স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা ব্যাপকভাবে গণ-জাগরণের উপরই নির্ভর করিতেছে। কঠোর বাস্তব অবস্থার তাড়নে এবং অ-বাঙালী প্রভুত্বের কষ্টকর পীড়নে ইসলাম রাষ্ট্রের মোহ সেদিন পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাঙিয়া যাইবে।

পরলোকে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়

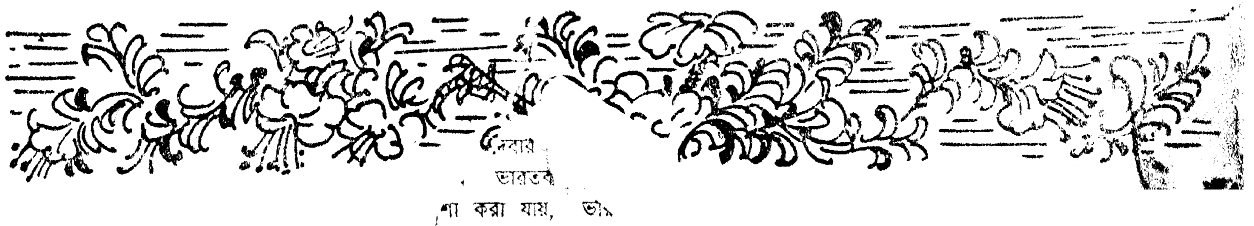
ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে বাঙলা দেশ সত্যকার একজন কৃতী সন্তানকে হারাইয়াছে। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ডাক্তার রায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, যক্ষ্মা রোগের তিনি সমগ্র ভারতের অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন; এই প্রতিষ্ঠানের শাখাস্বরূপে কার্শিয়াংয়ে যে হাসপাতালটি পরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মূলেও প্রধানত তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিনি অন্যতম অনুগত ছিলেন এবং তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যস্বরূপে এবং পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানস্বরূপে তিনি বিপুল কর্মশক্তি নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজনীতিকে প্রকৃতপক্ষে তিনি মুখ্যবৃত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুঃস্থ এবং পীড়িত মানবের নিরাতঙ্কের সেবার মধ্যেই ডাক্তার কুমুদশঙ্করের কর্মোদ্যম বিশেষভাবে পরিস্ফুর্ত হইত এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাধিত নরনারীর সেবার দিকেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠানুদিষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহা জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সাধনাকে স্মরণ করিবে। ডাক্তার রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গণতান্ত্রিকতার নূতন ব্যাখ্যা

জনাব লিয়াকৎ আলী খান পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী, বর্তমানে তিনি পাকিস্থান মুসলিম লীগেরও নিয়ামক পুরুষ। সেদিন তিনি প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থান ও মুসলিম অভিন্ন এবং পাকিস্থানের গণ-পরিষদ মুসলিম লীগের নির্দেশ সর্বদা অবিসংবাদিতভাবে শিরোধার্য করিয়া আসিতেছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ জনাব লিয়াকৎ আলী সাহেবের এই একটি উক্তির ভিতর দিয়াই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, মুসলমান ভিন্ন অপর কাহারও স্থান এই প্রতিষ্ঠানে নাই; সুতরাং একদলীয় এমন যে রাষ্ট্র, তাহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে একান্ত যাহারা মূর্খ, তাহাদের পক্ষেই শোভা পায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে তেমন রাষ্ট্রে সমানাধিকার লাভের প্রত্যাশা করা বাতুলতা বলিয়াই বিবেচনায় দাঁড়ায়। রাষ্ট্রে যেখানে সর্বজনীন অধিকার সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ নাই এবং গোষ্ঠীবদ্ধ শাসক-শ্রেণীই যেখানে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে জবরদস্ত একনায়কত্বেরই কার্যত প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র, সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্রবিজ্ঞান এখানে খাটে না, মিঃ লিয়াকৎ আলীর এই ধারণা। তাঁহার ধারণা এই যে, একনায়কত্বই তাঁহার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সত্যে সার্থকতা লাভ করিবে। মোস্লেম লীগ এবং পাকিস্থান রাষ্ট্র যদি অভিন্ন হয় এবং একই ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন, তবে একনায়কত্ব পাকিয়া উঠিবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি তেমন মেজাজের লোকই নহেন। পাকিস্থানের অধিবাসিগণ ইহা হইতে দৃঢ়তর আশ্বাস আর কি আশা করিতে পারেন? পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তথা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের মন ও মেজাজের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অনুকম্পার ছত্রচ্ছায়াতলে অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গরিমা আস্বাদন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থতা বোধ করুন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রতিকার

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন পূর্ববঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। তিনি আদর্শনিষ্ঠ কর্মী পুরুষ। সতীন্দ্রনাথ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে বাঙলা দেশ বহুদিন মুক্ত হইলেও উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার ভাব এখনও বর্তমান আছে এবং তাহা জাতি-গঠন কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া সতীনবাবু বলিয়াছেন—'বিরুদ্ধ শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা একরকম নিষ্ফল ও অগৌরবজনক মৃত্যু বরণ করিয়াছে। জীবন, ধন-সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর যদি তাহাদের মৃত্যু ঘটিত, তবে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিবর্তন ঘটিত।' সতীন্দ্রনাথের বেদনার গভীরতা আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মনের মূলে নৈতিক এই যে শক্তি, ইহা গড়িয়া তোলা যায় না; সেক্ষেত্রে জীবন্ত আদর্শের প্রেরণা থাকা দরকার। বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমষ্টি মনে যে আদর্শ সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়াছিল, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা মানিয়া লইবার পর তাহা ভাঙিয়া যায়—আশ্রয়ের মানসিক প্রতিবেশ জাতি হারাইয়া ফেলে। রাষ্ট্রের সহিত সাম্প্রদায়িকতাকে জড়াইবার দুর্বুদ্ধিই প্রধানত এক্ষেত্রে কাজ করে এবং পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িকতারই প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে দেখা দেয়। বস্তুত রাষ্ট্র-চেতনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে যাহারা জড়াইয়া পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহারাই বাঙলার বুকে আত্মঘাতী অনর্থের জন্য প্রধানত দায়ী। এই নীতির প্রতীক করিতো সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনমতকে জাগাইয়া তুলিবার বৃহত্তর আদর্শ জাতির সম্মুখে নেতারা যদি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন, তবে অনর্থ এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করিত না এবং নিদারুণ নৈতিক অবসাদও জাতিকে আচ্ছন্ন করিত না। ফলত সাম্প্রদায়িকতার পাপকে যদি সমূলে উচ্ছেদ করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হওয়াই প্রয়োজন এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হইতে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি দূর করা দরকার। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই স্থায়ী ফললাভ হইবে না এবং নৈতিক উপদেশেও যে বিশেষ কোন কাজ হইবে, আমরা ইহা মনে করি না।



দিবার

ভারতক

শা করা যায়, ভাঃ



কালোরাতের কবিতা

অজিত দত্ত

অন্ধকার নীরন্ধ্র কী হয়?
রাত্রেও তো তারা ফোটে, নিশা মেঘে বিদ্যুৎ তো রয়।

তমিস্র জীবনে তাই আজো বুঝি কভু স্বপ্ন দেখি,
অন্ধকার বর্তমানে দীপ জ্বালি এখনো সাবেকী।
যখনি শরতে আসে নীলাকাশ, ফাগুনে দখিনা,
মনের সে দীপে খুঁজি কাঙ্ক্ষিতার সাড়া পাই কিনা।
অকস্মাৎ হৃদয়ের আলোড়নে স্নেহস্পর্শ পেলে
এখনো উৎসাহে ডাকি—'এলে? তুমি এলে?'

জীবনের দিবা হলে শেষ
সূর্যের প্রখর আলো যখন নিঃশেষে নিরুদ্দেশ,
তখনো তো মনের পিপাসা
কেঁপে কেঁপে খুঁজে ফেরে চেনা মুখ, পরিচিত আশা।
তারা কি ফেরে না আর? মিছে কথা, কত শতবার
কত শুভদৃষ্টি মাঝে জীবনের ঘোচে অন্ধকার।
কত লগ্ন দর্পণের মত
পিছের আনন্দটিরে করে' তোলে মুহূর্তে জাগ্রত।

যেমন জীবন দিয়ে উষায় মধ্যাহ্নে দ্বিপ্রহরে
আলোরে বেসেছি ভালো, সেই তীব্র আসক্তি অন্তরে
আঁধারেও তেমনি উদ্দাম,
এখনো নক্ষত্র আছে, তুল্যহীন সে আলোরও দাম।
এখনো সমস্ত সত্তা আশা-প্রেম-স্বপ্ন স্মৃতিময়,
হীরক খচিত রাত্রি—সে কি কভু রন্ধ্রহীন হয়?

বৈদেশিকী

তিব্বত

তিব্বতের ভিতর সশস্ত্র চীনা অভিযানের সংবাদ চিন্তার কারণ হয়েছে। অনেকদিন যাবৎই থেকে থেকে চীনা সৈন্যের তিব্বতে প্রবেশের গুজব রটছিল বটে, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে, সেগুলো মিথ্যা। কিন্তু এবার গুজব নয়। সিকাং প্রদেশ থেকে তিব্বতের ভিতর সৈন্য প্রেরণের আদেশ যে পিকিং সরকার দিয়েছেন, সেটা পিকিংয়ের খবরেই প্রকাশ। ভারত গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে দুঃখিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন—একথা পিকিং গভর্নমেণ্টকে জানানো হয়েছে।

আশ্চর্য হবারই কথা, কারণ ভারতে সকলেই আশা করেছিল যে, চীন-তিব্বত সমস্যা আপোষেই মিটে যাবে। বিশেষ করে একটি তিব্বতী প্রতিনিধিদল চীনা সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য পিকিং অভিমুখে যাত্রা করছেন বলে যখন সকলে জানে, তখন [illegible] চীন সরকার তিব্বতের মধ্যে সৈন্য প্রবেশের হুকুম দেবেন, এটা কেউ ভাবেনি। তবে এ ব্যাপারের সব দিককার খবর হয়ত সাধারণের জানা নেই। আপোষ-আলোচনা চালাবার বিষয়ে তিব্বতী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত গুরুতর গাফিলতি কিছু ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত [illegible] না। যাই হোক, তিব্বতের [illegible] সরকারের বর্তমান ব্যবহারে ভারতবর্ষ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। তিব্বতের উপর চীনের আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকার অস্বীকার না করেও ভারতবর্ষ চেয়েছে যে, তিব্বতের স্বাধিকার-অটোনমি বজায় থাকে। তিব্বত চীনের সঙ্গে বিবাদ করে কখনই টিকতে পারবে না, কিন্তু তিব্বতবাসীদের জীবনযাত্রার উপর চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাও কাম্য হতে পারে না। পিকিং কর্তৃপক্ষের মনে হয়ত একটা সন্দেহ আছে যে, তিব্বতের বর্তমান কর্তাদের সঙ্গে চীনের শত্রুদের যোগাযোগ আছে। কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণ থেকে তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমেরিকার সাহায্য চাওয়ার কথা কখনো কখনো শোনা গিয়েছে বটে, কিন্তু ভৌগোলিক কারণে সে কথায় বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হয় না। তবে পিকিংয়ের মন যে এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এটা দুঃখের কথা। কারণ ভারতবর্ষের এই আশা ছিল যে, পিকিং সরকারের মনে আমেরিকার প্রতি যে সন্দেহ আছে, সেটার চেয়ে চীনের প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের সুস্পষ্ট সৌহার্দ্যের মূল্য বেশি হবে।

তিব্বতের ভিতর চীনা অভিযানের সংবাদে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব দেখা যাচ্ছে। তিব্বতের উপর এই হামলা করার দরুণ চীনের উপর চটে গিয়ে ভারতবর্ষের একেবারে খোলাখুলি ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দিয়ে ফেলা উচিত—এই রকম একটা প্রচারের প্রয়াস চলছে! এরকম মন্তব্যও শোনা যাচ্ছে যে, চীনের এই ব্যবহার পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে ভীষণ অপমানকর। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এ-ব্যাপারটাকে ঠিক ইঙ্গ-মার্কিন চোখ দিয়ে দেখতে রাজি হচ্ছেন না। তিব্বতে চীনা সৈন্যের অভিযান তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ করছেন না, ভারত গভর্নমেণ্টের অসন্তোষ পিকিংয়ে জানানোও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই ব্যাপার নিয়ে এখনই হন্তদন্ত হয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতি বদলে দিতে হবে, তার কোন মানে নেই। রুশ বা ইঙ্গ-মার্কিন কোন ব্লকেরই সামিল না হয়ে যেখানে যেটা উচিত মনে হবে, সেখানে সেটার সমর্থন করাই ভারত গভর্নমেণ্টের বর্তমান পররাষ্ট্র-নীতির মূলকথা। এই স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি ত্যাগ করার কোন কারণ উপস্থিত হয়নি। বরঞ্চ এ বিষয়ে আরও সতর্ক হয়ে ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার প্রয়োজন বেড়েছে বলেই মনে হয়।

এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে, তাতে তিব্বতে এখনো বিশেষ কোন যুদ্ধ হয়েছে বলে জানা যায়নি। চীনের সিকাং প্রদেশ তিব্বতের পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত। এইখান থেকেই চীনা সৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এই প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে অনেকে কিন্তু তিব্বতীজাতীয়। দলাই লামার প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাসিত পাঞ্চেন লামার পক্ষপাতী অনেক লোক সিকাংয়ে বাস করে। সিকাং থেকে যদি চীনা সৈন্যবাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করে থাকে, তবে তার মধ্যে তিব্বতীজাতীয় লোকও থাকা সম্ভব, সুতরাং চীনা অভিযানকে তিব্বতের 'ঐক্য ও মুক্তি'র অভিযানরূপে চিত্রিত করা কঠিন হবে না। এখন পর্যন্ত কোন সামরিক সঙ্ঘর্ষের খবর আসেনি, তিব্বতী সৈন্যেরা নাকি কেবল পিছু হটে আসছে। চীনা সৈন্যেরা তিব্বতের রাজধানী লাসার ২৫০ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে বলে খবর আসছে। তবে তিব্বতের এই অভিযান সংক্রান্ত কোন খবরই খুব সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। আর এক খবর শোনা যাচ্ছে যে, দলাই লামা ইতিমধ্যেই দেশত্যাগ করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এর মধ্যেই-বা কতটুকু সত্য আছে, তা কে জানে। তবে তিব্বতের এই ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষকে ভয় লাগিয়ে দেবার খুব একটা চেষ্টা চলছে। সে বিষয়ে ভারতবর্ষের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আশা করা যায়, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কগণ মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেশকে ঠিকপথে পরিচালিত করতে পারবেন।

'সুদূর প্রাচ্য'

কোরিয়াতে উত্তর কোরিয়ানরা যেখানে সম্ভব এখনো যথাসাধ্য ইঙ্গ-মার্কিণ-দক্ষিণ কোরিয়ানদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। অবশ্য এই অসম যুদ্ধের ফল যা হবার হয়েছে ও হবে। কিন্তু কোরিয়ায় শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হবার আশা কম। উত্তর কোরিয়ানরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়। বহু ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য যে দীর্ঘকাল কোরিয়াতে থাকবে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নতুন করে দশ হাজার বৃটিশ সৈন্য কোরিয়াতে পাঠানো হচ্ছে। মার্কিন সৈন্যের তো কথাই নেই।

আমেরিকা কোরিয়াকে আলাদা করে দেখে নি। কোরিয়া, ফরমোজা, ইন্দোচীন—সবগুলিই মার্কিন নীতির চক্ষে একসূত্রে গাঁথা। এ বিষয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থারের যে মত, আমেরিকার গভর্নমেণ্টের সেই মত। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ওয়েক দ্বীপে এসে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। জেনারেল ম্যাকআর্থারের পূর্বেকার দু-একটা খোলাখুলি কথায় 'হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেল' এই ভয় করে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে একটু প্রতিবাদের মত করতে হয়েছিল। ম্যাকআর্থারের কোরিয়া-বিজয়ের পর তাঁকে আর পায় কে? কোরিয়া তো হস্তগত হয়েইছে, ফরমোজাকে সুরক্ষিত করা চলছে। যারা বলেছিল যে, ম্যাকআর্থারী নীতির ফলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে—চীনের সঙ্গে, এমন কি, রাশিয়ার সঙ্গেও সঙ্ঘর্ষ বেঁধে যাবে—তারা এখন বুঝুক যে, তারা কত নির্বোধ। জোর দেখিয়েই না রাশিয়া এবং চীনকে চেপে রাখা গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার 'আত্মরক্ষার' জন্য কোরিয়া চাই, ফরমোজাও চাই, ইন্দোচীনও চাই—কারণ স্থলভাগ থেকে বিপদ নিবারণ করতে হলে ইন্দোচীন নিরাপদ হাতে থাকা দরকার। সুতরাং হো-চি-মিনের উচ্ছেদ করতেই হবে। সম্প্রতি নাকি হো-চি-মিনের সৈন্যেরা ফরাসীর বাহিনীকে বেশ একটা ঘা দিয়েছে। মার্কিন সাহায্য ব্যতিরেকে ফরাসীদের ইন্দোচীনে টিকে থাকার যেমন কোন সম্ভাবনা নেই, তেমনি পুরোদমে যদি ফরাসীদের পক্ষে মার্কিন সাহায্য আসে, তবে হো-চি-মিন সারা জীবন যুদ্ধ করেও ইন্দোচীনকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, এরোপ্লেন ইন্দোচীনে পৌঁছতে শুরু করেছে। দরকার হলে মার্কিন সৈন্যও যে পৌঁছবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩০।১০।



গালব ও মাধবী

সুবোধ ঘোষ

সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন এবং কত সহস্র প্রার্থীকে গো, ভূমি, কাঞ্চন ও শস্য দান করেছেন কাশীশ্বর রাজা যযাতি! তাঁর কাছে দানই হলো মানলাভের একমাত্র ব্রত এবং মানই হলো মানব-জীবনের একমাত্র পুণ্য।

পুণ্যের প্রয়োজন হয়েছে রাজা যযাতির: কারণ তিনি সেই সব রাজর্ষির মধ্যে স্থান-লাভ করতে চান, যাঁরা পুণ্যবলে স্বর্লোকে অধিষ্ঠান লাভ করেছেন। এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু কবে এ-স্বপ্ন সফল হবে? কবে যাবেন স্বর্লোকে? কবে হবে সময়, কবে আসবে সুযোগ?

বৈভব ক্ষয় হয়ে গেছে অনেক, কিন্তু ক্ষয় হয়নি তাঁর আরও দান করবার স্পৃহা। রত্নাগার শূন্য হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো শূন্য হয়নি তাঁর আরও মান লাভের আকাঙ্ক্ষা। কারণ, দানের গর্বে ও গৌরবে তিনি সব রাজর্ষির মহিমা খর্ব করে দিতে চান। স্বর্লোকের রাজর্ষিদের মধ্যে একজন সাধারণ হয়ে নয়—অসাধারণ হয়ে, প্রধান হয়ে এবং সর্বোচ্চ হয়েই তিনি আসন লাভ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তাই সব চেয়ে বেশি পুণ্যবল সঞ্চয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছেন রাজা যযাতি।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সভাকক্ষে বসে-ছিলেন রাজা যযাতি। তখনো প্রার্থীর সমাগম আরম্ভ হয়নি।

সভাকক্ষের চারদিকে তাকালেই বোঝা যায়, রাজা যযাতির মনে দান করার আকাঙ্ক্ষা যত বড়, দান করার মত রাজৈশ্বর্য ও শক্তি ততটা নয়। রাজছত্রে মৌক্তিক গুচ্ছ নেই, রাজদণ্ড মণি-বিচিত্রিত নয়। সিংহাসনে নেই হেমকান্তি-রুচিরতা, মর্মরশিলায় রচিত স্তম্ভে ও বেদিকায় নেই বিদ্রুমশোভা। নেই চারণ-সুন্দরীর শ্রোত্রহারী গীতস্বর, নেই চঞ্চরীক-নয়না চামরগ্রাহিণীর চারুকটাক্ষ। সিংহাসনের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র অন্তরগর্ভিত বর্তিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির আভা যযাতির মুকুট স্পর্শ করে, কিন্তু রত্নহীন সে মুকুট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না।

সভাকক্ষে প্রথম প্রবেশ করলেন এক তপস্বী। রাজা যযাতি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে তপস্বীকে দান করার জন্য বলেন—দান গ্রহণ করুন যোগীবর।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন—আমি বিষয়ী নই রাজা যযাতি, তাম্রমুদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।

রাজা যযাতি পরক্ষণে ভূর্জপত্র ও লেখনী হাতে নিয়ে বললেন—তবে আপনাকে একখণ্ড ভূমি দান করি। দানপত্র লিখে দিই।

তপস্বী আবার আপত্তি করেন—আমি গৃহী নই রাজা যযাতি, আমার কোন ভূমি-খণ্ডের প্রয়োজন নেই।

এক মুষ্টি যবকণা তুলে নিয়ে রাজা যযাতি বলেন—তবে এগিয়ে আসুন যোগীবর, আপনার ঐ চীরবস্ত্রের অঞ্চল বিস্তারিত করুন। আপনাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শস্য দান করি।

তপস্বী বলেন—শস্যকণায় আমার প্রয়োজন নেই।

যযাতি—তবে কি চান আপনি? বলুন, আপনাকে কি বস্তু দান করবো?

তপস্বী—যদি নিতান্তই দান করতে চান, তবে আমাকে আপনার সভায় কিছুক্ষণ উপবেশন করতে অনুমতি দান করুন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে বলেন—আসন গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু দানেই আপনি পরিতুষ্ট হবেন যোগীবর? আমার কাছ থেকে আর কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবার নেই?

আসন গ্রহণ করার পর তপস্বী বলেন—আমি আপনাকে একটি দিব্য লোকনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি রাজা যযাতি। যদি শ্রবণ করেন, তবেই আমার ওপর অনেক অনুগ্রহ করা হবে।

যযাতি—বলুন যোগীবর।

তপস্বী—পুণ্যার্জন লোকজীবনের একটি লক্ষ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু স্মরণে রাখবেন, পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই।

যযাতি—আপনার উপদেশের তাৎপর্য বুঝলাম না যোগীবর।

তপস্বী—মহৎ পন্থা ছাড়া মহদভীষ্ট লাভ হয় না রাজা যযাতি। সদাচরণে সদ্বস্তু, সম্মানের পথে সম্মান লাভ হয়, অন্যথায় হয় না।

যযাতি—কেন হয় না?

তপস্বী—যেমন মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পুষ্পদ্রুম মঞ্জুরিত হয় না, হয় বসন্তানিলের মৃদুল স্পর্শে। নিষাদের প্রজ্বলন্ত মশালের আভায় নিদ্রিত বিহঙ্গ জাগে না রাজা যযাতি, জাগে প্রাচীপটে অভ্যুদিত নবার্কের আলোকা-প্লুত ইঙ্গিতে। শোণিতজলা বৈতরণীর তরঙ্গে স্বর্ণমরাল কেলি করে না, তার জন্য চাই মানস-হ্রদের স্বচ্ছোদক।

যযাতি—শুনলাম যোগীবর।

তপস্বী—স্মরণে রাখবেন মহারাজ।

যযাতি—বনবাসীর লোকনীতি বনের জীবনেই সত্য হতে পারে যোগীবর। নৃপোত্তম যযাতির পক্ষে এমন নীতি স্মরণ করে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। সঙ্কল্প যে-কোন পন্থায়

সিদ্ধ করাই রাজসিক ধর্ম। যদি একটি বিষদিগ্ধ শরের আঘাতে হত্যা করে মাতঙ্গের মস্তকমৌক্তিক লাভ করা যায়, তবে কোন্ মূর্খ শতবর্ষ প্রতীক্ষায় থাকে, কবে কোন্ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পুলকিত জ্যোতির আবেদনে সে গজমৌক্তিক আপনি স্খলিত হবে বলে? পাতাল-ভুজঙ্গের চক্ষু অন্ধ করে দিয়ে যদি ফণামণি লাভ করা যায়, তবে শতবর্ষ ধরে নাগপূজা করার কি সার্থকতা?

তপস্বী আর প্রত্যুত্তর দিলেন না। গাত্রোত্থান করলেন এবং রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা যযাতি লক্ষ্য করলেন, সভা-প্রান্তে আর একজন প্রার্থী এসে বসে আছে, কান্তিমান এক ঋষিযুবা।

যযাতি আহ্বান করেন—আপনার কি প্রার্থনা নিবেদন করুন ঋষি।

ঋষিযুবা বলেন—আমি অর্থের প্রার্থী মহারাজ।

রাজা যযাতি এক শত তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে বলেন—গ্রহণ করুন ঋষি।

ঋষিযুবা হেসে ফেলেন—ঐ যৎসামান্য অর্থের প্রার্থী আমি নই কাশীশ্বর রাজা যযাতি।

যযাতি—বলুন, আপনার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

ঋষিযুবা—নিশাকরসদৃশ শুভ্রদেহ এবং শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত অশ্ব সংগ্রহ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাই আমাকে দান করুন।

ঋষিযুবার কথা শুনে রাজা যযাতির হর্ষোৎফুল্ল বদন মুহূর্তের মধ্যে বিষন্ন হয়ে ওঠে। বৈভবহীন কাশীশ্বরের রত্নাগার শূন্য করে দিলেও নিশাকরসদৃশ শুভ্রদেহ ও শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত দুর্লভ অশ্ব ক্রয় করার মত অর্থ হবে না। ঋষি হয়েও এমন বিরাট পরিমাণ অর্থ প্রার্থনা করে, কে এই ঋষি?

রাজা যযাতি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি ঋষি।

ঋষিযুবা—আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব।

রাজা যযাতি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান এবং আগ্রহাকুলিত স্বরে বলেন—আপনি বিশ্বামিত্র আশ্রমের বিখ্যাত জ্ঞানী গালব?

গালব—আমাকে জ্ঞানী গালব বলে সম্বর্ধনা করবেন না রাজা যযাতি। এমন সম্মানিত সম্ভাষণে আমার অধিকার এখনো হয়নি। আমি এখনো ঋণমুক্ত হতে পারিনি।

যযাতি—কিসের ঋণ?

গালব—গুরুঋণ। গুরুকে এখনও ...ণা দান করতে পারিনি। জ্ঞানী গাল... নামে মর্ত্যলোকে খ্যাত হবার মত ...রবের অধিকারী হতে পারবো না, যতদিন গুরুকে দক্ষিণা দান করে মুক্ত হতে না পারি।

যযাতি—শুনেছি, বিশ্বামিত্রের মত উদার-স্বভাব তপোধন শিষ্যের একটি মাত্র প্রণামেই তুষ্ট হয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশী বা অন্য কোন দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করেন না।

গালব—গুরু বিশ্বামিত্র আমার কাছে কোন দক্ষিণা চাননি রাজা যযাতি। আমিই তাঁকে দক্ষিণা দিতে চেয়েছি, কারণ আমি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চাই না। গুরু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আমিও যথোচিত দক্ষিণাদানে তাঁর গুরুত্বের মূল্য শোধ করে দেব। আমারই নির্বন্ধাতিশয়ে গুরু আমার কাছে দক্ষিণা গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন।

যযাতি—কি দক্ষিণা চেয়েছেন আপনার গুরু?

গালব—পূর্বেই বলেছি মহারাজ, চন্দ্র-প্রভোপম সিতদেহ এবং এক কর্ণ শ্যামবর্ণ, এইরূপ অষ্টশত অশ্ব।

যযাতি—কি দারুণ দক্ষিণা! গুরু আপনার ওপর অদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন ঋষি।

গালব—হ্যাঁ রাজা যযাতি, আমার নির্বন্ধাতিশয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আমাকে বিড়ম্বিত করার জন্যেই এইরকম দুঃসংগ্রহণীয় দক্ষিণা চেয়েছেন।

যযাতি হতাশকুণ্ঠিত স্বরে বলেন—ঋষি গালব, ধনপতি কুবের ছাড়া বোধ হয় এমন ঐশ্বর্যশালী নৃপতি খুব কমই আছে, যাঁর পক্ষে এইরকম অষ্টশত অতিদুর্লভ সুজাত অশ্ব সংগ্রহের মত উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ দান করা সহজসাধ্য। আমার পক্ষে তো অসাধ্য।

গালব—শুনেছিলাম, আপনি দানের গৌরবে গরীয়ান হয়ে স্বর্লোকের সকল রাজর্ষির মধ্যে মানীশ্রেষ্ঠ হবার সংকল্প করেছেন।

যযাতি—হ্যাঁ ঋষি, এই সংকল্পই আমার জীবনের স্বপ্ন।

গালব—আপনার এই স্বপ্ন সফল করার সুযোগ আমি এনেছি রাজা যযাতি। বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের প্রার্থনা আপনি পূরণ করতে য...া পারেন, তবে আপনার খ্যাতি সকল দানীর ...শীত ছাড়িয়ে উঠবে। আপনি মানীশ্রেষ্ঠ ...ত পারবেন, আপনি স্বর্লোকের সকল ...জর্ষির মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করতে পারবেন।

যযাতি—আপনি মিথ্যে বলেননি ঋষি।

গালব—তা হলে অবিলম্বে আমার প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করুন।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজা যযাতি। ঋষি গালবের প্রার্থনা পূরণ করতেই হবে। মানী-শ্রেষ্ঠ হবার সুযোগ এসেছে এতদিনে, এ সুযোগ বিনষ্ট হতে দিতে পারবেন না। প্রার্থী গালব ঋষি যদি আজ বিমুখ হয়ে চলে যান, দানশক্তিহীন যযাতির অপবাদ রটিত হয়ে যাবে ত্রিভুবনে। স্বর্গে যাবার পথ অবরুদ্ধ হবে চিরকালের মত। মানহীন সে জীবনের চেয়ে বেশী অভিশপ্ত জীবন আর কি হতে পারে?

কিন্তু উপায়? উপায় খুঁজছিলেন রাজা যযাতি। সঙ্গত বা অসঙ্গত, সৎ বা অসৎ, কুট কিংবা সরল, করুণ অথবা নির্মম—যে কোন উপায়ে তাঁকে আজ তাঁর দানশীল জীবনের গর্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর যযাতি বলেন—আমার রত্নাগার যদিও শূন্য, কিন্তু আমার প্রাসাদে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে ঋষিবর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আশা করি, আপনার প্রার্থনা পূরণ করতে পারবো।

সভাগৃহ ছেড়ে ব্যস্তভাবে রাজা যযাতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

রাজা যযাতির কাছে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আশ্বস্ত মনে শূন্য সভাগৃহের একপ্রান্তে বসে রইলেন গালব। এতদিনে গুরু-ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানীগালব নামে যশস্বী হতে পারবেন, কল্পনা করতেও তাঁর অন্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। ত্রিভুবন জানবে, ঋষি গালব এক অতিকঠিন ও অসাধ্যপ্রায় দক্ষিণা দান করে গুরুদত্ত জ্ঞানের মূল্য শোধ করে দিয়েছে। গালবের কীর্তিকথা প্রতি জনপদের চারণের মুখে সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হবে। গালবও বিশ্বাস করেন, ত্রিলোকের জনসমাজে মানী হওয়াই একমাত্র পুণ্যকর্ম এবং মানবলই একমাত্র পুণ্যবল।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে ধন্য হচ্ছিলেন গালব। কাশীশ্বর যযাতির কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছেন। এই বৈভবহীন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে, সেই রত্ন দান করবেন যযাতি। দুর্লভ রত্নের বিনিময়ে অষ্ট-শত দুর্লভ অশ্ব সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। সভাগৃহের প্রান্তে বসে অধীর আগ্রহে রাজা যযাতির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন ঋষি গালব।

চমকে উঠলেন গালব। শূন্য সভাগৃহ যেন হঠাৎ পরিমলবিধুর বাতাসের স্পর্শে সুগন্ধিত হয়ে উঠেছে। সভাগৃহে প্রবেশ করছেন রাজা যযাতি, তাঁর সঙ্গে পুষ্পাভরণে ভূষিতা এক কুমারী। মঞ্জুলগতি সে নারীর পায়ে নূপুর আছে, কিন্তু তার পদচ্ছন্দে নূপুর নিক্কণিত হয় না। শুধু যেন সৌরভ স্ফুরিত আর বর্ণ-বিকশিত ক'রে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত এক নারীর মূর্তি রাজা যযাতির সঙ্গে সভাগৃহে এসে ব্রীড়াকুণ্ঠিত হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা যযাতি বললেন—ঋষি গালব, আমার এই একটিমাত্র রত্ন আছে, আমার কন্যা মাধবী। এছাড়া আপনাকে দান করার মত আর কোন রত্ন নেই।

রত্ন? ঋষি গালব তাঁর দুই চোখের দৃষ্টিতে সুতীব্র কৌতূহল নিয়ে কুমারী মাধবীর দিকে তাকিয়েছিলেন—কোথায় রত্ন?

রত্নের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলেন না গালব। যযাতি-নন্দিনী মাধবীর কুন্তলস্তবক থেকে পদনখশোভা পর্যন্ত কোন রত্ন-ভূষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নূপুরগুলি পর্যন্ত স্বর্ণনির্মিত নয়, কতগুলি স্বর্ণযূথিকার কোরক যেন সেই রূপমতী তরুণীর কিশলয়কোমল চরণের প্রণয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে আছে, তাই শব্দ করতে পারে না।

যযাতি বলেন—আমার এই রত্নকে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম ঋষি। আপনি তৃপ্ত ও তুষ্ট হউন। আমার দান সিদ্ধ হউক এবং আমার দানবলে অর্জিত পুণ্যের জোরে আমি স্বর্গে গিয়ে রাজর্ষির মধ্যে আমার কাঙ্ক্ষিত স্থান গ্রহণ করি।

যযাতি-নন্দিনী মাধবী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং গালবকে প্রণাম করে। কিন্তু গালব বিব্রত ও বিচলিতভাবে যযাতিকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনি আমাকে অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন বঞ্চিত করছেন রাজা যযাতি? আমি অর্থ প্রার্থনা করেছি, আমাকে অর্থ দান করুন। পুষ্পান্বিতা বনলতার মত সুন্দর অথচ মূল্যহীন এই কুমারীকে দানস্বরূপ গ্রহণ করে কি লাভ হবে আমার?

যযাতি দুঃখিতভাবে বলেন—চন্দ্রমণির চেয়েও রূপপ্রভাশালিনী এই কন্যাকে মূল্যহীন কেন মনে করছেন ঋষি? এই ভুবনের যে-কোন দিক্‌পাল নরপতি তাঁর রত্নাগারের বিনিময়ে আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

—পিতা!

আনতমুখী মাধবী হঠাৎ মুখ তুলে পিতা যযাতির মুখের দিকে তাকায়। মাধবীর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক, অসিতনয়নে যেন চকিত বিদ্যুতের জ্বালা, এবং ভীরু ভ্রূলতায় যেন খর গ্রীষ্মবায়ুর আঘাত এসে লেগেছে।

রাজা যযাতির কথার তাৎপর্য এতক্ষণে স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে কুমারী মাধবী, ঐ সুকঠোরহৃদয় তরুণ ঋষির কাছে তাঁর আদরিণী কন্যাকে সম্প্রদান করছেন না পিতা যযাতি। একমুষ্টি তাম্রমুদ্রা অথবা যবশস্যকণা হাতে তুলে নিয়ে প্রার্থীকে যেমন অকাতরচিত্তে দান করেন দাতা যযাতি, এ দানও তেমনি। এ দানের অনুষ্ঠান যযাতিনন্দিনী মাধবীর পতিলাভের আয়োজন নয়, ঋষি গালব শুধু দাতা যযাতির কাছ থেকে মূল্যবান একটি বস্তু লাভ করছেন, যে বস্তুর বিনিময়ে রত্ন ও অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

—কিসের জন্য এবং কার কাছে আমাকে এভাবে দান করছেন পিতা?

প্রশ্ন করতে গিয়ে বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে কুমারী মাধবীর চক্ষু। এই তো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত আগে তার কুমারী জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে যেন এক পরিণয়োৎসবের আলিম্পিত অঙ্গণভূমিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধবী, গালব নামে কুবলয়নয়ন ঐ পুরুষপ্রবরের বরতনু বরণ করার জন্য। কিন্তু বৃথা, সে কল্পনা ক্ষণিকের মরীচিকার ছবি মাত্র।

শান্তস্বরে এবং অবিচলিতভাবে রাজা যযাতি প্রত্যুত্তর দেন—প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারি না কন্যা। কাশীশ্বর যযাতির কাছ থেকে দান চেয়েও প্রার্থী ফিরে গেছে দান না পেয়ে, এ অপযশের চেয়ে আমার কাছে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি কম ক্লেশকর। রাজা যযাতি যদি সবচেয়ে বড় দানবলে সবচেয়ে বেশী মানী ও পুণ্যবান হয়ে স্বর্গলোকের রাজর্ষিদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ না করতে পারে, তবে সে যযাতির জীবনে শত ধিক্। সারা জীবন ধরে, প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে লালিত আমার আকাঙ্ক্ষাকে আজ বিফল করতে পারি না তনয়া। ঋষি গালব আমার কাছে অর্থ প্রার্থনা করেছেন গুরু-দক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হবার জন্য, আমিও অর্থের পরিবর্তে তোমাকে ঋষি গালবের হস্তে প্রদান করে দায়মুক্ত হতে ও আমার দান-গৌরব রক্ষা করতে চাই। বৈভবহীন এই যযাতিকে মমতাহীন পিতা বলে মনে করো না কন্যা। এই পিতৃহৃদয়কে কুলিশবৎ কঠোর করে, আমার সকল মমতার মণিকাঞ্চনরূপিণী তোমাকে আজ অর্থীর হস্তে পণ্যবস্তুর মত প্রদান করতে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কন্যা, আমার এই ত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ—আমার এই দানের চেয়ে বেশী দুঃসাধ্য দান আর কি হতে পারে?

মাথা হেঁট করে মাধবী। বাষ্পায়িত চক্ষু আবার শুষ্ক হয়ে ওঠে। আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা হয় না। পিতা যযাতির কুলিশবৎ দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় স্পষ্ট করেই পেয়ে গেছে মাধবী।

অন্য কথা ভাবছিল মাধবী। সূর্যালোক-স্নাত নব দেবদারুর মত যৌবনসজ্জিত দেহ-শোভা নিয়ে যে ঋষির মূর্তি নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, তার সংকল্পও কি কুলিশবৎ কঠোর? ঐ বিস্তৃত বক্ষোপটের অন্তরালে কি অনুরাগ নেই? ঐ ফুল্ল কমলসদৃশ চক্ষু দুটি কি অকারণেই নীলিম হয়ে আছে? যযাতিতনয়া মাধবীর প্রণামের অর্থ বুঝতে পারবে না, সে কি এমনই অবুঝ? যে নারীকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত সুন্দর মনে হয়েছে, তাকে কি সত্যই মূল্যহীন মনে করতে পারে এই মনসিজগঞ্জনা সুন্দরেশ্বর?

কিন্তু, নিজেরই মনের মোহে আর এক মরীচিকার ছবি কল্পনায় দেখছিল মাধবী। পরক্ষণেই সে ছবি যেন এক তপ্ত ধূলিবাত্যার তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। কথা বললেন ঋষি গালব।

—নারীর রূপযৌবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই রাজা যযাতি। চন্দ্রমণিসম রূপশালিনী নারী আমি চাই না কাশীশ্বর, আমি চাই চন্দ্রমণি। আমি গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হতে চাই, তার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাই। এ ছাড়া অন্য কোন দানে আমি তৃপ্ত হতে পারবো না কাশীশ্বর। যদি আপনার কন্যা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি আপনার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষার জন্য এই ভুবনের যে কোন দিক্‌পাল নরপতির কাছ থেকে আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এনে দেবেন, তবেই আমি আপনার কন্যাকে সমুচিত মূল্যযুক্ত দান বলে গ্রহণ করতে পারি, নচেৎ পারি না।

—ঋষিবর!

যযাতিতনয়া মাধবী মুখ তুলে ঋষি গালবের দিকে তাকায়। মৃদুভাষিণী কুমারী মাধবীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে চমকিত ঋষি গালবও ক্ষণিকের মত অপ্রস্তুত হয়ে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাধবী বলে—আমি ভার নিলাম ঋষি, আপনার প্রার্থিত অর্থ সংগ্রহের দায় আমি নিলাম।

গালব বলেন—তথাস্তু। আমি আপনার দান গ্রহণ করলাম রাজা যযাতি। আপনি যশস্বী হউন।

পিতা যযাতিকে প্রণাম করে মাধবী বিদায় নেয়। কুণ্ঠাহীন ও স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে সভা গৃহ ছেড়ে ঋষি গালবের সঙ্গিনী হয়ে চলে যায়।

নৃপতি দিবোদাসের প্রাসাদ। স্ফটিক শিলায় নির্মিত চূড়া দূর থেকে পথিকের চক্ষে সূর্যাংশুগঠিত দণ্ডের মত প্রতিভাত হয়। মরকতে মণ্ডিত স্তম্ভাবলী, ও প্রবালখচিত সোপানশ্রেণী। রত্নাঢ্য রাজা দিবোদাস কুবেরের ঈর্ষা সমুৎপন্ন করে রাজসিক ঐশ্বর্যে সমাসীন হয়ে আছেন।

দিবোদাসের স্ফটিকশিলার প্রাসাদ হতে কিঞ্চিৎ দূরে সীধুগন্ধ বকুলে আকীর্ণ একটি উদ্যান, মাঝে মাঝে নীলাংগী অতসী ও কুন্দবৃন্তা পারুলের কুঞ্জ। তারই মধ্যে প্রিয়ঙ্গুলতিকায় মণ্ডিত অতিথিবাটিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে ঋষি গালব ও তাঁর সাথে যযাতিনন্দিনী মাধবী।

গালব ও মাধবী, একজন শুধু অর্থের প্রার্থনা এবং আর একজন অর্থদানের প্রতিশ্রুতি মাত্র। এ ছাড়া দু'জনের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। বৈভবশালী রাজা দিবোদাসের কাছে অর্থ সংগ্রহের আশায় এসেছে মাধবী, এবং গালব এসেছেন সে অর্থ গ্রহণের আশায়।

এই মাত্র পরস্পরের বন্ধন। তবু যখন গালব ও মাধবী দু'জনে অতিথিবাটিকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকে, উদ্যানের বকুলসৌরভ অকস্মাৎ মদিরতর হয়ে ওঠে, প্রিয়ঙ্গুলতিকা হঠাৎ আন্দোলিত এবং [illegible] কৃষ্ণবৃন্তা পারুল শিহরিত হয়। ভুল করে উদ্যানের প্রণয়-প্রগল্ভ লতা কিসলয় ও পুষ্পের দল, কিন্তু করেনি ভুল গালব ও মাধবী।

এখনো সেদিন রাজা দিবোদাসের সভায় গিয়ে অর্থ প্রার্থনা করে মাধবী। অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজা দিবোদাস মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু ততোধিক মুগ্ধ হলেন পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত কমনীয় মাধবীর যৌবনবিন্দুর অঙ্গশোভা দেখে। যযাতিতনয়ার প্রার্থিত অর্থ দান করবেন, কথা দিয়েছেন রাজা দিবোদাস, কিন্তু বিনিময়ে...।

কিন্তু অসম্ভব, রাজা দিবোদাসের অনুরোধ রক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়স্কর। সে ভয়ংকর অনুরোধের কথা শুনে যযাতিনন্দিনী মাধবীর সকল দুঃসাহস স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দিন যায়, অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ঋষি গালব। এখনো রাজা দিবোদাসের কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থ আনতে পারেনি মাধবী। অথচ লক্ষ্য করেন গালব, মাধবী যেন দিন দিন আরও অন্যমনা ও উদাসীন হয়ে পড়ছে। কখনো বা লক্ষ্য করেছেন, কুঞ্জের অন্তরালে শীতভীরু মল্লিকার মত যেন মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মাধবী। সুপ্তির মাঝখানে হঠাৎ জাগরিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করেছেন গালব, তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কে যেন তার পরাগবাসিত চেলাঞ্চল আন্দোলিত করে এতক্ষণ ব্যাজন করছিল তাঁকে, হঠাৎ অন্তর্হিত হলো। উদ্যানের তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকাশের চন্দ্রের দিকে যখন তাকিয়েছেন গালব, তখনো অনুভব করেছেন, যযাতিনন্দিনী মাধবী তার অসিত-নয়নের নিবিড়দৃষ্টি তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করে নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে।

ভীত, বিরক্ত এবং আরও অস্থির হয়ে উঠেছেন গালব। কি চায় মাধবী? কৈতবিনী এই নারী কি বিশ্বামিত্র শিষ্য গালবকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করতে চায়? পিতা যযাতির দানগৌরব বিনষ্ট করতে চায়? নিজ মুখে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চায়? নইলে, নিঃসম্পর্কিতা এই নারী ঋষি গালবের সঙ্গে প্রিয়াসুলভ লীলা-কলাপের প্রয়াস করে কেন?

গালব বলেন, আমি আর অপেক্ষায় থাকতে পারি না মাধবী, আমার প্রার্থিত অর্থ এনে দাও। এবং তুমি দায়মুক্ত হয়ে তোমার পিতার কাছে ফিরে যাও, আমিও গুরুদক্ষিণা দান করে আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

মাধবী—কেন গালব?

চমকে উঠলেন গালব। সন্দেহ নেই, সকল কুণ্ঠা ও লজ্জা বর্জন করে যযাতিকন্যা আজ প্রণয়াভিলাষিণী প্রিয়ার মতই মধুর সম্ভাষণে গালবকে ডাকছে।

গালব—ভুল করো না মাধবী। প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন করা ছাড়া আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করো না। নারী-প্রেমের চেয়ে লোকসম্মান আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

মাধবী—এমন নির্মম কথা বলো না গালব। তোমার প্রেমিকা মাধবীর দিকে একটি মুহূর্তের জন্যও মুগ্ধ হয়ে তাকালে তোমার সম্মান নষ্ট হবে না।

গালব—তা হয় না মাধবী।

মাধবী—তোমার শুভার্থিনী ও কল্যাণ-কামিকা, তোমার চরণে প্রণামলুব্ধা এই মাধবীর জন্য একটুও মমতা, একটুও লোভ হয় না গালব?

গালব—ক্ষমা করো কাশীশ্বর কন্যা, এমন লোভে আমার প্রয়োজন নেই।

মাধবীর কণ্ঠস্বর পরুষ স্পর্শে আহত বীণাতন্ত্রীর মত বেজে ওঠে—দুঃসাহসী ঋষি, সন্ধ্যাকাশের ঐ সুন্দর শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে জোর করে বল দেখি, কোন প্রয়োজন নেই।

গালব—প্রয়োজন নেই যযাতিনন্দিনী মাধবী।

শান্তস্বরে মাধবী বলে—কথা দিলাম গালব, আজই নিশাবসানের পূর্বে তুমি তোমার প্রার্থিত অর্থ পাবে।

গালব—তোমার কল্যাণ হউক্।

মধ্য রাত্রি, নিশাবসানের এখনো অনেক বাকী। উদ্যানের কোকিল কূজন বন্ধ করেছে। অতিথি বাটিকার নিভৃতে একাকী বসেছিলেন গালব, গন্ধতৈলের প্রদীপে আলোকশিখার চাঞ্চল্য ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না। মাধবী গেছে রাজা দিবোদাসের স্ফটিক-শিলার প্রাসাদে, প্রার্থিত অর্থ নিয়ে আসতে।

অকস্মাৎ রত্ননূপুরের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে অতিথি বাটিকার নিভৃত। বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় গালব, মাধবী এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মূর্তি নয়, অমরেশ্বর ইন্দ্রের অলকাপুরীর এক শতরত্ন-ভূষিতা প্রমোদপ্রমদার মূর্তি।

অট্টহাস্যনাদে বিস্মিত গালবকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে মাধবী প্রশ্ন করে—দেখ ঋষি, চিনতে পার কি?

গালব—চিনেছি।

মাধবী—পুষ্পাভরণে ভূষিতা সেই মাধবীকে এখন এই রত্নভূষণে বেশী সুন্দর মনে হয় কি?

গালব—না।

মাধবী—বেশী মূল্যবতী মনে হয় কি?

গালব—মনে হয় বৈকি।

মাধবী—তোমারই পায়ে প্রণমাননতা সেই মাধবীকে এখন আরও বেশী সম্মানিকা মনে হচ্ছে কি ঋষি?

গালব নিরুত্তর থাকেন এবং দৃষ্টি নত করেন। মাধবী যেন তার নারীজীবনের এক সুগভীর বেদনাকে বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করার জন্য আরও তীক্ষ্ম অট্টহাস্যে বলে ওঠে—চোখ তুলে তাকান ঋষি, বলুন দেখি, এ নারীকে দেখে লোভ হয় কি না?

তবু নিরুত্তর থাকেন ঋষি গালব। মাধবী বলে—আপনার লোভ না হোক্, রাজা দিবোদাস লুব্ধ হয়েছেন। তিনি আজ আমাকে তাঁর রাজশ্রীরূপে গ্রহণ করবেন। এই রত্নভূষণ তাঁরই উপহার, আজ আমার স্থান রাজা দিবোদাসের বৈদূর্যখচিত শয়নপর্যঙ্কে।

যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন ঋষি গালব এবং মাধবীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

অট্টহাসিনী প্রগল্ভা মাধবী হঠাৎ একবার বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত যেন যন্ত্রণায় ছটফট্ করে ওঠে, তারপরেই দু'হাতে চক্ষু আবরিত করে উদ্গত অশ্রুধারা নিরোধের জন্য। পরমুহূর্তে দুর্বলা লতিকার মতই ঋষি গালবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।—একবার লুব্ধ হও ঋষি, মুগ্ধ হও নিমেষের মত। কাশীশ্বর যযাতির দান এই কুমারীর অনুরাগ প্রতিদানে সম্মানিত কর ঋষি সুকুমার! এখনো সময় আছে, কথা দাও তুমি, তাহ'লে এই মুহূর্তে এই রাজশ্রীর রত্নাভরণ দিবোদাসের সম্মুখে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসি।

গালব—তার পর?

মাধবী—তারপর এ ভুবনে শুধু আমরা দু'জন।

গালব—তা হয় না মাধবী। জ্ঞানী গালব তার প্রখ্যাতি ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না, গুরু-দক্ষিণা দানে অপারগ গালব জীবনব্যাপী অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। বেঁচে থাকলেও সে অপবাদের জ্বালা যযাতিকন্যার বিম্বাধরের চুম্বনে শান্ত হবে না।

মাধবী শান্তভাবে উঠে দাঁড়ায়, এবং অবিচলিতস্বরে বলে—ঠিকই বলেছ গালব। তোমার জীবনের শান্তি ও সম্মান নষ্ট করতে পারি না। দয়িতের সুখের জন্য প্রণয়িনী নারী মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভাগিনী যযাতিনন্দিনী না হয় একটি রাত্রির মত মৃত্যু বরণ করবে। শান্ত হও গালব, গুরুদক্ষিণার জন্য প্রার্থিত অর্থ পাবে। আমি যাই, নিশাবসানে আবার দেখা হবে।

মাধবী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

ঈপ্সিত অর্থ পেয়েছেন গালব। গুরুদক্ষিণা দান করে সসম্মানে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। জ্ঞানী গালবের সুকীর্তিকথা দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে গেছে।

দায়মুক্ত হয়েছেন কাশীশ্বর যযাতি। জ্ঞানী গালবের মত ঋষির প্রার্থনা যিনি পূরণ করতে পেরেছেন, তাঁর দানের গৌরববার্তা স্বর্লোকের রাজর্ষি সমাজেও পৌঁছে গেছে।

আর মাধবী? মাধবী ফিরে এসেছে বৈভবহীন রাজা যযাতির আলয়ে।

কিছুদিন হলো ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাজা যযাতি। আর বিলম্ব করতে পারেন না। দানীশ্রেষ্ঠ নামে সর্বখ্যাত যযাতি স্বর্লোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

রাজা যযাতির বৈভবহীন এই মর্ত্য প্রাসাদের জীবনে একটি মাত্র কর্তব্য যা বাকী আছে, তাই পালন করার আয়োজন করলেন, স্বর্গধামে যাবার আগে। কন্যা মাধবীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদানের জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করলেন।

মাধবীর স্বয়ংবর সভা! সংবাদ শুনে এবং আয়োজন দেখে মাধবী তার কক্ষের নিভৃতে অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছতে গিয়েও হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। কোথায় তার স্বয়ং এবং কোথায়ই বা বর? যার জীবনের কোন ইচ্ছার সম্মান কেউ দিল না, যার প্রথম কামনার বরমালা দলিত করে চলে গেছে জীবনের বাঞ্ছিত, তার জন্যে স্বয়ংবর সভার চেয়ে বধ্যমঞ্চের প্রয়োজন বরং বেশি।

মনে পড়ে, ঋণমুক্ত হয়ে গালব তার গৃহাশ্রমে চলে গেছে। সম্মান ও শান্তি এসেছে তার জীবনে। ভালই হয়েছে। কিন্তু একবারও কি সেই কমলনয়ন তরুণ জ্ঞানীবরের মনে এ প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর আর কারও কাছে তার কোন ঋণ রয়ে গেল কি না?

দিবোদাসের স্ফটিকপ্রাসাদে একটি নিশীথের ঘটনা মনে পড়ে মাধবীর। এ স্মৃতি সহ্য করতে পারে না, গৃহের নিভৃত হতে ছুটে এসে প্রাসাদের বাইরে উপবন-বীথিকার কাছে দাঁড়ায়। চোখে পড়ে, তারই স্বহস্তে রোপিত সেই শিশু রক্তাশোক অযত্নে শীর্ণ হয়ে গেছে। ভৃঙ্গারক বারিপূর্ণ করে নিয়ে এসে রক্তাশোকমূলে জলসেক দান করে মাধবী।

তবু বুঝতে পারে মাধবী, তার নয়নভৃঙ্গারকের বারিধারা থামছে না। কাকে প্রশ্ন করবে মাধবী, যযাতিনন্দিনী তার প্রেমাস্পদের শান্তি আর সম্মান রক্ষার মোহে যে কাজ করেছে তার কি ক্ষমা নেই? এই শিশু রক্তাশোকের মুখে যে ভাষা নেই, নইলে জিজ্ঞাসা করা যেত, সত্যিই কি ঘৃণ্য হয়ে গেছে মাধবী এক স্ফটিকপ্রাসাদের লালসার কক্ষে ধনাঢ্য নরপতির নৈশবিলাসে তার কুমারীদেহ উপঢৌকন দিয়েছে বলে?

জগৎ ঘৃণা করুক মাধবীকে, কিন্তু জগতের মধ্যে একজন তো ঘৃণা করতে পারে না। কারণ, আর কেউ না জানুক, সেই তো জানে, কেন ও কিসের জন্য কিসলয়শুচি কিশোরিকা মাধবী তার রূপযৌবন আসঙ্গলিপ্সু এক পরপুরুষের কাছে নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। যযাতিকন্যার সেই ভয়ংকর আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্থলাভ করে ঋণমুক্ত হয়েছে যে জ্ঞানী গালব, সে কি আজও ঘৃণা করে দূরে সরে থাকবে? মাধবীর স্বয়ংবর সভার সংবাদ কি সে এখনো শুনতে পায়নি? কোথায় তুমি গালব, এস তোমার কুবলয়সদৃশ নীলনয়নের তরুণদ্যুতি নিয়ে। তোমারই জন্য সমর্পিত তনুমনপ্রাণ, তোমারই জন্য পাপিনী, যযাতিকন্যা মাধবীকে উদ্ধার করে তোমার জীবনসহচরী করে নিয়ে যাও। তুমি তো এখন ঋণমুক্ত, শান্ত সম্মানিত ও সুখী—তবে এখন এই বৈভবহীন প্রাসাদ থেকে পুষ্পালিতা ব্রততীর মত মূলহীনাকে উদ্ধার করে নিয়ে তোমার প্রেমের স্পর্শে অমূল্য করে তুলতে বাধা কই?

উপবন বীথিকার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় মাধবী, প্রাসাদের দূর দক্ষিণে কলস্বরা এক স্রোতস্বতীর কূলে শ্যামদূর্বাদলে আকীর্ণ প্রান্তরে স্বয়ংবর সভার হর্ষ জেগে উঠেছে। চন্দ্রাতপের বর্ণশোভা দেখা যায়। শোনা যায়, সভায় সমাগত রূপমতী যযাতিকন্যার পাণিপ্রার্থী প্রিয়দর্শন রাজপুত্র ও বীরোত্তম সকলের বিশ্রান্ত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।

অস্তাচলের পথে ধাবমান অপরাহ্ণের রক্তাভ সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মাধবীর অসিতনয়নশ্রী। তবু যেন একটা ক্ষীণাশার গুঞ্জরণ ক্লান্ত নূপুরের মত মাধবীর মনের নেপথ্যে বাজে—সে কি আজও না এসে থাকতে পারবে? যযাতিকন্যার সেই প্রণমিত আত্মনিবেদনের কথা কি সে ভুলে গেছে? অঋণী, মানী ও জ্ঞানী গালব কি অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

কিন্তু আর এই নিভৃতে উপবন বীথিকার শিশু রক্তাশোকের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবনা করার সময় ছিল না। পিতা যযাতি এসে আহ্বান করলেন এবং স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে রাজা যযাতির অনুগমন করে স্বয়ংবর সভায় এসে দাঁড়ালো মাধবী।

বরমালা হাতে তুলে নিয়ে সভার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অসিতেক্ষণা মাধবীর দৃষ্টি কিছুক্ষণের মত কাকে যেন অন্বেষণ করে। কিন্তু কুবলয়নয়ন কোন স্নিগ্ধদর্শন তরুণ ঋষির মূর্তি কোথাও দেখা গেল না। নবীনকুসুমে গ্রথিত বরমালা কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রগণের পংক্তি পরিক্রম করে মাধবী। কোন দিকে এব কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। শুধু এগিয়ে যেতে থাকে পুষ্পান্বিত ব্রততীর মত সুচারু দেহা যযাতিনন্দিনী। রাজা যযাতি কন্যা অনুসরণ করে চলতে থাকেন। বাদ্যের উল্লাস দিগ্‌বায়ু প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

অগ্রসর হতে হতে সভার শেষপ্রান্তে গি একবার ক্ষণিকের মত দাঁড়ালো মাধবী। অ এগিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না, কারণ ত পরেই স্রোতস্বতীর সুতরল জলরেখা, ওপা তৃণপ্রান্তর এবং তার পরে বনভূমির আরম্ভ

সুহরিৎ বনশীর্ষে অস্তোন্মুখ সূর্যে লোহিতাভ বেদনার ছায়া পড়েছে। যযাতিক মাধবী বরমালা ছিন্ন করে ভূতলে নিক্ষেপ ক এবং স্বয়ংম্বর সভার শেষ প্রান্ত পার হ স্রোতস্বতীর কূলে এসে দাঁড়ায়।

যযাতি চীৎকার করে ডাকেন—কোথায় য মাধবী?

মাধবী—অরণ্যের ক্রোড়ে।

যযাতি—রাজপ্রাসাদের মেয়ের অরণ্যে প্রয়োজন?

মাধবী—ক্ষমা কর পিতা, ক্ষমা কর আমাকে তোমার রাজপ্রাসাদ আর রাজাজন অরণ্যই আমার যথার্থ আশ্রয়।

আমাকে তোমার রাজপ্রাসাদ আর রাজজনপ

স্রোতস্বতীর ক্ষীণ জলরেখা পার শরাহত হরিণীর ত্রস্তগতি ছায়ার মত, পিছনের যত করাল দান-মান-পুণ্যের অরণ্যের দিকে চলে গেল মাধবী। ? নামে, অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় ন

কাশীশ্বরের প্রাসাদ শূন্য। দাতা য স্বর্লোকে গিয়ে পুণ্যশীল রাজর্ষি স উচ্চাসন অধিকার করেছেন। পুণ্যহীনা ম গেছে বনে।

এ-বনে দাবানল নেই। মাসান্তের পর তারপর বৎসরান্ত। বৈশাখী রক্ত-পুষ্প পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেখা দেয়। কিন্তু বরবর্ণিনী সেই য নন্দিনী মাধবীর কর্ণে ও কবরীতে কুসুমের স্তবক আর শোভিত হতে দেখ না। চিকুর-নিকুরম্ব হয়েছে কঠিন জা কণ্ঠাভরণ হয়েছে একটিমাত্র রুদ্রাক্ষের মা উপবাস, বল্কলবাস এবং অধোশয্যা, যৌবনের সকল অভিমান ক্লিষ্ট করে, ব্রত-পূজা ও তপস্যায় দাবানলহীন এই দিনযামিনীর প্রতিটি মুহূর্ত সার্থক মাধবী এবং তার অন্তরের নিভৃতে এক ব বিদগ্ধ সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে। রাজপ্র পুণ্যতত্ত্ব কোনদিন বুঝে উঠতে পারেনি মাধবী, সেই মাধবী আজ তার বন তপস্বিনীর জীবনে উপলব্ধি করেছে—হীন চিত্তের এই আনন্দই তো পুণ্য। অ

সকল ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে, আজও বিস্মৃত হয়নি মাধবী সেই পরিচিত মুখগুলি—সুন্দর ও অসুন্দর, রূঢ় ও কোমল। সেই আঘাত ও অপমানের সকল ইতিহাস আজও স্মরণ করতে পারা যায়। কিন্তু স্মরণ করলেও রাগ, দ্বেষ, অভিমানের কোন সাড়া জাগে না মাধবীর মনে। সিদ্ধসাধিকা মাধবীর ভাবনা আজ নিঃশেষে বেদনাহীন হয়েছে, কারণ ক্ষয় হয়ে গেছে সকল কামনা।

সেদিন দিবাবসানের পর বনসরসীর জলে স্নান সমাপণ করে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল মাধবী, তখন দেখতে পায়, ঊর্ধ্বাকাশ হতে যেন একটি নক্ষত্র স্খলিত হয়ে ভূপতিত হলো। এ-দৃশ্য দেখে দুঃখিত হয় মাধবী। কে জানে, কোন্ মহাজনের পুণ্য ক্ষয় হয়েছে, তারই লক্ষণ। পরক্ষণে শুনতে পায় মাধবী, কোলাহল জেগেছে জনপদে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকে মাধবী। তার পরেই বনাধিষ্ঠাত্রীর পূজো সমাপন করে এবং ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ বনপথ ধরে অগ্রসর হয়ে বনের উপান্তে এসে দাঁড়ায়। তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে এবং জনপদের সকল কোলাহল ধ্বনিও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে।

ঊষা সমাগমে আলোকিত হয়ে ওঠে প্রাচীপট কাশীশ্বর যযাতির কক্ষে পরিত্যক্ত রাজ-প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে আজ একজন ভল্লধারী দ্বারী দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। ফিরে এসেছেন রাজা যযাতি; পুণ্যক্ষয়ে আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত স্বর্গ হতে স্থানচ্যুত হয়েছেন রাজা যযাতি।

স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছেন কাশীশ্বর যযাতি। স্বর্লোকাশ্রিত দেব-মানব ও রাজর্ষির কেউ কাশীশ্বর যযাতিকে পুণ্যবান বলে স্বীকার করেন নি। যযাতির দান যথার্থ দান নয়, যযাতির পুণ্য যথার্থ পুণ্য নয়। যযাতির সকল প্রখ্যাতি বিনষ্ট হয়েছে, কারণ স্বর্লোকের রাজর্ষি সমাজ এতদিনে জানতে পেরেছেন, কি উপায়ে রাজা যযাতি জ্ঞানী গালবের প্রার্থনা পূরণ করেছেন। ধিকৃত, নিন্দিত ও অবমানিত রাজা যযাতি স্বর্গ হতে ফিরে এসে বিষণ্ণ-বদনে সভাগৃহে একাকী বসেছিলেন। মানের গর্ব অপহৃত হয়েছে, দানের গৌরব চূর্ণ হয়েছে।

সভাগৃহে প্রবেশ করলেন চীরধারী এক তপস্বী। রাজা যযাতি বিস্মিত হয়ে দেখলেন—সেই তপস্বী।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন—আজ আমি আবার আপনাকে সেই লোকনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি কাশীশ্বর।

যযাতি—বলুন যোগীবর। আমার এই মানহীন ও পুণ্যহীন দগ্ধমরুবৎ জীবনের শান্তির জন্য আপনার সান্ত্বনা দান করুন।

তপস্বী—সর্বলোকনীতির সারভূত এই সত্যবাদে আজ বিশ্বাস করুন রাজা যযাতি। পুণ্যোর্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই। আপনি কর্মব্রতের এই নীতি অস্বীকার করেছেন, তাই আপনার অভীষ্টি সিদ্ধ হয়নি।

যযাতি—বিশ্বাস করি তপস্বী। কিন্তু পুণ্যভ্রষ্ট ও মানহীন জীবনের গ্লানি নিয়ে আর বেঁচে থাকতে চাই না যোগীবর।

তপস্বী করুণামিশ্রিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে বলেন—কিন্তু আর একটি কথা বিশ্বাস করবেন কি কাশীশ্বর?

যযাতি—অবশ্যই বিশ্বাস করবো তপস্বী।

তপস্বী—আজ আপনার যথার্থ প্রখ্যাতি ত্রিভুবনে রটিত হয়েছে।

যযাতি—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না যোগীবর।

তপস্বী—যে সিদ্ধসাধিকা পুণ্যবতী মাধবী আজ আবির্ভূতা হয়ে আপনার এই রাজ্য ও জনপদ ধন্য করেছে, আপনি যে তারই পিতা কাশীশ্বর। এই সম্মানের গৌরব নিয়েই আপনি পুনরায় স্বর্গে গমন করুন, রাজর্ষি সমাজ আপনাকে সাগ্রহে ও সানন্দে স্থান দান করবেন।

রাজা যযাতি চীৎকার করে ওঠেন—আমার বনবাসিনী কন্যা মাধবী, সে কি বেঁচে আছে?

তপস্বী সভাগৃহের দ্বারপ্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন—সে আপনার কাছেই এসে গেছে কাশীশ্বর।

কাশীশ্বর যযাতি ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, মূর্তিমতী পুণ্যশিখার মত তপস্বিনী মূর্তি মাধবী দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি ব্যাকুল পদক্ষেপে পিতা যযাতি ছুটে গিয়ে মাধবীকে বক্ষোলগ্ন করলেন। কন্যার শির চুম্বন করে অশ্রুসিক্ত চক্ষে যযাতি বলেন—ক্ষমা করো কন্যা। যে অপমান ও তুচ্ছতার জ্বালা নিয়ে এ-প্রাসাদ বর্জন করে অরণ্যের আশ্রয় নিয়েছিলে, সে-জ্বালা আজ আমাকে দান করো।

পিতা যযাতিকে প্রণাম করে মাধবী বলে—আমার তপশ্চর্যার পুণ্য লও পিতা।

তপস্বী আনন্দধ্বনি করেন—আপনার সকল অখ্যাতি ঘুচে গেল কাশীশ্বর। আপনি স্বর্গ-ধামে গমন করুন। আর বিলম্ব করবেন না।

পিতা যযাতিকে প্রণাম করে মাধবী বিদায় নেয়। সভাগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে রাজা যযাতি কন্যা মাধবীর শির চুম্বন করে বিদায় দান করেন। তপস্বীও বিদায় নেয় রাজা যযাতিকে আশীর্বাদ দান করে।

স্বর্গধামে প্রস্থানের পূর্বে শূন্য সভাগৃহে প্রসন্ন অন্তরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা যযাতি। তাঁর শিক্ষা আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দিব্য লোকনীতির সারভূত সত্য আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

আর একটু বিলম্ব করতে হলো রাজা যযাতিকে। সুন্দরদর্শন এক তরুণ ঋষি-যুবা অকস্মাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করেন। রাজা যযাতি সবিস্ময়ে দেখেন, জ্ঞানী গালব এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। উদ্‌ভ্রান্ত, অশান্ত দাবানলতাড়িত প্রাণীর মত বেদনার্ত দৃষ্টি, জ্ঞানী গালব বলেন—জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য আপনি গ্রহণ করুন রাজা যযাতি। আমি পুণ্যহীন হতে চাই।

যযাতি— কেন ঋষি গালব?

গালব—জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য তার জীবনের অভিশাপ হয়েছে রাজা যযাতি। শান্তি পাই না কাশীশ্বর, পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত শুচিস্মিতা এক নারীর মুখচ্ছবি ভুলতে পারছি না। তার দুটি অসিতনয়ন আমারই মূঢ়তার আঘাতে অশ্রুসিক্ত হয়েছে। চাই না মান, চাই না পুণ্য, আজ আমি এক পুণ্যহীনা নারীর বরমাল্য লাভ করে ধন্য হতে চাই।

যযাতি—কার কথা বলছেন জ্ঞানী গালব?

গালব—যযাতি-কন্যা মাধবীর কথা।

যযাতি সস্নেহ স্বরে বলেন— তার কথা জিজ্ঞাসা করে আপনার কোন লাভ হবে না জ্ঞানী গালব।

গালব—কেন কাশীশ্বর, সে যে আমারই দয়িতা।

যযাতি—বড় দেরি করে ফেলেছেন জ্ঞানী গালব।

গালব আর্তনাদ করে ওঠেন—এমন নির্মম কথা বলবেন না রাজা যযাতি, বলুন মাধবী কোথায়?

যযাতি বলেন—ঐ যে তৃণাঞ্চিত প্রান্তর দেখতে পাচ্ছেন, তারই শেষ প্রান্তে এক বিষণ্ণ অপরাহ্ণের আলোকে ক্ষণিকের মত দাঁড়িয়ে, স্বয়ংবর সভার হর্ষ স্তব্ধ করে দিয়ে, নিজের হাতে বরমাল্য ছিন্ন করে এবং ভূতলে নিক্ষেপ করে চলে গেছে মাধবী।

সভাগৃহ ছেড়ে ধূলিলিপ্ত পথের ওপর এসে দাঁড়ায় গালব। তারপর অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তৃণাঞ্চিত প্রান্তরের শেষ প্রান্তে স্রোতস্বতীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়। দিগ্‌ভ্রান্তের মত কি যেন অন্বেষণ করতে থাকে গালব।

বোধ হয় ছিন্ন বরমাল্যের একটুকু অবশেষ খুঁজছিল গালব। কিন্তু অনেক অন্বেষণের পর দেখতে পেলেন গালব, স্রোতস্বতীর তটলগ্ন দূর্বাদলের ওপর কোন্ তপস্বিনীর একটি রুদ্রাক্ষের মালিকা পড়ে আছে।

রুদ্রাক্ষের মালিকার দিকেই তার শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো গালব। প্রেমিকার চিতাবশেষ অঙ্গারখণ্ডের দিকে প্রেমিক যেমন স্তব্ধ দৃষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

জীবনের সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে যে সংখ্যাতীত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বহু সঙ্কল্প এবং পরিকল্পনা যেমন কার্যে পরিণত হ'তে পারেনি, তেমনি এমন অনেক কিছু ব্যাপার শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে যার মূলে কোনোদিন কোনো প্রেরণা ছিল না; এমনকি, হয়ত ঔদাসীন্য অথবা অনিচ্ছাই ছিল। স্মৃতিকথা নাম দিয়ে যে লেখা আজ আরম্ভ করলাম তা যদি কোনোদিন সত্য সত্যই পরিণতি লাভ করে, তা হ'লে তা শেষোক্ত শ্রেণীরই আর একটি দৃষ্টান্ত ব'লে পরিগণিত হবে, সে কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

জীবনী অথবা জীবনকথা পড়তে আমার ভাল লাগে, কিন্তু লিখতে একেবারেই না। নিজের ত কথাই নেই, অপরেরও নয়। নিজের জীবনী লেখবার কথা মনে হ'লে, মনে হয়, সে যেন কতকটা নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই ক'রে যাওয়ার মতো হবে। অপরের লিখতে সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। যে মানুষ সারা জীবন কল্পনার রেখাঙ্কনের উপর শিল্পকলার রঙ চড়িয়ে নরনারী সৃষ্টি করে করে হাত পাকালে, অথবা কাঁচালে, সে যদি হঠাৎ একদিন রক্তমাংসে গঠিত অরুণকান্তি সরকারের জীবন চরিত লিখতে ব'সে নিজের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কল্পনার রঙের পাত্রে তুলি ডুবিয়ে অরুণকান্তির উপর এক পোঁছ অন্যতর রঙ চড়িয়ে অরুণকান্তিকে তরুণকান্তি ক'রে বসে তা হ'লে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। সুতরাং কোনো অরুণকান্তি সরকারের জীবনী লেখবার প্রস্তাবে সঙ্কোচ এসে কখনো যদি আমাকে বাধা দিয়ে থাকে, তা হ'লে সে সঙ্কোচকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

আমার জীবনে একবার মাত্র এমনি একটা সঙ্কোচ আসবার কারণ ঘটেছিল প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর। শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয়, আবাল্য বন্ধু; আমাদের উভয়ের গার্হস্থ্য এবং সাহিত্য জীবনের একটা বিশেষ অংশ একত্রে এক গৃহে অতিবাহিত হয়েছিল; বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সকল কারণ বশতঃ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। একটি বড় প্রকাশকের পক্ষ থেকে এজন্য লোভনীয় পারিশ্রমিকের প্রস্তাবও আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু পাছে জীবনীর মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া করতে গিয়ে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া ক'রে বসি, সেই ভয়ে ঐ প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হইনি।

অনেকের মতে আমার জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই মতের সহিত আমার মতেরও খানিকটা ঐক্য যে নেই, তা নয়। অবশ্য এভারেস্টের শিখরে আরোহণ করিনি, আর সাগরগর্ভের সুগভীর অতলেও ডুব মারিনি; কিন্তু এই দুই চূড়ান্তের মধ্যস্থলে যে বিশাল সমতল ভূমি আছে, তার একটা অংশে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে সে কথা অস্বীকার করতে পারিনে। এই সকল অভিজ্ঞতা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেছে-বুছে একটা কোনো পদার্থ খাড়া করবার জন্য যে-সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এখন কোনো সুদূর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গৌরবজনক পদ অধিকার ক'রে আছেন, এবং অপর একজন এই কলিকাতা নগরেই উত্তরোত্তর সাহিত্য প্রতিষ্ঠা অর্জন, এবং সাহিত্য-পণ্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রে চলেছেন। তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতেও এত বিলম্ব ক'রে ফেলেছি যে, এখন যদি তাঁরা ব'লে বসেন, 'কই, এমন অনুরোধ আমরা করেছিলাম বলে ত মনে পড়ে না', তা হলে তাঁদের দোষ দিতে পারব না।

স্মৃতিকথা লেখবার পূর্বে একটা কথা স্বীকার ক'রে রাখছি যে, যে-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে স্মৃতিকথা লেখবার কথা, সেই স্মরণশক্তিরই আমার যথেষ্ট দৈন্য আছে। শুধু যে আজই আছে, তা নয়; চিরকালই ছিল। স্কুল কলেজে অধ্যয়নকালে ইতিহাস আমার ভাল লাগত না তার নাম-স্থান আর তারিখের কণ্টকাকীর্ণতার জন্যে। শিবাজী মহারাজ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ কথাটা আমার কাছে মুখ্য ছিল না; আমার কাছে মুখ্য ছিল, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে ছাত্রকে ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, তার পক্ষে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দই মুখ্য কথা। শিবাজী যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতেন, তা হ'লে সে ছাত্রের পক্ষে কোনো আপত্তিই থাকত না, যদিও আমার পক্ষে থাকত; কিন্তু যে মুহূর্তে শিবাজী জন্মগ্রহণ করলেন, সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে শিবাজীর জন্মগ্রহণের সন-তারিখ হ'ল অপরিহার্য জিনিস,—কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে ভুলে-না-যাবার অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু। এমন অনেক সুখময় দিনের স্মৃতি আমার মনে সুস্পষ্ট হয়ে আছে, যার সন-তারিখ সম্পূর্ণ ভুলে মেরে দিয়েছি। কিন্তু তার জন্য মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

তাহারে বাসিয়াছিনু ভাল,
সে কথায় পূর্ণ আছে মন।
কোন্ সনে কি তারিখে বাসিয়াছিলাম,
সে প্রসঙ্গে কি-বা প্রয়োজন!

সন-তারিখ যে আমার মনের মধ্যে দয়া ক'রে দল বেঁধে বসবাস করছে না, সেজন্য আমি তাদের কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিবৃন্দের চিত্তজগৎ তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত, এবং যথার্থই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান। সুতরাং আমার মতো অর্বাচীন লোকের চিত্তে তাদের স্থান না হ'লে দুঃখ করবার কিছু নেই।

আর একটা কথা। এই স্মৃতি-কথা লিখতে আমি সময়ের ক্রমিকতা কঠোরভাবে মেনে চলব না। আমরা যখন একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন বিভিন্ন চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে সময়ের ক্রম ধ'রে আসে না,—আসে এলোমেলো ক্রমে: এক বিষয়বস্তু থেকে অপর বিষয়বস্তুতে চিন্তা যায় অনেক সময়ে অনন্তরের প্রণালী ডিঙিয়ে। স্মৃতিকথা লিখতে আমি অনুসরণ করব সেই অলস চিন্তারত মনের পদ্ধতি। ১৩৫০ সালের কথা লিখে চুকেছি বলে ১৩৩০ সালের কথা পুনরায় লিখব না, এমন দুর্বলতা আমার লেখার মধ্যে দেখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কথা লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্রের কোনো কথা যদি অনিবার্য বেগে মনের রুদ্ধ দ্বারে এসে ধাক্কা মারে, তা হ'লে হয়ত দুয়ার খুলে তাকে অভ্যর্থিত ক'রে নেবো; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কোনো এক প্রবলতর কথা অলক্ষিতে স্মৃতিমন্দিরে ঢুকে পড়ে, তা হ'লে সে কথাকে প্রথম প্রাধান্য দেবো না এমন কথাও বলতে পারিনে।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোনো ঐতিহাসিক অথবা জীবনীকার যদি আমার এ লেখা থেকে তাঁদের লেখার মাল-মশলা সংগ্রহ করতে ইতস্তত করেন, তা হলে ক্ষুণ্ণ হব না। কিন্তু রসিক পাঠকের কানে কানে ব'লে রাখি, তাঁরা যেন এ কথায় সত্য সত্যই বিচলিত না হন্। আমার এ লেখায় কাহিনী-অংশ যতটুকু থাকবে তা হবে একান্ত নির্ভরযোগ্য; আর, সন-তারিখ যেখানে যতটুকু পাওয়া যাবে তা যদি একান্ত নির্ভরযোগ্য না-ও হয়, তথাপি নির্ভুলতার যথাসাধ্য কাছাকাছি যাবে, এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। অর্থাৎ, কোনো ঘটনা যদি গ্রীষ্মকালের ঘাম-ঝরা দিনে ঘ'টে থাকে ত বড়-জোর তাকে বসন্তকালের ফুল-ফোটা দিনে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাই ব'লে শীতকালের পাতা-ঝরা দিনে কখনো নয়। আর, কাহিনীর বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কাহিনী আমি যথাযথভাবেই বিবৃত করব,—কিন্তু তাতে যদি সাহিত্যের একটু রসান চ'ড়ে

বসে, তা হ'লে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেই রসানকে ক্ষমা করবেন, যেমন তাঁরা ক্ষমা করেন উৎকৃষ্ট কড়া-পাকের বরফি সন্দেশের উপরকার রূপালি পাতকে। রূপালি পাতের দ্বারা সন্দেশের শোভা বাড়ে, কিন্তু স্বাদ কমে না।

আমাদের সংসারে বস্তুর উপর এইরূপ রঙ চড়ানোর প্রথা অনেক ব্যাপারেই প্রচলিত আছে। স্বর্ণকার সোনার অলংকারের উপর রঙ চড়ায়। তামা ও পিতলের সামগ্রীর উপর সোনা, রূপা ও নিকেলের জল চ'ড়ে গৃহের চতুর্দিকে উজ্জ্বল হ'য়ে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের সভ্যতার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের বেশ-খানিকটা অংশ অসত্যের বাণী অধিকার ক'রে সমস্ত জিনিসকে মোলায়েম ক'রে থাকে। নিমন্ত্রণ গৃহে কদর্য খাদ্য আহার ক'রেও আমরা প্রসন্নমুখে বলি, খাশা খাওয়া গেল! ক্রোড়পতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে করজোড়ে আবাহন ক'রে বলেন, আমার গরিবখানায় পদার্পণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবেন; আপনার দৌলতখানার কুশল ত? যদিও ক্রোড়পতি নিজেই অবগত আছেন যে, দৌলতখানায় দু-বেলা ঠিক-মতো অন্ন জুটছে না। শুধু বাজনেই আমরা ফোড়ং দিইনে, ব্যঞ্জনেও দিই। বৈষ্ণবপদকর্তার আসল পদের উপর আখর চড়িয়ে আমরা কীর্তন-গান করি। পদ যদি হয়, 'মনের বেদনা মরমীয়া জানে সই'—কীর্তন গায়ক তার উপর আখর চড়ান, 'এ আট পশুরীর মন নয়ক', ষোড়শী-কিশোরী মন।'

রঙ-চড়ানোর এরূপ দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে রাশি রাশি ছড়িয়ে আছে। এ সকল যখন সহ্য করে, এমন কি ভাল লাগার, অভ্যাস আমাদের আছে, তখন আশা করি আমার স্মৃতিকথায় যদি সামান্য একটু সাহিত্যের রঙ প্রকাশ পায়, তা হ'লে খুব বেশি আপত্তিকর হবে না।

যাঁরা গুরুপাক গাঢ় দ্রব্যের খদ্দের, যাঁরা প্রজ্ঞামদিরার পিপাসু, তাঁরা আমার স্মৃতিকথার মধ্যে তাঁদের পছন্দসই পাকা মালের সন্ধান পাবেন কি না বলতে পারিনে, কারণ জীবনে তেমনভাবে সাধুসংগ করবার সুযোগও পাইনি, দুস্তর মরু-পর্বত অতিক্রম ক'রে দুর্গম তীর্থ-ভ্রমণও করিনি, আর, ভারতবর্ষের সীমান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে দেশ-বিদেশের চিন্তানায়কগণের সহিত জগৎ-তত্ত্ব ও বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে সুনিবিড় আলাপ-আলোচনাও চালাইনি। যাঁরা হাল্কা রসের রসিক, অতি-প্রত্যুষের সুমিষ্ট খেজুর রস—যা মত্ততা আনে না, কিন্তু তৃপ্তি দেয়—যাঁরা অবহেলা করেন না, আমাদের প্রতিদিনকার সামান্য এবং সংকীর্ণ জীবন-পরিধিও সমগ্র বিশ্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের জন্য আমার এই লেখা। দুনিয়া এমনই আজব জায়গা যে, এমন অনেক ঘটনাও ঘটা সম্ভব যা হনলুলু অথবা ক্যামাস্কাটকায় না ঘ'টে আমাদের এই নগণ্য বাঙলা দেশে ঘটলেও আমাদিগকে পুলকিত করে, এমন কি, সেই ঘটনাগুলিকে স্মৃতিকথার অন্তর্ভুক্ত করলেও গুরুতর অপরাধ হয় না।

২

মানুষের স্মৃতি জীবনের কত সুদূর অতীত পর্যন্ত পরিচালিত হ'তে পারে, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য কি, তা আমি জানিনে। কিন্তু অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে, সে-সব দিনের কিছু কিছু কথা, যখন আমার বয়স ছিল তিন কিম্বা সাড়ে তিন বৎসর। তার পূর্বের কোন কথাই তেমন মনে পড়ে না, একমাত্র জননীর স্নেহনিষিক্ত মুখাবয়ব ছাড়া। প্রতিদিন নিয়মিত বেশ-কিছুক্ষণ গভীর আনন্দভরে সে মুখ নিরীক্ষণ করার ফলে বোধ হয় তার ছবি মনে রাখবার অভ্যাস আমার মস্তিষ্কের মধ্যে পাকা হ'য়ে গিয়েছিল।

শৈশব ও বাল্যকালের কথা অনেকদিন পর্যন্ত যে সুস্পষ্টভাবে আমাদের স্মৃতি অধিকার ক'রে থাকে বোধ হয় তার কারণ আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরকার যে চাকতি (Disc) অথবা কোষের (Cell) উপর ঘটনার রেখাগুলি মুদ্রিত হ'য়ে অবস্থান করে, শৈশব এবং বাল্যকালে সেই কোষ অথবা চাকতিগুলি সর্বাপেক্ষা নরম থাকে ব'লে তাদের উপর চিন্তা অথবা অনুভূতির রেখাও গভীরতম রন্ধ্রে মুদ্রিত হয়, ও সেই কারণে সহজে মুছে যায় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত চাকতি অথবা কোষগুলি ক্রমশ কঠিন হ'য়ে আসে। সুতরাং তাদের উপর অনুভূতির ছাপ পড়তে থাকে ক্রমশ অগভীর রন্ধ্রে। সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সের কথা আমাদের তত মনে থাকে না, যত মনে থাকে তরুণ বয়সের কথা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা এই পর্যন্তই থাক্, এখন যে-কথা বলছিলাম তা বলি। আমার যখন তিন অথবা সাড়ে তিন বৎসর বয়স তখন আমরা সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য বাস করছিলাম বেহার প্রদেশের বক্সার শহরে। আমার পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ণিয়ায় চাকরি করতেন। পূর্ণিয়ার ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে প্লীহা ও যকৃতের সাংঘাতিক বিকার বশত আমার ফুলদাদা নগেন্দ্রনাথের সংকটাপন্ন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। হালে পানি না পেয়ে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বায়ুপরিবর্তনের। অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ব'লে তখনকার দিনে বক্সারের প্রসিদ্ধি ছিল। রৌদ্রবায়ুনন্দিত একটি উন্মুক্ত পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া নিয়ে আমরা বক্সারে বাস করতে আরম্ভ করলাম।

চাকরির জন্য পিতাঠাকুর মহাশয় বক্সারে বেশি থাকতে পারতেন না। পুরুষ অভিভাবক স্বরূপ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মেজদাদা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝে থাকতেন, কিন্তু কলেজের পড়াশুনোর জন্য তাঁরাও সর্বদা থাকতে পারতেন না। সেজন্য অবশ্য বিশেষ কিছু অসুবিধাও ছিল না। আমার মাতাঠাকুরাণী মনোমোহিনী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং সংসারসুদক্ষা রমণী ছিলেন। মাত্র তাঁর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাহস ও কর্মপটুতার উপর নির্ভর ক'রে অমন সংকটাপন্ন রোগী নিয়েও বিদেশে বাস করা চলতে পারত। কিন্তু বক্সারে আমাদের একজন স্থায়ী এবং পাকা পুরুষ অভিভাবকেরও অভাব হয়নি। তিনি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বক্সারের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল।

কান্তিবাবু ছিলেন আমাদের পল্লীজামাতা; অর্থাৎ, ভাগলপুরের বাঙালিটোলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে তিনি বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সহিত আমাদের পরিচয়; আর, সেই পরিচয়ের প্রভাবেই তিনি বাড়ি ভাড়া ক'রে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে বক্সারে আমাদের বসবাসের সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, প্রতিদিন তিনি নিয়মিতভাবে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন ও দেখাশুনা করতেন।

এ সকল ত' গেল শোনা কথা,—শ্রুতি; স্মৃতি নয়। এবার স্মৃতির কথা বলি। বক্সারের তিনটি কথা আমার মনে পড়ে; খুব স্পষ্টভাবে না হ'লেও, খুব অস্পষ্টভাবেও নয়।

পরবর্তীকালে ভাগলপুরে কান্তিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হ'য়েছিল। কিছুকাল তথায় এক সঙ্গে ওকালতিও করেছিলাম। কান্তিবাবু ছিলেন উদার-হৃদয় খাড়া স্বভাবের গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; কথা কইতেন কম, হাসতেন তার চেয়েও অনেক কম; আর, কদাচিৎ কখনো যদি হাসতেন, সে হাসির বারো আনা মারা যেত ঘনবিস্তৃত গুম্ফশ্মশ্রুর নিবিড়তার মধ্যে। বক্সারে বাস-কালে তরুণ বয়সে গোঁফদাড়ির অত বাড়বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হয়নি। কিন্তু গম্ভীরবদন তিনি তখনো ছিলেন সে কথা সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন কান্তিবাবু আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, কাজেকাজেই তাঁর মুখ আমার বিশেষ পরিচিত হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁর নামও আমি শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে-সব দিনের প্রতিদিবসের দেখা তাঁর মুখ আমার একটুও মনে পড়ে না; শুধু মনে পড়ে একদিনকার অট্টহাস্যনিনাদিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখ। বোধ করি, সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা ব্যতিক্রমই আমার মনের উপর গভীর ছাপ মেরেছিল। কান্তিবাবুর সে হাসির হেতু ছিলাম আমিই। সুতরাং কথাটা একটু খুলে বলি।

চাকরের সহিত আমি মাঝে মাঝে বৈকালের দিকে কান্তিবাবুর বাড়ি বেড়াতে যেতাম। সে-সব সময়ে কান্তিবাবু প্রায়ই কাছারিতে থাকতেন। একদিন সকালের দিকে, বোধ হয় কোনো প্রয়োজন বশত, মাতাঠাকুরাণী আমাদের চাকরকে কান্তিবাবুর বাড়ি পাঠালেন, এবং সেই সঙ্গে আমাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কম্বিনেশন সুট প'রে ফিটফাট সাজ-গোজ ক'রে কান্তিবাবুর বাড়ি উপস্থিত হ'য়ে দেখি, প্রশস্ত বারান্দায় মক্কেলদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে কান্তিবাবু কাজ করছেন। বোধ হয় সেদিন ছুটির দিন ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল মুখে কান্তিবাবু বললেন, "এস খোকা, আমার কাছে এসে বোসো।" গম্ভীর মুখে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো একটা বেঞ্চে একজন মক্কেলের পাশে বসলাম।

আমার সহিত দু-চারটে কথাবার্তার পর কান্তিবাবু পুনরায় কাজে মন দিলেন, এবং মক্কেলদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হ'লেন। ক্ষণকাল আমি ধৈর্য ধ'রে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। কিন্তু ক্রমশ বিরক্তি বোধ হ'তে লাগল। মক্কেলদের সঙ্গে আমাকে এমন ক'রে বার-বাড়িতে বসিয়ে রাখার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা কথা কইতে বাধ্য হ'লাম।

"কান্তিবাবু!"

সকৌতূহলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কান্তিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলত?"

"কই, সে-সব কিছু হচ্ছে না?"

"কি-সব?"

"খাওয়া-দাওয়া?"

আমার এই কথায় কান্তিবাবু সেই অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন যা আজও আমার স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মক্কেলরাও দেখাদেখি হাসতে আরম্ভ করেছিল। হাসি থামলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে কান্তিবাবু বললেন, "নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া হবে।" তারপর চাকর ডেকে খাবার দেবার কথা ব'লে দিয়ে আমাকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

অন্দর মহলের প্রতি আমার আস্থা ছিল! বোধ হয় সেখানে সুখাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, আর মক্কেলরূপী অবান্তর বস্তুর একান্ত অভাব ছিল, সেই দুই অভিজ্ঞতার ফলে। মক্কেলদের মধ্যে শুকনো ডাঙ্গায় বসিয়ে রেখেই কান্তিবাবু হয়ত আমাকে বাইরে বাইরে বিদায় করবেন, সেই ভয় থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে আশ্বস্ত চিত্তে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেদিন কান্তিবাবুর হাসি দেখে আমি কতটা লজ্জিত হয়েছিলাম তা জানিনে, কিন্তু প্রচুর বিস্মিত হয়েছিলাম বোধ হয় এই কথা ভেবে যে, এমন নির্বিকার খোলের মধ্যেও এমন হাসির তুবড়ি থাকতে পারে!

বক্সারের দ্বিতীয় কথা তিনটি তালগাছের কথা। আমাদের বাড়ির সদর দরজা থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়েই ডান দিকে এই তিনটি সমবয়সী এবং সমদৈর্ঘ্যের তালগাছ যেন নিবিড় সৌহার্দ্যে পরস্পরের অতি কাছাকাছি তেড়া-বেঁকাভাবে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ানাড়ি করত। তাদের মাথা-নাড়ানাড়ি দেখে আমার মনে হোত, সে যেন শুধু মাথা-নাড়ানাড়িই নয়, কথা-কওয়া-কয়িও বটে। বাড়ির ভিতরের বারান্দা থেকেও তাল-গাছ তিনটির মাথা দেখা যেত। দিনেরবেলায় সবুজ চেরা পাতার তালগাছ ব'লে তাদের চিনতে একটুও ভুল হ'ত না; সন্ধ্যা হ'লে কিন্তু মনে হতো তারা যেন তিনটে বিকট দৈত্যের মাথা। স্বপ্নে তাদের কি-রকম মূর্তি দেখতাম তা জানিনে, কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখতাম তারা আবার সবুজ পাতার তাল গাছ হ'য়ে সোনালী রৌদ্রকিরণে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। সন্ধ্যাকালের দৈত্যদের কোনো চিহ্নই তাদের মধ্যে খুঁজে পেতাম না।

ফুলদাদার কথা বক্সারের তৃতীয় কথা, যা আমার এখনো মনে আছে। বক্সারের স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু, ডাক্তার বৈদ্যদের সুচিকিৎসা এবং প্রাণপণ চেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের নিরবসর সেবা ও পরিচর্যা, এবং কান্তিবাবুর বিচক্ষণ শুশ্রূষাদান কিছুই ফুলদাদাকে আটকে রাখতে পারলে না। একদিন রৌদ্রস্নাত ঝলমলে প্রভাতে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন,—চৌদ্দ বৎসর বয়সের ফুটফুটে বালক, পূর্ণিয়া গভর্নমেন্ট স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, বাপ-মার নয়নের মণি! ফুলদাদার নিয়মিত ডায়রি লেখবার অভ্যাস ছিল,—বক্সারে অবস্থান-কালেও তিনি ডায়রি লিখেছিলেন। বড় হ'য়ে আমরা মুক্তার মতো অক্ষরে লিখিত সেই ডায়রি পাঠ ক'রে মুগ্ধ হয়েছি। সে ডায়রির একখানা ছিন্ন পাতাও আজ নেই। ধীরে ধীরে কেমন ক'রে ক্রমশ তা অবলোপের অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করল তা কেউ বলতে পারে না। থাকলে আমাদের পরিবারের একটা মূল্যবান সম্পদ হোত।

ফুলদাদার মৃত্যু-দিবসের কোনো কথা আমার একটুও মনে পড়ে না,—এমন কি, কান্নাকাটির কথাও নয়। বোধ হয় বিপদের মুহূর্তে অসময় দেখে আমাকে কান্তিবাবুর বাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একখানা সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে ফুলদাদা নিত্য বারান্দায় রৌদ্র-কিরণে ব'সে বহুক্ষণ ধ'রে মুখ ধুতেন, আমার শুধু মনে পড়ে তাঁর সেই রুগ্ন কৃশ ফুটফুটে চেহারাখানি। তখন সে কথা নিশ্চয়ই মনে হ'ত না,—এখন কিন্তু ফুলদাদার ক্লান্ত-পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়লেই মনে হয় সেই সুন্দর মুখখানির উপর যেন মৃত্যুর নিশ্চিত নীলাভ ছায়া ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল।

আমাদের বিপদের বন্ধু কান্তিবাবু, যিনি আমাদের বক্সারের বাসা বেঁধে দিয়েছিলেন, তিনিই পুনরায় সেই বাসা ভাঙ্গার দুঃখময় কার্যে সচেষ্ট হলেন। মার মুখে শুনেছি, ফুলদাদার মৃত্যুকালে কান্তিবাবু শোকে অধীর হ'য়ে রোদন করেছিলেন। একটি মৃত্যুপথযাত্রী শরণাগত বালককে রক্ষা করবার জন্য যে চেষ্টা তিনি কায়মনোবাক্যে করেছিলেন, তার অসার্থক হওয়ার দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

কান্তিবাবুর চেষ্টায় সংসার গুটিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যে পুনরায় আমরা বক্সার রেল স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী শোকে ধৈর্যশীলা রমণী ছিলেন,—আমাকে বুকে জড়িয়ে তিনি ভাগলপুরের পথে ফিরে চললেন। পশ্চাতে প'ড়ে রইল বক্সারের শ্মশানঘাটে তাঁর জীবনের আনন্দ হৃদয়ের নিধি নগেনের সুকুমার দেহের ভস্মাবশেষ। (ক্রমশ)

দক্ষিণ ভারতের চেন্নকেশবের মন্দির

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণরস হলো ধর্ম। ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থাই সমাজ-জীবনে সঞ্চারিত হয়ে ব্যক্তিকে দিয়েছে কর্ম-শক্তি, দিয়েছে প্রেরণা; আবার শিল্পে, সাহিত্যে, ললিত কলায় তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে শত মাধুর্যে। এ কোন বিশেষ যুগের সত্য নয়। এ ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য, আজ বিজ্ঞান থেকে ব্যক্তি-জীবন পর্যন্ত যখন সংশয়বাদে বিক্ষুব্ধ তখনো ভারতের জনমনের ওপর ধর্মের প্রভাব কি অপরিসীম। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জন্মকে সভ্যতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আজ যেখানে এসে পৌঁচেছে সেখানে কি আবার পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন দেখা দেয়নি? ঐতিহাসিক বলেছেন, মধ্যযুগের চার্চকে যদি রাষ্ট্র বলা হয়, তবে টিউডর যুগের রাষ্ট্রও ছিল চার্চ-ধর্মী। শুভাশুভের প্রশ্ন এড়িয়েও বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের প্রতিপাদ-ধর্মী দুই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মিশরীয় কি গ্রীক সভ্যতার মত ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য সম্পদের পেছনেও রয়েছে ধর্মের প্রেরণা। কালের আঘাত সয়ে টিঁকে থাকা ভারতের কোন মন্দির আজ হয়ত আমাদের শুধু বিস্ময় দৃষ্টি আকৃষ্ট করে; কিন্তু এক-দিন এই মন্দিরই ছিল সমাজ-জীবনের নিয়ন্তা। দেবমূর্তির সম্মুখে বসতো নগর পরিষদের অধিবেশন, অনুষ্ঠান হতো নির্বাচন, নিষ্পত্তি করা হতো বিরোধ-কলহের। এখানেই কবি, গায়ক ও নৃত্য-শিল্পীরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতেন রাজ-সম্মান লাভের আশায়। সকাল সন্ধ্যায় চলতো শাস্ত্রপাঠ এবং মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিলো গুরুদেবের পাঠচর্চার আয়োজন। মাঝে মাঝে দূর দূরান্ত থেকে কৃষক, বণিক, শিল্পীরা এসে সমবেত হতো এই মন্দিরের পাদদেশে। এমনি করে এক একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো সমাজ-জীবন, গড়ে উঠতো সভ্যতা।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের স্থপতি ও কারুকার্যের বিচার করতে হবে; সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ঐতিহ্য আর ধর্ম-বিশ্বাস।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের উৎপত্তি আজো রহস্যাবৃত। তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মোটামুটি-ভাবে তার একটা রূপ নির্ধারণ করেছেন। তাঞ্জোর, মাদুরা, চিদাম্বরম্, শ্রীরঙ্গম ও রামেশ্বরমের অপরূপ কারুকার্যখচিত মন্দির-গুলি দেখে অনেকেই সেগুলিকে দ্রাবিড় স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন বলে ভুল করে থাকেন। দ্রাবিড় শব্দটির অর্থ ব্যাপক। পল্লব, চোল চালুক্য, হায়সালা পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশের আমলে যে বিশেষ 'স্কুল' গড়ে ওঠে তার সব-গুলিই দ্রাবিড় পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের স্থপতিবিদ্যার প্রাচীনতম যে নিদর্শন



মহীশূর রাজ্যে হাসান জেলায় অবস্থিত বেলুড় নামক স্থানে চেন্নকেশব মন্দিরের প্রবেশদ্বার

পাওয়া গেছে তা হলো খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পল্লভ আমলে নির্মিত প্রস্তর স্তম্ভ। এরও আগে ইঁট ও কাঠ দিয়ে যে সব মন্দির বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল তা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী—হিন্দুধর্ম ও শিল্পের এক সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের যুগ। এই সময়ে হয়সালা রাজবংশ মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযোজনা করে। প্রধানত চালুক্য রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করেই হয়সালা যুগের পদ্ধতি গড়ে ওঠে। চালুক্য সাম্রাজ্য মধ্যভারতে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলায় এর প্রভাব সমভাবে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু হয়সালা রাজ্যে এসে এক অভিনব রূপ ও প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে।

নবম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ চালুক্য সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প-পদ্ধতিও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে থাকে। এই সময় সূক্ষ্মতম কারুকার্যের দিকে ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। পূর্বতন যুগের এক কক্ষযুক্ত মন্দির গঠনের পদ্ধতি ত্যাগ করে শিল্পীরা দুই বা বহু কক্ষযুক্ত মন্দির নির্মাণে



মন্দিরের প্রবেশমুখে হয়সালা রাজবংশের প্রতীকমূর্তি। 'সল' নামক একজন মেষপালকের বংশ হ'তে এই রাজ্যের উৎপত্তি এবং এই মেষপালক একাই একটি সিংহ বধ করেছিলেন



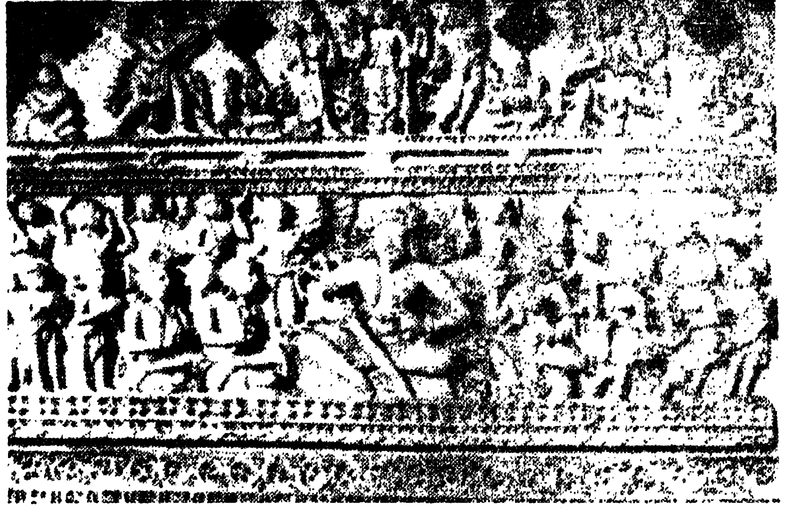
মন্দিরগাত্রে ব্র্যাকেট মূর্তি: দর্পণ হস্তে নারী



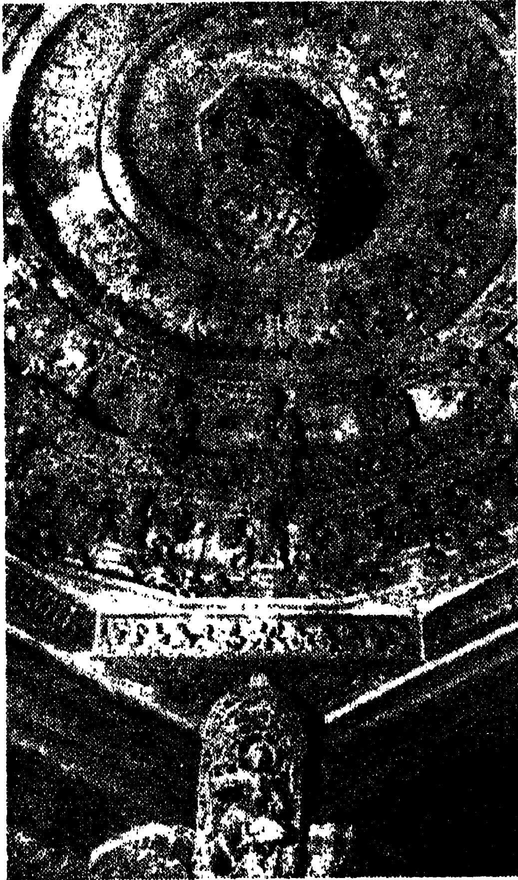
ব্র্যাকেট মূর্তির অপর একটি নিদর্শন, বিবসনা নারী

উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং মন্দিরের আকৃতিও ধরাবাঁধা চতুষ্কোণাকার না রেখে গোলাকার বা ইচ্ছামত আকার দিয় তাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। হয়সালা যুগে এসে এই পদ্ধতি আরও পূর্ণতা লাভ করে। মন্দিরের প্রবেশপথ, থাম, খিলান, কার্নিস সব স্থানেই রয়েছে হয়সালা শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি। বেলুড়ের বিখ্যাত চেন্ন কেশবের মন্দির এক কক্ষযুক্ত। কিন্তু এই যুগের শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সোমনাথপুরের মন্দির (১২৬০ খৃঃ) তিন কক্ষযুক্ত এবং এক মণ্ডপের তিন দিকে সেগুলি প্রতিসমভাবে অবস্থিত।

বিশ্ববিখ্যাত চেন্ন কেশব মন্দিরের গৌরববাহী বেলুড় শহরটি মহীশূর রাজ্যের হাসান জেলায় অবস্থিত। এখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন অপরূপ তেমনি মনোরম এখানের আবহাওয়া। প্রায় আটশত বছর ধরে এই বেলুড় ছিল হয়সালা রাজ্যের রাজধানী। সে যুগে সমৃদ্ধি ও গুরুত্বের দিক থেকে এক-মাত্র দ্বারসমুদ্র বা হালেবিদ নগরীর পরেই ছিল এর স্থান। আড়াই শতাব্দী কাল দ্বার-



বেলুড় মন্দিরের নির্মাতা বিষ্ণুবর্ধনের রাজসভা।



হয়শালা স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরের ছাদ সম্পূর্ণ কালো পাথরের উপর খোদাই করা।



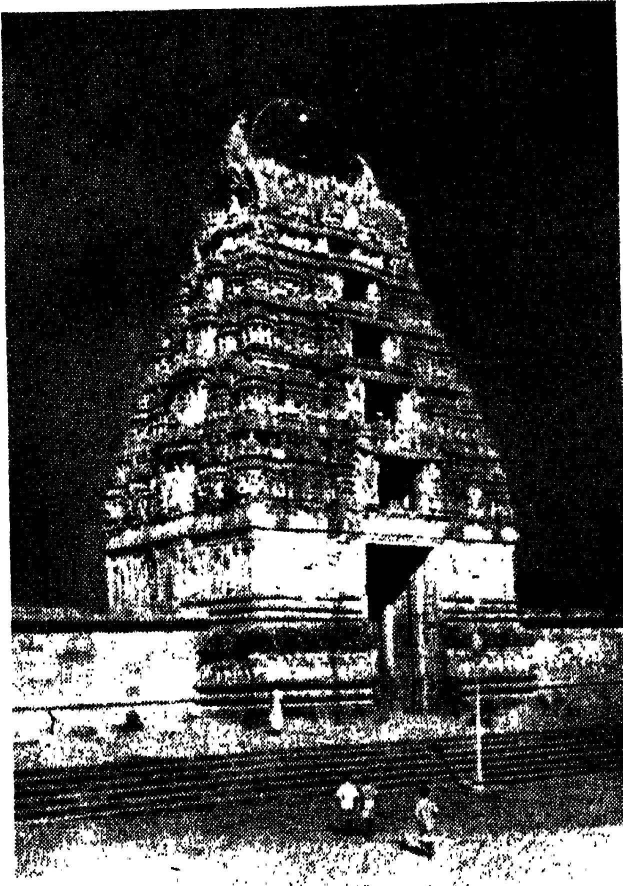
মন্দিরের অভ্যন্তরে নারীমূর্তি

সমুদ্র হয়শালা রাজ্যের রাজধানী হবার সৌভাগ্য বহন করেছে। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই রাজবংশের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিষ্ণুবর্ধন তালকড়ের যুদ্ধে চোল রাজাকে পরাজিত করেন এবং এই বিজয় গৌরবের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১১১৭ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তাই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম দেন বিজয় নারায়ণ। মন্দির নির্মাণের কারণ সম্পর্কে এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, বিষ্ণুবর্ধন জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে রামানুজাচার্যের কাছে বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করেন—এটি তারই একটি।

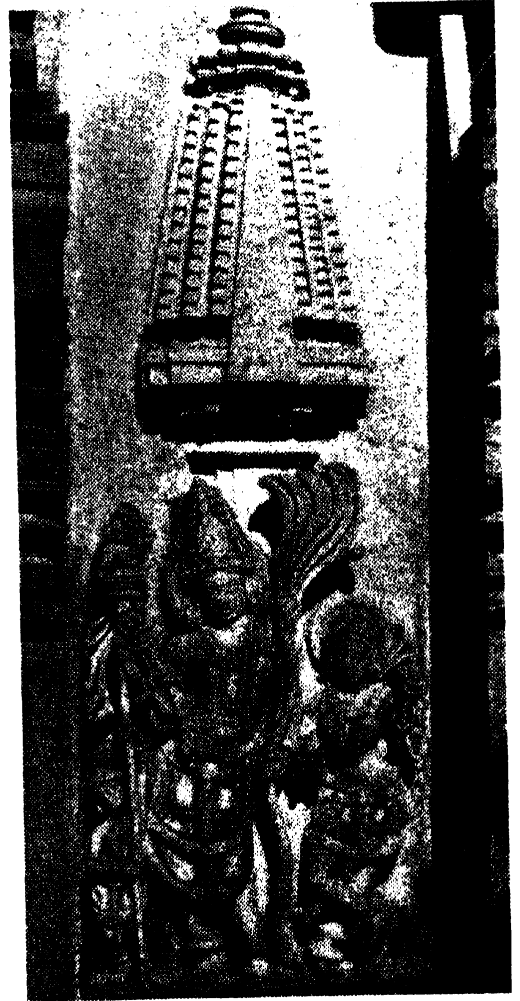
মূলত বিষ্ণুবর্ধন কেশব মন্দিরের নির্মাতা হলেও পরবর্তী যুগে অনেক রাজন্য এর সঙ্গে অনেক কিছু যোগ করেছেন; গঠন বিন্যাস থেকে তা সহজেই ধরা যায়। প্রধান মন্দিরটির চার পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি আরো কয়েকটি মন্দির রয়েছে এবং এ সবগুলিই খুব উঁচু এক প্রাচীর দিয়ে সংরক্ষিত। প্রধান ফটকের ওপর ইটের তৈরী বিরাট গম্বুজটি অনেক পরের যুগের। ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই মন্দিরের যে ছবিটি প্রথম চোখের ওপর ভেসে ওঠে তাতে বিস্ময় দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না; বিশেষ করে মাদুরা কি চিদাম্বরমের মন্দিরের গগন-চুম্বী বিরাটত্ব এর নেই। কিন্তু আরো কাছে এলে এর স্থাপত্যশিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্যের অপরূপ সৌন্দর্য আপনা থেকেই ভাস্বর হয়ে ওঠে।

মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭৮ ফুট ও প্রস্থে ১৫৬ ফুট এবং তিন ফুট উচ্চ মূল ভিত্তির ওপর স্থাপিত। প্রধানত তিন অংশে এটি বিভক্ত—গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সুখনাশী অর্থাৎ বিগ্রহ কক্ষের সম্মুখস্থ অংশ এবং নবরঙ্গ অর্থাৎ প্রধান মণ্ডপ। নবরঙ্গের পূর্ব এবং উত্তর ও দক্ষিণে তিনটি প্রবেশ পথ। প্রত্যেকটি দ্বারের ওপরেই রয়েছে সূক্ষ্ম শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন। পূর্ব দ্বারের পাশে দণ্ডায়মান আছেন প্রেমের দেবতা মন্মথ এবং প্রেমের দেবী রতি। চৌকাঠের দক্ষিণে ও বামে মন্দিরের রক্ষাকর্তা দ্বার-পালকের মূর্তি। দ্বারের ওপরে হিরণ্যকশিপু হত্যারত নৃসিংহের মূর্তি। তাঁর দুই পাশে মকর; মকরের কারুকার্যখচিত দীর্ঘ পুচ্ছ নেমে এসেছে দ্বারপালকের মস্তকের ওপরে। এই প্রবেশ পথের দক্ষিণে স্থাপিত আছে হয়সালা রাজবংশের প্রতীক—বিরাটাকার সিংহের সঙ্গে যুদ্ধরত বীরের প্রতিমূর্তি। প্রবাদ আছে, রাজবংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা সল তাঁর জৈন গুরুর আদেশে এক আক্রমণকারী সিংহকে হত্যা করেছিলেন। প্রতিটি হয়সালা মন্দিরের সম্মুখেই সাক্ষাৎ মিলবে এই রাজ-প্রতীকের।

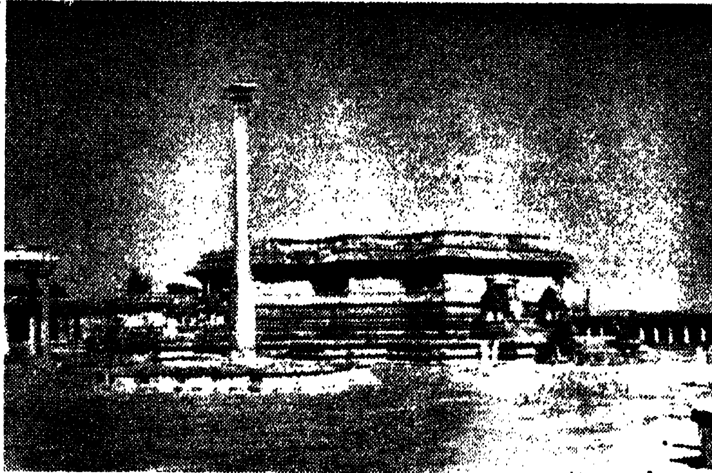
নবরঙ্গের অর্থাৎ প্রধান মণ্ডপের দেয়ালের বহির্ভাগে খোদিত আছে একটির ওপর একটি



মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার



মন্মথ ও রতি মূর্তি



মন্দিরের বহির্দৃশ্য

করে কয়েক সারি মূর্তি। সর্বনিম্নের সারি হলো এক হস্তীযূথ। প্রতিটি হস্তী এমন অলঙ্কারভূষিত মনে হয় তারা রাজশোভাযাত্রায় চলেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিখুঁত খোদাই দেখে হস্তীর দেহ-গঠন সম্পর্কে তৎকালীন শিল্পীদের জ্ঞানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। এর ওপরে এক সারি সিংহ-লতা বা সিংহ মস্তক এবং তারপর বিভিন্ন নৃত্য-ভঙ্গিমারত নারী শ্রেণী। রেলিংএ রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীর রূপদান করা হয়েছে। রেলিংএর ওপরে পূর্ব দ্বারের উভয় দিকে উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার পর্যন্ত দশটি করে প্রস্তরের 'স্ক্রীণ' বা ঝিল্লি। এর দ্বারা শুধু যে নবরঙ্গে আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে তা নয়, নীচের সূক্ষ্ম কারুকার্যের ভীড়ের ভাব এটা একটা আশ্চর্য রিলিফের কাজ করেছে। দ্বারের দক্ষিণ প্যানেলে রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাজসভার দৃশ্য। তাঁর বাম দিকে বসে রাণী গুরুর মুখ থেকে ধর্মকথা শুনছেন।

হয়সালা স্থাপত্যের চরম বিকাশের সাক্ষ্য বহন করছে ঝিল্লির পার্শ্বস্থ থামের ব্র্যাকেট-মূর্তিগুলি। পরিকল্পনায়, গঠনলালিত্যে, চাকচিক্যে এর তুলনা নেই। শিল্পীরা মুগ্ধ হয়ে একে 'প্রস্তরের ওপর খোদিত কবিতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই মূর্তিগুলি 'মদনাকাই' (বিচিত্র ভঙ্গিমায় নারী) নামে পরিচিত। এদের মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ; আটত্রিশটি মূর্তি অক্ষুণ্ণ আছে, দুইটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'দর্পণ হস্ত নারী' মূর্তিটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এক নর্তকী প্রসাধন সমাপন করে দর্পণে নিরীক্ষণ করেছেন তাঁর প্রতিমূর্তি: মুখে ফুটে উঠেছে গর্বের হাসি। অঙ্গে আবরণ বেশী নেই। কিন্তু আছে আভরণের প্রাচুর্য। নর্তকীর ভ্রূধনু, পটল-চেরা চোখ, উন্নত নাসা, বিম্বোষ্ঠ, সুডৌল বক্ষ—নারীরূপের চরম প্রকাশে সার্থকতা লাভ করেছে। আর একটি মূর্তি—এক তন্বী বসনের মাঝে কর্কট আবিষ্কার করে ভয়-বিহ্বল হয়ে বিবসনা হয়েছেন। বিবসনা নারীর রূপ প্রকাশে চতুর শিল্পী নূতন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন। আশ্চর্য এই, নারীমূর্তি খোদাইয়ে এই যুগের শিল্পীরা গ্রীক শিল্পীদের মতই সমান ঔৎসুক্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

মন্দিরের আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায়ও অপরিসীম দক্ষতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মণ্ডপ বা নবরঙ্গের থামগুলি। এর মধ্যে মোহিনী ও নরসিংহ থাম বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথমটির কোথাও চক্রাকার, কোথাও ছত্রাকার আবার কোথাও ঘটের আকার। নীচে এক বেদীর উপর দীর্ঘ মোহিনী মূর্তি স্থাপিত, মস্তকে তাঁর দীর্ঘ মুকুট। নরসিংহ থামের খাঁজে খাঁজে খোদাই করা আছে অতি ক্ষুদ্র অথচ নিখুঁত দেবমূর্তি। কি অপূর্ব দক্ষতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী। প্রতিটি মূর্তির পাশে কিছুটা ভূমি শূন্য রাখা হয়েছে—শিল্পী যেন আহ্বান জানিয়েছেন,—কোথায় আছো কোন্ শিল্পী, এসো, পাথরে ফুটিয়ে তোল দেখি এমনি এক মূর্তি। শোনা যায়, এই থামটি এক সময়ে স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে আবৃত্ত হতো, অসম্ভব কিছু নয়।

অন্যান্য অংশের মত মন্দিরের সিলিং বা ছাতও অপরূপ কারুকার্যময়। নবরঙ্গের ছাত অষ্টভুজাকৃতি। এর ওপর থেকে উঠে গেছে গম্বুজ। পাথর কেটে নয়, পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে এই গম্বুজনির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের মাঝখান থেকে নেমে এসেছে পদ্মের কুঁড়ি, তার ওপর খোদাই করা আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি।

গর্ভগৃহে তিন ফুট উঁচু বেদীর ওপরে কেশব বা বিজয়-নারায়ণের মূর্তি স্থাপিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভিত চতুর্বাহু তাঁর, স্বর্গীয় সুষমা তাঁর অঙ্গে। বিগ্রহের পশ্চাতে প্রভাবলীর ওপর দশবতারের পরিচয়। কারু-কার্যে, অঙ্গ-সৌষ্ঠবে, আনুপাতিক গঠনে ও গঠন সৌকর্যে এই কেশব মূর্তি হয়সালা শিল্পে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।





পরের বাড়ী নয় তবু রাখহরি চোরের মত গুটি মেরে উঠছেন।

উঠছেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়, ধীরে ধীরে, সন্দেহ-সন্দিগ্ধ চিত্তে। বিড়ালের থাবার মত নিঃশব্দে পা রাখছেন, বন-শেয়ালের মত শরীরটাকে কুঁজো করে এগিয়ে আসছেন।

মাটির বাড়ী, চললে শব্দ হবার কথা নয় তবু সাবধানের অন্ত নেই তার। আগেই জুতোটা খুলে ফেলেছেন। পুরোন তালি-মারা জুতো। অনেক বছর আগে এক একবার আর্তনাদ তুলত। কিন্তু কে বলতে পারে বিনা শব্দেও অনেকে চকিত হয় না!

তাই ঠান্ডা সরীসৃপের মত প্রায় বুকে হেঁটে. আলতো পা ফেলে ফেলে উঠছেন নিজ-বালিয়া এম ই স্কুলের থার্ড মাস্টার শ্রীরাখহরি ভট্টাচার্য।

তিনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন, বার বার চোখ রাখছিলেন চারদিকে। এইবার, এতক্ষণে ধরা পড়ল। আজ তিনি একবার দেখে নেবেন, ভীষণ, অতি ভীষণ শাস্তির ভারে জর্জরিত করে দেবেন অপরাধীকে, না, না, কোন ক্ষমা নেই আর।

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। বাইরের আগুন-জ্বলা দুপুরের মত।

রাখহরি উঠছেন, উঠছেন, একটার পর একটা ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠছেন, পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে টেনে দেওয়াল ধরে উঠছেন। সিঁড়িটার শেষ প্রান্তে এসে গেছেন। কিন্তু না, এখনই থামতে পারেন না তিনি, তাড়াতাড়ি গলাটা তাই বাড়িয়ে দিলেন চৌকাঠের ভেতরে, তারপর একটি বজ্রহুংকারে ফেটে পড়লেন, ললে তুই এখানে বসে কি কচ্ছিস?

ঠিক ধরেছেন। যা মনে করেছেন তাই। পই-পই করে যা বারণ করেছেন ছেলেটা তাই করছে। ওইটুকুন ছেলে, আবার প্রচন্ড হুংকারে রাখহরি কাঁপিয়ে দিলেন ললিতকে, শরের কলম নিয়ে ফের বসা হয়েছে? তোকে না কদ্দিন বারণ করিচি। তা নয় ইস্কুল থেকে এসে, নুকো নুকো—

লুকিয়ে লুকিয়ে কিছুই করবার ইচ্ছা ছিল না ললিতের। আসলে হয়েছে কি হেড-পন্ডিতের বকুনী খেয়ে আজ মনটা গেছে খারাপ হয়ে। বাস্তবিক সংস্কৃত সে যতই ভালো জানুক না কেন হাতের লেখা যার অত

খারাপ সে কি কখনো পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে? ম্যাট্রিকে এরকম খাতা পণ্ডিতেরা দেখেই না, হাতের লেখা পড়তে না পেরে একটা গোল্লাচুর বসিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বলেছেন হেড পণ্ডিত, আর তোমার সে পরীক্ষায় বসতে বেশী বিলম্ব নেই, মাত্র দু-বছর, বড় জোর আড়াই। তা' ক্লাশ এইটের হাফ-ইয়ারলিতে, তিনি বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ললিতকে, লেখার যা নমুনা সে দেখাচ্ছে তাতে তার পারে যাবার কোনো আশাই নেই।

তাই ললিত বসেছিল শরের কলম নিয়ে। বাবা অমনি চীৎকার করেছেন পেছন থেকে যেন একটা মহা অপরাধ সে করে ফেলেছে। এমন চমকে উঠেছে যে হাতের ঠেলায় দোয়াতটা গেছে উল্টে। মেঝেময় যে কালী গড়াচ্ছে সে কি তার দোষে?

ললিত মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল এক-পাশে। রাখহরি আপন মনে বক্ বক্ করতে করতে হঠাৎ তার মুখের দিকে চাইতেই আর কথা কইতে পারলেন না। বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই কচি মুখ। অনেক কথা বলবার ছিল কিন্তু কিছুই বলা হল না। আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে হাত ধরলেন, ধরলেন অত্যন্ত স্খলিত মুষ্টিতে, শেষে ধীরপদক্ষেপে নীচের ঘরে নেমে এলেন। উদাসীনভাবে শেতলপাটির ওপর বসলেন, অন্যমনস্ক হয়ে ময়লা বালিশটা টেনে নিলেন কাছে। তারপর হঠাৎ যেন চমক ভাঙল, কানে ছুঁচ ফোটাল এই অসহ্য নীরবতা, কথা কইতে পারলেই যেন বাঁচেন এই রকম ভঙ্গীতে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তোকে তো আমি কদ্দিন বারণ করিচি, হাতের লেখা করবার কোনো দরকার নেই।

ললিত তার পাশে বসে নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল। নিশ্চল, নির্বাক সে। রাখ-হরিও কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, যেন আর কিছু বলবার নেই, কেন তার এত রাগ, এত বকুনি, সব কিছুর যেন কারণ দেখান হয়ে গেল। তবু মনটাতো কই হাল্কা হলো না। সব কথা বলেও যেন অব্যক্ত-অনুচ্চোরিত রয়ে গেল কি একটা বিশেষ বাক্য।

ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রাখহরি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করবি? শুবি আমার কাছে? ঘুমোনা একটু, এই ভর দুপুরে।

ললিত মাথা নাড়ল, সে পড়বে, শনিবারের দুপুর কি কেউ ঘুমিয়ে নষ্ট করে? পণ্ডিত মশাই রোজই বলেন, ভালো ছেলের কাছে ছুটির অর্থ হলো পুরোন পড়া ঝালিয়ে নেয়া। অবশ্য বিশ্ববয়াটেরা এই সময়ে হয় ঘুমোয় নয় ছিপ্ ফেলে।—আহা! কালীটা কি এখনো মেঝেতে গড়াচ্ছে? অমন ঘন নীল কালী, এত-ক্ষণে হয়তো শুকনো মেঝে সব টেনে নিয়েছে। শরের কলমটা তো বাবা অনেক আগেই মুচড়ে দিয়েছে। হাতের লেখা তার বড্ডো খারাপ, একটু হাত ফিরোবে, সে উপায়টুকু নেই, বাবাটা যেন কি, কেন যে তাকে হাতের লেখা ভালো করতে দেয় না, কেন যে অমন করে বকে, অমন রেগে যায়......

ললিত আস্তে আস্তে উঠে গেল। রাখ-হরি আনমনা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন জানালার দিকে। কেন যে তিনি অমন করে বকেন, হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠেন তা যদি ললিত জানত, তবে এতবার নিষেধ করার পর হয়তো আর কোন দিন ভুলেও হাত মক্সো করতে বসতো না। ছেলেকে সব কথা বললে বুঝবে না কিন্তু দুর্ভাগ্যকে তো ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

দুর্ভাগ্যকে কেউ কি কোনদিন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে? রাখহরি উঠে বসলেন তাড়া-তাড়ি, বালিশটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসেই রইলেন কতক্ষণ. জানালা ছাড়িয়ে তার নৈরাশ্যভরা দৃষ্টি চলে গেছে দূরের ঐ বাঁশবনে, ছায়াঘেরা জায়গা-টুকুতে ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে দু একটা ঘুরন্ত বাঁশপাতা দুরন্ত বেগে মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, দু-একটা শুয়ে থাকা হলুদে রঙা পাতা ঘূর্ণির টানে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে, শেষে ক্লান্ত জীর্ণতায় মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ছে। জনহীন জায়গাটা এই গ্রীষ্মের প্রজ্জ্বলন্ত আকাশের নীচে বোবা অতীতের মত শান্ত হয়ে রয়েছে আর যখন একটু আধটু জোরালো বাতাস বইছে তখন সে যেন এক না বলা কথা আর ফেলে আসা দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে বার বার আপন নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠছে।

বাঁশবনের ঐ একটুকরো শান্তশীতল অন্ধকার কি তার কৈশোরের আশ্রয় ছিল না? কতদিন একা একা নতুন বেরুনো বাঁশের কোঁড়ের পাশে বসে তিনি আনমনে কঞ্চি কেটেছেন আর কলম বেড়েছেন। আপন মনে কত নতুন নতুন নিবের সৃষ্টি করেছেন, কোনোটা বড় অক্ষর লেখার জন্যে, কোনোটা বা কাতিয়ে লেখার জন্যে, কোনোটা শুধু ইংরেজী, কোনোটা শুধু বাঙলা। সেদিনও এমনি গ্রীষ্মের দুপুরে ক্লান্তিহরা স্নিগ্ধ বাতাস বইত, সেদিনও এমনি বাঁশপাতার বনে ঘূর্ণির হুর্রা উঠত। আর ঐ সোজা-সটান তেজী বাঁশের গায়ে নরম কঞ্চির ওপর লেগে থাকা খসখসে পাতাগুলো কাঁপত, সেই সঙ্গে কাঁপত তার মন, এবার কি নতুন অক্ষর ফুটে উঠবে তার লেখনীশিরে! সারা দুপুর ধরে সেই যে একগাদা কলম বাড়তেন একমনে, তখন কি কোন দিন ভেবেছেন, এই সঙ্গে তিনি কুঁদে কুঁদে রূপ দিচ্ছেন তার ভবিষ্যত ভাগ্যকে! দুপুরের শেষে যখন সেই কলম একটার পর একটা কষ্ কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তালপাতায় আর কলাপাতায় লিখতেন, তখন কি আদৌ ভাবতে পেরেছেন এই অর্থ-হীন সযত্ন আঁকি বুঁকি টানের মধ্যে তার কপালে টানা হয়ে যাচ্ছে ভাবী ভাগ্যরেখা!

প্রথমে খ্যাতিটা আবদ্ধ ছিল পরিজনের মধ্যে, তারপর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে, শেষে গ্রামান্তরে। কি অসীম উৎসাহে তিনি দিনের পর দিন পরের বেগার খেটে দিয়েছেন। এখন সে সব কথা মনে পড়লে নিজের বেহিসেবী যৌবনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। আজ মাইতিদের বাড়ী হরিনাম সংকীর্তন, সারা-দিন ধরে কাগজের ওপর লিখে যাও—হরিনাম সত্য— হরিনাম সত্য—কাগজ কালি তারাই দেবে, তুমি শুধু তোমার কলম নিয়ে বসে যাও, রং বাহারে ফুটিয়ে তোল ঐ এক মন্ত্র। ঘোষেদের বাড়ী আসছেন দেশনেতা, পরি-দর্শন করবেন অনাথ-আশ্রম কেন্দ্র, সেই সঙ্গে দেবেন বক্তৃতা, নরম-গরম মিঠে-কড়া বক্তৃতা। লোকে আসবে কি যদি না তুমি বাজারে হাটে আর মাঠে ঘাটে এঁটে বেড়াও তোমার হরেক বিজ্ঞাপন! ঐ দেখ, সামনে তোমার পরীক্ষা কিন্তু তার চেয়েও বড় হচ্ছে বাবুদের বাড়ীর ডাক। দুটো ওয়েল কম্ আর চারটে স্বাগতম লিখে দিতেই হবে, বসে যাও এখুনি পড়া-শুনো ফেলে।

এমনি করে তার কৈশোরের অন্তে যৌবনের পালা শুরু হয়েছিল। ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানা জুটেছিল খুব সম্ভব হাতের লেখার জোরে। লেখা ত নয়—ছবি। ভাব অশুদ্ধ, বানান ভুল ততোধিক। তবু লোকে বার বার চেয়ে দেখে। একাগ্র সাধনার অবিরত পরিশ্রমে অক্ষরগুলো যেন বলদৃপ্ত, তার প্রতিটি টান যেন কারুশিল্পতার অপূর্ব সংযমে মুগ্ধ।

এর পর গুরু ট্রেনিংটাও পাশ করে ফেললেন। তখন যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন, মরণাপন্ন অঘোর মাস্টারের হাতছানি তারই দিকে। তাঁর মৃত্যুর পর থার্ড মাস্টারের পদটা একেবারে তারই করতলগত।

সূর্য যেমন আজো পূবে উঠছে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবী যেমন আজো চব্বিশ ঘণ্টায় একপাক ঘুরছে, তেমনি করে আজো নিজবালিয়া এম ই স্কুলের থার্ড মাস্টার [illegible] খিল্যাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে হাতের লেখা শেখাচ্ছে।

এমনি ধারা জীবনে অভ্যস্ত হতে তার পক্ষ থেকে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু [illegible] প্রত্যাশিত পথ ধরে নিদারুণ উৎপাত [illegible] স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধল তার ঘরে। [illegible] হওয়ার পর থেকে তার গুণমুগ্ধের [illegible]

যেন বেড়ে গেল। প্রায় রোজই একটা না একটা লোক আসতে লাগল নানান্ ফরমাস নিয়ে, তার ঐ এক মূলে সুর, আমাকে এইটুকুন লিখে দিতে হবে ভালো করে।

তখন সংসারের ভার মাথার ওপর আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসছে। অভাব-অনটন কাঁধের ওপর ডাঙশ মেরে ছোটাচ্ছে চারদিকে, দুপুরে স্কুল মাস্টারী, সকালে টিউশনী, বিকেলে টিউশনী, রাত্রে টিউশনী, পাগল হয়ে উঠেছেন তখন, আর সেই সময় কিনা পরহিত এবং সদাব্রতের এই নিরন্তর আহ্বান। একদিন জমিদার বাড়ী থেকে ডাক এল, যেতে পারলেন না, গোমস্তা এসে শুনিয়ে গেল দু'কথা, গরীবের বড্ড বাড় বেড়েছে।

গরীব তারা কয়েক পুরুষ ধরে, এখনো সেই গরীবই আছেন, স্কুল মাস্টার কখনো বড়লোক হয়? কেউ শুনেছেন? এর মধ্যে বাড়টা কোথায় দেখলেন ঠাকুর?

আর একদিন এলো এক প্রাক্তন ছাত্র। তখন তিনি প্রৌঢ় হয়েছেন। আদর করে বসালেন তাকে। একথা সেকথার পর ছেলেটি তার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। ডাক্তারী পড়ছে সে, কতকগুলো ফার্মাকোলজির নোট যদি মাস্টার মশাই লিখে দেন টাইপের মত করে, এই বেশী নয়, পঁয়তাল্লিশ পাতা।

পারেন নি, মাত্র পঁয়তাল্লিশ পাতা তিনি ছাপার অক্ষরে লিখে দিতে পারেন নি। তাই ছেলেটি সেই যে রাগ করলো সে রাগ তার কখনো পড়লো না। এই গাঁয়ের পাশেই সে ডাক্তারখানা করেছে। নিজের ট্যাঁক থেকে কি দেবেন তবু কোন দিন ডাকতে সাহস পেলেন না। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন ছোট আর অপরাধী হয়ে গেছেন।

এমনি ধারা ছোটোখাটো আরো কত ঘটনাই ঘটল। সব চেয়ে মনে বাজল একটি সন্ধ্যার প্রলোভন। ওপাড়ার দাশরথি এসে বলল, মাস্টার মশায়, এবার গঞ্জে একটা মনোহারী দোকান খুললুম, দেননা একটা সাইনবোর্ড লিখে, বেশ রঙচঙে বড়সড় করে, ষাট্টা টাকা দেব তবে লম্বায় পুরো আট হাত মেপে নেব।

প্রথমটায় মনে হয়েছিল কাজটা নিয়ে নেন। বাজারের সাইনবোর্ড দেখে দেখে কতদিন তিনি অভিসম্পাত দিয়েছেন হতভাগাদের, লেখার টান শিখল না লিখতে এয়েছে সাইনবোর্ড! কিন্তু না, তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলেন। এতদিনে যেন তিনি তাঁর কপালে টাঙানো সাইনবোর্ডটার মর্যাদারক্ষা করতে পেরেছেন। ঐ হাতের লেখাই তার কাল, তার মহাশত্রু। বিবাদ আর অশান্তি, প্রত্যাখ্যান আর মনোমালিন্য, এ আর সহ্য করতে পারে না তার ভেঙে পড়া মন। পরের এই বেগার খাটার অবসান হোক। যে ভুল তিনি করেছেন, তাঁর বংশের আর কেউ যেন তা না করে। শুধু নকল করে দেবার জন্যে আর কেউ যেন না ডাকে তাদের।

ভাগ্যলিপির যখন তিনি পাঠোদ্ধার করে এনেছেন তখন একদিন চোখ পড়ে গেল কৈশোরের খেলাঘর ওই বাঁশতলির দিকে। সেদিনও এমনি দুপুর। অসীম আলস্যে চোখে মুখে তন্দ্রার ঝিম্ লেগেছে। হঠাৎ যেন দেখতে পেলেন নিজেকে, নিজের কৈশোরকে, কিশোর রাখহরি বনের ছায়ায় বসে কঞ্চি কেটে

কেটে কলম বানাচ্ছে। ঘুম ছুটে গেল, তাড়াতাড়ি বাঁশতলির দিকে ছুটলেন, তারপর কিশোর রাখহরির হাতটা ধরে প্রৌঢ় পরিণামদর্শী অভিজ্ঞ রাখহরি চীৎকার করে উঠলেন, বললে, খবরদার আর এদিকে আসবি না, কঞ্চির কলম আর যেন না হাতে দেখতে পাই।

সেদিন ললিত খুব ভয় পেয়েছিল, অনেকদিন ওধারের ছায়া মাড়ায়নি। তার চেয়েও ভয় পেয়েছিলেন রাখহরি নিজে। পরের দিনই হাট থেকে রেডইঙ্ক নিব আর পেনহোল্ডার কিনে উপহার দিয়েছিলেন ললিতকে। তাতেও মনের ভয় ঘোচেনি। স্কুলের তিরিশ টাকা মাইনে থেকে নগদ তিন টাকা ছিনিয়ে একটা ঝকঝকে ঝরণা কলম কিনে দিয়েছিলেন ভাবী বংশধরকে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ও কলম দিয়ে কেউ কখনো হাতের লেখা মক্সো করে না আর অন্য কলম ছোঁবারও দরকার নেই তার।

সেই থেকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করছেন তিনি। হাতের লেখা ছেলেটার একে খারাপ তার ওপর যত বড় হচ্ছে লেখাটা ততই খারাপ হচ্ছে, এ দেখে তিনি সবিশেষ আশান্বিত, ছেলেটা তার মত নকলনবিশী হবে না, আর কেউ কখনো তাকে ধরে বসবে না দুটো ওয়েলকম্ আর চারটে স্বাগতম লিখে দেবার জন্যে।

হঠাৎ রাখহরি ভট্চায উঠে বসলেন, স্বপ্নরেশ ছুটে গেল, অতীতের যত কাহিনী বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মনে পড়েছে, প্রতাপচকের বেরা মশাই একবার যেতে বলেছেন, কি একটা লিখে দিতে হবে, হয়তো স্বাগতম, হয়তো ওয়েলকম্ নয়তো আর কিছু।

উঠে দাঁড়ালেন রাখহরি। সারা দেহে ক্লান্তির ছাপ। যেন এইমাত্র অনেক জীর্ণ বোঝাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, উঠে পড়লেন মাটি ফুঁড়ে।

তাড়াতাড়ি ফতুয়াটা গায়ে চাপিয়ে নিলেন। তার ওপর আধময়লা পাঞ্জাবীটা তারপর আস্তে আস্তে বাইরে যাবার দরজাটি খুললেন।

স্কুল ফিরতি পথে বেরা মশায়ের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আঁচ পেয়েছিলেন একটা কিছু অঘটন ঘটবে। ঠিক তাই হল। তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না কিন্তু মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল আর ধরা পড়ে গেল ছেলেটা।

যত রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, বিরক্তি—সব ঢেলে দিলেন তার ওপর।

এক ঝলক গরম হাওয়ার ঝাপটা মুখে লাগল। নির্জন নিস্তব্ধ গ্রাম প্রচণ্ড রৌদ্রে ধুঁকছে। রাখহরি একবার পেছন দিকে তাকালেন, ললিতের মা, ললিত কি করছে দেখো তো, আমি চললুম।

বাইরে থেকে রাখহরি দরজা বন্ধ করলেন। তার কণ্ঠস্বর ঘূর্ণির পাকে পাকে ঘুরতে লাগল ছোট্ট বাড়ীর আনাচে-কানাচে। ললিতের মা ওপরে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন ললিত কাঁদছে।

ললিত কাঁদছে, তাদের বড় ছেলে ললিত, বড় আশার ধন ললিত, ভবিষ্যতের একমাত্র নির্ভর ললিত কাঁদছে। সামনে মেলাই বই-পত্তর পড়ে রয়েছে। কোনোটার পাতা উড়ছে ফর্ ফর্ করে, কোনটা হাঁ করে আছে, কোনটা বা মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তার মাঝখানে বসে দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে ললিত কাঁদছে অবিরল ধারায়।

মা বসলেন তার কাছে। এমনি পাগল ওর ছেলে। হ্যাঁরে, এত করে বললেও তুই বুঝবি না? হাতের লেখার জন্যে কি আসে যায় যদি তুই উত্তর লিখতে পারিস ঠিক মত?

মা কোলের কাছে ললিতের মাথাটা টেনে নিলেন। মুখে তার ফুটে উঠল বিচিত্র হাসি। আর আড়াই বছর দেরী তো? তুই দেখে নিস, আমি বলছি, হাতের লেখার জন্যে তোর পরীক্ষা পাশ আটকাবে না।

* * * * *

সত্যিই আটকালো না। বল যেমন ঢালু জায়গা দিয়ে গড়িয়ে যায় তেমন স্বচ্ছন্দে সবেগে পরীক্ষা বৈতরণী পার হয়ে গেল ললিত। মা হাসলেন, তাঁর দৃষ্টির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বলে। আর রাখহরি? আনন্দে কেঁদেই ফেললেন জোয়ান ছেলের সামনে।

আবেগের মাত্রাটা একটু কমলে ললিত ধরে বসল, এবার আই এস-সিটা সে পড়বেই।

রাখহরিকে তখন স্পষ্টই বলতে হোল, একটা ছেলেকে শহরে রেখে পড়াবার মত অবস্থা তাঁর নয়। ঐ তো, কিছু লিখতে হলেই যারা তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় তারা কি কিছু সাহায্য করল! তাই ত তিনি অনেক বলে করে তাঁর এক ছাত্রের বাবাকে রাজী করিয়েছেন, লোকটি কিছুদিন তার বাসায় থাকতে দেবেন আর বড় জোর হপ্তাখানেক খেতে দিতে পারেন। তার মধ্যে যদি ললিত চাকরি দেখে নিতে পারে ভালোই, নচেৎ—অবশ্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না তার জন্যে।

উপযুক্ত ছেলে ললিত। চোখ মেলে চাইতেই বুঝলো সব। যথা সময়ে তল্পি বেঁধে মায়ের পায়ে প্রণাম করতে এলো।

এবারে মায়ের কাঁদবার পালা। তাঁর ললিত বড় হয়েছে কি? রোজগার করবার মত বয়স হয়েছে কি তার? কই তিনি তো কিছুই বুঝতে পারছেন না। ও যে এখনো তেমনি হাবা-গোবা রয়ে গেছে। ওর হাতের লেখা যে এখনো তেমনি জবড়জং জড়ানো মড়ানো, ঠিক ছোটো ছেলের মতো।

রাখহরি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। বার বার বলে দিলেন, কলকাতায় পৌঁছেই একটা চিঠি তারপর চাকরী পেলেই আর একটা চিঠি, এর ব্যতিক্রম যেন না হয়।

রেলগাড়ী ললিতকে তুলে নিয়ে মহা আড়ম্বরে চলে গেল। স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে এলেন রাখহরি। কতক্ষণ পর্যন্ত দূরে বিলীয়মান গাড়ীর দিকে তিনি আনমনা দৃষ্টি মেলে রেখে দিলেন। ঐ রেলগাড়ীর দুরন্ত গমকের মতই ঝক্‌মক্ করছে তাঁর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা।

শুধু একখানার পর আর একখানা চিঠির অপেক্ষা।

চিঠি এলো যথাসময়ে। খামখানা খুলতে তর সইল না। চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলেই প্রসারিত পত্রখানার ওপর আকুল দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন রাখহরি।

নিরাপদে কলকাতায় পৌঁচেছে—এইটুকু জানতে পারলেন খালি চোখে। না, চোখদুটো সত্যিই গেছে। চশমাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চিঠির ওপর।

'সে ভালোই আছে'—এবারে এইটুকু বুঝলেন। নাঃ, কিছুই পড়া যাচ্ছে না, যা খারাপ হাতের লেখা—রাখহরি বিরক্ত হতে যাচ্ছিলেন মনে মনে। হঠাৎ কি একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর মাথার মধ্যে উঁকি মেরে গেল। তার কেউ কখনো তার বংশধরকে বেগার খাটাতে ডাকবে না। আবার উপুড় হয়ে পড়লেন চিঠির দুর্বোধ্য শব্দমালার ওপর।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

কলকাতায় গিয়েই সত্তর টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছে, যার বাসায় উঠেছে সেই ভদ্রলোকের চেষ্টাতেই—বার চারেক চিঠিখানা পড়ে এই মর্মার্থটুকু তিনি আবিষ্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন, ললিতের মা, খবর শুনেছো, সত্তর টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছে ললিত।

বাড়ীর সামনেই পিপুলেশ্বর শিবের মন্দির। ললিতের মা ঘটা করে সেদিন নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলেন।

সেদিন রাখহরি আর স্কুলে গেলেন না। সকলের কাছে খাম হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন আলুথালু বেশে। সবাকেই বললেন গদ্ গদ্ কণ্ঠে, ললিত আমার সত্তর টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছে।

ছেলে পড়াতেও তার গেলেন না। সেদিনেই ঘরে বসে বসে ঠিক করে ফেললেন জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কিভাবে কাটিয়ে দেবেন।

যতদিন বোঝা ছিল ততদিন মাথা নীচু করে নির্বিকার চিত্তে কাজ করে গেছেন। আজ, এতদিন পরে লক্ষ্য পড়ল তাঁর নিজের দেহের ওপর, তাঁর পারিপার্শ্বিকের ওপর।

সত্যি, শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। এমনি করে খাটলে আয়ু আর বেশিদিন নয়। তার ওপর ঘরদোরের যা অবস্থা! জমিজমা বলতে কিছুই নেই, গয়নাগাটি যৎসামান্য। অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ শুনে চোরেও হাসবে। না, বাড়ীটাকে মেরামত করতেই হচ্ছে। তারপর কিছু সোনাদানা জমিজমার ব্যবস্থা। সবই তিনি করবেন, কিন্তু সব শেষে, হ্যাঁ, সব শেষে একটি বাসনা তাঁর রয়েছে, ললিতের জন্য একটি টুকটুকে বউ...... নিজের হাতে আঁকা ভবিষ্যতের এক মনোরম ছবির দিকে চেয়ে রাখহরির চোখে আর দুপুরের ঘুম নামে না, তাঁর দূরাস্তৃত কল্পনার ক্ষেত্রে ওই রোদ মাখানো খুশী-ঝলমলে বাঁশবন কেবলি গড়ে আকাঙ্ক্ষার সবুজাভ ছায়াপাত করে যায়।

পরদিন ললিতের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ আঁটলেন। ছাত্রের বাবাকে অনেক ধরে করে ললিতের মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই হয়েছে। তাহলে শুধু খেতে পরতে সে তিরিশটা করে টাকা রাখলেও মাসের শেষে নিদেন চল্লিশ টাকাও পাওয়া যেতে পারে। আর এখানের একটা টিউশনী পনেরো টাকা। ব্যস, আর কি চাই!

স্কুলে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন রাখহরি। মন্ত্রের মত অক্ষরে কারণ দেখালেনঃ শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

আর দুটো টুইশনীও ছেড়ে দিলেন। মুখেই বললেন ছেলের বাবাকে, আর কেন, তিনি বুড়ো হতে চললেন, ছেলে রোজগারী হয়েছে, মাসে মাসে টাকাই যখন পাঠাবে--

বৃদ্ধ আর হচ্ছেন কই! মনে মনে অনুভব করেন তিনি, আবার সেই হারানো দিনের শক্তিসামর্থ্য ফিরে আসছে যেন। নতুন কিছু গড়ে তোলার তেমনি উৎসাহ, তেমনি নির্বাধ সজীবতা।

লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা ধার করলেন কিছু। বেশ চড়া সুদে। শুধু তাঁর যৌবনই বেহিসেবী হয়নি, তাঁর প্রৌঢ়ত্বও পরিণামদর্শী নয়। রাখহরি হাসেন মনে মনে। এককূলে যখন নিশ্চিত আয়ের কঠিন তীরভূমির সাক্ষাৎ মিলেছে তখন বাড়িটা মনের মত করে সাজাতে গোছাতে, তারপর ললিতকে একদিন চিঠি দিয়ে আনাতে বাধা কোথায়! ছোট্ট টুলের ওপর বসে বসে রাখহরি সারাদিন ঘরামির কাজ দেখেন আর আপন মনে চিন্তার ঢেউ তোলেন।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর নীচের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মাথায় অনেক প্ল্যান ঘুরছে। বাড়ির যা রূপ খুলেছে দিনকে দিন, ললিত দেখলে কি খুশীই না হবে! এই তো মাস কাবার হয়ে এল, চিঠিটা এইবার লিখে ফেললেই হয়। নগদ টাকার মোটা অংশ খরচা হয়ে গেছে ঘর সাজাতে। তারপরে এই দুচারটে শাড়ী ধুতি, বাসনকোসন কেনার খরচ। তা হোক, ললিত এলে তার প্রথম দিনের মাছটার আলুটার অভাব হবে না। তারপর করকরে চল্লিশ টাকা যখন সে রাখহরির হাতে তুলে দেবে তখন তিনি কি বলে আশীর্বাদ করবেন তাকে? এ্যাঁ? কি বলে আশীর্বাদ করবেন?

সুখস্বপ্নাবেশে তাঁর দুইচোখ মুদ্রিত হয়ে এল।

অকস্মাৎ ভূত দেখার মত চমকে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন তিনি। না—না—এমন সুন্দর দুপুরে তার কখনই মতিভ্রম হতে পারে না। কিন্তু তিনি ত ভুলও দেখছেন না। এইতো দিব্যি নীচতলার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, জানলা দিয়ে বাঁশবন দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বাঁশবনের গায়ে শেষ দুপুরের মলিন রোদ, আর দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, চৌকাঠ ধরে ললিতই দাঁড়িয়ে আছে বটে। ধুলোয় ধূসর অঙ্গ। পথশ্রমে বিবর্ণ বিশীর্ণ তরুণ মুখ।

ললিত প্রণাম করছে, রাখহরি ধরে বসালেন তাকে। বিস্ময় বিস্ময়ে কতক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। শেষে দু'তিনবার ঢোক গিলে বললে, ভাল আছিস বাবা?

ললিত ঘাড় কাত করলে। সেটা তার চোখেই পড়ল না। তাড়াতাড়ি কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন, ওগো ললিতের মা, দেখে যাও, কে এসেছে।

এতক্ষণে তিনি যেন মুক্তি পেলেন। আনন্দের সুরটুকু বিস্ময় ছাপিয়ে প্রকাশিত হল।

ললিতের মা দ্রুতপদে ঘরে ঢুকলেন। তাকে প্রণাম করতে যেয়ে ললিত আর উঠতে পারল না, সেইখানেই মাথা নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলল, মাগো, চাকরীটা আর রইল না, শুধু হাতের লেখা খারাপ বলে তাড়িয়ে দিলে।

রাখহরি সামনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। কথাটা কানে যেতেই দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, গাটা কেমন যেন টলে উঠেছে। কিন্তু ততক্ষণে আরো অনেক কথা তার কানে গলানো লোহা ঢেলে দিচ্ছে, চোখে বালির ঝাপ্টা ছুঁড়ে দিচ্ছে......কোম্পানীর বড়োবাবু বলেছিলো কাজ পছন্দ হলে সতের টাকা করে মাইনে দেবে।

—স-তে-র—না—স-ত্-ত-র?— রাখহরির জিভটা নড়ে উঠলো আলতো অসংলগ্নভাবে।

—না, সতের, আমি চিঠিতে তাই লিখেছিলাম, কিন্তু হাতের লেখা এত খারাপ, না, চাকরী কিছুতেই হলো না, কোথাও না......

জল, একটু জল চাইছে তাঁর তৃষিত জিহ্বা, বাতাস, মাথার ওপর একটু বাতাস, হায়! চোখের সামনে কেন ঝাপসা হয়ে আসছে সব......নতুন রং করা দেয়াল ধরে ধরে বোবা রাখহরি ভটচায মেঝেতে বসে পড়লেন।

দূরের বাঁশতলিতে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। বিশ্রী আর্তনাদ তুলে একটা বুড়ো বাঁশ লুটিয়ে পড়ল।

দুঃঘণ্টা

অশোককুমার মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরিশিষ্ট

বাইরে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেনি। ঘরটা অন্ধকারই। ভাল করে নজরে আসে না কিছুই। মশার একটানা গুঞ্জন ধ্বনি কানে আসে কেবল। চোখ খুলেই শুয়েছিলাম আমি। চিন্তার বিরাম নেই। শরীর এবং মন দুইই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শেষ নিঃশ্বাসগুলো তাই বোধহয় জোরে জোরে পড়ছিল।

হঠাৎ টর্চের আলো মুখের ওপর এসে পড়লো। চোখ দুটোতে যেন ধাঁধা লেগে গেল। চোখ বুজে ফেললাম। চোখ খুলেই দেখি সামনে কাপ্তেন দাঁড়িয়ে। সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেল। হৃদ্‌যন্ত্রটা অস্বাভাবিক রকম জোরে জোরে ধকধক করতে লাগল। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেন তার শেষ শিখাটুকু উজ্জ্বল করার প্রয়াস পাচ্ছে সে। কাপ্তেনের দিকেই তাকিয়েছিলাম, কিন্তু ভাষা আমার মূক হয়ে গেল। অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু সবই যেন অব্যক্ত রয়ে গেল। কাপ্তেনের আগমন প্রত্যাশাই করছিলাম, কিন্তু তার উপস্থিতি যেন সবই ওলট-পালট করে দিল আমার মধ্যে। যা কিছু চিন্তা করার ছিল তার সবই কি শেষ হয়েছে? কি করবো, কি ভাববো এখন?

কাপ্তেনই কথা বললেন প্রথমে—"খুব কষ্ট হয়েছে?" কোন উত্তর করলাম না। অনুযোগ অভিযোগের অভিমানে যে নিরুত্তর রইলাম, তা নয়। এ পরিহাস প্রশ্নের উত্তর দিতে আত্ম-মর্যাদায় বাধলো।

শান্ত্রী দুজনকে ইশারায় কাছে ডেকে কাপ্তেন আমার বাঁধন খুলে দিতে বললেন। বন্ধনমুক্ত করার এ আদেশ, কঠোর এবং কঠিন এক ইঙ্গিত। সমস্ত শরীর আমার হিম হয়ে গেল যেন। তবুও বন্ধনমুক্ত হয়ে যেন চরম স্বস্তি পেলাম আমি। হাত-পা সব অবশ হয়ে গেছে। শুয়ে ছিলাম, শুয়েই রইলাম আমি।

ঘরের বাইরে যেতে কাপ্তেন ইঙ্গিতে আদেশ করলেন আমায়। নিজে এগিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। কোন রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করলাম আমি বিনা বাক্যব্যয়ে। আমার পিছু নিল দুজন সশস্ত্র শান্ত্রী। বেয়নেট পরানো বন্দুক তাদের ওঠানোই আছে আমার উদ্দেশ্যে। ঘরের বাইরে আসতেই কাপ্তেন পিছু ফিরে শান্ত্রীদ্বয়কে ফিরে যেতে বললেন ইশারায়। শান্ত্রী দুজন বন্দুক নামিয়ে নিয়ে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে। কাপ্তেন এগিয়ে চললেন। আমিও যন্ত্রবৎ তাকে অনুসরণ করে চললাম।

আকাশে চাঁদ ছিল। বাতাস ছিল শান্ত। এখানে-ওখানে নানা আকারের এবং আকৃতির অনেকগুলো মেঘ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিল। জোৎস্নার আলোয় সবটাকে সাদা দেখাচ্ছিল। এয়ারোড্রোমের পাকা রাস্তাটাও চাঁদের আলোয় পরিষ্কার চকচকে দেখাচ্ছিল। এদের সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মন আমার ছিল না তখন। একটা সাদা গোল দড়ি কাপ্তেনের কাঁধের ওপর থেকে নেমে কোমরের কাছে তার খাপখোলা পিস্তলটা ঝুলিয়ে রেখেছে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে সেটা। দৃষ্টি আমার ঘুরে ফিরে ওই একই জিনিসের ওপর এসে পড়ছিল কেবলই।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন কাপ্তেন। পিছু ফিরে বললেন তিনি—"ভয় করছে?"

চুপ করে ছিলাম। চুপ করেই পথ চলতে লাগলাম।

কাপ্তেন পিছিয়ে আমার পাশে এলেন। স্পষ্ট সহজ গলায় বললেন তিনি—"ভয় করবেন না। আপনাকে গুলী করতে নিয়ে যাচ্ছি না আমি!"

এই আশাতীত অস্বাভাবিক উক্তিতে যতটা আশ্চর্য হলাম তার চেয়ে কম আশ্চর্য হলাম না আমাকে "আপনি" বলাতে। ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম হলো না তার কথাগুলো। কাপ্তেন কি বললেন? যা বলেছেন, ঠিক তাই শুনেছি তো? না এ বোধ হয় আমার আত্মসান্ত্বনার মনগড়া কথা।

"কি বলছেন" প্রশ্ন করে যে তার কাছ থেকে পুনরুক্তি শুনবো এ সাহস পর্যন্ত আমার হল না। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বুঝালাম।

এরই জন্যই তো কাপ্তেন তার জেরার জের টানেননি আটটার পর এসেই?

চমকে উঠলাম।—

কাপ্তেন নিজের কথার জের টেনে বললেন—"আপনার কেস্ আমি হায়দ্রাবাদ আরমি হেডকোয়ার্টাসে 'রেফার' করেছিলাম। তাদের আদেশ আপনার প্রাণহাণি না করা। কিন্তু সম্প্রতি সামরিক নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে আপনাকে। আপনার অফিসের কর্মচারী-দের পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে নাম-ধাম লিখে ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনাকে এবং আপনার দপ্তরের আর একজন কর্মচারীকে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। কাল এরোড্রোমের যন্ত্রপাতি সব দেখে নিয়ে আপনাদেরও পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনার ওপর আর কোন রকম অত্যাচার হবে না, এ আমি কথা দিচ্ছি।"

নিজের শ্রবণ শক্তিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখন স্বপ্ন দেখছি না তো? নিজের সত্ত্বা সম্বন্ধে কেমন সন্দেহ এসে গেছে মনে।

যে পথে গিয়েছিলাম, ফিরতে লাগলাম সেই পথ ধরে।

পুনর্জন্ম পেলাম। "ইতি" দিয়ে 'পুনশ্চ' শুরু হল। জীবন নাট্যের অঙ্ক শেষে আরম্ভ হল আর এক অঙ্ক। মৃত্যু আশঙ্কার অবসানে, বন্দী জীবন চলবে এবার। কোথায়, কবে এর শেষ? আমার জীবনের নাটকীয় এ দুঃঘণ্টার সার্থকতা কি?

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি চাঁদ মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। অল্পক্ষণ পরেই মেঘ গেল সরে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে চাঁদ আবার হেসে উঠলো যেন।

কাপ্তেন উচিৎ কথাই বলেছেন। কাপ্তেনের কথা বলার ধরণ আমূল পরিবর্তন হয়েছে গত দুঃঘণ্টায়। আমি সম্মতি জানালাম।

যে কুটীরে মৃত্যুর মুখোমুখি দুঃঘণ্টা কাটিয়েছি, সেখানেই আবার ফিরে এলাম। কুটীরের সামনে সশস্ত্র একজন লেফ্‌টানেণ্ট দাঁড়িয়ে। তাকে কিছুদূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সাথে কি কয়েকটা কথা বলে কাপ্তেন চলে গেলেন। যাবার আগে আমায় বলে গেলেন আবার—"আপনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন। এই লেফ্‌টানেণ্ট অফিসারকে আপনার অসুবিধার কথা জানাবেন।"

কাপ্তেনের এই মতান্তর দেখে আশ্চর্য তো হলামই, অবাকও না হয়ে পারলাম না। যে খাটিয়াতে বাঁধা অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তারই ওপর হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়লাম। বাইরের জোৎস্নাটা তখন যেন বড় ভাল লাগল। একদৃষ্টে দরজার ভিতর দিয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে রইলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লেফ্‌টানেণ্টের সাথে আলাপ হল। অতি ভদ্র এবং অমায়িক এঁর ব্যবহার। বিনীত হয়ে বললেন তিনি—"চলুন, আপনার কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসবেন।"

"চলুন" বলে তাঁর অনুসরণ করলাম। সঙ্গে আর কোন শান্ত্রী রইলো না।

এরোড্রোমের কণ্ট্রোল টাওয়ারের একটি ঘরে আমার এবং আবহাওয়া অফিসের সমস্ত কর্ম-চারীদের আটক রাখা হয়েছে। অনাহারে এবং ক্লান্তিতে সকলেরই চোখ গেছে বসে—উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় সমস্ত মুখগুলো বিষাদমাখা। রাওকে কেবল দেখলাম না ঘরে। আমার দেখা পেয়ে সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হল। অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল, আমাকে এরা মেরে ফেলেছে। খবরাখবর আদানপ্রদান করার

অবকাশ তখন ছিল না। নির্দেশানুযায়ী আমাকে সাবধানবাণী জানিয়ে দিতে হল সবাইকে। যথাসম্ভব ধীর সংযত কণ্ঠে বল্‌লাম আমি তাদের—এখানে কারও কাছে বা কারও বাড়ীতে কোনোরকম অস্ত্র থাকলে তা এখনই বলে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আপনারা নির্ভয়ে থাকবেন। পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে পরে আপনাদের ছেড়ে দেবে এরা। আমাকে এবং রাওকে উপস্থিত মিলিটারী arrestএ থাকতে হল কয়েকটা জরুরী কাজের জন্য। আমাদের জন্য আপনারা আশঙ্কা করবেন না কিছু।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি তখনও।

সমস্ত হাকিমপেট এরোড্রোমটায় হায়দরাবাদ সৈন্য ছেয়ে গেছে। অতি পরিচিত পরিবেশটির আমূল পরিবর্তন হয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে। আপন ঘরেই যেন অনাধিকার প্রবেশ করেছি আমি। অপরিচিতের মধ্যে বেখাপ্পা বেমানান আমি। বিনা বাক্যব্যয়ে লেফ্‌টেনেন্টের সাথে সেই পুরানো কুটীরটায় ফিরে এলাম আবার। সামরিক সৈনিকদের খাবার আমার জন্য খানিকটা নিয়ে এলো একটা শান্ত্রী। কোন রকমে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে প্রাণভরে অনেকখানি জল খেয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ পরে এরোড্রোমে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ সৈন্যের অফিসারদের যেখানে খাওয়া-দাওয়ার এবং এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা, সেখানেই আমাকে নিয়ে গেল লেফ্‌টানেণ্ট অফিসারটি। বুঝলাম তারই হেপাজতে রয়েছি আমি। সেখানে সাক্ষাৎ হল রাওয়ের সাথে। রাও এবং আমার থাকার ব্যবস্থা হল এখানেই। একটা খাটিয়াতে এলিয়ে দিলাম নিজের ক্লান্ত দেহটাকে। ক্লান্তিতে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। ঘুমিয়ে যেন বাঁচলাম আমি।

সামরিক হেপাজতে দ্বিতীয় দিনও কাটলো। আমাদের কোথাও নিয়ে যাবার কোনো উৎসাহ দেখলাম না কারও। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেনের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তিনি বল্‌লেন—"হায়দ্রাবাদ রেডিওর খবর শুনেছেন?" মুখে তার ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছে।

শান্তভাবে উত্তর করলাম—"না শুনিনি।"

—"শোনেন নি? পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখন ঠেলা সামলাতে পারবেন আপনার নেতারা?"

এ উক্তির উত্তর নেই। তার এ অবান্তর উক্তির মধ্যে বিদ্রূপের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে আমি অন্য কথা বল্‌লাম। "এক কাপড়ে গতকাল সকাল থেকে রয়েছি আমি। পুলিশ স্টেশনে আমাকে আজ নিয়ে যাওয়া হয়নি। আপনার আপত্তি না থাকে কিছু কাপড়জামা যদি বাড়ী থেকে আনিয়ে দিতে পারেন বড় উপকৃত হই।"

ক্যাপ্টেন করুণা দেখালেন আমায়। তিনি বল্‌লেন—"না আপত্তি নেই আমার। আপনাকেই ট্রাকে করে নিয়ে যাবে আপনার বাড়ীতে। আপনি ইচ্ছামত আপনার প্রয়োজনীয় নিয়ে আসতে পারেন। কাল আপনার যা হোক্ একটা ব্যবস্থা হবে। হ্যা, বলে রাখি আপনাকে। আমি নিজে আপনার বাড়ী সার্চ্চ করে এসেছি। অফিসের কাগজপত্তর, রেডিও ইত্যাদি নিয়ে এসেছি আমি। আপনার অন্য কোন ব্যক্তিগত জিনিস আমি আনিনি।"......

সেই রাতেই মিলিটারী ট্রাকে চড়ে বাড়ী গেলাম শান্ত্রী এবং লেফ্‌টানেন্টের সাথে।

বোলারামের যে অঞ্চলে থাকতাম, সেটা যেন শ্মশান হয়ে গেছে। কোন' অসামরিক নাগরিকের সাথে সাক্ষাৎ হল না আমাদের। বাড়ীতে ঢুকে দেখি, গতকালের সকালের খাবার তখনও সাজানো রয়েছে। ঘরদোর ফাঁকা। চাকরটি পালিয়ে গেছে। ট্রাঙ্ক, বাক্স সব কিছু ভাঙ্গা! ঘরগুলোয় ঘুরে বুঝলাম, আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী লুট হয়ে গেছে। কাপড়-জামা ছাড়া, অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ছোট জিনিস নিয়ে গেছে গুণ্ডারা। কারা নিয়েছে সে তো জানাই আছে। স্থানীয় রাজাকারদেরই এই কীর্তি। গ্রামে, শহরে সুবিধা পেলেই এই তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ। শোকে দুঃখে হাহুতাশ করার মত অবকাশ ছিল না। কাপড়-জামা কিছু সঙ্গে নিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম আমি। দু'চারখানা বই, খাতা কলম নিতেও ভুলিনি। কতদিনের কারাবাস এখন ভোগ করতে হবে, কে বলতে পারে।

সামরিক হেপাজতে ফিরে এলাম আবার। সেখানে আরও দু'দিন কাটল। ১৬ই সেপ্টেম্বর বিকালে আমাকে এবং রাওকে বোলারাম পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের জন পঁচিশ কর্মচারীকে পুলিশ স্টেশনের দুটি ছোট্ট কামরায় আটক রাখা হয়েছে। তাদের নিদারুণ অবস্থা দেখে চোখের জল আর আটকে রাখতে পারলাম না। পশুদেরও বোধহয় মানুষ এভাবে রাখে না কোথাও। অতি পরিচিত তবুও অন্য জগতের মানুষ যেন এরা। নায়ার আমার হাত ধরে বললে—'So we meet again. This is life.' গলার স্বর তার গাঢ় গম্ভীর। চোখে তার জল টল্‌টল্ করছে। উত্তরে বললাম—

"yes we part to meet again. But this time it is for the goodwill of you all."

আমাকে এবং রাওকে দেখে সকলেরই স্বস্তি ফিরে এলো। সকলেরই আশঙ্কা ছিল, আমাদের দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের সকলকে পুলিশ স্টেশনে এনে পরে কি করবে স্থির করতে না পেরে 'লক-আপেই' আটকে রেখেছে গত তিন দিন!

বোলারাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে ত্রিমলঘেরী। সেখানে একটা বাড়ীতে ডাক বিভাগের সব কর্মচারীদের আটক রাখা ছিল। সেখানেই আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। পরিচিত অপরিচিত অনেকের সাথেই আলাপ হল সেখানে। এরোড্রোমের কর্মচারী আমরা যে বেঁচে রয়েছি সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল তাদের কাছে। একটা ছোটখাটো বাগান বাড়ীতে আমরা প্রায় একশ'জন ভারত সরকারের কর্মচারী সেই রাত কাটালাম সেখানে। বাগানের পাঁচিলের ধারে ধারে শান্ত্রী অবশ্য সব মোতায়েন ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ যে অসুস্থ হয়ে পড়েনি এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। পরস্পর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প হতে লাগল অবিরাম। সে গল্পের যেন শেষ নেই। সকলে এক জায়গায় এসে মনে বল পাওয়া গেল অনেকখানি, যদিও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউই কোন নিশ্চিত কথা বলতে পারে না।

সন্ধ্যা এলো। রাত্রি গভীর হল। পরে তারও অবসান এলো। ভোর হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। চৈতন্য ফিরে আসতেই আর একটা অনিশ্চিত কঠোর দিনের সম্মুখীন হলাম। প্রভাতে প্রাতঃক্রিয়াদি শেষ হল। বেলা বাড়তে লাগল।

অনর্গল বকে চলেছে ঘরের সমস্ত লোকগুলো। এত অবান্তর কথাও মানুষে বলতে পারে। একটুও চুপ করে থাকতে পারে না এরা। জন আষ্টেক দশ অপেক্ষাকৃত চুপ করে আছে। তারা তাসে বসেছে। 'ব্রিজ' খেলা হচ্ছে। কোথা থেকে এক জোড়া তাস জোগাড় করে, বেশ ভুলে আছে তারা। তাস-পাশা-দাবার ওই এক মস্ত সুবিধা। সময় কাটানো এবং নিজেকে ভুলিয়ে রাখার মস্ত সহায় এরা।

হঠাৎ সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কি একটা খবর এসেছে। অপরিচিত একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি খবর?"

উদ্বেগ এবং আশঙ্কা নিয়ে উত্তর করলেন তিনি—"আমাদের এ বাড়ী ছাড়তে হবে।"

—"কোথায় যেতে হবে?"

—"তা জানা নেই।"

—"কখন?"

অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা গেল বেড়ে। সামান্য জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে নিল সবাই। দুখানা বাস দাঁড়িয়েই ছিল বাগান-বাড়ীর বাইরে। সারি দিয়ে বন্দীদের মত গিয়ে সেই দুখানা বাসে উঠে বসলাম সবাই। সকলেই এখন অস্বাভাবিক রকম নীরব। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় যেন সকলের মনেই চেপে বসেছে। নিরুপায় যখন, তখন নীরবেই বিপদের সম্মুখীন হওয়া সমীচীন। গুজব শুনেছিলাম, ক্লাস এ, বি, সি প্রিজ্‌নার হয়ে ভাগ হয়ে যাবো আবার। এ ভাগ অবশ্য কারও যেন ভাল লাগছিল না—ভাবতেও পারছিল না কেউ।

বিখ্যাত ত্রিমলঘেরীর ফোর্ট। এই ফোর্টের মধ্যেই বাস দুখানা নিয়ে গেল আমাদের। সেখানে বিরাট একটা হলঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ত্রিমলঘেরী ফোর্ট তখন হায়দ্রাবাদ সৈন্য দিয়ে সুরক্ষিত। নিশ্চিন্ত হলাম সবাই।

বুঝলাম এখানেই আমাদের War Prisoner হয়ে থাকতে হবে অনিশ্চিত কালের জন্য। আফ্‌শোস্ করার কিছু ছিল না। মন আমাদের তৈরীই ছিল। বরং গত চার দিনের কষ্টের পর এ আমার কাছে আরামেরই মনে হল। যতদিন আটক থাকতে হবে, ততদিন যদি এখানেই থাকতে পাই তাহলেই ভাগ্যবান মনে করবো নিজেকে।

কিন্তু থাকতে হল না একদিনও! সেইদিনই দুপুরে খবর এলো, হায়দ্রাবাদ সৈন্য ফোর্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে! বিনাসর্তে হায়দ্রাবাদ সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে ভারত সৈন্যের কাছে।

আমরা মুক্ত? এ অনুভূতির উপলব্ধি হয় না সহজে। কি করবো? কোথায় যাবো? আমাদের ওপর খবরদারি করবার মত কেউ রইল না ফোর্টের মধ্যে! ফোর্ট ছেড়ে বাইরে বেরুতে গেলে কেউ ধমক দিয়ে বলবে না আমাদের—"এই কোথায় যাও!"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো সবাই। হল ঘরখানা গম্‌গম্ করতে লাগল। কেউ গান ধরলো, কেউ উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল। বিজয়ী বীর যেন আমরা সবাই।

ফোর্টের বাইরে এসে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। রাস্তা-ঘাটে জনতা তখন আইন-শৃংখলার আয়ত্তের বাইরে। ভারত সৈন্যের ট্যাঙ্ক, ট্রাক, বিজয় গৌরবে শহরের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে কি উল্লাস, সে কি জয়ধ্বনি। নিরস্ত্র নাগরিকেরা অন্তর থেকে অভিবাদন জানাচ্ছে এই বিজয়ী ভারত—সৈন্যদের।

সন্ধ্যার পর একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করে আমরা বোলারামে দক্ষিণ সদনে এলাম। চারিদিকেই চাঞ্চল্য, শহরময় উৎসাহ উত্তেজনা। ভারত সৈন্য তখনও ক্রমাগত শহরের মধ্যে প্রবেশ করে নানা ঘাটি আগলে বসছে। বাঁধা জল যেন বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এই সৈন্যকে কোন্ সাহসে হায়দ্রাবাদ হুমকি দেখায় তো!

নির্দেশ পেলাম দক্ষিণ-সদন থেকে। পরের দিন সকালেই এরোড্রোমে ফিরে গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব যন্ত্রপাতি চালু করে নিয়ে, কাজ চালাতে হবে।

* * * * *

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।

শোভাযাত্রা করে অফিসের সমস্ত কর্মচারী হেঁটে গেলাম বোলারাম থেকে হাকিমপেট এরোড্রোমে। পথে অনেকেই ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানালো আমাদের। এ তাদের অন্তরের শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিবাদন। ভেল্কিবাজির মত সব উপে গেছে যেন। ফাঁকা মরুভূমির মত পড়ে রয়েছে বিরাট এরোড্রোমখানা।

ঘণ্টা দুই-এর মধ্যে বেতার যন্ত্রগুলো আমাদের সক্রিয় হয়ে উঠলো। মাদ্রাজ, বম্বে, নাগপুরের সাথে আলাপ শুরু হয়ে গেল। বিমান-পথ সচল হল, স্বাভাবিক হল।

সমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরমহংসদেব এত বড়, মহান্ ও গভীর চরিত্র আর আমরা এত তুচ্ছ, অগভীর ও পল্লবগ্রাহী যে তাঁর সম্বন্ধে কোনও প্রকাশ্য আলোচনা করতে বসা ধৃষ্টতাই মনে হয়। কিন্তু যেহেতু, মহাপুরুষের চরিত্র ও বাণী যুগে যুগে মানুষকে কাছে টেনেছে, ভাবিয়েছে এবং মূক ব্যক্তিকেও বাচাল করেছে, সেই হেতু তাঁর মাহাত্ম্য এবং উপলব্ধ সত্যকে কিছুটা বিশ্লেষণ করে সকলের সামনে তুলে ধরার মতন কাজেরও বোধ হয় একটা সার্থকতা আছে।

গান্ধীজীর কর্ম-জীবনই যেমন তাঁর বাণী, পরমহংসদেবের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ, চিন্তা, ভাব ও কথামৃতই তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের উজ্জ্বলতম ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না, এখানে সে প্রশ্ন অবান্তর। বিশেষ করে আমাদের মতন অর্ধশিক্ষিত দেশে, যেখানে সাধু ও সাধনার চেয়ে যৌগিক-শক্তি আর বিভূতিলীলার মাহাত্মাই বেশি, সেখানে পরমহংসদেবের সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব বোঝা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-পরিবৃত থেকে যে মহাপুরুষ এই সংসার ও সমাজের পরিবেশেই আপনার অমূল্য উপদেশ বিতরণ করে গেছেন, তাঁর মধ্যে যে আদর্শ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল—যা সচরাচর ঘটে না, যুগ-যুগান্তের পর মাত্র একটি দুটি মানব-চরিত্রে যার আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয় ঘটে—এ কথা নিঃসন্দেহ।

সাধক রামকৃষ্ণের একটি দিক, আর কথক রামকৃষ্ণের আর একটি দিক। এই দুটি গুণের, অর্থাৎ সাধনা ও কথকতার শ্রেষ্ঠ মিলন হয়েছিল পরমহংসদেবের উপদেশে ও কথোপকথনে। যেখানে তিনি ভাব-সমাধি-মগ্ন, সেখানে তাঁর নিঃসঙ্গ আত্মার যাত্রা, প্রসার ও ব্যাপ্তি সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে। কিন্তু যেখানে তিনি ভক্ত শিষ্যের সখা ও সুহৃৎ, সেখানে তিনি মনের কথা মুখ-খুলে বলেন এবং এমন সুন্দর ও নিপুণভাবে বলেন, যে সে কথা ভোলা যায় না। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকবারই 'কথামৃত' পড়েছি। যতবার পড়েছি, ততবারই মনে হয়েছে পরমহংসদেব অতি উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন,—জীবন-শিল্পী ও বাক্‌শিল্পী। এমন শিশু-সুলভ সরলতায় এমন নিষ্পাপ ও মধুর জীবন যাপন যিনি করেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্প—সত্য তাঁর কাছে নিত্য উদ্ঘাটিত। আর ধর্মতত্ত্বকে যিনি নিগূঢ়-তার খোলস খুলে ফেলে, দার্শনিক কূটজালের বাহ্যবেশ ছাড়িয়ে নিয়ে, এমন সরস ও উপাদেয়-ভাবে পরিবেশন করতে পারেন ও জানেন, তাঁর মধ্যে মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা নিশ্চয়ই আছে। লেখক হিসাবে এই কথাটাই আমার মনে হয় যে, ছাপা অক্ষরে শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত অনেক রচনার চেয়ে মুখে-মুখে চল্‌তি ভাষায় রসিয়ে কথা বলার যে ক্ষমতা, সেটা বাচনভঙ্গীর তথা শিল্প-শক্তির কিছু কম পরিচয় নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কথা-বলা দুটিই ছিল আশ্চর্য শিল্প। কিন্তু সে দুটি হল এক অপরূপ ব্যক্তিত্বের দুটি স্বতন্ত্র প্রকাশ। আর পরমহংসদেবের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় অনুভূত সত্যের উপলব্ধি আর ঘরোয়া ভাষায়, অন্তরঙ্গ চিত্র ও প্রতীক-দৃষ্টান্তে, সেই সত্যের মহিমা রসসমৃদ্ধ করে বর্ণনা করা এক পরম-অন্বয়ের সূত্রে বাঁধা। শ্রীরামকৃষ্ণের রসবোধ, তাঁর কৌতুক-প্রিয়তা, তাঁর বাক্‌পটুতা এবং উদাহরণ-নির্বাচনের নৈপুণ্য সত্যিই অপূর্ব।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের উপদেশ এইভাবেই বিকীর্ণ হয়েছে। রূপক ও কথাসাহিত্যের একটি বড় নমুনা হল বাইবেল ধর্মগ্রন্থ। যীশুখৃষ্টের 'প্যারেবল্' আর শ্রীরামকৃষ্ণের কথকতা হল প্রাচ্য দেশীয় সাধনা ও ঐতিহ্যেরই উজ্জ্বলতম পরিচয়। তার মধ্যে আছে জ্ঞানের সারমর্ম—যা নিছক যুক্তি-বিজ্ঞানের এবং শুষ্ক মতবাদের অনেক ঊর্ধ্বে। তার মধ্যে ইমারৎ তৈরির কারিগরি নেই, আছে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সহজ শিল্পের পরিকল্পনা।

এইবার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অর্থ নির্ণয় করা যাক। হিন্দু সমাজের যে পরিবেশে পরমহংসদেবের আবির্ভাব, সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শুধু বাংলা দেশে নয়, সর্বত্রই একটা বড় রকমের সংকট উপস্থিত হয়েছিল, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম প্লাবনে নব্য শিক্ষার উগ্র আকর্ষণ, অপর দিকে সেই নব্য সমাজের উচ্ছৃংখলতা। একদিকে বৈষয়িক বুদ্ধি, অপর দিকে সংশয়বাদ। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সমাজের মধ্যেই অজস্র গলদ, অকারণ বিধি-নিষেধের নাগপাশ। ধর্ম জীবনেও তখন প্রচুর গ্লানি। কেবল বিভিন্ন মতবাদ আর আড়ম্বর-অভিমান। ঠিক এই সময়ে, রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তাঁর সাধক জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের অনেক অংশই আজও আমাদের অজ্ঞাত। তবে নানাভাবে ঈশ্বর-সাধনা করে তিনি যে অবস্থায় উন্নীত হলেন, সেখানে নব্য সমাজের যুক্তি-অভিমান এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও বিস্মিত হয়ে রইল। গল্পচ্ছলে পরমহংসদেব যখন বিশ্বের কল্যাণকামনায় লোক-শিক্ষা দিতে লাগলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলেঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না"......।

ঈশ্বরের আদেশ-প্রাপ্তি না হলে এমন কথা মুখে জোগায় না। তাই সমাজের অভিজাত-শ্রেণী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর দরিদ্র মানুষ, সকলেই ছুটে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে এই নিরভিমান আপনহারা মাতৃ-পূজারীর কাছে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা নগণ্য, সমাজের আদব-কায়দা, চাল-চলন তাঁর জানা নেই। কিন্তু গৃহী অথচ বিষয়ভোগ-বিমুখ, সামাজিক অথচ কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, দেশমুক্তির অকৃত্রিম সন্তান অথচ পরমজ্ঞানী এই সাধকের সর্বভেদিনী বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ পরিচয় পাবার জন্যে সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত পুরুষ তাঁর কাছে স্বেচ্ছায় হাজির হয়েছিলেন। ধর্মগুরুর পদে অধিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না। তাঁর উপদেশেও কোনো ফাঁকি ছিল না। শিক্ষা-বিহীন হয়েও শ্রবণ-মনন-স্মরণ বৃত্তিগুলির সাহায্যে হিন্দু ও অপরাপর শাস্ত্র-দর্শনের সারতত্ত্ব তিনি যে অবলীলায় মন্থন করে লোকের সামনে প্রকাশ করতেন, তাতে শিক্ষিত মানুষ বিস্মিত এবং অভিভূত হত। কবির কল্পনা-শক্তি, কথকের প্রকাশভঙ্গী, সত্য-সাধকের ঋজু দৃষ্টি, বিজ্ঞানীর সতর্ক পর্যবেক্ষণ-শক্তি কি করে একটি মানুষের মধ্যে এমন সহজ ও সাবলীলভাবে মিলিত হয়েছিল—সে কথা যখনই ভাবি, তখনই মনে হয় যে পরমহংসদেব যদি ধর্মগুরু না-ও হতেন, তবু তাঁর মনের ও হৃদয়ের অসামান্য বৈশিষ্ট্য, তাঁর নির্ভীক্ সবল-স্বাধীন মন, কোমল-কঠিন চরিত্র, জাগ্রত দৃষ্টি এবং সত্যনিষ্ঠা তাঁকে যে কোনও যুগে অসাধারণ পুরুষ বলেই চিহ্নিত করত।

পরমহংসদেবের যে ঐশ্বরিক অনুভূতি বা উপলব্ধি, তার পিছনে ছিল অনেকদিনের আকুল এবং একাগ্র সাধনা। ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর সাহায্যে তন্ত্র-সাধনা, ভক্ত জটাধারীর সাহচর্যে বাৎসল্য রসের সাধনা—সন্ন্যাসী গুরু তোতাপুরীর দীক্ষায় নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনা। এরূপ নানাভাবে বিভিন্ন ধর্ম-সাধনা—এগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি সর্বধর্মের তত্ত্ব-সমন্বয় করে আপনার জীবনে সেই মহাসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, যাকে Gilbert Murray বলেছেন :—"Dogma

divides, religious experience unites," অর্থাৎ মতবাদের বুদ্ধিবিচারে নিরর্থক বিরোধ, কিন্তু ধর্মের গভীর অনুভূতিতেই প্রকৃত মিলন। ধর্মের এই সূক্ষ্ম ও গভীর মিলন, বিশ্বমানবের সঙ্গে গভীর একাত্মবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পরমহংসদেবের সাধনার তাৎপর্য।

পরমহংসদেবের চরিত্র, সাধনা এবং শিক্ষা সম্পর্কে আমি একাধিকবার 'সমন্বয়' কথাটির প্রয়োগ করেছি। কেন না, সমাজ ও ধর্ম-জীবনে তাঁর যে বিশিষ্ট স্থান ও দান, সেটি ঐ সমন্বয়ের সূত্রেই গ্রথিত। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি যুগ-সন্ধিক্ষণ। বাঙলার সমাজ ও ধর্ম-জীবনের তখন ঘুণ-ধরা অবস্থা। দরিদ্র এবং পরাধীন দেশের শিল্প-সাহিত্য-বাণিজ্য শ্রীহীন, প্রাণহীন এবং বিদেশী বণিকের অনুগ্রহ-পুষ্ট। বহির্জগতে তখন বাঙালীর কোনও মুক্তির উপায় ছিল না। পরমহংসদেব তখন শাশ্বত ধর্মের মূল সত্য সহজ ভাষায় প্রচার করলেন, ঘোষণা করলেন মনের স্বাধীনতা। অথচ তাঁর মধ্যে কোনও গোঁড়ামির বন্ধন ছিল না। জাতিভেদ সম্পর্কেও তাঁর মতামত ছিল উদার। হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য তাঁর জেদ ছিল না। অপর ধর্মের প্রতি, বিদেশী সমাজের প্রতি, তাঁর কোনও সংকীর্ণ মনোভাব ছিল না। আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। অথচ সজ্ঞানে তিনি ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেন নি। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের বুলি তিনি মুখস্থ করেন নি। যুগের চলতি ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার চেষ্টাও করেন নি। বিদেশী, বিধর্মী অথবা নব্য সমাজকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে অবজ্ঞা করেন নি। অথচ সকলের ধর্মের প্রতি তাঁর একই উদার মনোভাব দেখাতে পশ্চাৎপদ হন নি।

সে যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ ও তার নেতাদের সঙ্গে পরমহংসদেবের বিশেষ প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল এই কারণেই। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, ত্রৈলোক্য সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তদানীন্তন ব্রাহ্ম ভক্তরা তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনিও তাঁদের আন্তরিক প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতেন। এক হিসেবে শিক্ষিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সনাতন হিন্দু সমাজের প্রধান ঘটক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জাতিভেদে অবিশ্বাসী এবং হিন্দুয়ানির তীব্র সমালোচক ব্রাহ্মদের সঙ্গে একত্র পানাহারে তিনি কুণ্ঠিত হননি। যে সব শিক্ষিত ব্রাহ্ম অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম ও চিন্তাবীর সে যুগে পরমহংসদেবের কাছে এসেছেন, তাঁরা কিসের সন্ধানে এসেছিলেন? যাঁর কাছে তারা এসেছিলেন, তাঁর নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানের ও শিক্ষার অহঙ্কার কিছুমাত্র ছিল না। সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতন মনোবৃত্তি, ধর্মের লীলা প্রকট করবার কোনও ক্ষুদ্র, চমকপ্রদ শক্তি দেখাবার তাঁর বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। অথচ দুই বিরুদ্ধ উপাদানের মধ্যে এত সহজ আকর্ষণ, শুদ্ধ মনের মিলন সম্ভব হয়েছিল কি করে? গোঁড়ামি ও সংস্কার-বর্জিত এত উদার মনের প্রসার বিনা সমন্বয়-সাধনায় সম্ভবপর হয় কি? ব্রাহ্ম সমাজ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে খোলাখুলি সমালোচনা অথচ আন্তরিক প্রীতি আর ভক্তির রসমাধুর্য পেয়েছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। মালিন্য-বর্জিত, আনন্দময় প্রীতির স্পর্শে, ব্রহ্মের নামগানে ও কীর্তনে তাঁর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার প্রশমন হয়েছিল। ঊনিশ শতকের বাঙলার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ব্রাহ্ম-সমাজের এই অদ্ভুতপূর্ব মিলন আমাদের ধর্ম ও সমাজের দিক থেকে একটি সার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। এক দলের বিপ্লবী চিন্তা, অপর দলের নিবর্তন-সাধনা। এক সমাজের শুদ্ধ জ্ঞান ও নিরাকার-প্রীতি, আর একটি মানুষের অপরূপ ভক্তি এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আশ্চর্যভাবে মিশেছিল একটি বিশেষ লগ্নে।

যে ভারতীয় সাধনা, জিজ্ঞাসা এবং মানব-প্রীতি সুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, তারই সমাপ্তি ঘটল সেই শতকের শেষ ভাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে। যে ত্রিধারায় ভারতীয় সাধনার খণ্ডিত প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করি রাজা রামমোহনের উপনিষদ্-লব্ধ ব্রহ্ম-সাধনা দ্বারা প্রভাবিত বৈদান্তিক নব্য হিন্দু সমাজের যুক্তিবাদী চিন্তাধারায়, আর্য-সমাজের অনুসৃত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং সনাতন ধর্মাচরণে, পরবর্তী কালে গীতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মে,—সেই ত্রিধারার সংগম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের তীর্থ-প্রাঙ্গণে। উপনিষদের—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' আর গীতার—

'ন চাহং বেদৈর্ন তপসা
ন দানেন চেজ্যয়া
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং
দৃষ্টবানসি মাং যথা'

আর নিরাকার-বাদীর বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়-চিন্তা সব এসে মিলেছিল একটি নিরক্ষর, নিরহঙ্কার, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের কণ্ঠোচ্চারিত চরম আন্তরিক উক্তিতে—'এই পাখা যেমন দেখছি—সামনে, প্রত্যক্ষ—ঠিক অমনি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি।'

পরমহংসদেবের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে—ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব, সাধনার অভিপ্রায়, জ্ঞান-লাভের বিভিন্ন পন্থা, এ সবের সমন্বয় ঘটেছিল এমন একটি জীবনে—যেখানে কর্মে আর চিন্তায়, বাক্যে আর আচরণে, উপদেশে আর জীবনায়নে ঘটেছিল পরিপূর্ণ, স্বভাব-সুন্দর সংগতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম-চিন্তার প্রথম দিকে যে মূলগত দ্বন্দ্বের আভাস পাই,—রামমোহন, দয়ানন্দ অথবা বঙ্কিম-প্রবর্তিত আপাত-বিরোধী চিন্তা-ধারার,—সেই দ্বন্দ্বের শোধন, সংগত এবং পূর্ণ মিলন হয়েছিল পরমহংসদেবের জীবনে, সাধনায় এবং কথামৃতে। বৈষ্ণব সাধক, মরমিয়া ও সুফীর দল মধ্যযুগ থেকে যে ঈশ্বর-উপলব্ধি, সত্যের অনুভূতি, বহুর পিছনে—বিচিত্র খণ্ডিত সত্তার পিছনে—যে গভীর একাত্মবোধ সন্ধান করে ফিরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী—ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিপূরক।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে এই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে এই সমন্বয়-সাধনা, ভারতীয় ঐতিহ্যের এই গতিশীলতা এবং ক্রমিক প্রসারের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিই আমায় মুগ্ধ করে। তিনি যে সাধু-সন্ন্যাসী, এইটেই তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা নয়। তিনি এযুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ—যাঁকে দেখে লোক শিখবে, প্রেরণা পাবে, ভেদাভেদ-রহিত হয়ে বিশ্ব-মানবের আত্মার কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হবে—এইটাই হল সব চেয়ে বড় কথা। যীশুখৃষ্টের জীবন-বাণী উপলব্ধি করেই সলের শিষ্যত্ব এবং সেণ্ট পল-এ তাঁর রূপান্তর সার্থক হয়েছিল। পরমহংসদেবের প্রকৃত মাহাত্ম্যের বিচার, বিশ্লেষণ ও মর্মগ্রহণ করেই নরেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব এবং স্বামীজির কর্মপ্রেরণা ঠিক তেমনিভাবেই সার্থক হতে পেরেছিল। ধর্মগুরু আর প্রচারক হিসেবেই তাঁদের পরিচয় একমাত্র সত্য নয়।

পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণীর উপযুক্ত একখানি বাঙলা বইয়ের অভাব অনুভব করেছি অনেক দিন থেকে। ঊনিশ শতকের বাঙলা সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও কর্ম-প্রসঙ্গের পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য ও সাধনার তাৎপর্য-বোঝানো একটি ভালো সর্বাঙ্গপূর্ণ অনুশীলন গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয়নি।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

এক

গ্রেপ্তার—ফ্রাউগ্রুবাক ও ফ্রাউলিন বার্সৎ-নারের সঙ্গে আলোচনা।

জোসেফ কের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অনেক-দিন ধরে কেউ অভিযোগ করছে। কারণ কোনো কিছু অন্যায় না করেও একদিন সকালে সে গ্রেপ্তার হল। এই দিন তার বাড়ীওয়ালীর রাঁধুনী তার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল না। এর আগে বরাবর সে আটটার সময় খাবার দিয়ে যেত। খাবার না আনার মত ভুল, এর আগে আর কখনো হয়নি। খাবারের আশায় প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো জোসেফ। বালিশে মাথা রেখে অপরদিকের জানালায় সে বৃদ্ধা মহিলাটিকে দেখতে পেল। তার মুখের চেহারা জোসেফের মনে হল, বেশ কৌতূহলী ও অস্বাভাবিক। সে বোধ হয় এতক্ষণ উঁকি মেরে জোসেফকেই দেখছিল। তারপর নিজেকে বেশ ক্ষুধার্ত মনে হওয়ায় জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে সে ঘণ্টা বাজালো। আর তৎক্ষণাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে দরজা খুলে একটি লোক তার ঘরে ঢুকলো, যাকে এর আগে কোনোদিন জোসেফ এ বাড়ীতে দেখেনি। লোকটি বেশ রোগাটে ধরণের, কিন্তু তা হলেও বেশ আঁটোসাটো গড়ন। সে একটি ঢিলে ঢালা ধরণের কালো পোষাক পরেছে। পোষাকটায় অনেকগুলো পকেট, বকলেসও বোতাম ছিল। তাছাড়া ভ্রাম্যমানদের পোষাকের মত এতে একটা বেল্টও ছিল। যদিও পোষাকের এত রকম আড়ম্বর থেকে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না, এ-থেকে কি সুবিধা হতে পারে, তবে পোষাকটির জন্য লোকটিকে বেশ বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন মনে হচ্ছিল, সন্দেহ নেই। 'আপনি কে?' জোসেফ প্রশ্ন করল আগন্তুককে। প্রশ্ন করার সময় বিছানা থেকে নিজেকে কিছুটা তুলে নিল সে। কিন্তু এই প্রশ্নে আগন্তুককে মোটেই বিচলিত মনে হল না। তার ভাবখানা এরকম, যেন তার পোষাকই সব কিছু বলে দিচ্ছে। তাই সে কেবল জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন?" "আমার আমার ব্রেকফাস্ট আনার কথা ছিল।" কে বলল। তারপর একটু নীরব থেকে অত্যন্ত গভীর মনোযোগে লোকটিকে সে দেখল, আর সেই সঙ্গে ভাববার চেষ্টা করল, লোকটি কে হতে পারে। কিন্তু আগন্তুক লোকটি বেশী-ক্ষণ নিজেকে কের মনোযোগী দৃষ্টির সামনে আটকে রাখল না। সে দরজার কাছে গেল এবং দরজা দুটো একটুখানি ফাঁক করল। তার ফাঁক করার ধরণ দেখে মনে হয়, দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে আগন্তুকটি বলছেঃ "আন্না নাকি তার জন্য ব্রেকফাস্ট আনার কথা ছিল।" এর জবাবে পাশের ঘর থেকে খানিকটা অট্টহাসি শোনা গেল। হাসির আওয়াজটা এ রকম ছিল যে কোনো লোকের পক্ষে বলা সম্ভব না, একজন অথবা বহুজনের মিলিত হাসির শব্দ এটা। অবশ্য এই হাসি থেকে আগন্তুক লোকটি নতুন কিছু জানল না। তাই সে কে'কে বিবৃতি দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল: "এ হতে পারে না।" "এটা একটা খবরই বটে।" বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ট্রাউজারটা ঠিক করতে করতে বেশ জোরেই কে কথাগুলো বলল। "আমি দেখছি পাশের ঘরে কারা, আর জানতে চাই এ ধরণের ব্যবহারের কি উত্তর ফ্রাউ গ্রুবাক আমাকে দেয়।" কিছু পরেই অবশ্য কের মনে হল এমন জোরে কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি। কারণ এভাবে কথা বলার ফলে আগন্তুক লোকটিকে সে তার সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ দিয়ে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টা তার কাছে এই সময় বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না। যাই হোক, আগন্তুক লোকটি কথাগুলোর একটা অর্থ ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ "আপনার কি এখানে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে?" "আমি এখানে থাকব না, আর যতক্ষণ না আপনার কোনো পরিচয় পাই, ততক্ষণ আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনাও করব না।" "আমি অনেক কথাই বলেছি।" আগন্তুকটি বলল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে খুলে ফেলল। পার্শ্ববর্তী ঘরে কে বেশ আস্তে আস্তেই ঢুকলো। যদিও এত আস্তে প্রবেশ করার কথা সে ভাবেনি। ঘরে ঢুকে প্রথম দৃষ্টিতেই ঘরের সমস্ত জিনিস ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় যেমন দেখেছিল, তেমনিই তার মনে হল। এটা ফ্রাউ গ্রুবাকের শোবার ঘর। ঘরটি নানা রকম আসবাবপত্র, কম্বল, ছবিতে এরকম চিহ্নিত যে, স্বাভাবিক এতটুকু ফাঁকও ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রথমে কেউ লক্ষ্য করতে পারবে না যে ঘরের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না। বিশেষ করে যে লোকটি এই পরি-বর্তনের সৃষ্টি করেছে সে খোলা জানালার পাশে বসে একখানা বই পড়ছিল। বই থেকে সে এই সবেমাত্র চোখ তুললো। "আপনার নিজের ঘরেই আপনার থাকা উচিত ছিল। ফ্রাঞ্জ কি আপনাকে একথা বলেনি?" হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন?" কে তার নতুন পরিচিত ফ্রাঞ্জের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করল। ফ্রাঞ্জ তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কথা-গুলোর পরেই আবার সে পিছু ফিরল। খোলা জানালা দিয়ে কে আবার সেই বৃদ্ধা মেয়ে-লোকটিকে দেখতে পেল। সে বৃদ্ধজনোচিত কৌতূহলে একেবারে অপরদিকের জানালার কাছে সরে এসে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। "আমি ফ্রাউ গ্রুবাককে খুঁজছি।" কে বলল। এই কথাগুলো বলে সে যেন দুজন লোকের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায় (যদিও তারা তার কাছ থেকে বেশ দূরেই ছিল) এবং ঐ ঘর থেকে সে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। "না", জানালার কাছের লোকটি বই বন্ধ করে টেবিলের ওপর বইখানা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। "আপনি বাইরে যেতে পারেন না। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" কে বললঃ "হ্যাঁ তেমনি মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কেন?" "এর উত্তর আমরা আপনাকে দিতে পারি না। আপনি আপনার ঘরে যান এবং সেখানে অপেক্ষা করুন। আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঠিক সময়ে আপনাকে সব-কিছু জানান হবে। এভাবে খোলাখুলি কথা বলে আমি আবার ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করছি। কিন্তু আমি আশা করি একমাত্র ফ্রাঞ্জ ছাড়া আর কেউ আমার কথা শোনেনি। আর ফ্রাঞ্জ ত নিজেই খোলাখুলি অনেক কথা বলে তার ওপর যে নির্দেশ জারী করা হয়েছিল তা লঙ্ঘন করেছে। তবে একথা বলা যায় ওয়ার্ডার সম্পর্কে আপনার অদৃষ্ট যেমন ভাল দেখা গিয়েছে, সেরকম যদি চলতে থাকে তবে ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।" কের মনে হল, তার এখন বসা দরকার, কিন্তু সে দেখতে পেল একমাত্র জানলার পাশটিতে ছাড়া, সমস্ত ঘরে একখানাও চেয়ার নেই। "আপনি শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে, আমরা সত্যি কথাই বলছি," অন্য লোকটির সঙ্গে একযোগে তার দিকে অগ্রসর হতে হতে ফ্রাঞ্জ বলল। পরবর্তী লোকটি কের চেয়ে লম্বা এবং সে কের কাঁধটা ধরল। তারা দুজনেই তার নৈশ পোষাকটি পরীক্ষা করে বলল, এখন তাকে একটি সাধারণ সার্ট পরতে হবে। তারা

অবশ্যই তার পরিত্যক্ত পোষাক এবং আণ্ডার-ওয়্যারটা নিয়ে যাবে। তবে যদি সে মামলায় খালাস পায়, তবে এগুলো তারা ফেরৎ দিয়ে দেবে। "গুদামে জমা দেওয়ার চেয়ে এগুলো আমাদের কাছে দেওয়া অনেক ভাল।" তারা বলল, "কারণ গুদাম থেকে প্রচুর চুরি হয়। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গুদাম কর্তৃপক্ষ সব বিক্রি করে দেয়, তা আপনি মামলায় জিতুন অথবা হেরে যান। আর আপনি কিছুতেই, অন্তত আজকালকার এই দিনে, জানতেই পারবেন না কতদিন আপনার বিচার চলবে। অবশ্য ডিপো থেকে অবশেষে আপনাকে দাম দেওয়া হবে। তবে তারা যে দাম দেবে তা সাধারণত খুবই খারাপ। আর এটা ত জানা কথাই যে, বছরে বছরে হাতফের হলেই টাকা কমতে শুরু করে।" এ সমস্ত উপদেশের প্রতি কে তার মনোযোগ দিতে পারল না। তার জিনিসগুলোর জন্য যদিও খুব বেশী দামের কথা সে ভাবে না। তবে তার কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার আসল অবস্থাটা জানা। কিন্তু তার পাশের এই সব লোকগুলোর জন্য সে কিছুই ভাবতে পারছে না।

দ্বিতীয় ওয়ার্ডারের ভুঁড়িটা তার সামনে এগিয়ে দেওয়া। আর এই লোকগুলো, কে ভাবল ওয়ার্ডার ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। কিন্তু তবু সে দেখল লোকটির মুখের সঙ্গে যেন তার মেদবহুল দেহটার কোনো মিল নেই। লোকটির মুখটা শুকনো, হাড় বার করা, আর লম্বা নাকটা একদিকে বাঁকানো। কে ভেবে কূল পায় না এই লোকগুলো কোথা থেকে এল; কি নিয়ে কথা বলা-বলি করছে, আর কোন অধিকারেই বা তারা এসেছে? কে যে দেশে থাকে, সেখানে একটি আইনানুগ শাসনতন্ত্র আছে। সেখানে সকলেই শান্তিতে থাকার অধিকারী। সেখানে নির্দিষ্ট আইন আছে, তবু তারা কোন সাহসে তার বাড়ীতে এসে তাকে গ্রেপ্তার করে? সে সব সময়েই জীবনের জটিলতা বাদ দিয়ে চলতে ভালবাসে। যখন জীবনে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল, তখনই সে দুর্ঘটনায় বিশ্বাস করে। এমনকি যখন তার সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে উঠছে তখনও তার আগামী কালের কথা ভাবতে ভাল লাগে না। কিন্তু তার এ ধরণের মতবাদ এক্ষেত্রে ভাল ঠেকল না। একবার তার মনে হল যে এটা বুঝি আগাগোড়াই একটা হাসির ব্যাপার। তার ব্যাঙ্কের সহকর্মীরা তার ত্রিশতম জন্ম-দিন উপলক্ষে বোধ হয় এমন একটা মজার ব্যাপারের অবতারণা করেছে। সে ভাবল তার এখন হাসাই উচিত। কারণ তার হাসি দেখে লোকগুলিও হাসতে শুরু করবে। আর লোক-গুলির দিকে তাকিয়ে কের মনে হল, তারা রাস্তার কুলি। অন্তত তাদের দেখতে সেই রকমই মনে হয়।

কিন্তু কে তখনও মুক্ত। ওয়ার্ডারদের সারির মধ্য দিয়ে কে তার ঘরের দিকে তাড়া-তাড়ি চলে গেল। 'লোকটির অন্তত কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।' সে শুনতে পেল ওয়ার্ডারদের মধ্য থেকে একজন কথাগুলো বলছে। ঘরে ঢুকেই সে তার ড্রয়ারটা খুললো। ড্রয়ারের সমস্ত কিছুই বেশ পরিপাটিভাবে সাজানো রয়েছে। কিন্তু প্রথমবার তাড়া-হুড়োয় সে তার পরিচয় পত্রটি দেখতে পেল না। অবশেষে সে তার সাইকেলের লাইসেন্সটা খুঁজে পেয়ে ওয়ার্ডারদের কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু লাইসেন্সটা তার কাছে অত্যন্ত সাধারণ মনে হল। তাই আবারো সে খুঁজতে আরম্ভ করল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে তার 'বার্থ সার্টিফিকেটটা' পেল। সে যখন পাশের ঘরে ঢুকেছিল, তখন অপরদিকে ফ্রাউ গ্রুবেক দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু কেকে পলক মাত্র দেখেই যেন সে কেমন অসুবিধা বোধ করে। তাই অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে আবার সে দরজা বন্ধ করে দিল। অন্য সময় হলে 'কে' হয়ত অন্য কোনো মন্তব্য করত কিন্তু এখন সে ঘরের মধ্যখানে সার্টিফিকেটটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজার দিকে শুধু তাকাল। দরজাটা আর খুলল না। এর মধ্যে এক হ্রস্বেড় শুন কে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবার সে স্পষ্ট দেখতে পেল, জনালার কাছে টেবিলের ধারে বসা ওয়ার্ডারগুলো বেশ উৎসাহের সঙ্গে তার ব্রেকফাস্টের সদ্ব্যবহার করছে। 'মেয়েটি এখানে কেন এল না?' কে জিজ্ঞাসা করল। লম্বা ওয়ার্ডারটি এর উত্তরে বলল, 'আপনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর সে আর এখানে আসতে পারবে না।' কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে আমি কি করে গ্রেপ্তার হই? মধুর পাত্রে এক স্লাইস মাখন মাখানো রুটি ডুবিয়ে দিতে দিতে ওয়ার্ডারটি এবার বলল: 'আবার আপনি আগের মত শুরু করলেন।' আর এসব প্রশ্নের আমরা কোনো জবাব দেই না।' 'কিন্তু এই কথাগুলোর উত্তর আপনাদের দিতে হবে।' এই দেখুন আমার পরিচয়পত্র। এখন অপানারা বার করুন আপনাদের কাগজপত্র। বিশেষ করে আমাকে গ্রেপ্তার করার সমান।" "হায় ভগবান।" ওয়ার্ডারটি বলল। "আপনি আপনার অবস্থাটা না বুঝেই আমাদের দুজনকে বিরক্ত করছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আর অন্য কেউ আপনার সম্পর্কে এত ঘনিষ্টভাবে চিন্তা করে না।" কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে না নিয়ে ফ্রাঞ্জ বলল: "আর সেই কারণেই আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।" এই কথা-গুলো বলে 'কে'র দিকে বেশ সপ্রতিভ ও অর্থসূচকভাবে তাকাল। আর এমনভাবে তাকালো, আগাগোড়াই 'কে'র কাছে কেমন হেঁয়ালী মনে হয়। ফ্রাঞ্জের দৃষ্টির সামনে 'কে'রও মুখের কথা যেন ফুরিয়ে গেল। সে তার সঙ্গে চোখে চোখেই কথা বলতে যেন লুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু এই প্রলোভন সে একটু পরেই কাটিয়ে উঠে তার পরিচয়পত্রের ওপর আঙুল দিয়ে আবার বলল: "দেখুন, দেখুন—আমার পরিচয়পত্রটি দেখুন।" এ কথায় সবচেয়ে লম্বা ওয়ার্ডারটি চীৎকার করে বলল: "আপনার এসব কাগজপত্র দিয়ে কি হবে? আর আপনার কথাবার্তা একটা শিশুর চেয়েও নিরেট। সত্যি করে বলুন ত আপনি কি চান। আপনি কি মনে করেন আমাদের সঙ্গে বক-বকাবকি করে এই মামলার কোনো কিনারা করতে পারবেন? আমরা এত সাধারণ স্তরের কর্মচারী যে, আমরা নিজেরাও কোনো দলিল দস্তাবেজ দেখিনি। আমাদের একমাত্র কাজ হল প্রত্যেকদিন দশ ঘন্টা করে আপনাকে পাহারা দেওয়া। আর এই কাজের জন্যই আমাদের মাইনে দেওয়া হয়। এই হল আমাদের নিজেদের কথা। তাছাড়া আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন, তার সম্পর্কে আগে বেশ ভাল করে খোঁজখবর নেন। এ বিষয়ে তাঁরা কোনো-রকম ভুল করেন না। আমি আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জানি যে, কে কোন দোষ করল, সে খোঁজ নিয়ে তাঁরা বেড়ান না। যখন আইন মাফিক আসামীর বিরুদ্ধে ডিগ্রী হয়ে যায়, তখনই গ্রেপ্তার করার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে আইনের প্রতিটি অনুচ্ছেদ এভাবে অনুসরণ করা হয়, তখন কি কোনোরকম ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে?" "এ ধরণের আইনের আমি কিছুই জানি না।" 'কে' জবাব দিল। এবার ওয়ার্ডারটি বলল: "আপনার ভবিষ্যৎ বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।" 'কে' বলল:, "বোধ হয় আপনাদের মাথায় ছাড়া এই আইনের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।" 'কে' ভেবেছিল, এই কথা বলে ওয়ার্ডারটিকে বেশ চিন্তায় ফেলা যাবে, অন্তত সে তার কথার অসামঞ্জস্য বুঝতে পারবে, যার ফলে সুবিধা হবে তারই। আর যদি তাও না হয়, তবে কথা-বার্তায় ওদের বক্তব্যের ধরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ওয়ার্ডারটির জবাব বড় উৎসাহহীন ঠেকল। "আপনি আবারেশ-এর বিরুদ্ধে কথা বলছেন।" এবার ফ্রাঞ্জ কথাবার্তার মাঝখানে বাধা দিল। "দেখ উইলেম, ভদ্রলোক নিজেই বলছেন যে, আমাদের আইন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না, কিন্তু তবু তিনি নিজেকে নির্দোষ বলছেন।" "তোমার কথা অবশ্য ঠিক।" অপর ওয়ার্ডারটি বলল, "তবে তুমি কোনো মানুষকে বুদ্ধিমান তৈরী করতে পার না।" 'কে' এবার আর কোনো জবাব দিল না। মনে

মনে ভাবল, আমাকে কি আরো চিন্তা করে দেখতে হবে, এই সমস্ত বাজে ভাড়াটে লোক-গুলোর অর্থহীন কথায় আমি নিজেকে কি আরও সংশয়চিত্ত করে তুলব?— কিছুক্ষণ আগেই ত তারা তাদের সব পরিচয় দিয়েছে। তারা যে সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে, তার কোনো অর্থ তারা নিজেরাই বোঝে না। একমাত্র ভাঁওতা দিয়েই তাদের এরকম বিশ্বস্ত করা যায়। আমার সমান বুদ্ধির কোনো লোকের সঙ্গে দু'একটি কথা বলেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানতে পারতাম, কিন্তু এদের সঙ্গে যদি দু' ঘণ্টা ধরেও আলোচনা করা যায়, তবুও কিছু বোধগম্য হবে না। ঘরের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় কে বারকয়েক হাঁটাচলা করল। রাস্তার অপরদিকের জানালায় সে সেই বৃদ্ধা মেয়ে-লোকটিকে ছুটে আসতে দেখল। তার পাশে তার চেয়ে বেশী বুড়ো একজন লোক মেয়েলোকটির এক হাতে তার কোমর জড়ানো। 'কে'র এক সময় মনে হল, এ প্রহসন যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব, শেষ করে দেওয়া দরকার। "আমাকে আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্মচারীর কাছে নিয়ে চলুন।" কে বলল। "তিনি যখন বলবেন, তার আগে নয়।" উইলেম উত্তর দিল। "এখন আমার কথা শুনুন", সে বলল, "আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। তারপর ঠিক জানতে পারবেন, আপনার সম্পর্কে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবশ্য আমাদের এই উপদেশ দেবার অর্থ আপনাকে বাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য নয়। আমরা চাই ঠিক সময় আপনাকে সুস্থভাবে যেন আমরা পেতে পারি। আমরা আপনাকে আগে ভাগে এত কথা জানাচ্ছি, কিন্তু তবু আমাদের প্রতি আপনি সমুচিত ব্যবহার করছেন না। আর আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, আমরা যেই হই না কেন, অন্ততঃ আপনার চেয়ে আমরা মুক্ত। সেটা বড় কম সুবিধে নয়। আপনি যদি কিছু টাকা খরচ করতে রাজী থাকেন তবে রাস্তার দোকান থেকে আপনার ব্রেকফাস্ট আনতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

একথার কোনো উত্তর না দিয়ে 'কে' যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হল সে যদি পাশের ঘরের দরজা অথবা হলঘরের দরজা খোলে, সম্ভবত তাকে এদের দুজনের কেউই বাধা দেবে না। এইটেই তখন 'কে'র মনে সমস্ত সমস্যার সমাধান বলে মনে হল। কিন্তু, পরমুহূর্তেই আবার সে ভাবল, যদি তারা তাকে ধরে ফেলে?—একবার যদি সে এদের কাছে ছোট হয়ে যায়, তবে কোনোমতেই সে তার বর্তমান সম্মান ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাই দ্রুত কোনো সমাধানের কথা আর না ভেবে সে তার নিজের ঘরের দরজা খুলল। কারণ, যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটবেই। এর পর সে তার নিজের ঘরে কোনো কথা না বলে ঢুকল। আর এই সময় ওয়ার্ডাররাও কোনো কথা বলল না।

ঘরে ঢুকে 'কে' বিছানায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। তারপর পাশের স্ট্যাণ্ড থেকে একটা সুন্দর আপেল তুলে নিল। এগুলো সে আগের দিন রাত্রে ব্রেকফাস্টের জন্য এনে রেখেছিল। কিন্তু ব্রেকফাস্টের সব সম্ভাবনাই শেষ। তাই আপেলটায় কয়েকটা কামড়ের পর তার মনে হল, একটা নোংরা কাফেখানার ব্রেকফাস্টের চেয়ে অন্ততঃ আপেল-গুলো মন্দ নয়। যাক্, ওয়ার্ডারদের সহানুভূতি গ্রহণ না করায় কোনো ক্ষতি হয়নি। এবার সে নিজেকে বেশ সুস্থ ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন মনে করে। হয়ত তার ব্যাঙ্কের আজকের কাজ মাটি হয়ে গেল, কিন্তু এর জন্য তার মোটেও ভাবনা হল না, কারণ ব্যাঙ্কে বেশ একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী সে। কিন্তু সে যে আজ কাজে অনুপস্থিত থাকবে, তার জন্য কি তার সত্য কারণ জানান উচিত। অন্ততঃ তার মনে হল, তাই করা উচিত। যদি কর্তৃপক্ষ তার কথা বিশ্বাস না করে, তবে সে ফ্রাউ গ্রুবাককে সাক্ষী মানবে। তাহলে হয়ত সমস্ত অবস্থাটা তারা বুঝতে পারবে। আর তাতেও যদি না হয় তাহলে রাস্তার ঐ দুটো বিশ্রী লোককে সে ধরে নিয়ে যাবে। তারা হয়ত আবার অপর-দিকের জানালায় এসে ভীড় বাঁধিয়েছে। হঠাৎ একটা কথা 'কে'র মনে হল। ওয়ার্ডার দুজন ত' তাকে একলা তার নিজের ঘরে থাকতে দিয়েছে। তাদের কি সন্দেহ হল না যে, সে এখন ইচ্ছে করলেই আত্মহত্যা করতে পারে। যদিও এর পরেই সে তার নিজের দিক থেকে বিচার করল, সত্যিই তার আত্মহত্যা করার কোনো কারণ ঘটেছে কিনা। একমাত্র কারণ হতে পারে যে, ওয়ার্ডার দুজন তার ব্রেকফাস্ট পাশের দরজায় বসে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু এ ধারণাটা এত বাজে মনে হল যে, 'কে' যেন ইচ্ছে করলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্ম-হত্যা করতে পারবে না। আর তা ছাড়া ওয়ার্ডার দুজন নিশ্চয় মোটেই বুদ্ধিমান নয়। তাই যদি হত, তবে হয়ত তাকে তারা একলা ছেড়ে দিত না। তার গতিবিধি লক্ষ্য করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এই ওয়ার্ডার দুজনের আছে। সে এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে দেয়াল-আলমারিটার কাছে গেল। সেখান থেকে ব্রাণ্ডির বোতল থেকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢেলে নিল। প্রথম গ্লাস সে ব্রেকফাস্ট শেষ করছে এই ভেবেই নিঃশেষ করল। দ্বিতীয় গ্লাস উৎসাহ ও বল ফিরে পাবার জন্য পান করল, শেষের গ্লাস সে সমস্ত রকম অসুবিধার প্রতিষেধক হিসাবে পান করল।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে সে একটা চীৎকার শুনতে পেল। এই চীৎকারে তার মনের অবস্থা এত সাঙ্ঘাতিক হল যে, তার দাঁত পানীয়ের গ্লাসে লেগে গেল।

'ইন্সপেক্টর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' চীৎকারের অর্থটা এবার তার কাছে পরিষ্কার হল। এই কথাতেই সে চমকে গিয়েছিল। গলার স্বর এত রুক্ষ ও মিলিটারী মেজাজের যে, ফ্রাঞ্জের কণ্ঠস্বরও এর কাছে হার মানে। যাই হোক, অবশেষে অন্তত একজন ঊর্দ্ধতন কর্মচারীর সাক্ষাৎ মিলল। 'তা হলে এল এতক্ষণে।' দেয়াল-আলমারিটার দরজা বন্ধ করতে করতে জোরে জোরে 'কে' বলল। সে দৌড়ে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে গেল। সেখানে দেখতে পেল, ওয়ার্ডার দুজন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল সে। তাকে দেখে ওয়ার্ডার দুজন চীৎকার করে বললঃ

"আপনি এখন কি ভাবছেন? আপনি কি মনে করেন, ঐ শার্ট পরেই আপনি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। তাহলে তিনি শুধু আপনাকেই নয়, আমাদেরো ধমকাবেন।"

কে বললঃ "থাক্ অন্য লোকের দরকার নেই। একলা আমায় ধমকেই যথেষ্ট।" এই কথাগুলো বলে দ্রুত 'কে' তার পোষাক পাল্টাবার জায়গায় গেল। "আপনারা যদি আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে তোলেন, তবে কিভাবে আশা করতে পারেন যে, আমি আমার সবচেয়ে ভাল পোষাক পরে থাকব?"

"কিন্তু এই কথা বললে আপনার কোনো সুবিধে হবে না।" ওয়ার্ডারটি বলল। 'কে'র গলা উঁচু পর্দায় ওঠা সত্ত্বেও বেশ শান্ত ছিল। এইভাবেই বোধ হয় সে তার বুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল।

"যত সব বাজে নিয়ম।" চেয়ারের ওপর থেকে একটা কোট তুলে নিতে নিতে 'কে' গর্জে উঠল। কোটটা সে এমনভাবে হাতে তুলে নিল, যে দেখে মনে হয়, সে যেন ওয়ার্ডারদের অনু-মোদন প্রার্থনা করছে। তারা হাত নাড়ল।

"একটা কালো কোট আপনাকে পরতে হবে।" তারা বলল। একথা শুনে কে মেঝেয় কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে বুঝতেই পারছে না এ কথার অর্থ কী?

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ওয়ার্ডার দুজন মিচকি মিচকি হাসল। "অবশ্য কোট পরার ব্যাপারটা আপনার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ নয়। যাই হোক", আবার তারা তাদের আগের কথায় ফিরে গেল, "আপনি তবু কালো কোটই পরুন।"

"কালো কোট পরলে যদি মামলার কোনো দ্রুত সুরাহা হয়, তবে বেশ আমি কালো কোটই পরছি।" 'কে' বলল।

এবার সে তার পোষাকের আলমারিটা খুলে একটা কালো কোট খুঁজতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে সে তার রকমারী পোষাকের মধ্য থেকে একটা কালো স্যুট খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে একটা কালো স্যুট বার করল। স্যুটটা অদ্ভুত চকচকে। স্যুটটার রঙে সেখানে উপস্থিত সকলের মনে বেশ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হল। এর পর আরেকটা শার্ট বার করে সে বেশ সযত্নে পোষাক বদলাতে লাগলো। 'কে'র মনে এই সময় একটা গোপন চিন্তার ঢেউ এসে দোলা দেয়। তার মনে হল, মামলার ব্যাপারটা সে বেশ তাড়াতাড়িই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আর ভাগ্যের কথা, ওয়ার্ডার দুজন আবার তাকে স্নান করে নিতে বলেনি। তবু সে তাদের ওপর চোখ রেখে লক্ষ্য করতে লাগল, স্নান করার ব্যাপারটা তাদের মনে হয় কিনা। কিন্তু একথা তাদের মনে হল না। পরন্তু এরই মধ্যে উইলেম ফ্রাঞ্জকে ইন্সপেক্টরের কাছে পাঠিয়ে জানাতে বলেছে যে 'কে' পোষাক বদলাচ্ছে।

বেশ পরিপাটি করে পোষাক পাল্টে সে উইলেমের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে পাশের ঘরে এল। ঘরখানা সম্পূর্ণভাবে খালি। এই ঘরের মধ্যে দিয়ে সে তার পাশে আর একটা ঘরে ঢুকলো। ঘরটির দুটো দরজাই হাট করে খোলা। 'কে' বেশ ভালভাবেই জানত, এই ঘরখানা সম্প্রতি কে একজন ফ্রাউলিন বার্স্টনার ভাড়া নিয়েছে। সে একজন টাইপিস্ট। খুব ভোরে উঠে সে কাজে বার হয়, আর বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরে। যাতায়াতের পথে ইতিমধ্যে তার সঙ্গে 'কে'র সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। মেয়েটির বিছানার পাশে রাত্রে ব্যবহারের জন্য যে টেবিলটা ছিল, কে দেখতে পেল, সেটা ঘরের মধ্যখানে নিয়ে গিয়ে ডেস্কের কাজ চালানো হচ্ছে। তার পেছনে ইন্সপেক্টরটি বসে আছে। তার পা দুটো আড়াআড়িভাবে রাখা, আর একখানা হাত সে চেয়ারের পেছন দিকে এলিয়ে দিয়েছে।

ঘরের এক কোণে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রাউলিন বার্স্টনারের একটা ফটো দেখছিল। ফটোটা দেয়ালে লাগানো একটি মাদুরের সঙ্গে লটকানো ছিল। একটা সাদা ব্লাউজ খোলা জানালার ছিটকানির সঙ্গে ঝুলছিল। রাস্তার ধারে জানালায় সেই দুজন তখনো দাঁড়িয়ে। তবে তাদের দলের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়েছে। কারণ তাদের পেছনে তাদের চেয়েও মাথায় উঁচু একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। লোকটির গালভরা ছুঁচলো দাঁড়ি আছে। লোকটি বারে বারেই তার দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিল।

"জোসেফ কে?" সম্ভবত ইন্সপেক্টরটি তার ভাম্যমনোযোগ ফিরিয়ে আনবার জন্য কেকে ডাকল।

কে মাথা নাড়ল। এরপর ইন্সপেক্টরটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বোধ হয় আজকের সকালের ঘটনায় খুব বিস্মিত হয়েছেন?" কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতে করতে সে দু হাতে টেবিলটির ওপর মোমবাতি, দেশলাইয়ের বাক্স, পিন কুশন সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। যেন তার সওয়ালের জন্য এগুলো খুব দরকার।

"নিশ্চয়ই।" 'কে' জবাব দিল। তবু যাই হোক, তার মনে হল, শেষকালে অন্তত একজন বিবেচক লোকের দেখা পাওয়া গেল। তার কাছ থেকেই সব জানা যাবে। আবারো ও ই বলল:

"বিস্মিত অবশ্য আমি হয়েছিলাম। তবে তেমন কিছু বেশী নয়।" (ক্রমশঃ)

পূর্ণতপা

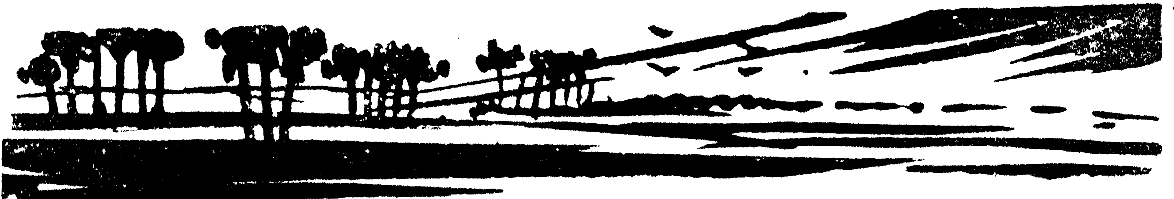
শ্রীনির্মল চৌধুরী, এম এ

বহু দীর্ঘ তপস্যার অমারাত্রি পেরিয়ে,
সংজ্ঞান অসংজ্ঞান ক্লিষ্ট মনের
বিক্ষোভ মুছে নিয়ে,
প্রাণ-পূর্ণ পৃথিবীতে প্রেম গুণের
জয়গান ধ্বনিত হোলো।
দুর্বার হতাশার ছবিসহ নিষ্ফলতাকে পূর্ণ ক'রে
আজ পূর্ণতপা হ'লাম আমি!
হে অপর্ণা,
তোমার তাপদগ্ধ, তপঃক্লিষ্ট জীবনকে
আজ তাই স্মরণ করি।

গীত হোক্ তা পুঁথিতে পুঁথিতে
ধর্মান্ধ, ভক্তিপ্লুত মানুষের স্মৃতির আলোকে
লেখা হয়ে যাক মহাকাব্যের সম্ভাবনাকে বুকে নিয়ে।
হে সুভনা পর্বত দুহিতা, ধন্য তুমি!

বিংশ শতাব্দীর এক অতি সাধারণ নারীর মতন,
অবহেলিত প্রেমের শূন্যতায়,
প্রণয়ীর বহুবল্লভতায়, অন্তরে বাহিরে
নিষ্করুণ দগ্ধতায় দগ্ধ হওনি তুমি।
তুমি জয় করেছিলে আত্মসমাধিস্থ মহেশ্বরকে,
তোমার সহায়তা করেছিল সুরমণ্ডলী!
আর নিঃসহায়া নারী আমি,.
জানি আমার এ গাথা, কোনদিন
লেখা থাকবে না পুঁথির পাতায়

মানুষের স্মৃতি সযত্নে পরিহার করবে একে
তবু সর্বপ্রেমগ্রাসী খর্বতাকে তুচ্ছ করে
আমার মৌন সাধনা আপন বৈভবে জয়যুক্ত হয়েছে
তাই শ্রেষ্ঠ পূর্ণতপা আমি।



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমাদের লক্ষ্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব কন্যা নদীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত শ্রম যেন সার্থক হইয়া গিয়াছিল। ধবল বলিয়াছিল, "একটা নদীর তীরে যখন আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমাদের আর কোথাও নড়িতে হইবে না। নদীতীরে জমি কখনও নিষ্ফলা হয় না শুনিয়াছি। মাঁংরা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কপোত সম্প্রদায়েরা যাহারা নদীর তীরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। কন্যা নদীর তীরে আমরাও বংশানুক্রমে বাস করিব। কি বল মাঁংরা?" মাঁংরা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কোনও উত্তর দিল না, মৃদু হাসিল মাত্র। মাঁংরা বহুদর্শী লোক, বহুদিন ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার যাহা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তাহা সর্বসমক্ষে সেদিন সে ব্যক্ত করে নাই। যাইবার পূর্বে ধবলকে গোপনে বলিয়া গিয়াছিল। মাঁংরা, নীহু, রাকো, মংকা ইহারা আমাদের দলের পর্যটক ছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ দিত চাষ করিবার মতো জমি আর কোথাও আছে কি না। ইহাদের আমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া চলিতাম, কারণ ইহারাই ছিল বহির্জগতের বার্তাবহ। আমরা সীমাবদ্ধ স্থানে চাষ লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম, ইহারা নানা দেশ হইতে নানা খবর সংগ্রহ করিয়া আনিত। ইহারা ছিল স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক, নিজেরাই শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত, খাদ্যের জন্য আমাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না, মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিত, কিছুদিন আমাদের মধ্যে বাস করিত, আবার চলিয়া যাইত। তাহাদের আগমনের জন্য মনে মনে আমরা সকলেই উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আজকাল গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র তোমাদের যে পিপাসা মিটায় উহারাও আমাদের সেই পিপাসা মিটাইত। অনেক নূতন সংবাদ, অনেক কল্পনার খোরাক তাহাদের মাধ্যমেই আমরা পাইতাম। তাহা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা বড় কথা তাহারা অনধিকৃত নূতন জমির সন্ধান আনিয়া দিত। মাঁংরা কন্যা নদীর সংবাদ আমাদের আনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলাম। কারণ সেই অনাবৃষ্টির যুগে শিকারও সুলভ ছিল না, আমরা অনেকে শিকার করিবার দক্ষতাও হারাইয়াছিলাম।

...আমরা যখন কন্যা নদীর উভয় তীরের সমস্ত জমি দখল করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম তখন মাঁংরা একদিন চলিয়া গেল। যেদিন চলিয়া গেল তাহার আগের দিন রাত্রে সে আর ধবল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া কি সব পরামর্শ করিয়াছিল। গোপন পরামর্শ। আমরা কেহ কিছুই জানিতাম না। আমাদের তৃতীয় ফসল যখন আশানুরূপ হইল না, তখন আমরা ইহার আভাস পাইলাম।

প্রথম দুই বৎসর ফসল আমাদের খুব ভাল হইয়াছিল। আমরা নদীর উভয় তীরেই খুঁড়িয়া বীজ বপন করিয়াছিলাম, এত ফসল ফলিয়াছিল যে, আমাদের সকলের আহারের সংস্থান হইয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। মাটি খুঁড়িয়া মাটির নীচে সেই উদ্বৃত্ত শস্য আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাটির নীচে শস্য অতি চমৎকার থাকিত। আমাদের পর্যটক নীহু সঞ্চয় করিবার এই কৌশলটি আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল। গর্তের মেঝেতে আমরা পুরু খড়ের আস্তরণ বিছাইয়া দিতাম, গর্তের দেওয়ালেও আমরা কাদা দিয়া লেপিয়া সেই কাদায় সারি সারি নলখাগড়ার নল এমনভাবে বসাইয়া দিতাম যে, শস্য মাটির সংস্পর্শে আসিতে পারিত না। সেই গর্তে শস্য জমা করিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া শুষ্ক খড় চাপা দিয়া গর্তের মুখটা আমরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতাম। শস্য একটুও নষ্ট হইত না। নীহু কোথা হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

...কন্যা নদীর তীরে প্রথম কিছুদিন আমরা অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। শুধু আনন্দ নয়, নিত্য নব বিস্ময়ও আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। উমগা পর্বতের সানুদেশ অরণ্যময় ছিল এবং সেই অরণ্যে আমাদের পরিচিত-অপরিচিত বহুবিধ পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এজন্য আমাদের অসুবিধাও কম ভোগ করিতে হয় নাই, বন্য গরু ছাগল মহিষের দল আসিয়া আমাদের ক্ষেত নষ্ট করিত, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আসিয়া আমাদের তৃণশীর্ষগুলি খাইয়া ফেলিত, তাহাদের তাড়াইবার জন্য অথবা শিকার করিবার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, কিন্তু তবু ইহাতে একটা নূতন ধরণের বিস্ময় আমরা অনুভব করিতাম। ইতিপূর্বে এতগুলি পশু-পক্ষীকে এত নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাহাদের যে সব সময় তাড়াইতে হইত বা শিকার করিতে হইত তাহা নয়, আমাদের ক্ষেতগুলি সু-উচ্চ বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল, সব সময়ে তাহারা আমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে যখন তাহারা বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িত তখনই আমরা তাহাদের আক্রমণ করিতাম, মাংসের প্রয়োজনেও মাঝে মাঝে শিকার করিতে হইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা তাহাদের নজরে নজরে রাখিতাম। কন্যা নদীর তীরে দেবদারু বৃক্ষ অনেক ছিল। দেবদারু-শাখায় বসিয়া বসিয়া আমরা ইহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতাম। তাহারাও আমাদের উপর লক্ষ্য রাখিত। বিশেষ করিয়া তাহারা, যাহারা আমাদের অন্যমনস্কতা অসাবধানতার সুযোগ লইয়া আমাদের শস্যে ভাগ বসাইত। সেকালের কয়েকটি চিত্র এখনও মনে আছে।

...উমগা পর্বতের উপত্যকা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। উপত্যকা সন্নিহিত অরণ্য হইতে একদল গরু বাহির হইল। বিরাট ককুৎ ও গলকম্বল সমন্বিত একটি ষণ্ডের সমভিব্যাহারে কয়েকটি গাভী। ষণ্ডটি একবার ঘাড় তুলিয়া আমাদের ক্ষেতের দিকে চাহিল। আমাদের ক্ষেতে বালকবালিকারা সব সময়েই পাহারা দিত। সম্ভবত সে তাহাদের দেখিতে পাইল, বুঝিল এখন ওদিকে যাওয়া নিরাপদ হইবে না। দুষ্ট বালকেরা শিক্ষকের সাড়া পাইয়া যেমন পড়ায় মনোযোগ দেয় অনেকটা সেইভাবেই সে উপত্যকায় চরিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেখাদেখি গাভীরাও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপত্যকার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং উপত্যকার ঘাসেই মনোনিবেশ করিল। গাভীদের সঙ্গে নানা বয়সের বাছুরও ছিল। নিতান্ত শিশু যাহারা তাহারা মাতৃস্তন্য পান করিতেছিল। মাতৃস্তন্য পাননিরত গোবৎস ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। দেখিতে বড়ই ভাল লাগিত। পিছনের পা দুইটির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া তাহারা স্তন্যপান করিতে করিতে মায়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুকুরশাবককে স্তন্যপান করিতে দেখিয়াছি, কারণ কুকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেই অনেক কুকুর ছিল। তাহারা কি করিয়া কবে যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা মনে নাই। গো

প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া অথবা স্নেহের তাড়নায় কেন যে ঝাউঝাউকে পুষিয়াছিল জানি না। তাহার পর হইতেই কিন্তু কুকুর আমাদের জীবনের সঙ্গী হইয়া আছে। দেবদারু বৃক্ষের শীর্ষে বসিয়া পাননিরত গোবৎসগুলিকে দেখিয়া তাহাদেরও পুষিতে ইচ্ছা করিত। সে ইচ্ছা যে কেবল আমারই হইত তাহা নয়, অনেকেরই হইত। কিন্তু সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার সঙ্গতিও আমাদের তখন ছিল না, সাহসও ছিল না। তাহারা আমাদের খাদ্যে ভাগ বসাইত বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিরূপতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবু তাহাদের নিকট পাইবার জন্য একটা লোলুপতা জাগিত, নিছক সৌন্দর্য প্রীতির জনাই জাগিত বোধ হয়। সুন্দর ফুল তুলিয়া আমরা মাথায় পরিতাম, রঙীন পাথর এবং ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া অলংকার প্রস্তুত করিতাম। যাহা কিছু সুন্দর তাহাকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জীবনকে নিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অথবা মনে হয়, পরবর্তী যুগে আমরা যে গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম আপাতদৃষ্টিতে তাহার অন্য কারণ থাকিলেও আসল কারণের বীজ বোধ হয় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন চেতনায় এখানেই উপ্ত হইতেছিল। ক্রীড়াশীল গোবৎসগুলির দিকে আমরা ক্রীড়নকলুব্ধ শিশুর মতোই চাহিয়া থাকিতাম। এই আগ্রহ, এই সৌন্দর্যপ্রীতি, দুর্লভকে লাভ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা অবশেষে আমাদের জয়ী করিয়াছে, শত্রুকেও আমরা মিত্র করিয়াছি। আর একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। মনে হয় সেদিন আমি আমার জীবনের চরমতম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, কোনও কিছু আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আনন্দ তখন আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সেদিন আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম তাহা এখন অতিশয় সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু তখন তাহা আমার অতিশয় অভিনব মনে হইয়াছিল। সেদিন শিকারের আশায় উম্‌গা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম। আমিই তখন আমাদের দলের মধ্যে সেরা শিকারী ছিলাম। গরুর মাংসে আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, ধবলের নূতন প্রিয়তমা নিনানির আদেশে আমি পাহাড়ি ছাগল শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। পাহাড়ি ছাগল শিকার করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাহাড়ি ছাগলের মতো এমন চতুর এবং পলায়নদক্ষ জানোয়ার খুব কম দেখিয়াছি। পারতপক্ষে তাহারা সমতলভূমিতে নামিত না, পর্বতের দুর্গম স্থানেই অতিশয় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খাড়া পাহাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারও গায়ে পাহাড়ি ছাগলকে উঠিতে দেখিয়াছি। পাশাপাশি দুইটি পর্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ পথ, পাহাড়ি ছাগল তাহার ভিতর অনায়াসে ঢুকিয়া পড়ে। বহুদূরে হইতেই তাহারা শত্রুর আগমন টের পায় এবং টের পাইলে এমনভাবে আত্মগোপন করে যে, শত্রুকে হার মানিতে হয়। অতর্কিতে তাহাদের নিকটবর্তী হইতে না পারিলে তাহাদের শিকার করা যায় না। হাওয়ায় তাহারা মানুষের গন্ধ টের পায় এবং টের পাইলে তাহাদের দলের নেত্রী (ছাগীরাই প্রায় দলের নেত্রী হয়) সামনের পাটি ঠুকিয়া সামান্য একটু শব্দ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে লক্ষ্য করিলাম উপত্যকার বাম ধারে পর্বতশৃঙ্গের ঈষৎ নিম্নে বারান্দার মতো যে স্থানটুকু বাহির হইয়া রহিয়াছে তাহার উপর দুইটি ছাগশিশু দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহারা পরস্পরকে ঢুঁ মারিতেছে। একটু পা ফসকাইয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু উহাদের কখনও পা ফসকাইতে দেখি নাই। ছাগশিশু দেখিয়া বুঝিলাম যে, দলটিও তাহা হইলে নিকটেই কোথাও আছে। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থামিয়া গেলাম। হাওয়া ওই দিকেই বহিতেছিল। মনে হইল এখন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, হয়তো ইতিমধ্যেই উহারা আমার আগমন টের পাইয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকা যাক, হাওয়া ঘুরিলে তাহার পর অগ্রসর হওয়া যাইবে। উহারাও হয়তো নামিয়া আসিতে পারে। তীব্রবেগে হাওয়া বহিতেছিল। হাওয়া এড়াইবার জন্য আমি বৃক্ষবেষ্টিত একটা ঘন ঝোপে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়া দ্রুতগতিতে প্রথমেই একটি গাছে উঠিয়া পড়িতে হইল। ঝোপের অন্তরালে একটি বন্য গরু বসিয়াছিল। কোনও বন্য জন্তুর খুব কাছে থাকা নিরাপদ নয়, এই বোধটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বন্য গরুর সম্মুখীন হইবার মতো ভারী অস্ত্রও আমার কাছে ছিল না, তীর ধনুক লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। গাছে উঠিয়া দেখিলাম গরুটা চলিয়া গেল না, বসিয়াই রহিল। আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, উঠিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠিল না, বসিয়া রহিল। তখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম ওটা একটা গাভী এবং তাহার পিছনের দিক হইতে কি যেন একটা বাহির হইয়া আছে। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল—গাভীটি প্রসব করিতেছে। বিস্ময় ও আনন্দের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। সেই বৃক্ষশাখায় চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া নীরবে রুদ্ধশ্বাসে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিলাম। মনে হইল অপরূপ একটা কিছু দেখিতেছি। মনুষ্যসন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বহুবার দেখিয়াছি, আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠিতে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কোন অভিনবত্ব আছে বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। কিন্তু এই গো-জননীর প্রসব ব্যাপারটা আমাকে সেদিন বড়ই অভিভূত করিল। তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। জমি চাষ করিয়া বীজ বপন করা, বীজ অঙ্কুরিত হইলে পাহারা দেওয়া, তাহার পর শস্য পাকিলে সেগুলি কাটিয়া সঞ্চয় করা এবং এই সবেরই পুনরাবৃত্তি আমাদের কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যদিও বন্যা নদীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাবিধ নৃত্য গীত পূজা উৎসব আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিত কিন্তু সে সবও একটা বিশেষ পদ্ধতির গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া অভিনবত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের সংঘাতে সমস্ত সত্তা অপূর্ব পুলকে মাতিয়া ওঠে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সেই অজানা বিস্ময়ের জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকি। আজ তোমাদের কবি ও বৈজ্ঞানিকেরা নিত্য নূতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে আনন্দে অভিভূত হন আমিও তখন ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সেইদিন আর একটা বিস্ময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেইদিনই আমি প্রথম শালাপর্ণীকে দেখিয়াছিলাম। ওই সদ্যপ্রসূতা গাভীটিই শালাপর্ণীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। বাছুরটি তখন সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, গাভীটি চাটিয়া চাটিয়া তাহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় ঠিক আমার সম্মুখের একটি বৃক্ষ হইতে এক বোঝা কচি ঘাস গাভীটির মুখের সম্মুখে পড়িল। গাভীটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রথমটা একটু সচকিত হইয়া উঠিলেও বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং মুখের কাছে খাদ্য পাইয়া অবিলম্বে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ওই কচি ঘাসের বোঝাটার দিকে চাহিয়া। ওগুলি যে আমাদেরই ক্ষেতের তৃণ-শস্য, ওগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত দলটাই যে সর্বদা সজাগ হইয়া আছে। যে গরুকে আমাদের ক্ষেত হইতে দূরে রাখিবার জন্য আমরা নানাভাবে সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছি সেই গরুর মুখেই আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে কে আনিয়া দিল! অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সম্মুখের বৃক্ষটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম নিকষকৃষ্ণাঙ্গী একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দে নামিয়া সে বনান্তরালে মিলাইয়া গেল। আমিও পরমুহূর্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতেই পাইলাম না।

মনে হইল ঝোপের আড়ালেই সে কোথাও আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সদ্যোজাত গোশাবকটি আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিলাম তাহার মা তাহাকে চাটিয়া চাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি মুগ্ধনেত্রে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা অসমসাহসিক স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। বাছুরটাকে চুরি করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! উহাকে যদি আমরা পুষি ধবল কি খুব আপত্তি করিবে? ধবল যদি আপত্তি করে তখন না হয় ওটাকে মারিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই চলিবে। কিন্তু এখন যদি একটা জীবন্ত বাছুর কাঁধে করিয়া হাজির হইতে পারি আমাদের দলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কি করিয়া ধরা যায়। উহার মায়ের নিকট যাওয়া তো অসম্ভব। একটা চিল আসিয়া একটু দূরে বসিয়াছিল, গাভীটা এমন তাড়া করিয়া গেল যে, সে পলাইবার পথ পাইল না। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে হয়তো নিঃশব্দচরণে উহার নিকটবর্তী হইতে পারিব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। উমাগা পর্বতের আশেপাশে বহুরকম হিংস্র শ্বাপদ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাঘের গর্জন, এমন কি সিংহের গর্জনও মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। হায়েনার ডাক তো প্রায়ই শোনা যায়। তাছাড়া আমাদের দলের তিজা বন্যকুকুরও দেখিয়াছে নাকি। বন্যকুকুরের মতো ভয়ানক প্রাণী আর কিছু নাই। একবার উহাদের কবলে পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। একা আসিয়াছি, একটা উদ্ভট খেয়ালের বশীভূত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। বাছুরটা উঠিয়া টলিতে টলিতে ঠিক আমার গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা যদিও তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল কিন্তু ঠিক কাছটিতে ছিল না, শিলাঙ্গী গাছের উপর হইতে তাহাকে ঘাসের বোঝা দিয়া গিয়াছিল সেইটিই সে তখন শেষ করিতেছিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাছুরটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম এবং মুখ দিয়া তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি আবার গাছে উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ আমি গাছে উঠিতেছিলাম ততক্ষণ বাছুরটা আমার মুখ হইতে ঝুলিতেছিল। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। গাছে উঠিয়া বাছুরটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম। কিন্তু সে এত ছটফট এবং চীৎকার করিতেছিল যে, তাহাকে সামলানো শক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মা-ও গাছের নীচে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং ঊর্ধ্বমুখ হইয়া হাম্বারব করিতেছিল। বাছুরটাকে এক হাতে আঁকড়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়াছিলাম, আর এক হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম একটা গাছের ডাল। ভয় হইতেছিল যদি গাছের ডালটা ভাঙিয়া যায় তাহা হইলে নীচে পড়িয়া যাইব এবং নীচে পড়িয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। বাছুরটাকে ফেলিয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত, কিন্তু বাছুরটাকে কিছুতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না. আসন্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে আমি তাহাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম কোথা হইতে ধোঁয়া আসিতেছে। এখানে আগুন জ্বালাইল কে? কাছে পিঠে তো কোনও মানুষ আছে বলিয়া জানা নাই। পর মুহূর্তেই সেই কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরীর কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও ঘনাইয়া আসিল মনের ভিতর। উমাগা পর্বত যদি মনুষ্য অধ্যুষিত হয় তাহা হইলে চিন্তার কথা। যে কোনও দিন অতর্কিতে তাহারা আসিয়া হানা দিতে পারে। ফিরিয়া গিয়াই ধবলাকে কথাটা বলিতে হইবে। আমার চিন্তাধারা আর অগ্রসর হইবার অবসর পাইল না, কারণ পরমুহূর্তেই একটা বর্শা আসিয়া আমার মাথার ঠিক উপরের ডালটাতে বিঁধিল, একটুর জন্য আমার মাথাটা বাঁচিয়া গেল কাহারও বর্শার লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া যে-ই স্থানপরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম অমনি বাছুরটা আমার কোল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু একটা গো-শাবকের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা চলে না। গাছের আরও উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটা স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ আর কোনও কিছু ঘটিল না। সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম বাছুরটার কি হইল। কিছুই হয় নাই, দেখিলাম তাহার মা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিয়া দিতেছে। সে দিব্য মায়ের আশেপাশে ঘুরিতেছে, মাঝে মাঝে লাফাইবার চেষ্টাও করিতেছে। তাহাদের দিকে কিন্তু ভাল করিয়া আর মন দিতে পারিতেছিলাম না। বর্শাটা শুধু যে গাছের ডালেই বিঁধিয়াছিল তাহা নয়, আমার মনেও বিঁধিয়াছিল। বর্শাটা কে নিক্ষেপ করিল না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আস্তে আস্তে আবার উপর হইতে নীচে নামিলাম এবং বর্শাটা বৃক্ষশাখা হইতে খুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। চমৎকার পালিশ করা পাথরের বর্শা, খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ। সে যুগে আমরা সকলেই পালিশ করা অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এমন চমৎকার পালিশ করা অস্ত্র আমাদের ছিল না। আমি সবিস্ময়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অস্ত্রটিকে ক্রম্বার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন একটা চমৎকার অস্ত্র হস্তগত হওয়াতে অতিশয় পুলকিতও হইয়াছিলাম। একবার ইচ্ছা হইল এই অস্ত্রের দ্বারাই গাভীটাকে হত্যা করিয়া গোশাবকটিকে হরণ করি। গাভীর কপালের ঠিক মধ্যস্থলে যদি এই বর্শা বিদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে আর উঠিতে হইবে না। আর একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম তাহারা কোথায় কিভাবে আছে। এবার কিন্তু তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তাহারা অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে। সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপের বাহিরে বেশ খানিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মতো স্থান ছিল। দেখিলাম, তাহারা সেই মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাঠের অপর পারে একদল গরু চরিতেছে। সেইদিকেই তাহারা চলিয়াছে। একটা জীবন্ত গো-শাবক লইয়া গিয়া আমাদের দলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিব মনে করিয়াছিলাম তাহা বিসর্জন দিতে হইল। নামিতে যাইব এমন সময় দেখি নীচের একটা ডালে সেই কৃষ্ণা কিশোরীটি আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত, চোখের পলক পড়িতেছে না। আমিও নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অমন নিখুঁত চোখমুখের গড়ন ইতিপূর্বে দেখি নাই। তাহা এতই অপূর্ব যে, সহসা আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মনে হইল মানুষ নয়, কোনও দেবতা না অপদেবতা। অপদেবতার ভয়টাই আমাদের বেশী ছিল সে যুগে। উমাগা পর্বতে যে একাধিক অপদেবতা নিশ্চয়ই আছে এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হইয়াছিল। একদিন ধবলের বৃদ্ধা জননী শার্দিগাদি বলিয়াছিল উড্ডীয়মান শকুনদের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মনে হয় যে, উমাগা পর্বতে প্রেতিনীরা বাস করে। আমাদের দলের আর একজন শিকারী রূতারু একদিন স্বচক্ষে নাকি একটা মায়ামৃগও দেখিয়াছিল। রূতারু মৃগটিকে অনুসরণ করিতেছিল, কিছুদূর যাইবার পর মৃগটি তাহার চোখের সামনেই নাকি অদৃশ্য হইয়া গেল, পরমুহূর্তে রূতারু দেখিতে পাইল, অদূরবর্তী ঝোপটা নড়িতেছে রূতারু ভাবিল হরিণটাই হয়তো সেই ঝোপে ঢুকিয়াছে, ছুটিয়া সেখানে গেল, কিন্তু হরি দেখিতে পাইল না, দেখিল বৃহচ্চঞ্চু একটা বিরাট পেচক বসিয়া আছে। রূতারুর দৃ ধারণা মৃগটাই পেচকে রূপান্তরিত হই গিয়াছিল। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আমিও তা প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। আরও ঘাবড়াই গেলাম যখন সে কোনও কথা না বলিয়া আমা দিকে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল।

(ক্রমশ

সাধুভাষা ও চলতি ভাষা

নারায়ণ চৌধুরী

বাঙলা সাহিত্য ভাষার দিক থেকে দ্বিধা-বিভক্ত: একদিকে তার সাধুভাষা, অন্যদিকে চল্‌তি বা কথ্য ভাষা। দুইটি সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত স্রোতের মতো সাধু ভাষা আর চল্‌তি ভাষা বাঙলা সাহিত্যের বুক চিরে পাশাপাশি বয়ে চলেছে। বোধ করি, পৃথিবীর ভাষার ইতিহাসে বাঙলাই একমাত্র দৃষ্টান্ত যেখানে একই সঙ্গে, একই কালে দুইটি ভাষারীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অন্যান্য দেশের সাহিত্যে ভাষারীতির দ্বন্দ্বের পরিচয় নাই, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব হচ্ছে ভাষা বিকাশের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী আঞ্চলিক ভাষারীতির দ্বন্দ্ব। প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেই দ্বন্দ্ব। প্রতিযোগিতায় এক প্রদেশ বা অঞ্চলের ভাষা যখন তার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে কিম্বা বিশেষ অবস্থাগত সুবিধার দরুণ সর্বজনীনতার মর্যাদা লাভ করে তখন স্বভাবতই অন্যান্য ভাষাগুলি তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে উপভাষার গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর পর আর বিভিন্ন দাবীর লড়াইয়ের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু বাঙলায় তার বিপরীত। কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র ক'রে ভাগিরথী নদীর দুই তীরে যে কথ্যভাষার প্রচলন, ভৌগোলিক এবং অন্যান্য কারণে সেইটে আজ বাঙলা সাহিত্যের সমাদৃত ভাষা হ'য়ে উঠেছে এবং আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের লেখক গোষ্ঠীর একটি মোটা অংশের অভিমত যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহ'লে তাঁরা সকলেই একবাক্যে বল্‌বেন যে, এইটেই বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র ব্যবহারের ভাষারূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে সাধু-ভাষাকে নিয়ে। সাধুভাষা কিছুতেই চল্‌তি ভাষাকে আসন ছেড়ে দিচ্ছে না। বরং বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রের সমর্থনে এবং পুরাতনপন্থী এক শ্রেণীর লেখক গোষ্ঠীর পোষকতায় সাধু-ভাষা চল্‌তি ভাষার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা আড়াআড়ির ভাব নিয়ে চলছে। এই অবস্থা সাহিত্য বা ভাষার অগ্রগতির পক্ষে কোনক্রমেই কল্যাণপ্রদ হ'তে পারে না। বাঙলা ভাষার এই যে দ্বিমুখী ঝোঁক, এতে বাঙলা সাহিত্যিকদের উদ্যম অযথা দুইটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তার অর্থ তাঁদের শক্তি আর সম্ভাব্যতা দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। সাধু ভাষা নিজেও যথাযথভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারছে না, এদিকে পদে পদে চল্‌তি ভাষাকে সে পিছে টেনে রাখছে। এরূপ অবস্থায় উচিত একের জন্যে স্থান ক'রে দিয়ে অপরের প্রস্থান এবং প্রস্থানের ভূমিকাটি যে সাধু ভাষার উপরই আরোপিত হওয়া উচিত আজকের দিনে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে ব'লে মনে করি না।

বাঙলা গদ্যসৃষ্টির আদি পর্বে যে ভাষা-রীতির আশ্রয়ে তদানীন্তন লেখকগণ তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করবার কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে যা আরও বহু শক্তিশালী লেখকের পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যাশ্চর্যরূপে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, সেইটিকে বলা হয় সাধু ভাষা। এ ভাষা-রীতির 'সাধু' নামকরণ কেন হ'লো বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তদানীন্তন গদ্যের কৃত্রিম বাক্যবিন্যাস আর বাক্যের ভিতর তৎ-সম শব্দের আধিক্য লেখকদের মনে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিলো যে, সংস্কৃতশব্দপুত এই গুরু-গম্ভীর চালের রচনারীতিকে যদি কোন নামে অভিহিত করতে হয় তো সেটা 'সাধু' নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য। পুরাতন গদ্য-রীতিকে 'সাধু' নাম দিয়ে বর্তমান-প্রচলিত গদ্যরীতিকে 'চল্‌তি' আখ্যা দেবার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্নভাবে সাধু ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার একটা চেষ্টা আছে। যেন চল্‌তি গদ্য নিতান্তই সাময়িক তাগিদে সৃষ্ট বাঙলা গদ্যের একটা অস্থায়ী রূপ। চল্‌তি ফ্যাসানের মতো ওটা নেহাৎ চল্‌তি কালের ব্যাপার; তার প্রতি সাধু ভাষার গুরুত্ব কোনক্রমেই আরোপ করা চলে না। চল্‌তি ভাষার অপর নাম কথ্য ভাষা; এ নামের মধ্যেও পরোক্ষভাবে একটা অবজ্ঞার ভাব মিশে আছে। কথ্য ভাষা, সে তো ভাষার নেহাৎ কথ্য রূপ, আটপৌরে রূপ। সাধু ভাষার মতো বনেদী চালের ভাষার সঙ্গে তার কি তুলনা হ'তে পারে?

রবীন্দ্রনাথ এ সকল কারণে চল্‌তি গদ্য-রীতির নাম দিয়েছিলেন 'প্রাকৃত বাঙলা'। এ নাম গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রাকৃত বাঙলা', তার মানে যে বাঙলা খাঁটি দেশজ সংস্কারের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে, যার বাক্যরীতিতে প্রাকৃত অর্থাৎ দেশী শব্দের বহুল ব্যবহার, যার চলন আর বলন কৃত্রিমতামুক্ত, স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সাধু আর চল্‌তি ভাষার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: "রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। তেমনি বাঙলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী- সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী—একটাকে আদর ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চল্‌তি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি, প্রাকৃত বাঙলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।" (বাঙলা ভাষা-পরিচয়, পৃঃ ৩৮)।

সাধু ভাষা আর চল্‌তি ভাষার পার্থক্য শুধু তাদের রূপের পার্থক্য নয়, তাদের মানসিক গঠনেরও পার্থক্য। অর্থাৎ দুইয়ের চিন্তাপ্রণালী আলাদা। আর যেখানে চিন্তা-প্রণালী আলাদা সেখানে বাক্যগঠনরীতিও যে আলাদা হবে সে তো না বললেও চলে। সাধু বাক্যের শব্দবিন্যাসে কর্তা ক্রিয়া কর্মের একটা বিশেষ ক্রম অনুসরণ করা হয়। এই ক্রম প্রায় সর্বত্র এক থাকে। কিন্তু চল্‌তি বাক্যে অর্থের ঝোঁক অনুযায়ী প্রায়ই কর্তা ক্রিয়া কর্মের বিন্যাসের অদল-বদল হয়। দুয়ের syntax আলাদা। শুধু "করিতেছি"-র স্থলে "করছি" কি "ভাবিতেছি"-র স্থলে "ভাবছি" বললেই সাধু ভাষা চল্‌তি গদ্যে রূপান্তরিত হ'লো এমন কথা মনে করবার কারণ নেই, যদিও লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা মনে ক'রে থাকেন। সাধু ভাষায় দীর্ঘদিন কলম চালিয়ে হঠাৎ চল্‌তি ভাষা রপ্ত করবার চেষ্টা করলে তার ফলে কিম্ভূত ভাষারই সৃষ্টি হয়। ভাষা আয়ত্ত করা অবশ্য সবক্ষেত্রেই অতি কঠিন ব্যাপার। তবে সাধু আর চল্‌তি ভাষার কথা যদি তোলা হয়, বলবো চল্‌তি ভাষা আয়ত্ত করা তুলনায় অনেক কঠিন। চেষ্টার দ্বারা সাধু ভাষার রূপ সকলেরই পক্ষে অল্পদিনের আয়ত্ত করা সম্ভব; কিন্তু চল্‌তি ভাষার বিশেষ রূপটির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে এবং তা অন্তরস্থ না হ'লে এ ভাষায় কোনক্রমেই লেখনীর স্ফূর্তি জন্মাতে পারে না। কথ্য ভাষা মুখের কথায় যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে, খুবই সহজ; কিন্তু যা-ই তাকে কলমের মুখ দিয়ে বলাবার চেষ্টা হ'লো তা রীতিমতো একটা সাধনার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। সহজ কথাটি সহজভাবে বলতে পারার মতো কঠিন কাজ আর দুনিয়ায় বড়ো নেই।

এটা দেখেছি, ভাষারীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে বাল্যের প্রভাব বড়ো ফলদায়ক। দৈবগতিকেই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক ছেলেবেলায় যে যে-ভাষারীতির দিকে ঝোঁকে সেইটেই পরবর্তী জীবনে তার ভাষারীতি হ'য়ে দাঁড়ায়। সাধু ভাষার সাহিত্য প'ড়ে প'ড়ে যাঁর মন একেবারে সাধু ভাষার ছাঁচে গ'ড়ে উঠেছে, উত্তর জীবনে তাঁর পক্ষে আর চল্‌তি ভাষা রপ্ত করা

সহজ হয় না। অপরপক্ষে, চল্‌তি ভাষার মাধ্যমে যাঁর সাহিত্যের সঙ্গে শৈশবে প্রীতির যোগ স্থাপিত হয়েছে, এবং এই প্রীতির সূত্রে চল্‌তি গদ্যের রস যিনি প্রাণ ভরে আস্বাদন করেছেন, উত্তর জীবনে সাধু ভাষার সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় ঘটা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে সাধু রীতির গদ্য সম্পর্কে উৎসাহ তেমন ক'রে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। মানুষের মন বস্তুটি তো সব সময় conditioned হবার জন্যে তৈরী হ'য়েই আছে। এও একরকমের 'কন্ডিশন্‌ড্' হওয়া। ছোটবেলা থেকে যে যে ভাষারীতির অবলম্বনে চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয় তার পক্ষে আর পরিণত বয়সে ভিন্ন ভাষাশ্রয়ী হওয়া প্রায়শঃ সম্ভব হয় না।

কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত একথার প্রমাণ করে না। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন একটানা সাধু ভাষায় গদ্য সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। এমন কি, আচার্য প্রমথ চৌধুরী যখন 'সবুজ পত্রের' মারফৎ চল্‌তি গদ্যরীতির আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, কবির কাছ থেকে সহসা এ আন্দোলনের সমর্থন পাওয়া যায়নি। প্রথম কিছুদিন এ আন্দোলন থেকে দূরে দূরেই ছিলেন এবং পূর্ববৎ সাধু ভাষার মারফৎ কলম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একবার যখন চল্‌তি গদ্যের আন্দোলনের সঙ্গে কবি নিজের নাম জড়ালেন এবং সাধু ভাষা ছেড়ে চল্‌তি বাঙলাকেই আশ্রয় করলেন তাঁর ভাষা এক অনবদ্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। কবির নব-অনুশীলিত চল্‌তি গদ্যরীতির যেমনি অভিনব ভঙ্গি, তেমনি বসানুভূতিময় সাবলীল রূপ। এ গদ্য থেকে একটা অতি পরিচ্ছন্ন, পরিশীলিত রুচি যেন কেবলই ছিট্‌কে ছিট্‌কে বের হচ্ছে। বুদ্ধির দীপ্তিতে এ ভাষা উজ্জ্বল, পাঠকের প্রতি আত্মীয়তার প্রীতি দিয়ে ঘেরা, কৌতুকে প্রসন্ন। এ ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই "শেষের কবিতা"র গদ্যে। চল্‌তি গদ্যরীতিতে কবি সেই যে দীক্ষিত হয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চল্‌তি গদ্যের আশ্রয় ত্যাগ করেননি। শেষ বয়সে কবিকে দিয়ে সাধু ভাষায় আর কিছু লেখানো সম্ভব হয়নি। কবি শুধু যে চল্‌তি গদ্যের অনুকূলে সাধু ভাষা নিঃশেষে পরিহার করেছিলেন এমন নয়, বিভিন্ন রচনায় তিনি চল্‌তি গদ্যরীতির প্রতি তাঁর অবিচলিত আনুগত্য জানিয়ে গেছেন এবং বাঙলা সাহিত্যে চল্‌তি গদ্যই যে একমাত্র ব্যবহারের ভাষা হওয়া উচিত সে কথা জোর গলায় প্রচার ক'রে গেছেন। "বাঙলা ভাষা-পরিচয়" বইতে তিনি লিখেছেন, "যে দক্ষিণী বাঙলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাঙলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবর-স্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপটে" (পৃঃ ৪৭)। অন্যত্র তিনি এই স্থির বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন যে, সুয়োরাণী (সাধু ভাষা) নেবেন বিদায়, আর একলা দুয়োরাণী (চল্‌তি ভাষা) বস্‌বেন রাজাসনে।

চলতি গদ্যের প্রতি কবির এই অকুণ্ঠ সমর্থন বাঙলার প্রগতিপন্থী অন্যান্য লেখকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেছে। চল্‌তি গদ্যের ব্যবহার ক্রমশঃই যে প্রসারলাভ করছে আর সাধুভাষার প্রয়োগ ক্রম-সংকুচিত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে এইটে বোধকরি তার একটা কারণ।

আচার্য প্রমথ চৌধুরী চলতি ভাষার আন্দোলনের জন্যে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর এ কীর্তিটাও বড়ো কম প্রকাণ্ড নয় যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চল্‌তি গদ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল যিনি গদ্যে তাঁর যাবতীয় চিন্তা সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রায় চল্‌তি ভাষায় কিছু লেখেন নি বললেই হয়, তাঁকে পঞ্চাশোত্তর জীবনে সহসা চলতি গদ্যের সমর্থকরূপে পাওয়া যে একটা মস্ত বড়ো কৃতিত্ব একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের মনের সচলতা আর চির-তারুণ্যের পরিচয় আমরা নানাভাবে পেয়েছি। এই দৃষ্টান্তটুকুও অন্যতম একটি পরিচয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাস আর কুশলতা হঠাৎ একদিন বিনা আড়ম্বরে ত্যাগ করে নূতন কিছু গ্রহণ করার মধ্যে যে মনের পরিচয় পাওয়া যায় সেইটি সংস্কারমুক্তির প্রেরণায় সতত চঞ্চল নব নব বৈচিত্র্যপ্রয়াসী একটি মন। চল্‌তি গদ্যের অনুশীলনে নিযুক্ত হয়ে এই মন যে নিত্য নূতন বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করলো সে তো আমরা চোখের উপরই দেখলাম।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষার আবহাওয়াতেই যদি বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তো হঠাৎ দীর্ঘ দিনের অভ্যাস বিসর্জন দিয়ে চলতি ভাষার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্তি খুঁজে পেলেন কী করে। একবার মনের ছাঁচ এক ভাষার আনন্দ অনুযোগী গড়ে উঠলে তারপর আর তার বদল হওয়া কঠিন—এ কথাই যদি সত্য হয় তো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে নীতি খাটলো না কেন।

এ কথার উত্তর রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর বয়সে বিলেত যান। সেখান থেকে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে যে পত্রগুচ্ছ তিনি লিখেছিলেন তা অনবদ্য চলতি ভাষায় লিখিত। প্রথম জীবনে পত্রের আকারে আরও যেসব রচনা তিনি লিখেছিলেন —সেগুলিকে পত্র না বলে রচনাই বলব, সমগ্র জীবন কবি পত্রের আবরণে পত্র-সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন—তাদের ভাষাও বিশুদ্ধ চলতি রীতিতে লেখা। যথা "ছিন্নপত্র"র ভাষা। এ ভাষার মাধুর্য কে অস্বীকার করবে। "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" কিম্বা "ছিন্নপত্রের" ভাষার সঙ্গে কবির শেষ জীবনের রচনাভঙ্গীর অদ্ভুত একটা সৌসাদৃশ্য আছে। তাদের বাক্যরীতি, ঢং, রস অনেকটা একরকম। প্রথম আর শেষ বয়সের রচনারীতির মধ্যে এই সাদৃশ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের পক্ষপাত যে চলতি ভাষার দিকেই ছিল একথাই শুধু এতে প্রমাণ হয়। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবি ছিন্নপত্রের পরে দীর্ঘদিন আর চলতি ভাষায় কিছু লেখেননি। সাধু ভাষা তাঁর লেখনীকে স্ব-বশ করে রেখেছিল। কবির নব নব রস-গ্রাহিষ্ণু বৈচিত্র্যশীল মন এতো দীর্ঘ একটা অধ্যায় কী করে সাধুভাষার কৃত্রিম সংযম-বন্ধন মেনে নিতে পারলো সেইটে ভাবতে সত্যি অবাক লাগে। হাঁপিয়ে ওঠার কোন লক্ষণই তিনি প্রকাশ করেননি। তাই বীরবলী গদ্য-রীতির আন্দোলনকে একদিক থেকে একটা দৈব আশীর্বাদ বলেই মনে হয়। যথাসময়ে বীরবলী উদ্যোগের একটা প্রচণ্ড তাড়না সৃষ্টি না হলে রবীন্দ্র ভাষা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতো কিনা সন্দেহ।

বাঙলা সাহিত্যে বীরবলের গদ্য অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ যোজনা। রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্য বোধ হয় তার চাইতেও অনেকগুণ সুন্দর। বীরবল চলতি গদ্যের আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক বটে, কিন্তু চলতি গদ্যের কাঠামোয় তিনি খড়-মাটি যোজনার অধিক কিছু করে যেতে পারেননি। প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা বাকী ছিল, সে কাজ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রমথ চৌধুরীর আগেও বাঙলায় চলতি গদ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে, তবে তা কোন সময়েই বিধিবদ্ধ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। সাধু ভাষার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে চলতি গদ্য উঁকি দিয়েছে, আবার বিচ্ছিন্নভাবেই তা মিলিয়ে গেছে। "আলালের ঘরের দুলাল," "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" এইরূপ দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই বইগুলির রচনারীতি তৎকালীন সাহিত্য-সমাজে তেমন কল্কে পায়নি, যদিও বইগুলির উপভোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্যভাষা কলিকাতা কেন্দ্রিক ভাগীরথী তীরের কথ্যভাষা এবং বাঙলায় যাঁরা সে সময় সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন ভাগীরথী তীরের মানুষ এমন কথা বললে বোধকরি কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। অথচ মজা এই যে ভাগীরথী তীরের মানুষ ভাগীরথীর প্রাণরসপুষ্ট কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে আমল দেননি; তাঁদের সবটুকু

লোবাসা গিয়ে প'ড়েছিল সাধুভাষার উপর। টা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাঙলায় সাধু-ষার নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা চলেছিল বললে টেই অত্যুক্তি করা হয় না।

সাধু ভাষা বাঙলা সাহিত্যকে বিচিত্র র্শ্বর্য দান করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমগ্র বনের সাহিত্যচিন্তা আর সাহিত্যকল্পনা যে যায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, জীবনের অনেক-লি মূল্যবান বৎসর রবীন্দ্রনাথ যে ভাষার ধ্যমে সাহিত্য সাধনা করেছেন, শরৎচন্দ্র যে ষার আশ্রয়ে তাঁর গোটা কথাসাহিত্যের লাপ অংশ ছাড়া) বনিয়াদ খাড়া করেছেন, ক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজ-রায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, মী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নীরা যে ভাষাকে অবলম্বন করে বিপুল মাণ চিন্তাসমৃদ্ধ গদ্য রচনা করে গেছেন সে ষার গরিমা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তরাং এ কথা তো নিশ্চিতরূপেই বলা যায় র্ঘদিনের অনুশীলন আর অভ্যাসের ফলে ষায় সাধু ভাষার যে একটা বিশিষ্ট সংস্কার র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, চলতি গদ্যরীতির ক্ষে এখনও সে জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে তোলা ম্ভব হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, সাধু-ষার রূপ কৃত্রিম। তার বাক্যবিন্যাসরীতি আর দ সংকলন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন একটা অনু-ঙ্গের ভাব আছে যা চিন্তাকে স্বচ্ছ হতে দেয় । মুদ্রিত অক্ষরের মধ্যেই শুধু যে এ চ্ছতা পরিস্ফুট তা-ই নয়, লেখকের ভাবনা ন্ত তার দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত। সাধুভাষার মে চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে আড়ষ্টতার সঞ্চার । নিজের লেখাই নিজের কানে কৃত্রিম নায়। আর সাধুভাষার চালে কেউ যদি কথা তে চেষ্টা করে তবে তো তা রীতিমতো সোদ্রেকের কারণ হয়। প্রমথ চৌধুরী মশায় থেই বলেছেন, কলমের ভাষা যদি মুখের যা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, তবে মুখে কালি ড়।

এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত অবশ্য করা চলে যে, চলতি ভাষায় কৃত্রিমতার অবকাশ নেই। ছে, তবে তার ক্ষেত্র সংকুচিত। পূর্বেই লছি, চলতি ভাষার বিশেষ ছাঁদটুকু অন্তরস্থ হলে লেখার মধ্যে তাকে যথাযথভাবে টিয়ে তোলা কঠিন। এমন ক্ষেত্রে চলতি দার ধ্বনিও কৃত্রিম শোনাতে বাধ্য। এইখানে টি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। চলতি । হলেই যে তা প্রাঞ্জল হবে, প্রসাদগুণসমন্বিত , এমন কোন কথা নেই। আধুনিক বাঙলা হিত্যে এমন দু'চারজন লেখক আছেন যাঁদের তি গদ্য সাধু ভাষার ভঙ্গির চাইতেও ত্রমধর্মী। সংস্কৃত শব্দের আধিক্যে এবং টিল বাক্যগঠনরীতির চাপে সে ভাষার প্রায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার যোগাড়। ফলে পাঠকের পক্ষেও তা একটি নিশ্বাসরোধী ব্যাপারের সামিল হয়ে পড়ে। এমন ভাষার চাইতে সাধু-ভাষা ভালো।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, লেখকের মনোগত চিন্তা আর কল্পনার রূপটুকু পরিচ্ছন্ন আর স্বচ্ছ হওয়া চাই। চিন্তার মধ্যে অস্বচ্ছতা থাকলে লেখাও অস্বচ্ছ হতে বাধ্য, তা সে সাধু ভাষার লেখাই হোক আর চলতি ভাষার লেখাই হোক। অপর পক্ষে, কী বলবো এবং কেমন করে বলবো। সেইটে সম্পর্কে যদি মনের মধ্যে একটা স্পষ্টধারণা থাকে তা হলে সাধুভাষার বাক্য-প্রণালীও যথেষ্ট মনোগ্রাহী হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির উল্লেখ করা যায়। গল্প-উপন্যাসের বর্ণনাংশ বরাবর তিনি সাধুভাষার আশ্রয়েই লিখেছেন, কিন্তু গল্প বলবার গুণে তাঁর সাধুভাষা কী অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে! বারেকের জন্যেও মনে হয়না কৃত্রিম একটা ভাষারীতির মারফৎ কাহিনীটি বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের একজন প্রবীণ ঔপন্যাসিকের কথা মনে পড়লো। এককালে তিনি একটি বিখ্যাত মাসিকপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, কথাসাহিত্যের রূপ সাধুভাষায় যতো প্রাঞ্জল হয়, চলতি ভাষায় তেমন হয় না। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বাঙলা দেশের কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম করছিলেন; আর আশ্চর্য, তাদের সব কয়টিই সাধু ভঙ্গিতে লেখা!

এ কথার তখন কী উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই, আজকে হলে এইরকম বলতামঃ সাধু-ভাষার রূপ মূলতঃ কৃত্রিমধর্মী হলেও দীর্ঘ-দিনের ব্যবহারে তার একটা মাজাঘষা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। এ রূপের সঙ্গে পাঠক ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত। একটা শব্দ বা বাক্যাংশ গোড়ায় যতোই বেখাপ্পা শোনাক্, দীর্ঘদিন কানের পাশে গুঞ্জিত হতে থাকলে পরে আর তেমন বেখাপ্পা শোনায় না। মানুষের স্বভাবের মতো চোখ বা কানেরও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রচুর। সাধুভাষা সম্পর্কেও সেই কথা। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তার আপাত-রুক্ষতার ধারগুলি ক্ষয়ে গেছে। এককালে আমরাই যে ভাষা দেখলে চমকে উঠতাম আজ আর তা দেখে চমকে উঠি না। তা ছাড়া, অভ্যাসের ধর্মই হলো এই যে অভ্যস্ত বিষয় বা ব্যাপারকে তা তৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। তার মধ্যে এমন রস আর অর্থের সঞ্চার করে যা পূর্বে তথায় অনুপস্থিত ছিল। অপ্রীতিকর বস্তু ভাসসাযুজ্যগুণে প্রীতিকরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

কিন্তু চলতি ভাষার এ সুবিধা সীমাবদ্ধ। আজও তার শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। ফলে চলতি ভাষার চারদিকে এখন পর্যন্ত কোন ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারেনি। এখন চলতি ভাষাকে যে আকারে আমরা পাচ্ছি তা হচ্ছে তার হয়ে ওঠার বয়স। দিন দিন তার পরিধি প্রসারিত হচ্ছে, রূপ উজ্জ্বলতর হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে, "চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। আমাদের দিনরাত্রির মুখরিত সব কথা পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।" উর্বরতার কাল আর ফলদানের কাল এক নয়। কাজেই এখনই যদি আমরা চলতি ভাষার কাছ থেকে পরিপূর্ণ ফলসমৃদ্ধি আশা করি সেটা অধীরতার পরিচায়ক হবে। চলতি ভাষাশ্রিত কথাসাহিত্যের রূপ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পাঠকদের গ্রহণীয় হয়নি সত্য, কিন্তু এতে সংকুচিত হবার কারণ নেই। চলতি ভাষার সামনে বিচিত্র সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। সে ভবিষ্যৎ যতোই নিজেকে উদ্ঘাটিত করবে ততোই চলতি ভাষাকে পূর্ণতররূপে প্রকটিত দেখতে পাবো। সাধুভাষার বাক্যরীতি যেহেতু পূর্ব-পরিচিত, অভ্যস্ত সেই হেতু প্রাঞ্জল মনে হয়। নইলে এমনিতে যে সে বাক্য-রীতি সহজাতভাবে প্রাঞ্জল এমন কথা আদৌ বলা চলে না। পক্ষান্তরে, চলতি ভাষার বাক্য-রীতি স্বভাবতঃই প্রাঞ্জল। শুধু ব্যাপক আর একাগ্র চর্চার মধ্য দিয়ে এক্ষণে সেটি বিকশিত হওয়ার অপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় 'শেষের কবিতা' লিখেছেন, 'যোগাযোগ' লিখেছেন, 'ল্যাবরেটরী'র মতো ছোট গল্প লিখেছেন, সে ভাষার অনন্ত সম্ভাবনার তল পাওয়া যায় না। চলতি গদ্যের অনতিপক্ক অবস্থাতেই যদি এই সব অনবদ্য সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকে, চলতি গদ্যের রূপ যখন আরও বিকশিত হবে, প্রতিভাবান শিল্পী তাকে যে আকার দেবেন তার যথাযথ চেহারা কল্পনাও করা যায় না।

কথাসাহিত্যে চলতি ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিশেষ কিছু ভাববার নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সকল কুশলী কথাশিল্পীই চলতি ভাষাকে অব্যভিচারীরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের শক্তি স্পর্শে চলতি গদ্য দিনদিন পুষ্ট হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা, এর পর আরও কয়েকজন যথার্থ শক্তিশালী চলতি গদ্য লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। এঁদের ভিতর অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ দু'চার জনের নাম বিশেষ-ভাবে করা যেতে পারে।

কিন্তু কথাসাহিত্যের গদ্য আর প্রবন্ধ-সাহিত্যের গদ্য এক নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে চলতি ভাষার ব্যবহার নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছে। কেন বলি।

প্রবন্ধ সাহিত্যের গদ্য হলো মুখ্যতঃ জ্ঞানের গদ্য। এ গদ্যের চালের মধ্যে হৃদয়-সংবেদনের স্থান কম, চিন্তার স্থান প্রশস্ত।

বর্তমান-ব্যবহৃত চলতি ভাষার রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ ভাষার মধ্যে এখনও অনেকটা-পরিমাণ কাব্যের আমেজ লেগে আছে। বাঙলা সাহিত্যে কাব্যের ঐতিহ্য অতি পুরাতন। দীর্ঘদিনের সংস্কারের ফলে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, গদ্যরীতিকেও খানিকটা কাব্যলক্ষণাক্রান্ত না করলে আমরা আরাম পাইনে। কিন্তু এই কাব্যগন্ধী গদ্য কথা-সাহিত্যের উপযোগী হতে পারে, চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ-সাহিত্যের একেবারেই উপযোগী নয়। বাঙলায় প্রবন্ধ-সাহিত্য ঠিক যে গড়ে উঠতে পারছে না এইটে তার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য যে এ্যাপ্রোচ্, যে চিন্তার ভঙ্গি, যে বিষয়-সমৃদ্ধি দরকার, আজকের চলতি গদ্য এখনও ঠিক তার অনুসারী হয়ে উঠতে পারেনি। আরও একটি কারণ চলতি গদ্যের এই অনুপযোগিতার পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে বলে মনে হয়। চলতি গদ্যের ঢংটি যেন একটু হাল্কা। মনে হয় গুরুগম্ভীর বিষয়ের ভার এর উপর চাপাতে গেলেই এ নুয়ে পড়বে, ভর সইতে পারবে না।

আশংকাটি ঠিক অমূলক বলা যায় না। চলতি গদ্যরীতির মধ্যে এখন পর্যন্ত একটা তরল স্বচ্ছন্দতার ভাব আছে, যেটি তার কাটিয়ে ওঠা উচিত। এই তারল্য ব্যক্তিগত নিবন্ধধর্মী হাল্কা রচনার সহায়ক হতে পারে, চিন্তাপ্রধান রচনার আদৌ সহায়ক নয়। এই দিক থেকে বরং সাধু ভাষা তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। বাঙলা ভাষার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা সাধু ভাষায় লেখা এটা নিতান্ত অকারণ নয়। রজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক লেখকগণ এবং বাঙলা দৈনিক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকবর্গ এখনও যে সাধুভাষার বন্ধন কেটে বেরিয়ে আসতে পারছেন না এজন্যে তাঁদের দায়ী করলেই হলো না; চলতি ভাষার দুর্বলতার মধ্যেও এর আংশিক কারণ নিহিত আছে। এইসকল ক্ষেত্রে চলতি ভাষা তার যোগ্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু একটা ভাষারীতি সকল প্রয়োজনের উপযোগী হবে, তার মধ্যে কোন অপূর্ণতা বা অনুপযোগিতা থাকবে না, এমন আশা করাই বাতুলতা। চলতি গদ্যের বেলায়ও তেমন সুসম্পূর্ণতার প্রত্যাশা করা চলে না। তবে চলতি গদ্য সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় এই যে যে অসম্পূর্ণতার কথা বলা হলো সেটি তার সহজাত ত্রুটি নয়। এই ত্রুটি অনুশীলন দ্বারা মোচনীয়। চলতি ভাষার প্রকাশভঙ্গীমা নিয়ে যত বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, ততো তার বহিরঙ্গের দৌর্বল্য কেটে গিয়ে অর্থগরিমা বৃদ্ধি পাবে। চলতি গদ্য নানান বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের উপযোগী হবে। চলতি গদ্যের 'ফর্ম' নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে যেরূপ বিধি-বন্ধ প্রয়াস চলছে তাতে সেই সম্ভাবিত কাল খুব দূরাগত বলে মনে হয় না।



রং চং

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

হঠাৎ সেদিন কুমারেশের সঙ্গে দেখা। মহালয়ার ছুটির দিন।

রৌদ্রোজ্জ্বল সুন্দর আকাশের এখানে ওখানে পক্ষবিস্তার ক'রে ছিল শাদা শাদা মেঘ।

আর আকাশ থেকে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল নীল দ্যুতিময় আভা নীচে রাস্তায়, রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর উপর, একটা শিশু দেবদারুর মাথায়, অদূরে দাঁড়ানো কা'র বেবি অস্টিনের হুডের গায়ে।

পেভমেন্টের এ পাশে দেবদারুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল ওদের রিক্সা।

পুজোর দীর্ঘ ছুটি আরম্ভ হওয়ার আগে হাল্কা একটা ছুটি কাজের মানুষ দু'টোকে বেশ উল্লসিত উদভ্রান্ত করে দিয়েছে তা কুমারেশের মুখের দিকে, বেশভূষার দিকে, তার স্ত্রী ডলি মিত্তিরের হাসি, বেশভূষা ও চাউনির দিকে তাকিয়ে অনুভব করলাম। ঢোক গিলে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় চললে ?'

'মার্কেটিং।' বলল কুমারেশ, তারপর পার্শ্বে উপবিষ্টা অর্ধাঙ্গিনী ডলিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল। 'ডলি, শ্রীমতী ডলি মিত্তির, আমার স্ত্রী।'

হেসে বললাম, 'দেখেই বুঝেছি। তারপর ?'

কুমারেশের গলার স্বর তেমনি তীব্র, ধারালো, দরাজ আছে লক্ষ্য করলাম।

'আমার বন্ধু, মাধব,—মাধব সোম। ব্রিলিয়েন্ট স্কলার, ভয়ানক ইনটেলেকচুয়াল লোক।' স্ত্রীর নিকট বন্ধুর পরিচয় দিয়ে কুমারেশ হাসতে লাগল, হাঁপাতে লাগল।

আয়ত সুন্দর চোখ মেলে ডলি এবার আমাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখল।

'তারপর তোমার খবর কি ?'

'এই, কাটছে কোনোরকম।' বললা কুমারেশের মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে 'কতকাল পরে দেখা।'

কিন্তু কুমারেশ সে কথার উত্তর দেয়নি অপাঙ্গে চট্ ক'রে স্ত্রীকে একবার দেখে সে আগের চেয়েও জোরালো লম্বা গলায় হাসল 'মহিষীর হুকুম। ছুটির দুপুরটা শাড়ি গয়নার দোকানে কাটবে, ভায়া।'

'এই চুপ!' ডলি চোখ পাকিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়।

কিন্তু কুমারেশের তাতে গ্রাহ্য নেই, হাসে 'ট্যাক্সি করলে রাস্তার দু'ধারের দোকান তো দেখা হয় না, তাই রিক্সা। কেমন না ?' আমার দিকে এবং পর মুহূর্তে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুমারেশ মিটি মিটি হাসে।

যেন লজ্জিত আহত হয়ে ডলি মুখ নামালো।

বললাম, 'আচ্ছা বেশ, তোমরা জিনিসপত্তর কেনাকাটা করো, চলি—'

'ইউ স্কাউন্ড্রেল!' কুমারেশ ভয়ানক জোরে ধমক দিয়ে উঠল। 'চলি মানে? কি এমন কাজের তাড়া তোমার ছুটির দিন? সঙ্গে এসো।' রিক্সা থেকে লাফিয়ে নেমে কুমারেশ আমার হাত ধরল।

'মন্দ কি চলুন।' ডলির এই প্রথম খুশি গলা শুনলাম। 'ওর না আছে জানাশোনা ভাল দোকান, না জানে কিছু দরদস্তুর করতে।' রিক্সা থেকে মহিষী নামল।

'আমারই কি দামটাম তেমন জানা আছে, না জানাশোনা দোকান।' আমতা আমতা করছিলাম। কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনের একজনও সে কথায় কর্ণপাত করল না।

'আগে তুমি আমায় সরবতের দোকানে নিয়ে চল।' ডলি স্বামীকে হুকুম করল। 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

'এই তো চা খেলে।' কুমারেশ কেমন ভাঙ্গা গলায় হাসল। 'এর মধ্যেই তেষ্টা পেল।'

'উঃ কি তোমার চা।' ডলি বলল, 'তা-ও তো হাজার বার বলার পর একটা বাজে রেস্টুরেন্টে নিয়ে ঢোকালে।'

কুমারেশ কথা কইল না।

এবং দেখা গেল হাজার বার নয়, ডলি একবার হুকুম করতে ওর হাত ধরে কুমারেশ ডান পেভমেন্টের উপর, বলতে গেলে প্রায় একটা প্রথম শ্রেণীর সরবতের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পশ্চাতে আমি।

'এখানে এসে কেন বসলুম জানো?'

'কেন?' সরবতের গ্লাসের ওপর ডলির সুন্দর চোখ বঙ্কিম ভ্রূযুগল জেগে ছিল। যেন তন্ময় হয়ে কুমারেশ তা দেখতে দেখতে হাসি গলায় প্রশ্ন করল, 'কেন, কেন হঠাৎ তোমার সরবত খেতে ইচ্ছে হ'ল শুনি?'

'ঐ দেখো।' আঙুল দিয়ে ডলি উল্টো দিকের ফুটপাতের একটা দোকান দেখাল।

কুমারেশ সেদিকে তাকায়, আমিও তাকাই। শ্বেতপাথরের জিনিস। থালা গ্লাস হরিণ পাখি তাজমহল পিরামিড সাজিয়ে রেখেছে।

'কতকাল আমার এক সেট্ পাথরের জিনিস কেনার ইচ্ছা।'

'আমি তো বারণ করছি না, কেনো না তুমি।' কুমারেশ স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকায়।

ডলি চোখ বুজে আর এক ঢোক সরবত গিলল। একটু সময়ের স্তব্ধতা।

না, সরবত পান করতে করতে আমি ওদের কথা ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম নিজের কথা।
[illegible]

বন্ধু বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দোকানে দোকানে ঘুরে, ওদের এটা ওটা দরদস্তুর কেনাকাটা করায় সাহায্য করব ভয়ে আমি যে ক্লান্ত বা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম তা নয়। বরং কোনো কিছু কেনাকাটা দরদস্তুর না ক'রে উদ্দেশ্যহীনের মতো কেবলই রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তখন এদের দেখা পেয়ে মনে মনে বেশ খুশিই হ'লাম।

কিন্তু ওদের মধ্যে যেন কি হ'ল।

সরবতের গ্লাস হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে রাখল ডলি।

'থাকগে, পাথরের জিনিস আজ কিনব না।'

'কেন?' কুমারেশ ঢোক গিলল। উদ্বিগ্ন গলার স্বর। ডলি স্বামীর চোখে চোখে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকায়। ঠোঁটে অল্প হাসি। 'হাজার বার তো বলে নিই। তারপর একদিন রাজী হয়ো, এসে এক সেট্ থালা গ্লাস বাটি কিনে নেয়া যাবে।'

কুমারেশ কথা বলল না।

সরবত খাওয়া শেষ ক'রে তিনজন রাস্তায় নামলাম।

ডলি বলল, 'জুতোর দোকানে ঢুকবে কি আগে?'

'তোমার ইচ্ছা।' কুমারেশ গলা পরিষ্কার করল। 'শাড়ির দোকানও কাছেই।'

ডলি আবার আমার দিকে তাকায়।

বাঁ-হাতের রুমাল দিয়ে ও চিবুকের নিচেটা মোছে। কুমারেশ দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়।

বললাম, 'গহনার দোকানও কাছেই।'

'তবে সেখানেই আগে যাওয়া যাক।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কুমারেশ প্রস্তাব করে।

ডলি খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ল।

আর কৃতজ্ঞতার অভিনন্দন জানিয়ে আমায় আর একটি সুন্দর চাউনি উপহার দিলে ও।

কুমারেশ তো খুশিই।

তিনজন কলরব করতে করতে 'হীরক-ভাণ্ডারে' প্রবেশ করলাম। কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত জুয়েলার্স শপ্।

আমার উপর গহনা পছন্দ এবং সেটার দাম ঠিক করার ভার গছিয়ে কুমারেশ একটা চেয়ারে চুপচাপ ব'সে রইল। সিগারেট পুড়ল।

ডলিকে নিয়ে আমি শো-কেইসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

এত কাছাকাছি হয়েছি দুজন যে, ওর চুলের সুঘ্রাণ দেহের সৌরভ মাঝে মাঝে আমার নাকে এসে লেগেছে। আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি পরস্ত্রীর ঘনসান্নিধ্যে।

তারপর ডলি এক সময় সোজা চলে গেল কুমারেশের পাশে, দোকানের দরজায় সে চুপচাপ চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল।

'একটাও পছন্দ হল না?' কুমারেশ এক ধরণে হাসল।

ডলি মাথা নাড়ল।

কুমারেশ সোলার টুপি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাতের রুমালটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ডলি বলল, 'সোনাদানা,—হাজারটা দোকানে না ঘুরলে হাজার রকম ডিজাইন না দেখলে কিচ্ছু পছন্দ করা যায় না।'

ডলি ঠাট্টা করল কি গম্ভীরভাবে কথা বলল ঠিক ধরতে না পেরে যেন শূন্য দৃষ্টিতে একটুক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে কুমারেশ বলল, 'চলো।'

কিন্তু রাস্তায় নামতে ডলির সুর বদলায়।

'থাক আজ। যেদিন পাথরের বাটি কিনব সেদিন নয় গহনাও কেনা যাবে।'

'তবে কি এখন শাড়ির দোকানে ঢুকবে?' অল্প অল্প হাসে কুমারেশ।

'আগে তো টফি খাওয়াও।' পাশের একটা দোকানের সো-কেইসে কাচের বোয়মের ভিতরে রঙিন প্যাকেট মোড়া চকোলেট লজেন্স দেখে ডলি থমকে দাঁড়ায়। 'গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে আবার।'

'নিশ্চয় খাওয়াবো টফি।' অমিত উৎসাহে কুমারেশ চকোলেট কিনতে অগ্রসর হয়।

ডলি আমার চোখে চোখ রেখে নীরবে হাসে।

'হাজারবার বলতে হ'ল না', বললাম আমি, 'মুখ থেকে বের করেছেন কি কুমারেশ ছুটে গেছে চকোলেট কিনতে।'

ডলি একথার উপর কোনো মন্তব্য করেনি।

কুমারেশ ফিরে এলো।

গালে চকোলেট পুরে ডলি বলল, 'চলুন কোথায় আপনার শাড়ির দোকান।' বললাম, 'ঐ তো সামনে।'

আশ্চর্য একটা শাড়িও ওর পছন্দ হল না।

বললাম, 'আর একটা দোকান দেখবেন কি?'

একটা লজেন্স মুখে পুরে ডলি মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই। বাজারে মনের মত কাপড় আমদানী হয়নি, হলে ওরা রাখত। দোকানটা তো আর খুব ছোট নয়।'

বললাম, 'তা-ও বটে।'

'তাই ভাল।' হাল্কা গলায় কুমারেশ বলল, 'দু'চারদিন পরে বরং—'

'শাড়ি গহনা এক সঙ্গে কেনা যাবে।' স্বামীর অর্ধসমাপ্ত বাক্য পূরণ ক'রে ডলি রাস্তায় পা বাড়ায়। আমরাও। কুমারেশ কাঁচা ডাবের দোকান দেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'তোমার ডাব কত ক'রে হে!'

'চার আনা।'

'বড়গুলো?'

'ছ' আনা।'

'আমাকে একটা বড় ডাব কেটে দাও।' কুমারেশ ডলির দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ায়। 'একটা ডাব খাও, ডাব খেলে তোমার পিপাসা আর থাকবে না।'

সব কিনে কিনে খাওয়াচ্ছ।' ডলি কাটা ডাব মুখের কাছে তুলে অপাঙ্গে আমাকে দেখে।

কুমারেশ নতুন সিগারেট ধরায়।

'জুতোর দোকানে?' কুমারেশ প্রশ্ন করে।

'দরকার নেই, ঐ একদিনেই সব হবে।' লক্ষ্মী মেয়ের মত ডলি রুমাল দিয়ে ঠোঁট ও থুঁতনিতে লেগে থাকা ডাবের জল মুছল।

যেন বিজয়গর্বে কুমারেশ আমার মুখের দিকে তাকাল।

'এবার কি ঘরে ফিরবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

স্বামী স্ত্রী যুগপৎ আমার দিকে মুখ ফেরাল। 'কেন, আপনার কি কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি?'

'কারো সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট?' কুমারেশ খোঁচা দেয়।

'বৌয়ের কোনো ফরমাস?' তার বৌ প্রশ্ন করে।

'একটু বেড়াচ্ছি, আর না সঙ্গে।' কুমারেশ আমার হাত ধরে বলল, 'চল ঐ পার্কে গিয়ে একটু বসি।'

'হুঁ, চলুন।' ডলি বলল, 'বুঝতে পারছেন না। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে এখানি দাম্পত্যকলহ সুরু হবে। একটা জিনিস কিনতে পারলাম না।'

'সে দোষ তো আপনার, আপনারই কিছু পছন্দ হ'ল না।' হেসে মন্তব্য করলাম।

কথার শেষে কুমারেশের চেহারা দেখলাম। কুমারেশ মাথার উপর ট্রামের তার দেখছিল।

'তোমার সব শুদ্ধ কত খরচ হ'ল? ডাব টফি চা সরবৎ নিয়ে?' হঠাৎ ডলি স্বামীকে প্রশ্ন করল। তখন আমরা পার্কের কাছে এসে গেছি। কুমারেশের দিকে তেরছা চোখে ডলি তাকিয়ে।

'এক টাকা ন' আনা।' গম্ভীর গলায় কুমারেশ উত্তর দিলে। ডলি আর শব্দ করল না।

পার্কে ঢুকে তিনজন পাশাপাশি একটা চেয়ারে বসি। আতাগাছের ঘনছায়ায় জায়গাটা ঠাণ্ডা। আকাশের সাদা মেঘগুলো ছেঁড়া তুলোর মত হয়ে গেছে হাওয়ায়। একদৃষ্টে তাই দেখছিলাম হঠাৎ থমথমে গলার শব্দে চমকে উঠি।

'আমার কাছে ভাঙতি ন'আনা নেই, সব আস্ত টাকা। বাড়ি গিয়ে তোমায় এক টাকা ন'আনা দিয়ে দেব।'

'তা দিও, অত তাড়া কি, এক সময় দিয়ে দিলেই হবে।' মিনমিনে গলায় বলল কুমারেশ আর জুতোর তলা দিয়ে পায়ের নীচের কতকগুলো ঘাস ছিঁড়ে ফেলল।

'না যখন তখন।' সরু গলায় ডলি কথা কয়। 'সঙ্গে সঙ্গে এসব দিয়ে দেওয়া ভাল। পরে আর মনেটনে থাকে না।'

নিশ্চুপ নতমুখে কুমারেশ ছেঁড়া ঘাসের ডগাগুলো দেখলে লক্ষ্য করলাম।

চুপ করে থাকি।

একটা পাখি মাথার ওপর গান গাইছিল। যেন কি এক অস্বস্তিতে ডলি উঠে দাঁড়াল। 'না এখনি ভাল। তোমার তো সিগারেট ফুরিয়েছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে টাকা ভাঙ্গাব। এক টাকা তিন আনা তুমি পাচ্ছ। দাঁড়াও।'

ব'লে ডলি আর অপেক্ষা করল না, সিগারেট কিনতে চলে গেল।

'কি ব্যাপার?' বন্ধুর চোখের দিকে তাকাই।

'ঐ হচ্ছে, মাঝে মাঝে ওরকম করছে আজকাল।' কুমারেশ ক্ষীণ হাসল : 'ও এখন চাকরি করছে কি না।'

চোখ বড় করলাম আমি।

'তাহলে তোমার টাকায় শাড়ি, গহনা জুতোও কিনবে না শেষ পর্যন্ত, এই মতলব? কি বলো? আত্মসম্মানবোধ?'

'তা হবে, হ'তে পারে।' কুমারেশ ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

ডলি ফিরে এল সিগারেট নিয়ে।

'এই তোমার পয়সা, সিগারেট।'

'তোমরা ততক্ষণ গল্প করো দু'জন।' কুমারেশ উঠে দাঁড়াল। 'আমি একটু পায়চারি করব।'

ব'লে আর কথা না কয়ে সোজা চলে গেল সে দূরে অন্য গাছের ছায়ায়।

ডলি ফ্যালফ্যাল ক'রে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল এক সময়। বললাম, 'কি ব্যাপার?'

ডলি মৃদু হাসল।

'ওই হচ্ছে, ঐ করছে আজকাল।'

'কেন?'

'চাকরি নেই।'

'কিন্তু—' ঢোক গিলে বেশ কিছুক্ষণ চু[প] ক'রে রইলাম কথাটা জিজ্ঞেস করার আগে তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'কিন্তু বে[শ] তো খরচ করল তখন কুমারেশ আপনা[র] সরবত, ডাব, চা-টা বাবদ, পোষাক-পরিচ্ছদ ওর খারাপ না। আমি আরো ভাবলা[ম] ভাবছিলাম—'

'পোষাকপরিচ্ছদ আমার দেওয়া।' নিষ্কম্[প] সহজ গলায় ডলি বলল, 'পাঁচ টাকা ধার ক[রে] এনেছে কাল কারো কাছ থেকে। তাই খ[রচ] করছে, তাই দিয়ে ও আমার—'

ডলি থেমে গেল।

পাখিটা জোরে কিচিরমিচির করে উঠ[ল] মাথার উপর।

কুমারেশ ফিরে এসেছে।

বলল, চলো ওঠা যাক।'

'বাড়ি ফিরতে এখন ট্যাক্সি ডাকবে না না সেই রিক্সা?' বলে ডলি এক পলক স্বাম[ীর] দিকে তারপর আমার চোখে চোখ রেখে সু[ন্দর] বাঁকা ঠোঁটে হাসল।

যেন অপ্রস্তুত হয়ে কুমারেশ আমার দি[কে] চোখ ঘোরাতে চোখটা আমি অন্য দি[কে] ফিরিয়ে নিই।

রাস্তায় নেমে ওরা পরে ট্যাক্সি কি রি[ক্সা] ডেকেছিল জানি না। তবে পার্কের গেট [পার] হবার সময় দেখি অদূরে আইসক্রীমের গা[ড়ি] এসে গেছে।

'কি খাবে নাকি একটা ম্যাগ্‌নোলি[য়া] বল, ডাকব? একটা বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া খে[লে] তোমার শরীর জুড়িয়ে যাবে।' স্ত্রীর দি[কে] বিস্ফারিত চোখে চেয়ে কুমারেশ পরে আম[ায়] এক পলক দেখল। আকাশের দিকে মুখ [তুলে] ডলি মৃদু গুঞ্জন করার মতন শব্দ ক[রে] বলল, 'ডাকতে পারো, ডাকো।'

আশ্চর্য, একবার কিন্তু ও আর ঔ[র] মুখের দিকে তাকাল না। না কি ওর শুনতে পাইনি বলে ডলি মনে করেছিল। চলে যাবার পরও ভাবলাম।



মৃত্যু রহস্য

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

'শঙ্খে তোমার তোল নাদ
প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ...
মরণ, হে মোর মরণ।'...
রবীন্দ্রনাথ।

মৃত্যু মনুষ্যজীবনে সর্বপ্রহেলিকার নিগূঢ়তম প্রহেলিকা। মানুষের জীবননাট্যে যবনিকাপাত যে কত নির্মম আকস্মিকতায় হইতে পারে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সা-অভিলাষের সুবর্ণসৌধ মুহূর্তে যে কিভাবে ধূলায় লুটাইতে পারে, ভবিষ্যতের সহস্র জল্পনা-কল্পনা, শতাধিক কামনা-বাসনা কত অনাড়ম্বরে যে শূন্যে বিলীন হইতে পারে; এক কথায়, কত ক্ষণিক, কত অনিশ্চিত যে মানুষের এই জীবন —অকস্মাৎ, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে (সংগোপনেই হউক আর ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াই হউক) আবির্ভূত হইয়া মৃত্যু যেন তাহাই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। তাই, মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসা যেমন চিরন্তন, রহস্য যেমন কুহেলিকাচ্ছন্ন—আতঙ্কও তেমনি গভীর ও দুরপনেয়। এবং এইজন্যই পৃথিবী-পৃষ্ঠে-প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মসমূহে মৃত্যু সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ এবং ব্যাখ্যা স্থান লাভ করিয়াছে। মানবের প্রগতি-ইতিহাস, বিশেষ করিয়া তাহার ধর্মবুদ্ধির উদ্ভব-আখ্যায়িকায় মৃত্যুর বিশিষ্ট প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি জটিল মনোবৃত্তির ক্রিয়ায় মানবের মধ্যে আংশিকভাবে ধর্মবোধ প্রথম জাগ্রত হইলেও মৃত্যুর সহিত ভীত-চকিত পরিচয় যে ভগবানে বিশ্বাসী হইতে এবং ইহলোক ভিন্ন আর এক-লোকের অস্তিত্বে আস্থাবান হইয়া উঠিতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সেকথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এই মাত্র যে-ব্যক্তি সুখে-দুঃখে, হাসিকান্নায় তাহাদেরই একজন হইয়া বাঁচিয়াছিল—কিসের প্রভাবে, কাহার স্পর্শে সে সহসা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, আর উঠিল না? কি সে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা? প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগ্নকায়, বনচারী মানব-মানবী এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া যেমন বিহ্বল হইয়াছিল অন্য কোন ঘটনায় তদ্রূপ হইয়াছিল না। ফলে, রজনীর গাঢ় তমিস্রায় নিদ্রার আবরণতলে দিবাচিন্তার বিকৃত পরিণতি স্বপ্নাকারে সেই মৃত জনের পার্থিব, বাস্তব রূপে তাহার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছিল। ইহলোক ভিন্ন অন্য একলোকের অস্তিত্বে আস্থা, ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে ভয় ও বিশ্বাস এই স্বপ্নদর্শন হইতেই মানবমনে প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। তারপর, সেইকাল হইতে আজ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বরূপ, জন্ম ও পুনর্জন্ম, ভূত-প্রেত প্রভৃতি লইয়া কত মতবাদই না মাথা তুলিয়াছে, কত অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় দর্শনকথা, কত 'কা'-র ইতিবৃত্ত, ভগবান বুদ্ধের জরা ও মৃত্যুর বিভীষিকাদর্শনে গৃহত্যাগরূপ কত অনবদ্য-কাহিনী আমরা শুনিতে পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর তুহিন গহ্বরে ঘনান্ধকারছায়া সাধারণ মনুষ্যের সম্মুখ হইতে কিছুমাত্র দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। মৃত্যু-পারের অনাবিষ্কৃত দেশ সাধারণ মানবের নিকট চিরকালেরই মত অনির্বচনীয় রহস্যে আবৃত রহিয়া গিয়াছে। মৃত্যুভীতি—সাধারণ প্রাকৃত সংসারী মানবকে একইভাবে আতঙ্কিত ও ভীত করিয়াছে ও করিতেছে। অনাগত দূর ভাবী-কালে মানবের জ্ঞানপরিধি আরও বিস্তৃত হইলে, অতীন্দ্রিয় দর্শনক্ষেত্রে বিচরণক্ষমতা আরও অবাধ হইলে তাহার মনোভাব কীদৃশ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু আজ পর্যন্ত বহু আবিষ্কার, বহু মতবাদ সত্ত্বেও মৃত্যু সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া এইটুকুই শুধু বলা চলে যে, মৃত্যু মানবজীবনের অবধারিত পরিণতি। অকস্মাৎ তাহার আগমন হইতে পারে এবং যে-দেহটি মৃত্যুস্পর্শে হিম-শীতল হইয়া একবার ভস্মীভূত হইল অথবা ভূগর্ভে সমাহিত হইল সজীব সচলতার রাজ্যে সে আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং' কখনো সম্ভব হইবে না, কখনো সম্ভব হইবে না। সুতরাং চরম সমস্যা ও প্রশ্ন দাঁড়াইল এই যে,—মৃত্যুই কি তবে জীবনের পরিসমাপ্তি? মানবের হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেম, সুকৃতি-দুষ্কৃতি—মৃত্যুস্পর্শে সব কিছুরই কি পর্যবসান? মানবের সমগ্র অস্তিত্ব কি কেবল দেহেই পর্যবসিত এবং মৃত্যুতেই কি উহার পূর্ণচ্ছেদ?...

তাহার উৎসাহী, আশাবাদী মন এ পরিণতিকে মানিয়া লইতে দ্বিধা করিল, নিভৃত ইঙ্গিতে সান্ত্বনা দিয়া কে তাহাকে যেন বলিল—'মৃত্যুই মানবের চরম পরিণতি নহে—এক শাশ্বত জীবনমন্দাকিনী মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া কল্প হইতে কল্পান্তর পর্যন্ত গতিশীল রহিয়াছে। অনুসন্ধান কর জানিতে পারিবে, এগিয়ে চল উপলব্ধি করিতে পারিবে।'

জগতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের যে-কথা আমরা প্রবন্ধারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের উদ্ভব এই অনুসন্ধানেরই বহুমুখী বিচিত্র পরিণতি হইতে। জন্মান্তর-বাদ, Transmigration কিংবা Metempsychosis প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক মতবাদ এই ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত।......

খৃষ্টান জগতে Justinian এর পূর্ব সময় পর্যন্ত Origen ও অন্যান্য ধর্মযাজকগণ ট্রান্স-মাইগ্রেসনে বিশ্বাস করিতেন। গ্রীক দার্শনিক মতবাদ এই ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত।

"After death the rational mind having been freed from chains of the body, assumes an ethereal vehicle and passes into the region of the dead where it remains till it is sent back to this world to inhabit some other body, human or animal. After undergoing successive purgations it is received among the Gods and returns to the eternal source from which it first proceeded."....

কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করিয়া জাস্টিনিয়ানের সময় হইতে এ মতবাদে তাঁহারা অবিশ্বাসী হইয়া উঠেন। অধুনা কেবলমাত্র খৃষ্টানগণ নহেন, প্রাচীন ইহুদী, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ও Metempsychosis মতবাদে অবিশ্বাসী। পুনর্জন্মবাদ ইহারা অস্বীকার করেন। একটিমাত্র জন্মে জীবনের সূত্রপাত ও অবসান—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ও আত্মার সমসাময়িক, যুগপৎ-সৃষ্টি ভগবৎবিধানে সম্ভব হইয়া থাকে—ইহাই তাহাদের মত। মৃত্যুর পর স্বর্গ কিংবা নরক নামক স্থানে সুখ বা দুঃখভোগ করিবার অদৃষ্ট লইয়া Soul-কে অনন্তকাল বাস করিতে হইবে। সে 'Soul' বেদান্তের আত্মা নহে।

"After death each one of us will continue to live either in heaven or hell to enjoy or to suffer throughout eternity."

—মোটামুটিভাবে ইহাই তাহাদের মতবাদের সারকথা। আবার, আধুনিক যুগের স্পিরিচুয়ালিস্টগণও জন্মান্তরবাদ মানেন না—একজন্মবাদই তাঁহারাও গ্রহণ করেন, স্বীকার করেন। স্বামী অভেদানন্দকৃত 'Life Beyond Death' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে আবার ট্রান্স-মাইগ্রেসন মতবাদেরই বিশেষ প্রচলন ছিল কোনকালে। তাহাদের মতে একটি দেহত্যাগের পর তন্মধ্যস্থ আত্মা বা Soul সহস্র বৎসর ধরিয়া অভিজ্ঞতালাভ ব্যপদেশে দেহান্তর পরিভ্রমণ করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে Soul-এর নিজস্ব গুণ বা পরিমাণ কিছুমাত্র ব্যাহত বা পরিবর্তিত হয় না। তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সে ক্ষেত্র অন্বেষণ করিয়া লয় মাত্র।

"The soul after leaving the deadbody

for thousands of years in order to gain experiences in each of the different stages of life. The migrating substance (soul) being a fixed quantity, with fixed qualities choses its form according to its taste, desire and bent of character."
—ইহাই প্রাচীন মিশরীয়গণের ধারণা ছিল।

আমাদের এই ভারতভূখণ্ডে আবার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই মৃত্যুরহস্য ভেদ করিবার প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন ও মৃত্যুভীতিজয়-প্রয়াস একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—চিরদিন। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কঠোপনিষৎ এই মৃত্যুরহস্যালোচনায়ই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্মরণাতীত কালের সেই রহস্যাবৃত আরণ্যক সভ্যতার যুগে...যখন জগতের অন্য কোন দেশে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ঈষন্মাত্র আলোকপাত হইতেও বহু বহু শতাব্দী বিলম্ব আছে—সেই শতকল্প ও মন্বন্তরকাল পূর্বেকার দিনে নচিকেতামুখে ভারতীয় সাধক মৃত্যুদেবতার নিকট এই শাশ্বত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।'...

"মানুষের মরণ হইলে যে-সংশয় উপস্থিত হয় —কেহ বলেন, পরলোকবাসী আত্মা আছেন, কেহ বলেন, তিনি নাই—আপনার উপদেশ হইতে আমি সেই আত্মার অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের বিষয় জানিতে চাই। বরসমূহের ইহাই আমার তৃতীয় বর।' এইটি নচিকেতার প্রশ্ন ছিল।... কিন্তু কেবল প্রশ্ন উত্থাপনই নহে, পরন্তু আত্ম-সমাহিত হইয়া ধ্যানের তৃতীয় নেত্রে অপরা-জ্ঞানের অপরিসর পরিধির বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই জটিলতম প্রশ্নের সমাধানও সে আবিষ্কার করিয়াছিল। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুদেবতা নিগূঢ় তত্ত্বকথা সেদিন বিবৃত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'হে নচিকেতা, মৃত্যু শুধু দেহেরই হইয়া থাকে, কিন্তু দেহীর মৃত্যু নাই। দেহী...'নিত্যং অবধ্যোহয়ং'। বলিয়াছিলেন,...

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন
নায়ং কুতশ্চিন বভুব কশ্চিৎ,
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'...

আত্মরূপই মনুষ্যের যথার্থ রূপ। ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। জন্ম, জরা ও মৃত্যুহীন এই ব্রহ্ম বা আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন না—শরীর নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না।

'অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্,
আত্মাহস্য জন্তো নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ।'—

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করিয়া বীতশোক হন এবং অব্যাহত আনন্দধারায় সিক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভে ধন্য হন।...

'এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্যমর্তঃ
প্রবৃহ্য ধর্মমনুসতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে।'

এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, সম্যক্ গ্রহণ করিয়া এবং তৎপর ধর্মসহায়ে দেহ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া দেহী সূক্ষ্ম আত্মাকে লাভ করে এবং এই আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।"...সে আনন্দ অব্যাহত, সর্বোত্তম। উহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভই 'মন্যতে নাধিকং ততঃ'।...কারণ, এই আত্মা সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ ও পরমাগতি।...

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরাবুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহানপরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর,
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি।'

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা (যাহাকে ভাষ্যকার হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণীমাত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাপকতত্ত্ব বলিয়াছেন) শ্রেষ্ঠ। আবার হিরণ্যগর্ভ হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ বা পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। তিনি পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি।

অতএব, আর্যঋষির মতে মৃত্যু অর্থে দেহ এবং ইন্দ্রিয়েরই কেবল মৃত্যু বুঝাইবে কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয়গুহায় অশরীরীরূপে, নিত্য-রূপে যিনি বিরাজমান, যিনি সুবিশাল ও সর্বব্যাপী তিনি 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জনৈক মার্কিন মহিলার নিকট লিখিত একটি চিঠিতে এই তত্ত্বটি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"Coming and going is all delusion. The soul never comes nor goes. Where is the place to which it shall go, when all space is in the soul? When shall be the time for entering and departing, when all time is in the soul? The earth moves, causing the illusion of the movement of the sun, but the sun does not move. So Prakriti or Maya or Nature is moving, changing, unfolding viel after viel—turning leaf after leaf of this grand book—which the witnessing soul drinking in knowledge, unmoved, unchanged. All souls that ever have been, are or shall be, are all in the present tense, and to use a material simile—are all standing at one geometrical point. Because, the idea of space does not occur in the soul."....

সুতরাং, মৃত্যু একটি বাহ্যিক পরিবর্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি'...

তদ্রূপ দেহ জীর্ণ হইয়া গেলে নূতন দেহ মানব স্বভাবতঃই গ্রহণ করিয়া থাকে।...

মৃত্যুরহস্যের এই যে অভিনব ও বলি ব্যাখ্যা—ইহার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি হই আনন্দস্থিতি ও শোকাতীত অবস্থা লাভ হই থাকে—একথা শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষ করিয়াছেন—বহু গ্রন্থে, বহু স্থানে।

অনন্তপার শাস্ত্রসমুদ্র হইতে শ্লোকশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সম্যক পরিচয় প্রদ করিতে আমরা এখানে চেষ্টা করিব না। তা খুব সহজসাধ্য ব্যাপারও নহে। এ প্রস আমরা শুধু এইটুকুই বলিব যে, আ মহিমাজ্ঞাপক ও মৃত্যুরহস্যচ্ছেদক শ্লোকম উপনিষদ গ্রন্থরাজির সর্বত্র বহুলে পরিম আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। কে কঠোপনিষদই নহে—বৃহদারণ্যক, ছান্দো কেন, ঈশ প্রভৃতি উপনিষদেও আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা ব্যপদেশ মৃত্যু সম্পর্ক ইঙ্গিত বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আবার, ঐ শ্লোকরাশির সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশিভাবে এমন শ্লোকও যথেষ্ট যাহাতে আত্মায় অবিশ্বাসী, মৃত্যুতত্ত্বজ্ঞানহ দুর্ভাগাদের পরিণতি যে কী হইবে তা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।...

'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্য
মনসা এব ইদমাপ্তব্যং নেহনানাস্তি কিঞ্চন,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্য

যাহা এখানে তাহাই সেখানে, যাহা সে তাহাই এখানে উপাধি অনুযায়ী বিভ হন। যে এই ব্রহ্মে নানা বা বহু দর্শন সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। দ্বারাই এ ব্রহ্ম উপলভ্য—এই ব্রহ্মে অ ভেদ নাই। যে ইহাতে ভেদ দর্শন করে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়।...

সুতরাং, অবিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দে কিছু নয়। পরন্তু অবিশ্বাস দূর ক অধ্যবসায় সহায়ে দৃঢ়নিষ্ঠায় আত্মতত্ত্বজ্ঞা জন্য, হে মানব...

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।'

মনে রাখিও, সহজ, সুগম, বিঘ্নহীন ইহা নহে :

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'....

তাহা কর, যদি প্রচেষ্টা তোমার সার্থক হয় অমৃতের অধিকারী তুমি অবশ্য হইবে। সেজন্য অমিতসাহসে অগ্রসর হইতে হ মৃত্যুর একেবারে সামনা-সামনি, মুখো দাঁড়াইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল নৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।'

অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন, আপ্তকাম ঋষি তাই অভয় দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন...

'অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরমধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।'...অর্থাৎ, অনাদি অনন্ত মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্যকে জানিতে পারিলে মৃত্যুহস্ত হইতে বিমুক্তি অবশ্য লাভ করা যায়।

ইহার পর আবার এই তত্ত্ব ভাবীকালের সাধকগণ কিভাবে, কোন্ প্রণালীতে উপলব্ধি করিতে পারিবেন তাহারও উপায় তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টায়, বহু তপস্যায়, বহু সাধনমার্গ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু চরমে মৃত্যুরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের জন্য দুইটি বিশেষ পথের কথাই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ, 'ত্যাগ' ভিন্ন অমৃতত্ব লাভ সম্ভব নহে। ত্যাগের মধ্য দিয়াই তাহাকে ভোগ করিতে হয়।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ' নিবৃত্তিরত, প্রবচন, মেধা বা বহুশ্রুতি কোন কিছুতেই এই আত্মতত্ত্ব লভ্য নহে—যাহার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিবেন কেবল তিনিই তাহাকে লাভ করিবেন।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈ এষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।'... সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর এবং তাহারই কৃপার অনুবর্তী হইয়া......

'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য', সর্বধর্মের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই 'শরণং ব্রজ' হইয়া চলিতে থাক, মৃত্যুরহস্য ছিন্ন হইবে, তাঁহাকেও লাভ করিবে। মৃত্যুর পারে যাইবার, মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার ইহাই কৌশল। অন্য কোন কৌশল নাই।

আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইহাই প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ অভিনব আবিষ্কার এবং এই আবিষ্কারই পরবর্তীকালের সমগ্র হিন্দুদর্শনের ভিত্তি। তাই দেখিতে পাই, শাস্ত্রসমূহের কৌস্তুভমণি, সর্বহিন্দুশাস্ত্রসার ভগবৎগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থদ্বয় ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা মৃত্যুর ঘনান্ধকার নিভৃত প্রদেশ হইতেই উদ্ভূত হইল। অধুনা বহু-আলোচিত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত, যুক্তিবিচার-সহনক্ষম বেদান্ত দর্শনেরও উহাই অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সাধক শুধু যে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতেই সক্ষম হইয়াছিল তাহাই নহে পরন্তু, উত্তরকালে তাহাকে সে একান্ত আপন বলিয়া, 'প্রিয়তম' বলিয়া গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইয়াছিল। উত্তরাখণ্ডের জনৈক সন্ন্যাসীকে বিষাক্ত কালকূট দংশন করিলে—'আমার প্রিয়তমের দূত আমাকে চুম্বন করিয়াছে' বলিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এ কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত গল্পের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, আমাদের এই বাঙলা দেশে, পরবর্তী যুগের বাঙলা সাহিত্যে কত বিচিত্র রচনায়, কত বেহুলা লক্ষীন্দরের মর্মন্তুদ কাহিনীতে, কত সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে, সতীর দেহত্যাগ ও অভিমন্যুর অন্যায়-সমরে অকালে প্রাণ বিসর্জনরূপে কত করুণ আখ্যায়িকায় এই মৃত্যু-রহস্য যে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অবধি নাই। বস্তুতঃ, সর্বভীতির মূলীভূতকারণরূপে যে মৃত্যু মানুষের চক্ষে নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া সর্বলোকে, সর্বকালে প্রতিভাত—তাহাকেই একান্ত প্রিয় বলিয়া, বহু বাঞ্ছিত অতিথি বলিয়া স্বাগত আহ্বান করিবার মত সাহস ও প্রেরণা আমাদের কবিকুল প্রভূত পরিমাণে অর্জন করিয়াছিলেন উত্তরকালে। তাই বাঙলার কবিগুরুর কণ্ঠে আমরা শুনি,

মরণ যেদিন দিনের শেষে
আসবে তোমার দুয়ারে,
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে?
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে।'

আবার কল্পনারাজ্যে আরও অগ্রসর হইয়া প্রেম সম্বন্ধে মৃত্যুকে আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সে মাধুর্য রসেও অভিষিক্ত করিয়াছে রজনীর স্তব্ধ নীরবতায়, হরিবিলাস-কুতূহলী অভিসারিকা যেমন উদ্বেলিত অন্তরে ও নিভৃতচরণে ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জবীথি দিয়া প্রেমাস্পদের উদ্দেশে বাহির হয় ঠিক তেমনিভাবে এ-যুগের ভারতীয় কবি মরণ মিলনে অগ্রসর হইয়া অপূর্ব গীতি রচনা করিয়াছেনঃ

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো একি প্রণয়েরি ধরণ?
যবে সন্ধ্যাবেলার ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নামিয়া
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারাদিনমান মাঠে ভ্রমিয়া—
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো, অতি মৃদুগতি চরণ,
আমি বুঝিব না কী যে কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।......ইত্যাদি

'ভানু সিংহের পদাবলী' গ্রন্থে আবার এই মরণকে 'শ্যাম' সম্বোধনে ডাকিয়া, ব্রজ বুলি ছন্দে নন্দিত করিয়াও কবি গাহিয়াছেন।......

'মরণরে, শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব, নিরদয় মাধব
তুহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর......
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর
তুহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণরে আওরে আও।'.....

এইরূপে আরও কত মনোজ্ঞ রসরচনা, কত অনবদ্য কবিতা, স্মরণ, নৈবেদ্য, প্রান্তিক' নবজাতক, রোগশয্যায় প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিধি মধ্যে তাহাদের উদ্ধৃতি সম্ভব নয়.....সুতরাং সে প্রয়াস আমরা করিব না। উপসংহারে শুধু ইহাই বলিব যে......অতি প্রাচীন যুগের বিস্মৃতপ্রায় দিন হইতে বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিবিচারের দিন পর্যন্ত মৃত্যু-রহস্য লইয়া মানুষ নানাভাবে চিন্তা গবেষণা করিয়াছে, ধ্যানতপস্যায় মাতিয়াছে এবং সেই সাধনলব্ধ তত্ত্বরাশি কখনো শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত ও নির্দেশরূপে, কখনো কল্পনামণ্ডিত মনোরম ছন্দগাথায় প্রকাশ করিয়া মানুষকে মৃত্যুভীতির পারে লইয়া যাইতে সে চেষ্টা করিয়াছে। যাঁহারা সাধক, বাণী উপাসক—তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল অভয়বাণী অতীতে যেমন পরম উদ্দীপকরূপে ক্রিয়া করিয়াছে—ভাবীকালেও হয়ত তদ্রূপই করিতে থাকিবে; কিন্তু সাধনহীন, সন্দিগ্ধমনা, ক্ষীণশক্তি সাধারণ মানুষ শত আবিষ্কার, শত অভয়বাণী সত্ত্বেও চিরদিনই মৃত্যুকে ভয় করিবে, তাহাকে এড়াইয়া, ফাঁকি দিয়া চিরদিনই এই সংসারের হাটে অব্যাহত বিকিকিনি করিতে চাহিবে। তাহার পক্ষে তাই আর্যঋষির আবিষ্কার নহে, উপনিষদের আত্মতত্ত্বও নহে—পরন্তু, বকরূপী ধর্মের প্রশ্নোত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহাকে পরমাশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মহাভারতের সেই সর্বজনবিদিত বাণীটিই বোধ করি চরম ও পরম বলিয়া প্রতিভাত হইবে......

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।'



চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

গুরুদেব বলিয়াছিলেন, জীবনকে যদি দেখিতে চাও, তাহা হইলে শহরের চৌরাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও, অনেক কিছু রগড় দেখিবে। সেই হইতে গুরু-নির্দেশিত বাক্যের মর্যাদা রাখিবার জন্য আজও বেকার থাকিলেই চৌরাস্তার একধারে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুজনের ধাক্কা খাইয়াছি, সন্দেহভাজন হইয়াছি এবং নিজের তন্ময়তার জন্য বা নির্বুদ্ধিতার জন্য পকেটমারের হাতে অনেক কিছু খোয়াইয়া আসিয়াছি, তবুও অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই—আমার চৌরাস্তার মোহ কমে নাই।

* * * *

ট্রাম, বাস, রিক্সা, মোটর, গো-যান, দ্বিচক্রযান, অশ্বযান, ভট্‌ভটি, ম্যান, লরী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, কিশোর কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ফিরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেওয়ালা, সুন্দর, অসুন্দর কতজন কত দিকেই না চলিয়াছে। কেহ আশাহত কেহ আশায় উদ্দীপ্ত, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ হতবাক্‌, কেহ সবাক—কত তাহাদের ভাব, কত রূপ ভঙ্গী, কত রকম মতলব, কত কথা তাহাদের মুখে। দেখিয়া শুনিয়া আর কিছু না হউক মানব-চরিত্রের বিচিত্র ভাবধারার একটা ইঙ্গিত মনের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে। চোখ বুজিলে পুরা মানুষটাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দু'একটি রেখায় কার্টুনের ছবির মত একটা মজাদার রূপ পাওয়া যায়। যিনি রসিক, তিনি তাহারই ভিতর দিয়া বহু রসের সন্ধান পাইতে পারেন। জীবনের ও সংসারের চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া স্বদেশ ও বিদেশের এই চলমান পার্থিব জীবনের ছবি আঁকিবার জনাই চৌরাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

* * * * *

পাকিস্থানের এক খবরে প্রকাশ যে, এই বৎসরে ঢাকায় বিশটি স্থানে বিনাড়ম্বরে দুর্গাপূজার বিজয়ার আয়োজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। খর্বাকৃতি প্রতিমাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোভাযাত্রাসহ লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রায় হিন্দু ও মুসলমানগণ যোগদান করিয়াছিল। শোভাযাত্রীরা প্রহরীবেষ্টিত হইয়া নির্দিষ্ট রাস্তাগুলি দিয়া যাইবার সময় দুর্গা-মায়ী-কী-জয়, পাকিস্থান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি করে।

—প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানেই প্রথম সর্বধর্ম-সমন্বয় করিল, ইহা আশার কথা। মহরমের সময় ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে কোথাও কালী মায়ী-কী-জয় বলিয়া শোভাযাত্রায় ধ্বনি তুলিয়া হিন্দুরা অগ্রসর হইয়াছে কি না, সে সংবাদ কানে আসে নাই।

* * * * *

সাম্প্রতিক ওয়েক্‌ আইল্যাণ্ড সফরে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সহিত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কোন মতানৈক্য হইয়াছে কি না, এই সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করায় ট্রুম্যান সাহেব টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়া ওঠেন, আমাদের আলোচনা বিশেষভাবে সফল হইয়াছে।

—টেবিলের পরিবর্তে যদি কোন সাংবাদিকের পৃষ্ঠে ঐ মুষ্ট্যাঘাত পড়িত, তাহা হইলে সাফল্যের পরিমাণ বোধ হয় আরও বিশেষভাবে অনুভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

* * * * *

তিরুমালাইয়ের এক মন্দিরে সম্প্রতি চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী পূজার্চনার জন্য গিয়াছিলেন। সেই সময় প্রধান পুরোহিত বলেন যে, বর্তমানে মন্দিরে কম চাউল সরবরাহ হয়, সেই হেতু তীর্থযাত্রিগণকে প্রসাদ প্রদান করা যায় না। সরকার যদি এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখেন ভাল হয়। তদুত্তরে রাজাজী বলেন, ভগবানের অজীর্ণ হইয়াছে, তাহা না হইলে খাদ্য-সংকট ঘটিত না।

আমাদের মনে হয়, বুড়া ভগবান বেচারীর শুধু অজীর্ণ হয় নাই, ভিমরতীও ধরিয়াছে; তাহা না হইলে তিনি রাজাজীকে একবার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ দিয়া পুনরায় দপ্তরবিহীন মন্ত্রিত্বের গদীতে বসাইবেন কেন?

* * * * *

বিহারের খাদ্য-মন্ত্রী অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ স্ব-প্রদেশের খাদ্যাবস্থা দেখিয়া সহসা যেরূপ গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ চমকাইয়া উঠিয়াছিল। রাজধানী দিল্লী হইতে শিলং পর্যন্ত যেন ভূমিকম্প ঘটিয়া গেল। কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগ রাতারাতি গুদামের চাবি খুলিয়া টন টন মাল পাঠাইবার পথ পাইলেন না, কৃষি-বিভাগ, সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা তারস্বরে টেলিফোনে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের শরণ লইলেন, মুখ্য মন্ত্রী মুসৌরীতে হাওয়া খাইতে গিয়া স্বদেশের বেগতিক হাওয়া দেখিয়া ছুটি বাতিল করিয়া দেশের ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন, রাষ্ট্রপতি পাটনায় দুঘণ্টা নামিয়া অবস্থা আলোচনা করিতে আসিলেন, কিন্তু এত কাণ্ড ঘটিয়া যাইবার পর অনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহ মহাশয় সমগ্র দোষ সাংবাদিকদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বিবৃতি দিয়াছেন যে, আমি তো কিছুই বলি নাই। অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত বিরোধ দূরে থাক, বিহার মন্ত্রিসভা এতটা ঐক্যবদ্ধ যে পূর্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই।

—ওঃ! সাংবাদিকরা কি সাংঘাতিক জীব! অসতর্ক মুহূর্তে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলিয়াও মন্ত্রীদের প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার উপায় নাই। কোন কথা পেটে রাখিতে পারে না, ইহাদের জন্যই না আবার মন্ত্রিত্ব-পদে ইস্তফা দিতে হয়।

* * * * *

পাকিস্থানের ঘরের কথা আর কিছু ফাঁস করিয়া দিলে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে গুলী করিয়া মারা হইবে বলিয়া পাকিস্থান হইতে এক বেনামা-পত্র আসিয়াছে। উক্ত পত্র-লেখক মণ্ডল মহাশয়কে আরও সতর্ক করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন—স্মরণ রাখিবেন, আপনি যাহা বলেন আমরা তাহা শুনিতে পাই, যাহা করেন তাহা দেখিতে পাই, আপনার চাল-চলনের প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং কেহই আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

—আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে গুলী খাইতে নিশ্চয় মণ্ডল মহাশয় ভীত হইয়া পড়েন নাই; কিন্তু পাকিস্থানে বসিয়া বসিয়া অষ্ট-সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকরা যদি তাঁহার সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়, তাহা হইলেই লজ্জায় ও শঙ্কায় তাঁহাকে হয়তো লেকসাকসেসে গিয়া বাসা বাঁধিতে হইবে।

কোনরকম প্রতিযোগিতা, লটারী বা উপহারের লোভ দেখিয়ে কোন ছবির দিকে আকর্ষণ করাকে ঘুষ দেওয়ারই নামান্তর বলা যেতে পারে। তাছাড়া, কোন ছবির সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতা, লটারী বা উপহার যুক্ত থাকলে, প্রকৃতপক্ষে, লোকের ঝোঁক সেক্ষেত্রে ছবির ওপরে থাকে না, সরে গিয়ে আঁকড়ে ধরে লেজুর আকর্ষণগুলোকেই। ছবির গুণাগুণ নিরূপণেও তখন আর কেউ মন দেয় না। ছবি একটা পরম সৃষ্টি—কোন সৃষ্টিকারই তার সৃষ্ট জিনিসের এ অমর্যাদা বরদাস্ত করবে না।

এখন পুরনো রীতি আবার পুনরুদ্ভাবিত হতে সবে আরম্ভ করেছে; এখনই সময়—তাকে আর না বাড়তে দেওয়া। এ বিষয়ে চলচ্চিত্রের সত্যিকারের ভক্তরা যেনো সতর্ক হন। এ ধরণের কৃত্রিম উপায়ে ছবির দিকে টানা যায় সাময়িকভাবে কিন্তু তাতে ছবির আকর্ষণ তো বাড়ানো যায়ই না, উল্টে মর্যাদাই নষ্ট করা হয়।

স্টুডিও সংবাদ

'বিদ্যাসাগর'-এর পরে এম পি প্রোডাকসন্স-এর আর একখানি যশাভিলাষী চিত্র—যাতে অগ্রদূতবৃন্দের পরিচালনায় চিত্রগ্রহণকার্য চলছে।

ছবিটির কাহিনী—দার্জিলিংয়ের নিসর্গ-বৈচিত্র্যের পটভূমিতে একটি সরস কমেডি-রোমান্স। রচনা সুকবি শৈলেন রায়ের। নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন জনপ্রিয়া ভারতী দেবী।

জানা গেলো, এখানকার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হবার পরে এই সপ্তাহেই পরিচালকবৃন্দ কর্মী ও শিল্পীদের সহযোগে শৈলাভিমুখে যাত্রা করেছেন স্থানীয় দৃশ্যাগুলির চিত্র গ্রহণের জন্য।

পুস্তক পরিচয়

তামস-তপস্যা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; সাহিত্য জগৎ, ১৯-বি, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা; মূল্য চার টাকা।

"তামস-তপস্যা" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কালে রচিত উপন্যাসগুলির অন্যতম উপন্যাস। দেড় বৎসরে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, তাতেই প্রমাণ বইটি পাঠক সাধারণ্যে সমাদৃত হয়েছে।

প্রায় আড়াইশো পাতায় সম্পূর্ণ এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষের জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানুষটি হ'লো প্রাণকৃষ্ণ ওরফে পানু। গ্রামঘরের আর দশটি ছেলে যেমন মানুষ হয়, তেরো-চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত পানু অল্পবিস্তর সেইভাবেই মানুষ হয়েছিল; তার চরিত্রে বা জীবনযাত্রায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না যার থেকে একটা উপন্যাস তৈরী হ'তে পারে। কিন্তু তেরো-চোদ্দ বছরের মাথায় এসে তার জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। তাদের পার্শ্ববর্তী গৃহের এক ধনী মহাজন খুন হওয়ার ব্যাপারে পুলিশ, অকারণ সন্দেহে পানুদের বাড়ির সকলের উপর অকথ্য নির্যাতন-পীড়ন চালায়। অত্যাচার থেকে মেয়েরাও রেহাই পায় না। পানুর বাপ, পানুর দিদি এবং পানু বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়। এই অন্যায় জুলুমের দৃশ্য প্রত্যক্ষ আর তার ফলভোগ ক'রে সেই যে পানুর মনে মানুষের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে তা আর নেভে না। ক্ষোভে রোষে বেদনায় ভয়ে পানু ঘর ছাড়া হয়; ঘটনাচক্রে সে গিয়ে পড়ে এক হা ঘরে দলের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে সভ্য মানুষের সমাজের আচার-ব্যবহার ভাষা বিশ্বাস নীতিবোধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পানু হয়ে ওঠে হা-ঘরেদেরই একজন। আদিম বন্য জীবনযাত্রার বাধাহীন বিস্তৃতির মধ্যে পানু যেন জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ, নতুন তাৎপর্য অনুভব করে। এই অনুভূতি আরও তীব্র হয় জীবন সঙ্গিনীরূপে বেদের ঘরের মেয়ে রুকিনিকে পেয়ে। রুকিনির উন্মাদনার মধ্যে পানুর পূর্ব জীবনের স্মৃতি একেবারে তলিয়ে যায়।

চার বৎসর এভাবে কাটে। হঠাৎ রুকুনি মারা যায়। পানুর জীবন শূন্যতায় ভ'রে ওঠে। অন্তরের শূন্যতার ফাঁক দিয়ে শৈশব স্মৃতি তার মনে পুনরায় উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করে। এমনি যখন তার মনের অবস্থা তখন হা-ঘরেদের সঙ্গে শহর থেকে শহরে পরিভ্রমণকালে একদিন পানু অপ্রত্যাশিতভাবে তার দিদির দেখা পায়। পানুর মনে সংসারের আকর্ষণ প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে। সে হা-ঘরেদের সংস্রব ছেড়ে পালায়। সংসার জীবনে ফিরে এসে সে ঘর বাঁধে; বিয়ে করে। কিন্তু পানু আর সে পানু নেই; চার বৎসরের বন্য অনিয়ন্ত্রিত জীবন তার চরিত্রের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে। সে হ'য়ে উঠেছে নিষ্ঠুর, কোপন স্বভাব, প্রতিহিংসাপরায়ণ, অত্যাচারী। মানুষের সমাজের সহস্রবিধ অনাচার, অবিচার অন্যায় লোভ আর স্বার্থপরতা তাকে ক'রে তুলেছে মানুষের প্রতি সম্ভ্রমহীন। পানু সংসার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়, কিন্তু পারে না। প্রতি পদে তার কারও না কারও সঙ্গে সংঘাত বাধে। সংঘাত শেষ অবধি অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়। অত্যাচার যখন অসহ্য হয়, পানু পুরাতন ডেরা গুটিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধে। ভয়ে নয়, হতাশায় নয়; অন্যায়-অবিচার সম্ভাবনা বিবর্জিত সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাত্রার লোভে।

কিন্তু এমন জায়গা মানুষের সমাজে কোথায় পাওয়া যাবে। প্রতিটি জায়গায় পানুর তিক্ত অভিজ্ঞতাই সার হয়। আর সে তিক্ততার সমস্ত ঝোঁকটুকু গিয়ে পড়ে তার নিজের উপর, আর তার পরিবার দুটির উপর। রাঙিয়া আর ছুটকিকে সে কারণে অকারণে মারধোর করে। আর সে মার যেমন তেমন মার নয়, ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড মার। অত্যাচারে পানু নির্মম, বন্য।

কিন্তু এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বন্যকল্প মানুষটির সবটুকুই পাষাণ দিয়ে গড়া নয়। তার চরিত্রের আর একটি দিকও আছে, সেটি মমতায় স্নিগ্ধ, স্নেহে কোমল। তারাশঙ্কর এই স্নেহ-কোমল মানুষটির চিত্রই ধ'রে দিতে চেয়েছেন "তামস-তপস্যা" উপন্যাসে। এক অনাহারক্লিষ্ট বিশীর্ণ গোবৎসকে আঘাত করার বেদনা থেকে পানুর মনে জন্ম নিল এক অননুভূত নূতন অনুভূতি যা তার স্বভাবের রুক্ষতাকে অবনমিত ক'রে আনলো। "তামস-তপস্যা" উপন্যাসের এই ঘটনা দিয়ে শুরু এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই পরবর্তী কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে। যে লোক সামান্য উত্তেজনায় মানুষ খুন করতে পশ্চাৎপদ হয় না, তার মধ্যেও ব্যথাবোধ কতো প্রবল আর গভীর হ'তে পারে, তার চিত্র অঙ্কন ক'রে তারাশঙ্কর এই গ্রন্থে মনুষ্য চরিত্রের স্বতোবিরোধী দ্বৈত স্বভাবের রহস্যটিকেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন মাত্র। চিত্রটি মর্ম স্পর্শ করে। পানু আসলে অতি সরল সাদাসিধে মানুষ। তার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আমরা দেখতে পাই সেটি তার স্বভাবজ নয়; সেটি তার চরিত্রের প্রকটিত হয়েছে সমাজের হৃদয়হীনতার প্রতিক্রিয়ায়। সে নির্দোষ, কিন্তু দুষ্ট নয়। সমাজের উপরতলার মানুষদের অত্যাচার একজন নিরীহ শান্ত সরল মানুষের স্বভাবকে কিভাবে ভেঙেচুরে দুমড়ে দিতে পারে পানু চরিত্র তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

বইটির রচনা রীতি সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক বইগুলির রচনা রীতিতে যে প্রখর আর সচেতন ভাষা স্পষ্ট চোখে পড়ে এ বইটিতে তার কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব ঘটেছে মনে হলো। কাহিনীর বাঁধুনি সর্বত্রই অগোছালো আর শিথিল। ঘটনাগুলি যেভাবে মনে এসেছে, সেভাবেই লেখক সেগুলোকে সাজিয়ে গেছেন; তাদের সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এর অর্থ গল্পটি পূর্ব পরিকল্পিত নয়; যেমন তেমনভাবে কোন এক জায়গা থেকে কাহিনী শুরু ক'রে যেমন তেমনভাবে কোন এক জায়গায় এসে কাহিনী শেষ করেছেন। কাহিনীটিকে নিজের গতিতে স্বচ্ছন্দ চলতে দেওয়ার ফলে তার শিল্পরূপ ব্যাহত হয়েছে। তবু যে কাহিনীটি জমেছে সে শুধু পানুর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জোরে, ঘটনাগুলির মর্মান্তিক নাটকীয়তার জোরে। তারাশঙ্করের লিখন পদ্ধতি যদি শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পকুশলতামণ্ডিত হতো, আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যের সে কী সমৃদ্ধির যুগই না সূচিত হতো!

আজ কাল পরশুর গল্প : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়; সাধারণ পাবলিশার্স, ৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা—১৭; দাম দুই টাকা।

বাঙলাদেশে গল্প সংগ্রহ ভালো কাটে না। তবু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্প সংগ্রহটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। সেটা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সকল গল্পকারের পক্ষেই আশার কথা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আরও এজন্যে যে বইটিতে তিনি যে জাতীয় গল্পের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাতে মধুর আস্বাদ একেবারেই নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাঙালী সমাজের কতকগুলি নগ্ন বাস্তব হাঁপ-ধরানো চিত্র উপস্থাপিত ক'রে আমাদের বিবেক বোধকে উদ্দীপিত, আত্মতুষ্টির মনোভাবকে ব্যাহত করা ছাড়া গল্পগুলি রচনা করার আর তাঁর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল ব'লে মনে হয় না। সমাজের নগ্ন কদর্য দিক যতোই সুনিপুণ তুলিকাপাতে চিত্রিত হোক না কেন, পাঠক সহজে তা গ্রহণ করতে চায় না। বিশেষ ক'রে রোমাণ্টিক সংস্কারে পরিপুষ্ট বাঙালী পাঠকের অতিমাত্রিক বাস্তবধর্মী গল্প সম্পর্কে একটা ভীতি আছে। ভীতিটুকু সবটাই অকারণ এমন বলা যায় না। আজকাল সোশ্যাল রিয়ালিজম-এর নামে সাহিত্যে নির্বিচারে ক্লেদ ঘাটা চলছে। ঘটনার চিত্রণ উলঙ্গ হোক, কুৎসিৎ হোক, তার

গায়ে যদি একবার রিয়ালিজম-এর তিলক পরানো যায়, 'কথা সাহিত্যের দরবারে কোন্ না সে গল্প পাশ মার্ক পেয়ে যাবে। বিশেষ সাহিত্যিক মহলে আজকাল আবার এ সব গল্পই ফুল-মার্ক পাচ্ছে; অন্য গল্প মোটে আমল পাচ্ছে না। তবে অধিকাংশ পাঠকের নিকট এ ধরণের গল্প যে আজও সত্য হ'য়ে উঠতে পারেনি সেকথা একপ্রকার জোর ক'রেই বলা যায়।

তবু মাণিকবাবুর বাস্তবধর্মী তিক্ত কথা চিত্র সংগ্রহ "আজ কাল পরশুর গল্প"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, সেটা তাঁর লেখনীর শক্তিমত্তারই পরিচয় দেয়। মাণিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী অনন্য, চিন্তা স্বকীয়তায় মণ্ডিত, প্রকাশ রীতি সূক্ষ্ম; এই শক্তিকে তিনি কেবলমাত্র যৌন মনস্তত্ত্ব আর সামাজিক ক্লেদ ঘাঁটায় নিয়োজিত করছেন ভাবতেই যা আক্ষেপ জাগে। রিয়ালিজম মানে কি ক্লেদ-রতি? মানুষের জীবনের মহত্তর প্রেরণা আর সৌন্দর্যের অভীপ্সাকে ফুটিয়ে তোলা কি রিয়ালিজম নয়? মনস্তত্ত্বের প্রতি মাণিকবাবুর ঝোঁক; মনস্তত্ত্ব কথাতেই যদি ঃ নগ্নসং তিলিন নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা কুৎসিত মনেরই পরিচায়ক।

পংখীরাজ—বিভাবতী দেবী। গ্রন্থবিহার, ২২, হ্যারিসন রোড কলিকাতা। মূল্য—বারো আনা।

ঈশপের ছড়া—মিহির সেন। গ্রন্থবিহার, ২২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—বারো আনা।

এক যে ছিল—রাজেশকুমার রায়। গ্রন্থবিহার ২২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—চৌদ্দ আনা।

আলোচ্য বই তিনটি ছড়ায় আর ছবিতে ভরা। ছড়া বলিতে যা বুঝায়, এগুলি সে জাতের নয় আসলে এগুলিকে বলা চলে কাঁচা কবিতার সমষ্টি। প্রথম কথা বলিবার এই যে, প্রকাশকের লেখক-নির্বাচনে ভুল হইয়াছে। কবিতা লিখিয়া যাঁহাদের হাত পাকিয়াছে, মন মজবুত হইয়াছে—ছড়া কেবল তাঁহারাই লিখিতে পারিলেও পারিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'প্রভাত সংগীত' বা 'সন্ধ্যা সংগীতে'র ন্যায় কাব্যজীবনের শৈশবে ছড়া লিখিতে বসেন নাই; তাঁহার ছড়াও তাঁহার শেষ বয়সের রচনা। বালক বালিকা শিশু বা কিশোর-কিশোরী-দের জন্য এ বই লেখা মনে হইল; কিন্তু ইঁহার প্রতি তাহাদের কোনো আকর্ষণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক কথা নেহাৎই শক্ত এবং মিল সহজ নয়। বিশেষত, তৃতীয় গ্রন্থটিকে তৃতীয় শ্রেণীর বলিতে হয়। লেখক ছড়ার সঙ্গে নিজের নাম প্রচারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হাস্যকর।

স্বদেশ প্রেমিক রমাকান্ত রায়—সম্পাদক শ্রীহরিদাস নামানন্দ। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—আড়াই টাকা।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে যে কয়জন দেশ-প্রেমিক তাঁহাদের ঐকান্তিকতা ও ত্যাগনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন রমাকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। রমাকান্ত ছিলেন কাশ্মীর রাজের খনিতত্ত্ববিদ্, সেই সময় তিনি স্বীয় পদমর্যাদা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার পথে স্বদেশীবস্ত্র স্কন্ধে বহন করিয়া ফিরি করিয়াছেন। এইরূপ ত্যাগব্রতী অগণিত রমাকান্তের চেষ্টায় ও সাধনায় আজ ভারত স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। আজ আমাদের কর্তব্য ইঁহাদের ভুলিয়া না যাওয়া এবং ইঁহাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কর্তব্যকর্ম করিয়া যাওয়া। সম্পাদকগণ অনেক পরিশ্রমের ফলে রমাকান্তের জীবনের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রম সার্থক হোক।

দুর্গম গিরিশিরে—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ৩।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যে মানুষকে নানারূপ দুর্যোগ ও দুর্ভোগে ভুগিতে হয়। এই কাহিনী লেখক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার কিয়দংশ কয়েক বৎসর পূর্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের তাণ্ডবে ব্রহ্মদেশ হইতে অগণ্য নর-নারীকে পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়—সেই মর্মন্তুদ ঘটনা ধীরে ধীরে কাহিনীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দুর্গতির সেই ইতিহাস ভবিষ্যৎ কালের জন্য লেখক লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। লেখক স্বয়ং ভুক্তভোগী, তাই রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

অখণ্ড জবান বা সহজ হিন্দী শিক্ষা—শুদ্ধোধন সেন। আরতি এজেন্সি ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—দুই টাকা।

হিন্দী এখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই এখন শিক্ষা করা উচিত। হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, আমরা মুখে যে হিন্দী বলি তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা যে হিন্দী নয়, আসলে তাহা যে কোনো একটি ভাষাই নয়—তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। হিন্দী ব্যাকরণ কিছু জটিল, সুতরাং ব্যাকরণ ভালো মত আয়ত্ত করিতে কিছু সময় লাগে। এই কারণে বর্তমানে সহজ হিন্দী ব্যাকরণের প্রচার আবশ্যক। ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা এমন কিছু কঠিন নয়। এই দিক দিয়া আমরা আলোচ্য ব্যাকরণটির লেখক ও প্রকাশককে উৎসাহ দিতেছি—তাঁহাদের উদ্দেশ্য সার্থক হোক।

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

কলিকাতা, ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ ও প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, জ্যোতিষ তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন **জ্যোতিষ-সম্রাট, জ্যোতিষ-শিরোমণি, যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)**; বিশ্ববিখ্যাত—নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত পরিষদের সভাপতি এবং কাশীস্থ সর্বজনবিদিত বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ইনি ভারতের জনসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, স্বাধীন নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা— **ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা** প্রভৃতি দেশের মনীষীবৃন্দকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ভূরি ভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিতে পাইবেন। **ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি বিগত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী** মহাযুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিনেই মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা সফল হওয়ায় মহামান্য সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, ভারতের বড়লাট এবং বাঙ্গলার গভর্ণর মহোদয়গণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত ও সম্মানিত হইয়াছেন এবং **১৯৪৬ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর** ভারতের রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গভর্ণমেণ্ট গঠনের এক ঘণ্টার মধ্যে জ্যোতিষসম্রাট মহোদয় ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (টেলিগ্রাম নং ২৯ হাটখোলা, ৩রা সেপ্টেম্বর এবং সোসাইটির অফিস চিঠি নং ৭০৬৫ তার ৬ই সেপ্টেম্বর দ্রষ্টব্য) তাহাও অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে। **এতদ্ব্যতীত বিগত ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট** স্বাধীনতা লাভে ঘোষিত ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সমস্ত অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাও ক্রমশঃ সফল হইতে চলিল। **ইহা ছাড়া ইনি ভারতের আটারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ পরামর্শদাতা রূপে গৌরবলাভ করিয়াছেন।**



রাজ-জ্যোতিষী

জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া ভারতবর্ষে একমাত্র ইঁহাকেই বিগত ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় "জ্যোতিষ শিরোমণি" এবং ১৯৪৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কাশীতে আড়াই শতাধিক বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বারাণসী পণ্ডিত মহাসভা কর্তৃক "জ্যোতিষসম্রাট" উপাধি দ্বারা সর্বোচ্চ সম্মানিত করা হয়। বিগত ১৯৫০ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বারাণসীতে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ববিখ্যাত বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সর্বভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। জ্যোতিষে সম্মান ভারতে এই প্রথম। যোগ ও তান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার কবিরাজ-পরিত্যক্ত দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশনাশ এবং সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণের জন্য অপরিসীম ক্ষমতা।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অযাচিত অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" **কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়** কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রেই সম্ভব।" **সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী** কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" **উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি কে রায়** বলেন—"ইনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহার গণনা ও তান্ত্রিক শক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" **বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত** বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিক শক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" **কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস এম দাস** বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" **উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী** বলেন—"আমার জীবনে এরূপ বিজ্ঞ দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" **বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার শ্রী মাধবন্ নায়ার** কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" **চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে রুচপল** বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" **জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে এ লরেন্স** বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫ টাকা পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক। ধারণে অল্পায়াসে ক্ষুদ্রব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, অভিলষিত ধন, যশ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (অব্যর্থ) মূল্য—৭৷৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন সত্বর ফলপ্রদ কবচ—২৯৷৵০। (প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। কল্পবৃক্ষতুল্য আজীবন ফলপ্রদ মহাশক্তিশালী—১২৯৷৵০।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা-মোকদ্দমায় সুফল লাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা এবং উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মোন্নতি লাভে অব্যর্থ। মূল্য—৯৷০। বৃহৎ—৩৪৷৵০। আজীবন ফলপ্রদ মহাশক্তিশালী—১৮৪৷০।

বশীকরণ (মোহিনী) কবচ—ধারণে উত্তরোত্তর মিত্রতা বৃদ্ধি হয়, চিরশত্রুও মিত্র হয়। মূল্য—১১৷০। শক্তিশালী সত্বর ফলদায়ক—৩৪৵০

সরস্বতী কবচ—ধারণে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল লাভ এবং স্থির বুদ্ধি দান করে। মূল্য—৯৷৵০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৮৷৵০।

নৃসিংহ কবচ—শ্বেত বা রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া ও মৃগীনাশক এবং বন্ধ্যায় সন্তানপ্রদ। ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষায় এবং সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। মূল্য—৭৷৵০। বৃহৎ শক্তিশালী—১৩৷৵০। মহাশক্তিশালী—৬৩৷৵০। ইহা ছাড়াও বহু কবচাদি আছে।

বিশ্ববিখ্যাত সোসাইটি হইতে প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান জ্যোতিষ গ্রন্থ।

জ্যোতিষ সম্রাট প্রণীত **'জন্ম মাস রহস্য'**—কোন্ মাসে জন্ম লইলে কিরূপ ভাগ্য, স্বাস্থ্য, বিবাহ কর্ম, বন্ধু, মনের গতি, স্বভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। এরূপ পুস্তক আজও প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৩৷০, ভাগ্য **পরীক্ষা** বা **হাত দেখা**—৩, **জ্যোতিষ শিক্ষা**—৩৷০, **অদৃষ্ট বিচার**—১৷০, **যোটক বিচার**—২, **স্বপ্নফল বিজ্ঞান**—২, **জ্ঞানযোগ**—১৷০, **খনার বচন**—১৷০, **তাজক প্রশ্ন গণনা**—২৷০, **প্রশ্নসার সংগ্রহ**—১।

পুস্তকের মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়। প্রশংসাপত্রাদিসহ বিস্তৃত বিবরণ ক্যাটলগের জন্য লিখুন বা সাক্ষাতে জানুন।

(রেজিষ্টার্ড) **অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী** (স্থাপিতাব্দ—১৯০৭ খৃঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস—১০৫ (দে), গ্রে ষ্ট্রীট, 'বসন্ত নিবাস' (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও মহামায়া মন্দির), কলিকাতা—৫। সাক্ষাৎ—প্রাতে ৮৷০—১০৷০টা। ফোন—বি বি ৩৬৮৫

ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা—১৩। ফোন—সেণ্ট্রাল ৪০৬৫। **সময়—বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা**

লণ্ডন অফিস—মিঃ এম এ কার্টিস, ৭এ, ওয়েষ্টওয়ে রেইনিস্ পার্ক, লণ্ডন।

খেলাধূলা

এ্যাথলেটিক

এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতা আগামী বৎসরের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতাটি যাহাতে সাফল্য-মণ্ডিত হয় তাহার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টার অবধি নাই। তবে ঠিক কে কতদূর করিবেন অথবা করিতে পারিয়াছেন, তাহার কিন্তু কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদপত্র মারফৎ যে সকল সংবাদ প্রচারিত হইতেছে তাহাতে সাধারণের মনে এইটুকু ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, উক্ত অনুষ্ঠানটি বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সমতুল্য একটা কিছু হইবে। আমাদের কিন্তু ধারণা ঠিক বিপরীত। আমাদের আশংকা হয় শেষ পর্যন্ত না দেশ বিদেশের প্রতিনিধিগণ ভারতে পদার্পণ করিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যান। বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা যে দুইটি কঠিন সমস্যার বিষয় সেইদিকে পরিচালকগণকে একেবারেই দৃষ্টি দিতে দেখা যাইতেছে না। ইংলণ্ড বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে এবং সেইজন্যই অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রভূত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর, মুষ্টিযোদ্ধা, ঘোড় সোয়ার, নৌ চালক, অস্ত্র চালক সকলেই বাসস্থান ও আহারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দিল্লী শহরে উদ্বাস্তু ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর সকলকেই আহার ও বাসস্থান দিতে পারে না, এইরূপ অবস্থায় যখন এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতার সময় ১৭টি দেশের সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও ২০ সহস্র বাহিরের দর্শক দিল্লী শহরে সমবেত হইবে তখন কি করিয়া সকল কিছু সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, ইহা আমাদের মত সত্যই কল্পনাতীত। বলিতে পারেন সামরিক বিভাগ এই বিষয় সাহায্য করিবে, কিন্তু যদি সামরিক বিভাগ হঠাৎ কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হন ও তাহাও সেনা নিয়োগে সমাবেশ করিতে বাধ্য হয় তখন এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অবস্থা কি হইবে ইহা কি তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন।

কর্মসূচী পরিবর্তন প্রয়োজন

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের জন্য যে কর্মসূচী রচনা করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তন করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বিশ্ব অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত অনুষ্ঠান হিসাবে যখন ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে তখন যে সকল প্রতিযোগিতা বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হইতে পারিল ও ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিল তাহা কেন বর্তমান কর্মসূচী হইতে বাদ দেওয়া হইল? মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ বিষয়ে ভারত বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। বর্মা, সিংহল, ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশে মুষ্টিযোদ্ধা বা মল্লবীরের একেবারেই অভাব নাই। এশিয়ান গেমসে ঐ দুই বিষয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য তাহারা উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। এইরূপ অবস্থায় পরিচালকগণ সকলকে হতাশ করিয়া কর্মসূচী পরিবর্তনে যদি স্বীকৃত না হন তবে খুবই অবিচার করিবেন। এমন কি আমাদের আশংকা হয় মল্লবীর ও মুষ্টিযোদ্ধাগণ এই বিষয় লইয়া এইরূপ তুমুল আন্দোলন করিবেন যে, শেষ পর্যন্ত না এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। সময় এখনও আছে। আমরা আশা করি, পরিচালকগণ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া উক্ত দুইটি বিষয় অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে স্থান দিবেন।

জাপান হইতে শতাধিক প্রতিনিধি ভারতে ঐ সময় আসিবে বলিয়া কোন এক বিশিষ্ট ক্রীড়া পরিচালক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জাপানের খ্যাতনামা সাঁতারুগণও ভারতে ঐ সময় আসিবেন। এই সংবাদ খুবই আনন্দের সন্দেহ নাই, তবে আমাদের চিন্তা করিতে হইতেছে ভারত হইতে ঠিকমত সাঁতারু প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে কিনা। ভারতের সন্তরণ পরিচালনা কতকগুলি লোকের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে যাহাদের অনেকেই সাঁতার যে কি কি তাহাই জানেন না। এমন কি জলে ফেলিয়া দিলে বোধ হয় আর জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন না। ইহাদের যাহারা মন সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন তাহারাই নির্বাচিত হইবেন। অথচ ঠিকমত ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে জাপানের ঠিক পরেই সাঁতার বিষয়ে ভারত স্থান অধিকার করিতে পারিত।

লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জাম

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জাম পরিচালকগণ ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সরঞ্জামের জন্য এত অধিক অর্থ ব্যয় করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। হয়তো বা ইহাও হইতে পারে, "বাজার গরম" করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা প্রচার করা হইতেছে। তাহাই যদি হয় আমরা পরিচালকদের সাবধান করিয়া দিয়া রাখিব, "এই সকল কথার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ। এইরূপও হইতে পারে জনসাধারণ প্রত্যেকটি সরঞ্জামের দাম কত ছিল তাহা জানিবার জন্যও দাবী করিতে পারে। ঐ সময় যদি কিছু গলদ প্রকাশ পায় তাহা হইলে পরিচালকদের লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। আদালত ও অবমাননার চরম শাস্তি ভোগ করিবার যদি ইহাদের ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে এই সকল "বাজার গরম" নীতি পরিত্যাগ করাই উদ্যোক্তাদের বুদ্ধিমানের কার্য হইবে।

পাকিস্থানের যোগদান সম্ভাবনা

পাকিস্থান, ইসরাইল প্রভৃতি দেশ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে যাহাতে যোগদান করে তাহার জন্য চেষ্টা চলিয়াছিল। ইসরাইল সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কেবল পাকিস্থান সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে, বেচারী শিশু প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে অপদস্থ করিবার কি কারণ আছে। ইহা সকলেরই জানা আছে পাকিস্থানে এ্যাথলেটিকস বলিতে কিছুই নাই। এ্যাথলীট দল জোগাড় করাও ইহাদের পক্ষে খুবই কঠিন। তাহা ছাড়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ নীতি পাকিস্থান একেবারেই সমর্থন করে না, আমাদের উক্তি হয়তো ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে, তবে ইহাদের কার্যকলাপ দেখিয়াই ঐরূপ ধারণা হইয়াছে।

ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটি

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের এ্যাথলেটিক বিষয়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি লোকের নাম দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই লোকটির শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা সব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া আমরা কিছুইতেই কল্পনা করিতে পারি না যে, নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সময় সকলে ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলেন কিনা? যাহাদের বা নীতিগত রাখিবার কোশল ছাড়া এই লোকটির অন্য কোন জ্ঞান আছে, বিশেষ করিয়া এ্যাথলেটিকসের "অ আ ক খ" সম্বন্ধেও ইহার কোন জ্ঞান যে নাই ইহা আমাদের জানিতে বাকী নাই। আমরা গত ২০ বৎসর ধরিয়া মাঠের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। ইহাকে কখনও "চিৎকার" ছাড়া আর কিছুই করিতে দেখি না। সে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই দেশে বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত এ্যাথলীট বা এ্যাথলেটিকসের বিশেষজ্ঞ আছেন, অথচ ইহাকেই নির্বাচকমণ্ডলীতে গ্রহণ করা হইল ইহাই আশ্চর্য। দেশের নেতাগণ দৃষ্টিপাত না হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না।

ক্রীকেট

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল আরও দুইটি খেলায় যোগদান করিয়া একটি খেলায় বিজয়ী ও একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষ খেলায় কেবল ট্রিভস দেড় শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কমনওয়েলথ দলের ব্যাটিং শক্তির এখনও ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। প্রথম টেস্ট খেলা শীঘ্র আরম্ভ হইবে দিল্লীতে, উহার পরেই ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় দলে যে বাধাগুলি এখনও যে স্থান পাইবার উপযুক্ত শক্তি রাখেন তাহার পরিচয় তিনি উত্তর প্রদেশের প্রদেশপালের পক্ষে খেলিয়া দিয়াছেন। আশা আছে খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে ভারতীয় দ্বিতীয় টেস্ট দলে স্থান দিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না।

কমনওয়েলথ বনাম ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী

কমনওয়েলথ বনাম ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর একদিনব্যাপী খেলায় কমনওয়েলথ দল ৮৯ রানে বিজয়ী হইয়াছেন। খেলার ফলাফল:—

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—৩ উইঃ ১৭১ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (ফুলার্টন ২৪, ডিকসন ৫১, শ্যাকলটন ৭২ রান নট আউট, ভিওয়ান ৪০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ন্যাশনাল ডিফেন্স দল—৮৭ রান (মেহ্‌দীপৎ ২৪, উইন ৬ রানে ৩টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ বনাম উত্তর প্রদেশ প্রদেশপাল দল

কমনওয়েলথ ও উত্তর প্রদেশ প্রদেশপাল দলের তিনদিনব্যাপী খেলা কানপুরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—৩৩৩ রান (কেন ট্রিভস ১৫৫ রান, ইকিন ৬৩, সুঁটে ব্যানার্জি ৮৭ রানে ২টি, রংগচারী ৯০ রানে ২টি ও বিজয় হাজারে ৩৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

উত্তর প্রদেশ প্রদেশপাল দলের প্রথম ইনিংস—১৮৭ রান (গুল মহম্মদ নট আউট ৭১ রান, কিষেণচাঁদ ৪৩, ওমপ্রকাশ ৩২, ফিশলক ২৬ রানে ২টি, শ্যাকলটন ৪২ রানে ৩টি, ফুলার্টন ৩৭ রানে ২টি ও রামাধীন ৪৬ রানে ২টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইঃ ১২৪ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (ট্রিভস নট আউট ৫৪, স্পনার নট আউট ৫৪, সুঁটে ব্যানার্জি ৩৬ রানে ৩টি ও রংগচারী ৪৩ রানে ১টি উইকেট পান।)

উত্তর প্রদেশ প্রদেশপাল দলের দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ৩৬ রান।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৩শে অক্টোবর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থান সম্পর্কে মৌলিক নীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে ফ্যাসিস্ট গ্র্যান্ড কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত ডিক্টেটারশিপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহার ফলে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ব্যক্তিগত অধিকার এবং সর্বোপরি ইসলাম পদানত হইবে।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার এক আকস্মিক প্লাবনের ফলে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের এক বিস্তৃত অংশ সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বারিপাত এবং পার্বত্য নদীসমূহে জলোচ্ছ্বাসই এই আকস্মিক প্লাবনের অন্যতম কারণ।

গত রবিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগরের নিকট ধুলারহাটে এক বিরাট জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—ভারতের খ্যাতনামা যক্ষ্মা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় অদ্য রাত্রিতে মান্দ্রাজের অন্তর্গত ভেলোরে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

করাচীতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হায়দরাবাদ (সিন্ধু) কোতোয়ালী থানার বাহিরে সমবেত উচ্ছৃঙ্খল জনতা বলিয়া বর্ণিত বহু লোকের এক জনতার উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে ১০ জন নিহত ও ৭২ জন আহত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়া এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারত ইহাকে সমর্থন করিবে।

নেপাল আইন পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে নেপালের মহারাজ ঘোষণা করেন যে, মন্ত্রিসভায় আইন পরিষদের দুইজন নির্বাচিত সদস্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা কমিটিসমূহ গঠন করা হইতেছে।

সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের বার্ষিক সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের নদী উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহে ফসল ও শিল্প উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে।

কলিকাতায় মুচিপাড়া এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে দুইটি সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং পিস্তলধারীর গুলীতে ২ ব্যক্তি আহত হয়। একটি ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তেরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং অপর ক্ষেত্রে ৫৭০ টাকা লইয়া উধাও হয়।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংবাদ সরবরাহ বিভাগের শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান মিঃ উইলিউ বি হ্যারিসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

২৫শে অক্টোবর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গনের আশঙ্কা ঘটিয়াছে।

পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ এ রহমান এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ২৭শে অক্টোবর "প্রতিবাদ দিবস"রূপে পালনের জন্য তিনি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, বিহার রাজ্যের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিহার মন্ত্রিসভায় বিরাট ফাটল দেখা দিয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ গভীর শিকড় গাড়িয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আসামের ভূকম্পন ও বন্যাপীড়িত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের জন্য অদ্য নয়াদিল্লী হইতে বিমানযোগে গৌহাটির কাইকচি বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বিহারে যে গুরুতর খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই বিহারে প্রায় ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করিতেছেন। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আগামী তরা নবেম্বর বিহার গভর্নমেন্টের সহিত যে আলোচনা করিবেন, কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী তাহাতে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য এক সাক্ষাৎকারকালে জানান যে, ভারত গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন। শ্রীযুত সেন বলেন যে, বরাদ্দ ঐ চাউল যদি অনতিবিলম্বে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং বরাদ্দ গমও যদি নির্ধারিতভাবে আসিতে থাকে তাহা হইলে আমরা কোন রকমে নবেম্বর মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখিতে সমর্থ হইব। শ্রীযুত সেন প্রসঙ্গতঃ রাজ্যের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি পুনরায় উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতেছে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

শিলং মিউনিসিপাল বোর্ডের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আসামের জনসাধারণ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

২৮শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য বিমানযোগে দিল্লী হইতে শ্রীনগরে পৌঁছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কাশ্মীরের সমৃদ্ধি ভারতে যোগদানের উপরেই নির্ভর করে।

নয়াদিল্লীতে লক্ষ্ণৌর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচালাপতি রাওয়ের সভাপতিত্বে বার্তাজীবিগণের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন আরম্ভ হয়।

২৯শে অক্টোবর—ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য কলিকাতা পৌঁছিলে নাগরিকগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। রাষ্ট্রপতি এইদিন লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সহিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কলিকাতায় পরিষদ ভবনে ভারত-পাকিস্থান যুক্ত প্রেস কমিটির এক বৈঠক হয়। ভারত-পাকিস্থান যুক্ত প্রেস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সি আর শ্রীনিবাসন এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

জামসেদপুরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত বার্তাজীবী সম্মেলনের অধিবেশনে বার্তাজীবীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষাকল্পে ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘ নামে নয়াদিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে অক্টোবর—দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত হইতে ৪৫ মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—ফরাসী সেনা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্যেরা কম্যুনিস্ট চীনের উপকূল সীমান্তের কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত সীমান্ত ঘাঁটি চুকপাইসান পুনরধিকার করিয়াছে। গত শনিবার ভিয়েৎমিন সেনারা এই ঘাঁটিটি দখল করিয়া লইয়াছিল।

২৫শে অক্টোবর—মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে পৌঁছিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনা কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মার্কিন ৯ম কোরের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী সীমান্ত হইতে ২০ মাইল দূরে থাকিবে এবং কেবল মাত্র দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীই উত্তর কোরিয়া দখলের কাজ শেষ করিবে বলিয়া পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে আদেশ বাতিল করিয়া যে কোন শক্তি প্রয়োগ করিয়া মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে পৌঁছিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট কম্যুনিস্ট দলের সংবাদপত্র 'প্রাভদা'য় অদ্য পিকিং হইতে প্রেরিত এই মর্মের এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর ৬ষ্ঠ ডিভিসন গতকল্য কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হইয়া মাঞ্চুরিয়া সীমান্তস্থিত ইয়ালু নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হয়।

২৮শে অক্টোবর—তিব্বতের লাসা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চীনা সৈন্যরা যে তিব্বতে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তিব্বত গভর্নমেন্ট তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

২৯শে অক্টোবর—চীনা কম্যুনিস্ট সেনাধ্যক্ষগণের পরিচালনাধীন তিব্বতী 'গণবাহিনী' নাকচুকালাসা রাজপথ ধরিয়া তিব্বতের অভ্যন্তর ভাগে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥৹
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥৹ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]　শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল।　Saturday, 18th November, 1950.　[৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল

গত ১৪ই নবেম্বর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ৬১তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থানে তাঁহার জন্মতিথি মহোৎসবের সঙ্গে প্রতিপালিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জওহরলালজী ভারতের প্রধান মন্ত্রিস্বরূপে যে মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির মূল কারণ নহে। তিনি ভারতের সকলের আপনার লোক। তিনি আমাদের মনের মানুষ। শ্রীজওহরলালজী আজ যদি ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আসনে সমাসীন না থাকিতেন, তাহা হইলেও জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হইত না। সুদীর্ঘকাল দেশসেবার ব্রত উদ্‌যাপনে, ত্যাগে, তপস্যায় এবং সর্বোপরি আদর্শনিষ্ঠ নীলকণ্ঠ চরিত্রের মাহাত্ম্যে তিনি মহীয়ান হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লোকসেবারই পরম কর্তব্য পালন করিবার প্রয়োজনে পড়িয়াই শ্রীজওহরলালকে ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বহু শতাব্দীকাল পরাধীন থাকিবার পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এইরূপ একটা বিপুল পরিবর্তনের মুখে জাতিকে সুসংস্থিত করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক অবস্থা বর্তমানে যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে এই ক্ষেত্রে কর্তব্য অত্যন্তই সুকঠিন। শ্রীজওহরলালজী মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারিস্বরূপে এই গুরুতর কর্তব্য যেরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালন করিতেছেন, তাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে দূর হইতে সমালোচনা করা অতি সহজ কাজ; কিন্তু ভারতের মত একটা বিরাট ও বিশাল দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালনের গুরুভার যাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্পর্কে বহন করিতে হয়, শুধু তাঁহার পক্ষেই এই কর্তব্য যে কত কঠিন, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার পর এত বড় একটা দেশের সব সমস্যা দুই তিন বৎসরের মধ্যেই যে সমাধান হইয়া যাইবে, ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমানের যে সব সমস্যা সেগুলির অধিকাংশই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট এবং বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সহিত এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে; কারণ অসতর্ক মুহূর্তের একটি অসমীচীন সিদ্ধান্ত ব্যাপক অনর্থের কারণ সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সব ব্যবস্থার সম্বন্ধেই এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ স্বরাষ্ট্র ব্যাপারকে বর্তমানে পররাষ্ট্র বিচার হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করিয়া দেখা চলে না। এইদিক হইতে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এশিয়ার উত্তরাংশে কোরিয়ায় রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে এবং তাহারই ঘাত-প্রতিঘাত রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং বিজিগীষাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের সীমান্তবর্তী তিব্বত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারত অবশ্য অপর কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঙ্গে অনর্থক জড়িত হইতে চাহে না; তথাপি এসিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক এই যে আলোড়ন, এই ব্যাপারে সে একেবারে উদাসীনও থাকিতে পারে না। ইহার প্রতিক্রিয়া কোন-না-কোন আকারে ভারতের উপর আসিয়া পড়িবেই। এমন অবস্থায় শ্রীজওহরলালের কর্তব্য কত কঠিন সহজেই অনুমেয়। ভারতের প্রতি এই কর্তব্য পালনে ভগবান্ শ্রীজওহরলালকে শক্তি দান করুন এবং সমগ্র জাতির আন্তরিক সহযোগিতায় সেই শক্তি ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলুক আমাদের এই প্রার্থনা।

নেপালে গণজাগরণ

নেপালে গণ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। নেপালের মহারাজাধিরাজ ভারতে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বর্তমানে দিল্লীতে আছেন। সহসাই দেখিতে দেখিতে ভারতের উত্তর সীমান্তে নৈসর্গিক পরিবর্তনের একটা প্লাবন আসিয়া পড়িল। তিব্বত রহস্যময় দেশ। লামাদের ধর্মশাসিত এই রাজ্য এতকাল জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল বলা চলে। ভারতের সঙ্গে এই দেশের সম্পর্ক অবশ্য নূতন নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিব্বতের সঙ্গে সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একদিকে ভারতের শাসনাধিকারে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ এবং অপরদিকে চীনের সহিত রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার-বিনিময় ও অধিকারগত বিরোধ লইয়া তিব্বতের শাসকদের কূটনীতির সংগ্রামের কিছু কিছু অবতারণা ঘটিলেও সমগ্রভাবে জগতের উপর সেগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার সেখানকার পরিস্থিতি নূতন আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সূত্রে বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে তিব্বতের আবির্ভাব ঘটিবে বলিয়া মনে হয়, তাহা যেরূপ পন্থা ধরিয়াই হোক। কিন্তু এদিকে নেপালে

পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক আকার ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ নেপালের প্রধান মন্ত্রীর হাতেই সেখানকার শাসনভার ন্যস্ত থাকে। তাঁহাকে সাধারণতঃ নেপালের মহারাজা এবং নেপালের অধিপতিকে মহারাজাধিরাজ বলা হয়। প্রধান মন্ত্রীর মতেই নেপালাধীশের অনুমোদন আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। এই অধিকার লইয়া বিরোধ পূর্বেও ঘটিয়াছে; কিন্তু বর্তমানের বিরোধ অধিকতর সুদূর-প্রসারী; কারণ, নেপালের জনমত ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নেপাল এখনও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রানুযায়ী শাসিত হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর দল বা গোষ্ঠী রাণারাই নেপালের শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া ইঁহারা প্রমোদ-বিলাসে প্রমত্ত। প্রাচীন যুগের প্রগতি-বিরোধী অভিজাত গোষ্ঠীসম্বন্ধ প্রভুত্ববাদ হইতে উদ্ভূত অনেক দুর্নীতিমূলক অনাচার এবং কু-প্রথা নেপালের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত আছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নেপাল এখনও আচ্ছন্ন, সেখানে দারিদ্র্য অপরিসীম। প্রজাদের অধিকার কার্যতঃ সেখানে স্বীকৃত হয় না। কয়েক বৎসর হইল জনজাগরণের প্রভাব হিমালয়ের এই গিরিকন্দরেও প্রবেশ করে। সেখানকার অধিবাসীরা আর ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে অস্বীকৃত হয়। তাহারা নিজেদের দেশ শাসনে নিজেদের অধিকার চায়। প্রকৃতপক্ষে নেপালের প্রধান মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে যখন নয়াদিল্লীতে গিয়াছিলেন, তখনই ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জনগণকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হয়; কিন্তু কার্যতঃ সে অনুরোধে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে জনগণের অধিকারের সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রবল দমননীতি প্রযুক্ত হইতে থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়া নেপালের সর্বত্র দেখা দেয়। নেপালাধীশ নিজে প্রজাদের অধিকারের সমর্থক। নেপালের সুপরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহে এবং তাহাতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাণা পরিবারেরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রজাদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাহাদিগকে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু নেপালের স্বৈরাচারী শাসকেরা সহজে নত হইবেন কিনা এখনও বলা যায় না। বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীর দল নেপালাধীশকে গদীচ্যুত করিয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক একটি শিশু পৌত্রকে রাতারাতি রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের এই কূটনৈতিক চাল শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে কতটা সঙ্গত হইয়াছে না হইয়াছে, সে প্রশ্ন আমরা তুলিব না। এই স্থলে শুধু ইহাই বলা চলে যে, স্বৈরাচারী শাসকদের এই চক্রান্ত সফল হইবে না এবং নেপালের জাগ্রত প্রজাশক্তির কাছে তাঁহাদিগকে নতি স্বীকার করিতে হইবেই। সে শুভবুদ্ধি তাঁহাদের যত সহজে উদয় হয়, ততই মঙ্গল। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারত কিছুতেই মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থন করিবে না। ইহা সত্য যে, শাসনক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের মর্যাদাকে অস্বীকার করিয়া সে কোনরূপেই রাষ্ট্রীয় আদর্শের অবমাননা করিতে পারে না। সুতরাং নেপালের বিপ্লবীদের সাফল্য ভারতের জনসাধারণ আন্তরিকভাবে কামনা করে।

পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ

পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণ-পরিষদে উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত হয়। পরে জন-আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই অভিমত উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দেখা যাইতেছে, পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এমন আন্দোলনকে আন্দোলনকারীদের অপপ্রচার বলিয়া অভিহিত করিলেও তাহারা আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া উঠিতে ভরসা পান নাই। বস্তুতঃ এই ব্যাপার লইয়া পূর্ববঙ্গ এবং পাকিস্থানের করাচীস্থ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যেও কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিবেন এখনও তাহা সুস্পষ্ট নহে। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, দমন-নীতির সাহায্যে এই আন্দোলনকে দাবাইয়া দেওয়া হইবে। আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে ইহার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে কোন দমননীতি অবলম্বন করিবেন না। প্রত্যুত তাঁহারা সমধিক কূটনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয় বোধ করিবেন। পূর্ববঙ্গের মূলনীতিবিরোধী এই আন্দোলনকে ইহার মধ্যেই "প্রাদেশিকতা" আখ্যা দেওয়া হইতেছে। ক্রমে টানিয়া বুনিয়া ইহা যে ইসলামের শত্রুদল, বিশেষভাবে পাকিস্থানের চারিদিকে সদাজাগ্রত শত্রুবর্গের যে বিভীষিকা পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ বক্তৃতামুখে ক্রমাগত বিস্তার করিতেছেন, তাহাদেরই অনুকূলে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। ইসলামের আদর্শের জিগীরের সাহায্যে সেই যুক্তিতে জোর বাঁধিতে কসুর কিছু করা হইবে না। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যেই যে এই আন্দোলন এই উপায়ে সে সম্বন্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাজ বাগাইয়া লইবেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকারগত মর্যাদা সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন তাঁহারা যদি সেই মর্যাদা এবং অধিকারকে সত্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তবে এসব চাতুরীতে তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। পরন্তু যদি তাঁহারা নিজেদের সংকল্পশীলতার সঙ্গে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষায় জাগ্রত না হন, তবে স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার প্রভাব পূর্ববঙ্গের উপর আসিয়া পড়িবেই এবং তাহার সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিগত মর্যাদাও বিলীন হইয়া যাইবে। এপক্ষে চেষ্টা তো কম হইতেছে না। বাঙলা ভাষার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গে আরবী হরফ চালাইবার উৎকট আগ্রহ সেই প্রচেষ্টারই অন্যতম পরিণতি। বিশিষ্ট পণ্ডিত ডক্টর শহীদুল্লাহ এই প্রচেষ্টা কার্যে পরিণত হইলে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পক্ষে তাহা কিরূপ মারাত্মক হইবে, বহুবার সে কথা বলিয়াছেন। সেদিনও তিনি শ্রীহট্টে বক্তৃতায় বিষয়টির উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আরবী হরফওয়ালাদের উদ্যম শিথিল হইতেছে না। করাচীর কর্তারা পাকিস্থানের সংহতি এবং ঐক্যের নামে কার্যতঃ সেই দিকেই যে সায় জোগাইতেছেন, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু শিক্ষা এবং সংস্কৃতির গোড়া যদি শক্ত না থাকে, তবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের ভিতরকার যে সংহতি, সে সংহতির ভিত্তি স্বেচ্ছাতন্ত্র ও স্বৈরাচারের উপরই গিয়া বর্তে। পূর্ববঙ্গের যাঁহারা সত্যই উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা পাকিস্থানের সংহতির অনর্থক ধাপ্পাবাজীতে পড়িয়া নিজেদের জন্মভূমির দুর্গতিই কি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—ইহাই হইতেছে প্রশ্ন।



নেপাল

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

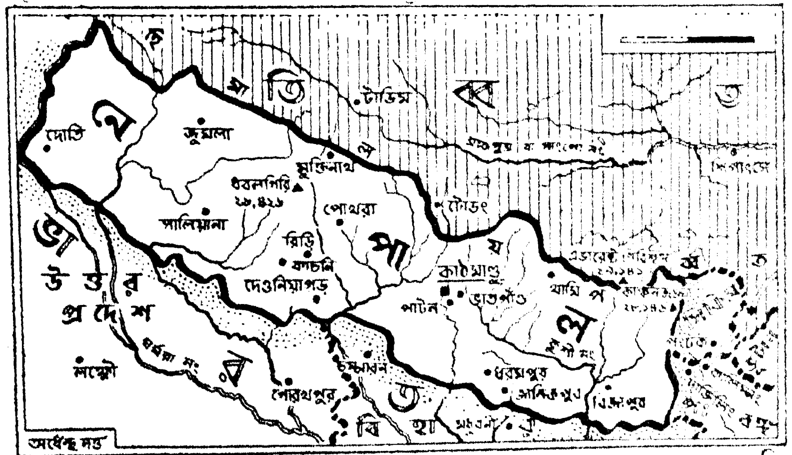


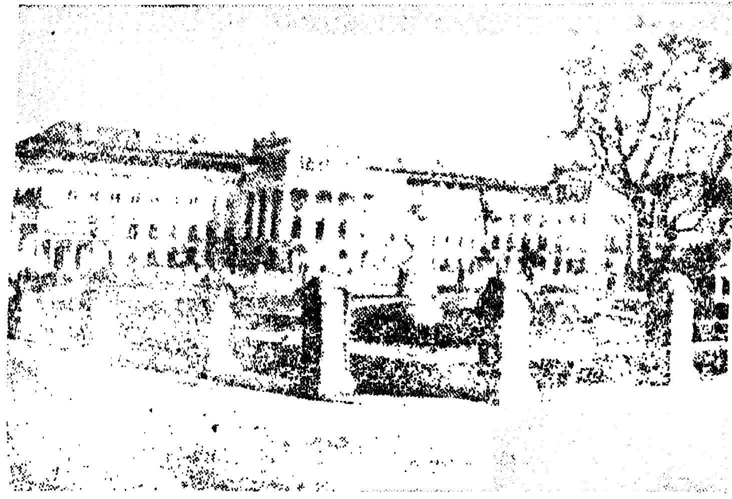
ভারতের পূর্ব প্রান্তে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড এই আলোড়ন। সেদিনকার সেই ভূকম্পনের চেয়েও কঠিন আর সুদূর-প্রসারী। কারণ ভূকম্পনের ফলে কেবলমাত্র মাটিতে ফাটল ধরেছিল কিন্তু এ আলোড়নের ফল শুধু ভূপৃষ্ঠে নয়—সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যেও ফাটল ধরিয়েছে। এই কম্পনের ফল কি যে হবে, কোথায় যে এর শেষ তা আজ জোর করে বলা সম্ভবপর নয়।

এই আলোড়ন প্রথম সৃষ্টি হয়েছে তিব্বতে। লালচীন এগিয়ে এসেছে তিব্বতকে মুক্তি দিতে তার মুক্তি ফৌজ নিয়ে। তাদের অভিযান শেষ হবার আগেই আর একটা আলোড়ন জাগল নেপালে। এখানে আর বৈদেশিক মুক্তি ফৌজের অভিযান নয়। রাণার দুঃশাসনের হাত থেকে নেপালকে উদ্ধার করবার জন্যে গণফৌজের মুক্তি অভিযান। জগতের ইতিহাসে এ ব্যাপার অভিনব না হলেও নেপালের ইতিহাসে এটা অভিনব। এই অভিযানের অভিনবত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে, শুধু জনগণের নয় নেপালের শাসক মহারাজাধিরাজেরও সমর্থন রয়েছে এই অভিযানের পক্ষে। কারণ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর শাসন তিনি চান না। চান না গণমত দাবিয়ে রাখার শাসনব্যবস্থাকে। তিনি চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে তাই তাঁকে শুধু সিংহাসন ত্যাগ করতে হল না, ভারতের রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে চলে আসতে হল ভারতে। রাণা অবশ্য বুদ্ধিমান। আগেই তিনি মহারাজাধিরাজের এক পৌত্রকে চুরি করে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকেই মহারাজাধিরাজ বলে ঘোষণা করে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মহারাজা মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা। কিন্তু এমনিভাবে নেপালের উপর কর্তৃত্ব তিনি বজায় রাখতে পারবেন কি না অদূরভবিষ্যতেই তা স্থিরীকৃত হবে। তা নিয়ে গবেষণা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

যে নেপাল আজ হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সেই দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কারণ নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে হলে তার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা একান্তভাবে প্রয়োজন।

নেপাল হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর আয়তন হচ্ছে প্রায় ৫৫ হাজার বর্গমাইল। দৈর্ঘ্য হবে এর প্রায় ৫০০ মাইল, আর প্রস্থে ৯০ থেকে ১৪০ মাইল। দেখতে নেপাল





নেপাল মহারাজাধিরাজের প্রাসাদ

অনেকটা ভারত দেশ। নেপালের দক্ষিণ সীমান্ত বন জঙ্গলে ঘেরা তরাই অঞ্চল, আর উত্তর সীমান্ত সুউচ্চ পর্বতমালা শোভিত। হিমালয় পর্বত থেকে যে সব নদী নেমেছে, তারাই দেশকে চারটি স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত করেছে। পশ্চিম প্রান্তের বিভাগটি বাইশী (২২) রাজার দেশ, মহাদেবুলা, দোতি আর সল্লিয়ানা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে চৌবিসী (২৪) রাজার দেশ এবং তাতে আছে মুকুন্দপুর, পাল্‌পা, গোর্খা আর নওয়াকোট রাজ্য। তৃতীয় বিভাগটি রাজধানীসহ খাস নেপাল। এখানে আরও কতকগুলি বড় নামজাদা শহর রয়েছে। চতুর্থ বিভাগ হচ্ছে পূর্বাঞ্চল—কিরাতীদের দেশ, ধানকোটা, ইলাম, বিজয়পুর প্রভৃতি ছোট ছোট দেশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। প্রধান প্রধান নদী হচ্ছে কর্নালী, গণ্ডক এবং কুশী। এই কুশীর উপরই বাঁধ দেবার চেষ্টা চলছে।

নেপাল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে স্বর্ণ, লৌহ, তাম্রের খনি। এখান থেকে রপ্তানি হয় গবাদি পশু, কাঁচা চামড়া, আফিং, রঙ, পাট, ধান, কলাই, চাউল, রেশম, পশমী দ্রব্য ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে নেপালে মোট ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে চাষাবাদ হয়েছিল।

নেপালের পৃথক টাকা পয়সা রয়েছে। নেপালী টাকা ভারতীয় টাকা থেকে ওজনে ৯ গ্রেন কম। একশত নেপালী পয়সায় এক টাকা হয়। ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম নোটের প্রচলন হয়। নেপাল সরকারের মিণ্ট কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত। নেপালের ডাক-টিকিটগুলিও সুদৃশ্য।

ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সহজ পথ হচ্ছে উত্তর বিহারের রক্সৌল থেকে ট্রেনে যাওয়া। ১৯২৭ সালে নেপাল সরকার এই হালকা রেলপথ স্থাপন করেন। এই লাইন ২৫ মাইল দূরবর্তী আমলেকগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। এই লাইনের উপর বীরগঞ্জ অবস্থিত, যেখানে কংগ্রেসী সেনারা গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমলেকগঞ্জ থেকে ভীমফেদি এই পঁচিশ মাইল হাঁটা পথ। রাস্তা ভাল। মোটর লরিও চলে। ভীমফেদি থেকে কাঠমাণ্ডু প্রায় কুড়ি মাইল। পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় একটি রেলপথ খোলা হয়েছে। এটা আউধ ত্রিহুত রেলওয়ের জয়নগর স্টেশন থেকে জনকপুর ও বিজলপুর পর্যন্ত প্রসারিত। নেপালে মোটর চলবার মত রাস্তা আছে প্রায় ২৩৫ মাইল। নেপালের রাজধানীর সঙ্গে বীরগঞ্জ ও রক্সৌলের টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিক্ষার দিক দিয়েও নেপালের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুতে একটা কলেজ আছে। এটা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। তাছাড়া নেপাল উপত্যকায় স্কুল আছে অনেকগুলো। কাঠমাণ্ডুকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার বলা চলে।

নদ, নদী আর গিরি-পর্বত নেপালে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, তা যেমন মনে আনন্দের সৃষ্টি করে, আবার তা ভয়েরও সঞ্চার করে। দক্ষিণ সীমান্তের সুবিস্তীর্ণ গহন বনরাজিসমন্বিত তরাই অঞ্চল আর উত্তর সীমান্তের ধবলগিরি, গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি বিরাট তুষারমৌলী পর্বতমালা মনে যুগপৎ আনন্দ ও ভীতির সঞ্চার করে। এ ছাড়াও নেপালের দ্রষ্টব্য স্থানের অভাব নেই। রাজধানীতে রয়েছে নয়নমুগ্ধকর রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধ মন্দির, আর স্তূপ এবং হিন্দু মন্দির। মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াগুলি গগনস্পর্শী স্পর্ধা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত বর্ষ ধরে। ওর দরজায়, জানালায় আর দেওয়ালে রয়েছে নেপালী কারুশিল্পের মনোহর নিদর্শন। রাজপ্রাসাদ ও সিংহ দরবার বা প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদও পর্যটকের নয়ন বিমুগ্ধ করে। দরবারে প্রবেশ করলে এর ঐশ্বর্য যে কোন দেশের রাজাকে হারিয়ে যে দেবে তা সুনিশ্চিত। কাঠমাণ্ডু নেপালের প্রধান নগর। এখানে একটা বিরাট মাঠ—কলকাতার মত রয়েছে, নাম টুঁড়িখেল। এখানে প্রতিদিন নেপালী সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করে। টুঁড়িখেলের উত্তরে রাণী পোখরি বা রাণীর দীঘি। কাকচক্ষু জল ওর। এই দীঘির মাঝে রয়েছে সুন্দর একটি মন্দির। সেতু দিয়ে যেতে হয় মন্দিরে। আর আর বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে কালভৈরব, হনুমান ঢোকা, স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির, বোধনাথের মন্দির; নেপালের অন্যতম শহর পাটনেও বহু দেখার



দিল্লীতে নেপালাধীশ। সঙ্গে জওহরলাল ও পৌত্র।

জিনিস রয়েছে, যথা—মাচেন্দ্রের মন্দির। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৪০৮ সালে। এখানে প্রতি বৎসর রথযাত্রা হয়। ভাতগাঁওতেও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির রয়েছে। এখানকার পশুপতিনাথ মন্দির প্রসিদ্ধ। ইনি হচ্ছেন নেপালের রক্ষাকর্তা দেবতা।

নেপালের লোকসংখ্যা (১৯৪৮ সালের হিসাব অনুযায়ী) প্রায় ৫৬ লক্ষ। অধিবাসীদের অধিকাংশেরই বৃত্তি সামরিক। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও বিশ্বাসী। নেওয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সাধারণত কৃষিকার্যে নিযুক্ত। এরা দক্ষ ও পরিশ্রমী।

এককালে নেপালীরা অনেকেই ছিল বৌদ্ধ-



নেপালী কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালা।

ধর্মাবলম্বী, কিন্তু বর্তমানে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। তারা প্রধানত ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, ক্ষেত্রী, কিরাতী, গুরুং, মগর ও নেওয়ার বর্ণভুক্ত। গোর্খালী, মগর আর গুরুং সম্প্রদায় হিন্দু এবং ভুটিয়া, নেওয়ার, লিম্বু, কিরাতী আর লেপচা সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাদের ধর্মের সাথে হিন্দুধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাকে আর এখন বৌদ্ধধর্ম বলা চলে না।

সম্প্রদায় হিসাবে নেপালীদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নেপালীরা অধিকাংশই মিশ্র মোঙ্গল জাতিসম্ভূত। নেপালের উত্তর অংশে পার্বত্য অঞ্চলে ভুটিয়া বা তিব্বতীরা বাস করে। গুরুং আর মগর সম্প্রদায় বাস করে প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলে। মধ্য অঞ্চলে বাস করে বিশেষ করে মুর্মি, গোর্খালি আর নেওয়ার সম্প্রদায়। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা হচ্ছে কিরাতী, লিম্বু আর লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত। পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে ব্রাহ্মণ আর ছত্রীরা। এ ছাড়া তরাই অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বাস।

নেপালের শাসকগোষ্ঠী হিন্দু। তাঁরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত হিন্দু পূজা-আর্চা করে থাকেন। ওখানে দুর্গাপূজাকে বলা হয় দসাই* আর দেওয়ালীকে বলা হয় তিহার।

নেপালের বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করলেও ওদের রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে নেপালী।

নেপালের প্রাচীন ইতিহাস খুব নির্ভরযোগ্য নয়, এটা পুরাবৃত্ত ও কিম্বদন্তীর উপরই বেশী ভাগ নির্ভরশীল। প্রবাদ আছে যে, ডিমের মত নেপাল উপত্যকায় ছিল প্রকাণ্ড একটি হ্রদ। বিষ্ণু দেবতা পাহাড় কেটে সেই হ্রদের জল বের করে দেন। নেপাল বলতে আমরা যেমন একটা দেশকে বুঝি, সেখানকার অধিবাসীরা তা বোঝে না। তাদের কাছে পরিচিত নেপাল উপত্যকা নেপাল দেশ নয়। এই উপত্যকাতেই ঘটেছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ। এখানেই হয়েছে ইতিহাসের সৃষ্টি। এখানেই রয়েছে প্রাচীনতম এবং পবিত্রতম মন্দির, বৃহত্তম নগর। এখানেই চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্য আর শাসনকার্য। নেপালের আর সব অঞ্চল এখনও রয়েছে অনাবিষ্কৃত। ভবিষ্যতে যদি সে সব অঞ্চলের কারো যবনিকা অপসারিত হয়, তবে হয়ত অনেক জিনিসই জানতে পারা যাবে। যে সব প্রাচীন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পঞ্চম শতকের শিলালিপি। খৃষ্টপূর্ব ৫৬৮ শতকে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন লুম্বিনী-কাননে। নেপাল তরাইয়ের রুম্মিনদেই কাননটিই নাকি লুম্বিনী-কানন। স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই সম্রাট অশোক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন এখানে। তাতে উৎকীর্ণ করেন উপদেশাবলী। সম্রাট অশোক নিজে এসেছিলেন নেপাল উপত্যকায় (বর্তমান রাজধানী যেখানে, সেখানে) এবং পাটন ৫টি স্তূপ নির্মাণ করেন।

পরবর্তী যুগে যাঁরা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মল্ল ও লিচ্ছবি রাজবংশ। জনৈক চৈনিক পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিচ্ছবিরাজবংশের রাজা অংশু বর্মণ-এর নাম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যখন নেপালের শাসনকর্তা স্রঙ-সান-গ্যাম্পো নেপালে আসেন এবং জনৈকা নেপালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। এই রাজকুমারীই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে উৎসাহ জোগান।

অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করলে বহু হিন্দু পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান। ১৩২৬ সালে ত্রিহুতের হরি সিং নিজেকে নেপালের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তাঁর বংশধরেরা পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত নেপাল শাসন করেন। এর পর যাঁরা নেপালের শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাঁরা জাতিতে রাজপুত। বর্তমান শাসনকর্তারাও রাজপুতদেরই বংশধর। রাজপুতেরা চিতোর মুসলমান কর্তৃক দখল করা হলে পালিয়ে গিয়ে নেপালের গুর্খা নামক শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁরা মহা-প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং দেশে প্রভাব বিস্তার করেন। এঁরাই আজকের গুর্খা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুর্খার রাজা পৃথ্বী সিং যখন আপন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন নেপাল উপত্যকায় সমকক্ষ রাজা ছিলেন চারজন। তাঁদের রাজধানী ছিল পাটন, ভাটগাঁও, কীর্তিপুর আর কাঠমাণ্ডুতে। এঁরা সবাই মল্লবংশোদ্ভব। এঁদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই ছিল।



নেপালের প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা

এই আক্রমণে নেপালের জন্য ভাটগাঁওয়ের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সাহায্য চাইলেন। এতে তাঁর সুবিধেই হল। তিনি কীর্তিপুর অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধ রাজা ইংরেজের সাহায্য চাইলে ইংরেজ সাহায্য পাঠান ঠিকই, কিন্তু দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে যে সৈন্য নেপালে এসে পৌঁছল, তাদের হটিয়ে দেওয়া পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষে খুব কঠিন কিছু হল না। ফলে তাঁর রাজ্য সীমানা আলমোড়া থেকে সিকিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হল। ১৭৭২ সালে তিনি মারা যান এবং তাঁর ছেলে রাণা প্রতাপ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর শিশু পুত্র রাণা বাহাদুর রাজা হলেন। ১৭৯০ খৃঃ গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং তিব্বতে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর সিগাৎসে দখল করে।

রাজ্য বিস্তারের নেশায় নেপালী সৈ

মুখোমুখী এসে দাঁড়াল শিখ রাজাদের সামনে, কিন্তু পরাজিত হয়ে জিত রাজ্যের অনেকটা অংশ ছেড়ে দিতে হয় রণজিত সিংহের হাতে। ১৮০০ শতকে রাণা বাহাদুর অত্যাচারের চরম নিদর্শন স্থাপন করতে শুরু করলে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তাঁর শিশুপুত্র গিরবন যুদ্ধবিক্রম রাজা হন। রাণা বাহাদুর বেনারস চলে যান। রাণা বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন দামোদর পান্ডে। তাঁকে হত্যা করে ভীমসেন থাপা প্রধান মন্ত্রী হন। রাণা বাহাদুর ফিরে এসে পুত্রের নাবালকত্বের সময় রিজেন্টরূপে কাজ করতে থাকেন। বৈমাত্র ভাই তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু তাঁকেও ভীম-



নেপালের বিষ্ণু দেবতা

সেন থাপার আত্মীয় বালা নরসিংহ হত্যা করেন।

ভীম সেন-এর নেতৃত্বে নেপালীরা দক্ষিণে ভারতের সমভূমির দিকে রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাহিনী তাহাদের বাধা দেয়। আপোষ-এর জন্য চেষ্টা হল, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় ১৮১৫ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। বহু যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃঃ সাগৌলীতে গুর্খাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হল। সন্ধির ফলে গোর্খারা তাদের অনেক স্থান ছেড়ে দিল এবং রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখে।

নেপালের নিয়ম হচ্ছে বৎসরের নির্দিষ্ট একদিন সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে পদত্যাগ করতে হবে। পরে রাজা তাঁদের আবার নিয়োগ করেন। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রীর অত্যধিক ক্ষমতা ও প্রভাব সহ্য করতে না পেরে ১৮৩৩ সালে রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম ভীম সেনকে পুনর্নিয়োগ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে ছিল প্রধানা রাজ্ঞীর উৎসাহ ও পান্ডে দলের প্রেরণা। ১৮৩৭ সালে ভীম সেন আত্মহত্যা করেন।

ভীম সেনের মৃত্যুর পর রাজ্যের ক্ষমতা কার্যত পরিচালনা করতেন প্রধানা রাজ্ঞী এবং পান্ডে দল। তাঁরা বিবাদ বাঁধালেন ইংরেজের সঙ্গে। ১৮৪১ সালে প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পর ঐ হাঙ্গামা অনেক হ্রাস পেল। কিন্তু শীঘ্রই দ্বিতীয়া রাজ্ঞী স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা দুর্বল বলেই তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সহজে। দ্বিতীয়া রাজ্ঞী ছিলেন পান্ডে দল-বিরোধী ভীম সেন দলের সমর্থক। তিনি ভীম সেনের ভাগনে মাথবর সিংহকে প্রধান মন্ত্রী (১৮৪৩) নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র চলতেই লাগল। পরে রাজারই আদেশে ১৮৪৫ সালে জঙ্গ বাহাদুর রাজপ্রাসাদের মধ্যেই ওঁকে গুলী করে হত্যা করলেন। মাথবর সিংহের মৃত্যুর পর দুদলে একটা আপোষ হল সত্য, কিন্তু ১৮৪৬ সালেই তা ভেঙ্গে গেল। এর পর ঐ দুদলই নষ্ট হয়ে গেল। জঙ্গ বাহাদুর প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৭৭) কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি শাসন-কার্য পরিচালনা করে গেলেন। ইতি-পূর্বে এক হত্যা ষড়যন্ত্রের জন্য রাজ্ঞীকে নির্বাসিত করা হল দেশ থেকে। রাজাও তাঁর সঙ্গে গেলেন। দেশে থেকে গেল শিশুপুত্র সুরেন্দ্র। রাজা কিন্তু কিছুদিন পর ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করেই বাস করতে লাগলেন। ১৮৫৪ সালে নেপালের সঙ্গে তিব্বতের যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ শেষ হল দুবৎসর পর। জঙ্গ বাহাদুরের শাসনকাল খুব শান্তিপূর্ণ হওয়ায় তাঁকে নেপালের রাজা উপাধি দিলেন 'মহারাজা'। সেই থেকে নেপালের প্রধান মন্ত্রীকে বলা হয় 'তিন সরকার' আর রাজাকে (মহারাজাধিরাজ) 'পাঁচ সরকার'। জঙ্গ বাহাদুরের পর তাঁর পুত্র রাণা উদীপ সিং মন্ত্রী হন। ওঁর মৃত্যুর পর নানা ষড়যন্ত্র ও হত্যাকান্ডে পর প্রধান মন্ত্রী হন জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র বীর সমশের জঙ্গ বাহাদুর (১৮৮৫)।

বীর সমশের-এর মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে। তারপর মন্ত্রী হন তাঁর ভাই দেব সমশের। তিন মাস পরে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর ভাই চন্দ্র সমশের মন্ত্রী হলেন। তিনি ২৮ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সময় নেপালের নানা উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরই সময় প্রথম মহাযুদ্ধ বাঁধে। তিনি প্রচুর সৈন্য দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেন। জেনারেল স্যার সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ১৯২৯ সালে মারা যান। তাঁর ভাই লেঃ জেঃ স্যার ভীম সমশের প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি মারা যান ১৯৩১ সালে পরে মন্ত্রী হন শেষ ভাই জেঃ স্যার যোধ সমশের জঙ্গ। এঁর সময় দ্বিতীয় মহাসমর বাঁধে। ইনি ১৯৪৫ সালে পদত্যাগ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লেঃ জেঃ স্যার পদ্ম সমশের জঙ্গ দুবৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করবার পর ১৯৪৮ সালে পদত্যাগ করেন। প্রধান মন্ত্রী হন চন্দ্র সমশের জঙ্গের পুত্র স্যার মোহন সমশের জঙ্গ। ১৮৮৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

নেপালের শাসন-ব্যবস্থা অল্পবিস্তর সামরিক ধারার। নিয়মতন্ত্রের দিক দিয়া নেপাল সরকার একটি স্বৈরতন্ত্র এবং মহা-রাজাধিরাজই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নৃপতি। কিন্তু কার্যত তাঁর কোন ক্ষমতাই নেই। প্রধান মন্ত্রীই নেপালের সর্বময় কর্তা। তিনিই সেনা-বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তাঁরই অধীনে রয়েছে



বীরগঞ্জের যুদ্ধে নিহত বিদ্রোহী সেনাদলের পরিচালক ত্রিভুন মল্ল

রাজার আত্মীয়-স্বজন, রাজগুরু, সেনাপতি-বৃন্দ, সর্দার-সমন্বিত মন্ত্রণা-পরিষদ। মন্ত্রণা-পরিষদই সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পদ বংশপরম্পরা-গত। মহারাজাধিরাজের কাছ থেকে রাণা বংশের প্রধান মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর রাণা প্রথম এই অধিকার লাভ করেন। ১৮৬৭ সাল থেকে নেপালের পূর্ণ কর্তৃত্ব এসে পড়েছে প্রধান মন্ত্রীদের হাতে।

নেপালের বর্তমান অধীশ্বরের নাম হচ্ছে মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ বাহাদুর। ১৯০৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নেপালের রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও হত্যাকান্ড একটা নারকীয় ব্যাপার। প্রথম থেকেই এটা চলছিল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে এবং গণমতে বিশ্বাসী বলে বর্তমান মহারাজাকে নেপাল ছেড়ে চলে এসে ঠাঁই নিতে হয়েছে ভারতে। পরে যা হচ্ছে, তা প্রতিদিনই আমরা জানতে পারছি।

অন্ত্যেষ্টি

রণজিৎকুমার সেন

বর্ষণমুখর ক'লকাতার রাজপথ। জলে শপ্ শপ্ ক'রছে চারপাশ। কোথাও জল দাঁড়িয়ে ট্রামবাস আটকে প'ড়েছে। তীর্থের কাকের মতো পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে কাতারে কাতারে অপেক্ষমান মানুষ। ইতিমধ্যে মৌলালী হ'য়ে ধর্মতলার ট্রাম এসে দাঁড়ালো শিয়ালদায়। যাবে গ্যালিফ স্ট্রীট। বাদুড়ঝোলা ঝুল্‌ছে মানুষগুলো। মেয়েদের ভিড়ই কি কিছু কম? সীটে ব'সে, দাঁড়িয়ে, একেবারে পুরুষ মানুষগুলোর গা ঘেষাঘেষি ক'রে। অলঙ্কারের প্রাচুর্য তাতে কিছুমাত্র কমেনি। পথে ঘাটে এসব সময়েই বরং অলঙ্কারের আতিশয্য প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে।

এস্‌প্লানেড থেকে উঠেছিল সুব্রত। মুখ-ভর্তি দাড়ি, মাথাভর্তি অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, অর্ধ পরিষ্কৃত গায়ের জামাটার কোথাও বা ছেঁড়া, কোথাওবা রিপুর চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লেডীস সীটের ঠিক পিছনেই এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে এসেছিল সুব্রত। যেমন ক'রে দাঁড়িয়ে এসেছে বেলা ছ'টায় আপিস ফিরতি বাবুরা। আজ অন্ততঃ মাইনের দিন যে নয়, একথা স্পষ্টই বুঝে নিল সে, বুঝে নিল আপিস-ফেরতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। ক্লান্ত, বিমর্ষ, রেখাঙ্কিত ললাটে অবসাদের চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। তাছাড়া তারিখটাও আজ ১লা থেকে ৩ তারিখ নয়। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। বাবুদের মুখে তাই ঘর্মের আবরণে হাসি শুকিয়ে গেছে। হায়রে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন!

কথা ছিল—সারাদিনের কাজের চেষ্টার পর আজ আর কোথাও না গিয়ে সন্ধ্যাসন্ধ্যিই ঘরে ফিরবে সুব্রত। ঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে এই অনুরোধই তুলে ধ'রেছিল জয়া তার বিধবা বোন। অনুরোধটা ছিল অবশ্য জয়ার স্বার্থের অনুকূলেই। সন্ধ্যার দিকে মনে হয়, বিভীষিকায় ভ'রে ওঠে বাড়ীর চারপাশ। দুষ্ট লোকের কটাক্ষ চাহনীতে কেমন ভারী হ'য়ে ওঠে এদিকের আবহাওয়াটা। নিশ্বাস পড়তে চায় না তখন জয়ার। সুব্রতর দেড় বছরের খোকা শঙ্কর এসময়টা আর আগ্‌লে রাখ্‌তে পারে না তার পিসীকে। সোমত্ত যৌবন। থই থই করে দেহ-তটিনী। ইলেক্‌ট্রিকের অভাবে প্রদীপ জ্বালাতে হয় ঘরে। অন্ধকারে থম থম করে চারদিক। একা ঘরে দেড় বছরের শঙ্করকে নিয়ে ভয় পাবারই কথা যে জয়ার! তার দিক থেকে সুব্রতকে তাড়াতাড়ি ক'রে ঘরে ফেরার জন্য মাথার দিব্বি দেওয়াও অন্যায় কিছু নয়।

কিন্তু সময় কোথায় সুব্রতর? জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেণের চাকার মতো ঘুরচে তার ব্রহ্মতালু। ফেরারী আসামীর মতো জীবন থেকে ছিট্‌কে প'ড়ছে সে। হ'য়ে কুকুরের মতো ঘুরচে সে অনবরত চাক্‌রীর চেষ্টায়। ডালহৌসী, ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার মার্চেণ্ট আপিস থেকে মাড়োয়ারী গদি। প্রখর রোদের তাপে পুড়ে পুড়ে সারা দেহ তামাটে হ'য়ে উঠেছে, তার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে বর্ষার মুষল ধারা। কিছুদিন থেকেই মাথার মধ্যে কেমন একটা দৌরাত্ম্য শুরু হ'য়েছিল। মাঝে মাঝেই কেমন অনাবশ্যকভাবে গরম হ'য়ে ওঠে ব্রহ্মতালু, চিৎকার করে সব কিছু ভেঙেচুরে একাকার ক'রে দিলেও যেন শান্তি নেই তখন। জয়াই বলেছে কতবারঃ 'ইদানিং তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছো, বলো তো দাদা? কিছুর মধ্যে কিছু নয়, হঠাৎ এমন খিঁচিয়ে ওঠো যে, দেখ্‌লে ভয় হয়।'—সত্যিই কি তাই? সত্যিই সে ভয় দেখায় নাকি তবে? কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে কোনো পাহাড়তলী থেকে ঘুরে এলে একেবারে মন্দ ছিল না। কিন্তু অবকাশ কোথায়, অর্থ কোথায় ঘুরে আসার মতো! কুঁজোর আবার চিতিয়ে শোয়া!

জীবনটাকে তবু আজ অনেকখানি হাল্কা ক'রে দিয়ে গেছে কল্যাণী। চার বছর হ'লো তাদের বিয়ে হয়েছিল, শূন্য হাতে নিঃসম্বলের গৃহে এসে একদিন পূর্ণ হাতে শ্রেষ্ঠ উপহার তুলে দিয়েছিল সে সুব্রতকে। সে ঐ শঙ্কর। আজ সে দেড় বছরের অনিন্দকান্তি দেব-শিশু। কিন্তু কল্যাণীকে ধ'রে রাখা গেল না। সূতিকা থেকেই প্রথম রোগটা দেখা দিল, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো টিউবারকিউলোসিস। যাদবপুরে নিয়ে ভর্তি করবার মত অর্থ নেই, অনেক চেষ্টায় অনেক হাঁটাহাঁটি করে শেষ পর্যন্ত কম খর্‌চায় বেড পাওয়া গেল কাঁচরাপাড়ায়। বেলা আড়াইটার ট্রেন ধ'রতে হতো রোজ শিয়ালদহ থেকে, নইলে বিকেল চারটেয় গিয়ে ছ'টা অবধি এ্যাটেণ্ড করা যেতো না কল্যাণীকে। প্রতিদিনই লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌তো—কেমন অদ্ভুতভাবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে কল্যাণী। তার চোখের জল—সে কি এত শীগ্‌গিরই ভুলে যাবার? জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু ক'রে কত কথাই না হ'তো কল্যাণীর সঙ্গে। সমস্ত কথা ছাপিয়ে সব চাইতে বড় করে ফুটে উঠ্‌তো প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের গ্লানি আর ব্যর্থতাটাই। জীবনের আশা দিয়ে যে কথাগুলোই উচ্চারণ ক'রতে যেতো সুব্রত, নিজের কানেই তা অলীক, অবাস্তব আর প্রতারণা ব'লে মনে হতো তার। কল্যাণী ঠিকই বুঝেছিলেন—মিথ্যা আশ্বাসে মহাকালের প্রলয় দেবতা ভুলবেন না; দিন তার এগিয়ে আস্‌চে। এরকম মুহূর্তগুলোতে তার চোখের জলের ভাষা-গুলো—সে কি সত্যিই সহ্য করা যেতো? একটা দিনের কথাই বিশেষভাবে এখানে মনে প'ড়ছেঃ

কল্যাণী ব'ল্‌লো, 'আমার চোখ দু'টোর দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেছ? একদিন যে চোখে আমার চুম্বন করে তুমি বলেছিলে—তোমার হৃদয়াকাশের চাঁদ আর সূর্য লুকিয়ে রয়েছে এখানে, সে চোখ দুটো কালি প'ড়ে আজ শুকিয়ে মরে গেছে। আজ শুধু ঘৃণা ছাড়া এচোখ দুটোর আর কিছুই প্রাপ্য নেই।'

সুব্রত বল্‌লো, 'এ তুমি কি বল্‌ছো কল্যাণী?'

—'ঠিকই বল্‌ছি।' কল্যাণী বল্‌লো, 'হাজার হলেও তুমি তো পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষের মন—সে কি কিছুই জানিনে?'

সুব্রত বল্‌লো, 'সেটুকুই সব, তুমি আমি—তোমার আমার সম্পর্কটা তবে কিছুই নয়?'

—'কিছু নয় কেন, তার উপরেও প্রবৃত্তি বলে কিছু তো আছেই! তা যাক—।' কিছু-ক্ষণের জন্য থাম্‌লো কল্যাণী, তারপর অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস টান্‌লো কণ্ঠের মধ্যে। একটা উদ্গত কাশিকে অনেক কষ্টে চেপে গেল আলজিভের নিচে, নইলে এক্ষুণি হয়ত একটা অনর্থ ঘ'টে যেতো। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে সুব্রতর চোখের দিকে চোখ রেখে। ক্রমশঃই চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠ্‌ছিল কল্যাণীর। বল্‌লো, 'তুমি চেষ্টা করলে কি হবে, আমার মন বল্‌ছে—সত্যি আমি আর ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো না। এখানেই আমাকে শেষ নিশ্বাস ফেল্‌তে হবে।'

'সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর মুখে হাত চাপা দিয়ে সুব্রত বলে উঠ্‌লো, 'এমনি সব যাচ্ছেতা বলে বলেই আমাকে তবে তুমি কাঁদাতে চাও?'

কেন যেন এবারে আর কথাটার প্রত্যুত্তর করলো না কল্যাণী। আবার কিছুক্ষণের জন্য তেমনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে সুব্রতর চোখের দিকে চোখ রেখে।

হঠাৎ ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠ্‌লো হাসপাতালের। ৫টা ৫৫ মিনিট। আর মাত্র ৫ মিনিট শেষ হতে বাকী আছে ভিজিটারদের এ্যাটেন্ডিং টাইমের।

কল্যাণী বল্‌লো, 'আমার বাব্‌লু, আমার শঙ্কর কেমন আছে, বল্‌লে না তো? কাল রাত থেকে ওর জন্যে বড্ড মন কাঁদ্‌ছে।'

সুব্রত বল্‌লো, 'নিজে তো বড় একটা ঘরে ব'সে থাক্‌তে পারিনে, জয়াই দিন রাত আগ্‌লে রাখে ওকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে কিছুতেই আর থাক্‌তে চায় না। তোমাকেই খোঁজে তখন। কি করে যে আবার ঘুম পাড়াই শঙ্করকে, তা আর ব'লবার নয়।'

অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো কল্যাণীরঃ 'এমন সাহস নেই বলি যে, একবারটি বাবুলুকে আমার নিয়ে এসো এখানে। কারুর কি আসতে আছে এখানে! তবু বাব্‌লুকে ছেড়ে একটা মুহূর্তও যে এখানে তিষ্ঠোতে পারছিনে গো! সব সময় ওর ডাক এসে আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে। ওর যেন একটুও অনাদর হয় না, একটুও যেন কষ্ট হয় না বাব্‌লুর, দেখো।'

—'দেখ্‌বো বৈ কি, আমিও কি ওর বাপ নই!'

বল্‌তে গিয়ে অলক্ষ্যে একবার গলাটা কেঁপে উঠ্‌লো সুব্রতর। বাপ হয়ে পিতৃত্বের উপযুক্ত কর্তব্য কি এতটুকুও পালন করতে পেরেছে সে? দুধের অভাবে পানোর জল খেয়ে খেয়ে কাঁচ হাড়ের উপর দিয়ে আজ অবধিও ভালো করে মাংস দেখা দিল না শঙ্করের। এমনি করে ও-ই বা কতদিন বাঁচ্‌বে? অথচ ওর মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে কোন লেনিন, সান-ইয়াৎ-সেন, নেপোলিয়ান না কোনো একজন জগদীশ বোস। সেই অতুল সম্ভাবনাকে বাপ হ'য়ে নিজের হাতে আজ গলা টিপে মারছে সুব্রত। চাক্‌রী নেই, কোথাও একটা ভাঙা চেয়ার, টেবলও খালি নেই তার জন্য; দুধ আসবে কোত্থেকে শঙ্করের? ক'ল্‌কাতায় নিটোল জলের দামই দশ আনা সের, দুধ কোথায়?

ঠন্ ঠন্ ঠনা ঠন—।

শেষ ঘন্টি পড়লো হাসপাতালের।

নীরবে উঠে এলো সুব্রত। বাইরে এসে চোখ দু'টোকে একবার ভালো করে রগড়ে নিল সে। তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে কল্যাণী, অথচ একটা দিনও দু'টো আঙুর কি একটা বেদানা এনেও তাকে হাতে ধরে দিতে পারছে না সে। অদৃষ্টবন্ধনে শুধু বিয়েটাই হ'য়েছিল তাদের, স্বামী হ'য়ে কিছুই করতে পারলো না সে স্ত্রীর জন্য। ধিক্ তার স্বামীত্ব আর পিতৃত্ব। তার অতি বড় শত্রুকেও যেন জীবনে কখনও এমন পাপের দংশন সইতে না হয়। বড় জ্বালা, বড় বিষ।...

বর্ষার মুষলধারা নেমেছে ক'লকাতার আকাশ ছেয়ে। ঝম্‌ঝম্ ঝমাঝম্। বৃষ্টির তোড়ে ঘন কুয়াশার মত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে রাজপথের পরিবেশ। রাস্তার পাশে গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষমান মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে তীর্থের কাকের মতো। ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা ঝুলছে যাত্রীরা।

হাওড়া টু গ্যালিফ্ স্ট্রীটের ট্রাম। দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌চে অজস্র স্ত্রী-পুরুষের চাপে। লেডিস্ সীটের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আস্‌ছিল এতক্ষণ সুব্রত। জয়ার অনুরোধের সঙ্গে তার স্মরণশক্তিকে মেলাতে পারেনি সে। কল্যাণীর কথাগুলো মনে জেগে সমস্ত বুকের ভিতরটা কেমন এক অস্বাভাবিকভাবে অনবরত তোলপাড় ক'রছিল। আজও ডালহৌসী, ক্লাইভ স্ট্রীট্ আর বড়বাজারের এমন স্থান নেই যেখানে চাক্‌রীর জন্য একবার ক'রে ঢু না মেরেছে সে। দেখেছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ কেমন ক'রে সশেলষে বিদায় ক'রে দিতে পারে তার দেশের লোককে! সেখানে এতটুকুও মমতা বা চক্ষুলজ্জার অবকাশ নেই। টাকার জগতের মানুষের চরিত্র একেবারেই আলাদা বস্তু।

মাথার ভিতরটা কিছুদিন থেকেই কেমন গোলমাল হ'য়ে গিয়েছিল। হয়ত একেবারেই পুরোপুরি পাগল হ'য়ে যেতে আর দেরী নেই। জয়াও কতকটা এমনই ইঙ্গিত ক'রেছিল সেদিন। জয়ার দোষ কি? মেয়েটাও কি কম ভয়ে ভয়ে আছে! কাছাকাছি মানুষগুলো সুচরিত্রের মানুষ নয়; তাদের চোখের চাহনি আর অযাচিত সাহায্যের উৎসাহ তার চাইতে জয়াই বরং বেশী বোঝে। সারাদিন একা শঙ্করকে আগ্‌লে তাকেই ঘরে থাক্‌তে হয়। পাড়া-প্রতিবেশের আবহাওয়া সে বেশী বুঝ্‌বে না তো কে বুঝ্‌বে? অথচ এর প্রতিবিধানের উপায় নেই, সুযোগ নেই আত্মসংস্কারের।

এই অবকাশে শঙ্করের কথাটাই আর একবার মনের উপর দিয়ে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল, সেই সাথে কল্যাণীর মুখখানিও। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার এক মিনিট আগেও কল্যাণী প্রতিদিনের মতই আকুল উচ্ছ্বাসে ব'লেছিল—'নিজের জীবন দিয়েও পারো তো শঙ্করকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরো। ওর মধ্যেই বেঁচে থাক্‌বো তুমি আর আমি।'—ট্রামের চলন্ত চাকার মতই মুহূর্তে একবার বিঘূর্ণিত হ'য়ে উঠ্‌লো ব্রহ্মতালুটা। বয়লারের আগুনের মতো শোঁ শোঁ ক'রছে কানের দু'টো পাশ। পাশেই টিকিট নিয়ে হঠাৎ গণ্ডগোল বেঁধেছে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে জনৈক ভদ্রলোকের, তাই নিয়েই মস্ত একটা হুলুস্থুল। ভদ্রলোক একখানি সিকি দিয়েছিলেন পাঁচ পয়সার একটা টিকিটের জন্য। ফিরে পাবার কথা তাঁর এগারো পয়সা, অথচ মাত্র তিন পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে কণ্ডাক্টার তাঁকে বুঝ্ দিচ্ছে একটা দো আনীর। আসলে অন্যমনস্কতায় হিসাবের ভুল। তাই নিয়েই মুখখিস্তি, শেষ পর্যন্ত কিছু একটা হাতাহাতি হবার মতই অবস্থা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্রামের যাত্রীরা ঝুঁকে পড়লো ভদ্রলোকটির পক্ষ নিয়ে। কণ্ডাক্টার লোকটিও দম্‌বার পাত্র নয়; ডিপোয় গিয়ে টিকিট পিছু হিসেবপত্র না ক'রে সে একটি পয়সাও আর দিতে রাজি নয় ভদ্রলোকটিকে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা ততক্ষণে মারমুখো হ'য়ে উঠেছেঃ 'পয়সা দেবে না, মাগ্‌না, বাপের জমিদারী পেয়েছো নাকি? চাপ্‌কে একেবারে দাঁত খসিয়ে দেবো হারামজাদা।'

অকস্মাৎ এদিক থেকে সচকিত চিৎকারে ফেটে প'ড়লো লেডিস্ সীটের একটি মেয়ে। কিন্তু সেদিকে সহসা বড় একটা কারুর নজর গেল না। দ্রুত ধাবমান ট্রামের মতই দ্রুত এগিয়ে চ'লেছে এখানে অজস্র চাপবাঁধা মানুষগুলোর জীবনধর্ম। গেটের সাম্‌নে দিয়ে ব্রস্তে পথ ক'রে চলন্ত ট্রাম থেকেই মাঝ রাস্তায় নেমে প'ড়লো সুব্রত। লক্ষ্য ক'রবার মতো বিষয় নয়, এরকম হামেশাই তো কত মানুষ চলন্ত ট্রাম থেকে খাড়া নেমে পড়ছে, আবার চলন্ত ট্রামেই লাফিয়ে উঠ্‌ছে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে। ট্রামের লোকেরা তখন দু'ভাগ হ'য়ে গেছেঃ একদিকে কণ্ডাক্টার, আর-একদিকে মেয়েটি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রোধে, কৌতূহলে আর অধৈর্যে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে মানুষগুলো। এতক্ষণে মেয়েটি একবার সশব্দে কেঁদে উঠ্‌লোঃ 'উঃ মাগো, আমার সব গেল, সর্বনাশ হ'য়ে গেল আমার! আমি কোন্ মুখে ঘরে ফিরবো!'

কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে মেয়েটিকে, বুঝ্‌তে পারলো না লোকগুলো। এতক্ষণে চিৎকার ক'রে এবারে যেন কণ্ঠ তাদের একেবারে বোবা হ'য়ে গেছে।

বৃষ্টিভেজা সাম্‌নের উন্মুক্ত পথে স্পীড্ বাড়ছে একটু একটু ক'রে ট্রামের; ট্রাম এগিয়ে চ'লেছে মাণিকতলা ছাড়িয়ে ফড়িয়াপুকুরের কাছাকাছি।......

রাস্তায় নেমে সার্কুলার রোড্ ছেড়ে একটা গলির মুখে ঢুক্‌লো সুব্রত। জীবনের একটা মস্ত বড় পরীক্ষায় আজ উত্তীর্ণ হ'লো সে। একাজে তবে চাক্‌রী পাবার মতো খুব একটা 'এক্সপেরিয়েন্স'র দরকার হয় না, ইচ্ছে থাক্‌লেই পথ ক'রে নেওয়া চলে। হাতের মুঠোর মধ্যে তার চক্‌চকে এক ছড়া বিছে হার। মেয়েটি নিশ্চয়ই আঘাত পায়নি গলা থেকে টেনে আনতে গিয়ে! সুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছে বেশ দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে পিছন থেকে;

হয়ত তার সাম্‌নের চেহারাকে অনেকখানি উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল হারছড়া। সহ্য ক'রতে পারলো না সে। কল্যাণী এসে হঠাৎ সাম্‌নে দাঁড়ালোঃ 'নিজের জীবন দিয়েও পারো তো শঙ্করকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরো।' দুনিয়ার লোক অর্থে আর অলঙ্কারে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে, আর এক ফোঁটা দুধের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে ম'রবে শঙ্কর? বাপ হ'য়ে কোন্ প্রাণে তা সহ্য ক'রবে সুব্রত?—হাতের মুঠোর মধ্যেই একবার হারছড়াকে নাচিয়ে দেখ্‌লো সেঃ আড়াই ভরি থেকে তিন ভরির কম নয়। সোনার বাজারদর এখন একশো তেরো থেকে একশো আঠারো টাকার মধ্যে ওঠানামা ক'রছে। হারছড়া ভাঙিয়ে ছ'মাসেরও উপরে দুধের খরচা চ'লে যাবে শঙ্করেরঃ খাঁটি দুধ—টাকা টাকা সের। শঙ্কর বাঁচবে বড় হবে, তার মধ্যে বেঁচে থাক্‌বে সে আর কল্যাণী।—

উন্মাদের মতো একবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো সুব্রত। বাবা ছিলেন তার নিষ্ঠাবান বাচস্পতি পণ্ডিত, এককালে পাঠশালা বসিয়ে সংস্কৃত শিখিয়েছেন ছেলেদের। আজীবন যা কিছু রোজগার ক'রেছেন তিনি, বিলিয়ে দিয়েছেন গরীব ছাত্রদের কল্যাণে। বাবার কাছেই প্রথম শিক্ষা তার। জীবনে অফুরন্ত আদর্শ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিল সে। কিন্তু বাবাও চোখ বুজে গেলেন সংসার থেকে, তারও জীবনে নাম্‌লো অমাবস্যার কালো ছায়া। জয়াকে অবশ্য বাবাই নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন; কোষ্ঠী বিচার ক'রে দেখা গিয়েছিল—সতী সীমন্তিনী হ'য়ে সুখে থাক্‌বে জয়া। হায়রে সুখ, এমন সুখও লেখা ছিল তার অদৃষ্টে! তারপর সুব্রত নিজে। কল্যাণীকে সে ঘরে এনেছিল নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে। তখনও দু'একটা রোকারী ছিল হাতে। ছোট একখানি সস্তা ভাড়াটে ঘরেই অনায়াসে চ'লে যেতো তাদের পায়রা-দম্পতির জীবন। অকস্মাৎ একদিন ব্যবসার বাজারে মন্দা পড়লো। ক'ল্‌কাতার জীবন তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে। হাতছাড়া হ'য়ে গেল রোকারী। তারপর থেকে অবিশ্রাম গতিতে চ'লেছে জীবন-সংগ্রাম। পায়রার খোপ ছেড়ে নেমে আস্‌তে হ'লো ষষ্ঠিতলার বস্তি অঞ্চলের নিম্নতম জীবনের গর্তে। চার পাশে কসাইয়ের মতো মানুষগুলো সমুদ্যত রক্তচোখে চিবিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তার মাঝখানে দ্বীপের মতো জীবনে প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে মাটির প্রদীপে সল্‌তে জ্বালিয়ে রাত্রির তপস্যা শেষ ক'রতে হয় তাদের তিনটি প্রাণীকে।

নিজের অলক্ষ্যেই আর একবার সশব্দে হেসে উঠ্‌লো সুব্রত।—চমৎকার জীবন! বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান বাচস্পতি পণ্ডিত, তার ছেলে আজ বিপ্রস্ত জীবনপথের কদর্য সোয়ারী। সেও নিষ্ঠাবান বৈ কি? জীবন সম্পর্কে নিষ্ঠা না থাক্‌লে কি মানুষ এমন সুন্দরভাবে অসম্ভ চোখের উপর দিয়ে চমৎকার রাহাজানি ক'রে আস্‌তে পারে?—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—মুখের হাসি যেন বিঘূর্ণিত রহস্যজাল, ভেদ ক'রে আকাশের ইথারে গিয়ে ছড়িয়ে প'ড়ছে।

ঘরে ফিরতে স্বভাবতঃই অনেকটা রাত হ'য়ে গেল সুব্রতর। অভিমানে হয়ত প্রথমটা কথা না ব'লে আড়াল দিয়ে ঘুরবে খানিকক্ষণ জয়া, তারপর কাটা কাটা কথায় অভিমানের ঝাল মিটিয়ে নেবে এক সময়। কল্যাণী বেঁচে থাক্‌তেও গৃহজীবনে এমনি অভিমানই সইতে হতো সুব্রতকে। মনে মনে জয়ার মানভঞ্জনের কথাগুলো ঠিক্ ক'রেই একসময় ঘরের চৌকাঠে এসে পা দিল সুব্রত। ডাক্‌লো, 'জয়া, জেগে আছিস্, না শঙ্করকে নিয়ে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছিস্?'

কিন্তু এ কি! জয়া কোথায়? কোথাও সাড়া নেই তার। দরজার পাল্লা দু'টো হা হ'য়ে আছে। বৃষ্টির ভিজে বাতাসে আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে ঘরের ভিতরটা। মেঝের মাদুরের উপর কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে শুয়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে শঙ্কর—তার দেড় বছরের দেব-শিশু। পাশে প্রদীপের স'ল্‌তে তেলের অভাবে ক্রমেই শিখাহীন হ'য়ে আস্‌চে। আর-একবার চিৎকার ক'রে ডাক্‌লো সুব্রতঃ 'জয়া, জয়া কোথায় গেলি, জয়া—!'

কোথাও সাড়া নেই জয়ার।

এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে একবার লক্ষ্য ক'রলো সুব্রত, খুঁজে দেখ্‌লো বাসাটার এখানে ওখানে। আবার ডাক্‌লো, 'জয়া কোথায় গেলি, জয়া?' কিন্তু নেই, কোথাও নেই জয়া। অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে যেন কি ভাব্‌তে চেষ্টা ক'রলো একবার। নেই জয়া; এতদিনে তবে তাকেও যেতে হ'লো! আশঙ্কাটা এতদিন তবে সে মিথ্যেই করেনি। চারপাশে নারী-দেহ লোলুপ দুর্বৃত্তেরা অনবরত তার দিকে গৃধ্‌চোখে তাকিয়ে শ্বাস টান্‌তো। হয়ত এমনি একটা দিনের অপেক্ষাতেই ক্রমান্বয়ে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিল তারা। আজ সুযোগ পেয়ে জয়াকে নিয়ে তারা ভেগেছে। আর ভাব্‌তে পারে না সুব্রত। এতক্ষণে হয়ত জয়ার দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে খাচ্ছে উন্মত্ত কুকুরগুলো; তারপর একসময় তার গলিত মাংসপিণ্ডগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেবে পথে, ডাস্টবিনে কিম্বা কোনো প'চা ড্রেনে।

উঃ, অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে সারা বুক। জয়ার কথার উপর গুরুত্ব দিতে চায়নি সুব্রত, তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতে হবে বৈ কি? জ্বলন্ত ফার্নেসের আগুন দাউ দাউ ক'রে উঠেছে সারা বুকের মধ্যে। নিজের মধ্যে নিজে জ্বলে ম'রছে, পুড়ে মরছে সুব্রত। ত্রস্তে একবার শঙ্করকে টেনে নিয়ে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রলো সে।—'এমন ক'রেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারলি তুই পিসীমাকে? একা মাকে খেয়েই তোর শান্তি হয়নি?'

অতর্কিতে হারছড়া হাত থেকে মেঝেয় খ'সে প'ড়ে বিচিত্র সুরে একবার আওয়াজ হ'য়ে উঠ্‌লো। সেদিকে লক্ষ্য গেল কিনা সুব্রতর, বোঝা গেল না। রহস্যজালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেঁধেছে তার স্নায়ুতন্ত্রের সংঘাত; জ্বলন্ত ফার্নেসের আগুন উঠেছে দাউ দাউ ক'রে, সেই আগুনে জ্বলে যাচ্ছে......পুড়ে যাচ্ছে তার সমস্তটা বুক, সমস্ত চেতনা। তিলে তিলে নিজের মধ্যে রচিত হ'চ্ছে তার নিজের অন্ত্যেষ্টি।

পাশে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লো সুব্রত—তেলহীন শুক্‌নো স'ল্‌তেটা পুড়তে পুড়তে এতক্ষণে এসে দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লছে প্রদীপের বুকের মাঝখানটায়। বুক জ্ব'লছে প্রদীপের।



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সুড়ঙ্গের মুখটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল, শীতল বাতাস বহিতেছিল, গানের সুরে আমার ক্লান্ত দেহ কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতেও পারি নাই। তন্দ্রার ঘোরেও আমি অস্পষ্টভাবে উহাদের সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম, মনে হইতেছিল বহু দূর হইতে ঝরণার অস্ফুট কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আমি যেন সেই ঝরণার উদ্দেশ্যে চলিয়াছি এই ধরণের একটা এলো-মেলো স্বপ্নও যেন তন্দ্রার ঘোরে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আচমকা শ্বাসরোধ হইয়া ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার মুখের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

"কে, কে তুমি?"

"আমি শিলাঙ্গী। তুমি কে?"

শিলাঙ্গী তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রি, চতুর্দিক নির্জন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শিলাঙ্গী বলিল, "ও, তুমি! তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"সুড়ঙ্গ পথে"

"কেন আসিয়াছ"

"তোমাকে দেখিব বলিয়া"

"মিথ্যা কথা। তুমি আমার বাছুর চুরি করিতে আসিয়াছ। কিন্তু বৃথা আসিয়াছ বাছুর এখানে নাই। সে এমন জায়গায় আছে যে, সহজে খুঁজিয়াও পাইবে না"

তাহার সরল চক্ষু দুইটি হাস্যোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"বাছুর চুরি করিতে আসি নাই, সত্যই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

শিলাঙ্গী নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথাগুলি সে বিশ্বাস করিয়াছে।

"আমি তাহা হইলে যাহা চাহিব দিবে?"

নিতান্ত সরলভাবে কথাগুলি বলিয়া সে সোৎসুকে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি চাও বল, যদি অসম্ভব না হয় নিশ্চয়ই দিব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়।"

"কি"

"তোমাদের ক্ষেতের ঘাস। আমার দুধুনী মধুনীকে খাইতে দিব। তুমি যদি দাও, তাহা হইলে রোজ আমাকে কষ্ট করিয়া আর চুরি করিতে হয় না"

"তুমি কি রোজ চুরি করিয়া আন?"

"রোজ। এখনই তো চুরি করিতে যাইতেছিলাম"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"বল, দিবে?"

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করিলাম। বস্তুতঃ এবিষয়ে আমার মনে কৌতূহলও কম হয় নাই।

"তুমি আমাদের ক্ষেতে যাও কি করিয়া?"

শিলাঙ্গী সরল সত্য কথাই বলিল। তাহাকে মিথ্যা বলিতে কখনও শুনি নাই।

"আমি সুড়ঙ্গ পথেই যাই। ইঁদুরের মতো আমরা মাটির নীচে অনেক গর্ত করিয়াছি। ইঁদুরের গর্তগুলিকেই বড় করিয়া লইয়াছি। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া আমি পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইব। সেখানে আর একটি সুড়ঙ্গ আছে কিছু দূরে। সেই সুড়ঙ্গটি একেবারে তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি খরগোশরা করিয়াছিল, তাহারা তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া কচি কচি ঘাস খাইয়া আসিত। আমিই প্রথমে সেটা আবিষ্কার করি, তাহার পর ঝোনাঝিরা, রাঠা, বানন্দা এবং আরও অনেকে মিলিয়া গর্তটাকে বড় করিয়া দিয়াছে, এখন বেশ সহজে যাওয়া যায়। আমি রোজ যাই"

আমি অবাক হইয়া শিলাঙ্গীর কথা শুনিতেছিলাম। আমাদের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া এই তস্করী প্রত্যহ আমাদের খাদ্য চুরি করিয়া আনে এবং তাহা এমনভাবে বলিতেছে যেন, তাহা কোনও অন্যায় কার্য নহে! পরে জানিয়েছিলাম, তাহার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের।

"কাজটা কি ভাল কর?"

তাহার কথা শেষ হইবামাত্র আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

"কোন কাজটা—"

"এমনভাবে আমাদের ঘাস চুরি করিয়া আনা"

"চুরি করিয়া না আনিলে দুধনী মধুনীকে খাওয়াইব কি করিয়া? তুমি আমাকে যদি রোজ কিছু কিছু দাও, আমি আর চুরি করিব না। দিবে?"

"ওই ক্ষেত যদি আমার একার হইত, নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু উহা যে সকলের। সকলের মত না লইয়া কি করিয়া দিব বল? আমাদের দলপতি ধবলকে যদি তোমাদের দলপতি গিয়া বলে এবং সে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে নিয়মিতভাবে ঘাস পাইবে। কোনও গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই"

"রোহা কাহারও নিকট ভিক্ষা করে না। আমার দুধনী মধুনীর জন্য কেনই বা সে নিজেকে নীচু করিবে? আমি যদি তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি, সে কি রাজী হইবে?"

"বোধ হয় না। এক টুকরা ঘাসও সে নষ্ট করিতে চায় না। উহাই যে আমাদের খাদ্য। উহার বীজ আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখি—"

"আমি বলিব অন্যায় কর। যাহা গরুর খাদ্য তাহাকে যদি তোমরা নিজেদের খাদ্যে পরিণত কর, গরুরা কি খাইবে?"

প্রশ্নটা এভাবে কোনও দিন ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করি নাই। তবু উত্তর দিলাম, "গরুরা কি খাইবে বা পাখীরা কি খাইবে, তাহা তো আমাদের সমস্যা নয়, তাহা লইয়া আমরা কখনও মাথাও ঘামাই নাই। আমরা কি খাইব, সেই সমস্যা সমাধান করিতেই আমরা ব্যস্ত"

"তোমরা কি মাংস খাও না?"

"খাই বইকি। কিন্তু আমাদের দলে কত লোক, অত মাংস পাইব কোথায়?"

"আমরা যাহা করি, তাহাই করিলে পার। আমরা মাংস খাই, গরুর দুধও খাই। আমরা ঘাস খুঁজি গরুকে খাওয়াইব বলিয়া। তোমরা যখন আস নাই, তখন কন্যা নদীর তীরে আমাদের গরুরা আনন্দে চরিয়া বেড়াইত। তোমরা আসাতে মুশকিল হইয়াছে। বাধ্য হইয়া চুরি করিতে হইতেছে। আচ্ছা, গরুর বেলায় আমরা যাহা করি, তোমরা তাহা করিলেও তো পার"

"কি"

"কোনও গরুর সব দুধটা আমরা খাই না, বাছুরের জন্যও রাখিয়া দিই, কারণ গরুর দুধ তো বাছুরের জন্যই, তোমরাও তাই কর

না। ঘাস তো গরুর জন্যই, গরুর জন্য কিছু ঘাস তোমরা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দল-পতিকে আমি যদি গিয়া বলি, তিনি কি রাজি হইবেন না?"

"তুমি বলিলে হইবেন না। তোমার বাবা রোহা যদি যান, তাহা হইলে কি করিবেন বলা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একজন দলপতির অনুরোধ আর একজন দলপতি উপেক্ষা করেন না। তোমার বাবাকে একদিন আসিতে বল—"

"রোহা কখনও কাহারও কাছে ভিক্ষা করিবে না। সে আমাদের কন্যা নদীর তীরে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছে। আমাদের গরুরা এখন নিগম বনে আছে, সেখানে খাদ্যেরও অভাব নাই, আমরা কয়েকজন লুকাইয়া তোমা-দের ক্ষেতে যাই আমাদের নিজেদের প্রিয় গরুগুলির জন্য ঘাস আনিতে। আমি যাই দুধ্নীর জন্য। ঝোনাঝিরার একটি প্রিয় ষাঁড় আছে পিঙ্গল, ঝোনাঝিরাও তাহার জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের ক্ষেতে গিয়া ঘাস আনে। বানন্দা রাঠাও যায়। তাহাদেরও নিজের নিজের গরু আছে। চার পাঁচটি গরুর মতো ঘাস তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে না?"

আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী সোৎসুকে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিলাঙ্গীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি খুবই আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল। ধবলের অজ্ঞাতসারে কিছু করিবার কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না। ধবলকে এবিষয়ে অনুরোধ করিলেও কিছু হইবে না, তাহাও আমি জানিতাম। খানিকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া তাই সত্য কথাটাই বলিতে হইল।

"আমি কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিব না"

"তবে যে বলিলে আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে?"

"সে কথা মিথ্যা নয়। সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে। তোমাকে দেখিতেই এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমাকে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিতে পার, তাহা জানিয়াও আসিয়াছি।"

"তুমি যদি আমার বাছুর চুরি না করিতে আমি বর্শা ছুঁড়িতাম না। শুধু শুধু তোমাকে মারিতে যাইব কেন! তবে শেষ পর্যন্ত তোমা-দের সহিত বোধ হয় যুদ্ধই করিতে হইবে। ঝোনাঝিরার তাহাই ইচ্ছা, সে তোমাদের কন্যা নদীর তীর হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়। তোমাদের বিরুদ্ধে সে একটা দল গঠন করিতেছে। রোহাকেও একথা বলিয়াছে। কিন্তু রোহা এখনও সম্মতি দেয় নাই। রোহা কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চায় না। কিন্তু ঝোনাঝিরা যদি ক্রমাগত রোহাকে বলিতে থাকে, তাহা হইলে সে একদিন হয়তো রাজি হইয়া যাইবে। নিগম বনে এখন গরুদের প্রচুর খাদ্য আছে, সে খাদ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন রোহাকে রাজি হইতেই হইবে, কন্যা নদীর তীরে তখন গরুর দলকে লইয়া না গেলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? তাই বলিতেছি ভালভাবে আমাদের সহিত যদি একটা রফা করিয়া ফেল, তাহা হইলে উভয় পক্ষই শান্তিতে থাকিতে পারিব, তাহা না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য"

"বেশ, আমি আমাদের দলপতি ধবলকে একথা বলিব। চেষ্টা করিব যাহাতে সে তোমাদের কিছু ঘাস দিতে রাজি হয়"

"এখন তাহা হইলে সর, আমি যাই"

"কোথায়"

"এ সুড়ঙ্গে ঢুকিব। এখন তোমাদের ক্ষেতের প্রহরীরা ঘুমাইতেছে, এই সময় চুরি করিবার সুযোগ"

"আমি যদি তোমাকে বাধা দিই?"

"আমি জানি, তুমি দিবে না"

"দিব না? কেন!"

"তুমি যে বলিতেছ, আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে"

মুচকি হাসিয়া সে সুড়ঙ্গে গিয়া ঢুকিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...গর্তের অপর প্রান্তে যখন উপনীত হইলাম তখন প্রভাতের আর বেশী দেরি নাই, পূর্ব দিগন্তে ঊষার রক্তিমাভা দেখা যাইতেছে। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। ঝিল্লী ধ্বনিও নাই। একটা তীব্র হাওয়ায় সমস্ত উপত্যকা আলোড়িত হইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শিলাঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম না। যতক্ষণ সুরঙ্গের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও তাহার নাগাল, এমন কি সাড়া শব্দ পর্যন্ত পাই নাই। অতিশয় দ্রুতগতিতে সে আগাইয়া গিয়াছিল। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিব। কোন সুড়ঙ্গ দিয়া সে আমাদের মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই গাছে উঠিয়া আমার ধনুর্বাণ পাড়িয়া আনিলাম এবং সেই ঈষৎ অন্ধকারে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বারম্বার মনে হইতে লাগিল ওই কিশোরী মেয়েটির নিকট আমি পরাজিত হইয়া গিয়াছি।

...সহসা নিনানির কথা মনে পড়িল। মনে হইল সে হয়তো আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যদি পাহাড়ী ছাগল দেখিতে পাই, কিন্তু একটাও দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও দেখা গেল না। নিনানির আবদার মাখা মুখটা মনে পড়িল। তাহার বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখি নাই। শিলাঙ্গীর আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও শিলাঙ্গীকে আর সেদিন দেখিতে পাইলাম না। নিজেদের আস্তানার অভিমুখেই রওনা হইলাম অবশেষ।

...নিনানি পথের ধারেই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া আগাইয়া আসিল।

"তোমার এত দেরি হইল যে—"

"পাহাড়ী ছাগল খুঁজিতেছিলাম"

"আন নাই তো একটাও"

"পাইলাম না। কাল পাহাড়ী ছাগল একটাও বাহির হয় নাই"

"ঘিসু কিন্তু দুইটা ছাগল কাল মারিয়া আনিয়াছে"

"ঘিসু? সে কখন গিয়াছিল?"

"তুমি যাইবার একটু পরেই। তুমি আমার জন্য ছাগল মারিতে গিয়াছ শুনিয়া সে কি স্থির থাকিতে পারে?"

নিনানির চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

"কাল সমস্ত রাত্রি কোথায় ছিলে?"

"একটা গাছের উপর"]

"একা ছিলে—?"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায় পাইব"

"মনে হইতেছে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে—"

"তাই নাকি! জাগিয়াই ছিলাম, ভাল ঘুম হয় নাই"

"তোমার জন্য কিছু ছাগলের মাংস রাখিয়াছি, চল, আগে সেটা খাইয়া লও। ঘিসু জানিতে পারিলে আর থাকিবে না"

"ঘিসুর মাংস ঘিসুই খাক, আমার প্রয়োজন নাই"

নিনানির মুখে আবার সেই দুষ্ট হাসিটা ফুটিয়া উঠিল।

"ঘিসুকে দিলেই ঘিসু খাইবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি খাও"

নিনানি আমার দিকে একটু ঢলিয়া এক হাত দিয়া আমার কোমরটা জড়াইয়া ধরিল। নিনানি এরূপ করিলে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম। আমার ভয় হইত যদি ধবল দেখিতে পায় মুশকিলে পড়িব। আইনতঃ যদিও ধবলের স্ত্রীর উপর আমার অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যতঃ সে অধিকার আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম। অপরের স্ত্রীর বিষয়ে উদাসীন

থাকাটাই ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে শোভন বিবেচিত হইতেছিল। দল বাঁধিয়া যখন থাকিতে হইবে তখন নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য যাহাতে না হয় সে বিষয়ে ক্রমশঃ আমরা সচেতন হইতেছিলাম। নিনানি কিন্তু ধবলকে অপমান করিবার জন্যই যেন যখন তখন আমাকে জড়াইয়া ধরিত। দলপতির বিশেষ অধিকারের জোরে বৃদ্ধ ধবল নিনানিকে বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। এ কথাটা নানা ছলে নিনানি ধবলকে জানাইয়া দিতে ছাড়িত না। মুশকিলে পড়িতাম আমি। কারণ দলপতির বিরাগভাজন হইয়া থাকা নিরাপদ ছিল না।

"কোমরটা ছাড়। ধবল যদি দেখিতে পায়—"

"পাইলেই বা। আমি যতক্ষণ আছি ধবল তোমার কিছু করিতে পারিবে না"

"তবু ছাড়। ঘিসুকে চটাইয়াও লাভ নাই"

"আসল কথাটা বলিতেছ না কেন?"

"কোন্ কথাটা—"

"আমাকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না। কাল পাহাড়ে অনেক ছাগল নামিয়াছিল, ইচ্ছ করিলেই তুমি মারিয়া আনিতে পারিতে। কিন্তু কাল তুমি অন্য ব্যাপারে মাতিয়াছিলে, আমার কথা মনে ছিল না"

"কি যা তা বলিতেছ"

"ঠিকই বলিতেছি"

নিনানির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে হাসিতেছিল, কিন্তু সে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎচমক দেখিয়া বুঝিলাম তাহার মনের ভিতর অগ্নিগর্ভ মেঘ জমিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর স্থির করিলাম সমস্ত ঘটনাটা নিনানির কাছে গোপন করা সমীচীন হইবে না। তাহাকে খানিকটা অন্তত বলা উচিত।

"চুপ করিয়া আছ যে"—নিনানিই আবার প্রশ্ন করিল।

"ভয় হইতেছে সত্য কথা বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না"

"ভণিতা ছাড়িয়া কি বলিতে চাহ বল"

"কাল আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে উমগা পাহাড়ের অপর পারে একটা অদ্ভুত জাতি বাস করে। আমাদের মতো তাহারা তৃণবীজ খাইয়া থাকে না, গরুর দুধই তাহাদের প্রধান খাদ্য"

"গরুর দুধ? পায় কি করিয়া?"

"ফাঁদ পাতিয়া গরুকে ধরে, তাহার পর তাহার বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাঁশের কেঁড়েতে ভরিয়া লয়। সেই দুধ তাহারা পান করে"

"বল কি! কি করিয়া তুমি উহাদের সন্ধান পাইলে?"

এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইলাম। শিলাঙ্গীর কথাটা নিনানিকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না।

বলিলাম—"ছাগলের খোঁজে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-পথ দেখিলাম। কৌতূহল হইল ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি কি আছে। আশা করিয়াছিলাম, শজারু শসক অথবা শৃগালের সন্ধান পাইব। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা মনষ্য চলাচলের পথ। সেই পথ অনুসরণ করিয়া অবশেষে পর্বতের অপরপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিরাট এক সভায় একজন কথক কথকতা করিতেছিল। সে কথকতা অতি চমৎকার। সেই কথকতার মধ্যেই উহাদের পরিচয় পাইলাম। উহাদের পূর্ব-পুরুষ কাংড়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল একটি প্রস্তর ভেদ করিয়া। তাহার ঠিক পাশেই ছিল আর একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে উঠিয়াছিল একটি সদ্যপ্রসূতা গাভী ও তাহার বৎস। কি করিয়া কাংড়া সেই গাভীকে বশ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ কথক কখনও বক্তৃতা করিয়া, কখনও গান করিয়া বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই সভায় আর একটি ভয়ানক কথাও শুনিলাম। উহারা শীঘ্রই নাকি আমাদের আক্রমণ করিবে"

"কেন"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। যে-কোনও প্রকার হুজুকে মাতিবার জন্য নিনানি উৎসুক হইয়া থাকিত।

"তাহাদের গরুর জন্য ঘাস চাই। পূর্বে তাহাদের গরু কন্যা নদীর তীরে চড়িত, এখন আমরা সেখানে ঘাস বুনিয়াছি। হয় তাহাদের গরুর ঘাস দিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে"

"আমরা ঘাস দিব না। যুদ্ধ করিব। আমাদের সহিত উহারা পারিবে কি?"

"চল, ধবলের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাক"

"ইহাতে আবার পরামর্শ করিবার কি আছে? যুদ্ধই করিতে হইবে এবং সে যুদ্ধে আমরা জিতিবই। আমাদের দলের মেয়েরা যদি পবিত্রভাবে অগ্নিপূজা করিয়া যুদ্ধের নাচ নাচিতে পারে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাদের হারাইয়া দেয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধের কথা মনে নাই?"

"আমরা অল্পদিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। এ অঞ্চলের পথ-ঘাটও আমাদের ভাল করিয়া চেনা হয় নাই, এ অবস্থায় যুদ্ধ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না!"

"উহাদের হুমকি সহ্য করিয়া থাকাটাও কি বুদ্ধিমানের কাজ হইবে? আজ যদি উহাদের ঘাস দাও, কাল জমি চাহিবে—"

"দেখাই যাক না কি করে। তবে উহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ধবল কি বলে শোনা যাক—"

"ধবল যুদ্ধ করিতে চাহিবে না, কারণ সে বুড়া হইয়াছে। তোমরা তাহার কথায় সায় দিও না। অপমান আমরা সহ্য করিব না"

নিনানি যদিও একটু আদুরে আদেরে গোছের ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হইলে সে ভয়ংকরী হইয়া উঠিত। খঞ্জনদের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন নিনানি কুঠার ও বর্শা লইয়া রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোমল ও কঠিনের একটা অদ্ভুত সমন্বয় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সেইজন্যই নিনানিকে চটাইতে সাহস করিতাম না।

তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিলাম, "ঠিকই তো অপমান সহ্য করিতে যাইব কোন্ দুঃখে? তবে ধবল যখন আমাদের দলপতি, তাহার অভিজ্ঞতা যখন আমাদের অপেক্ষা অধিক, তখন তাহার মতামত আমাদের শুনিতেই হইবে।"

"তবে তাই শোন গিয়া। ওখানে আবার ভীড় জমিয়াছে দেখিতেছি।" আমরা আমাদের আস্তানার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম ধবলের কুটির প্রাঙ্গণে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কি যেন বলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম লোকটি আগন্তুক, তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

ক্রমশঃ



স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

ওষুধ খাই কেন?

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

খাদ্য খাওয়ার মতো ওষুধ খাওয়াও এখনকার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জীবনে ওষুধ খেতে হয়নি এমন কথা বোধ করি কেউই এখন বলতে পারবে না। কিন্তু অনেকেরই এতে বিরক্তি বোধ হয়, এমন কি মনে প্রশ্নও জাগে যে, রোগ হলেই অমনি ওষুধ খেতে হবে কেন, আর ডাক্তারের সাহায্যই বা নিতে হবে কেন? এমন প্রশ্ন এখনও যদিও তর্কের স্থলে অনেকের মুখে শোনা যায় বটে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর জবাব মানুষে বহুকাল আগেই পেয়ে গেছে, যখন নেহাৎ বর্বর যুগে সে গুহার মধ্যে বাস করতো। প্রথম যখন নিরীহ নির্বিরোধী সুস্থ মানুষ পড়ে গিয়ে হাত পা কাটলো, চোট খেয়ে তার হাড় ভাঙলো, যখন তার প্রথম হয়তো বিনা কারণেই ভীষণ মাথা ধরলো, হঠাৎ পেট কামড়ালো, প্রবল জ্বরে সে প্রথম বেহুঁশ হয়ে পড়লো, তখনই বুঝতে পারলে যে, অসুস্থ হলে সে কতই শক্তিহীন ও অসহায় হয়ে পড়ে, অপরের সাহায্য আর ওষুধ জাতীয় জিনিসের সাহায্য না নিলে তার কোনোই উপায় থাকে না। কিন্তু কার সাহায্য সে নিতে পারবে, কার কাছে গেলে তার কাটা ঘা জোড়া লাগবে, আর কোন জিনিসেই বা তার পেট কামড়ানো সেরে যাবে, জ্বরের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে? কে এমন বিদ্যে জানে? যার তার কাছে গিয়ে তো কোনো লাভ নেই, এমন কারো কাছে যাওয়া চাই যে, ওর কিছু ব্যবস্থা জানে। সুতরাং তখন থেকেই সৃষ্টি হোলো এমন একদল সাহায্যকারী মানুষ, যাদের আমরা আজ বলছি ডাক্তার, আর তখন থেকেই আবিষ্কৃত হতে শুরু হোলো এমন সব উপকারী জিনিস, যাকে আমরা এখন বলি ওষুধ। কত কালের কত প্রাণান্তকর চেষ্টায় কত লোকের জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলে যে এক একটা ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কোন রোগের জন্যে কি উপায় করতে হবে, তা সহজেই কি জানা গেছে? এর জন্যে কত হাতড়াতে হয়েছে, কত ভুলচুক করতে হয়েছে, কত অসহায়ের উপর কত অত্যাচার করা হয়েছে, কত লোকের জীবন নষ্ট করা হয়েছে, তবে হয়তো সামান্য একটু উপায় জানা গেছে। এমনিভাবে যুগের পর যুগ কেটে গেছে। যতটুকু জানা জিনিস, তার চেয়ে দশগুণ বেশী না জানা জিনিস নিয়েই এতকাল চলে এসেছে। ডাক্তারের কাজ হলো যেমন অসুস্থ মানুষকে সাহায্য দেওয়া, ওষুধের কাজ হলো তেমনি শরীরের ভিতরকার অসুস্থ যন্ত্রতন্ত্রগুলিকে সাহায্য দেওয়া। কিন্তু যেখানে ঠিক যেমন ওষুধটি দরকার, সেখানে তাই না দিয়ে অন্য রকম জিনিস হাজার দিলেও কিছু ফল হয় না। যে ডাক্তার তেমন ওষুধটির কথা জানে না, সে হাজার চেষ্টা করলেও রোগের কিছু কিনারা করতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা তো আর এক সময়ে এক যুগের মধ্যেই সবটা গজিয়ে উঠতে পারে না। একটা বিশেষ রকমের বিদ্যাকে আমরা বলি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে কত যুগের পরে যুগ লেগে যায়। ততকাল পর্যন্ত অ-বিদ্যা এবং অবিজ্ঞানের হাতে মানুষকে অনেক কষ্ট অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়।

যাই হোক, এখন আর কিন্তু সেদিন নেই। রোগের বিজ্ঞান আর তার চিকিৎসার বিজ্ঞান এখন বেশ ভালোভাবেই গড়ে উঠেছে। কোন কোন রোগের কি কি কারণ, তা প্রায় সমস্তই আমরা জেনে গেছি। কোন রোগটিকে যে কেমন করে চিনে ফেলতে হয়, তাও আমরা জানি, আর কোনটির জন্যে কি ধরণের ব্যবস্থা করতে হবে, তাও আমাদের অজানা নেই। এখন আর আন্দাজে কাজ চালাবার কোনো দরকারই নেই। নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা রোগ চেনা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত ওষুধের দ্বারা সে রোগ সারানো যায়। সকল রোগের বেলা একথা এখনো বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশের বেলাতেই তাই বটে। কিন্তু এসব তো গেল বৈজ্ঞানিকদের আর চিকিৎসকদের তরফের কাজ। যারা আপামর জনসাধারণ, যারা চিরদিনই রোগে ভুগে আসছে এবং এখনও ভুগছে, তাদের তরফের কাজটা কি? তাদের পক্ষে উচিত কাজ হোলো এইসব বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট উপায়গুলির যথারীতি সাহায্য নেওয়া। রোগ হলে বিজ্ঞান যেমনভাবে চলতে বলে, যেমন ব্যবস্থা করতে চায়, তেমনি সব ব্যবস্থাকে তখন মানতে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করানো না হয়, তাহলে এইসব ফলিত বিদ্যার কি সার্থকতা আছে? আর বিদ্যাটা যখন গড়ে উঠেছে, তখন দরকারের সময় তার সাহায্যটাই বা নেওয়া হবে না কেন?

কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে, চিকিৎসিত হওয়া সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সকলের রুচি ঠিক সমান নয়। সাধারণতঃ এবিষয় নিয়ে দুই আলাদা আলাদা রকমের মনোভাবযুক্ত মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। দু'রকম নাম দিয়ে বললে বলতে হয় যে, তার মধ্যে এক রকম হলো নেতিবাচক, আর একরকম অতিবাচক। প্রথম দলের মধ্যে পুরুষও আছে এবং শিক্ষিত মানুষও যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই দলে মেয়েদের ভাগটাই যেন কিছু বেশী। তারা যেন পারতপক্ষে ওষুধ বলে নামকরা কোনো জিনিস কিছুতেই খাবে না, রোগ হলে কোনো চিকিৎসার দিকেই মোটে ঘেঁষবে না। রোগ হয়েছে, না হয় দুদিন একটু কষ্টই পাবো, তারপর আপনিই সেরে যাবে, তার জন্যে গুচ্ছের ওষুধ খাবো কেন, আর ডাক্তার বদ্যির হুকুম মেনেই বা চলবো কেন? যুক্তি হিসাবে তারা এই ধরণের কথাই বলবে, কিন্তু তলে তলে তার মূল কারণ রয়েছে হয়তো। একটা বিভীষিকা বা কুঁড়েমি, কিংবা ফোঁড়া-ফুঁড়ির ভয়, কিংবা কুপথ্য বা নেশার জিনিস ছাড়বার ভয়, কিংবা পয়সা খরচের ভয় ইত্যাদি সেখানে নানারকমের ভিতরকার মনস্তত্ব। পাছে ডাক্তার দেখাতে হয়, ওষুধ খেতে হয়, এই ভয়ে রোগকে তারা লুকিয়ে রাখে, বাড়ির কাউকে জানতে দেয় না। হাজার কষ্ট পেতে থাকলেও বলে ওকিছু নয়। এর ফলে তারা অনেক সময় নিজেদের মহা বিপদ ডেকে আনে, কারণ সামান্য রোগ কোনো বাধা না পেয়ে হঠাৎ অসামান্য হয়ে ওঠে, তখন সেই অতিবিলম্বে অব্যর্থ রকমের চিকিৎসাও ব্যর্থ হয়ে যায়। আর যদিও তা নাই বা হোলো ব্যর্থ, তবু কিন্তু বিলম্বিত চিকিৎসা সার্থক হলেও রোগের শেষ ফলটা অনিষ্টকারী। তার কারণ, চিকিৎসার আগের থেকে রোগে যতখানি ক্ষতি করে ফেলে, চিকিৎসা করিয়ে সে রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেলেও তখন আগেকার ক্ষতিটির পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কতই উদাহরণ নিত্য পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কেবলই সময়মত চিকিৎসার অভাবে শরীরের কোনো একটা অঙ্গ চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। কত শত অন্ধ মানুষকে আপনারা দেখতে পান, যাদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মান্ধ নয়, ছেলেবেলাতে হয়েছিল হয়তো সামান্য রকমের চোখের অসুখ, কিন্তু সময়মত চিকিৎসার অভাবেই তারা অমনি সারা জীবনের অন্ধত্ব নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। একটি লোকের ধনুক ভাঙা পণ ছিল, কিছুতেই সে কুইনিন খাবে না। কুইনিন বা ঐ ধরণের কোনো ওষুধ খাওয়া তার মতে বিষ খাওয়ার সঙ্গে সমান, খেলেই তার মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। অথচ বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামে নিত্য যাতায়াত আছে, অতএব মাঝে মাঝে তার ম্যালেরিয়া হয়। তবু কুইনিন ইত্যাদি সে কোনোমতেই

খায় না, শিকড় বাকড় খেয়ে প্রত্যেক বারেই অনেক কাল পর্যন্ত ভুগে অনেক কষ্টে সেরে ওঠে। হঠাৎ একবার হোলো তার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ঠিকমতো ওষুধ না পড়াতে সে রোগ মস্তিষ্ক আক্রমণ করলে। তবুও কুইনিন খাবে না, জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে বলতে লাগলো, খবরদার যেন আমাকে কুইনিন টুইনিন দেওয়া না হয়। যখন সে নিতান্তই জ্ঞানহারা অবস্থায় হাত পা খেঁচতে শুরু করেছে, তখন তাকে অগত্যা সেই কুইনিন ইনজেকশনই দিতে হোলো। তার ফলে রোগটা তার সেরে গেল বটে, কিন্তু মাথাটা গেল বিগড়ে। সেই বিকৃতি নিয়ে সে আজও বেঁচে আছে, জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁকা বাঁকা কথা বলে, আর অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে থাকে। তবু তার ধারণা কুইনিনেই তার ঐ সর্বনাশ হয়েছে।

কিন্তু চিকিৎসায় অবহেলা করলে কেবল যে তাতে নিজেরই অনিষ্ট হবে, অন্য কারো তাতে কোনো ক্ষতিই নেই, এমন ধরণের কথা মনে করাও আর এক মারাত্মক ভুল। নিজের শরীরে রোগ হলে কেবল যে তাতে নিজের সম্বন্ধেই একটা দায়িত্ব আসে তা নয়, সেই সঙ্গে অপর পাঁচজনের সম্বন্ধেও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে। অধিকাংশ রোগই এমন সোজা জিনিস নয় যে, শুধু তোমার অনিষ্টটুকু করেই ক্ষান্ত হয়ে থাকবে। শতকরা প্রায় আশি রকমের রোগই হোলো সংক্রামক, সুতরাং তোমার হলেই তার থেকে সেটা তোমার বাড়ির অপর পাঁচজনের হতে পারে; তোমার পাড়ার পাঁচজনের কি দেশের পাঁচজনের হতে পারে। নিজেকে তুমি যেমন খুশি বিপদে ফেলতে পারো, তাতে কারো কিছু বলবার নেই, কিন্তু অন্য কাউকে বিপদে ফেলবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নেই। এই কথাটাই আজকালকার দিনে প্রত্যেকের পক্ষে খুব ভালোরকম ক'রে বুঝে রাখা দরকার। আজকাল কে-না জানে যে, যক্ষ্মা রোগটি এখন যেন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন করে এরোগের এতটা ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হচ্ছে? অনেকটাই আমাদের ব্যক্তিগত অযত্নে, অবহেলায়, অমনোযোগে। কারো হয়তো অল্প জ্বর হতে লাগলো, কাসি হতে লাগলো, সেটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। দুচার মাসেও যখন সারলো না, তখন ডাক্তার দেখালে হয়তো দু একবার, রীতিমত চিকিৎসা হ'তে শুরু করলে তারও অনেক কাল পরে। তাতে রোগ তার সারলো কি না সারলো, সেটা পরের কথা, কিন্তু ততদিনে রোগের বীজ সে চতুর্দিকে বিস্তর ছড়িয়ে বেড়ালে, জেনে কিংবা না জেনে নিজের অনিষ্টের চেয়ে পরের অনিষ্টই সে অনেক বেশি করলে। এমনিই তো হয়ে চলেছে আজকাল সাধারণভাবে। যদি গোড়া থেকেই চিকিৎসা ক'রে রোগটাকে সে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতো, তাহ'লে নিশ্চয়ই আরো পাঁচজনের তাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো। সুতরাং নিজের জন্যে না হলেও পরের মঙ্গলের জন্যে সময়মতো চিকিৎসা করানো বিশেষ দরকার। কেবল যক্ষ্মার বেলাতেই নয়, সকল রকম সংক্রামক রোগের বেলাতেই এই কথা।

আবার অন্যদিক দিয়ে একদল অতিবাচক বাতিকগ্রস্ত প্রকৃতির মানুষ আছে, যারা রোগ না হলেও নিয়মিত ওষুধ খায়, ওষুধ খেলে আর রোগ মোটে হ'তেই পারবে না। এই ভেবে নিত্য নিত্য কিছু ওষুধ খায়। বলা বাহুল্য যে, চিকিৎসা ব্যাপারের মধ্যে দুটো দিক আছে। একটা হোলো ডাক্তার কবিরাজ দেখানো, আর একটা হোলো ওষুধ খাওয়া প্রভৃতির দ্বারা যথারীতি চিকিৎসার প্রয়োগ করা। এর মধ্যে প্রথমটাতে অর্থাৎ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করানোতে কখনই কোনো আপত্তি নেই, এমনকি রোগ না হলেও পরীক্ষা করানোতে দোষ নেই, কিছুমাত্র সন্দেহ হলেই সেটা করিয়ে নেওয়া খুব ভালো কথা। যদি নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, কোনো রোগ নেই, সে তো খুবই আনন্দের বিষয়। আর সামান্য কিছু হয়ে থাকলেও গোড়াতেই তাকে নির্মূল করা যায়। সুতরাং যারা কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজকে দিয়ে পরীক্ষা করায়, তারা সেটা নিতান্ত মন্দ কাজ করে না। কিন্তু যারা চিকিৎসার বিদ্যাটা জানে, তাদের মধ্যে কাউকে না দেখিয়ে নিজের রোগ নিজেই চিনে নিজেই তার ওষুধ ঠিক করে নিয়ে কিংবা শরীর ভালো রাখতে একটা কিছু ওষুধ খাওয়া দরকার ভেবে নিজের আন্দাজে যা হোক একটা পেটেন্ট দাওয়াই বেছে নিয়ে তাই নিয়মিত খেতে থাকা, একে কখনো চিকিৎসা বলা চলে না, একে বলে ওষুধ খাওয়ার বাতিক। এটা খুবই খারাপ জিনিস। নিত্যই ওষুধ খেতে থাকলে ওষুধ খাওয়ার এমন একটা ধাত জন্মে যায়, ঠিক যেমন আফিম খাওয়ার মতো। আর তখন সত্যিকার কোনো রোগ হলে ওষুধজাতীয় জিনিসে তেমন কাজও করে না। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে এইটুকু আদর্শ থাকা চাই যে, রোগ হলে তৎক্ষণাৎ তার উপযুক্ত চিকিৎসা করাবো। সেই পক্ষে যখন যা দরকার হবে, তখন তাই মেনে নেবো। নিজের ব্যবস্থা নিজে করবো না, আর ডাক্তার বদ্যির চিকিৎসার কোনো রকম বিধিতে কিছুমাত্র আপত্তি করবো না। কিন্তু যখন কোনো রোগ নেই, তখন কোনো চিকিৎসারই দরকার নেই। সুতরাং কোনো ওষুধ খাবার দরকার নেই, তখন মেনে চলবো শুধু স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলি। যাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যাতে রোগ নিবারণ হবে, যাতে রোগকে প্রতিরোধ করবার শক্তি বাড়বে, সেই ধরণের কাজ নিশ্চয় করবো। কিন্তু দরকার না হলে খামকা ওষুধ খেতে যাবো কেন, ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ? ব্যাধিত লোকের পক্ষে ওষুধই হোলো পথ্য, কিন্তু নীরোগ লোকের পক্ষে ওষুধের কি দরকার? এটি শাস্ত্রবাক্য, বাদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই এটি মেনে চলা উচিত।

ফ্যাশন

পূর্ণিমা সরকার

সেদিন এক আত্মীয়ার বিয়েতে দেখলাম তার একজন বান্ধবী কতকগুলি প্রসাধন সামগ্রী উপহার দিয়েছেন আর তার সঙ্গে এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়েছেন—"তোমার কমনীয় রূপকে রমণীয় করে তুলতে এইগুলি দিলাম।" কথাটি আমার বেশ পছন্দ হলো। কাগজের টুকরোটি আর একবার পড়লাম সেই সঙ্গে প্রসাধন দ্রব্যগুলির দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম কি কি জিনিস আছে। ঐগুলোর মধ্যে স্নো, পাউডার ছাড়া কতকগুলি জিনিস আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—রুজ, লিপস্টিক, আই পেনসিল, নেল পলিশ। মেয়েটির রূপ কতখানি কমনীয় ছিল বলতে পারি না। ঐগুলির সাহায্যে তার রূপকে সত্যই কিছু রমণীয় করে তোলা সম্ভব হবে কিনা তাহা বলতে পারি না।

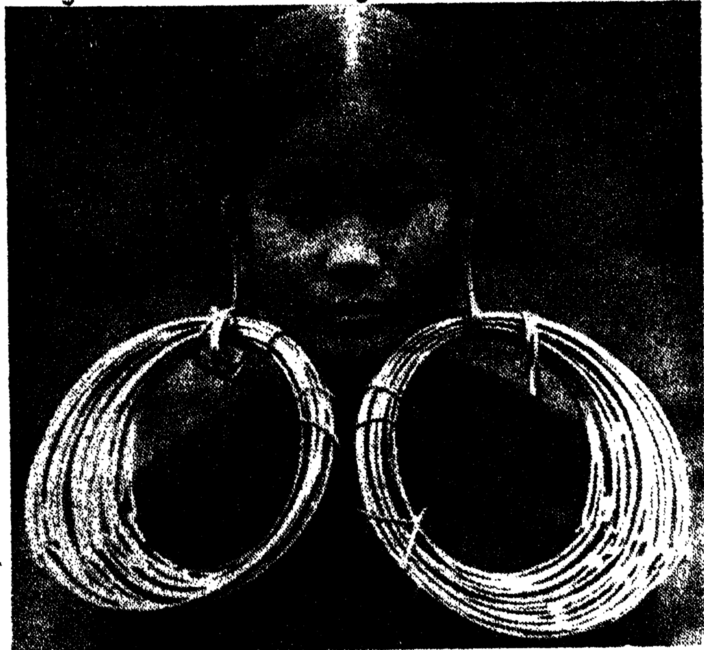
প্রসাধন দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য যে, কিছুটা বাড়ান যায় একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে খোদার ওপর খোদকারী করার কথা আমি বলছি না। প্রসাধনে যে সৌন্দর্য বাড়ে তা ক্ষণিকের; কিন্তু ক্ষণিকের আনন্দটকুই বা উপভোগ করবো না কেন? যদি রুচিমত সাজসজ্জা করা যায় তাহলে সত্যই সুন্দর হওয়া যায়। কিন্ত পথে ঘাটে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রুচির বিকার আমাদের চোখে পড়ে। ভাল সাবান মেখে স্নান করে পরিষ্কার শাড়ী পড়ে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে, কপালে একটি টিপ পরলে স্বাভাবিক রূপকে সত্যই রমণীয় করে তোলা যায়। তবে এই শাড়ী পড়া, টিপ পড়া, চুল আচড়ান ইত্যাদির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। এই সাজসজ্জা ফ্যাশন-সঙ্গত করতে হলেই রুচির বিকৃতি ঘটে।

ফ্যাশন কথাটির অর্থ কি? ইংরাজীতে বহু শব্দ আছে যার ঠিক বাঙলা প্রতি শব্দটি এক কথায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্যাশন কথাটি এদের মধ্যে অন্যতম। অভিধান খুললে অবশ্য একটা মানে পাওয়া যায়—"প্রচলিত প্রথা।" এর দ্বারা কিন্তু এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, "ফ্যাশন" চিরাচরিত প্রথা নয়। কোনও লেখক এটাকে লোকাচারের নেশা বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের নজিরটা পড়লে মানেটা খুব অসংগত মনে হয় না।

একবার ইংলণ্ডের যুবরাজের পত্নী কোনও এক মহতী সভায় আহূতা হন। তাঁর পায়ে সেদিন একটু ব্যথা হয়েছিল তাই তাকে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয়। যথাসম্ভব সোজা হবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু খোড়ান ভাবটি কিছুতেই যায়নি, তাই দেখে সেদিনকার সভার মহিলা সভ্যাগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, একটু বেঁকে বেঁকে অর্থাৎ লতিয়ে লতিয়ে চলাই বুঝি আজকালকার ফ্যাশন। সেইদিন থেকে মেয়েরা কোথাও যেতে হলে একটু বেঁকেই চলতেন।......আর একটি সভায় ফরাসী দেশের কোনও এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তার টুপিতে একটি টুনটুনি পাখী লাগিয়েছিলেন; তারপর থেকেই ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে "আনটুনটুনি", "ধরটুনটুনি", "মার টুনটুনি" রব উঠল। ফলে ফসলের ফলন খুব কম হলো। কারণ ধান, যব ইত্যাদি ফসলের গায়ে এক রকম পোকা হয়। টুনটুনি পাখীরা সেই পোকাগুলি খেয়ে ফেলে। সুতরাং দেশের টুনটুনি যত মরতে লাগলো ফসলও তত নষ্ট হতে লাগল। তখন রাজা বাধ্য হয়েই "টুনটুনি রক্ষা আইন" প্রণয়ন করলেন।

এইখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। ফ্যাশন কথাটি যেন মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার। ফ্যাশন কথাটি শুনলেই মনে হয় এ যেন মেয়েলী কথা। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হয় তার মধ্যে বেশীর ভাগ পত্রিকাই মহিলা পরিচালিত। এই বৈশিষ্ট শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশী কাগজগুলিতেও এটা লক্ষ্য করা যায়। তবে ছেলেরা যে একেবারেই ফ্যাশন করেন না তা নয়। পথে ঘাটে অনেক ফ্যাশন দোরস্ত ছেলেও চোখে পড়ে। তাদের ফ্যাশন চুলের ছাঁট, গোফের কাট, সার্টের কফ, পাঞ্জাবীর ঝুল ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। বড়ুয়া পাঞ্জাবী, আমেরিকান কফের সার্ট আজকালকার ফ্যাশন বলেই চলছে। আজকাল গোঁফ কামিয়ে ফেলা নিতান্ত পক্ষে কেটে ছেঁটে ছোট্ট করে নাকের তলায় একটুখানি "বাটার ফ্লাই" গোঁফ রাখাই ফ্যাশন। এমন একদিন ছিল যখন গোঁফ রাখা একটা ফ্যাশন ছিল। স্ট্যালিনের গোঁফের কথা আমরা সকলেই জানি। এই রকম গোঁফ রাখা যেকালে ফ্যাশন ছিল সেকালে জনৈক কৌরের গোঁফ ছিল সাড়ে সাত ইঞ্চি।

ফ্যাশন আর স্টাইল এক নয়। "শেষের কবিতায় অমিত বলেছে—"ফ্যাশনটা হলো মুখোশ আর স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। অমিতের নেশা হলো স্টাইলে। পাঁচজনের মধ্যেও কোনও একজন মাত্র নয়, ও হলো একেবারে পঞ্চম।"



কানে এ রকম গহনা পরাও ফ্যাশন

এই পাঁচজনের একজন হওয়াটাই হ'লো ফ্যাশন। ফ্যাশন কথাটি বড় একটা একক ব্যবহার করতে দেখা যায় না। এর সঙ্গে "আধুনিক" কথাটি জুড়তেই হয়। "আজকাল-কার ফ্যাশন" বা "আধুনিক ফ্যাশন" কথাটির চলনই বেশী। আজকাল সকলে এই রকম চলে তাই আমি চলি সকলে এই রকম করে তাই আমিও করি; এই হলো ফ্যাশনের মূল কথা। সকলের সঙ্গে পা ফেলে সমান তালে চলাই ফ্যাশন। অনেক সময় অবশ্য এই ফ্যাশনের গড্ডলিকা প্রবাহে দেশ ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি ফ্যাশন চিরাচরিত প্রথা নয়। ঋতুচক্রের আবর্তনের মত এ ধরার বুকে নিত্য নূতন রূপে দেখা দেয়। আজকাল খুব তাড়াতাড়ি ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়। আগেকার কালে এত দ্রুত ফ্যাশন বদল হতো না। বর্তমান জগতের প্রগতি পরায়ণতাই এর কারণ। বৈজ্ঞানিক যুগে একের সঙ্গে অন্যের একদেশ বা এক জাতের সঙ্গে অন্য দেশ বা অন্য জাতের ভাবের আদান প্রদান দ্রুত সম্ভব হয়; এই কারণে এক দেশের হালচাল অন্য দেশে খুব সহজেই প্রবর্তিত হয়। এই জন্য আজকাল যে শুধু দেশী ফ্যাশনের প্রচলন দেখা যায় তা নয়, বিদেশী ফ্যাশন খুবে বেশী দেখা যায়। আজকাল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সালওয়ার পাঞ্জাবী ব্যবহার করেন, কারণ এই রকম পোষাক পরা আজকালকার ফ্যাশন। ছেলেরাও সেরওয়ানী চোস্ত কিংবা গুজরাটি প্যাটার্ণের পাঞ্জাবী পারজামা পড়া ফ্যাশন মনে করেন। আগেকার কালে আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা ছিল খুব বেশী। তখন একটি পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে অন্য একটি পরিবারে মেয়েদের খুব কমই দেখা সাক্ষাৎ ঘটতো সেইজন্য ফ্যাশনের দ্রুত পরি-বর্তন সম্ভব হতো না। তখনকার কালে এক একটি পরিবারের এক একটি ফ্যাশন প্রায় tradition (ঐতিহ্য) হয়ে উঠতো। এক একটি পরিবারের পোষাক তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট কারিগর অর্থাৎ দর্জি থাকতো আর সেই হতো পরিবারের "ফ্যাশনবেল পোষকের" প্রবর্তক। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"নতুন পোষাক বলে প্রায়ই একটা লোক অদ্ভুত অদ্ভুত পোষাক আনতো আর হৈ হৈ পড়ে যেত। লোকটাকে দেখলে রাগ হতো। মনে আছে এই জবড় জঙ্গ পোষাক দেখে দেখে যখন চোখ হাঁপিয়ে উঠেছে তখন একদিন শিয়ালদা স্টেশনে দেখি সাদা রং-এর কালো পেড়ে শাড়ী পড়ে একটি মেয়ে চলেছে। মুখের চারিদিকে কালো রংএর ফ্রেম করে আছে সাদা করে পড়া শাড়ী দেখেই মনে হলো এ কত ভাল, কত ভাল।"

সেকালের শিশু রবীন্দ্রনাথের চোখে যা কত ভাল লেগেছিল আজকাল এই রকম "কত ভাল" মেয়েরা নিজের চোখেই প্রায় দেখেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েরা তো আর পর্দার আড়ালে থাকেন না। ট্রেনে ট্রামে বাসে দেশে বিদেশে নিয়তই যাতায়াত করত হয় ফলে ফ্যাশনের পরিবর্তন হয় দ্রুত।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় ফ্যাশনের মূল উদ্দেশ্য নিজের রূপকে রমণীয় করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ মানুষ চিরকালই সৌন্দর্যের উপাসক। আগেই বলেছি ফ্যাশন মুখ্যতঃ নারী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও আমাদের সমাজ পুরুষের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জীবন যুদ্ধে নারীর পক্ষে পুরুষের সাহায্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিধির বিচারে পুরুষ জাতি সুন্দর। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও পুরুষ জাতি স্ত্রী জাতি অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী। সেই কারণে স্ত্রী জাতি স্বতঃই পুরুষ জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রী জাতিকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তোলা হয়। এই জনাই কবি বলেছেন—কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে নয় নিজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সকলেরই মনোগত ইচ্ছে থাকে। ছোট শিশুর মধ্যেও এই ইচ্ছের বিকাশ দেখা যায়। ছোট ছেলেরা যখন নিজের মুখে এক গাদা পাউডার মেখে ভূত সেজে বসে কিংবা সাজতে গিয়ে এক কৌটা পাউডার ঘরে ঢেলে বসে থাকে তখন আমরা এটাকে নিছক দুষ্টুমি বলেই মনে করি, কিন্তু এর মূলেও আছে ঐ রূপ চর্চা এবং নিজেকে অন্যের দৃষ্টি পথে তুলে ধরা শুধু রূপ চর্চাই ফ্যাশনের একমাত্র কারণ নয় এর সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা আছে যুগের থেকে পিছিয়ে না পড়ার ঐকান্তিক চেষ্টা।



আফ্রিকার মেয়েদের বড় বড় ঠোঁট সৌন্দর্যের উপাদান বিশেষ

সভ্য-অসভ্য সমাজ নির্বিশেষে ফ্যাশনের প্রচলন আছে। সমাজ ভেদে, দেশ ভেদে ও যুগ ভেদে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশনের তারতম্য ঘটে। এক দেশ বা এক যুগের ফ্যাশন অন্য দেশ বা অন্য যুগে হাসির খোরাক যোগায়। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও মেয়েদের গোলাপী আভাযুক্ত পাতলা ঠোঁট সৌন্দর্যের আধার মনে হয়, কিন্তু আফ্রিকায় মেয়েদের বড় বড় ঠোঁট সৌন্দর্যের উপাদান বিশেষ। এই ঠোঁট বড় করার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি নেই। বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত এদের ঠোঁট এত বড় হয় যে, সাধারণের চোখে শুধু যে বিশদৃশ লাগে তা নয় বিভৎস লাগে। আগেকার কালে চীন দেশীয়গণ তাদের দেশের কোনও রমণীর পদতল ছোট না হলে তাকে সুন্দরী বলেই মনে করতেন না। যাতে পা বড় না হয় এই জন্য চৈনিক রমণীগণ বাল্যকাল থেকেই এক রকম লৌহ পাদুকা ব্যবহার করতেন। কারণ ছোট পা তখনকার অভিজাত শ্রেণীর নারীদের ফ্যাশন ছিল। অতি পুরাকালে গহনার ফ্যাশন ছিল না। তখন মানুষের অঙ্গের শোভাবর্দ্ধনের জন্য দেহে নানা রকম চিত্র বিচিত্র আঁকার ফ্যাশন ছিল। এখনও কোনও কোনও দেশে বিশেষ করে উড়িষ্যাতে এই উল্কি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এককালে ভারতবর্ষেই মেয়েরা কানে এক সঙ্গে ছটা মাকড়ি, হাতে পায়ে রতন চুড়, মাথায় ঝাঁপটা নাকে নথ ইত্যাদি অষ্টাঙ্গে গহনা পরে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি সাধন করতেন। বর্তমানে বোধ করি অর্থনৈতিক কারণেই এই সব গহনা থেকে সংক্ষতর হতে চলেছে। তবে আফ্রিকায় আজও কানে নানা রকম মাকড়ি পরার ফ্যাশন আছে। আগেকার কালে ফরাসী দেশের মেয়েদের মধ্যে খুব ঝুলওয়ালা স্কার্ট পরা ফ্যাশন ছিল। সূর্যের তাপ লাগাবার জন্য এক সময় এর বহর কমতে থাকে এবং কমতে কমতে প্রায় অর্ধ নগ্ন থাকাই ফ্যাশন হলো। স্নানের পর চুল শুখান সম্ভব হয় না বলে ওদেশে মেয়েরা ছোট করে চুল ছাটেন অর্থাৎ বব করা সিঙ্গেল করাই ফ্যাশন। এই সব বিদেশী ফ্যাশন ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হলে সত্যই চক্ষু পীড়াদায়ক হয়। যে দেশে ও যে আবহাওয়ায় যেটি অস্বাভাবিক তাকেই স্বাভাবিক করে তোলা ফ্যাশনের একটি অঙ্গ। অর্থাৎ নকলকে

রূপ দেওয়া হলো ফ্যাশন। আমাদের দেশের গায়ের চামড়ার রং হয় শ্যামল না হয় বাদামী, তাই স্নো-পাউডার চর্চিত করে তাকে ফর্সা করাই ফ্যাশন। ওদের দেশে আবার রৌদ্র স্নান (sunbath) করে চামড়াকে তামাটে করা এক ফ্যাশন।

সাধারণতঃ ফ্যাশনের প্রবর্তন হয় অভিজাত শ্রেণী থেকে। অভিজাত শ্রেণীর কোনও মাপ-কাঠি নেই। যার যত পয়সা সেই নিজকে তত অভিজাত বলে মনে করে। সেই কারণে সাধারণতঃ শাসক সম্প্রদায়ই অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হন। তাই আমাদের দেশে মুসলমানদের আমল থেকেই চোখে সুর্মা, গায়ে আতর দেওয়ার চলন হয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগে বাঙালী মেয়েরা শাড়ীর আঁচল মাথায় তুলে না দিয়ে আলাদা "ভেল" ব্যবহার করতেন। বর্তমানে কি কারণে জানি না সালোয়ার পাঞ্জাবী ও ওড়নার ফ্যাশন হয়েছে। এরপর এলো সিনেমার যুগ। এখন শাড়ীর পাড় টিপের কায়দা সিনেমা তারকাদের নির্দেশ মতই হয়। মনোনমালা শাড়ী, ভাগ্য-চক্র ব্লাউজ, কাননবালা টিপ ইত্যাদি আজকাল-কার ফ্যাশানের জিনিস।

আগেই বলেছি প্রসাধনকে ফ্যাশন সংগত করতে গেলেই রুচির বিকার ঘটে। সাজসজ্জা সব সময় রুচিকর হওয়া দরকার। ছোট ছোট মেয়েদের রঙীন শাড়ী পড়লে বেশ দেখায়। রঙীন শাড়ী পড়ে লঘু পদবিক্ষেপে স্কুলের মেয়েরা যখন দল বেঁধে যায় তখন মনে হয় যেন একদল প্রজাপতি চঞ্চল ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে এই রঙীন শাড়ী সম্বন্ধে সকলেরই একটু সচেতন হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে সকলকে যে সব রঙের শাড়ী মানায় না একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে। অনেকে এই কথা সহ্য করতে পারেন না, মনে করেন তাদের গায়ের রংএর প্রতি বুঝি কটাক্ষ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে পথে ঘাটে বার হতে হলে খুব উগ্র রংএর শাড়ী সকলের পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া ভাল। তবে নিমন্ত্রণ অথবা পার্টিতে যাওয়ার কথা আলাদা, যাদের গায়ের রং শ্যামল তারা যদি হাল্কা রংএর শাড়ী ব্যবহার করেন তাহলে তাদের চামড়ার উজ্জ্বল্যই প্রকাশ পায়। অথচ চড়া রংএর শাড়ীতে তাদের বেশী করে কালো মনে হয়। সাদা শাড়ী অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েদের সব সময় সকলেকই ভাল লাগে। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলাম—

বাঙলাদেশের মেয়েদের শাড়ী প্রায় সর্বদাই সাদা। সাদাটাই প্রধান রং, মাঝে মাঝে যে এঁরা ঝকমকে রং লাগান না তা নয়, সে একটা সৌখীন বাহার; কিন্তু যে রংটা দেশের রং সে সাদা অথচ কাথিওয়াড় রাজপুতানার স্ত্রীলোকদের ঘাগরা দেখে আশ্চর্য হয়ে দেখতুম সাদা কাপড় চোখেই পড়ত না। সব কড়া কড়া রং, সবুজ লাল কখনও পড়তে দেখিনি। ওদের মরু-ভূমির দেশ কিনা প্রকৃতিতে রং নেই চোখ তাই রংএর জন্য তৃষিত হয়ে থাকে। রঙীন ঘাগরা, রঙীন ওড়না, আর মাথার ওপর সারি সারি কলসীতে জল। তাই ভাবলুম, যেমন কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য জল নিয়ে আসে, তেমনি চোখের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য বইএ দিয়েছে রংএর ঝরণা। কিন্তু আমাদের বাঙলা দেশ প্রকৃতিই



আফ্রিকার মেয়েদের উল্কি অঙ্গ শোভা বাড়ায়

যে রঙীন, তার ঘন শ্যামলের মাঝখানে সাদা রঙের কালো পাড়টি যেমন মানায় এমন আর কিছুতেই নয়।"

ঐ সৌখীন বাহার হিসাবে রঙীন শাড়ী যে একেবারে অচল তা নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকেই এক-খানা লাল রংএর শাড়ীর সংগে একটা নীল বা সবুজ রংএর ব্লাউস গায়ে চড়িয়ে বসে আছেন। এতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয় সত্যি, তবে সুরূপ বা সুরুচির জন্য নয়। রংএর এই অপূর্ব সমবেশেই সকলের মাথা ঘুরিয়ে দেয় তার দিকে। এতে স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকুও ঢাকা পড়ে এই রংএর ঝলমলানিতে।

আগেকার দিনে মেয়েরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধতেন। বিশেষ করে চীন ও জাপানের মেয়েরা চুলের ওপর অনেক রকম ফ্যাশন করেন। হাইনান দ্বীপের মেয়েরা খোঁপার সংগে এক টুকরো ষাঁড়ের পাঁজরার হাড় আটকে রাখতেন। আমাদের দেশের মেয়েরাও অনেক কেয়ারী করে চুল বাঁধতেন। চুলের সামনের দিকে "নেপোলিয়ান" ঢং-এ পাতা করার ফ্যাশন অল্পদিন আগেই ছিল। আজকাল বোধ হয় "এ্যালবার্ট" করে চুল বাঁধা ফ্যাশন। অত সব ফ্যাশন না করে চুলের মাপে একটা সিঁথি করে চুলগুলো পেছনে ঠেলে আল্গা করে বেণী করলেই বোধ করি সবচেয়ে ভাল দেখায়। অবশ্য বড় বড় মেয়েদের আল্গা একটা খোঁপাতেও বেশ দেখায়। স্কুল কলেজের মেয়েদের বোধ হয় পিঠের ওপর বেণী দুলিয়ে দিলেই আধুনিকতম ফ্যাশন হয়।

"বেণী দুলিয়ে চলেন যিনি
ঐ আধুনিক বিনোদিনী।"

বেণী দোলাবার অছিলায় অনেকে আবার দু-পাশে দুটো বিণুনী ঝুলিয়ে দেন। স্কুলের ফ্রকপরা মেয়েদের ছোট ছোট চুলে দুটো বিনুনীতে বেশ দেখায় সত্যি, কিন্তু বড় বড় মেয়েদের লম্বা লম্বা চুলে দুটো বিনুনী যে খুব বেশী শোভা বাড়ায় না, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করবেন।

এরপরে টিপ পরার কথা বলা যায়। আজ-কাল টিপ পরার পাট অনেকেই উঠিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে তাঁদের কপালের মাপ অনুযায়ী ছোট্ট একটি টিপ পরেন; তাতে মুখশ্রী সত্যই বেড়ে যায়। কিন্তু অনেকে যখন আধুলি বা টাকা পরিমাণ একটি টিপ কপালে চড়িয়ে বসেন, তখন তাঁর মুখচন্দ্রিমাকে রাহু-গ্রস্তই মনে হয়। আজকাল আবার গোল টিপের যুগ চলে গিয়ে বাদামী টিপ পরা ফ্যাশন হয়েছে। যাঁদের মুখের গঠন একটু লম্বাটে অর্থাৎ পানের মত তাঁদের এই ধরণের বাদামী টিপ পরলে খারাপ দেখায় না। কিন্তু দু' এক-জনের দেখাদেখি সকলেই যদি এক ফ্যাশন করতে থাকেন, তাহলেই মুশকিল। বিশেষ করে এই বাদামী টিপ ঠিকমত আকতে না পেরে কুম-কুম দিয়ে যখম লম্বামত একটা তিলক কেটে দেন, তখন দেখলে মনে হয় যেন কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। এই রক্তক্ষরা মহিলার রূপ কতখানি কমণীয় হবে, তা সহজ অনুমেয়।

রক্তের প্রসঙ্গ আসাতে আরও দুটি কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েদের হাতের নখে কিউটের লাগান এবং ঠোঁটে রং লাগানোর কথাই বলি। যাঁদের নখের ব্লেডগুলো বড় বড় তাদের নখে অল্প গোলাপী রঙ-

এর "নেল-পলিশ" লাগালে বেশ স্বাভাবিক মনে হয় আর দেখতেও ভাল লাগে। কিন্তু যাঁদের নখের রেড ছোট, তাঁরা যদি এই নোখ আঙুলের মাথা থেকে বাড়িয়ে সুচল করে, চাঁপার কলির আকার দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বেশ খানিকটা ক্ষুন্ন হয়। এই রকম সুচল এবং ধারাল নখে যদি খানিকটা লাল নেল-পলিশ মাখান হয়, তাহলে ঠাকুরমার ঝুলির "রক্তখাকী রাক্ষসীদের" কথাই মনে করিয়ে দেয় না কি? আর এর সঙ্গে যদি ঠোঁটে বেশ টকটকে করে খানিকটা লিপস্টিক লাগান যায়, তাহলে সত্যই 'নরখাদক' মনে হবে। অবশ্য খুব ফিকে করে ঠোঁটে একটু গোলাপী রং দেওয়াটা মোটেই খারাপ নয়। কারণ ঠোঁটের গোলাপী রং সৌন্দর্যের একটি অঙ্গবিশেষ। এই ঠোঁটকে রক্ত রং বিম্বোষ্ঠ করে তোলাতেই আপত্তি।

প্রথমেই বলেছি যে, স্নো পাউডার মাখলে মুখের শ্রী বাড়ে, কিন্তু এই স্নো পাউডার মাখার নামে "এনামেল" করলেই কদর্য রূপ গ্রহণ করে। আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকেই অঙ্গরাগের ব্যবহার চলে আসছে। পুরাকালে যে সব অঙ্গরাগ ব্যবহার হোত, তা প্রকৃতিজাত ছিল। তখনকার কালে চামড়া মসৃণ রাখার জন্য ইউ এস এ-র পন্ডস গ্রেট-বৃটেনের হেজলিন ইত্যাদির আমদানী হতো না। স্নানের আগে দুধের সর মেখে স্নানের সময় মুশুরীর ডালবাটা বা খোল দিয়ে অঙ্গ মার্জনা করলেই চলত। স্নানের শেষে চন্দনবাটা মাখারও প্রচলন ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায়, গ্রীকরাজ নীরোর মহিষী গাধার দুধ সহযোগে স্নান করতেন। ভারত-সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের স্নানের চৌবাচ্চায় বেল ফুল ফেলে রাখা হতো। এই সব ফ্যাশন আজকাল উঠে গেছে।

এসব ছাড়া আজকাল গহনার ফ্যাশনও অনেক রকম দেখা যায়। প্রথমেই বলেছি, ফ্যাশন ঋতুচক্রের মত আবর্তিত হয়। বর্তমানে গহনার ফ্যাশনের মধ্যে পুরাকালের মত চুড়, তাবিজ, কাণবালা ইত্যাদির ফ্যাশনের প্রচলন হয়েছে। কটকি কাণবালা, ভাটিয়া চুড়ি, মাদ্রাজী নেকলেশ ইত্যাদির ফ্যাশন তো আছেই।

ফ্যাশনের মূলমন্ত্র হচ্ছে স্বাস্থ্য। নিজেকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যদি ফ্যাশনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সুগঠিত স্বাস্থ্য রক্ষা করাই ফ্যাশনের গোড়ার কথা বলে মেনে নিতে হয়। কোনও সুমার্জিতা হীনস্বাস্থ্য সুন্দরী মেয়ের চেয়েও একটি প্রাণচঞ্চল কালো সাঁওতাল মেয়ে যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, তা যাঁরা সাঁওতাল পরগণার দিকে গেছেন, [illegible] বাহুবল্লরী

তাদের চলার ঠমক আমাদের তাক লাগায়। একটি হাস্য-লাস্যময়ী স্বাস্থ্যবতী নারী যতই কালো হোক আর যতই অসজ্জিতা হোক না কেন, সুসজ্জিত হীন-স্বাস্থ্য মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এইজন্য ফ্যাশন করতে হলে স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাই উচিত।

বর্তমানে বিদেশাগত অঙ্গরাগগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য নানারকম রোগ এই কারণে খুব বেশি হয়। ডাঃ কোয়ান চর্মরোগ হতে দেখা যায়।

রূপ ও স্বাস্থ্যের কথা বাদ দিলেও ফ্যাশন করতে আর একটি বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। পূর্বে ফ্যাশন সীমাবদ্ধ ছিল বিত্ত-শালী মেয়েদের মধ্যে। বর্তমানে প্রতি ঘরেই ফ্যাশনের প্রচলন দেখা যায়। এইভাবে ফ্যাশনের জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় পরিবারের বহু ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে স্মরণ রাখা উচিত যে, ফ্যাশনের জন্য আমরা যে সব জিনিস ব্যবহার করি, তা প্রায় সমস্তই বিদেশাগত, ফলে আমাদের বহু অর্থ বিদেশে চলে যায়।

হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠেয় দশটি সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সংস্কারটিকে প্রধান বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ, অনেকগুলি সংস্কারের অনুষ্ঠান ত এখন এক এক করে, সমাজ থেকে একেবারে উঠে গেছে। এমন কি উপনয়ন পর্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণ-কুলে আর অনুষ্ঠিত হয় না, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুলে ত দূরের কথা। কিন্তু বিবাহটা আজ পর্যন্তও সমাজে টি'কে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে ভরসা হয়; অন্তত আমাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত।

মনু বলেছেন, বিবাহ আট প্রকার। এইখানেই হয়ত আপনারা আমাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। আশ্চর্য হয়ে বলবেন, াহ আট প্রকারের? এ আবার কি কথা? মরা ত বরাবরই জানি, বিবাহ ত মাত্র একই ারের। বর টোপর মাথায় দিয়ে ক'নের বাড়ি । সেখানে পুরুত দুটো মন্ত্র পড়ায়। নের বাপ আরও দুটো মন্ত্র পড়ে, বর-ক'নের হাত এক করে, কন্যা সম্প্রদান করে দিলেই বিয়ে হয়ে গেল। এতে আবার প্রকার ভেদ ' রকম? তবে হ্যাঁ, বিবাহের সঙ্গে যে ওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা (আজকাল আর নয়), ন-সামগ্রী সাজিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তে নানারকমের প্রকার-ভেদ আছে বটে; টা অস্বীকার করা যায় না।

আপনাদের বিশ্বাস হবে না বলেই আগের থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছি। মনু-ংহিতার তৃতীয় অধ্যায় খুললে দেখতে পাবেন, ১শের শ্লোকে স্পষ্ট লেখা আছে:—

াহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
ান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চ অষ্টমোঽধমঃ॥

র মানে হচ্ছে:—

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং সর্বাধম পৈশাচ, এই আট প্রকারের বিবাহ আছে।

এর মধ্যে প্রথম চারটা প্রশস্ত এবং শেষের চারটি নিন্দনীয়। নাম থেকেই বুঝতে পারছেন যে, শেষের চারটি অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এইগুলো ঐ নামের ভিন্ন ভিন্ন অনার্য কিম্বা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ। ব্রাহ্মণ্য সমাজ সেগুলো কখনই ভাল-ভাবে গ্রহণ করেন নি।

আপনারা যদি মনে করেন যে, এই আট রকমের বিবাহই এখনও প্রচলিত আছে, তাহলে ভ্রমে পড়বেন, এবং সেই ভ্রমবশত যদি কেউ নিজেদের সম্বন্ধে সেগুলোর প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন ত বিপদে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কারণ পীনাল কোড বলে আর একটা শাস্ত্র আছে, যার বিধিনিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের সূত্রগুলোর চেয়ে অনেক বেশী কঠিন, কোন-মতেই তা অগ্রাহ্য করা যায় না।

হিন্দু সমাজে এখন কেবল ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহেরই প্রচলন আছে। ব্রাহ্ম নাম শুনেই ব্রাহ্মসমাজে যে পদ্ধতিতে বিবাহ হয়, এটাকে যেন তাই মনে করে বসবেন না। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ্য আচারে সম্পৃক্ত বিবাহকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হোত। এই বিবাহই এখন সকল ভদ্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত। আসুর বিবাহ হয় সেখানে, যেখানে কন্যাকে দাম দিয়ে কেনা হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীতে এ বিবাহের বেশ চলন আছে। আবার সমাজের যে সব জায়গায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম বা পয়সার অভাবে যেখানে পুরুষদের বিবাহের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, সেই সব স্থলে দাম দিয়ে মেয়ে কিনে আসুর বিবাহও চলে।

গান্ধর্ব বিবাহের অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠান বর্জিত স্রেফ প্রণয়মূলক বিবাহের ধারা এখনও সমাজের নিম্নশ্রেণীতে ও আদিবাসীদের মধ্যে অনেক স্থানে দেখা যায়। শুধু রেজিস্ট্রী করা বিবাহ-পদ্ধতি ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে কি না, সুধী ব্যক্তিরা বিচার করে দেখবেন।

এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানান মুনির নানান মতের মত, নানা রকমের দেশজ বিবাহ প্রচলিত আছে। সে সবের শুধু ফিরিস্তি দিতে গেলেও একটা বেশ বড় রকমের বই হয়ে ওঠে। এই সামান্য প্রবন্ধে তার স্থান সংকুলান করা সম্ভব নয়। এইসব দেশজ বিবাহ ব্যাপারগুলোকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ভাল চোখে না দেখলেও, বহুদিনের প্রথা বলে সেগুলোকে একেবারে অগ্রাহ্য না করতে পেরে কোনরকমে সহ্য করে গেছেন।

এ সম্বন্ধে একটা মজার উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত আছে। সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। এটা পড়লে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগত বিচিত্র রকমের আচার-ব্যবহার ও তার সঙ্গে বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও এইটুকু আভাষ পাওয়া যায় যে, অন্যের কাছে দৃষ্টিকটু হলেও, অপরের আচার-বিচার-গুলো একেবারে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে॥
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্য ভোজনে॥
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্যং বিধীয়তে॥

অর্থাৎ,—মগধ দেশে মদ্যপানে দোষ নেই। কলিঙ্গ দেশে অন্ন গ্রহণ কিম্বা গম্যাগম্যার বিচার নেই। উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ বিবাহ দোষের নয়। গৌড়দেশে মৎস্য-ভক্ষণে দোষ হয় না। আবার কেরল প্রদেশে মাতুল-কন্যা বিবাহেও দোষ নাই। যে দেশে যে আচার পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত আছে, সেই আচারই বৈধ।

পুরাকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে, বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ ধরাকাটা, বিধি-নিষেধ ছিল না। দেখতে পাওয়া যায়, সে যুগের সমাজ, নিজের প্রবল প্রাণের বেগেই চলন্ত। সব বাধা-বিপত্তি, বিধি-নিষেধ, অতি সহজেই সে সমাজ ডিঙিয়ে চলে গেছে। কোন কাজটা বিধিমতন হোল কি না, সে যুগে তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও ছিল না, সময়ও ছিল না। এর চেয়ে অনেক দরকারী কার্য তখন আর্য পিতামহদের হাতে ছিল।

সে যুগে আর্যে-অনার্যে বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি পরবর্তীকালের মাপকাঠিতে অনেক প্রকারের অবৈধ বিবাহ অবাধে সমাজে গ্রাহ্য হয়ে গেছে। বৈদিক যুগ ছিল বিস্তারের যুগ।

তারপর এল ব্রাহ্মণ্য যুগ। সে সম আর্য-অনার্য অনেকটা মিশে গিয়ে ভারতবর্ষের উত্তরাপথে একটা বিস্তৃত সমাজে পত্তন হয়েছে। এই সমাজের মাথা হলে ব্রাহ্মণেরা। কারণ অন্যান্য বর্ণের লোকের তখনও শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণদে সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন নি। বিস্তারের পরিবর্তে এল সংরক্ষণ। তখন সংহিতা, নিবন্ধ, ধর্মশাস্ত্রের সূত্রগুলি দিয়ে সমাজকে চারিদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে কসে বাঁধা হোল। এই সূত্রগুলি দেখতে বা পড়তে যতই ক্ষীণ বোধ হোক না কেন, আসলে কিন্তু সেগুলো মৃণালসূত্রের মতন একেবারেই কোমল নয়, ইস্পাতের দড়ির মতন বজ্র-কঠিন। সেই-জন্য সেকালের সেই লোহার মতন শক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাঠামোটাই আজকের দিনের অতি নব্য যুগেরও হিন্দু সমাজের বনেদরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

সংরক্ষণের একটা রূপ হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এবং ভেদবুদ্ধি স্বভাবতঃই একটি গণ্ডির সৃষ্টি করে। স্মৃতির, নিবন্ধের, ধর্মশাস্ত্রের সূত্র-গুলির জোরে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এসব ত চলে গেলই; উপরন্তু ক্রমে ক্রমে নিষিদ্ধ হলো, সগোত্র, সপ্রবর, সপিন্ড, সশ্রেণী বিবাহ। এর উপর এই যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবের জন্য শুভ দিন-ক্ষণ দেখা, কন্যার নাম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা করা, কোষ্ঠী

গণনা করা এইরকম নানাপ্রকারের পরীক্ষার ও গণনার দ্বারা বিবাহের শুভাশুভের ফলাফল যাচাই করার প্রথা, ব্রাহ্মণ্য যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এগুলি এখনও বনেদী হিন্দু সমাজের প্রায় সর্বত্র সেই একইভাবেই চলে আসছে।

আমাদের বাঙলা দেশ ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত বলেই হোক, কিম্বা বাঙলা দেশ সব সময়েই নিজের একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব মতের মতন করে নিজেকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে বলেই হোক, স্মৃতিসম্মত বিধি নিষেধ গুলোর কড়াকড়ি বাঙলা দেশে কোনকালেই ছিল না।

বিখ্যাত ভবদেব ভট্ট ১১শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে স্মার্ত আবহাওয়ার চলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এঁরই সৃষ্ট বিবাহ পদ্ধতি সমগ্র বাঙলা মুল্লুকে না হোক, তার প্রায় সমস্ত জায়গায় প্রচলিত। ভবদেব ভট্ট শুধু কেবল বড় স্মার্ত পণ্ডিতই ছিলেন না; তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজনীতিতেও এঁর দক্ষতা বড় কম ছিল না। এর ফলে তিনি পূর্বাঞ্চলের বর্মণ-রাজাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং পুরুষানুক্রমে এই পদ তাঁর বংশে অনেক দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এর পরের বড় স্মৃতিকার হচ্ছেন স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। ১৫শ শতাব্দীর লোক। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ইনি নিজের প্রতিভা-বলে বাঙ্গালী সমাজকে স্মৃতির বন্ধনে আরো পাকা করে বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে বন্ধন এত দৃঢ় যে, আজ পর্যন্তও বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ তার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

ভট্টাচার্যরা স্মৃতির বিধান দিয়ে বাঙলা দেশের পূর্বে প্রচলিত বিধিহীন বিবাহগুলোকে যে একেবারে বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন, এ ধারণা করলে সেটা একেবারেই ভুল ধারণা হবে। আজ পর্যন্তও বাঙলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাঙালী সমাজের বিভিন্ন স্তরে, এমন এমন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে যে, সেগুলোকে কোনোক্রমেই স্মার্তমতে শাস্ত্রীয় বিবাহ বলা চলে না।

বরঞ্চ স্মৃতিশাস্ত্রের কড়া বন্ধন এড়াবার জন্য, খানিকটা তারই রসে পাক হয়ে, এক গুপ্তশাস্ত্রের প্রচলন বাঙলাদেশে হয়েছিল, তার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। এর বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুজো-পার্বণের নাম হোল শাক্তধর্ম, যে ধর্ম এখন বাঙলা দেশের বারো আনা হিন্দুদের ধর্ম। কিন্তু এর সাধনভজনটা গোপনীয় রয়ে গেল। তার নাম হোল তান্ত্রিক সাধনা।

এই ধর্ম অনুসারে একরকমের গুপ্ত বিবাহ হোত, যেটা ছিল অসামাজিক এবং সেই কারণে স্মৃতিবিরুদ্ধ। তারই নাম শৈব বিবাহ। এই বিবাহে জাতি, বর্ণ, বয়স প্রভৃতি, বা স্মার্ত আচার বিচারের কোনো বাধাই ছিল না। কেবল দুটো নিষেধ ছিল। সে দুটো যে কেবল ভট্টাচার্যদের মান রক্ষা করার জন্য এমন মনে হয় না। যে স্ত্রীলোকের স্বামী বর্তমান, তাঁর আর শৈব-বিবাহ হতে পারত না। আর সপিণ্ড, অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে শৈববিবাহ একেবারেই অচল।

শৈববিবাহ সম্পূর্ণ গোপনে এবং কেবল-মাত্র তান্ত্রিক সাধনার চক্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলে, এর এখনও চল আছে কিনা, যাঁরা তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষিত বা অভিষিক্ত নন, তাঁদের পক্ষে সঠিক বলা শক্ত। তবে কানাঘুসো শোনা যায় যে, তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলিতে এ বিবাহ নাকি এখনও প্রচলিত আছে।

স্মৃতির বিধানগুলোর উপর বাঙলা দেশের ঘাড়ে আর একটা বড় ভেদ বুদ্ধির বোঝা চাপান হয়েছিল, সেটা কৌলিন্য প্রথা। সেকালে এর উপর, বিবাহ ব্যাপার অত্যন্ত প্রবলভাবে নির্ভর করত। আর এক বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত দেবীবর ঘটক। একে বলা হয়, মেল বন্ধন। এই কৌলিন্য প্রথা বল্লাল সেনের আমদানী বলে লোকের কাছে পরিচিত। কিন্তু পণ্ডিতেরা বিশেষ বিবেচনা করে স্থির করেছেন, কৌলীন্য প্রথা বল্লাল সেনের অনেক পরে সৃষ্ট হয়। আমার নিজের মনে হয় এই কৌলীন্য প্রথা আমদানী করার মধ্যে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘু-নন্দনের অনেকটা হাত আছে। কারণ তাঁর মেজাজটা ছিল সম্পূর্ণ রক্ষণশীল। এবং তাঁর স্মৃতির বিধানগুলি স্থায়ীভাবে কার্যকরী হওয়ার পক্ষে এক ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ সমাজের প্রয়োজন। এই সমাজই হচ্ছে কুলীন সমাজ। পরবর্তীকালের বাঙ্গালী সমাজে এই প্রথা কি যে কুপ্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তার পরিচয় পাবেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন (ভট্টাচার্য) বা নাটুকে রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব নামের এক নাটকে।

ইংরেজী আমলের স্মৃতিকারেরা, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা, বিবাহ বিধানে কিছু কিছু নব্য হাওয়া আনবার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজী ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ হয়। ১৮৭২ ও ১৯২৩ সালের দুটি বিবাহ আইনের বলে, আরো অনেক সুবিধা হয়েছে। যেসব লোকেরা বিবাহ ব্যাপারে জাতি, শ্রেণী, গোত্র, বর্ণ, প্রবরের খোঁজ করাটা একে-বারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, আইন-মতে আঁটঘাট বাঁধা বিবাহ করার পক্ষে তাঁদের আর কোনো বাধা রইল না। আর সুবিধা হোল তাঁদের, যাঁরা বিবাহে দিনক্ষণ দেখা, পুরুত-নাপিত ডাকা, আচার-বিচার মানা, এসব পছন্দ করেন না, বা এগুলোর উপকারিতার উপর কোনই আস্থা রাখেন না। তাঁরা এসব বাদ দিয়ে এখন স্বচ্ছন্দে বিধিমত বিবাহ করতে পারেন।

এখন আমাদের দেশী সরকারের যুগে, বিবাহের আইন সংস্কার করে, হিন্দু বিবাহের সনাতন প্রথা-পদ্ধতি, বদলাবার চেষ্টা হচ্ছে। শেষপর্যন্ত এটা কি চেহারা নেবে, এখনও জানা যায়নি। এই চেষ্টার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ দেখা দিলেও, এই চেষ্টার মধ্যে যে সেই অতীতকালের বেগ-বন্ত প্রাণের সুর আছে, এ বিষয়ে সকলেই বোধহয় একমত।

বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া যায় না বলে, আমাদের এ আমলের স্মৃতিকারেরা (ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা) মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়েছেন। মেয়েরা চান বা না চান বিবাহ ব্যাপারে তাঁদের কতকগুলো অধিকার দিতেই হবে।

মেয়েদের সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতিকারদের মূলমন্ত্র ছিল—স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য উচিত হয় না। অর্থাৎ স্ত্রীজাতিরা লতার মতন কোনো পুরুষ বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন, এই হোল সনাতন রীতি। ঘরোয়া জীবনেও এই রীতির ফল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অল্প বয়সে মেয়েদের অমুকের মেয়ে বলে ডাকা হয়, যৌবনকালে তাঁরা অমুকের স্ত্রী। সন্তানবতী হলে অমুকের মা। এরই জন্য ইংরেজী Miss, বা Mrs. (সধবা ও বিধবা রূপান্তরে), এ দুটি শব্দের বেশ জুতসই দিশি প্রতিশব্দ আমাদের দেশে নেই। যেগুলো আছে, সেগুলো পোষাকী কাপড়ের মতন। ভয় হয় একটু চাপেই খুলে পড়ে যাবে। নতুন বিধানের প্রধান চেষ্টা হচ্ছে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ তাঁরা যে স্বাধীন জীব এই বোধটা জাগিয়ে তোলা। এই জিনিসটা মনে রাখলেই নতুন আইনে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে, তার সব কথাগুলো বেশ সহজে বোধগম্য হয়ে আসবে।

এখন বিবাহের আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। বৈদিক যুগে বিবাহে মাস, দিন, ক্ষণ ইত্যাদি দেখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না বলেই ত মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে এবং তার পরবর্তীকালে, এগুলো আস্তে আস্তে হিন্দু সমাজের উপর বেশ কায়েমী স্বত্বে বসে গিয়েছিল।

আগেকার দিনের গোড়াকার দিকে, পৌষ ও চৈত্র মাস বাদ দিয়ে, আর অন্য সব মাসেই বিবাহ চলত। তবে ওরি মধ্যে আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুনে এই পাঁচ মাস বিবাহের পক্ষে সুপ্রশস্ত ছিল; বাকী পাঁচ মাস তত ভাল নয়। আষাঢ় মাস আজকাল প্রশস্ত মাসের মধ্যেই চলে গেছে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক অচল মাসের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

দুর্ঘটনার জন্য বা অন্য কোন রকম বাধা পড়ার দরুণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে কোন কোন বিশেষ মাস বিবাহের পক্ষে বর্জনীয় হয়ে থাকে। এই প্রথা সেই

পরিবারের কুলাচার বলে মেনে নেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার অনেকে বড় ছেলের বিবাহ দেন না।

বাংলা দেশের সর্বত্র সাধারণত সন্ধ্যার আরম্ভ থেকে ভোর রাত্রি পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যেই হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, বাংলার বাহিরে কোন কোন জায়গায় দিনের বেলায়ই হিন্দুদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তা তাঁর দেখাও আছে, শোনাও আছে। আমার কিন্তু কোনটাই নাই। তবে এদেশীয় খৃষ্টানরা ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে দিনে দিনেই বিবাহ-কর্ম সমাধান করে নিয়ে থাকেন। এদেশীয় মুসলমান সমাজেও দিনমানে বিবাহে কোন বাধা নাই; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা প্রায় হিন্দুদের মতনই, সন্ধ্যা থেকে রাত্রির মধ্যে বিবাহকার্য করাই প্রশস্ত বলে মনে করেন।

হিন্দু বিবাহ সংস্কারের মধ্যে দুইটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আছে। একটি বৈদিক, অপরটি দেশাচার, লোকাচার বা স্ত্রী-আচার বলে খ্যাত। বিবাহের স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে সব কথা বলতে গেলে, সে হবে আর এক আস্ত মহাভারত। কারণ এই স্ত্রী-আচারগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের। এমন কি একই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিভিন্ন প্রকারের। শুধু তাই হলে ত রক্ষা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণে, সম্প্রদায়ে, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারেও আবার বিচিত্র রকমের বিভিন্ন স্ত্রী-আচার দেখা যায়। প্রচলিত সমস্ত রকমের স্ত্রী-আচার এখনও এক জায়গায় সংগ্রহ করে কেউ প্রকাশ করেন নি। যদি কখনও করা হয়, তখন তার থেকে যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে, সেটা যে বহুমূল্য হবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

বৈদিক আচারের ক্রিয়াগুলি কিন্তু প্রায় একই। তবে এই ক্রিয়াগুলির বাহিক অনুষ্ঠান ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইতরবিশেষ কিছু তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক আচারের মধ্যে তিনটি ক্রিয়া আছে। প্রথমেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। এটা ঐহিক উন্নতির জন্য। সেই কারণে এর আর এক নাম বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ। তাছাড়া সমস্ত শুভকার্য আরম্ভের আগে পূর্ব-পুরুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা এদেশে মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে।

এ পরে সম্প্রদান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই বর-বরণ ও তাঁকে পাদ্য-অর্ঘাদি দিয়ে সম্বর্ধনা করার ব্যবস্থা আছে। আর কন্যা সম্প্রদান ত আছেই। তা না হোলে আর বিবাহই হয় কি ক'রে?

সবশেষে কুশণ্ডিকা। এর প্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে হোম করে অগ্নি-সংস্কার, আর হচ্ছে পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী গমন। এই সপ্তপদী গমন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। আর কোনরকমে এই সপ্তপদী গমন অনুষ্ঠানটা একবার শেষ হয়ে গেলে, এক যমরাজ ছাড়া হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ করান স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কারও সাধ্য নাই। বর্তমানকালের স্মৃতিকারেরা, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা, যমরাজের এমন কি যমদূতেরও সাহায্য না নিয়েও হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদের একটা বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় আছেন। একথা এক-চক্ষু হরিণের মতন নিশ্চিন্ত হিন্দু স্বামীদের জেনে রাখা ভাল।

পুরুত ঠাকুরেরা যে রকম তাড়াতাড়ি বিবাহের মন্ত্রগুলি আওড়ে যান, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষের পুরুতের সঙ্গে এমন ঝগড়া বাধান, যে তাতে বরের কেন, বরের বাপেরও সাধ্য নেই মন্ত্রগুলো বোঝবার। শুধু কতকগুলো অং-বং শব্দই কানে আসে। কিন্তু ঐ মন্ত্রগুলি ভাল করে শুনে, তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারলে, সেগুলোতে কি যে অপূর্ব রসের সন্ধান পাওয়া যায়, তা কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই। তাছাড়া এসব মন্ত্র শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যাবে, এরকম আশঙ্কা আছে। কারণ শোনা যাচ্ছে, নতুন তন্ত্রে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই মন্ত্র হবে। বর, কন্যাকে বলবেন,—"আমি তোমাকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম। আর সেইমত কন্যাও বরকে বলবেন,—"আমি তোমাকে বৈধ স্বামীরূপে গ্রহণ করলাম। ব্যস্, সব চুকে গেল। কথাতেই আছে, যে বিয়ের যে মন্ত্র।

পাঠকদের মনোরঞ্জন করা যেতে পারবে, এই ভরসায় আমি পাণিগ্রহণের সময় বরের কয়েকটি প্রার্থনা মন্ত্র এবং সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করে, তার বাঙলা অনুবাদও দিচ্ছি। ভাল-মন্দ তাঁরাই বিচার করুন।

গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং।
ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ॥

আমি তোমার পতি। সৌভাগ্য লাভের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। তুমি আমারই সঙ্গে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হও।

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম
যদেতদ্ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥

সত্যরূপ গ্রন্থির দ্বারা আমি তোমার হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি। আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের হৃদয়ের সহিত এক হউক।

সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং—
শৃণুয়াম শরদঃ শতম্॥

আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি যেন সর্বদা প্রীতিপূর্ণ থাকি, উজ্জ্বল হই, প্রসন্নচিত্ত হই, এবং এইরূপে যেন আমরা শতবর্ষ জীবিত থাকি। শতবর্ষেও যেন আমাদের দৃষ্টি ম্রিয়মান না হয়। শত বৎসরেও যেন আমাদের শ্রবণ-শক্তি ক্ষীণ না হয়।

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তম্ অনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচম্ একমনা জুষস্ব—
প্রজাপতি ষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিবিষ্ট হোক। তোমার চিত্ত যেন আমার চিত্তের অনুকূল হয়। একমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। প্রজাপতি আমার ব্রতে তোমাকে নিযুক্ত করুন।

ধ্রুবা দ্যৌ র্ধ্রুবা পৃথিবী।
ধ্রুবং বিশ্বম্ ইদং জগৎ॥
ধ্রুবাসং পর্বতা ইমে।
ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্॥

দ্যুলোক ধ্রুব। পৃথিবী ধ্রুব। ধ্রুব এই বিশ্বজগৎ। এই পর্বত সকল ধ্রুব। এই কন্যাও পতিকুলে ধ্রুব হোক।

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

তুমি শ্বশুরকুলে সকলের কাছে সম্রাজ্ঞীর মত বিরাজ কর। শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবর সকলেরই নিকট তুমি সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শোভমানা হও।

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ।
সমাপো হৃদয়ানি নৌ॥
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা।
সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

দেবতারা আমাদের এক করুন। অনুকূল জলবায়ু আমাদের হৃদয়কে এক করুক। উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি।
শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ॥
বীরসূ র্দেবকামা স্যোনা।
শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

তোমার দৃষ্টি প্রসন্ন হোক। তুমি পতির হিতকারিণী ও জীবগণের কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন সুন্দর হোক। তুমি সুতেজস্বিনী হও। তুমি বীর প্রসবিনী হও। তুমি ঈশ্বর-পরায়ণা হইয়া মনুষ্য ও পশুদের মঙ্গলকারিণী হও।

এখন সপ্তপদী গমনের মন্ত্র।—

ওঁ ইষে একপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব।
অন্ন লাভের জন্য প্রথম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব।
বল লাভের জন্য দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব।
ধন লাভের জন্য তৃতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মাম্
অনুব্রতা ভব।

সুখ লাভের জন্য চতুর্থ পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব।

সন্তান লাভের জন্য পঞ্চম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্পদী ভব সা অনুব্রতা ভব।

ঋতুসমূহের আনুকূল্য লাভের জন্য ষষ্ঠপদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব।
সখ্য লাভের জন্য সপ্তম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুগামী হও।

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখন্তে গমেয়ং, সখ্যন্তে
মা যোষাঃ, সখ্যন্তে মা যোষ্ঠ্যাঃ।

সখ্য লাভের জন্য সপ্তপদ গমন করিলে। এখন কল্যাণময়ী স্ত্রীরা আমাদের সখ্য দৃঢ় বন্ধন করুন। আমি যেন চিরকাল তোমার সখ্য লাভ করি। অন্য কোন নারী যেন আমাদের সখ্য বন্ধন ছিন্ন না করেন।

সর্বশেষে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে বরের প্রার্থনা।—

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বিপরেতন॥

কল্যাণময়ী এই বধূকে আপনারা সকলে মিলিয়া দর্শন করুন। ইহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া আশীর্বাদ করত আপনারা গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

কত যুগ-যুগান্তর ধরে এই একই মন্ত্র আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বিবাহকালে উচ্চারণ করে এসেছেন। আজও সেই মন্ত্রই আমরা উচ্চারণ করছি। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা ও তাহাদের পরবর্তীরাও এই একই মন্ত্র উচ্চারণ করে চলবে; এই প্রার্থনা আমি মনে মনে করি।

বেতার প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্বাচন ও রেডিও

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়ে আসছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত সাধারণ নির্বাচনের নীতি এই প্রথম এদেশে প্রযুক্ত হতে যাচ্ছে। নূতন নির্বাচন-ব্যবস্থায় অগণিত সংখ্যক লোক ভোট দেবার অধিকারী হয়েছেন এবং তাঁরা এই অধিকার উৎসাহের সঙ্গে প্রয়োগ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। জনগণের ভোট সংগ্রহের মানসে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এখন থেকেই তৎপর হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। সর্বত্র প্রাক্-নির্বাচন প্রস্তুতির ভূমিকা রচিত হচ্ছে।

সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্-নির্বাচন প্রস্তুতিতে প্রচার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে এবং এই ক্ষেত্রে রেডিওর যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে তা না বললেও চলে। তবে কথা হচ্ছে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও নির্বাচনের প্রচারের যন্ত্ররূপে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেবে কি না; যদি দেয়, সকল রাজনৈতিক দলকে পক্ষপাতশূন্য হয়ে সমান প্রচারের সুবিধা দেবে কিনা।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ধারাধরণ যতদূর বাইরে থেকে বোঝা যায়, তাতে নিশ্চিত অনুমান করা চলে সকল রাজনৈতিক দলকে সমান প্রচারের সুযোগ দেওয়া তো পরের কথা, কংগ্রেস ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আদৌ কোন সুযোগ তাঁরা দেবেন না। অল ইণ্ডিয়া রেডিও গভর্নমেণ্ট পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কংগ্রেস এই গভর্নমেণ্টের কর্ণধার। সুতরাং প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত জানিয়ে বা না জানিয়ে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও যে কংগ্রেসের অনুকূলে নির্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন তা একপ্রকার অবধারিত বলা চলে। সেজন্যে অবশ্য জনগণের তরফে আপত্তির কোন কারণ নেই। কেননা এটা তো স্বভাবিক, যে দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তার মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনে যাতে জয়ী হতে পারে সেজন্যে শাসনক্ষমতার সব কটি সুবিধা আর অধিকার কাজে খাটানো হবে। রেডিও ক্ষমতা-ভোগী দলের হাতে একটা মস্ত বড়ো অস্ত্র, আর সকলে যখন নির্বাচনের লড়াইয়ের জন্যে প্রাণপণে তৈরী হয়েছেন তখন ক্ষমতাভোগী দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে তাঁদের একটি প্রধান অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করবেন না এতোটা আশা করা চলে না।

রেডিও কংগ্রেসের অনুকূলে একটি বড়ো প্রচারের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। তা হয়তো হোক, লোকে তা নিয়ে রেডিওর সঙ্গে কলহ বাঁধাতে যাবে না। শুধু জনগণের দাবী এই যে, ন্যায়নীতির খাতিরে, নিরপেক্ষ সমদৃষ্টির আদর্শের খাতিরে, প্রধান প্রধান অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক দলগুলিকেও রেডিওর মাধ্যমে খানিকটা নির্বাচনী প্রচারের সুবিধা দেওয়া হোক্। রেডিও সরকার-করধৃত রয়েছে বলেই তার ষোল আনা সুবিধা সরকার নিজে ভোগ করবে এটা কাজের কথা নয়। আর কিছুর জন্যে না-হোক্, শোভনতার খাতিরে অন্ততঃ, কিছু কিছু নির্বাচনী প্রচার-সুবিধা অপরাপর দলগুলির ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়া উচিত।

এর নজীর আছে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। ঠিক যে অর্থে অল ইণ্ডিয়া রেডিও গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠান বি বি সি সে অর্থে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠান না হ'লেও বি বি সি-র উপর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে। ১৯২৩ সালে গঠিত The Sykes Committee এবং তারই দু'বৎসর পর গঠিত The Crawford Committee ব্রিটিশ বেতারের পরিচালনা-নীতি গ্রহণ করতে গিয়ে যেসব মূল্যবান সুপারিশ করেন তাতে বেতারের উপর সাক্ষাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত না হ'লেও বেতার পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব যে সরকারের সেকথা স্বীকার করেন। সরকার কমিটিদ্বয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তারই ফলে ১৯২৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের জন্ম।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বি বি সি-র অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না। সেটা তাঁদের অভিপ্রেতও নয়। তবে কোন্ নীতি বা সংস্কারের ভিত্তিতে বি বি সি-র কার্যকলাপ পরিচালিত হবে সেটা বেঁধে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের। তা তাঁরা বেঁধেও দেন। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে যে Broadcasting Policy প্রচারিত হয় তাতে দেখা যায়, রাজনৈতিক মতামতের প্রশ্নে বি বি সি-র কার্যধারা কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কাগজে-কলমে বাঁধাবাঁধি কিছু ধরে দিতে না চাইলেও এটা অন্ততঃ তাঁরা চান যে, বি বি সি সকল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা নিরপেক্ষ সামঞ্জস্যের নীতি বজায় রেখে চলবেন। অর্থাৎ স্বীকৃত দলগুলির কোন একটিকে তাঁরা অতিরিক্ত প্রাধান্যও দেবেন না, আবার কোন একটিকে দাবিয়েও রাখবেন না। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির অধ্যায়ে বি বি সি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মুখপাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান এবং নিজেরা কোনরূপ রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত না ক'রে প্রত্যেক দলকেই রেডিওর মাধ্যমে কিছু কিছু প্রচারের সুবিধা দেন।

রেডিওর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুসৃত এই নীতি ভারতের বেলায়ও যে কেন প্রযুক্ত হ'তে পারবে না বোঝা যায় না। সকল দলকে নির্বাচনী প্রচারের যাবতীয় সুবিধা-সুযোগ দিতে গভর্নমেণ্ট ন্যায়তঃ বাধ্য। সেইটে যদি মেনে নেওয়া যায়, রেডিওকে শুধুমাত্র নিজেদের প্রচারের কাজে লাগানোর কারণ দেখা যায় না। অবশ্য ভারতে ইংলণ্ডের মতো রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। ভারতে রাজনৈতিক দল বহু এবং তাদের সকলেই নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে এটা আশা করা যায়। প্রত্যেক দলকে রেডিওর মারফৎ নির্বাচনী প্রচারের সুবিধা দিতে গেলে একটা অসুবিধাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অসুবিধা অনেকখানি লাঘব হ'তে পারে যদি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক মূল রাজনৈতিক দলগুলির স্বীকৃত মুখপাত্রদের কেবলমাত্র মুখপাত্রদের—প্রচারের সুবিধা গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেসব দলের পশ্চাতে গণসমর্থন আছে এবং যাদের প্রতিনিধিত্বমূলক স্বরূপ কংগ্রেস স্বীকার করেন, প্রতিপক্ষ হলেও তাঁরা গভর্নমেণ্টের হস্তে সম্যক্ মর্যাদালাভের যোগ্য। নির্বাচনের প্রস্তুতির অধ্যায়ে গভর্নমেণ্ট যদি তাঁদের সে মর্যাদা রক্ষা না করেন এবং সবটুকু মনোযোগ নিজের উপরই ন্যস্ত করেন, সেক্ষেত্রে আত্মপরতা আর ক্ষমতালোলুপতার অপবাদ কোনক্রমেই এড়ানো যাবে না। এই অপবাদ এড়াবার জন্যে গভর্নমেণ্ট কী করতে চান সেটা জানা দরকার। কংগ্রেসের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা অসীম এবং কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা সর্বাধিক সংখ্যায় নির্বাচনে জয়যুক্ত হোন এইটেই আমরা মনে-প্রাণে কামনা করি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, জয়লাভের তাগিদে অন্যান্য দলকে বঞ্চিত ক'রে কংগ্রেস নিজের অনুকূলে সবটুকু সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে আমরা তার মূক দর্শক হ'য়ে থাক্‌বো। দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তা একটি বিরাট আর মহৎ ঐতিহ্য। পক্ষপাতিত্বের কলঙ্কের দ্বারা তাকে ধূলিমলিন হ'তে দেওয়া চলে না। কংগ্রেস স্বীয় নির্বাচনী প্রচারের যন্ত্ররূপে রেডিওকে ব্যবহার করুন ক্ষতি নেই কিন্তু সেই সংগে অপরাপর মূল দলগুলিকেও রেডিওর মারফৎ নির্বাচনের সুযোগ সুবিধা দিন—এইটেই জনগণের দাবী। এই দাবীর পশ্চাতে কংগ্রেসকে বিব্রত করার কোন অভিসন্ধি লুক্কায়িত নেই। কংগ্রেসের সুনাম রক্ষার জন্যই এমনতরো দাবী উত্থাপিত হওয়া দরকার।

কংগ্রেসের পক্ষে এই দাবীর মর্যাদা রক্ষা কোনক্রমেই যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের উচিত হবে রেডিওকে দলগত প্রচারের যন্ত্ররূপে একেবারেই ব্যবহার না করা। যে সুবিধা তাঁরা অপরাপর দলগুলিকে দিতে অপারগ সে সুবিধা নিজেরা আত্মগত না করলে তবেই শুধু ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষিত হ'তে পারে। হয় তাঁরা কাউকেই সুবিধা দেবেন না নয় তাঁরা সকলকেই সুবিধা দেবেন এইতো আমরা বুঝি।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও বিতর্কমূলক রাজনীতি যথাসাধ্য এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করেন। তার মানে এ নয় যে, তাঁদের কোন রাজনীতি নেই। সর্বসাধ্য উপায়ে তাঁরা কংগ্রেসের পরিপোষিত রাজনৈতিক আদর্শটিকেই শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরবার কাজে নিয়োজিত। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ব্যবস্থার অনুকূলে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বলাই বাহুল্য, নির্বাচনকালীন অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। সব সময় এ অবস্থা লেগে থাকে না; যে দেশে যেমন বিধি, তদনুযায়ী কয়েক বৎসর পর পর এজাতীয় বিশেষ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যেটা গ্রাহ্য বিশেষ অবস্থায় সেটা গ্রাহ্য নাও হ'তে পারে। সরকার-চালিত রেডিওর একদেশদর্শিতা অন্যকের দিনে যদি বা মেনে নেওয়া যায়, নির্বাচনকালে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। সরকার-চালিত প্রতিষ্ঠান বলেই আরো বিশেষ ক'রে সে সময় রেডিওর পক্ষে সমদর্শী হওয়া দরকার। নির্বাচনপ্রয়াসী রাজনৈতিক দলগুলি যদি নির্বাচনী প্রচারের সুযোগ-সুবিধার জন্য গভর্নমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হবে তো কার কাছে হবে? রেডিও গভর্নমেণ্টের হাতে একটি বড়ো প্রচার-যন্ত্র। সে যন্ত্রের সুবিধা নির্বাচনপ্রার্থী দলগুলির মধ্যে পক্ষপাতহীনভাবে বিতরিত হ'লে তবেই শুধু সমদর্শিতার আদর্শ বাস্তবতঃ রক্ষিত হওয়া সম্ভব।

রেডিয়ো

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

ত্রি-অক্ষরে রহস্যবাদিনী
এ কী দুর্দৈব তোমার!
তুমি প্রলাপ দিয়ে প্রচ্ছন্ন করেছ
আর্যাবর্তের জীবনমন্ত্র।
এ জনপদ শষ্পহীন তোমার বিষনিঃশ্বাসে।

কুষাণবংশের পোষাক পরে
দিল্লীর রাজপথে গড়িয়ে চলে যারা,
তারা এসে গাইবে সামগান ভাঙাগলায়?
তারা এসে গাইবে অমর-ভারতীর জয়গান
তোমার থিস্‌ল্‌ মাইক্রোফনে?

বিজ্ঞানের বায়সনীড়ে কে রেখেছিল তোমাকে?
তুমি ব্যোমতলে শব্দব্রহ্মের শাপভ্রষ্টা মানসকন্যা!

ব্রতচারিনি,
তোমার মূর্চ্ছিত অংগে অল্পনা এঁকে দেব
এই অংগনের পলিমাটী চন্দনে।
স্টুডিয়োর শব্দগ্রাসী দেওয়ালে
লিখে দেব গায়ত্রীমন্ত্র,
এভারেস্ট্ শৃংগে বসবে যখন
জগৎ-জোড়া ট্রান্সমিটার;
হলদে কাগজে আসবে না আর অমোঘ নির্দেশঃ
'ভারত-পাকিস্থান চুক্তি করো কার্যকরী'।
সেই লগ্নে,
গীত-গজল-টপ্পার কল-কোলাহলের ঊর্ধ্বে
জাগবে তোমার অস্ফুট অনাবিষ্কৃত মহামন্ত্রঃ
জয় হিন্দ্
জয় ভারত!

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমস্ত বসন্তকাল 'কে'র এই ভাবেই কাটাতে হল তার সকাল সন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্ত। সাধারণতঃ সে রাত নটা পর্যন্ত তার অফিসে কাজ করত। কাজের শেষে সম্ভবতঃ দু-একজন বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে একটু খানি সে বেড়াত। বেড়ানোর শেষে সবান্ধবে এক মদের দোকানে উপস্থিত হয়ে সেখানে সে রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকত। আর এই সময়ে তার টেবিলের পাশে এসে বৃদ্ধ পাঁড়-গুলো তার পিঠে হাত বুলতো। কিন্তু তার এ কার্যতালিকার মাঝে মাঝে পরিবর্তন অবশ্য হত। তার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং দায়িত্ববোধের জন্য তার প্রতি বেশ প্রসন্ন ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি যখন তাকে নিমন্ত্রণ করতেন, তখন সোজা মোটরে সে গিয়ে ম্যানেজারের ভিলায় হাজির হত। সপ্তাহে একবার করে সে এলসা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত। মেয়েটি একটি হালফ্যাসানের রেস্তরায় সমস্ত রাত চাকরী করত। আর দিনে সে তার অতিথিদের বিছানায় অভ্যর্থনা জানাত।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় 'কে' সোজা বাড়ী ফিরে যেতে চাইল। তার সমস্ত দিনটা কেমন যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। সমস্ত দিন তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কিছু ভাসা ভাসাভাবে চিন্তা করেছে। কিন্তু কিছুতেই সে মনকে ডুবিয়ে দিতে পারল না। সমস্ত দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেন যেন তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সকালের ঘটনায় ফ্রাউ গ্রুবাকের গৃহস্থালির সমস্ত শান্তি যেন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তার কর্তব্য সব কিছু ঠিক করে নেওয়া। একবার যদি এই সব ঠিক করে ফেলা যায়, তবে আজকের ঘটনার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে। জীবনে আবার পুরাণো গতি ফিরে আসবে। কেরাণীদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ নেই। কারণ ব্যাঙ্কের কাজে আবার তারা মগ্ন হতে পারবে। তাদের কোনো পরিবর্তন হবে না। 'কে'-এর মধ্যে এই কেরাণীদের মনের অবস্থা বোঝবার জন্য রহুবার একক বা সম্মিলিতভাবে তাদের তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে। প্রত্যেক বারই সে তাদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

রাত সাড়ে নটায় 'কে' যখন তার বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হল, সে দেখতে পেল, একটি অল্প বয়সের ছেলে, পা দুটো ফাঁক করে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার একটা পাইপ।

ছেলেটির মুখের খুব কাছে 'কে' তার মুখটা সরিয়ে আনলো। ঢোকবার রাস্তাটা এত অন্ধকার যে, খুব কাছাকাছি না হলে কিছুই দেখা যায় না। ছেলেটিকে এবার সে জিজ্ঞাসা করলঃ "তুমি কে"?

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে একপাশে সরে গিয়ে ছেলেটি জবাব দিলঃ "আমি এ বাড়ির পোর্টারের ছেলে"।

অধৈর্যভাবে লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে 'কে' বললঃ "বাড়ির পোর্টারের ছেলে?"

"আপনার কি কিছুর দরকার আছে। আমি কি আমার বাবাকে পাঠিয়ে দেব?"

"না না," কে এমনভাবে কথাগুলো বলল, যাতে মনে হয়, সে অনেক অন্যায় করেছে কিন্তু, সব ভুলে গিয়ে ক্ষমা করছে। আবার সে বললঃ

"বেশ, বেশ!" এইবার সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। যাবার আগে আর একবার ছেলেটিকে দেখবার জন্য সে ঘাড় ফেরালো।

সে প্রথমে একেবারে তার ঘরে ফিরে যেতে মনস্থ করেছিল। কিন্তু ফ্রাউ গ্রুবাকের কথা মনে হওয়ায় তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা মারল। ফ্রাউ গ্রুবাক একটা টেবিলের সামনে বসে ছিল। টেবিলটার ওপর রাশীকৃত পুরণো মোজা। এতরাতে দরজায় টোকা মারার জন্য এবার 'কে' বেশ অপ্রতিভ বোধ করল। তারপর ফ্রাউ গ্রুবাককে দেখে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু ফ্রাউ গ্রুবাক এই প্রার্থনায় কান দিলেন না। বেশ সাদরে 'কে'কে অভ্যর্থনা জানাল। আর একথা 'কে'ও জানে যে, সে তার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালবাসে। কারণ তার মত এমন মূল্যবান বোর্ডার ফ্রাউ গ্রুবাকের খুব অল্পই আছে। কে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল যে, আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। তার এইসব দেখে মনে হল, মেয়েদের হাত বেশ গোছালো। সে হয়তো ডিনারের ডিসগুলো ভেঙ্গে চুরে ফেলত। অন্তত ঠিকমত যে সেগুলি সরিয়ে রাখতে পারত না এ কথা ঠিক। বেশ কৃতজ্ঞতা দু'চোখে মাখিয়ে সে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকাল। "এত রাত্রেও তুমি কাজ করছ কেন?" 'কে'র প্রশ্ন। তারা এতক্ষণে দুজনেই টেবিলের সামনে এসে বসেছে। টেবিলের ওপর জমা করা মোজার স্তূপে 'কে' তার একখানা হাত ঢুকিয়ে দিল।

নিজের অনেক কাজ বাকী আছে, তাই কারণ সমস্ত দিনটা আমার কেটে যায় বোর্ডার-দের দেখাশোনার কাজে। আমার নিজের কাজ আমাকে সন্ধ্যাবেলার দিকে শেষ করতে হয়।"

"আমার মনে হয়, আজকের বাড়তি কাজ-টুকু আমারই জন্যে।"

"সে কেমন করে হবে?" হাতের কাজ কোলে রেখে প্রশ্ন করল।

"আজ সকালে যারা এসেছিল আমি তাদের কথাই বলছি।"

"ওঃ, তাই! কিন্তু এতে আমার কিছু অসুবিধা হয়নি।"

চুপ করে 'কে' এবার তার দিকে তাকাল। সে আবার তার হাতের কাজ তুলে নিয়েছে। (কে মনে মনে ভাবল। হয়ত আমি একথা জিজ্ঞাসা করায় ফ্রাউ গ্রুবাক বেশ আশ্চর্য হয়েছে। তার হাবভাবে মনে হয়, এমন একটা ঘটনার উত্থাপন আমার পক্ষে উচিত হয়নি। কিন্তু আমার বলা যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আর একমাত্র এই বৃদ্ধ মেয়েলোকটি ছাড়া কার কাছেই বা আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম?)

তা হয়ত হবে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাদের আসার ফলে তোমাকে কিছু বেশী কাজ করতে হয়েছে। তবে এরকম কোনো ঘটনা আর ঘটবে না।" কে অবশেষে কথাগুলো বলল।

বেশ একটু দুঃখের চিহ্ন হাসিতে ফুটিয়ে তুলে সে উত্তর করল। উত্তর শুনে মনে হয় সে যেন তার বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। "না না, ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনা ঘটতে পারে না।"

"তোমার কি সত্যি তাই মনে হয়?"

"হ্যাঁ।" তার গলার সুর নরম। "আর আপনি একথা নিয়ে খুব কিছু ভাববেন না। পৃথিবীতে ত কত কিছুই ঘটে। আর হের কে আপনি যখন অকপটে এমনভাবে আমাকে সব কথা বলছেন তখন আমার বলা দরকার যে, আমিও আপনাদের কথাবার্তার কিছু কিছু দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। ওয়ার্ডার দুজনও আমাকে দু-এক কথা বলেছে। সে কথায় মনে হয়, আপনার খুসী হওয়াই উচিত। আমার চেয়েও বেশী খুসী। কারণ, আমি ত আপনার বাড়িওয়ালী ছাড়া আর কেউ নই। ওয়ার্ডারদের কথাবার্তায় আমার মনে হল না বিশেষ করে তারা খুব খারাপ লোক। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু একটা চোরকে যে-ভাবে এবং যে-জন্য গ্রেপ্তার করে আপনাকে

সেরকম কোনো কারণে নয় নিশ্চয়ই? চুরির জন্য যদি আপনাকে গ্রেপ্তার করা হত, তবে সেটা খুবই খারাপ। কিন্তু এই ধরণের গ্রেপ্তারের অর্থ আমার কাছে বেশ মহৎ মনে হচ্ছে—মাফ করবেন, আমি হয়ত বোকার মত কিছু বলছি।—কিন্তু সত্যি এই গ্রেপ্তারের ঘটনা আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার করেছে। কেমন যেন এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, যা আমি বুঝিনি। আর সত্যি বলতে কি আমি বুঝতে চাইও না।"

ফ্রাউ গ্রুবাক, এক্ষুণি তুমি যে সব কথা বললে, তার একটিও আমি বোকার মত মনে করি না। এমনকি আংশিকভাবে আমিও তোমার সংগে একমত। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হল, তোমার চেয়েও আমি বেশি গুরুত্ব এর প্রতি আরোপ করেছি। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় নয়, কাল্পনিকও বটে। আমি আজকের ব্যাপারে একটু আশ্চর্য বোধ করেছিলাম ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যেতে পারত। আমার অনুপস্থিতিতে এত বেশি বিচলিত না হলেও চলত। সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে তোমার কাছেও আমি চলে আসতে পারতাম ব্রেকফাস্টের জন্য। বেশ নতুনই হত, রান্নাঘরে বসে ব্রেকফাস্ট করা। আর তারপর প্রয়োজনমত আমার জামা-প্যান্ট তোমাকে আনতে বলতে পারতাম। এক কথায়, আমি যদি আরও একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করতাম, তবে এত কিছু ঘটবার অবকাশই হত না। অঙ্কুরেই সব বিনাশ হয়ে যেত। কিন্তু আমি একেবারে অপ্রস্তুত ছিলাম। ব্যাঙ্কে আমি সব সময়েই বেশ প্রস্তুত থাকি। তাই সেখানে সম্ভবত এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। আমার বেয়ারা রয়েছে। আমার ডেস্কের সামনেই অফিসের ফোনটি। সব সময়েই আমার কাছে লোকজন আসা যাওয়া করছে। সব সময়েই কেরাণী অথবা ক্লায়েণ্ট, কিংবা অন্য কোনো কাজের চাপে ব্যস্ত থাকি। তাই সবসময়েই আমাকে বেশ সতর্ক থাকতে হয়। এমন একটি ঘটনা যদি আমার ব্যাঙ্কে ঘটত, তবে বোধ হয় আমি বেশ উপভোগ করতে পারতাম, যাক্। আর পুরোণো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। এসব কথা বলার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি শুধু তোমার এ সম্পর্কিত মনোভাব জানতে চেয়েছিলাম। যাই হোক্, আমি খুসী হলাম যে, আমরা অন্তত অনেকাংশে একমত। এখন তোমার হাত বাড়ানো দরকার। অন্তত আমাদের পারস্পরিক সমমনোভাব হ্যাণ্ডসেক করেই স্বীকার করা উচিত।"

তির্যক দৃষ্টিতে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকিয়ে কে ভাবল: "ইন্সপেক্টর আমার সংগে হ্যাণ্ডসেক করতে রাজী হয়নি। সে কি হবে?" ফ্রাউ গ্রুবাক এবার উঠে দাঁড়াল, কারণ কে-ও দাঁড়িয়ে। ফ্রাউ গ্রুবাক বেশ অসুবিধা বোধ করছিল, কারণ, 'কে'র এত কথার কোনো সঠিক অর্থ সে বুঝতে পারেনি। বোধহয় এমন অসুবিধায় পড়ে সে এমন কতকগুলি কথা বলল, বাস্তবিকপক্ষে যা সে বলতে চায়নি। আর কথাগুলি তার অপ্রাসংগিকও বটে। হ্যাণ্ডসেক করার কথা ভুলে গিয়ে কান্নাবোজা গলায় বলল: "হের 'কে' আজকের ঘটনাকে এমন গভীরভাবে মনে গেঁথে ফেলবেন না।" এ কথায় হঠাৎ কে'র মনে অন্য কথা উঁকি

মারল। সে ভাবল তারা পরস্পর একমত হোক বা না হোক, তাতে কি এসে যায়?

"আমার তো মনে হচ্ছে না আজকের ঘটনা আমার মনে রেখাপাত করেছে।"

দরজার কাছে সরে এসে এবার 'কে' জিজ্ঞাসা করলঃ "ফ্রাউলিন বার্স্‌ৎনার কি বাড়ি আছেন?"

"না।" ফ্রাউ গ্রুবাক জবাব দেয়। আর এই দুঃসংবাদটি দেবার সময় কেমন এক দূরত্বের সহানুভূতিতে সে হাসল। অবশ্য তার হাসিতে কপটতা ছিল না।

"সে থিয়েটারে গেছে। তার কাছে আপনার কি জিজ্ঞাস্য কিছু আছে? তাকে কি আমি কোনো খবর দেব?"

"না, তার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।"

"আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কখন সে থিয়েটার থেকে ফিরবে। তবে সাধারণত সে যখন থিয়েটারে যায়, তখন বেশ দেরী করেই ফেরে।"

দরজার দিকে আবার মুখ ফেরালো 'কে'ঃ "এ কথা আলোচনায় কোনো লাভ হবে না!" তার মাথাটা এবার বুকের কাছে ঝুলে পড়ল। "আমার ইচ্ছে ছিল তার কাছে ক্ষমা চাই। কারণ আজ সকালে আমার জন্যই তার ঘরটা আটক ছিল।"

"তার কোনো দরকার নেই হের কে। দেখছি খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই আপনার চোখ আছে। তবে কথা কি জানেন? ফ্রাউলিন এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না। সে খুব ভোর থেকেই আজ বাড়ির বাইরে। আবার সব কিছু ঠিক করে রাখা হয়েছে। আপনি নিজেই খোঁজ করে দেখুন না?" এই বলে সে ফ্রাউলিনের ঘরের দরজা খুলল।

"ধন্যবাদ। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।" কে এই বলে জবাব দিল বটে, কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে ফ্রাউলিনের ঘরেও সেই সঙ্গে ঢুকলো। অন্ধকার ঘর। চাঁদের নরম আলোয় ঘরটা ভরে গেছে। তবু দেখা গেল, ঘরের সব কিছুই বেশ গোছানো রয়েছে। এমন কি ব্লাউজটাও আর জানালায় ঝুলছে না। বালিশগুলো বিছানার ওপর যেন বড় বেশী উঁচু মনে হচ্ছে। বালিশগুলো দেখলে মনে হয়, চাঁদের আলোয় যেন তাদের শুইয়ে রাখা হয়েছে।

"ফ্রাউলিন প্রায়ই দেরী করে বাড়ি ফেরে তাই না?" কথাগুলি বলে এমনভাবে 'কে' ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকাল যেন সব দোষ তার।

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে উত্তর দিল ফ্রাউ গ্রুবাক ঃ "যুবক যুবতীরা সাধারণত এরকমই করে।"

"তা ঠিক।" কে বলে। "কিন্তু বাড়াবাড়ি কি ভাল?"

"হের কে, আপনার কথা ঠিক। তবে বাড়াবাড়ি হতেও পারে। অন্তত এ-সব ক্ষেত্রে ত বটেই। আমার অবশ্য ফ্রাউলিনের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। বড় ভাল মেয়ে সে। কর্মঠ, সুরুচিসম্পন্ন আর খুব দয়াপ্রবণ তার মন। তার এই সমস্ত গুণেরই আমি প্রশংসা করি। তবে কথা কি জানেন, তার আরও একটু লজ্জা থাকা উচিত। আরও স্বগত। এই মাসেই তাকে আমি দুবার নির্জন রাস্তায় দেখেছি। আর দুবারই ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে। এই ব্যাপারে আমি বড় বিচলিত হয়েছি। হের কে, একথা অবশ্য আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। তবে আমার ভয় হয়, এমনি করেই হয়ত সে চলতে থাকবে। তবে ইচ্ছা আছে, এ সম্পর্কে আমি তার সঙ্গে আলাপ করব। আর তা ছাড়া আপনি ভেবে দেখুন, এ ব্যাপারে তার সম্পর্কে আমার সন্দিগ্ধ হওয়া অন্যায়।"

"তুমি বোধহয় ভুল করছ।" চটে উত্তর করল 'কে'। এমন হঠাৎ সে কথা বলল যে, মনের ভাব সে লুকোতেও পারল না। "আর ফ্রাউলিন সম্পর্কে আমার কথার ঠিক অর্থও তুমি বুঝতে পারনি। আমি ফ্রাউলিনকে বেশ ভাল করেই চিনি। তার সম্পর্কে তুমি যে সব কথা বললে, তার একটাও সত্য নয়। তবে আমার বোধ হয় এ কথা বলা উচিত হল না। আমি তোমার কথায় বাধা দিতে চাই না। তুমি তোমার ইচ্ছে মত তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে পার। গুড নাইট!"

"হের কে।" ফ্রাউ গ্রুবাক তার পিছু পিছু দরজার দিকে এগুলো। 'কে' ততক্ষণে দরজাটা খুলে ফেলেছে। "আমি ফ্রাউলিন সম্পর্কে সত্যি কিছুই বলতে চাইনি। অবশ্য আমি অপেক্ষা করব ভবিষ্যতে কি ঘটে দেখবার জন্য। তবে বিশ্বাস করুন, আপনি ছাড়া কাউকে আমি এ কথা বলিনি। এ গোপনীয়তা ভঙ্গ করিনি। আসলে আমার এই ব্যস্ততা আমার বাড়ির সুনাম রক্ষার জন্য। আর সেই কারণেই ফ্রাউলিনের ব্যাপারে আমি এত চিন্তিত হয়েছিলাম।"

দরজার ফাঁক দিয়ে 'কে' চীৎকার করে বললঃ "সুনাম রক্ষা, তাই না? তুমি যদি তোমার বাড়ির সুনাম রক্ষার জন্য অত বেশী উদ্‌গ্রীব হতে তবে সবচেয়ে আগে আমাকে তোমার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।" এই কথার শেষে 'কে' দরজা বন্ধ করে দিল। গ্রাহ্যই করল না দরজায় অন্যদিকে কি কথা বলছে।

ঘরে ফিরে এসে তার মোটেও ঘুমুতে ইচ্ছা করল না। সে ঠিক করল সমস্ত রাত জেগে থাকবে। আর এই সুযোগে দেখবে সত্যি কখন ফ্রাউলিন বার্স্‌ৎনার ঘরে ফেরে। তার সঙ্গে তখন কথা বলবে, যদিও সময়টা তখন খুব সুবিধাজনক নয়। জানালার কাছে এবার ক্লান্ত চোখে বসল 'কে'। চোখ বুজে সে ভাবল, ফ্রাউলিনকে সে তার সঙ্গে একযোগে নোটিশ দেবার কথা বলবে কি। সে বেশ অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে দেখল, ফ্রাউ গ্রুবাককে নোটিশ দেওয়া উচিত। কিন্তু তবু যেন এই কথায় তার মন সাড়া দিয়ে উঠল না। তার মনে হয়, বড় বেশী প্রতিক্রিয়াই এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে। সকালের ঘটনার ফলে সে বোধহয় নিজেই এই আস্তানা ছাড়তে চায়। কে তার মনকে সন্দেহ করতে সুরু করল। কিন্তু এমন কথা ভাবার কি-ইবা অর্থ?

নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রান্ত সে এবার সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সোফায় ডুবিয়ে দিল। তার আগে সে এণ্ট্রেন্স হলের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল। যেই আসুক না কেন, সে তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে না। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে সোফায় বসে একটা সিগার টেনে কাটিয়ে দিল। কিন্তু এইভাবে শুয়ে থাকতে তার আর ভাল লাগল না। তাই উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক ঘরের মধ্যে পাইচারী করল। তার ভাবখানা দেখে মনে হয় সে এর ফলে হয়ত ফ্রাউলিন বার্স্‌ৎনার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবে। অবশ্য ফ্রাউলিনের প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ আর সে অনুভব করছিল না। এমনকি মনেও করতে পারল না আসলে তার মুখের চেহারাটা কেমন। তবুও যেন তার সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এত দেরী হওয়ায় মনে মনে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। তার মনে হল এমন এই দিন যে রাত্রির ঘোমটা পড়ল, তাও বোধহয় এমনিভাবে অপেক্ষাতেই সরে যাবে। তার বিরুদ্ধে কে-র অনেক অভিযোগ জমে উঠলো। তার জন্যই সে আজ এলসার কাছে গেল না। এমনকি এখনও সে তারই জন্য নৈশ ভোজন শেষ করেনি। অবশ্য তার এ অভিযোগের অবকাশ এখনি সে মুক্তি পেতে পারে যদি এলসা যে মদের দোকানে কাজ করে সেখানে চলে যায়। বেশ—মনে মনে ঠিক করল 'কে'। ফ্রাউলিন বার্স্‌ৎনারের সঙ্গে কথা শেষ করে সে এলসার ওখানে যাবে।

(ক্রমশঃ)

শেখার মনস্তত্ত্ব এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তার প্রভাব

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

শৈশব শিশু-শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে শিশু যখন জগতের দিকে ফিরে চায়, তখন জগৎ-জীবন-রহস্য তার মনে অনন্ত কৌতূহল জাগায়। সে জগৎকে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় সমস্ত কিছুকে। অনুভূতির মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তার জানার পালা। অজস্র ভাবনা, অফুরন্ত কৌতূহল, নিত্য-নূতন কৌতুক শিশু-মনের জিজ্ঞাসাকে মুখর করে তোলে—এবং অলক্ষ্যে আরম্ভ হয় তার শিক্ষা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি কেবল সজাগ হয়ে উঠে না, বস্তু জগৎ সম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব ধারণা জন্মে। তাই এই বয়সে শিশুর জানার আগ্রহ, অনুকরণ স্পৃহা, স্মৃতি শক্তি, অধ্যবসায় এমন এক অদম্য উৎসাহ আর কৌতূহলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে শিশু যে জ্ঞান আহরণ করে, পরিণত বয়সের আপ্রাণ চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকারণ কৌতূহল যেমন কমতে থাকে, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মনের আগ্রহও তেমনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েঃ আর সে অফুরন্ত উদ্যম থাকে না; কাজেই মন আর বহির্প্রেরণায় তেমন করে সাড়া দেয় না! সেইজন্যে শৈশবে শিশুর কৌতূহল বা ইচ্ছাকে অবদমন করতে নেই, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তা না হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হতে পারে; কারণঃ

The greatest amount of learning taking place during the period if unmaturity.

কাজেই শৈশবের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিশু যাতে তার জীবনের সমস্ত সুযোগ-গুলোকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিলে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন যে আপনা থেকেই গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের এই প্রস্তুতি করণের অবাধ স্বাধীনতা, অফুরন্ত সুযোগ কেবল কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে মিলতে পারে, আর কোথায়ও তা সম্ভব নয়।

শিশুমন যখন থেকে বহির্প্রেরণায় সাড়া দেয়, তখন থেকেই আরম্ভ হয় তার শিক্ষা। তাই জীবনের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য জীবন নয়। জীবনের প্রস্তুতি চলেছে নিরন্তর—কখনো তার প্রেরণা আসে বহির্জগৎ থেকে, আবার কখনো আসে ভিতর থেকে। এই যে বিচিত্র প্রেরণার সঙ্গে শিশুমনের বোঝাপড়া চলেছে, তা এতই অনন্ত এবং অফুরন্ত যে, তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলা অসম্ভব। এইজন্যে নির্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন; কেমন করে তা সম্ভব? কেন, মনের মাপকাঠিতে বাছাই হবে ভাল মন্দ লাগার তারতম্য অনুসারে। সকল প্রেরণাই যে মনকে আলোড়িত, অনুপ্রাণিত করতে পারবে এমন নয়; কারণ বহির্প্রেরণালব্ধ অনুভূতি মাত্রই প্রীতিকর বা আনন্দদায়ক হতে পারে না; তা ছাড়া এই প্রীতি এবং অপ্রীতিকরের প্রশ্নটাও অনেকাংশে নির্ভর করে মানসিক অবস্থার উপর। সুতরাং এই যে বহির্জগত আর অন্তর্জগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান প্রদান চলছে, তাকে গ্রহণ এবং বর্জন যা কিছু করছে মন। কাজেই এই গ্রহণ এবং বর্জন যদি শিক্ষার মূলনীতি হয়, তবে সে যে মনের অভিরুচির রঙে রূপায়িত হবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন উঠে যে, শেখার পদ্ধতি বলতে তবে আমরা কি বুঝবো? বর্জন, না গ্রহণ ও দুটোর কোনটাই নয়, সে হচ্ছে নির্বাচন—একেবারে ভিন্ন প্রক্রিয়া। তবে গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যে দিয়েই যে নির্বাচন সঠিকভাবে মনের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত হবে তাকেই আমরা শিক্ষা বলবো। অবশ্য এই শেখার ব্যাপারটা অভ্যাসের দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হয়। তাই শেখার পদ্ধতি কি, তার উত্তরে একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন যে,—

Learning is nothing but making the responses appropiate."

এখানেই বাছাইএর কথা উঠে, কারণ এই responseকে appropriate করতে হলে অনেক অবান্তর অপ্রীতিকর বিষয়কে বাদ দিয়ে, যা মনকে নাড়া দেয়, যা ভাল লাগে, যে প্রেরণায় প্রাণ সাড়া দেয়, তাকে বেছে নিতে হবে। অবশ্য আদিম সহজাত প্রবৃত্তিগুণেও মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা।

তবে শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে উদ্যম। প্রচেষ্টা ভিন্ন কিছুই শেখা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা দেখি যে কোন নূতন বিষয় আয়ত্ত করবার সময় আমরা ভেবে চিন্তে কোন নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করি না। বরং বার বার চেষ্টা করে একটা উপায় নির্ধারণ করবার প্রয়াস পাই। চলতি কথায় যাকে দেখে বা ঠেকে শেখা বলা। প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটা সেইরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সুরু হয়। এই যে পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখা একে অনেকে নির্বাচন নীতি বলেছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একে বলা উচিত বাছাই প্রথা। যতদূর সম্ভব ভুল বিষয়বস্তু বা পন্থা পরিহার করে নির্ভুল উপায়ে কিছু শেখার চেষ্টা করারই নাম শিক্ষানুশীলন।

এই প্রসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইকের নাম উল্লেখযোগ্য, ইতর প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা মূলক পরীক্ষা করে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে গিয়েছেন, তা শেখার পদ্ধতি (laws of learning) নামে অভিহিত। এখন সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

পরিণাম পরিমিতিই হচ্ছে শেখার প্রথম নীতি। এই পদ্ধতির পরিমিতির প্রভাব কি, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে থর্নডাইক্ বলেছেন যে, কোন বহির্প্রেরণার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মন যেখানে সহজে সাড়া দেয়, সেখানেই বুঝতে হবে যে, পরিণাম পরিমিতির (laws of effect) প্রভাব বিদ্যমান। যে কোন অবস্থায় বহির্প্রেরণার সঙ্গে যখন মন শুধু সাড়া দেয় না, মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একটা সন্তোষজনক সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন সেই অনুভূতি আমাদের স্মৃতিপটে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়; সেখানে আপনা থেকেই এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে যে, তখন সেই ঘটনা পরম্পরা আমাদের ভাল লাগে, অর্থাৎ তা আমাদের মনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে সম্পর্কটি যদি বিরক্তিকর বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে সে অনুভূতি আমাদের মনে কোনই রেখাপাত করে না। বরং মন স্বেচ্ছায় সেই অপ্রীতিকর অংশটুকু বর্জন করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব স্মৃতির তিক্ত বা মধুর অভিজ্ঞতার উপরই ভাল মন্দ লাগার তারতম্য নির্ভর করে। তবে নিয়মিত একটা কিছু করার ফলে যা অভ্যাসে পরিণত হয়, তাকে পরিহার করা কঠিন। প্রথম দিকে হয়তো বা প্রচেষ্টার ফলে অচার আচরণের কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা যায়, তা বলে কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তিকেই বদলানো যায় না! যেমন স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার কথাই ধরা যাক। শ্বাস বা পাক যন্ত্রাদির ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না; ও প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, তার

উপর মানুষের কোন হাত নেই। হাঁচি, কাসি হাইতোলা প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও বহুকষ্টে সংযত করতে হয়। এই সামান্য প্রক্রিয়াগুলিকে নিরুদ্ধ করতে না জানি কী সচেতন প্রচেষ্টাই করতে হয়। অবস্থাবিশেষে হাস্য-প্রবণতা দমন করাও যায়, আবার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোযোগ দেওয়াও সম্ভব। এই তো গেল পরিণাম পরিমিতর কথা।

এখন পৌনঃপুনঃ বা ব্যবহারিক নীতির (law of frequency, use or disuse) জগতে আসা যাক। প্রয়োজন সর্বস্ব জৈবিক জীবনে অপ্রয়োজনের স্থান নেই; কারণ সেখানে আছে শুধু জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম, আর নৈমিত্তিক দাবীদাওয়া মেটানোর প্রচেষ্টা। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে যখন আমাদের আগ্রহ জাগ্রত হয়, তখন আমরা সে বিষয় সহজেই আয়ত্ত করতে পারি। এই যে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু করা, যে কোন সুযোগকে জীবনের কাজে লাগানো,—এই প্রচেষ্টাকেই থর্নডাইক বলেছেন ব্যবহারিক নীতি। এ পদ্ধতির মধ্যে অবশ্য দুটি প্রধান দিক আছে—তার একটি হচ্ছে ব্যবহার, অন্যটি হচ্ছে অব্যবহার। অভ্যাস, অনভ্যাসের দ্বারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবহারিক নীতি। তাই দেখা যায় যে, বহির্প্রেরণার সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকলেই অভ্যাসের দ্বারা যেমন একটা আচরণ বদ্ধমূল হয়ে উঠে, অনভ্যাসের দরুণ নিশ্চয় সে সম্পর্কের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে সন্তোষজনক বা অপ্রীতিকর মনোভাবের কথা ভুললে চলবে না; কারণ নিত্য ব্যবহারের ফলে যে প্রচেষ্টা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ ভাল লাগার ফলে বহির্জগতের সঙ্গে যেখানে মনের একটা নিবিড় আত্মিক যোগ ঘটেছে—সেখানেই আছে একই প্রক্রিয়ার বহুদিনের পুনরাবৃত্তি। এ ছাড়া আরো দুটি প্রক্রিয়া আছে, যা একান্ত অলক্ষ্যে আমাদের স্মরণের মণিকোঠায় প্রতিদিনের চিহ্ন রেখে যায়—তা হচ্ছে ঘটনার আতিশয্য (Intensity) আর নূতনত্ব (Recency)। অর্থাৎ ঘটনার প্রভাব মনে যতই রেখাপাত করে, ততই ঘটনা-প্রবাহের স্মৃতি আমাদের স্মরণের সিংহাসন অধিকার করে বসে; আর এই প্রক্রিয়া যতই ঘন ঘন চলতে থাকে—বিস্মরণের যবনিকা যেমন দূরে সরে যায়—ততই স্মৃতির শাখায় স্মরণের ফুল ফুটে উঠে।

কার্যতৎপর নীতিই (law of readiness) হচ্ছে শেখার তৃতীয় স্তর। কার্যকারণ ভিন্ন কোন কিছুই সম্ভবপর নয়; তবে কাজ করবার যে কোন অভিপ্রায়ের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন, নইলে প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যাবার আশংকা আছে। কাজেই প্রস্তুতির গোড়াপত্তন ভাল না হলে কাজ যে ফলপ্রসূ হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্য অনেকে এই নীতিকে বলেছেন 'প্রস্তুতি' অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়। কার্যতৎপর নীতির মূলে কথা এই যে, কাজের সঙ্গে যেখানে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেখানেই শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায়। এখানে অবশ্য আবার সেই ভাল মন্দ লাগার প্রশ্নও আছে। কাজেই এক কথায় প্রস্তুতি বলতে আমরা বুঝি যে, when any conduction unit is in readiness to conduct, for it to do so is satisfying when a conduction unit is not in readiness for it to conduct is annoying.
অর্থাৎ যে চলমান কর্মপ্রবাহে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে উঠে তাকে আমরা তৃপ্তিকর সুখানুভূতি বলতে পারি, কিন্তু তার উল্টো প্রক্রিয়াকে অপ্রীতিকর উপলব্ধি বলা চলে। সেই কারণে যখন কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়, তখন সেই কাজ সমাধা করতে পারলেই মন তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠে, অন্যথায় সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে! এই তিনটি প্রধান নীতির সঙ্গে থর্নডাইক যথাক্রমে আরো পাঁচটি শিক্ষার তথ্য জুড়ে দিয়েছেন, যথা—গুণিতক অনুভূতি (multiple response to the same external situation) অর্থাৎ একই বহির্প্রেরণার সঙ্গে মন যেখানে একাধিকবার সাড়া দেয়, যেখানে প্রীতির সম্পর্কের অবাধ লেন দেন চলে—তাকেই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি বা গুণিতক বলে। যেমন শয়নকক্ষে এসেই নববিবাহিতা মেয়েদের যেই প্রবাসী স্বামীর কথা মনে পড়ে যায়, অমনি তারা স্বামীর আলোকচিত্র বার করে তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে এই আচরণ তাদের নৈমিত্তিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রবণতা (Attitude set or disposition)। কোন বিষয়ের প্রতি গভীর আসক্তি থাকলে, সে বিষয় আয়ত্ত করতে বিশেষ সময় লাগে না, বরং দিন দিন তার প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। যেমন ধরা যাক, ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস প্রবণতা, শিল্প এবং সংগীত প্রীতি—এ অভ্যাসগুলি এমন করে মানুষকে পেয়ে বসে যে, সাধনা-নিরত যোগীর মতই এই প্রবণতায় মানুষ অনেক সময় পার্থিব জগতের কথা ভুলে যায়। ফলে এমন একাগ্রচিত্তে সে তার সাধনায় মশগুল হয়ে যায় যে, সে-সাধনায় তার সিদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জন্মগত স্বাভাবিক প্রবণতাগুণেও অনেক কিছু শিখতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ হচ্ছে আংশিক প্রক্রিয়া (partial activity)। অর্থাৎ যে বহির্প্রেরণা আমাদের অনুভূতিতে গানের রেশের মত একটা মধুর স্মৃতির ইঙ্গিত রেখে যায়, আর সেই অর্ধ-চেতনাকে আমাদের সজ্ঞান-মনে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি, ফলে আমাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে উঠে; এবং আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। শিক্ষার এই পরোক্ষ নীতিকেই আংশিক প্রক্রিয়া বলে।

চতুর্থতঃ হচ্ছে সদৃশ্যীকরণ (law of assimilation or analogy)। যে কোন জানা শিল্প বা কৌশলের অনুরূপে অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করতে বেশী সময় লাগে না। কার্যবিধির মধ্যে যেখানে যত সাদৃশ্য বিদ্যমান, অথবা একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের যদি খুব মিল থাকে, তবে একটির বিষয় ওয়াকিবহাল হতে পারলে, সহজেই অন্যটির বিষয় জানা যায়। যেমন গান বাজনার কথাই ধরা যাক। সংগীতের তাল-লয়-মান সম্বন্ধে যার নির্ভুল ধারণা জন্মেছে, চেষ্টা করলে সে সহজেই সংগৎ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে। এই যে শিক্ষার বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ রয়েছে—একেই সদৃশ্যীকরণ বলে।

পঞ্চমতঃ হচ্ছে পরিবেশ বদল (law of associative shifting) অর্থাৎ বৈচিত্র্যের আনন্দের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক নূতন বিষয় শিক্ষালাভ করতে পারি। দিনের পর দিন একই বিষয় পড়তে পড়তে যখন অবসাদ আসে, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে উঠে, তখন নূতন বিষয়ের অবতারণার দ্বারা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে শেখার ঝিমিয়ে আসা আগ্রহকে যে পুনর্জীবিত করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এইজন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা দেশভ্রমণকে শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংগ বলে মনে করেন। দেশ দেশান্তরের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার যে বাস্তব জ্ঞান জন্মে,—বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পুস্তকপাঠের সেই গতানুগতিক উপায়ে তা লাভ করা অসম্ভব। এই যে দৃশ্যান্তরের সঙ্গে শিশুর জানার পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, একেই পরিবেশ বদল বলে।

শিক্ষার মনস্তত্ত্বের পরই শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি করণের কথা এসে পড়ে। কি করে শিখতে পারি বা শেখার পদ্ধতি কি, তা জানার পরেই শিক্ষণ-ক্ষমতার কথা উঠে। অর্থাৎ কত বেশী এবং কতদূর পর্যন্ত শিখতে পারা যায়? যদি সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তা হ'লে শিক্ষার মান কি সর্বত্রই একই হবে? অথবা অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হবে? অভ্যাসকালীন শিক্ষার হার কি একইরূপ থাকে? না, কখনো কম, কখনো বা বেশী হয়? জ্ঞান ও কৌশল কি একইভাবে আয়ত্ত হয়?

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ও বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নেই। এক ঘণ্টায় যতটা শিখতে পারা যায়, দশ ঘণ্টায় যে তার দশগুণ শিখতে পারা যাবে এমন নয়। শেখার আগ্রহ, মনোযোগ, অনুকূল পরিবেশ, শেখাবার ধারা, পুঁথি

সঞ্চিত জ্ঞান, বয়স, শারীরিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতিকরণের তারতম্য ঘটে। বংশগত ঐতিহ্য, শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানার্জন ক্ষমতাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে; অর্থাৎ শেখার হার অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যের উপর। তা ছাড়া সমান তালে একইভাবে সমস্ত কিছু শেখা যায় না। অর্থাৎ এক ঘণ্টায় যা শেখা যায়, দশ ঘণ্টায় তার দশগুণ শেখা যাবে, তা কিন্তু সম্ভব নয়! নূতন বিষয় শেখা অপেক্ষা পুরাতন বিষয় আবার ঝালিয়ে নেওয়া অধিকতর সহজ। কোন জিনিষ গোড়ার দিকে যত তাড়াতাড়ি শেখা যায়, পরে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি শেখা যায় না। প্রত্যেকেরই শিক্ষা-জীবনে এমন এক সময় মাঝে মাঝে আসে, যখন কোন কিছুই শিখতে পারা যায় না; অথবা যা শেখা যায়, তা নিতান্তই তুচ্ছ। এই যে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা, একে প্লেটো বা চড়াই বলে।

এই প্লেটো সম্বন্ধেও আবার দুটি মতবাদ আছে। কেহ বলেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি ভাল করে শেখবার জন্য চড়াই-এর প্রয়োজন। অনেকে আবার মনে করেন যে, শিখতে শিখতে যখন অবসাদ আসে, তখনই দেখা দেয়, মানসিক নিষ্ক্রিয়তা; কিন্তু আবার যখন বহিঃপ্রেরণায় আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়, তখনই চড়াই অতিক্রম করা যায়। যতদূর মনে হয় যে, বিষয়টির প্রাথমিক ধারণাগুলি আয়ত্ত হলে যখন প্রথম জানার কৌতূহল প্রশমিত হয়, বা কাজে অবসাদ আসে এই উভয়বিধ কারণেই প্লেটোর আবির্ভাব হয়। যা হোক এটা ঠিক, যে কারণেই প্লেটোর আবির্ভাব ঘটুক না কেন, তা অতিক্রম করতে নূতন করে আগ্রহের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কতটা শিখতে পারা যায়, তা'ও জানা দরকার। সংক্ষেপে বলা চলে যে, কতটা শিখতে পারা যায়, তার একটা দৈহিক ও তাত্ত্বিক সীমা আছে। তার অতিরিক্ত নূতন কিছু শেখা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত অভ্যাস যতই বেশী হোক না কেন, সমস্ত বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করা যাবে এমন নয়; তা ছাড়া আদর্শের কাছাকাছি যাওয়া যায় বটে, কিন্তু আদর্শকে ছুঁতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ কৌশল যত উঁচুদরের হবে, অনভ্যাস ঘটলে তা তত শীঘ্রই ভুলে যাবার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে অভ্যাস করতে হবে? অনেকক্ষণ ধরে কয়েকবার, না কিছুক্ষণের জন্য অনেকবার? পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, নবায়ত্ত কৌশলটি ভুলে যাবার আগেই পুনরভ্যাস করলে সুফল পাওয়া যায়। কোন কৌশল বা বিষয়কে শরগত করতে হলে মনোযোগ সহকারে বার বার অভ্যাস করতে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে কিভাবে শিখতে হবে? সমস্ত বিষয়টাই কি একসঙ্গে, না একটু একটু করে ধীরে ধীরে? একসঙ্গে অনেকগুলি শিশুকে অর্থবোধক কোন একটি কবিতা মুখস্ত করতে দিলে শিশুদের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে পারে। তবে দলগতভাবে কিছু করা এটা বয়স্কদের কাছে অনেকটা সহজসাধ্য হলেও, শিশুদের ক্ষেত্রে সব সময় প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া মুখস্ত করার বিষয় বেশী দীর্ঘ হলে শিশুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে।

অপরপক্ষে অর্থহীন ছাড়া কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে একটু একটু করে শিক্ষা করতে হয়। এই নীতি অবলম্বন করে দেখা গিয়েছে যে, মুখস্ত করার সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। শেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা যাঁদের আছে, তাঁরাই জানেন যে, শিশু-শিক্ষা ব্যাপারে এই পদ্ধতি বা তত্ত্ব কত ফলপ্রসূ। শিশুর আগ্রহ, অনুরাগ, মনোভাব, ভাবাবেগ এবং অভিরুচি অনুসারেই শিশুর উপযোগী শিক্ষা দিতে না পারলে, শিক্ষার প্রতি শিশুর এমন বিতৃষ্ণা আসতে পারে যাতে কোন শিক্ষাই কার্যকরী না হতে পারে। কোন বয়সের ছেলে মেয়ে কতখানি এবং কি বিষয় শিখতে পারে তা শিক্ষকদের জানতে হবে; এদিক দৃষ্টি রেখে যে শিক্ষাই দেওয়া যাক না কেন, শিশুর পক্ষে তা গুরুপাক হবে না, বরং হবে একান্ত স্বাভাবিক। শৈশব থেকেই আরম্ভ হয় শিশুর শিক্ষা। চপলমতি শিশুদের মন কাদার মত কোমল, কাজেই তার উপর বহিঃপ্রেরণা যে, স্থায়ী চাপ রেখে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, শিশু বয়সই শিক্ষার বয়স। কাজেই এই বয়স থেকে শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এমন অনুরাগ, যার অন্তরের তাগিদে শিশু শিক্ষাকে জীবনের অভি.
শিখবে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ.
নিয়ত শিশুর মনে যে কৌতূহল
জাগিয়ে তুলছে; ততই বহিঃপ্রেরণার প্র
শিশু বেশী করে সাড়া দিতে শিখছে। শিশু ভালবাসে, কিসের প্রতি তার বিতৃষ্ণা—ব্যক্তিগত-ভাবে তা জানতে হবে, নইলে কোন শিক্ষা-পদ্ধতিতেই কোন ফল পাওয়া যাবে না।

প্রাথমিক শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাগুলি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, উক্ত নীতি কতদূর প্রযোজ্য। শিক্ষা দেবার পূর্বেই দেখতে হবে যে, শিশু গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে কিনা। শিশু যখন যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে, জানার ইচ্ছা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝতে হবে শিশু শিক্ষালাভ করবার উপযুক্ত। সেই সময় শিশু যা শিখবে তা তার মনে গভীর রেখাপাত করবে। এইজন্যে চাই পরিবেশ সৃষ্টি, শিশুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া সমস্ত কাজে শিশুকে প্রাধান্য দেওয়া—শিশু শিক্ষার কাজে নেমে এই সত্য আমরা বার বার উপলব্ধি করেছি। এইজন্যে আমরা প্রথম প্রথম শিশুর চাহিদার অনুরূপ রসদ যোগাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। যা শিশু ভালবাসে, সে বিষয়ে তার আগ্রহকে সজাগ করে তুলবার চেষ্টা করেছি, ফলও পেয়েছি আশানুরূপ। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলে পড়িয়ে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করবো যে, শিখবার পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য হয়েছে।

প্রথমে হাতে কলমে শিক্ষার কথা ধরা যাক। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে গিয়ে আমরা

উপর মানুষের কোন হা
হাইতোলা প্রভৃতি
বহুকষ্টে সংযত
প্রক্রিয়াগুলি
সচেতন
হাস

কাজ করার
চ করে যে,
প্রবল হয়ে
য় তাই সে
নুভব করতে
for method
শেখে। প্রথম
সম্বন্ধে কোন
ধারণা নেই, সে শিশু ... করে স্পর্শানুভূতির উপর নির্ভর করে। যে ঘটনা তার কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়, তা সে ক্রমে ক্রমে বর্জন করতে শেখে। আবার অনেক সময় বার বার ভুল করতে করতে হঠাৎ যখন সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে সত্য পথের সন্ধান সে পায় তখন তার প্রাণে আনন্দ ভরে উঠে। এমনি একটি ঘটনা সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমাদের পাঠশালার মুকুল কিছুতেই কাঁচি ধরে গরু ঘোড়ার ছবি (লিনোকাটের সাহায্যে এঁকে দেওয়া) কাগজ থেকে কাটতে পারত না। কাটতে গেলে হয়ত গরুটার গলা, না হয় হাতীটার শুঁড় কেটে ফেলত। যতদিন সে ভাল করে কাঁচি ধরতে শেখেনি, ততদিন কিন্তু সে ছবি কাটায় আনন্দ পেতো না; তারপর সেদিন দেখলাম মুকুল গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাঁচি নিয়ে কি কাটছে। কাছে যেতেই সে উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখালে যে, সে হাতীর ছবি কোনরকমে কেটেছে। দেখলাম তার চোখে মুখে কি আনন্দ দীপ্তি! সে আমাকে বল্লেঃ কাঁচি দিয়ে ছবি কাটতে ভারী মজা লাগে মাস্টার মশায়। কাঁচিটা আমায় দেবেন, বাড়ি গিয়ে কাগজের অনেক হাতী কেটে আনবো।

বুঝলাম অনেকবার ভুলচুক করে কাঁচির ব্যবহার সে শিখেছে, তাই তার ও কাজে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। শিশুরা যে কত অনুকরণপ্রিয় এবং make belief খেলায় যে তারা কত আনন্দ পায় তা উপলব্ধি করেছি অনেকবার। এইধরণের প্রীতিকর খেলাধুলায় শিশুদের সাড়া দিতে দেখেছি গভীরভাবে। যে পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত, যে জীব জানোয়ার সে দেখেছে, তাদের অনুকরণ করে কিছু করতে বল্লেই ছেলেদের মধ্যে নিজেদের জাহির করার প্রতিযোগিতা পড়ে যায়—কে কত ভাল করে তার অনুকরণ করতে পারে।

কোন কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করানোর পর অনেকদিন সে ব্যায়ামটি অভ্যাস না করিয়ে, পরে ক্লাস নিতে গিয়ে দেখেছি যে, সে অঙ্গভঙ্গি শিশুরা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু হাঁসের মত বা ব্যাঙের মত চলার স্মৃতি তাদের মনে দাগ কেটে বসে গেছে। ছড়া মুখস্থ করানোর সময় দেখেছি যে, যেগুলি তাদের এক সপ্তাহ ধরে শেখান গেছে, সেগুলিই তারা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শিখেছে। কিন্তু যেগুলি কিছুদিন অন্তর শিখাবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি আয়ত্ত করতে ছেলেদের অনেক বেশী সময় লেগেছে। শিক্ষার প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কোন ধারণা শিশুদের মনে নেই, তবে কোনটি প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর তা ছেলেরা বেশ বুঝতে পারে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে ছেলের উপযোগী কয়েকটি খেলা শিখিয়ে পূর্বের চেয়ে ভাল ফল পেয়েছি। সেদিন দৌড়ে গাছ ছুঁয়ে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াতে বলতেই দেখলাম 'বেলা' বলে একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে; অন্যেরা তখন দৌড় দিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, আগের দিন দৌড়াতে গিয়ে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে, তাই ওর এ খেলার প্রতি ভয় জন্মে গেছে। সে ওখেলা শিখতে নারাজ।

দীর্ঘ কবিতা একসঙ্গে শিশুরা যে মুখস্ত করতে পারে না তা পরীক্ষা করে দেখেছি। অর্থহীন দীর্ঘ কবিতা একটু একটু করে অনেকদিন ধরে শিক্ষা দিলে শিশুরা শিখতে পারে। এক্ষেত্রে ড্রিলিংএর বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সময়ের ব্যবধানে শিশুরা অনেক কিছুই ভুলে যায়। ছুটির পর এসে এ সত্য আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। ছুটির আগে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যা তাদের শিখিয়েছিলাম, যেমন সংখ্যা গণনা করা, তিনের ঘরের খানিকটা নামতা, বৃষ্টিপড়ার গান প্রভৃতি, এসে দেখি ছেলেদের অনেকের মন থেকেই তার অনেক কিছুই বিশেষ করে সংখ্যার ধারণা মুছে গিয়েছে এবং অল্পবিস্তর অনেক কিছু সুঅভ্যাসই তারা ভুলে গিয়েছে। যদিও কিছুদিন পূর্বে অনেক অনুশীলন করেই সেগুলি তারা শিখেছিল। এর কারণ এই যে, সময়ের ব্যবধানে শিশুর স্মৃতি থেকে অনেক দাগই মুছে যায়। এইজন্য ক্ষেত্র বিশেষে ঘন ঘন অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপসংহারে এই কথাই বলা চলে যে, শিশুকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সুতরাং শিশু জীবনের চাহিদা এবং অনুরাগের দিকে দৃষ্টি রেখে শিশু বিদ্যালয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশুর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সম্যকরূপে জাগ্রত হয়। শিশুর মন তৈরী না হলে, শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে অরণ্যে রোদনই হবে।

কাশ

সুশীলকুমার গুপ্ত

শ্রাবণের কান্নাশেষে। সজল সবুজে ভরা মাঠে
কাশ ফুলে আনন্দের শঙ্খ শুভ্র ঢেউ অগণন,—
সে ঢেউয়েরা ভেঙে পড়ে দিগন্তের স্বচ্ছ নীলঘাটে,
ছড়ায় মেঘের ফেনা রাশি রাশি তুলোর মতন।
রাঙা রৌদ্রপাল তুলে ইতিহাস দূরের পথিক,
হৃদয়ের পথ এঁকে বলাকার সারি উড়ে যায়;
জীবন সাহানা বাজে, তরঙ্গের হাসির ঝিলিক,
ধোঁয়ার রক্ত কলঙ্কের চিহ্নলুপ্ত দীপ্ত শুভ্রতায়।

এরি কতগুলি ঢেউ খেলা করে হৃদয়ের তটে;
সকল গ্লানিমা মৃত্যু অন্ধকার ধুয়ে মুছে যায়
শুভ্রতার শুচি হস্তে; স্মৃতির আশ্চর্য দীপ্ত পটে
অনেক হারানো মুখ ছবি, কালো নয়ন তারায়
বিদ্যুতের টানগুলি কেউ যেন আঁকামোছা করে;
তুষারের মত শান্তি দগ্ধ মন-মাঠে শুধু ঝরে!



প্রাচীন পারসীক হইতে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

মৃত্যুরে করি না ভয় হেন মিথ্যা কথা
কেমনে বলিব বলো? অন্তিম জড়তা
তুহিন তর্জনী তুলি একটি ইঙ্গিতে
স্তব্ধতার নাগপাশে সকল সঙ্গীতে
নিষ্পেষিয়া বন্দী করে; হাসি, সখ্য, প্রীতি,
তৃণ দলে মুক্তা বিন্দু, ঋতুর বিবৃতি
নব নব ভাষাময়ী, নিখিল চেতনা
আমার অন্তর লোকে করে আনাগোনা
মৃদুচারী বধূ সম, সব যাবে থেমে,
অনন্ত অসীম কালো ঊর্ধ্ব হ'তে নেমে
ঢেকে দিবে পরিচয়, মৃত্যু তারে বলি।
তাহারে করি না ভয়? আপনারে ছলি।
কিন্তু যবে ভাবি মনে তুমিও মৃত্যুর,
মৃত্যুরে অমনি মনে হয় অন্তঃপুর॥

২

জরারে করেছি জয় হেন মিথ্যা কথা
কেমনে বলিব বলো? সঙ্গীতে নিরতা
দেহের ধমনী ধারা হবে অচপল,
অন্তরের উচ্ছ্বসিত বাসনা বিহ্বল
পাষাণী অহল্যা হবে, সুখের কার্মুক
আকর্ণ টানিয়া এনে উদ্বেলিত বুক
আর কি হানিব শর? ভাষার অঞ্চল
দুই হস্তে নিঙাড়িয়া বেদনাশ্রুজল
হানিতে কি শক্তি রবে? হয়তো তখন
পূর্ব প্রেম স্মৃতিচ্ছবি করিব গোপন
সঙ্কোচে সম্ভ্রমে লাজে! হয়তো সেদিন
তোমারে দেখিয়া চোখে নামিবে প্রবীণ
পাণ্ডুচ্ছায়া, মনে হবে তোমার সে জ্যোতি
অনভিজ্ঞ নয়নের কল্পনা-মূরতি॥

৩

কিন্তু যবে মনে করি জরা দৈত্য, হায়,
তোমারো অনিন্দ্যরূপে হাতটি বাড়ায়
সঙ্গোপনে, মনে পড়ে নিষ্ঠুর অঙ্গুলি
গালের গোলাপ যত লইতেছে তুলি,
চোখের অপরাজিতা, অকুণ্ঠ গ্রীবার
শিশির নির্যাসে স্নিগ্ধ রজনীগন্ধার
পুষ্পগুলি একে একে করিছে চয়ন—
জরার বিষম শঙ্কা মিলায় তখন।
মনে হয় বিশ্বজয়ী জরার সন্দনে
একলগ্নে যাত্রা মোরা ক'রেছি দু'জনে।
কালের নিয়মে তুমি হইবে জরতী
আর যদি আমি রই অনন্ত যযাতি,
হেন সম্ভাবনাচ্ছায়া মহা সর্বনাশ।
এই তো সৌভাগ্য সখী মোরা যুগ্ম গ্রাস॥

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পিতাঠাকুর মহাশয়ের পেন্সন নেওয়ার পর পূর্ণিয়ার পাট তুলে দিয়ে আমরা সপরিবারে কলিকাতায় ভবানীপুরে এসে বাস আরম্ভ করেছি। কলিকাতায় দাদা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেছেন।

পূর্ণিয়ায় আমি গভর্মেণ্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন করতাম। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ফ্র্যান্সিস্ জেভিয়ার মুখার্জী। ধপ্‌ধপে গৌরবর্ণ দেহ, মুখে এক মুখ কাঁচা দাড়ি-গোঁফ, শান্ত ভদ্র আকৃতি, শাসনের লেশমাত্র উগ্রতা ছিল না; কিন্তু আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ করতাম সহজ প্রবৃত্তির বশে।

পূর্ণিয়ার স্কুলে বাঙলা পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং আমাকে পড়তে হ'ত হিন্দী। আমার বাঙলা দেশের সহপাঠিগণ যখন পড়তেন, 'ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ, কে দিল তোমারে এরূপ রূপ?' তখন আমি পূর্ণিয়ার স্কুলে পড়তাম,—

ছহরে' শিরপর ছব মোর-পখা,
উনকী নথকী মুক্তা থহরে'।
ফহরে' পিয়ারো পট-বেণী ইতে,
উনকী চুনরিকে ঝবা ঝহরে'॥

আরও নিম্নশ্রেণীতে আমি যখন পড়তাম—

সুত বিত নারী ভবন পরিবারা
হোঁ হি যাহি জগ বার হি বারা।
অস বিচার জীয় জাগহু' তাতা,
মিলে ন জগমে সহোদর ভ্রাতা॥

তখন বাঙলা দেশের আমার বয়সের বালকেরা পড়তেন,—

রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয়ধন,
কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ।

আমার সরোজিনী দিদি বাঙলা পড়তেন। তাঁর কাছে শুনে শুনে আমি বাঙলা ভাষার শিশু-কবিতা কণ্ঠস্থ করতাম। তা ছাড়া, সখা, সাথী, সখা ও সাথী, মুকুল প্রভৃতি ছেলেদের মাসিকপত্রগুলি বাঙলা শিক্ষার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করত। আমার বাঙলা ভাষা শিক্ষার প্রকৃত ক্রম হচ্ছে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা—তারপর একেবারে সুদীর্ঘ লম্ফে বিষবৃক্ষ। কথামালা এবং বিষবৃক্ষের মধ্যস্থল জুড়ে ছিল হিন্দী ভাষার শিক্ষা।

কলিকাতায় আসার পর ভর্তি হলাম ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বান স্কুলে। প্রকাণ্ড স্কুল, হাজার-বারশ' ছাত্র, হেডমাস্টার সুবিখ্যাত শিক্ষানায়ক বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। হেডমাস্টার মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করতাম যথেষ্ট। কিন্তু তার চতুর্গুণ ভয় করতাম শ্রীপতি হেডপণ্ডিত মহাশয়কে। সাধারণত ছেলেরা পণ্ডিতমশায়দের ভয়-ভীতি একটু কমই করে, কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিতমশায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই ছিল। দেখতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন; দোহারা দেহ, ফুট-ফুটে রঙ, সুন্দর মুখশ্রী, প্রতিভাব্যঞ্জক চক্ষু। কিন্তু তিনি যখন কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে কোন ছাত্রের প্রতি ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বক্র কটাক্ষে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতেন তখন সে ছাত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত ভয়ে হিম হয়ে যেত। তিনি গাল-মন্দ দিতেন না, রূঢ় কর্কশ ভাষাও প্রয়োগ করতেন না; কিন্তু মার্জিত ভদ্র ভাষায় এমন মর্মন্তুদ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে জানতেন যে, তার কাছে কিল-চড় চাপড় অনেক নিম্ন-স্তরের দণ্ড বলে মনে হ'ত।

শ্রীপতি পণ্ডিতমহাশয়ের ক্লাসের এক-দিনকার একটা ঘটনা বলি। সেদিন আমাদের পাঠ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নামে আমাদের ক্লাসে কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণের একটি ছাত্র পড়ত। সর্বদা অসুখে ভুগে-ভুগেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সনৎ ছিল নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারা ধরণের ছেলে। তার শান্ত, মিষ্ট প্রকৃতির জন্য তাকে আমার বড় ভাল লাগত।

বেঞ্চে বসে ডেস্কের উপর নেতিয়ে পড়ে নির্বিষ্টচিত্তে সনৎ পড়া শুনছিল, এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের তার উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল।

"সনৎকুমার!"

ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সমীহ ভরে সনৎ বললে, "আজ্ঞে পণ্ডিতমশায়?"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "কিম্‌টা ধাতু, না শব্দ?"

মুহূর্তকাল চিন্তা করে সনৎ বললে, "ধাতু পণ্ডিতমশায়।"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "পরস্মৈপদী, না আত্মনেপদী?"

এখন, সংস্কৃত ব্যাকরণের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের কল্যাণে সনৎকুমারের এটুকু জানা ছিল যে, উভয় পদের মধ্যে পরস্মৈপদীটা কিছু সহজ এবং আত্মনেপদী অপেক্ষাকৃত কুটকচালে তাই সে মাথা একটু চুলকে বললে, "পরস্মৈপদ পণ্ডিতমশায়।"

"রূপ কর।"

পরস্মৈপদীর সাধারণ ফর্মায় কিম্ শব্দকে নিক্ষেপ করে সনৎকুমার রূপ ক'রে চলল "কিমতি কিমতঃ কিমন্তি, কিমসি কিমথ কিমথ, কিমামি কিমাবঃ কিমামঃ, অকিম অকিমতাম্ অকিমন্—"

হস্ত প্রসারিত করে সনৎকুমারকে বাধা দিয়ে গভীর স্বরে শ্রীপতি পণ্ডিতমশা বললেন, "থামো সনৎকুমার, থামো—তুমি যে রকম অবলীলাক্রমে রূপ ক'রে চলেছ, তাতে আমারই এখন সন্দেহ হচ্ছে কিম্‌টা ধাতু, না শব্দ!"

অবস্থার কৌতুকপরতায় এবং তার উপর এই সরস মন্তব্যে একটা দম-ফাটা হাসি আমাদের কণ্ঠে এসে হাজির হয়েছিল; কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিতমশায়ের ব্যক্তিত্বের চাপে সে দুর্দমনীয় হাস্যকে তার উৎসক্ষেত্রে নিঃশব্দে নামিয়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সে সময়ে হিতবাদী নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত 'কুটিবিকরা' শীর্ষক এক কবিতা সম্পর্কে মানহানির মকদ্দমার বিচারে উক্ত পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নয় মাসের কারাদণ্ড হয়। বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে আমরা সাউথ সুবার্বান স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিত হয়ে প্রতিবাদস্বরূপ একটি কবিতা ছাপাই। কবিতাটি রচিত করে বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়। দুই ভাগে কবিতাটির মর্ম বিভক্ত। প্রথম অংশে বিচারপতির অবিচারের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ; এবং দ্বিতীয় অংশে অকারণে দণ্ডিত কাব্যবিশারদ মহাশয়ের প্রতি সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভবানীপুরে বাস করতেন। হিতবাদী পত্রের সুযোগ্য এবং নির্ভীক সম্পাদনার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কবিতা ছাপিয়ে যুগপৎ কর্তব্যবোধ ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছি মনে করে আমরা মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করছিলাম। কবিতাটি স্কুলের ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের মধ্যে বহুলভাবে বিতরিত হয়েছিল।

ইংরাজির ক্লাস। ধীরে ধীরে ক্লাসে প্রবেশ করলেন হেডমাস্টার বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। আসন গ্রহণ করে তিনি চাপকানের পকেট থেকে বার করলেন এক খণ্ড আমাদের প্রতিবাদ কবিতা। সাগ্রহে আমরা কান পাতলাম সুখ্যাতি শোনবার প্রত্যাশায়। কিন্তু হা

হরি! আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বেণীমাধব বললেন, 'এই কবিতাটি ছাপিয়ে তোমরা দুটি ভুল করেছ। প্রথমত, মকদ্দমার বিচার-অবিচার সম্বন্ধে তোমরা ছেলেমানুষেরা কি বোঝো? আমরা, তোমাদের মাস্টারমশায়রা ত' কিছু বুঝিনে। সুতরাং ও বিষয়ে তোমরা যা কিছু অভিমত প্রকাশ করেছ, তা হয়েছে অনধিকার চর্চা। তোমাদের দ্বিতীয় ভুল, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তোমরা সান্ত্বনারই বানান ভুল করে বসেছ। 'ন'য়ের নীচে শুধু 'ত' দিলে সত্যিকার সান্ত্বনা দেওয়া হয় না; 'ন'র নীচে 'ত, আর তার নীচে 'ব' দিলে তবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা সান্ত্বনাও দিয়েছ ভুল।" আমাদের কবিতার শিরোনাম ছিল "সান্ত্বনা"।

হেডমাস্টার মহাশয়ের মন্তব্যে আমরা লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই; কিন্তু উপকৃতও হয়েছিলাম, অন্ততঃ আমি। অপরের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সান্ত্বনা শব্দ লিখতে কখনো বানান ভুল করি নি। হাতীর কথা মনে হলে শুঁড়ের কথা যেমন অনিবার্যভাবে মনে আসে, সান্ত্বনার কথা মনে হলে ব-ফলার কথা তেমনি মনে পড়ে।

আর একটি ইংরাজি শব্দের বানানের বিষয়েও একটি কৌতুকজনক কাহিনী আছে। আমি তখন casual student-রূপে রিপন কলেজে বি-এ পড়ি। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার দুই বৎসরের বি-এ অধ্যয়ন সাঙ্গ করা ছিল, অসুস্থতাবশত পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারি নি বলে অধ্যয়নের অভ্যাসটা চালু রাখবার উদ্দেশ্যে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কলেজে আমার কর্তব্য ছিল দুটি,—প্রথমত, মাসে মাসে কলেজের মাহিনা দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ইচ্ছামত ক্লাসের লেকচারে উপস্থিত হওয়া অথবা না হওয়া। বৎসরান্তে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে পরীক্ষা দোব,—সুতরাং রিপন কলেজে অ্যাটেন্ডেন্স রাখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রথম প্রথম নিয়মিত কলেজে যেতাম, কিন্তু যাওয়ার মূলে প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না বলে ক্রমশই যাওয়ায় শৈথিল্য দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বেছে-বুছে পছন্দ মতো, এমন কি সুযোগমতো যেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাস আমি পারতপক্ষে বাদ দিতাম না। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বার্কের অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পড়াতেন। কিন্তু সে ত পড়ানো নয়; সে যেন অগ্নিগর্ভ ওজস্বিনী ভাষায় স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্রপাঠ। সুরেন্দ্রনাথের পড়ানো শুনে মনে হত, এডমণ্ড বার্ক-এর অশরীরী আত্মা যেন তাঁর দেহের মধ্যে ভর করে অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সএর ভাষায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের দুর্বার দাবী পেশ করছে। যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজি বক্তৃতার ভাষা, যুক্তি এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিলাতের ইংরাজগণ পিট, ফক্স প্রমুখ ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর বক্তাগণের ভাষা, যুক্তি এবং কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে বিমুগ্ধ হতেন, সেই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের উদাত্ত হতে অনুদাত্তের মধ্যে ওঠা-নামার অপূর্ব কর্তনা শুনে আমাদের রক্তের মধ্যে আগুন ধরে যেত। তখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের অগ্নিযুগ আরম্ভ হয়েছে; আর সে অগ্নিযুগের প্রধান যজ্ঞক্ষেত্র বাঙলা দেশ এবং প্রধান হোতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন সুরেন্দ্রনাথের ক্লাসে প্রসংগক্রমে ইংরাজি বিগিনিং শব্দের কথা উঠল। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সুনিশ্চিতভাবে আমি জানি বিগিনিং শব্দের মধ্যস্থলে পাশাপাশি দুটি 'এন' আছে, কিন্তু লেখবার সময়ে কেন বলতে পারিনে, বেরিয়ে যায় একটা 'এন'। এ প্রসংগের পর আর কোনওদিন সুরেন্দ্রনাথের একটা 'এন' বেরিয়েছিল কি না বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বেরোয় নি। বিগিনীং লিখতে হলেই সুরেন্দ্রনাথের দুটি 'এন'-এর গল্প মনে না পড়ে যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের ক্লাস ব্যতীত অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্লাসে প্রায়ই যেতাম, আর যেতাম মাঝে মাঝে অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাসে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান পড়াতেন। তাঁর লেখবার পেন্সিলটি উঁচু করে ধরে ছাত্রদিগকে বলতেন—'Suppose this to be a test-tube.' প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আমার পক্ষে এমন কথায় হাস্য-সম্বরণ করা কঠিন ছিল; কিন্তু পড়ানোর গুণে পেন্সিল টেস্ট টিউব হয়ে উঠত। তখনকার দিনে অনেক কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বাদ দিয়ে।

ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াতেন। গণিত শাস্ত্রে তিনি সেকালে একজন অতিশয় নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। নিরস গণিত শাস্ত্র পড়াতেন, কিন্তু মনে হত কাব্য পড়ছি। সেই লোভে সুবিধে পেলেই, অর্থাৎ কলেজে গেলেই এবং তাঁর ক্লাস থাকলেই ক্লাসে উপস্থিত হতাম। একদিন ক্লাসে হাজির হয়েছি, নাম ডাকা হচ্ছে। আমার নাম ডাকা হতেই একটু উঁচু হয়ে উঠে বললাম—'প্রেসেণ্ট স্যার!'

রেজিস্টার থেকে মুখ তুলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ক্ষেত্রনাথ বললেন—'কি গাঙ্গুলি মশায়! ব্যাপার কি? এদিকে আজ কোন বরাৎ-টরাৎ ছিল নাকি? অমনি দয়া করে আমাদের অঞ্চলটাও সেরে যাচ্ছেন? খাতায় ত দারুণ অবস্থা! পাঁচ-ছটা করে 'এ' তারপর একটা করে 'পি'। বলি, এ রকম আচরণ করলে অ্যাটেণ্ডেন্স থাকবে ত?'

অনেক কষ্টে casual student হয়েছিলাম। একবার সিটি কলেজে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের নিকট গিয়ে সাধাসাধি করি, তারপর হতাশ হয়ে রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে এসে চাপাচাপি লাগাই। পাঁচ-ছয়দিন এই রকম ব্যাপার চলছিল। হেরম্ব মৈত্র বলেন, 'তুমি Regular student হয়ে এক বছর প'ড়ে আমাদের কলেজ থেকে পরীক্ষা দাও, তোমাকে এখনি ভর্তি করে নিচ্ছি। তা নয়, পড়বে তুমি আমাদের কলেজে, আর পরীক্ষা দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, এই বা কেমন কথা? প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করলে তুমি কি লাটসাহেব হবে?'

তা হয়ত হব না, কিন্তু দু'বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে বারো টাকা হিসাবে মাহিনা গুঁজে নাম বেরোবে ছ'টাকার কলেজ থেকে—তাই বা কোন্ দেশের কথা? রিপন কলেজে গিয়ে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে ভাল মানুষ ত্রিবেদী মহাশয় ভীত হয়ে বলেন, 'দেখ, পরীক্ষা তুমি দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, আর পড়বে তুমি এখানে, এ রকম casual student হবার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটিতে আছে কি না, আমি তা ঠিক জানিনে। তার চেয়ে তুমি আমাদের কলেজে এসে পড়ে যেয়ো, তোমাকে ভর্তি হতেও হবে না, মাইনেও লাগবে না।' আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম না; বললাম, 'অযথা কলেজের নিকট অর্থ-ঋণে ঋণী হওয়া ত উচিত নয় স্যার। তা ছাড়া, মাসে মাসে টাকা না দিলে কলেজে আসবার চাড় থাকবে না।' কিছুটা দয়াপরবশ এবং অনেকখানি অনন্যোপায় হয়ে ত্রিবেদী মশায় আমাকে ভর্তি করে নেবার আদেশ দিলেন।

আসল কথা ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ফাঁস করে দিয়ে অত কষ্টে অর্জিত casual studentship-কে বিপন্ন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা উচিত হবে না মনে করে তাঁর মন্তব্যের বিষয়ে কোন উত্তর দিলাম না। কি জানি, যদি তাঁর খাতা থেকে আমার নাম খারিজ করে দেবার জন্যে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের কাছে কোন প্রস্তাব করে বসেন। একটু চড়ুকে হাসি হেসে শুধু নিঃশব্দে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, অ্যাটেণ্ডেন্স না থাকে ত রম্ভা!

পূজার ছুটিতে আমরা সপরিবারে কলিকাতা থেকে ভাগলপুরে এসেছি। দুর্গা-পূজা সবেমাত্র হয়ে গেছে। প্রথম কার্তিকের লতায়-পাতায় দূর্বাঘাসে নূতন হেমন্তের শিশিরকণা প্রভাত-সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক করতে আরম্ভ করেছে।

বিহার প্রদেশে শীতকালেই ঘুড়ি ওড়াবার ধুম। অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রভাস ও আমি যখন পারি তখনই ঘুড়ি ওড়াই, প্রধানত গঙ্গার তীরে, কখনো কখনো বা দোতলার ছাতে। প্রভাস আমার ভাগীনের, অর্থাৎ স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম

সহোদর। প্রভাস ও আমি প্রায় সমবয়সী; আমিই এক-আধ বৎসরের বড়।

ঘুড়ি ওড়ানোর বিষয়ে প্রভাস ও আমার মধ্যে পরিপূর্ণ মিত্রতা বিদ্যমান। পরস্পরের প্রতি আমরা কখনো আক্রমণশীল হইনে। একান্তই যদি প্যাঁচ লড়তে হয়ত লড়ি অপর কোনপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা অতর্কিতে এক গোত্তা মেরে প্রভাস আমার ঘুড়ি কেটে দিলে। ঘুড়িখানা হায় হায় করে এপাশ-ওপাশ কাৎ হয়ে উড়তে উড়তে গঙ্গাবক্ষে পড়ে ঘুড়ি-জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করলে।

বিনা প্ররোচনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্যে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "তুই আমার ঘুড়ি কাটলি কেন?

বিস্মিতকণ্ঠে প্রভাস বললে, "কাট্‌লাম নাকি?"

"কাটলিনে ত ঘুড়ি জলে গিয়ে পড়ল কেমন করে?"

মনে হল প্রভাসের মুখে অতি ক্ষীণ এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল। সে বললে, "তাই যদি দেখতে পাব উপীন মামা, তাহলে কি তোমার ঘুড়ি কাটি?"

"দেখতে যদি না পাস তাহলে তোর ঘুড়ি অমন গুছিয়ে গোটাচ্ছিস কেমন করে?"

"ও একরম আন্দাজে।"

একথার উপর আর কথা নেই, লাটাইয়ে কাটা সুতো গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে প্রভাস কতকটা আপন মনেই বলতে লাগল, 'চোখ অনেক দিনই খারাপ হয়েছে, এতদিন বলি নি, আর কিন্তু না বললেই নয়। চশমা না নিলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।'

এর পর প্রভাস চশমার জন্য অনেকের নিকটই দরবার করতে লাগল; কিন্তু কেউ বড় গা-গোছ করে না। হতাশ হয়ে হয়ে অবশেষে সে অহিংস উপায় পরিত্যাগ করে হিংস্র উপায়ের শরণাপন্ন হল। কেউ হয়ত সামান্য একটু ঝাপসা আলোয় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলেছে হঠাৎ প্রভাস শক্ত মাথা নিয়ে একেবারে তার নাকের উপর গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নাক চেপে ধরে 'গেছি গেছি' বলে সে বেচারা চীৎকার করে উঠল। অম্লান মুখে প্রভাস বললে, 'তা কি করব, আমি কি চোখে দেখতে পাই?'

চাকররা হয়ত তিন ঘড়া গঙ্গা-জল ভ'রে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে, এমন কায়দা করে প্রভাস চলে গেল যে, তার মধ্যে দুটো ঘড়া উল্টে পড়ে ভক্ ভক্ করে জলোদ্গীরণ করতে লাগল। ব্যস্ত হয়ে চাকররা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। প্রভাস বললে, "চোখে দেখতে পাইনে,—অমন জায়গায় ঘড়া রাখলে পড়বে না? অথচ জলের ঘড়া রাখবার অমন উপযুক্ত স্থান বাড়ির মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

এই ধরণের উৎপাত দিনের পর দিন বেড়েই চলল। অবশেষে একদিন পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন, "ভুবন বলছিল, প্রভাসের চোখ ভারি খারাপ হয়েছে, ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবুকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমার ব্যবস্থা কর।"

ভুবন, অর্থাৎ ভুবনমোহিনী প্রভাসের মাতা, আমাদের মেজদিদি; আর নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, সরকারী হাসপাতালের অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জেন, পিতাঠাকুর মহাশয়দের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রভাসের পিতা মতিদাদা ত সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ; সংসারে থাকেন, কিন্তু এমন নির্লিপ্তভাবে যে, তাঁর হিসেব থেকে সবাই নিজেদের বাদ দিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনের তিনি কেউ নন, কিন্তু অপ্রয়োজনের এমন বন্ধু আর দুটি নেই। দুটো পাটকাঠি, কিছু লাল-সবুজ-সাদা কাগজ, খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে যদি কেউ বললে, "মতিদা, একটা খেলনা করে দিন।" তৎক্ষণাৎ মতিদাদা তৎপর হলেন। খানিকটা আঠা করিয়ে নিয়ে কিছু সুতো জোগাড় করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এমন এক সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী করলেন, যা আজকালকার দিনে মনিহারী দোকানের শো-কেসে রাখলে তিন টাকা মূল্যের টিকিট লাগানো চলে। অপূর্ব প্রতিভা, কিন্তু সে প্রতিভা, সঞ্চিত হবার আধার খুঁজে না পেয়ে অপচয়িত হয়ে গিয়েছিল।

মতিদাদাকে দিয়ে জাহাজ তৈরী করানো সহজ, কিন্তু প্রভাসকে সঙ্গে দিয়ে হাসপাতালে পাঠানো সহজ নয়। ওদিকে কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদমপুর ক্লাবের থিয়েটারের মহলা নিয়ে শরৎচন্দ্র এমন মেতেছেন যে, স্নানাহারের সময় নেই। অগত্যা প্রভাসকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ভার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার উপরই দিলেন।

প্রভাসকে বললাম, "আজ একটু দেরী হয়ে গেছে, কাল তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাব প্রভাস।"

শুভস্য শীঘ্রং নীতি স্মরণ করে প্রভাস বললে, "কাল আবার কেন?—আজই চলো। কিচ্ছু দেরী হয় নি।"

"তবে চল্।"

দুজনে গুটি-গুটি হাসপাতালের পথে অগ্রসর হলাম। দুই চক্ষুর আসন্ন অলংকরণের চিত্র মানস-মুকুরে দর্শন করে মনে হল, প্রভাস বেশ সপুলক চিত্তে চলেছে। আমিও যে প্রভাসের আগতপ্রায় সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হই নি, তা বলতে পারিনে।

হাসপাতালে পৌঁছলাম।

আমাদের দুজনকে দেখে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

বললাম, "প্রভাসের চোখ খারাপ হয়েছে; বাবা আপনাকে দিয়ে দেখাতে পাঠিয়েছেন।"

প্রভাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নিমাইবাবু বললেন, "চোখ আবার কবে খারাপ হল? আচ্ছা, ঐ বেঞ্চে বোস্, একটু পরে দেখছি।"

দুজনে পাশাপাশি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

বেশী বিলম্ব হল না, অল্পক্ষণ পরেই নিমাইবাবু আমাদের দুজনকে চক্ষু পরীক্ষার ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা দেওয়ালে বৃহৎ আকারের চার-পাঁচখানা বোর্ড টাঙানো; কোনটাতে ইংরাজি বর্ণমালার অক্ষর এলো-মেলোভাবে মুদ্রিত, কোনটাতে হিন্দী বর্ণ-মালার, কোনটাতে বাঙলা বর্ণমালার, কোনটাতে উর্দুর, কোনটাতে বা আর কোনরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন। প্রত্যেক বোর্ডেই অক্ষরগুলি কয়েক শ্রেণীতে বৃহত্তম হতে ক্ষুদ্রতম আকারে মুদ্রিত।

লম্বা এক লাঠির সাহায্যে ইংরাজি বোর্ডের চতুর্থ লাইনের একটা অক্ষর দেখিয়ে নিমাই-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কোন্ অক্ষর বল্।"

ধরা যাক, সে অক্ষরটা "L". কিন্তু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে প্রভাস বললে "S"।

তৃতীয় লাইনের গোটা তিনেক অক্ষর নিয়ে নিমাইবাবু পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ফল একই হল, কোনটাই প্রভাস বলতে পারল না। তখন দ্বিতীয় লাইন টপ্‌কে নিমাইবাবু একেবারে প্রথম লাইনে গিয়ে পড়লেন। প্রথম অক্ষর একটা বৃহৎ সাইজের E; সেটার উপর লাঠি ফেলে বললেন, "বল্ এটা কোন্ অক্ষর?"

আমি আশা করেছিলাম, এবার প্রভাস বলতে পারবে; কারণ অক্ষরটা এমনই প্রকাণ্ড বড় যে, একমাত্র অন্ধ ভিন্ন আর সকলেরই বলবার কথা। প্রভাস কিন্তু দেখে দেখে বলে বসল "O"।

নিমাইবাবু বললেন, "ঠিক,—বারান্দায় চল্।"

আমি ভাবলাম, না! প্রভাসটা নির্ঘাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চশমা তার কে মারে!

কাম্পাউণ্ডে কাছেই একটা কালো রঙের গরু চরছিল, যে রকম হৃষ্টপুষ্ট দেহ, বোধ করি নিমাইবাবুরই হবে। বারান্দায় এসে গরুটাকে দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি চরছে বল্।"

ভাবলাম, এটা ত' প্রভাস বলবেই, কিন্তু তাতে ওর কোন ক্ষতি হবে না; যে রকম বৃহৎ সাইজের E-কে O বলে এসেছে, চশমা ওর অনিবার্য।

প্রভাস হয়ত আমার চেয়েও সতর্ক প্রকৃতির মানুষ; গরুটাকে দেখে বললে, "ঘোড়া।"

যাঁহাতক্ বলা ঘোড়া, এক বিরাশী সিক্কা

ওজনের চড়ের শব্দ, আর সংগে সংগে সিংহ-গর্জন, "বল কি ওটা।"

অতর্কিত চড়ের জন্য দুজনের মধ্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। ইঞ্চি ছয়েক নীচু হয়ে গিয়ে আর্তকণ্ঠে প্রভাস বলে উঠল, "গরু, গরু, গরু।" তিনবার গরু শব্দ উচ্চারিত করবার উদ্দেশ্য বোধ হয় পাছে স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে নিমাইবাবু আবার একটা চড় বসান।

এদিকে, আমি ত আর আমাতে নেই। চড়ের শব্দ শোনামাত্র তিন হাত পেছিয়ে দাঁড়িয়েছি। কি জানি, aiding ও abetting-এর অভিযোগে যদি আমার উপরও একটা চড় পড়ে।

চক্ষু পরীক্ষার ঘরে প্রভাসকে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবু পুনরায় প্রভাসের চক্ষু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। চড়ের কল্যাণে প্রভাস দিব্য-দৃষ্টি লাভ করেছিল; ছোট, বড়, মাঝারি—সব অক্ষরই সে যথাযথভাবে বলে গেল। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে নিমাই-বাবু বললেন, "বাড়ি যা তোরা। মহেন্দ্র-বাবুকে বলিস, ওর চোখ বেশ ভাল আছে।"

আবার আমরা গুটি গুটি বাড়ির পথে পা চালালাম। ঘটনার শোচনীয়তা আমাদের দুজনকে নির্বাক করে দিয়েছিল। খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর প্রভাসকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "সামনেই ছট্ পরব আসছে প্রভাস। ছটের মেলায় চার আনা দিয়ে একটা সাদা কাচের চশমা কিনে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পরিস। দামটা না হয় আমিই দোব।"

প্রভাস আমাকে ভুল বুঝলে, মনে করলে আমি তাকে উপহাস করছি। কোন উত্তর না দিয়ে শুধু আমার প্রতি একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টির অর্থ—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না।

সে যাই হোক, সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির লোকজনের নাক, আর চাকরদের গঙ্গা-জল ভরা ঘড়া আবার নিরাপদ হ'ল।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সারধর্ম

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

রসের ধর্মই হইল বিস্তার এবং রসের এই বিস্তারশীলতাকে হৃদয়ের সংস্পর্শে স্বীকারকেই আনন্দ বলা যাইতে পারে। স্বীকার যেখানে আত্ম-নিবেদনও সেখানে আছে, সুতরাং পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনেই আনন্দের সার্থকতা। নাম-সাধনায় ভগবানের এই আনন্দলীলা মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয়কে প্রস্ফুটিত শতদলের পাপড়ির ন্যায় খুলিয়া দেয়; কারণ শুদ্ধ মনন-মাধুর্যে এক্ষেত্রে আত্মনিবেদন সর্বতোভাবে এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে সম্ভব হইয়া থাকে। প্রত্যুত অন্য সাধনায় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের বহির্মুখীন গতি থাকিলেই এবং বহির্বিষয়ের বিচারে স্বীকারও সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিবে। ফলে হৃদয়ের যে মন্দিরে আনন্দময় দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা উন্মুক্ত হইবে না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভগবান্ রসময়, তিনি আনন্দময়, সুতরাং রস এবং আনন্দ ছাড়া তাহাতে অন্য কোন শক্তি আছে কি? বস্তুতঃ ইহা বিতর্কের বিষয় নয়। তবে সোজা কথা এই যে, আনন্দ ছাড়া যদি তাঁহার অন্য কোন শক্তি না থাকিবে, তবে তিনি আনন্দকে আশ্রয় করিতে যাইবেন কেমন করিয়া এবং আনন্দকে তিনি যদি আশ্রয় করিতে না চান, তবে লীলাই বা জমে কেমন করিয়া? সেক্ষেত্রে তাঁহার আনন্দ-ময়ত্ব এবং রসময়ত্বও চিন্ময়ত্বে থাকে না; অধিকন্তু তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও ব্যাহত হইয়া পড়ে। সুতরাং ভগবানের অন্য শক্তিও আছে; ভগবান একাধারে রস-আস্বাদক এবং রসময় কলেবর। তাহার সে শক্তি সব আনন্দেরই উজ্জীবক, পরিপোষক এবং সহায়ক। অন্য কথায় ভগবানের সব শক্তিই আনন্দের স্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার বহুভাব একই ত্রিশক্তিতে বিলম্বিত এবং একই শক্তিতে বিধৃত; সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রীভগবানে স্ব-গত ভেদ নাই। ভগবানের এই যে আনন্দময়ী শক্তি, যাহার স্বারা তাঁহার সব শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তিনিই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার মাধুর্য কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। তাঁহার অঙ্গের লাবণ্যময় সুষ্ঠু সন্নিবেশের উন্মেষভঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, রসধর্মকে উচ্ছ্বসিত করিয়া ছড়াইয়া দেয়।

শ্রীরাধার এই যে মাধুর্য, ভগবৎ-শক্তিকে প্রেমরস-প্রাচুর্যে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিবার এই যে তাঁহাদের লাবণ্য, ইহাতে নিরঙ্কুশ-শক্তি আছে এবং ইহার বিভুত্ব বা বিস্তার-শীলতাকেও অস্বীকার করা চলে না। তাঁহার সখীগণ ইহাকে বিস্তার করেন। তাঁহারা তাঁহার ভাব-ভঙ্গীর পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধার চিন্ময় লাবণ্য-লীলার এই পরিপোষণ-কারিণী সখীগণ তাঁহারই ভাবস্বরূপিণী, তাহা হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীরাধা স্মিতালীবর্গবলিতা হইয়াই ললিতা। "মহাভাবস্বরূপো শ্রীরাধাঠাকুরাণী"; তাঁহার অঙ্গদ, বলয়, নূপুর সব আভরণ, এগুলিও জড় পদার্থ নয়। তাঁহার ভাব-স্বরূপিণী তাঁহারাও চিন্ময়ী। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শ্রীরাধার সখী। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণসেবার ভাব-ভূষণে রাধারাণীর অঙ্গের মাধুরীকে সঞ্চারিণী করিয়া তুলিতেছেন; সুতরাং ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, গোবিন্দের আনন্দবিধায়িনী। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। সখীগণ-সমন্বিতা এমন যে শ্রীরাধা, তাঁহার সন্নিকর্ষ মহিমায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য উৎকর্ষলাভ করে এবং তাহাতে উজ্জ্বল রসের উন্মেষ হইয়া থাকে। শ্রীরাধারাণীর মাধুর্য রসে নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে আপন মাধুর্যই আস্বাদন করেন। কৃষ্ণ-লীলার এই নিগূঢ় রহস্যটি ইহাকে উপলব্ধি না করিতে পারিলে শুধু জ্ঞান-বিচারের স্বারা উপনিষদের যে পূর্ণ রহস্যতত্ত্ব তাহা সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করা কঠিন। ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা শুধু আলোচনারই বিষয় থাকিয়া যায়; পরন্তু জীবনকে নূতন করিতে পারে না। চোখের দৃষ্টি কিছু বদলায় না।

"রাধাকৃষ্ণের এই লীলা অতি গূঢ়তর"—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের সামাজিক এবং লৌকিক যে নীতি, ইহা তাহার অনেক উপরে। এই রসতত্ত্বটি সহজে, সাধারণ আমরা, আমাদের সংবেদনে আসিবে না বলিয়া সাধক অনেক ক্ষেত্রে ইহা সংগোপন রাখিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বালক, গোপিকারা বালিকা। গোপিকাদিগকে লইয়া তাঁহার যে রাসলীলা তাহা বালকবালিকাদেরই উল্লাস বা বিলাস নৃত্য, এইভাবে জড় সম্বন্ধ-বিচারে কৃষ্ণ-লীলাকে কাম গন্ধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য লৌকিক নীতির বাহ্য আবরণের স্বারা নির্দোষত্ব প্রতিপাদনে এবং বিভিন্ন পুরাণের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুদ্ধির প্রাখর্য এবং পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ-লীলার অনুধ্যানে সাধকের অন্তর্প্রাহী অনুভূতিতে রসধর্ম যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, হৃদয়পদ্ম তাঁহাদের যখন ফুটে, তখন এসব বিচার কোথায় ছুটিয়া যায়! ফলতঃ শ্রীরাধা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের তারুণ্য-লীলাকে এইভাবে কাম সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিবার কৌশলের প্যাঁচের মধ্যে পড়িলে লীলারসে মনকে নিষিক্ত করা সম্ভব হয় না এবং মূল তত্ত্বের উপলব্ধি হইতেই আমাদিগকে বঞ্চিত হইয়া পড়িতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের বুদ্ধির কৌশলে বাহাদুরী থাকিতে পারে; কিন্তু সত্যের সান্নিকর্ষ নাই। লীলার রস-রহস্য-তাৎপর্য নিগূঢ়স্বভাবের সম্পদেরেই ইহাতে সম্যক্‌রূপে অস্বীকার করা হয়। ফলতঃ শ্রীরাধা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা ইহা কাম-ক্রীড়া নহে, ইহা বুঝাইবার কৌশলে বিপদ ঘটে এই যে, রস-ধর্মের প্রাচুর্যে প্রেমের প্রোজ্জ্বল প্রভাব-সঞ্চারী সে লীলার যে বীর্য মন তাহার স্পর্শ পায় না এবং এইভাবে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত আবরিত হইয়া পড়ে। এমন ব্যাখ্যা বেদ-বিরোধী, ইহাই বলিতে হয়; কারণ, "রসো বৈ সঃ"—শ্রুতির এই সিদ্ধান্ত তদ্দ্বারা খণ্ডিত হয় এবং রাসলীলা সে অবস্থায় আর রস-লীলা থাকে না। তাহার ফলে কামকে জয় করিবার মত অন্তরে প্রেমের যে গভীর সংস্পর্শ সে লীলায় সম্পুটিত রহিয়াছে, তাহার আস্বাদন দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়।

সমস্যা হইতেছে এই যে, নামের প্রত্যক্ষ সংবেদনে প্রজ্ঞান-ঘন করুণার স্পর্শে মনের যদি জাগরণ না ঘটে অর্থাৎ মনের বিভিন্ন বৃত্তিনিচয় অব্যবহিত আবেশে যদি পরিস্ফুট না হয়, অন্য কথায় তাহার বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়াচার যদি নিবৃত্তি না ঘটে তবে এই গূঢ় রস-সাধনার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। বাহির হইতে পড়িয়া পিটিয়া মনের ভিতর অনপেক্ষ সে আত্মসন্নিষ্ঠ বলিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কতক-

গুলি বিচারের দ্বারা মনকে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের এই যে উপরের স্তর, আত্মার রাজ্য সেখানে ঠেলিয়া তোলা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎ-সম্পর্কে প্রেমের সংস্পর্শে গেলে তবে ইন্দ্রিয়ার্থের নিবৃত্তি ঘটে এবং মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। সে অবস্থায় অনাবিল শান্তির একটি শান্ত স্নিগ্ধ আলো মনোরাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রেমের সমুদ্রে মন ডুবিয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা হয় প্রেমে। পূর্ণের সঙ্গে মানবচিত্তের সেই পরম সংযোগ বা মানুষের পূর্ণ জীবনে প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। এই পূর্ণতা বলিতে এমন একটা অবস্থা নিশ্চয়ই নয়, যেখানে বাহ্য এই জগতের কোন পরিবর্তন থাকিবে না; কিংবা মানুষের এই জড় দেহে অক্ষুণ্ণতা ও অটলত্ব আসিবে; বস্তুতঃ জগতের পরিবর্তন সে অবস্থাতেও থাকিবে; কিন্তু সেই পরিবর্তনের আবর্তের সাড়া ভিতরে জাগিবে অন্য রকমে। ফলতঃ সেই পরিবর্তনের মধ্যেই সাধনার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ সনাতন সত্যে সঞ্জীবন লাভ করিবে। দেহের বিনাশ নিশ্চয়ই ঘটিবে; কিন্তু বিনাশের উপলব্ধি হইবে অন্যভাবে, বিনাশ আর বিনাশ থাকিবে না, তাহা প্রাণের বিকাশ এবং নবীন হইতে নবীনতর জীবনের প্রকাশকেই অনায়াস করিয়া তুলিবে। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ইহাই পথ।

নামের মধ্যে এমন একটি গভীর সত্যের সংবেদন পাওয়া যায়, যাহা প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমের রাজ্যে লইয়া তোলে এবং জীবনে মহিমা খুলিয়া দেয়। শব্দ ছড়াইয়া পড়ে ভাবে এবং ভাব ঘনীভূত হয় আত্মার অফুরন্ত আনন্দ-লীলায়। সে লীলার চিন্ময় রস প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সব শব্দে জড় মন সাড়া দেয় না, ধরা পড়ে না। ভগবানের লীলার জাল ছড়াইয়া মনের চারিদিকে বেড় দিয়া ক্রমে ক্রমে শব্দের সঙ্গে মনের সম্পর্ককে গাঢ় করিয়া তুলিতে হয়। এইভাবে শব্দ পরিণত হয় নামে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভাবাত্মক উপলব্ধিযুক্ত শব্দকে নাম বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ যে শব্দের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগে আত্ম পরিচয় সেইটি প্রদীপ্ত হইয়া মনকে নিবিষ্ট করে, তাহাকেই নাম বলিতে হয়। সব শব্দে আমাদের মন সাড়া দেয় না, কিন্তু আত্ম পরিচয়বোধযুক্ত নামে আমাদের মন সাড়া দিবেই। কৃষ্ণ নামে এই পরিচয়বোধটি সর্বভাবে এবং সকল রসে মনকে প্রোজ্জ্বল করিয়া অনুরাগে আনিয়া দেয়। শব্দব্রহ্মে মনকে ডুবাইয়া পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ এই নাম উন্মুক্ত করে। মনকে আত্মাভিমুখী সম্প্রসারণের এই শক্তি নামের আছে বলিয়াই নামের এমন মহিমা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, শুধু নাম শুনিলে কি প্রেম লাভ করা যায় না, সাক্ষাৎ-সম্পর্কে লীলা-শ্রুতিও আবশ্যক? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, নামের সঙ্গে আত্মবোধটি জাগানোই হইতেছে মুখ্য কথা। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তাঁহার মুখে নাম শুনিলেই লীলা-শ্রুতির প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে নামের ভিতর দিয়া সেই প্রেম লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। কারণ, ভক্তের উচ্চারণের ভিতর দিয়া নামের অন্তর্নিহিত প্রেমের লীলার প্রজ্ঞানময় স্ফুরণ ঘটে। আত্মরসের ঘনিষ্ঠতাই ভক্তের মুখ হইতে নামরূপে স্ফুট হইয়া ফুটে। এমন ভক্তের মুখে নাম শুনিলে নামের অন্তর্নিহিত রূপ এবং লীলার খেলার সঙ্গেই সাক্ষাৎ-সম্পর্কে মনের দোলা লাগে। ভক্তের মনন ও তাঁহার বচন এখানে এক হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার একান্ত আত্মনিবেদনের ফলে সর্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মতত্ত্বই তাঁহার উক্তিতে অভিব্যক্ত হইতেছে। তিনি নিজেকে ডুবাইয়া নামকেই ধরাইয়া দেন। ফলতঃ লীলা-শক্তি ভক্তকে আশ্রয় করিয়াই সেখানে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এমন ভক্তের দর্শন লাভ করা দুর্লভ; অধিকন্তু দর্শন লাভ করিলেও তাঁহাদিগকে ধরা যায় না এবং চেনা যায় না। প্রকৃত তাঁহাদের বচনের অন্তর্নিহিত আত্ম-ভাবটি আমরা অখণ্ড আগ্রহে গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহাদের আচরণ ও বচনের মধ্যে জড়দৃষ্টি নিবন্ধন আমরা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বসি। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জোর করিয়া আত্ম-বোধটি জাগাইতে গেলেও সোজাসুজি তাহার উন্মেষ ঘটে না—মন ছুটিয়া ছুটিয়া অন্যদিকে যায়। এইজন্যেই সাধারণতঃ লীলা-শ্রুতির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নহিলে সব কথাই তো এক হিসাবে ভগবানের কথা এবং সব নাম তাঁহারই নাম। আমাদের মন যে কিছুর সম্পর্কে যাইতেছে, তাঁহারই পরিচয় পাইতেছে, তাঁহার কথাই শুনিতেছে। কিন্তু আমরা সর্বত্র তাঁহার আত্মীয়তার ভাবটি পাইতেছি না, কেবল অভাবই দেখিতেছি, ইষ্ট আমাদের লক্ষ্যের ভিতর পড়িতেছে না, শুধু অনিষ্টই আমরা চারিদিকে দেখিতেছি। ইহার কারণ এই যে, জড় উপাধিগত আচরণটিকে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি। ইহার ফলে বচনের ভিতর দিয়া লীলা-স্ফুরণের উৎসগত ভাবটি চাপা পড়িয়া যাইতেছে। গাছ, লতাপাতা বুঝিতেছি। কিন্তু আত্মরূপী দাতাকে আমাদের মন সর্বত্র সব ভূতে স্বীকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। সকলে ভগবানের নামই করিতেছে, কিন্তু কানে সে ধ্বনি ঝঙ্কার তুলিয়া বিকার ঘুচাইয়া সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত ভক্তি বা শ্রদ্ধাকে সত্য করিয়া তুলিতেছে না। আমরা ভগবানকে পাইয়াও ভগবানকে এই-ভাবে উপেক্ষা করিতেছি। সকলই ব্রহ্ম, একথা আমাদের পক্ষে নিরর্থকই থাকিয়া যাইতেছে। এজন্য নামের ভিতর মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলে যুগোপযোগী লীলারও আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। নহিলে নামের বীর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না এবং সাধু সঙ্গ করিলেও প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে তাহা সদ্য সদ্য জীবনে সার্থক হইয়া উঠে না।

নামের এই বীর্য সংবেদন, ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইটি বিষয় উপলব্ধি হয়। একটি শক্তি যেন নিম্নগতিতে মনকে উপরের দিকে আকর্ষণ করিয়া তোলে, অপর একটি শক্তি উপর হইতে আসিয়া মনকে আপ্যায়ন করে, অনাময় একটা আশ্রয় দেয়। ঊর্ধ্বমুখে সম্প্রসারণ শক্তির মূলে থাকে যোগের আকৃতি এবং অকুণ্ঠ স্বীকৃতির উজ্জীবনময় সাড়া মিলে নিম্নাভিমুখী সম্প্রসারণ-শীল শক্তিতে। নামের অন্তর্নিহিত শক্তিতে এইরূপ অনুলোম-প্রতিলোম ক্রিয়া রহিয়াছে। সাধক এই শক্তির বিলাস-বৈচিত্র্যের রসে অভিষিক্ত হইলে তবে অধ্যাত্ম রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই শক্তির সাহায্যশূন্য অবস্থায় মনকে প্রতিবেশের বহুধা বিক্ষেপকর আলোড়ন ও বিলোড়ন হইতে একত্বের অনপেক্ষ আবেষ্টনের মধ্যে এবং যাহা সংস্পর্শের কোলাহল ছাড়াইয়া সুরের ঝঙ্কার ধারায় চিদাকারের সান্দ্র সংস্পর্শের রাজ্যে লইয়া তোলা বড়ই কঠিন, বলিতে গেলে অসম্ভব। প্রকৃত তেমন অবস্থায় মনকে যতটা জোরে উপরে তুলিতে চেষ্টা করা যায়, মনের নিম্নাভিমুখী পতনের গতি তাহার অপেক্ষাও অনেক প্রবল হইয়া থাকে এবং মনের কোণে সূক্ষ্মরূপে অহঙ্কারের আড়ালে যেসব ত্রুটি থাকিয়া যায়, পড়িবার বেলায় সেগুলি উৎকট হইয়া উঠে। ভাগবত বলেন, ইন্দ্রিয় কিংবা পরকে জয় করিলেই মনকে জয় করা যায় না, শুধু সে পথ ধরিয়া মনকে নিগৃহীত করিতে গেলে, শুধু কষ্টই সার হইয়া থাকে। কৃষ্ণনামের সাধনার পথে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানের ভিতর দিয়া গোপিকা-দের প্রেম সাধকের অন্তরকে অনুভাবিত করে—বিষ্ণুপুরাণ বলেন, "প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজে গোপাঙ্গনা হরিং।" গোপিকাদের প্রেম পরব্রহ্ম কৃষ্ণতত্ত্বকে রসমাধুর্যে চিত্তে উদ্দীপ্ত করিয়া সাধককে আকৃষ্ট করে, মনকে সহজভাবে রসময় প্রেমময় দেবতায় অভিনিবিষ্ট করিবার পক্ষে ইহাতে সুবিধা হয়। প্রতিলোমের দিক হইতে যেমন এই হিসাবে, সেইরূপ অনুলোম ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রেম ভগবানের ও আমাদের মধ্যে মর্যাদাগত যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা বিলীন করিয়া দেয় এবং ভগবানকে আমাদের কাছে নামাইয়া আনে। এ সাধনার পথে সাধক এ সত্য অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন যে, শুধু আমাদেরই ভগবানকে প্রয়োজন এমন নয়, ভগবানের পক্ষেও আমাদিগকে প্রয়োজন। আমাদিগকে পাইয়াই ভগবান আপ্তকাম এবং পূর্ণকাম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যেই ভগবান পূর্ণভাবে আপনাকে পাইতে চাহিতেছেন; এবং এইখানেই তিনি অখিল-ভূতের আত্মা, সর্বভূতের পক্ষে মধু।

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সাধারণতঃ গোল ঘটে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ শাস্ত্রোক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যামূলে এই কথা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন যে, গোপিকারা অন্য ভক্ত একই পর্যায়ভুক্ত; এমন কি, ইঁহাদের কাহারো কাহারো মতে ইঁহারাও ভক্ত, তবে সাধারণ ভক্তের চেয়ে ইঁহারা একটু উঁচু। কিন্তু রস-সাধনার পথে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যাঁহারা সাধক তাঁহাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সাধনা এবং অনুধ্যান গোপিকাগণ কিংবা তাঁহাদের অধীশ্বরী শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া চলে না। ইঁহাদিগকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব; তিনি রসময়, আনন্দময় পরব্রহ্ম। ভক্ত তাঁহার সাধনায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার রস সমগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গ শক্তিস্বরূপিণী ইঁহাদের প্রেমের আলোকেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই স্বরূপতত্ত্বকে সাধকের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিলে সাধনার প্রাণধর্মই নষ্ট হইয়া যায় এবং রসের সঞ্চার বা বিস্তারের ক্ষেত্র কিছু থাকে না। বৈষ্ণব মহাজন বলেন, "গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।" কৃষ্ণলীলার নিত্যসঙ্গিনী গোপিকাদিগকে কথায় কথায় ভক্তের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিলে মূলতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে ঐশ্বর্য-বোধই সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং সাধকের পক্ষে সে লীলার অবিচ্ছিন্ন রসধারার আপ্যায়ন বা আকর্ষণে আত্মনিবেদনের পথে অন্তরায় ঘটে। সেক্ষেত্রে অনুধ্যান নিবিড় হয় না এবং অহঙ্কার ছুটে না। সুতরাং গোপিকা-দের অনুগতিতে সাধক ভক্ত হইতে পারেন, এই কথাই দাঁড়ায়। গোপী-প্রেম-বিচ্ছুরিত কৃষ্ণলীলার চিন্ময় আনন্দধারা ভক্তের চিত্তকে আত্মরসে প্লুত করিয়া জগতে বিস্তার লাভ করে, ইহাই সত্য। দেহ, মনকে অভিস্নাত করিয়া আনন্দ রসের যাহাতে এমন বিস্তার ঘটে তাহাই নাম। সর্বাত্মস্নপন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য Promacetin নাম দিয়ে একটা নতুন ধরণের ওষুধ বের হয়েছে। এই ওষুধটা দুবার করে খেতে হয়। অনেকগুলি কুষ্ঠ রোগীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই ওষুধের দ্বারা রোগ খুব ভাল ভাবেই সারে। আর সেটা সারা জীবনের মতই সারে। চামড়ার ওপরে ছোট ছোট দাগ নাক, মুখ অথবা গলার ওপরের প্রথম রোগের লক্ষণগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওষুধ খাওয়া যায় তাহলে দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ সেরে যেতে দেখা যায়। নাক, কান আঙ্গুলের ডগার ফুলো অবস্থায় যদি ওষুধ খাওয়া যায় তবে এক থেকে দু মাসের মধ্যেই এই ফুলোগুলো কমতে আরম্ভ করে। প্রথম অবস্থায় যদি এই ওষুধ দিয়ে বছর খানেক চিকিৎসা চালান যায়—তাহলে রোগী রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

*



ডিম গুণিবার যন্ত্র

আমেরিকায় ডিম গোনবার জন্য একটা নতুন ধরণের যন্ত্র তৈরী হয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডিম চালান দেবার আগে এই যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এই যন্ত্র ঘণ্টায় ৬০০০টি ডিমের ওজন, ভাল কি খারাপ তার পরীক্ষা করে ওপরে একটা করে ছাপ দিয়ে দিতে পারে।

*

একটি বিলাতী কম্পানী এক ধরণের ছোট মোটর সাইকেল তৈরী করে বাজারে বিক্রি করছে। মোটর সাইকেলটা এলুমিনিয়ামের তৈরী। ওজন ১মণ ৫ সের। এক গ্যালন প্যাট্রলে প্রায় ২০০ মাইল চলে। এর সবচেয়ে বেশী গতি ৫০ মাইল। সবচেয়ে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে এর চালক ইচ্ছে



মোটরের ক্ষুদ্র সংস্করণ

করলে একে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়ী বা অফিসের ভেতর রেখে দিতে পারেন।

*

রাজমিস্ত্রিদেরও কাজ এবার যন্ত্রের সাহায্যে করা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা বাড়ী গাঁথবার সময় তাদের কর্ণি দিয়ে সুরকী বা সিমেন্ট ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর এক একটা ইট বসিয়ে যায়। বর্তমানে এক ধরণের যন্ত্র তৈরী হয়েছে যেটার সাহায্যে সুরকী বা সিমেন্ট সমানভাবে ইটের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া যায়—আর তার ওপর এক একটা করে ইট বসিয়ে দিলেই হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এইটে সুবিধা হয় যে, কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, আর সুরকী বা সিমেন্ট একটুও নষ্ট হয় না। তাছাড়া সুরকী বা সিমেন্টের স্তর বেশ সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

*

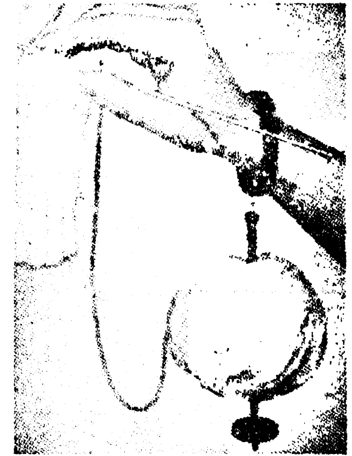


অন্ধকারে লিখিবার কলম

যুদ্ধের সময় খুব অল্প আলোর মধ্যেই ডাক্তার বা সংবাদদাতাদের লেখাপড়ার কাজ করতে হত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য জার্মানীতে এক নতুন ধরণের লেখার কলম বের হয়েছে। কলমটার লেখবার নিবের পাশ দিয়ে কাগজের ঠিক যে যে জায়গার ওপর লেখা হচ্ছে তার ওপর সুন্দরভাবে আলো এসে পড়ে। কলমটায় এমন বন্দোবস্ত আছে যে, একটানা তিন ঘণ্টা লিখে যাওয়া যায়।

*

যে সব মেয়েদের উল দিয়ে বোনবার ঝোঁক আছে তারা কোন সময় নষ্ট করতে চায় না। বাড়ীতে বসে গল্প করতে করতে রাস্তায় চলতে ফিরতে তারা বুনে যায়। কিন্তু তাদের বোনবার গুলি নিয়ে অনেক সময় খুব অসুবিধা হয়। কারণ গুলিটা সুবিধা মত করে রাখা যায় না। কোলের ওপর রেখে বুনতে গেলে অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে গিয়ে এদিক সেদিক চলে যায়। এই অসুবিধার



বুননের উল রাখিবার সহজ ব্যবস্থা

জন্য অনেকে একটা ছোট থলি অথবা নিজের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে গুলিটা রেখে বুনতে থাকে। এর চেয়ে আরো সহজভাবে গুলিটা নেবার একটা উপায় বার হয়েছে। গুলিটা একটা লম্বা তকলীর মত জিনিসে গোল করে গুটিয়ে নিয়ে সেটা একটা ছোট আংটা দিয়ে হাতের কোন বালার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে দেখা যায় যে, বুনতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

*

কফি খেতে হয় গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে এক জাতের কফি পাওয়া যায় যেটা গরম জল ছাড়াও ঠাণ্ডা বরফ জলের মধ্যে ফেলে দিলেও কফি তৈরী করা যায়।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার এক নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতেও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে।

—আমেরিকা ও সোভিয়েটের সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রয়াসের আয়োজন দেখিয়া মনে হয় যে, ভবিষ্যতে অশান্তি ঘটাইবার মত কোন প্রাণী বোধ হয় বিশ্বে থাকিবে না। দুইজনের চাপে পড়িয়া সর্বাপেক্ষা শান্তি ঘটিবারই সম্ভাবনা বেশি।

* * * * *

তিব্বতের দলাই লামা ভারতে আসিতে চাহিলে ভারত তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

—কোন্ উদ্বাস্তু শিবিরে তিনি থাকিবেন, তাহা অবশ্য এখনও ঠিক হয় নাই। তবে ধুবুলিয়া বা রাণাঘাটে নিশ্চয় নহে।

* * * * *

ভারত ও পাকিস্থানের চুক্তি অনুসারে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সমস্ত পরিবার পাকিস্থানে আছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী সেই সমস্ত ব্যক্তিকে ভারতে পাঠাইয়া দিবার কথা ছিল। পাকিস্থান সরকার তৎপরিবর্তে আসল লোকজনদের না পাঠাইয়া অব্যাহতগতিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের এখানে পাঠাইয়া দিতেছেন।

—আমাদের অনুরোধ, ভারত সরকারও কয়েকজন চোর, গাঁটকাটা ও ডাকাতকে পাকিস্থানে এইবার চালান করিয়া দিন। তাহা হইলেই উভয় সরকারের চুক্তির সামঞ্জস্য থাকিবে।

* * * * *

দিল্লীর কোন এক সভায় শ্রীজওহরলাল নেহরু মাত্র চার মিনিট বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

—অনেকে বলিতেছেন, সেদিন তাঁহার শরীর নিশ্চয় ভাল ছিল না।

* * * * *

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাণ্ডিত্য বর্জন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে আর পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করা চলিবে না। এই উপাধিটি নাকি আভিজাত্যের দ্যোতক।

—শুনিলাম, তাঁহার এই উপাধি ত্যাগে এদেশের পণ্ডিত মহাশয়েরা রীতিমত ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। জওহরলালজীর মত বেচারীদের কোন শক্তিই নাই, তবু ঐ উপাধিটুকু থাকার জন্য তাঁহার সহিত খানিকটা মিল আছে ভাবিয়া তাঁহারা খুশি হইতেন। এখন তাহাও যদি যায়, তাহা হইলে পেরেকে শিখাটুকু ঝুলাইয়া রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

* * * * *

পাক সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ লেঃ জেঃ আর সি ম্যাক সম্প্রতি বলিয়াছেন, কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সাফল্য ঘটিলে পাকিস্থানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইত। এইজন্যই কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্থান বাহিনীর যোগদান আবশ্যক হইয়াছিল। দিল্লীর পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—আমাদের মনে হয়, প্রতিবাদ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ছিল। বেচারী বিদেশী, উপরন্তু পাকিস্থানের নিমকে পুষ্ট। অতএব সে এরূপ তো বলিবেই। না বলিলে পাকিস্থানের কর্তাদের নিকট হইতে ম্যাকের ভয় নাই?

* * * * *

যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জানাইয়াছে যে, কেহ যাহাতে আত্মরক্ষার অজুহাত প্রদর্শন করিয়া পররাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আরও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

—এখন তো আত্মরক্ষার অজুহাতে যুদ্ধ হয় না। ভিন্ন দেশের জনগণের মুক্তির জন্য অপর দেশ গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করে। সারা পৃথিবীতে এখন মায়ের চেয়ে মাসীদের দরদ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে।

* * * * *

চীনের তিব্বত অভিযানকে সমর্থন করিয়া ডন্ পত্রিকা বলিয়াছেন, উক্ত কার্যটি ভারত কর্তৃক হায়দরাবাদে শান্তি অভিযানের তুল্য।

—যদিও তুলনাটি ঠিক হয় নাই, তবু এতদিন বাদে হায়দরাবাদে ভারতবর্ষ যে প্রকৃতই শান্তি অভিযান করিয়াছিল, তাহা ডন্ পত্রিকা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আদালতে এই কারণেই বোধ হয় আজে-বাজে প্রশ্ন করিয়া জেরা করার নিয়ম।

* * * * *

আমেরিকার রিপাবলিকান দলের নেতা মিঃ স্টেশন তাঁহার নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মিঃ ট্রুম্যানের সোহাগের ফলেই মাও-সে-তুং মাথায় চাপিয়া বসিয়াছেন।

—ইহার জন্য ট্রুম্যান সাহেবকে দোষ দেওয়া অনুচিত। তিনি এতদিন চিয়াং কাইশেককে কাঁধের উপর চড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি যদি ঠিকমত মাথায় চড়িয়া না বসিতে পারেন, পড়িয়া যান, তাহার জন্য ট্রুম্যানের মাথার দোষ দেওয়া উচিত কি?

* * * * *

পাকিস্থানে নবগঠিত জিন্না-মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁ বলিয়াছেন যে, উহা জিন্না-মুসলিম লীগ নহে, মামদোত-মুসলিম লীগ।

—শুনিলাম, জনাব মামদোতের খাঁ বাহাদুর নাকি আবার বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, বর্তমান মুসলিম লীগও খাঁটি মুসলিম লীগ নহে—উহা লিয়াকৎ খাঁ মুসলিম লীগ নামে অভিহিত।

* * * * *

শ্রীযুক্ত জওহরলালজী বোম্বাইয়ে বালকানজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শিশুদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না।

—আমরাও করি না। শিশুদের অপেক্ষা শিশুদের বাবাদের প্রতি বরং বেশি মনোযোগ দেওয়া বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বৈদেশিকী

নেপাল

গত এক সপ্তাহের মধ্যে নেপালের পরিস্থিতিতে দ্রুত বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে আসার উদ্দেশ্যেই নেপালের রাজা কাঠমণ্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাণা-সরকার প্রথমে তাঁকে নিরাপদে নেপাল থেকে বেরুতে দিতে সম্মত ছিলেন না। ভারত গভর্নমেণ্টের পীড়াপীড়িতে রাণা সরকার শেষ পর্যন্ত রাজার ভারতে আসার পথে আর বাধা দেবার চেষ্টা করেননি। গত শনিবার ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা "ডাকোটা" এরোপ্লেন রাজা ও রাজপরিবারবর্গকে কাঠমণ্ডু থেকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছে। রাজা ভারত সরকারের অতিথিরূপে এখন দিল্লীতে আছেন।

রাজা যেদিন নেপাল ত্যাগ করে দিল্লীতে পৌঁছান সেই দিনই নেপালী কংগ্রেসের অধিনায়কত্বে নেপালের মধ্যে একাধিক স্থানে রাণা-সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমেই বীরগঞ্জের গভর্নরকে বন্দী করে "বিদ্রোহীরা" বীরগঞ্জ শহরটি দখল করে। বীরগঞ্জ প্রদেশের অধিকাংশই সম্ভবতঃ এখন নেপালী কংগ্রেসী ফৌজের করায়ত্ত হয়েছে। বীরগঞ্জ নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। নেপালের তৃতীয় বৃহত্তম শহর বিরাটনগরও "বিদ্রোহী"রা দখল করে নিয়েছে বলে সংবাদ এসেছে। বীরগঞ্জ থেকে নেপালী কংগ্রেসী দল উত্তরে রেলপথ ধরে আমলেকগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে শোনা যাচ্ছে। এদিকে পশ্চিম নেপালের সমগ্র পাল্‌হি জেলা নেপালী কংগ্রেসের দখলে এসেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। নেপালী কংগ্রেসী মহল বলছেন যে সর্বত্রই রাণা-সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট জনসাধারণ নেপালী কংগ্রেসের এই অভিযানকে সমর্থন করছে। কোনো কোনো জায়গায় সরকারী রক্ষীরাও কংগ্রেসী দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। কাঠমণ্ডু থেকে রাণা-সরকার কর্তৃক প্রেরিত কোনো বড় সৈন্যদলের সঙ্গে নেপালী কংগ্রেস ফৌজের মোকাবিলার সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি। নেপালী কংগ্রেসী মহল মনে করেন যে, নেপালের সৈন্যবাহিনীর এক অংশ কার্যকালে রাণা-সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সরকারী সৈন্যবাহিনীর মতিগতির উপর বর্তমান সংগ্রামের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।

এদিকে রাণা-সরকার ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট এই নালিশ করেছেন যে, "বিদ্রোহীরা" ভারতভূমি থেকে নেপালের উপর হামলা করছে। ভারত গভর্নমেণ্ট একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বলেছেন যে, যাঁরা নেপালে রাণা-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাঁরা সকলেই নেপালের লোক এবং তাঁরা যা কিছু করছেন নেপালের ভিতরেই করছেন। যাই হোক ভারত গভর্নমেণ্ট রাণা-সরকারকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা "বিদ্রোহী"দের ভারতভূমির কোনো অংশকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে বা অন্যভাবে ব্যবহার করতে দেবেন না। বীরগঞ্জের গভর্নরকে বন্দী করে ভারত-সীমানার মধ্যে আনার পরে ভারত সরকারের আদেশক্রমে বিহারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে যান। আর একটি সংবাদ পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট যতদূর সম্ভব রাণা-সরকারের মন রক্ষা করে চলতে চাচ্ছেন। সোমবার নেপালী কংগ্রেসের নেতা শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা এবং তাঁর ভাই শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ একখানি চার্টার্ড বিমানে দিল্লীর উইলিংডন বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ামাত্র পুলিশ তাঁদের জিনিসপত্র তল্লাসী করে এবং তাঁদের নিকট প্রাপ্ত ৩৫ লক্ষ টাকাও নাকি পুলিশ আটক করে। বীরগঞ্জে কোষাগার থেকে পাওয়া ঐ টাকা মহারাজাধিরাজের হাতে দেবার জন্যই তাঁরা নিয়ে আসছিলেন। বোধ হয় নেপাল সমস্যার একটা শান্তিমূলক মীমাংসা হয় কিনা, সে বিষয়ে রাজা ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের তল্লাসী করা বা তাঁদের কাছ থেকে টাকা আটক করা ভারত গভর্নমেণ্টের অবশ্য-কর্তব্য ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য নেপালের বৈধ ও ন্যায়ানুমোদিত সরকারের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র আন্দোলনে ভারত গভর্নমেণ্টের সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করার কথা উঠেই না। কিন্তু বর্তমানে কোনটা বৈধ ও ন্যায়ানুমোদিত সেইটাই তো প্রশ্ন। বর্তমান রাণা-সরকারই কি নেপাল রাজ্যের বৈধ ও ন্যায়ানুমোদিত কর্তা? স্বৈরাচারী রাণা-সরকারের ভয়ে রাজাকেই পালাতে হয়েছে। নেপালী কংগ্রেস রাজাকে মেনে নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াসী। শোনা যায় রাজাও রাণা-সরকারের স্বৈরাচারের অবসান চান। এ অবস্থায় ন্যায় ও বৈধতা কোন্ পক্ষে? রাজাকে ভারত গভর্নমেণ্ট সম্মানিত অতিথি হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট শ্রীত্রিভুবন বিক্রমকে নেপালের রাজা বলেই গ্রহণ করেছেন। রাণা-সরকার যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত বলে ঘোষণা করেছে এবং তাঁর এক শিশুপৌত্রকে নূতন রাজা বলে চালাবার চেষ্টা করছে—এসব ভারত গভর্নমেণ্ট এখনো মেনে নেননি। এমত অবস্থায় ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে রাণা-সরকারের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে নেপালী কংগ্রেসের উপর কোনো রকম জুলুম করা উচিত হতে পারে না। নেপালে স্বৈরাচারী রাণা-সরকারের উচ্ছেদ করে সেখানে রাজার অধীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে তাতে যোগ দেবার জন্যে ভারত-প্রবাসী বহু নেপালীই উৎসুক হবেন। সেজন্য নেপালী কংগ্রেস কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছেন। রাণা-সরকার হয়ত ভয়েতে এরূপ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ বন্ধ করে দেবার জন্যে ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করবেন। এরূপ অনুরোধ রক্ষা করা ভারত গভর্নমেণ্টের কখনই কর্তব্য হতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে সেটা নিরপেক্ষ না থেকে নেপালের গণমুক্তির বিরুদ্ধতা করাই হবে।

নেপালের এই সংগ্রামে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সহানুভূতি কোন্ দিকে সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষেও নেপালে গণতান্ত্রিক জাগরণের বিরুদ্ধতা করার কোনো সংগত কারণ নেই। তবে নেপালের বর্তমান রাণা-সরকারেরও পৃষ্ঠপোষক যে পৃথিবীতে নেই, তা বলা যায় না। নেপালে যদি নেপালী কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে নেপালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কতকগুলি পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে যেগুলি সকলের ভালো লাগবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নেপালে যদি গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বৃটেনের সৈন্যবাহিনীতে গুর্খা সৈন্য ভর্তি অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি বর্তমানে বৃটিশকে ছুঁলেই মার্কিন-শরীরেও শিহরণ জাগে। সুতরাং রাণা-সরকারকে সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন মনে করা হবে না।

কোরিয়া

কোরিয়ার যুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জেনারেল ম্যাকআর্থারের নালিশের শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্যে সিকিউরিটি কাউন্সিল পিকিং গভর্নমেণ্টকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পিকিং গভর্নমেণ্ট বলেছেন যে, ফরমোজা ও কোরিয়াতে আমেরিকার হামলা-ই আসল আলোচ্য বিষয়। কোরিয়ানরা তাদের দেশ থেকে বিদেশী আক্রমণকারীদের দূর করার জন্যে যে সংগ্রাম করছে তাতে চীনা স্বেচ্ছাসেবকরা যদি সাহায্য করতে অগ্রসর হয়ে থাকে তবে পিকিং গভর্নমেণ্ট সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করেন।

১৩।১১।৫০

ইন্দ্রজিতের আসর

পুরো এক বছর ধরে আমি কি লিখব তাই নিয়ে আমার বন্ধুদের বিষম ভাবনা। আমি নিজে ভাবনা চিন্তার ধার ধারি না; কারণ আমি তো লিখছিনে, আমি কথা বলছি। ভেবে ভেবে যদি কথা বলতে হয় তবে কথা বলার মেহানৎ পোষায় না। নিছক মনের আনন্দে যদি কথা বলা যায় তবেই কথা বলে আরাম। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি বাক্যানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকে উৎপন্ন যে বাক্য তাকেই বলে সাহিত্য। আর সাহিত্য বলতে আমি বুঝি কথা-সাহিত্য, মুখের কথাই যেখানে সাহিত্যের মর্যাদা পাবে। কথাটার মধ্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে। বোধ করি আমার মতো লোককে ব্যঙ্গ করেই ডি এল রায় বলেছিলেন—আমরা যা লিখি তাই কাব্য আর যা বলি তাই বক্তৃতে। আমি আবার তারও বাড়া, বলছি কিনা আমি যা বলি তাই সাহিত্য। সত্যি বলতে কি—না লিখলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এমন কুসংস্কারে কোনকালে আমার বিশ্বাস নেই। পৃথিবীর কোন দেশেই সাহিত্য আক্ষরিক মূর্তিতে প্রথমে দেখা দেয়নি। লোকের মুখে মুখেই সাহিত্যের প্রচার হয়েছিল। এইজন্যই পদ্য আগে গদ্য পরে। মনে রাখবার সুবিধার জন্যই ছন্দোবন্ধ পদের সৃষ্টি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে সাহিত্যে আর ভগবানে এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে। উভয়েই নিরাকার। তফাৎ এইটুকু যে ভগবান প্রথমে ছিলেন সাকার পরে হয়েছেন নিরাকার (এখন অবশ্যই বেকার)। আর সাহিত্য প্রথমে ছিল নিরাকার, বহুযুগ পরে অক্ষর সংযোগে সাকার হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় লিখেছেন গল্প উপন্যাস, শেষের দিকে লিখেছেন গল্প সল্প। প্রমথ চৌধুরীও শুরু করেছেন বড় গল্প দিয়ে আর শেষ করেছেন স্বল্প গল্প লিখে। ও'রা মহারথী, ও'দের পন্থা উল্টো। আমি খুদে লেখক, আমার শুরু খোস গল্প দিয়ে। খোস গল্পে হাত পাকিয়ে তবে বড় গল্পের কথা ভাবব। গাল গল্পও বলতে পারেন; কারণ গালাগালিও কিছু থাকবে নইলে ঠিক জমবে না। খোস গল্প কিম্বা গাল গল্প খাঁটি বাঙলা দেশের সামগ্রী। আমাদের দেশে ও জিনিসটির যেমন চর্চা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়। বাঙলা দেশের লোক-সাহিত্য বলতে আমি ঐ জিনিসটিকেই বুঝি। খাঁটি বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম বৃদ্ধদের গল্পের আসরে। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য আমাদের লোক-সাহিত্য, চণ্ডীমণ্ডপ কাব্য আরো বড় লোক-সাহিত্য। সময়ের বিবর্তনে চণ্ডীমণ্ডপের উচ্ছেদ হয়েছে। গল্পের আসর গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে শহরে সে পৌঁচেছে। চণ্ডীমণ্ডপের স্থান নিচ্ছে ড্রয়িং-রুম, চায়ের দোকান আর কফি হাউস। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যে শহুরে সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আমাদের দেশে সেই সাহিত্য দেখা দিয়েছে।

জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই বাঙলা দেশের গৌরব আজ ক্ষুণ্ণ; কিন্তু সুখের বিষয় বাঙালীর বাকচাতুর্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। বাঙালী আজ হৃতসর্বস্ব, কিন্তু হতবাক নয়। বাঙালীকে যারা কথাসর্বস্ব বলে গাল দেয়, তারা বাঙালীকে কখনো বুঝবে না। আমি তো ওটাকে গালাগাল বলে মনেই করি না। আমার মতে কথাসর্বস্ব মানে সাহিত্যসর্বস্ব। আর সব গিয়ে-থুয়ে বাঙালীর একমাত্র সাহিত্যটি আছে। বাঙালীর মুখের কথা যেদিন বন্ধ হবে, সাহিত্যও সেদিন যাবে, বাঙালী জাতি সেদিন মরবে। Samson-এর শক্তি কেশাগ্রে, বাঙালীর শক্তি জিহ্বাগ্রে।

যে মানুষ কথা বেশি বলে, সে বেফাঁস কথা কিছু বলবেই। অতিরিক্ত কথার নামই অত্যুক্তি। সেটা তো দোষের কথা নয়, সেটা কাব্যের অলঙ্কার। কবিমাত্রেই তা করে থাকেন। কবির মন অকৃপণ মন। তিনি বাড়িয়ে বলেন। কেজো মানুষ কৃপণ, সে কমিয়ে বলে। যে ব্যক্তি বাড়িয়ে বলে, সে অত হিসেব করে, ওজন করে কথা বলতে পারে না। সেজন্যই কবি কিম্বা সাহিত্যিকরা কথার ব্যাপারে বেহিসাবী এবং বেপরোয়া। ক্ষিপ্ত ব্যক্তির বাক্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ কিছু থাকবেই। এ'রা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলেন না। তার ফল অবশ্যই মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো বোধ করি এই জন্যই তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র থেকে কবিদের বাদ দিয়েছিলেন। যাঁরা আবোল-তাবোল বকেন, তাঁদের তিনি পাগল আখ্যা দিয়ে মনুষ্য-সমাজের অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর মতে যাদের আর্টের সংজ্ঞা হচ্ছে fine frenzy অর্থাৎ কিনা মনোহারী উদভ্রান্তি তাঁদের কদাপি বিশ্বাসং ন কর্তব্য। প্লেটোর কথা পুরোপুরি না মানলেও তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কারণ সাহিত্যিকদের বেপরোয়া কথার ফলে মানব-সমাজে অনেক অঘটন ঘটেছে। ফরাসী বিপ্লবের মূলে রুশো ভল্টেয়ার আর রুশ বিপ্লবের মূলে কার্ল মার্ক্স। এ'দের কথার ফলে কতখানি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে পারে, আগে যদি ভেবে দেখতেন, তবে এমন সর্বনেশে বই তাঁরা কক্ষনো লিখতেন না। অতএব এ'রা যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিবেচনাশূন্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ'রা কখনো ভেবে দেখেন নি যে, বেপরোয়া কথার মধ্যে এমন এক মাদকতা আছে যে, সাধারণ মানুষ কিছুতেই তার মোহ কাটাতে পারে না।

কথার আর এক বিশেষ লক্ষণ যে, যত দিন যায় পুরোনো মদের মতো তত তার ধক বাড়তে থাকে। মদের মতো মুখের কথাকেও বেশ কিছুদিন জিইয়ে রাখতে হয়—

"Cool'd a long age in the deep-delved earth."

এইখানেই লেখার প্রশ্ন ওঠে। ছাপার অক্ষরে বইএর পাতার মধ্যে কথাকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। দিনের পর দিন যাবে, বছরের পর বছর কাটবে। ভয় নেই, কথা দম আটকে মরবে না, বরং যত দিন যাবে, আস্তে আস্তে কথার পাখা গজাবে। কার্ল মার্ক্সের কথার পাখা গজাতে প্রায় এক শতাব্দী লেগেছে; সেই কথন এখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছেয়েছে।

উড়ো কথা নিতান্ত অবাস্তব কল্পনা নয়। কথা সত্যি সত্যি ওড়ে, দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই যে আজ আমি কথা বলছি, তাকে যতই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুন, একদিন এর ব্রহ্মতেজ প্রকাশ পাবেই। কারণ শাস্ত্রে বলেছে শব্দই ব্রহ্ম। এ যুগের মানুষ ব্রহ্মকে মানে না, bombকে মানে। তাতে কিছু ক্ষতি নেই। গ্রন্থবন্দী কথাকে অনায়াসে time bomb-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। ভালো মানুষটির মতো বইএর পাতায় মুখটি গুঁজে পড়ে আছে, কিন্তু যথাসময়ে যখন বিস্ফোরণ হবে, তখন হুলুস্থূলু কাণ্ড বেঁধে যাবে। ইতিপূর্বে ভগবানের সঙ্গে সাহিত্যের তুলনা করেছি। আরেক দিক থেকেও দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সাহিত্য অর্থাৎ কথা ভগবানের মতোই সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান।

রঙ্গজগৎ

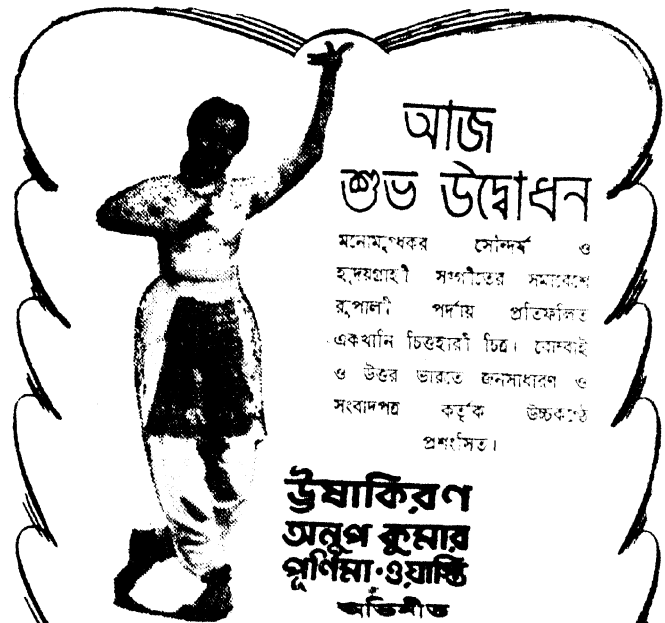
মেজদিদি (শ্রীমতী পিকচার্স—রূপশ্রী ও ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও)—কাহিনী: শরৎচন্দ্র; চিত্রনাট্য : হরিদাস ভট্টাচার্য; পরিচালনা : সব্যসাচী; আলোকচিত্র: অজয় কর; শব্দযোজনা: সমর বসু; সুরযোজনা : কালীপদ সেন' শিল্প-নির্দেশ : ভূপেন মজুমদার। ভূমিকায় : বিজয়কুমার, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (লেত্তো), নৃপতি, আশু বসু, কুমার মিত্র, বাণীবাবু, কানন ভট্টাচার্য, রেণুকা রায়, শোভা সেন, শিখারাণী বাগ প্রভৃতি।

নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনে ছবিখানি ১০ই নবেম্বর শ্রী, প্রাচী ও পূর্ণতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

দিন কতক আগে মাদ্রাজের এক মন্ত্রী ভারতীয় ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, ছবিতে থাকে খালি কান্না আর কান্না এবং তিনি পয়সা খরচ করে কাঁদতে রাজী নন। ভারতের খবর সচিব শ্রীদিবাকরও একবার প্রায় এই রকমই একটা মন্তব্য করেন। এঁদের এই মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে যে, ছবি অবকাশ বিনোদনের বা লোককে খুশী করার উপাদান, কিন্তু তা দেখে যদি মন ভারীই হয়ে ওঠে তো তেমন উপাদানের সার্থকতা কি। অনেক ক্ষেত্রেই এ-যুক্তি প্রযোজ্য হলেও কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কেঁদে খুশী হওয়া অথবা খুশী হয়ে কাঁদারও অবকাশ এসে যায়। 'মেজদিদি' সেই রকমই একটি উপাদান।

শরৎচন্দ্রের গল্প, আবেগের যাদু সৃষ্টিতেই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিতে সাড়া জাগিয়ে তোলার তার অপরিসীম ক্ষমতা। বিষয়বস্তু, ঘটনা, চরিত্র সবই বাস্তবতা ও মানবতার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মাখামাখি হয়ে আছে যে, কাহিনীর টুকরো মাত্রও সরাসরিভাবে হৃদয়ে পৌঁছে যায়। দীর্ঘকাল ধরে তাই একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসা যাচ্ছে যে, মারাত্মক রকমের বিকৃতি না এনে শরৎচন্দ্রের গল্পটাকে কোন রকমে যেখানে সামনে তুলে ধরতে পারা গিয়েছে,—যতো কল্পনাবিহীন পরিচালন দোষদুষ্ট হ'য়েই হোক—আবেগ ঠিক প্রবাহিত হয়ে যাবেই। এ এক অসাধারণ যাদুকরী ক্ষমতা। 'মেজদিদি' ছবিখানিতে গল্পের মূলটুকু বজায় আছে, তাই দর্শক মন আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠা থেকে রেহাই পায় না।

বিষয়বস্তু হচ্ছে নারীর বাৎসল্য এবং স্নেহকাঙাল একটা বালক মন। প্রথমটির প্রতীক মেজদিদি হেমাঙ্গিনী এবং দ্বিতীয়ের কেষ্ট। গল্পের আরম্ভ কেষ্টকে নিয়ে। গরীব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। গরীব বলেই সঙ্গীদের কাছেও তার কোন আদর নেই। কিন্তু তার অনাদরের চরম আরম্ভ হলো মারা যাবার পর বৈমাত্রেয় দিদি কাদম্বিনীর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া থেকে। কাদম্বিনী কেষ্টকে লেখাপড়া করতে না দিয়ে স্বামী নবীনের দোকানে চাকরের কাজে লাগিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, কথায় কথায় কেষ্টর ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনারও অন্ত ছিলো না। এই অসহায় দুর্ভাগা ছেলেটার দুঃখে হেমাঙ্গিনীর মন কেঁদে উঠলো। কেষ্টকে ডেকে সে মাতৃস্নেহে আদর করতে লাগলো, ক্ষুধার সময় খাওয়াতে লাগলো, দুঃখের সময় তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে কাদম্বিনীর কলহের সৃষ্টি হলো। ক্রমে ব্যাপারটা নবীন এবং হেমাঙ্গিনীর স্বামী, ছোট ভাই বিপিনেরও অশান্তির কারণ হয়ে উঠলো। হেমাঙ্গিনী শহুরে মেয়ে, মমতার ভরা মন, পরের দুঃখে সে স্থির থাকতে পারে না। তাই এ বাড়িতে বিপিনের স্ত্রী হয়ে আসার পরই ওর ঐ মনের জন্যেই গোলযোগের সৃষ্টি হলো যা পরিশেষে দু ভাইকে পৃথক করে দিয়েছিলো। কেষ্টকে নিয়ে এই নতুন অশান্তি বিপিন আর সহ্য করতে চায় না। ওদিকে কেষ্টর ওপরে নবীন পরিবারের অত্যাচার বেড়েই যেতে লাগলো। একদিন কেষ্টর ওপরে ওদের নির্দয়তা চরমে গিয়েও পৌঁছলো—হেমাঙ্গিনীর অসুখ, ক্ষোভে সে কেষ্টকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে। কেষ্ট লুকিয়ে তার খবর নিয়ে যায়, কিন্তু একদিন যখন সে শুনলে যে, তার মেজ-



দিদির বুকে সর্দি জমেছে তখন আর সে স্থির থাকতে পারলে না, কারণ তার মা বুকে সর্দি জমেই মারা যায়; মেজদিদির সর্দি তাই তাকে বিচলিত করে তুললে। সব বাধা অগ্রাহ্য করে সে নবীনের খদ্দেরের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করে ছুটলো তার নিজের গ্রামে বিশালাক্ষীর কাছে পুজো দিতে। কারণ মার অসুখের সময় সে শুনেছিল বিশালাক্ষীর পুজো দিলে অসুখ ভালো হয়ে যায়। দুপুর থেকে রাত হয়ে গেলো, রাতও পার হয়ে গেলো, কেষ্ট নিরুদ্দেশ। সেই সঙ্গে ওর টাকা আদায় করে নিয়ে যাওয়ার কথাও জানা গেলো। অবশেষে দারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কেষ্ট ফিরে এলো। হাতে তার পুজোর ফুল আর প্রসাদ। কাদম্বিনী তাকে টেনে নিয়ে এল হেমাঙ্গিনীর কাছে—কেষ্টর টাকা চুরি আর অপ্রমাণিত রইলো না। রাগে হেমাঙ্গিনীও তাকে চোর আখ্যা দিয়ে চপেটাঘাতের সঙ্গে সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলে। কাদম্বিনীরা কেষ্টকে টেনে নিয়ে গেলো একটা হিংস্র উল্লাসে—কেষ্টর ওপর হেমাঙ্গিনীকেও বিরূপ করে দেওয়া গেছে! কেষ্টর ওপর ওদের হিংস্রতার চরম প্রকাশ পেলে নবীনের অতি নির্দয় প্রহারে। বেতের প্রতিটি আঘাত যেন হেমাঙ্গিনীরই অঙ্গে গিয়ে পড়তে লাগলো। প্রহারে কেষ্ট ক্ষতবিক্ষত ও জ্ঞানহারা হলো। পরদিন সকালে হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করতে পারলে না। বিপিনের কাছে সে প্রার্থনা জানালে কেষ্টকে তার কাছে থাকতে দেওয়া হোক। বিপিন এই নিয়ে নতুন করে ভাই-বৌদির সঙ্গে কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হতে চাইলো না। সে হেমাঙ্গিনীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে বেরিয়ে গেলো। হেমাঙ্গিনীর পক্ষে আর সে বাড়িতে থাকা চললো না। সে চললো কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গ্রামে। কাদম্বিনী রাস্তা রুখে দাঁড়ালো—কেষ্টর অভিভাবক সে সুতরাং হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সে তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু হেমাঙ্গিনী তার বড় জা এমন কি ভাসুরের কথাও অগ্রাহ্য করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেই। ওদের এই বিবাদের মাঝে প্রতিবেশীরা এসে দাঁড়ালো এবং প্রথমে তারা নবীন-কাদম্বিনীর পক্ষ হয়ে কথা বললেও পরে হেমাঙ্গিনী কেষ্টর অঙ্গে প্রহারের ক্ষত দাগ দেখিয়ে দিতেই তারা ওদের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো যার ফলে নবীন-কাদম্বিনী সরে পড়তে বাধ্য হলো। হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে নিয়ে চলেছে, আর ওদের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বিপিন ছুটেছে তাদের পিছু পিছু। শেষে কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর কাছেই থাকবে বিপিন এই প্রতিশ্রুতি দিতে তবে ওরা ফিরে এলো।

গল্পটা মিলনান্তক বটে, কিন্তু একেবারে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়াই করুণ। গল্প মেজদিদির নামে, কিন্তু যাবতীয় ঘটনা হচ্ছে কেষ্টকে ঘিরে, তবে মেজদিদি বড়ো হয়ে উঠলো এই কারণে যে তার চরিত্রের মধ্য দিয়েই কাহিনীকার প্রকৃত মানবতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অনাথ অসহায়ের জন্য বেদনাবোধ, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রভৃতি মানুষের মহৎ বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে মেজদিদি চরিত্রে—মেজদিদি তাই বড়ো এবং গল্পের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

ছবিতে গল্পটাকে বলা হ'য়েছে এবং কাহিনীকারের যে বক্তব্য তাও পেশ ক'রে দেওয়া হয়েছে কিন্তু খুব কৃতিত্বের সঙ্গে নয়। সূক্ষ্ম দিককে প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হ'য়েছে এবং অনেক জায়গাতেই ঘটনাবিন্যাসে সমতার অভাব দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও অবান্তরতাও যে এসে পড়েনি তাও নয়। কেষ্টর জীবনে তার মার মৃত্যুটা একটা বড়ো কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটেই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা নয়—তার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেবার একটা হেতু মাত্র। কিন্তু ছবিতে এই ঘটনাকে এতো উঁচু নাটকীয় ধাপে তুলে ধরা হয়েছে যে তার অব্যবহিত দৃশ্যাবলীর সঙ্গে কোন সমতা থাকে না। এমনি একটা অসম দৃশ্য শেষেও দেখা যায়, সেটা হ'লো চোর প্রতিপন্ন হ'য়ে নবীনের হাতে কেষ্টর প্রহার খাওয়া। বীভৎসতার চরম এ দৃশ্যটিতে এনে দেওয়া হ'য়েছে তা নাটকের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে পরিচালকের সাদনবৃত্তি প্রকাশের একটা উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, শ'দেড়েক ফিট ধরে নিষ্ঠুর প্রহার দেখিয়ে নাটককে যে ধাপে তোলা হলো সেটা পরিণতি পাবার কথা পরের দৃশ্যে হেমাঙ্গিনী চলে যাবার সময় প্রতিবেশীর কাছে কেষ্টর গায়ে ক্ষতের দাগ উন্মোচনের মধ্যে—কারণ সেইটেই হ'লো কাদম্বিনী-নবীনের অমানুষিক দুর্বৃত্তপনার মুখোস উন্মোচন। কিন্তু সে ঘটনাটা আগের দৃশ্যের ওজনে নাটকীয়তায় অনেক নিস্তেজ, আর তার ফলেই ঠিক পরেই পরিশিষ্ট দৃশ্যটিতে বিপিন কর্তৃক হেমাঙ্গিনী ও কেষ্টকে ফিরিয়ে আনার ঘটনাটায় আর কোন প্রাণ থাকে না।

কেষ্টকে নিজের কাজে রাখার জন্যে বিপিনের কাছে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার, আগেতো অদেয় ছিল না কিছুই বলে ফ্ল্যাস-ব্যাক করে ছাদের ওপরে হেমাঙ্গিনীর গান নাটকের কি প্রয়োজন যে মিটিয়ে গেলো তার হদিশ পাওয়া যায় না, বরং গল্পটার গতি রুদ্ধ হয়ে যেতেই দেখা যায়। দৃশ্য সংস্থাপন অনেকখানি মঞ্চনাটকের মতো ক'রে ভাগ ক'রে নেওয়া; খুব সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্র জুড়ে দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে। পরিচালকের সূক্ষ্ম দিক অনুধাবনে অক্ষমতাও অনেকক্ষেত্রে বেশ ধরা পড়ে যায়।

ছবিখানিতে অভিনয়ের দিকটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত। সবচেয়ে জোরে মন টেনে ধরে কেষ্টর ভূমিকায় বিজয়কুমার। পরাশ্রয়ী অনাথ বালকের এমনি একটা চেহারা সে ফুটিয়ে তুলেছে যে দেখে কোন কঠিনতম মনও করুণাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কথার চেয়ে দৃষ্টি আর অভিব্যক্তি যে কতো গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে তার ভারী সুন্দর একটি উদাহরণ পাওয়া গেলো। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এই সুরে শিল্পীটির আসল নামটি কর্তৃপক্ষ চেপে গিয়েছেন। বিজয়কুমারের আসল নাম সবুর—"ছোটভাইয়ে" অভিনয় করে জগৎজোড়া নাম কেনার পরও এই নাম পরিবর্তন অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে।

এরপরেই সামনে এসে পড়েন কাদম্বিনীর ভূমিকায় রেণুকা রায়। ইদানীং রেণুকা টাইপ চরিত্রাভিনয়ের দিকে নজর দিয়েছেন এবং সে বিষয়ে তিনি সফলও হ'চ্ছেন। কাদম্বিনী তার নবপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কেষ্ট ও মেজদিদির বিপরীত চরিত্র হিসেবে তিনি বেশ

সমতা রক্ষা করে গিয়েছেন। মেজদিদির ভূমিকায় কানন ভট্টাচার্য কাহিনীকারের জোর পেয়েছেন এবং তিনিও সে মর্যাদা রেখে গিয়েছেন। নবীনের চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী তার চলতি টাইপকে বদলেছেন। জহর গাঙ্গুলীর বিপিনের মধ্যে তেমন কিছু নেই, তবে ব্যক্তিত্বের জোরে চরিত্রটি সামনে এসে দাঁড়ায়। ছোটদের মধ্যে কাদম্বিনীর অকালপক্ক আদুরে ছেলে পাঁচুগোপালের ভূমিকায় নিরঞ্জন ওরফে লেতো যেখানেই আবির্ভূত হ'য়েছে দর্শকদের দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নিয়েছে; তেমনি হেমাঙ্গিনীর কন্যারূপে শিখারাণীও।

কলাকৌশলের দিক প্রশংসনীয় নয় মোটেই। একটা কোন সমতা বলতে নেই। কোথাও ক্যামেরা বা সাউণ্ডের কাজ ভালো, কোথাও খারাপ, আবার কোথাও বা খুবই খারাপ। আবহ-সঙ্গীত নাটকের রেশকে ছড়িয়ে দিতে বেশ সাহায্য ক'রেছে, তবে গানগুলির মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই।

ছবিখানি দর্শকগ্রাহ্য হবে, তার গল্পের জোরে, মানুষের মনের একটা পরম অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় ব'লে। ছবিখানি চলচ্চিত্রের বর্তমান বাজারে শক্তি সঞ্চার ক'রবে। এ রকম ছবির সর্বভারতীয় চাহিদা খুবই, এর হিন্দী সংস্করণ বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ ক'রতে পারতো।

পুস্তক পরিচয়

ভুতুড়ে বিমান—মহেশ্বর রায় প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—কালকাটা বুক ডিপো, ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছোটদের বই। শিশু সাহিত্যে লেখকের দক্ষতা আছে এবং এক্ষেত্রে তিনি যে নবাগত নহেন, বইখানা পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। কিশোর-কিশোরীদের মনে রহস্যময় কৌতূহল জাগ্রত করিয়া নূতন নূতন বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে তাহাদের সন্ধানী বুদ্ধিকে সহজভাবে ফুটাইয়া তুলিবার মধ্যে পাকা হাতের পরিচয় বইখানার ভিতর পাওয়া যায়। ছাপা, বাঁধাই ভালো। কয়েকখানা সুন্দর ছবি বইখানার বিষয়বস্তুকে ছোটদের পক্ষে সমধিক আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ৫১৭।৫০

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য—দুই টাকা।

এই গ্রন্থে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাঁহার ভাষার ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সমালোচকদের প্রতি মন্তব্য করিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুখবন্ধের ভাষা সহজ নয়, সরলও নয়—একথা প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু তিনি পরিশ্রম করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া বঙ্কিমের ভাষার যে নমুনাসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। লেখকের মন্তব্য বাদ দিয়া পড়িলেই গ্রন্থটি অধিক উপাদেয় বোধ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের মান আরও উচ্চতর হওয়া সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। ১৬১।৫০

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্তিকা—১৫ই আগস্ট, ১৯৫০। শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

এই সংখ্যাটি দশম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা। সর্বসাধারণের মধ্যে ইহার তেমন প্রচার নাই; শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের মধ্যেই ইহার বহুল আদর অধিক। আলোচ্যসংখ্যায় শ্রীহরিদাস চৌধুরীর 'বেদান্তের বাণী' ও নিশিকান্তের দীর্ঘ কবিতা 'অন্তরাল' উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের 'যোগসমন্বয়' ও পত্রধারা এই সংখ্যার আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ২৬৩।৫০

চিত্রবাণী (শারদীয়া সংখ্যা) গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক সম্পাদিত ও ৫, হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা।

বিষয় বৈচিত্র্যে, অঙ্গন-পারিপাট্যে ও অভিনবত্বে শারদীয়া চিত্রবাণী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অভিনবত্বের দিক দিয়া ভারতী দেবীর 'স্টিরিওস্কোপিক' আলোচিত্র ও স্কেচ্যাক শিল্পী সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, বেলা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দাস ও উৎপলা সেনের বিস্তৃত আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে ভারতীয় কোনো কাগজেই স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্র স্থান লাভ করে নাই; আর স্কেচ-ব্যাক শিল্পীদের জনসমক্ষে পরিচয়ের এই প্রচেষ্টাও এই প্রথম। এজন্য সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদের পাত্র।

একাধিক প্রবন্ধ ছাড়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জীবনী ও সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গেও আলোচনা আছে,—যথা, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, তুলসী চক্রবর্তী, সুরাইয়া ও নার্গিসের। উদয়শঙ্কর ও অমলাশংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণীও উল্লেখযোগ্য।

অসংখ্য ছবি ও আর্টপ্লেটে বাঙলা তথা ভারতের খ্যাতনামা ও উদীয়মান বহু অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচয় করাইয়াছে শারদীয়া চিত্রবাণী। আমরা চিত্রবাণীর বহুল প্রচার কামনা করি।

ছন্দপতন—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীমহেশ্বর রায়, মুসাপুর বিবেকানন্দ বুক স্টল, হরিপাল, হুগলী; প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

ছন্দপতন ছোট গল্প সংকলন। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিভিন্ন সময়ে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন হইলেও নিপুণতার সহিত তিনি বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। লেখকের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী মনের কাছে এক গভীর আবেদন করিয়া যায়। বইখানি বেশ ভাল লাগিল। ২৩৭।৫০

রূপমঞ্চ (পূজা সংখ্যা)—সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য তিন টাকা।

সিনেমা সাময়িকগুলির মধ্যে রূপমঞ্চ মাসিকের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা যায় না, অন্ততঃ চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টেরা তো নয়ই এবং রূপমঞ্চের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ বছরের পূজা সংখ্যায়। সর্বতোভাবে সিনেমার নানাদিকে নানাভাবে সমাসীন্ভাবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরই রচনা এতে স্থান পেয়েছে যার মধ্যে আছেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল, শব্দযন্ত্রী যতীন দত্ত, আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি লাহা, পরিচালক হীরেন বসু, উদয়ন, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ১৬৮ পৃষ্ঠার সংখ্যা, প্রতি পাতাতেই প্রায় ছবি। সংখ্যাখানি চিত্রামোদীদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়, তবে বিসদৃশ লাগবার মধ্যে রূপমঞ্চ-হাতে অভিনয় শিল্পীদের ছবির সংখ্যা বেনো বড্ড বেশী হয়ে গিয়েছে।

হসন্তিকা (পূজা সংখ্যা)—সম্পাদক নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য দেড় টাকা।

ছোট পত্রিকাগুলির মধ্যে শ'দেড়েক পাতায় এই পূজা সংখ্যাখানি অনেকগুলি লেখকের নাম থেকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখকদের মধ্যে আছেন সম্বুদ্ধ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অক্রুর-বন্ধু; কবিদের মধ্যে কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রভাতকিরণ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ; ছবিতে গোপাল ঘোষ, রেবতী ঘোষ, সফিউদ্দিন এবং ব্যঙ্গচিত্রে কাফী খাঁ, প্রমথ সমাদ্দার, শৈল চক্রবর্তী, রেবতী ঘোষ প্রভৃতি। সাজসজ্জা, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি বাঁধাধরা।

পটভূমি—পরিমল মুখোপাধ্যায়, দি বুক হাউস, ১৫, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

পরিমলবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত নহেন। ইতিপূর্বে অনুবাদ কার্যে তিনি কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং সম্ভবতঃ সেই সূত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পসমূহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। বাঙলা ছোট গল্পও সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের ছোট গল্পের সঙ্গে সমকক্ষতার স্পর্ধা দাবী করতে পারে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে "পটভূমি"র গল্পগুলি বাঙলা ছোট গল্পের ঐ উচ্চ মর্যাদার বিন্দুমাত্র হানি ঘটায়নি বরং অনেকাংশে মর্যাদা আরও বাড়িয়েছে।

"পটভূমি"তে মোট ১১টি গল্প আছে। বেশীর ভাগ গল্পই মনস্তত্ত্বমূলক এবং এক সূক্ষ্ম ও বিচিত্রগতিতে তাহা আত্মপ্রকাশ করেছে। এর মধ্যে 'মন্দুসেক' গল্পটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এই অবজ্ঞাত সমাজের কাহিনী অতি মনোরমভাবে এই গল্পটিতে ধরা পড়েছে। 'মন্দুল', 'অস্পৃশ্য' ও 'অবচেতন' এই তিনটি গল্পেও লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'পটভূমি' বাঙলা সাহিত্যের এক সার্থক সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হবে একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ২৪১।৫০

খেলাধুলা

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ও ভারতীয় দলের পাঁচ দিনব্যাপী প্রথম টেস্ট ম্যাচ দিল্লীতে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। খেলায় উভয় দলেরই কৃতি খেলোয়াড়গণ বোলিং ও ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় যে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত খেলার গতি এইরূপ এই অবস্থায় উপনীত করে যে, সকলকেই কমনওয়েলথ দলের পরাজয় পর্যন্ত কল্পনা করিবার মত মানসিক শক্তিদান করে। কমনওয়েলথের পেশাদার ও ধুরন্ধর খেলোয়াড়গণ শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলকে জয়ী হইবার সুযোগ দান করেন নাই। তাহা হইলেও এইটুকু বলা চলে যে, এই খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট খেলার খ্যাতি বা মান কোনরূপেই ক্ষুন্ন হয় নাই, উপরন্তু অনেক বৈদেশিক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞগণকে একটু চিন্তিতই করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ন্যায় অভাবনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন এই আশঙ্কা অনেককেই করিতে হইয়াছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব

প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের পক্ষে বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৪ রান করিয়া নট আউট থাকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। রামাধীন ইংলণ্ডের টেস্ট খেলায় বহু খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড়কে বিব্রত করিয়া যে যশোলাভ করিয়াছেন, ভারতের এই টেস্ট খেলায় এক হাজারেই তাহা অনেকখানি ক্ষুন্ন করিয়াছেন। ইহার পরেই মুস্তাক আলী, অধিকারী, উমরিগার, এমন কি ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্টেরও নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রত্যেকেই কমনওয়েলথের বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন বোলারদের বিরুদ্ধে অপূর্ব ব্যাটিং করিয়াছেন। ভারতীয় দলের বোলার হিসাবে বিনু মানকড়ই সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ১৬৯ রানে শেষ করিয়া কমনওয়েলথ দল উল্লসিত হইয়া ব্যাটিং করিতে আসিলে মানকড়, ওরেল, এমেট, ইকিন, ট্রিভস প্রভৃতিকে একের পর এক আউট করিয়া এইরূপ এক অবস্থা সৃষ্টি করে যে, কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক পর্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কমনওয়েলথ দলের ৫টি উইকেট মাত্র ৭৫ রানে পড়িয়া যায়। কমনওয়েলথের পরম সৌভাগ্য যে, ডুল্যান্ড ও ট্রাইব সেই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করিতে সক্ষম হন। কমনওয়েলথ দলে দ্বিতীয় ইনিংসে মানকড়ের বলের বিরুদ্ধেও যে অধিক রান করিয়াছেন তাহা কেবল খেলোয়াড়দের ক্যাচ ফেলিবার মারাত্মক ত্রুটির জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

তিনজনের শতাধিক রান

প্রথম টেস্ট খেলায় কমনওয়েলথ দলের পক্ষে প্রথম ইনিংসে ডুল্যান্ড ও দ্বিতীয় ইনিংসে ফিশলক শতাধিক রান করেন। ভারতীয় দলের বিজয় হাজারে ১৪৪ রান নট আউট থাকিয়া ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন।

খেলার বিবরণ

ভারতীয় দল প্রথম টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। সারাদিন ব্যাটিং করিয়া ভারতীয় দলের দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৬৭ রান হয়। দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ভারতীয় দলের অবশিষ্ট তিনটি উইকেট মাত্র ২ রানে পড়িয়া যায়। কমনওয়েলথ দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়াও সুবিধা করিতে পারেন না। দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান করেন। ডুল্যান্ড ৬৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দল ২৭২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ডুল্যান্ড শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রথম ইনিংসের ন্যায় ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন না। অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলী প্রথম হইতেই দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিং করেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ১ উইকেটে ১৪৮ রান হয়। বিজয় মার্চেন্ট ৪৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনের সূচনায় বিজয় মার্চেন্ট আউট হইলেও ভারতীয় দলের রান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উমরিগার, ফাদকার, হাজারে প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। চতুর্থ দিনের শেষ ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ৩৪০ রান করিতে সক্ষম হন। হাজারে ৯৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। পঞ্চম দিনের কিছু সময় খেলিয়া ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ৪২৯ রান হইলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করা হয়। কমনওয়েলথ দল ৩২৭ রান পশ্চাতে পড়িয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ১ উইকেটে ২১৪ রান করিতে সক্ষম হন। প্রবীণ খেলোয়াড় ফিশলক ১০২ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ফলে খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—১৬৯ রান (হাজারে ৩১, উমরিগার ২৮, ফাদকার ৪১, কিষেণচাঁদ নট আউট ১৬, রামাধীন ৪৪ রানে ৪টি, ট্রাইব ৪৭ রানে ৩টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস :—২৭২ রান (এমেট ৫৫, ডুল্যান্ড ১০৮, ট্রাইব ৩৮, মানকড় ৩৬ রানে ৪টি, এন চৌধুরী ৮২ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস—৬ উইঃ ৪২৯ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (হাজারে নট আউট ১৪৪, বিজয় মার্চেন্ট ৪৮, মুস্তাক আলী ৬১, উমরিগার ৫৬, অধিকারী ৫৬, ফাদকার ৩৭, ওরেল ১২০ রানে ৩টি, রামাধীন ১১১ রানে ১টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১ উইঃ ২১৪ রান (ফিশলক নট আউট ১০২, এমেট নট আউট ৪৩, পিম্বলেট ৬৩, মানকড় ৬১ রানে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দ্বিতীয় টেস্ট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ভারতীয় দ্বিতীয় টেস্ট দল মনোনীত করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় যাঁহারা ভারতীয় দলের পক্ষে খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে এন চৌধুরী, সি এস নাইডু, পি জি যোশী ও কিষেণচাঁদ এই চারিজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়া তাঁহাদের স্থানে চারিজন তরুণ খেলোয়াড় গ্রহণ করিয়াছেন। এই চারিজনের নাম যথাক্রমে বি সি আলভা, এস জি সিন্দে, রাজেন্দ্র নাথ ও ডি এস মাঞ্জরেকার। বি সি আলভা মাদ্রাজের একজন তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়। অফ স্পিন বোলার ও নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। মাঞ্জরেকার বোম্বাই-এর একটি ১৯ বৎসর বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড়। ব্যাটিংয়ে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন আশা করা যায়। রাজেন্দ্র নাথ বিহারের তরুণ উইকেট রক্ষক। এস জি সিন্দে সি এস নাইডুর ন্যায় গুগলী বোলার। নিম্নে দ্বিতীয় টেস্ট দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল :—(১) বিজয় মার্চেন্ট (অধিনায়ক), (২) বিজয় হাজারে (সহঃ অধিনায়ক), (৩) মুস্তাক আলী, (৪) বিনু মানকড়, (৫) এস জি সিন্দে (৬) ডি জি ফাদকার, (৭) এইচ আর অধিকারী, (৮) পি আর উমরিগার, (৯) বি সি আলভা, (১০) রাজেন্দ্র নাথ (উইকেট রক্ষক), (১১) ডি এস মাঞ্জরেকার।

দ্বাদশ ব্যক্তি :—এম আর রেগে।

অতিরিক্ত :—গোলাম আমেদ ও ডি কে গাইকোয়াড়।



দিল্লীর প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্টের সহিত করমর্দন করিতেছেন। মার্চেন্টের পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিজয় হাজারে ও মুস্তাক আলী।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই নবেম্বর—কালিম্পং-এর সংবাদে প্রকাশ, অভিযাত্রী চীনা ও তিব্বতী বাহিনীর অগ্রগামী দল লাসা হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী রেতিং-এ পৌঁছিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য বোম্বাইয়ে বক্তৃতাকালে বলেন যে, বাহিরের কোন শক্তিই ভারতবর্ষকে দুরবস্থায় ফেলিতে পারিবেন না। একমাত্র আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে।

ঢাকায় পাকিস্থানের মূলনীতি নির্ধারণকল্পে জাতীয় কনভেনশনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ববঙ্গের সতেরটি জেলার সাড়ে চারি কোটি নরনারীর তিনশত জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

ভারত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আফতাব-ই মুসিকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ গতকল্য রাত্রিতে বরোদায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারীয়েট হইতে সমস্ত মন্ত্রী দপ্তরকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে প্রধান মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করিতে হইলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরিবর্তে শ্রীজওহরলাল নেহরু লিখিতে হইবে।

৭ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীস্থিত নেপালের দূতাবাস হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, নেপালাধীশ গতকল্য সকালে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া একটি "বৈদেশিক দূতাবাসে" আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য নেপাল গবর্নমেণ্ট নেপালের পার্লামেণ্টে রাজগুরু ও গুরুদারগণের (অভিজাতবর্গ) এক জরুরী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ইতোমধ্যে নেপাল গবর্নমেণ্ট যুবরাজের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নেপালের শাসক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতের মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পুণা হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরবর্তী কাসিজিতে গ্লাইডার ঘাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

শিলং-এ ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বাস ও পাকিস্থান সংখ্যালঘু মন্ত্রী ডাঃ মালেক পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রকাশ, ভারত-পাকিস্থান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে ভাবে মুসলমানরা দলে দলে আসামে প্রবেশ করিতেছে—অদ্যকার বৈঠকের উহাও অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল।

কালিম্পং-এর সংবাদে প্রকাশ, শীর্ষস্থানীয় লামাগণ লাসাকে একটি সুরক্ষিত নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। নগরীর সীমানা বরাবর সান্ত্রী ও প্রহরীদের মোতায়েন করা হইয়াছে।

৮ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে গতকল্য হইতে নেপালের মহারাজাধীরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ভারতে আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে জানা গিয়াছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র এই সম্পর্কে জানান যে, ভারত সরকার নেপালাধীশকে ভারতে আগমনের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা দিবেন।

কালিম্পং-এর সংবাদে প্রকাশ, অভিযাত্রী চীনা ও তিব্বতী বাহিনীর অগ্রগামী দল লাসা হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ফণ্ডোজং ছাড়াইয়া গিয়াছে।

৮ই নবেম্বর— অদ্য মধ্যাহ্নে কলেজ স্কোয়ারের নিকটে মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ কলিকাতা কর্পোরেশনের ২নং ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার অফিসের সম্মুখে এক সশস্ত্র রাহাজানি হয়। উক্ত রাহাজানিতে লিপ্ত যুবকরা কলিকাতা কর্পোরেশনের গাড়ী আক্রমণ করিয়া উহা হইতে প্রায় ৭০ হাজার টাকা লুঠ করে। তন্মধ্যে প্রায় ২৩ হাজার টাকা পরে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৯ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, ভারতের উত্তর সীমান্ত সন্নিহিত তিব্বত ও নেপালে হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় ভারতের নূতন বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বর্তমানে জনসাধারণকে সর্বপ্রকার দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠিয়া নবার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া সর্দার প্যাটেল বলেন যে, নেপালের রাজা ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিতে পারি না।

অদ্য কালীপূজা ও দীপালী উপলক্ষে বাজী পোড়াইতে অথবা তৈয়ারী করিতে গিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন অংশে ৬০ জনেরও অধিক অগ্নিদগ্ধ অথবা বিস্ফোরণের ফলে আহত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি বালক হাসপাতালে মারা যায়।

১০ই নবেম্বর—ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর হইতে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, নেপালাধীশ তাঁহার পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে ১১ই নবেম্বর শনিবার নয়াদিল্লীতে উপনীত হইবেন।

১১ই নবেম্বর—ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী রক্সৌল শহর হইতে পি টি আই-এর প্রতিনিধি তারযোগে জানাইয়াছেন যে, নেপালী কংগ্রেস বাহিনী সরকারী সৈন্যদের সহিত তীব্র সংঘর্ষের পর নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বীরগঞ্জ দখল করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা তথায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নেপালী কংগ্রেস বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীত্রিভুবন মল্ল সরকারী ফৌজের সহিত সংঘর্ষে গুরুতর আহত হইয়াছেন। নেপালী কংগ্রেস বাহিনী নেপালের নয়টি বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুই তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

নেপালাধীশ মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহদেব অদ্য সপরিবারে নয়াদিল্লীতে আগমন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু পালাম বিমান ঘাটিতে নেপালাধীশকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১২ই নবেম্বর—নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বীরগঞ্জে নেপালী কংগ্রেস বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নেপাল কংগ্রেস বাহিনী আরও নূতন ৪টি স্থানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

নেপালী কংগ্রেস নেতা শ্রীত্রিভুবন মল্ল অদ্য সকালে মারা গিয়াছেন। তিনি গতকল্য বীরগঞ্জে কংগ্রেস বাহিনী পরিচালনা করিতে গিয়া আহত হন।

বিদেশী সংবাদ

৬ই নবেম্বর—জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সকাশে এক স্পেশ্যাল রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোরিয়ায় তাঁহার বাহিনী এক্ষণে চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত।

৭ই নবেম্বর—পিকিং বেতারে অদ্য বলা হইয়াছে যে, তিন হাজার চীনা উত্তর কোরীয়দের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। ইহারা সকলেই চাষী মজুর; নিজ দেশ রক্ষার অভিপ্রায়ে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিয়াছে। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোরিয়ায় প্রবেশ করার জন্য আরও ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ইয়ালু নদীর উত্তর তীরে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী উত্তর কোরিয়ায় অভিযান আরম্ভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধলিপ্ত হইয়াছে বলিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার যে অভিযোগ করিয়াছেন, উহা গত রাত্রিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হইয়াছে।

৮ই নবেম্বর—মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ডেমোক্রাটিক দল মার্কিণ সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে অদ্য ২২৯-২৩৫ ভোটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের পরাজয় ঘটিয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে না।

৯ই নবেম্বর—টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ন্যূনপক্ষে ৬০ হাজার প্রথম শ্রেণীর চীনা সৈন্যের সম্মুখীন। আরও ৬০ হাজার চীনা সৈন্য কোরিয়া রণাঙ্গনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় ৪টি চীনা আর্মি হইতে ঐ সকল লোকজন সংগৃহীত হইয়াছে।

১০ই নবেম্বর—বৃটিশ দার্শনিক লর্ড রাসেল (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) ও মার্কিন উপন্যাসিক মিঃ উইলিয়ম ফকনার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া অদ্য ঘোষিত হইয়াছে।

১১ই নবেম্বর—বৃটিশ কমনওয়েলথ ব্রিগেড ও মার্কিন ২৪শ ডিভিসন অদ্য উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ায় এক নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে এবং তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

১২ই নবেম্বর—কোরিয়া রণাঙ্গনে মার্কিন প্রথম সাঁজোয়া ডিভিসন আজ প্রবল প্রতিরোধের মুখে দুইটি পাহাড় অধিকার করিয়াছে। চংচন নদীর উত্তর তীরে দক্ষিণ কোরিয়া এক কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

পিকিং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিব্বত ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তদনুসারে যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥০
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 25th November, 1950. [৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপাল ও ভারত

নেপালের গণ-বিপ্লবের পরিণতি কতদূর গিয়া দাঁড়াইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহা এখনই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বস্তুত ব্যাপারটি সামান্য নহে এবং ভারতের রাজনীতির উপর এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পতিত হইবে, এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে। নেপালের গণ-বিপ্লব সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। গান্ধী পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে এই আন্দোলনের এই দিক হইতে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নেপালের শাসক-গোষ্ঠী 'রাণা'দের প্রভূত সামরিক শক্তি আছে, অন্ততপক্ষে বিদ্রোহীদের চেয়ে তাহাদের সামরিক শক্তি সংগঠিত এবং উপকরণে সমধিক প্রবল। পশুশক্তিতে তাহারাই প্রধান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবীদিগকে তাহারা যে সহজেই দমন করিতে পারিবে, ইহাও ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সঙ্ঘবলই জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নেপালের জনগণের সুদীর্ঘ শোষণে পরিপুষ্ট রাণারা বিদ্রোহীদিগকে লুণ্ঠনকারী, দস্যু প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে জগতের কাছে নিন্দিত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং নিজেদের সাফাই গাহিবেন, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে। কারণ জগতের সর্বত্র শোষণ-লিপ্সু, পশুবলপরায়ণ শাসকের দল এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের কাছেও এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত বীর সন্তানেরা ছিল ডাকাত। সিপাহী-বিদ্রোহের যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ইংরেজের কাছে 'দস্যু' নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে বাঙলার যে সব সন্তান ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারাও ছিলেন ইংরেজের কাছে ডাকাত। সুতরাং এ চাল আমাদের জানা আছে এবং ভারতের কোন লোকই নেপালের স্বৈরাচারী শাসকদের এইরূপ প্রচারকার্যে ভুলিবে না। নেপাল দীর্ঘ দিন হইতে প্রগতিবিরোধী শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত এবং পীড়িত হইতেছে, ইহা আমরা জানি। নেপাল কংগ্রেসের আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞও নহি। ফলতঃ ভারতের কংগ্রেসকর্মীদের সহানুভূতি বরাবরই নেপালের জন-আন্দোলনকারীদের সহিত রহিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসকদের নিপীড়নের সম্বন্ধে আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অতীত যুগের সংস্কার-সুদৃঢ় সংগ্রাম-প্রবৃত্তি নেপালের জন-আন্দোলনের সহিত আমাদের সহানুভূতিকে আজ আন্তরিক করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সত্য যে, নেপালের স্বৈরাচারী শাসকেরা পশুশক্তির জোরে তথাকার গণ-আন্দোলনকে আপাততঃ দমিত করিতে সমর্থ হইতেছেন, ইহা প্রতীত হইলেও তাহাদের সে গর্ব এবং দম্ভ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জনগণের অন্তরে যদি একবার জাগিয়া উঠে, তবে পশুশক্তি যত প্রবল হোক না কেন, সেই আন্দোলনকে পিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে জনশক্তি প্রতিরোধের সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সমধিক প্রবল আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নেপালের পক্ষেও এই সত্যের অন্যথা ঘটিবে না। প্রকৃতপক্ষে নেপালের জন-আন্দোলনের সাফল্যের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। নেপালে যদি আজ স্বৈর-শাসন ধ্বংস হয় এবং তৎপরিবর্তে জনগণের শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহা হইলে আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ নেপালবাসীরা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংহত হইয়া উঠিবে এবং কোন মতবাদের আড়ালেই বিদেশীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ছল বা কৌশল তাহাদের কাছে আর খাটিবে না। পরন্তু নিজেদের এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার আগ্রহেই ভারতের সঙ্গে নেপালের সহযোগিতার সম্পর্ক যে তাহাদের আন্তরিক হইয়া পড়িবে, ইহাও স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে নেপালের স্বৈরাচারী শাসনের যদি আজ অবসান না ঘটে, তাহা হইলে গণ-আন্দোলনের গতি নূতন দিকেও মোড় ধরিতে পারে। নেপালের জাতীয়তাবাদী দল সে অবস্থায় নিরাশার মধ্যে পড়িয়া কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্যও ঝুঁকিয়া পড়িতে পারেন। বস্তুত চীনে এমন ব্যাপারই ঘটিয়াছিল এবং ইন্দোচীনে এখনও তেমনই ব্যাপারই পাকিয়া উঠিতেছে। সুতরাং নেপালের গণ-বিপ্লবের ফলে, ভারতের দিকে কম্যুনিস্টদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, এই বিভীষিকায় আমাদিগকে ধাপ্পা দিবার যে চেষ্টা হইতেছে, বাস্তবিকপক্ষে তাহার কোন মূল্যই নাই—পক্ষান্তরে নেপালে যদি এই বিপ্লবের ফলে স্বৈর-শাসনের অবসান না ঘটে, তবেই বরং সেই-রূপ ভয়ের কারণ ষোল আনা রহিয়াছে। সুতরাং ভারত নেপালের গণ-জাগরণের সাফল্য এবং তথাকার স্বৈর-শাসনের অবসানই সর্বতোভাবে কামনা করে।

নেপালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

নেপালের রাজনীতিক অগ্রগতি এবং আর্থিক উন্নতিই ভারতের কাম্য— ভারতের রাষ্ট্রপতি এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। 'বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও জগতের কোন স্থানে নগ্ন স্বৈরাচারের প্রভুত্ব চলিবে, ইহা বিস্ময়জনক।' ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে এমন অবস্থা চিন্তারও অতীত এবং ইহা অসহ্য। কিন্তু ভারত সরকার আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে আবদ্ধ। নেপালের ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ বিষয়ে কড়াকড়িও আরম্ভ হইয়াছে এবং নেপালের সীমান্তভাগস্থ বিহার ও উত্তর প্রদেশের অঞ্চলগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বাঙলার সীমান্তও অবশ্য নেপালের সঙ্গে যুক্ত আছে; কিন্তু সীমান্ত ব্যাপারে এখানে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় নাই। কিন্তু ভারতের কোন স্থান হইতে নেপালের বিদ্রোহ পরিচালিত না হয়, তৎপ্রতি এখানেও লক্ষ্য রাখা চলিতেছে। আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানবিদগণের এ বিষয়ে নিষ্ঠাবুদ্ধির সম্বন্ধে আমরা বিতর্কের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। কিন্তু সোজাসুজি এই সম্পর্কে কতগুলি সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার নেপালের বর্তমান শিশু মহারাজাধিরাজকে শাসনতন্ত্রসম্মতভাবে অদ্যাপি স্বীকার করিয়া লন নাই। সুতরাং ভারত গভর্নমেণ্টের নীতির দিক হইতেও নেপালের বর্তমান বিদ্রোহ বিধিবহিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চলিতেছে, এখনও এমন কথা বলা যায় না। ভারত হইতে নেপালের বিদ্রোহীদলে যোগদান করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে বাধা দেওয়া হইবে কি না, এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কেন্দ্রস্থানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে কি না, এই প্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্নও উঠিয়াছে। নেপালের বিদ্রোহ যদি বিধিবহিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে না হয়, অর্থাৎ অবৈধ শাসন-ব্যবস্থার প্রতিরোধের জন্য হয়, তবে এই প্রশ্ন প্রধানত উঠে না। দ্বিতীয়ত সে প্রশ্ন যদি ছাড়িয়াও দেওয়া যায়, তাহা হইলেও নেপাল রাষ্ট্রের যাহারা প্রজা তাহাদিগকে নেপালে গমন করিতে দিতে বাধা দেওয়াতে আন্তর্জাতিক বিধির বিরুদ্ধতাই ঘটে। ফলত কোন রাষ্ট্রে অপর রাষ্ট্রের বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা বা অর্থসংগ্রহ আন্তর্জাতিক বিধির ব্যাঘাতক বলিয়া বিবেচিত হয় না, এমন ঐতিহাসিক নজীর অনেক রহিয়াছে। বস্তুতঃ নেপালের বিদ্রোহ-পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি সৈনিকদলে সম্বদ্ধ না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে নেপালে প্রবেশ করে, তবে আন্তর্জাতিক বিধানের দিক হইতেও তেমন কাজ আপত্তিকর হইতে পারে না। ইহা ছাড়া, নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নানাদিক হইতে এতই ঘনিষ্ট যে, শুধু আন্তর্জাতিক বিধানের ব্যাখ্যা-ভাষ্য ধরিয়া এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে উদাসীন থাকাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। নেপালের শাসনতন্ত্র জনমতের বিরোধী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং সে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিবার নৈতিক অধিকারও নিশ্চয়ই নেপালবাসীদের রহিয়াছে। তাঁহারাও মানুষ। "নেপালবাসীরা বর্তমানে যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সংগ্রাম, সত্যের জন্য সংগ্রাম, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম। ভারতের এমন একজন লোকও নাই, যিনি নেপালবাসীদের এই বীর্যময় সংগ্রামে সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন।" প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুলকালাম আজাদের উক্তিতে প্রত্যেক ভারতবাসীরই অন্তরের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুত ভারতবাসীরা নেপালের 'রাণা'-শাসনের উৎসাদন কামনা করে। সোজা কথায়, তাহারা বিদ্রোহীদেরই জয় চায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেপালের বীর সন্তানেরা জীবনদান করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের পরিচালনাধীনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' নেপালীদের বীরত্বের সে কথা ভারতবাসী বিস্মৃত হইতে পারে না। ভারতে নেপালের বিদ্রোহ-পরিচালনে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের প্রশ্নটি সম্বন্ধে এইসব নানাদিক হইতে বিবেচনা করা দরকার এবং ভারত সরকারের নীতির মধ্যে কোনরূপ দ্বৈধ ভাব থাকা উচিত নয়। আমরা আশা করি, ভারত সরকার এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতি-নির্ধারণে নেপালের স্বৈরাচারী শাসকদের সহায়ক দুর্বলতার কোনরূপ কূটনৈতিক চক্রে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিভ্রান্ত হইতে দিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সমুন্নত আদর্শ এবং মানবতার প্রতি মর্যাদা-বোধ এক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তব্য নির্ণয়ে সাহায্য করিবে।

ভারতের খাদ্যসমস্যা—

গত ৬ই নবেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গের রেশন-এলাকায় সাপ্তাহিক রেশনের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছিল, ২০শে নবেম্বর হইতে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া পূর্বপরিমাণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য শেষবারে এই কর্তিত হারটি পরিপূরিত হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তির সঞ্চার হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত এক্ষেত্রে যে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাও সুখের কথা; কারণ, ইহার পূর্বে দুই দুইবার রেশনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়; কিন্তু প্রতিশ্রুত মত তাহা পরিপূরিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বলা বাহুল্য, রেশন-ব্যবস্থায় নির্ধারিত পরিমাণ জনসাধারণের অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ সত্বর যে এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব হইবে, ইহা তো মনে হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে খাদ্যসচিব শ্রীযুক্ত কে এম মুন্সীও দেশের খাদ্যসংকট গুরুতর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আসামের ভূমিকম্প এবং কয়েকটি প্রদেশে প্লাবনের ফলে এই সমস্যা সমধিক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং আকস্মিক অবস্থার দরুণ বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর মেয়াদ ভারত সরকারকে বাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। খাদ্যসচিব ইহাও জানাইয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকা পর্যন্ত আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে দ্বিধা করা হইবে না। খাদ্যসচিব আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল করা হইবে বলিয়া সরকার তাঁহাদের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা হইবে না। খাদ্যসচিবের মতে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পর এত বড় দায়িত্বের ভার দেশ আর নাকি গ্রহণ করে নাই। এবং এই সময়ের মধ্যে আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল না হইতে পারি, তবে আমাদের বিনাশও নাকি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গাডগিলও আমাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতে কসুর করেন নাই। তিনি সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, কু-শাসনের ফলে ১৯৪৩ সালে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। সে অবস্থা আর কোনক্রমেই ঘটিতে দেওয়া হইবে না। এ সংকল্প শুভ সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু কথার জোরেই যেসব সমস্যা বাস্তব, সেগুলির সমাধান করা যায় না। এবং এইভাবে মন্ত্রীদের কথার মূল্যও দেশের লোকের কাছে একেবারে নষ্ট হইয়াছে বলিলেও চলে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে দেশ এবং জাতির স্বার্থবোধকে উৎপাদক শ্রেণীর অন্তরে জাগ্রত করিয়া তোলা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। কংগ্রেসের কৃষি-সংস্কার কমিটির মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা দেশের খাদ্যসংকট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি পুলিশী রাষ্ট্রের শাসনকার্য চালাইবার জন্য কিছুদিন পূর্বেও যেসব সিভিল সার্ভিস চাকুরিয়াগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাঁহাদের উপরই যদি আজ এদেশের শতকরা ৪০।৫০ ভাগ কৃষকের চাষাবাদ সংস্কারের ভার দেওয়া হয়, তবে তাহা কস্মিনকালেও বাস্তবে পরিণত হইবে না। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে

সমাজের নিম্নস্তরের যেসব লোক রহিয়াছে, তাহাদের সুখ ও দুঃখকে নিজেদের সুখ ও দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পারে, এইরূপ একদল মানুষের প্রয়োজন। সেবাই হইবে তাহাদের আদর্শ এবং সেই আদর্শের সঙ্গে থাকা চাই দৃঢ়প্রত্যয় এবং অসীম ধৈর্য। বস্তুত এখনও আমাদের শাসন-প্রতিবেশে এইরূপ সেবক এবং কর্মিদলের অভাব সুস্পষ্টভাবেই রহিয়াছে। ফলত ইংরেজ গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের শাসন-ব্যবস্থার মূলীভূত যাবতীয় জীর্ণ সংস্কার এখনও আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় নাই।

পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি

দিল্লী-চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আগাগোড়াই অপরিসীম আশাশীল। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার এই আশাশীলতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে এবং অসহায়ের অনর্থক আত্মতুষ্টিস্বরূপেই প্রতিভাত হয়। ভারতীয় পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধন-অভিভাষণে প্রধান মন্ত্রীর এতৎসম্পর্কিত তেমন একটা আত্মতুষ্টির ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এত বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার বিশেষভাবে অবতারণা না করিয়া অবস্থা সন্তোষজনক, এইভাবে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সব চুকাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর দিল্লী-চুক্তির সাফল্যে বিস্ময় অবশ্য নূতন নহে। তাঁহার সে বিস্ময় উত্তরোত্তর সীমাহীনতায় সম্প্রসারিত হইতেছে। বস্তুত উদ্বাস্তুরা যে এইভাবে বাড়ি-ঘরে ফিরিয়া যাইবে, এমন আশা তিনি করিয়াই উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্যই কি অবস্থা এমনই আশাপ্রদ? প্রধান মন্ত্রীর নিজের উক্তিতেও তাহা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার প্রদত্ত হিসাবেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পর হইতে উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়া এখন ৩৫ লক্ষ লোক ভারতে রহিয়াছে; মাত্র ৮ কি ৯ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সংখ্যার কতকটা আকস্মিক পরিস্ফীতিতেই সম্ভবত ভারতের প্রধান মন্ত্রী এতটা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু যাহারা ফিরিতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে যে পূর্ববঙ্গে পুনরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যেই সেখানে যাইতেছে, ইহার প্রমাণ কি? পণ্ডিত নেহরু নিজের মনেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহই রহিয়া গিয়াছে। তিনি একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হয়ত ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে যথোচিত সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে সমর্থ হইতেছেন না বলিয়াই ইহাদের অনেকে একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পুনরায় দেশে ফিরিতেছে, অথবা কেহ কেহ তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আসিবার জন্যই সাময়িকভাবে সেখানে যাইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রধান মন্ত্রী যাহাই মনে করুন, উদ্বাস্তুদের গমনাগমনের এই হিসাবকে আমরা কোনদিনই তেমন কিছু গুরুত্ব দেই না। কারণ এতদ্দ্বারা পূর্ববঙ্গের অবস্থার স্থায়িত্ব কিছুই সূচিত হয় না। পূর্ববঙ্গে কিছুদিন হইল সাম্প্রদায়িক অশান্তিমূলক ঘটনা বেশী কিছু ঘটে নাই; কিন্তু একটা সমুন্নত সংস্কৃতি-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের মানসিক নিরুদ্বেগ বা স্বস্তির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে। নিজেদের অধিকারে দৃঢ় হইয়া নিজেদের মান-মর্যাদা বজায় রাখিয়া তাঁহারা থাকিতে চাহেন এবং জোর করিয়া এই অবস্থাকে মনের মধ্যে গড়িয়া তোলা যায় না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিবেশের উপর তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে সেইরূপ মান-মর্যাদা এবং অধিকার লইয়া বসবাস করিবার মত সামাজিক প্রতিবেশ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। 'পাকিস্থান আর মোশ্লেম লীগ একই' অর্থাৎ পাকিস্থানে মুসলমানেরই মান, মুসলমানেরই মর্যাদা এবং রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য—এই নীতি পূর্ববঙ্গের শাসন-নীতিকে প্রভাবিত করিতেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে সাম্প্রদায়িক একটা ভেদবোধকে জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ বা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনেই বড় জোর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতিগতি ভালমানুষীতে পর্যবসিত হইতে পারে, হিন্দুদের অধিকারের স্বীকৃতির পক্ষে সামাজিক প্রতিবেশকে তাহা সুনিশ্চিত করে না। বাস্তবিকপক্ষে শুধু আশাশীলতার সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছাড়িতে চায় না; কিন্তু তাঁহারা মানুষের মত সেখানে থাকিতে চায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ক্রীতদাসের দৈন্যময় জীবনকে বরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এজন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, বাঙালী জাতি আজও ইহাই জানিতে চাহে। অনর্থক কথার উচ্ছ্বাসের অবসর এখন আর নাই। বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া স্থায়ীভাবে যাহাতে এ সমস্যার সমাধান হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করাই বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ববঙ্গের জনমতের প্রতিক্রিয়া

পাকিস্থানের গণপরিষদে মূল নীতি নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রচারের সিদ্ধান্ত পরিষদের মুসলিম লীগ দলের সদস্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী বর্তমানে মুসলিম লীগ দলের সর্বময় কর্তা। প্রকাশ, রিপোর্টটির সম্বন্ধে আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবের উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র জনগণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাহার বিরুদ্ধতার জন্য অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সুপারিশ সম্বন্ধে অনুকূল মতাবলম্বী নহেন। পাকিস্থানের গণ-পরিষদের কয়েকজন সদস্য ইতোপূর্বেই এই সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের জনমত অগ্রাহ্য করিয়া রিপোর্টটি যদি বর্তমান আকারে গণপরিষদে পেশ করা হয়, তবে তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রস্তাবগুলি বর্তমান আকারে পরিষদে উপস্থিত না করাতে পূর্ববঙ্গের জনমতেরই মর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু তথাপি শাসন-বিধি প্রণয়ন ক্ষেত্রে কার্যতঃ সে মর্যাদাকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গে যাহারা কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধতা করিতেছে, তাহারা রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিতেছে, তাহারা ইসলামের শত্রুদলের দুষ্ট অভিসন্ধিতে বিভ্রান্ত হইয়াছে, সর্বশেষে পাকিস্থান রাষ্ট্রের ঐস্লামিক গণতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রবর্তনে তাহারা বাধা দিতেছে, ক্রমেই এই সব কথা উঠিতে থাকিবে। পরন্তু বিরোধী দলের অনিষ্টকর কার্যের জন্যই পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী রচনা করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে, এই শ্রেণীর প্রচারকার্য করাচীকে কেন্দ্র করিয়া এবং তাহাদের অনুগত মোল্লাতান্ত্রিকদিগকে আশ্রয় করিয়া অতঃপর উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়। সুতরাং পাকিস্থানের গণপরিষদে এই সিদ্ধান্তকে সোজাসুজি পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক মতবাদীদের জয়রূপে গ্রহণ করিবার সময় এখনও আসে নাই। মুসলিম লীগের মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধ প্রগতি-বিরোধী মতবাদ হইতে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রকে মুক্ত করিয়া সত্যই যদি পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মর্যাদা সেখানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সেজন্য আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ সংগ্রামেরই প্রয়োজন হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বর্তমানে তাহার সূচনা মাত্র দেখা দিয়াছে।

বিপ্লবের পথে নেপাল

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

নেপাল স্বাধীন রাষ্ট্র। নেপালের অধিবাসীরা মুক্ত, স্বাধীন। শুধু আজ নয়, বিস্মৃত প্রায় যুগ থেকেই তারা স্বাধীন। তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিদেশীরা কোন বাধা সৃষ্টি করার অবকাশ পায় নি। শাসনের নামে শোষণ চালাতে পারে নি কোন বিদেশী শক্তি। কারণ নেপালের দুর্ধর্ষ



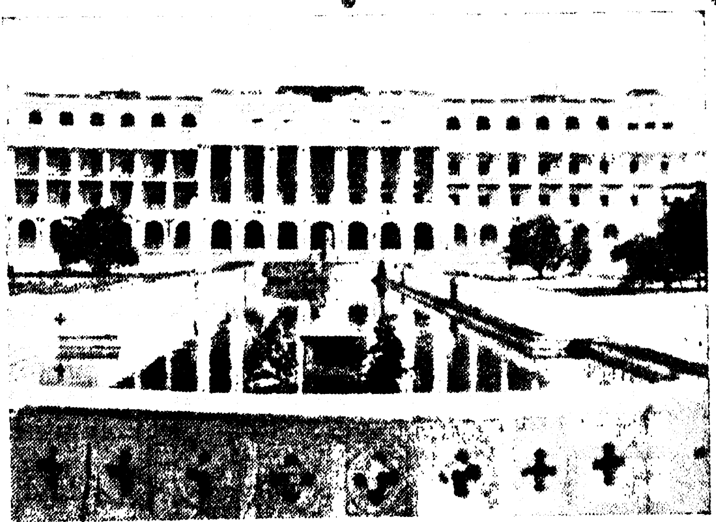
নেপালের মহারাজাধিরাজ শ্রীত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ দেব

পার্বত্য জাতি তাদের সে সুযোগ দেয়নি। শ্বেত জাতির প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল তারা। সামরিক শক্তিতে গরীয়ান হয়ে বজায় রাখতে পেরেছে স্বীয় স্বাধীনতা। এ অতি আনন্দ ও গর্বের কথা। এটা গৌরবের বিষয়ও। কিন্তু এই আনন্দ, গৌরব ও গর্বের পশ্চাতে যে এত অশ্রু লুক্কায়িত ছিল তা কি কেউ জানত? কেউ কি খবর রাখত স্বাধীন নেপালে দরিদ্র নেপালীদের রক্তস্রোত বইছে কত ধারায়? রাণা শাহীর নির্মম শাসন ও শোষণ যে বিদেশীকেও হার মানিয়েছে তার সংবাদ কি নিয়েছে কেউ? অশিক্ষিত, অজ্ঞ, দরিদ্র নেপালবাসীর কত চোখের জল মিশেছে পাহাড়ী নদীর ধারায় তার খবর কি পেয়েছে বাহির বিশ্ব পায় নি—কারণ জানতে চায় নি। আজ নেপাল বিপ্লবের মুখে। রাজপ্রাসাদের বিপ্লব জনগণের বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। তাই সবাই নেপালকে জানছে। জানছে মহারাজাধিরাজের কথা, রাণা শাহীর কথা। স্বাধীন দেশের পরাধীন মানুষগুলির কথা। অবশ্য কথাগুলি নূতন কিছু নয়। চিরাচরিত, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। তবু তা জানা আমাদের প্রয়োজন।

নেপালে যে বিদ্রোহ, যে মুক্তি অভিযান চলেছে তাতে আছে তিনটি পক্ষ। রাজার দল, প্রধান মন্ত্রীর দল আর জনসাধারণ। অবশ্য বর্তমানে রাজার দল আর জনসাধারণ এক হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায় এখন চলেছে দুটি দলে বিরোধ—অর্থাৎ প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীলের মধ্যে সংঘর্ষ। রাজার দল তথা জনসাধারণ চায় শাসন সংস্কার, চায় জনগণের হাতে শাসন ভার। রাজাকে তারা দেখতে চায় নিয়মতান্ত্রিক প্রধান রূপে। আর চায় বর্তমান রাণাশাহী তথা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিলোপ। নেপালের বর্তমান রাজাকেও প্রগতিপন্থী বলা যেতে পারে। তাঁর ইচ্ছাও জনগণের দাবী মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তাতে নারাজ। অবশ্য বর্তমান প্রধান মন্ত্রী হিজ হাইনেস দি মহারাজা মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা নাকি কোন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, নেপালে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হবে। কিন্তু তাঁর কথায় ও কাজে কোন মিল নেই। জনগণ তাঁর কথায় বিশ্বাস করে না। বিদ্রোহের যে বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল অনেকদিন থেকে আজ তা প্রকাশ পেয়েছে প্রবলভাবে।

নেপালের ঐতিহাসিক পরিচয় মোটামুটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে জানতে পারা যায় নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যে প্রথম প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ও তাঁর উত্তর পুরুষেরা কত হীন ষড়যন্ত্র ও হত্যা করেছে। সে সব নারকীয় হত্যাকান্ড খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার তাঁদের কাছে। সেই ব্যাপারের বোধ হয় পুনরাবৃত্তি হত বিংশ শতাব্দীতেও। কিন্তু হতে পারেনি। কেন হয়নি তা এখনও জানা যায়নি। তবে শীঘ্রই সে রহস্য উদ্ঘাটিত হবে আশা করি।

নেপাল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি যে, নেপালের রাজা সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন নৃপতি। তাঁর মঞ্জুর ও শিলমোহর ছাড়া (একেই লাল মোহর বলা হয়) কাউকে 'বির্তা' (নিষ্কর জমি) দেওয়া হয় না। ফাঁসির আদেশে, পুরস্কার দানে, রাষ্ট্রদূত নিয়োগে, সামরিক ও অসামরিক লোক নিয়োগে এমন কি রাষ্ট্রের হিসাব পত্রেও তাঁর মঞ্জুর ও মোহর থাকা দরকার। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সম্মুখেই পরিচয়পত্র উপস্থিত করতে হয়। রাজার কাছেই সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। কিন্তু এত ক্ষমতা তাঁর থাকলেও তিনি



সিংহ দরবার। এখানেই বাস করেন প্রবল প্রতাপান্বিত নেপালের প্রধান মন্ত্রী



নেপালের তরাই অঞ্চলের চাষী।

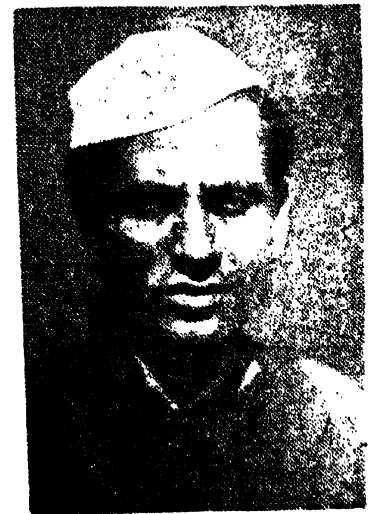
ক্ষমতাহীন। সত্যিকারের ক্ষমতা পরিচালনা করেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। রাজা শুধু নামেই রাজা অথচ মজা হচ্ছে এই, প্রধান মন্ত্রীও ক্ষমতা পেয়েছেন রাজারই অনুজ্ঞা দ্বারা। (একে বলা হয় লাল পাঞ্জাপত্রের আদেশ)। কিন্তু হলে কি হবে। প্রধান মন্ত্রীই এখন রাজ্যের সর্বেসর্বা। তাঁর আদেশই আইন। এত ক্ষমতাপন্ন তিনি যে, ইচ্ছে করলেই প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাও বাতিল করে দিতে পারেন। অর্থাৎ কার্যত তিনিই নেপালের শাসনকর্তা আর রাজা হচ্ছেন আইনত কর্তা। রাজ্যের এই সর্বময় কর্তৃত্ব মুঠোর মধ্যে আনেন সর্বপ্রথম জঙ্গ বাহাদুর। সেই সময়কার নেপালের রাজা ছিলেন দুর্বল চরিত্র। তাই ক্ষমতা হস্তগত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু হয়নি। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রিগণ সেই ক্ষমতাকে আরও করায়ত্ত করেছেন। ফলে নেপালাধিপতিগণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন খেলার পুতুল। কার্যত তাঁদের রাজপ্রাসাদে বন্দী জীবন যাপন করতে হত। বর্তমান নৃপতির বেলায় এর একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। তাঁর চলাফেরা, কাজকর্ম সব কিছুর উপরেই ছিল প্রধান মন্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়। মহারাজাধিরাজের একজন বাঙালী শিক্ষক ছিলেন। একদিন তিনি নাকি মহারাজাধিরাজকে একখানা গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র পড়তে দিয়েছিলেন। পরের দিনই তাঁর চাকুরী খতম হয় প্রধান মন্ত্রীর আদেশে। রাজার আদেশ ও অনুরোধেও কোন ফল হয়নি। এমনি অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছিলেন মহারাজাধিরাজ। এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষা বর্তমান বিপ্লবের পথকে করেছে প্রশস্ততর। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে সাহায্য করেন ও উৎসাহ দেন রাণা বংশের (প্রধান মন্ত্রীর বংশের) কেউ কেউ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ। সর্বোপরি জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে রাজার পশ্চাতে।

কোন রাষ্ট্রের শক্তি একক কোন ব্যক্তি বা বংশের করতলগত হলে তাঁর বা তাঁদের অত্যাচারী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। নেপালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে নেপালের যে দুরবস্থা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর বংশের অর্থগৃধ্নুতার ফলে দেশে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়ন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, উদরপূর্তি করার অন্ন নেই, লজ্জা নিবারণ করার বস্ত্র নেই। দারুণ শীতে নেপালীরা যে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এর উপর রয়েছে 'রাস্তা শুল্ক', 'কুলি কর' প্রভৃতি ট্যাক্স। বুভুক্ষু, নিপীড়িত নেপালবাসী তাই বাঁচার আশায় গ্রহণ করে সৈনিকবৃত্তি, নয়ত দেশ ত্যাগ করে ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার আশায়।

সত্যি, স্বাধীন দেশে যে এমন দুঃশাসন থাকতে পারে তা কল্পনাতীত ব্যাপার। রাস্তা দিয়ে রাণার গাড়ী গেলে সবাইকে কুর্নিশ করতে হবে। ছুটে পালালে তার প্রাণদণ্ড নির্ঘাৎ। প্রধান মন্ত্রী বা রাজবংশের কেউ মারা গেলে রাজ্য শুদ্ধ সবাইকে মাথা মুড়ে অশৌচ পালন করতে হবে। এমনি আরও অপমানকর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে চালু। এই অপমান-রথ যাতে নির্বিবাদে চালান যায় তাই বোধ হয় শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে কর্তৃপক্ষ মন দেন না। হাসপাতাল আর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর ভ্রমণ বাবদ ব্যয় করা হয় ৮ লক্ষ টাকা। সাধারণ পাঠাগারকে কর্তৃপক্ষ চোখে চোখে রাখেন। সভাসমিতি করা বা বক্তৃতা করা নেপালে পরম্পরাগতভাবে নিষিদ্ধ। কেবল কি এই? নেপালবাসীদের আমোদ-প্রমোদের সুযোগও নিয়ন্ত্রিত। তারা সিনেমা থিয়েটার দেখতে পারে না। কারণ তাতে তাদের নৈতিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ আমোদ-আহ্লাদের জন্য রাণাদের রয়েছে বহু সিনেমা থিয়েটার। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ওর জন্যে। নিজেদের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে শত শত তরুণী নিয়ে হারেম নির্মাণ করে রাখেন তাঁরা। যেখানে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও নিপীড়ন এত ব্যাপক সেখানকার জনসাধারণ কেন যে আরও আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি তাই আশ্চর্য!

রাণাশাহীর বিরুদ্ধে প্রথম যিনি বিদ্রোহের চেষ্টা করেন তিনি হচ্ছেন চন্দ্র সিং নামে জনৈক নেপালী। ১৯২৭ সালে তিনি 'প্রচণ্ড গোর্খা' নামে একটি দল গঠন করেন। এ দল অবশ্য ভেঙে যায় কয়েক বৎসর পরে। তারপর ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয় 'প্রজা পরিষদ' নামে একটি গুপ্ত সমিতি। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শ্রীটংকপ্রসাদ উপাধ্যায়। এ দলের অনেকে প্রাণ দেন ফাঁসী কাঠে। তারপর ১৯৪৭ সালে শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার উদ্যোগে গঠিত হয় 'নেপালী ন্যাশনাল কংগ্রেস'। পরে নেপালী 'ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস দল' নামেও আর একটি দল গঠিত হয়। এ দু'দলের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় 'নেপালী কংগ্রেস'। এই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করে 'নেপালী প্রজা পঞ্চায়েৎ' নামে আর একটি রাজনৈতিক দল। নেপালী কংগ্রেসই আজ নেপালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারক ও বাহক। এই কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা।

নেপালের জনগণের মধ্যে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলে



নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমাতৃকা-প্রসাদ কৈরালা।

রাণার উদ্যত খড়্গ কংগ্রেস কর্মীদের উপর নেমে এল। জেল, জরিমানা, ফাঁসী—দমননীতির সব কয়টি অস্ত্রই প্রয়োগ করা হল। কিন্তু মুক্তির স্বাদ জেনেছে যাঁরা তাঁদের কি এমনি করে দমন করা চলে? কংগ্রেসী দল তাই ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠল। জন-সমর্থন বাড়ল। রাণাশাহীর অবসান, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন, শাসনতন্ত্রে প্রধান হিসাবে রাজার পদমর্যাদা স্থিরীকরণ—মোটামুটি এই দাবী নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করল।

নেপালের এই গণদাবীকে মহারাজাধিরাজ সমর্থন করেন। নেপালের রাজার এই মনোভাব প্রধান মন্ত্রী মহারাজা মোহন সমশের জঙ্গ



কংগ্রেস বাহিনীর অধিনায়ক মেঃ জেঃ সুবর্ণ সমশের জঙ্গ রাণা।

বাহাদুর রাণা পছন্দ করেন না। তিনি চান না যে রাজা এই গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এ নিয়ে এঁদের চলেছিল মন কষাকষি। প্রধান মন্ত্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন রাজার উপর। তাঁর 'আটপহরী' প্রহরীরা অষ্টপ্রহর জেগে থেকে পাহারা দিত রাজাকে। কিন্তু তাদের এমন কি রাণাকেও ফাঁকি দিয়ে রাজা আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতীয় দূতাবাসে। সেখানে থেকে চলে এসেছেন ভারতে।

রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর এই বিরোধ শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। আজ উভয়ে বোধ হয় উভয়ের পরম শত্রু। কিন্তু আশ্চর্যের কথা উভয়ের মধ্যে রয়েছে বৈবাহিক সম্বন্ধ। রাজার তিন বোনের বিয়ে হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর তিন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রথম বোনের বিয়ে হয়েছে জেঃ কাইজার সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার সঙ্গে। ইনি একজন সিনিয়র কমান্ডার জেনারেল। দ্বিতীয় ভগ্নীর বিয়ে হয়েছে ভারতস্থ নেপালী রাষ্ট্রদূত জেনারেল সিংহ সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার সঙ্গে। তৃতীয় বোনের বিয়ে হয়েছে জেনারেল কৃষ্ণ সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার সঙ্গে। এ বিয়ের আয়োজন করেছিলেন বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর পিতা মহারাজ চন্দ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা। বর্তমান রাজার পিতা মহা-রাজাধিরাজ পৃথ্বী বীর বিক্রম শাহ দেব এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এতে হয়ত দুইটি বংশের বহুদিনের বিরোধের অবসান হবে। কিন্তু তা হয়নি। বৈবাহিক সম্বন্ধও রাজাকে উপেক্ষা করার মনোভাব থেকে বর্তমান প্রধান মন্ত্রীকে রেহাই দেয়নি। তার উপর গণ-আন্দোলনের সমর্থক দেখে তিনি রাজার উপর আরও রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি জনসাধারণের মত নেপালের রাজাও চাইতেন রাণাশাহীর অবসান। তাঁকে এ ব্যাপারে সমর্থন করতেন রাণা বংশের অনেকে এবং আর্মি অফিসারদের কেউ কেউ। গণ-আন্দোলন সমর্থন করায় নেপালের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নির্যাতীত হন। ভূতপূর্ব কমান্ডার ইন চীফ ও পাল্‌পা জেলার গভর্নর ৭৫ বৎসর বয়স্ক জেনারেল সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণাকে জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক বলে বন্দী করা হয়। বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতা রুদ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুরের ছেলেদের বন্দী করার আদেশও জারী করা হয়। যাঁদের নির্বাসিত করা হয় তাঁর মধ্যে রয়েছেন ৬৫ বৎসর বয়স্ক হিরণ্য সমশের রাণা, মেঃ জেঃ সুবর্ণ সমশের রাণা ও মেঃ জেঃ মহাবীর সমশের রাণা। হিরণ্য সমশের ও তাঁর পুত্রের সম্পত্তি কাঠমাণ্ডু সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেন।

কংগ্রেসী আন্দোলন যখন জোরালো হয়ে ওঠে তখন ছোটখাট একটা সৈন্য বিদ্রোহ ঘটে। এতে প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গ সচেতন হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন সৈন্যদের মধ্যেও কংগ্রেসী কর্মীরা তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি নিপুণতার সঙ্গে রাণা বংশের প্রচ্ছন্ন আন্দোলনকারীদের ও সেনাবাহিনীর যে সব লোক জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক তাঁদের দমন করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

গত অক্টোবর মাসে বিশ্বজগৎ সবিস্ময়ে জানল যে প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজ-কর্মচারীদের হত্যা করার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এ উপলক্ষে অনেক ধরপাকড় হল। লোকে বলে বিরোধীদলকে উচ্ছেদ করার জন্যে এটা রাণারই অপকীর্তি। তিনি বহু উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীকে কৌশলে বন্দী করলেন। সেনাবাহিনীতে অনেক রদবদল করলেন।

শোনা যায় প্রধান মন্ত্রী ভেবেছিলেন রাজাকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করবেন এবং যুবরাজকে রাজা ঘোষণা করে স্বীয় কর্তৃত্ব ও প্রভাব বজায় রাখবেন। কিন্তু রাজাও চালাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর ফাঁদে পা দেননি। যুবরাজ ও এক পৌত্রকে সঙ্গে করে তিনি নিরাপদে ভারতে চলে এসেছেন। অবশ্য একটি পৌত্রকে প্রধান মন্ত্রী আটকিয়ে রাখতে পেরেছেন এবং তাঁকেই রাজা ঘোষণা করে



নেপালী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমহেন্দ্র বিক্রম শাহ।

শাসনকার্য চালাচ্ছেন। এদিকে মহারাজাধিরাজ ভারতে চলে আসা মাত্র নেপাল কংগ্রেসের সেনা-বাহিনী হামলা চালিয়েছে রাণা সরকারের বিরুদ্ধে। এতে সেনাপতিত্ব করছেন মেজর জেনারেল সুবর্ণ সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা। প্রথম ধাক্কাতেই তাঁরা দখল করে নিয়েছিলেন নেপালের অন্যতম নগরী বীরগঞ্জ। বীরগঞ্জের আক্রমণের অধিনায়কত্ব করেন ত্রিভূম মল্ল। যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন। তিনি আজ শহীদ। গণবাহিনীকে প্রথম জয়ের গৌরব দান তিনি করে গেছেন।

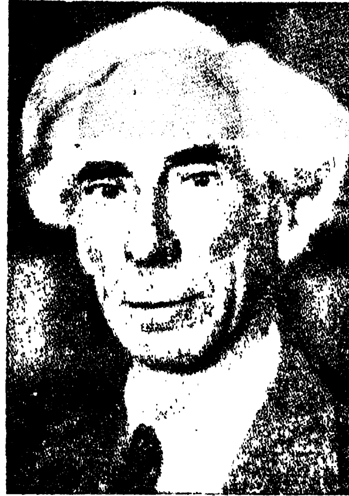
সংবাদ এসেছে কংগ্রেস সেনানীরা বীরগঞ্জ পরিত্যাগ করেছে। এটা ভাগ্যবিপর্যয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই-ই শেষ নয়। শেষের আরম্ভ মাত্র।

বার্ট্রান্ড রাসেল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

সাহিত্যের জন্য চলতি বছরের নোবেল প্রাইজ বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে দেওয়া হয়েছে। খবর শুনে আনন্দ হয়, গুণী যথাযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তবু সংগে সংগেই মনটা বিষিয়েও ওঠে,—এত দেরীতে! রাসেলের বয়স ৭৮ বৎসর। গুণগ্রাহী যাঁরা তাকে জানেন তাঁদের অধিকাংশই মনে করবেন, গুণের স্বীকৃতিসূচক এই যে নোবেল প্রাইজ, এ রাসেলের মত মনীষীর আরও আগে পাওয়া উচিত ছিল; এতদিন যে এ পুরস্কার তিনি পান নি তাতে তাঁর অগৌরব হয়নি, বিচারকের অন্তরের দৈন্যই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ বুঝতে অবশ্য কারও অসুবিধা হবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজের যারা কর্ণধার, সংস্কারান্ধ মুষ্টিমেয় সেই বিত্তশালীদের মুখরোচক কথা রাসেল কোনদিন বলতে পারেন নি ব'লেই তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে এত দেরী হল। বার্ণার্ড শ'র বেলাতেও এই-ই হয়েছিল,—রাসেলের বেলায় দেরী না হয় আরও একটু বেশী হয়েছে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল গুণী লোক, আধুনিক যুগের চিন্তানায়কদের অন্যতম। ঠিক সুপুরুষ হয়তো তিনি নন। তাঁর শীর্ণ দেহ, পলিত কেশ ও লোলচর্মে কালের অসংখ্য পদচিহ্ন আজকাল সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা দেখা যায়। তবু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয় তাঁর ছবির দিকে। তার দৈহিক কাঠামোর দৈর্ঘ্য ও ঋজুতার পূর্ণাহুতিপুষ্ট হোমাগ্নিশিখার আভাস পাওয়া যায়; তার শীর্ণ মুখের প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর উদ্যত খড়্গের মত নাক আর বিশাল উন্নত ললাটে ধী আর তেজের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়; তাঁর বড় বড় চোখ দুটির দিকে চাইলেই মনে হয় যে, তারা অনায়াসে পৃথিবী পার হয়ে গ্রহনক্ষত্রের পরিধি অতিক্রম করে অজানার রাজ্যে অরূপ রতনকে প্রত্যক্ষ দেখতে পারে। অসাধারণ রাসেলের রূপ, আর তেমনি অসাধারণ তাঁর প্রতিভা ও জীবন। জীবনে গতানুগতিকতাকে তিনি উদ্ধত উপেক্ষায় পরিহার ক'রে চলেছেন; তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রেও অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও দুর্ধর্ষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে একমাত্র ক্ষুরধার বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে বিচারের দুর্গম পথে সত্যের সন্ধানে রাসেলের অভিসারযাত্রার কাহিনী স্মরণ করলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয়। সত্যানুসন্ধিৎসার আন্তরিকতায়, গবেষণার নিষ্ঠা ও অনন্যচিত্ততায়, চিন্তার সাহসিকতায়, যুক্তির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ও আবিষ্কারের মৌলিকতায় এযুগে রাসেলের সমকক্ষ খুব বেশী লোক নেই। বাগ্মী, লেখক, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তানায়ক, এমনকি, কর্মী হিসাবেও বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে এযুগের প্রধানদের অন্যতম, ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখককে সে কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে হবে।



নোবেল-লরিয়েট বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শিক্ষিত সমাজে রাসেল অপরিচিত নন; এমনকি, এই বাঙলা দেশেও তিনি অতি পরিচিতদের অন্যতম। তবে জগতের প্রত্যেকটি অসাধারণ মানুষের মতই তাঁর সমসাময়িকদের কাছে সুবিচারের চেয়ে তিনি অবিচারই পেয়েছেন বেশী, আর তা-ও প্রতিপক্ষীয়দের কাছ থেকেই কেবল নয়, ভক্তদের কাছ থেকেও। তাঁর নিজের দেশে অনেকদিন একরকম অপাংক্তেয় হয়েই থাকতে হয়েছে তাঁকে। তার কতকটা তাঁর মতের জন্য, কতকটা আচরণের। যা গৌণ তা তাঁর প্রতিপক্ষীয়েরা হয় ভ্রম নয় তো ষড়যন্ত্র ক'রে মুখ্যের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে সমাজে ওঁকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছে; পচা ঘায়ের সন্ধান পেলেই একশ্রেণীর মাছি যেমন ভনভন করতে করতে সদলবলে সেখানে ছুটে আসে, তেমনি রক্ষণশীল সমাজের সমালোচকের দল কল্পলোকের স্যামসন, ওথেলো ও জ্যাঁ ক্রিস্তফ এবং বাস্তব জগতের মিলটন, শেলী, বায়রণ প্রভৃতির জীবনকাহিনীকে উপেক্ষা করে রাসেলের পারিবারিক জীবনের দু'একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছে, তাঁর সমাজদর্শন ও জীবনদর্শনের অপব্যাখ্যা করেছে। এর চেয়েও মর্মান্তিক অবিচার রাসেলকে করেছে আমাদের দেশের তরুণ রাসেলভক্তদের বিরাট একটি দল যারা অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁর একখানি মাত্র বই (Marriage and Morals—বিবাহ ও নীতি-ধর্ম) পড়ে ওর মধ্যে যৌবনের সহজ অসংযমের প্রশ্রয় আছে মনে ক'রে রাসেলকে ব্যভিচার ও উচ্ছৃংখলতার প্রচারক ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছে, যেমন করেছে তারা ফ্রয়েডকে নিয়ে। দুঃখ ও লজ্জার সংগে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে কতবড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, তা এইসব অসংযত ও অর্ধশিক্ষিত অন্ধ ভক্তদের অপপ্রচারের ফলে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। অথচ একথা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট সত্য যে, নরনারীর যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে রাসেলের যে মত তা ব্যভিচার বা উচ্ছৃংখলতার পরিপোষক তো নয়ই, অধিকন্তু তা রাসেলের প্রবর্তিত সমগ্র সমাজ ও জীবনদর্শনের এক অতি নগণ্য ও গৌণ অংশ মাত্র।

১৮৭২ খৃস্টাব্দের ১৮ই মে এক অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারে রাসেলের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন লর্ডবংশ-সম্ভূত। দুঃখ তাকে পেতে হয়নি। কিন্তু মাত্র তিন বৎসর যখন তাঁর বয়স তখনই তাঁর পিতামাতা মারা যান। তাঁর পিতা অভিজাত-বংশীয় হলেও উদারপন্থী ছিলেন এবং পুত্রকে প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের আওতার বাইরে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন; ব'লে গিয়েছিলেন যে, পুত্রকে যেন গোঁড়া ধর্মমত অনুসারে ও রক্ষণশীল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া না হয়। কিন্তু রাসেলের ঠাকুরমা সে নির্দেশ মানেন নি। রাসেলকে তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং ওরই তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাছে প্রচলিত বিশ্বাস ও নিয়মকানুনের বাঁধা পথেই রাসেল প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। তথাপি উত্তর জীবনে ঠাকুরমার মনের মত তিনি হননি, হয়েছেন সংশয়বাদী, যুক্তিবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক,—এত বেশী সংস্কার-মুক্ত যে কিছুই স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লে মেনে নিতে রাজী নন তিনি, কোন তত্ত্বকেই যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই না ক'রে গ্রহণ করেন না। পরবর্তী জীবনে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রসংগে এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, মানুষের বিশ্বাস ও

আচরণ তার পুঁথিপড়া বিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, ওদের উৎস তার সহজ প্রবৃত্তি (temperament)। কথাটা হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম ও জন্মান্তরবাদের মত শোনায়, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত যুক্তিবাদীর মুখ থেকে বের হয়েছে ভেবে আশ্চর্যও হয়তো হতে হয়। তবু এটা সত্য যে, একথা তিনি বলেছেন এবং তাঁর নিজের জীবনই এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে কতকটা সাক্ষ্য দিচ্ছে নিশ্চয়ই।

যাহোক, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভা, রূপকে অতিক্রম ক'রে বিমূর্তকে অনুধাবন করবার অপরিসীম মানসিক শক্তি। স্বভাবতই গণিত ও দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি এবং যথাসময়ে দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হন। এরকম সময়েই তাঁর চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে। সেটা আভিজাত্যের প্রতি সহজ বিতৃষ্ণা, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা ও অর্থের প্রতি বিরাগ। উত্তর জীবনে আভিজাত্য-সূচক পারিবারিক পদবী তিনি স্বেচ্ছায় এবং সংকল্প ক'রে বর্জন করেছেন। আর্ল বা লর্ড পদবী তিনি ব্যবহার করেন না। ও নামে কেউ তাঁকে চেনেও না। হয়তো জগতের জনসাধারণের কাছে তিনি সাধারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেল। অন্য দশ জন সাধারণ বুদ্ধিজীবীর মত তিনিও জীবিকানির্বাহের জন্য নিয়মিতভাবে কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রথম জীবনে, মাত্র ২২ বৎসর বয়সেই পররাষ্ট্র বিভাগের অধীনে প্যারীস্থ বৃটিশ রাজদূতাবাসে সহকারীর চাকরি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বেশী দিন সে কাজ করেন নি। প্যারী থেকে প্রায়ই তিনি জার্মানীতে যাতায়াত করতেন। বার্লিনে জার্মান সোস্যালিস্ট ডিমক্রেটিক পার্টির সংস্পর্শে এসে তিনি সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে চিন্তা ও পড়াশুনো আরম্ভ করেন এবং ওকেই অবলম্বন ক'রে তাঁর প্রতিভার অপর বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বের অপর স্বরূপ বিকাশলাভ করতে থাকে। কিন্তু তখনও তিনি প্রধানত সত্যানুসন্ধী জ্ঞানসাধক,—বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশী। সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে এক নির্জন পল্লীতে বাসা নিয়ে তিনি জ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯০০ খৃস্টাব্দে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক এ্যালফ্রেড হোয়াইটহেডকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্যারীতে গণিতবিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং এর ফলে গণিত সম্বন্ধে তাঁর সহজ অনুসন্ধিৎসা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে দুই মনীষীর সমবেত গবেষণার ফল এবং রাসেলের প্রথম যুগান্তকারী গ্রন্থ The Principles of Mathematics (গণিতের মূলনীতি) প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দে বের হয় তাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ Principia Mathematica ঐ বৎসরেই তাঁর সহজ প্রতিভা ও মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি পান তিনি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাদরে তাঁকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাসেলের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চিন্তাশীল জ্ঞানসাধক হিসাবে জীবন ও সমাজসম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মানবজীবনের সহজ ও সুন্দর বিকাশের জন্য অপরিহার্য ব'লে যেসব নীতি তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী মহাসমরের মধ্যে তিনি সে সকলের উদ্ধত অস্বীকার প্রত্যক্ষ করেন। আর নিজের অন্তরে অনুভব করেন জ্ঞানসাধকের নির্বিকার, বৈরাগী জীবনের সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা ও স্থূলে অশোভনতা। ইতিহাসের দেবতা যেন নির্মম আকর্ষণে রাসেলকে সরস্বতীর মন্দির থেকে টেনে এনে সৈনিকের উর্দি পরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। রাসেল সেই যে সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, সে সংগ্রাম তাঁর আজও শেষ হয়নি।

সাম্যবাদের মূলনীতিগুলি আগেই রাসেলের মনকে মুগ্ধ করেছিল; শ্রেণীহীন, শোষণহীন, পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক অভিনব এক সমাজের স্বপ্নের অঞ্জন এঁকে দিয়েছিল তাঁর দুটি চোখে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তাই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করতেই রাসেল সক্রিয়ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। শাস্তি হিসাবে তাঁর ১০০ পাউণ্ড জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন তিনি। তখন তাঁর বইগুলি নিলামে বিক্রয় ক'রে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ রাসেলের "দেশদ্রোহীতায়" ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অধ্যাপক নিযুক্ত ক'রে নিমন্ত্রণ পাঠালেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য ইংলণ্ডেই কয়েকটি বক্তৃতা দেবার আয়োজন করেন তিনি, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ তা-ও বন্ধ করে দেন। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শাপে বর হয় তাঁর ঐ শাস্তি—জেলে ব'সে তিনি তাঁর অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ Introduction to Mathematical Philosophy (গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা) রচনা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর রাসেলের পরিব্রাজক জীবনের আরম্ভ হয়। আর ওরই সঙ্গে চলতে থাকে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ধনতন্ত্র, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্বার অভিযান। তিনি একাধিকবার আমেরিকায় যান। বলশেভিক বিদ্রোহের পর সাম্যবাদী রুশিয়ার অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার জন্য ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তিনি রুশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯২০ খৃস্টাব্দের শরৎকালে চীনে যান পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে। পরবর্তী বসন্তকালে সেখানেই গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েন তিনি,—একবার তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে গুজবও র'টে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। তারপর জগতের অনেক জায়গায় গিয়েছেন তিনি। এই সেদিন (গত আগস্ট মাসে) প্রাচ্যের অনেক দেশ পরিভ্রমণ শেষ ক'রে বিলাতে ফিরবার পথে ভারতবর্ষও তিনি দেখে গিয়েছেন। দমদম বিমান ঘাঁটিতে বিশ্রাম করতে করতে সাংবাদিকদিগের সঙ্গে আলোচনায় প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মরণকামড়ের নিন্দা ক'রে এবং জওহরলাল নেহরু তথা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে সেদিন যেসব মন্তব্য তিনি করেছিলেন তা আজ অনেকেরই মনে পড়বে হয়তো।

সুদীর্ঘ জীবনে রাসেল অনেক বই লিখেছেন। ওদের কয়েকটি মৌলিক রচনা, কয়েকটি পণ্ডিতের পাঠ্য দুর্বোধ্য সূত্রসংগ্রহ বা টিকা এবং অধিকাংশই দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে সারগর্ভ কিন্তু সহজবোধ্য রচনা। প্রত্যেক গ্রন্থেই রাসেলের অসাধারণ প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মৌলিক চিন্তার ছাপ আঁকা রয়েছে। দু'এক পাতা পড়লেই বোঝা যায় যে, এ রাসেলের নিজস্ব জিনিস, আর কারও কলম থেকে এ লেখা বের হতে পারে না। তাঁর রচনাশৈলীও তাঁর নিজস্ব। ওরই গুণে দুর্বোধ্য গণিত ও দর্শনের আলোচনাও তাঁর লেখায় উপন্যাসের মতই সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। তবে উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে Philosophy of Leibniz—লাইবনিজের দর্শন, (১৯০০); Principles of Mathematics—গণিতের মূলনীতি, (১৯০৩); Problems of Philosophy—দর্শনের সমস্যা; (১৯১১); Principia Mathematica (অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সঙ্গে সহযোগিতায় রচিত, (১৯১০) Our Knowledge of the External World as a Field for Scintific Method in Philosophy—বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের. জ্ঞান ও দর্শনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, (১৯১৪); Principles of Social Reconstruction—সমাজের পুন-

গঠনের মূলনীতি, (১৯১৭); Mysticism and Logic—অতীন্দ্রিয়বাদ ও ন্যায়শাস্ত্র, (১৯১৮); Roads to Freedom—স্বাধীনতার পথ, (১৯১৮); The Practice and Theory of Bolshevism—বলসেভিজম, আদর্শ ও বাস্তব, (১৯২০); The Problem of China—মহাচীনের সমস্যা, (১৯২২); The A. B. C. of Relativity—আপেক্ষিকবাদের অ,আ, ক,খ, (১৯২৫); Sceptical Essays —সংশয়বাদ সম্বন্ধীয় রচনাবলী, (১৯২৮); The Conquest of Happiness—সুখী হবার পথ, (১৯৩০); Education and Social Order—শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা, (১৯৩২); Human Knowledge, Its scope and Limit—মানুষের জ্ঞানের পরিধি ও সীমানা, (১৯৪৮); এবং Authority and the Individual—শাসন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, (১৯৪৯)। কেবল গ্রন্থগুলির নাম থেকেই বোঝা যায়, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়মুখিতা নিয়ে কত বিস্তৃত ও বিচিত্র ক্ষেত্রে, কত দুর্গম অন্ধকার গহ্বরে মৃতসঞ্জীবন সত্যের সন্ধান তিনি করেছেন।

উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য রাসেল কর্মের সাধনাও করেছেন। মানুষকে নূতন ক'রে গড়তে না পারলে সমাজের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা সার্থক হবে না, এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে রাসেল মানুষ গড়ার শিল্প হিসাবে শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণার ফল তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী রাসেল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ অভিনব এক পদ্ধতিতে বালক-বালিকাকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। তাঁর মতে অতি শৈশবেই সে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত। নিজের মতকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি স্ত্রী ডোরা রাসেলের সাহায্যে নিজেই এক শিশুবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২৭)। কিন্তু তাঁর মত বৈপ্লবিক, পদ্ধতি অভিনব। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সমাজ তাঁর উদ্যোগ দেখে আঁৎকে উঠেছিল। রাষ্ট্রের কর্ণধার ও দেশের ধনীরা তাঁকে সাহায্য করেনি। ওদের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও করেননি তিনি। সাহায্য নিলেই সরকার বা বড় লোকেরা তাঁর বিদ্যালয়ের উপর কর্তৃত্ব করতে চাইবে, তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন দাবী করবে এবং ফলে তাঁর অত সাধ ও সাধনার ধন শিক্ষায়তনটি প্রাণ হারিয়ে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের হীন প্রতিবিম্বের মত হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। "বড়লোকেরা ভাল জিনিসও তো চাইতে পারে!" একবার দিলীপকুমার রায় ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে রাসেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। না, রাসেল এক মুহূর্তও দ্বিধা না ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোকেরা যা চায় তা সব ক্ষেত্রে ও সব সময়েই খারাপ হবে।" সম্পূর্ণভাবে নিজের বিশ্বাস, আদর্শ, পদ্ধতি ও শক্তি অনুসারে শিশুবিদ্যালয় চালাবার চেষ্টা রাসেলের সার্থক হয়নি। আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক ও উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রের অভাবে অল্প কিছুদিন পরেই বিদ্যালয় বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। শিক্ষা সম্পর্কে রাসেলের চেষ্টা ও পরীক্ষা স্বভাবতই আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর স্বপ্ন ও উদ্যমকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যা হোক, বিশ্বের দরবারে রাসেলের যে গৌরবের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে তা শিক্ষাবিদ হিসাবে নয়, দার্শনিক হিসাবে। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অমূল্য,—শঙ্করাচার্য, প্লেটো, স্পিনোজা, বার্গশ,˚ আইনস্টাইনের পার্শ্বে তাঁর স্থান। তাঁর গবেষণার পদ্ধতি যেমন তাঁর নিজস্ব, তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহও তেমনি মৌলিক। দর্শনের ভাণ্ডারে রাসেল যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন তা মহাপণ্ডিতদের কাছেও সহজবোধ্য নয়। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সংক্ষেপে নির্ভুলভাবে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নিরর্থক। শুধু আংশিকভাবে প্রকাশ করা যায় তাঁর বিচারের পদ্ধতি; তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের সামান্য একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র। রাসেল গণিতের বিশেষজ্ঞ; স্বভাবতই তিনি নৈয়ায়িক। তাঁর পথ যুক্তির পথ; তাঁর লক্ষ্য বিশুদ্ধ জ্ঞান। উভয়েরই গুণগত সাদৃশ্য আছে, তাই একের সাহায্যে অপরকে পাওয়া যায়। ব্যক্তি বা বস্তু অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়, চলার পথের বাহনও নয়। যা মূর্ত, তার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। এ্যারিস্টটলের ন্যায়কে অতিক্রম ক'রে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। অঙ্ক শাস্ত্রের ১,২, ৩এর গণনায় তার সন্তুষ্টি নেই, বীজগণিতের ক, খ, গ, ঘ তাঁর কাছে অপরিহার্য। বস্তু নয়, সংখ্যা নয়,—তিনি চান প্রতীক। প্রতিজ্ঞা তাঁর মতে বস্তুকে প্রকাশ করবে না, প্রকাশ করবে সম্বন্ধকে, আর তা-ও হবে সার্বিক সম্বন্ধ। যদি সব ক'ই খ হয় এবং ভ যদি হয় ক, তাহলে ভ আর খ এক,—এই হ'ল রাসেলের নব্য ন্যায়। ক প্রতীকের যা-ই অর্থ হউক না কেন এবং সে বস্তু বা ভাবের যতই পরিবর্তন হউক না কেন, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য তাতে অনুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হবে না। সার্বিকের জগৎ সত্তার জগৎ,—রাসেল লিখেছেন তাঁর Mysticism and Logic নামক গ্রন্থে,—সত্তার জগৎ অপরিবর্তনীয়, দৃঢ়, নির্ভুল; গণিতবিশারদ, নৈয়ায়িক, আধিবিদ্যক চিন্তাধারার প্রবর্তক এবং জীবনের চেয়েও পূর্ণতাকে যারা বেশী ভালবাসে তাদের সকলের বাঞ্ছনীয় এই সত্তার জগৎ —এই world of being. দর্শনের আগ্রহসূচক বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে সমগ্র দর্শনকে গণিতের কাঠামোর মধ্যে ফেলা, দর্শনকে গণিতে পরিণত করা—এই হয়েছে রাসেলের আজীবনের সাধনা। তাই উইল ডুরাণ্ট রাসেলকে আধুনিক পাইথাগোরাস ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই বিশিষ্ট গাণিতিক পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে এবং প্রচলিত সকল দার্শনিক মতকে বিচার ক'রে রাসেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাকে খুব সম্ভব এইভাবে প্রকাশ করা চলে,—জড় ও চৈতন্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই; পার্থক্য যা আছে তা গঠনের, উপাদানের নয়।

বস্তুবাদী বা জড়বাদী (Materialist) বলতে যা বোঝা যায়, রাসেল তা নন। Idealist বা নিছক ভাববাদীও তিনি নন। জগৎকে মায়া ব'লে তিনি উড়িয়ে দেন না, জড়ও মনে করেন না। অনেকে তাঁকে বাস্তববাদী (Realist) ব'লে বর্ণনা করেন, কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁর কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করলে তাঁকে বলতে হয় অদ্বৈতবাদী। বস্তুতঃ রাসেলের একাধিক ভাষ্যকার তাঁকে নির্গুণ অদ্বৈতবাদের (Natural Monism) প্রবর্তক ব'লে বর্ণনা করেছেন। কথাটার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত মতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পার্থক্য যা তা মৌলিক। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম আর রাসেলের মৌলিক চৈতন্য এক নয়। এর কারণ অনেক। তবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

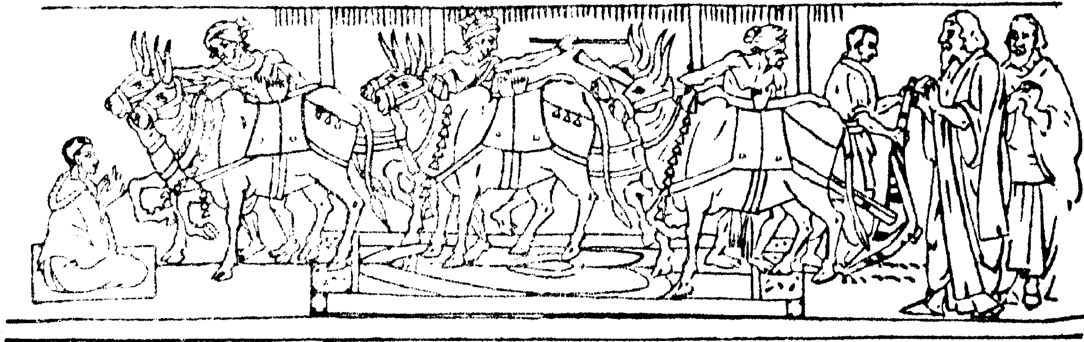
সমগ্রভাবে বিচার করলে রাসেলকে সংশয়বাদী বলতেই বেশী ইচ্ছা হয়। কি যে মানুষ জানতে পারে (Epistemology) সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি দার্শনিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সে সংশয়ের নিরসন এখনও হয়নি, বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার উপসংহারে স্পষ্ট ভাষায় তিনি স্বীকার করেছেন, "শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যা আমরা জানতে পেরেছি তা অতি নগণ্য,—the final conclusion is that we know very little." এ রাসেলের মত মনীষীরই উপযুক্ত কথা। কিন্তু এ কথা যিনি বলেন তাঁকে সংশয়বাদী বলাই হয়তো সঙ্গত।

হয়তো সংশয়প্রবণতাই রাসেলের স্বভাব, —তাঁর মানসিক প্রকৃতি বা যাকে তিনি বলেন temperament তার প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সহজ, শান্ত, গতানুগতিক জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর যে তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আপোষহীন বিদ্রোহ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ধারাও লিখিত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে, হয়তো ওর

মূল উৎসও তাঁর স্বভাবের সংশয়প্রবণতা। হয়তো সেইজন্যই কোনদিনই তাঁর চিন্তায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি, তাঁর অশান্ত ও অসন্তুষ্ট আত্মা পরম নির্ভরে কোন চরম প্রাপ্তিকে অবলম্বন করে শান্তও হতে পারে নি। ভারতীয় ঋষির মত উদাত্তকণ্ঠে কোনদিনই বলতে পারেন নি তিনি যে, তাঁর সকল সংশয়ের নিরসন হয়েছে, চরম ও পরম সত্যকে তিনি নিঃসংশয়ে জানতে পেরেছেন। আধিবিদ্যক দর্শনের (Metaphysics) ক্ষেত্রে যেমন, সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি রাসেল সকল সূত্রকে অস্বীকার ক'রে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেও উপসংহারে নিঃসংশয় স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারেন নি। আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তিনি নির্মম হস্তে আঘাত করেছেন, যীশু খৃষ্টকে বিদ্রূপ করেছেন, ঈশ্বরকে করেছেন অস্বীকার। অথচ বিজ্ঞান ও দর্শনের বিস্তৃত আলোচনার উপসংহারে নির্গুণ অদ্বৈতকে স্বীকার না ক'রে পারেন নি। অতীন্দ্রিয়বাদকে (Mysticism) তাঁর একাধিক রচনায় নির্মমভাবে তিনি সমালোচনা করেছেন, স্বজ্ঞাকে (Intuition) নিষ্ঠুর হস্তে স্থানচ্যুত ক'রে বুদ্ধিকে (Reason) শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন তিনি। তথাপি মাঝে মাঝে এমন সব কথা তিনি বলেছেন, এমন আচরণ করেছেন যাতে উইল ডুরাণ্ট এবং রবীন্দ্রনাথের মত লোককেও বলতে হয়েছে যে অন্তরে অন্তরে রাসেল চিরদিনই অতীন্দ্রিয়-বাদী,—হয়তো তাঁর বাস্তবতাবাদ, তাঁর বিজ্ঞান ভক্তি কোন কোন সাধু-পুরুষের মত ভান বা ভেকমাত্র। অতএব বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবতাবাদী হয়েও বিবর্তনবাদের অন্যতম মূল-নীতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন; বিবর্তনের গতি যে অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণতির, নীচু থেকে উপরের দিকে, তা অস্বীকার করতে চেয়েছেন; এক জায়গায় বলেই ফেলেছেন তিনি, নিম্নতম শ্রেণীর জীব পরিণত হতে হতে দার্শনিক হয়েছে এ কথা যে বলে সে তো ঐ জীব নয়, সে যে দার্শনিক; সুতরাং বিশ্বাস কি তার কথায়? সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে রাসেলের যে মতবাদ তাকে সমগ্রভাবে নিয়ে বিশ্লেষণ করলেও ওর মধ্যে রাসেলচরিত্রের সংশয়প্রবণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। দারিদ্র্য, সংঘাত, যুদ্ধ প্রভৃতির মূল কারণ তাঁর মতে সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার। প্রুধঁর (Proudhan) সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুর মিলিয়ে তিনিও বলেছেন যে, সম্পত্তিমাত্রই (Private property) চোরাই মাল। একাধিক রচনায় তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ দাবী করেছেন, চেয়েছেন বৈষম্যের অবসান; উদাত্তকণ্ঠে সাম্যবাদের জয়গান গেয়ে নিজের দেশে "লাল" বিপ্লবী সন্দেহে অপাংক্তেয় হয়েছেন তিনি। অথচ বলশেভিক বা কম্যুনিস্ট তিনি হতে পারেন নি,—অন্ততঃ তাদের দলে ভিড়তে পারেন নি নিশ্চয়ই। রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় গিয়ে স্বচক্ষে যা তিনি দেখে এসেছিলেন, বিশেষ ক'রে ব্যক্তির উপর সর্বাত্মক রাষ্ট্রের (Totalitarian State) অপ্রতিহত কর্তৃত্ব, তাতেই তাঁর মন বাস্তবিক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠেছিল। ফিরে এসেই রুশিয়া ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে যা তিনি লিখেছিলেন তা কম্যুনিস্ট তথা সাধারণভাবে বামপন্থীদের প্রীতিপ্রদ হয়নি তার সর্বশেষ গ্রন্থে (Authority and the Individual) কম্যুনিজমের মূলনীতি ও বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের আচরণ ও বিধান-সমূহের বিরুদ্ধে আরও উগ্র মত প্রকাশ করেছেন তিনি, বার বার নানা যুক্তি প্রয়োগ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, যে ব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না, যার ফলে সমষ্টির চাপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত পিষ্ট হতে হতে শেষে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, সে ব্যবস্থা মানবের তথা সমাজের কল্যাণকর হতে পারে না। ফলে কম্যুনিস্টদের চোখে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। ইতির দিকে যে সমাবাদ তিনি প্রচার করেছেন (Guild Socialism) তার অন্যতম মূলনীতি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এর স্বপক্ষে যুক্তি যতই থাকুক না কেন এবং রাসেল প্রভৃত পাণ্ডিত্য ও গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তার প্রয়োগ করেছেন—আধুনিক জগতের উল্লেখযোগ্য কোন সাম্যবাদী দলই এর সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন না,—এ ব্যবস্থাকে যে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা যেতে পারে তেমন বিশ্বাসও অধিকাংশ বামপন্থীরই নেই। সুতরাং রাসেল ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন, সাম্যবাদী সমাজেও প্রায় তেমনই অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছেন।

আসল কথা, রাসেল কোন দল বা সম্প্রদায়ের লোক নন, প্রচলিত কোন বাদ বা পদ্ধতিকে সমর্থন করার দায় তার নেই। প্রখর ব্যক্তিত্বশালী রাসেল ব্যক্তিত্বকেই সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সকল প্রকার মতবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করবার জন্যই আজীবন লেখনী চালনা ক'রে এসেছেন। নিতান্তই কথায় তাঁকে প্রকাশ করতে হলে বলতে হয় যে, তিনি মানবতাবাদী বা humanist—আমাদের দেশের যে সাধক জীবনের এক পরম মুহূর্তে গেয়ে উঠেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,' সেই চণ্ডীদাসের সগোত্রীয় তিনি। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা বোধ করি এই যে, ঈশ্বর নেই, কিন্তু মানুষ তাকে সৃষ্টি করবে। তাঁর রচনায় বুদ্ধির বড়াই ও যুক্তির প্রদর্শনী যতই থাকুক না কেন, ওর নীচে ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে অহেতুক মানবপ্রীতির কুলনাদিনী স্রোতস্বিনী। মহৎ লোক তিনি। বার্ণার্ড শ' তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, অসাধারণ প্রতিভায় দীপ্ত তাঁর মন; উইল ডুরাণ্ট বলেছেন, যীশু-খৃষ্টের প্রকৃত শিষ্য তিনি; রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে তাঁকে কবি ও অতীন্দ্রিয়বাদী ব'লে স্বীকার করেছেন; রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন যে, তাঁর মতবাদকে অস্বীকার ক'রেও তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়।

বহু বিলম্বে হলেও এ হেন গুণীর গুণের স্বীকৃতিতে বিশ্বের সুধীসমাজ আনন্দিত হবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

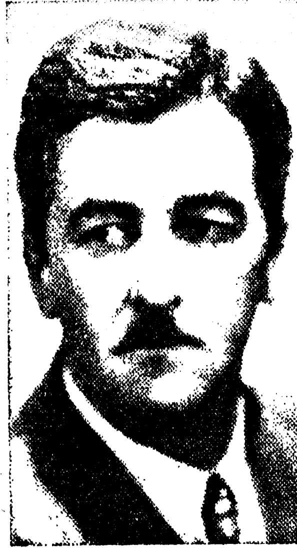


নোবেল-লরিয়েট ফকনার

শ্রীবিমল ঘোষ

১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডপ্রবাসী মার্কিন কবি টমাস স্টার্ন ইলিয়ট সাহিত্যের জন্য সুইডিস একাডেমীর নোবেল পুরস্কার পান, কিন্তু তারপর ১৯৪৯ সালে এই পুরস্কার কোন সাহিত্যিককেই দেওয়া হয় নি, তার কারণ সুইডিস একাডেমীতে সাহিত্যের পুরস্কারটির জন্য যে সমস্ত প্রার্থী সৃষ্টি ওনাম উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তাঁরা কেউই সুইডিস একাডেমীর সদস্য-পরীক্ষকদের বিচারে পুরস্কারের যোগ্যতার মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন নি। যাই হোক্, সম্প্রতি একই সংগে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজেতাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং যথাক্রমে মার্কিন উপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনার ও বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ও পণ্ডিত বার্ট্রাণ্ড রাসেল ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম অল্পবিস্তর পৃথিবীর সব দেশেই কেউ না কেউ জানেন, এদেশে আমরা অনেকেই তাঁর নানা রচনা ও গ্রন্থের সংগে পরিচিত। রাসেলের অভিনব জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা ও বৈপ্লবিক সমাজ-বিবর্তনের সমর্থনে তাঁর যুক্তি ও চিন্তাধারার স্বকীয়তা রাসেলকে খ্যাতি ও সম্মানের আসনে বহু আগেই অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ভাষণ ও লিখন-ভংগীর প্রভাবও আধুনিককালের মননশীলতার পথে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের নোবেল পুরস্কার বিজেতা হিসাবে উইলিয়াম ফকনারের নাম ঘোষিত হতে দেখে এদেশের ও অন্য অনেক দেশের সাধারণ সাহিত্যানুরাগীর দল সচকিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে যে, সেটা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছি, কারণ উইলিয়াম ফকনার তাঁর নিজের দেশ আমেরিকায় আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি ও সমাদর পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার বাইরের দেশগুলির পাঠক-সমাজে তত বেশী পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। তবে যে দু'চারজন বিদেশী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক আমেরিকার সাহিত্য-জগতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মত আপটন সিনক্লেয়ার, সিনক্লেয়ার লুইস, হেমিংওয়ে, ই এম ফর্স্টার প্রমুখ আমেরিকান সাহিত্যিকদের রচনা পাঠেই ক্ষান্ত না থেকে আমেরিকান সাহিত্যে নূতন প্রতিভার সন্ধান করেছেন, তাঁরাই ফকনারের প্রতিভার দ্যুতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে, একথা অকপটেই বলা যায়। কাজেই তাঁর এই নোবেল পুরস্কার লাভের সংবাদে কেউ যেন একথা না ভাবেন যে, একজন অজ্ঞাতকুলশীল সাধারণ লেখকের গলায় বিশ্ব-সাহিত্যের জয়-



নোবেল-লরিয়েট ফক্‌নার

মাল্য দুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা রসজ্ঞ ও সাহিত্য-দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরা ফকনারের বিশ্ব-বোধজাত উদার দৃষ্টি, নিপীড়িত মানবতার প্রতি মমত্ব ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয়ে তাঁকে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বলেই স্বীকার করবেন।

ফকনারের সাহিত্যের সংগে আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যের এক বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। তিনি আমেরিকান সাহিত্যের অসংলগ্ন আভিজাত্যকে এবং কপট মানবদরদী ভাষা ও ভংগীকে শুধু পরিহারই করেন নি, তাকে নির্মম আঘাত করে আমেরিকান সাহিত্যে সেখানকার জীবনের অপরদিকটিকেও উদ্ঘাটিত করে সত্যসন্ধ জীবন-শিল্পীর পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে, সোভিয়েট সাহিত্যের মত উগ্র প্রোপাগাণ্ডা-ধর্মী বাস্তবতার বাহুল্য নেই। যদিও ঐ পথাবলম্বী ও পথাশ্রয়ীরা ফকনারকে তাঁদেরই সমগোত্রীয় বলে উল্লাস প্রকাশ করছেন এবং রুশ সাহিত্যিক সলোখবকে একমাত্র তাঁর সমকক্ষ বলে জাহির করছেন। যাই হোক তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বা দলকে সম্মুখে রেখে তিনি করেন নি, তাঁর অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে তাঁর নিজের জীবন ও তার চারিপাশের পরিবেশের প্রতি গভীর প্রেম, তীক্ষ্ম অনুভূতি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিক্ষমতা। সেই সমস্ত কথাই আজ এই নোবেল-লরিয়েটে ফকনার সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার।

আমেরিকার যে অংশ ও অঞ্চলটিতে তিনি জন্মেছিলেন সেটির প্রতি এবং তার চারপাশের মানুষগুলির প্রতি তাঁর প্রেম ও প্রীতি যে অসীম, তা তাঁর সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর এই প্রীতি ও প্রেমের প্রকাশ নানা অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। একজন সমালোচক তাই তাঁর সাহিত্য সমালোচনা প্রসংগে বলেছেন—

"He writes like a man who so loves his land that he is fearful for the well-being of every creature that springs from it."

একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক লেখক ও লেখিকাই ফকনারের মত নিপুণভাবে তাঁদের নিজের নিজের ভিটেমাটি ও জন্মাঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের চিত্র আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁর উপন্যাসগুলিকে তাই বলা হয়—

Projections of the author's inner conflict with the world about him.

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সে পরিবারটি এককালে দক্ষিণাঞ্চলে এক সমৃদ্ধশালী পরিবার ছিল, কিন্তু ১৮৬১—৬৫ সালের আমেরিকান সিভিল ওয়ারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাঁর জন্ম হয় দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র অথচ অভিজাত এক প্রাচীন পরিবারে—১৮৯৭ সালে। তাঁকে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজনিত নানা বাধা ও অসুবিধার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে হয়। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে জেফারসন নামে যে কাল্পনিক শহরটিকে খাড়া করেছেন, বলা হয় বাস্তবে নাকি সেটি মিসিসিপির দক্ষিণ প্রদেশভুক্ত তাঁর জন্মভূমি অক্সফোর্ড শহরেরই কথা। আর তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র-গুলিও হলো তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের ব্যঙ্গ-চিত্র। এ উক্তির তিনি কখনও কোনও প্রতিবাদ করেন নি। কাজেই এ অনুমান মিথ্যা নয়।

তাঁর শৈশব ও শিক্ষাদীক্ষার প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন তাঁর বাবার চারটি ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলে। অভাব-কষ্টের চাপে তাঁর শৈশবের লেখাপড়া তেমন কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম ধরে চলে নি, বার বার স্কুল বদলানোর ফলে মাধ্যমিক স্কুলের সমস্ত ক্লাসগুলোও অতিক্রম করবার সুযোগ তিনি পান নি। স্কুলের কয়েকটা ক্লাস অবধি তিনি পড়েন আর মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ক্লাসে যোগ দিয়ে সামান্য কিছু লেখাপড়া করেন। স্কুলের পড়া তেমন না হলেও ছোটবেলা থেকেই তিনি বাড়ি বসে নিজের খুশিমত রকমারী বই প'ড়ে আর কবিতা লিখে বেশীরভাগ সময় কাটাতেন বলে জানা যায়।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় যখন তিনি যুবক, তখন ক্যানাডিয়ান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যে লেফ্‌টেন্যান্টের পদে উন্নীত হয়ে ফ্রান্সে যান। সেখানেই তিনি বাইরের জগতের চাঞ্চল্য ও বৈচিত্র্যকে বাস্তবে প্রথম উপলব্ধি করেন এবং এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে সমস্ত ভাবের প্রতিফলন ঘটায়, তাই তিনি পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস "Soldier's Pay" বইটিতে। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তিনি আবার তাঁর জন্মভূমি অক্সফোর্ডে ফিরে আসেন এবং নতুন করে পড়াশোনার খেয়াল-খেয়ালে মেতে ওঠেন। এই সময়েই তিনি মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাপছাড়াভাবে এ বিষয়ে সে বিষয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর পাঠ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে পড়াশোনায় লেগে থাকতে পারেন নি। অভাবের দায়ে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি শেষকালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ রঙ করার মিস্ত্রীর চাকুরী নেন, কিন্তু কাজে অমনোযোগিতার অপরাধে সে চাকুরীটিও হারান।

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁকে অক্সফোর্ড ত্যাগ করে নিউ অর্লিয়েন্সে আস্তানা গাড়তে হয়। এইখানেই পরলোকগত আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শেরউড এন্ডারসনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

মিঃ এন্ডারসন এই তরুণ লেখকের রচনা-শক্তি দেখে মুগ্ধ হন এবং তিনি নিজে সচেষ্ট হয়ে ফকনারের একটি রচনা সেই সময়কার একটি মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। সেইটিই হলো ফকনারের প্রথম রচনা, যেটি প্রকাশিত হয়। এটি একটি কবিতা এবং এর প্রকাশকাল ১৯২২ খৃষ্টাব্দ।

এর কিছুদিন পরে এন্ডারসনের উৎসাহ ও সমর্থন পেয়ে তিনি "Soldier's Pay" ও "Mosquitoes" নামে দুটি উপন্যাস লেখেন। আর তখনই আবার তাঁর ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর খেয়াল চাপে। তিনি এক মালবাহী জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে ইউরোপের পথে পাড়ি দেন। একটি বছর ইউরোপে কাটিয়ে ১৯২৫ সালে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটে নিজের জন্মভূমি অক্সফোর্ডেই ফিরে এলেন এবং ফিরে ছুতোরের কাজ নিলেন। কারণ তাঁর ঐ উপন্যাস দুখানি এন্ডারসনের সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রকাশিত হলেও বাজারে তেমন কাটলো না, কাজেই আয়ের পথ প্রশস্ত হলো না। "দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরী" বলে উপন্যাসের পান্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের কাছে যেতে তারা তাঁর আগের বই দুখানির হিসেব দেখিয়ে ফিরিয়ে দিলে। কাজেই মন-মরা হয়ে ছুতোরের কাজেই লেগে পড়লেন, অবসর সময়ে মাছ ধরে, ক্ষেত-খামারে কাজ ধরে, শিকার করে কাটাতে থাকেন। কবিতা ও উপন্যাস লেখায় তাঁর উৎসাহ আগ্রহ কিছুদিনের জন্য সব যেন দমে গেল। যাক্‌, আবার ধীরে ধীরে মনে তাঁর আশা, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস জাগতে লাগলো, যখন কেউ কেউ লিখে এবং মুখে জানালেন যে, তাঁর সাহিত্য-রচনার বৈশিষ্ট্য আছে। ওদিকে তাঁর উপন্যাস কিছু কিছু বিক্রীও হতে লাগলো। ১৯২৯ সালে আবার তাঁর "দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরী" বইখানা প্রকাশ করলেন। তখন আবার নূতন উদ্যমে তিনি কলম ধরলেন, আর শুরু করলেন জেফারসনের কাল্পনিক সারটোরিস পরিবারকে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাস মালার প্রথম গ্রন্থ "সারটোরিস"। এই বইটিও ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলো। এই বছরেই তিনি দুটি শিশুর জননী বিধবা মিসেস এস্টেলী ওল্ডহ্যাম ফ্রাঙ্কলিনকে বিবাহ করলেন।

বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি বুঝলেন যে, সহসা বিয়ে করে একটা বৃহৎ পরিবার গড়ে তিনি বড় ভুল করেছেন। বই বিক্রীর সামান্য আয় থেকে চারটি প্রাণীর সংসার চালানো তাঁর পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠলো। তখন মিঃ ফকনার এক বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রে নাইট-সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকুরী গ্রহণ করলেন। এই চাকুরী নেওয়ার ফলে সারারাত তাঁকে জেগে কাটাতে হতো—ফলে সারাটি দিন শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে থাকতো, চিন্তা করবার, রচনা লেখবার এতটুকু অবসর তাঁর মিলতো না, আর সে ইচ্ছাও হতো না তাঁর। তবে ভোর রাতে তাঁর মনটা বেশ চাঙ্গা থাকে যে, একথাটা একদিন তাঁর মনে হলো। সেইদিন থেকেই ভোর রাতে তাঁর কারখানার এক কোণায় বসে তিনি 'দি সাউন্ড এন্ড ফিউরী' বইটিকে সংশোধন করতে লাগলেন। আর "অ্যাজ আই লে ডাইং" ও "স্যাংচুয়ারী" বলে নতুন দুখানি উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। ১৯৩০ সালে 'অ্যাজ আই লে ডাইং' বইটি প্রকাশিতও হলো। দুঃখ-দারিদ্র্যের বিড়ম্বনায় 'বেঁচে-থেকে-মরা' মানুষের কাহিনী। "স্যাংচুয়ারী" বইটি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়ে বেরুলো এবং এই বইটিই তাঁর যশ এবং অর্থাগমের পথকে প্রশস্ত করে দিলে। ফকনার এর আগে যে কয়খানি বই লিখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছি, সেগুলির রচনা তেমন বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু হয় নি বলেই পাঠক এবং সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন। কেউই তাঁকে তেমন আমল দেননি, বরং ফকনারের ঐ বইগুলির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'মত-পথের বালাইবিহীন লেখক', "একটা অস্পষ্ট দুর্বল হেঁয়ালীবাদী লেখক", অধিকাংশ পাঠকই তখন বলতেন, 'ফকনারের লেখা পড়ে কিছুই বোঝা যায় না,' ইত্যাদি। যাই হোক, ফকনার তাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম হননি এবং তাঁর নিজস্ব ধারাটিকে বদলাননি যে, তা একান্ত বলিষ্ঠভাবে প্রকট হলো, যখন তাঁর 'স্যাংচুয়ারী' বইটি এক মহাবিভীষিকাময় পটভূমিকায় নানা ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশে সকল পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করলে। ইচ্ছে করেই তিনি ধীর-স্থিরভাবে এই রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখলেন।

তাঁর দুঃখকষ্টময় জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি পটুয়া, ছুতোর, পোস্ট মাস্টার, কয়লাখনির মজুর, চৌকিদার এবং কেরানীর চাকুরীর কোনওটাই বাদ দেননি। এই সব কিছুর অভিজ্ঞতাই কালের প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাঁর লেখনীশক্তি ও চিন্তার ব্যাপকতাকে যে কিভাবে বাড়িয়ে তুলেছে ১৯৩১ সালে স্যাংচুয়ারী প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সেটি আমেরিকার সাহিত্যানুরাগী পাঠক ও সমালোচকদের ধীরে ধীরে বোধগম্য হতে লাগলো। কিন্তু বর্তমান কালে তাঁকে যদিও আমেরিকান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম লেখকদের একজন বলেই গণ্য করা হয়, তবুও ফকনার সমালোচকদের মনযোগানোর কোনও চেষ্টাই করেন না। তাঁর জটিল গদ্য রচনার নিজস্ব শৈলী বহুক্ষেত্রেই সমালোচকদের ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। তাঁর বই পড়তে বসলে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রেই তিনি এমন এক একটি দীর্ঘ একটানা বাক্য রচনা করেছেন, যেটি শেষ করতে কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে যেতে হয়। তাঁর লেখার স্টাইল বা শৈলীর কোনও বাঁধাধরা ধাঁচ-ধরণ নেই এবং সচেতন ও সাবধানী মন নিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে লেখার কসরৎকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, লেখকের মধ্যে যদি গল্প থাকে, তাহলে তাকে আপন বেগে বেরিয়ে আসতেই হবে। অনেকের মতে তিনি স্থূল রসিকতা এবং অমার্জিত ভাষা ও অতিরিক্ত জোর দিয়ে যেভাবে ট্র্যাজেডি ফুটান,

তা সাহিত্যিকজনোচিত নয়। এটা অবশ্য বলে থাকেন তাঁরাই, যাঁরা আমেরিকান সাহিত্যের ভাষা ও ভঙ্গীতে ঘসা-মাজা অতি-আধুনিক সৌখীনতার প্রবর্তন করেছেন।

মিঃ ফকনার তাঁর সাহিত্য-সমালোচক ও পাঠকদের মতামত সম্বন্ধে সব সময়েই উদাসীন—তা নিয়ে তিনি এতটুকুও মাথা ঘামান না। দেখতে মানুষটি খাটো, রোগা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে গোঁফ আর চোখ দুটি তীক্ষ্ম। তিনি খুব ধীরে ধীরে ও সাবধানে কথা বলেন, কেউ তাঁকে অত কম কথা কইতে দেখে বলেন, লোকটা দাম্ভিক। কেউ-বা বলে সঙ্কোচ এবং অভিমানবোধই তাঁর কম কথা বলার কারণ।

তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, ১৯৩১ সালের পর থেকে তিনি এ পর্যন্ত ১৫ খানি নভেল কয়েকটি কবিতার বই লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্প ছায়াছবিতেও গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত "ইনট্রুডার ইন্ দি ডাস্ট্" বইটি ছায়াছবিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। এটি হচ্ছে একটি ছোট ছেলে কিভাবে আর একটি নিরীহ নিগ্রো ছেলেকে খুনের অপরাধের দায় থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে তারই প্রাণবন্ত কাহিনী।

ফলে ফকনার পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাস, গল্প ও কবিতার বইগুলির আয় থেকে বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি তাঁর পিতৃপিতামহের প্রাচীন বাড়িটি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথায় নতুন করে গড়ে তুলেছেন, নিজে একটি এরোপ্লেন কয়েকটি মোটরগাড়ী কিনেছেন। সম্প্রতি তিনি অক্সফোর্ডের এক পাহাড়ের উপর ৩৫ একর ব্যাপী এক খামার বাড়ি তৈরী করিয়ে সেখানেই পরম শান্তিতে বাস করেন। খামার বাড়িতে তিনি অসংখ্য কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া পালন করেন এবং নিজেই তাদের দেখাশোনা করেন। এখনও প্রতিদিন তিনি সকালটা লেখার কাজেই কাটান—বিকেলে শিকার করেন বা মাছ ধরেন।

ফকনারের আধুনিকতম উপন্যাসগুলির মধ্যে নামকরা উপন্যাস হলোঃ (১) "য়্যাব্সেলম্! য়্যাব্সেলম্!" (২) "দি ওয়াইল্ড পামস্" (৩) "দি হ্যামলেট্" (৪) "ইনট্রুডার ইন্ দি ডাস্ট্" (৫) "লাইট্ ইন অগাস্ট"। তাঁর লেখা ছোট গল্পের সঞ্চয়ন গ্রন্থের নাম হলোঃ (১) "দিজ্ থারটিন্" (২) "ডক্টর মার্টিনো"; তাঁর দু'খানি নামকরা কবিতার বই হলোঃ (১) "দি মারবেল ফন্" (২) "দি গ্রীন্ বো"।

ফকনারের জীবন ও সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁরা হয়তো এটি থেকে কিছুটা তৃপ্তি লাভ করবেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর রচনা পাঠ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন, তাঁদের কাছে কয়েকটি কথা জানানো দরকার। সেটি হচ্ছে ফকনারের সাহিত্য-সৃষ্টির পটভূমি আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল; এই অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান ও বহুল পরিমাণে অনাধুনিক ও অনগ্রসর। এই অঞ্চলে শ্রমজীবী নিগ্রো পুরুষ ও নারীর জীবন কিভাবে বিকৃতি ও বৈকল্যের বিষে জরজর সমাজের অসাম্য অবিচারে সেখানকার মানুষ কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তারই বাস্তব ঘটনাবলী ও রূঢ় সত্যগুলি ফকনারের সমস্ত উপন্যাসের অবলম্বন। তাঁর প্রায় সমস্ত বইগুলি রচিত হয়েছে এই একই পটভূমিকায়। সেই কারণে তাঁর "লাইট ইন অগাস্ট" বইটি ছাড়া আর সব বই-ই হয়তো আধুনিক সৌখিন সাহিত্যানুরাগীদের কাছে খাঁটি সাহিত্যপদবাচ্য বলে গণ্য হবে না। তাঁর লেখায় ঘসা মাজা আধুনিক সাহিত্যের সৌখিনতার চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা নেই, যার জন্য রীতিমত গভীর অনুভূতির সঙ্গে বইগুলি পাঠ করলে তবেই তাঁর বিকারগ্রস্ত চরিত্রগুলির প্রকারভেদ উপলব্ধি করা সম্ভব। সভ্যতার নামে অগ্রগতির নামে মানুষ কতখানি নিষ্ঠুর ও বর্বর হয়েছে, তার অকপট ছবি ফুটে উঠেছে ফকনারের সাহিত্যে। এই পতনকে যাঁরা স্বীকার করে নিয়ে সভ্য ও শিক্ষিত বলে পরিচিত মানুষের জীবনের বিকৃতিগুলিকে সংশোধন করে নেওয়ার আগ্রহ রাখেন তাঁরা ফকনারের রচনাকে বর্তমান সময়ের একান্ত প্রয়োজনীয় অবদান বলে গণ্য না করে পারবেন না। শিক্ষিত ও সভ্য বলে কথিত মানব সমাজের অত্যাচারে অবিচারে আজ যারা নিপীড়িত, তাদের স্বপক্ষের সংগ্রামিক ফকনার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এটা বর্তমান মানব সমাজের পক্ষে নিতান্ত আশা ও আনন্দের কথা যে তাতে সন্দেহ নেই।

দৈহিক

জয়শ্রী চৌধুরী

এই দেহকে জানি
কত দিনের কত সুখ দুঃখের পাকে পাকে
অণু পরমাণুর কত অসংখ্য বেষ্টনে
এই সত্তা গড়া;
প্রতিদিনের ধূলির মালিন্য থেকে
জীবনের কত না বলা ক্ষণে
একে অর্ঘ্য দিয়েছি,
পৃথিবীর মধু সরোবরে ফুটে উঠেছে
প্রাণপদ্ম
তার চারিদিক ঘিরে,
উন্মীলিত দলের কারুকলা।
তবু কোন্ নিবিড় তমিস্রায়
আদিমতার অন্ধকার থেকে
মানুষ উঠেছে জেগে
এই সত্তার গভীরতা ব্যেপে
আরো ব্যাপ্তি চাই যেন
তার করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে।

সমুদ্রের এপার হ'তে ওপার
অরণ্যের বৃক্ষমালায়
মর্ত্যের তৃণধূলিতে
তার লালসার জিহ্বা প্রসারিত।
নেই কোন বীর বাণীর সাড়া
নেই কোন বর হস্তের অভয়দান
পিশাচের জৈব প্রেরণায় আহুতি দিতে
এই দেহ উৎসর্গীকৃত!
'দেহ হ'তে দেহাতীত' 'সত্তা হ'তে আত্মা'
এই সত্য কে আনবে বিশ্বাস?
কে জানাবে মরদেহের অপমানে
অমর আত্মা চির অক্ষয়?
এই দেহের অমৃত বর্ষী উৎস
কোন্ পথে হয়েছে শুষ্ক
কেবল দুর্গম অন্ধকারে
অসহায় ক্ষুধিতায় চাই শান্তি
এই দেহে নয়, অপার্থিব সত্তায়।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

ওহিও শহরের আলফ্রেড উইলসন সাহেব শিশু-মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে শিশুদের মিথ্যা কথা বলা বা চুরি ধরা পড়িয়া যাইবে।

—তদ্দ্বারা বয়স্কদের মিথ্যাচার ও চুরি ধরিবার উপায় আছে কিনা জানা যায় নাই। তবে ভারতবর্ষে সে যন্ত্র এখন আসিলে মূল যন্ত্রটাকে লইয়াই হয়তো চোরাকারবার শুরু হইয়া যাইবে।

*　*　*　*　*

লাহোরের সিভিল ও মিলিটারী গেজেট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পাকিস্থান ও ভারতের দুই প্রধান মন্ত্রীর অবিলম্বে একটি বৈঠক বসানো কর্তব্য। কারণ উক্ত গেজেটের মতে নেপাল ও তিব্বতের ব্যাপারটি তাঁহারা গুরুতর বলিয়া মনে করিতেছেন।

—কিন্তু কাগজের সম্পাদক উদ্বেগবোধ করিলে কি হইবে, পাকিস্থানের কেহই এজন্য উদ্বিগ্ন হন নাই। হয়তো তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এখন যাহার খুশী সে ভারতে ঢুকিয়া পড়ুক না কেন, তাঁহারা সেই ফাঁকে একেবারে কাশ্মীরে ঢুকিয়া পড়িবেন। তাহার পর সমগ্র ইসলাম জগৎ বিপন্ন বলিয়া চীৎকার করিলেই চলিবে!

*　*　*　*　*

নেপালের মহারাজার সর্বকনিষ্ঠ তিন বৎসর বয়স্ক পৌত্রের সহিত বর্তমান নেপালের প্রধান মন্ত্রীর নাতনীর স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ না হইলে রাজার নাকি রাজ-গদীতে বসিবার অধিকার হয় না। অতএব বাধ্য হইয়া এই আয়োজন করিতে হইয়াছে।

—ভালই হইয়াছে। পাত্রীর বয়সটা জানিতে পারিলে বলিতে পারিতাম, ফুলশয্যাটা জমিল কেমন!

*　*　*　*

দিনাজপুরের এক গ্রামে শ্রীললিতমোহন রায় পারিবারিক প্রথানুসারে লক্ষ্মী-পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে মূর্তিপূজা মহাপাপ বলিয়া আনসার বাহিনী ও পুলিস আসিয়া সে পূজা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

—সেই গ্রামে নিশ্চয় ডাঃ মালেক ও শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়েরা এখনও বক্তৃতা দিয়া আসেন নাই। উঁহাদের সফর হইয়া যাউক, তাহার পরই লক্ষ্মীপূজা শুধু নয়, দোল-দুর্গোৎসব সকলই করিতে পারা যাইবে।

*　*　*　*　*

জনৈক রেলযাত্রী আনন্দবাজার পত্রিকায় অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে বহু লোক্যাল ট্রেনে বিপদজ্ঞাপক শৃঙ্খল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও ট্রেন থামে না। ইহার প্রতিকার করা কর্তব্য।

—প্রতিকারের কিছু নাই। সকল বিভাগে আমরা এখন শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছি, তাই ট্রেন-গুলিই বা এখন শৃঙ্খল মানিবে কেন?

*　*　*　*　*

ভারতের রেলওয়ে ও যানবাহন দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীকে শান্তনম বলিয়াছেন যে, রেলগাড়ি হইতে ইণ্টারক্লাস বাদ দিয়া যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারী তহবিলের চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষামূলক কাজে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাকে অপব্যয় বলা যায় না।

—নিশ্চয় যায় না। পরীক্ষা করিতে গিয়া চব্বিশ লক্ষ টাকা চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে অপব্যয় বলিবে কোন মূর্খ? বলে, অতবড় রাজা রামচন্দ্রের পত্নী, সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় গোটা মানুষটাই উঁপিয়া গেল—এ তো সামান্য টাকা!

*　*　*　*

শ্রীযুত জওহরলাল নেহরু তুর্কিস্থানের শিশুদের অনুরোধে একটি শিশু হাতীকে পাঠাইয়াছেন। ইতিপূর্বে আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানেও তিনি ভারতের কয়েকটি ছোট হাতী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

—একজন প্রশ্ন করিলেন, জওহরলালজী কোন দেশে বড় হাতী পাঠাইতেছেন না কেন? আর একজন বলিলেন, ইতিপূর্বে অনেকগুলিকে ভারতের দূতরূপে বহু স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে।

*　*　*　*　*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ হেণ্ডারসন সেদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এক।

—সে তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভারতের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে ঢুকিতে না দেওয়া ও কোরিয়ার যুদ্ধে ৩৮ অক্ষরেখা পার না হইতে অনুরোধ করার ব্যাপারেই উভয়ের নীতির ঐক্য সুস্পষ্ট-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বৈকি!

*　*　*　*　*

ডেনমার্ক সরকার অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর উপর একটি কর ধার্য করিয়াছেন।

—ভারত সরকার জনসংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে যদি এখানে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর উপর সন্তান পিছু কিছু মোটা কর ধার্য করেন, তাহা হইলে দেশটা বাঁচিয়া যায়।

*　*　*　*

কোরিয়ার যুদ্ধে চীনাদের যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করায় সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সী টাস বলিতেছেন যে, এ চীনারা সরকারী চীনা নয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী।

—তাই ভাল। তবে চীনাদের প্রায় সকলকেই যেন দেখিতে একরকম লাগে কিনা, তাই কে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করিতেছে আর কে অনিচ্ছায় যুদ্ধ করিতেছে, তাহাই চিনিয়া ওঠা দুষ্কর।

*　*　*　*　*

দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে বর্ণ-বৈষম্য সম্বন্ধে যে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছে, সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার রাষ্ট্রপুঞ্জের নাই।

—কি করিয়া থাকিবে। ঘরের কেলেঙ্কারী বাবঘরের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে কি? নিজের সুবিধা ও অপরের অসুবিধা কিভাবে ঘটাইতে পারা যায়, তাহারই জন্য তো দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগদান করিয়াছে।

*　*　*　*　*

বৃটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ জেমস্ চুটার কমন্সসভায় বলিয়াছেন, এবার যুদ্ধ লাগিলে অসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোক হতাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

—সে বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ নাই। তবে যাহারা যুদ্ধ বাধায় তাহাদের মধ্যে কজন মরিবে যদি জানিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতাম।

মশার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

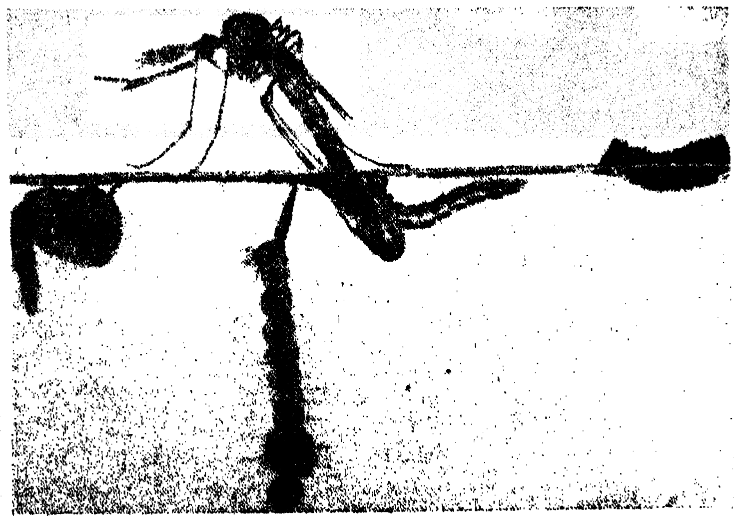
মশার সঙ্গে আমাদের যত বেশি পরিচয় বোধ হয় এমন অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গেই নয়। তার প্রধান কারণ এদের সংখ্যার গুরুত্ব ও মানুষের উপর এদের আক্রমণের প্রভাব। সর্ব দেশের সর্বপ্রকার জলবায়ু সহ্য করবার ক্ষমতাও ওদের অসাধারণ। আমাদের মতো গরম দেশের লোকের বিশ্বাস শীতের প্রকোপ মশা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে মেরু প্রদেশের অতি নিকটবর্তী স্থানও এদের অগম্য নয়। উত্তর সাইবেরিয়ার টুন্ড্রা প্রদেশে বৎসরের ৮।৯ মাস কাল বরফে আচ্ছন্ন থাকলেও শীতের অবসানে সে-সব স্থানে মশার উপদ্রব এত বাড়ে যে, বনের জন্তু-জানোয়ারদের মশার উপদ্রবে বন ছেড়ে দূরে পলায়ন করতে হয়।

মশার উপদ্রব পৃথিবীতে শুধু আজই নয়। এরা পৃথিবীর অতি আদিম যুগের প্রাণী। পৃথিবীতে পতঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও আবির্ভাব হয়েছিল। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীতে পতঙ্গের প্রাচীনত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী। অতি আদিতে মশা হুল নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলো কিনা তা জানবার উপায় নেই, তবে যতদিন হ'তে ওদের সঙ্গে মানুষের পরিচয়, ততদিন থেকেই মানুষ এদের হুলের জ্বালা অনুভব করে আসছে। আজ শুধু হুলের জ্বালায়ই নয় এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে, এই হুল মানুষের দেহের নানা রোগেরও কারণ। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ডাঃ ম্যানসন্ (Patric Manson) ফাইলেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করেন রুগ্ন দেহ হ'তে ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু সুস্থদেহে বহন করে মশা। তারপর ক্রমে ক্রমে জানা গেলো ফাইলেরিয়ার ন্যায় ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের কারণও মশা। অবশ্য এক শ্রেণীর মশাই এসব বিভিন্ন শ্রেণীর রোগের কারণ নয়। মশার দ্বারা রোগ সংক্রামিত হবার তথ্য আবিষ্কার হবার পর হ'তে সভ্য দেশসমূহে তাদের ধ্বংসের জন্য নানাভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামে আমাদের পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব হবে না, যদি না আমরা তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারি।

মশা যখন কামড়াবার জন্য আমাদের গায়ে বসে তখনই আমরা ওদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হই। কিন্তু তখন আমরা ওদের মারতে বা তাড়াতেই এতটা ব্যস্ত থাকি যে, তাদের দিকে ভালো করে নজর দেবার অবসরও হয় না, ইচ্ছাও থাকে না। তখন তাদের যেটুকু দেখি তাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র একটি কালো বিন্দু ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। একটু ভালো ক'রে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায় পতঙ্গ জাতির অবয়বের সকল অঙ্গই ওদের দেহে বর্তমান। দেহের তিনটি অংশ—মাথা, পিঠ (Yhorax) ও উদর; পিঠের উপরে দুজোড়া ডানা ও নিম্নভাগে তিন জোড়া পা, মুখে যে হুলটি আছে কামড়াবার সময় যেমন খুশী এদিক ওদিক বাঁকাতে পারে; হুলের মাঝখানটা ফাঁপা ও গোড়ার দিকটা একটা শোষক-যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত, সেই শোষক-যন্ত্রের সাহায্যেই ওরা রক্ত চুষে খায়, হুলের অগ্রভাগ ছুরির ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। আমাদের গায়ে বসে চামড়া বিদ্ধ করে হুলের তীক্ষ্ণ ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে; ডানা ও সর্বাঙ্গ অতি ক্ষুদ্র আঁশে আবৃত। ওদের দেহটি বেশ সরু লম্বা ছিপছিপে ধরণের। লম্বা লম্বা পা ও মুখের হুলটি ওদের একটি বিশেষত্ব। ওদের ডাক ও কামড় একেবারে খাঁটি মশা-মার্কা। ডাকটি কানে পৌছানো মাত্রই বুঝতে দেরী হয় না কার ডাক আর হুলের জ্বালার তো তুলনাই নেই।

মশকতত্ত্ববিদেরা একটি অতি আশ্চর্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাদের গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে একমাত্র স্ত্রী মশাই আমাদের কামড়ায় ও আমাদের গায় হুল ফুটিয়ে রক্ত পান করে। কারণ স্ত্রী মশার মুখেই হুল আছে পুরুষ মশার মুখে হুল নেই। সেইজন্য পুরুষ মশা আমাদের কামড়াতে পারে না। পুরুষ-মশা মুখ দিয়ে বনের লতা ফল, ফুল, পাতা প্রভৃতির পচা গলা রস চুষে চুষে খায়। মশার স্ত্রীজাতিকে আমাদের সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু আমরা পরিত্যাগ করতে চাইলেও ওরা আমাদের পরিত্যাগ করবে কেন? সুযোগ পেলেই ওরা আমাদের গায়ে এসে উড়ে বসে রক্তপানের জন্য। গায়ে বসেই রক্ত-শোষণের জন্য যে হুল ফুটিয়ে দেয় তা নয়। হুল ফোটাবার পূর্বে প্রথম বেছে নেয় ঠিক জায়গাটি সাধারণতঃ রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরার প্রতিই ওদের লক্ষ্য। অনেক সময় হুল ফুটিয়ে রক্তের খোঁজ না পেলে হুলটি তুলে নেয়—তারপর এক পা দু'পা ক'রে এদিক ওদিকে সরে হুলটিকে এদিক ওদিকে নেড়ে-চেড়ে আবার হুল ফুটিয়ে দেয়। হুলের জ্বালা ঠিক ওদের হুলেতে নয়, সে জ্বালা ওদের মুখের লালাতে। হুল দিয়ে রক্ত চোষবার আগে ক্ষতস্থানের মুখে খানিকটা মুখের লালা দেয় লাগিয়ে। লালা মাখাবার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। কারোর



মশার জীবনচক্রের ছবি। প্রথমে ডিম, দ্বিতীয় লার্ভা বা ছানা, তৃতীয় পুপা বা পুত্তলি। পুত্তলি হতে মশার জন্ম হচ্ছে।

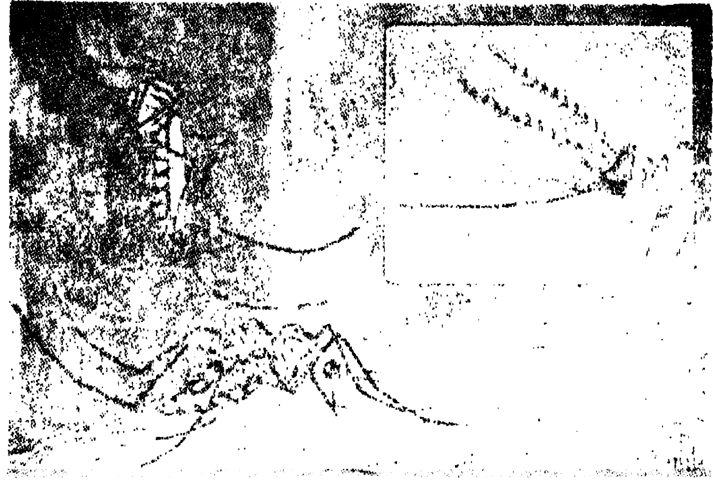
কারোর মতে লালার মধ্যে থাকে উত্তেজক পদার্থ। ক্ষতস্থানে উত্তেজনা জন্মালেই রক্তের চলাচল বৃদ্ধি পায়। আবার কারো কারোর মতে মুখের লালা ক্ষতস্থানের রক্তকে জমতে দেয় না। তাতে ওদের রক্তপানের সুবিধে বাড়ে। লালার যে উদ্দেশ্যই থাক—জ্বালা উভয়বিধ কারণেই সমান।

কামড়ের পরই বিরক্তিকর ওদের ডাক। কিন্তু এই ডাকের উৎপত্তিস্থল যে কোথায় তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। ডানার দ্রুত কম্পন একটি কারণ হ'তে পারে। হিসেবে ধরা পড়েছে ওড়বার সময় সেকেণ্ডে পাঁচ-শতেরও অধিকবার ওদের ডানার কম্পন হ'য়ে থাকে। কিন্তু ডানার কম্পনই ডাকের একমাত্র কারণ নয়। ডানা ছিন্ন ক'রেও ওদের ডাক একেবারে বন্ধ করা যায়নি।

মশার জগৎ খুব সম্ভবত শব্দময়। শব্দ সম্বন্ধে ওদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতিশয় প্রবল। খুব সকালে ও সন্ধ্যায় মশার দলকে একবার ক'রে ঝাঁক বেঁধে উড়তে দেখা যায়। তখন সেই ঝাঁকের ভিতরে যে গুঞ্জনধ্বনি জাগে তারি ভিতর হ'তে বিশেষ শব্দ অনুসরণ ক'রে পুরুষ মশা স্ত্রী মশাকে খুঁজে বের করে। এই গুঞ্জনধ্বনিকে অনুকরণ ক'রে বিশেষ একটি পর্দায় যন্ত্র বাজিয়ে পুরুষ মশাকে ঝাঁকে ঝাঁকে যন্ত্রের দিকে আনা সম্ভব হয়েছে। সেইরূপ গুঞ্জন-শব্দ উৎপাদন ক'রে মশা মারবার কলও তৈরি হয়েছে। সেই কলের সামনে থাকে একটি বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন পর্দা। কলে গুঞ্জনধ্বনি বাজতে আরম্ভ হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা সেই দিকে ছুটে আসে ও বৈদ্যুতিক পর্দায় আটকা পড়ে দলে দলে মারা যায়। আমাদের কানে স্ত্রী ও পুরুষ মশার ডাকের পার্থক্য উপলব্ধি না হলেও ওদের পরস্পরের নিকট সেই ডাকের অর্থ ভিন্নরূপ। ওদের শ্রবণেন্দ্রিয় মুখের দুপাশের দুটি শুঁড়ের (antennae) গোড়ায় অবস্থিত। তারি সঙ্গে সংলগ্ন যে দুটি পালকের মতো জিনিস আছে তার মধ্যে প্রথমে জাগে ধ্বনির কম্পন।

মশার জন্মকাহিনী অতি বিচিত্র। মশার ডিম হয় আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ডিম হ'তে প্রথমেই মশা হয় না। মশার জীবনচক্র চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে ডিম, ডিম হ'তে হয় ছানা, তাকে বলা হয় লার্ভা (larva) বা ক্রীমিকীট, লার্ভার পরবর্তী রূপ পুপো (pupa) বা পুত্তলি, পুত্তলি হতেই জন্ম হয় খাঁটি মশার। মশা ডিম পাড়ে কখনো আলাদা আলাদা একটি একটি ক'রে কখনো গুচ্ছাকারে, এ দু'রকমের ডিমই জলে ভেসে বেড়ায়।

সাধারণতঃ সব জাতীয় মশাই ডিম পাড়ে জলে। কোন কোন স্থানে ভিজে স্যাঁতসেতে জমিতেও মশা ডিম পাড়ে। কিন্তু সেরূপ ডিমেরও ফোটবার জন্য দরকার হয় জলের। ডিম পাড়বার জন্য যে-কোন জলাধার হলেই হলো। সামান্য শিশি-বোতল, ভাঙ্গা বাসনপত্র হতে ডোবা, খানা, স্রোতস্বতী প্রভৃতি যে-কোন জলাধারের মধ্যেই মশা ডিম পাড়তে পারে। জলের স্রোত বেশি হ'লে সাধারণতঃ সেরূপ স্থান ওরা পরিত্যাগ করে। কিন্তু সেরকম স্রোতস্বতীর ধারে ঝোপ, আগাছা, ঘাস প্রভৃতি থাকলে তাতে ডিম পাড়তে ওদের কোনরূপ বাধা হয় না। গাছের কোটরে, বড় বড় পাতায় একটু জল জমলে তার মধ্যেও অসংখ্য মশার ছানাকে কিলবিল করতে দেখা যায়। বর্ষায় আনারসের পাতার গোড়ায় সঞ্চিত জলে এইরূপ কিলবিলে ছানা অনেক দেখতে পাওয়া যায়। একত্রে গুচ্ছাকারে আবদ্ধ ভাসমান ডিমগুলিকে জলের উপরে দেখায় অতি ক্ষুদ্র একটি ভেলার মতো।



কর্মব্যস্ত মশা। উপরেরটি স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত, নীচের মশাটি হুলফুটাতে। ডান ধারে মশার ছবি।

গরম দেশে ডিম ফুটে ছানা ও ছানা হ'তে মশার জন্ম হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। জলে ওদের জন্ম হলেও প্রথম অবস্থায় ওরা মাছের ন্যায় জলের ভিতরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য লার্ভাদের বারবার জলের উপরে ভেসে উঠতে হয়। সে অবস্থায় মাথাটা থাকে জলের নীচে লেজ দেয় উপরের দিকে তুলে। তখন মনে হয় মাথা নীচু ক'রে লেজের সঙ্গে যেন ঝুলে আছে। লেজের মাথায় নলের মতো একটি জিনিস আছে সেটিই ওদের নিঃশ্বাস নেবার যন্ত্র। জলে তেল ঢেলে দিলে সেই ভাসমান তেল নলের মুখটি দেয় বন্ধ করে। তখন উপর হ'তে হাওয়া নিতে না পেরে দম বন্ধ হয়ে ওরা মরে যায়। মশা ধ্বংস করবার এ একটি অতি সহজ উপায়। লার্ভাগুলি যতদিন জলে থাকে সর্বক্ষণ কিলবিল করে কেবলি উপরে নীচে ওঠানামা করে বেড়ায়। এ শুধু খেয়াল বশে নয়, জলের মধ্যে এভাবেই ওরা আহার সংগ্রহ করে। জলের ভিতরের অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, প্রাণী ও নানাবিধ ভাসমান জিনিস ওদের খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য ও উত্তাপ পেলে ওরা দ্রুত বাড়ে। খুব বেশি হ'লে ৭ হ'তে ১০ দিনের মধ্যে পূর্ণাংগ মশার রূপ প্রাপ্ত হয়ে জল হতে ডাঙ্গায় উঠে আসে। কিন্তু তার পূর্বে ওদের খোলস বদলাতে হয় বারকয়েক। যতবার খোলস বদলায় ততবারই ওরা একটু একটু ক'রে বড় হয়। শেষবার খোলস বদলাবার পর মশা হ'য়ে আর বাড়ে না। সুতরাং অতি ছোট ক্ষুদে মশাগুলিকে মশার ছানা মনে করা ভুল।

লার্ভাবস্থায় ওরা সাধারণতঃ চারবার খোলস ছাড়ে। শেষ খোলস ছাড়বার পর ওদের চেহারা যায় বদলে। লেজের দিকটা প্রায় একরকমই থাকে, কিন্তু মাথার দিকটা ওঠে ফেঁপে ফুলে। ওদের এ অবস্থার নামই পুত্তলি। পুত্তলিতে যেমন চেহারা বদলায় তেমনি জীবনযাত্রার প্রণালীরও পরিবর্তন ঘটে। এ সময় এরা খায় না কিছুই, নড়েচড়েও না—জলের উপর একই স্থানে স্থির হ'য়ে ভেসে থাকে। ওদের খোলসের ভিতরের মাংসপেশীও তখন ভেঙ্গেচুরে ঘোলের মত জিনিসে রূপান্তরিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘোলের ন্যায় পিণ্ড পদার্থ হ'তেই জন্ম হয় পূর্ণাংগ মশার—পা হয়, ডানা হয়, উদর, পিঠ ও মাথা হয়। খোলসের ভিতরে পূর্ণাংগ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুত্তলিটি এতটা হাল্কা হ'য়ে যায় যে, দেহের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণরূপে

জল ছেড়ে উপরে উঠে পড়ে—লেজের দিকটা তখনো জলের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। সেই ঊর্ধ্বভাগের মধ্যেই থাকে মশার পূর্ণাঙ্গ রূপ, কিন্তু খোলসের আবরণে ঢাকা। এই আবরণটি ফেটে গিয়েই মশার জন্ম হয়। জন্ম মাত্রই ওরা উড়তে পারে না—ডানা শক্ত হবার জন্য কিছুক্ষণ রোদ হাওয়ার প্রয়োজন হয়। ততক্ষণ ওরা খোলসের ভেলাটির উপর ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসবার পর হ'তেই এদের আবার আর এক নতুন জীবন আরম্ভ হয়।

নবজাত মশাটি স্ত্রী হলে একদিন কি দুদিনের মধ্যেই ওর একটি প্রণয়ী জুটে যায়। বিবাহ-রাত্রির অবসানে স্ত্রী মশা আহার সন্ধানে বহির্গত হয়। এ সময় ওদের (স্ত্রী মশার) রক্তের তৃষ্ণা বাড়ে। এ শুধু উদর পূরণের জন্য নয়—মানুষ বা জীবজন্তুর রক্ত না হ'লে ওদের উদরের ডিমগুলি পরিপুষ্ট হ'তে পারে না। উদরের অধিকাংশ ডিমই নষ্ট হ'য়ে যায়। যে সব মশা ঘরে থাকে তখন ওরা মানুষকে কামড়ায় খুব বেশি। রক্ত না পেলে ফুলের মধু বা ফুল ফল, লতা, পাতা প্রভৃতির পচাগলা রস পান ক'রেও তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণ করে। উদ্ভিজ্জ রসই হ'ক বা রক্তই হ'ক ভোজটি হজম হয়ে গেলেই ওরা ডিম পাড়বার জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে বহির্গত হয়। যথা সময়ে যথাস্থানে ডিম-পাড়া হ'য়ে যায়, পরবর্তী বংশের জন্ম হয়। জীবনচক্রের গতি পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকে।

পুরুষ মশার পরমায়ু খুবে বেশি নয়—ঘরে যারা বাস করে শীতকাল পড়লেই ওরা মরে যায়। স্ত্রী মশাগুলি তখনো বেঁচে থাকে। ঘরের ভিতরেই কোন নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিয়ে ওরা সে সময়টা ঘুমিয়ে কাটায়। শীত অবসানের সঙ্গেই সেই সব নিরাপদ স্থান হ'তে ওরা বের হয় ও রাত দিন হুল ফুটিয়ে আমাদের অস্থির ক'রে তোলে। যথা সময়ে এরাই আবার নতুন ক'রে ডিম পাড়ে। আবার বংশ বৃদ্ধির পালা আরম্ভ হয়।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে একটি ফরাসী কোম্পানী পানামা খাল খননে নিযুক্ত হয়। কিন্তু শেষ করতে পারে নি। পীতজ্বরের আক্রমণে এত লোকের মৃত্যু ঘটে যে কোম্পানীকে কাজ ফেলে চলে আসতে হয়। এই পীতজ্বরের কারণ এক শ্রেণীর মশা। পীতজ্বরের মশার বিশেষ 'আকর্ষণ' লোকালয়ের দিকে। ঘরের ভিতরে যেখানে সামান্য একটু জল পায় সেখানেই এরা ডিম পেড়ে রাখে। ঘরের ভিতরে জলের কুঁজোতে ফুলদানীর জলে, ফুলের গাছের টবের জলে ওরা ডিম পাড়ে রাশি রাশি। হাসপাতালের নার্সদের অজ্ঞতাও ছিলো পানামা খালের কর্মিবৃন্দের মধ্যে রোগ ছাড়াবার একটি কারণ। রোগীর মনে আনন্দ দেবার জন্য রোগীর শয্যাপার্শ্বে বা জানালার ধারে ওরা জলপূর্ণ টব বা ফুলদানী রেখে দিতো। তাতে তাদের অজ্ঞাতসারে জন্ম হ'তো রাশি রাশি পীত-জ্বরের মশার (Aedes aegypti)। সুতরাং একবার যারা হাসপাতালে প্রবেশ করতো তাদের রোগের হাত এড়িয়ে হাসপাতাল হ'তে বের হবার উপায় ছিলো না। এ জাতীয় মশা শীত সহ্য করতে পারে না—স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় মশাই শীত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মরে যায়। কিন্তু বংশের ধারাকে জীবিত রাখবার জন্য রেখে যায় রাশি রাশি ডিম। ডিমের শীত সহ্য করবার ক্ষমতা অসাধারণ। সেই ডিম হ'তেই শীতের শেষে নতুন মশার জন্ম হয়।

এনোফেলিস্ মশার নামের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এরাই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। পীতজ্বরের মশার ন্যায় ওরা ততটা মানুষের বাসগৃহ ভক্ত নয়। ডিম পাড়বার জন্য এরা মুক্ত স্থানই বেশি পছন্দ করে। ঘাস বা আগাছাপূর্ণ ডোবা, খানা, রাস্তার ধারের নালা, খাল, পুকুর, বিল, কিম্বা ছোট ছোট স্রোতস্বতীর ধারে ধারে আগাছা বা ঘাস প্রভৃতির ভিতরই এরা বেশি ডিম পাড়ে। গাছের উপরে কোটরে বা পাতার সঞ্চিত জলেও এদের ডিম বা ছানা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ীর বাইরে যে সব ভাঙ্গা শিশি, বোতল, টিনের কৌটা, হাঁড়ি, কলসী বা জালা প্রভৃতি পড়ে থাকে তাতে জল সঞ্চিত হ'লে এনোফেলিস্ মশা সেই সব পাত্র খুঁজে খুঁজে বের ক'রে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রেখে যায়। সুতরাং বর্ষায় এদের বংশ যে অগুণিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

জলের মধ্যে ওদের ডিম কোথাও দেখতে পাওয়া যায় একটি একটি আলাদাভাবে কোথাও বা গুচ্ছাকারে, অন্যান্য মশার ন্যায় এনোফেলিসের লার্ভা জলের মধ্যে খুব বেশি কিলবিল করে বেড়ায় না। ওরা সাধারণতঃ জলের উপর সমান্তরাল রেখায় স্থির হয়ে অবস্থান করে এবং সেইভাবেই জল হ'তে খাবার সংগ্রহ ক'রে খায়। সুতরাং জলের মধ্যে

এনোফেলিসের লার্ভা চেনা খুব কঠিন নয়! শীতের সময় অন্ততঃ শীতের দেশে, ওরা অন্যান্য জাতীয় মশার ন্যায় ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। বনের মধ্যে গাছের ছাল, বাকল বা ফাটল প্রভৃতির ভিতর ঢুকে যায়।

ইডিস্ (Aedes) বা সোরোফোরা (Psorophora) নামক মশাদ্বয় পীতজ্বরের মশারই নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু এরা জলে ডিম না পেড়ে ভিজে স্যাঁতসেঁতে বা শুষ্ক জমিতে ডিম পাড়ে। কিন্তু যেখানে সেখানে নয়, পূর্বে যেখানে একবার বৃষ্টির জল জমেছিলো ডিম পাড়বার জন্য সেরূপ স্থানই এরা বাছাই করে। কারণ ডিম পাড়বার পর জল না পেলে ডিম ফুটে ছানা হ'তে পারে না। যেখানে ডিম পাড়বে বৃষ্টি হ'লে সেখানে জল জমা চাই।

উত্তর প্রদেশে যে সব স্থানের শীতের সময় বরফ জমে সে সব স্থানের মশা ডিম পাড়ে বরফ-গলা জলে। বরফ গলে শীতের শেষে। সুতরাং এরা বৎসরে একবার মাত্র বংশ উৎপাদন করতে পারে। বরফ-গলা শেষ হ'য়ে যাবার পর সে সব স্থানে যে সব মশা ডিম পাড়ে সে বৎসর তাদের ছানা হ'তে পারে না, তাদের ছানা হয় পর বৎসর। সে সময় বরফ গলে নতুন যে জল হয় সেই জলেই ডিম ফোটে। বরফ জমবার পূর্বে গরমের সময় বৃষ্টি হ'লেও সে জলে ওদের ডিম ফোটে না—ডিম ফোটবার জন্য ডিমের গায় একবার শীতের হাওয়া লাগা প্রয়োজন।

অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ প্রদেশে অথবা মরু-অঞ্চলে যে সব স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম সে সব স্থানে প্রতি পশলা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একবার ক'রে মশার বংশ বৃদ্ধি পায়। কিলবিলে ছানা হ'তে এদের পূর্ণ পরিণতি ঘটে অতি দ্রুত। একদিন বা দুদিনের মধ্যেই এদের কিলবিলে লার্ভা অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। কেননা বৃষ্টির জল গর্তের মধ্যে থাকে খুব অল্প সময়ের জন্য, রোদে শুকিয়ে যায়। কখনো কখনো কিলবিলে ছানাগুলির পরিণতি ঘটবার পূর্বেই জল শুকিয়ে যায়। সে ছানাগুলি তখন মরে যায়, কিন্তু অন্য ডিম হ'তে তখন ওদের বংশ রক্ষা পায়। বহুদিন জল না পেলেও ডিমের ভিতরের প্রাণ নষ্ট হয় না। মরু অঞ্চলে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল পরেও ডিম ফুটে ছানা হ'তে দেখা গেছে।

এনোফেলিস মশা সম্বন্ধে যত বেশি তথ্য জানবার সুবিধে হয় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। কেননা এদের মত এত বড় শত্রু মানুষের আর কেউ নয়।

এনোফেলিস কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সকলেরই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করবার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়। কয়েক শ্রেণীকে আমাদের সাংঘাতিক শত্রু ব'লে গণ্য করা হয়।

এনোফেলিস মশা চিনতে পারা যায় ওদের ডানার ফোটা ফোটা দাগ হ'তে। কামড়াবার সময় ওরা হুলটি ওদের শরীরের সঙ্গে একেবারে সোজা করে বিদ্ধ করে দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের লোকেরা এনোফেলিসের নাম দিয়েছে "এনাফোলীস প্রিগো" (prego) মানে "প্যারেক (nail) মশা।" কেননা কামড়াবার সময় চামড়ার উপরে ওদের দেখায় কাঠে বা দেয়ালে পোঁতা ছোট্ট একটি প্যারেকের মতো।

মশা রোগ বহন করবার সময়—তা ম্যালেরিয়াই হোক, পীতজ্বরই হোক বা অন্য রোগই হোক—ওদের দেহেই রোগের জীবাণু অনেকাংশে পরিণতি লাভ করে। মশা যে রোগ বহন করে তা প্রকৃতপক্ষে মশারই রোগ। একমাত্র রোগাক্রান্ত (infected) মশার কামড়েই আমাদের দেহে সেই রোগ সংক্রামিত হ'তে পারে।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এতক্ষণ এলোমেলো কথায় এত ডুবে ছিল যে, বুঝতেও পারেনি 'কে' কখন সে তার শোবার ঘর পার হয়ে এসেছে। গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে এতক্ষণ সে এণ্ট্রেন্স হলে পাই-চারী করছিল। তার বোধ হয় কখনও মনে একবারও উঁকি মারেনি,—ওটা তার ঘর নয়। এতক্ষণে ফ্রাউলিন বার্সংনার বাড়ি ফিরল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে তার সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছিল। তালার কথায় তার মনে যেন কেমন ভয় হল। একটু যেন কেঁপেও উঠল সে। এবার সে তার নরম কাঁধের ওপর সিল্কের শালটা জড়িয়ে দিল। এক মিনিটের মধ্যেই সে এবার ঘরে পৌঁছুবে। আর এত রাত্রে—এমন সময় নিশ্চয় কে তার ঘরে ঢুকবে না। তাই 'কে'-র যদি কোনো কথা তাকে বলবার থাকে ত এক্ষুনি বলতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কে তার ঘরের আলো নিভিয়ে রেখেছিল। তাই এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তাকে ফ্রাউলিনের সামনে পড়তে হবে। যার ফলে ফ্রাউলিন বেশ চমকে উঠবে। কিন্তু নষ্ট করার মত সময় ছিল না কে-র হাতে। তাই দ্বিধায় সে ফিসফিসিয়ে উঠল দরজার ফাঁক থেকে।

"ফ্রাউলিন বার্সংনার!" সমন জারির ভঙ্গী এতে নেই। কেমন যেন প্রার্থনার সুর।

"ওখানে কেউ আছেন নাকি?" চোখ দুটো প্রসারিত করে চারিদিকে তাকিয়ে ফ্রাউলিন জিজ্ঞাসা করল।

"আমি।" 'কে' বলল।

একটু হেসে এবার ফ্রাউলিন বার্সংনার বলল ঃ "ও হের কে? গুড ইভনিং। একথার পর সে তার হাতখানা 'কের' দিকে এগিয়ে দিল।

"আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। আপনার কি এখন সময় হবে?"

"এখন?" ফ্রাউলিন জিজ্ঞাসা করে। "কিন্তু এখন সময়টা কি খুব অস্বাভাবিক নয়?"

"রাত ন'টা থেকে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"ও! কিন্তু আমি যে থিয়েটারে গিয়েছিলাম। কি করে জানব, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

"আপনাকে আমি যে কথা বলব, তা' আজকেরই কোন ঘটনা সম্পর্কে, তাই বেশ জরুরী।"

"ও, বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি বড় ক্লান্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমার ঘরে আসুন, সেখানে বসে কয়েক মিনিট কথা বলা যাবে। আর তাছাড়া আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না। কারণ আমাদের কথায় অন্য সকলের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এখানে আপনি একটু-খানি অপেক্ষা করুন। আমি ঘরে গিয়ে আলো জ্বালবার পর আপনি এখানকার আলোটা নিভিয়ে দেবেন।"

'কে' কথামত কাজ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নতুন করে ফ্রাউলিন আবার তাকে ঘরে যাবার নিমন্ত্রণ করলে সে ফ্রাউলিনের ঘরে ঢুকলো।

একটা সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফ্রাউলিন বলল, "বসুন।" ক্লান্তির কথা ঘোষণা এমনভাবে করা সত্ত্বেও সে নিজে বিছানায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন কি সে তার মূল্যবান টুপিটাও খুলে রাখল না।

"হ্যাঁ, বলুন কি কথা। আমি বেশ কৌতূহল বোধ করছি।' সে তার পায়ের ওপর পা রাখল।

"বোধ হচ্ছে আপনি বলবেন," 'কে' বলতে শুরু করল। "আমার কথা এখন না বললেও কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু—"

"থাক্ থাক্। আর ভূমিকায় দরকার নেই।" ফ্রাউলিন জবাব দেয়।

"এ কথায় আমি বেশ আশ্বস্ত বোধ করছি।" 'কে' বলল। "আজ সকালে আপনার ঘরে যে গোলমাল হল, তার জন্য আমি কিছু পরিমাণে দোষী। যারা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তারা সম্পূর্ণভাবে আমার অপরিচিত। আর আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তারা এ সমস্ত করেছে। তবু যখন আমি আমার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন, তখন আমি এ ব্যাপারের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই।"

একথায় ফ্রাউলিন বার্সংনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে আনল ঘরের চারদিকে। 'কের' দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল, "আমার ঘর"?

"হ্যাঁ আপনারই ঘর।" 'কে' কথা কটি বলে চোখ তুলে তাকাল। এবার এই প্রথম 'কে' তার চোখের ছায়া দেখল ফ্রাউলিনের চোখে। "যেভাবে ঘরটিকে তচনচ করা হয়েছিল, সেকথা বলারও অনুপযুক্ত।"

"কিন্তু ঘটনার মধ্যে কি এমন কোন অংশ নেই, যাতে উৎসাহিত বোধ করা যেতে পারে?" ফ্রাউলিন বার্সংনারের প্রশ্ন।

'কে' বলল। "না।"

ফ্রাউলিন বলল, "বেশ তাহলে আমি আর এই ব্যাপারে কিছু জানতে চাইব না। আপনি যখন বলছেন, উৎসাহিত বোধ করার মত কিছুই নেই, তখন চুপ থাকাই ভাল। আপনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আর আমি তা মঞ্জুরও করলাম। বিশেষ করে আমি ত কোন অসুবিধার চিহ্নও খুঁজে পাচ্ছি না।" মুঠো-খোলা হাতে ঠোঁটের ওপর আঙুলে বোলাতে বোলাতে এবার সে ঘরে একবার পাইচারী করল। এর পর এক সময় সে মাদুরে-মোড়া দেওয়াল, যেখানে তার ফটো টাঙ্গানো ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হল।

"এ কি, আমার ফটোর এমন দশা কেন?" চীৎকার করে বলল ফ্রাউলিন, "বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই আমার ঘরে কোন লোক এসেছিল, যার এ ঘরে ঢোকবার কোন অধিকার নেই।"

'কে' কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল। আর বোধ হয় মনে মনে ব্যাঙ্কের কেরাণী কামিনারের মুণ্ডপাত করছিল। কামিনারই বা কেমন, সে কি ফটোটা নাড়াচাড়া না করে থাকতে পারল না।

"কি অসম্ভব ব্যাপার।" আবারও ফ্রাউলিন কথা বলে। "আমার মনে হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে যাতে আপনিও আমার ঘরে না আসেন, সে কথা আপনাকেও এখন আমার বলা উচিত।"

ফটোটার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে 'কে' বলল, "আমি ত আপনাকে ইতিমধ্যেই বলেছি ফ্রাউলিন যে, আপনার ছবিতে আমি হাত দিই নি। তবু যখন আপনি বিশ্বাস করছেন না, তবে ঘটনাটা শুনুন ঃ ইন্টারোগেসন কমিসন তাদের কাজের সুবিধার জন্য তিনজন ব্যাঙ্কের কেরাণীকে এনেছিল। তাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস কেউ এ কাজ করেছে। তবে আমি তাকে সহজে ছাড়ব না। সুযোগ পেলেই তাকে ডিসমিস করব।"

তবু ফ্রাউলিনের চোখে প্রশ্ন।

"আপনি হয়ত কিছুই বুঝতে পারছেন না। তবে আমার প্রত্যেকটি কথা সত্যি। আজকে সকালে এখানে ইন্টারোগেসন কমিশন এসেছিল।"

"আপনার জন্য?" ফ্রাউলিন জিজ্ঞাসা করল।

'কে' বললঃ "হ্যাঁ। আপনি কি ভাবেন, আমি কোন অপরাধ করতে পারি না?"

"আপনি অপরাধ করতে পারেন কি পারেন না, এই আপনার জিজ্ঞাস্য। তাই না? তবে দেখুন, এইঘটনা শুনেই আমি কোন মন্তব্য করতে রাজী নই। আর এই ঘটনার ত অনেক রকম অর্থই হতে পারে। আর তাছাড়া আপনাকে আমি ভাল করে চিনি না। তবে অপরাধের অভিযোগ নিশ্চয়ই বেশ গুরুতর। তা না হলে কি কোন লোককে জেরা করতে ইন্‌টারোগেসন কমিশন এসে উপস্থিত হয়। তবে আপনাকে দেখে মনে হয় জেল থেকে পালাবার মত কোন অপরাধ আপনি করেন নি।"

"হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক।" 'কে' বলল। "আমার মনে হয়, শীঘ্রই ইনটারোগেসন কমিশন বুঝতে পারবে আমি শুধু নিরপরাধীই নই। তারা আমার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে যে ধারণা করেছে, তাও ভুল।

এবার খুব সতর্ক হয়ে জবাব দেয় ফ্রাউলিন বার্সংনার। "নিশ্চয়ই এটা সম্ভব।"

'কে' আবারো এই একই কথার মোড় ধরে বললঃ "আপনার বোধ হয় আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই।"

"না আমার নেই। তবে দেখুন, আমি সব বিষয় সম্পর্কেই জানতে চাই। আর আইন আদালতের ব্যাপার আমার জানতে বেশ ভাল লাগে। আইন আদালতের এক মনোযোগ আকর্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাই না? তবে আমি খুব শীঘ্রই আমার এই অজ্ঞতার নিরসন করছি। কারণ আগামী মাস থেকে আমি এক আইনজীবীর কর্মচারী হিসাবে কাজ নিচ্ছি।"

"বাঃ বেশ চমৎকার তো। তাহলে ত আপনি আমার এই মামলার কিনারা করতে বেশ সাহায্য করতে পারেন।"

"তা হতে বাধা কি? কারণ আমি আমার জ্ঞান দিয়ে বেশী ফল পেতে চাই।"

"না না, আপনি আমার কথাটা হাল্কাভাবে নেবেন না। আমি আমার এই প্রস্তাবের প্রতি বেশ গভীরতাই আরোপ করছি। অবশ্য আমার মামলা খুবই সাধারণ। তাই কোন উকিল মোক্তারের দরকার নেই। একজন উপদেষ্টা পেলেই আমি বেশ ভালভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।

এবার ফ্রাউলিন বার্সংনার বললঃ "কিন্তু কারু উপদেষ্টা হবার আগে আমার জানা দরকার কোন ঘটনার বিষয়ে আমি উপদেশ দিচ্ছি।"

"এই ত হয়েছে মুশকিল। কারণ ব্যাপারটা আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পারছি না।"

"তাহলে আপনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন। আর এই এত রাত সম্ভবত ঠাট্টার জন্য অনুকূল নয়।" এই বলে ফ্রাউলিন ফটোটার পাশ থেকে সরে গেল। এতক্ষণ তারা এইখানে দাঁড়িয়েই আলাপ করছিল।

"কিন্তু ফ্রাউলিন," 'কে' বলল, "আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। আমি আপনাকে যতটুকু জানি বলেছি, কিন্তু তবু আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না কেন? আর তাছাড়া ইনটারোগেসন কমিশনটাও আসল নয়। আমি একে ইনটারোগেসন কমিশন নাম দিয়েছি, কারণ আমি বুঝতে পারছি না, অন্য কি নাম এর দেওয়া যেতে পারে। আর আমাকে কমিশন কোনরকম জেরা করে নি। আমাকে শুধু গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।"

সোফার ওপর বসে ফ্রাউলিন বার্সংনার এবার আরেকবার হাসল। আবার সে প্রশ্ন করলঃ

"তাহলে ওটা কিসের মতন?"

"ওঃ সে ভয়ানক কান্ড।" কিন্তু একথা বলার সময় 'কে' হয়ত ভাববার অবকাশই পেল না, কি সে বলছে। তার চোখ তখনও ফ্রাউলিনের ওপর। এক হাতের ওপর মাথাটা শুইয়ে রেখেছিল ফ্রাউলিন বার্সংনার। সোফা কুশনের ওপর তার এক হাতের কনুই যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্য কনুইটা সে খুব আস্তে কোমরের ওপর আলস্যে ভেঙ্গে রাখল। 'কে' মুগ্ধ হয়ে দেখছিল ফ্রাউলিনকে।

"আপনার জবাবটা ত খুবই সাধারণ ধরণের হল।" ফ্রাউলিন বলল।

"আপনি বলছেন খুব সাধারণ?" 'কে' এবার নিজের চেতনায় আবার ফিরে এল। "আপনাকে কি ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল দেখাব?" কথা শেষ করে মনে মনে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তবু সে নড়তে পারল না।

"আমি এখন বড় ক্লান্ত।" ফ্রাউলিন বার্সংনার বলল।

"হুঁ, আর আপনি বাড়িতে ফিরেছেনও খুব দেরী করে।"

"আর তাই আপনি আমাকে বকাবকি করছেন। অবশ্য বকুনি খাওয়াই আমার উচিত। তবে গোলমালটা কিভাবে পাকিয়ে উঠেছিল, তা আর দেখাবার কোন দরকার নেই। তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখন।"

"না না, দরকার আছে বৈকি। আমি আপনাকে এক মিনিটের মধ্যেই সব দেখাচ্ছি।" এই বলে 'কে' জিজ্ঞাসা করলঃ "আমি কি এই নাইট-টেবিলটা আপনার বিছানার পাশ থেকে সরাতে পারি?"

ফ্রাউলিন এই প্রশ্নে চেঁচিয়ে উঠল। "টেবিলটা সরিয়ে আপনি কি করতে চান! না না, টেবিলটা সরাবেন না।"

"কিভাবে সমস্ত ঘটনাটা ঘটল, তাহলে আর আপনাকে দেখাতে পারলাম না।" 'কে' কথাগুলি এমনভাবে বলল যে, মনে হয় তার ভয়ানক অপূরণীয় কোন একটা ক্ষতি হ'ল।

"ও ঘটনাটা দেখাবার জন্য আপনি টেবিলটা সরাতে চাচ্ছেন। তবে সরিয়ে ফেলুন, যে-কোনো উপায়েই আপনি ওটাকে সরাতে পারেন" ফ্রাউলিন বার্সংনার বলল, তারপর একটু থেমে তার কথার সঙ্গে আবার যোগ করল, "আমি এখন এত ক্লান্ত যে আপনি আপনার খুসীমত সব কিছুই করতে পারেন।"

'কে' টেবিলটা সরিয়ে ঘরের মাঝখানে রাখল, তারপর সে নিজে গিয়ে তার পেছনে বসল। "লোকগুলো কে কোথায় কি ভাবে ছিল, তার একটা ছবি নিশ্চয়ই এখন আপনার মনে থাকা দরকার। ব্যাপারটা ভারি মজার। আমি ইন্সপেক্টর। ওখানে ওই বাক্সটার ওপর ওয়ার্ডার দুজন বসে ছিল। আপনার ফটোটার পাশে তিজন যুবক দাঁড়িয়ে। আর মাঝে একবার বলে রাখা দরকার, জানালায় একটা সাদা ব্লাউজ ঝোলানো ছিল। ছবিটা হল মোটামুটি এই রকম। এখন আমরা আসল কথা সুরু করতে পারি। হায় হায়, আমি আমার নিজের কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। আর আমিই-তো এই ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আমি এই খানে এই টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইন্সপেক্টর তার পা দুটো আড়াআড়ি রেখে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারের পেছনে এই ভাবে সে তার হাতদুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। লোকটা একেবারে অসভ্য। এখন আমরা সত্যি সত্যি সুরু করতে পারি। ইন্সপেক্টরটি চিৎকার করছিল। তার চিৎকার শুনে মনে হয় সে বোধহয় আমার ঘুম ভাঙ্গাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু আসলে সে হল্লা করছিল।"

ফ্রাউলিন বার্সাংনার বেশ উৎসাহের সঙ্গে 'কের' কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু এবার সে তার ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে তাকে আস্তে কথা বলতে বলল। কিন্তু তখন বেশ দেরী-ই হয়ে গেছে। 'কে তার নিজের অভিনয়েই মশগুল। সে বেশ চিৎকার করে বলল, "জোসেফ কে," অবশ্য ইন্সপেক্টর যত জোরে চিৎকার করেছিল, তার থেকে আস্তেই কে চিৎকার করল; কিন্তু 'কের' গলার আওয়াজটা এমন ছিল যে, বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ থেকে শব্দটা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

পাশের ঘরের দরজায় তখন জোরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। কড়া নাড়ার শব্দে ফ্রাউলিন বার্সাংনার যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। সে তার বুকের ওপর হাত রাখল। 'কে' হঠাৎ বেশ চমকে উঠল। যে মেয়েটির সামনে

সে সকালের ঘটনাগুলো দেখাচ্ছিল, তার ওপর; এবং এই সংক্রান্ত ভাবনা থেকে মনকে সরিয়ে আনতে তার বেশ একটু সময় লাগল। সে যখন তার সম্বিৎ ফিরে পেল তখন, তাড়াতাড়ি ফ্রাউলিনের কাছে এগিয়ে এল, এবং তার হাতদুটো হাতের মুঠোয় তুলে নিল। সে তারপর আস্তে আস্তে ফ্রাউলিনের কানের কাছে বলল; "ভয় কি, আমি আছি। সব এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কে কড়া নাড়ল। পাশের ঘরে ত কেউ ঘুমুচ্ছে না।"

এবার তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস করে ফ্রাউলিন বার্সাৎনার বলল, "না, কাল থেকে ফ্রাউ গ্রুবাকের ভাই-পো একজন ক্যাপ্টেন ওখানে ঘুমুচ্ছে। অন্য কোনো ঘর না পাওয়ায়ই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি এ কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি এত জোরে চেঁচালেন যে, সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"গোলমাল কিছুই হয় নি।" তারপর যখন ফ্রাউলিন আবার কুশনে শুয়ে পড়ল, কে তার কপালের ওপর চুমু খেল।

তাড়াতাড়ি আবার উঠে বসল ফ্রাউলিন। "আপনি চলে যান এখান থেকে, চলে যান, এক্ষুণি চলে যান। আপনি কি ভেবেছেন। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।"

"আমি যাবনা" 'কে' বলল। আপনি একটু শান্ত না হলে আমি যাব না। চলুন আমরা ঘরের এক কোণে চলে যাই। তা হলে সে আর আমাদের কোনো কথা শুনতে পাবে না।', ফ্রাউলিন এবার আত্মসমর্পণ করল।

আবারো 'কে' বলল "আপনি ভুলে গেছেন, ব্যাপারটা আপনার পক্ষে অবশ্যই অপ্রীতিকর, তবে ভয়াবহ কিছু নয়। আপনি জানেন ফ্রাউ গ্রুবাকের এই ব্যাপারে বেশ হাত আছে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন যখন তার ভাইপো। আপনি বোধহয় এও জানেন, সে আমাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে। সে আমার ওপর নির্ভরশীলও বটে। আমি এমন কথাও আপনাকে জানাতে পারি যে, সে আমার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করেছে। আমাদের দুজনের এখানে একত্র থাকার যে কোনো কারণই আবিষ্কার করুন না কেন, আমি তাই তাকে বিশ্বাস করাতে পারব। আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, আপনার আবিষ্কার যদি সম্ভবপর হয় তবে তা' আমি শুধু ফ্রাউ গ্রুবাককে দিয়ে গ্রহণই করাব না, পরন্তু সে যাতে সত্য সত্যই তা বিশ্বাস করে সে ব্যবস্থাও করব। আমার কোনো কথা আপনার ভাববার দরকার নেই। আপনি যদি চান, আমি আপনাকে আক্রমণ করেছি, এমন কথা রাষ্ট্র হ'ক, আমি তাতেই রাজী আছি। আমি ফ্রাউ গ্রুবাককে তাই বলব। সে আমার ওপর এতটুকু বিশ্বাস না হারিয়েও এ কথা মেনে নেবে। সে আমার প্রতি এত অনুগত।"

ফ্রাউলিন বার্সাৎনার এ কথায় চুপ করে থাকল। কোনো কথাই তার মুখে ফুটে এল না। সে নীচে মেঝের দিকে তাকাল।

'কে' বলল: আমি আপনার ওপর হামলা করেছি, এ কথা কেন ফ্রাউ গ্রুবাক বিশ্বাস করবে না।" কে ফ্রাউলিনের চুলগুলো দেখছিল। ভেঙে পড়া চুলের সিঁথি। কয়েক গোছা চুল নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। তবু যেন বেশ সাজানো তার লালচে চুলের ঢেউ। সে আশা করেছিল ফ্রাউলিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথার উত্তর দেবে। কিন্তু মুখ না তুলে, কোনোরকম ভাব পরিবর্তন না করে ফ্রাউলিন বলল; "আমাকে ক্ষমা করুন। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেনের উপস্থিতি আমায় তেমন বিচলিত করে নি। আমি দরজার খুব কাছে বসেছিলাম, তাই আমার মনে হয়েছিল আমার ঠিক পাশেই বুঝি কেউ কড়া নাড়ছে। আপনি আমাকে যে কথা বলতে বললেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

আমার ঘরে যা' কিছু ঘটুক, আমি তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। আমার কিছু আসে যায় না কে কি ভাবল বা জিজ্ঞাসা করল। আপনার প্রস্তাবে আমার প্রতি যে অপমানকর ইঙ্গিত আছে তা' আপনি বুঝতে পারেন নি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। অবশ্য আপনার প্রস্তাব যে শুভ বুদ্ধিপ্রণোদিত তা আমি উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এখন আপনি যান। আমাকে একা থাকতে দিন। মানসিক শান্তির জন্য একটু নির্জনতার প্রয়োজন, এর আগে এত গভীরভাবে আমি কখনো অনুভব করিনি। আপনার কয়েকমিনিট আধ ঘন্টার সীমানাও পার হয়ে গেছে।"

'কে' ফ্রাউলিনের হাতদুটো ধরল। তারপর তার কব্জি দুটো ধরে জিজ্ঞাসা করল: "কিন্তু আপনি ত' আমার ওপর রাগ করেন নি?"

ফ্রাউলিন 'কের' মুঠো থেকে তার হাতদুটো মুক্ত করে এনে বলল; "না না, আমি কখনো কারুর ওপর রাগ করি না।" 'কে' আবারো ফ্রাউলিনের হাতদুটো ধরার ইচ্ছা অনুভব করল। ফ্রাউলিন এবার আর আপত্তি করল না। হাতদুটো 'কের' হাতের মুঠোয় দিয়ে সে তাকে দরজার দিকে নিয়ে গেল। 'কে' ইতিমধ্যে চলে যাবার জন্য তার মনকে তৈরী করছিল। কিন্তু দরজার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তার ভাব দেখে মনে হয় যে, দরজাটিকে সে ওখানে দেখবে আশা করেনি। ফ্রাউলিন এবার নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য দরজা খুলে এনট্রেন্স হলে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে ফিস্‌ফিস করে বলল; "লক্ষ্মীটি, এবার আসুন! দেখুন", সে ক্যাপ্টেনের দরজার দিকে আঙ্গুল তুলল। দরজার নীচে একফালি আলো দেখা যাচ্ছে।—"সে আলো জেলে আমাদের ব্যাপার দেখছে, আর এই ফাঁকে বোধহয় বেশ মজাও লুটে নিচ্ছে।"

"আমি আসছি," কে বলল। এই বলে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রাউলিনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর প্রথম সে তার ঠোঁট ফ্রাউলিনের ঠোঁটের ওপর রেখে চুমু খেলো। একটু পরে ফ্রাউলিনের সমস্ত মুখমণ্ডল 'কে' তার চুমুর রেখায় ভরে দিলো। তার চুমু খাওয়ার ধরনে মনে হয়, বহু অভীপ্ট স্বচ্ছ জলের ঝরনার ওপর তৃষ্ণার্ত একদল পশু লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সবচেয়ে শেষে সে ফ্রাউলিনের ঘাড়ে চুমু খেলো। সেখান থেকে মুখ সরিয়ে এনে ডান কাঁধে ঠোঁটদুটো অনেকক্ষণ ধরে রাখল। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে একটু গোলমালের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলল।

"আমি এখন যাচ্ছি। 'কে' বলল। সে বোধহয় ফ্রাউলিন বার্সাৎনারকে তার প্রথম নামে ডাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে নামটা জানত না।"

'কের' কথায় ফ্রাউলিন জোরে জোরে ঘাড় এলালো। তার একখানা হাত আলতোভাবে 'কের' দিকে চুমুর জন্য তুলে ধরল। সে এমনভাবে একটুখানি ঘুরে দাঁড়াল যেন সে কি করছে কিছুই জানে না। মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর সে তার নিজের ঘরে ফিরে এল।

ঘরে ফিরে এসে একটু পরেই 'কে' তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং শোবার সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর ঘুমে মগ্ন হল। কিন্তু শোবার আগে সে ফ্রাউলিনের প্রতি তার ব্যবহারের কথা একটু ভাবল। কিন্তু সব ভেবে সে খুসীই হল। তার শুধু আশ্চর্য লাগছিল এই মনে করে, যে আরো বেশী খুসী সে কেন হতে পারছে না; ফ্রাউলিন বার্সাৎনার তার মনে গভীর আঁচড় কেটেছে। আর ক্যাপ্টেনটাও কম ভাবিয়ে তোলেনি।

ক্রমশ

গ্রামের শিক্ষায় নাচ

শান্তিদেব ঘোষ

মাস কয়েক আগে বাঙলা দেশের এক সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৃত্য শিক্ষার প্রচলন বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি খুব কম লোকেরই হয়তো চোখে পড়েছে। তা নিয়ে ভাববার কিছু যে আছে এ ধরণের কোন চিন্তাও এ পর্যন্ত শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে দেখা যায়নি। সামান্য ভাবেই বিষয়টিকে দেখা হয়েছে বলেই বোধহয় সংবাদপত্রেও তাকে নিয়ে বিশেষ ফলাও করা হয় নি। কিন্তু এই সংবাদটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এবং আমার মনে হয় এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্দের একবার ভাল করে ভেবে দেখা উচিৎ। সংবাদটিতে প্রকাশ যে, "ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদপ্তর ভারতের স্কুল ও কলেজসমূহের বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি লোক-নৃত্য মনোনয়ন করিবার জন্য ভারতের সর্ববিধ লোক-নৃত্য পরীক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সকলরাজ্য-গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা চাওয়া হইতেছে।

সকল রাজ্য হইতে যথেষ্ট তথ্যাবলী সংগ্রহের পরে বিভিন্ন ভারতীয় লোক-নৃত্য শিক্ষা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে পারেন।"

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ যে ভারতের স্কুল কলেজে নৃত্যকলা চর্চার প্রতি মনোযোগী হয়েছে এ সংবাদে তা বোঝা যায়। এবং নৃত্যকলাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই এ সংবাদে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। কারণ ভারতে ইংরাজ শাসনের গত দেড়শ বছরের মধ্যে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত, ভারতবাসী মাত্রই এতদিন মনে করেছে যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যের স্থান হতে পারে না, নৃত্য চর্চা উচ্চজগনের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। এবং সকলেরই মনে ধারণা ছিল যে মানুষ হতে গেলে কেবল বই পড়া বিদ্যার দ্বারা বুদ্ধির চর্চাই যথেষ্ট, আনন্দের বা সৌন্দর্যের চর্চায় কোন আয়োজন সেখানে না থাকলেও চলতে পারে।

এতদিনের এই ভুলের প্রতিবাদ ভারতে প্রথম করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে প্রথম সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নৃত্যকে স্থান দিলেন। ক্রমে তাঁর সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের আরো কয়েকটি বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৃত্য-চর্চার আয়োজন করেছিল। সরকারীভাবে একমাত্র মাদ্রাজ সরকারের শিক্ষাবিভাগই গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেই প্রদেশেরই কয়েকটি দলবদ্ধ নাচকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত চর্চার অনুমতি দিয়েছে ও বহু সরকারী বিদ্যালয়ে তা শেখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত অন্য কোন প্রদেশের শিক্ষাবিভাগ এতদূর অগ্রসর হবার সাহস দেখাতে পারেনি। তারা সংশয় দোলায় দুলছে, ভাবছে নাচকে বিদ্যায়তনে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে স্থান দেওয়া উচিৎ কি অনুচিৎ, তাতে সমাজের ভাল হবে কি মন্দ হবে। সম্প্রতি বাঙলা সরকারের অধীনস্থ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য রচিত পাঠ্যতালিকায় নৃত্যশিক্ষার একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেইভাবে কাজ এখনো কোথাও আরম্ভ হয়েছে বলে শোনা যায় না।

ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগের তপোবনের শিক্ষায় শিক্ষিত মুনিঋষিরা সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা করেছেন। তখনকার দিনে তাঁরাই ছিলেন ঐ সব শিল্পের ধারক ও বাহক। বৌদ্ধযুগে বিহারগুলি সাক্ষাৎভাবে শিক্ষার সঙ্গে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা রাখেনি বটে, কিন্তু সে যুগের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ঐ সব শিল্পকলাকে এমনভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, বিহারে তার জন্যে আলাদা করে কোন ব্যবস্থা না থাকলেও রাজা থেকে সুরু করে তখনকার গ্রামবাসীরা নৃত্যগীত ইত্যাদি আরো বহুতর শিল্পকলার শিক্ষা আপনা হতেই পেত। আজও সেভাবে গ্রামের ছেলেমেয়েদের নৃত্যগীত ও অন্যান্য কলাকে গ্রহণ করতে দেখি ভারতের নানা অঞ্চলে। নাচ গান শেখবার জন্যে সেই সব গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই অথচ গ্রামের নারী পুরুষ নাচে গানে বিশেষ পটুত্বলাভ করে। কারণ গ্রামের আনন্দের জীবনের সঙ্গে সেই সব নাচ গান এমনভাবে যুক্ত যে, সেই সমাজে বাস করে তার প্রভাবকে এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে অসম্ভব। চেষ্টা না করলেও নৃত্যগীতের আবহাওয়াই তাদের নাচায়, তাদের গান গাওয়ায়। টোল মক্তব বা চতুষ্পাঠির যুগে বিদ্যালয়ে নাচ শেখবার ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু তখনকার গ্রাম সমাজও নাচকে একটুও অবহেলা করেনি। তার প্রতি সকলেরই ছিল যথেষ্ট টান, চর্চা ছিল ও গ্রামবাসীরা নাচতে ভালবাসত।

ইংরাজ যুগে শহরের নূতন সমাজ ব্যবস্থা, নাচের সেই প্রাচীন আবহাওয়াটিকে রক্ষা করতে পারেনি বলে নাচ সেখানে স্থান পেল না। অথচ এই যুগের বিদ্যালয়ও তাকে গ্রহণ করল না। এরদ্বারা উভয় দিক থেকে আমরা, নগরবাসীরা, নাচকে ত্যাগ করে, নাচে দেউলিয়া বনলাম। এইভাবে নৃত্যে অজ্ঞ ও রুচিহীন হয়ে আমরা একশবছরের উপর সময় কাটিয়েছি। নির্মল আনন্দ উপভোগের বিষয় এই নৃত্যকলাকে ত্যাগ করে মনে করেছিলাম মানুষের জীবনে এর কোন প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন কেবলমাত্র অলস বিলাসের জীবনে।

মাত্র ২৫ বছর পূর্বে সহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নৃত্যে বর্তমান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এতদিন শহরবাসীরা গ্রাম-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সহরকে কেন্দ্র করে, ইংরাজী সভ্যতার ভালমন্দে মিশে, সম্পূর্ণ নতুনভাবে যে নতুন সমাজ রচনা করেছে, তার চিন্তাধারা, আচার ব্যবহার, শিক্ষা দীক্ষায় দেখি গ্রাম সমাজে উদ্ভূত চিন্তা, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে বহু পরিমাণে অমিল। এই সমাজ গ্রামকে অবজ্ঞা অবহেলা করার দরুণ, গ্রামে উদ্ভূত ও এতদিনকার প্রচলিত অনেক কিছুকেই সে গ্রহণ করতে পারল না; অথচ নিজেরাও বহুদিন পর্যন্ত নানা শিল্পকলার ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি। শহরের সমাজের কাছে নাচেরও হল ঠিক সেই দশা। গ্রাম থেকে কিছু নিলও না, নিজেরা কিছু করলও না, তাই নাচের দিক থেকে তাদের উপবাসী থাকতে হয়েছিল, এতদিন।

গ্রামের মত সামাজিক নৃত্যের কোন আয়োজন শহরবাসীরা নিজেদের জন্যে আজও পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি। বর্তমান শহরের সমাজে নাচের যে আন্দোলন দেখি তার মধ্যে গ্রামের মত দলবদ্ধ সামাজিক নাচের কোন পরিকল্পনা আজও দেখা দেয়নি। নাচে শহরের এই আন্দোলনের মধ্যে আছে একটা ব্যবসাদারী মনোভাব। তাই প্রয়োজন হয় শহরের রঙ্গমঞ্চের, ভাড়াকরা সাজ পোষাকের, ভাড়াকরা যন্ত্রসঙ্গীতের দলের, টিকিট করে তবে সে নাচের আনন্দ পরিবেশন করা হয়। সকলে মিলে একসঙ্গে নৃত্যছন্দের আন্দোলনে কেবল আনন্দ উপভোগ করার মত আয়োজন এখনও সেখানে গড়ে উঠলোনা।

শহরবাসী আমরা যখন নৃত্যচর্চার আলোচনায় বর্তমানকালের অবনতির কথা তুলি, তখন নিজের অজান্তে গ্রামের কথা আমরা একেবারে ভুলে গিয়ে শহরের সমাজের কথাই বলি। বর্তমান যুগে নৃত্যবিষয়ে যাবতীয় চিন্তা শহরবাসীরা নিজেদের এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যেই করে থাকে। আমরা যখন বলি, এ যুগে আমাদের দেশে নাচের অবনতি হয়েছে তখন আমরা অত্যন্ত ভুল করি। সে অবনতির কথা সমগ্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে

কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। মুসলমানযুগের সভ্যতার উপরে অনেকেই দোষ দিয়ে বলেন যে, তার প্রভাবে ভারতীয় নৃত্য অনেকখানি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারত নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় তা মোটেই সত্য নয়। তখনও উচ্চ ও সাধারণ নানাশ্রেণীর নাচের চর্চা ভারতের নানা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বিশেষভাবে হত। এ যুগেও ভারতের যে সব অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব কম সেখানে ভারতীয় নৃত্যের আন্দোলন খুবই জাগ্রত। সেখানে ত আমরা কোনরূপ অবনতির পরিচয় পাই না। যেটুকু রুচি ভ্রষ্টতার লক্ষণ কোথাও কোথাও প্রকাশ পায়, ভালকরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তার মূল কারণ হল শহরের ভ্রষ্টরুচির প্রভাব। গ্রামের বহু রকমের নাচে উচ্চরুচির নিদর্শনে অনেককেই মুগ্ধ করে। আমরা যদি ধীর ভাবে চিন্তা করি, তা'হলে দেখব এতদিন আমরা শহরবাসী শিক্ষিতেরা নৃত্যকলা বিষয়ে ভালমন্দ যেসব কথা বলেছি তা খুব ভেবে চিন্তে বলিনি। রুচিহীন বলেই নাচকে আমরা এতদিন গ্রহণ করিনি বললে অন্যায় বলা হবে, আসলে ইংরেজ যুগের শিক্ষাই আমাদের নাচকে অবহেলা করতে শিখিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ নৃত্য শিক্ষাবিষয়ে যে কথা ভাবছেন তাদের এই ভাবনার জন্যে প্রশংসা করি, কিন্তু যে ভাবে কাজে নামতে চাচ্ছেন বলে সংবাদ বেরিয়েছে, যদি তা সত্যি হয় তবে বিশেষ ভয়ের কারণ আছে।

সংবাদটি পড়ে প্রথমেই প্রশ্ন জেগেছে, শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে নাচের যে ব্যবস্থা করতে চান তা কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে? মনে হয় যাদের মধ্যে নিজস্ব নাচ বলে কিছু নেই, যারা আজ একসঙ্গে গ্রাম সমাজের মত আনন্দে নাচতে জানে না, সেই নগরবাসী নরনারীদের জন্যে। নৃত্য বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের এই চিন্তার ভিতর দিয়ে তাদের কথাই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের মধ্যে নিজস্ব কোন ধারার নাচ নেই বলেই এত বাছাবাছির কথা উঠছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাদের মধ্যে নিজস্ব নাচের চর্চা রয়েছে, যে গ্রামবাসীরা যুগযুগ ধরে, শহরবাসী শিক্ষিতদের অবহেলাকে লক্ষ্য না করে, নিজেদের মধ্যে নাচকে সজীব রেখেছে, তাদের মধ্যেও কী এই নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী হবে? ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীরা যে বহু-রকমের নৃত্যের অধিকারী, সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পিত এই ইচ্ছা কার্যকরী হলে সেই সব নাচের কি হবে? নির্বাচিত নাচ গ্রহণ করে অন্য সব নাচ কি তারা ত্যাগ করবে? শিক্ষা বিভাগ বেছে বেছে গোটাকয়েক নাচকে যদি ভারতের সব বিদ্যালয়ে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বলে নির্দেশ করেন, তবে বিদ্যালয়ের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকল গ্রামবাসীরা তাদের প্রচলিত নাচগুলিকে অবশ্যই অবহেলা করবে। তা করবারও বড় কারণ আছে। ভারতের বর্তমান নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থাৎ ওয়ার্ধা প্রবর্তিত নইতালিম বা সার্জেণ্ট পরিকল্পিত শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম উৎসবগুলিকে স্থান দেওয়া হয় নি। অথচ ভারতের নানা অঞ্চলে নানাস্তরের হিন্দু সমাজের ধর্ম উৎসবগুলিই ছিল, নানারূপ শিল্পকলার বিকাশের উৎসব। উভয় শিক্ষা পরিকল্পনায় ধর্মউৎসবগুলিকে বিদ্যালয়ে স্থান না দেওয়ায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বর্ধিত প্রায় প্রত্যেক ছেলেই ধর্ম উৎসবের প্রতি অমনোযোগী হবে, এমন কি তাকে অশ্রদ্ধা ও অনাবশ্যক বলে মনে করবে। তাতে আপনা-থেকেই তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কলার মত নৃত্যকলার চর্চাও যে ধ্বংস হবে একথা নিশ্চিত করে বলা চলে। থাকবে কেবল শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত কয়েকটি নাচ। একথা মনে রাখতে হবে যে, এই ভাবেই একদিন বিদ্যালয়গুলি নাচকে অবহেলা করেছিল বলেই সেই শিক্ষায় বর্ধিত শহরবাসী শিক্ষিত মাত্রেই নৃত্যকলার প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করেছে।

এ যুগের বিদ্যালয়গুলি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং প্রাচীন গ্রাম সমাজের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নৃত্যগীতের যে শিক্ষা গ্রামবাসীরা পেত, এ যুগে তার দায়িত্ব গিয়ে পড়ছে বিদ্যালয়গুলির উপর। তাই বিদ্যালয় ছেলেমেয়েদের মনকে যে ভাবে তৈরী করবে সমাজের চিন্তা-ভাবনা সে ভাবেই রূপ নেবে। ধর্ম উৎসবের সঙ্গে জড়িত গ্রামে গ্রামে যে নানারূপ বিচিত্র নৃত্যকলার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টির ধারাটি ধর্মউৎসব বিহীন বিদ্যালয়ে আর কি ভাবে বজায় রাখা সম্ভব বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাঁদের অবশ্যই ভাবতে হবে। যদি তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনানুসারে অল্প কয়েকটি নাচের মধ্যেই এত বড় দেশের নৃত্য বৈচিত্র্যকে রুদ্ধ করে রাখতে চান তবে তা হবে মৃত্যুর সমান। এবং গ্রামের স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। ভারতের গ্রাম শিল্পীদের সৃষ্ট নাচের মত এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সেই বৈচিত্র্যের উৎসকে নষ্ট করার কোন কারণ যেন আমাদের হাতে না ঘটে। উপস্থিত উচিৎ হবে নাচের সম্পূর্ণ তালিকা রচনা হয়ে গেলে পরে, যে প্রদেশে যে সব নাচ আজও প্রচলিত আছে, সেই প্রদেশের বিদ্যালয়ে কেবল সেই সব নাচগুলিকেই অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নির্দেশ করা। যে অঞ্চলে নাচ নেই কেবল সেখানকার জন্যে নাচ নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে। তাতে করে প্রত্যেক প্রদেশে প্রচলিত গ্রামের নাচগুলি পুনর্জীবন পাবে ও দেশের মধ্যে তা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তখনই ভারতীয় নৃত্যের বহুরকম বৈচিত্র্যের অধিকারে আমরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অহংকার করতে পারবো। এই উপায়ে গ্রামের নাচগুলিকে দেশের মধ্যে আরো ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমরা উচ্চস্তরের নৃত্যকলায় যুগোপযোগী নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যেতে পারবো। সেই কারণে নতুন পরিকল্পনার দ্বারা এতদিনকার গ্রামে প্রচলিত নৃত্য বৈচিত্র্যগুলি যাতে নষ্ট না হয়, শিক্ষা বিভাগ যেন সেই পথে চিন্তা করেন। এবং বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের নৃত্য আন্দোলনকে সেই পথেই পরিচালিত করেন। শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে যে নাচই আজ নির্বাচিত হোক না কেন তাই হবে তাদের পক্ষে নতুন, সুতরাং সেখানে বাছাবাছির কোন প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু গ্রামের অবস্থা তো তা নয়। তাই নৃত্য বিষয়ে আমাদের যে কোন পরিকল্পনা রচনার সময় শহর ও গ্রামকে একসঙ্গে চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে, তবেই হবে সে পরিকল্পনা সার্থক। কারণ পূর্বেই বলেছি যে, গ্রামে নাচ আছে। তা আছে বলেই এ যুগের শহরবাসী শিক্ষিতদের নৃত্য আন্দোলনে সেই গ্রামের নাচগুলিই হল মূলভিত্তি। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে শহরবাসীদের ঐ গ্রামবাসীদের কাছেই ছুটতে হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতেও ছুটতে হবে। গ্রামবাসীরা নাচকে বাঁচিয়ে না রাখলে দেশে-বিদেশে যে সব ভারতীয় নৃত্যদল আজ নাচে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তা এত সহজ হত না। ভারতের সব শ্রেণীর মধ্যে নাচকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, গ্রামের সম্পদকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, তার বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে লুপ্ত হতে না দিয়ে, কি করে সকলের মধ্যে নাচকে নির্মল আনন্দের খোরাক হিসেবে প্রচার করা যায়, বিদ্যালয়ের নৃত্য পরিকল্পনার সেইটিই যেন হয় মূল লক্ষ্য।

ডাক টিকিটের মাপে যদি এক টুকরো মানুষের গায়ের চামড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাহলে তার মধ্যে ৩,০০০,০০০টি কোষ, এক গজ শিরা, ৪ গজ নার্ভ, ১০০টি ঘর্ম-গ্রন্থি, ১৫টি তৈল-গ্রন্থি, ১০টি কেশ, ২৫টি অনুভূতি কেন্দ্র, ২টি ঠাণ্ডা এবং ১২টি উত্তাপ অনুভবের কেন্দ্র আছে।

*

প্রায় দুবছর গবেষণা করার পর আমেরিকার বস্ এন্ড লম্ব্ কোম্পানী এক নতুন ধরণের ক্যামেরা বের করেছে যেটা চক্ষু-চিকিৎসকদের চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজে লাগছে। এই ক্যামেরার সাহায্যে চোখের ভেতরের ছোট শিরা, নার্ভ, নার্ভকেন্দ্র সবই পরিষ্কারভাবে তুলতে পারা যায়। চিকিৎসকেরা রোগীর চোখের অসুখ হলেই এখন এই ক্যামেরার সাহায্যে অনেকগুলো ছবি তুলে নিয়ে সেগুলোকে বর্ধিত করে পরীক্ষা করে কি ধরণের রোগ হয়েছে তা ঠিক করেন।

*

এটা পেনিসিলিনের যুগ—সব কিছুতেই এখন পেনিসিলিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন কি দাঁতের মাজনও পেনিসিলিন দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। বাজারে এটা ডেন্টোসিলিন নাম দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই নতুন দাঁতের মাজন দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত অনেক ভাল থাকে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০০টি ছাত্রের প্রায় ২ বছর ডেন্টো-সিলিন দিয়ে দাঁত মাজবার পর দেখা গেল যে, ছেলেদের আগে যতটা দাঁতের রোগ হত এখন তার প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ কম হচ্ছে।

*

মানুষ কত সরু তার তৈরী করতে পারে? সরুর কথা বলতে গেলেই বলি চুলের মত অথবা চুলের চেয়েও সরু। বর্তমানে চুলের ১/১০ ভাগের চেয়েও সরু তার তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই তার ·০০০১৫ ইঞ্চি মাত্র মোটা। আর এই তার বৈদ্যুতিক পরীক্ষার কাজে লাগান হচ্ছে।

*

এক ধরণের রবার তৈরী হয়েছে যা জাহাজের জলের ভেতরকার চাকা, মাটির নিচের যে কোন ধাতুর তার, নল অথবা যে সব বস্তু মাটি বা জলের মধ্যে থাকার দরুণ নোনা ধরে যায় এমন সব জিনিসের ওপর প্রলেপ দিয়ে দিলে ঐ সব জিনিস আর কখনোও নষ্ট হতে পারবে না।

*

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ Antoine Laurent Lavoisier-এর নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি। Lavoisier ১৭৪৩ সালে প্যারী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৬৮ সালে Academy of Sciencesএ ভর্তি হন। এখানে তিনি সেই সময়কার অনেক বিখ্যাত রাসায়নিকের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। ১৭৭১ সালে Lavoisier- Marie Anne Pierette-কে বিবাহ করেন। Pierette ছবি আঁকা এবং কাঠে খোদাইয়ের কাজে খুব পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি সারা জীবন Lavoisier-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্যে সাহায্য করেছিলেন। অক্সিজন গ্যাস প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের কত প্রয়োজনীয় Lavoisierই প্রথম পরীক্ষার দ্বারা দেখান। তিনিই প্রথম সমস্ত রসায়ন বস্তুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নামকরণ আরম্ভ করেন। এবং নিজে তেত্রিশটি নতুন রসায়ন বস্তু আবিষ্কার করেন। Lavoisierই 'হাইড্রোজন', 'অক্সিজন', 'ক্যালরি' কথাগুলির প্রবর্তক। এই সব রসায়ন বস্তু সূক্ষ্মভাবে ওজনের কোন যন্ত্র না থাকায় তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ভুলভাবে ওজন করবার নিক্তি তৈরী করেন। এ ছাড়াও Lavoisier বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহনির্মাণ প্রণালীর প্রবর্তন করেন। তিনি অর্থনৈতিক উপায়ে ব্যাঙ্ক ও কর প্রথার সংস্কার করেন।

*

কিন্তু এত বড় একজন বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু কাহিনী শেষ পর্যন্ত বড় দুঃখের। Lavoisierকে রাষ্ট্রের আদেশে প্রাণ হারাতে হয়। তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধরণের কর প্রথার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দল তাঁকে ধরে এনে বিচার-প্রহসন করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কারণ তাদের মতে রাষ্ট্রতন্ত্রে কোন বৈজ্ঞানিকের স্থান নেই এবং কোন প্রয়োজনই নেই। ১৭৯৪ সালের মে মাসে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়।

*

এমাজোন উপত্যকার কোন কোন অংশে এক জাতের লতা জাতীয় গাছ পাওয়া যায়, যার রস থেকে ঐ অঞ্চলের অসভ্যরা এক ধরণের পানীয় তৈরী করে। এই পানীয়কে ওরা yocco বলে। দেখা গেছে যে, yocco খেলে মানুষের কোন রকম নেশা হয় না অথচ কয়েক ঘণ্টার জন্য তার ক্ষিদে এবং ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই গাছের রসের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'কেফিন' জাতীয় বস্তু আছে। এই গাছ আমেরিকার অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না এবং এদের জন্মানও যায় না। ওখানকার অসভ্যরা এই yocco এত বেশী ভালবাসে যে, তাদের এর রস থেকে পানীয় তৈরীর ফলে এই গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসতে আরম্ভ করেছে।

*

সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগ দুরকমভাবে ধরা যায়—হয় এক্সরের সাহায্যে আর না হয় বি, সি, জি টীকার সাহায্যে। চিকিৎসকেরা কিন্তু এছাড়াও একটা সোজা উপায় বার করবার চেষ্টা করছিলেন যাতে আরো সহজেই যক্ষ্মা রোগ ধরা যায়। রকফেলার ইন্স্টিটিউটে এ নিয়ে গবেষণা করে একটা উপায় তারা বার করলেন।

*

সন্দেহযুক্ত রোগীর হাতের শিরা থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে নিয়ে ঐ রক্ত থেকে রক্ত কণিকাগুলো আলাদা করে নেবার পর সাদা জলীয় পদার্থ, যাকে 'সিরাম' বলা হয়, কোন একটা ভেড়ার রক্ত ঐভাবে বার করে নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর পর এই সিরাম মিশ্রিত ভেড়ার রক্ত সাধারণ রক্তের যে রকম উত্তাপ সেই উত্তাপে রাখা হয়। তারপর ঘরের উত্তাপে এক রাত্রি রাখা হয়। রোগীর শরীরে যদি যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থাকে তাহলে সেই রক্ত এই সময় জমে যাবে—আর যদি কোন জীবাণু না থাকে তাহলে রক্ত জমবে না। প্রায় ৯৫০টি রোগীর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা ৯২·৩ ভাগ ঠিক হয়েছে।

*

গত বৎসর বৃটেন থেকে সবশুদ্ধ ২২,১২,০০০টি সাইকেল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষই হচ্ছে সব চেয়ে বড় ক্রেতা। প্রায় ৩,৫০,০০০টি বাইসাইকেল এখানে রপ্তানি হয়েছে। মোটর সাইকেলের সব চেয়ে বড় ক্রেতা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। সে প্রায় ৩ কোটি টাকার ওপর মোটর সাইকেল কিনেছে। বৃটেন সবশুদ্ধ বাইসাইকেল আর মোটর সাইকেলে ৩৪ কোটি টাকা রপ্তানি করেছে।

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

লোকটি ধবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল—"আমাদের দলপতি উলম্ভন এই সমস্ত প্রদেশের অধিপতি। এ প্রদেশের সমস্ত নদী, বন, পর্বত, জমি, পশুপক্ষী তাহার অধিকারভুক্ত। উলম্ভনের প্রপিতামহ বনজিরা নিজের বাহুবলে একদা এই সমস্ত অঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া বেড়াইত। তাহারই বংশধর উলম্ভন এখন সরসরা নদীর তীরে বাস করিতেছে। উলম্ভনের আদেশ অনুসারে আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে, কন্যা নদীর তীরে এতদিন কেহ বসবাস করিতে আসে নাই বলিয়াই ইহা অনধিকৃত ছিল, তোমরা আসাতে উলম্ভন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, তোমরা কৃষিকর্ম করিয়া এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর ইহাই উলম্ভনের ইচ্ছা। কিন্তু একটি সর্ত আছে। তোমাদের উলম্ভনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।"

"বশ্যতা স্বীকার? সে আবার কি?"

ধবল সত্যই ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। আমরা কেহই পারি নাই। দীর্ঘকায় লোকটি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "এ প্রদেশের সকল লোকই উলম্ভনকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তোমাদেরও মানিয়া লইতে হইবে।"

"তাহাতে আমাদের লাভ?"

"লাভ আছে। তোমরা যদি কোনপ্রকার বিপদে পড় উলম্ভন সদলবলে আসিয়া তোমাদের সাহায্য করিবে। উলম্ভন বিপদে পড়িলে তাহাকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে। ইহারই নাম বশ্যতা স্বীকার। অবশ্য ইহার পরিবর্তে তোমাদের উলম্ভনকে মধ্যে মধ্যে কিছু উপহারও প্রেরণ করিতে হইবে।"

"কি উপহার?"

"পশুপক্ষী শিকার করিয়া পাঠাইতে পার। তোমাদের তৃণবীজ দিতে পার। প্রয়োজন হইলে তোমাদের বাড়তি যুবক-যুবতীদের দান করিতে পার।"

ধবল নির্বাক হইয়া রহিল। আগন্তুক ভীষণ-দর্শন এবং বলিষ্ঠ, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীও স্পর্ধা-ব্যঞ্জক, সহসা তাহার কথার প্রতিবাদ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়াই সে চুপ করিয়া ছিল। ভীড় ঠেলিয়া নিনানি কিন্তু আগাইয়া গেল এবং আগন্তুকের মুখের দিকে নির্ভয়দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করি উলম্ভন কি করিবে?"

আগন্তুক নিনানির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল তাহার পর বলিল, "উলম্ভন কি করিবে তাহা উলম্ভনই জানে। আমি তাহার আদেশ তোমাদের শুনাইয়া দিলাম। তোমরা প্রত্যুত্তরে যাহা বলিবে তাহাও তাহাকে গিয়া বলিব। তবে এটা ঠিক তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করিতে চাও, উলম্ভন তোমাদের সহিত শত্রুতা করিবে, অবশেষে তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

নিনানি বলিল, "বেশ, আমরা উলম্ভনের সহিতই গিয়া এ বিষয়ে আলাপ করিব। উলম্ভনের নিকট আমাদের প্রতিনিধি যাইবে। তুমি যখন এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলিতে পারিতেছ না তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া লাভ নাই। তুমি আসিয়াছ ইহাতে অবশ্য আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। এস, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সমাদর করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই, তবু যাহা আছে তাহা দিয়াই তোমাকে অভ্যর্থনা করিব।"

নিনানি চিরকালই সপ্রতিভ। সকলে যেখানে ইতস্ততঃ করে নিনানি সেখানে আগাইয়া গিয়া স্পষ্ট কথা সহজভাবে বলিতে পারে। ধবল পর্যন্ত তাহার ভয়ে ভীত। পাছে নিনানি অপর কাহাকেও বিবাহ করিয়া সমস্ত দলের উপর কর্তৃত্ব করে সেই আশঙ্কাতেই ধবল তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। নিনানি অপরাজিতা বংশের মেয়ে। আমাদের দলের কলঙ্গা দূর দেশ হইতে একদা তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিনানিকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলাম, কিন্তু ধবল অবশেষে তাহাকে দাবী করিল বলিয়া আমরা বঞ্চিত হইলাম। বস্তুতঃ নিনানিই আমাদের দলের প্রাণ ছিল। ধবল দলপতি ছিল বটে, কিন্তু নিনানির ইচ্ছাতেই সমস্ত হইত। নিনানির দিকে চাহিয়া ধবল মৃদুহাস্যসহকারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল। ভাবটা—আমার মনের কথাগুলি তুমি ঠিক গুছাইয়া বলিয়াছ।

আগন্তুক নিনানির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। নিনানির বক্তব্য শেষ হইলে বলিল, "তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি কে তাহা জানিতে পারি কি?"

"আমি? ইহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেই জানিতে পারিবে।"

নিনানি মৃদুহাস্যসহকারে আমাদের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কুরঙ্গিনীর মতো লীলায়িত গতিতে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘিসু আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল।

"নিনানি আমাদের দলপতির প্রিয়তমা পত্নী।"

"ও! তাহা হইলে তো আমি পরম সম্মানিত হইলাম। নিশ্চয়ই উঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়"

ধবল সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমরা সকলে নিনানির ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...শালপাতার উপর কিছু তৃণবীজ চূর্ণ, আগুনে ঝলসানো ছাগলের রাং, নারিকেলের খোলে কিছু মধু, কন্দ ও ফল সাজাইয়া দিয়া নিনানি আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। নিনানির অভ্যর্থনাপদ্ধতিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আগন্তুক সমস্ত খাদ্যগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল—"আপনারা অগ্রে আহার করুন, তাহার পর আমি আহার করিব। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের গৃহে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার অগ্রভাগ অন্নদাতাকে না খাওয়াইয়া আমরা খাইতে পারি না। ইহাই আমাদের নিয়ম। আপনারা খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করুন, তাহার পর আমি খাইব।"

নিনানি বলিল, "ইহাই যদি আপনাদের নিয়ম হয়, সে নিয়মের মর্যাদা আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিব। কিন্তু এই নিয়মের পশ্চাতে যে অবিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা আমাদের সম্মানকে আঘাত করিতেছে। অতিথিকে বিষ-প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবার প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। যাই হোক, আপনাদের নিয়ম আপনি পালন করুন। আমাকেও কিছু দিন—"

নিনানি দুই হস্ত পাতিয়া আগন্তুকের মুখের উপর তাহার ব্যঙ্গদীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আগন্তুক নিনানির প্রসারিত হস্তে একটু মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে ব্যঙ্গ অথবা ভর্ৎসনা করা বৃথা, কারণ আমি

আমাদের দলপতি উলম্ভনের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র।"

"ঠিক ঠিক।"

ধবল সোৎসাহে তাহাকে সমর্থন করিল।

নিনানি নিপুণতার সহিত মধু চাটিতে চাটিতে প্রশ্ন করিল—"তোমার নামটি জানিতে পারি কি?"

"আমার নাম গজন্ধর।"

গজন্ধর উবু হইয়া বসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল এবং যতক্ষণ আহারে ব্যাপৃত রহিল, একটি কথা বলিল না। আহারান্তে ধবলের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"বহুদিন এ ধরণের খাদ্য আহার করি নাই। আহার করিতে করিতে মনে হইতেছিল, আবার যেন শৈশবে ফিরিয়া গিয়াছি।"

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত ধবল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল। আমরাও ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নিনানি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সম্যকরূপে সম্বর্ধনা করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই। এখন কি কি দ্রব্য কিভাবে ভক্ষণ করা তোমার অভ্যাস তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে তদনুযায়ী আয়োজনের চেষ্টা করিব।"

গজন্ধর বলিল, "আমরা এই সব জিনিসই আহার করি, কিন্তু আমরা রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। মাটির পাত্র প্রস্তুত করিবার রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে। সেই সব মাটির পাত্রে আমরা তৃণ-বীজ সিদ্ধ করিয়া খাই। শাক-পাতা, কন্দ, ফল-মূলও সিদ্ধ করি। মাংসও সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। তোমরা যদি উলম্ভনের নিকট যাও, সবই দেখিতে পাইবে।"

"আমরা যাইব" -ধবল সোৎসাহে বলিল।

"তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাইতে চাও, তাহা হইলে অদ্যই সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। কারণ আমি আগামীকল্য সন্ধ্যায় উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি।"

ধবল ঘিসুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঘিসু, তুমি, আমি এবং ভঙ্গা চল যাই।"

ঘিসু এবং ভঙ্গা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপত্তি করিল না। আমার ভয় হইতেছিল, পাছে ধবল আমাকেও যাইতে বলে। কিন্তু বলিল না। বলিলে মুশকিলে পড়িতাম, কারণ সেই রাত্রেই আমি শিলাঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিভাবে যে তাহার সাক্ষাৎ পাইব, তাহা জানিতাম না, কিন্তু তবু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম যে, নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইব।

গজন্ধর নিনানির দিকে চাহিয়া বলিল—"দলপতির প্রিয়তমা পত্নীও যদি স্বামীর সঙ্গে গমন করে, উলম্ভন অতিশয় প্রীত হইবে।"

"বিনা আমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না—" নিনানি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

"আমি তো আমন্ত্রণ করিতেই আসিয়াছি। আমি সাদর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিতেছি।"

ধবল ভীত হইয়া পড়িল। নিনানিকে লইয়া গজন্ধরের দেশে যাইবার সাহস তাহার ছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমরা দুইজন অনুপস্থিত থাকিলে এখানে কাজের ক্ষতি হইবে।"

আমাদের দলের সমস্ত নারীরা একত্রিত

হইয়া গজন্ধরকে দেখিতেছিল। গজন্ধর তাহাদের দিকে দেখাইয়া বলিল—"এতগুলি স্ত্রীলোক তো রহিয়াছে, ইহারা কি দুই-চারি দিনের জন্য কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে না?"

ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "নিনানি যখন আসে নাই, তখন সমস্ত কাজ আমিই তো নির্বাহ করিতাম। জমির সমস্ত কাজ এখনও আমিই চালাই।"

নিনানি হাসিয়া বলিল—"এসব আলোচনা অতিশয় অবান্তর। আমাদের দলপতির সহিত উলম্ভন কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। উলম্ভনের সহিত আমাদের শত্রু সম্পর্ক অথবা মিত্র-সম্পর্ক হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এ অবস্থায় আমি তোমার সহিত যাইতে পারি না। উলম্ভন যদি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তখন তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিব।"

গজন্ধর ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বেশ তাহাই হইবে।"

...সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে গজন্ধরের সহিত ধবল, ঘিসু, ভঙ্গা চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমাদের প্রথামতো আমাদের কুলদেবতা নিম্ব বৃক্ষের নিকট তিনটি পারাবত বলি দেওয়া হইল। বলি দিবার জন্য আমরা বন্য পারাবত ধরিয়া রাখিতাম। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকের গলায় এবং হাতে কুমীরের এবং কাছিমের হাড়ের টুকরাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, কুমীর এবং কাছিম যেমন আত্মরক্ষায় দক্ষ, কেহ যদি তাহাদের অস্থি অঙ্গে ধারণ করে, সে-ও অনুরূপ দক্ষতা লাভ করিবে। কেহ বিদেশে গেলে আমরা তাহাদের গলায়, হাতে তাই কুমীর এবং কাছিমের হাড় বাঁধিয়া দিতাম। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কুমীর এবং কাছিমের হাড়ও সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ধবল, ঘিসু এবং ভঙ্গা অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর লইয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন হইতে ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি, ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভঙ্গার প্রবীণা পত্নী সাংরা উপবাস করিতে লাগিল। তাহাদের স্বামীরা না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহারা অন্ন গ্রহণ করিবে না—ইহাই আমাদের নিয়ম ছিল। তাহারা চলিয়া যাইবার পর নিনানি আর একটা কাজও করিল। আমাদের দলে চন্মনা নামে একটি দুঃসাহসিক যুবক ছিল। নিনানির আদেশে সে ধবল, ঘিসু ও ভঙ্গার অনুসরণ করিল। নিনানি তাহাকে বলিল—"তুমি দূরে দূরে উহাদের অনুসরণ করিবে। উহাদের গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে। গজন্ধরের আচরণে যদি কোনওপ্রকার দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাও, কিম্বা ধবল, ঘিসু বা ভঙ্গার যদি কোনও বিপদ হইয়াছে বোঝ তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের খবর দিবে। সর্বদা সজাগ থাকিও।" চন্মনা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই নিনানির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। চন্মনা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আমাদের দলের বিঘাও এমন একটি কান্ড করিয়া বসিল যাহাতে আমরা সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। বিঘাও সহসা মূর্ছিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে উপদেবতা ভর করিত। ইতোপূর্বে মূর্ছিত অবস্থায় সে দুই একবার আতঙ্কজনক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সেগুলি ফলিয়া যাওয়াতে আমরা তাহার মূর্ছাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। প্রথমবার বিঘাও বলিয়াছিল—"জিনার দিন ফুরাইয়াছে। অশ্বত্থদেবতা তাহাকে যদি সাহায্য না করে সে বাঁচিবে না।" জিনা ছিল আমাদের দলের একটি বৃদ্ধা। ভবিষ্যদ্বাণী করিবার কিছুদিন পরে সে মরিয়া গেল। যদি সে না মরিত বিঘাও নিশ্চয়ই বলিত যে, অশ্বত্থদেবতার সহায়তাতেই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতাই আমাদের তখন ছিল না। আমরা প্রত্যেকে ভূত প্রেতের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতাম। শুধু যে তাহাদেরই ভয় করিতাম, পূজা করিতাম তাহা নয়। যাহার যাহার মুখ দিয়া তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত তাহাদেরও আমরা ভয় করিতাম, তাহাদেরও আমরা সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইতাম। সে যুগে একটা অদৃশ্য প্রবল শক্তির নিকট আমরা সকলে যেন দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না। এইজনাই নিনানি ধবলকে বিবাহ করিয়াছিল, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দলপতির কথা অমান্য করিলে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে। ধবলের প্রমাতামহ কানা ছিল, তাহার প্রেতাত্মা ধবলের রক্ষণাবেক্ষণ করে ইহা সকলে জানিত এবং মানিত। ক্ষেতে ফসল না হইলে আমরা মনে করিতাম সেই একচক্ষু উপদেবতা রুষ্ট হইয়া আমাদের ফসল নষ্ট করিয়া দিতেছেন। রুষ্ট উপদেবতাকে তুষ্ট করিবার নানাবিধ পদ্ধতি ধবলের জানা ছিল বলিয়াই ধবল আমাদের দলপতি হইয়াছিল। রুষ্ট দেবতা কিছুতেই তুষ্ট না হইলে অবশেষে আমরা সে জমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমিতে চাষ করিতাম, ভাবিতেই পারিতাম না যে, জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। ধবলের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইত। মনে হইত জমিতে উপদেবতার যে পাপদৃষ্টি লাগিয়াছে তাহা দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত। ধবলের অলৌকিক শক্তির উপর আমরা অগাধ বিশ্বাস পোষণ করিতাম। আমাদের দলে এ বিষয়ে ধবলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিঘাও। কারণ তাহারও অলৌকিক শক্তি ছিল। সুতরাং বিঘাও মূর্ছিত হইয়া পড়াতে আমরা সকলেই খুব ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে তখন প্রেতকে শান্ত করিবার যে উপায়টি সাধারণ লোকে জানিত সেই উপায়টিই আমরা অবিলম্বে অবলম্বন করিলাম। বিঘাওকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া গান করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে সুকণ্ঠী যে রমণীরা ক্ষেতে কাজ করিতেছিল (তখন মেয়েরাই প্রধানত ক্ষেতের কাজ করিত) তাহাদেরও ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা কন্না নদীতে স্নান করিয়া আসিল এবং আলুলায়িত সিক্ত কেশে বিঘাওকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। তাহারাই হইল মূল গায়িকা, আমরা সকলে তাহাদের দোহারকি করিতে লাগিলাম। গায়িকাদের মধ্যে নিনানিও ছিল। কিছুক্ষণ গান চলিবার পর বিঘাও বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমি ধবলের প্রমাতামহ। আমার ইচ্ছা নিনানি সিক্ত কেশ দিয়া আমার পা মুছাইয়া দিক। তাহার পর আমি ব্যক্ত করিব কেন আমি বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়াছি।"

...

নিনানির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিঘাওয়ের দুই পায়ে কুষ্ঠের মতো একপ্রকার ঘা ছিল। কেশ দিয়া সেই পা মুছাইয়া দেওয়া সত্যই কঠিন কাজ। কিন্তু যতই কঠিন হউক নিনানি আপত্তি করিতে পারিল না। কোনও প্রেতাত্মার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও তখন ছিল না। থাকিলেও সে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস পাইত না। আপত্তি করিলে সমস্ত দলের আক্রোশ তাহার উপর গিয়া পড়িবে। সমস্ত দলের হিতাহিত প্রেতাত্মারাই নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশ্বাস আমাদের মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং দলের মঙ্গলের জন্য প্রেতাত্মার আদেশ আমাদের সকলকেই শিরোধার্য করিতে হইত। এখনও তোমরা সমাজের হিতার্থে যেমন অনেক অপ্রিয় আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হও, আমরাও তেমনি হইতাম। পরলোকই তখন ইহলোককে শাসন করিত এবং পরলোকের প্রতিনিধি ছিল বিঘাওয়ের মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকেরা।

বিঘাওয়ের রক্ত পুঁজমাখা চরণ দুইটি নিনানি তাহার সিক্ত কেশ দিয়া মুছাইয়া দিল। তাহার পর সে মূর্ছিত বিঘাওকে প্রশ্ন করিল—"এবার আমি স্নান করিয়া আসিব কি?"

"না। ধবল না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তুমি তোমার কেশ ধৌত করিবে না।"

আমরা সকলে নির্বাক হইয়া রহিলাম।

বিঘাও বলিতে লাগিল—"তোমার অহঙ্কৃত উক্তিই ধবলকে উলম্ভনের নিকট যাইতে বাধ্য করিয়াছে। ধবল যতক্ষণ না নিরাপদে ফিরিয়া

আসে ততক্ষণ তোমাকে অস্নাত থাকিতে হইবে। এইবার আমি কেন আসিয়াছি শুন। আমি সাবধান করিতে আসিয়াছি। তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তোমাদের নিকট সে কবে আসিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে তোমাদেরই চক্ষু। তাহার পদধ্বনি অভ্রান্তভাবে শ্রবণ করিতে পারে তোমাদেরই কর্ণ। তোমরা চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া বিঘাও নীরব হইল। আমরা আবার গান গাহিতে লাগিলাম, কারণ তখনও পর্যন্ত বিঘাওয়ের মূর্ছা ভঙ্গ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে বিঘাও আবার বিড়বিড় করিয়া কথা বলিতে লাগিল। "উলম্ভনের সহিত ধবল বন্ধুত্ব করিতে গিয়াছে বলিয়া তোমরা উল্লসিত হইও না। বন্ধুত্ব এবং দাসত্বের প্রভেদ অতি অল্প। স্বাধীনতার মূল্যে বন্ধুত্ব লাভ করিতে হয়, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া লোকে দাসত্বও বরণ করে। ধবলের স্বাধীন বুদ্ধি যাহাতে আচ্ছন্ন না হয় তাহার জন্য তোমরা নিম্বদেবতাকে রক্তচর্চিত কর। আবার বলিতেছি, চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

বিঘাও আবার নীরব হইল। নিনানি এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, এইবার সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারের কোনও ভাষা নাই, তাহা কেবল চীৎকার মাত্র। মনে হইল, আকাশ বাতাস যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল। আমরা সকলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুই হস্তে তাহার মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে মধুর বহ্নিদীপ্তি নাই, তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরের স্বতোৎসারিত প্রতিবাদ যেন চোখের ভাষায় বলিতে চাহিতেছে—এ অন্যায় আদেশ আমি মানিব না। চীৎকার করিতে করিতে নিনানিও অজ্ঞান হইয়া গেল। আমরা যন্ত্রচালিতবৎ পুনরায় গান গাহিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—কেহ অজ্ঞান হইয়া গেলে গান গাওয়াই নিয়ম ছিল—আমরা মনে মনে ইহাও প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে, নিনানির মুখ দিয়া আমরা হয়তো অন্য কোনও প্রেতাত্মার নির্দেশ শুনিতে পাইব, কিন্তু বিঘাও সহসা বলিল—"উহাকে তোমরা ঘরের ভিতরে লইয়া যাও।" সবিস্ময়ে দেখিলাম, বিঘাও উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখে মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সে হাসি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বিঘাওকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম। কারণ সে ছিল যাদুকর। যাদু-শক্তিবলে সে অঘটন ঘটাইতে পারে এই বিশ্বাস সে আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ধবলের সহিত তাহার মূলত বিরোধও ছিল এইখানে। ধবলেরও অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু তাহাকে আমরা ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, তাহাকে লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতেও আমাদের বাধিত না, তাহাকে কখনও ভয় করি নাই। কারণ ধবল কখনও নিজের শক্তিতে আস্ফালন করিত না। এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তিকে প্রার্থনা করিয়া সে সমস্ত দলের কল্যাণ সাধন করিত। বিঘাও কিন্তু নিজেই ছিল শক্তিমান। নিজের যাদুশক্তি বলেই সে যে কোন লোকের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, সে যেন মনুষ্যরূপী সর্প বা ব্যাঘ্র। ধবলকে সে মনে মনে অবজ্ঞা করে ইহাও আমরা জানিতাম। একদা সে গোধিকা-সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল শুনিয়াছিলাম। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তাহারই অভিশাপে নাকি গোধিকা সম্প্রদায় মহামারী রোগে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পর্যটক মীংরার সহিত ইহার দেখা হয়। মীংরাই ইহাকে আমাদের দলে আনিয়াছিল, ধবলকে বলিয়াছিল, 'বিঘাও শক্তিশালী লোক, ইহাকে দলে রাখিলে অনেক আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, ইহার যাদুশক্তি তুচ্ছ করিবার মতো নহে, ইহাকে আশ্রয় দাও।' মীংরার কথাতেই ধবল বিঘাওকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বিঘাও ধবলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে। অনেকের কাছে সে বলিত—'যে লোক নিজে শক্তিমান নয়, কেবলমাত্র প্রার্থনা করিয়া দেবতার শক্তিকে কাজে লাগাইতে চায়, তাহার নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। অক্ষম লোককে দেবতা দয়া করেন না, দেবতা কাহাকেও স্বেচ্ছায় দয়া করেন না, নিজের শক্তিবলে দেবতার দয়া আদায় করিয়া লইতে হয়। ধবলের সে শক্তি আছে কিনা সন্দেহ।' তাহার কথাবার্তা আমরা সভয় বিস্ময়ের সহিত শুনিতাম। অনেকের মধ্যে এ ধারণাও হইয়াছিল যে, ধবলের পরিবর্তে সে যদি আমাদের দলপতি হয় তাহা হইলে আমরা বোধ হয় নিরাপদ হইব। ধবল কিন্তু এসব বিষয়ে সচেতন ছিল না। সে ছিল আনমনা আপনভোলা লোক। কন্যা নদীর তীরে তীরে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রধান কাজ। পূর্বেই বলিয়াছি, সে কন্যা নদীর মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিত। তাহার আর একটি আকর্ষণও ছিল। নিনানি। নিনানিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, নিনানিকে সে ভয়ও করিত, তাই নিনানির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। বিঘাও ঠিকই ধরিয়াছিল। নিনানির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই সে উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।......নিনানিকে ধরাধরি করিয়া আমরা কুটিরের ভিতর লইয়া গেলাম। কয়েকটি রমণী তাহাকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। আমিও কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত গান গাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছিল। শিলাঙ্গীর সন্ধানে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ



সৃষ্টি-সংহার

হীরালাল দাশগুপ্ত

বিকলাঙ্গ কঙ্কালের কামনা-কুয়াশা ঢাকা—ধূম্র-ধূমল—
নগরীর নীল চোখে বিলম্বিত ধূসর হতাশা!
সহস্রের নিপীড়নে বক্র দেহ—শীতল-কঠিন—
মৃত্তিকার রক্তে লাল ইঁটের পৃথিবী
সিমেন্ট-শৃঙ্খল-ছন্দে মুক্তি মাগে সূর্যসমীপেষু!
সূর্য-বীর্যে সত্য হবে স্বপ্ন-সম্ভাবনা,
লোহার গাঁইতি ঘায়ে মুক্ত হবে ইঁটের বন্ধন।
হে সময়!
হে সহর!

জন্ম আর সঙ্গমের মুখোমুখি,
তুমি আর আমি শুধু সমুদ্রের ঢেউ—
পরমাণু পারাপারে প্রেতায়িত ছায়া!
ইতিহাস গুপ্তদ্বার পথে
ভাবনা অরণ্য নীল বারংবার বিভ্রম-বিলাস—
অতীতের মৃতদেহে আশ্চর্য আলোর দম্ভ
আগামীকালের!
অন্তরের ঐক্যতান
ঊর্ধ্বগতি অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়,
অসমাপ্তি টেনে দেয় সমাপ্তির রেখা
শতছিদ্র নিশীথের স্থূল তমিস্রায়!
হে সময়!
হে সহর!

তবুও আকাশ, পৃথিবী, প্রণয়, নক্ষত্র—
শুধু অন্ধগতি মৃত্যু-দুর্নিবার!
অর্থহীন উত্তর দক্ষিণ অধঃ ঊর্ধ্ব পথের বিচার।
সমুদ্রের তীরে তীরে নতুন জাহাজ আর নতুন বন্দর,
হৃদয়-বাণিজ্য আর পণ্য-বিনিময়,
নগর নিতম্বে নিত্য নব পদধ্বনি,
মাইল মাইল লৌহরেখা পর্বতে প্রান্তরে—
পথে পথে এ পরিবাহন—
এই সত্য শুধু,
—জীবন-বেদের মন্ত্র ব্যাকরণহীন—
সূর্য-স্তম্ভ পাতালপুরীতে!
হে সময়!
হে সহর!

ইন্দ্রজিতের আসরে

প্রায় পনের বৎসরের ব্যবধানে হঠাৎ আমার এক বিস্মৃত-প্রায় বন্ধুর চিঠি পেয়ে সেদিন একেবারে চমকে উঠলুম। এতটা অবাক হবার কারণ ইনি কখনো চিঠি লেখেন না, অবশ্য আমিও লিখি না। বাক্যালাপে আমি যেমন ওস্তাদ, পত্রালাপে তেমন নই। মুখের বচনেই বিশ্বাস করি, ডাকের বচনে নয়। যে সব বন্ধুরা দূরে চলে যান ডাকঘরের মারফৎ, তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারিনে। হাতের কাছে যাঁদের পাই, তাঁদের নিয়েই মত্ত হয়ে থাকি। নিকটের দাবীকেই মানি, দূরেরও যে দাবী আছে, সে কথা ভুলে যাই।

যে সব বন্ধু নিয়ে ইদানীং আমার দৈনন্দিন জীবন কাটছে, তাঁদের সঙ্গে আমার জীবন এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে যে, কিছু বলতে গেলেই এঁদের কথা আপনি এসে যায়। যাঁরা আমাকে জানেন, তাঁরা এই বন্ধু-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার কথা কখনো ভাবেন না। আমাকে জানলে আমার বন্ধুদেরও জানতে হয়। কিছুদিন আগে দুটি ভদ্রলোক বলছিলেন, আপনার লেখার ভিতর দিয়ে আপনার বন্ধুদের সঙ্গেও আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় হয়ে গেছে। কথাটি শুনে বড় ভালো লাগল। বলা বাহুল্য, এঁদের এই উক্তিটি আমার বন্ধুদের জানিয়ে রেখেছি। কারণ মনে মনে আমার ভরসা আছে যে, ভবিষ্যতে কোন না কোন বন্ধু চন্দ্রনাথ বসুর মতো বন্ধুবৎসল ইন্দ্রজিৎ নাম দিয়ে নিশ্চয় আমার জীবন-কাহিনী লিখবেন। তাঁদের লেখার মধ্যে যদি কোথাও আমার পরিচয় না মেলে, তবে বুঝতে হবে বন্ধুত্বের মর্যাদা তাঁরা রাখেন নি।

মনের মধ্যে এই অভিমানটুকু রেখেছিলাম বলেই সেদিন এই বিস্মৃতপ্রায় বন্ধুটির চিঠি পেয়ে এতখানি ধাক্কা লাগল। আমি নিজেকে বন্ধুবৎসল বলে গর্ব করে থাকি। কিন্তু আমিই কি বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছি? নিজের মনে নিজেকে বারম্বার ধিক্কার দিতে হ'ল। অথচ এঁকে ভুলবার কথা নয়। ইনি আমার শৈশবের বন্ধু। ইস্কুলে নীচের ক্লাস থেকে একসঙ্গে পড়েছি। তারপরে যেমনটা হয়। আমি পরীক্ষা পাশের ঢেউএ ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে এসেছি। বন্ধুটি ম্যাট্রিকের সীমানা পার হয়ে আর অগ্রসর হন নি। পূর্ববঙ্গের এক পল্লীতে পৈত্রিক ব্যবসা কবরেজী করেন। ছুটিছাটায় দেশে যখনি গিয়েছি, বন্ধুটি খবর পাওয়া মাত্র কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন। অনেক স্নিগ্ধ অপরাহ্ন সুখ-দুঃখের গল্প করে কাটিয়েছি। ইতিমধ্যে অনেকদিন দেশে যাওয়া হয় নি। দেশ বিভাগের পরে তো মোটেই নয়।

সেই বন্ধুটির চিঠি। ছোট্ট পোস্টকার্ডে ক'টি মাত্র কথা লিখেছেন। কেমন আছি, ছেলেমেয়ে ক'টি, বড়টির বয়স কত হল। পড়াশুনা কি করছে ইত্যাদি। নিজের কথা বিশেষ কিছুই লেখে নি—শারীরিক ভালই আছে, এইটুকু মাত্র। খুব সামান্যই লিখেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে হঠাৎ এই চিঠি লিখবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু না-বলা অনেক কথা চিঠির ফাঁকে ফাঁকে থেকে গেছে। ইংরেজি-মতে লাইনের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে গেলে সে সব কথা অনায়াসে চোখে পড়ে। বন্ধুটি এখনও পূর্ববঙ্গেই রয়েছেন। আত্মীয়-বান্ধব সকলে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। আত্মীয়হীন নির্বান্ধব সংসারে কতখানি অসহায় বোধ করছেন চিঠিতে কিছু না লিখলেও বুঝতে বাকি থাকে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন—নির্বান্ধব সংসারে কোথাও যদি একজন বন্ধুও থাকে। নিরানন্দ জীবনে ঐটুকু সান্ত্বনার মূল্য অনেক।

পূর্ববঙ্গে যে ট্রাজেডি ঘটেছে তার দৈহিক দুর্গতি এবং আর্থিক ক্ষতির দিকটাই আমরা বড় করে দেখেছি। মানুষের ভিটে-মাটি উচ্ছন্নে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কত মধুর সম্পর্কের উচ্ছেদ হয়ে গেছে, সে হিসেব কে রাখে? ভাই ভাইকে ছেড়ে চলে এসেছে। এক ভাই প্রাণের দায়ে পালিয়েছে, আর এক ভাইকে প্রাণের দায়েই থাকতে হয়েছে। চলে এসে যাবে কি? আপন মানুষে পর হয়ে গেল—এর চাইতে দুর্দৈব সংসারে আর কি হতে পারে? সুখ-দুঃখের ভাগী আত্মীয়-বান্ধবের বিচ্ছেদ মনের উপরে যে কত বড় নিপীড়ন আজকের কলরবের মধ্যে, সেই কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। আমার বন্ধু-পত্নীটির কথা মনে পড়ে। আত্মীয়বিধুরা Ruthএর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—She stood in tears amid the alien corn. পূর্ববঙ্গের কত প্রীতি-উজ্জ্বল স্মৃতি আমাদেরও বুকে বাসা বেঁধে আছে।

অন্যান্য দেশের বিপ্লবে যে প্রচণ্ড তোলপাড় ঘটেছে, আমাদের দেশেও তাই ঘটল। একে বিপ্লবই বলা চলে। অথচ এর মধ্যে গৌরবের কিছুই নেই। বিপ্লব যতখানি দেয় বেদনা তার চাইতে বেশি দেয় চেতনা। সেইখানেই বিপ্লবের সার্থকতা। অচৈতন্য মানুষের কার্যকলাপ বিপ্লবের বিকল্প রূপ। মানুষের অবচেতন মনে যে প্রচ্ছন্ন পশু বিরাজমান, তারই বাহ্য প্রকাশ। বিপ্লবের পশ্চাতে যে মহত্তর আদর্শের প্রেরণা থাকে, তারই অভাবে আমাদের এই তথাকথিত বিপ্লব এমন বিকৃত এবং বীভৎস আকার ধারণ করেছে, যা পৃথিবীর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

কথা বলতে বলতে কথার সুর বদলে গেছে, বেশ টের পাচ্ছি। কি করব বলুন। সামান্য কথাকে একটু দার্শনিকতার রাংতা মুড়ে জাহির করবার সস্তা লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারিনে। কিন্তু আর নয়। বিগত দিনের বন্ধুত্বের কথা বলছিলাম। জীবনের ঘাটে ঘাটে কত বন্ধুত্বকে অতিক্রম করে এসেছি। কলেজ-জীবনে যে তিনটি বন্ধু দিবারাত্রির সহচর ছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়? এঁরা কেউ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে কলকাতা জনশূন্য মনে হ'ত। এখন বৎসরের পর বৎসর যায়, তাঁদের খবর পাই না, খবর নেবার চেষ্টাও করি না। সঙ্গী-সাথী বন্ধু ছাড়া আমার দিন কাটে না, অথচ ভাবতে গেলে দেখি বন্ধুত্বের প্রতি আমার মন অত্যন্ত নিরাসক্ত। নইলে কলেজোত্তর জীবনে যে দুই বন্ধুর সঙ্গে দৈবযোগে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল, তাঁদের ছেড়ে এসে সেই ভাঙ্গা-মন আবার জোড়া লাগাতে পারব, সেকথা তখন ভাবতেও পারি নি। আমাদের এই তিন বন্ধুর সংযোগে যে ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছিল, সেটাকে একটা ছোটখাটো phenomenon বলা যেতে পারে। বারান্তরে সে কাহিনী আপনাদের কাছে বলব।



কিন্তু মহিমদা—"

"বুঝেছি অরুণ, তুমি কি বলতে চাচ্ছ। ভাবছ মহিমদার মুখে এ ভাষা, অন্তরে এ ভাব কেমন ক'রে এল। বড় বিস্ময়ের কথা, না?"

"সত্যিই মহিমদা, অত্যন্ত অবাক লাগছে আমার। মাত্র দশ বার বৎসরের অ-পরিচয়। এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমার সবই পরিবর্তন হ'য়ে গেল! তোমাকে তো আশৈশবই জানি—এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি, এক সঙ্গে কলেজে ভর্তি হয়েছি, একই মেসে একই ঘরে থেকেছি, এক সঙ্গে বেড়িয়েছি, সিনেমা দেখেছি, এমন কি মিস্ সেনের বাড়িতেও অনেকদিন এক সঙ্গে গিয়েছি। তোমার মনের খবর আমার চেয়ে কেউ বেশী রাখত না, এমন কি তখনকার মিস্ তোড়া সেনও না। রাগ কোরো না মহিমদা—দশ বার বৎসরের ফাঁকটাকে একেবারে অস্বীকার করে পুরাতন বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই এ কথা বলছি,—তোমার মন এত হিসেবী, এত বাস্তববাদী ছিল যে, সেখানে কখনো কোন বড় অনুভূতির সম্ভাবনা দেখিনি। প্রথম যেদিন তুমি মিস্ তোড়া সেন সম্পর্কে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করলে এখনও সে সব পরিবেশ স্পষ্ট মনে আছে,—উপস্থিত বন্ধুরা একবাক্যে বললে, 'মহিম মহা ফাঁদে পা দিল'। কিন্তু আমার কী মনে হয়েছিল জান? মনে হ'ল, 'ঠকুক মহিমদা, না হয় একটু কষ্ট হবে। তবু মানুষের মত হোক, একটু কোমলতা, একটু সরসতা প্রাণে দেখা দিক। হিসাবের মরুভূমিতে আত্মহত্যা থেকে বাঁচুক।"

মহিম জানলার ফাঁক দিয়া দূরে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যেন অস্পষ্ট অতীতকে বহু দূর হইতে চিনিতে চেষ্টা করিতেছে।

অরুণ বলিতে লাগিল, "সেদিনও আমার বিস্ময়বোধ কম হয়নি। কিন্তু তোমার জীবনের মূল-সুদ্ধ যেন পাল্টে গেছে আজ। যৌবনে তোমার মত হিসেবীকে বেহিসেবী করে দিয়েছিল মিস্ তোড়া সেনের প্রতি তোমার প্রেম। তোমার পরিণত বয়সে আবার নূতন করে কী পেয়েছ মহিমদা যাতে তোমার জীবনে এত বড় বিপ্লব ঘটে গেল?"

মহিম ধীরে ধীরে বাহির হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। চোখ দুটি তাহার যেন একটু ভিজা। শান্ত, স্থির দৃষ্টিতে অরুণের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "যুগে যুগে যে প্রেমের জয়গান গাওয়া হয়ে আসছে তার মধ্যে সত্য নেই—একী হ'তে পারে! তুমি ঠিকই বলেছ অরুণ আমারও মনে হচ্ছে আমার হিসাবের মরুবালিতে রস-সঞ্চার করবার শক্তি অন্য কিছুরই ছিল না। আবার এখন সব হিসাব চুকিয়ে দেবার সময় হয়েছে—এখন যে কোনদিন ডাক আসবে তারই জন্যে অপেক্ষা করা বইতো নয়—এখনও সেই বিশ্বজয়ী প্রেম আমার জীবন ক্ষেত্র রূপে রসে গন্ধে মাধুর্যে পূর্ণ করে তুলেছে। একথা যে এর আগে এমন করে ভেবে দেখেছি তা নয়। তোমার কথাতে যেন মনে হচ্ছে পরিণত বয়সে তাকেই নূতন করে পেয়েছি যাকে কাঁচা যৌবনে একবার পেয়েছিলাম।"

অরুণ একটু কৌতূহল বোধ করিতেছিল। বলিল, "কোন বিপ্লব ঘটবার আগে তার কারণ গুলির পরিণতি লাভ করা চাই, নইলে বিপ্লব ঘটতেই পারে না। তোমার জীবনে যে মহা-পরিবর্তন ঘটে গেছে তারও ইতিহাস আছে।

ঘটনা-পরম্পরায় তারই সাধনা করে এসেছ তুমি, অথচ তোমারই অলক্ষ্যে সেগুলি ঘটে গেছে। তুমি কোনদিন হয়তো সেগুলির দিকে চাওনি। কোন সামান্য ঘটনাকে হয়তো তুমি দায়ী করছ, গৌরবদান করছ, আসল ইতিহাসটুকু অলক্ষ্যেই রয়ে গেছে।"

"স্বীকার করি অরুণ, নইলে সেই ছোট্ট ঘটনাটুকুর কী এমন শক্তি থাকতে পারে, যাতে আমার জীবনের দুর্বার গতি রুদ্ধ হ'য়ে গেল, নূতন দিকে স্রোত বইতে লাগল! সে দিনটার কথা এখনও মনে পড়ে। দুর্ভিক্ষের সময়। দেশের যত চাউল, আটা সব গভর্নমেণ্টের হাতে তুলে দেবার জন্য গভর্নমেণ্ট দেশবাসীকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানালেন। আমার অনুগৃহীত বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের সাহায্যে আমি এ কাজ সহজেই করতে পারব মনে করলাম। তাই একবার আমার সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য গেলাম। তিনি সব শুনলেন, লাভের কথা বেশ ভালভাবেই ব্যাখ্যা করলাম। তিনি কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন; তারপর হঠাৎ চ'লে গেলেন, ব'লে গেলেন 'এখনি আসছি'। ফিরে এসে বললেন, 'না, হ'ল না। ও কাজের দরকার নেই।' আমি হতবাক। দরকার নেই! এত সহজ অথচ এত লাভ, তবু দরকার নেই! আমি বিস্মিত, ক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন বল তো?' উত্তর এল, 'ঠাকুর রাগ করবেন।'

'ঠাকুর রাগ করবেন?'

'হ্যাঁ, নারায়ণের পায়ে ফুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঠাকুর ফুল নিলেন না, ফুল পড়ে গেল। তুমি ও কাজ কোরো না, অমঙ্গল হবে। কী হ'বে অত টাকা দিয়ে?'

তুমি বিপ্লবের কথা বলছিলে, অরুণ বিপ্লব ভয়ঙ্কর, নিদারুণ, না? আমার মনেও যেন ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গেল, প্রলয়ের মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অসহ্য। আমি বজ্রাহত হ'য়ে পড়েছি মনে হ'ল। রক্ষা পেলাম পত্নীর কোমল কণ্ঠস্বরে। তিনি অপরাধীর মত বললেন, 'রাগ কোরো না আমার উপর।' অরুণ, রত্নাকর দস্যুর কণ্ঠে যেমন অকস্মাৎ দেবভাষা উচ্চারিত হয়েছিল, আমারও মুখ থেকে তেমনি বাহির হ'য়ে এ'ল, 'তোমার উপর রাগ কোরব কেন? ঠাকুরের ইচ্ছে নয়, সেখানে তুমি আমি কী করতে পারি। চল, ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি।' সেইবার প্রথম আমি ঠাকুরের কাছে মাথা নত করলাম।"

অরুণ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন উপস্থিত হইল। চিন্তার স্রোত নিতান্ত লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রান্তে গিয়া পৌঁছাইতে পারিল না। অরুণ এ যাবৎ বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছে, বহু লোককে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছে, জীবনের বহু রূপে পরিবর্তনের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে। কিন্তু মহিমের নবজীবন তাহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। কৌচের উপর সমস্ত দেহের ভার ন্যস্ত করিয়া মহিম বসিয়া আছে। শীর্ণ নহে, তবু সর্বাঙ্গে ক্লান্তির ছাপ, যেন সে সত্য সত্যই পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়া পরপারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই মহিম, আর সেই মহিম! সেই সুস্থ, সবল দেহ, সেই সতেজ মাংসপেশী, ক্লান্তিহীন বিশ্রামহীন ক্ষিপ্র গতি, কোথায় গেল সব? এ যেন নূতন মহিম। কোন মানুষ কী এতটা নূতন হইয়া যাইতে পারে?

মহিমের নবজীবন প্রত্যক্ষ সত্য বিশ্বাস করিতেই হইবে। তাই বলিয়া মহিম 'সহধর্মিণী' বলিয়া যাহার উল্লেখ করিল তাহার কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে? মহিম প্রসঙ্গক্রমে তাহার পত্নীর যে পরিচয়টুকু দিয়া দিল, তাহা কেহ মানিতে পারে, অরুণ মানিবে কী প্রকারে। মহিম বলিয়াছে বলিয়াই কি অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তোড়া সেনকে অরুণ বহুদিন হইতেই জানে। মহিমের সহিত তোড়ার প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই অরুণ তাহাকে দেখিয়াছে, বহুবার সান্নিধ্যে আসিয়াছে, বহু কিছু শুনিয়াছে। মহিম ও তোড়ার বিবাহের পর তাহাদের প্রগতিশীল সংসারের সহিত বহুদিন পর্যন্ত অরুণের যোগ ছিল। তোড়া সম্বন্ধে অরুণের মনে কোথাও কোন ফাঁক নাই। অরুণের নিকট তোড়া অপরিবর্তনীয়। ঠাকুরের পায়ে ফুল দিবে—তোড়া সে জাতির নহে। ডিনার, সিনেমা, পিয়ানো, স্তরে স্তরে সুস্মিত হাসি, প্লিজ, থ্যাঙ্ক ইউ প্রভৃতির সহিত তোড়া খাপ খায়, মিশিয়া যায়। কোন কার্যের পূর্বে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া নারায়ণের পায়ে ফুল দেওয়া তোড়াদের কাজ নহে। মহিমের ভাষা ও ভাব নূতন হইয়াছে, একেবারে অসম্ভব হয়তো নহে। মহিম তোড়াকে মিসেস গাঙ্গুলী না বলিয়া সহধর্মিণী বলিতে পারে, ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাসী হইতেও পারে। কিন্তু তোড়ার জগতে এ সবের প্রবেশ নাই। অরুণ অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, এ হ'তে পারে না।"

মহিম বোধ করি অন্য চিন্তায় এতক্ষণ মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অরুণের কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কী বলছ অরুণ?"

অরুণ প্রথমতঃ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাব সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না কিছু না। তবে একটা কথা তোমায় বলি মহিমদা। সাহিত্যকে মনো-বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে বিচার করে দেখাই আমার কাজ। বিদ্বান সমাজে সেটুকু আসন পেয়েছি সে এরই জোরে। আমার ধারণা কোন প্রচণ্ড ধাক্কা জীবনে না এলে জীবনের মূলে অনুভূতির পরিবর্তন হয় না। বাস্তব সংসারে প্রতিদিন যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, সেখানেও দেখেছি ঐ একই সূত্র সত্য, আঘাতের দান সুস্পষ্ট। তুমি যে আজ অন্য দিকে চলেছ, এরও মূলে কোন অসহ্য বেদনা আছে। হয়তো সে বেদনা তোমার স'য়ে গেছে, হয়তো বেদনাই নেই এখন। তবু আমার সন্দেহ তোমার উপর কোন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। কী ঘটেছে তোমাদের জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই। যাই ঘটে থাকুক না কেন, তার প্রচণ্ডতা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।"

মহিম একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল, নিজেকে ঠিক করিয়া লইবার জন্য কিছু সময় গ্রহণ করিল। তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিল, "অস্বীকার করব না, অরুণ। হিসাবের কড়া পাহারা এড়িয়ে কেমন করে কোথা থেকে যে সংসার মানুষের বুকে শেল হানে তা ভেবে পাই না। কিন্তু তোমার বিচারে আমার ও তোড়ার আঘাত এমন অসাধারণ বলে ঠেকছে কেন? সংসারে এ রকম তো ঘটে থাকে।"

"এ তো সোজা কথা, মহিমদা। যে পরিবর্তন যত অস্বাভাবিক, তার মূলে আঘাতও তত প্রচণ্ড। তোড়া দেবী এখন তাঁর নামের শেষে দেবী যোগ করলে তাঁকে অপমান করা হবে না নিশ্চয়ই। তিনি যখন দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে প্রণামের পরিবর্তে ফটো তুলতে লাগলেন, তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে তিনি এ'র থেকে রেহাই পাবেন?"

মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি এখনও সে দিনের কথা ভুলতে পারনি, অরুণ।"

"না মহিমদা, যেদিন তিনি আমার বৃদ্ধা দিদিমাকে চার আনা পয়সা বকশিশ দিলেন, সেই দিন থেকেই তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা পাকা হ'য়ে গেছে।"

"কী বলছ অরুণ?"

"এতদিন বলিনি তোমাকে, হয়তো কষ্ট পাবে মনে করে। আমি আমার মা-বাবাকে হারিয়েছি অতি শৈশবে, মনেও পড়ে না। দিদিমাই আমাকে মানুষ করেছেন, সে তো তোমার অজানা নেই। দিদিমাই আমার মা-বাপ-বন্ধু সব। তিনি একদিন গঙ্গা-স্নানের পর গঙ্গাতীরে বসে মালা জপ করছিলেন। তোড়া দেবী সেখান দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে তাঁর 'লিলি' কুকুরটা। যেতে যেতে দিদিমার উপর চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়ালেন, তারপর 'দিদিমার' সামনে গিয়ে ক্যামেরা ফিট করতে লাগলেন। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলাম, মানলেন না। আমিই বা কী বলব তাঁকে। ফটো তোলা হ'লে খুশী হয়ে দিদিমার কোলে চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে বল্লেন,

"বুড়ী বেশ ইনটেলিজেন্ট, চোখ বুজে বেশ পোজটা দিয়েছিল।' দিদিমার অভ্যাস আমি জানতাম। পূজার কোন ব্যাঘাত ঘটলেই তিনি চোখ বুজতেন। মূর্তিমতী ব্যাঘাত যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হ'লেন তখন চোখ বোজা ছাড়া তাঁর আর কী উপায় ছিল!"

মহিমের স্বরে তীব্র বেদনা প্রকাশ পাইল। যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, মানুষের ভিতরটা যখন শূন্য হ'য়ে আসে তখন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেই সে নিজেকে জাহির করে। যাইহোক অরুণ, তার হ'য়ে তোমার কাছে মাপ চাইছি। দিদিমা এখন মান-অপমানের বাইরে, তাঁকে প্রণাম করি।"

মহিম চোখ বুজিয়া করজোড়ে প্রণাম করিল। অরুণ বিস্মিত হইয়া দেখিল মহিমের চোখে জল। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া সে মহিমের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিল এবং মিনতির স্বরে বলিল, "পুরোনো কথা তুলে তোমায় কষ্ট দিলাম মহিমদা। আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না তোমাদের অতীতের কথা তুললে, সে যে বেদনা-দায়ক হবে তা আমি জানতাম। তবু—"

"না, অরুণ। অতীতের কথা শুনে বেদনা পাবার তো কোন কারণ নেই। উপরের ধাপে উঠে সিঁড়ির নীচের ধাপের দিকে চেয়ে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়।।"

"সে যাই হোক, মহিমদা, তোড়া-বৌদির কথা যা কিছু বলেছি তিনি যেন ক্ষমা করেন। তিনি সম্বন্ধে আমার বৌদি, তাঁকে প্রণাম জানাই। আর প্রণাম জানাই সংসারের সেই নিষ্ঠুর দেবতাকে যাঁর নির্মমতায় তোমাদের দুজনের জীবনের ছন্দ আজ মিলে গিয়েছে। আজ উঠি। এখন আবার সিনেটে যেতে হবে। রবিবার সন্ধ্যায় আসব, বৌদির হাতের চা খেয়ে যাব। আসি—।"

অরুণ একটু তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া গেল। মহিম নিষ্পলক-নেত্রে সম্মুখে চাহিয়া রহিল; কী দেখিতেছিল জিজ্ঞাসা করিলে কখনই সে বলিতে পারিত না।

(২)

রবিবার। সন্ধ্যা হইয়াছে। অরুণ মহিমের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মহিম অবসন্নভাবে তাহার শয্যায় বালিশ ঠেসান দিয়া আধ-শোয়া হইয়া রহিয়াছে এবং অদূরে দুইটি কৌচের উপর বসিয়া দুইজন মিস্টার-লোক মৃদু-গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। ঘরে একটি অনুজ্জ্বল নীল বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, তাহার অস্পষ্ট আলোকে সজীব নির্জীব সব কিছুরই আবছায়া দেখা যাইতেছে, দেওয়ালে পতিত বিচিত্র আকৃতির ছায়াগুলি যেন প্রাধান্য লাভ করিয়া ঘরটির ভিতর ছায়া-পুরীর আব-হাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন একটি পীড়াদায়ক নৈরাশ্য ঘরের বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে।

মহিমের ইঙ্গিতে অরুণ মহিমের শয্যায় গিয়া বসিল। অরুণের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বলিল,

"আজ একটি বিশেষ দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে যাব, অরুণ। অস্বীকার কোরো না।"

অরুণ তাহার বাল্য-বন্ধুর মুখে এরূপ কাকুতি কখনও শুনে নাই। অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকিল। আন্তরিক সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কী দায়িত্ব, মহিমদা, আগে একটু জানতে পাইনে?"

একটু অভিমানের স্বরে মহিম বলিল, "এর আগে আমার কাজ করবার সময় তোমার কোন প্রশ্নই থাকত না, অরুণ।"

"এখনও নেই মহিমদা, রাজী আছি।"

একটি কৌচের দিকে চাহিয়া মহিম অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে বলিল, "তাহ'লে মিস্টার কর—ওঃ ভুলে গেছি,—মিঃ কর, ডাক্তার রায় ইনিই অরুণচন্দ্র মজুমদার, আমার বাল্য-বন্ধু এবং আমার অবর্তমানে আমার সংসারের অভিভাবক। অরুণ, ইনি মিস্টার আর কর বিখ্যাত উকীল; আর উনি মিস্টার এন রায় ও'র বাপের বাড়ীর ডাক্তার, দিনকতকের জন্য কলিকাতায় এসেছেন। তাহ'লে আর দেরী নয় মিস্টার কর, অরুণের হাতে দলিল দুটি দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

"সিওর, সিওর,"—এই বলিয়া মিঃ কর তাঁহার চামড়ার চ্যাপ্টা ব্যাগ হইতে দুটি কাগজের প্যাকেট লইয়া অরুণের দিকে আগাইয়া ধরিলেন। অরুণ দলিলের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কী করিবে কী বলিবে বুঝিতে না পারায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মহিম বোধ করি অরুণের দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিল, একটু হাসিয়া বলিল, "দ্বিধা কোরো না, অরুণ। দেরী করা ঠিক হবে না। সময় থাকতে সব ব্যবস্থা করাই ভাল। ডাক্তার রায় আমার বুকের উপর স্টেথসকোপ বসিয়ে যে রকম মুখের ভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে আর দেরী করতে সাহস হয় না।

ডাঃ রয় সাহস দিয়া বলিলেন, "না, না, ইমিডিয়েট ডেনজার নেই। পেসেন্টের নার্ভাস হওয়া উচিত নয়। আমার ফোন নম্বর তো জানেন, দরকার হলেই ডাকবেন। আর ঐ বড়ি আর মিক্‌চারই এখন চলুক।"

মিঃ কর সিগার-চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়া বলিলেন, "আমি নিজে আরেনসনের কাছে গিয়ে দ্বিতীয় ঔষধটার ব্যবস্থা করছি। সে আমার ক্লায়েন্ট কিনা। নইলে ঐ জিউ ব্যাটার কাছ থেকে ঔষধ বের করা আর কা'রও সাধ্য নেই, রেয়র মেডিসিন কিনা।. আচ্ছা, আজ উঠি। এখনই একবার কস্‌বা যেতে হবে, এনগেজমেণ্ট আছে। গুড্ বাই মিস্টার গাঙ্গুলী, গুড বাই ডক্টর রয়। মিস্টার মজুমদার, দলিল দুটি আপনাকে দিয়ে গেলাম, পড়ে দেখবেন। আমার মনে হয় মিস্টার গাঙ্গুলীর ওপিনিয়ন রিভাইজ করা উচিত। তবে আমার দিক থেকে কিছু সাজেস্ট করা চলে না, আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে দেখবেন। গুড বাই।"

জুতার মস্ মস্ শব্দ করিয়া মিস্টার কর চলিয়া গেলেন। ডাক্তার রায়ও উঠিলেন। রোগীকে বার বার সাহস দিয়া এবং তাঁহার ফোনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনিও অন্তর্হিত হইলেন। মহিম হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল।

অরুণের শিক্ষিত মন ইতিমধ্যে ঐ অল্প-ক্ষণের ঘটনাগুলিকে পরস্পর গ্রথিত করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। অরুণ বুঝিয়াছে যে, সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, মহিমের ধারণা জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যুর দেরী নাই এবং সে দলিল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বাল্যবন্ধুর হাতে সংসারের ভার অর্পণ করিতেছে। বন্ধু হিসাবে এ ভার তাহাকে লইতে হইবে। কিন্তু বিচারের অন্তরালে মনের আর একটি শক্তি আছে, ইহা সকল বিচার বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, স্থির সিদ্ধান্তকে বানচাল করিতে পারে। অরুণ যুক্তি দিয়া স্থির যাহাই করুক না কেন, তাহার মন সে সিদ্ধান্ত মানিলে তো! ডাক্তারের মুখের কথায় বাহিরের যে কোন লোক বুঝিয়া লইত মহিমের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। তথাপি অরুণ কি বিশ্বাস করিতে পারিতেছে? সুদীর্ঘ বার বৎসরের পর চিরদিনের বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে। এখনও কাহারও প্রাণের কথা বলা শেষ হয় নাই। এখনই বন্ধুর মৃত্যুর ইঙ্গিত? এ কি সম্ভব? সুখের মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া অদৃষ্ট মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্রূপ করে, তাই বলিয়া ভাগের বিদ্রূপের একটা প্রাকৃতিক সীমা নাই? কত বৎসর পূর্বে অরুণেরই তো একবার মনে হইয়াছিল তাহার মৃত্যু আসন্ন। কই সে তো আজিও মরে নাই! স্নায়বিক দুর্বলতায় এইরূপ অমূলক ধারণার সৃষ্টি অনেকেরই হয়, মহিমেরও হইয়াছে। আর দলিল প্রনয়ণ? মহিম চিরদিনই হিসাবী। এখনও যে তাহার চরিত্রে হিসাবীর ছাপ থাকিবে না একথা কে বলিতে পারে? কোথাও কিছু নাই, আগে হইতে সম্পত্তির পাকা বন্দোবস্ত করা—ইহা হিসাবী অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

যাহাই হউক, মহিমের মৃত্যুর এই অকারণ আতঙ্ক লঘু করিয়া দিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে অরুণ একটু বেশী রকম হাস্য করিয়া বলিল, "বাহাত্তরের আগেই তোমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে, মহিমদা। সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করতে তোমায় কে পরামর্শ দিল?"

"সত্যই দেরী সইবে না, তরুণ। এখানকার ডাক্তারেরা তো এক রকম বলেই দিয়েছেন। তবে বাপের বাড়ির লোকদের উপর মেয়েদের অটুট বিশ্বাস থাকে জান তো। ওঁরই জেদে ডাক্তার রায়কে আনা হয়েছিল। ডাক্তার রায়ের মতও তো শুনলে। কিন্তু সে সব কথা যাক। আজ থেকে যে কটা দিন বেঁচে থাকি, তুমি রোজ একবার করে এস। যে কথার কোন মূল্য নেই, এমন সব কথা প্রাণভরে বলে নেব।"

অরুণের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, কেমন একটু ভয় পাইল, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু দলিলের ভার আমায় দিলে, আমি তো কিছু জানি না।"

"পড়লেই জানতে পারবে ভাই। না—না, এখনই দলিল পড়তে বোসো না। তার চেয়ে সারাংশটা বলে দিচ্ছি। পরে খুঁটিনাটি পড়ে নিও। এই বাড়িটা তোড়ার নামে লিখে দিলুম, আর নগদ কিছু টাকা। এই বাড়ি, আর ঐ টাকা ব্যবসারের আয়েই করেছিলাম। তা ছাড়া এই বাড়িটা তোড়ার পছন্দ অনুসারেই করা হয়েছিল,- আসন, আসবাব দেখেই বুঝতে পারছ। নদীর ধারে আমার সামান্য পৈতৃক ভিটাটুকু মেরামত করে বাসোপযোগী করে দিয়েছি। সেখানে বাগান, পুকুর, জমিও কিছু আছে,—তারও বিবরণ দলিলে পাবে—নিঃসন্তান হিন্দু বিধবার একলা এক মুঠো তাতেই চলে যাবে। এর বেশী আমার পত্নী নিতেও চাইবেন না।"

"ঠিক বুঝলুম না, মহিমদা। হেঁয়ালির মত ঠেকছে। একবার বলছ তোড়া বৌদির জন্য এই বৃহৎ অট্টালিকা ও নগদ টাকা রইল; আবার বলছ পৈতৃক সম্পত্তি যা রইল তাতে একমুঠো কোন রকমে চলে যাবে। মানে কী?"

"এর ভিতর হেঁয়ালি কিছুই নেই অরুণ। যে ব্যবসায়ে ঠাকুরের সায় নেই, তারই টাকায় কেনা সম্পত্তি উঁর সইবে কেন? সেইজন্যে তোড়াকেই দিয়ে গেলুম। তা ছাড়া তোড়ার স্বামীর অবস্থা এখন বড় খারাপ। যে আশায় ঋণ করেছিলেন, তা ব্যর্থ হ'ল,—আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। মাঝখান থেকে ঋণ শোধ করতে সম্পত্তি সব বিক্রয় হ'য়ে গেল। স্বাস্থ্য গেল, মান গেল, আশা গেল। তোড়ার মনের অবস্থাটা বুঝে দেখ। দারিদ্র্য তাকে অবিরত দগ্ধ করছে, অথচ করবার কিছু নেই। এ বাড়িতে ফিরে আসা এখন চলে না, আমার কাছে সাহায্যও চাওয়া যায় না। অনেক ভেবে তবে সব স্থির করেছি, অরুণ।"

অরুণ এবার সত্যই ভয় পাইল। সে বুঝিল বাহিরে মহিমকে যেরূপই দেখাক না কেন, তাহার ভিতর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তা শক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। মনের গোপন কক্ষে চাপা ধারণা, চাপা ইচ্ছা এখন স্নায়ুর দুর্বলতার সুযোগে অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তোড়া সম্পর্কে মহিমের অন্তরে নিশ্চয়ই কোন গোপন অবিশ্বাস ছিল, তাহাই আজ মস্তিষ্কের দুর্বল অবস্থায় কল্পিত গল্পের মধ্যে প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ অবিশ্বাসের জন্য মহিমকে দোষী করা যায় না। সে যাহা হউক, এখন মহিমের চিন্তা হইতে তোড়ার প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিতে হইবে, অতএব অন্য কথার অবতারণা করা দরকার।

অরুণ বলিল, "ও সব কথা এখন থাক। ও সব দু' মাস ছ' মাস দেরী সইবে। আমাকে কবে হঠাৎ বাহিরে চলে যেতে হবে তা'র ঠিক

নেই। এখন প্রাণভরে গল্প-গুজব করে নিই। তোমার ছোট বয়সের কথা মনে আছে, মহিমদা?"

"খুব মনে আছে। তোমার ডাক নাম ছিল কানাই, আমাকে ডাকত বলাই বলে। ঘণ্টা তিনেক আগে জন্মেছিলাম, তাই আমি বরাবরই তোমার দাদা হ'য়ে রইলাম, আর তুমি আমার কাছে ছোটবেলায় কান-মলা খেতে। তারপর তোমার মা মারা গেলেন। তুমি তোমার দিদিমার কাছে মানুষ হ'তে লাগলে। কয়েক মাস পরে আমার মা'ও গেলেন। তোমার দিদিমা আমাকেও কোল দিলেন। তাঁকে আশ্রয় করেই আমরা দু'জন কানাই বলাই বড় হ'তে লাগলাম। সে যেন কত যুগ হ'য়ে গেল। তারপর আরম্ভ হ'ল তোমার আমার স্কুলের জীবন, সেও কোথায় শেষ হ'য়ে গেল। কলেজে ভর্তি হ'লাম দু'জনে, তাও শেষ হ'য়ে গেল। মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তোড়া। আমার কয়েকটা বছর আনন্দের ঘূর্ণিতে পড়ে কেটে গেল। না-না, তোমরা তোড়াকে ভুল বুঝ না। সে আমাকে আদৌ ফাঁকি দেয়নি। সে অনেকটা দমকা বাতাসের মত যখন এসে পড়ে, সামলান কঠিন। কিছুক্ষণ পরে সে যেন শূন্য। ওটা ওর প্রকৃতি। ঝড়কে বাঁধতে যেতে নেই। দরজা জানালা খুলে দিয়ে তার পথ পরিষ্কার করে রাখতে হয়; নইলে অনর্থ ঘটে। তাই যখন সে বড় আশা করে ভাবী "আই সি এস"-এর দিকে ঝুঁকল, তখন সে সম্পূর্ণভাবেই ঝুঁকল, কোন দ্বিধা-দুর্বলতা সেখানে ছিল না। আইনের পথে তাকে আমি মুক্তি দিলাম, সেও ঝড়ের মত চলে গেল,—কী উপড়ে গেল, কী চুরমার হ'ল, কীইবা শ্মশানঘাটে পোড়া কাঠের মত পড়ে রইল,—সে দেখল না। এখন ভাবি কী করে সে ব্যর্থ ভদ্রলোকের গৃহে চুপ করে আছে। বোধ হয় সে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, তা না হ'লে সে গৃহও এতদিন চুরমার হ'য়ে যেত।"

মহিম অতি দ্রুততালে কথাগুলি বলিয়া গেল। তাহার মৃত্যু যেন আসন্ন, মৃত্যুর পূর্বেই কোন রকমে এই কথাগুলি শেষ করা চাই। অরুণ কথার মোড় ঘুরাইবার কোন সুযোগ না পাইয়া ব্যথিত বিহ্বলচিত্তে বসিয়া রহিল।"

মহিম অপেক্ষাকৃত ধীর ও অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমরা ভাব এ সব কথায় আমি ব্যথা পাই। তা' পাইনে। সে ক্ষত যদি আজ থাকত তাহ'লে পল্লীর এক সামান্য গৃহ থেকে যে বালিকাকে নারায়ণ সাক্ষী করে এনেছি, তাকে ফাঁকি দেওয়া হ'ত যে। গঙ্গায় কত বড় বড় উপড়ে পড়া গাছ ভেসে যায়। আমিও তেমনি আমার সমস্ত ভার কমলার উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। দাও তো, অরুণ, ঐ টেবিল থেকে একটা বড়ি। বুকটা আজ বড্ড ব্যথা করছে।"

অরুণ বাঁচিল। মহিমের কথার স্রোত বন্ধ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, পাইতেছিল না। টেবিল হইতে বড়ি আনিয়া দিয়া ধমকের সুরে বলিল, "তখন থেকে কেবল বকেই চলেছ। আসল কথায় ফাঁকি। আজ না আমার বৌদির হাতে চা খাবার কথা ছিল। কিন্তু যিনি দেবেন তাঁর দর্শন পর্যন্ত এখনও পেলাম না।"

মহিম বড়িটা গিলিয়া লইয়া কিছুক্ষণ ব্যথার ধাক্কাটা সামলাইতে লাগিল। চোখ বুঁজিয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল। তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিল, "দেখবে তাঁকে? আচ্ছা, আমার সামনের জানালাটা খুলে দাও।"

অরুণ সামনের জানালাটা খুলিয়া দিল। উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া যে দৃশ্য অরুণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তাহার তুলনা অরুণের জীবনে মিলে নাই। দীর্ঘ বারান্দার অপর প্রান্তে নাতি বৃহৎ একটি ঘর। ঘরের একদিকে দেওয়ালে সংলগ্ন হইয়া রৌপ্য-নির্মিত দেব-সিংহাসন শোভা পাইতেছে। রাশি রাশি পুষ্প সিংহাসনের মধ্যভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কোন দেব-মূর্তি দেখা যাইতেছে না। সম্মুখে নানা পাত্রে নৈবেদ্য। পার্শ্বে এখনও ধূপশলাকা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। বিজলী বাতির পরিবর্তে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সিংহাসনের সম্মুখে ধ্যানাসনা কমলা। নিশ্চল, নিস্পন্দ দেহ, বোধ হয় শ্বাস-ক্রিয়াও স্থগিত রহিয়াছে। মুদ্রিত চক্ষু, সমাহিত দেবী-রূপ। অরুণের মনে হইল কমলা পৃথিবীর স্পর্শের বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং হৃদয়ান্তঃপুরচারী দেবতা ভক্তের হৃদয়-শত-দলে বিরাজ করিতেছেন। সেখানে অনুক্ষণ পূজা চলিতেছে। কে পূজা করিতেছে কে পূজা লইতেছে? দেবতা কি কেবল মানুষের পূজাই লন, দেবতা কি কখন মানুষের ধ্যান করেন না? কমলা তাঁহার দেবতার চরণ বন্দনা করিতেছেন, দেবতা কি কমলার আরতি করিতেছেন না?

অরুণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। চাহিয়াই থাকিত, কেবল মহিমের শান্ত কণ্ঠস্বরে চোখ ফিরাইল।

"দেখতে পেলে, অরুণ, তোমার বৌদিকে?"

অরুণ ধীরে ধীরে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া মহিমের সামনে আসিয়া বসিল, বলিল, "দেবী-দর্শন হ'ল, মহিমদা।"

মহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার ঐ দেবীটি আজ সারাদিন উপবাস করে আছেন, ঠাকুরের কাছে আমার আরোগ্যের বর নিয়ে ছাড়বেন। কতক্ষণে যে ঠাকুরের উত্তর পাবেন, পূজা সারা হবে, উপবাস ভাঙবে কী জানি।"

"না মহিমদা, আমার দেবী আজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে চাওয়া-পাওয়া তো পৌঁছাবে না, এমন কি তোমার জন্য মঙ্গল কামনাও ওখানে অচল।"

"অরুণ, তোমার কথায় আজ আমার একটি সত্য উপলব্ধি হ'ল। চাওয়ার একাগ্রতাই ওঁকে চাওয়া-পাওয়ার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। উনি আর দেবতা ছাড়া সেখানে কিছুই নেই। আমার আজ চোখ খুলল!"

"আমারও আজ এক নূতন শিক্ষা হ'ল, মহিমদা। আমাদের মেয়েদের নামের শেষে 'দেবী' কথাটা যোগ করা হয়। কেন হয় আজ বুঝলাম ঠাকুর ঘরের দিকে চেয়ে।"

মহিম অরুণের কথার সূত্র ধরিয়া আপন-মনে বকিতে লাগিল, "দেবী! মঙ্গলদায়িনী, বিশ্ব-চিত্ত-বিজয়িনী দেবী! যেখানে কামনা পরাভূত, সেখানে কেবল বিজিত চিত্তের পূজা চলে, সমানাধিকার দাবী চলে না। আমার আজ চোখ খুলল।"

অরুণ নিরুত্তর।

মহিম বলিয়া চলিল, "সংসারে এই দেবী-রূপ দুর্লভ। কেই বা এই দেবী-রূপের ধ্যান করে? দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করবার মত শুচিই বা কার? এখন আর সে সাধনার সময় নেই যে!"

"ঠাকুরপো"

অরুণ চমকিয়া উঠিল, মহিমও চোখ খুলিল। তাহাদের সম্মুখে কমলা স্বয়ং, এক হাতে প্রসাদের থালি, অপর হাতে চরণামৃতের ভাণ্ড। অরুণ দেখিল পদ্মের পাপড়ির মত দুটি পা কার্পেটের উপর শোভা পাইতেছে। আলতার গোলাপী রেখা পা-দুটিকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। দুটি আঙুলে ছোট ছোট দুটি নূপুর বাঁধা। ধব্‌ধবে শাদা কাপড়ের লাল পাড়টুকু পা দুটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ পায়ে মাথা না ঠেকাইলে মন খারাপ হইয়া যায়। অরুণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"এই গ্লাসের জলেই হাতটা ধুয়ে নিন, ঠাকুরপো। প্রসাদটুকু খেয়ে নিন। চা এনে দিচ্ছি।"

"দোহাই বৌদি, আপনার হাতে চা মানায় না। ওটা যে কোন বাড়িতে, যে কোন দোকানে পাওয়া যাবে। যেটা পাওয়া যাবে না সেটা এই প্রসাদটুকু।"

মহিম বলিল, "ভালই হ'ল। উনি ভাল চা করতে পারেনও না।"

"কে বল্লে পারি না। কিন্তু তুমি এরই মধ্যে একটা বড়ি খেয়েছ যে? তোমার ব্যথাটা কি খুব বেড়েছে?"

"মিথ্যা বলব না, সত্যই আজ বেড়েছে, আজ ভয় হচ্ছে আমার। যাই হোক, আমার জন্য প্রসাদ কই?"

"ছিঃ, লোভ করে না। ডাক্তার বারণ করে

গেছেন। তোমার জন্যে ঠাকুরের চরণামৃত এনেছি, এই তো তোমার প্রসাদ!"

কমলা মহিমকে চরণামৃত পান করাইয়া দিলেন, মহিম ছোট ছেলেটির মত কমলার হাতে চরণামৃত পান করিল। তাহার পর মহিমের কপালে হাত দিয়া কমলা বলিলেন, "দেখেছ, তুমি কি রকম ঘেমে গিয়েছ। তবু তুমি বসে আছ, আর কথা কইছ। কথা বলতে কত যে নিষেধ করি, তবু আমার কথা শোনা হয় না। শীঘ্র শুয়ে পড়। আমি এখুনি আসছি। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি চলে গেলেই আবার উঠে বোসো না যেন। আপনি একটু দেখবেন তো ঠাকুরপো।"

এই বলিয়া কমলা মহিমকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। মাথায়, পাশে বালিশ দিয়া, মাথার কাছে বিজলী পাখাটা খুলিয়া দিয়া কমলা চলিয়া গেলেন। তাঁহার পায়ের নূপুর দুটি ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। অরুণ দেখিল মহিমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

"আর একটা বড়ি দেব, মহিমদা?"

মহিম সে কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী! এ কী কল্পনা তোমার কবি? এ কী ভুল! বল,— তুমি মাতা, তুমি কন্যা, তুমি বধূ বিশ্ববিজয়িনী! শুধু বিশ্ববিজয়িনী নয়, বিশ্বব্যাপিনী, বিশ্বচিত্ত-বিহারিনী! সমগ্র বিশ্ব তোমার কাছে পরাজিত, বিশ্বচিত্ত তোমাতে সমর্পিত। তুমি নন্দন-বাসিনী নও, তুমি বিশ্ব-বাসিনী। তোমার নূপুর বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে বাজে তোমার নূপুর; ঘোর ঘন কৃষ্ণ মেঘের বজ্র-গর্জনে বাজে তোমার নূপুর। প্রভাতের রক্ত-রবি-করে শুনি তোমার চরণ-ধ্বনি, নিস্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের নিদারুণ দিবালোকে শোনা যায় তোমার নূপুর, তন্দ্রাচ্ছন্ন রজনীর শীতল চন্দ্রালোকে বাজে তোমারই পায়ের নূপুর। ঐ শোন নূপুর বেজে চলে ঝম্ ঝম্ ঝম্। নারায়ণের পায়ে কে পরিয়ে দিয়েছে নূপুর? ঠাকুর ঘরে ঐ যে শুনতে পাচ্ছি ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঐ দেখ, ঐ আকাশে, কান পেতে শোন, দূরে দূরে বহু দূরে আকাশের শেষ সীমায় বেজে চলেছে—।"

অরুণ ডাকিল, "মহিমদা, এই বড়িটা খেয়ে নাও।"

"দেবে, দাও।"

বড়ি খাওয়াইয়া দিয়া অরুণ পাশের টেলিফোন ঘরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মহিম ঘুমাইতেছে। কমলা তখনও আসেন নাই। অরুণ অন্তঃপুরের দিকে চলিল। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে কমলার দর্শন মিলিল। অরুণ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বৌদি কী করব এখন।"

"কেন, ঠাকুরপো, খুব বেড়েছে? তাহ'লে ডাক্তারকে খবর দাও। ঠাকুরের কী ইচ্ছা কী জানি!"

"শেষ চেষ্টা করবার জন্য একাধিক ডাক্তারকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু সকলেরই এক কথা, তাঁদের করবার কিছু নেই। মিস্টার কর জানালেন তিনি ঔষধ যোগাড় করতে পারেননি। এখন কী করি বৌদি?"

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ওঁর কাছে গিয়ে ব'স ঠাকুরপো, আমি আসছি।"

অরুণ মহিমের কাছে উপস্থিত হইয়া শুনিল, মহিম বলিতেছে, "ঘুমিয়ে পড়েছে, সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মাঝে বাজছে কা'র পায়ের নূপুর ঝম্ ঝম্।"

তাহার পর সুর করিয়া গাহিল, "এক মনে শোন হিয়ার মাঝে তাঁর মুরলী বাজে, প্রেম-নগরে বসত যে তাঁর তোরই হিয়ার মাঝে।" আবার বলিতে লাগিল, "হিয়ার মাঝে প্রেম-নগরে তাঁর মুরলী বাজে! মুরলী নয়, নূপুর। নূপুর বাজে হিয়ার মাঝে। কান পেতে থাক, শুনতে পাবে।"

কমলা আসিয়া মহিমের শয্যা প্রান্তে বসিলেন, হাত দিয়া পায়ের উত্তাপ বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার পর শিয়রের দিকে সরিয়া আসিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মহিমের কপালের ঘাম মুছিয়া দিলেন। মহিম চোখ মেলিল, একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কমলার দক্ষিণ হাতটি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া পরম তৃপ্তিভরে চোখ বুজিল। মহিম বলিতে লাগিল, "এই তো পেলাম, এই তো প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছি! তবু কেন হিয়া জুড়ন না গেল! লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। কেন ভিতরটা তবু খাঁ খাঁ করে? তবু কেন শূন্য মন্দির মোর! মন্দির শূন্য? আমার মন্দির শূন্য, দেবী নাই? দেবী ঠাকুর ঘরে? দেবীর মন্দিরে ঠাকুর? সেখানে কমলার শতদল ফুটেছে যে! আমার মন্দির শূন্য!"

অরুণ দেখিল মহিমের মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। কমলার সংযমের বাঁধ ভাঙিল। মহিমের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি গো, আর না, চুপ কর।"

মহিম আবার বলিতে লাগিল, "কমলা, তোমার মনে আছে, তুমি যখন ছোট ছিলে তোমার পায়ে মল ছিল। মল বাজত ঝম্—ঝম্—ঝম্—ঝম্। তারপর বড় হ'লে, মল পরতে চাইলে না। আমি জোর করে তোমার পায়ে নূপুর দুটি বেঁধে দিলাম। তোমার চলার পথে সলজ্জ বালিকার অস্ফুট কথার মত নূপুর বাজে ঝুম্ ঝুম্। কে সেই কবি যিনি নূপুর আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁকে নমস্কার করি। কে সে শিল্পী যাঁর কল্পনায় জেগেছিল অলক্তক-রঞ্জিত কমল-দল নিন্দিত চরণ যুগল! যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, তখন কি তোমার নূপুর বাজবে না? কেন বাজবে না, বাজবে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, আমি শুনব। আকাশে বাতাসে তোমার নূপুর বাজবে, আমি শুনব। কিন্তু এখানে না। না, না, এ বাড়িতে নয়। এখানে তোড়া এসে তার সংসার পাতবে, তার নতুন সংসার। কমলা, কমলা, তোমার নূপুর থেমে গেল কেন! কই, আর নূপুর বাজছে না তো! সময় নেই। কই! বাজুক, একবার বাজুক! ঐ বেজেছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, শুনতে পাচ্ছি ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—।"

মহিমের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার পদপ্রান্তে কমলা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

* * * * * *

কমলাকে মহিমের পৈতৃক ভিটায় পৌঁছাইয়া দিয়া অরুণের ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার হাতে পায়ের নূপুর দুইটি খুলিয়া দিয়া কমলা বলিয়াছিলেন, "এ দুটিকে গঙ্গার জলে দিয়ে দিও, ঠাকুরপো, এর আর তো দরকার নেই!" অরুণ হাত পাতিয়া নূপুর দুইটি লইয়াছিল বটে, কিন্তু আজিও গঙ্গায় দেওয়া হয় নাই। একটি রূপার কৌটায় সে দুটি সযত্নে রক্ষিত আছে।



অনুবাদ সাহিত্য

একটি গোলাপ—এমিলিকে

উইলিয়ম ফকনার

(১)

যখন মিস এমিলি গ্রিয়ারসন মারা গেল, শহর ভেঙে আমরা সকলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে গেলাম। বিরাট একটা সৌধ ধ্বসে পড়লে মানুষ তার জন্য একটা সসম্ভ্রম অনুকম্পা অনুভব করে—পুরুষেরা গেল সেই প্রেরণায়; মেয়েরা গেল নিছক কৌতূহলের বশে। এই যে বাড়িটা, গত দশ বছরে যার ভিতরে এর একমাত্র ভৃত্য, একাধারে মালী ও পাচক সেই জরাজীর্ণ নিগ্রোটা ছাড়া আর কেউ ঢুকে দেখেনি, না জানি কি আছে তার ভিতরে।

আঠারো শ' সত্তরের স্থাপত্য রীতি অনুসারে গম্বুজ, থাম ও ব্যালকনি অলংকৃত প্রকাণ্ড চারকোণা বাড়িটা—দেয়ালের রং হয়ত কোনকালে সাদা ছিল। আজকাল আশে পাশে যেখানে সেখানে গ্যারেজ-গুদাম গজিয়ে উঠে পাড়ার একদা খ্যাত আভিজাত্যকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে নিয়েছে; এমন কি, এ-রাস্তার যাঁরা পুণ্যশ্লোক নাগরিক ছিলেন, তাঁদের নামগুলি পর্যন্ত। গর্বোদ্ধত শিরে বেপরোয়া মেয়ের মত আজও দাঁড়িয়ে আছে শুধু মিস এমিলির বাড়ির ভগ্নাবশেষ। আধুনিক গ্যাসোলিন পাম্প ও তুলো বোঝাই ওয়াগনগুলোর চক্ষুশূল হয়ে। আজ সেই মিস এমিলিও জেফারসনের বিস্মৃত পুণ্যশ্লোক নামগুলিতে আর একটি নাম যোগ করতে চলে গেল—যেখানে সিডারগন্ধবিমোহিত সমাধি ক্ষেত্রে তারা অন্তিম শয়নে শুয়ে আছে জেফারসনের যুদ্ধে মৃত অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের পাশাপাশি।

মিস এমিলি বেঁচে থাকতে জেফারসনের পৌরনায়কবর্গ তাকে একটা সামাজিক দায় বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ সযত্নে রক্ষা করবার দায় যেমন মানুষে নেয়। সেই এক কর্নেল সারটোরিস ছিলেন তখনকার মেয়র, আঠারো শ' চুরানব্বই সালে একদিন তিনি মিস এমিলির সমস্ত ট্যাক্স মাফ করে দিলেন, এমিলির বাবার মৃত্যুর দিন থেকে। তিনি বলতেন, এমিলির বাবা শহরের সবাইকে টাকা ধার দিয়ে গেছেন, শহরের পক্ষে সে-ঋণ এই উপায়ে শোধ করাই সুবিধের হবে। এরকম কথা কর্নেল সারটোরিসের যুগের লোকের মাথাতেই আসা সম্ভব।

তাঁর উত্তর পুরুষের নতুন লোকেরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যখন পৌরসভা অলংকৃত করলেন, তখন এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল। প্রথম বছরে তাঁরা এমিলিকে ট্যাক্স নোটিশ পাঠালেন। কোন জবাব এল না। আর একটি চিঠি তাঁরা লিখলেন, সময়-সুযোগ মত মিস এমিলি যেন শেরিফের অফিসে দেখা করেন। এক হপ্তা পরে মেয়র নিজে লিখলেন, তিনি মিস এমিলিকে অফিসে আসবার জন্য গাড়ি পাঠাচ্ছেন। মেয়র উত্তর পেলেন, অতি সেকেলে আকারের চিঠির কাগজে। টানা-টানা হাতের লেখায়, 'আমি মোটে বাড়ির বার হই না।' চিঠির সাথে আটকানো ছিল ট্যাক্স নোটিশখানা, কোন মন্তব্য ছিল না।

অল্ডারম্যানদের এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হল। সভা শেষে তাঁরা একত্রে এমিলির বাড়ির দুয়ারে হানা দিলেন। প্রায় অন্ধকার হলঘরে বুড়ো নিগ্রো তাঁদের বসালো, যে-ঘরে বহুদিন কোন দর্শনপ্রার্থীর পা পড়েনি। ভ্যাপসা ধুলো ধুলো গন্ধ, ভারি চামড়া মোড়া আসবাব। অসংখ্য ফাটা দাগে চামড়ার আবরণগুলো বিকৃত। তাঁরা বসতেই ধুলোর ক্ষীণ কুণ্ডলী কয়েকটা তাঁদের পায়ের কাছে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো। ফায়ার প্লেসের উপর ধূলিমলিন সোনালি ইজেলে মিস এমিলির বাবার একখানা ছবি।

এমিলি এলে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। স্থূল, ছোটখাটো দেখতে একটি মহিলা। কালো বেশ, কোমর অবধি ঝোলানো শরু সোনার একটি চেন। জলে টসটসে ফ্যাকাশে চেহারা, স্থূল মুখে ছোট দুটি চোখ, একতাল ময়দায় টিপে বসানো দু' টুকরো কয়লা।

সে তাঁদের বসতে বলল না। যতক্ষণ তাঁরা বললেন, ততক্ষণ এমিলি নীরবে শুনল; আচমকা বক্তার কণ্ঠ একেবারে থেমে গেল, মাঝখানেই যখন শুকনো হিমেল গলায় এমিলির জবাব এল।

"জেফারসনে আমার কোন ট্যাক্স-ফ্যাক্স নেই। কর্নেল সারটোরিস আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনারা রেকর্ডে দেখতে পারেন।"

"কিন্তু কর্তা তো আমরা; আপনি কি শেরিফের নোটিশ পাননি?"

"তা পেয়েছি। উনি বুঝি নিজেকে শেরিফ ভেবে বসে আছেন। জেফারসনে আমার কোন ট্যাক্স নেই।"

"কিন্তু রেকর্ডে সেরকম কোন প্রমাণ নেই। আমাদের তো আইন—"

"কর্নেল সারটোরিসের কাছে যান—জেফারসনে আমার কোন ট্যাক্স নেই।"

"কিন্তু, মিস এমিলি—"

"কর্নেল সারটোরিসের কাছে যান।" (কম করে দশ বছর কর্নেল সারটোরিস স্বর্গত হয়েছেন।) "জেফারসনে আমার কোন ট্যাক্স নেই। টোবি!" নিগ্রোটা এগিয়ে এল। "এঁদের দরজাটা দেখিয়ে দাও।"

(২)

এমনি করেই তাঁদের আগের পুরুষের পৌরনায়কদের এমিলি জব্দ করেছিল, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, তার বাবার মৃত্যুর দু'বছর পর, তার প্রণয়ীর হঠাৎ অন্তর্ধানের কিছুদিন পর। একদিন একটা বিকট দুর্গন্ধ সে-বাড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়ল। তার প্রণয়ী নিরুদ্দেশ হবার পরদিন থেকে সে বাড়ির বাইরে পা দেয়নি। কেউ কেউ একথা বলতে তার বাড়ি গেল, কিন্তু দেখা করেনি এমিলি। একমাত্র নিগ্রোটা বাজারে ঝুড়ি হাতে আনাগোনা করত বলে বোঝা যেত বাড়িতে প্রাণের লক্ষণ বলতে একটা কিছু আছে।

তারা বলল, "একজন চাকরের পক্ষে এই বাড়ি পরিষ্কার রাখা সম্ভব!" দুর্গন্ধ যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, তারা আশ্চর্য হল না। উদ্ধতগর্বিত গ্রিয়ারসনদের সাথে বাইরের পৃথিবীর স্থূল নোংরা জগতের এও একটা যোগসূত্র।

অতিষ্ঠ হয়ে এক পড়শী আশী বছরের বুড়ো বিচারক স্টিভেন্সকে অভিযোগ জানাল, একটা বিহিত করতেই হবে।

"তা আমি কি করতে পারি, ম্যাডাম!" তিনি বললেন।

"কেন, তাকে এটা বন্ধ করতে আদেশ দিন না! আইন বলে তো একটা জিনিস আছে!"

"দরকার হবে না," স্টিভেন্স বললেন, "হয়ত নিগ্রোটা সাপ কি ইঁদুর-টিঁদুর মেরে আঙিনায় ফেলে রেখেছে। আমি ওকে ডেকে বলে দেব।"

পরদিন আরও অনেক অভিযোগ এল।

"কিছু একটা করতেই হবে স্যার। মিস এমিলিকে বিরক্ত করবার কোন ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু দুর্গন্ধটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।" সে-রাত্রে আবার অল্ডারম্যানদের সভা

বসল—তিনজন পাকা দাড়ি, একজন ছোকরা।

ছোকরাটি বলল, "অতি সোজা কথা, তাকে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে বলে খবর পাঠান। একটা সময় দিন—যদি এর মধ্যে—"

"ড্যামিট—" স্টিভেন্স বললেন, "এও কি সম্ভব, একজন মহিলাকে মুখের ওপর বলবে তোমার গায়ে দুর্গন্ধ!"

শেষে গভীর রাতের অন্ধকারে তারা চারজন সন্তর্পণে আড়াল দিয়ে বাড়ির আনাচে কানাচে চূণ ছড়িয়ে রেখে এল। মাঝে একবার উপরের এক অন্ধকার জানালায় আলো জ্বলে উঠেছিল—নিশ্চল এমিলির ছায়ামূর্তি জানালায় দৃশ্য হয়েছিল হাত পা মাথা বিহীন পাষাণ প্রতিমার মত। পা টিপে টিপে তারা সরে পড়লো। কয়েকদিনের মধ্যেই গন্ধটা মিলিয়ে গেল।

সেদিন থেকে লোকে সত্যি সত্যি এমিলির জন্য দুঃখ বোধ করতে লাগল। গ্রিয়ারসন পরিবারে মস্তিষ্ক বিকৃতির নজীর আছে, কিন্তু আসল ব্যাপার, তাদের আভিজাত্যটা কিছু উৎকট ধরণের। আভিজাত্যের গরমে কোন ছেলেই মিস এমিলির কাছাকাছি এগুতে পারেনি। এমিলি ও তার বাবাকে দূর থেকেই দেখেছি। তাদের আমরা রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ বলে কোনদিন ভাবতে পারিনি। বহুদিন পর্যন্ত একটা মূক অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীর মত এমিলি ও তার বাবার ছবি আমাদের স্মরণে ছিল—সামনের দরজার ফ্রেমে আঁটা এমিলির ছিপছিপে দেহলতা, তার দিকে পিছন ফিরে তার বাবার ছায়ামূর্তি, হাতে ঘোড়ার চাবুক। ত্রিশে পা দিয়েও এমিলি কুমারী থেকে গেল এতে খুশী ঠিক হইনি,—আক্রোশটা একটু মিটেছিল বলতে পারি।

তার বাবা মরে গেল, সম্পদ বলতে এমিলির রইল শুধু বাড়িখানা। এতে লোকে খুশী হল—অতঃপর এমিলিকে তারা করুণা করতে পারবে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে এতকাল পরে এমিলি মানুষ বলে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। একটা পেনীর আসা-যাওয়ার সাথে মানুষের হর্ষ বিষাদের সেই চিরপুরাতন সম্বন্ধ আজ এমিলিও বুঝতে পারবে।

লোকে শোক সহানুভূতি জানাতে এল, এমিলি দরজায় দাঁড়িয়ে সবাইকে ফিরিয়ে দিল, বলল, "বাবা তো মরেনি!" অনেক করে মৃত-দেহটি কবর দেবার জন্য ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল।

আমরা সেদিন উন্মাদ বলে এমিলিকে সন্দেহ করিনি। ভেবেছিলাম, যে লোকটা তার জীবনের পথ থেকে কত ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়ে তার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে তাকে মৃত্যুর পরও ও আটকে রাখতে চেয়েছিল।

(৩)

একবছর কেটে গেল। রাতারাতি শহরের পথঘাট পাকা করবার হিড়িক পড়ে গেল। কণ্ট্রাক্টর, কলকব্জা, নিগ্রো কুলিতে রাস্তাগুলো গিজগিজ করে উঠলো। আর তাদের সাথে এল হোমার ব্যারণ বলে ঢ্যাঙ্গা এক ইয়াঙ্কি ফোরম্যান।

প্রথম দিন, দলে দলে ছোট ছেলে তাকে ঘিরে কি করে সে নিগ্রোদের গালাগাল দেয় শুনতে এল। দ্বিতীয় দিন থেকে যেখানেই হাসি, হৈ-হুল্লোর সেখানেই মধ্যমণি হোমার ব্যারণ। এর পরের দৃশ্য, এক রবিবার অপরাহ্নে হলদে চাকার গাড়ীটা এক জোড়া ঘোড়া জুতে রাস্তায় বেরোল—সওয়ার মিস এমিলি ও হোমার ব্যারণ।

প্রথমে আমরা খুশী হয়েছিলাম, যাক্ এতদিনে এমিলি একটা কিছু পেয়েছে। অবশ্য মেয়েরা বলছিল, "গ্রিয়ারসন বাড়ির মেয়ে যে একটা দিনমজুরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে তা মনে হয় না।" আরও বুড়ো যারা তাদের মত, যত দুঃখই পাক্ খানদানী লোকে খানদানী ভোলে না। তারা শুধু বললে, "বেচারী এমিলি!"

কানাকানি শুরু হয়ে যায়, "হ্যাঁ হে, সত্যি কি— —?" "তা নয় তো কি—এ ছাড়া আর কি হতে পারে?"

সহসা ক্লপ-ক্লপ-ক্লপ শব্দে রাস্তা মুখরিত করে জুড়ি ঘোড়ার গাড়ীটা গড়িয়ে যায় রবিবারে অপরাহ্ণে। অপরাহ্ণের কিরণ ব্যর্থ করে আটকানো খড়খড়ি, ভিতরে সিল্ক সাটিনের খস্খস্ ধ্বনি। আওয়াজ ওঠে "বেচারি এমিলি।"

এমিলির মাথা কিন্তু উঁচুই হ'তে থাকে—আগের চাইতেও উঁচু। মাথা উঁচু করেই শেষ গ্রিয়ারসন হিসাবে সে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চায়। সে যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে এটা ভাল করে বাজিয়ে জেনে নিতে চায়, সমালোচনা করবার মত কাজ সেইজন্য হয়ত ওকে করতে হয়েছিল।

এমনি উঁচু তার মাথা সেদিনও ছিল, এর এক বছর পর যেদিন সে ওষুধের দোকানে বিষ কিনতে গিয়েছিল।

"দোকানে সব চেয়ে কড়া যে বিষ আছে ইঁদুর মারা বিষ চান—"

"দোকানে সব চেয়ে কড়া যে বিষ আছে তাই—কি বিষ তা বুঝি না।"

কয়েকটা নাম করে দোকানদার বলল, "এতে হাতী অবধি মারা যায়—তবে আপনি যা চাইছেন তা হচ্ছে—"

"আর্সেনিক! খুব কড়া হবে তো?"

"তা তো হ'বে—কিন্তু আপনার দরকার তো—"

"আর্সেনিক!"

দোকানদার তার দিকে তাকালো। এমিলিও উল্টে তাকালো। মরিয়া হয়ে দোকানদার বলল—"কিন্তু আইন আছে আপনাকে জানাতে হবে কি কাজে—" এর উত্তর তখুনি পেয়েছিল, এমিলির গ্রিয়ারসনী চোখের অগ্নি দৃষ্টিতে। আর্সেনিক তাকে প্যাক করে দিতে হয়েছিল।

(৪)

আমরা বললাম, "নিশ্চয় আত্মহত্যা করবে।" তার কারণ ছিল। প্রথমে আমরা বলেছিলাম এমিলি হোমার ব্যারণকে বিয়ে করবে। পরে জেনেছিলাম, হোমার ব্যারণ বিয়ের কথা মোটেই ভাবে না, বলে, বিয়ে করা দলের ছেলে ও নয়। তবু রবিবারের বিকালে সেই ঘোড়ার গাড়ী আবার টগ্বগিয়ে চলে যায়, ভিতরে এমিলির মাথা উঁচু, হোমারের মুখে সিগার, মাথায় তেকোণা টুপি, হাতে লাগাম, চাবুক, হলদে দস্তানা। এইবার আমরাও বলি, "বেচারী এমিলি।"

শহরের যুব-সম্প্রদায়ের চোখের সামনে একটা দুর্নীতির দৃষ্টান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে নীতিবাগীশদের মুখপত্র একদিন এমিলির সাথে মোলাকাৎ করতে গেলেন। সে মোলাকাতের ফলাফল কি হয়েছিল তা বহু অনুরোধেও তিনি প্রকাশ করেন নি, তবে দ্বিতীয়বার যেতে তিনি একেবারে সোজা অস্বীকার করেন।

সেই রাত্রেই তাঁর স্ত্রী খবর দিলেন, আলাবামাতে—এমিলির দুই জ্ঞাতি বোনকে। খবর পেয়ে তাঁরা এমিলির বাড়িতে চলে এলেন। রুদ্ধশ্বাসে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম, কি হয় দেখতে—আলাবামার এই দুই বোন আরও কড়া গ্রিয়ারসন কিনা!

দুদিন দেখতেই চলে গেল, তৃতীয় দিনে এমিলি কতগুলো টাই, কলার, নাইট সার্ট ও সুট কিনল—আর কিনল পুরুষের ব্যবহারের রুপার টয়লেট সেট—প্রত্যেকটিতে নাম খোদাই করা—এইচ বি। এবার আমরা বললাম, ওরা বিয়ে করেছে। দু'একদিনের মধ্যেই আলাবামার বোনেরা আলাবামায় ফিরে গেলেন। এক সন্ধ্যার গোধূলিতে পড়শীরা দেখল নিগ্রোটা হোমার ব্যারণকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই শেষ—এর পর হোমার ব্যারণকে আর কেহ দেখেনি। এমিলিকে অল্পস্বল্প দেখেছি, বেশী দেখেছি নিগ্রোটাকে, বাজারের ঝুড়ি হাতে বাড়িতে আনাগোনা করতে। এমিলি একটু একটু করে মোটা হল, চুলে সাদা রেখা পড়ল। ধীরে ধীরে কালোর সংখ্যা কমে সব চুল সাদা হয়ে ঘষা লোহার রং ধরল। শেষ অবধি তার চুলের সেই চক্চকে ঘষা লোহার রং বজায় ছিল।

বাইরের জগতের সঙ্গে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র শেষের দিকে কয়েক বছর তার হয়েছিল, চীনা মাটিতে রংয়ের কাজ শেখাবার একটা ক্লাসের মত যখন সে করেছিল। শেষ ছাত্রটি সেদিন শেষবারের মত তার দরজা থেকে বেরিয়ে গেল সেদিন থেকে এমিলি বাইরের জগৎ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সেই নিগ্রোকে দেখেছি, বাজারের ঝুড়ি হাতে আনাগোনা করতে। দিনে দিনে তারও সব চুল সাদা হয়ে গেল। পিঠ কুঁজো হয়ে গেল। প্রতি ডিসেম্বরে একখানা করে ট্যাক্স নোটিশ আমরা এমিলির নামে পাঠিয়েছি, নিয়মিত ফিরে এসেছে সে নোটিশ। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে তোলা এক প্রাচীন প্রতীকের মত এক যুগের বার্তা আর এক যুগে বহন করে চুয়াত্তর বছর বয়সে এমিলি মরে গেল। সেই ভারী ওয়ালনাটের খাটে এমিলিরই সমবয়সী বিবর্ণ বালিশটায় এমিলির মাথা নিথর হয়ে পড়ে রইল।

(৫)

বাজারে কেনা ফুলের একটা পাহাড় এমিলির দেহের উপর জমে গেল। চাপা ফিস্ফাস কথা, সকৌতুক চকিত চোখের ইতস্ততঃ চাহনিতে আবহাওয়া ছমছমে হয়ে উঠেছে। অতি বৃদ্ধ কোন কোন লোক গোল হয়ে গল্প করছে, যেন এই সেদিন এমিলি ছিল তাদের নাচের সঙ্গিনী। বৃদ্ধের চোখে অতীতটা দীর্ঘ-পথের অপর প্রান্তের মত ক্রমশ সরু হয়ে মিলিয়ে যায় না—হয়ে থাকে এক চিরবসন্তের সবুজ প্রান্তর, কোন শীত যাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারে না।

উপরতলায় এমিলির একটা ঘর ছিল, এই চল্লিশ বছরে সে ঘর অন্য কেউ খোলেনি। সুষ্ঠুভাবে এমিলির সমাধি হয়ে গেল। দরজা ভেঙে সে ঘর আমরা খুললাম। আমরা ঘরে ঢুকলাম। দমকা হাওয়ায় খানিকটা ধুলো উড়ল।

যেনো একটা সাজানো বাসর ঘিরে কবরের অদৃশ্য ভ্রূকুটি। তার থমথমে ছায়া পড়েছে-রং জ্বলে যাওয়া গোলাপী পর্দায়। গোলাপী অবগুণ্ঠনে ঢাকা প্রদীপে, ড্রেসিং টেবিলের উপর কলঙ্ক ধরে যাওয়া রুপোর টয়লেট সেটে—কলঙ্ক ধরে টয়লেট সেটে খোদা নামগুলি ঢেকে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। টেবিলে একটা কলার, একটা টাই, এই যেন কেউ খুলে রেখেছে। পুরু হয়ে ধুলোর স্তর জমে গেছে উপরে। চেয়ার থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা সুটটা ঝুলছে। একজোড়া বোবা জুতো আর মোজা মেঝেতে পড়ে আছে।

আর মানুষটি—সে বিছানায় শুয়ে।

সে মাংসহীন মুখের বীভৎস হাসি অনেকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে দেখলাম। আলিঙ্গনের ভঙ্গিতেই শুয়েছিল সে। কিন্তু প্রেম—তার চেয়েও শক্তিশালী মৃত্যু। নাইট সার্টের ভিতরে তার দেহের সবটা একটু একটু করে গলে, ক্ষয়ে বিছানায় মিশে গেছে। তিল তিল করে অসীম ধৈর্যে জমেছে একটা স্থায়ী ধুলোর স্তর তার মাথার বালিশের উপর।

তারপর আমরা আরও দেখলাম। দ্বিতীয় বালিশটাতে গভীর হয়ে বসে যাওয়া একটি মাথার ছাঁচ। একজন হাত দিয়ে সেখান থেকে কি যেন তুলল। ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখলাম—সুদীর্ঘ কয়েক গুচ্ছ কেশ—শুভ্র, চকচকে ঘষা লোহা।*

(অনুবাদকঃ সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত)

*উইলিয়াম ফকনার—A Rose for Emily.

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৭)

প্রভাসকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই জ্বরে পড়লাম। সামান্য গা-গরম, আততায়ীর পদক্ষেপ অত্যন্ত মৃদু,—আছে কি নেই, সব সময়ে ধরাই যায় না।

এ পূর্ণিয়ার অকুলীন ম্যালেরিয়া জ্বর নয়, যা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রিতে পৌঁছে দেয়। আমরা ত গোলা লোক, আমাদের কথা স্বতন্ত্র, জ্বরের ধীর-মন্থর বনেদি চাল দেখে বহুদর্শী চিকিৎসক নিমাইবাবুই ধরতে পারেন নি যে, যিনি আমার দেহে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি রাজ-চক্রবর্তী সান্নিপাতিক বিকার; ইংরেজি চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় Enteric অথবা Typhoid fever.

উপসর্গ কিছুই নেই; তরল পথ্যের উপর আছি; শুয়ে বসে কাটাই; অল্প-স্বল্প পড়ি; গল্প-টল্পও করি। এদিকে জ্বরের গতি ধীর, কিন্তু সুনিশ্চিত ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বদিকে এগিয়ে চলেছে, মুখের দিকেও, লেজের দিকেও। অর্থাৎ Maximum ও Minimum টেম্পারেচার, দুই-ই। কিন্তু এমন একটু বিশেষ কায়দায় যে, মুখ এবং লেজের দূরত্ব ক্রমশ অল্প হয়ে আসছে।

এ লক্ষণটা তেমন ভাল নয়। জ্বর যদি ডিগ্রি সাড়ে তিন-চারের মধ্যে ওঠা-নামা করে, তাহলে বুঝতে হবে সে নমনীয়, সুতরাং তার প্রকৃতি কতকটা সরল। কিন্তু সে যদি লেজ ও মুখ সঙ্কুচিত করে ডিগ্রি দেড় দুয়েকের মধ্যে ঠাঁই নেয়, তাহলে বুঝতে হবে সে বিষধর সর্পে পরিণত হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে দংশন করে প্রাণবিয়োগ ঘটাতে পারে।

সে যাই হোক, আমাকে নিয়ে তেমন উদ্বেগের কারণ ছিল না। নিমাইবাবু অন্তত আমাদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে, সরল রেমিটেণ্ট জ্বর, যে কোন সপ্তাহের মাথায় ছেড়ে যাবে। উদ্বেগ কিন্তু প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছিল মেজদিদিকে নিয়ে। গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে তিনি নানা প্রকার জটিল ব্যাধিতে ভুগছিলেন; রোগশয্যা থেকে সংবাদ পাচ্ছিলাম, তাঁর অসুখটা হঠাৎ অনিবার্যগতিতে খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। শরৎ প্রায়ই আমাকে দেখতে আসত, আর মাঝে মাঝে বলত, 'উপীন, মা বোধ হয় এবার আর বাঁচবে না।' শুনে মনের মধ্যে ভারি কষ্ট পেতাম। সরল ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য মেজদিদিকে আমরা ভারি ভালবাসতাম।

এদিকে আমার জ্বর আপাত-সরল গতিতে দিনের পর দিন অতিক্রম করে তিন সপ্তাহের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৈকালে নিমাইবাবু আমাকে দেখতে এসেছেন। বহুক্ষণ ধরে নাড়ি পরীক্ষা করে মনে হল, তাঁর মুখটা যেন একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। ভাবলাম, তিন সপ্তাহের শেষে জ্বরটা ছেড়ে না গিয়ে আরও এক-আধ সপ্তাহ নেবে, হয়ত সেই কথা ভেবে নিমাই-বাবু একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তিনি পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত নীচে নেমে গেলেন।

মার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললাম, 'মা, মশারিটা তুলে দাও ত।'

আমার কথা শুনে মার মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছায়া দেখা দিলে; দাদাকে সম্বোধন করে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, 'লালমোহন, উপীন ভুল বকছে; শীগগির নিমাইবাবুকে ডেকে আনো।'

দাদা তাড়াতাড়ি নীচে চলে গেলেন। আমি দেখলাম, ভুলই বলেছি বটে, মশারি তোলাই আছে। মাতাঠাকুরাণীর অতি-ভয়ার্ততায় ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আচ্ছা, কুড়ি-একুশ দিন জ্বরে ভুগছি, একটু যদি ভুলই হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে ভুল বকছে?'

শুনেছিলাম, মিনিট চার-পাঁচেকের মধ্যে বাবা ও নিমাইবাবু আমার পার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে আমি বিকারের চরম স্তরে উপনীত হয়ে উন্মত্তভাবে চীৎকার করছি, 'চামার! চামার!' কার প্রতি এই সৌজন্য প্রকাশ করছিলাম, সেটা কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ পায়নি।

অতঃপর দিন কুড়ি-বাইশ চলল একেবারে মহা-নিমগ্নতার পালা। চন্দ্র-সূর্য যার উঠেছে, তার উঠেছে, আমার ওঠেনি; দিবা-রাত্রি যার হয়েছে, তার হয়েছে, আমার হয়নি। জ্ঞান-জগতে যখন প্রথম প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন বুদ্ধি স্তিমিত, অনুভূতি আচ্ছন্ন, স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় এবং দৈহিক শক্তির পরিপূর্ণ বিরতি। নবজাত শিশুর অপরিণত চৈতন্য যেরূপ হয়, আমারও তখন কতকটা সেইরূপ অবস্থা।

শুনেছিলাম, ঐ 'ন দিন ন রাত, ন চন্দ্র ন সূর্য' দিনগুলিতে আমার উপর দিয়ে টাইফয়েডের টাইফুন-ঝটিকা প্রবাহিত হয়েছিল। ডবল নিউমোনিয়া থেকে আরম্ভ করে কোমা, ডিলিরিয়াম, বেড-সোর—কিছুই বাদ পড়েনি। অসুখ বাড়াবাড়ি হতেই ভাগলপুরের অপর একজন বড় ডাক্তার, টাইফয়েড স্পেশালিস্ট, শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিমাইবাবুর সহিত চিকিৎসায় যোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি, এক-দিন রাত্রি এগারোটার সময়ে আমার অবস্থার চরম অবনতিকালে ভাইনাম গ্যালিসিয়া, মৃগনাভি ও মকরধ্বজের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ করেও চিকিৎসকদ্বয় যখন আমার দ্রুত-অপচীয়মান জীবনশক্তিকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন মাতাঠাকুরাণী, সব-কিছু লৌকিক উপায়ের অন্ত হয়েছে আশঙ্কা করে, পাগলিনীর ন্যায় পদব্রজে ছুটেছিলেন এক মাইল দূরস্থিত বুড়ানাথ মহাদেবের মন্দিরে। বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে বাড়ির আরও তিন-চারজন স্ত্রী-পুরুষকে ছুটতে হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি থেকে লোক গিয়ে যখন সংবাদ দিলে, আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তখন মা উপুড় হয়ে বুড়ানাথের সামনে পড়ে, কপালে রক্তের চিহ্ন। সাষ্টাঙ্গে বুড়ানাথকে প্রণাম করে ফুল-বিল্বপত্র নিয়ে মা যখন গৃহে ফিরলেন, তখন আমার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া পুনরায় বোঝা যেতে আরম্ভ হয়েছে।

নিমাইবাবু বলেছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র দুটি টাইফয়েড রোগীকে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা থেকে সেরে উঠতে দেখেছিলেন—আমাকে এবং একটি সতের বৎসর বয়সের মুসলমান বালককে।

পথ্যের পরিমাণ এবং প্রকারের ক্রমোন্নতির সহিত হারানো শক্তিগুলি পুনরায় ফিরে পেতে লাগলাম। মেজদিদির কথা মনে পড়তে আরম্ভ করেছে; কিন্তু কেউ আমাকে তাঁর কথা বলে না বলে আমিও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি, কি জানি, কি কথা শুনতে হয়। মনটা তাঁর জন্য উৎসুক ও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে।

সহসা দৈব একদিন আমার সংশয়ের নিরসন করে দিলে। জ্বর ত্যাগ হয়েছে প্রায় দিন কুড়িক, তখনো কিন্তু আমি সম্পূর্ণ উত্থানশক্তিরহিত। বৈকালের দিকে জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছি, হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলে শরৎ। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই জিভ্ কেটে পালিয়ে গেল। মাথা তার নেড়া। শরৎ হয়ত ভেবেছিল, আমি হয় ঘুমিয়ে, নয় পাশ ফিরে শুয়ে আছি।

শরতের ন্যাড়া মাথার অর্থ বুঝতে বিলম্ব হল না। আঘাত পেলাম, কিন্তু দুর্বল চিত্তে আঘাতের চোটও বোধ হয় তেমন সবল হতে পারে না। সান্নিপাতিকের মহাসাগর তলে

আমি যখন নিমগ্ন, সেই সময়ে মেজদিদি পরলোকগমন করেছেন।

দিন দুয়েক পরে মাকে বললাম, "মা, প্রভাসকে ডেকে দাও—একটু গল্প করব।"

মা বললেন, "তোমার ছোঁয়াচে অসুখ হয়েছিল; আর দিনকতক যাক, তারপর প্রভাস আসবে।"

আমি বললাম, "আসছে ত ঘরে সবাই, এক শরৎ আর প্রভাস ছাড়া। আমি জানতে পেরেছি মেজদিদি মারা গেছেন।"

বিস্মিতকণ্ঠে মা বললেন, "কে তোমাকে বললে?"

বললাম, "কেউ বলেনি, ন্যাড়া মাথা নিয়ে শরৎ পরশু ঘরে ঢুকে পড়েছিল।"

দুঃখের মধ্যেও মার মুখে মৃদু হাস্যের আমেজ দেখা দিলে; বোধ হয় মনে মনে ভাবলেন, ধর্মের কল বাতাসে এমনি করেই নড়ে। প্রকাশ্যে বললেন, "তোমার মনে কষ্ট হবে বলে ওরা আসত না। আচ্ছা, প্রভাসকে ডেকে দোবো।"

শরতের কনিষ্ঠ ভাই প্রকাশের না-আসা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি—বয়সে আমি তার নাগালের অনেক বাইরে।

ক্ষণকাল পরে প্রভাস এসে হাজির হল। আমার খাটের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে আমার একটা হাত ধরে হাসিমুখে বললে, "কেমন আছ উপীন মামা? —ভাল আছ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললাম, "হ্যাঁরে প্রভাস, মেজদিদি চলে গেলেন? কিছুতেই রইলেন না?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে প্রভাস বললে, "নাঃ! কিছুতেই না।"

"কবে মারা গেলেন?"

"দিন কুড়ি-বাইশ হবে।"

বললাম, "তুই আমার কাছে আসতিস্ নে কেন বল্ দেখি? বিকারের ঝোঁকে 'প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল! প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল!' বলে চেঁচাতাম, তাই রাগ করেছিলি?"

ভুরু কুঁচকে প্রভাস বললে, "দূর! তাই কখনো কেউ করে? বোম মামা (আমার দাদা) কাঁচি দিয়ে তোমার চুল ছেঁটে দিচ্ছিলেন, তুমি যে তাঁকে নাপিত মনে করে ঠাস করে তাঁর গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিলে, তাইতে কি তিনি তোমার ওপর রাগ করেছিলেন? বিকারের রুগী আর পাগল ত' একই ধরণের মানুষ।"

কিছুক্ষণ গল্প করে প্রভাস চলে গেল।

বৈকালের দিকে শরৎ এসে হাজির হল। হাসতে হাসতে বললে, "আমার ন্যাড়া মাথা দেখে তুই ভেবে নিলি কেন উপীন, মা মারা গেছেন। আমার নামই ত' ন্যাড়া।"

আমি বললাম, "তোমার নাম ন্যাড়া হতে পারে, কিন্তু মাথায় ত' তোমার বড় বড় চুল ছিল।"

মেজদিদির মৃত্যুতে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে শরৎ বললে, "মা মারা গেছেন, সে এক-রকম ভালই হয়েছে উপীন।"

বিস্মিত ও আহত হয়ে বললাম, "কেন?"

শরৎ বললে, "এক বাড়িতে দুজন রুগীর অবস্থা অত বাড়াবাড়ি হলে একজন মারা না গেলে আর একজন ভাল হয় না। তুই ছেলে-মানুষ, তুই ভাল হয়ে উঠেছিস, এ কত আনন্দের কথা!"

এ-কথার মধ্যে আমার প্রতি শরতের মমতা প্রকাশ পেলেও কথাটা আমার তেমন ভাল লাগল না। প্রতিবাদস্বরূপ বললাম, "কিন্তু দুজনে ভাল হয়ে উঠলে আরও কত ভাল হত!"

শরৎ বললে, "তাত হতই, কিন্তু অত ভাল সব সময়ে হয় না।"

আমার সহিত বেশি কথা কওয়া তখনো বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল, অল্পক্ষণ পরেই শরৎ চলে গেল।

(৮)

আমার অসুখের খুব বাড়াবাড়ির সময়ে আরোগ্য-কামনায় কালীপূজা মানত করা হয়েছিল। মুঙ্গের থেকে আমাদের কুল-পুরোহিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছেন পূজা করতে।

প্রত্যহই হাসিতে ও কাশিতে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। গল্প করতে করতে তিনি যত হাসেন, তামাক খেতে খেতে তত কাশেন। যখন তামাক খেতেখেতে গল্প করেন, তখন হাসি ও কাশির ঐকতানিক লহরা চলতে থাকে। উগ্র গৌরবর্ণ দেহ, তার উপর খাড়া নাকে আর মাথার টাকে পুরোদস্তুর বামুন-পণ্ডিতি চেহারা; সরল অন্তঃকরণ; আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

স্থানীয় কারিকরের বাড়ি থেকে প্রতিমা গড়িয়ে এসেছে। সারাদিন মহা উৎসাহ ও উল্লাসে পূজার উদ্যোগ-আয়োজন চলার পর রাত্রে পূজা আরম্ভ হয়েছে। অন্দর মহলের যে দ্বিতল কক্ষে আমি থাকি, একেবারে পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত বলে তার জানালা চণ্ডী-মণ্ডপের প্রাঙ্গণে খোলে। আমার শয্যা থেকে পূজার হৈ-চৈ, এমন কি, মন্ত্র পাঠের অস্পষ্ট গুঞ্জন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

বাড়ির অধিকাংশ লোকই চণ্ডীমণ্ডপ বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। দ্বিতলের ঘরে আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছেন আমার মেজ ভ্রাতৃজায়া, শ্রীযুত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী, স্বর্গীয়া শৈবলিনী দেবী। বয়সে ইনি আমার চেয়ে ঠিক দুই বৎসরের বড় ছিলেন। স্বভাবের মাধুর্যে ও অন্তরের সুস্পষ্ট সরলতা গুণে ইনি আমাদের পরিবারস্থ সকলের সবিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। আমি তাঁকে শৈলদিদি বলে সম্বোধন করতাম।

কিছুক্ষণ থেকে বেশ জোরে বাজনা বাজছিল; তারপর অল্প একটু বিরামের পর খুব জোরে বেজে উঠেই সহসা একেবারে থেমে গেল। হঠাৎ সব চুপচাপ, শুনশান্।

আমি বললাম, "শৈলদিদি, বুঝতে পারছ কি হয়েছে?"

সকৌতূহলে শৈলদিদি বললেন, "কি হয়েছে?"

"পাঁঠা বেঁধে গেছে।"

বলি বেঁধে যাওয়া অতীব অশুভজনক লক্ষণ। তার সরল অর্থ, পূজায় দেবী প্রসন্না হননি; ফলে ব্যাধির পুনরাক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা।

আমার কথা শুনে শৈলদিদি বেচারার মুখ শুকিয়ে চুণ! এত সেবা-শুশ্রূষা, সাধ্য-সাধনা, রাত জাগাজাগির পর কূলে-তোলা এমন সাধের ঠাকুরপোটিকে যদি সামান্য একটা বলির ফেরে পুনরায় জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, তার চেয়ে হৃদয়বিদারক কাণ্ড আর কি হতে পারে! আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে, আসলে বোধ হয় নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, যথাসাধ্য দৃঢ়তা সঞ্চয় করে বললেন, "কক্ষণো না—ও তুমি ভুল বুঝেছ।"

বললাম, "ভুল বুঝেছি, কি ঠিক বুঝেছি, নীচে গেলেই জানতে পারবে। বলিদানের বাজনা শোনায় এ-দু-কান এত পাকা যে, ভুল বোঝবার উপায় নেই।"

আমার অনুমান অবশ্যই ভুল হয়নি—পাঁঠা বেঁধে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে যাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে বলি হয়ে আসছে। প্রথম প্রথম এক দিনের পূজায় নয়টা করে ছাগ বলি হোত, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনদিন এরূপ ব্যাপার ঘটে নি। একটা গুরুতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় পিতাঠাকুর মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী প্রতিমার সম্মুখে উপুড় হয়ে পড়লেন।

এই মহা অকল্যাণের ব্যাপারে প্রতিকার অবশ্য আছে; কিন্তু সেই কঠিন ও দুঃসাধ্য অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সামান্য মাত্রও ত্রুটি ঘটলে স্বয়ং হোতার সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা। সেইজন্য সহজে কেহও এই দুষ্কর কার্যে ব্রতী হতে চায় না।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কিন্তু প্রস্তুত হলেন। তিনি আমাদের বহুদিনের কুল-পুরোহিত, আত্মীয়ের মতই নিজেকে বিবেচনা করেন,—আমাদের বংশের এত বড় একটা অমঙ্গল অনিরাকৃত রেখে দেবার ভীরুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। তাছাড়া, মাতাঠাকুরাণীর ও পিতা-

...কুর মহাশয়ের কাতরতা দেখে তিনি ...ভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন।

তখন সেই মহাহোমের আয়োজনে সমিধ্ ও গব্যঘৃত সংগ্রহের জন্য দিকে দিকে উদ্যম-শীল লোক ধাবিত হল। বিল্বকাষ্ঠ ও ঘৃত বাড়িতেও কিছু পরিমাণ ছিল, আপাতত তাই দিয়েই কার্য আরম্ভ হয়ে গেল। এদিকে ঐ দ্বিখণ্ডিত ছাগদেহ ছুরি-বঁটি প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে অতি ছোট ছোট টুকরায় কাটা হতে লাগল। তারপর প্রবলভাবে হোমানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে মন্ত্র পাঠ করে করে এক-একটি মাংসের টুকরা মায় অস্থি, রক্ত ও লোম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হতে লাগল। মাংস-খণ্ডের দহনকার্য যাতে ত্বরিত এবং পরিপূর্ণ হয়—অর্থাৎ কুণ্ডের ভিতর হতে কোনপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রান্ত হতে না পারে, তজ্জন্য ঘন-ঘন সমিধ্ ও গব্যঘৃতের প্রয়োগে যজ্ঞাগ্নিকে চরম মাত্রায় জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। গভীর নিষ্ঠার সহিত সারারাত্রি ধরে এই সুদুষ্কর কার্য চলল। অবশেষে শেষ মাংস-খণ্ড যখন যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হল, তখন পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

পাঁঠা বেঁধে যাওয়ার কথা আমি যে জানতে পেরেছি, তা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। মা এসে আমার মাথায় ফুল-বিল্বপত্র ছুঁইয়ে চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। ক্ষণকাল পরে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাকে শান্তিজল দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "মা-কালী পূজোয় খুব প্রসন্ন হয়েছেন উপেন। সারারাত্রি ধরে আস্ত ছাগটি তিনি একেলা খেয়েছেন; আমাদের জন্য একবিন্দুও প্রসাদ রাখেন নি!" বলে পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর সেই পেটেণ্ট হাসি হেসে উঠলেন।

শুনলাম, পাঁঠা বেঁধে গিয়ে হোম যদি সুসম্পন্ন হয়, তাহলে বৎসরাবধি সৌভাগ্যের আর আদি-অন্ত থাকে না। সেরূপ পাঁঠা বেঁধে যাওয়ার কল্যাণ পাঁঠা না-বেঁধে যাওয়ার কল্যাণকে বহু মাইল পশ্চাতে ফেলে যায়।

স্বভাবতঃ আমি অবিশ্বাসী। কিন্তু যে কারণেই হোক, পাঁঠা বেঁধে যাওয়ার পর এক বৎসর কাল আমাদের চলিত ভাষায় যাকে বলে 'ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হওয়া', ঠিক সেই ব্যাপারই হয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে সংস্কার এবং কুসংস্কারের মূলগুলি হয়ত এইরূপ কাক-তালীয় ঘটনার সাহায্যেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

রঙ্গজগৎ

গরবিণী (ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স—ইন্দ্রপুরী)—

কাহিনী : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়; চিত্র-নাট্য ও সংলাপ : নিতাই ভট্টাচার্য; পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী; আলোকচিত্র : অনিল গুপ্ত; শব্দযোজনা : গৌর দাস; সুর-যোজনা : সুধীরলাল চক্রবর্তী; ভূমিকায় : জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, শ্যাম লাহা, কুমার মিত্র, দীপ্তি রায়, কেতকী, সুপ্রভা, রেণুকা রায়, অপর্ণা প্রভৃতি।

প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনে ৯ই নভেম্বর রূপবাণী, ইন্দিরা ও অরুণাতে মুক্তিলাভ করেছে।

স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ চিরাচরিত লাইনের বাইরে দিয়ে চলা এবং পরিকল্পনার অভিনবত্বের জন্যে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী ছবির বাজারে নাম ক'রে রেখেছেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্রকে দীপ্তিময় করে তোলার মধ্যে। 'গরমিল' থেকে এই পর্যন্ত যে কোন একখানা ছবি তুলে ধরলেই তাঁর মনের গতি মেয়ে-ঘেঁষা দেখা যাবে। ইদানীং কিন্তু সেই মন একটু এলোমেলো হয়ে উঠেছে। তিনি যা বলতে চান, সেটা খুব স্পষ্ট করে সামনে তুলে ধরতে পারছেন না। মূল বক্তব্যের খেইটা কেমন যেন বারে বারে তিনি হারিয়ে ফেলেন, অথবা বলা যায় যে, বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন্ কথাটাকে আসল বক্তব্য বলে পেশ করবেন, সেটা যেন ঠিক করে উঠতে পারেন না, কেমন যেন একটা আঁতিপাতি ভাব। 'গরবিণী' কাহিনীর মধ্যে বেশ একটা বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিষয়বস্তু বলে আঁকড়ে ধরার মতো একটা কিছুকে স্পষ্ট করে সামনে তুলে ধরতে পারা যায় নি। আর তাই কাহিনীর নামের সঙ্গে কাহিনীর মিল খুবই আবছা থেকে গিয়েছে।

গল্পের আরম্ভ শুভাকে নিয়ে। দেখে মনে হলো সেই গরবিণী। কলেজে পড়ে, কলেজ লাইব্রেরীতে বিদ্বান, দাম্ভিক অশোকের সঙ্গে তার বিকল্প আলাপ। পরে সেই অশোকই হলো ওর ছোট বৈমাত্রেয় বোন রিণির গৃহশিক্ষক। ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে যে, বাড়ির কর্তা জমিদার হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ইন্দুমতীর বনিবনা নেই। কর্তা হরপ্রসাদ দিনরাত তাঁর ঘরে থাকেন, তাই বাড়ি ও জমিদারীর কর্তৃত্ব করেন ইন্দুমতীর মাতুল যোগেন। শুভা, রিণি বা বাড়ির আর কেউ যোগেনকে বড় একটা সহ্য করতে পারে না। চেহারার ছাপেতেই তার দুর্বৃত্তপনা ধরা পড়ে যায়। নায়েবের সঙ্গে ষড় করে সে জমিদারী উচ্ছন্নে দিচ্ছে। হরপ্রসাদ কোন খবরই রাখেন না, শুভাও তাই মেয়ে হলেও স্বত্ব-ভোগ থেকে বঞ্চিতা। শুভার মা অর্থাৎ হরপ্রসাদের প্রথমা স্ত্রী সম্পর্কে একটা রহস্য আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে। চোদ্দ বছর আগেই তিনি মারা গিয়েছেন বলে রটনা করা হলেও কোথাও একটা অসত্য রয়েছে। এদিকে অশোক ও শুভার বিলাপটা ক্রমশঃই প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। শুভার মা যোগমায়া সম্পর্কে রহস্যটা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়লো। হরপ্রসাদের মাতব্বর প্রজা সনাতন চোদ্দ বছর ধরে গ্রামের পূজো বন্ধ হওয়ায় প্রজারা বিরূপ হয়ে ওঠার কথা জানাতে আসায় কথায় কথায় শুভা তার মা'র প্রসঙ্গে জানতে পারে যে, তিনি পাগল হয়ে রাঁচিতে আছেন। হরপ্রসাদ এতকাল এ খবর মেয়ের কাছে গোপন করে রেখেছেন।

এই সময়েই যোগমায়ার পালক কাকা বর্মার অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার নবীন বাঁড়ুজ্যে সে বাড়িতে এসে হাজির হন, তিনিও যোগ-মায়ার মৃত্যু বিশ্বাস করেন না। শুভার কাছে খবর পেয়ে তিনি শুভাকে সঙ্গে করে রাঁচিতে গেলেন। কিন্তু পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষ হরপ্রসাদের অনুমতি ছাড়া যোগমায়াকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। ওরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে শুভা

জানলো যে, তার বাবা কদিন ধরে নিরুদ্দেশ। আসলে হরপ্রসাদও গিয়েছিলেন রাঁচিতে; কিন্তু সেখানে গিয়ে খবর পেলেন যে, যোগমায়া কদিন ধরে নিরুদ্দেশ। একদিন সবার অলক্ষ্যে যোগমায়া হরপ্রসাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সোজা তিনি নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন, কিন্তু সেখানে দেখলেন ইন্দুমতীকে। ইন্দুমতীর সংগে বচসা হতে হতে যোগমায়া আর্তনাদ করে উঠলো। সবাই সেখানে এসে উপস্থিত হলো। হরপ্রসাদ যোগমায়ার আরোগ্যের জন্যে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করলেন। হরপ্রসাদ বিশেষজ্ঞদের কাছে যোগমায়ার মস্তিষ্ক-বিকৃতির যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন, তাতে জানা গেলো যে, চোদ্দ বছর আগে গ্রামে পুজোর সময় যোগমায়ার দান-ধ্যান ব্যাপারে হরপ্রসাদের পিতা রুষ্ট হন এবং সেই সূত্রে তিনি যোগমায়ার কাকা নবীনের ওপর কটাক্ষ করেন। যোগমায়া তাতে ক্ষুব্ধ হয়। সেই সময়েই যোগমায়া সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়, যাতে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। পিতা হরপ্রসাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়াবার জন্যে যোগমায়াকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু যোগমায়াকে নিরোগ করে তুলতে পারলেন না। তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে, যোগমায়ার পাগলামোটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এবং তার সন্তানের মধ্যেও তা বর্তাতে পারে। এ সংবাদে শুভার সব আশা মিটে গেলো। তাকে বিবাহ করার অশোকের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলো। যোগমায়া বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে বন্দুক কথাটার উল্লেখ করে, আর যোগেন চাটুজ্যেকে দেখলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই সূত্র ধরে মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ আরম্ভ হলো। তাতে জানা গেলো যে, গর্ভপাত হওয়ার ফলে যোগমায়ার যখন প্রথম মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে, সে সময়ে যোগমায়া জীবিত থাকলে হরপ্রসাদের বিবাহে পাছে কোন বিঘ্ন জন্মায়, সে সম্ভাবনা নির্মূল করার চেষ্টায় যোগেন চাটুজ্যে যোগমায়াকে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। সেই সময়ে একদিন যোগেন যোগমায়ার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে জোর করতে থাকে। টানাটানিতে বন্দুকের গুলী ছুটে যায় যেদিকে হরপ্রসাদ ও তাঁর বাবা ছিলেন, সেইদিকে। কিন্তু ব্যাপারটা রটে যায় এই বলে যে, যোগমায়াই তার স্বামী ও শ্বশুরকে হত্যায় উদ্যত হয়েছিলো। এই ঘটনা জানার পর মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে যোগমায়ার মন থেকে আতঙ্কের ভাব দূরীভূত হয় এবং সে আরোগ্যলাভ করে। আর যোগেন ধরা পড়ে ভয়ে পালাতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়, যে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে যোগমায়া একদিন পাগল হয়েছিলো। এর পর শুভাও ছুটে যায় অশোকের কাছে। ওদের বিয়ের দিনে শুভা গিয়ে তার বাবাকে ডেকে নিয়ে এল। আর নবীন ধরে নিয়ে এলেন ইন্দুমতীকে। ইন্দুর ভুল ভাঙলো, সংসারের ভার যোগমায়ার হাতে তুলে দিয়ে সে পাশে এসে দাঁড়ালো।

গল্পে প্রথমে পাচ্ছি শুভা আর অশোককে, তারপর আসছে হরপ্রসাদ ও যোগমায়া। খানিক পরে পাওয়া যাচ্ছে একলা হরপ্রসাদকে এবং শেষের দিকে একলা যোগমায়াকে। ঘটনাবলী গেঁথে যাওয়া হয়েছে এই লাইন ধরেই, যার ফলে কাহিনীর মুখ্য কেন্দ্র বলতে কিছু দাঁড়াতে পারে নি, তেমনি সত্যিকারের নায়ক-নায়িকাও হয়ে ওঠে নি কেউই। কোন একটা দিক বা কোন একটা চরিত্রের ওপর মন বসতে পারে না, যদিও সুস্পষ্ট নাটকীয় উপাদানের অভাব ঘটে নি। গল্পের ধাঁচটা ধরে তার বক্তব্যটা এই সাব্যস্ত করা যায় যে, লোকে পাগল হলেই তাকে বাতিল করে দিতে নেই, কারণ প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে আরোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এই দিক দিয়েই ছবিখানির অভিনবত্ব ফুটেছে। কিন্তু সেটা অন্যান্য ঘটনার মধ্যে এমনি জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে মূল বক্তব্য হিসেবে সেটা তেমন জোর পায় নি। যাই হোক্‌ কাহিনীর মৌলিকত্ব এবং বিশেষ করে অশোক ও শুভার টেরিয়ে বলা সংলাপ ছবিখানিকে উপভোগ্য করে রেখেছে। পরিচালনায়ও কল্পনা-শক্তির বেশ প্রখরতা কতক ক্ষেত্রে দেখা যায়। চরিত্রগুলি নেহাৎ অপলকা নয়, ঘটনাবলীর মধ্যেও জোর আছে, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব ঘটেছে যার জন্যে সমষ্টিগতভাবে মনের ওপরে খুব একটা গভীর রেখা টেনে দিতে পারে না।

অভিনয়ের ব্যাপারে একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সাধারণত যাকে যে ধরণের চরিত্রে দেখায় লোকে অভ্যস্ত, এতে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা তার উল্টো ধরণের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গম্ভীর, উদাস-প্রকৃতির ও অনুশোচনায় বিক্ষুব্ধ অন্তর হরপ্রসাদের ভূমিকায় নেমেছেন জহর গাঙ্গুলী: কুশলী অথচ রসিক দাদু নবীনের ভূমিকায় নেমেছেন ছবি বিশ্বাস; কূটপ্রকৃতি দুরাত্মা যোগেনের ভূমিকায় নেমেছেন শ্যাম লাহা। শুভা ও অশোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে দীপ্তি রায় ও বিকাশ রায়। চটুল রিণির ভূমিকায় হাস্যরস পরিবেশন করেছেন কেতকী-রাণী।

কলা-কৌশলের দিকটা সর্বাঙ্গীনভাবেই শোচনীয়। অত্যন্ত নাটকীয় দৃশ্যও শব্দের জড়তায় সংলাপকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। ক্যামেরার কাজও সুবিধের হয় নি বেশীরভাগ জায়গাতেই। সুর-যোজনায় সুধীরলাল চক্রবর্তী কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারেন নি।

বহুরূপীর নাট্যোৎসব

আগামী ৩রা ডিসেম্বর থেকে প্রায় দেড় মাস যাবৎ প্রতি রবিবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বহুরূপী সম্প্রদায় কর্তৃক একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ রকম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন অভিনব। প্রথম রবিবার, ৩রা ডিসেম্বর অভিনীত হবে তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'পথিক'; ১০ই ডিসেম্বর শ্রীসঞ্জীব প্রণীত "উলুখাগড়া।" ১৭ই ডিসেম্বর তুলসী লাহিড়ীর "ছেঁড়া তার"। এর পরের তিনটি রবিবার ঐ তিনটি নাটকেরই পুনরভিনয় হবে। বহুরূপীর পুরোভাগে আছেন প্রখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। নাটকখানিতে অভিনয় করবেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালি সরকার, গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি।

নৃত্য-শিল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী

দীর্ঘ ক' মাস ধরে ভারতীয় নাচের নামে একপ্রকারের হাত-পা সঞ্চালন দেখে রসপিপাসুরা যে সময় প্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলো এমনি সময়ে আবির্ভূতা হলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী। গত ৬ই নভেম্বর পূর্ব পরিষদের উদ্যোগে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে দক্ষিণ ভারতের এই শিল্পী অভিবাদন জানান।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী প্রখ্যাত নৃত্য-শিল্পী রাগিণী দেবীর কন্যা। ইতিপূর্বে রাগিণী দেবীর সংগে ভ্রমণকালে তিনি এই নিউ এম্পায়ার মঞ্চেই নাচ দেখিয়েছেন, তবে তখন তাঁর শিক্ষানবিশীকাল এবং প্রায় শৈশবাবস্থা। তারপর দীর্ঘকাল ইউ এস কুঞ্জরাওয়ের অধীনে ভারত নাট্যম পদ্ধতিতে নৃত্য শিক্ষা করে আমেরিকায় যান। সেখানে নিউ ইয়র্ক মঞ্চে তাঁর নাচে মুগ্ধ সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তারপর কলকাতায় তাঁর এই অবতরণ হচ্ছে পরিণত শিল্পী হিসেবে ভারতে তাঁর প্রথম প্রকাশ। বড়ো শিল্পীর যে যে গুণের দরকার—সুঠাম দেহ, মাধুর্য, লাবণ্য, শুভাভিব্যক্তি, মুদ্রাবিন্যাস ও ছন্দোজ্ঞান—ইন্দ্রাণীর মধ্যে সব কটি লক্ষণই পাওয়া যায়। তাঁর নাচের মধ্যে ভারত নাট্যমের শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্য চমৎকার ফুটে ওঠে—সাবলীল গতি বিস্তার, সুললিত অঙ্গ-সঞ্চালন (মুদ্রা ও অভিব্যক্তি), আর ছন্দোময় তাল। ইন্দ্রাণী সম্প্রদায়ের আর একজন বড়ো কৃতী হচ্ছেন নাট্যকলা বিশারদ পান্ডনাল্লুর চোক্কালিঙ্গম পিল্লাই—সংগীত পরিচালক। শ্রীপিল্লাই তাঞ্জোরের বিখ্যাত নৃত্য ও সংগীতবিদ্ বংশোদ্ভূত। ইতিপূর্বে তিনি আদিয়ারে রুক্মিণী দেবী প্রতিষ্ঠিত কলাক্ষেত্রে নৃত্য-শিক্ষক ছিলেন।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী নতুন নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে স্মরণীয় কৃতিত্ব স্থাপনের আভাস দিয়ে গিয়েছেন।

দেশী সংবাদ

১৩ই নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক কংগ্রেস-কর্মীর দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনে "কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি" নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যথাক্রমে এই দলের সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

রক্সৌলের সংবাদে প্রকাশ, নেপালী কংগ্রেস বাহিনী অভিযানের দ্বিতীয় দিবসে সেমরা হইতে অগ্রসর হইয়া দশ মাইল দূরবর্তী আমলেখগঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা বীরগঞ্জ প্রদেশের সীমান্তবর্তী কতকগুলি ঘাঁটি অধিকার করিয়াছে এবং পশ্চিম নেপালের পালপা জেলায় পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নেপালের তৃতীয় বৃহত্তম শহর বিরাটনগরেও কংগ্রেস বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য পার্লামেণ্টের শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে এক ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট ১৯৫১ সালের নবেম্বর মাসের শেষার্ধে কিম্বা ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে পার্লামেণ্টের ও বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার জন্য সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবেই স্থির করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলিয়া বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতবর্ষ শান্তি কামনা করিতেছে। বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।

নেপাল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত নূতন সৈন্যদল বিরাটনগরে পৌঁছিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, রেশন অঞ্চলে মাথাপিছু সাপ্তাহিক যে সাত ছটাক করিয়া খাদ্য-রেশন হ্রাস করা হইয়াছে, আগামী সোমবার, ২০শে নবেম্বর হইতে তাহা অবশ্যই পুনর্বহাল করিয়া মাথাপিছু পূর্বের ন্যায় ২ সের ১০ ছটাক করিয়া রেশন দেওয়া হইবে।

১৫ই নবেম্বর—গতকল্য ভারতীয় পার্লামেণ্টের শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধন ভাষণে রাষ্ট্রপতি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, অদ্য সেগুলি সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বিতর্ক আরম্ভ হয়। প্রতিবেশী দেশসমূহের নূতন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিয়া ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিয়া তোলা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যগণ বক্তৃতা দেন। অদ্যকার বিতর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বক্তৃতা। তিনি দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার সহিত বক্তৃতা দেন এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

১৫ই নবেম্বর—অদ্য পার্লামেণ্টে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, কোরিয়া সংগ্রামে চীনা বাহিনীর যোগদানের ফলে কোরিয়া কমিশনে সহযোগিতা সম্পর্কে গুরুতর সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হইবে না। শ্রী নেহরু বলেন যে, এ পর্যন্ত ভারত কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট, একটি মেডিক্যাল ইউনিট ও ঔষধপত্র সরবরাহ করিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

নেপালে সরকারী বাহিনীর অগ্রগামী দল বীরগঞ্জের সোজা ১২ মাইল উত্তরে জিৎপুরে পৌঁছিয়াছে।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, লাসা হইতে ভারত সরকার সরকারী সূত্রে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, তিব্বত-চীন সম্পর্ক সম্বন্ধে যে চুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সর্বৈব মিথ্যা।

পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং উহার সম্পাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁহাদের দল প্রার্থী দাঁড় করাইবেন।

১৬ই নবেম্বর—অদ্য পার্লামেণ্টে ভারত সরকারের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সমস্ত দিন ধরিয়া বিতর্ক চলে। আচার্য কৃপালনী, শ্রী বি দাস, অধ্যাপক এন জি রঙ্গ প্রভৃতি এই বিতর্কে যোগদান করেন এবং খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের কার্যের তীব্র সমালোচনা করেন। কার্যে অদক্ষতা, সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ও দুর্নীতি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করা হয়।

নেপালের সরকারী সৈন্যদল বীরগঞ্জের ৬ মাইল উত্তরে পর্বানীপুরে আক্রমণ করায় নেপালী কংগ্রেস বাহিনী আজ বীরগঞ্জ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সরকারী সৈন্যগণ কর্তৃক যাহাতে বীরগঞ্জ পুনঃ অধিকৃত না হয়, তজ্জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ব নেপালের গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্য-দুর্গ উদয়পুর গড় কংগ্রেস বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

১৭ই নবেম্বর—অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে খাদ্যব্যবস্থা সম্পর্কে দুই দিনব্যাপী বিতর্কের উত্তর দিয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী বলেন যে, দেশে গুরুতর খাদ্যসংকটের প্রতিকারের জন্য বর্তমান বৎসরে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ৩০ লক্ষ টন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীযুত মুন্সী বলেন যে, ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, কোনক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম করা হইবে না।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, দলাই লামার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য লাসায় পোটালা প্রাসাদে এক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হইবে।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, বীরগঞ্জের যুদ্ধ এক্ষণে সুনির্দিষ্টভাবে নেপালী কংগ্রেস বাহিনীর অনুকূলে গিয়াছে। কংগ্রেস বাহিনী পর্বানীপুর হইতে সরকারী সৈন্যদলকে হটাইয়া দিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, সেনাবাহিনীর ব্যয় কমাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতি সহ পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট চটকলগুলিতে কাঁচাপাট সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় পাট ক্রয় বোর্ড গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উদ্বাস্তুগণের পুনর্বসতি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এযাবৎ মোট ১,৭০০ প্লট জমি উদ্বাস্তু কৃষি-পরিবারগুলির মধ্যে এবং ১৪,৬৬৫ প্লট জমি অ-কৃষি উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়াছেন।

১৮ই নবেম্বর—নেপালী কংগ্রেস বাহিনী ঝিঝা থানা অধিকার করিয়াছে। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস বাহিনী কর্তৃক খাজুরী অধিকৃত হয়। বীরগঞ্জের যুদ্ধে সরকারী বাহিনী যে ৬ মাইল পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে তাহা পুনরধিকার করিয়াছে।

কলিকাতায় অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত্যা ও অবিরাম প্রবল বারিপাত হয়। এই দিন জোড়াবাগান পার্কের নিকট মণ্ডল স্ট্রীট বাই লেনে একটি তিনতলা বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ার ফলে দুইজন স্ত্রীলোকের শোচনীয় মৃত্যু হয়।

১৯শে নবেম্বর—বীরগঞ্জ হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী পর্বানীপুরে নেপালী কংগ্রেসের যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের রাজধানী বীরগঞ্জে চলিয়া আসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য মধ্য কলিকাতায় ৩/১, ডিক্সন লেনের একটি ত্রিতল ভবনে অতি ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে একই পরিবারের ৬ ব্যক্তি জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই নবেম্বর—অদ্য লেক সাকসেস্-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরখানায় তিব্বত গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ সম্বলিত এক আবেদন পাওয়া গিয়াছে। উক্ত আবেদনে চীনা কমুনিস্ট বাহিনী কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের অভিযোগ করা হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অদ্য লেক সাকসেসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ পেশ করেন। ভারতের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা তিন লক্ষ ভারতীয়ের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করিয়াছে, উহা দ্বারা মানবাধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনন্দ ও ঘোষণার বিরোধিতা করা হইয়াছে।

১৫ই নবেম্বর—প্রচণ্ড শীতের জন্য কোরিয়ার যুদ্ধ কেবলমাত্র টহলদারী কর্মতৎপরতায় নিবদ্ধ আছে। পূর্ব রণাঙ্গনে মার্কিন ৭ম পদাতিক বাহিনী মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অভিমুখী অভিযানে বাধার সম্মুখীন হইতেছে।

১৬ই নবেম্বর—গত রাত্রে কমুনিস্ট চীন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট জেনারেল ম্যাক্আর্থারের রিপোর্ট সম্পর্কে এই প্রথম পত্র পাঠাইয়া জানাইল যে, কোরিয়ায় চীনাদের সাহায্য স্বতঃপ্রণোদিত এবং ন্যায়সঙ্গত।

১৮ই নবেম্বর—মার্কিন ৭ম বাহিনীর সৈন্য অদ্য সাংগুই শহর অতিক্রম করিয়া আগাইয়া গিয়াছে। এই শহরটি মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬৷৷৹
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬৷৷৹ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 2nd December, 1950 [৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপালের সমস্যায় ভারত

নেপালের গণ-বিপ্লব সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব কিরূপ, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীদের যদি সুযোগ থাকিত, তবে সহস্র সহস্র ভারতবাসী নেপালে প্রবেশ করিয়া সেখানকার স্বৈরাচার-শাসনের অবসান ঘটাইত। নেপালের রাণা শাসনে শাসনতান্ত্রিক বৈধতা যাহাই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধ্যযুগীয় বর্বরযুগের বিধান এখনও সেখানকার শাসনতন্ত্রে অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। নেপালবাসীরা দারিদ্র্যের ভারে প্রপীড়িত। নিরক্ষর অজ্ঞতার অন্ধকারে তাহারা আচ্ছন্ন। নেপালের জনশ্রেণীর অধিকাংশকেই অন্নমুষ্টির জন্য পশুর ঘৃণ্য জীবনের দৈন্য বহন করিতে হয়। ইহাদের অনেকেই স্বদেশের বাহিরে গিয়া কুলী, মজুর এবং ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে ইহাদেরই শোণিত শোষণ করিয়া 'রাণা' পরিবার পরিস্ফীত। অপরিমিত ঐশ্বর্যের আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে তাহারা বিলাস এবং ব্যসনে প্রমত্ত। এমন-শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিপ্লব ঘটিবে, ইহাই বর্তমান যুগে স্বাভাবিক; বরং তাহা না ঘটাই আশ্চর্যের বিষয় ছিল। বস্তুত নেপালের গণ-বিপ্লব তথাকার জনসাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণেরই সূচনা করিতেছে এবং মনুষ্যত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই এই বিপ্লবকে অভিনন্দিত করিবেন। নেপালের সঙ্গে ভারতের আর্থিক স্বার্থ এবং নিরাপত্তার প্রশ্নও বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে; সুতরাং নেপালের বিপ্লব সম্পর্কে ভারত সরকার উদাসীন থাকিতে পারেন না কিংবা দূরে দাঁড়াইয়া এই বিপ্লবের তত্ত্বকথার মতবাদমূলক বিচার এবং বিশ্লেষণেও নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহাদের পক্ষে অন্তত সম্ভব নয়। একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারত সরকার নেপালের সম্পর্কে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, এ প্রশ্ন এই সব নানা কারণে মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার নেপালের শিশু মহারাজকে স্বীকার করিয়া লন নাই; কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্ভবত নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে তাঁহাকেই স্বীকার করিয়া লইবেন এবং সেই উপায়ে নেপালের প্রধান মন্ত্রীর মন যোগাইয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির সম্প্রসারণে গুর্খা সৈন্যদের গোলামীর সাহায্য লাভের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন উপস্থিত করিবেন। নিজেদের স্বার্থ-সাধনে বৃটিশ জাতি চিরদিনই সুপটু এবং সেক্ষেত্রে মানবতা বা উদারতা এ সব ধার তাহারা কার্যত কোন দিনই ধারে না। নেপালের বেলাতেও বৃটিশ নীতির সেই চিরন্তন ধারার যে বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিবে, আমরা এমন মনে করি না। ভারতে নিজেদের শোষণ-নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য তাহারা বরাবরই সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে সমর্থন করিয়াছে। নেপালের সম্পর্কেও তাহারা নিজেদের স্বার্থের দায়েই তথাকার স্বৈরাচারী শাসকদেরই পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রশ্নটি অন্য রকম। রাজনীতি অবশ্য সাময়িক আবেগ বা উত্তেজনার ব্যাপার নয়; সেইরূপ সুবিধাবাদমূলক সংকীর্ণতার ফলে সে ক্ষেত্রে পরিণামে বৃহত্তর বিড়ম্বনারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। নেপালের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার স্বার্থের ঘাঁটি বজায় রাখিয়া আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন, ইহা অনুমান করা যায়। কারণ, পশু শক্তির সাহায্যে নেপালের গণবিপ্লব দমন করা গেলেও দুরবস্থা বেশী দিন বজায় রাখা যাইবে না, তাঁহার নিজেও ইহা বুঝেন। ইঁহাদের পরিপোষক দল এবং পৃষ্ঠপোষকগণও পিছনে থাকিয়া সুবিধাবাদমূলক সেই পরামর্শই রাণা গোষ্ঠীকে দিবেন, ইহাই মনে হয়। কিন্তু নেপালের শাসকদের স্বার্থমূলক এমন আপোষ-নিষ্পত্তিতে সেখানকার সমস্যার সমাধান কিছুই হইবে না। নেপালের জাগ্রত জনগণ নিজেদের অধিকার চাহে। তাহারা শাসক-গোষ্ঠীর অনুগ্রহোপজীবী হইয়া থাকিতে রাজী নয়। মনুষ্যত্বের এ দাবী। এই দাবী যাহাতে নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত গভর্ণমেণ্টের তজ্জন্য বলিষ্ঠ নীতি লইয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে নেপাল সরকার নানাবিধ বর্বর নীতি অবলম্বন করিতেছেন, এ সব খবর ভারতে পৌঁছিতেছে। ভারতের সীমান্তের মধ্যেই সেদিন পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীযুত শিবনলাল শকসেনা নেপালী সেনাদের গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছেন। মধ্যযুগীয় বর্বর সংস্কারান্ধ শাসকদের নীতির ফলে এ-সব ঘটিবারই কথা এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হইতেও ভারতের পক্ষে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং নেপালে স্বৈর-শাসনের অবসান যাহাতে ঘটে এবং জন-মতানুযায়ী শাসনতন্ত্র সেখানে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত সরকারকে তদনুযায়ী তাঁহাদের নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে

হইবে। পক্ষান্তরে ভারতের নীতি এই সম্পর্কে যদি স্বৈরশাসনের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির পাঁকের ভিতর গিয়া একবার পড়ে, তবে নানা দিক হইতে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিবে এবং ভারতের বিড়ম্বনার কারণ তাহাতে বৃদ্ধিই পাইবে।

কর্মীর আদর্শ

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে যোগদান করিতে গিয়া যে সব কর্মী নিঃস্ব হইয়া পড়েন, তাঁহাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দানে ভারত সরকার হইতে ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত এইচ ভি কামাথ ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দেশকর্মীদের নিঃস্বার্থ আদর্শের প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীজওহরলালজী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব-স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া বলেন, "আমরা যাঁহারা সেদিন ঐ সংগ্রামে অগ্রণীর স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, তাঁহারা জনগণের জয়ধ্বনি লাভ করিয়াছি, পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত হইয়াছি কিংবা পদ-প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি। কিন্তু এই সংগ্রামে প্রধান দায়িত্ব যাহারা বহন করিয়াছে, তাহারা দেশের লাখই ছিল শ্রমিক কৃষক দোকানদার বা ফ্যাক্টরী-সমূহের কারিগর। ইহাদিগকে কেহই জানে নাই, ইহাদিগকে কেহই চিনে নাই এবং ইহারা জয়ধ্বনি লাভ করে নাই কিংবা পুষ্পমালা ইহাদিগকে কেহ পরায় নাই। আমরা যখন ইহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতাম, তখন বলিয়াই দিতাম যে তাহারা বেতন পাইবে না, লভ্যাংশ কিছুই তাহাদের মিলিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সে আদর্শ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি এবং দেশের কাজ করিবার প্রশ্ন যেখানে উঠে আমরা লাভের খাতাই খুলিয়া বসি।" ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির গভীরতা আমরা উপলব্ধি করি, এবং আমরা একমাত্র স্বীকার করি যে দেশের যাহারা জনসাধারণ, তাহাদের সেবা করাতেই আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধনার মূলীভূত আদর্শের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে অবশ্য এ সত্যও স্বীকার করিতে হয় যে, যাঁহারা দেশের জনসাধারণের দুঃখকষ্টকে নিজেদের করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য নিঃস্বতা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনে জন-স্বার্থের বৃহত্তর আদর্শেরই সেবা করা হইয়া থাকে। দেশ প্রেমের প্রেরণায় যাঁহারা উদ্দীপ্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মান-যশের কাঙ্গাল নহেন। ভিক্ষার জন্য আতুরের মত অঞ্জলি বাড়াইতে তাঁহারা অবশ্যই যাইবেন না; কিন্তু দেশসেবক কর্মীদের যে-সব পরিবার একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি জাতির কর্তব্য আছে। জনসেবার আদর্শে রাষ্ট্রীয় সাধনাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনে তাঁহাদের পূজা এবং সমাদর করাও রাষ্ট্রের পক্ষে দরকার, এ সত্যকে অস্বীকার করিলে জাতির পক্ষে তাহাতে প্রত্যবায় ঘটে।

সখ্যের অন্তরায়

মিঃ গজনফর আলি খান পাকিস্থানের পরিচালকবর্গের অন্যতম। তিনি গত ২০শে নবেম্বর লাহোরে এক সম্বর্ধনা সভায় একটি উক্তি করিয়াছেন, যাহা আমরা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। তাঁহার অভিমত এই যে,—"যদি ভারত ও পাকিস্থান তাহাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটাইয়া লইত এবং পরস্পরের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রভূত গুরুত্ব লাভ করিতে পারিত।" কথাটি অবশ্য সত্য এবং গুপ্তও নহে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ইহা সম্ভব হয় না কেন? বলা বাহুল্য, এজন্য ভারতের পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি কিছু করা হয় নাই এবং সে চেষ্টা সমভাবেই চলিতেছে। কিন্তু সে সব কোন চেষ্টাই অদ্যাপি সফল হয় নাই। মিঃ গজনফর আলি নিজেই ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। লাহোরের সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন, "ভারত ও পাকিস্থানের পুনর্মিলনের কথা উঠিতেই পারে না; কারণ এইরূপ পুনর্মিলনের কোন সাধারণ ভিত্তি নাই।" প্রকৃতপক্ষে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সখ্য যে ঘটিতেছে না তাহার মূলে পাকিস্থানের নেতাদের মনে অনর্থক একটা আশঙ্কার ভাব সবসময়েই কাজ করিতেছে। পুনর্মিলনের ফলে ভারত পাকিস্থানকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এবং পাকিস্থানের নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, তাঁহারা অবিরত এই বিভীষিকা দেখিতেছেন। শুধু ইহাও নয়! তাঁহারা এই আতঙ্ককে এড়াইবার জন্য ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাবটি পাকিস্থানের সর্বত্র সজাগ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষকে ভিত্তি করিয়া একটা সংহতিবোধ জমিয়া উঠিবে এবং সেই পথে পাকিস্থানের নানারূপ আর্থিক সমস্যা এবং তজ্জনিত জনগণের অসন্তোষ চাপা দিয়া সেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিকতার গতি রুদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে, ইহাই তাঁহাদের ভরসা। ইহারই ফলে ভারতের সহিত সখ্য এবং সৌহার্দ্যের সব কথা পাকিস্থানের নেতারা সন্দেহের চোখে দেখেন। পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধে এই জুজুর ভয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে পাইয়া বসিয়াছে; কারণ পশ্চিম পাকিস্থানের সম্বন্ধে এদিক হইতে সব আশঙ্কা ইহার মধ্যেই চুকাইয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর হিন্দু সম্প্রদায় তথা হইতে উৎসাদিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে এ কাজ নিষ্পন্ন করা এখনও পুরাপুরি রকমে সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া, তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পর্যন্ত তাঁহাদের মনে অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে এবং সে ভাব পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কর্তারা তাঁহাদের মনের সেই আশঙ্কার ভাব এখনও নিরাকৃত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সাধারণ ভিত্তি কিছু নাই একথা তাঁহারা আন্তরিকভাবে মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। বস্তুত এই উভয় বাঙলার মধ্যে সুদীর্ঘকালের গঠিত একটা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সব দেশ এবং সব জাতিতেই ভাষা এবং সাহিত্য মিলনের প্রধান ভিত্তিভূমি। এ সত্যকে শুধু কথার জোরে এবং মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার সংস্কারের আশ্রয়ে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে সত্য পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের চিত্তে শঙ্কার একটা ভাবকে বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছে। এজন্য পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারকে পিষ্ট করিয়া সেখানে পশ্চিম পাকিস্থানের শাসন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূল নীতি-নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে পাকিস্থানের শাসকবৃন্দের নীতিগতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব ঐ আন্দোলনের দিক হইতে সরিয়া গিয়া যাহাতে অন্যদিকে, বিশেষভাবে ভারত-বিরোধী একটা নীতি ধরিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁহারা সেই কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'পাকিস্থান বিপন্ন', 'ইসলাম রাষ্ট্রের শত্রুরা চারিদিকে'—এই আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিতে ধর্মসংস্কারের প্রভাবে জন-গণের অধিকার দাবী আন্দোলন চাপা পড়িবে ইহা তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন। এইজনাই এতদিন পরে পূর্ববঙ্গে এ আর পি আন্দোলন উদ্যমের সহিত নূতন আকারে গড়িয়া তোলা হইতেছে। নতুবা অন্য কোন কারণই নাই। পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে কেহ সশস্ত্র সমারোদামে অবতীর্ণ হয় নাই, ইহা সকলেই বোঝে। বস্তুত এইসব আন্দোলনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে ভারত। পাকিস্থানের বিভিন্ন নেতারা পাকে-প্রকারে তাঁহাদের উক্তি এবং বিবৃতির ভিতর দিয়া সে ইঙ্গিত অবিরতই করিতেছেন। ভারতের

বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের ফলে অবশ্য ভারতের শঙ্কার বিশেষ কারণ ঘটিবে না; কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পড়িবে ইহাই আশঙ্কার বিষয়। প্রকৃত-পক্ষে পাকিস্থানের নিয়ামকগণ ভারতবর্ষকে ভৌগোলিক বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই; ভৌগোলিক বিভাগ সত্ত্বেও জন-জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে ঐক্য থাকা উচিত ছিল, পুনর্মিলনের সম্ভাবনা তিরোহিত করিবার জন্য তাহারা সেগুলির উপরও ক্রমাগত আঘাত হানিতেছেন। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা ধ্বংস হইতে বসিয়াছে এবং অর্থনীতিক বিপর্যয় সকল দিক হইতে সমৃদ্ধিশালী সেই দেশের জীবনী-শক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। দীপ সেখানে নিভিয়া যাইতেছে এবং আঁধার ঘিরিয়া আসিতেছে। এ অবস্থার প্রতীকার কোথায়? প্রশ্নটি শুধু পূর্ববঙ্গের জন্যই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন মরণের সঙ্গেও এ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে।

ভারতের সামরিক আদর্শ

ভারতের সমর-সচিব সর্দার বলদেব সিং কিছুদিন পূর্বে দেরাদুনস্থ সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সামরিক আদর্শের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমর-সচিব বিদ্যার্থিগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত কোন বিরোধের মীমাংসার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে অপর কোন শক্তি শস্ত্রবলে কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে যদি আমাদিগকে বাধ্য করিতে উদ্যত হয়, আমরা তাহাও বরদাস্ত করিব না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমর সচিব ভারতের সামরিক নীতির নির্দেশ করিতে গিয়া প্রধানত দেশের স্বাধীনতা এবং জাতির মর্যাদার উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। ভারত যদি অপর কোন শক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আক্রান্ত হয়, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই কি সে সমর-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবে, অন্যথায় নয়? ভারতের সেই দিক হইতে নিরাপত্তাকে রক্ষা করাই কি ভারতের মর্যাদা রক্ষারও পর্যায়ভুক্ত হইবে, অন্য বেলায় নহে? বাস্তবিকপক্ষে ভারত রাষ্ট্রীয় আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং যে মহান্ আদর্শের জন্য দেশের বীর সন্তানগণ বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহাকে শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশের নিরাপত্তা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিতে গেলে বিচারে কিছু সংকীর্ণতা ঘটে বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মতে মুখ্যভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে দেশের পরাধীনতার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যটি প্রকট থাকিলেও সে আদর্শ সর্বাধিক ব্যাপক ছিল এবং তাহা ছিল মানবতার মধ্যেই প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে গিয়া ভারতের বীর সন্তানেরা পশুবলে পদদলিত, দুর্গত, অত্যাচারিত মানব-সমাজের মুক্তির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মর্যাদাকে সেই দিকটা লইয়াই সমগ্রভাবে বিচার করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। দৃষ্টান্তস্বরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তিব্বতের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়ন-নীতির ভারত আগাগোড়া বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আলাপ-আলোচনার পথে এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যবাদ তথাকার সরকারের নীতিকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর উগ্র আকার ধারণ করিতেছে। ফলতঃ সেখানকার সরকারের নীতির সঙ্গে ভারতীয়দের স্বার্থ এবং মর্যাদার প্রশ্নই কেবল জড়িত নয়, সমগ্রভাবে মানবতার প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ দল কৃষ্ণাঙ্গ যাহারা, তাহাদের সকলকেই ক্রীতদাসে পরিণত করিতে আজ প্রয়াসী এবং এক্ষেত্রে বিবেকবুদ্ধির কোন কথা তাহারা মানিতে রাজী নয়। তাহাদের এই কাজকে আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপন্থী এবং ভারতের মর্যাদার উপর আঘাত বলিয়াই গ্রহণ করিব। সেইরূপ তিব্বতেরও কথা। চীন আজ তিব্বতের উপর সার্বভৌম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দাবী করিতেছে যে, তিব্বত চীন সরকারেরই প্রজা। তিব্বতের কোন স্বাধীন সত্তা নাই; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর দল যখন তিব্বত আক্রমণ করিয়াছিল, তখন এই সব প্রভুর দল কোথায় ছিলেন? তিব্বতে ৩৫ হাজার লামা মঙ্গোলিয়ায় সমবেত হইয়া সেই দুর্দিনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু চীন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে নাই। তিব্বত স্বতন্ত্রভাবেই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সন্ধি সূত্রে সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। তিব্বতের অধিবাসীরা যদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন চাহে, সেকথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু পশুশক্তির জোরে চীনের কম্যুনিস্ট সরকার যদি আজ তিব্বত অধিকার করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শই ক্ষুণ্ণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং সেক্ষেত্রে ভারতেরও উদাসীন থাকা চলে না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিক হইতেও নয় এবং মানবিকতার দিক হইতেও নহে। প্রকৃত-পক্ষে শুধু বৈদেশিক শক্তি ভারতের তোরণ-দ্বারে আসিয়া তূর্যধ্বনি যখন করিবে, শুধু তখনই ভারতের সামরিক চেতনা কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইবে—আমরা এমন যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, বিশ্বের প্রতি এবং বিশ্বের মানব-সমাজের প্রতিও ভারতের সামরিক শক্তি-সম্পর্কিত কর্তব্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্বকে ছাড়িয়া ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতের মর্যাদার বিচার করা চলে না।

ভারতের সাধনা

গত ৯ই আশ্বিন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্বর্ধিত করেন। বাঙলা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের অবদান অপরিসীম। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় যে অভি-ভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মূলীভূত আদর্শটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের বর্তমান অশান্তির কথা উত্থাপন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "আজ সমগ্র জগতে যে অশান্তির আগুন চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে, কে জ্বালাল? এর আসল কারণই বা কি? প্রত্যেকেই নিজের নিজের অন্তঃকরণে এটা চিন্তা করে দেখতে পারেন। এ হচ্ছে সংসারের ভোগ-বিলাসের অত্যধিক অসংযত আকাঙ্ক্ষা বা কাম ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দভাবে ভেবে দেখতে পারেন, এই অত্যধিক ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর যদি কিছু সমগ্র মানব জাতির তেমন অনিষ্টকর থাকে। আজ সমগ্র জগৎ মনমত হয়ে এই রোগে পীড়িত। এরোগের চিকিৎসা কাম ত্যাগ। কাম ত্যাগের কথায় সকলে ভয় পায়। এবিষয়ে মানুষের একেবারে ভুল ধারণা। কাম ত্যাগ মানে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাওয়া নয়।" প্রকৃতপক্ষে সেবার পথেই যে সুখ এবং ত্যাগের দ্বারাই যে ভোগ সত্য এবং সার্থক হইয়া থাকে, আমরা এই সত্য বিস্মৃত হইয়াছি এবং ইহার ফলে জগতের সর্বত্র অশান্তি ও অনর্থ বিস্তার লাভ করিতেছে। সেবার ধর্মকে যদি আমরা জীবনে না প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তবে বাহিরে ভোগৈশ্বর্যের উপকরণ বাড়াইলে যে আমাদের শান্তি নাই, এই সহজ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমরা যদি মানুষ হিসাবে বাঁচিতে চাই, জাতি হিসাবে জগতে যদি আমাদিগকে টিকিয়া থাকিতে হয়, তবে এই সেবা ও ত্যাগের পথই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। জাতির জনকস্বরূপে গান্ধীজী নিজের জীবন দান করিয়া এই সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে বহুশ্রুত শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের সনাতন-বাণীই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। পশুত্বের পীড়ন হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে বাঙলার জ্ঞানবৃদ্ধ এই মনীষী পুরুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বৈদেশিকী

নেপাল

রাণাশাহী সৈন্যদের বীরগঞ্জ পুনরধিকার করার পরেও নেপালী কংগ্রেসীরা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়ে নি। তারা গেরিলা সংগ্রাম চালাবার জন্যে কৃতসংকল্প হয়েছে এবং নানাস্থান থেকে নেপালী কংগ্রেসী গেরিলাদের তৎপরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। বীরগঞ্জ থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে খোরি অঞ্চলে রাণাশাহী সৈন্য ও কংগ্রেসী গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। আরও পশ্চিমে বুটওয়াল জেলার ভিতরেও উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। কংগ্রেসী গেরিলারা বুটওয়ালের হেডকোয়ার্টার শহর ভৈরবের বেশির ভাগ অধিকার করেছে বলে একটি খবর এসেছে। অনেক জায়গায় নেপালের সাধারণ লোক, কৃষক প্রভৃতি কংগ্রেসী গেরিলাদের সহযোগিতা করছে বলে শোনা যাচ্ছে। মোটের উপর রাণাদের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় বিদ্রোহের মনোভাব নেপালের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। এ অবস্থায় রাণা সরকার সৈন্য দিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিতে পারবেন এরূপ মনে করা ভুল হবে। এ সম্পর্কে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। আমাদের গবর্নমেণ্ট যাই ভাবুন না কেন, নেপাল সংলগ্ন সমস্ত ভারতীয় অঞ্চলের অধিবাসীরই নেপালী কংগ্রেসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই সব অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং নেপালের সমস্যার একটা ভদ্র মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সে উত্তেজনা প্রশমিত হবে না।

নেপালের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সংস্কার যে অত্যাবশ্যক ভারতীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের এই অভিমত নানা ভাবে ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভারত গভর্নমেণ্ট যে কী নীতি অনুসরণ করছেন তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। নেপাল স্বাধীন রাজ্য, তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতবর্ষ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে নেপালের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে ঘনিষ্ঠ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ রয়েছে, তাতে নেপালের পরিস্থিতির প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট উদাসীন থাকতেও পারেন না, ইত্যাদি মামুলী বুলির আড়ালে ভারত গভর্নমেণ্ট রাণা সরকারকে কতটা আশ্রয় বা কতটা চাপ দিতে প্রস্তুত সেইটেই আসল কথা। এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রভাব রাণা সরকারের অনুকূলে কাজ করছে বলে মনে হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শিশু রাজকুমার জ্ঞানেন্দ্রকে নেপালের রাজা বলে স্বীকার করে নেবার পক্ষপাতী বলে শোনা যাচ্ছে। তবে জ্ঞানেন্দ্রকে রাজা বলে স্বীকার করে নিতে ভারত গভর্নমেণ্টের অনিচ্ছার দরুণই নাকি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে রাণা সরকারের পক্ষপাতী হবেন এটা স্বাভাবিক। কারণ বর্তমান রাণাশাহী শাসনের স্থলে যদি নেপালে সত্যকারের গণতান্ত্রিক শাসন চালু হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ সৈন্য বাহিনীতে গুর্খা সৈন্য রাখার ব্যবস্থার অবসান হতে বাধ্য। তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এটাও বুঝেন যে, ভারতের সমর্থন না পেলে আজকের দিনে কোনো রাণাশাহীকেই অল্পকালের জন্যও নেপালে টিকিয়ে রাখা যাবে না। সেই জন্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টকে বাদ দিয়ে কিছু করতে ইতস্তত করছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে রাণা সরকারের একটা আপোষ না হলে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

সম্প্রতি রাণা সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল কৈশর শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ও পররাষ্ট্র সচিব জেনারেল বিজয় শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে নয়াদিল্লীতে এসেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নেপাল সম্পর্কে কী ব্যবস্থা সঙ্গত হবে বলে ভারত গভর্নমেণ্ট মনে করছেন এবং তার অনুকূলে তাঁরা কী চেষ্টা করবেন। রাণাদের পক্ষপাতীরা এই বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, রাণা সরকারের বিশেষ ওলটপালট করতে গেলে নেপালে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটবে, তাতে ভারতবর্ষের বিপদ, যেহেতু তিব্বতে কম্যুনিস্ট চীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, ইত্যাদি। সুতরাং রাণা সরকারের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে ওপর ওপর একটু গণতান্ত্রিকতার রং লাগিয়ে সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? বরং তাতে যে ভয় করা হচ্ছে সেটা আরো বাড়বে, কারণ যদি শাসন সংস্কারের ভাঁওতা দিয়ে বর্তমান আন্দোলনকে চাপা দেবার চেষ্টা হয় তবে তা চাপা থাকবে না, উল্টে সে আন্দোলন যাদের চাই না তাদের অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অতএব নেপালের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে সত্যকার গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর নেপালের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এখানে কোনো ফাঁকি দেবার চেষ্টা হলে তার ফল পরে আরো দশগুণ ভুগতে হবে।

কোরিয়া

কোরিয়ায় ম্যাকআর্থার তরণী প্রায় তীরে এসে ডোবার দাখিল হয়েছে। বড়দিনের মধ্যেই "যুদ্ধ শেষ করা" এই রব তুলে ম্যাকআর্থার এক নূতন অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, অভিপ্রায় ছিল যে, উত্তর কোরিয়ার বাকী জায়গাটুকু দখল করে উত্তর কোরিয়ানদের অবশিষ্ট সামরিক শক্তি খতম করে দেবেন এবং উত্তর কোরিয়ানদের সাহায্য করতে যে চীনা সৈন্য এসেছে তাদেরও ঝেঁটিয়ে ইয়ালু নদী পার করে দেবেন। প্রথমটা দু' চারদিন এই নয়া অভিযান বেশ চলছিল—ম্যাকআর্থার বাহিনী এগিয়ে চলেছে আর উত্তর কোরিয়ান ও তাদের সাহায্যকারী চীনারা যুদ্ধ না করেই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সব ওল্টাতে শুরু করল। উত্তর কোরিয়ানরা ও চীনারা এখন এমন ঠেলা দিচ্ছে যে ম্যাকআর্থার বাহিনী পিছিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাকআর্থার পূর্বে অভিযোগ করেছিলেন যে, ৬০ হাজার চীনা সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধে নেমেছে। এখন তিনি দু'লক্ষ চীনা সৈন্যের কথা বলছেন এবং বলছেন যে, "রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদল এখন একটি সম্পূর্ণ নূতন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে।" সেনাপতি হিসাবে জেনারেল ম্যাকআর্থারের মান যত বড়ই হোক না কেন, "রাজনীতিক" ম্যাকআর্থার কোরিয়ার ঘটনার বর্তমান গতিতে বিশেষ খুশী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, যুদ্ধ কোরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে জেনারেল ম্যাকআর্থারের কোনো বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নি, বরং চীনের আরও এগিয়ে যাবার জন্যই উৎসুক বলে মনে হয়েছে। ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না বলে ভারত গভর্নমেণ্ট মত প্রকাশ করেন। কারণ তাতে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের কথা তখন গ্রাহ্য করা হয় নি। কেউ কেউ ভেবেছিল যে চীনারা ম্যাকআর্থারী প্রকোপ দেখে ভয় পেয়ে গেছে, ম্যাকআর্থার বাহিনী চীনের সীমানায় পৌঁছে গেলেও তারা এখন এগুবে না। ম্যাকআর্থার নিজে বোধ হয় চীনারা একটু লাগুক তাই চেয়েছিলেন, কারণ তাহলে যুদ্ধটা বেশ চাগিয়ে করা যাবে। ম্যাকআর্থারের মনে যাই থাক এংলো-মার্কিন মহলে কিন্তু কোরিয়াতে চীনের হাত-লাগানোতে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হয়। বৃটেন চীনের সঙ্গে দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের আশংকায় যথেষ্ট ভীত হয়ে পড়েছে, আমেরিকার কর্তাদের মধ্যেও অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়। অতএব আমেরিকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে চীনের আশঙ্কা দূর হতে পারে এরকম ভাবে কোরিয়া সমস্যা সমাধানের একটা জোর চেষ্টা এ সময় হবার সম্ভাবনা আছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে বেশ তৎপর হয়েছেন বলে মনে হয়। ম্যাকআর্থারী নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করে চলা বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে উত্তরোত্তর বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে—এই ধারণা বৃটেনে এখন প্রবল হয়েছে। আমেরিকার পক্ষে বৃটিশ মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সহজ হবে না। ২৯।১১।৫০।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

লেবুর মধ্যে ভিটামিন 'সি' যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই ভিটামিন শরীরের হাড় এবং সংযোজক পেশী তৈরী করতে সাহায্য করে। আর এই জন্য আমরা বেশী করে লেবু খেতে চেষ্টা করি। ডাঃ হেনরী হিক্স কিন্তু বলেছেন যে, খুব বেশী লেবু খাওয়া মোটেই ভাল নয়—কারণ বেশী লেবু খেলে বিভিন্ন ধরণের দাঁতের রোগ দেখা দেয়। তিনি ১৫ বৎসর ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বেশী লেবু খাওয়ার দরুণ দাঁতের রোগ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী হয়। ডাঃ হিক্সের মতে সপ্তাহে দুটো কিম্বা তিনটের বেশী লেবু অথবা ঐ জাতীয় ফল খাওয়া উচিত নয়। তার মত হচ্ছে যে, ভিটামিন সি শুধু লেবু থেকে না নিয়ে অন্য উপায়ে খাওয়া ভাল।

*

লণ্ডনের 'ম্যাজিক সারকেলের' সভ্য হতে গেলে কয়েকটা নতুন ধরণের ম্যাজিক দেখান



ম্যাজিসিয়ান আসল মহারাজা

দরকার। যোধপুরের মহারাজা একজন সখের ম্যাজিসিয়ান। তিনি এই ম্যাজিক সারকেলের সভ্য হবার জন্য একটা নতুন ধরণের খেলা সারকেলের অন্যান্য সভ্যদের সামনে দেখিয়েছিলেন। খেলাটা হচ্ছে যে, একটা কাচের গ্লাসের মধ্যে একটা কাচের জগের থেকে পরিষ্কার জল ঢালবার সংগে সংগেই গ্লাসটার ভেতর থেকে আগুন বের হতে থাকবে।

*

জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক্‌ কোম্পানী এক নতুন ধরণের ঘাড়ি বার করেছে। ঘড়িটায় একবার 'এলার্ম' দেবার কাঁটা ঠিক করে দিলে প্রত্যেক দিনই ঠিক সেই সময় ঘড়িতে এলার্ম বাজবে। এতে এই সুবিধা হয় যে, যদি কোনদিন কোন কারণে এলার্ম দিতে ভুলে যাওয়া যায়, তাহলেও ঘড়ি কিন্তু ঠিক্‌ সময় মত বেজে উঠবে।

*

জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আনবিক বোমার সাহায্যে কিরকমভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। এই ধ্বংসের হাত থেকে অসহায় যে সমস্ত নরনারী বেঁচে গিয়েছিল তাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা কি রকম বিকৃত হয়েছিল তার সম্বন্ধেও অনেক ভয়াবহ সংবাদ আমরা পড়েছি। এতদিন বাদেও এই হতভাগারা সম্পূর্ণ সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। এদের জীবদ্দশায় এরা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গেছে। এ সম্বন্ধে গবেষণাকারীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, যদিও এই শহরের অধিবাসীদের মুথার চুল ওঠা, প্রজনন ক্ষমতা এবং রক্তের মধ্যে অনেক তফাৎ ইত্যাদি সব সাধারণ মানুষের মতই হয়ে এসেছে; তবে একটা নতুন উপসর্গ এদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে চোখেতে ছানি পড়া। চক্ষু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখার পর স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে এখানকার চোখের ছানি শতকরা ১০ ভাগ হচ্ছে আনবিক বোমার প্রতিক্রিয়া। আরো ভাল করে অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, আনবিক বোমাটি ফাটবার সময় তার ৩,০০০ ফুটের মধ্যে যে সব লোকেরা ছিল তাদের শতকরা ৪০ ভাগ চোখের ছানিতে আক্রান্ত হয়েছে; আরো শতকরা ৪০ ভাগের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

*

কাজের সুবিধার জন্য অনেক ধরণের ছোট টাইপরাইটার বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। জার্মানীতে এক ধরণের ক্ষুদে টাইপরাইটার তৈরী হয়েছে, যেটা বোধ হয় বাজারের অন্য সব টাইপরাইটারকে হার মানিয়ে দেবে। এটা



বড় টাইপরাইটারটির তুলনায় ছোটটি কত ছোট!

এমনভাবে তৈরী যে, টাইপ করবার সময় 'রোলার'টা একদিক থেকে আর একদিকে সরবে না। শুধু অক্ষরগুলো চাবী টেপবার সংগে সংগে একটার পর একটা কাগজের ওপর এসে পড়বে।

*

ছোট ক্যামেরা গুপ্তচরদের একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু এটা আবার গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে সংগে রাখার জন্য নতুন নতুন উপায় বার করতে হয়। জার্মানীতে গত যুদ্ধের সময় এক ধরণের খুব ছোট ক্যামেরা তৈরী হয়েছিল, সেটা হাতের মনিবন্ধে ঘড়ির মত করে বেঁধে রাখা হত। এই সব ক্যামেরার লেন্স খুব ভালভাবে তৈরী করা হোত। এক সেকেণ্ডের ১।১২৫ ভাগে এই ক্যামেরায় ছবি তোলা যায়। বর্তমানে এই ক্যামেরা বাজারে বিক্রির জন্য তৈরী করা হচ্ছে।



মনিবন্ধে গহনা নয়—ক্ষুদে ক্যামেরা!

*

মেয়েদের নখে নেল পলিশ দেওয়া আজকালকার একটা ফ্যাসন। কিন্তু এর ফল যে কত সাংঘাতিক হতে পারে তা অনেকেই জানেন না। আজকাল মেয়েদের নখে প্রায়ই একরকম রোগ হতে দেখা যায়। ডাঃ কোয়ান বলেন যে, নেল পলিস্‌ ব্যবহার করবার জন্যই এই রোগ হয়। এই রোগটাকে 'রিং ওয়ার্ম' বলে। এ রোগ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। প্রথমে নখগুলো সাদা হতে থাকে, তারপর নখের তলার দিকটা ফুলে ওঠে—ক্রমশঃ রক্ত পড়তে থাকে, শেষপর্যন্ত নখগুলো খসে যায়। ডাঃ কোয়ান আরো বলেন, যে এ রোগ বন্ধ করবার একমাত্র উপায় নেল পলিশ ব্যবহার না করা।

*

আপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Arvie Frantzele রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে শরীরের ভেতরের হাড়ের কাছের কোমল অংশের—যেমন পেশী, চর্বি চামড়া ইত্যাদির ছবি তোলবার এক নতুন ধরণের উপায় বার করেছেন। এতদিন রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে এইসব কোমল অংশের ছবি তোলবার কোনরকম উপায় ছিল না। Dr. Frantzele-ই প্রথম এটা করলেন। তাকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা, রসায়নবিদ্‌রা এর জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

ইন্দ্রজিতের আসর

দু'বছর আগে বার্নার্ড শ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম যে, এমন প্রাণবন্ত মানুষের মৃত্যু যে বয়সেই হোক, বলব অকালমৃত্যু! আমাদের দেশে মানুষকে শতায়ু হও বলে আশীর্বাদ করবার রীতি আছে। অবশ্য গান্ধীজী সেই পরমায়ুর সীমাকে আরো পঁচিশ বছর পিছিয়ে দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্য যেভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাতে তাঁর সেই অভিপ্রায় নিতান্ত অবাস্তব মনে হত না। যাহোক্, বার্নার্ড শ প্রায় মানুষের ঈপ্সিত পরমায়ুর প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন। বলেছিলেন এবারকার অপারেশনের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলে তিনি অমর হবেন। অর্থাৎ এ ধাক্কা তিনি সামলে উঠতে পারবেন এ আশা তিনি একেবারেই করেননি। মৃত্যুর জন্য এবার তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। জীবনে কেউ তাঁকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি, স্বয়ং মৃত্যুও পারল না।

শ' অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। নিদ্রাহীন চাঞ্চল্যে কেটেছে সারা জীবন। মৃত্যুর পূর্বে সে ক্লান্তির অপনোদন করে নিলেন অঘোর নিদ্রায়। Oh Nancy, I want to sleep—only sleep—লেডি এস্টরকে উদ্দেশ করে তাঁর এই উক্তি সেক্সপীয়রের ভাষায় এ্যান্টনির উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

'Unarm me Eros, the long day's task is done and I must sleep'

গ্যয়েট মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, আলো চাই, আরো আলো। শ বললেন, ঘুম চাই, আরো ঘুম। ঠিক আমার মনের মতো কথাটি। গ্যয়টে জ্ঞানের আলো চেয়েছিলেন। এমন আলোই হয়েছে, চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। যে সভ্যতার আলো রাতকে দিন করতে পারে সে আলোকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। আমার আঁধার ভালো আলোর চেয়ে, নইলে যে ঘুমোতে পারিনে।

বার্নার্ড শ সারা জীবনে একটিও গতানুগতিক কথা বলেননি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা যদি গতানুগতিক ভাষায় শোক প্রকাশ করি তাহলে শ'এর আত্মার অবমাননা করা হবে। তাঁর মৃত্যুকে আমি যে অকালমৃত্যু বলছি সেটা নিতান্ত গতানুগতিক অর্থে বলিনি। আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, অসাধারণ মানুষ কেবলমাত্র নিজের জীবনের মধ্যেই বেঁচে থাকেন না। তাঁর জীবনের একটি বৃহৎ অংশ সমকালীন মানুষের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। আমরা শ'এর যুগবর্তী মানুষ। বিধাতার কৃপায় আমাদের আয়ুষ্কাল এখনও শেষ হয়নি। এতকাল ধরে শ' আমাদের জীবনে যে রসের যোগান দিয়ে আসছিলেন আমাদের বাকি জীবনে সে রস থেকে আমরা বঞ্চিত হলুম, সেই অর্থে বলছি যে বার্নার্ড শ'র মৃত্যু অংশতঃ আমাদেরই অকালমৃত্যু।

বার্নার্ড শ জীবনকে নিয়ে অনেক কৌতুক করেছেন, মৃত্যুতেও তার সমাপ্তি হয়নি। মৃত্যু জিনিসটা অবশ্য কৌতুকের ব্যাপার নয়। তথাপি বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পরে যে কৌতুকটি আত্মপ্রকাশ করেছে সেটি আপনারা অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যতখানি বিচলিত করেছে ইংলণ্ডের সমাজকে ততখানি বিচলিত করেনি। শ' যে দরের সাহিত্যিক এবং মনীষী তাতে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় দেশময় যতখানি উদ্বেগ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কথা ইংলণ্ডে তার কিছুই হয়নি। ভোর পাঁচটায় ডাক্তার যখন শ'এর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করছেন তখন মাত্র পাঁচ ছজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁর গৃহদ্বারে উপস্থিত। আমাদের দেশে এরূপ নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্য কল্পনা করা যায় না। অনেকে বলবেন ইংরেজ জাত কোনো বিষয় নিয়েই হৈচৈ করতে ভালবাসে না। সে কথা খুব জানি। কিন্তু সেটা যে সব ক্ষেত্রেই একটা প্রশংসার কথা এমনও নয়। এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুসংবাদের যে বিবরণ বেরিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি বিস্তৃত বিবরণ ভারতীয় কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। স্টেটসম্যান তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের দ্বিতীয় স্তম্ভে পঁচিশ-ত্রিশ লাইনের মধ্যে শ'এর শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপ্ত করেছেন। আসল কথা ইদানীং শ' যে সব রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাতে ইংরেজ জাতের বিষম 'গোসা' হয়েছে। তা ছাড়া গত সত্তর বছর ধরে শ' যে সব ছিষ্টিছাড়া কথা বলে এসেছেন ইংরেজ তা না পেরেছে গিলতে না পেরেছে ফেলতে। ইংরেজ এক বিষম বনেদি জাত। চিতাবাঘ যেমন গায়ের দাগ কিছুতেই বদলাতে পারে না, ইংরেজ তেমনি জাতের ধারা অর্থাৎ tradition কিছুতেই বদলাতে চায় না। বার্নার্ড শ সেই tradition-এর মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। তাদের বহু যুগ লালিত সামাজিক সম্পর্ক—স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক—সে আঘাতে অল্পবিস্তর নড়বড়ে হয়ে গেছে। ইংরেজের মস্ত বড় গর্ব ছিল যে তার গৃহটি একটি কেল্লাবিশেষ। বার্নার্ড শ সেই কেল্লার ভিত উড়িয়ে দিয়েছেন। ইংরেজের মনুসংহিতা শেভিয়ান সংঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। Time-honoured বলে কোনো জিনিস বার্নার্ড শ'র ভাষায় নেই। সময় সব জিনিসকেই জীর্ণ করে দেয়। পুরোনো রীতিনীতিকে বদলে সময়োপযোগী করে নিতে হয়।

বার্নার্ড শ এ যুগের সবচাইতে বড় heretic। বিংশ শতাব্দী বলেই রক্ষে। নইলে St. Joan-এর মতো St. Bernardকেও আগুনে পুড়ে মরতে হতো। ইংরেজ ধর্মভীরু জাত নয়, কিন্তু অতিশয় prestige-ভীরু। বার্নার্ড শ'কে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। কারণ জানে, তাহলে শিক্ষিত-জগৎ তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবে। ইংরেজ মনে মনে বলেছে যে, সমস্যাটা ঘুমিয়ে আছে—সেটাকে খুঁচিয়ে জাগাও কেন? Let the sleeping dog lie. ভিক্টোরীয় যুগের সাচ্ছন্দ্যে লালিত ইংরেজ মন গোড়া থেকেই ওঁকে বরদাস্ত করতে পারেনি। ছিলাম সুখে—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সত্তর বছর ধরে শ ইংরেজের পিঠে ভূতের কিল মেরেছেন। শুধু ইংরেজ নয়, সর্বদেশে যেখানে মানুষ ভুয়ো কল্পনা বিলাসের সৃষ্টি করেছে কিম্বা মিথ্যার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে শ তাকেই হাসির ধমকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর সব দেশে যুবক সম্প্রদায়ই তাঁর অনুরাগী পাঠক। তাঁদের মাথায় তিনি যত সব উদ্ভট কল্পনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সক্রেটিসের মতো তিনি correptor of youth. খুব ভাগ্য যে সক্রেটিসের দশা তাঁর হয়নি। তাঁর নাটকে যে যুক্তিবাদের প্রাধান্য সেটিও সক্রেটিস-পন্থী। পাঠকের মনকে নিরন্তর তর্কে আহ্বান করেছেন। এদিক থেকে তাঁর প্রত্যেকটি নাটক এক-একটি Socratic dialogue. মানুষ নিজেকে সুসভ্য বলে গর্ব করে। কিন্তু তার মধ্যে এখনও অনেক আদিম স্থূলতা থেকে গেছে। শ' সেই স্থূলতার প্রতি বারম্বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একজন সমালোচক খুব মজা করে এই কথাটি বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের প্রতি শ'এর সংক্ষিপ্ত বাণী হচ্ছে—

Look here, brother, there's a tail hanging behind you.

কথাটা শুনতে অস্বস্তিকর, কিন্তু মাঝে মাঝে কেউ যদি স্মরণ করিয়ে দেন তো ভালো বই মন্দ হয় না।



প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সমভিব্যাহারে নর্মান মার্শাল সম্প্রদায়ের সেক্সপীরিয় অভিনেতৃবর্গ

মানুষের রুচি ও তৃপ্তিতে ভেদ সর্বকালের। তবু বিরোধের অন্তরালে স্বভাব ও প্রকৃতিতে মানবের চিরন্তনী সুর আছে—মিলনের বন্ধন আছে। শিল্পীর দৃষ্টিতে এই মিলন রাগিণী ধরা পড়ে; তার লেখনীতে এই সত্যই প্রকাশ পায়। জীবনের এই মূল কথাগুলিকে যে লেখক বা শিল্পী যত সর্বজনের উপযোগী করে তুলতে পারেন, তাঁর সেই পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ হয়।

মহাকবি বা মহানাট্যকারের সৃষ্টিতে তাই বৈচিত্র্য থাকে। সর্বজনের তৃপ্তি ও আনন্দ সৃজনে এ নিয়ম তাঁকে মানতেই হয়। ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রের রচনাতেও তাই বিচিত্র ভাব ও পরিবেশের অভাব নেই। কাব্যানুরাগীর চোখে তিনি কবি—শব্দালঙ্কার ও বর্ণনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। মনীষীর চোখে তিনি অধ্যয়নের বস্তু—মানবের প্রকৃতি ও চরিত্রের সত্যদ্রষ্টা। সমাজের বিভিন্ন চোখে তিনি ধরা দিয়েছেন—বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীতে।

তবু নাট্যগুরু সেক্সপীয়রকে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে; একটি বিশেষ প্রকাশ আছে—যে দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেওয়া প্রয়োজন। সেটা তাঁর সমস্ত রচনা ও সৃষ্টি-প্রকাশকে রূপায়িত করার দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি না থাকলে প্রযোজকের মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে অর্থহীন। এ দৃষ্টি লাভ করতে গেলে প্রয়োজন, সেক্সপীয়রকে সম্পূর্ণভাবে জানা, তাঁর সমস্ত রচনা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। —কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রকে এইরূপে জানা একমাত্র গভীর অনুরাগীর পক্ষেই সম্ভব। সেক্সপীয়রের নাটক প্রযোজককে তাই সেক্সপীয়রের অকৃত্রিম অনুরাগী হওয়া চাই।

নাটকের প্রাণবস্তুকে অক্ষত রেখে যে কোন দৃশ্যসজ্জা ও পরিবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করা চলে। উপরন্তু প্রাণবস্তুর প্রকাশ-সাফল্যই নাটকের সাফল্য নিরূপণ করে। দৃশ্য, সজ্জা, আলোক নিয়ন্ত্রণ—সকল কিছুকেই যুগোপযোগী করে নেওয়া চলে মূল ভাব-বস্তুকে অক্ষত রেখে। এমন কি, প্রয়োজন হলে ভাববস্তুর উন্নতির জন্য দৃশ্যসজ্জা বা কথোপ-কথনের পরিবর্তন করাও চলতে পারে।

সেক্সপীয়রের নাটক রচনার জীবনী তাঁর অভিনয়-জীবনীর সঙ্গে মিশ্রিত। তাই তাঁর রচনা সুযোগ পেয়েছে চরম শক্তিশালী হওয়ার। অপর দিকে তাঁর বিপুল শব্দের ঐশ্বর্য তাঁর নাটকগুলিকে তাঁর সময়ে করে তুলত অদ্ভুত প্রাণবন্ত। এলিজাবেথীয় যুগে—নাটক অভিনয়ের প্রণালী ছিল এখন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মঞ্চ ও বেশভূষার ছিল না কোন চাকচিক্য। চার চাকা লাগানো চলমান মঞ্চের সম্মুখে বা পার্শ্বে কোন রকম আচ্ছাদন ছিল না। পিছন দিকে পাশাপাশি দুটো ঘর থাকত



'ওথেলোর'-র একটি দৃশ্যেঃ এমিলিয়া (ফ্রান্সিস ক্লেয়ার) ও আয়াগো (ওয়াল্টার ফিৎসজারেল্ড)

—প্রবেশদ্বারের মত—আর তার উপর দিকে থাকত একটি বারান্দা (Balcony)। পোষাকও যুগ মেনে চলত না। অভিনয় যে-যুগকে রূপায়িত করছে—তার সামান্য দু-একটা চিহ্ন ধারণ করত শুধু। যেমন—হয়তো একজন ভেনিসের একটা জামা পরল কিম্বা কেউ গ্রীক কায়দার শিরস্ত্রাণ ধারণ করল।

দৃশ্যকে রূপায়িত করবার কোন সাজ-সরঞ্জাম না থাকলেও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্য-রূপায়ণে সবচেয়ে বড় সহায় ছিল কাব্য-গীতি (Verse)। এই কাব্যছন্দই সকল কিছুর পরিপূরক ছিল। দর্শকের মনে—সজ্জা, আলো, বিচিত্র দৃশ্য একের পর এক এঁকে যেত এর সুললিত ছন্দ।

সেক্সপীয়রের নাটক সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে তাঁর নাটকের ত্রুটিহীন অভিনয় দেখা প্রয়োজন। এ রকম অভিনয় একমাত্র ইংরেজ অভিনেতা দ্বারাই সম্ভব। কারণ অন্য ভাষায় বা অন্য দেশীয় অভিনেতা দ্বারা এর রূপান্তর অসম্ভব। সেক্সপীয়রের নাটক ভিন্ন ভাষায় অনূদিত করতে গেলে অঙ্গহানি ঘটবেই। —ইংরেজ শিল্পীদের সেক্সপীয়র-অভিনয় এই কারণেই সর্বজন আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু দেশ পর্যটন করে অভিনয় দেখানোর অসুবিধা পর্যাপ্ত। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, যেটা সকলের নজরে আসবে, সেটা আর্থিক অসুবিধা। প্রধান ও সাধারণ শিল্পীদের ছাড়াও নানা রকমের লোক ও যন্ত্রপাতি যা আধুনিক মঞ্চের অপরিহার্য, তা সঙ্গে পাঠাতে হয়। তাই এই ভ্রাম্যমাণের দলের খরচ রীতিমত স্ফীতই হয়ে ওঠে।

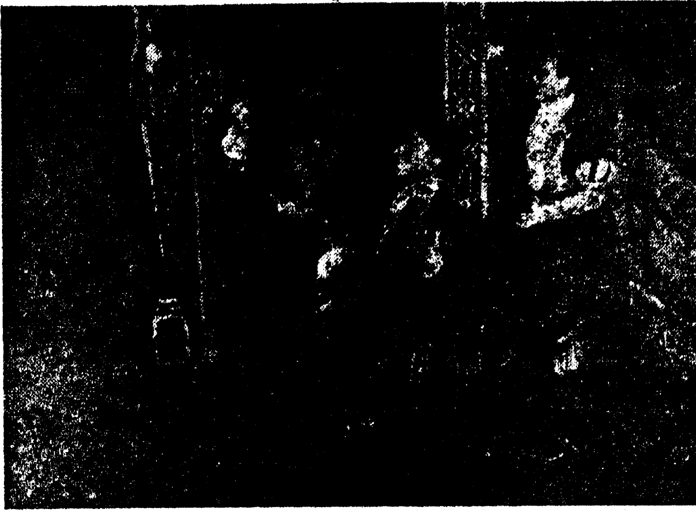
এ অসুবিধা ছাড়াও আর একটি বড় অসুবিধা আছে। বেশির ভাগ দেশেই সেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করে দেখানোর মত কোন জায়গাতেই বেশিসংখ্যক রঙ্গমঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ নেই—দু-চারটে নাম করা শহরে ছাড়া। —যদিও এর আগে এগারোটি দেশে বৃটিশ কাউন্সিল এই রকম ভ্রাম্যমাণ অভিনেতার দল পাঠিয়েছেন। তবু এই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে, এবার কাউন্সিল এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং পরখ করে দেখছেন, এর ফল কিরূপ দাঁড়ায়।

গত বসন্তে একটি ভ্রাম্যমাণ ছোট্ট দলকে তাঁরা ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন। দলটির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় যেসব সমৃদ্ধ শহর আছে, সেইগুলি মাত্র ঘোরা। তাঁদের পরিবেশন করার ভার ছিল—সেক্সপীয়রের নাটকের বিভিন্ন উদ্ধৃতি। কিন্তু প্রচুর জন-সমাগম দেখতে পেলেন তাঁরা। এতটা তাঁদের আশার বাইরে। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের এ-অভিনয় দর্শকের গণ্ডি হয়তো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাঁরা চমকিত হলেন—সর্বসাধারণের ঔৎসুক্য দেখে। বাধ্য হয়ে তাঁদের প্রত্যেক জায়গাতেই করতে হল অতিরিক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। ঘুরতে হল আশাতিরিক্ত অনেক জায়গা। হল, সিনেমা বা মঞ্চ—যেখানেই অভিনয় সম্ভব—সেখানেই করতে হল প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত।

ফ্রান্সে এই অভিনয় অদ্ভুত চেতনা সঞ্চার করার পরই নানা দেশ থেকে বৃটিশ কাউন্সিলের



'ম্যাকবেথে' নামভূমিকায় জন ওয়াইজ



'মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস'-এর একটি দৃশ্যে শাইলক (ওয়াল্টার ফিৎসজারেল্ড), এণ্টোনিও (ডেভিড কিং উড) ও ব্যাসানিও (জোনাথন মেডিংস)

কাছে আসতে থাকে অনুরোধ, এই রকম একটা ভ্রাম্যমাণ ছোট্ট দল পাঠানোর জন্য। এ-রকম একটা দল সর্বপ্রথম ভারত ও পাকিস্থানে পাঠানো হবে—এই সিম্ধান্তই গৃহীত হল। এ দুটো দেশকে প্রথমেই স্থান দেওয়ার কারণও আছে কতকগুলো। প্রথমত, ভারতে সেক্সপীয়রের অনুরাগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। একমাত্র বৃটেন ছাড়া এরকম সেক্সপীয়রের ভক্ত আর কেউ নয়। তাছাড়া এ দুটো দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ নেই, যা একটা পূর্ণ অভিনেতার দলকে সুযোগ দিতে পারে। তাই এই রকম উম্ধৃতি-পরিবেশনকারী দলকে সর্বপ্রথম ভারতেই ঘোরানো হচ্ছে। এতে ইংরেজ শিল্পীদের সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দর্শনেচ্ছু জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটবে। পরে এর ফলাফল দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ দলকেও ভারতে আনা হতে পারে। —প্রধান শহরগুলিতে তাঁদের অভিনয় দেখানো চলবে।

প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুতে থাকবে দুটো কিম্বা তিনটে বিখ্যাত ও সর্বজনপ্রিয় নাটকের কতকগুলি দীর্ঘ কথোপকথন ও কতকগুলি দৃশ্য এবং মাত্র একটা করে দৃশ্য ও ছোট ছোট কথা নেওয়া হবে অপেক্ষাকৃত সাধারণ নাটকগুলি থেকে। প্রথম দলে পড়বে—হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার, মার্চেণ্ট অব ভেনিস এবং এ'দের থেকেই থাকবে দীর্ঘ অংশগুলি। ছোট্ট অংশগুলি উম্ধৃত হবে—রোমিও এণ্ড জুলিয়েট, এ্যাণ্টনিও এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, দি টেম্পেস্ট, রিচার্ড সেকেন্ড, রিচার্ড থার্ড থেকে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আর একটি বিশেষ আকর্ষণী হবে—কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে সেক্সপীয়রের প্রসিম্ধ উক্তিগুলির উম্ধৃতি।

অনুষ্ঠানের পটভূমিকা ও সজ্জার ক্ষেত্রে সেক্সপীয়রের সম-সাময়িক নীতিই অনুসৃত হবে। কেননা, আবৃত্তি এক নাটক থেকে আর এক নাটকে পর্যায়ক্রমে দ্রুত স্থানান্তরিত হবে। শিল্পীদের যেতে হবে—সীজারের রোম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ওয়ার-উইকশায়ারে—মধ্যযুগীয় স্কটল্যান্ড থেকে প্রসপেরোর যাদু দ্বীপে। সুতরাং স্থান ও কালকে রূপারিত করবার কোন উপায় নেই দৃশ্য ও সজ্জায়। এলিজাবেথীয় যুগের প্রণালীকেই শিল্পীর দল মেনে চলবে। যে-চরিত্রে যে রকম প্রয়োজন, সেইটুকু পোষাক পরিবর্তন করবে।

মাত্র ছয়জন শিল্পী দ্বারা গঠিত এই উম্ধৃতি-পরিবেশনকারীকে পরিচালনা করবেন ওয়াল্টার ফিজজেরাল্ড। ইনি লণ্ডনের একজন



নিদ্রায় ভ্রমণরতা লেডী ম্যাকবেথ (ফ্রান্সিস ক্রেয়ার)



'টেম্পেস্ট'-এর একটি দৃশ্যে মিরাণ্ডা (জুডিথ স্কট) ও ফার্ডিনাণ্ড (জন মেডিং)



হ্যামলেট (ডেভিড কিং উড) এবং তদীয় মাতা, রাণী (ফ্রান্সিস ক্লেয়ার)

যশস্বী অভিনেতা। এর পরেই জন ওয়াইসের নাম আমাদের মনে রাখতে হবে। ইনি ছাব্বিশটা সেক্সপীয়রের নাটকে অভিনয় করেছেন। তাছাড়া ফ্রান্সিস ক্লেয়ার ও জুডিথ স্টট্ নাম্নী দুজন সুদর্শনা অভিনেত্রী আছেন। জুডিথ স্টট্—'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'দি টেমিং অব দি স্রু' নাটকদ্বয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ফ্রান্সিস ক্লেয়ার বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন—তার মধ্যে 'হ্যামলেটে' রাণীর ভূমিকা এবং বার্নার্ড শ'এর 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যানে' অ্যানের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই উদ্ধৃতি-পরিবেশনকারী দলের পর্যটন ফলাফল থেকে বোঝা যাবে—সেক্সপীয়রের প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ। আশা করা যায়, ইংলন্ড তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রের প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ যথেষ্ট চেতনার সঞ্চার করবে।

নীলপদ্ম

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এ-এক আশ্চর্য ব্যথা নিদ্রাহীন নিশীথে আমার
অঙ্গের অঙ্গারে ওঠে জ্বলে, অস্থিমজ্জার গ্রন্থিকে
কঠিন জিহ্বায় খোঁজে, নীলপদ্ম-হৃদয়ের দিকে
বাড়ায় সুদীর্ঘ বাহু, থরোথরো অস্থির আঙুল
মন্ত্রের মুদ্রায় করে ওঠানামা।
এ-আঙুল কার?
এই বাহু, এই জিহ্বা? নিদ্রার আকাশে থাকে বিঁধে
এ-কার সুতীক্ষ্ম তীব্র শায়ক? অঙ্গের উপকূলে
ভাসিয়ে যন্ত্রণা তার জ্বলে ওঠে চিন্তার সমিধে।

এ-এক আশ্চর্য সুখ সেই তীক্ষ্ম ব্যথার অতলে
স্থিরপ্রভ আনন্দের অনির্বাণ অম্লান শিখায়
রাত্রিদিন জেগে থাকে, হৃদয়ের সব দুঃখ দায়
নিভিয়ে অশ্রুর স্রোতে ঢাকে তার বঞ্চনার ক্ষতি।

এই ব্যথা নীলপদ্ম-আনন্দের জিহ্বা হয়ে জ্বলে,
এ-আনন্দ ব্যথাম্লান নিদ্রাহীন যন্ত্রণার জ্যোতি।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১

শরতের ডাক নাম ছিল ন্যাড়া। জন্মকালে বোধ হয় তার মাথায় চুল খুব কম ছিল ব'লে ঐ নামে তাকে ডাকা হ'ত। কিন্তু দেবানন্দপুরে থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ি আসার পর তার ন্যাড়া নাম খুব বেশি চর্লেনি। শরতের পিতা মতিদাদা আর মাতা আমাদের মেজদিদি শরৎকে ন্যাড়া ব'লে ডাকতেন; কিন্তু কখনো-সখনো, কতকটা সখ ক'রে এক আধজন ছাড়া আর বড় কেউ ও নামে ডাকত না। এমন কি, শেষাশেষি মতিদাদা এবং মেজদিদিও ন্যাড়া ও শরৎ দুই নামেই মিলিয়ে-মিশিয়ে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কি জানি কেন, মতিদাদার মুখে শুনে শুনেই বোধ করি, আদমপুর ক্লাবে শরতের ন্যাড়া নাম প্রায় ষোল আনা চলিত হ'য়ে গিয়েছিল।

আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল সঙ্গীত চর্চা, টেনিস খেলা, বিলিয়ার্ডস খেলা ও মাঝে মাঝে থিয়েটারের নাটক অভিনয় করা। কিন্তু সর্বপ্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল আড্ডা দেওয়া। মফস্বলে এবং কলিকাতায় অনেক ক্লাব দেখেছি, কিছু কিছু ক্লাব আমরা নিজেরাও চালিয়েছি; কিন্তু আদমপুর ক্লাবের মতো অমন সুনিবিড়ভাবে জমা ও মজা আর একটি ক্লাব কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিস্টাল ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র। তাঁকে অবলম্বন ক'রে অন্য যে সকল ক্রিস্টাল জোট বেঁধেছিল তন্মধ্যে কয়েকটির নাম,—শরৎ মজুমদার, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগিনেয় শরৎ-চন্দ্র, উপীলা (উপেন্দ্র) লাহিড়ী, সতীশ বসু, মণি মজুমদার, সুকুমার মৈত্র, রাজেন মজুমদার ('শ্রীকান্ত'র অন্তর্গত ইন্দ্রনাথ চরিত্রের উৎস বলে অনুমিত) ও রাজেন গাছি। আরও কয়েকজন প্রধান সদস্যের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু তাঁদের নাম মনে করতে পারছিনে। বহুবিধ গুণ-সমষ্টির প্রভাবে কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন কেন্দ্র হবার উপযুক্ত পাত্র। সুশ্রী আকৃতি, সুমিষ্ট প্রকৃতি, অমায়িক ব্যবহার, উদার অন্তঃকরণ, দরাজ হস্ত,—এ সকল গুণ ত' তাঁর ছিলই; তদুপরি তিনি ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক; হার্মোনিয়ম বাজাতে পারতেন এত ভাল যে, আড়াল থেকে শুনলে মনে হ'ত না, যা বাজছে তা হার্মোনিয়মের মতো সামান্য যন্ত্র; টেনিসে তাঁর খেলার শৈলী ছিল উচ্চাঙ্গের; আর বিলিয়ার্ডসে ভাগলপুরে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ, শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, ইউরোপীয়নদেরও মধ্যে। ভাল বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড় উচ্চ ইংরাজ রাজকর্মচারী এলে রাজা সাহেব পুত্রের সহিত বিলিয়ার্ডস খেলবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রিত করতেন। কিন্তু কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে কুমার সাহেবকে পরাজিত করবার গৌরব দেখা যেত।

আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আদমপুর ক্লাবের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলাম। বয়সে আমরা আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের চেয়ে মোটামুটি বছর ছয়সাতের ছোট ছিলাম ব'লে ক্লাবের খাস-মহলের পরিধির মধ্যে আমাদের স্থান ছিল না বটে, কিন্তু তার অব্যবহিত বহির্ভাগে যতটা সান্নিধ্য বজায় রাখা সম্ভব তা আমরা রেখে চলতাম। টেনিস গ্রাউন্ডে আমরা কোর্টের বাইরে নিকটেই অবস্থান করতাম, আর সুযোগ পেলেই বল কুড়িয়ে দিতাম; যখন মজলিশ বসত, আমরা ঘরের বাইরে বারান্দায় তাঁবেদারীর অপেক্ষায় থাকতাম; কোনো ফাই-ফরমাশ পেলে তা তামিল ক'রে কৃত-কৃতার্থ হতাম। আমাদের আনুগত্য একেবারে অপুরস্কৃত যেত না; পৃষ্ঠপোষকোচিত আচরণ এবং মাঝে মাঝে তদপেক্ষা সারবান পদার্থের দ্বারা আমরা আপ্যায়িত হতাম।

নাটক অভিনয়ের সময় উপস্থিত হ'লে আমরা কিন্তু অনিবার্য হ'য়ে পড়তাম। উদ্যোগ পর্ব থেকেই ক্লাবের সীমান্ত রেখা অতিক্রম-পূর্বক খাশ-মহলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে নানাবিধ উপায়ে আমরা আমাদের মূল্যবানতার প্রমাণ দিতাম। পার্ট নকল করা থেকে আরম্ভ ক'রে অভিনয় রজনীতে সীন ওঠা-নামার দড়ি টানাটানি পর্যন্ত যাবতীয় তল্পিদারির কাজ আমরা সানন্দে সম্পন্ন করতাম।

একবার বিখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর তাজ্জব ব্যাপার প্রহসনের অভিনয় হচ্ছে। আমি একটা উইংসের পাশে সীনের দড়ি ধ'রে ব'সে আছি; প্রম্পটার আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রম্পটিং করছে, পাশে আর একজন জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে প্রম্পটারকে আলো দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমি উপর দিকে চাইতেই—এমনই যোগাযোগের ব্যাপার—গলন্ত মোম এসে পড়ল একবারে আমার ডান চোখের ভিতর। চোখের যন্ত্রণার ত' কথাই নেই; সমস্ত শরীর একটা দুর্বিষহ বেদনায় আর্ত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল যেন চক্ষুর ভিতর দিয়ে এক রাশ বিদ্যুৎপ্রবাহ সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

দুই চক্ষু বুজে প্রাণপণে কষ্ট সহ্য ক'রে সীনের দড়ি টেনে ধ'রে কোনো প্রকারে ব'সে রইলাম। মিনিট পাঁচ-সাত পরে দৃশ্য পরিবর্তিত হ'তেই দড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রম্পটারকে দু-চার কথায় আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বাড়ি ছুট দিলাম।

দিন চারেক পরে আদমপুর ক্লাবে গেছি। তখনো চোখটা সামান্য লাল হ'য়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই কুমার সতীশ তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "সাবাশ! আমি সুকুমারের মুখে সব শুনেছি। তুমি যে অত যন্ত্রণার মধ্যেও সীনের দড়ি ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঘটাও নি, এর দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কর্তব্য বোধের পরিচয় দিয়েছ।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "আমি যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হতাম তা হ'লে তোমাকে এ সৎকার্যের জন্যে ভিক্টোরিয়া ক্রশ মেডেল দিতাম।"

শুনে আমার মনে হ'ল, হায়, হায়! আমার দুচোখেই কেন সেদিন মোমবাতি পড়েনি!

আমার ডান চক্ষু লক্ষ্য ক'রে কুমার সতীশ বললেন, "তোমার চোখ ত এখনও লাল হয়ে রয়েছে উপেন!"

বললাম, "এখন ত' প্রায় নেই, এর চেয়েও অনেক বেশি লাল হ'য়েছিল।"

ব্যগ্র কণ্ঠে কুমার সতীশ বললেন, "তা আমি জানি জবাফুলের মত লাল হয়েছিল, ল্যাড়ার মুখে শুনেছি।"

ল্যাড়া,—অর্থাৎ ন্যাড়া, অর্থাৎ পরবর্তী-কালের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আদমপুর ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়ার পরিবর্তে ল্যাড়া ব'লে ডাকতেন। আমার বিশ্বাস, আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের ব্যবহৃত এই ল্যাড়া শব্দটিকেই শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় ছাঁচে ফেলে শুদ্ধি ক'রে নিয়ে Lara-য় দাঁড় করিয়েছিলেন। তখনকার দিনের অনেক কাগজ-পত্রে, অনেক খাতায় বইয়ে শরৎচন্দ্র নিজের নাম সই করতেন, St. C. Lara। আমরা বুঝতাম তার অর্থ, শরৎচন্দ্র ল্যাড়া; কিন্তু কোনো অজানা লোক আচমকা দেখে যদি মনে করত, হল্যান্ড কিম্বা বেলজিয়াম দেশীয় সেন্ট-ক্রিস্টোফার লারা নামক কোনো সাধু মহাপুরুষ ঐভাবে নিজের নাম দস্তখৎ করেছেন, তাহ'লে তাকে দোষ দেওয়া চলত না।

যে সকল পরিবেশ অথবা অবস্থার মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, আদমপুর ক্লাব তন্মধ্যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন পর্দার মতো ক্লাবের সদস্যগণ, এক সরগ্রামের অন্তর্গত হলেও প্রত্যেকে বিভিন্ন সুরের প্রকাশক ছিলেন। এরূপ

একটি সরগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে মানব চরিত্র অনুশীলন করার সুযোগ লাভ দুর্লভ সৌভাগ্য এবং সে অনুশীলনের মূল্যও যথেষ্ট বেশি।

আদমপুর ক্লাব শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

১০

চোখের সামনে মৃত্যু ঘটতে জীবনে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি করুণ; আর তেমনি আমার মনের মধ্যে কিছুকাল ধরে গভীরভাবে একটা বৈরাগ্য-মিশ্রিত আতঙ্কের ছায়া বিস্তার ক'রে রাখার বিষয়ে অদ্বিতীয়। আতঙ্ক নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে নয়; মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা কল্পনা-পরিকল্পনার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর সেই কথা ভেবে। যে সূত্রের উপর জীবন বিলম্বিত হ'য়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে তা ছিন্ন হয়ে যাবার মত দুর্বল, সে কথা জ্ঞানের মধ্যে জানা ছিল, কিন্তু চোখের উপর এমন ক'রে দেখা ছিল না।

হাইকোর্টের পূজার ছুটি হ'তে পরিবারস্থ সকলে ভাগলপুর চ'লে গেলেন। ভবানীপুরের বাসায় তালা পড়ল। তখনকার দিনে বাড়িতে তালা লাগিয়ে একটু নজর রাখবার জন্য প্রতিবেশীদের ব'লে ক'য়ে বিদেশ গমন করা চলত। আজকালকার মতো চোরেরা তখন এতটা তৎপর হ'য়ে ওঠেনি। এখন বাড়িতে লোক না রেখে শুধু তালা বন্ধ ক'রে গেলে রেলগাড়ি বর্ধমান পৌঁছবারও সবুর সয় না, তারি মধ্যে তালা চাবি ভেঙে ভাল ভাল মূল্যবান সামগ্রী বেছে বেছে রমের ঘর হ'তে শ্যামের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

আমার কলেজ বন্ধ হ'তে তখনো দিন কুড়িক দেরি আছে। আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে বৌবাজারে ৪নং দুর্গা পিথুড়ীর লেনে কাকার বাসায় এসে উঠলাম। আমার কাকা অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার কালেক্টরিতে চাকরী করতেন। তাঁর তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন, মধ্যম বঙ্কিমবিহারী ও কনিষ্ঠ বিপিনবিহারী। এই বিপিনবিহারীই বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এম এল এ।

তখন বিপিন নিতান্ত লাজুক মুখ চোরা শান্ত প্রকৃতির বালক ছিল। সে সময়ে তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, ভবিষ্যতে একদিন এই ফুটফুটে ছিপছিপে নিরীহ বালকটি একজন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল হ'য়ে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া নিতে সক্ষম হবে এবং উত্তরকালে কংগ্রেসের পতাকাতলে উপস্থিত হ'য়ে একজন উচ্চ শ্রেণীর অকৃত্রিম দেশকর্মী ব'লে নিজেকে প্রতিপন্ন করবে। বিপিন যখন দুর্দান্তভাবে ক্রিয়াশীল, তখন তাকে নিয়ে প্রবল ইংরাজ পুলিশের দুরূহ সমস্যার দুস্তর সলিলে নাকানি চোকানি খাবার অন্ত ছিল না। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছিলাম, তৎকালীন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের কনফিডেন্সিয়াল পুলিশ রিপোর্টের পাতায় পাতায় 'বিপিন গাঙ্গুলীর' নামোল্লেখ দেখা যেত। একবার পুলিশ কর্তৃক বিপিন ধৃত হওয়ার সংবাদ লাভ ক'রে সিমলার গর্ডন কাসেলে হোম ডিপার্টমেণ্টের একজন ইংরাজ কর্মচারীকে অপর এক ইংরাজ কর্মচারীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলতে শোনা গিয়েছিল, That terrible Bepin Ganguli (বেপিন গাঙ্গুলী) has been caught!

চোখে ধুলো ছিটিয়ে পালিয়ে যাবার কৌশল আছে, সে কথা শুনেছি। কিন্তু ধূলির সাহায্য একদম না নিয়ে সম্পূর্ণ এক অভিনব উপায়ে বিপিন ভায়া একবার পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছিলেন। সে কাহিনী শুনলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই একটু কৌতুক বোধ করবেন।

অতি প্রত্যুষে একদিন পুলিশ এসে কাকার বাড়ির সদর দরজা ঘেরাও ক'রে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ভিতর থেকে কেউ দরজা খুললেই বিপিনকে ধরবার ব্যবস্থা করবে। সেদিন বিপিন গৃহে উপস্থিত আছে। সামনের বাড়ি থেকে ইসারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে নির্বাক বার্তা পৌঁছে গেছে। পলায়ন করতে হ'লে পশ্চিমদিকের যে সদর দরজায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, তাই দিয়েই করতে হয়; গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। ক্ষণকাল পরে খট ক'রে খিল খোলার শব্দ হ'য়ে সুপ্রশস্ত দরজা প্রসারিত হয়ে খুলে গেল। বাহিরের ঘরে প্রবেশ করবার জন্য পুলিশ সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে চক্ষের নিমেষে অতর্কিতে সাপটে মাল কোঁচা মারা একটা শ্বেতবর্ণের পদার্থ সিংহ বিক্রমে লাফ দিয়ে ইন্সপেক্টারের প্রায় কাঁধ বরাবর উঁচু হ'য়ে একেবারে গলির উপর পড়ল; তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে বৌবাজার স্ট্রীটের দিকে ছুট দিলে। হকচকিয়ে গিয়ে পুলিশরা সমস্বরে হাঁ-হাঁ রবে চিৎকার ক'রে উঠল। গলিতে দুই জায়গায় দুজন কন্সটেবল মোতায়েন ছিল, তারা একদিকসে ঐ ছুটন্ত পদার্থকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আটকে রাখতে পারলে না,—দুই ঝটকায় দুই কন্সটেবলের আলিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নগ্নপদে দুদ্দাড় ক'রে দৌড়ে ঐ পদার্থ বৌবাজার স্ট্রীটের ফুটপাথে পথচারীদের মধ্যে গিয়ে মিশল।

বিপিন গাঙ্গুলী কন্সটেবলদের করায়ত্ত হ'ল না; যা করায়ত্ত হ'ল তা বিপিন গাঙ্গুলীর দেহের খানিকটা করে সর্ষপ তৈল-! পুলিশের আগমন সংবাদ পেয়েই বিপিন মাল কোঁচা মেরে সমস্ত দেহে বেশ ক'রে সরিষার তৈল মেখে নিয়েছিল। দু পায়ে আড়াই সেরি বুট প'রে ধপড় ধপড় শব্দ করতে করতে বিপিনকে অনুসরণ ক'রে কন্সটেবলরা যখন বৌবাজার স্ট্রীটের ফুটপাথে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন বোধ হয় নিকটবর্তী কোনো গুপ্ত ঘাটিতে প্রবেশ ক'রে বিপিন কলের জলের ঝরণা খুলে স্নানে বসেছে।

এ গল্পটি আমার শোনা গল্প কিন্তু এত বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যে, এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

বংশগুণাধিকার (heredity) নামে একটা যে মতবাদ প্রচলিত আছে, বিপিনের ক্ষেত্রে তার ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকে বলে মাটির মানুষ, কাকা ও খুড়িমা তাই ছিলেন। তবে বিপিন এত শৌর্য অধিকার করলে কোথা হ'তে? মানুষের মধ্যে 'ভোলানাথ' ব'লে কোনো কিছু বস্তু যদি থাকে, কাকা ছিলেন তাই,—আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও, উগ্র গৌরবর্ণের নাতিস্থূল দেহ, মুখাবয়বে সরলতা এবং নির্মলতার এমন সুস্পষ্ট ছাপ যে, তাঁর শত্রুও মনে করত না, প্ররোচিত হ'য়েও তিনি কারও অনিষ্ট করতে পারেন।

আমি কাকার বাসায় আসবার চার পাঁচদিন পরেই ভাগলপুর থেকে শরৎচন্দ্র এসে উপস্থিত হ'লেন। আদমপুর ক্লাবে থিয়েটার হবে, স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করবার উপযুক্ত দুই একটি বালক সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, কিছু সাজসজ্জা ক্রয় অথবা ভাড়া করবার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল।

শরৎচন্দ্র আসার পর প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে আমরা উভয়ে মিলিত হতাম। কাছেই কোনো মেসে শরৎচন্দ্র থাকতেন। আমাদের কাজ ছিল পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, বৌবাজারের চোরাবাজারে পুরাতন জিনিসপত্র ঘাঁটা ও কিছু কিছু কেনা এবং ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে, এমন কি না হ'লেও, দোকানে ঢুকে পেট ভরে খাবার খাওয়া। একদিন শরৎ ও আমি থিয়েটার দেখেছিলাম। কোন্ থিয়েটার তা মনে পড়ছে না, কিন্তু সুলিখিত ঝরঝরে একটি নাটকের সু-অভিনয় দেখে আমরা দুজনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। নাটকটির নাম 'চক্ষুদান', অথবা 'দৃষ্টিদান', অথবা ঐ রকম আর কিছু। সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া নাটকের অন্তর্গত একটি গান আমাদের অতিশয় ভাল লেগেছিল। তার প্রথম লাইন মনে আছে, 'বল বল আবার বল, ভাল কথার মিছেও ভাল।'

একদিন, কি জানি কেন, রাত্রি দুটো-আড়াইটার সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শোবার সময়ে সহজ বাড়ি দেখেই শুয়েছিলাম,—অন্ততঃ আমি তখন সেই রকমই বুঝেছিলাম; জেগে দেখি, বাড়িময় একটা অসম্ভব চঞ্চলতা; চাপা গলায় অস্ফুট কথোপকথন, সাঁড়িতে

ত্বরিত ওঠা-নামার পদধ্বনি, সকলের চলনে-বলনে একটা সন্ত্রাসের ভঙ্গী। উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে অবগত হলাম, কালীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে দুবার Eclampsia fit-এর আক্রমণও হয়ে গেছে।

কালী কাকার পনের-ষোল বৎসর বয়সের পরমা সুন্দরী কন্যা, আসন্ন প্রসবের প্রতীক্ষায় পিতা-মাতা-আত্মীয়-পরিজনের আদর ও যত্নের মধ্যে কিছুকাল হ'তে পিত্রালয়ে বাস করছে। এইবার তার প্রথম প্রসব।

কালীর জন্য, কি জানি কেন, আমার মনে একটা উদ্বেগ লেগে থাকত। অতি যত্নের ফলেই বোধ হয়, দেহ তার একটু স্থূল হ'য়ে গেছে; অলস বিষণ্ণভাবে সর্বদা শুয়ে ব'সে থাকে; কাজকর্ম কিছুই করে না, অথবা করতে দেওয়া হয় না; পা দুটি বেশ একটু ফোলা-ফোলা। মনে মনে ভাবতাম, কি ক'রে বেচারা ভালয়-ভালয় সন্তান প্রসব করবে!

শুনলাম, অবস্থা সংকটাপন্ন মনে হওয়ায় ধাত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ললিত দাদা গেছেন ডাক্তার কেদার দাসকে নিয়ে আসবার জন্য। কেদারনাথ দাস তখনকার দিনের কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসূতি চিকিৎসক। তাঁর সুনাম ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

একজন সহকারী ডাক্তার সহ কেদার দাস যখন উপস্থিত হ'লেন ততক্ষণে আরও একবার ফিট হয়েছে। বিবরণ শুনে ও রোগী পরীক্ষা ক'রে কেদার দাস মুখ বিকৃত করলেন। Eclampsia-র ফিট একবার হওয়াই যথেষ্ট আশঙ্কার ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে ত তিন-তিন বার! ডক্টার দাসের মুখ থেকে বিশেষ কিছু আশা-ভরসার কথা পাওয়া গেল না; কিন্তু তিনি সাহসী সৈনিকের ন্যায় অ্যাপ্রন পরিধান ক'রে যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিলম্বে রোগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

ঘরের ভিতর ডাক্তারগণ, ধাত্রী ও খুড়িমা ছিলেন; আমরা ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রসূতি-কক্ষের দ্বার খুলে কেদার দাস যখন বেরিয়ে এলেন, তখন প্রাঙ্গণে প্রত্যুষের স্তিমিত আলোক এসে পড়েছে।

শুনলাম, শিশুটি রক্ষা পায়নি, কিন্তু প্রসূতি জীবিত আছে; তবে গভীর অজ্ঞান অবস্থায় নিমগ্ন। ক্লোরোফর্ম হয়ত সে অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

ডক্টার দাসের পিছনে পিছনে আমরা বাইরের ঘরে এসে হাজির হলাম। সেবা ও ঔষধ সম্বন্ধে ধাত্রী ও ললিতদাদাকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে ডক্টর দাস প্রস্থানোদ্যত হলেন। কাতরকণ্ঠে কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার-বাবু, মেয়েটা বাঁচবে ত?"

কেদার দাস উত্তর দিলেন, "সে কথা ত' ডাক্তাররা বলতে পারে না। তবে মেয়েটি যে প্রসব করানোর চোট কাটিয়ে উঠেছে, এ একটা আশার কথা।"

যাবার সময়ে ডক্টর দাস ব'লে গেলেন, সেবা-শুশ্রূষার জন্য কলেজের দুটি ছাত্রকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

সকাল সাতটা আন্দাজ যথারীতি শরৎ এসে হাজির হ'ল। এক রাত্রির ফেরে বাড়ির এরূপ অবস্থান্তর দেখে সে ত' অবাক! সেদিন তার আর মেসে ফিরে যাওয়া হল না।

বেলা আড়াইটা আন্দাজ বিনা নোটিশে কেদার দাস এসে হাজির। সঙ্গে দুটি মেডিক্যাল ছাত্র; বেলা নয়টার সময়ে যে দুটি ছাত্রকে পাঠিয়েছিলেন, তাদের বদলি।

তখনো কালীর অজ্ঞান অবস্থা চলেছে। পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার বললেন, ভালও নয় মন্দও নয়,—একই অবস্থা। যাই হোক, আমরা তাতেই একটু আশ্বস্ত হলাম,— রোগের সমভাবও ভাল। ভাটা বন্ধ হয়ে জীবন-নদী যদি থমথমিয়ে থাকে, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে জোয়ারের আশা করা যেতে পারে।

কাকা ফি দিতে উদ্যত হ'লে ডক্টর দাস বললেন, "কি আশ্চর্য! আপনি 'কল' দেওয়ায় আমি এসেছি না কি যে, ফি নোব? আপনার মেয়েটি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যক মতো মাঝে মাঝে আসব, তার জন্যে আপনাকে কিছু দিতে হবে না।"

লক্ষ্মীর মতো রোগিনী, আর মহাদেবের মতো রোগিনীর পিতাকে দেখে ডাক্তার বোধহয় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ফি নিতে সম্মত না হওয়ায় কাকা ঈষৎ সংকোচ বোধ করছেন বুঝতে পেরে কেদার দাস সহাস্যমুখে বললেন, "এর জন্যে আপনাকে কুণ্ঠিত হতে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। বেশ ত' এক কাজ করলেই হবে। আপনি ত সন্দেশের পাড়ায় বাস করেন, ভগবানের কৃপায় আপনার মেয়েটি ভাল হয়ে উঠুক, তারপর আমাকে টাকা পাঁচেকের উৎকৃষ্ট সন্দেশ আর একজোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি-চাদর পাঠিয়ে দেবেন,—আমি খুব খুশি হব।"

এমন কথার পর কাকাকে অগত্যা নিবৃত্ত হতেই হল। দুরূহ সমস্যার সন্দেশের দ্বারা এরূপ সুমিষ্ট সমাধান হতে দেখে খুশি হয়ে গেলাম। ডাক্তারের মহানুভাবতা দেখে আমার মনও খানিকটা মহানুভাব হয়ে উঠল। কেবলই মনে হতে লাগল, আমিও যদি এইরূপ কোনো একটা মহানুভাবতা দেখাবার সুযোগ পাই ত নিশ্চয় দেখাই।

সন্ধ্যার সময়ে কেদার দাস এলেন, সকালে যে ছেলে দুটি এসেছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে। ওরা সারা রাত্রি আমাদের গৃহে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করবে। বলা বাহুল্য, এরা দুজনে আহারাদি করবে আমাদেরই গৃহে।

কালী তখনো একভাবেই অজ্ঞান হয়ে আছে। কিন্তু তাকে পরীক্ষা করে দেখে ডক্টর দাসের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করলে। বললেন, নাড়ী অনেকটা উন্নতি করেছে, দুর্বলতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। শুনে আমাদেরও যেন খানিকটা দুর্বলতা হ্রাস পেলে।

ঘর থেকে সকলেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন, শুধু শরৎ ও আমি রইলাম কালীর কাছে। ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে কেদার দাস ধাত্রী ও ছাত্রগণকে সমস্ত রাত্রির রোগী-পরিচর্যার বিস্তৃত উপদেশ দিচ্ছেন। ঘরে বসেও আমরা তা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ শরৎ বলে উঠল, "ওরে উপীন, কালী যে মরে যাচ্ছে!"

চমকিত হয়ে কালীর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য অল্প-একটু ফাঁক হয়ে বুজে গেল। শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম, "কি বলছ শরৎ! ভুল করছ না ত?"

এ বিষয়ে শরৎ আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ; "না, বোধহয় ভুল করছিনে" বলে সংক্ষেপে আমার কথার উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেদার দাসকে বললে, "ডাক্তার-বাবু, একবার দেখবেন চলুন ত। কেমন যেন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে নত হয়ে বসে কেদার দাস কালীর মণিবন্ধ টিপে ধরলেন; তারপর আর-একটু জোরে আর একবার নাড়ী টিপে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "Gone!"

কি সর্বনাশ! Gone? চলে গেছে? এত সহজে, এত অবলীলাক্রমে একেবারে হাতের বাইরে? ফিরিয়ে আনবার আর কোনও উপায় নেই? জীবন কি তা হলে এমনই পিচ্ছিল বস্তু যা কেদার দাসের মতো শক্তিমান ডাক্তারকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেও ফস্কে বেরিয়ে যেতে পারে!

এর পর চোখের উপর কত মৃত্যু ঘটতে দেখেছি, কিন্তু কালীর মৃত্যু-সভার সেই 'Gone' শব্দের ভয়াবহতার তুলনা নেই! আজও সে শব্দের বৈরাগ্যগম্ভীর ধ্বনি কানে লেগে আছে।

ক্ষণিকের জন্য যে আশার রশ্মি হৃদয়ে দেখা দিয়েছিল, একটা বুক-ফাটা ক্রন্দনের রোলে তা সমাধি লাভ করলে।

(ক্রমশ)

রাসেল-জীবন-দর্শন

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

১৯১৪ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে আরম্ভ হয়েছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন একটি আধবয়সী মানুষ। বিষয়বস্তু দার্শনিক তত্ত্ববিচার— Our knowledge of the External world. মানুষটি দেখতে শীর্ণকায়, বিবর্ণ, বিষণ্ণ। মনে হয় এর মৃত্যু ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

দশ বছর পরে। ইতিমধ্যে অনেক আশার সমাধি হয়েছে। জীবনচর্যার হয়েছে অনেক পরিবর্তন। তবু বায়ান্ন বছরের সেই মানুষটিকে আজ দেখলে মনে হয় নবীন যৌবনের প্রতীক। ঠোঁটে হাসি, নয়নে দীপ্তি, বুকে নবযুগ সৃষ্টির বিপুল সম্পত্তি।

মানুষটি আর কেউ নন—বার্ট্রান্ড রাসেল, ১৯৫০ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার যাঁর বিশ্ব-স্বীকৃত খ্যাতিকে দিয়েছে নবতর স্বীকৃতি। বস্তুবিক বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনের এই দুটি খণ্ড দৃশ্যের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই তাঁর দীর্ঘ জীবনের দুটি সুস্পষ্ট অধ্যায়ের আভাষ। দুটি পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার অপূর্ব ক্রমবিকাশ ঘটেছে রাসেলের জীবনে। এক রাসেলকে আমরা পাই তীক্ষ্ম-যুক্তিবাদী ন্যায়শাস্ত্রের পূজারীরূপে। অঙ্ক-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তখন তাঁর সে কী মাতামাতি।

Mysticism and Logic বইতে তিনি লিখেছেন :—
Mathematics, rightly viewed possesses not only truth but supreme beauty.
জীবনে যা কিছু দেখবার এবং শিখবার, যা কিছু অনুভব করবার, সব কিছুকে ঠেসে ভরে দিতে হবে নিরেট নির্ভুল অঙ্কশাস্ত্রের কাঠামোর ভিতর—, এই ছিল তখনকার গাণিতিক রাসেলের একমাত্র কামনা।

কিন্তু চেহারা বদলাতেও তাঁর সময় লাগল না। যে মানুষ ডুবে ছিল নিরেট অঙ্ক আর নির্ভুল যুক্তিশাস্ত্রের কঠিন খোলসের মধ্যে, কোন্ যাদুদণ্ডের ছোঁয়াচে একদিন তার ভিতর হতে বেরিয়ে এল এক স্বপ্নদর্শী মানবপ্রেমিক —বেরিয়ে এল এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। জগৎ সবিস্ময়ে দেখল, সেদিনের সেই শীর্ণকায় অধ্যাপকের রক্তহীন বিবর্ণ মুখে ফুটে উঠেছে নব জীবনের ভাস্বর দীপ্তি। রাসেলের জীবনের এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেই উইল্ ডুরাণ্ট লিখেছেন :
There have been two Bertrand Russells: one who died during the war; and another who rose out of that one's shroud, an almost mystic Communist born out of the ashes of a mathematical logician.

প্রশ্ন জাগে মনে : এই রূপান্তর সম্ভব হল কেমন করে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত বীভৎসতাই দিল তাঁর চোখ খুলে। মানুষে মানুষে সে কী নারকীয় স্বার্থ-সংঘাত। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী মেলেছে কুটিল ফণা। হাজার হাজার তরুণ জীবন ছুটে চলেছে মরণের পথে। কেন? সাম্রাজ্য-রক্ষার দায়ে। সাম্রাজ্য কি এতই মূল্যবান? মানুষের চেয়েও? জীবন-দর্শনের নতুন সূত্র খুঁজে পেলেন প্রৌঢ় দার্শনিক। সেই সূত্র ধরে তিনি পৌঁছুলেন সাম্যবাদে। বললেন, পৃথিবীর যত অনর্থের মূল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা। আর এই অনর্থের একমাত্র আসান সাম্যবাদ।

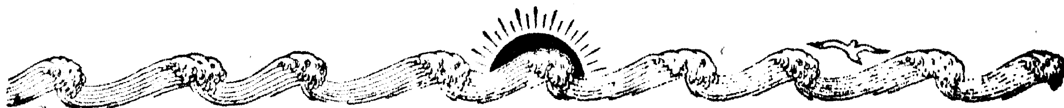
নবলব্ধ চেতনার অত্যুগ্র উৎসাহের বশে রাসেল বার বার আক্রমণ করতে লাগলেন তৎকালীন মন্ত্রিসভা ও রাজ সরকারকে। রাজশক্তি ক্রুদ্ধ হল। একখানি আপত্তিকর পুস্তিকা প্রকাশের অভিযোগে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হল। রাসেলের চাকরি গেল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে। লণ্ডনের এক ক্ষুদ্র ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল। সমাজ তাঁকে ত্যাগ করল। যুদ্ধাক্রান্ত দেশ তাঁকে আখ্যা দিল দেশদ্রোহী।

নিয়তির পরিহাস : সাম্যবাদের স্বপ্নও তাঁর একদিন ভাঙল। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য রাসেল বের হলেন দেশ ভ্রমণে। এলেন তাঁর স্বপ্ন সাফল্যের দেশ রাশিয়ায়। দেখলেন, হতাশ হলেন।
Russia seems on the way to be coming a greater france, a great nation of peasant proprietors.
কিন্তু তার বেশী নয়। কোথায় তাঁর স্বপ্নে দেখা ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার নিরংকুশ লীলা-ভূমি?

ঘুরতে ঘুরতে এলেন চীনে। চমক লাগলে রাসেলের চোখে। এ কোন্ দেশে এলাম? কেমন মানুষে এরা? যন্ত্রের ঘর্ঘর অবিরাম বাজে না কানে। মানুষগুলো চলে ধীর চালে। অবসর আছে, তাই আছে অবসর-বিলাস, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় ও সুযোগ। মহাএসিয়ার বিপুল জীবন-স্রোতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সত্যসন্ধানী জীবন-দার্শনিক প্রথম উপলব্ধি করলেন : যা দেখেছি, যা জেনেছি, মানুষের সম্বন্ধে সেই তো শেষ কথা নয়।

I have come to realise that the white race is not as important as I used to think it was. If Europe and America kill themselves off in a war it will not necessarily mean the destruction of the human spices. nor even an end to civilisation. There will still be a considerable number of Chinese left; and in many ways China is the greatest country I have even seen. It is not only the greatest numerically and the greatest culturally, but it seems to me the greatest intellectually.

এই মহাচীন কি মহাএসিয়ার প্রতীক নয়? অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে দুটি মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরো-আমেরিকা তৃতীয় মহাযুদ্ধের রক্ত-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারের মালা দুলিয়েছে আটাত্তর বৎসর বয়সের এমন একজন বিদগ্ধ মানুষের গলায় যাঁর দার্শনিক তৃতীয় নয়নের সম্মুখে মহাএসিয়া ফুটে উঠেছে মানব সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের ভিত্তিভূমিরূপে। ভারতবর্ষের ঋষি-কবির একটি সমার্থক উক্তিও এখানেও উদ্ধৃত করা চলে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে : ক্ষমতাগর্বী ইওরো-আমেরিকা স্বার্থ-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মনীষী রাসেলের মর্ম-সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারবে কি?



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

...আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছিল। আকাশে যে এত নক্ষত্র আছে নিবিষ্টচিত্তে এমনভাবে তাহা বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই, কারণ এমনভাবে আর কখনও একাকী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সুযোগই মেলে নাই জীবনে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ইতোপূর্বে বহুবার শয়ন করিয়াছি কিন্তু একা নয়, সঙ্গে কেহ না কেহ থাকিত, তাহাকে লইয়াই মগ্ন থাকিতাম, আকাশের দিকে চাহিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল ধবলা উহাদের দিকে চাহিয়া গভীর রাত্রে প্রার্থনা করে, কিন্তু সে প্রার্থনা কি কখনও সফল হওয়া সম্ভব? ধবলের ভাষা কি উহাদের পর্যন্ত পৌঁছায়? পৌঁছাইলেও কি তাহারা আমাদের মঙ্গল করিতে সক্ষম? অতগুলি নক্ষত্রের মধ্যে কে আমাদের বন্ধু কে শত্রু তাহা ধবল ঠিক করিতে পারে কি করিয়া? উহারা কত দূরে আছে কে জানে! উহারা কি আমাদের পরিচিত সূর্যের সগোত্র? সূর্যেরই কি সন্তান-সন্ততি উহারা? তাহা হইলে দিনের বেলা কোথা থাকে! বৃদ্ধা জিনা একটা গল্প বলিত তাহা মনে পড়িল। সে বলিত, সূর্যের দুইটি বিবাহ। তাহার একটি পত্নী দিবস। তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া সে সূর্যকে ছাড়িতে চাহে না, সন্তান-কামনায় সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দ্বিতীয় পত্নী রাত্রি, তাহার অনেক সন্তান, সন্তানদের লইয়াই সে এত ব্যস্ত যে, সূর্যের দিকে তাকাইবার অবসর পায় না। মাঝে মাঝে কিন্তু সূর্যকে দাবী করে সে। সন্ধ্যায় বা উষায় ঘনঘটা করিয়া ঝড়বৃষ্টি হইলে জিনা বলিত রাত্রির সহিত দিবসের কলহ বাধিয়াছে, রাত্রি দিবসের নিকট হইতে সূর্যকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। জিনার গল্পটা বড় ভাল লাগিত, ভাল লাগিত বলিয়াই বোধ হয় বিশ্বাস করিতাম। বহু জন্ম পূর্বে আর একটা যে গল্প শুনিয়াছিলাম, ধর্ষিতা শবরী ওকার অশ্রুবিন্দুগুলি আকাশের গায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া জাগিয়া আছে, সে গল্প আর মনে ছিল না। নূতন গল্পে নূতন আস্থা স্থাপন করিয়া নূতন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, বিঘাও যাহা বলে তাহাই হয়তো ঠিক। গাছের শাখা ধরিয়া সজোরে টান দিলেই গাছ অবনত হইতে পারে, প্রার্থনা করিলে হইবে না। বহুকাল পূর্বে রাহুলাও ঠিক এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বিষের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা মনে ছিল না। জোনাফুদ্দিনের বিফলতাকে আমরা ক্ষমা করি নাই, কিন্তু সে কথাও মনে ছিল না। রাহুলা-জোনাফুদ্দিনকে মনে না থাকিলেও জীবন যুদ্ধের তাড়নায় যুগে-যুগে জন্মজন্মান্তরে বারম্বার আমরা যে দুইটি পথের সম্মুখীন হইতেছিলাম সে পথ দুইটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ তাহা মানব সভ্যতার দুইটি দিক অলংকৃত করিয়াছে। কোন পথটা সত্য তাহা আজও বোধ হয় সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হয় নাই। একটি পথ শক্তির, আর একটি ভক্তির। এক পথের পথিক রাহুলা, কাংড়া, বিঘাওরা, আর এক পথের পথিক জোনাফুদ্দিন, ওরকী, ধবলেরা। কখনও রাহুলারা জিতিয়াছে কখনও জোনাফুদ্দিনেরা। কখনও মনে হইয়াছে পুরুষকারই সত্য, কখনও আবার আমরা দৈবকে সত্যরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেদিন গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল ওই অগণিত নক্ষত্রদলে ক্ষীণকণ্ঠ ধবলের প্রার্থনা কি দিশাহারা হইয়া পড়িবে না? মনে হইতেছিল ধবল বোধ হয় ভুল পথে আমাদের লইয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল শক্তিশালী বিঘাওই বোধ হয় চালক হিসাবে অধিকতর সক্ষম। তাহার ক্ষমতা আছে। বৃদ্ধা জিনার মৃত্যু সংবাদ সে পূর্বেই টের পাইয়াছিল। আজই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, সে অহংকৃতা নিনানির মস্তক তাহার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত চরণের উপর টানিয়া আনিয়াছে। অভিশাপ দিয়া গোধিকা সম্প্রদায়কে সে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। ক্ষমতাবান নেতারই তো প্রয়োজন আমাদের। আরও কিছুদিন পূর্বে যদি বিঘাও আসিত তাহা হইলে হয়তো আমাদের এত কষ্ট করিয়া কন্যা নদীর তীরে আসিতে হইত না। সে হয়তো মন্ত্রবলে সেই সব জমিকে আবার শস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত।

........আমি মাঠের মাঝখানে ঘন ফসলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শুইয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া যদিও নানারূপ অসংলগ্ন চিন্তার ধারা মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল কিন্তু একটি চিন্তা অনড় হইয়া মনের কেন্দ্রে বসিয়াছিল। ঠিক চিন্তা নয়, আকাঙ্ক্ষা। মার্জার যেমন মূষিকের গর্তের নিকট ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে আমিও তেমনি আমাদের ক্ষেত্রমধ্যস্থ গর্তটির পাশে ওৎ পাতিয়া শুইয়াছিলাম। প্রতিমুহূর্তে আশা করিতেছিলাম শিলাঙ্গী ওই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আমার সমস্ত অন্তর ওই নিকষ কৃষ্ণাঙ্গী অদ্ভুত নয়না উজ্জ্বল দৃষ্টি সরলা কিশোরীকে ঘিরিয়া যেন স্বপ্নলোকে আরতি করিতেছিল। গর্বিতা দৃপ্তদীপ্তা নিনানির মধ্যে নারীত্বের যে স্বাদ পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাও অপরূপ, তাহার মাদকতায় আমার সমস্ত সত্তা অভিভূত হইয়া পড়িত কিন্তু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল এরকমটি আর কখনও দেখি নাই। তাহার সরল সাহস, তাহার অকপট সত্যভাষণ, বন্য গাভীর মুখে সবুজ ঘাস তুলিয়া দিবার জন্য দুরূহ অভিযান, সর্বোপরি আমার সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য তাহাকে এমন একটা মহিমা দান করিয়াছিল যাহা আমি আর কখনও দেখি নাই। ইচ্ছা করিলে সে আমার পশু প্রবৃত্তিকে অনায়াসে উত্তেজিত করিতে পারিত কিন্তু সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই ছিল না। মনে হইতেছিল সে যেন তাহার আসন্ন যৌবন বিষয়ে সচেতন নয়। তাহার মুঞ্জরিত দেহশ্রীর সহিত বালিকাসুলভ একটা উৎসুক কৌতুকশীলতা যুক্ত হইয়া এমন একটা অনন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, আমার বন্য প্রকৃতি তাহাকে অধিকার করিবার জন্য অধীর উন্মুখ না হইয়া পারে নাই। আমার প্রকৃতির মধ্যেও একজন উৎসুক বালক বাস করিত। যে কারণে আমি সদ্যোজাত গোবৎসটি লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম ঠিক সেই কারণেই আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। আমার ক্রীড়াপ্রবণ চরিত্র তাহার মধ্যে একজন ক্রীড়াসঙ্গিনীকে আবিষ্কার করিয়াছিল, যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ নয়, পাশবিক ক্ষুধার তাড়নক মাত্র নয়, যাহার মন নিত্য নব ঔৎসুক্যে নিত্য নব উৎসাহভরে দৈনন্দিন জীবনের অতি-পরিচিত সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াই আনন্দলাভ করে।

......কন্যা নদীর পশ্চিম তীরে আমাদের তৃণক্ষেত্রটি উমগা পর্বতের পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরিসরে নিতান্ত কম ছিল না। একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাইত না। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে শিলাঙ্গীর গর্তটি খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শশক অথবা শজারুর গর্ত অনুসন্ধান করিতে আমরা

অভ্যস্ত ছিলাম, শিলাঙ্গীর গর্তের মুখ নিতান্ত ছোটও ছিল না, তবু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক সময় লাগিল, কারণ মুখটি তৃণাচ্ছাদিত ছিল, এক বোঝা সবুজ ঘাস দিয়া মুখটি কে যেন বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল যাহাতে সহসা দেখিলে মনে হয় উহা ক্ষেতেরই একটা অংশ। বোঝার তৃণগুচ্ছ কিন্তু জীবন্ত তৃণের মতো সতেজ ছিল না, তাহাদের ম্রিয়মান মূর্তি দেখিয়াই আমি সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর চাতুরী আমার নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়াতে খুবই কৌতুকবোধ করিয়াছিলাম, ইহাতে তাহাকে পাইবার আগ্রহটা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছিল।

......রাত্রি কত হইয়াছিল জানি না। অপেক্ষা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর স্পর্শেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল, "আমাকে ধরিবে বলিয়াই এখানে আসিয়া শুইয়াছ নিশ্চয়। কিন্তু আমি যদি চলিয়া যাইতাম তুমি জানিতেও পারিতে না। এই তো তোমাদের পাহারা দেওয়ার নমুনা—"

দেখিলাম শিলাঙ্গী কয়েকটি ছোট ছোট তৃণগুচ্ছ আলাদা আলাদা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার কোমরে একটা বড় লতা জড়ানো ছিল। সেই লতায় তৃণগুচ্ছগুলি সে পৃথক পৃথকভাবে বাঁধিতে লাগিল।

"অমন করিয়া বাঁধিতেছ কেন"

"বোঝা বড় হইয়া গেলে গর্তের ভিতর ঢোকে না। এইভাবে বেশ সহজে লইয়া যাওয়া যায়। লতাটা কোমরে বাঁধা থাকে, সুড়ঙ্গের ভিতর আমি যখন বুকে হাঁটিয়া চলি ঘাসের ছোট ছোট বোঝাগুলি আমার পিছনে পিছনে আসে। আজ দেখিলাম বাচ্চুরটাও একটু একটু ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জন্য কচি কচি ঘাস লইয়াছি কিছু। এই দেখ—!"

তিনটি ছোট ছোট ঘাসের বোঝা সে তুলিয়া ধরিল। এমন সহজ আনন্দে সে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল যেন সে আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে অপহরণ করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই। আমি যে তাহার শত্রুপক্ষ, ইচ্ছা করিলে এখনই যে আমি তাহাকে বন্দী করিতে পারি বা মারিয়া ফেলিতে পারি এসবের আভাসমাত্রও তাহার চোখের দৃষ্টিতে বা কণ্ঠস্বরে ছিল না। পরিচিত বন্ধুর নিকট সে যেন মনের আনন্দে গল্প করিয়া চলিয়াছিল। আমার কথায় সে কিন্তু বিস্মিত হইল। আমি বলিলাম—"এ ঘাস কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে দিব না।"

"কেন—"

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার বিস্মিত নয়নযুগল হইতে চন্দ্রালোকও যেন প্রতিফলিত হইয়া নীরব ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল—কেন?

"তুমিই বল না আমাদের ঘাস তোমাকে লইয়া যাইতে দিব কেন? এ ঘাস সাধারণ ঘাস নয়। ইহারা আপনাআপনি হয় নাই। ইহাদের উৎপন্ন করিতে আমাদের মেয়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহারা এই বিস্তৃত ভূমি খুঁড়িয়াছে—একবার নয়, বার বার খুঁড়িয়াছে—তাহার পর বীজ বুনিয়াছে। বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার জন্য উপবাস করিয়া পূজা করিয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে আমরা বেড়া দিয়া সমস্ত মাঠটা ঘিরিয়াছি, দিবারাত্রি পাহারা দিতেছি। সেই ঘাস তুমি আসিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড" আমার কথা শুনিয়া সে একটুও অপ্রতিভ হইল না। বরং তাহার কণ্ঠস্বরে একটা তর্কের সুর ফুটিয়া উঠিল।

"অদ্ভুত কাণ্ড তো তোমরাই করিয়াছ। কোথা হইতে আসিয়া আমাদের গরুদের জমিগুলিতে বেড়া ঘিরিয়া নিজেদের দখল জমাইয়া বসিয়াছ। তাহারা এখন খাইবে কি বল? তুমি কি বলিতে চাও আমার দুধুনী মধুনী না খাইয়া মারা যাইবে? এ জমি তাহাদের, এ জমির ঘাসও তাহাদের। তাহারাই জমির আদিম মালিক। তোমরা হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বলিয়া কি তাহাদের দাবী লোপ পাইবে?"

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম—"যাহার জোর বেশী তাহারই দাবী টিকিবে। গরুর দাবীর চেয়ে মানুষের দাবী যে অনেক বেশী একথা কি তুমি জান না?"

"জানিলেও মানিতে রাজী নই"—শিলাঙ্গী হাসিয়া উত্তর দিল। "তাছাড়া আর একটা কথাও তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, দাবীটা ঠিক গরুর নয়, দাবীটা মানুষেরই। ওই গরুর দলের পিছনে আমরা আছি। আজ তুমি যদি আমার ঘাস কাড়িয়া লও এবং সে কথা আমি যদি রোহাকে গিয়া বলি রোহা তোমাদের আসিয়া আক্রমণ করিবে, হয়তো তোমাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে। তোমাকে তো বলিয়াছি যে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমি গিয়া যদি আজ বলি—"

"মনে কর তোমাকেই যদি যাইতে না দিই—"

"আমাকে ধরিয়া রাখিবে? বেশ তো"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি আগ্রহে আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল। বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত প্রাণশক্তিই যেন উন্মুখ একাগ্র হইয়া উঠিল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। শিলাঙ্গী একটুও ভয় পাইল না। আমার আশা ছিল ভয় পাইলে সে হয়তো আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। শিলাঙ্গীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া আমার এত ভালো লাগিল যে, আমি আর কোনও কথা বলিতে পারিলাম না; মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম কেবল।

শিলাঙ্গী বলিল—"বেশ চল, তোমাদের দলপতির সহিত আলাপ করিয়া ফেলি। এখন ফিরিয়া যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। চল তোমাদের কাছেই রাতটা কাটাইয়া যাই।"

"ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় কেন?"

"একটু আগেই যে ভীষণ শব্দ হইল তাহা শুনিতে পাও নাই?"

"না। কিসের শব্দ?"

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল।

"বাঘের গর্জনেও তোমার ঘুম ভাঙে নাই! সমস্ত পাহাড়টা কাঁপিয়া উঠিল আর তুমি ঘুমাইতেছিলে! চল, তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি যে, তোমার মতো নিদালু লোক যদি ক্ষেত পাহারা দেয় তাহা হইলে ক্ষেতের ফসল একটিও থাকিবে না। আমরাই আসিয়া সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইব।"

আমি মনে মনে সত্যই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু বলিলাম—"আজ আমার পাহারা দেওয়ার পালা নয় তাই আমি ঘুমাইতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম তোমাকে ধরিব বলিয়া।"

"কিন্তু আমি তোমাকে না জাগাইলে কি আমাকে ধরিতে পারিতে?"

"আমি জানিতাম, তুমি আমাকে জাগাইবে।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"এ খবর তোমার চোখের দৃষ্টিতে কাল দেখিয়াছিলাম।"

"সত্য না কি!"

তাহার বিস্ফারিত নয়নে সরল বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি ধরিয়া অসীম আনন্দ সহকারে সে বলিল, "তুমি ঠিক ধরিয়াছ কিন্তু। তোমাকে আমার এত ভালো লাগিয়াছে যে, আজ বাহির হইবার পূর্বেই আমি মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে, যেমন করিয়া হোক তোমার সহিত আমি দেখা করিবই। তোমাকে যদি এখানে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো তোমাদের পল্লীতে গিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতাম। একথা আমার চোখ দেখিয়াই তুমি কাল বুঝিতে পারিয়াছিলে?"

"না পারিলে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতাম না। আমি ইহাও আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, আমাকে এখানে না পাইলে তুমি হয়তো পল্লীর ভিতরে যাইবে। তাই এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম।"

"তোমাদের পল্লীর ভিতরে গেলে ক্ষতি কি? তোমাদের দলপতি কি লোক ভাল নয়?"

"ধবল লোক ভাল, কিন্তু দলপতি ছাড়াও আরও নানা ধরণের লোক আছে তো! কাহার মাথায় কি কুমৎলব জাগিবে কে বলিতে পারে। তোমার এমন রূপ, আমাদের দলে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যাও কম নয়, কেহ হয়তো তোমাকে দখল করিয়া বসিবে।"

"ইস আমাকে দখল করা অত সহজ নয়। আমি বাঘকে পর্যন্ত ভয় করি না। এখনই তো বাঘের ঠিক পাশ দিয়ে চলিয়া আসিলাম, বাঘ আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এমন আরও অনেকবার ঘটিয়াছে।"

"এখন তুমি বাঘের পাশ দিয়া আসিয়াছ? বল কি! কোথায় বাঘ—"

"উলগা পাহাড়ের উপত্যকায়। এই সুড়ঙ্গের অপর মুখটা যেখানে আছে ঠিক তাহার পাশেই একটা বাঘ হরিণ মারিয়াছে। আমি যখন উপত্যকার ঠিক মাঝখানে তখন চাঁদও ঠিক পাহাড়ের মাথায়। জ্যোৎস্নায় সমস্ত উপত্যকাটা ভরিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিলাম, সুড়ঙ্গের কাছে একদল হরিণ চরিতেছে। আমি গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক দিন হইতেই আমার একটি হরিণ শাবক পুষিবার ইচ্ছা আছে। ভাবিলাম যদি উহাদের দলে হরিণ শাবক থাকে তাড়া করিব। কচি শিশু নিশ্চয়ই আমার সহিত ছুটিয়া পাল্লা দিতে পারিবে না। ঠিক ধরিয়া ফেলিব। প্রায় যখন উহাদের কাছাকাছি আসিয়াছি তখন একটা গাছের উপর হইতে বাঘটা উহাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল এবং একটা হরিণকে ঘায়েল করিল। তাহার পর হরিণটাকে টানিতে টানিতে সুড়ঙ্গের ধারে আনিয়া ভীষণ গর্জন করিল একটা। তুমি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাইতেছিলে তাই গর্জনটা শুনিতে পাও নাই। গর্জন করিয়া সেই-খানেই বসিয়া পড়িল বাঘটা, বসিয়া হরিণের রক্তপান করিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘ কিছুতে ওঠে না। আমি দেখিলাম দাঁড়াইয়া থাকিলে সময় মতো এখানে পৌঁছিতে পারিব না, সকাল হইয়া যাইবে। তখন আমি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাঘের কাছাকাছি যখন আসিয়াছি তখন বাঘটা ঘাড় তুলিয়া আমার দিকে একবার তাকাইল, আমিও তাহার চোখে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাঘটা আবার আহারে মনো-নিবেশ করিল। আমি ঠিক তাহার পাশ দিয়া আসিয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম। আরও কয়েকবার বাঘের সামনে পড়িয়াছি। দেখিয়াছি তাহাদের ভয় না করিলে তাহারা কিছু বলে না।"

বলিতে বলিতে গর্বে তাহার চক্ষু দুইটি যেন আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মানুষ কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। বাঘকে বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করিও না।"

"নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস করিয়া দুই একবার ঠকিয়াছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতককে শাস্তি দিতেও ছাড়ি নাই।"

তাহার কালো চোখের তারায় প্রতিফলিত জ্যোৎস্নালোক যেন কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

"শাস্তি দিবার শক্তি তোমার আছে? তোমাকে দেখিয়া সে কথা কিন্তু মনে হয় না। ধর, আমি যদি এখন তোমাকে আক্রমণ করি তুমি কি করিবে?"

বহু জন্ম পূর্বে জোলমাকেও ঠিক এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। জোলমা সমুচিত উত্তরও দিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আর সে উত্তর বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া গিয়াছিল। সেই পুরাতন আমি যে নূতন মঞ্চে পুরাতন নাটকেরই নব-রূপ দান করিতেছি তাহা মনে ছিল না। তন্বী শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল উহার গায়ে আর কত শক্তি থাকিতে পারে? হাতটা যদি সজোরে চাপিয়া ধরি, ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না।

"করিয়াই দেখ না।"

মৃদু হাসিয়া শিলাঙ্গী উত্তর দিল।

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিলাম। পর মুহূর্তে কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শিলাঙ্গী ছিটকাইয়া সরিয়া গেল এবং পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটা ফাঁস আমার গলদেশে লাগিয়া আমার শ্বাসরোধ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

একটী পথের কাহিনী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এ-পথের বাঁকে দাঁড়ালে কখনো একদিন যেত শোনাঃ
একটি নদীর মন-কেড়ে নেয়া সুর,
মনে হতো বাজে সেতারের মতো। তবু কেউ জানতো না
নদী-র মোহানা অনেক—অনেক দূর।

আমাদের মন দিশারী-র মতো অবিরত তাই খুঁজে
ক্লান্ত হ'তো না। সারাদিন আসা-যাওয়া
এক পথ ধ'রে, বিনা কারণের অজস্র কথা কওয়া......
তারপর এক ছায়াসন্ধ্যায় দুচোখ এসেছে বুজেঃ
অনেক দূরের নদীর হৃদয় পাওয়া
ঘটেনি সহজে, অবুঝ শুনেছি সেতারের মতো বাজে
মহুয়াবনের হাওয়া।
নদীর মোহানা মেলেনি। ফিরেছি আবার পথের বাঁকে,
আর শুনিনি-তো সে-একদিনের গান;
তাই কতোবার দাঁড়িয়ে এখানে খুঁজেছি যদি-বা তাকে
মধুর সে সুরঃ স্বপ্নের সিঁড়ি ক'রে গেছি নির্মাণ।

আজ মনে হ'লো—এ-পথের বাঁকে সে-গান যাবে না শোনা
মহুয়াবনের হাওয়ায় যদি-ও কেঁপে কেঁপে ওঠে প্রাণ—
এক সন্ধ্যায় তবু ছিঁড়ে গেছে আমাদের জালবোনা,
পথের আলো-ও নিভে গেছে, আর কোনোদিন জ্বালবো না॥

অনুবাদ সাহিত্য

সেদিন সাঁঝে সূর্য্য নামে পাটে

উইলিয়াম ফক্নার

সোমবারটা এখন জেফার্সনের কাছে সপ্তাহের অন্যদিনের চেয়ে তফাৎ নয়। রাস্তা এখন মুড়ে দেওয়া, টেলিফোন আর ইলেকট্রিক কোম্পানীরা আরো বেশী করে গাছ কাটছে—ওক্, মেপল্ আর এমস্—চিমড়ে-পড়া কদাকার ডুমোডুমো আঙুরের থোকা ঝোলানো লোহার থামগুলোকে জায়গা করে দেবার জন্যে—আর আমাদের এক শহুরে ধোপা আছে সোমবার করে খেপ নিতে বের হয়, কাপড়ের পোঁটলাগুলোকে বিশেষভাবে তৈরী চড়া-রঙের একখানা মোটরে জড়ো করে যায়ঃ সারা সপ্তাহের বাসি কাপড়গুলো সতর্ক, বিরক্তিকর ইলেকট্রিক হর্নের পিছনে ভূতের-মতো চলতে থাকে, রবার আর এস্ফাল্টে সিল্ক ছেঁড়ার মতো ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া শব্দ ক'রতে ক'রতে এবং নিগ্রো মেয়েরাও যারা পুরানো রীতি অনুসারে এখনো সাদা আদ্মীদের পোষাক ধোলাই করে, তারা মোটরে এনে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু পনেরো বছর আগে, সোমবার সকালে শান্ত, ধুলোটে, ছায়াঘন রাস্তা নিগ্রো স্ত্রীলোকে ভর্তি থাকতো, পাকুড় বাঁধা অনড় মাথার ওপরে চাদরে জড়ানো কাপড়ের পোঁটলা, তুলোর গাঁটের মতো প্রকাণ্ড, হাতে না ধরে সাদা বাড়ির রান্নাঘরের দরজা থেকে নিগ্রো হলের দরজার ধারের ভাটি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতো।

ন্যান্সী তার পোঁটলাটা মাথার ওপরে রেখে, তারপর সেই পোঁটলার ওপরে রাখতো খড়ের কালো নাবিক-টুপীটা যেটা ও পরতো শীতে গ্রীষ্মে। ন্যান্সী ঢ্যাঙা, উঁচনো নির্বর্ণ মুখ সামান্য একটু তোবড়ানো যেখানে দাঁতের পাত্তা নেই। কখনো কখনো আমরা গলি ধরে মাঠ পার হয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতুম, মাথার ওপরে ব্যালান্স করে রাখা পোঁটলা আর টুপীটা একেবারেই নড়ে-চড়ে না, এমন কি নালাতে নেমে ফের ওঠবার সময় বা বেড়া পার হবার জন্যে ঝুঁকে পড়ার সময়েও নয়। হাত আর হাঁটুর ওপরে ভর করে হামাগুড়ি দেবে, মাথাটা খাড়া, শক্ত পোঁটলাটা পাথরের বা বেলুনের মতো অনড়, তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে থাকবে।

কখনো বা ধোপানীদের স্বামীরাও কাপড় নিয়ে বা দিয়ে আসতো, কিন্তু ন্যান্সীর হয়ে জুবা কোনদিন তা করতো না, বাবা ওকে আমাদের বাড়িতে আসা বারণ করে দেবার আগেও নয়, এমন কি ডিলসে অসুখে পড়ায় ন্যান্সী আমাদের রান্না করে দিতে এলেও নয়।

তারপর প্রায় অর্ধেক সময় গলি ধরে ন্যান্সীর বাড়িতে গিয়ে ওকে সকালের জলখাবার খেতে আসার জন্যে ডাকতে যেতে হতো। আমরা গিয়ে থামতুম নালাটার ধারে, কারণ বাবা বলে দিয়েছিলেন জুবার সঙ্গে যেন মোটেই না মিশি—বেঁটে কালো লোকটা, মুখের নীচে ক্ষুরে কাটা দাগ। আমরা গিয়ে ন্যান্সীর বাড়ির দিকে ঢিল ছুঁড়তুম, যতক্ষণ না সে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াতো, কাপড়ের পোঁটলাবিহীন মাথাটা দরজার গায়ে হেলিয়ে দিয়ে।

"মতলব কি, বাড়িটা ঢিলচ্ছো যে বড়ো?" ন্যান্সী বলে, "ক্ষুদে ডাকাতদের মতলব কি বলো তো?"

"বাবা বললেন, তোমাকে জলখাবার খেয়ে যেতে," ক্যাডী বললে। "বাবা বললেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেলো, তোমাকে এক্ষুনি আসতে হবে।"

"জলখাবারের পাট আমি করবো না," ন্যান্সী বলে, "আমি চললুম ঘুমতে।"

"নিশ্চয় তুমি মাতাল হয়েছো," জ্যাসন বলে, "বাবা বললেন তুমি মাতাল হয়েছো। ন্যান্সী তুমি মাতাল?"

"কে বলে আমি মাতাল?" ন্যান্সী বলে ওঠে, "আমাকে ঘুম যেতেই হবে। জলখাবারের পাট আর করছি না।"

কাজেই খানিক পরে বাড়িটার দিকে ইঁট ছুঁড়ে আমরা ফিরে গেলুম। শেষে ও যখন এলো, আমার তখন ইস্কুলের দেরী হয়ে গেছে। সেদিন পর্যন্ত আমরা হুইস্কী বলেই জানতুম, যেদিন ওকে আবার গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাবার পথে মিঃ স্টোভালের পাশ দিয়ে যেতে হলো। মিঃ স্টোভাল হলেন ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী আর ব্যাপ্টিস্ট গীর্জের ডিকন্, আর ন্যান্সী বলতে লাগলোঃ

"এই সাদা আদ্মী, আমার টাকা কখন দিচ্ছো? কখন আমার টাকা দেবে সাদা আদ্মী? একটা কাণাকড়ি দিয়েছো তো তিন খেপ হলো—" বলতে লাগলো যে পর্যন্ত না মিঃ স্টোভাল ওর মুখে লাথি মারতে লাগলো, আর দারোগা মিঃ স্টোভালকে ধরে ফেললে, আর ন্যান্সী রাস্তায় পড়ে হাসতে লাগলো। মাথাটা ঘুরিয়ে ও থুঃ করে খানিকটা রক্ত আর দাঁত ফেলে বললে, "ও আমাকে একটা কাণা-কড়ি দিয়েছে আজ তিন খেপ হয়ে গেলো।"

ওই করেই ও দাঁত খোয়ালো, আর সারাদিন ধরে সবাই ন্যান্সী আর মিঃ স্টোভালের কথা বলাবলি করতে লাগলো, আর সে রাতে যে কেউ গারদের পাশ দিয়ে গিয়েছে, সেই শুনেছে ন্যান্সীকে গাইতে আর চেঁচাতে। তারা ওকে জানলার গরাদ ধরে থাকতে দেখেছে, আর ওদের অনেকে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে শুনেছে, ওকে আর ওকে চুপ করানোর জন্যে জেলারের চেষ্টা। চুপ ও করে নি দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত, যখন জেলার ওপরে ধুপধাপ শব্দ শুনতে পায় এবং ওপরে গিয়ে দেখে ন্যান্সী জানলার গরাদ ধরে ঝুলে রয়েছে। জেলার বললে হুইস্কী নয়, কোকেন; কারণ কোকেনে চুর না হলে কোন নিগার আত্মহত্যা করে না, যেহেতু কোন নিগার কোকেনে চুর হলে সে আর নিগার থাকে না।

জেলার বাঁধন কেটে নামিয়ে ওকে জাগিয়ে তুললে, তারপর ওকে প্রহার লাগালে, ঠেঙালে। ন্যান্সী তার পোষাক বেঁধে নিজেকে ঝুলিয়ে ছিলো। ফন্দীটা ফেঁদেছিলো ঠিকই, কিন্তু ওরা যখন ওকে গ্রেপ্তার করে তখন গায়ের পোষাক ছাড়া ওর আর কিছু ছিলো না, কাজেই হাত বাঁধবার ওর আর কিছু জোটে নি এবং তাই জানলার কার্নিস থেকে হাত ছেড়ে দিতে পারে নি। জেলার তাই শব্দ শুনে ওপরে গিয়ে দেখে ন্যান্সী জানলা থেকে ঝুলছে, সটান উলঙ্গ।

যখন ডিলসে অসুখে তার ঘরে পড়ে এবং ন্যান্সী আমাদের রান্না ক'রে দিচ্ছে, আমরা ওর এপ্রনটা ফোলা দেখলুম; সেটা হলো জুবাকে বাবা আমাদের বাড়িতে আসা বারণ করার আগে। জুবা তখন রান্নাঘরে উনুনের পিছনে বসে, ময়লা সুতোর মতো ক্ষুরে কাটা দাগ-ওয়ালা ওর কালো মুখ নিয়ে। ও বললে ন্যান্সীর জামার নীচে তরমুজ রয়েছে। আর এদিকে তখন শীতকাল।

"শীতকালে তুমি তরমুজ পেলে কোত্থেকে?" ক্যাডী বললে।

"আমি নয়;" জুবা বললে। "আমি ওকে এনে দিই নি। তবে আমি ওটা কাটতে পারি, নিজের মতো করে।"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার ওকি কথার ছিরি?" ন্যান্সী বললে। "নিজের কাজে যাও দিকি। চাও বুঝি যে রান্নাঘরে এসে

ঘুরে ঘুরে করছো, আর ছেলেদের সঙ্গে ঐরকম কথা বলছো সেটা মিঃ জ্যাসন এসে দেখুক।"

"কি আবার কথার রকম, ন্যান্সী?" ক্যাডী বললে।

"সাদা আদমীর রান্নাঘরে ঘুরে ঘুরে আমি করি না।" জুবা জবাব দেয়। "কিন্তু সাদা আদমীরাই আমার ওখেনে ঘোরে। সাদা আদমী আমার বাড়িতে আসবে, কিন্তু আমি বারণ করতে পারবো না। সাদা আদমী যখন আমার বাড়িতে আসতে চাইবে, তখন সেটা আর আমার বাড়ি থাকবে না। আমি তাকে রুখতে পারবো না, কিন্তু আমাকে সে লাথিয়ে তাড়াতে পারে না। না সে তা পারবে না।"

ডিলসে তখনও অসুখে পড়ে আছে তার ঘরে। বাবা জুবাকে বলে দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে যেন সে না আসে। ডিলসের তখনও অসুখ। অনেকদিন হয়ে গিয়েছে। খাবার পর আমরা লাইব্রেরীতে রইছি।

"ন্যান্সীর কি এখনো হয় নি," মা বললেন। "ডিসগুলো ধুচ্ছে তো অনেকক্ষণ হলো।"

"কোয়েণ্টিন গিয়ে দেখে আসুক না," বাবা বললেন। "যাও কোয়েণ্টিন, গিয়ে দেখে এসো তো ন্যান্সীর হলো কি না। বলে দাও বাড়ি যেতে পারে।"

গেলুম রান্নাঘরে। ন্যান্সীর হয়ে গেছে। ডিসগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। ন্যান্সী একটা চেয়ারে বসে আছে, নিভানো উনুনটার গায়েই। আমার দিকে ও চাইলে।

"মা জানতে চাইলে তোমার হয়েছে কি না," আমি বললুম।

"হ্যাঁ," বলে ন্যান্সী আমার দিকে চাইলে। "কাজ আমার শেষ হয়েছে।" আমার দিকে চেয়ে রইলো।

"ও কী?" আমি বলে উঠলুম। ও কী?"

"আমি আর কি, একটা নিগার বৈ তো নয়," ন্যান্সী বললে। "কিন্তু এতে আমার দোষ নেই।"

আমার দিকে ও চাইলে, নিভানো উনুনের পাশে চেয়ারে বসে, মাথায় সেই নাবিক-টুপী। আমি লাইব্রেরীতে ফিরে গেলুম। সেই ঠাণ্ডা উনুনে আর সব, যখন মনে হয় গরম, কর্মব্যস্ত, মুখরিত রান্নাঘর। ঠাণ্ডা উনুন আর সরিয়ে রাখা ডিস, আর তখন কেউ খেতে চাইছে না।

"ওর হয়ে গেছে?" মা জিগ্যেস করলেন।

"হ্যা মা," বললুম।

"কি করছে ও?" মা বললেন।

"কিছু করছে না, ওর কাজ শেষ।"

"আচ্ছা আমি গিয়ে দেখছি," বাবা বললেন।

"বোধ হয় বাড়ি নিয়ে যাবে বলে জুবার জন্যে অপেক্ষা করছে।" ক্যাডী বললে।

"জুবা চলে গেছে," আমি বললুম। ন্যান্সী আমাদের বলেছিলো একদিন সকালে উঠে ও দেখে জুবা চলে গেছে।

"আমায় ও ছেড়ে গেছে," ন্যান্সী বলেছিলো। "মেক্সিকোয় সরে পড়েছে, আমার মনে হয়। শহরের পুলিসদের ফাঁকি দিয়ে, আমার মনে হয়।"

"ভালো আপদ গেছে," বাবা বললেন, "ওখেনেই যেন ও থাকে।"

"ন্যান্সী অন্ধকারে বড়ো ভয় খায়," জ্যাসন বললে।

"তুমিও তো," ক্যাডী বলে।

"কক্ষনো না," জ্যাসন জবাব দেয়।

"ভাগ্, ভীতু বিড়াল," ক্যাডী উত্তর দেয়।

"কিছুতেই আমি নয়," জ্যাসন বলে।

"এই, ক্যান্ডেস্," মা ধমক দেন। বাবা ফিরে এলেন।

"আমি গলি পর্যন্ত ন্যান্সীর সঙ্গে যাচ্ছি।" তিনি বললেন। "ও বলছে, জুবা ফিরে এসেছে।"

"ও কি দেখেছে তাকে?" মা জিগ্যেস করলেন।

"না। কজন নিগ্রো ওকে বলে পাঠিয়েছে যে, সে শহরে ফিরেছে। আমার বেশী দেরী হবে না।"

"ন্যান্সীকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমাকে তুমি একলা ফেলে যাবে?" মা বলে উঠলেন। "আমার চেয়ে ওর নিরাপত্তাটাই বেশী দামী হলো তোমার কাছে?"

"বিশেষ দেরী আমার হবে না।" বাবা বললেন।

"নিগ্রোটা ঘুরছে আর তুমি এই বাচ্চাগুলোকে এমনি ফেলে যাবে?"

"আমিও যাচ্ছি," ক্যাডী বললে। "আমি যাবো বাবা।"

"সে আর এদের কি করবে, দুর্ভাগ্যবশত যদি এদের পায়।" বাবা বললেন।

"আমিও যাবো," জ্যাসন বললে।

"জ্যাসন!" মা ধমক দিলেন। তিনি বলছিলেন বাবাকে। তার কথার ধরণেই বলে দেওয়া যায়। তার যেন বিশ্বাস যে, তিনি যা মোটেই পছন্দ করেন না, বাবা যেন সারাদিন ধরে তেমন একটা কিছু করারই চিন্তা করে গিয়েছেন এবং তিনি সব সময়েই জানতেন যে, খানিক পরে বাবা আবার তাই ভাবতে থাকবেন। আমি চুপ করে ছিলুম, কারণ বাবা এবং আমি দুজনেই জানতুম যে, মা তার কাছে আমাকে রেখে যাবার জন্যে বাবাকে বলবেন, মার যদি সময়ে কথাটা মনে পড়ে। বাবা তাই আমার দিকে চাইলেন না। আমিই সবচেয়ে বড়ো। আমি ন'বছরের আর ক্যাডী হলো সাত আর জ্যাসন পাঁচ।

"যতো সব বাজে!" বাবা বললেন, "আমাদের বেশী দেরী হবে না।"

ন্যান্সীর টুপী পরাই ছিলো। আমরা গলিতে এসে পড়লুম। "জুবা আমার সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করতো," ন্যান্সী বললে। "ওর দুটো ডলার থাকলেই, একটা হতো আমার।" গলি ধরে আমরা চলতে লাগলুম। "গলিটা পার হতে পারলেই," ন্যান্সী বললে, "তারপরেই ঠিক যেতে পারবো।"

গলিটা সব সময়েই অন্ধকার। "এইখেনেই তো জ্যাসন হ্যালোইনের ভয় খেয়েছিলো," ক্যাডী বললে।

"না, আমি ভয় খাই নি," জ্যাসন বললে।

"র‍্যাচেল মাসী কিছু করতে পারে না ওকে?" বাবা বললেন, র‍্যাচেল মাসী বুড়ো। ন্যান্সীর ঘরের পিছনে উনি থাকেন, একাই। তার ছিলো সাদা চুল, আর সকাল বসে পাইপ টানতেন, সারাদিন ধরে; তার কোন কাজ করতেন না তিনি। লোকে বলে তিনি জুবার মা। তিনিও কখনো বলতেন ও তাই, আবার কখনও বা বলতেন জুবার তিনি কেউই হন না।

"হ্যাঁ তোমার ভয় হয়েছিলো," ক্যাডী বললে। "ফ্রনীর চেয়েও তুমি ভয় পেয়েছিলে। এমন কি টি-পির চেয়েও ভয় পেয়েছিলে। নিগারদের চেয়েও।"

"ওকে কেউ কিছু করতে পারে না," ন্যান্সী বললে। "ও বলে আমি ওর ভেতরে শয়তানকে জাগিয়ে দিয়েছি, আর কেউ তাকে থামাতে পারবে না।"

"যাক, এখন তো ও চলে গেছে," বাবা বললেন। "এখন আর তোমার তো ভয় করার কিছু নেই, খালি যদি সাদা আদমীদের তুমি ছেড়ে কথা কও।"

"সাদা আদমীকে ছেড়ে কথা বলবে?" ক্যাডী বললে। "কি করে ছেড়ে দেবে?"

"ও যায়নি কোথাও," ন্যান্সী বললে। "আমি ওর সাড়া পাই। এখন, এই গলিতে ওর সাড়া পাচ্ছি। ও আমাদের কথা শুনছে, প্রত্যেকটি কথা, কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে দেখিনি, আর আমি ওকে দেখতেও চাই না কোনদিন কেবল একবার ছাড়া, ওই ক্ষুরখানা নিয়ে। ওর পিঠে সুতোয় বাঁধা ঐ ক্ষুরখানা, সার্টের ভেতরে। তারপর আর অবাক হবো না।"

"না আমি ভয় পাইনি," জ্যাসন বললে।

"ঠিকভাবে চললে, এই পাড়া থেকে বেঁচে যেতে," বাবা বললেন। "কিন্তু এখন সব ঠিক আছে। এখন বোধহয় ও সেণ্টলুইতে। হয়তো আর একটা বিয়ে করেছে, তোমাকে ভুলে গেছে।"

"তাই যদি করে থাকে, তাহলে ওর আর খোঁজ করে দরকার নেই," ন্যান্সী জবাব দিলে। "আমি ওখেনে দাঁড়িয়ে থাকবো আর যেই ও

বৌয়ের গায়ে হাত দেবে, দেবো সেই হাতখানা কেটে। ওর মুণ্ডু কাটবো, ওর বৌয়ের পেট ফাঁসাবো, আর ওর—

"চুপ চুপ," বাবা বললেন।

"কার পেট ফাঁসাবে, ন্যান্সী?" ক্যাডী প্রশ্ন করলে।

"আমি মোটেই ভয় পাইনি," জ্যাশন আবার বললে। "আমি একাই গলিটা দিয়ে যেতে পারি।"

"তাই বটে!" ক্যাডী বলে উঠলো। "আমরা সঙ্গে না থাকলে এদিকে পা বাড়াতে সাহসই হতো কি-না!"

ডিলসের তখনও অসুখ, আর তাই আমরা প্রতি রাত্রে ন্যান্সীকে বাড়ি পৌঁছে দিই—যদ্দিন না মা বললেন, "এই পৌঁছে দেওয়া আরও কদ্দিন চলবে বলো তো? এতো বড়ো বাড়িটায় আমি থাকবো একলা আর তোমরা যাবে একটা ভীতু নিগ্রোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে?"

ন্যান্সীর জন্যে রান্নাঘরে আমরা একটা মাদুর ঠিক করে দিয়েছিলুম। একদিন রাত্রে আমরা জেগে উঠলুম, একটা শব্দ শুনে। সেটা গানও নয়, কান্নাও নয়, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসছে। মার ঘরে আলো রয়েছে আর বাবাকে নেমে যেতে শুনলুম দালান ধরে, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে, আর আমি আর ক্যাডী গেলুম দালানে। মেঝেটা ঠাণ্ডা। মেঝে থেকে আমাদের পা কুঁকড়ে যেতে লাগলো যখন শব্দটা আমরা শুনছিলুম। গানের মতনও, আবার গানের মতো নয়ও, নিগ্রোরা যেরকম শব্দ করে।

তারপর শব্দ থামলো এবং বাবা পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন শুনলুম, আর আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সিঁড়ির মাথায়। তখন আবার শব্দটা আরম্ভ হলো, সিঁড়িতেই, খুব জোরে নয়, আর আমরা দেখতে পেলুম ন্যান্সীর চোখদুটো, মাঝ সিঁড়িতে, দেয়াল ঘেঁষে। বিড়ালের চোখের মতো দেখতে, দেয়াল ঘেঁষে মস্ত এক বিড়াল, আমাদের লক্ষ্য করছে। সিঁড়ি বেয়ে ও যেখেনে ছিলো সেই পর্যন্ত নেমে আসতেই ও আবার শব্দটা বন্ধ করলে, এবং আমরা ওখেনে দাঁড়িয়ে রইলুম বাবা যতক্ষণ না রান্নাঘর থেকে ফিরে এলেন, হাতে পিস্তলটা নিয়ে। তিনি ন্যান্সীকে নিয়ে গেলেন এবং তারপর তারা ফিরলেন ন্যান্সীর মাদুরখানা নিয়ে।

আমাদের ঘরে মাদুরখানা বিছানো হলো। মার ঘরের আলোটা নিভে যেতে আমরা আবার ন্যান্সীর চোখ দেখতে পেলুম। "ন্যান্সী," ফিস্‌ফিস্ করে ক্যাডী ডাকলে, "ন্যান্সী, ঘুমিয়েছো?"

ন্যান্সী কি একটা বললে ফিস্‌ফিস্ করে। সেটা হ্যাঁ কি না, বুঝলুম না কিছু। যেনো কেউ বলেনি, যেনো কোথাও থেকে শব্দটা আসেনি কোথাও যায়নি, যেনো ন্যান্সী ওখেনেই নেই। সিঁড়িতে ওর চোখের দিকে এমনি কটমট করে চেয়েছি যেনো ওর চোখ আমার চোখের পাতায় ছাপা হয়ে গিয়েছে, সূর্যের দিকে চেয়ে চোখ বন্ধ করে সূর্য না থাকতেও যেমন হয়। ন্যান্সী ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো, "যীশু! যীশু!"

"জুবা, না?" ক্যাডী ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে। "ও বুঝি রান্নাঘরে আসার চেষ্টা করছিলো?"

"যীশু" ন্যান্সী শুধু বললে। বললে এইভাবেঃ যী-ই-ই-ই-ই-ই-শু, যেমন দেশলায়ের বা মোমবাতির শব্দ আস্তে নিভে যায়।

"আমাদের দেখতে পাচ্ছো, ন্যান্সী?" ক্যাডী আবার প্রশ্ন করে। "আমাদের চোখও দেখতে পাচ্ছো?"

"আমি আর কি, নিগার বই তো নয়," ন্যান্সী বললে। "ভগবান জানেন। ভগবান জানেন।"

"নীচে রান্নাঘরে কি দেখেছিলে বলতো?" ক্যাডী আবার ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো। "ভিতরে কি ঢুকতে চাইছিলো?"

"ভগবান জানেন," ন্যান্সী জবাব দেয়। আমরা ওর চোখ দেখতে পাচ্ছিলুম। "ভগবান জানেন।"

ডিলসে ভালো হয়ে উঠলো। আমাদের ডিনার রাঁধলে। বাবা বললেন, "তুমি বরং আরও দু-একদিন বিছানায় থাকো।"

"কিসের জন্যে?" ডিলসে প্রশ্ন করে। "আর একদিন দেরী হলে, এ জায়গার আর হাল থাকবে না কিছু। যাও, এখন যাও দিকি, রান্নাঘরটা ঠিক করে নিতে দাও তো।"

ডিলসে সাপারও রাঁধলে। আর সেই রাত্রে অন্ধকার হবার আগেই ন্যান্সী রান্নাঘরে এলো।

"কি করে জানলে ও ফিরে এসেছে?" ডিলসে প্রশ্ন করে। "তুমি তো দেখোনি ওকে।"

"জুবাটা হচ্ছে যাকে বলে নিগার," জ্যাসন বলে ওঠে।

"আমি ওর সাড়া পাচ্ছি," ন্যান্সী বলে। নালাটার ওপাশে ও শুয়ে আছে আমি সাড়া পাচ্ছি।

"এই রাত্তিরে?" ডিলসে প্রশ্ন করে।" ও কি এই রাতে ওখেনে আছে নাকি?

"ডিলসেটাও নিগার," জ্যাসন বলে ওঠে।

"নাও কিছু খাও দিকি," ডিলসে বলে।

"না, আমার কিছু চাই না," ন্যান্সী বলে।

"আমি তো আর নিগার নই," জ্যাসন বলে।

"একটু কফি খাও," ডিলসে বলে। ন্যান্সীর জন্যেও এক কাপ কফি ঢাললে। "তুমি জানো, এই রাত্তিরে বাইরে ওখেনে ও আছে? জানলে কি করে যে আজ রাতেই?"

"আমি জানি," ন্যান্সী উত্তর দেয়। "ওখেনে ও রয়েছে, অপেক্ষা করছে, আমি জানি। ওর সঙ্গে বহুদিন ধরে থেকেছি। ওর মনে কি আছে আমি তা ধরতে পারি।"

"আমি তো আর নিগার নই," জ্যাশন বলে। "তুমি নিগার, ন্যান্সী?"

"আমি এসেছি নরক থেকে," ন্যান্সী বলে ওঠে। "শীগ্গির আর আমি থাকবোও না। যেখেন থেকে এসেছি সেখেনেই যাবো এবার।"

কফিটা ও খেতে লাগলো। খেতে খেতে দু হাতে কাপটাকে ধরে আবার সেই রকম শব্দ করতে লাগলো। শব্দ করতে লাগলো কাপের ভেতরে, আর কফি ছলকে পড়লো ওর হাতের ওপরে, জামার ওপরে। ওর চোখ পড়লো আমাদের দিকে আর ও বসে রইলো ওখেনেই, হাঁটুর ওপরে কনুই রেখে, দু হাতে কাপটাকে ধরে, ভিজে কাপটার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো, কোন শব্দ না করে।

"ন্যান্সীর দিকে দেখো," জ্যাশন বললে, "ন্যান্সী আর আমাদের জন্যে রাঁধতে পারে না। ডিলসে এখন ভালো হয়ে উঠেছে।"

"তুমি চুপ করতো," ডিলসে বলে উঠলো। ন্যান্সী দু হাতে কাপটা ধরে আছে, আমাদের দিকে দেখছে, সেই রকম শব্দ করছে, যেনো দুজন রয়েছে ঃ একজন আমাদের দিকে চেয়ে, আর একজন শব্দ করছে। "মিঃ জ্যাশনকে দিয়ে দারোগার কাছে টেলিফোন করাচ্ছো না কেন?" ডিলসে বলে ওঠে। ন্যান্সী তারপর থামলো, ওর লম্বা তামাটে হাতে কাপটাকে ধরে নিয়ে। খানিকটা কফি খাবার আবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আবার তা কাপ থেকে ছলকে পড়লো, তার হাতের ওপরে আর জামার ওপরে আর সে কাপটা নামিয়ে রাখলে। জ্যাসন ওকে দেখতে লাগলো।

"আমি গিলতে পারছি না," ন্যান্সী বললে। "গিলছি কিন্তু কিছুতেই নীচে নামছে না।"

"তুমি নীচে ঘরে যাও," ডিলসে বললে। "ফ্রনী তোমার মাদুর বিছিয়ে দেবেখন আর আমিও যাচ্ছি একটু পরেই।

"কোন নিগারই ওকে রুখতে পারবে না," ন্যান্সী বলে ওঠে।

"আমি তো নিগার নই," জ্যাসন বললে, "তাই নয়, ডিলসে?"

"আমার তো তাই মনে হয়," ডিলসে বললে। ও চাইলে ন্যান্সীর দিকে। "আমি তো তা মনে করি না। তুমি করবে কি, তাহলে?"

ন্যান্সী আমাদের দিকে চাইলে। তার দৃষ্টি চললো দ্রুত, বিশেষ নড়চড় না করেই, যেনো দেখবার সময় আর নেই। "সেদিন রাতে তোমাদের ঘরে থাকার কথা মনে আছে?"

ও বললে। ও বললে কিভাবে পরদিন সকাল সকাল ওকে তুলে দিয়ে আমরা খেলতে আরম্ভ করেছিলুম। খুব চুপি চুপি আমাদের খেলতে হয়েছিলো ওর মাদুরের ওপরে যতক্ষণ না বাবার ঘুম ভেঙেছিলো আর ওর সময় হয়েছিলো নীচে গিয়ে জলখাবার তৈরী করার। "যাও মার কাছে বলে আমাকে আজ রাতটা এখানে থাকতে দেওয়াও।" ন্যান্সী বললে। "আমার কোন মাদুর চাই না। আমরা আরও খেলতে পারি।"

ক্যাডী মাকে জিগ্যেস করলে। জ্যাসনও সঙ্গে গেলো। মা বল্লেন, "বাড়িতে নিগ্রোদের আমি ঘুমোতে দিতে পারি না।" জ্যাসন কেঁদে ফেললে। সে কাঁদতে লাগলো যতোক্ষণ না মা জানালেন যে সে যদি চুপ না করে তো তিন দিন সে আচার খেতে পাবে না। জ্যাসন তখন বললে যে, সে থামতে পারে ডিলসে যদি তাকে চকোলেট-কেক তৈরী করে দেয়। বাবা সেইখানেই ছিলেন।

মা বললেন, "একটা কিছু বিহিত করছো না কেন? পুলিশ আছে কি জন্যে?"

"ন্যান্সী জুবাকে ভয় করে কেন?" ক্যাডী প্রশ্ন করলে। "বাবা, মা তোমরাও ভয় পাও নাকি?"

"ওরা কি করতে পারে?" বাবা বললেন। "ন্যান্সী যদি নাই দেখে থাকে তাহলে পুলিশে কি করবে?"

"তাহলে ওর ভয় কিসের?" মা বললেন।

"ও বলে সে এখানেই আছে। ও বলছে যে, ও জানে সে আজ রাতেও এখানে আছে।"

মা বলে উঠলেন, "তবুও আমরা ট্যাক্স দেবো, আর তুমি নিগ্রো মেয়েকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবে এদিকে আমি থাকবো একলা এতো বড়ো বাড়ি আগলে।"

"তুমি তো জানো, আমি ক্ষুর নিয়ে বাইরে ঘুমোই না।" বাবা বললেন।

"আমি থামতে পারি যদি ডিলসে চকোলেট-কেক করে দেয়।" জ্যাসন বলে ওঠে। মা আমাদের বাইরে যেতে বললেন আর বাবা বললেন যে, জ্যাসন চকোলেট-কেক পাবে কিনা তিনি বলতে পারেন না, তবে তিনি জানেন জ্যাসন মিনিট খানেকের মধ্যেই পেয়ে যাবে। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আমরা ন্যান্সীকে বললুম।

"বাবা তোমাকে বলতে বললেন, বাড়ি যেতে আর দরজা বন্ধ করে রাখতে, তাহলেই তুমি ঠিক থাকবে," ক্যাডী বললে। "আচ্ছা ন্যান্সী, কেন বলতো? জুবা তোমার ওপর ক্ষ্যাপা নাকি?" ন্যান্সী কফির কাপটা ধরে আছে, হাঁটুর ওপরে তার কনুই আর কাপটা ধ'রে আছে দুটো হাঁটুর মাঝখানে। কাপটার ভিতরে দেখছে। "কি তুমি করেছো বলতো যে জন্যে জুবা তোমার ওপরে ক্ষ্যাপা?" ক্যাডী বললে। ন্যান্সী কাপটা ফস্কে যেতে দিলে। মেঝেতে পড়ে ওটা ভাঙলো না, কিন্তু কফিটা গড়িয়ে পড়লো, আর ন্যান্সী ঐভাবেই বসে রইলো হাত দিয়ে কাপের মতো মুদ্রা কেটে। আবার সেইরকম শব্দ করতে লাগলো, জোরে নয়। গানও নয়, অ-গানও নয়। আমরা ওকে লক্ষ্য করতে লাগলুম।

"এই," ডিলসে বলে উঠলো। "ওটা এখন ছাড়ো দিকি। নিজেকে একটু শক্ত করো। এখানে সবুর করো, আমি ভার্শকে ডেকে আনছি, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে।" ডিলসে বেরিয়ে গেলো।

আমরা ন্যান্সীর দিকে চাইলুম। কাঁধের কাছটা তার কাঁপছে তবে শব্দটা করা বন্ধ করেছে। আমরা ওকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। "জুবা তোমাকে কি করবে?" ক্যাডী প্রশ্ন করে।" ও তো চলে গিয়েছে।"

ন্যান্সী আমাদের দিকে তাকালে। "তোমাদের ঘরে সেই যে রাত্তিরে ছিলুম, বেশ মজা হয়েছিলো, নয়?"

"আমার নয়," জ্যাশন বললে, "আমি কোন মজা পাইনি।"

"তুমি তো ঘুমিয়েছিলে," ক্যাডী জবাব দেয়। "তুমি ছিলেই না সেখেনে।"

"চলো আমার বাড়িতে যাই সবাই, বেশ মজা হবে।" ন্যান্সী বললে।

বললুম, "মা যেতে দেবে না, এখন বড্ডো দেরী হয়ে গেছে।"

"মার কথা গ্রাহ্য করো না," ন্যান্সী বললে। "আমরা তাকে সকালে বলবো, তিনি কিছু মনে করবেন না।"

"আমাদের যেতে দেবেন না," আমি বললুম।

"এখন জিজ্ঞেস করো না," ন্যান্সী বললে। "এখন ওর কথা ভেবো না।"

"ওরা তো বলেননি আমরা যেতে পারবো না," ক্যাডী বললে।

"আমরা জিগ্যেসও তো করিনি," আমি বললুম।

"তোমরা যদি যাও, আমি বলে দেবো," জ্যাশন বলে উঠলো।

"আমরা বেশ মজা করবো" ন্যান্সী বললে। "ওরা কিছু মনে করবেন না, আমার বাড়ি বৈ তো নয়। তোমাদের এখানে এতদিন আমি কাজ করছি। ওরা কিছু মনে কববেন না।"

ক্যাডী জানালে, "আমি যেতে ভয় পাই না। জ্যাশনই শুধু ভয় পাবে। ও বলে দেবে।"

"না আমি নই," জ্যাশন বলে।

"হ্যাঁ তুমি," ক্যাডী বলে, "তুমি বলে দেবে।"

"না আমি বলবো না," জ্যাশন বলে। "আমি ভয় খাই না।"

"আমার সঙ্গে যেতে জ্যাশন ভয় পায় না," ন্যান্সী বললে। "ভয় পাও, জ্যাশন?"

ক্যাডী তবুও বললে, "জ্যাশন বলে দেবেই।"

গলিটা অন্ধকার। খোঁয়াড়ের দরজা পার হলুম। "আমি বাজী রাখছি, দরজার পাশ থেকে যদি কিছু লাফিয়ে উঠতো, জ্যাশন চীৎকার করে উঠতো।"

"কক্ষনো নয়," জ্যাশন বললে। আমরা গলি ধরে চললুম। ন্যান্সী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিলো।

"অতো চেঁচিয়ে কথা বলছো কেন, ন্যান্সী?" ক্যাডী প্রশ্ন করে।

"কে; আমি?" ন্যান্সি বলে ওঠে। "শোন কথা, কোয়েণ্টিন আর ক্যাডী আর জ্যাশন আমাকে বলে কি না চেঁচিয়ে কথা বলছি।"

ক্যাডী বললে, "তুমি কথা বলছো যেনো আমরা চারজন রইছি। বলছো এমন করে যেনো বাবাও এখেনে রয়েছেন।"

"কে; আমি চেঁচিয়ে কথা বলছি, মিঃ জ্যাশন?" ন্যান্সী বললে।

"ন্যান্সী জ্যাশনকে বলছে 'মিস্টার'?" ক্যাডী বলে ওঠে।

"এবার শোন ক্যাডী আর কোয়েণ্টিন আর জ্যাশনের কথা," ন্যান্সী বললে।

"আমরা তো চেঁচিয়ে বলছি না," ক্যাডী বললে। "তুমিই তো কথা কইছো যেনো বাবা—"

"সস্," ন্যান্সী বললে, "চুপ, মিঃ জ্যাশন।"

"ন্যান্সী জ্যাশনকে বলছে 'মিস্টার,' আফ্—"

"চুপ," ন্যান্সী বললে। নালাটা যখন পার হচ্ছিলুম ও তখন চেঁচিয়ে কথা বলছিলো এবং যেখেনে বেড়ার ধারে মাথায় কাপড় নিয়ে ও ঝুঁকতো সেখেনে পৌঁছে চুপ হয়ে গেলো। তারপর আমরা ওর বাড়িতে এসে গেলুম। আমরা তখন জোরে চলছিলুম। ও দরজাটা খুললে। বাড়ির গন্ধটা লণ্ঠনের মতো আর ন্যান্সীর গন্ধটা পলতের মতো, একজন যেনো আর একজনের গন্ধ নেবার জন্যে অপেক্ষায় ছিলো। আলোটা জেলে সে দরজাটা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিলে। তারপর ও চেঁচিয়ে কথা বলা থামালে, আমাদের দিকে চেয়ে।

"আমরা এখন কি করবো?" ক্যাডী বললে।

"তোমরা সব কি চাও করতে?" ন্যান্সী জানতে চাইলে।

ক্যাডী বললে, "তুমি বলেছিলে বেশ মজা হবে।"

ন্যান্সীর বাড়িটার কিছু ব্যাপার ছিলো; সেটার গন্ধ পাওয়া যায়। জ্যাশন শুঁকলেও তা। "আমি এখানে থাকতে চাই না," বললে সে। "আমি বাড়ি যাবো।"

"যাও তাহলে, বাড়ি যাও," ক্যাডী বললে।

"আমি একলা যেতে চাই না," জ্যাশন বললে।

ন্যান্সী জানালে, "দেখ না, আমরা কেমন মজা করি।"

"কেমন মজা ?" ক্যাডী প্রশ্ন করে।

ন্যান্সী দরজার গায়ে দাঁড়ালো। আমাদের দিকে চাইতে লাগলো, যেনো চোখটা উপড়ে ফেলেছে, চোখের আর ব্যবহার করে না।

বললে সে, "তোমরা কি চাও করতে ?"

ক্যাডী বললে, "গল্প বলো। গল্প বলতে পারো ?"

"হ্যাঁ," ন্যান্সী জবাব দেয়।

"বলো তবে," ক্যাডী বলে। আমরা ন্যান্সীর দিকে চেয়ে রইলুম। ক্যাডী বললে, "তুমি কোন গল্পই জানো না।"

"হ্যাঁ" ন্যান্সী জবাব দিলে, "আমি জানি।"

ও এসে চুল্লীর পাশে একটা চেয়ারে বসলো। ওতে একটু আগুন ছিলো; ও ওটাকে জড়ো ক'রে দিলে; এমনিতেই বেশ গরম। আগুনের দরকার করে না। ও বেশ দপ্‌দপে আগুন তৈরী করলে। একটা গল্প বলতে লাগলো। ও বলে যাচ্ছে যেনো ওর চোখ দেখছে, যেনো ওর চোখ আমাদের দেখছে আর ও যে কথা কইছে সে স্বরটা ওর নয়। যেনো ও অন্য কোথায় থাকে, অন্য আর এক জায়গায় অপেক্ষা করছে। ও যেনো বাড়ির বাইরে। ওর স্বরটা ওখানে, আর ওর আকৃতি, যে ন্যান্সী, যেনো কোন বোঝা নেই এমনিভাবে বেড়ার মধ্যে কাপড়ের পোটলা মাথায় রেখে বেড়ার তারে ঝুঁকে পড়ে, সেই ন্যান্সীও যেনো ওখানে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। "তারপর এইখানেই রাণী এলো নালা পর্যন্ত হেঁটে, যেখানে সেই লোকটা লুকিয়ে ছিলো। রাণী চলেছে নালার ওপর দিয়ে, আর বলছে, 'এই নালাটা যদি পার হতে পারি,' এই বলছে—"

"কোন্ নালাটা ?" ক্যাডী প্রশ্ন করে। "বাইরে ঐ যেরকম রয়েছে ? রাণী নালাতে গেলো কেন ?"

"তার বাড়ি যাবার জন্যে," ন্যান্সী বললে। আমাদের দিকে ও ফিরে চাইলে। "বাড়ি যেতে গেলে ওকে নালাটা পার হতে হবে।"

"রাণী বাড়ি যেতে চায় কেন ?" ক্যাডী প্রশ্ন করে।

ন্যান্সী আমাদের দিকে চাইলে। ও কথা বন্ধ করে দিলে। আমাদের দিকে দেখতে লাগলো। জ্যাশন ছোট বলে ওর পা প্যান্ট থেকে সোজা বেরিয়ে আছে। "আমার ও গল্প ভালো লাগে না," বললে সে, "আমি বাড়ি যাবো।"

"আরো ভালো হলে হতো," ক্যাডী বলে। মেঝে থেকে ও উঠে পড়লো। "আমি বাজী রেখে বলতে পারি, এখন আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে।" দরজার দিকে ও গেলো।

"না," ন্যান্সী বললে। "খুলো না।" তাড়াতাড়ি উঠে সে ক্যাডীকে টপ্‌কে গেলো। দরজা ও ছুঁলো না, কাঠের হুড়কোটাও নয়।

"কেন ?" ক্যাডী বলে।

"আলোর কাছে এসো," ন্যান্সী বলে। "একটা মজা করবো আমরা। তোমাদের চলে যেতে হবে না।"

"আমাদের যাওয়াই ভালো," ক্যাডী বলে। "খুব যদি মজা হয়, তাহলে আলাদা।" ও আর ন্যান্সী ফিরে এলো আগুনের, লণ্ঠনের কাছে।

"আমি বাড়ি যাবো," জ্যাশন বলে। "বলে দেবো আমি।"

"আর একটা গল্প জানি," ন্যান্সী বলে। আলো ঘেঁষে ও দাঁড়ালো। ক্যাডীর দিকে ও চাইতে লাগলো, নাকের ডগার সঙ্গে সমান করে ধরা একটা কাঠির দিকে লোকে যেমন চায়। ক্যাডীকে দেখতে ওকে দৃষ্টি নামাতে হচ্ছিলো, কিন্তু তার চোখগুলো দেখাতে ওই নাকের ডগায় কাঠি ধরার মতো।

"শুনতে আমি চাই না," জ্যাশন বলে। "আমি দরজায় আওয়াজ করবো।"

"এটা খুব ভালো গল্প, "ন্যান্সী বলে।" "ওর চেয়েও ভালো।"

"কিসের গল্প ?" ক্যাডী প্রশ্ন করে। ন্যান্সী আলোর ধারে দাঁড়িয়ে। ওর হাতটা লণ্ঠনের ওপরে, লম্বা, তামাটে, আলোটাকে আড়াল ক'রে।

"তোমার হাত যে গরম চিমনীটার ওপরে," ক্যাডী বলে। "হাতে তাপ লাগছে না তোমার ?"

ন্যান্সী লণ্ঠনের চিমনীর ওপরে হাতটা দেখলে। হাতটা সে সরিয়ে নিলে, আস্তে। ওইখানেই ও দাঁড়িয়ে রইলো, ক্যাডীর দিকে চেয়ে, তার লম্বা হাতটা দুলিয়ে যেনো কব্জীর সঙ্গে সেটা সুতো দিয়ে বাঁধা।

"আর কিছু বরং করি এসো," ক্যাডী বলে।

"আমি বাড়ি যাবো," জ্যাশন বলে।

ন্যান্সী বলে, "ভুট্টা আছে।" ও একবার ক্যাডীর দিকে চাইলে, তারপর জ্যাশনের দিকে তারপর আমার দিকে তারপর আবার ক্যাডীর দিকে। "কিছু ভুট্টা আছে আমার।"

"ভুট্টা আমার ভালো লাগে না," জ্যাশন বলে। "তার চেয়ে মেঠাই ভালো।"

ন্যান্সী জ্যাশনের দিকে চাইলে। "তুমি তা হলো খাড়ুইটা ধরো। তখনও ও হাত পাকিয়েই যাচ্ছে। লম্বা, রোগা আর তামাটে।

"বেশ," জ্যাশন বলে, "যদি ধরতে পারি তো খানিক্ষণ থাকবো। ক্যাডী ধরতে পারবে না। ক্যাডী খাড়ুই ধ'রলে আমি বাড়ি যেতে চাইবো।"

ন্যান্সী আগুন জড়ো ক'রলে। "দেখো দেখো, ন্যান্সী আগুনে হাত দিয়েছে," ক্যাডী ব'ললে। "তোমার কি হ'লো ন্যান্সী ?"

"আমার কিছু ভুট্টা আছে," ন্যান্সী বলে। "কিছুটা আছে।" বিছানার নীচে থেকে খাড়ুইটা বের ক'রলে। সেটা ভাঙা। জ্যাশন কেঁদে ওঠে।

"খই হবে না," সে বলে।

"থাকগে, আমাদের এবার বাড়িতে ফেরা দরকার," ক্যাডী বলে। "চলো কোয়েণ্টিন।"

"দাঁড়াও," ন্যান্সী বলে; "দাঁড়াও আমি সারিয়ে নিচ্ছি। আমাকে একটু সাহায্য ক'রতে চাও না তোমরা ?"

"আমি পারবো না," ক্যাডী বলে। "এখন বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে।"

"জ্যাশন, তুমি আমাকে সাহায্য করো," ন্যান্সী বললে, "তুমি চাওনা আমায় সাহায্য ক'রতে ?"

"না," জ্যাশন জবাব দিলে। "আমি বাড়ি যেতে চাই।"

"চুপ," ন্যান্সী বলে; চুপ। দেখো। আমার দিকে দেখো। আমি এটা সারিয়ে দিচ্ছি যাতে জ্যাশন এটা ধরে খই ভাজতে পারে।" একটুকরো তার নিয়ে ও খাড়ুইটা সারিয়ে ফেললে।

"ও ধরতে ভালো লাগবে না," ক্যাডী বলে।

"হ্যাঁ লাগবে," ন্যান্সী বললে, "দেখো তোমরা। খোসা ছাড়াতে কিন্তু তোমাদের হাত লাগাতে হবে।"

ভুট্টাও ছিলো বিছানারই নীচে। আমরা খোসা ছাড়িয়ে খাড়ুইয়ের ভেতর দিতে লাগলুম আর ন্যান্সী জ্যাশনকে খাড়ুইটা আগুনের ওপর ধরিয়ে দিলে।

"এটা ফটফাট ক'রছে না," জ্যাশন বললে। "আমি বাড়ি যাবো।"

"সবুর করো না," ন্যান্সী বলে, "এক্ষুনি ফুটফাট ক'রবে। তারপর বেশ মজা হবে। ও আগুনের ধার ঘেঁষে বসেছিলো। আলোর পলতে এতো উঁচু ক'রে দেওয়া যে তা থেকে ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ ক'রলে।

"একটু কমিয়ে দিচ্ছ না কেন," আমি বললুম।

"ও ঠিক আছে," ন্যান্সী বলে। "আমি পরিষ্কার ক'রে দেবোখন। তোমরা সবুর ক'রো। খই এক্ষুনি ফুটে উঠবে।"

"ফুটবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না," ক্যাডী বলে। "যে করেই হোক আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। ওরা ভাবতে থাকবে।"

"না," ন্যান্সী বলে। "এক্ষুনি ফুটবে। ডিলসে বলবে খন ওদের, তোমরা আমার সঙ্গে আছো। অনেকদিন তোমাদের কাছে কাজ করছি। আমার বাড়িতে থাকলে ওরা কিছু মনে করবে না। দাঁড়াও না। এক মিনিটেই ফুটবে।"

জ্যাশনের তখন চোখে ধোঁয়া লাগায় ও কান্না শুরু ক'রলে। খাড়ুইটা দিলে আগুনে

ফেলে। ন্যান্সী একটা ভিজে কম্বল এনে ওর মুখ মুছিয়ে দিলে, কিন্তু ও কান্না থামালে না।

"চুপ করো," ও ব'ললে। "চুপ।" কিন্তু চুপ হ'লো না। ক্যাডী আগুনে থেকে খাড়ুইটা তুলে নিলে।

ব'ললে, "পুড়ে গেছে, আরও কতকগুলো ভুট্টা তোমাকে দিতে হবে।"

"তুমি কি সবগুলো ভেতরে দিয়েছিলো নাকি?" ন্যান্সী বলে।

ক্যাডী বলে, "হ্যাঁ।" ন্যান্সী ক্যাডীর দিকে চাইলে। তারপর ও খাড়ুইটা নিয়ে খুলে ফেললে আর কালো ভুষো ধরা ভুট্টাগুলো ওর এপ্রনের ওপর ঢেলে বাছতে লাগলো। তার লম্বা তামাটে হাত, আমরা দেখতে লাগলুম।

"আর তোমার নেই?" ক্যাডী বললে।

ন্যান্সী ব'ললে, হ্যাঁ, এই দেখো। এগুলো পোড়েনি।

"আমি বাড়ি যাব," জ্যাশন জানালে। "আমি ব'লে দেবো।"

"চুপ," ক্যাডী বলে। আমরা সকলে শুনতে পেলুম। ন্যান্সীর মাথাটা ইতিমধ্যেই হুড়কো দেওয়া দরজার দিকে ঘুরেছে, তার চোখগুলো লণ্ঠনের লাল আলোয় রক্তাভ। "কেউ আসছে," বললে ক্যাডী।

তারপর ন্যান্সী আবার সেই শব্দটা ক'রতে লাগলো, জোরে নয়। ওখেনে আগুনের ধারে বসে, হাঁটুর মাঝে তার হাতগুলো দুলছে। হঠাৎ ওর মুখে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা বেরিয়ে পড়লো, তার প্রত্যেকটা নিয়ে আসতে লাগলো ছোট ছোট আগুনের ফোঁটা তারপর চিবুকে পড়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

"ও কাঁদেনি," আমি বললুম।

"না আমি কাঁদিনি," ন্যান্সী ব'ললে। তার চোখ বন্ধ। "আমি কাঁদিনি। কে ও?"

"জানি না আমি," ক্যাডী বলে। ও দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চাইলে। "এইবারে আমাদের বাড়ি যেতেই হবে," ও ব'ললে। "বাবা আসছেন।"

"আমি ব'লে দিচ্ছি," জ্যাশন ব'ললে। "তোমরা সবাই আমায় নিয়ে এসেছ।"

তখনও ন্যান্সীর মুখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। চেয়ারে ও ঘুরে বসলো। "শোন। ওকে ব'লো। ওকে ব'লো আমরা মজা ক'রছিলুম। ব'লো সকাল পর্যন্ত আমি তোমাদের যত্ন ক'রে রাখবো। ব'লো আমাকে তোমাদের সঙ্গে বাড়ি যেতে দিয়ে মেঝেতে শুতে যেনো দেন। ব'লো আমি কোন মাদুরও চাই না। আমরা একটু মজা চাই। মনে আছে সেবার কেমন মজা হ'য়েছিলো?"

"আমি কোন মজা পাইনি," জ্যাশন বলে। "আমায় তুমি কষ্ট দিয়েছো। আমার চোখে তুমি ধোঁয়া দিয়ে দিয়েছো।"

বাবা ভিতরে এলেন। আমাদের দিকে তিনি চাইলেন। ন্যান্সী উঠলো না। "দাও ব'লে ওকে," বললে সে।

"ক্যাডী আমাদের এখানে আনিয়েছে," জ্যাশন বলে। "আমি আসতে চাইনি।"

বাবা আগুনের কাছে গেলেন। ন্যান্সী ওর দিকে মুখ তুলে চাইলে। "র‍্যাচেল মাসীর কাছে গিয়ে থাকতে পারবে না তুমি?" বললেন তিনি। ন্যান্সী বাবার দিকে ফিরে চাইলে, হাত তার হাঁটুর মাঝে। "জুবা এখানে নেই," বাবা বললেন। "থাকলে দেখতে পেতুম। একটা জনপ্রাণীও চোখে পড়লো না।"

"ও আছে, খানার ভিতরে," ন্যান্সী বলে। ঐ খানাটার হোথায় অপেক্ষা ক'রছে।"

"তোমার মাথা," বাবা বললেন। ন্যান্সীর দিকে চাইলেন তিনি। "তুমি জানো, ও আছে"

"আমি যে সংকেত পেয়েছি," ন্যান্সী বলে।

"কিসের সংকেত?"

"আমি পেয়েছি। যখন ঘরে ঢুকি ঐখেনে টেবিলের ওপর ছিলো। শুয়োরের হাড়, রক্ত মাখা মাংস লাগানো তখনও, আলোটার নীচে পড়েছিলো। ও আছে বাইরে, ওখেনে। তোমরা দরজার বাইরে গেলে, আমিও চলুম।"

"কে চললে, ন্যান্সী?" ক্যাডী প্রশ্ন করে।

"আমি কিন্তু বক্‌বক্ করি না," জ্যাশন ব'লে ওঠে।

"তোমার মাথা;" বাবা বলেন।

"ও ওই বাইরে আছে," ন্যান্সী বলে। "এই মুহূর্তেই ও ওই জানলা দিয়ে উঁকি মারছে, তোমাদের যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। তারপর আমিও চলবো।"

"মুখ্যু কোথাকার," বাবা বললেন। "বাড়িতে তালা লাগিয়ে চলো তোমায় র‍্যাচেল মাসীর কাছে রেখে আসি।"

"তাতে কোন ফল নেই," ন্যান্সী বললে। এবারে সে আর বাবার দিকে চাইলে না, বাবাই তার দিকে দৃষ্টি নামালেন, তার লম্বা, রোগা দোলায়মান হাতের দিকে।

"সরিয়ে দিয়ে কোন লাভই নেই।"

"তাহ'লে কি ক'রবে বলো?" বাবা প্রশ্ন করেন।

"আমি জানি না," ন্যান্সী বলে। "আমি কিছু পাবো না। সরিয়ে দাও। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। আমি বুঝি ওটা আমারই। আমি বুঝি যা আসছে তা আমি বৈ নয়।"

"কি আসছে, ক্যাডী বলে। কি তোমার?"

"কিছু নয়," বাবা বলে ওঠেন। "তোমাদের এখন শুতে যেতে হবে।"

"ক্যাডী আমাকে নিয়ে এসেছে," জ্যাশন বলে।

"র‍্যাচেল মাসীর কাছেই যাও," বাবা ব'ললেন।

"কোন লাভ নেই তাতে," ন্যান্সী বলে। আগুনের সামনে ও বসে আছে, তার কনুই হাঁটুর ওপর রাখা আর লম্বা লম্বা হাত হাঁটুর মাঝ বরাবর। "এখন তোমাদের রান্না ঘরেও কোন ফল হবে না। এখন তোমাদের মেঝেতে তোমাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও যদি শুই, আর পরদিন সকালে আমি পড়ে রইছি, আর রক্ত—"

"চুপ, করো," বাবা বললেন। "দরজায় খিল দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"অন্ধকার আমার ভয় করে," ন্যান্সী বললে। "ভয় করে এইজন্যে যদি অন্ধকারেই হ'য়ে পড়ে।"

"তাহ'লে তুমি ব'লতে চাও এখনেই বসে থাকবে, আলো জেলেই?" বাবা বললেন। তারপর ন্যান্সী আবার সেই শব্দ ক'রতে আরম্ভ ক'রলে, আগুনের সামনে বসে, হাঁটুর মাঝে লম্বা হাত রেখে। "আঃ, যতো সব," বাবা বিরক্ত হ'লেন, "চলো, তোমরা, শোবার সময় হ'য়েছে।"

"তোমরা গেলে, আমিও চল্লুম," ন্যান্সী বলে। "কাল আর আমায় জ্যান্ত পাবে না। মিঃ লাভলেডীর কাছে কবরের টাকা জমিয়ে রেখেছি—"

মিঃ লাভলেডী ছিলো বেঁটে, নোংরা লোক যে নিগ্রোদের কাছ থেকে বীমার টাকা আদায় ক'রতো, কুটিরে কি রান্নাঘরে প্রতি শনিবার সকালে পনেরো সেন্ট আদায় ক'রতে আসতো। সে আর তার বৌ থাকতো হোটেলে। একদিন সকালে ওর বৌ আত্মহত্যা করে। ওদের একটি শিশু ছিলো, মেয়ে। বৌ আত্মহত্যা করার পর মিঃ লাভলেডী আর মেয়েটা চলে যায়। কিছুদিন পর মিঃ লাভলেডী ফিরে আসে। শনিবার সকালে গলি ধ'রে ওকে যেতে দেখা যেতো। ও যেতো ব্যাপটিস্ট গির্জেতে।

বাবা জ্যাশনকে পিঠে নিয়ে চল্লেন। আমরা ন্যান্সীর দরজা পার হলুম; ও আগুনের সামনেই বসে। "এসো, এসে হুড়কোটা দিয়ে যাও," বাবা বললেন। ন্যান্সী নড়লো না। সে আর আমাদের দিকেও চাইলে না। আমরা ওকে ওখেনেই ফেলে এলুম, দরজা খোলা আগুনের সামনে বসা, যাতে অন্ধকারেই না হ'য়ে পড়ে।

"কি, বাবা?" ক্যাডী প্রশ্ন করে। "ন্যান্সী জুবাকে ভয় করে কেন বাবা? জুবা কি ক'রবে ওকে?"

"জুবা ওখেনে নেই," জ্যাশন বললে।

বাবা বললেন, "না, ও নেই ওখেনে। ও চলে গেছে।"

তাহ'লে খানায় যে দাঁড়িয়ে আছে সে কে?" জানতে চায় ক্যাডী। আমরা খানাটার দিকে চাইলুম। ওর কাছেই এসে পড়েছি, রাস্তাটা যেখেনে ঘন ঝোপ ধ'রে ওপরে গিয়ে উঠেছে।

"কেউ নয়," বাবা উত্তর দেন। দেখতে পাওয়ার মতো যথেষ্ট চাঁদের আলো ছিলো। খানাটা আবছা, ঘনো, নিস্তব্ধ। "ও যদি ওখেনে থাকে তো আমাদের তো দেখতে পাবে, না বাবা?" ক্যাডী বলে।

"তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে, "জ্যাশন ব'লে ওঠে। জ্যাশন বললে বাবার পিঠের ওপর থেকে "আমি আসতে চাইনি।"

খানাটা তখনও নিস্তব্ধ, একেবারে ফাঁকা, মৌচুষীতে ঠাসা। জুবাকে আমরা দেখতে পাইনি; যেমন দেখছিলুম ন্যান্সী তার বাড়িতে সেইখেনেই বসে রয়েছে, খোলা দরজা আর আলো জ্বালা, কারণ অন্ধকারে হ'য়ে যেতে সে দিতে পারবে না। ন্যান্সী বলেছিলো, "আমি বড়ো হাঁপিয়ে উঠেছি। নিগ্রো বৈ তো নই। কিন্তু আমার কোন দোষ নেই।"

কিন্তু তখনও আমরা ওকে শুনতে পাচ্ছি। আমরা বাড়ির বার হওয়া মাত্র ও আরম্ভ ক'রে দেয়; আগুনের ধারে বসে, তার লম্বা তামাটে হাত হাঁটুর মাঝে রেখে। খানাটা পার হ'য়ে গিয়ে তখনও ওকে শুনতে পেয়েছি, জ্যাশন বাবার প্রায় মাথামাথি ক'রে রয়েছে।

খানা পার হলুম, ন্যান্সীর জীবন থেকেও সরে এলুম। তখন ওর সেই জীবন ওখেনেই বসে আছে দরজা খুলে রেখে আর আলো জেলে, অপেক্ষা ক'রছে, আর খানাটা আমাদের আর আমাদের চলে যাওয়ার মাঝে, সাদা আদমী চলেছে, আমাদের আর ন্যান্সীর উদ্গত জীবনকে পৃথক ক'রে দিয়ে।

"এবারে আমাদের কাছাকাছি কে ক'রবে, বাবা?" আমি বললুম।

"আমি কিন্তু নিগার নই," জ্যাশন বলে বাবার কাঁধের ওপর থেকে।

তুমি তার চেয়েও বদ," ক্যাডী ব'লে ওঠে।" ভারী বকবক করো তুমি। একটা কিছু লাফিয়ে পড়লে নিগারের চেয়েও তুমি ভয় পেয়ে যাবে।"

"কিছুতেই নয়," জ্যাশন বলে।

"কেঁদেই ফেলবে," ক্যাডী বলে।

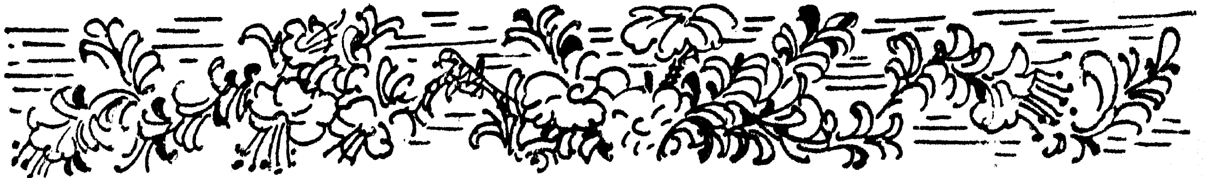
"ক্যাডী!" বাবা ধমক দেন।

"কিছুতেই নয়," জ্যাশন বলে।

"ভীতু বিড়াল," ক্যাডী বলে।

"ক্যান্ডেস!" বাবা আবার ধমক দেন।

(অনুবাদক—পংকজ দত্ত)





পিয়োন কখন চিঠিখানাকে জানলার ফাঁক দিয়ে ফেলে গেছে, তা কেউ জানতে পারেনি। তক্তাপোষের তলায় চটি জুতোটা রাখতে গিয়ে অরিন্দম সেটা আবিষ্কার করলে। বড় লম্বা সাইজের এক অদ্ভুত ধরণের খাম, তার মধ্যে বোধ হয় বিঘৎ দেড়েক লম্বা পুঁথির আকারে চিঠি! বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র কিন্তু বহু বর্ণে ছাপ, আবার তার ওপরে এক বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীর আঁকা একটি ছবির প্রচ্ছদপট! সত্যি কথা বলতে কি এত মূল্যবান নেমন্তন্ন পত্র অরিন্দম এর আগে আর কখনো কোথা থেকে পায়নি! তাই নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা সেই চিঠিটা দেখেই তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অবশ্য তার মত একজন কবি ও দরিদ্র স্কুল মাস্টারের পক্ষে এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণ পত্র, আনন্দের চেয়ে বিষাদই আনে বেশী, কেননা পুজোর শেষে দক্ষিণান্ত করার মত এখানেও যে একটা অত্যন্ত করুণ সামাজিক ব্যাপার থাকে সেটা গোলাপের সঙ্গে কাঁটার মত সব সময় যেন ফুটতে থাকে মনে! বাস্তবিক এই যৌতুক নামক পদার্থটি যদি বিবাহের আনন্দ উৎসবের অন্তর্গত না হ'তো তাহ'লে সবটা কি সুখেরই হতো!

তা ছাড়া অরিন্দমের এটা আবার কুটুম্ব স্থল! বড়লোক পিসশ্বশুরের বিলেত ফেরৎ পুত্রের বিবাহ! কিন্তু এ সব জেনে শুনেও যে অরিন্দম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তারও বুঝি একটা কারণ আছে! চিঠিটা পড়তে পড়তে কেবল সেই কথাটাই অরিন্দমের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। প্রায় বারো তেরো বছর হলো যাঁরা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি আজ হঠাৎ তাঁদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পত্র আসাতে যেমন সে একটু বিস্মিত হলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গর্বও অনুভব করলে।

অবশ্য গর্ব করার মতই ব্যাপার। অরিন্দমের পিসশ্বশুর মিঃ চৌধুরী কলকাতার একজন নাম করা ধনী ব্যক্তি। সমাজের যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরাই কেবল সেখানে নিমন্ত্রিত হন। কাজেই অন্য লোকের কাছে যে এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অরিন্দমের স্কুলের হেডমাস্টার নীতিনবাবু হ'লে এতক্ষণ এই চিঠিটা পকেটে করে বেরিয়ে পড়তেন। টালা থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত কারুর আর জানতে বাকী থাকতো না যে তাঁর সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর কি রকম ঘনিষ্ঠতা! অরিন্দমের তবু তাঁর সঙ্গে একটা সত্যিকারের সম্পর্ক আছে তবু সেটা বলে গর্ব অনুভব করতেও সে লজ্জা পেতো। বিয়ের পর দু' তিন বছর সেখানে তার যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তারপর হঠাৎ তাঁরা এমন বড়লোক হয়ে গেলেন পাটের ব্যবসায়ে যে অরিন্দমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে গেল। সে আর তাঁদের বাড়ি যেতো না—তাঁরাও কেউ আর তার খবর নিতেন

না। এইভাবে দীর্ঘ তেরো বৎসর কেটে গেছে। এর মধ্যে তাঁদের বাড়িতে কত বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মতিথি, উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোনদিনই আর সেখানে অরিন্দমের ডাক পড়েনি। তবে আজ এতকাল পরে মিঃ চৌধুরী তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বসলেন কেন? অরিন্দম ভাবে, তার অবস্থার উন্নতি ত কিছুই হয়নি, সেদিন ছিল সে ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার, এই তেরো বছরে সেটা বেড়ে একশো দশ টাকা হয়েছে, তেমনি ছেলে-পিলের সংখ্যা বেড়ে দারিদ্র্যও তার বেড়েছে চতুর্গুণ। তবে এতদিন পরে এই নিমন্ত্রণের কি কারণ থাকতে পারে?

অরিন্দম আকাশ পাতাল ভাবে! তবে কি কবি হিসেবে তার খ্যাতি বেড়েছে বলে এতদিন পরে তাকে তাঁদের মনে পড়লো?

বাস্তবিক অরিন্দম এখন বাঙলা দেশের একজন খ্যাতনামা কবি। প্রায় সব কাগজেই —কি মাসিক, কি সাপ্তাহিক, কি দৈনিক—তার কবিতা ছাপা হয়। এ ছাড়া কবিতার বই ও তার অনেকগুলো রয়েছে। অবশ্য সে নিজেই পয়সা খরচ ক'রে সেগুলো ছেপেছে এবং বড় বড় প্রকাশকদের নামেই বার করেছে যাতে কবি খ্যাতি তার আরো বাড়ে! কবিতার বই নাকি আজকাল ভাল চলে না—প্রকাশকরা কেউ তাই ছাপতে চায় না। যা হোক সে খবর ত বাইরের লোক কেউ জানে না, এমন কি নিজের স্ত্রী সুরমার কাছেও অরিন্দম সেটা গোপন রেখেছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জন্যে। গোপনে টুইশানী ক'রে প্রেস ও কাগজের দেনা শোধ করেছে। কাউকে জানতে দেয়নি। অরিন্দম ভাবে বড় বড় প্রকাশকদের পুস্তকের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তার কবিতার বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে নিশ্চয়ই সে সব তাঁদের চোখে পড়েছে। তা না হ'লে এতদিন পরে হঠাৎ তাঁকে তাঁরা এইভাবে স্মরণ করতে যাবে কেন?

আবার মনে হয়, এ ছাড়াও ছেলেদের পাঠ্য-পুস্তকে তার কবিতা একটা না একটা আছেই, বাড়ির কোন ছেলেদের বইয়ের পড়া বলে দিতে গিয়ে কোন না কোনদিন কি তার নামটা তাঁদের চোখে পড়েনি? সে গরীব হতে পারে, কিন্তু সে যে একজন খ্যাতিমান কবি তাতে ত কোন সন্দেহ নেই! মিঃ চৌধুরী বড়লোক হতে পারেন, তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে থাকতে পারে, কিন্তু দেশের ক'টা লোক তাঁর নাম জানে; তিনি মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো তাঁর নাম এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে? কিন্তু কবির কবিতা—সে ত বেঁচে থাকবে যুগে যুগে কালে কালে। নবীন সেন, বিহারীলাল, কিরণধন এদের কি কেউ ভুলতে পারে?

এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের চোখ দু'টা জ্বলে উঠলো। মনে পড়লো এই মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তার প্রথম-দিনের আলাপের কথা! পিসশাশুড়ীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে যখন সে তাঁকে নমস্কার করে দাঁড়ালো তখন মিঃ চৌধুরী ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি করো?

অরিন্দম একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বলেছিলো, এম এ পাশ ক'রে স্কুল মাস্টারী করি। কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়েছিল সুরমা। নব বিবাহিত স্বামীর এ পরিচয়টা তার মনঃপূত হয়নি তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল এ ছাড়াও আর একটা বড় পরিচয় ও'র আছে, বলনা তুমি সেকথা, লজ্জা কি?

মোটা চুরুটে একটা টান মেরে মিঃ চৌধুরী বলেছিলেন, সেটা কি রমা? সুরমা সগর্বে উত্তর দিলে, উনি কবি, বড় বড় সব পত্রিকাতেই ওঁর কবিতা বেরোয়, তুমি পড়োনি? তাছাড়া দু'খানা বইও আছে।

এইবার মিঃ চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। তিনি বলেন, ওসব কবিতা আমি পড়ি না।

সুরমা বললে, তা বললে শুনবো না—তোমাকে পড়ে দেখতেই হবে; আমি বই এনেছি দেবো বলে। বলতে বলতে তখনি সুটকেশটা খুলে একখানা স্বামীর কবিতার বই বার করে তাঁর হাতে দিয়েছিল। কিন্তু হায় পরের দিন সকালে ঘুমে থেকে উঠতেই অরিন্দম দেখলে সেই বইটার পাতা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে বাড়ির কয়েকটা ছেলে খেলা করছে!

এ দৃশ্য দেখার পর অরিন্দমের মনের ভাব কিরূপ হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো মিঃ চৌধুরীর মুখদর্শন করবে না। বলা বাহুল্য, এ প্রতিজ্ঞা বেশীদিন সে রক্ষা করতে পারেনি। এর কিছুদিন পরেই তার শ্বশুরবাড়িতে কি একটা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে অরিন্দম দেখলে যে মিঃ চৌধুরী তার অনেক আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বৈঠকখানার সবচেয়ে বড় ইজি-চেয়ারটার হাতলের ওপর দুটো পা তুলে দিয়ে চুরুট টানছেন আর একহাতে সেই মাসের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। সেই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় অরিন্দমের কবিতা ছাপা হয়েছিল। কবিতার চারিপাশে বর্ডার দিয়ে বড় বড় টাইপে ছেপে সম্পাদকমহাশয় তাকে একটু বিশেষ খাতির করেছিলেন।

মিঃ চৌধুরীকে একমনে সেই পত্রিকাটা পড়তে দেখেই আবার অরিন্দমের চোখ মুখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। সে ভাবলে, মিঃ চৌধুরী নিশ্চয়ই তার কবিতাটা পড়েছেন। তাই অকস্মাৎ সে একটু কাশবার চেষ্টা করলে। যাতে চৌধুরী তাকে দেখতে পেয়ে, তার কবিতার সুখ্যাতি করেন এই আশায়। কিন্তু তিনি সেদিক দিয়েই গেলেন না। বরং মুখ তুলে চুরুটের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে বললেন, এই যে, কখন এলে?

অরিন্দম সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে, আজ্ঞে এই আসছি?

এর পরই তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা এই গদাধর তলাপাত্রটি কে হে? বেশ লিখেছে ত গল্পটি?

অরিন্দম যেন এতক্ষণে একটা সুযোগ পেলে। সঙ্গে সঙ্গে বললে, এ কাগজে আমিও লিখি কিনা ওর সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ আছে? এই বলে একটু থেমে অরিন্দম ভাবতে লাগল, এইবার হয়ত তার লেখার কথা তিনি তুলবেন। কিন্তু হায় হতভাগ্য! তিনি বরং তার উত্তরে চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত করে বললেন, তোমার সঙ্গে এ'র পরিচয় আছে? একদিন নিয়ে যেয়োনা আমাদের বাড়িতে—তোমার পিসীমা এর লেখা বড় পছন্দ করেন! অমনি আমার ওখানে সেদিন একটু চা খেয়ে আসবে।

মুখে সম্মতি জ্ঞাপন করলেও এতে কিন্তু আরো বেশী অপমানিত বোধ করলে অরিন্দম। কোথাকার কে গদাধর তলাপাত্র—তার লেখার এত সুখ্যাতি! তাকে সে সত্যি সত্যি চেনেই না অথচ নিজেদের একান্ত আত্মীয় যে জামাই তার লেখার কথা একবার মুখে উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না? কেন, কবিতার কি কোন মূল্য নেই? যত মূল্য ওই ছোট গল্পের? ইনিয়ে বিনিয়ে এক-ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলার? এমনি আরো কত সব চিন্তা সেই চিঠিখানাকে উপলক্ষ্য করে তার মাথায় ভীড় করে আসতে লাগল। চিঠিখানাকে ভালো করে আর একবার পড়তেই তার মনে হলো, এতদিন পরে হয়ত তার মূল্যটা চৌধুরী সাহেব বুঝতে পেরেছেন—তাই আজ নিমন্ত্রণ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। তাছাড়া আজ-কাল অনেক ফিল্মে তার গান ত চলছে—পর্দার গায়ে তার নামটা কি একবারো চোখে পড়েনি? কিংবা প্রোগ্রামে তার নাম দেখে এতদিনে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, অরিন্দমকে তাঁরা স্বীকার না করলেও সে একটা যা-তা লোক নয়। তা না হলে এতদিন পরে তাকে এইভাবে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠাবার আর কি অর্থ থাকতে পারে? গর্বে আনন্দে এইবার সত্যি তার বুকটা যেন দশহাত হয়ে ওঠে!

এমন সময় রান্নাঘর থেকে সুরমা গজ গজ করতে করতে সেখানে এসে ঢুকলো। বলি কি করছো এখানে? রান্নাঘর থেকে যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ধরে গেল তা কি শুনতে পাও নি—চা যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল! এই বলে হঠাৎ সে থেমে গেল। তারপর আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, হ্যাঁগা, তোমার হাতে ওটা কিসের ছবি—দেখি ভারী সুন্দর ত?

এতক্ষণে যেন অরিন্দমের হ'ুশ হলো। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, রমা এ তোমার পিশে-মশায়ের চিঠি। তাঁর ছেলে মণ্টুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাই বৌভাতের নেমন্তন্য করেছেন আমায়!

কি ভাগ্যি? এতদিন পরে তাহলে মনে পড়েছে।

অরিন্দম বললে, তাই ভাবছি আমার যাওয়া উচিত কিনা?

সুরমা এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা বার দুই পড়ে ফেললে। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মুদ্রণ বৈচিত্র্য দেখতে দেখতে বললে, এতে ভাববার কি আছে—যাবে।

কিন্তু যেখানে তোমাকে বললে না—সেখানে কি আমার যাওয়া ভাল দেখায়?

তোমাকে যখন বলেছেন তখন আমাকে না বললেও ক্ষতি নেই। তুমি একটা এত বড় কবি—তোমার কত নাম যশ তাই তোমাকেই তাঁরা আগে বলেছেন। এতে আমার বরং গৌরবই বেশী।

অরিন্দম বললে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার ভাবছি যার সম্পর্কে আমার সম্পর্ক সেই যদি না যায় ত—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরমা বললে, এখন তুমিই তাদের আপনার জন—দশজনের কাছে তোমার পরিচয় দিয়ে তাঁরা নিজেরা ধন্য হবেন। আমি কে?

অরিন্দমের মনে হলো কথাটা সুরমা ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে তার বুকখানা যেন ফুলে ওঠে। কল্পনায় সে দেখে মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে মোটরে করে কত বড় বড় লোক এসেছেন তাঁদের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে—আর তিনি সগর্বে অরিন্দমের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ যেন অরিন্দমের কল্পনায় বাধা পড়ে। সে সুরমার দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁগা নেমন্তন্যে ত যেতে বলছো কিন্তু অত বড়লোকের বাড়ি ত যা তা জামা পরে যাওয়া যায় না।

সুরমা বললে, যা তা পরে কেন যেতে যাবে। সে সব ঠিক হয়ে যাবে'খন তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু তোমার মটকার পাঞ্জাবীটা আজই আর্জেণ্ট কাচতে দিয়ে এসো। এখনো ত চার দিন সময় রয়েছে—তাছাড়া ওপরের ভাড়াটে বিন্দুর মার কাছ থেকে একটা ভাল শাল চেয়ে নেবোখন। একটা রাত্তিরের ব্যাপার ত? এই বলে একটু চুপ করে থেকে সুরমা বললে, তবে এক জোড়া নতুন জুতো তোমায় কিনতে হবে। ওই পুরনো তালি দেওয়া জুতো পায়ে দিয়ে আমি তোমাকে অত সব ভদ্রলোকদের ভেতরে যেতে দেবো না।

নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে অরিন্দম চিরকালই উদাসীন, তবু সুরমা যা বললে তার বিরুদ্ধে সে কিছু বলতে পারলে না। শুধু একবার ক্ষীণ কণ্ঠে জানালে যে, এখনো মাস কাবারের দেরী—জুতো কেনার এত টাকা পাবো কোথায়?

মুখ টিপে একটু হেসে সুরমা বললে, সেটা কি না হিসেব করে বলেছি, ওটা আমিই তোমায় দেবো। কাল রঙের খুব ভালো একটা সোয়েড্-এর জুতো কিনে এনো। বুঝলে?

শনিবার দিন সন্ধ্যায় যথারীতি অরিন্দম সেজে গুজে বেরিয়ে পড়লো। নববধূকে যৌতুক দেবার জন্যে সে অন্য কোন জিনিস না নিয়ে নিজের কতকগুলো বাছা বাছা কবিতার বই একটা কাগজে সুন্দরভাবে বেঁধে সঙ্গে নিলে। তারপর কালীঘাট থেকে ট্রাম, বাস বদল করতে করতে অরিন্দম সেখানে গিয়ে হাজির হলো। রাউডন স্ট্রীটে যে নূতন বাড়িটা চৌধুরী কিনেছেন তার ঠিকানা দেওয়া ছিল চিঠিতে। সাহেবপাড়ার এদিকে কখনো অরিন্দম আসে নি। তাই বাড়িটা খ'ুজতে তাকে বেশ বেগ পেতে হলো। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। একটা বড় বাড়ির ফটকের সামনে সারি সারি অনেকগুলো ঝক ঝকে মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অরিন্দম বুঝলে এই বাড়িটাই হবে। কিন্তু ফটকের কাছাকাছি গিয়ে অরিন্দমের আর ঢুকতে ইচ্ছা করছিল না। সে বাড়িতে পায়ে হেঁটে বোধ হয় একমাত্র সে-ই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে। ফটকের সামনেই এক সাড়ে ছ' ফুট লম্বা শিখ শান্ত্রী বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটরগুলো যেমন ঢুকছে ফটকে অমনি একটা সেলাম ঠুকছে আবার যেই বেরিয়ে আসছে আবার সেলাম ঠুকছে। তাকে দেখে অরিন্দমের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। একবার মনে হলো যদি তাকে ঢুকতে না দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলে নেমন্তন্য পত্রটা আছে কিনা? তারপর সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকে গেল। কিন্তু শান্ত্রীটা তাকে সেলাম করলে না। দেখে প্রথমেই তার মনটা একটু দমে গেল। তবু ফটক থেকে সোজা যে লাল কাঁকড় দেওয়া পথটা বেঁকে গাড়ি বারান্দার নীচে চলে গিয়েছে তার উপর দিয়ে নতুন জুতো মচ্ মচ্ করতে করতে সে 'লনে'র মধ্যের সুসজ্জিত প্যাণ্ডালটায় গিয়ে উপস্থিত হলো। লাল গদি মোড়া অনেকগুলি চেয়ার চারিদিকে ছড়ানো, তার সামনে শ্বেত পাথরের টেবিল—তাতে ফুলদানীতে ফুলের গুচ্ছ দেওয়া রয়েছে। এই রকম এক একটা টেবিলের দু'দিকে দু'জন করে ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁদের কারুর মুখে চুরুট, কারুর বা বাঁকানো পাইপ—শাল দোশালা ঝলমল করছে তাঁদের গায়ে। এত বড় একটা কাজের বাড়ি কিন্তু কোথাও কোন কোলাহল বা কর্মব্যস্ততা নেই—নির্বাক যুগের ছায়াচিত্রের মত সবাই সব কাজ করে যাচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের মনে হতে লাগল যেন কোন একটা অজ্ঞাত জগতে সে এসে পড়েছে। কেউ তাকে চেনে না—সেও কাউকে চেনে না। শুধু একজন বেয়ারা এসে একটা শূন্য চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বললে। মিঃ চৌধুরীর ছোট ছেলে বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। সে একটা ঢিলে গরদের পায়জামার ওপরে শালের ধব ধবে শাদা একটা লম্বা পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করে দু' একজনের সঙ্গে এত আস্তে কথা বলছিল যে, পাশের লোকেও তা শুনতে পাচ্ছিল না। অরিন্দম তাকে ছেলেবেলায় দেখেছিল—অদ্ভুত গায়ের রঙ—প্রায় সাহেবদের মত—তার ওপর টানা বড় বড় চোখ। কাজেই তাকে দেখেই সে চিনতে পারলে কিন্তু সে অরিন্দমকে চিনতে পারলে না।

একটু পরে একজন বেয়ারা এসে একটা ট্রে তার সামনে ধরলে। তাতে গরম কোকো, 'হট ক্রীম' আরো ওই শ্রেণীর বিজাতীয় কি সব পানীয় ছিল! অরিন্দমের খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই শুধু এক কাপ কোকো হাতে তুলে নিয়ে বললে, আর কিছু চাই না। বেয়ারা বললে, আউর কুছ্ 'ড্রিঙ্ক' দেগা সাব?

নেহি। বলে অরিন্দম তাকে বিদায় করতেই মিঃ চৌধুরী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

অরিন্দম নমস্কার করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই তিনি ভ্রূ কুঁচকে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অরিন্দম বললে, চিনতে পারছেন না?

তখনো তাঁর মুখে চোখে অপরিচয়ের ভাষা। সে বললে, আমি অরিন্দম—কালীঘাট থেকে আসছি?

I see! তুমি রমার husband! চিনতে পেরেছি এবার। বসো বসো তুমি যে এসেছো দেখে ভারী খুশি হলুম! তারপর একমুহূর্তে চুপ করে কি যেন চিন্তা করলেন এবং একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠলেন, ওহো আর মিনিট পনেরো আগে যদি আসতে তাহলে—

অরিন্দমের মনে কৌতূহল জাগলো। সে বললে, কেন বলুন ত—কেউ কি আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল?

মিঃ চৌধুরী ঈষৎ হেসে বললেন, না ওসব কিছু নয়—এই গভর্নর ও মিনিস্টাররা সব এসেছিলেন কিনা, তাঁরা চলে গেলেন—তাই বলছিলুম একটু আগে এলে তাঁদের দেখতে পেতে!

এতে অরিন্দম মনে মনে ভারী চটে গেল। তাঁদের দেখে তার কি লাভ হতো—চারটে হাত বেরুতো? তবু মুখে ভদ্রতা রক্ষা করে অরিন্দম বললে, ও তাই নাকি?

এতে মিঃ চৌধুরী যেন আরো উৎসাহ বোধ করলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার নাম করে যেতে লাগলেন আরো সব কোন কোন বড়লোক এসেছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, মারোয়াড়ী, সাহেব প্রভৃতি নামের দীর্ঘ তালিকা তখনি তাকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা তুমি খাও, আমি এখুনি আসছি—ওদিকে আবার মণ্টুর কয়েকজন ইউরোপীয়ান বন্ধুরা খাচ্ছেন তাদের একবার দেখে আসি।

একটু পরে তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, তুমি আমাদের এই বাড়িটায় বুঝি এর আগে আসোনি, না? মিঃ চৌধুরী সে কথা বেশ ভালই জানতেন তবুও অরিন্দম বললে, আজ্ঞে না। তখন তিনি বললেন, ওঃ তুমি আমাদের বাড়ির তাহলে নতুন এক্সটেনশনটা দেখোনি? আচ্ছা এসো এদিকে একবার—বলে অরিন্দমকে নিয়ে তিনি প্যাণ্ডালটার পিছন-দিকে চলে গেলেন। তারপর নতুন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি দেখিয়ে বললেন, ওটাও আমরা কিনেছি সাড়ে চার লক্ষ টাকায়—১৯৪৭এ। ওটা ক্যামেরন সাহেবের বাড়ি ছিল—ভেতরে পুকুর, বাগান আছে। এর মাঝে একটা পাঁচিল ছিল, সেটা ভেঙে আমরা এক করে নিয়েছি। আর ওই দিকটায় মোটর গ্যারেজ—দুখানা গাড়ী ছিল আগে এবারে আমরা আরো তিন-খানা কিনেছি একখানা 'মার্সিডিজ' একটা, ডিলুক্স পণ্টিয়াক্, আর একটা ডি-সো-টো ৪৯' মডেল—বলতে বলতে তিনি নতুন একটা চুরুট ধরালেন। তারপর আবার বললেন, তুমি এত রাত করে এলে যে, তোমায় গাড়ীগুলো দেখাতে পারলুম না—আর এই বাড়িটার ভেতরটাও দেখাতে পারলুম না—ওতে এবার এয়ার কণ্ডিশনড্ প্ল্যাণ্ট বসিয়েছি—তা' ছাড়া লেটেস্ট এমেরিকান মডেলের কিচেন্ করেছি চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে। বরং আর একদিন একটু সকাল সকাল এসো সব দেখাবো কেমন— বাড়ি ত এবার চিনে গেলে? অরিন্দম এর জবাবে কি বলবে বুঝতে না পেরে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর একটু ইতস্তত করে বগল থেকে বইয়ের সেই প্যাকেটটা বার করে বললে, নববধূকে একবার দেখতে যাবো।

ব্যস্ত হয়ে মিঃ চৌধুরী বলে উঠলেন, ওঃ বৌমার কথা বলছ—এই ত এখানে ছিল, দেখো নি তুমি তাকে? ওঃ I see তালপুকুরের মহারাণী এসেছেন কিনা তাকে দেখতে, তাই ভেতরে চলে গিয়েছে! কেন, তোমার কি কিছু দেবার আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে অরিন্দম তার প্যাকেটটা তাঁকে দেখালে।

মিঃ চৌধুরী বললেন, You mean—মানে তুমি এই present-টা দিতে চাও তাকে—আচ্ছা, তার জন্যে চিন্তার কারণ নেই—আমি এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই আবদুল? বলে তিনি সামনে দিয়ে তখনি যে বাবুর্চিটা যাচ্ছিল তাকে ডাকলেন। তারপর বাবুর্চিটা সেলাম করে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, দিয়ে দাও ওটা ওর হাতে, ও ঠিক জায়গায় পোঁছে দেবে। 'মাজীকো আভি দে দেনা সম্‌ঝা?

অরিন্দম অগত্যা আবদুলের হাতেই তার কবিতার বইগুলো দিয়ে আবার তাঁকে নমস্কার করে চলে এলো।

বাড়িতে যখন অরিন্দম ফিরলো তখন রাত দশটা। বিশ্বের যত বিরক্তি যেন তার মুখে, অপমানের গ্লানিতে তার দেহ মন যেন কলুষিত।

সুরমা ছুটে এসে হাসতে হাসতে বললে, কিগো, কেমন বউ দেখলে? অরিন্দম দাঁতে দাঁত চেপে বললো, খুব ভালো।

সুরমা আবার জিজ্ঞেস করলে, কি রকম খাওয়ালে। পিশেমশাই খুব যত্ন করলে ত?

ঠিক সেই সুরে অরিন্দম আবার জবাব দিলে—খুব!

তবে তুমি যে বড় যেতে চাইছিলে না। এখন তুমি বিখ্যাত কবি পিসেমশায় কি সেকথা জানেন না ভেবেছো? বলে সুরমা গদ গদ হয়ে উঠলো।

অরিন্দম এর কোনো জবাব না দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে কলতলায় চলে গেল।

মুখর অতীত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পথের প্রান্তরে আর নদীর কিনারে
কত দাগ এঁকে এঁকে, মুছি বারেবারে,
শুধু মনে হয়
এতো এক অবাক বিস্ময়—সেই স্বর্ণরেখা
তুমি যাহা এঁকে গেছো গতির আবেগে
মন জুড়ে তাই আছে লেগে।

নানা রসে, নানা রঙে আলপনা ছবি
স্মৃতিতে রয়েছে জেগে সবি,
অন্য কিছু নয়
সকল চিন্তারে ঘিরে সকল সময়—
রঙ মাখা তুলিখানি আমারই আঙুলে
তোমার মেঘের মত ঘনকৃষ্ণচুলে
আঁকে বারবার—রঙে রঙে আলোর গাঢ়তা
রক্তে আনে মুগ্ধ চঞ্চলতা।

স্মৃতির ঢেউয়েরা এসে অবোধ হৃদয়ে,
আনে সাড়া দেয় হাতছানি
আমি জানিঃ সে মুহূর্তে চলে যায়
পিছনের ফেলে আসা দিনে,—
আমারে যেখানে তুমি নিয়েছিলে চিনেঃ
হাতে হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে, হৃদয়ে হৃদয়
যেখানে গিয়েছে কেটে অনেক সময়।

পৃথিবীর অলিগলি পথে হেঁটে হেঁটে
স্মৃতির-আরকে-ভেজা যত পণ্য ঘেঁটে
তাই শুধু নিতে হবে ঘ্রাণ,
উজ্জ্বল অতীত বুঝি—ভবিষ্যেরে শুনাবে সে গান।

চেনামুখ

চিন্ময় মুখোটি

আত্মজীবনী লেখায় আমার কোনও আগ্রহ নেই, যদিচ বয়সটা আমার প্রৌঢ়ত্বের কিনারা ছেড়ে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। যে অবস্থায় আছি, তীরের আকর্ষণটা এখনও আমার কাছে মহৎ। আর কিছুদিন গেলে দূরের দৃষ্টি হয়তো অর্জন করতে পারব। নিরাসক্ত চোখে ধরা পড়বে মাটির আর মানুষের প্রকৃত ছবি। উৎসাহ, উচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত স্পৃহার তীব্রতা কমে যাবে, মেদুর হয়ে আসবে স্মৃতির আকাশ। তখন হয় তো আত্মকথা লিখতে পারব—বিদেশী সাহিত্যে যে ধরণের বইগুলির ওপর আমার দুর্নিবার আসক্তি। স্মৃতিকথা মাত্রই হাস্যকর—এমন একটা ধারণা আমার ছিল বরাবর। নিজের জীবনের তুচ্ছ কথাগুলি বড় করে অনিচ্ছুক পাঠকের সামনে উপস্থিত করার মতন নির্বোধ কাজ আর কিছু নেই। কিন্তু চেসটারটন, নেভিল কাউৎস, হাওয়ার্ড স্প্রিং প্রভৃতি নানা সাহিত্যিক আর সাংবাদিকের স্মৃতিকথা-জাতীয় রচনা পড়ে এই কথাটা এখন মনে হচ্ছে যে, ওটাও সৎ সাহিত্য। উপরন্তু আত্মকথনের মধ্যেও সার্বজনীন আবেদন থাকতে পারে, যদি সেটা আত্মসর্বস্ব অথবা বাক্‌সর্বস্ব না হয়ে ওঠে। এক কথায়, সেই জাতীয় স্মৃতিকথাই হল সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ যার মধ্যে স্মৃতিটা আলোড়ন নয়, আলোচনা। কথাগুলো আত্মকেন্দ্রিক নয়, সামাজিক। চিন্তা কেবল অন্তর্মুখী নয়, কিছুটা বাস্তব এবং নৈর্ব্যক্তিক। যে বিচিত্র জীবন নিয়ে কাব্য। লেখা হয়, সেটা সাধারণ মানুষের কাছে আল্‌পনা নয়—পীড়াদায়ক গণ্ডী মাত্র। তবু একটি নিতান্ত সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আর উপলব্ধি হেয় নয়—যেহেতু বৃহত্তর জীবনের পরিধিকে তার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্ত কোথাও না কোথাও কখনো কখনো ছুঁয়ে ফেলে। তখন তুচ্ছতা হয় অসামান্য, নগণ্য প্রাত্যাহিক হয় স্মরণীয়, শাশ্বত। তা যদি হয়, মূল্যজ্ঞান এবং সামঞ্জস্যবোধ যদি তৈরি হয়ে থাকে—কালের ব্যবধানে পিছনে ফেলে-আসা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তখন স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেখা মানুষ আর বোঝা জিনিস অবান্তর হয় না। অবাঞ্ছনীয় আত্মকথার ভিড় কাটিয়ে তারা এগিয়ে আসে। একটি বিশেষ যুগের, বিশেষ সমাজের মানুষ আর ভাবধারার মধ্যে তারা ঠিক জায়গা খুঁজে নেয়। তখন সব মিলিয়ে ছবিটা সম্পূর্ণ আর সমগ্র হয়। একের সঙ্গে বহুর হয় শোভন সঙ্গতি।

আমার অভিজ্ঞতা অসাধারণ নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যে পরিবেশে মানুষ হয়, যে সব ঘটনা আর চরিত্রের সংস্পর্শে আসে—আমার জীবনেও তাই ঘটেছে। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে নই। আবার গৃহকোণে আবদ্ধ জীবমাত্র নই। কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-সঙ্গীতে আমার অনুরাগ নিঃসংশয়। কিন্তু ভালোয়-মন্দয়, স্বার্থে আর ত্যাগে, সুন্দরে আর কুশ্রীতে তৈরি এই বাস্তব জীবনের পাঠশালায় আমি নিত্যকালের পড়ুয়া। দেখার আনন্দ আমার অকৃত্রিম, কথা বলার আনন্দটাও আমার অন্তরপ্রবৃত্তি। ভাবনাটা আমার ভাববিলাস নয়। যাদের দেখেছি, তাদের বিশ্লেষণ করেই দেখেছি। যা বুঝেছি, সেটা ভালো লাগে বলেই বোঝবার চেষ্টা করেছি। এই দেখা আর ভালো-লাগার আনন্দ যদি কিছুটা রং ধরায় পাঠকের মনে, তাহলে লেখার পরিশ্রমটুকু অন্তত সফল হয়। আমার রচনা সব সময়ে কালানুক্রমিক নয়। ফুরসৎ ও মেজাজ মাফিক লিখেছি। তবে প্রসঙ্গটা ধারাবাহিক। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব লোক দেখেছি এবং যাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে, তাদের নিয়েই এ-কাহিনী। এখানে আমি প্রচ্ছন্ন; অন্য মানুষ একটির পর একটি জীবনমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে। নেপথ্যে কথা বলার ভার শুধু আমার। মন্তব্যে আর বর্ণনায় আমার পার্ট হল কোরাসের। তবে মানুষগুলি জীবন্ত; আমার হাতের পুতুল নয়। আপনারাও এ ধরণের মানুষ দেখেছেন, এসব চরিত্রের সংস্পর্শে হয়তো এসেছেন। আমার দেখা কোনও বিধবা মহিলার সঙ্গে আপনাদের কোনও বিধবা মাসী-পিসীর আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়। তাই লেখার নামকরণ করলুম 'চেনা মুখ'। মানে আপনাদের কাছে খানিকটা চেনা। এদের কথা শুনলে মনে হবে—এদের কোথায় যেন দেখেছি। আমার কাছে কিন্তু জানা—শুধু চেনা নয়। যাদের চিনেছি ও জেনেছি, তাদের কথাই লিখছি এই কারণে যে, অপর জীবনের কাছে এলে নিজের জীবনে তার ছাপ কিছুটা পড়বেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সাধারণত্বের সঙ্গে অসাধারণত্ব জড়িয়ে থাকে। যেখানে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ, সেখানে মানুষ হল টাইপ। যেখানে স্বাতন্ত্র্য হয় চিহ্নিত, সেখানে মানুষ হল ইনডিভিজুয়েল। মধ্যবিত্তের ঘরে জন্মে পারিবারিক আর সামাজিক সম্পর্কে যেসব মানুষের সংস্রবে আসতে হয়, তারা সাধারণ হলেও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। কেননা, দুনিয়ার আজব চিড়িয়াখানায় এমন মানুষ খুব কমই আছে, যার চরিত্রে সবটাই সঙ্গতি-অসঙ্গতির স্পর্শ নেই। তার মাথা হাজার কনসেণ্ট্রিক হোক, আচরণ খানিকটা এক্সেণ্ট্রিক হবেই। তাই বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষ—তা সে বাড়ির ঝি হোক অথবা কৃতবিদ্য শিক্ষিতই হোন—আপন আপন চরিত্র নিয়ে আমার দৃষ্টি ও মূল্যবোধ প্রভাবিত করেছে। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তারা শুধু নিজস্ব গাম্ভীর্য আর কৌতুক দিয়ে আমার লেখার মশলা জোগাড় করেনি, আমার মনের খোরাক জুগিয়েছে।

বাঙলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। যেখানে যাচ্ছি, সেখানেও দৃষ্টি আমার স্থির ও জাগ্রত থাকলে মনের ক্ষুধা মিটবে। আমি চেষ্টা করেও দেশ-প্রাণ হতে পারলুম না। ক্ষতিটা আমার অথবা দেশের, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে কবির উক্তিতে সায় দিয়ে বলতে পারছি না যে, এই দেশেতেই জন্মে যেন এই দেশেতেই মরি। কেননা, দেশের চেয়ে মানুষ আরও বড়। দেশপ্রেমের ভাবপ্রবণতায় জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব ধামা চাপা পড়ে যায়, এটা কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক বরদাস্ত করতে পারে না। তাই যাবার সময়ে আমার এই 'হরেকরকমবা' দোকানখানি যাবতীয় জিনিসপত্র সমেত 'দেশের' সাধারণ মানুষ-পাঠকের হাতে দিয়ে গেলাম।

বুড়ী ঝি

আমার প্রথম বাল্য-স্মৃতি গিয়ে পৌঁছচ্ছে একটি শীতের দ্বিপ্রহরে। সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। বাবা কাছারি চলে গিয়েছেন। মা পান ও দোক্তার কৌটা নিয়ে বোসেদের বাড়ি বেড়াতে গেছেন, দিদিরা ইন্সপেক্টর-গিন্নীর নতুন-কেনা কলের গান থেকে 'আজি এসেছি, আজি এসেছি বধু হে' মক্স করতে গেছেন। বড় দাদারা স্কুলে। আর আমরা দুই ছোট ভাই বাতাবি লেবু নিয়ে পিছনকার উঠোনে বল্ খেলছিলাম। হঠাৎ সজোরে কিক্ করার ফলে বলটা ধাঁ করে বুড়ী-ঝির পিঠে লাগতেই বুড়ী কঁকিয়ে উঠল, 'মোরে মেরে ফেলায়ে থো। তোদের জ্বালায় দু গেলাস অম্ন নিশ্চিন্দি হয়ে মুকি উঠ্‌তি পারিনে!' বুড়ী কাঁঠাল-তলায় রোদে পিঠ দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বুড়ীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দেখি, রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। বুড়ো মানুষ —দাঁত নেই। নরম ভাত, ঝাল-চচ্চড়ি আর কাদা-চিংড়ির অম্বল হল তার প্রিয় খাদ্য। বেলা গড়িয়ে গেলে তুবড়ানো গাল আর রোদে কোঁচকানো পিঠ নিয়ে বুড়ী দুটি দুটি করে মুখে ভাত তোলে।

বুড়ী কবে যে আমাদের বাড়িতে আসে, সে কথা বুড়ী বলতে পারে না, আর কারুর মনেও নেই। তার বয়সেরই কোনও ঠিকানা নেই। কখনো বলতো পঞ্চাশ, কখনো ষাট। সেই যে সেবার বড় ঝড় হয়, তখন তেঁতুলে থেকে গোবরডাঙ্গায় চাকরি করতে আসে। সেখানে বছর দুই কাজ করার পর আমাদের বাড়ি। এখন হিসেব করে নাও। সে যখন বাড়ি ছেড়ে আসে, তখন তার এক বোনপো ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিল না। তারপর আমাদেরই কাছে তার চল্লিশ বছর কাটল। আর এই সুদীর্ঘ কাল আমাদেরই সুখে-দুঃখে সে জড়িয়ে মিশিয়ে সংসারেরই একজন হয়ে গিয়েছে। এত আপনার জন আত্মীয়স্বজনও হতে পারে না। নিজস্ব সত্তা তার আর কিছু ছিল না। যে-বাড়ির মানুষগুলিকে আশ্রয় করে, তাদের স্নেহ আর সেবা দিয়ে সে এত বছর কাটিয়ে দিল, তাদের কাছেও সে এমন খাতির-যত্ন পেত যে নিজের দেশে একবার ঘুরে আসতেও তার মন সরত না। অপরের মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে নিজের ভাগ্য আর স্বার্থ এমন জটিলভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাকে ঝি বলে কেউ ভাবত না। বুড়ী শুধু বাড়িতে দিদিমা-ঠাকুমার মতই থাকত না। পাড়ার, এমন কি বাজারের লোকেরা পর্যন্ত তাকে আড়ালে ঠাট্টা-তামাসা করত আর সামনে খুব খাতির করে কথা কইত।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তার ওপর। কোন্ মেয়ে গলা ভাত আর টক্ ভালোবাসে, কোন্ ছেলে চিংড়িমাছ আর কোন্ ছেলে কইমাছ ছাড়া আর কোন মাছ খায় না, কার গা গরম হলে মাসকলাইয়ের তেল গরম করা দরকার, কার শরীর খারাপ হলে বার্লির সঙ্গে লজেঞ্চুস দিতে হবে, কে লেপ মুড়ি দিয়ে শোয় আর কে-ই-বা গায়ে গরম কাপড় রাত্তিরে খুলে ফেলে, কোন্ মেয়েটা দুপুরে লুকিয়ে পুকুরে জল ঘাঁটে আর কোন্ ছেলেটা সারা শীতকাল চান করতে চায় না, গায়ে খোস-পাঁচড়ায় ভরে যায়—বুড়ীর সমস্ত নখদর্পণে। সারাটা দিন সে তদারক করে চলেছে। দিবানিদ্রা তো নয়ই, রাতের ঘুমটুকুও বরাদ্দ। কাক-পক্ষী ডাকতে না ডাকতেই বুড়ী তার কাঁথা-মাদুর ছেড়ে জল গরম করাচ্ছে। ফটকিরি দিয়ে বাবু মুখ ধোবেন, দাঁতের গোড়া ফুলেছে। অন্যান্য ঝি-চাকর তার অধীনে, বামুন-ঠাকুর সকালে উঠে তাকেই জিজ্ঞাসা করত—আজ কি রান্না হবে? শিবু ঠাকুর একদিন ছেলেদের দুধে জল মিশিয়েছিল আর একদিন পোড়া ঘিয়ে বাবুর লুচি ভেজেছিল। তাতে শুধুই বাপান্ত করে ক্ষান্ত হয়নি বুড়ী। তাকে বরখাস্ত করে বলেছিলঃ 'অল্পেয়ে ড্যাকরা মিনসে—ও মানুষের গলা কাটতে পারে। ওকে রাখা চলবে না।'

আমরা ছেলেমেয়ের দল তার কাছে আদর-প্রশ্রয় যেমন পেয়েছি, বকুনি আর গালাগালও কম খাইনি। ইচ্ছা করে ধমকানি খাবার জন্যই তাকে চটিয়ে দিতাম। বুড়ী রাগে গরগর করত। তার সস্নেহে তর্জন-গর্জন শোনবার জন্য আমরা এমন অপকর্ম করতাম, যাতে তার নিজস্ব দেশী বয়েৎ বেরোয়। অনেকগুলি ভাই-বোনের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত ছিল। কাজেই পরস্পর ঝগড়া হলে বুড়ী তেড়ে আসত। নিজের প্রিয় ছেলে অথবা মেয়েকে আড়াল করে অপরদের ধমকানি দিত—'একটুও হায়া নেই তোর! বয়ার কোথাকার! আসুক আগে ঈষের মুল—মজাডা টের পাওয়াচ্ছি তোরে!' এখন এই বয়ার কথাটার অর্থ নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করেছি। বুড়ী নিজেও ঠিক মানে জানত না। বোধ হয় বুনো শুয়োর। আর ঈষের মুল বড় দাদা—যাঁর আগমন মাত্রই আমরা ছোট ছোট সর্পশিশুর দল মাথা গুটিয়ে পালিয়ে যেতাম।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকলেও অপর বাড়ির ছেলেমেয়েদের তুলনায় আমরা ছিলাম দেবশিশু। বোসেদের হারুর গোঁপ-দাড়ী বেরিয়ে গেলেও এখনও একটা পাশ করতে পারল না, কেবলই ফেল করে কিম্বা মজুমদারদের নিবে আর রাজু দুটিই গোমুর্খ—খালি ছিপ্ নিয়ে মাছ ধরে বেড়ায়। এমনতর মন্তব্য বহুবার শুনেছি। আমরা কেউ শ্যামবর্ণ হলেও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দোষ করলেও নির্দোষ। একবার আমরা পাশের ইঁটখোলায় কাঁচা ইঁট মাড়িয়ে এসেছিলাম। তাতে ঠিকাদার নালিশ জানাতে এসে যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাতে সে পালাবার পথ খুঁজে পায়নি। হরে কলুর ছোট্ট ক্ষেতটিতে চমৎকার কড়াইশুঁটি হত, আর বিনোদ তাঁতির পুকুর পাড়ে বোঁচ, বিলিতি আমড়া আর সজনে ডাঁটা ফলত ভালো। প্রত্যেক সপ্তাহে বুড়ীর 'কোটা' ছিল বরাদ্দ। বাজার করে ফেরবার পথে বুড়ী তার পাওনা জিনিসগুলি পুঁটুলি বেঁধে আনত। সম্মান-হানির ভয়ে তাকে অনেক বারণ করা হত। কিন্তু বুড়ী ভ্রূক্ষেপ করত না। তাকে নিয়ে সত্যিই এক-এক সময়ে মুশকিল হত। আমরা যখন মফঃস্বল ছেড়ে কলকাতায় আসি, তখনও বুড়ী সব্জি আর দুধ চালান দিত। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু মালীর হাতে জিনিস তুলে দেবার জন্য বুড়ী গার্ড সাহেবকে উদ্দেশ করে চেঁচাচ্ছে, কিম্বা স্টেশন মাস্টারকে গাড়ি আটকাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে, এমন হামেশাই ঘটত। কে কোন্ জিনিসটা খেতে ভালোবাসে, বুড়ী সারা গ্রাম ঢুঁড়ে সেগুলি জোগাড় করত আর শনিবার দিন চাকর বা মালীর হাতে শতাধিক উপদেশ দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিত।

আমার এক দিদি ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। সে যত দোষই করুক, সেগুলি তার গুণ। তার সাত খুন মাপ; কেননা, দেখতে সে ভালো। সে ইস্কুল পালাত। বাড়িতে নালিশ এলে মায়ের সঙ্গে বুড়ী তর্ক জুড়ে দিত—'কেন, ওর ইস্কুলে যাবার দরকারটা কিসের? মুসুর ডালির মতন যার রঙ, তার জন্যি তোমার বিয়ের ভাবনাডা আসছে কন্‌থে? বিয়ে অবশ্য তার ভালই হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত ভাল, তার বিস্তারিত সত্য ও অলীক কাহিনী শুনে বাড়ির সকলের, আত্মীয়-কুটুম্বের এবং যাবতীয় প্রতিবেশীর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। এই একটি বিষয়ে বুড়ীর ছিল অসীম দুর্বলতা এবং 'তোনোর' বিয়ের প্রসঙ্গ একবার উঠলে তাকে থামানো দুষ্কর হত। কিন্তু এহেন তোনো অশেষ গুণে-শালিনী ও সৌভাগ্যবতী হলে কি হয়, তার ছেলেমেয়েরা দেখতে-শুনতে ভালো হলেও আমাদের কাছে কিছু নয়। কেননা, বাবুর ছেলেমেয়েদের যেমন মুখশ্রী, তার আর তুলনা হয় না।

একবার এই দিদিকে নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদুরে এবং একজেদী। বুড়ীর প্রশ্রয়ে সেটা চরমে দাঁড়িয়েছিল। একবার আমাদের পিসেমশাই রথের মেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কারুর হাতে তীর-ধনুক, কারুর হাতে বাঁশি। কেউ-বা ফুলের চারা নিয়েছে, কেউ-বা পরেছে জল-চুড়ি। বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, এমন সময়ে কি একটা কারণে দিদির রাগ হয়ে গেল। চটেমটে সে ধুলোর ওপর বসে পড়ল পা ছড়িয়ে, তারপর শুয়ে পড়ল। পিসেমশাই গত্যন্তর না দেখে তার হাতটা ধরে টেনে তুলবার চেষ্টা করতেই নতুন রঙীন চুড়ি ভেঙে গিয়ে কব্জির কাছে একটু ছড়ে গেল। দিদির আর্তনাদ কানে যাওয়া মাত্র বুড়ী বেরিয়ে এল এবং নির্বিচারে পিসে-মশাইয়ের নিষ্ঠুরতা, কান্ডজ্ঞানহীনতার ওপর সজোরে মন্তব্য করে দিদির হাত ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। এই অপরাধের ফলে বুড়ী কোনও দিন পিসেমশাইকে ভালো চোখে দেখতে পারল না। শনি-রবিবার তিনি প্রায়ই আসতেন। খাইয়ে লোক তিনি। এলেই পুকুরে জাল ফেলা হত। মা একবার বুড়ীকে বললেন: 'মাছ কোটো'। বুড়ী সাফ্ জবাব দিলে, 'অমন বে-আক্কেলে মানুষির খাবার জোগাড় করতে আমার বয়ে গেছে। আমার তোনোরে উনি যে মারডা মেরেছে, তাতে আমার ভক্তি ছেরেদ্দা থাকতি পারেনা। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি নন্দাইরে সাত বেন্নুন রাঁধি খাওয়াতি থাকো।

ওনার আর মুখদর্শন করাতি আমার পিরবিত্তি নেই।

এই বুড়ী শেষকালে একদিন অসুখে পড়ল। স্থানীয় ডাক্তারের ওষুধে যখন উপকার হল না, তখন গাড়ী করে কলকাতায় তাকে নিয়ে আসতে গেলাম। কিন্তু সে এল না। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে বললে—'আর আমায় জ্বালাসনি তোরা। এইখানেই মরতে দে। আর মরলি পর হাড় ক'খান গঙ্গায় ফেলে দিস্। এক্ডা কথা রাখ্বি, আমার হীরে-মাণিক! তোরা আজ মোরে নিতি আসবি জেনে পুয়োর দোকান থে খাবার আনিয়ে থুইছি। ছোট বয়সির মতন দুকোন করে জিলিপি খা দিনি। আমি শুয়ে শুয়ে তোদের চাঁদপানা মুখ দেখি........'

দু একবার না-না করতেই ধমক খেলাম: 'কিদেডা আর কোন্ কালে হবে শুনি। তোরা হলি গাধার জো। সেই খাবি, কিন্তুক পানি ঘোলায়ে ঘোলায়ে খাবি। না খেয়ে আর বই-পত্তর মুখে নে বসে থাক্লি পেরাণডা আর কদ্দিন বাঁচবে, শুনি?'

বুড়ীর বিছানার পাশে বসে আমরা দু'ভাই খাবার সঙ্গে শেষ বকুনি খেলাম। পরের দিন ভোরে এ'ড়েদার গঙ্গায় তার সৎকার করে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন মনে হল মাতৃ-বিয়োগ হয়েছে........

পুস্তক পরিচয়

'মহাভারতে'র পরিচয়

বেদব্যাসকৃত 'মহাভারত' ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক যুগ বা দুই যুগের কথা নহে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মহাভারত নামে একটি গ্রন্থ ভারতীয় জনচিত্তে রস তত্ত্ব ও নীতি এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্ম প্রেরণাও দান করিয়া আসিতেছে। ভারতের ভৌম গঠনে হিমালয় যে রূপ ও মহিমা লইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ভারতীয় মনোলোকে মহাভারতও বস্তুতঃ সেইভাবে অধিষ্ঠিত। চিরপুরাতন হইয়াও ইহা চিরনূতন। পারমার্থিক জ্ঞানের সারভূত সত্যস্বরূপে যে "গীতা" বিশ্বের তত্ত্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিস্ময়, তাহাও এই মহাভারতেরই হৃদয়কন্দরে বিরাজিত এক অফুরান আলোকের দীপ। রামায়ণ নামে যে আর একটি মহাকাব্য ভারতীয় জনচিত্ত দিব্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহাও বস্তুতঃ মহাভারতীয় চিন্তারই অতুচ্চ কল্পলোক হইতে নিঃসৃত দ্বিতীয় গঙ্গা-প্রবাহের মত। মহাভারতকে 'পঞ্চম বেদ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই আখ্যা ভারতীয় জনজীবনে মহাভারতের মহিমা এবং গুরুত্বের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। চতুর্বেদের অনুশীলন অথবা অধ্যয়ন কোন কালে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। চারি বেদের চর্চা সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভারতের উচ্চ বা নীচ, দ্বিজ বা দ্বিজেতর, পণ্ডিত বা নিরক্ষর, সকল মানুষের দ্বারা যুগে যুগে অনুশীলিত হইয়াছে, লোকসাধারণের শ্রদ্ধায় আগ্রহে ও অধিকারে চিরসম্মানিত সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ, পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত মহাভারতকে লোক-বেদ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের অন্যান্য শাস্ত্রীয় অথবা ক্লাসিক গ্রন্থের তুলনায় মহাভারত গ্রন্থের ইহা একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য; পুরাণ হইয়াও ইহা সংহিতা, কাব্য-কাহিনী হইয়াও ইহা শাস্ত্রবৎ শ্রদ্ধেয় এবং চিরায়ত (ক্লাসিক) সাহিত্যে হইয়াও ইহা ভারতের লোকসাহিত্য।

মহাভারত বস্তুতঃ ভারত নামে দেশাত্মবোধ এবং ভারতীয়তা নামে বিশিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতীয়তার অভ্যুদয়ের ইতিহাস। ইহা প্রাচীন ভারতের কথা সাহিত্যের সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহা রাজনীতি, মনোনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নর-নারীর সম্পর্কবোধ, ধর্মতত্ত্ব এবং লোকাচারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ। ইহা ভাষা, পরিভাষা, উপমা, অলংকার ও প্রতিশব্দের অভিধান স্বরূপ। শিল্পী, ভাস্কর, কবি, কথক, নাট্যকার ও সঙ্গীতিকের কাছে মহাভারত হইল রূপ কল্পনা ও আবেদনের ভাণ্ডার। বাঙালী কবি কাশীদাস মহাভারতের কথাকে 'অমৃত সমান' উল্লেখ করিয়া অতিরঞ্জোক্তি করেন নাই।

সুতরাং, আধুনিক ভারতীয়ের কাছে মহাভারতের প্রয়োজন কতখানি তাহা আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। মহাভারতের সহিত পরিচিত হওয়া অর্থ আত্মপরিচয় লাভ করা, ভারতের ঐতিহাসিক রূপের চির-বহমান ধারাটির সহিত সংযোগ স্থাপন করা। মহাভারতের অধ্যয়ন ভারতীয়ের কাছে বস্তুতঃ তাহার সাংস্কৃতিক অভিরুচিকে ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত। এই ব্রত যাহার সম্পূর্ণ হয় নাই, সেই ভারতীয় শিল্পীর শিল্প অক্ষম, জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী উদ্‌ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। ভারত নামক এই সুপ্রাচীন ভূমির সংস্কৃতিগত রূপের একটি 'মহাভারতীয়' রূপ আছে, যাহা ভারতীয় মানসলোকের রূপ, যাহার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত তথাকথিত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোন ভারতীয় বলিতে পারেন না যে, তিনি আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছেন এবং ইহাও সাধারণ যুক্তির কথা, আত্মপরিচয় যাহার চিন্তায় সত্য হইয়া উঠে নাই, তাহার আত্মবিকাশ সম্ভবপর নহে। ভারতের ক্লাসিক ঐতিহ্যের বিরাট অধিকার হইতে যে ভারতীয় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, তাঁহার প্রতিভা 'নূতন' ঐতিহ্য সৃষ্টির পক্ষেও উপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে পারে না।

এই কারণেই পুরাতন মহাভারতের নূতন অনুশীলন জাগ্রত করিবার প্রয়োজন আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারত তাহার মহাভারতীয় কাহিনীকে নূতন করিয়া অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় আরও বেশী নিষ্ঠা আগ্রহ অধ্যবসায়ের দ্বারা শ্রবণ মনন ও অধ্যয়ন করিলে নবভারতের রূপ সৃষ্টির শক্তিই অধিকতর লাভ করিতে পারিবে। সুখের বিষয়, মহাভারত সম্বন্ধে একটা সন্দিৎসার ভাব শিক্ষিত সমাজে কিছু কিছু জাগ্রত হইতেছে। ইহা বৃহত্তর জাগৃতির পূর্ব লক্ষণ।

বাঙালী জনসাধারণের পক্ষে আনন্দিত হইবার বিষয় এই যে, সম্প্রতি বাঙলা ভাষায় এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা মহাভারতীয় সাহিত্যের সহিত অন্তরঙ্গতা লাভ করিতে বাঙালী পাঠকের পক্ষে যথার্থ সহায়ক। শ্রীরাজশেখর বসু বেদব্যাসকৃত মহাভারতের যে সারানুবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি; প্রায় সাতশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—সুলিখিত ভূমিকা, সুনিবন্ধ বিবরণসূচী এবং পরিশিষ্ট সম্বলিত এই গ্রন্থটিকে বাঙলা সাহিত্যেরই একটি নূতন সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। মহাভারতভুক্ত কুরু পাণ্ডব দ্বন্দ্বের মূল কাহিনী এবং অন্যান্য প্রায় সকল উপাখ্যানগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু কাহিনীগত ঘটনার উল্লেখ বাদ যায় নাই। শুধু বংশাবলীর বিবরণ, যুদ্ধের বর্ণনা, দেবস্তুতি এবং তত্ত্বের বর্ণনা বেশী সংক্ষেপ করা হইয়াছে। গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, মহাভারতের এই সারানুবাদ কাব্যভাষায় বিবৃত হইয়াছে এবং উহা অতীব প্রাঞ্জল অথচ ঐশ্বর্যশালী গদ্যের উদাহরণ। যাঁহারা এই সারানুবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহারা সুবৃহৎ মূল মহাভারত পাঠে অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। মূল মহাভারত পাঠ করিবার মত ধৈর্য, সময় কিম্বা সুযোগ যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের পক্ষে রাজশেখর বসুর রচিত মহাভারতের এই সারানুবাদ গ্রন্থের চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমরা জানি না। *

বাপু দর্শন—কাকা কালেলকর প্রণীত। অনুবাদক: শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। প্রকাশক: সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা।

কাকা কালেলকরের বিখ্যাত হিন্দী পুস্তক 'বাপুকী ঝাঁকিয়া'র বাংলা অনুবাদ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ—মহামানব মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যময় জীবনের বহু অনুল্লেখিত ঘটনার সুন্দর বর্ণনা। এই বিরাট মানবের পূর্ণ দর্শনের সহায়ক এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি বর্ণনার মাধুর্যে পাঠকের চিত্তকে একটি অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ করে। এই পুস্তক পাঠ করলে তীর্থ যাত্রার আনন্দ ও পুণ্য লাভ হয়। এছাড়া এই গল্পগুলির মধ্য থেকে জীবনীকারেরা গান্ধী চরিত্রের নানা দিকের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। সেদিক দিয়েও এর মূল্য কম নয়।

বাংলা ভাষায় এ-ধরণের বই নেই। এই অনুবাদ সেই ক্ষতি পূরণ করতে সাহায্য করবে। এই বই কিনলে অর্থের সদ্ব্যয় এবং পড়লে সময়ের সদ্-ব্যবহার করা হবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ২৮২।৫০

---

* **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত মহাভারত (সারানুবাদ)**—শ্রীরাজশেখর বসু। এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ (১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস (৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা) কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য—কাপড়ের বাঁধাই ১০৲ টাকা, কাগজের মলাট ৯৲ টাকা।

তরুণের স্বপ্ন (শারদীয়া সংখ্যা)—সম্পাদিকা: মালবিকা দত্ত। কার্যালয়, ১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১। মূল্য—১্।

মাসিক 'তরুণের স্বপ্ন'-এর শারদীয়া সংখ্যাটি লেখায়, রেখায়, ছাপায় ও ছবিতে অনবদ্য হইয়াছে। ইহাতে পরশুরাম, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন মিত্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য অনেকের লেখা প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাসমূহ উচ্চ শ্রেণীর।

পথ ও প্রান্তর (শারদীয়া)—সম্পাদক: নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যালয়: ১০৬।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। মূল্য—৸০।

বিশেষ পরিচিত না হইলেও যাহাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া 'পথ ও প্রান্তর'এর শারদীয়া সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাঁহারা স্ব স্ব রচনা দ্বারা উহার সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

সংখ্যা-বিজ্ঞানের অ আ ক খ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওআর্কস্; ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা—৬। ডিমাই ৮ পেজি, পৃঃ ১৪৯। মূল্য—চার টাকা।

বর্তমান সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক দৈনিক মানসিক ইত্যাদি মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংখ্যাবিজ্ঞান প্রয়োগ করা হইতেছে। এই নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের দ্বারা বর্তমানকে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা চলে, ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ সেইরূপই আন্দাজ করা পর্যন্ত যায়। বিদেশে, বিশেষভাবে আমেরিকায়, এই বিজ্ঞানের গবেষণা বেশ ব্যাপকভাবে হইতেছে এবং এ বিষয়ে বিস্তর বই বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বাংলায় এ সম্বন্ধে বই ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিল। লেখক বহুদিন যাবৎ এ বিষয় গবেষণা করিতেছেন। এই বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। এই কারণেই সহজ ও সাবলীল ভাষায় তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। সংখ্যাবিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়ক হইবে। অনেক জটিল বিষয় ইহাতে সহজবোধ্য করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

৩০৪।৫০

শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত:—প্রথম খণ্ড—(গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তত্ত্ব)—শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল। গ্রন্থকার কর্তৃক ৪নং বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সত্যই অমৃতসরোবর। ভক্তগণ এই অমৃতসরোবরে অবগাহন করিয়া জীবনকে ধন্য করেন ও জন্ম সার্থক করেন। শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত গ্রন্থখানি লীলাবিষয়ক হইলেও গ্রন্থকারের অপূর্ব বিশ্লেষণ-ভঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মমতের তাত্ত্বিকাংশগুলিকে সাবলীল করিয়া তুলিয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি স্পষ্ট ও সহজ করিয়া তুলিবার ফলে গ্রন্থখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। এই জটিলতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া লীলা-মাধুরীও সম্পূর্ণভাবেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যে এক বিশেষ সম্পদ হইবে।

২১৯।৫০

গীতা প্রসঙ্গ—শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল; গ্রন্থকার কর্তৃক ১৬ডি, ফার্ন রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণতত্ত্বকেই বুঝাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই গীতারূপে আমাদের কাছে রহিয়াছে। এই প্রাণকে চিনাইবার জন্যই তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের মধ্য দিয়া উপদেশ দিয়াছেন। প্রাণীর জন্য দয়াল ভগবানের সেই চেষ্টা মানবজাতির এক পরম সম্পদ। কৃপণ ও অক্ষম যাহারা, তাহারা দুর্ভাগা। ভগবানের সেই প্রচেষ্টা তাহাদের কাছে চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়াছে। গ্রন্থকার ভগবানের সেই প্রচেষ্টাকে শুষ্ক অনুবাদের মধ্য দিয়া উপস্থিত না করিয়া প্রাণ-প্রাচুর্যে পুষ্ট করিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সেই দিক হইতে গীতা প্রসঙ্গ সার্থক হইয়াছে। এই জটিল বিষয়কে সহজ ও স্পষ্ট করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছে।

২২০।৫০

অনুপমা—মণীন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক: এম্ কে গুপ্ত, ৫৮।১এ, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, কলিকাতা।

লেখকের প্রথম প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এ তথ্য পাওয়া গেল ভূমিকায়।

দুই বোনের কথা। বড় অনুপমা জলশিড়িতে স্কুল মিস্ট্রেস্। ছোট অরুণা কলিকাতায় হস্টেলে থেকে আই-এ পড়ে। একদিকে লেডীস হস্টেলে প্রতি রাত্রে অরুণার সঙ্গে বাংলার অধ্যাপকের অবৈধ অবাধ মিলন, অপর দিকে প্রেমের অভাবে দেহে মনে অনুপমার শুকিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে অধ্যাপক বিবাহিত জেনে অরুণার হতাশা এবং অনুপমার স্নেহের আবরণে প্রেমে আশ্রিত অর্ধউন্মাদ ধনীপুত্র গৌতমের সঙ্গে মিলনের আভাষ এই হলো ১০২ পৃষ্ঠার উপন্যাস। গল্পের কোনও উপাদানই নেই। ভাষা কাঁচা। প্রকাশ ভঙ্গী প্রেমের কবিতার উপযোগী। একটি চরিত্রও ফোটেনি। হাত থাকলেই লেখা যায়—টাকা থাকলেই ছাপান যায় সত্য, কিন্তু যে-বস্তু থাকলে লেখা সাহিত্য হয় লেখকের মধ্যে সে বস্তু নেই।

২৯২।৫০

ST. PAUL'S CATHEDRAL MISSION COLLEGE Golden Jublee Commemoration Volume 1900—1950. Edited and compiled By Prof. Nishith R. Ray, M.A.

সেন্ট পলস্ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা। শিক্ষা বিস্তারে এই বিদ্যালয়ের দান অনস্বীকার্য। ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত এই বিরাট সংখ্যাটি শুধু মাত্র এই বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্রই নয়। বহু চিন্তাশীল লেখকের তথ্য পরিপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ ও নিবন্ধ সম্ভারে এই সংখ্যাটি উৎকৃষ্ট সম্পাদনা ও সংকলনের একটি আদর্শ নিদর্শন। সুরুচি, চিন্তাশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত এরূপ সংকলন সম্ভব নয়। এই সার্থক প্রচেষ্টার জন্য আমরা অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৮৪।৫০

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'র সম্বন্ধে আলোচনা। এই আলোচনার বিশেষত্ব এই যে, প্রধানত পণ্ডিত-মন্যতাই যাহার মূলে থাকে, এমন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাচালতা ইহাতে নাই। কবির গূঢ় রসানুভূতিকে চিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বচ্ছন্দভাবে বিলসিত করিয়া তুলিবার উপযোগী সংযম-শৈলী এ রচনাকে সুমধুর করিয়াছে। প্রথম সংস্করণে 'কবির স্বপ্ন' বাংলার বিদগ্ধসমাজের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

২২২।৫০

আমরা আবার বাঁচব—নগেন দত্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড। ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বাঙালী সমাজের বর্তমান বিপর্যয়ের পট-ভূমিকায় লেখা উপন্যাস আকারের প্রবন্ধ। প্রবন্ধ বলিলাম এইজন্য যে, উপন্যাসে যে শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া আবশ্যক হয় ইহাতে তাহা নাই। কিন্তু ইহাতে লেখকের দরদের পরিচয় আছে। সেই দরদ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এসব বাদ দিলেও বইটি পড়িতে ভালো লাগিবে।

মহর্ষি রমণ—বিভূপদ কীর্তি। শ্রীরমণাশ্রম, পোঃ তিরুভন্নমালাই, মাদ্রাজ। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গভারতী, ১২৯এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

লেখক স্বীকার করেছেন যে, মহর্ষিকে তিনি স্বচক্ষে কোনোদিন দেখেন নাই। বহু ভক্তের চোখ দিয়াই তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু এই যোগীর সাধনা-পদ্ধতির দ্বারা লেখক তাঁর প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর ভক্তিপ্লুত মন দিয়া মহর্ষিকে দূর হইতে যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, এখানে তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এতে অনেক কাহিনীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষির প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা আছে তাঁদের এ বই ভালো লাগিবার কথা। যাঁরা মহর্ষি রমণের সহিত সবিশেষ পরিচিত নহেন, তাঁহাদেরও ইহা ভালো লাগিবে বলিয়া বোধ হয়।

মুখে হাসি চখে জল—শ্রীঅবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুরুলিয়া রোড, রাঁচী। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি কাঁচা হাতের লেখা মনে হয়। কিন্তু অনেক রচনার তারিখ দেখা যাইতেছে ১৯১২ সাল। লেখকের বাল্যের রচনা হয়ত জীবন-সায়াহ্নে ১৯৫০ সালে মুদ্রিত হইয়াছে। নিজের রচনার প্রতি প্রীতিবশতই ইহা যে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বোঝা গেল।

নব মেঘদূত—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সারস্বত মন্দির, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। পূর্ব মেঘে ও উত্তর মেঘে বইটি বিভক্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাণী রহিয়াছে; পূর্ব মেঘের ভূমিকা লিখিয়াছেন কবিশেখর কালিদাস রায়, উত্তর মেঘের ভূমিকা লিখিয়াছেন সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রচনাগুলি উপভোগ্য হইয়াছে; ইহা ছাড়া বলিবার আর কিছু নাই।

জ্যোতিষী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মহেন্দ্র পুস্তক ভবন। ২বি, নেবুবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

এই পুস্তকে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, লেখক ইতিপূর্বে ১৮টি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহা হইলে এই পুস্তক ১৯তম গ্রন্থ। লেখক 'নিবেদনে' যা বলেছেন এই গ্রন্থের পরিচয় সম্বন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট। 'দেশ' কাগজে জ্যোতিষী নামে আমার একটি গল্প বেরয়। গল্পটি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়, এমনি ছোট গল্পের তাগিদে লেখা। কিন্তু কোন এক বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকদের চোখে গল্পটি পড়ে এবং তাঁরা আমার কাছ থেকে কাহিনীটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই চিত্রনাট্যেরই উপন্যাস-রূপ।'

আহ্বান—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ আশ্রম, শিলচর, আসাম। মূল্য বারো আনা।

বেদনাভারাক্রান্ত মনের আক্ষেপ ও অনুরাগের দ্বারা রচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কোনো কোনো কবিতার বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশণ্ডী

জয়পুর চরকা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সমবেত সূত্রযজ্ঞে বিলম্ব করিয়া আসায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের জরিমানা দিতে হইয়াছে। জরিমানার পরিমাণ স্বহস্তে কাটা এক লাছি সুতা। সভাপতি মহাশয় নিজ হাতে দু লাছি সুতা কাটিয়া প্রাপ্যের অতিরিক্ত শোধ করিয়াছেন।

—আমাদের মতে সভাপতি মহাশয় প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিয়া পুনরায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিচারপতিগণ যদি কাহাকেও একশো টাকা দণ্ড দেন আর আসামী যদি তাঁহাদের নাকের উপর দুই শত টাকা ছুঁড়িয়া মারে তাহা হইলে আইন তাহাকে আরও গুরু দণ্ড দিবে। জয়পুর চরকা পরিষদের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সুতার পরিমাণ বাড়াইয়া একখানি কাপড় বুনিবার মত সুতা কাটাইয়া লইলে ভাল করিতেন।

* * *

পলাশী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, পাকিস্থান সীমানা পার হইয়া কয়েকজন মুসলমান আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হইয়া ভারতীয় গ্রামের বহু ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানে বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী বাহিনীর মাত্র কয়েকজন লাঠি হাতে সীমানা রক্ষা করেন।

—খবরটা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা সম্পূর্ণ অহিংস। রক্ষিবাহিনী লাঠি হাতে করিয়া সীমানা পাহারা দেয় কোন্ সাহসে? আমাদের মনে হয় অবিলম্বে ইহাদের লাঠি কাড়িয়া লইয়া পায়চারি করিয়া সীমানায় ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করা হউক।

* * * * *

কানপুরের পঞ্চাশজন ব্যবসায়ী পনেরো মাসে সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়াছিলেন, কিন্তু আয়কর তদন্ত কমিশন তাঁহাদের ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আপাতত চার কোটি টাকা সহজ কিস্তিতে যাহাতে আদায় হয় এবং তাঁহারা যাহাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য তদন্ত কমিশন কিস্তিতে টাকা পরিশোধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

—ইঁহাদের এতখানি জামাই-আদরের ব্যবস্থা কেন হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা কিস্তিমাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুনরায় কিস্তির সুযোগ দেওয়াটা কি ঠিক হইল?

* * * * *

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণুবিৎ অধ্যাপক জে এফ্ গেরিয়ার বলিয়াছেন যে, রাশিয়া ও আমেরিকার যেটুকু সামর্থ্য আছে তদ্দ্বারা আণবিক বোমা প্রস্তুত করিয়া পৃথিবী ধ্বংস করিতে বিশ হাজার বছর লাগিবে।

—আমাদেরও তাহাই মনে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি দ্বীপে আমেরিকা বোমা ফেলিয়া দুইটা ছাগকেও শেষ করিতে পারে নাই। অনেকে সেই দেখিয়া বলে যে পৃথিবীতে আণবিক বোমা মাত্র দুইটিই তৈয়ারী হইয়াছিল। হিরোসিমা ও নাগাসাকির পরেই তাহা খতম হইয়া গিয়াছে, অতএব আপাতত ভাবনা করিবার কিছু নাই।

* * * * *

তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকার যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া চীনের জনসাধারণ নাকি আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছে।

—আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন তাই দুঃখের উপর দিয়াই এযাত্রা ধাক্কাটা সামলাইয়া লওয়া গেল, নচেৎ গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারিত। কেহ কাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে যদি তাহার হাত চাপিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তো ক্ষেপিয়া যাইবারই কথা। চীন ধৈর্যশীল তাই দুঃখ বোধ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

* * * * * *

মসিয়ে ভিসিনস্কি বলিয়াছেন যে, সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিতে পারে।

—সে তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়া ও আমেরিকা কেমন কাঁধ ধরাধরি করিয়া পাশাপাশি শান্তভাবে বসিয়া আছেন।

* * * *

রাষ্ট্রপুঞ্জে বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের আলোচনা চলিতে পারে কিনা এবং এ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার আপত্তি নাকচ করিবার অধিকার আছে কিনা তাহা লইয়া ভোট গ্রহণ করা হয়। রাশিয়া কিন্তু এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ের ভোটাভুটিতে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে—সে কাহারও পক্ষে ভোট দেয় নাই।

—দিবেই না তো। নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতা রাশিয়া এখন ধনতন্ত্রবাদীদের সহিত পাশাপাশি বাস করিতে চাহিতেছে, তাহার প্রমাণ দিবার জন্য এরূপ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক।

* * * * *

পূর্ববঙ্গ সরকারের অসামরিক দেশরক্ষা দপ্তর প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ সহরগুলির জন্য বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

—এই সব দেখিয়াই তো নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফল কতটা ফলিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

* * * * * *

কলিকাতা শহরে প্রায় প্রত্যহই বহু এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে বা সন্ধ্যালোকে জনকোলাহলমুখরিত পথেও দস্যুবৃত্তি চলিতেছে। পুলিস ইহাদের এখনও সায়েস্তা করিতে পারে নাই।

—স্বাধীন হইবার পর হইতে চোর-ডাকাতের কাছে পুলিস এতখানি পরাধীন হইয়া পড়িল কেন, তাহা গবেষণার বিষয়।

* * * * *

রাষ্ট্রপুঞ্জে জাতীয়তাবাদী চীন প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ টি এফ সিয়াং বলিতেছেন যে, ভারত জাতীয়তাবাদী চীনকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহারা আসলে যে সমাজতন্ত্রবাদী, ভারত তাহা বুঝিতে পারে না। তিনি বলেন আমরা ইহা প্রচার করি না, কারণ আমরা জানি এদেশ সমাজতন্ত্রবাদ চায় না।

—ভারত তাহা হইলে ভুল বুঝিল

কিরূপে? জাতীয়তাবাদী চীন ভিতরে ভিতরে সমাজতন্ত্রবাদী কিন্তু তাহার দেশবাসী সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে, অতএব তাঁহাদের ঠেলিতে ঠেলিতে ফরমোজায় পাঠাইয়া দিয়াছে, এটা ভারত বুঝিয়াছে বলিয়াই তো আর জাতীয়তাবাদী চীনকে সমর্থন করে না, তাঁহাদের অধিকসংখ্যক দেশবাসীকেই সমর্থন করে।

* * * * *

লুধিয়ানায় শাস্ত্রানুযায়ী সত্তর বৎসর বয়স্ক ভগৎ সিং এবং ষাট বৎসর বয়স্কা বিবিরাম কাউরের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর ও কনে উভয়েই কখনও বিবাহ করেন নাই। উদ্বাস্তু হিসাবে এখানে আসিয়া পরিণয় সমাধা করিয়াছেন।

—খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। বিবাহের পর বাস্তুও বাঁধিতে পারিবেন এবং যে আক্কেলটুকু এতদিন পান নাই, এইবার হাড়ে হাড়ে মালুম করিতে পারিবেন।

* * * * *

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ভূতপূর্ব সদস্য ও সমাজবাদে বিশ্বাসী অপরাপর কংগ্রেস কর্মিগণ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আর একটি দল বাঁধিয়া যাহাতে থাকিতে পারেন, তাহার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলেই তাঁহারা সম্মেলন আহ্বান করিবেন।

—কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রমাগত দল পাকিতে থাকিলে সভাপতি মহাশয় কোন দলে থাকিবেন তাহা হইলে? অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে এবং এখানে যেরূপ দলাদলির ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে সভাপতি মহাশয়কে না শেষ পর্যন্ত দলাই লামার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

বেতার প্রসঙ্গ

অল্পদিন হল কলিকাতায় বেতার কেন্দ্রে 'বাঙলার নিজস্ব' নাম দিয়ে বাঙলাদেশের লোকসংগীতের একটি বিশেষ আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার প্রথম কার্যসূচীতে ছিল 'বর্ধমানের বাউল সংগীত' ও কিছুদিন আগে বসেছিল ঝুমুর গানের আসর। বেতারের এই বিশেষ আসর সম্বন্ধে আমাদের মত গ্রামসম্পর্ক-শূন্য অনেকেই খুব আনন্দিত হবেন। কিন্তু যারা এ বিষয়ে একটুও খবর রাখেন, তারা হয়তো মনে করছেন যে, এই আসর সাজিয়ে বেতার পরিচালকরা শহরের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছেন, কিম্বা তারা নিজেরাও এবিষয়ে একেবারেই কোন খবর রাখেন না।

'বর্ধমানের বাউল' নামে যা শোনান হল, শ্রীযুত তারাপদ লাহিড়িকে দিয়ে, তা সত্যিই কি বর্ধমানের প্রকৃত বাউল সম্প্রদায়ের গান, না বর্ধমানবাসী, কিম্বা কলিকাতাবাসী কোন আধুনিক সংগীতকার ঐ নামে গান রচনা করে দিয়েছেন? আমরা জানি, গত ৬০।৭০ বৎসর ধরে কলিকাতাবাসী বহুশিক্ষিত সংগীতকার, বাউলদের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ঐ নামেই বহু গান রচনা করে গেছেন, অথচ তারা কেউই কোনদিন বাউলদের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। আবার এমনও জানা যায় যে, কলিকাতা অঞ্চলে এমন সব সৌখিন বাউলদল ছিল, যাদের কথামত গান রচনা করতে হত কলিকাতাবাসী এইসব কবিদেরই। এইভাবে বাউলের নামে অনেক রকমের গান বাঙলাদেশে ছড়িয়ে গেছে। যে কারণে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ঝুমুর বা গৌরনিতাই বিষয়ক ভক্তিমূলক গানও বাউল নামে আজকাল যথেষ্ট শুনতে পাওয়া যাবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের বা সীমার মধ্যে অসীমের যোগের গান আজকাল খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত বাউল আদর্শের গান ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত যা সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা অতি সামান্য। এবং পুস্তকাকারে বা পত্রিকায় প্রকাশিত সংগ্রহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংগৃহীত সামান্য কিছু গান সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রকৃত বাউল ভাবধারার পরিচয়ের পক্ষে তা আদর্শস্থানীয়। যদিও সে সংগ্রহও খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু শিলাইদহ অঞ্চলের বাউলদের কাছ থেকে বেছে নেওয়া সেই গানগুলির চেয়ে প্রামাণ্য ও সুন্দর বাউল গানের সংগ্রহ এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। তার মধ্যে গগন হরকরা রচিত 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে' গানটির কথা অনেকেই শুনে থাকবেন।

কলিকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে বর্ধমানের বাউলের আসরে, আরম্ভে পরিচয় হিসেবে, বাউলের তত্ত্ব নিয়ে যে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা হয়েছিল, তার সঙ্গে সবকটি গানের ভাব সামঞ্জস্য ছিল কি?

বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত কোন বাউল যখন গান রচনা করে তখন গানের ভণিতায় তার নামটা তারা জুড়ে দেয়। শিষ্যপরম্পরা সে গান গীত হলেও গানের শেষে নামটি থাকাতে রচয়িতাকে জানা যায়। এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম দেখা গেছে অন্যদের দ্বারা রচিত বাউল গানের বেলায়। শহরবাসী, বাউল সম্প্রদায়ের বাইরের শিক্ষিত কবিরা, বিনা ভণিতাযুক্ত বহু বাউল গান রচনা করে গেছেন। তারা নাম দেননি। নমুনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বাউল সুর ও ভাবের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' বা 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' গান দুটির দিকে সকলকে দৃষ্টি দিতে বলি।

বেতারে-গীত গানগুলির সব কটিতে ভণিতায় রচয়িতার নামের পরিবর্তে আছে 'বাউল বলে' ইত্যাদি কথাটি। ঠিক এই ধরণের ভণিতাযুক্ত বাউল গান আছে কিনা আমরা আগে তা কখনো শুনিনি। এইরূপ ভণিতা আমাদের কাছে বেশ একটু অভিনব বলে মনে হল। যদি হালের কোন কবির রচনা না হয়ে কোন বাউলের রচনা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, বেতার পরিচালকদের এ কথাটি নতুন আবিষ্কার। কিন্তু একটি কথা সকলেরই জানা থাকা উচিত যে, 'বাউল' শব্দটি শিক্ষিতদের মধ্যে যতটা প্রচলিত হয়ে পড়েছে, প্রকৃত বাউলদের মধ্যে তার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। এমন কি গ্রামবাসীরাও 'বাউল' কথাটার সঙ্গে খুব পরিচিত নয়, তারা এদের জানে 'খেপা' নামে। তাদের গানকে বলে খেপার গান।

বেতারে এই গান কটিকে এমনভাবে প্রচার করা হল যে, তাতে সকলেই মনে করেছিল, নিশ্চয়ই এমন কিছু বিশুদ্ধ জিনিস এতে পাওয়া যাবে যা সচরাচর শোনা যায় না। অন্তত যা শুনে আধুনিক ও অনামা কবির রচনা বলে মনে সন্দেহ জাগবে না। কিন্তু সেই সন্দেহ মনে জেগেছে বলেই এত কথার অবতারণা করতে হল। আমাদের সেইজন্যেই বলতে হচ্ছে যে, বেতার পরিচালকদের এসব বিষয়ে আরো একটু সতর্ক হওয়া দরকার। বিশেষ বিজ্ঞাপন দ্বারা একরকমের ঔৎসুক্য শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে, কাজের বেলা তা পরিপূরণ না করে সন্দেহ জাগানো ঠিক নয়। অবশ্য উত্তরে পরিচালকরা হয়তো বলবেন যে, অধিকাংশ শ্রোতাদের মনে ত কোন সন্দেহ জাগেনি সুতরাং দু-একজনের মনে যদি তা জাগে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তার উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, বেতারের শ্রোতারা অধিকাংশই যে বাউল সম্প্রদায় বা তাদের গান বিষয়ে কিছুই জানে না একথা বেতার পরিচালকরা নিশ্চয়ই জানেন, সুতরাং তাদের মনে সন্দেহ না জাগাটা কিছু আশ্চর্যের নয়।

এই ধরণের বিশেষ কার্যসূচীর শিক্ষামূলক দিকটিও হল এর একটি বড় দিক, সে কথা ভোলা উচিত নয়। এই রকমের কার্যসূচী রচনার ভিতর দিয়ে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কথাই উৎসাহী শ্রোতাদের মনে জাগে।

না হলে সাধারণ কার্যসূচীতে এসব গানকে 'বাউল গান' নামে গওয়ালে নিশ্চয়ই এ ধরণের প্রশ্ন কেউ তুলত না।

'বাঙলার নিজস্ব' নামে এই বিশেষ আসরের বেলায়, তার শিক্ষামূলক দিকটিকেও যেন পরিচালকরা সব সময় মনে রাখেন। তথ্যানুযায়ী গানগুলি নির্বাচিত হলেই এ আসর সার্থক। তা না হলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে যে, পরিচালকেরা লোক ঠকানো কার্যসূচীতে শ্রোতাদের পরীক্ষা করছেন।

কয়েকটি চিঠি

(১)

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনাদের বহুল প্রচলিত 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে আমি বেতারের বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে উক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একদিন (সোমবার সকালে) 'সবিনয় নিবেদন' নামক যে দশ মিনিটের অনুষ্ঠানটি হয় তা কি বেতার কর্তৃপক্ষ একান্তই 'না দিলে নয়' বলিয়া 'বেগার ঠেলা' কাজ সারেন? বিরাট বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে যে অসংখ্য বাঙালী শ্রোতা আছেন, আশা করি বেতার কর্তৃপক্ষ এটা অস্বীকার করবেন না, এবং অগণিত শ্রোতা যে 'বেতার অনুষ্ঠানে'র নানারূপ দোষত্রুটির সমালোচনা ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠান, এটাও ঠিক। তা হ'লে সপ্তাহের মধ্যে একদিন মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে "শ্রোতাদের পত্রের উত্তর" দেবার নাম করে যে প্রহসনের সৃষ্টি করা হয় তা কি কোন রকমে কাজ সারা গোছের কাজ নয়? এই ধরণের 'নামমাত্র' অনুষ্ঠান থাকার কি অর্থ হয়? সারা সপ্তাহ ধরে যে সমস্ত পত্র শ্রোতাদের কাছ হ'তে আসে তার সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু এতগুলো পত্রের মধ্যে মাত্র ২খানি পত্রের উত্তর পাওয়া যায়। তাও "উত্তরদাতার" বিনয় বাক্যে অর্ধেক সময় কেটে যায়।

তারপর উত্তরদাতা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। যদিও তাঁর নাম প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের নিকট পরিচিত। তিনি বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত করার সময় কণ্ঠস্বরটি এমন অস্বাভাবিক করে ফেলেন যে, বিনীত হচ্ছেন কি ব্যঙ্গ করছেন বোঝা মুশকিল, 'সবিনয় নিবেদন' বলে কি বিনয়ের অবতার হতে হবে?

ইতি—শ্রীগোবিন্দ মতিলাল।

(২)

দেশ পত্রিকা সম্পাদক সমীপেষু

মাননীয় মহাশয়,

বেতারের কয়েকটি বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। 'সবিনয় নিবেদন'এ লিখলে তাঁরা কেবল 'কাটান'ই দেন। তাই আপনাদের কাছে লেখা আমার এই চিঠির মারফৎ বেতারের কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের এবং বেতার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথম। প্রতি মাসে বা প্রতি ঋতুতেই নতুন নতুন বহু গান বা কমিকের রেকর্ড বের হয়; সিনেমার গান তো আছেই। কিন্তু আমাদের কলকাতা 'বেতার স্টেশন' সেই যে পুরান গান বা একচেটিয়া কমিক ধরে বসে আছেন, এর আর অদল-বদল হয় না। তাঁরা বোধহয় ভুলে যান যে, সব সময় "পুরোন চাল ভাতে বাড়ে না।"

দ্বিতীয়। ছোটদের বৈঠক "অধুনা গল্পদাদুর আসর", যখন দাদুমণি পরিচালনা করতেন তখন গল্প হোত; হেমেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি লেখকরা তাঁদের নিজেদের লেখা 'রহস্য সিরিজ' থেকে গল্প বলতেন। মহাপুরুষদের 'জীবনী'ও আলোচিত হোত। কিন্তু এখন কি কালোদা আর কিইবা জয়ন্ত চৌধুরী আসরের নামে তাঁরা কেবল ছেলেখেলাই করেন! প্রশ্নের উত্তর যাও-বা দু'একটা দেন তার তো একাটাতেই ৫ মিনিট কেটে যায়। আসর হয় মাত্র ৩০ মিনিট, তার মধ্যে ১৫।২০ মিনিট যদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় তাহলে চিঠিপত্রের উত্তর বা অনুষ্ঠান কোনটাই সম্পূর্ণভাবে হয় না।

তৃতীয়। 'শিশু মহল' হয় মাত্র ১৫ মিনিট, সময় হিসেবে এর অনুষ্ঠান হয় অনেক। এর সময় আরো কিছু বাড়ানো উচিত।

চতুর্থ। 'লাউডস্পীকার' যখন চিঠির উত্তর দিতেন তখন প্রত্যেক চিঠিরই ভালোভাবে সমালোচনা কর্তেন এবং ৪।৫ জনের চিঠির উত্তর দিতেন। উপস্থিত যিনি এসেছেন তিনি গলা চেপে থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে 'সিনেমার ঢঙে' দু'একজনের যাও-বা উত্তর দেন, তাও তালগোল পাকিয়ে যায়, যথাঃ—"অমুক লিখছেন এই কিন্তু চোখ ফিরিয়েই আমরা দেখতে পাই তমুক লিখছেন ঐ"। এই ধরণের আর কি। সবিস্তারে বা সুষ্ঠুভাবে একটা চিঠিরও উত্তর দেন না।

এ বিষয়ে আমি কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে অনুরোধ করি। আশা করি, আমার এই চিঠি আপনাদের পত্রিকার 'বেতার প্রসঙ্গে' স্থান পাবে। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

বিনীতা—লতিকা ঘোষ।

(৩)

শ্রদ্ধেয় 'দেশ' সম্পাদক মহাশয়,

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শতাধিক পত্র লিখলেও তার কোন জবাব না পেয়ে এ পত্র লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, আপনার পত্রিকা চিঠির মূলবস্তু বেতার কর্ণধারগণের দ্বারে পৌছে দিতে সক্ষম হবে। আপনার পত্রিকার বেতার সম্বন্ধীয় নানা প্রকার সমালোচনাদি প্রকাশের সুযোগ লাভ করায় বেতারের উন্নতি বিধানে বিশেষ সহায়তা করবে।

বেতার কেন্দ্র একটি জাতীয় সম্পদ, যেখান হতে সম্ভব হয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও কলার বিস্তার। বেতারের সৃষ্টি ও প্রসার যে শুধু মনুষ্যের চিত্তবিনোদন করছে ও আনন্দ বর্ধন করছে, তা নয়; এর দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করছে। কলকাতা বেতার কেন্দ্র বাঙলার একটি মাত্র কেন্দ্র ও বাঙলার শ্রোতৃসাধারণের নিকট অতি প্রিয়। বেতার কর্ণধারগণ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন না। তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে, এক রকম বলা যেতে পারে স্বেচ্ছাচারভাবে দৈনন্দিন অনুষ্ঠানাদি পরিবেশন করে যাচ্ছেন, সহস্র শ্রোতাকে প্রতারিত ও অবজ্ঞা করে। তাঁদের অন্তরে এ ভাব এখনও জাগে নি যে, শ্রোতৃসাধারণের রুচির উপর বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। বেতার-কেন্দ্র একা গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। এখানে জনমত আবশ্যক। বাঙলা ও প্রবাসী বাঙালীর মতামত উপেক্ষা করে বেতার পরিচালনায় কলকাতা কেন্দ্র ক্রমশঃ নীচে নেমে আসছে।

ছাত্রদের বেতার অনুষ্ঠান উপভোগ করবার অসুবিধার সৃষ্টি—এই দিয়ে বেতার কেন্দ্রের অবিচারের অবতারণা করছি।

ছাত্রদের বেতার থেকে কি সুবিধা প্রদান করা হয় জানি না। তবে কতকগুলি ছাত্রোপযোগী অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির সময়গুলি এমন সময় নির্ধারিত হয়েছে যা ছাত্রদের পক্ষে শোনবার অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রথমতঃ কলকাতা কেন্দ্রের "গল্পদাদুর আসর" বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষে এ সময়টা যে কত অসুবিধাজনক তা বেতার পরিচালকবৃন্দ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। তা ছাড়া বিকেল ৫টায় ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষে রেডিওর সামনে উপবেশন করে থাকা কি সম্ভব? এই সময় অধিকাংশ ছাত্র ও ছাত্রীরা খেলাধুলায়, ভ্রমণ, গল্পগুজব এবং আরও অনেক প্রকারের চিত্তবিনোদনের কাজে ব্যস্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, "বিদ্যার্থীমণ্ডল" অনুষ্ঠানটি যে সময়ে প্রচারিত হয় সে সময়টা ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষে রেডিও শুনা যে কতখানি দুরূহ তা বলা কঠিন। এই সময় সকল ছাত্র ও ছাত্রী পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকে। কাজেই পড়াশুনা ত্যাগ করে রেডিও শুনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা ছাড়া পিতামাতার দিক থেকেও এই কাজ করতে ব্যাঘাত আসতে পারে। ঠিক একই কারণে ছাত্র ও ছাত্রীরা কলকাতা কেন্দ্রের নাটকাদি থেকেও বঞ্চিত। বেতার কর্ণধারগণ আশা করি, ছাত্রদের এই অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেবেন।

তারপর কলকাতা কেন্দ্রের "ব্যায়াম শিক্ষা" সম্বন্ধে বলব। দেহচর্চার দিক থেকে এই অনুষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। কিন্তু দেহচর্চার একটা বাধাধরা নিয়ম নির্ধারিত

আছে। এই অনুষ্ঠানের শিক্ষক মহাশয় প্রতিদিনই এক একটি নতুন ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন এরকমভাবে নতুন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কি? যে ব্যায়াম একবার শিক্ষা দেওয়া হয় সে ব্যায়ামের সম্পূর্ণ অভ্যাস না করেই অন্য ব্যায়াম শিখান কি একজন অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের পক্ষে উচিত? তারপর, প্রাতেই যে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিকেল বেলাতেও এ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হতে পারে। বেতার পরিচালকবৃন্দ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেবেন আশা করি।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে যে হাস্যরস বিতরণ করা হয় তা মোটেই কৌতুকপ্রদ নয়। কৌতুক-নক্সা প্রযোজকগণ অতি সাধারণ ঘটনাকে (যা মোটেই কৌতুক বলে অভিহিত করা যায় না) নক্সার ভিতর পরিবেশন করেন। মানুষের হাসির উৎস অতি তুচ্ছ কারণে উত্থিত হয় না। কৌতুক নক্সা প্রচারকালে সমস্ত নক্সাটির পরিবেশের মধ্যে এমন একটি ঘটনার আবির্ভাব করতে হবে যা শ্রোতৃসাধারণের হাসির খোরাক বেশী পরিমাণে যোগাতে পারে। কলকাতা কেন্দ্রের কৌতুক নক্সাগুলিকে কোন দিক থেকে পরিচালকবৃন্দ হাস্যরসাত্মক অনুষ্ঠানরূপে অভিহিত করেন বলা কঠিন। কেননা, এই নক্সাগুলিতে হাসির কোন চিহ্নও বর্তমান থাকে না। কৌতুক-শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে নক্সায় অভিনয় না করতে দিয়ে নক্সার হাসির খোরাক অনেকখানি কমে যায়। ভবিষ্যতে যখন কোন নক্সা প্রচারিত হবে আশা করি, প্রযোজকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রেখে নক্সা প্রচার করবেন। নমস্কার। ইতি—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বসু।

(৪)

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

বিভিন্ন পত্রিকায়, বিভিন্ন লোকের দ্বারা কলকাতা বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে নানা রকমের আলোচনাই হয়েছে। তবুও আমি আজ আরো কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অন্যান্য দোষত্রুটি বাদ দিয়ে সাধারণভাবে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সব গান বা বাজনা শোনা যায় সে সব কতখানি পরিতৃপ্তিকর হয় তা শ্রোতা মাত্রেই জানেন। আর তাছাড়া রেকর্ডই অধিকাংশ সময় বাজান হয়। উপরন্তু রয়েছে মাইনে করা স্টাফ আর্টিস্টের দল। ধরে এনে বসিয়ে দিলেই হল। স্টাফ আর্টিস্টরা যখন সংগীত পরিবেশন করেন তখন তা কতদূর অশ্রাব্য হয় তা কাকে বলব। অমৃতলাল রায়, নারায়ণ পালুই, অমিয় অধিকারী, সাগিরুদ্দিন সাহেব এ'রা তো বাঁধাধরা। এ'রা হয়ত প্রত্যেকেই গুণীলোক। কিন্তু যখন বাঁধা মাইনের উপর উপরি খাটতে হয় তখন সেটা কাজসারা গোছের হতে বাধ্য। কেননা ও'দের তো আর "নাম প্রচারের" প্রয়োজনীয়তা নেই। কেন বাজারে কি ভাল আর্টিস্ট নেই? আছে তো নিশ্চয়ই—তবে কি অর্থাভাব? সেটা বল্লেই তো হয়। কিন্তু অর্থাভাব হবে কেন? যদি বলা হয় যে বেতার মারফৎ যে অর্থ আয় হয় এবং বেতার কেন্দ্রের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ আছে তার mal-adjustment হচ্ছে তবে কি সেটা খুব মিথ্যা বা অন্যায় বলা হবে? কিন্তু জনসাধারণের অর্থ নিয়ে তাঁদের ভাল জিনিস পরিবেশন করা কী বেতার কর্তৃপক্ষের নৈতিক কর্তব্য নয়? এর জবাব কে দেবে?

মাঝে মাঝে বেতার কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি দেখে হাসি পায়। যখন জনসাধারণ তাঁদের অর্থে বাইরের গুণী লোক এনে সংগীত পিপাসা মেটায়—তখন বেতার কর্তৃপক্ষ 'রিলে' করে ধন্যবাদার্হ হতে চান। শুধু তাই নয় সবিধা হলে তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে কিছু টাকা দিয়ে "স্টীল রেকর্ড" করে রাখেন এবং সারা বৎসর ধরে তাই বাজান। যেমন এবার সানাই বাদক প্রোঃ বিস্‌মিল্লা খানের পার্টির রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। কেন এ'দের sitting দিলে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের গৌরব কি কোন অংশে কম হতো?

সাধারণ গাইয়ে-বাজিয়েদের programme শুনে আমরা ভাবি—কলকাতা বেতার কেন্দ্র আজকাল যাকে তাকে ধরে এনে বসাচ্ছে। কিন্তু সব চাইতে মজা হচ্ছে এই যে, যাকে তাকে ধরে এনে গাওয়ালে এ'দের "মহড়া" অর্থাৎ audition দেবার কায়দাকানুন নিয়মপদ্ধতির গুরুত্ব যদি একবার দেখেন, বেতার কেন্দ্রকে ভক্তি না করে উপায় নেই। বাজিয়েকে বলা হল—ঢিমে তেতালা বাজান, পা বর্জিত কোমল রেখাতে রাতের রাগিনী বাজান, গাইয়েকে হেন গান নেই যে ফরমাস করা হয়। কিন্তু এতো কেন? ঢিমে তেতালা গৎ কদিন আমরা শুনতে পাই? আর শুদ্ধ রাগরাগিণী কইবা শোনা যায়—বিশেষ বিশেষ গুণী লোক ছাড়া? —কুমারী ভারতী দাস।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক : নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

(দুই)

[প্রথম সওয়াল]

কোর্ট থেকে টেলিফোন মারফৎ কে-কে জানান হ'ল—আগামী রোববারে তার কেস সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক তদন্ত হবে। এর পর থেকে মাঝে মাঝে তদন্ত চলতে থাকবে, অবশ্য প্রতি সপ্তাহেই যে হবে এমন কোন কথা নেই, তবে যত দিন যাবে তদন্তের তারিখগুলো ততই ঘনসন্নিবিষ্ট হতে থাকবে। কেসটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল, কিন্তু তদন্তটা সুসম্পূর্ণ হওয়াও প্রয়োজন। রোববার যে তদন্তের দিন ধার্য করা হয়েছে তার কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র সেদিনই কে-র অবসর রয়েছে, তাই সে দিন তদন্ত হলে কে-র কোন কাজের ক্ষতি হবে না। তদন্তের দিন হিসেবে রোববারটাই কে-র বেশি পছন্দসই হবে, কোর্ট এটা ধরে নিয়েছে। তবে রোববার না হয়ে অন্য কোন দিন তদন্ত হলে যদি কে-র সুবিধে হয় কোর্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সেদিনই তদন্তের ব্যবস্থা করতে। দিনে সম্ভব না হলে রাত্রে তদন্ত হতে পারে। কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কে-র পক্ষে হয়তো এ সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হবে না। এ সব ভেবেই রোববারকেই তারা তদন্তের দিন হিসেবে ধার্য করেছেন এবং আশা করছেন কে সেদিন কোর্টে উপস্থিত থাকবে, অবশ্য রোববার সম্বন্ধে যদি কে-র কোন আপত্তি না থাকে। কোর্টের ঠিকানাটা কে-কে তারা দিয়ে দিলেন, শহরের বাইরের একটা রাস্তার নাম, কে সেখানে যায় নি কোনদিন।

ধীরে ধীরে টেলিফোন রিসিভারটা রেখে দিল কে। এতো কথার উত্তরে একটা কথাও বলে নি সে, একটা কথাও বলল না। মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে যে, রোববার দিনই কোর্টে যাবে। সময় নষ্ট করবার মত যথেষ্ট সময় আর নেই, এ ব্যাপারকে এখানেই শেষ করে দিতে হবে, প্রথম দিনের তদন্তই যেন শেষ তদন্ত হয়। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভাবছিল কে, এমন সময় ডেপুটী ম্যানেজারের আবির্ভাব হল। ডেপুটি ম্যানেজার ফোন করতে এসেছে, কিন্তু কে তখনও ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে।

'কোন খারাপ খবর এলো নাকি?' প্রশ্ন করল ডেপুটি ম্যানেজার। অবশ্য কে-র কোন সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের জন্য যে সে খুব চিন্তিত তা নয়, আসলে কে টেলিফোনের পথটা ছেড়ে দিক, এটাই তার উদ্দেশ্য।

'না, তেমন কিছু নয়'। এক পাশে সরে দাঁড়াল কে।

ডেপুটি ম্যানেজার টেলিফোন তুলে কনেকসনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কে-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা বলবার আছে আপনাকে, হের কে। আসছে রোববার আমার বাড়িতে একটা ভোজসভার আয়োজন করেছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আসেন তাহলে বড় খুশী হব। অনেকেই আসছেন সেদিন, আপনার অনেক বন্ধুবান্ধবও আসবেন। এ্যাডভোকেট হের হাসটেরারও আসছেন। আপনিও আসুন, খুব সুখী হব এলে।'

একটু চেষ্টা করেই ডেপুটি ম্যানেজারের বক্তব্যের দিকে মনটাকে আকৃষ্ট করতে হল কে-র। তার দিক থেকে নেহাৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার মত ব্যাপার না এটা। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের কাছে তার সম্মানের এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধের বেশ একটা পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে। ডেপুটি ম্যানেজার যদিও ফোন কানে করে কনেকশনের জন্যে অপেক্ষা করবার ফাঁকেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছে, সাধারণ ভদ্র প্রথাগুলোও মানেন নি, তবু এই আমন্ত্রণ করতে এসেই কে-র কাছে নিজেকে খানিকটা ছোট করাতে হয়েছে তাকে। প্রথমটা কে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল না। ইচ্ছে, ডেপুটি ম্যানেজার আরও এক আধবার সবিনয় অনুরোধ করুক তার কাছে।

ডেপুটি ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানাল কে, বলল, 'রোববারে একটু ব্যস্ত থাকব।'

'ও। কিন্তু এলে খুশী হতাম।' ততক্ষণে কনেকশন পেয়ে আলাপ আরম্ভ করেছে ডেপুটি ম্যানেজার।

সময় নেহাৎ কম লাগল না আলাপে। কিন্তু কে ততক্ষণ পর্যন্ত টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়েই রইল, দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য কি করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। ডেপুটি ম্যানেজারের আলাপ শেষ হতেই বিমূঢ় অবস্থাটা কেটে গেল কে-র। এ রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকার স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়ে ফেলল একটা, 'রোববার দিন এক জায়গায় যাবার জন্যে ফোন করলেন এক ভদ্রলোক, কিন্তু কখন যে যেতে হবে তাই বলেন নি।'

'ফোন করে জেনে নিন না সময়টা।' ডেপুটি ম্যানেজার বলল।

'থাক। তেমন জরুরী কিছু নয়।'

যেতে যেতে অন্য বিষয়ে কথা পাড়ল ডেপুটি ম্যানেজার। তার কথার উত্তর দিতে থাকলেও কে-র মাথায় তখন কোর্টের চিন্তা ঘুরছে। সকাল ন'টায়ই সাধারণতঃ কোর্টের কাজ আরম্ভ হয়; কে ঠিক করল, রোববার ন'টাতেই কোর্টে যাবে।

রোববারটা কেমন নিরুত্তাপ মনে হল, কেমন ঢিমে তালের। গতকাল গভীর রাত অবধি রেস্তোরায় বসে কাটিয়েছে কে, একটা উৎসব ছিল সেখানে। পরদিন ভোরে নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হল তার। ঘুম ভেঙেছেও একটু দেরীতে। ফলে, ঘুম থেকে উঠে আর এক মিনিটও বসতে পারে নি সে; সকালের খাবার না খেয়েই বেরিয়ে যেতে হল কোর্টে। রাস্তার লোক দেখতে দেখতে যাবার মত যথেষ্ট সময় ছিল না তার, লক্ষ্যই করেনি রাস্তায় যে আরও লোক চলছে, কিন্তু হঠাৎ তারই অধীনস্থ তিনজন কর্মচারী তার চোখে পড়ে গেল, তিনজনেই তার কেসের সঙ্গে জড়িত। রবেনস্টেনার, কুলিক, কমিনার। রবেনস্টেনার ও কুলিক একটা ভাড়া-গাড়িতে বসেছিল, কমিনার বসেছিল একটা বাড়ির বারান্দায়। ভাড়া-গাড়িটা কে-র ঠিক সামনে দিয়েই চলে গেল, কমিনার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে কে-কে দেখে নিল একবার। কে-কে এভাবে ছুটতে দেখে ওদের মনে নিশ্চয়ই কৌতূহল জেগেছে, ওরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে ভাবছে, এমন তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে কে। একটা গাড়ি ডাকবার কথা একবার ভেবেছিল কে, ইচ্ছে করেই ডাকে নি শেষটা। ঠিক ন'টায় গিয়ে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে, এটা মোটেই ভালো লাগছিল না তার। একেবারে ঠিক ঠিক ন'টায় পৌঁছাতেই হবে, এমন কি কথা আছে। কথা ছিল না ঠিকই, ন'টায় কোর্টে যেতে হবে—একথাও কেউ তাকে বলেনি, কিন্তু তবুও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কে হেঁটে চলেছে।

কে ভেবেছিল, দূর থেকেই আদালত-বাড়িটা অনায়াসে চিনে নিতে পারবে। নিশ্চয়ই কোন বিশেষত্ব থাকবে বাড়ির গঠনে, তার চরিত্রে। অথবা বহুলোক দরজার সামনে ভীড় করে কলোচ্ছ্বাস তুলবে। কিন্তু জুলিয়াসট্রাসেতে, অর্থাৎ যেখানে আদালত প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, তেমন কোন বিশেষ চেহারার বাড়ি চোখে পড়ল না কে-র। রাস্তার দু' ধারে ধূসর রঙের বাড়িগুলি সবই প্রায় এক রকম, কোন বাড়ির গঠনে বিশেষ কোন পারিপাট্য নেই। সবগুলি বাড়িতেই নিতান্ত দরিদ্র জনসাধারণের বাস। রোববার বলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির জানালাতেই আজ লোক দেখা যাচ্ছে, কেউ ঝুঁকে পড়ে সিগারেট ফুঁকছে অথবা শিশু কোলে দাঁড়িয়ে আছে।' দু একটা জানালার ওপর স্তূপীকৃত বিছানার বহর, সেখানে এক একটি শ্রান্ত বিপর্যস্ত ঘরণীর মুখ মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার। মাঝে মাঝে বিশ্রী রকম চিৎকার করছে লোকগুলি। কে-র মাথার ঠিক ওপরেই হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল একবার। কে চমকে তাকাতেই হাসির রোল পড়ে গেল। রাস্তার দুদিকের ফুটপাথে সারবন্দি মুদি দোকান রয়েছে অনেক। মেয়েরা ভীড় করছে দোকানে, গল্প করছে জিনিস কিনতে কিনতে। ফলওয়ালা চলেছে ফলের গাড়ি ঠেলে ঠেলে। হঠাৎ পুরোনো একটা ফোনোগ্রাফ চিৎকার করে উঠল কোথা থেকে।

গভীর মনোযোগে জায়গাটা দেখতে লাগল কে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেহাৎ মন্থর গতিতে। যেন অজস্র সময় রয়েছে তার হাতে অথবা এ রকমভাবে যেতে যেতেই হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পাবে, জানালায় দাঁড়িয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে। ন'টা তখন বেজে গেছে। বাড়িটা খুঁজে বের করলে কে। বেশ বড় বাড়ি। বাড়িতে ঢুকবার সদর রাস্তাটা বেশ চওড়া, ট্রাক বা মোটর অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারে এমন করে তৈরি।

বাড়ির বহিরঙ্গটা ভালো করে দেখতে লাগল কে—যদিও এটা তার স্বভাবসঙ্গত নয়। কিছুক্ষণ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কে। একটা লোক খবরের কাগজ পড়ছে বসে বসে, পাশেই দুটো ছেলে খেলছে। কলের কাছে দাঁড়িয়ে জল ভরছে লম্বা রোগাটে একটা মেয়ে, তাকাচ্ছে কের দিকে। বাড়ির উঠোনে দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকোনো হচ্ছে, মাঝে মাঝে চিৎকার করে একটা লোক তদারক করছে তার।

কে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। যে ঘরে সওয়াল জবাব হবে সে ঘরটা খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল কে। শুধু সেই একটাই নয়, আরও তিনটে সিঁড়ি রয়েছে সে বাড়িতে ঢুকবার। একটা সরু গলি পথ দিয়ে ভেতর-কার দিকে তাকাতে কের চোখে পড়ল সে বাড়িরই একটা অংশ, আর এক ফালি উঠান। এতোগুলো সিঁড়ির কোনটা ধরে এগুতে হবে অথবা বাড়ির কোন খণ্ডে আদালত বসেছে বুঝে ওঠা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল কের পক্ষে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম যে সিঁড়ি ধরে এগুচ্ছিল সেটা ধরেই এগিয়ে চলল। চলতে চলতে কোন মহামানবের একটা কথা মনে পড়ল কের। তিনি বলেছেন, অপরাধ এবং আইনের মধ্যে একটা গভীর আকর্ষণ আছে। তাই কের মনে হল, সে যেদিকে চলেছে সেটাই ঠিক পথ, আদালত ঘরটাও নিশ্চয়ই সেদিকে।

কয়েকটা ছেলে খেলা করছে সিঁড়িতে। কে ওদের মধ্য দিয়েই পথ করে চলে গেল। ওদের খেলায় বাধা পড়ল খানিকটা, একটু যেন চটে গেল ছেলেগুলি। কে ভাবল, আবার কোনদিন যদি এখানে আসতে হয় তাকে, কিছু চকোলেট নিয়ে আসবে পকেটে করে অথবা বেত আনবে একটা।

দুতলায় উঠে খুঁজতে আরম্ভ করল কে, আদালত ঘরটা কোথায়। সোজাসুজি কাউকে আদালত ঘরের কথা জিজ্ঞেস না করে একটা বিচিত্র লোককে আবিষ্কার করে নিল কে—ল্যানজ। ফ্রাউগ্রুবেকের ভাইপোর নামও ল্যানজ। ল্যানজ নামটা তাই এতো চট করে মনে পড়ে গেল কের। প্রত্যেক ঘরের দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল ল্যানজ বলে কোন বাসিন্দা সেখানে বাস করে কিনা। বাস কে করে না, তা কি আর কে জানে না। তবু ঐ ফাঁকে উঁকি মেরে ঘরের মধ্যটা দেখে নেওয়া গেল। কে দেখল আদালত ঘর খুঁজবার এটাই সব চেয়ে সহজ পন্থা। বেশী হাঙ্গামা কিছু নেই। অধিকাংশ ভাড়াটেই একখানা ঘর নিয়ে আছে, সঙ্গেই ছোট একখানা রান্না ঘর। বউটি রান্না করছে স্টোভে এক হাতে, অন্য হাতে ছেলেকে কোলে করে আছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক কোন ঘরেই বিছানা বড় একটা খালি পড়ে নেই, কেউ না কেউ শুয়ে আছেই; যাদের অসুখ তারা তো আছেই, তাছাড়া অনেকে ঘুম থেকে ওঠে নি তখনো। অধিকাংশ ঘরেই দরজা খোলা। দু'একটা ঘর বন্ধ রয়েছে। কে কড়া নাড়তেই একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলল, কের প্রশ্নটা শুনল তারপর ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্নটা শোনাল আর একজনকে। সে বোধহয় তখনো শুয়েই ছিল, এবার উঠে বসল, জিজ্ঞেস করল, 'ল্যানজ?'

'হ্যাঁ, ল্যানজ'। কে বলল। অবশ্য তার আসল প্রয়োজন সেখানেই শেষ হয়েছে। ল্যানজ নামধারী লোকটিকে কের নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন, অনেকের মুখেই এরকম একটা ভাব দেখা গেল। অনেকেই নামটা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল, ভাবলও কিছুক্ষণ, ল্যানজ নাহলেও প্রায় ঐ ধরণের নামওয়ালা দু'এক ভাড়াটের কথাও বলল, কেউ তার পরশির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এলো—ল্যানজ বলে কেউ সেখানে আছে কিনা, কেউ আবার কে-কে নিয়ে খানিক দূরে একটা ঘরে গেল—তার ধারনা সে ঘরে ল্যানজ বলে হয়তো বা কেউ থাকতেও পারে। এমনি করে সমস্ত ফ্ল্যাটটা দেখা হয়ে গেল কে-র। কিন্তু আদালত ঘরের কোন চিহ্নও নেই।

একটি লোক তখনো তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পাশের একটা ঘরে নিয়ে যাবে, সেখানে হয়তো ল্যানজ বলে কেউ থাকতে পারে। কে তখন হতাশ হয়ে পড়েছে, খোঁজাখুঁজি করবার আর ইচ্ছে নেই, ব্যর্থ মনে হচ্ছে সব। সুতরাং সজ্জন সঙ্গীটিকে বিদায় জানিয়ে ছ'তলার সিঁড়ি থেকে ওপরে না গিয়ে সোজা নীচে নেমে এলো। ঠিক করলো, আর খোঁজাখুঁজি করবে না। কিন্তু তা হলে তো সমস্ত অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে গেল—মনে মনে ভাবল কে। ভেবে রীতিমত চটেই গেল সে। না, এভাবে চলে যাওয়া যায় না, তাই আবার ছ'তলায় গিয়ে উঠলো কে। উঠেই একটা বড় পেণ্ডুলাম ঘড়ি চোখে পড়ল তার—ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে তখন।

বালতির মধ্যে জল নিয়ে ছেলেদের জামা-কাপড় ধুচ্ছিল একটি মেয়ে। কে তাকেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ল্যানজ বলে কেউ থাকে এখানে?'

ভিজে হাতে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিল মেয়েটি, 'ঐ ঘরে যান।' (ক্রমশ)



আলোচনা

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতি

মাননীয় মহাশয়,

গত ৬ই আশ্বিনের (23rd September) 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅদিতি রায়ের 'বুনিয়াদি শিক্ষার প্রগতি' প্রবন্ধটি পড়ে বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Training) সম্বন্ধে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হয়েছে, সেইগুলিই লিখে পাঠালুম।

আজ গণতান্ত্রিক ভারতে আমাদের বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Training) যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে একথা অনস্বীকার্য। আজ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মান এমন একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে, যাতে করে ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারলে আমাদের দেশের ছেলেদের পক্ষে অর্থোপার্জন দুঃসাধ্য। তাই ছেলে যাতে অর্থ উপার্জন করতে পারে এই আশায় দরিদ্র পিতামাতা অনাহারে দিন গুজরান করেও তাঁদের ছেলেদের ম্যাট্রিক পাশের তাগিদে তাঁদের বুকের রক্ত হিম করা অর্থ ঢেলে দিচ্ছেন অকাতরে। কিন্তু সেই ছেলে যখন ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে এল তখন দেখা গেল, উপযুক্ত শিক্ষা ত দূরের কথা, সে তার জীবিকা নির্বাহের অর্থটুকুও উপার্জন করতে অসমর্থ। কোথায় গেল দরিদ্র পিতামাতার আশা-ভরসা? জীবনযাত্রার দুর্বিষহ চাপে পড়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন ধ্বংসের মুখে। কিন্তু কেন এমন হয়? এর মূলানুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ছেলেকে অর্থ উপার্জনের তাগিদে ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট কিনতে পাঠান হল সে কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। তার মন হয়ত চায় বাগান করতে অথবা মিস্ত্রির কাজ শিখতে। কিন্তু পিতামাতার মনে এই ধারণাই দৃঢ়মূল যে ম্যাট্রিক পাশ না করলে ছেলে অর্থোপার্জন করতে পারবে না। তাই তাঁরা তাঁদের ছেলেদের বেঁধে ধরে পাঠালেন স্কুলে। কিন্তু ফল হল বিপরীত; ছেলে ফিরে এল পিতামাতার বোঝা হয়ে। কিন্তু তার মন যেদিক দিয়ে গড়ে উঠতে চেয়েছিল, সেই দিক হতে সে যদি কোন রকম সাহায্য পেত, তাহলে তার জীবন আজ এমনভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হত না; এমনভাবে আশা ভেঙে যেত না তার দরিদ্র পিতামাতার। তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা হত না অবসিত। তাই তার জীবনকে গড়ে তুলতে, তার পিতামাতার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করতে, চাই বুনিয়াদি শিক্ষা।

এই বুনিয়াদি শিক্ষা লাভের জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে হবে। তার ফলে আক্ষরিক জ্ঞান এবং বাহিরের আরও কিছু জ্ঞান তারা আহরণ করতে পারবে। শুধু অর্থোপার্জনের পন্থাই ত বেছে নিলে চলবে না। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সংগে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে তাদের; স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে অন্য দেশের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে তাদের। তাই বুনিয়াদি শিক্ষার সংগেও চাই আক্ষরিক জ্ঞান।

বুনিয়াদি শিক্ষা দেবার সময় এক বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে, এই শিক্ষাও যেন স্কুলের শিক্ষার মতন বাঁধাধরা হয়ে না পড়ে। তাহলে এ শিক্ষা সম্বন্ধেও শিশুমনে জাগবে আতঙ্ক এবং তাদের উৎসাহ পড়বে ভেঙে। শিশুমন কখনও বাঁধাধরা গণ্ডীর মাঝে বদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা চায় আনন্দ। আর একটা প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, উৎপাদন (Production) বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীদের ওপর যেন চাপ না দেওয়া হয়। "লেখিকা" এই প্রসংগে বলেছেন, "উৎপাদনাত্মক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলে শিশুর আনন্দ যাবে নিভে"—একথা অতি সত্য। কারণ যে সব শিক্ষার্থী আসবে তাদের যদি উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে শিক্ষালাভ করতে হয় তাহলে সে শিক্ষা হবে ভুয়ো এবং এই তাগিদে পড়ে যা উৎপন্ন হবে তাও হবে মূল্যহীন। এইজন্যই শিক্ষার্থীদের যেটুকু করতে শক্তি বা ইচ্ছা আছে সেইটুকুই করতে উৎসাহ দিতে হবে, তার ওপর চাপ যেন দেওয়া না হয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়াবার জন্য আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেসব জিনিস উৎপাদন করবে সেইসব জিনিসের একটা প্রদর্শনী (Exhibition) করতে হবে এবং সেইসব জিনিস বাজারে বিক্রয় করে যে মূল্য পাওয়া যাবে, তা থেকে কিছুটা রেখে বাকি অর্থ শিক্ষার্থীদের দিয়ে দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কিছু অর্থ সাহায্য এবং শিক্ষার্থীদের পিতামাতার মনেও কিছু আশার সঞ্চার হবে। উপরন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা জেগে উঠবে এবং তাদের উৎসাহ হবে ক্রমবর্ধমান। এইরূপে বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় যে বেকার সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হয়ে যাবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক মানও হবে কিছু উন্নত। ইতি—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, বরদা।

মহাশয়,

গত ৬ই আশ্বিনের 'দেশে' শ্রীঅদিতি রায়ের 'বুনিয়াদি শিক্ষার প্রগতি' প্রবন্ধটিতে দেখলাম লেখিকা বর্তমানে প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি গলদ দেখিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে, প্রত্যেক শিশু তার প্রবণতা (tendency) অনুসারে কাজ করে বড় হবে—এই তত্ত্ব (principle) মেনে নেওয়া হয়েছে; ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোরদের প্রত্যেককে এমন একটা হাতের কাজ নিয়ে থাকতে হবে, যাতে তার পারদর্শী হবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা আছে। কিন্তু একই রকমের কাজ সাত বছর ধরে করায় একটা একঘেয়েমি এসে যায় শিশুদের কাছে; তখন যদি তাদের ওপর জোর করে সেই কাজ চাপান হয়, তবে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা ঘটে—ফলে বুনিয়াদি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

লেখিকা বলেছেন শিশুরা কখনো একটা কাজে বেশীক্ষণ মন লাগিয়ে থাকতে পারে না—অতি সত্য কথা। কিন্তু যদি সে চিরকালই এই রকম বিভিন্ন বিষয়ে আধো আধো জ্ঞান বা পারদর্শিতা লাভ করতে চায়, তবে উত্তর-জীবনে এই expertদের যুগে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিশুর কথা স্বতন্ত্র। তাই বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই শিশুকে তার মনোমত বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে; কিন্তু অতি সাবধানে,—যাতে তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পথ ব্যাহত না হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকে।

আমরা সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, প্রত্যেক শিশুরই কোন একটা কাজে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। সে সেই কাজটাকে সম্পূর্ণ শেষ করতে চায়; কিন্তু তার মানসিক গঠন এমনই যে কাজের মাঝপথে হয়ত অন্য কোন বিষয়ে তার মন সহজে আকৃষ্ট হয়ে যায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার মন যখনই অপর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছে, তখনই সে ছুটে আসে তার অসমাপ্ত কাজটাকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিশু কখনও একটা কাজে দীর্ঘকাল মনোনিবেশ না করলেও, একটা কোন বিশেষ কাজ (যেটা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়) তার মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে।

তবে, যদি শিশুকে অন্য কোন দিকে মন দিতে না দিয়ে কেবলমাত্র এই একটি কাজেই নিযুক্ত হতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে তার আকাঙ্ক্ষিত কাজটিতেও অবহেলা দেখায়। তার ফলে কোন দিকেই সে পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে না। তার অবস্থা হয় Jack of all trades but master of none-এর মত। যারা আজ কর্মজীবনে অপ্রতিষ্ঠ, তাদের অধিকাংশেরই শৈশবে এই ব্যাপার ঘটেছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে কোন পথে গেলে বুনিয়াদি শিক্ষার এই সমস্যাটার সমাধান সম্ভব। শিশুকে খাতা কলম দিলে দেখা যায় যে, সে নিজ খুশীমত অর্থহীন রেখা টানছে; কিন্তু পড়াশুনো করে আর পাঁচজনের মত হবার ইচ্ছা যখন জাগে তার মনে, তখন সেই রেখাগুলোকে অক্ষরে রূপ দিতে চেষ্টা করে সে আপন অন্তরের তাগিদে; আর যথাযথ পরিচালনা পেলে সে সফলও হয় সহজে। বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাতেও শিশুর এই মৌলিক আচার বা behaviour-এর ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমে শিশুকে দিতে হবে বিভিন্ন কাজের মাঝে ছেড়ে—সে বিভিন্ন কাজই আপন ইচ্ছামত করবে প্রথমে। সেই সময়ে তার কোন কাজের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে সাবধানে সেই পথে চালালে তবেই উদ্দেশ্য সফল হবে। এই শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিশুরা সহপাঠিদের সংগে মিলেমিশে একটা সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে রাখবে। এই সমাজের একজন শিশুসভ্য হয়ত একটা খেলনা চাইল; এখন শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে সেই শিশুকে প্ররোচিত করা, যেন সে খেলনাটা চায় তার কোন খেলনাসৃজন-প্রিয় সহপাঠির কাছে। ফলে দ্বিতীয় শিশুটিও নিজ সহপাঠিকে স্বহস্তে খেলনা তৈরী করে দিয়ে গৌরব লাভের চেষ্টায় খেলনা সৃষ্টিতে মন দেবে। এই যে নিজের তাগিদে শেখা, এইটাই প্রকৃত শিক্ষা। ক্রমে শিশু যত বড় হয়ে উঠবে, সে খেলনা ছেড়ে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরীতেও মন দেবে। এরই মাঝে মাঝে সে আবার অন্য দিকে আকৃষ্ট হবে; তখনও তাকে যোগান দিতে হবে তার আনন্দের খোরাক।

এইসঙ্গে উৎপাদনাত্মক শিক্ষার কথাও এসে পড়ে। উৎপাদন বাড়াবার কাজটা বড়দের ওপরই দিতে হবে। শিশুদের দিতে হবে শুধু শিক্ষা লাভের প্রেরণা। তবেই তারা নিজ নিজ বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মন দিতে পারবে। ইতি—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, (৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞান, প্রেসিডেন্সী কলেজ)।

গত ১৮ই কার্তিকের 'দেশে' প্রকাশিত নারায়ণ চৌধুরী লিখিত "সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা" প্রবন্ধটি পড়লাম। 'দেশ' পত্রিকার পাঠক হিসাবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আশা করি, ছাপাবার উপযুক্ত মনে করবেন। লেখক পরোক্ষভাবে চলতি ভাষার সমর্থন করেছেন। সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার দ্বন্দ্ব আজকের নয়, একথা প্রত্যেকেই জানেন, তথাপি বাঙলা সাহিত্যে কোন ভাষাটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, এ সম্বন্ধে অনেক পরস্পরবিরোধী মতামত শুনতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই (১৮৫৯) বাঙলা সাহিত্যে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করবার প্রয়াস দেখা যায়। কি ভাষায়, কি ছন্দে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ এ তিনজনের অন্তিম পরিণতিতে যে ভাষা আজ সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম সাধুভাষা। প্রাক-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙলা চলতি ভাষা যাকে বলা হয় একরকম অশ্লীল ছিল তার প্রমাণ আছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়'। স্থানাভাবে আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেবঃ

'শিমলের শ্যাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখতে মন্দ নয়, গলাখানি যেন কাঁসি, খন্ খন্ করছেই কেত্তন আরম্ভ হল। কিত্তুনী 'তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননী চুরি করি, খাওয়াছে তাথইয়া' গান আরম্ভ করলে; সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন! চারিদিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো। খুলিরা হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলো কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বৃষ্টি করতে লাগলেন—হরি প্রেমে একজন গোঁসাইয়ের দিশা লাগলো; গোঁড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচতে লাগলো। ("কলিকাতার বারোয়ারী পূজা")

এই হোলো সবুজপত্র যুগের আগেকার চলতি ভাষার নমুনা। চলতি ভাষা কেন কল্কে পেল না, এ থেকেই বোঝা যায়। অথচ ভারতচন্দ্রের ভাষায় (ভারতচন্দ্রের মৃত্যু—১৭৬০) যে সংযম ও সুমার্জিত ভাব ফুটে উঠেছিল তার তুলনা হয় না। তাহার কারণ তাঁর শিক্ষিত রসবোধ ও বিদ্বানসুলভতা। এই সবের উপর পারস্য সাহিত্য প্রতিভা আর প্রচলিত মুসলমানী কথাসাহিত্যের প্রভাবও হয়ত কিছু ছিল।

এর অনেক পরে আমরা দেখিতে পাই বঙ্কিমী ভাষা বা সংস্কৃত বাঙলা এবং তারপর থেকেই বাঙলা ভাষা ও বাঙলা ছন্দের গতি ফিরিল।

এই সংস্কৃত বাঙলা এবং তৎপূর্ববর্তী সাহিত্যের ভাষা তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বাঙলা ভাষার একটি নতুন আঙ্গিক গড়ে উঠেছে।

নারায়ণবাবু ইচ্ছা করেই অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন, যেমন 'সাধু' ভাষার নামকরণ কেন হোলো। রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করেই যখন তিনি চলতি ভাষার সমর্থন করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তিনি উত্তর দিতে পারতেন। যাক সে কথা।

রবীন্দ্রনাথ চলতিভাষায় গল্প ও উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন সবুজপত্রের আবির্ভাবের অনেক পরে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চলতিভাষায় চমক লাগিয়ে দেবার মতও লিখেছিলেন, কিন্তু সে যৎসামান্যই; অধিকাংশ উপন্যাসেই সাধু ভাষা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। বাঙালী পাঠক সাধারণকে চমক লাগিয়ে একদিন তিনি লিখলেনঃ

"মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগ রেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তারপরে? পথে কালোমেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এককণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে ঊষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার।" (ঘরে বাইরে, প্রথম পৃষ্ঠা)

এর পরেই সাধুভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পত্রেও দেখা যায় সাধুভাষার প্রতি সরোষ কটাক্ষ। সুপ্রসিদ্ধ কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে, চলতি ভাষার সমর্থনে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি ১৩৫০ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রটি তারিখবিহীন হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সম্ভবত সবুজপত্র যুগের লেখা।

বাঙলা ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্যন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম—কিন্তু যখন তাঁকে রাজ-অন্তপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরাননি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য নয়, মর্যাদা রক্ষার জন্য।" (পরিচয়—১৩৩৮)

চলতি ভাষার প্রতি পক্ষপাত থাকিলেও তখনও তিনি সাধু ভাষার ঐতিহ্য অস্বীকার করেন নি।

সাধু ভাষার প্রতি ভয় পাবার কিছুই নাই বা বর্জন করার প্রশ্নও ওঠে না। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল্প ও উপন্যাস আজও সাধুভাষায় রচিত হয় এবং পাঠক সাধারণ রসভোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু চলতি ভাষার নামে আজ যা একরকম উৎকট ভাষা সৃষ্টি হয়েছে যা বাঙলা সাহিত্যের অনেক নামকরা দিকপাল সাহিত্যিকদের রচনায় পাওয়া যায়, সেই ভাষা, 'হুতোমকে'ও হার মানায়। কিন্তু বিস্ময় লাগে একজনের বেলায়, বীরবলের চলতি ভাষার পাঠশালায় যাঁর হাতে-খড়ি হোলো সেই সুধীন্দ্রনাথ, আজ পর্যন্ত একটি লাইনও চলতি ভাষায় লেখেন নি। বাঙলা দেশে আজও অনেক সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা সাধুভাষার মাধ্যমেই সাহিত্য রচনা করছেন এবং তা বর্জন করবার কোন আবশ্যকতা মনে করেন নি।

বিনীত

অমিতাভ দাস।

গান

মুকুল ভট্টাচার্য

১

এখানে অনেক গান আমার এখানে
গান আলোর মুক্তির, প্রাণে
সীমাহীন আকাশ—রাত্রির তারার গান!

২

আহা দেখো কী আশ্চর্য! দেখি চেয়ে চেয়ে
অনেক রাত্রির লুকানো
খনির প্রাণে তুমি গান শোনো।
তুমি গান গাও হাত দিয়ে ছোঁয় সেই মেয়ে!

৩

দেখি প্রত্যহ তোমাকেই চোখ মেলতে
তুমি আমি মিলে সমুদ্র পারি দিতে।
আমাকে আমার কত আর দেবো আমি!
হে অন্তরতম গান! একান্ত একক স্বামী!!



ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

সংগীত-সূর্য (আফতাব-ই-ম্যুসিকী) ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় সংগীত জগতের একটা দিক সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ওস্তাদজী ছিলেন ভারতীয় সংগীতের একটি বিশিষ্ট ধারার বাহক। রঙ্গিলা বা আগ্রা পদ্ধতি নামে বর্তমানে যা পরিচিত ফৈয়াজ খাঁ ছিলেন তার সাধক এবং প্রচারক।

ফৈয়াজ খাঁকে কলকাতার আসরে প্রথম দেখা যায় ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়োরী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীতে। কিন্তু তার আগে থেকেই খাঁ সাহেব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত-প্রতিভারূপে সম্মানিত হয়ে আসছেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি মহীশূরে রাজের কাছ থেকে দরবারী পুরস্কার লাভ করেন। তারপর তাঁকে সম্মানিত করেন ১৯১৮ সালে ইন্দোরের মহারাজা নগদ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, রাজ-কণ্ঠহার এবং দোশালা দিয়ে। ১৯২৮ সালে মহীশূরে রাজের আহ্বানে রাজ্যের সমস্ত গায়কদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়, খাঁ সাহেব তাতে সতেরো বার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে প্রত্যেক বার জয়লাভ করে আফতাব-ই-ম্যুসিকী উপাধি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে বরোদার গায়কোয়াড় খাঁ সাহেবকে "জ্ঞানরত্ন" উপাধি দান করে নিজের দরবারে আসন দান করেন। এ ছাড়াও খাঁ সাহেব জনসমাজের কাছ থেকেও অজস্র উপাধি পেয়েছিলেন—বেনারস থেকে 'সংগীত-রঞ্জন', অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স থেকে 'সংগীত-চূড়ামণি', লাহোর কনফারেন্স থেকে 'সংগীত-রত্ন', পুনা ও বম্বের সমজদারদের কাছ থেকে 'সংগীত সম্রাট'।

ফৈয়াজ খাঁর বংশ সংগীতজ্ঞের বংশ, একেবারে তানসেনের আমল থেকে চলে আসছে। তার মাতার পিতামহ হাজী সুজান সাহেব তানসেনের জামাতা ছিলেন। এদিকে তার প্রপিতামহ ছিলেন তখনকার দিনে একজন নামকরা সংগীতবিদ্ যিনি মিঞা রঙীলে নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার পিতামহ ছিলেন তদানীন্তন সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ওস্তাদ মহম্মদ শা রঙ্গীলে। পিতা গোলাম আব্বাস খাঁও সংগীতের একজন বড়ো সাধক ছিলেন।

ফৈয়াজ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৮ সালে আগ্রা শহরে এবং পিতা ও খুল্লতাত কল্লান [illegible] কাছেই তিনি সংগীত শিক্ষালাভ করতে [illegible]কেন। আট-ন বছর বয়সেই তার প্রতিভার [illegible]চয় পাওয়া যায়। যখন তিনি ব্যাণ্ড-[illegible]র বাজনা শুনে তা থেকে স্বরলিপি [illegible] করতে থাকেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই আসরে গাইবার মতো ক্ষমতার অধিকারী তিনি হন। পরে ফৈয়াজ খাঁ তার শ্বশুর মেহবুব খাঁর কাছেও সংগীতে শিক্ষালাভ করেন।

বড় সংগীতজ্ঞ বংশের সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে থেকে এবং শিক্ষা পেলেও কিন্তু ফৈয়াজ লাইন-ধরা গাড়ীর মতো এগিয়ে চলেননি। তখনকার দিনের দুজন জাঁদরেল ওস্তাদ ধামারে, পিতা গোলাম আব্বাস এবং খেয়াল ও ঠুংরীতে খুল্লতাত কল্লান খাঁর পাল্লাতে পড়েও কিন্তু তিনি নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সমর্থ হন। নিজস্ব একটা ধারার প্রবর্তন করেন যা উত্তরকালে ফৈয়াজী ঘরানা নামে পরিচয় লাভ করেছে। এ ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হলক তান, বোল-বিন্যাস এবং ছন্দোবৈচিত্র। এতে স্বরস্থানের মহিমা প্রকাশ বা অস্থায়ীর প্রাধান্য প্রতিফলনে তেমন লক্ষ্য রাখা হয় না। এ ঘরানায় তাই বিলম্বিতের চাইতে মধ্য লয়ের গানই বেশী জমে। এ ঘরানার এখন বাহক রইলেন তার কৃতী শিষ্যবৃন্দ, পণ্ডিত রতনজনকর, দিলীপচাঁদ বেদী, মোহন সিং এবং সরাফৎ হোসেন।

রঙ্গজগৎ

নূতন ছবির পরিচয়

শেষবেশ (পি এল প্রডাকসন্স—ক্যালকাটা মুভীটোন)—কাহিনীঃ ব্যোমকেশ হালদার ও কমল মুখার্জি; চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়; আলোকচিত্রঃ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিমাধব পাল; শব্দ-যোজনাঃ বাণী দত্ত ও তপন সিংহ; সুরযোজনাঃ শৈলেন রায়; ভূমিকায়ঃ অভী ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, ফণী রায়, রবি রায়, দেবেন ভট্টাচার্য, জহর রায়, অনুভা, নমিতা, ঊষারাণী, সন্ধ্যা দেবী, রাণী প্রভৃতি। ক্যালকাটা ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনে ২৪শে নভেম্বর চিত্রা, প্রাচী ও আলেয়ায় মুক্তিলাভ করেছে।

কেবলমাত্র বাঙলাই নয়, সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতের মধ্যে জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীনতম পরিচালক এবং উৎপাদনেও বোধহয় তার তোলা ছবির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু দুযুগ ধরে ছবি তুলে এলেও কোন যুগেতেই তিনি একখানি ছবির ক্ষেত্রেও ভাস্বর হয়ে থাকার মতো এতটুকুও প্রতিভার আভাস দিতে পারেননি—প্রাথমিক যুগ থেকেই চলচ্চিত্রের সংগে যুক্ত থেকেছেন এই দাবীতেই তিনি ছবি তুলে চলেছেন এই যা। কাজেই জ্যোতিষচন্দ্রের কোন ছবি দেখার কথা হলে কোন উদ্দীপনা জাগে না এবং দেখার পরও মানসিক অবস্থানে কোন পরিবর্তন ঘটে না। 'শেষবেশ' তার কোন ব্যতিক্রম নয়।

কল্পনাশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে, নাটক ও রসসৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বোধশক্তির দরকার হতে পারে এমন বালাই থাকলে জ্যোতিষচন্দ্র সাধারণত তা এড়িয়ে চলে যান। তাই সেইরকম নিজেরই মতো তিনি কাহিনী বেছে নেন। কিছুদিন আগে অবশ্য 'রবীন মাস্টার' তিনি তুলেছিলেন, কিন্তু তা থেকে তিনি বেশ কৃতিত্বের সংগেই সূক্ষ্মবুদ্ধিবৃত্তির অংশ পরিহার করে তাকেও নিজের মতো করে নিয়েছিলেন। 'শেষবেশ'এর বেলা অতো পরিশ্রমও দরকার হয়নি—কারণ, তিনি যেমনটি চান, মোটা মাথা থেকে বেরনো অতি স্থূল জিনিস, 'শেষবেশ' ঠিক তেমনই একটি বস্তু।

যেমন বিষয়বস্তু একেবারে পুরনো আমলের ঘটনা, বিন্যাসের ধারাও তেমনি পুরনো, ভাব ও ভাষাও তেমনি পুরনো একঘেঁয়ে আমলের। কিছু ঘটবার আগেই জানতে পারা যায় নয়তো তা জানিয়ে দেওয়া হয়। আর নিজের বুদ্ধিতে কুলিয়ে নেবার জন্যে যে কোনরকম অসম্ভব অবাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করে নেওয়া হয়েছে। গল্প হচ্ছে কেকা নামে এক ধনীর দুলালীকে নিয়ে। তাকে স্বাধীনচেতা উগ্র প্রকৃতির বলা হয়েছে এবং তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে বাপের নির্বাচন করা পাত্রকে বিবাহে তাকে অসম্মতা দেখিয়ে এবং বাপের সংগে সমানে চেঁচিয়ে মেজাজ দেখিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা দেখিয়ে। কেকার আপত্তি সে বনেদী বংশে বিয়ে করবে না, কারণ বনেদী বাড়ির বৌ হয়ে গেলে তাকে অন্দরমহলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাই কেকা বাড়ি থেকে পালালো। সেইদিনই তাকে কলকাতা থেকে দেখতে আসবার কথা স্বয়ং পাত্রের। টাঙা করে স্টেশনে যেতে পথে অন্য টাঙার সংগে ধাক্কা লেগে কেকা ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে শুশ্রূষা করার জন্যে এগিয়ে এলো অপর টাঙার একটিমাত্র যুবক। আর এক যুবক ঝোপের আড়াল থেকে শুশ্রূষা-রঙ্গ দেখতে লাগলো—আর এমন দুর্ঘটনায় টাঙাওয়ালারা কোথায় যে সরে পড়লো তার আর পাত্তাই পাওয়া গেলো না। কেকা জ্ঞান ফিরে পেয়ে যুবককে দেখেই ক্ষেপে গেলো এবং ভদ্রতা তুলে গাল দিয়ে গটগটিয়ে চলে গেলো। যুবকের বন্ধু এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো, যুবক সংগে সংগেই জানিয়ে দিলে যে, বিয়ে যদি করতে হয় তো ঐ মেয়েকেই। ছুটল যুবক কেকার পিছু পিছু। কেকা গিয়ে উঠলো ট্রেনে, যুবকও তার বন্ধুকে নিয়ে উঠলো সেই কামরাতেই। যুবক অসীম বিক্রম দেখিয়ে একটা জায়গা করে নিলে কিন্তু সেখানে বসে পড়লো কেকা। যুবক বসলো তারই পাশে একটা আসন

বাদ দিয়ে। তারপর যা হবার—ঘুমের ঘোরে অসীমের বুকে কেকার ঢ'লে পড়া, সুটকেশ চুরি যাওয়ায় কেকার টিকিট খোয়া যাওয়া, অসীম কর্তৃক টিকেটের দাম দেওয়া; কেকার তাতে কৃতজ্ঞতার বদলে রাগ দেখিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়া, অসীমের পশ্চাদ্ধাবন এবং কেকারও অসীমের সঙ্গে এসে হোটেলে রাত্রিযাপন। সকালে অসীমের বাজারে যাওয়া আর সেই ফাঁকে হোটেলে কেকার কাকার আবির্ভাব এবং কেকাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন। ব্যর্থপ্রেম অসীম কলকাতায় ফিরেই কেকাকে নিয়ে নাটক লিখে ফেলেন। কেকার বিয়ের জন্যে তার বাবাও তাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। কেকা হয়ে দাঁড়ালো অসীমের জনৈক বন্ধুর মাসতুতো বোন। কাজেই অসীমের নাটক অভিনয়ে কেকাও এলো দেখতে। তারই জীবনের ঘটনাগুলিকেই অভিনীত দেখতে দেখতে কেকার মাথা ঘুরে গেলো। মাঝখান থেকেই সে চলে গেলো। বাইরে এসেই তার দাদার সঙ্গে তার জন্মদিনের কথা উঠলো, ঠিক হলো নাট্যকার অসীমও নিমন্ত্রিত হবে। জন্মদিনে কেকা আগে থেকে বধূ বেশে তৈরী হয়ে গান গাইতে লাগলো, যথাবিহিত অপরের অনুরোধে, এবং গান শেষ হতেই অসীম এসে হাজির, দুজনের পরিচয় তারপর সর্বসম্মতিক্রমে মিলন।

গল্পটায় কি যে সারবস্তু, কোথায় তার নাটক, কোথায় রস কিছুই বোঝা যায় না। কোথাও কোন যুক্তি নেই, সঙ্গতিও নেই। কিজন্যে যে ছবিখানি তোলা হলো তারও কোন সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন নীরেট গল্প এবং নিতান্তই চিন্তা ও কল্পনাশক্তিবিহীন পরিচালনায় ছবির অন্য কোনদিকও সারবান হবার সুযোগ পায় না, এ ছবিতেও কোন দিকেরই কৃতিত্ব পাবার সুযোগ ঘটেনি। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এর বেশী কিছু দিতে পারবেন বলে মনে হয় না, তাই এই ছবিই যেনো তার শেষ হয়, তাহলেই হবে বেশ।

ভারতীয় ছোট ছবি

আজ প্রায় বছর দুই ধরে ভারতে ডকুমেন্টারী বা অন্যপ্রকারের যাবতীয় ছোট ছবি ও সংবাদ-চিত্র কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখনকার দিনে ছোট ছবির আবশ্যকতা ও তার সার্থকতার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। আমাদের দেশে ছোট ছবি ব্যবসার দিক থেকে লাভজনক ছিলো না বলে চিত্র-নির্মাতারা এদিকে মোটেই ঝোঁক দেয়নি। ছোট ছবির চলন, ধরতে গেলে ১৯৪৩ সালের আগে ছিলো না—তোলাও যেমন হতো না, দেখানো ব্যাপারেও, অন্ততঃ বিদেশী ছবি বাদ করেও, প্রদর্শনের কোন চাড় ছিলো না। আমাদের দেশে ছোট ছবি তোলা আরম্ভ হয় সরকারী উৎসাহে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং তা দেখানো শুরু হয় আইনের চাপ দিয়ে। যুদ্ধের সময় ছোট ছবির পর্যায় আরম্ভ হয় ইনফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইন্ডিয়ার অধীনে এবং দেখাতে বাধ্য করা হয় তৎকালীন ভারতরক্ষা আইনের জোরে। ছোট ছবি দেখানো দরকার, কিন্তু আমাদের দেশের প্রদর্শকরা সেটা একটা অতিরিক্ত ঝামেলা মনে করতো, তাই সোজা রাস্তায় তাদের দিয়ে সেসব ছবি দেখানো সম্ভব হতো কি না সন্দেহ, কাজেই তার জন্যে আইন না করে উপায়ও ছিলো না।

ইংরেজ শাসন অবসানের পর জাতীয় সরকার ইনফরমেশন ফিল্মস্ বিভাগটি তুলে দেয় কিন্তু দেশ ভাগাভাগি হবার পর আবার বিভাগটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ফিল্মস ডিভিশন অফ ইণ্ডিয়া নাম দিয়ে। এরও কাঠামোটা ইনফরমেশন ফিল্মসেরই ধাঁচে গড়ে নেওয়া হয়, তারই প্রাক্তন কর্মীর অধিকাংশকেই গ্রহণ করা হয়, এমন কি তোলা ছবিগুলি দেখাতে বাধ্য করার জন্যে আগের মতোই একটা আইন প্রণয়ন করে নেওয়া হয়।

তারপর এ পর্যন্ত মোট ৯৮ খানি ডকুমেন্টারি ও সংবাদ-চিত্র তোলা হয়েছে; ভারতের সমস্ত চিত্রগৃহে পর্যায়ক্রমে তা দেখানো হয়েছে এবং প্রথম বছরের হিসেবে প্রকাশ যে, এর দরুণ গভর্নমেণ্ট বেশ কিছু টাকা লাভও করতে পেরেছে—যা আগে আসলে অসম্ভব ব্যাপার বলে পরিগণিত হতো। একথা এখন স্বীকার করতে হবে যে, ফিল্মস ডিভিশন আমাদের দেশের ছবিঘরগুলিতে ছোট ছবি দেখাবার একটা রেওয়াজ সৃষ্টি করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু লোকের মনে ফিল্মস ডিভিশনের ছবির জন্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পেরেছে এ কথাটা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ, ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে উৎকর্ষ, আর ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবি সেইদিক থেকে অধিকাংশের বেলাতেই নীরেস। যে ৯৮ খানি ছবি এপর্যন্ত তোলা হয়েছে তার বেশীরভাগই আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু দু'একখানি ছাড়া বেশীরভাগই কোন ছাপ দিতে পারেনি—আমাদের নিজেদের দেশের জিনিস হলেও একথা স্বীকার করতেই হচ্ছে। আর সেইজন্যেই এ সম্পর্কে কিছু বলাও দরকার।

কয়েক সপ্তাহ আগে ফিল্মস ডিভিশনের ছবি সম্পর্কে বিদেশীদের কি মত সে-বিষয়ে বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মুখপত্রে প্রকাশিত সমালোচনার সারাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছিলুম। তা থেকে বোঝা যায় যে, বিদেশের তুলনায় আমাদের ছোট ছবি খুবই কাঁচা। দু'একখানি ছবি ইউরোপ ও আমেরিকায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবশ্য পুরস্কার লাভ করেছে, কিন্তু সেগুলি নেহাৎই ব্যতিক্রম—তাদের নিয়ে একটা গড়পড়তা নিরীখ ঠিক করে নেওয়া যায় না।

বিষয়বস্তুর অভাব আমাদের দেশে নেই। এবং সাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগরূপে ছোট ছবি অবশ্য প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু সেই প্রয়োজন মিটিয়ে দেবার জন্যে ছবি যতটা প্রেরণাদায়ক হওয়া উচিত ফিল্ম ডিভিশন তাতে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। ছবি তৈরী হচ্ছে এবং দেখানোও হচ্ছে দেশের সমগ্র প্রদর্শনক্ষেত্র ব্যেপে, কিন্তু নেহাৎই দু'একখানি ছাড়া কাজের মতো ছবি হয়নি কোনখানিই। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ত্রুটি অবশ্য নেই, কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে, সেই বিষয়বস্তুকে সামনে তুলে ধরার মতো, ব্যাখ্যা করার মতো, লোককে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মতো দৃষ্টি ও ভাষার অভাব। ছবিগুলি তোলায় অর্থ ও মেহনৎ ব্যয়ে কার্পণ্য করা হয়েছে বলা যায় না,

কতকগুলি ছবি তোলায় বহুবিধ অসুবিধেকেও যে অতিক্রম করতে হয়েছে সে পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সব ছবির ক্ষেত্রেই প্রেরণা পাবার মতো জোর পাওয়া যায় না। ফিল্ম ডিভিশনের ছবিগুলির টেকনিক্যাল উৎকর্ষ কোনরকমে পাতে দেবার চেয়ে ওপরের স্তরে ফেলা যায় না এবং পরিবেশন ব্যাপারেও কল্পনা-শক্তির যথেষ্ট অভাবই পরিলক্ষিত হয়, তবুও তা সহ্যের সীমার মধ্যেই থাকে, কিন্তু সবচেয়ে নালিশ হচ্ছে আবহ সংলাপের বিরুদ্ধে। ভাষার প্রয়োগে তা যেমন অসার, তেমনি বলার ভঙ্গীতেও কোন উদ্দীপনার সাড়া পাওয়া যায় না। ছবির বারোআনা ভাগ আকর্ষণ এই দোষেই নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়বস্তু নির্বাচনই শুধু নয়, তাতে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগও একটা প্রধান দিক —এদিকটা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে ভাষাভিজ্ঞদের সহযোগিতাও যেমন নেওয়া একান্ত দরকার, তেমনি যে বলে তার গলাটাও তেমন নাটকীয় রেশযুক্ত হওয়া দরকার, কারণ এসব ছবির আবহ-বক্তাই হলো প্রধান অভিনেতা, তার বাচনাভিব্যক্তি কৌশলের ওপরেই ছবির জমে ওঠা নির্ভর করে। ফিল্মস ডিভিশনের কর্তারা এ কথাটা মেনে নিলে তাদের শ্রম অনেকখানি সার্থক দেখতে পাবেন।

ইনফরমেশন ফিল্মসের আমলে তাদের ছবি সম্পর্কে সমালোচকদের মারফৎ লোকের মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অনেক প্রস্তাব গৃহীতও হতো। যার ফলে, শেষের দিকে ইনফরমেশন ফিল্মসের অনেকগুলি ছবিই জগতসমক্ষে উপহার দেবার যোগ্য হয়েছিলো। ফিল্মস ডিভিশনের আমলে প্রথমে কেবলমাত্র বম্বের সমালোচকদেরই মতামত প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়া হয় সমালোচকদের জন্যে প্রতিমাসে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়ে। তার কয়েক মাস পরে মাদ্রাজের সমালোচকদের জন্যেও সে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তারপর মাত্র সপ্তাহখানেক আগে, অর্থাৎ ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবি প্রথম বাজারে চালু হবার প্রায় বছর দেড়েক পর গত ২১শে ডিসেম্বর কলকাতার সমালোচক ও সাংবাদিকদের মতামত জানবার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ফিল্মস ডিভিশনের পাবলিক রিলেসন্স অফিসার জে এন গঞ্জু বম্বে থেকে এখানে এসেছিলেন এবং তিনি জানিয়ে গিয়েছেন যে, এ ধরণের প্রদর্শনী অন্যান্য কেন্দ্রের মতো এখানেও প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং ছবিগুলি সম্পর্কে সমালোচকদের মতামত গ্রহণ করা হবে—অবশ্য গ্রাহ্য করা হবে কি-না সে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি।

সেদিনের প্রদর্শনীতে ৬ খানি ছবি দেখানো হয়—১। ভারতের গুহা-মন্দির; ২। ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভ্যু; ৩। রাজস্থান সিরিজ ১—জয়পুর; ৪। ভারতীয় কারুশিল্প; ৫। কাশ্মীর উপত্যকা (রঙীন)। গোড়াতেই ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবি সম্পর্কে যে সাধারণভাবে মন্তব্য করেছি এ ছবিগুলির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। গুহা-মন্দির, রাজস্থান ও কারুশিল্প সম্পর্কিত ছবিগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সহজেই মনকে জমিয়ে দেবার মতো হলেও কল্পনাশক্তির অভাব, ভাষার দীনতা এবং বাচনভঙ্গীর দুর্বলতা মিলে ছবি-গুলি মনকে আঁকড়ে ধরে রাখায় ব্যর্থ—ছবি শেষ হবার সঙ্গেই আর সব ছাপ মুছে যায়।

ফিল্ম ডিভিশনের ছবিকে সার্থক করতে গেলে বিষয়বস্তুকে দেশের বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত-দের দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে তবেই তার মধ্যে ওজন আসবে। সংলাপ রচনার জন্যে ভাষাভিজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে। আবহ-বক্তার স্বর যথোপযুক্ত বাচনাভিব্যক্তিকুশল কি না দেখে নিতে হবে। দেশের বড়ো পরিচালকদের দিয়ে ফিল্মস ডিভিসনের অধীনেই হোক অথবা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, বছরে অন্ততঃ বারোখানি ছবি তুলিয়ে নিতে হবে। জনশিক্ষাব্রতে ফিল্মস্ ডিভিশনের প্রচেষ্টা সার্থক যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই এতো কথা বলতে হলো।

যাদুকর সোম

গত কয়েকমাস ধরে যাদুকর সোম কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে তার যাদুকরি কৌশলের জন্যে প্রখ্যাত হয়ে উঠেছেন। তাঁর অভিনব কলাকুশলতা ও ক্রীড়াবৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর যাদুকরদের পাশে আসন করে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রফেসার সোম বিদেশে তাঁর কৌশল দেখাতে যাবার সংকল্প করেছেন। তার আগে তিনি ডিসেম্বরে কলকাতার কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করবেন। তারপর তিনি ডালমিয়ানগর, পাটনা, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন।

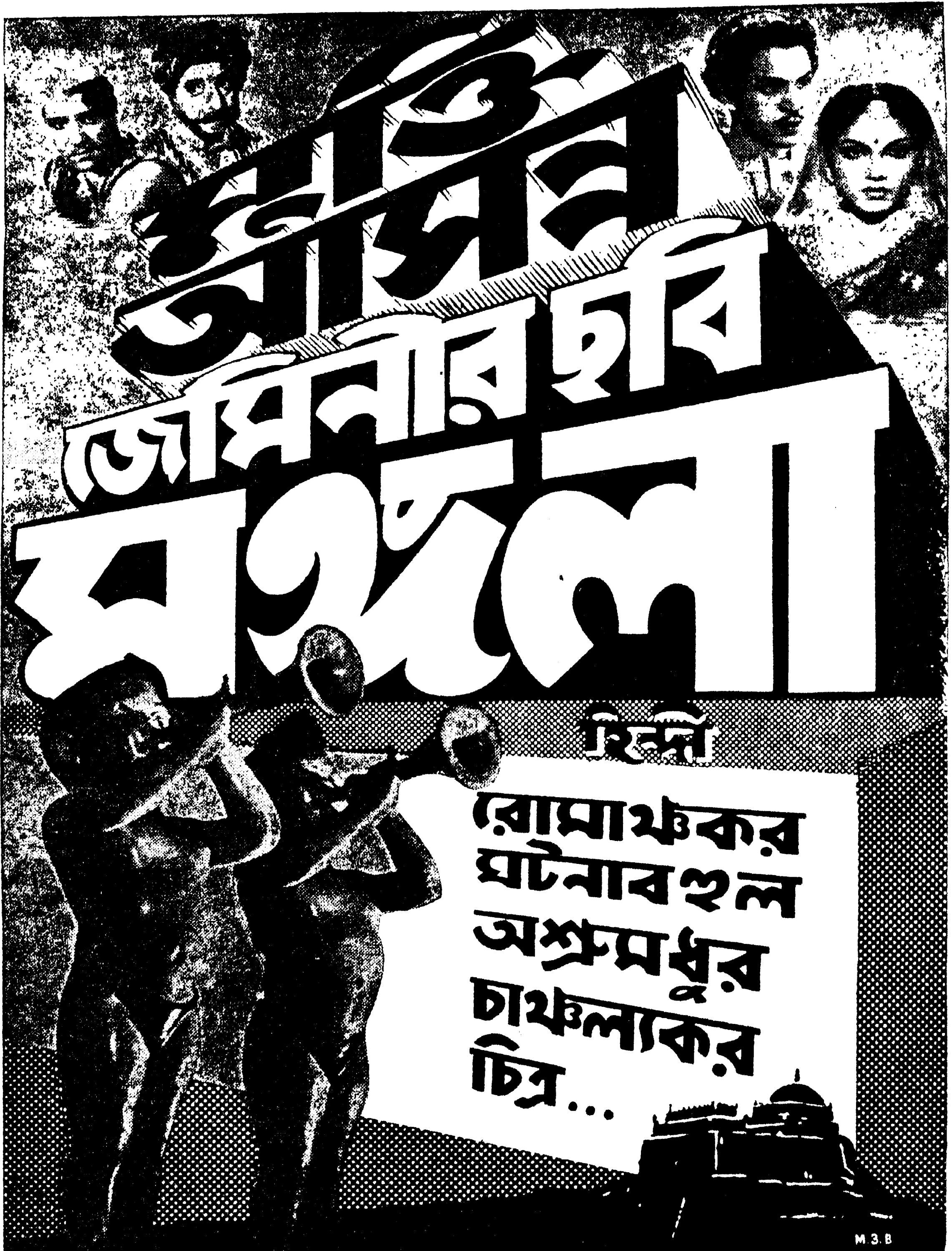
প্রফেসর সোমের এবারের অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোক্তা হচ্ছেন কুশলী প্রচারবিদ্ ফণীন্দ্র পাল।

"সহযাত্রী"

ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে।

গত সপ্তাহে সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিখানির একটি উপভোগ্য দৃশ্যের জন্য সপ্তসুরের এক বিচিত্র মায়াজাল রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সুকবি শৈলেন রায়ের রচিত এই কমেডি-রোমান্সখানিতে সুর-পরিবেশ অন্যতম আকর্ষণ রচনা ক'রবে ব'লে জানানো হ'য়েছে।

ভারতী-মলিনা-পদ্মা-জহর-কমল-হিমাংশুর প্রভৃতি সমাবেশে ছবিখানির ভূমিকালিপিও বলিষ্ঠ। পরিচালনা-অগ্রদূতবৃন্দ।


জেমিনীর ছবি
মঙ্গলা
হিন্দী
রোমাঞ্চকর
ঘটনাবহুল
অশ্রুমধুর
চাঞ্চল্যকর
চিত্র...
M 3.B

খেলাধুলা

সন্তরণ

নিখিল ভারত সুইমিং ফেডারেশন পরিচালিত প্রথম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা বোম্বাইতে সম্প্রতি যেভাবে ও যেরূপ অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত তো হয়-ই নাই, উপরন্তু ভারতীয় সন্তরণ ইতিহাসে এক চরম বিশৃংখলা ও কলঙ্কপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকগণ অনুষ্ঠানের সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই মতৈক্যের অভাবের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন দিয়াছেন। নিজ নিজ রাজ্যের যশ ও সুনাম বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ইহাদের মধ্যে এত তীব্রভাবে প্রকট হইয়া উঠে যে, অনুষ্ঠানের শত শত দর্শকের সম্মুখে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে ইঁহারা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই। এমন কি শেষ দিনে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণ বিষয় লইয়া যে প্রহসনের অবতারণা করেন, ইতিপূর্বে কোন জাতীয় বা সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি ও পরিদর্শকগণ যাঁহারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শেষ পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"ভারতের সন্তরণের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই শ্রেণীর লোক যত দিন পরিচালনার গুরু-দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন কোন কিছুই ভাল হইতে পারে না।" সর্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ হইতেছে, ইঁহারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত দেশবিদেশে শত শত অর্থ ব্যয় করিয়া মতামত প্রেরণ করিতে অনুরোধপূর্ণ তার প্রেরণ করিয়াছেন। নিজের কলঙ্কের কথা দেশবিদেশে প্রচার করিয়া দেশের ও জাতির সম্মানহানির কার্য যে করিতেছেন, ইহা ইঁহাদের একেবারেই স্মরণে নাই। ভারতীয় সরকারের শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্য দপ্তর খেলাধুলা ও ব্যায়ামের দিকে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলেই দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া-পরিচালক-গণ এইরূপ কলঙ্কপূর্ণ ও সম্মানহানিকর কার্যে লিপ্ত হইতে পারিতেছেন—ইহা আমরা বলিতে বাধ্য।

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভারতীয় দলের সহিত প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিবার পর আরও চারিটি খেলায় যোগদান করিয়া দুইটিতে ইনিংসে বিজয়ী ও দুইটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত কমনওয়েলথ দল ১২টি খেলায় যোগদান করিয়া ৬টিতে বিজয়ী ও ৬টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছেন। পরাজয়ের কালিমা এই দলের ভাগ্যে যে এই পর্যন্ত হয় নাই, ইহা সুখের বিষয়। তবে দিনের পর দিন দলের খেলোয়াড়গণ যেভাবে একে একে অসুস্থ অথবা আহত হইয়া খেলিবার যোগ্যতা হারাইতেছেন তাহাতে আশঙ্কা হয়, ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত ইহাদের খ্যাতি ও সম্মান অটুট থাকিবে কি না? জাঠরাজার দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় এই দলকে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বৈদেশিক ক্রিকেট শিক্ষক এডি পেণ্টারের পর্যন্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আরও তিনজন খেলোয়াড়কে বিলাত হইতে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কমনওয়েলথ বনাম পাতিয়ালা মহারাজার একাদশ

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভ্রমণের নবম খেলায় পাতিয়ালা মহারাজার একাদশকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে পরাজিত করিয়াছে। পাতিয়ালা মহারাজার দলে ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিলেন—মুস্তাক আলী ও সুটে ব্যানার্জি। মুস্তাক আলী ইতিপূর্বের টেস্ট খেলায় ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেও এই খেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। কি কারণে যে তিনি খেলিতে পারিলেন না বলা কঠিন। তবে সুটে ব্যানার্জি এই খেলায় দুইটি ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্বে কমন-ওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে সুটে ব্যানার্জি উত্তর ভারত প্রদেশপালের পক্ষে খেলিয়া বোলিংয়ে সফলতা লাভ করেন। কিন্তু এই খেলায় বোলিংয়ে সুবিধা করিতে না পারিলেও ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এই খেলা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই বলিতে শোনা যায়—"ইহাকে ভারতীয় টেস্ট দলে এখনও স্থান দেওয়া উচিত।" সাধারণের উক্তির কোনই মূল্য নাই। ক্রিকেট পরিচালনার গদি আঁকড়াইয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা "পেটোয়া" লোকদের দলভুক্ত করিবেন, ইহা সকলেই জানে। সুটে ব্যানার্জি কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া এক স্থানে বোলিংয়ে ও অপর স্থানে ব্যাটিংয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়াই যদি টেস্ট দলভুক্ত হইবার আশা রাখেন আমাদের যতদূর বিশ্বাস তাঁহাকে হতাশই হইতে হইবে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পাতিয়ালা মহারাজার একাদশ—প্রথম ইনিংস—১৫৩ রান (সুটে ব্যানার্জি ৫০ রান, ইন্দ্রজিৎ ১৯ রান; লেকার ২৩ রানে ৬টি ও ট্রাইব ৬০ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ—প্রথম ইনিংস—৭ উইকেটে ৪৩৫ রান ডিক্লেয়ার্ড (ফিসলক ৩৯ রান, গিম্বলেট ৩৫ রান, এমেট ৮৬ রান, গ্রিভস্ ৬৫ রান, ওরেল ৭৫ রান, ডুল্যান্ড ৪৬ রান, ট্রাইব নট আউট ৪৪ রান; ইন্দ্রজিৎ ৭৮ রানে ২টি, জসু প্যাটেল ১৩৭ রানে ৩টি ও পাতিয়ালার মহারাজা ৬২ রানে ২টি উইকেট পান)

পাতিয়ালা মহারাজার একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—২২৩ রান (দোলজিন্দর সিং ৪০ রান, সুটে ব্যানার্জি ৩৪ রান, জসু প্যাটেল ৫০ রান; ডুল্যান্ড ৫৩ রানে ৪টি ও ট্রাইব ৫৪ রানে ৪টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ বনাম জাঠরাজার একাদশ

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভ্রমণের দশম খেলায় জাঠরাজার একাদশের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। জাঠরাজার দলে বিজয় হাজারে, এম আর রেগে, টি বি নিম্বলকার, এস ডবলিউ সোহনী, এস সি সিন্ধে প্রভৃতি ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। খেলাটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে। কমন-ওয়েলথ দলের সহঃ অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল এই খেলায় ভ্রমণের সর্বপ্রথম শতাধিক রান করিয়াছেন। প্রথম খেলোয়াড় ফিসলক দ্বিতীয়বার শতাধিক রান করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। জাঠরাজার দলের পক্ষে এস্ ডবলিউ সোহনী, এম আর রেগে, বিজয় হাজারে ও বি বি নিম্বলকার ব্যাটিংয়ে সফলতা লাভ করেন। এস সি সিন্ধেকে টেস্ট দলভুক্ত করা হইয়াছে বোলিংয়ের জন্যই; কিন্তু এই খেলায় তাহার কোনই পরিচয় তিনি দিতে পারেন নাই। আশ্চর্য হইতে হয়, কিভাবে ইঁহারা দলে স্থান পান! খেলার আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, কমনওয়েলথ দল এই খেলাতেই ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা অধিক রান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। খেলার ফলাফলঃ—

জাঠরাজার একাদশ—প্রথম ইনিংস—২৬৪ রান (এম আর রেগে ৬৭ রান, সোহনী ৮২ রান, বিজয় হাজারে ৭১ রান; রিজওয়ে ৭৬ রানে ৩টি, ট্রাইব ৮৬ রানে ২টি ও ওরেল ২৮ রানে ৩টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ—প্রথম ইনিংস—৮ উইকেটে ৪৯৪ রান ডিক্লেয়ার্ড (ফিসলক ১২৩ রান, ওরেল ১২৭ রান, এমেট ৯২ রান, গিম্বলেট ৩০ রান, ডুল্যান্ড ৩৪ রান, ট্রাইব ৩৮; সোহনী ১১৫ রানে ২টি, ধানওয়াদে ৯৯ রানে ২টি, এম আর রেগে ৬২ রানে ২টি উইকেট পান)

জাঠরাজার একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ১৪৪ রান (এম আর রেগে ৩০ রান, বি বি নিম্বলকার নট আউট ৫২ রান, বিজয় হাজারে নট আউট ৩৭ রান; রিজওয়ে ৩৫ রানে ১টি, লেকার ১৬ রানে ১টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ বনাম বোম্বাই একাদশ

এই খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। বোম্বাই দলের পক্ষে খেলিয়া বিজয় মার্চেণ্ট ১৪৪ রান করিয়া নট আউট থাকিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কমনওয়েলথ দলের পক্ষে এমেট শতাধিক রান ও গিম্বলেট ৯৯ রান করেন। ফলাফলঃ—

কমনওয়েলথ—প্রথম ইনিংস—৩২৩ রান (ওরেল ৮১, ইকিন ৫৫; ফাদকার ৬২ রানে ৫টি ও রামচাঁদ ৭৫ রানে ৩টি উইকেট পান)

বোম্বাই একাদশ—৩১৭ রান (বিজয় মার্চেণ্ট নট আউট ১৪৪, এম গুপ্তে ৪৭; বি ডুল্যান্ড ১১৭ রানে ৬টি ও রামাধীন ৬২ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ—দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইকেটে ২১১ রান (গিম্বলেট ৯৯, এমেট ১০৩; এস গুপ্তে ৮৪ রানে ২টি ও এম প্যাটেল ১৩ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ বনাম বোম্বাই রাজ্য প্রদেশপালের দল

এই খেলায় কমনওয়েলথ দল এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে বিজয়ী হইয়াছে। কেন গ্রিভস এই খেলায় শতাধিক রান করেন। এমেট ৪ রানের জন্য শত রান লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশপালের একাদশ—প্রথম ইনিংস—২০২ রান (আর এস মোদী ৬৪, রঙ্গচারী ২৬; ট্রাইব ৭৬ রানে ৩টি, লেকার ৬১ রানে ৪টি, স্যাকলটন ২১ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ—প্রথম ইনিংস—৫ উইকেটে ৪৮৩ রান ডিক্লেয়ার্ড (কেন গ্রিভস ১৩২, এমেট ৯৬, ইকিন ৪৮, স্পুনার ৫৭, স্যাকলটন ৫৫ নট আউট ও পেণ্টার ৭৫ রান নট আউট; গোলাম আমেদ ৮০ রানে ২টি উইকেট পান)

বোম্বাই প্রদেশপালের একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—১০৮ রান (এম আর রেগে ৩৩; ট্রাইব ২৩ রানে ৮টি উইকেট পান)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে নভেম্বর—সাম্প্রতিক ভূকম্পের ফলে আসামের যে ক্ষতি হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। শিবসাগর ও লক্ষ্মীমপুর জেলা হইতে মোট ৫৭৪ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আবর পাহাড়ে ৩৫০ জনের এবং মিসমি পাহাড়ে ৬০২ জনের প্রাণহানির সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। একমাত্র উত্তর লক্ষ্মীমপুর মহকুমাতেই দুই সহস্র শস্য ভাণ্ডারসহ ১২ সহস্রাধিক গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, কোন মানচিত্রে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক ১৯১৪ সালে সিমলা বৈঠকে নির্ধারিত 'ম্যাকম্যাহন লাইনই' ভারত-তিব্বত সীমান্ত রেখা বলিয়া গণ্য এবং আমরা অবশ্যই তাহা মানিয়া চলিব। তিনি আরও বলেন, আমরা অবশ্যই সীমান্ত রক্ষা করিব এবং কাহাকেও সীমান্ত লঙ্ঘন করিতে দিব না।

পার্লামেণ্টে আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরকালে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ডাঃ বি আর আম্বেদকর বলেন যে, এ পর্যন্ত লোকসভার যে সকল ভোটারের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ১৭ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৭২ জন।

রক্সৌলের সংবাদে প্রকাশ, নেপালী কংগ্রেস বাহিনী প্রতিরোধ না চালাইবার সিদ্ধান্ত করায় বীরগঞ্জে ৯ দিন স্থায়ী জরুরী গভর্নমেণ্টের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে।

২১শে নভেম্বর—জয়নগরের সংবাদে প্রকাশ, নেপালের কংগ্রেস বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে বীরগঞ্জ রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছে। কংগ্রেসবাহিনী পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইতোমধ্যেই কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান কংগ্রেসের দখলে আসিয়াছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে উদ্বাস্তু সম্পত্তি (সংশোধন) বিলটি গৃহীত হয়। এইদিন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) বিল সিলেক্ট কমিটিতে অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন।

অদ্য পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী রেলমন্ত্রী জানান যে, ১৯৫০ সালের জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়েসমূহে ৬৫৩টি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

২২শে নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ওয়ার্কিং কমিটি আজ কংগ্রেস সদস্য পদের জন্য চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের অভিমত অনুযায়ী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে এই অনুরোধও জানান হইয়াছে যে, কংগ্রেসের সদস্য পদের চাঁদা বার্ষিক এক টাকা করে ধার্য করা হউক।

ভারত সরকার নেপালের তিন বৎসর বয়স্ক নূতন রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে স্বীকার না করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে অদ্য পার্লামেণ্টে স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী বলেন যে, কলিকাতায় লেক মেডিক্যাল কলেজে যে সব ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল, ১৯৫২ সালে তাহাদের শিক্ষাকাল শেষ হইলে কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আগামী সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সারা ভারতে এযাবৎ যে প্রায় সাড়ে সতর কোটি ভোটারের নাম রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা প্রায় এক কোটি ২১ লক্ষ বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য পার্লামেণ্টে অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) বিল ও পোর্ট ট্রাস্ট ও পোর্ট (সংশোধন) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৩শে নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অদ্যকার বৈঠকে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসের সকল কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহক সমিতির আয়ুষ্কাল দুই বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মিগণের দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবারবর্গের এবং মুক্তি সংগ্রামে যে সকল কর্মী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া শ্রী এইচ ভি কামাথ অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২৪শে নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিন ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশন হয়। সভায় স্থির হয় যে, কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রে যেরূপ বিধান আছে, তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি পূর্ববৎই থাকিবে।

শ্রী জওহরলাল নেহরু অদ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে নেপাল, তিব্বত ও কোরিয়ার সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। প্রকাশ, নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রী নেহরু বলেন যে, রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান রাখিয়া লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রী শিবনলাল শকসেনা এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বুধবার ভারত-নেপাল সীমান্তে সরকারী নেপালী সৈন্যদের গুলীতে একজন ভারতীয় নিহত এবং শ্রীযুত শকসেনাকে লইয়া চারিজন আহত হইয়াছে। শ্রীযুত শকসেনা বলেন যে, ঐ সময় তিনি ভারতীয় এলাকার মধ্যে ছিলেন।

নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা অদ্য এক বিবৃতিতে পুনর্দখলকৃত বীরগঞ্জে নেপাল সরকারী বাহিনী যে "বিভীষিকার রাজত্ব" সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নিন্দা করেন।

২৫শে নভেম্বর—গতকল্য শেষ রাত্রে দমদম বিমানঘাটির নিকট একখানি মালবাহী বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ে। উহার ফলে দুইজন বৈমানিক নিহত এবং ৪ জন আহত হন; একজনের আঘাত সাংঘাতিক।

অদ্য সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু দিল্লী হইতে বিমানযোগে জামসেদপুরে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী নেহরু জামসেদপুরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের এক যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

পার্লামেণ্টে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় সহকারী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীথিরুমল রাও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে অনেক ধানের জমিতে পাট চাষ করায় তথায় প্রায় ৬০ হাজার টন চাউল ঘাটতি হইবে।

আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা হল, থিয়েটার প্রভৃতি 'প্রদর্শনাগার' ও 'সাধারণ হল'সমূহে ধূমপান দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইবে।

১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাইয়ের পর পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত উদ্বাস্তুগণকে নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য আইন রচনা করিতে অনুরোধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শতাধিক পার্লামেণ্ট সদস্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

২৬শে নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য জামসেদপুরে জাতীয় ধাতু গবেষণাগারের উদ্বোধন করেন।

জামসেদপুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক, ভারত সরকার ইহাই চাহেন।

বিদেশী সংবাদ

২০শে নভেম্বর—মার্কিন ৭ম বাহিনীর অগ্রগামী দল উত্তর-পূর্ব কোরিয়ায় পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে সামান্য কম্যুনিস্ট বাধা অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের ৪ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে।

২১শে নভেম্বর—মার্কিন ৭ম ডিভিসনের সৈন্যদল অদ্য কোরিয়া-মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে উপনীত হইয়াছে। তাহারা সীমান্তবর্তী হাইসানজিন শহর অধিকার করিয়াছে।

২২শে নভেম্বর—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী অদ্য কমন্স সভায় বলেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আগামী জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণের এক সম্মেলন হইবে।

২৪শে নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের এক লক্ষ সৈন্য উত্তর কোরিয়ার বেওয়ারিশ এলাকার মধ্য দিয়া আরও ৬ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধরত বৃটিশ, মার্কিন ও দক্ষিণ কোরীয় সৈন্যদের আগামী বড়দিনের মধ্যে 'যুদ্ধ সমাপ্তির' আশ্বাস দিয়াছেন। যুদ্ধ সমাপ্তির সংকল্প লইয়া বৃটিশ ২৭শ ব্রিগেড এবং মার্কিন ২৪শ ডিভিশনের সৈন্যরা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করিয়াছে।

২৫শে নভেম্বর—উত্তর কোরীয় সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ায় মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অভিমুখে জেনারেল ম্যাকআর্থারের যুদ্ধ-সমাপ্তি অভিযান প্রতিহত হইয়াছে। ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী আক্রমণে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর এক লক্ষ সৈন্যের ইহাই প্রথম বৃহৎ পরাজয়।

২৬শে নভেম্বর—অদ্য রাত্রে জেনারেল ম্যাকআর্থারের যুদ্ধ-সমাপ্তি অভিযানের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সৈন্য কম্যুনিস্টদের আক্রমণে পূর্ণোদ্যমে পশ্চাদপসরণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কম্যুনিস্টরা প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে রণাঙ্গনের পূর্ব পার্শ্ব ভেদ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ তকচন শহর অধিকার করিয়াছে।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥০
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক) বার্ষিক—১৩, ষান্মাসিক—৬॥০ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল।   Saturday, 9th December, 1950.   [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপালে গণবিপ্লবের গতি

নেপালের স্বৈর-শাসকদের শক্তি গণবিপ্লব দমনে নিযুক্ত হইতেছে; কিন্তু বিপ্লবের গতি তাহাতে নিরুদ্ধ হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাই দেখা যাইতেছে, জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐ আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে এবং হিমালয়ের পাদদেশবর্তী দুরধিগম্য পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত তাহা ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। বীরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় জায়গা শাসকদের সৈন্যদল কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু আন্দোলন গোপন পথে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতেছে। গণ-আন্দোলনের গতি অনেক স্থানেই এইরূপ দাঁড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে শাসকদের শক্তিকে গোপন পথে গোড়ায় গিয়া আঘাত করে। সে অবস্থায় শাসকদের সমুন্নত শস্ত্রবল সঙ্ঘশক্তির সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। নেপালের গণ-আন্দোলনের গতি সম্মুখ-সংগ্রামের পথ হইতে ধীরে ধীরে এইভাবে গেরিলা-নীতির গতি ধরিতেছে এবং আধুনিক অস্ত্রবলোপেত এবং অপেক্ষাকৃত সুগঠিত শাসকদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষেও সে শক্তি যে দুর্বল হইয়া পড়ে নাই, ইহা সহজেই বোঝা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় জনগণ যদি একবার জাগ্রত হয় এবং যদি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রতিবেশের মধ্যে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ তাহারা একবার লাভ করে, তবে কোন শাসক-শক্তির পক্ষেই তাহাদিগকে পিষ্ট করা সম্ভব নয়। সে শক্তি পশুবলে যতই প্রবল হোক্ না কেন। নেপালের শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার পররাষ্ট্র-সচিব আপোষ-নিষ্পত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখাই যে মঙ্গলজনক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারাই যে তাহা সম্ভব এই সব সুবুদ্ধি-প্রণোদিত যুক্তির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণও আজ আমরা তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু শুধু কথায় কোন কাজ হয় না। স্বৈরাচারী শাসকদের মুখে মানুষের অধিকারের বড় বড় কথা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই শুনিতে পাইয়াছি। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কৃপায় সে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের অপ্রতুলতা কিছুই নাই; কিন্তু ঐ ধরণের কথার তাৎপর্য কি সে সম্বন্ধেও আমাদের মনে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নিজেদের অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার কৌশলস্বরূপেই তাঁহারা ঐ সব বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন এবং প্রজা-সাধারণের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালের সম্বন্ধেও এই রাজনীতিক তত্ত্বই সত্য হইয়া উঠিবে বলিয়া আমাদের ভয় হয়। শোনা যায়, নেপালের শাসকবৃন্দ এতদিন পরে ভারত সরকারের যুক্তির সারবত্তা নাকি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভারতের বর্তমান বাণিজ্য-সচিব শ্রীশ্রীপ্রকাশের পরামর্শ ক্রমে নেপালের যে শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়, তাহা প্রচলন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু কথাটা তেমন কিছু আশাপ্রদ নয়। ১৯৪৮ সালে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তখনকার মত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে তাহার মূল্য হয়ত ছিল; কিন্তু তাহার পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কালের গতি বর্তমানে অতি ক্ষিপ্র। নেপালী কংগ্রেস তখনও উক্ত শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং নেপাল সরকারও তাহা প্রবর্তন করেন নাই। নেপাল সরকার ১৯৪৮ সালে প্রজাদের হাতে উক্ত শাসনতন্ত্রগত অধিকার যদি ন্যস্ত করিতেন, তবে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রজারা নিজেদের অধিকার আরও অনেক সম্প্রসারিত করিয়া লইত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে নেপালের গণ-বিপ্লব হয়ত এইরূপ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করিত না; কিন্তু গণ-অধিকার সম্প্রসারণের আন্দোলন চলিতই; সুতরাং ১৯৪৮ সালে রচিত শাসনতন্ত্রগত অধিকারের প্রলোভন দেখাইয়া তথাকার জাগ্রত জনশক্তিকে আজ আর সন্তুষ্ট রাখা যাইবে না, ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে উক্ত শাসনতন্ত্রে নেপালে গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। জনগণের অধিকারের একটা ধোঁকা মাত্র তাহাতে আছে; কিন্তু প্রকৃত অধিকার উক্ত শাসনতন্ত্রেও নেপালের প্রধান মন্ত্রীর হাতেই ছিল। কারণ, প্রস্তাবিত আইনসভার ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন সদস্যই মনোনীত করিবার কর্তৃত্ব প্রধান মন্ত্রীর নিজের। ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ী জমিদার প্রভৃতি ধনিক শ্রেণীর ৬জন সদস্যও প্রধান মন্ত্রীরই তাঁবেদার। এরূপ শাসনব্যবস্থা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয় এবং নেপালের অধিবাসীরা এতদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। নেপালের শাসকদের শুভবুদ্ধি যদি সত্যই জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে সোজাসুজি জনগণের অধিকারকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া লউন নতুবা বিপ্লবের প্রবলতর তরঙ্গই যে হিমাদ্রের পাদমূল প্রকম্পিত করিয়া তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস আন্দোলনে বাঙলা

"বিশেষ বিচার করিলে বোঝা যায় যে, বাঙলা দেশের গণ-মন কখনও কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় নাই"—পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত ঘোষের এমন বিবৃতি অনেকেরই মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিবে। বাস্তবিকপক্ষে এমন উক্তি সত্যই কি যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে? ঘোষ মহাশয় তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য তথ্যাদিও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহে বাঙলার ছাত্ররা যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে বে-আইনী পুস্তক পাঠ করিয়া আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হয়। মেদিনীপুর এবং আরও দু' একটি ছোটখাট জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩২ সালের আন্দোলনেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। ইহা সত্য যে, সমগ্রভাবে মেদিনীপুর জেলার প্রায় গ্রামে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা ৪২'এর বিপ্লবেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের অন্য কোন জেলা সে গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হয় নাই। খণ্ড খণ্ডভাবে কয়েকটি জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল।" শ্রীযুত ঘোষ আজ বিতণ্ডার মুখে যাহাই বলুন, কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে বাঙলা দেশের সম্বন্ধে তাঁহার এই যে মন্তব্য আমরা ইহা সর্বাংশে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছি না; পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের উদ্যোগে আরব্ধ স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙলা দেশের যতখানি আন্তরিকতাপূর্ণ অবদান রহিয়াছে, ওজনে তাহা যাহাই দাঁড়াক, বেদনার দিক হইতে ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই সম্ভবতঃ তাহার তুলনা মিলিবে না। শ্রীযুত ঘোষ তাঁহার যুক্তির প্রমাণস্বরূপে ১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের সব কয়টি প্রার্থীর পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস-প্রার্থীদের সেই পরাজয়ে কংগ্রেসের মূল-নীতির পরাজয় সূচিত হয় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে 'না গ্রহণ—না বর্জন' নীতি গ্রহণ করেন। এই দুর্বল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মালব্যজী এবং শ্রীযুত আনে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করেন। বাঙলাই কংগ্রেসের এক শক্তিশালী অংশ এবং বাঙলার জনমত তাহার সমর্থক ছিল। জনগণ যাঁহাদিগকে তখন নির্বাচিত করিয়াছিলেন, বস্তুত কংগ্রেসের মূল আদর্শের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ ছিল না। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের সংগ্রাম-শক্তি তাঁহাদের সাধনায় বলিষ্ঠতা লাভ করিবে, জনগণ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই কাজ করিয়াছে। বস্তুত বাঙলা দেশ কোনদিনই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে আপোষ-নিষ্পত্তি সূত্রে নিজেদের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহারা কংগ্রেসের আদর্শে সংগ্রাম-শক্তিকে জীবন্ত রাখিতেই চাহিয়াছে এবং কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধতা কোন ক্ষেত্রেই করে নাই; সুতরাং "বাঙলার জনগণ কখনো কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় নাই", শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের এই যে অভিযোগ, আমরা প্রমাণিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অবশ্য বাঙলার কংগ্রেস আন্দোলনে মেদিনীপুর বীরত্বের যে উজ্জ্বল অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছিল তাহার তুলনা অন্যত্র হয় না; কিন্তু সে কথা শুধু বাঙলার পক্ষে কেন, সমগ্র ভারতের পক্ষেই প্রযোজ্য, এমন কি, গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেলের নিজেদের দেশ গুজরাট এবং তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে গঠিত আনন্দ ও বারদোলী তালুকের কর্মীরাও মেদিনীপুরবাসীদের অগ্নিময় আত্মদানের কাছে ঘেঁষিতে পারেন নাই। সুতরাং মেদিনীপুরের সঙ্গে বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের বিচার করা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে উপদলীয় হিসাবে জয়-পরাজয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে এই সত্য নিঃসংশয়িতভাবেই প্রতিপন্ন হইবে যে, বাঙলার জনগণ কংগ্রেসকেই সমর্থন করিয়াছে। তাহারা অভ্রান্তভাবে কংগ্রেসের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছে এবং কংগ্রেস-সাধনায় বাঙলার জনগণের অগ্নিময় আদর্শের প্রেরণা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অপ্রতিহত শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

সুদীর্ঘকালের সংস্কৃতি এবং বৃহৎ আদর্শের সূক্ষ্ম সাধনা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। এই ভূমিতে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেখানে জগতের শীর্ষস্থানীয় অনেক চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অসংখ্য বীর সন্তান এই ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া মাতৃ-ভূমিকে নিজেদের অকুণ্ঠ আত্মবদানের মহিমায় উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজ পূর্ববঙ্গের। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আজ নিরন্তর উপদেশ শুনিতে হইতেছে। যাঁহারা বহুজনকে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্তমানে পড়ুয়ার মত দিনের পর দিন কেবল কর্তব্য সম্বন্ধে পাঠই গ্রহণ করিতে হইতেছে। পূর্ববঙ্গে থাকিলে তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থা, বাহিরে পা বাড়ালেও গুরু মুখে পাঠ গ্রহণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের বিড়ম্বনায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বত্র তাঁহাদের উপদেষ্টা। ইঁহারা মানব-শিশু, সভ্যতার প্রথম স্তরের মানবক মাত্র। পাকিস্থানের শাসকবৃন্দ অবিরত ইঁহাদিগকে ইঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গেও উপদেষ্টা অনেক। সেদিন পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবও পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি উপদেশ বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। খাজা সাহেব বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যদি কোন অভাব অভিযোগ থাকে, তবে সেগুলির প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের নিজেদের গভর্নমেণ্টের উপরই নির্ভর করা উচিত। দুই নৌকায় পা দিতে গেলে তাঁহাদের কোন লাভ হইবে না। বলা বাহুল্য, এ সব কথার তাৎপর্য কি, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবিক পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গত আচরণ সম্বন্ধেও পাকিস্থানী কর্তাদের সন্দেহ পদে পদে। মানুষের বৃহত্তর অধিকারের কথা বলিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই, বৃহত্তর আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অধিকারও তাঁহাদের সঙ্কুচিত। শাসকদের কোন কার্যের সমালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদিগের রাষ্ট্রানুগত্যের অভাব ঘটিয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে সব পুরুষ প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শের সম্মান দেখাইতে গেলে তাঁহাদিগকে পাকিস্থানের শত্রুরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। নিজেদের মাতৃভাষার সমর্থনের সঙ্গত মনোবৃত্তি যদি তাঁহারা প্রদর্শন করিতে সাহসী হন, তবে তাঁহারা ইসলাম-রাষ্ট্র পাকিস্থানের সংহতি ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, এই জিগীর চারিদিকে জাগাইয়া তোলা হয়। কিন্তু এইভাবে প্রগতির সব পথ বন্ধ করিয়া কোন রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব কি? পাকিস্থানের শাসকগণ এই সত্য যত সত্বর হৃদয়ঙ্গম করেন ততই মঙ্গল।

জাতির নৈতিক আদর্শ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সংবাদপত্র সম্মেলনে বক্তৃতাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলালজী বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,—"আধুনিককালের একটা নিরুৎসাহকর ব্যাপার হইতেছে এই যে, আমরা দ্রুত নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া পড়িতে হইতেছে। জীবনে আদর্শ না থাকিলে উহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। জনসেবার প্রবৃত্তি অথবা সরকারী কর্মক্ষেত্রে সদাচরণ না থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়।" শ্রীজওহরলালের এই উক্তির যুক্তিবত্তা প্রতিপাদন করিবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না কারণ, আমাদের সমাজ-জীবনের সর্বত্রই ইহা সুপ্রকট। ফলতঃ আমরা বড় বড় কথা যতই বলি না কেন, সুবিধা যেখানে জোটে,

নিজেদের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখি। জাতির ইহা নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক। কেন এমনটা ঘটিল? এ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা চলে তাহা এই যে, স্বদেশ-প্রেম এবং স্বাজাত্য-মর্যাদাবোধ আমাদের মনে শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যত দিন সংঘর্ষ চলিতেছিল, তখন এই জিনিসটার অভাব আমাদের ঘটে নাই এবং প্রধানত তাহার প্রভাবেই আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ছিল। এখন আমরা যেন বড়ই আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি, স্বদেশ ও স্বজাতির জীবন্ত দরদের সাড়া আমাদের অন্তরে তেমন করিয়া জাগে না। আমাদের রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, দেশের স্বার্থহানিতে তাহা আর তেমন করিয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে না; বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা তেমন ভাবে আর আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করে না। জাতিকে এই নৈতিক অধোগতি হইতে মুক্ত করিতে হইলে স্বদেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধ বলিষ্ঠভাবে যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে বিকাশ লাভ করে, রাষ্ট্রের নীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। অন্য কথায় জাতির স্থূলে মন যাহাতে বৃহৎ আদর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং সূক্ষ্মতার স্তর ছাড়িয়া জড়চেতনার দিকেও আদর্শের প্রেরণা জনমানসে সম্প্রসারিত হয়, ইহাই করা দরকার। রাজনীতির দিক হইতে বস্তু-নিষ্ঠার এই অভাব জাতির নৈতিক দুর্গতির মূলে অনেকখানি রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

ধর্মের নামে বর্বরতা

পাকিস্থান রাষ্ট্রের নায়কগণ তারস্বরে সতত এই তত্ত্ব কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের রাষ্ট্র যখন ইসলাম রাষ্ট্র, তখন তাহা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এ সম্বন্ধে যাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহারা নেহাৎ নিন্দুক, তাহারা মূর্খ এবং দুরভিসন্ধিবশতঃই তাহারা ঐ সব কথা বলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা বলিয়াছি। কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মবিশেষের প্রাধান্য জড়িত করিতে গেলে তাহা যে কার্যত সাম্প্রদায়িক এবং ফলত গণতান্ত্রিক ও প্রগতি-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় সাধারণ যুক্তিতেও ইহা বুঝা যায়। কিন্তু যুক্তির মূল্য সব জায়গায় খাটে না; পাকিস্থানের নায়কগণ যুক্তির পথে যাইবেন না। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সুদীর্ঘ পত্র বিনিময়ে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাশ্মীরের অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশ মুসলমান সে অবস্থায় তাহারা যে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং পাকিস্থান হইতে আক্রমণকারী দস্যু দলের সঙ্গে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতে প্রস্তুত হয় নাই, ইহা যেন ভারতেরই কত অপরাধ? যাহারা মুসলমান, তাহাদের উপর পাকিস্থানের দাবী যেন সনাতন অধিকারবলে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রদায়িকতাই সার যুক্তি, জনগণের অধিকারের কোন মূল্য নাই। তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র এবং সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান। কিন্তু তুরস্কের সংবাদপত্রসমূহ পাকিস্থানের এমন গণতন্ত্রবিরোধী এবং মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে ইহার মধ্যেই সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছে। তুরস্কের স্বাধীনতার বনিয়াদ মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারের উপর নয়, তাহা স্বদেশপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশাত্মবুদ্ধি তুর্কীদের রাষ্ট্র ও তাহাদের সমগ্রত সামাজিক জীবনে সংহতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং মানব-নীতিকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। একজন তুর্কী সেখানে তুরস্কের অধিবাসী বলিয়াই গর্ব করে, ধর্মের কথা আওড়ায় না। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও আমাদের বিশ্বাস এই যে, পাকিস্থানের পরিচালকগণ যতদিন পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ সংস্কার হইতে নিজেদিগকে মুক্ত না করিবেন, তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাতিক হইতে মুক্ত না হইবেন এবং পাকিস্থানে তথাকার প্রত্যেক অধিবাসীর অধিকার সমান এই সত্যকে আন্তরিকভাবে রূপদান করিতে সাহসী না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত সমস্যা তাঁহাদের মিটিবে না। প্রত্যুত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে আশ্রয় করিয়া পাকিস্থানের ভিতরে সমস্যার সৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং বাহিরে সমস্যার সৃষ্টি হইবে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের সমস্যার জটিলতা বাড়িবে, বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই সমস্যার পাক জটিল আকার ধারণ করিবে। পাকিস্থানের নায়কেরা এ সত্য একেবারে যে না বুঝেন এমন মনে হয় না। তথাপি ইসলাম রাষ্ট্রের জিগীর তাঁহারা কেন তোলেন, সেকথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। ফলত ইসলাম রাষ্ট্রের স্লোগান না তুলিলে তাঁহাদের নিজেদের গোষ্ঠী-প্রভুত্ব বজায় রাখার পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক চেতনা হ্রাস পাইলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জনগণের স্বার্থ-স্বীকৃতির প্রশ্নের সমাধানে তাঁহাদিগকে সংকটের মধ্যে পড়িতে হয়, কিন্তু এ পন্থা আত্মঘাতী পন্থা—উন্নতির পথ ইহা নহে। এ পথ যুগের গতির বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় এ পথে ঘটে না, তাঁহারা যত সত্বর এই সত্যকে সোজা-সুজি স্বীকার করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল এবং গণতান্ত্রিকতাই যদি ইসলামের আদর্শ হয়, তবে সেই পথেই সে আদর্শ সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার ও বিভূতিভূষণ

বৎসরের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যসৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার'-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং প্রথম বৎসরের পুরস্কার যথারীতি প্রদত্ত হইয়াছে। অতীত সম্বন্ধে আলোচনার আজ কোন সার্থকতা নাই; শুধু এইটুকু সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাহিত্যের বিচার এবং মূল্য-নির্ধারণ অতীব দুরূহ ও কঠিন ব্যাপার। বিচারক শুধু সমালোচক হইলেই এই কঠিন দায়িত্ব নিষ্পন্ন হয় না; কিম্বা শুধু রসজ্ঞ হইলেও সাহিত্য-বিচারের অধিকার অর্জিত হয় না। বিচারকের দৃষ্টিতে এমন একটি অলৌকিক আলো থাকা প্রয়োজন, যে আলোতে শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টির শাশ্বত রূপটি আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হয়। রসজ্ঞ বা সমালোচকের দৃষ্টিতে এ আলো থাকে না, এ আলো থাকে দ্রষ্টার চোখে। দ্রষ্টার সংজ্ঞা লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়াও বলা চলে যে, দ্রষ্টার দৃষ্টি কম চোখেই থাকে। কাজেই, রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কারের বিচারকগণের রায় সম্বন্ধে যদি কোথাও কোন সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব কখনও দেখা দেয়, তবে তাহাকে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কদাচ বলা চলে না। এই বৎসরের পুরস্কার-পাত্রটি নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না, তাঁহাদের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই বাঙলার সাহিত্যিকগণ কর্তৃকই সম্পন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহা সুসম্পন্নই করা হইয়াছে। কলিকাতায় সিনেট হলে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাঙলার সাহিত্যিক ও সাহিত্য-অনুরাগী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এক জনসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বিভূতিভূষণের অল্প দিন পূর্বে প্রকাশিত 'ইছামতী' নামক উপন্যাসখানিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার সমিতি যেন পুরস্কারটি তাঁহাকে প্রদান করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুইটি কথাতেই সমাপ্ত করিতে পারি। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বিভূতিভূষণকেই আমরা প্রথম ও প্রধান সাহিত্যিক বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয়, প্রথম বৎসরেই এই পুরস্কার বিভূতিভূষণেরই প্রাপ্য ছিল। বাঙলার সাহিত্যিকমাত্রেই আমাদের এই দুইটি অভিমতের সঙ্গে একমত, সিনেট হলের সভাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙলার সাহিত্যিকগণ একযোগে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার কমিটির দুরূহ দায়িত্বটুকুও এই সঙ্গে পূর্বাহ্নে নিষ্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। এখন প্রদেশের গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের করণীয়টুকু সমাপণ করিলেই আমরা সুখী হইব।

শ্রীঅরবিন্দ

গত সোমবার ১৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ মহা-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহার রাষ্ট্র এবং অধ্যাত্ম-সাধনা একান্তভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতের ঋষি একদিন প্রত্যক্ষভাবে সত্য, শিব এবং সুন্দরকে উপলব্ধি করিয়া বিশ্ববাসীকে অমৃতের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারা উদাত্তকণ্ঠে জগতের নরনারীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখিয়াছি—আমরা অন্ধকারের পরপারে আদিত্য-বর্ণ পুরুষকে দেখিয়াছি। আর ভয় নাই। তাঁহাকে লাভ করিলে অমৃতত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়। ভারতের এই অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রীঅরবিন্দের জীবনে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলায় যেদিন অগ্নিযুগের উদ্বোধন ঘটে, সেদিনের কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ এবং অসম্মানের মাঝে শ্রীঅরবিন্দের সেই শান্ত এবং সৌম্য মূর্তি আজও যেন আমাদের চোখে পড়িতেছে। কারাকক্ষের অন্ধকার স্তর ভেদ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দের মানসলোক পলক-ময় পরম প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া আবির্ভূত হন। শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধ জীবনের সেই হইতে আরম্ভ। কারাগার হইতে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করিয়া ভগবদুপলব্ধির এই মহাসত্যকে ব্যক্ত করেন। ঋষিকণ্ঠে নিনাদিত অমর ভাষায় যে পরম সত্য একদিন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দের বচনে ও সাধনায় এই সত্যই প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়ার অগ্নিময় অভিভাষণ আমরা আজও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। সেদিন তিনি জাতিকে অমৃতের বাণী শুনান। সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন, দেখিয়াছি, বাসুদেব যিনি, যিনি নরনারায়ণ, আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভারতের তিনিই নিয়ন্তা। তিনি ভারত-ভাগ্যবিধাতা। তিনিই বিশ্বধর্মের বক্তা, গোপ্তা। তাঁহার মহতী ইচ্ছাই ভারতের মর্ম-মূলে কাজ করিতেছে। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বে মহামানব জাতির জাগরণের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। জানিয়াছি আমি সত্য, দেখিয়াছি আমি সত্য। বুঝিয়াছি আমি এই পরম তত্ত্বকে যে, মানুষ সামান্য নয়। অনিত্য এই যে মর্ত-জীবনের বিড়ম্বনা, কামনা-বাসনা-গত বৈষম্যের এই যে তাড়না, ইহার উপরে মানুষের উঠিবার অধিকার আছে। পারে, এই মানুষই দিব্য-জীবনের অধিকারী হইতে পারে। পরম সত্য যদি মানুষের চিত্তে একবার পরিস্ফূর্ত হয়, তবেই মানুষ তাহার সেই পদ বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। দিন আগত ঐ—আর চিন্তা করিও না, মানুষ সেই যে দিব্য-জীবন, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সর্ববিধ দৈন্য ও কার্পণ্য হইতে মুক্ত হইবে, সুতরাং ওঠ, জাগো, ভারত যে পরম অধ্যাত্ম সত্যকে নির্দেশ করিয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিয়া চলো। শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করো। তোমাদের দেহ, মন এবং প্রাণ তাঁহারই কৃপার দিব্যরসে দীপ্ত করিয়া লও। নূতন যুগ আসিবে এবং ভারতই বিশ্ব-জগতে এই যে নবীন জীবন, যৌবন, ইহাকে জাগ্রত করিতে অধিকারী।

বাঙলার প্রাণকেন্দ্রকে মন্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দের মানসলোকে যে অমৃতময় সত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। বাঙলার অগ্নিযুগের সাধক-সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ব-জগতের সহিত একাত্মতায় প্রতিষ্ঠিত হন। অগ্নিময় তাঁহার সমগ্র জীবন। প্রাণময় তাঁহার সাধনা এবং সিদ্ধিও তিনি লাভ করেন অভূতপূর্ব। প্রজ্ঞানময় তাঁহার দৃষ্টিতে বিশ্ব-জগতের মূলীভূত সত্য অভ্রান্তভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। গীতার সাধনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়াছেন, ভাব এবং ভাষাকে তিনি এক করিয়াছেন, তত্ত্ব যাহা ছিল, যাহা ছিল পরম রহস্য এবং নিগূঢ় তাহাকে তিনি বাস্তব সত্যে রূপায়িত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের সব সাধনা তাঁহার জীবনে যোগে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাঁহারা ঋষি, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্রের যাঁহারা উদ্গাতা, অমৃতের তাঁহারা অধিকারী। তাঁহাদের আবার মৃত্যু কোথায়? শ্রীভগবানের দিব্য-জীবনের জ্যোতির কাছে মৃত্যু ঘেঁষিতে পারে না, কালের সর্ববিধ্বংসী যে প্রভাব সনাতন মানবধর্ম, তাহার কাছে তাহাও পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, মন্ত্রদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা, মৃত্যুর তিনি অতীত। যোগ-সংশুদ্ধ তাঁহার দিব্য-জীবন শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু নাই, থাকিতেও পারে না। অমর জীবনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি মহতী ভাগবতী ইচ্ছারই সহায়ক হইয়াছেন এবং ভারতের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের মহতী ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবার রঙ্গময় লীলারই তিনি সঙ্গী হইয়াছেন। বিশ্ব-জগতের জন্য ভারতের যে সাধনা, মহামানব-সংস্কৃতির জন্য ভারতের যে ব্রত, তাহা যতদিন পূর্ণ না হইবে, মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের সাধনারও ততদিন নিবৃত্তি ঘটিবে না। পণ্ডিচেরীর পুণ্য তীর্থভূমিতে বদ্ধাসনে তিনি এতদিন যে সাধনায় নিগূঢ়ভাবে নিরত ছিলেন, অমৃতলোকে জগতের কল্যাণের জন্য, ভারতের লক্ষ্য এবং আদর্শকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিদ্ধদেহে সেই সাধনা করিবেন।

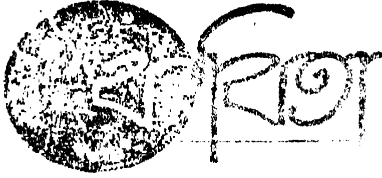
ভারতের সত্যই আজ দুর্দিন। ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। রাজনীতিকেরা যাহাই বলুন, সংস্কারমুক্ত সত্য দৃষ্টিতে ভারতের এই খণ্ডিত রূপ স্বীকার করা সম্ভব হয় না; সমগ্র ভারতের সনাতন যে সংস্কৃতি, তাহাকে বিভক্ত করা চলে না। ভারতভূমি সেদিক হইতে এক এবং অখণ্ড; বর্ণ, সম্প্রদায় এবং আচারগত ভেদ সত্ত্বেও ভারতের সুমহান্ সংস্কৃতি অনাময় ও অমৃতময় এই দিব্য-লীলায় সে উজ্জীবিত। শ্রীঅরবিন্দ এই অখণ্ড সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মহা-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছেন; কিন্তু মহাযোগীর এই যে মহাপ্রয়াণ, সেজন্য আমরা দুঃখ করিব না। শ্রীঅরবিন্দকে আমরা হারাই নাই, সুতরাং সেজন্য শোকাশ্রু বিসর্জনও করিব না। শ্রীঅরবিন্দ অমর। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের আত্মার বাণীমূর্তি। ভারতভূমি তাঁহার প্রচারিত সত্যের সাধনা করিবে, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আত্মোপলব্ধির জন্য অগ্রসর হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আছেন। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। আমরা দিব্য-জীবনে অধিষ্ঠিত সেই জ্যোতির্ময় জগৎগুরুকে বন্দনা করি। বাঙলার কবি একদিন তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিলেন,

—আছ জাগি সদা পরিপূর্ণতার তরে,
যার লাগি নরদেব চির রাত্রদিন তপোমগ্ন।

শ্রীঅরবিন্দের সেই মূর্তি আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত থাকিয়া আমাদিগকে যেন অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখে।



শুভ আবির্ভাব—১৫ই আগস্ট, ১৮৭২ খৃঃ তিরোভাব—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ খৃঃ



প্রাচীন পারসীক হইতে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

বৈদেহীবিহীন আমি ভ্রমিতেছি একা
বেদনার গোদাবরী তীরে। নাহি দেখা
যার লাগি চিত্ত সমুৎসুক। শুধু তার
অংগ হ'তে বিনিক্ষিপ্ত স্মৃতি অলংকার
সূচিছে বিরহপন্থ। কিংশুক অশোক
অরণ্যের তমসাতে রচিতেছে শ্লোক
বহ্নিময় বর্ণে বর্ণে। তারি তীব্র তাপে
মূর্ছাতুর ত্রিভুবন স্বপ্ন সম কাঁপে।
তুমি কি বিদেহ কন্যা? নতুবা কেন রে
বক্ষে টেনে তবু দেখি গেছ শূন্যে স'রে
কখন্ যে অকস্মাৎ! মত্ত আলিংগন
নিজেরে ঘেরিয়া বৃথা রচিছে বন্ধন।

দেহের রহস্য হেথা বুঝিতে আসিনি,
বেদনার গোদাবরী গদ্‌গদভাষিণী।

২

আমার পদ্মিনী তুমি, চিত্ত-চিতোরের
বাসনার বহ্নিবালা, রয়েছ হাতের
অনায়াত্ত পরপারে; হেরি যে নয়নে
কবিতার নিষ্কলুষ কনক দর্পণে
প্রতিবিম্ব মূর্তি তব। সেই ভালো সখী
কামনার গিরিশৃংগ মুহূর্তে চমকি
দেখা দেয়, তারপরে মিলাইয়া যায়
প্রাতঃশুক্রতারা সম দীপ্ত পূর্বাশায়।

স্বর্ণ সূত্রে গাঁথো যদি বনের কুসুম
তবু সে রহে না ফুল্ল, জড়তার ঘুম,
নিমীলিয়া দেয় তার নয়ন পল্লব।
হৃদয়ের তাপে হায় হৃদয় বল্লভ
উত্তাপিত সখী, সে যে ধর্ম হৃদয়ের,
কবিতার পদ্মদলে আসন প্রেমের॥

৩

সব দ্বার রুদ্ধ সখী, শুধু কবিতার,
সিন্ধুমুখী বাতায়ন খুলে ব'সে আছি,
ছায়াসম অস্তাচল, তারি কাছাকাছি
সূর্যাস্তের স্বর্ণপটে প্রদীপ্ত তোমার
বাসনাবিহ্বল মূর্তি শুভ্র সুকুমার।
মর্ত্যের রমণী সে কি? স্বর্গের ঘৃতাচী?
নিশিদিন এ প্রশ্নের সদুত্তর যাচি,
কিম্বা সে যে মরুবুদ্ধি চিত্তের বিকার?

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি মোর শিল্প শতদল
আলোকের অন্বেষণে মেলিয়াছে দল।
তুমি যদি নাহি ব'সো সে কমল 'পরে
বাতাসে না যদি ওড়ে তোমার অঞ্চল
তবে সব ব্যর্থ সখী, বাহিরে অন্তরে
শোকোচ্ছ্বাসে মর্মরিবে বিরহ অতল॥

শেষ দেখা

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

অন্যান্যবারের মতো এবারেও আমরা সকলে জমায়েত হয়েছি ঘাটশিলায়, পুজোর ছুটিতে।

তখন ভোর হয়েছে মাত্র। সামনে কলোনির উচ্চবাচ্চ প্রান্তর পেরিয়ে উপর-পাওড়ার পিছনের আকাশে ঈষৎ রঙিন আভা। পথের পাশেই ঘর। বিভূতিবাবু এসে ডাকলেন। আগেই বন্দোবস্ত ছিলো, তাই বেরিয়ে পড়তে বেশী দেরি হলো না।

দুজনে কলোনি পেরিয়ে ফুল-ডুঙরির পিছনের বনস্থলীতে যাবো। বনপ্রান্তে এসে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন থমকে। পূর্ব দিগন্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। সেখানে লাকাইসিনি পাহাড়ের ক্ষীণ রেখা, তার পিছনে উদয় রক্তিম ভাস্বরের। কিছুক্ষণ পরে আমরা বনে ঢুকলাম—বনের নাম এদোল বেড়া। এই বনটি তাঁর অতি প্রিয়। তরুণ শাল বন, মাঝে মাঝে অবশ্য আছে কুরচি, কেঁদ, মহুয়া, হরিতকী ও বহেরা গাছ। বনতল নানা শিলাখণ্ডে পরিবেষ্টিত—বেলে পাথর হতে কোয়ার্জ পর্যন্ত। এই বনের পশ্চিম প্রান্তে চক্রাকারে একটি রীজ্। এইটিই ছিলো আমাদের আড্ডা দেবার জায়গা।

আমাদের অতি প্রিয় জায়গাটিতে এসে দুজনে বসলেম। তিনি বললেন, হেমন্ত আর শীতে কিন্তু এ'বনের তেমন শোভা থাকে না। অবশ্য বাহিক সে শোভা। তবে, এ সময়ে যেন বনের গভীরতা যায় বেড়ে—যেন ভরা নদী কূলে কূলে। তবুও পাবে শ্যামা-লতা পুষ্প সুরভী, ভবরুও পাবে দু চারটে। হঠাৎ তিনি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখো দ্যাখো ওয়াইল্ড পিটুনিয়া ফুটেছে কিরকম।'

সত্যি, বেগুনী রঙের বন্যপুষ্পে একটা দিক প্রায় ছেয়ে গেছে। সামনের নিম্ন-ভূমিতেও বন বিস্তীর্ণ। তার উপরে এসে পড়েছে প্রভাতের সোনালী-সবুজ রৌদ্র। দূরে বনকাঠির পাহাড়—কালাঝোর রেঞ্জেরই এক অংশ। অনেক দূরে দেখা যায় ওরকাবেড়া ও দলমা পাহাড়। অরণ্যে এলেই তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকতে বলতেন। আজও তেমনি ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, কিছু দিন ধরে আমি একটা নূতন জিনিস উপলব্ধি করছি। রাত্রি অন্ধকার থাকতে অনেকদিন এখানে চলে আসি—এখানে এসে তবে ভোর হয়। তারপরে এই শিলাসনে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করি। উপলব্ধি যে একেবারে না হয়েছে তা নয়। কিছুক্ষণ তন্ময় হ'য়ে থাকবার পরে আমার চোখের সামনে থেকে যেন ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই অরণ্যভূমি। আমি যেন দেখতে পাই এক বিচিত্র দেশ—সে যে কতো সুন্দর! এই স্থূলতা দিয়ে নয় তৈরী সেখানকার কোনও কিছুই। এই দৃশ্যমান সৌন্দর্য তার কাছে অতি নগণ্য।

ভাবলাম, 'পথের পাঁচালী' ও 'দৃষ্টি-প্রদীপে' আরম্ভ হয়েছে যে অতি-জগতের



ভ্রাম্যমান বিভূতিভূষণ

সূচনা, উঠেছে যবনিকা, সেই জগতের অভি-ব্যক্তি হয়েছে 'দেবযানে'। আর এখন হচ্চে তার পরিপূর্ণতা। কিছুদিন হতেই বিভূতি-ভূষণকে দেখছিলাম একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবচেন তিনি সকল সময়েই। গত কয়েক বৎসর তাঁর সংগে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তাঁর এই সকল 'মুড্' বুঝতে পারতাম কিছু কিছু।

দূরাগত শারদ-সপ্তমীর পূজা-বাদ্য বাজছিল শোনা। কী যে অদ্ভুত লাগল তা বলবার নয়। আরও কিছুক্ষণ পরে উঠলাম আমরা। ফিরতে হলো তার বাড়িতেই। চায়ের টেব্‌লে পড়েছিলো একখানা বাঁধানো বই। বইখানার দিকে আমার লক্ষ্য দেখে তিনি বললেন, কয়েক বছর পূর্বে কলেজ স্ট্রীটে ফুটপাথ্ থেকে আট আনায় কেনা। বাঁধিয়ে নিয়েছি।

বিভূতিবাবু আবার বই বাঁধিয়েছেন! আশ্চর্য লাগল। বললেন, তোমাকে পড়াবো বলেই অনেক খুঁজে বের করে রেখেছি। পুজো সংখ্যাগুলো পড়বার সময় পাবে অনেক, এখানা এখন পড়ে নাও।

বইখানা নিয়ে খুলে দেখলাম—'Spirit Teachings' by W. Stainton Moses। মাথায় আমার বজ্রাঘাত। তাঁর রোখ যখন চেপেছেই তখন আমাকে পড়তেই হবে। বই-খানা নিয়ে বাড়ি ফিরে পড়বার চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে পাতায় পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়া দেখে সেগুলো পড়লাম প্রথমেই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জানলাম দেবযানের বীজ কোথায়। আর তারপর থেকেই বইটা পড়তে লাগল উৎসাহ।

অনেক নাস্তিককে দেখেছি বিভূতি-ভূষণের সংগে তর্ক করতে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুদিন তাঁর সংসর্গে থাকবার পরে যেন যাদুমন্ত্রের কাজ আরম্ভ হতো। বাংলা দেশের এক প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর বিশেষ বন্ধু। 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে তিনি শ'র মতোই উপহাস করতেন। তিনিও সেদিন বললেন, বিভূতিবাবু আর একটু হলে আমাকে ঘায়েল করে ফেলে-ছিলেন আর কী!

পরদিন আকাশের অবস্থা হলো যে রকম তাতে ঘরে বসে আড্ডা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তিনি অবশ্য সকালেই এলেন পুত্র বাবলুকে নিয়ে। চা-পানের সংগে সংগে অনেক গল্প করলেন, কিন্তু ভুললেন না সেই বইখানার কথা। বললেন, এই বইখানার খোঁজ পেয়েছি স্বামী অভেদানন্দের 'Life Beyond Death' থেকে। পড়ে দেখো। উচ্চতরো অনুভূতি যেখানে হয় সেখানে আর মতে মতে বিভেদ থাকে না। হিন্দু 'থিওসফিস্ট'-দের মতো এ'রাও স্বীকার করে গেছেন সপ্ত-স্বর্গ। কর্ম-ফলকে এ'রাও মানেন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কারের মূল্য বিশেষ নেই সেকথা এ'রাও করেছেন স্বীকার।

আরও বললেন, ব্রহ্মকে জানা যায় কি না, এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন। তবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। অংশ যেমন সম্পূর্ণকে পায় না দেখতে, তেমনি ব্রহ্মের অংশ হয়ে তাঁর সম্পূর্ণ রূপকে যায় না দেখা। মৃত্যুতে আমার বিশ্বাস নেই। আত্মার বিনাশ নেই, মৃত্যু হলো একটা process of evolution।



সুবর্ণরেখাতীরে বিভূতিভূষণের একটি প্রিয় স্থান



এদোলবেড়া বনভূমি

তবে এ কথা মনে করো না যে, এই পৃথিবীর থেকে মৃত্যুর দ্বার দিয়ে যখন পরবর্তী জগতে যাবো তখন হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ভগবানের সংগে। হয়তো বা চা খাবো তার সংগে এক টেব্‌লে বসে। তা নয়। পরবর্তী জগতের 'communicater' যাঁরা তাঁরা কী বলছেন দ্যাখো ঃ

'We know....more of the operations of that beneficient Power which controls and guides the worlds. We know of Him, but we know Him not..'

এখানে 'worlds' কথাটি লক্ষ্য করবে, ওই শব্দটি বহুবচন দেবার অনেক অর্থ, ওর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাবার চেষ্টা হয়েছে।

এতো কথা যখন তিনি বলছিলেন তখন তাঁর সেই বলার তীব্র গভীরতা দেখে মনে হলো, জীবনে গভীর উপলব্ধি না করে থাকলে এমন গভীর বিশ্বাসের সংগে এ সকল কথা বলতে পারে না কেউ।

আরও বললেন, তুমি বলবে এতো উপলব্ধি থাকতেও তিনি কেন বিকশিত হ'ন না। তারও আছে কারণ। এই আড়ালে থাকবারও আছে উদ্দেশ্য। তিনি প্রকাশ পেতে চান না, তিনি ধরা দিতে চান না। প্রকাশ পাবার সময় এলেই হয় মুস্কিল। কারো কাছে যদি তাঁর ধরা পড়বার মতো অবস্থা হয় তখন তিনি তাকে সরিয়ে দেন।

তাঁর শেষের উক্তিতে মনের ভিতরে কেমন একটু কাঁটা দিয়ে উঠল। কথার ভিতরে 'logic' ছিলো কতটুকু সে কথা চিন্তা করবার অবকাশ যেন তখন ছিলো না আমার। তিনি যেন তখন সবাইকে নিয়ে গেছেন ভাবময় জগতে।

পরদিন দুজনে মিলে অরণ্য পরিক্রমায় যাবার ব্যবস্থা করলেম। সকলেই কাঠের ঠিকাদারদের ট্রাকে বেরিয়ে পড়বো ঠিক হলো। সময়মতো 'স্ট্যান্ড'এ গিয়ে দেখি অমরবাবু তাঁর আরও কয়েকজন বন্ধু নিয়ে উপস্থিত। যাক্‌ বেশ মজা করেই যাত্রা হলো শুরু—কিন্তু আকাশের অবস্থা তেমনি মেঘমেদুর।

বিভূতিবাবু নবাগতদের এতক্ষণ এই দেশের 'টোপোগ্রাফী' বুঝাচ্ছিলেন। অরণ্য মেখলা ঐ শৈলশ্রেণী, শাল ও কেঁদ বনের ছায়ায় এই উচ্চাবচ্চ পথ, দূরের ইস্পাত-নীল কালাঝোড় পাহাড় শ্রেণী ও বন-নদীর উপল-বিধুর স্রোতরেখা—সকল যেন কথা কয়ে উঠে তাঁর বলার ভংগীতে। অরণ্য, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এ সকলের ভাষা তাঁর সুপরিজ্ঞাত। বাসাডেরা-পাস্‌-এর উপর দিয়ে পার হবার সময়ে তিনি অতি আগ্রহে দেখালেন সেই অতি-নিম্নের নৃত্য-চপল 'খরস্রোতা' বন্য নদীটি।

বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে আমাদের গাড়ি আবার উঠল পাহাড়ের উপরে। এক জায়গায় এসে গাড়ি থামিয়ে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। এখান থেকে আমাদের গন্তব্য স্থান ধারাগিরির ঝর্ণা। আমাদের পথটি পাহাড়ের উপরে এঁকে-বেঁকে উঠে গেছে আরও খানিকটা। এক জায়গায় এসে তিনি পাহাড়ের একটি ভয়ংকর খাড়াইয় ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরা প্রায় সকলেই এসে দাঁড়ালেম। সবাই মুগ্ধ ও বিস্মিত। প্রকৃতির এতো নগ্ন সৌন্দর্যের সমারোহও কি সম্ভব? পাহাড় এখান থেকে ঢালু হয়ে গেছে নেমে নীচে আরও নীচে। তার ওপাশে বিচিত্র 'formation'এ নানা শৈলশ্রেণী। সেগুলো পেরিয়ে দূরে সবুজ-নীল আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ-পুঞ্জ। তার ফাঁকে ফাঁকে শৈল-ঊর্মি দিগন্তরেখায় লীন। মাথার উপরের আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ-পুঞ্জ। তার ফাঁকে ফাঁকে মেঘ-ভাঙা স্তিমিত রৌদ্র। দু'পাশে ও পিছনে অরণ্যানী-পিটুনীয়া, ওয়াইল্ড ফ্ল্যাক্স, রক্ত রঙিন অরণ্য-কেনা, বন-টগর, শ্যামা-লতার পুষ্পসম্ভার, বন-শেফালী আরও কতো কী যে বন-ফুল! ভিজে বাতাসে প্রবাহিত বন-তুলসী ও শ্যামা ফুলের গন্ধ।

সকলই তিনি দেখালেন বিশ্লেষণ করে। বনে বনে ঘুরেছি অনেক। কিন্তু তাঁর সংগে ঘোরায় আনন্দ যেন অন্য ধরণের।

এরপর বন-পথ দিয়ে আমরা নেমে এলাম ধারাগিরির ঝর্ণায়। কী যে অপূর্ব এই বন-ভূমির শ্যাম-সমারোহ। বনে চলবার সময়ে তিনি আবার সকলে-চলা-পথে চলতে ভালোবাসেন না—পথ তিনি নিজেই তৈরী করেন। হাতে থাকে একখানা সরু লাঠি—বাঁশের কঞ্চি হলেই ভালো। সেইখানা হাতে করে তিনি যান এগিয়ে, আমরা চলি পিছনে পিছনে।

ধারাগিরিতে কিছু জলযোগের পরে আমরা আবার ফিরে এলাম মোটর চলা পথে। কিছুক্ষণ পরেই এলো মোটর। তাতে চেপে আমরা উঠে গেলাম আরও উপরে—সেই 'সুরু-জলে'। অরণ্য এখানে এতো গভীর যে, তিনি এক সময়ে বললেন, এখানে এলে সারান্ডা অরণ্যের খানিকটা আঁচ তবুও পাওয়া যায়। 'হে অরণ্য, কথা কও' বইয়েও আমি সারান্ডার সম্পূর্ণ রূপ বুঝতে পারিনি। সেই বিরাটের ইতিহাস লিখতে গেলে হয়ে যায় মহাভারত।

তাঁকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, অরণ্যের ভাষা তিনি শুনতে পান কি না। তিনি সত্যি আমাদের শুনোলেন অরণ্যের বাণী।

হঠাৎ তিনি বললেন, এসো আমরা পাঁচ-মিনিট চুপ করে থাকি।

সবাই নীরব হয়ে গেলাম। যে সরু পথটির পাশে আমরা বসে তা হারিয়ে গেছে আরও গভীর অরণ্যে। চারদিকে এতো নিবিড়তা যে, পাতা ঝরার শব্দটি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে সুস্পষ্ট। কতো নাম না জানা কীট-পতংগের ঐকতানিক সুর। ঘুঘুর ডাক বনের নিবিড়তাকে করে তুলেছে আরও বৈরাগী। গাছে গাছে ওরিয়ল ও নীলকণ্ঠের ডাক। আর মনে হয়, বনময় যেন চলেছে কাদের ফিস্‌ফিসানি।

অবাক হয়ে ভাবলাম, বনের বাণী তো মিথ্যা নয়!

মোটর-ট্রাকে কাঠ বোঝাই হলো। আমরা সবাই তার উপরে বসে ফিরে এলাম ঘাটশিলায়।

পরদিন বিকেলে গালুডির পথের পাশে এদোল বেড়ার বনস্থলীকে পিছনে রেখে আমরা বসলাম। আর একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিকও ছিলেন সঙ্গে। সূর্য অস্ত গিয়েছে প্রান্তরের ওপাশে দিগন্তরেখায় তামা-পাহাড়ের পিছনে।

বিভূতিবাবুর মনটা যেন তেমন ভালো ছিলো না। আজও কী যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন তিনি। সকালবেলাও অবশ্য এমনি-ভাবেই দেখেছি। তাই তাঁর মনের খোঁজ পাবার জন্য নানা প্রসঙ্গ এনে ফেললাম। অবশেষে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ফেঁদে বসলাম। নানা কথার পরে তিনি যা বললেন তা যেন 'মেসেজ্' হয়ে রইল 'পস্টেরিটির' কাছে।

তিনি বলতে লাগলেন, আজকের মানুষ তার জীবনের গভীরতরো অনুভূতি ফেলেছে হারিয়ে। উচ্চতরো জীবনের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে সে বর্তমান সভ্যতার মোহের চাকচিক্যে চোখ ফেলেছে ধাঁধিয়ে। কিন্তু তারা বোঝেনা যে, কী তারা করছে, কতটুকু তারা করেছে, কতটুকুই বা তাদের ক্ষমতা। বিরাটের তুলনায় এই বিশ্বই বা কতটুকু, আর বিশ্বের তুলনায় আমাদের সভ্যতাই বা কতটুকু, আর এই সভ্যতার তুলনায় আমাদের জীবনই বা কতটুকু। নিয়ন্ত্রণ আমরা করিনে, নিয়ন্ত্রিত আমরা হই। সৃষ্টি আমরা করিনে, আমরা সৃষ্ট। এই মহাবিপর্যয়েরও ছিলো কারণ, ছিলো দরকার। বিশ্বনিয়ন্তা যদি সকল শুভের কারণ হন তবে তিনি সকল দুর্ভাগ্যেরও কারণ। তিনিই গান্ধীকে বানিয়েছেন, তিনিই জিন্নাকে বানিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটা আছে বৈ কী। কিন্তু কালের প্রবাহ যেমন আমরা পারিনে রোধ করতে, তেমনি উত্থান-পতনের শক্তি রোধ করবার ক্ষমতাও নেই আমাদের কারণ, উত্থান-পতন আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, আমরা উত্থিত পতিত হই মাত্র। সুতরাং, কালের এই বিপর্যয় প্রবাহ একদা হবে কল্যাণপ্রসবী।

সবাই নীরবে রইলাম। জানিনা সেই নব-প্রভাতের সূর্যোদয় হবে কবে।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সকালে অনেকক্ষণ তিনি কাটালেন আমাদের বাসায়। নানা কথার পরে তিনি 'স্পিরিচুয়ালীজম্' ও 'থিওসফী' প্রসঙ্গ তুললেন। গত এগারো দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাদের বাসায় অথবা এইসব দিকেই কাটিয়েছেন। অবশ্য বেড়ানো ছাড়া। এর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, পরলোক-তত্ত্ব নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন সবচেয়ে বেশী। আমরা দুজনে বসে একবার গভীর আলোচনা করে শ্রীঅরবিন্দের 'Savitri' কাব্য পড়েছিলাম। আজ তার থেকেই বার বার নানা জায়গা থেকে উদ্ধৃত করে বললেন।

তিনি বলতে লাগলেন, তুমি পরলোক বিশ্বাস করো আর না-ই করো· ইহলোকে যে প্রত্যেক আত্মাই এক একটি 'মেসেজ্' নিয়ে এসেছে এ তুমি বিশ্বাস করো। উন্নত অনুন্নত আত্মার ভেদাভেদ তাদের বাণীও যেন হয় বিভিন্ন স্তরের।......আত্মার 'egoism'-এ আমি বিশ্বাসী নই। অনন্ত সিন্ধুর জলও যা একটি ঘটের ভিতরের জলও তা। ঘটটি ভেঙে ফেলো, জলের বিভিন্ন রূপের চিহ্ন থাকবে না। তেমনি আত্মা দেহমুক্ত হলে বিভিন্ন স্বর্গের স্তর লঙ্ঘন করে ব্রহ্মে হয় লীন। দেখো শ্রীঅরবিন্দ কী বলেছেনঃ

'Sel's vast spiritual silence occupies space;
Thought falls from us and we cease from joy and grief;
The ego is dead;'

আরও অনেকক্ষণ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার পরে তিনি যেন তন্ময় হয়ে হাত জোড় করে উপনিষৎ আবৃত্তি করলেনঃ

'বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥'

মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, ইছামতীর পুলিন-



অরণ্যপথে

সালিনী কূলে ছোট-এরাণ্ডী ফুলে ঘেরা তিত্‌পল্লার শোভিত যে পল্লীর চিত্র যে শিল্পী করেছেন অক্ষরায়িত আজ তিনি এই ধুলোমাখা রক্ত-মাংসের জীবনকে বিশ্লেষণ করে এসে পৌঁচেছেন কোথায়!

সন্ধ্যায় ডাঃ বোসের বাড়িতে এক সভায় ঘাটশীলা পৌরজনসভা বিভূতিবাবুকে সম্বর্ধনা জানালো। এ-ই যে তাঁকে শেষ সম্বর্ধনা, সেদিন সে কথা কে ভেবেছিলো! বাড়ি ফিরবার পূর্বে তিনি একপাশে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন, আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি, তোমাতে আমাতে নির্জনে বসতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে। কালকে খুব সকালে যাবো।

বুঝলাম, সকালবেলার কথাগুলোর খেই ধরেই তিনি এই কথা বললেন।

তারপরদিন আমার ফিরে আসবার পালা। তা সত্ত্বেও তিনি আসবেন বলেছেন বলে অতি প্রত্যূষে উঠে অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু তিনি এলেন একটু বেলাতেই। আমার কিছু বলবার আগেই তিনি হেসে বললেন, আজ কেন যেন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি আজ চলে যাচ্ছ শুনলাম। হঠাৎ কেন?

লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ ও চা দেওয়া হলো তাকে খেতে। একসময়ে বললেন, আমাদের সেই experiment-টা আর হলো না। যাক্, তুমি তো আসচো কালী পুজোর সময়ে, তখনই হবে। ভিড়ও তখন থাকে কম। ও নিরিবিলি না বসলে হবে না।

কী বিষয় তার একটু আভাষ চাইতেই বললেন, না না এখন নয়। এতো চট্ করে বলা যায় না।

তারপর আরও খানিকক্ষণ ধরে তিনি 'স্পিরিচুয়ালিজম্' সম্বন্ধে অনেক বুঝালেন ও বললেন। অবশেষে এলো বেড়াবার কথা। বললেন, আমার এক প্রকাশক বলেছেন যে, বিলেত ঘুরে আসবার সম্পূর্ণ খরচটা তিনি দেবেন আমাকে। অবশ্য একখানা বই লিখে দিতে হবে। বাঙলা দেশের ও ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের তুলনামূলক বিবরণ। তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে আমার সঙ্গে।

আমার সায় পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, একজন সঙ্গীর অভাবে আমার যাওয়া হচ্ছিল না। বেশ ভালোই হলো। সামনের বছর পুজোর পরে বেরিয়ে পড়বো কী বলো?

তৎক্ষণি বসে কিরকম পোষাক হবে তা ঠিক করে ফেলা হলো। গরম পা-জামার উপরে লং-কোট। মাথায় গরম 'কেপ্'। একটা 'পাইপ' তাকে কিনে দিতে হবে। আরও বললেন যে, তিনিও শীঘ্রই কলকাতা ফিরবেন। কারণ, বনগাঁ কলেজে তিনি অধ্যাপক হয়েছেন, ১৬ই নবেম্বর তাঁকে যোগ দিতে হবে কাজে। সেই সময়েই জামাকাপড়গুলোর অর্ডার দেওয়া যাবে। তিনি উপদেশ দিলেন, ইতিমধ্যে আমার যতো বন্ধু আছে বিদেশে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। পরিশেষে বললেন, বেশ হবে কিন্তু। বিদেশে আমার শুধু দুজনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে। একজন আইনস্টাইন, অন্যজন শ'। 'আইয়েটে' শ'র সঙ্গে দেখা করে বলবো, 'কেমন আছেন বার্নার্ডদা!'

নিজের পরিহাসে নিজেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তারপর আমার গাড়ির সময় হয়েছে দেখে তিনি বিদায় নিলেন।

তৈরী হয়ে স্টেশন যাবার পথে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। স্টেশনের পথে তাঁর একটি অতি প্রিয় জায়গা আছে—মাঠের মধ্যে কয়েকটি নিঃসঙ্গ হরিতকী গাছ, তারই ছায়া। দেখলাম, বসে আছেন তিনি সেখানে। যোগেন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে।

বললাম, বাড়ি গেলেন না?

উত্তর দিলেন হেসে, বসে আছি বলে তো আবার দেখা হলো। কালী পুজোয় আসতে ভুলো না যেনো।

বিদায় নিলাম, সে-ই আমার শেষ বিদায় হবে কে জানত। ৯ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার, বেলা তখন ১০টা। তাঁর জীবনে বৃহস্পতিবার আর আসেনি।

উইল

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুসমাজে এখন উইল করাটা আইনের বলে অত্যন্ত সোজা হয়ে গেছে। সেইজন্য মনে হয়, উইলের আইন সম্বন্ধে গোটাকতক মোটামুটি কথা অনেকেরই জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে। এই সঙ্গে উইলের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানতে পারলে ভাল লাগতে পারে। এই মনে করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হচ্ছে।

উইল জিনিসটাকে বাঙলা ভাষায় অনেকে চরমপত্র, শেষপত্র, ইচ্ছাপত্র ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাঙলা ভাষার সাধুতা রক্ষা করার শুচিবাই যখন আমার নেই, তখন আমি এই নিবন্ধে উইলকে উইল বলেই চালিয়ে যাচ্ছি, তার বাঙলা কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করব না। কারণ, টেবিল চেয়ারের মতন, উইল কথাটা বাঙলা ভাষার জাতে উঠে গেছে। ইংরিজীতে যেমন পাকা সাহেব তাদের অভিধানে পাকা হয়ে বসে গেছে। প্রমাণ দরকার হোলে, কৃষ্ণকান্তের উইলকে নজীর দেখাতে পারি। কৃষ্ণকান্তের চরম ইচ্ছাপত্র বল্লে কি সেটা বাঙলা বলে মনে হোত কি?

আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক রকমের আইনের মতন, উইল-সংক্রান্ত আইনও, সম্পূর্ণ বিলিতি আমদানী। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রগুলো ঘেঁটেঘুঁটে এমন কিছু বার করতে পারিনি, যাতে বেশ নিঃসঙ্কোচে জোর করে বলতে পারি যে, পুরাকালে এদেশে উইল করার পদ্ধতি ছিল। তবে তখনকার দিনে একটা নিয়ম ছিল। সেটা প্রায় উইলের কাছাকাছি। বয়স হলে, গার্হস্থ্য-ধর্ম পরিত্যাগ করে, পরমার্থ চিন্তার দিন কাটাবার জন্য, লোকদের সংসার ত্যাগ করার এক রীতি ছিল। তার পূর্বে, পার্থিব ধনসম্পত্তি ছেলেদের ডেকে, তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল।

পরবর্তীকালেও অনেক দিন পর্যন্ত, বনে না হোক্, শেষবয়সে তীর্থস্থানে বাস করতে যাওয়ার রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। তীর্থের মধ্যে প্রধান ছিল কাশী, বৃন্দাবন এবং পুরীর জগন্নাথধাম। কিন্তু বনে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু তীর্থে গেলেও দেখতে পাওয়া যায়, লোকদের মন অনেক সময় পড়ে থাকতো এই সংসারেরই দিকে; এবং অনেককে সেইজন্য সেখান থেকে আবার বাড়ি ফিরে আসতেও দেখা যেত। এরকম অবস্থায় একেবারে দান করে, সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব হওয়ার চেয়ে, মরার পর, বিষয়-সম্পত্তির কি বিলি-ব্যবস্থা হবে, তার একটা নির্দেশ লেখাপড়ায় দিয়ে যাওয়া, বুদ্ধির কাজ বলে, অনেকে বিবেচনা করতেন। এইরকম লেখাপড়া করার নামই উইল।

ইংরেজরা উইল করতে ওস্তাদ। ইংলণ্ডে সবচেয়ে পুরোনো উইল পাওয়া গেছে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইংরেজ রাজা এল্ফ্রেড দি গ্রেটের। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, যে-সব ইংরেজ এদেশে আসতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একটা না একটা উইল রেখে যেতেন। গরীব কেরাণী, নগণ্য পল্টন থেকে আরম্ভ করে বড় বড় সওদাগর, এমন কি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বাররা পর্যন্ত সকলেই। অন্যান্য কারণের মধ্যে এও একটা কারণ ছিল যে, তখনকার দিনে এদেশে আগত অধিকাংশ ইংরেজই এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক, দিশি বা ফিরিঙ্গী মেয়ে, নিয়ে ঘর-সংসার করতেন। ফলে এই স্ত্রীলোক-দের গর্ভে সন্তান জন্মাত। সেকালের রীতি অনুসারে এটাকে কেউ খারাপ জিনিস বলে মনে করত না। এখন এই সব স্ত্রীলোক ও তাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য উইল করে একটা বন্দো-বস্ত না করে গেলে, তাদের একেবারে পথে বসতে হয়। সাধারণ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে তারা ত কিছুই পায় না। এই কারণে সে সময়কার সরকারী দপ্তরে যেসব ইংরেজদের উইল জমা রাখা আছে, সেগুলো পড়লে দেখা যায়, তার মধ্যে অধিকাংশই এইরকমই সব ব্যবস্থা করার জন্য।

ইংরেজদের আশ্রয়ে তখনকার দিনে যেসব দিশি লোকেরা কোলকাতায় এসে বাস করতেন, তাঁরাও ইংরেজদের দেখাদেখি, উইল করার প্রথাটা গ্রহণ করে নিতে আরম্ভ করলেন। কারণ এতে অনেক দিক থেকে অনেক রকমের সুবিধা।

প্রথম প্রথম উইল রেজিস্ট্রী করতে হোত, গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের কাছে, সেইখান থেকেই প্রোবেট পাওয়া যেত। প্রোবেট হচ্ছে, উইলটা যে প্রমাণ করা হোল, তারই নিদর্শন-স্বরূপ একটা সার্টিফিকেটের মতন। তারপর ১৭২৬ সনে মেয়রস্ কোর্ট বলে কোলকাতায় এক আদালতের সৃষ্টি হয়। সেটা এখন ছোট আদালতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইখান থেকে তখন প্রোবেট দেওয়া হোত। এর পর ১৭৬৫ সনে, ইংরেজদের বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পাবার পর, কোলকাতায় ১৭৭৪ সালে, ইংরিজী সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরোণো দপ্তর ঘাটলে দেখা যায় যে, ১৭৭৫ সাল থেকে ১৭৮২ সাল পর্যন্ত এই সাত বছরে সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রায় ২০০ দিশি লোকের উইলের প্রোবেট দেওয়া হয়েছিল।

এরপর থেকে, ১৮১৬ সাল পর্যন্ত, এই ৩৪ বৎসর কোনো হিন্দু উইলের প্রোবেট দেওয়া হয়নি। কারণ অনুসন্ধান করলে প্রকাশ পায়, এ সময়কার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চার্টারে বলা হয়েছে যে, দিশি প্রজাদের উপর তাদের নিজেদেরই স্বদেশী আইন প্রযোজ্য হবে, ইংরেজী আইন নয়। এর ফলে তখনকার দিনের জজদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হোল যে, যখন হিন্দু আইনে উইল করার কোনো ব্যবস্থাই দেওয়া নেই, তখন তাঁরা কি করে আর হিন্দু উইল গ্রাহ্য করেন?

কিন্তু দেখা গেল যে, উইল না থাক্লে অনেক রকম ল্যাঠা এবং নানা রকমের উৎপাত উপস্থিত হয়। তখন জজেরা স্থির করলেন, হিন্দু আইনে উইলের বিধি নেই বটে, নিষেধও ত' কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং একেবারে নিষেধ যখন নেই, তখন বর্তমান যুগে দিশি লোকেদের উইল করতে না দেওয়াটা ভারী অন্যায় কাজ হবে। আইন ব্যাপারে কালের গতির সঙ্গে তাল রক্ষা করতে গিয়ে এ রকম অনেক নতুন নতুন রকমের সূত্র দেখা দেয়। এরই নাম ইংরিজীতে লিগল ফিকসন। অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত মিথ্যা। কিন্তু পাছে কোথাও কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়, সেইজন্য জজেরা হিন্দুদের উইলের প্রোবেট দেবার পূর্বে, পদে-পদে স্মার্ত পণ্ডিতদের কাছ থেকে একবার যাচিয়ে নিতেন যে, উইলে লেখা ব্যবস্থাগুলো ঠিক হিন্দু আইনসম্মত কি না। হিন্দু আইনের ব্যবস্থাগুলো বুঝিয়ে দেবার জন্য যেসব পণ্ডিতেরা আদালতের সংস্রবে থাকতেন, তাঁদের সেকালে জজ-পণ্ডিত বলে ডাকা হোত।

১৮৩২ সালে সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ের বলে, হিন্দুদের উইল করাটা বে-আইনী নয় বোলে সাব্যস্ত হয়। আরও ৩০ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, প্রিভিকাউন্সিলও রায় দিলেন যে, হিন্দুদের উইল করার পুরো-পুরি ক্ষমতাই আছে। এরপর এই ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস করেননি।

কিন্তু ক্ষমতা যখন হোল, তখন হিন্দু উইল-সংক্রান্ত আইনের একটা ভাল রকম বিধি-ব্যবস্থা করার দরকার। এই উপলক্ষে ১৮৭০ সালে ২১ নম্বরের আইনের দ্বারা Hindu Wills Actটি পাশ করা হয়। নামটা যদিও Hindu Wills Act, কিন্তু এ অ্যাক্টে হিন্দুত্ব বড় কিছু ছিল না। বিলিতি উইলের আইনটি এই অ্যাক্টের প্রায় সমস্ত ধারাগুলিতে নিবদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের আজকালকার খাওয়া-পরা, শোয়া-বসা, চলা-ফেরা সবই যেমন দিশি-বিলিতিতে মেশান,

সেইরকম আমাদের যা কিছু আইন এখন চলছে, সেগুলোও ঐ রকম আধা দিশি আধা পরদিশি; নির্জলা খাঁটি স্বদেশী কোনটাই নয়। ১৯২৫ সালে Indian Succession Act-এর মধ্যে Hindu Wills Act অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক হয়ে গেছে। এখন উইল সম্বন্ধে যা কিছু বিধিনিষেধ, বিলি-ব্যবস্থা ঐ ১৯২৫ সালের Succession Act-ই পাওয়া যায়।

যাঁরা প্রাচীন পুঁথিপত্রের, দলিল-দস্তাবেজের মতন নীরস জিনিসেও রস খুঁজে বের করেন, তাঁরা যদি কখনও পুরোনো দিশি উইলগুলো, দপ্তরে বসে পড়ে দেখবার সুযোগ পান, তাহলে সেগুলোর থেকে তাঁরা প্রচুর আনন্দ পাবেন বলে মনে করি। তা ছাড়া এগুলোর থেকে সে-সময়কার একটা সামাজিক চিত্রও তাঁরা আমাদের চোখের সামনে ধরে দিতে পারবেন, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আর এই উইলগুলো থেকে তখনকার দিনের বাঙলা গদ্যের আকার-প্রকার এমন কি শব্দের বানানগুলোও যে কি অদ্ভুত রকমের ছিল, তারও বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাঙলায় লেখা একটা অতি সংক্ষিপ্ত উইলের নিদর্শন দিচ্ছি। উইলকর্তা সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের যুগলকিশোর আঢ্য; তখনকার দিনের এক বিখ্যাত ধনী লোক। এঁর তৈরি, এঁরই নামে পরিচিত, সেকালে গঙ্গার তীরে এক ঘাট ছিল। উইলের তারিখ ১১৮৮ বাঙলা সনের ৫ই ভাদ্র। ইংরাজী ১৭৮১ সালের ১০ই আগস্ট। প্রায় একশ আশি বছর আগেকার ব্যাপার।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

সহায়

লিখিতং শ্রীজুগোলকিশোর আঢ্যস্য।
উইলপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি আমার স্ত্রী শ্রীমতি কিশোরি দাসি ও আমার পুত্র নন্দলাল আঢ্যকে স্বইৎসা পুর্ব্বক আমার ইষ্টেটের জাইণ্ট এক্যেকিটরস করিলাম আমার দৌলাত ও আমলা ও গয়রহ সমস্তের মালিক করিলাম এই উইলপত্র সেওয়ায় আর কোন উইলপত্র কাহারো নামে থাকে তাহা রদুল করিলাম।—ইতি বাঙ্গলা সন ১১৮৮ এগার শত অষ্ট আশি ইংরাজী সন ১৭৮১ সাল, তারিখ ৫ই ভাদ্র। ১৮ আগস্ট।

শ্রীজুগোলকিশোর আঢ্যস্য।

দিশি লোকের মধ্যে যাঁরা কোলকাতার আদিম বাসিন্দা, তাঁদের মধ্যে কয়েক ঘর পশ্চিমা লোক; বাঙালীদের মধ্যে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের শেঠ বসাকরা, সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মল্লিকরা ও ব্রাহ্মণকুলের ঠাকুরবাবুরা, কায়স্থ সমাজের মিত্তিররাই প্রসিদ্ধ। তারপর যখন মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, তাঁর মুন্সীআনার বকশিশ হিসেবে, ক্লাইভের কাছ থেকে, কোলকাতার উত্তরে সুতানটী গ্রামটির জমিদারীস্বত্ব পান, সেই সময় থেকে, তিনি আস্তে আস্তে, অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের কোলকাতায় আনিয়ে, সুতানটী গ্রামে জমি দিয়ে বসবাস করান। এঁদের অনেকেই ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে, ইংরেজদের তাঁবে বিষয়-কর্ম করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, অনেক ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে এ পর্যন্ত যা সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দিশি উইলের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে উমিচাঁদের উইল।

এই উমিচাঁদ ইতিহাসে বিখ্যাত। এঁর আসল নাম আমীর চাঁদ। ইনি পাঞ্জাবী শিখ সম্প্রদায়ের লোক। কোলকাতায় এসে উমিচাঁদ প্রথমে বৈষ্ণবদাস শেঠের গদিতে সামান্য কর্মচারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। পরে নানা উপায়ে নিজেই অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে হাতে তাঁর উইল লিখে যান। উইলে তারিখ নেই, সই নেই। কিন্তু যিনি তাঁকে লিখতে দেখেছিলেন, তিনি সাক্ষী দিয়ে গেছেন, মৃত্যুর এক মাস পূর্বে উমিচাঁদ স্বহস্তে এই উইল লেখেন। উমিচাঁদ মারা যান ১৭৫৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর। বাঙলা ১১৬৫ সালের অঘ্রাণ মাসে। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের দেড় বৎসর পরে, আর আজ থেকে ১৯২ বৎসর আগে। নিঃসন্তান বিপত্নীক অবস্থায় ইনি মৃত হন। এই উইলে তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কর্মচারীদের বিভিন্ন রকমের মোটা টাকা দান করে, আরও অনেক রকম সৎকার্যেও অনেক টাকা দিয়ে, বাকি সব সম্পত্তি শিখ গুরু গোবিন্দের মন্দিরের সেবার জন্য উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি ক্লাইভের হাতে ঠকে গিয়েও, বিলেতের এক হাসপাতালে প্রায় ২০ হাজার টাকা দাতব্য করে গিয়েছিলেন।

গল্প আছে, উমিচাঁদ যখন শুনলেন যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার ধনরত্ন থেকে ক্লাইভ তাঁকে যে ২০ লক্ষ টাকা দেবেন বলেছিলেন, তার থেকে তিনি একটু কিছুও পাবেন না, তখন তিনি নাকি টাকার শোকে, একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই উইল পড়লে, পাগলামির ত' কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পাগল হয়ে যাওয়ার গল্পটি সম্পূর্ণ বানান বলেই সন্দেহ হয়।

তীর্থযাত্রার পূর্বে উইল করে যাওয়ার রীতি, দুটি স্ত্রীলোকের উইলে পাওয়া যায়। একটি পরমেশ্বরী দাসীর, আর একটি রামনারায়ণ মল্লিকের মা, নাম জানা নেই। একজন গিয়েছিলেন বৃন্দাবন, অপর জন যাচ্ছেন কাশী। উভয় উইলের মর্ম এই যে, যদি তীর্থ থেকে তাঁরা ফিরে আসেন, তাহলে তাঁরা দত্ত-সম্পত্তি আবার ফিরে পাবেন। আর সেখানে তাঁদের মৃত্যু হলে, যাঁদের হাতে সম্পত্তি দিয়ে গেলেন, তাঁরাই তার মালিক হবেন। প্রথমটির তারিখ হচ্ছে, ২২শে কার্তিক, ১১৭৭ সন; ইংরাজী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ। ১৮০ বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয়টির তারিখ হচ্ছে, ২৭শে কার্তিক, ১১৯৮ সন; ইংরাজী ১৭৮২ সাল। ১৬৮ বছর আগের।

পরমেশ্বরী দাসী বিখ্যাত রতন সরকারের স্ত্রী। রতন সরকারের পুরো নাম, রত্নেশ্বর সরকার। ইনি সামান্য ইংরেজী শিখে ইংরেজদের দোভাষীর কাজ করে বিস্তর ধন উপার্জন করে গিয়েছিলেন। কোলকাতা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এঁর নামে একটি রাস্তা এখনও পর্যন্ত আছে। পরমেশ্বরী দাসী কিসের লোভে তীর্থস্থান ত্যাগ করে, আবার কোলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তার কারণটা সঠিক জানা যায় না। বোধ হয় গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায়। কারণ দেখা যায় যে, মৃত্যুর একমাস পূর্বেই তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়েছিল। সেই যুগলকিশোর আঢ্যর ঘাটেই তিনি ছিলেন। গঙ্গার হাওয়া পেয়ে এই মুমূর্ষু বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বোধ হয় একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এক মাসের মধ্যে তিন তিনবার গঙ্গাগর্ভে অন্তর্জলী করবার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তখনকার দিনের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, কোলকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ বড়লোকদের উইলের কিছু কিছু যা সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এই—

শ্যামাচরণ শেঠ—তারিখ ১০ই অঘ্রাণ, ১১৭৭ (ইং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে)।

শোভারাম বসাক—তারিখ ২৩শে নভেম্বর, ১৭৭৩।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব—তারিখ ১৩ই মে, ১৭৯১।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ, তারিখ নেই।

গোকুলচন্দ্র কারফরমা—তারিখ ২০শে নভেম্বর, ১৭৯৮।

গৌরচরণ মল্লিক—তারিখ ১৪ই ভাদ্র, ১২০৭ (ইং ১৮০০ খৃষ্টাব্দ)।

নিমাইচরণ মল্লিক—তারিখ ২৪শে মাঘ, ১২১৩ (ইং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ)।

গোকুলচন্দ্র মিত্র—তারিখ ৪ঠা মার্চ, ১৮০৮

সূর্যকুমার ঠাকুর—তারিখ ৩রা জানুয়ারী, ১৮২০।

এর মধ্যে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের, গোকুলচন্দ্র কারফরমার, গোকুলচন্দ্র মিত্রের ও সূর্যকুমার ঠাকুরের উইল সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করলে, একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, এই উইলগুলোতে হিন্দু-আইনের কতকগুলো বনেদী বিধি, জজ এবং স্মার্ত

পণ্ডিতদের রায়ে, এমন পাকা হয়ে যায় যে, এখনও পর্যন্ত সেগুলো বেশ টিঁকে আছে।

দর্পনারায়ণ তাঁর উইলে, তাঁর বড় ছেলে রাধামোহন ঠাকুর এবং তাঁর তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণমোহন ঠাকুরকে অবাধ্যতার জন্য, আর বিষম মদ খাওয়ার বদ-অভ্যাসের দরুণ, বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন। উইল করার সময় আগত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের ধরাধরিতে দু'জনকে কেবল ১০ হাজার টাকা করে দেন। তাঁর আর এক ছেলে, প্যারীমোহন ঠাকুর বোবা কালা ছিলেন বলে, তাঁকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে এবং তারপর তাঁর গৃহদেবতা রাধাকান্তজীর সেবার বন্দোবস্ত করে, বাকী সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর অবশিষ্ট চার ছেলে,—গোপীমোহন, হরিমোহন, লাড্‌লীমোহন এবং মোহিনীমোহনকে সমান ভাগে দিয়ে যান।

এই উইল নিয়ে যখন মামলা ওঠে, তখন বিচার্য বিষয় এই ছিল যে, বড় ছেলে, যিনি শ্রাদ্ধের অধিকারী, তাঁকে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না? পণ্ডিতের কাছে জজেরা মন্তব্য চেয়ে পাঠালে, তাঁরা বল্লেন যে, বাঙলা দেশের এই নিয়ম যে, বাপ তার পূর্ব-পুরুষদের অর্জিত এবং স্বোপার্জিত উভয় রকমেরই সম্পত্তির থেকে, শুধু বড় ছেলে কেন, সব ছেলেকেই বঞ্চিত করে, যাকে ইচ্ছে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেন। তাতে কোন বাধা নেই।

গোকুল কারফর্মার উইলটা সেকালের লোকের পক্ষে একটু আশ্চর্য রকমের। তিনি উইলের গোড়াতেই লিখছেন,—তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কোনো বিধানই মানেন না। বিচারবুদ্ধির ফলে, তিনি নিজে যা ভাল বোধ করেন, সেই মতনই ব্যবস্থা তাঁর উইলে করছেন। তাঁর একজিকিউটররা তাঁর লেখা উপদেশ ও তাঁর ইচ্ছাকে, যেন বেদাদির অনুশাসনের চেয়েও বড় বলে মনে করেন। তিনি শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য পারলৌকিক ক্রিয়ায় কোনো ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। কেবল মৃতদেহ দাহাদি করার আনুষঙ্গিক কর্মের জন্য ২০০্ টাকা খরচ করা যেতে পারে।

পণ্ডিতেরা মত দিলেন, এ উইল টিঁক্‌তে পারে না। সাধারণ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে বিষয় তাঁরই সাত ছেলের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হল।

গোকুল মিত্র, প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর। এই গোবিন্দরাম মিত্র কোলকাতার প্রথম দিশি জমিদার, বা কালেক্টার। এঁকে ইংরেজরা Black Zamindar বলে ডাক্‌তেন। আহিরীটোলার বিখ্যাত মদনমোহন জিউ ঠাকুর, এঁদেরই কুলদেবতা। গোকুল মিত্রের উইলের বলে, সর্বপ্রথম হিন্দু আইনে, ঠাকুর সেবার পালা ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যৌথ সেবায় অসুবিধা হয় বলে, মদনমোহন জিউ-এর সেবা তখন থেকে নিজের নিজের পালা অনুসারে, ঠাকুরের সেবায়েতেরা করে থাকেন।

সূর্যকুমার ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুরের বড় ছেলে, এবং দর্পনারায়ণের পৌত্র। তাঁর ছেলে ছিল না। তিনি উইলে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যাসন্তানদের ও মৃত কন্যার পুত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্য ভাল রকম বন্দোবস্ত করে, এই ব্যবস্থা লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, যদি তাঁর পুত্রসন্তান না হয়, তাহলে বাকী সম্পত্তি, তাঁর পাঁচ ভাই, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার, প্রসন্নকুমার এঁরাই পাবেন। সূর্যকুমার অপুত্রক মারা গেলে, তাঁর স্ত্রী অভয়া দেবী স্বামীর ভাইএদের নামে, উইল নাকচ করার এক মামলা আনেন। কিন্তু এই মামলার বিচারে স্থির হয়, হিন্দুরাও উইলে এমন দান করতে পারেন, যে-দান একটা নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটা, বা না ঘটার, উপর নির্ভর করে।

সূর্যকুমারের ভাই নন্দকুমার ঠাকুর, পরে রক্ষনশীল সমাজের নেতা হয়ে, উমানন্দন ঠাকুর নামে, রামমোহন রায়ের মতের বিরুদ্ধতা কোরে প্রবন্ধাদি লেখেন। শোনা যায় যে, তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলো, আসলে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, যিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। এঁরই ছোট ভাই, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, আবার রামমোহন রায়ের অত্যন্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। এবং নানাভাবে, চারদিক থেকে তাঁকে সাহায্যও করেছিলেন।

সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নিজেও, সে সময়কার সমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হিন্দুকলেজে ডি রোজিওর প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং উত্তরকালে নব্যবঙ্গ সমাজের এক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য, তিনি বেথুন স্কুলের বাড়ি করার জন্য, নিজের জমি দান করে দেন।

সামান্যভাবে দিশি উইলের ইতিহাস সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা গেল। এখন উইলের আইন সম্বন্ধে আসল কটা খুব প্রয়োজনীয় কথা জানিয়ে দিচ্ছি। এগুলো জানলেই যদি মনে করে নেন যে, উইলের আইনটা বেশ বুঝে গেছেন, তাহলে সেটা একেবারেই ঠিক হবে না, আগে থাক্‌তেই সে বিষয়ে কিন্তু সাবধান করে দিই। কারণ, আইনের শাস্ত্র হচ্ছে, গুপ্তবিদ্যা। অর্থাৎ এর ব্যাখ্যাটা, শুধু যে বইএতে পাওয়া যায়, এমন নয়। গুরুমুখী বিদ্যার মতন আইনের অনেক তত্ত্বই, আইন ব্যবসায়ীদের মগজে, আর জজ সাহেবদের পেটে, গুহাহিতং হ'য়ে লুকান থাকে বলে, উইল নিয়ে একটা মামলা না উঠলে, আর তার রায় না বেরোনো পর্যন্ত, সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো কথা বলতে যাওয়া, ঠিক ঘোড়দৌড়ের কোন্ ঘোড়াটা বাজী জিত্‌বে, আগের থেকে তা বল্‌তে চেষ্টা করারই মতন দুর্বুদ্ধির কাজ।

এর একটা বিখ্যাত নজীর আছে। পাথুরে-ঘাটার ঠাকুরবাড়ির প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন উইল করে, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি প্রথমে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে, আর তাঁর অবর্তমানে, তাঁর বড় ছেলেকে, তারপর পুরুষানুক্রমে বংশের বড় ছেলেকে পর পর দিয়ে গেলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই একটু হেসে নিয়েছিলেন। ঠাকুরবাবুর ইচ্ছা ছিল, তাঁর একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন, যিনি ইতিপূর্বে খৃষ্টান হ'য়ে গিয়েছিলেন, তিনি যেন তাঁর সম্পত্তির অধিকারী না হন। কিন্তু আইনের অনেক কূটতর্কের পর, বিস্তর পয়সা খরচের পর, সবচেয়ে বড় আদালতের বিচারে এই স্থির হোল যে, প্রসন্নকুমারের সমস্ত সম্পত্তি যতীন্দ্র-মোহনের মৃত্যুর পর, জ্ঞানেন্দ্রমোহনেরই কাছে ফিরে গিয়ে, তাঁতেই বর্তাবে! ফলত প্রমাণ হয়ে গেল, ঠাকুরমহাশয়ের মতো অত বড় আইনজ্ঞ পুরুষও বে-আইনী কাজ ক'রে গেছেন।

গোড়াতেই তাহলে প্রশ্ন ওঠে, উইল করবার অধিকারী কে? অধিকারী ভেদটা ত সর্বত্রই আছে। আইনে বলে, পাগল আর নাবালক ছাড়া, সবাই উইল করতে পারেন। সাধারণ বুদ্ধিতে পাগল বলতে যে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে সকলেরই একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। বেশী ব্যাখ্যা করে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঐ পাগল যে কে, শুধু সেই নিয়েই আইনে যেসব মস্ত মস্ত কূটতর্ক আছে, তা বুঝতে চেষ্টা করলে, অনেক বিজ্ঞ জ্ঞানী লোকদেরও মাথার ব্যারাম দেখা দিতে পারে। ক্ষ্যাপা বা ছিট-গ্রস্ত বলতে যে-পাগল বোঝায়, সে-পাগল আইনী-পাগল নয়। আবার আর এক রকমের পাগল আছে, যে পাগল, অন্য সব বিষয়ে ঠিক সাধারণ মানুষের মতন, কিন্তু একটা বিশেষ কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। যেমন এক ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর পাগলামীটা ছিল এই ধরণের যে, তিনি বেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। আর তিনি নিজেকে বোধ হয় ভেবে নিয়েছিলেন, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, কিম্বা লর্ড এসেক্স, কিম্বা ঐ রকম আর কেউ বলে। ঐ লোকটিকে তাঁর বিপক্ষের লোকেরা জজের রায়ে পাগল বলে সাব্যস্ত করতে পারেন নি। আর এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনিও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে সাধারণ লোকের মতন; কেবল তাঁর এক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং যিশু খৃষ্ট এবং ভগবানের দূত, অর্থাৎ মেশায়া।

আমরা যে যিশু খৃষ্টের সম্বন্ধে জানি, তাঁর মতে, সেই খৃষ্ট, অতি সাধারণ এক মনুষ্য ছিলেন, আসল যিশু খৃষ্ট মোটেই নন। ক্রীশ্চানরা ভুল করে তাঁকে মেশায়া বলে মনে করেন। সোজা কথা, আইনের মতে পাগল হচ্ছেন সেইজন, যিনি এমনি অবিবেচক যে, নিজের সম্পত্তি নিজে রক্ষা করবার ক্ষমতা ধরেন না। এখন কবি কি আর্টিস্ট ব্যক্তিরা, আইনের প্যাঁচে, ঐ দলে গিয়ে পড়েন কিনা, তার নজির এখনও পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

নাবালকদের সম্বন্ধে অবশ্য অত গভীর আলোচনা আইন শাস্ত্রে নেই। তার কারণ, নাবালকদের বয়সটার বিষয় একটা পাকাপাকি রকম বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সচরাচর আঠার বৎসর বয়স অতিক্রম করলেই, লোকে নাবালক খোলস ছেড়ে, সাবালক পদবীতে আরূঢ় হয়। কিন্তু এখানেও আবার সামান্য একটু কথা আছে। যদি আদালত থেকে কোনো নাবালকের অভিভাবক ঠিক করে দেওয়া হয়, তাহলে সে বেচারীর অর্বাচীন দুর্নাম ঘোচাতে পুরো একুশ বৎসর বয়স লাগে। কেন যে এমন ধারাটা হয়, তার কোনো যুক্তি বইয়ে দেওয়া নেই। তবে আইন কর্তাদের মনে মনে বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের বুদ্ধি পাকতে কিছু বিলম্ব হলেও হতে পারে।

স্ত্রীজাতিরাও উইল করতে পারেন। আইনে স্ত্রীলোকদের থেকে পুরুষদের অনেকটা প্রভেদ থাকলেও, উইল সম্বন্ধে পক্ষপাত কম। তবে স্ত্রীলোকেরা কেবল নিজের সম্পত্তিই, যাকে স্ত্রীধন বলে, সেইটুকু মাত্র, উইল করে দিতে পারেন। কারণ, আইনের একটা প্রবচন আছে, অন্যের সম্পত্তি কেউ অপরকে দান করতে পারে না। সে উইল করেই হোক, আর দানপত্র করেই হোক। ধরুন, যদি কেউ তাঁর উইলে গভর্নমেণ্ট হাউসটা আমাকে দান করে যান, তাহলে সেটা, আমার প্রতি তাঁর অত্যন্ত প্রীতির নিদর্শন হ'তে পারে, কিন্তু আইনের উপর সেটায় অত্যন্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

উইল ক'রে যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকলেও, মানুষ জীবিতকালে যাদের খোরপোষ দিতে বাধ্য, তাদের ব্যবস্থা না ক'রে, অন্যকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেলেও, খোরপোষ-এর অধিকারীরা মামলা করে, মৃত ব্যক্তির স্টেটের থেকে, উপযুক্ত পরিমাণ খোরপোষের টাকা আদায় করে নিতে পারেন। মানুষের প্রধান পোষ্য হচ্ছে, তার স্ত্রী ও নাবালক সন্তানরা। এই খোরপোষের বন্দোবস্তটা কিন্তু ন্যায্য হওয়া চাই। অর্থাৎ স্ত্রীকে ও নাবালক সন্তানদের দু' চার টাকা দিয়ে বাকী টাকা অপরকে দিলে চল্‌বে না। এই ন্যায্য পরিমাণটা নির্ভর করে মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় কি রকমভাবে তাঁর থাকার অভ্যাস ছিল, কি রকম পরিমাণ ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন, আর কি রকম আন্দাজ টাকায় খোরপোষ ভালভাবে চল্‌তে পারে, এই সবের উপর। স্যার তারকনাথ পালিত তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে মাত্র ১০০্ টাকা দিয়ে বাকী সব কোলকাতার ইউনি-ভার্সিটিকে বিজ্ঞান চর্চার জন্য দিয়ে গিয়ে-ছিলেন।

তার বিধবা স্ত্রী, লেডী পালিত, এই বন্দোবস্ত স্বীকার না করে এক মামলা আনেন, দেখা গেল, সার তারকনাথ জীবিতকালে বালীগঞ্জে তিনতলা বাড়িতে থাকতেন, বাবুর্চি খানসামা রাখতেন, আর সম্পত্তিও রেখে গেছেন, পাঁচ সাত লাখ টাকার উপর, এ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য একশ টাকা ত নস্যির মতন। জজেরা বিচার করে তাঁর পাঁচশ টাকার মাসো-হারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

জোর করে কাউকে দিয়ে উইল করিয়ে নিলে কিন্তু সেটা উইল হবে না, বলাই বাহুল্য। তবে এ জোর গায়ের জোর বা লাঠীর জোর নয়। এর মানে, উইল কর্তার মনের উপর এমন এক প্রভাব বিস্তার করা, যার ফলে কর্তার বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় এবং তখন তাঁকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করান যায়।

উইল সম্পূর্ণ নিজের হাতে লেখা যেতে পারে; পরকে দিয়ে লিখিয়েও নিতে পারা যায়। টাইপ করালে, খরচ একটু সামান্য বেশী হয় বটে, তবে হাতের লেখার চেয়ে পরিষ্কার হয় বলে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হাতের লেখাটা একেবারে অপাঠ্য না হলেই ভাল। কারণ, কথার মারপ্যাঁচের উপরই উইলের যাবতীয় মামলা চলে। যেমন কাশী আর ফাঁসীতে অনেক তফাৎ হয়ে যায়, লেখার আঁক যোঁকের একটু তারতম্যে। কাগজ যে-রকম হয়, তাতেই চল্‌বে। সময় কম থাকলে, হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই মাথা পেতে নিতে হয়। প্রচলিত যে-কোন ভাষায় উইল লেখা চলে। তবে সেটা ভাষা হওয়া চাই। কতকগুলো হিজিবিজি, বা ছবি কি চিহ্নমাত্র হলে, একে-বারেই চল্‌বে না।

আগেকার দিনে মৌখিক উইলের প্রচলন ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে, আজকালকার আইনে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া, লেখা-উইলই, উইল বলে গণ্য। ব্যতিক্রম, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত যোদ্ধাদের বেলায়।

উইল করতে গেলে সর্বাগ্রে দেখা চাই, অন্ততঃপক্ষে দুজন সাক্ষী ঠিক আছে কিনা। উইলকর্তার হয় তাঁদের সামনে সই করতে হয়, নচেৎ তাঁদের কাছে স্বীকার করতে হয়, দস্তখতকরা কাগজটি হচ্ছে তাঁরই সইকরা উইল। সইটি কিন্তু ঠিক থাকা চাই। সই করতে না জানলে বা না পারলে, তার বদলে ঢেঁড়া সই, কিম্বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সাক্ষী দুজনেরও উইলকর্তা ও পর-স্পরের সামনে সই করা দরকার। একজন সাক্ষী হলে, কিন্তু একেবারেই চলবে না। তার কারণ, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারেন। কিন্তু দুজন বা ততোধিক সাক্ষী মিললে, যে মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেড়ে যেতে পারে, এর নজীর মামলার ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নয়।

এর পরেই স্থির করতে হয়, উইলের এক-জন বা একাধিক একসিকিউটর। উইলের সর্ত-গুলো কার্যে পরিণত করার ভার তাঁদের উপর। উইলপত্রের ব্যবস্থাগুলো কর্তার জীবদ্দশার পর কার্যকরী হয়, এবং মরার পর উইলকর্তা নিজে একেবারে কাজের বার হয়ে যান বলে, একসি-কিউটর বলে এক মধ্যস্থ ব্যক্তির দরকার। তিনি প্রায় চিনির ভারবাহী বলদের মত। অর্থাৎ তাঁর হাতে টাকা আসে বটে; কিন্তু তিনি সেটার রসাস্বাদন করতে পারেন না।

মৃত্যুর পর থেকেই উইলটি কার্যকরী হয় বলে, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত উইল যত-বার ইচ্ছে ততবার বদ্‌লান যেতে পারে। তবে মনে রাখবার বিষয় হচ্ছে এই যে, নতুন উইল সই করবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো উইলটি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে কিম্বা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কারণ একই লোকের দুটো উইল একসঙ্গে পাওয়া গেলে, তাই নিয়ে মস্ত বড় মামলা বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা।

উইল যে অতি সাধারণ চলতি ভাষায় করা চলতে পারে, সেটা সব আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাই স্বীকার করেন। বরং আইনের বিশেষ ভাষা ব্যবহার করলেই বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, সেক্ষেত্রে, আইনের ভাষার যে বিশেষ বিশেষ মানে প্রচলিত হয়ে আছে, সেই অর্থই তখন প্রযোজ্য হবে। বাক্য বহু অর্থপ্রেয়সী। অর্থাৎ তিনি কখন যে কৃপা করে কোন্ অর্থকে আশ্রয় করেন, তা শুধু ভাবতে গেলেই, মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। সুতরাং আইনের কথাগুলোকে শত হস্ত দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সোজা সাধারণ চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও যদি মনে করা যায় যে, আপদ বিদায় হোল, সেটাও হবে মস্ত একটা ভ্রম। যেমন একজন উইলে লিখেছিলেন যে, আমি আমার স্ত্রীকে আমার সম্পত্তির মালিক করে গেলুম। অতি ছোট, সাধারণ চলিত কথা। কিন্তু এই কথাটির মানে বুঝতে, তিন তিনটে জজের মাথা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। একজন

বললেন, মালিক অর্থে ম্যানেজারি স্বত্ব, আর একজন বললেন, এতে পুরোপুরি নিব্যূঢ় স্বত্ব দেওয়া হল না, আর একজন হাল ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, এতে কিছুই দেওয়া হল না বলেই তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।

উইল সম্বন্ধে আইনশাস্ত্রে বিস্তর বিধি-নিষেধ আছে। সেগুলো একেবারেই উপেক্ষা করবার বস্তু নয়। তবে সব জানা থাকলেও যে, বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তা' নয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, তাহলেও, ও সম্বন্ধে আদালতে কখনও কোনো প্রশ্নই উঠত না। তবে সুখের বিষয় এই যে, বিপদ যখন সত্যই উপস্থিত হয়, তখন উইলকর্তার কাছে সেটা আর আপদজনক নয়, বরং আমোদজনক হলেও হতে পারে।

এই বিধিনিষেধগুলো মোটামুটি এই রকমের। সব কথা খুলে বলতে গেলে, সে কথা কেউ বুঝতেও পারবেন না, আর আমিও যে বোঝাতে পারব, তা মনে করি না।

অস্পষ্ট কথার ব্যবহার আইনের প্রথম ও প্রধান নিষেধ। ভাষার দ্বারা দুটি কাজ সম্পন্ন করা যায়। এক, মনের ভাব গোপন করা, আর এক, মনের ভাব প্রকাশ করা। মনের ভাব যদি ভাষায় বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ না হয়, ত তাহলে বড়বড় মামলা বেধে যেতে পারে, জেনে রাখা উচিত। উদাহরণ, উইলে যদি লেখা থাকে, আমি অমুককে কিছু টাকা দিলুম, এ দান অগ্রাহ্য। কেননা কিছু টাকা যে কত টাকা, তা বোধ হয় অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আইনস্টাইন সাহেবও বুঝিয়ে দিতে পারবেন না।

কিন্তু অস্পষ্ট কথাটা যদি অন্য কোনো বিবরণের দরুণ, একটু সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে অন্য কথা। যথা—পড়া গেল উইলে লেখা আছে, আমার ভাই অশোকের মেজো ছেলে নীরেশকে আমি হাজার টাকা দান করলুম। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ভ্রাতা অশোকের নীরেশ বলে কোনো পুত্রই নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যম পুত্রের নাম সুরেশ। এক্ষেত্রে সুরেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনিই সেই হাজার টাকার অধিকারী।

এ ছাড়া আরও খানিকটা সুবিধা আছে। বিবরণটা সম্পূর্ণ পরিমাণে ঠিক না হলেও, ক্ষতি নেই, যদি বর্ণনায় খানিকটাও মেলে। তা হলেও চলবে! যেমন কোনো উইলকার লিখে দিয়ে গেলেন, তাঁর রামপুরের জমিদারী তিনি অমুককে দিলেন। দেখা গেল, উইলকর্তার রামপুর বলে কোনো জমিদারী নেই, তবে ঐ নামেরই একটা তালুকদারী আছে বটে। এখানে আইনের বেশি বাছবিচার নেই। যা তালুকদারী তাই জমিদারী।

তবে এক জিনিসের একাধিক বিবরণ দিলে, গোল বাধ্‌বার সম্ভাবনা খুব বেশী। বহুভাষণ সর্বদাই বর্জনীয়। যথা—উইলে, যদি লেখা থাকে, আমার রামপুরে প্রজাবিলি যে-জমিদারীটা আছে, সেটা আমি অমুককে দান করলুম। দেখা গেল যে রামপুরের জমিদারীর খানিকটা জমি প্রজাবিলি, আর খানিকটা আছে খাসে। এ ক্ষেত্রে অমুকের কপালে খাসের জমি একেবারেই ফস্কে গেল।

কিন্তু যেখানে নাম বা বিবরণ পড়েও, কিছু বোঝা যায় না, সেখানে কিন্তু উইলকর্তার মনে মনে কি যে ছিল, তা জানবার চেষ্টা করাও চলবে না। যেমন উইলে পাওয়া গেল, আমি হাজার টাকা দিলুম। কাকে দিলুম তার উল্লেখ নেই। এখানে কর্তার কাকে এই হাজার টাকা দেবার ইচ্ছে ছিল, সে বিষয়ে আর সাক্ষী সাবুদ দেওয়া চল্‌বে না। ওটা একেবারেই বাতিল।

একই জিনিস কিন্তু একাধিক লোককে দেওয়া যায় না। তবে একাধিক জিনিস একই লোককে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এই নিয়ম না মেনে, যদি কেউ এর বিপরীত ব্যবস্থায় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যান, তাহলে প্রথমে যাঁর নাম উইলে উল্লেখ আছে, তিনি দান গ্রহণের অধিকারী হবেন না। সবশেষে যাঁর নাম উল্লেখ আছে, তিনিই দানের যোগ্যপাত্র। উদাহরণ—একটা হীরার আংটী প্রথমে দেওয়া গেল সুরেশকে, আবার সেই আংটিটাই উইলের শেষ অংশে পড়া গেল, দেওয়া হয়েছে, নীরেশকে। এখানে আর সুরেশকে জয়লাভ করতে হবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, দানপত্র করে যদি এই আংটিদান ব্যাপারটা সারা হোত, তাহলে সুরেশকে হটান নীরেশের কর্ম হোত না। অর্থাৎ বিরুদ্ধকালে, দানপত্রে, আগের কথাগুলোই কার্যকরী হয়; আর উইলে, শেষের কথাগুলো।

তবে যদি একই জিনিস বিকল্পে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু প্রথম যার নাম আছে, জিনিসটা তারই প্রাপ্য। অর্থাৎ একটা হীরের আংটি সুরেশকে কিম্বা নীরেশকে দেওয়া হলে, সুরেশই সেটা পাবে। কিন্তু যদি দেখা যায়, সুরেশ উইলকর্তার আগেই মারা গিয়েছে, তাহলে সেটা নীরেশেরই প্রাপ্য।

একাধিক জিনিস যদি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে জিনিসটা রূপে এবং পরিমাণে বিভিন্ন হওয়া দরকার। অর্থাৎ যদি উইলের প্রথম ভাগে একশ টাকা একজনকে দান করা গেল, আবার শেষ ভাগেও একশ টাকা সেই একই লোককে দেওয়া হল; অঙ্কশাস্ত্র মতে, একে একে মিলে দুই হলেও, আইনশাস্ত্র মতে, লোকটির মাত্র একশ টাকাই প্রাপ্য। তবে এক স্থানে একশ এবং পরবর্তী স্থানে দুইশ থাকলে, দুই আর একে মিলে তিনশই হবে। এই নিয়মটা কোন্ যুক্তির ফলে, এখনও তা ঠিক জানা যায় নি।

একই জিনিস দুজনকে একসঙ্গে দান করলে, এবং দুজনই উইলকর্তার মৃত্যুর পর জীবিত থাকলে, প্রত্যেকেই আধাআধি ভাগে পাবেন। কিন্তু একজনের তার পূর্বেই মৃত্যু হলে, বাকী যিনি রইলেন, তিনিই সমস্তটাই পাবেন। অঙ্কশাস্ত্রে আধা যে কখনও পুরো হয়, এ রকমটা হতে বড় দেখা যায় না।

দান জিনিসটা সম্পূর্ণ না হোক, অনেকটা দাতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দাতা ইচ্ছে করলে, চুক্তিবন্ধ করে দান করতে পারেন। ধরা যাক, দাতা বল্লেন যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করলে, হাজার টাকার যৌতুক পাবেন। এখন ভ্রাতুষ্পুত্র যদি সুপুত্র না হয়ে, প্রেমের খাতিরে, মনোমত নায়িকাতে সম্মিলিত হন, তাহলে তাঁর ভাগ্যে এই যৌতুকটা নিছক কৌতুকে পরিণত হবে। তবে দানকর্তার কোন অদ্ভুত বা বে-আইনী খেয়াল চরিতার্থ করতে গ্রহীতা বাধ্য নন। সেক্ষেত্রে দান অসিদ্ধ। যথা—উইলে বলা গেল যে, রামমূর্তি যদি এক ঘণ্টায় একশ মাইল হেঁটে যেতে পারেন ত এক এক মাইলের একশ গুণ টাকা তিনি পুরস্কার পাবেন। এমন ধারা অসম্ভব খেয়ালী দানকে রামমূর্তি রাবণমূর্তি ধারণ করেও, সুসিদ্ধ করাতে পারবেন না।

তথৈবচ, যদি উইলে বলা যায় যে, অমুককে খুন করলে, অমুক আমার সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হবেন। সেই পড়ে দ্বিতীয় অমুক যদি সেটা কার্যে পরিণত করতে যান, ত তাঁর কপালে পেঁয়াজ পয়জার দুইই আছে।

এই হোলো বড় বড় বিধিনিষেধগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উইল করবার ইচ্ছে থাক্‌লে, এগুলো জেনে রাখলে কাজে লাগতে পারে বলে, আমি সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা দিলুম।

তবে আমার ব্যাখ্যা শুনে, কেউ যেন হঠাৎ মনে না করে বসেন যে, আসলে উইলের আইনটা অতি সরল, একটা খুব সাদাসিদে ব্যাপার। আবার কেউ যেন ভয় পেয়ে, উইল না করাটাই যেন মনস্থ না করে বসেন।

মোটের উপর উইল একটা করেই মরা ভাল; সম্পত্তি কিছু থাক্ বা না থাক্।

অবলেপ

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়



একবার, দুবার করে বারচারেক পড়লেন চিঠিটা তারপর গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিনোদবাবু হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে কে আছিস।' তাঁর খাস পেয়াদা নরহরি দরজার পাশে বসে ঝিমোচ্ছিলো। মনিবের আওয়াজ কানে যেতেই লাফিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বললো, 'হুজুর, ডাকলেন।'

'নীচে সবাই এসে গেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু এসে গেছেন।'

'মোহিনীবাবুকে একবার পাঠিয়ে দে ওপরে। বল্ খুব জরুরী।'

নরহরি তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে রিহার্সাল রুমে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রায় সবাই এসে গেছেন। মেয়েরা অনেকেই এসেছে। একটু হোমরা চোমরা যারা, তাদের আনতে গাড়ী গিয়েছে। চেয়ারের হাতলে পা তুলে মোহিনীবাবু চুরুট মুখে দিয়ে বসে আছেন চুপচাপ। মেজাজ খুবই খারাপ। চোখ মুখের ভাবে বেশ ধরা পড়ছে সেটা।

নরহরি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, বড়বাবু একবার ডাকছেন। বেজায় জরুরী।'

চুরুটটায় বার দুয়েক টান দিয়ে মোহিনীবাবু চেয়ারের হাতল থেকে পা দুটো নামালেন। বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এগোও বাপধন। আমি যাচ্ছি।'

সতরঞ্চের একেবারে কোণের দিকে বসা মেয়েটি মোহিনীবাবুর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো, 'শুনে আসুন, আবার কি ফরমাস। লীলা দেবী অসুস্থ, এ বই নির্ঘাৎ বদলাবে। কিন্তু সপ্তাহে দুবার করে বই বদলালে পার্টই বা মুখস্থ হবে কখন আর রিহার্সালই বা হবে কখন?

মোহিনীবাবু উত্তরে ভুরু দুটো একটু কোঁচকালেন। বিরক্ত মনে মনে তিনিই কি আর কম হয়েছেন। দিনের পর দিন বই বদলাতে থাকলে মেহনৎ তাঁরই কি কম হয় নাকি? উৎরে গেলে হাততালি পাবে এ্যাক্টর এ্যাকট্রেসরা কিন্তু বই মার খেলে সবাই ঝাল ঝাড়বে মোহিনী মাস্টারের ওপর। এতো জানা কথা।

'দেখি কি বলেন বড়বাবু' মোহিনীবাবু পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন।

'যাই বলুন' আগের মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, বুধবারে রিহার্সাল হলে আমি থাকতে পারবো না, আমার আবার স্যুটিং আছে।'

মেয়েটির ঠিক পাশেই গোপেশবাবু বসেছিলেন। এ দলের সেরা কমিক প্লেয়ার। বাঁ চোখটা বন্ধ করে নাকে নস্যি দিতে দিতে বললেন, 'বলো কি যমুনাবিবি, এতেই অডি-টোরিয়মে মার মার কাট কাট পড়ে যায়, এর ওপর আবার স্যুটিং। দুনিয়াতে জ্যান্ত পুরুষ আর উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না নাকি?'

যমুনা কনুই দিয়ে গোপেশবাবুকে মোলায়েম একটা গুঁতো দিয়ে নাকি সুরে বললো, 'যান ভারি ইয়ে আপনি। প্রত্যেক কথায় কেবল হাসি মস্করা।'

গোপেশবাবু পকেট থেকে আধপোড়া বিড়িটা বের করে নিলেন, এ পকেট ও পকেট দেশলাই হাতড়ালেন কিছুক্ষণ ধরে, তারপর বললেন, 'নাও ঠেলা, দেশলাইটা বুঝি পিরুর দোকানেই ফেলে এসেছি।'

মাঝখানে বসা মোটাসোটা গোলগাল একটি মেয়ে এমন সুযোগ ছাড়লো না। মুচকি হেসে বললো, 'তোমার আবার দেশলাই কি হবে গো গোপেশবাবু। পাশে যমুনাদি রয়েছে, ওর রূপের আঁচে ধরিয়ে নাও না বিড়িটা।'

মেয়ে পুরুষ সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলো।

বড়বাবুর কামরার কাছ বরাবর এসে মোহিনীবাবু সিটের ওপর চেপে ধরে হাতের চুরুটটা নিভিয়ে ফেললেন। হলোই বা বয়েস কম, মনিব তো।

বিনোদবাবুর হাতে চিঠিখানা তখনও ধরা। মোহিনীবাবুকে দেখে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'বোসো মাস্টার, সুখবর আছে।'

সুখবর? আজ বছর তিনেক হলো ভাঙন ধরেছে থিয়েটার কোম্পানীতে। যত রাজ্যের বস্তাপচা বইয়ের আমদানী শুরু হয়েছে, আর তেমনি জুটেছে এ্যাক্টর এ্যাকট্রেস। অন্য থিয়েটারের ঝাঁড় দিয়ে ফেলে দেওয়া যত রাবিশ জুটেছে এসে 'রূপমহল' থিয়েটারে। মোশন শেখাতে মোহিনীবাবুর প্রাণান্ত। এখনও কথার আড় ভাঙেনি ভালো করে, ফুট লাইটের সামনে দাঁড়াবার সখ।

'লীলা আছে কেমন?' পাশে রাখা গড়গড়ার নলটা বিনোদবাবু হাতে তুলে নিলেন। গড়গড়া ধরবার বয়সের কোঠায় এখনও হয় তো পা দেননি বিনোদবাবু, কিন্তু নেশার কি আর বয়েস আছে। গড়গড়ায় কিন্তু বেশ ভারিক্কি দেখায় বিনোদবাবুকে আর এত বড়ো একটা থিয়েটারের মালিক, একটু ভারিক্কি না হলে মানায় কখনও!

'সেই রকমই' মোহিনীবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বসতে ঠোঁট বেঁকালেন, 'সাতদিন না গেলে এ অসুখের তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। ডাক্তারও তো তাই বলছে। আচ্ছা বিপদ। পুজোর মুখে, নতুন বই প্রায় তৈরী এই সময় হিরোইনই যদি বিছানা নিলো, তবে তো একেবারে সর্বনাশের মাথায় পা।'

'হুঁ' বিনোদবাবু খুব অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করলেন। বেশ খোসমেজাজী ভাব। হাতের মুঠোয় যেন দামী কিছু একটা আছে, এমনি চেহারা মুখ চোখের।

'কিন্তু সুখবরটা কি?' মোহিনীবাবু মনে করিয়ে দিলেন কথাটা।

বিনোদবাবু গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রাখলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন ভালো করে তারপর হাতের চিঠিটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কাঞ্চন চিঠি লিখেছে?'

'কাঞ্চন?' মোহিনীবাবু দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন।

'সে কি মাস্টার, এর মধ্যে কাঞ্চনকে ভুলে গেলে? 'কোহিনুরের' কাঞ্চন, যার নাম হ্যান্ড-বিলে থাকলে, একটি বক্সও খালি থাকতো না।'

'কাঞ্চনবালা? খুব মনে আছে। কি লিখেছে চিঠিতে?' মোহিনীবাবু রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

'আসতে চায় এখানে। আমাদের থিয়েটারে প্লে করতে চায়' বিনোদবাবু মুচকি হাসতে লাগলেন।

কথাটা কিন্তু মোহিনীবাবুর যেন কেমন লাগলো। কাঞ্চনবালা সেধে চিঠি লিখেছে 'রূপমহল' থিয়েটারে, এ কি সম্ভব না কি? সামনাসামনি আলাপ অবশ্য নেই মোহিনী-বাবুর সঙ্গে কিন্তু তার অভিনয় তিনি দেখেছেন রাতের পর রাত জেগে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েসা, 'জনা'য় জনা, এসব কি ভোলবার। তারপর হঠাৎ কি হলো, এক রাতে অভিনয় করতে করতে স্টেজের ওপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো মেয়েটি। সারা হলে হৈ চৈ চীৎকার। আর দেখা গেলো না মেয়েটিকে। কলকাতার বাইরে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তারপর আর কেউ খোঁজ খবর রাখেনি। কিন্তু সে কি আজকের কথা।

অবশ্য তখন শুধু বিনোদবাবু কেন, অনেক থিয়েটারের মালিকই আসা যাওয়া করেছিলো কাঞ্চনের কাছে। তাকে ভাঙিয়ে আনার কম চেষ্টা করেছিলো? কিন্তু 'কোহিনুর' ছেড়ে সে আসতে রাজী হয়নি। টাকার লোভেও নয়।

লোকে বলতো অন্য কথা। কোহিনুরের মালিক তপন সিংহের সঙ্গে কাঞ্চনের নাম জড়িয়ে কানাঘুষো করতো। কিন্তু সেদিনের সেই কাঞ্চন বেঁচে আছে এখনও। এতদিন পরে আবার সখ গেছে থিয়েটারে নামতে, তাও আবার এই রূপমহল থিয়েটারে।

'কাশী থেকে লিখেছে চিঠি। বড্ড অভাবে পড়েছে। বয়সও হয়েছে। টাকাপয়সা যোগাড় করতে না পারলে না খেয়ে মরবার দাখিল হয়েছে। তাই দুঃখ করে লিখেছে, যদি ছোট-খাটো একটা পার্ট দিই তো প্রাণটা রক্ষে হয় তার।'

মোহিনীবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'বলেন কি বড়বাবু, ছোটখাটো পার্ট? রূপ-মহল থিয়েটারে কাঞ্চনবালা করবে মাইনর পার্ট? জনা, জনা, আর কোন বই নয়। দেখবেন পুজোর বাজার মাত করে দেবো একেবারে, বাকি দুটো থিয়েটার কানা হয়ে যাবে। কাঞ্চন জনা, আর আমাদের বিমলবাবু প্রবীর। পয়সা কুড়িয়ে আপনি শেষ করতে পারবেন না।' উত্তেজনায় মোহিনীবাবু রীতিমত হাঁপাতে শুরু করলেন।

বিনোদবাবু হেসে উঠলেন, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মাস্টার। তা হলে কাঞ্চনকে পত্রপাঠ আসতেই লিখে দিই, কি বলো?'

'একবার বলতে' মোহিনীবাবুর গলা বেশ কেঁপে উঠলো, 'পুজোর আর দিন সাতেক তো আছে মোটে।'

বিনোদবাবু আর মোহিনীবাবু দুজনেই গেলেন হাওড়া স্টেশনে। মোহিনীবাবু আবার মাঝপথে গাড়ী থামিয়ে ফুলের মালা কিনে নিলেন এক ছড়া। অভিনন্দন জানাতে হবে বৈ কি। এতকাল পরে ফিরছে কলকাতায়, একেবারে খালি হাতে অভ্যর্থনা করতে যাওয়ার মানে হয় কোন!

গাড়ী আসতে কিছুটা এগিয়েই কিন্তু বিনোদবাবু আর মোহিনীবাবু দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ইন্টার ক্লাস মেয়ে কামরা থেকে কাঁকালে দুটো হাত দিয়ে কিছুটা কুঁজো হয়ে যে নামলো, সেই যদি কাঞ্চনবালা হয় তো, মাথায় থাক 'জনা' অভিনয় আর দু হাতে পয়সা কুড়োনোর আকাঙ্ক্ষা, স্টেজের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে না দুর্ঘটনা বাঁধায়।

কাঞ্চনই এদিক ওদিক চেয়ে ওদের কাছে এলো। একটা হাত আড়াআড়িভাবে চোখের ওপর রেখে ঠাউরে ঠাউরে দেখে বললো, 'কে বিনোদবাবু না, সঙ্গে ও বাবুটি কে? আর বলেন কেন, অল্প বয়সে শরীর একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। না পাই ভালো করে কিছু দেখতে, না পারি বেশীক্ষণ টান হয়ে চলতে।'

বিনোদবাবু এগিয়ে এলেন। অল্পসল্প কথাবার্তাও সুরু করলেন। কিন্তু মোহিনীবাবু নির্বাক্‌। তিনি ভাবছিলেন, হ্যান্ডবিল বিলি হয়ে গেছে, দেয়ালে দেয়ালে বড়ো বড়ো লাল নীল অক্ষরে লটকে দেওয়া হয়েছে রূপমহলের আগামী আকর্ষণের কথা! ফেরবার আর কোনই পথ নেই। স্রেফ দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। আজ-কালকার বদমেজাজী দর্শকদের কথা কিছু বলা যায় না। দু'হাত কোমরে দিয়ে, চোখ পিট পিট করতে করতে এইরকমভাবে যদি স্টেজে দাঁড়ায় জনা, তাহলে স্রেফ সিনে আর বেঞ্চের সারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বে দর্শকদের দল। কোন বাধা মানবে না।

কিন্তু আর উপায়ই বা কি। এক উপায় শেষমুহূর্তে বই বদল করা। কিন্তু তাতেই কি বেইজ্জতী হবার ভয় কম নাকি!

'এঁকে তো চিনতে পারলাম না ঠিক?' গাড়ীতে ওঠবার মুখে কাঞ্চন মোহিনীবাবুর দিকে চোখ ফেরালো।'

'ইনি আমাদের মোশন মাস্টার। খুব কাজের লোক। কত ভূষি-মালকে যে উৎরে দিয়েছেন ঠিক আছে'

'নমস্কার' কাঞ্চন হাত দুটো জোড় করলো। মোহিনীবাবু নিরুপায়। হাত তুলে নমস্কার ফেরৎ দিলেন।

রূপমহল থিয়েটারেই কাঞ্চনের থাকবার বন্দোবস্ত হলো। বিনোদবাবু আর মোহিনী-বাবু দুজনে দেখাশোনা করতে লাগলেন।

'শুনুন মোহিনীবাবু' কাঞ্চন দু-একদিন পরে মোহিনীবাবুকে বললো, 'আমাকে আর ভীড়ের মধ্যে রিহার্সাল দেওয়াবেন না। বইটা বরং রেখে যাবেন এক কপি। চোখ বুলিয়ে নেবো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' মোহিনীবাবু বিব্রত হয়ে উঠলেন, 'শুধু থিয়েটারের একদিন আগে ফুল রিহার্সালে আসবেন আপনি। এন্ট্রান্স এক্সিটগুলো রপ্ত করে নিলেই হবে। আপনার জন্য নয়, কো-এ্যাক্টরের সুবিধের জন্য।' একটু থেমে মোহিনীবাবু হাতের বইটা এগিয়ে দিলেন কাঞ্চনের দিকে, 'এই নিন, এই কপিটা রেখে দিন আপনার কাছে।'

হাত বাড়িয়ে বইটা টেনে নিয়ে বসে বসে কাঞ্চন পাতা ওল্টাতে লাগলো। মোহিনীবাবু ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবৃত্তি করছে কাঞ্চন। অর্জুনের যজ্ঞ অশ্ব ধরেছে প্রবীর, বীরপুত্র যুদ্ধে যাবার আগে মায়ের চরণ বন্দনা করতে এসেছে, সন্তানকে আশীর্বাদ করছে জনা। সিঁড়ির রেলিং ধরে চুপ করে মোহিনীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। মধুর বাচনভঙ্গী, সুস্পষ্ট উচ্চারণ, ভারি সুরেলা গলার আওয়াজ। পুরোনো-দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, জমজমাট কোহিনুরের দিনগুলির কথা। এই 'জনা'ই বোধহয় বার দশেক দেখেছিলেন মোহিনীবাবু। কাঞ্চন জনা। ঠিক এমনটি যেন তারপরে আর কেউ পারলো না।

পায়ে পায়ে মোহিনীবাবু আবার কাঞ্চনের ঘরে ফিরে এলেন।

আবৃত্তি থামিয়ে কাঞ্চন চুপচাপ বসে আছে। কোলের ওপর খোলা বই। দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

আর এগোতে সাহস হলো না মোহিনী-বাবুর। কাঞ্চনের দেহটাই আছে এখানে, মনটা পিছনে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে চলে গেছে। নাট্যবীর্যের জ্বলন্ত এক যুগে।

ঘুরে চলে আসতে গিয়েই কাঞ্চনের গলার আওয়াজে মোহিনীবাবুর চমক ভাঙলো।

'কি এসে আবার চলে যাচ্ছেন যে?'

'চমৎকার লাগলো। বহুদিন এমন গলার আওয়াজ শুনিনি।'

'কিন্তু শুধু মিঠে আওয়াজে কি ভুলবে আজকের দর্শক' ঠোঁটের দুটো কোণ বেঁকিয়ে কাঞ্চন অদ্ভুতভাবে হাসলো, 'বয়সটাও তো খুঁজবে?'

মোহিনীবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক আজকের দর্শক যে কি চায়, তিনিই জানেন না ভালো করে। আর কাঁচাবয়স! থিয়েটারে বয়স বাড়ায় কমায় তো আলোর সার আর রঙের প্যাঁচ। বাহান্নকে ষোলো করতে আর হাঙ্গামাটা কোথায়! সে কথা তিনি ভাবছেন না। কিন্তু একটু খুঁত যেন রয়েছে, খুব সামান্য, কিন্তু আজকের দর্শক সেটুকুই হয়তো ক্ষমা করবে না। সুর রয়েছে কাঞ্চনের গলায়! পুরোনো-দিনের আবৃত্তির ঢং। বুঝিয়ে শুনিয়ে শুধু সেটা কাটিয়ে দিতে হবে। ব্যস, আর দেখতে হবে না। কাঞ্চনই হয়তো রূপমহলের লক্ষ্মী হয়ে দাঁড়াবে। ভাঙা হাটে চাঁদের আলো।

ওই শেষদিকের টানগুলো একটু কমিয়ে দিতে হবে আপনার' কথাটা মোহিনীবাবু বলেই ফেললেন, 'একটু যেন সুর থেকে যাচ্ছে।'

'সেকি, পৌরাণিক বইয়েতেও সুর থাকবে না, নইলে যে বড্ড খটমট শুকনো শুকনো লাগবে?' অবাক হয়ে গেলো কাঞ্চন।

তা হয়তো লাগবে কিন্তু আজকের দর্শক ওই শুকনো জিনিসই পছন্দ করে। দানীবাবুর ঢংয়ের অভিনয় আর দোলা দেয় না মানুষের মনে। জীবনের রসকস শুকিয়ে গেছে, তার আবার অভিনয়ে!

'ঠিক আছে, থিয়েটারের আগের দিন একটু সেরেসুরে নিলেই হবে।' মোহিনীবাবু আর কথা বাড়ালেন না।

সকাল থেকে ব্যস্ততার যেন আর শেষ নেই। ভোর ভোর বিনোদবাবু এসে বসে আছেন থিয়েটারে। কালিঘাট ফেরৎ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। পুজোর নির্মাল্য সব জায়গায় ছুঁইয়ে দেওয়া হয়েছে।

টিকেট বিক্রীও বেশ আশাপ্রদ। যে ক'খানা নীচু ক্লাসের টিকেট বাকী আছে বেলা চারটা নাগাদ টিকেট ঘর খুললেই বিক্রী হয়ে যাবে। খুব ফলাও করে কাঞ্চনবালার কথা লেখা হয়েছে বিজ্ঞাপনে। 'জনা'র পোজে দাঁড়ানো ফটোর একটা ব্লকও দেওয়া হয়েছে। নাট্য সম্রাজ্ঞী কাঞ্চনবালা। বিগত যুগের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর প্রত্যাবর্তন। গালভরা সব কথা নিজে বেছে বেছে মোহিনী-বাবু বসিয়ে দিয়েছেন। গোটা দুয়েক নতুন নতুন সিনও আঁকানো হয়েছে। নীলধ্বজের প্রাসাদ আর যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে আনকোরা দৃশ্যপট। পোষাকগুলো অবশ্য পুরোনোই। মেজে ঘষে সব কিছু ঝকঝকে করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বার চারেক মোহিনীবাবু খোঁজ নিয়ে গেছেন কাঞ্চনের।

'কেমন আছেন? শরীরগতিক ভালো তো? গরম দুধ একটু খেলে হতো না?'

কাঞ্চন মুচকি হেসেছে, 'সব ঠিক আছে মোহিনীবাবু। কোন ভয় নেই। কেবল বিমল-বাবু এলে একটু আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, প্রবীরের সঙ্গে সিনগুলো একটু ঝালিয়ে নেবো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়, এলেই পাঠিয়ে দেবো।' মোহিনীবাবু তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

কিন্তু কোথায় বিমলবাবু তার ঠিক আছে! তিনি আসবেন ঠিক প্লে শুরু হবার আধঘণ্টা আগে। কি জানি বেশী আগে এলে যদি মান খোয়া যায়। নতুন বই শুরু হবার দিনও তো একটু আগে আসে মানুষ।

বেশীক্ষণ দাঁড়াবারও সময় নেই মোহিনী-বাবুর গোপেশবাবুর 'বিদূষক' যেন জমছে না বিশেষ। জলো জলো। এটা যে নিছক হাসির পার্ট নয়, বোঝানোই যাচ্ছে না ভদ্রলোককে।

প্লে শুরু হবার আধঘণ্টা আগে থেকেই হল ভর্তি হয়ে গেলো। বাড়তি চেয়ারেও কুলোবার উপায় নেই। তিলধারণের ঠাঁইয়েরও অভাব। বিনোদবাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন সব। বহুদিন এমন ভীড় হয়নি রূপমহল থিয়েটারে কিসের জন্যই বা হবে। মানুষ কি আর মাগনা পয়সা খরচ করে আজকাল।

রং, ঝলমলে শাড়ী আর গয়নায় বেশ মানিয়ে গেলো কাঞ্চনকে। তন্বী তরুণী হবার তো কোন প্রয়োজন নেই, বীর প্রসবিণী রাজ-মহিষী। নাই বা দেখালো কাঁচা বয়সী। ঠিক আছে। মোহিনীবাবু উৎসাহ দিলেন। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওতেই হবে।'

মুচকি হাসল কাঞ্চন, 'বুকটা একটু দুর দুর করছে যেন মোহিনীবাবু। অনেকদিন পরে কিনা।' নিজেই যেন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলো।

'ওরকম হয়। একবার ঢুকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে' খুব সাবধানে রুমালের কোন দিয়ে কাঞ্চনের ঘাড়ের বাড়তি রংয়ের পোঁচটা মোহিনীবাবু ওঠাতে লাগলেন।

বিনোদবাবু সুরু হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে হন্তদন্ত হয়ে গ্রীনরুমে ঢুকলেন, 'কৈ, কাঞ্চন কোথায়?'

ঝকমকে পোষাকের বহরে ঠিক মানুষকে চিনে ওঠাই দায়। পাশেই দাঁড়িয়েছিলো কাঞ্চন। মুখ ফিরিয়ে বললো, 'কি হুকুম বলুন বিনোদ-বাবু।'

বিনোদবাবু সামনে এসে কাঞ্চনের একটা হাতই জাপটে ধরলেন, 'আমার মানসম্ভ্রম সবই তোমার হাতে কাঞ্চন। আজ প্রথম নাইট। আজ যদি উৎরে যেতে পারি তাহলে পুজোর বাজার এই রূপমহলই রাখবে।'

কোন উত্তর দিলো না কাঞ্চন। বুকের মধ্যে বেশ ঢিপ ঢিপ করছে। কেবলই শুকিয়ে আসছে গলার কাছটা। জল খাওয়া ঠিক হবে না, এক কাপ চা পেলে হতো।

প্রথম দুটো সিন কোনরকমে উৎরে গেলো, কিন্তু গোলমাল শুরু হলো তৃতীয় সিন থেকে। অডিটোরিয়াম থেকে মোহিনীবাবু ছুটে এলেন ভেতরে। প্রম্পটারের কানে কানে বললেন, 'ও নিশি, করছে কি কাঞ্চন। টেনে টেনে গানের সুরে কথা উচ্চারণ করছে আর বেটাছেলের মতন হাতদুটো নাড়াচ্ছে কেন?'

প্রম্পটিংএর ফাঁকে নিশি জিভ আর তালু দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করলো, 'আর বলেন কেন স্যার! বুড়ো হাতি ক্ষেপেছে, এখন রুখবে কে?'

মোহিনীবাবু কথা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। বিশ্রী হৈ চৈ শুরু করেছে দর্শকের

দল। পিছন দিকে শীষ আর টিট্‌কিরীর শব্দ আসছে।

'গান গাইছো নাকি চাঁদমণি।'

'কোন হাট থেকে আমদানী করা মাল রে বাবা।'

'এক 'জনা'তেই জান মেরে দিলে দাদা।'

ড্রপ পড়তেই মোহিনীবাবু ছুটে কাঞ্চনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'ও কি করছেন, বড্ড যে সুর হচ্ছে আপনার কথায়, আর স্টেজে এত ছুটোছুটি করছেন কেন? দেখছেন অডিয়েন্স কি রকম গোলমাল শুরু করেছে।'

'গোলমাল শুরু করেছে?' কাঞ্চন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'হ্যাঁ, রীতিমত গালিগালাজ আরম্ভ করেছে।'

'কি জানি, আমি ভাবলাম বুঝি ভালো লেগেছে ওদের। 'কোহিনুরে' এই জায়গায় কিন্তু প্রচুর হাততালি পেতাম আমি।'

মোহিনীবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে অনেককষ্টে সামলালেন নিজেকে।

তারপর বললেন, 'সুর একেবারে বাদ দিয়ে দিন। আজকালকার দর্শক সুর একেবারে পছন্দ করে না আর মুভমেণ্ট একদম কমিয়ে দিন।'

মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কাঞ্চন। মাথা তুললো না। কি জানি মুখ তুললে যদি ধরা পড়ে যায় মোহিনীবাবুর কাছে। তারপরের দুটো সিন একটু সংযত অভিনয় করলো কাঞ্চন। খুব মেপে মেপে পা ফেললো। হাত নাড়াটাও বেশ কমিয়ে দিলো। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন কৃত্রিম। কারুর শেখানো বুলি যে আউড়ে যাচ্ছে এটা বড্ড প্রকট হয়ে উঠলো।

পিছনের দিকে একটানা হৈ চৈ। প্রবীর-বেশী বিমলবাবু পর্যন্ত ভুরু কুঁচকে অভিনয় করতে লাগলেন।

ড্রপ পড়তেই বিমলবাবু মোহিনীবাবুর সামনে একেবারে ফেটে পড়লেন, 'কি আরম্ভ করেছেন আপনারা? এ কি 'জনা' যাত্রা চলেছে? যত সব বুড়ো হাবড়া যোগাড় করবেন আর আমাদের প্রাণান্ত। কাল থেকে অন্য প্রবীর খুঁজে নেবেন আপনারা। আমার দ্বারা হবে না।'

মোহিনীবাবু চুপ করে রইলেন। ঠিক বুঝতে পারলেন না কিছু। সেদিনের কাঞ্চনই বদলালো, না আজকের মানুষগুলো বদলালো বোঝাই ভার। কিন্তু এভাবে অভিনয় চললে দর্শক নির্ঘাত মারমুখো হয়ে আসবে। পয়সা দিয়ে এই ভাঁড়ামি দেখতে তো আসেনি মানুষ।

খুঁজে খুঁজে মোহিনীবাবু ঠিক বের করলেন কাঞ্চনবালাকে। কোণের দিকে দাঁড়িয়ে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, মোহিনীবাবু পিছনে গিয়ে বললেন, 'সব ডোবালেন আপনি, সর্বনাশ করলেন?'

একটু হয়তো রূঢ় হয়ে গিয়েছিলো মোহিনীবাবুর কণ্ঠস্বর, কিংবা হয়তো আওয়াজটা একটু জোর হয়ে গিয়েছিলো, কাঞ্চনবালা রীতিমত চমকে উঠলো। চায়ের কাপ থেকে কিছুটা চা চলকে গালের ওপর গিয়ে পড়লো। একবার 'উঃ' করে উঠেই কাঞ্চন থেমে গেলো। গাল থেকে চা-টা মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'সুর তো আমি বাদ দিয়েছি মোহিনীবাবু 'কিন্তু সত্যি বলছি এভাবে এ্যাক্টিং করতে আমি কেমন জোর পাচ্ছি না। আর গোটা তিনেক সিন তো? আমাকে নিজের মত অ্যাক্‌টিং করতে দিন। আপনাদের ক্ষতি যা হবার, তাতো হয়েইছে।'

শেষের দিকের কথাগুলো শোনাই গেলো না। মোহিনীবাবুর মনে হলো কাঞ্চনের দুটো চোখও যেন চকচক করে উঠলো। তিনি আস্তে আস্তে সরে এলেন।

শেষের সিন ক'টা কাঞ্চন নিজের মত করেই অভিনয় করলো ফলে অডিটোরিয়মে কুকুর আর শেয়ালের ডাকে কাঞ্চনের গলা চাপা পড়ে গেলো। খুব জোর শব্দে মনে হলো দু-একজন বোধহয় চেয়ারের দু-একটা হাতলই খুলে ফেললেন। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই কায়দা করে উইংসের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেরকম বেগতিক কিছু দেখলে সবেগে প্রস্থান করবেন।

ঠিক যবনিকা পড়ার আগে স্টেজের ওপর কাগজ মোড়া কি একটা এসে পড়লো। সিন পড়ার পর এদিক ওদিক চেয়ে কাঞ্চন কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললো। স্টেজে ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার রেওয়াজটা এখনও আছে তাহলে। কিন্তু কাগজটা একটু খুলেই কাঞ্চন বিব্রত হয়ে পড়লো। কমলালেবুর খোসা আর বাদামের খোলা সযত্নে প্যাক্ করা।

পর্দার ওপার থেকে দর্শকদের বক্রোক্তি কানে আসলো। মোটেই খুসী হয়নি জনতা। কোহিনুরের আমলের অভিনয় দিয়ে আজকের দর্শকদের ভোলানো যায় না।

পিছন ফিরেই কাঞ্চন দাঁড়িয়ে পড়লো। কোণের দিকে বিমলবাবু হাত পা নেড়ে কাঞ্চনের 'অ্যাক্টিং' সুরু করেছেন। মেয়েলী গলায় টেনে টেনে জনার পার্ট বলে চলেছেন। তাঁকে ঘিরে মেয়ের দল হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। মোহিনীবাবুর সংগে চোখাচোখি হ'তেই তিনি পাশ কাটিয়ে স্টেজের বাইরে চলে গেলেন। বিনোদবাবুর সংগে দেখা হ'লেও হয়তো এই রকমভাবেই স'রে দাঁড়াবেন তিনি। তার মানে কাঞ্চনের অভিনয়ের পালা আজই শেষ। কিন্তু তারপর! অতলগর্ভ অন্ধকার। আলোর সামান্য রেখাও নেই। নিজেকে ভারি অসহায় লাগলো কাঞ্চনের। বিনোদবাবুর হাতে পায়ে ধ'রলে ছোট খাটো পার্ট হয়তো দু' একটা মিলে যেতে পারে। কিন্তু কি জানি, আজকের এ অভিনয়ের পরে মুখ তুলে বুঝি দাঁড়ানো যায় না কারুর সামনে!

কাঞ্চনের দিন শেষ হ'য়ে গেছে। ও যেন অন্য এক যুগের। এ যুগের মানুষকে ও যেমন চেনে না, তেমনি তারাও চেনে না ওকে। কাঞ্চনের দু'টো চোখ জলে ভ'রে এলো। কাঁকালের ব্যথাটা আজ ভোর থেকেই শুরু হ'য়েছে। অভিনয়ের উত্তেজনার মধ্যে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি কাঞ্চন, কিন্তু সোজা হ'য়ে দাঁড়ানোই মুস্কিল।

আশে পাশের লোকদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো কাঞ্চন। আশ্চর্য, মুখ তো নয় যেন মুখোশের সার। সমবেদনা চুলোয় যাক্, কেউ এগিয়ে এসে একটি কথাও বলতে পারে না।

সিনের পাশে এসে ড্রেসার তাড়া দিলো, 'পোযাক ছেড়ে দিন এইবার।'

কি পরুষ নির্মম গলার আওয়াজ! ভাবটা যেন অভিনয় তো খুব করলেন, এবার পোযাক গয়নাগুলো ছেড়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।

আস্তে আস্তে উইংসের দিকে কাঞ্চন পা বাড়ালো।

ভেতরে ঢোকবার মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করলো না। খুব মৃদু কিন্তু খুব দরদী গলার আওয়াজ।

'মাইজী।'

এদিক ওদিক চেয়েই লোকটাকে কাঞ্চন দেখতে পেলো। একেবারে কোণের দিকে পুরোনো সিনগুলো যেখানে জড়ো করা রয়েছে, তার পাশেই বুড়ো মুসলমানটি, দাঁড়িয়ে।

'কে?'

'আমি করিম, মাইজী?'

'করিম, কে করিম?' প্রাণপণ চেষ্টায় কাঞ্চন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

'আজ্ঞে কোহিনুরের সিন শিফ্‌টার। মাস ছয়েক হ'লো এখানে কাজ করছি।'

করিম, করিম মিয়া। আবছা মনে পড়লো কাঞ্চনের। সেদিনের জোয়ান করিমের এই চেহারা হ'য়েছে। তুবড়ে গেছে দুটো গাল, কোটরগত চোখ, একটি দাঁতও নেই।

'কি খবর করিম' দ্বিধা জড়ানো গলার স্বর কাঞ্চনের।

একপা দুপা ক'রে কাঞ্চনের দিকে এগিয়ে এলো করিম। ভাঙা গলায় বললো, 'আশ্চর্য আপনার সাধনা মাইজী। এত বছর পরে শুনলুম কিন্তু একটু বদলায় নি। অ্যাক্টিং করছেন এ যেন মনেই হয় না। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মাইজী, এমনটি আর কেউ পারবে না।'

মিনিট কয়েক কাঞ্চনের মনে হ'লো সব যেন দুলছে। সিন, উইংস, স্টেজের পাটাতন, সামনে দাঁড়ানো করিম পর্যন্ত। চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা। ঢোক গিলে আস্তে শুদ্ধ বলে উঠলো 'করিম!'

করিম ঘাড় নাড়লো, 'কিন্তু মাইজী প্রবীরের পার্ট করা বিমলবাবু টাবুর কাজ নয়, থাকতেন কোহিনুরের পুলিনবাবু, দেখতেন সব মাত ক'রে দিতেন।'

সব কিছু ভুলে কাঞ্চন করিমের একটা হাত চেপে ধরলো।

'সত্যি, সত্যি তোমার ভালো লেগেছে করিম?'

'হ্যাঁ মাইজী, ষোলো বছর বয়স থেকে এ লাইনে রয়েছি আর আজ বাষট্টি বছর বয়স হ'লো। সাচ্চা ঝুটা আমি খুব চিনি মাইজী।'

হাজার হাততালির চেয়েও যেন মিষ্টি লাগলো করিমের গলা। আজকের অপমান টিটকারী সব ধুয়ে গেলো ওর কথায়। কিছু বোঝে না আজকের দর্শক। সাচ্চা ঝুটার তফাৎ করতে পারে না। কিন্তু ঠিক তারিফ করতে পেরেছে কোহিনুরের করিম।

নিজের দিকে একবার চোখ ফেরালো কাঞ্চন, ওর আজকের অভিনয়ের মতন এ পোষাক গয়না সবই তো মেকী। রূপমহলের হাটে এর কোনই দাম নেই। মেকী পোষাকের মতন মানুষটাও তো বরবাদ হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ কাঞ্চনের মনে পড়ে গেলো। অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে করিমের হাতের চেটোয় রেখে দিলো, 'ভয় নেই করিম, ও আংটিটা রূপমহলের নয়, ওটা খাঁটি সোনার, কোহিনুরের যুগে রোজগার করা, ওটা আমি তোমায় দিলাম।'

তারপরেই ঝর ঝর করে কাঞ্চন কেঁদে ফেললো। জীবনের শেষ সম্বল সোনার টুকরোটা পরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নয়, আনন্দে, গর্বে, পরিপূর্ণ সুখে ওর চোখের জল বুঝি আর বাধা মানলো না।

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

"কি করিতেছ, ছাড় ছাড়, আমার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে"

শিলাঙ্গী দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"আর একটু জোরে যদি টান চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া যাইবে। বড় বড় গরু আমাদের এই ফাঁসে আটকাইয়া কাবু হইয়া পড়ে"

"খুলিয়া দাও, বড় কষ্ট হইতেছে"

"শপথ কর আর কখনও আমার গায়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত দিবে না"

শপথ করিলাম।

"তিনবার কর"

তিনবার করিলাম। তবু শিলাঙ্গী আমাকে বন্ধনমুক্ত করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না, দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেই লাগিল। ফাঁসটা এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দড়িটা এত শক্ত যে আমি চেষ্টা করিয়াও তাহা খুলিতে পারিলাম না। আমার ব্যর্থ প্রয়াস শিলাঙ্গীর হাসির খোরাক জোগাইতে লাগিল কেবল। অবশেষে করুণকণ্ঠে আবার মিনতি করিতে হইল।

"শপথ তো করিয়াছি, এইবার খুলিয়া দাও"

"তোমাকে আর একটা শপথ করিতে হইবে"

"কি বল"

"শপথ কর যে, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই"

সেদিন গভীর রাত্রে চন্দ্রালোকিত শ্যামল ক্ষেত্রে বসিয়া শিলাঙ্গীর এই দাবী বড় অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। আজও অদ্ভুত মনে হইতেছে। মনে হইতেছে ইহাই বোধ হয় পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন দাবী। তখনকার দিনে মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি শস্যক্ষেত্র, তাহারই মধ্যস্থলে আমি বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম, আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল একটি অপরিচিতা তন্বী কিশোরীর উপর, আর সে আমার জীবনের বিনিময়ে দাবী করিতেছিল প্রকৃত বন্ধুত্ব। আজও কি অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

"প্রকৃত বন্ধুত্ব বলিতে তুমি ঠিক কি বোঝ তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্যই তোমার বন্ধু হইতে চাই তাহা শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর"

"আমার যাহাতে অপমান বা অমঙ্গল হয় তাহা তুমি ইচ্ছা করিয়া কখনও করিবে না—ইহাকেই আমি প্রকৃত বন্ধুত্ব বলি। এরকম বন্ধু আমার একজনও নাই। অনেকেই আমাকে বিবাহ করিতে চায়, অনেকে আমাকে লইয়া একটু মজা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু আমার একজনও নাই। তুমি হইবে?"

"হইব। তোমার নিকটও আমি এই দাবী করিতে পারি কি"

"নিশ্চয়—"

শিলাঙ্গী আসিয়া আমার গলার ফাঁস খুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়, ছুটিয়া আসিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সে আমার ক্রোড়ের উপর উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে এক অপূর্ব কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জোলমার নিস্পৃহতা আমার পৌরুষকে একদিন কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। শিলাঙ্গীর আগ্রহ সেদিন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। জোলমার নিস্পৃহতা তাহাকে রহস্যময়ীও করিয়াছিল, শিলাঙ্গীর অতি-সরলতাও তাহাকে কম রহস্যময়ী করে নাই। আমি তাহার সম্বন্ধে আকুল হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কারণ সে যুগেও যে মানব-চরিত্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম তাহাতেও কপটতার খাদ থাকিত। পশুত্বের স্তর হইতে যতই আমরা সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতেছিলাম ততই আমাদের সারল্য অবলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির সহিত তাল রাখিয়া আমাদের চরিত্রও জটিল হইতেছিল। কাহাকেও ভাল লাগিলে সে যুগেও আমরা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিতাম না —, "আমি তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি।" কাহারও উপর ক্রোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণও আমরা করিতাম না। শত্রুর সহিতও হাসিমুখে আলাপ করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছিলাম। তাই শিলাঙ্গীকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাহার সরলতার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। শিলাঙ্গী যদি নারী না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে তাহার এই আচরণে হয়তো আমি বিস্মিত হইতাম, হয়তো ভয় পাইতাম, হয়তো তাহাকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতাম। শিলাঙ্গী নারী বলিয়া তাহার আচরণের একটি অর্থই সেদিন আমার চক্ষে প্রতিভাত হইল—সে আমার পৌরুষকে কামনা করিতেছে। প্রকৃত বন্ধুত্বের অন্য কোনও অর্থ করিতে পারি নাই সেদিন। তাই পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলাম

"তোমাদের দলের লোক যদি আমাদের সহিত শত্রুতা করে তাহা হইলেও তুমি আমার বন্ধু থাকিবে ত?"

শিলাঙ্গী বলিল, "নিশ্চয়। আমাদের দলের সহিত তোমাদের যাহাতে শত্রুতা না হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। রোহার সহিত যদি ভাব করিতে পার তাহা হইলে সহজেই তাহা হইয়া যাইতে পারে। রোহার কাছে চল না একদিন। রোহা যখন একা থাকিবে তখন তাহার সহিত দেখা করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই। রোহা লোক খুব ভাল।"

"কি করিয়া জানিব কখন কোথায় সে একা থাকে"

"সেটা জানা মুশকিল বটে। তবে প্রত্যহই সে খানিকটা সময় একা থাকে। আমাদের গরুরা নির্গম বনে এখন আছে, সেখানে একা একা সে প্রায়ই যায়। সেইখানে আমি তোমাকে একদিন লইয়া যাইব। কিন্তু কোথায় তোমাকে খবর দিব? উন্নগা পাহাড়ে যেখানে তোমার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল সেইখানে তুমি যদি দুপুরে যাও, আমিও আসিব। দূরে কে যেন আসিতেছে একজন"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম। সত্যই দূরে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছিল। সন্দেহ হইল হয়তো নিনানি।

শিলাঙ্গীকে বলিলাম, "তুমি এখন চলিয়া যাও। আমি কাল তোমার সহিত দেখা করিব"

"যে আসিতেছে তাহার সহিত যদি আলাপ করি ক্ষতি কি। তুমি যদি আমাকে নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দাও—"

আমি শিলাঙ্গীকে কথা শেষ করিতে দিলাম না।

"কে আসিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এখন যাও। আলাপের ব্যবস্থা পরে করিব। আমাদের দুই দলের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব হয় আলাপ তো হইবেই। এখন কিন্তু ও যদি তোমাকে আমাকে এইভাবে দেখে—বিশেষতঃ তুমি আমাদের শস্য কাটিয়া লইয়াছ তাহা হইলে সমূহ গোলযোগের সম্ভাবনা। তুমি এখন যাও—"

"বেশ। তুমি তাহা হইলে ঘাস দিয়া গর্তের মুখটা বন্ধ করিয়া দাও"

একটু অনিচ্ছাভরেই শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। সরীসৃপের মতো গর্তের মধ্যে ঢুকিল, ছোট ছোট তৃণগুচ্ছগুলিও তাহার অনুসরণ করিল। যে ঘাসের বোঝাটা দিয়া আগের দিন গর্তের মুখ ঢাকা ছিল সেইটা দিয়াই মুখটা বন্ধ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মনে হইল তাহা সমীচীন হইবে না, মুখটা খোলাই থাক। গভীর রাত্রে আমার এখানে অবস্থানের কারণটা তাহা হইলে দেখাইতে পারিব।

......নিনানিই আসিতেছিল। সে কাছাকাছি আসিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিনানির চুল আলুলায়িত। আমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি এখানে! আমি কতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছি। তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

বলিলাম—"দেখিলাম এখানকার তৃণগুলি খুব বেশি নড়িতেছে। ভাবিলাম হয়তো ছাগল বা গরু ঢুকিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল এই গর্তটা দেখিতেছি। বোধ হয় ইঁদুর কিম্বা খরগোসের গর্ত!"

নিনানি গর্তের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলমাত্র, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিল না।

বলিল, "আমি কন্যা নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছি। ধবলের প্রমাতামহের আদেশ আমি মানিতে পারিলাম না। জানি সে প্রতিশোধ লইবে, তবু মানিতে পারিলাম না। বিঘাওয়ের পায়ের পুঁজরক্ত আমি মাথায় করিয়া থাকিতে পারিব না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো আমার মৃত্যু হইবে, তাই যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি তোমার কাছেই থাকিব"

এই বলিয়া সে আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে কাঁপিতেছে।

"কখন তুমি স্নান করিলে?"

"একটু আগে"

"আর কেহ কি তোমাকে স্নান করিতে দেখিয়াছে?"

"না। আমার যখন মূর্ছা ভাঙিল তখন উঠিয়া দেখি সকলে ঘুমাইতেছে। তোমাকে খুঁজিলাম কিন্তু পাইলাম না। একাই তখন বাহির হইয়া আসিলাম। কেবল জিগা আমার সঙ্গে ছিল।"

ধবলের কুকুরের নাম জিগা।

"জিগা কোথায়?"

"তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। জিগার সঙ্গও আমার ভাল লাগিল না। বিঘাওয়ের পুঁজরক্ত মাথায় মাখিয়া আমি খোলা আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল আকাশের জ্যোৎস্নাও আমার কেশ স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিতেছে, মনে হইল পৃথিবীর সর্বত্রই চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে আর সমস্ত অন্ধকার আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে আমার মাথায়, আমার পুঁজরক্তমাখা কেশে। মনে হইল ইহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ধবলের প্রমাতামহ যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে চায় মারিয়া ফেলুক। অপরাজিতা বংশের কন্যা আমি, এত গ্লানি বহন করিয়া বাঁচিতে চাই না। এই কথা মনে হওয়ামাত্র আমি কন্যা নদীতে নামিয়া অবগাহন করিলাম। এইবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না তো?"

"না—"

নিনানি উৎসুক নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার অধরে আবার মৃদু মৃদু হাসিও ফুটিতেছে।

"আমার চুলে হাত দিয়া দেখ, আর একটুও পুঁজরক্ত নাই। কন্যা নদীর জলে বারবার ধুইয়াছি। হাত দিয়া দেখ না একবার"

তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহার পর বলিলাম, "চল, এবার ফিরি—"

"কোথায় ফিরিব?"

"ঘরে চল—"

"সকলে যদি জানিতে পারে যে আমি বিঘাওয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্নান করিয়াছি, তাহা হইলে কি তাহারা আমাকে ঘরে থাকিতে দিবে?"

"তুমি যদি ঘরে থাকিতে চাও তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার সাহস কাহারও হইবে না। তুমি দলপতি ধবলের পত্নী একথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন"

"ভানা, টুলা, কিম্বা, বেসু—ইহারাও ধবলের পত্নী। তোমরা ইহাদের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছ তাহা মনে হয় না। সেদিন ঠেঠরা ধবলের সম্মুখেই টুলাকে প্রহার করিল, ধবল তো কিছুই বলিল না। তোমরাও সকলে চুপ করিয়া ছিলে। একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নির্যাতন করিলে কেহই প্রতিবাদ করিবে না জানি। কারণ আমি সকলেরই চক্ষুশূল।"

"আমি প্রতিবাদ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহই তোমাকে অপমান করিতে পারিবে না। তা ছাড়া আর একটা কথা। তুমি যে স্নান করিয়াছ একথা কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন কি। কেহ যখন তোমাকে স্নান করিতে দেখে নাই তখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না কি হয়"

"আমার মাথার চুলই যে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। আমার চুল দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে যে আমি স্নান করিয়াছি।"

সহসা আমার মাথায় একটা প্রেরণা আসিল।

আমি বলিলাম, "চল, তোমার মাথার চুল আমি ঢাকিয়া দিব—"

"ঢাকিয়া দিবে? কিরূপে তাহা সম্ভব"

"গাছের সরু সরু ডাল ও পাতার সাহায্যে"

কথাটা বলিয়া আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। সহসা উদ্বুদ্ধ কল্পনা আমাকে নিমেষে যেন নূতন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া

দিল। কল্পনানেত্রে আমি নিনানির মস্তকে শাখা-পত্র-নির্মিত শিরস্ত্রাণটা যেন দেখিতে পাইলাম। নিনানিকে আমি যে ভালবাসি শিলাংগীকে ভাল লাগিয়াছে বলিয়া সে ভালবাসা যে এতটুকু ম্লান হয় নাই সহসা তাহা যেন উপলব্ধি করিলাম। তাহার দুঃখ, তাহার আতঙ্ক, তাহার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার উপর তাহার আকুল নির্ভরশীলতা আমার পৌরুষকে একাগ্র করিয়া তুলিল। সেই একাগ্রতাই বোধ হয় আমাকে স্রষ্টাপদেও উন্নীত করিল। প্রেমের প্রেরণায় আমি এখন একটা সৃষ্টিকর্মে মাতিয়া উঠিলাম যাহা ভবিষ্যতে যুগান্তকারী বলিয়া বিঘোষিত হইবে। তখন কিন্তু চুপড়ি না ঝুড়ির সম্ভাবনা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। অপমানিতা নিনানিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার কল্পনা তখন উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, তাহার সম্বৃত কেশপাশ বেষ্টন করিয়া শাখা-পত্রের আবরণ সৃজন করিতেছিল, তাহার পরিণামের কথা ভাবে নাই। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে আমাদের জমির প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল। সেই গাছটা দেখাইয়া নিনানিকে বলিলাম, "চল আমরা ওই গাছের তলায় যাই। ওখানে গিয়া এখনই তোমার মাথা ঢাকিয়া দিব"

নিনানি আবদার-মাখা কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না। আমাকে তুমি তুলিয়া লইয়া চল"

নিনানিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। হাঁটিতে হাঁটিতেই ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া তাহার মাথার চুল ঢাকিব। চুলগুলি প্রথমে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে। তাহার পর তাহার কপালে একটা লতার বেষ্টনী দিব, তাহার পর চুলের চূড়ায় সরু সরু গাছের ডাল বাঁধিয়া সেই ডালগুলি নোয়াইয়া আনিয়া সেই লতা-বেষ্টনীতে আটকাইয়া দিব। খুব ঘন ঘন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে চুল না দেখা যায়। ডালের ফাঁকে ফাঁকে পাতা গুঁজিয়া দিলে একেবারেই দেখা যাইবে না। কল্পনার উন্মাদনায় আমি অতিশয় দ্রুতবেগে গাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাছের তলায় পৌঁছিতে খুব বেশি সময় লাগিল না, স্কন্ধারূঢ়া নিনানির ভার আমাকে ক্লান্তও করে নাই, আমি স্বপ্নের পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া চলিয়া গেলাম। গাছের তলায় দেখিলাম ঘন অন্ধকার। কেবল একটি স্থানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। নিনানিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলাম—"তুমি ওই চাঁদের আলোয় বস। আমি গাছের উপর উঠিয়া শাখা-পত্র সংগ্রহ করি। একটা লতাও সংগ্রহ করিতে হইবে"

"লতা? লতা লইয়া কি করিবে"

"দেখিতেই পাইবে"

"ও বুঝিয়াছি"

নিনানির চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল। আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। গাছে এক ঝাঁক বক বসিয়াছিল। আমি গাছে উঠিতেই তাহারা 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখি তাহারা মাথার উপরে চক্রাকারে উড়িতেছে। কৃষ্ণ-আকাশের পটভূমিকায় চন্দ্রালোকে সেই শ্বেতপক্ষ বিহঙ্গম দল আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিল। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা উদ্ভট উপমাও মনে জাগিল। হঠাৎ মনে হইল জ্যোৎস্না বোধহয় বিহঙ্গরূপ ধরিয়া এই বৃক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বকের দল দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমি ডাল ও পাতা সংগ্রহে মন দিলাম। ডাল ও পাতার বোঝা লইয়া নীচে নামিয় দেখি নিনানি নাই।

"নিনানি—"

কোনও সাড়া পাইলাম না।

"ননানি—"

তবু কোনও সাড়া নাই। কোথায় গেল সে? সহসা শিলাংগীর কথা মনে পড়িল। কাছেই কোথায় যেন বাঘ বাহির হইয়াছে।

"নিনানি—"

"আঃ, অত চীৎকার করিতেছ কেন। আমি লতা সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। দেখ, এই লতায় হইবে কি না"

"কোথায় গিয়াছিলে?"

"পাহাড়ের উপর। নীচে কোথাও পাইলাম না। পাহাড়ের উপরও পাই না, একটি মেয়ে আমাকে দিল"

"মেয়ে? কাহাদের মেয়ে"

"তুমি যাহাদের কথা বলিতেছিলে, পাহাড়ের ওপারে যাহারা থাকে, যাহারা গরুর দুধ পান করে তাহাদের মেয়ে। নাম বলিল শিলাংগী। মেয়েটি একটি লতায় ঘাসের কয়েকটি ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর আমার কাছে আগাইয়া আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল—আমি এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া আছি কেন। আমি বলিলাম—আমার একটা লতার দরকার, তাহাই খুঁজিতে আসিয়াছি। সে বলিব—এখন পাহাড়ে লতা খোঁজা নিরাপদ নয়। বাঘ বাহির হইয়াছে। তোমার যদি বিশেষ দরকার থাকে আমার এই লতার খানিকটা অংশ লও। এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া খানিকটা লতা ছিঁড়িয়া আমাকে দিল। দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। বেশ মেয়েটি। দেখ, এই লতায় হইবে কি না"

আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। শিলাংগীর সহিত নিনানির দেখা হইয়াছে। এখন হইলে বলিতাম বিধাতার কি অদ্ভুত পরিহাস। কিন্তু তখন বিধাতার সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাই এই ধরণের কথা মনে হইল না, কিন্তু এই অদ্ভুত যোগাযোগের বিস্ময়টা আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল, মনে হইল একটা অজানা ইংগিত আমাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বহুকাল পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহাও অস্পষ্টভাবে।

"অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন"

"বাঘ বাহির হইয়াছে না কি"

আমার নীরব বিস্ময়ের হেতুটা বাঘের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চক্ষু দুইটি আর একটু বিস্ফারিত করিলাম।

"তোমার তো বাঘকে ভয় পাইবার কথা নয়। তুমি বাহির হইয়াছ শুনিলে বাঘেরই বরং ভয় পাইবার কথা। কন্যা নদীর তীরে আসিবার পথে কুঠারের এক আঘাতে তুমি যে প্রকাণ্ড বাঘটাকে মারিয়াছিলে তাহার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বাঘদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। নাও, এখন কি করিবে কর, আমার বড় ক্লান্ত লাগিতেছে।"

"যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ওইখানে বস"

ক্রমশঃ





তামাকের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা তামাকের ধোঁয়ার মতই ধোঁয়াটে। ইয়োরোপে এবং তথা সমগ্র পৃথিবীতে তামাক ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে।



ফরাসী চিকিৎসক জিন নিকট, যাঁর নামানুসারে নিকোটিন কথাটির প্রচলন হয়েছে। ইয়োরোপে তামাক প্রচলনে ইনিই অগ্রগণ্য।

আমেরিকায়, বিশেষতঃ মধ্য আমেরিকায়, তামাক বন্যভাবে জন্মায়। কলম্বস ও তাঁর সঙ্গীরা ওদেশে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের ধূমপান করতে দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্বে তাঁরা কোনো মানুষকে তাম্রকূট সেবন করতে দেখেন নি। তাই তাঁরা যখন দেখলেন যে, সেখানকার লোকেরা শুকনো তামাক পাতা গুঁড়িয়ে লম্বা একটি পাইপের মধ্যে পুরে তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করে পাইপটিকে মুখ দিয়ে বেশ টানতে আরম্ভ করল ও তারপর নাক ও মুখ দিয়ে সমানে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল তখন ত চোখ বড় হয়ে ওঠবারই কথা। তার ওপর যখন তাঁরা শুনলেন যে, ধূমপান অভ্যাস করলে কয়েকদিন বিনা আহারেই চালিয়ে দেওয়া যায় এবং শরীরের আভ্যন্তরিক ক্লেদ নষ্ট করে তখন তাঁরাও ধূমপান অভ্যাস করলেন এবং এইভাবে তাম্রকূট আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে চলে এল। অনেকে বলেন যে, আমেরিকার আদিবাসীরা যে বিশেষ ধরণের পাইপে ধূমপান করত তার নাম ছিল "টুবাকো" এবং সেই থেকেই নাকি তামাকের প্রচলিত ইংরেজি কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মেক্সিকোতে তামাক গাছকে 'টোব্যাকো' বলা হত এবং সেই থেকেই এই নাম চলে আসছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে **জিন নিকট** নামে একজন ফরাসী চিকিৎসককে লিসবনে পাঠানো হয় এক ঘটকালির ভার দিয়ে, রাজা সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে ভ্যালয়ের মার্গারেটের বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়া। ডাক্তারবাবুর প্রকৃতি ছিল অনুসন্দিৎসুপ্রবণ। তিনি লিসবনে যেয়ে আমেরিকা প্রত্যাগত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সেদেশের গাছপালার বিষয় তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং সদ্য আমদানী করা তামাক গাছের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। তিনি শুনেছিলেন যে, ঘা ফোড়ার ওপর তামাক গাছের পাতা চাপিয়ে দিলে ঘা ফোঁড়া শুকিয়ে যায় এবং মাথা ধরলে কপালের ওপর তামাক



সার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধূমপান প্রচলন করেন। ফাঁসিমঞ্চে ওঠবার পূর্বে র‍্যালে একবার ধূমপান করে নিয়েছিলেন

পাতা রাখলে মাথাধরা সেরে যায়। অনেকে জানেন যে, আমাদের দেশে অনেকে ফোড়া ফাটাবার আগে তার ওপর হুঁকোর জল দিয়ে থাকেন এবং দাঁতের গোড়ার ব্যথা সারাবার জন্যও গুঁড়ো তামাকের পাতা লাগিয়ে দেন।



দক্ষিণ ভারতের একটি তামাকের কারখানায় তামাক শ্বকিয়ে নেবার পর

নিকট আরও শ্বনেছিলেন যে, তামাকের প্রভাবে কাসি, হাঁপানি, পেট-ব্যথা ও বাতব্যথা সেরে যায় এবং তামাকের ধোঁয়ায় রোগবীজাণ্ব ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। ১৬১৪ ও ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের প্লেগের সময় সর্বজনীন ধ্মপান প্রচলিত হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, প্লেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এবং ইটন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন প্রাতে নিয়ম করে ধ্মপান করতে হত।

জিন নিকট তামাকের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে রীতিমতো চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তামাকের ভেষজগত গ্বণে বিশ্বাস করতেন। নিকট পরে একটি ফরাসী ভাষার অভিধান সংকলন করেছিলেন, তাতে তিনি তামাক সম্বন্ধে লিখেছিলেন; কিন্তু ধ্মপান সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেননি। জিন নিকটের নাম থেকেই তামাক গাছের নামকরণ করা হয়েছে 'নিকোটিয়ানা টোব্যাকাম' এবং নিকোটিন কথাটিও তাঁরই নামান্বসারেই হয়েছে।

তামাকের কোনো রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে কিনা এ নিয়ে ইংরেজরা বেশী মাথা ঘামায়নি; পরন্তু তারা আমেরিকার আদিবাসীদের অন্বকরণে ধ্মপানেই মনোনিবেশ করেছিল। জনশ্রুতি এই যে, রাণী এলিজাবেথের পার্শ্বচর স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধ্মপান প্রচলন করেন। র‍্যালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম নতুন পৃথিবীতে গমন করেন এবং ইংলণ্ডের কুমারী রাণীর সম্মানে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম রাখেন ভার্জিনিয়া। এই ভার্জিনিয়াতে উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ হয় এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তামাকের মধ্যে ভার্জিনিয়ান টোব্যাকোর স্থান। র‍্যালে তিনজন রেড ইণ্ডিয়ানকে ইংলণ্ডে নিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজরা অবাক হয়ে তাদের ধ্মপান দেখত কিন্তু তারাও অচিরে ঐ রেড ইণ্ডিয়ানদের মতোই ধ্মপায়ী হয়ে উঠল। গল্প আছে যে, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ফাঁসি মঞ্চে ওঠবার পূর্বে স্নায়্ব কঠিন করে নেবার উদ্দেশ্যে ধ্মপান করে নিয়েছিলেন।

তামাকের সংগে ইয়োরোপে আর একটি জিনিসের আমদানী হয়েছিল, সেটি হল গোল আল্ব। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তামাককে গ্রহণ করতে বেশী সময় লাগেনি কিন্তু আল্ব খাওয়া অভ্যাস করতে মান্বষের শত বৎসর লেগেছিল। বিখ্যাত অভিযাত্রী হাম্বোল্ড বলেছিলেন যে, "মান্বষ তখন ঠিক যেন শিশ্বর মতো আচরণ করেছিল, তাকে দেওয়া হল একটি জবলন্ত কাঠকয়লা আর এক খণ্ড রুটি, সে রুটি ফেলে সাগ্রহে জবলন্ত কয়লার প্রতি আকৃষ্ট হল।"

রাণী এলিজাবেথের সভায় ধ্মপায়ীরা সমাদৃত হত এবং ধ্মপান ভদ্রতার অপরিহার্য অংগরূপে পরিগণিত হত অথচ রাজা প্রথম জেমস্ ধ্মপানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ধ্মপান যাতে ব্যাপকতা লাভ করতে না পারে সেজন্য 'কাউণ্টারব্লাস্ট টু টোব্যাকো' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করতেন। সেই পুস্তিকার এক স্থানে লিখিত ছিলঃ

> ধ্মপান প্রথা চক্ষ্বর পক্ষে ক্ষতিকর, মাথার মগজের পক্ষে বিপজ্জনক, আর ফ্বস্‌ফ্বস্ ত খারাপ করেই। তা'ছাড়া এর দুর্গন্ধযুক্ত আদি-অন্তহীন ধোঁয়ার কথা না বলাই ভাল।

জেমস্ আইনের সাহায্যে ধ্মপান প্রথা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে যখন ফল হল না তখন তিনি তামাকের ওপর নির্ধারিত কর পাউণ্ড প্রতি ছয় পেন্স থেকে দশ পেন্স পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু কোনোই ফল হল না, উল্টে লোকেরা তামাক গাছের চাষ আরম্ভ করে দিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ ভার্জিনিয়ার তামাক চাষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ইংলণ্ডে তামাক চাষ নিষিদ্ধ করে দিলেন। অবশ্য রাণী অ্যানের সময় আবার ধ্মপান প্রথা চরমে উঠেছিল। সে সময়ে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তামাকের স্বাদ গ্রহণ করতেন। এই সময় থেকে তামাক থেকে নস্য প্রস্তুত হতে লাগল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাম্রকূট জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল, সিগারের প্রচলন শ্বরু হল। অবশ্য আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে একপ্রকার সিগার অথবা মোটা বিড়ি খাওয়ার প্রচলন ছিল। তারা শ্বকনো গ্বঁড়ো তামাক তালপাতায় মুড়ে ধ্মপান করত এবং এইপ্রকার সিগার স্পেন দেশে আমদানী করাও হত।

অবশেষে আগমন হল সিগারেটের। বলতে গেলে সিগারেটের জন্মস্থান ব্রেজিলে, তবে ব্রেজিলবাসীরা 'সিগারেট' বলত না, তারা বলত 'প্যাপিলিটস'। এই প্যাপিলিটস স্পেনে



ধ্মপায়ী রেড ইণ্ডিয়ান। কলম্বসের যুগে

ও ফ্রান্সে বিক্রয় হত। ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় থেকে সিগারেট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সৈন্যরা সিগারেট প্রস্তুত করতে শেখে। ফ্রান্সে সম্রাট লুই নেপোলিয়ান আর ইংলণ্ডে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড সিগারেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহিলারাও সিগারেট ব্যয় করতে শ্বরু করেছেন এবং তার ধাক্কা ভারতে এসেও পৌঁছেছে।

ভারতবর্ষে তামাকের আমদানী হয় সম্ভবতঃ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে। পর্তুগীজরাই এদেশে তামাক আমদানী করে। দক্ষিণ ভারতেই প্রথমে তামাকের চাষ শ্বরু হয়, কিন্তু সমস্ত ভারত-

বর্ষে চাষ ছড়িয়ে পড়তে শত বৎসর সময় লেগেছিল, লোকেরা সহজে তামাক গ্রহণ করতে চায়নি। আকবর বাদশাহকে তাঁর চিকিৎসকেরা তামাক খেতে নিষেধ করত আর জাহাঙ্গীরও রাজা জেমসের মতো তামাকের ব্যবহার বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাপেক্ষা বেশী তামাক উৎপন্ন হয় এবং তামাক থেকে শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের কয়েক কোটি মুদ্রা আয় হয়। ভারতবর্ষে প্রথম সিগারেটের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল ১৯১২ সালে বিহারের ডালসিং সেরাইয়ে। বর্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, সাহারাণপুর ও মুঙ্গেরে সিগারেটের কারখানা আছে; তবে চুরুট একমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই প্রস্তুত হয়। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন রাজ্য মিলে ভারতের শতকরা ষাট ভাগ বিড়ি প্রস্তুত করে। ভারতের প্রস্তুত চুরুট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং তা উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও হয়েছে কিন্তু ভাল সিগারেট এখনও তৈরি হয়নি; তার কারণ বোধ হয় এদেশে এখনও 'ভার্জিনিয়া' তামাক প্রস্তুত হয় না। ভার্জিনিয়া তামাক ভারতে উৎপন্ন করবার চেষ্টা চলছে। মাদ্রাজের গুণ্টুরে একটি কেন্দ্রীয় তামাকু গবেষণাগার আছে।

অবিভক্ত ভারতে বঙ্গদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী তামাকের চাষ হত, বর্তমানে মাদ্রাজ। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এখন দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই কিছু তামাকের চাষ হয়। মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত উত্তর-প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, বরোদা ও মহীশূরে তামাকের চাষ হয়। পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ফিলিপাইন, রাশিয়া, ব্রেজিল, গ্রীস, তুরস্ক, চীন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে তামাকের চাষ হয়।

সিগার ও সিগারেট ব্যতীত তামাক পাইপের জন্যও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; তাছাড়া বিড়ি ও হুকার জন্যও তামাক দরকার। নস্য, খৈনি বা শুখা, মিসি, জর্দা, দোক্তা ইত্যাদিতে তামাকের প্রয়োজন বড় কম নয়।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঘরে ঢুকে কে-র মনে হল কোন সভা-সমিতি হচ্ছে সেখানে। নানা ধরণের লোক বসে আছে ঘরটায়। একজন নূতন লোক যে ঘরে ঢুকেছে সেদিকে খেয়ালও নেই কারো। ঘরটা একবার ভালো করে দেখে নিল কে। মাঝারি সাইজের ঘর। দুটো জানালা আছে। আর, দেখে একটু অবাক হল কে, ছাতের ঠিক তলায়ই একসার গ্যালারী রয়েছে। সেখানেও লোকের ভীড় কিছু কম নয়। ঢুকে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না কে, বেরিয়ে এলো বাইরে, বড় ভারি ঠেকছিল ঘরের বাতাস। সেই মেয়েটির কাছে আবার গেল সে, 'কোথায়, ল্যানৎজকে তো দেখছি নে।'

'ভেতরে যান।' মেয়েটি বলল। তারপর এগিয়ে এসে দরজার হাতলে হাত রাখল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আর কেউ আসবে না।'

'বুঝলাম।' কে বলল, 'কিন্তু ঘর তো আগেই ভরে আছে, তিল রাখবার জায়গা নেই।' বলে সে আবার ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই কের নজরে পড়ল, দুটি লোক এক বিচিত্র ভঙ্গিতে কথা বলছে। একজন দুটো হাত প্রসারিত করে যেন কাউকে টাকা দিচ্ছে—এমনি একটা ভঙ্গি করে আছে; আর একজন তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ একখানা হাত এসে কে-র হাত ধরল। কে তাকিয়ে দেখল লালমুখো একটি ছেলে। ছেলেটি তাকে আকর্ষণ করল সামনের দিকে, 'আসুন, আসুন।'

কে ছেলেটির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। দেখল, এতো লোকের ভীড়ের মধ্যেও একফালি সরুপথ রয়েছে। হয়তো পথ রেখেই সবাই বসেছে। দুদিকেই লোক বসেছে, মধ্য দিয়ে পথ। সকলেই নিজের দলের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। পোষাকপরিচ্ছদ সকলেরই একরকম। পুরোণো ধরণের লম্বা কালো কোট-গায়ে, বেশ ঢিলেঢালা। আর কিছু নয় এই অদ্ভুত ধরণের পোষাকটাই যেন কেমন কেমন মনে হল কে-র। তা না হলে এটাকে একটা, রাজনৈতিক সম্মেলন বলে অনায়াসে ভেবে নিতে পারত সে।

ছেলেটি ঘরের আর এক সীমান্তে নিয়ে গেল কে-কে। সেখানে একটা মঞ্চের চারদিকে কিছু লোক ভীড় করে আছে। মঞ্চের ওপর একটা ছোট টেবিল। সেই টেবিলের পাশে মঞ্চের একধারে একটা চেয়ারের ওপর মোটা-মতন এক ভদ্রলোক বসে আছেন, খুব হাত-পা ছুঁড়ে কথা বলছেন কারো সঙ্গে। কে-র মনে হল লোকটি বোধহয় ব্যঙ্গ করছে কাউকে। বিচিত্র মুখভঙ্গি করে ঠাট্টা করছে। যে ছেলেটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, সে বেচারা একটু মুশকিলে পড়ল, দুতিনবার চেষ্টা করেও কে-র উপস্থিতি ঘোষণা করতে পারল না। পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে নিজেকে খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরে তিনবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই; কেউ কান দিল না তার কথায়। অবশেষে একজন মোটা ভদ্রলোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল ছেলেটি এবং কে-র দিকে। ছেলেটির বক্তব্য শুনে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার, তারপর কে-র মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার তো আরও একঘণ্টা পাঁচ মিনিট আগে এখানে পৌঁছবার কথা ছিল।'

কে উত্তর দিতে যাচ্ছিল; কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের ডানদিক থেকে সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল সবাই।

'আরও এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট আগে এখানে পৌঁছবার কথা ছিল আপনার।' ভদ্রলোক আবার অভিযোগ করলেন চড়া গলায়। সারা ঘরে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। এরপর ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না, কিন্তু আর সকলের গুঞ্জন বেড়ে চলল। তারপর, 'কে' ঘরে ঢোকবার সময় যেমন ছিল, ঘরের অবস্থা তার থেকে অনেক শান্ত হয়ে এল। শুধু গ্যালারির লোকগুলো বকে চলল তখনও। ধুলো-ধোঁয়ায় অনুজ্জ্বল ঘরে যতটুকু দেখা যায় তাতে মনে হল, গ্যালারির লোকগুলোর পোষাক যেন নীচের লোকদের পোষাক থেকেও খারাপ। মাথায় আঘাত লাগার ভয়ে তাদের অনেকে তুলোর গদি নিয়ে এসে তাদের মাথা আর ছাতের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখেছে।

'কে' ঠিক করল, বেশি কথা না বলে সে শুধু এদের লক্ষ্য করে যাবে। সেইজন্যে দেরী করে আসার অভিযোগের কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়ে সে শুধু বলল, 'দেরী হোক আর না হোক, এখন তো আমি এসে পৌঁছেছি।' এ কথায় অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঘরের ডান-দিকের লোকেরা। 'এদের মুগ্ধ করা খুব সহজ', 'কে' ভাবল। অবশ্য 'কে'-র ঠিক পেছনে ঘরের বাঁদিকের অংশের নীরবতা তাকে একটু বিব্রত করল। বাঁ দিকের শুধু দু'একটি লোক তাকে অভিনন্দন জানাল। 'কে' ভাবতে লাগল, কি করে সে চিরদিনের জন্যে ঘরের সকলের হৃদয় জয়

করবে, অথবা তা যদি সম্ভব না হয়, অন্তত এই সময়ের জন্যে ঘরের অধিকাংশ লোককে মুগ্ধ করবে।

'হুঁ,' ভদ্রলোকটি বললেন, 'কিন্তু আমি এখন আর আপনার বক্তব্য শুনতে পারব না।' গুঞ্জনের ঢেউ আবার উঠল। এবার অর্থ অনেক স্পষ্ট। হাত নেড়ে ঘরের লোকদের থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'তবে আমি আজ একবারের জন্যে একটা ব্যতিক্রম মেনে নেবো। কিন্তু এই ধরণের দেরি আর যেন কখনও হয় না। আপনি সামনে এগিয়ে আসুন।'

'কে'র জন্যে পথ করে দিতে একজন মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। এগিয়ে গিয়ে 'কে' মঞ্চে উঠল। সে একেবারে লেগে রইল টেবিলের সঙ্গে। তার পেছনের জনতা এত বিরাট যে, মনে হল নিজেকে না সামলালে সে ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলখানাকে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটকেই মঞ্চের থেকে ফেলে দেবে

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে একটুও বিব্রত মনে হল না। তিনি বেশ আরামে তাঁর চেয়ারে বসে রইলেন এবং তাঁর পেছনের লোকটির সঙ্গে শেষবারের মত কয়েকটি কথা বলে একখানা ছোট নোটবই তুলে নিলেন। শুধু ওই নোটবইখানাই টেবিলের ওপরে ছিল। স্কুলের ছাত্রদের বহুদিনের পুরোন খাতার পাতার মত তার পাতার ধারগুলো দুমড়ে গেছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুরুব্বির ভঙ্গীতে 'কে'র উদ্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'তা হলে বাড়ির দেয়াল রঙ করাই আপনার কাজ?' 'না', কে বলল, 'আমি একটি বড় ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার।' তার জবাবে ঘরের ডান দিকের লোকেরা এমন প্রাণখুলে হেসে উঠল যে, তাকেও হাসতে হল। তারা হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে কাঁপতে লাগল, যেন প্রচণ্ড কাশির দমকে কাঁপছে। এমন কি গ্যালারিতেও কয়েকজন হাসির তোড়ে যেন ফেটে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেটের মেজাজ তখন চড়ে গেছে। ঘরের অন্য লোকদের আয়ত্তে আনতে না পেরে, তিনি গ্যালারির দিকে তাঁর অসন্তোষের আগুন ছড়াতে লাগলেন। তাঁর ভুরুর যে বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে এতক্ষণ তার মনে হয়নি। এবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গ্যালারির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আর চোখের ওপরে তাঁর মোটা কাল ভুরু বিচিত্র ভঙ্গীতে কুঁচকে গেল।

ঘরের বাঁ দিকের লোকগুলো কিন্তু আগের মতই নীরব। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। মঞ্চ আর ঘরের ডানপাশের কলরব তাদের যেন ছুঁতে পারছে না। বাঁ দিকের লোকগুলো সংখ্যায় ডানদিকের লোকদের থেকে কম। তাদেরও বোধহয় কোনো গুরুত্ব নেই; কিন্তু তাদের থমথমে ভারিক্কি চাল বেশ একটা গুরুত্ব এনে দিয়েছে। 'কে' যখন তার কথা শুরু করল, তার নিশ্চিত ধারণা হল যে, সে বাঁ দিকের লোকগুলোর অভিমতই প্রকাশ করছে।

'মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট, আমি ঘরের দেয়ালে রঙ করি বলে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, অথবা, প্রশ্ন নয়, আপনি যে মন্তব্য করেছেন—তা আমার ওপর যে বিচারের প্রহসন চলছে তার মতই আজগুবি। আপনি আপত্তি করতে পারেন যে, এটা মোটেই কোনো বিচার নয়; সত্যিই তাই, কারণ আমি যদি একে বিচার বলে স্বীকার করি তাহলেই এটা বিচার, না হলে নয়। তবে এখনকার মত আমি একে স্বীকার করলাম, বলতে গেলে করুণা করেই। যদি এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেই হয়, করুণা করে ছাড়া কেউ তা করতে পারে না। আপনার বিচার পদ্ধতি ঘৃণ্য —একথা আমি বলি না, কিন্তু কথাটি আপনার গোপন বিবেচনার জন্যে আমি পেশ করতে চাই।' কথা শেষ করে 'কে' ঘরের চারদিকে তাকাল। কথাগুলো সে ধারাল গলায় বলেছে, সে যেটুকু চেয়েছিল তার থেকেও ধারাল, এবং বেশ যুক্তিসহকারে। যে কোনো রকমের বাহবা পাওয়া তার উচিত ছিল, কিন্তু সবাই নীরব, তারা স্পষ্টই পরের ঘটনার জন্যে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে। হয়ত এ ঝড়ের আগের নীরবতা, এখনই দমকা হাওয়া ছুটবে আর শেষ হবে এ প্রহসন। ঠিক এই সময়ে ঘরের দরজা খোলায় 'কে' রেগে উঠল। ময়লা পোষাক পরিষ্কার করে যে মেয়েটি সে ঢুকল ঘরে। মনে হল তার কাজ শেষ হয়েছে। একান্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করা সত্ত্বেও ঘরের কয়েকজনের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই কে-র মনের আগুন নিভিয়ে দিলেন। কারণ, তিনি তার কথায় একেবারে ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। গ্যালারির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। 'কে'-র বক্তৃতার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে তিনি খুব আস্তে বসে পড়লেন; তাঁর বসাটা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাক এই যেন তিনি চান। সম্ভবত মেজাজ ঠাণ্ডা করতে তিনি আবার নোটবইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

'ওতে বিশেষ কোনো সুবিধে হবে না,' 'কে' বলল, 'আপনার নোটবই আমি যা বলেছি তারই স্বীকৃতি।' সেই বিচিত্র জমায়েতে শুধু নিজের গম্ভীর কথার আওয়াজে উৎসাহিত হয়ে কে চট করে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে নোটবইখানা ছিনিয়ে নিল এবং মাঝখানের একটা পাতা দু'আঙুলে চেপে ওপরে তুলে ধরল আর ছোট ছোট করে লেখা কালির ছোপ লাগান হলদে-হয়ে-আসা পাতাগুলো দু'পাশে ঝুলতে লাগল। নোটবইখানা সে হাতে নিল না, যেন হাত নোংরা হয়ে যাবে। 'এগুলো হচ্ছে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নথিপত্র'—বলেই সে আঙুল আলগা করে নোটবইখানাকে টেবিলের ওপর পড়ে যেতে দিল। 'মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট, অবসর মত আপনি এটাকে আবার পড়তে পারেন। যদিও এতে কী আছে আমি জানি না, তবু এটাকে আমি ভয় করি না একটুও। এটাকে আমি আঙুল দিয়ে ছাড়া ছুঁতে পারি না; এটাকে হাতে তুলে নিতেও আমার বাধে।' নোটবইখানা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সেটাকে তুলে নিলেন এবং দুমড়ে যাওয়া পাতাগুলোকে ঠিক করে আবার পড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক মনে হল।

প্রথম সারির লোকগুলোর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণভাবে 'কে'র দিকে নিবদ্ধ ছিল যে, কিছুক্ষণ সেও তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারা সকলেই বয়স্ক; কয়েকজনের দাড়ি সাদা। তারাই কি এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী, এই জমায়েতের মতামত তারাই কি নির্ধারণ করবে, সে সবার সামনে ম্যাজিস্ট্রেটের অপমান করা সত্ত্বেও তার বক্তৃতার আরম্ভ থেকে তারা যে নিষ্ক্রিয় নীরবতায় ডুব দিয়েছে তা থেকে কি তারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে না?

'আমার বেলায় যা ঘটেছে,' আগের থেকেও ভারিক্কি চালে 'কে' বলতে শুরু করল, 'আমার বেলায় যা ঘটেছে, তা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং সেই কারণে এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই, বিশেষত আমি যখন ব্যাপারটাকে খুব গভীর-ভাবে নিচ্ছি না। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত নীতিরই নজির। এই ভ্রান্ত নীতি আরও অনেকের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণেই আমি এখানে কথা বলতে উঠে দাঁড়িয়েছি, শুধু আমার নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য নয়।'

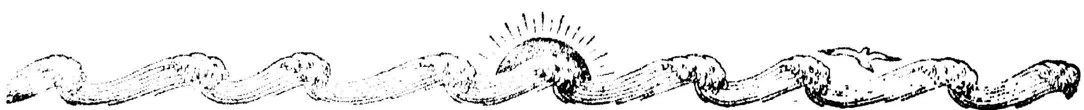
কথা বলবার সময় নিজের অজান্তে 'কে'র গলা চড়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে কয়েকজন মাথার ওপর হাত তুলে তালি বাজিয়ে চীৎকার করে উঠলোঃ 'সাবাস! কেন নয়? বাহবা! বাহবা!' প্রথম সারির কয়েকজন তাদের দাড়ি ধরে টানল, কিন্তু এভাবে বাধা পেয়েও কেউ ফিরে তাকাল না। 'কে'-ও সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিল না, তবু সে পুলকিত হয়ে উঠল। সকলের কাছ থেকে অভিনন্দন পাওয়া প্রয়োজন বলে তার আর এখন মনে হল না; ঘরের লোকগুলো যদি বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে আর এখানে সেখানে কয়েকজন যদি তার মতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তাহলেই সে খুব খুশি হবে।

'বক্তা হিসেবে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছে আমার নেই,' 'কে' বলল, 'আর ইচ্ছে থাকলেও সে ক্ষমতাই নেই আমার। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয়ই এখানে সবচেয়ে ভাল বক্তা। এটা তাঁর কাজেরও অঙ্গ। সাধারণের অভিযোগ সাধারণ্যে প্রকাশ পাবে, আমি শুধু এই চাই। শুনুন আমার কথা। দিন দশেক আগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল তা আমার কাছেও অদ্ভুত মনে হয়। অবশ্য সে কথাকে আমি এখন তেমন কোনো দাম দিচ্ছি না। সকালবেলা বিছানা ছাড়বার আগেই আমাকে পাকড়াও করা হয়। মাননীয় ম্যাজি-স্ট্রেটের মন্তব্য থেকে মনে হয়, ঘরের দেয়ালে রঙ লাগায় এমন কোনো লোককে গ্রেপ্তার করার আদেশ সম্ভবত ছিল। সে লোকটিও নিশ্চয়ই আমার মত নির্দোষ। তবে বদলে গ্রেপ্তারকারীরা আমার ঘরে হানা দেয়। দু'জন অভদ্র ওয়ার্ডার আমার পাশের ঘরটি দখল করে বসে। আমি যদি একটা দুর্ধর্ষ দস্যু হতাম তা হলেও বোধহয় তারা এর থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারত না। ওয়ার্ডার দু'জন চূড়ান্তরকম অসভ্য। তারা চেঁচামেচি করে আমার কানের পর্দা প্রায় ছিঁড়ে দিয়েছে। নানা ফন্দিফিকিরে তারা আমাকে তাদের ঘুষ দিতে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। আমার পোষাক আর অধোবাসগুলো আত্মসাৎ করবার মতলবে তারা আমাকে অনেক ভাঁওতা দেয়। আমারই চোখের সামনে গাঁড়োলের মত আমার সকালের খাবারগুলো খেয়ে তারা আমাকে খাবার কিনে এনে দেবে বলে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিল। এ-ই সব নয়। তৃতীয় একখানি ঘরে তারা আমাকে ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে যায়। ঘরখানি এমন একজন মহিলার—যাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। ওয়ার্ডার দু'জন আর সেই ইন্সপেক্টর সুন্দর ঘরখানিকে কদর্য করে তুলছিল। আমাকে শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে হল। শান্ত থাকা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। তবু আমি সফল হলাম এবং একান্ত ভদ্রভাবে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম। ইন্স-পেক্টরটিকে এখন আমি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। সেই মহিলার ঘরের একখানি চেয়ারে অবিনয়ের চরম দৃষ্টান্তের মত আমিরী কয়দায় চিৎ হয়ে থেকে ইন্সপেক্টরটি আমার প্রশ্নের কী জবাব দিয়েছিল জানেন? সে আসলে কোনোই উত্তর দেয়নি; সম্ভবত সে কিছুই জানত না। সে আমাকে গ্রেপ্তার করে-ছিল এবং তার পক্ষে সেটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ-ই সব নয়। সে আমার ব্যাঙ্কের তিনজন অধস্তন কর্মচারীকে ওই মহিলাটির ঘরে নিয়ে এসেছিল। তারা মহিলাটির কয়েক-খানা ছবি ওলট-পালট করে মজা করছিল। এই কর্মচারীদের নিয়ে আসার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমার বাড়িওলী ও তার চাকরাণীর মত তারাও আমার গ্রেপ্তারের খবর ছড়াবে এবং সমাজে আমার সুনাম ও বিশেষ করে ব্যাঙ্কে আমার মর্যাদা নষ্ট করে দেবে—ইন্সপেক্টরের এই আশা ছিল। কিন্তু তার এই আশার মুখে ছাই পড়েছে। এমনকি আমার সাদাসিধে বাড়িওলী ফ্রাউ গ্রুবাকেরও এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ছিল যে, রাস্তার চ্যাংড়া ছোকরাদের ফাজলামোকে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া যায়, আমার গ্রেপ্তারের তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব নেই। আমি আবার বলছি, সমস্ত ব্যাপারটায় আমার আর কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছি আর মাঝে মাঝে একটু রেগে উঠেছি; কিন্তু ব্যাপারটা কি ভীষণ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারত না?"

'কে' থামল এবং নীরব ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, তিনি কাকে যেন চোখের ইশারা করলেন। 'কে' হাসলঃ 'আমার পাশে বসে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট আপনাদের মধ্যে কাউকে কিছু একটা ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে আপনাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা এখান থেকে নির্দেশ নিয়ে থাকেন। হাততালি দেবার জন্যে না শিষ দেবার জন্যে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি জানি না, এবং আমি যখন আগে থেকেই ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিয়েছি, তখন এর আসল মানে বুঝবার আশা আমি ইচ্ছে করেই ত্যাগ করলাম। এসব ব্যাপারের আমি মোটেই ধার ধারি না এবং গোপনে ইশারা-ইঙ্গিত না করে তাঁর নুন-খাওয়া সাকরেদদের প্রকাশ্যে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আমি সবার সামনেই মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে দিচ্ছি। তিনি সময়মত বলতে পারেনঃ শিষ দাও! অথবাঃ হাততালি দাও!'

বিব্রত অথবা অধৈর্য হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর চেয়ারে বসে অস্বস্তিকর ভাবভঙ্গী করছিলেন। পেছনের যে লোকটির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন সে তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্যে অথবা বিশেষ কোনো পরামর্শ দেবার জন্যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নিচের ঘরের লোকেরা চাপা গলায় কথা বলছে, তবু তাদের ক্ষোভ স্পষ্ট। আগে মনে হয়েছিল, ঘরের দু' পাশের দুটি দল কখনও মিলতে পারে না; কিন্তু এখন তারা যেন এক হয়ে আসছে। কয়েকজন 'কে'-কে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল, আর কয়েকজন দেখাচ্ছিল ম্যাজিস্ট্রেটকে। গুমোট আবহাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে, ঘরের এক সীমান্ত থেকে অপর সীমান্তের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে গ্যালারির লোকদের। কী ঘটছে জানবার জন্যে তারা অন্যান্যদের ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করছে আর ভয়ার্ত তির্যক চোখে তাকাচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। প্রশ্নের জবাবও দেয়া হচ্ছে গোপনে। যারা প্রশ্ন করছে তারাই আবার উত্তরদাতাদের মুখে হাত দিয়ে কথার আওয়াজ নিচু পর্দায় নামিয়ে দিচ্ছে।

(ক্রমশঃ)



স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১১)

মৃত্যু জীবনের পূর্ণচ্ছেদ অথবা মৃত্যুর পরও জীবন কোনো প্রকারে নিজের জের টেনে চলে,—তা সে আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ হয়েই হোক অথবা অবিনশ্বর আত্মার মধ্যে নিজের সত্তাকে গুটিয়ে নিয়েই হোক,—সে বিষয়ে এত বাদ-প্রতিবাদ, এত তর্ক-বিতর্ক এত বিশ্বাস অবিশ্বাসের অবকাশ আছে যে, বিষয়টা আজ পর্যন্ত মোটের উপর রহস্যই থেকে গেছে।

আইন শাস্ত্রে highly probable এবং highly improbable নামে দুটি তত্ত্ব আছে, মাত্র যার উপর নির্ভর করে অভিযুক্তকে দণ্ড অথবা মুক্তি দেওয়া চলে। পরলোকতত্ত্বে যাঁরা সুপণ্ডিত, পরলোক বিষয়ে যাঁদের গভীর গবেষণা এবং মননশীলতা আছে, তাঁদের প্রমাণ পরীক্ষা অবগত হলে, যুক্তি বিচার শুনলে, পরলোক highly probable হয়; কিন্তু তদপেক্ষা এক ইঞ্চিও বেশী কিছু হয় না। এতদিন চেষ্টাচরিত্র চলেছে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোককে যুক্ত করে এ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেতু নির্মিত হল না। যে উপকরণ অলৌকিককে গড়ে তোলে, বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাই তার প্রায় ষোল-আনাই সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার। ভৌতিক বিবেচনা ভূতের ভয়ের মধ্যে এমন আশাহীনভাবে তলিয়ে গেছে যে, দম আটকে তার মধ্যে সে বেচারা বোধহয় মারাই পড়েছে।

গভীর রাত্রে দরজা খুলে দেখি, উঠানের ঈশান কোণে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে অশরীরী প্রেতাত্মা হাতছানি দিচ্ছে। বিনা বাক্যব্যয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে লেপের মধ্যে আশ্রয় নিই। পরদিন সকালে উঠে দেখি সূর্যকিরণেও ঈশান কোণে হাতছানি দিচ্ছে বটে, কিন্তু প্রেতাত্মা নয়, আকন্দ গাছের পাতা। এ অবস্থায় অশরীরী প্রেতাত্মাকে উঠানের ঈশান কোণ থেকে বিদায় নিতে হয় বটে, কিন্তু একেবারেই বিদায় নেয় না; ঈশান কোণ থেকে বিদায় নিয়ে প্রেতাত্মা বাসা বাঁধে আমার আপন অন্তরাত্মার মধ্যে। এমনিভাবেই প্রধানতঃ ভূতের ভয়ের ল্যাবরেটারিতেই ভৌতিক বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে।

সে যাই হোক, আজ আমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত যে কাহিনীটি বিবৃত করব, তার দ্বারা পরলোকের সেতু নির্মিত না হোক, অন্ততঃ ইহলোকের কঠিন যবনিকার গাত্রে একটা ছিদ্র নির্মিত হয়ে পরলোকের খানিকটা অংশ দেখা গিয়েছিল, সে কথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যেতে পারে। ১৯৪২ সালে দেওঘরে অবস্থানকালে এই কাহিনীটি আমি সুপ্রসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয়ের নিকট বলেছিলাম।* গল্পটি শুনে যৎপরোনাস্তি খুশি হয়ে তিনি বলেছিলেন, পরলোকবাদের প্রমাণ হিসেবে এ গল্প অনন্য; এবং গল্পটি লিখে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে, যে কথা অলৌকিক, যা শুনে লোকে বিশ্বাস করবে না, এমন কি, হয়ত উপহাস করবে, তেমন কথা জনসমীপে প্রকাশ করে তার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করবে না। শাস্ত্রের আর একটি উপদেশ, শতং বদ মা লিখ। একশ বার বোলো, কিন্তু লিখো না। আমি শেষোক্ত উপদেশটি পালন করে গল্পটি এ পর্যন্ত বহুলোককে বলেছি, কিন্তু লিখিনি। আজ 'স্মৃতিকথা' লিখতে বসে বোধহয় কর্ণের মৃত্যু-কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই গল্পটা না লিখে থাকতে পারলাম না।

আমি তখন ভাগলপুরে ওকালতি করি। সকালে মক্কেল নিয়ে বসি; আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দ, প্রতারিত হওয়া—প্রতারিত করা নিয়ে দ্বিপ্রহর কাটে আদালতে; বৈকালে গৃহে ফিরে চোগা-চাপকানের বিজাতীয় খোলস থেকে আর্ত দেহকে খালাস করে, চা-খাবার খেয়ে ছুটি দিই 'ভাগলপুর ইন্সটিটিউটে'। সেখানে টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বিলিয়ার্ডস্, বই, সংবাদ-পত্র, গান-বাজনার বিচিত্র আয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ উত্তর দিকের সুবিস্তৃত বারান্দায় আকাশের চন্দ্রাতপতলে ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে রাজা-উজির মারা আর গালগল্প ওড়ানো। ইন্সটিটিউট থেকে ফিরে যদি মক্কেল থাকে ত' কাজে বসি, নচেৎ আহার সমাপন করে আইন এবং সাহিত্য নিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাই।

এইভাবে এক নিয়মে এক ছন্দে জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন বৈকাল বেলা ইন্সটিটিউট যাবার পথে আদমপুরের মোড়ে একটি ভদ্রলোকের সহিত একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হল।

"একি! আপনি এখানে?"

"চাকরি উপলক্ষে এসেছি। আপনি এখানে কি করেন?"

"ওকালতি করি।"

আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস। ভাগলপুরে এসেছেন কমিশনারের পার্শোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। এঁর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। গণিত শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আদমপুরে মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমরেন্দ্র সপরিবারে বাস করছেন। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে দুইখানি বাড়ি; ছোটখানিতে মণিবাবু নিজে বাস করেন, বড়টি ভাড়া নিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথ। কম্পাউণ্ডের অব্যবহিত নিম্নেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী; তখন সুবিস্তৃত প্রসারে ভাগলপুরের উপর দিয়েই প্রবাহিত।

ভাগলপুরের সম্মুখবর্তী গঙ্গা নদীর একটা অদ্ভুত আচরণ দেখা যায়। কখনো ইনি ভাগলপুর শহরের অব্যবহিত উপকূল স্পর্শ করে প্রবাহিত হন, কখনো বা পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে সাড়ে পনের আনা জল নিয়ে সরে পড়েন, শহরের উপকূলে পড়ে থাকে আধ-আনা জলের বিশীর্ণ উপশাখা, ভাগলপুরবাসীরা তার নাম দেয় যমুনিয়া, অর্থাৎ যমুনা। এই গঙ্গা ও যমুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থলে জেগে ওঠে এক সুবিস্তৃত চরভূমি, যার নাম একেবারে বাঁধা আছে দিয়রা-শঙ্করপুর এবং যার পলি-পড়া নূতন মৃত্তিকার অত্যুৎপাদিকা শক্তির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যমশীল তৎপর লোকেরা একদিনও বিলম্ব করে না। দেখতে দেখতে দিয়রার বক্ষের উপর গজিয়ে উঠতে থাকে চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি, দোকান-পশার। কালক্রমে শঙ্করপুর দিয়রার উপর নাতিবৃহৎ শঙ্করপুর মৌজা গড়ে ওঠে। তার ঘনসন্নিবদ্ধ বসতির মাঝে দিকে দিকে পথ-ঘাটের বিস্তার, পথ-পার্শ্বে জায়গায় জায়গায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের জলবায়ু-রৌদ্রের প্রভাবে বর্ধিত বৃহৎ বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ।

সকালে-বৈকালে চরভূমির উন্মুক্ত স্থান মুখর হয়ে ওঠে গো-মহিষাদি পশুর গলায়-বাঁধা ঘণ্টির বিচিত্র সুরে। প্রত্যহ খেয়া নৌকা ভর্তি হয়ে ভারে ভারে আসে বিবিধ শস্য, আনাজ, দুগ্ধ এবং ঘৃত দধি ননী প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য। উদ্যমশীল গোয়ালারা পারানির কড়ি ও সময় বাঁচাবার জন্য প্রত্যুষে দুধের ভাণ্ড বামহস্তে মাথার উপর ধারণ করে দক্ষিণ বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে সাঁতার কেটে ভাগলপুর শহরের ঘাটে এসে ওঠে দুধ বিক্রয় করবার জন্যে। শীতকালে

বোঝা-বোঝা আসে টাটকা তাজা যেন সবুজ রঙে চোবানো বড় বড় কড়াইসুঁটি, গ্রীষ্মকালে আধ মণ-ত্রিশ সের ওজনের ভাগলপুরের বিখ্যাত তরমুজ।

পক্ষান্তরে ভাগলপুর থেকে ব্যাপারীরা শঙ্করপুরে নিয়ে যায় বস্ত্র লবণ হতে আরম্ভ করে সংসারের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য যা শঙ্করপুরের চরভূমিতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপে আমদানী ও রপ্তানির সাহায্যে শঙ্করপুর ও ভাগলপুরের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ চলতে থাকে।

কিন্তু সহসা একদিন কোনো এক বর্ষাকালের খরস্রোতের উপর ভর দিয়ে গঙ্গামাতার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়ে যায়। ত্রিশ বৎসর ধরে শঙ্করপুর দিয়ার যে আলগা-মাটি ক্রমশ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে, কাস্তের মুখে পাকা ধানের মত, উত্তর উপকূল থেকে তা কাটতে আরম্ভ করে বঙ্গোপসাগরে চালান যেতে থাকে। একাজটি সম্পূর্ণ হতে, অর্থাৎ গোটা শঙ্করপুর দিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে দুই তিন বৎসরের বেশি লাগে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্করপুরবাসীরা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পাতা সংসারের বাড়ি-ঘর তুলে মালজাল নিয়ে সরে পড়বার কার্যে বিব্রত হয়ে ওঠে।

এদিকে, দেবী জাহ্নবী যেখান থেকে উত্তরায়ণ আরম্ভ করেছিলেন সেখানে পৌঁছে, অর্থাৎ ভাগলপুর শহরের পাড়ে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করেছেন। স্থানে স্থানে পাড় খসে পড়ে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হচ্ছে। চক্ষের সম্মুখে শঙ্করপুরের ভয়াবহ বিলোপ দেখে যোগশরের গঙ্গাতীরবর্তী বুঢ়ানাথের মন্দিরে স্বয়ং শঙ্কর চিন্তিত হয়ে ওঠেন, কি জানি দেবী তাঁকে শুদ্ধ তাঁর মন্দিরটি লেহন করে না নেন! বাঙালীটোলায় আমাদের পৈতৃক বাড়ির ঠিক উত্তরে ঘোষেদের বাড়ির অল্প-স্বল্প অংশ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করেছে। স্নান করতে এসে স্নানার্থীরা ত্রস্ত হয়ে বলে, 'মা, যথেষ্ট কৃপা করেছ, এবার তোমার অনুগ্রহের সীমান্ত-রেখা দয়া করে টানো।'

কিছুকাল পূর্বে শঙ্করপুর দিয়ার বক্ষে যেখানে স্বচ্ছন্দে গরু-বাছুর চরে বেড়াত, এখন সেখান দিয়ে কলিকাতা-পাটনাগামী বৃহৎ মালবাহী স্টীমার অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে।

অমরেন্দ্রবাবুর ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে তাঁর কম্পাউন্ড স্পর্শ করে গঙ্গা নদী সগৌরবে প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীচিহ্নিত অমরেন্দ্রনাথের কম্পাউন্ড ও অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভস্পৃহা ধীরে ধীরে আমার সায়াহ্নগুলিকে অধিকার করতে লাগল। ইনস্টিটিউট যাওয়া ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাসে মাসে মাত্র চাঁদা দেওয়াতে পর্যবসিত হল।

আমাদের বৈঠক বসত নদীমুখ হয়ে নবদূর্বাদলের হরিৎ আস্তরণের উপর। সম্মুখে পূর্ববাহিনী খরস্রোতা ভাগীরথী নদী; তার উত্তরে অপর পারে দিগন্তবিলীয়মান বালুচর; নদীতটে সাহিত্যিকের পক্ষে পরম কৌতূহলের বস্তু নদীজলাভিমুখে হেলে-পড়া ক্ষয়িতমূলে সেই অশ্বত্থ গাছ, গভীর রাত্রে নৈশ অভিযান থেকে ফিরে এসে যার শিকড়ে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'ইন্দ্রনাথ' নৌকা বাঁধত।

এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রথম প্রথম বৈঠকে বসতাম মাত্র আমরা তিনজন, অমরবাবু, অমরবাবুর বাড়িওয়ালা মণিবাবু ও আমি। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও ভারতবিখ্যাত গায়ক ইনকমট্যাক্সের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এই মণিবাবু। তিনি নিজেও একজন সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

শশিকলার মতো দিনে দিনে না হলেও, ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করতে করতে আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা শেষ পর্যন্ত আট নয়জনে এসে দাঁড়াল। এ কয়েকজন অবশ্য পাকা সদস্য। তা ছাড়া দু-চার জন ছুটকো সদস্যও ছিলেন, ধূমকেতুর ন্যায় যাঁরা মাঝে মাঝে এসে দু-চার দিন আকাশ আলো করে অন্ত যেতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ, পাকা সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রধানত কলিকাতায় থাকতেন; কিন্তু পূজার ছুটি ও বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে তিনি বৎসরে নিয়মিত দুবার ভাগলপুরে আসতেন ও প্রতিদিন আমাদের দলে হাজির হতেন।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা—এই চার ভাবের অভিধা নিরূপক একটি সূত্র আছে, "অত্যাগসহনো বন্ধু সদৈবানমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।" এই সূত্র অনুযায়ী আমরা আট নয়জন পাকা সদস্য যে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম তা বলতে পারিনে, কারণ পরস্পরের বিচ্ছেদ আমাদের সহ্য করতেই হোত; সুহৃদও আমাদের ঠিক বলা চলত না, কারণ মতামতের ক্ষেত্রে আমরা কারো অনুগত হয়ে তাঁবেদারি করে চলতাম না, বরং মাঝে মাঝে প্রয়োজন উপস্থিত হলে একেবারে রুখে উঠতাম; আমরা একক্রিয় ছিলাম না বলে আমাদের মিত্র বলাও চলত না, কারণ আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন হাকিম, কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, কেউ-বা ব্যবসায়ী। তবে রুচি ও প্রবৃত্তির একতাবশত আমরা অনেকটা সমপ্রাণ অর্থাৎ সমভাবাপন্ন ছিলাম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। রুচির একতা যে-পরিমাণ সমপ্রাণতার সৃষ্টি করতে পারে, এমন বোধ করি আর কিছু নয়। সভা-সমিতির সভ্য হবার সাধারণ নিয়ম, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল', অর্থাৎ, দাও চাঁদা হও সভ্য। আমাদের দলের সভ্য হবার কড়ি, অর্থাৎ প্রবেশ-টিকিট, ছিল রুচির মিল। রুচির মিলের টিকিট দুষ্ক্রেয় বস্তু। সুতরাং আমাদের দলটি বিস্তৃত হতে পারেনি, কিন্তু গভীর হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

দলটি সবেগে পুরা-দমে চলছে, এমন সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভাগলপুরে বদলী হয়ে এলেন। দেখতে অতিশয় সুপুরুষ; মুখে প্রসন্ন মিষ্টহাসি লেগেই আছে; মার্জিত রুচি, মার্জিত কথাবার্তা, সুমার্জিত আচরণ। সর্বোপরি, এমন একটা সহজ তরল সহৃদয়তা, যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়। আমাদের দলপতি অমরেন্দ্রনাথ নিপুণ জহুরী, অবিলম্বে ক্ষিতীশচন্দ্রকে হাত ধরে দলে টেনে নিলেন। সুরসিক ক্ষিতীশচন্দ্রকে লাভ করে আমাদের দল উল্লসিত হয়ে উঠল।

শীতকাল। ভাগলপুরের দুর্জয় শীতে গঙ্গার ধারে বৈঠক আর সম্ভব হচ্ছে না। তৎপরিবর্তে বসছে আমার বৈঠকখানার প্রশস্ত ফরাসের উপর। সেখানে চলে প্রধানত গল্পগুজব আর সঙ্গীতের মজলিস। যখন গান চলে তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর সকলেই হন শ্রোতা। সুতরাং গান গাইতে হয় একমাত্র আমাকেই।

ফরাসের উপর দিনে দিনে ক্রমশ আমাদের বসবার স্থানগুলি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সকলেই নিজ নিজ স্থানে এসে বসে, কেউ কারো স্থান অধিকার করে না। অমরেন্দ্রনাথ ও আমি সামনা-সামনি বসি, মধ্যে পড়ে থাকে একটা হার্মোনিয়মের ব্যবধান। একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আমরা সকলেই ফরাসে বসি। কিছুকাল পূর্বে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় তিনি পা মুড়ে বসতে পারেন না। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বেতের ইজি চেয়ার ছিল, প্রতিদিন সঙ্গীতপ্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র একটি পায়ের উপর অপর পা স্থাপন করে সেই চেয়ারে উপবেশন করে গান শোনেন, আলাপ-আলোচনা করেন। চেয়ারটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এমনকি, তিনি উপস্থিত না থাকলেও কেউ সেটা অধিকার করে না, তাঁর অপেক্ষায় খালি পড়ে থাকে।

ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি ও আমার বাড়ি রাস্তার এপার-ওপার। একদিন ছুটির দিনে সকালবেলা তাঁর ময়ূরকণ্ঠি রঙের সৌখীন বালাপোষটি গায়ে দিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র এসে হাজির; হাতে একখানা বই।

অভ্যর্থনা করে তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক্ষিতীশবাবু, সকাল বেলা বই হাতে করে বেরিয়েছেন, ব্যাপার কি?"

স্মিতমুখে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষিতীশবাবু বললেন, "এটি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বই। এর একটি গানের ভাষা ও ভাব কয়েক-দিন থেকে আমার মনকে অস্থির করে রেখেছে। আমার দ্বারা ত' সম্ভব নয়, তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। স্বরলিপি থেকে গানটি শিখে আমাদের সভায় আপনাকে গাইতে হবে।" বলে গানের পাতাটি খুলে বইখানি আমার হাতে দিলেন।

গানটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! সত্যিই অতি চমৎকার, এমনকি, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও। যে অদ্ভুত গল্প বলতে উদ্যত হয়েছি, তার পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য সমগ্র গানটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান,
তার বদলে আমি চাইনে কোনো দান।
ভুলবে সে গান যদি, না-হয় যেয়ো ভুলে,
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?
সেই কথাটি কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে।
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুলতে সে কি পারো ভুলিয়েছ মোর প্রাণ!

গানটি পড়ে বললাম, "সত্যিই অপূর্ব! হাকিমের হুকুম তামিল করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

কিছুক্ষণ গল্প করে ক্ষিতীশবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

স্বরলিপি থেকে গানটি উদ্ধার করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হল না; তখন ও বিদ্যা কতকটা আয়ত্তে ছিল। প্রতিমার দুই চোখে তারকা বসিয়ে দিলে মুখমণ্ডলের যে অবস্থা হয়, সুললিত ভাষায়মণ্ডিত অপূর্ব ভাবের গানটিতে সুর সংযুক্ত হওয়ায় ঠিক সেই অবস্থা হল। গানটি যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে!

সেদিনকার সান্ধ্য মজলিশে প্রথমেই গাইলাম, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'।

ক্ষিতীশবাবু ত' আত্মহারা! চেয়ার থেকে উঠে পড়ে পা মুড়ে আমার পাশে এসে বসেন আর কি! অপর সকলেও এমন সুন্দর নূতন গান শুনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। অমরবাবু বললেন, "এ গান কোথায় পেলেন? কখনো ত' আপনার মুখে আগে শুনিনি?"

গানটির সকালবেলাকার ইতিহাস প্রকাশ করে বললাম। শুনে সকলে যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন এবং এমন অপরূপ সঙ্গীত-সুরধুনী আমাদের সভায় নিয়ে আসবার কারণ হওয়ার জন্য ক্ষিতীশবাবুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন নিত্যই ঐ গানটি স্বেচ্ছাক্রমেই গাইতাম, কিন্তু পরে এক-আধ দিন বাদ পড়বার উপক্রম হতে লাগল। কিন্তু উপক্রম হলে হবে কি? বাদ পড়বার উপায় ছিল না। ক্ষিতীশবাবু মনে পাড়িয়ে দিতেন, "উপেন-বাবু, সেই গানটা?"

"কোনটা বলুন ত?"

"সেই 'আমি তোমায় যত'?"

"ও! আচ্ছা, গাচ্ছি।"

অনুরোধে খুশি হয়েই গান ধরতাম,—আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।

এইরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটতে লাগল। অবশেষে আমরা লক্ষ্য না করে পারলাম না যে, 'আমি তোমায় যত' গানটির কোনোদিন কোনো প্রকারে বাদ পড়বার উপায় নেই। আমি যদি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া গাই ত' বহুৎ আচ্ছা, অন্যথা ক্ষিতীশবাবু আমাকে গাইতে বাধ্য করেন।

গোপন পরামর্শ অনুযায়ী একটু কৌতুক করবার অভিপ্রায়ে দু-চারখানা গান গেয়ে হার্মোনিয়ামের স্টপগুলো ঠেলে দিয়ে বেলোটা বন্ধ করে হয়ত' বলি, "আজ আর থাক্।"

ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়েই সতীন্দ্রবাবু হয়ত' বলেন, "তবে থাক্।"

কিন্তু ফরাসের উপর 'থাক্' বললে কি হবে? ওদিকে বেতের ইজি চেয়ারে উসখুসুনি আরম্ভ হয়ে গেছে। নড়ে-চড়ে বসার সামান্য একটু শব্দ, অত্যন্ত চাপা গলা খেঁকারির অল্প একটু আওয়াজ, তারপর কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠস্বর, "উপেনবাবু, সেই গানটা?"

ফরাসের উপর উচ্চ হাসির ঝড় বয়ে যায়। ক্ষিতীশবাবু লজ্জিত হন, লজ্জিত মুখে গান শুনে আনন্দ লাভ করেন এবং পরদিন প্রয়োজন হলে লজ্জিত কণ্ঠে "উপেনবাবু, সেই গানটা" বলতে বিরত হন না। ক্রমশ আমাদের সকলের মধ্যে 'আমি তোমায় যত' গানটির নাম দাঁড়িয়ে গেল, 'সেই গানটা'। উল্লেখ করবার প্রয়োজন হলে আমরাও বলতাম, 'সেই গানটা'।

ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গীতে অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত ছিল না; কিন্তু একমাত্র এই গানটির উপরই তাঁর যেন একটা অলৌকিক আকর্ষণ দেখা যেত।

সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিনগুলি অতি-বাহিত হয়ে চলেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন বিপদ দেখা দিলে। সেদিন রবিবার অথবা অন্য কোন ছুটির দিন। সন্ধ্যার সময়ে শুনলাম, টমটম্ ও তৎসহিত ঘোড়া ক্রয় করবার অভিপ্রায়ে ক্ষিতীশবাবু অপরাহ্নকালে নিজে টমটম্ চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, এমন সময়ে ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে বিগড়ে গিয়ে অসামাল হওয়ায় গাড়ি উল্টে পড়ে ক্ষিতীশবাবু আহত হয়েছেন। উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্ষিতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি, ইত্যবসরেই ডাক্তার এসে ক্ষত পরিষ্কৃত করে ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। বেশির ভাগ চোট মস্তকে। ব্যান্ডেজের দ্বারা একটা চোখ প্রায় ঢেকে গিয়েছে। একটা খাড়া চেয়ারে ক্ষিতীশ-চন্দ্র সোজা হয়ে বসে আছেন। মুখে তাঁর সদানন্দভাবের মিষ্ট হাসির খানিকটা অংশ লেগে রয়েছে। বললেন, গ্রহের ফের, এর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই।

দিন দুই প্রায় সমভাবেই কাটল, বিশেষ উদ্বেগের কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। হঠাৎ কিন্তু একদিন সমস্ত মুখবয়ব জুড়ে ভীষণ বিসর্প (Erysipelas) রোগ দেখা দিলে। অমন যে সুশ্রী মুখ, কোথায় যে কি তার হয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না। মুখ ও মাথা চতুর্গুণ ফুলে উঠে তার মধ্যে চক্ষু গেল ডুবে, নাসিকা গেল বুজে। অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল। চিকিৎসা বিষয়ে ভাগলপুরে যা-কিছু হওয়া সম্ভব কিছুই বাকি রইল না। ইংরাজ সিভিল সার্জেন থেকে আরম্ভ করে দু তিনজন খ্যাতনামা বাঙালী ডাক্তার একত্রে মিলিত হয়ে রোগের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে হল। একদিন রাত্রি দশটা আন্দাজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, একদল অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব সকলকে কাঁদিয়ে অকালে অসময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র চলে গেলেন।

আত্মীয়বর্গের দুঃখের ত পরিসীমাই নেই, আমাদের মনও দুঃসহ শোকের ভারে পীড়িত হয়ে উঠল। আমাদের মৈত্র-জগতের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে গিয়ে খানিকটা আলোক হরণ করে নিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশবাবুদের বাড়ি মজঃফরপুরে। দিন দুই পরে তথা হতে তাঁর অগ্রজ সুরেন্দ্র-নাথ সেন এসে উপস্থিত হলেন, শোকাভিভূত আত্মীয়বর্গকে মজঃফরপুরে নিয়ে যাবার জন্য। ইনি আমার পূর্বপরিচিত; মজঃফরপুরে এ'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার কয়েক-বার সুযোগ হয়েছিল।

সুরেনবাবুর সহিত আমরা সকাল-বিকাল মিলিত হই, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে চমকে উঠি! তিনি কথা কন, আমাদের মনে হয় যেন ক্ষিতীশবাবুই কথা কইছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে কণ্ঠস্বরের মিল থাকার মধ্যে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে এত!

ভাগলপুরের পাট তুলে মজঃফরপুরে রওনা হ'তে সুরেনবাবুদের দিন চারেক লাগবে। যেদিন তাঁরা রওনা হবেন তার আগের দিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ সুরেনবাবুকে বললেন, "দেখুন সুরেনবাবু, আপনার মুখ

দেখে, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের কেমন যেন ক্ষিতীশবাবুকে মনে পড়ে। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা যেমন সন্ধ্যাকালে উপেনবাবুর বৈঠকখানায় বসতাম, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে তেমনি যদি বসি, তা'হলে হয়ত আমাদের মনে হবে, কিছুক্ষণের জন্যে যেন ক্ষিতীশবাবুকেই আমরা ফিরে পেলাম।"

অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব শুনে অভিভূত হয়ে সুরেনবাবু বললেন, "আমিও ভারি তৃপ্তি পাব অমরবাবু! ক্ষিতীশ যে আপনাদের কত আপনার ছিল তা জানতে আমার আর বাকি নেই।"

সন্ধ্যাকালে আমরা সুরেনবাবুকে মধ্যে নিয়ে আমার বৈঠকখানার ফরাসের উপর মিলিত হলাম। সুরেনবাবু ব্যতীত আমরা সেদিন ছিলাম, যতটা মনে পড়ছে, জন আষ্টেক বন্ধু। সুরেনবাবু আমাদের সঙ্গে ফরাসেই বসেছিলেন; ঘরের কোণে বেতের চেয়ারটা খালি পড়েছিল, যেমন সেটা খালি পড়ে থাকত ক্ষিতীশবাবুর অপেক্ষায়, যেদিন তিনি আসতেন না, অথবা আসতে বিলম্ব করতেন।

চায়ের পালা শেষ হলে গল্পের গতি হল ত্বরিত। বলা বাহুল্য, যা-কিছু গল্প সেদিন হচ্ছিল, সবই ক্ষিতীশবাবুকে কেন্দ্র করে। আমরাও কিছু-কিছু বলছিলাম, সুরেনবাবুও অনেক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সদ্যোভূত বিচ্ছেদ ও শোকের একটা ফিকা চেতনার আবহাওয়ায় সমস্ত ঘরটা যেন চকিত হয়ে উঠেছে!

ঘণ্টা খানেক কথোপকথনের পর সহসা অমরেন্দ্রনাথ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন; বললেন, "কি জানি কেন, বোধহয় সুরেনবাবুর উপস্থিতির জন্যেই, আজকের এই সভার অধিবেশনের সময় নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা গোলমাল ঠেকতে আরম্ভ করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন এমন কোন একদিনের সভা যখন ক্ষিতীশবাবুর টাইফয়েড-দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি। এই বিভ্রান্তি, যা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু আনন্দ দিচ্ছে, বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায় যদি উপেনবাবু ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা' গান।"

সুরেনবাবু সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। মজঃফরপুরে তাঁর সহিত আমার পরিচয়ের প্রধান কারণ ছিল সঙ্গীত ও গান-বাজনার চর্চা। গানের কথায়, বিশেষতঃ ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা'র কথায়, তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন। ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা' কি ব্যাপার, দু-চার কথায় অমরবাবুর নিকট হতে অবগত হয়ে নিয়ে সেই গানটি গাইবার জন্য তিনি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। আমাদের দলেরও সকলে বিশেষ আগ্রহ গানটি আমি গাই। অমরেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে হার্মোনিয়ম এসে পড়ল আমার সম্মুখে। অগত্যা গান ধরলাম,—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—'

চেয়ে দেখলাম অমরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজেছেন। ওটা ও'র চিরকালের অভ্যাস। গান আরম্ভ হওয়ামাত্র চোখ বুজে অতি মৃদু-ভাবে দোল খান,—গান শেষ হলে চোখ খোলেন। গানের এমন নিষ্ঠাবান শ্রোতা গায়কের ভাগ্যে কদাচিৎ মেলে। অপরে গানের বিঘ্ন ঘটালে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ত হনই; গানের সময়ে গায়ককে বাহবা দিয়েও তিনি গানের রসভঙ্গ করেন না। সামনে বসে অমরবাবু চোখ বুজে দোল খাচ্ছেন দেখলে আমি গান গাইতে উৎসাহ লাভ করি।

গানের আস্থায়ী অন্তরা শেষ করে সঞ্চারী ধরেছি,

তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে!

এমন সময়ে অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "উ-উ-পেন বা-আ-বু!"

আমি উত্তর দিলাম, "হুঁ!"—অর্থাৎ, আমিও দেখেছি! দেখেছি, ঘরের নৈঋত কোণে রক্ষিত বেতের ইজি-চেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র, —এক লহমার জন্য অবশ্য,—কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্যবোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি,—একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটল (solid) ক্ষিতীশচন্দ্র,—ছায়া নয়, মায়া নয়,—ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়। তেমনি আগেকার মতো পায়ের উপর পা দিয়ে ডান হাতের তাড়ুটি উপর পায়ের উপর রেখে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদু-মৃদু হাসছেন। 'সশরীরে প্রকাশ' বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহ'লে একান্ত-ভাবে তাই।

ওদিকে ফরাসের উপর আড় হ'য়ে পড়ে মতিবাবু হাত-পা খেঁচাতে আরম্ভ করেছেন আতঙ্কে নয়, আবেগে। প্রেমসুন্দরবাবু, (একদা শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ প্রেমসুন্দর বসু) গম্ভীর-মুখে বসে ঘটনার অলৌকিকতায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছেন। মৃদুকণ্ঠে অমরবাবু ঘটনার বিষয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাদের দলের মধ্যে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এক সময়ে এক সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখেছিলেন; দেখেননি শুধু সুরেনবাবু। যাঁরা দেখেছিলেন, সকলের নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না;—অমরেন্দ্র-বাবুর হয়ত মনে থাকতে পারে।

এ বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা একটু বিচিত্র। নিমীলিত-নেত্রেই তিনি ঘরের মধ্যে কোনো অলৌকিক পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করেন। তখন চোখ খুলে চেয়ারের উপর দেখতে পান ক্ষিতীশবাবুকে। আমাদের মুখে এ ঘটনা শুনে যাঁরা প্রতিবাদ করেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বেতের চেয়ারের উপর ক্ষিতীশবাবু আবির্ভূত হননি, হয়েছিলেন আমাদের মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রবণতার উপর; কেহ বলেন, আমাদের এই অভিজ্ঞতাটি mass hypnotism-এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; আরও অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব কথা, এসব যুক্তি-তর্ক আমরাও ত জানি। আমরাও ত এসব বলতে পারি, কিন্তু তারপরও যে মনের মধ্যে খানিকটা সংশয় থেকে যায়! আলোচ্য ঘটনাটিকে যখন একান্তভাবে মনে মনে বিশ্বাস করতে যাই, তখন সংশয় এসে তার উপর ছায়াপাত করে। আবার যখন অবিশ্বাস করতে চাই, তখন মনে হয়, তা হ'লে উপড়ে ফেলে দাও সে দুটো নিরর্থক চক্ষু, যারা ছায়াকে কায়া দেখতে এত ওস্তাদ!

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। আলোচ্য ঘটনার পর, দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঐ ঘরে একা বসে লেখাপড়া করেছি। কেবলমাত্র বাড়ি ঘুমন্ত নয়, সারা পল্লী তখন ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারের দিকে চেয়ে দেখেছি, রোমাঞ্চও হয়ত এক-আধবার হয়েছে, কিন্তু কোনো দিন কিছু আর দেখিনি। একদিন মৃদুস্বরে 'সেই গানটা'ও গেয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনও নয়।

(ক্রমশ)

অনুবাদ সাহিত্য

জাগিন্‌স্‌-এর গল্প

স্টীফেন লিকক্‌

জাগিন্‌স্‌-এর সঙ্গে আমার আজকের আলাপ নয়, সে প্রায় বহুদিনের কথা। তখন আমাদের ছোকরা বয়েস, কলেজের ছুটিতে দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাঁবু ফেলছি এখানে সেখানে। আমাদেরই মধ্যে কে একজন যেন গাছে পেরেক ঠুকছিল; উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, একটা তক্তা ঝুলিয়ে তাক্‌ বানানো হবে। জাগিন্‌স্‌ তাকে সাহায্য করতে দৌড়ে এল। এসে বল্‌লো, 'দাঁড়াও বাপু, এ-তক্তায় হবে না, বড্ডো বেশী লম্বা। তাক্‌ যদি বানাতেই চাও তো কিছুটা এর ছেঁটে ফেলতে হবে। তার জন্যে একটা করাত চাই।' বলে সে করাত খুঁজতে গেল। আর তা পাওয়াও গেল একটু বাদে। তখন আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। দুবার করাত টেনেই জাগিন্‌স্‌ বল্‌লো, 'বড্ডোই ভোঁতা হয়ে গেছে দেখছি, একটুখানি ধার দিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে একটা উকো চাই।' উকো যদিবা পাওয়া গেল, তখন দেখি তার হাতল নেই। কি দিয়ে এখন হাতল বানানো যায়? কাঠ দরকার এক টুকুরো। গাছ থেকে তা কেটে নিতে হবে। তার জন্যে আবার কুড়ুলটাতে শান দিতে হয়। শান দেবার একটা যন্তর যে আমাদের কাছে না ছিল তা নয়, তবে তার পায়া নেই। জাগিন্‌স্‌ বল্‌লো, 'কুছ্‌ পরোয়া নেহি, এক্ষুনি আমি পায়া বানিয়ে নিচ্ছি।' কার্যকালে দেখা গেল, পায়া বানাতে হলে ছুতোরদের মতন লম্বা একটা বেঞ্চি দরকার। বেঞ্চি বানাবার জন্যে আবার হরেক রকমের সব যন্তরপাতি প্রয়োজন। তার জন্যে আবার গ্রামে যেতে হয়। কি আর করা যায়, গ্রামের দিকেই রওনা হয়ে গেল জাগিন্‌স্‌। বলাই বাহুল্য গ্রাম থেকে সে আর ফিরে আসেনি।

সপ্তাহ কয়েক বাদে শহরে ফিরে তার সঙ্গে দেখা হলো। দেখি সে পাইকিরী দরে যন্তরপাতি কিনবার তালে আছে।

এর পরে তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব জমে গেল। আমরা আবার একই কলেজে পড়তাম। তবে তার পড়াশুনো তেমন এগোয়নি। বেচারা বেশ উৎসাহভরেই কলেজজীবন শুরু করে-ছিল, হঠাৎ যেন কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে গেল। জাগিন্‌স্‌ তখন 'ফ্রেঞ্চ' ক্লাসে যাচ্ছে। দু-একদিন গিয়েই দেখলো ফরাসী ভাষাটা যদি ঠিকমতো শিখতে হয় তো মূল-ফরাসীটাও শেখা দরকার। তার জন্যে দরকার ল্যাটিন পড়া। ল্যাটিন শিখতে হলে সংস্কৃতটাও শিখতে হয়। জাগিন্‌স্‌ তখন সংস্কৃত নিয়ে মেতে উঠ্‌লো কিন্তু সেও মাত্তর দিন কয়েকের জন্যে। প্রাচীন ফার্সী না শিখে কি সংস্কৃত শেখা যায়? কে শেখাবে প্রাচীন ফার্সী? শেখা আর হলো না।

পথ বদলালো জাগিন্‌স্‌। পদার্থ বিদ্যা পড়তে শুরু করলো। বেশ এগোচ্ছিলও। কিন্তু সেই যে তার সর্বনেশে নেশা, এখনো তার জের কাটেনি। যা কিছুই করোনা কেন, খুঁজে দেখতে হবে তার মূল কোথায়। বিদ্যুৎবেগে সে পিছু হট্‌তে শুরু করলো। অণু, অণু থেকে পরমাণু, পরমাণু থেকে ইলেকট্রন—আরো, আরো পিছনে যেতে হবে। অসীম শূন্যতায় গিয়ে পৌঁছুলো জাগিন্‌স্‌। তখনো তার অন্বেষণের অবসান হয়নি।

জাগিন্‌স্‌-এর কপালে, অতএব, ডিগ্রী জুট্‌লো না। আর ডিগ্রীই যদি না জুটলো তো বিদ্যে নিয়ে কি ধুয়ে খাবে। তা সে যাই হোক্‌, জাগিন্‌স্‌-এর তাতে কিছু আসে যায় না। বড়লোকের ছেলে, লাখখানেক ডলারের মালিক। তাই নিয়ে সে ব্যবসায় নেমে পড়লো। গ্যাস-এর কারখানা খুললো একটা, একলাখ ডলার তার মূলধন। কিন্তু কয়লা তখন অগ্নি-মূল্য, ফলে ব্যবসাতে সে মার খেল। নব্বুই হাজার ডলারে কারখানা বিক্রী করলো জাগিন্‌স্‌, অতঃপর কয়লাখনির শেয়ার কিনলো তাই দিয়ে। ওদিকে কয়লাখনি-গুলোর তখন টালমাটাল অবস্থা, মেসিনারী পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। আশী হাজার ডলারে সে তখন শেয়ারগুলো সব বেচে ফেললো একে একে, সেই টাকায় মেসিনারী তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলো। এবারে তার লাভ হতো নিশ্চয়ই, তবে কিনা সেখানেও আর এক ফ্যাসাদ। গ্যাসের তখন এত দাম যে, কার-খানা চালানো এক কঠিন সমস্যা। কি করা যায়, কী করা যায়! একটার পর একটায় হাত দিতে লাগলো জাগিন্‌স্‌, একটার পর একটায় সে মার খেতে লাগলো। প্রত্যেক বছরেই সে টাকা লোকসান দিচ্ছে; চড়া বাজারে তার মাত্রা আরো বেশী।

পারিবারিক জীবনে কিন্তু তার অশান্তি ঘটেনি কখনো। বিয়ে করেনি জাগিন্‌স্‌, তবে প্রেমে পড়েছে বার কয়েক। সে প্রেম মা ফলেষু।' তার প্রথম প্রেমের গল্প শুনুন; আমি তখন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মেয়েটিকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখেছিল জাগিন্‌স্‌, তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে গেল। বল্‌লো, 'এ মেয়েকে আমার বিয়ে করতে হবে।'

আমি বললাম, 'উত্তম প্রস্তাব। কখন বিয়ে করতে চাও? এক্ষুণি?'

জাগিন্‌স্‌ বল্‌লো, 'না। আগে ওর যোগ্য হই।'

অবিলম্বে সে যোগ্যতা অর্জনের সাধনায় নিমগ্ন হলো কোন পথে সে যোগ্যতা অর্জন করবে? ধর্মের পথটাই প্রশস্ত। দিনকতক খুব ধর্মালোচনায় মত্ত দেখলাম ওকে; তারপর হঠাৎ একদিন তার উপলব্ধি হলো, ধর্মালোচনায় পারদর্শী হতে হলে প্যালেস্টাইনের ইতিহাস পড়তে হয়। ইহুদীদের ইতিহাসেই যদি তার দখল না জন্মালো, কী করে তাহলে সে বিয়ে করবে? ব্যাপার বুঝুন। পুরো দু-বছর পড়া-শুনো চালালো জাগিন্‌স্‌, তারপর তার মনে হলো—হ্যাঁ, এইবারে হয়তো বিয়ে করা যায়। মেয়েটি ইতিমধ্যে আর এক ছোকরাকে বিয়ে করে দিব্যি ঘর-গেরস্তালী পেতেছে। জুতোর দোকানে কাজ করে ছোকরা, প্যালেস্টাইনের ইতিবৃত্ত তো দূরের কথা, মোজেস্‌ যে কে—তা পর্যন্ত জানে না।

যা হয়, আবার প্রেমে পড়্‌লো জাগিন্‌স্‌। প্যালেস্টাইনের ইতিহাস মুখস্ত করেছে, বিয়ে না করে এখন উপায় কি তার?

মেয়েটির নাম মিস্‌ থর্নক্রফ্‌ট্‌। আরো পাঁচটি বোন আছে তার। গরীব বটে, তবে খুব চালাক। গুণপনাও আছে শুনলাম, নিজের হ্যাট নাকি নিজেই বানাতে পারে। এবারেও সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম। তবে এবারে আর জাগিন্‌স্‌ বৃথা কালক্ষেপ করলো না। মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে তার মেজো বোনের সঙ্গে দেখা। তার চেহারা আরো সুন্দর, আর সে তার দিদির থেকেও গরীব বোধ হয়। এ আবার যে শুধু হ্যাট্‌ই বানায় তা নয়, নিজেই নিজের ব্লাউজ বানিয়ে নেয়। বড়কে ছেড়ে জাগিন্‌স্‌ তখন মেজোর প্রেমে পড়লো। কিছুদিন বাদে আবার সে একদিন তাদের বাড়ী গেছে, সেজো বোন এসে দরজা খুলে দিল। এ আবার হ্যাট্‌ আর ব্লাউসেই

ক্ষান্ত দেয়নি, জামাকাপড় স্কার্ট গাউন সব-কিছুই সে নিজের হাতে বানাতে শিখেছে। পরিণামে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। একের পর এক সব কটি বোনেরই প্রেমে পড়লো জ্যাগিন্‌স্, কাউকেই আর তার বিয়ে করা হলো না।

ভালোই হলো। বিয়ে যে করবে, খাওয়াবে কি। বছরের পর বছর ক্রমেই সে গরীব হয়ে পড়ছে। শেষ শেয়ারটি বিক্রী করে দিয়ে সে একটি ইনসিওরেন্সের পলিসি কিনলো অবশেষে। সেও আবার এক মজার পলিসি। সব টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। এবছরে যা-টাকা পাবে, পরের বছর তার থেকে কম পাবে, তারপরের বছর আরো কম, তার-পরের বছর আবার আরো কম। তার মানে, বেশীদিন যদি বাঁচে, টাকার অঙ্ক তাহলে শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে। না খেয়েই মরতে হবে তখন।

ইতিমধ্যে তার বয়েস বেড়েছে, দৃষ্টি আচ্ছন্ন। খাটো খাটো জামাকাপড় পরে, মনে হয় একটা বাচ্চা ছেলে যেন বুড়ো মানুষের ছদ্মবেশ পরে ঘুরছে। সেই শিশুরই মতন হাবভাব, কপালে কিছু রেখা পড়েছে শুধু।

আর কথাবার্তা যা বলে তাও সেই অতীত জীবনেরই জের টেনে। যেমন ধরুন:—

—'ট্রেনে একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল।'

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, 'কবেকার কথা বলছো জ্যাগিন্‌স্?' অমনি সে তার ভুরু কুঁচকে চিন্তা করবে খানিকক্ষণ। তারপর বলবে, '১৮৭৫ সালে। না কি ১৮৭৬ সালে? ঠিক মনে পড়ছে না বাপু, ১৮৭৫ সালেই বোধ হয়।'

ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে জ্যাগিন্‌স্। আগে সে তার যৌবন বয়সের গল্প বলতো, এখন আবার আরো পিছনে চলে গিয়েছে।

সেদিন সে নেড্ হার্পার আর জো হার্পারদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের গল্প কর-ছিলো। নেডের গায়ে নাকি ছিল অসুরের মতন জোর। নেডের তখন বয়েস কত জিজ্ঞেস করে-ছিলাম। জ্যাগিন্‌স্ বল্‌লো, 'তিন বছর।' জো হার্পারের অবশ্য শক্তি ছিল না, তবে হ্যাঁ—বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তার বয়েসের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম। জ্যাগিন্‌স্ বল্‌লো, 'তা প্রায় বছর দেড়েক হবে।'

বুঝলাম, বাল্যকাল থেকে জ্যাগিন্‌স্ এখন তার শৈশবে গিয়ে পৌঁচেছে। সেই সর্বনেশে নেশা, মূলে যেতে হবে। শৈশব থেকে সে আরো পেছনে যাবে। শৈশবের থেকেও পেছনে? সে কোথায়? মৃত্যুর মুহূর্তে? না-কি জন্মের? ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

সে যাই হোক্, আশ্চর্য লোক জ্যাগিন্‌স্। অমন লোক আর দুটি দেখলাম না।

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার উপন্যাস

শ্রীপরিমল দত্ত

শুভকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধব আর পারিবারিক মহলে আমার সম্ভাব্য উপন্যাস লেখার জবর খবর বেশ প্রাচীন, প্রায় বনেদি বললেই চলে। আমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রৌদ্রপক্ক মধুর আপেলের মতো রসালো ইংরেজিতে বছর ছয়েক আগে লিখেছিলেন: 'বন্ধু তোমার উপন্যাসের কত দূর? আড্ডা না দিয়ে রোজ পাতা চারেক করে লিখলেও, বছর খানেকের মধ্যে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারবে। কুঁড়েমি করো না, লক্ষ্মীটি লিখে ফেল—সত্যি লিখে ফেল। সে উপন্যাসে মানুষ বিফলতা যেন জয় করে, রামধনু আঁকা অনন্ত আশায় যেন বিশ্বাস রাখে, ভালবাসে, দুঃখ পায়, আবার দুঃখ যেন জয়ও করে।' উপন্যাসে হাত দিয়ে এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে মোটে দশ পাতা লিখেছি। একটি ছেলে নিকট পশ্চিমের কোনো ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছে। এরপর আমার উপ-ন্যাসের খাতায় আঁচড় কাটিনি, কাজেই আমার নায়কের কপালও শাদা সেখানেও কোনো আঁচড় পড়েনি। তার অদৃষ্ট আমার কাছে আজ পর্যন্ত অদৃষ্ট রইলেও, একমাত্র ভরসা সে পুরুষ মানুষ, আমার মত খোদ ঈশ্বরও তার ভাগ্য দেখে দিতে অক্ষম। যখন উপন্যাস লেখায় হাত দিইনি, তখন উপন্যাস পড়েছি প্রচুর কিন্তু উপন্যাস-শিল্প সম্পর্কে ভাবিনি মোটেই। আজকাল ঠিক তার উল্টোটি দেখা দিয়েছে—উপন্যাস পড়া গেছে কমে, তবে উপন্যাসের ইতিহাস, ঔপন্যাসিকের জীবনী আমার নখাগ্রে। কেবল নামই শিখিয়ে নন, আনকোরা নতুন ঔপন্যাসিকদের প্রথম উপন্যাসের সমালোচনা, তাঁদের জীবনদর্শন, আত্মজীবনীর মোটা ও মিহি আখ্যায়িকাগুলির মূলসূত্র কণ্ঠস্থ করে রেখেছি। এন্টনী ট্রোলোপ তাঁর জীবননামায় খোলাখুলিভাবে কবুল করেছেন, উপন্যাস লেখা নাকি জলের মতো সোজা। ভোরবেলা এক পেয়ালা কফি হলেই হল, তারপর কোমর বেঁধে, শক্ত হয়ে, চেয়ারে বসতে হবে, লেখা সেটা গৌণ জিনিস, লিখলেই লেখা যায়, লেখা হয়। তিনি আরো প্রাঞ্জল করে বলেছেন, প্রবন্ধ লিখতে হলে বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার, উপন্যাসে সে বালাই নেই। কিম্বা আল্ডুস হক্সলীর উপদেশ শিরোধার্য করব? কালি কলম কাগজ ত আছেই—একজোড়া বেড়াল পুষলেই হল; তারপর সাইকোলজিক্যাল নভেল ও নভেল লেখার কৌশল আপনিই আয়ত্ত হবে। কিম্বা সোমারসেট মমের মতো জিখিয়ের নোটবুক কি রাখব? বহু মেয়ে মাতৃবিদ্যা না জেনেও মা হন, আর উপন্যাসকলা সম্পর্কে যিনি বই লিখতে পারেন, উপন্যাস লেখা প্রায়ই তাঁর সাধ্যের বাইরে। উপযুক্ত বয়সে কোনো ভদ্র-মহিলার সন্তান না হলে মুষড়ে পড়ার ঘটনা সংসারে বিরল নয়। সহযোগিনীরা তার দুঃখে অকৃত্রিম সমবেদনা জানায়, উপদেশ দেয়। পুত্র-কামনায় কখনো সে ঠাকুরের দোর ধরে, মানৎ করে, ষষ্ঠীতলার বুড়ো বটগাছে ঢেলা বাঁধে, তাগামাদুলি পরে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ঔপ-ন্যাসিক যশপ্রার্থী পুরুষ মানুষের মানস সন্তান না জন্মালে যে কী অপরিমেয় অনি-র্বচনীয় দুঃখ হয়, না-ঔপন্যাসিক মূঢ় পুরুষ-মানুষে কেমন করে বুঝবে? নতুন ঔপন্যাসিকের প্রথম লেখা উপন্যাস দেখলে একাধারে বাৎসল্য আর সন্তাকাঙ্ক্ষী ঈর্ষার চোখে তাকাই, ভাবি বিধাতা তুমি এত কৃপণ কেন, ওরা ত আমার কলমেও জন্মাতে পারত?

প্রবাদে বলে, অতি বড়ো রূপসীর বর জোটে না, অতি বড়ো ঘরণী ঘর পায় না। সবিনয়ে নিবেদন করি, আমার মধ্যে অতি-বড়ত্ব কিছুই নেই, তবুও ঔপন্যাসিক হবার দুর্মর বাসনাটা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। স্থানীয় বন্ধুবান্ধব মহলে টোকা মেরে দেখেছি, ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী হওয়া ছাড়া ঔপন্যাসিক হওয়ার অভিলাষ কারুর নেই। আর তাঁদের মধ্যে দু-চারজন উপন্যাস শুরু করে, শেষ অবধি পড়ার ধৈর্য রাখেন। আর দলের সাড়ে পনেরো আনাই সে কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি নন। কাজেই তাঁদের কাছে আমার অজাত উপন্যাসের সম্ভাব্য জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করতে বুক ফাটলেও, মুখ ফোটে না।

ঊনিশ শতকের বাঙ্গালী সাহিত্যিক তাঁদের নাটক, উপন্যাস বা কাব্যের নাম নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামাতেন না। কোদালকে তাঁরা কোদালই বলতেন, সেটাকে খনিত্র বলে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেননি। নীলদর্পণ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কুরুক্ষেত্র—বইয়ের নামেতেই প্রকাশ, দুই মলাটের মধ্যে কী আছে। বাড়ির নাম, বাড়ির খোকা-খুকুর নাম রাখার মতো উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে আমি রুচিবাগীশ। বুদ্ধদেব বসুর বহু বইয়ের

নাম রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি থেকে নেওয়া, যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানি, রডড্রেনডনগুচ্ছ, সবপেয়েছির দেশ। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত হক্সলীকে কেউ টেক্কা দিতে পারেননি। তাঁর খুব কম উপন্যাস বা ছোটো গল্পের বই আছে যার নাম কোনো পূর্বাচার্যের কবিতার চরণ থেকে সংগৃহীত নয়। আমি কোটেশন থেকে নাম নেওয়ার পক্ষপাতী, তবে তা দূরকালের প্রাচীন কাব্যের পুষ্পবাটিকা থেকে চয়ন করতে চাই,—যে পথ বহু লোকের পথচলায় গরম হয়ে উঠেনি, যেখানে কম লোকের ভীড়। নাম দিতে পারি—'মেলানি'। 'চির জনমের তরে ছিরা মাগিল। মেলানি।' (আমি হলুম কোটেশন-কানা, কিন্তু কোটেশনে কান আছে; ভুলচুক থাকলে ঠিক করে নেবেন।) কথাটি আধুনিক বাঙলায় অপ্রচলিত হলেও শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে কী মিষ্টি, কত মধুর। 'দিল্লী অনেক দূর'—হনোজ দেহলী দূর-অস্ত্;—নামটা মোটের উপর পছন্দসই, ও-নামও বহাল রাখতে পারি। যে ভদ্রমহিলাকে উৎসর্গ করব, তিনিও একপায়ে খাড়া, প্রায়ই তাগিদ আসছে, পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে পৌঁছুতে কত দেরি? অনেক কথা বলা দীর্ঘ উৎসর্গপত্র আমার একান্ত অপছন্দের। কথার মিতব্যয়িতা না হলে, উৎসর্গলিপির সমস্তটাই অর্থহীন প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনী পরলোকগতা পত্নীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন, অল্প ও অপূর্ব কথায়ঃ 'কমলাকে যে আর নেই।' মনে করুন, আচার্য জগদীশচন্দ্রকে, রবীন্দ্রনাথের একখানি নামকরা কবিতার বইয়ের উৎসর্গলিপিঃ

'সত্যরত্ন দিলে তুমি, পরিবর্তে তার
কথা ও কাহিনী মাত্র দিনু উপহার।'

লোকে হয়ত ভাল উপহারই দেয়, কিন্তু উপহারবাণী ভাল হতে খুব কমই দেখা যায়। যেমন দেখা যায় না—স্টাইলিস্ট আর স্টাইলিশ্-এর মর্তকায়ায় মিলন। লোকে বলে ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না। সত্যি কথা বলতে কি চাবুকের অভাবে আমার কল্পনার পক্ষীরাজ, ফেনায়িত সুনীল শূন্যতার পরীস্থান উজাড় করে নেমে আসচে না। উপন্যাসের নাম এখনও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়নি, কাজেই উপন্যাসের আবির্ভাব অসম্ভব। রোজ সকালে দাড়ি কামাতে কামাতে আয়নার দিকে চেয়ে আমার অধ্যাত্ম চিন্তা পাক খেয়ে উঠে। মনকে প্রশ্ন করি সত্যিই কি আমার দ্বারা উপন্যাস লেখা কোনো দিন হবে? এমন উপন্যাস সত্যিই একদিন আমি কি লিখব যা গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

তৃতীয় জর্জের জননী তাঁর সন্তানকে একটিমাত্র বাণী দিয়েছেনঃ 'জর্জ তুমি রাজা হও'। আমার উৎসর্গীতব্য অসম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ আর গোপনচারিণী ভদ্রমহিলাটি মাদ্রাজে বিন্ধ্যগিরির পারে, কিম্বা বিদেশে পাটনাতে যেখানেই থাকুন সেকথা জেনে আপনাদের লাভ নেই তবে এইটুকু জেনে রাখুন—তৃতীয় জর্জের জননী তাঁর কাছে হার মেনে যান। তিনি আমায় কেবল ঔপন্যাসিক নয়, উপন্যাস-সম্রাট হতে বলেন। 'আপনার উপন্যাসের কতদূর? "দিল্লী অনেক দূর" কি চিরদিন দূরে রইবে?'—এ হল তাঁর সব চিঠির ধুয়া। পাওনাদারের ফেউয়ের মতো নিশীথের দুঃস্বপ্নের মতো—তাঁর তাগাদা আমার মর্মে এসে ঘা দিচ্ছে। তাঁকে এ কথা বলতে গভীর লজ্জাবোধ করছি যে, বহুদিন ধরে আমার শুরু করা উপন্যাসের পাতায় নতুন একটি পংক্তিও যোগ করিনি। তিনি আমার একটি মহৎ উপকার করেছেন। আজকাল ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে জগৎসংসার দেখতে শুরু করেছি।

কারুর মুখ সুন্দর, কেউ বা কুৎসিত, কেউ চালাক, কেউ বোকা, বজ্জাত, খোসমেজাজী, খোসপোষাকী কেউবা 'ল্যাজে-গোবরে' হয়ে পেন্সীর মত ঘুরে বেড়ায়—এরা সকলেই আমার অলিখিত উপন্যাসের মক্কেল। মানুষকে আজকাল নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছি। কারুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে উন্মনা হয়ে ভাবি, আমার উপন্যাসের ক্যানভাসে পাকড়াও করলে কেমন হয়? বন্ধু যাদুগোপাল কাঞ্জিলালের উচ্চারিত উৎকেন্দ্রিকতা বন্ধু মহলেই সীমাবদ্ধ—তার ধর্মপত্নীর চোখে ও দপ্তরের ফাইলে তার চরিত্র বোধকরি নির্মল এবং প্রতিশ্রুতিময়; কিন্তু তাকে কজন লোকেই বা চেনে? ডিকেন্সের আবিষ্কার পিক উইক-এর মতো, এই মজার মানুষ কাঞ্জিলালটিকে বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধিকালের মধ্যে, কিছু অদলবদল করে দম দিয়ে ছেড়ে দিলে, চিরদিনের জন্য সে সাহিত্যের বাঁধা গ্যালারীতে উন্নীত হবে—এ বিশ্বাস আমি রাখি। কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় অপূর্ব রসোত্তীর্ণ উপন্যাস লিখে রাতারাতি সফল হওয়া যায় না, সেজন্য রীতিমতো প্রস্তুত হতে হয়। লেখক মুদিগিরি করতে পারে, হাকিম হতে পারে, কয়লাখনির মজুর হতে পারে, বাঁধিগৎ দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত আজিবীকা পালন করে চলতে পারে কিন্তু তার অবাঙ্মানসগোচরে গল্পের প্লট প্রকাশের জন্য আপনি আকুলিবিকুলি করবে। সত্যিই কারুর যদি বলার মতো কথা থাকে, তাকে লিখতে হবেই। সে কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। কবিগুরু সাধারণভাবে কবিদের (লেখক সম্প্রদায় তার থেকে নিশ্চয় বাদ পড়েন না।) ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব, কবি তেমন নয়গো'। মোদ্দা কথা কবিরা চাঁদের দিকে চোখ তুলে, নদীর কূলে বসে থাকে না—আর গভীর দীর্ঘশ্বাসের কথা রীতিমতো হাসিমুখেই লিখতে পারে। লিখিয়ে ডেস্কে বসে কলম হাতে নিয়ে কাগজের ওপর যখন লেখে সেই অবস্থায় লেখা কেবল লেখা নয়, সে ঘুমে জাগরণে নিজের অজ্ঞাতসারে লিখেই চলেছে। সে হাজারও মানুষের সঙ্গে মিশবে, হাজার ক্লাসিক্সের বই পড়বে, অভিজ্ঞতা সমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ নিয়ে আসবে জীবনে—নয়ত লিখিয়ে সে হবে কি দিয়ে কি করে। আসলে দেখবার মতো চোখ, নেবার মতো গ্রহিষ্ণু মন, লেখার হাত না থাকলে ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না। মেজে ঘষে রূপ, বেঁধে ধরে পীরিতি হয় না,—ঘটে কিছু না থাকলে, কেবল লেখার ইস্কুলের অগ্নিপরীক্ষা আর পরিপাটির মধ্যে দিয়ে পাকা লিখিয়ের আবির্ভাব ঘটে না। সবচেয়ে বড়ো কথা জীবনকে ভালবাসতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে, তার ভালবাসায়, ঘৃণায়, সফলতায়, বিফলতায়, ক্ষমায়, ব্যথায়—আর মায় ঐৎকেন্দ্রিকতায়ও। সমস্ত কুঁড়েমি বিসর্জন দিয়ে, বই পড়া, আড্ডা দেওয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রেখে, সত্যিই একদিন আমি কি লিখব সেই উপন্যাস গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি?



জড়বুদ্ধিতা

রমেশ দাশ

অবতরণিকা:

মানুষের মধ্যে চিরকাল বুদ্ধির প্রভেদ লক্ষিত হয়। সকল মানুষের বুদ্ধি সমান না হলেও অধিকাংশ মানুষ স্বাভাবিকবুদ্ধিসম্পন্ন। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান প্রতিভাবান মানুষের যেমন অভাব নাই সেইরূপ এমন মানুষেরও অভাব নাই যাদের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অপেক্ষা অল্প। এই পরোক্ত মানুষগুলি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি হতে বঞ্চিত। এদের জড়বুদ্ধি (Feebleminded) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেদিন থেকে পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাব ঘটেছে সেদিন থেকেই জড়বুদ্ধির সাক্ষাৎ মিলেছে। জড়বুদ্ধি মানুষের প্রাচীনতা স্বীকৃত হলেও বহুদিন ধরে উন্মাদদের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য উপলব্ধ হয় নাই। সম্প্রতি অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন জড়বুদ্ধি এবং উন্মাদের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। জড়বুদ্ধিরা উন্মাদ নয়। তাদের বুদ্ধিশক্তির অভাব। বুদ্ধির অভাবে তাদের মানসিক বৃত্তিগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না।

ইতিকথা:

খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হবার পূর্বে জড়বুদ্ধি এবং উন্মাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। যীশুখৃষ্ট যখন পৃথিবীকে প্রেমের বাণী শোনালেন তখন এই হতভাগ্য মানুষগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হলো। গীর্জার পাদ্রীরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলেন। কিন্তু শীঘ্রই এদের প্রতি সাধারণের মনোভাব পুনরায় বিরূপ হয়ে উঠলো। খৃষ্টধর্মের মধ্যে দুটি বিরোধী দলের উৎপত্তি হলো। Roman Catholic বা রক্ষণশীলেরা প্রাচীন ধর্মমত এবং আচার আচরণ ও সংস্কারকে নির্বিচারে মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু Protestant বা বিদ্রোহীদল প্রাচীন আচার আচরণ ও সংস্কারের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এঁরা ঘোষণা করলেন প্রত্যেক মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী হতে হবে। কেহ মন্দ কাজ করলে শাস্তি পাবে এবং ভালো কাজ করলে পুরস্কৃত হবে। উন্মাদ এবং জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতো। Protestantদের প্ররোচনায় এদের ওপর শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো। এদের ওপর এই সময় এমন নিপীড়ন শুরু হলো যে বিজ্ঞানীরা এই সময়টাকে 'বেত্র ও শৃঙ্খলের যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। এই যুগের অবসান ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময় জড়বুদ্ধি এবং উন্মাদদের মধ্যে বিভেদ আবিষ্কৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টায় এদের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। ফ্রান্সের অন্তর্গত এভিরন নামক স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে কয়েকজন শিকারী একটি বন্য মানবশিশুকে আবিষ্কার করেন। এই শিশুটি 'এভিরনের বন্য শিশু' নামে অভিহিত হয়েছে। এই শিশুটির হাবভাব দেখে বোঝা গেলো সে জড়বুদ্ধি। এই জড়বুদ্ধি শিশুটিরই ওপর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্যারীতে শিশুটিকে নিয়ে আসবার পর তার শিক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হলো। Pinel প্রমুখ একদল বৈজ্ঞানিক বললেন, শিশুটি জড়বুদ্ধি অর্থাৎ তার বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত স্থূল। তার পক্ষে কোনরূপ শিক্ষালাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু de Condillac-এর দল এই মতের প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের ধারণা শিশুটির বুদ্ধিশক্তি স্বাভাবিক মানুষেরই মতো কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার বুদ্ধিশক্তির বিকাশ সম্ভব হয় নাই। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে। Itard সাহেব এই শিশুটির শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। সযত্নে তাকে পশুর স্তর হতে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে প্রয়াস পেলেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ প্রয়াস ব্যর্থ হলো। তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন শিশুটি প্রকৃতই জড়বুদ্ধি। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন স্বাভাবিক এবং জড়বুদ্ধি মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান তা পূরণ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি সকল চেষ্টা ত্যাগ করলেন। Itard কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফলকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নাই। তাঁর জনৈক ছাত্র Seguin লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর গুরুর প্রয়াস যথেষ্ট ফলবতী হয়েছে। Itard যখন জড়বুদ্ধি শিশুটিকে শিক্ষাদান হতে বিরত হলেন তখন Seguin সেই গুরুদায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন এবং পরিশেষে কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য করলেন যে, জড়বুদ্ধিকেও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এই ঘটনার পর পৃথিবীর নানাস্থানে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষাদানের জন্য বিবিধ শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হলো। পেন্সিলভ্যানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে Witman-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

জড়বুদ্ধিতার কারণ:

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জড়বুদ্ধিতার প্রধানতম কারণ বংশক্রম (Heredity)। Godard সাহেব এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত 'কালিকাক পরিবারের' বংশ ইতিবৃত্ত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান। বিপ্লবের (Revolution) সময় পর্যন্ত উক্ত পরিবারের বংশ ইতিহাস অনুসরণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময় জনৈক সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে জনৈকা জড়বুদ্ধি রমণীর অবৈধ মিলনের ফলে যে দীর্ঘ বংশের সৃষ্টি হয়েছিলো তার অধিকাংশ ব্যক্তিই জড়বুদ্ধি। পরবর্তী সময়ে উক্ত পুরুষের সঙ্গে জনৈকা তীক্ষ্ণবুদ্ধি রমণীর বৈধ মিলনের ফলে যেসকল বংশধরের উদ্ভব হয় তাঁদের অধিকাংশই প্রতিভাবান এবং খ্যাতিসম্পন্ন। বংশক্রম জড়বুদ্ধিতার প্রধান কারণ হলেও কদাচিৎ দেখা যায় কঠিন শারীরিক পীড়ার পর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায়। তাছাড়া শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ লক্ষ্য করেছেন Thyriod প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরের কতকগুলি গ্রন্থির সঙ্গে বুদ্ধির নিকটসম্পর্ক বর্তমান। এই সকল গ্রন্থি হতে ক্ষরিত রসের পরিমাণ যথেষ্ট না হলে বুদ্ধির অল্পতা ঘটে।

জড়বুদ্ধিতার বৈশিষ্ট্য ও নির্ণয়:

জড়বুদ্ধি মানবের প্রধান বৈশিষ্ট্য বুদ্ধির হ্রস্বতা। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ হতে এদের বুদ্ধির পরিমাণ কম। এজন্য কোন মানুষকে জড়বুদ্ধি বলবার পূর্বে তার বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিমাণও জানতে হবে। Binet সর্বপ্রথম বুদ্ধি মাপ করবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষা প্রস্তুত করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষা-

গুলিকে নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের বুদ্ধির গড় নির্ণয় করেছেন। কোন একটি মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তার বয়সের গড় বুদ্ধির তুলনা করলে বোঝা যাবে সাধারণের চেয়ে সে বেশী কি কম বুদ্ধিমান। Binet-র গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বুদ্ধির বিকাশ স্তব্ধ বা ব্যাহত হলে জড়বুদ্ধিতার উদ্ভব ঘটে আর বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়া অসম্বদ্ধ হয়ে পড়লে মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। Binet-র পর আরও অনেক মনীষী বুদ্ধি মাপবার বিবিধ উপায় আবিষ্কার করেছেন। বর্তমান-কালে পৃথিবীর সকল দেশেই মনস্তত্ত্ব গবেষণাগারগুলিতে এই সকল পরীক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

জড়বুদ্ধির প্রকারভেদ:

সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনায় জড়বুদ্ধিরা কম বুদ্ধিমান হলেও সকল জড়বুদ্ধির বুদ্ধির পরিমাণ সমান নয়। বিজ্ঞানীরা এইদিক দিয়ে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে কম তাদের 'নির্বোধ' অথবা 'অত্যল্প-বুদ্ধি' (Idiots) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের চেয়ে যাদের বুদ্ধি কিছু বেশী তাদের 'অল্প-বুদ্ধি' বা 'কিঞ্চিৎবুদ্ধি' (Imbeciles) নামে অভিহিত করা হয়। জড়বুদ্ধিদের মধ্যে যারা সর্বাধিক বুদ্ধিমান অথচ সাধারণ মানুষের চেয়ে যাদের বুদ্ধি কিছু কম তাদের 'মিতবুদ্ধি' (Morons) বলা হয়।

জড়বুদ্ধিতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:

নির্বোধেরা নিজের প্রতি যত্ন নিতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যারা অল্পবুদ্ধি তারা ক্বচিৎ লেখাপড়া শিখতে পারে এবং সহজ কাজকর্ম করতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর জড়বুদ্ধিরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে লিখতে পড়তে পারে, সহজ সহজ অঙ্ক কষতে পারে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে নানা রকম কাজ করতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

জড়বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিশক্তির প্রতিহত বিকাশ। স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে তুলনায় এদের বুদ্ধিবিকাশের গতি শুধু যে মন্থর তাই নয়, স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই এই গতি অধিকতর হ্রাস হয়ে আসে এবং স্তব্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া জড়বুদ্ধিগণ অনেক দেরীতে হাঁটতে এবং কথা বলতে শেখে এবং তাদের দৈহিক পুষ্টিও নানাভাবে ব্যাহত হয়। এদের দেহে নানাবিধ অপূর্ণতা থাকে। এরা সহজে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং অল্প বয়সে মৃত্যুলাভ করে।

জড়বুদ্ধির শিক্ষা ও চিকিৎসা:

জড়বুদ্ধিদের সম্পূর্ণ আরোগ্য দান করা সম্ভব নয়। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা-দানের সাহায্যে তাদের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা যায়। মানব মনের নানারূপ কার্যক্ষমতা আছে। স্মৃতিশক্তি এইরূপ একটি ক্ষমতা। কোন কোন জড়বুদ্ধির বিশেষ কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা বেশ উন্নত হতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষার আলোকে এই সকল বিশেষ ক্ষমতা বিকশিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার গুণে জড়বুদ্ধিরা কুটীর-শিল্প, চিত্রাঙ্কন, উদ্যানরচনা, সঙ্গীত-শিক্ষা, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। যার যে বিষয়ে যোগ্যতা এবং ঔৎসুক্য আছে সেই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারে। Thyroid প্রভৃতি গ্রন্থির পুষ্টির অভাবে যে-সকল শিশু জড়বুদ্ধি হয় অতি শৈশবে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে তারা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এইরূপ চিকিৎসা অতি শৈশবেই কার্যকরী হয়। অধিক বয়সে এরূপ চিকিৎসায় কোন ফল হয় না।

যবনিকা:

মানবসমাজে জড়বুদ্ধির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। সমাজ এদের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। সমাজকেই এদের অন্নবস্ত্র জোগাতে হয় সুতরাং এদের নিকট বিনিময়ে সমাজ অবশ্যই কিছু উপকার দাবী করতে পারে। আমরা বলেছি মনস্তত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে এদের দিয়ে নানাবিধ মূল্যবান কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। এদের শিক্ষা এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান নির্মিত হওয়া আবশ্যক। অরক্ষিত অবস্থায় জড়-বুদ্ধিরা সমাজের উপকার করা দূরে থাকুক নানাভাবে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। অর্থ-নীতি এবং মানবতা উভয় দিক দিয়ে বিচার করলে জড়বুদ্ধিগণের যত্ন লওয়া এবং তাদের যথাযথ শিক্ষাদান করা একান্ত দরকার।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ইতালীর কারলো লেটো তার 'প্যাসিকো' মোটর বোটে করে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি ১৩৯·১৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৮৭ মাইল বেগে তার মোটর বোট চালিয়েছেন। কারলো আগেকার রেকর্ডের চেয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৫ কিলোমিটার



করলো লেটো 'প্যাসিকো' চালাচ্ছেন

বেশী চালিয়ে আগেকার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তার 'প্যাসিকো'তে ৩০০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন লাগান আছে।

*

শরীর ধারণের জন্য ভিটামিনের দরকার—বিশেষতঃ শিশুদের। নিউইয়র্কের একজন ডাক্তারের কিন্তু মত হচ্ছে যে, শিশুদের যদি 'এ' এবং 'ডি' ভিটামিন খুব বেশি পরিমাণে খাওয়ান হয় তাহলে এদের উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্রমাগত ভিটামিন খাওয়ানোর ফলে শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়। অনেক সময় শরীরের কোন অংশ খুব ফুলে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়। এমন কি বেশি ভিটামিন খাওয়ার ফলে শরীর এত বিকৃত হয়ে যেতে পারে যার জন্য শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

*

আণবিক রশ্মি নিয়ে যে সব পুরুষ এবং মহিলারা গবেষণা করছেন তাঁরা যাতে পরস্পর বিবাহ না করেন বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন সে সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হতে বলছেন। এই রশ্মি নিয়ে কাজ করার দরুণ এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এর ফলে এই সব পুরুষ এবং নারীদের বিবাহের পর সন্তান জন্মান খুবই বিপজ্জনক। এই ধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কারণই হচ্ছে যে জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকির অধিবাসীদের ওপর আণবিক রশ্মির প্রতিক্রিয়া দেখার ফলে।

*

মাছেরা কি শুনতে পায়? মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ কারল ভন ফ্রিস্কের মত হচ্ছে যে মাছেরা শব্দ শুনতে পায়। এদিকে মৎস্য-বিশারদ এলেক্স ওয়ালেসের মত কিন্তু ঠিক উল্টো।

তিনি বলেন যে, মাছেরা কোন রকম শব্দ শুনতে পায় না। তবে মাটির ভেতর দিয়ে শব্দের স্পন্দন অনুভব করতে পারে। ম্যালবোর্ণে তিনি তার 'ট্রাউট' মাছ-পালনের পুকুরে এটা প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তিনি জলের ওপর মাছের খাবার ছড়িয়ে সব মাছগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করলেন। তারপর জলের ওপর মাছগুলোর কাছে বন্দুক ছুঁড়ে আওয়াজ করলেন। মাছগুলো কিন্তু শব্দ শুনে একটুও নড়ল না।

*

'কামধেনু' কে না চায়? কিন্তু কামধেনুর কথা পৌরাণিক কাহিনী হয়েই দাঁড়িয়েছে। মহাভারতের বিশ্বামিত্র মুনির 'কামধেনু'র কথা আমরা সকলেই জানি। তারপরও যে দু'-একটা 'কামধেনু'র কথা শোনা যায়নি এমন নয়। কিছু দিন আগে স্পেন দেশের এক চাষীর ঘরে একটি গরুর খোঁজ পাওয়া গেছে যেটা নয় মাস বয়স থেকেই কোন রকম বাচ্চা ছাড়াই দিনে আট সেরের ওপর দুধ দিচ্ছে। এটাকেও আমরা 'কামধেনু' বলতে পারি।

*

মোটর চালাবার সময় মোটর চালকদের চোখে যদি কোনরকম জোরাল আলো এসে পড়ে, তাহলে তাদের পক্ষে মোটর



চশমা চোখে মোটরচালক মোটর চালাচ্ছে।

চালান অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যাতে এই ধরণের আলো চালকের চোখে এসে না পড়ে তার জন্যে অনেক নতুন নতুন উপায় বার হচ্ছে। বর্তমানে এক ধরণের চশমা তৈরী হচ্ছে, যার কাঁচের মধ্যে দিয়ে জোরাল আলো চোখে পড়লেও চোখ ধাঁধিয়ে যায় না—ফলে মোটর চালকের কোন অসুবিধা হয় না।

*

বাতাসে যে 'নাইট্রোজেন' গ্যাস থাকে সেটা বড় বড় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী তাদের কাজের জন্য বাতাস থেকে সংগ্রহ করে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, বছরে এর জন্য ৫,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কত বছরে বাতাসের সমস্ত নাইট্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করে নেওয়া যাবে। হিসাব করে দেখা গেল যে বাতাসের মধ্যে সবশুদ্ধ ৪,৬৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন গ্যাস আছে। আর এই নাইট্রোজেন শেষ করতে ৯৩০,০০০,০০০ বছর সময় লাগবে।

*

আলোর সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আজকাল কলকাতার অনেক বড় বড় রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায়। এতে এই সুবিধা যে,



রাস্তার ধারে কথা-কওয়া আলোক নিয়ন্ত্রণ।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুলিসকে হাত তুলে আর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না।

ইংলণ্ড এর চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। এখানে আলোর সঙ্গে সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, আলোর সম্বন্ধে পথচারী এবং যানবাহনের চালকদের চীৎকার করে সজাগ করে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের "হিজ মাষ্টারস ভয়েস" কোম্পানী এটা তৈরী করেছেন।

*

কোন ধাতুর পাতের ওপর যন্ত্রের সাহায্যে কত সূক্ষ্ম ছেঁদা করা যায়? এক জাহাজ তৈরীর কারখানায় একটা পাতলা প্ল্যাটিনাম পাতের ওপর যন্ত্রের সাহায্যে এত সূক্ষ্ম ছেঁদা করা হয়েছে যে ছেঁদাটাকে পরে খুঁজে বার করতে হয়েছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। ছেঁদাটার মাপ হচ্ছে ৬/১০,০০০ ইঞ্চির সমান। একটা মানুষের চুল যতটা মোটা এটা তার তিনভাগের চেয়ে সরু! মাকড়শার তৈরী সবচেয়ে সরু সুতও এই ছেঁদার চেয়ে কিছু মোটা। ছেঁদাটা করবার সময় কারিগরকে এমন একটা যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় যেটার সাহায্যে ছেঁদা করবার জন্য ভোমরাটা কখনো ধাতুর পাতের সঙ্গে এসে লাগছে সেটা বোঝা যায়। 'হাইড্রোলিক' সংক্রান্ত কাজের জন্যই এত সূক্ষ্ম ছেঁদার দরকার হয়।

সাহিত্য প্রসংগ

সাহিত্য ও উদ্দেশ্য

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্পর্কে কিছু লিখিতে বসিলে আমার মনের ভিতর দুই কারণে একটা অনিচ্ছা মাথা নাড়া দিয়া উঠে। প্রথমত, আমি সাহিত্যিক নই; অর্থাৎ সাহিত্য আমার পেশা নয়। গল্প, উপন্যাস, নাটক কিম্বা সমালোচনা লিখিয়া আমি অন্নবস্ত্রের সংস্থান করি না। সাহিত্য আমার কাছে নেশাও নয়। কোন জিনিসকে ভালভাবে চিনিতে এবং ভালবাসিতে না পারিলে অথচ সেই জিনিসের উপর মনের গোপনে একটা অস্পষ্ট ভাল-লাগা জাতীয় ভাব থাকিলে নেশার উৎপত্তি হয়। সাহিত্যের সংগে আমার আশৈশব পরিচয়, অনেক দিনের জানা-শোনা, তার সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লেখক এবং সমালোচকরা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, যাহা আমার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ নয়। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সমস্যা জীবনের অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা সহজ স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করিবেন, তর্ক করিবেন; কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের প্রসংগ উঠিলেই তাঁহাদের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং মনের সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়; যেন শিল্প-সাহিত্য এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার, যেন খানিকটা শ্রদ্ধা এবং খানিকটা আন্তরিক অনুভূতি দিয়াই শিল্প-সাহিত্যকে বুঝিতে হইবে, যেন—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ', সুতরাং যাহা আছে, তাহাই গ্রহণ কর।

আমি মনে করি, সাহিত্য-কর্ম মানুষের মনের আর দশটি ক্রিয়ার মতই একটি। মানুষের জীবনের সংগে যুক্ত অন্যান্য দশটি বিষয় যেসব সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলে এবং জীবন ও জগতের পরিবর্তন দ্বারা যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং সাহিত্য আলোচনায় বুদ্ধিচিন্তা আচ্ছন্নকারী প্রচলিত শ্রদ্ধা, অনুভূতি, সৌন্দর্য-রস ইত্যাদির কবল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। পূর্বের প্রশ্নগুলিকেই নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে।

বর্তমান আলাচনার জন্য একটি প্রশ্ন লওয়া যাক। প্রশ্নটি এই—সাহিত্যের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা। একথা বলিলে চলিবে না যে, প্রশ্নটি অনেক পুরাতন এবং এ-প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয় নাই। কোন্ প্রশ্নেরই বা মীমাংসা হইয়াছে? মীমাংসা অর্থ যদি এই হয় যে, সেই বিষয় নিয়া আর আলোচনা চলিবে না; মামলা চিরকালের জন্য নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, কোন গভীর এবং মূল্যবান প্রশ্নেরই মীমাংসা নাই অর্থাৎ তাহা কখনও চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায় না। প্রশ্নের উত্তরগুলি এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে উত্তরণ করিতে থাকে। এক যুগের সত্য-মিথ্যার সংগে পরবর্তী যুগের সত্য-মিথ্যার সংঘাত বাঁধে; এবং এমনি করিয়াই প্রশ্ন এবং তাহার মীমাংসা ক্রমাগত আগাইয়া চলে।

বিজ্ঞানের কি উদ্দেশ্য আছে? বৈজ্ঞানিক বলিবেন আছে, জগতকে জানা। সাহিত্যের কি উদ্দেশ্য আছে? আমি বলিব—আছে, ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলিকে বুদ্ধি এবং আবেগের দ্বৈত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এই যে সমস্যা, যাহা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত, তাহা ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে অনবরত উপস্থিত হইতেছে। অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, মনস্তত্ত্ব এবং অন্যান্য বিজ্ঞান এই সব সমস্যা নিয়া চিন্তা করিতেছে এবং সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সমস্যা, সংকট, সংঘাতকে অবলোকন করিতে না পারিলে সমগ্র চিত্রটি লাভ করা যায় না। এবং সমগ্র চিত্রটি না পাওয়া গেলে জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। সমগ্র দৃষ্টির ভিতর আমাদের মূল্য চেতনা (sense of values) নৈতিক ভাল-মন্দর ধারণা নিহিত থাকে। জীবন ও জগৎকে আমাদের মূল্যের (values) নিরিখে বিচার করিয়া আমরা সভ্যতা গড়িয়া তুলি। সাহিত্য মানুষকে এই সমগ্র দৃষ্টি এবং মূল্য চেতনা দিতে পারে। যাঁহারা বলেন, সাহিত্য Amoral, অ-নৈতিক; নীতির সংগে তাহার কোন সংস্রব নাই, তাঁহারা সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন শিল্প-সাহিত্য একদা মানুষের Play-instincts অর্থাৎ ক্রীড়া-কৌতুকের প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া শিল্প-সাহিত্য আজও খেলা-খেলা স্তরে থাকিয়া যাইবে। জীবনের মত বিরাট এবং গুরু বিষয়কে শিল্প-সাহিত্য উপজীব্য করিবে, কিন্তু কিছু বলিবে না, কিছু বুঝাইবে না, কিছু নির্দেশ করিবে না। ইহা এক মস্ত ভুল ধারণা। সাহিত্য প্রথমত এবং প্রধানত নৈতিক। নীতি নিয়াই সাহিত্যের কারবার।

আমি জানি, এখনই প্রবল প্রতিবাদ উঠিবে। এই প্রতিবাদকে আমি দুইভাগে ভাগ করিতে

পারি। একদল আছেন, যাঁহারা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী, সাহিত্যে উদ্দেশ্যহীনতার পক্ষপাতী, 'Art for Art's sake-ists; তাঁহাদের মতবাদকে আক্রমণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। অবশ্য তাঁহাদের কেহ যদি বলেন যে, যুক্তিতর্ক নিরর্থক, তবে আমিও বলিব যে, আমি স্যামুয়েল বাটলারের উপদেশাবলীর ভক্ত। বাটলারের একটি মূল্যবান উপদেশ আছে—'Arguments are not so good as assertions.'

আর একদল, যাঁহারা আমার বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইবেন—আসলে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কিন্তু মূলগত কোন পার্থক্য নাই। কেবল একটি শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া ভুল বুঝিবার ফলেই বিবাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহারা আমার মতই সাহিত্য ক্ষেত্রে সনাতন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদের বিরোধী, তাঁহারা সমাজ-সচেতন এবং বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সাহিত্য আমাদের মতে সমাজের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অবিচারকে আঘাত করিবে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধতা করিবে, সুতরাং সাহিত্যকে প্রধানত নৈতিক বলিতে তাঁহাদের আপত্তি। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রচলিত রীতিনীতিকে সমালোচনা করাও নীতিগত ব্যাপার। আর তাহা ছাড়া, পুরান নীতিকে ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নীতিকে গড়িতে হয়, যেহেতু নূতন কালের মানুষ কেবল পুরান নীতিকে অমান্য করিয়া সেই নীতির উল্টা পথগুলি ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। তাহার জন্য নূতন নীতি, নূতন বিধানের প্রশস্ত সড়ক চাই। দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক সমাজের অন্যায়-অসত্যকে সমাজের পটভূমিতে রাখিয়া দেখান যে, ইহা চিরন্তন এবং অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়, কোন দৈব অভিশাপ নয়; মানুষ ইচ্ছা করিলে ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। যেখানে দুর্নীতি আছে, সেখানে তাহার পরিবর্তে সত্যকার নীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যেখানে আছে ভারাক্রান্ত অন্ধকার, সে-স্থান ফাঁকা থাকিবে না, সেখানে আলো জ্বলিবার অবকাশ থাকিবে। সমাজের বিধি-বিধানের মূলে গিয়া যাঁহারা এইভাবে খড়্গাঘাত করেন, রক্ষণশীল সমাজ তাঁহাদের ভয় করে। কিন্তু কাহিনীর নায়ক-নায়িকার অত্যন্ত ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছার সঙ্গে সামাজিক নীতির সংঘর্ষ বাঁধিল, আর লেখক শুধু সেই মুহূর্তের জন্য সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন, এবং পুনরায় কাহিনীর মোড় ঘুরাইয়া টানিয়া নিয়া চলিলেন যেন কাহিনীতে একটি মোচড় দিবার জন্যই সেই সংঘর্ষের অবতারণা করা হইয়াছিল—এমন লেখকের উষ্মাকে সমাজ ভয় করে না, কেননা, সে জানে যে, এই লেখক সমাজের মর্মমূলে গিয়া আঘাত করিবে না, তাহার রাগ, বিরাগ, অভিমান কিছুক্ষণের জন্য ভাষায়, আবেগে, কাহিনীর আখ্যানভাগের কৌশলে ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া যাইবে। যে-শিল্পী দার্শনিকও নয়, সে অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত। প্লেটো বলিয়াছিলেন, দার্শনিককে রাজা অথবা রাজাকে দার্শনিক হইতে হইবে, নতুবা রাষ্ট্রের মঙ্গল নাই। তেমনি জীবন ও জগৎকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্য দার্শনিককে শিল্পী অথবা শিল্পীকে দার্শনিক হইতে হইবে; নতুবা—

নতুবা যাহা সাধারণ হয়, তাহাই চলিতে থাকিবে। ভাষা আছে, ভঙ্গি আছে, কাহিনী আছে, কিন্তু রচনায় চরিত্রের দৃঢ়তা নাই। মানুষ এবং তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে জানিয়া সেই সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে স্থাপন করিলে তবে শিল্প-সাহিত্যে চারিত্রিক দার্ঢ্য দেখা দিবে। আমাদের মূল লক্ষ্য মানুষ; মানুষের সমাজ এবং সামাজিক নীতি। একটি বিশেষ মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা হইতেই শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। শিল্প-সাহিত্য আর কিছু নয়, সেই প্রচেষ্টারই by product, উপফল।

সুতরাং সাহিত্যে উদ্দেশ্য থাকিলে রস ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহাদের বক্তব্যের উত্তরে বলিতে হয়, তাহা হইলে দোষটা রসের। এমন আনন্দ এবং রসোপলব্ধি নিয়া আমি কি করিব, যাহা একই সময়ে আমার চেতনাকে প্রসারিত করিয়া দিবে না, যাহা আমার বুদ্ধি এবং আবেগকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিয়া আমার সম্পূর্ণ সত্তায় ক্রমবিকাশ সাধন করিবে না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রস ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং বাস্তব জীবন, বিশাল জগৎ এবং বিচারশীল চেতনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া রস তীব্রতর হইতে থাকে।

বৈদেশিকী

কোরিয়া : ততঃ কিম্?

চীনা "স্বেচ্ছাসেবক" ও উত্তর কোরিয়ানদের পাল্টা আক্রমণের মুখে ম্যাকআর্থার বাহিনী বেসামাল হয়ে পালাচ্ছে এবং যেখানে যেখানে চীনা ও কোরিয়ানদের বেড়ের মধ্যে পড়েছে সেখান থেকে পালাতেও পারছে না। দেড় মাস আগে উত্তর কোরিয়া গভর্নমেণ্টের রাজধানী পিয়ং-ইয়াং শহর ম্যাকআর্থার বাহিনী অধিকার করে। সম্প্রতি ম্যাকআর্থারী সৈন্যদল পিয়ং-ইয়াং ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা এখন দক্ষিণমুখে দৌড়চ্ছে এবং চীনা ও উত্তর কোরিয়ানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

ম্যাকআর্থারী সৈন্যদল কোথাও একটি নূতন আত্মরক্ষা সীমানায়—ডিফেন্স লাইনে—গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে শুনা যাচ্ছে কিন্তু সেটা যে কোথায় হবে তা বুঝা যাচ্ছে না, কারণ সে খবর গোপন রাখা হচ্ছে। ম্যাকআর্থার বাহিনী সেই নূতন লাইনে গিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তারা কোন্ দিকে কীভাবে যাচ্ছে তার খবর চাপা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে যে ম্যাকআর্থার এখন কোথাও নূতন ডিফেন্স লাইন দাঁড় করাতে পারবেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে কত দূরে গিয়ে পারবেন বা আদৌ পারবেন কিনা সেইটাই এখন প্রশ্ন। নূতন অনেক সৈন্য না এনে ফেলতে পারলে সম্মিলিত চীনা ও উত্তর কোরিয়ানদের আক্রমণের মুখে বর্তমান ম্যাকআর্থার বাহিনীর পক্ষে কোরিয়ায় টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যে বেগে চীনারা এগিয়ে আসছে তাতে নূতন সৈন্য এনে তাদের ঠেকাবার মতো যথেষ্ট সময় আছে কিনা সন্দেহ। সেইজন্য কেউ কেউ বলছে যে, এখন ম্যাকআর্থার বাহিনীর কোরিয়া ত্যাগ করে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদের মতে আপাতত কোরিয়া থেকে স্থল সৈন্য সরিয়ে এনে বিমান থেকে বোমাবাজি ও নৌবহর থেকে তীরে কামান আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া উচিত। যতদিন পর্যন্ত আবার সৈন্য নামানোর বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ না হয়। এদের মতে অবশ্য শুধু কোরিয়া নয় চীন রাজ্যের উপরেও আকাশ ও সমুদ্র থেকে আক্রমণ চালানো দরকার।

কিন্তু কোরিয়া থেকে এই অবস্থায় হটে এলে যে মান যায়—সেটা সহ্য করা আমেরিকার পক্ষে কঠিন। সেইজন্যেই এ্যাটম বোমা ফেলার কথা উঠেছে। এ্যাটম বোমা খাওয়ার ভয়ে বা খেয়ে যদি চীনারা কোরিয়াকে আবার ম্যাকআর্থারের হাতে সমর্পণ করে পালায়। কিন্তু এ্যাটম বোমা ফেলার কথা উঠতে চীনারা যত ভয় পেয়েছে তার চেয়ে বেশি ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে অন্যেরা। কথাটা ওঠা মাত্রই তো বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে আমেরিকায় যাওয়া স্থির করলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত। মিঃ এ্যাটলী বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মচারী ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

এ্যাটম বোমা ফেলা হোক আর না হোক, চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় আমেরিকার মিত্রগণও অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ম্যাকআর্থার তো কবুল জবাব দিয়েছেন যে, চীনরাজ্য (যেখান থেকে তাঁর শত্রুরা এখন দুর্নিবার জলস্রোতের মত কোরিয়ায় ঢুকেছে সেখানে) আক্রমণ না করলে কোরিয়ার যুদ্ধজয়ের কোনো আশাই নাই।

কিন্তু চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হলে চীন-সোভিয়েট চুক্তি অনুসারে রাশিয়া চীনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য। তাহলে তো বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়। তখন য়ুরোপের কী দশা হবে? এখন পর্যন্ত তো আতলান্তিক চুক্তির সামরিক ফল তেমন কিছু ফলে নি। এখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে পশ্চিম য়ুরোপের স্থলভাগ রুশিয়ার হাত থেকে বাঁচানো কি সম্ভব হবে? সম্ভাব্য রুশ আক্রমণ থেকে পশ্চিম য়ুরোপের সামরিক সুরক্ষার ব্যবস্থা কোরিয়া যুদ্ধের দরুণ আরো বাধাগ্রস্তই হচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধ না হয়েও যদি বর্তমানের মত চীনের সঙ্গে যুদ্ধ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে তবে "য়ুরোপ রক্ষার" পরিকল্পনা অধিকতর বিপন্ন হবে। কারণ চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে আমেরিকা ও তার মিত্রদের শক্তি ক্ষয় হতে থাকবে এবং সেই পরিমাণে রাশিয়ার শক্তি বাড়বে। তাই বৃটেন চীনের সঙ্গে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য একটা শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে। যুদ্ধ কোরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর জয়ের আশা এখন আর নেই। কিন্তু যুদ্ধে হার স্বীকার করাও আমেরিকার পক্ষে এখন কঠিন। সুতরাং ইঙ্গ-মার্কিন নীতির উভয় সংকট উপস্থিত হয়েছে।

ম্যাকআর্থারী নীতির ফল এরকম হতে পারে বৃটেনের এ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সময় থাকতে সে জোর করে আমেরিকাকে কিছু বলে নি। এখন সর্বনাশের মুখে এসে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে মার্কিন নীতির বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবে এখনো চীনের সঙ্গে একটা আপোষ যাতে হতে পারে মিঃ এ্যাটলী সেই দিকেই চেষ্টা করছেন, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য চীনকে শান্ত করা ততটা নয় যতটা য়ুরোপে রাশিয়াকে ঠেকানো। কিন্তু চীনের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন দল এখন স্বভাবতঃই একটু বে-কায়দায় পড়ে গেছে। ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণ থেকে উত্তর কোরিয়ানদের হটিয়ে দিয়েই যদি একটা আপোষ-মীমাংসার কথা তোলা হোত তাহলে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে সর্বদিক দিয়েই কথা বলার জোর থাকত বেশি। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। নৈতিক এবং সামরিক উভয় দিক থেকেই এখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে কথা বলার জোর কমে গেছে। কোরিয়ার সম্পর্কে কোনো মীমাংসা করতে হলে এখন আর চীনের অন্যান্য অসন্তোষের কারণগুলি বাদ রেখে কিছু করা যাবে না। চীনের একটা বড় মামলা ফরমোজা নিয়ে। আমেরিকা ফরমোজায় চিয়াং কাইশেককে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, চিয়াং কাইশেককে ফরমোজা থেকে আমেরিকায় স্থানান্তর করা ছাড়া চীনের সঙ্গে আমেরিকার মিটমাট সম্ভব নয়।

কোরিয়াতে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে নেবার আশায় এ্যাটম বোমা ফেলার একটা অত্যুগ্র বাসনা আমেরিকার একদল লোকের হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা যদি কোরিয়ায় বা চীনে এ্যাটম বোমা ফেলে তবে তার ফলে আমেরিকার প্রতি এশিয়াবাসীদের যে মনোভাবের সৃষ্টি হবে সেটা এশিয়ায় মার্কিন প্রভাবের পক্ষে একেবারে মারাত্মক হবে। কোরিয়াতে মার্কিন বিমানবাহিনী যে নৃশংস বোমাবর্ষণ চালিয়েছে তার ফলে ইতিমধ্যেই এশিয়াবাসীর মনে ক্ষোভের অন্ত নেই। পিয়ং-ইয়ং ছেড়ে পালাবার সময়ে ম্যাকআর্থার বাহিনীর ধ্বংস-লীলার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা পড়লে এই "মুক্তিদাতা" তথাকথিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর প্রতি অপরিসীম অশ্রদ্ধা জন্মে।

নেপাল

নেপালের প্রধান মন্ত্রীর তরফ থেকে যাঁরা নয়াদিল্লীতে ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে নেপাল সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছিলেন তাঁদের আলোচনা এখনও শেষ হয় নি। নেপালী কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের সংবাদে প্রকাশ যে, তরাইয়ের অনেকাংশ এবং কয়েকটি পার্বত্য স্থানও এখনও কংগ্রেসীদের দখলে আছে। কিন্তু এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হোল ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কাঠমাণ্ডুতে এক বিরাট জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শনের সংবাদ। ঐ তারিখে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের স্যার এজলার ডেনিং ও ভারতে অবস্থিত বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ রবার্টস্ কাঠমাণ্ডুতে যান। তাঁহারা বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হলে হাজার হাজার নরনারীর এক বিরাট জনতা "পাঁচ সরকার" অর্থাৎ রাজাকে চাই না রাণা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনমতের এরূপ অভিব্যক্তি পূর্বে নেপালে কখনও হয় নি। বর্তমান অবস্থায় রাণাশাহীর বিরুদ্ধে খাস কাঠমাণ্ডুতে এরূপ প্রকাশ্য জনবিক্ষোভ থেকে বুঝা যায়, নেপালের জনচিত্ত এখন কিসের দোলায় আন্দোলিত। বৃটিশ প্রতিনিধিদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তাৎপর্য এই যে, নেপালের জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ইংরেজরা রাণাশাহীর পক্ষপাতী। নেপালের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে রাণাশাহীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার ফল মারাত্মক হবে।

৫।১২।৫০

পুস্তক পরিচয়

ভৈরবী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সারস্বত মন্দির, ১ রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। সহজ মিল ও সাবলীল ছন্দে রচিত কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। কবিতা বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এ কবিতা তাহা নহে। কিন্তু লেখক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ২৫৩।৫০

সিদ্ধির পথ—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। যুগবার্তা পাবলিশিং হাউস, ৪৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রেয়ঃ লাভ করিবার পথে বহু বিঘ্ন রহিয়াছে। এই বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ সাধনার। তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এই গ্রন্থে ইহার পথনির্দেশ দেওয়া আছে। ২৯০।৫০

কৃষ্ণ-ভগবান—শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সুপ্রচারিত থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ-নিন্দার বিরাম নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের অজ্ঞতাই ইহার কারণ। সেই অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য লেখক কৃষ্ণ বিষয়ক বিবিধ আলোচনা করিয়াছেন। বইটি বহুল প্রচারের প্রচেষ্টা আবশ্যক। ২৮৯।৫০

তরণী-বিহারঃ—শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী। শ্রীক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী, ৭বি গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা (মূল্যমর্ধং পারমার্থম্)।

শ্রীকৃষ্ণলীলাগীতির পদ্যানুবাদ। মূল পাঠও ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার ইহা একটি স্তর মাত্র। লেখক ভক্তিপূর্ণ মনে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাই ইহাতে আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ২৯৪।৫০

Fair and Free Elections M Venkataranjaiya. Hind Kitabs Ltd. Bombay Price As. -|12|-.

নির্বাচন আসন্নপ্রায়। সহজ ও নিরপেক্ষ ভোটের বিষয়ই এখন বহুল আলোচিত হইতেছে। এরূপ সময় এই গ্রন্থ অনেকের সহায়ক হইবে।

পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সংকলিত। আনন্দ আশ্রম, কালনা, বর্ধমান। রাজ সংস্করণ ৪৲, সাধারণ সংস্করণ ৩৲।

শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর জীবন-কথা ও তাঁহার উপদেশামৃতের সংকলন। কর্ম ও সংসার, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এতে আছে। এইসব গ্রন্থ পাঠে দেশের মানসিক আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন হইবে বলিয়া বোধ হয়।

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যকৃষ্ণানন্দ অবধূত। নিত্যনারায়ণমঠ, পোঃ গোমো, বিহার। মূল্য বাঁধা দুই টাকা, অ-বাঁধা এক টাকা বারো আনা।

মহাপুরুষগণের কথা যত বেশী আলোচিত হয় ততই মনের ময়লা দূর হয়—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের জাতীয় জীবনে এখন যে মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বিদূরণের জন্য এইরূপ গ্রন্থের কিছু কিঞ্চিৎ প্রচার আবশ্যক। ২৯৫।৫০

বিশ্বরাজনীতির ধারা—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা।

বিশ্ব-রাজনীতির প্রবাহ এখন কোন্ দিকে বহিয়া চলিয়াছে ইহা বর্তমানে সকলেরই প্রশ্ন। রাজনীতি এখন এমন জটিল ও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার গ্রন্থি উন্মোচন করাই কষ্টকর। জগদানন্দবাবু সাংবাদিক, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাহা ছাড়া তিনি কবিও বটেন। তাঁহার বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাঁহার রচনাকুশলতার গুণে গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাজনীতির ধারা সব সময় বোঝা যায় না। এই বই পাঠ করিলে সকলের পক্ষেই বিশ্ব-ব্যাপার সহজবোধ্য হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ২৯১।৫০

(১) **শ্রীশ্রীনাম মহিমামৃত**	১৷৷০
(২) শ্রীশ্রীগুরু গীতা	১৲
(৩) মহারসায়ন	১৲
(৪) সুধার ধারা	৷৷০
(৫) ত্রৈকালিক স্তবমালা	৷০

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। (১) নামের মহিমা, সুন্দর সংগ্রহ পুস্তক। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এবং বিভিন্ন সংহিতা হইতে নামের মহিমাত্মক শ্লোক এবং ভারতের বিভিন্ন মহাপুরুষ ও সাধু মহাত্মাদের ভগবানের নামের মাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক বচনরাজি উদ্ধৃত হওয়াতে গ্রন্থখানি বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। (২) গুরু গীতার অনুবাদ সরল এবং ব্যাখ্যা সুখবোধ্য। (৩) বর্তমান যুগে নাম সাধনাই যে প্রধান ধর্ম আলোচ্য পুস্তকে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (৪) পয়ারছন্দে অধ্যাত্ম-সাধনার অনেক সার কথা ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৫) মুখ্যভাবে রামচরিত অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যাকালের জন্য ভগবানের নাম কীর্তন নির্দেশিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-রসপিপাসু সমাজে হুগলীর অন্তর্গত ডুমুরদহ, শ্রীরামাশ্রম হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকগুলি সমাদৃত হইবে।

দেবযান—মাসিক পত্র, দ্বিতীয়বর্ষ—সম্পাদক শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দেবযান কার্যালয়, পোঃ মগরা, হুগলী। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

আলোচ্য সংখ্যাখানি ১৩৫৬ ভাদ্র হইতে ১৩৫৭ শ্রাবণ পর্যন্ত সংখ্যা। পত্রিকাখানি সর্বাধিক সুপরিচালিত এবং নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পূর্ণিমা (শারদীয়া, ১৩৫৭)—সম্পাদক ঃ কুমার পিণাকভূষণ। কার্যালয় ঃ ৪৮এ, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০।

লেখায়, ছাপায় ও ছবিতে যে সব শারদীয় মাসিক ও সাপ্তাহিক বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে তাহার মধ্যে 'পূর্ণিমা' অন্যতম। নূতন ও পুরাতন বহু লেখকের লেখা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্প ও প্রবন্ধ সুন্দর ও সরস। প্রচ্ছদপট মনোহর।

ইনসিওর্যানস অব ব্যাঙ্ক ডিপোজিটস—শ্রী আর এম মিত্র। প্রকাশক—পি সি চ্যাটার্জি, ১।২, দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

বাংলা দেশে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে আর ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্ক ফেল না করে তার জন্য ব্যাঙ্কের জমা টাকা বীমা করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকেই অনুভব করিতেছেন। এ বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে কিছু করা দরকার এবং গ্রন্থকারের পুস্তিকাখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। তবে তাঁর মতামত ও প্রস্তাব কতদূর গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জমা টাকার কিছু অংশ বীমা করা থাকিলেই ব্যাঙ্ক ফেলের সম্ভাবনা দূরীভূত করা যায় না। পুস্তিকাখানিতে "ক্যাপিটাল" ও "ক্যাপিটাল ফরমেশান" সংজ্ঞা দুটির পরিষ্কার

ধারণার অভাব আছে। ও দুটি এক জিনিস নয়। পুস্তিকার কলেবর হিসাবে দাম খুব বেশী বলিয়া মনে হয়। ১৮৯।৫০

গোসটস্ : হেনরিক ইবসেন। অনুবাদিকা : শিউলি মজুমদার। প্রকাশক সুনীলকুমার ঘোষ, ২৩ডি কুমারটুলি স্ট্রীট, দাম : দুই টাকা।

অন্তর্দ্বন্দ্ব, চরিত্রের সংঘাত, সমাজ সমস্যার প্রতিফলন, দৃশ্যের স্বল্পতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সুবর্ণ যোগ ঘটেছে ইবসেনের নাটকে। উপরন্তু বাস্তবানুগ সংলাপ-যোজনায় ইবসেন অনন্য। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক সকল দিকেই তিনি পূর্বসূরীদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নাটককে নূতন রূপ দিয়েছেন। যদিও তাঁর উত্তরসূরী বার্ণার্ড শ' আরও অগ্রসর, তবু ইবসেনের নাটকের মূল্য কোনদিন হ্রস্ব হবে না।

বাঙলা নাটকে এখনও সেক্সপিয়রের যুগ চলেছে। সেই স্বগতোক্তি, অস্বাভাবিক সংলাপ, অতি প্রাকৃত ঘটনার ছড়াছড়ি এবং পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের অতি প্রচলন বাঙলা নাটকের প্রধান দোষ। এই সময়ে ইবসেনের সুবিখ্যাত নাটক 'গোস্টস্'-এর বাঙলা অনুবাদ ইংরাজী না জানা নাটক রসাস্বাদী পাঠকের উপকার দর্শাবে। অনুবাদ খুব স্বচ্ছন্দ না হলেও মোটামুটি ভাল। কিন্তু অজস্র বানান ভুল বিরক্তিকর।

৩১০।৫০

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি এইচ ডি প্রণীত। প্রকাশক প্রাচ্য বাণী মন্দির—৩, ফেডারেশন স্ট্রীট। ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য—আট আনা মাত্র।

পুণ্য শ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন কাহিনী সর্বত্রই সুবিদিত। এই পুস্তিকায় তাঁহার পূত জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংক্ষেপে একত্রে সন্নিবেশিত হইবার ফলে ইহা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগর জীবনের সমগ্র অবয়বটিই মানসপটে ভাস্বর হইয়া উঠে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিকে ছিলেন যেমন প্রাচীন ভারতের সহিত নব্য ভারতের সেতুবন্ধ, অন্যদিকে তিনি তদ্রূপই ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গমস্থলে অভ্রান্ত নাবিক। বস্তুতঃ ভারতের নব জাগৃতির মূলে যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের দুশ্চর তপস্যা ও অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ রহিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগের অগ্রণী। শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, জনসেবা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে এই মহাপুরুষের অবদান অতুলনীয়। উঁহার বিশ্বরূপীন সম্বন্ধে এই পুস্তিকায় ডক্টর চৌধুরী বিদ্যাসাগর জীবন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে অনুসন্ধিৎসুগণ ইহা পাঠ করিয়া বাঙলার তৎকালীন সমাজ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

পুস্তিকাটি সকল দিক দিয়াই প্রশংসার যোগ্য। ইহার বহুল প্রচার আমাদের ঐকান্তিক কাম্য। ৩১২।৫০

ছবির দেশ—শ্রীমতী বীণাপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১৮, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। দাম—বার আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা ছবির মধ্য দিয়ে দেশের কথা। ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, শিশুদের উপযোগী প্রাঞ্জল ভাষায়। পাতায় পাতায় ছবি এবং কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে। এই বই পড়ে শিশুদের আরও জানবার জন্য কৌতূহল বাড়বে। ছাপা ও কাগজ আর মলাট শিশুরা পছন্দ করবে। ৩০৯।৫০

মানুষের মহিমা—শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য বি এ, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—এক টাকা।

ভগবান বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের মনীষীদের জীবনের উপদেশমূলক ছোট ছোট গল্প শিশুদের জন্য সরল ভাষায় লেখা। প্রত্যেকটি গল্পই ছোট, চিত্তাকর্ষক এবং উপদেশপূর্ণ। এই গল্পগুলো পড়ে ছোট বড় সকলেই আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করবে। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যাঁরা স্মরণীয়, যাঁরা দেশের মনীষী তাঁরা প্রত্যেকেই যে ব্যক্তিগত জীবনেও মহৎ ছিলেন এই গল্পগুলি তারই দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তক হিসেবে এইরূপ বইয়ের প্রয়োজন আছে। ৩০৬।৫০

ঈশোপনিষৎ—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব। প্রকাশক —শ্রীমৎ প্রিয়লাল ব্রহ্মচারী সাধন সমর আশ্রম, লিলুয়া, হাওড়া। মূল্য ২, টাকা।

উপনিষদসমূহের মধ্যেই ঈশোপনিষৎ আকারে খুবই ক্ষুদ্র; আঠারটি মন্ত্রের সমষ্টিমাত্র কিন্তু সাধকদের কাছে পরমপ্রিয়। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে। তিনি বৈদিক যুগে ঋষিদের ঈশ্বরোপসানার পথেরই ব্যাখ্যা করিয়া অপূর্ব মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। আত্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থখানিতে আলোর সন্ধান পাইবেন।

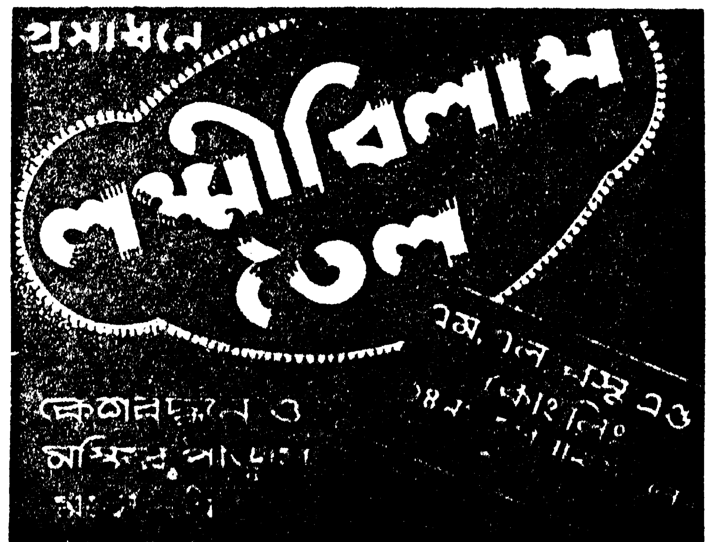
২২৮।৫০

পাখনা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী—৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা।

রূপকথার ধরণে গল্প বলেও জীবনের গভীর কথাকে সাহিত্যে রূপায়িত করা যায় কিনা, ভাষা-শিল্পের যাদুকর অচিন্ত্যকুমার সে পরীক্ষা করেছিলেন প্রথম তাঁর 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'তে। সে পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর 'পাখনা' উপন্যাস হিসেবে আরও বেশী সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে। অবশ্য কেউ যদি 'পাখনা'কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলতে দ্বিধাবোধ করেন তা হলে তাঁর সঙ্গে একমত হতে আমাদের আপত্তি নেই। কারণ, সার্থক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে এত বেশী সৃষ্টি হয়ে গেছে যে গঠনপ্রণালীর বিচারে 'পাখনা'কে তাদের সমপংক্তিতে বসানো সম্ভব হয়। তবে জীবনের যে দু একটি বিশেষ ধারা, যা গভীরতায় অতল, তার বিশ্লেষণ সত্যিই কোনো গল্পের সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না, এবং এ বই-এ লেখক একটি মেয়ের জীবনের সেই বিশেষ ধারাটিকেই অল্প কথায় ধরতে চেয়েছেন। সুতরাং গঠনে যতই কেন না গল্প-ধর্মী হোক, অন্তত বিষয়বস্তুতে 'পাখনা' উপন্যাস সৃষ্টির সংধর্মকে বজায় রেখেছে।

বইটিতে একটা বিশিষ্টতা এই যে চরিত্র-রূপায়ণে অচিন্ত্যকুমার ঠিক গতানুগতিকতাকে অবলম্বন করেন নি। অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক প্রায় সর্বত্রই অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, পাঠকদেরও খানিকটা সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ, কথোপকথনেই উদ্দিষ্ট চরিত্রকে সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে বলে আঞ্চলিক ভাষাকে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন লেখক, এবং তার ফলে যদি পাঠক বাচন ভঙ্গিটিকে সঠিকভাবে ধরতে না পারেন তা হলে সমস্ত বইটির মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হবেনই।

কিন্তু সচেতন পাঠকের কাছে কেবল তুফানি নয়, মুচিপাড়ার বাচ্চা মেয়েগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠবে। তার অর্থ, মানুষই নয়, ভদ্রলোক বর্জিত অস্পৃশ্য পাড়ার গল্প লিখতে গিয়েও অচিন্ত্যকুমার সত্যি কথা লিখেছেন, বাজিয়ে বাজিয়ে গল্পই বলেন নি। ২১৫।৫০



ইন্দ্রজিতের আসর

বার্নার্ড শ'র মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে প্রথম দফায় যেসব কথা আমার মনে হয়েছিল, গত সংখ্যায় আপনাদের কাছে তা নিবেদন করেছি। সেদিন বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে আমাদের এখানে একটি আলোচনা সভা হল। সাহিত্যরসিক বন্ধুবর্গ শ'-এর সাহিত্য নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন। বলা বাহুল্য, সে আলোচনা অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছিল। আমি নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি হলেও সে আলোচনায় যোগদান করেছিলাম। যে কথা ক'টি সেদিন বলেছিলাম, তা আপনাদের কাছে পুনরায় পেশ করছি। আমার এ বক্তব্য শ'এর সাহিত্য সম্পর্কে নয়, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। অবশ্য সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। যদ্দুর মনে পড়ছে গায়টে বলেছিলেন—

A great writer must first of all be a great man and after that a writer.

তিনি গর্ব করে বলতেন, নেপোলিয়নের সঙ্গে যখন প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন নেপোলিয়ন তাঁকে দেখবামাত্রই বলে উঠেছিলেন— Here's a man; কই বলেন নিতো— Here's a poet, তাই যদি বলতেন তো মামুলি কথা হ'ত; মানুষটাই বড় কথা। কীর্তির চাইতে কর্তা বড়, কাব্যের চাইতে কবি।

বার্নার্ড শ তাঁর অনতিদীর্ঘ নাটকের অতি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য সম্যকভাবে বুঝবার পক্ষে সে ভূমিকাও যথেষ্ট নয়। শ'এর বিরাট ব্যক্তিত্বই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের ভূমিকা। ভূমিকা কথাটা দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। দেখা গেছে, যাঁরা যুগ-প্রবর্তক সাহিত্যিক, তাঁরা নিজ নিজ দেশের সংকট মুহূর্তে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে ভূমিকা রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা নয়, চিন্তানায়কের। জাতির স্খলন পতন ত্রুটির প্রতি তাঁরা সর্বসাধারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাতির ভ্রান্তি মোচন করেন। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে শত হস্তেন দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন, সেই যুগেই মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে Great Sentinel আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বাদেশিকতার আতিশয্যে আমাদের মন যখন পশ্চিম-বিমুখী হয়ে উঠছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ সেই আত্মঘাতী ভ্রান্তি থেকে দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছিল। একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা, তখনই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংস্কৃতির আবাসভূমি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বিশ্ব এবং বিশ্বকবি দুটো কথাই উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সত্যই বিশ্বস্ত প্রহরীর কাজ করেছেন, একথা আজকের দিনে আর কেউ অস্বীকার করে না। বার্নার্ড শ'কেও সেই অর্থে Great Sentinel বলতে আমাদের বাধা নেই। এঁদের বলা যেতে পারে Keeper of world conscience, পৃথিবীর ইতিহাসে এধরণের দৃষ্টান্ত আরো দেখা গেছে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময় পরাজিত জার্মেনীর আবহাওয়া যখন উগ্র স্বাদেশিকতায় বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, গায়টে তখন সে আন্দোলন থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। জার্মেন এবং ফরাসী সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক বৃহত্তর সভ্যতার সৃষ্টি হবে এই আশা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। এমন অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে, নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইউরোপের সব দেশ একতাবদ্ধ হোক, তাহলেই ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হবে। সেদিন তিনিও উপহাসের পাত্রই হয়েছিলেন। তাঁর ঈপ্সিত শান্তি আজও পর্যন্ত ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বার্নার্ড শ কিছুদিন আগে বলেছিলেন, Stalin is the main prop of world peace, এর মধ্যে গায়টের কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই উক্তি থেকে শেভিয়ান অত্যুক্তিটুকু বাদ দিলে শাদা মানেটা এই দাঁড়ায় যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে বিরোধিতা না করে সহযোগিতা করাই বিশ্বশান্তি রক্ষার সহজতম উপায়। বলা বাহুল্য, ইংরেজ তাঁর এসব উক্তি আদৌ পছন্দ করেনি। রোমা রোলাঁকেও অনুরূপ মতামতের জন্য নিজ দেশে লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সহজে কেউ খোয়াতে চায় না। এঁরা যে সত্যিকারের শান্তিপ্রয়াসী ছিলেন, তার প্রধান প্রমাণ তাঁরা শান্তির খাতিরে খ্যাতির মোহও ত্যাগ করেছিলেন।

সুবিশাল ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আমি গায়টে, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ এবং বার্নার্ড শ'কে এক পর্যায়ে স্থাপন করেছি। এঁরা নিজ নিজ দেশে এবং যুগে সদাজাগ্রত প্রহরীর কাজ করেছেন। সাহিত্যিক হিসাবে শ'এর চাইতে বড় সাহিত্যিক হয়তো এযুগেই আরো জন্মগ্রহণ করেছেন। আপাততঃ ওসব তর্কের মধ্যে প্রবেশ করবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু মতিভ্রান্ত মানুষকে সুমতি দেবার জন্য তিনি যতটা চেষ্টা করেছেন, এমন খুব কম লোকেই করেছেন। বলা বাহুল্য, ফল যতটা হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। সে দোষ শ'এর নিজের। কথার ধারে কথার ভার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কথার ধারও চাই ভারও চাই। তাঁর সমগোত্রীয় আর যে ক'জনার নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা মানুষের অর্জিত বুদ্ধি (knowledge) আর সহজাত বোধ (emotion)-এর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। শ' কেবলমাত্র বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছেন। ভুলে গিয়েছেন যে, কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধ হওয়া যায় না। knowledge আর wisdom এক কথা নয়।

মানুষের পরমায়ু সম্বন্ধে বরং কথা বলা চলে, সাহিত্যের পরমায়ু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলা কঠিন। এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শ'এর সাহিত্যের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বেশি সুদূরপ্রসারী। ডাঃ জনসন যে এক যুগে সাহিত্য সম্রাটের মর্যাদা পেয়েছিলেন, সেটা সাহিত্যের জোরে নয়, ব্যক্তিত্বের জোরে। সে হিসাবে বার্নার্ড শও এযুগে ইংলণ্ডের সাহিত্য সম্রাট। অবশ্য তাঁর সাম্রাজ্য কতদিন টিকে থাকবে, তা অনেকটা নির্ভর করবে তাঁর বসওয়েল-এর উপর।

সেক্সপীয়ার যে যুগে নাটক লিখেছিলেন, সে যুগ নাটকের পক্ষে অনুকূল ছিল, আমাদের এযুগ নাটকের পক্ষে প্রতিকূল। শ' সেক্সপীয়ারের সমকক্ষ কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ। এলিজাবেথীয় যুগে রেনাসাঁসের প্রথম সংঘাতে ইংলণ্ডের সদাজাগ্রত জীবন নাটকীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর Sophisticated জীবন নাটকীয় সম্ভারে সমৃদ্ধ নয়, নাট্যকেপনার ভাবে বিড়ম্বিত। শ' এই নাট্যকেপনাকেই নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত করেছেন। তাঁর নাটকে জীবনের গভীরতা না থাকতে পারে, কিন্তু উপরকার মেকি জঞ্জাল অপসারণের আপ্রাণ চেষ্টা আছে।

রায়বাহাদুর চুণীলাল

গত শনিবার রাত্রে দিল্লীতে 'সরগম' ছবিখানির মুক্তি-মহরতে উপস্থিত থাকাকালে ফিল্মিস্তানের কর্ণধার রায়বাহাদুর চুণীলাল অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। এই আকস্মিক ঘটনা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, সমগ্র ভারতীয় চিত্রশিল্পকেই প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে। কারণ রায়বাহাদুর কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারই ছিলেন না, সমগ্র ভারতীয় চিত্রশিল্পেরই তিনি ছিলেন সঞ্চালক।

রায়বাহাদুরের সঙ্গে চিত্রজগতের পরিচয় ১৯৩৬ সাল থেকে, যে বছর হিমাংশু রায় তাঁকে সঙ্গী নিয়ে বম্বে টকীজের পত্তন করেন। ধরতে গেলে ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের শিল্পোচিত ভিত্তি সেই থেকেই। তার আগে চলচ্চিত্র ব্যবসা ছিলো এলোমেলো, সুপরিকল্পিত ধারা অনুসরণে পরিচালিত হতো না। চুণীলালই প্রথম চলচ্চিত্রকে হিসেবী পথ ধরে চলবার প্রেরণা দেন। তাঁর চেয়ে প্রাচীন চিত্র-প্রযোজক আছে, কিন্তু তাঁর চেয়ে কীর্তিমান কেউ নেই।

হিন্দী ছবির ভারতময় প্রচলনের জন্যে রায়বাহাদুরের ব্যবসা-নীতিরই হচ্ছে সবচেয়ে কৃতিত্ব। হিমাংশু রায় ভারতীয় ছবিকে অভিনব রূপদান করেন, চুণীলাল তাকে বাজার চালু করেন এবং এমনি কৃতিত্বের সঙ্গে যে অল্প দিনের মধ্যেই বম্বে টকীজের নাম ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বম্বে টকীজের ছবিই হিন্দী ছবির নিরিখ হয়ে দাঁড়ায়। তবেই আমল থেকে হিন্দী ছবি ভারতময় বাজার করে নিতে সক্ষম হয়। চুণীলাল কলকাতায় আসেন বম্বে টকীজের প্রথম ছবি 'জোয়ানী কী হাওয়া' ছবি বেচতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় এমনি বাজার ঠিক করে নেন যে, তারপর 'অচ্ছুৎ-কন্যা' থেকে একের পর এক করে 'কিসমৎ' পর্যন্ত বম্বে টকীজের প্রায় প্রত্যেকখানি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে হিন্দী ছবির চাহিদা পাকা করে দিয়েছে। যুদ্ধের সময় তিনি বম্বে টকীজ থেকে আলাদা হয়ে ফিল্মিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে তিনি নতুন উদ্দীপনা এনে দেন। বম্বে টকীজে থাকাকালে তিনি যে নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন, এবারেও সেই নীতি ধ'রেই তিনি এগিয়ে চললেন এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পকে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলেন। নিজের কৃতিত্বেই তিনি ক্রমে ভারতীয় চিত্রশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপাত্র হ'য়ে দাঁড়ান। ভারতীয় চিত্রশিল্পকে করের বোঝা থেকে রেহাই দেবার জন্যে এবং অন্যান্য সহযোগিতা লাভের জন্যে তিনি গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসছিলেন। চুণীলাল ছিলেন চলচ্চিত্রশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। ছবি তৈরী ব্যাপারেও যেমন, ছবিকে ঠিক মতো বাজারস্থ করাতেও তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে এসেছেন, প্রেরণা দান ক'রেছেন। মৃত্যুকালে তিনি মোশন পিকচার্স সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ছিলেন এবং বম্বে সেন্সর বোর্ডে চিত্রশিল্পের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন, চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটিতেও তিনি সভ্য নির্বাচিত হন।

রঙ্গজগৎ

আসামে 'সম্পদ'-এর চিত্রগ্রহণ

পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী ছবি 'সম্পদ'-এর চিত্রগ্রহণের জন্যে পঁয়ত্রিশজনের একটি দল নিয়ে আসাম যাত্রা ক'রেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কাহিনীটির পনেরো আনা ভাগ ছবিই আসামে গৃহীত হবে। এই দলে শিল্পীদের মধ্যে আছেন সমীরকুমার (অশোককুমারের জ্ঞাতি ভ্রাতা), প্রণতি ঘোষ, ডোরা স্যামুয়েল, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জীবন গাঙ্গুলী, বলাই মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, লক্ষ্মী রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। গিরীন চক্রবর্তীর সুরযোজনায় ছবির গানগুলি ইতিপূর্বেই রূপশ্রী স্টুডিওতে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

"সহোদর"

বীমা প্রতারণার উদ্দেশ্যে হত্যার দানবীয় ষড়যন্ত্র, প্রেম ও ঈর্ষ্যা, ত্যাগ ও লোভের সংঘর্ষের পটভূমিতে রূপায়িত বিচিত্র ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব—এই নিয়েই সূচিত হয়েছে সুধীর দাস প্রযোজিত "সহোদর" ছবিখানির আখ্যানভাগ।

পরিচালক চিত্ত বসু ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ কাজ সমাপ্ত ক'রেছেন এবং অচিরেই ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে।

সিপ্রা, মনোরমা, কেতকী, জহর, কমল, শুভেন, হরিধন, গুরুদাস প্রভৃতির সমাবেশে ছবিখানির ভূমিকালিপিও বলিষ্ঠ, সুর সংযোজনা ক'রেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ছবির মহরৎ

গত জগদ্ধাত্রী পূজোর দিন ভবানী কলা মন্দিরের তৃতীয় অবদান "অনুরাগ"-এর মহরৎ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করছেন যতীন দাস।

'বহুরূপী'-র নাট্যোৎসব

গত সোমবার, ২৭শে নবেম্বর ব্রিস্টল হোটেলে 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায়ের অধিনায়ক-বৃন্দ একটি মধ্যাহ্ন ভোজে সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের নাট্য আন্দোলনের মূল সূত্র বিবৃত করেন। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত 'বহুরূপী'-র তরফ থেকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'বহুরূপী' এদেশে free theatre আন্দোলনের প্রবর্তনা ক'রতে চায়। চিরাচরিত ধারায় এখনকার মঞ্চ যেভাবে চলেছে তাকে বদলানো দরকার আধুনিক মনের প্রয়োজনে এবং 'বহুরূপী' সেই চেষ্টাই ক'রছে। শ্রী সেনগুপ্ত জানান যে, আগেকার মতো নাটকে শুধু রাজার জয় গাইবার দিন চলে গিয়েছে, এখন সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বাস্তবপন্থী করা দরকার—এই কারণেই 'বহুরূপী'-র একটা নিজস্ব মঞ্চের প্রয়োজন এবং সেজন্য জনসাধারণের সাহায্য দরকার।

'বহুরূপী'-র অধিনায়কদের অন্যতম শ্রীশম্ভু মিত্র জানান যে, জাতিকে চিনতে হয় তার মঞ্চশালা থেকে, কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে মঞ্চ সেকেলে হ'য়ে পড়েছে এবং যেভাবে চলেছে তা লোককে মোটেই তৃপ্তি দিতে পারছে না। তাই প্রকৃত নাট্যকার, অভিনয়শিল্পী, চিত্রশিল্পী সকলে মঞ্চ থেকে সরে রয়েছেন। 'বহুরূপী' তাই নতুন ধারায়, নতুন পরিবেশে এবং এখনকার মানুষের মনের উপযোগী নাটক পরিবেশন করার চেষ্টা ক'রছে। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' থেকে এদেশে যে নাট্য-ধারার সূত্রপাত 'বহুরূপী' সেই ধারাকেই অবলম্বন ক'রে চলবে, বাস্তবানুগ পথ ধ'রে।

'বহুরূপী'-র সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন যে, 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীনতা সমুজ্জ্বল, একটা নতুন ধারা প্রবর্তনের শক্তি তাদের আছে, তাদের মধ্যে নতুন ভাবধারায় উদ্দীপিত এমন প্রতিভা আছে যা শেখবার জন্যে তিনি নিজেই এই সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হ'য়েছেন।

'বহুরূপী' আগামী রবিবার, ৩রা ডিসেম্বর থেকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে পর পর ছ'টি রবিবার তিনখানি নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা ক'রছে। এ সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মধ্যে আছেন মনোরঞ্জন, কালি সরকার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি। ৩রা ডিসেম্বর অভিনীত হবে তুলসী লাহিড়ী রচিত নাটক 'পথিক'। এর পরের দু' সপ্তাহে অভিনীত হবে যথাক্রমে শ্রীসঞ্জীব রচিত 'উলুখাগড়া' ও তুলসী লাহিড়ীর অপর নাটক 'ছেঁড়া তার'।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী শেষ সময় ভারতীয় দ্বিতীয় টেস্ট দল হইতে অসুস্থতার অজুহাতে এম জি সিন্ধেকে বাতিল করিয়া অভিজ্ঞ কুশলী খেলোয়াড় সি এস নাইডুকে দলভুক্ত করিয়া সত্য সত্যই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিবর্তন ভারতীয় দলের শক্তি-বৃদ্ধিতে অনেকখানি সাহায্য করিবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই প্রসঙ্গে অপর দুইজন তরুণ খেলোয়াড়ের পরিবর্তে আর এস মোদী ও সুটে ব্যানার্জিকে দলভুক্ত করিলে ভারতীয় দল রীতিমত শক্তিশালী হইত, ইহাও না বলিয়া আমরা পারি না। ভবিষ্যৎ ভারতীয় টেস্ট দল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে তরুণ খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন অন্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেও আমাদের করে নাই। যে বিরাট ভ্রমণ-তালিকা গঠন করা হইয়াছে তাহাতে তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়দের বৈদেশিক খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলিয়া শক্তি-অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে ইহা বলিতে আমরা বাধ্য। দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ফলাফলের পর আমরা আশা করি, খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী এইভাবে টেস্ট দলে তরুণ খেলোয়াড়দের গ্রহণ-নীতি বর্জন করিবেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল

আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কমনওয়েলথ দলের সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। এই খেলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল গঠন উপলক্ষে বোম্বাইতে এক ট্রায়াল খেলার আয়োজন করা হয় ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাদের প্রতিনিধিদের প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধমত ভারতের ২৭টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় মোট ৪১ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ৪১জন খেলোয়াড় লইয়া দুইটি দল গঠন করিয়া খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী সকল খেলোয়াড়কে তিন দিন নেটে প্র্যাকটিশ করিতে দিয়া তাহার পর দল গঠন করিয়াছেন। এই নির্বাচকমণ্ডলীতে ছিলেন এইচ এন কন্ট্রাক্টর, অধ্যাপক ডি বি দেওধর, এম দে, বিজয়সারথী, অধ্যাপক এস রায় ও এস মাথাই। যে সকল খেলোয়াড় লইয়া ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় দল গঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন খেলায় সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একমাত্র পুণার আর আর শেলকেই অজ্ঞাতনামা। কি হিসাবে ইনি দলভুক্ত হইলেন বুঝা ভার, তবে খেলার মাঠেই ইঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। দলের অধিনায়ক হইয়াছেন বোম্বাইয়ের ইরাণী ও সহ-অধিনায়ক হইয়াছেন বাঙলার কৃতি তরুণ খেলোয়াড় পি রায়। নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

বে-রাম ইরাণী (বোম্বাই) অধিনায়ক, পি রায় (কলিকাতা) সহ-অধিনায়ক, এস পি গুপ্তে (বোম্বাই), সি টি পতঙ্কর (বোম্বাই), ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা), দীপক সোধান (গুজরাট), ওমপ্রকাশ (বেনারস), সি ডি গোপীনাথ (মাদ্রাজ), আর সিন্দু (দিল্লী), এন টি আদিশেষ (মহীশূর), আর আর শেলকে (পুণা) দ্বাদশ ব্যক্তি:— নাজির আলী খাঁ (ওসমানিয়া)।

অতিরিক্ত:—আনন্দমোহন গুপ্ত (বেনারস), এম ডি ইরাণী (বোম্বাই)।

কমনওয়েলথ দলে খেলোয়াড় পরিবর্তন

কমনওয়েলথ দলের দুইজন খেলোয়াড় জ্যাকসন, স্পুনার শীঘ্রই দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। দলের অধিনায়ক এখনও বাতরোগ মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। দুইটি টেস্ট খেলাতেই তিনি যোগদান করিতে পারিলেন না। কমনওয়েলথ দল পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে খেলোয়াড়-দের অসুস্থতার জন্য। সেইজন্য বিলাত হইতে ডবলিউ এইচ এইচ সার্টক্লিফ, এইচ স্টিফেনসন ও আর আর ডোভেকে আনাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইঁহারা তৃতীয় টেস্ট খেলার পূর্বেই ভারতে পৌঁছিবেন।

ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে আরও কয়েকজনের যোগদান সম্ভাবনা

ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের যোগদানের হিড়িক ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বপ্রথম পরলোকগত বোলার অমর সিং যোগদান করেন। ইহার পর হইতে লালা অমরনাথ, বিনু মানকড়, বিজয় হাজারে প্রভৃতিকে যোগদান করিতে দেখা যায়। গত বৎসর উক্ত তিনজন খেলোয়াড় ছাড়াও পি আর উমিরগার যোগদান করেন। দাদু ফাদকারও ইঁহাদের দলভুক্ত হন। পরে সি এস নাইডু যোগদান করেন। বর্তমানে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, বরোদার টেস্ট খেলোয়াড় গুলেমহম্মদকেও ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের একটি ক্লাব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইন্দোরের এইচ গাইকোয়াড় ও বোম্বাইয়ের তরুণ খেলোয়াড় জি এস রামচাঁদেরও যোগদান সম্ভাবনা আছে। ভারতে পেশাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন না হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে এইভাবে একের পর এক যোগদান করিতে হইতেছে। ইহাতে অনেকেই বলিবেন বৈদেশিক অভিজ্ঞতা ইঁহাদের চৌখস খেলোয়াড়ে পরিণত করিবে। কিন্তু আমরা মনে করি, ইহা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে একদিন চরম দুর্গতির কারণ হইবে। বিদেশের আবহাওয়ায় তরুণ খেলোয়াড়গণকে এইরূপ এক বিকৃত অবস্থা দান করিবে যে ইঁহাদের অনেককেই দেশের বিভিন্ন খেলায় যোগদান করা একদিন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ভারতে পেশাদারী ব্যবস্থা ক্রিকেট মহলে প্রবর্তন করিতে এমন কি বাধা থাকিতে পারে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। বিদেশে অর্থ উপার্জন করিয়া অস্তিত্ব রাখিবার জন্যই যে এই সকল খেলোয়াড় যাইয়া থাকেন ও যাইতেছেন ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ঠিকভাবে চিন্তা করিলে ইহা ভারতের জাতীয় জীবনের কলঙ্ক বলিয়া কি অভিহিত করা যায় না?

++++++++++++++++++++++++++++

ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১০ উইকেটে পরাজিত

বোম্বাইয়ের কমনওয়েলথ ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। খেলার ফলাফল:—

কমনওয়েলথ দল: ১ম ইনিংস ৪৭৭ রান ও ২য় ইনিংসে কেহ আউট না হইয়া ৪৯ রান।

ভারতীয় দল:—১ম ইনিংস ৮২ রান ও ২য় ইনিংস ৩৯৩ রান।

[বিস্তৃত বিবরণ আগামী সপ্তাহে আলোচিত হইবে]

++++++++++++++++++++++++++++

টেনিস

নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশনের খেলোয়াড় ক্রমপর্যায় গঠনকারী কমিটি ১৯৪৯-৫০ সালের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকা পাঠে সাধারণে আনন্দিত হইবেন যেহেতু দিলীপ বসু পুনরায় সর্বশ্রেষ্ঠ বা এক নম্বর ভারতীয় খেলোয়াড় বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের চিন্তা হইতেছে নূতন খেলোয়াড়গণ দলে দলে কেন টেনিস খেলায় যোগদান করিতেছেন না বা ভারতীয় টেনিস খেলার ক্রমোন্নতিতে সাহায্য করিতেছেন না? ইহার প্রকৃত অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মাত্র ৫টি খেলোয়াড়কে লইয়া ক্রমপর্যায় তালিকা গঠন করা ও স্বীকার করা যে মহিলা খেলোয়াড়গণ নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় মহিলা বিভাগের ক্রমপর্যায়-তালিকা গঠন করা সম্ভব হয় নাই, ইহার কোনই যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। টেনিস খেলা প্রচুর ব্যয়বহুল খেলা এবং তাহা যদি দরিদ্র ভারতীয় ক্রীড়া উৎসাহীদের পক্ষে খেলা সম্ভব না হয় তবে স্পষ্টই প্রচার করা উচিত। ইহাতে লজ্জিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। আর্থিক দুরবস্থার জন্য পৃথিবীর বহু দেশেই টেনিস খেলার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও যাইবে। সুতরাং এইটুকু ক্রমপর্যায় গঠনকারী কমিটি কেন উল্লেখ করিতে পারিলেন না আমাদের বোধগম্য হয় না। নিম্নে ভারতীয় পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) দিলীপ বসু
(২) সুমন্ত মিশ্র
(৩) নরেন্দ্র নাথ
(৪) নরেশ কুমার
(৫) জি বসন্ত

এশিয়াটিক টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ

সম্প্রতি লাহোরে পাকিস্থান দল টেনিস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় এশিয়াটিক টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের খ্যাতনামা দুইজন খেলোয়াড় দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই। দিলীপ বসু গতবারের এশিয়াটিক চ্যাম্পিয়ান, সুতরাং তাঁহার না যোগদান খুবই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মিশর হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফিলিপাইন, তুরস্ক, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছেন। পরিচালকগণের কর্মকুশলতার সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। কারণ ইঁহারা "ওয়াক ওভারের" এক নূতন রেকর্ড প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে সকল বৈদেশিক খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ড্রবনীর নামই উল্লেখযোগ্য।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৭শে নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে পার্লামেণ্টের কংগ্রেস দলের সদস্যগণের এক ঘরোয়া বৈঠকে দেশের খাদ্যাভাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেন। প্রকাশ, কংগ্রেস দল ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী গভর্নমেণ্টের কাজ করিয়া যাওয়া উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নেপালের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার জন্য নেপালের দেশরক্ষা মন্ত্রী সিনিয়র কম্যাণ্ডিং জেনারেল কৈশের সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী জেনারেল বিজয় সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা একখানি বিশেষ বিমানযোগে নয়াদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

গতকল্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতী কলাভবনের (শান্তিনিকেতন) অধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল বসুকে সাহিত্যে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি প্রদান করা হয়।

নেপালী কংগ্রেস বাহিনী গতকল্য বীরগঞ্জের প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উপলদাং দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

২৮শে নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান তাঁহাকে আর একবার করাচী পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক, ১৫৩ক ধারা এবং পূর্ব পাঞ্জাব নিরাপত্তা আইনের ২৪ক ধারা অচল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আকালী নেতা মাস্টার তারা সিং-এর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা বাতিল করিয়া বিচারপতিগণ অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

২৯শে নবেম্বর—আকালী নেতা মাস্টার তারা সিংকে অদ্য কর্নাল সাব-জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নেপালী কংগ্রেস বাহিনী পশ্চিম নেপালের ভৈরব দখলের চেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করিয়া আসিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের উদয়পুরগড় নেপালী কংগ্রেস বাহিনী কর্তৃক অধিকারের সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

৩০শে নভেম্বর—কলিকাতা পুলিশ সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম এল এ, মোল্লা জান মহম্মদ, মিঃ সাদ্দাতুল্লা খাঁ এবং মিঃ খয়রুল আনাম খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাদিগকে প্রেস আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১লা ডিসেম্বর—অদ্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কোরিয়া পরিস্থিতির অবনতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রকাশ, অবস্থা জটিল আকার ধারণ করিয়া বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় প্রধান মন্ত্রী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

খাদ্য মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী অদ্য পার্লামেণ্টে চিনি সম্বন্ধে নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া বলেন যে, উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিতে উৎকৃষ্ট গুড়ের সর্বোচ্চ মূল্য মণ প্রতি ১৯৲ টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তেহট্ট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গতকল্য ভারত সীমান্তবর্তী তেহট্ট থানার (নদীয়া জেলার অন্তর্গত) ভাটাপাড়া গ্রামে পাকিস্থান এলাকা হইতে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে শ্রীদেশবন্ধু গুপ্তের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে নির্ভীকভাবে ও সততার সহিত নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণের নিকট আবেদন জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁহাদের দায়িত্বসমূহ স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করেন।

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামে ক্ষেতের কলাই-এর মালিকানা স্বত্ব লইয়া উদ্বাস্তু ও মুসলমানদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন উদ্বাস্তু নিহত হইয়াছে।

পুলিশ বিবেকানন্দ নগরে এক উদ্বাস্তু জনতার উপর প্রথমে লাঠি এবং পরে একবার গুলী চালায়। বিবেকানন্দ নগর টালীগঞ্জ থানা এলাকায় একটী উদ্বাস্তু পল্লী। পুলিশের গুলী চালনার ফলে কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই ঘটনা সম্পর্কে ২৬ জন উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩রা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় যে কোন ভাবে হস্তক্ষেপ করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি এইরূপ আশ্বাস দেন যে, সরকার অথবা অপর কোন পক্ষ হইতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

কটকের সংবাদে প্রকাশ, ১১ বৎসর বয়স্ক একটি ক্ষুদ্র রাখাল বালক কিভাবে সমস্ত প্রকার রোগ নিরাময় করিতেছে, গত কয়েকদিন যাবৎ উড়িষ্যার রাজধানীতে উহাই সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এই বালক এখন নেপালী বাবা নামে পরিচিত।

৪ঠা **ডিসেম্বর**—অদ্য সোমবার রাত্রি ১-৩০ মিনিটের সময় ঋষি শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত পক্ষকাল যাবৎ তিনি মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে **নভেম্বর**—উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ায় মার্কিন ব্যূহের উপর কম্যুনিস্টদের ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সংগ্রাম করিতে করিতে মার্কিন বাহিনী অদ্য আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে মার্কিন ২৪শ ডিভিশনের সৈন্যদল পশ্চিম উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ চংজু বন্দর ত্যাগ করিয়াছে।

কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধিগণ অদ্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগদান করেন।

২৮শে নভেম্বর—জেনারেল ম্যাকআর্থার তাঁহার দুইজন প্রধান সেনাপতিকে টোকিওতে এক জরুরী বৈঠকে আহ্বান করিয়াছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুই লক্ষাধিক চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে এক সম্পূর্ণ নূতন যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, কোরিয়ায় চীন কম্যুনিস্টদের হস্তক্ষেপ এক্ষণে প্রকাশ্য ও জঘন্য ধরণের আক্রমণে পরিণত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারেন অস্টিন বলেন, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ নিরাপত্তা পরিষদকে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইতে হইবে।

চীনা কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ উড সিউ চুয়ান নিরাপত্তা পরিষদে সংক্ষেপে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, তিনি কোরিয়া সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন। তিনি বলেন, ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ চীনার পক্ষ হইতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফরমোজায় বে-আইনী ও অপরাধজনক আক্রমণের অভিযোগ জানাইতে আসিয়াছেন।

২৯শে **নভেম্বর**—উত্তর-পশ্চিম কোরিয়ায় তুষারাবৃত রণাঙ্গনে চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর ৮০ হাজার সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা

৩০শে নভেম্বর—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য ঘোষণা করেন যে, কোরিয়ায় আণবিক বোমা ব্যবহারের বিষয়ে বরাবর চিন্তা করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, আণবিক বোমা ব্যবহার করিতে হইবে কিনা, তাহা অবশ্য রণক্ষেত্রস্থিত মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষগণের উপর নির্ভর করে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, আণবিক বোমা ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না।

মার্কিন অষ্টম আর্মির সৈন্যদল চংচন নদীর তীর হইতে ২০ মাইল দূরে রচনা করায় অদ্য কার্যতঃ কম্যুনিস্ট বাহিনী কর্তৃক চংচন দখলের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনদিনব্যাপী প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর উত্তর-পশ্চিম কোরিয়া রণাঙ্গনে কম্যুনিস্টদের চাপ শিথিল হইয়া আসিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১লা ডিসেম্বর—কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী অনতিবিলম্বে বিমানযোগে ওয়াশিংটন যাত্রা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২রা ডিসেম্বর—জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার অদ্য টোকিওতে বলেন যে, তিনি আণবিক বোমা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রার্থনা করেন নাই। তিনি বলেন যে, বর্তমানে কোরিয়ায় চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনী ও রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ চলিতেছে।

৩রা ডিসেম্বর—অদ্য উত্তর কোরিয়ার প্রাক্তন রাজধানী পাই-অং-যং হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যাপসারণ আরম্ভ হইয়াছে এবং শীঘ্রই নগরী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইবে।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।॰ আনা বার্ষিক—১৩৲, ষাণ্মাসিক—৬॥॰
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩৲, ষাণ্মাসিক—৬॥॰ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 16th December, 1950. [৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপালের পরিস্থিতিতে ভারত

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্ সম্প্রতি পার্লামেণ্টে সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারত সরকার নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন শাহকে নেপালের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীজওহরলালজীর এই ঘোষণার দ্বারা একথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, ভারত সরকার নেপালের রাণা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু-মহারাজাকে স্বীকার করেন না। ভারত সরকার এইভাবে নেপালের শিশু মহারাজাকে সরাসরি অস্বীকার করিয়া তথাকার জনমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নেপালের সমস্যা উত্তরোত্তর যে আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে ইহাই যথেষ্ট নহে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর অভিমত এই যে, নেপাল শক্তিশালী এবং উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাঁহারা তাহা দেখিতে চান এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, সাবেকী ধারায় নেপালের শাসনতন্ত্র যদি এখনও চলে, তবে সেখানে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বলা বাহুল্য, নেপালের শান্তি এবং নিরাপত্তার সঙ্গে ভারতের স্বার্থ বিশেষভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। শ্রীজওহরলালজী সেকথাও স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নেপালের স্বাধীনতাকে আমরা যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়া থাকি; কিন্তু তাই বলিয়া যাহাতে ভারতের সীমান্ত ভাগের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, আমরা নেপালে কোনক্রমেই তাহা ঘটিতে দিতে পারি না। বস্তুত ভারত অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে চাহে না এবং অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতাতে সে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছুক নহে। কিন্তু নেপালের স্বাধীনতা বলিতে তথাকার রাণা-গোষ্ঠীর স্বৈর-শাসনকেই যদি স্বীকার করিতে হয় এবং সেই শাসনকে স্বাধীন শাসনতন্ত্রের মর্যাদা দিয়া ভারতকে নেপালের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দর্শক থাকিতে হয়, তবেই তো বিপদ। আমরা আশা করি, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই। তিনি নিজেও বলিয়াছেন—নেপালে প্রকৃতপক্ষে কোন শাসনতন্ত্রই নাই। প্রধান মন্ত্রীর একথা সর্বাংশেই সত্য। মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারই সেখানে অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারে জাগ্রত নেপালের অধিবাসীরা এমন অবস্থা আর কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না। স্বাধীনতা মানুষের প্রাথমিক অধিকার। সেই অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা যখন নেপালের জনসমাজে একবার জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন পশুশক্তির বলে তাহাকে দমিত করা সম্ভব হইবে না। ফলত নেপালের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা বলিতে ভারত সরকার নীতিগতভাবে নেপালের এই স্বৈর-শাসনকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না এবং নেপালের বর্তমান শাসকবর্গের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনাও তাঁহাদের সেই ভিত্তিতে চালানো উচিত নয়। আমরা আশা করি, ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূত্রে নেপালের শাসকবর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা ইহার মধ্যেই সে অভিজ্ঞতা যথেষ্টরূপে অর্জন করিয়া ফিরিয়াছেন। বস্তুত নেপালের স্বৈরশাসনের অবসান যাহাতে ঘটে, সেই পক্ষে ভারত সরকারের সমগ্র নীতি সুস্পষ্টরূপে এবং সাক্ষাৎ-সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য। এতদুভয়ের মধ্যে মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থায় যদি ভারত সরকার রাজী হন, অর্থাৎ যদি রাণা শাসন আরও কিছুদিন টিকিয়া থাকে, নির্বিবাদ মীমাংসার দায়ে ভারত সরকার যদি এমন ব্যবস্থায় সম্মত হন, তবে আমরা স্পষ্ট ভাষাতে এই কথাই বলিব যে, নেপালের শান্তিও যেমন তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সেইরূপ বর্তমান অবস্থায় ভারতের নিরাপত্তার পক্ষেও তাহা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং রাণার দলকে নেপালের গদি ছাড়িয়া সোজাসুজি সরিয়া দাঁড়াইতে বলাই ভারত সরকারের পক্ষে সর্বতোভাবে সমীচীন এবং নীতিসম্মত পন্থা হইবে; ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গর্ব

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা জগতের মূলে যে পরম তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহা যে অ-বৈজ্ঞানিক নহে, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমানে যে জড়বিজ্ঞানের এত গর্ব করে, তাহা যে তাহার কাছে কত অকিঞ্চিৎকর, শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাব সেই সত্য উন্মুক্ত করিয়াছে। প্রাণহীন হইবার পরও দেহ কিরূপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিকৃত এবং সতেজ ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাছে ইহা নিশ্চয়ই রহস্যস্বরূপ অনুমিত হইবে। বস্তুত পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরীক্ষা-প্রমাণের দ্বারা এ-সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং একথা অবিশ্বাস করাও চলে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল্য না আছে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না কিংবা অন্ধ কুসংস্কারকেও আমরা বিজ্ঞানের উপর স্থান দিতে বলিতেছি না।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, বিজ্ঞানের নামেও আমরা যেন নূতন রকমের কুসংস্কারের মধ্যে গিয়া না পড়ি এবং মানব-জীবনের মূলে যেসব সনাতন সত্য রহিয়াছে, যে সত্য রহিয়াছে মানুষের আত্মায় নিষ্ঠিত, অর্থাৎ যে বৃহৎ সত্যকে মানুষ মননের মূলে উপলব্ধি করিতে পারে, আমরা যেন তাহাকে উপেক্ষা না করি এবং জড় সুখ উপভোগের প্রবৃত্তিকেই বড় করিয়া না দেখি। মানুষের দেহ অবশ্য নশ্বর, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কিন্তু প্রাণশক্তি যে অপরিম্লান এবং বৃহতের সেবা বৃহতের উদ্দেশে নিজকে দানেই পরিম্লান সেই প্রাণের যে মহিমা শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবে এই তাৎপর্য সম্ভবত প্রকটিত হইল এবং পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের উপর ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রাধান্যই এতদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাধনায় অভিনব সত্যের ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর সেই ইঙ্গিত রহস্যময় আকর্ষণে জনমানসে নবীন সাধনার চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ মহামানব ছিলেন, তিনি ছিলেন মহাযোগী। তিনি সত্য-দ্রষ্টা সাধক ছিলেন। এমন মহাপুরুষকে পাইলে যে কোন দেশ, যে কোন জাতি গর্ব করিতে পারে; বাঙলা দেশ শ্রীঅরবিন্দের জন্মভূমি, এজন্য বাঙালী আমরা, আমরাও গর্ব করিব। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহামানবের স্মৃতি পশ্চিম-বঙ্গে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইবে, আমরা ইহাই আশা করি। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের নিজের দিক হইতে এইরূপ স্মৃতিরক্ষার কোন প্রয়োজনই নাই; কারণ সুদীর্ঘ তপঃপ্রভাবে পুণ্যময় জীবনে তিনি যে পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যে সত্য সম্বন্ধে মানব-সমাজকে তিনি নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। কিন্তু তাঁহার দিক হইতে প্রয়োজন না থাকিলেও শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতি-রক্ষার প্রয়োজন আমাদের দিক হইতে আছে; এদেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভিব্যক্তি, এদেশের সনাতন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিশ্বমানবতার আদর্শের দিক হইতে সে প্রয়োজন রহিয়াছে এবং আমরা যেন তৎসম্পর্কিত কর্তব্য প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ না হই।

সাধুর পীড়ন

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ খান আবদুল গফফর খান পাকিস্থানের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। সম্প্রতি তাঁহার নিদারুণ স্বাস্থ্য-হানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দিল্লীস্থ আফগান-দূত সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, বার্ধক্যজনিত ব্যাধির সহিত খান সাহেব তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও হারাইয়াছেন। সীমান্ত গান্ধী কারাবাসে আদৌ অনভ্যস্ত নহেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কারাগারে তাঁহার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানের কারাগারে তাহাই ঘটিয়াছে। একান্ত বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় এই যে, পাকিস্থানের শাসকগণ তাঁহার কারামুক্তির কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে পাকিস্থানের জনগণের বিক্ষোভ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ সবই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত সীমান্ত গান্ধীর প্রতি নির্যাতন সমগ্র পাঠান সমাজকে পাকিস্থানের প্রতি উত্তরোত্তর বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার ফলে পাকিস্থানের পক্ষে সীমান্তের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতেছে। খান সাহেব সাধু প্রকৃতির পুরুষ। তিনি মহানুভব এবং উদারচেতা পুরুষ। এইরূপ একজন পুরুষের অকারণ নির্যাতনে পাকিস্থানের গৌরব অবশ্যই বাড়িতেছে না; বিশেষত তিনি পাকিস্থানেরই একজন উন্নতি-কামী ব্যক্তি। এমন একজন সাধু ব্যক্তির পীড়নে পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যে অপরাধ অর্জন করিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস আছে, একদিন তাঁহাদের সেজন্য পরিতাপ করিতে হইবে এবং তাঁহারা বুঝিবেন যে, খান আবদুল গফফর খানকে বন্দী রাখিয়া তাঁহারা পাকিস্থানেরই মহা-অনিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু সময় থাকিতে তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি

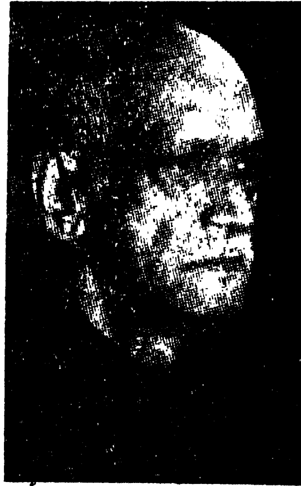
জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের মহামেধ-ভূমি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম বলি এইখানেই পড়িয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, শিখের রক্ত একধারায় মিশিয়া এই ভূমি হইতে পরকীয় প্রভুত্ব উচ্ছেদের দুরন্ত বীর্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তি, বীভৎস হিংস্রতা এই ভূমিতে নগ্নতা লাভ করিয়া নিজের নিঃশেষের পথই উন্মুক্ত করিয়াছিল। ভারতের আত্মা দুরন্ত বীর্যে এবং প্রদীপ্ত মহিমায় জাগিয়া উঠিয়াছিল; মহামানব মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে রুদ্রবাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। এই স্থানে ভারতের যেসব বীর সন্তান আত্মদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বলা বাহুল্য, এই কাজ পূর্বে হওয়াই উচিত ছিল; সে যাহা হোক, এতদিন পরেও ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সরকার এ বিষয়ে যে উদ্যোগ হইয়াছেন, ইহাও সন্তোষের বিষয়। আমরা আশা করি, দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মদাতা সন্তানগণের উপযুক্ত স্মৃতি প্রতিষ্ঠার কার্য বিলম্বিত হইবে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতে বিভিন্ন স্থানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মান সূচক যেসব মূর্তি বা স্মৃতি চিহ্ন আছে সেগুলিও অবিলম্বে অপসারিত করা দরকার। হলওয়েল মনুমেণ্ট ইতঃপূর্বেই অপসারিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি ফলকটি এতদিন পর্যন্তও দেওয়ালে বসা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহা অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়; কিন্তু গড়েরমাঠে জাঁদরেলদের মূর্তিগুলি আর কতকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তির স্পর্ধা ফলাইতে থাকিবে এবং ভারতের মর্যাদার উপর আঘাত করিবে, আমরা কর্তৃপক্ষকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

পূর্ববঙ্গের সুনাম

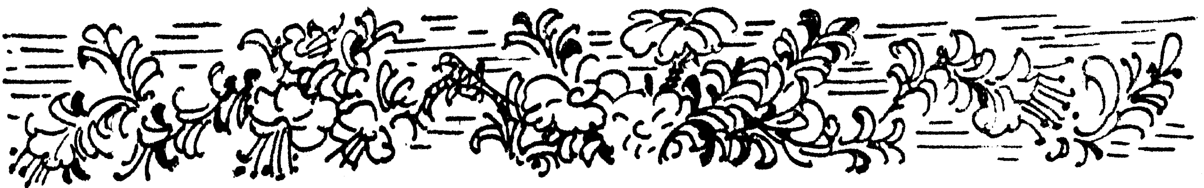
পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন সম্প্রতি চট্টগ্রামে সফরে গিয়া জনসভায় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ বৎসরের প্রথমার্ধে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে পূর্ববঙ্গের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় হিংস্রতা এবং বর্বরতার স্মৃতি আমরা পুনরায় উদ্দীপ্ত করিতে চাহি না, পরন্তু পূর্ববঙ্গের সুনামের প্রতি যে সেখানকার শাসকবর্গের এতদিন পরে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এইজন্যই আমরা সুখী হইয়াছি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এই যে সুনাম, এই বস্তুটি কি, কিসের জন্য পূর্ববঙ্গের সুনাম। বিগত শতাব্দীকাল ধরিয়া পূর্ববঙ্গের মনীষা বাঙলার সংস্কৃতিকে উদার করিয়াছে এবং বৃহত্তর আদর্শের সাধনায় প্রাণশক্তির উদ্দীপনায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ববঙ্গ অ-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বদেশপ্রেমের অগ্নিময় সাধনার উদ্বোধন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দুর্জয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ সেই পূর্ববঙ্গ শ্মশানভূমিতে পরিণত, উৎসবের বাতি সেখানে নিভিয়া গিয়াছে, আনন্দের উৎস সেখানে শুকাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু ইসলাম রাষ্ট্রের একটা ফাঁকা গৌরব এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া অসহায় অনর্থকর আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এ বেদনা কে বুঝিবে? পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার-গণ এই অবস্থার সত্যই প্রতিকার করিতে সমর্থ কিনা, এ বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সুনাম সত্যই যদি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে মানবতার বৃহত্তর আদর্শকে সেখানে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক অন্ধতাকে উৎখাত করিতে হইবে।

আচার্য যদুনাথ

গত ২০শে অগ্রহায়ণ আচার্য যদুনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার ব্যবস্থা করেন। আচার্য সরকারের এই সম্বর্ধনায় সমগ্র বাঙলার সশ্রদ্ধ সহযোগিতা এবং সমর্থন ছিল, সন্দেহ নাই। আচার্য সরকার আজ বয়োবৃদ্ধ; কিন্তু বহু পূর্বেই স্বদেশে এবং বিদেশের বিজ্ঞজন-সমাজে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন। এই বয়সেও জ্ঞান-সাধনায় তাঁহার বিরতি নাই। বাণী তাঁহার এই বরপুত্রকে নিত্য তাঁহার কৃপা-কটাক্ষে জ্ঞানানন্দ ধারায় সঞ্জীবিত রাখিতেছেন। আচার্য সরকারকে বৃদ্ধ বয়সে স্বজনের বহু বিয়োগ-ব্যথা পাইতে হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞান-সাধনায় তাঁহার নিষ্ঠা এবং উদ্যম তাহাতে বিচলিত হয় নাই। ভারতের ইতিহাসের মোগল শাসন-যুগের উপর তাঁহার প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও গবেষণা যে আলোকসম্পাত করিয়াছে, তাহা মৌলিকত্বমূলক। এই সাধনায় তিনি নিজেই একক কীর্তিলাভ করেন নাই। বিদেশী পণ্ডিত সমাজে ভারতের কীর্তিও বর্ধিত করিয়াছেন। ভারত আজ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে; সুতরাং বর্তমানে তাহার দায়িত্ব আরও বেশি। পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে আমাদের আর চলিবে না। জগতে নিজেদের মর্যাদা যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদিগকে আগাইয়া যাইতে হইবে। জগৎকে নূতন কিছু দিতে হইবে। সেদিনের সম্বর্ধনার উত্তরে আচার্য সরকার এই মহান্ দায়িত্বের সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। আচার্য সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন, 'বিগত ষাট বছরে আমাদের মধ্যে মৌলিক গবেষণার এত উন্নতি হইয়াছে, তাহা যে ইউরোপীয়দের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও সঙ্ঘর্ষের ফলে, একথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে এই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সঙ্ঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকর্ষ যাহাতে দিন দিন নিকৃষ্ট এবং অবশেষে বিনষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে আমাদের শিক্ষক ও চিন্তা-রাজ্যের নেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ গবেষণার জীবন-মন্ত্র হইতেছে ক্রমোন্নতি, এই রাজ্যে কোথায়ও পৌঁছিয়া সন্তুষ্টিতে বসিয়া থাকিবার, ঘুমাইবার সাধ্য নাই; থামিলেই



অবনতি এবং পশ্চাদগমনেই মৃত্যু। সেইজন্য আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে স্থায়ী এবং প্রাণবন্ত করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সাধনা নিষ্কাম এবং নিষ্কাম বলিয়াই তাহা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, অনন্ত রসের উৎসের অভিমুখে সে সাধনা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে উন্মুখ করিয়া তোলে। রহস্যের উপর নূতন রহস্য সাধকের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। পদ, মান বা ডিগ্রীর লোভ রসের এই উৎসের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। স্বার্থের সংকীর্ণতায় জ্ঞান-সাধনার ঐশ্বর্যকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে, তাহার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ হইয়া যায় এবং এইভাবে সত্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আচার্য এ জ্ঞান-সাধনার এই রহস্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার সমগ্র জীবন জ্ঞান-সাধনার এই অনন্ত এবং অভিনব রস-সত্তার দিকটাই আমরা উন্মুক্ত দেখিতে পাই। এই রস তাঁহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, প্রাণধর্মে পূর্ণ করিয়াছে। শোককে ভুলাইয়াছে এবং বার্ধক্যকে বিদূরিত করিয়া যৌবনের বল দিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সাধনার মধ্যে রস-ধর্ম সম্পর্কের যদি উপলব্ধি না ঘটে, তবে সে সাধনা প্রজ্ঞানময় হইতে পারে না এবং তাহাতে অভিনবত্ব বা মৌলিকত্ব কিছু থাকে না। জগৎকে কিছু দিতে হইলে নিজকে দিতে হইবে এবং সাধনার মধ্যে অনন্ত রস-সত্তার সন্ধান যিনি লাভ করিয়াছেন, নিজকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। যে দেশে এবং যে জাতির মধ্যে এমন জ্ঞান-সাধকদের আবির্ভাবের ধারাটি বজায় থাকে, সেই জাতি এবং সেই দেশই জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হয়; নতুবা শুধু অতীতের দোহাই দিয়া কোন দেশ বা কোন জাতি জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। আচার্য সরকার গুরুপরম্পরা এই জ্ঞান-সাধনার ধারাটি বজায় রাখিবার উপর জোর দিয়াছেন, তাঁহার নিজের জীবনই ইহার আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের ক্ষেত্রেই যে আচার্য সরকারের অপরিসীম পাণ্ডিত্য নিবদ্ধ, এমন কথা বলা চলে না। সুদীর্ঘকাল বহুভাবে তাঁহার মনীষার সম্পর্কে তিনি বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙলার এই জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীর অশীতিতম বর্ষ পূর্তিতে তাঁহাকে সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দেশের পক্ষ হইয়া আবশ্যক যে কর্তব্য, তাহাই প্রতিপালন করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবার জন্য আচার্য সরকারের যে অবদান, বাঙালী-মাত্রেই সেজন্য আচার্য সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। বস্তুত আচার্য সরকার বর্তমান যুগে সমগ্র বঙ্গের জ্ঞান-গুরুবর্গের মধ্যে অন্যতম। আমরা এই উপলক্ষে আচার্য সরকারকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।



ইন্দ্রজিতের আসর

আপনি ঘরের মানুষে ছেড়ে দূরের মানুষের কথা বলছেন—রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক বেশ একটু অনুযোগের সুরেই কথাটা বললেন। ওঁর অনুযোগের কারণটা আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন। আমি পর পর দু' সংখ্যায় বার্নার্ড শ সবন্ধে লিখেছি অথচ বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছুই বলিনি, এইটেতে ওঁর মনে লেগেছে। বার্নার্ড শ এবং বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এমন দরের সাহিত্যিক যে আমার মতো ব্যক্তির লেখা না লেখার উপরে তাঁদের মান অপমান নির্ভর করে না। তাঁরা দুজনেই আত্মনির্ভর এবং স্বপ্রতিষ্ঠ। কাজেই ভদ্রলোক অতটা বিচলিত না হলেও পারতেন। কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে। বার্নার্ড শ কি সত্যি দূরের মানুষ? উনি বললেন আগে একথা আমার মনেই হয় নি। তাঁকেও আমি ঘরের মানুষ বলেই জানতুম। প্রতিবেশী কে? পাশের বাড়ির যে ব্যক্তির সংগে কলকাতায় নিত্য আমার ঝগড়া হয় সে, না সেই সাগর পারের মানুষ with whom I converse day by day?

তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন বিভূতিবাবু শুধু ঘরের মানুষ নন, তিনি ঘরোয়া মানুষ। শ আর যাই হোন ঘরোয়া মানুষ নন। বুদ্ধিজীবী মানুষ কখনো ঘরোয়া প্রকৃতির হন না। ঘরেও নহে পরেও নয় যে জন আছে মাঝখানে শ সেই মানুষ। তিনি একেবারে in the thick of the fight, বাইরে থেকে তিনি ঘরকে আন্দোলিত করেছেন।

শ' ভুবনজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন তার প্রধান কারণ তিনি যে ভাষায় লিখেছেন তা সমস্ত বিশ্ববাসীর ভাষা। বিভূতিবাবুর লেখা যদি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হত তবে তাঁর খ্যাতিও নিঃসন্দেহে সাগর পারে পৌঁছাত; চাই কি স্টকহলম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত।

বিভূতিবাবু শুধু যে নির্ভেজাল বাঙলা ভাষায় কথা বলেছেন এমন নয়, এমন ষোল আনা বাঙালী মনের কথা আর কেউ বলেনি। বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ দেশী বিদেশী মাল-মসলার বিচিত্র সমাবেশে যে সাহিত্যিক ভোজের আয়োজন করেছেন তা স্বাদে গন্ধে ফারপো কিম্বা পেলিটির বাড়ির ভোজের অনুরূপ। আর বিভূতিবাবুর পরিবেশন একান্তভাবে বাঙালী মনের রুচি-রোচন। স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূজাতে। তৃপ্তি আমিষেও হয় নিরামিষেও হয়। প্রয়োজন শুধু রন্ধন-কৌশলের আর সযত্ন পরিবেশনের।

বাঙলা দেশের এমন অন্তরঙ্গ ছবি, বাঙালী কিশোর মনের এমন অনবদ্য চিত্র বাঙলা সাহিত্যে আর নেই। বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া অপুর ধরেছে কায়া। অপুর জীবন কাহিনী অনেকাংশে প্রত্যেক বাঙালী কিশোরের জীবন চরিত। মনে আছে বিচিত্রায় যখন এই বিচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছিল তখন এর কত কত টুকরো অংশে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছি। বিভূতিবাবু কতকাংশে আমারও জীবন-চরিতকার, আপনাদেরও অনেকের। দারিদ্র্যের ছাপ আমার সর্ব অঙ্গে মনে। দারিদ্র্যকে সকলে কুৎসিৎ বলেই জানে; কিন্তু একদিকে স্নেহ মমতা করুণায় অপরদিকে হীনতায় অপমানে মিশিয়ে সে জিনিসের মধ্যেও যে কি অপূর্ব রস লুক্কায়িত থাকে বিভূতিবাবু তার সন্ধান দিয়েছেন। জীবনের কঠিনতম অভিজ্ঞতার মধ্যে যিনি রসের সঞ্চার করতে পারেন তিনিই মহাকবি; পথের পাঁচালী মহাকাব্য। অপুর্বায়ণ আমাদের রামায়ণ।

পাশ্চাত্য সমালোচক কবিদের আখ্যা দিয়েছেন—unacknowledged legislators of the world, তাঁরা যে ন্যায়ের বিধান দেন সে বিধান কাজির বিচারের জন্য নয়। তাঁরা মানবিক নীতির নতুন মানদণ্ড প্রণয়ন করেন। সে মানদণ্ডে যে মা সন্তানের জন্য চুরি করে সে চোর নয়, সাধু; যে মিথ্যা বলে সে সত্যবাদী। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বজয়ার ভীতি কম্পিত মন—জীবন ভর কত চুরি, কত অপমান চুরি যদি না করতেন, অপমান যদি না সইতেন তবে মা হওয়া তাঁর মিথ্যা হত। সোটো চুরির অপবাদ থেকে অপু দুর্গাকে রক্ষা করেছে, আমাদের যদি নীতি-জ্ঞান থাকে তবে আমরাও তাকে অপবাদ থেকে রক্ষা করব। এই নীতি বিভূতিবাবু শিখিয়েছেন। ভালোবাসার সাতখুন মাপ।

দাশু রায়ের পাঁচালী যদি আজ পর্যন্ত টিকে থাকে তবে বিভূতিবাবুর পাঁচালি নিরবধি কাল বেঁচে থাকবে—গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। আজকের মানুষে নিরবধি কালে বিশ্বাস করে না। রুচির পরিবর্তনে কালের যাত্রায় ছেদ পড়ে। Norwagian Saga (পাঁচালি) এই যুগে চলে না, বিংশ শতাব্দীতে Forsyte sagar চলন। নিরবধি কাল বলতে আমি বুঝি বাঙালী যতদিন বাঙালী থাকবে। বাঙালী কতদিন বাঙালী থাকবে সেইটেই আজকের প্রশ্ন। যে বনগাঁ অঞ্চলের চিত্র তিনি আমাদের এঁকে দিয়েছেন সে বনগ্রামে একদিন হয়তো বনও থাকবে না, গ্রামও থাকবে না। ঘেঁটু ফুল আর বনমল্লিকার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে না, গুলঞ্চের লতা, শ্যাওড়ার ডাল আর বাঁশঝাড়ের বেড়াকে ঝেঁটিয়ে ফেলে তার জায়গায় কারখানায় চিমনীর উদ্ধত শির আকাশে তুলে দাঁড়াবে। বন্য প্রকৃতি বৃক্ষ-বল্কলের আবরণ ত্যাগ করে শহুরে ঝুলকালি মেখে ভদ্র সাজবেন। সেদিন কি বাঙালী আর বাঙালী থাকবে? বাঙলার বনভূমি যেদিন বদলাবে সেদিন তার মনোভূমি কি অবিকৃত থাকবে? নিশ্চিন্দিপুর যদি না থাকে তো অপুও থাকবে না। কারণ কলকাতা সহরে অপুর জন্ম হতে পারে না। মহাসমুদ্র যেমন পৃথিবীর স্থলভাগকে গ্রাস করতে পারে নি, আশা করছি শহুরে সভ্যতাও বাঙলা দেশের সংকীর্ণ গ্রামাঞ্চলকে একেবারে গিলে খেতে পারবে না।

বর্তমান সভ্যতার প্রধান নগর আমেরিকা। নগরের নাগপাশ ওকে যেমন বেঁধেছে এমন আর কাকেও নয়। এমন কারখানা-কলঙ্কিত দেশ দুনিয়াতে আর দুটি নেই। এই সেদিন আমেরিকার একজন নব্য লেখকের সংগে আলাপ হল। শুনে আশান্বিত হলাম ওদেশেও নগর-বিমুখতা দেখা দিচ্ছে। তিনি নিজেও একজন গ্রামাঞ্চল-ভক্ত। আমেরিকার গ্রামা-জীবন নিয়ে তিনি বহুসংখ্যক গল্প লিখেছেন। বলছিলেন, I am not an urban animal. এই কথাটি বিভূতিভূষণের মুখে যেমন মানায় এমন আর কারো মুখে নয়।

বিভূতিভূষণ যে পথের সন্ধান দিয়েছেন সে পথে রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়া বয় না, পদে পদে তর্কের কুশাগ্রে খোঁচা খেতে হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি আনে ক্লান্তি, হৃদয়বৃত্তি দেয় শান্তি। সেই ছায়া ঘন মেঠো পথে বাঙালীর মন বারম্বার ফিরে আসবে, তবেই সে বাঁচবে। যিনি পথের সন্ধান দেন তিনি নমস্য। পথিক বিভূতিভূষণকে নমস্কার করি—পথের সাথী নমি বারম্বার, পথে চলার লহ নমস্কার।

শ্রীঅরবিন্দ

নির্মাল্য বসু

জমাট অন্ধকার পথ ভুলিয়ে দিয়েছে বারবার;
চোখের সামনে মেলে দিয়েছে সংশয়ের ধূসর যবনিকা;
ভয় পেয়ে মুখ ফিরিয়েছি ও-পাশে
মৃত্যু সেখানেও ভ্রূকুটি করছে দুর্বাশার মতো।
সেখানেও বিষিয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস বায়ুঃ
অন্ধকারের পাকচক্রে ঘুরে মরছি
নিত্যদিনের ঘূর্ণীপাকে।
আর কি যেন হাতড়েছি সেই পঙ্ককুণ্ডে—
কি যেন খুঁজেছি প্রাণপণেঃ
একটু আলোঃ একটু বাতাসঃ একটু আলো!
শিশুর বুঝ-না-মানা জিজ্ঞাসার মতো
হাত বাড়িয়েছি আকুল আবেগে
কোথায় মুক্তি? কোথায় অমৃত? কোথায় সূর্য?

তারপর তুমি এসে দাঁড়িয়েছো—
আমার বিহ্বল দৃষ্টির সীমাকে ছাড়িয়েঃ
অসহ্য আনন্দ, বেদনায় স্তম্ভিত করে দিয়ে
আমার সমস্ত অনুভূতিকে!
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম তোমার ক্ষমাসুন্দর,
যোগীশ্বর মূর্তি!
শুচিস্মিত স্নিগ্ধ মহিমায়
আকাশ-প্রদীপের মতো জ্বলে উঠ্‌লো
আমার চোখের সামনে।
অনন্ত প্রজ্ঞার আলোকে ধীরে ধীরে উন্মীলিত হোল
তোমার তৃতীয় নয়ন,
সহস্রদলে,
উন্মীলিত হোল—মানস-সরোবরের
সহস্রদল শ্বেত-পদ্মে!

অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তুমি হাত বাড়ালে
এ মাটির থেকে লক্ষ যোজন দূরে . . . .
অনেক উঁচুতে . . . . অনেক উঁচুতে . . . .
অত দূরে—অত উঁচুতে পৌঁছলো না আমার দৃষ্টি,
পৌঁছলো না আমার কল্পনা।
তোমার সে জ্যোতির্ময় ভুজের দিব্যচ্ছটায়
শুধু ঝলসে গেল আমার চোখ,
নিশ্চল হয়ে গেল আমার চোখের তারা।
তোমার হাত উঠ্‌লো কতদূরে? সে কতদূরে?
সে কি জীবন-মরণের সীমারও বাইরে . . .
যে সীমাকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি কোনদিনও?

সেদিন শুধু দেখেছি—বুঝিনি কিছুই।
আজো বুঝিনি—কিন্তু উপলব্ধি করেছি
তোমার অনির্বচনীয়তার মধ্যে
যে সত্যকে, যে সাধনাকে
তারি মধ্যে তুমি শশ্বত করে রেখে গেলে
আমাদের মৃত্যুময় জীবনকে অমরত্বের অনির্বাণ
মহিমায় :—
রূপকথার সোনার-কৌটোয় লুকিয়ে রাখা
প্রাণ-ভোমরার মতো।
তার ক্ষয় নেই।
তার ভয় নেই॥

অরবিন্দ-প্রয়াণ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এখানে আর নাবিক নেই, এখানে শুধু তাই
তরংগের মির্নাত শুনে নৌকা আর জড়ো
হয় না, হতে চায় না। এর পাহাড়ে উৎরাই
এখন শুধু, চড়াই নেই কোথাও। থরো থরো
কাঁপছে জরাজীর্ণ মনঃ এবার ছোটো বড়ো
শিরীষ-ডাল ঢাকছে মুখ, আবার কোনোদিন
হয়তো কেউ দেবে না প্রাণ। স্মৃতির রিণিরিণ্
এখনো তবু এখনো বাজেঃ 'যাত্রা সুরু করো'।

এখানে কেউ বলেছে কবেঃ 'যাত্রা করো সুরু
অমর্ত্যের তীর্থে চলো, হৃদয়ে নিতে হবে
অনির্বাণ আলোর দান। দিনের সংগীতে
ব্যর্থ হবে অন্ধকার।' হায়, সে-বৈভবে
ব্যথার হিম জমছে আজ, শুধুই ঝরা ঝরু
রিক্ততরু ঝরায় পাতা। ক্ষুব্ধ দ্বীপ শীতে॥

বিপ্লবী অরবিন্দ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ



"বন্দে মাতরম্" সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দ (১৯০৬-০৭)

সাধারণ লোকের সহিত রাজনীতি সম্পর্কে স্বল্পকাল প্রকাশ্য যোগাযোগ রাখিয়া তাহাদেরই নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকার সৌভাগ্য ক্বচিৎ কোনও মহাপুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ অদ্বিতীয়।

তাঁহার বিলাতে প্রবাসকালের সহিত জনসাধারণের কোনও যোগ ছিল না, বরোদা অবস্থানকালে (১৮৯৩-১৯০৬) প্রথম কয়েক বৎসর বরোদার ব্যাপার লইয়া নিষ্ঠার সহিত অকুণ্ঠ শ্রমে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, অতুলনীয় জ্ঞানে বরোদাধিপতির কাজে, বরোদার শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। বাঙলা, তথা ভারতের রাজনীতির কর্ণধাররূপে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে তিনি আপনাকে সর্বপ্রকারে উপযুক্ত করিয়া লইতেছিলেন, সহকর্মীদের সাহায্যে বাঙলায় আপনার কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন, কিন্তু তখনও জনসাধারণ তাঁহার নামেরও কোনও পরিচয় পায় নাই। তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া লোকচক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই কংগ্রেসে। তাহার পর রাজনীতি সংক্রান্ত কাজে তিনি বরোদা হইতে কলিকাতা আসেন ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে। ২০শে জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ মনোনয়ন করিয়া বিলাতে ইংরেজ সরকারের নিকট দলিলপত্র পাঠাইয়া দেন এবং ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে বঙ্গ বিভাগের কাজ শুরু হইয়া যায়। জুলাই মাসে যখন বঙ্গ বিভাগের কথা প্রকাশিত হয়, তখন দেশের মধ্যে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইল এবং ৭ই আগস্ট তারিখে কলিকাতা টাউন হলে বিরাট সভায় তাহার প্রতিবাদ ধ্বনিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ বাঙালীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই প্রথম প্রকাশ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আর উপস্থিত ছিলেন, স্যার গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, সখারাম, কৃষ্ণকুমার, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি তদানীন্তন বাঙলার প্রায় সমস্ত মনীষী।

প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে লোকসমক্ষে দার্শনিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, বক্তা ও বামপন্থী দলের গুরুরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। তিনি ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে পৌঁছেন। সেখানে প্রায় একমাস আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল ছদ্মনামে পণ্ডিচেরী পৌঁছান। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর অর্থাৎ ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১৯০৯ সালের শেষ, প্রকৃত হিসাবে মাত্র পাঁচ বৎসর তাঁহাকে আন্তরিকভাবে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯০৮ সালের ২রা মে হইতে তিনি আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে কারাগারে বন্দী অবস্থায়, বাহিরের সকল যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৯০৯ সালের ৬ই মে পর্যন্ত অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। সুতরাং সংক্ষিপ্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরও এক বৎসর নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটাইতে বাধ্য হইয়া, তিনি মাত্র চার বৎসর কাল ভারতের প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

এই অল্পকাল রাজনীতির দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে থাকিয়া তিনি স্বাধীনতার যে প্রেরণা ভারতবাসীকে দিলেন, তাহারই শক্তিতে ভারতবাসী ১৫ই আগস্ট (শ্রীঅরবিন্দের জন্ম তারিখে), ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে বহু মনস্বী, ত্যাগী, নির্ভীক, অসমসাহসিক দেশপ্রেমিকের জীবনেতিহাস লিখিত আছে। কিন্তু এই স্বল্পকালের জন্য রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখিয়া জাতীয়তার সংগ্রামে এত অপরিমেয় শক্তিদান করিতে কাহাকেও দেখা

যায় না। কেহ সারা জীবন অপরিসীম ত্যাগ, কল্পনাতীত শ্রম, নিষ্ঠা দিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন, তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোনও এক কোণে আপনার নামের জন্য একটু স্থান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেহ বা অসাধারণ জনপ্রিয়তা, বহু বৎসরের সঞ্চিত সুনাম ক্ষণিকের দুর্বলতায় বিপক্ষ শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বা নিজ বিশ্বাসের বশে সাহায্য করিতে গিয়া ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ বা ফাঁসির কাষ্ঠে, শত্রুর গুলীতে, নির্যাতনে, অত্যাচারে, অনাহারে, সংগ্রামের পথক্লেশে জীবন বিসর্জন দিয়া মানবের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবার দাবী উপস্থিত করিবার অধিকার লাভ



সস্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দ

করিয়াছেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে দুই, চার, দশ, বিশ বৎসর সকল ক্ষতি ও বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বা কিছুদিনের কারাবাস ভোগ করিয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক অনন্ত সমুদ্রে উত্থিত জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? ইতিহাস ঘাঁটিলে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনে কার্যকালের তুলনায় জনপ্রিয়তার উপমা বিরল। তিনি এ-বিষয়ে নিতান্ত একক, তাঁহার সহকর্মীরা বরেণ্য গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ মনীষীরা নানাভাবে লোকসমক্ষে বহু বৎসর ধরিয়া উপস্থিত ছিলেন। নানা কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা নানাভাবে সাধনা করিয়াছেন, সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের দান সম্পর্কিত যশঃ বহুদিনের সাধনারূপে তাঁহারা লাভ করিয়াছেন।

ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবে শ্রীঅরবিন্দের কিভাবে এইরূপ উত্থান অধিকার করা সম্ভব হইল, তাহা চিন্তা করিলে সদুত্তরের অভাব হয় না। সকল অবস্থা পূর্বাপর বিবেচনা করিলে দেখা যায় তিনি এইরূপ একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবার জন্য বহুদিন আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কিভাবে (সাহেব) ডাঃ কে ডি ঘোষের পুত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন তাহাই প্রথম প্রশ্ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উত্তর অতি সরল। ঋষি রাজনারায়ণের দৌহিত্ররূপে মাতৃরক্তে শ্রীঅরবিন্দ দেশভক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

বিলাত প্রবাসের শেষের দিকে যখন ভারতের পরাধীনতার কথা মনে পড়িয়াছে, তখন ইংলণ্ড, গ্রীস, ইতালী প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তাঁহার নিকটে নূতনভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির জীবনী তাঁহার নিকট পঠিত অপর সকল বিদ্যার মধ্যে নূতন আলোকে দেখা দিয়াছে। তাঁহার নিকটে তাহাই ধ্যানধারণা হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতির তীব্রতা অপর সকল সহকর্মী অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং যে কাজেই যখন তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার কায় মন ও বাক্য সমান তালে সহযোগিতা করিয়াছে। এই সকলের সমন্বয় যাঁহার মধ্যে যত বেশী, যত তীক্ষ্ণভাবে তীব্রভাবে যিনি যে কোনও অভাবই অনুভব করিতে শিখিয়াছেন, কর্মপ্রেরণাও তাঁহার সেই অনুপাতে শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। যখন ক্ষেত্র উর্বর হয়, তখন বীজটি পড়িলেই তাহা বলিষ্ঠ হইয়া অঙ্কুরিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও সাধনা তাঁহার দেশপ্রেমকে সতেজ করিয়াছে। তিনি ১৯০৭ সালের ৭ই আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তাঁহার প্রিয় ছাত্রদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কালে বলিলেন যে, তিনি আশৈশব ("The mission that I have taken up from my childhood") ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি বিলাতে অবস্থানকালে ভারতের পক্ষে ছাত্রদিগের মধ্যে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। ১৮৯০ সালে শিক্ষা সমাপনান্তে বরোদার গাইকোয়াড়ের কার্যে যে দুই বৎসর বিলাতে থাকিতে বাধ্য হন, সে সময় তিনি ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছেন। ভারত হইতে প্রেরিত জাতীয়তাবাদী যে সকল পত্র-পত্রিকা সে সময় বিলাতে পৌঁছিত, তাহা সংগ্রহ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বিদেশীর অধিকারে ভারতের দুঃখ-দুর্দশা পাঠে মর্মাহত হইতেন। তখন হইতেই যথাকালে এই অপমানের প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাব নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না।

বাঙলায় আসিবার পূর্বে তিনি বরোদায় যে কয় বৎসর কাটাইয়াছেন, তখনও তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। বাঙলা ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" পড়িয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। "বন্দে মাতরম্" তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশকে 'মা' বলিয়া পূজার ডালি দিলেন। দেশ তাঁহার নিকট সুহাসিনী,



মাণিকতলা বাগানের একাংশ

সুমধুরভাষিণী, সুখদা বরদা, বহুবলধারিণী, রিপুদলবারিণী মাতৃরূপিণী। দেশমাতৃকা তাঁহার নিকট একাধারে বিদ্যা, ধর্ম, হৃদয়, মর্ম ও দেহে প্রাণ। সেই মাটির মা সন্তানের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি; তিনিই আবার দশপ্রহরণধারিণী, বিদ্যাদায়িনী বাণী, তিনিই অতুলা, অমলা, কমলা মা। সেই মাকে যে সন্তান ভুলিয়া থাকে, তাঁহার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে প্রাণপাত করিতে বিমুখ হয়, তাহার জীবন ধিক্। আর শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজো করি।"

তিনি ভবিষ্যতের জন্য কায়িক ক্লেশ বরণ করিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে আসিয়া সাধারণ একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেশভূষা, শয্যা কৃচ্ছ্রসাধনের উপযোগী হইয়া উঠিল। আহার্য সম্বন্ধে কোনও লক্ষ্যই রহিল না।

রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করিয়া লইয়া তিনি বরোদা কলেজ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে সুযোগ পাইয়া মহারাষ্ট্রের "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায় নিজ

রাজনৈতিক মতবাদ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিতে থাকেন। দেশমাতৃকাকে বন্দনা জানাইয়া তিনি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বন্দে মাতরম্ শিরোনামায় দুইটি প্রবন্ধ দেন। তাহার পর দেশের তদানীন্তন শাসন-পদ্ধতি এবং আবেদন নিবেদনের সাহায্যে শাসন-সংস্কার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে থাকেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বস্তু ক্রমশ বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং তিলক মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ ঘটিতে লাগিল। তাঁহার প্রবন্ধের মত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যাওয়ায় ক্রমে "ইন্দু প্রকাশে" প্রবন্ধ প্রকাশে বাধা পাইতে থাকেন এবং ক্রমে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময়েই তিনি সারা ভারতব্যাপী এক তুমুল বিপ্লবের কল্পনা করেন। "বন্দে মাতরম্" হইল মুক্তির মন্ত্র এবং ইহাকে



সুরেন্দ্রনাথ

অবলম্বন করিয়া আসমুদ্রহিমাচল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদের সহায়তা না পাইলেও বিরুদ্ধাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যদি স্বাধীনতা লাভের পথে গভর্নমেণ্ট বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ ও তাহাদের দ্রব্যাদি বর্জন করা স্থির হয়। পরে নিরুপদ্রব ভাবে আইন প্রতিরোধ করা প্রয়োজন হইলে সে পথও অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া স্থির করেন।

ইহার পশ্চাতে তাঁহার আরও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। তিনি বরোদা থাকাকালেই তথাকার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি এবং পারাঞ্জপে পরিচালিত হিন্দু সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ইহা হইতে সহজেই মনে করা যাইতে পারে, তিনি এই সময় হইতেই প্রকাশ্য আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে গুপ্ত সমিতির অবস্থান সমর্থন করিয়াছেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকে ১৯০৩ সালে এবং তৎপূর্বে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিপ্লবের বন্ধুরপথে সহগামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)কে কর্মপন্থা সম্পর্কে সকল পরামর্শ দিয়া ১৯০২ সালে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। গুপ্ত সমিতি স্থাপন করা এবং দেশের যুবকদের শরীর ও চরিত্র গঠন এবং সকল প্রকার নির্যাতন, ত্যাগ, দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করাই তখনকার প্রধান কর্মতালিকা বলিয়া স্থির করেন। যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রের সংযোগে কলিকাতায় মিঃ পি মিত্র ব্যারিস্টারের সাহায্যে গুপ্ত সমিতি চারিদিকে গড়িয়া উঠিতেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ৬ই এপ্রিল বরোদার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তিনি যুগান্তর অফিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া অপূর্ব ত্যাগের পরিচয় দিলেন। দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, আবাল-বৃদ্ধ তাঁহার নাম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিতে লাগিল।

এ সকল পূর্বাপর অবস্থা আলোচনা করিলে সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে যে আসন অধিকার করিলেন, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট সাধনা করিয়াছেন। সিদ্ধি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎকে গভর্নমেণ্টের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অত্যল্পকালের মধ্যে তাহার সংস্রব ছিন্ন করিলেন। ইতোমধ্যে ১৯০৬ সালের ৬ই আগস্ট ইংরাজি "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হয় এবং তিনি তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থার সহিত ভারতবর্ষ পরিচিত হইয়া উঠে। ইংরাজের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে, সে বিষয়ে তিলক মহারাজের সহিত তাঁহার মতের সাম্য হওয়ায় তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন। বাঙলায় ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণের সহযোগিতা লাভ করিলেন। ক্রমে একদিন যাঁহারা ভারতের শাসন-সংস্কার সংঘটিত করিবার জন্য অগ্রণী ছিলেন, সেই দক্ষিণপন্থী বা মডারেট-দিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভারতবাসীর জন্য ভারত এবং পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী যুগান্তর, বন্দে মাতরম্, সন্ধ্যা প্রভৃতি প্রচার করিয়া কেবল ইংরাজের নয়, বহু তদানীন্তন বামপন্থী নেতৃবর্গের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল।

এ অবস্থা বেশীদিন চলিবার নয়। রাজনৈতিক সভাসমিতিতে এই বিরোধ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্র সম্মেলনে বাঙলার নেতৃবর্গের মধ্যে শাসন-সংস্কার বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উহা লাভের জন্য মত ও পথ লইয়া বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবর্গ উপস্থিত; শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার মতাবলম্বী নেতৃবর্গ তাঁহাদের মত গ্রহণ করাইবার জন্য সচেষ্ট। মীমাংসা হইল না। তাহার পর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে সেই প্রশ্ন উঠিল; আবার মীমাংসা হইল না। উপরন্তু দুই দলের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।



ব্রহ্মবান্ধব

তিনি যে মন্ত্র শুনাইলেন, তাহা অভূতপূর্ব, তাহা নূতন, তাহাতে উন্মাদনা আছে, আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপনের নির্দেশ আছে। তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা মানুষের অন্তরে। স্বাধীনতার স্বাদ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, অত্যাচার, কারাগার, ফাঁসিকাষ্ঠ তাহার কাছে অসার, অলীক। ব্রহ্মবান্ধব এ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইংরাজের শাসনকে, ইংরাজের বিচারালয়কে, ইংরাজের রায়কে উপেক্ষা করিয়া ডঙ্কা-নিনাদে দিবালোকে চলিয়া গেলেন। উপাধ্যায় মুক্ত, অন্তরে-বাহিরে মুক্ত, তাঁহাকে শাসন করা, কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ রাখা বিদেশীর সাধ্যাতীত।

স্বাধীনতার সংগ্রামে দুঃখকে অভ্যর্থনা জানাইয়া আলিঙ্গন করাই বীরের ধর্ম। মায়ের কাজে হাসিমুখে যত ক্লেশ সহ্য করা যাইবে শৃঙ্খলের গ্রন্থি, সেই অনুপাতে খসিয়া পড়িবে। গভর্নমেণ্টের সকল অত্যাচার

অনাচার দমননীতি চিত্তের স্থৈর্য ও বল এবং দৈহিক সহন-শক্তির নিকট পুষ্পের ন্যায় কোমল হইয়া উঠিবে। তাঁহার বাণীতে বহু যুবক "বিঘ্ন-বিপদ, দুঃখ-দহন" তুচ্ছ করিয়াছে, মোহের কারা ভাঙিয়া হাসিমুখে মৃত্যু-গহন পার হইয়াছে, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের গান গাহিয়া দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এক কথায় বলিলেন—

"Brave its (repression's) fury! Feel your strength."

আরও বলিলেন—

"Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice."



বালগঙ্গাধর তিলক

আরও অভিনব বার্তা তিনি জগৎকে শুনাইলেনঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা কোনও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করি না। কাহাকেও ঘৃণা করি না। শাসন-যন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিয়া পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে ঢালিয়া তাহা আমলাতন্ত্র হইতে সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত করিতে চাই। বিদেশী শাসক-বর্গের স্থলে আমরা ভারতবাসীকে দেখিতে চাই।" তিনি আরও নূতন কথা বলিলেনঃ

"They lie who say that this aspiration necessitates hatred and violence. Our ideal of patriotism proceeds on the basis of love and brotherhood and it looks beyond the unity of the nation and envisages the ultimate unity of mankind. But it is a unity of brothers, equals and freemen that we seek not the unity of master and serf, of devourer and devoured."

১৯১০ সালে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা কেবল ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের মন্ত্র বলিয়া নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের এক গোষ্ঠী-গঠনের কল্পনা আজ পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচ্য বিষয়।

শ্রীঅরবিন্দ লেখা ও বক্তৃতা সাহায্যে অলস অবশ মনে সাহস দিতে লাগিলেন। অসাড় দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহাইয়া তাহাতে চেতনা দান করিলেন। শিক্ষিত, বিশেষত ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ লোকের মধ্যে, ধনীর মধ্যে, অবকাশবহুল লোকের মধ্যে যে রাজনীতি এতদিন নিবদ্ধ ছিল, তাহা নূতন প্রেরণায় সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, কেবল ধনী ধন দিতে পারে তাহা নয়, যে দরিদ্র সে মায়ের চরণে দারিদ্র্য উৎসর্গ করিয়া নিঃস্ব হইতে পারে। ধন, মান, যশঃ, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সুখ, স্বস্তি, আনন্দ, বিশ্রাম কাহারও কিছু নাই, যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়। এমন কি দেশপ্রেমিকের নিকট জীবনেরও কোনও দাম নাই, যদি তাহা মায়ের চরণে বলি দিবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত না হইয়া থাকে। রাজনীতিক্ষেত্রে 'পালনীয় ধর্ম' সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার পূর্বে গীতায় বলা হইয়াছে; গীতার অনুসরণে কেশরী পত্রিকায় ১৮৯৭ সালের ১৫ই জুন সংখ্যায় তিলক মহারাজ বলিয়াছিলেন—

"গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপন আচার্য ও জ্ঞাতি-দিগকে বধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ফল-লাভের প্রত্যাশা না করিয়া কেহ যদি নিষ্কাম-ভাবে কাজ করে, তাহা হইলে কোনও দোষ হয় না।"

আবার বন্দে মাতরমে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—"রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের নীতি-বোধই আমাদিগকে রাজনৈতিক কাজে পরি-চালিত করিবে।......আক্রমণ অন্যায় হয় তখনই, যখন তাহা প্রয়োগ করিবার সঙ্গত কারণ দেওয়া যায় না। যথেচ্ছাচার বা অসদুদ্দেশ্যে যে বল-প্রয়োগ করা হয়, কেবল তাহাই অবৈধ।"

ইহাতে যিনি যাহাই বুঝিয়া থাকুন, বাঙালী যুবক বুঝিল স্বাধীনতার পথে যাহারা কণ্টক, যাহারা অত্যাচারী, যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের বিনাশে দোষ নেই। স্বাধীনতার



বিপিনচন্দ্র পাল

জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার উৎসাহ শ্রীঅরবিন্দ দিতেছেন, শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে বাঙলার কবি তাঁহার লেখনী ধরিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইল, তাহা বিরল। গদ্য সাহিত্যে "ভবানীর মন্দির, স্বাধীনতার ইতিহাস, বর্তমান রণনীতি শিক্ষা, মুক্তি কোন্ পথে" প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে বজ্রাগ্নি সৃষ্টি করিলেন, তাহা "আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগ-যুগান্তের বিদ্যুৎবহ্নিতে মহামন্ত্রশিখা।" বাঙালীর মনের সকল অন্ধকার, সকল সন্দেহ, সকল ভয় দূর-দূরান্তে বিলীন হইয়া গেল। কবি যুবকদের ডাক দিয়া বলিলেন,—

"আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।



লালা লাজপত রায়

থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র
প্রেত ভয়ে ছি ছি, ডরিবি কে?
মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
অসুর নিধনে কিসের তরাস?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্?
না গণি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান;
সাহসেতে ভর করি সে সাগর,
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
চরণের তলে দলি রিপুগণ,
লভিত নির্বাণে অমর জীবন,
তা'দেরি অংশে তা'দেরি বংশে
জনম; সে কথা স্মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য
আর্যের মত মরিবি কে?

আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
চন্দন-মাখা হাতে দেববালা
নন্দন ফুলে গাঁথি জয়মালা
তোমারে নিরখি রয়েছে অপেখি
সে বিজয়-মালা পরিবি কে?
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?

আবার একজন গাহিলেন:

* * * *

দিব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি
মন্দিরে তোমার;
যায় যাক্ থাক প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া
জাগিব আবার—।
হিমাচল হ'তে দূরে কুমারিকা পার
কাননে প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে
প্রাসাদে কুটীরে;
কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায়
উঠুক জ্বলিয়া,
মা তোর তাপসী-মূর্তি পূজিবে সন্তান
হিয়া রক্ত দিয়া!

কত রূপে, কত তালে, কত ছন্দে বাঙলার কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্
এই বেলা তুই দিয়ে দে না!
ওরে মানের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে
তফাৎ মাত্র এই;—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে;
অমর জীবন পাবিরে ভাই,
জগৎ মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখবে যখন
পরকালের খাতা;—
তখন, তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা!

চারিদিক হইতেই এক সুর ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল—

* * * *

"গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিপদসহ এ জীবন কে বা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

হেমচন্দ্র পূর্বেই গাহিয়াছিলেন, "যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে"; রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতি অজস্র কবিগণের উন্মাদনাপূর্ণ কবিতায় পত্রপত্রিকা ভরিয়া স্তুপ উঠিল। বাঙালী যুবক স্বাধীনতার 'রণ-রঙ্গরসে' উন্মাদ হইয়া উঠিল। অকাতরে প্রাণ বলি দিল, চূড়ান্ত নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিবার জন্য বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল মথিত করিয়া তুলিল।

আলিপুরের ষড়যন্ত্র মামলায় অব্যাহতি পাইয়া কর্মযোগিন্ ও আর্য পত্রিকা সম্পাদনা করিতে করিতে তাঁহার বাঙলা দেশ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইল। মাত্র পাঁচ বৎসর প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া তিনি বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লব আনিলেন চিন্তাধারায়, বিপ্লব আনিলেন কর্মপন্থায়, বিপ্লব আনিলেন ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণায়। তাঁহার এ শক্তি ছিল। অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম ত্যাগ, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, অপার ধৈর্য ও স্থৈর্য, অনাসক্ত জীবন, সবল অর্থপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবত্তায় তিনি দেবোপম। তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন—"সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়।" সুতরাং তিনি ঐহিক সুখকে, সুখভোগের স্পৃহাকে অন্তরে স্থান দেন নাই। তিনি বলিলেন,—

> "আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে, আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার; যাহা বাকী রহিল, তাহা ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দু-শাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর।"

এইরূপ আত্মবিশ্লেষণ এবং তাহার ফলে নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রে আসিয়া যিনি উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত স্থান দিবার জন্য জগৎ উন্মুখ হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, সমস্ত দেশটা তাঁহার পরিবার, আর ভারতবাসী তাঁহার পরিজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

> "ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

অরবিন্দ বলিলেন—

> "পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।"

সবার জন্য এই দরদী প্রাণ ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের পরাধীনতা যখন এই অবস্থার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে, তখন সকল কষ্ট বরণ করিয়া জীবনকে আহুতি দিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন।

স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন। সারা ভারত শ্রীঅরবিন্দের নামে বিহ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার বাণী, তাঁহার নির্দেশ পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। তিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে মঙ্গলময় গ্রহ। তাঁহার জীবনের আলোকসম্পাতে তমিস্রারজনীতে কণ্টকাকীর্ণ পথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই পথে কত যুবক, জনক-জননীর নয়নের মণি, দরিদ্র সংসারের একমাত্র অবলম্বন দেশমাতৃকার ডাকে প্রাণ-বলি দিয়া ধন্য হইয়াছে। তিনি পরবর্তী রাজনীতির সংগ্রামের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। বিদেশী বর্জন, অসহযোগ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিয়া কত অবিশ্বাসীর হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়ের বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগ আত্মাহুতির দুরূহ পথে তিনি চলিয়াছেন, অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন আন্দোলন তাঁহারই প্রদর্শিত পথে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি কাল-স্রষ্টা, তিনি লোকচক্ষের অন্তরালে ধ্যান-নেত্রে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই অকালে বোধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কাল পূর্ণ হইয়াছে। সেই পূজার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতায়। তিনি কর্মক্ষেত্রে আসিবামাত্র সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" আজ প্রতি বাঙালীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জাতির প্রতীক। সকল ক্ষেত্রে যিনি আপনার প্রতিভায়, মহিমায় সমুজ্জ্বল, ভাস্বর, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে সেই বিপ্লবী অরবিন্দের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দেখিবার, তাঁহার বাণী স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ধন্য বলিয়া মনে করেন। এ শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও খাদ নাই, কারণ তাঁহার মধ্যে কোনও দুর্বলতা, কোনও মলিনতা ছিল না। তিনি মহামানব। তাঁহার স্মরণে কৃতজ্ঞতায় চিত্ত আপনি ভরিয়া উঠে। তিনি বলিতেন, "বন্দে মাতরম্", "জয় হিন্দুস্থান।" আমরা বলি, "বন্দে মাতরম্", "জয় হিন্দ।"



অন্তিম শয়নে শ্রীঅরবিন্দ

দিব্যমানব শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

(১)

আলিপুরের সেসন জজের আদালতে সেদিন বেজায় ভীড়।

বিচার হচ্ছে বিদ্রোহী বাঙালীর।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে সাহস পায় যাঁরা, তাঁদের শাস্তি দিতে হবে। নির্মম ভাবে সাজা দিতে হবে দলের নেতাকে। আদর্শ শাস্তি। যাতে ভবিষ্যতে আর তাঁরা মাথা তুলতে না পারে।

কিন্তু এমনি কিছু করলে লোকে খারাপ বলবে। তাই বিচারালয়ে হাজির করা হয়েছে তাঁদের। অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে আনা হয়েছে বহু দলিল-পত্র আর সাক্ষী-সাবুদ। সাক্ষীরা প্রমাণ দেখিয়ে গেল আসামীদের অপরাধের। দলিল-পত্র প্রমাণ করল গোপন ষড়যন্ত্রের। তার উপর সরকারী ব্যারিস্টার অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিলেন আসামী-দের অপরাধ।

এসেসররা নিঃসন্দেহ হলেন যেন।

ফাঁসি আর আটকায় কে?

আত্মপ্রসাদে স্ফীত হলেন সরকার পক্ষ।

অলক্ষ্যে বিধাতা হাসলেন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার। প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত। কিন্তু উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ছেন তিনি।

শুরু করলেন তিনি সওয়াল।

উপস্থিত সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

অনাবশ্যক বাকজাল নেই, উষ্মা নেই, করুণা ভিক্ষা নেই। যা বলছেন, সবটুকু যুক্তি-সহ, সুচিন্তিত এবং প্রয়োজনীয়। তাঁর যুক্তির দীপ্ত আভায় সরকারী ব্যারিস্টারের সমস্ত বাকজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে লাগল।

বিচারপতি সজাগ হলেন। এসেসররা হলেন সতর্ক। অন্যেরা যেন একটু আলোর দর্শন পেলেন। তাই খুশির আভা দেখা দিল তাদের চোখে-মুখে।

আসামীর ব্যারিস্টার তাঁর সওয়াল শেষ করবার আগে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন: "আমি শুধু আজ একথাই আপনা-দের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, একদিন যখন আজকের এই বাদানুবাদ, আজকের এই দ্বন্দ্ব, এই উত্তেজনা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, একদিন যখন আজ যিনি অভিযুক্ত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আর অপরাধীর বেশে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, সেদিন মানুষ এ'র নাম স্মরণ করবে দেশপ্রেমের চারণ কবিরূপে, সেদিন লোকে এ'র স্মৃতির পদতলে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে দেশাত্মবোধের ঋষি বলে, সেদিন এ'রই বাণী ভারতবর্ষের সমুদ্রতট উল্লঙ্ঘন করে দেশ-দেশান্তরে নব নব মানবের হৃদয়ে নিত্য প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।"

মৃত্যুর মতো খাঁটি সত্য কথা উচ্চারণ করে-ছিলেন সেদিন তিনি।

অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী।



চিত্রে দণ্ডায়মান কৃষ্ণধন ঘোষ, তাঁর বামে বিনয়, দক্ষিণে মনোমোহন, উপবিষ্ট শ্রীঅরবিন্দের মাতা, তাঁর ক্রোড়ে সরোজিনী ও পার্শ্বে শিশু অরবিন্দ।

সেদিনের সেই ফাঁসীর আসামী আজিকার দিব্য-মানব শ্রীঅরবিন্দ।

এবং তাঁর সম্বন্ধে মহান্ সত্য-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন সর্বজনপূজ্য, সর্বস্বত্যাগী দেশবন্ধু—তখনকার দিনের সি আর দাশ।

কী অপূর্ব যোগাযোগ!

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! দুজনেই আজ অন্য জগতের অধিবাসী।

দেশবন্ধু গেলেও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন। বাঙালীর আশা ছিল, ভরসা ছিল। কিন্তু সে আশা-ভরসা পূর্ণ হল না।

৫ই ডিসেম্বরের কালরাত্রি চিরস্মরণীয় হয়ে রইল জাতির জীবনে।......

(২)

১৮৭২ সাল।

অদ্ভুত সময় সেটা। জগতের বাতাসে তখন স্বাধীনতা-গানের উষ্ণতা। দিকে দিকে নব-জাগরণের সাড়া। বাঙলার বুকেও জেগেছে নবযুগের স্পন্দন।

এমনি দিনে জন্ম নিলেন ভারতের ম্যার্টার্সান শ্রীঅরবিন্দ।

১৫ই আগস্ট আবির্ভাব হলেন যুগমানব।

৭৫ বৎসর পরে এই তারিখেই হয়েছে ভারতের যুগ পরিবর্তন।

যাক......

অতি আধুনিক এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর বাবা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। আচার-ব্যবহার ছিল তাঁর খাঁটি সাহেবি, কিন্তু হৃদয়টা ছিল খাঁটি বাঙালী। কুসুমের চেয়েও তা কোমল। অন্যের দুঃখ দেখলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসভুক্ত নামকরা ডাক্তার ছিলেন তিনি। পয়সা রোজগার করেছেন প্রচুর। আবার ব্যয়ও করেছেন বিস্তর দানধ্যানে।

পিতার কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছেন ঔদার্য, বদান্যতা আর নির্বিচার পরদুঃখ-কাতরতা। অন্য আর একজন ঋষিপ্রতিমের জীবনের প্রভাবও তাঁর উপর যথেষ্ট পড়েছিল। ইনি হচ্ছেন জাতীয়তাবাদের ঋষি রাজনারায়ণ বসু। ইনি শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। তাঁর ভগবদ্‌ভক্তি ও দেশপ্রেম শ্রীঅরবিন্দকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে-ছিল। এই দুই মহান প্রতিভার সমন্বয়ে সৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দ।

ওঁরা চার ভাই। জ্যেষ্ঠ বিনয় ও মনমোহন, আর কনিষ্ঠ বারীন্দ্র। ভগ্নী ছিল তাঁর একটি। নাম তাঁর সরোজিনী।

পাঁচ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। পিতা কিন্তু তাঁকে কোন বাঙালী স্কুলে ভর্তি করলেন না। তিনি সর্বোচ্চ ইংরেজি শিক্ষা পাক, এ-ই ছিল পিতার ইচ্ছা।

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল।

তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেণ্ট-এ।

ইংরেজি স্কুল, ইংরেজ মাস্টার, ইংরেজি ধরণধারণ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তাতে কোন অসুবিধা হল না।

আপন প্রতিভায় বিকশিত হতে লাগলেন। শিক্ষকেরা চমৎকৃত হল।

কিন্তু এটুকুতেই পিতা খুশি নন। তিনি চান ওঁকে সর্বতোভাবে সাহেব করে তুলতে। তাই পাড়ি জমালেন বিলেত। সঙ্গে চলল সাত বছরের শ্রীঅরবিন্দ এবং আর আর ভাইয়েরা ও তাঁদের মা। এই যাত্রাপথে জাহাজের উপরেই জন্ম হয় বারীন্দ্রকুমারের। এর কিছুদিন পরে তাঁর মা সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যান।

ম্যাঞ্চেস্টার শহরে থাকত পাদ্রী ড্রুইড সাহেবের পরিবার। কৃষ্ণধন বড় তিন ছেলেকে রেখে দিলেন তাঁদের পরিবারে—লেখাপড়া আর বিলিতি আদব-কায়দা শেখাবার জন্য। কিছুদিন পরে তিনি ফিরে এলেন ভারতে। শ্রীঅরবিন্দের মাতাও ফিরে এলেন নিজের দেশে। তিন ভাই রইল শুধু বিদেশ-বিভুঁয়ে। সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনীতে।

কিন্তু তাতে ওঁরা দমবেন কেন।

নূতন আবহাওয়া, নূতন সমাজ ও নূতন আদব-কায়দা রপ্ত করে নিলেন ধীরে ধীরে।

শ্রীঅরবিন্দ ভর্তি হলেন 'গ্রামার' স্কুলে। পাঁচ বৎসর পরে তিনি ভর্তি হলেন লণ্ডনের সেণ্ট পলস বিদ্যালয়ে।

আরও পাঁচ বৎসর পর তিনি সসম্মানে পাশ করলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। তারপর ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে।

এ সময় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। বাঙলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর সেই সময়েই। ১৮৯০ সালে, মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি আই সি এস পরীক্ষা দিলেন। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে তিনি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ফলে সাহেবি মেজাজের হাকিম হওয়া তাঁর হল না। শোনা যায়, লণ্ডনের ভারতীয় মজলিসে তিনি যেসব



অরবিন্দ আশ্রম

বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার জন্যই তাঁকে অকৃতকার্য করান হয়েছিল। যাক, বিধাতার অভিপ্রেতও ছিল না বোধহয়। ঋষি অরবিন্দ ভারতকে তথা জগৎকে শোনাবেন যে নতুন বাণী। হাকিম হলে সে সম্ভাবনা থাকত কোথায়?

আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় পিতা ক্ষুণ্ণ হলেন। হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ দুঃখিত হলেন না। নিজের প্রাণে জ্বলছে দিব্য আলো। তাতেই মনকে দীপ্ত করে নিলেন। কেম্ব্রিজে আবার পড়াশুনা আরম্ভ করলেন।

১৮৯২ সালে ক্লাসিক্স ট্রাইপোজ পরীক্ষায় পাশ হলেন প্রথম বিভাগে প্রচুর সম্মান নিয়ে।

তাঁর মেধা, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের হল জয়-জয়কার।

কিন্তু বেদনা এল অন্য পথে। সে অর্থ কষ্ট। পিতা প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণে অপারগ হলেন। ধার করে খরচ চালাতে হল তিন ভায়ের। তারপর, কৃষ্ণধন মারা গেলেন। অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। দেশে ফিরে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেটা ১৮৯৩ সাল।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর ছিলেন তিনি বিলাতে। তার তখনকার বয়সটা বড় মারাত্মক। এ সময় চিত্তবৃত্তি থাকে বড় কোমল। যে কোন জিনিসের ছাপ পড়ে অতি সহজেই। শ্রীঅরবিন্দ যে সভ্যতা, বিলাস, আড়ম্বর ও আবহাওয়ায় ছিলেন, তাতে পুরোদস্তুর ফিরিঙ্গি হয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর বেলা কিছুই হয়নি। ইংরেজের গুণটুকু আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন তিনি, দোষটুকু বাদ দিয়ে। তাই দেশে ফিরলেন দেশের ছেলে হয়ে, দেশপ্রেমের অত্যুগ্র কামনা বুকে নিয়ে।

(৩)

বিলেতে থাকতেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল বরোদায় গাইকোয়ারের সংগে। শান্ত সৌম্য-মূর্তি, প্রতিভায় উজ্জ্বল মুখ, ধীর গম্ভীর প্রকৃতি, স্বল্পবাক ও অনাড়ম্বর অরবিন্দকে করে নিলেন তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। তারপর হলেন তিনি রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী।

কিন্তু এ-কাজ যেন তাঁর ভাল লাগল না। তিনি শিখতে চান, আর চান শেখাতে। তাই ও-কাজ তাঁর ভাল না লাগারই কথা। তাই ছেড়ে দিলেন। গ্রহণ করলেন বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ।

জ্ঞান-তপস্বী খুঁজে পেলেন সত্যিকারের পথ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলল সমান গতিতে।

বাঙলা শিখতে লাগলেন তিনি সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট। রাত জেগে পড়তেন ইউরোপের নানা ভাষার শত শত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস আর দর্শন। ভারতীয় প্রাচীন কাব্য, দর্শন এবং সাহিত্য-সম্পদের সংগেও পরিচিত হতে আরম্ভ করলেন তিনি। তাঁর লাইব্রেরী ভরা থাকত ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজি, গ্রীক লাতিন প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের বই!

তাঁর দাদা মনমোহন ঘোষ সুকবি বলে তখন যশঃ অর্জন করেছেন। শ্রীঅরবিন্দেরও কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ হল এই বরোদায়। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বন করে ইংরেজির নানা ছন্দে তিনি রচনা করলেন অনেক কবিতা। ১৮৯৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর রচিত কবিতা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

প্রশংসা তিনি অযথা করেন নি!

অর্থ তিনি উপার্জন করতেন এখানে। কিন্তু অকাতরে বিলিয়ে দিতেন তা। নিজের প্রয়োজন বড় একটা তাঁর ছিল না। পায়ে থাকত তাঁর শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতো, পরণে মোটা পাড় বিশ্রী ধুতি, গায়ে মোটা মেরজাই আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। শোবার জন্যে ছিল সাধারণ লোহার খাট, আর গায়ে দেওয়ার জন্যে সামান্য একখানা আলোয়ান।

ভবিষ্যৎ মহামানবের কৃচ্ছ্রসাধনার আরম্ভ। এর চেয়ে আর বেশি চাই কি?

১৯০১-২ সালে তিনি বিয়ে করেন। এর একটু ইতিহাস আছে। চিরকাল বিয়ে না করেই থাকবেন ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবী ঐ শ্যামবর্ণ ক্ষীণতনু যুবকটিকে ভালবেসে পতিত্বে বরণ করে ফেললেন। শুনে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন স্ব-ইচ্ছায়। কিন্তু সংসারের মধ্যে বাঁধেন নি নিজেকে তিনি কোনদিন। স্ত্রীকে তিনি তাঁর সাধনার সাথী বলেই মনে করতেন। বাঙলা ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ রাঁচিতে পিত্রালয়ে দেহত্যাগ করেন শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী।

(৪)

১৯০৫ সাল।

বাঙলায় জেগেছে তখন নূতন উন্মাদনা। দিকে দিকে তূর্য ধ্বনিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' ছড়াচ্ছে বিপ্লবের অগ্নিবাণী। 'লাল-



"শ্রীমা"

বাল-পালের' সিংহ গর্জনে বাতাস থরথর করে কাঁপছে। যুবক বাঙলার বিক্রমে শাসকের হৃদ-স্পন্দন স্তব্ধ হবার উপক্রম। তাঁদের এক ধ্বনি, 'বন্দে মাতরম্'। এক আওয়াজঃ 'বঙ্গভঙ্গ রোধ কর'।

দিল্লী মসনদ কেঁপে উঠল।

বাঙলা তথা জাতির মরণ-বাঁচন ক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ আর থাকতে পারলেন না বাঙলার বাইরে।

বাঙলার ছেলে ফিরে এল বাঙলা মায়ের কোলে। বাঙালীর জীবনে নূতন প্রেরণার তরঙ্গ উঠল। নূতন অধ্যায়ের হল সূচনা।

শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হলেন নূতন ক্ষেত্রে। অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ হলেন রাজনৈতিক শ্রীঅরবিন্দ।

বরোদায় থাকতেই তিনি পুণার গুপ্ত দলের নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন। দীক্ষার পরেই তিনি যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে পাঠিয়ে বাঙলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বরোদা কলেজের চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন এসে ন্যাশনাল কলেজে। বেতন সামান্য। হোক। দেশ-সেবাই প্রথম, পয়সা নয়। সমস্ত মন ঢেলে দিলেন নিজের কাজে। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলেন না সেখানে। মতবিরোধ হওয়ায় ছেড়ে দিলেন সে প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু তার জন্যে বসে রইলেন না নিষ্ক্রিয় হয়ে। ভিতরে তাঁর আগুন জ্বলছে। বসে থাকবেন কি করে? আত্মপ্রকাশ করল দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'। শ্রীঅরবিন্দ দেখা দিলেন নূতনরূপে। এখান থেকে আরম্ভ হল তাঁর গরম রাজনীতির পালা।

"বন্দে মাতরমের" জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষা, চারিদিকে আগুন ছড়ালো। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের আন্দোলন ম্লান হয়ে গেল। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল আত্মভোলা, মরণ-পাগল বিপ্লবী দল। বিক্ষোভের অগ্নি-শিখা শত জিহ্ব হয়ে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল।

শাসক চঞ্চল হয়ে উঠল। সাজা দিতে চাইল শ্রীঅরবিন্দকে কিন্তু ব্যর্থ হল তারা। সেটা ১৯০৭ সাল।

শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রবল ও অসাধারণ ত্যাগ মুগ্ধ করল কবিগুরুকে। তিনি তাঁকে দিলেন অন্তরের শ্রদ্ধা আর প্রীতির অর্ঘ্য। বললেনঃ "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

মধ্যপন্থী দলের সঙ্গে জাতীয় দলের সংঘর্ষ, মেদিনীপুর ও সুরাটে দক্ষযজ্ঞ, ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। সে কথা আবৃত্তি করে লাভ নেই। কিন্তু সেই সংঘর্ষে আপন আদর্শে দৃঢ় থেকে শ্রীঅরবিন্দ যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা' উল্লেখযোগ্য। কোন বাধাই তাকে টলাতে পারেনি। আপন ইচ্ছাকে তিনি জয়ী করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাই।

কিন্তু বিপদ এলো অন্য দিক থেকে।

কিংসফোর্ডের হত্যা চেষ্টা নিয়ে যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার হলো, তারই অভিযোগে ১৯০৮ সালের ১লা মে মাঝ রাতে গ্রেপ্তার হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আরও অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ল যুগান্তর দলের।



রাজনৈতিক নেতা শ্রীঅরবিন্দ

আরম্ভ হল আলিপুরে বোমার মামলা।

আদালতে জবানবন্দী দিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহার জন্য আমি জীবনধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন।"

নির্ভীক ও স্পষ্ট, দীপ্ত ও দৃপ্ত ঐ স্বীকৃতি!

উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে এতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের রূপ।

তাই বোধহয় ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পেরে-ছিলেন সি আর দাশ। সে কথা আগেই বলেছি।

মুক্তির পর এক বৎসর চুপ করে থেকে তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক "কর্মযোগীন" ও বাঙলা সাপ্তাহিক "ধর্ম" নামে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্রায় বৎসরাধিককাল পরে একদিন তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে জেনে চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে।

শুরু হল তাঁর ধর্মজীবন।

নূতন ইতিহাস রচনা করলেন তিনি স্বীয় সাধনা ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে।

(৫)

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী এসে পৌঁছলেন। এখান থেকে প্রকাশ করলেন ইংরেজি 'আর্য' পত্রিকা। এতে 'বন্দে মাতরম' বা 'কর্মযোগীনে'র অগ্নি ভাষা নেই। আছে অধ্যাত্ম সম্পদের পুণ্য প্রস্রবন।

স্থাপন করলেন আশ্রম। তারপর শুরু হল তাঁর নীরব সাধনা।

১৯০৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম যোগাভ্যাস করেন। তখন কোন গুরুর সাহায্য তিনি নেননি। পরে তাঁর সাক্ষাৎ হয় মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে। তাঁর থেকেই তিনি দীক্ষা নেন। রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকলেও ধর্মচর্চায় তিনি সময় অতিবাহিত করতেন। তারপর জেলখানায় যাওয়ায় যোগ-সাধনায় তাঁর সুবিধা হয়। ধর্মচর্চাকে তিনি জীবনের নিত্যসঙ্গী করে নেন। পণ্ডিচেরীর আশ্রম তাঁর আত্মোপলব্ধির পথকে করে দিল প্রশস্ততর।

এর পরে এলেন 'শ্রীমা'। ইনি ফরাসী মহিলাঃ নাম মীরা রিশার। এঁর স্বামীর নাম মঁসিয়ে পল রিশার।

মীরা রিশার দীক্ষা নিয়ে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিলেন আশ্রমে এবং ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন আশ্রমবাসীদের 'মা'।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর বাণী ও দর্শন নিয়ে চলেছে আলোচনা, গবেষণা ও বিতর্ক। হওয়া স্বাভাবিক। জগৎকে শুনিয়েছেন তিনি নূতন বাণী, দেখিয়েছেন নূতন পথ। কিন্তু সে-পথের দিশারী অকস্মাৎ চলে গেলেন এ-জগৎ ছেড়ে। গত ৫ই ডিসেম্বর রাত দেড়টার পর তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এ-বাঙলার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য। যখন তাঁর দরকার সবচেয়ে বেশি......তখনই শ্রীঅরবিন্দ চলে গেলেন। এ-অভাব পূর্ণ হবে কবে?

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিনানি গিয়া সেই আলোকিত স্থানটিতে পবেশন করিল। সেই বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষতলে ভীর রাত্রে জমাট অন্ধকারের পটভূমিকায় নানিকে বড় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। মনে ইতেছিল, সে-ই যেন মূর্তিমতী আলোক, মাট অন্ধকারের বুকে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। কন্যা দীতে অবগাহন করিয়া সত্যই সেদিন ন অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়া-হল। তাহা যে কত বড় বিদ্রোহী নের পরিচয় তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আজ য়তো তোমাদের পক্ষে শক্ত। মানব-মনের সান্দর্যপ্রিয়তার নিগূঢ় প্রেরণায় সে স্বয়ং ত্যুকেই বরণ করিয়াছিল। জিগাওয়ের াদেশ উপেক্ষা করিলে যে কানা ভীষণ প্রতি-শাধ লইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল, তবু সে াথায় পুঁজরক্ত মাখিয়া থাকিতে পারে নাই। াহার অন্তরের শুচিতাবোধ তাহাকে দ্রোহিনী করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার রিবেষ্টিতা জ্যোৎস্নালোকিতা নিনানির দিকে াহিয়া আমি যে বিস্ময় অনুভব করিতেছিলাম াহার মধ্যে ভয়ও ছিল। কারণ, আমিও শ্বাস করিতেছিলাম যে, নিনানির অবাধ্যতার য়ঙ্কর পরিণাম এবার আসন্ন, কানা তাহাকে কছুতেই ক্ষমা করিবে না। নিনানি মৃত্যুর র প্রেতিনী হইয়া হয়তো আমাদের কাছা-াছি কোথাও আশ্রয় লইবে। আমি যদি খন নিনানিকে তুষ্ট করিতে পারি নিনানির প্রতিনীও আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবে। আমি য ঠিক জ্ঞাতসারে এসব কথা ভাবিতেছিলাম, াহা নয়, নিনানির প্রতি প্রেমই প্রধানত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহাই সত্য, কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হইতেছে যে, নিনানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সেদিন যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার অন্তরালে হয়তো ভয়ও ছিল। কারণ, সে যুগে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক ছিল পরলোক। যে পরলোকে বিদ্রোহী প্রেতাত্মারা অসীম শক্তি-লাভ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ওঠে, যে পরলোকের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ইহলোকে জিগাওরা আধিপত্য করে, সে পরলোককে উপেক্ষা করিয়া অথবা তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সে যুগে কোনও কার্যই আমরা করিতে পারিতাম না।

"তুমি মাথাটা একটু নীচু করিয়া বস। তোমার চুলগুলো আগে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে"

নিনানি মাথা নীচু করিল। আমি আমার শাখাপত্রের বোঝাটা লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বাধ্য বালিকার মতো নিনানি মাথা নীচু করিয়া রহিল।

...নিনানির মাথাটুকু ঢাকিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। তাহার মাথার কেশরাশি যে কতবার কতপ্রকারে বাঁধিলাম ও খুলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। নিনানি কিন্তু ধৈর্যভরে বসিয়া রহিল, একটুও প্রতিবাদ করিল না। চন্দ্রালোকিত অংশটুকু ক্রমে ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছিল, আমরাও সরিয়া সরিয়া বসিতেছিলাম। উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়া বসিবার সাহস আমাদের ছিল না, সে যুগে আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই আমরা নিরাপদ বোধ করিতাম।

...নিনানির মস্তকের আবরণটা যখন শেষ হইল তখন নিজের কারুকর্ম দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। শাখাপত্রের শিরস্ত্রাণ পরিয়া নিনানিকে নূতন দেখাইতেছিল। রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের কোমল আলোকে শ্যাম-শিরোভূষণ-শোভিতা নিনানিকে যেন অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। কল্পনায় আমি যে চিত্র দেখিয়াছিলাম বাস্তবে তাহাই যেন অবাস্তব হইয়া গেল। অপূর্ব পুলকে ও গর্বে আমার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, আমি যেন নিনানিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলাম। এ নিনানি ধবলের নিনানি নয়, এ নিনানি আমার, একান্তভাবেই আমার। ইহাকে আমি ধবলের কাছে আর ফিরাইয়া দিব না। সহসা আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, তাহার পর স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আদরে নিনানির কখনও অরুচি ছিল না, সে পর্যন্ত বলিল, "অগ্লো, তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি। আমাকে নামাইয়া দাও, চল এবার ফিরিয়া যাওয়া যাক"

"তোমাকে আমি ফিরিতে দিব না। তুমি এইখানেই থাক—"

"মানে—?"

"এখন এইখানে থাক তাহার পর তোমার জন্য আমি অন্য একটা বাসা ঠিক করিব। সকলে জানুক যে, তুমি মরিয়া গিয়াছ, জিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া কানা যে নিদারুণ আদেশ তোমাকে দিয়াছে সেই আদেশের ফলে তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা আমি গিয়া এখনই সকলকে বলিয়া দিতেছি। আমি বলিব যে, জিঘাওয়ের কথা অমান্য করিয়া তুমি কন্যা-নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছিলে, কানা ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না"

নিনানি বলিল—"মৃত্যু তো আমার হইবেই। তখনই সকলে দেখিবে। এখন হইতে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাভ কি"

"লাভ এই যে, যতক্ষণ তুমি বাঁচিয়া থাকিবে একান্তভাবে আমারই থাকিবে। জিঘাও জানুক যে, তুমি আর নাই"

"তাহাতেই বা লাভ কি তোমার"

নিনানির চোখে এক ঝলক আলো চকমক করিয়া উঠিল, মুখে মৃদু হাসি ফুটিল।

"তোমার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া জিঘাও কি করে দেখা যাক না। তোমার অন্তর্ধানে তাহার মনে কি-ভাব জাগে দেখিতে চাই। লাভ হয়তো তেমন কিছু হইবে না, তবু কৌতূহল হইতেছে—"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ব্যাপারটার অভিনবত্ব আমাকে ক্রমশ যেন পাইয়া বসিল। নিনানির মস্তক ঘিরিয়া শাখাপত্রের যে শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছিল, আমিই যে তাহার স্রষ্টা এই বোধ আমাকে যেন নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল, আমি যাহা খুশী করিতে পারি, জীবন্ত নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার দুঃসাহসিকতাও অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিল তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। নিনানি কিন্তু একটা অদ্ভুত খবর দিল। যদিও ঘটনাটা আমার নিকট স্বাভাবিক মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অদ্ভুত ঠেকিল।

মৃদু হাসিয়া নিনানি বলিল, "এ খবর শুনিয়া জিঘাওয়ের মনে কি ভাব হইবে তাহা আমি জানি"

"জান?"

"হাঁ জানি। জিঘাও হতাশ হইবে।"

"হতাশ হইবে? কেন"

"কারণ সে একাধিকবার আমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। তাহার আশা আছে যে,

আমি একদিন তাহার নিকট ধরা দিব। তাহার আকাঙ্ক্ষা ধবলকে সরাইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সে-ই একদিন নিম্ব সম্প্রদায়ের দলপতি হইবে। সে এখনও বোধ হয় আশা করে যে, আমি তাহার সহায়তা করিব। সুতরাং আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে সে হতাশই হইবে"

"তবে সে তোমাকে এমনভাবে অপমান করিল কেন"

কথাটা বলিয়াই আমি বুঝিলাম যে, ভুল বলিয়াছি। নিনানি আমাকে সংশোধন করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে।

"সে তো আমাকে অপমান করে নাই। আমাকে শাস্তি দিয়াছে ধবলের প্রমাতামহ কানা। জিঘাওয়ের উপর যদি কোনও প্রেতাত্মা ভর করিয়া কোন কথা বলে তাহার জন্য জিঘাওকে দায়ী করা চলে না"

"ঠিক ঠিক"

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। প্রেতাত্মাদের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলাম। জিঘাও-জাতীয় যাদুকরদের মারফতই যে তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় কখনও সরল ভাষায় কখনও নিগূঢ় ইঙ্গিতে প্রকাশ করে ইহাতেও আমাদের কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু ওই ধরণের কথা আমার মুখে যে কেন আসিল তাহা জানি না।

"জিঘাও তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল, একথা আমাকে তো বল নাই—"

নিনানির চোখে মুখে দুষ্টামিমাখা হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কত লোকে কত কথা বলে। সব কথা কি সকলকে বলিতে পারি? বলিলে তোমাদের নিম্ব সম্প্রদায়ের এতদিন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত"

আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মাথার শাখা-পত্রময় শিরোভূষণটা আবার আমাকে উদ্দীপ্ত করিল, আবার আমার মনে হইল আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি। জিঘাওকে কঠোর শাস্তি দিবার অসমসাহসিক কল্পনাও একবার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।

"জিঘাও যখন তোমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল তখন তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?"

"তাহা তোমাকে বলিব কেন"

"বলিতেই হইবে"

আগাইয়া গিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে আমি নিনানির হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলাম। আমার মূর্তি দেখিয়া নিনানির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

"বল তুমি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলে"

"বলিয়াছিলাম যে, তোমার পায়ের ঘা আগে সারুক তাহার পর তোমার কথার জবাব দিব"

"এই জবাব দিয়াছিলে? পায়ের ঘায়ের কথা বলিয়াছিলে?"

"হাঁ"

নিনানির চোখের দৃষ্টি ভাষাময় হইয়া উঠিল। আমার চোখেও হয়তো ভাষা ফুটিয়াছিল। আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে যাহা জাগিতেছিল তাহা মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করা দূরে থাক ভালভাবে চিন্তা করিতেও সাহস পাইতেছিলাম না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নিনানিকে আর ফিরিয়া যাইতে দিব না, লুকাইয়াই রাখিব। জিঘাওকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

"সত্যই তাহা হইলে আমরা আর ফিরিয়া যাইব না?"

"না। আপাতত তুমি এখানে গাছের উপর লুকাইয়া থাক। আমি উন্নগা পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি, যদি থাকিবার মতো গুহা পাওয়া যায় একটা। নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে"

"গুহা? আমি গুহায় একা থাকিতে পারিব না"

"একা থাকিবে কেন, আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। আমার তো ঘরে বউ নাই যে, তাহার জন্য প্রত্যহ ঘরে ফিরিতে হইবে। আমি দিনের বেলায় মাঠে কাজ করিব, তাহার পর রাত্রে পাহারা দিবার ছুতায় বাহির হইয়া পড়িব। তখন তোমার কাছে যাইব"

"সমস্ত দিন আমি একা গুহায় বসিয়া বসিয়া করিব কি"

"শিকার করিবে। তোমার হাতের লক্ষ্য তো অব্যর্থ। আমি তোমাকে তীর ধনুক দিয়া আসিব। চকমকি ও কিছু কাঠও লইয়া যাইব। তুমি শিকার করিয়া রাখিবে, আমি রাত্রে গিয়া সেগুলি ঝলসাইব। তাহার পর দুইজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাওয়া যাইবে। ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন? নূতন ধরণের জীবন যাপন করিয়া দেখা যাক না কি হয়"

নিনানির মন যে এই অভিনবত্বের প্রলোভনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মুখে সে আপত্তি করিতেছিল ছলনার বশে। তাহার মতো ছলনাময়ী রমণী আমাদের দলে আর ছিল না।

"ধবল ঘিসু যদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসে?"

"ফিরিয়া আসিলে তাহারাও তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবে, তখন বোঝা যাইবে তাহারা তোমাকে কতটা ভালবাসে"

নিনানির চক্ষু দুইটি আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"ডানা টুলা কিম্বা বেসুও আমার মৃত্যু-সংবাদে কি করে তাহাও একটু লক্ষ্য করিও। আমার মনে হয়, টুলাটা কাঁদিবে"

"লক্ষ্য করিব। তুমি তাহা হইলে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাক, আমি গুহার সন্ধানে চলিলাম"

...উন্নগা পর্বতে গুহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন আর একটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিল। শিলাঙ্গীর কথা নিনানিকে বলিব কিনা, নিনানির কথাও শিলাঙ্গীকে বল সমীচীন হইবে কিনা। একাধিক স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখা, এমন কি অপরের বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌন-সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সে যুগে পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। জননীর পরিচয়েই তখন পুত্রের পরিচয় হইত। আমার বয়সও তখন বেশী নয়, যে বালিকাটির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সে বহুকাল পূর্বে মারা গিয়াছে, সুতরাং একাধিক স্ত্রীর সহিত যে আমি সংশ্লিষ্ট থাকিব ইহা সে যুগে স্বাভাবিক বলিয়াই সকলে মনে করিবে, ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক আপত্তি উঠিবে না তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তবু নিনানির প্রতি আমার যে দুর্বলতা আছে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার সাহস আমার ছিল না, ধবলের নিকট একথাটা গোপন করিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করিতাম। কারণ আমি জানিতাম —আমরা সকলেই জানিতাম যে, সামাজিক নিয়ম যাহাই থাক ঈর্ষা নামক সহজাত প্রবৃত্তিটি সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের নিয়মেই চলে। ধবল যদি টের পায় যে, আমি নিনানির প্রতি আসক্ত সে কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করিবে না। সুযোগ পাইলেই সে প্রতিশোধ লইবে। নিনানি অথবা শিলাঙ্গীর মনোভাব যে ইহা হইতে বিভিন্ন হইবে সে প্রত্যাশা আমার ছিল না। নিনানির সহিত শিলাঙ্গীর যোগসূত্রের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম প্রয়োজনের খাতিরে। নিনানিকে যদি উন্নগা পর্বতের গুহায় থাকিতে হয় তাহা হইলে শিলাঙ্গীর সহায়তা অতিশয় সুবিধাজনক হইবে। নিনানির সহিত পাহাড়ে একটু আগে শিলাঙ্গীর পরিচয় হইয়াছে, নিনানিকে গিয়া যদি বলি যে, শিশাঙ্গীর সহিত পাহাড়ে আমারও হঠাৎ দেখা হইয়া গেল তাহা হইলে নিনানি কোনও সন্দেহ করিবে না। শিলাঙ্গীকে কিন্তু কি বলিব? শিলাঙ্গীর সহিত আমার যে পূর্বে আলাপ হইয়াছে একথা শিলাঙ্গীকে যদি নিনানির নিকট গোপন রাখিতে বলি তাহা কি রাজি হইবে? এইসব কথা চিন্তা করিতে করিতে উন্নগা পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থিত পর্বতশৃঙ্গগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। দূর হইতে পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল বিরাটকায় উন্নতশীর্ষ পাঁচটি দৈত্য ভ্রাতা যেন ঠেসাঠেসি করিয়া পাশাপাশি বসিয়া আছে। ইতোপূর্বে উপত্যকায় অপর পা

খনও যাই নাই, যাইবার প্রয়োজনও হয় নাই, কা যাইতে একটু ভয়-ভয়ও করিতেছিল, রণ সংগে একটি প্রস্তর ছুরিকা ব্যতীত অন্য স্ত্র ছিল না। বাধ্য হইয়া তবু যাইতে ইতেছিল, কারণ উপত্যকার এধারে কোনও হা দেখিতে পাইলাম না। উপত্যকার দক্ষিণ ান্তে দেখিলাম গরুর দল চরিতেছে, মনে ইল শিলাঙ্গীর দুধনী মধুনীও ন উহাদের মধ্যে রহিয়াছে। খানিক-ণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের মধ্যে কটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দিতেছিল দি শিলাঙ্গীকে সহসা দেখিতে পাই। তাহার কট উন্নগা পাহাড়ের অনেক খবর পাওয়া ইবে নিশ্চয়। শিলাঙ্গীকে কিন্তু দেখিতে াইলাম না। একাই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

...পঞ্চ পর্বতের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম কটি ঝরণা রহিয়াছে। ঝরণাটা প্রথমে ঠিক খিতে পাই নাই, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম। ুইটি পাহাড় পাশাপাশি খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, াহাদের মাঝে রহিয়াছে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, াহার ভিতর দিয়া একটা জল-স্রোতও বাহির ইতেছে একটু পরে দেখিতে পাইলাম। জল-রা পাহাড় বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেবর্তী একটা ঘন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নে হইল, ইহাই তাহা হইলে কন্যানদীর উৎস। হার নাম কন্যানদী কে দিয়াছিল জানি না, াঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, নদীটির নাম ন্যা। উৎসের কাছাকাছি কন্যানদীকে দেখিয়া নে হইল নামটি সার্থক। দুরন্ত কিশোরীর তোই কন্যা যেন পাহাড়ের ফাটল হইতে বাহির ইয়া অরণ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। মনে হইল, সে ন লুকোচুরি খেলিতেছে। জল-স্রোতের ুই তীর শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত। অনেক বৃক্ষ, নেক গুল্ম, বহুপ্রকার লতা ও পুষ্পে উভয় ীর অলঙ্কৃত। বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানা র্ণের নানা আকৃতির পক্ষী বসিয়া আছে। ত রাত্রে যে বকের দলকে দেখিয়াছিলাম াহাদের আবার এখানে দেখিতে পাইলাম। াছরাঙা পাখীও ছিল কয়েক রকম। আরও নেক পাখী ছিল যাহাদের আমি চিনি না, তোপূর্বে দেখি নাই। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল একটা ূতন দেশে আসিয়াছি যেন। একটা অদ্ভুত াসনাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল। সেই আদিম যুগে যখন আমি সাধারণ বন্য পশুমাত্র ছিলাম তখন ইকাকে সবলে হরণ করিয়া নির্জন হায় নিজস্ব গৃহ-স্থাপনের প্রেরণা যে স্বার্থ-বুদ্ধি আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল সেই বুদ্ধি আমার মনে নূতন বাসনারূপে আবার আবির্ভূত হইয়া কহিল—'এই স্থানে তুমি যদি নিনানি ও শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজের ঘর বাঁধ কেমন হয়।' ইকার কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু সেই প্রবৃত্তিটা অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ছিল সহসা যেন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কথাটা ভাবিবাই কিন্তু আমি হাসিয়া উঠিলাম। কথাটা ছাড়িয়া একা বাস করিব কিরূপে? যে জীবনে আমি এখন অভ্যস্ত হইয়াছি সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া সে জীবন যাপন করা যায় না। একা আমি চাষ করিতে পারিব না। শিকার হয়তো করিতে পারি কিন্তু শিকারের মাংস ঝলসাইয়া দিবে কে? আমাদের দলের কতক-গুলি নারী এই কার্যের জন্যই নিযুক্ত আছে। আরও কতকগুলি নারী পশুচর্ম পরিষ্কার করে। পশুচর্মগুলি চামড়ার সুতা দিয়া শেলাই করিবার দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কয়েকজন। তাহারা সকলের জন্য অংগাচ্ছদ প্রস্তুত করে। তাছাড়া অস্ত্র পাইব কোথায়? আমাদের সম্প্রদায়ে বিবা, কাটমা, শাম্বো, তিনা, রিখুলি, বিনুধা দিবারাত্রি বসিয়া পাথর ঘষিতেছে, পাথর ফুরাইলে পাথর খুঁজিয়া আনিতেছে, পশুচর্মের বিনিময়ে, তৃণবীজের বিনিময়ে অন্যত্র হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, ইহা কি আমার একার দ্বারা সম্ভব? তাহারা যে অগ্নি-পূজা, প্রস্তর-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, ভূমি-পূজা, নদী-পূজা আমাদের জীবনের প্রধান নির্ভর তাহা করিবে কে? ধবল নিশ্চয় আসিবে না। অদৃশ্যলোক নিবাসী ভূত-প্রেতদেরই বা কে শান্ত করিয়া রাখিবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বিপন্ন হইব তখন যাদুবিদ্যাবিৎ জিঘাও কি আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে? না, একা বাস করা আর সম্ভব নয়। সহসা তখন মনে হইল তবে কি জন্য আমি গুহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি? মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে? নিনানি যখন কানার আদেশ অবহেলা করিয়াছে তখন তো তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে মরিতেই হইবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একান্তভাবে কয়েকদিন পাইবার জন্যই কি আমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে চাই? লুকাইয়া না রাখিলেও তো তাহা অসম্ভব হইত না। নিশীথ রাত্রিই যে আমাদের জীবনে প্রত্যহ গোপনতার সৃষ্টি করে। এতদিন যে নিনানির সঙ্গলাভ করিয়াছি তাহা কি কম নিবিড় কম ঘনিষ্ঠ ছিল?

যে প্রশ্নটাকে মন এড়াইয়া যাইতে চাহিতে-ছিল আত্মবিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাহারই সম্মুখীন হইতে হইল। তবে কি জিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি সন্দিহান হইয়াছি? নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া আমি কি দেখিতে চাই যে, জিঘাও সত্যই শক্তিশালী কিনা? ধবলের প্রমাতামহ কানার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সন্দিহান নাকি! কথাটা মনে হইবার সংগে সংগে কতকগুলি পাখী একযোগে চীৎকার করিয়া উড়িতে লাগিল, চতুর্দিক যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি ভয় পাইয়া গেলাম, আমার আশংকা হইল আমার অবিশ্বাসের কথা কানা বোধ হয় টের পাইয়াছে, অভাবিত উপায়ে এখনই হয়তো শাস্তিও দিবে। একবার ইচ্ছা হইল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করি। নিনানিকে গিয়া বলি যে, গুহা পাওয়া গেল না, সে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল ফিরিয়া যাক। আমার পলাইবার ইচ্ছা হইল বটে কিন্তু আমি নড়িতে পারিলাম না। আর একটা প্রবলতর প্রবৃত্তি আমাকে সেইখানে অনড় করিয়া রাখিল। ভয়কে পরাভব করিয়া কৌতূহল জয়ী হইল। আমি সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম পাখীরা সহসা এমনভাবে ডাকিয়া উঠিল কেন। দেখিলাম পাখীগুলি যে গাছ হইতে উড়িয়াছিল সে গাছে গিয়া আর বসিল না। কতকগুলি দূরের গাছে বসিল, কতক-গুলি উড়িতেই লাগিল। তাহার পর একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল একটা নিষ্পিষ্ট আর্তনাদ যেন ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ভয় হইল এসব কানার কারসাজি নয় তো! উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনিবার্য কৌতূহল আমাকে যেন ভীত শিশুর মতো টানিয়া লইয়া চলিল। সন্তর্পণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই জল-ধারার তীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও ব্যাপারটা দেখিতে পাই নাই। পর-মুহূর্তেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, একটা ময়াল সাপ একটা হরিণকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। এ অঞ্চলে যে হরিণ আছে তাহা জানিতাম না। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আরও বিস্ময়ের হেতু বনান্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। বুধা যক্ষিনীকে তখনও দেখিতে পাই নাই। একটু পরেই সে বনের আড়াল হইতে এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া বাহির হইল। আবার চলিয়া গেল, একটু পরে আর এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া আসিল। আবার গেল, আবার খড় আনিল। কয়েকবার গিয়া অনেক খড় সে জমা করিয়া ফেলিল। আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল যখন দেখিলাম সে খড়ের বোঝা-গুলি ময়াল সাপটার চারিদিকে বৃত্তাকারে সাজাইতেছে। ময়াল সাপটা হরিণের সর্বাংগে নিজেকে জড়াইয়া একটা স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্তূপকে কেন্দ্র করিয়া বুড়ি বোঝাগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

১৯৪৭ এর পরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মোহিতকুমার সেনগুপ্ত

প্রায় ২০০ শত বৎসর ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস মোটেই গৌরবের নহে। লিখিতে ও পড়িতে পারে এইরকম লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা ১০জন মাত্র। শিক্ষা-প্রসারের কথা যখনই উঠিয়াছে তখনই বিদেশী সরকার অর্থের অভাব এই অজুহাতে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ছিল না নাড়ীর টান—তাই এদেশের লোক লিখিতে পড়িতে শিখুক আর না শিখুক সে বিষয়ে সরকারের মাথা ব্যথা ছিল না। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ইংরাজ সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা কেবল বিশ্বের কাছে কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য এবং শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিবার কাজে সহকারী তৈয়ারী করিবার জন্য। কিন্তু এখন আমাদের দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়াছে—সুদিন আসিয়াছে। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন—আমাদেরই প্রতিনিধি শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন। দেশের লোক অশিক্ষিত থাকিলে বিদেশের কাছে আজ আর আমাদের কৈফিয়ৎ দিবার কিছু থাকিবে না। তাই আমাদের জাতীয় সরকার শিক্ষা-বিস্তারের দিকে মন দিয়াছেন। তিন বৎসর মাত্র আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। একটা জাতির জীবনে তিন বৎসর খুব বড় কথা নহে। তবু এই তিন বৎসরে আমাদের জাতীয় সরকার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কি করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

সকল সভ্যদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং আবশ্যিক। চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকে মহাত্মা গোখলে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯৩০ সালের মধ্যে সকল প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রদেশেই এই আইন সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয় নাই। স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নতির দিকে মন দিয়াছে। চলতি শিক্ষা-পদ্ধতি যে ত্রুটীপূর্ণ সে বিষয়ে তর্কের কোন প্রয়োজন নাই। এই বাবদে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মোটা অংশই যে অপচয় হয় তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তাই সরকার শিক্ষার এই প্রথম ধাপটার উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতেছে। শিশুদের জন্য কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা-নীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত সরকার কর্ম-কেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকেই চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে চাই শিক্ষক। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা-দান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বাঙলা দেশে ১৯৪৮ সালে প্রথম দুইটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়; তাহার পর বর্তমান বৎসরে আরও ৫টি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার ১৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দান করিতে হইলে প্রত্যেক জেলাতে অন্ততঃ একটি করিয়া শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা উচিত। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—যে শিক্ষকদের দ্বারা আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করিতে যাইতেছি তাহারা উপযুক্ত কি না। কর্মের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকদের যে রকম বিদ্যা, বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসুতা থাকা উচিত তাহা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আছে কি? বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে এবং যে সকল বুনিয়াদী শিক্ষকের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্তমানে যে সকল শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছেন তাহাদের দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে যাইলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

স্বাধীন ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইতেছে তাহারা যদি অজ্ঞ ও নিরক্ষর হয় তাহা হইলে তাহারা স্বার্থান্বেষী লোকেদের হাতের পুতুল হইবে এবং স্বাধীনভাবে ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়াও জনগণের নিরক্ষরতার অন্যদিকও আছে। দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা কোন বিষয়েই উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের শতকরা ৮৫জন থাকে নিরক্ষর। সেইজন্য বয়স্কদের শিক্ষাকেই জাতি গঠনের প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। বৃটিশ আমলে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই বলিলেই চলে। কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট জাতি গঠনের এই দিকটায় দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। সকল প্রদেশেই জনশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলা দেশে ২।৩টি জেলার জন্য একজন করিয়া জনশিক্ষা কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং প্রতি জেলার জন্য আছেন একজন করিয়া Circle Assistant. প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বয়স্কদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে ২ মাসের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শিক্ষকেরা নিজেদের গ্রামে গ্রামে Circle Assistant-এর তত্ত্বাবধানে বয়স্কদের শিক্ষা দিতেছেন। জেলার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে একজন করিয়া সামাজিক শিক্ষক (Social Teacher) নিযুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ জন-শিক্ষা-কেন্দ্রে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বই, শ্লেট, ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে এবং বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে Radio এবং ছোটখাট একটা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে সরকারের কাজ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্য করিয়া জনশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে আরও অনেক কিছু করিতে হইবে।

গ্রামে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা সকলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন এবং রাত্রে বয়স্কদের শিক্ষা দেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে মাসে ১০ টাকা মাত্র বেতন দেওয়া হয়। যে প্রাথমিক শিক্ষকরা শিশুদেরই সন্তোষজনকভাবে পড়াইতে পারেন না বলিয়া অনেকেরই মত তাহাদের উপর বয়স্ক শিক্ষার ভার দিলে কাজ যে কতটা আগাইবে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমার মনে হয় প্রতি জেলায় একজন করিয়া Circle Assistant-এর পরিবর্তে প্রতি থানায় একজন করিয়া Circle Assistant থাকা উচিত। বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি গ্রামের জন্য একজন করিয়া বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষক থাকা উচিত। বয়স্কদের শিক্ষা বলিতে শুধু লিখিতে পড়িতে শিখাই বুঝায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নতিসাধন এই শিক্ষার অন্তর্গত। বয়স্কদের উপযুক্ত বই-এরও অভাব। এখন যে বইগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাহা বয়স্ক শিক্ষার উপযুক্ত নহে বলিয়া মনে হয়। বয়স্কদের শুধু লিখিতে পড়িতে শিখাইলে

চলিবে না—তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য প্রত্যেক থানায় Circle Assistant-এর পরিচালনায় থাকিবে একটি করিয়া ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার।

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে প্রাথমিক শিক্ষার দোষই শুধু চোখে পড়ে না, মাধ্যমিক শিক্ষা একেবারে দোষ-ত্রুটীর বাহিরে নহে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ছেলেদের আকর্ষণীয় কিছুই নাই। কিন্তু মাধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের প্রবেশিকা পাশের একটা ছাপ জীবন-যাত্রার পথে Pass-port। তাই স্বার্থের খাতিরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় ছেলেদের ভীড়। স্কুলের সংগে ছেলেদের কোন প্রকার যোগ থাকে না—তাই দেখা যায় বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া শতকরা ৯০জন যুবক প্রাক্তন বিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোলমাল নানা রকম—Managing Committee ও শিক্ষকদের সহিত মনোমালিন্য, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নাই মধুর সম্পর্ক। সরকারী, রেলওয়ে ও মিশনারী কয়েকটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্যত্র শিক্ষক-দের বেতন এতই কম যে, তাহারা স্কুলের সময়ের বাহিরে অন্য কিছু না করিলে দুবেলা দুইটি খাইতে পাইবেন না। তাহা ছাড়া তাহাদের চাকরীরও কোন নিশ্চয়তা নাই। শিক্ষা জগতে কোথায় কি হইতেছে তাহা খোঁজ রাখিবার সময় ও সুযোগ শিক্ষকদের নাই। বছরের শেষে ছেলে পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষকদের দায়িত্ব শেষ হয়। Double Account রাখা এবং অন্যায়ভাবে শিক্ষককে তাড়ান ইহাও অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করা হইয়া থাকে।

বাঙলা সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এই প্রদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রসংখ্যা হিসাবে A B C ও D এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন গুণসম্পন্ন শিক্ষকদের মাহিনার স্কেল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কেল অনুযায়ী শিক্ষকদের মাহিনা যাহাতে দেওয়া হয় তাহার জন্য সরকার হইতে প্রত্যেক বিদ্যালয়কে সাহায্য করা হইতেছে। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাড়ান জেলা স্কুল পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া হইবে না। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত কর্তৃত্বাধীনে ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে এক কর্তৃত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সরকার শিক্ষক-মহাশয়দের বেতনের যে হার নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই দুর্দিনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতনের পার্থক্য এতই বেশী যে তাহাতে শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকা কঠিন। মাধ্যশিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য যে বোর্ড স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষক প্রতিনিধিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৮৫জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-কার্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের কৃষকরা অশিক্ষিত—তাহারা কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত উন্নত প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞ। কৃষি-কার্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করা সরকারের কর্তব্য। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বাহিরে কতকগুলি কলেজ চালু করিলেন। কতকগুলি সাধারণ কলেজ বাড়ানোর প্রয়োজন বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদি সরকার বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইত। পশ্চিম বাঙলায় এক চুঁচুড়া ছাড়া আর কোন কৃষি বিদ্যালয় নাই। প্রত্যেক জেলার সদরে একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র (Agricultural Farm) আছে। কিন্তু ইহাতে চাষীদের বিশেষ কোন উপকার হয় না। প্রতি থানায় যদি একটি করিয়া সরকারী Agricultural Farm চালু করা হয় তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। থানায় থানায় যে সকল Agricultural Farm থাকিবে সেখানকার কর্মচারী-দের আর একটি কাজ হইবে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপন করা। এখন সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের কৌলিন্য বজায় রাখিয়া সব সময় সাধারণ লোকেদের কাছ হইতে দূরে থাকেন। কোন সরকারী কর্মচারীদেরই এইরূপ মনোভাব থাকা উচিত নহে। বিশেষ করিয়া কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের সাধারণ কৃষকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে এবং তাহাদের কৃষিকার্যের মধ্যে কোথায় ত্রুটী হইতেছে তাহা হাতে কলমে দেখাইয়া দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকারের কার্য অনুকরণীয়। সমগ্র প্রদেশে গ্রাম্য অঞ্চলে মাদ্রাজ সরকার আগামী বৎসর ২২০টি কৃষি-ক্ষেত্র (Agricultural Farm) স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। কৃষিকার্যের জন্য ভাল গরু ও মহিষের ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দরকার। সরকার হইতে অল্প মূল্যে কৃষকদের গরু, মহিষ ও যন্ত্রপাতি দেওয়া দরকার। পশ্চিম বাঙলায় জলের অভাবে অনেক জমি পতিত থাকিয়া যায়। পতিত জমি উদ্ধার ও জলের অভাব দূর করিবার জন্য সরকার Tank Improvement বিভাগ খুলিয়াছেন এবং কতকগুলি সেচখালও খনন করা হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলায় অনেক পুষ্করিণী আছে যাহা দিন দিন শুকাইয়া অকেজো হইয়া যাইতেছে। সরকার হইতে এই পুষ্করিণীগুলি খনন করিয়া দিলে কৃষিকাজের সুবিধা হইবে এবং মাছ চাষও হইবে। বীজ বিতরণের জন্য সরকার হইতে কতকগুলি বীজাগার স্থাপন করা হইয়াছে। এই বীজাগারের সংখ্যা আরও বাড়ান উচিত এবং অন্ততঃ প্রতি Union-এ একটি করিয়া বীজাগার স্থাপন করা উচিত। আমরা প্রত্যেক বাড়ী হইতে জঞ্জাল এবং মলমূত্র ইতস্তত ফেলিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যহানি করিয়া থাকি। এইগুলি নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিলে ভাল সার হইতে পারে। সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মচারীদের গ্রামে গ্রামে গিয়া Compost তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। অল্প মূল্যে ভাল সার কৃষকরা যাহাতে পাইতে পারে তাহার জন্য প্রতি Union-এ প্রতিষ্ঠিত বীজাগারে সার বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই জনসাধারণ এবং সরকারের ঝোঁক বেশী। বৃটিশ রাজত্বকালে কেতাবী বিদ্যা অর্জন করিলে রাজ-সরকারে এবং অন্যান্য সদাগরী অফিসে চাকরী মিলিত বলিয়া আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এই দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে দেশের আনাচে কানাচে সরকারের বিনা সাহায্যেই মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ফল এই হইতেছে যে, উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত হোক আর না হোক সকল ছেলেকেই মা-বাপ উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেছে। উচ্চ শিক্ষা ও আশানুরূপ বিস্তার লাভ করে নাই—কিন্তু কারিগরী বিদ্যায় আমাদের দেশ পড়িয়াছে পিছাইয়া। দেশে কারিগরী বিদ্যা যাহাতে বিস্তার লাভ করে সরকার ও জনসাধারণের সেদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। এখন সারা পশ্চিম বাঙলা প্রদেশে মাত্র ৬টি কারিগরী বিদ্যালয় আছে এবং তাহা খুব উচ্চাঙ্গের নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধুনা অর্থ সাহায্য করিয়া এই কারিগরী বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি জেলায় অন্তত একটি করিয়া কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। পুঁথি প্রধান উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকল ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত না রাখিয়া কারিগরী বিদ্যার দিকে আকর্ষণ আছে এইরকম ছেলেদের কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতবর্ষ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৮৫ জন কৃষি কার্যের উপর নির্ভর করে এবং গ্রামে বাস করে। ভারত-বর্ষ কোনদিনই শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিতে পারে না এবং দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে শিল্পে

নিয়োজিত করা সম্ভবও নয় এবং উচিতও নয়। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে আমাদের শিল্প প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষের মত গ্রামবহুল কৃষি প্রধান দেশে কুটীর শিল্পের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষে এক সময় নানারকম কুটীর-শিল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিদেশী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া এই কুটীর শিল্পগুলি মৃতপ্রায় হইয়া আছে এবং কোন কোনটি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোথায় কোন শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া উন্নত প্রণালীতে কুটীর শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কলেজ থাকা উচিত। এখানে প্রদেশে প্রচলিত বিভিন্ন কুটীর শিল্প বিষয়ে উনত প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইবে। এই কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা প্রতি Union-এ গিয়া গ্রামগুলিতে কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন। কারিগরদের অল্প মূল্যে উন্নত যন্ত্রপাতি দিতে হইবে এবং অর্ধশিক্ষিত কারিগররা যাহাতে মামুলী জিনিস তৈয়ারী না করিয়া নূতন নূতন design-এর জিনিস তৈয়ারী করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রয় হয় তাহার জন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত। অল্পদিন হইল ভারত সরকার কুটীর শিল্পের উন্নতি সাধন করিবার জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করিয়াছেন; কিন্তু কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। বাঙলা সরকার কুটীর শিল্প প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। Dispursal Scheme-এর জন্য সরকার যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহার কিছুটা যদি একটা Central Institute of Cottege Industres স্থাপন করিবার জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে দেশের সত্যকার উপকার হইত।

আমাদের দেশে অন্ধ, মূক ও বধিরদের সংখ্যা কত তাহা আজও সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশই সমাজের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিকলাঙ্গদের শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা হইয়াছে। সাধারণত দেখা যায় ভগবান এই সকল ভাগ্যহীনদের একদিকে যেমন বঞ্চিত করেন তেমনি অন্য কোন না কোন বিশেষ শক্তিদান করেন। যদি শিক্ষা দ্বারা এ অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ সাধন করা যায় তাহা হইলে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে এবং সমাজের গলগ্রহ না হইয়া সমাজের উপকার করিতে পারিবে। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিকলাঙ্গদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই বলিলেই চলে। সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় অন্ধদের জন্য কলিকাতায় দুইটি বিদ্যালয় আছে এবং মূক ও বধিরদের জন্য আছে একটি। এই সকল বিদ্যালয়ে খরচ এতই বেশী যে কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই তাঁহাদের ছেলেদের পাঠাইতে পারেন। দেশে অন্ধ, মূক ও বধির শিশু কত আছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাদের শিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। যেসকল বিকলাঙ্গদের পিতামাতার খরচ বহন করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের সরকারী ব্যয়ে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্ধ, মূক ও বধিরদের শিক্ষাদান করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। সরকার হইতে Scholarship দান করিয়া বিদেশে কয়েকজন শিক্ষককে পাঠাইতে হইবে বিকলাঙ্গদের শিক্ষার নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য। প্রত্যেক Training College-এ বিকলাঙ্গদের শিক্ষা পদ্ধতি বিভাগ একটা থাকা উচিত।

আমাদের দেশে চিকিৎসকের অভাব খুবই বেশী। প্রতি ১০,০০০ লোক পিছু একজন করিয়া চিকিৎসক আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু শুধু গ্রামের হিসাব লইলে বোধ হয় প্রতি ২০,০০০ লোকের জন্য একজন চিকিৎসক আছেন কিনা সন্দেহ। অনেক সময় দেখা যায় ২০।২৫ খানা গ্রামের মধ্যে একজন মাত্র চিকিৎসক আছেন। প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যাইতেছে। দেশে যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক বৃদ্ধি পায় তাহার দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙলা দেশের মধ্যে কলিকাতায় দুইটি মেডিকেল কলেজ এবং বর্ধমান, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও কলিকাতায় কয়েকটি মেডিকেল স্কুল ছিল। মফস্বলে মেডিকেল স্কুল থাকার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা অল্প ব্যয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিত এবং স্কুলে পাশকরা চিকিৎসকরা প্রায়ই গ্রামে চিকিৎসা করিতে বসিত। কিন্তু সরকার চিকিৎসা বিদ্যার মান উন্নয়ন করিবার জন্য মেডিকেল স্কুল উঠাইয়া দিয়া শুধু মেডিকেল কলেজের শিক্ষাই চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহার ফলে কলিকাতায় ২টির জায়গায় ৪টি কলেজ হইল বটে; কিন্তু মফস্বলের মেডিকেল স্কুলগুলি উঠিয়া গেল। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের ডাক্তারী পড়া একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুদিন হইতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য বে-সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু সরকারী আয়ুর্বেদ কলেজ, গবেষণাগার ও হাসপাতাল এখনও স্থাপিত হয় নাই। উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের অভাবে আমাদের দেশের এই পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতি আজ জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। এবিষয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারের দৃষ্টিপাত করা উচিত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি লোকের খুব আস্থা আছে একথা বলা যায় না। অল্প খরচে চিকিৎসা করান যায় বলিয়া দেশের লোক এইদিকে ঝুঁকিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে ভাল কিছু নাই একথা বলিতে চাহি না। কিন্তু যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি বই এবং এক বাক্স ঔষধ লইয়া আরম্ভ হয় তাঁহাদের মানুষের মরণ বাঁচন লইয়া খেলা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়া উচিত। সরকারের একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ, গবেষণাগার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং সরকার-গ্রাহ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও চিকিৎসা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

প্রায় ২০০ শত বৎসর পরাধীনতার পর আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এদেশের সমস্যা অনেক। আমরা মোটে তিন বৎসর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। একটা জাতির জীবনে তিন বৎসর এমন কিছু দীর্ঘ নহে। এই অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না। তবে সরকার যাহাতে সকল সমস্যার প্রতি সজাগ থাকেন, তাহা জনসাধারণের দেখা উচিত। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। আমাদের জাতীয় সরকার এক একটি করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আমাদের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয় নাই। ইংরাজ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আগের মত কিম্বা বেশীই বলা যাইতে পারে আমাদের জাতীয় সরকারের file প্রীতি বাড়িয়াছে। মাথাভারী শাসন ব্যবস্থা এখনও আগের মতই চলিতেছে—কোথাও তাহার পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায় না। মহাত্মাজীর শিষ্য এবং সহকর্মীরা আজ শাসন ব্যবস্থা চালাইতেছেন; কিন্তু মহাত্মাজীর বিকেন্দ্রিত করণের আদর্শ আজ অতল গহ্বরে চাপা পড়িয়াছে। গ্রামের লোকেদের দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া নিজেদের সুখ দুঃখ নিজেদের দেখিবার সুযোগ মিলিতেছে না। শাসন ব্যবস্থা দিনের পর দিন হইতেছে কেন্দ্রীভূত। যে সকল কংগ্রেস নেতারা ছিলেন জনসাধারণের বন্ধু, সহকর্মী ও দরদী, আজ তাঁহারা শাসকের গদিতে বসিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক : নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঘণ্টা না থাকায় টেবিলে একটা ঘুষি মেরে 'কে' বলল, 'আমার কথা প্রায় শেষ হয়েছে।' ঘুষির শব্দে ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর পরামর্শদাতা চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের থেকে সরে গেলেন। 'এসব ব্যাপার থেকে আমি সম্পূর্ণ আলাদা। সেইজন্যে আমি বিষয়টি শান্তভাবে বিচার করতে পারি। আপনারা যদি এই আদালতকে সত্যিই কোনো মূল্য দেন, তা হলে আমার কথা শুনলে আপনাদের যথেষ্ট সুবিধে হবে। কিন্তু আমাকে যা বলতে হবে তার ওপর আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে তা পরের জন্য মুলতুবী রাখতে আমি আপনাদের অনুরোধ করি। কারণ আমার সময় নেই' আমাকে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেতে হবে।'

সংগে সংগে সমস্ত ঘর নীরব হয়ে এল। সভার সকলে যেন 'কে'-র নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। তারা আর এখন এলোমেলো চীৎকার করছে না অথবা হাততালি দিচ্ছে না। 'কে'-র অভিমত যেন তাদেরও অভিমত

সকলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে 'কে'-র কথা শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। নীরবতার মধ্যে চাপা গলার যে ফিসফিসানি কানে বাজছে তা ঘর-ভাঙা হাততালির আওয়াজ থেকেও উত্তেজনাকর। খুব নরম গলায় 'কে' বলল, 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই আদালতের সকল কাজ, আমার ক্ষেত্রে আমাকে গ্রেপ্তার করা এবং আজকের এই জেরা—এ সবের পেছনে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিপরায়ণ ওয়ার্ডার, বর্বর ইন্সপেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ করে। ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে যাঁদের সবচেয়ে ভাল বলা যেতে পারে তাঁরা শুধু নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি খুব উঁচুস্তরের বিচার-কর্তৃপক্ষ আছেন। এঁদের অধীনে আবার রয়েছে অপরিহার্য ও অগণিত চাকর, কেরাণী, পুলিশ ও অন্যান্য সহকারী; হয়ত জল্লাদও রয়েছে। জল্লাদ কথাটি উচ্চারণ করতে আমি মোটেই ভয় পাই না। আপনারা বলতে পারেন, এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের আসল তাৎপর্য কি? নির্দোষ লোকদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই প্রতিষ্ঠানের আসল কাজ। কিন্তু তাঁদের ব্যবস্থা অধিকাংশ সময়ে কার্যকরী হয় না, যেমন হল না আমার বেলায়। সমস্ত ব্যাপারটার অসঙ্গতি বিবেচনা করলে, প্রতিষ্ঠানের উঁচুস্তরের কর্তাদের পক্ষে তাঁদের অনুচরদের জঘন্য দুর্নীতিপরায়ণতা কি করে দূর কথা সম্ভব? তা কখনও সম্ভব নয়। এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম বিচারপতিকেও তাঁর আদালতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে। এই কারণে ওয়ার্ডাররা ধৃত লোকদের পোশাকে আত্মসাৎ করবার মতলব ফাঁদে, ইন্সপেক্টররা বেমক্কা অপরিচিত নির্দোষ লোকের ঘরে ঢুকে অসভ্যতার পরিচয় দেয়। ওয়ার্ডাররা কয়েকটি গুদামের কথা বলেছিল, যেখানে কয়েদীদের জিনিসপত্র জমা রাখা হয়। ধৃত লোকদের বহু কষ্টে সংগৃহীত জিনিসপত্র যেখানে পচে গলে নষ্ট হবার জন্যে জমা রাখা হয় সেই সব গুদাম এবং এই প্রতিষ্ঠানের অনুচরদের হাতসাফাইয়ের পর জিনিসপত্রের কতটুকু বাকী থাকে তা আমি দেখতে চাই।'

এই সময়ে ঘরের এক সীমান্ত থেকে কে যেন এক বিচিত্র শব্দ করল। বাধা পেয়ে 'কে' ভুরুর ওপর হাত রেখে দেখতে চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কি। ধোঁয়া ও অনুজ্জ্বল আলোয় সমস্ত ঘরে এক সাদাটে কুয়াসার আস্তরণ পড়েছে। যে মেয়েটি ময়লা পোষাক পরিষ্কার করে ওই বিচিত্র আওয়াজ কি তার মুখ থেকে বেরিয়েছে? 'কে'-র মনে হল, ঘরে ঢুকবার পর থেকেই মেয়েটি নানাভাবে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। ওই শব্দ সত্যিই তার মুখ থেকে বেরিয়েছে কি না, এখন বলা মুশকিল। 'কে' শুধু দেখতে পেল, একটি লোক তাকে দরজার পাশে এক কোণে নিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে। তবু মেয়েটি ওই শব্দ করেনি, করেছে ওই লোকটি। লোকটির মুখ খোলা, সে ওপরে ছাতের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের চারপাশে কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। 'কে' আদালতে যে গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তা যে এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এতে গ্যালারির লোকগুলো খুব খুশি। 'কে'-র প্রথমেই দৌড়ে দরজার পাশের কোণটিতে পৌঁছবার ইচ্ছে হল। তার স্বভাবতঃই মনে হয়েছিল যে, আদালত-ঘরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং অন্ততঃ মেয়েটি ও ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দেবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কিন্তু প্রথম সারির লোকগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রইল; কেউ নড়ল না, কেউ তাকে এগোতে দিল না। বরং তারা তাকে বাধা দিল। পেছন থেকে কার একখানা হাত 'কে'-র জামার কলার চেপে ধরল—কার হাত পেছন ফিরে দেখবার অবকাশ তার মিলল না। 'কে'-কে বাধা দেবার জন্য বুড়ো লোকগুলো তাদের হাত বাড়িয়ে দিল আর এই সময়ে মেয়েটি আর ওই লোকটার কথা ভুলে গেল 'কে'। তার মনে হল, তার স্বাধীনতা বিপন্ন, সত্যিই এতক্ষণে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। মরিয়া হয়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল 'কে'। সমগ্র জনতার দিকে সে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। এরা কি তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছে? সে কি তার বক্তব্যের কর্যকারিতাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিল? যখন সে কথা বলছিল তখন কি এরা এদের সত্যিকার অভিমত গোপন করে রেখেছিল আর এখন তার বক্তৃতা শেষ হবার পর এরা ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে? তার চারপাশে কাদের এসব মুখ! তাদের ধূর্ত কাল ক্ষুদে চোখের মণি দ্রুত এপাশে-ওপাশে নড়ছে, তাদের খোঁচাখোঁচা দাড়ি হাত দিলে যেন গুঁড়িয়ে যাবে। তাদের দাড়িতে হাত দেওয়া যেন জন্তুর থাবার হাত দেবার মত।

এতক্ষণে 'কে' আবিষ্কার করল, তাদের দাড়ির তলায় কোটের কলারে বিভিন্ন আকারের ও রঙের ব্যাজ ঝুলছে। যতদূর সে দেখতে পেল, তারা সবাই ওই ব্যাজ পরেছে। ঘরের দু'পাশের দুই দলের সবাই পরস্পরের সহকর্মী। ঘরে দাঁড়িয়ে 'কে' হঠাৎ দেখল, ম্যাজিস্ট্রেটের কোটের কলারেও সেই ব্যাজ। হাঁটুতে হাত রেখে স্থির চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ যেন নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে 'কে' চীৎকার করে উঠল, 'তাই বল! আমি এতক্ষণ যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলছিলাম আপনারা সকলেই দেখছি তার অনুচর। আপনারা সকলে আমার কথা শুনতে এবং আমার সম্বন্ধে যা কিছু সম্ভব জেনে নিতে এখানে এসে জুটেছেন। আপনার

এতক্ষণ দলাদলির অভিনয় করছিলেন আর আমার পেট থেকে কথা বের করবার জন্যে এবং একজন নির্দোষ লোককে বোকা বানাবার জন্যে একদল হাততালি দিচ্ছিলেন। আমি আশা করছিলাম যে, আপনারা একজন নির্দোষকে রক্ষা করবেন—এর থেকে আপনারা হয়ত শুধু একটু তামাসার খোরাক পেয়েছেন অথবা—' যে বুড়ো লোকটা কাঁপতে কাঁপতে 'কে'-র একেবারে কাছে চলে এসেছিল তাকে লক্ষ্য করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরে যাও, না হলে আমার ঘুষি খেতে হবে—অথবা আপনারা হয়ত সত্যিই দু'একটি বিষয় জানতে পেরেছেন। আমি চাই আপনাদের কারবার ভালই চলুক।' বুড়ো লোকটা আরও কাছে সরে আসায় 'কে' চট করে তার টুপি চেপে ধরল আর বিস্ময়ে অভিভূত লোকদের মধ্য দিয়ে বুড়োকে ঠেলে নিয়ে চলল দরজার দিকে। কিন্তু মনে হল, ম্যাজিস্ট্রেট 'কে'-র থেকেও দ্রুতগামী' কারণ তিনি দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। 'একটু দাঁড়ান,' তিনি বললেন। 'কে' থামল, কিন্তু চোখ রাখল দরজার ওপর, ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরে নয়। হাতলটা সে ধরেই রইল। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'আমি আপনাকে শুধু এই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, একজন অভিযুক্ত লোককে জেরার সময় যে সব সুযোগ দেওয়া হয়, আপনি হয়ত সচেতন নন যে, আপনি নিজের হাতেই আজ সে সব সুযোগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।'

'কে' হাসল, তখনও দরজার দিকে তার দৃষ্টি। 'শয়তানের দল, আমি তোমাদের জেরা ভাল করে শিখিয়ে দেবো! চীৎকার করতে করতে দরজা খুলে, সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল 'কে'। তার পেছনে উত্তেজিত আলোচনার গুঞ্জন উঠল। আদালত-ঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই আবার সজীব হয়ে উঠেছে এবং দক্ষ ছাত্রদের মত বিশ্লেষণ করছে আজকের ঘটনা।

তিন

শূন্য সওয়াল ঘরে

পরের সপ্তাহের প্রত্যেকটি দিন 'কে' নতুন সমনের অপেক্ষা করল। জেরা করতে দিতে তার অসম্মতি যে ওরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেবে—একথা সে ভাবতে পারল না এবং শনিবার সন্ধ্যায়ও যখন নতুন সমন এল না, 'কে' ধরে নিল যে, সে ঠিক সময়ে ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবে ওরা তাই ভেবে রেখেছে।

সুতরাং রবিবার সকালে সে সেখানে গিয়ে পৌঁছল এবং এবার বারান্দা ও সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি এগিয়ে গেল। যে কয়েকটি লোক তাকে চিনতে পারল তারা নিজেদের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছু জেনে নেবার প্রয়োজন 'কে'-র আর ছিল না। সে চট করে ডান দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল এবং দরজার কাছে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে একবারও না তাকিয়েই 'কে' পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

'আজ কোন অধিবেশন নেই,' মেয়েটি বলল।

'আজ বৈঠক নেই কেন?' প্রশ্ন করল 'কে'; 'কে' মেয়েটির কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিন্তু মেয়েটি নিজে পাশের ঘরের দরজা খুলে তাকে দেখিয়ে দিল যে, কোন বৈঠক হচ্ছে না। ঘরখানা সত্যিই শূন্য আর সেই শূন্যতার জন্যই আরও কদর্য। টেবিলখানা এখনও মঞ্চের ওপর রয়েছে এবং টেবিলের ওপর কয়েকখানা বই।

'বইগুলোর পাতায় একবার চোখ বুলোতে পারি?' 'কে' জানতে চাইল। তার যে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল তা নয়। সে তার এখানে আসাটা একেবারে অর্থহীন করতে চায় না।

'না।' বলেই মেয়েটি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। 'অনুমতি নেই। ওসব বই মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের।'

'বুঝলাম'। ঘাড় নেড়ে 'কে' বলল, 'বইগুলো সম্ভবতঃ আইনের এবং এখানকার বিচার-পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই যে, দণ্ড পেতে হলে শুধু নির্দোষ হলেই চলবে না, নির্বোধও হতে হবে।'

'নিশ্চয়!' 'কে'-র কথা ঠিক না বুঝেই মেয়েটি বলল।

'কে' বলল, 'তা হলে আমার আবার যাওয়াই ভাল।'

'আমি কি ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর পাঠাব?' বলল মেয়েটি।

'তুমি চেন তাঁকে?'

'নিশ্চয়। আমার স্বামী যে আদালতের একজন কর্মচারী'

এতক্ষণে 'কে' লক্ষ্য করল, যে লাগোয়া ঘরটিতে গত রবিবারে শুধু একটা সাবান জলের টব ছিল সেটি এখন আসবাবপত্রে সাজান বাসের ঘরে পরিণত হয়েছে।

তার বিস্ময় লক্ষ্য করে মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এখানে বিনা ভাড়ায় থাকবার ঘর পাই, কিন্তু আদালতের অধিবেশনের দিনে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়। আমার স্বামীর এই চাকরির অনেক অসুবিধেও আছে।'

মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে 'কে' বলল, 'আমি ঘর দেখে খুব বিস্মিত হইনি, বিস্মিত হয়েছি তুমি বিবাহিত দেখে।'

'গত অধিবেশনে আপনার বক্তৃতার সময় আমাকে ঘিরে যে ঘটনাটা ঘটেছিল আপনি বোধহয় তার প্রতি ইঙ্গিত করছেন।' মেয়েটি বলল।

'নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত করছি।' 'কে' বলল, 'ঘটনাটা অবশ্য পুরোন হয়ে গেছে, তবু তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। আর এখন তুমি নিজেই বলছ যে, তুমি বিবাহিতা!'

'পরে যে-সব আলোচনা হল তাতে বোঝা যায় যে, আপনার কথা ওদের খুব খারাপ লেগেছিল। অতএব আপনার বক্তৃতায় বাধা দেওয়ায় কোন ক্ষতি হয়নি।'

'তা হতে পারে,' 'কে' কথার মোড় ঘোরাতে চাইল না, 'কিন্তু তাতে তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয় না।'

'যারা আমাকে জানে তারা কেউ আমার দোষ ধরে না।' মেয়েটি বলল, 'যে লোকটিকে আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরতে দেখেছিলেন সে অনেক দিন থেকেই আমার পেছনে লেগে আছে। অনেকের চোখেই আমি হয়ত লোভনীয় নই, কিন্তু তার চোখে আমি লোভনীয়। তাকে এড়িয়ে চলবার কোন উপায় নেই; এমন কি আমার স্বামীও এখন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। আমার স্বামীকে যদি চাকরি বজায় রাখতে হয় তা হলে তাঁকে এটা মেনে নিতেই হবে। কারণ যে লোকটিকে আপনি দেখেছিলেন, সে একজন ছাত্র এবং সম্ভবতঃ একদিন সে আরও বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হবে। আমার পেছনে সে সব সময়ে লেগে আছে; আজও আপনি আসবার ঠিক আগে সে এখানে ছিল।

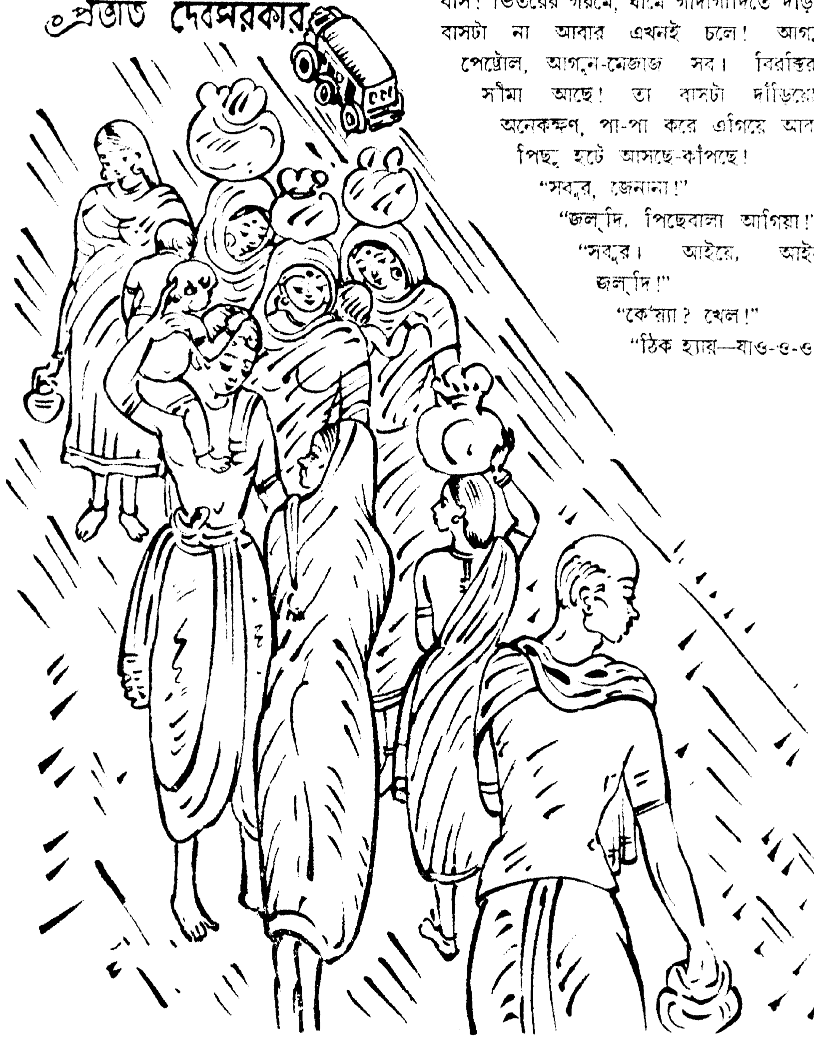
'এখানকার সব গানেরই এক সুর।' 'কে' বলল, 'আমি আর আশ্চর্য হচ্ছি না।'

ক্রমশঃ



একটি দুর্ঘটনা

প্রভাত দেবসরকার



হঠাৎ স্টপেজের মাঝপথেই বাসটা বাঁধল। আচমকা ঝাঁকুনিতে আগাপাস্তলা সশব্দে কেঁপে উঠেই বাসটা স্থির হয়ে গেল। একটা আতঙ্কিত বিস্ময় ভিতরের সঞ্চালিত দেহ-গুলোকে নাড়া দিয়ে মুহূর্তের জন্যে থ' হয়ে রইল—আপনা থেকে বসবার-দাঁড়াবার তিলও ধরে গেল! কলকব্জা-ছেঁড়া আর্তনাদের নিঃশব্দ রেশটা যাত্রীদের সজাগ করে দিলে।

না, কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি। বা, কোন দুর্ঘটনা পশ্চাদ্ধাবন করেনি। আগে-পাশে কোন গাড়ি-ঘোড়াও পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। বাসটা থেমেছে, একদঙ্গল যাত্রীকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে। হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা নয়, টেনে-হিঁচড়ে তুলে নেওয়া—গাদার মড়ায় ফেলে দেওয়া।

অধৈর্য মুহূর্তে, অধৈর্য যাত্রী আর অধৈর্য বাস! ভিতরের গরমে, ঘামে গাদাগাদিতে দাঁড়ান বাসটা না আবার এখনই চলে! আগুনে পেট্রোল, আগুন-মেজাজ সব। বিরক্তিরও সীমা আছে! তা বাসটা দাঁড়িয়েছে অনেকক্ষণ, পা-পা করে এগিয়ে আবার পিছু হটে আসছে-কাঁপছে!

"সবুর, জেনানা!"

"জল্‌দি, পিছেবালা আগিয়া!"

"সবুরে। আইয়ে, আইয়ে জল্‌দি!"

"কেঁয়্যা? খেল!"

"ঠিক হ্যায়—যাও-ও-ও!"

অবশেষে একটা আর্তকোলাহল সমস্ত বাসটাকে যেন আক্রমণ করলে। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে করে প্রায় গুটি দশ-পনের যাত্রী টাল-মাটাল অবস্থায় হুড়মুড় করে বাসে উঠে পড়ল। ঊর্ধ্বশ্বাস গতির সঙ্গে নিজ নিজ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে দিশাহারার মত এটা ধরে, ওটা ছাড়ে—একে ডাকে, ওকে বকে, তাকে খোঁজে। আর সকলের মধ্যে এমন একটা অকুণ্ঠ অস্থিরতা প্রকাশ পায় যেন দলটার প্রত্যেকে প্রত্যেককেই হারিয়ে ফেলেছে,—চোখের ওপর থেকে একটা অন্ধপর্দা সরিয়ে দেবার জন্যে সকলেই আকুলি-বিকুলি করছে। কে জানে, এত লোকজনের সান্নিধ্য এদের খেয়াল হয়েছে কি না!

অসুবিধাটা যেন তাঁদেরই বেশী হলো যাঁরা বরাবর বসে আসবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। পিছনের সিট থেকে একজন বললেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অমন গুতো-গুঁতি করছো কেন সব এগিয়ে যাও না!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর মুখিয়ে উঠল : দেখুন না, যত সব ইয়ে—

স্পষ্ট না হোক অস্পষ্ট গুঞ্জরণে সমাসীন ব্যক্তিদের অনেকেই উক্তিটা সমর্থন করলেন। অলক্ষিতে অসন্তুষ্টির একটা ঢেউ বয়ে গেল। ইয়ে'র মানে উপলব্ধি করে অনেকে সশব্দে হাসলেন।

দলটা এখনো টাল সামলে উঠতে পারেনি। সামনে এগোবার পথও পাচ্ছে না। এদিকে আশ-পাশ থেকে এগিয়ে যাবার ক্রুদ্ধ পরামর্শে আরো যেন বিহ্বল হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সঙ্গের মেয়েছেলেগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে—বসবার জন্যে তাঁদের একবাক্যে সবাই বলছেন, কিন্তু বসবার আসন তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ তাঁদের বসতে সাহায্য করবে বলে মনেও হয় না।

দরজার সামনে লেডীজ সিটটা ভর্তি হয়েই আসছে দুজন আধুনিকা সর্বাধুনিক সাজগোজে সেটাকে আলো করে আছেন। তাঁদের একজন বক্রনয়নে এঁদের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করেই বোধহয় মুখ টিপে হেসে পার্শ্ববর্তিনীর কানে কানে কৌতুককর কিছু একটা সংবাদ সরবরাহ করলেন। দুজনেই হেসে উঠলেন। এঁদের হাসির ছটায় অসহায়া-দের মুখগুলো আরো করুণ দেখাল।

দেখতে খারাপ হলেও সকলে নির্বিবাদে দেখছেন। মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের তাগাদা দেবার গরজ বড় একটা কারো নেই। এদিকে তিনটি বৌ, দুটি কুমারী আর তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যেন অকূল পাথারে পড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। দলের অভিভাবক যিনি বৃদ্ধমত পিছন থেকে ক্রমাগত তাড়া দিয়ে দলের সকলকে শান্ত হতে বলছেন, কিন্তু নিজে ঠিকমত দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে অস্থির হয়ে অনেকের বিরক্তির উদ্রেক করছেন : কোথাকার ইয়ে—দাঁড়াতেও জান না! ...অত ছটফট করছো কেন?...ভূত কোথাকার পাটা মাড়িয়ে দিলে! চোখে দেখতেও পাও না? যত সব ইয়ে—আশপাশ থেকে বৃদ্ধ যতবার তিরস্কৃত হন ততবারই নিজের দলটিকে

সামলাতে তাড়া দেন ঃ ছট্‌ফট্‌ করো না, চুপ করে দাঁড়াও—থির হও! বাপ্‌-সকলরা!

মেয়েছেলের দলটি তখন মধুচক্রবেষ্টনকারী মক্ষিকার মত দলের একটি যুবককে ছেঁকে ধরে আছে—যুবকটির কাঁধ-পিঠ-হাত কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল অপ্রস্তুত মুখটা অনেকগুলো ক্রুদ্ধ, বক্র এবং উদ্ধত চাহনির ওপর ভেসে আছে। ধরা-পড়া চোরের মত চেয়ে যুবকটি যেন নিঃশব্দে সকলের হয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করছে ঃ দয়া করে কিছু মনে করবেন না, আমরা এখনই নেমে যাব! গাঁ থেকে সব এসেছি, আদপকায়দা কিছুই জানি না! আপনাদের চরণাশ্রয় কামনা করি, বড় দীন অধম আমরা! ওরি মধ্যে পোষাকের দীনতা ছাড়িয়ে কুমারী মেয়ে দুটির একটিকে বেশ সজাগ এবং সপ্রতিভ মনে হয়। বিহ্বল চাহনির মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে—যেন বিপরীত কোন মন্তব্য মানতে সে রাজী নয়। সমবেত লজ্জা এবং অপমানের স্পর্শটাকে ঠেলে দিতেই বোধহয় তার গ্রীবাভংগী অতিশয় কঠিন হয়ে আছে—স্ফুরিত অধরের কুঞ্চনরেখায় অনুদার পারিপার্শ্বিককে অবহেলা করার মনোভাবটা স্পষ্ট। যে-কেউ, যে-কোন কথা বলছে তাতেই মেয়েটির দৃষ্টি চকিত ক্ষুরধার হয়ে উঠছে।

বারদুই মেয়েটি বৃদ্ধের কথার যেন প্রতিবাদ করলে, তুমি চুপ কর না—বলে দাঁড়াতেই পারা যায় না থির হবে! কেন?

এঁরা কি মনে করছেন—মুখ ফুটে বৃদ্ধ বলতে পারেন না, কিন্তু পারলে যেন ভাল হ'তো, এমনিভাবে তিনি এদিক-ওদিক চাইলেন। সৌদামিনীর অত কথায় দরকার কি—অত জোরই বা কেন? একটু 'থির' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ক্ষতিই বা কি? এখনো মেয়ের তেজ কত! সব কথায় মেয়ের চোপা আছে!

অপর মেয়েটি ভিড়ের ধাক্কায় একেবারে দুমড়ে গেছে। তার বৈশিষ্ট্যহীন মুখে ভাবলেশহীন চাহনিটা ডাংগায় তোলা মাছের চোখের মত নিস্পন্দ, স্থির। কিছুই যেন তার খেয়াল হচ্ছে না, বা যা হচ্ছে তার জন্যে এতটুকু অনুভূতির অভিব্যক্তি তার সাধ্যাতীত। হঠাৎ পাষাণ-হয়ে-যাওয়ার উপমাটা মেয়েটিতে সার্থক হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিকে কোলের কাছে আঁকড়ে ধরে অকাতরে ভিড়ের চাপ সহ্য করছে।

বৌ তিনটি মাঝখানের যুবকটির দুই কাঁধের উপর এক হাতের ভর দিয়ে কোলের ছেলে আর বেশবাস সামলাতে সামলাতেই কেমন যেন ঢিলে-ঢালা হয়ে গেছেন। এই অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে হঠাৎ যেন তাঁরা নিজেদের পোষাক-আশাক সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছেন। সামলাতে সামলাতে একটি বউ-এর পিঠের কাপড় তো হাঁ হয়েই গেল—আর একজনের আঁচল ছিঁড়ে দু'ফাক হলো। আশপাশের উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তাঁরা নিজেদের যত ঢাকতে চেষ্টা করলেন, ওদিকে কাঁকের ওপর ছেলেগুলোর নেই আঁকড়ে পনা তত বেড়ে গেল—মাতৃবক্ষ নিঙড়ে সুধাস্বাদের এই যেন উপযুক্ত সময়।

"কি রাক্ষুসে চেহারা ছেলের বাবা!" লজ্জিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধস্বর সশব্দে বেজে ওঠে। বাদুড়-ঝোলা ছেলেগুলো টিল্‌-বিল্‌ করে চেঁচায়। বাসটার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

মজাটা কিন্তু বেশিক্ষণ উপভোগ করা গেল না। এক সময় পথ-চাওয়া কণ্ডাক্টারটার ভিতরের দিকে নজর পড়ল। এক মুখে বাইরের যাত্রী অভ্যর্থনা জানিয়ে আর এক মুখে বললে, লেডীজ সিটটা ছেড়ে দেবেন দয়া করে!

হঠাৎ যেন সবার খেয়াল হলো। ভিড়ের মধ্যে অনেকগুলো দৃষ্টি তৎপর হয়ে উঠল। হাতে-নাতে ধরা পড়ার অপ্রস্তুত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিতে বসে বসে অনেকে বেজার হলেন, জায়গা নেই, তবু লোক তুলবে—তোমাদের আর কি! মর শালা তোমরা!

ইতিমধ্যে লেডীজ সিটের তাগাদায় ভিড়ের পাকা গাঁথুনীটা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে। আশপাশের হাতের পায়ের, মাথার ফাঁক দিয়ে খুব স্পষ্ট না হলেও দেখা গেল ঃ দরজার বাঁ-হাতি বড় সিটটায় মাত্র একটি মহিলাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে তিনজন যুবা-পৌঢ় গ্যাঁট হয়ে আছেন। আর তার উল্টো দিকের আসনটায় একটিও মহিলা নেই, সবই পুরুষ।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি তখনো চলছে। বিরুদ্ধ মন্তব্যও দু'একটা এদিক-ওদিক থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু মহিলার আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের ঠিক খেয়াল হয়েছে কি না বোঝা গেল না। যতদূর মনে হয়, তাঁরা যেন হঠাৎ বড় বেশী অন্যমনস্ক এবং ধ্যানগম্ভীর হয়ে উঠেছেন। শব্দ-স্পর্শের সব অনুভূতিই তাঁদের লোপ পেয়েছে।

কিন্তু কনডাকটার ছাড়ার পাত্র নয়। আবার হাঁক দিলেন, লেডিজ সিট ছেড়ে দিবেন দয়া করে! এঁদের বসতে দিন। যান আপনারা!

একটা ভ্যাবাচাকার ভাব নিয়ে দলটি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল,—কে জানে, তাদের বরাতে আবার কিছু একটা ঘটবে কি না! এই অবস্থায় বসতে পাওয়া তো পরম ভাগ্যের কথা। অতো ভাগ্য কি তাঁরা করেছেন?

কনডাকটারের গলার সংগে আরো কয়েকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর মিশে ধমকান ভংগিতে ধ্বনিত হলো ঃ দেখতে পাচ্ছেন না, মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে?—লেডিজ সিট ছেড়ে দিন! উঠুন!

তবু দেরী হল। ওঠা-বসা দুই-ই সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া উঠবেনই বা কোথায়? মেয়েছেলে তোলবার সময় খেয়াল থাকে না? একদিকের আসন থেকে তৎক্ষণে বিকৃত কণ্ঠের প্রতিবাদ হয়েছে ঃ তোমার যে আর তর সয় না দেখি!—ওঠ বললেই অমনি ওঠা যায় আর কি! ভর্তি গাড়ীতে গেদে দেবার সময় মনে থাকে না! এখন উঠুন নবাব কোথাকার!! দণ্ডায়মান যাত্রীদের একজন পাশ ফোঁড় দিলেন, ওর দোষ কি, আপনারা ওঠেন বলেই তো তোলে? না উঠলেই পারেন!

পরামর্শটা দার্শনিকের মত হলেও শ্লেষাত্মক।

কেন, আপনার কথায় নাকি?—বিকৃত স্বর আরো বিকৃত হয়ে উঠলো, পাশ-ফোঁড়ও রুখে উঠলেন, হ্যাঁ আমার কথায়!—তা বলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকবে বলতে চান? অত যদি বসবার সখ ট্যাক্সি চড়ে যেতে পারেন!

ট্যাক্সির উল্লেখে বোধ হয় সামর্থ্যের খোঁচা ছিল—তাও সংগের মেয়েদের সামনে। তড়াক করে ভদ্রলোক সিট ছেড়ে উঠেই আস্তিন গুটিয়ে ভিড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্তব্যকারীকে আহ্বান করলেন ঃ কই সামনে এসে বলুন না দেখি! বড় যে ট্যাক্সি দেখাচ্ছেন!

উন্নততর যানবাহনের উল্লেখকারী তখন অনেকগুলি আপোষকারী হাত-বুক-পিঠের আড়ালে আটকা পড়ে ছটফট করছেন। এক-একবার লাফিয়ে ওঠার ভংগিতে দুষ্কৃতকারীকে মুখোমুখি পাওয়ার চেষ্টায় ঝাঁঝিয়ে উঠছেন ঃ দরকার হলে এরোপ্লেন দেখাবো—ভেবেছেন কি!

ও'রা যাই ভাবুক, এদিকে যাদের নিয়ে এত কাণ্ড সেই দলটির ভাববার আর কিছু রইল না। হঠাৎ মনে হলো, দলটির একজনও আর এই বাসে নেই। এতটুকু সাড়া-শব্দ, অস্থিরতা তাদের টের পাওয়া গেল না। অপরাধীর ভয়-বিহ্বলতায় আড়ষ্ট মূর্তিগুলো যেন এইমাত্র পাষাণ হয়ে গেছে। হঠাৎ এ আবার কি হলো?

ওদিকে বাদানুবাদ সমানে চলছে, কিন্তু ভিড়ের ব্যূহ কিছুতেই ভেদ হচ্ছে না। এক সময় বাস থেকে রাস্তায় নেমে উভয়ের শক্তি-পরীক্ষার প্রস্তাবও যেন হলো, কিন্তু ভিড় ঠেলে পথে নামার অসুবিধার জন্যে প্রস্তাবটা কার্যকরী হল না। যতদূর সম্ভব মুখে মুখেই শক্তিপরীক্ষা চলতে লাগল। কনডাকটারটি এক পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যেতে লাগল; বোধ হয় তার আর মাথা ঘামাবার কিছু নেই। মাঝখান থেকে বৃদ্ধটি বারকতক অস্ফুটে কি বলতে চেষ্টা করলেন। এই অহেতুক অনর্থের জন্যে নিজেকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করে হাত তুলে বিবদমানদের নিরস্ত হবার অনুরোধ করলেন ঃ ঠিক আছে, আমরা এমনিই যাব'খন। তোমরা বাবারা বস!

আর কিছু না হোক, এই উত্তপ্ত উত্তর প্রতিযোগিতার ফলে দু'পাশের মহিলার আসন খালি হয়ে গেল। যাঁরা সাতে-পাঁচে কিছুতেই ছিলেন না তাঁদেরও উঠে দাঁড়াতে হলো। এত তর্ক-বিতর্কের লাভটা তা হলে কি?

উত্তিষ্ঠমান একজন রসিকতা করে বললেন : তখনই বলছিলাম, লেডিজ সিটে বসা আর পাকিস্থানে বাস করা সমান! নাও এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুঁতো খাও!

রসিকতাটা তেমন উপভোগ্য হলো না। হয়তো উপেক্ষার ব্যক্তিদের নিয়ে সরস কোন মন্তব্য তেমন জমে না। কেবল আধুনিকা দুটির অধরে কিছুটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বৃদ্ধ ইতস্তত করলেও সৌদামিনী সময় নষ্ট করেনি। একরকম ঠেলে নিয়ে গিয়ে সে দলটাকে খালি আসনের একটাতে বসিয়ে দিলে। বৌ তিনটি বসল দরজার বাঁদিকের আসনে, অপর একটি মহিলার সঙ্গে। সৌদামিনীরা পাঁচজন বসল আধুনিকা দুটির কোল-ঘেঁসা পরিত্যক্ত আসনটায়।

বসতে পেয়ে ছোটগুলোর উল্লাস অদম্য হ'য়ে উঠল। বোঝবারই উপায় নেই যে, এরা এই একটু আগে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে ছিল। ভোঁতা ভোঁতা মুখগুলো রবারের পুতুলের মত প্রাণহীন মনে হ'য়েছিল। একটা রুদ্ধ প্রাণোচ্ছ্বাস সহসা উন্মুক্ত হ'য়ে যেন কল্ কল্ খল্ খল্ করে উঠল।

এই পরিবেশে এত বোধ হয় বেমানান প্রগলভতা এত হাসিরও বোধ হয় আবশ্যকতা ছিল না। কোনখানেই কোন সাড়া জাগল না। উপেক্ষায় এত আনন্দ ম্লান হ'য়ে গেল। কেবল সপ্রশ্ন ছোট ছোট হাতের আকর্ষণে সৌদামিনীর মুখটা এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগল। যেমন দুর্বোধ্য প্রশ্ন তেমনি তার অবোধ্য জবাব। আধুনিকা দুটির নিঃশব্দ হাসি আর থামে না। কোথাকার জংলী সব কে জানে! কি মনে করে' সৌদামিনী মাঝে মাঝে গম্ভীর হ'য়ে বাচ্চাদের চুপ ক'রতে বলে। কিন্তু কতক্ষণই বা, অবোধ শিশুর অবাধ্যতা আবার শুরু হয় সমানে।

যেন দয়া করে' বসতে দেওয়া হ'য়েছে—তার ওপর আবার এত হৈ-চৈ! এখনি দয়া প্রত্যাহার করা হ'বে। চুপ্, চুপ্, চুপ্! করছিস কি তোরা? বৃদ্ধের তিরস্কারের সাক্ষীমানার শেষ হয় না; টেপি, মোনা, হাবুল চুপ করে' বসতে পারো না সব! অস্থির হ'লে কেন?

পরের বাড়িতে এসে পোয়াতীরা যেমন নিজের নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়ে সামলায় বৃদ্ধটি তেমনি এদের সামলাতে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। দলের যুবকটি তখন ঝাড়া-হাত-পা হ'য়ে বাইরের দিকে চেয়ে বাসটার গতির বেগ আন্দাজ ক'রতে চেষ্টা ক'রল। কোলকাতায় এই প্রথম না এলেও আজকের কোলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে তার পরিচিত শহরের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না। বড় পর পর মনে হচ্ছে স্থান থেকে স্থানান্তর, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর! অন্যমনস্ক হ'য়ে ভুলেই যায়, কোথায় তাদের গন্তব্য—ভুলে যায়, আর কেউ তার সঙ্গে আছে কিনা। বাইরের হাওয়াটা এতক্ষণে গায়ে লেগে কেমন একটা উদাস লঘু চেতনায় মনকে তার আচ্ছন্ন করে' ফেলে।

মৌলালীর মোড়ে আসতেই বাসটা অনেক খালি হ'য়ে গেল। দরজার সামনে ভিড়ের গাঁদিটা পাতলা হ'য়ে এঁদের ক'জনকে একেবারে বেয়াব্রু করে দিলে, দুদিক থেকে বাসের উজ্জ্বল আলো আর সুসভ্য পরিচ্ছন্ন রুচি যাত্রীদের নগ্ন চোখের ওপর মানুষগুলোকে ঘসা পয়সার মত ম্যাড়মেড়ে দেখাল, কি দীন, হীন, বিষণ্ণ মূর্তি সব! এঁরা কোন দেশের মানুষ যারা বাসটাকে এমন নিরানন্দ করে' দিয়েছে? এঁদের জন্যে ওঠা-নামার স্বাচ্ছন্দ্যও যেন জড়িত হ'য়ে গেছে।

কন্‌ডাক্‌টারটা অতো বাড়াবাড়ি না ক'রলে বোধ হয় সম্ভ্রম দেখিয়ে এঁদের আসন করে' দেবার জন্যে কারো বয়ে যেত না। আসন ছেড়ে দিতে যিনি দ্বিরুক্তি করে' আবহাওয়াটাকে উত্তপ্ত করে' তুলেছিলেন তাঁর মুহুর্মুহু এঁদের দিকে তাকানোর মধ্যে কেমন যেন একটা তাৎপর্য ছিল; এদের জন্যে সহযাত্রী একজন ভদ্রলোককে অপমান করা আপনাদের উচিত হয়নি। এখন তো আপনারা সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, বলুন তো লেডিজ্ পর্যায়ে কি এরা পড়ে? কন্‌ডাক্‌টারের কি পয়সা-পাওয়া নিয়ে কথা!

অবহেলার ঔদাসিন্যে বাসটাও বোধ হয় আর তেমন জোরে ছুটতে পারছে না। বড্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে। এ বাসে না চড়লেই হ'তো!

বৃদ্ধ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, সামনের ফাঁকা জায়গাটায় উবু হয়ে বসে পড়েছেন। প্রথাবিরুদ্ধ ব'লেই বোধ হয় তাঁর কুণ্ঠাটা এত জাজ্জ্বল্যমান। আর এই কুণ্ঠিত চরণাশ্রয়ের মধ্যেও বৃদ্ধকে এতক্ষণে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হয়—যাক্, 'এদের তিনি ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবেন তা'হলে! আপাতত একটা ভাবনা থেকে রেহাই। যে-করে' যেভাবে কেটেছে এই ক'দিন ভাবলে জ্ঞান থাকে না—কুকুর বেড়ালেরও অধম! যদি ভুলে যাওয়া যায় এখন—

কন্‌ডাক্‌টার এসে ভাড়া চাইতে বৃদ্ধ যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন। ব্যস্ত হাতে ট্যাঁক্ ঝেড়ে এক টাকার মলিন একখানা নোট বার করে' কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কালীঘাট দিয়ো—মার মন্দির!

বৃদ্ধের মুখে গন্তব্যস্থানের উল্লেখমাত্রই আর আর যাত্রীদের মুখে নিঃশব্দ কৌতুক হাসির হিল্লোল বয়ে গেল। এতক্ষণে দলটির সঠিক পরিচয় পেয়ে মন-ভার-করা আবহাওয়াটা যেন লঘু হ'লো। আধুনিকা দুটি গা টেপা-টেপি করলেন।

সৌদামিনী আরো শক্ত হ'য়ে ছোট তিনটে ছেলেমেয়েকে আঁকড়ে ধরে' বসে রইল। পাশের মেয়েটির বিষণ্ণতা সিসের মত বুঝি ভারি হ'য়ে আছে।

এখনই যেন রহস্য করবার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেছে। পিছনের আসন থেকে একজন জিগ্যেস করলেন, কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে কর্তা?

জবাব দিতে বৃদ্ধ আবার কৃতার্থ বোধ করেন : শিঁয়ালদ! পাঁচের নম্বর :—

আরে না না! দেশ কোথায়?—বিজ্ঞতমের হাসিটা বোধ হয় থামবেই না।

বৃদ্ধ থতমত খেয়ে যান—জড়িতকণ্ঠে অপরাধীর মত বলেন, বরিশাল জিলা বাবু!

আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার হয় না। অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীনতায় সবার মুখে চোখে সহসা একটা বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। মড়া আগলে বসে থাকার গাম্ভীর্য নেমে আসে। কিছুক্ষণের জন্যে ইঞ্জিনের আক্ষেপ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

বৃদ্ধ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, হঠাৎ সব এমন চুপচাপ হ'য়ে গেল কেন। অজান্তে কোন অপরাধ করে' ফেলেননি তো? অবুঝ সংশয়ে বৃদ্ধ উসখুস করেন খানিকক্ষণ। তারপর নিষ্প্রভ চোখদুটোকে স্তিমিত করে' তাঁদের কালীঘাট যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

শিয়ালদায় আর থাকা চললো না। কলেরা লেগে গেছে, তাঁর দলের দুটি শিশু মারা গেছে। আর যা পুঁজিপাটা সঙ্গে এনেছিলেন তাও শেষ—এখন ঐ ছেলেটা যদি কিছু জোটাতে পারে তবে রক্ষে। ঐ তিনটি বৌ-ই তাঁর পুত্রবধূ, ছেলেরা বেঁচে আছে কি মারা গেছে, তিনি জানেন না। খোঁজখবর তো কিছু নেই। মেয়ে দুটির একটি তাঁর নিজের। আর একটি ঐ যে ওধারে ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন, কি রকম যেন হাবা-বোবা গোছ। কথা যে একদম বলে না, তা নয়। মধ্যে মধ্যে বলে, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। ওকে নিয়ে মুশ্‌কিল তাঁর বেশী। ফেলে দিতে তো পারেন না!

ওধারের বোবামত মেয়েটি হঠাৎ বিকট দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে' বাইরের দিকে চেয়ে সৌদামিনীকে কি ইশারা করলে। সৌদামিনী মুখটা ফিরিয়ে আবার ঘুরিয়ে নিলে। আত্ম-সচেতনতায় সে যেন কাঠ হ'য়ে আছে।

বাসটা তখন ধর্মতলায় গির্জা এবং মস্‌জিদের মাঝামাঝি জায়গায় এসে থেমেছে। জুম্মার নামাজ সেরে যে ভিড়টা পথে সরষের

মত ছড়িয়ে পড়েছে তাকে পাশ কাটাতে বাসটা ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে।

অপ্রস্তুত বৃদ্ধ বল্লেন—ঐ রকম মাঝে মাঝে করে ও। কোথাও কিছু নেই, কি যে দেখে, কি যে বোঝে, অমনি শব্দ করে' ভয় লাগিয়ে দেয়। এখন আমরা কিছু মনে করি না। মাথাটা বোধ হয় ওর খারাপই হ'য়ে গেছে!

বোবা মেয়েটি বার বার বাইরের দিকে চায়, আর মুখ ফিরিয়ে আহত পশুর মত গোঁ-গোঁ করে। এক সময় সৌদামিনীর ধমক খেয়ে চুপ করে' গেল।

কারণ কিছু একটা ভাববার আগেই বাসটা গড়ের মাঠের মধ্যে এসে পড়ল। আর কারো শোনবার আগ্রহ না থাক্, তখনো বৃদ্ধের কাহিনী বলার শেষ হয়নি।

"এমনিতে তো আর মরণ হ'লো না, বেঁচে আছি যখন, যাই মাকে দর্শন করে' আসি। কবে বলতে কবে মরে যাব তার ঠিক কি! থেমে, কি ভেবে বৃদ্ধ চোখটা তুলে একবার চারপাশে চাইলেন। তাঁর এমনি মনে হ'লো, এতক্ষণ ঘুমন্ত লোকদের গল্প শোনাচ্ছিলেন। কেউ-ই তাঁর কথা শোনেনি, মিছিমিছি তিনি বকে গেছেন।

অভিমানে কি বেদনায় জানি না, বৃদ্ধ চুপ করে' গেলেন। কি দরকার লোকের তাঁর এত কথায়! বাড়ির খবর জানতে চাইলেই অমনি যত দুঃখের কথা বলতে হ'বে! কেন, কি গরজ পড়েছে এঁদের? বুড়ো হ'লে বুঝি অমন বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে থাকে! পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠে বৃদ্ধের মনে হয়, এঁরা তাদের ভিখিরী ভাবছেন না তো? আর ভাবলেই বা কি!

অভিমানটা বেশীক্ষণ বজায় থাকে না। বৃদ্ধ আবার সকলকে শুনিয়ে পরম আগ্রহভরে বলেন, মাকে দেখবো আর মার মন্দিরে পড়ে থাকবো—ধর্মশালা তো আছে। তারপর মার দয়ায় আস্তানা কি আর একটা না-জুটবে! তখন—

থিয়েটার রোডের মোড়ে বাসটা প্রবল বেগে নড়ে উঠল। মনে হ'লো, কেউ যেন বাসটিকে শূন্যে তুলে ধরে আছড়ে ফেলে দিলে। জুয়ার ঘুঁটি নাড়ার মত ভিতরের যাত্রীরা সজোরে একটা ঝাঁকুনি খেলে—স্থানচ্যুত, বিপর্যস্ত হ'লো অনেকে, আর্তকোলাহল উঠলো।

মুহূর্তের জন্যে, আবার সব স্থির। একটা রিক্সাকে বাঁচাতে বাসটা অমন ক'রে বেঁধেছে। দাঁতকপাটি লাগার মত ব্রেক কসেছে।

বাসটার কোনই ক্ষতি হয়নি, রিক্সাটাও বড় জোর বেঁচে গেছে। যাত্রীরা অনেকে যে-যার জায়গায় ঝেড়েঝুড়ে বসেছেন। কিন্তু উদ্বাস্তু দলের আর্তকোলাহল এখনো থামেনি। ওদের কি যেন একটা হ'য়েছে। সামনে দাঁড়াবার জায়গায় ভিড় জমে আছে।

বাসটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। যত বারই স্টার্ট নিতে যায় ততবারই কন্ডাক্টার ঘণ্টা দিয়ে হেঁকে ওঠেঃ বাঁধকে! সবুর!

অনেক চেঁচামেচি, উত্তর প্রত্যুত্তর, জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশ্য দুর্ঘটনাটা সকলের প্রত্যক্ষ হ'লো। বাসের ঝাঁকুনি খেয়ে উদ্বাস্তু দলের একটি বউ-এর কোল থেকে ছেলে পড়ে গিয়ে কেটেকুটে রক্ত বেরিয়েছে। রক্তপাত সামান্য, কিন্তু ছেলেটির কোন সাড়া নেই—বোধ হয়, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

নির্লিপ্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, মরে গেলে ফেলে দাও। অত কি! দলের যুবকটি ছেলেটির মাকে প্রবোধ দিচ্ছে, না না, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, এখনি আবার জ্ঞান হ'বে। কেন, তোমরা অতো চেঁচামিচি করছো?

বৃদ্ধ হাসলেন, আর জ্ঞান হ'য়েছে! যাক্ একটা তবু কমলোঃ অতো কাঁদবার কি আছে?

তবু কান্না থামেনি, তবু কোলাহল কমেনি। অনেক স্নেহের মায়া বন্ধন সহস্র পাকে দলটিকে যেন জড়িয়ে ধরলে। প্রায় সকলেই একবার করে' ছেলেটিকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে; সকলেরই কাপড়ে-চোপড়ে রক্ত লাগলো। ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে বোবা বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

অতঃপর হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দিয়ে সকলে মিলে ছেলেটি, ছেলেটির মা এবং যুবককে রাস্তায় নামিয়ে দিলে। বাস ছাড়ে ছাড়ে।

আর সময় নষ্ট না ক'রে বৃদ্ধ একেবারে ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোন কথা না-বলে সোজা দোরগোড়ায় এগিয়ে গেলেন। পিছন ফিরে তাকিয়ে দলটিকে কি ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দলের বাকি ক'জন উঠে এসে বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়াল। কন্ডাক্টার এবং শুভানুধ্যায়ী অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও সকলে পড়ি-কি-মরি ক'রে রাস্তায় নেমে গেল।

বাসটা থিয়েটার রোডের মোড় পেরিয়ে আসতে পিছন থেকে দেখা গেলঃ উদ্বাস্তুর দলটি তখন সম্পূর্ণ হ'য়ে অকুতোভয়ে রাস্তা পেরুচ্ছে। ওদের কেউ-ই হাসপাতালে যায়নি। বৃদ্ধ আগে আগে সৌদামিনী পিছনে আর আশ্চর্য, ওপারের স্টপেজে দাঁড়িয়ে যে বাসটি 'শেয়ালদা-শ্যামবাজার করে' হাঁকছে ওরা সবাই মিলে গুঁতোগুঁতি, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি করে' সেটাতেই উঠে পড়ল।

উদ্বাস্তুদের পরিত্যক্ত খালি সীটে বসতে বসতে এঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, ঐ জন্যেই বেটারা পথে ঘাটে পড়ে মরে। বুদ্ধি দেখ দেখি, কোথায় হাসপাতালে যাবি তা নয়, এক সঙ্গে মরবার জন্যে আবার ডেরায় ফিরে চলল সব! উজবুক কাঁহাকার!

একবার যেন আমাদের বাসটা কালীঘাট ব্রীজের ওপর উঠতে দূর থেকে মার মন্দিরের চূড়োটা দেখে ওদের কথা মনে হ'য়েছিল। তারপর বাসটা গড়িয়ে নীচে নামতে ওদের কথা আর মনে হয়নি। তা ছাড়া, কালীমন্দিরের চূড়োটা অনেক বাড়ির আড়ালে ডুবে গিয়েছিল।



বেতার প্রসঙ্গ

রেডিও-র জনপ্রিয়তার স্বরূপ

রেডিও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রেডিও মহল থেকে প্রায়ই এরূপ দাবী করা হয় এবং এই জনপ্রিয়তার প্রমাণস্বরূপ রেডিওর কর্তারা রেডিও-লাইসেন্সের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাটা লোকের চোখের সামনে তুলে ধরে থাকেন। রেডিওর লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়ছে অর্থাৎ গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ছে সেটা অস্বীকার করি না, কিন্তু তার থেকে কি একথা বলা চলে যে রেডিও দিন দিন অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? আজকাল সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপক অনুশীলনের যুগে সংখ্যা-গণনার দ্বারা বিষয় বা বস্তুর মূল্য-বিচারের একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ নিরূপণের ক্ষেত্রে সাংখ্যিক বিচার আর কতদূর কার্যকরী হতে পারে? আর পরিমাণ-বিচারের মানকে আমরা গুণ-বিচারের মান বলে ধরবোই বা কেন?

রেডিওর লাইসেন্স-প্রাপকের সংখ্যা বাড়ছে তার অর্থ আগে যতো লোক রেডিও শুনতো এখন তার চাইতে কিছু বেশি লোক রেডিও শোনে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু বেশি লোক রেডিও শুনবে। কিন্তু তার থেকে রেডিওর প্রোগ্রামের ভালো-মন্দ বিচার করতে গেলে বিচারে ভুল হবার আশঙ্কা থাকবে। সংখ্যাস্ফীতি ব্যাপ্তির পরিমাপক, উৎকর্ষের নয়। খুব অল্পসংখ্যক শ্রোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও রেডিওর প্রোগ্রাম ভালো হতে পারে। অগণিত সংখ্যক শ্রোতার আনুকূল্য লাভ করলেই যে রেডিওর প্রোগ্রাম ভালো হবে এমন কোন কথা নেই। বরং উল্টোও হতে পারে। যেমন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বেলায় হচ্ছে। রেডিওর প্রচার বাড়ছে, কিন্তু রেডিওর প্রোগ্রামের মান নেমে যাচ্ছে। প্রোগ্রামের ভিতর একঘেয়েমির ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রথম কিছুদিন রেডিওর প্রোগ্রাম শুনতে ভালোই লাগে; প্রোগ্রাম প্রত্যাশার অনুরূপ হোক না হোক কোন কিছু নূতন পাওয়ার মধ্যে যে বৈচিত্র্যের স্বাদ থাকে সেই বৈচিত্র্যই প্রোগ্রামগুলির আকর্ষণীয়তার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই নূতনত্বের রোমান্স মুছে যায়। আর বলাই বাহুল্য, সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যের স্বাদও যায় মুছে। রেডিও-শোনা ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রেডিওর এককালীন উৎসাহীরাই তখন সর্বাগ্রে রেডিও বন্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বড় বড় শহর অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহেই রেডিওর 'এরিয়েলের' তার ঝুলতে দেখা যায়। অভিজাত বা উচ্চ মধ্যবিত্তদের কথা তো ছেড়েই দিলুম, যাঁদের অবস্থা এমন কি মোটামুটি রকমের ভালো তাঁরাও রেডিও-সেট কিনতে ছাড়েন না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে এঁদের সকলেই রেডিও-অনুরাগী। এমন অনেক লোক এঁদের মধ্যে পাওয়া যাবে যাঁরা ঘরে রেডিও-সেট রাখেন সখের খাতিরে, অনুরাগের খাতিরে নয়। রেডিও আজকাল গৃহের একটি শোভা, গৃহস্বামীর সংগতির পরোক্ষ বিজ্ঞাপন। ঘরের আর দশটা মূল্যবান আসবাবপত্রের মতো রেডিও-সেটও একটি মূল্যবান আসবাব এবং অধিকাংশ গৃহে রেডিওকে এই চোখেই দেখা হয়ে থাকে। রেডিও-শোনাটা যেন উপলক্ষ, ঘরে রেডিও আছে এইটেই হলো আসল কথা। কোন কোন গৃহে দেখেছি রেডিও-সেটটি ঘরের এক কোণায় মূক আর স্থাণু হয়ে পড়ে আছে, কেউ তার দিকে ফিরেও চাইছে না। অব্যবহারে আর অযত্নে সেটের গায়ে ধূলোর পুরু আস্তরণ জমে উঠেছে। কারণ আর কিছু নয়, বাড়িতে নতুন রেডিও এলে তাকে ঘিরে হৈ চৈ আর মাতামাতি করবার যে একটি প্রাথমিক অধ্যায় থাকে, বুঝতে হবে এসব গৃহে স্পষ্টই তার অবসান হয়েছে, এখন কারুরই রেডিওর দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই। এককালীন রেডিও-উৎসাহীদের এই নির্মম ঔদাসীন্যে রেডিও-ও তাই বেদনায় নীরব, যেন অভিমানভরে স্তব্ধ হয়ে আছে।

এতে বোঝায় এই কথা যে, ঘরে রেডিও থাকাটাই রেডিওর প্রতি আগ্রহের প্রমাণ নয়। বরং একটি ভিন্নতর উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়করূপে রেডিওর ব্যবহারের দৃষ্টান্তটাই সর্বাধিক চোখে পড়ে। সে উদ্দেশ্য হলো রেডিওর মাধ্যমে বিলাসের মোহের পরিতৃপ্তি: এই নির্জনে অথচ সুনিশ্চিত আত্মতৃপ্তি যে আমার গৃহের মূল্যবান উপকরণের তালিকায় এমন নূতন একটি উপকরণ যোগ হলো যা দশজনকে দেখিয়ে বেড়ানো চলে, শুনিয়ে বেড়ানো তো চলেই। বাড়িতে রেডিও থাকার ঐ একটি মস্ত লাভ। যে-কোন সময় নিজেকে সে তারস্বরে প্রচার করতে পারে। আত্মঘোষণার এতো বড় ফলপ্রদ যন্ত্র আর পূর্বে তৈরী হয়নি। প্রতিবেশীর অবসরকালের বিশ্রান্তির উপর চড়াও হতে যেমন তার বাধা নেই, তেমনি প্রতিবেশীর কর্মব্যস্ততার উৎকণ্ঠিত মুহূর্তগুলিকে ভেংচাতেও তার জুড়ি মেলে না। বাড়িতে রেডিও থাকা মানে সাদীয় (sadistic) সুখ অনুভব করবার একটি মোক্ষম অস্ত্র করায়ত্ত থাকা। এ জাতীয় সুখের নেশা লোকে বড় সহজে ছাড়তে চায় না।

আর একটি বিষয় ভাববার আছে। যাদের কথা উপরে বলা হলো তাদের সকলেই প্রায় সঙ্গতিপন্ন শ্রেণীর লোক। এই শ্রেণীর নিম্নে যে বিরাট শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জনতা পড়ে আছে তাদের সংগে রেডিওর বলতে গেলে কোন যোগাযোগই নেই। তার অর্থ রেডিওর প্রচার কেবলমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সর্বসাধারণের ভোগ্য হয়ে উঠতে এখনও তার বহু বিলম্ব। আর তা যতদিন না হচ্ছে রেডিওকে কোনক্রমেই 'জনপ্রিয়' আখ্যা দেওয়া চলে না। রেডিওর লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়ছে বটে, কিন্তু সেটা একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নিত গণ্ডীর মধ্যেই বেড়ে চলেছে; সকল শ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারছে না। লাইসেন্সের সংখ্যাবৃদ্ধিটাই তো বড় কথা নয়; সংখ্যাটা সকল স্তরের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে কি না সেইটে দেখা দরকার। এই মানদণ্ডে অল ইণ্ডিয়া রেডিও যে আজও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রেডিওকে যথার্থ জনপ্রিয় করবার জন্যে রেডিওর তরফ থেকে শুধু যে চেষ্টারই অভাব তা-ই নয়, ইচ্ছারও অভাব। রেডিওর সবটুকু ঝোঁক এখন পর্যন্ত মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর নিবদ্ধ। এই শ্রেণীর লোকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী মুখ্যতঃ রেডিও কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রোগ্রাম রচনা করে থাকেন; সাধারণের রুচি-পছন্দের সঙ্গে সে সকল প্রোগ্রামের বলতে গেলে কোনই যোগ নেই। বিরাট শ্রমজীবী শ্রেণী রেডিওতে এখন পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

বলা হবে রেডিওর তরফ থেকে শ্রমজীবীদের কল্যাণের জন্যে "মজদুর-মণ্ডলী" এবং গ্রামবাসীদের মঙ্গলার্থে "পল্লীমঙ্গল আসর"-এর ব্যবস্থা আছে; তাদের মূল্য আর উপযোগিতা কি একেবারেই কিছু নেই? আমরা বলবো আছে, তবে এই প্রোগ্রাম দুটি আরও বিস্তৃত সময় নিয়ে আরও সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রচারিত হওয়া উচিত এইটেই শুধু আমাদের বক্তব্য। এখন যে আকারে এই দুটি প্রোগ্রাম চলছে তার ভিতর একটা দায়-সারা গোছের ভাব আছে। শ্রমজীবী আর কৃষিজীবীদের জন্য প্রোগ্রাম না করলে ভালো দেখায় না নেহাৎ সেজন্যেই যেন এ দুটি প্রোগ্রামের অবতারণা—নয়তো বেতার-কর্তৃপক্ষ শহুরে শ্রোতাদের তৃপ্তি-বিধানের দায় নিয়েই আগাগোড়া সময় কাটিয়ে দিতেন এ রকম মনে করবার কারণ আছে।

ইউরোপ-আমেরিকায় যেভাবে বেতার-প্রোগ্রামের পরিকল্পনা হয়ে থাকে, এদেশে সে রকম হওয়া উচিত নয়, একথা আমরা সবিনয়ে বলবো। ভারতীয় সভ্যতা মূলতঃ পল্লীকেন্দ্রিক; ভারতের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপও তাই। অল ইণ্ডিয়া রেডিও শহরবাসীর উপর সর্বাধিক ঝোঁক দিয়ে এ দেশের একটি মূল ঐতিহ্যের বিরোধিতা করছেন।

শিল্পী কানোয়ালকৃষ্ণের চিত্রপ্রদর্শনী

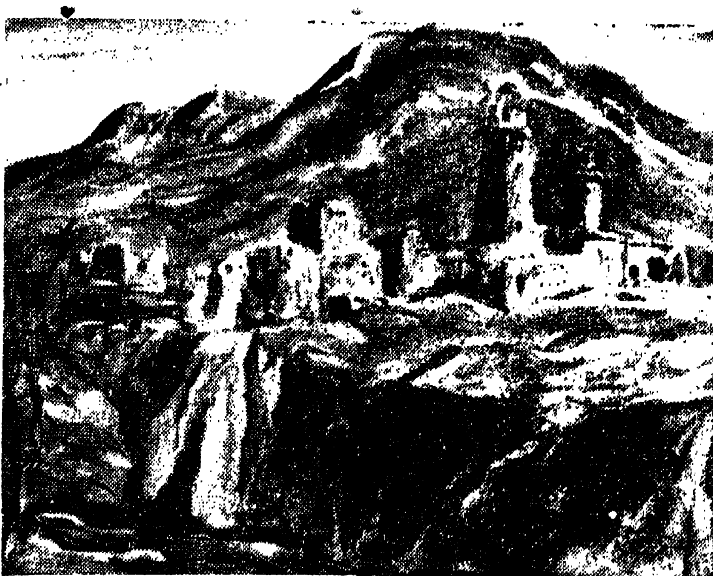
ইন্দ্র দুগার

শিল্পী কানোয়ালকৃষ্ণ কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষাকালীনই ১৯৩৮ সনে বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটির তিব্বত পরিক্রমায় যোগ দেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর মন বার বার এমনই এক বহির্জগতের যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিব্বতের সমাজ-জীবন এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে রূপ দেন তিনি। সেই সময় থেকেই তুষারে আবৃত পাহাড় আর পাহাড়ে ঘেরা সমাজ-জীবন তাঁকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। বহুবার তিনি তারপর সিকিম, ভুটান, তিব্বত, কাশ্মীর এবং তার আশেপাশের জায়গা পরিভ্রমণ করেছেন এবং আজও সময় এবং সুযোগ পেলেই তিনি সেই আকেটনীতে গিয়ে রূপ দেন তাঁর স্বপ্নকে—তাই তাঁর ছবিগুলোতে বিশাল হিমালয়-ঘেরা পথ-প্রান্তরের আর সমাজ-জীবনের ছাপই বেশী। বর্তমান প্রদর্শনীর জন্যই তিনি সিকিম থেকে একদিনের জন্য এখানে এসেছেন।

কানোয়ালকৃষ্ণের ছবির সঙ্গে কলকাতার রসিক-সমাজ বেশ পরিচিত, কারণ বহু প্রদর্শনীতেই তাঁর ছবি একাধিকবার দেখান হয়েছে। তিনি এর আগে বার বার একক প্রদর্শনীও কলকাতায় করেছেন। কিন্তু এবারকার একক প্রদর্শনী বোধ হয় বছর দশ পরে করা হয়েছে। এবারকার প্রদর্শনীর বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে তেল রঙের তুলি দিয়ে আঁকা জলরঙের কতকগুলো ছবি। কাগজের প[...] ময়দার আঠার খুব পাতলা করে এক 'ওয়াশ' দিয়ে তার পরে স্বচ্ছ জল রঙে তি[...] যে ছবি কটি এঁকেছেন রঙ এবং 'এফেক্ট'-এ[...] দিক থেকে সেগুলো সত্যই অপূর্ব হয়েছে[...] এক-এক জায়গায় 'তৃতীয় ডাইমেনশনে[...] এফেক্ট' সত্যই মুগ্ধ করে এবং তুলি চালন[...] শিল্পীর দক্ষতার এবং সাহসের পরিচয় পাও[...] যায়। এই ধরণের আঁকা তাঁর 'খাইবারে[...] মিনার' (নং ৫৭), আফ্রিদিদের ঘাটি (নং ৬[...]) একটি আফ্রিদি গ্রাম, (নং ৫৮) লামাদের [...] (নং ১৮), চিত্রলের পাহাড় (নং ৫০), সে[...] কিলার পথে (নং ১৭) ইত্যাদি রচনা-বিন্যা[...] বা 'কম্পোজিশন'-এর দিক দিয়ে সার্থ[...] সৃষ্টি। মোটা বোর্ডের পরে 'টেম্পেরা' র[...] আঁকা ভগ্ন দেউল (নং ২৮) ছবিটির রচ[...] বিন্যাস সুন্দর এবং মাঝের ঘরটিতে হা[...] লাল রঙের ব্যবহার ছবিটিকে অভিন[...] দিয়েছে। এছাড়া তিনি সাধারণতঃ [...] 'টেকনিকে' কাজ করেন সেই ধরণের কাে[...] মধ্যে কৈলাস পর্বত (নং ১) গ্রাম-প্রধা[...] বাড়ী (নং ৮), বরখায় তীর্থযাত্রীদের আস্ত[...] (নং ২) 'শিয়াং গুম্পা' (নং ৩২) ছবিগু[...] দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুয়াশা (নং ৬০) ছবি[...]



বরখায় তীর্থযাত্রীর আস্তানা



খাইবারের মিনার



চিত্রলের পাহাড়

এই ধরণের একটি শ্রেষ্ঠ কাজ সামান্য রঙের ব্যবহারে যেন কুয়াশার মায়াজাল ধরা পড়েছে। মেটে বাড়ী (নং ২৫) ছবিতে রোদের খেলাও চমৎকার। এই ধরণে আঁকা অন্যান্য ছবি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কারণ শিল্পীর এই ধরণের কাজের সংগে আমরা বিশেষ পরিচিত। প্রতিকৃতিগুলোর মধ্যে তিব্বতী রাজকর্মচারী (নং ২২) এবং চিত্রালী সৈয়দ (নং ২৩) ছবি দু'খানির রচনাভঙ্গি এবং ব্যক্তি-চরিত্রের প্রকাশ মনে দাগ এ'কে দেয়—এই ধরণের আরও কিছু কাজ দেখতে পাব বলে আশা করে-ছিলাম।

শিল্পী কানোয়ালের এই প্রদর্শনীটি সত্যই উচ্চাঙ্গের হয়েছে। আরও ভাল লেগেছে এইজন্য যে, শিল্পী যখন যেভাবে আঁকার প্রেরণা পেয়েছেন তুলির সাবলীল গতিতে তাই তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, কিন্তু কোথাও ছবি আঁকার নামে উগ্র টেকনিকের কসরৎ বা "আধুনিকতা"র দোহাই দিয়ে পাশ্চাত্যের অপাংক্তেয় ছবির সচেষ্ট নকলনবিশী কোথাও নেই—যদিও তাঁর অংকনপদ্ধতি বিদেশীয়। আমাদের তথাকথিত আধুনিক শিল্পীরা আজ পাশ্চাত্যের মুখ চেয়ে উদ্দেশ্যহীন এক কর্ম-সর্বস্বতার মোহে ঘুরপাক খাচ্ছেন হঠাৎ খ্যাতি অর্জনের চেষ্টায়। কানোয়ালকৃষ্ণের মধ্যে সেই কৃত্রিমতা একেবারেই নেই; আন্তরিক এবং একাগ্র একটি শিল্পী-মনের পরিচয় তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় আছে বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। তাঁর ছবি দেখে মন প্রসন্ন হয়।

আকাশ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কোনো কিছু ভালো আর লাগে না যখন,
কাজ নেই, পরিশ্রান্ত মন,
সে মুহূর্তে কেউ এক ছায়ার আভাসে
তারার প্রদীপ জেবলে রেখে দেয় পাশে,
যেন এক বন্ধুর মতন
অপরূপ পরিবেশ, ক্ষণ—
নীলস্বপ্ন করে আকর্ষণ
ভরে তোলে শ্রান্ত অবকাশ।
অন্য কেউ নয় সে যে—
এ মুক্ত আকাশ।

আকাশ যে রঙিন ইশারা
মূর্ছনার স্বাদ—
নীলাকাশে নিয়ে আসে চাঁদ,
শূন্য মন করে দিশাহারা।
এ আকাশে—ব্যাপ্তির ভিতরে
হৃদয়কে সচকিত করে,
একটি আকাঙ্ক্ষা বুনে যায়,
মুঠো মুঠো ব্যঞ্জনা ছড়ায়,
যখন কোনোই কাজ একটুও হাতে নেই—
শ্রান্ত মন জৌলুস হারায়।

শ্রান্ত মন যবে এক পরিতৃপ্তি খোঁজে
সে মুহূর্তে ধরা দেয় আকাশ সহজে।

বিজ্ঞানের কথা

প্রকৃতি ও শস্য উৎপাদন

ডাঃ অভীশ্বর সেন

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর মৃত্তিকা হইতে বিঘা পিছু প্রায় ১৬ সের করিয়া নাইট্রোজেন অপসারিত হয়। কৃষিক্ষেত্রে এই নাইট্রোজেনের কিয়দংশ বৃষ্টি বা জলসেচের জলে দ্রবীভূত হইয়া জলের সংগে মাটির বহু নীচে চলিয়া গিয়া শেষে মাটি হইতে অন্তর্হিত হয়; কিয়দংশ শস্যের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যে মাটিতে কোন শস্য নাই, সেখানে শুধু বৃষ্টির জলেই এতখানি নাইট্রোজেন নষ্ট হইতে পারে। মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেনের এই অপসারণ প্রতি বৎসর অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। জমিতে সার হিসাবে নাইট্রোজেন না দিলে, একদিন মৃত্তিকা হইতে যে সমস্ত নাইট্রোজেন নিঃশেষ হইয়া যাইত, এ সম্ভাবনা ছিল।

ভারতবর্ষের মৃত্তিকার কথাই ধরা যাউক। এখানে মাটির ভিতর নাইট্রোজেনের পরিমাণ এক লক্ষ ভাগের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ মাত্র। হিসাব করিয়া দেখা যায়, একশত বৎসরেরও কম সময়ে মাটির নীচে তিন ফুট পর্যন্ত সমস্ত নাইট্রোজেন নিঃশেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কারণ ভারতবর্ষের অতি অল্প জমিতেই রীতিমত সার দেওয়া হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া এখানের মাটি বিনা সারে প্রতি বৎসর শস্য উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। বহু শতাব্দীর পরও এখানের মাটির নাইট্রোজেন এখনও শেষ হইয়া যায় নাই—ভবিষ্যতেও কোনকালে যে শেষ হইবে, তাহা মনে হয় না। অজ্ঞাতে কে যেন মাটির ভিতর নাইট্রোজেন যোগাইয়া চলিয়াছে। ভারতে একর পিছু শস্য উৎপাদন এখন নিতান্ত কম। কয়েক বৎসর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শস্যেরই একর পিছু উৎপাদন কম হইতেছে। তাহার একমাত্র কারণ এই কয়েক বৎসরে বহু নূতন জমিও বাড়িয়াছে। এই নূতন জমিগুলির উৎপাদন বাদ দিলে দেখা যায়, বহুকাল ধরিয়া ভারতে একর পিছু শস্য উৎপাদন প্রায় একই রকম আছে।

শস্য উৎপাদনের এই সর্বনিম্ন সীমা—যাহার নীচে শস্যের উৎপাদন আর নাবে না অথচ মানুষ চেষ্টা করিয়া জমিতে নাইট্রোজে এবং স্বাভাবিক বৃষ্টির অতিরিক্ত জল দি যাহার উপর উন্নতি সাধন করিতে পারে-কাহার উপর নির্ভর করে, তাহা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে মাটির নাইট্রো জেনের পরিমাণ ও তাহার বাৎসরিক পরিবর্ত লক্ষ্য করিয়া শুধু এই সিদ্ধান্তে আসি উপস্থিত হইতে হয় যে, এই সর্বনিম্ন শ উৎপাদনের জন্য দায়ী প্রাকৃতিক আবহাওয়া-বৃষ্টি, তাপ ও রৌদ্র। সার না দিয়া, প্রা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গম উৎপাদন করিয়া ইংলণ্ডের কৃ গবেষণাগারে দেখা গিয়াছিল যে, প্রথম কু বৎসর ধরিয়া শস্য উৎপাদন কমিতে থাকিলে পরের কুড়ি বৎসর ধরিয়া শস্যের উৎপাদন প্রা একই রকম থাকে। শেষের কুড়ি বৎসরের দিে



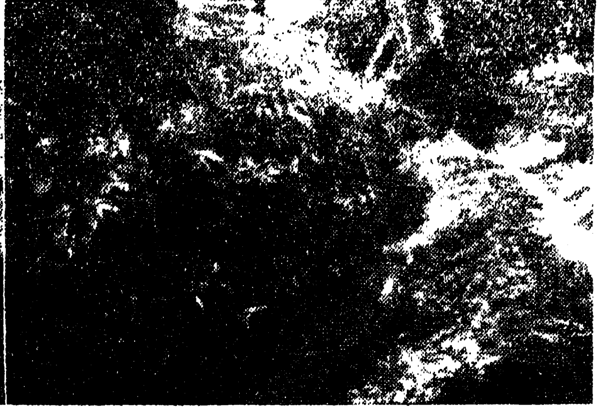
প্লাবিত কৃষিক্ষেত্রের শস্য



সাধারণ কৃষিক্ষেত্রের শস্য



বন্যার জলে প্লাবিত কৃষিক্ষেত্র



বৃষ্টির জলের প্রাচুর্যে অনুর্বর বালুময় ভূখণ্ডের উপর জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে

লক্ষ্য রাখিয়া পরীক্ষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই উৎপাদন ভবিষ্যতে একই রকম থাকিবে, আর কমিবে না।

রোদামস্টেড কৃষি গবেষণাগারের দুইটি পরিত্যক্ত জমিতে কয়েক বৎসরের পর দেখা গিয়াছিল, কেমন করিয়া নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। জমিগুলিতে যে সকল আগাছা ও তৃণ জন্মিয়াছিল, পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনগ্রাহী উদ্ভিদ ছিল না বলিলেও চলে। সুতরাং উদ্ভিদের দ্বারা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। এই সকল মাটির প্রকৃতি ছিল অম্ল, সুতরাং নাইট্রোজেন-গ্রাহী জীবাণুদের বৃদ্ধির কোন উপায় ছিল না যাহাতে এই সকল জমির মাটির নাইট্রোজেন বৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণ দর্শান যাইতে পারা যায়। জমির ভিতর নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন প্রমাণ সঙ্গত কারণ তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

কয়েক বৎসর শস্য উৎপাদনের পর, শস্য উৎপাদন যখন কমিতে থাকে, তখন এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখিলে দেখা যায়, তাহাতে পরের বারের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশ বাড়িয়াছে। এখানেও মাটির ভিতর নাইট্রোজেনের পরিমাণ অদৃশ্যভাবে বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মাটি এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মাটির এক অদ্ভুত শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। বাতাসের মধ্যে সকল সময় সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনঘটিত এমোনিয়া বাষ্প মিশ্রিত থাকে। বাতাসের মধ্যে হাজার ভাগের মধ্যে মাত্র তিন ভাগ অঙ্গারক বাষ্প লইয়া উদ্ভিদ আপনার দেহ গঠিত করে। বাতাসের মধ্যে লক্ষ ভাগের মধ্যে কয়েক ভাগ মাত্র এমোনিয়া গ্রাস করিয়া মাটি আপনার নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে।

শুষ্ক মাটিও এমোনিয়া গ্রাস করিতে পারে। মাটির জল, তাহার সূক্ষ্ম কণা ও তাহার অম্লত্ব এমোনিয়া গ্রহণ শক্তি বহুগুণ বাড়াইয়া তোলে। মাটিকে ফেলিয়া রাখিলে তাহার নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে ঠিক এই উপায়েই। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বৈজ্ঞানিক খানিকটা মাটি লইয়া তাহাকে সিক্ত ও চূর্ণ অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিয়া দেখেন যে, ছয় মাসের মধ্যে তাহার নাইট্রোজেনের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, সাধারণ কৃষিক্ষেত্রে এই পরিমাণ নাইট্রোজেন বৃদ্ধি ঘটিলে তাহার দ্বারা দুই বৎসরের গমের ফসল অনায়াসে জন্মান যায়—নাইট্রোজেন যেভাবে মাটির ভিতর বাড়ে, দেখা গিয়াছে তাহা বাড়ে ঠিক এমোনিয়ার আকারে। নাইট্রোজেনগ্রাহী জীবাণুরা যখন বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, তখন মাটির ভিতর অঙ্গার দ্রব্যের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই পরীক্ষায় মাটির ভিতরকার অঙ্গার দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যায় নাই। মাটিও ছিল অম্ল। সুতরাং নাইট্রোজেন বৃদ্ধির একমাত্র সঙ্গত কারণ হইতে পারে, কোন নাইট্রোজেনগ্রাহী জীবাণুর বিনা সাহায্যে মাটির বাতাস হইতে এমোনিয়া গ্রহণ।

বাতাসে অঙ্গারক বাষ্প আসে আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ বাষ্প হইতে, জান্তব জগতের শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে এবং জলে-স্থলে বিভিন্ন স্থানের অগ্নিকুণ্ড হইতে। বাতাসে এমোনিয়াও আসে বহু প্রকারে। আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ বাষ্পে এমোনিয়া থাকে; কয়লা জ্বালাইবার সময় সমস্ত নাইট্রোজেনটুকু মুক্ত হইয়া আসে না, তাহাতেও এমোনিয়া থাকে। তাই কয়লার ধুঁয়ে এত এমোনিয়া পাওয়া যায়। বহু প্রাকৃতিক রাসায়নিক খনিজ দ্রব্য জলের সহিত রাসায়নিক প্রণালীতে আবদ্ধ হইবার সময় এমোনিয়া বাহির হইয়া আসে। জীব-জন্তুর জৈব অবশেষ ভগ্ন হইবার সময় তৈরী হয় এমোনিয়া। মল-মূত্রের সহিত নাইট্রোজেনের অধিকাংশই এমোনিয়ার আকারে বাহির হইয়া আসে। সমুদ্র-জলের প্রকৃতি ক্ষার, তাহাতেও এমোনিয়া থাকে। সমুদ্র-জল রৌদ্রে বাষ্পীভূত হইবার সময়েও তাহার সহিত এমোনিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময়, বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ফলে জল ভাঙিয়া গিয়া হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে, এই হাইড্রোজেন বিদ্যুৎসম্পাতে বাতাসের নাইট্রোজেনের সহিত মিশিয়া এমোনিয়া তৈরী করে।

বহু কৃষি বৈজ্ঞানিক আমেরিকায় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরিত্যক্ত জমিতে অথবা কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃষ্টির অনুপাতে বাড়ে। মাটির নাইট্রোজেনের সঙ্গে উদ্ভিদ স্বাস্থ্য নিবিড়ভাবে বিজড়িত। বৃষ্টি যেখানে বেশী, মানুষের সাহায্য ব্যতীতও প্রকৃতি সেখানের জমিকে বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।

পরিত্যক্ত জমির নাইট্রোজেন কেমন করিয়া আপনা-আপনি বাড়িয়া যায়, তাহার একটা কারণ সহজে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। সিক্ত মৃত্তিকা-কণার বাতাসের এমোনিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি বেশী। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অমরনাথ পুরী লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা কণার এমোনিয়া গ্রহণ শক্তি তাহার সিক্ততার উপর নির্ভর করে। মাটি সিক্ত অবস্থায় থাকিলে তাহার ভিতর এমোনিয়ার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদ সে নাইট্রোজেন ব্যবহার করে। অবশ্য শুষ্ক মৃত্তিকারও এমোনিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তবে তাহা নিতান্ত কম। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাতাসের এমোনিয়া ও উদ্ভিজ্জ অবশেষ মাটির নাইট্রোজেনকে বাড়াইয়া তোলে—এই

নাইট্রোজেনেই বৃষ্টিবহুল স্থানকে স্বাভাবিক উদ্ভিদে ভরিয়া ফেলে।

সুতরাং মানুষ জমিতে সার দিক বা না দিক স্বাভাবিক বৃষ্টি প্রতি বৎসর মাটিতে খানিকটা নাইট্রোজেন নানা উপায়ে পেশছাইয়া দেয়। বৈজ্ঞানিকদের একটি হিসাবে দেখা যায়, প্রতি ইঞ্চি বৃষ্টি এক লক্ষ ভাগ মাটির ভিতর সাত ভাগ নাইট্রোজেন বাড়াইয়া তোলে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুব সামান্য মনে হইলেও ইহা নিতান্ত সামান্য নয়। উদ্ভিদের প্রয়োজন ও কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকার পরিমাণ তুলনায় এই সামান্য নাইট্রোজেনটুকু সারা বৎসর ধরিয়া জমিতে জমিতে শেষে বাৎসরিক শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট হয়—নানা উপায়ে ইহার পরিমাণও বাড়াইয়া তোলা যায়।

আমাদের দেশের মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ যে কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলন্ডের মত শীতপ্রধান দেশের মাটিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তাহা আমাদের দেশের মাটির নাইট্রোজেনের প্রায় চারিগুণ। আমাদের দেশের মাটির নাইট্রোজেনের ক্ষীণ পরিমাণকেই আমাদের উৎপাদন দারিদ্র্যের কারণ মনে করিয়া কৃষি রাসায়নিকগণ একদিন উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বহু পরীক্ষা করেন। এ সকল পরীক্ষা সত্ত্বেও জমির উৎপাদন যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

তাহার কারণ বৃষ্টি অথবা জলসেচই উৎপাদনের প্রধান প্রয়োজন। জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, বহু স্থানে জলসেচের সুবন্দোবস্ত নাই।

মাটিতে কলাই জাতীয় নাইট্রোজেনবাহী উদ্ভিদ কিছুদিনের জন্য জন্মাইয়া মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিলে তাহা উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। এই সবুজ সারের প্রচলন ভারতবর্ষে বহুল নয়, তাহার একমাত্র কারণ পর্যাপ্ত জলের অভাব। কারণ এই সকল উদ্ভিদের ডালপালা মাটির ভিতর পচিয়া উদ্ভিদ খাদ্য তৈরী করিবার জন্য দরকার প্রচুর জলের। তাহারা পচিয়া না গেলে সারের কাজ করে না। শস্যক্ষেত্রের জন্য জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উদ্ভিদ-খাদ্য বা সার জোগানোর সমস্যাও অনেকটা মিশিয়া যায়।

আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের যে সকল জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিলে আমাদের বহু কৃষি-সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে চেষ্টা করা উচিত, যতদূর সাধ্য জলের অপচয় নিবারণ করা; কারণ জলের প্রয়োজন শুধু উভিদ দেহ গঠন করিবার জন্যই নয়। জলের সাহায্যেই প্রকৃতি নানা উপায়ে মাটির ভিতর উদ্ভিদ খাদ্য জোগানোর বন্দোবস্ত করে।

অনুবাদ সাহিত্য

প্রেক্ষাকিনী

এ ই কোপার্ড

পল্লীগ্রামের রেল স্টেশন। যেমনি অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামটি, তেমনি নামগোত্রহীন স্টেশনটি। নিরালা, নির্জন, জনমানবহীন পরিবেশ। আশেপাশে কোন বন নেই, নেই কোন ফার্ম-গৃহ। মন্দির বা চার্চের কোন চিহ্ন দেখা যায় না কোনখানে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে রেল স্টেশনের দালানটি জলাভূমির উপর। একক, নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত! রাজপথ তো দূরের কথা...পায়ে-চলা পথেরও সন্ধান মিলে না, যেটি এসে স্টেশনে পৌঁছেছে সেটি ছাড়া। সেটিও স্টেশনে এসেই নিঃশেষ হয়ে গেছে—এগুতে আর ভরসা পায়নি।

এমনি নির্জন স্টেশনে তিনটি বিধবা নারী যে কি করে এসে জুটেছেন সে এক বিস্ময়। বোধ হয় এটা নিছক দৈবদুর্ঘটনা। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে-বসে ওরা আলাপ করছিলেন। আলোচ্য বিষয়বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। নিজেদের সুখ-দুঃখ আর অভাব-অভিযোগ, এই ছিল ওঁদের আলোচনার বিষয়। সবার মত ওঁদেরও অভাব অভিযোগের অন্ত নেই। মন খুলেই তাঁরা আলাপ করছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, স্টেশনে এসে মিলিত হবার আগে তাঁরা ছিলেন পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, আগন্তুক! কিন্তু তাতে তাঁদের আলাপ জমার দিক থেকে কোন অসুবিধা হয়নি। তিনজনেরই ছিল অভাব-অভিযোগ অনেক এবং তার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে আলাপ-আলোচনার সূচনা।

তিনজনের মধ্যে একজনের নাম সিলভিয়া প্রাইড। বয়সে ইনি সর্বকনিষ্ঠা। দৃষ্টিতে বিষণ্ণতার ছাপ, কিন্তু পরম রূপবতী। সাজ-সজ্জায় আভিজাত্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। দ্বিতীয়টির নাম বিডি এ্যাসপোল। ইনি বয়স্কা। অতীতের সৌন্দর্যের চিহ্ন এখনও তাঁর দেহ ছেড়ে চলে যায়নি। চোখের দৃষ্টিতে এখনও তার আভাষ দেখা যায়! তৃতীয়া হচ্ছেন ইভা গসপেডাল। পর্যটকের হাবভাব তাঁর সারা অঙ্গে। কাঁধে তাঁর আঁটসাট করে বাধা একটা হ্যাভারস্যাক। বসার সময়ও ওটা তিনি খুলে রাখেন নি।

'পিঠের ওটা খুলে ফেলে আরাম করে বসুন না?' কিছুক্ষণ আলাপের পর মিসেস এ্যাসপোল বললেন।

মিসেস গসপেডাল মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন।

নানা বিষয়ে আলাপ চলতে লাগল।

প্রথমা সদ্যপতিহারা হয়েছেন। হাতে বাঁধা কালো রিবন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া স্ব স্ব দুঃখের কথা বলে যাচ্ছিলেন অনবরত।

কথা বলতে বলতে একবার হঠাৎ মিসেস এ্যাসপোল বলে উঠলেন, 'খুলে ফেলুন না ওই বোঁচকাটা?'

মিসেস ইভা গসপেডাল আবার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'কেন? গাড়ি কখন আসবে ঠিক নেই, ওটা কাঁধে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন?'

ইভা এর কোন জবাব দিল না।

'কদিন আপনার স্বামী মারা গেছেন,' মিসেস এ্যাসপোল জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস প্রাইডকে।

'তিন মাস', জবাব দিলেন তিনি।

'মাত্র তিন মাস!' প্রতিধ্বনি করল বিডি এ্যাসপোল। 'অনেকদিন আগে বিয়ে হয়েছিল আপনাদের?'

'না, তিন সপ্তাহ', জবাব এলো।

'মাত্র!' বিডির কণ্ঠস্বরে করুণা মাখান। 'মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন ভদ্রলোক! অসুস্থ ছিলেন নাকি?'

'না। খুব শক্ত সমর্থ ছিলেন উনি। ওর স্বাস্থ্য ছিল ঈর্ষার বস্তু! কিন্তু হঠাৎ মারা গেলেন উনি। একেবারে আকস্মিক! যেন দপ্ করে বাতি নিভে গেল। মৃত্যুর কোন কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না, অন্তত ডাক্তাররা তো পাননি।'

'আহা-হা-হা!' মিসেস এ্যাসপোলের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর। দৃষ্টিতে তাঁর বিষাদের রেখা দেখা গেল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। 'মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের একমাত্র সত্য। ওপথে সবারই যেতে হবে—তাই না? দু'দিন আগে আর পরে। কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু তবু মৃত্যুর কথা আমরা কেউ ভাবি না—ওর জন্যে প্রস্তুত হই না।'

তারপর একটু থেমে বললেনঃ 'আমার স্বামী চলে গেছেন দেড় বছর আগে।'

'চলে গেছেন, মানে?' মিসেস গসপেডাল জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, নিউমোনিয়া হয়েছিল তাঁর।'

'ইস্, বড্ড খারাপ তো।'

'হ্যাঁ, ডবল নিউমোনিয়া হয়েছিল।'

'তবে তো কোন আশাই ছিল না।'

'হ্যাঁ, দু'দিনেই তাঁর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।'

'মরে গেলেন?'

'হ্যাঁ, মরে গেলেন।' মিসেস এ্যাসপোল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেনঃ 'কমবেশী কুড়ি বছর তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু উনি —কি নিষ্ঠুর দেবতা। জানি না ওখানে বসে ভগবান কি ভাবছেন।'

সুন্দরী সিলভিয়া তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানালেন। 'ভগবান এখানেই আছেন, এই পৃথিবীতে', তিনি বললেন, 'তা যদি না হয় তিনি কোথাও নেই।'

'আপনি...তাই...ভাবেন?' বিডি জিজ্ঞাসা করলেন।

'ছিঃ!' মিসেস প্রাইডের ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল।

ওকে এভাবে কথা বলতে দেখে মিসেস এ্যাসপোল বুঝতে পারল যে, এই তরুণী বিধবার মনেও ধর্মভাব জেগেছে। বুঝতে পেরেই সে একটু সঙ্কুচিত, একটু পোঁছিয়ে গেল, যেন অভাবনীয় কিছু দেখে ফেলেছে। কিন্তু মিসেস প্রাইডের মিষ্টি কণ্ঠস্বর, তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য এবং মধুর ভঙ্গিমা প্রভৃতি সব কিছুর জন্যে ঐ হতবুদ্ধি ভাবটা আর বেশীক্ষণ রইল না।

'আমি বলছিলাম', বিডি বলতে লাগল, 'ভগবান কেবল বেছে-বেছেই কতকগুলো লোককে টেনে নেন।'

'ওকথা বলবেন না', তরুণী বিধবা উদ্বেগ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'দয়া করে ওকথা বলবেন না। আমরা ভগবানের চক্ষে সবাই সমান।'

'সে তো সত্যি', বিডি বললেন, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি এবং তা যে সত্য তাও স্বীকার করছি। কিন্তু আমরা দেখতে কি সবাই একরকম—নয়ত? এবার ভগবান কার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন তা বলতে পারবেন আপনারা? কাকে চাই তাঁর জানেন আপনারা?'

'চুপ করুন আপনি।' মিসেস প্রাইড আবার অনুরোধ জানালেন।

'আমার জীবনে ভাঁটা ধরেছে কিন্তু আপনাদের তা নয়। জীবনের পথ আপনাদের উন্মুক্ত। বিয়ে থা' করে আবার সংসারী হতে পারবেন আপনারা।'

'অসম্ভব!' তরুণী বিধবার জবাব শুনে মিসেস এ্যাসপোল ক্ষণিকের জন্য হকচকিয়ে গেলেন কিন্তু সামলিয়ে নিয়ে বললেন, 'হুঁম, কিন্তু মন আপনার পরিবর্তন করতেই হবে!'

'কখনও নয়, কখনও নয়', জবাব দিলেন মিসেস এ্যাসপোল। কণ্ঠে তাঁর দৃঢ়তা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও সে পেয়েছে স্বামীর প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ আর প্রীতি। তাই তাঁর

চিরদিনের সঞ্চয়...বহুমূল্যে ঐশ্বর্য। ঐ ঐশ্বর্যে সে মহিমান্বিতা, যার ঔজ্জ্বল্যে অন্য দুইজন মহিলা যেন ঝল্‌সে উঠলেন।

এমন সময় ওয়েটিং রুমের দোরটা অর্ধেক খুলে গেল। একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন ঘরে। মাথায় তাঁর রেলকর্মচারীর টুপি কিন্তু পরনে পশমী এ্যাপ্রণ। তিনি ঘরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তাঁর চাহনিকে কিন্তু কিছুতেই ভদ্র বলা চলে না। ইনিই হচ্ছেন স্টেশন মাস্টার। শুধুই কি স্টেশন মাস্টার? তিনি টিকিট বিক্রেতা, টিকিট কলেক্‌টার, ব্যাঙ্কার, বাতি পরিষ্কারক, সিগ্‌-নালার, জানালা পরিষ্কারক, ঝাড়ুদার অর্থাৎ একাধারে সব। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দরজার হ্যান্ডেলটা পরিষ্কার করতে লাগলেন, যদিও তার কোন দরকারই ছিল না। মহিলাদের তিনি অবশ্য কিছু বললেন না, কিন্তু ওঁদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল যে, যত শীঘ্র ও চলে যায় ততই ওঁদের পক্ষে মঙ্গল। ভদ্রলোক কিন্তু সেদিকে মন না দিয়ে হ্যান্ডেল পরিষ্কার করল তারপর অনাবশ্যক-ভাবেই ঘরের একটা সেলফ্‌-এ ঝাড়নিটা বুলোতে লাগল। তারপর এক সময় ক্ষুণ্ণ মনে ঘর ত্যাগ করে চলে গেল।

ও চলে যাবার পর সিলভিয়া শুধালো বিডি এ্যাসপোলকেঃ 'আপনি কি আবার বিয়ে করবেন?'

'বিয়ের বয়স আমার চলে গেছে', কাষ্ঠ হাসি হেসে বিডি বলল। 'বুড়িকে আর কে বিয়ে করবে?'

'কি যে বলেন!' স্মিত হেসে সিলভিয়া বললেন, 'এখনও তো আপনি বেশ সুন্দরী আছেন।'

'এখনও আছি! হা হা হা! এখন আর কোন সৌন্দর্য নেই আমার। তবে, হ্যাঁ, সুন্দরী আমি একদিন ছিলাম বটে। খুবই সুন্দরী ছিলাম। যে ভালবাসে না তাকে খুশী করতে গেলে অযথাই নিজের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আমার বেলায় তা হয়নি। কুড়ি বছর আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। প্রেম ভরা ছিল আমাদের দিনগুলি, কিন্তু এখন বুড়িয়ে গেছি...'

'কি বলছেন!' মিসেস প্রাইড ধমক দিয়ে উঠলেন।

'অন্তত মাঝ বয়েসী তো! যে মানুষের সঙ্গে মিশব তাঁর সঙ্গে কি আর খাপ খাব। অথচ একদিন আমি তরুণী ছিলাম, ছিলাম সুন্দরী। অবশ্য বিবেচনাশূন্য ছিলাম। বিবাহিত জীবনে সুখেই ছিলাম। তবু যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে বলব, হ্যাঁ, বিয়ে করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়, আমার স্বামী আমাকে কোনদিন প্রবঞ্চনা করে নি, বিবাহিত জীবনের ধর্ম নষ্ট করে নি।'

'তা কি করে বলবেন?' ইভা গসপেভাল বলল।

'সে আমি জানি। ও বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তেমন কাজ করার চেষ্টা সে করে নি—চায়ও নি। তাছাড়া আর একটা বৈশিষ্ট্য তার ছিল, সে হচ্ছে খাওয়া। খাওয়া পেলে আর কথা নেই। কিন্তু শেষে তা অসহ্য হয়ে উঠল। হ্যাঁ, একেবারে অসহ্য। মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসল। তার মনে হত সে যেন ধীরে ধীরে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মনেও শঙ্কা জাগল। কিন্তু কিছুই হল না তাঁর। আমার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও খাওয়া বন্ধ

হল না। খেয়েদেয়ে বেশ পুরুষ্ট হয়েছিল। তাই মৃত্যুভয় তাঁকে ম্লান করতে পারেনি। অবশ্য দেড় বছর হয় সে আর বেঁচে নেই।'

বিডি এ্যাসপোলের গল্প একটানা চলেছিল। সিলভিয়া স্বভাবসুলভ নম্রতার সঙ্গে ও গল্প শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে হাসছিলেন। মিসেস গসপেডালও শুনছিলেন কিন্তু হাসছিলেন না। তিনি ফট্ করে বলে ফেললেন, 'তবে তো আপনার দুঃখের কিছু নেই।'

'হ্যাঁ। তবে স্বামী স্বামীই।' বিডি বললেন।

'কি চান তবে আপনি? দুটি মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।'

'দূর তাই কি!' তরুণী বিধবা বলে উঠলেন।

'অন্য যে কোন লোকের মত।'

'কিন্তু পার্থক্যও তো রয়েছে।'

'কোথায় পার্থক্য? একজনকে দেখলেই আপনার দেখা হয়ে যাবে সমগ্র ইংরেজ বাহিনী!'

'তা ঠিক, তা ঠিক!' বিডি স্বীকার করলেন। 'সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেও এবং জগতটাকে দেখ, একথাই আজকাল ওরা প্রচার করছে যুবকদের কাছে আজকাল।'

'ওদের সঙ্গে আপনি চিরকাল কি করে চলবেন', মিসেস গসপেডাল বলে চললেন, 'ওরা কি মনে মুখে এক? ওরা হচ্ছে ফাঁকির রাজা আর মিথ্যার জাহাজ। কোথায় থাকে ওরা। সে আপনি জানতে পারবেন না। কোথায় ছিল তাও জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না।'

মিসেস প্রাইড বক্তার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি কিন্তু বলেই চললেন, 'ওদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে গল্পের সেই বুড়ির মত। যেখানে যেতো সেখানেই সঙ্গে নিয়ে যেতো বুড়োকে।'

'সঙ্গে করে নিয়ে যেতো? কিভাবে?'

'ব্যাগে ভরে কাঁধে ফেলে নিয়ে বেড়াবে। তখন তো সে ছোট্টটি হয়ে যাবে। স্ত্রী যখন ইচ্ছে তাকে ব্যাগ থেকে বের করবে, কিছুক্ষণ খেলা করবে আবার ভরে রাখবে।

'ওমা!'

'হ্যাঁ তাই। শুধুমাত্র খেলার বস্তু।'

'ওতে জীবনের চিহ্ন কোথায়?' মিসেস এ্যাসপোল বললেন।

ইভা গসপেডাল বলতে লাগলেনঃ 'স্বামী কখন বাড়ি আসেন আর বেরিয়ে যান এ ছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না। কোথায় যান, কি করেন সে সংবাদ রাখব?...ফুঃ! উনি ছিলেন এক নম্বরের অবিশ্বাসী। কতবার যে আমাকে ঠকিয়েছেন তার হিসেব নেই। এরকম স্বামী দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'এর যে কি জবাব তা আমি জানি না' বিডি বললেন, 'তবে আমার স্বামী যদি বিন্দুমাত্র ও ধরণের হতেন তবে...?'

'তবে? তবে কি?...বলুন কি করতেন?'

'তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতাম', মিসেস এ্যাসপোল বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে চলে যেতাম।'

ইভা একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিসেস প্রাইডের দিকেঃ 'কি করতেন?'

'আমি আত্মহত্যা করতাম', আবেগহীন কিন্তু জ্বালাময় কণ্ঠে জবাব এলো।

'আমি স্বামীকে হত্যা করতাম', ইভা চেঁচিয়ে উঠল।

ও'র এই কথাগুলো বজ্রের মত শোনাল। অপর মহিলাদ্বয় হতবাক্ স্তব্ধ অনড় হয়ে গেলেন। ক্ষণপরে মিসেস প্রাইড বললেনঃ 'কি ভাবে?'

'আমি তাঁকে হত্যা করতাম, হত্যা করতাম।' স্বরে ক্রুরতা ফুটে উঠেছিল।

'না, আপনি তা পারতেন না,' বিডি বললেন। 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

'আপনি ধরা পড়ে যেতেন না?' তরুণী বিধবা জিজ্ঞাসা করলেন।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বয়স্কা মহিলাটি বললেন, 'এই ত আমি এখানি আছি। বেশ আছি—কিন্তু স্বামীকে তো আমি হত্যা করেছি।

'কি করে? কি করে?' অপর দুজনে সমস্বরে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, হত্যা করেছি, কিন্তু তার জন্যে কোন দোষ আমার উপর পড়েনি। খুব কৌতুহল জাগছে মনে, না? চমৎকারভাবে কাজ হাসিল করেছি। ও আমাদের দুজনের জীবনটাকেই নষ্ট করে দিক তা কি আমি হতে দিতে পারি? আরে ভয় কি? কোন ভাবনা নেই। আমি তো এখানে বসে আছি কিন্তু ও চলে গেছে চিরকালের জন্যে।'

মিসেস গসপেডাল একটু থামলেন। অপর দুইজনও নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। দৃষ্টিতে তাঁদের অস্বোয়াস্তি। ঘরে কোন ঘড়ি ছিল না, কিন্তু তবু একটা টিক্ টিক্ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল বোধ হয় উপস্থিত মহিলাদের বুক কাঁপুনির শব্দ। ও আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আরম্ভ করলঃ 'কি ও কাজ করা আমার উচিত হয়নি। একটা দুঃখ লাগল মনে। এ দুঃখ আমার জন্যে; ও'র জন্য...দুঃখ নিয়েই আমাকে মরতে হবে। আমার আর দরকারটা কি? স্বামী নেই, নেই পুত্র কন্যা। কে এখন আমাকে দেখবে? যত কারণই থাকুক না, ওকে হত্যা করা উচিত হয়নি। পাপ করেছি বলে যে দুঃখ হচ্ছে তা নয়! পাপের কথা আমার মনেও হয় না। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি। আজ জগতে আমার কেউ নেই...আমি সঙ্গীহীনা একাকিনী।'

তিনি শেষ করলেন। কিন্তু কাহিনী শেষ হল কিনা তা কেউ জানতে চাইল না, কেউ আর কোন কথা বলল না। ক্ষণপরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল।

'ঐ আসছে', একজন বললেন।

'এবার যেতে হবে', অন্যজন বললেন।

তিনজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কেউ নামল না ট্রেন থেকে। মহিলাদের দুজন একটা কামরায় ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলেন। অন্যজন তাঁর কাঁধের হ্যাভারসাক নিয়ে সম্মুখের একটা কামরায় উঠলেন। তিনি একাকীই ভ্রমণ করতে চান। অনুবাদকঃ **শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়**

কড়া নাড়া

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

পাষাণ পুরীতে সহসা কে নাড়ে কড়া!
অন্ধকারের কালো কালো চোখে
দুর্বার কোন দুঃসাহসীর মশাল আগুন জ্বলে!
পাষাণের ঘুমে জমাট স্বপ্নদল
ডানা মেলে ওড়েঃ বন্ধ জানালা খোলে—
রাজকন্যার হিম চোখে মুখে
ত্রস্ত চকিত বিদ্যুৎ জেগে ওঠে।
পাষাণ পুরীতে সহসা কে নাড়ে কড়াঃ
রুদ্ধ দুয়ারে ঝড় আছড়ায় সিংহের গর্জনে,
জীর্ণ ইঁটের পাঁজরে মৃত্যু কাঁপে—
পাষাণ পুরীর দৈত্যের ঘুম ভেঙে করে কুটিকুটি
দুঃস্বপ্নের বিষঢালা দংশনে।
বন্দিনী রাজকন্যার চোখে লাগে
সোনার জিয়ন কাঠি—
বন্দিনী রাজকন্যার দেহ জুড়ে
রোমাঞ্চ জাগে অপরূপ মুক্তির ঃ
স্পন্দিত বুকে রক্তে রক্তে শোনে
জীবন-ক্ষুব্ধ দুরন্ত কড়া-নাড়া।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১২

যে-সকল ঘটনার দ্বারা পরলোকের অথবা প্রেতলোকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত না হ'লেও কতকটা 'highly probable' হয়, ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘটনা ভিন্ন এমন আরও দু-চারটি ঘটনা আমার জানা আছে। তন্মধ্যে উপস্থিত যে-দুটির কথা বল্‌তে উদ্যত হয়েছি, তার মধ্যে একটি স্মৃতি, অপরটি শ্রুতি। যেটির সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তার কথাই আগে বলি।

তখন আমরা ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়া রোডের একটি গৃহে বাস করি। ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কিন্তু আনুমানিক ১৯০২ কিম্বা ১৯০৩ সালের কথা হবে। ভাদ্র মাস। মাতাঠাকুরাণীর তালনবমী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাত্রিকালে বিশ-পঁচিশজন ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছেন, নানাপ্রকার গল্প-গুজব চলছে, এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওরফে নাকুবাবু, হঠাৎ ব'লে বসলেন, "এ বাড়িতে ভূত আছে।"

সম্পূর্ণ লৌকিক বিষয়ের আলাপ-আলোচনার মধ্যে অকস্মাৎ আধিভৌতিক প্রসঙ্গের অবতারণায় কয়েকজন হেসে উঠ্‌লেন।

তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে নাকুবাবু বললেন, "হাসা সহজ; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখবার পর বোধ হয় সহজ হবে না। যেদিন পরীক্ষা করবেন, সেই দিনই প্রমাণ পাবেন। আজই করুন না, আজই পাবেন।"

এত-বড় দাপটের (challenge) পর উক্ত ব্যক্তি একটু দ'মে গিয়ে বল্‌লেন, "আপনি কি ক'রে জানলেন? কারো কাছে শুনেছেন না-কি?"

ঈষৎ উষ্মার সহিত নাকুবাবু বললেন, "কারো কাছে শুনিনি মশায়, নিজের দুকানেই শোনা হয়েছে। লালমোহনবাবুরা এ বাড়িতে আসবার ঠিক আগে, এক মাস দু'মাস নয়, কয়েক বৎসর আমরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম।"

নাকুবাবুর পিতা করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় তখনকার দিনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। তাঁর জুনিয়ার ছিলেন আমার দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গত-নির্মাণ ক'রে করুণাবাবুরা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এ গৃহ ভাড়া নিই।

নাকুবাবুর কথা শুনে তাঁর প্রতিপক্ষ ঈষৎ প্রবল হ'য়ে উঠে বললেন, "ও! আপনি দেখেন নি, শুনেছেন?"

"কেন, শোনাটা কি কিছুই নয়। দেখাটাই সব? আমরা কি শুধু শুনেই ভুল করি, দেখে করিনে? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তা' রজ্জু শুনে, না দেখে?" ব'লে নাকুবাবু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগলেন।

ভূতের গল্প এম্‌নিই ত' মহা কৌতূহলের বস্তু, তার উপর নাকুবাবু ভূত দেখেন নি, শুনেছেন, শুনে অভ্যাগতগণের মধ্যে ঔৎসুক্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নাকুবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে এক ব্যক্তি বললেন, "আরে, রাখুন মশায়, আপনাদের দেখা আর শোনার ঝগড়া! কি শুনেছিলেন আপনি বলুন,—আমরা শুনি?"

বিস্মিতকণ্ঠে নাকুবাবু বললেন, "শুনেছিলাম মানে?—একদিন না-কি? প্রতি-রাত্রে শুনতাম।"

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক স্মিতমুখে বল্‌লেন, "আচ্ছা, কি শুনতেন তাই বলুন।"

একমুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করে নিয়ে নাকুবাবু বলতে আরম্ভ করলেন,—আমরা ভাড়া নেওয়ার আগে যাঁরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন, তাঁদের একটি বছর চারেকের ছেলে ছিল, সে পড়াশুনো যতটুকু করত তার দশগুণ করত খেলা। আর, মার্বেল ছিল তার একমাত্র খেলার বস্তু। হয় একতলায়, নয় দোতলায়, নয় সিঁড়িতে, নয় ছাতে, সর্বদাই তার মার্বেল গড়ানোর শব্দ শোনা যেত। তার খেলার সাথী ছিল না, প্রতিপক্ষ ছিল না; একপক্ষ সে নিজে, অপর পক্ষ মার্বেল। একদিন ছেলেটি ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হ'ল। ডাক্তার আর আত্মীয়েরা মিলে দিন দুই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালালে, কিন্তু ছেলেটি বাঁচল না। একদিন রাত্রি একটার সময়ে যে-ঘরে আমরা ব'সে আছি ঠিক তার উপরের দোতলার ঘরে সে মারা গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন রাত্রি একটার সময়ে ছেলেটি ঐ ঘরে একটিবার মার্বেল ছাড়ে। শক্ত মেঝের ওপর শক্ত মার্বেল পড়ে তিন-চারবার শব্দ করে ঠক্, ঠক্, ঠক্ ঠক্। অস্পষ্ট নয়, এত স্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলেও না শুনে উপায় নেই। আজ যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এ ঘরে একটা পর্যন্ত জেগে শুয়ে থাকেন, আজই শুনতে পাবেন।"

নাকুবাবুর কাহিনী শেষ হ'ল। সংক্ষিপ্ত সাধারণ কাহিনী,—রোমাঞ্চকর তার মধ্যে কিছুই নেই। তবে ভূতের বাসা মাথার উপর ক'রে ভূতের গল্প শোনার মধ্যে কৌতুকের হয়ত কিছু ছিল। যে ভদ্রলোক ভূত দেখা ও শোনা নিয়ে তর্ক তুলেছিলেন, তিনি হয়ত কিছু জেরা করবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু আহারের ডাক পড়াতে সকলে উঠে পড়লেন।

রাত্রি এগারটা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার সমাপন ক'রে বহুক্ষণ যে-যার বাড়ি চ'লে গেছেন। বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়াও হ'য়ে গেছে। চাকর-বামুনরা খেতে বসেছে। তখনো ভবানীপুরে আন্ডার গ্রাউন্ড্ ড্রেন হয়নি; সদর দরজার সম্মুখে কাঁচা নর্দমা পার হবার জন্য খিলানের উপর সিমেন্ট বাঁধানো পথ; তার দুই দিকে দুটি পাকা মঞ্চ। মঞ্চের উপর মুখোমুখি ব'সে আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় অলস কথোপকথনে রত, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল নাকুবাবুর গল্প। বল্‌লাম, "শ্যাম, রাত্রি ত এগারোটা হ'ল,—আর ঘণ্টা দুই পরে চার বৎসরের বালক-ভূতের মার্বেল খেলার পালা। নাকুবাবু ত' আস্ফালন করে গেলেন, শোনবার ইচ্ছে করলে আজ রাত্রেই শোনা যেতে পারবে। আজ রাতটা থেকে যাও-না এখানে। ঘণ্টা দুয়েক গল্প ক'রে জেগে থেকে নাকুবাবুর বালক-ভূতের পিণ্ডদান ক'রে ঘুমানো যাবে।"

প্রস্তাবটা শ্যামরতনের ভালই লাগল। বল্‌লেন, "বাড়িতে কিন্তু খবর দিতে হবে; নইলে ভাববে।"

বললাম, "অবশ্যই দিতে হবে।"

কিন্তু কে খবর দেয়? ভাগিনেয় সুশীলচন্দ্র পরিবেশন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চাকর-বামুনদের খাওয়া শেষ হয়নি। অগত্যা পরামর্শ ক'রে আমরা দুজনেই শ্যামরতনের বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে এলাম যে, সে রাত্রে শ্যামরতন বাড়ি ফিরবে না।

বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শয্যা পেতে আমরা দুজনে যখন পাশাপাশি শয়ন করলাম তখন রাত বারোটা। সাড়ে বারোটার মধ্যে, শুধু আমাদের বাড়িই নয়, সারা পল্লী গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। ঘরের ভিতর আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে, আর পরিশ্রান্ত সুশীল একটা ইজি-চেয়ারে দেহ সমর্পণ ক'রে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। তার নিঃশ্বাসের উত্থান-পতনের শব্দ এবং ক্লক-ঘড়ির টক্ টক্ টক্ টক্ আওয়াজ লয় ও সুরের সাম্য রেখে ঐকতান বাজিয়ে চলেছে।

মৃদু গুঞ্জনে আমাদের গল্প চলেছে সহজ গল্পের ছন্দে ও ক্রমে। মাঝে মাঝে জোর মাত্রা

সম পড়ছে প্রাণখোলা হাসির রবে। মনের মধ্যে ভৌতিক অভিব্যক্তির জন্য বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই,—সুতরাং ভয় ত' দূরের কথা, উদ্বেগও নেই। ভৌতিক প্রমাণ পরীক্ষা করবার জন্য তোড়জোড়টা নিতান্তই উপলক্ষ,—আসল লক্ষ্য নির্বিবাদে বেশ খানিকটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। ঘড়িটা ছিল আমাদের মাথার শিয়রে পাশের দেওয়ালে। ঘাড় তুলে দেখলাম একটা বাজতে দশ মিনিট। ক্ষণকাল পরে খুট ক'রে একটা শব্দ হ'ল; ঘণ্টা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগে ঘড়ির মধ্যে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ। আমি বললাম, "শ্যাম, সময় হয়েছে, এবার মুখ বুজে কান পাতো।" কথা বন্ধ ক'রে আমরা দুজনে উৎকর্ণ হলাম। ঘর হ'য়ে গেল একেবার নিঃশব্দ, একমাত্র সুশীলের নাকের ফিস-ফিসোনি, আর ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ ছাড়া।

যথাসময়ে ঢং ক'রে ঘড়িতে একটা বাজল,—আর সঙ্গে সঙ্গে একযোগে উপরকার দোতলার ঘরে মার্বেল পড়ার শব্দ,— ঠক্—ঠক্—ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্ মৃদু নয়, অস্পষ্ট নয়,—একেবারে সুস্পষ্ট, সজোর।

এ-দিকে ফরাসের উপর, যেন বৈদ্যুতিক সংযোগে, আমাদের দুজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বশরীরে ছম্ ক'রে কাঁটা ধ'রে গেছে, নড়ন নেই, চড়ন নেই,—কথা নেই, বার্তা নেই, উর্ধ্বনাসিক হ'য়ে উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছি, যেন দুটি নির্বাক নিশ্চল মাটির পুতুল। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, তা পর্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তার উপর মনের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা হঠাৎ যদি দেখি তক্তাপোষের ধারে ধারে একটি বছর চারেকের ছেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা হ'লে কি করা যাবে! কি করা যাবে সেকথা অবশ্য আগে-ভাগে বলা কঠিন, কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, ওরূপ সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত হ'লে বোধকরি আমাদের দুজনের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে একমত হ'য়ে হার্ট ফেল করা। আপাততঃ উভয়ের ঠিক একই মাত্রায় সমাধির অবস্থা,—বিন্দুমাত্রও ইতর-বিশেষ নেই। কোনোপ্রকার প্রস্তাব পরামর্শ না ক'রে অকস্মাৎ এরূপ একক্রিয় হবার দৃষ্টান্ত এই মতভেদ-পীড়িত বাঙলা দেশে আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

আমাদের ত এই অবস্থা, ও-দিকে ইজি-চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে শ্রীমান সুশীলচন্দ্র নিশ্চিন্ত সুনিদ্রায় নিমগ্ন। Ignorance is a bliss, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জ্ঞানের বৈমাত্র ভাই অজ্ঞানতা মানুষের পক্ষে অনেক সময়েই কল্যাণ-স্বরূপ। সুশীল আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছ' বৎসরের ছোট; তবু মনে হচ্ছিল ও যদি একবার জেগে ওঠে ত' ওকে অবলম্বন ক'রে আমরা দুজনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। কিন্তু পরিশ্রান্ত সুশীলের প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যে তার সুদূরে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। আর, আমাদের দেহেও বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না তাকে জাগাবার।

আমাদের মতো দুজন জোয়ান যুবা-পুরুষের পক্ষে মার্বেলের শব্দে অতটা ভয় পাওয়া সমীচীন হয়নি, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ভয়ের মতো অর্যৌক্তিক ব্যাপার ত বেশি নেই,—অতি অল্প সময়েই সে যুক্তি-বিবেচনার অনুপাত মেনে চলে। সময়-বিশেষে সামান্য একটু মৃদু শব্দে যে-পরিমাণ ভীতি উৎপন্ন হয়, অনেক সময়ে কামান দাগলেও তত হয় না। একথার প্রমাণ-স্বরূপ ক্ষুদ্র একটি গল্প বলি।

আমরা তখন ভাগলপুরের বাইরে থাকি। আমাদের দোতলার ঘর-দালান সব সময়ে তালা দেওয়াই থাকে, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় তালা খুলে শরৎচন্দ্র ও মণিদাদা সেখানে লেখা-পড়া করেন। শরৎচন্দ্র, অর্থাৎ পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, আর মণিদাদা অর্থে আমার ছোট কাকা মহাশয় অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই মামা-ভাগ্নে, মণিদাদা ও শরৎচন্দ্র, শুধু সমবয়স্কই ছিলেন না, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে স্কুল-কলেজে যাওয়া, একসঙ্গে লেখা-পড়া করা,—সর্বদা তাঁরা একত্রে থাকতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে শরৎচন্দ্র দেখেন মণিদাদা আগেই পোঁছে গেছেন। ঘরের মধ্যস্থলে দরজার দিকে পিঠ ক'রে বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে প্রদীপের সলতে ওস্কাতে ওস্কাতে নিবিষ্ট মনে একটা কোনো চিন্তায় মগ্ন আছেন।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, মহাসুযোগ উপস্থিত! এ সুযোগ কিছুতেই হারানো উচিত নয়। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে মণিদাদার পশ্চাতে এসে উপবেশন করলেন, তারপর মণিদাদার বাম কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, হা!

কানের পাশে অস্ফুট 'হা' শব্দ শুনে মণিদাদা সিদ্ধান্ত করলেন, ভূত এসে গেছে, এবং অতি সন্নিকটে। হাত কেঁপে পিলসুজ থেকে প্রদীপ মাটিতে প'ড়ে ঘর হ'য়ে গেল অন্ধকার। তারপর দরজা দিয়ে পলায়নের অভিপ্রায়েই বোধহয় বোঁ ক'রে ফিরতে গিয়ে সাংঘাতিক পরিণতি দেখা দিলো! ভূত এসে পড়ল একেবারে দুই বাহুর মধ্যে! এখন এরূপ অবস্থায় মানুষ মরিয়া হওয়া ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না। মণিদাদাও তাই হলেন, এবং ভূতকে নিয়ে কি করা যেতে পারে সহসা ভেবে না পেয়ে, আপাততঃ দুই হাতে সবলে তাকে চেপে ধ'রে দুই চক্ষু বুজে ঝাকানি দিতে আরম্ভ করলেন। এই ঝাঁকানিটা মহাসংকটের উপলব্ধির একটা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এদিকে বলবান মণিদাদার সবল ঝাঁকানির মধ্যে প'ড়ে ভূত বেচারার ত' ওষ্ঠাগতপ্রাণ! "ও মণিমামা, আমি! ও মণিমামা, আমি শরৎ! ছেড়ে দাও!"

কে কার কথায় কান দেয়! চোখ বুজে মণিদাদা সমানে ঝাঁকানি দিয়ে চলেছেন।

"ও মণিমামা, মরে গেলুম, ছেড়ে দাও,—আমি শরৎ!"

অবশেষে মণিদাদার কর্ণে শরতের সকাতর আবেদন প্রবেশ করল। শরৎকে ছেড়ে দিয়ে গভীরস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "শরৎ? হতভাগা! আমাকে তুই মেরে ফেলেছিলি!"

উত্তরে করুণ কণ্ঠে শরৎ বলেছিলেন, "তোমার কানের কাছে অল্প একটু হা করলে যদি মেরে ফেলা হয়, তাহলে মিনিট দশেক ধরে আমাকে তোমার ঐ দুর্দান্ত ঝাঁকানি দিলে কি করা হয়, তা আমি জানিনে।"

এ মন্তব্য কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা নয়। মণিদাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট এক চীৎকার করা অপেক্ষা 'অল্প-একটু হা' করা যে ভীতি উৎপাদনের দিক দিয়ে অনেক বেশি কার্যকর, সেকথা শরৎচন্দ্রের অবিদিত ছিল না।

সে যাই হোক, আমাদের ক্ষেত্রেও যদি বছর চারেকের একটি বালককে আমাদের তক্তাপোষের ধারে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখা যেত, তাহলে যে আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনে মৃতবৎ নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিলাম, সেই আমরাই হয়ত মরিয়া হয়ে উঠে সেই বালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু সে বিষয়ে সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় অগত্যা যেমন ছিলাম, তেমনিই পড়ে রইলাম—দু-চার মিনিট নয়, পুরোপুরি আধ ঘণ্টা।

রাত্রি দেড়টার সময়ে হড়-হড় করে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আমাদের গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'রোকো! রোকো!' রবে আরোহী চিৎকার করে উঠতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। জয় রামচন্দ্র! কিশোরীনাথ ঝা, থিয়েটার দেখে ফিরেছেন। কিশোরীবাবু দাদার একজন বিশিষ্ট বিহারী মক্কেল, সুরসিক ব্যক্তি এবং বয়সে বছর কুড়িক বড় হলেও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি যে এ সময়ে থিয়েটার দেখে ফিরবেন, সে আশ্বাসের কথার খেয়ালই ছিল না।

উল্লসিত হয়ে শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়ে দুদ্দাড় করে ছুটি গিয়ে সদর দরজা খুলে প্রায় অভিনন্দিত করে কিশোরীবাবুকে ভিতরে নিয়ে এলাম। শ্যামরতনকে ও আমাকে দেখে কিশোরীবাবু বিস্মিতও হলেন, খুশিও হলেন। মিনিট পাঁচ-সাত কথাবার্তার পর যে-যার

শয্যায় শুয়ে পড়লাম। কিশোরীবাবু শয়ন করলেন আমাদের পাশের ঘরে। উৎকট উত্তেজনা থেকে মুক্তিলাভ করে দেহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল—গাঢ় নিদ্রার মধ্যে নিমজ্জিত হতে বিলম্ব হল না।

পরদিন সকালে কথাটা দাদাকে বললাম। শুনে দাদা বললেন, "মেয়েদের কাছে গল্প কোরো না—ভয় পাবে। অনেক বাড়িতেই মার্বেল গড়ানোর মত শব্দ শোনা যায়। ও এমন কিছু নয়।"

কিন্তু আট-দশ দিন পরেই দাদার 'এমন কিছু নয়' 'বেশ একটা কিছু হয়ে দাঁড়াল। দাদার দ্বিতীয় জামাতা সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি) দু-চার দিনের জন্যে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। একদিন সকাল বেলা সুবোধ আমাকে বললেন, "ছোট কাকা, কাল রাত্রে একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলাম।"

শোনা মাত্র আমার মনে হল, এ নিশ্চয়ই মার্বেলের শব্দ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার। সকৌতূহলে বললাম, "কি বল দেখি?"

সুবোধ বললেন, "রাত তখন একটা-দেড়টা হবে দোর খুলে দেখি বারান্দায় শ্বশুর মশায়ের ঘরের দরজার সামনে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম, বাড়িরই কোন ছেলে হবে; কিন্তু অত রাত্রে ছোট ছেলে কি করে একা বারান্দায় বার হয় ভেবে বিস্মিতও হলাম। তারপর হঠাৎ দেখি, ছেলেটি কখন অন্তর্হিত হয়েছে; ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখি, না, দাঁড়িয়েই রয়েছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু ছেলেটি পুনরায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গতিক ভাল নয় দেখে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম। বলে সুবোধ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

সেই দিনই দাদাকে সুবোধের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। দাদা অবশ্য পূর্বের মতো মেয়েদের নিকট একথা বলতেও নিষেধ করে দিলেন; কিন্তু সেদিনের মতো 'ও এমন কিছু নয়' বলতে পারলেন না।

সুবোধের অভিজ্ঞতার এবং আমাদের অভিজ্ঞতার দুটি গল্পকে স্বতন্ত্রভাবে উড়িয়ে দেওয়া (Explain away করা) যত সহজ, একত্রে তত সহজ নয়। দুটি গল্পকে সংযুক্ত করে দেখলে মনে হয়, উভয়ের সমষ্টি থেকে কোন-এক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে একটা কথা জানানোর প্রয়োজন আছে। মাসকয়েক পরে আবার একদিন শ্যামরতন ও আমি উভয়ে মিলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে রাত্রি একটা পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। সেদিন কিন্তু আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনতে পাইনি।

ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস যাঁদের সুদৃঢ়, তাঁদের কাছে কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মার্বেলের শব্দ না শুনতে পাওয়ায় কৈফিয়ৎ আছে। তাঁরা বলেন, প্রেতাত্মারা একবারই শুধু তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, বারম্বার পরীক্ষা দেওয়ার তামাসায় সরিক হন না।

হয় ত' তাই।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি শোনা গল্প। শোনা হলেও এত বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যে, তার ঘটনা-অংশ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, তাৎপর্য তার যা-ই হোক না কেন। আমার মাতাঠাকুরাণী এবং মেজদাদার মুখে গল্পটি বহুবার শুনেছি।

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় থাকি। দুটি যমজ কন্যা প্রসব করার পর মাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। পূর্ণিয়ায় যখন শারীরিক উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন উন্নততর চিকিৎসা এবং বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়া হল। যমজ মেয়ে দুটির লালন-পালনের সুবিধার জন্য নিযুক্ত করা হল একটি দুগ্ধবতী ধাত্রী।

কিছুকাল ভাগলপুরে অবস্থান করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মাতাঠাকুরাণী মেজদাদার সহিত পূর্ণিয়ায় ফিরে চলেছেন। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে প্রায় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত করতে হবে। ভোর চারটের সময়ে ঘাটের গাড়ি ছাড়বে: সেই গাড়িতে আরোহণ করে সকরি ঘাটে এসে স্টীমারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে মণিহারী ঘাটে পৌঁছে পূর্ণিয়ার রেল ধরতে হবে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ওয়েটিংরুমে মাতাঠাকুরাণী ও মেজদাদা অপেক্ষা করছেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, মেজদাদার দেহে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে মাতাঠাকুরাণী বললেন, "রমণী, বড়-খুকি মারা গেছে।"

বড়খুকি অর্থে যমজ দুটি কন্যার মধ্যে বড়টি।

চমকিত হয়ে মেজদাদা বললেন, "সে কি কথা! তুমি কেমন করে জানলে?"

মা বললেন, "সে নিজে এসে আমাকে জানিয়ে গেল।"

মেজদাদা বললেন, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ মা। ও কিছু নয়।"

সবেগে মাথা নেড়ে মা বললেন, "না, না,—স্বপ্ন-টপ্ন ওসব কিছু নয়। আমি তখন জেগে ছিলাম। বড়খুকি এসে সহজ সুরে আমাকে বললে, "মা, আমি তোমার বড়খুকি, এখনি মারা গেলাম। তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি।' আমি হকচকিয়ে গেলাম। কথা বলবার সময় না দিয়ে সে চলে গেল।"

মার বাক্যের মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে মেজদাদা আর কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না, চুপ করে রইলেন।

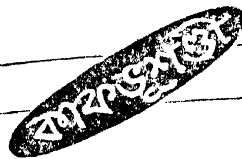
পরদিন বেলা দশটার সময় উভয়েই পূর্ণিয়া স্টেশনে পৌঁছলেন। স্টেশন থেকে ভাড়ায় আমাদের বাড়ি যাবার পথে মাঝখানে এক জায়গায় কাপ্তেন ঘাটের পুলে পড়ে। এই কাপ্তেন ঘাটের পুলের নিম্নেই পূর্ণিয়ার শ্মশান অবস্থিত। কাপ্তেন ঘাটের পুলের উপর দিয়ে যাবার সময়ে মাতাঠাকুরাণী স্যাম্পনি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন, সৎকার করতে যারা এসেছিল, তখনো তারা সেখানে আছে কিনা। বড়খুকির মৃত্যু সম্বন্ধে এতই তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

বাড়ি পৌঁছে মেজদাদা দেখলেন, সাহেবগঞ্জ স্টেশনে মাতাঠাকুরাণী তাঁকে যে কথা জানিয়েছিলেন—স্বপ্ন দেখেই হোক, অথবা অপর যে কোন উপায়েই হোক—তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। ঠিক তার আগের রাত্রে বারোটা আন্দাজ বড়খুকি হঠাৎ মারা গেছে। বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ করেনি; সকাল থেকে কয়েকবার বমি করেছিল, তারপর অকস্মাৎ মৃত্যু।

আমাদের সহজ সাধারণ বিবেচনা ও বিচার-শক্তির দ্বারা এ-গল্পটির যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখতে গেলে সহজেই হয়ত এমন কয়েকটি দুর্বল স্থান অনুভব করা যাবে, যার উপর রীতিমত জেরা চালানো সম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, ভৌতিক কল্পনা যদি আদৌ ভুলই হয়, তাহলে ইহলোকের বুদ্ধি-বিচার ধারণা-বিবেচনার মাপকাঠি দিয়ে সেকথা প্রমাণ করতে যাওয়াও ভুল হবে।

তাছাড়া, এ-গল্পের মধ্যে ভৌতিক সংস্পর্শবর্জিত এমন দুটি ব্যাপার আছে, যার রহস্য সকল বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাকে হার মানায়। প্রথমত, সাহেবগঞ্জে মাতাঠাকুরাণী কর্তৃক বড়খুকির মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন; দ্বিতীয়ত, ঠিক সেই একই সময়ে পূর্ণিয়ায় বড়খুকির মৃত্যু। কোন লৌকিক কৈফিয়তের দ্বারা এমন অলৌকিক ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন বোধ করি, আজ পর্যন্ত কাহারো দ্বারা সম্ভবপর নয়। (ক্রমশ)

চৌরাস্তার ধারে



জামসেদপুরের এক শিশু সম্মেলনে শ্রীজওহরলাল নেহরুকে একটি শিশু প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি কতদূর লেখাপড়া শিখিয়াছেন? বলা বাহুল্য প্রধান মন্ত্রী শিশুটির প্রশ্নে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং খুব সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

—উত্তর দেওয়া সত্যই কঠিন, কিন্তু শিশুর মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। জওহরলালজী সম্প্রতি পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিতেই সে ভাবিয়াছে যে, তাঁহার আর বিদ্যা নাই, মিছামিছি পণ্ডিত উপাধি ব্যবহার করিতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন, নয় ভাবিয়াছে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার চারিপাশের লোকেদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখিয়া পাণ্ডিত্যের উপর অশ্রদ্ধাবশত উপাধিকে ব্যবহার করিতেও লজ্জিত হইতেছেন।

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পয়লা ডিসেম্বর হইতে সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষেধ আইন বলবৎ করিয়াছেন।

—ভালই করিয়াছেন, কিন্তু আইনের পরিধি আর একটু বাড়াইয়া দিলে অ-ধূমপায়ী আমরা বাঁচিতাম। ঘণ্টা দুয়েক নিষ্ক্রিয় অবস্থা ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া বা ভোগ করিয়া আসিয়া ট্রামে-বাসে বাবুরা যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া তুলিবেন, তাহার প্রচণ্ডতা হইতে আমাদের রক্ষা করিবে কে?

* * * * *

সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া বলিয়াছেন যে, চীনের মাও সে তুং এবং তিব্বতের দলাই লামা, এই দুই নেতা যদি ভারতে আসিয়া গয়াতে সম্মিলিত হন, তাহা হইলে আলাপ-আলোচনার দ্বারা তিব্বত-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

—আমাদেরও তাহাই মনে হয়। ঐ সঙ্গে ট্রুম্যান ও স্ট্যালিন সাহেবকেও আনিতে পারিলে আরও ভাল। তারপর ডাঃ লোহিয়া গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িয়া যদি যথাবিহিত ক্রিয়াকর্মাদি শুরু করেন, তাহা হইলে ইঁহাদের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহাতে তিব্বত-চীন সমস্যা কেন, বিশ্ব-সমস্যাও মিটিয়া যাইতে পারে।

* * * * *

রাষ্ট্রপুঞ্জ বৈঠকে চীনা গণসাধারণতন্ত্র ও কোরিয়া সাধারণতন্ত্রের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদিগকে টেবিলের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিবার জন্য ডাঃ রেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোরিয়া সম্বন্ধে আলোচনায় অসম্মত চীনা নেতা বু-সিউ-চুয়াং সেখানে না বসিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আসনে উপবেশন করেন। কোরিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি সেই সময় বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতা-অন্তে অকস্মাৎ সকলে দেখেন, মিঃ বু কোন্ সময়ে গুটি গুটি আসিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি এন রাওয়ের পার্শ্বে তাঁহার সংরক্ষিত আসনেই বসিয়া আছেন।

—অনেকে ইহার কারণ কি অনুমান করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমরা পারিয়াছি। রাষ্ট্রপুঞ্জ বিভিন্ন কর্ণধারদের জন্য ভাল ভাল আসন রাখিয়াছেন, কিন্তু কর্মচারীদের জন্য অবশ্যই সেরূপ ব্যবস্থা রাখেন নাই এবং সেদিকে যত্নও লন না। নিশ্চয় ছারপোকার দৌরাত্ম্যে চীনা প্রতিনিধি বু-উ-উ করিয়া উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* * * * *

কোরিয়া যুদ্ধের খবরে প্রকাশ, চংসনজিনে য়ালু নদীর পুলের উপর সুপারফোর্ট বিমান হইতে ৬৮৮০০০ পাউণ্ড বোমাবর্ষণ করা হয়।

—অনেকে হয়তো চমকাইয়া উঠিতেছেন, কিন্তু চমকাইবার কিছু নাই। একটি দুটি

বোমা ফেলিয়াই যে কোন পুলের দফা-রফা করা যায়। সেক্ষেত্রে যখন এতগুলি বোমা ফেলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোনটা তাক্‌মাফিক্ লাগে নাই—সবই নদীর জলে পড়িয়াছে।

* * * * *

কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীকে এম মুন্সী মহাশয় অনেক অংক কষিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের পর খাদ্য আমদানীর জন্য এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

—আমাদেরও তাহাই মনে হয়। মুন্সী মহাশয় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ১৯৫২ সালের পূর্বেই হয়ত না খাইয়া অনেকে মরিবে, বাকী যাহারা খাবি খাইতে থাকিবে, তাহাদের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে একটা হইবেই।

* * *

পাকিস্থানের কাশ্মীর মন্ত্রী জনাব গুরম্যানি সম্প্রতি বলিয়াছেন, হয় রাষ্ট্রপুঞ্জ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিবে, না হয় করিবে না। যদি না করে, তাহা হইলে পাকিস্থানের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা থাকিবে। কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থায় সম্মতি দেওয়া অথবা কাশ্মীরকে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাকিস্থান নিশ্চয় শেষোক্ত পন্থা বাছিয়া লইবে।

—মুক্ত করা কিন্তু কঠিন। পারতপক্ষে ভারত যুদ্ধ করিবে না। অতএব কেহ যুদ্ধ করিতে আসিলে আমরা শুধু ফুঁ দিয়া এখন তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিব। আমাদের সমবেত ফুঁয়ের প্রকোপে যে বাত্যার সৃষ্টি হইবে, তাহার প্রতাপ গুরম্যানি সাহেবের পক্ষেও গুরুতর বলিয়া ঠেকিতে পারে।

* * *

উড়িষ্যায় রাতুলাই নামক একটি স্থানে এক রাখাল বালক নাকি এমন ঔষধ দান করিতেছে, যাহার ফলে জন্মান্ধ দৃষ্টি পাইতেছে, চিরবধির শ্রুতিধর হইতেছে, খোঁড়ারা জোড়া পায়ে দৌড়াইতেছে ইত্যাদি। ফলে সেখানে ভীড়ের অন্ত নাই। উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট ভীড় দেখিয়া রাখাল বালকের সত্যি কোন ক্ষমতা আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য তদন্ত কমিশন বসাইয়াছেন।

—কমিশন তদন্ত করিয়া ফলাফল একটু সত্বর জানাইলে ভাল হয়। কারণ ইতিমধ্যে দেশ হইতে বুড়ী মাসিমা চোখে ঠুলি বাঁধিয়া বাড়িতে হাজির হইয়াছেন, পিসেমহাশয়ের ট্রামে ঠ্যাং কাটা পড়িয়াছিল, তিনি কাঠের পা লইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন, ইহা ছাড়া পেট-রোগা, ম্যালেরিয়া ভোগা কতজন আত্মীয় যে আসিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। ঠিক আমার বাড়ি হইতেই উড়িষ্যা যাইবার জন্য যত লোক মজুত আছে, তাহার জন্য একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

দ্বৈরথ (এস বি পিকচার্স—ইন্দ্রপুরী)—**কাহিনী :** বনফুল; পরিচালনা : সুধীশ ঘটক, বিজন সেন; আলোকচিত্র : বিশু চক্রবর্তী; শব্দ-যোজনা : জে ডি ইরাণী; সুরযোজনা : কালীপদ সেন; মার্গ সঙ্গীত : চিন্ময় লাহিড়ী; শিল্পনির্দেশ : বীরেন নাগ; ভূমিকায় : বীরেশ্বর সেন, পাহাড়ী সান্যাল, মনোরঞ্জন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, শিশির বটব্যাল, কুমার মিত্র, ননী মজুমদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনা, মলয়া, প্রীতিধারা, লীলাবতী প্রভৃতি।

ছবিখানি ১লা ডিসেম্বর থেকে মল্লিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেষণে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

চলচ্চিত্র চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য বস্তু বলেই তার মহিমার স্ফূর্তি নির্ভর করে চোখে দেখার সুযোগের ওপরে, অর্থাৎ ঘটনার মৌলিকত্ব, চমৎকারিত্ব ও বিন্যাস-বৈচিত্র্যের ওপরে। 'দ্বৈরথে'র দুর্বলতাই হচ্ছে সেই দিক থেকেই। কারণ এর গল্প হচ্ছে চারিত্রিক বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে। সব দিকে স্বাভাবিক হয়েও কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন অদ্ভুত কিছু দেখা দেয়, যার ব্যাখ্যা কেবল মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে—সেটা হলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নেবার জিনিস—চোখের সামনে তার সূক্ষ্ম গতিবিধিকে তুলে ধরে দেখাবার জিনিস তা নয়। আর যদিও-বা কোন প্রখর মেধা চারিত্রিক বিকার ও বৈচিত্র্যকে মূর্ত করে তোলার সফলও হয় তো স্বভাবই তার চেহারাটা প্যাঁচালো হয়ে ওঠে। তার ওপর বিকার-বিচিত্র চরিত্র দলে বেশি হয়ে পড়লে যার যেমন স্ব স্ব বৈচিত্র্যকে সামলে রেখে যেতে সম্মিলিতভাবে একটা কোনও মূল প্রতিপাদ্য খাড়া করে তোলা জটিল হয়ে ওঠে। 'দ্বৈরথ'-এর বেলাতে ঠিক তা-ই ঘটেছে।

এতে মানসিক বিকারগ্রস্ত চরিত্র রয়েছে একাধিক। অবাস্তবও নয় তারা কেউ। কিন্তু সবারেরই নিজের নিজের চরিত্র সম্পর্কে একটা কিছু বোঝবার বিষয় থাকায় সবাইকে কোন একটা সূত্রে মিলিয়ে একটা 'কমন' প্রতিপাদ্য রচনা করে তোলা যায়নি। তাই ছবিখানিতে কতকগুলো অস্বাভাবিক ধরণের চরিত্রের তত্ত্ব পেয়েছি, কিন্তু কাহিনীর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

'দ্বৈরথ'এর প্রধান বিকার-বিচিত্র চরিত্র হচ্ছে উগ্রমোহন, তার বন্ধু চন্দ্রকান্ত ও আর একটি। ছেলেবেলা থেকেই এরা সহোদরোপম বন্ধু। পাশাপাশি দুটি জমিদার এরা। শুধু তাই নয়, উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের ভগিনীপতি। কিন্তু অদ্ভুত রেষারেষি এদের পরস্পরের মধ্যে। গোপনে একজন আর একজনকে জব্দ করার জন্য কেবলই ষড়যন্ত্র করে চলেছে। একজন একটা কিছুর উদ্যোগ করলেই সেই হয়কে নয়

রঙ্গজগৎ

করার জন্যে আর একজন উঠেপড়ে লাগে; অদ্ভুত নেশা এদের দুজনের। অথচ এমনি ব্যাপার যে, প্রতিদিন দুজনে বসে দাবা না খেললেও চলে না। উগ্রমোহনের সমস্ত প্রকৃতিটাই উগ্র, কেবলই যেন সে হাত দিয়ে লোকের মাথা কাটছে; সবাই সদা ভয়ে তটস্থ।



মুক্তি প্রতীক্ষিত 'সহোদর' চিত্রের রূপসজ্জায় গুরুদাস ব্যানার্জি

একমাত্র তার মার কাছেই সে উল্টো প্রকৃতির, একেবারে শিশুর মতো হয়ে পড়ে সেখানে। চন্দ্রকান্ত সঙ্গীতপ্রিয় সৌখীন লোক; উগ্রমোহনের ঠিক উল্টো স্বভাবের। উগ্রমোহনের সবই পালোয়ানী মতে, আর চন্দ্রকান্তের মিহি। চরিত্রে কিন্তু উগ্রমোহন ছিলো শক্ত—সুন্দরী বিধবাকেও সে মাথা নেড়া করে দেবার হুকুম দিতে পারে; ওদিকে চন্দ্রকান্ত লুকিয়ে বেদেনী মেয়ের সঙ্গে ছদ্মবেশে নৈশ অভিসার করে ফেরে। এক সময়ে উগ্রমোহন রেশমি নামক এক বাঈজীর উপর দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলো, সেবার চন্দ্রকান্তই প্রতিদ্বন্দ্বী সেজে তাকে উদ্ধার করে। সামনা-সামনি দুই বন্ধুর মধ্যে বিরোধের চেয়ে মৈত্রী ভাবই দেখা যায়, কিন্তু আলাদা থাকলেই পরস্পরে ষড়যন্ত্র করতে থাকে অপরকে জব্দ করার জন্যে। চন্দ্রকান্ত টাকা ধার চাইলে গোলক শা'র কাছে; উগ্রমোহন গোলক শা'কে ডেকে শাসিয়ে দিলে যে, চন্দ্রকান্তকে যেন সে টাকা না দেয়। গোলক শা' সেকথা গিয়ে জানালে চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্তের জিদ্ চাপলো, টাকা সে নেবেই এবং তার জন্যে যদি গোলক শা' বিপদ আশংকা করে তো সে উগ্রমোহনের জমিদারীর আওতা ছেড়ে চন্দ্রকান্তের জমিদারীতে এসে উঠুক। গোলক তা-ই করলে। আর একদিকে উগ্রমোহন তার মৃতা ভাগিনেয়ীর দুই মেয়ে রুমনি-ঝুমনীর বিয়ে ঠিক করলে। রুমনী-ঝুমনীর পিতা গঙ্গাগোবিন্দের এ বিয়েতে মত নেই; সে গিয়ে ধর্ণা দিলে চন্দ্রকান্তের কাছে। উগ্রমোহন জোর করে বিয়ে দেবার জন্যে পাত্রদ্বয়ের পিতাকে এনে বন্দী করে রাখলেন, আর ওদিকে চন্দ্রকান্ত বিয়ে বন্ধ করার জন্যে পাত্র দুটিকে তার গৃহ থেকে সরিয়ে ফেললেন। শেষে অবশ্য গঙ্গাগোবিন্দ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে বিয়েতে রাজী হলেন, বিয়ে বেশ ধুমধামের সঙ্গে দুই বন্ধুর উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হলো। এর পর ঘনিয়ে উঠল গোলক শা'র ব্যাপার। উগ্রমোহন গোলক শা'কে অপহরণ করলেন। এই সময়ে উগ্রমোহনের মা বৃন্দাবন যাত্রা করেন। গোলক শা'কে নিয়ে গিয়ে প্রথমে একটা ভাঙা কালিবাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়। চন্দ্রকান্ত চর নিযুক্ত করলে তার খোঁজ নেবার জন্যে। অমাবস্যার রাত্রে উগ্রমোহন মন্দিরে গিয়ে গোলককে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। প্রহার জর্জরিত গোলক এক ফাঁকে লোষ্ট্রাঘাতে উগ্রমোহনের উপর শোধ নিতে গেলো, কিন্তু ইট গিয়ে লাগলো দেবী মূর্তির গায়ে।

ক্রোধান্ধ উগ্রমোহন গোলককে যম ঘরে বন্ধ করে রাখার হুকুম দিলেন। চন্দ্রকান্ত সে খবর পেয়ে পুলিশে সংবাদ দেবার কথা বললেন। কিন্তু শেষে খুনের দায়ে উগ্রমোহনের ফাঁসি হবে এবং বন্ধুর সেই পরিণাম আর ভগিনী বাণীর দুর্ভাগ্যের কথা বিবেচনা করে সে নিবৃত্ত হলো। ইতোমধ্যে মার অসুখের খবর পেয়ে উগ্রমোহন বৃন্দাবনে চলে যায়। সেই সুযোগে বাণী এসেছিলো তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এবং সেই সূত্রেই সে গোলককে যমঘরে বন্দী করার খবর পায়। সেও স্বামীর অসম্মানজনক পরিণতির কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। স্বামীর মান-মর্যাদা ও খ্যাতি রক্ষায় সে দৃঢ় হলো। রাত্রে সে চাবি নিয়ে গোপনে যমঘরের দিকে গেলো। মাঝ পথে পরিচারিকাদের দাঁড় করিয়ে সে একা এগিয়ে গেলো যমঘরের দিকে। সে সময়ে উপস্থিত হলো প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আর বারি বর্ষণ। বাণী যমঘরের ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে পড়লো—অন্ধকার গহ্বরে বিষাক্ত সাপ এসে তাকে গ্রাস করলে। এর পর দেখা গেলো শোক-বিমূঢ় উগ্রমোহন বাণীর প্রিয় বাদ্যযন্ত্রগুলি ঘিরে বসে আছে, আর চন্দ্রকান্ত এসেছে তাকে সান্ত্বনা জানাতে।

প্রথম দৃশ্যে উগ্রমোহনের উগ্রস্বভাবের একটি রুদ্র নিদর্শন দেখিয়ে ছবির আরম্ভ, কিন্তু আসল গল্প কোথায় কিভাবে এবং কাকে নিয়ে শুরু করা যায় সেই ধরতাটায় এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ছবি যায় ফুরিয়ে। আসলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা বলে কিছুই দাঁড় করানো যায়নি। রকম কতকের কতকগুলি চরিত্র এনে ধরা হয়েছে, কিন্তু কেন, কি তাদের লক্ষ্য, তাদের সার্থকতাই বা কি আর এরা বলতে-বোঝাতেই বা কি চায় তার কোন আভাসও স্পষ্ট নয়। গল্প যদি থাকেও কিছু তো তার মধ্যে কোন খেই নেই।

সাজ-পোষাক, হাবভাব এবং অন্যান্য সবদিকে আহাওয়া ও পরিবেশ একেবারেই এ যুগীয়, তার সঙ্গে যমঘরের মতো সর্পকুঠুরীর পরিকল্পনা অত্যন্ত উদ্ভট। সেই যমঘরে বাণীকে টেনে নিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়ে কিসের কোন্ সমাধানে পৌঁছনো গেলো? বাণীর মৃত্যুতে গোলক সার হত্যা চাপা পড়ে কি করে। উগ্রমোহনের নালিশে ফৌজদারী মামলা তদন্তের জন্যে ডেপুটি এলো চন্দ্রকান্তের গৃহে, তারপর চন্দ্রকান্তর বন্ধুর অনীপাত বলে এবং মিশ্রজীর ঠুংরীতে বিহ্বল হয়েই কি সে মামলা চাপা দিয়ে দিলে? কোন্ যুগের লোক এরা সব যাতে কথায় কথায় লাঠি তরাজ, দাঙ্গা, আটক চালিয়ে যেতে পারে?—সাজ-পোষাকে তো একেবারে হাল-ফ্যাশনের বললে ভুল হয় না! ফ্ল্যাশ-ব্যাক'এ রেশম বাইজীর সঙ্গে উগ্রমোহনের অধ্যায় দৃশ্যটি নির্বাক রাখা হয়েছে, সম্ভবত রেশমের ভূমিকাভিনেত্রী বাক্‌পটিয়সী নয় বলেই, কিন্তু তাতে নাটকীয়তাকে কি খর্ব করে দেওয়া হয়নি? শেষ দৃশ্যে যমঘরের দিকে বাণী পা-বাড়াতেই বিনা আভাসে হঠাৎ ভীষণ বজ্রপাত আর ঝড়বৃষ্টি নাটকীয়তা গড়ে তোলার চেয়ে বেখাপ্পাই হয়ে দাঁড়ায় বেশী। সব কেমন যেনো এলোমেলো। সংযোগলেশহীন, অসংবিভক্ত চরিত্র ও ঘটনার কাহিনী। ছবির পটটি খুবই প্রশস্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে ভরাট করার কোন কিছুই ফলিয়ে তোলা যায়নি। বিন্যাসে কল্পনাশক্তির নাটকীয় চিন্তাধারার অভাব সুপ্রকটিত।

চরিত্রগুলির কারুর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য আরোপিত না হতে পারায় তাদের পরিণতিতেও কোন যুক্তি মেলেনি। কোন চরিত্রই তাই মনেও ধরে না মোটেই। চরিত্রানুগ অভিনয়শিল্পী নির্বাচনে ত্রুটি বিশেষ ধরা যায় না বরং বলা যায় যে, অভিনেতাদের ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বের জন্যেই চরিত্রগুলিকে মনে বসিয়ে নিতে আগ্রহ জাগে, কিন্তু তারপর দেখা যায় এক একজনকে মনে হয় বিভিন্ন মানসিক লক্ষণগুলিকে আয়নার সামনে অভিব্যক্ত করে যাওয়ার মতো। উগ্রমোহনরূপে বীরেশ্বর সেনকে বেশ মানিয়েছে—অভিব্যক্তিতে, চেহারায়, প্রায় সবদিকেই—কিন্তু চরিত্রটিরই প্রয়োজন ঠিক করে দিতে কাহিনীরই জোর না থাকে তো যতো ভালো অভিনয়ই হোক আবেগের গোড়ায় তা পৌঁছয় না। পাহাড়ী সান্যাল অভিনীত চন্দ্রকান্তের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ, তবে একক অভিব্যক্তি প্রকাশে দুই বন্ধুর মধ্যে তাকেই বেশী মনে ধরে। বাণীর ভূমিকায় মলয়া সরকারকে দেখিয়েছে সুন্দর এবং তাকে সুন্দর করে দেখাবার চেষ্টাও হয়েছে প্রয়োজনকে ছাপিয়েই। অভিনয় অবশ্য তিনি খারাপ করেননি, দু' একটি দৃশ্যে তার বেশ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। গোলক সা'র ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় কালী মন্দিরে প্রহৃত হওয়ায় জিঘাংসার একটা লাখ টাকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন; ছবির শেষেও তার সে চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ভাসতে থাকে। চন্দ্রকান্তের ম্যানেজার কমলাকান্তের ভূমিকায় ননী মজুমদারের অভিনয় নজরে পড়ে।

গানের ব্যাপারে ভারতীয় মার্গ সংগীতকে অবলম্বন করা হয়েছে। চন্দ্রকান্তের দরবার গাইয়ে মিশ্রজীর ভূমিকায় উচ্চাঙ্গের একখানি ঠুংরী ও একখানি খেয়াল গেয়ে শুনিয়েছেন চিন্ময় লাহিড়ী—দর্শকের মনও তাতে ভোলে ছবিরও আকর্ষণ বেড়েছে। প্রথম ঠুংরী গানখানির প্রবর্তনা কিন্তু একরকম জোর করেই। উগ্রমোহনের বাহার নামক গাভী চুরি করিয়ে তাকে শেষ জানাবার জন্যেই তাকে শুনিয়ে চন্দ্রকান্ত কর্তৃক মিশ্রজীকে দিয়ে খেয়ালে বাহার গাওয়ানোর মধ্যে ঘটনার সঙ্গে তবু একটু সংগতি থেকেছে। রেশম বাইজীর ভূমিকায় আমিনার মুখ দিয়ে গাওয়ানো গজলখানিও মনকে মোহিত করে তোলে। চিরকাল কলকাতারই শিল্পী হলেও এ ছবিতে আমিনাকে বম্বে-র বলে চালানোর অর্থ! হঠাৎ একটা সঙ্কটপূর্ণ ঘটনাকে ভেদ করে আধা বেদেনী আধা সাঁওতালী গোছের একদল কিম্ভূতসাজ মেয়েদের নাচ এনে ফেলায় ছবির শোভাই বা কি বেড়েছে আর নাটককে তা সাহায্যই বা কি করলো কি ভাবে? চন্দ্রকান্তের নৈশ অভিসারকে প্রকাশ করার অন্য আরও তো সংগত সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারতো! আরও দুখানি গান আছে বাণীর গলায়,—একখানি "মন্দিরে মম কে" অনুসরণে আর একখানি খেয়াল। গানগুলি রচনা করেছেন প্রণব রায়। গানগুলির সব কখানিই আসর জমিয়ে দেবার মতো। আবহসংগীতের বেলায় কিন্তু প্রশংসা করার অবকাশ খুবই কম। অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যের ভাবের সঙ্গে আবহসংগীত অসংগতই লাগে; মাঝে মাঝে ছাঁকা বিলিতী গৎ বড়ই কটু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দৃশ্যসজ্জাই হচ্ছে ছবিখানির সব চেয়ে প্রশংসনীয় দিক। পরিবেশকে গড়ে তুলতে তা যেমন সহায়তা করেছে তেমনি একটা ওজনও এনে দিতে পেরেছে। যমঘরটির পরিকল্পনায় বিশেষ করে শিল্পনির্দেশক বীরেন নাগ খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলের অন্যদিকে লক্ষ্য করার মতো প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তরুণ আলোকচিত্রশিল্পী বিশু চক্রবর্তী। চন্দ্রকান্তের অভিসার কালে চাঁদনী রাতে আলোকবাহুল্য এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য দূর থেকে ট্রাক্ করার দোষ ছাড়া, আলোকচিত্র গ্রহণ, উভয়তঃই, দৃশ্যসংগঠনে এবং আলোকসম্পাতে বেশ একটা নাটকীয় ছাপ এনে দিয়েছে। শব্দ গ্রহণ ভালোই।

"সৈরথ" মনে না লাগার মতো এই কারণে যে এতে কোন সুসম্বন্ধ গল্প নেই, আর কোন বক্তব্যও নেই।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন মাঠে শোচনীয়ভাবে দশ উইকেটে কমনওয়েলথ দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। ভারতীয় দলের এই অপ্রত্যাশিত পরাজয় সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের অনেককেই স্তম্ভিত ও মর্মাহত করিয়াছে। ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম দীর্ঘকাল হইতেই "ব্যাটস্‌ম্যানস্ প্যারাডাইস্" বা ব্যাটস্‌ম্যানদের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনের সাহায্যকারী মাঠ বলিয়াই খ্যাত। সেইরূপ মাঠে ভারতীয় দল প্রথম ব্যাটিংয়ে সুযোগ লাভ করিয়াও কিভাবে যে প্রথম ইংনিংস এ মাত্র ৮২ রানে শেষ করিয়া শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল—এই প্রশ্ন অনেকেই সমাধান করিতে পারেন নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, অনেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল আশাহত, ব্যথিত ক্রীড়ামোদিগণ যদি অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ক্রিকেট টেস্ট খেলার ইতিহাস আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, বহু স্থানেই খেলার মাঠ বা পিচ্ খেলোয়াড়দের বিভ্রান্ত করিয়া কল্পনাতীত ফলাফলের কারণ হইয়াছে। এই খেলাতেও ব্রাবোর্ন মাঠের নূতন রীতি অনুযায়ী নির্মাণ ব্যবস্থাই যে ভারতীয় দলকে প্রথম ইনিংসের খেলায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করে, এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে ঐ মাঠেই যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড়গণ শতাধিক, দ্বি-শতাধিক—এমন কি, তিন শতাধিক পর্যন্ত রান করিয়াছেন, তাঁহারা কোন রান না করিয়াই আউট হইবেন, ইহা বিশ্বাসঘাতক পিচ্ বা মাঠ ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপেই ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। অধ্যাপক দেওধর এই খেলা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানগণ যদি বিপর্যয়ের মুখে দৃঢ়চিত্তে বেপরোয়া ব্যাটিং করিবার নীতি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে প্রথম ইনিংস্ অল্প রানে শেষ হইত না। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কেন করেন নাই, তাহা তাঁহারাই জানেন; সুতরাং সেই বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে দৃঢ়তার যে মোটেই অভাব ছিল না, তাহা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ক্রিকেট খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকে। সুতরাং তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল এই পরাজয়ের সমুচিত প্রত্যুত্তর দান করিবেন না—কে বলিতে পারে?

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভারতীয় দল প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করিয়া মাত্র ৮২ রানে প্রথম ইনিংস্ শেষ করে। মুস্তাক আলী, হাজারে, ফাদকার, অধিকারী, আলভা, মাঞ্জরেকার প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ কোন রান না করিয়াই আউট হন। কমনওয়েলথ দলও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত খেলিয়া ৫২৭ রানে ইনিংস্ শেষ করে। ভারতীয় দল ৩৪৫ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তৃতীয় দিন, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের কিছুক্ষণ খেলিয়া ৩৯৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। পি আর উমরিগর ও বিজয় হাজারে উভয়ে এই খেলায় শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কমনওয়েলথ দল মধ্যাহ্ন ভোজের পর ২ মিনিট খেলিয়া কেহ আউট না হইয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৯ রান সংগ্রহ করে।

:: খেলার ফলাফল ::

ভারতীয় দলঃ—প্রথম ইনিংস্—৮২ রান (বিজয় মার্চেণ্ট ৩৭ রান, সি এস নাইডু ২৭ রান; রিজওয়ে ১৬ রানে ৪টি উইকেট, লেকার ৩২ রানে ৩টি উইকেট ও ওরেল ২৩রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দলঃ—প্রথম ইনিংস্—৫২৭ রান (এমেট ৩৯ রান, ওরেল ৩৫ রান, কেন গ্রিভস্ ৮৯ রান, ইভিন ৭৭ রান, স্পুনার নট আউট ৬২ রান, লেকার ৩৭ রান, রিজওয়ে ৩১ রান; বি সি আলভা ৭০ রানে ২টি উইকেট, সি এস্ নাইডু ৮৩ রানে ৩টি উইকেট, উমরিগর ৬৮ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন)

ভারতীয় দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস্—৩৯৩ রান (পি আর উমরিগর ১৩০ রান, বিজয় মার্চেণ্ট ৬২ রান, বিজয় হাজারে ১১৫ রান, বিনু মানকড় নট আউট ২৭ রান, মুস্তাক আলী ২৬ রান; লেকার ৮৮ রানে ৩টি উইকেট, জি ট্রাইব ১০০ রানে ২টি উইকেট দখল করেন)

কমনওয়েলথ দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস্—কেহ আউট না হইয়া ৪৯ রান (ফিসলক নট আউট ৩০ রান, ইভিন নট আউট ১৮ রান)

ভারতীয় তৃতীয় টেস্ট দল

ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতায় ভারতীয় বনাম কমনওয়েলথ দলের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা হইবে। এই খেলায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছেঃ—বিজয় মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), বিজয় হাজারে (সহঃ অধিনায়ক), বিনু মানকড়, সি এস্ নাইডু, আর এস্ মোদী, ডি জি ফাদকার, এইচ্ আর অধিকারী, পি আর উমরিগর, এন চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ (উইকেটকিপার) ও এম আর রেগে, দ্বাদশ ব্যক্তি ডি এল মাঞ্জরেকার; অতিরিক্তঃ—এইচ্ গাইকোয়াড় ও পি জি যোশী।

দ্বিতীয় টেস্ট দলে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে বি সি আলভা, ডি এল মাঞ্জরেকার ও মুস্তাক আলীকে বাদ দিয়া তাঁহাদের স্থলে তৃতীয় টেস্ট দলে এন চৌধুরী, আর এস্ মোদী ও এম আর রেগেকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকাতার সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ মুস্তাক আলী বাদ পড়ায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বহু প্রাচীরপত্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন, তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় বেশ কিছুটা গণ্ডগোল হইবে। কিন্তু আমরা ইহার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদীরা আর যাহাই কিছু হোক না কেন, অপ্রতিনিয়ন্ত্রিত কোন কার্যেই লিপ্ত হইতে পারে না। মুস্তাকের খেলা দেখিবার জন্য সকলেই উন্মুখ এবং তাহা সম্ভব করাও কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকদের পক্ষে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। মধ্যপ্রদেশ প্রদেশপালের দলের অধি-

নায়ক যেরূপভাবে বিনু মানকড় হইয়াছেন, পশ্চিম বাঙলার প্রাদেশিকদের দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলীকে করিলেই সকল গোলমালের অবসান হইবে —এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ড দলের এইবারের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় খেলা স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই। প্রথম দিন খেলা চলিবার পরই দ্বিতীয় দিন, প্রবল বারিপাতের ফলে মাঠ সিক্ত হওয়ায় খেলা চলা সম্ভব হয় নাই। তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হইলে সিক্ত মাঠে ইংলণ্ড দল সুবিধা করিতে পারে নাই। অল্প রানে প্রথম ইনিংস্ শেষ হইতেছে দেখিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। অস্ট্রেলিয়া দলও খেলিতে নামিয়া অনুরূপ [illegible] সম্মুখীন হয় ও ডিক্লেয়ার্ড করে। ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া শেষ [illegible] জয়ী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু [illegible] দিনে অল্প অল্প বারিপাতের মধ্যে খেলিতে [illegible] প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিতে পারে নাই। [illegible] অস্ট্রেলিয়া খেলায় বিজয়ী হয়। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল ৭০ রানে ইংলণ্ড দলকে পরাজিত [illegible] টেস্ট পর্যায়ের খেলায় সাফল্য লাভের শুভ [illegible] বলিয়াই যে ইহা উল্লেখযোগ্য তাহা [illegible] উপলব্ধি করিয়া [illegible] বেপরোয়াভাবে ডিক্লেয়ার্ড [illegible] ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট [illegible] এইরূপ নীতি কখনও অনুসৃত [illegible] এই দিক হইতেই [illegible] ক্রিকেট টেস্ট ইতিহাসে এক নূতন [illegible] রচনা করিয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল [illegible]:—

অস্ট্রেলিয়া:—প্রথম ইনিংস্—২২৮ রান (মরিস [illegible], নেল হার্ভে ৭৪ রান, মিলার ১৫ রান, [illegible] ২৬ রান, লিণ্ডওয়াল ৪১ রান, জনসন্ [illegible] বেইলী ২৮ রানে ৩টি উইকেট, বেডসার [illegible] রানে ৪টি উইকেট, ব্রাউন ৬৩ রানে ২টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড:—প্রথম ইনিংস্—(৭ উইকেটে) ৬৮ [illegible] ডিক্লেয়ার্ড (ইভান্স ১৬ রান, সিম্পসন ১২ [illegible] নট আউট ৮ রান; জনস্টন ৩৫ রানে [illegible] উইকেট, মিলার ২৯ রানে ২টি উইকেট পান)

অস্ট্রেলিয়া:—দ্বিতীয় ইনিংস্—(৭ উইকেটে) [illegible] রানে ডিক্লেয়ার্ড (নেল হার্ভে ১২ রান, জনসন [illegible] রান, মিলার ৮ রান; বেইলী ২২ রানে ৪টি উইকেট ও বেডসার ৯ রানে ৩টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড:—দ্বিতীয় ইনিংস্—১২২ রান (হাটন নট আউট ৬২ রান, ব্রাউন ১৭ রান; লিণ্ডওয়াল [illegible] রানে ২টি উইকেট, ইভার্স্ল ৪০ রানে ৪টি উইকেট, জনস্টন ৩০ রানে ২টি উইকেট ও মিলার [illegible] রানে ১টি উইকেট লাভ করেন)

কমনওয়েলথ ও হোলকার দলের খেলা

কমনওয়েলথ ও হোলকার দলের তিনদিনব্যাপী [illegible] ইন্দোরে নবনির্মিত "পাটের" ম্যাটিংয়ে খেলা [illegible] অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলার [illegible] এই যে, উভয় দলই প্রথম ইনিংসের খেলায় [illegible] সুবিধা করিতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় [illegible] বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের নিদর্শন উভয় পক্ষের [illegible] খেলোয়াড়গণই দিয়াছেন। শেষ দিনে খেলাটি বিশেষ উপভোগ্য হয়। কমনওয়েলথ দলের রামাধীন ও হোলকার দলের গাইকোয়াড়ের বোলিং উপভোগ্য হয়।

:: খেলার ফলাফল ::

হোলকার:—প্রথম ইনিংস্—১৪৮ রান (রঙ্গনেকার ৩৮ রান, কর্ণেল নাইডু ১৯ রান, সারভাতে ১৫ রান, অর্জুন নাইডু ২৫ রান, স্যাকলটন ৪৩ রানে ২টি উইকেট, রামাধীন ৪০ রানে ৫টি উইকেট ও আর ডোভে ২৫ রানে ৩টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ:—প্রথম ইনিংস্—২২৩ রান (কেন গ্রিভস্ ৬৫ রান, স্যাকলটন ৪৩ রান, স্টিফেনসন নট আউট ২৮ রান, এমস্ ১৫ রান, ওরেল ১৩ রান, সাটক্লিফ ১৩ রান; এইচ্ গাইকোয়াড় ৭৫ রানে ৫টি উইকেট, সি টি সারভাতে ৭৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন)

হোলকার:—দ্বিতীয় ইনিংস্—(৪ উইকেটে) ২৯৭ রান (নিভসরকার ২১ রান, মুস্তাক আলী ৭২ রান, রঙ্গনেকার ৭৮ রান, সারভাতে নট আউট ৪৮ রান, এস্ জাগদেল নট আউট ৫৩ রান; ওরেল ৪০ রানে ১টি উইকেট, রামাধীন ১০০ রানে ১টি উইকেট, ট্রাইব ৬০ রানে ১টি উইকেট লাভ করেন)

কমনওয়েলথ:—দ্বিতীয় ইনিংস্—(২ উইকেটে) ১৫৭ রান (ইকিন নট আউট ৭৬ রান, ওরেল ৬৮ রান, গাইকোয়াড় ৪৯ রানে ১টি উইকেট ও এস্ সুলে ০ রানে ১টি উইকেট লাভ করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৪ঠা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে প্রধানতঃ "কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্ট" গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সদস্যদের অধিকাংশই ফ্রণ্ট গঠন অনুমোদন না করার পক্ষপাতী।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের প্রধান সচিব শ্রী এস এন রায় ঘোষণা করেন যে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুসারে উদ্বাস্তুগণের নিজ নিজ স্থাবর সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পাইতে ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯৫০) মধ্যে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে বলিয়া যে সময় নির্দিষ্ট ছিল, তাহার মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ (১৯৫১) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের দূরপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ স্যার ই ডেনিং ও ভারতস্থিত বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ এফ রবার্টস অদ্য বিমানযোগে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর গৌচর বিমানঘাটিতে পৌঁছিলে সমবেত প্রায় ২৫ হাজার নেপালী নরনারী রাণা শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

৫ই ডিসেম্বর—শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানে দেশে গভীর শোকের ছায়াপাত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ধানে শোক প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগতের এই সংকট মুহূর্তে তাঁহার তিরোধানকে শান্তিকামী জগতের দুর্দৈব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারত ও সিকিমের মধ্যে অদ্য একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী সিকিম ভারতের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকিবে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার থাকিবে। পররাষ্ট্রের সহিত সিকিমের সম্পর্ক এবং সিকিমের সামরিক রক্ষাব্যবস্থা ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে হাওড়া-হুগলী মিউনিসিপ্যাল মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী হইতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ছয়জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের পর অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—অদ্য পার্লামেণ্টে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু শান্তিপূর্ণ মনোভাব ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার দ্বারা বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিতে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন প্রমুখ বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের নিকট আন্তরিক আবেদন জানান।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এই বলিয়া নেপাল সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন যে, নেপালের সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে সমাধান না করিয়া জের টানিয়া চলিতে দিলে নেপালের পক্ষে ভাল হইবে না। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন—"আমরা নেপালে বৈদেশিক প্রভাব প্রসার লাভ করিতে দিব না।"

পণ্ডিচেরীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের মরদেহ সমাধিস্থ করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের দেহ দিব্যজ্যোতিঃ দ্বারা এরূপ সমুদ্ভাসিত যে, তাহাতে বিকৃতির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

৭ই ডিসেম্বর—পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিতর্কের জবাবদান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন, বিগতকালে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার বা স্বৈরাচারী ক্ষমতা যাহাই থাকুক না কেন, তিব্বতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র তিব্বতের অধিবাসীদের রহিয়াছে। ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়া শ্রীনেহরু বলেন,—"কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিকট আমার বা আমার দেশের বিচারবুদ্ধি সঁপিয়া দিতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নাই।"

পণ্ডিচেরীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীঅরবিন্দের মরদেহ দিব্যজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া এখনও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। অদ্য প্রাতে শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তরের প্রায় ৫৪ ঘণ্টা পরে তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁহার দেহ পরীক্ষা করেন। দেহ আদৌ বিকৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

৮ই ডিসেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে নেপালের দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল কৈসার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল বিজয় নেপালের রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম সাহ দেওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

পণ্ডিচেরীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অর্থসচিব আজ সকালে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত শ্রীঅরবিন্দের দেহ আপাততঃ আর কাহাকেও দর্শন করিতে দেওয়া হইবে না। আজ সকালেও দেহটি অবিকৃত আছে, জীবনদীপ নির্বাণের ৮০ ঘণ্টা পরও কোনও প্রকার বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয় নাই।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীকিশোরীমোহন ত্রিপাঠীর এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলেন যে, ১৯৫০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাকেয়া আয় করের পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকা; তন্মধ্যে ২৩ কোটি টাকা অবিলম্বে আদায় করা যাইবে।

৯ই ডিসেম্বর—অদ্য অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় পণ্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

নয়াদিল্লীতে নেপাল সরকারের প্রতিনিধি জেনারেল কৈশের সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা ও জেনারেল বিজয় সমসের এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে আলোচনা গত ২৮শে নভেম্বর আরম্ভ হইয়াছিল, সেই আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। নেপালের রাজাকে স্বীকার করা এবং নেপালে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত সরকার তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক সংঘের শ্রীযুত মতিলাল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১০ই ডিসেম্বর—অদ্য সন্ধ্যায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারকে তাঁহার ৮১তম জন্মদিবস উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী হলে উক্ত সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৫ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের অষ্টম আর্মির সৈন্যরা উত্তর কোরিয়ার ভূতপূর্ব রাজধানী পাই-অংয়ং সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই সহস্র সহস্র চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্য উক্ত নগরীতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত হইতে আরও চীনা সৈন্য কোরিয়ায় প্রবেশ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরিবেষ্টিত হইবার আশংকা থাকায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী দক্ষিণদিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

গতকল্য রাত্রে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তৃতীয় দফা সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় বৈঠকে জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে সর্বাধিনায়ক করিয়া তাঁহার নেতৃত্বে ইউরোপে ঐক্যবদ্ধ উত্তর অতলান্তিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা রচনায় মনোনিবেশ করেন।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী অদ্য রাত্রে জানাইয়াছেন যে, কোরিয়ার গণ-বাহিনী এবং চীনা স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী অদ্য পাই-অং যং মুক্ত করিয়াছে।

৭ই ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী অদ্য এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, কোরিয়া হইতে স্বেচ্ছায় সৈন্যাপসারণ করা হইবে না এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ বরদাস্ত করা হইবে না। তদুপরি তাঁহারা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কেও একই নীতি অনুসরণ সম্পর্কে একমত হইয়াছেন।

৮ই ডিসেম্বর—বিশ্বসংকট সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মিঃ এটলীর মধ্যে আলোচনার অদ্য পরিসমাপ্তি ঘটে। এই আলোচনা বৈঠক সম্বন্ধে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্গত সমস্যার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শান্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হইলে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিরুদ্ধে দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ হইয়া একযোগে দণ্ডায়মান হইবে।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, কোরিয়া রণাঙ্গনে কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা দলে দলে তাইডং নদীর মোহনা অতিক্রম করায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর পশ্চিম উপকূলে অগ্রগামী পার্শ্ব বিপন্ন হইয়াছে। অগ্রগামী চীনা কম্যুনিষ্ট দল এবং নূতন রক্ষাব্যূহে অপেক্ষমান রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর মধ্যে অদ্য কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয় নাই। রণাঙ্গনে অদ্য উদ্বেগজনক স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

৯ই ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, কোরিয়া যুদ্ধে চীনা কম্যুনিষ্টদের হস্তক্ষেপের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্পর্কে সাধারণ কার্যনীতি উদ্ভাবন করিতে ট্রুম্যান-এটলী সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে।

কোরিয়ায় উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

১০ই ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, দূরপ্রাচ্যের নীতি সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত গুরুতর মতভেদ ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অদ্য নূতন করিয়া দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৬নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ। শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 23rd December, 1950. ৮ম সংখ্যা

মহাপ্রয়াণ

দুর্যোগের ঝঞ্ঝা-তাড়নকে প্রতিহত করিয়া নরনারীগণ জগতে যুগে যুগে মহত্বে সিদ্ধির জন্য দুর্গম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে আমরা ইহাদের জীবনের প্রবল প্রাণধর্মের উচ্চ বিকাশের পরিচয় পাই। দুর্দৈবের সরণী-পথে তাঁহাদের শক্তির উন্মদ-লীলার আড়ম্বর আমাদের দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দেয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই শ্রেণীর শক্তিধর পুরুষবর্গের অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সংকট-যাত্রার পথে যাঁহারা অভিযাত্রী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী পুরুষ। সর্দারজীর মহাপ্রয়াণে ভারতের ইতিহাসের সত্যই এক বীর্যময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে একজন বীর পুরুষকে হারাইল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সংগ্রামশীল পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যকারের যোদ্ধা। ভারতের এই লৌহমানব তরবারি লইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। শত্রুর শোণিত-ধারায় তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে সিক্তও করেন নাই। কিন্তু পশুবলে দৃপ্ত শত্রুর দল তাঁহার বীর্যবলের কাছে সন্ত্রস্ত হইয়াছে। দুর্নিবার গতিতে তাঁহার শক্তি প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিয়াছে এবং তাহাদের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে।

৭৬ বৎসর পূর্বে গুজরাটের এক অজ্ঞাত গ্রামে সর্দার প্যাটেলের জন্ম হয়। জীবনের সুখ-সম্পদকে তিনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন, বিষয়ের বন্ধনকে তিনি ছেদন করিয়াছিলেন। মহাত্মা





অন্তিম শয়নে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা কন্যা মণিবেন

গান্ধীর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরূপে বারদৌলীর কৃষক দলকে লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সর্দারজী যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, সেদিন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অহিংস সংগ্রামে অগ্নিময় আত্মদানের এক অভিনব অধ্যায় উন্মুক্ত হয়। বারদৌলীর সর্দারের দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি সেদিন আপতিত হইয়াছিল। সংশয়ীর দল সেদিন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় যে, অহিংস যে সংগ্রাম, তাহাতেও আগুন আছে। তাহার শক্তি শত্রুর সকল বলকে চূর্ণ করিবার সামর্থ্যও রাখে। সর্দারজীর দ্বারা সুপরিচালিত সে সংগ্রামের পরম ত্যাগের প্রচণ্ড মহিমায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া যায়। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন—তুচ্ছ এ জীবন, ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের ধমনীতে ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর আত্মশক্তির প্রবল প্রেরণা সর্দারজীর সাধনার বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন্ত এবং দুর্জয় হইয়া উঠে। প্রাণ দিয়া প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অসত্যের সঙ্গে কোন আপোষ নাই; অন্যায়ের সঙ্গে কোন মীমাংসা অসম্ভব। সর্দার বল্লভভাই এই সংকল্পশীলতাকে জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। ১৯৪২ সালের বিপ্লবের বীজ এইভাবে উপ্ত হয়। সৈনিকের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতাকেই সর্দারজী বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন। বৃহৎ আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গের অধিকারের উপরই ছিল তাঁহার কর্মসাধনার ভিত্তি, বিচারের উপর নয়।

চাই মানুষের অধিকার—বিচার বুঝি না। সোজাসুজি এইভাবে সত্যকে স্বীকার করাই ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বভাবধর্ম। এই ধর্ম কর্মফল সম্বন্ধে তাঁহাকে নিরপেক্ষ করিয়া তোলে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহাকে অমিত অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি প্রকৃত কর্মযোগী ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একনিষ্ঠ সেই যোগ সাধনায় আমরা সর্দারজীকে সমারূঢ় দেখিয়াছি। গীতায় উক্ত নিয়ত কর্মই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন কাব্যময়। সে জীবন ছন্দোময় এবং মাধুর্যময়। বৃহৎ আদর্শের বেদীমূলে গান্ধীজী নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা; তিনি মহামানব; তিনি সমগ্র বিশ্বের। গান্ধীজীর সর্বাগ্রগণ্য শিষ্য সর্দারজীর জীবনেও কাব্য ছিল, ছন্দ ছিল, তাঁহার জীবনেও মাধুর্য না ছিল, এমন নহে; কিন্তু প্রচণ্ড এক রৌদ্র-দীপ্ত কর্মসাধনার ঐশ্বর্যময় দীপ্তি সর্দারজীর সমগ্র জীবনকে সর্বসাধারণের পক্ষে যেন দুরধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিল। জনগণের অধিনায়ক হইয়াও তিনি যেন সাধারণ জীবন হইতে দূরে ছিলেন। কর্মীর জীবনের এমন যে বীর্যময় প্রভাব সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাকে অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য বা রূঢ়তা বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের বেদনাই বহ্নিগর্ভ এমন ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে এবং দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্যে বজ্র-জ্বালা বিকীর্ণ করিয়া তেমন ব্যক্তিত্ব জাতিকে পথ দেখাইয়া দেয়। দেশবাসীর জন্য বেদনা সর্দারজীর আত্মপ্রতীতিকে এমনই দৃঢ় এবং অনেকটা রূঢ় রূপ দিয়াছিল। সর্দার বল্লভভাইয়ের কর্ম-সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বমানবতার পরিচয় আমরা পাই না। দেশের অন্তরেই তিনি বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশকেই তিনি বড় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং দেশের সেবাতেই জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্দারজী সুদীর্ঘ কাল সাম্রাজ্যবাদী শত্রু দলের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও তাঁহার সে সাধনার বিরাম ঘটে নাই। ভারতের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অতন্দ্রিত উদ্যমে কর্ম করিয়াছেন। ভারত বিভাগ এবং তজ্জনিত উপদ্রব ও অশান্তি সর্দারজীর অন্তরকে উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্দৈবের প্রতিকার কিসে সম্ভব তিনি সেজন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং প্রতিপক্ষের অসংগত দাবী এবং অনিষ্টকর প্রচেষ্টা প্রধানত তাঁহার বলিষ্ঠ চিত্ততার ফলেই অনেকক্ষেত্রে যে ব্যর্থ হইয়াছে একথাও বলা যায়। ভারতের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যগুলির ভেদ-ব্যবধান উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে সংঘবদ্ধ করা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনন্যসাধারণ কর্ম-প্রতিভা এবং নীতি নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে সর্দারজী অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন এবং ইতিহাসে কোন দিন যাহা ঘটে নাই, ভারতকে তেমন এক মহান্ ঐক্যসূত্রে সংঘবদ্ধ করিয়া ভারতের শত্রুদলকে হতোদ্যম করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সর্দারজীর সাধনার শেষ হয় নাই। সংকট আমাদের এখনও চারিদিকে রহিয়াছে। সর্দার বল্লভভাইয়ের মত শক্ত মানুষকে হারাইয়া তাই আমরা মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। মনে হয়, সর্দারজীকে যদি আরও কিছুদিনের জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে পাইতাম, তবে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত। ভারতের লৌহ-মানবের কাছে কোন চতুরতা চলিত না। কয়েক মাস পূর্বেও সর্দারজী বলিয়াছিলেন, আমার যে সময় তাহাতে ভগবানের নাম করিয়া জীবন কাটানোই এখন আমার পক্ষে উচিত; কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। প্রকৃত কর্ম-সন্ন্যাসীর মতই সর্দারজীর এই কথা। আজ এমন একজন কর্ম-সন্ন্যাসীকে আমরা হারাইয়াছি। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। মানুষের জীবন চির-দিনের জন্য নয়; কিন্তু বৃহত্তের জন্য যে জীবন, সে জীবনের মহিমা অপরিম্লান। সর্দারজীর অপরিম্লান জীবনের আদর্শ আমাদের অগ্রগতির পথ উজ্জ্বল রাখুক, ইহাই প্রার্থনা।

সর্দারজীর শেষ বাণী

যেমন একটা জাতি দীর্ঘদিনের বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খল হইতে যখন মুক্তিলাভ করে, তখন তাহার স্বাধীনতার বিপদ বাহিরের শত্রু হইতে আসে না—আসে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হইতে। ভারতের এই সংকট-সময়ে সেই কারণেই আমাদের সতত সতর্ক ও সাবধান থাকা কর্তব্য"—দিল্লী হইতে বোম্বাই যাইবার প্রাক্কালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া এই সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেন। ইহাই সর্দারজীর শেষ বাণী। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর যোদ্ধার এই বাণীতে ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যগত যে সত্য তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই পরপদানত হইয়াছিল, বিদেশীর বাহুবীর্যের নিকট নয়। ভারতে বীর ছিল, রণনিপুণ যোদ্ধারও অভাব এদেশে ছিল না। ভারতের স্বাধীনতার শেষ পর্যায়েও এ পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহের ন্যায় বীরের আবির্ভাব ভারত-ভূমিতে ঘটে এবং হায়দার আলীর মত সমরকুশলীও এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমরোপ-করণের অভাবও কোন যুগে ভারতের ছিল না। তথাপি ভারত পরাধীনতার নাগপাশে বন্ধ হয়। কারণ, ভারতের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ভেদ ও বিরোধ এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে আদর্শবিহীন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আত্মঘাতী অনাচার এবং উপদ্রব। বস্তুত আভ্যন্তরীণ এই যে দুর্বলতা ভারত যদি ইহা হইতে মুক্ত থাকিত এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থবোধের অভাব তাহার না ঘটিত, তবে সিপাহী-বিদ্রোহের ফলেই ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়া পলাইতে হইত এবং ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইত। ভারত বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। সর্দারজীর শেষ বাণীর প্রতি আজ সমগ্র দেশের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ফলত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সংকট এখনও কাটে নাই। স্বার্থলিপ্সু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহের সংঘর্ষ-সমুত্থিত ধূম্রজালে ভারতের দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার বিপদ বৈদেশিক শত্রু হইতে দেখা দিবে না। স্বাধীন ভারতের সংগ্রাম-শক্তি সেই বিপদ রোধ করিতে সমর্থ। কিন্তু স্বাধীনতার বিপদ বিশেষ করিয়া নবলব্ধ স্বাধীনতার পক্ষে সংকট ভারতের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হইতে এখনও দেখা দিতে পারে। বস্তুত স্বাধীনতা লাভ করাই বড় কথা নয়। স্বাধী-নতা বীরভোগ্যা, দুর্বলের জন্য নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করাই বীরের ধর্ম। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং উপদলীয় মতবাদের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়া সেই বীরের ধর্ম যেন বিস্মৃত না হই। প্রকৃতপক্ষে তরবারি কোষ-বন্ধ করিবার সময় এখনও আসে নাই। সর্দারজীর আত্মদান, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অতন্দ্রিত সাধনায় সমগ্র জাতির চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ যেন সর্বদা আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল থাকে।

বল্লভভাই প্যাটেল

আজ থেকে বাইশ বছর আগে, তেইশে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের আইন সভায় গভর্নর স্যার লেস্‌লি উইলসনের বক্তৃতায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক আত্মাভিমান এবং সেই সঙ্গে ভ্রূকুটি কুটিল একটা আক্রোশের সুর একটু বেশী উগ্রভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে। স্যার লেস্‌লি বলেন:

"..... the issue is, whether the writ of His Majesty the King Emperor is to run in a portion of His Majesty's dominions, or whether the edict of some unofficial body of individuals is to be obeyed. That issue, if that is a issue, is one which Government is prepared to meet with all the power which Government possesses."

—প্রশ্ন হলো, মহামান্য সম্রাটের রাজ্যের কোন অংশ মহামান্য সম্রাটের বিধান অনুসারে চল্‌বে, না কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তির অনুশাসন মেনে চলবে? এই প্রশ্ন, যদি এটা আদৌ একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে, তবে গভর্নমেণ্টও তার সমগ্র শক্তি নিয়ে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।"

গভর্নর স্যার লেস্‌লির বক্তৃতায় যে স্থানটিকে মহামান্য সম্রাটের রাজ্যের কোন অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই স্থানটি হলো গুজরাটের একটি তালুক, নাম বারডোলি। এবং যে কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তির অনুশাসনের বিরুদ্ধে স্যার লেস্‌লি গভর্নমেণ্টের সকল শক্তি প্রয়োগের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন, সেই কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল।

গুজরাটের একটী তালুক বারডোলিতে তখন দিনের পর দিন এমন একটা ঘটনার আলোড়ন চল্‌ছিল, যার দিকে সমস্ত ভারতের জনসাধারণ প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিল। বারডৌলির সত্যাগ্রহ, কয়েক হাজার চাষীর অহিংস বিদ্রোহ! গভর্নমেণ্ট নতুন করে জমির যে জরিপ ও বন্দোবস্ত করলেন, তাতে চাষীর প্রদেয় খাজনার হার বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এবং এরকম খাজনাবৃদ্ধির কোনই সংগত কারণ ছিল না। খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বারডৌলি তালুকের প্রজাদের আবেদনে কোন ফল হলো না, গভর্নমেণ্ট নতুন করহার অনুসারেই কর আদায়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রজারা খাজনা দেওয়াই বন্ধ করলো, এবং এই খাজনা বন্ধ আন্দোলন যাঁর নেতৃত্বে আরম্ভ হলো তিনিই হলেন শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, গুজরাটেরই এক চাষী পরিবারের সংসারে যিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

বারডোলির কৃষক খাজনা দেয় না। সরকার প্রচণ্ড বিক্রমে কৃষকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে। গরু-বাছুর,

তৈজসপত্র ও ভূমি। সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়ায়। বোম্বাই হতে পাঠান গুন্ডার দল (যারা বোম্বাই পুলিশ দপ্তরের বি-সি [bad characterer] তালিকাভুক্ত এবং আইনের চক্ষে সন্দেহভাজন ব্যক্তি) আনিয়ে বারডোলির কৃষকের ঘরে ঘরে অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য নিয়োগ করা হলো। ফেরারী দস্যু সর্দারকেও পুলিশ পক্ষ থেকে সাহায্য দেওয়া হলো যাতে বারডোলির নরনারীকে আতঙ্কিত করার কাজটা সহজে নিষ্পন্ন হয়। চাষীর জমি বাজেয়াপ্ত হয়, নিলাম হয়ে যায় মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার এবং ধরপাকড় চলতে থাকে। বারডোলির বিভিন্ন সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে, পার্শী, মুসলমান, হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়ে বারডোলির বিদ্রোহের কঠিন ঐক্য বিনষ্ট করার জন্যও সরকারী চেষ্টা হয়। কিন্তু বারডোলি বিচলিত হয় না।

অহিংস সংগ্রামের এক বিরাট পরীক্ষাগার হয়ে ওঠে বারডোলি, এবং এই সংগ্রামের পুরোধা বল্লভভাই প্যাটেল। আপাতদৃষ্টিতে যে আন্দোলনকে একটি তালুকের কয়েক হাজার চাষীর খাজনা বন্ধ আন্দোলন বলে মনে হয়, সে আন্দোলন বস্তুত বৃহত্তর এবং নিগূঢ়তর এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে ভারতেরই জনচেতনার এক নতুন উদ্বোধন ও পরিণাম সৃষ্টির আন্দোলন হয়ে ওঠে।

যে চাষীকে ভীরু ও দুর্বল মনে করা হতো, সেই চাষীর চেতনায় দুর্জয় সংগ্রামী মনোভাব স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। যে চাষী মেয়ে তার গেরস্থালীর সীমার বাইরে কোন ঘটনা সম্বন্ধে কোন উৎসাহ কোনদিন দেখায়নি, সেই মেয়েও তার অভ্যস্ত সংকোচ ও কুণ্ঠা বর্জন করে 'আসামী' স্বামীকে আদালতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, এবং আদালত থেকে কারাগারে যাবার পথে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এই চেতনার অভ্যুত্থান এক বিশাল হৃদয় নির্ভীক এবং দৃঢ়সংকল্প সংগ্রামী গান্ধী-শিষ্যের নেতৃত্বে সম্ভবপর হয়েছিল, এবং তাঁকেই সমগ্র ভারত শ্রদ্ধার বশে 'সর্দার' নামে সম্বোধন করেছে।

বারডোলি যেমন ভারতীয় জাতির জাগৃতির ইতিহাসে একটি নৈতিক পরীক্ষার অধ্যায়, তেমনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বেরও পরীক্ষাগার। উত্তরকালে সমগ্র ভারত রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এবং জাতীয় সংগঠনে সর্দার বল্লভভাইয়ের যে নেতৃত্বের পরিচয় পেয়েছে, সে নেতৃত্ব-শক্তি বারডোলির ভূমিতেই প্রথম সকল নৈপুণ্য, গুণ এবং লক্ষণ নিয়ে স্ফূর্ত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। সংহতি সৃষ্টির বিস্ময়কর দক্ষতা, বিপদ ও বাধার সম্মুখে অবিচল স্থৈর্য, সংকল্পের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি এবং দুর্বার আবেগে অভীষ্টের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হওয়ার ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়—সর্দারজীর চরিত্রনিহিত এই দুর্লভ গুণাবলী বারডোলিরই দান। মহাত্মা গান্ধীর কাছে যে নীতির দীক্ষালাভ করেছিলেন বল্লভভাই, বারডোলিতে এক দুরূহ কর্মযজ্ঞের ভেতরে সেই নীতি পালনের যথার্থ যোগ্যতা ও শক্তি বল্লভভাই অর্জন করেছিলেন। বারডোলির সংগ্রাম সফল হবার পর স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা মহারুদ্র যজ্ঞ করেছিলেন, শ্রীমহাদেব দেশাই লিখিত বারডোলি সত্যাগ্রহের কাহিনীতে এই ঘটনাটিও উল্লিখিত হয়েছে। সর্দারজীর চরিত্র বারডোলির সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যে দীক্ষালাভ করেছিল, তার মধ্যে অলক্ষ্যে যেন মহারুদ্রেরই প্রেরণার কিছুটা স্পর্শ ছিল। উত্তরকালে গান্ধী শিষ্য বল্লভভাইয়ের ব্যক্তিত্ব সংগ্রামক্ষেত্রে যেভাবে প্রকাশলাভ করেছে সেটা তাঁর গুরুর ব্যক্তিত্বের প্রকাশভঙ্গীর তুলনায় কিছুটা পৃথক। সর্দারজীর চরিত্র হতে কল্যাণের শক্তি যখন সংগ্রামপরায়ণ হয়ে উঠেছে তখন সেটা একটু সুশাণিত দীপ্তি নিয়েই ফুটে উঠেছে। কখনো বা প্রকাশিত হয়েছে ঝঞ্ঝার আবেগ নিয়ে, যা সম্মুখের সব বাধা দুর্বলতা ও প্রত্যাঘাতকে উৎখাত ক'রে চলে যেতে চেয়েছে। গান্ধী এবং গান্ধী-শিষ্য উভয়েই কল্যাণধর্মের পূজারী, তবুও দুজনের উপাসনার পদ্ধতিতে যেন একটু পার্থক্য ছিল। এ পার্থক্য আদর্শের বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নয়। গান্ধীজী তাঁর সংসার জীবনের যে স্তরে দাঁড়িয়ে মানুষকে তাঁর বাণী শুনিয়েছেন, সর্দারজী নিজেকে তার চেয়ে এক ধাপ নীচের স্তরে রেখে কর্মের আবেদন জানিয়েছেন। তাই গান্ধীজীর বাণীর এবং বল্লভভাইয়ের আবেদনের সুর একই শঙ্খের ধ্বনি থেকে উৎসারিত হলেও জনতার কানে মাঝে মাঝে দুইরকমের সুর ব'লে বোধ হয়েছে। বলা যায়, স্বরগ্রামের পার্থক্য, কিন্তু তার আবেদন মূলত এক।

সর্দারজীর নেতৃত্বের সাফল্য এবং বারডোলির সংগ্রামের জয় ভারতের জনমানসে অলক্ষ্যে আর একটি যে বিরাট ঐশ্বর্য দান করেছিল, সেটা হলো আশাবাদ বা আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা। বারডোলিতে যা সম্ভব হলো, সমগ্র ভারতে তা কেন সম্ভব হবে না? কয়েক হাজার গ্রাম্য কৃষক যদি সাম্রাজ্যিক শক্তির সকল ঔদ্ধত্য তুচ্ছ ক'রে ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী কেন তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না? যেন ভারতের অদৃষ্টের এক সুবৃহৎ ও প্রত্যাসন্ন সংগ্রামের প্রাথমিক আভাস দিয়ে এবং তার পরিণামেরও আভাস দিয়ে বারডোলির জয়ী কৃষক এক ঐতিহাসিক প্রেরণা সৃষ্টি করে দিল।

কিন্তু গান্ধীজী বারডোলির দিকে তাকিয়ে যা বুঝেছিলেন, বল্লভভাই বারডোলির শিক্ষাগার থেকে যে শিক্ষা নিয়ে প্রস্তুত হলেন এবং সমগ্র ভারতের চিত্ত বারডোলির ঘটনা থেকে যে আশাবাদের পুণ্যাভিষেক লাভ করলো, ব্রিটিশ শাসক তখনো সেটা বুঝতে পারেনি। সেটেলমেণ্ট কমিশনার মিঃ অ্যান্ডার্সন বিদ্রূপ ক'রে বললেন—

"I beseech them, to think twice, lest in marching to what they are pleased to call their Thermopylae, they do not by mistake find themselves at Panipat"

— আমি অনুরোধ করছি, তাঁরা (বারডোলির সত্যাগ্রহীরা) যেন এখনো দু'বার চিন্তা ক'রে দেখেন যে, তাঁরা কি করতে চলেছেন, এবং তার পরিণাম কি হবে। যাঁরা এই আন্দোলনকে থার্মোপাইলির সংগ্রামের মত একটা গৌরবের সংগ্রাম ব'লে রটনা করছেন তাঁরা ভুল করছেন এবং এই ভুলের পরিণামে তাঁরা একদিন দেখতে পাবেন যে, থার্মোপাইলির পরিবর্তে তাঁরা পাণিপথের অবস্থায় পড়েছেন।

কিন্তু মিঃ অ্যান্ডার্সনের এই বিদ্রূপপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হলো। সর্দার বল্লভভাইয়ের পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের সৈনিকেরা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, 'চতুর্থ পাণিপথের' যুদ্ধে বারডোলির নিরস্ত্র কৃষকেরা সাম্রাজ্যিক শক্তিকে পরাভূত করেছে। ব্রুমফিল্ড কমিটি নতুন ক'রে অনুসন্ধান করলেন, এবং বারডোলির বর্ধিত খাজনার হার রহিত করা হলো।

বারডোলির সংগ্রামের কাছে ভারতের ইতিহাস ঋণী। বার-ডোলির কৃষকের সংগ্রামই বিংশশতাব্দীর এক অসাধারণ শক্তিধর নেতাকে সকল প্রকার যোগ্যতা দিয়ে তৈরী ক'রে ভারতের অদৃষ্ট রচনার দুরূহ কর্তব্যের দীক্ষা দান করলো। বল্লভভাইও তাঁর জীবনের শ্রেয়কে এই বারডোলির ভূমিতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতের সাধারণ মানুষ সুখী ও শক্তিমান হবে—এই ছিল বল্লভ-ভাইয়ের কাম্য। এই পরম কাম্যকে কোন্ পন্থায়, কি মূল্যে দিয়ে, কতখানি ত্যাগের উপচার দিয়ে, কত ধৈর্য, চেষ্টা ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা দান করতে হবে—বারডোলির কৃষকের কুটিরে কুটিরে ঘুরে তিনি সেই সাধনারই পরীক্ষা করেছিলেন। তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—"বল্লভভাই বারডোলিতেই তার জীবনবল্লভের সাক্ষাৎ পেয়েছে।"

সর্দারজীর জীবনে কোন পুঁথিগত মতবাদের প্রকোপ পড়েনি। তাঁর কাম্য সাধ্য ও অভীষ্টকে তিনি কৃষকের সংসারে দাঁড়িয়েই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতের কোটি মূক, দুর্বল ও অবনত জনতার মধ্যে মানবসত্তার যে নিপীড়িত রূপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তারই মুক্তি



জাতির জনক ও তাঁর দুই বাহু

ও গান্ধীজির সাধনাকে করেছিলেন তাঁর জীবনের 'বল্লভ', তাঁর আদর্শ, তাঁর সম্পদ, শ্রেয় প্রেয় সব কিছু। অন্যদিকে মমত্বে পরিপূর্ণ সংসারের অধিকারী তিনি ছিলেন, কিন্তু সংসারের বাস্তবতার মধ্যে এবং রাজনীতির সহস্র ঘাত সংঘাতের মধ্যে চলতে হয়েছিল বলে তাঁকে সৈনিকের মতই কঠিন বর্ম পরিধান করতে হয়েছিল, যে বর্মে তাঁকে অনেক সময় কঠিন ও কঠোর মনে হতো।

সর্দার শেষ পর্যন্ত কাজ করতে করতেই বিদায় নিয়েছেন। স্বাধীন ভারতকে এবং ভারতের ভবিষ্যৎকে শক্তি ও কল্যাণের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার বহু ও বিবিধ উদ্যোগ তিনি আরম্ভ করেছিলেন। তার বহু উদ্যোগ সম্পূর্ণ এবং সফল হয়েছে, এবং আরও বহু উদ্যোগ অসমাপ্তই রয়ে গেছে। যজ্ঞীয় আয়োজনের মাঝখানেই অকস্মাৎ যেন অগ্নিহোত্রী বিদায় নিলেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ভিত্তি তিনি কত পরিশ্রমে এবং কি দক্ষতার সংগে দৃঢ়তর করার গুরু দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে চেষ্টার ইতিহাস সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের মত জনসাধারণের প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কিন্তু এই সংগঠনের সাধনা যে কত দুরূহ ও কঠিন, এবং সর্দারজীর প্রতিভা সে সাধনায় কী প্রবল নিষ্ঠার সংগে একে একে এবং ক্রমে ক্রমে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিল তা উপলব্ধি করাও সাধারণ জনতার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু জনতা জানুক বা না জানুক, সর্দারজীর তিন বৎসরের সংগঠন ব্রতের পুণ্যফলে ভারতের ইতিহাসই এক নূতন ভূমিকা লাভ করেছে। সর্দারজীর জীবন প্রতি ভারতীয় সেবকের কাছে সেবার আদর্শ এবং প্রতি কর্মীর কাছে কর্মযোগের উদাহরণ হয়ে থাকবে। ভারতের অতীত এবং আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সর্দার বল্লভভাইয়ের মত সাধক ও শক্তিশালী পুরুষের উদাহরণ বিরল। সর্দারজীর জীবন সাধারণ ভারতীয়ের কাছে এই প্রেরণা চিরকাল সঞ্চার করবে—যে কাজ করতে চায় তার শক্তির অভাব হয় না, এবং যে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে তার শক্তিকে কোন বিরোধীর অপশক্তি দমন করতে পারে না।

"গম হইতে সম্পূর্ণভাবে তুষ পৃথক করিবার অপূর্ব ক্ষমতা বল্লভভাইয়ের আছে। জওহরলাল বা আমার ন্যায় কল্পনাবিলাসী নহেন। মনের আবেগকে তিনি দমন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং একবার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। আপনাদের জওহরলালের নিকট হইতে ভাব আর বল্লভভাইয়ের নিকট হইতে তাহার বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে হইবে।"

—গান্ধীজী



লৌহ-মানব বল্লভভাই

ইউসুফ মেহেরালী

মহাত্মার পরে ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বল্লভভাই-ই হচ্ছেন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। তার মানে এই নয় যে, জনপ্রিয়তা অথবা বুদ্ধিবৃত্তি বা কল্পনার প্রসারের দিক থেকেও তাঁর স্থান মহাত্মাজীর পরে। তা আদৌ নয়। তাঁর জনপ্রিয়তা জওহরলালের জনপ্রিয়তার এক ভগ্নাংশও নয়, বুদ্ধি শক্তিতে তিনি রাজাগোপালাচারীর অনেক পেছনে পড়ে থাকেন এবং কল্পনাশক্তি, এমন জিনিসের কথা তিনি আদৌ শুনেছেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু ভারতে তিনিই হচ্ছেন দক্ষ সংগঠক এবং এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নির্মম। নিজের হাতে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং গড়ে তুলেছেন এমন একটা শক্তিশালী যন্ত্র যা কেবলমাত্র বহুসংখ্যক রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীকেই বিনষ্ট করেনি, একাধিকবার সুচতুর বিদেশী আমলাতন্ত্রকেও ঘায়েল করেছে, তাঁদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কান্বিত করে তুলেছে। পার্লামেণ্টারী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি কার্যত ভারতের সাতটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রধান মন্ত্রিগণ এবং অপরাপর নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্মিগণ প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন শ্রদ্ধা আর ভীতিমিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে।

তাঁর সুদীর্ঘ বাষট্টি বৎসরের জীবন হচ্ছে দুঃসাহসিক উদ্যম আর বিরামবিহীন সংঘর্ষে পূর্ণ। তিনি বিরাট বিরাট সব সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তাতে লেগে রয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বোধ হয় গান্ধীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। একাজ তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী যখন আহমেদাবাদে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করলেন তখন বল্লভভাই একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যারিস্টার। আহমেদাবাদ ক্লাবে সব আইনজীবীরা সমবেত হতেন। সেখানে মহাত্মা ছিলেন তাঁদের আনন্দের খোরাক। শান্ত শিষ্টাচার বিশিষ্ট একজন ভূতপূর্ব ব্যারিস্টার তাঁর সত্য এবং অহিংস প্রতিরোধ অস্ত্র নিয়ে বিরাট শক্তিশালী ব্রিটিশ শক্তিকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করছেন এটা তাঁদের কেমন হাস্যকর মনে হত। মহাত্মাকে নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুকে বল্লভভাই প্রাণ খুলে যোগদান করতেন। আহমেদাবাদ ক্লাবে এসে স্বীয় আদর্শ বুঝিয়ে দেবার দুঃসাহস করেছিলেন একবার মহাত্মা। সে সময় তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেই গৃহের এক কোণে বসে বল্লভভাই তাস খেলছিলেন। তাঁর ওষ্ঠে ছিল একটুকরো বিদ্রূপাত্মক হাসি।

বল্লভভাই মহাত্মা গান্ধীর দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেছেন শুনে তাঁর বহু বন্ধুই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। স্রোতের টানে চলার মত লোক তিনি নন। তাঁর অতীত এর সাক্ষ্য দেবে। অবিচলিত পদক্ষেপে এবং অত্যদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে পথ করেই তিনি সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্কুলে পড়ার সময় সব মাস্টারকেই তাঁকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে

হ'ত। প্রায়ই তাঁকে স্কুল পাল্‌টাতে হত, কারণ কোন মাস্টারই তাঁর বিদ্রোহী জীবনী-শক্তিকে দমন করতে পারতেন না। শিক্ষা শেষ করে তিনি ওকালতি আরম্ভ করলেন। ফৌজদারী মামলার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেওয়ানী আইনের জটিলতা তাঁর উৎসাহকে হিম করে দিত। খুন, ডাকাতি আর লুণ্ঠনের মামলা সমর্থনে তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পেত বেশী। শীঘ্রই তাঁর নাম বিচার-পতিদের কাছেও শংকার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁকে এড়াবার জন্যে রেসিডেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট বোরসাদ থেকে আনন্দে স্থানান্তরিত হল এবং পরে বল্লভভাই আনন্দে ওকালতি করতে আরম্ভ করলে কোর্ট আবার বোরসাদ-এ নিয়ে যাওয়া হল!

তিনি ওকালতিতে মনঃপ্রাণ অর্পণ করে-ছিলেন। বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হলে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করতে লাগলেন। স্কুলে পড়াশুনোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন কিন্তু তাতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পক্ষে এবং ওকালতি পরীক্ষার কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। তাঁর অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতা অতি সামান্য ব্যাপারের জন্য রক্ষিত থাকত। পরীক্ষার পরেই ইউরোপ পরিদর্শন করবার জন্য অপেক্ষা না করে তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হলেন। ইউরোপীয় দেশসমূহ দেখার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান নি, তা ছাড়া তাঁর এ সম্পর্কে বিশেষ কোন কৌতূহলও নেই।

গান্ধীজীর মতবাদের যাদুমন্ত্র বল্লভভাইকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে নি, মানুষটিই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে গুজরাট ছিল যেন আবদ্ধ জল। গান্ধীজীর সাহসিক এবং দৃঢ় নেতৃত্ব ঐ স্থানে আবর্ত সৃষ্টি করল। বল্লভভাই নিজে ছিলেন শক্ত মানুষ তাই মহাত্মার অফুরন্ত আত্মপ্রত্যয় তাঁর উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। গান্ধীজী যখন একটা কার্যকরী এবং সংগ্রামশীল কার্য-ক্রম রচনা করলেন বল্লভভাই তাতে যোগ দিলেন। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি গান্ধীজীকে ক্রমে ক্রমে তাঁর রুটিন মাফিক কাজ থেকে রেহাই দিতে লাগলেন এবং নিজেকে একজন অপরিহার্য সহকারী করে তুললেন। তিনি স্বীয় প্রভুর বাণী নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং এমন সব সংগঠন গড়ে তুললেন যারা কৃষকদের সংগ্রামে যোগ দিল। এর মধ্যে ১৯২৮ সালে বাদোলীতে যে কর বন্ধ আন্দোলন হয় তাই হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত। বল্লভভাইয়ের নেতৃত্বে কৃষককুল কিভাবে একটা শক্তিশালী গভর্নমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচার প্রতিরোধ করে চলেছে সমগ্র জাতি তা উৎসুক ভরে দেখছিল। পরে যখন কৃষকদের জয়লাভ হল তখন বল্লভভাই হয়ে দাঁড়ালেন সর্ব-ভারতীয় নেতা। ১৯৩০ সালে তিনি গুজরাটে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং ঐ আন্দোলনকে এমন এক স্তরে উন্নীত করেন যার ফলে বহু সরকারী চাকুরিয়া কাজ ছেড়ে ছিল। সেই আন্দোলনের আবহাওয়া এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যা শাসক আর পূর্বে কোনদিন দেখেনি। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে ধন্য হল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৯৩২ সালে যখন আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হল তখন গান্ধীজীর সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হলেন এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ দুটি বছর বিনা বিচারে আটক রইলেন।

গান্ধীর শিষ্য হলেও বহু বিষয়েই তাঁর সঙ্গে মতের অমিল ছিল। একজন বাস্তববাদী ও করিতকর্মা রাজনীতিজ্ঞ বলে তাঁর কাজের পদ্ধতিটাই ছিল সাধারণত পৃথক্‌। তিনি ছিলেন গোঁড়া স্বভাবের লোক। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না। গান্ধীজী তাঁর দর্শনের ভিত্তি করেছেন গীতার শিক্ষাকে এবং এমন কি ঐ পুস্তকটির উপর একখানি ভাষ্যও রচনা করেছেন তিনি, কিন্তু বল্লভভাই গীতাই পড়েন নি। গান্ধীজী সত্যের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অতিমাত্রায় কিন্তু বল্লভভাইয়ের লক্ষ্য হল প্রধানত জাগতিক। সংগঠন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। তিনি চান দ্বিধাহীন আজ্ঞানুবর্তিতা। তাঁর প্রকৃতি হল কোন প্রতিকূলাচরণ অথবা অপরের স্বাধীন চিন্তা সহ্য করতে না পারা। হয় তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে তাঁর যন্ত্রে যুক্ত হতে হবে অথবা ভিন্ন মত হয়ে ধ্বংস হতে হবে। তিনি নির্মমভাবে কিন্তু কৌশলে বিরুদ্ধবাদীদের তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দিতেন।

বল্লভভাইয়ের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়েছে। গান্ধী নীতি ছাড়া তাঁর জীবন দর্শন হচ্ছে একান্তভাবে প্রায়োগিক। কোন বিষয়ের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে তিনি সচরাচর মাথা ঘামান না। তিনি প্রধানত প্রক্রিয়াত্মক কর্ম সম্বন্ধেই উৎসাহী। কাজ করাবার জন্যে তিনি একটা পন্থা বের করেছেন, সেটা হচ্ছে একটি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত দল, যার সর্বেসর্বা হচ্ছেন তিনি নিজে।

তিনি হচ্ছেন নীরস সরলতার প্রতিমূর্তি। অর্থ ব্যাপারে তাঁর আসক্তি খুবই কম ছিল। দেশের স্বার্থে তিনি নিজের সব কিছু দান করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন অর্থই শক্তি। যে সব পুঁজিবাদীরা তাঁর চারদিকে ভীড় করে থাকে তাদের সম্বন্ধে তাঁর কোন ভ্রান্তি নেই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, কংগ্রেসের বাইরে থাকলে এরা যত গোলমাল করতে পারে ভিতরে থাকলে তা পারবে না। তিনি ওদের মূল্য জানেন। তাই ওদের যথোচিত মূল্য দিতে তিনি কার্পণ্য করেন না। তাঁর কোন স্বচ্ছ সামাজিক দর্শন নেই। জনগণের প্রতি তাঁর আছে রাজনীতিজ্ঞের ঘৃণা। অবশ্য গান্ধীর সংস্পর্শে আসার পর ঐ মনোভাব কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি।

গান্ধীর সহযোগীদের কেউ কেউ তাঁর গঠনমূলক কর্মপন্থা, যাতে আছে মদ্যপান নিবারণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খদ্দর প্রচার প্রভৃতি, নিয়ে এগিয়ে যেতে পছন্দ করেন কিন্তু বল্লভভাই তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চিত রেখেছেন রাজনৈতিক ব্যাপারের জন্য। গান্ধীজী একবার কার্যসূচী রচনা করে দিলেই হয়, বল্লভভাই তা কার্যে রূপান্তরিত করতে নিয়োগ করেন সর্ব-শক্তি। গান্ধী যখন আইন পরিষদ বয়কটের পক্ষে অভিমত দিলেন তখন বল্লভভাই তা নিয়ে দাশ, জ্যেষ্ঠ নেহেরু ও তাঁর ভাই বিঠলভাই প্যাটেলের বিরুদ্ধে অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। আবার গান্ধীজী যখন আইন পরিষদে প্রবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন তখন বল্লভভাই ভার নিলেন পার্লা-মেণ্টারী কাজের এবং অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে এই নূতন পরীক্ষার কাজ চালিয়ে গেলেন।

অপরিচয়ের অন্ধকার রাজ্য থেকে কঠিন পথ অতিক্রম করে এসে বল্লভভাই যশঃগৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর পারিবারিক ইতিহাস থেকে ওঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গুজরাটের কৈরা জেলায় তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ও জেলাটা রবিন হুড-এর ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। ওঁর পিতা সেই ঐতিহ্যেরই একজন আদর্শ প্রতিনিধি। ১৮৫৭ সালে যখন মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হল তখন ওঁর পিতা গুজরাট থেকে রওনা হয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে।

আর একবার কোন নৃপতি তাঁর পিতাকে বন্দী করেন। তাঁকে যখন মহান্‌ ব্যক্তিটির কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি দাবা খেলায় মত্ত ছিলেন। বন্দী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোর্ডের ভাল একটা চাল বলে দেওয়ায় নৃপতির প্রশংসা অর্জন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তিও। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই প্যাটেল, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পরিচিত, আইন পরিষদের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হলে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। পরে তাঁর কারাদণ্ড হয়।

বল্লভভাই পেয়েছিলেন পিতার সাহস ও নির্ভীকতা এবং ভ্রাতার উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা।

বল্লভভাই নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীদের নেতা। কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের দমনের জন্য তিনিই নিশ্চিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর পক্ষপাতীদের হাতের প্রধান

অস্ত্র। যদিও বল্লভভাই-ই প্রধানত এই শাসন-তান্ত্রিক যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছেন এবং নিরঙ্কুশ দক্ষতা নিয়ে ওর সভাপতিত্ব করেছেন, তবু বলতে হবে তিনি নিজে কিন্তু পোষা কন্সটিটিউসনালিস্ট ছিলেন না। সন্দেহ নেই যে, বয়সের সঙ্গে তাঁর মধ্যে নরমপন্থী ভাবও এসে গেছে। আর-না-অগ্রসর-হওয়া এবং যা জয় করা হয়েছে তাকে সংহত ইচ্ছা তাঁর জেগেছে। কিন্তু সংগ্রাম তিনি ভালবাসেন এবং এটাই হচ্ছে তাঁর সহিষ্ণুতার বিশেষ গুণ। বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখনও তিনি ওকালতি করেন। একদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছিলেন। সে সময়েই তাঁর হাতে একখানা টেলিগ্রাম দেওয়া হয়। টেলিগ্রামে ছিল স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ। বল্লভভাই টেলি-গ্রামটি পড়লেন এবং তারপর আবার শান্ত কণ্ঠে সওয়াল করতে আরম্ভ করলেন, যেন কোন কিছুই ঘটে নি। টেলিগ্রামে কি যে সংবাদ ছিল তার বিন্দুমাত্রও কেউ জানতে পারল না অথবা তাঁর মনের মধ্যে কি হচ্ছে তাও কেউ জানতে পারল না। সেদিনকার মত কোর্টের কাজ শেষ হলে মাত্র সবাই জানতে পারলে সেই দুঃসংবাদ। সেই মানসিক বল এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি—তাই লোকে তাঁকে ভয়ের চক্ষে দেখে।

নেতৃত্বসুলভ গুণ তাঁর বহু। কিন্তু সেগুলি হচ্ছে সংহতিকারকের গুণ, অগ্নিময় পথে এগিয়ে চলে যে অগ্রনায়ক সে গুণ তাঁর ছিল না। সে গুণ ছিল গান্ধীজীর। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তিনি ছিলেন না, এক কদম চলাই ছিল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

Leaders of India থেকে অনূদিত।

ভারতের সর্দার

গোপাল ভৌমিক

৭৬ বৎসর বয়সে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা এবং সংগ্রামোত্তর পর্বে আমাদের জাতীয় গভর্নমেণ্টের প্রধান শক্তি-স্তম্ভ সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল তাঁর জন্ম-প্রদেশ বোম্বাই-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—এই দুঃসংবাদে সারা ভারত মর্মাহত হয়েছে। হবারই কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যাঁরা দীর্ঘ ৩০।৪০ বৎসরের সংগ্রামের ফলে ভারতকে দুঃসহ পরবশতা থেকে মুক্তি দিয়ে-ছেন—তাঁরা আজ প্রায় সকলেই প্রবীণ বয়স্ক ও কালের অমোঘ নিয়মে তাঁরা আজ সবাই এক এক করে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ভারতের অধিবাসীরা আজও তাদের প্রিয়তম নেতা গান্ধীজীর মৃত্যুর শোক ভুলতে পারেনি। সেই শোক ভুলতে না ভুলতেই আবার তারা নতুন শোকের সম্মুখীন হল—এবার যিনি বিদায় নিয়ে গেলেন তিনি ছিলেন একদিক থেকে গান্ধীজীর সবচেয়ে বেশি প্রিয় শিষ্য এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক।

আমাদের দেশে যাকে পরিণত বয়সে মৃত্যু বলে সর্দার প্যাটেলের সেই মৃত্যু হয়েছে। তবু তাঁর মৃত্যু শোচনীয় এইজন্যে যে, পঙ্গু, অথর্ব বা কর্মশক্তিহীন হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। ইংরেজীতে যাকে বলে 'dying in harness'—এ মৃত্যু হল সেই মৃত্যু—বীরের মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেশকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি, কর্মক্ষমতা ও আন্তরিক আনুগত্য দিয়েছেন। এখন মনে হয় যে, দেশ স্বাধীন হবার পর গত তিন বৎসর একক স্কন্ধে তিনি যে গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন সে গুরুদায়িত্ব বহন করতে না হলে এত শীঘ্র হয়তো তাঁর জীবনাবসান হত না। নিজের কর্মনিষ্ঠা ও আনুগত্যের দ্বারা গান্ধীজীর বিশ্বস্ত শিষ্যরূপে পরিগণিত হবার পর থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রায় পূর্ণ দায়িত্বই ন্যস্ত ছিল তাঁর সুযোগ্য হস্তে। এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মীপুরুষের উপর গান্ধীজী কি পরিমাণ নির্ভর করতেন—নীচের ঘটনা থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সর্দার প্যাটেল প্রথম কারাবাস করেন। এই সময় জন-সভায় বক্তৃতাদি দেওয়া সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেই আদেশ অমান্য করে তিনি ধরা পড়েন ও তাঁর তিন মাস কারাদণ্ড হয়। এই সংবাদ গান্ধীজীর কানে পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন ঃ "গভর্নমেণ্ট আমার বাহু দুইটি কেটে নিয়ে গেছেন।" গান্ধীজীর এই একটি-মাত্র উক্তির মধ্যেই সর্দার প্যাটেলের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের গুরুদায়িত্ব ছাড়াও দেশ-শাসনের একটা বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর কাঁধে। তিনি হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব এবং এই পদটির দায়িত্ব যে কি অপরিসীম সে কথা না বললেও চলে। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষ যে দুর্দৈব ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে গেছে, সর্দার প্যাটেলের শক্তিশালী হাতে ভারতের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব না থাকলে সে দুর্দৈব ও বিশৃঙ্খলা হয়তো ভারতকে গ্রাস করেই ফেলত। ভারতের মত দেশের স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের কাজ নিয়ে যেখানে যে কোন লোকের হিমসিম খাওয়ার কথা সেখানে সর্দার প্যাটেল এই দপ্তরটি ছাড়াও আরও দুটি দপ্তরের কাজ একা হাতে চালিয়ে গেছেন। এই দুটি দপ্তরের একটি হল বেতার ও তথ্য এবং অপরটি হল দেশীয় রাজ্য-দপ্তর। শেষোক্ত দপ্তরের অধিনায়করূপে তিনি ভারতের পাঁচ-শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে কার্যতঃ অবলুপ্ত করে যে ঐক্যবদ্ধ নবভারত গড়ে তুলেছেন—ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিনা রক্তপাতে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব, সর্দার প্যাটেলের আগে একথা এমনভাবে কেউ প্রমাণিত করতে পারেনি। কূটনীতিজ্ঞ সর্দার প্যাটেলকে তাই কেউ কেউ বিশ্ববিশ্রুত জার্মান কূটনীতিবিদ্ বিস্মার্কের সঙ্গে তুলনা করেন।

এই ধরণের গুরুতর জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে সর্দারজী পরিণত বয়সে নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেবার অবকাশ পাননি। ১৯৪৯এর গোড়ায় তিনি প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তখন থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে পারলে হয়তো তিনি সুস্থ থাকতে পারতেন। কিন্তু সে বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। বরং দেশ ও জাতির দাবীতে তিনি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল খুবই খারাপ। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হল তার পরিমাপ প্রসঙ্গে 'অপূরণীয়' কথাটি প্রয়োগ করতে মন সরে না। বহু ব্যবহারের ফলে একথাটি তার প্রকৃত গুরুত্ব ও ভাবব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলেছে। এক অর্থে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মৃত্যুজনিত ক্ষতিই অপূরণীয়। ভারতের রাজনীতিতে সর্দার প্যাটেল একজনই ছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁর চেয়ে বড় নেতা বা কর্মীর সন্ধান হয়তো আমরা পেতে পারি—কিন্তু তাঁকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না কোনদিন। তাঁর অভাবে কংগ্রেসের সংগঠন-কার্য চালানোর জন্যে লোক পাওয়া যাবে, স্বরাষ্ট্র সচিব হবার মত নেতাও খুঁজে পাওয়া যাবে, বেতার ও দেশীয় রাজ্য-দপ্তরও মন্ত্রীবিহীন হয়ে থাকবে না—কিন্তু



ভারত রাষ্ট্রের দুই কর্ণধার সর্দার প্যাটেল ও শ্রীনেহেরু

একা হাতে যে নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার সংগে তিনি এতগুলি কাজ করে গেছেন, তার বিকাশ আর কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আমরা খুঁজে পাবো কি না সন্দেহ। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন তাঁর সম্পাদিত কাজের চেয়ে অনেক বেশি বড়। তাঁর রাজনৈতিক মত ও পথের সংগে অনেকেরই মতৈক্য ছিল না—কিন্তু মত ও পথের ঊর্ধ্বে তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল তাকে কেউ অশ্রদ্ধা করতে পারত না কোনদিন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

শক্তিমত্তা, বাস্তববোধ ও অপূর্ব সংগঠনী-শক্তি—সর্দার প্যাটেলের চরিত্রের এই তিনটি ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য তাঁর অনেকটা পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। গুজরাটের যে পতিদার কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন শক্তিমত্তা ও দেশপ্রেম ছিল সে পরিবারের বংশগত। তাঁর পিতা জাভের ভাই কৃষিজীবী হলেও খাঁটি কৃষক ছিলেন না—তিনি ছিলেন মোটামুটি ভূম্যধিকারী। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি স্বগ্রাম করমসাদ ছেড়ে উত্তর দিকে বহুদূরে হেঁটে গিয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানের জন্যে। এই ঘটনার মধ্যে দেশপ্রেম, নির্ভীকতা ও শক্তিমত্তার যে পরিচয় দেখি পরবর্তীকালে সর্দার প্যাটেলের চরিত্রে আমরা দেখেছি তারই পূর্ণ প্রস্ফুটন। তাঁর জীবনে স্বদেশপ্রেমের বিকাশ ঘটেছিল কিঞ্চিৎ বিলম্বে ১৯১৬ সালে গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসার পর। তখন তাঁর বয়েস ৪১ বৎসর। তার পূর্ব পর্যন্ত সর্দার প্যাটেলের জীবনযাপনরীতি ছিল সাধারণ রকমের। যে স্বদেশপ্রেম তাঁর অন্তর্জীবনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল, তাকে বেগবতী স্রোতস্বতীতে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন ছিল মহাত্মা গান্ধীর সোনার কাঠির স্পর্শ। সর্দার প্যাটেলের দাদা শ্রীবিঠলভাই প্যাটেলও ভারতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ। ইংরেজ আমলে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার তিনিই প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নদিয়াদ তালুকে স্বগ্রাম করমসাদে সর্দার প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে নদিয়াদ শহরে মাতুলালয়ে সর্দারজী মানুষ হয়েছিলেন। এইখানে হাইস্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন ও ১৮৯৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ সালে তিনি ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি প্রথমে পাঁচমহলে আইন ব্যবসায় শুরু করেন, পরে কৈরা এবং তারও পরে আহমেদাবাদ শহরে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে পুরোপুরি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত আহমেদাবাদই ছিল তাঁর মূল কর্মকেন্দ্র। পাতিদারের সমাজের তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে অত্যন্ত অল্প বয়সেই সর্দার প্যাটেলের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী জাভেরবা ছিলেন সর্দারজীর স্বগ্রামের তিন মাইল দূরবর্তী গণগ্রামের মেয়ে। সর্দার প্যাটেলের পুত্রকন্যা মাত্র দুজন—কন্যা মণিবেন প্যাটেল ও পুত্র দয়াভাই প্যাটেল। মণিবেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৩ সালে আর দয়াভাই জন্মেছিলেন ১৯০৫ সালে। আজীবন কুমারী থেকে মণিবেন পিতার পাশে পাশে ছায়ার মত বিচরণ করতেন। মণিবেন ছাড়া সর্দারজীকে প্রায় কল্পনাই করা যায় না—বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ দিকে। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ১৯০৮ সালে সর্দারজীর পত্নীবিয়োগ হয়।

ব্যারিস্টার বল্লভভাই

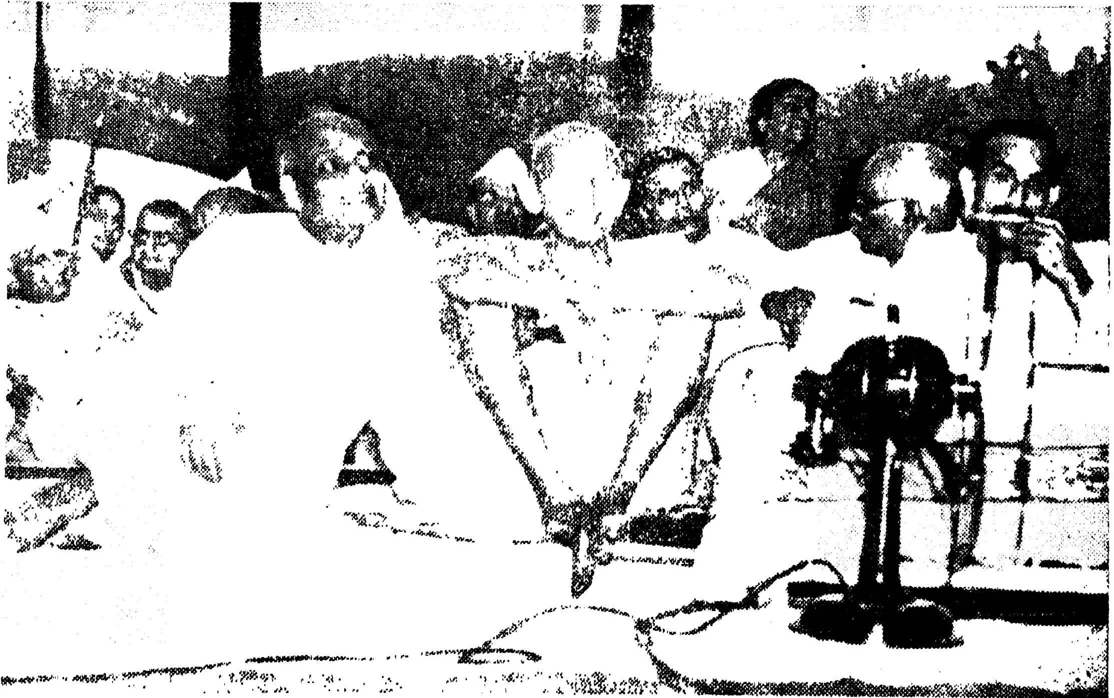
আইন ব্যবসায়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অতি সহজেই প্রচুর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থ অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ফৌজদারী মামলায় আহমেদাবাদ আদালতে তাঁর মত শক্তিমান কোন উকীল ছিলেন না। যুক্তিতর্কের বহরে প্রতিপক্ষকে তিনি নাস্তানাবুদ করে ফেলতেন। কতটা মনোযোগ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে তিনি কাজ করতেন—তার সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। ১৯০৮ সালে একটি বড় মামলায় প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে তিনি জেরা করায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ বহন করে এল তারবার্তা। তিনি তারবার্তাটির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন সত্য—কিন্তু পারিবারিক জীবনের এত বড় দুর্ঘটনা তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও কর্তব্যচ্যুত করতে পারল না। তারবার্তাটিকে সরিয়ে রেখে তিনি পূর্ববৎ জেরার কাজ করে চললেন। আদালতের কাজ শেষ না

হওয়া পর্যন্ত তাঁর পার্শ্ববর্তী উকীলবন্ধুরা জানতেও পারলেন না যে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। এমনই উদ্দাম ও ভাবপ্রবণতাবর্জিত মানুষ ছিলেন তিনি। যখন তিনি কোন কাজে মনোনিবেশ করতেন, তখন বাইরের শত বাধা-বিঘ্নও তাঁর মনে সামান্যমাত্র আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারত না। স্ত্রীবিয়োগের দুই বৎসর পরে ৩৫ বৎসর বয়সে সর্দার প্যাটেল ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ইংল্যান্ড-যাত্রা করেন। এত বয়সে তাঁর বিলাত-যাত্রার কারণ অর্থলিপ্সা কিংবা যশর্লিপ্সা নয়—এই বয়সে নিজের ব্যবসায়ে এই দুটিরই অধিকারী তিনি হয়েছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল সমব্যবসায়ীদের মধ্যে যথোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করা। তিনি চোখের উপর দেখতেন যে, যাঁরা বুদ্ধিতে ও আইনজ্ঞানে তাঁর চেয়ে অনেক ছোটো তাঁরা শুধু বিলাতী ডিগ্রীর জোরে আইনের চোখে ও আদালতের চোখে অধিক মর্যাদা পান। এই অসাম্যের ব্যবধান ঘোচানোর জন্যেই তিনি ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। মাতৃহীন ছেলেমেয়ে দুটিকে তিনি আত্মীয়দের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়নি। আইন সম্বন্ধে হাতে-কলমে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি সহজেই সহপাঠীদের উপর টেক্কা দিতে পারতেন। তার উপর ছিল একাগ্রচিত্ত অধ্যয়ন। ফলে তিনি এক বৎসর কম সময় নিয়েই ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ৫০ পাউন্ড পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে তিনি ফিরে এলেন বোম্বাই শহরে। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বেসিল স্কটের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই যথেষ্ট আলাপ ছিল। ফিরে এসে বল্লভভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। স্যার বেসিল তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন এবং তাঁকে পুরোপুরি সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, বল্লভভাই যদি বোম্বাইতে থাকেন তবে তিনি তাঁকে গভর্নমেণ্ট ল স্কুলে (ল কলেজের নাম সে সময় ল স্কুল ছিল) অধ্যাপক পদ দিতে পারেন। কিন্তু বল্লভভাই-এর চরিত্রে যশলিপ্সা তত প্রবল ছিল না বলে তিনি আহমেদাবাদ আদালতেই আইন-ব্যবসা শুরু করলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন-ব্যবসায় ছেড়ে দেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আহমেদাবাদেই খ্যাতির সঙ্গে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেল যে, বল্লভভাই বিলাতী আদব-কায়দায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরেজী আদব-কায়দায় পোষাক-পরিচ্ছদ ত তিনি করতেনই—তদুপরি ধূমপান, বাজী রেখে তাস-খেলা ও মদ্যপানেও তিনি বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েকে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে পাঠাবেন এই আশায় তিনি তাঁদের কনভেণ্টে পড়তে দিয়েছিলেন। এমন একটি মানুষের জীবনে গান্ধীবাদ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করল—সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

গান্ধীবাদে দীক্ষা

ভারতকে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সত্য ও অহিংসার আদর্শ সম্বল করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বিরাট আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে সর্দার প্যাটেলের মত একনিষ্ঠ একজন কর্মীর প্রয়োজন ছিল—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গান্ধীজী সর্দার প্যাটেলের আহমেদাবাদকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে। এত কাছে থেকেও গান্ধীজী কিন্তু সহজে সর্দার প্যাটেলের মনে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও শক্তিমন্ত্রের উপাসক বল্লভভাই গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের কর্মনীতিকে আদৌ প্রীতির চোখে দেখতেন না বরং সহকর্মীদের কাছে নানাভাবে তার নিন্দাবাদ করতেন। গান্ধীজী ১৯১৫ সালে আহমেদাবাদে সত্যাগ্রহাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন পর্যন্ত জননেতারূপে বল্লভভাইর কোন খ্যাতি ছিল না—তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল আইনজীবীদের মধ্যে



কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর পাশে সর্দার প্যাটেল

এবং আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপেও তিনি কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময় গান্ধীজী প্রায়ই গুজরাট ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন—সত্যাগ্রহের পদ্ধতি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কিন্তু বল্লভভাই প্রায়ই এসব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন না—এমন কি কাণও দিতেন না। গান্ধীজী যখন ক্লাবের অধিকবয়স্ক সদস্যদের কাছে নিজের কর্মরীতি ব্যাখ্যা করতেন—তখন তরুণ সহকর্মীদের সঙ্গে পিছন দিকে বসে বল্লভভাই আরামে ধূমপান করতেন আর তাস খেলতেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগ ঘটে ১৯১৬ সালে এবং এই সালেই তিনি গুজরাট সভার সদস্যরূপে কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে যোগ দেন। এ যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয় যখন গান্ধীজী গুজরাট সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্দার প্যাটেল গুজরাট সভার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৯১৭ সালে বিহারে নীলচাষীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে গিয়ে গান্ধীজী বাধাপ্রাপ্ত হন এবং মতিহারীতে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাঁড়িয়ে সবলকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায় নিষেধমূলক আদেশ না মেনে জেলে যাওয়াকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। গান্ধীজীর এই বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত কার্যক্রম বল্লভভাইকে অনেকটা অভিভূত করে ফেলে এবং তাঁর গান্ধীবিদ্বেষ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। অতঃপর গুজরাট সভার মাধ্যমে উভয়ের যোগাযোগ যত বাড়তে থাকে—উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কও তত বেশি করে স্থাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত বল্লভভাই গান্ধীবাদে দীক্ষা নিয়ে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুগামী হয়ে ওঠেন। তার প্রথম সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায় কৈরা সত্যাগ্রহ উপলক্ষে। এটা হল ১৯১৭-১৮ সালের কথা। গান্ধীজী এ সময় বিহারে চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। কৈরা সর্দার প্যাটেলের নিজের জেলা এবং এই জেলায় শস্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চাষীদের যে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছিল তার হাত থেকে তাদের মুক্তি দেবার জন্যেই এ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হয়েছিল। গুজরাট সভার তরফ থেকে গান্ধীজীর উপরই এ অন্যায় প্রতিকারের ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি গভর্নমেণ্টের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করেও যখন প্রতিকার করতে পারলেন না, তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সত্যাগ্রহের। গান্ধীজী বিহারে কর্মব্যস্ত ছিলেন বলে সত্যাগ্রহ পরিচালনার অধিকাংশ দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী বল্লভভাইর উপর। কৈরা সত্যাগ্রহ উপলক্ষে সর্বপ্রথম সর্দার প্যাটেলের অপূর্ব কর্মনৈপুণ্য ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখা গেল যে, হ্যাট কোট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরে তিনি দিনের পর দিন গ্রামের চাষীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তাদের কাছে পেঁছে দিচ্ছেন অহিংস সংগ্রামের মূলমন্ত্র। গান্ধীজী সময় পেলেই কৈরাতে আসতেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য উভয়কে ভালভাবে চিনবার সুযোগ পেলেন। গান্ধীজীও বল্লভভাইর নেতৃত্বে কৈরার সংগ্রামে ভারতের গণশক্তিই হয়েছিল বিজয়ী। এই ঘটনার ফলে সর্দার প্যাটেলের জীবনের গতিও গেল আমূলে পরিবর্তিত হয়ে।

অসহযোগ ও বারদৌলি সত্যাগ্রহ

সর্দার প্যাটেলের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি বোধ হয় বারদৌলির সত্যাগ্রহ। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯২৮ সালে। মাঝে যে দশ বৎসর সময়—সে সময়টা তিনি চুপ করে বসে ছিলেন না। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি ধাপে ধাপে গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন সম্মুখের দিকে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন দেওয়া দূরে থাক, ইংরেজরা আমাদের উপহার দিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, রাউলাট আইন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারত মুখর হয়ে উঠল প্রতিবাদে। পশ্চিম ভারতে এ প্রতিবাদকে একক প্রচেষ্টায় সার্থক করে তুলেছিলেন যে মানুষটি তিনি বল্লভভাই প্যাটেল। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনকেও সর্বাংশে সার্থক করে তোলার কাজে তিনি প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিলেন। প্রতিদানে কৃতজ্ঞ বোম্বাইবাসীরা তাঁকে নবগঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেছিলেন। ১৯২১ সালে আহমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রম পুরোপুরি অনুমোদিত হয়। বারদৌলির বৃহত্তর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করার পূর্বে এই সময় সর্দার প্যাটেল আরও দুটি ছোট খাটো সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে সাফল্যলাভ করেছিলেন। তার একটি সত্যাগ্রহ হয়েছিল বোরসাদ তালুক অঞ্চলে পুলিশের পিটুনী করের বিরুদ্ধে ১৯২২ সালে, আর একটি সত্যাগ্রহ হয়েছিল নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ ১৯২৩ সালে। গান্ধীজীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এ দুটি সত্যাগ্রহেরই পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং দুটিতেই অপূর্ব সংগঠন-শক্তির প্রমাণ দিয়ে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সর্বভারতীয় নেতারূপে প্যাটেলের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যে সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২২ সালে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গয়া কংগ্রেসে। গয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন বল্লভভাই প্যাটেল।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সর্দার প্যাটেলের জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের। সে হল তাঁর আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদলাভ। অসহযোগ আন্দোলনের শেষে একমাত্র নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী ছাড়া অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্যই কাউন্সিলে প্রবেশ করে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্ব দখলে মন দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই নতুন কর্মনীতি অনুযায়ী বল্লভভাই ১৯২৪ সালে অতি সহজে আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মী ও সংগঠনকারীরূপে সর্দার প্যাটেলের প্রতিভা কত উচ্চদরের ছিল—সে কথা এই চার বৎসরের আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায়। তাঁর কার্যকালে আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্যে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

১৯২৮ সালে সর্দার প্যাটেলের সংগ্রামী জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা ঘটে। সে হল বারদৌলির কৃষক বিদ্রোহ। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কৃষকদের নিয়ে ইতোপূর্বে আর এত বড় গণ-আন্দোলনের প্রয়াস করা হয়নি কোনদিন। বারদৌলির দরিদ্র নিষ্পেষিত কৃষকদের উপর গভর্নমেণ্ট বর্ধিত খাজনার ভার চাপানোতেই এই সত্যাগ্রহের উদ্ভব হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন উপায় না পেয়ে কৃষকগণ সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করে এবং সর্দার প্যাটেলকে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানায়। বোরসাদ ও নাগপুরের সাফল্যপূর্ণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্যে তাঁর খ্যাতি তখন বিপুল। প্রথমত সর্দারজী সত্যাগ্রহ থেকে গ্রামবাসীদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি সত্যাগ্রহ পরিচালনায় রাজী হন—তবে একটি সর্তে যে, এ সত্যাগ্রহের সাফল্যপূর্ণ অবসান না হওয়া পর্যন্ত গ্রামবাসিগণ প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মত সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন নীরবে সহ্য করবে—কোনরূপে হিংসাত্মক আচরণ করবে না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সর্দার প্যাটেল সত্যাগ্রহ পরিচালনার সর্ববিধ ব্যবস্থা করলেন—বহু স্বেচ্ছাসেবক তিনি তৈরী করলেন, চাষীদের উদ্বুদ্ধ করে তুললেন নতুন শক্তিতে. পুরাতন সহকর্মীদের টেনে নিয়ে এলেন কাছে। এমন কি, এই সত্যাগ্রহ উপলক্ষে একটি প্রচার বিভাগীয় দপ্তরও তিনি গড়ে তুললেন। গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রবন্ধ

লিখে সর্দার প্যাটেলের এই নতুন প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। পুরোপুরি খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করার আগে সর্দার প্যাটেল চেষ্টা করলেন বোম্বাই গভর্নমেন্টের সংগে একটা আপোষ-রফা করতে। তিনি গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, হয় তাঁরা প্রজাদের বর্ধিত খাজনা মকুব করুন, নয়তো এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যবস্থা করুন। গভর্নমেন্ট এ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আরম্ভ হল খাজনা বন্ধ আন্দোলন এবং সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে সে আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত প্রজাশক্তিই হল জয়ী। গভর্নমেন্ট প্রজাদের ন্যায়সংগত দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলেন—নিয়োগ করলেন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি। ভারতের মাটিতে আর একবার গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের সাফল্যপূর্ণ পরীক্ষা হল এবং সে অগ্নিপরীক্ষার প্রধান সেনানীরূপে সর্দার প্যাটেলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র। তাঁর নেতৃত্বের শক্তি, সাহস ও কর্মশীলতায় মুগ্ধ গান্ধীজী তাঁকে উপাধি দিলেন 'সর্দার' অর্থাৎ নেতা। তদবধি বল্লভভাই প্যাটেল সর্দার প্যাটেলরূপে সারা ভারতের কাছে পরিচিত।

কংগ্রেস সংগঠন ও কারাবরণ

১৯২৮ সালের পর থেকে সর্দার প্যাটেল-বিহীন কংগ্রেসের কথা ভাবাও যায় না। সর্ববিষয়ে তিনি হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের ভাবনায়ক মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত বিশেষ। মাঝে মহাত্মা গান্ধী, তাঁর একদিকে আদর্শবাদী জওহরলাল ও অপরদিকে কর্মবীর সর্দার প্যাটেল—এঁদের বলা চলে সংগ্রামী কংগ্রেসের ত্রিমূর্তি। ১৯৩০ সালে সর্দার প্যাটেল সর্বপ্রথম ধরা পড়েন ও কারারুদ্ধ হন। এ হল আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ—এই সময় গান্ধীজী তাঁর সুবিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহের অভিযান করেন। সর্দার প্যাটেল সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জনসভায় বক্তৃতা দিতে যেয়ে ধরা পড়েন ও তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তি পাবার পর সর্দার প্যাটেল আইন অমান্য আন্দোলনকে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটে। এই বৎসর সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালের শরৎকালে ইংল্যান্ডে যে গোলটেবিল বৈঠক বসেছিল সেই বৈঠকে ভারতের কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজীর যোগদানের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, গোলটেবিল আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হয়েছিলও কার্যত তাই এবং গান্ধীজী বিলাত থেকে ফিরে আসতে না আসতেই নতুন করে সরকারী চণ্ডনীতির আক্রমণ এসে পড়েছিল ভারতের জাতীয় জীবনের উপরে। প্রতিবাদে আবার আরম্ভ হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সর্দার প্যাটেলকে কার্যত সরকারী অবরোধেই কাটাতে হয়েছিল।

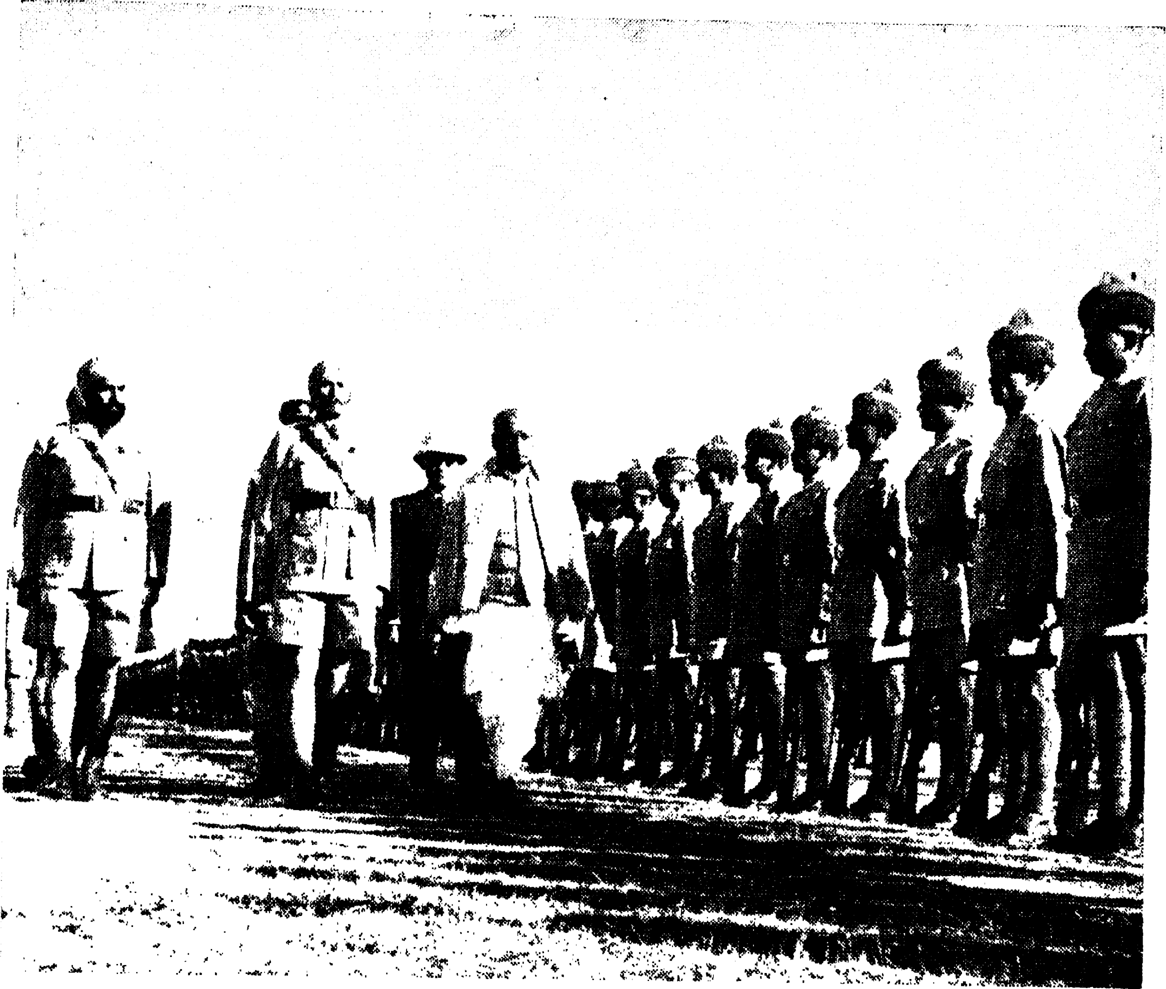
এর পরের পর্যায়ে আমরা দেখি ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে এবং নতুন শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্যে ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের যে পার্লামেন্টারী সাব-কমিটি গঠিত হয় সর্দার প্যাটেল ছিলেন তার চেয়ারম্যান। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রচুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে রাজকোট রাজ্যে শাসন সংস্কারের ব্যাপারে রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের সংগে আলাপ-আলোচনায়ও তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এইখানে কংগ্রেস সংগঠনে সর্দার প্যাটেলের আর একটি বিরাট দানের উল্লেখ না করলে তাঁর জীবনের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। সে হল কংগ্রেস আদর্শে শ্রমিক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। কৈরা সত্যাগ্রহের পরে পরেই ১৯১৮ সালে আহমেদাবাদের মিল-কর্মীরা ধর্মঘট করে এবং সে ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহাত্মা গান্ধী। এখানেও গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন সর্দার প্যাটেল। এইখানে তাঁর সংগঠনী শক্তির অপর একটি দিকের পরিচয় পাই। কঠিন পরিশ্রম করে তিনি আহমেদাবাদের দরিদ্র নিরক্ষর ও শোষিত শ্রমিকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন গঠন করেছিলো। এইটিই বোধ হয় ভারতে সর্বপ্রথম সুগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে বল্লভভাই-র এ দান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরই আদর্শে পরবর্তীকালে ভারতের সর্বত্র অজস্র ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর শেষ বয়সেও সর্দার প্যাটেল শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় প্রয়োজনে সুসংহত করার কাজে নতুন করে নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন কারাগারে ছিলেন, তখন কম্যুনিস্টরা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। কংগ্রেস ভারতে জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠন করার পর দেখা গেল যে, কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় গভর্নমেন্টের সকল কাজেই বাধা দেবার চেষ্টা করে। তখন সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণকারী শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠল একটি সর্বভারতীয় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনটিই ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ উপলক্ষে সর্দার প্যাটেল পুনরায় কারাবরণ করেন। পর বৎসর স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ তিনি মুক্তি পান। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট তিনি পুনরায় সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ধরা পড়েন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আহমেদনগর দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধশেষে ভারতের জীবনে নবযুগের সূচনা দেখা দেয়। তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় বড়লাট ওয়াভেল কর্তৃক আহূত সিমলা সম্মেলনে। এই সম্মেলনে এবং তার পরবর্তী স্তরে বৃটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতে এলে তাঁদের সঙ্গে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক আলাপ-আলোচনায় কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যরূপে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রচুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এর পরেই আমরা সর্দার প্যাটেলকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ নূতন রূপে—স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় গভর্নমেন্টের অন্যতম কর্ণধার রূপে। বর্তমানে সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করব।

শাসক রূপ

জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আনয়নে যাঁরা একদিন অগ্রণী ছিলেন, তাঁদেরই হাতে আজ এসে পড়েছে ভারত শাসনের ক্ষমতা। এই পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁরা যে প্রত্যেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এমন কথা বলা চলে না—বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর সুতীব্র ব্যতিক্রম। তিনি জীবনে পার্লামেন্টারী রাজনীতির ধার-কাছ ঘেঁসেও যান নি—বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধান মন্ত্রীরূপে জীবনের শেষভাগে তাঁর উপর এসে পড়েছিল পার্লামেন্টারী রাজনীতির ঝুঁকি। গত তিন বৎসরের স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার আলোচনা করলে দেখা যায় যে এ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিজের দপ্তরগুলি পরিচালনায় তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া তো দুষ্করই—পার্লামেন্টের উত্তর প্রত্যুত্তর দানের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অতি নিপুণ। তাঁর বক্তৃতাবলীতে তথ্য ও তত্ত্বের চমৎকার সমন্বয় তো থাকতই—তার উপর প্রয়োজন বোধে থাকত রঙ্গ-ব্যঙ্গের ছিটে ফোঁটা। ব্যঙ্গের কুটিল কশাঘাতে মাঝে মাঝে



সর্দার প্যাটেল সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

তিনি প্রতিপক্ষের সমালোচককে নাজেহাল করে দিতেন।

শাসকরূপে সর্দার প্যাটেলের কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে ভারতের মানচিত্রে আজ যে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রাপ্য হল তাঁর। পরাধীন ভারতের জাগরণের ইতিহাসে বারদৌলির সত্যাগ্রহ যেমন নতুন যুগের স্মারক হয়ে বর্তমান, তেমনই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে নবভারতের একীকরণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবন্ধ হয়ে রবে। সর্দার প্যাটেল যদি জীবনে আর কিছু না করতেন, তবে এই একটিমাত্র কৃতিত্বের জোরেই তিনি ভারত ইতিহাসের স্মরণীয়-বরেণ্য হয়ে থাকতেন। বিভক্ত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল তখন ভারতের সামনে সমস্যার অন্ত ছিল না। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা ছিল—সে সমস্যা এখনও আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল ভারতের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখা নিয়ে। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ধারক ও বাহক প্রায় ৫০০ দেশীয় রাজ্যের অবস্থিতি গণতান্ত্রিক ভারতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল তীব্রতর। তাদের দাবী ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের অন্তর্ভুক্তি ও যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ বৃটিশ স্নেহচ্ছায়ায় দীর্ঘদিন থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদানের কিংবা নিজের রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন স্পৃহাই তাঁদের ছিল না। হায়দরাবাদের মত এক আধটি দেশীয় রাজ্য আবার কল্পিত স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ভারতকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল। এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিরূপে সর্দার প্যাটেল যে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব, রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—তা নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তিনি দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে এবং প্রয়োজন বোধে ভয় দেখিয়ে সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে ভারতে যোগদান করতে বাধ্য করেছিলেন। তারপর তাদের আয় ও আয়তন ও লোকসংখ্যার অনুপাতে—এই সব দেশীয় রাজ্যকে তিনটি উপায়ে ভারতের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে যে দেশীয় রাজ্যের আয়, আয়তন ও লোকসংখ্যা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে, তাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে—তবে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের কেন্দ্ররূপে নয়, স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রদেশরূপে। ক্ষেত্র বিশেষে আবার কয়েকটি

পাশাপাশি অবস্থিত দেশীয় রাজ্যকে একত্রীভূত করে ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যের নৃপতি শুধু ভাতাভোগী নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপেই আছেন, শাসন ক্ষমতা সমস্তই প্রজাদের হাতে। যে সব দেশীয় রাজ্য একেবারেই ক্ষুদ্রায়তন তাদের নৃপতিবৃন্দকে ভাতা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যগুলিকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই-ভাবে স্বাধীন ভারতের বুক থেকে কলঙ্ক চিহ্ন স্বরূপ এই সব দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্য সর্দার প্যাটেলের। বিনা রক্তপাতে এরূপ বিরাট পরিবর্তন সম্ভব—একথা একদিন আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সর্দার প্যাটেল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিন বৎসরের মধ্যে সেই অসম্ভবকেই আমাদের জাতীয় জীবনে সম্ভব করে তুলেছেন।

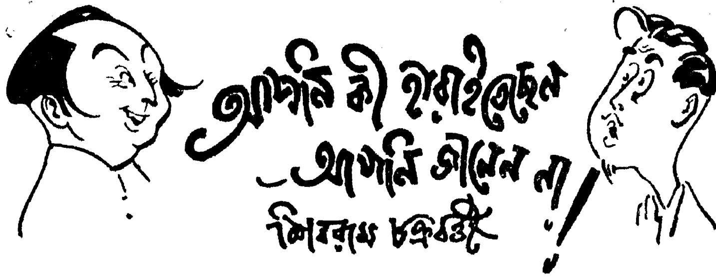
দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল হায়দরাবাদ। রাজাকর দলের প্রেরণায় নিজাম কিছুতেই ভারতে যোগদানে রাজী হন নি। শান্তির পথে, আপোষ-আলোচনার পথে হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধানের বহু প্রয়াস ভারত গভর্নমেন্ট করেছিলেন। কিন্তু নিজামের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কোন চুক্তিতেই আসা সম্ভব হয় নি। তাই বাধ্য হয়েই সর্দার প্যাটেলকে শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদে পুলিশী অভিযান করতে হয়েছিল। এর ফলে হায়দরাবাদও শেষ পর্যন্ত ভারতে যোগ দিয়েছে ও নিজাম রাজ্যে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র সচিবরূপে ভারতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে আরও একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সাধ্যানুযায়ী সমস্যাগুলির সমাধান ব্যবস্থা করে এই দৃঢ়চেতা পুরুষ নিজের কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা যারা করেছিল, তাদের মধ্যে কম্যুনিস্ট, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও মাস্টার তারা সিং পরিচালিত আকালী দলের কথা উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষার জন্যে সর্দার প্যাটেল দৃঢ়হস্তে এদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ দমন করতে আদৌ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তা যদি তিনি না পারতেন তা হলে ভারতেও হয়তো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ব্রহ্মের মতই বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হত। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম তিন বৎসর যে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে কাটতে পেরেছে তার জন্যেও আমাদের সর্বাধিক কৃতিত্ব দিতে হয় সর্দার প্যাটেলকে।

মানুষ বল্লভভাই

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কার্যকলাপের মোটামুটি বিবরণ উপরে দিলাম। কিন্তু তারও পরে একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায় মানুষ বল্লভভাই সম্বন্ধে। ভাবী দিনের মানুষে হয়তো এই প্রশ্নের আলোকেই সর্দার প্যাটেলের চরিত্র বিচার করে দেখতে চাইবে। জনসমাজে বল্লভভাই 'লৌহমানবরূপে' প্রকীর্তিত। সাধারণ মানুষের ধারণা যে তার মনে ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসের কোন বালাই ছিল না। মনে তাঁর যে ভাবই থাক মুখে তার প্রতিচ্ছবি পড়ত না কোনদিন। হয়তো কথাটার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে। তার জীবনের একাধিক ঘটনা সেই পথেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু এর সর্বাংশ কখনও সত্য হতে পারে না। তা যদি হত তবে গান্ধীজীর মত মানবতার পূজারী সর্দার প্যাটেলকে শিষ্যরূপে পেয়ে গৌরব বোধ করতেন না। সর্দার প্যাটেলের যাঁরা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁরাও বলেন যে বাইরের কঠিন আবরণের নীচে সর্দারজীর মন ছিল অত্যন্ত কোমল, স্নেহশীল ও বন্ধুবৎসল। তবে যাকে আমরা হৃদয়াবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাস বলি তার অস্তিত্ব তাঁর চরিত্রে ছিল না। বজ্র-কঠিন ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সংকল্প। একবার যা কিছু তিনি করবেন বলে স্থির করতেন তার থেকে তাঁকে টলানো বড় একটা সহজ ছিল না। কর্তব্যের পথে স্নেহ বা দয়ামায়ার কোন স্থান ছিল না তাঁর কাছে। অনেকে বলেন, তিনি সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। একথাটা আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। ভেবে চিন্তে যে কর্মপদ্ধতি তিনি স্থির করতেন, অপরের সমালোচনা শুনে তার আমূল পরিবর্তন করতে তিনি রাজী না হলেও অংশ বিশেষ অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতেন—এরূপ নজির দুর্লভ নয়। দেশকে এবং জাতিকে তিনি ব্যক্তিগত বাদ বিসম্বাদের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। এর জন্যে প্রয়োজন হলে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। আবার দেশ বা জাতির জন্যে আত্মত্যাগ করতে তিনি যে আদৌ কুণ্ঠিত ছিলেন না—তার প্রমাণ পাই স্বাধীন ভারতে তাঁর আচরণ দেখে। আমাদের জাতীয় গবর্ণমেন্টের যাঁরা অধিনায়ক তাঁদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রবীণতম। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অপেক্ষা তিনি ছিলেন ১৫ বছরের বড়। ইচ্ছা করলে সর্দার প্যাটেলই ভারতের প্রধান মন্ত্রী হতে পারতেন এবং বয়সের বিচারে এ পদ তাঁরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, ভারতের জাগ্রত জন-সমাজের কাছে তাঁর চেয়ে জওহরলালের ব্যক্তিত্বের আবেদন অনেক বেশী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জওহরলালের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁর তুলনায় অনেক বেশী। ভারতের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাই তিনি বিনা দ্বিধায় জওহরলালের নেতৃত্ব মেনে দেশের সেবা করে গেছেন। ভিতরে বড় ধরণের কোন আদর্শবাদ না থাকলে এ স্বার্থত্যাগ কয়জন লোক করতে পারে?

পুরুষোচিত দৃঢ়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম-নিষ্ঠা সর্দার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল একথা আগেই বলেছি। বিদ্যাবত্তা তাঁর বেশী ছিল না এবং বিদ্যাবত্তার বড়াইও তাঁর ছিল না। পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার দিক থেকে মৌলানা আজাদ বা জওহরলালের কাছে তাঁর চরিত্র তাই অনেকাংশে নিষ্প্রভ। তাঁর চেয়ে অনেক বড় বক্তাও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে সর্দার প্যাটেলের মধ্যে যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল আধুনিক ভারতে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মধ্যে একটা সহজাত নেতৃত্ব ছিল এবং সে নেতৃত্বকে সহজে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না কারও। তিনি যে কথা বলতেন, তার মধ্যে প্রায়ই উপমা তুলনার কোন চটকদার বাহার থাকত না। তবু সে কথাগুলির পিছনে এমন একটা শক্তি থাকত, যে শক্তি ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। তিনি মাঝে মাঝে রঙ্গ-ব্যঙ্গের আশ্রয় নিতেন না এমন নয়—তবে সে রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যেও বল্লভ-ভাই-এর পুরুষোচিত দৃঢ়তার সন্ধান পাওয়া যেত। ঘরে এবং বাইরে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে আজ ভারতকে এগুতে হচ্ছে। এই অবস্থায় সর্দার প্যাটেলের ন্যায় বিরাট ব্যক্তির অভাবে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর কর্তব্য ও দায়িত্ব যে শতগুণে বেড়ে গেল —একথা বলার অবকাশ রাখে না। অনেকের ধারণা যে মন্ত্রীসভায় জওহরলালের সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের প্রায়ই বিরোধ লেগে থাকত। একথা মূলতঃ সত্য নয়। বহু বিষয়ে এই দুই-জন জননেতার ব্যক্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতানৈক্য হওয়া শুধু সম্ভব নয়—স্বাভাবিক। কিন্তু তার ফলে ভারতের জাতীয় গবর্ণমেন্টের সংঘবদ্ধ কার্যক্রম আদৌ ব্যাহত হয়নি। এক হিসাবে এঁদের ব্যক্তিত্ব যেমন পরস্পরবিরোধী ছিল, তেমনই অন্যদিক থেকে এঁদের ব্যক্তিত্ব আবার ছিল পরস্পরের পরিপূরক। সর্দার প্যাটেলকে নিয়েই জওহরলাল ছিলেন পূর্ণাঙ্গ। সর্দার প্যাটেলের অভাব জওহরলাল পূরণ করতে পারবেন কিনা—এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপরে ভাবী ভারতের ইতিহাস বহুলাংশে নির্ভর করবে।



ঢাকায় আমাদের সব কিছুই খোলা-খুলি। এমন কি, ঐ খুন-খারাপিও। তো সেদিন, ছোটখাট একটা দাঙ্গা হয়ে সকলের চোখের সামনেই। কোন ঢাক্ গুড় গুড় নেই।

দরকার, আমার এই কাহিনীটা নোয়াকং ঘটনার আগেকার। কিম্বা, নোয়াকং কাহিনীর আগের দুর্ঘটনা—বলা যায়।)

আমি ঢাকায় তখন।

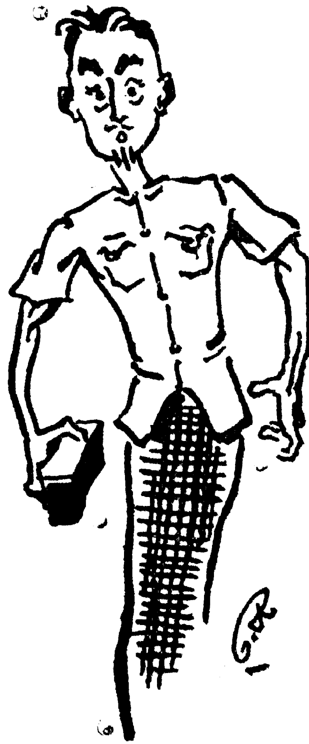
কোন কাজ না থাকলে দাঙ্গা ই এখানকার ফ্যাসান। সেই সনাতন খুড়োর গঙ্গাযাত্রার। তবে স্মরণ পরের খুড়োর—নিজের চাচার নয়।

পারটা এমন কিছুই অস্বাভাবিক নয় হৈ চৈ করবার মতও না। সেকালের শহর—সাবেকী আমলের সেই ঠাট রয়েছে এখনো। কথায় কথায় ! সেকেলে নবাবী ঠাট্টা।

এব, দাঙ্গা ঘটেই। মাঝে ঘটে। তাহলেও তা নিয়ে করার মতো কিছু নেই। কেননা, দুটো দাঙ্গার মাঝামাঝি ভালোই আমাদের। দাঙ্গাতেও কাটে নেহাৎ মন্দ মতই কেটে যায়। সেই জনাই আমরা দাঙ্গা না কচু! আর, তার কাটে বেশ। দাঙ্গা করেও—(বলা উচিত,) তারপরেও আমরা চাঙ্গা থাকি। দুধ, মাছ, ডিম—ইস্‌লাম আর ইলিশ। করতে হিম্‌শিম্‌ খেতে হয়।

ছাড়া, দাঙ্গাটাকেও খাপিয়ে নেয়া যায়। অকুস্থানে না থাকলেই চলে,—লেই মিটে যায়। ঢাকাই বন্ধুরা আগে-জানিয়ে দেন—ওহে চকর্‌বর্‌তি, অমুক এ সময়ে এ পথে বেরিয়ো না। এসো মহাল্লায়। সেদিন আমাদের একটু—কী বলে গিয়ে—এই একটু হল্লা-টল্লা।

তাহলেই হয়। দয়া করে তাঁরা দিলেই বেঘোরে আর জানটা দিতে হয় এবং দেখেছি, কী নির্ভুল ওঁদের দিনক্ষণ। আর কী আশ্চর্য পাংচুয়ালিটি। যদি সকাল সাতটায় দাঙ্গা বাধার কথা থাকে, তাহলে যতই ঘনঘটা হোক না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব সেরেসুরে নাস্তার সময় সবাই



ইঁটটা ছাড়বেন, না, ছুঁড়বেন?

মজুদ। অদ্ভুত Show-শৃঙ্খলা, দাঙ্গা করেও কাউকে নাস্তানাবুদ হতে হয় না।

এখন, সেদিনের কথা বলি। বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি, খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো আবহাওয়াটা যেন কেমন! দুপাশের দোকান-পসারের ঝাঁপ ফেলা। মুসলমানী চা-খানাগুলি খোলা কেবল। একটা পাঠান পুলিস আমার পাশ দিয়ে চলে গেল গা ঘেঁষে, বাঁশের মোটা লাঠি হাতে। হাবভাবে বেশ বাস্তভাই।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরলাম। গলিটা ফাঁকা। বাসিন্দারা সব গেল কোথায়? অন্য পাড়ায় বিষয়কর্মে নাকি? শুধু এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। একমাত্র লোক গোটা গলিটায়। পরণে সিল্কের লুঙ্গি, বুশ্ সার্ট গায়, হাতে আধখানা ইঁট। আমাকে দেখে কি করবেন, তিনি ভাবতে লাগলেন।

ইঁটটা ছাড়বেন, না ছুঁড়বেন বোধ হয় এই ছিল তাঁর ভাবনা। ঠাহর পাচ্ছিলেন না ঠিক—আমাকে দেখে।

আমারও তথৈবচ। কি করবো আমিও ভেবে পাচ্ছিনে।

দুজনেই আমরা ইতস্তত করি। দুদিক দিয়ে। আমি পায়ের দিকে—তিনি হাতের দিকে। পালাবার পথ-টথ আছে কি না আমি তাকাই। ইঁটটা তাক্ করবেন কি না তাঁর সমস্যা।

'সালাম্ আলেকম্!' আমি বল্লাম। অগত্যা।

'আলেকম্ সালাম্!' তিনি হাঁপ ছেড়ে হাত নামালেন। তাঁর ইঁটসংকুল হাত।

কিন্তু তাঁকে তেমন খুশি দেখা গেল না। কেমন যেন মন-মরাই দেখলাম। মনে হলো, ইঁট না হলেও কি যেন তাঁর হাত হতে ফসকেছে।

'আপনি কি কাউকে খুঁজছিলেন?' ভদ্রতার খাতিরে শুধাতে হলো আমায়।

'আঁ—হাঁ। না, ঠিক তা নয়।......' তাঁর একটু আমতা আমতা শুনি: 'ঠিক খুঁজছি না। মানে, খুঁজছি বটে, তবে বিশেষভাবে কাউকে নয়.....মানে এই........'

'বুঝেচি। আজকের দাঙ্গাটা আপনার মাঠে মারা গেল। কাউকে মারতে পারেন নি—তাই না?'

'তাই বটে। দুপুরের খানাপিনার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এখন উঠে দেখছেন বিলকুল খতম্?'

আমার জবাবে তাঁর গলা থেকে অর্ধস্ফুট একটা অব্যয়-ধ্বনি বেরুলো। হতে পারে সেটা কোন উর্দু জবান, আমার জানা নেই।

আমি আর তাঁকে কি সান্ত্বনা দিতে পারি? একমাত্র বাস পাত্র হতে দেয়া যায়, কিন্তু তন্মাত্র প্রাণ সেই দৃষ্টান্তে দিতে যাওয়া একটু যেন মাত্রাধিক্য হয় না? তাছাড়া, বুদ্ধ-যুগের এতকাল পরে এই বুদ্ধির যুগে এসে অমন দানশীলতা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে।

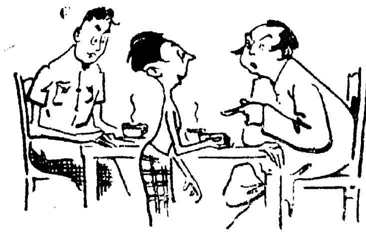
অগত্যা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলি—আমি—আমি সত্যিই ভারী দুঃখিত। কাফের হতে না

পারার জন্য লজ্জিত আমি খুবই। নইলে কখনই আমি আপনার ঐ ইঁটখানা বরবাদ হতে দিতাম না। আমার দ্বারাই আপনার বেহেস্তে যাবার পথ পরিষ্কার হতে পারতো...'

'ইয়াল্লা! বলবেন না, বলবেন না।' তিনি ডুক্‌রে উঠলেন—'ওকথা বলবেন না। খোদার কুদ্‌রতে দুজনেই আমরা বেঁচে গেছি আজ। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণই আপনার। আমি বুঝতেই পারি নি গোড়ায়। আর, কি করেই বা বুঝবো? লুংগি না পরে বাঙালীদের মতন ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছেন। যাক্‌, যেতে দিন। একটুর জন্যেই গুনাহ্‌র হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গেছে।'

'সে আপনার নিজ গুণে।' আমি বলি, তার বেশি আর কিছু বলি না। বলতে পারি না।

কিন্তু না বল্লেও, অকথিত বেদনায় আমার হৃদয় গুমরোয়। হাতে আধখানা ইঁট, দাঙ্গা-



হাতিয়ার বেহাত

হীন পাকিস্থানী—এ দৃশ্য অবর্ণনীয়। চোখ মেলে এমনটা দেখা যায় না। হতে পারেন উনি কোন আন্সার-আন্সার বাহিনীরই কেউ-কেটা হয়তো; কিন্তু ওঁকে আমার কাছে এক প্রশ্ন বলেই মনে হয়। আমার প্রশ্নের আনসার্‌ নয়!

ইঁটহস্ত দাঙ্গাভ্রষ্ট এবং হৃতবেহেস্ত এই জনাবকে আমি কোন্‌ ভাষায় সান্ত্বনা জানাবো?

'এর মধ্যেই কি সব হাঙ্গামা শেষ হয়ে গেছে?' আমি জিগেস্‌ করিঃ 'রমনার ওদিকটায় চলছে বোধ হয় এখনো? কিম্বা কুর্মিটোলার দিকে—?'

'কুর্মিটোলায় আমার কী? আমাদের কী।' উনি উস্‌কে ওঠেনঃ—'ও তো যতো গুণ্ডাদের—ছোটলোকদের ব্যাপার। পাঠানদের কাণ্ড।' মুখ বেঁকিয়ে তিনি বলেন।

'যা বলেছেন।' আমার বলতে হয়।—'আপনি বুঝি দপ্তরখানার ভদ্র দাঙ্গায় ভিড়তে চেয়েছিলেন?'

'হাঁ, হাঁ'—সায় দিলেন তিনি—'ধরেছেন ঠিক।'

'কিন্তু সে দাঙ্গা তো যদ্দুর জানি, দুটোর আগেই ফিনিশ্‌ হয়ে গেছে.....'

'আমারো তাই মালুম। ঘুমিয়েই সব মাটি করেছি আজকে।' মলিন হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

'তাহলে? তাহলে আর কী হবে? আসুন, ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্‌।' আমার আমন্ত্রণ জানাই।

ভদ্রলোককে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল সত্যিই। ভদ্রলোকেরো কম কষ্ট হচ্ছিল না। থান্‌ ইঁট হাতে না হক ঘুরে বেড়ানো কি কম হয়রানি? দেখতেও খুব সুচারু নয়।

'চলুন তাই।' ইঁটখানার হাত বদলে তিনি বল্লেন।

চাখানায় গিয়ে ঢুকলাম দুজনায়।

যেমন গেলে তেমনি কি ভীড় সেই আস্তানায়? ঝক্‌ঝকে ছোরার সংগে খাপ্‌ মেলানো চক্‌চকে চোখ চারধারেই চাকচিক্য। আর ঢাকাই বাঙলায় কথা বললে কি হয়, সকলেই তারা তৈমুরলং। ঔরংজেবের বংশধর এক একটি। মোগল কিম্বা পাঠান। কিম্বা পাঠান আর মোগলের থেকে মোঠান্‌ বাদ দিলে যা দাঁড়ায়—পাগল।

সেই মোগলোপাঠানদের মাঝখানে গিয়ে বসলাম আমরা—ওদের নাকের ডগায় সকলের।

বাচ্চাটা দু'পেয়ালা চা নিয়ে এলো।

আমি ইঁটখানা ওর হাতে দিয়ে বল্লাম—দ্যাখো হে, এটি তোমাদের মালখানায় নিয়ে মজুদ রাখো। ইঁট নয়, এটি হাতিয়ার। বুঝেছো? দেখো যেন হারায় না, কি, আর কেউ না হাতায়। হুঁশিয়ার।'

ছেলেটা দ্বিরুক্তি না করে ইঁটখানা কাঁধে নিয়ে গিয়ে জমা দিলো তার মালিকের জিম্মায়।

চা-পানের শেষে তিনি বল্লেন—চলুন, আপনার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমি না করলাম না। যে বাসায় উঠেছিলাম, সেটা আমার পাশেই। পাকিস্থানী হলেও নিরাপদ এলাকাই। তাছাড়া অনেকটা নির্বিপদে। তবুও তো বাসার কাছে গিয়ে পৌঁছোবার আগেই অধমের মাথাটায় একাধিক থান্‌ ইঁট এসে পৌঁছতে পারে তো? সেই হিসেবে, আত্মরক্ষার দায়ে যেমন রোগের টীকা নিতে হয়, তেমনি দাঙ্গার এই জ্যান্ত জীবাণুটিকে সংগে রাখলে হয়তো বা অযাচিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যায়।

'কষ্ট করে যাবেন অদ্দুর?' বলি আমি তবুও।

'না, চলুন। লুংগি পরে না বেরিয়ে যা ভুল করেছেন। মনে রাখবেন আমাদের মহমেডান স্পোর্টিংও এসব কাণ্ডে ওদের মোহনবাগানের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না... সেম্‌সাইডে গোল হয়ে যেতে পারে।'

'তা বটে।' আমি ঘাড় নাড়ি—'তা তো হতেই পারে।'

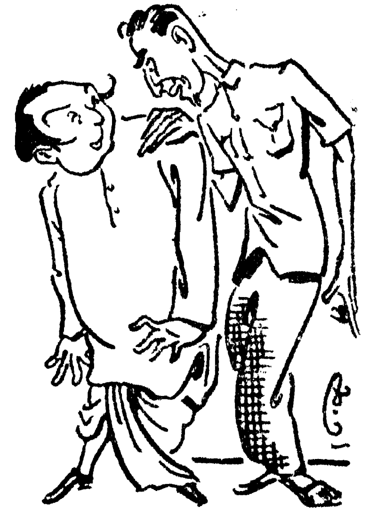
'তাছাড়া ঐ—ঐ পাঠানদের মশাই একটুও বিশ্বাস নেই.....' বলতে গিয়ে, কী ভেবে তিনি চেপে যান হঠাৎ।

'এই জন্যেই তো জনাব, আমাদের উর্দী পরা উচিত।' আমিও গায়ে পড়ে বলিঃ 'আগে উর্দী পরুন, তারপরে উর্দু পড়ুন।'

'হাঁ, ঐ উর্দুতেই সারবে আমাদের।' আর তিনি চাপেন না, চাপতে পারেন না—'উর্দু আর ঐ সিন্ধিওয়ালারাই।'

'আর হিন্দু বাঙালীকে মারবে হিন্দি-ওয়ালারা। আমাদের নসিবে সিন্ধিবাদ আর ওদের বরাতে হিন্দিবাদ।'

পাল্লার দুধারেই যে সমান ভার, সেটা



পাঠান-রাজত্বে অসন্তোষ!

আমি প্রমাণ করে দেখাতে যাই। পর্যন্ত প্রমাণ

চলতে চলতে আমাদের আলোচনা চলে। হঠাৎ তিনি আমার ঘাড়ে ঝুঁকে পড়ে বলেন—'সাচ্চা কথা বলি বেরাদর, এই পাঠান রাজ আমার ভালো লাগে না। এখন এরা হিন্দুদে ভোগাচ্ছে, তা ঠিক, কিন্তু হিন্দুরা গেলে তা পরে আমাদের ভোগাবে।'

'কী বলেন মশাই, ওদের রাজ্য হতে পারে—কিন্তু পাট? আমাদের পাট?......বাধা দি আমি বলতে যাই।—'পাট তো আমাদের মারে কে?'

'ওদের রাজ্যপাট, আর আমাদের লোপাট হিন্দু-মুসলিম কোন বাঙালীকেই ওরা নেক নজরে দ্যাখে না। ওদের মতলব, আ আমাদের দুই ভাইকে ফারাক্‌ করা, তারপরে—তারপরে ভালো করে ফাঁক করা।'

'ছি ছি, হিন্দুকে আপনি ভাই বলছেন' আমি আঁৎকে উঠিঃ 'কাফেরদের? তো তোবা।'

কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোন প্রতিধ্বনি আসে না, খুব সম্ভব লজ্জাতেই, তিনি বোবা হয়ে থাকেন।

দেখতে দেখতে এসে পড়ি নিজের এলাকায়।

আমার বাসার বরাবর এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। খুঁৎ খুঁৎ করেন কি রকম। উঁকি মারেন এদিকে ওদিকে।

'কী? কিছু হারিয়েছে নাকি আপনার?' আমি জিগেস করি।

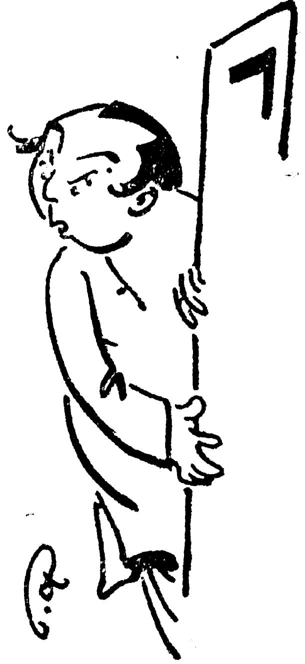
'তাই তো ভাবছি। মনে হচ্ছে কী যেন ফেলে এলাম কোথায়! বুঝতে পারছি না তো।'

'ও, সেই ইটখানা? তা সেটা তো সে ... আপনার—সেই চাখানাতেই থেকে গেল।'

'ও, তাই! তাই বটে। তাই হাত খালি খালি ঠেকছিল কেমন!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন ভদ্রলোকের 'সেই জন্যেই এমন হাল্কা হাল্কা লাগছিল। তাই বটে।'

'দেখুন ভালো করে—আর কিছু হারাননি তো আপনি?'

আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াই।



অকথিত অকথ্যতা!

'না। আর—আর কী হারাবো? আর তো কিছু সঙ্গে ছিল না আমার।' তবুও একবার তিনি পথের ওপরে চোখ বুলিয়ে নেন—'নাঃ, আবার কী হারাবো?'

'কী হারিয়েছেন বলবো? বলবো আমি?' বলতে বলতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি। বলতে গিয়েও বলি না। দরজাটা বন্ধ করে দিই ভালো করে।

বলবো বন্ধু? হারিয়েছেন আপনি বেহেস্ত। আপনার বেহেস্তের সর্টকাট্। সেই আস্মানি পাকিস্থানে পাকাপাকি আস্তানা। একমাত্র কাফেরকে মারতে পারলেই —সেই একমাত্তর পুণ্যবলেই যে বেহেস্ত, আপনার স্বহস্তে আসতে পারতো, বেহাত করেছেন আপনি তাকেই।

'আপনি কী হারিয়েছেন আপনি জানেন না।'

না-জবাই-হওয়া নিজেকেই আমি জবাব দিই।—'হায় বেরাদর, হারিয়েছেন আপনি আমাকেই।'

হ্যাঁ, আমাকেই। নিজের দোষেই তুমি হারিয়েছো দোস্ত্।

সিদ্ধান্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নীড় খুঁজে-খুঁজে ঝিমোয় প্রাণ,
দূরে দিগন্তে চোখ তুলি;
আলো যে হৃদয় ভ্রাম্যমান,
পথে যেতে ঝরা ফুলগুলি।
কোন্ তিথি আর কোন্ লগন
কোন্ নীল রাত, কোন্ হাওয়া
খোঁজ রাখে না তো মরমী মন,
যাবে না আবেগ খুঁজে পাওয়া।

পথ খুঁজি, দিশা মেলে না আর
শুধু আলেয়ার হাতছানি;
মরুদেশে নামে অন্ধকার,
যমে ও মানুষে টানাটানি।
বারুদের ঘ্রাণ প্রান্তরময়,
সূর্যের দাহ স্থলে-জলে;
আকাশের নীলে জমেছে ভয়
ছায়া কাঁপে বনে পলে-পলে।

এরি মাঝে তুমি হায়রে হায়
পথের কিনারে বেঁধেছো নীড়;
মসৃণ ঋজু শীর্ণকায়
যৌবনঘন তনুতে তীর।
আকাশের কোণে জমেছে মেঘ,
পথের কিনারে আছে যে ভয়;
তোমারো হৃদয়ে বজ্র বেগ,
সোনালী হাসিতে পৃথিবী জয়।

তুমি-ই শেখালে তাই শেষে
যতো ছলাকলা আজ মিছে;
নানা আলোড়ন দেশে-দেশে,
ক্লান্তির ছায়া নামে পিছে।
আজকে তাই তো একযোগে
মাঝপথে থামি; ফিরে তাকাই;
ফসলের মাঠ কার ভোগে
যদি চলে' যাই? করি যাচাই॥

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

নির্ভয়ে সে ময়াল সাপটার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোঝাগুলি সাজানো হইয়া গেলে সে কোমরের চর্মপেটিকা হইতে চকমকি বাহির করিয়া আগুন জ্বালিল এবং একটি খড়ের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিল। তাহার পর আর একটা স্তূপ ধরাইল। তাহার পর পা দিয়া ঠেলিয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপ দুইটি ময়াল সাপটার কাছে আগাইয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধার মুখটা প্রকাণ্ড, নাকটা খড়োর মতো, চিবুকের নীচে গলা পর্যন্ত একটা চামড়ার মতো ঝুলিতেছে। গরুদের যেমন গলকম্বল থাকে, অনেকটা তেমনি। কোনও কালে বোধ হয় চিবুকের নীচে প্রচুর চর্বি ছিল, এখন চর্বি নাই, লোলচর্মটা ঝুলিতেছে। তাহার পলিতকেশ পীতাভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরগত। দাঁত আছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা দাঁত বাহিরে প্রকট হইয়াই রহিয়াছে, ঠোঁটে ঢাকা পড়ে নাই। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। মনে হইল, সে কি যেন বলিল। বলিয়া খড়ের জ্বলন্ত স্তূপ দুইটিকে আর একটু আগাইয়া দিল। দেখিলাম ময়াল সাপ ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন শিথিল করিতেছে। বৃদ্ধা ভর্ৎসনার সুরে আবার তাহাকে কি যেন বলিল, জ্বলন্ত খড়ের স্তূপ আর একটু আগাইয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়াল সাপ হরিণটিকে ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া যাইতেছে। মৃত হরিণটা পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধা তখন মৃত হরিণকে টানিয়া আনিয়া জ্বলন্ত খড়ের স্তূপের ভিতর ফেলিয়া আরও শুকনো খড় তাহার উপর চাপাইয়া দিল। দগ্ধ হরিণ-চর্মের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম বৃদ্ধার জিহ্বাগ্র মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ময়াল সাপটা যেদিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া বৃদ্ধা মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে কি যেন বলিতেছিল, সহসা একটা গাছের দিকে চাহিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সু-উচ্চ বৃক্ষশাখায় একদল শকুনি বসিয়া রহিয়াছে। আমার এইবার ভয়-ভয় করিতে লাগিল, আশঙ্কা হইল, এ আমাকে যদি দেখিতে পায়, হয়তো......। সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। কিছুদূর গিয়া গতিবেগ দ্রুত করিয়া দিলাম। উন্মুক্ত উপত্যকায় গিয়া যখন পড়িলাম, তখন আমি ছুটিতেছি। রৌদ্রের স্বর্ণকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছিল, নির্মেঘ নীল আকাশে চক্রাকারে চিলের দল উড়িতেছিল, একটা নামহীন পাখী ডালে ডালে চীৎকার করিতেছিল, দূরে বন্য গরুর দল চরিতেছিল, পাহাড়ের সানুদেশে পাহাড়ী ছাগলেরা নামিয়া আসিয়াছিল, আমার কিন্তু এসব দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না, আমি সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। আমার আশঙ্কা হইতেছিল, শিলাঙ্গী হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিলাঙ্গীকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে যে সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহা আমি অনুভব করিতেছিলাম। ঠিক করিয়াছিলাম, তাহার নিকট কিছুই গোপন করিব না। নিনানি-সম্পর্কিত সমস্ত কথা তাহার কাছে অকপটে বলিয়া তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিব। আমার বিশ্বাস ছিল, সে সাহায্য করিবে। সে আমার বন্ধু হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই আপদে-বিপদে আমার সহায় হইবে, কখনও এমন কিছু করিবে না যাহাতে আমার অপমান বা অমঙ্গল হয়......।

...শিলাঙ্গী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিলাম, হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল!

"তুমি অত হাঁপাইতেছ কেন"—নামিয়াই প্রশ্ন করিল সে।

"ছুটিয়া আসিয়াছি।"

মনে হইল কথাটা শুনিয়া শিলাঙ্গী খুশি হইল। তাহার সরল চোখের দৃষ্টিতে আনন্দের ছটা দেখিতে পাইলাম।

"ছুটিয়া আসিয়াছ? কি দরকার ছিল।"

"আমার ভয় করিতেছিল, যদি তুমি চলিয়া যাও।"

"বাঃ, আমি যখন কথা দিয়াছি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিব, তখন কি চলিয়া যাইতে পারি? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতাম। তোমার জন্য একটা জিনিস আনিয়াছি—এই দেখ—"

শিলাঙ্গী তরতর করিয়া গাছে উঠিয়া গেল এবং একটি ছোট বাঁশের কোঁড়ে লইয়া নামিয়া আসিল।

"দুধ! খাইয়া দেখ।"

দুধ পূর্বে কখনও পান করি নাই। কোঁড়েটা মুখে তুলিয়া একটু চাখিয়া দেখিলাম প্রথম। স্বাদটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হইল, খুব ভাল লাগিল না।

"কেমন লাগিতেছে।"

"খুব ভাল নয়। কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি ফলের স্বাদ—মনে হইতেছে যেন তরল কোনও ফল"—আমি চাখিয়া চাখিয়া সন্দিগ্ধভাবে দুগ্ধপান করিতে লাগিলাম।

"শরীরের তেজ কিন্তু খুব বাড়ায়। ঝোনঝিরা প্রচুর দুধ খায় রোজ। তাই উহার গায়ে খুব জোর। ঝোনঝিরা মাংসও কম খায় না। ওটা একটা রাক্ষস। নাঃ, তুমি সবটা খাইও না, আমার জন্যও একটু রাখ। আমি আমার অংশের দুধটুকু তোমার জন্য আনিয়াছিলাম—আমাকে একটু দাও।"

আমার হাত হইতে দুধের কোঁড়েটা কাড়িয়া লইয়া বাকী দুধটুকু সে ঢক ঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

"আজ তোমার নিকট যাইবে? আজ তোমা বোধ হয় একা আছে। কারণ আসিবার সময় দেখিলাম ঝোনঝিরার দল অস্ত্রে শান দিতে বসিয়াছে।"

"আজ আমার কোথাও যাইবার উপায় নাই। সর্বপ্রথম আমাকে তুমি একটা গুহা খুঁজিয়া দাও।"

"গুহা? তার মানে! গুহা লইয়া কি করিবে?"

"নিনানিকে রাখিব।"

"সে আবার কে?"

"তাহা হইলে চল এক জায়গায় বসি। সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। কিন্তু তোমাকে শপথ করিতে হইবে যে, একথা আর কাহাকেও বলিবে না। নিনানির কাছেও না। নিনানি যেন জানিতেও না পারে যে, তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে, তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।"

"নিনানি কে?"

"চল সব বলিতেছি।"

সেই ঝোপের ধারে একটি বিস্তৃত প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া শিলাঙ্গীকে আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত কথা শুনিয়া শিলাঙ্গী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আমার মুখের উপর সরল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—"নিনানিকে তুমি বুঝি খুব ভালবাস?"

"তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না, বাসি। প্রবল দলপতির অধিকার লইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমাকেই সে বিবাহ করিত।"

"সে-ও তোমাকে খুব ভালবাসে তাহা হইলে?"

"বাসে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে কানা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তাই সে জীবনের শেষ কয়টা দিন একান্ত আমার কাছে থাকিতে চায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে তাহাকে একটা গুহা খুঁজিয়া দিব। এ প্রতিশ্রুতি আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

"তাহা না হয় করিব। একটা গুহার খবর আমি জানিও। কিন্তু আগে তুমি আমার আর একটা কথার জবাব দাও"

"বল—"

"আমাকে তুমি নিনানির নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছ কেন? তুমি তো আমাকেও ভালবাস, আমাকে দেখিয়া সে রাগ করিবে কেন?"

"নিনানি বড় হিংসুক। আমি যে আর একজনকেও ভালবাসি ইহা সে সহ্য করিতে পারে না।"

শিলাংগী সহসা উভয় বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

"আমিও হিংসুক। নিনানির উপর আমারও হিংসা হইতেছে। কিন্তু আমি কখনও তাহার অনিষ্ট করিব না, কারণ তুমি যে তাহাকে ভালবাস"

আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সে যুগে এমন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিব বলিয়া প্রত্যাশাও করি নাই। আমার পূর্বে ... জোলমার আবির্ভাবও এমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। সে-ও আমাকে ভালো বাসিয়াছিল—কেন যে বাসিয়াছিল তাহা জানি না—হয়তো বা আমার মধ্যেও এমন একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে আমি নিজে সচেতন ছিলাম না কিন্তু আমি তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, কারণ তখন সে অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব আমার কল্পনার অতীত ছিল। বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তাহাকে পাইয়াও পাই নাই। অপ্রত্যাশিতকে বুঝিতে সময় লাগে, যখন তাহাকে বোঝা যায় তখন সে আয়ত্তাতীত হইয়া যায়। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনুষ্যত্ব জন্ম-জন্মান্তরে জোলমাকেই কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। আজ এতদূরের ব্যবধানে সেই প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে আজও আমি অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত আছি। আমি জোলমাকে নানারূপে বারম্বার পাইয়াছি এবং হারাইয়াছি। শিলাংগীর মধ্যেই জোলমা ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার মুখে এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক উক্তি শুনিয়া আমি অভিভূত চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার সন্দেহও হইল তাহার এ যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য কি না। প্রথম দর্শনে তাহার সম্বন্ধে যে কথা মনে হইয়াছিল আবার সে কথা মনে হইল। সত্যই এ মানবী তো, না কোনও উপদেবতা আমার সহিত ছলনা করিতেছে। কিন্তু আমার সমস্ত বিস্ময়, সন্দেহ ভয়কে ছাপাইয়া একটা অপূর্ব আনন্দ আমার অন্তরে উথলিয়া উঠিল। আমার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব যেন ক্ষণিকের জন্য শিলাংগীকে চিনিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, আমি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া শিলাংগী প্রশ্ন করিল, "তোমার নিনানি দেখিতে কেমন?"

"তুমি তাহাকে দেখিয়াছ। কাল রাত্রে তুমি যে মেয়েটিকে লতা দিয়াছিলে সেই নিনানি।"

"সেই নিনানি!"

শিলাংগী তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হাঁ, সেই নিনানি। অমন করিয়া উঠিলে যে!"

"সে তো অপরূপ সুন্দরী। আমি তো প্রথমে তাহাকে জ্যোৎস্না-পরী ভাবিয়াছিলাম। আমাদের কথক মিনাহা বলে জ্যোৎস্না-পরীরা গভীর রাত্রে পৃথিবীতে ফুলের মধু খাইবার জন্য আসে। আমি ভাবিয়াছিলাম মধু খাইবার লোভেই কোনও জ্যোৎস্নাপরী বোধহয় মহুয়া বনে আসিয়াছে। কিন্তু সে যখন আগাইয়া আসিয়া লতার খোঁজ করিল তখন অবাক হইয়া দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। তাহার সহিত আলাপ করিয়াও বড় ভাল লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল বাঘের কথা, আমার কাছে যে লতা ছিল তাহারই খানিকটা অংশ দিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। নিনানি তো চমৎকার মেয়ে। আমার সেই লতা দিয়াই তাহার মাথার আবরণ প্রস্তুত করিয়াছ?"

"হাঁ"

শিলাংগীর মুখভাবে আবার বিমর্ষতা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "নিনানিকে যখন তুমি ভালবাস তখন কি আর আমাকে তোমার ভাল লাগিবে"

"নিশ্চয় লাগিবে। তুমি নিনানি নও, কিন্তু তুমিও অপরূপ"—আমার আবেগপূর্ণ এই কথাগুলি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিলাংগী শুনিল। মনে হইল সে যেন বিস্ময়কর কিছু একটা শুনিতেছে। তাহার পর সহসা আবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হইল।

"নিনানির সহিত আমার আলাপ করিয়া দাও"

"না, তাহা নিরাপদ নয়। নিনানি বড় হিংসুক, বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ। হয়তো তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে। তাছাড়া সে তো আর বেশীদিন বাঁচিবেও না। যে কয়টা দিন বাঁচে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি। তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে জানিতে পারিলে সে কষ্ট পাইবে। তাহার জন্য একটা গুহা দেখিয়া দাও। খালি গুহা আছে কি কোথাও?"

"আছে। উপত্যকার পরপারে পঞ্চপর্বতে যক্ষিণী বুড়ির দখলে কয়েকটা খালি গুহা আছে। বুড়ি আমাকে ভালবাসে খুব। আমি যদি বলি একটা গুহা দিতে পারে—"

পঞ্চ-পর্বতে আমার অভিযানের কথা তখনও শিলাংগীকে আমি বলি নাই। শিলাংগীর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শিলাংগী ওই বৃদ্ধাকে চেনে না কি!

"গুহার খোঁজে আমিও পঞ্চ পর্বতের দিকে গিয়াছিলাম। যক্ষিণী বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। বড় অদ্ভুত মনে হইল। একটা ময়াল সাপ হরিণ ধরিয়াছিল—"

"ও ময়াল সাপটাকেও তুমি দেখিয়াছ। ওটা ওর পোষা ময়াল সাপ। আমরা যেমন কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরি যক্ষিণী তেমনি ময়াল সাপের সাহায্যে শিকার ধরে। ময়াল সাপটাকে শিশু অবস্থা হইতে ও নাকি পুষিয়াছে। ময়াল সাপের জন্য যদি পাঁঠা ও খরগোস, পাখী প্রভৃতি ধরিয়া রাখে। উহার জন্য একটা গুহাও আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষিণী বড় অদ্ভুত লোক। উহার ভাষাও অদ্ভুত। অধিকাংশ কথা ইঙ্গিতে বলে। মনে হয় ও জন্তু-জানোয়ারের ভাষা জানে। তাহাদের সহিত তাহাদের ভাষাতেই কথাও কয় মাঝে মাঝে।"

"তুমি উহার কথা বুঝিতে পার?"

"পারি বই কি। তুমিও একটু চেষ্টা করিলে পারিবে"

"তোমার সহিত উহার আলাপ হইল কি করিয়া? ও কে?"

"ও কে তা জানি না। দুধুনীর জন্য ঘাস খুঁজিতে একদিন পঞ্চ-পাহাড়ে গিয়াছিলাম, তখন উহার চেহারা দেখি। প্রথমটা ভয় হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছি। মাঝে মাঝে উহাকে দুধ দিয়া আসি। যক্ষিণী যদিও মাংসাশী, কিন্তু দুধও খুব ভালবাসে"

"উনগা পাহাড়ে ও কোথা হইতে আসিল, উহার বংশপরিচয় কি, তাহা জান না?"

"না। তবে আমার মনে হয় ময়াল সাপই উহার বংশদেবতা। কারণ, ও ময়াল সাপ ছাড়া আর সমস্ত রকম জন্তু আহার করে। যত্ন করে কেবল ময়াল সাপকে"

"উহার অধিকারে খালি গুহা আছে তুমি জান?"

"উহার অধিকারে কয়েকটি গুহাই আছে। একটিতে ও থাকে। আর একটিতে থাকে দুইটি ময়াল সাপ। তৃতীয় গুহাটিতে শশক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুকে বন্দী করিয়া রাখে। মাঝে মাঝে এক একটি জন্তু বাহির করিয়া ময়াল সাপদের খাইতে দেয়। এই তিনটি গুহা প্রায়

পাশাপাশি আছে। আর একটু দূরে বেশ বড় গুহা আছে সেটি খালি।"

"এই ভয়াবহ পরিবেশে নিনানি কি থাকিতে পারিবে?

"যক্ষিণী যদি থাকিতে দিতে রাজি হয় অনায়াসেই পারিবে। কারণ যক্ষিণী লোক ভাল। সে নিনানিকে যত্নেই রাখিবে। কিন্তু যক্ষিণী যদি রাজি না হয় তাহা হইলে অন্য গুহার সন্ধান করিতে হইবে। আমি ঠিক যক্ষিণীকে রাজী করিতে পারিব, চলই না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক"

"বেশ, চল"

"ব্যাপারটা তুমি উহাকে বুঝাইতে পারিবে তো?"

"আশা করি পারিব"

......আমরা পুনরায় সেই উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিলাম। শিলাঙ্গী ঠিক যেন হরিণীর মতো চলিতেছিল। তাহার সহিত কুরঙ্গিনীর অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি ঠিক যেন কুরঙ্গ-নয়ন। তাহার চাল-চলন গতিভঙ্গী সমস্তই হরিণের মতো। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে সে আমার স্কন্ধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছিল, লাফাইয়া নামিয়া আবার ছুটিয়া চলিতেছিল। মাঝে মাঝে ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও ঝোপে আত্মগোপন করিয়া আমাকে নাকাল করিবার চেষ্টাও করিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া আমি যখন তাহাকে খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি তখন সহসা তাহার কলহাস্য শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, সে আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাকে যেখানে খুঁজিতেছি সেখানে সে নাই, অনেক দূরে আর একটা ঝোপের অন্তরাল হইতে সে উঁকি দিতেছে। এইভাবে আমরা যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি তখন একটা কথা কেন জানি না আমার মনে হইল। যে প্রশ্নের উত্তর কেহ কখনও দিতে পারে নাই সেই প্রশ্নটাই শিলাঙ্গীকে আমি করিলাম।

"আচ্ছা, শিলাঙ্গী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঠিক উত্তরটি চাই কিন্তু"

"কি কথা"

"তোমার আমাকে ভাল লাগিল কেন?"

"কি জানি"

টপ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে আমার কাঁধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। টপ করিয়া নামিয়া পড়িল আবার। দুরন্ত বালক যেন।

"মনে পড়িয়াছে কেন তোমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তুমি যখন সেদিন গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া মধুনীকে তুলিয়া গাছে উঠিয়া গেলে, তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে শাখা ধরিয়া আরও উপরে চলিয়া গেলে তখনই তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছিল"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে মারিবার জন্য বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে—"

"বাঃ, ছুঁড়িব না? আমার মধুনীকে তুমি তুলিয়া লইয়া গেলে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব না? কিন্তু যখন দেখিলাম তুমি অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, এমন কি আমার বর্শাটাও হস্তগত করিলে তখন তোমাকে আরও ভাল লাগিয়া গেল"

শিলাঙ্গী ঘাড় ফিরাইয়া আমার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিবদ্ধ করিয়া আবার কিছুদূরে ছুটিয়া গেল।

"শোন শোন—"

"কি"

"তোমাদের ঝোনঝিরাও তোমাকে খুব ভালবাসে না কি"

"খুব"

"তুমিও তাহাকে ভালবাস?"

মোটেই না। ঝোনঝিরার ইচ্ছা আমাকে বিবাহ করিয়া আমাদের দলের দলপতি হইবে। আমি কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব না"

"তোমার ইচ্ছার উপরই তোমার বিবাহ নির্ভর করে না কি? আমাদের সমাজে তো মেয়ের মা-ই এ বিষয়ে কর্ত্রী, ছেলের মা-ও"

"আমাদের সমাজেও তাই। আমি কিন্তু দলপতি রোহার কন্যা, আমার মা শম্খী রোহাকে বলিয়া গিয়াছে যে, আমার অমতে রোহা যেন কাহারও সহিত আমার বিবাহ না দেয়। রোহাও শম্খীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে!"

"শম্খী কোথায় গিয়াছে?"

"পরলোকে। সেইজন্যই তো আমার জোর [illegible] বেশী। শম্খী হয়তো মত পরিবর্তন [illegible] পারিত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। [illegible] পরলোককে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন [illegible] হইবে। রোহা লোকও খুব ভাল। সে [illegible] মতের বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।"

[illegible] পর ঠিক যে প্রশ্নটি আমার মনে [illegible] তাহা কিন্তু আমি আর মুখ [illegible] বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গীও কিছু [illegible] সে কেবল আমার দিকে চাহিয়া [illegible] হাসিতে লাগিল।

[illegible] পঞ্চ পর্বতের নিকটে সেই স্থানটিতে [illegible] দেখিলাম যক্ষিণী নাই, ময়াল সাপ [illegible] হরিণও নাই। খড়ের স্তূপগুলি ভস্ম [illegible] হইয়াছে, কোন কোনটার ভিতর হইতে [illegible] বাহির হইতেছে। পাখীগুলিও আর [illegible] করিতেছে না, সকলেই স্ব স্ব স্থানে [illegible] নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে দেখিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী তাহা হইলে [illegible] সে ঝলসানো হরিণটা লইয়া নিজের [illegible] গিয়াছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি [illegible] লইয়া আসি। আমি ডাকিলে তাহার [illegible] তুমি যাইও। এখন এইখানেই দাঁড়াইয়া [illegible]"

শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। শিলাঙ্গী যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, রোহাকেও সে যদি সম্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে এই অভিনব গো-দুগ্ধপায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে কি? সে কথা স্থির করিবে ধবল কিম্বা জিহ্বাও। তাহারা যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে না। নিতান্তই যদি বিবাহ করিতে হয়, দল ত্যাগ করিতে হইবে। রোহার দল কি আমাকে আশ্রয় দিবে? আশ্রয় পাইলেও কি শান্তিতে থাকিতে পারিব? ঝোনঝিরার কথা মনে পড়িল। ঝোনঝিরা যদি কিছু না-ও বলে তাহা হইলেও কি সুখে থাকিতে পারিব? আমাদের এই পুরাতন দল, যে দলের সহিত আমি আজন্ম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি, যে দলের জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আমার পিতা সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে দলে আমার মায়ের একদা একাধিপত্য ছিল, যে দলে আমার সহোদর-সহোদরার সংখ্যা বাইশজন, যে দলের সহিত আমি কত দেশ-দেশান্তর পর্যটন করিয়াছি, আমার সর্বপ্রকার শিক্ষা-দীক্ষা যে দলের মধ্যে হইয়াছে, যে দলের কত কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়ার সহিত আজও আমার সম্বন্ধ নিবিড়, সে দল ত্যাগ করিয়া আমি কি থাকিতে পারিব? তাছাড়া নিমানি, নিমানির যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আর একটা কথাও মনে পড়িল। ধবল উলুক্তনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে, তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহা অনিশ্চিত। যদি যুদ্ধ বাধে, সে যুদ্ধে আমাকেও যোগ দিতে হইবে। এ অবস্থায় দলত্যাগের কথা ভাবাই অনুচিত। শিলাঙ্গীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য কিন্তু সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চ পর্বতের শিখরলগ্ন একখণ্ড শুভ্র মেঘের মতো তাই আমার চিন্তা নানাভাবে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আমার মনের মধ্যে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা শিলাঙ্গীর ডাক শুনিতে পাইলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী একটি বৃক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বৃক্ষশীর্ষ হইতেই সে আমাকে ডাকিতেছিল। সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী আমার দিকে আসিতেছে। ছুটিয়া আসিতেছে।

"যক্ষিণীর সহিত দেখা হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তাহাকে সব কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি। সে নিমানির জন্য গুহা দিতে রাজী আছে। নিমানি আসিবে শুনিয়া সে খুব খুশি। বলিতেছিল একা-একা তাহার আর ভাল লাগে না। একজন সঙ্গিনী যদি তাহার কাছে থাকে, সে তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে। তুমি চল না আলাপ করিবে।"

যক্ষিণীর গুহাটি বেশ বড় এবং সুরক্ষিত। আমি গিয়া দেখিলাম, সে আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঝলসানো হরিণের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আমার দিকে সে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর শিলাঙ্গীর দিকে চাহিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কি হরিণের মাংস খাইবে? খাইতে চাইও না। চাহিলে হয়তো ও তোমাকে একটু মাংস দিবে, কিন্তু খাদ্যে ভাগ বসাইলে যক্ষিণী মনে মনে খুব চটিয়া যায়। কারণ বড় পশুর মাংস ও আজকাল বড় একটা পায় না। ময়াল সাপ যদি কোনও দিন কিছু ধরে তবেই পায়। ফাঁদ পাতিয়া খরগোস ইঁদুর ধরে, তাহারও ভাগ ময়াল সাপকে দিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ইহাকে খাদ্য আনিয়া দিই, তাই ও আমার উপর খুব খুশি।"

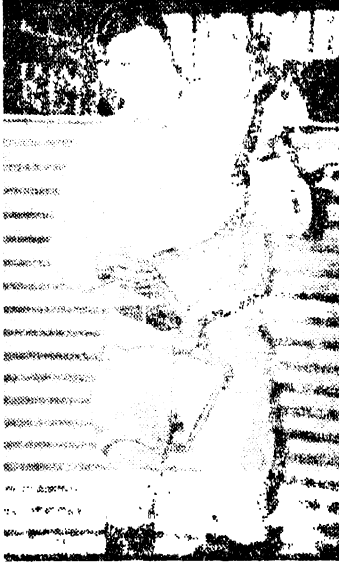
শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া যক্ষিণীর দিকে চাহিয়া আমি মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম যে, মাংস আমার চাই না। যক্ষিণী আপনমনে মাংস খাইতে খাইতে শিলাঙ্গীর সহিত মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল। বানরের কিচির-মিচিরের সহিত শালিকের ভাষা মিশিলে যেমন শোনায়, যক্ষিণীর ভাষা অনেকটা সেইরূপ শুনাইতে লাগিল। দেখিলাম, শিলাঙ্গীও সে ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছে। বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারে। কথা বলিতে বলিতে যক্ষিণী সহসা ভীত শালিকের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর শিলাঙ্গীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পাহাড়ের গায়ে কি দেখাইতে লাগিল। (ক্রমশ)



বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

কে কাকে খাচ্ছে? কথায় বলে পেটের দায়ে খেয়োখেয়ি হয়। এখানে এই তিনটে সাপ এই কথাটার উদাহরণ। একটা ব্যাংকে এরা তিনজন খাবার ডাক করছিল। শেষ



একটা সাপ আর দুটো সাপকে গিলেছে

পর্যন্ত এদের একজন ব্যাংটাকে গিলে ফেলে তার সংগী দুজনকেও গিলতে আরম্ভ করেছে। বেচারা এখনও বোধ হয় বুঝতে পারছে না যে, তার জয়লাভের পুরস্কার দুটি সে তার পেটে ধরাতে পারবে না।

*

রাজা মহারাজাদের কাণ্ডই আলাদা। ফরাসী দেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সাই প্রাসাদে একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছেন। প্রাসাদের মাটির নীচে একটা কুঠরীর ভেতরে সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী ৬টা চৌবাচ্চা আছে। এই চৌবাচ্চার মধ্যে লুইয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় টাটকা মাছ জীবন্ত অবস্থায় রাখা থাকত। এই চৌবাচ্চা-গুলো আবার লুইয়ের রান্নাঘরের সংগে একটা নালা দিয়ে সংযুক্ত ছিল—যাতে করে রাঁধুনী রান্নাঘরে বসেই জ্যান্ত মাছ পেতে পারে। ১৭০০ খৃঃ অব্দে চতুর্দশ লুই ফরাসী দেশে রাজত্ব করতেন।

*

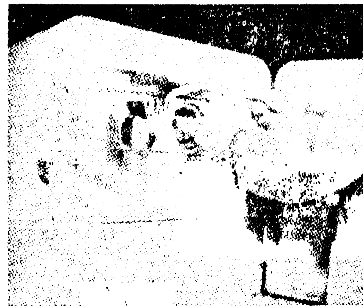
পায়রা পোষবার সখ অনেকেরই আছে। সখ ছাড়াও মানুষের প্রয়োজনেও পায়রা পুষতে হয়। যুদ্ধের সময় পায়রার সাহায্যে গোপনীয় খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এর জন্য সামরিক বিভাগে পায়রাদের শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত আছে। এই শিক্ষার মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে এদের দ্রুত ওড়বার ক্ষমতা। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার দুটো পায়রা না থেমে ১০০০ মাইল পথ উড়ে গিয়ে দ্রুত ওড়বার এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পায়রা দুটো পুরো আড়াই দিন উড়েছিল—আর এদের ওড়বার গতি ছিল প্রত্যেক ১ মিনিটে ১৪০০ গজ রাস্তা।

*

আশার কথা- হৃদরোগের জন্য একটা নতুন ওষুধ বের হয়েছে, অবশ্য এখনো এটা বাজারে চালু হয়নি। এই ওষুধটার নাম দেওয়া হয়েছে LANATOSIDE C। দুজন ডাক্তার অনেক চেষ্টা করে এই ওষুধটা বার করেছেন। ডিজিটালিস গাছ থেকে এই ওষুধটা তৈরী করা হয়েছে। যে সব রোগীদের বয়সটা একটু বেশী হয়েছে তাদের পক্ষেই এই ওষুধটা বেশী কার্যকরী হয়। ওষুধটা শরীরের শিরাতে ইন্জেকসন করলে তবে তার কাজ হয়। ১৪ জন রোগীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১২ জনের খুব উপকার হয়েছে।

*

আজকাল অনেকের বাড়িতেই রেফ্রিজারেটার দেখতে পাওয়া যায়। রেডিও, গ্রামোফোন, মোটর গাড়ির মতই বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর হরেক রকম মডেলে রেফ্রিজারেটার কিনতে পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের একটা কোম্পানী সহজে বহনোপযোগী সবচেয়ে ছোট একটা রেফ্রিজারেটার তৈরী করেছে। এর সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে, ৬ থেকে আরম্ভ করে ২২০ ভোল্টের যে কোন ইলেকট্রিক দিয়ে এটা চালান যায়। এটা চালাতে একটা ১৫ ওয়াটের বাতি জ্বালবার যা খরচ তার বেশী লাগে না। লম্বা চওড়া এবং উচ্চতায় এটা সব দিক দিয়ে মাত্র ২ ফুট। মোটর গাড়িতে দরকার হলে এই রেফ্রিজারেটার লাগান যায়।



রেফ্রিজারেটর থেকে খাবার বের করা হচ্ছে

টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি খেলবার কোর্ট তৈরী করবার একটা সহজ উপায় বার হয়েছে। প্ল্যাস্টিকের এক ধরণের সাদা ফিতে তৈরী হচ্ছে। খেলবার কোর্টের জন্য আলাদা কোন দাগ না দিয়ে এই প্ল্যাস্টিকের ফিতে পেরেক দিয়ে ২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর আটকে দেওয়া হয়।



প্ল্যাস্টিকের ফিতে দিয়ে টেনিস কোর্ট তৈরী করা হচ্ছে

এই ফিতের সুবিধা হচ্ছে যে, এর সাদা রং অনেক কাল থাকে, রোদ বৃষ্টিতে চট করে নষ্ট হয়ে যায় না।

*

আমরা সকলেই জানি যে, পাখীর ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করবার জন্য অথবা রান্না করবার সময়ই শুধু তাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ডিম সংরক্ষণের জন্য তাপের প্রয়োজন। ডিমের ওপর পরিমিত তাপ প্রয়োগ করলে। ডিমগুলি অনেকদিন টাটকা রাখা যায়। এতদিন এ সম্বন্ধে ভালরকম গবেষণাই হয়নি। বর্তমানে আমেরিকার কৃষি বিভাগ এ নিয়ে গবেষণা করতে আরম্ভ করেছে। কৃষি বিভাগ ডিমকে একটা নির্ধারিত উত্তাপের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে দেয় যার ফলে ডিমগুলোর মধ্যে একটা আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোনরকম রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। আর এর জন্য ডিমগুলো অনেক কাল ভাল অবস্থায় থাকে। এই প্রক্রিয়াকে "থার্মোস্টেবিলিজেশন" বলা হয়। থার্মোস্টেবিলিজেশনের পদ্ধতি আবিষ্কারের আগেও কিন্তু তাপের সাহায্যে ডিমকে তাজা রাখা হোত। ডিমগুলোকে ফুটন্ত জলের মধ্যে ২০ সেকেণ্ডের জন্য ডুবিয়ে রেখে, জল থেকে তুলে নিয়ে ভাল করে শুকিয়ে শুকনা ছাইয়ের মধ্যে রেখে দেওয়া হোত। অনেক সময় ডিমগুলোকে ছাইয়ের বদলে নুন অথবা যবের ভেতর রেখে দেওয়া হোত। অনেক সময় আবার গরম তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তারপর সেটাকে হিম কক্ষের মধ্যে রেখে দিয়েও দেখা হয়েছিল যে, এতেও ডিম অনেকদিন ভাল অবস্থায় থাকে।



স্বয়ম্বরা

নির্মলেন্দু মান্না

বর নিজেই এসেছিল কনে দেখতে।

জয়তীর কাছে ভারী আশ্চর্য লাগে ব্যাপারটা। ওমা, কি কান্ড! বরের বিয়ে হল না এদিকে কনের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হয়ে গেল। না বাবু, সেকালে বাপ মা পছন্দ করে দিয়ে দিত, সেই ব্যবস্থাই ছিল বেশ। বর-কর্তাদের মনে কোন আগল থাকত না, পষ্টাপষ্টি বলে ফেলত সব, অমন কানে কানে ফিস্ ফিস্ করত না। আগে থেকে জানাশোনা আছে তারপর বিয়ে হোল, সে আলাদা কথা, আর তা নইলে বেহায়ার মত নিজের বউ নিজেই পছন্দ করতে আসা...যাই বলো, জয়তী খুব বুঝতে পেরেছে দিদির ভাবী বরটা ভারী নির্লজ্জ। সেদিনে এমন ড্যাব ড্যাব করে তার দিকে তাকাচ্ছিলো যে মায়ের ফরমাজ শুনতে না হলে লজ্জায় সে ওদিকের ছায়াই আর মাড়াতো না।

সেদিনে মজাটা হোলো বেশ। তপতীদির জন্যে বর খুঁজে খুঁজে বাবা যখন হয়রান হয়ে গেছেন তখন বাবার আপিসের এক বন্ধু খবর দিয়ে গেল তার হাতে একটা উপযুক্ত পাত্র আছে, রাইটার্স বিল্ডিংএ কাজ করে, খুব শিক্ষিত আর দেখতে শুনতেও ভালো, অনেক বলা কওয়ায় ছেলেটি বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, আর তপতীর ছবি দেখেও তার অপছন্দের কিছু কারণ ঘটেনি, এখন সে নিজে একবার দেখতে চায়। তা' দেখে গেলেই বিয়েটার প্যাকাপ্যাকি একটা ব্যবস্থা হয়।

দরজার আড়াল থেকে খবরটা শুনেই জয়তী থ' হয়ে গেল। ওমা, কি কান্ড! হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দেখে তপতীদি তারই পাশে দাঁড়িয়ে। তন্ময় হয়ে খবরটা শুনছে।

জয়তী তক্ষুনি তাকে জড়িয়ে ধরল। না ধরে থাকতে পারল না। তার ঐ একটি দিদি, তপতীদি বলো, বড়দি বলো, শুধু দিদি বলো, যাই বলো না কেন, এ্যাদ্দিন পরে তারই বিয়ের ফুল ফুটলো।

থাম তুই, অত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আর, মুখে কাপড় দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে উঠল তপতী. জয়তীর কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইল, দেখাতে চাইল, এটা একটা খবরই না, অত্যন্ত পচা-পুরোন ব্যাপার, এই নিয়ে কতবার যে হোলো, আরো একবার না হয় হবে।

দিদিকে গম্ভীর দেখে জয়তীও আর হাসতে পারলে না। সত্যি, দিদির মত দুঃখ আর কেউ পায়নি। তিন বচ্ছর ধরে বাবা সমানে খোঁজাখুঁজি করছেন। কত ছেলের বাবা-কাকা-দিদি-দাদাবাবু এলো আর গেলো, তাদের এই দোতোলার ভাড়াটে কুঠরীতে। কেউ একটা পান মুখে দিয়েই উঠে পড়ে বললে, পরে খবর দেব। কেউ রীতিমত জলযোগ সেরে টিপ্পনী কাটলে, মেয়ে মোটে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছে, গান জানে না, তার ওপর এই দোমথ বয়েস। মা অনেক চেপেচুপে বলেছিলেন, মেয়ে সবে আঠারো ছাড়িয়েছে। কিন্তু তপতীদির চেহারাটাই এমন যে কুড়ির নীচে বলে কেউ বিশ্বেস করে না।

শুধু কি এখানেই শেষ নাকি! দিদিকে কতবার ইডেন গার্ডেন আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যাওয়া হলো। একবার সেখানে কে একজন চুপিসারে বলেই ফেলেছিল, মেয়ের চলন বাঁকা। কথাটা শুনেই মা বলে-ছিলেন, বিশেষ করে দেখতে নারি। আর বড়দি তো কেঁদেই আকুল। লোকের সামনে আর কত ছোট হবে!

সবচেয়ে বেশী মুষড়ে পড়েছিলেন বাবা। শ্যামবাজার থেকে ইডেন গার্ডেন, তাও ট্যাক্সিতে করে যাওয়া আসা, আর বরকর্তাদের মন জোগাবার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখা—আর্থিক আর মানসিক, দুদিকেই তাঁর বেশ চাপ পড়েছিল। তারপর সর্বশেষে সেই পছন্দ না হওয়ার চিরাচরিত অভ্যস্ত সংবাদ, ক্ষোভে এবং দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে বাবার শরীর যেন ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল।

কতবার টাকা দিয়ে তিনি রফা করতে চেয়েছেন, পারেননি। দাবীর অর্ধেকটা মেটাতেও সামর্থ্যে কুলোয়নি। চাকরী করে আর কত মাইনে পান। খেয়ে বেঁচে থাকতেই তো সব ফুরিয়ে যায়। জমেই বা কি করে! এর মধ্যে জয়তীর পড়ার জন্যে একটা মোটা খরচ আছে। এইতো ক্লাশ টেন হোলো, আর দুদিন বাদেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা, হোলো, অন্ততঃ আই-এটা সে পাশ করবেই, সতেরো, আঠারো, তারপরে যা হয় হোক, কিন্তু তার আগে,

এখনো তিন বছর ধরে সমানে খরচ টেনে যেতে হবে।

জয়তী অনেকবার ভেবেছে, দিদির মত ক্লাশ এইটে পড়া ছেড়ে দিলেই তার ভালো হোতো। অন্ততঃ এই স্কুলের মাইনে, হাত খরচ আর বই কেনার টাকাগুলো বাঁচতো। সেও বড় কম নয়। কিন্তু কি হোতো তাতে! বাবার ওপর বোঝাটা বাড়ত বই কমত না। না, না, এ রকম সে কোনদিন চায়নি। তপতীদির মত অসহায় হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সে পারবে না। কোন রকমে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবেই। তাকে দেখতে এমন কিছু ফেলনা-ফেলা নয়। তার ওপর টেনেটুনে আই এটা পাশ করতে পারলে নিজের ঘর নিজেই দেখে নিতে পারবে। সেকালে আমাদের দেশেই কত মেয়ে যে তাই করত। নল দময়ন্তী পড়নি?

চমকে উঠল জয়তী। ছিঃ ছিঃ এ সব কি সে ভাবছে! রোববারের দুপুরে পুরোণ পড়া সারবে বলে ইংরেজী সিলেকশনখানা টেনে নিয়েছিল সামনে। তারপর কখন আনমনে আর্থার মি এর লেখা জোয়ান অব আরক পেরিয়ে, সিস্টার নিবেদিতার বিক্রমাদিত্যের গল্প ছাড়িয়ে, আকবরের জমজমাট রাজসভার বর্ণনা ফেলে রেখে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় চলে গেছল। মাঝখানে অনেক আবোল তাবোল হিজিবিজি ভেবেছে। দূর ছাই, ছুটির দুপুরবেলা কেউ কখনো ইংরেজী পড়ে! এবার এ্যালজেব্রার বইখানা আলগোছে টেনে নিল সে। অসীম আলস্যে দু একবার তুড়ি দিয়ে হাই তুলল। শেষকালে একটা শক্ত অঙ্কে মন বসাতে চাইল। খসখস করে দু একবার আঁচড়ও কাটলে পেন্সিলের।

কিন্তু অঙ্কের ঐ এক মহাদোষ। ও স্পর্শ করেছে কি লজ্জাবতী লতার মত চোখের পাতা বুজে আসবে। শত চেষ্টাতেও জাগিয়ে রাখতে পারবে না তাকে।

তাহলে সে কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে? সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সারা দুপুর ধরে পড়বে, পরীক্ষায় একটা ভালো ফল—না, না, সে আদৌ শোবে না, তাহলে সত্য রক্ষা হয় না, এখন একটু জিরিয়ে নেবে মাত্র। এই টেবিলের কোণায় আড়াআড়ি হাত দুটোর ওপর মাথাটি রেখে চোখের পাতা দুটো কেবল এক করে নেবে।

আর আশ্চর্য, অমনি করে মাথাটি নোয়ালেই অনেক এলোমেলো আবছায়া ছবি বোজা চোখের ভেতর নাচতে থাকে। সেই ছবিগুলো এত পুরোণ, এত পরিচিত, তবু যেন নতুন, কত অবাক কাণ্ডে ভরা, কোন এক দূরের দেশের গল্প যেন......

বেশ ঘণ্টা খানেক আগে। আর একটু পরেই যে বিকেল নামবে তেমনি এক পলাশ রঙের বিকেলবেলা তপতীদিকে পাড়ার মেয়েরা মিলে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে। কি ব্যাপার? না, বর নিজেই আসছে কনে দেখতে।

জয়তী রইল দিদির ধারে কাছে অথচ সরে সরে। ভেঙে পড়া চুলের খোঁপায় জড়ানো বেল ফুলের একগাছি মালা। ঐটে সে দিদির কাছ থেকে না চাইতে পেয়েছিল। পাবে না কেন? একগাছি চুড়ি বই সব গয়না দিদির জন্যে খুলে দিতে হোল। এই জন্যে সে কতবার লুকিয়ে লুকিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। কিছু বেমানান হচ্ছে নাকি? তাহলে সে ফাইফরমাস খাটতে পারবে না, সোজা মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বলে বসে পড়বে। নইলে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে মায়ের হুকুম মতো তার ভাবী জামাইটির সামনে একবার পানটি ধরে নিয়ে আসবে, আবার দরবেশ-মিহিদানার ছোটো ডিসটি ফেরত আনবে, এ সহ্য হবে না তার পক্ষে।

সত্যিই বেমানান হয়েছিল একটু। পাট-ভাঙা চকচকে শাড়ীটায় অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তাই কারুর কথা না শুনে আটপৌরে ডুরে শাড়ীখানাই পরল। তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা পুরোন পরিষ্কার ব্লাউজ। বাস্, আর কিছু নয়। সাধারণ সজ্জা, প্রসাধন উহ্য কাঁচা মুখ, এলো খোঁপায় ফুলের মালা—সব মিলিয়ে অপরের কাছে অসহ্য হবার মত দায় থেকে বাঁচা গেল।

এসেছিল দুটি মাত্র প্রাণী। বর আর বাবার বন্ধু। জয়তীর বাঁ দিকে এখন যে জানলাটা বন্ধ আছে, ওটা খুলে দিলেই বড় রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সেদিনও জয়তী দেখেছিল, সামনের বাস স্ট্যাণ্ডে যে কটি লোক নেমেছে তার মধ্যে দুটি মাত্র লোক তাদের বাড়ির দিক এগিয়ে আসছে।

জয়তী ছুটে গিয়ে খবরটা হুড়মুড় করে ভেঙে দিয়েছিল, ওরা আসছে। ওরা? ওরা কারা? দুটি মাত্র লোক। একজনের গায়ে গিলে করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো জরিপাড় ধুতি, হাতে ঘড়ি, পকেটে ফাউণ্টেন পেন, চোখে চশমা। বাকী লোকটা অদ্দুর পৌঁছয়নি। একটা ধোলাই করা ধুতির সঙ্গে ছিটের সার্ট। তার ঐ বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারাটা ঠিক যেন সাঙ্গোপাঙ্গোর মত। যদিও দেখেই মনে হচ্ছিলো ঐ সোণার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবী পরা ছেলেটার চেয়ে ওর বয়েস ডবলেরও বেশী হবে। ঐ লোকটাই নাকি বাবার বন্ধু, ওই নাকি দিদির জন্যে......

লোকটাকে দেখলেই মনে হয় ধূর্ত-ধড়িবাজ, এক কথায় খুব চালাক, যে কাজ ধরবে তার একটা হেস্তনেস্ত করে তবে নিস্তার। বাবা বলেন, দিদির জন্যে কাকাবাবুই নাকি এখন শেষ ভরসা। কাকাবাবু, হ্যাঁ, কাকাবাবু বলেই ডাকতে বলেছেন বাবা।

সেদিন কাকাবাবুই সব দিক মানিয়ে নিলেন। ওরা আসছে বলতেই মা-বাবা কি রকম উদ্বিগ্ন আর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কাকাবাবুর কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। খুব কথা বলছিলেন ছেলেটির সঙ্গে। ধরতে গেলে তাকে কথা কইবার সুযোগই দিচ্ছিলেন না একদম। আর সেই সঙ্গে হাত নাড়ছিলেন অজস্রবার। ছেলেটির কাঁধে ছোট থাবা মেরে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

—ব্রেভো বয়, এই তো চাই, অপরের মুখে ঝাল খাওয়ার কোনো মানে হয় না, বিশেষ টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরীর মিডল হাফের ছেলে হয়ে, বলতে বলতে বাড়ি ঢুকলেন কাকাবাবু। তারপর সামনে বাবাকে দেখেই হ্যাল্লো ওল্ড ম্যান, তোমার প্রথম জামাই পছন্দ করে নাও, এই ফেলে দিলাম—বলে বাবাকে টানতে টানতে দোতলায় উঠে এলেন।

ওদের তিনটি মাত্র ঘর। সামনের ঘরটাতেই একটা ধবধবে চাদর বিছিয়ে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার চৌকাঠে পা দিয়েই জয়তীকে ফুলদানী সাজাতে দেখে, কি গো মা, তোমার দাদাবাবুটিকে পছন্দ হয়, বলে কাকাবাবু হাঁক ছাড়লেন।

সেই মুহূর্তে নীরেনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল। নীরেন, নীরেন্দ্রনাথ, বেশ নাম। সুন্দর চেহারা। লজ্জায় লাল হয়ে জয়তী পালাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু মুখের ফোয়ারা খুলে দিলেন, ফুল সাজাচ্ছিস? বড় ভালো জিনিস। দে, দে, ঐ রাঙা গোলাপটা তোর দাদাবাবুকে দে।

কোনরকমে হাত বাড়িয়ে ফুলটা দিয়েছিল জয়তী। তারপর এক ছুটে পাশের ঘরে। পালিয়ে তবে নিস্তার। মাগো, দিদির বরটা ফুল নেবার সময় রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে কেমন ড্যাব ড্যাব করে তার দিকে চাইছিল। তারপর ফুলটা দিতেই কেমন হাসল, হেসে মাথা নীচু করে নাকের কাছে ফুলটা তুলে ধরল, যেন কি একটা পদ্মরাগ পেয়ে গেছে।

কাকাবাবু তখন অনুরোধ করছিলেন, এসো মাস্টার, ডবল হাফ চা হয়ে যাক। পরে বাবার দিকে ফিরে, ওহে বিড়ি-টিড়ি আছে? সিগ্রেট ফিগ্রেট আবার ধাতে সয় না।

তারপর হাইড্রাণ্টের মুখ খুলেছিলেন তিনি, মাস্টার, রাইটার্স বিল্ডিংএ আড়াইশো টাকার অফিসার তুমি, নব্য ইয়ং বেঙ্গল, তোমার অমন সোমবারের মহাত্মাজী হওয়া সাজে? ওই নাও, পাত্রী এসে গেছে, এখন বাজিয়ে দেখে নাও।

এই সময় নীরেন্দ্রনাথের কাছে একটু বাধা পেতেই অন্য দিকটা কথার তোড়ে ভাসিয়ে চল্লেন, এসো মা, থাক থাক, আর নমস্কার জানাতে হবে না, বোসো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানটাতেই বোসো, বেশ সামনাসামনি। অত মুখ নীচু করে না মা, তোমরা হলে গিয়ে একালের ছেলেমেয়ে, ফুল ফ্লেজড ফ্রিডম এ্যাণ্ড ফ্রী মিক্সিং সোসাইটিতে মানুষ, তা এখন তোমরা কথা

কইতে পার, আমরা বুড়ো হাবড়া লোক, এক পাশে সরে দাঁড়াচ্ছি। বুঝলে নীরেন, ভেবো না আমি ঘটকালী করতে এসেছি। তোমাদের দুজনকে স্নেহ করি তাই মিলিয়ে দিতে চাই। যাকে বলে জীবনে জীবন যোগ করা— একালের রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু পড়েছি হে মাস্টার পড়েছি, দমকা হাসিতে ফেটে পড়লেন কাকাবাবু।

এইটুকু সময়ের মধ্যে নানা কাজে, কাজের ছলায় মোট তিনবার ঘরে যাতায়াত করল তী। প্রত্যেকবার আড়চোখে চাইল বরের দিকে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মেশানো ভাবখানা। র আর কি! একটু পরে দিদি নিজেই ত ধরে বে, কেমন দেখলি ভাই বল না। আমি কি র মুখ তুলতে পেরেছি রে!

কাকাবাবু তখনো নিবে আসা বাতির মত করছিলেন, না মাস্টার, তোমাকে নিয়ে লাম না, বাপ মা মারা যাওয়াতে এই অস্পষ্ট হয়েছে, নিজের কোন কাজে যেন জোর নেই, যেন আমার পছন্দতেই তোমার চলে যাবে। ও মা, তোমার নামটা বলো তো। কি তে জান? শেলাই ফোঁড়? না, না, ওসব লেখাপড়ার খবরে দরকার নেই। যার ওপর সংসারের ভার পড়বে তার আবার লেখাপড়া! সা, খোকার হিসেবটা রাখতে পারবে তো! স, তাহলেই হোলো।

এই সময়টায় সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে রেন উঠে দাঁড়ালো। হাঁ হাঁ করে ছুটে লেন বাবা, হাত ধরে বসাতে চাইলেন। সঙ্গে বাধা দিলেন কাকাবাবু নিজে, না না ওল্ড-ন, আমরা চললুম এখন, তপতী মাকে দেখতে শী সময় লাগে নাহে। তুমি কি ভেবেছো, ? জল খাবার? জল খাবার কে খাবে! ভেরী ভেরী ওল্ডম্যান, তুমি কি সত্যিই এসেছো সাধারণ লোকের মত মেয়ে দেখতে সেছি? তাহলে হাসিয়ে দেখতে হয় তোমার রের সব দাঁত আছে কি না, চুল খুলিয়ে খতে হয় ওটা আসল না পরচুলা, আর—নাঃ মার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, ম ভাই, সপ্তাখানেকের মধ্যে নির্ঘাৎ তুমি র পেয়ে যাবে, আমিই তোমার বাড়িতে এসে য়ের দিন ঠিক করে যাব, কিসসু ভেবো না হে বো না, এই অধম তারণ যখন কাজে নেমেছে ওরে জয়তী, এক খিলি পান দিয়ে যাতো মা। ল্ডম্যান, একটা বিড়ি দাওতো দেখি, বেশ কড়া খে...

পানের খিলি মুখে দিয়ে বিড়ীর ধোঁয়া ছাড়তে ড়তে সেদিন কাকাবাবু চলে গিয়েছিলেন। ছনে ভাবী জামাইয়ের গা ঘেঁসে আপ্যায়ন রতে করতে সিঁড়ি ভেঙেছিলেন বাবা। শেষ-লে ওদের মিলিত গমন পথের দিকে চেয়ে সেছিলেন মৃদুভাবে।

ওদিকে জয়তী দিদির সামনে ফেটে পড়েছিল। প্রচণ্ড আবেগে ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের মত হুস্ হুস্ করে কথার ধোঁয়া ছাড়ছিল, দিদি, সত্যি তোর ভাগ্য ভাল। এমন রূপ গুণ, অমন ঘর বর, যেদিক দিয়েই ধরণা কেন, এতটুকু খুঁৎ নেই। আর তুই যা ভয় করছিস তা কক্ষনো হবে না, দেখে নিস, এই বলে রাখলুম আমি। যদি বলিস, কেন, তাহলে বলবো, আমি যে নিজের কানে তোর ইয়ে মানে আমাদের ভাবী দাদাবাবুকে পছন্দ হওয়ার কথা বলতে শুনেছি।

এই সময়ে বাবা নীচ থেকে উঠে এলেন

দোতলায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখন চারটি হাত এক হলে বাঁচি, আমি তো নিজের কানে পাত্রকে চুপি চুপি বলতে শুনলুম যে আমাদের তপুকে ওর মনে ধরেছে।

সবায়ের মনে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।

জয়তী কানে কানে তপতীকে বললে, দিদি, সেকালে দময়ন্তী এসে নল রাজার গলায় মালা দিয়েছিল, একালে নল এসে দময়ন্তীদের...

ধড়মড় করে উঠে বসল জয়তী, সিধে হয়ে বসল। আধোতন্দ্রার মধ্য দিয়ে দেখা স্বয়ম্বর সভার সেই আশ্চর্য ছবিটা ভেঙে পড়ল। ইস্‌ আবার যা তা কথা সব ভাবছে। এ সব ভাবনার কোন মানে হয় না অথচ অনেক সময় এরাই মনকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে ইংরেজীর পড়া বাকী থাকে, অঙ্ক অর্ধেকটার বেশী এগোয় না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। বিকেল হয়ে এল বলে। বড় রাস্তায় জল দিচ্ছে কর্পোরেশনের লোক। রাস্তার ওপারে বাড়িগুলোর আড়ালে সূর্য এইমাত্র নেমে পড়ল। দুপুরের এক ঝলক ভাঙা ভাঙা ঘুমের পর চারদিকে কেমন যেন একটা বিকেলের শিথিল কর্মচাঞ্চল্য। তার মধ্যে স্বয়ম্বরা দময়ন্তীর সেই মোহময় ছবিটা কোথাও যেন আশ্রয় না পেয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে। অথচ দময়ন্তীকে এত ভালো লাগে তার।

জয়তী আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। রাস্তার ধারের এই জানলাটার অদ্ভুত আকর্ষণ আছে তার কাছে। বাইরের লোকজন, ট্রামবাস, এ সব দেখবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই তার। তার সমস্ত আকর্ষণ শুধু একটি জিনিসের দিকে। সে আর কিছু নয়, একটি সাজসজ্জার দোকান। ঐ যে, এখান থেকে স্পষ্ট তার সাইন বোর্ড পড়া যাচ্ছে, দি বেঙ্গল ডেকরেটার্স, ঠিক ভজুল এ্যাণ্ড কোম্পানীর জুতোর দোকানের পাশে।

বড় রাস্তার ধারেই বেশ মাঝারী সাইজের ঘর, চারদিক সাজান গোছান, সামনেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভেতরের শো কেসে নীল লাল হলদে রঙের রকমারী কাপড় থাক থাক ভাঁজ করা রয়েছে, ডাইংক্লিনিং এর দোকানে কাপড় যেমন সাজানো থাকে, ঠিক তেমনি। পাছে খদ্দের ভুল বোঝে তাই দরজার মুখেই খুব বড় হরফে লেখা আছে ঃ এই স্থানে টিনের চালা, সামিয়ানা, হোগলা ও প্যাণ্ডেল প্রভৃতি আসর সাজানর সর্ববিধ জিনিস এবং চেয়ার, টেবিল, বাসন ইত্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

দোকানটায় ঢোকবার মুখেই একটা টেকো মাথার লোক তক্তপোষের ওপর রঙচটা ক্যাশ-বাক্সর সামনে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কি সব আঁক জোক করে আর হুকুম দেয়। বাকী তিন চারটে আধময়লা লোক খুব ছুটোছুটি কোরে কখনো কাপড় গুছোয়, কখনো ময়লা সতরঞ্চীতে ঝাঁট দিয়ে ধুলো ওড়ায় কখনো বা ছেঁড়া পরদা কি ফাটা সামিয়ানা রিপু করতে বসে। জয়তী কতদিন ওদের কাজ করতে দেখেছে তবু কখনো ওরা পুরোন হল না তার কাছে। সাজসজ্জা নিয়ে লোকগুলোকে ব্যস্ত দেখলে কত কথা আপনি মনে আসে। এই যে জয়তী দাঁড়িয়ে আছে, জানলার গরাদ দুটি ধরে দেয়ালে মাথাটি হেলিয়ে, এমনি করে সময় নষ্ট করার কি কোন অর্থ হয়! অথচ কতদিন, কত সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি-দুপুরে সে এমনিভাবে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে কত ভেবেছে, কি সে ভাবনা তা নিজেই জানে না, তবু ভাবতে ভালই লাগে।

ঐ যে দোকানের ভেতর চারটে লোক কাজ করছে, ওরা যেন তার চিন্তার এক একটি জট খুলে নিয়ে যাচ্ছে। সেকালের দময়ন্তীদের স্বয়ম্বর সভা সাজাতো রাজার লোক, এ যুগে সাজায় বেঙ্গল ডেকরেটার্স এর মালিক মহাজনেরা। দোকানের সজ্জাসম্ভার উৎসবের নিশানা, আনন্দের প্রতীক। ওই যে লোকটা ঝকঝকে রঙীণ চাদরগুলো এক এক করে সাজিয়ে রাখছে, ও কি কোনদিন ভাবতে পেরেছে ভবিষ্যতের কত আলোঝলমল স্বপ্নভরা মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকবে ওরা! আর ঐ যে একপ্রস্থ ময়লা চাদরকে ও পাশে ঠেলে রাখলো, ওদের প্রতি অঙ্গে বিগত আনন্দের চিহ্ন, ওরা উৎসবের মধ্য রাত্রির মত ক্লান্ত আর মলিন। ঐ যে সিংহাসনটা, ওর ওপর কত বর এসে বসেছে। ঐ যে বড় চাঁদোয়াখানা, ওরই নীচে হয়তো হয়েছে কন্যা সম্প্রদান, যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব......আত্মার প্রতিধ্বনি নিয়ে পড়া মন্ত্রের উচ্চারণ। কিংবা ধরো তিন রঙা পতাকার মত রঙীন চাঁদোয়াগুলোর কথা। কত উচ্ছল উল্লাস মুহূর্তে হর্ষধ্বনির মাঝে দেশনেতা এসে আসন গ্রহণ করেছেন ওর নীচে তারপর বর্তমানের সমস্ত দুঃখের বোঝা সরিয়ে অমৃতবাক্যে আশ্বাস দিয়েছেন শ্রোতাদের। কত সর্বজনীন পুজোর, কত সামাজিক সম্মিলনের, কত গীত সভার আনন্দ সংবেদন ভরা নিবিড় মুহূর্তের এরা সাক্ষী হয়ে আছে।

আজ লোকগুলোকে খুব ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে, ধুপ ধাপ মেঝের ওপর কাপড় ফেলাছড়া করছে। হয়তো কোথাও ডাক পড়েছে কিংবা হয়তো কিছুই হয়নি শুধু হিসেব মেলাবার পালা এসেছে। কিন্তু আর কিছুদিন বাদে সত্যিই ওরা কাজ পাবে। বেশী কিছু না হোক অন্ততঃ বরাসনটা ভাল করে সাজাতে হবে। ছোট্টো ভাড়াটে বাড়ি। তার মধ্যে হয়তো অমন অতিথিকে মানাবে না। তবু চেষ্টার ত্রুটি করবে না জয়তী নিজে।

—তুই আজ বেড়াতে যাবি না? কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল তপতী, যদি যাসতো সাজগোজ করে নে, আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না বলে দিচ্ছি।

জয়তী তাকাল তার দিদির দিকে। এই কদিনে যেন খেলায় খুশীতে রঙে লাবণ্যে সব দিক দিয়ে বেড়ে উঠেছে তপতীদি। দেখাশুনো হয়ে যাওয়ার পর থেকে সংসারের আর কোন কাজ করতে হয় না ওকে। জীবনের পরম প্রত্যাশিত দিনগুলো ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে বলে কেমন যেন বাঁধনহারা খেয়াল খেলায় ও মেতেছে। পোষাক প্রসাধন আর গান গল্পেই সর্বদা মশগুল।

ঘরে ঢুকেই তপতী একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিতে লাগল। চোখের তারায় তখন নিজের প্রতিচ্ছবিটা ভাসছে, বিয়ের কনে হিসেবে খুব বেমানান হবে না যদিও বয়েস একটু—

—জানলা দিয়ে কি অত দেখছিস রে? প্রতিচ্ছবির চোখে চোখ রেখে তপতী প্রশ্ন করল।

—সামনের ঐ দোকানটা, জয়তী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তোর বিয়ের জন্যে কটা হোগলা আর ছেঁড়া ত্রেপল ভাড়া মিলবে কিনা দেখছি।

কথাটা কেড়ে নিয়েই তপতী বলতে গেল, ওসব তোর বিয়েতে, আমার জন্যে আসবে—এই খানটায় ছন্দ পতনের হোঁচট খেল সে, কি আসবে তা কি কোনদিন জেনেছে না ভেবেছে?

—তোর জন্যে আসবে একটা ফাঁকা ঠেলাগাড়ী, কথার খেই ধরাতে গেল জয়তী, দোকানে বেশীর ভাগ শো কেশই তো খালি দেখছি।

কথাটা বলবার আগে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে, দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, কপালের ওপর টিপ আঁকতে গিয়ে কি রকম আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এ সময়ে রসালাপ জমবে না। জয়তী আবার বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল।

দিদি শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে সমস্ত বাড়িটা। বিশেষ এই ঘরখানা। দু বোন এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে এইখানে। দুজনের মিলিত জীবনে কত হাসিকান্নার বিচিত্র অভিনয় হয়ে গেছে। দিনের পর দিন ধরে সামনাসামনি বসে কল্পনার কত অস্পষ্ট ছায়াছবি এঁকেছে কথার আলাপে। কৈশোর আর যৌবন সন্ধিক্ষণের উদ্বেল দিনগুলো কত দ্রুত তারা পেরিয়ে এল, এখন সামনে কেবল বিচ্ছেদের চিরন্তন কাহিনী এগিয়ে আসছে।

স্মৃতির রোমন্থনে ক্লান্ত জয়তী জানলার গরাদে মাথা রাখল। তাকেও এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। মা বাবাকে ফেলে যেতে হবে অজানা ঘরে, অচেনা লোকের পাশে। হয়তো আর বেশী দেরী নেই, মাত্র দুতিন বছর। এই সময়টায় কত অভাবিত ঘটনার সংযোগ

[প্র]য়োজন চলবে মনের মধ্যে। হয়তো কিছুই হবে না, শুধু একজনকে দেখে মনটা অকারণে খুশী হয়ে উঠবে, কিংবা হয়তো একজনের সামান্য ঔদাসিন্যে অবাধ্য অবাধ কান্না ঝরবে, হয়তো আরো কিছু, পছন্দ অপছন্দ, দেনা-পাওনা আর বরপণের দুঃসহ ক্ষত সৃষ্টি হবে।

সব সরিয়ে কিন্তু একটি মাত্র ছবি চেতনার অন্তঃপুরে জেগে থাকবে। জীবনের প্রসন্ন জ্যোতি দিয়ে আঁকা তার সর্ব অবয়ব। আনন্দ মানসের সে আকাশে বেঙ্গল ডেকরেটার্স-এর অন্ধকার কোণে পড়ে থাকা বিচিত্রবর্ণ চন্দ্রাতপ [illegible] দুলে উঠবে, শুভ্র দীপাধারে সহস্র শ্বেতকুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে, অদৃশ্য সানাইয়ের সুরে সুরে বাজবে তিলক কামোদ, অবশেষে স্বয়ম্বর সভায় দেখা দেবে বাঙালী মেয়েদের নম্রা দময়ন্তী। সবিনয় নমস্কারে সমাগত প্রার্থীদের বিদায় দিয়ে সেই মানুষকে তার অতৃপ্ত নয়ন খুঁজে বেড়াবে যাকে সে পেয়েছে মনের মধ্যে অথচ পায়নি সম্মুখে। অকস্মাৎ ছবির সঙ্গে ছবি মিলে যাবে, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়া, হাতের বরমাল্য উঠবে দুলে, এ যুগের নল নীরেন্দ্রনাথের বেশে হৃদয় জিতে নেবে।

মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল জয়তী। কার কথা সে এঁকে চলেছে? কাকে নিয়ে এই কল্পনার সূত্রাতন্তু বোনা? একটা আশঙ্কা জাগল তার মনে, ভীত দৃষ্টিতে তাকাল তপতীদির দিকে।

না, ও কিছু বুঝতে পারেনি, টের পায়নি ওর মনের কথা। জয়তী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। দিদি এখন বাইরে গেলে সে বেঁচে যায়। ধরা পড়বার উৎকট ভাবনা থেকে রেহাই পায়। নিজেকে গোপন করবার জন্যই জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

হঠাৎ চোখ আটকিয়ে গেল দূরের বাস স্ট্যান্ডে। ওই তো তাদের কাকাবাবু বাস থেকে নামছেন। হন হন করে এগিয়ে আসছেন তাদেরই বাড়ির দিকে। কি রকম হাসি হাসি মুখ।

দিদি—চীৎকার করে উঠল জয়তী। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তপতীকে।

আঃ ছাড় ছাড়, তোর আবার হোলো কি—[illegible] ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল তপতী।

তক্ষুনি ছেড়ে দিলে জয়তী। হাত ধরে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলে তপতীকে, তারপর দৌড়ে গেল দরজার দিকে।

সিঁড়িতে তখন কাকাবাবুর জুতোর আওয়াজ মসমসিয়ে উঠেছে।

আসুন কাকাবাবু, বাবা পাশের ঘরে আছেন, তরতর করে কথা বলে গেল জয়তী, আপনি বাস থেকে নামতেই আমি দেখতে পেয়েছি। গত সপ্তাহে কিন্তু একদিনও আসেননি কাকাবাবু।

ইস্, নটি গার্ল, কাকাবাবু দেঁতো হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেন, এটুকু বোঝনা, তোমার কাকাবাবুর কাজ কত! পরে একটু থেমেই বললেন, হ্যাঁ, এখন যাও তো মা, তোমার বাবার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে।

ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন কাকাবাবু। জয়তী একবার ইচ্ছে হোল হো হো করে হেসে ওঠে, বলে, কাকাবাবু, আপনি যে রকম আস্তে কথা বলেন তাতে পাশের ঘর অবধি কিছুই পৌঁছয় না শুধু কি বলছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আশ্চর্য, এবার কিন্তু খুব চাপা গলাতেই কাকাবাবু কথা বলছেন, বলবার চেষ্টা করছেন, এই দেখ ভাই, ছেলে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে কিন্তু—গলার স্বরে অদ্ভুত নম্রতা। জয়তী একটু অবাক হয়েই তপতীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, হাত রাখল দিদির কাঁধে, আর একবার জড়িয়ে ধরে বলতে চাইল, দিদি, সত্যি কি সৌভাগ্য তোর, কিন্তু বলল না, বলা হল না, কান খাড়া করে সামনের ঘর থেকে ভেসে আসা কথাগুলো সে গিলতে লাগল।

ফিসফিস করে উঠলেন কাকাবাবু, অবশ্য নীরেন তোমার কাছ থেকে একটা আধলাও চায়নি ভাই, বলেওনি যে মেয়ে তার অপছন্দ হয়েছে, শুধু বলেছে—

থামলেন কাকাবাবু। জয়তী আরো এগিয়ে এল তপতীর কাছে। বাহুর বেষ্টনে ঘেঁষা-ঘেঁষি হতে চাইল দুজনে।

থামলে কেন, কি বলেছে বলো, বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

একবার কেশে নিলেন কাকাবাবু। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, নীরেন জানিয়েছে, তোমার ছোট মেয়েকেই সে বিয়ে করতে চায়। সেদিন এখানে বসেই সে ওর পছন্দের কথা আমাকে বলেছে।

না, না, সে হয় না, তা কি করে হবে! বাবার প্রতিটি কথায় আশা ভঙ্গের অসহ বেদনা গুমরিয়ে উঠল, তাহলে আর কি ও মেয়ের বিয়ে দিতে পারব!

জয়তী তৎক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে দিদিকে। সরে দাঁড়িয়েছে এক পাশে। বড়দির দিকে আর চাওয়া যাচ্ছে না। ও কি যেন হারিয়ে ফেলেছে ক্রমশ। শুকনো চোখের তারা দুটো হতাশা আর অবসাদের ভারে মুহ্যমান হয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখটা লজ্জায় আর অপমানে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে একেবারে।

অসহ্য লাগল এই থমথমে আবহাওয়া। আলতো পদক্ষেপে ঘরের এক পাশে জানলার ধারে চলে এল জয়তী। গরাদ দুটো ধরে উদাস উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল রাস্তার দিকে। কেমন করে না জানি একটু পরেই চোখের চাউনীতে ধরা পড়ল দি বেঙ্গল ডেকরেটার্স। দোকানটার সামনে একটা ঠেলাগাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যস্ত লোকগুলো ঘর খালি করে তার ওপর ঝকঝকে রঙীন কাপড় স্তূপীকৃত করছে।

ঐ দেখে হু হু করে উঠল জয়তীর বুক। এতদিন যা সে জেনেছে সব মিথ্যে, সব ভুল। রঙবাহারী সাজগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে কত অশ্রুসিক্ত করুণ কাহিনী, কত অনুচ্চারিত বেদনা। ঐ বরাসন থেকে হয়তো কত বর উঠে গেছে, ঐ সামিয়ানার নীচে কত অকথ্য গালির সঙ্গে হয়তো দেশনেতার দিকে ঢিল ছুঁড়েছে উন্মাদের দল, কত গীত সভার সুর কেটেছে, তাল থেমেছে, ক্ষুব্ধ বিরোধিতায় বিষাক্ত হয়ে গেছে সজ্জিত মণ্ডপ......

বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠল জয়তীর মুখ। ওর বিষণ্ণ দৃষ্টির সামনে দিয়ে কতকগুলো লোক খুব হৈ হৈ করে ঠেলা গাড়ীটা টানতে সুরু করল। একটা অর্থহীন শূন্যতায় সীমাবদ্ধ হয়ে এল সব কোলাহল, সকল সজ্জা-সম্ভার। জয়তীর সামনে থেকে ঠেলাগাড়ীটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।



বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও কম্যুনিজম্

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে বিশ্বের সুধীসমাজ আনন্দিত হয়েছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তবে ঘটনাটাকে উপলক্ষ্য ক'রে বিস্ময়ও নিতান্ত কম সৃষ্টি হয় নি। আগে কেন এ পুরস্কার তাকে দেওয়া হয় নি এবং এখন কেন দেওয়া হ'ল, এ নিয়ে নানা জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে সমস্যা যেটুকু, তা সময়টাকে নিয়ে। এটা সুসময় নয়; নানা কারণে সকলের পক্ষেই জটিল সমস্যাসঙ্কুল। ভাল-মন্দ বর্তমানে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে যে, একটি থেকে আর একটিকে পৃথক ক'রে দেখা অনেকের পক্ষে মোটে সম্ভবই নয়। রাসেলের মত মনীষীও পেরেছেন কি না সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। সে যা হোক, ঠিক এই সময়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা হয়তো তাঁর পক্ষে শুভ হয় নি। কারও কারও মনে এমন ধারণাও হয়তো হয়েছে যে, বিচারকেরা নির্মল ও স্নিগ্ধ সাহিত্যরসের আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হন নি, রাজনৈতিক মতবাদের উগ্র মদিরা পান করে মাতাল হবার পর তাঁদের রায় দিয়েছেন। ভাবখানা এই যে, রাসেল যা পেয়েছেন, তা গুণের স্বীকৃতি নয়, ওকালতির দক্ষিণা। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাসেল সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে যে মনোভাব বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় প্রকাশ করেছেন, তারই পুরস্কারস্বরূপ নোবেল প্রাইজ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এ অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। একথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, রাসেল নির্মমভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিপক্ষীয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানে একাধিকবার তিনি মস্কোতে বোমা ফেলবার সুপারিশ করেছেন; এই সেদিনও—নোবেল প্রাইজ পাবার দিনকয়েক পরেই তিনি প্রকাশ্য মন্তব্য করেছেন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ যদি শুরুই হয়ে যায়, তাহলে কালবিলম্ব না করে রুশিয়াতে এ্যাটম বোমা ফেলতে হবে। সুতরাং এরূপ সন্দেহ কারও মনে যদি থাকে যে, সোভিয়েট-বিরোধী বলেই রাসেলকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে সন্দেহের নিরসন করা যাবে না। তবে উত্তরে একথা জোর করেই বলা চলে যে, রাসেল আজ নূতন করে সোভিয়েটবিরোধী হন নি, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রবিশেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষসঞ্জাত নয় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বজনবিদিত দলা-দলির সঙ্গে ঐ বিরুদ্ধাচরণের অণুমাত্রও সম্বন্ধ নেই। বস্তুত রাসেলের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের সম্যক আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে রাসেলের বিরোধ মৌলিক; সোভিয়েট রুশিয়া যে মূলনীতি ও আদর্শের রাষ্ট্রিক রূপায়ণ এবং সমগ্রভাবে যাকে কম্যুনিজম বলা হয়, সেই জিনিসটিই রাসেলের কাছে অগ্রাহ্য। রাসেলের নিজের দার্শনিক বিশ্বাস এবং কার্ল মার্কস প্রবর্তিত কম্যুনিজমের মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে, রাসেলের পক্ষে বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সমর্থন করা একেবারে অসম্ভব।

ত্রিশ বৎসর আগের কথা। বিলাতের শ্রমিকদলের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে (সদস্য হিসাবে নয়) রাসেল গিয়েছিলেন বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার অবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্য। মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর কল্পনার সৃষ্টি ও ধ্যানের উপলব্ধিকে—শ্রেণীহীন, ধন-বৈষম্যহীন সমাজ; নির্ভীক, আত্মমর্যাদাবোধে দীপ্ত, কর্মকুশল ও মুক্ত মানুষ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা-হীন, অহিংস মানব-সমাজের প্রীতিশ্রুতিসমৃদ্ধ বৈভব; পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রচুর অবসরের আশ্রয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অপ্রতিহত সুযোগের প্রাচুর্য; অবশ্যম্ভাবী আর্থিক দারিদ্র্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা হতে পরিপূর্ণ অব্যাহতি; পারস্পরিক প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগিতায় নূতন জীবন ও নূতন জগৎ সৃষ্টির অতিমানবিক এক প্রয়াস;—তদানীন্তন রুশিয়ার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে। প্রেরণা পেয়েছিলেন সমসাময়িক ইতিহাস থেকে। মাত্র কিছুদিন আগেই রুশিয়ায় অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। কেবল জারের স্বৈর-তন্ত্রেরই অবসান হয় নি, অবসান হয়েছে খোদ ধনতন্ত্রের। শত্রুর নিন্দা আর বন্ধুর প্রশংসা বিস্ময়জনকভাবে একত্র মিলে গিয়ে ঘোষণা করছে যে, রুশিয়ায় যুগযুগান্তরের অর্জিত সভ্যতার সুদৃশ্য প্রাসাদ বুনিয়াদসহ ভেঙ্গে গিয়েছে, জন্মগত আভিজাত্য ধ্বংস হয়েছে, ধনবৈষম্যের অবসান হয়েছে, চিরকালের শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণ একসঙ্গেই পুরোহিত ও আমলা সম্প্রদায়ের কঠোর নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে মানবের সহজ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শোষণহীন, বৈষম্যহীন, শান্তিময় সাম্যবাদী সমাজ সে দেশে পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর অনাড়ম্বর মহিমায় ধীরে ধীরে হলেও নিয়মিত গতিতে ও নির্ভুল লয়ে গড়ে উঠছে। ঐ নিয়ে জগতের সর্বত্রই তথা বামপন্থী মহলে আশা ও উৎসাহের অন্ত নেই। সেই আশা ও সেই উৎসাহ রাসেলের হৃদয়কেও দোলা দিয়েছিল। অনেকখানি বিশ্বাস নিয়েই তিনি বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যা তিনি দেখেছিলেন, তা তাঁর প্রত্যাশা বা স্বপ্নের সঙ্গে মেলে নি। তাঁর সেদিনের আশাভঙ্গের সেই করুণ কাহিনী ফিরে এসেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই বইতে—দি প্র্যাক্‌টিস এ্যান্ড থিওরী অফ বলসেভিজম্—সোভিয়েট রুশিয়া ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে যে মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর আজকের অভিমত তা থেকে খুব বেশী উগ্র নয়।

রাসেল দেখেছিলেন, বলসেভিক রুশিয়া সর্বত্রই খাদ্যসংকট। অত বড় দেশ, লোকসংখ্যার শতকরা ৮৫ জনই কৃষিজীবী, তবু শহরের লোক পেট পুরে খেতে পায় না। দেশে খাদ্যশস্যের খুব যে অভাব, তা নয়—গাঁয়ের চাষী সরকারের কাছে স্বেচ্ছায় শস্য বেচতে চায় না বলেই শহরের শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। চাষীর অসন্তোষের কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব। কারখানা চলে প্রধানত যুদ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্য। অত শীতের দেশ, তবু কারও অঙ্গেই প্রচুর বস্ত্র নেই। ভাল খাবার, ভাল কাপড় সাধারণ লোক চোখেই দেখতে পায় না। রেল-গাড়িতে স্থানাভাব। বেড়াবার জন্য দূরে থাক, প্রয়োজনেও সাধারণ মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। সংগঠিত যান্ত্রিক শিল্পের প্রয়োজন ওখানে যে অনুপাতে বেশী, ওর অভাব ঠিক সেই অনুপাতেই তীব্র। কারখানাসমূহের রাষ্ট্রী-করণের সঙ্গে সঙ্গে আগের পরিচালনা ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়েছে, অথচ নূতন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। বুর্জোয়া হবার অথবা বুর্জোয়া সমাজের সমর্থক হবার অপরাধে বিশেষজ্ঞদের চাকরী গিয়েছে অথচ শ্রমজীবী-সমাজ থেকে উপযুক্ত সংখ্যায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং কারখানাসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। যারা খাঁটি শ্রমিক, তাদের মনেও পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। বেতন যা পাওয়া যায়, তাতে সপরিবারে পেট পুরে খাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই অধিকাংশ শ্রমিককেই 'উপরি' খাটতে হয়। তা-ও সব সময় পাওয়া যায় না; পাওয়া গেলেও সকলের শরীর অত পরিশ্রম সইতে পারে না। তাই অনেক শ্রমিক কারখানা থেকে গ্রামে পালিয়ে যায়, উৎপাদন আশানুরূপ পরিমাণে হয় না। জীবনযাত্রা সব দিক দিয়েই অত্যন্ত কষ্টকর। এমন যে জল, মস্কো শহরে তারও অভাব। সারাদিন কারখানায় হাড়ভাঙ্গা

[illegible]নী খাটবার পর শ্রমিককে বালতি হাতে [illegible]র নদীতে ছুটতে হয় জল আনবার জন্য। [illegible]দিকেই বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য সর্বব্যাপী; [illegible]জিবাদী ইংলণ্ডের তুলনায় সাম্যবাদী [illegible]শিয়ায় "শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিনযাপনের" [illegible]নি ও কষ্টই অনেক বেশী,—এই-ই রাসেলের [illegible] পড়েছিল।

কিন্তু কেবল ঐ কারণেই যে রাসেলের [illegible] রুশিয়ার প্রতি বিমুখ হয়েছিল, তা নয়। [illegible] বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্যের পিছনে [illegible] যে ভাবধারা, যে আয়োজন, যে বিধান [illegible] এবং যে সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, [illegible] তাঁর মন ভয়ে সংকুচিত হয়ে পরে [illegible] লোকে গিয়েছিল। রাসেল দেখে-[illegible] রাষ্ট্রের ভীতিপ্রদ সর্বাধিনায়কত্ব। [illegible] যাকে বলে শ্রমিক শ্রেণীর [illegible] কর্তৃত্ব (Dictatorship of the [illegible]iate) আসলে তা কম্যুনিস্ট পার্টির [illegible] অল্পকয়েক লোকের অপ্রতিহত [illegible] আর কিছু নয়। দেশের শাসন [illegible]দেরই ইচ্ছা ও আদেশমত কম্যুনিস্ট-[illegible] সংখ্যাগরিষ্ঠ না [illegible] কম্যুনিস্টরাই দেশের শাসনকর্তা। [illegible] পরোয়া করে না তারা। [illegible] নিজেদের জ্ঞান ও [illegible] ব্যাখ্যা ক'রে ঐ পথে দেশকে [illegible] করে পুলিস, গুপ্তচর আর [illegible] সহায়তায়। রুশিয়ার শাসনব্যবস্থা [illegible] শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ— [illegible] ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষের শাসন-[illegible]। পুলিসের প্রতাপ সেখানে [illegible]। ব্যক্তির জীবন সেখানে কর্তৃত্বের [illegible] আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। পুঁজিবাদী [illegible] চেয়েও বলসেভিক রুশিয়ার অবস্থা [illegible] খারাপ যে, রুশিয়ায় গভর্নমেণ্ট [illegible] সরকারী মনোবৃত্তির সঙ্গে পুঁজি-[illegible] মনোবৃত্তিও আয়ত্ত করে নিয়েছে এবং [illegible] ফলে উপরতলার লোকের ক্ষমতা ও [illegible] বড় বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এই যে [illegible], এই-ই রাসেলকে সবচেয়ে বেশী পীড়া [illegible]। তাঁর চোখে পড়েছিল কেবল [illegible] বৈষম্যই নয়, প্রচলিত সকল আশা ও [illegible] পরিপন্থী আর্থিক বৈষম্যও। [illegible] যারা শাসক, তারা আমলাই হউক, [illegible] মন্ত্রীই হউক, আরাম ও বিলাসের জীবন [illegible] করে না নিশ্চয়ই। তবে এ কথাও ঠিক [illegible] সাধারণ শ্রমিকের মত প্রতি মুহূর্তে ক্ষুধার [illegible] তাকে সহ্য করতে হয় না। একজন [illegible] মস্কোর এক সরকারী দফ্‌তরের সামনে [illegible] রাসেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ [illegible]রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে-[illegible] "ওখানে যারা কাজ করে, তারা রোজ পেট [illegible] খেতে পায়।"



এই হ'ল মোটামুটিভাবে রাসেল রুশিয়ায় গিয়ে যা দেখেছিলেন। কিন্তু কেবল এই কারণেই তিনি সোভিয়েট রুশিয়া বা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন নি। এটা খুব মোটা কথা যে, তা যদি তিনি করতেন, তাহলে তাঁর মত সুধী-সমাজে একেবারেই কোন সমাদর পেত না। অন্তত এতদিন পর নিশ্চয়ই বলা চলত যে, বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রুশিয়ায় সরকারী শাসনের কড়াকড়ি ও জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা দেখেই অত বড় একটা পরীক্ষার বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করা হয়েছিল, ইতিহাসই বহুল পরিমাণে তার অযৌক্তিকতা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। বর্তমান লেখকও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে পারত যে, যে অবস্থা রাসেল সেদিন রুশিয়ায় দেখে এসেছিলেন, হুবহু সেই অবস্থাই বর্তমানে ভারতবর্ষেও তো দেখা যাচ্ছে, সুতরাং ঐজন্য বলসেভিক গভর্নমেণ্টকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করতে হলে আমাদের দেশের গণতন্ত্র-বিশ্বাসী কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট যায় কোথায়? কিন্তু আসল কথা এই যে, রাসেলের 'The practice and Theory of Balshevism' বইখানি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে, কেবল বাহ্যিক অভিব্যক্তি ও সময়োপযোগী ব্যবস্থাসমূহের কড়াকড়ি লক্ষ্য করেই তাঁর মন বলসেভিক রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিমুখ হয় নি, বলসেভিকবাদ বা মার্কস্‌বাদ বা কম্যুনিজমের মূল নীতি-সমূহের ও সব অভিব্যক্তি—তাদের বিরুদ্ধেই তাঁর মত বিষিয়ে উঠেছিল, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে সব নীতির প্রয়োগের ফল গোড়াতেই অত বিষময়, তা জগৎ-জুড়ে প্রসারলাভ করলে এবং অন্যান্য সমস্ত নীতি ও বিধানকে পরাজিত ক'রে একচ্ছত্র কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে মানবের প্রভূত অকল্যাণ হবে। এক কথায় রুশিয়া তথা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে রাসেলের যে সমালোচনা, তা রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর বিষোদ্গার নয়, যুক্তিবাদী দার্শনিকের সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আপত্তি। উক্ত গ্রন্থের গোড়াতেই খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন যে, পুঁজিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে

কম্যুনিজমের বিরুদ্ধাচরণ করলে তা হবে প্রতিক্রিয়াশীলের কাজ এবং তা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; তিনি পুঁজিবাদের সমর্থক বলে বলসেভিক-মার্কা সাম্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, তিনি সাম্যবাদী বলেই সাম্যবাদের ঐ বিকারকে গ্রহণ করতে পারছেন না।

রাসেলের লেখাগুলি সমগ্রভাবে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মার্কসীয় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি একেবারে মৌলিক, অর্থাৎ যে নীতিগুলি মার্কসবাদের শিকড়ের মত এবং যেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, তাদের কোনটিকেই তিনি সমর্থন করেন না, দার্শনিক হিসাবে তো নয়ই, সমাজ-বৈজ্ঞানিক হিসাবেও নয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Matirealistic interpretation of History) শ্রমজীবী শ্রেণীর অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব, সর্বাত্মক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবীত্ব, জাতীয়তার তুলনায় শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা ও কার্যকারিতা, মার্কসবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা, এমন কি মার্কসীয় অর্থনীতির যা ভিত্তি, সেই উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধীয় মতবাদ (Theory of Surplus Value) পর্যন্ত রাসেল স্বীকার করেন না। এই সমস্ত মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে রাসেল তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ে যে সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তাদের আশ্চর্য সঙ্গতি দেখলে কিছুতেই একথা বলা যায় না যে, সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিদ্বেষ কোন সময়েই তাঁর চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

দার্শনিক-তত্ত্বের উপর রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা বা উভয়কে একত্র মিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাই রাসেল পছন্দ করেন না। তাঁর মতে এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাজনৈতিক মতবাদ ধর্মমতের মতই কঠিন, অপরিবর্তনীয় ও উপাস্য হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, সম্প্রদায়ানুরক্তি প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ, জীঘাংসা প্রভৃতি নীচ ও ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তিসমূহকে উত্তেজিত করে। দার্শনিকতত্ত্ব ভুল কি নির্ভুল, ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে অবান্তর, কেননা তত্ত্ব যত ভালই হউক না কেন, ওকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নিলে তা কুফল প্রসব করবেই। রাসেল উদাহরণ দিয়েছেন খৃষ্টধর্মের। যীশুখৃষ্ট যে সব উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, নিজের জীবন দিয়ে যে তত্ত্ব শিখিয়েছেন, সম্প্রদায় হিসাবে খৃষ্টানগণ তার অধিকাংশই গ্রহণ করে নি, কিন্তু যীশুর নাম নিয়ে খৃষ্টীয় আখড়ার আওতায় তারা যুদ্ধ করেছে, হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, অন্যান্য উপায়ে নির্যাতন করে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন নানা দিক দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বস্তুবাদ বা উক্ত দর্শনভিত্তিক বিবর্তনবাদের উপর খাড়া করা হয়েছে বলে মার্কসবাদও রাসেলের মতে আর একরকম ধর্ম হয়ে উঠেছে। রাসেল উক্ত দার্শনিক তত্ত্ব মানেন না, ঐ বিবর্তনবাদকেও তিনি একাধিক গ্রন্থে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বড় রকমের ঐতিহাসিক পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কারণে ঘটে না এবং বিপ্লবোত্তর পরিণতি সব ক্ষেত্রেই উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা আনয়ন করে না। ইতিহাসের অনেক বড় বড় ঘটনা বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির চিন্তা বা কাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অনেক সময়ে আবার অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনায় রুশীয় বিপ্লব সবটাই অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া এবং ওতে লেনিনের কর্তৃত্ব কিছুই নেই অথবা বিশেষ একটি মুহূর্তে লেনিনকে রুশিয়ায় যাবার অনুমতি দেওয়ার মত তুচ্ছ ঘটনায় ঐ বিপ্লবের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় নি, একথা রাসেল মানেন না। আরও গোড়ার কথা, তিনি মনে করেন যে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি বিশেষ একটি সূত্র অনুসারে ইতিহাসের গতি ও পরিণতি ব্যাখ্যা করতে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে অর্থনৈতিক সূত্র কেন, যে কোন সূত্র অনুসারেই তিনি ন্যায়সঙ্গত ও আপাতবোধ্য ব্যাখ্যা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ নিজেই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের মত অত বড় ঘটনার মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, নদীস্রোতের গতি ও পরিণতি অর্থাৎ ভৌগোলিক।

যা হোক, রাসেলের মূল বক্তব্য এই যে, মার্কসপন্থীদের হাতে মার্কসের দার্শনিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ধর্মমতের পর্যায়ে নীত হয়েছে বলে ঐ মত প্রচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সাধারণভাবে মার্কসীয় মহলে এবং বিশেষ করে সোভিয়েট রুশিয়ায় সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ও হিংসাপ্রবণতা অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পেয়েছে, আর তা-ও খৃষ্টান বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টীয় আখড়া (Roman Catholic Church) তৎকালীন খৃষ্টানদের কাছে যা ছিল, একালের কম্যুনিজম এবং সোভিয়েট রুশিয়া কম্যুনিস্ট-পন্থীদের কাছে ঠিক তাই,—সার্বভৌম, অভ্রান্ত, মানবের মুক্তির আদি ও অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বার্নার্ড শ'ও রুশিয়া ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন তাঁর 'The intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism' নামক গ্রন্থে। সে যা হোক, মার্কসীয় তত্ত্বকে গোড়াতেই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেবার ফলে রাসেলের মতে কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিশেষ এক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পায় এবং কালক্রমে তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। নিজেদের তারা অভ্রান্ত মনে করে। তারা প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। নূতন কোন মত বা তত্ত্বকে তারা গ্রহণ করা দূরে থাক, ধীর ও পক্ষপাতহীনভাবে বিচার পর্যন্ত করতে পারে না। মার্কসবাদ-সম্মত আচার-আচরণই ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রের চরম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য মনে করার ফলে উক্ত আচার-আচরণ তারা সকলের উপরেই চাপাতে চায় এবং কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে বাধ্য করবার জন্য অতিমাত্রায় হিংস্র হতে তাদের একটুও আটকায় না।

রাসেলের এ সব যুক্তি মনোবিজ্ঞানের মূল নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে বিচার করে তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, রুশিয়ায় ত্রিশ বছর আগে যা তিনি দেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যা আরও পরিণত হয়েছে, তার কোনটিই আকস্মিক ঘটনা নয়, সাময়িক বিকারও নয়, মার্কসীয় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অবশ্যম্ভাবী ফল। নিজের মতকে যে অভ্রান্ত মনে করে, সে বা সেইরকম মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব হাতে পেলে না করতে পারে, এমন কোন অপকর্ম নেই। কর্তৃত্ব করবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত-প্রবৃত্তিসমূহের অন্যতম। ক্ষমতা সকলের কাছেই মধুর এবং সেটা ঠিক সন্দেশের মত মধুর নয়, মদ বা আফিঙের মত মধুর। যে লোক একবার ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছে, সে ক্রমেই আরও ক্ষমতা চাইবে এবং তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কিছুতেই হবে না। সুতরাং রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার তাদের ক্ষমতা উক্ত রাষ্ট্রের বিধান অনুসারেই যদি অপ্রতিহত হয় তাহলে কোন অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার থেকে তারা নিবৃত্ত হবে না। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম যদিও বা হয়, ক্ষমতাভোগীর উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতেই পারে না। বস্তুতঃ রাসেল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের—বিশেষ করে লেনিনের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রকারান্তরে তাঁদের নিয়মের ব্যতিক্রমই বলেছেন, এক গোঁড়ামী ছাড়া অন্য কোন দোষ তাঁদের উপর তিনি আরোপ করেন নি। তবে এ কথাও তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, যে কোন ধর্মমতের মত রাজনৈতিক মতেরও যারা প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের চরিত্রে কোন দোষ থাকে না, সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা হন নির্লোভ, সংযত, পরার্থপর ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু তাঁদের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর তাঁদের পরিত্যক্ত আসনে যারা অধিষ্ঠিত হন সেই নন্দীভৃঙ্গীদের মধ্যে ওসব মৌলিক গুণ প্রায়ই থাকে না, থাকে কেবল গোঁড়ামী ও ক্ষমতা-প্রিয়তা এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে স্বয়ং

লাভবান হবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। রাসেলের মতে এই মৌলিক কারণেই সোভিয়েট রুশিয়ায় স্বভাবতই উত্তরোত্তর ব্যক্তির স্বাধীনতার বিনিময়ে রাষ্ট্রের অর্থাৎ মুষ্টিমেয় রাষ্ট্র-পরিচালকের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যে আর্থিক বৈষম্য দূর করবার জন্যই বিপ্লব হয়েছিল অথচ তৎসত্ত্বেও যা ত্রিশবৎসর আগেও বড় স্পষ্ট হয়েই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল সেই আর্থিক বৈষম্যও বর্তমান রুশিয়ায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মার্কসীয় ধনিক শ্রেণীর বিলোপ ঘটে থাকলেও ওরই শূন্যস্থানে নূতন এক শোষক-শ্রেণীর বা ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কসবাদের অন্যতম মূলনীতি সশস্ত্র বিপ্লবের অপরিহার্যতা রাসেল স্বীকার করেন না এবং বিপ্লব হলে তার ফল শুভ যে হবেই তা-ও মানেন না। এ সম্বন্ধে রাসেলের মত এই যে, সশস্ত্র বিপ্লব নীতি হিসাবে অগ্রাহ্য এবং কর্মসূচী হিসাবে অপরিহার্য নয়। বিপ্লবকে অপরিহার্য মনে করার কারণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ। এ সম্বন্ধে রাসেল বলেন যে, কোন দেশের অধিকাংশ লোককে প্রচারের সাহায্যে সাম্যবাদপন্থী করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে বলপ্রয়োগের ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসের কোন ভিত্তি থাকে না। দ্বিতীয়তঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে যারা পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদপন্থী সরকারের সঙ্গে অনবরত মেশামেশি করে তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করলে বিপ্লবপন্থী কম্যুনিস্টমাত্রকেই 'নিকষিত হেম' মনে করবার স্বপক্ষে যুক্তি থাকে না। গোপনে প্রচারকার্য চালিয়ে সরকারী সেনাবাহিনীকে দিয়ে যদি বিদ্রোহ করানো সম্ভব হয় তাহলে প্রকাশ্য প্রচারকার্য চালিয়ে ওদের অধিকাংশকে কেন সাম্যবাদের পক্ষে ভোট দেওয়ানো যাবে না তা-ও সহজবোধ্য নয়। রাসেলের মূল বক্তব্য এই যে গণতান্ত্রিক দেশে জনমতের বিবর্তনের যে অবস্থায় সংখ্যালঘুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমগ্র বিপ্লব সফল এবং সার্থক হতে পারে সে অবস্থায় সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও সাম্যবাদী বিপ্লবকে সফল ও সার্থক করা যায়।

সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাসেলের নৈতিক আপত্তি আরও মৌলিক। তিনি বলেন যে, দেশের জনমত সাম্যবাদকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বল-প্রয়োগ করে যদি শাসনযন্ত্রকে অধিকার করে এবং বলপ্রয়োগ করেই সাম্যবাদ ও নিজেদের কর্তৃত্ব জনসাধারণের উপর চাপাতে চায় তাহলে বলপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কর্তৃ-পক্ষীয় লোকজন বে-পরোয়া, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও অত্যাচারী হয়ে উঠবে এবং যাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলবে তারাও স্বাভাবিক নিয়মেই হয় পাশব প্রকৃতির নয়তো জড় ও নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। কম্যুনিস্টদের বিশ্বাস ও কর্মসূচী অনুসারে জগতের সর্বত্রই যদি এই রূপ বিপ্লবের মহড়া চলতে থাকে তাহলে হিংসা ও বিদ্বেষের যে আগুন জ্বলে উঠবে তাতে মানবসভ্যতার কয়েকটি মন্দ জিনিসের সঙ্গে অধিকাংশ ভাল জিনিসই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং ধনতন্ত্রের শূন্য সিংহাসনে সাম্যবাদের অভিষেক না হয়ে বর্বরতার প্রতিষ্ঠা হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হিংসার পথে সাম্যবাদকে আবাহন করবার যে কর্মসূচী কম্যুনিজমের অপরিহার্য অঙ্গ তার বিরুদ্ধে রাসেলের অভিমতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

আসল কথা রাসেলের কাছে সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টির মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। স্বাধীন মানুষ, মুক্ত মন—এই রাসেলের কাম্য। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী। তাঁর লেখক জীবনের ঊষাকাল থেকে আজ পর্যন্ত উপলক্ষ্য পেলেই নির্ভুল ও নির্ভীকভাবে তিনি বলে আসছেন যে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না। সভ্যতা কি? প্রগতি কি? রাসেল বলেন যে, বিশেষ বিশেষ যুগে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি মানুষ প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত পথে চিন্তা করতে, প্রচলিত আচরণকে বর্জন করে অসাধারণ আচরণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই না মানব জাতি বর্বরতা থেকে বর্তমান স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, সক্রেটিস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, রবীন্দ্র-নাথ, বার্নার্ড শ, ভল্টেয়ার, মার্কস্, লেনিন প্রভৃতি যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ চিন্তা ও আচরণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই না ধর্ম, সাহিত্য ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উন্নতির উপরেও আরও উন্নতি হয়েছে। মার্কসের রচনা লেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুড়িয়ে ফেলা হত অথবা সোভিয়েট রুশিয়ার আচরিত পদ্ধতি অনুসারে শিশু মার্কসের চিন্তাশক্তিকেই যদি পঙ্গু করে দেওয়া হত, তবে কোথায় আসত আজ কম্যুনিজম বা সোভিয়েট রাশিয়া? ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, তার মনের সজীবতা ও চিন্তার স্বাধীনতা রাসেলের মতে অমূল্য সম্পদ, কোন কিছুর বিনিময়েই তিনি

এ সম্পদকে হারাতে রাজী নন। "মুক্ত বুদ্ধিই মানব প্রগতির একমাত্র চালক। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি বলেই আমি বলশেভিজমের বিরোধী—যেমন বিরোধী আমি রোমান ক্যাথলিক আখড়ার,"—এ কথা রাসেল লিখেছিলেন ত্রিশ বছর আগে; কিন্তু দুই বছর আগেও ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি।

রাসেলকে বুঝবার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করার জন্য তিনি কেবল কম্যুনিজম ও সোভিয়েট রুশিয়ারই নিন্দা করেন নি, আধুনিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও রেহাই দেন নি তিনি। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পসংগঠনের গতি লক্ষ্য করে তো বটেই, সমাজসেবা ও নিয়ন্ত্রণের আপাতমনোহর পথে রাষ্ট্রের অধিকার ও সরকারী ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ লক্ষ্য করেও তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ (Authority and the Individual) তাঁর এই আশংকা ও সতর্কীকরণ খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যদি বর্তমানের গতিতে বাড়তে থাকে, তাহলে অদূর-ভবিষ্যতেই ব্যক্তি তার সৃষ্টি করবার সহজ প্রবৃত্তি হারিয়ে নির্জীব ও অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠবে। তাই তারস্বরে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অতীতের যে কোন যুগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও তাঁর এ হেন কঠোর সমালোচনা পাঠ করলে কিছুতেই বলা চলবে না যে, কম্যুনিজম তথা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে।

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাসেল কম্যুনিজম ও আধুনিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক সমালোচনা করেই নিজের কর্তব্য শেষ করেন নি, গঠনমূলক প্রস্তাবও তাঁর লেখায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। সর্বাত্মক রাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করেও তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু অরাজতন্ত্রের (Anarchism) সমর্থক তিনি নন। তিনি চান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের এক সুষ্ঠু সমন্বয়। মোটামুটিভাবে তাঁর মতের ভিত্তি মনোবিজ্ঞান। যে সব গুণ মূলতঃ স্থিতিশীল (Static), সেগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর তেমন আপত্তি নেই; কিন্তু গতিশীল (Dynamic), যে গুণাবলী তাদের সহজ গতিকে অব্যাহত রাখতে হবে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে দেশে শান্তি রক্ষা করা, রাজনৈতিক ও আর্থিক সুবিচারের ব্যবস্থা করা এবং দেশের ধনোৎপাদিকা শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এর বাইরে যে বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। শিল্প-বাণিজ্য অর্থাৎ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রেও রাসেল এই মূলনীতি প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। তিনি শিল্পের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের বিরোধী; বড় বড় কারখানা তিনি একেবারে চান না; এমন ব্যবস্থা তিনি চান, যাতে শিল্পের পরিচালকের সঙ্গে নিম্নতম কর্মচারীরও ব্যক্তিগত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শ্রমিকমাত্রই কারখানাকে নিজের জিনিস বলে মনে করতে পারে, কারখানাজাত দ্রব্যকে নিজের সৃষ্টি বলে অনুভব করতে পারে। এই সব বিষয়ে গান্ধীজীর মতের সঙ্গে রাসেলের মতের একটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্বন্ধে মোটামুটি এই হ'ল রাসেলের মত। এর প্রত্যেকটি মতের বিরুদ্ধে অনেক কথাই হয়তো বলা যেতে পারে—কোন মত বা যুক্তির বিরুদ্ধেই তা বলা যায় না! তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, রাসেলের যুক্তির মধ্যে ভ্রম বা অসম্পূর্ণতা যদিও বা থাকে, বিদ্বেষ একেবারেই নেই। আর, যে মূলনীতির ভিত্তির উপর রাসেল তাঁর মতবাদের বিরাট প্রাসাদ খাড়া করেছেন, তাকে খণ্ডন করা সহজসাধ্য নয়,—অস্বীকার করা পায়ের নীচের মাটিকে সরিয়ে দেওয়ার মতই বিপজ্জনক।

প্রেমিকা

শ্রীদীপক পাল

মুদিত প্রেমের কমল-কলিকাটিরে
ঢেকেছে লজ্জা আঁধার-পর্ণপুটে।
উত্তরিবে যবে শরম-শেষের তীরে
আধো-জাগা প্রেম আপনি উঠিবে ফুটে।
প্রেম-অলকার সে-তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা প্রেমিকার অনুগামী—
হতাশা আমার নিরাশায় পড়ে লুটে।

সেই প্রণয়ের ঈষৎ মধুর গন্ধ
মরমে মরমে রহিয়া রহিয়া আসে।
হৃদয়ে যে-গান ঘুমাইছে নিস্পন্দ,
কণ্ঠের ভাষা কাঁপিছে তাহারি ত্রাসে।
তোমার প্রেমের অজানা অধরা আশা—
কোন্ রহস্যে মায়া-ঘেরা তার ভাষা,
ছায়াছবি আঁকে আমার চিত্তাকাশে।

ধৈর্যের সীমা শেষের প্রান্তে এসে
না-পাওয়ার ভয়ে গহনে হয়েছে হারা।
কান-খাড়া-করা রাসভেরা হেসে হেসে
মাভৈঃ বলিয়া সরবে দিতেছে সাড়া।
হতাদর প্রেম বেদনার ফুল তুলে
অবমাননার দরিয়ার কূলে কূলে
চলেছে প্রেমের আরতি করিতে সারা।

হে মোর মানসী, যাহা কিছু ছিল সাথে
চেয়েছি তোমার অঞ্চলে দিতে ঢাকি।
মরমের সাথী, তোমার পেলব হাতে
পরাতে চেয়েছি আমার হাতের রাখি।
কত অভিহত আশা ও না-গাওয়া গীতি
কত-না কুণ্ঠা-পলাতক ভীরু প্রীতি
বিদায়বেলায় থরে থরে আজও বাকী।

বিরূপ-হাস্যে যে-কামনা মল ধুঁকে
পুড়ে ছারখার যে ছাই রহিল পড়ে,
যে সিঁথির আলো শেল হয়ে বাজে বুকে
যে হারের দ্যুতি মিলায় দিগন্তরে—
সে তোমার প্রেম আমারে দিয়েছে হেলা—
তোমার দুয়ারে বারে বারে অবহেলা
রূঢ় হতাশার ঠাট্টা জানায় তারে।

চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পী গোপাল ঘোষ

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর, একপক্ষকাল ধরে ১নং চৌরঙ্গী টেরেস-এ শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা ছবির যে প্রদর্শনীটি হয়ে গেল, শিল্প-রসিকদের কাছে সেটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। গোপাল ঘোষ আমাদের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম, তাঁর ছবিও আমাদের কাছে বহু পরিচিত, প্রতি বছরই তাঁর প্রদর্শনী আমরা দেখে আসছি। এবারকার প্রদর্শনীতেও তাঁর সেই শিল্প-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। এবার আরও বিশেষ করে ভাল লাগল, তাঁর সেই সহজ রূপদৃষ্টির আন্তরিক প্রকাশ, যা তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনাকে একটি সুন্দর বিশিষ্টতা দিয়েছে। তাঁর কোন ছবিতেই চেষ্টাকৃত একটা উদ্দেশ্য আনার প্রয়াস নেই। তথাকথিত আধুনিকতার মোহে আমাদের দেশে একদল শিল্পী আজ শিল্পের নামে এক কিম্ভূত শিল্প সৃষ্টি করছেন। ইউরোপের নানা ইজম্-এর মোহে এঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ; এঁদের রচনায় তাই দেশের সত্যিকারের কোন পরিচয় ফোটে না। তাই দেশের মনকেও এঁরা স্পর্শ করতে পারেন না ছবির মারফৎ। গোপাল ঘোষের আগের বহু রচনা দেখে মনে হয়েছিল, তিনিও এই 'আধুনিক'দের দলভুক্ত হয়ে নিজের ক্ষমতার যেন কিছুটা অপব্যবহার করছেন। এবারকার প্রদর্শনীতে কিন্তু সে রকম কোন রচনা নেই, প্রত্যেকটি ছবিই তাঁর আন্তরিক একটি সৃষ্টির প্রেরণায় সুন্দর।

এই প্রদর্শনীর বিশিষ্ট আকর্ষণ হচ্ছে, তাঁর আঁকা বহু স্কেচ এবং রূপকথা অবলম্বনে রচিত কাল্পনিক চিত্রগুলি। পশু, পাখী, মাছ, ময়ূর, গাছ-পালা, মানুষ-জন কোনটিই বাদ পড়েনি, তাঁর কল্পনার জগৎ থেকে। এই স্কেচ-গুলোর মধ্যে আবার এমন অনেক ছবি আছে, যাকে প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর একটি ছবি বলা যেতে পারে। চীনা কাগজে দশটি ভাগে ভাগ করে চীনা 'স্ক্রোল' চিত্রের মত করে আঁকা ছবি-গুলোও ভাল লাগল, ওপরে এবং নীচে হলদে সিল্ক দিয়ে 'মাউণ্ট' করাতে আরও ভাল লাগছিল। তবে 'স্ক্রোল' চিত্রের যা নিয়ম, সেই-ভাবে সবগুলো ছবির যদি একটি ধারাবাহিকতা রাখা যেত, তাহলে ছবিগুলো আরও রসোত্তীর্ণ হত। স্কেচগুলোর মধ্যে 'মেয়ে ও পাখীরা (নং ৫৬), গ্রাম্য চরিত্র (নং ৫৮), পাখী (নং ৫৯), দুটি মেয়ে (নং ৬৭), দুটি চরিত্র (নং ৭১), নগ্না (নং ৮৪), নিবেদন (নং ৭৭) প্রভৃতি এবং নং ৯৮-এর প্রতীক্ষমানা মেয়েটি সুন্দর হয়েছে। সামান্য কটি দক্ষ লাইনে তিনি অব্যক্ত অনেক কথা আমাদের বলেছেন। কাল্পনিক রূপারোপে আঁকা ছবি-গুলোর মধ্যে ৬১নং, ৬৫নং ও ৯৩-৯৭নং ছবিগুলো মুগ্ধ করে—শিল্পীর কল্পনাশক্তিকে রূপায়িত করার সাবলীল ক্ষমতা দেখে।

রাঙা মেয়ে (নং ৩৮) ছবিটির রঙের ব্যবহার এবং ছন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু হাতের কছে এসে শিল্পীর অসাবধানতা একটু পীড়াদায়ক ঠেকে। আগাগোড়া যেমন সুষ্ঠু ড্রইং রাখা হয়েছে, তেমনই সুষ্ঠু ড্রইংএর



রহস্যময় হিমগিরি



মীনপুচ্ছ লীলা

সাহায্যে হাতের আঙুল প্রভৃতি দেখানো উচিত ছিল। ছবিটির আবেদন অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে হাত দুটো। গাগরী ভরণে (নং ৩৫) ছবিটির গতিছন্দ সুন্দর, কিন্তু শিল্পী তাঁর বহু কথাচিত্রে যেমন রেখার সংযম দেখিয়েছেন, তেমনই সংযম এখানে দেখালেও ছবিটি আরও ভাল হত। সব চাইতে মুগ্ধ করে মোলায়েম রঙে আঁকা তাঁর বাক্যহারা (নং ১৫), মেঘের নীড় (নং ৫), স্বর্গচূড়ায় (নং ১৪) ছবিগুলো। স্বপ্নলোক (নং ১৭) কোন এক সুন্দর স্বপ্ন-পুরীতে নিয়ে যায়। ছবিটি দেখে কানোয়াল কৃষ্ণের এবারকার প্রদর্শনীতে 'কুয়াশা' ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঝড়ের শেষ (নং ১) ছবিটিতে কালো আকাশের দিগন্তে ক্ষীণ আলোয় হলদে আভা ছবিটির নামকে সার্থক করেছে। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে এমন অনেক ছবি আছে, যেগুলো চড়া রঙের ব্যবহার বা অসাবধান রেখা ব্যবহারের জন্য রসোত্তীর্ণ হয়নি। প্রসঙ্গতঃ ঝড়ের বন্দী (নং ২০), বয়ঃসন্ধি (নং ৮) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। মর্ত্যের স্বর্গ ছবিটিতে লাল রঙের স্বপ্নপুরীটিকে আরও দূরে নিয়ে গেলে ভাল হত। দার্জিলিং (নং ৩৪) ছবিটির সম্মুখপটে গাছ দুটি চোখকে পীড়া দেয়—পটভূমিও সম্মুখ দৃশ্যের মত কাগজ-না-ছেড়ে করার জন্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। জল-পাহাড়ের দৃশ্য ছবিটিতে মধ্যে মধ্যে শাদা কাগজের 'গ্রেণ' বেরিয়ে থাকাতে সুন্দর 'এফেক্ট'এর সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া হলদিঘাট, রাজপুতনা (নং ১১) ছবিটিতে রঙের ব্যবহার প্রাচীন রাজপুত ছবির রঙের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং প্রথম



জল তরঙ্গ

দৃষ্টিতেই রাজপুতনার কোন দৃশ্যচিত্র বলে স্থির ধারণা হয়। কাঞ্চি (নং ২৫) ছবিটিতে চড়া রঙের ব্যবহার ছবিটির রসগ্রহণে বাধা দেয়নি, যদিও হাতে গিয়ে সেই একই দোষে দুষ্ট—রাঙা মেয়ের মতো। চীনে ধরণের অনেকগুলি কাজের মধ্যে 'পূর্বাচল' ছবিটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সব মিলিয়ে গোপাল ঘোষের এই প্রদর্শনীটি যে দর্শকদের গভীর আনন্দ দিয়েছে, সেকথা আগেই বলেছি। কলকাতায় এই শীত-কালে যে ক'টি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইতোমধ্যে হয়ে গেছে বা হবে, তার মধ্যে গোপাল ঘোষের এই একক প্রদর্শনীটি নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রদর্শনী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একাডেমী অব ফাইন আর্টস

একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর পঞ্চদশ বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীটি সাধারণের জন্য খোলা হয়েছে মূ্যজিয়মে গত ১৬ই আগস্ট থেকে। একাডেমি আজ ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্প-রসিকদের কাছে এবং গত দু বছরে এর উন্নতি আরও আশান্বিত করেছে শিল্পী মহল এবং রসিক সমাজকে। এবারকার প্রদর্শনীর মান যে গত বছর থেকে উন্নত, তা বলা চলে না মোটেই, তবে নানান দিক থেকে এবারকার প্রদর্শনী স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর মধ্যে প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আচার্য নন্দলাল অঙ্কিত চারটি ছবি এবারকার প্রদর্শনীর গৌরব বাড়িয়েছে। এর পরেই যাঁদের ছবি এবার প্রথম এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টার জন্য অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলকাতার রসিক সমাজের কাছে ধন্যবাদার্হ। আমাদের আধুনিক শিল্প যুগের দুই দিক্‌পাল অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ছবি ছাড়া এ-প্রদর্শনী যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। এঁদের আঁকা নতুন ছবি যদি প্রতি বছর না-ও পাওয়া যায়, তাহলে আলাদা করে প্রদর্শনীর সঙ্গে "loan section"এর ব্যবস্থা করে এঁদের এবং অন্যান্য শিল্পাচার্যদের পুরোনো ছবি দেখানোর উপায় করলে কলকাতার রসিকজন এবং ছাত্রসমাজ বিশেষ উপকৃত হবে। কারণ দেশের জনসাধারণ এবং চিত্রশিল্পের ছাত্ররা আমাদের শিল্পাচার্যদের আঁকা মূল ছবি দেখার সুযোগ প্রায় পায় না বললেই চলে। 'প্রিন্ট' যা আছে, তাও ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবির প্রিন্টের তুলনায় এত নিকৃষ্ট যে, তার থেকে মূল ছবি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা মোটেই জন্মায় না। আর বিদেশী ছবির প্রিন্ট কিংবা অ্যালবাম্‌ যেহেতু অতি সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়, সেহেতু আমাদের ছাত্ররা সেই সব কেনে এবং স্বভাবতঃই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নকলনবিশীর চর্চা করে। দেশের শিল্প-ঐতিহ্যকে প্রচার করায় তেমন প্রচেষ্টা নেই বলেই আমাদের তরুণ শিল্পীরা তাই আজ আদর্শভ্রষ্ট আর পরমুখাপেক্ষী।

কর্তৃপক্ষ ছবি টাঙাবার দিকে এবার আরও বেশি নজর দিয়েছেন দেখে সুখী হলাম। আচার্য নন্দলাল এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য শিল্পীর ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত ছবিগুলো যে ঘরটিতে টাঙানো হয়েছে, সেই ঘরটির সাজানো বিশেষভাবে ভালো লাগে। কিন্তু ছবির মনোনয়ন এবং পুরস্কার ঘোষণা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। শিল্পীর নাম দেখে নয়, ছবির গুণ আর সৌন্দর্য বিচার করেই ছবি মনোনীত হওয়া উচিত। নামকরা শিল্পী বলেই যেমন তাঁর যে-কোনো ছবি টাঙানো উচিত নয়, তেমনি আবার পারিতোষিক বিতরণে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা পরিচালিত হওয়াও অবাঞ্ছনীয়।

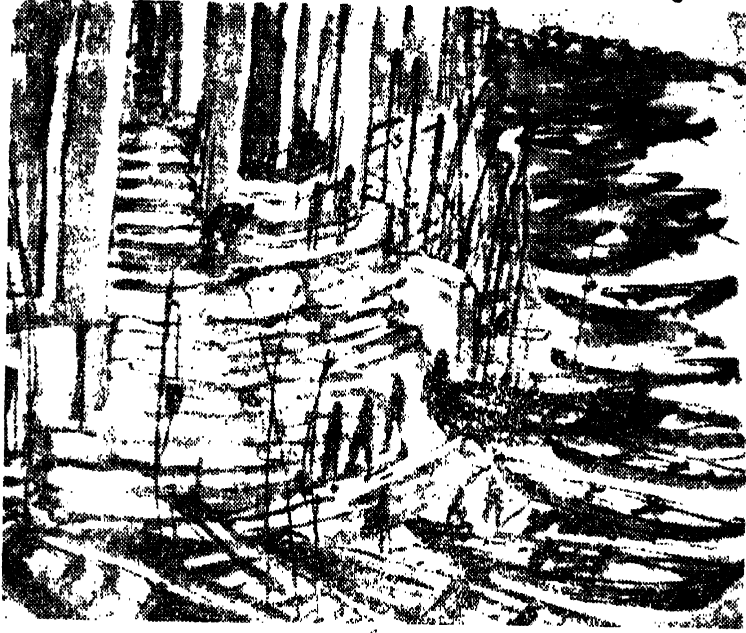
প্রদর্শনী ঘরে ঢুকেই ডানপাশের ঘরে তিন দিকের দেয়ালে অতি যত্নসহকারে স্থাপিত



দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা — শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু



দিনমজুর — শিল্পী রামকিঙ্কর



বারাণসীঘাটে শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আচার্য নন্দলাল অঙ্কিত ছবি চারটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঁ দিকের দেয়ালে স্থাপিত 'বাগোদর-হাজারীবাগ' (নং ৫৬) 'টাচে' আঁকা দৃশ্যচিত্র, গাছের ফাঁকে কয়েকটি যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক, বিষয়বস্তু যেমন একটু চমক লাগায়, রঙের খেলা তেমনি ভালো লাগে। বীণাবাদিনী (নং ৫৭) তাঁর পুরানো রচনা এবং সকলের কাছেই বিশেষ পরিচিত 'মুগা' সিল্কে 'Indian Red' রঙের লাইন দিয়ে আঁকা। রেখা-রচনায় আচার্য নন্দলালের আশ্চর্য দক্ষতা এ-ছবির প্রতিটি ছন্দোময় রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামনের দেয়ালে 'দার্জিলিং হতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য' (নং ৫৫) ছবিটি আগাগোড়া 'সবুজ পাথরের' রঙ দিয়ে আঁকা, কোথাও কোথাও কালোর দু-একটা টাচ্। দূরে যোগমূর্তি গিরীশ শায়িতরূপে কাঞ্চন-জঙ্ঘার চূড়া, পাহাড়ের কোলে কোলে শাদা হাল্কা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। নন্দলালের শিল্প-সাধনার এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই ছবিটির ধ্যানমৌন প্রশান্তি। 'বসন্ত উৎসব' (নং ৫৪) ডানদিকের দেয়ালে যেন বসন্তের সেই রঙীন আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যরতা মেয়েদের গতিছন্দ এবং হলদে রঙের সাড়ী একটি স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। সব কটি মেয়েকেই একই রঙের সাড়ী পরিয়ে শিল্পী রঙ ব্যবহারে যে সংযম এবং দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা বোধ করি নন্দলালের মতো মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শিল্পী অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত কিশোরী (নং ২৫৮), বেদাধ্যয়ন (নং ২৫৪), মাতৃত্ব (নং ২৫৭), প্রণয়পত্র (নং ২৫৬), প্রতীক্ষমানা (নং ২৫৫) ছবিগুলো যে শিল্পী কেন প্রদর্শনীতে দিয়েছেন বুঝতে পারলাম না—এর কোনোটাই রসোত্তীর্ণ হয়নি। ড্রইংয়ের বিকৃতি চোখকে পীড়া দেয়—সন্দেহ হয়, ইনিই কি সেই অসিতকুমার হালদার যিনি বিগত দিনে রাসলীলা, সুরের আগুন, দুর্যোগ রাত্রি, কুনাল, শিব ও উমা, বন্দিনী-সীতা প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন! তাঁর আজকের রচনা দেখে মনে হয়, যেন কোন তরুণ শিল্পীর অপটু হাতের আঁকা। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত আনন্দপুর (নং ৮৬) ছবিটিতে দিগন্তে নীল পাহাড় এবং মেঘের খেলা, পাহাড়ের কোলে কোলে ঘন সবুজ বন, নদীতটে গ্রাম্য লোকজনের ব্যস্ততা, নদীর চরে এক ঝাঁক মরাল, সমস্ত ছবিটায় একটি নির্জন শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। পীর পাহাড়ের দৃশ্য—মাত্র দুতিনটে 'প্যাস্টেল' রঙে অত্যন্ত জোরালো "এফেক্ট"-এর সৃষ্টি হয়েছে, দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া বেলা-ভূমি মনকে সেই সুদূরে টেনে নিয়ে যায়। শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার অঙ্কিত রাজগৃহে তীর্থযাত্রীদের আস্তানা (নং ১৭৭) ছবিটির রচনাচ্ছন্দ এবং রঙ মুগ্ধ করে। যত্নে অঙ্কিত এই চিত্রটিতে তাঁর অঙ্কন পদ্ধতির বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। স্কাউটদের ক্যাম্প (নং ১৭৮) এই প্রদর্শনীর অন্যতম সেরা ছবি। নির্জন পাহাড়ের কোলে স্কাউটদের তাঁবু এবং ছবিটির রঙে এক শান্ত পরিবেশ। হীরাচাঁদের সুক্ষ্ম-দৃষ্টি থেকে যেন কোন কিছুই বাদ পড়ে না, এ ছবিটিতে তার নজীর পাওয়া যায়। রাজগৃহ কুণ্ড (নং ১৭৯) ছবিটির কম্পোজিশন সুন্দর। শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্ম-পুকুর (নং ৩৫)-এর রঙ এবং পদ্মবনের শ্রী সকলকেই মুগ্ধ করে। বিনোদবিহারী মুখো-পাধ্যায় অঙ্কিত বারাণসীর ঘাট (নং ৩৫৫)



রাজগিরের কুণ্ড শিল্পী শ্রীহীরাচাঁদ দুগার



স্নেহ শিল্পী ধনরাজ

চীনা কালিতে আঁকা একটি বলিষ্ঠ রচনা—তুলির ছোপ দেখেই বোঝা যায় একটি আত্মনির্ভর শিল্পীমন। সূর্যমুখী (নং ৩৫৬) ছবিটিও চীনা কালীতে রেখায় ও টাচে অঙ্কিত, ফুলগুলির পাপড়িতে এখানে সেখানে হাল্কা হলদে রঙের 'টাচ' ছবিকে এক নূতন রূপ দিয়েছে। কাশ্মীরী শাল (নং ৩৫৭) ছবির পরিবেশ আধুনিক হলেও রূপোলী, লাল এবং হলদে রঙের খেলা এবং শালের অলঙ্করণ আর নক্সার কাজ সুন্দর। শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনালী ফসল (নং ৩৪) এবং নন্দিনী (৩৩) ছবি দুটি তাঁর সূক্ষ্ম অঙ্কন-দক্ষতার পরিচায়ক। সমরেন্দ্র গুপ্তের ছবি দুটি রীতিমত হতাশ করে, যদিও তাঁর পুতুলের বিয়েতে (নং ২৫১) নতুন ধরণে আঁকবার প্রচেষ্টা কিছুটা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতো প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম, তা পেলাম না। শিল্পী কৃপাল সিং কর্তৃক সত্যিকারের ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত পাবুজী রাঠোরের বিবাহ (নং ৫৬৫) রচনায়, রঙ ব্যবহারে, সূক্ষ্ম চিত্রণ ইত্যাদি সব দিক থেকে এই প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। সাদা গোলাপ (নং ৫৬৬) আর একটি ভাল ছবি, প্রথম দৃষ্টিতেই মুগ্ধ করে, সাদা রঙের ব্যবহারে ও দক্ষ লাইনে মুন্সীয়ানা আছে। ইন্দ্র দুগারের নিজস্ব রীতিতে আঁকা সিক্কের পরে 'বসন্ত' (নং১৮১) রাজগৃহের বৈভার গিরি (নং ১৮০) রাজপুতানায় নাহারগড় (নং ১৮২) ইত্যাদি কয়েকটি ছবিতে যে মৌলিকতা এবং সৃষ্টির আবেদন আছে, তা বিশেষভাবে দর্শকের মনকে স্পর্শ করে। ধীরেন ব্রহ্মর ছেলে খেলা (নং ৭০) এবং মহারাজা অশোক (নং ৬৯) ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত নিখুঁৎ কাজ। সরমা ভৌমিকের বাঁকা পথ (নং ৪৫) ছোট্ট ছবি কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্যে সকলের মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেফালী সরকার অঙ্কিত নোঙর আর নৌকা (নং ৫০৮) ছবিটিতে রঙের ব্যবহার মৌলিক—দেশী লাল, হলুদ-'ওকার' আর নীল রঙের বিন্যাসে আলঙ্কারিক কম্পোজিশন সুন্দর। এই ধরণের আর একটি মৌলিক রচনা শ্রীমতী আনন্দ করের আঁকা ছবিটি। কমলারঞ্জন ঠাকুরের সুরের জন্ম (নং ৬২৪) মোলায়েম রঙে ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত, কিন্তু মেঘ ও জলের ঢেউ প্রভৃতিও লাইনে করা উচিৎ ছিল যেমনভাবে 'ফিগারটি' করা হয়েছে। চলার পথে (নং ৬২৬) কিছুটা বাস্তবতার সংগে আঁকা মানুষগুলোর সংগে ওই একই ধরণের মামুলী কল্পিত গাছপালা প্রত্যেকটি ছবিতে



বিশ্রামরত শিল্পী শিল্পী চিন্তল কর



সাঁওতাল পল্লী

শিল্পী কৃপাল সিং

দেখে দেখে বড় দৃষ্টিকটু ঠেকে। ঠিক একই দোষে দুষ্ট তাঁর তপোবন (নং ৬২৭) নামে বিরাট ছবিটি। তা ছাড়া শিল্পী বড় ক্যানভাসে ছবিটিকে আয়ত্ত করে ঠিক তাল বজায় রাখতে পারেন নি। রঙের ব্যবহার কাঁচা। নিলীমা দের কপোত (নং ১৭০), সুধীর মুন্সীর সোনার বাঙ্গলা (নং ৩৭১) ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত এবং শেষের ছবিটিতে রঙের ব্যবহার খুব মোলায়েম। মোটের ওপর ভাল ছবিগুলোর মধ্যে তারাপ্রসাদ বিশ্বাসের বসন্ত (নং ৫৩) কে শ্রীনিবাসনের কালো মেয়ে (নং ৬০৪), ফণিভূষণের আল্পনা (নং ৪৩৪), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শিবাজী (৬৫০), অরূপ গুহ-ঠাকুরতার অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা (নং ২৪৩), পরেশ সিংহ রায়ের আস্তানা (নং ৫৯৯) ইত্যাদির নাম করা যায়। শিল্পী এ এ রাইবারের রচনাগুলির মধ্যে দু একটি একটু ভাল তবে কিছুটা 'ইলাস্ট্রেসন'ধর্মী। গোলক দাসের কাজগুলোর মধ্যে শান্তিনিকেতনের ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু মুখ প্রভৃতিকে বিকৃত করবার প্রচেষ্টার সার্থকতা কোথায়—তা বুঝতে পারলাম না। শুধু নতুন করবার ইচ্ছে ছাড়া এ আর কিছুই নয়। শেষগিরি রাওয়ের



লড়াই

শিল্পী জি ডি পলরাজ

স্যাটিসফাইড স্টম্যাক (নং ১২) ছবিটির নামকরণে খানিকটা ধোঁকা লাগাবার চেষ্টা থাকলেও, তাঁর রঙের ব্যবহারে মুন্সীয়ানা আছে। অর্ধনারীশ্বর (নং ৩১৮) আচার্য নন্দলাল ও যামিনী রায়কে ব্যর্থ অনুকরণ করার প্রচেষ্টা মাত্র। কানোয়াল কৃষ্ণের নেপাল-চিত্রলের দৃশ্য চিত্রগুলি এই প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ, সামান্য রঙে কাগজ ছেড়ে কাজ করার মধ্যে তাঁর মুন্সিয়ানা ফোটে। বীরেন দের রচনাগুলো দেখে মনে হয় যেন ক্যালেন্ডারের ছবি—তা ছাড়া আর্ট স্কুলে এই ধরণের কাজ প্রায় সকলেই করে। কোনো নূতনত্ব নেই কাজগুলোর মধ্যে। তবু এদের মাঝে 'বর্ষায় ল্যান্সডাউন' বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণ চক্রবর্তীর ছবিগুলো সেই একই ধরণের—তাঁর এ ধরণের ছবি প্রদর্শনীতে আর না দেওয়াই ভাল। কেশরী মহাজন, ভবানী দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, মনোহর যোশী, এচ এম পাদে প্রভৃতির আঁকা কোন না কোনো ছবি রচনা, রঙ বা বিষয়বস্তুর কোনো না কোন বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য। মুরলীধর টালীর স্টাডি, বিমল দাশগুপ্তের নৈশলমের দুর্গ (নং ১৫৭) রোদের ছোঁয়ায় সুন্দর রূপ নিয়েছে, কিন্তু সম্মুখে পটে কিছু লোকজন না দিলে রঙ ফাঁকা ঠেকেছে।

গ্রাফিক শিল্প বিভাগে অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কুয়াশা', কৃপাল সিংহের শান্তিনিকেতন, সুন্দর শেঠের প্রতিকৃতি, মাখন দত্ত গুপ্তের মা ও ছেলে, সুমঙ্গল সেনের বিশ্রামরতা এবং হরেন ঘোষের রচনাগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তেলরঙের কাজগুলোয় শিল্পী যতীশ সিংহের সেই নগ্ন মূর্তি, পুরাণ-কাহিনীর হাস্যকর চিত্ররূপ, বাহুতটে শায়িতা মেয়ে এ যেন আর দেখা যায় না—সেই একই ঢংয়ের একই বিষয়বস্তু, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বরাবরই দেখছি। জে পি গাঙ্গুলীর কাজগুলোতে নেই কোন নূতনত্ব, সেই সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় এবং বেগুনে ফুল। কতকাল এ আর দেখা যায়? অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিলাভেন্ডীর আদিবাসী (৮৩) ছবিটিতে পাহাড়ের রঙের Texure এবং পরিবেশ সুন্দর, পাহাড়ের ফাঁকে দূরে নীল আকাশ বিরাটত্বের সূচনা দেয়। ভুটিয়া মা (নং ৮৭) ছোট্ট একটি সুন্দর কাজ, স্নেহপরায়ণ ভুটিয়া মা-র এবং ঝুড়িতে ছোট্ট ছেলেটির ভাবের প্রকাশ এবং ছবিটির রং বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভি ডি চিঞ্চলকরের প্রত্যেকটি ছবিই এবারকার প্রদর্শনীর বিশিষ্ট সম্পদ। তাঁর ছবিগুলোর রঙের সংস্থাপন, কম্পোজিশন, রঙের প্রয়োগ অপূর্ব এবং প্রতিটি কাজে সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বিশ্রামরত শিল্পী (নং ৭৭) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। এ ছাড়া দুপুরের বিশ্রাম (নং ৮১) ছবিটিতে ঝুড়িতে বসা মেয়েটির সুন্দর ভাবভঙ্গি, বারাণসীর ঘাটে কর্মব্যস্ততা এবং রঙের খেলা, পিচোলা হ্রদ এবং উদয়পুর প্রাসাদ (নং ৭৯)এর বিরাটত্ব এবং গোলী কন্যা (৭৮) ছবিটির সহজ সরল মেয়েটির কর্মরত ভাবটি অতি সুন্দর ফুটেছে। ললিতমোহন সেনের ছবিগুলো যাঁরা তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের বেশী ভাল লাগবে, সেই একই পদ্ধতিতে আঁকা, সেই কম্পোজিশন কুঁড়েঘরের চালায় আর দেয়ালে রদ্দুরের খেলা, তবু তাঁর প্রত্যেকটি কাজই রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং সহজেই আকৃষ্ট করে। মাখন দত্ত গুপ্তের জেলে-নৌকা (নং ১১৪) ছবিটিতে 'প্রিমিটিভ'দের মত নৌকার গায়ে লাল রঙের ব্যবহার এবং আদিম নক্সার কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হৈমন্তী সেনের বর্মী মেয়ে (নং ৫২৯) অতি সুন্দর কাজ, রং বসানোর কায়দা এবং পাতলা জামার আভাসে মুন্সিয়ানা আছে, নুসেল হোয়াইটের আঁকা রাধাকৃষ্ণের প্রতিকৃতি (নং ২৭৫এ) একটু আড়ষ্ট হলেও ভাল কাজ, ক্যানভাসের টেক্‌শ্চারের সঙ্গে মানিয়ে কাজ করাতে মুন্সিয়ানা আছে। কিশোরী রায়ের 'To be or not to be' (নং ৪৬৪) একটি প্রাণবন্ত কাজ। জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের প্রায় ভ্যানগগের ব্যর্থ অনুকরণগুলো এবং আউটব্রিজের লাল রঙের কতকগুলো তৃতীয় শ্রেণীর ছবি কেন যে টাঙ্গানো হল বোঝা মুশকিল। ঠিক একই কথা বলা চলে নীরেন ঘোষের 'বনে বসন্ত' ছবিটির বিষয়ে। বীরেন শীলের ধান-বোনা (নং ৫১২) ধান কাটছে না পুকুরে স্নান করছে ধরা মুশকিল। সুধীর খাস্তগীরের



কর্মরতা — শিল্পী হুসেন



সুখী দম্পতী — শিল্পী হরেন দাস

তিনটি ছবির কোনোটাই রসোত্তীর্ণ হয়নি—তাঁর 'আধুনিক'ভাবে কাজ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ রচনাগুলি রীতিমত মুদ্রাদোষে দুষ্ট। সত্যেন ঘোষালের ইকরি-মিকরি লাইন ওয়ালা বিরাট বিরাট ছবিগুলো না টাঙালেই ভাল হত। ছবিগুলো চোখকে পীড়া দেয়। ইথেল শী'র 'রেড্ মুন' (নং ৫৬৩) একটি নূতন ধরণের কাজ। দ্বারকেশ যোশীর উদয়পুরের দৃশ্য (নং ২৭৩) অনেকটা চিন্তলকরের কাজ বলে ভ্রম হয়। কাজটায় প্রকৃতির বিরাটত্ব এবং উদয়পুরের হ্রদের বাহার ধরা পড়েছে। 'মডার্ন'(?) ছবিগুলোর মধ্যে শিল্পী রামকিঙ্কর অঙ্কিত কএকটি ছবি এবারকার প্রদর্শনীর আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ, রঙের ব্যবহারে এবং প্রাণচঞ্চল গতিছন্দে প্রতিটি ছবি মুখরিত। সাঁওতাল পরিবার (নং ২৮৯) ও হেমন্ত (নং ২৮৮) ছবি দুটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর একটু abstract ছবি মজুরদল (নং ২৮৭) এবং ঘরমুখো (নং ২৯০) প্রথম দৃষ্টিতে অবোধ্য ঠেকলেও কর্মরত কুলীমজুরদের ব্যস্ততা এবং দিনান্তে বাড়ির পথে মোষদলের যাত্রা রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে না। এর পরই শিল্পী গোপাল ঘোষের বলিষ্ঠ তুলির ছোপে আঁকা ছবিগুলোর রঙ ও বিষয়বস্তুর চিত্রণ সুন্দর। সুখ (নং ২৩৩) ছবিটিতে রঙের ব্যবহারে আনন্দোচ্ছল জীবনের পরিচয়, 'A pair'এ ভীত চকিত কপোতদুটি—দূরে ঝড়ের ইঙ্গিত, সাঁওতালী পথের উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা পথের ঝোপঝাড় মিলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে তা আর কোন ছবিতে বিরল। কিশোরী (নং ২৩২) বিরাট নীল গাছের নীচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে—রঙের এবং কম্পোজিশনে দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, দেবযানী কৃষ্ণার প্রধান কাজ (নং ৩১১) পারিবারিক প্রতিকৃতি (নং ৩১২) Killing the Mara মুগ্ধ করে। যোগেনের Players Spirit (নং ২২৪) লম্বা লম্বা ভূতের মত খেলোয়াড়দের বিকৃত করে মডার্ন'এর নামে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা অসহ্য। রথীন মৈত্রের ছবিগুলোর মধ্যে 'Girl with a Vase' (নং ৩৩২)এ রঙের প্যাটার্ন করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। কল্যাণ সেনের বিদেশীয় তৃতীয় শ্রেণীর অপাংক্তেয় ছবির ব্যর্থ অনুকরণ, ছবির সামনে আর দাঁড়াবার ইচ্ছে করে না। 'প্রদর্শনী' ছবিটিতে ফর্ম-এর আগাগোড়া বিকৃতি কিন্তু পটভূমিতে ফিনিশড কাজ কেন—সেখানে বোধহয় বিকৃত করা তাঁর শক্তিতে কুলোয়নি। 'প্রসাধন' ছবিটি এদের মধ্যে তবু ভাল। হরেকৃষ্ণের বাজার দৃশ্য, এক্কাগাড়ী ভ্যান গগের মত তুলি চালনার প্রচেষ্টা—তবু মন্দ নয়। W. Langhammer-এর বিশ্রাম ও চাষী দম্পতি কোথাও কোথাও চড়া রঙের জন্য দৃষ্টিকটু ঠেকে, এইচ গাড়ের হলুদ-বন (নং ২০২)এর গাছগুলো এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ঘন নীলের খেলা ছবিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছে। লক্ষ্মণ পাইয়ের Water Carrierএর ছন্দ এবং নতুন করে আঁকবার পদ্ধতি দর্শককে ছবিটির সামনে নিয়ে যায়।

ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে শ্রীরামকিঙ্করের দুটি রচনা নতুন দৃষ্টিতে গড়া, গতিছন্দে মুখরিত। ললিত সেনের পোর্সিলেনের মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যদিও পায়ের দিকে কাটা কাটা ঠেকে। সুনীল পালের অনন্ত যৌবন, উদ্দাম যৌবনের মূর্ত প্রতীক। এর দুটো স্থাপত্য—ডিজাইনে ভারতীয় প্রথার কাজ সুন্দর। নটীর ভঙ্গীমাটিও মধুর। অন্যান্য কাজের মধ্যে বিভূতি সেনের দুর্গা প্রতিমা, সতীশ চক্রবর্তীর বড়দাদা, প্রমোদগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'মারবল স্টাডি', শ্রীদাম সাহার গণেশ, বিপ্রচরণ মহান্তীর মা ও ছেলে, জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আলিঙ্গন, ধনরাজ ভগতের মমতা, ঘোড়া ও সহিস, দিনমজুর, সুধীর সাহার ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতি শিল্পীদের নিজস্ব রীতিতে নমুনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। শ্যামাপদ ভাস্করের একটি হাতীর দাঁতের কাজ আশ্চর্য সুন্দর। এই রচনাটির মধ্যে ভাস্কর্যের যে দক্ষতা ফুটেছে, তা আজকের দিনে বড়ো একটা দেখা যায় না।

শ্রীসহস্রাক্ষ

ক্যালকাটা ফটো সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফ্কা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

"আমার মনে হচ্ছে, আপনি এখানকার সব অব্যবস্থার প্রতিকার করতে উদ্গ্রীব।" চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টির পাহারা দিয়ে আস্তে আস্তে মেয়েটি বলল। তার তাকানোর ভঙ্গীতে মনে হয় যেন উভয়ের পক্ষেই গুরুতর কোন বিষয় সম্পর্কে সে কথা বলছে। " আপনার কথা থেকে এমন কিছুই একটা আমি অনুমান করছিলাম। অবশ্য আপনার কথার সবটুকু আমি শুনতে পাইনি। মাত্র কিছুটা শুনেছিলাম। শুরু থেকেই সব কথা শোনবার ভাগ্য আমার হয়নি। আমি তখন নীচে ছাত্রটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। আপনার কথাগুলো আমার বেশ ভাল লেগেছে। উঃ কি ভয়ানক জায়গা এটা।" কথাগুলো শেষ করে মেয়েটি থামল। একটু পরে 'কে'র হাতখানা সে তার মুঠোয় তুলে নিল। "আপনার কি মনে হচ্ছে, এসব অব্যবস্থার প্রতিকার আপনি করতে পারবেন।" 'কে' এবার সামান্য একটু হাসল। তার হাতটা একটু নাড়ল, মেয়েটির নরম আঙুলের মুঠোয়। কে বলল, "কিন্তু এ-জায়গায় আমার কিছু করবার নেই। আর তুমি যদি এমন কোন কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বল, তাহলে হয় তিনি তোমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবেন, নতুবা কোন দণ্ড তোমাকে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনও স্বপ্নেও আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা ভাবতে পারি না। এবং এখানকার বিচার-ব্যবস্থার প্রতিকার সম্পর্কে ভাবতে এক ঘণ্টার ঘুমও নষ্ট করতে রাজী নই। তবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেই আমায় নানা কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ে, কোনভাবে যদি তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি, খুশিই হব। তবে তোমাকে আমি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি পরাহিতাকাঙ্ক্ষী বলে দিচ্ছি না। কারণ এর বদলে তুমিও আমাকে সাহায্য করতে পার।"

"আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

"ওই টেবিলের ওপরকার বইগুলো আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দেখতে দিয়ে।"

"বেশ তাই হবে।" মেয়েটি কে'কে তার সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এল। বইগুলো বহু পুরনো। অনেক হাতে ঘোরার পর বইগুলোর পাতার পাশগুলো দুমড়ে গেছে। একটার মলাট সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। অন্যগুলোর পাতা কোন রকমে সুতোয় আটকে আছে মাত্র।

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "এখানকার সব কিছুই কি রকম নোংরা।" ফলে মেয়েটি 'কে'র হাত দেওয়ার আগে তার অ্যাপ্রন দিয়ে বইয়ের ওপরকার ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল। 'কে' বইগুলোর প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা উল্টেই দেখল একটা অশ্লীল ছবি। ছবিতে একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উলঙ্গ হয়ে সোফায় বসে আছে। ছবিখানা দেখলেই চিত্রকরের অশ্লীল উদ্দেশ্য বেশ বোঝা যায়। ছবিগুলো এত স্থূলে ধরণের যে, শিল্প-চাতুর্যের বিন্দুমাত্র চিহ্নও তা থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছবিতে দুটো নগ্ন দেহকেই শুধু আঁকা হয়েছে। যা মানুষের কোন বৃত্তিকেই আকর্ষণ করে না। অন্য কোন বইয়ে আর 'কে' চোখ দিল না। আর একখানা বইয়ের নামটা একবার দেখল মাত্র। সেখানা একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির নামঃ How grete was plagued by her husbands Hous.

"এসব আইনের বই এখানে পড়া হয়।" কে বলল। "আর এখানকার এই লোকগুলো আমার বিচার করবে।"

"আমি আপনাকে সাহায্য করব।" মেয়েটি বলল। "আমার সাহায্য পেতে কি আপনি চান?"

"কোনরকম অসুবিধায় না পড়ে তুমি কি আমায় সাহায্য করতে পার? কিছুক্ষণ আগেই তুমি আমাকে বলেছ, তোমার স্বামী ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সম্পূর্ণভাবে কৃপানির্ভর।" এর উত্তরে মেয়েটি বলল, "তবু আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই। আসুন এ বিষয়ে আমরা আলাপ করি। আমার অসুবিধার কথা ভাববেন না। বিপদ সম্পর্কে আমার যত ভীতি, তা ভয় পেতে চাই বলেই। আসুন।" সে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে 'কে'-কে জায়গা করে দিল।

"আপনার কালো চোখ দুটি কি সুন্দর!" কে'র মুখের দিকে তাকিয়ে বসবার পর মেয়েটি বলে। "আমি লোককে বলতে শুনেছি, আমার চোখও নাকি সুন্দর। কিন্তু আপনার, আপনার আরও সুন্দর। আপনাকে এখানে প্রথম দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেইজন্যই আমি পরে মিটিং হলে গিয়েছিলাম। এমন ধরণের কাজ এর আগে আমি কখনই করিনি। আর ও ধরণের কিছু করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধও বটে।"

"ওঃ, তাই এত কাণ্ড।" কে' ভাবল। সে নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করতে চায়। আর সকলের মত তারও চরিত্র বলতে কিছু নেই। এখানকার কর্মচারীদের আর তার ভাল লাগছে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নূতন যারা এখানে আসে, যাদের তাকে ভাল লাগে, তাদেরই সে বলবে, একই কথা বলবে। আপনার চোখ বড় সুন্দর।" পায়ের পাতায় ভর করে কে এবার উঠে দাঁড়াল। যেন সে এতক্ষণ ভাবছিল না। কথাই বলছিল। তার সমস্ত অবস্থা ব্যাখ্যা করছিল। "আমার মনে হয়না, তুমি আমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পার, কে বলল; আমাকে সাহায্য করতে হলে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমি নিশ্চিত, সে রকম কোন পরিচয় এদের কারো সঙ্গে নেই। তোমার আলাপ শুধু নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে। যারা এখানে দল বেঁধে এসে জোটে। তুমি তাদের সাহায্যে আমার জন্য হয়ত কিছু করতে পার। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তারা যা করতে পারবে, তার দ্বারা মামলার তেমন কোন সুরাহা হবার আশা নেই। আর আমাকে সাহায্য করতে এলে তুমি তোমার কয়েকজন বন্ধুকেও হারাবে। আমি তা চাই না। এসব লোকের বন্ধুত্ব তোমার প্রয়োজন। অতি দুঃখের সঙ্গেই আমি একথা বলছি।

তোমার প্রশংসার উত্তরে আমার বলতে বাধা নেই। তোমাকে আমারও ভাল লাগে। বিশেষ করে তোমার ধূসর দৃষ্টি, যা এখনও তোমার চোখে। তবে দেখ, এ-ব্যাপারে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। মানুষের ভীড়েই তোমার জায়গা, যে ভীড় আমি পছন্দ করি না কিন্তু এর মধ্যে বেশ সহজ হতে পার। তুমি এখানকার ছাত্রটিকে ভালবাস। তা যদি না-ও হয়, তবে আমি বলতে বাধ্য, অন্তত তোমা স্বামীর চেয়ে তুমি তাকে বেশি পছন্দ কর এ তোমার কথা শুনেই বোঝা যায়।

'না, না। না উঠেই চীৎকার করে উঠ মেয়েটি। তারপর 'কে'র হাতখানা জড়িয়ে ধর মাত্র। "আপনি যাবেন না, আমার সম্পর্কে ভু ধারণা নিয়ে আপনি যাবেন না। এভাবে এখা থেকে চলে যেতে কি আপনার একটুও বাধে না। আপনার কাছে কি আমার কোন মূল্য নেই। আমার কাছে কি আরও একটু, আর কিছুক্ষণ বসতেও আপনার বাধা, এটু অনুগ্রহও আপনি আমায় করতে পারেন না

তুমি আমায় ভুল করছ। এই বলে 'কে' আবার বসে পড়ল। 'তুমি যদি যাও আমি খুশি হয়েই এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকব। আমার হাতে এখন প্রচুর সময়। কোর্টের সওয়াল আজও হবে, এই ভেবেই এখানে আমি এসেছিলাম। তবে আমার মূল কথা হল, আমার মামলা সম্পর্কে তোমায় অনুগ্রহ করে কিছু না করতে বলা। তুমি এ কারণে অসন্তুষ্ট হও না। তুমি যখন জানবে, আমি এই মামলার ব্যাপারটা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, এবং বিচারে যদি আমার কোনও শাস্তি হয়, তবে হাসব, তখন তোমার নিশ্চয়ই ক্ষোভের কোনও কারণ থাকবে না। তবে আমার মনে হয় না কোর্ট এসম্পর্কে কখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই সমস্ত কিছুই ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে। আর তা' না হলে শীঘ্রই দেওয়া হবে। কারণ এ মামলার তদন্তের ভার যাদের ওপর তারা অত্যন্ত অলস। তাই সব কিছু ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। অথবা তারা কিছু অর্থ আমার কাছ থেকে পাওয়ার আশায় মামলার একটি অভিনয়ও চালিয়ে যেতে পারে। তবে তোমায় আমি বলছি। তারা যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। আমি কখনও কাউকে ঘুষ দেই না। তবে নেহাৎই যদি তুমি আমার জন্য কিছু করতে চাও তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে এ কথা জানিয়ে দিতে বলো, যে কোনো বিষয়েই আমি ঘুষের পক্ষপাতী নই। আর ঘুষ দেয়ায় আমি কখনই প্রলুব্ধ হব না, অথবা ফন্দি ফিকির করেও কোনোভাবে কাউকে আমি ঘুষ দেব না। এইসব লোক যারা ঘুষ নিতে বেশ উদ্‌গ্রীব, কোনোভাবেই তারা আমার কাছ থেকে এক আধলাও বার করতে পারবে না। তুমি ওদের একথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও। তবে আমার মনে হয় এরই মধ্যেই ওরা এব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। আর যদি না-ই পেরে থাকে তবে সংবাদটা না জানালেও এমন কোনো ক্ষতি নেই। অবশ্য জানা থাকলে কিছু অসুবিধার হাত থেকে তারা বেঁচে যাবে। আর আমাকেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করতে হয় না। নেহাৎই যদি তেমন কিছু ঘটে, যার ফলে তাদের বেশ অসুবিধা হতে পারে, তবে তার সম্মুখীন হতেও আমি রাজী। তবে আমি দেখতে চাই ওরা অসুবিধায় পড়ুক। ও, একটা কথা। তোমার সঙ্গে কি ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপ আছে। 'নিশ্চয়ই'। মেয়েটি বলল। 'আর আপনাকে যখন আমি সাহায্যের কথা বলি, তখন তার কথাই আমার সর্বপ্রথম মনে হয়েছিল। আমি জানতাম না, সে একজন সামান্য কর্মচারী। তবে আপনি যখন বলছেন, কথাটা অবশ্যই সত্যি। অবশ্য একথাও আমার মনে হচ্ছে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ মহলে সে যে রিপোর্টগুলো পাঠিয়েছে, তা নিশ্চয়ই তাদের মতামত প্রভাবিত করবে। আর সে অনেকগুলো রিপোর্টই পাঠিয়েছে। আপনি বলছিলেন, সব কর্মচারীই কুঁড়ে। কিন্তু তা' সবার সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়। বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট। সে সব সময়েই রিপোর্ট লেখে। যেমন গত রবিবার সন্ধ্যের পরেও কোর্টের কাজ চলেছিল। অধিবেশনের পর সকলেই চলে যায়। কিন্তু সে একা কোর্টে থেকে গেল। আমি তাকে আমাদের রান্নাঘরের ছোট ল্যাম্পটা দিয়ে এলাম। আমাদের ওই একটাই ল্যাম্প। তারও আলো খুব দরকার ছিল। দেখলাম আলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে লিখতে আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে আমার স্বামী বাড়ী ফিরল। রবিবার তার কোনো কাজ থাকে না। আমরা আমাদের ফার্নিচারগুলো সরিয়ে আনলাম। আবার ঘরটিকে আগের মত গুছিয়ে নিলাম। তারপর আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী এল। তাদের সঙ্গে আমরা মোমবাতির আলোয় কথা-বার্তা বললাম। বলতে কি এতক্ষণ আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কথা মনেও আসেনি। আমরা শুয়ে পড়লাম দুজনে। হঠাৎ অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেট চুপচাপ আমাদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একহাত দিয়ে সে আলোর রেখা আড়াল করবার চেষ্টা করছে। যাতে আমার স্বামীর মুখে আলো না পড়ে। এমন ধরণের সতর্কতার কোনো দরকারই ছিল না। আমার স্বামীর ঘুম এত গভীর যে, আলোতেও তার ঘুম ভাঙে না। আমি এত অবাক হয়েছিলাম যে, আর একটু হলে প্রায় চিৎকার করে উঠতাম আর কি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভাল। সে আমাকে সতর্ক করে দিল। ফিস ফিস করে আমার কানে কানে বলল, তখন পর্যন্ত সে লিখছিল। সে আলোটা ফিরিয়ে দিতে এসে-ছিল। আর বলল কি জানেন! আর বলল, সে জীবনেও ভুলবে না আমার শুয়ে থাকার দৃশ্য। আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে সে সব সময়েই লেখে। এতে নিশ্চয়ই আপনার মামলার রিপোর্টও ছিল। কারণ ও দুদিনের অধিবেশনে আপনার মামলাটার গুরুত্ব কম ছিল না। আর অতবড় রিপোর্ট নিশ্চয়ই বাজে হতে পারে না। আপনি বোধহয় অনুমান করতে পেরেছেন, সে বেশ আমার সম্পর্কে তার পর থেকে মনোযোগী হয়ে পড়েছে। সে দিন-ই বোধহয় সে আমাকে প্রথম দেখল। আমি তার ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছি। এছাড়া অন্য অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি, যাতে করে আমি বুঝতে পেরেছি, সে আমার অনুগ্রহ চায়। গতকাল সে ছাত্রটির মারফৎ আমার জন্য এক জোড়া মোজা পাঠিয়ে দিয়েছে। ছাত্রটি তার সঙ্গেই কাজ করে। তাদের দুজনের মধ্যে বেশ মিল আছে। অবশ্য সে বলেছে কোর্ট-ঘর পরিষ্কার করার ওটা পুরস্কার। কিন্তু তা একটা অছিলা মাত্র। কারণ ওঘর পরিষ্কার রাখা আমার কাজ। আর পুরস্কার আমার স্বামীর প্রাপ্য। আমার নয়। বড় সুন্দর মোজা-গুলো। দেখুন,"—মেয়েটি তার পা-দুটো ছড়িয়ে দিল। মোজা দেখাবার জন্য স্কার্টটা হাঁটুর ওপর তুলে আনল।—"মোজাগুলো অত্যন্ত সুন্দর। আর কি মসৃন দেখুন, কিন্তু আমার মত মেয়ের এসব মানায় না।"

আবার হঠাৎ মেয়েটি 'কের' হাতের ওপর ভেঙে পড়ল। 'কের' হাতের ওপর আবার তার হাত। তার ভঙ্গীতে কেমন যেন নিশ্চয়তা দেবার ভঙ্গী। সে বলল: 'চুপ, বার্টল্ড আমা-দের লক্ষ্য করছে'। একথায় আস্তে আস্তে 'কে' তার চোখ তুলল। আদালত ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বেঁটে যুবক। তার পা-দুটো অনেকটা ধনুকের মত। চালচলনে কিছুটা গাম্ভীর্য আনার চেষ্টায় মুখে সে তার নাতিঘন লালচে দাড়ির কয়েকটি গোছ রেখে দিয়েছে। দাড়িতে সে কেবলই আঙুল বোলাচ্ছে। 'কে' বেশ কৌতূহলী হয়ে লোকটার দিকে তাকাল! তার মনে হল এই অদ্ভুত আইন বিভাগের সে একজন ছাত্র। যার বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। আর এই ছাত্রটিই হয়ত কালে কালে এখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে যাবে। কিন্তু মনে হল, ছাত্রটি 'কে'র প্রতি দৃষ্টিই দিচ্ছে না। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে যেন কি-একটা সংকেত করল। এই প্রথম সে তার দাড়ি থেকে আঙুল তুলে এনেছিল। ছেলেটি তারপর জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি এবার 'কে'র কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল: আমার ওপর রাগ করবেন না, লক্ষ্মীটি। আমার সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা করবেন না। আমাকে এক্ষুণি ওর কাছে যেতে হবে। দেখছেন না, কি ভয়ানক ওর চেহারা। পা দুটো কেমন বাঁকা। কিন্তু আমি এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে আসছি। তখন আমি আপনার সঙ্গে যাব। আপনি যদি চান, তবে আপনার সাথে আমি সব জায়গাতেই যেতে রাজী আছি। আমাকে আপনি যা চান, তাই করতে পারেন। এখান থেকে আমি বাইরে যেতে পারলে বেঁচে যাই। আর সে যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয়। আমি আর এখানে ফিরে আসতে চাই না।" শেষবারের মত মেয়েটি কের হাতের ওপর আবার মৃদু চাপ দিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি জানালার পাশে সরে গেল। ইচ্ছা না থাকলেও 'কে'র হাতটা মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরতে শূন্যে এগিয়ে গেল। মেয়েটি সত্যিই 'কে'-কে আকর্ষণ করেছে। আর এই মুগ্ধতায় তার মন্দ না হওয়ারও কোনো যুক্তি নেই। এবার তার মন থেকে সন্দেহ সরে গেল। তার আর মনে হ'ল না আদালতের নির্দেশে মেয়েটি এমন

করে তাকে প্রলুব্ধ করছে। মেয়েটি কি ভাবেই বা তাকে শিকার করতে পারে? এখনও কি এই আদালতের নিয়ম নির্দেশ অগ্রাহ্য করবার মত সে মুক্ত নয়? অন্ততঃ তার ক্ষেত্রে আদালতের নিয়মকানুন যতটুকু প্রযোজ্য। এমন একটি সামান্য ব্যাপারেও কি সে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না? মেয়েটি সাহায্য করবার যে প্রতিশ্রুতি জানিয়েছিল, কই, তাতে কপটতার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেই প্রতিশ্রুতির সবটুকুই অগ্রাহ্য করার মত নয়। মেয়েটিকে যদি 'কে' তার সঙ্গে নিয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেট আর অনুচররা খুব জব্দ হবে। এর থেকে এদের ওপর আর উপযুক্ত কি প্রতিহিংসা নেওয়া যায়? মেয়েটি যদি 'কে'র সঙ্গে চলে যায়, তখন হয়ত একদিন ম্যাজিস্ট্রেট 'কে' সম্পর্কে তার মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করবার কাজ শেষ করে মেয়েটির ঘরে আসবে। এসে দেখবে, মেয়েটি নেই। তার শয্যা শূন্য। তখন মেয়েটি 'কে'র কাছে। এই মেয়েটিই, যে এখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, সে তখন একমাত্র 'কে'র। একান্তভাবেই তার। কালো খসখসে পোষাকের নীচে নরম মোমের মত মসৃণ দেহ, যা নিয়তই ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করে। তার সমস্ত উত্তাপটুকু 'কে'র। আর কারো নয়।

মনে মনে এতক্ষণ শুধু সন্দেহ আর দ্বিধার ঢেউ তুলেছে সে। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ওদের ফিসফিসিয়ে আলাপ যেন অনেকক্ষণ ধরে চলছে। এবার সে টেবিলের ওপর আঙুলের গাঁট দিয়ে শব্দ করল। তাতেও কথা শেষ না হওয়ায় কিল মারতে আরম্ভ করল টেবিলের ওপর। ছাত্রটি মেয়েটির কাঁধের ওপর দিয়ে 'কে'র দিকে অল্প একটু তাকাল। কিন্তু চলে গেল না। বরঞ্চ মেয়েটির আরও ঘনিষ্ঠ হল। তার কোমর জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি আগ্রহে ছেলেটির কাছে মাথা সরিয়ে আনল, যেন কত মনোযোগ দিয়ে সে তার কথা শুনছে। আর এমন করে মুখ সরিয়ে আনায় ছেলেটি তার গলার ওপর চুমু খেল। এমনকি ভাবল না একবারও 'কে' কি মনে করতে পারে। এব্যাপারে ও জায়গায় স্বৈরাচার সম্পর্কে 'কে'র মনে আর সন্দেহ থাকল না। এইসব নিয়মেই ছাত্রটি মেয়েটিকে এত জবরদস্তি করতে পারছে। মেয়েটিও তার কাছে এ অভিযোগ করেছিল। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কে' তার হাঁটুতে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘরে পাইচারি আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে ছাত্রটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কিভাবে তাড়াতাড়ি এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তার এমন করে চলাফেরা করায় নিশ্চয় সে বেশ বিরক্ত বোধ করছে। তাই যখন 'কে' শুনল ছেলেটি রেগে গিয়ে বলছে, "আপনি যদি এমনই অধৈর্য হয়ে থাকেন, তবে আপনি অনায়াসে চলে যেতে পারেন। পথে কিছুই আপনার পথ রোধ করে দাঁড়াবে না। বাস্তবিক পক্ষে আমার এঘরে আসার পরই আপনার চলে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তা যখন যাননি, তখন যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে সরে পড়াই আপনার কর্তব্য। আপনার পায় যতটুকু কুলোয়, তত দ্রুত সরে পড়ুন এবার।" ছাত্রটির কথায় যেন রাগ ফেটে পড়ছে। সেই সঙ্গে তার স্বরে ভবিষ্যৎ উচ্চ কর্মচারীর অপমানকর রেশও আছে। মনে হল, সে যেন কয়েকজন অপরাধী কয়েদিকে আদালতে গালিগালাজ করছে। 'কে' একথায় ছাত্রটির কাছে নিঃশব্দে সরে এল। একটু হাসল। তারপর বলল, "আমি যে অধৈর্য হয়েছি, সে কথা সত্য। কিন্তু এভাবে আমার ধৈর্যের বাঁধ বাঁধা যাবে না। এখন যদি আপনি আমাদের যেতে দেন, তবে অতি সহজেই আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। এখানে হঠাৎ হয়ত আপনি পড়াশুনা করবার জন্য আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন। আমি জানি, আপনি এখানকার একজন ছাত্র। তবে এ-ঘর খালি করে দিতে আমি রাজী। এক্ষুণিই মেয়েটিকে ছেড়ে দিলে আমরা এক্ষুণি চলে যেতে পারি। আমি জানি জজ হবার আগে আপনার অনেক পড়াশুনা করতে হবে। যদিও বিচার সম্পর্কীয় বিষয়ে বিশদভাবে আমার কিছু পড়াশুনা নেই, তবে এটুকু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, পড়াশুনার সঙ্গে আপনার এরকম অভদ্র ব্যবহারের কোনো যোগ নেই। আর এমন অভদ্র আচরণেই আপনি পারদর্শিতা লাভ করেছেন।"

ছাত্রটি বলল, ভদ্রলোকটিকে কিছুতেই যেতে দেওয়া এখন আর উচিত হবে না।' তার কথার ভঙ্গীতে মনে হল, কে যে-সমস্ত অপমানসূচক কথা তাকে বলেছে, সেগুলো যেন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। "আমার ভুল হয়েছিল। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম, সওয়ালের সময় তাকে যেন তার নিজের ঘরে বন্ধ রাখা হয়। মাঝে মাঝে এমন হয়, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

'এতসব কথায় কাজ কি?' কে বলল। তার হাতটি কথার শেষে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল, 'চল আমরা যাই।' 'তাই নাকি', ছাত্রটি বলল। 'তা' আপনি মেয়েটিকে কিছুতেই পেতে পারেন না। এই বলে সে মেয়েটিকে তার হাতের ওপর তুলে নিল। না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, ছাত্রটির গায়ে এত জোর। কোলে তুলে নিয়ে সে তার নরম দৃষ্টি মেয়েটির মুখে বুলিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে, বোধ হয়, মেয়েটির ভারেই একটু কুঁজো হয়ে দরজার দিকে চলে গেল। অবশ্য 'কে'র কথা মনে করে সে একটু ভয়ই পেয়েছিল। কিন্তু তবু সে 'কে'কে আরো একটু রাগিয়ে দেবার জন্য, আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে মেয়েটিকে। তার মুখে মুখ ঘসতে লাগল। 'কে' তাদের পেছন পেছন কয়েক পা এগিয়ে গেল। সে ঠিক করেছিল, তাদের যেতে দেবে না। যদি দরকার হয়, সে ছেলেটির গলা পর্যন্ত ধরতে রাজী আছে। মেয়েটি তখন বলল, এসব করে কোনো লাভ হবে না। আপনার সঙ্গে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে নিয়ে যাবার জন্য এই ক্ষুদে গুণ্ডাটাকে পাঠিয়েছে। ছাত্রটির গালে দুটো মৃদু টোকা দিয়ে সে আবার বলল, গুণ্ডাটা আপনার সঙ্গে আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না।

'কে' চিৎকার করে উঠল। আর তুমিও এর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও না।' 'কে' তার হাতখানা ছাত্রটির কাঁধের ওপর রাখল। এবার ছাত্রটি তার দাঁত বের করে ফেলল। মেয়েটি 'কে'র হাতটি তার দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না আপনি এরকম করবেন না। আপনি কি ভেবেছেন। বুঝতে পারছেন না, আপনি এমন করলে আমার ভীষণ ক্ষতি হবে। তাকে চলে যেতে দিন। লক্ষ্মীটি, তাকে যেতে দিন। সে শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের কথা অনুসারে কাজ করছে। আমাকে সে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।'

"বেশ তাহলে সে যাক। আর আমিও তোমার মুখ কখনও দেখতে চাই না। 'কে' হতাশায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলল। কথার শেষে সে ছাত্রটির পিঠে একটা ঘুঁষি মারল। ঘুঁষিটা এত জোরে হয়েছিল যে, ছাত্রটি আর একটু হলে হোঁচট খেত আর কি। শুধু এভাবে 'কে'র হাত থেকে রেহাই পাবার আনন্দে সে একেবারে পড়ে গেল না। 'কে' আস্তে আস্তে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এবার সে বুঝতে পারল, এদের সঙ্গে এই তার প্রথম অঘোষিত পরাজয়। অবশ্য এ-কথাটা তত সত্য নয়। সে পরাজয়ের কথা ভাবছে, তার কারণ, সে যুদ্ধের কথা ভাবছিল। সে যখন তার বাড়ীতে থেকে তার নিয়মিত কাজকর্ম করে, তখন সে এদের থেকে অনেক উঁচুতে। তখন সে তার পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য এদের যে কোনো লোককেই লাথি মেরে ভাগিয়ে দিতে পারে। সে মনে মনে বেশ একটা মজার ছবি আঁকল। আচ্ছা, এমন হয় না। এই কুৎসিত, অনুগৃহীত লোকটি, যার ধনুকের মত বাঁকা পা, বিশ্রী দাড়ি, সে এলসার বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে হাত জোড় করে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে। ছবিটা 'কে'-র কাছে এত ভাল লাগল যে, সে স্থির করল যদি কখনও সুযোগ হয়, তবে সে ছাত্রটিকে নিয়ে একদিন এলসার ওখানে যাবে।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৩

সুখাদ্য, বিশেষতঃ বাঙালীর পক্ষে পাকা রুই মাছের মতো প্রথম শ্রেণীর সুখাদ্য, সুস্থ শরীরে রুচি এবং ক্ষুধার পরিপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যেও কিরূপ যন্ত্রণার কারণ হতে পারে, তার কটু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছিলাম, কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনের একটি মেসে বাস করবার সময়ে।

তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ পড়ি। হাইকোর্টের দীর্ঘ পূজার ছুটি আরম্ভ হতেই আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সকলে ভাগলপুরে চলে গেলেন। আমার কলেজ বন্ধ হতে তখনো দিন কুড়ি বাইশ দেরী। সে-সময়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আমার দুই খুড়তাত ভাই, ঝামাপুকুর লেনের একটি ছাত্র-মেসে থেকে কলেজে পড়েন যতদূর মনে পড়ে সেই বাড়িটি সতের নম্বরের।

সুরেনদাদা ও গিরীনের সম্পর্কে সর্বদা আমি ঐ মেসে গিয়ে আড্ডা জমাতাম, বিশেষত গান-বাজনা করতাম বলে, মেসের সকল সদস্যেরই সঙ্গে আমার পরিচয়, এমন কি কিছু খাতির-দারিও ছিল।

আমার আত্মীয়রা ভাগলপুরে যাওয়ার পর সুরেনদাদার আগ্রহে পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি তাঁর দীর্ঘ-মেয়াদি অতিথি (long-term guest) হয়ে তল্পি-তল্পা নিয়ে ঝামাপুকুরের মেসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। কিছুদিনের মতো আমার সঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে সুলভ হওয়ায় সুরেনদাদা ও গিরীন ভায়ার ত কথাই নেই, অপর মেম্বারগণও বিশেষ আনন্দিত হলেন।

প্রাইভেট মেসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সকল মেম্বারকে একাদিক্রমে এক এক মাস মেসের ম্যানেজার, অর্থাৎ সংসারের গৃহিণী, হতে হয়। ভাঁড়ারের চাবি থাকে, অবশ্য আঁচলে নয়, তাঁর জামার পকেটে; টাকা-কড়ি থাকে তাঁরই বাক্সে; দোকান-বাজার হয় তাঁরই খেয়াল এবং হুকুম অনুসারে; আর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা দুবেলা তিনিই ভাঁড়ার বার করে থাকেন। মাঝে মাঝে দরকার পড়লে চাকর-বামুনকে দু-চার টাকা আগাম-প্রাপ্তির জন্য হাত পাততে হয় তাঁরই নিকট। সর্বোপরি, বাজারের টাকা কড়ির হিসাবে দু-চার পয়সা যদি কম পড়ে, অথবা মবলগ দু-চার আনা আত্মসাতের বিষয়ীভূত হয়েছে বলে যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হ'লে সে কথা ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করবার একমাত্র মালিক ম্যানেজার। সুতরাং যাঁর যখন ম্যানেজারির পালা, চাকর-বামুনদের উপর তাঁর তখন প্রভাব-প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। আমি যখন মেসে এসে উঠলাম, তখন চলছে সুরেনদাদার পালা। কাজে-কাজেই ম্যানেজারবাবুর অতিথিরূপে আমার আদর-যত্ন একটু বেশি হবারই কথা। হয়েছিলও অবশ্য তাই। কিন্তু সেই হ'ল আমার যন্ত্রণার প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণের কথা পরে বলছি।

আমি মেসে এসে পৌঁছতে সুরেনদাদা পাচককে বললেন, "ঠাকুর, এ বাবু কখনো মেসে থাকেননি। বাড়িতে থাকেন, ভাল খান্ দান্। তুমি একটু ভাল করে—"

সুরেনদাদাকে কথা শেষ করতে হ'ল না, সম্পূর্ণ সম্মতিচিত্তে ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "সে আর আমাকে বলতে হবে না বাবু, আপনার যখন ভাই, কোনো কষ্ট হবে না বাবুর।"

প্রথম কারণ এইরূপে সৃষ্টি করলেন সুরেনদাদা; তার একটু পরেই আমি করলাম দ্বিতীয় কারণের সৃষ্টি। ঠাকুরের হাতে একটি টাকা দিয়ে বল্‌লাম, "ঠাকুর, আমি সকালে তর্পণ করি, গঙ্গাজল দরকার হয়। আজ তর্পণ করে এসেছি, আজ আর দরকার হবে না; কাল থেকে দরকার হবে। তুমি যদি আমার পিতলের ঘড়াটা করে এক ঘড়া গঙ্গাজল এনে দাও, তা হ'লে ঐ জলেই যে-কয়েক দিন তর্পণ এখনো বাকি আছে, চলে যাবে। ঘড়া বড় নয়, মাঝারি।"

ঠাকুর মনে মনে হিসেব করে দেখলে, ম্যানেজারবাবুর যখন ভাই, তখন তাঁর ফাই-ফরমাসের ওপর একটু পরিশ্রম দেখাতে পারলে ম্যানেজারবাবুকে খুশি রেখেও বাজারের হিসাবে আরো কিছু সুবিধা করা যেতে পারবে। ঘাড় নেড়ে বললে, "এনে দোবো বাবু। এ টাকায় কি আনতে হবে বলুন?"

বল্‌লাম, "আনতে কিছু হবে না। গঙ্গা-জল আনবার বকশিশ দিলাম তোমাকে ও টাকা। আবার যাবার দিন ভাল করে বকশিশ দিয়ে যাব।"

মেসের ঠাকুর, অনেক বাবুকে চরিয়ে খায়, কাঁচা লোক সে নয়। তবু সামলাতে পারলে না, স্মিত-স্ফুরিত মুখে এবং ঈষৎ বিস্ফারিত দুই চক্ষে উগ্র আনন্দের এবং ততোধিক উগ্র বিস্ময়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পেলাম। এক ঘড়া গঙ্গাজল আনবার জন্য অগ্রিম এক টাকা বকশিশ! তাও বড় নয়, মাঝারি সাইজের ঘড়া। তার উপর, যাবার দিন পুনরায় ভাল করে বকশিশ দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি! সে ভাল বকশিশ নিদেন পক্ষে কোন্-না টাকা দুই-ত হবে! আমি অবশ্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে দেখিনি, তথাপি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে সময়ে ঠাকুর মনে করছিল, সহসা তার অদৃষ্টে একটা ছোট-খাটো সৌভাগ্য-যোগের উদয় হয়েছে, যার ফলে তার পূজার সময়ের তহবিল কিছু স্ফীত করবার জন্য ভবানী-পুরের রাজপুত্রগোষ্ঠের এক বাবু-লোক মেসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য এই গান-গাওয়া আড্ডা-মারা বাবুটিকে সে অনেক সন্ধ্যায় মেসে দেখেছে, কিন্তু তখন কে জানত, অমন ধানের মধ্যে এমন চাল!

ঠাকুর বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবু, আপনাদের খাইয়ে-দাইয়ে আমি জল আনতে চলে যাব। জল নিয়ে এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া করব।"

আমি বললাম, "তার দরকার নেই, আজ যে-কোনো সময়ে জল আনলেই চলবে, খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর যেয়ো। আর, এ বেলা আমি এখানে খাব না, ভবানীপুরে চললাম, সেখানেই আহার করব। তারপর সন্ধ্যার গাড়িতে আমার আত্মীয়দের হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরব। রাত্রে অবশ্য এখানে খাব।"

ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "যে-আজ্ঞে।"

সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেসে আড্ডা জমেছে,—মনে হ'ল আমার আসার পর আড্ডা আর একটু ঘনীভূত হয়ে উঠল। অক্ষয়বাবু নামে মেসে একটি সৌখীন মেম্বার ছিলেন, তাঁর একটি দামী হারমোনিয়ম ছিল। সে হারমোনিয়মটি তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন এবং সহজে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। কিন্তু আমার হাতে হারমোনিয়মের ক্ষতি হবে না, এ বিশ্বাসটুকু তাঁর ছিল। আমি মেসে এলেই তিনি হারমোনিয়মটি বার করে দিতেন এবং পীড়াপীড়ি করে আমাকে গান গাওয়াতেন। যতদূর মনে পড়ছে, সুযোগ মত আমার কাছে তিনি অল্প-স্বল্প সঙ্গীত শিক্ষাও করতেন।

সেদিনও আমি আসার পর অক্ষয়বাবুর হারমোনিয়ম এসে পড়ল এবং গান আরম্ভ হল। গানে ও গল্পে আসর হয়ে উঠল সর-গরম। গানের পর গল্প এবং গল্পের পর গান চলতে চলতে রাত যখন নটা সাড়ে নটা হল, ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে আহার প্রস্তুত।

এর আগে কখনো মেস-জীবন অতিবাহিত করিনি; এর পরেও কখনো নয়। সামাজিক

সংসারের সুনির্দিষ্ট ছক থেকে বেরিয়ে অসামাজিক মেসের আলগা এলাকায় প্রবেশ লাভের পর তার সূত্রপাতটি ভারি মিষ্টি লাগলো। বাঁধন আছে, কিন্তু বন্ধন নেই; ছন্দ আছে, কিন্তু সে ছন্দে মিল বসাবার অযথা উদ্বেগ নেই। খুশী হলাম। কিন্তু কে জানত, এই খুশী হওয়ার অব্যবহিত পরেই অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সংকট দেখা দিয়ে মেসের আনন্দময় অনাবিল দিবস-প্রহরের প্রত্যাশাকে ধূসর করে দেবে!

হৈ-চৈ করে একতলায় নেমে এসে খাবার ঘরে প্রবেশ করে আসনে-আসনে যেখানে যার খুশি বসে পড়া গেল। এক প্রান্ত থেকে ঠাকুর অন্নের থালা পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছে। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা! দেখতে দেখতে সকলের সামনে ভাতের থালা ও ডালের বাটি পড়ে গেল। গোটা তিনেক তরকারি,—একটা ভাজা, একটা চচ্চড়ি ও একটা ঝাল দেওয়া মাছ। মেসের বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের পাতে দুই খণ্ড করে মাছ। তরকারিগুলি থালার দক্ষিণ দিকে স্থাপিত।

ভাত ভাঙতে গিয়ে হাতে কি-একটা ঠেকল। বার করে দেখি, এক টুকরো মাছ! বুঝতে বাকি রইল না, 'যাবার দিনের ভাল করে বকশিশ দেওয়া যাতে সত্য সত্যই ভাল হতে পারে তদ্বিষয়ে ঠাকুর অবিলম্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে! তাড়াতাড়ি মাছের টুকরোটা ভাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাশের দিক থেকে খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল ঢালতে গিয়ে ডালের মধ্যেও একটা কি কঠিন পদার্থ অনুভব করলাম। প্রবল সন্দেহ হল, এও হয়ত মাছেরই টুকরো। এদিক ওদিক দক্ষিণে বামে তাকিয়ে দেখলাম, ক্ষুধার প্রথম মুখে সকলেই নিজ নিজ আহারে ব্যস্ত, আমাকে লক্ষ্য করার মতো অবসর কারও তখন নেই। ডালের ভিতর থেকে কঠিন পদার্থটাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দেখি, অনুমানে একটুও ভুল হয়নি, আর একটা মৎস্যখণ্ডই বটে! তাড়াতাড়ি সেটাকে চচ্চড়ির ভিতর চাপা দিয়ে ডাল-ভাত মেখে ভাজা দিয়ে খেতে খেতে, এ কঠিন অবস্থায় কি করা কর্তব্য তা নির্ণয়ের দুর্ভেদ্য সমস্যায় নিমগ্ন হলাম। কথাটা যদি প্রকাশ করে বলে ঠাকুরের অসঙ্গত কাজের নিন্দা করি, তা হলে আমার সততা রক্ষা হয় বটে, কিন্তু ঠাকুর বেচারাকে বিপদে ফেলা হয়। অথচ, যেখানে প্রত্যেকে মাত্র দু-টুকরো করে মাছ খাচ্ছে, আমি সেখানে প্রকাশ্যে দু-টুকরো এবং গোপনে আরও দু-টুকরো চোরাই মাছ খাই কি করে? দুশ্চিন্তায় আমার আহার মন্থরগতিতে চলেছে; অপরপক্ষে যারা ক্ষুধার স্বাভাবিক নিষ্পাপ তাড়নায় খাচ্ছে, তাদের আহার এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিভরে! যা হয় একটা কিছু অবিলম্বে স্থির করা দরকার!

মনে হল, ঠাকুরকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া মোটের উপর সঙ্গত হবে। কালই তাকে সতর্ক করে দিতে হবে, এমন অন্যায় কাজ দ্বিতীয়বার যেন সে কিছুতে না করে। প্রথম অপরাধেই বেচারাকে ধরিয়ে দিলে, নীতির দিক দিয়ে আমার পক্ষে যত বাহাদুরি দেখানোই হোক-না কেন, অন্তরের দিক দিয়ে একটু হৃদয়হীনতারও পরিচয় দেওয়া হয়। ও যদি আমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে দুখানা মাছ চুরি করে দিয়ে থাকে, তা হ'লে ওর সেই ঋণ পরিশোধ করবার উদ্দেশ্যে আমি যদি সে কথাটা আজকের মত গোপন করে যাই, তা হলে বোধ হয় খুব বড় একটা অপরাধ হয় না।

মনের মধ্যে নৈতিক সমর্থন পাওয়া মাত্র নিমেষের মধ্যে কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে গেল। ঝাল-দেওয়া মাছের একখানা টুকরো সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে যে ব্যাপার করলাম, তাকে গলাধঃকরণ পর্যন্ত বলা চলে, কিন্তু খাওয়া কিছুতেই বলা যায় না। তারপর, সামনের দিক থেকে মাছের টুকরো সমেত বেশ খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল মেখে মাছ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ মাছটারও গতি করে চচ্চড়ি-ঢাকা মাছটা সন্তর্পণে বের করে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। এখন বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম,—অবস্থা আয়ত্তে আনা গেছে। এখন যদি একান্তই কেউ আমার থালা লক্ষ্য করে বড় জোর মনে করবে, মাছ-ভক্ত মানুষ চচ্চড়ি শেষ না করেই মাছে হাত দিয়েছে।

সত্য কথা বলতে, পাকা রুই মাছের সুমিষ্ট আস্বাদ পেলাম তৃতীয় এবং চতুর্থ মৎস্যখণ্ডে; পূর্বের দুই খণ্ড নষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র সংকট মোচনের প্রচেষ্টায়। দুই-একটা প্রশ্নের অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া ছাড়া এপর্যন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কারো সঙ্গে কথা কইনি; এবার নিশ্চিন্ত উল্লসিত মনে হাস্য-কৌতুকে যোগ দিলাম। কিন্তু অনেক কৌশলে, অনেক দুঃখে আজ সঙ্কট-মোচন হয়েছে। এমন কুৎসিত ব্যাপারকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, ঠাকুরকে শাসন করতেই হবে।

পরদিন সকালে কিন্তু ঠাকুরকে মাছের কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। তাকে একান্তে পেলাম একেবারে খাবার সময়ে। মেসে রাত্রিকালে সকলে একত্রে আহার করে; দিনের বেলা কিন্তু যে যার প্রয়োজনমতো যখন সুবিধে খেয়ে নেয়। সে সময়ে বেলা এগারোটার সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ আরম্ভ হোত, বাকি সব কলেজই শুরু হোত সাড়ে দশটা বেলায়। সুতরাং আমি যখন খেতে বসলাম তখন প্রায় সকল সদস্যই আহারাদি সমাপন করে বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর থালা এনে আমার পাতের সামনে রাখলে। পরিপাটি করে বাড়া অন্ন, বেশি বেশি ব্যঞ্জন, চার খণ্ড মৎস্য। তা-ও প্রত্যেক খণ্ডই বৃহদাকারে, পূর্ব রাত্রে যে আকারের মাছ খেয়েছিলাম তার অন্ততঃ দেড়া।

থালা রেখে আমার সামনে বসে পড়ে স্মিতমুখে ঠাকুর বললে, "বাবু যদি রাত্রেও এখনকার মতো একটু আগে-পাছে করে বসেন তাহলে একটু জুৎ করে খাওয়াতে পারি।"

চারখানা মাছ দেখেই মেজাজ বিগড়েছিল, তার উপর এই কথা শুনে পিত্ত জ্বলে গেল। তথাপি নূতন লোক আমি, কতকটা নরম সুরেই বললাম, "তুমি কি মনে করছ ঠাকুর, মাছের লোভে আমি সকলের পরে খেতে বসেছি?"

সবেগে মাথা নেড়ে জিভ কেটে ঠাকুর বললে, "রাম! রাম! তাই কখনো মনে করতে পারি? মাছের আপনার কি অভাব? আপনি একা বসলে আমি একটু জুৎ পাই।"

বললাম, "কিন্তু জুৎ ত' আমারও পাওয়া দরকার। কাল রাত্রে তুমি লুকিয়ে দু-টুকরো মাছ আমাকে বেশি দিয়েছিলে, তা খেতে আমার ভারি খারাপ লেগেছিল।"

অবাক হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে ঠাকুর বললে, "কেন?"

ঠাকুরের কথার সুরে বুঝতে পারলাম, আমার মন্তব্যের আসল তাৎপর্যই গ্রহণ করতে পারেনি। চিরদিন বাবুদের বঞ্চিত করে মাছ খেয়ে খেয়ে যে রসনা পাকিয়েছে, চুরি করা মাছ খেতে কারো খারাপ লাগতে পারে, এমন কথা তার ধারণারই অতীত। ঠাকুরের কথার কোনো সোজা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ বাবুদের ক'খানা করে মাছ দিয়েছিলে ঠাকুর?"

ঠাকুর বললে, "দুখানা করে।"

"তাহলে আমাকে চারখানা কেন?"

"আপনার সঙ্গে বাবুদের তুলনা? ওঁরা হলেন মেম্বার, আপনি গেস্টো (guest)।"

"ওঁদেরও কি এমনি বড় বড় টুকরো দিয়েছিলে?"

মৃদু হেসে ঠাকুর বললে, "ঐ উনিশ-বিশ।"

"কে বিশ? আমার, না ওঁদের?"

সোজা উত্তর না দিয়ে, বোধকরি আমাকে কিছু খুশি করবারই মতলবে, ঠাকুর বললে, "আপনার জন্যে একটু বেছেবুছে রেখেছিলাম।"

বেছে-বুছে আদৌ নয়। মাছ কোটবার সময়ে চাকরকে দিয়ে ঠাকুর বড় বড় কয়েক খণ্ড কুটিয়ে নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাত্রের জন্যও নিশ্চয় এইরকম চার টুকরো মাছ আমার জন্যে পৃথক করা আছে। এইরূপ বৃহদাকার আট টুকরো মাছের দ্বারা যে পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত মাছ হতে মেসের মেম্বারদের বঞ্চিত করেছি, তার কথা ভেবে মনের মধ্যে গভীর গ্লানি উপস্থিত হল। বললাম, "শোনো ঠাকুর, আমি গেস্টোই হই আর যা-ই হই,

তেমনই দেবে। তুমি ত' দু-টুকরো মাছ ভাতের ভেতর আর ডালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খালাস, আমিও না-হয় তোমার মান আর আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কোনোরকমে বাড়তি মাছ দুখানা লুকিয়ে খেলাম,—কিন্তু কাঁটা? থালার পাশে চারখানা মাছের কাঁটা যে, দুখানা মাছের কাঁটার ডবল আকারে উঁচু হয়ে ওঠে, তার কি করবে বল? মান বাঁচাবার জন্যে মাছ না হয় লুকিয়ে খেলে, কিন্তু লুকিয়ে কাঁটা খেলে প্রাণ বাঁচবে কি? অতএব ও-সব লুকোচুরিতে আর কাজ নেই, দু-টুকরো মাছেই আমি খুব খুশি হবো, এবার থেকে তুমি আমাকে মেম্বারদের সংগে ঠিক একভাবে মাছ দেবে। আপাততঃ তিনখানা মাছ তুলে নাও।"

সবিস্ময়ে ঠাকুর বললে, "মাত্র একখানা খাবেন!"

বললাম, "এ একখানা মাছ বাবুদের দেওয়া দুখানা মাছেরই সমান হবে।"

"কিন্তু বাবুরা ত এখন কেউ নেই, তবে আপনার আপত্তি কিসের?"

"সে কথা তুমি বুঝবে না ঠাকুর। তিনখানা মাছ তুমি তোলো।"

কাতরকণ্ঠে ঠাকুর বললে, "সে তিনখানা মাছ কার মুখে দোবো বাবু? বাবুদের দেওয়া চলবে না, আমাদের মুখেও রুচবে না!"

বললাম, "তা যদি একান্তই না রোচে, তোমাদের মেসে ত একটা বৃহৎ সাইজের বেড়াল আছে, তাকে দিয়ো; তার মুখে বাধবে না।"

পাত থেকে একখানা মাছ তুলে নিয়ে ব্যগ্র-কণ্ঠে ঠাকুর বললে, "আর কোন আপত্তি করবেন না বাবু,—আপনার কথা রাখলাম।"

পাপের ফাঁসে মানুষ যদি একবার মাথা গলায়, আর তার রক্ষা থাকে না; নৈতিক শক্তি হারানোর ফলে পাপ যখনই তাকে টান দেয় তখনই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের দিকে এগিয়ে যায়, পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না। কাল রাত্রে চোরাই মাছ দুটি ভক্ষণ করার ফলে আমি ও আমার নৈতিক শক্তি হারিয়েছিলাম, ঠাকুরের সহিত রফায় সম্মত হতে হল।

রাত্রে খেতে বসে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল সকালে ঠাকুরকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলাম, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে! খানিকটা মাছ, বোধ হয় দু টুকরোই হবে, কাঁটা বেছে চূর্ণ করে চচ্চড়ির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তা না-হয় দিক্, কিন্তু প্রকাশ্যে যে দুখণ্ড পাতে দিয়েছে তার নিন্দনীয় আয়তন দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল! বড় বড় আকারের আটখানা মাছ বার করে নেওয়ার ফলে সাধারণ খণ্ডগুলো যেন কালকের রাতের খণ্ডর চেয়েও ছোট হয়ে গেছে; আর তার দরুণ উভয়-বিধ খণ্ডের মধ্যে আকারের অনুপাত এমন অসংগতভাবে অসম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা লক্ষ্য করে অপরপক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে যদি প্রতিবাদ করে বসে, আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

কাল তবু সাধারণ আকারের প্রকাশ্য টুকরো দুটোর সহায়তায় ডাল ও ভাতের মধ্যে লুকানো চোরাই মাল দুটোকে পাচার করবার কিছু সুযোগ ছিল। আজ এই ঢিবে-ঢিবে রাম-টুকরো দুটোর কি উপায় করা যায়! কাঁটার সমস্যা না হয় সমাধান করা যাবে কতক কাঁটা পাতের পাশে ফেলে, আর বাকি পিছন দিকের ভাতের তলায় অলক্ষিতে চালান করে। কিন্তু

মেম্বারদের যেমন মাছ দেবে, আমাকেও ঠিক ভাজা ও চচ্চড়িতে হাত দেবার আগে মাছ যদি শেষ করে ফেলি তা হলে দেখতে শুনতে ভারি বিশ্রী হয়। কে কি দেখ্‌লে, কে কি ভাব্‌লে তা জানি নে, কোনরূপে ঘাড় গুঁজে সে রাত্রির পালা শেষ করলাম।

পরদিন সকালে উঠে ভেবে দেখলাম, ঐ উৎসাহশীল ঠাকুরকে দমন করা আমার কাজ নয়, সুরেনদাদার কাছে দরবার করা ছাড়া উপায় নেই। সুবিধা মতো তাঁকে একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে কাতরস্বরে বললাম, "দোহাই সুরেনদাদা, তোমার ঠাকুরের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে! নইলে কোন্ দিন মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে হাসপাতালে যেতে হবে! উঃ পাকা রুই মাছ যে এমন বিপজ্জনক জিনিস হতে পারে, আগে তা কে জান্‌ত!"

সকৌতূহলে সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বল্ তো?"

আনুপূর্বিক সকল কথা সুরেনদাদার নিকট যৎপরোনাস্তি কাতরভাবে বিবৃত করলাম। কাহিনীটি মাছ খাওয়া সংক্রান্ত হলেও, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে করুণ রসেরই প্রাধান্য ছিল। আশা করেছিলাম সব কথা শুনে সুরেনদাদা সহানুভূতিশীল হবেন। কিন্তু কাহিনীটা শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উল্লসিত হয়ে উঠল এবং শেষ হলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, তাঁর ধারণা হয়েছে আমি তাঁর কাছে প্রগাঢ় কৌতুক রসের অবতারণা করেছি! কুঞ্চিত চক্ষে ভুজভুজ করে হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "এর জন্যে কাতর হয়েছিস? এত সৌভাগ্যের কথা রে! চারখানা করে বড় বড় রুই মাছের টুকরো বরাত জোর না হলে জোটে না। 'যো আপ্‌সে আতা হ্যায় উস্‌কো' আসতে দে।"

সুরেনদাদার দু'হাত চেপে ধরে বল্‌লাম, "ও কথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না, রক্ষা করতে হবে!"

মনে হল কাতর প্রার্থনায় সুরেনদাদার চিত্ত একটু দ্রবীভূত হয়েছে; বললেন, "আচ্ছা, ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইব।"

কি কথা কয়েছিলেন তা সুরেনদাদাই বলতে পারেন, আমার কিন্তু মনে হল, যদি কথা কয়ে থাকেন, তদ্দ্বারা ঠাকুরের উৎসাহ শাণিতই হয়েছে। সেদিন মেসে মাংসর পালা। রাত্রে খেতে বসে দেখি, আমার বাটিতে সুনির্বাচিত নরম নরম একরাশ মাংস গজ্‌গজ্ করছে, হাড় এবং ছাল সযত্নে বাদ দেওয়া, তার উপর গোটা পাঁচ-ছয় মেটের টুকরো। মাছের পরিমাপে মাংসর হিসাব ধরা একটু কঠিন। বুঝলাম, তারই সুযোগ নিয়ে ঠাকুর মাছের ঝাল মাংসয় বেড়েছে। এ কথাও বুঝতে বাকি রইল না যে, ঝামাপুকুরের মেস না পরিত্যাগ করতে হলে 'what cannot be cured 'must be endured' নীতি অনুযায়ী ঠাকুরকে সহ্য করতেই হবে।

ঠাকুরের উপর রাগ ধরে, কিন্তু একটু মায়াও হয়। তার পদ্ধতি নিকৃষ্ট, কিন্তু উদ্দেশ্য নিন্দনীয় নয়,—সে আমাকে খুশি করতেই চায়। যাবার দিন দু'টাকা বকশিশে চলবে না দেখছি। কিছু উঠ্‌তেই হবে।

মৎস্য-সমস্যার দ্বারা ঝামাপুকুরের মেস কণ্টকিত ছিল বটে, কিন্তু চিত্তবিনোদনের দু'টি উপায়ও সেখানে খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথম উপায়টি পেয়েছিলাম এক সংগীতের আসরে; দ্বিতীয়টি স্কুলপথগামিনী দু'টি বালিকার অবয়বে। প্রথমটির জন্য মেস ছেড়ে দু-দশ কদম দূরে যেতে হোত; দ্বিতীয়টির জন্য কিন্তু পাদমেকং মেস পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন হত না,—লগ্ন অনুযায়ী মেসের বারান্দায় দাঁড়ালেই চল্‌ত। প্রথমে সংগীত আসরের কথাই বলি।

একদিন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট হয়ে বাসায়

ফিরছি। মেসের কাছাকাছি এসে দেখি একটি বাড়িতে পথের ধারে এক তলার বৈঠকখানায় উচ্চাঙ্গের গান-বাজনা চল্‌ছে। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতের অনুরক্ত শ্রোতা, দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৈঠকখানায় ফরাসের উপর গাইয়ে-বাজিয়ে ও শ্রোতার ভিড়ে তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরে পথের ধারে জানলায় জানলায় পথিক ও পল্লীবাসীর জনতা। ভিতরে যখন মাঝে মাঝে গানের সমের উপর শ্রোতাদের সমবেত প্রশংসামত্ত কণ্ঠের উচ্চ ঐকরব ধ্বনিত হচ্ছে, বাইরেও তখন জনতার মধ্যে তার সাড়া উচ্ছল হয়ে উঠছে। বৈঠকখানা ও পথপার্শ্ব নিয়ে একটা বৃহৎ মজলিশের সৃষ্টি হয়েছে। ভারি জমজমাট অবস্থা।

যে গানটা চলছিল শেষ হলে, পথের এক ভদ্রলোকের নিকট হতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ; গৃহের কর্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সকলেই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী; দু-চার দিন অন্তর প্রায়ই সঙ্গীতের বৈঠক বসে; তখনকার দিনের কয়েকজন খ্যাতনামা গাইয়ে-বাজিয়ে, যথা—কাণা শরৎ, কায়েত শরৎ, ভোলানাথ বাড়ুজ্জে, সুশে (সুশীল) বাড়ুজ্জে প্রভৃতি নিয়মিত এসে আসর জমান।

পরবর্তী গান আরম্ভ হল। প্রথমে কিছুক্ষণ চলল আলাপ, তারপর সহসা এক সময়ে শুরু হয়ে গেল বিলম্বিত লয়ের খেয়াল। তানে-বাঁটে গমকে-মীড়ে-সার্গমে গান হতে লাগল অলঙ্কৃত। বিশুদ্ধ রাগের অভিজাত চালের সহিত বাঁয়া তবলার অপরূপ সঙ্গত মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি করলে এক বিচিত্র স্বরলহরী, যা মাঝে মাঝে খণ্ডিত হতে লাগল শ্রোতৃবর্গের অদমনীয় স্বতঃস্ফূর্ত বাহবা এবং সম দেওয়ার রবে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গান যখন শেষ হল, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে।

আর দেরি করা চলে না। ওদিকে মেসে সকলের আহারকার্য যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ত মাছের কাঁটা বাগিয়ে ঠাকুর আমার অপেক্ষায় বসে আছে, একা অসহায় অবস্থায় তার হাতে পড়লে নাকালের আর সীমা থাকবে না। দ্রুতপদে মেসের দিকে অগ্রসর হলাম।

যে কয়েকদিন ঝামাপুকুরের মেসে ছিলাম, তার মধ্যে পাঁচ-ছয় দিন সঙ্গীতের আসর বসেছিল। সর্বদা খবর রাখতাম এবং আসর আরম্ভ হলেই যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে পদচারণ আরম্ভ করতাম। সেদিন বোধহয় আমার পালার চতুর্থ দিন। গান চলছে, যথানিয়ম ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে গান শুনছি, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "আপনি ত দেখি প্রায়ই আসেন?"

মৃদু হেসে বল্‌লাম, "তা আসি।"

"গান-বাজনা খুব ভাল বাসেন বুঝি।"

বললাম, "বাসি।"

"তবে আসরে গিয়ে বসুন না, এখনো ত' জায়গা রয়েছে। গানের আসরে শ্রোতার ত' আটক নেই।"

তা হয়ত নেই; কিন্তু জানা নেই, শোনা নেই, সুবাদ নেই, সম্পর্ক নেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হব, তারপর কেউ যদি গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে বলে বসে, "কি চাই এখানে?" তা হ'লে এমন তাল কেটে যাবে যে, পথে দাঁড়িয়েও গান শোনা আর চলবে না। নিজের মান নিজের হাতে রাখাই ভাল।

ভদ্রলোককে বললাম, "ভেতরে গিয়ে বস্‌লে ইচ্ছামত ওঠা চলবে না। এখানে কোনো অসুবিধে নেই।"

ঘণ্টা দুই কান ভরে গান শুনে প্রসন্নচিত্তে মেসে ফিরলাম।

সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বৎসর অতীতের কথা, কিন্তু সে সঙ্গীত-আসরের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো যেন তার গভীর-মিষ্ট স্বর-ঝঙ্কার কানের মধ্যে শুনতে পাই।

ঝামাপুকুরের মেসের দ্বিতীয় আকর্ষণের কথা হচ্ছে পূর্বোক্ত শ্লেটপুস্তকহস্তা বিলম্বিতবেণী দুটি স্কুল-বালিকার কথা। এবার সৎসাহসের সহিত সেই বিচিত্র ও আপাতগোপনীয় কাহিনী বলি। (ক্রমশঃ)

বৈদেশিকী

গত এক পক্ষকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরো ঘোরালো, আরো সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে। দৌড়াদৌড়ি, হাঁকডাকের অন্ত নেই। এর মূলে সবচেয়ে যে বড় কারণটি রয়েছে, সেটি হোল কোরিয়াতে উত্তর কোরিয়ান ও চীনাদের হাতে ম্যাকআর্থার বাহিনীর নাকানিচুবানি খাওয়া। এতবড় হার নাকি মার্কিন সৈন্যের ভাগ্যে পূর্বে কখনও ঘটেনি।

কোরিয়াতে আমেরিকার সেরা সৈন্য এক লক্ষ ৪০ হাজার ছিল, তাদের সঙ্গে সেরা বৃটিশ সৈন্য ও অন্যান্য মিত্র সৈন্য নিয়েছিল ২০ হাজার। তার মধ্যে পাঁচ হাজার খুব ভালো তুর্কি যোদ্ধা। এ ছাড়া এক লক্ষের উপর ছিল দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্য। এর উপর ভারী অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন, বিমান ও নৌশক্তির একতরফা প্রাধান্য তো জেনারেল ম্যাকআর্থারের ছিলই। এসব সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়াতে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের ম্যাঞ্চুরিয়া অভিমুখী "যুদ্ধ খতমের যুদ্ধের" অভিযানকে হাল্কা অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়ান ও চীনারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সংখ্যায় হয়ত এরা ম্যাকআর্থার বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু তাতে আমেরিকানদের পরাজয়ের গ্লানি ও শোচনীয়তা কিছু কমবার নয়।

ম্যাকআর্থার বাহিনীর দুর্দশার খবর যখন আমেরিকায় প্রকাশিত হোল, তখন সেখানে লোকেরা প্রথম স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারণ এরকম খবরের জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ম্যাকআর্থারের আশার বাণী যে, বড়দিনের আগেই কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ করে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসবে, সেটা তখনও যে তাদের কানে বাজছিল। সুতরাং কোরিয়ার সংবাদ তাদের কাছে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বোধ হোল। প্রথম বিস্ময়, তারপর ভয়, রাগ ও ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান কোলাহলে ফেটে পড়ল। এই ডামাডোলের মধ্যে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলে ফেল্লেন যে, কোরিয়ার যুদ্ধে এ্যাটম বোমের ব্যবহার হবে কিনা সে প্রশ্ন "সক্রিয়-বিবেচনাধীন" রয়েছে। এসংবাদে পৃথিবীময় উত্তেজনা যেন টগবগিয়ে উঠল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝি শুরু হয়ে যায়!

বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলী ছুটলেন আমেরিকায়। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় চীনের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া মারাত্মক হবে, কারণ, তাহলে সম্ভাব্য রুশ আক্রমণ থেকে পশ্চিম য়ুরোপ রক্ষার আয়োজনে বাধা পড়বে, ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের অধিকাংশ শক্তি এশিয়ায় ব্যয়িত হলে পশ্চিম য়ুরোপ রুশ শক্তির নিকট আরো অসহায় হয়ে পড়বে। অন্য এশীয় জাতি-দের নিঃসংশয়ে সঙ্গে না পেলে চীনের মতো বিরাট জাতির সঙ্গে যুদ্ধে নামা যে মোটেই উচিত হবে না, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সেটাও উপলব্ধি করেন। কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি সম্বন্ধেও বৃটিশ গবর্নমেণ্টের ধারণা বোধ হয় আমেরিকার থেকে কিছু ভিন্ন, যদিও সম্প্রতি কোরিয়াতে মার্কিন বাহিনী যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, তার ফলে নিশ্চয়ই চীনের শক্তি সম্বন্ধে আমেরিকার ধারণা এখন বদলে গেছে। চীন সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যের আরো একটা বড় কারণ হোল হংকং এবং বৃটিশ বণিকস্বার্থ, যার জন্যে বৃটেন আমেরিকার অপেক্ষা না করেই মাও সি-তুং-এর গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। এইসব কারণে বৃটেন নরম-গরম নীতির পক্ষ-পাতী, কোরিয়াতে মুখরক্ষা করে যদি চীনের সঙ্গে আপাততঃ একটা চলনসই গোছের মিট-মাট হোত, যার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপে আত-লাণ্তিক চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা চলতে পারত, তাহলে বৃটেন খুশি হোত। এবিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন দলভুক্ত পশ্চিম য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলিও মোটের ওপর বৃটেনের সঙ্গে একমত। কারণ সকলেই প্রথমে বাড়ীর কাছের সমস্যার কথা ভাবছে।

মিঃ এটলী ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের আলোচনার ফলে মার্কিন ও ইঙ্গ-য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সকল পার্থক্য দূর হয়নি, তবে কাজের দিক দিয়ে উভয়কেই একই পথে হাঁটতে হবে বেশ বোঝা যাচ্ছে। বৃটেন এখনো চীনের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধে নামতে চায় না, কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকাকে ছেড়ে আসবারও কোনো পথ তার নেই। আর যুদ্ধ যে কোন্ গতি নেবে, তা কেউ বলতে পারে না। একদিকে আমেরিকা নিজের মানরক্ষার জন্যে অধীর এবং অপরপক্ষকে চীনারাও আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দিহান এবং তারা কিছুতেই আমেরিকান সৈন্যকে কোরিয়াতে থাকতে দিতে চায় না। এ অবস্থায় চীনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিনদের যুদ্ধ ব্যাপকতর হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ইতিমধ্যে ইউ-নোতে কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য একটা প্রচেষ্টা ভারতবর্ষ প্রমুখ কয়েকটি এশীয় দেশের প্রতিনিধিরা শুরু করেন। তার জন্যে ইউ-নোতে একটা প্রস্তাব পাশ ও তিনজনের একটা কমিশনও নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু চীনারা এখনো সে কথায় ভিড়ছেন না। তাঁদের বক্তব্য হোল এই যে, শুধু যুদ্ধবিরতির কথায় তারা এখন যেতে পারেন না। যদি তার সঙ্গে ফরমোজার সমস্যা সমাধান, ইউ-নোতে পিকিং গবর্নমেণ্টকে স্থান দান ও কোরিয়া থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের আলোচনা না হয়। চীনারা মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় উপরোক্ত প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবে কোরিয়াতে বিপন্ন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীরই কেবল সুবিধা হবে। সুতরাং সে আলোচনায় চীনারা অগ্রসর হচ্ছেন না।

অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে বিরাট সমর-সজ্জার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। অস্ত্র নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ ও তদানুসঙ্গিক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আতলাণ্তিক চুক্তি অনুসারে যে সম্মিলিত য়ুরোপীয় সৈন্য বাহিনী গঠিত হবার কথা তার সর্বাধিনায়কও নিযুক্ত হয়ে গেছেন—জেনারেল আইজেনহাওয়ার। এই সৈন্য বাহিনীতে পশ্চিম জার্মানী থেকে যোদ্ধা গ্রহণ করা হবে এ সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে। সুতরাং সত্বরই হোক বা কিছু বিলম্বেই হোক আর একটি সর্বাত্মক বিশ্বযুদ্ধের দিকে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষ, কি করবে, সেইটেই এখন ভাবা দরকার। এরূপ যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়াই হবে ভারতের কাম্য—কেবল কাম্য নয়, একমাত্র বাঁচবার পথ। এবিষয়ে কোনোরকম নীতির অনিশ্চয়তা থাকা এখন বিপজ্জনক। পৃথিবীর দুই ব্লকের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতবর্ষ যে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করবে, একথা এখন স্পষ্ট করে ঘোষিত হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ থাকতে হলে বহু বিষয়ে আমাদের নীতির, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অদলবদলের প্রয়োজন হবে, যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তে পারে। যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাও অনেকটা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করবে। ভারতবর্ষকে সে শক্তি সংগ্রহ করতেই হবে, কারণ দুর্বলতার দরুণ যদি তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়, তবে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১৯-১২-৫০

চলচ্চিত্রে সর্দারজীর অবদান

সর্দার বল্লভভাইয়ের কাছে ভারতের চিত্রামোদীরা একদিক থেকে ঋণী। স্বাধীন ভারতের আমলে তিনিই ফিল্মস্ ডিভিসনের পত্তন করেন এবং সংবাদ ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে বৎসরাধিক কাল তিনি বিভাগটি পরিচালনা করেন। ফিল্মস্ ডিভিসনের বর্তমান কাঠামোটি তাঁরই রচনা।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব

গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহ কাল ধরে কলকাতায় সোভিয়েট চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বসুশ্রী ও বীণা সিনেমাতে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কৃষ্টিগত সংযোগ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ওপরেই পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করছে যাতে "বাঁচো এবং বাঁচাও" নীতি সবাই মেনে নিতে পারে। কৃষ্টির দিক থেকে জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে বিভেদ যথেষ্ট থাকলেও সভ্যজগতের লোকেদের মধ্যে একটা একতার সুর প্রবাহিত আছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় আশা করেন যে, এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি রাশিয়ার জীবন ও কৃষ্টি যেভাবে উপস্থিত করেছে এবং ছবিগুলি তোলার চমৎকার কুশলতা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে ভারতের ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলায় অনুপ্রাণিত করবে। তিনি চান যে সেই কতকগুলি ভারতীয় ছবি রাশিয়াতে নিয়ে যাবার যেনো সুযোগ পাওয়া যায়।

ভারতে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে কে ভি নভিকভ প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে কৃষ্টিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলেন যে খুব দূরবর্তী লোকেদের মধ্যেও কৃষ্টির সম্পর্ক গড়ে তোলা স্বাভাবিক; শুধু স্বাভাবিকই নয়, ভারত ও রাশিয়া এই দুই মহান প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তা দরকারও। ইতিহাস ও কৃষ্টিতে মহান্ ভারতের জনগণের কাছে রাশিয়ার অতীত ও বর্তমানের কৃষ্টি সম্পদ নাটক, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে এনে পেঁৗছে দেবার উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

মাননীয় বিচারপতি কে সি চন্দ্র এই চলচ্চিত্র উৎসব উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতিরূপে বলেন যে, কৃষ্টির কোন বাঁধ নেই এবং পৃথিবীকে এক করে তোলায় জাতিগুলি পরস্পরকে যেন ভালো করে বুঝবার সুযোগ পায়।

রঙ্গজগৎ

রাশিয়ার চলচ্চিত্র মন্ত্রী মঃ বোলশেখভ একটি টেলিগ্রামে কমিটির সভাপতির কাছে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে কৃষ্টিগত বন্ধন দৃঢ়তর হলো।

অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হবার আগে সর্দার প্যাটেলের স্মৃতির উদ্দেশে দুমিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এদেশে এরকমপ্রকার সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব ইতঃপূর্বে মাসখানেক আগে বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়।

বসুশ্রী ও বীণাতে প্রতিদিনই নির্বাচিত সোভিয়েট ছবি দেখানো হয়, তাছাড়া ৩০ বছর ধরে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস অবলম্বনে বসুশ্রীতে একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়।

"বহুরূপী"র নাট্যোৎসব

গত ৩রা ডিসেম্বর থেকে প্রতি রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে "বহুরূপী" সম্প্রদায়ের তিনখানি নাটক 'পথিক', 'উলুখাগড়া' 'ছেঁড়া তার' অভিনীত হয়।

"বহুরূপী" দলটি নতুন হলেও দলের প্রধানরা হচ্ছেন প্রাক্তন গণনাট্য সম্প্রদায়ের—যারা 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক দুখানি মঞ্চস্থ করে বাঙলা মঞ্চজগতে একটা নতুন ধারা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তখনকার সে প্রচেষ্টা বেশীদূর এগোতে পারেনি। তারপর দলটিও ভেঙে দুভাগ হয়ে যায় এবং আলাদাভাবে সেই থেকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নাটক আত্মপ্রকাশ করলেও জনতাকে আঁকড়ে ধরার মতো কোন দীর্ঘায়িত অবদান আর পাওয়া যায়নি। তার পর "বহুরূপী" সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানই হচ্ছে প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

নাটক তিনখানির বিষয়বস্তু গড়ে তোলা হয়েছে এখনকার বহুবিধ জীবন-সমস্যাকে কেন্দ্র করে। 'পথিক' ও 'ছেঁড়া তার'এর রচয়িতা হচ্ছেন তুলসী লাহিড়ী আর 'উলুখাগড়ার' রচনা করেছেন শ্রীসঞ্জীব।

কোন ব্যাপারে যুগান্তর এনে ফেলতে যে সব লক্ষণ থাকা দরকার তিনখানি নাটকেরই প্রযোজনা ও অভিনয় ব্যাপারে সে সমস্ত লক্ষণগুলিই স্পষ্ট। বাঙলা নাটকের বর্তমান ধারাকে মোড় ফিরিয়ে নতুন তেজে দীপ্তিমান করে তোলার শক্তি পাওয়া গিয়েছে এই তিনটি মঞ্চ অবদানের মধ্যে। বিন্যাস বিষয়ে এবং বিশেষ করে, অভিনয়ের দিক থেকে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নাটক তিনখানিতে অভিনয় প্রতিভার একক এবং সম্মিলিত প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে আমাদের মঞ্চে আগে কোনদিনই তা পাওয়া যায়নি। বাস্তবানুগত্য ও প্রাণস্পর্শতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে কৃতিত্বে তা অতুলনীয়। অভিনয় বলে মনে হয় না, সামনে যেনো প্রকৃত চরিত্রগুলিকেই তাদের স্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

তিনখানি নাটকেই নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করেছেন মিত্র দম্পতী, শম্ভু

ও তৃপ্তি। আবৃত্তিতে ও অভিব্যক্তিতে দর্শকের অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে নেবার যে দক্ষতা এরা দেখিয়েছেন আমাদের দেশে তার সংগে তুলনা করার কাউকে পাওয়া যায় না। তিনটি নাটকেই এদের অভিনীত চরিত্রগুলি একেবারেই আলাদা ধরণের, সর্বদিক থেকেই ভিন্নজাতীয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একটার ছাপ আর একটায় গিয়ে স্পর্শও করেনি। প্রত্যেকটি চরিত্রই নতুন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ দখলের মধ্যে নিয়ে এসে নিজেদের তারা যেভাবে মিশিয়ে দেন তাতে স্তম্ভিত হতে হয়।

অন্যান্য শিল্পীরাও প্রায় সকলেই স্মরণীয় কৃতীত্ব দেখিয়েছেন—যেমন গীতা ভাদুড়ী "পথিক" ও "উলুখাগড়ায়"; কানু বন্দোপাধ্যায় "পথিক"-এ, গংগাপদ বসু তিনটি নাটকেই; মহম্মদ ইস্রাইল "পথিক" ও "ছেঁড়া তার"-এ; এবং তুলসী লাহিড়ী "ছেঁড়া তার"এ। এদের অভিনীত সমস্ত চরিত্রগুলি আসর ছেড়ে আসার পরও জ্বলজ্বল করে চোখে ভাসতে থাকে।

নাটকগুলির প্রয়োগে যে কতটা যত্ন নেওয়া হয়েছে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে "ছেঁড়া তার"এ বছর পাঁচ-ছয়ের একটি ছোট ছেলে শ্যামলের অভিনয়ে। নাটকগুলির সংলাপ হচ্ছে রংপুরী ভাষায়—ভাষাটি শ্যামল আয়ত্ত্ব তো করেছেই এমন কি অত্যন্ত কঠিন তার ভূমিকাটিও যে-ভাবে সে ফুটিয়ে তুলেছে তাতে তার প্রশংসা ছাড়া তাকে তৈরী করে তোলার কঠিন অধ্যবসায়টাও লক্ষ্য করার বিষয়। বাংলা মঞ্চে এর আগে অতো ছোট ছেলের অমন প্রাণবন্ত অভিনয় আগে কখনও দেখা যায়নি।

দৃশ্য সন্নিবেশ, আলোকসম্পাত প্রভৃতি দিকেও একটা নতুনের রেশ অনুভব করা যায়।

"বহুরূপী"র এই নাট্যোৎসব কয়েক বৎসর আগে সুরু নব নাট্যধারাকে স্থায়িত্ব এনে দেওয়ায় সহায়তা করবে— নাট্যামোদীদেরও জীবনে হবে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

আগামী তিনটে রবিবার নাটক কখানি পর পর নিউ এম্পায়ার মঞ্চেই পুনরাভিনীত হবে।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স

উত্তর কলকাতার বেনেটোলা অঞ্চলের এই সৌখীন সম্প্রদায় শীঘ্রই শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকখানি মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছে। বিশিষ্ট ভূমিকায় থাকবেন অমূল্য বোস, অরুণ রক্ষিত, নন্দ মান্না, জীবন গোস্বামী প্রভৃতি।

নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন

বাইশে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূরবী সিনেমা গৃহে সর্বভারতীয় সংগীত শিল্পীদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের সম্মেলনে যে সব শিল্পী যোগদান করছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন—

কণ্ঠ সংগীত

কেশরবাই কেরকর (বম্বে), জ্যোৎস্না ভোলে (বম্বে), রসুলন বাঈ (বেনারস), অঞ্জনিবাঈ কালগুটকর (বম্বে), সোমলতা ভাট (দোহদ), ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খান, পণ্ডিত দত্তাত্রেয় পলুসকর, ওস্তাদ সরফৎ খান (বরোদা)।

যন্ত্র সংগীত

পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ (তবলা), ওস্তাদ বিলায়েৎ হুসেন খাঁ (সেতার), প্রঃ পি এ সুন্দরম আইয়ার (বেহালা), এস গোপালকৃষ্ণণ (বেহালা), ওস্তাদ ইস্তিয়াক আহমেদ (সরোদ), মিঞা বিস্মিল্লা পার্টি (সানাই), প্রঃ অনোখেলাল মিশ্র (তবলা), প্রোঃ গোপাল মিশ্র (সারেংগী)।

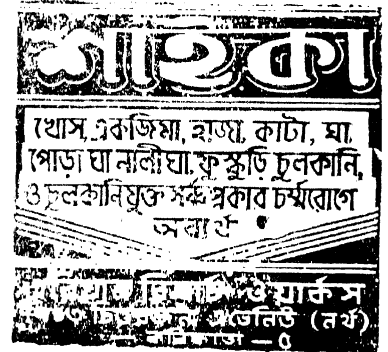
নৃত্য

কুমারী ভারতী, কুমারী মনোরমা সাহা (বম্বে), কুমারী থাঙ্গামনী (মাদ্রাজ)।

এছাড়া দক্ষিণীর শিল্পী দল রবীন্দ্রনাথের গানের সংগে নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। এবারের অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতের জনপ্রিয় কয়েকজন নামকরা শিল্পীদের আগমনের সংগে বহু নূতন শিল্পীর পরিচয় পাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

তানসেন-বিষ্ণু দিগম্বর বৃত্তি

নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে এবার ১১০০ টাকার একটি বৃত্তি সংগীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তার অধিবেশন গত ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে। সর্বসমেত ১৩ জন শিল্পী কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। এদের মধ্যে দিল্লীর শ্রীমতী কমলা কেতকর কণ্ঠ সংগীতে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শনে এই বৃত্তি লাভে সক্ষম হয়েছেন।





সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১১ই ডিসেম্বর—ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সীর সভাপতিত্বে অদ্য বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন রাজ্যের ২১ জন প্রতিনিধি এবং ভূপাল, আজমীর মারোয়াড়, দিল্লী, কুর্গ ও কচ্ছের চীফ কমিশনারগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী প্রারম্ভে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে সমগ্র দেশের জন্য একরূপ নীতি উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিতে হইবে।

নেপালী কংগ্রেস মহলের সংবাদে প্রকাশ, বিরাটনগর শহরটি কেবল গভর্নর কর্নেল উত্তম বিক্রম রাণার বাসভবন ব্যতীত সমগ্রভাবে অভিযাত্রী বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। গতকল্য ব্রেনগান, স্টেনগান ও রাইফেলধারী ৫ শতাধিক স্বেচ্ছাসেনা শহরটির উপর হানা দেয়।

নয়াদিল্লীতে পুনর্বাসন মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় সরকার যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় ও গর্বের বিষয়।

গতকল্য পাকিস্থানী পুলিশ বনগাঁ থানার এলাকাধীন একটি গ্রামে কয়েক ব্যক্তির উপর গুলী চালাইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—রণতলাইর নেপাল বাবা যে সর্বরোগহর ঔষধ বিতরণ করিতেছেন, উহার উপকারিতা সম্পর্কে তদন্তের জন্য উড়িষ্যা সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, শতকরা ৯০ জনেরই রোগ নিরাময় হয় নাই। অবশিষ্ট দশজন অতি সামান্যই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

রাণাঘাটের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থানের তেহট্ট থানায় (পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার সীমান্তের নিকট) পাকিস্থান ব্যাটেলিয়ন রেজিমেণ্ট ও অন্যান্য সৈন্যদল সমাবেশ এবং সীমান্তের অপর দিক হইতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা প্রায়ই গুলীবর্ষণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ, পাকিস্থান সৈন্যগণ এই অঞ্চল দিয়া প্রায়ই ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে।

অদ্য পূর্ববঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের অধিবেশনে কমিশন কিরূপে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রতিরোধ করা যাইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলে ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ চৌধুরী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে গুণ্ডা আইন প্রবর্তন করিবার কথা বলেন।

১৩ই ডিসেম্বর—বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্য বণ্টন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথারীতি চালু থাকিবে এবং ব্যয় বাহুল্য হ্রাস সম্পর্কে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

নেপাল কংগ্রেস মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসৈন্যগণ পূর্ব নেপালের পশুপতি-নগর, গোর্খে এবং পিখাল অধিকার করিয়াছে।

১৪ই ডিসেম্বর—জানা গিয়াছে যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাইয়ের পর পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত উদ্বাস্তুগণকে নাগরিক অধিকার দিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন 'সংকটজনক খাদ্য সমস্যার' সমাধানকল্পে সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের উল্লেখ করেন।

১৫ই ডিসেম্বর—ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আজ সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটের সময় বোম্বাইয়ে বিড়লা ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত শেষ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় সর্দারজীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণ আসিয়া শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য অক্সিজেন দেন। প্রায় পাঁচঘণ্টা পর সর্দারজীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে এবং তাহার প্রায় ৯৭ মিনিট পর ৯টা ৩৭ মিনিটের সময় তাঁহার জীবন দীপ নির্বাপিত হয়।

প্রায় ৫ লক্ষ নরনারী বিড়লা ভবনে ভারতের এই সুমহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু, প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ দিল্লী হইতে বিমানযোগে আসিয়া উপস্থিত হন। অপরাহ্ণ ৫টা ১৫ মিনিটে এই সুমহান নেতার নশ্বর দেহ লইয়া ৫ মাইল দীর্ঘপথে শোকযাত্রা আরম্ভ হয়। রাত্রি ৭টা ৪০ মিনিটে সোনাপুর মহাশ্মশানে সর্দারজীর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৬ই ডিসেম্বর—কটকের সংবাদে প্রকাশ, রণতলাই অঞ্চলে গত ৪৮ ঘণ্টায় অন্ততঃপক্ষে তিন শত লোকের রোগে মৃত্যু হইয়াছে। উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট কটক হইতে ৮০ মাইল দূরে রণতলাই গ্রামে ১২ বৎসর বয়স্ক রাখাল বালকের 'সর্বরোগ-হর দৈব ঔষধ' নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে অদ্য ভারত গভর্নমেণ্টের এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অতুলনীয় যোদ্ধা সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুতে ভারতের জনসাধারণ এবং কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্টের 'গুরুতর ও অপূরণীয়' ক্ষতি হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য অদ্য কলিকাতার ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সেনাপতি, শক্তিশালী জননেতা সর্দার প্যাটেল ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও নিয়মানুবর্তিতা চিরদিন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

বিদেশী সংবাদ

১১ই ডিসেম্বর—অদ্য সিঙ্গাপুরে 'বনবালা' বার্থাকে (মুসলমান পালিতা ওলন্দাজ বালিকা) লইয়া মুসলমানরা ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করে। এই হাঙ্গামায় ১০ জন ইউরোপীয় নাগরিক ও ৪ জন ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারী আহত হন। উন্মত্ত জনতা পুলিশ দলকে আক্রমণ করে এবং মোটর গাড়ী ও বাসে অগ্নি-সংযোগ করে।

১২ই ডিসেম্বর—জেনারেল ম্যাকআর্থারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মঙ্গোলিয়ান সেনাবাহিনী উত্তর কোরিয়া রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যদের সহিত যোগ দিয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের মুখ্য প্রতিনিধি শ্রী বি এন রাও অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে বলেন, প্রজাতান্ত্রিক চীন তাঁহাকে জানাইয়াছে যে, তাহারা যুদ্ধ চাহে না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে।

সোভিয়েটের আপত্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি অদ্য ১৩টি রাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কিত পরিকল্পনা সম্পর্কে অগ্রে বিবেচনা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। চীনা বাহিনী অপসারণ সম্পর্কে ষট্‌-শক্তির প্রস্তাব অপেক্ষা এই পরিকল্পনাটিকে অগ্রাধিকার দিবার প্রস্তাবটি ৪৮—৫ ভোটে গৃহীত হয়।

'বনবালা' বার্থার ব্যাপার লইয়া গতকল্য সিঙ্গাপুরে যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহার ফলে অদ্য মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ১২জন লোক নিহত, ১৮৮ জন আহত হইয়াছে। বার্থা তাহার মাতার সহিত অদ্য গোপনে হল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ, চীনের কোন্ গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিষ্ঠানে চীনের প্রতিনিধিত্ব লাভ করিবে, তৎসম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য সাতজনকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন।

১৪ই ডিসেম্বর—কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে তিনজনের একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব গতকল্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে ৫১—৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির জন্য ১৩টি রাষ্ট্র যে প্রস্তাব করিয়াছিল, অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ তাহা ৫২—৫ ভোটে অনুমোদন করিয়াছেন।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য কোরিয়ার প্রধান রণাঙ্গন স্তব্ধ রহিয়াছে এবং ৩৮° অক্ষ রেখার দক্ষিণাংশে থাকিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী কম্যুনিস্ট বাহিনী আর অগ্রসর হয় কি না তাহাই লক্ষ্য করিতেছে।

১৬ই ডিসেম্বর—চীনা কম্যুনিস্টরা অদ্য উত্তর-পূর্ব কোরিয়ার প্রধান নগর হামহুং-এ প্রবেশ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী আরও দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য জাতীয় সঙ্কটাবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। 'কম্যুনিস্টদের বিশ্ব-জয় প্রচেষ্টা'র বিরুদ্ধে সকল শক্তি সমাবেশ করিতে তিনি জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

১৭ই ডিসেম্বর—গতকল্য রাত্রে মার্কিন গভর্নমেণ্ট আমেরিকায় কম্যুনিস্ট চীন ও উত্তর কোরীয় গভর্নমেণ্টের সমুদয় সম্পত্তি আটক করিয়াছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেজিষ্ট্রিকৃত জাহাজগুলিকে কম্যুনিস্ট চীনের বন্দরে নোঙর করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।॰ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷॰
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷॰ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৫৭ সাল।   Saturday, 30th December, 1950.   [৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শেখ আবদুল্লা

কাশ্মীরের জননায়ক শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে কয়েক দিনের জন্য নিজেদের মধ্যে পাইয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাঁহার বাণী বাঙালীর অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আমাদের দৃষ্টিতে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছে। শেখ আবদুল্লার প্রতি বক্তৃতায় এই পরিচয় স্পষ্ট হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার এই প্রথম আগমন হইলেও তিনি বাঙালীকে জানেন। তিনি বাঙালীর ব্যথা বোঝেন এবং ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় বাঙলার যে বিশেষ অবদান, তিনি অন্তরে অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। বস্তুতঃ শেখ মহম্মদ আবদুল্লার মুখে আমরা বাঙলার প্রাণের কথা শুনিয়াছি। দুই জাতি-তত্ত্বের অনিষ্ট-কারিতা যে কতখানি এবং তাহার মধ্যে যে কত-খানি অনুদারতা ও হিংস্রতা রহিয়াছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাঙালীরা তাহা মর্মান্তিকভাবে বুঝিয়া লইয়াছে। সুতরাং কাশ্মীর কিজন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইয়াছে, বাঙালীরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। শেখ আবদুল্লা বলিয়াছেন, শতাব্দী-কাল হইতে আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে পাশাপাশি মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছি। এমনই কাশ্মীর। সেই কাশ্মীরে তাঁহারা আরণ্য জীবনের বিভীষিকা বিস্তার করিতে দিবেন না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন শত্রুতার ভাব নাই—কিন্তু ভারতবর্ষ যেভাবে বিভক্ত হইয়াছে, কাশ্মীরকে তাঁহারা সেভাবে বিভক্ত হইতে দিবেন না। প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগের আঘাত এবং বেদনায় বর্তমানে বাঙলাদেশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবস্থার যে অনিষ্টকারিতা, সহস্র সদুপদেশ এবং যুক্তিতেও বাঙালী তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। সেজন্য পাকি-স্তানের জবরদস্তিমূলক অধিকারে বিব্রত ও বিপন্ন কাশ্মীরের অধিবাসীদের মর্মবেদনা বাঙালী বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ।



বহু দূরত্বের ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতের দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত এই দুই প্রদেশের মধ্যে এক গভীর অন্তঃপ্রবাহী সহানুভূতির যোগসূত্র রহিয়াছে। বাঙলার মন আজ কাশ্মীরের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরের ভবিষ্যতের উপর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মৌলিক আদর্শের সার্থকতা বর্তমানে নির্ভর করিতেছে এবং কাশ্মীরের বেদনার পুটপাকে ভারতীয় জাতি-গঠনের মহারসায়ন প্রস্তুত হইতেছে। দুই জাতি-তত্ত্বের মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধ যুক্তিতে কাশ্মীরের সম্বন্ধে পাকিস্তান যে অনর্থকর দাবী উত্থাপন করিয়াছে ভারতকে তাহা ব্যর্থ করিতেই হইবে; সেজন্য যেরূপ ক্ষতি এবং যতটা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনই হোক না কেন। নতুবা রাষ্ট্রস্বরূপে ভারতের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাহার রাষ্ট্রীয় আদর্শের কোন মূল্যই থাকে না। পাকিস্তানের নেতারা কাশ্মীর দখল করিবার জন্য ধর্মান্ধতার যতই জিগীর ছাড়িতে থাকুন, ভারতের স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আরণ্য জীবনের বিভীষিকার মধ্যে কাশ্মীরকে তাঁহারা টানিয়া লইতে পারিবেন না। তাঁহাদের তেমন দুর্মতি যত সত্বর দূর হয়, ততই মঙ্গল।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

কয়েক দিবসব্যাপী অধিবেশনের পর কলিকাতায় ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইল। কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার সনাতন আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনো-ময় এবং বিজ্ঞানময় ভারতের যে কল্যাণ মূর্তি, তাঁহার অপূর্ব ভাষায় সে পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বমানব-সংস্কৃতির সমুন্নতির জন্য ভারতের আত্মার যে অতন্দ্রিত সাধনা চলিতেছে ডক্টর সর্বপল্লী তাঁহার তপো-মূর্তিকে প্রকট করিয়াছেন। দেশ, জাতি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদের কোন বন্ধন ভারতের সাধনা স্বীকার করে নাই, সর্বজনীন যে মনের মহত্ত্ব ভারত তাহাকেই প্রচার করিয়াছে। ভারতের ঋষিগণ অমৃতের বাণী বিশ্বকে

শুনাইয়াছেন। মানব আত্মার অনন্ত এবং অব্যয় আনন্দময় সত্তার অনির্বাণ মহিমাকে উন্মুক্ত করিয়া ভারতের সাধনা সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধ্বে মানব-সমাজের মধ্যে মৈত্রীকে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যুগে যুগে ভারত এই মানব-মঙ্গল মন্ত্র প্রচার করিয়াছে। ভারতের সাধকগণ মানব-মৈত্রীর মূলীভূত পরম সত্যকে নিজেদের জীবনের সাধনায় রূপ দিয়াছেন। ভারতের আত্মার এই যে অবদান ইহা কোন দিন পরিচ্ছিন্ন হয় নাই। বস্তুত দীর্ঘ দিনের পরাধীনতাও এ সত্যকে বিমলিন করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলতঃ পরাধীনতার অন্ধতম যুগেও ভারতের জ্ঞানিগণ মানব-মৈত্রীর পরম মহত্ত্ব বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন। স্বার্থলিপ্সু পশুবলের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল-মন্ত্র এদেশে উদ্গীত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ মানব-সভ্যতার আদর্শকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি রমণের মুখে এ যুগেও আমরা অমৃতের বার্তা শুনিয়াছি। কিন্তু স্বার্থের তাড়নায় উন্মত্ত এ জগতে আজ ভারতের কথা কে শুনিবে, কে তাহার কল্যাণ-সাধনাকে বাস্তব জীবনে রূপ দিবে—সমস্যা হইতেছে ইহাই। বর্তমানে সভ্যতার গতি দুর্নিবার কূটচক্রে ঘুরিতেছে। বিবেকের নামে, বুদ্ধির নামে—মানুষের মুক্তি-সাধনার দোহাই দিয়া আসুরিক বিজিগীষা বিশ্বজগৎকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। সব বুঝিয়া, সব জানিয়াও হিংসার পথে, ধ্বংসের স্রোতে ইহার গতি—উদ্দাম, বিবেকান্ধ ইহার মূঢ়তা এমনই প্রবল। কে এই ধ্বংসের গতি রুদ্ধ করিবে, জগৎকে এমন দারুণ দুর্বিপাক হইতে কে রক্ষা করিবে? প্রকৃতপক্ষে শুধু বচনের কর্ম নয়, প্রয়োজন জীবনের। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডিত্য-সম্পর্কিত বিচার বা গবেষণার পথে বর্তমানের এই সংকট-সমস্যার প্রতিকার সম্ভব হইবে না, প্রয়োজন বৃহত্তের জন্য অনুভাবনার, প্রয়োজন বেদনার। ভারতের আত্মাকে মন্থন করিয়া বৃহত্তের জন্য এই বেদনা যুগে যুগে বাজিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসের মূল তথ্য যাহাই বলুক, বাহ্য প্রতিবেশে তাহা যতই পরিচ্ছিন্ন থাকুক, বৃহত্তের জন্য বেদনা ভারতের পক্ষে সত্য এবং নিত্য। মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া সমষ্টি-মানবের চেতনায় সেই বেদনার বীজকেই উপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সনাতন-সাধনার প্রেরণা সেই বেদনার মধ্যেই সম্পুটিত রহিয়াছে। সেই বেদনা বিশ্বের সমাজ-জীবনে কত দিনে বিস্তার লাভ করিবে, আমরা জানি না; কিন্তু সেই বেদনা মানব-সংস্কৃতির সাধনাকে যত দিন পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া না তুলিবে, তত দিন পর্যন্ত জগতের রক্ষা নাই; পরন্তু বর্তমান সভ্যতার হিংস্র অন্ধতা মানব-সমাজকে সর্বনাশের পথেই লইয়া চলিবে। বড়দিন উপলক্ষে মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রভৃতির মুখে আমরা যে সব শান্তির বাণী শুনিয়াছি তাহা নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি? বস্তুতঃ ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা বিশ্বের জন্য যে বেদনা বহন করিয়া চলিয়াছে এবং ভারতের সাধকদের সত্যনিষ্ঠিত জীবনে যে বেদনার তপ্ততা ত্যাগময় বীর্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, শুধু তাহাই জগৎকে রক্ষা করিতে সমর্থ।

নেপালের ভবিষ্যৎ

নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার পত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, বর্তমান মাসেই নেপালের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তিনি একটি ঘোষণা করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইতিমধ্যে নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম সাহ দিল্লী হইতে নেপালের অধিবাসিগণকে উদ্দেশ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। নেপাল ত্যাগ করিবার পর এই তাঁহার প্রথম বিবৃতি। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাবে নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহকেই নেপালের অধিপতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই নেপালাধীশ্ব বর্তমান বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং সেই বিবৃতিতে নেপালের শাসন-ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের অধিকার লাভ বাঞ্ছনীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাও এতদনুযায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। ভারত সরকার নেপাল সরকারের নিকট নেপালের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এই গণ-পরিষদ গঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত নেপালের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিবার জন্য একটি মধ্যবর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু এই গভর্নমেণ্ট যেভাবে গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে নেপালের জনসাধারণ কতটা সন্তুষ্ট হইবে,—এ বিষয়ে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ এই গভর্নমেণ্টে রাণা-গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা থাকিবেন, বিশেষতঃ রাণা-পরিবারেরই একজন প্রধানমন্ত্রী হইবেন এবং এই প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত হইবেন। ভারত সরকারের এই ব্যবস্থা বস্তুতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝামাঝি একটা রফার ব্যাপার। তবে এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে গেলে নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে অন্ততঃ একটি সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যে কংগ্রেসকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী এবং রাণাগোষ্ঠী বিদ্রোহী আখ্যা দিয়াছেন এবং কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে দমন-নীতি অবলম্বন করিতেছেন, যাহাদিগকে দস্যু আখ্যা দিতেও তাঁহার পক্ষে বাধে নাই সেই বিদ্রোহী কংগ্রেসের নেতাদের সংগে যুক্ত দায়িত্বে মন্ত্রিসভায় তাঁহাকে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। রাণা-গোষ্ঠীর একনায়কত্বের মূলে এইভাবে আঘাত পড়িবে। ফলতঃ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় যদি ইহাতে বাধে, তবে গণ-বিপ্লব পুনরায় অনিবার্য হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র ও রাণাতন্ত্রের মধ্যে গোঁজামিল ইহার পর আর সম্ভবপর নয় এবং রাণাতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রকে আজ নেপাল হইতে বিদায় লইতেই হইবে। নেপালের রাণা-গোষ্ঠী যদি সহজে এ সত্যকে স্বীকার করিয়া লন, এবং তাঁহারা যদি নেপালের প্রগতিকামী জনগণের দাবীর মর্যাদা রাখিতে অগ্রসর হন, তবেই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। পক্ষান্তরে মধ্যবর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থার আড়ালে যদি তাঁহারা স্বৈরতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দুরভিসন্ধির দ্বারা পরিচালিত হন এবং গণ-পরিষদের গঠনকে বিলম্বিত করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে থাকেন, তবে ভারত সরকারকে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নেপালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং বর্তমানে তাঁহাদের প্রস্তাবে আপোষ-নিষ্পত্তির যে একটা ভাব রহিয়াছে, তাহা বজায় রাখা তখন আর তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব হইবে না। কারণ, নেপালের শান্তি এবং নিরাপত্তার উপর ভারতের নিরাপত্তা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। নেপালের জনগণের মধ্যে অসন্তোষের ভাব উদ্দীপ্ত রাখিয়া ভারত সরকার নিজেদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। নেপাল সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতিকে দৃঢ়তর করা সত্যই প্রয়োজন হইবে কিনা, নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার উপর তাহা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে; বস্তুতঃ জনসাধারণের কাছে নেপালের স্বৈরাচারী শাসকদিগকে আজ হেট মানিতেই হইবে। ভারত সরকারের প্রস্তাবে ভাষাগত ব্যাখ্যা যাহাই হোক, নেপালের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে নীতির যৌক্তিকতার মূল্য সেই দিক হইতেই বিচার করিতে হইবে।

মিঃ লিয়াকত আলীর আশ্বাস

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁর পূর্ববঙ্গ সফর সমাপ্ত হইল। পাকিস্তান গণ-পরিষদের মৌলিক নীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জনমত কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিয়াছে, আমরা আশা করি, জনাব লিয়াকত আলী সাহেব এই পরিভ্রমণের ফলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধপক্ষের সমালোচনার উত্তরে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার ভিতর সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ধরাছোঁয়ার কিছুই পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের অভিভাষণে জনাব লিয়াকত আলী সাহেব স্বীকার করেন যে, উক্ত কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের রহিয়াছে এবং তাহারা ইহার সংশোধনের জন্য দাবী করিতে পারে। মূলে নীতি-নির্ধারণ কমিটির রিপোর্ট দোষ-ত্রুটির অতীত, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি লোক নিতান্ত ভ্রান্তভাবে তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে, পাকিস্তানের কর্তা ব্যক্তিরা এতদিন প্রধানতঃ এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিতেছিলেন এবং রিপোর্টে সংশোধন করিবার মত দোষ-ত্রুটি কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র বক্তব্য ছিল। জনাব লিয়াকত আলীর উক্তিতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়; কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর এতৎসম্পর্কীয় উক্তির যুক্তি কার্যকালে কোন ধারা ধরিবে, এখনও বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না; কারণ শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের সোজাসুজি গণতান্ত্রিক অধিকারকে তিনি এক্ষেত্রেও স্বীকার করিয়া লন নাই, "ঐশ্লামিক" এই সংজ্ঞার আড়ালে সে অধিকারে সত্যকার স্বরূপ অদ্যাপি প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীহট্টের বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনাব লিয়াকত আলী সেখানে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, ইশলামের নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে; কারণ ঐশ্লামিক নীতির উপর যদি পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপিত না হয়, তবে পাকিস্তান টিকিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ হেঁয়ালীর মতই জটিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্লামিক রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ কি এবং এ সম্বন্ধে ইশলামের অনুশাসন কি তাহার ব্যাখ্যা ভাষ্য বহু বিতর্ক এবং বিরোধের বিষয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও এ সত্য উপলব্ধি না করিয়াছেন এমন নয়, তাই তাঁহাকে একথা বলিতে হইয়াছে যে, ঐশ্লামিক নীতিই যে সর্বোৎকৃষ্ট এমন মৌখিক ঘোষণা প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীর মনে আস্থা জন্মাইতে পারা যাইবে না। এই নীতি কর্মে রূপায়িত করিতে হইবে। ঐশ্লামিক নীতির এই যে রূপায়ণ, তাহা প্রক্রিয়া-ক্রমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ, তাহাদের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের সমাধিকার সূত্রে তাহাদের মান-মর্যাদা কতটা সুরক্ষিত হইবে, ইহা সন্দেহের বিষয়ই থাকিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ যে ধারা ধরিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে সেখানে ঐশ্লামীয় আদর্শের রূপায়ণ চলিতেছে, তাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অদ্যাপি নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে অভাব-অভিযোগের কারণ যে রহিয়াছে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের প্রতি সর্বসাধারণের দরদই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া থাকে এবং সমাজ-সংস্থিতিকে সুদৃঢ় করে, পাকিস্তান ইশলামের রাষ্ট্র এবং ইশলামের নীতির দ্বারাই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে, এই ধরণের প্রচারকার্য সাম্প্রদায়িকতার চেতনাই স্পষ্ট ও সমাজ-জীবনে জাগ্রত রাখে এবং শাসন সমস্যাকে জটিল করিয়া তোলে। পাকিস্তানের সমুন্নতি যদি সত্যই সাধন করিতে হয় এবং বিশ্ববাসীর মনে সেই রাষ্ট্রের আদর্শগত নীতির মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে বিশেষ ধর্মগত বিচার-বোধকে সর্বাগ্রে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে শুধু কথার হেঁয়ালী চালাইয়া প্রগতিশীল জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধনায় বাঙলা

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইল। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বাংলার সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। নানা মতবাদের সংঘাতের মধ্যেও সম্মেলনের এই অধিবেশন সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছে। জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি এই বাঙলা। বাঙলাদেশের ভাব-সমুদ্র মন্থন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিময় আবর্ত উত্থিত হয়। বাঙলার সাধনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেদিন এক নূতন রূপ দিয়াছিল। বাঙলার দিগাঙ্গনে জ্যোতির্ময়ী দেবী সেদিন জাগিয়া ছিলেন এবং বাঙলার সাধকগণ সাহিত্য, শিল্প সকল দিক হইতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই দেবীকে ভূষণ এবং আয়ুধের দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। বাঙলার এই দেবীপূজায় সংকীর্ণতার কোন স্থান ছিল না। বাঙলার স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধ প্রাদেশিকতার দ্বারা কোনদিন বিমলিন হয় নাই। মানবতাই তাহার মূলে কাজ করিয়াছে, আর্ত, পীড়িত এবং পরপদদলিত নরনারীর মুক্তির প্রেরণাই বাঙালীর সেই সাধনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মনিবেদনের পথে জনচিত্তের সঙ্গে গভীরভাবে সংবেদনা ছিল বলিয়াই সেই সাধনা এতটা শক্তি লাভ করে এবং স্বার্থ-সুখ-সম্পর্ক শূন্য ছিল বলিয়াই রাষ্ট্রসাধনায় বাঙালীর সেই দর্শন সমগ্র ভারতের জনগণের চিত্তকে আলোড়িত করিতে সমর্থ হয়। বাঙলার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধনার মূলে এই যে প্রেরণা ইহার মধ্যে অর্থচেতনা না ছিল, এমন কথা আমরা বলিব না। ফলতঃ দেশের লোকের আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার আগ্রহ সে সাধনার মূলে উদগ্রভাবেই ছিল, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সে সাধনার মূলে বিশেষভাবে ছিল আত্মভাবনা। দেশের নরনারীকে আপন করিয়া দেখিবার দৃষ্টি—যাহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, তাহাদের জীবনেও সত্য এবং সুন্দর সাক্ষাৎ সম্পর্কে অনুভূতি। এই যে অনুভব বাঙলার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধনাকে ইহা প্রাণের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাঙালী দেশের দিকে চাহিয়া প্রাণ বলে প্রাণ দিয়াছে এবং অমৃতত্বের মহিমা তাহার রাষ্ট্রসাধনায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারত আজ স্বাধীন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশ হইতে আজ বিতাড়িত; কিন্তু কোথায় বাঙলার রাষ্ট্র-সাধনায় প্রাণের সেই প্রেরণা? সত্যই রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ত্যাগ, তপস্যা এবং আত্মদানের সব আগ্রহ যেন নিভিয়া গিয়াছে। বাঙলার রাষ্ট্রনীতিক সাধনা দেশের অন্তর-ধারার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৃহৎ আদর্শের উদ্দীপনা বাঙলার সমাজজীবনে আর তেমন করিয়া সাড়া দেয় না। বর্তমান সঙ্কটকালে সমগ্র বাঙালী জাতির বিশেষভাবে এই সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে; কারণ সমষ্টি-চেতনা যদি জাগ্রত না থাকে, তবে রাষ্ট্রের সাধনা কিছুতেই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন মতবাদের পারিভাষিক তত্ত্বের অন্ধ অনুকরণ মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয়ের স্পর্ধাই প্রচ্ছন্ন আকারে তাহার ফলে প্রবল হইয়া উঠে এবং জনগণের দুর্গতির কারণ ঘটায়। দেশের নরনারীর সেবার মধ্যে অনপেক্ষ যে আনন্দ বাঙলার রাষ্ট্র-সাধনাকে সেই ভাব-রসে বিভাবিত করিবার প্রয়োজন সত্যই দেখ দিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাকে ভাবুকতা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না, যে ভাব-ধারা জীবনের মহিমাকে বিস্তার করে, সেবাকে স্বচ্ছন্দ করিয়া তোলে, বাস্তব বিচারের দিক হইতেও রাষ্ট্রনীতির সাধনায় তাহার মূল্য সামান্য নহে।

শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষের আনন্দ উৎসব

৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-দিবস। ভারতের এই মহাপুরুষ এক শতাব্দী আগে যে সত্যোপলব্ধি করেছিলেন, সাধনার যে বীজ সেদিন বীরভূমের প্রান্তরের এক প্রান্তে রোপিত হয়েছিল, আজ তা বিরাট মহীরুহরূপে প্রকাশমান। এই পুণ্য দিবসটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই আজ থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগে ১৯০১ সালের ৭ই পৌষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন ছয়জন ছাত্র নিয়ে যে বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল আজ তা সহস্রাধিক ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে চলছে। একদিকে মহর্ষির সাধনার সঙ্গে নিবিড় সংস্রব, অপরদিকে আশ্রম-গুরু রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, এই দুইয়ের সহযোগে শান্তিনিকেতন আজ নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। তাই প্রতি বৎসর আশ্রমবাসীরা ৭ই পৌষের পুণ্য দিবসটি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনদিনব্যাপী উৎসবরূপে পালন ক'রে থাকেন। এই উপলক্ষে বিরাট প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। সেই মেলায় প্রধান অংশ গ্রহণ করে থাকে বীরভূমের পল্লীবাসীরা। হাজার হাজার গ্রামের লোক তাদের হাতের তৈরী পণ্যসামগ্রী নিয়ে এই মেলায় উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য আসে সার্কাস পার্টি, নাগরদোলা, যাত্রার দল, কবি গান। নানারকম ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অন্তরের যোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সর্বত্র শান্তিনিকেতনের বহু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী ছড়িয়ে রয়েছেন, এই উৎসব দিবসের টানে তাঁরা সবাই দূর দূরান্ত থেকে এসে মিলিত হন এবং মিলিতকণ্ঠেই গান গেয়ে থাকেন—

"মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে
সে যে করেছে এক মন
আমাদের শান্তিনিকেতন॥"



সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভাষণ



ডাঃ মুখার্জি জনৈক স্নাতককে ডিপ্লোমার সহিত সপ্তপর্ণ উপহার দিতেছেন



শ্রীযুত নন্দলাল বসু একজন স্নাতককে চন্দনের ফোঁটার দ্বারা আশীর্বাদ করিতেছেন

মেলা প্রাঙ্গনে পল্লীবাসীদের পসরা

ডান দিকেঃ পাথর মালা, কাঁচের চুড়ি, বাঁশের বাঁশি ও খেলনা প্রভৃতির দোকান

নীচেঃ নাগরদোলায় নাগরিক ও গ্রামবাসীদের ভীড়



উপরেঃ সাঁওতালদের হাতের তৈরী নক্সা-করা চিনের পাত্র

বাঁদিকেঃ গ্রামের মৃৎশিল্পীর তৈরী নানা-রকমের মাটির পাত্র

[দেশ পত্রিকার ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত]

বৈদেশিকী

কোরিয়া যুদ্ধের খবর এখন আর পূর্বের মতন অবাধে আসে না। উত্তর কোরিয়ায় ম্যাকআর্থার বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হবার পর থেকে কড়া সামরিক সেন্সর-শিপের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে এদেশের খবরের কাগজে আজকাল যুদ্ধের যে খবর বেরুচ্ছে তা থেকে কোরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণ ও সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয় এবং সেজন্য যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে দক্ষিণ কোরিয়ায় আবার একটা বিষম টানা-হ্যাঁচড়া চলবে বলে বোধ হয়।

উত্তর-পূর্ব কোরিয়ায় যে আমেরিকান বাহিনী বিপন্ন হয়েছিল তারা কোনোরকমে হুংনাম বন্দর দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। এই বাহিনীর বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়েছে এবং এদের অস্ত্রশস্ত্র মালপত্তরও অনেক গেছে সন্দেহ নেই। তবে এই সৈন্যবাহিনীর বেশির ভাগ লোককে যে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন সেইটেই এখন ম্যাকআর্থারী নেতৃত্বের একটা পরম কৃতিত্ব বলে প্রচার করা হচ্ছে। যাই হোক্ হুংনাম বন্দর দিয়ে যাদের পার করা হোল তাদের নাকি দক্ষিণ কোরিয়ার পুসান অঞ্চলেই কোথাও নামানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে ম্যাকআর্থারী ফৌজ কোন্ অঞ্চলে কত জড়ো হয়েছে সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে না, যদিও তাতে প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সমরকর্তাদের খবর পাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। অতীতে দেখা গেছে, প্রতিপক্ষের মতিগতি ও গতিবিধির খবর সম্বন্ধে জেনারেল ম্যাক-আর্থারই বার বার নিজেকে প্রতারিত করেছেন। যাই হোক্ দক্ষিণ কোরিয়ায় আর একটা বড় গোছের বলপরীক্ষার জন্য উভয় পক্ষ প্রস্তুত হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে যুদ্ধটা ঠিক কী আকার নেবে সেটা এখনো বুঝা যাচ্ছে না। ম্যাকআর্থার বাহিনী কোরিয়ার কোমর বরাবর একটা লাইন নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন বলে মনে হচ্ছে না। চীনারা ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে বলে এখনো সঠিক খবর আসে নি তবে সময় হলেই যে তারা এগুবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই, যদি না ইতোমধ্যে একটা রাজনৈতিক মীমাংসার পথ খুলে যায়। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটুকু?

ইউনোতে ভারতবর্ষ প্রমুখ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের আগ্রহে যে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব পাশ হয়েছিল সেটা পিকিং সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফরমোজার নিকটবর্তী সমুদ্র থেকে আমেরিকার নৌবহর সরিয়ে নেওয়া, বিদেশী সৈন্যের কোরিয়া ত্যাগ এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও ইউনোতে চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধির পরিবর্তে পিকিং সরকারের প্রতিনিধিকে স্থান দান—এই প্রশ্নগুলির আলোচনা মুলতুবী রেখে কেবল কোরিয়াতে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবের আলোচনা করতে পিকিং সম্মত নয়। পিকিং জানে যে, উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দুটির সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতভেদ আছে। বৃটেন ইউনোতে ও সিকিউরিটি কাউন্সিলে পিকিং সরকারকে স্থান দিবার পক্ষপাতী। চীনের সঙ্গে যদি একটা নিষ্পত্তি হয় তবে ফরমোজা থেকে আমেরিকান নৌবহর সরানোও বৃটেন চাইবে। প্রকৃতপক্ষে আমে-রিকার ফরমোজা সম্পর্কিত নীতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের গোড়া থেকেই মনঃপুত হয় নি। কোরিয়ার সঙ্গে ফরমোজাকে জড়াবার ম্যাক-আর্থারী নীতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের সমর্থন পায় নি, যদিও এ্যাটলী-ট্রুম্যান বিবৃতিতে এ বিষয়ে বৃটিশ আপত্তির একটু নরম হবার আভাস পাওয়া যায়। যাই হোক্, হংকং এবং বৃটিশ বণিক স্বার্থের খাতিরে বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট চীনের সঙ্গে মোটামুটি একটা আপোষের পক্ষপাতী। সুতরাং যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় কোরিয়া থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবীর বিরুদ্ধে বৃটেন আমেরিকার সহিত একমত হলেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও বৃটিশ জনমত যে চীনের প্রতি আমেরিকার মনো-ভাবকে কিছুটা আপোষ-মুখী করার চেষ্টা করছে পিকিং নিশ্চয়ই সেটা বুঝছে। এই ফাঁকটুকু দিয়েই যা একটু ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যায়। সম্ভবত এই কথা ভেবেই পিকিং সরকার ইউনোর যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও এই আশা প্রকাশ করেছেন যে যুদ্ধ-বিরতির চেষ্টার জন্য ইউনো যে তিন-জনের কমিশন নিযুক্ত করেছে তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কাজ করে যান। সুতরাং যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য কূটনৈতিক চেষ্টাও কিছু চলছে এবং চলবে।

দর কষাকষির দিক দিয়ে চীনের পজিশন এখন খুবই জোরালো। সাময়িক হলেও যুদ্ধে ম্যাকআর্থারী ফৌজের একটা বিষম হার হয়েছে। পিকিং এটাও জানে যে, ইঙ্গ-মার্কিনের মুখরক্ষার তাগিদ থাকা সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে একটা পুরোপুরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বৃটেন কিছুতেই চায় না। আমেরিকাও ক্রমশ বৃটিশ মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। তার অবিশ্যি প্রধান কারণ এই যে, আমেরিকাও বুঝতে পারছে যে, এক সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়া এবং পশ্চিম য়ুরোপের "রক্ষা"-ব্যবস্থা গড়ে তোলা একরকম অসম্ভব। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির এক দলের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও ট্রুম্যান সরকার ও আমেরিকার জনমত য়ুরোপ-রক্ষার প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেবার ক্রমশ পক্ষপাতী হয়ে উঠ্ছে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং মোটের উপর পরিস্থিতি চীনের খুবই অনুকূল, যার দরুণ চীনের পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিনদের কাছ থেকে ভালো সর্ত আদায় করা সম্ভব। চীনের কিন্তু একটি বড় অসুবিধা আছে। চীনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিনের একটা মীমাংসা হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে য়ুরোপে আতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের সামরিকশক্তি-সংহতি সহজ হবে, অর্থাৎ সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ থামলে য়ুরোপে রাশিয়ার বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা। এখানে চীনের জাতীয় স্বার্থ রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটা বিরোধের মূল লক্ষিত হয়। কিন্তু আবার রাশিয়াকে চটানোও এখন চীনের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ নয়। রাশিয়ার বন্ধুত্ব বর্তমান অবস্থায় চীনের পক্ষে অপরিহার্য, এ বিষয়ে পিকিং-এ দ্বিমত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং মীমাংসার পথে জটিলতারও অন্ত নেই।

বর্তমান অবস্থায় কোরিয়াতে যুদ্ধ চলার সম্ভাবনাই চৌদ্দ আনা বলা যায়। সিউল থেকে রী গভর্নমেণ্ট আবার দক্ষিণমুখী পালিয়েছে। সিউল রক্ষা জেনারেল ম্যাক-আর্থারের বর্তমান সমর-পরিকল্পনার অন্তর্গত কিনা নিশ্চিত বলা যায় না, বোধ হয় নয়। কোরিয়ার আড়াআড়ি কোনো লাইন নিয়ে যুদ্ধ করা বোধ হয় এখন ম্যাকআর্থার বাহিনীর সাধ্যাতীত। আপাতত পিছনে বন্দর রেখে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর একটি অঞ্চল রক্ষাই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যাদেরই জয় হোক হতভাগ্য কোরিয়ার আর কিছু থাকবে না। যে বর্বর ধ্বংস ও নির্মম লোকহত্যা চলছে তার কথা চিন্তা করলে কোনো মতবাদ, কোনো বুলি কিছুর উপরেই আর মানুষের শ্রদ্ধা থাকে না।

২৬।১২।৫০



ছবির মত আজো চোখে লেগে আছে সেই চেহারা। নাম শিখারাণী। দেখতেও অবিকল শিখার মত। নাক মুখ চোখ ভ্রূ আলাদা আলাদা ভাগ করে দেখিনি কোন দিন; যখনই দেখেছি, তখনই আস্ত মানুষটাকেই দেখেছি, আস্ত শিখাটা। সে-শিখায় কখনো পেয়েছি তাপ, কখনো আলো। খুঁটিনাটি করে সেসব কাহিনী বলার আজ আর আগ্রহ নেই।

ঘটনাও তো হয়ে গেল অনেক দিনের। এত পুরনো কথা কেউ মনে রাখে না হয়ত, কিন্তু আমার একথা মনে করে রাখার কারণ ভিন্ন, একেবারে আলাদা, আর নেহাতই ব্যক্তিগত। অনেকে হয়তো ইতিমধ্যেই কারণটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। বলে রাখা ভালো, তাঁদের অনুমান ঠিক।

আমি প্রেমে পড়েছিলাম শিখার। এমন মেয়ের প্রেমে না পড়াটাই অবশ্য অন্যায়। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি নরম; যেমন তেজী, তেমনি গরমও।

ছবির মত আজো তার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। বহুদিন কেটে গেছে। এই দুইটি চোখের সম্মুখ দিয়ে এরই মধ্যে অন্ততঃ হাজারটা মেয়ে যাতায়াত করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যের কেউই শিখার ছবিটা চাপা দিতে পারেনি। শিখাকে তো পাওয়া যায়নি, তার স্বপ্নটা নিয়ে তাই এই সতেরোটা বছর এক-টানা কাটিয়ে চলেছি। শিখা এখন কোথায় আছে, কিভাবে আছে—সেসব খবর নেবার কোনো আগ্রহও নেই। অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে গিয়ে থাকবে।

সেবার এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে দেখি, সাতটি মেয়ে আমাদের সহপাঠী। বি-এ পর্যন্ত পাস করে এলাম ছেলেদের সঙ্গে পড়ে পড়ে; এখানে এসে হঠাৎ মেয়েদের সঙ্গী পেয়ে ভেতর-ভেতর খুশি হলেও বাইরেটা ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কোন্ চাল কোন চলন কার চোখে কখন কেমন বেকায়দা দেখায়, এই ভয়। এমন সময় এল অষ্টমা শিখারাণী পাকড়াশি। তার চেহারাটাই একটা চমক।

অরবিন্দ ছিল ভারিক্কে ধরণের, নস্যি নিত খুব, গলার স্বরও ভারী। একবার মুখ তুলে চেয়ে বলল, এমেয়ে এখানে কেন?

প্রবীর বলল, আমাদের নয়নরঞ্জনের জন্যে বোধ হয়।

—তবে যাবে কোথায়? বেকুবের মত প্রশ্ন করলাম আমি।

—হারেমে। অরবিন্দ নির্লিপ্ত জবাব দিল। একটু ভেবে বলল, হয়তো জীবনে ওর কোনো ট্রাজেডি আছে।

সবাই চুপ করে গেলাম। অরবিন্দের থিয়োরি চট করে ধরা গেল না।

অরবিন্দ এক টিপ নস্যি নিল, দুবার কাশল, রুক্ষ এক মাথা চুলের মধ্যে আঙুল চালালো কিছুক্ষণ, তারপর অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল, বলল, বেড়ে দেখতে। এমন মেয়ে আবার পড়তে আসে! এখানে তো আসবে সব চুপসানো দুমড়ানোরা, কালো আর ফ্যাকাশেরা; --যাদের গার্হস্থ্য কোনো প্রসপেক্ট নেই, তারা।

—ডুবেছিস্। মন্তব্য করল প্রবীর।

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে আমি বললাম, চুপ, এই দিকে আসছে।

আঁচলের বাতাস দিয়ে শিখা পাশের বেঞ্চে গিয়ে বসল। দখিনা পবন জিনিসটা কোনো-দিন দেখি নি। মনে হল, এই আঞ্চলিক হাওয়াই বুঝি সেই দক্ষিণের বাতাস। কিংবা হয়ত বা দাক্ষিণ্যের।

মৌচাকে ঢিল পড়ার শামিল ক্লাসে এসে পড়েছে শিখারাণী। চারদিকে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। চাপা গলার আলাপ ও আলোচনা কিছুতে যেন থামে না।

পিছন থেকে আমরা দেখছি ওর চুলের ঢিবিটা। মাথার পেছনে যেন প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। এলো খোপা বাঁধা, হাড়ের কাঁটা দিয়ে মাথার সঙ্গে যেন গেঁথে রেখে দিয়েছে। আবলুশের মত কালো।

প্রবীর বলল, আমি ম্যারেড, তা না হলে একবার পাকড়াশিকে পাকড়াও করার চেষ্টা করে দেখতাম।

অরবিন্দ মন্তব্য করল না, শব্দ করে নস্যি টানল।

বলতে ইচ্ছে হল, আমি কিন্তু আন্‌-ম্যারেড; কিন্তু কথা বেরল না।

হাসে না, কথা বলে না, কারো দিকে অনুগ্রহ করেও তাকায় না—মাথা নীচু করে ক্লাসে আসে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় শিখারাণী। আমি দূর থেকে দেখি, কাছে ঘেঁষতে প্রবল ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস হয় না। নিখিল, বনমালী, দেবেশ আর নিত্যানন্দ এর মধ্যে নানা অছিলায় অন্ততঃ ছয়-সাত বার তার কাছে গেছে। এদের তবু সাহস আছে। আমার মত যারা ভীতু প্রকৃতির তারা কাছে ঘেঁষে না অবশ্য, কিন্তু শিখা তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা অশ্রাব্য মন্তব্য নিক্ষেপ করে। এই দুই দলের ওপরই আমার রাগ হয় ভয়ানক। আমার কেমন যেন ধারণা হয়ে গেছে যে, শিখা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কৃপণের ধনের মত অনেকটা। আগলে বসে থাকব, ব্যবহার করব না; অথচ হাত দিতেও দেব না কাউকে।

দৈবাতে কখনো তার পথের মাঝখানে পড়ে গেলে আমি সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতাম। অরবিন্দ গম্ভীর হলে হবে কি, তাকেও ইচ্ছে করে রাস্তা জুড়ে দাঁড়াতে দেখেছি। প্রবীর ম্যারেড, তবু সেও একটু-আধটু চোরা চিমটি দিয়েছে।

এত উৎপাত আর উপদ্রব সত্ত্বেও শিখা মাথা তুলল না একদিন। একদিন একটা কটাক্ষ পর্যন্ত নিক্ষেপ করল না কারো দিকে।

ক্লাসে খুব গোলমাল হত হরিদাস ভড়ের পিরিয়ডে। মানুষটা গোলগাল, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। তাঁর নাম হয়েছিল তাই ভুঁড়িদাস হর। হরের পিরিয়ড মানেই হৈ হুল্লোড়। শিখাকে এঁর ক্লাসে একটু বিচলিত দেখতাম। সে নিজেকে হয়ত নিরাপদ মনে করত না এই সময়টা। বেঞ্চের সঙ্গে আঠার মত লেগে বসে থাকত।

সেদিন হরিদাসবাবু ক্লাসে আসছেন, ছেলেরা দল বেঁধে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওদের তামাশার বহর দেখে চট করে ক্লাসে ঢুকে পড়তেই দেখি সামনে শিখা। গায়ে ঠিক যেন তাপ লাগল আমার। পেছন থেকে তো প্রবীররা হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল—অ্যাকসিডেণ্ট, অ্যাকসিডেণ্ট। অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্স।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। প্রবীররা ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরল, বলল, খুব লেগেছে? উন্‌ডেড হয়েছ কি?

শিখার দিকে তাকাতে পারলাম না। কিন্তু আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। এমন সময় চক্রব্যূহ বেষ্টিত হয়ে ক্লাসে ঢুকলেন হরিদাস-বাবু। বললেন, হয়েছে কি?

প্রবীরদের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, অ্যাকসিডেণ্ট সার্, কলিশন।

আর একজন বলল, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে।

হরিদাসবাবু নিরীহ মানুষ। আর কিছু কাউকে জিজ্ঞেস না করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, খুব লাগেনি তো?

উত্তর দিতে পারলাম না। ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেরা একসঙ্গে হেসে উঠল। ওদিকে ওরা মুখে কাপড় দিয়ে ফিকফিক করে হাসছে, শিখা মাথা নীচু করে বসে আছে কাঠ হয়ে—এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলাম।

পেছনের বেঞ্চ থেকে সকলে গাল বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—হর হর, ব্যোম ব্যোম।

আমাকে ধরাধরি করে প্রবীররা টেনে নিয়ে গেল সীট্‌এ।

এর পর তিনদিন লজ্জায় আমি ক্লাসেই আসিনি। তারপর যেদিন এলাম, সেদিন দেখি নতুন উপসর্গ। ঠিক এই তিন দিন নাকি শিখাও অ্যাবসেণ্ট হয়েছিল।

আমার নামটা এতক্ষণ ভুলক্রমে বলা হয় নি। আমার নাম প্রদীপ।

নিত্যানন্দ যে কবিতা লিখতে জানে, আগে জানা ছিল না। এরই মধ্যে সে তার রাফ খাতার পাতায় কয়েকটা লাইন লিখে ফেলেছে। চেঁচিয়ে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে প্রবীর। লাইন-গুলো আজ আর মনে নেই, বক্তব্যটা একটু-একটু মনে পড়ে। একটা মাটির পিদিম নাকি অবহেলায় পড়েছিল আস্তাকুঁড়ে, ছুঁড়ে-ফেলা সেই পিদিমটা কুড়িয়ে এনে তাতে নাকি দেওয়া হল পলতে, দেওয়া হল তেল। আর যাবে কোথায়—ব্যাস্, শিখায় আলো হল ক্লাস।

দশচক্রে ভূত হলেম না, ভড়কে গেলাম। শিখার ত্রিসীমানা মাড়াতে আর ভরসা হল না। এদের জ্বালায় পড়াশুনা ছেড়ে পালাতেই ইচ্ছে হত এক এক সময়, কিন্তু আমার কিসের আকর্ষণে কিছুতেই তো পেরে ওঠা গেল না। বলতে বাধা নেই, আমি আমার অজানিতেই শিখার প্রেমে পড়ে গেলাম। প্রেমটা ক্রমশঃ এমন প্রবল ও তীব্র হয়ে উঠল যে, তার কথা ভাবতে ভাবতে রাত্রে মাথা গরম হয়ে যেত—ঘুম হত না।

শিখারাণী শিখাখান জ্বালায়ে—নিত্যা-নন্দের ভাষায় ক্লাসকে আলোকিত ও পুলকিত করে রেখেছে বটে, কিন্তু সেই জ্বালায় তলে তলে আর একজন যে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখবর হয়ত সে রাখত না। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি, আশ-পাশ থেকে আমার গলা শুনলে সে যেন একটু সচকিত হত। তার এই চকিত ভাবের কারণ জানার কথা আমার নয়। অথচ ভাবতে বড় ভালো লাগত যে, শিখার হয়ত টান হয়েছে আমার ওপর।

প্রবীর একদিন ছুটে এসে বলল, ও শিখা না রে, ও আগুন।

—যথা। অরবিন্দ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করল।

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, লাইব্রেরীতে দেখা। সরাসরি সামনে গিয়া জিজ্ঞাসা করলাম বই নিচ্ছেন বুঝি? জবাব দিল না। বললাম, আমি কিন্তু ম্যারেড, কিছু মনে করবেন না। শাদা মনেই জিজ্ঞাসা করছি—প্রদীপের সঙ্গে দেখা হয়েছে? যেই-না বলা, অমনি দপ করে জ্বলে উঠল। কি বলল জানিস্? বলল স্টুপিড।

প্রবীর হাসছে বেহায়ার মত, খানিকটা স্টুপিডের মতই। আমার সম্বন্ধে আর কোনো কথা হল কি না, জানবার জন্যে আমার ভেতরটা দাপাতে লাগল। এমন সময় দেখি, শিখা ক্লাসে ঢুকছে। কোনো দিন সে মাথা তুলে তাকায় না। আজ সকলে দেখে চমকে গেল। শিখা মুখ তুলে চারদিকে তাকাচ্ছে। হয়ত প্রবীরকে খুঁজছিল, কিন্তু আমার মনে হল, হয়ত খুঁজছে আমাকে। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে বসলাম। একটু পরে মাথা তুলে দেখি, তার অপর্যাপ্ত চুল আজ বেনী বাঁধা নয়, পিঠময় ছড়ানো। কালো রেশমের মত চকচক করছে।

বীরকুৎসার হাই ইংলিশ স্কুলে মাস্টারি করছি পনরো বছর হল। জীবনের আগের অধ্যায়গুলো মুছে ফেলতে পারা যায়নি। কিন্তু সে-সব পাগলামির কথা মনে হলে এখন হাসি পায়। কিন্তু প্রকাশ্যে হাসবার উপায়ও নেই। সেই পাগলামির জের যে টেনে চলেছি এখনো। জীবন থেকে কোথায় ছিটকে চলে গেছে উচ্চ আশার আকাঙ্ক্ষা, কোথায় চলে গেছে শিখারাণী। তার কোনো খোঁজও নেই, খবরও নেই। এই গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি নিয়ে নিরিবিলি অজ্ঞাতবাস করে চলেছি। প্রবীর নাকি শ্বশুরের কল্যাণে ভালো চাকরি পেয়ে সস্ত্রীক দেরাদুনে আছে; অরবিন্দ পলি-টিক্‌সে মেতে আছে, মাঝে মাঝে কাগজে নাম দেখি। নিত্যানন্দ হয়েছে জার্নালিস্ট। আমি এদের খবর এইটুকু রাখি বটে, কিন্তু ওরা যে আমার কোনো খোঁজ রাখে না, এ বিষয় আমি নিশ্চিত। কোথায় কলকাতা শহর, আর কোথায় রাজসাহী জিলার এই ছোট একটুকরো গ্রাম। তবু সুখেই আছি বলতে হবে। কোনো ঝক্কি নেই, কোনো ঝামেলা নেই। আমি আছি, আর আছে আমার সঙ্গী রাধা।

বাৎসরিক একবার করে উচ্চ আশার প্রেরণা পাই। এই সময় ইউনিভার্সিটিতে একটা করে দরখাস্ত পাঠাই—যদি পরীক্ষকের কাজটা পাওয়া যায়। পনেরো বছর মাস্টারি

জীবনের মধ্যে বারো বছর ধরে আর্জি পেশ করে আসছি। কোনো জবাবও পাইনে, হয়ত জবাব আমি চাইও নি। কয়েক বছর পাঠাতে পাঠাতে ওটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। বীরকুৎসা ইস্কুলের মাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হলে তার যে ইজ্জৎ কতটা বাড়বে, তা দূরে বসে কারো পক্ষে আন্দাজ করা সহজ নয়। জীবনে হাজারো রকমে বে-ইজ্জৎ হয়ে হয়ত এই শেষ ইজ্জতের সন্ধান করছিলাম।

এবার দেখি, মঞ্জুর হয়ে গেছে আবেদন। চিঠি এসেছে। বীরকুৎসায় সাড়া পড়ে গেছে। খবর পেয়ে হেডমাস্টার মশাই দেখা করতে এলেন।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায় বললেন, আপনাকে প্রথমদিন দেখেই বুঝতে পেরেছি জীবনে আপনি একটা কিছু করবেন—চোখে-মুখেই প্রতিভার ছাপ আছে আপনার। গলার স্বর একটু নামিয়ে বললেন, কাকে দরখাস্ত করতে হয়, মশায়?

রাধা কোনো কথা বলছে না, মুখ টিপে টিপে হাসছে। আমার এই সৌভাগ্যে তারও যেন অংশ আছে—তার হাবভাব অনেকটা এমনি।

সরাসরি চলে এলাম কলকাতায়। পথঘাট তেমনি আছে, ঘরবাড়ি সব আগেরই মত। তেমন কোনো পরিবর্তনই চোখে পড়ছে না। একটা শহরের জীবনে পনেরো বছর হয়তো কিছু না। কিন্তু একটা মানুষের পক্ষে এ যে ঢের। এরি মধ্যে তার মুখের চামড়া যায় কুঁচকে, মাথার চুলেও হয়ত পাক ধরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বদল হয়েছে কিছু। নতুন দালান উঠেছে, পুরনো দালানগুলো পালিশ করা হয়েছে। আমাদের বাল্যলীলার আসরটা চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলাম। দেখলাম বটে, কিন্তু এই দেখার নেপথ্যে একটা অনুভূতির জ্বালা ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, একদিন যারা জড়ো হয়েছিলাম এখানে, আজ তারা সবাই কে কোথায় ছড়িয়ে গেছে। নিত্যনন্দ আর অরবিন্দ কলকাতাতেই আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করে যাবার লোভ হতে লাগল শুধু।

দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিং থেকে আশুতোষ বিল্‌ডিঙে যাবার মুখেই থমকে দাঁড়ালাম। একটা চেনা মুখ যেন। ভালো করে নজর করতেই চিনতে পারলাম। কাছে গিয়ে কথা বলব কি বলব না ভাবলাম কিছুক্ষণ। যার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলিনি, তার সঙ্গে আজ যেচে কথা বলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। কিন্তু তবু এগোলাম।

—চিনতে পারেন?

—কেন পারব না। আপনি আমাকে চিনেছেন দেখছি। শিখারাণী সপ্রতিভভাবে বলল।

সতেরো বছর সময়টা তবে বুঝি কিছু না। টানা সতেরো বছর পর দেখেও দুজন দুজনকে সহজেই চিনতে পারলাম।

—এখানে? জিজ্ঞাসা করলাম আলগোছে।

শিখারাণী বলল, পরীক্ষার খাতা নিতে। —আপনি।

হাসলাম, বললাম, ডিটো। ওই একই কাজে।

শিখা আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়।

বললাম, আমি আছি বীরকুৎসার ইস্কুলে।

তার সিঁথিটা ফুটফুট করছে। কালো চুলের ফাঁক দিয়ে রং যেন ফুটে বেরচ্ছে। অরবিন্দর মন্তব্যটা মনে পড়ল, এমন মেয়ে এখনো কোনো হারেমে ভর্তি তাহলে হয়নি। কেমন যেন গোলমাল ঠেকতে লাগল আমার। মনে হতে লাগল, আমার কোনো হিসেবে ভুল হচ্ছে কি না। সতেরো বছরের মধ্যে জীবনের অনেক বদল তো হতে পারে। হয়ত জীবনে জুটেছিল কোনো বন্দর, তার পর সে অন্দর হয়তো চলে গেছে অন্তরালে। হতেও পারে বই-কি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়?

কাঁথী। কন্‌টাই।

সেখানে কতদিন?

—বছর দশ। তার আগে তো ছিলাম, আপনারই কাছাকাছি। নওগাঁর ইস্কুলে, রাজসাহীর নওগাঁ। সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়ে এসেছি।

আক্ষেপও নয়, অনুতাপও নয়—নিজের ওপরেই যেন অভিমান হতে লাগল। বীরকুৎসা আর নওগাঁ খুব তফাতে তো নয়। তার কোনো খোঁজই যে রাখিনি, এটা যেন আমার খুব বড় রকমের অপরাধ হয়ে গেছে, এমনি মুখ করে বললাম, ইস্, খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল আমার।

শিখা হাসল, চট করে গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, নিশ্চয় উচিত ছিল। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। শিখা জিজ্ঞাসা করল, সপরিবারেই থাকেন সেখানে?

হাসি পেল, বললাম, হাঁ। থাকি আমি আর রাধা।

শিখা কি যেন ভাবল, তার পর বলল, আপনার স্ত্রীর নামটি তো বেশ। বললাম, পুরো নাম রাধাবল্লভ বিশ্বাস।

চমকে উঠল শিখা, বলল তার মানে?

—ভৃত্য। ব্যাচিলার্স ডেনের সে হচ্ছে পাহারাদার।

—বিয়ে-টিয়ে করেন নি বুঝি?

—সুযোগ পেলাম কোথায়? প্রবীর ছিল ম্যারেড, কিন্তু প্রদীপ এখনো আন্-ম্যারেড।

হেসে উঠল শিখারাণী।

বেপরোয়া হয়ে বললাম, অর আপনার কথা কিছু বলুন।

—বিয়ে? করেছিলাম তো। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগে।

—বুঝলাম না।

শিখা বলল, থাক্ সে কথা। বুঝে দরকার নেই। আমাদের ক্লাস-মেট সেই কবিটি এখন কোথায়—নিত্যগোপাল, না, নিত্যানন্দ।

—নিত্যানন্দ। সে খবরের কাগজে কাজ করছে। তার কবিতাটির কথা মনে আছে দেখছি তাহলে।

শিখা বলল, বড় জ্বালিয়েছে। একদিন প্রবীরকে তো খুব ধমক দিয়েছিলাম। চাকরি লাগছে কেমন, বলুন।

শিখা যে এত কথা বলতে পারে, এ ধারণাই ছিল না। মেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে এখন কথা বলাটাই অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকবে। সে অকপটে সব কথা বলে যেতে লাগল। ক্লাসের সব ছেলেমানুষীর কথা। যেসব জিনিস সে লক্ষ্যই করেনি বলে ধরে নিয়েছিলাম, এখন তার কথা শুনে বুঝতে পারছি সবই সে জানে।

কিন্তু একটা কথা হয়ত সে জানে না। আমি যে তার প্রেমে পড়েছিলাম, এবং কাঁচা বয়সের সেই মোহটাই এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত আমাকে যে আইবুড়ো রেখে দিয়েছে—এ সংবাদটি হয়ত তার অজ্ঞাত। তার সেই অজ্ঞাত কাহিনীটা আজ এই প্রকাশ্যে দিনের আলোতে দাঁড়িয়ে তাকে অকপটে বলব, এতকাল ছেলে পড়িয়ে-পড়িয়েও এ বাচালতা আয়ত্ত করতে পারিনি। কিভাবে সাজিয়ে কিভাবে বুঝিয়ে বলা যায়, এই কথাটা ভাবছি: শিখা বলল, চলুন। মীটিং বুঝি আরম্ভ হয়ে গেল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, আপনার কথাটা পরিষ্কার জানা হল না—

শিখারাণী বলল, আমার স্বামী মারা গেছেন। হল তো? এবার নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে। বীরকুৎসায় গিয়ে চিঠি দিবেন, যোগাযোগ রাখবেন।

অরবিন্দর অনুমান তবে তো মিথ্যা নয়। জীবনে তবে এর ট্রাজেডি আছে। বন্দরও ছিল, অন্দরও ছিল; নোঙর ছিঁড়ে গেছে তাই এ হয়ে গেছে একেবারে সদরের সাধারণ।

বললাম, অনুমান করেছিলাম।

শিখা ঝাঁজ দিয়ে বলল, মিথ্যে কথা।

মীটিংএর পরে দুজন এসে দাঁড়ালাম সিঁড়ির কাছে। সরু সিঁড়ি, পাশাপাশি নামা অসুবিধে। আগে আগে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিলাম। পেছন থেকে ও আমার ঘাড়ের পাকাচুলগুলো দেখে ফেলবে, এই ভয় হল। শিখা আগে আগে নামতে

লাগল, আমি তার এক ধাপ পিছন পিছন। আবলুশের মত কালো চুলের এলোখোঁপা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অগুনতি পাকা চুল, চাঁদির ওপর আধুলি পরিমাণ টাক। আমার প্রৌঢ়ত্বের রহস্য তার কাছ থেকে গোপন করলাম, কিন্তু তার রহস্যটা যে আমার কাছে ফাঁস হয়ে গেল—এ খবর জানল না শিখারাণী পাকড়াশি।

সতেরোটা বছর একেবারে মাঠে মারা গেছে। আজ আর সে সব বছরকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

ফিরে এসেছি বীরকুৎসায়—বিজয়ী বীরের মত। পরীক্ষার খাতার মোটা একটা বোঝা নিয়ে।

ইস্কুলের নামটা জানা হয়নি। বার বারই এই কথা মনে হচ্ছে। কাঁথীর মত জায়গায় মেয়ে ইস্কুল নিশ্চয় একটার বেশি নয়। কদিন ধরে তার খোঁজ নিতে লাগলাম।

রাধা বলল, দাদাবাবুর শরীর বুঝি ভালো না?

—না রে রাধা, বিয়ে করব।

রাধা উল্লসিত হয়ে বলল, কাকে?

বললাম, তোর বৌদিকে।

—সে কে?

হেসে বললাম, আমিই কি চিনি ছাই। খুঁজতে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব ভাবছি।

রাধা তাগাদা দিয়ে বলল, দাও না লিখে। ডাকে ফেলে দিয়ে আসছি এখুনি।

রাধার হাতে চিঠি দিলাম। ঠিকানাটা ঠিক হল কিনা, কে জানে। লিখে দিলাম, বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। দ্বিতীয় মেয়ে ইস্কুল নিশ্চয় কাঁথীতে নাই।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

সবুজ পদ্ম

শ্রীশুভময় ঘোষ

লি-পোর ছদ্মনাম ছিল চিং-লিয়েন, মানে "সবুজ পদ্ম"। লি-পোর কবিমনকে বুঝতে গেলে সবুজ পদ্ম নামটা যথেষ্ট সাহায্য করবে। রবীন্দ্রনাথ লি-পো সম্বন্ধে বলেছেন "চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখেছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হোল। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদা-দেখা চোখ। নিজের মন দিয়ে দেখেছিলেন পৃথিবীকে—এই দেখাই হল দর্শন। শুধু তত্ত্বের সন্ধানই দর্শন নয়। জীবনকে, পৃথিবীকে আন্তরিকভাবে দেখা, অনুভব করাই দর্শন।" এই হল কবির দার্শনিকতা। লি-পো এইভাবে পৃথিবীকে দেখেছেন, তাই তাঁর হৃদয়ে আছে ছেলেমানুষী, অথচ তাঁর মুখে আছে "the laughter of the old rogue philosopher."

পৃথিবীর প্রতি লি-পোর মন সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট। তার রূপ আর রঙেই অধিকাংশ চীনে কবিরা মশগুল। এই আকর্ষণে শুধু তাঁদের মনই নয়, সারা শরীরও সাড়া দেয়। তাই চীনেকবিতার বিষয়বস্তুতে অনেক জৈব ব্যাপারের অবতারণায়, বিদেশীরা অবাক হয়।

লি-পো'র সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কবিতা হ'ল—"শাশ্বতত্রয়ী।"

ওপরে চাঁদ,
ফুলের বনে পানপাত্র হাতে সঙ্গীহীন আমি,
আর আমার ছায়া ঃ
এই আমরা তিনজন।
চাঁদকে ডাকি সুরার অংশ নিতে;
কিন্তু মদ সে খায় না।
ছায়াটা শুধু আমার পিছু পিছু চলে।
ওদের সঙ্গ কিছুক্ষণ চাই,
কারণ বসন্ত তো উপভোগের ঋতু।
গান গাই, চাঁদ তার মাথা নাড়ায়;
আমার নাচে ছায়াটা ফোলে দোলে।
যখন জেগে থাকি,
একই সাথে খেলাধুলা চলে।
মাতাল হয়ে যে যার খুশী মাফিক ঘুরি,
চিরকালের বাকহারা সঙ্গী ঃ
যতদিন না মেঘের রাজ্যে ফের দেখা হয়
পরস্পরের সাথে।"

চাঁদ, মদ আর আমি—এই নিয়ে বহু কবিতাই চলে এসেছে। কিন্তু এই কবিতার সুরটা অন্যরকম। সাধারণ ওমর খৈয়ামী-কবিতা নয়। এখানে দেখা যাবে কয়েকটি প্রাকৃতিক ছবি ও উপভোগ। কোনও অপ্রাকৃতিক বা mystic বিষয় নেই। প্রকৃতির বেড়া পেরিয়ে যাওয়া হয়নি, কিন্তু এর আবেদন দূরপ্রসারী। আজকালকার দিনে এই উপভোগে মানুষে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে লি-পো বহু শত বৎসর আগে জন্মেছিলেন এক সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীতে। সে যুগের চীন দেশের বিশেষ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার ফলে লি-পো'র কাব্য গড়ে উঠলেও তাঁর কবিতা এমন একটা উঁচু সুরে ভরে উঠেছে যে এখনও এমন কি আরও পরের যুগেও পৃথিবীর সব দেশেই এ কবিতার রসিক পাঠক জুটবে।

লি-পোর কবিতায় প্রকৃতি আর জীবনের প্রতি ফাঁপা ভাবালুতা নেই। উপভোগের মধ্যে জীবনের শীতলতা তীক্ষ্ণতার স্বাদ থাকায় তা সম্পূর্ণ গভীর। প্রাকৃতিক বস্তুকে সপ্রাণ মনে করে তার সঙ্গ উপভোগ করেছেন। মানুষের রক্তমাংসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, আত্মার প্রতিও ভক্তি। আর আছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। তাই রাজমন্ত্রিত্বের বদলে দীঘির পাড়ে বসে মাছ-ধরাটা তাঁর কাছে বেশি লোভনীয়। তাঁর বলিষ্ঠ কল্পনার অবাধ প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। রাজকর্মচারীর সংকীর্ণ অফিসঘরে তা ব্যাহত হয়, বাইরের পৃথিবীর গণ্ডগোলে হারিয়ে যেতে পারে। আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়োয় তাঁর কল্পনা এই পরিবেশ খুঁজে পায়—তিনি তখন আকাশের গা থেকে তারা ছিঁড়ে আনতে চান,—কথা বলতে ভয় পান, পাছে স্বর্গের শান্তি ভেঙ্গে যায়—

পাহাড়ের চূড়োয় এই মন্দিরটাতে রাত কাটাবো
আজ।
হাত দিয়ে তারাগুলোকে এখান থেকে ছিঁড়ে
নেওয়া চলে।
চারদিক নিস্তব্ধ।
জোরে কথা কইতে সাহস পাইনে,
পাছে, স্বর্গলোকের শান্তি হয় ক্ষুণ্ণ।

লি-পো'র romanticismর সঙ্গে অন্য দেশের কবিদের romanticismর অনেক তফাৎ। চীনেকবিদের সঙ্গেই অন্য দেশের কবিদের এই পার্থক্য। চীনে কবিতায় প্রেমকে কখনও বড় জায়গা দেওয়া হয়নি। চীনেকবিরা অন্য দেশের কবিদের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড় যোগ রাখেন প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর কিছু দেখবার তাঁদের নেই। তার বদলে জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট, অন্যদের চোখে তুচ্ছ অংশের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগ। কাঁকড়ার ঝোল বা মদের গেলাশের চেয়ে তাই প্রেমকে বেশি প্রাধান্য তাঁরা দেন না।

সত্যিকারের প্রেমের কবিতা চীনেকবিরা লেখেননি। অথচ চিংড়ির বড়া, পাখীর সুপের ওপর অজস্র কবিতা, আর ভাল কবিতা

তাঁরা লিখেছেন। সে সব কবিতার ছত্রে ছত্রে খাওয়ার লোভ অত্যন্ত প্রকট। আর কেউ এতটা উচ্ছ্বসিতভাবে খাওয়া নিয়ে কবিতা লিখতে সাহস করবেন না। প্রেমের কবিতা এ'দের লেখায় যা পাওয়া যায়, তাতে বন্ধুত্বের সুরটাই বড়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের আবেগটাই স্থান পেয়েছে। প্রেমের কবিতায়ও প্রকৃতির প্রাধান্য খুবই। তারই নানা সঙ্কেত, ব্যঞ্জনায় একেকটি আবেগ রূপ নেয়, মনকে নাড়া দেয়।

তোমাদের উত্তর অঞ্চলে
ঘাসেরা আবার হয়েছে জেড-পাথরের মত নীলাভ
এখানে মালবেরীগুলোর ভারে
নুয়ে পড়েছে সবুজ পাতাওলা গাছের ডাল,
আর এতদিন বাদে
হতাশার ভারে ভেঙে পড়ছে যখন আমার মন,
তখন ইচ্ছে হ'ল তোমার ঘরে ফেরার?
হায়গো, দখিন হাওয়া
(তোমাকে চিনতে পারি কই?)
তবু মিছে কেন
আমার মশারি দু'ভাগ করে দাও?

চীন দেশে Poetry, Philosophy, Painting সব সময়ে এক সঙ্গে চলে। বিশেষ করে, কবিতা আর ছবির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কবিরা দেখেন চিত্রকরের দৃষ্টিতে, চিত্রকরেরা প্রকাশ করেন কবির ভঙ্গীতে। একথা কবি লি-পো'র বেলায় খুব বেশিরকমেই সত্যি। চীনে ছবি আর কবিতার একটি মস্ত বড় গুণ হল অল্প কথায় অনেক কিছু বলা। অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ের সঙ্গে চিত্রপটের বিরাট ফাঁকা অংশের ছন্দের সুষমায়, ছবির পুরো রূপ গড়ে ওঠে। যে অংশে তুলির কোনও আঁচড়ই পড়ল না সে অংশের প্রাধান্য খুবই বেশি। অনেক ভেবে-চিন্তে এই ফাঁকা জায়গাগুলো সাজাতে হয়। তুলির অল্প কয়েকটি আঁচড় যা থাকে, তাদের বলিষ্ঠতা, তাদের নিশ্চেষ্ট স্বচ্ছন্দতা লক্ষ্যনীয়। বিরাট ফাঁকা সাদা পটে, অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ে ধরা পড়ে অসীমের রূপ। চীনে কবিতাও, এদিক দিয়ে চীনে ছবির মতই। অনেক কথা না বলেই, কবিরা বলেন অনেক-কিছু। বলা হল অল্প দু'একটি কথা, কিন্তু তার ভেতরের সুরটা, যা ভাষায় প্রকাশ পায়নি, তা অনবরতই পাঠকের মনে ঘুরে ঘুরে বেজে উঠবে। লি-পো'র এই কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ—

তাং ইয়াঙের মেয়েটি
খালি পা, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে।
আর কুয়ে-চির মাঝি,—সে তার নৌকোয়।
চাঁদ ডোবেনি তখনো—
ভগ্ন হৃদয়ে, এ ওর দিকে চেয়ে॥

সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, তা লি-পো'র ছিল না। কাব্য-অনুশীলনে শুধু লি-পো কেন, রাহিকু, পোচিউ প্রভৃতি অন্য অনেক বড় বড় চীনেকবিদের কোন নজর ছিল না। শুধু প্রতিভার জোরেই এ'রা কবিতা লিখতেন, আবেগের মুহূর্তে। লি-পো কবিতা লিখতেন অবসর সময়ে, অনেকটা খেলার ছলে। মদের আসরে মুখে মুখে কবিতা তৈরি ক'রে যেতেন, যার কিছু কিছু তক্ষুণি শূন্যে মিলিয়ে যেত, আর কিছু কিছু শ্রোতাদের বা কবির নিজেরই মনে মনে ঘুরত, পরে টুকে রাখা হত। দুর্গম মন্দিরের গায়ে বা বন্ধুদের হাতপাখায় হঠাৎ খেয়ালের বশে চার লাইন কবিতা লিখে রাখলেন, পরে পণ্ডিতদের বহু কষ্টে সে-সব উদ্ধার করতে হ'ল। এই কারণেই লি-পো'র কবিতায় একটি বিশেষ মানুষের, একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার ছাপটাই বড় হ'য়ে দেখা দেয়। অবশ্য তার আবেদনটা সর্বব্যাপী।

লি-পো নিজে ছিলেন নিছক কবিত্বের নেশায় মশগুল। তাঁর পাঠকরাও সে নেশা থেকে বঞ্চিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক এই কবিতাটি—

নিবিড় স্বপ্নের মত এ জীবন। কেন পরিশ্রম?
সারাদিন মদের নেশার আমেজে কাটে,
শুয়ে থাকি সদর দরজাটার পাশে।
জেগে উঠে
বাগানের গাছগুলোর ওপর দিয়ে দৃষ্টি পাঠাই।
আর শোনো একটা কী পাখী গান গাইছে যেন ফুলের মধ্যে থেকে?
এটা কোন ঋতু বল তো!
ওটা বুঝি কোয়েলা—গান শোনাচ্ছে বসন্তের বিদায়ী বাতাসকে,
ব্যথার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বেদনায় ভরিয়ে দিলাম মন।
আর একবার পূর্ণ হল পানপাত্র:
কণ্ঠে জোরালো গান নিয়ে আছি উজ্জ্বল চাঁদের প্রতীক্ষায়!
গান আমার ফুরোলো,
মনকে পীড়া দিচ্ছিল কোন ভাবনা?
মনে নেই আমার মনে নেই।

লি-পো'র শ্রেষ্ঠ কবিতারচনা বোধ হয় তাঁর মৃত্যু। নেশার ঘোরে, মদের ঝোঁকে সমুদ্রের জলে দেখেছিলেন চাঁদের রূপোলি ছায়া, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সমুদ্রের জলে, চাঁদ ধরবেন বলে, বলা বাহুল্য, আর উঠে আসতে পারেননি। জানি না, এই কঠিন বাস্তব আঘাতে, মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর সারা জীবনের চাঁদের নেশা কেটে গিয়েছিল কি না। না যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আশা করি, যাবার আগে আবার বলতে পেরেছিলেন,

"গান আমার থামল—
মনকে ভুলিয়ে তুলেছিল কোন্ ভাবনা?
মনে নেই।" *

* কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরুণ বাগচী

রাতের আর্কেষ্ট্রা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

আকাশপ্রদীপ

রিক্ত পৃথিবীর পথে ধূসর ধুলায়,
কতবার নাম মুছে যায়।
তবু কোনো স্বপ্নদ্রষ্টা মন
কাগজের বাসা গড়ে একান্তে নির্জন;
শেষে তার অন্তঃপুরে সন্ধ্যাদীপ জেবলে
জীবনের বৈজয়ন্তী আকাশে উড়ায়!

রাত্রির হাওয়া

তোমাকে রাত্রির হাওয়া দিতে পারি আমি:
যদি তুমি তার ঢেউয়ে ভেসে
জোনাকির আলো জেবলে, নিভে, আলো জেবলে
চঞ্চল উচ্ছল হাসি হেসে
আকাশে উজ্জবল শিল্প এ'কে যেতে চাও;
দেব' তবে অন্ধকার নদীর বাতাস
এখন যেখানে তুমি যাও!

স্তব্ধ-মুখর

কখনো তোমাকে দেখে আমি
নির্বাক বিস্মিত হয়ে গেছি;
আবার কখনো যেন পরম নির্ভর পেয়ে
এলোমেলো কত কি বলেছি।
তুমি যেন মধ্যরাত্রি নিস্তব্ধ নির্জন:
অথবা হাওয়ার দিনে বিশুষ্ক পাতার রাশে
মুখরিত স্বপ্নের মতন!

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

দেখিলাম ময়াল সাপটা পাহাড়ের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। যক্ষিণী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঠিক পাশেই যে গুহাটি ছিল তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম সে একটা খরগোসের কান দুইটা ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সেটাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই মৃত খরগোসটা লইয়া তৃতীয় গুহাটার ভিতর ছুঁড়িয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম ময়াল সাপটা আসিয়া সেই গুহায় প্রবেশ করিতেছে। সম্পূর্ণরূপে যখন প্রবেশ করিল তখন যক্ষিণী আগড় দিয়া গুহার মুখটা বন্ধ করিয়া একটা ভারী পাথর আনিয়া আগড়টাতে ঠেসাইয়া দিল, যাহাতে আগড় খুলিয়া না যায়। তাহার পর আসিয়া আবার আহারে মন দিল। আজ এসব কথা রূপকথার মতো মনে হইতেছে, কিন্তু একদিন এসব সত্য ছিল। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষ হেন কাজ নাই যাহা করে নাই। জীবন-সংগ্রামে সংগ্রামের বাহিরের রূপটা বারম্বার পরিবর্তিত হইয়াছে, আজও হইতেছে, কিন্তু জীবনের স্থূল রূপটা আজও অপরিবর্তিত আছে, তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষা সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। সে বাঁচিতে চায়, বিকশিত হইতে চায়। যক্ষিণী বাঁচিবার প্রেরণায় ময়াল সাপ পুষিয়াছিল, আমি বিকশিত হইবার প্রেরণায় যক্ষিণীর দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। কারণ, নিনানিকে ঘিরিয়া আমার চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিকাশের উন্মাদনায়, একটা অভিনব কিছু করিবার নেশায় আমি গুহার সন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু আজ যেমন করিয়া ভাবিতেছি তখন এমন করিয়া ভাবিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যক্ষিণীকে দেখিয়া তখন আমার ভয় করিতেছিল, আশঙ্কা হইতেছিল নিনানি এখানে থাকিতে পারিবে কি? শিলাঙ্গীর কিন্তু কোন আশঙ্কা ছিল না। আরও কিছুক্ষণ যক্ষিণীর সহিত আলাপ করিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"চল, এবার নিনানির গুহাটা দেখিয়া আসি"

"সেটা কোথায়?"

"ওই গাছটার আড়ালে। ওখানে যক্ষিণীর খরগোস ধরিবার সরঞ্জাম আছে। যক্ষিণী বলিতেছে, যে মেয়েটি ওখানে থাকিবে, তাহাকে আমার জন্য খরগোস ধরিতে হইবে। আমি একা আর পারিয়া উঠিতেছি না, তাহাকে আমি ফাঁদ পাতিতে শিখাইয়া দিব।"

"নিনানিও অনেক রকম ফাঁদ পাতিতে জানে। হয়তো সে পাখীও ধরিতে পারিবে। কিন্তু মুশকিল হইবে ময়াল সাপের ব্যাপারটাতে। ময়াল সাপের কাছাকাছি সে থাকিতে চাহিবে কি না সন্দেহ"

"নিনানি খুব ভীতু বুঝি—"

"মোটেই ভীতু নয়। সে যুদ্ধ পর্যন্ত করিয়াছে। ময়াল সাপকেও সে হয়ত ভয় করিবে না। আমি আন্দাজ করিতেছি যদি করে—"

"চল গুহাটা তো আগে দেখিয়া আসা যাক"

গুহা দেখিয়া পছন্দ হইল। ঠিক এইরকম গুহাই আমি খুঁজিতেছিলাম। নিনানি যদি এখানে থাকে কেহই তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। আর একটা সুবিধাও ছিল। দেখিলাম অন্য একটা পথ দিয়াও এই গুহায় আসা সম্ভব। সে পথটা অবশ্য পাহাড়ের উপর দিয়া। আমাদের যেখানে ক্ষেত আছে সেইখান হইতে কন্যা নদীকে কেহ যদি অনুসরণ করে তাহা হইলে পণ্ড পর্বতের অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিবে। সে স্থানে হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া এই গুহার প্রবেশ পথে আসা যায়। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে যক্ষিণীর অজ্ঞাতসারেও এই গুহায় যাতায়াত করা সম্ভব। গুহা দেখিয়া খুশী হইলাম, কিন্তু আমার অপেক্ষা ঢের বেশী খুশী হইল শিলাঙ্গী। তাহার খুশীর কারণ সে আমাকে খুশী করিতে পারিয়াছে। আমি যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে আনিবার জন্য এত কাণ্ড করিতেছি ইহা তাহার অবিদিত ছিল না তবু সে খুশী হইতেছিল। সে হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখিও আমি ঠিক তোমার নিনানির সহিত ভাব করিয়া ফেলিব। দুধ বড় ভাল জিনিস। কয়েকদিন দুধ খাওয়াইলেই সে আমার বশ হইয়া যাইবে"

"কিন্তু আমার সহিত যে তোমার কোনও সম্পর্ক আছে একথা যেন ঘুণাক্ষরে তাহার নিকট প্রকাশ করিও না"

কথাটা শুনিয়া শিলাঙ্গী আবার একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বিমর্ষতার ছায়া আবার যেন তাহার চোখের দীপ্তিকে ম্লান করিয়া দিল। আমাকে ভালবাসিয়া সে যে পাপ করিয়াছে তাহা যে কাহারও নিকট হইতে গোপন করা প্রয়োজন একথা যেন তাহার অন্তরতম সত্তা কিছুতেই মানিতেছিল না। সেইজন্য বোধহয় যক্ষিণীর নিকট আমরা আবার যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। ফিরিয়া দেখিলাম যক্ষিণী পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া হরিণের হাড় ভাঙিতেছে এবং ভিতরকার রক্তাক্ত মজ্জা চুষিয়া চুষিয়া আহার করিতেছে। আমার দিকে চাহিয়া যক্ষিণী শিলাঙ্গীকে কি যেন একটা প্রশ্ন করিল।

"আমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক যক্ষিণী জিজ্ঞাসা করিতেছে। উহাকে কি বলিব?"

প্রশ্ন করিয়া শিলাঙ্গী উৎসুক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোমার যাহা খুশী বল"

যক্ষিণীর ভাষায় শিলাঙ্গী তাহাকে সম্ভবত সত্য কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারিল না। তাই অবশেষে ইঙ্গিতের আশ্রয় লইল। কথা বলিতে বলিতে সহসা আসিয়া সে আমার কটি বেষ্টন করিয়া আমার বুকের উপর মাথাটি রাখিল। দেখিলাম যক্ষিণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াছে, তাহার রক্তাক্ত অধরে হাসিও ফুটিয়াছে। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী এবং নিনানিকে লইয়া আমার পরবর্তী জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইবে তাহার পূর্বাভাস আমার চেতনায় যেন নিগূঢ় ইঙ্গিতে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

......শিলাঙ্গী ও আমি ফিরিতেছিলাম। শিলাঙ্গী কেমন যেন একটু মনমরা হইয়া গিয়াছিল। যে উৎসাহভরে সে আসিয়াছিল সে উৎসাহ তাহার আর যেন ছিল না। সে-ও কিসের যেন আভাস পাইয়াছিল।

"রোহার সহিত তুমি কবে দেখা করিবে?"

"আগে নিনানিকে লইয়া গুহায় যাই, তাহার পর ঠিক করিব"

"নিনানিকে কি আজই গুহায় লইয়া যাইবে? এখনই?"

"তাহাই তো ঠিক করিয়াছি"

"বেশ। আমি তাহা হইলে বাড়ি যাই। দুদুনী মধুনীকে অনেকক্ষণ দেখি নাই, তাহারা আবার নিগম বনে চলিয়া গেল কি না কে জানে। নিগম বনে রোহার একটা গাভী আছে, যেমন তাহার শিং তেমনি তাহার স্বভাব, দুদুনীকে দেখিলেই তাড়া করিয়া আসে। তোমার সহিত আবার কখন দেখা হইবে?"

"কাল দুপুরে আবার ওই ঝোপে আসিব"

"বেশ। আমি চলিলাম তাহা হইলে"

শিলাঙ্গী দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া অদূরবর্তী সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল।

......বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া নিনানি গান

গাহিতেছিল। নিনানির গানের গলা চমৎকার ছিল। দূরে দাঁড়াইয়া আমি কিছুক্ষণ তাহার গান শুনিলাম। আমাদের সেই পুরাতন গানটাই সে গাহিতেছিল, এই গানটাই আমাদের প্রিয় ছিল। গানের ভাষা খুবই সরল—'ওগো আকাশের মেঘ, তুমি কবে আসিবে। মাটির বুকে ঘাসেরা যে তোমার আশায় তাহাদের সবুজ বুক পাতিয়া রাখিয়াছে। গাছের ডালে ফুলের দল যে তোমার আশায় ফুটিতেছে এবং ঝরিতেছে। নদীর জল যে তোমার জলের সহিত মিলিতে চায়, পাখীরা যে ডানা মেলিয়া মেলিয়া আকাশে উড়িতেছে তোমার বারি-ধারায় স্নান করিবে বলিয়া, আমাদের চোখের কালো তারা যে তোমার কালোরূপের আরাধনা করিতেছে; ওগো আকাশের মেঘ কবে তুমি আসিবে।' সে যুগে আমাদের গানে সুরের বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তার সহিত গানের যে পার্থক্য তাহা সে যুগের গানেও পরিস্ফুট হইয়াছিল। মনের যে ভাব যে ভাবনা যে আকুতি আমরা সাধারণ কথাবার্তায় প্রকাশ করিতে পারি না সুরের সাহায্যে গানে তাহাই আমরা প্রকাশ করি। সেদিন নিনানির গানে যে আবেদন যে আকুলতা অন্তরতম সত্তার যে নিবিড় আগ্রহ ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা সাধারণ কথায় প্রকাশ করা যাইত না। যে নিনানিকে আমি কখনও দেখি নাই, মাঝে মাঝে যাহার আভাসমাত্র পাইয়াছি, সুরের রূপে সেই নিনানি আকাশের বিরাট পটভূমিকায় যেন মূর্ত হইয়াছিল। আজ মনে হইতেছে সুরের কোনও বৈচিত্র্য ছিল না বলিয়াই বোধহয় আরও ভাল করিয়া মূর্ত হইয়াছিল। সঙ্গীতবিশারদদের নিকট যাহা আজ একটানা একঘেয়ে গমক-গিটকারি-হীন অলঙ্কারশূন্য প্লুত স্বর মাত্র মনে হইবে আমার নিকট তাহাই অপরূপ মনে হইয়াছিল। সেই গানের সুরের মধ্যেই সেদিন আমি সেই অপরিচিতাকে যেন সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াছিলাম যে, আমার আশায় যুগ যুগান্ত বসিয়া আছে এবং আমি যাহার অনুসন্ধানে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

......নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল। গাছটার দিকে আগাইয়া গেলাম। মনে হইতেছিল সমস্ত গাছটাই যেন আকাশের দিকে চাহিয়া গান করিতেছে।

"নিনানি—"

সঙ্গে সঙ্গে নিনানির গান থামিয়া গেল, একটু পরেই গাছ হইতে নামিয়া আসিল সে। তাহার মাথায় শাখাপত্ররচিত সেই শিরস্ত্রাণটা দেখিয়া আবার আমার সমস্ত অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল, আমি যে নূতন ধরণের একটা কিছু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি এই আনন্দটা আবার যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। শুধু তাহাই নয়, নিনানিকে যক্ষিণীর গুহায় রাখিয়া যে অনিশ্চিত বিপজ্জনক জীবন যাপন করিতে যাইতেছিলাম তাহা যেন আর অনিশ্চিত বা বিপজ্জনক মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল একটা সুনিশ্চিত অভিনবত্বের সন্ধানেই যেন যাত্রা করিতেছি।

নিনানি গাছ হইতে নামিয়া বলিল—"তুমি বড় বেশী দেরি করিয়াছ। মনে হইতেছিল, তুমি বুঝি আর ফিরিবে না"

"চল, বেশ ভালো একটা গুহা পাইয়াছি"

"কোথায়, কত দূরে?"

"ওই যে দূরে পঞ্চ পর্বতের শিখর দেখা যাইতেছে ওইখানে"

"ওখানে মানুষ আছে?"

"আছে। যক্ষিণী আছে। গুহাটা তাহারই, সে-ই তোমাকে থাকিতে দিয়াছে"

"যক্ষিণী আবার কে!"

"অদ্ভুত একটা বুড়ি। গেলেই বুঝিতে পারিবে। ময়াল সাপ পুষিয়াছে। ময়াল সাপের সাহায্যে হরিণ ধরে"

"তাই না কি! ময়াল সাপ পোষার কথা আগেও শুনিয়াছি। কিন্তু কেহ গরু পুষিয়া দুধ খায় এ কথা কখনও শুনি নাই"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে ভয় নয় কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

"কি করিয়া সন্ধান পাইলে তুমি। আমার বারবার ভয় হইতেছিল তুমি হয়তো আর ফিরিবে না। মনে হইতেছিল হয়তো ধবল ফিরিয়া আসিয়াছে, হয়তো উলম্ভনের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে, সেই যুদ্ধের আয়োজনে তুমি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ। আচ্ছা, উলম্ভনের সহিত যদি সত্যই যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় তখন কি হইবে, আমি গুহায় একা বসিয়া থাকিব, আর তোমরা যুদ্ধে চলিয়া যাইবে?"

"গেলেই বা ক্ষতি কি! তুমি গুহায় থাকিয়াও তো আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করিতে পার। গুহার সম্মুখে খানিকটা প্রশস্ত স্থান আছে, গাছও আছে। অগ্নি জ্বালাইয়া স্বচ্ছন্দে তুমি যুদ্ধের নৃত্য নাচিতে পারিবে"

"আমাকে কিছু তীর ধনুক এবং অস্ত্র-শস্ত্রও তাহা হইলে দিয়া যাইও"

"সে তো দিবই"

"যক্ষিণী বুড়ির সন্ধান তোমাকে কে দিল"

"ঘুরিতে ঘুরিতে নিজেই তাহাকে আবিষ্কার করিলাম"

"সে কি আমাদের ভাষা বোঝে?"

"না।"

"তবে কি করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলে"

একটু বিপদে পড়িলাম।

বলিলাম—"ইঙ্গিতের দ্বারা। কিন্তু তুমি যেন উহার সহিত আলাপ করিতে যাইও না। প্রথমত অনেক সময় নষ্ট হইবে, দ্বিতীয়ত বুড়ি কি বুঝিতে কি বুঝিয়া হয়তো হাঙ্গামা বাঁধাইবে। আমি অনেক কসরৎ করিয়া তাহাকে আমার মনোভাব বুঝাইতে পারিয়াছি। এখন আমাদের কার্যসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, আর কসরৎ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বুড়ি বলিয়াছে, ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে খরগোস ধরিয়া দিতে হইবে। তাহার ময়াল সাপের জন্য খরগোস দরকার।"

"কি রকম?"

নিনানি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল। তাহাকে যতটা পারিলাম বুঝাইয়া বলিলাম।

"কি রকম ফাঁদ? আমি যে রকম ফাঁদ পাতিতে জানি তাহার জন্য আঁঠা চাই"

"বুড়ির কাছে সে সব সরঞ্জাম আছে। চল এখন যাওয়া যাক—"

......গুহার উদ্দেশ্যে উভয়ে যাত্রা করিলাম। নিনানি আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি শিলাঙ্গীর কথাটা বাদ দিয়া তাহাকে যতটা সম্ভব সত্য উত্তরই দিতেছিলাম। এখন আমার মনে হয় শিলাঙ্গীর কথাটা নিনানির কাছে যদি গোপন না করিতাম তাহা হইলে হয়তো পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরার রূপ বদলাইয়া যাইত। সে যুগে একাধিক রমণীর সহিত সংশ্রবই তো নিয়ম ছিল। একটি পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক রমণীর বা একটি রমণীকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক পুরুষের ঈর্ষা-ফেনায়িত জীবন-তরঙ্গেই তো আমরা অবগাহন করিতাম, শিলাঙ্গীকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার বাসনা আমার মনে কেন জাগিয়াছিল জানি না। এখন মনে হইতেছে তখনই বোধহয় আমার অন্তরাত্মা শিলাঙ্গীকে স্বতন্ত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল তাই সে আমাকে তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। মনে হইতেছে.....কত কথাই মনে হইতেছে......।

......নিনানির গুহাটা পছন্দ হইয়াছিল। সেখানে গিয়া কিন্তু কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। নিনানি শুইবে কিসে? গুহার ভিতর কোন শয্যা ছিল না। বাহির হইয়া দেখিলাম একস্থানে বুড়ির শুকনো খড় জমা করা আছে, তাহাই এক বোঝা লইয়া আসিলাম। দ্বিতীয় সমস্যা খাদ্য। নিনানি অনেকক্ষণ কিছু আহার করে নাই। ক্ষুধায় সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। নিনানিকে বলিলাম, "চল যক্ষিণীর কাছে যাই, দেখি সে যদি কিছু খাবার দেয়, তাহার কাছে কিছু মাংস ছিল দেখিয়া গিয়াছি।" যক্ষিণীকে দেখিবার জন্য নিনানিও উৎসুক হইয়াছিল। উভয়ে তাহার গুহার দিকে অগ্রসর হইলাম।

"ওই দেখ—"

নিনানি হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিলাম ময়াল সাপটা নিজের খানিকটা দেহ গুহা হইতে বাহির করিয়া দিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। আমিও অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর নিনানিকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—"ও পোষা সাপ। মানুষকে কিছু বলিবে না। পাশের গুহাটাই যক্ষিণীর। এস এইদিক দিয়া নামিয়া যাই"

যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে গিয়া দেখি অর্ধভুক্ত হরিণটার উপর মাথা রাখিয়া যক্ষিণী ঘুমাইতেছে। আমাদের পদশব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া হরিণটাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। মানুষের চীৎকার নয় সন্ত্রস্ত পাখী যেমনভাবে চীৎকার করে তেমনি চীৎকার। মনে হইল একটা ভীত দাঁড়কাক যেন কা কা কা কা করিয়া উঠিল। আমি যক্ষিণীর দিকে চাহিয়াছিলাম নিনানির মুখভাব লক্ষ্য করি নাই। লক্ষ্য করিলে আরও বিস্মিত হইতাম। নিনানি মোটেই ভয় পায় নাই, সে বিস্মিত এবং উৎফুল্ল হইয়াছিল। আমি চমকাইয়া উঠিলাম যখন সে যক্ষিণীর ভাষায় যক্ষিণীকে সম্বোধন করিল। নিনানিকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই মনে ছিল না যে, নিনানি বিদেশিনী, ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, মাত্র কিছুকাল পূর্বে আমাদের দলের একজন তাহাকে বিদেশ হইতে লইয়া আসিয়াছিল। এইটুকুমাত্র জানিতাম যে, সে অপরাজিতা বংশের মেয়ে। আমাদের ভাষা সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিল যে, আমরা কখনও সন্দেহও করি নাই যে, কোনওকালে তাহার বিভিন্ন মাতৃভাষা ছিল। সে এমনভাবে আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিল, এমনভাবে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল যে, তাহার অতীতটা আমার চেতনা হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সে যেন চিরকালই আমার আছে, চিরকালই আমার থাকিবে। অতীত বা ভবিষ্যৎ আসিয়া আমার এই ধারণায় কখনও ছায়াপাত করে নাই। তাই রূঢ় সত্যটা সহসা আমাকে চমকিত করিয়া দিল। আমি অবাক হইয়া নিনানির মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম।

"তুমি ইহার ভাষা জান না কি!"

"জানি বই কি। যক্ষিণী যে একজন অপরাজিতা। সম্পর্কে আমার দিদিমা হয়। আমার আপন দিদিমার বড় দিদি। জাগুয়ার বংশীয় দস্যুদল যখন আমাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় তখন আমাদের দলের বহুলোক বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমি তোমাদের দলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শালমিটিনাকে যে এখানে এভাবে দেখিব তাহা প্রত্যাশা করি নাই। যক্ষিণীর নাম শালমিটিনা—"

যক্ষিণী আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল। মুচকি হাসিয়া নিনানি তাহাকে কি বলিল, বলিতেই সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া অর্ধভুক্ত হরিণটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

"ওরকম করিতেছে কেন"—নিনানিকে আমি প্রশ্ন করিলাম।

"কি বলিতেছে জান? বলিতেছে এই হরিণমাংসের এক টুকরাও আমি প্রাণ থাকিতে কাহাকেও দিব না। বহুদিন পরে আমি আজ আহার পাইয়াছি, তোমরা যাও, চলিয়া যাও এখান হইতে"

"তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে কি?"

"পারিয়াছে। দেখনা আমি ঠিক উহার নিকট হইতে মাংস আদায় করিব। আমরা অপরাজিতা বংশীয়েরা আতিথ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলাম। সেই বংশের মেয়ে শালমিটিনা অনাহারে, অত্যাচারে, অভাবের তাড়নায় কি হইয়াছে দেখ। আহা বেচারার যদি রূপ-যৌবন থাকিত এমন দুরবস্থা হইত না" এই বলিয়া নিনানি আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। হাসিয়া বলিল, "আমিও তো ঠিক এই অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তোমাদের দলের কলঙ্গা নামক সেই ছোকরাটিকে বশ করিয়াছিলাম কেবল রূপ-যৌবনের জোরে। তাহার পর তোমাদের দলপতির প্রিয়তমা পত্নী হইয়াছি। তোমাকে পাইয়াছি। আহা বেচারি শালমিটিনা"

গভীর অনুকম্পাভরে নিনানি যক্ষিণীর গুহায় প্রবেশ করিল এবং যক্ষিণীর নিদারুণ চীৎকার উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিল। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিনানি কি যে বলিতেছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা বুঝিতে না পারিলেও তাহার কণ্ঠস্বর হইতে অনুমান করিতেছিলাম নিনানি তাহাকে আশ্বাস দিতেছে, সান্ত্বনা দিতেছে, তাহার গালে চোখে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিতেছে। যক্ষিণী যদিও ক্রমাগত চীৎকার করিতেছিল কিন্তু তাহার চীৎকারে প্রতিবাদের সুর ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে লক্ষ্য করিলাম, ক্রমশ তাহা রোদনে পরিণত হইল, তাহার পর সহসা থামিয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম নিনানি যক্ষিণীকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে, নিনানির স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া যক্ষিণী নীরবে রোদন করিতেছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সহসা নিনানি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি আজ রাত্রে এখানে থাকিবে?"

"থাকিব। তবে একবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অনেকক্ষণ অনুপস্থিত আছি, তুমিও নাই, কে কি বলিতেছে একবার শুনিয়া আসা উচিত। তা ছাড়া ধবলও হয়তো ফিরিয়া থাকিতে পারে—"

"তাহা হইলে তুমি আর দেরি করিও না। চলিয়া যাও। আমি যখন শালমিটিনার দেখা পাইয়াছি তখন আর ভাবনা নাই, আমি এইখানেই উহার সহিত থাকিব, তুমি এইখানেই ফিরিয়া আসিও।"

"বেশ। একটু সাবধানে থাকিও, ময়াল সাপটা কাছাকাছি আছে—"

নিনানি মুচকি হাসিল মাত্র। তাহার সেই হাসিতেই যেন তাহার চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার সাহস, তাহার রহস্যময়ী প্রকৃতি, তাহার ভালবাসা, তাহার ব্যঙ্গ-প্রবণতা, তাহার ছলনামধুর স্বভাব সমস্তই যেন ওই ক্ষুদ্র স্মিত হাস্যটুকুতে ফুটিয়া উঠিল। আমি চলিয়া যাইতেছিলাম সহসা নিনানি বলিল, "তোমার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। খানিকটা মাংস তুমি লইয়া যাও" একটু ঝুঁকিয়া সে দগ্ধ হরিণটাকে নিজের নিকট টানিয়া লইল। খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া সে যক্ষিণীর মুখে পুরিয়া দিল। যক্ষিণী তাহার স্কন্ধ হইতে মাথা তোলে নাই, তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়াই সে মাংসের টুকরাটি চিবাইতে লাগিল, চোখ পর্যন্ত খুলিল না। কেবল দেখিলাম তাহার গণ্ড বাহিয়া যে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহার বেগ যেন বাড়িয়া গেল। নিনানি আমার দিকেও খানিকটা মাংস ছুঁড়িয়া দিল।

"এইটা খাইতে খাইতে তুমি চলিয়া যাও। আর দেরি করিও না।"

যক্ষিণী প্রতিবাদ করিল না। এই কিছুক্ষণ আগে যে নিনানি অতি অসহায় ছিল সেই যেন সহসা সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তর্নিহিত অদৃশ্য-শক্তি তাহার নিজের অজ্ঞাতসারেই সেদিন যেন তাহাকে মহিমান্বিত করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)



বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ

যতীন্দ্রকুমার সেন

বিজ্ঞাপনের প্রচলন বহুদিনের। ধরতে গেলে পৌরাণিক, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগ থেকে এটি চলে আসছে। তখনকার দিনে সম্রাটের শৌর্যবীর্য, যোদ্ধার বীরত্ব কাহিনী, লাবণ্যময়ী ললনার রূপের খ্যাতি, সাধুসন্তের অলৌকিক মহিমা, লোকের মুখে মুখে ফিরত, অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত হত। সে সময়ের উদাহরণের অন্ত নেই।

পরবর্তী যুগে রূপসীর রূপের খ্যাতি, সম্রাটের ধনরত্নের কাহিনী বা রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা প্রচারিত হয়ে যে সব ঘটনার সৃষ্টি করেছে, ইতিহাসে তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপন, প্রচারের নামান্তর একথা বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগের মত পূর্বকালে সংবাদপত্র বা রকমারি ছবি বিজ্ঞাপনের বাহক ছিল না। ভাট, দূত, এরা ছিল প্রচারের বাহক, আর এই সঙ্গে সম্রাটদের ছিল শিলালিপি বা তাম্রশাসন। বিগত যুগ ছেড়ে দিয়ে আধুনিক যুগে ফিরে আসা যাক। আধুনিক বিজ্ঞাপনের পঁচানব্বই ভাগ প্রচার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। এই প্রচারের ধরণ বহুরূপ। এর সফল প্রয়োগ দেশী ব্যবসায়ীরা শিখেছেন বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে।

বিজ্ঞাপনের ব্যাপার আজকাল দাঁড়িয়েছে শিল্পকলায়। এর ব্যবসায়ী হয়েছেন অনেক। মাকড়সার জাল পাতার মত এঁদের কাজ। রাজনীতিকের মত এঁরা কূটকৌশলী। এই বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীরা জানেন লোক বিশেষের দুর্বলতা কোথায়। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে, কথার মারপ্যাঁচে, হরেকরকম ছবিতে, নানা উপায়ে ব্যাপারীর পণ্যদ্রব্যের গুণাবলী এমনভাবে প্রচার করেন যে, ক্রেতা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এঁদের সকলকার ক্রিয়াকলাপ যে মার্জিত বা সঙ্গত, তা নয়, তবুও এঁদের ক্ষমতা অপরিসীম। অনেক প্রস্তুতকারক (manufacturer) বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীর (advertising agency) মারফত প্রচারের কাজ না করিয়ে নিজেরাই এটা করে থাকেন। জনসাধারণের কাছে অবশ্য সব সমান।

বিজ্ঞাপনের ধারা দিন দিন বদলে যাচ্ছে। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে যে সব বিজ্ঞাপন বার হত কোনও রকম স্বাভাবিকতার ধার তারা ধারত না। সে সময়কার খবরের কাগজে অনেকে দেখে থাকবেন—মেঘলোকে অর্ধচন্দ্রের ওপর একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তাঁর এক হাত আছে চাঁদের গায়ে আর অন্য হাতে উঁচু করে ধরে আছেন একটি অতিকায় বোতল। ছবির নীচে লেখা—"সর্বমঙ্গলা দেবীর তেজস্কর সালসা।" এ ধরণের বিজ্ঞাপন এখনও যে বার হয় না তা নয়, তবে কতকটা রূপ বদলে আত্মপ্রকাশ করে। নস্যের বিজ্ঞাপনে—বিরাট ভুঁড়ি খালি গা এক হাত লম্বা নাকযুক্ত মানুষের ছবি; মেদবহুল আবক্ষদাড়ি মোটা পৈতে গলায় ব্রাহ্মণ ফুটপাঁচেক লম্বা একটি হাত বাড়িয়ে লেখা দেখাচ্ছেন—"বিশুদ্ধ হিন্দুমতে প্রস্তুত চপ কাটলেট ও ফাউলকারি", কিম্বা পর্বতপ্রমাণ ভোজ্যের সামনে আহারে ব্যস্ত লোকের ছবির নীচে লেখা—"আমাদের হজমী ঔষধ খান। পাহাড় হজম হয়ে যাবে।"

পরিব্যাপ্ত বাতাসের মত আমরা অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপনের মধ্যে চলাফেরা করছি। ট্রাম, বাসস্টপ, রেল স্টেশন, বাজার; বিজ্ঞাপন কোথায় নেই? পূজার মণ্ডপও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়ায় না। এমন কি, শহীদ বীরের মর্মর মূর্তির পেছনে বিজ্ঞাপন ঝুলছে—মূর্তিকারের নয়, লোহার ফটকনির্মাতা কম্পেনীর। সিনেমায় আগামী বার্তা বা বিরামের সময় দেখবেন, নানা কম্পেনীর বিজ্ঞাপন। চিনি মোড়া কুইনিন-এর বড়ির মত, দর্শকদের অবাঞ্ছিত এই সব বিজ্ঞাপন গিলতে হয়।

বাজারে গেলে শুনবেন, তরকারিওয়ালা চেঁচাচ্ছে—"আমার লঙ্কা যে সে লঙ্কা নয় বাবু, লঙ্কেশ্বর।" "শশাটা দেখছেন, যেন শশকটা।" "কাঁচা খান, রেঁধে খান, অমৃত দাদু অমৃত।" "পাঁশডাঙ্গার পুঁইশাগ কত্তাবাবু। ছেলের মতন লকলকে ডাঁটা। ঘণ্টায় এক হাত বাড়ে।" যদি জেরা করেন—"ঘণ্টায় এক হাত বাড়ে? বল কিহে, যায় কোথায়?" জবাব শুনবেন—"বাবুদের পেটে।"

মুদির দোকানে ডাল কিনতে যান—"অড়র ডাল আছে?" "আছে বই কি মশাই, 'চন্দৌসির' অড়র ডাল। খাসা গলে।" 'চন্দৌসির' নাম শুনে ভড়কে গেলেন, বললেন—"আটা ও গমের জন্যে 'চন্দৌসির' নাম। অড়র এল কোত্থেকে?" মুদী অম্লান বদনে উত্তর দিলেন—"কোথায় কি হয় আপনারা জানবেন কেমন করে? ডাল নিয়ে যান।" আর একজন বলছেন—"সোনামুগের ডাল চান? নতুন আমদানী সোনাবিষ্টুপুরের ডাল নিয়ে যান। গলে যেন মাখম। খোশবোতে এক থালা ভাত উড়ে যায়। যে পেটে জলও সয় না, সে পেটে এই ডাল সইবে।" সরষের তেলের বেলায় শুনবেন—"কলের বাজে তেল নয়। ঘানির তেল।" সাধারণ লোক 'ঘানি' বললে বোঝেন, বলদ-টানা ঘানি, অতএব, তেল ভাল। ঘানি না হলে তেল তৈরি হয় না। সুচতুর দোকানদার খরিদ্দারকে কলের তেলই বেচেন 'ঘানির' তেল বলে। জেরা করলে শুনবেন—"বাবু, ইলেকট্রিক ঘানি। কলের তেল কেন হবে? বলদ কোথায় বাবু যে বলদ টানা ঘানির তেল হবে। সব ইলেকট্রিক, সব ইলেকট্রিক।" সরষের তেলের বেলায় 'ঘানি' কথাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করবেন। একটি কথায় লোককে বিভ্রান্ত করবার এমন সহজ পথ আর নেই। মাছওয়ালা হাঁকছে—"বরপ দেওয়া মাছ নয় বড়বাবু। এরোপ্লেনে আনা পশ্চিমের জ্যান্ত মাছ। মুড়োটা দেখছেন? একটা যজ্ঞির রান্না হয়ে যায়।

তিন রকমের বিজ্ঞাপন সচরাচর দেখা যায়। অচল, সচল ও 'চোরাই'। অচল বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়তই আপনারা দেখছেন—আলোকিত লেখায়, পোস্টার ছবিতে, দেওয়ালে বা যথাতথা আঁটা ছাপা ও হাতের লেখায়, বাড়ির ওপর ফ্রেমে আঁটা বিরাট চিত্রে। সচল বিজ্ঞাপন—নামাবলী গায়ে পুরুতঠাকুর, গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো ডাক্তার, লেখা বা ছবিযুক্ত চলন্ত গাড়ি, পায়ে ঘুঙুর বাঁধা মেগাফোন মুখে চানাচুরওয়ালা, 'দেদো আনা', 'সাড়ে ছে আনার' ব্যাপারী, 'নিলামীমাল বহুত সস্তা বোম্বাই চাদরা তৌলিয়া' ইত্যাদির ফেরিওয়ালা। আরও আছে অনেক—রোজই দেখেন পথে ঘাটে নানা জায়গায় নানা বেশে। 'চোরাই' বিজ্ঞাপন—ভোরে উঠে দেখলেন, বাড়ির দেওয়ালে ঔষধ বা প্রসাধন দ্রব্যের ছাপ (stencil)। অনেক ব্যবসায়ী সস্তায় এইভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। গভীর রাত্রে এঁদের লোক বার হয় এই বে-আইনী কাজের জন্যে, চোরের মত। ভাল পরিষ্কার দেওয়ালের ওপর এঁদের লোভ বেশী। জনসাধারণ বিরক্ত ক্ষুব্ধ হলেও এই অত্যাচার সয়ে যান, অর্থাৎ হাঙ্গামা করতে চান না। ফলে, এঁদের সাহস বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এঁরা কেউ ক্ষমার পাত্র নন।

সচল বিজ্ঞাপনের পর্যায়ে আর একটা ফেলা যায়—খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় গল্পচ্ছলে লেখা জিনিসের নাম। এই ধরণের প্রচারকাজে থাকে, ন্যাকামি, অসঙ্গত বাক্যালাপ ও কেনবার মাত্রাহীন অনুরোধ। সময় সময় ভয়ও দেখানো হয়। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন—

শাড়ীর বিজ্ঞাপনে—"কি ভাই লীলা দি, এবার পুজো সেরিমনির জন্যে কি শাড়ী কিনলি? আমরা কিনেছি 'মডার্ন' শাড়ী

স্টোরস' থেকে চারখানা শাড়ী। ওঃ কি সাংঘাতিক শাড়ী। দেখলে ভাই অবাক হয়ে যাবি। পরলে মনে হবে যেন গায়ে কিছু নেই। দেরি করিস নে ভাই। এই বেলা কিনে ফ্যাল।"

তেলের বিজ্ঞাপনে—"ওগো শনুছ? আপিস থেকে ফেরবার সময় 'নিউ কেমিক্যাল'-এর ছ শিশি 'গোল্ডেন হেয়ার অয়েল' কিনে এনো। ডজন দরে হবে। আমার ও মেয়েটার চুল যে সব উঠে গেল। তোমারও চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ওরা বলছে এটা মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল। মাখলেই সাত দিনে মেঘের মত ঘন চুল হবে।"

ঔষধে—"কি চেহারাই হয়ে গেছে! এ অবস্থায় থাকলে চাকরি যাবে ও বাঁচা শক্ত হবে। এক কাজ কর, 'লম্বার্ড'-এর গ্রেট নার্ভ টনিক' আজ থেকেই খেতে আরম্ভ করে দাও। অল্প-দিনেই চাঙ্গা হয়ে যাবে। ম্যাজিকের মত কাজ করে। সব সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানাতেই পাবে।"

বারোয়ারি, আজকাল সর্বজনীন পূজার মণ্ডপে ঢুকলে দেখতে পাবেন—বেদীর ওপর প্রতিমার সামনে আশে পাশে ইংরেজীতে নাম ঝুলছে: ইলেকট্রিক কণ্ট্রাক্টারের, মণ্ডপ সজ্জাকরের, আর বেদীর ঠিক পায়ের নীচে ওরিয়েণ্টাল মূর্তি বিশারদ মূর্তিকারের সাইন-বোর্ড। কি কুক্ষণেই অবনীন্দ্রনাথ 'ওরিয়েণ্টাল' চালিয়েছিলেন! গোত্রহীন কত কি ওরিয়েণ্টাল এর দোহাই দিয়ে কৌলীন্য প্রাপ্ত হল।

বারোয়ারির কর্মকর্তাদের, বিজ্ঞাপনদাতারা হয়ত কিছু টাকা ছেড়ে দিয়েছেন এই সর্তে, যে তাঁদের নাম এইভাবে জাহির করতে হবে। কর্মকর্তাদের কিছু টাকা সাশ্রয় হল। শোভন-অশোভন ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না, আর বিজ্ঞাপনদাতারা ভুলে গেলেন, মাতৃভাষা।

সর্বজনীন দুর্গোৎসবে আর একটি বস্তু সকলের দৃষ্টি বোধ হয় এড়ায় না। এটি সচিত্র তোরণ। ব্যবসায়ীরা মায়ের নামের সুযোগে নিজেদের নাম ও পণ্য বিজ্ঞাপিত করে নেন, কারণ এই তোরণ তাঁদেরই টাকায় খাড়া হয়।

চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনে সিনেমা কম্পেনীরা অপরাজেয়। যেমন লাখো লাখো টাকার কারবার, প্রচার ব্যয়ও তেমন। বেশীদিনের কথা নয়: মহানগরী একদিন যথাতথা আঁটা প্রচারচিত্রে, কথায়, পথে পথে দোদুল্যমান ছবির নামে কোলাহলিত হয়ে উঠল। চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগল, "এই ছবি অর্ধ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে ও সময় লেগেছে অর্ধযুগ।" এমন আড়ম্বরপূর্ণ অনন্যসাধারণ বিজ্ঞাপন সচরাচর প্রকাশিত হয় না। লোকে সিনেমা হাউসের দেওয়ালে নটনটীদের সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদের ফোটোগ্রাফ দেখে কুতূহলী হয়ে উঠলেন। চিত্রপ্রারম্ভে নটীর কীর্তিকাহিনী কোনও এক রাষ্ট্রনায়িকা বিঘোষিত করলেন। হাজার হাজার উন্মুখ নরনারী সিনেমা হাউসের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রদর্শকরা বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন—"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোটো এ বাড়ি"—"হাউস ফুল।" দিনের পর দিন "হাউস ফুল" চলল। অভিনব সাফল্য-মণ্ডিত বিজ্ঞাপনের জোরে হাজার হাজার টাকা মিনিটে মিনিটে হাত ঘুরে গেল।

কোনও নতুন ছবির ঘোষণাতে সিনেমা হাউসের বাইরের দেওয়ালে দেখবেন মনোরম চিত্রপট, হাতে আঁকা বা আঁটা। সুকৌশলী চিত্রকর বিগতযৌবনা নটীকে খাড়া করেছেন পরিপূর্ণাঙ্গী যুবতীতে, আর শ্যামাকে গোলাপ-নন্দিতা রূপসীতে। এই মনোমুগ্ধকর





লোকাকর্ষী চিত্রিত বিজ্ঞাপনে থাকে—নটনটীদের প্রতিকৃতি, চিত্রাভিনয়গত কোনও বিষয়বস্তু, ছবির ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম। রং-এর খেলায়, রেখায় চিত্রকর যে ক্ষমতার পরিচয় দেন, তা অপূর্ব। এইসব নির্বাক পট মনে হয় যেন শতগুণমুখর। চিত্রশিল্পী এখানে সম্মানের পাত্র।

কিছুদিন থেকে শারদীয়া ও বার্ষিকসংখ্যার মলাটে বিজ্ঞাপনের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। শারদীয়ার কোনও শ্রী প্রায়ই এগুলিতে থাকে না। থাকে, দৃষ্টিকটু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর। বিজ্ঞাপনদাতারা মনে করেন, মলাটটা তাঁদের, কারণ তাঁরা নিজেদের পণ্য প্রচারের জন্যে প্রকাশকদের টাকা দিয়েছেন। প্রকাশকরা কোনও আপত্তি তোলেন না। টাকা নিয়ে তাঁদের কাজ। এঁরা লাভবান হন দুদিক থেকে, বিজ্ঞাপনদাতা ও বইয়ের ক্রেতার টাকায়। এই বিজ্ঞাপন-কলঙ্কিত সংখ্যাগুলির আকর্ষণ, নামজাদা লেখকদের লেখা ও চিত্রকরদের ছবি। সুচতুর প্রকাশক ক্রেতাদের বঞ্চিত করেন না। তাঁরা সংখ্যাগুলির পিছনে প্রচুর অর্থব্যয় করেন। পাঠক সম্প্রদায় লেখা ও রেখার যে সমাদর করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় কিছুই অবিক্রীত থাকে না। কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞাপনের সমাদর করেন কি? করুন বা নাই করুন, বিজ্ঞাপনদাতারা অর্থব্যয় করে যান এই উদ্দেশ্যে যে, কোনও না কোনও সময় কোনও লোক বা লোকে বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হবেন। তাঁদের ব্যয়িত অর্থ, লাভ নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে। ব্যবসায়ীরা ব্যাজলাভের কথা কখনও ভোলেন না।

এই প্রসঙ্গে বিলিতী ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখযোগ্য। ঘোর যুদ্ধ চলছে। বাজারে ব্যাপারীর মাল নেই, কিন্তু বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে—"আমাদের জিনিস অপেক্ষা করে থাকবার মত। যুদ্ধশেষে আপনিও পাবেন।" এই প্রচারের উদ্দেশ্য, ক্রেতাকে তাঁদের পণ্যের বিষয় সচেতন করে রাখা। এতে এখন যা খরচ হচ্ছে তার বদলে প্রভূত অর্থ তাঁরা ফিরে পাবেন।

বিলিতী পত্রিকার মলাটে সুশোভন অথচ দৃষ্টিকটুত্বহীন বিজ্ঞাপনের কয়েকটা কথা বলছি। রাজপথের ছবি, পথের নামে, মাসিকেব নাম। পথের এক পাশে একটি বাড়ির দেওয়ালে এমন জায়গায় ছোটো করে একটি পানীয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, যে বইটির ওপর দৃষ্টিপাত করলেই সেটি নজরে পড়বে। আর একটি—এও রাজপথের ছবি। পথে অগণ্য মোটর গাড়ি চলেছে। সকলকার সামনে যে লাল রং-এর মোটর গাড়িটি আসছে, তাতে লেখা এক সুবিখ্যাত নির্মাতার নাম। যেখানে সচরাচর গাড়ির নাম ছোটো করে লেখা থাকে, ঠিক সেই জায়গায়। টায়ার নির্মাতা এক নামজাদা কম্পেনীর বিজ্ঞাপন—জোটিতে মালবাহী অনেক লরী দাঁড়িয়ে। মালখালাস দেবার জন্যে লরীটি এসে দাঁড়িয়েছে। টায়ারের ওপর স্পষ্ট অক্ষরে নির্মাতার নাম। সাদা অক্ষরে এমনভাবে লেখা যে, চোখে পড়বেই। ছবিটি সুবিখ্যাত বিলিতী চিত্রকরকে দিয়ে আঁকানো। বহু বর্ণে ছাপা। ছবির নীচে টায়ার কম্পেনীর বিনা মূল্যে বিতরণের বার্তা। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যে শিল্পবোধের পরিচয় দেন, তা প্রশংসনীয়।

বিলিতী ব্যবসায়ীরাও যে সব সময় সুশোভন বা মার্জিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, তা নয়। তবে বাক্‌চাতুর্যে ও চমৎকার চিত্রে এগুলির স্থূলত্ব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের প্রকাশিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে যে মনোহারিত্ব থাকে তা এদেশে দুর্লভ। সুসংগত ও মার্জিত বিজ্ঞাপনে যে কটি কম্পেনী এদেশে নাম করেছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আশা আছে, আরও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন ও প্রচারকার্যকে শিল্পকলায় পরিণত করবেন।

নকলকরা প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। অন্যান্য বিষয়ের মত বিজ্ঞাপনেও এটি বিলক্ষণ আছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির এমন সহজ পথ আর নেই। ভাষা বা ছবির একটু অদল-বদল, বা সময় সময় হুবহু নকল করাকে আত্মমর্যাদা-হানিকর অনেকেই মনে করেন না। নগণ্য ব্যবসাদাররা এ কাজ করলে তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের পক্ষে দুর্নামের কথা।

অন্যান্য পণ্যের তুলনায়, ঔষধ, পানীয় বা প্রসাধন সামগ্রীর ভাষা ও ছবির নকলই বেশী। উদাহরণ অনেক; স্থান অল্প। উল্লেখযোগ্য দুএকটি বিষয়ের কথা বলব। বাঙলা দেশে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র সগৌরব প্রচলন আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন থেকে। সেই সময় কোনও এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ এদেশী কম্পেনী এই ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিকে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগিয়ে দিলেন। বুদ্ধিমান ব্যবসাদার প্রচারের অভিনবত্বের এই সুযোগ ছাড়লেন না। ছবির পর ছবি বার হতে লাগল। নকলনবিশরা নিষ্ক্রিয় রইলেন না। তাঁদের ছবির মত কিন্তু বিকৃত অনুকরণে প্রকাশ পেলে, অর্ঘের থালা হাতে চতুর্ভঙ্গ মূর্তিতে যুবতী। বাদ কিছুই নেই। অদ্ভুত কেশবিন্যাস, বুকে ন্যাকড়া বাঁধা, পরণে দেড় হাত গামছার মত কটিবাস, গায়ে সেরদশেক গয়না। অর্ঘের থালায়, ফুল শাঁখ ও ধূমায়িত ধুনুচি। যাঁরা একচোটেই কাজ সারতে চাইলেন, তাঁরা তাঁদের ওপর আরও কিছু উঠে, ঐ থালাতেই বসিয়ে দিলেন তাঁদের পণ্যের কয়েকটি দ্রব্য। অনেকে একটু নূতনত্ব করবার সাধ সংকল্পে লাগালেন এক বিরাট ধুনুচি ও ততোধিক বিরাট এক শাঁখ—মাত্র এই দুটি বস্তু। মূর্তিটি বাদ দিলেন। বিজ্ঞাপনটি লোকের বিশেষভাবে নজরে পড়বে বলে, ধুনুচি থেকে উড়িয়ে দিলেন চিমনির মত ধোঁয়া। বাঙলা দেশ আজও ঐ ধূমান্ধকারের হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

ইংরিজীর নিছক অনুবাদ যে অদ্ভুত বাঙলার সৃষ্টি করে তার নমুনা দেখেছিলাম অনেকদিন আগে একটি কাপড়কাচা সাবানের বিজ্ঞাপনে—"ধোয়ন সাবান। অতি খাস প্রক্ষাল বিদ্যুত সমান", ইংরেজীতে ছিল—Washing soap. Cleanses finely with lightning speed. এটি খাস বিলেত থেকে এসেছিল। এদেশেও ইংরেজীর কথাগত অনুবাদে পাবেন—সূক্ষ্ম পায়ের সূক্ষ্ম জুতা—a fine shoe for a fine foot. সরের মত ফেনা—creamy lather—সাবানের বিজ্ঞাপনে। কিম্বা;সৌন্দর্য যেতে বসেছিল, আমাদের ঔষধের গুণে রক্ষা পেলে—loosing her beauty until our medicine came to her rescue.—এরকম অনুবাদ বিকৃতি অনেক আছে। আর একটি উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি। ঔষধের বিজ্ঞাপনে কোনও এক কম্পেনী জানাচ্ছেন—"আমাদের ঔষধ অবিশ্বাস্য কার্যকরী"—of unbelievable efficacyর বাঙলা অনুবাদে। একটু খুলে বলি; বিজ্ঞাপনদাতা বলতে চান, তাঁর ঔষধের কাজ এমন যে না খেলে বিশ্বাস করা যায় না, অর্থাৎ অমোঘ। লেখার দোষে লোকের মনে ধোঁকা জাগা বিচিত্র নয়।

আজকাল অনেক নামজাদা পত্রিকায় নানারকম রজোনিঃসারক ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ঔষধগুলি হয়তো নিরীহ বা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু লেখা হয় "যতদিনের বা যে কোনও অবস্থায়" ফলপ্রদ। অর্থাৎ ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে—ঔষধ সেবনে নিশ্চিত গর্ভপাত। অনেক কামোদ্দীপক ভেষজও প্রচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

মাদুলি ও কবচের বিজ্ঞাপনে—প্রেম, অর্থলাভ, রোগ ও সংকটশান্তি, শত্রুনিপাত; ইত্যাদিতে সুনিশ্চিত সাফল্য বিঘোষিত হয়। মাদুলি ও কবচের মোহ অনেকেরই আছে। বিজ্ঞাপনদাতারা, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' এই মহাবাক্যটি বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে দেন।

বিলিতী তেজস্কর ঔষধের বিজ্ঞাপনে ভাষায় ও ছবিতে যৌন আবেদন প্রকট হয়ে ওঠে। সময় সময় বিকটও বটে। এসব এখনও ভারতীয় বিজ্ঞাপনে বেশীরকম স্থান পায়নি, তবে বেশী দেরিও নেই।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু বিরাট। প্রচারপন্থা অগণিত। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পোন্নতির সঙ্গে বিজ্ঞাপন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্যবসায়ীদের নীতি সব দেশেই সমান। প্রচারকার্য কারও স্থূল, কারও সূক্ষ্ম।

ইন্দ্রজিতের আসর

গোড়াতেই বলে গিয়েছিলাম যে, স্বাধীন ভারতেই মহাভারত। আমি নব মহাভারত রচনা করে বেদব্যাসের খ্যাতি অর্জন করব এই আশাও মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। মহাকাব্যের মালমসলাও হাতের কাছে প্রভূত পরিমাণে জমে উঠেছিল। সেই লোভেই কথাটা বলে ফেলেছিলাম। সত্যি, ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে না হতে অতীতের গহ্বর থেকে কুরুক্ষেত্রের শিবিরটি পর্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তফাৎ যৎসামান্য—কুরুপাণ্ডবের শিবির উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এ কুরুক্ষেত্রের শুরুটাও আদি যুগের মহাভারতের অনুরূপ। এ যুগের ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিররা পাশার চালে হেরে গিয়ে (শকুনি মামার কাছে?) রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ হেলায় হাতছাড়া করেছেন। আর কত সহস্র দ্রৌপদীর যে বস্ত্রহরণ হয়েছে তার সংখ্যা কে করবে? যাক্ ভেবে দেখলুম ইতিহাসের যদিবা পুনরাবৃত্তি হয় মহাকাব্যের পুনরাবৃত্তি কোনোমতেই চলে না। দ্বাপর যুগের সঙ্গে কলিযুগের analogy টেনে টেনে মহাকাব্য রচনার মধ্যে তেমন কৃতিত্বও নেই। আদি এবং অকৃত্রিম বস্তু ছাড়া অন্য রচনায় আমার মন ওঠে না। এজন্য ইদানীং মহাভারত রচনার আকাঙ্ক্ষা আমি ত্যাগ করেছি। এখন কিছু লিখতে গেলে সেটা বেদব্যাসের প্যারোডি হবে মাত্র।

স্বাধীনতা তো পরিহাসের বস্তু নয়। অন্ততঃ আমার আপনার মুখে পরিহাস শোভা পায় না। কেবল নেতাদেরই সেই অধিকার আছে। অতএব এ বিষয়ে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করাই নিয়ম ছিল। কিন্তু আমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। স্বাধীন ভারতের কথা লিখব বলে প্রথম কিস্তিতেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলাম। সম্প্রতি একজন পত্রপ্রেরক আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন স্বাধীন হবার পরে দেশে আমি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি রাস্তায়, ঘাটে, হাটে, বাজারে, আপিসে, আদালতে, খেলার মাঠে যে মানুষ দেখেছি তাদের দেখে মনে কি পরিবর্তন এল। ইনি বুদ্ধিমান লোক; স্বাধীনতার মৌলিক অর্থ সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান আছে। দেশ যেমন মাটি দিয়ে তৈরী নয়, মানুষ দিয়ে তৈরী—স্বাধীনতার মূর্তিও তেমনি মৃন্ময় নয় চিন্ময়। স্বাধীনতার ফলে দেশে যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে তা দেশের মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাবে। আমাদের দেশ মূর্তি পুজোর দেশ। দেশকেও আমরা দেবীমূর্তি হিসেবে পুজো করেছি। মাটির দেবতাকে পুজো করবার সবচেয়ে বড় সুবিধে এই যে, নৈবেদ্যটা পুরোপুরি ফিরে পাওয়া যায়। শুধু মন্ত্র আওড়িয়ে অর্থাৎ বক্তৃতা দিয়েই সে পুজো দিব্য সমাধা হয়। কিন্তু মানুষ হচ্ছে জাগ্রত দেবতা। তাদের পুজো করা এক ফ্যাসাদ, নৈবেদ্যটুকু তারা চেঁচে পুঁছে খেয়ে ফেলে। ওসব দেবতার খিদে বেশী। মন্ত্রীরা শুধু মন্ত্র পড়ে ওদের তুষ্ট করতে পারবেন না। তার উপরে আবার মেজাজ বিষম খারাপ। যখন তখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। পুরুতঠাকুরের প্রাণ থাকে তো মান থাকে না। একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। একজন স্বদেশানুরাগী ইংরেজ খুব তোড়জোড় করে বক্তৃতা করেছিলেন—

Ladies and gentlemen, I stand upon the soil of liberty.

শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিল মুচি। দাঁড়িয়ে উঠে বললে,

No, Sir, you stand upon a pair of boots for which you have not paid me.

বাস্ এক কথাতেই বক্তৃতার দফারফা। দেখুন তো কাণ্ড। লোকটা নিতান্ত মুচি বলেই এমন সরেস বক্তৃতাটা পাদুকাঘাতে পণ্ড করে দিল।

এখন ভেবে দেখুন, এমন যে জাগ্রত দেবতা তাদের নৈবেদ্য আপনি কদিন রেশন করে রাখবেন? তারা জোর করে কেড়ে খাবে। এইজন্য স্বাধীন দেশের রাস্তায় ঘাটে চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবি। প্রতিদিনের খবরের কাগজে এই এক বৃত্তান্ত। আগে চোরের ধন বাটপাড়ে খেত, এখন বাটপাড়ের ধন চোরে খায়। কারণ, স্বাধীন দেশে চোরের চাইতে বাটপাড়ের সংখ্যা বেশি। এই তো গেল রাস্তাঘাটের কথা। হাটে বাজারের কথা যদি বলেন—ইংরেজের আমলে আমরা কেবল লালবাজারকেই জানতুম। স্বাধীন দেশে একটিমাত্র বাজার আছে; তার নাম কালাবাজার। লালবাজার যদি শক্ত হত তো কালাবাজার অত ফাঁপতে পারত না। কলকাতা সহরে চোরাবাজার আগেও ছিল। তখনকার মানুষে রেখে ঢেকে কথা বলত না—কোদালকে কোদাল বলত। সুসভ্য মানুষে কোদালকে বলে খনিত্র, চোরাবাজারকে বলে কালাবাজার। সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগলেই শাদা জিনিস কালা হয়ে যায় আর সিধে জিনিস বাঁকা। যাক্, ইংরেজের আমলে আমরা যে সত্যি সত্যি পরাধীন ছিলুম তার প্রমাণ সে আমলে ছিয়ানব্বুই কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়া অসাধ্য ছিল। সে অসাধ্য সাধন স্বাধীন ভারতেই সম্ভব। ফাঁকি দেওয়ার সুবিধেকেই তো বলে স্বাধীনতা। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে এর পরে আর দেশের শত্রুরাও তা অস্বীকার করতে পারে না। এত সুযোগ সুবিধে পরাধীন দেশে কক্ষণো থাকে না।

ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। ইস্কুলে পড়বার কালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—কবিতাটি পড়ে প্রথমটায় বড় হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমার বুদ্ধিটা বোধকরি একটু প্যাঁচালো। আমি ঐ লাইনটির মানে করেছিলুম—স্বাধীনতারূপ হীনতার মধ্যে কে বাঁচিতে চায়! কাজেই এ কবিতা যে কেমন করে স্বদেশপ্রেমের কবিতা হল তা আমি একেবারে বুঝে উঠতে পারিনি। বেশ মনে আছে ক্লাসে মাস্টারমশায়কে জিগ্যেস করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলাম। ভালো কথার কদর্থ করতে গিয়ে যে সত্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলাম তাই ভেবে আমি নিজেই এখন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। ইংরেজ কবি শিশুকে বলেছেন seer, বলেছেন prophet. আমি সেদিন যে অর্থটি করেছিলাম তার মধ্যে কতখানি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল একবার তা ভেবে দেখুন।

ইংরেজ যখন ভুয়া স্বাধীনতার দলিল হাতে নিয়ে সাধাসাধি করেছে মহাত্মা গান্ধী ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছিলেন, এ তো জাল চেক্; এই নিয়ে আমি কি করব? Post-dated Cheque জাল চেক্-এরই সামিল। এখন একবার কাণ্ডটা দেখুন। সেই জাল চেক্ ভাঙাবার জন্য দেশময় কি হুড়োহুড়িই না লেগেছে!

স্বাধীনতার নামে একদিন দেহে মনে কি রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়েছে। আর আজ তার বাস্তব রূপ দেখে হৃৎকম্প দেখা দিয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস বই আর কি? যা ছিল আমাদের ধেয়ানের ধন তা এত বড় প্রহসন কেমন করে হল!



চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশণ্ডী

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানের সেরা খবর কোরিয়ার যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সেরা খবর রণতলাইয়ের নেপালীবাবার সর্বরোগহর ঔষধ বিতরণ। বড়দিনে শীতের মরসুমে কপি, কড়াইশুঁটি, কমলালেবু, নতুন গুড়ের আবির্ভাবে অন্তর যেমন পুলকিত হইয়া উঠে, তেমনি গতানুগতিক খবর পাইতে পাইতে চিরাভ্যস্ত মন মাঝে মাঝে এইরূপ জবর খবর পাইলে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া ওঠে, ভগবান আর কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখ, তোমার বিচিত্র লীলা আর একটু দেখিতে দাও প্রভু!

*　　*　　*　　*

নেপালীবাবার দাওয়াইয়ের শেষ পরিণতি যে কী হইবে তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু পোড়াদেশের অধিকাংশই যে বুঝেন নাই তাহার প্রমাণ একদিনে দুই লক্ষ লোকের আগমনের ভিতর দিয়া পাওয়া গিয়াছে। কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই যে, ব্যাপারটি আগাগোড়াই ফাঁকি। ট্রামে, বাসে, ক্লাবে সর্বত্র এক কথা—ওঃ, বিংশ শতাব্দীতে এ এক অঘটন ব্যাপার! আমার এক বন্ধুর মাসীর চোখে ছানি পড়িয়াছিল এক পুরিয়া খাইতেই ছানিকে কে যেন যোগবলে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল, অমুকের পুত্র একেবারে কথা কহিতে পারিত না হঠাৎ গাছের শিকড়ের গুঁড়া খাইয়া সে এত বকিতে সুরু করিয়াছে যে, তাহাকে বারবার মুখ চাপিয়া ধরিয়া থামাইতে হইতেছে।

*　　*　　*　　*

এ সমস্ত কথা অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিলে তেমন অসংগত বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখেও যখন মহোৎসাহের সহিত বাবার ক্ষমতা ও তহাদিগের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সার্টিফিকেট প্রচারিত হইতে লাগিল তখনই বুঝিলাম, তদা নাশংসে বিজয়ার সঞ্জয়। দিনকয়েক যাইতে না যাইতে সর্বরোগহর ঔষধের ফাঁকি ধরা তো পড়িলই উপরন্তু হাজার খানিক লোক ঐ স্থানেই সংক্রামক কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে সকল লোককে বাঁচাইবার জন্য উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট নেপালবাবা ও তাহার বাবার উপর ১৪৪ ধারা জারী করিলেন ও ঔষধ বিতরণ বন্ধ করাইলেন।

*　　*　　*　　*

ইতোমধ্যে ত্রিচিতে আর এক নেপালবাবার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইনিও নাকি প্রসাদ ও সুতা বিলাইয়া রোগ সারাইয়া দিতেছেন। এখন কত জায়গায় যে বাবা দেখা দিবেন তাহাই ভাবিতেছি। বাঙলা দেশের এখন বাবা মা কেহই নাই, তাই কান্দিতে এক জীর্ণ সেতুর ঝরঝরে সুরকি খাওয়াইয়া সবাইকে ভাল করিবার মতলব করিয়াছে। অবশ্য যাহারা এ প্যাঁচ বাহির করিয়াছে তাহাদের মগজের প্রশংসা করি। কারণ দুই চারি শত ব্যক্তির মধ্যে একজনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবেই, সেই সময় ভক্ত যদি ভাব গদগদচিত্তে ঐ সেতুটিকে সরাইয়া দেয় তাহা হইলে লোকের ভবপারে যাত্রার সুবিধা না হইলেও ইহকালে পারাপারের সুবিধা হইবে।

*　　*　　*　　*

বাবাদের খবর শুনিতে শুনিতেই চক্ষু কপালে উঠিয়া গিয়াছিল এমন সময় এক আধুনিক ছোকরাবাবুর খবর পৌঁছাইতেই ধাত ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। ময়মনসিংহের এক সিনেমা হলে মহল চিত্র দেখিয়া একটি হিন্দুস্থানী যুবক বলিতে থাকে যে সেই সে ছবির নায়ক এবং তাহার প্রিয়তমা যখন ইহজগতে নাই তখন প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিছুতেই তাহাকে আসল তথ্য বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে আত্মীয়স্বজন শিকল দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

*　　*　　*　　*

চিত্র দেখিয়া মানুষ এইরূপ কি করিয়া হয় ভাবিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন; কিন্তু আমরা হই না। কারণ আমরা জানি যে, আমাদেরও মাঝে মাঝে এ অবস্থা হয়। পাঠক-পাঠিকাদেরও হয়। চিত্রের প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখিয়া অজাতশ্মশ্রুদের মনে যে অস্থিরতা ঘটে আমাদের তাহা হয় না বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে মূল চিত্রটির গল্প, সংলাপ, কায়দা-কানুন দেখিতে দেখিতে আমাদের তো পাগল হইয়া উঠিবার অবস্থা হয়।

*　　*　　*　　*

সিংগাপুরে বনবালা বার্থাকে লইয়া একটা মহামারী ঘটিয়া গেল। একটি কিশোরী বালিকাকে কেন্দ্র করিয়া নিহত ও আহতের সংখ্যা দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে আমরা আজও সেই বর্বর যুগে আছি। অতীতে নারীর জন্য কত রাজা, কত রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এখনও সেই নারীকে লইয়া টানাটানির শেষ নাই। যাহাই হউক সিংগাপুরে ইতোমধ্যে যে কয়জন শিঙা ফুঁকিয়াছে তাহার সংখ্যা আর বৃদ্ধি না পাইলেই মঙ্গল।

*　　*　　*　　*

কোরিয়ার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, চীনা কম্যুনিষ্টরা উত্তর কোরিয়ার প্রধান নগর হামহুং-এ প্রবেশ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী আরও দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ দেখিয়া মনটা দমিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু খবরটির শেষাংশে রহিয়াছে, অবস্থা সন্তোষজনক। যুদ্ধের যেমন কিছুই আমরা বুঝি না তেমনি যুদ্ধের খবর পড়িলেও আসল ব্যাপার কিছুই বোঝা যায় না।

*　　*　　*　　*

আমাদের সহপাঠি গদাকে একবার পাড়ার লোক খুব ঠেঙাইয়াছিল। গদা সর্বদা নিজের শক্তির খুবই দাপট দেখাইত; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহিত একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া রীতিমত মা খাইল। সেই হইতে গদা আর কাহারও সহিত বল-পরীক্ষায় নামিত না ঠিক, কিন্তু মুখের দাপটে সকলকে ঠিক রাখিত। তাহাকে পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করিলে সে একটি কথা বলিত, এখন অবস্থা খুব সন্তোষজনক, সমস্ত পাড়াকে সে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছে। পরে মারিতে মারিতে সকলে তাহাকে পাড়া ছাড়া করিল; কিন্তু সে আজ পর্যন্ত নিজের অবস্থাকে অসন্তোষজনক বলিয়া ভাবিল না।

*　　*　　*　　*

সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাগরিকা ও বরুণা নামে দুটি ট্রলার কিনিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দুটি জাহাজে করিয়া কত মৎস্য ধরিবেন জানি না, তবে বড় বড় মাছ ধরা পড়িলেই খুশী হই। দু'চারটি চুণোপুঁটি ধরিয়া পরে না আবার কে কোম্পানীর হস্তে সমস্ত ভার অর্পিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

শংকরাচার্য থেকে রাজা রামমোহন রায় পর্যন্ত, প্রায় হাজার বৎসর ধরে, আমাদের দেশের লোকের মনে ধর্ম সম্বন্ধে দুটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল। একটা হচ্ছে যে, সংসারে থেকে ধর্মলাভ হয় না; ধর্মলাভের জন্য সংসার ত্যাগের দরকার। আর একটা হচ্ছে, ধর্মের মধ্যে একটা অলৌকিক, অনৈসর্গিক কিছু থাকা চাই, তা না হলে সেটা ধর্মই হলো না। ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তার দ্বারা কোন অলৌকিক শক্তি অর্জন; যে শক্তির বাহ্যিক প্রকাশের কোন পার্থিব কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন রায় তাঁর উপদেশের দ্বারা, আর তাঁর নিজের জীবন যাপনের পদ্ধতির দ্বারা দিয়ে, পরিষ্কার দেখিয়ে দিলেন যে, এই সংসারে থেকে, সাংসারিক বৃত্তি অবলম্বন করেও, মানুষ ধার্মিক হতে পারে। তার জন্য পর্বতে, জঙ্গলে, গুহা, গহ্বরে, কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। এমন কি, নিজের ও নিজের পোষ্যবর্গের জন্য সৎপথে থেকে, অর্থোপার্জন কিংবা বৈষয়িক কর্ম করলেও, মানুষের ধর্মহানি ঘটে না। আর সৎপথে থাকলে মোক্ষ লাভও করা যেতে পারে।

রামমোহন রায় আরও দেখিয়ে দিলেন যে, ধর্ম-সাধনায়, মন্ত্র-তন্ত্রের, তুক্‌তাক্‌, গুপ্ত আচার-অনুষ্ঠানের, ন্যাস-সমাধির, কোনই প্রয়োজন নেই। ধর্মের মধ্যে অলৌকিক, অনৈসর্গিক কোন ব্যাপারকে টেনে আনবারও আবশ্যক নেই। ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে,—শান্তি লাভ করা। শক্তি অর্জন করে, অপরের উপর প্রাধান্য করবার বাহাদুরী, ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য নয়। কিংবা ধর্ম নিয়ে বাণিজ্য করার নিমিত্ত সাধন-ভজন নয়। ধর্মের ব্যবহারিক অংশ হচ্ছে, সর্বচরাচরের হিতের জন্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠান মানুষের বা জীবের হিতকরী নয়, সে অনুষ্ঠান আর যাই হোক, ধর্মানুষ্ঠান নয়।

নানা দেশের শাস্ত্র-গ্রন্থ ভাল করে তলিয়ে আলোচনা করে, রামমোহন রায় বল্লেন, সব ধর্মেরই আসল ভিত্তি হচ্ছে, যুক্তির উপর। আর বল্লেন, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই, সর্ব দেশেরই ধর্মের মূল কথা একই। যা কিছু বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে, তার ব্যবহারিক অংশ নিয়ে। এই ব্যবহারিক দিক থেকে বিরোধ ঘটে তখনই, যখন ব্যবহার যুক্তিহীন হয়ে ওঠে। মুক্তির পথ থেকে যুক্তিকে বাদ দিলে, ধর্ম হয়ে ওঠে অধর্ম। তখন মুক্তি না হয়ে, হয় অধঃপতন, আর হয় আধ্যাত্মিক বিনাশ।

এই অধঃপতন ও বিনাশের পথে এদেশের লোক কতদূর পর্যন্ত নীচে নেবে গিয়েছিল, তার পরিচয় আমাদের ইতিহাসেই আছে। যাঁরা আরঙ্গজীব বাদশার মৃত্যুর কিছু পূর্ব থেকে, লর্ড লেক কর্তৃক উত্তরাপথে, এবং স্যার আর্থার ওলেসলী (পরে ডিউক অফ ওয়েলিংটন) কর্তৃক দাক্ষিণাপথে, ইংরেজ রাজত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত, এই ১০০ বছরের, ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করে পর্যালোচনা করেছেন, তাঁদের কাছে এই অধঃপতনের ইতিহাস কিছুমাত্র গোপন নেই। এই একশ বছরের অধর্ম, অত্যাচার, অরাজকতাও তাঁদের অবিদিত নয়। এর পর থেকেই, ভারতবর্ষে অন্ধকার মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের আলোকধারার সূত্রপাত। এই সময় থেকে আধুনিক যুগের ভাব ও মুক্তির আস্বাদ বাঙালীদের মারফৎই, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামমোহন রায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেখলেন, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলি যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কাছে, এই ধর্মের বাহ্যিক সাধনায় পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে, রামমোহন রায় দেখলেন, যুক্তির পথে ভক্তি-মুক্তি দুই একসঙ্গেই সম্ভব। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করে, এই যুক্তির ধর্ম প্রচারে মনোযোগ দিলেন। এই সময় এই নতুন মুক্তিবাদ প্রচারের এক প্রধান সহায় হোল, হিন্দু কলেজ। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানত রামমোহন রায়েরই চেষ্টায়, পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখবার জন্য এই কলেজ, সরকারের তরফ থেকে, স্থাপন করা হয়।

এই ধর্ম প্রচারে রামমোহন রায়ের প্রধান আশ্রয় হলো, এদেশেরই চিরকালের প্রামাণ্য শাস্ত্র, যা প্রস্থানত্রয় নামে অভিহিত। অর্থাৎ উপনিষৎ, ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্র; যুক্তির দ্বারা মুক্তিলাভের এই তিনটি বড় রাস্তা। কিন্তু সেই সময় আমাদের দেশের সমাজ, অজ্ঞানের কুসংস্কারে, নির্বুদ্ধিতার কুফলে, এত নীচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, লোকেরা তাঁদের নিজেদেরই প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলিকে, রামমোহন রায়ের স্বরচিত শাস্ত্র বলে, অপবাদ দিতে একেবারেই কুণ্ঠিত হন নি।

কিন্তু রামমোহন রায় তাতে পশ্চাৎপদ হবার লোক ছিলেন না। তিনি এইসব প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলি বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে, নিজের খরচে ছাপিয়ে, বিনা-মূল্যে বিতরণ করতে লাগলেন। আর তর্ক-আলোচনা করে, বই লিখে ও অন্যান্য কার্য-কলাপে বুঝিয়ে দিলেন,—যে সব অর্বাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রামাণ্য শাস্ত্র নয়, যেগুলি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলিকেই আশ্রয় করে আমাদের ক্রিয়াকাণ্ড যুক্তিহীনতার, বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পদে পদে দিচ্ছে। নির্বোধ লোককে প্রবোধ দেবার জন্য রচিত আখ্যায়িকাগুলিকেই, আমরা প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে মেনে নিচ্ছি। রামমোহন রায় আরও দেখিয়ে দিলেন যে, এই প্রামাণ্য শাস্ত্রের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই; বা তার সঙ্গে অলৌকিক, অনৈসর্গিক কোন কিছুর সম্বন্ধ নেই। সুতরাং ছাপা করিয়ে, সর্বসাধারণে তার প্রচার করা, কোনমতেই দোষণীয় নয়। কারণ, ধর্মের কথা, শান্তির কথা, মুক্তির কথা, সকলের নিমিত্ত। কোন ব্যক্তি-বিশেষের, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের, কোন সমাজ-বিশেষের, একচেটে গুপ্তধন নয়।

এই যুক্তির ধর্ম প্রচারের দ্বারা, মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে, রামমোহন রায় সমস্ত অজ্ঞানতা কুসংস্কার মোচন করে, তাঁর শিষ্যদের তাঁদেরই পূর্ব-পিতামহদেরই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। এ সেই ধর্ম, যে ধর্মের দ্বারা, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় রকমেরই কল্যাণ একসঙ্গেই সাধন হয়।

এই ধর্ম প্রচারের সহায়কর‍ূপে রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা' নামে এক ধর্মসভা স্থাপন করেন। বাঙলা দেশের তখন সকলেই যে মূঢ় ছিলেন, তা নয়। কয়েকজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই আত্মীয়সভায় একে একে যোগ দিলেন। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাবুরা এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন; যেমন গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর। টাকীর মুন্সীবাবুদের দুইভাই, কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূকৈলাসের কালীশংকর ঘোষাল, পোস্তার রাজা বৈদ্যনাথ রায়, সিন্দুরেপট্টীর কাশীনাথ মল্লিক, মথুরানাথ মল্লিক, জোড়া-

সাঁকোর দেওয়ানবাড়ির জয়কৃষ্ণ সিংহ, কোলকাতার ব্রজমোহন ও কৃষ্ণমোহন মজুমদার দুই ভাই, ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নন্দকিশোর বসু, চন্দ্রশেখর দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও বৃন্দাবন মিত্র; এঁরা সকলেই রামমোহন রায়ের প্রচারকার্যে সাহায্য করেন এবং তখনকার দিনের সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কিছুকাল পরে আত্মীয়সভা উঠে যায়। তখন থেকে রামমোহন রায় ও তাঁর শিষ্যবর্গেরা, ক্রীশ্চান পাদ্রী এ্যাডামের ইউনিটেরিয়ান ধর্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ এক উপাসনার পর, বাড়ি ফেরার পথে, রামমোহন ব্রহ্মোপসানর জন্য সেখানে এক সভার উদ্বোধন রায়ের দুই শিষ্য, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বল্লেন, "উপাসনার জন্য অপরের মন্দিরে যাবার কি প্রয়োজন? আমাদের নিজেদের এক উপাসনা-মন্দির হলে ত ভাল হয়।"

কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগল। তিনি তাঁর অন্যান্য শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে, চীৎপুরের বড় রাস্তার উপর এক বাড়ি ভাড়া করে, ২০শে আগস্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, ব্রহ্মোপসনার জন্য সেখানে এক সভার উদ্বোধন করলেন। সেই সময়কার লোকেরা এই উপাসনা-সভাকে ব্রহ্ম-সভা বলে উল্লেখ করতেন।

তারপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী, চীৎপুর রোডে অবস্থিত বর্তমানে ৫৫ নম্বরের বাড়ীটি, রামমোহন রায়ের ব্যয়ে কেনা হয়ে, ব্রহ্মোপসনা স্থায়ী করার জন্য তিনজন ট্রাস্টীর হাতে সমর্পণ করা হ'ল। এই মন্দিরের প্রথম তিনজন ট্রাস্টী ছিলেন,—টাকীর মুন্সীবাড়ির বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাধাপ্রসাদ রায়, এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রমানাথ ঠাকুর।

এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ প্রায় ৫০০ হিন্দু, এই প্রতিষ্ঠা-কর্মের উদ্বোধন সভায় উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন। মন্‌গোমরী মার্টিন বলে এক ইংরেজ ক্রীশ্চানও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এই ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রধান আচার্য নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রধান আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে পরমেশ্বরের আরাধনা করার জন্য, ব্রহ্মসভার উপাসনায় এক সার্বভৌম রূপ ছিল, এবং সেই কারণে, যে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই এই উপাসনায় যোগ দিতে পারতেন; ব্যক্তিগত ধর্ম তাঁর যাই হোক না কেন, আর তাঁর ধর্ম অনুষ্ঠানের বাহ্যিক প্রকরণ যেরকমই হোক না কেন। বস্তুত এই ধর্মমন্দিরের উপাসনায় সেকালে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান সকলেই যোগ দিতেন। যোগ দেওয়ার পক্ষে মনেরও কোন বাধা হোত না। কেননা, আগেই বলেছি, এই উপাসনার পদ্ধতিতে একটা সার্বভৌম রূপ ছিল।

যে ট্রাস্টডীডের দ্বারা এই মন্দিরের ট্রাস্টী নিযুক্ত করা হয়, সেই দলিলেই এই ব্রহ্ম-মন্দির যে জন্য উৎসর্গ করা হোল, তার এক বিবরণ ইংরেজী ভাষায় দেওয়া আছে।

রামমোহন রায়ের রচিত এই উৎসর্গ-পত্রের ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সম্পদ। এর এক অতি অক্ষম চুম্বক অনুবাদ আমি এখানে দিচ্ছি। কিন্তু মূল রচনাটি সকলেরই একাধিকবার পাঠ করা কর্তব্য। "চিরন্তন, অগম্য, নির্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য এই মন্দির উৎসর্গ করা গেল। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্তা, তাঁকে কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের কল্পিত কোন নামে, উপাধিতে বা বর্ণনার দ্বারা উপাসনা এই মন্দিরে অকর্তব্য। এই মন্দিরে কোনো প্রকারের চিত্র, ধাতুমূর্তি, প্রতিমূর্তি ভগবদ্-উপাসনার জন্য ব্যবহার করা, বা কোনোরূপ বলিদানের জন্য, পশু কিম্বা অপর কোনো প্রাণীহত্যা করা নিষিদ্ধ। কোনো ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের কোনো উপাস্য দেবতা, বা উপাস্য বস্তুকে, এখানে কোনোরূপ উপহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হবে না। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও রক্ষা কর্তা, একমাত্র পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণার নিমিত্ত প্রেম, ভক্তি, দয়া, ধর্ম ও চরিত্রের উন্নতিকল্পে এবং সর্বপ্রকার ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের চেষ্টায়, এখানে উপাসনা করা ও উপদেশাদি দেওয়া হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পদমর্যাদা নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি ভক্তিভাবে, শান্ত মনে, শিষ্টাচারে, এখানে উপাসনা করতে পারবেন।"

এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠান বিগত শতাব্দীর এক সর্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই মন্দির কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক সমাজের মন্দির নয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, রামমোহন রায় বাঙলা দেশে যে বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন, সেই বীজ থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ, সেদিন থেকে আজ প্রায় ১২০ বৎসর ধরে, বাঙলা দেশের মধ্যবর্তিতায়, সমস্ত ভারতবাসীদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে,—ধর্ম-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিতে, আচারে, ব্যবহারে সর্বত্রই, যে ফল উৎপন্ন করেছে, তার মূল্য বিচার করবার সময় এসেছে।

স্বদেশীয় লোকেদের অত্যাচারে, অনাচারে, নিন্দায়, অপবাদে, বিচলিত না হয়ে, রামমোহন রায় বলেছিলেন, যে বিধাতাপুরুষ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে, আমাদের সকলের গোপনতম মনোভাব পর্যন্ত জানতে পারেন, তিনি প্রকাশ্যেই আমাদের বিচার করেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন আমার স্বদেশবাসীরা কৃতজ্ঞতাপূর্বক আমার কার্যের কথা স্মরণ করবেন।

ভারতবর্ষের নবযুগের অভ্যুদয়ের আরম্ভে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, রামমোহন রায়ের অপূর্ব কীর্তিকলাপ স্মরণ করবার দিন এসেছে। রামমোহন রায়ের বীজমন্ত্র, 'সত্যমেব জয়তে' আজ ভারত-সরকারের মূলমন্ত্র। আজ এই বিগত যুগের এবং উদীয়মান নবযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, আমরা কোন ধর্মে ব্রতী হব? আমাদের পূর্বপিতামহের প্রদত্ত সেই সার্বভৌম যুক্তির ধর্মে; যা আমরা বহুকাল ধরে ভুলে গিয়েছিলাম, এবং যা রামমোহন রায় আমাদের সামনে পুনরুদ্ধার করে ধরেছিলেন,—না অন্য আর কোনো ধর্মের?

আজকের দিনে বিধাতার কাছে আমরা কিসের প্রার্থনা করব? ধনের, মানের, যশের, পুত্র, কলত্রের, উচ্চপদের বা অন্য আর কোনো কিছু পার্থিব সম্পদের? না সেই শুভ বুদ্ধির নিমিত্ত, যে বুদ্ধি বিশ্বাসী সকলের কল্যাণের হেতুস্বরূপ?

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ।
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি বর্ণহীন হইয়াও বিবিধ শক্তি সংযোগে, নানা বর্ণের প্রাণীসমূহের প্রয়োজন জানিয়া, তাহাদের কাম্য বিধান করিতেছেন; যিনি সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান আছেন এবং প্রলয়ান্তেও যিনি একমাত্র বিদ্যমান থাকিবেন; তিনিই পরম দেবতা। তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

মানুষ প্রায় সব জন্তুকেই তার কোন না কোন কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। গাড়ী টানবার জন্য কুকুর, ছাগল, ভেড়া, বেড়াল, সিন্ধুঘটক জাতীয় অনেক জন্তুকেই কাজে লাগান হচ্ছে। জিম ক্যাসপার অস্ট্রিচ পাখীকে গাড়ী টানবার কাজে লাগিয়ে আর একটু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। তিনি অস্ট্রিচ পাখীকে



অস্ট্রিচ পাখীর মুখে লাগাম লাগান হয়েছে।

এর জন্য রীতিমত শিক্ষা দিয়েছেন। এই পাখী আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়। এরা একেবারেই উড়তে পারে না—আকারে এরা প্রায় একটা মানুষের মাথার সমান। উড়তে না পারলেও এরা কিন্তু মাটির ওপর খুব জোরে ছুটতে পারে। এরা যখন ছোটে, তখন এদের দু' পায়ের মাঝখানের দূরত্ব প্রায় কুড়ি ফিটের ওপর।

*

আমরা 'ঘুম-পাড়ানি' গানের কথা সকলেই জানি। আর এর থেকেই বোঝা যায় যে, গানের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এই সম্মোহনী শক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার সিকাগো মেডিক্যাল রিসার্চের কর্তৃপক্ষরা রোগীদের কোন অস্ত্রোপচারের জন্য অচেতন করার সময় সুরের সাহায্য নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু তাদের এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যে, অস্ত্রোপচারের সময় যাতে সুর চিকিৎসকদের কানে না যায়। কারণ, তাহলে অস্ত্রোপচারের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এর জন্য চিকিৎসকদের কান বাঁচিয়ে রোগীদের গান শোনাবার একটা উপায়ও হয়েছে। রোগীর কানে একটা 'হেড ফোন' লাগান থাকে।

অন্য একটা ঘরে রেকর্ডের সাহায্যে গান-বাজান হয়—আর এই গানের সুর দেওয়ালে বসান সরু নলের ভেতর দিয়ে হেড ফোনের সাহায্যে রোগীর কানে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সুরের মোহে রোগী এমনই মুগ্ধ হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার শেষ হয়ে যাবার পর রোগী প্রশ্ন করে 'অপারেশন কি শেষ হয়ে গেছে ?"

এটা অবশ্য কিছু নতুন আবিষ্কার নয়। পুরাকালের মিশরের রাজার চিকিৎসকেরাও চিকিৎসার জন্য সুরের সাহায্য নিতেন।

দেখা গেছে যে, শতকরা ৬১ জন রোগী কিছু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, ৩১ জন আধুনিক গান আর খুব অল্পসংখ্যকই রাগপ্রধান এবং লোকসঙ্গীত পছন্দ করে।

*

স্ট্রেপ্টোমাইসিন ওষুধের নাম আমরা সকলেই জানি। ক্ষয়রোগের পক্ষে এটা খুব উপকারী। চেকোস্লাভিয়ার সরকারী স্বাস্থ্য গবেষণাগার এক নতুন উপায়ে এই স্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে সব রোগীদের স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইন্‌জেকসন করা হয় তাদের প্রস্রাব থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরী করা যায়। এই রকমভাবে ওষুধ তৈরী করে দেখা গেছে যে, যতটা ওষুধ রোগীকে ইন্‌জেকসন করা হয় তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ আবার প্রস্রাব থেকে পাওয়া যায়।

*

যাদু-সম্রাট সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব হোত কি না, জানি না। এটা কিন্তু যাদুর সাহায্যে সম্ভব হয়নি। মেয়েটা যার ওপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা অণু-পরমাণু নিয়ে গবেষণা করবার যন্ত্রের অংশ। এটার ভেতর দিয়ে প্রায় চার লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ শক্তি যাচ্ছে। এই বিদ্যুৎ মেয়েটির কোন

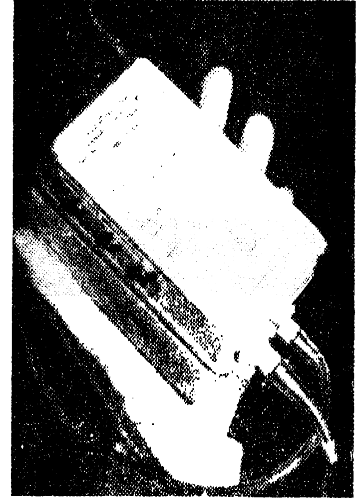


বিদ্যুতের জন্য মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ক্ষতি করছে না, শুধু এর মাথার চুলগুলো বিদ্যুতের জন্য সব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

*

জাহাজ, উড়ো জাহাজ মাত্রেই বেতারে খবর পাঠাবার এবং শোনবার বন্দোবস্ত থাকবে। বিশেষ করে উড়োজাহাজ আকাশে ওড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বেতারযন্ত্রী বিমানঘাঁটির সঙ্গে



হাতের চেটোতে প্রেরক-যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছে

যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। কোন বিপদ হওয়া মাত্রই এই খবর বেতারযন্ত্রী বেতার মারফৎ জানিয়ে দেবে। এই বিপদসূচক খবর পাঠানোকে এস ও এস বলা হয়। যে যন্ত্র দিয়ে এই সব খবর পাঠানো হয়, তাকে ট্রান্সমিটার বা প্রেরকযন্ত্র বলা হয়। এই প্রেরকযন্ত্র যত ছোট হয়, ততই আজকালকার দিনে সুবিধা। এতদিন এই যন্ত্রের ওজন কুড়ি সের ছিল। কিন্তু বর্তমানে আকারে খুব ছোট, ওজনে অনেক কম এমন এক প্রেরক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এটা এখন অনায়াসে উড়োজাহাজ চালকের বা বেতারযন্ত্রীর জামার পকেটে রেখে দেওয়া যায়।

*

চার বছর আগে বিকিনি প্রবাল বলয়ে আণবিক বোমা পরীক্ষার সময় সমুদ্র থেকে প্রায় ৪৮১ প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করা হয়েছিল। মৎস্যবিদ্‌রা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এর মধ্যে প্রায় ৭৯ প্রজাতি তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এর মধ্যে অনেক অদ্ভুত আকারের মাছও ছিল। একটা প্রজাতি পাওয়া গেছে যেটা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ছোট মাছ। এই মাছ অনেকটা টেঁপা মাছের মত দেখতে।

জাতের ছবিগুলির উপর তাঁরা চোখ বুলিয়ে যান, প্রদর্শনী কমিটির অনুরোধ ও উপরোধে ড্রয়িং রুম সাজাবার জন্যে ছবি বাছাইও হয়। সঙ্গে সঙ্গে লেবেল পড়ে Sold to so & so। আমরা তাই দেখে কৃতার্থ হই। অথচ ঐ ভিড়ে তুলির জোর থাকলেও খুঁটির জোর না থাকলে কোনো তরুণ শিল্পীর পক্ষে স্থান পাওয়া দুরূহ। অতএব পার্কের রেলিং অথবা চায়ের দোকান ছাড়া তারা যাবে কোথায়?

নরেশ সেনগুপ্তর প্রদর্শনী দেখে তরুণ ও প্রতিভাবান শিল্পীদের এই দুর্দশার কথা বার বার মনে হচ্ছিল বলেই এত কথা বলতে হোলো। ১৯৪৮ সালে গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে নরেশবাবুকে রাঁচীতে থাকতে হয়েছে। তাই প্রদর্শনীর ৩১ খানা ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে রাঁচী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর সেখানকার প্রকৃতির কাছাকাছি যে সব মানুষ থাকে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র। প্রদর্শনীর ছবিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ফুলদানিতে রাখা কয়েকটি ফুল, যেমন রেড লিলি, সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, ইত্যাদি। দ্বিতীয় দৃশ্যচিত্র, যেমন হুড্রু জলপ্রপাত, শাল-বীথিকা, কুটীর, আলো-ছায়া ইত্যাদি। তৃতীয় হচ্ছে নরনারীর কর্মরত জীবনের একাধিক ছবি, যাতে ফিগার ড্রয়িংএ শিল্পীর জোরালো তুলির স্বাক্ষর বর্তমান। নরেশবাবুর ছবিগুলির মধ্যে রাঁচি অঞ্চলের পরিবেশ নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির যে সরল ঋজুতা নরেশবাবুর ছবিতে তার ছাপ সুস্পষ্ট। সবগুলি ছবিই টেম্পেরায় করা জল-রঙ বা অয়েল তিনি কোথাও ব্যবহার করেন নি। কয়েকটি ছবিতে টেম্পেরায় তৈলচিত্রের বৈশিষ্ট্য আনবার চেষ্টা প্রসংশনীয়। ছবিগুলির অধিকাংশই রঙের ঔজ্জ্বল্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু গভীরতার অভাবে সে দৃষ্টিকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

শিল্পী শ্রীমতী দেবযানী কৃষ্ণ

শ্রীসহস্রাক্ষ

শ্রীমতী দেবযানী কৃষ্ণের প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষা আরম্ভ হয় ইন্দোর এবং বোম্বাইয়ে। ভারতের বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করে তিনি সেই সব জায়গার শিল্পধারা অনুশীলন করেছেন এবং তাঁর স্বামী শিল্পী কানোয়াল কৃষ্ণের সঙ্গে তিব্বত, সিকিম, কাশ্মীর, খাইবার প্রভৃতির বহু জায়গায় ঘুরে ছবি এঁকে বেড়িয়েছেন। বর্তমানে তিনি সিকিমেই আছেন। ৮ই এবং ৯ই ডিসেম্বর সেখানে মুখোস-নৃত্যের মরশুমে সেখানে তিনি এই নৃত্যোৎসবের নানান ছবি আঁকছেন। সেই মুখোস-নৃত্যের কিছু কিছু এই প্রদর্শনীর বিশিষ্ট সম্পদ।

শ্রীমতী কৃষ্ণের এবারকার প্রদর্শনীতে এই মুখোসগুলোয় এবং মুখোসনৃত্যের নানান ভঙ্গিমায় প্রায় ২০।২৫টি ছবি স্থান পেয়েছে।



হাটবাজার



প্রেসিডেন্সী উদ্যানে

লামাদের বিশ্বাস মহাকাল এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার আত্মা তাঁদের দেশকে রক্ষা করেন নানান্ বিপদ আপদের হাত হতে, এঁদের ভোজোৎসব উপলক্ষে কঙ্কালমালী, দ্রংষ্ট্রা-করালবদন, ত্রিনয়ন মহাকালের বেশে জনৈক লামা সেই উৎসবে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করেন—সঙ্গে থাকেন তাঁর অনুচরবৃন্দ, সিংহ, ষাঁড়, কাক, গরুড় প্রভৃতির মুখোস পরে। এই সব মুখোসের ছবি এবারকার প্রদর্শনীতে রয়েছে—নানান্ রঙের রঙ-ছটায়, মুখের নানান ভঙ্গিমায়। বিচিত্র গঠন এবং সাজসজ্জা প্রভৃতি নানান দিক দিয়ে এগুলো বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে প্রথম দৃষ্টিতেই। এদের মধ্যে কাঞ্চন-জোধনায় 'স্পিরিট' (নং ১) শা-না-বা কালো টুপির নাচ (নং ৩) ষাঁড় (নং ৪) তুষার-সিংহ (নং ৫) লা-চাম-কুলক (নং ২৪) সৃষ্টি পালনের দেবতা গংপো (নং ১০) প্রভৃতির মুখের ভঙ্গি, চড়া রঙের চোখ-ঝলসানো বাহার এবং নানান্ বিচিত্র সাজসজ্জার জন্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের উত্তর সীমান্তের এই

সংস্কৃতির রূপ নব্যজগতের ছোঁয়ায় আর কতদিন টিকে থাকবে—হয়ত বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণের এই ছবিগুলোতে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এর পরেই তাঁর আঁকা কয়েকটি প্রতিকৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হলদে শাল (নং ৬৫) গুরুরূপ (নং ২৭) ভুটান থেকে (নং ২৮) নীলা (নং ৪৩) আর্দালী (নং ৪৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিব্বতী বধূর (নং ৪৪) লজ্জাবনতা নববধূর শান্ত ভাবটি—মাথায় চাঁদোয়ায় গোলাপী ফুলের ছোপ এবং ওদের উৎসবের বিশিষ্ট সাজ-সজ্জা ও পোষাক-পরিচ্ছদ সব মিলে ভারী মধুর লাগে, ফুলের স্টাডিগুলোর মধ্যে Hyddrangers (নং ৪৯) ভাল লাগল। পাহাড়ের গায়ে তুষার আবৃত নানান্ আকৃতিকে ছবিতে রূপ দেবার প্রচেষ্টা—তাঁর খেলনা নিয়ে খেলার ছলে আঁকা বহু ছবির মতই মুগ্ধ করে। এদের



মুখোস নৃত্য

মধ্যে মাতৃত্ব ছবিটিতে (নং ৫৩) মায়ের ঘিরে সন্তানের দল, শাদা আর (নং ৫৪) গুরুর পদতলে (নং ৫৬) ই ছবিতে ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের চমৎকার ফুটে উঠেছে। খেলনা নিয়ে তাঁর ৩৪নং থেকে ৩৭ নম্বর পর্যন্ত গুলির রচনা আর রঙের খেলা নূতনত্বের দিয়ে আকৃষ্ট করে। দৃশ্যচিত্রের মধ্যে প্রথ চোখে পড়ে 'লা খং' (নং ৫০) ছবি ছবিটির রঙ চমৎকার, অন্যান্য ছবির মধ্যে 'হাটবাজার' (২৯) এবং 'বস্তী' মন্দ নয়।

শ্রীমতী কৃষ্ণের আঁকা এই ছবির প্রদর্শনীটি দেখে একটি বৈচিত্র্যভরা আনন্দে মন ভরে উঠল; তিনি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে সেই অতি বিরল একজন শিল্পী, যিনি তাঁর রচনায় প্রেরণা হিসেবে খেলনা, মুখোস, আদিম আচার ও বেশভূষা প্রভৃতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।

বাসা বদল

শ্রীকরুণাময় বসু

চোখের সম্মুখ থেকে পরিচিত আকাশ
হঠাৎ মুছে গেল।
নির্জন নীল বনান্তের ডগায় তরুণ আকাশের হাতছানি,
বিলীয়মান রক্তমেঘের লীলায়
রেখাঙ্কিত রূপকথার কাহিনী।
সবুজ ঘাসের ডগায়
ভোরবেলাকার শিশির বিন্দুর ঝিলিমিলি;
পাখীদের কলকাকলিতে জেগে ওঠা অদ্ভুত সকাল।
কলকাতা ছেড়ে নতুন অচেনা পাড়াগাঁয়ে
বাসা বাঁধলাম।

বকুলঝরা পথের পাশটিতে মজা পুকুর,
ভাঙা শিবমন্দিরের ভগ্নস্তূপ:
নিস্তব্ধতার আতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি ছলছল করছে।
ঐ দূরে ঘন বনের মাথার উপরে সোনালি সূর্যের আভা,—
পৃথিবীর সানন্দ উজ্জীবন!
মালতী লতার কুঞ্জশাখা থেকে টুপ টুপ করে
ঝরাফুল ভিজেমাটিতে ঝরে পড়ছে;
একটা অদ্ভুত ধরণের লাল পাখী এগাছের ডাল থেকে
ওগাছে চলে যাচ্ছে।
ঘাসের ডগায় একটা বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি
ডানা মেলে চুপ করে বসে আছে।
কেন জানিনে হঠাৎ আচমকা আনন্দে মন উৎসুক হয়ে উঠল।
আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যে পথ চলে গিয়েছে
কতো দূরদূরান্তরে,
ভাঙা নদীর ধারে ধারে, হিজল বনের গাছের ছায়ার নীচে,
কত দেশ-দেশান্তর, পাহাড় পর্বতমালা পেরিয়ে
মহাসমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাড়ি দিয়ে,
এ পথের শেষ কোথায় কে জানে?
হঠাৎ কেন মনে হল জানিনে আনন্দের যেন বয়স নেই,
আদিম কালের কাঁচা মন মানুষে এখনো হারায়নি।
তাইতো মানুষ চলে যায় এশিয়ামাইনরের তপ্ত বালু পথে
উষ্ট্রযূথের দলে নিরুদ্দেশ যাত্রায়,—
উদ্দাম বালু ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কতো দুরন্ত অভিযান।
টাইফুন ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রে ভাঙা পাল তুলে
দুঃসাহসী নাবিক পাড়ি দেয়;—
কোথায় দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে নির্জন দ্বীপপুঞ্জ;
নারিকেল কুঞ্জের শাখায় শাখায় মর্মর-কম্পন,
নীলপাহাড়ের সানুদেশে নেমে আসা অপরূপ কুয়াশা-স্বপ্ন;
সমুদ্রের অগভীর জলে রক্ত প্রবালের ঝিলিমিলি।
সহরতলীর ধারে একটা ছোট পাড়াগাঁয়ে বসে এসব কথা ভাবতে
এতো আশ্চর্য লাগে!
এই আশ্চর্য লাগে বলেই পৃথিবী এখনো শ্যামল,
বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ।
তাইতো মানুষ এখনো কাব্যে, চিত্রে গোধূলির
রক্তমেঘের স্তূপ আঁকে;
তাইতো মানুষ ভালোবাসে, গান গায়, অশ্রুতে
জানায় অশ্রুত বেদনা;—
কতো হারানো দিনের কাহিনী চিরন্তন রসে
নিবিড় করে তোলে।

বড়দিন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

শিশিরের মুক্তো-মাখা মাকড়ের জাল
ময়দানে মেলেছে এক আশ্চর্য সকাল।
দূরের গীর্জায় কোথা ঘণ্টা বাজে ক্ষীণ—
নীল রেশমের মত আকাশ মসৃণ;
অকস্মাৎ মনে হ'লো :
আজ বড়দিন।

আজ বড়দিন!
একটি মধুর স্মৃতি জড়ানো প্রাচীন—
বড়দিন।

দিনে দিনে আরো বৃহত্তর
আজ থেকে দিন হবে বড়।
সূর্যের প্রখর অভিযানে
রাত্রির তাঁবুতে সাড়া—এখানে-ওখানে
অন্ধকার সর্বদিকে ভয়ে থরোথরো।

আজ হ'তে দিন হ'লো বড়।

তবু দিন বড় হ'লো নাকি!
স্টীলের ঈগল পাখী
আকাশে আকাশে আর দেবে না টহল;
মারণ-অস্ত্রের কুতূহল
চিরতরে হবে সম্বরিত!
পৃথিবী ধ্যানস্থ ফের শান্ত, সমাহিত।

জীবনের আর্ত আর্তনাদ
ধ্বনিবে না দিগন্তে অবাধ;
হিংসার শ্মশানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত প্রেম :
প্রতি গ্রাম, জনপদ হবে বেথ্লেহেম!

দিন যদি আজ থেকে হ'লো সে বড়ই :
মানুষের বৃহত্তর বড়দিন কই?

কাহিনী

জগদীশ ভট্টাচার্য

তারপরে একদিন এল তা'রা রাতের আঁধারে,
আতঙ্কিত প্রাণ নিয়ে পার হয়ে এল দীর্ঘপথ;
বহু মাঠ, বহু নদী, বহু হিংস্র পশুর শপথ,—
বহু মৃত্যু পার হয়ে এল তা'রা মানুষের দ্বারে।
তা'রাও মানুষ ছিল, একদিন তাদেরো সংসারে
প্রিয়চোখে প্রেম ছিল, প্রাণে ছিল স্বপ্ন সুমহৎ,
গর্বের অতীত ছিল, আশাদীপ্ত ছিল ভবিষ্যৎ;—
তা'রা ভালবেসেছিল মানুষেরি প্রিয়দেবতারে।

হঠাৎ তাদের চোখে আকাশের সূর্য গেল নিভে,
অন্ধকারে ছুটে এল নরঘাতী দানব-বাহিনী;
জিঘাংসায় উল্লসিত শুরু হল বীভৎস কাহিনী,—
জীবনের অমৃতকুণ্ড পূর্ণ হল শবে আর শিবে।
সেই মৃত্যু পার হয়ে প্রাণে নিয়ে পশু-কাতরতা
প্রেতের প্রদেশ থেকে পরাজিত এল মানবতা॥

বেতার প্রসঙ্গ

বেতারের পল্লীমঙ্গল আসর, কাদের আসর?

বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরের বিষয়ে আমরা কিছুদিন আগে যে কথাগুলি বলেছিলাম তা হয়তো আমাদের পাঠকদের মনে আছে। আজ আর একবার সেই আসর নিয়ে আরো কিছু বলব মনে করেছি। এই আসরের কার্যসূচীর যে খুব কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। তবে একটু পরিবর্তন যা লক্ষ্য করেছি, তা হল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "আমাদের যাত্রা হল শুরু" গানটির ব্যবহার। কিছুদিন থেকে দেখছি ঐ গানটি এই আসরের দ্বিতীয় উদ্বোধক সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হয় আসরের পরিচালক মহাশয় এই গানটির দ্বারা জানাচ্ছেন যে, বাইরে থেকে যে যা বলুক, বা যে যতখানি ইচ্ছা সমালোচনার তুফান তুলুক, "হে দিল্লীর বেতারের কর্ণধারগণ, তোমরাই আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমাদের নমস্কার করি। তোমরা আমাদের এই সমালোচনারূপ তুফানে আমাদের এই কর্মতরীখানির হাল ধরে থাক। আমরা ভালমন্দ যা কিছুই করি না কেন, তোমরাই আমাদের ভগবান অর্থাৎ উপরওয়ালা, তোমরা সন্তুষ্ট থেকে আমাদের যদি রক্ষা কর তবে আর আমাদের ভয় কাহারে"। তা না হলে "আমার সোনার বাংলা"-র মত উপযুক্ত একটি গান থাকতে আবার এই গানটি ব্যবহার করা কেন?

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর দ্বারা পরিত্যক্ত গ্রামে, দরিদ্র, খারাপ রাস্তাঘাট, অসুখ-বিসুখ ও শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামগুলি শহরের তুলনায় একেবারে নির্জীব, যেন মরণের পথে এগিয়ে আছে। এই রকমের গ্রামবাসীরা বেতার যন্ত্র রেখে পল্লীমঙ্গল আসরের শিক্ষা বা আনন্দ গ্রহণ করতে পারে না বলে, কিছুদিন থেকে সরকারী পল্লী উন্নয়ন বিভাগ থেকে কয়েকটি ব্যাটারী চালিত বেতার যন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে কোথাও কোথাও বিতরণ করা হয়েছে। তার অনেক যন্ত্র আবার একটানা কোন গ্রামে থাকে না। যন্ত্রগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। যে কয়দিন কোন গ্রামে থাকে সেই কয়দিনই গ্রামবাসীরা যা শোনবার তা শুনে নেয়। এর মধ্যে ব্যবহারের অজ্ঞতার জন্যে অনেক যন্ত্র শোনবার পক্ষে এমন অযোগ্য হয়ে পড়ে যে, তা থেকে শ্রুতিমধুর কোন কার্যসূচী শোনার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। যাই হোক উপস্থিত যে ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়েছে তাকেই আমরা বলব তাদের পক্ষে যথেষ্ট। এবং আশা করি ধীরে ধীরে দেশের অবস্থার উন্নতির সংগে সংগে বেতার যন্ত্রের ব্যবহারেরও উন্নতি দেখা দেবে। কিন্তু এই ধরণের অবস্থার মধ্যে পল্লীমঙ্গল আসরের পরিচালক মহাশয় কিভাবে কাজ করবেন সেটাই হল ভাববার কথা। তাঁর চিন্তার মধ্যে থাকা চাই দূরদৃষ্টি। আর থাকা চাই মনের মধ্যে বর্তমান গ্রামবাসীদের শিক্ষা, বুদ্ধি, দারিদ্র্য ও সমাজব্যবস্থার সমগ্র রূপটি। গ্রামে পল্লীমঙ্গল আসরের শ্রোতার সংখ্যা আজ অতি সামান্য হলেও, মনে রাখতে হবে যে, ধীরে ধীরে এদের সংখ্যা বাড়বেই। সুতরাং গ্রামের অল্প কয়েকটি যন্ত্রের শ্রোতাদের কথা ভেবেই তারা যেন কার্যসূচী রচনা করেন। মফঃস্বল শহরের কথা কোন রকমেই মনে যেন স্থান না পায়। আমরা মনে করি শহরের কোন শ্রোতার চিঠি-পত্রেরও কোন জবাব না দেওয়াই উচিত। তাদের জন্যেও বেতারে কতক রকমের অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে, যার শেষ নেই। তাই গ্রামের আসরকে একমাত্র গ্রামেরই আসর করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে দূরভবিষ্যতে যেদিন গ্রামের সংগে নগরের ব্যবধান ঘুচে যাবে সেদিন কার্যসূচীর বদল হবেই। তখন সকলকে এক করে দেখে সেইভাবে কার্যসূচী রচনা করায় ক্ষতি নেই। কিন্তু এখনো সে সময় আসেনি। গ্রামকে তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে, উভয় সমাজকে এক করে নেবার সাধনাই হবে আমাদের একমাত্র সাধনা। কিন্তু ধাপে ধাপে গ্রামকে তৈরী করে নিতে হবে। হঠাৎ একদিনে তাদের কাছে একসংগে যাই কিছু উপস্থিত করি না কেন তা হবে নিরর্থক। অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথম দিনে প্রচুর পরিমাণে মাংস পোলাও খাওয়ানো যেমন বিপজ্জনক, এও ঠিক তাই। ধীরে ধীরে রোগীর স্বভাবের সংগে তাল রেখে যেমন পথ্য করতে হয়, গ্রামের জীবনে আমরা মনে করি সেই রকমের বুঝে শুনে বেতার থেকে পথ্য পরিবেশ করা হবে।

বর্তমানে গ্রামের শ্রোতারা পল্লীমঙ্গল আসর শুনে স্বভাবতই মনে করছে যে, "বাবু"রাই কেবল তাদের শোনাবার অধিকারী, আর তাদের অধিকার কেবল "বাবু"দের কথা শোনবার। এই ব্যবধানটা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরের কার্যসূচীর দ্বারা খুবই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। তাকে দূর করা চাই। পল্লীবাসীদের ভাবতে দেওয়া চাই যে, আসরটি তাদেরই আসর। শহরের বাবুদের আসর এ নয়।

ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠান মারফৎ বহু টাকার লেনদেন যে হয়ে থাকে একথা সকলেই জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বেতারের সেই টাকার এক পয়সাও দরিদ্র পল্লীবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে শোনা যায় না। দেখা যায় শিল্পীদের মধ্যে বণ্টনের জন্যে যে টাকা বেতারের তরফ থেকে খরচ হয়, তার সবটাই যায় শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পকেটে। এও এক রকমের "তেলামথায় তেল ঢালা"। শহরবাসী আমাদের ভাবা উচিত, কি করে এই টাকার অন্ততঃ কিছু অংশ গ্রামের মধ্যে বিলি করা যায়। বেতারের পল্লীমঙ্গলের আসর সেদিক থেকে গ্রামকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। বেতারের এই পল্লীমঙ্গল আসরে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব থাকায় গ্রামবাসী প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। পল্লীর শুভ কামনার নাম করে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বকিছু সুবিধা নিজেরা ভোগ করছে। বেতারের পল্লীমঙ্গলের আসরের টাকার সবটাই তারা আত্মসাৎ করছে। বেতারের পরিচালকমণ্ডলী বা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরের পরিচালক মহাশয় শহরবাসী ও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলেই তাদের নিজেদের সমাজের স্বার্থটাকেই সর্বাগ্রে বড় করে তারা ভাবেন। শহরবাসী এই শ্রেণীর একটা বড় দোষ হচ্ছে যে তারা সব সময়ই মনে করেন যে, তারাই কেবল বলবার, বুদ্ধি দেবার অধিকারী। গ্রামবাসীরা কেবল তাদের কাছে সব শুনবে। আমাদের শহরবাসীদের এ মনোভাব সম্পূর্ণ দূর করা উচিত।

কেন আমরাই কেবল তাদের উপর এইভাবে মাতব্বরী করব? কেন আমরা তাদের বলব না যে "তোমরা তোমাদের অবস্থার কথা ভাব এবং সেই মত পথ করে নাও"। কেন আমরা তাদের মনে আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ না করে তাদের ক্রমাগত বোঝাব "তোমরা নিজেরা কিছু করতে সমর্থ নও, সুতরাং অন্ধবিশ্বাসে আমরা যা বলব তাই তোমাদের করে যেতে হবে।" পল্লীমঙ্গল আসরের ভিতর দিয়ে শহরবাসীর এই মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। বেতার পরিচালকরা যদি সত্যই পল্লীর মঙ্গল চান তবে এই ভুল পথ তাদের ছাড়তেই হবে। পল্লীমঙ্গল আসর কি করে পল্লীবাসীদেরই আসরে পরিণত হতে পারে সেই যেন হয় পরিচালকদের একমাত্র চিন্তা। পল্লীবাসীদের ডেকে বলতে হবে, "তোমরা এস। তোমরা বল তোমাদের নিজের কথা। তোমাদের গ্রাম-জীবনের কথা। তোমাদের ইতিহাস। তোমাদের কবি তোমাদের মনোভাবই শোনাবে। তোমাদের গান গাইবে তোমাদেরই গাইয়ে। তোমাদের ভাল তোমরা কি করে করতে পারো তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, যারা গ্রামে বাস করে, তাদের তোমরা পাঠাও। তারাই এসে সে কথা সকলকে শোনাক। তার পরে তোমাদের জানা নেই এমন সব খবর জানতে বা শুনতে তোমরা সাহায্য নাও শহরের কাছ থেকে।" যদি শহরবাসীকে এ বিষয়ে কিছু করতে হয় তবে পিছন থেকেই তা করা উচিত। কিন্তু সাহায্যের নামে নিজেরাই ঠেলে এগিয়ে এসে ওদের যেন ক্ষতি না করি। আমাদের মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের পক্ষে কোনরূপ লোক দেখানো দরদ দেখিয়ে এইভাবে গ্রামবাসীদের স্বার্থের ক্ষতি করা মোটেই উচিত হচ্ছে না। সত্যিই যদি পল্লীর মঙ্গল করাই হয় পরিচালক বা বেতার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা, তবে তাদের বর্তমান চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীকে সম্পূর্ণ বদলাতে হবে।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৪

সকালে আহারের পর একদিন মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অলস অন্যমনস্কভাবে পথের লোক-চলাচল দেখছি। মেসের প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেছে, অবশিষ্ট আমিও মিনিট দশেক পরে কলেজ রওনা হব, এমন সময়ে দেখি পশ্চিম দিক থেকে বই-শ্লেট হাতে দুটি মেয়ে আসছে। হঠাৎ চেতনা যেন সজাগতর হ'য়ে উঠল; আর, মেয়ে দুটি যতক্ষণ দৃষ্টিপথে রইল, পথের বাকি সকল বস্তুই হয়ে গেল অবান্তর।

মেয়ে দুটি যুবতী নয়, কিশোরীও নয়,—নিতান্তই 'অলপ বালিকা-বয়সী'; বড়টির বয়স বছর দশেক, ছোটটির বছর আষ্টেক। কিন্তু এজন্য আক্ষেপ করবার কোনো হেতু নেই,—তখনকার দিনই ছিল ঐ বয়সের। সেকালে মেয়েদের বিবাহ হ'ত এগার-বারো বৎসর বয়সে, সুতরাং প্রাগ্‌বিবাহ কালের যা-কিছু করণীয় ছেলেদের সবই সারতে হ'ত আট-দশ বৎসর বয়সের মেয়েদের অবলম্বন ক'রে। এখনকার যুবকেরা ফ্রকপরিহিতা যে-সব মেয়েদের খুকি ব'লে সম্বোধন করে, আমাদের কালের ছেলেরা সেই বয়সের মেয়েদের মনে মনে সখী ব'লে সম্বোধন করত, আর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামে কবিতা লিখ্‌ত। তখনকার দিনের কোনো এক কবি যে 'পাতাঢাকা ফুলকে' লক্ষ্য করে লিখেছিলেন,—

> আমারো নয়ন রয়েছে এখনো
> তোমার স্বপনে মুগ্ধ!
> পাতাঢাকা ফুলে অলির মতন
> হৃদয় আমার লুব্ধ।

হলফ নিয়ে বলতে পারি, সে পাতাঢাকা ফুলের বয়স বছর বারোর অধিক কখনই ছিল না। তখনকার দিনে আমাদের অলিধর্মী মন কলিরই ভজন গাইত।

এটা নিতান্তই রুচির কথা। এক যুগে ফল ভাল লাগে, এক যুগে ফুল; এক যুগে ফুল ভালো লাগে, আর এক যুগে কুঁড়ি। আমাদের যুগ ছিল কলিকার যুগ; আমাদের হৃদয়বৃত্তি, আমাদের কাব্যরসোৎসাহ আলোড়িত হ'ত কলিকাকে কেন্দ্র ক'রে। ফুলকে কেন্দ্র ক'রে আলোড়িত হবার সুযোগ আমাদের কালে দুর্লভ ছিল। কলি যখন ফুল হ'য়ে ফুটত, তখন আর তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করা যেত না,—বড় জোর বলা চল্‌ত,—

> যে আমার যৌবনের ছিল সহচরী,
> আশার কনকরেখা, হৃদয়ের বাণী,
> পরস্ত্রী সে কাছে আসে মাতৃরূপ ধরি'
> সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখি, সরেনাক' বাণী!

নিশ্চেতন মনে, বোধ করি কতকটা চেতন মনেও, একটা আগ্রহ বাসা বেঁধেছিল। আহারের পর মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তিন-চার দিন পরে আবার একদিন মেয়েদুটিকে দেখতে পেলাম। একদিন বৈকালের দিকে দেখি মেয়েদুটি পূর্বদিক হ'তে পশ্চিম দিকে চলেছে,—সম্ভবতঃ স্কুল থেকে বাড়ির দিকে। কেমন যেন একটা নেশা ধ'রে গেছে। সুযোগ পেলেই অপেক্ষা ক'রে থাকি; কখনো দেখতে পাই, কখনো পাইনে।

একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম সুরেনদাদার কাছে। সেদিন, কি কারণে মনে নেই, সুরেনদাদা বাড়ি ছিলেন। মেয়েদুটি যাচ্ছে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কার্য চালাচ্ছি, এমন সময়ে সুরেনদাদা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "কি দেখছিস?"

বললাম, "পথ।"

"শুধু পথ?—আর কিছু নয়?"

হেসে বললাম, "আরো কিছু।"

ধরা এবং ধরা-পড়া দুইই হ'য়ে গেল। সুরেনদাদা বললেন, "বেশ দেখতে, না?"

দুটি কারণে স্বীকার করতে হ'ল। প্রথমতঃ, বেশ দেখতে না হ'লে, আমার চক্ষু দুটির প্রতি গুরুতর দোষারোপ করতে হয়, মেয়েদুটিকে অত আগ্রহের সহিত দেখার সর্বপ্রধান কৈফিয়ৎ থেকেই তা হ'লে নিজেকে বঞ্চিত করি; দ্বিতীয়তঃ, বেশ নয় বললে সুরেনদাদাই বা সে কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

সুরেনদাদা বললেন, "বোধহয় দুই বোন।"

বললাম, "আমার ত' বোধহয় ও মনে হয় না। দুটির মধ্যে নানান্ প্রভেদকে জড়িয়ে এমন এক অভেদ আছে, যা একমাত্র দুই বোনের মধ্যেই থাকা সম্ভব।"

সুরেনদাদা আমার বিচার সমর্থন করলেন।

এ ঘটনার পর আরও কয়েকদিন মেয়েদুটিকে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

একটা কথা ভাবছি। আমার এই কাহিনী শুনে পাঠকগণ, বিশেষতঃ সুরুচিসম্পন্না পাঠিকাগণ একটু অস্বস্তি বোধ করছেন না ত? এমন কথা তাঁরা ভাবছেন না ত যে, মেসের বারান্দা থেকে স্কুলপথগামিনী দুটি নিরীহ বালিকাকে বারংবার দেখার মধ্যে কি এমন সংগত আচরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, আর সেই কথা এতদিন পরে এমন ফলাও ক'রে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে কি এমন বাহাদুরি প্রকাশ করাই বা হচ্ছে?—এমন কথা তাঁরা যদি সত্য সত্যই ভাবেন তা হ'লে আমার বক্তব্য হবে, বাহাদুরি প্রকাশ করা কিছুই হচ্ছে না,—যে মানুষ সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তার দেহের চামড়াই শুধু আলগা হয় না, মন, মুখ এবং সংগে সংগে কলম পর্যন্ত আলগা হয়ে যায়। আর আচরণের বৈধতা সম্বন্ধে বলতে পারি, এ বিষয়ে আমি যোগ্যতম ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমার আচরণের বৈধতার সপক্ষে সার্টিফিকেটই শুধু দেননি,—সকল কথা শুনে বেশ একটু পুলকিতও বোধ করেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, এ বিষয়ে একটু নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা হ'লে মন্দ হয় না। কথাটার একটা যুক্তিমূলক মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের পক্ষে অপর এক পুরুষের প্রতিভাব্যঞ্জক বীরত্বদীপ্ত সুশ্রী মুখের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করে খুশি হওয়া যদি অবৈধ না হয়, তা হ'লে সেই পুরুষের পক্ষে কোনো সুন্দরী তরুণীর মুখমণ্ডলে বালার্কের আভা এবং নীলপদ্মদ্বয়ের লীলা দেখে খুশি হয়ে একাধিকবার দৃষ্টিপাত করলে অবৈধ আচরণ হবে কেন? আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমি বলতে বাধ্য হব, অবৈধ হবে না। অবৈধ হবে বলে মনে করলে, সে মনে করার মধ্যে এমন এক দুর্বল অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়, যা প্রত্যেক নীতিবোধসম্পন্ন ভদ্রব্যক্তির পক্ষে লজ্জার কারণ হওয়া উচিত। শরৎ প্রভাতের শিশিরভেজা গাছের প্রথম স্থলপদ্মের প্রতি পথিকের বারংবার দৃষ্টিপাত যদি দোষের না হয়, সুন্দরী তরুণীর সুঠাম দেহবল্লরীর মুখপদ্মের প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাতই বা দোষের হবে কেন? দোষ যদি একান্তই কারো হয় ত' একমাত্র সেই বিধাতারই হবে, যিনি মানুষের চক্ষে ভাল বস্তুকে ভাল লাগবার শক্তি মুক্ত হস্তে দান করেছেন।

এই প্রসংগ নিয়ে কয়েকবারই আমার সুন্দরী তরুণীদের সহিত রীতিমত বচসা হয়েছে এবং প্রতিবারই আমি উপরিউক্ত যুক্তির

সাহায্যে তাঁদের পরাস্ত করেছি। যখনকার কথা বলছি সে সময়ে আমাকেও তরুণ বলা চলত। অবশ্য বচসা যা-কিছু ঘটেছিল বাস্তব-জীবনে তার একটিও ঘটেনি; প্রত্যেকটি ঘটেছিল আমার আন্তরলোকে। কিন্তু আন্তর-লোক বলে উপেক্ষা করবার কোনও হেতু নেই। সে লোকে যা কিছু বিচার অথবা সিদ্ধান্ত হয়, সবই ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে হয়; সুতরাং সে লোকের জয়-পরাজয়ের ভিত্তিও খুব দৃঢ়।

বচসা আন্তরলোকে হলেও তার সূত্রপাত কিন্তু প্রতিবারই হোত বহির্জীবনে। পথ চলতে চলতে হয়ত কোনো মৃগনয়নার সহিত বারকয়েক দৃষ্টিবিনিময় ঘটে গেল; অমনি তিনি আমার আন্তরলোকে প্রবেশ করে ভ্রূভঙ্গ সহকারে আমাকে তিরস্কার করলেন, "ভারি অসভ্য মানুষ তো আপনি!"

উত্তর দিলাম, "প্রমাণ না পেলে স্বীকার করব না।"

"বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন কেন?"

বললাম, "কারণ আছে।"

"কি কারণ, বলতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়িতে আয়না আছে?"

"আছে।"

"বাড়ি ফিরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবেন, আয়নার মধ্যে কারণ খুঁজে পাবেন। ঝগড়া যদি একান্তই করতে হয়, আমার সঙ্গে না করে সেই বিধাতাপুরুষের সঙ্গে করবেন, যিনি আপনাকে এমন করে সৃষ্টি করেননি, যাতে একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দ্বিতীয়বার করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

প্রতিবারই এই, অথবা এইরূপ যুক্তি দেখানোর পর তরুণীরা নিরুত্তরে আমার আন্তরলোক পরিত্যাগ করেছিলেন, যুক্তির দ্বারা কতকটা খুশি হয়েই বোধহয়।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুটি সাক্ষী তলব করবারও অভিপ্রায় করেছি। দুজনেই আমাদের দেশের দুই মহাকবি। একজন আধুনিক কালের, অপরে প্রাচীন যুগের। বলা বাহুল্য, একজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপর জন কালিদাস।

যদি আমার ধারণা ভুল হয় তা হ'লে নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থী হব, কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো পুস্তকে, সম্ভবতঃ ইয়োরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে লিখেছিলেন, 'আমার অভিভাবকগণ যাই মনে করুন না কেন, সুন্দর মুখ আমার ভাল লাগে, সে কথা স্বীকার করবই।' যদি আমার ভুলই হয়ে থাকে, অর্থাৎ এমন ধরণের কথা যদি তিনি নাই লিখে থাকেন, তা হ'লেও আমার সবিনয় নিবেদন হবে, এ সত্য এমন করে প্রকাশ করবার শক্তি ও সৎসাহসের অভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না।

আমার দ্বিতীয় সাক্ষী, কবি কালিদাস, সুন্দর মুখ দেখে শুধু খুশি হয়েই নিরস্ত হননি, তদুপলক্ষে কাব্য-রচনাও করেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে সমস্ত উজ্জয়িনীর পথ দিয়ে তিনি রাজসভায় যোগদান করবার অভিপ্রায়ে চলেছেন, এমন সময় সহসা সামনে দেখা হয়ে গেল এক নীলনয়না কিশোরীর সঙ্গে।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, "এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

ভয়োদ্বিগ্ন চকিত হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

কালিদাস বললেন,

কুসুমে কুসুমোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে,
বালে, তব মুখাম্ভোজে কথম্ ইন্দিবরদ্বয়ম্।

[কুসুমে পরে কুসুম ফোটা সম্ভব তা নয়,
তোমার মুখপদ্মে কেন ইন্দিবরদ্বয়?]

ফুলের ওপর ফুল ফোটে, এমন কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। কিন্তু বালিকে, তোমার রক্তবর্ণ মুখপদ্মের ওপর দুটি নেত্র-নীলপদ্ম ফুটল কি করে?

এই অপরিমেয় কাব্যপ্রশস্তির প্রসাদে হর্ষে ও লজ্জায় আরক্ত হয়ে মেয়েটি পাশ কাটিয়ে পালাবার উপক্রম করছিল, এমন সময় কবি কালিদাস বললেন,

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে, হরিণায়তলোচনে,
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।

[পুনঃ ফিরে চাও বালা, অয়ি মৃগলোচনে,
শুনেছি সক্ষম শুধু গরলের মোচনে।]

হে হরিণনয়না বালিকা, একবার ফিরে চাও। দৃষ্টিদান করে তুমি আমাকে বিষে জর্জর

রেছ, আর একবার দৃষ্টিদান করলে বেঁচে উঠতেও পারি; কারণ, শোনা যায় বিষই বিষের ঔষধ।

এই কাতর প্রার্থনায় সদয় হয়ে হরিণ-নয়না পুনরায় দৃষ্টি দান করেছিলেন কি না, বর্তমান ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর। যে পরিমাণ সাক্ষী-সাবুদ আমি উপস্থাপিত করলাম, তাতে আমার মামলায় আমি ডিক্রি পেতে পারি বলে মনে করি।

অপর পক্ষ অবশ্য বলতে পারেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের মুখে দৃষ্টিপাত করেন না; একান্ত প্রয়োজন হলে করেন পায়ে। আমার মনে হয়, এরূপ আচরণের মধ্যে সবলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনার ফলে সাধু-সন্ন্যাসীরা অবগত আছেন যে, তৎকালীন বিরাট মুনিঋষিগণের পক্ষেও স্ত্রীলোকের মুখ নিরাপদ বস্তু ছিল না। সুন্দরী রমণীর মুখ চোখে পড়া, আর সংগে সংগে যোগভংগ ও পতন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রমুখ বড় বড় ঋষিগণ এ বিষয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছেন যে, একটা কথাই দাঁড়িয়ে গেছে—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সেইজন্য পরবর্তীকালের সতর্ক সাধু-সন্ন্যাসিগণ রমণীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণই করেন না। একান্ত প্রয়োজন হলে মুখপদ্ম থেকে দূরতম স্থান পাদপদ্মে দৃষ্টি-পাত করেন। আমরা সাংসারিক প্রাণী, আমাদের যোগও নেই, যোগভংগের উদ্বেগও নেই। রমণীর মুখপদ্ম দেখে যদিই বা আমরা ঘায়েল হই, তথাপি লেখাপড়া-আপিস-আদালতের সংগে যোগরক্ষা করেও চলি। সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসিগণের নজির আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

দেখতে দেখতে আমার দিন কুড়ি-বাইশের স্বল্পায়ু মেস-জীবন শেষ হ'য়ে এল। তর্পণ করতাম, সেইজন্য সংগে পাঁজি ছিল। দুই-একদিন এদিক-ওদিক দেখে একটা দিন পাওয়া গেল যেদিন তিথি, নক্ষত্র, যোগিনী প্রভৃতি সকলেই একযোগে বলছে, সাবধান! বেরিয়েছ, কি মরেছ! তখন আমাদের সত্যসন্ধিৎসু মন সকল প্রকার মিথ্যা সংস্কারের পাশ ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার জন্য ব্যগ্র। ঠিক করলাম ঐদিনেই যাত্রা আরম্ভ ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটা শাখার সত্যাসত্যের বিষয়ে পরীক্ষা নিতে হবে;—তা'তে যদি জীবনান্ত হয়, সেও ভাল।

যথা দিনে ঠাকুর-চাকরকে বসশিশ দিয়ে খুশি করে, যে-সকল বন্ধু-বান্ধব তখনও বাড়ি যান নি তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে অপরাহ্ন-কালে সুরেনদাদা, গিরীন ও আমি, আমরা তিন ভাই, একখানা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে হাওড়া স্টেশনের অভিমুখে রওনা হলাম।

যে-রকম উৎকট অশুভ দিন, হাওড়া স্টেশন ত বহু দূরের কথা, হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছেই ঘোড়ার উচিত ছিল মুখ থুবড়ে প'ড়ে গাড়ি উল্টে দিয়ে আমাদের আহত ক'রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা। তৎ-পরিবর্তে দেবী যোগিনী আমাদের সম্মুখে অবস্থান ক'রে পথ দেখিয়ে চল্‌লেন, এবং অশুভ তিথি ও প্রতিকূল নক্ষত্র আমাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন ও রাত্রি যাতে সুপ্তিময়ী হয় তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

কাজে কাজেই পরদিন সকালে আমরা তিনজনে সুস্থ শরীরে ও বহাল তবিয়তে ভাগলপুরে পৌঁছে গৃহে উপনীত হলাম।

আত্মীয়স্বজনের পরিপূর্ণ সমাবেশে গৃহ তখন আনন্দ উচ্ছলিত হচ্ছে।

১৫

বছর দেড়েক পরের কথা।

তখন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। লোকের মুখে মুখে শুনলাম আমার জীবনেও না-কি বসন্ত জাগ্রত হবার উপক্রম করেছে। কেউ তার পাপিয়ার তান শুনতে পাচ্ছে, কেউ অশোক গুচ্ছের লাল পতাকার সঞ্চালন দেখছে, কেউ বা মলয় হিল্লোলের শীতল স্পর্শ অনুভব করছে। আমি অনুভব করতে লাগলাম বসন্তকালের সেই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, যা ধীরে ধীরে নিদাঘের প্রদাহের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘাম ঝরাতে থাকে। জীবন চলছিল এ পর্যন্ত বেশ একটা সহজ যতির ছন্দে, হঠাৎ তার মধ্যে এ কি যতিভংগের উৎপাত! চিরদিনের চার-চার-তিন-তিনের দুলকি চাল থেকে তিন-দুই চার পাঁচের কদম চালে প'ড়ে হোঁচট্ খেতে খেতে মারা যেতে হবে দেখছি! না,! ও কার্য কিছুতেই করা হবে না। বিবাহ এখন মাথায় থাক্।

বেঁকে বসলাম! কিন্তু সে বাঁকা সরল রেখার এত কাছ-বরাবর চলতে লাগল যে, প্রতিপক্ষ বোধহয় সেটাকে 'মুখের লজ্জা' বিবেচনা ক'রে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কালো মেঘের ধারে ধারে যেমন সূর্য কিরণের রূপালি আভা প্রকাশ পায়, আমার 'না'-এর পাশে-পাশে তেমনি তাঁরা 'বহুৎ আচ্ছা'র সোনালি প্রভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বউদিদি বল্‌লেন, "তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে উপীন।"

বললাম, "ভারি আশ্চর্য ফুলত' বউদি, যা গাছ জন্মাবার আগেই ফোটে!"

বউদিদি বললেন, "হ্যাঁ, এ আশ্চর্য ফুল গাছে ফোটে না, অদৃষ্টে ফোটে।"

আজকাল মেয়েদেরও বিয়ের ফুল ফোটে না;—অর্থাৎ ফুটেও অনেক সময়ে বিয়ে হয় না,—আবার না ফুটেও অনেক সময়ে হয়। আমাদের সময়ে কিন্তু ছেলেদেরও বিয়ের ফুল ফুট্‌ত। তখনকার দিনের ছেলেরা আজকাল-কার মেয়েদের চেয়েও অনেক বেশী মেয়েলি ছিল। তারা প্রথমে কন্যাপক্ষের কাছে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ত, তারপর মুখবুজে অভিভাবকদের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করত। তাই বিয়ের রাত্রে তাদের দেখে বাসর-ঘরের মেয়েরা বলত, বর, না চোর।

আজকাল মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যদি মেয়েকে প্রশ্ন করে, আমরা তাদের বর্বর ব'লে মনে করি। আমাদের কালে কিন্তু অনেক সময়ে পাত্রীপক্ষ পাত্র দেখ্‌তে এসে পাত্রকে প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত করত। পরীক্ষার ফলাফলের উদ্বেগে শুধু পাত্রেরই নয়, পাত্রের অভিভাবকদেরও, হৃৎকম্প হ'তে থাক্‌ত! কোনো রকমে উৎরোতে পারলে হয়! বল্‌তে লজ্জা এবং কৌতুক দুই-ই অনুভব করছি, একবার আমিও ঐরূপ পরীক্ষার মধ্যে পড়বার উপক্রম ক'রেছিলাম। তখন আমাকে অনূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঘরে বাইরে উৎসাহশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা চলেছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় একদিন আমাকে বললেন, "শুনেছি, তোমাকে নাকি রায়বাহাদুর অমুক দেখ্‌তে আসবে?"

বললাম, 'সেই রকম ত' আমিও শুনেছি।"

"সাবধান! ও ভদ্রলোকের বড্ড কোয়েস্‌চেন্ জিজ্ঞাসা করবার অভ্যেস আছে। বাড়ি গিয়ে নামতা মুখস্থ করতে আরম্ভ ক'রে দাও।"

শুনে আমি ত' নিরপরাধ সৌরেনের উপরই খাপ্পা হ'য়ে উঠলাম, "চালাকি নাকি! কোয়েস্‌চেন করবে কি রকম?"

হাসতে হাসতে সৌরেন বললে, "ভারি কোয়েস্‌চেন করা রোগ ঐ ভদ্রলোকের।"

বাড়ি এসেই আমার ভগ্নীপতি শরৎদাদার সংগে বোঝাপড়া করলাম। তিনিই এ বিবাহ প্রস্তাবে আমাদের দিকে প্রধান উৎসাহী। সৌরেনের কাছে যা শুনেছিলাম ব্যক্ত ক'রে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললাম, "বাড়ি ব'সে অবশ্য কথার দ্বারা অভদ্রতা প্রকাশ করব না; কিন্তু পরীক্ষার মতো কোনো কিছুর সূত্রপাত দেখলেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্থানত্যাগ করব! পরীক্ষা দিয়ে বি-এ পাশ করা যায়, বিয়ে করা চলে না।"

তখনকার যুগে আমাদের আত্মমর্যাদার চেতনা ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে অবলম্বন ক'রে সব দিকে সবলে জাগ্রত হ'তে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এ হেন অপমান কিছুতেই সহ্য করা হবে না!

দিন দুই পরে আমার ডাক পড়ল আমাদের বৈঠকখানায়। উপস্থিত হ'য়ে দেখি, একটা কোনো বিষয় নিয়ে রায়বাহাদুর দাদার সহিত উৎসাহ ভরে আলোচনা করছেন।

আমি প্রবেশ করতেই আলোচনা পরিত্যাগ ক'রে আমার প্রতি মনোযোগী হলেন।

যুক্ত করে ঈষৎ নতমস্তকে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে উপবেশন করলাম।

ক্ষণকাল তীক্ষ্ম নেত্রে আপাদমস্তক আমাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে রায়বাহাদুর বললেন, "নাম কি তোমার?"

বললাম, "উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"নামের আগে শ্রী দাওনা?"

বললাম, "নিজের নামে দিইনে, অপরের নামে দিই।"

"প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়?"

বাহুল্য প্রশ্ন। জানেন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, তবু যাই হোক, সাধারণ আলাপ-আলোচনার মামুলি প্রশ্ন, আপত্তি করবার কারণ নেই। বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে কে প্রোফেসার?"

কয়েকজন অধ্যাপকের নাম করলাম।

"সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?"

"না।"

"গায়ত্রী মনে আছে?"

"আছে।"

"সূর্যের অষ্টম নাম কি, বলতে পার?"

বুঝতে পারছি, প্রশ্নগুলি ক্রমশঃ সাধারণ আলাপ-আলোচনার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আপত্তিকর এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তথাপি এ প্রশ্নটাও সাধারণ আলাপেরই প্রশ্ন মনে করে বললাম, "না, বলতে পারিনে।"

ভদ্রলোক এবার একটু বিরাম গ্রহণ করলেন,—বোধহয় উপক্রমণিকা ভাগ শেষ ক'রে মূল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হবার চেষ্টায়। এক মুহূর্ত মনে কি ভেবে নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "আচ্ছা What is the goal of human life—এই বিষয়ে তোমার মন্তব্য ইংরিজিতে দু-চার মিনিট বল দেখি।"

প্রশ্ন শুনে এবং আমার মুখে বিদ্রোহের রক্ত-পতাকা দর্শন ক'রে শরৎদাদার বুঝতে বাকি ছিল না সংকটের কাল উপস্থিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পূর্বেই তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "ও-সব কথা অনুগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন না। ও বলেছে বিয়ে করবার জন্যে পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা যা দেবার ইউনিভার্সিটিতেই দেবে।"

এ রকম সবল প্রতিবাদ ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতায় বোধ করি এই প্রথম। অভিমানের গাঢ় ছায়া মুখমণ্ডলে ঘনিয়ে এল। ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "না, না, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি ওকথা জিজ্ঞাসা করিনি,—এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি, তাই জানতেই চাইছিলাম। ইউনিভার্সিটি যাদের ছাপ মেরে দিচ্ছে তাদের পরীক্ষা করার কোনও মানে হয় না।"

দু-চার মিনিট গল্প ক'রে, শীঘ্রই আর একদিন আসবার কথা জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় গ্রহণ করলেন।

যোগেন্দ্রনাথ দত্ত নামে হাইকোর্টের এক উকিল সে সময়ে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দাদার জুনিয়ার এবং সেই সূত্রে প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। রায়বাহাদুর প্রস্থান করবামাত্র তিনি আমার প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন।

"বে-বে-এশ্ করেছ! যদি উত্তর দিতে তোমাকে ফুল্-ফুল্-উল্ বলতাম!"

স্মিতমুখে দাদা বললেন, "ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দিলেন, কিন্তু ইংরাজিতে কেন জানতে চেয়েছিলেন, সেই আসল কথারই কৈফিয়ৎ দিলেন না।"

খুশি হ'য়ে আমি কক্ষ পরিত্যাগ করলাম।

যে ঘটনার কথা বললাম, সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তনের দিক দিয়ে, খুব বেশি দিনের কথা নয়; কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে, রায়বাহাদুর ত' দূরের কথা, কোনো রাজাবাহাদুরও বোধহয় আজকাল একজন মেয়েকেও এমন প্রশ্ন করতে সাহস পান না।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে ঘটকরূপে আমার জীবনে আবির্ভূত হলেন বন্ধুবর স্বয়ং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পাত্রীটি কলিকাতা ঝামাপুকুরের মেয়ে। 'বন্ধু ঘটকের প্রতি' নাম দিয়ে কবিতা রচিত ক'রে ছন্দোবদ্ধ প্রতিবাদ করলাম। প্রতিবাদের আন্তরিকার বিষয়ে আমার নিজেরই খুব বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ একটা না করলেও শোভন হয় না, নিজেকে নিতান্তই সুলভ এবং লঘু প্রতিপন্ন করা হয়। যতদূর মনে পড়ে কবিতাটি চতুর্দশপদী সনেট জাতীয় ছিল। তার মাঝখানের গোটা চারেক লাইন মনে পড়ছে,—

আপন কৌতুক লয়ে আপনার মনে
হারে রে অবোধ, তুমি করিতেছ খেলা!
এ ধারে যে মোর চারু নিকুঞ্জ-কাননে
ধড়াধড় পড়িতেছে বড় বড় ঢেলা!

প্রকৃতপক্ষে নিকুঞ্জ-কাননে খুব বড় বড় ঢেলা যে পড়েনি, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে; ও কথার পনের আনাই বোধ হয় বিনয়।

প্রতিবাদের শেষ দুই ছত্রও মনে আছে,—

এই যে ভবানীপুর, অতি চমৎকার!
ঝামাপুকুরের দিকে যেয়োনা ক' আর।

কিন্তু এই দুটি লাইন দিয়ে সনেট যখন শেষ করছিলাম, তখন মাথার উপরে বিধাতা-পুরুষ হাসছিলেন। 'যেয়োনা ক'আর' বললেই যদি হোত!

সৌরেনের ঘটকালি সফল হ'ল না; প্রতিবন্ধক হ'ল মর্তধামের কেউ নয়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র।

কয়েক মাস পরে কিন্তু পাত্রী পক্ষের গৃহ থেকে পাকা দেখা সেরে এসে সুরেনদাদা আমাকে বললেন, "ওরে, কোন্ বাড়িতে তোর বিয়ে হচ্ছে জানিস?"

বললাম, "কোন্ বাড়িতে?"

ঝামাপুকুরের মেসে থাকতে তুই যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতিস, সেই বাড়িতে। আর, কার সঙ্গে হচ্ছে জানিস?"

"কার সঙ্গে?"

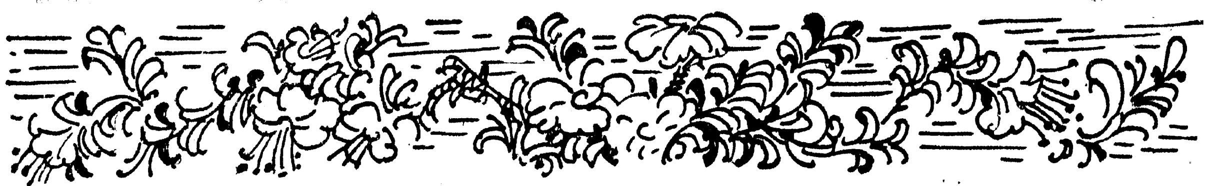
"মেসের বারান্দা থেকে যে-দুটি স্কুলের মেয়েকে দেখতিস, তাদের বড়টির সঙ্গে।"

আশ্চর্য! এমন যোগাযোগ? যে গাছ, তারই ফুল! লোকে যে বলে মৎস্য যোগ শুভ যোগ সে কথা, তা হ'লে, নিতান্ত মিথ্যা নয়!

মেসে থাকতে মৎস্যের মহিমা একটুও বোঝা যায় নি।

কয়েক দিন পরে ঝামাপুকুর লেনের সেই গানের আসরে গিয়ে যখন আসন গ্রহণ করলাম, তখন সত্যই মনে হল, Truth is সময়ে সময়ে stranger than fiction!

(ক্রমশ)



অনুবাদ সাহিত্য

উত্তরাধিকার

ভার্জিনিয়া উল্ফ্

সিসি মিলারের জন্যে'। স্ত্রীর ড্রইংরুমের টেবিলের উপর জড় করা আংটি আর ব্রোচের গাদা থেকে মুক্তোর ব্রোচটি তুলে গিলবার্ট ক্ল্যান্ডন তাতে খোদাই করা শব্দটি পড়ল,— 'সিসি মিলারকে স্নেহোপহার'।

সেক্রেটারি সিসি মিলারকে মনে রাখা এ কেবল এ্যাঞ্জেলার মত মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। এ তারই উপযুক্ত। তবুও গিলবার্ট ভাবল, এটা আশ্চর্য। এই প্রত্যেকটি জিনিষ নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখা, প্রত্যেকটি বন্ধুর জন্যেই কিছু-না কিছু উপহার রেখে যাওয়া। যেন নিজের মৃত্যুর কথা সে আগেই জানতে পেরেছিল। শুনেছিল তার পদধ্বনি। অথচ দু'সপ্তাহ আগে এক সকালে এ্যাঞ্জেলা যখন বাড়ী থেকে বেরোল তখন সে সুস্থ। সম্পূর্ণ সুস্থ। পিকাডিলির মোড় পেরোবার সময়, যারপরে গাড়ী চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়, তখনও গিলবার্ট সিসি মিলারের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে গিলবার্ট। তাঁর মনে হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে এতদিন কাটাবার পর, এ সহানুভূতিটুকু প্রাপ্য সিসি মিলারের।

হ্যাঁ, গিলবার্ট বসে বসে ভাবছিল, এ্যাঞ্জেলার এই সব জিনিষ গুছিয়ে রেখে যাওয়া—এ আশ্চর্য। প্রত্যেকটি বন্ধুর জন্যেই তাঁর প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু-না-কিছু উপহার। প্রতিটি হার, আংটি আর চীনে বাক্সের ওপরেই কার না কার নাম লেখা। এদের প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গেই গিলবার্ট আর এ্যাঞ্জেলার যুগ্ম-স্মৃতির ডোর জড়ান। এই যে—এই এ্যানামেলের ডলফিনটা—সেটা কিনে দিয়েছিল এ্যাঞ্জেলাকে। ভেনিসের এক গলিতে এটা এ্যাঞ্জেলার নজরে পড়েছিল। এ্যাঞ্জেলার সেই খুশিয়াল কণ্ঠ আজও মনে পড়ে। কেবলমাত্র তাঁর জন্যেই বিশেষ কিছু রেখে যায়নি এ্যাঞ্জেলা। অবশ্য তাঁর ডায়েরী বাদ দিলে। সবুজ চামড়ায় বাঁধাই পনের খানা ছোট ছোট খাতা। তাঁর পিছনে, এ্যাঞ্জেলার লিখবার টেবিলের ওপর সাজান। বিয়ের পর থেকেই নিয়মিত ডায়েরী লিখত এ্যাঞ্জেলা। এই ডায়েরীকে উপলক্ষ করে ছোটখাট অনেক কলহও হয়েছে তাঁদের মধ্যে। এ্যাঞ্জেলা হয়তো ডায়েরী লিখছে এমন সময় ঘরে এলো গিলবার্ট। অমনি তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করল এ্যাঞ্জেলা। 'না-না—এখন নয়—আগে আমার মৃত্যু হোক।' আজ সত্যিই সেই ডায়েরী রেখে গেছে এ্যাঞ্জেলা। তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে। এটিই একমাত্র জিনিষ যা ছিল তাদের যৌথ অধিকারের বাইরে। এটি এ্যাঞ্জেলার নিজস্ব। একেবারে ব্যক্তিগত। কিন্তু গিলবার্টের বিশ্বাস ছিল এ্যাঞ্জেলার আগেই সে মরবে। যদি আর এক মুহূর্ত—মাত্র এক মুহূর্ত অপেক্ষা করত এ্যাঞ্জেলা, একবার ভেবে দেখত কী সে করতে যাচ্ছে, তাহলে এভাবে তাঁকে মরতে হত না। কিন্তু এ্যাঞ্জেলা দৃঢ় পায়ে বাঁক ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। জেরার সময় এই কথাই বলেছিল ড্রাইভার। গাড়ী থামাতে চেষ্টা করবার কোন অবকাশই তাকে দেয়নি এ্যাঞ্জেলা।

হলের মধ্যে গোলমালে গিলবার্টের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'মিস মিলার এসেছেন', ঝি জানাল।

মিস মিলার ঘরে এলো। এর আগে ওকে কখনও একা দ্যাখেনি গিলবার্ট। সাশ্রুনয়নে তো নয়ই। সিসিকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তাঁর কাছে এ্যাঞ্জেলা ছিল মনিবের চেয়েও অনেক বেশী। তাঁর বন্ধু।

সিসি মিলারের দিকে একখানা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বসতে বলল গিলবার্ট। তার মনে হলো ওদের মত আর দশটি মেয়ের থেকে এতটুকুও তফাৎ নয় সিসি মিলার। এমনি হাজারো সিসি মিলারকে দেখতে পাওয়া যাবে রাস্তায়। ছোট্ট, হাল্কা শরীরের মেয়েটি। কালো এ্যাটাচি কেস হাতে। কিন্তু এ্যাঞ্জেলার সহানুভূতিপূর্ণ চোখ ওরই মধ্যে সব রকমের গুণ খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর মতে সিসি ছিল বিবেচক, সংযতবাক্ বিশ্বাসী। সব কথাই খুলে বলা চলে তাঁর কাছে।

মিস্ মিলার প্রথমে কথা বলতে পারল না। বসে বসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তারপরে চেষ্টা করল কথা বলতে।

'—মাফ করবেন মিঃ ক্ল্যান্ডন', সিসি বলল।

গিলবার্ট একটু গুঞ্জন করল। এতো খুবই স্বাভাবিক। তাঁর স্ত্রী যে সিসি মিলারের কাছে কতখানি ছিল তা বোঝে গিলবার্ট।

'এখানে যে আমি কত সুখে ছিলাম'—চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে বলল সিসি। গিলবার্টের পিছনে এ্যাঞ্জেলার লিখবার টেবিলের ওপর গিয়ে তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো। এখানে তাঁরা কাজ করত। সে আর এ্যাঞ্জেলা। একজন নামজাদা রাজনীতিকের স্ত্রীর ওপর যে দায়িত্বের ভার চাপে তা পালন করতে হতো এ্যাঞ্জেলাকে। গিলবার্টের সাফল্যের পিছনে এ্যাঞ্জেলার দান ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। প্রায়ই দেখেছে গিলবার্ট এ্যাঞ্জেলা আর সিসি মিলার বসে আছে টেবিলের পাশে। সিসির সামনে টাইপরাইটার। এ্যাঞ্জেলার ডিক্টেশন টাইপ করছে সিসি। এখন একমাত্র করণীয় হচ্ছে সিসি মিলারের জন্যে যে ব্রোচটা রেখে গেছে এ্যাঞ্জেলা সেটি তাকে দিয়ে দেওয়া। সিসি মিলারের পক্ষে এধরণের উপহার যেন একটু অনুপযোগী। এর চেয়ে কিছু টাকা অথবা টাইপরাইটার পেলেই বোধ হয় ওর সুবিধে হতো। কিন্তু এ্যাঞ্জেলা রেখে গেছে তাঁর ব্রোচ। আর তাতে লেখা 'সিসি মিলারকে স্নেহোপহার'।

ব্রোচটি সিসি মিলারের হাতে দিল গিলবার্ট আর সেই সঙ্গে ছোট্ট একটি বক্তৃতা, এতক্ষণ মনে মনে সে যা তৈরী করছিল। যার সারমর্ম হচ্ছে, গিলবার্ট জানে যে এই উপহারের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করবেন মিস মিলার। তাঁর স্ত্রী এটি প্রায়ই পরতেন।

হয়তো এর মধ্যে সিসি মিলারও দু'চারটে কথা গুছিয়ে নিয়েছিল। ব্রোচটি হাতে নিয়ে বলল, ব্রোচটিকে সে অমূল্য সম্পদরূপেই রক্ষা করবে।

গিলবার্টের মনে হলো, হয়তো বা সিসির এমন পোষাকও আছে যার সঙ্গে এ্যাঞ্জেলার মুক্তোর ব্রোচ মোটেই বেমানান হবে না। ওর পরণে এখন ছোট কালো কোট আর স্কার্ট। তাঁর পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারপরেই গিলবার্টের মনে হলো, তাইতো এতো শোকের পোষাক। ওর জীবনেওতো দুঃখ এসেছে। এ্যাঞ্জেলার মৃত্যুর দু' এক সপ্তাহ আগে সিসির এক ভাই-এর মৃত্যু হয়েছে। এই ভাইটি ছিল ওর অত্যন্ত আদরের। গিলবার্টের যতদূর মনে পড়ছে তাঁরও এমনই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। সেইরকমই কী যেন বলেছিল এ্যাঞ্জেলা। এ্যাঞ্জেলার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় এতে বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

ইতোমধ্যে সিসি মিলার উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে দস্তানা পরছিল। সে বুঝতে পারছিল এখানে থাকা আর তার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। কিন্তু গিলবার্টের মনে হলো সিসির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দু'চার কথা তার জিজ্ঞাসা করা উচিত। এর পরে কী করবেন মিস মিলার। গিলবার্ট কি তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারে?

সিসি তাকিয়েছিল টেবিলের ওপর রাখা টাইপরাইটারটার দিকে। যার পাশে রয়েছে এ্যাঞ্জেলার ডায়েরী। অতীত স্মৃতির সমুদ্রে

তখন ডুবে আছে সিসি। গিলবার্টের কথা যেন তাঁর কানেই পৌঁছল না। গিলবার্ট আবার তাঁর প্রশ্নের পুনরুক্তি করল, 'আপনি এখন কী করবেন ঠিক করেছেন মিস মিলার?'

'আমি কী করব? সে ঠিক আছে মিঃ ক্ল্যান্ডন। আপনি দয়া করে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

গিলবার্টের মনে হলো একথার মানে হচ্ছে ওর কোন আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে, গিলবার্ট ভাবল, পরে পত্রালাপ করাই বিবেচনার কাজ হবে। এখনকার মত ওর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে গিলবার্ট বলল, 'মনে রাখবেন মিস্ মিলার। যদি কোনভাবে আপনার কোন উপকার করতে পারি তাহলে আনন্দিত হব।'

তারপর গিলবার্ট দরজা খুলে দিল। চৌকাঠে পা দিয়ে, যেন হঠাৎ কোন কথা মনে পড়েছে, মিস মিলার ফিরে দাঁড়াল।

'মিঃ ক্ল্যান্ডন', সিসি মিলার এই প্রথম স্থির দৃষ্টিতে তাকাল গিলবার্টের দিকে; আর এই প্রথম তাঁর সহানুভূতিশীল অথচ তীক্ষ্ম দৃষ্টির ভাষা গিলবার্টকে হতচকিত করল।

'যদি কখনও', সিসি বলে চলল, 'যদি কখনও কোনভাবে আপনার কোন উপকার করতে পারি, মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীর খাতিরে, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।'

সিসি মিলার বেরিয়ে গেল। তাঁর এই কথা আর তাঁর দৃষ্টি আশাতীত। যেন সে বিশ্বাস করে, সে আশা রাখে যে, তাঁকে গিলবার্টের প্রয়োজন হবে। চেয়ারে ফিরে এসে একটি আশ্চর্য, অদ্ভুত কথা মনে এলো গিলবার্টের। এও কি সম্ভব যে, এত বছর ধরে, গিলবার্ট যখন তাঁর দিকে কোন নজরই দেয়নি, সিসি মিলার, ঔপন্যাসিকের ভাষায়, তাঁর প্রতি দুর্বলতা পোষণ করে এসেছে। যেতে যেতে আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল গিলবার্ট। বয়েস তাঁর এখন পঞ্চাশের ওপর। তবুও, আয়নার দিকে তাকিয়ে, গিলবার্ট একথা স্বীকার না করে পারল না যে, সে এখনও সুদর্শন।

'বেচারা সিসি মিলার!' মৃদু হেসে শব্দ ক'টি উচ্চারণ করল গিলবার্ট। এ্যাঞ্জেলা বেঁচে থাকলে সেও আজ এই পরিহাসের ভাগ নিতে পারত। কী এক সহজাত আকর্ষণ এ্যাঞ্জেলার ডায়েরীর দিকে টেনে নিয়ে গেল গিলবার্টকে। এলোমেলোভাবে পাতা উল্টে এক জায়গায় পড়ল, 'গিলবার্টকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল।' যেন গিলবার্টের প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে এ্যাঞ্জেলা। যেন এ্যাঞ্জেলা বলতে চাইছিল, মেয়েদের কাছে গিলবার্টের চেহারা আকর্ষণীয়। সিসি মিলারও নিশ্চয়ই এই আকর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। গিলবার্ট পড়ে চলল, 'আমি যে গিলবার্টের স্ত্রী সেজন্যে আমি গর্বিত।' এ্যাঞ্জেলার স্বামী বলে তার নিজের গর্বও কিছু কম ছিল না। কত সময়, বাইরে কোথাও এক সঙ্গে ডিনারে বসে, তাঁর মনে হয়েছে, উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে এ্যাঞ্জেলার মত সুন্দরী কেউ নয়। গিলবার্ট আরও পড়ল। সেই বছর সে প্রথম পার্লামেন্টের নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা দুজনে নির্বাচনকেন্দ্রে সফর করছিল। ডায়েরী—'গিলবার্ট যখন বসল সবাই তাঁর প্রশংসামুখর। সমবেত জনতা গিলবার্টের প্রশস্তি গাইছিল। আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।'

গিলবার্টেরও মনে আছে একথা। প্ল্যাটফর্মের ওপর তাঁর পাশেই বসেছিল এ্যাঞ্জেলা। তাঁর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল এ্যাঞ্জেলা তা আজও মনে আছে গিলবার্টের। মনে আছে, এ্যাঞ্জেলার চোখের কোণে মুক্তোবিন্দুর মত বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। তারপর, গিলবার্ট পাতা ওল্টাল. তারা তখন ভেনিসে। নির্বাচনের পরে ছুটির সেই ক'টি মধুর দিনের কথা মনে আছে তাঁর। 'ফ্লোরিয়ান্সে আমরা বরফ খেলাম।' গিলবার্ট হাসল। এত ছেলেমানুষ ছিল এ্যাঞ্জেলা। কী ভালই না বাসত বরফ। 'গিলবার্ট আমাকে রোমের ইতিহাসের ভারি মজার গল্প শোনাল। গিলবার্ট বলল যে, ডোজেনরা—।' স্কুলের মেয়ের মত হাতের লেখায় সবটাই লিখে রেখেছে এ্যাঞ্জেলা। ওঁর সঙ্গে বেড়াবার অন্যতম আনন্দ ছিল ওর জানবার অদম্য আগ্রহ। এ্যাঞ্জেলা বলত যে, সে ভীষণ অজ্ঞ। যেন সেই অজ্ঞতাই তাঁর অন্যতম আকর্ষণ ছিল না।

পরের খাতাখানা টেনে নিল গিলবার্ট। তাঁরা তখন লন্ডনে ফিরে এসেছে। 'ভালো ধারণা সৃষ্টি করবার জন্যে আমি এত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।' বৃদ্ধ স্যার এডওয়ার্ডের পাশে সে যেন এ্যাঞ্জেলাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছে সেই জাঁদরেল উপরওয়ালাকে জয় করবার জন্যে তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা। গিলবার্ট তাড়াতাড়ি পড়ে চলল। ডায়েরীর পাতায় টুকরো টুকরো ঘটনা। 'কমন্স্‌-এর সভায় ডিনার খেলাম। লাভ গ্রোভস্‌-এ বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। লেডি এল্‌, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিলবার্টের স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন কিনা।'

তারপর যত সময় কেটেছে—টেবিলের ওপর থেকে আর একখানা খাতা তুলে নিল গিলবার্ট—নিজের কাজে ততই সে বেশী করে জড়িয়ে পড়েছে। আর, সেই জন্যই, প্রায়ই একলা থাকতে হয়েছে এ্যাঞ্জেলাকে। তাঁদের যে কোন সন্তান হয়নি সেজন্যে দুঃখের অন্ত ছিল না এ্যাঞ্জেলার। এক জায়গায় সে লিখছে, 'গিলবার্টের যদি একটি ছেলে হতো বেশ হতো তাহলে। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে এই কামনাই করি।' অথচ মজা এই যে, এনিয়ে গিলবার্ট কখনও আফশোষ করেনি। জীবন তো সর্বদিক দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছিল। কোথাও এতটুকু দৈন্য ছিল না। সে বছর সরকারী অফিসে সামান্য একটা কাজ পেল গিলবার্ট। নেহাতই সামান্য। কিন্তু এ্যাঞ্জেলা মন্তব্য করছে, 'গিলবার্ট একদিন প্রধান মন্ত্রী হবেই।' হয়তোবা, ঘটনাস্রোত অন্যখাতে বইলে, এতদিনে তাই হতো। এইখানে গিলবার্ট একটু থামল। কী হলেও হতে পারত তাই নিয়ে জল্পনা করল একটু। রাজনীতি তো জুয়ো খেলা, ভাবল গিলবার্ট। সে খেলার সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি। পঞ্চাশ বছর বয়সেও নয়। আরও পাতা ওল্টালে গিলবার্ট। ছোটখাট নানা ঘটনা, কলহ, যা নিয়ে এ্যাঞ্জেলার জীবন গড়ে উঠেছিল।

আরও একখানা খাতা নিল গিলবার্ট। পাতা ওল্টাল এলোপাথারি। 'আমি কি ভীরু! আবার সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু গিলবার্টের এত কাজ; তার ওপর আমার বিষয় নিয়ে তাঁকে বিব্রত করা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি?' এর মানে কি? ও! এইতো, এখানেই সব লেখা আছে। ইস্ট এন্ডে কাজ করবার কথাই বলতে চাইছিল এ্যাঞ্জেলা। 'আমি সাহস সঞ্চয় করে গিলবার্টের কাছে কথা পাড়লাম। এত সদয় গিলবার্ট, এমন লক্ষ্মী, কোন বাধাই দিল না।' এবিষয়ে তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা মনে আছে গিলবার্টের। এ্যাঞ্জেলা বলেছিল নিজেকে ওঁর অত্যন্ত একা মনে হয়। একেবারে একা। নিজের জন্যে কিছু কাজ সে করতে চায়। গিলবার্টের মনে আছে এখানে, এই চেয়ারে বসে, এই কথা বলবার সময় লজ্জায় কেমন লাল হয়ে উঠেছিল এ্যাঞ্জেলা। কী সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছিল। এই নিয়ে এ্যাঞ্জেলাকে একটু পরিহাস করেছিল গিলবার্ট। এ্যাঞ্জেলার বাড়ী আর গিলবার্ট, এদের তদারক করেও কি তাঁর সময় কাটে না? তবু এ কাজে যদি সে আনন্দ পায় গিলবার্টের আপত্তি নেই। শুধু এ্যাঞ্জেলাকে কথা দিতে হবে নিজের শরীরের প্রতি কোন অযত্ন সে করবে না। তারপর থেকে প্রত্যেক বুধবারেই হোয়াইট চ্যাপেলে যেত এ্যাঞ্জেলা। গিলবার্টের মনে আছে এই উপলক্ষে এ্যাঞ্জেলা যে পোষাক পরত তার প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর। কিন্তু এ্যাঞ্জেলা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তাঁর কাজ। এখানে ডায়েরী এই জাতীয় কথায় ভর্তি, যেমন—মিসেস জোনস্‌-এর সঙ্গে দেখা হলো। ওঁর দশটি সন্তান। কোন এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামীর একখানা হাত অকেজো হয়ে গেছে। লিলির একটা চাকরির জন্যে আমার যথাসাধ্য করছি।' গিলবার্ট পাতা ওল্টাল। তাঁর নিজের নাম খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। উৎসাহে তাই ভাঁটা পড়তে শুরু করল গিলবার্টের। কোন কোন জায়গায়

আবার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। যেমন, 'বি, এমএর সঙ্গে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উগ্র রকমের বিতর্ক হলো।' কে এই বি, এম? মনে মনে ওঁর পুরো নামটা হাতড়ে বেড়াল গিলবার্ট। কিন্তু তাঁর পরিচিত কোন নামের সঙ্গেই মিলল না। ভাবল হয়তো কোন মেয়ে। কোন এক কমিটিতে আলাপ হয়েছিল এ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। 'উচ্চশ্রেণীর ওপর বি, এম, উদ্ধতভাবে আক্রমণ চালাল। সভার শেষে আমি ওঁর সঙ্গে হেঁটে ফিরলাম। তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বড়ই সংকীর্ণমনা পুরুষ বি, এম।' ওঃ! বি, এম্, তাহলে পুরুষ, আর সেই বুদ্ধিজীবী-দেরই অন্যতম এ্যাঞ্জেলার ভাষায় যারা সংকীর্ণ-মনা। এরপরে ডায়েরী দেখে বোঝা গেল এ্যাঞ্জেলা তাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছিল। "বি, এম্, ডিনারে এসেছিল। সে মিনির সঙ্গে করমর্দন করল!" এই বিস্ময় চিহ্নটি বি, এম্এর মনের আর একটি পরিচয়, বোঝা যাচ্ছে বৈঠকখানায় পরিচারিকা দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। মিনির সঙ্গেও সে করমর্দন করেছিল। বি, এম্ সেই সব শ্রমিকদের একজন মেয়েদের বৈঠকখানায় বসে যারা মতামতের ছুরিতে শান দেয়। গিলবার্ট এদের হাড়ে হাড়ে চেনে। বি, এম্ যেই হোক না কেন এই বিশেষ শ্রেণীটিকে দুচক্ষে দেখতে পারে না গিলবার্ট।

আরও কয়েক পাতা, তারপর, এই যে, আবার বি, এম্। "বি, এম্-এর সঙ্গে লণ্ডন টাওয়ারে গিয়েছিলাম। ও বলল, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আমরা বেওকুফের বেহস্তে বাস করছি।"

বাঃ এই তো বি, এম-এর উপযুক্ত কথা। গিলবার্ট যেন নিজের কানেই সব শুনতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে এই লোকটিকে। বেঁটেখাটো মানুষটি। খসখসে দাড়ি, লাল টাই, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী টুইডের পোষাক আর জীবনে কখনও নিজের কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করেনি। একে চিনবার মত চোখ নিশ্চয়ই ছিল এ্যাঞ্জেলার। গিলবার্ট পড়ে চলল, "—সম্বন্ধে বি, এম অত্যন্ত অশোভন কথা বলল।' অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নামটি কেটে ফেলা হয়েছে। 'আমি বললাম —সম্বন্ধে কোন নিন্দাই আমি সহ্য করতে রাজী নই।' এবারেও নামটি কালির পোচে ঢাকা পড়েছে। একি তাহলে তাঁর নিজেরই নাম? এই জন্যেই কি সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাঞ্জেলা খাতা বন্ধ করে ফেলেছিল? আরও বাড়িয়ে দিল। এই ঘরে বসে তাঁরই সম্পর্কে আলোচনা করবার ধৃষ্টতা ওর হলো কি করে! এ্যাঞ্জেলা কেন একথা বলেনি গিলবার্টকে? কোন কথা লুকোনো তো ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বি, এম, সম্পর্কে প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা খুঁজতে লাগল্ গিলবার্ট। 'বি, এম, আমাকে তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলছিল। ওঁর মা দিনমজুরী করতো। আমি যখন একথা ভাবি, এই বিলাসের মধ্যে বাঁচতে আমার মন বিষিয়ে ওঠে। একটা টুপির দাম কিনা তিন গিনি!" এ্যাঞ্জেলা যদি এইসব জটিল বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করত। বি, এম তাঁকে বই পড়তে দিয়েছিল। কার্ল মার্ক্সের 'দি কামিং রেভেল্যুশন।' বি, এম, বি, এম, বি, এম্। ধারে বারেই কেবল এই নামসংক্ষিপ্ত। কিন্তু পুরো নাম নেই কেন? এই নামসংক্ষিপ্তর মধ্যে যে অন্তরঙ্গতার আভাস পাওয়া যায় সে তো এ্যাঞ্জেলার স্বভাববিরুদ্ধ। এ্যাঞ্জেলা কি মুখো-মুখিও তাঁকে বি, এম বলে ডাকত? 'ডিনারের পরে হঠাৎ বি, এম এলো আশাতীতভাবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি তখন একা ছিলাম।' এটা মাত্র এক বছর আগের ঘটনা। 'সৌভাগ্যবশতঃ!' কেন সৌভাগ্যবশতঃ কেন? 'আমি তখন একা ছিলাম।' সে রাত্তিরে আমি কোথায় ছিলাম? আমি? এনগেজমেন্ট বইএর পাতা ওল্টাল গিলবার্ট। এই যে পেয়েছি। সে রাত্তিরে ম্যানর হাউসে ডিনার ছিল। আর এদিকে এ্যাঞ্জেলা আর বি এম সেই সন্ধ্যা নিরালা কাটিয়েছে। সেই সন্ধ্যার কথা মনে করতে চেষ্টা করল গিলবার্ট। তার জন্যে কি উপরে বসে অপেক্ষা করছিল এ্যাঞ্জেলা? ঘরের অবস্থা কি স্বাভাবিক ছিল? কোন ব্যতিক্রমই কি তাঁর চোখে পড়েনি? টেবিলের ওপর গ্লাস অথবা কাছাকাছি দুখানা চেয়ার? না মনে পড়ছে না। ম্যানর হাউসে ডিনার, টেবিলে নিজের বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই তার মনে পড়ছে না। ব্যাপারটা ক্রমেই যেন আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। এ্যাঞ্জেলা, তাঁর স্ত্রী, তাঁরই অনুপস্থিতিতে নিরিবিলি অন্য পুরুষকে অভ্যর্থনা করছে। হয়তো এর পরে সব পরিষ্কার হবে। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে এ্যাঞ্জেলার শেষ অসমাপ্ত ডায়েরীখানা টেনে নিল গিলবার্ট। এই যে শেষ খাতার প্রথম পাতায়ই সেই হতভাগাটার নাম। 'আমি আর বি, এম নিরিবিলি নৈশ-ভোজন করলাম। ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ও বলল যে এখন আমাদের পর-স্পরকে বুঝবার সময় হয়েছে। আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও শুনবে না। কিছুতেই না। ও আমাকে ভয় দেখাল আমি যদি না......'বাকী লেখা সব কেটে দেওয়া হয়েছে। গোটা পাতা ভর্তি, কেবল লেখা, 'মিশর-মিলবু, মিশর।' কিন্তু এর কেবল একটিমাত্র অর্থই হতে পারে।। হতভাগাটা এ্যাঞ্জেলাকে ওর উপপত্নী হতে বলেছিল। আর তাও কিনা গিলবার্টের ঘরে বসে। এর পরে আর নাম-সংক্ষিপ্ত নেই, কেবল 'সে'। 'সে আবার এসেছিল। আমি তাঁকে বললাম যে এখনও কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারিনি। আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম যেন আমাকে ত্যাগ করে।' তাহলে এই ঘরে বসেই সে এ্যাঞ্জেলার ওপর জুলুম করেছে। কিন্তু এ্যাঞ্জেলা কেন তাঁকে জানায়নি একথা? তারপর 'আমি ওঁকে চিঠি লিখেছিলাম।' এর পরে শাদা পাতা। আবার 'আমার চিঠির কোন জবাব নেই।' একখানা পাতা শাদা। তারপর 'ও যা ভয় দেখিয়েছিল তাই করেছে।' তারপর—তারপর কী? পাতার পর পাতা উল্টে গেল গিলবার্ট। সব শাদা। আবার এ্যাঞ্জেলার মৃত্যুর ঠিক আগের দিন, 'আমারও কি তাই করবার সাহস আছে?' এখানেই শেষ।

গিলবার্ট ক্র্যাণ্ডনের শিথিল হাত থেকে ডায়েরীখানা পড়ে গেল। এ্যাঞ্জেলাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পিকাডিলির বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাঞ্জেলা। চোখ উদ্ভ্রান্ত, হাত মুষ্টিবদ্ধ। আর ওইতো গাড়িখানা এলো। সে আর সহ্য করতে পারছে না। সবটুকু সত্য তাঁকে জানাতেই হবে। টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল গিলবার্ট।

'মিস্ মিলার।' ঘর নিস্তব্ধ। তারপর ওদিকে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন ঘরে এলো।

'আমি সিসি মিলার কথা বলছি।' অবশেষে তাঁর গলা শোনা গেল।

'বি, এম, কে?' গিলবার্ট ফেটে পড়ল।

সিসি মিলারের টেবিলের ওপর সস্তা ঘড়ির টিক্ টিক্ শোনা যাচ্ছে। তারপর একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস। সে কথা বলল, 'বি, এম আমার ভাই।'

তাহলে সে সিসি মিলারের ভাই, যে সেদিন আত্মহত্যা করেছে!

'আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?'

'না'—গিলবার্ট চীৎকার করে উঠল, 'কিছুই না'।

গিলবার্ট তাঁর উত্তরাধিকার পেয়েছে। সিসি মিলার সেই সত্যই তাঁকে জানিয়েছে। প্রিয়-জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যেই এ্যাঞ্জেলা বাঁক ঘুরেছিল। তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই পিকাডিলির মোড় পাড়ি দিয়েছিল এ্যাঞ্জেলা।

অনুবাদঃ দেবদাস পাঠক

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফ্কা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে 'কে' দ্রুত দরজার দিকে হেঁটে গেল। সে দেখতে চেষ্টা করল, মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ ছাত্রটির আর গায়ে কত জোর, সে তাকে তার হাতের ওপর রাখবে, এমনকি রাস্তা পার হবার সময়েও। কিন্তু ততটুকুও তাদের যেতে হল না। 'কে' দেখল, ঠিক অপর দিকে দরজা থেকে সংকীর্ণ একটি কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। ওপরে বোধ হয়, ছোট একটি কুঠুরি আছে। সিঁড়িটার মধ্য পথে একটা বাঁধ থাকায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্রটি ওই সিঁড়ির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে নিয়ে চলেছে। ছেলেটির দ্রুত নিঃশ্বাস। গলা দিয়ে যেন কেমন একটা শব্দ। ইতিমধ্যে তার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। মেয়েটি সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে দাঁড়ানো 'কে'র দিকে হাত নাড়ল। দু কাঁধে ঝাঁকানি দিল একবার। যেন সে বলতে চায়, এমন এক অপহরণে তার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। তবে ওই নির্বাক ভঙ্গী থেকে অনিচ্ছার অল্পই খুঁজে পাওয়া যায়। 'কে' মেয়েটির দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোনো ভাব নেই। নেই কোনো ভাষা। মনে হয়, মেয়েটি যেন তার কাছে নতুন। সম্পূর্ণ অপরিচিতা। 'কে' ভাবল, সে কোনোমতেই মেয়েটির প্রতি কোনোরকম অবিচার করবে না। ব্যর্থ হওয়ার জন্যও নয়। এমন কি অতি সহজেই ব্যর্থতার বেদনা কাটিয়ে যাবার জন্যও নয়।

তাদের দুজন সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু সেখানে 'কে' পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল। সে এবার বাধ্য হল এই সিদ্ধান্ত করতে, মেয়েটি শুধু তাকে প্রতারণাই করেনি। তাকে মিথ্যে কথাও বলেছে। মেয়েটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয়ই ওই ছোট খুপরিতে বসে অপেক্ষা করছে না। কাঠের সিঁড়িটা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কেউ বলতেও পারে না, সিঁড়িটা কত লম্বা। কিন্তু 'কে' দেখল, একটা ছোট কার্ডে লিখে আটকে দেওয়া হয়েছে। "ওপরে আদালতের দপ্তরসমূহ।" লেখাগুলি যেন কোনো ছেলে মানুষের। বেশ বোঝা যায়, আদালত দপ্তরগুলো এবাড়ীর ওপরে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কারো মনে আদালত সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে না। যাদের অভিযুক্ত করা হয়, তারা সহজেই বুঝতে পারবে আদালতের আর্থিক সংগতি কত অল্প। যে বাড়ীতে এর বিভিন্ন দপ্তর, সে বাড়ীর বিভিন্ন অংশে সবচেয়ে গরীব যারা, তারাই থাকে। অবশ্য এমন সম্ভাবনাও আছে যে, এদের প্রচুর টাকা। কিন্তু কর্মচারীরা তা বিচার কার্যে ব্যয় না করে পকেটস্থ করছে। 'কে' এপর্যন্ত এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তা থেকে এমন ধারণা করাই সবচেয়ে বেশী সম্ভব। তাই যদি হয়, তবে এমন দুর্নীতির জন্যও অন্ততঃ কিছু আশার কারণ তার আছে। দরিদ্র আদালত থেকে অন্ততঃ। দরিদ্র আদালত অপরাধীর পক্ষে অপমানকর। এখন 'কে' বেশ বুঝতে পারল। প্রথম দিন এখানে তাকে আসবার সমন না দিয়ে কেন বাড়ীতেই ওভাবে গ্রেপ্তার করা হল। এই ম্যাজিস্ট্রেটের তুলনায় সে অনেক বেশী আরামের অধিকারী। সে একটা খুপরীতে বসে তার কাজ চালায়। আর 'কে', ব্যাঙ্কে তার প্রকাণ্ড একটি হল। তারই সংলগ্ন একটি ছোট বসার ঘর আছে। সে তার সেই ঘরের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে ব্যস্ত শহর জীবনকে দেখতে পারে। এ-কথা সত্য, সে ঘুষ কি অন্য কোনো উপায়ে উপরি আয় করে না অথবা সে তার অধস্তন কর্মচারীকে তার জন্য কোনো মেয়ে জুটিয়ে আনতে বলে না। কিন্তু 'কে' এই সমস্ত সুযোগ ছাড়তে চায়। অন্ততঃ এই জীবনে।

'কে' তখনও আদালত-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় একজন লোক নীচে থেকে ওপরে উঠে এল। খোলা দরজা দিয়ে সে দেখল ঘরের ভেতরটা। এখান থেকে আদালত-ঘরটার সব কিছুই দেখা যায়। এবার লোকটি 'কে'-কে জিজ্ঞাসা করল সে সেখানে কোনো একটি মেয়েকে দেখেছে কি না। 'তুমি এই আদালতের একজন পরিচারক তাই না?' 'কে' জিজ্ঞাসা করল।

'হাঁ'। লোকটি বলল। 'ও, আপনিই 'কে', আপনাকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে? আপনাকে স্বাগতম জানাই।' সে কথা শেষ করে 'কে'র দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। 'কে' মোটেই এমন কোনো ব্যাপার আশা করতে পারেনি।

'আজ আদালতের কোনো অধিবেশন হবে না।' পরিচারক বলে যেতে লাগল। 'কে' তখনও চুপ 'কে' একবার লোকটির দিকে, লোকটির সাধারণ পোষাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি।' লোকটির জ্যাকেটের ওপরেই যা-কিছু আদালতের চিহ্ন। একটি সাধারণ বোতাম ছাড়া বাকী-দুটো গিল্টির বোতাম। বোতাম দুটো দেখে মনে হয়, ও-দুটো যেন কোনো একটি সামরিক কোট থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

'আমি কিছুক্ষণ আগে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে আর এখন এখানে নেই। ছাত্রটি তাকে ওপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেছে।' একথায় পরিচারকটি বলল ঃ 'আপনি বুঝি তাই একা এখানে? তারা সব সময়েই আমার কাছ থেকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। আজকে রোববার। আজ আমার কোনো কাজ করার কথা নয়। তবু তারা আমাকে একটা বাজে কাজে বাইরে পাঠিয়েছিল। কাজ কিছু নয়। আসলে তারা আমাকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলল মাত্র। যাতে তাদের এ সব কাজে আমি কোনো বাধা না দিই। তারা আমাকে খুব দূরেও পাঠায় না। তার কারণ, আমার তাতে আশা থাকে, একটু তাড়াতাড়ি করলেই আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতে পারব। আর আমিও তাই করেছি। যথাসম্ভব আমি দ্রুত দৌড়ে যেখানে আমাকে পাঠান হয়েছিল, সেখানে গেলাম। আধ-খোলা অফিসের জানালা দিয়ে আমি খবরটুকু দিয়ে আবার রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে এখানে ফিরে এসেছি। আমি চাই না, আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আমাকে বেশিক্ষণ দূরে রাখা হোক। এত তাড়াতাড়ি করেও কোনো লাভ হল না। আমার আগেই এখানে এসে ছাত্রটি হাজির হয়েছে। আমার কাজ যদি ওদের ওপর নির্ভর না করত, তবে ওকে আমি দেখে নিতাম। এই দরজার পাশে দেয়ালের ওপর থেকে ওকে আমি মেরে ফেলতাম। এখন আমার প্রত্যহের স্বপ্ন হল এই। আমি দেখতে চাই মুখ বিকৃত করে আঙুলগুলো সিঁটকে ও এখানে পড়ে আছে। ওর বাঁকা পা দুটো একটা বৃত্তের মত গোল হয়ে গেছে। তার চারদিকে রক্ত। কিন্তু এখনও এটা একটা স্বপ্নই।'

'কে' অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ছাড়া কি অন্য কোনো উপায় নেই?'

'না। অন্য কিছু আছে বলে আমি জানি না। আর এখন অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। এতদিন ছাত্রটি শুধু তার নিজের সম্ভোগের জন্যই আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেত। এখন আমি যা' ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে।

আমার স্ত্রীকে এখন ম্যাজিস্ট্রেটের আনন্দ-বিধানের জন্যও নিয়ে যাওয়া হয়।'

'কে' জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে কি তোমার স্ত্রীরও কোনো দোষ নেই।' কথা বলার সময় 'কে' নিজেকে বেশ সংযত রেখেছিল। সে তখনও মনে মনে ঈর্ষাবোধ করছে। 'নিশ্চয়ই'। আদালত পরিচারক বলল, 'তার অনেক দোষ আছে। সে নিজে তার কাছে ধরা দিয়েছে। আর লোকটিও হল সে রকম। সে যে মেয়ে দেখবে, তারই পেছনে ছুটবে। এ বাড়ীর পাঁচটি ফ্ল্যাটের অন্তঃপুরেই সে এখন তার অবাধ গতি করে নিয়েছে। আর আমার স্ত্রী এ-বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। তার জন্যেই আমি কিছু বলতে পারি না।'

'কে' বলল, 'তুমি যা বললে, তা যদি ঠিক হয়, তবে ত কিছু করবার আছে বলে মনে হয় না।'

'কেন না?' আদালত পরিচারকের প্রশ্ন। 'একদিন যদি তাকে বেশ ধমকে দেওয়া যায়, তবে সে আর কিছু করতে সাহস পাবে না। ও একটা কাপুরুষ। কিন্তু আমি তাকে ধমকাতে পারি না। আর কেউ আমার জন্য এ-কাজ করবে না। কারণ সকলেই তাকে ভয় পায়। সে এখানে বেশ প্রতিপত্তিশীল। কেবল-মাত্র আপনিই এ-কাজ পারেন।'

আশ্চর্য হয়ে 'কে' জিজ্ঞাসা করল 'কেন, আমি কেন?'

আদালত পরিচারক এর জবাবে বলল, 'কারণ আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'তাইত আমার বেশি ভয় পাবার কারণ রয়েছে। যদিও আমি জানি, সে মামলার ফলা-ফল সম্পর্কে কিছু করতে পারবে না। তবে প্রাথমিক সওয়ালে তার কিছু হাত থাকলেও থাকতে পারে।'

'হাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' আদালত পরিচারক বলল। তার কথায় মনে হল, তার নিজের বক্তব্যের মতই 'কে'র কথা যেন স্বয়ংসমর্থিত। তবু একথা বলা যায় যে, কোনো মামলার ব্যাপারেই এখানকার কেউ কিছু করতে পারে না।'

'কে' বলল, 'হাঁ, তবে আমার তা মনে হয় না। অবশ্য তার জন্য ছাত্রটিকে শিক্ষা দিতে আমার বাধবে না।' সাধারণ লৌকিকতার নিয়ম মেনে যেন আদালত পরিচারক বলল : 'তা হলে আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।' তার কথার ভাবে মনে হয় যে, সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, এত সহজেই তার মনো-বাসনা পূর্ণ হতে পারে। 'কে' তখনও বলে চলেছে, 'এমনও হতে পারে এখানকার সম্ভবত সমস্ত কর্মচারীর এই একই শিক্ষা পাওয়া উচিত।'

'হাঁ, হাঁ। ঠিক তাই।' আদালত পরিচারক 'কে'-র কথায় সায় দেয়। সে এবার 'কে'-র দিকে বেশ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল। এতক্ষণ সে এমন সাহস পায়নি। 'কে'-র সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়েও নয়। সে আরও বলল : 'এখানে সব কিছুই বেশ ধীরে-সুস্থে করতে হবে।' কিন্তু ওদের আলাপ যেন আর জমছে না। কেমন যেন আদালত পরিচারক অসুবিধাবোধ করছিল আলাপে। হঠাৎ তাই সে কথার বাঁক ধরল : 'যাই হোক এখন আমার ওপরে খবর দিতে হয়। আপনিও আসবেন নাকি?'

'কে' বলল, 'আমার ওপরে কোনো কাজ নেই।'

'না, তবু আপনি আসতে পারেন। কেউ আপনাকে লক্ষ্য করবে না।'

'ওপরে গিয়ে কি কিছু দেখবার আছে?' ইতস্ততঃ করে 'কে' জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই ওপরে যাবার কেমন যেন একটা ইচ্ছা সে অনুভব করে। আদালত পরিচারক জবাব দিল। 'আমার মনে হয়, ওপরের অনেক কিছু দেখে আপনি বেশ উৎসাহিত বোধ করবেন। 'বেশ তাহলে চলুন।' অবশেষে 'কে' বলল। 'আমি আপনার সঙ্গেই আসছি।' এই বলে সে দ্রুত সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। এমন কি পরিচারকটির থেকেও দ্রুত।

ওপরে উঠে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। তার কারণ পেছনেও একটা সিঁড়ির ধাপ। সে বলল : 'ওরা সাধারণ মানুষের কথা একেবারেই ভাবে না।'

'তারা কারো কথাই ভাবে না।' আদালত পরিচারকের উত্তর। 'দেখুন এই বসবার ঘরটা দেখুন।' একটি প্রশস্ত বারান্দা। বিভিন্ন দপ্তর কয়েকটি আটপৌরে দরজা দিয়ে ভাগ করা। যদিও বাইরের আলো আসার জন্য কোনো জানালা নেই, তবু সে জায়গাটা অন্ধকার ছিল না। তার কারণ দপ্তরগুলির কোনো আবরু নেই। কোনো বেড়া শুধু ছাদ পর্যন্ত কয়েকটা কাঠের রেলিং উঠে গেছে। যে-টুকু আলো, তা ওই পথেই আসছিল। সেই অস্ফুট আলোয় দেখা যাচ্ছিল কয়েজন কেরানীকে। তাদের কেউ ডেস্কের সামনে বসে লিখছিল। কেউ রেলিং-এর ঘনিষ্ঠ হয়ে বাইরের লবীতে লোকজনের যাতায়াত দেখছিল। লবীতে মাত্র কয়েকজন লোক। তার কারণ বোধ হয়, সে দিনটা রোব-বার। তাদের চালচলন বেশ সাধারণ। প্রায় নিয়মিতভাবে তারা বারান্দার দু'পাশে পাতা কাঠের বেঞ্চির ওপর বসেছিল। তাদের পোষাক-গুলো অপরিস্কার। তবে তাদের দাড়ি কাটার ধরণ, মুখের হাবভাব, তাদের বসবার ভঙ্গী এই রকম সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা কোনো উঁচু শ্রেণীর লোক। বারান্দায় টুপি রাখার কোনো র‍্যাকেট না থাকায়, তারা তাদের টুপিগুলি বেঞ্চির নীচে রেখেছিল মনে হয় দেখে, একজন আর একজনকে বুঝি ক্রমিক সংখ্যার মত অনুসরণ করছে। তারা যখন দরজার কাছে বসছিল, তখন 'কে' এবং আদালত পরিচারক তাদের দেখতে পাচ্ছিল। তারা তাদের দেখে স্বীকৃতিতে ঘাড় কাত করছিল। তাদের দু'জন দু'জন করে দরজার কাছে আসছিল। প্রথম দু'জন এসে চলে যাবার পর আবার দু'জন এল। নতুন দু'জনও পূর্ববর্তীদের মত উঠে দাঁড়াল। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় ওরা এমন স্বীকৃতিই ঐ সব লোকগুলোর কাছ থেকে পেল। তারা সম্পূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। পিঠটা একটু কুঁজো। হাঁটু দুটো সামান্য ভাঙা। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা রাস্তার ভিখারীদের মত অনেকটা। 'কে' আদালত পরি-চারকের জন্য একটু দাঁড়াল। সে তখন একটু পেছনে পড়ে। সে এলে 'কে' তাকে বলল : 'ওদের চালচলন কি রকম বিনয়ী দেখেছ?'

'হাঁ।' আদালত পরিচারক জবাব দিল। 'ওরা অভিযুক্ত। ওদের প্রত্যেকেই কোনো না কোন অপরাধের আসামী।'

'তাই হবে।' 'কে' বলল। 'তাহলে ওরা আমার সমধর্মী।' এই বলে সে সবচেয়ে নিকটবর্তী লম্বা, প্রায় পক্ককেশ লোকটির দিকে ফিরল। সৌজন্যতার সুরে জিজ্ঞাসা করল তাকে : 'আপনি এখানে কি জন্য অপেক্ষা করছেন? কিন্তু এমন একটি অযাচিত প্রশ্নে লোকটির সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। লোকটি ভীষণ ঘাবড়ে যায়। আর তার সমস্ত জটপাকানো অনুভূতি আরো গভীর হল। যখন সে ভাবল, এই পৃথিবীর মানুষ হিসাবে, আর মানুষ যখন প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিমান, তখন তার জানা উচিত যে কোনো অবস্থাতেই কেমনভাবে চলতে হয়। একথা মনে হওয়ায় লোকটা বেশ একটু বিরক্তই হল। তবু লোকটি এ-স্থানে 'কে'-র কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। অন্যান্য পার্শ্ববর্তী-দের দিকে তাকালো। ভাবখানা এই, 'আমি ত কিছু বলতে পারছি না। তোমরা কিছু বলে এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য কর।' তার তাকানোয় মনে হয় এ অবস্থায় 'কে'-র কথার জবাবদিহি করা যেন তাদের কর্তব্য। এবার আদালত পরিচারকটি এগিয়ে এল। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে বেশ চাঙ্গা করে দেবার চেষ্টায় বলল : 'এই ভদ্রলোক শুধু জানতে চাইছেন, আপনি কি জন্য অপেক্ষা করছেন। আসুন ভদ্রলোকের কথার জবাব দিন।' আদালত পরিচারকের এমন আত্মীয়-ঘনিষ্ঠ সুর লোকটির মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। 'আমি অপেক্ষা করছি——' লোকটি শুরু করল ঠিকই কিন্তু শেষ করতে পারল না। স্পষ্টই বোঝা যায়

সে প্রশ্নের একেবারে মাপাজোঁকা এক উত্তর দিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু জানত না কিভাবে তা করতে হয়। অন্যান্য লোকগুলো এতক্ষণে ওদের চারপাশে সরে এসে দাঁড়িয়েছে। আদালত-পরিচারক তাই তাদের বলল: 'আপনারা সব সরে দাঁড়ান। যাতায়াতের পথে ভীড় করবেন না।' তারা একটু পিছু হটল ঠিকই, কিন্তু একেবারে তাদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল না। ইতিমধ্যে লোকটি তার অস্তিত্বে ফিরে এল। ক্ষীণ একটু হেসে আবার উত্তর করল: 'একমাস আগে আমি আমার মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি এফিডেফিট এখানে দাখিল করেছিলাম। তার কি হল, জানবার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।'

'মনে হচ্ছে', কে বলল, 'আপনি নিজেকে বেশ অসুবিধার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন।' 'হ্যাঁ আমার নিজের মামলা কি-না' লোকটি উত্তর দিল।

'কিন্তু আপনার মত কেউ ভাবেন না।' 'কে' আবার নতুন কথার মোড় ধরল। 'যেমন আমি। আমাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর সে কথা আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতই নিশ্চিত। কিন্তু এপর্যন্ত আমি কোনরকম এফিডেভিট অথবা সে-জাতীয় কিছু দাখিল করিনি। আপনি কি মনে করেন এর দরকার আছে।'

'এর উত্তরে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারি না।' লোকটি সংক্ষেপে উত্তর করল। আরো একবার সে দেখল, যে প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা রাখা হচ্ছে না। তাই তার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক, 'কে' তাকে নিয়ে তামাসা করছে। তাই নতুন ভুল এড়াবার জন্য সে প্রায় আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল আর কি। 'কে'র দৃষ্টি তখন অধীর আগ্রহে বিস্ফারিত। সে শুধু বলল: 'যাই হোক আমি আমার এফিডেফিটগুলো দাখিল করেছি।'

'সম্ভবত আপনি বিশ্বাস করছেন না আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' 'কে' জিজ্ঞাসা করল। 'না, হাঁ, বিশ্বাস করব না কেন। নিশ্চয়ই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' লোকটি বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাশে সরে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার জবাবে বিশ্বাসের সুর নেই। কেমন যেন আশঙ্কার আভাস।

'তার মানেই আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।' 'কে' জানতেও চাইল না লোকটি সত্যি-ই সে-কথা অবিশ্বাস করছে কি-না। এবার 'কে' তার হাত ধরল। তার হাত ধরেই তাকে যেন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে, ভাবখানা এইরকমের। 'কে'র লোকটিকে কোনো ব্যথা দেবার ইচ্ছে ছিল না। আর ইতিমধ্যেই সে লোকটির মনোভাব বুঝে ফেলেছে। তবু লোকটি চেঁচিয়ে উঠল। যেন 'কে' তাকে দু' আঙুলে ধরেনি। জোর করে মুঠো চেপে ধরেছে। ওরকম অসভ্য রকমের চীৎকার 'কে'র পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। 'কে'র মনে হল লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে না করল। সম্ভবত সে তাকে জজ মনে করেছে। তাই যাবার ইশারা সমস্ত শরীরের ভঙ্গীতে এনে 'কে' এবার তার হাত সত্যই জোরে চেপে ধরল। ছুঁড়ে ফেলল বেঞ্চের ওপর। এবং ওখান থেকে চলে এল।

'অধিকাংশ আসামীরাই এমন।' আদালত পরিচারক বলল। তাদের পেছনে অন্যান্য আসামী আর মক্কেলরা। যে লোকটি চীৎকার করে উঠেছিল, তার চীৎকার এখন থেমেছে। অন্যান্য লোকগুলো এতক্ষণে তাকে ঘিরে ধরে সমস্ত ঘটনাটা জানতে চাচ্ছে। একজন ওয়ার্ডার তখন 'কে'র কাছে এল। তার তলোয়ারই তার পরিচয়। তলোয়ারের ধারালো দিকটা দেখে বোঝা যায়, ওটা এলুমিনিয়মের তৈরী। 'কে' লোকটির খুব কাছে সরে এল। হাত দিয়ে সে একবার পরখ করল তলোয়ারের ধার। ওয়ার্ডারটি এসেছিল গণ্ডগোলের কারণ জানতে। ঘটনা সম্পর্কে সে প্রশ্ন করল। আদালত পরিচারক অল্প কথায় তাকে ভাগিয়ে

দেবার চেষ্টা করলেও ওয়ার্ডারটি গেল না। পরন্তু বলল, সে নিজেই সব কিছুর তদন্ত করবে। এই বলে সে দ্রুত সরে যাবার ইঙ্গিত দিল। কিন্তু খুব ছোট ছোট পা ফেলতে লাগল। বোধহয় ওর বাত আছে। যাবার আগে সে একবার সেলাম করেছিল।

'কে' এসব ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাল না। বিশেষ করে সে দেখতে পেল একটা ফাঁকা জায়গা। যার কোনো দরজা নেই। সে আদালত পরিচারকের কাছ থেকে খোঁজ করল ওটা তাদের রাস্তা কিনা। আদালত পরিচারক মাথা নাড়ল। 'কে' এবার তার গতি ঘুরিয়ে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল। 'কে'র হঠাৎ মনে হয় সবসময়েই সে আদালত-পরিচারকের থেকে দু' এক পা আগে আগে চলেছে। আর ও-জায়গায় এসে তার মনে হল, সে যেন বন্দী। তার চারপাশে পাহারা। এ কথা মনে আসার পর কয়েকবার সে থামল, আদালত-পরিচারকের পার্শ্ববর্তী হবার জন্য। কিন্তু বারে বারেই আবার সে পেছনে পড়ে থাকে। এই অস্বস্তি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অবশেষে 'কে' বলল:

'এ-জায়গা দেখা আমার শেষ হয়েছে। চল এখন আমরা যাই।'

'আপনার এখনও সবকিছু দেখা শেষ হয়নি।' আদালত পরিচারক বলল।

'আমি সবকিছু দেখতে চাই না।' এতক্ষণে 'কে' যেন সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 'আমি এখন বাইরে যেতে চাই। কিভাবে এখান থেকে বার হওয়া যাবে? কোনটা বার হবার দরজা?'

বিস্ময় মানল আদালত পরিচারক। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আপনার যাবার পথ ভুলে যাননি।' আপনি কোণের দিকে চলে যান, তারপর ডানদিকে বারান্দার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। তাহলেই যাবার রাস্তা পাবেন।' 'তুমিও এস আমার সঙ্গে।' 'কে' বলল। 'আমাকে রাস্তাটা ঠিক ঠিক দেখিয়ে দাও। এখান থেকে বারান্দার অনেকগুলো অংশ দেখা যাচ্ছে। ওথেকে আমি আমার রাস্তা খুঁজে পাব না।'

যেন ধমকানির সুরে কথা বলল, আদালত পরিচারক। 'যাবার মাত্র একটি পথই আছে। আমি আপনার সঙ্গে এখন যেতে পারব না। কারণ আমায় এখন খবরটা দিয়ে আসতে হবে।' ইতোমধ্যেই আপনার জন্য আমার বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

বিলাত-ভ্রমণ—অক্ষয়কুমার নন্দী। ইকনামিক জুয়েলারী ওয়ার্কস; টালিগঞ্জ, কলিকাতা। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য চার টাকা।

অক্ষয়কুমার নন্দী লণ্ডনে গিয়েছিলেন নিজের কাজে; ওদেশে গিয়ে ব্যবসা করবার জন্যে। তবে তাঁর এ-যাওয়াটা, যারা কখনও বিলেত যায়নি, কোনোদিন যাবে না, তাদের পক্ষে লাভজনক হয়েছে। অভিজ্ঞতা আর দৈনন্দিন ডায়েরী থেকে তৈরী তাঁর 'বিলাত-ভ্রমণ' গ্রন্থটি আসলে তাঁর একার ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী; গঙ্গা আর টেমস নদীর মধ্যে যত নদী আর সমুদ্র আছে, যত দেশ মহাদেশ আছে এ গ্রন্থ বস্তুত তারই সর্বৈব বিবরণ। সে সব দেশ আর দেশীয় মানুষের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। বিলাত শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল ইংলণ্ড বটে, কিন্তু শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো স্বদেশের বাইরে সমস্ত ভূখণ্ডকে উপলক্ষ করেই। অর্থাৎ সঠিক মানে অনুযায়ী সমগ্র বহির্ভারতই আমাদের কাছে বিলাত। তাই লেখক বিলাত-ভ্রমণ বলতে কলম্বো থেকে লণ্ডন পর্যন্ত যত বন্দর আর মাটি পেরিয়েছেন তারই পরিচয় দিয়েছেন সবিস্তারে। অর্থাৎ বইটি প্রায় অর্ধবিশ্বের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

সাহিত্য হিসেবে বিলাত ভ্রমণের সার্থকতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। যা দেখলাম, কাগজে লিখে রাখলাম তার কথা—অক্ষয়বাবু কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য এ কথাও সত্য, তিন শো পাতায় কোথাও বিরক্তিকর বর্ণনা বা ভাবালুতা নেই।

২০৮।৫০

যৌবনের অভিশাপ—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ। প্রাপ্তিস্থান বুক কর্পোরেশন লিমিটেড—৫।এ, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

পতঙ্গ—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রোমাণ্টিসিজিমকে বাদ দিয়ে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং তাতে সফলও হন, তাঁদের ক্ষমতা প্রচুর। প্রেমসর্বস্ব কাহিনীর রচনাকারও, স্বীকার করতে হবে, সম-সফলতায় সমান শক্তিমান। কিন্তু মুস্কিল এই, যেহেতু প্রেম হৃদয়জাত, শারীর নয়, সেহেতু, কল্পনার প্রশ্রয় পেয়ে শেষোক্ত কাহিনী অধিকাংশস্থলেই বড় বেশী আবেগ-উচ্ছল হয়ে পড়ে, সংসাহিত্যবিচারে যা নিন্দার্হ। 'যৌবনের অভিশাপে' তাই ঘটেছে। সাধারণভাবে একটি সামান্য ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এত আবেগের আশ্রয় না নিলে তবু এ গ্রন্থটিকে লেখক রক্ষা করতে পারতেন। কোনো চরিত্রই মনের মধ্যে বিশেষ ছাপ রাখে না।

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় গড়া উপন্যাস 'পতঙ্গ'। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ সে অতীত যদি সুদূরবর্তী না হয়, উপন্যাস রচনা করতে হ'লে লেখকের পক্ষে অত্যন্ত সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পৃথ্বীশবাবু সে সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন বলে এ গ্রন্থটি সার্থক হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। চরিত্রসৃষ্টিতে ক্ষমতার পরিচয় আছে। পাঠকমাত্রের মনকেই যে 'মীরা' স্পর্শ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের ভাষার প্রতি আরও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ঘটনাপ্রবাহ যে পাঠকের মনকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, লেখনরীতি ও ভাষার মাধুর্যই তো তার প্রথম ও প্রধান সহায়ক।

২০৩।৫০, ২০৪।৫০

আর্জেনটিনার স্বদেশ সেবক পেরো—শ্রীদিলীপ-কুমার মালাকার; ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণ-ওয়ালিস স্ট্রীট; দাম ছয় আনা।

আলোচ্য পুস্তিকা উপরের গ্রন্থকারের লিখিত আরেকটি জীবন-চরিত। এই গ্রন্থে তিনি অখণ্ড লাতিন-আমেরিকার আদর্শ ও কার্যক্রমে বিশ্বাসী পেরোর জীবনী আলোচনা করেছেন। আলোচনা সহজ ও সরল।

এবারের বড়দিনে

প্রমোদে বড়দিনের ক'লকাতা এবার খুবই আকর্ষণীয়। পর্দা, মঞ্চ ও আসর সর্বদিক থেকেই খুবই সরগরম। চারদিক থেকে এবার লোকেরও আমদানী বেশ। সেই অনুপাতে বাজারও বেশ ভালো জমেছে দেখা যাচ্ছে না।

সবচেয়ে বেশী লোক আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছে ময়দান। যথাপূর্বে ঘোড়দৌড় তো আছেই, তাছাড়া ইডেন গার্ডেনসে কমনওয়েলথ দলের সংগে এগারো দিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা এবং উডবার্নসে টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ্ মিলে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক লোকের পয়সা ও মেজাজ আঁকড়ে রেখে দিয়েছে। একুনে হিসেব ধ'রলে পর্দার সম্মিলিত দর্শক সংখ্যাই বেশী, কিন্তু চিত্রগৃহ পিছু আমদানী ধ'রলে অন্যবারের চেয়ে বাজার বরং খারাপ বলেই মনে হয়। পাঁচখানি বাঙলা ছবি চলছে শহরের ১৬টি চিত্রগৃহে—"বৈরথ", "মর্যাদা", "মেজদিদি", "সহোদর" ও "ইন্দ্রজাল"। শেষের ৩খানি এই সপ্তাহে আরম্ভ হ'য়েছে দক্ষিণ ক'লকাতার নতুন চিত্রগৃহ "ভারতী"র উদ্বোধন ক'রে। "ভারতী"ও বড়দিনের একটা বড় আকর্ষণ। হিন্দী ছবির মধ্যে নতুনদের মধ্যে পড়ে "মংগলা", "নই ভাবী" ও "পুতলী" এবং চলতিদের মধ্যে "বরসাৎ", "বাবুল", "দাস্তান" ও "সংগ্রাম"—সব মিলে দখল ক'রে রেখেছে ১৯টি চিত্রগৃহ। বিদেশী ছবির চিত্রগৃহে সাতটিতেই নতুন ছবি থাকলেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হ'লো "সিণ্ডারেলা"।

মঞ্চের দিকে স্থায়ী তিনটি মঞ্চে তিনখানি নতুন নাটক আরম্ভ হ'য়েছে "পেশোয়া মাধবরাও", "পথের রাজা" এবং "খবর বলছি"। এছাড়া রয়েছে বহুরূপী সম্প্রদায়ের নাটোন্দান "ছেঁড়া তার"।

আসরের দিক থেকে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন তো আছেই, তারপর ১লা জানুয়ারী থেকে রয়েছে উদয়শঙ্কর ও তৎসম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান।

অন্যান্য বছরের মতো সার্কাস দলও এসেছে, তবে তাদের তাঁবু ফেলতে হয়েছে শহরতলীতে। প্রতিবছরের মতো চারুকলা প্রদর্শনীটিও শহরের একটা বড়ো আকর্ষণ।

সমস্ত আকর্ষণ মিলিয়ে বড়দিনের ক'লকাতা জমকালো খুবই। কিন্তু সাধারণ আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ায়, রাস্তায় ভ্রাম্যমান লোকেরই ভীড় দেখা যাচ্ছে বেশী, সে তুলনায় প্রমোদগৃহগুলিতে জনসমাগমের তেমন বিশেষ চাপ নেই।

নূতন ছবির পরিচয়

মংগলা জেমিনির হিন্দী ছবি, ২২শে ডিসেম্বর থেকে বসুশ্রী, ওরিয়েণ্ট ও দীপক দেখানো হচ্ছে। পরিবেশক রাজশ্রী পিকচার্স।

রঙ্গজগৎ

কোনো এক দেশের এক রাজকুমার সেই দেশের এক কৃষক-কন্যার প্রণয়াসক্ত হন; কিন্তু কৃষক-কন্যা মংগলা রাজকুমারকে জানত, জানত যে, সে স্ত্রীলোকদের শিকার রূপেই পেতে চায়। এই কারণে রাজপুত্রকে সে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু রাজকুমারের জেদ, তার মংগলাকে চাই-ই। মংগলারও জেদ বেড়ে যায়, সেও প্রতিজ্ঞা করে যে, সে রাজকুমারের জালে পা দেবে না। কিন্তু রাজরোষের দ্বারা তাড়িত হয়ে মংগলাকে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে হল; সে দেখল, সে যদি রাজকুমারকে বিবাহ করতে সম্মত না হয়, তাহলে তার নির্দোষ বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করা হবে। পিতার প্রতি স্নেহের বশে মংগলা আত্মসমর্পণ করল। রাজকুমারের সংগে তার বিয়ে হল। মনে হল এইখানেই হয়ত নাটোর পরিণতি ঘটবে, কিন্তু আসলে নাটক শুরু হল এখানেই। রাজকুমার মংগলার সংগে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করল এবং অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল। মংগলাকে নিয়ে গিয়ে এক দুর্গম দুর্গে বন্দী করে রাখল রাজকুমার। বন্দিনী মংগলা এক বীভৎসা প্রহরিণীর দ্বারা তাড়িত ও উৎপীড়িত হতে লাগল এবং প্রহরিণীকে এক রাত্রে ভূতের ভয় দেখিয়ে তার কামরা থেকে বের করে দিল। এবার মংগলা সেই দুর্গম দুর্গ ও তার পিতৃগণের মধ্যে এক সুড়ংগ খনন করে তার পিতার নিকটে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এই রাজপুত্রকে সে তার পুত্রের দ্বারা অপমানিত করাবে। মংগলা শুরু করল তার ষড়যন্ত্র। এক যাদুকর দলের সংগে সে করল বন্দোবস্ত এবং সেই দলের নাচিয়ে সেজে রাজদরবারে গিয়ে মোহিনী নাচ নাচতে লাগল। নাচ দেখে রাজকুমার মুগ্ধ; কিন্তু রাজকুমার চিনতে পারল না যে, এই মোহিনী নর্তকী তারই বন্দিনী। রাজকুমারের আদেশে যাদুকর নর্তকীকে রাজকুমার সমীপে পাঠালো। এইখানে দুজনের মিলন হল এবং তার ফলে মংগলার এক পুত্র জন্মাল। সে তখন চলে গেল তার দুর্গের কারাগারে। পুত্র ক্রমশ বড় হল এবং দেখতে হল অবিকল তার পিতার মত। মায়ের আশীর্বাদে সেই পুত্র একদিন পিতাকে বন্দী করল রাজকুমার সেজে এবং সেইখানে পিতা-পুত্রের পরিচয় হল এবং রাজকুমার অনুতপ্ত হয়ে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল মংগলার কাছে। এইখানেই যবনিকা।

জেমিনীর বই জাঁকজমকপূর্ণ। এর আগে এঁদের 'চন্দ্রলেখা' ও 'নিশান' দর্শকদের যতটা আনন্দ দান করতে পেরেছে, এই বইও ততটা আনন্দ দিতে পারবে। মংগলার চরিত্রে ভানুমতীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ সরলা কৃষক বালিকার চরিত্র-চিত্রণে যতটা দক্ষতা ভানুমতী দেখিয়েছেন, কৃষক-কন্যার ছদ্মবেশে মোহিনী নর্তকীর চরিত্র-চিত্রণেও দক্ষতা দেখিয়েছেন ততটাই। ভানুমতীর সু-অভিনয়ই বইটাকে টেনে নিয়ে গেছে বলা যায়। তার চেহারারই একটা আবেদন আছে, তার ওপর নৃত্যেও তাঁর পারদর্শিতা কম নয়, অভিনয়াংশও সেইরূপ। গানের কথা বলা গেল না, কেননা, এগুলি প্লে-ব্যাক কি না অথবা ভানুমতী কর্তৃক গীত কি না তা জানা নেই। যাই হোক, গানগুলি সুগীত হয়েছে। মোট কথা এই যে ভানুমতীকে কেন্দ্র করেই গল্পটা যেমন গড়ে উঠেছে, ভানুমতীকে কেন্দ্র করেই তেমনি জেমিনীও গড়ে উঠবে বলে মনে হয়। এমন সু-অভিনেত্রী সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। জেমিনী নিশ্চয় এঁর জন্য গর্বিত।

নায়কের ভূমিকায় রঞ্জনের অভিনয় সর্বত্র সমান হয় নি। মাঝে মাঝে তাঁর অভিনয় যেন ঝুলে গেছে। রাজকুমারের চরিত্র অতিরিক্ত রূঢ়, এই রূঢ়তা প্রকাশ করার অস্বাভাবিক চেষ্টার দরুণই হয়ত এমন হয়ে থাকবে। রঞ্জন দুইটি চরিত্র অভিনয় করেছেন—রাজকুমার ও রাজকুমারের পুত্র। রাজকুমারের পুত্ররূপে তাঁর অভিনয় অধিকতর সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হয়েছে।

জেমিনির ছবি সিসিল বি ডি মিলির ছবির মত জাঁকজমকপূর্ণ। এই জাঁক বজায় রাখবার জন্যে ছবিতে আঁট-আঁট জামা পরা অগুন্তি মেয়ে আমদানী করতে হয়েছে। শারীরিক কলা-কৌশল দেখানো ব্যতীত এই মেয়েদের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। রাজকুমারের লাম্পট্যের পরিচয় দেবার জন্যেই যদি এদের আনা হয়ে থাকে, তাহলে বলব, সেদিক থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি; কিন্তু দর্শকদের নয়ন-রঞ্জনের জন্যে যদি পরিচালক এদের এনে থাকেন, তাহলে তা ফলপ্রসূ হয়েছে।

নাচ ও গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ওপর যাদুকর দলের যাদুক্রিয়াগুলিও ভালো।

শব্দগ্রহণ ও ফটোগ্রাফী উচ্চাংগের। ভারতীয় ছবির পক্ষে এদিক থেকে জেমিনীর ছবির উৎকর্ষতা স্বীকার করতে হবে। পরিচালনাও সুচারু হয়েছে। প্রধান চরিত্রের দিকে কড়া নজর রেখে ছোটখাট চরিত্রের প্রতি পরিচালক যে উদাসীনতা দেখান নি, এইটে আশার কথা। বিশেষ করে ভারতীয় ছবির পক্ষে।

জেমিনী তিনটি জাঁকজমকপূর্ণ ছবি উপহার দিলেন। তাঁদের এই শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তাঁরা যদি এবার কোন ভারতীয় কাহিনী—

সামাজিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নিয়ে একটা ছবি তোলেন, তাহলে ভারতবাসী তাঁদের অভিনন্দিত করবে।

মর্যাদা (ভবানী কলামন্দির—ইন্দ্রপুরী স্টুডিও)—

কাহিনী ও সংলাপ : শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র : তারা দত্ত, শব্দযোজনা : শিশির চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনা : রাম পাল ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নৃত্য পরিকল্পনা : শ্যামসুন্দর, আবহ-সংগীত : দক্ষিণামোহন ঠাকুর। ভূমিকায় : পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, অরূপকুমার, জীবেন বসু, হরিধন, ফণী রায়, নবদ্বীপ, বাণীবাবু, আশু বোস, নৃপতি, স্মৃতি, মনীষা, রেবা বোস, প্রেমকুমারী প্রভৃতি।

কনক ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে ছবিখানি ১৫ই ডিসেম্বর রূপবাণী, অরুণা ও ইন্দিরাতে মুক্তিলাভ করেছে।

ঠিক আশা মতোই "অভিমান", "জিপসী মেয়ে" ও "অপবাদ"-এর প্রযোজক তার ধারারই আর একখানি ছবি এনে উপস্থিত ক'রেছেন। তবে "মর্যাদা"-র অতিরিক্ত বাহাদুরী হ'চ্ছে যে, এ ছবিখানির মার্কা "U" অর্থাৎ সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য এবং বিজ্ঞাপনে বেশ ফলাও ক'রে জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে যে, এতোদিন যে-প্রযোজক কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ছবি তুলেছেন আজ তিনিই তাঁর ছবির দর্শক-গোষ্ঠীর মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও ভিড়িয়ে নেবার আয়োজন ক'রেছেন। আসলে কিন্তু ছবিখানির "U" সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্যতা খুবই সন্দেহজনক।

গল্পে, সাজে-পোষাকে, ঢঙে-ভঙ্গীতে বম্বেকে নকল ক'রে যাওয়ার যে মর্যাদাহানিকর ব্রত প্রযোজক সরোজ মুখার্জি গ্রহণ ক'রে বাঙলার চলচ্চিত্রে অপবাদ এনে দিয়েছেন এ-ছবিখানিও তার একটি দর্পিত ঘোষণা। বাস্তবতা, যুক্তিযুক্ততা ও শ্লীলতার মানকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার দৃষ্টান্তে বম্বের প্রযোজকদেরও তিনি প্রায় পরাস্ত ক'রে এনে ফেলেছেন।

গল্প মানেই অবাস্তব ও অনিয়মিত কতকগুলি চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ছাড়া কিছু ধারণায় ধরতে না পারলে যে বস্তু সৃষ্টি হয় "মর্যাদা"-র আখ্যানভাগও তাই, কাহিনীবিন্যাসও তাই। আগাগোড়া সর্বকিছু কৃত্রিম; রূপ ও রীতির বিকৃতিই সার, রুচীর কথা তো তোলাই বাহুল্য।

ছবির আরম্ভ দেওয়ালের গান সহযোগে পুষ্পমাল্য সজ্জিত নেতাজীর প্রতিকৃতির প্রকাশে এবং তা থেকে টানা একেবারে কোমর দোলানো নাচের আসরের ওপর। তার পরেই রাস্তার ওপর বারান্দায় একটি মেয়ের একা দাঁড়িয়ে রাস্তার লোককে শুনিয়ে গান। গানের শ্রোতা দেখা গেলো সামনের বাড়ীর তলাকার ডিস্‌-পেনসারির জানলায় লোলুপদৃষ্টি ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার। গান থামতে দেখা গেলো একখানি গরীব গৃহস্থ ঘর, স্বামী-স্ত্রী। মুখরা স্ত্রী ঝংকার দিয়ে মেয়ের চালচলন সম্পর্কে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছে—বারান্দার সেই মেয়েটি। ভদ্দরলোকের নাম কুমার মিত্র, ছাপাখানার কম্পোজিটার। মেয়ের নাম ছবি। ছবি এসে জানালে যে তার বড়লোক বান্ধবী ডলি তাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী পাঠিয়েছে। মার আপত্তি সত্ত্বেও বাপের অনুমতি নিয়ে ছবি গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। সামনের ডিসপেনসারির ডাক্তারও ছুটে এলো সেই সুযোগে ছবির কাছে তার প্রেম নিবেদন করতে। ছবি জানালে যে প্রেমের পথে বাধা হ'চ্ছে ডাক্তারের গায়ের জীর্ণ কোটটি। ডলির বাড়ীতে পৌঁছতে ডলি তার প্রেমিক প্রশান্তর কাছে মিথ্যে ক'রে ছবিকে বিখ্যাত ধনী কুমার বাহাদুরের কন্যা ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলে। ছবির গানেও প্রশান্ত মুগ্ধ হলো। ফিরবার পথে ছবিকে সে বাড়ী পৌঁছে দিতে গেলো। গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো কুমার বাহাদুরের অট্টালিকার সামনে। ছবি সেখান থেকেই প্রশান্তকে বিদায় দিতে চায়, কিন্তু প্রশান্ত নাছোড়বান্দা, ছবিকে একেবারে ঘরে না তুলে দিয়ে সে যাবে না। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দুজনের বহুক্ষণ বাক্যব্যয় চললো বিদায় প্রহসন নিয়ে। লোকজনের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, প্রশান্ত চলে না যাওয়া পর্যন্ত। প্রশান্ত যাবার পর ছবি চলে যেতে উদ্যত হতেই রিভলবার নিয়ে এক পাগলাটে লোকের আবির্ভাব। ইনিই কুমার বাহাদুর। ছবিকে সে চোর ব'লে ধ'রে নিয়ে পুলিশে ফোন ক'রে দিলে। ছবি অমনি 'বাবা' ব'লে কুমার বাহাদুরের পা জড়িয়ে ধরলে। যাদুবৎ কুমার বাহাদুরের নিজের মৃত কন্যার কথা মনে পড়ে হৃদয় গলে গেলো। কাজেই পুলিশ আসতে কুমার বাহাদুর বাজে কথা বলে তাদের ভাগিয়ে দিলেন। কুমার বাহাদুর ব'লেই বোধ হয় তাদের অনর্থক হয়রাণ করা সত্ত্বেও, পুলিশ তাকে কিছু না ব'লেই চলে গেলো! প্রশান্ত পরদিন ছবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে এসে হাজির। কুমার বাহাদুরের সখ ছবি আঁকা। প্রশান্ত কুমার বাহাদুরের ছবির তারিফ ক'রে ছবির প্রসঙ্গে আসতে চেষ্টা করলে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে চলে যেতে হলো। তারপরেই এলো ছবি আগের রাতের ব্যাপারের জন্যে ক্ষমা চাওয়ার বাহানা ধ'রে। প্রসঙ্গক্রমে প্রশান্তর আসার কথা প্রকাশ পেলো এবং প্রশান্তর ওপরে ছবির ঔৎসুক্যের টান লক্ষ্য ক'রে কুমার বাহাদুর ছবিকে জেরা ক'রে রাতারাতি গড়ে ওঠা ওদের সম্পর্ক জেনে ফেললেন। প্রশান্তর বাবা স্যার বিজন বসু তার ছেলে বিখ্যাত কুমার বাহাদুরের একমাত্র মেয়ের প্রণয়প্রার্থী জেনে খুশী হলেন। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়েটা পাকা করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হলেন। এদিকে ছবি এসেছিলো কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে। কুমার বাহাদুর তখন কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছিলেন। ওষুধের বড়ী খাওয়ার জন্যে জলের দরকার হওয়ায় ছবি তার হাত-ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে জল আনতে গেলো। সেই সুযোগে কুমার বাহাদুর ছবির ব্যাগে একগাদা টাকা পুরে দিলেন। ছবি বাড়ীতে ফিরতে তার ব্যাগে টাকা দেখে বাপ-মা স্তম্ভিত হলো। কিভাবে টাকা এলো ছবি বলতে না পারায়, ছবি কি ক'রে টাকা পেলে তা জানবার জন্যে কুমার মিত্র কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এলো। কুমার বাহাদুর বাড়ীতে তখন নেই, কুমার মিত্র অপেক্ষা করছেন এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন স্যার বিজন। বলা বাহুল্য দুজনেই পরস্পরকে কুমার বাহাদুর ব'লে ধরে নিলেন এবং সামান্য দু-এক কথাতেই প্রশান্ত ও ছবির বিয়ে পাকা হয়ে গেলো। এরপর আসল কুমার বাহাদুর প্রশান্তের ওপরে ছবির টান দেখে স্যার বিজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করতে গিয়ে হাজির হলেন। স্যার বিজন আসল কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেদিনের তার দেখা ব্যক্তিটির মিল না পেয়ে তাকে জোচ্চোর আখ্যা দিয়ে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন। এর পর প্রশান্ত কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ছবির পরিচয় সূত্রে জানতে পারলে যে সে কুমার বাহাদুরের কেউ নয়, এক দরিদ্র কম্পোজিটরের মেয়ে মাত্র। প্রশান্ত ছবির বাড়ীতে এসে তাকে অপমানিত করে প্রেম ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। প্রশান্ত ফিরে গেলো ডলির কাছে এবং তার কাছ থেকে জানলে যে সে-ই ছবির মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাকে বিপাকে ফেলার ব্যবস্থা করে। কুমার বাহাদুর চোখের জল আর আদুরে কান্নায় 'বাবা' ডাক সইতে পারেন না। তাই ছবি তার কাছে গিয়ে কেঁদে বাবা ব'লে পা জড়িয়ে ধরতেই কুমার বাহাদুর গলে গিয়ে ছবিকে মেয়ে বলে স্বীকার ক'রে সব সম্পত্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। এরপর প্রশান্তর বাপ স্যার বিজনের এই বিয়েতে আর আপত্তি রইলো না। ঘটা ক'রে বিয়ের আয়োজন হয়েছে এমন সময়ে আসরে এসে উপস্থিত ডলি। বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র বের ক'রে ছবির ওপর সে বাপের পরিচয় লুকোবার অপবাদ আরোপ করলে। যদিও এটা সবারই জানা ব্যাপার, এমন কি ছবিরও কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন করে ছবির চোখ খুলে গেলো: সে জানালে যে তাকে যদি তার দরিদ্র ঘর থেকে তুলে আনা হয় তবেই

সে বিয়ে করবে। বলেই সে পালিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে। প্রশান্তও বলা বাহুল্য, পিছন পিছন ছুটে এলো এবং সেখানেই সে ছবির গলায় মালা পরিয়ে দিলে।

গল্পতে বংশমর্যাদা বা আত্মমর্যাদা কোন মর্যাদারই ইজ্জত রাখা হয়নি, আর প্রেমের মর্যাদাকে তুলে ধরা হয়েছে দৌলতের ওজনে। চরিত্রগুলি উন্মাদাগারের পলাতক রুগী সব। সঙ্গতীবিহীন চালচলন, কথাবার্তা সবায়ের। ঘটনাগুলির মধ্যেও সাবলীলতার সাড়া নেই।

ছবিখানি সেন্সর হওয়া এবং "ক" সার্টিফিকেট পাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উদ্বোধনেই নেতাজীর ছবি ধরে নাচগান আরম্ভ অত্যন্ত আপত্তিজনক। ছবিতে অকারণ নেতাদের প্রতিকৃতি ব্যবহার না করার একটা নির্দেশ আছে সেন্সর থেকে—এখানে তা পালিত হয়নি। ডলির বাড়ীর পার্টিতে দুটি মেয়ের পাশ্চাত্য ঢঙে শ্লীলতা-বর্জিত পোষাকে কামাতুরভঙ্গী সহযোগে নাচ "ক" সার্টিফিকেট পাবার যোগ্য হয় কোন বিবেচনায়? অশ্লীলতার আরও উদাহরণঃ প্রশান্তর প্রশ্নে ডলি জানালে সে চলেছে 'ড্রেস চেঞ্জ করতে,' বলেই সে মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনে প্রশান্তর হাত ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে পোষাক বদলাতে যাওয়া; কুমার বাহাদুর ও কুমার মিত্রের মধ্যে বিয়ের প্রসঙ্গে সংলাপে 'মেয়েতে মেয়েতে বিয়ের' কথা বলে পরিহাস ইত্যাদি। সেন্সরের মতে তাহলে এসবও স্পর্শকাতর অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পরিবেশন যোগ্য! না, এর মধ্যে এমন কোন রহস্য রয়েছে যার জন্যে সেন্সর এসব উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে?

ছবিখানির সবই কেমন বেজাতের। ভাষা ও নামাদি থেকে চরিত্রগুলিকে বাঙালী ও বাঙলা সমাজেরই অন্তর্গত বলে মনে হয়, কিন্তু ভাবভঙ্গী ও চলনবলন একেবারেই আলাদা—বাঙালী তো নয়ই, একেবারেই কোন জাতে পড়ে কি-না ভেবে দেখবার বিষয়। কাহিনীর বিবৃতিপ্রসঙ্গে ডলিদের উগ্র-আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু দেখানো যা হয়েছে তাকে না ফেলা যায় তথাকথিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে, আর না পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আধুনিকতার কোন সঠিক লক্ষণ। স্যার বিজন হলেন লর্ড ক্লাইভের আমলের আধুনিক। কুমার বাহাদুর বা ডাক্তারকে ফেলা যায় উন্মাদ-সমাজে। ছবিখানিতে সার বলতে কিছু নেই। দেখার পর, কি পেলুম ব'লে কোন ভাবনা ওঠে না, কিন্তু ভাবনা হয় এই ভেবে যে, যা দেখা ও শোনা গেলো তা দেখবার বা দেখাবার উপযুক্ত কি-না।

পরিচালক দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল ইংলণ্ডে ছিলেন; মহাপ্রতিভাবান পরিচালকের সহকারীরূপে তিনি কাজ করেছেন। এবং তিনি ছিলেন এমনি সময়ে যখন ইংলণ্ড ছবির নতুন রূপ ও সংজ্ঞা গড়ে তুলে পৃথিবীর মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। ছবিতে কি ধরণের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করে এবং কিভাবে পরিবেশন করে ইংলণ্ডের ছবি পৃথিবী জয়ে সক্ষম হলো, তার সে ব্যক্তিগত জ্ঞান থাকারই কথা; এখানে তিনি সে-জ্ঞানের অমর্যাদাই ঘটিয়েছেন।

এ-ধরণের ছবির অন্যান্য দিকের আলোচনা অবান্তর। যে ছবিকে আদপেই গ্রাহ্য করে নিতে আপত্তি, তার কলাকৌশলাদি বা অভিনয় প্রভৃতির কোন পর্যায়ে পড়ে সে বিচার করাই নিরর্থক।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল বর্তমানে বাঙলার অতিথি। বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ অতিথির প্রতি যথাবিহিত কর্তব্যপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই, সুতরাং এই বারেও হইবেন না। তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলে মুস্তাক আলী গৃহীত না হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন মাঠে ভীষণ গণ্ডগোল হইবে; কিন্তু আমরা একরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি, এইরূপ কোন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় হইবে না। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর ত্রুটির জন্য ক্রীড়া অনুষ্ঠান পণ্ড করিবার মত হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক বাঙলার ক্রীড়ামোদিদের মধ্যে কেহ আছেন বলিয়া আমরা ধারণাই করিতে পারি না। ক্রিকেট পরিচালকগণের নিকট নাকি ইতোমধ্যেই কয়েকখানি ভীতি উদ্রেককারী পত্র গোপনে প্রেরিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে নাকি এই বিষয় উদ্যোক্তাগণ শান্তিরক্ষক পুলিশ কর্তৃপক্ষগণের সহিতও আলোচনা করিয়াছেন, এইরূপ সকল সংবাদ লোক মুখে পরম্পরায় প্রচারিত হইতেছে। উদ্যোক্তাগণ যখন এই সম্পর্কে কোন কিছুই প্রচার করেন নাই, তখন এই সকল গুজবে বাঙলার দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত সমাজ কখনই চঞ্চল হইয়া উঠিবেন না এই বিশ্বাসও আমাদের আছে। বিশেষ করিয়া মুস্তাক আলী বাঙলার খেলোয়াড় নহেন—তাঁহাকে লইয়া বাঙলার ক্রীড়ামোদীদের হৈ চৈ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। আমরা দুঃখিত হইলাম শুনিয়া যে, মুস্তাক আলী কোন কোন সংবাদ-পত্রের প্রচারিত সংবাদ দেখিয়া টেস্ট খেলার সময় কলিকাতায় আসিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়াছেন। এমনকি পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপালের দলে খেলিবার জন্য যে অনুরোধপত্র তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাও তিনি সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে লইয়া কলিকাতার মাঠে কোনরূপ গোলমাল হয় ইহা তিনি মোটেই ইচ্ছা করেন না বলিয়াই বাধ্য হইয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মুস্তাক আলী তাঁহার বিচার বুদ্ধিতে যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন এবং সেই বিষয় আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তবে আমরা এই অবস্থা সৃষ্টি-কারীদের যা কোনরূপেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। ইহারা বাঙলার ক্রীড়ামোদীদের কপালে অযথা কলঙ্ক কালিমা লেপনের কারণ হইলেন ইহাই অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়।

মিঃ ডাকওয়ার্থের অযৌক্তিক উক্তি

কমনওয়েলথ দলের ম্যানেজার মিঃ ডাকওয়ার্থ সম্প্রতি নাগপুরে কোন এক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন, "অমারা পাঁচটি টেস্ট খেলিতে আসিয়াছি ১৫টি নহে।" এই উক্তি তিনি করিয়াছেন যেহেতু মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের দলে ভারতের তৃতীয় টেস্ট দলের নির্বাচিত তিনজন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ ডাকওয়ার্থ কেবল উক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না বেশ কিছুটা হৈ চৈ করেন ও আপত্তি জানান এই বলিয়া যে কমনওয়েলথ দলের খেলোয়াড়গণ ইহার জন্য বিশেষভাবেই পরিশ্রান্ত হইতেছেন। সাধারণ খেলাতেও সকল দলকে রীতি-মত লড়িতে হইতেছে। মিঃ ডাকওয়ার্থের আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকে নাই পরিচালকগণের অনুরোধে তাঁহাদের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধেই খেলিতে হইয়াছে। মিঃ ডাকওয়ার্থের আপত্তি সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ইংলণ্ডের বর্তমান অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দলকে কিরূপ দলের সহিত বিভিন্ন স্থানে খেলিতে হইতেছে তাহাও বিশেষভাবেই অবগত আছেন, ইহার পরও কি করিয়া এইরূপ অযৌক্তিক আপত্তি ও হৈ চৈ করিলেন আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। কমনওয়েলথ দলের ম্যানেজার হিসাবে তিনি গত বৎসরও ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সময়েও বহু স্থানেই ভারতের টেস্ট খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ দলকে খেলিতে হইয়াছে। সেই সময় যদি আপত্তি না হইয়া থাকে বর্তমানে ভ্রমণের অর্ধেকের অধিক খেলা শেষ করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা খুবই অন্যায় হইয়াছে। কোন এক সাংবাদিক এই প্রসঙ্গে যে উক্তি করিয়াছেন, "ডাকওয়ার্থ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না," আমরা তাহা সমর্থন করি না, তবে এইটুকু না বলিয়া পারি না যে, তিনি নেহাৎ বালকোচিত জ্ঞানহীনের মত উক্তি করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এইরূপ করিলে পরিণাম খুব মধুর হইবে না।

এম সি সির ভারত ভ্রমণে বিপত্তি

১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের এম সি সি দল ভারত ভ্রমণ করিবে ঠিক আছে এবং উহা ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভাতেই স্থির হইয়াছে। সেই ভ্রমণ ব্যবস্থা হইবে কিনা এই লইয়া কোনরূপ আলোচনাই যে পরে হইতে পারে ইহা আমাদের ধারণাতীত ছিল। বর্তমানে ইংলণ্ড হইতে প্রচারিত কয়েকটি সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতেছে। আমাদের প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "অন্য কোন দেশের ভ্রমণ বাতিল করিবার কথা যখন ইতোপূর্বে কখনই হয় নাই তখন একমাত্র ভারতের ভ্রমণ লইয়া এত হৈ চৈ কেন?" ভারত ক্রিকেট খেলায় খুব উন্নতি করিয়াছে, যে কোন দল ভারতে প্রেরণ করিলে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইবে এই আশঙ্কাই কি বর্তমানে ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে? "ইহার পশ্চাতে কি কোন রাজনৈতিক চাল আছে?" "হঠাৎ এই রাজনৈতিক চালের কি কারণ হইতে পারে তাহা কি ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকদের স্পষ্ট ভাষায় বলিবার সাহস আছে?" ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্নই আছে যাহা একের পর এক করিলে এক বিরাট পুস্তক রচিত হইতে পারে।

সংবাদে বলা হইয়াছে, খেলোয়াড় সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রমণ ব্যবস্থা ঠিক করিবার পূর্বে এই কথা স্মরণ করিয়াই মতামত দেওয়া উচিত ছিল। একটা ব্যবস্থা করিয়া হঠাৎ একটা অজুহাত দিয়া বাতিল করিলে কেবল যে ভারতের ক্রিকেট পরিচালকগণ বিরত হইবেন তাহা নহে, সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিচালকদের সম্বন্ধে খুব বড় কিছু ধারণা পোষণ করিবেন না।

কমনওয়েলথ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের দল

কমনওয়েলথ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের দলের তিন দিনব্যাপী খেলা নাগপুরে অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলাটি পাটের নির্মিত ম্যাটে খেলান হয় ও উভয় দলের ব্যাটসম্যানগণই বিশেষ সুবিধাজনক রান সংগ্রহ করিতে পারেন না। কমনওয়েলথ দল প্রথম খেলিয়া ২৩৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করিলে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের দল প্রথম ইনিংসে ২১৬ রান সংগ্রহ করেন। পরে কয়েক ঘণ্টা খেলিবার সুযোগ পাওয়ায় কমনওয়েলথ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৭ উইকেটে মাত্র ১৫১ রান করেন। খেলার ফলাফলঃ কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস ২৩৮ রান (গিম্বলেট ১১১, ফিনিক ২২, ট্রাইব ৪৬, ওরেল ২০, জি এস রামচাঁদ ৮০ রানে ৫টি, এস ডবলিউ সোহনী ৯২ রানে ২টি উইকেট পান)।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের প্রথম ইনিংসঃ—২১৬ রান (সোহনী ৪৮, কিষেণচাঁদ ৪৮, জি রামচাঁদ ৩২, বিনু মানকড় ৩৩, রিজওয়ে ৩৯ রানে ২টি, ট্রাইব ৭১ রানে ২টি ও ডোভে ১৯ রানে ২টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৭ উইঃ ১৫১ (গিম্বলেট ৫৩, এমেট ৬৫, কিষেণচাঁদ ৫৬ রানে ২টি, কে কেশরী ১৭ রানে ৩টি উইকেট পান)।

টেনিস

পাকিস্থান লন টেনিস এসোসিয়েশন পরি-চালিত এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতি-যোগিতা কোনরূপে শেষ হইয়াছে। নির্বাচিত চেক খেলোয়াড় ও বর্তমানে মিশরের প্রতিনিধি জে ড্রবনী পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। মিক্সড ডাবলস ফাইনালে পরাজিত হইয়াছেন নতুবা তিনটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হিসাবে গৌরবলাভ করিতেন। মহিলা বিভাগে আমেরিকান মিস হার্টই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

জে ড্রবনী (মিশর) ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ গেমে এফ কোভালেস্কিকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস ডোরথী হার্ট (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে মিসেস এ জে মোট্রাসকে (ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

ড্রবনী (মিশর) ও ইফতিকার আমেদ (পাকিস্থান) ৬-২, ৬-১, ৬-২ গেমে হ্যান্স রেডল ও এ হুবারকে (অস্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিসেস মেট্রোম ও মিস কে টাকে (ব্রিটেন) ৬-২, ৩-৬, ৬-৪ গেমে মিস ডোরথী হার্ট (আমেরিকা) ও মিসেস ডোলেশচালকে (অস্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

মিঃ ও মিসেস মোট্রাস (ব্রিটেন) ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে জে ড্রবনী (মিশর) ও মিসেস রিটা এণ্ডারসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ কর্তৃক উত্থাপিত ভারতীয় আয়কর আইন সংশোধন বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এইদিন পার্লামেণ্টে দ্রব্য সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কিত বিলটি গৃহীত হইয়াছে।

বাঙলার চারিটি প্রধান ব্যাঙ্ক—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও হুগলী ব্যাঙ্ক একীভূত হইয়া 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত হইয়া অদ্য হইতে কার্যারম্ভ করিয়াছে।

নেপালী কংগ্রেস বাহিনী বিরাটনগরের প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে ভোজপুর শহর দখল করিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, ভারতের পূর্ব সীমান্তের সন্নিকটে একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বহু সংখ্যক চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য রিমা নামক স্থানটি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। 'ম্যাকম্যাহন' সীমারেখার ঠিক অপরপারেই রিমা অবস্থিত।

এয়ার ইণ্ডিয়ার নিরুদ্দিষ্ট ডাকোটা বিমানটি অদ্য কোয়েম্বাটুরের নিকটস্থ অরণ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই বিমান দুর্ঘটনায় বৈমানিকসহ ২০ জন যাত্রী নিহত হইয়াছেন।

গত রবিবার সকালে এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার যে ডাকোটা বিমানটি টাঙ্গাইলের নিকট দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহাতে ৪ জন বৈমানিকের মধ্যে দুই জন এবং ১৭ জন যাত্রীর মধ্যে দুইজন নিহত হইয়াছেন।

ব্যারাকপুরের নিকট এক রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পার হইবার সময় একখানি ট্রেনের সহিত একটি বাসের সংঘর্ষের ফলে তিনজন লোক নিহত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, বিশ্বকে যদি বর্তমানের ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এমন এক নূতন মানব-সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যেখানে মানুষ শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রীড়নকরূপে পরিণত না হইয়া স্বাধীনতা ও মুক্তির আধাররূপে স্বীকৃতি পাইবে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে চিনির রেশন ব্যবস্থা আর বলবৎ থাকিবে না, তবে বে-সরকারীভাবে রেশনের দোকান হইতে বর্তমান হারে চিনি বণ্টন-ব্যবস্থা পূর্ববৎ চালু থাকিবে।

২১শে ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, নেপালের প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, নেপালের শাসন সংস্কার ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তিনি এক ঘোষণাবাণী প্রস্তুত করিতেছেন। বর্তমান মাস শেষ হইবার পূর্বে উক্ত ঘোষণাবাণী নেপালের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হইবে।

শ্রীনেহরু নেপাল সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে রাজা ত্রিভুবন সম্পর্কে ভারতের মনোভাব পুনরায় ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, শান্তি ও স্থায়িত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম সাহেরই নেপালের রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, তিনি পাকিস্থানের প্রধান-মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন যে, কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের পর লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি করাচী পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। ভারত ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে 'যুদ্ধবর্জন ঘোষণা সম্পর্কে' যে পত্র বিনিময় হইয়াছে, শ্রীনেহরু অদ্য তাহা পার্লামেণ্টে পেশ করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, নৌ বা বিমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের কথা গভর্নমেণ্ট চিন্তা করিতেই পারেন না—সমরশক্তি কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না করিয়া গভর্নমেণ্ট যথাযথ সতর্কতার সহিত স্থল সেনার সংখ্যা হ্রাস করিতেছেন।

নদীয়া জেলার সীমান্তে তেহট্ট থানার অধীন ভাটুপাড়া অঞ্চলে ভারতীয় ইউনিয়নের সীমান্ত-রক্ষী পুলিশ দল ও অপরপারের পাকিস্থানী পুলিশের মধ্যে উপর্যুপরি দুইদিবস ধরিয়া গুলী বিনিময় হইবার এক সংবাদ কলিকাতায় পাওয়া গিয়াছে।

২২শে ডিসেম্বর—কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা অদ্য কলিকাতায় এক ভাষণকালে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যাহাই ঘটুক না কেন, কাশ্মীরে আমরা পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। আমরা কিছুতেই কাশ্মীরে পাকিস্থানের দুই জাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে এবং আমাদের দেশকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হইতে দিব না।"

২৩শে ডিসেম্বর—কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কাশ্মীরে গণভোট সাফল্যের অনুকূলে প্রথম প্রয়োজন হইল কাশ্মীরকে পাকিস্থানের আক্রমণাত্মক কবল হইতে মুক্ত করা। তিনি আরও বলেন যে, কাশ্মীরের কোন অংশ দখল করিয়া রাখার নৈতিক বা আইনগত অধিকার পাকিস্থানের নাই।

নেপালের বিরাটনগরের গভর্নর অদ্য পরিবার-বর্গ সহ আত্মসমর্পণ করেন। চতুর্দশ দিবসের পর আজ গভর্নরের প্রাসাদ অবরোধের অবসান হইল।

অদ্য শান্তিনিকেতনে উৎসবমুখর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পৌষ-উৎসব আরম্ভ হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

কটকে এক সাংবাদিক বৈঠকে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী বলেন যে, রণতলাই-গামী যাত্রীদের মধ্যে ৭৭৪ জন মারা গিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য ভারত সরকার বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৪ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর—পুণায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৯তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কোরিয়ান যুদ্ধ বিরতি কমিটি অদ্য রাজনৈতিক কমিটিকে জানাইয়াছেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির জন্য যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, চীনা কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষ উহার কোন জবাবই দেন নাই।

পশ্চিম ইউরোপে একটি সুসংহত সেনা বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে উত্তর অতলান্তিক চুক্তিতে যোগদানকারী ১২টি রাষ্ট্রের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ অদ্য ব্রুসেলস-এ এক বৈঠকে মিলিত হন।

১৯শে ডিসেম্বর—অতলান্তিক চুক্তিতে যোগদানকারী ১২টি রাষ্ট্রের দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এক যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জেনারেল আইসেনহাওয়ার অতলান্তিক রক্ষী বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন। নূতন বৎসরের প্রথমভাগে ইউরোপে তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২০শে ডিসেম্বর—চীনা কম্যুনিস্টদের পাল্টা আক্রমণে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দক্ষিণে হটিয়া আসার পর হইতে উত্তর কোরিয়ার পশ্চিম রণাঙ্গনে তিন সপ্তাহব্যাপী স্তব্ধতার পর অদ্য পুনরায় ৩০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল হইতে ৩০ মাইল দূরে ইমজিন নদীর তীরবর্তী এক স্থানে দক্ষিণ কোরায় সেনাদল দুইঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ করে।

২১শে ডিসেম্বর—লক্ষাধিক কম্যুনিস্ট সৈন্য উত্তর-পূর্ব কোরিয়ার হাংনাম রক্ষী মার্কিণ ফৌজের উপর তিনদিক হইতে চাপিয়া আসায় পেবণক্লিষ্ট মার্কিন সৈন্যগণ হটিয়া আসিয়া সংকীর্ণতর স্থানে আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করিয়াছে।

২২শে ডিসেম্বর—টোকিওর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া নিউইয়র্ক বেতারকেন্দ্র হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি কল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রয়ী কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কম্যুনিস্ট চীন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

লণ্ডনের ফ্লিট স্ট্রীটস্থ স্যালিসবেরী স্কোয়ার হাউসে গত ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ইঙ্গ-ভারত শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বৃটেনে ভারতের হাইকমিশনার শ্রীকৃষ্ণ মেনন আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার লণ্ডন অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

২৩শে ডিসেম্বর—জেনারেল ম্যাকআর্থারের এক ইস্তাহারে চংগাই অঞ্চলে চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ সমর্থন করা হইয়াছে। চংগাই ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর।

২৪শে ডিসেম্বর—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সীংম্যান রী অবিলম্বে রাজধানী সিউল ত্যাগ করিয়া আসিতে সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩ ষান্মাসিক—৬॥০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩ ষান্মাসিক—৬॥০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 6th January, 1951 [১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইতিহাসের স্রষ্টা

গত ১৩ই পৌষ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গম-তীর্থে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চিতা-ভস্ম বিসর্জিত হইয়াছে। দেহ নশ্বর, তাহা একদিন বিলীন হইয়া যাইবেই; সুতরাং সর্দার প্যাটেলের দেহত্যাগে দুঃখে মুহ্যমান হইবার কিছু নাই। প্রকৃতপক্ষে আত্মা অবিনশ্বর এবং যাঁহারা এই নশ্বর দেহকে বৃহতের সাধনায় বিসর্জন করেন, তাঁহাদের আত্মার অমর জ্যোতিঃ কালের প্রভাবকে আলো করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বস্তুত দানই এ-দেহের ধর্ম এবং দানেই ইহার মান রক্ষিত হয় এবং প্রাণধর্ম দেশ-কালের পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করিয়া অপরিম্লান মহিমায় উদ্দীপিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দেহটিকে অশেষ ভীতির দ্বারা আগলাইয়া রাখা বাঁচিবার পথ নয়, পরন্তু দেহকে বৃহৎ স্বার্থে বিনিয়োগ করিবার আর্ট বা কলাকৌশলটি অধিগত হওয়াই অমৃতত্ব লাভের উপায়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই আর্টটি অধিগত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীই তাঁহার উপদেষ্টা। মহাত্মাজীর সমগ্র জীবনটি একটি অপূর্ব আর্ট। সর্দার বল্লভভাই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যস্বরূপে তাঁহার জীবন-নীতিই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্দারজীর অবদান অপরিমিত সন্দেহ নাই; কিন্তু কালের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষায় এ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সমষ্টি-সাধনার মধ্যে হয়ত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া একটা সমন্বয়তা লাভ করিবে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যথাযথভাবে রচনা করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। সেই ইতিহাস যেদিন রচিত হইবে অহিংস-সংগ্রামের পথে জনগণের প্রাণশক্তির বিকাশ-বিলাসের পরিপূর্ণতার মধ্যে সর্দার বল্লভভাইয়ের ব্যক্তিত্ব হয়ত ততটা পরিচ্ছিন্ন থাকিবে না। বহুর মধ্যে একের অবদান তাঁহার প্রাণধর্মের বৈচিত্র্যকে প্রসারিত করিবে। কিন্তু একটি বিষয়ে সর্দার বল্লভভাইয়ের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। ভারতের লৌহমানব সেক্ষেত্রে আপন মহিমায় অচল-প্রতিষ্ঠ থাকিবেন এবং সর্দারজীর একত্ব বহুর মধ্যে বিলীন না হইয়া বহুকে বৃহৎ স্বার্থের সাধনায় নিয়ন্ত্রিত করিবে। ভারতের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর তাহা অনন্তকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি এ ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসের স্রষ্টা। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতের প্রায় ছয়শত দেশীয় রাজ্যকে অখণ্ড ভারতের সত্তার সঙ্গে সংঘবদ্ধ করিয়া সর্দারজী যে তীক্ষ্ন নীতিজ্ঞান এবং কূটবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এইখানে সর্দারজী শুধু স্রষ্টা পুরুষই নহেন, তিনি দ্রষ্টা পুরুষ। সত্যকে তিনি সোজাসুজি দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নীতি এরূপ বলিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এবং বিজীগিষার পথে বিনিশ্চিত অধ্যবসায়ে সে নীতিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে সত্যই ইহার তুলনা নাই। ভারতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব না ঘটিয়াছে, এমন নয়। এদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে অতীত যুগেও আমরা বহু বীর্যশালী পুরুষের অভ্যুদয় দেখিয়াছি। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বৃহৎ স্বার্থে ভারতের রাষ্ট্র-চেতনায় বলিষ্ঠভাবে কোন নীতিকে রূপ দিতে পারে নাই। ফলতঃ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব জীবনকালের সীমা অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শিবাজী মহারাজের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। কিন্তু সর্দারজী তাঁহার ব্যক্তিত্ব অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় জীবন্ত করিয়া গিয়াছেন। সর্দারজী দেশের জন্যই জীবন দিয়াছেন, কিন্তু সে-জীবন-দানের মধ্যে এইখানেই রহিয়াছে আর্ট। তাঁহার কর্ম-সাধনায় এইখানেই রহিয়াছে সুকৌশল এবং এইখানেই রহিয়াছে ব্যক্তি-মহিমায় নীতিকে স্থায়িত্ব দান। এই হিসাবে তিনি অমর।

যাদবগড়ে গুলী চালনা

সম্প্রতি উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে পুলিশের পীড়ননীতি অবলম্বনের ফলে একজন তরুণী মহিলাকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। টালীগঞ্জ থানার এলাকাধীন যাদবগড়ে পুলিশের গুলী চালনার ফলে এই মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে। উদ্বাস্তুদের প্রতি পুলিশের উৎপীড়ন অবশ্য নূতন নয়; ধুবুলিয়া ক্যাম্পেও কিছুদিন পূর্বে এই ধরণের ব্যাপার ঘটে। কিন্তু যাদবগড়ে সেদিন আইন ও শান্তি রক্ষার নামে যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। উদ্বাস্তুরা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া মিছিল বাহির করে, সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ইহাই তাহাদের অপরাধ। পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালায়, কাঁদুনে বোমা ছোড়ে; তারপর মহকুমা হাকিমের গাড়ি হইতে তাঁহার আর্দালী গুলী চালায়। বস্তুত এত ব্যাপার

করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। উদ্বাস্তুরা মিছিল বাহির করিয়াছিল, আইনের দিক হইতে তাহা অপরাধ হইতে পারে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ-ভাবেই তাহাদের মিছিল চলিতেছিল। সুতরাং তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়া বিক্রম প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। তারপর গুলী ছোড়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারের শাসন-বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়াছেন এবং মহকুমা হাকিমের যে আদালী গুলী ছুড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহাকে সসপেণ্ড করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সরকারী করুণার এই পরিচয়ে কেহ কৃতার্থ হইবে না। এই ধরণের শাসন-বিভাগীয় তদন্তের সাধারণত কি ফল হয়, তাহা আমাদের জানা আছে। যাদবগড়ের এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্বাস্তুঘটিত এই ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে সরকার হইতে কি নীতি অবলম্বিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রতি বিশেষ কোন নির্দেশই প্রদান করেন নাই। পুলিশ বোধ হয়, যাহা খুশী, তাহাই করিতে পারে। প্রকাশ, মহকুমা হাকিমের গাড়ির উপর ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে গুলী ছোড়া হয়। ইহার ফলে একটি নির্দোষ মহিলা আহত হন, পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বস্তুত শ্রীযুক্তা বীণাপাণি মিত্র মিছিলকারীদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি নিকটবর্তী একটি বাড়ির ভিতর ছিলেন, সুতরাং গুলী বে-পরোয়াভাবে চালানো হইয়াছিল, ইহাই বোঝা যায়। মহকুমা হাকিমের গাড়ির উপর ইট-পাটকেল যখন পড়িয়াছে, তখন গুলী না চালাইয়া থাকা যায় কি? পশ্চিমবঙ্গ তবে যে ধ্বংস হয়। সত্যই উৎকট ব্যাপার, নিষ্ঠুর এবং দায়িত্ববিহীন এমন জবরদস্তি! আমরা জিজ্ঞাসা করি, গুলী চালাইবার আদেশ কে দিয়াছিল? প্রাণের মূল্য কি এতই সামান্য! মানুষের প্রাণের মূল্য এইভাবে তুচ্ছ হইতে থাকিলে জনসাধারণের মধ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতিতে ক্রমাগত এইরূপ অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উদ্বাস্তুদের উপ-নিবেশগুলির জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন এবং সেসব জমি জরিপ করা হইতেছে, আমরা এইরূপ কথাই শুনিতেছিলাম। যে পর্যন্ত এই কাজ সম্পন্ন না হয় এবং উদ্বাস্তুদের উপনিবেশগুলির সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না হয়, ততদিন উদ্বাস্তুদের উৎখাত ——নীতি বন্ধ রাখিলে নিশ্চয়ই জমিদারী ...ন্র সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল ...কর্তৃপক্ষ প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সঙ্গে ...না- সাধারণ আইন রক্ষার ঢালা হুকুমই সম্ভবত চলিতেছে। ফলে এমন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটিয়াছে। অতঃপর কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে চৈতন্য ঘটা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু উৎখাতের নাম লইয়া লোকের জীবন লইয়া যাহাতে এমন ছিনিমিনি খেলা না চলে, সরকারের সে সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। বলা বাহুল্য, বিভাগীয় তদন্তের মামুলি যুক্তিতে এ সম্পর্কে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে না। এ সম্বন্ধে বে-সরকারী তদন্ত হওয়া দরকার এবং যাহারা আইন রক্ষার নামে ক্ষমতার এরূপ অপপ্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের সাজা হওয়া উচিত; নতুবা দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে না।

কমনওয়েলথ সম্মেলন

লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন। জগতের শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষাই নাকি এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু জগতের শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার নামে শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির পাকের মধ্যে গিয়া ভারত না পড়ে, এজন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার এই সম্মেলনের নীতি-নির্ধারণে অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আমাদিগকে কোন বিশেষ নীতি অবলম্বন করিবার নিমিত্ত বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা হইবে না। না হয় ভালই; কিন্তু শুধু তাহাই এক্ষেত্রে একমাত্র কথা নয়। কেহ ভারতের স্বাধীন নীতি-নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে, আমরা অবশ্যই ইহা বরদাস্ত করিব না। সেই সঙ্গে আমাদের জাতির মান-মর্যাদা এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখা আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম রাষ্ট্র। ইংলণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বদা আগ্রহশীল দেখা যায়। জগতের শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার যে পবিত্র ব্রতের কথা কমনওয়েলথ সম্মেলনের উদ্যোক্তৃবর্গের মুখে আমরা শুনিতেছি, দক্ষিণ আফ্রিকা খুব সম্ভব জনবল এবং উপকরণ দিয়া তাহাতে সাহায্য করিতে স্বভাবতঃই আগ্রহ দেখাইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়দিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ক্রমাগতভাবে যেরূপ বর্বর নীতি অবলম্বিত হইতেছে, কমনওয়েলথের সঙ্ঘশক্তির দায়ে সে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে কি? অষ্ট্রেলিয়া শান্তি ও মৈত্রীর জন্য কথা আজ আওড়াইতেছে। সেদিন অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেঞ্জিস নিজেও ভারতে আসিয়া অনেক মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, অষ্ট্রেলিয়া কি কৃষ্ণাঙ্গ-বর্জন নীতি পরিত্যাগ করিতে রাজী আছে? প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য তোড়-জোড় বাঁধা শান্তির পথ নয়। বিভিন্ন শক্তির পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত শান্তির পথ। কমনওয়েলথ সম্মেলনে যাঁহারা আজ সমবেত হইতে চলিয়াছেন, তাঁহাদের এই সত্যটি আগে উপলব্ধি করা দরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের রাজ্যে ভারতীয়দিগকে কুকুর-বিড়ালের চেয়ে হেয় দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিবেন, কৃষ্ণাঙ্গ জাতিসমূহের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক দৃষ্টির বর্বরতা তাঁহারা অবাধে চালাইতে থাকিবেন, আর এই অবস্থায় ভারত, সেই দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে হাত মিলাইয়া কমন-ওয়েলথের মহিমা প্রতিষ্ঠায় নিজেদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। অন্তত ভারত সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত নহে। ইহার উপর কাশ্মীরের সমস্যাকেও এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী আবদার তুলিয়াছেন। কাশ্মীর পাকিস্থানকে দিতেই হইবে, নতুবা তিনি কাহারো সঙ্গে কোন সহযোগিতা করিবেন না। ভারতকে এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ শান্তি ও মৈত্রীর ভ্রান্ত মোহে এমন ভণ্ডামীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী যেন না ভুলেন এবং কাশ্মীরকে বিসর্জন দিয়া ভাল-মানুষী দেখাইতে না যান। শান্তি সবাই চায়, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিয়া শান্তি কাম্য নয়। কাশ্মীরের সঙ্গে কোন আলোচনা এই বৈঠক উপলক্ষে যদি হয়, পাকিস্থানকে পররাজ্য আক্রমণকারী এই ভিত্তির উপর ভারতের পক্ষ হইতে সে ক্ষেত্রে দাঁড়ানো দরকার এবং কাশ্মীরের যে অংশে পাকিস্থানী শাসন কায়েম আছে তাহা উৎখাত করানো উচিত।

নেপালের ভবিষ্যৎ

বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পাইলে তাহার পিপাসা ছাড়িতে পারে না। স্বৈর-শাসনের মধ্যেও সেইরূপ একটা হিংস্রতা রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শাসকদের এই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে শুধু সদুপদেশের দ্বারা মুক্ত করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন হয় শক্ত ব্যবস্থার। নেপালের সম্বন্ধে এমন আশঙ্কা আমরা পূর্বেই প্রকাশ

করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, যত সহজে নেপালের রাণা-গোষ্ঠীর মনে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে বলিয়া মনে করা যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটিবে না এবং সুদীর্ঘ স্বৈরশাসনের যথেচ্ছাচারের মোহ নেপালের রাণা-গোষ্ঠীর মনোবৃত্তিকে কূটচক্রের মধ্যে ফেলিয়া পাক খেলিতে থাকিবে। তাঁহাদের পিছনে প্ররোচকেরও অভাব নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতিগতি যে অনেকটা রাণাগোষ্ঠীর অনুকূল তাহা ইতঃপূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা রাণাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত শিশু রাজাকেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। এই সব কারণে রাণা-গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার পিপাসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা নানা কৌশলে শাসনাধিকার-সম্প্রসারণ বিলম্বিত করিবার চেষ্টায় আছেন। আশা এই যে, সময় পাইয়া সেই সুযোগে গণ-আন্দোলনকে তাঁহারা দমিত করিবেন এবং অবস্থার মোড় ঘুরাইয়া লইবেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলালের নিকট লিখিত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে নেপালের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মোহন সমশের জ্ঞাপন জানাইয়াছেন যে, এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নেপালের শাসন-সংস্কার ও শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, রাণা বাহাদুরের রাইফেল, মেসিনগান ইত্যাদির গর্জনে রাজধানী কাঠমাণ্ডু ভীতিসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেনাবাহিনীর আক্রমণে রাজপথে রক্ত বহিয়াছে; বহু লোক হতাহত হইয়াছে। ভারত সরকার নেপাল গভর্নমেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নানারকমের ফ্যাকড়া তোলা হইতেছে। ভারত সরকার নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহকে নেপালের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু রাণাতন্ত্র তাহাতে রাজী হইতে পারিতেছেন না। এক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনের কারণ কি, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ প্রজাদের অধিকারের সমর্থক। তাঁহাকে নেপালের অধিপতি বলিয়া পুনরায় স্বীকার করিয়া লইলে নেপালের প্রজা-আন্দোলন শক্তিলাভ করিবে এবং তাহার ফলে রাণাতন্ত্রের উৎখাত ঘটিবে, ইহাই আশঙ্কা। কিন্তু আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও এই কথাই বলিব যে, নেপালের সমস্যাকে এই-ভাবে অমীমাংসিত রাখা ভারতের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার দিক হইতে মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু তথাকার রাণাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান না ঘটিলে সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন আশা করা যায় না। বস্তুতঃ রাণাতন্ত্রের অধিকার বজায় রাখিয়া সাময়িক একটা গোঁজা মিলে এ সমস্যা সমাধান হইবার নহে। সে অবস্থায় বঞ্চিত গণশক্তি বিক্ষোভ ও বিপ্লবের নূতন গতি ধরিবে এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় ভারতের পক্ষে নেপাল একটা বড় সমস্যায় পরিণত হইবে। ফলত বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট শক্তির প্ররোচক দল সেই সুযোগে নেপালে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে। ইহার মধ্যেই তাহাদের চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয়। এরূপ অবস্থায় নেপালে গণ-তান্ত্রিক অধিকার যাহাতে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য ভারত সরকারের দৃঢ়তর নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তেলে জলে কখনও মিশ খাইবে না। নেপালের স্বেচ্ছাচারী রাণা-গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক মতবাদের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রজাদের হাতে শাসনাধিকার সহজে ছাড়িয়া দিবেন, এমন আশা করা একান্তই ভুল বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতের নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব—

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্থলে শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগ পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া গিয়াছিল। রাজাজীর তীক্ষ্ম মনীষা আছে, বিশেষত শাসনকার্য পরিচালনায় কূট-বুদ্ধির প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্বন্ধেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি কতকটা বিচারপরায়ণ এবং আপোষনিষ্পত্তির অনুকূলে হইলেও সুনির্ধারিত নীতিকে কার্যকর রূপ দিবার মত বলিষ্ঠ মনোবল তাঁহার আছে। সুতরাং সর্দার বল্লভভাইয়ের প্রকৃতিতে যে দৃঢ়তা ছিল রাজাজীর নীতিতে তাহার অভাব ঘটিবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। স্বরাষ্ট্র সচিবের কার্যভার গ্রহণ করিবার পর রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে এমন দৃঢ়তার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালনে দেশের সর্বসাধারণ এবং সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। দেশবাসী রাজাজীর ন্যায় জননায়ককে সর্বতো-ভাবে সাহায্য করিবেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার নীতির অনুবর্তন করিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গেই রাজাজী পার্লামেণ্ট এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতৃবর্গের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্যও দেশবাসীর কাছে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এক্ষেত্রে কর্তব্য শুধু দেশবাসীরই নয়, নেতাদেরও রহিয়াছে। ক্ষমতা-প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ যাঁহারা শাসন বিভাগীয় পদাধিকারে প্রতিষ্ঠিত, জনমতের অনুবর্তন করা তাঁহাদেরও উচিত; পরন্তু যদি তাঁহারা জনমতের অনুবর্তন না করেন এবং দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলেন, তবে জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিরুদ্ধ সমালোচনার আঘাত তাঁহাদের উপর পড়িবেই। গণতান্ত্রিক শাসনের ইহাই রীতি এবং এক্ষেত্রে পদাধিকারী যাঁহারা জন-সাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্যনিষ্ঠার মূল্যই বাস্তবক্ষেত্রে সমধিক। সত্যাগ্রহের নাম করিয়া মিথ্যাগ্রহ এবং বীরত্ব প্রদর্শনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশের স্বার্থের অনিষ্টসাধন কিছুতেই ক্ষমার্হ হইবে না, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীস্বরূপে রাজাজী স্পষ্টভাবে একথা জানাইয়া দিয়াছেন। নানা মতবাদের জিগীর তুলিয়া সস্তায় নেতৃত্ব ও বীরত্বের মর্যাদা লাভ করিবার মতিগতি এদেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিছুদিন হইতে দেখা দিয়াছে। কোন রকমে একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবের বাতিক উস্কাইয়া তোলা ইহাদের ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে। অথচ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মদানের উদ্দীপনা কিংবা লোকসেবার জন্য ঐকান্তিকতা ইহাদের একটুও নাই। ইহারা নিতান্ত ভীরু। ইহাদের সম্বন্ধে রাজাজীর সতর্কবাণী সময়োচিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

বাঙলার সীমান্তে যুদ্ধ-নিবৃত্তি—

বাঙলার সীমান্তে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে নদীয়া জেলার সীমানায় পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্থানী পুলিশের পারস্পরিক গুলী বিনিময় দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি উভয় বঙ্গের গভর্নমেণ্ট সীমান্তের ঘাটিতে নিযুক্ত পুলিস বাহিনীকে গুলী না চালাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই নির্দেশ এতদিন কেন দেওয়া হয় নাই, আমরা বুঝিতে অসমর্থ। কিন্তু এখানে গুলী চালানো বন্ধ হইলেও অন্যদিকে অনর্থের কারণ এখনও ঘটিতেছে। সম্প্রতি একদল মুসলমান পাকিস্থান হইতে আসিয়া ২৪ পরগণার সন্দেশখালী পুলিস স্টেশনের অন্তর্গত ফরেস্ট অফিসারের ক্যাম্পে হানা দিয়া বন্দুক ও গুলী বারুদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। দিল্লী-চুক্তি প্রতিপালনে পারস্পরিক প্রতি-যোগিতার এই যুগে উভয় বঙ্গের সীমানায় এইসব উপদ্রব কেমন করিয়া সৃষ্টি হয়, আমরা বুঝি না। বলা বাহুল্য, এইসব ব্যাপার হইতে যে কোন দিন ব্যাপকতর অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। উভয় বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সম্প্রসারিত হইবার পক্ষে এগুলি যে ব্যাঘাতক, তাহা উপলব্ধি করিয়া এমন ধরণের ব্যাপার যাহাতে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়, তাহা করা একান্তই কর্তব্য।



ঘুঘু ডাকে

দিনেশ দাস

সকালের আলো-আলো হলুদ রোদ্দুরে
উড়ো এক ঘুঘু ডাকে দূরে
একটানা ডেকে ডেকে সারা
কানের পাতায় ঝরে শিশির-ফোঁটার মত
টুপ্‌টাপ্‌ সুরের ফোয়ারা,
অজস্র পাপ্‌ড়ি যেন ঝরে মাঠময়
আজো কি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়?

ঘুঘু ডাকে
জলের মতই টানা ঝক্‌ঝকে সুরে
জলের মতই ঘুরে ঘুরে
একটি করুণ বৃত্ত আঁকেঃ
সেই বৃত্ত গোল হয়ে
আমার শরীর মন ঢেকে দেয় মূক সমারোহে
আলো-নীল হ্রদের মতন,
আমার শরীর-মন
রেষারেষি করেনাকো পুরোনো বিরোধে
হাত ধরাধরি ক'রে নেমে আসে
সকালের ভোর-কচি কলাপাতা রোদে।

শহরতলীর শিরা বেয়ে বেয়ে স্টেট বাস চ'লে গেল ধুঁকে
কখনো বাঘের মত কখনো সাপের মত ফুঁসে,
উপরে একটি ঘুঘু সবে-পাড়া-নরম-ডিমের মত বুকে
জীবনের হাওয়া টানে--হাওয়া আনে
শহরের মৃত ফুসফুসে।

এখানেও ভোর হয়?
শহরে পেলাম আজ ভোরের আস্বাদ
শহরেও নামে দেখি ঈশ্বরের স্থির আশীর্বাদ
পৃথিবী আশ্চর্য মনে হয়
পৃথিবী আচম্‌কা মনে হয়॥

বৈদেশিকী

কোরিয়ার যুদ্ধ

কোরিয়াতে ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে আবার প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। উত্তর কোরিয়ান ও চীন সৈন্যদের আক্রমণে ম্যাকআর্থার বাহিনী পিছু হট্‌ছে। সিউলের ৩০ মাইল উত্তরে ইমজিন নদী বরাবর ম্যাকআর্থার বাহিনী যে আত্মরক্ষা লাইন দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিল সেটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। উত্তর কোরিয়ান এবং চীনা সৈন্য সিউলের পাঁচ ছ' মাইলের মধ্যে এসে গেছে বলে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই সিউল উত্তর কোরিয়ান ও চীনারা দখল করে ফেলবে মনে হয়। সিউল থেকে রী গভর্নমেণ্ট বহু পূর্বেই সরে পড়েছে।

ম্যাকআর্থার ফৌজ পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে বোমারু বিমানের আক্রমণের কথাই নেই। এরূপ নৃশংস ধ্বংস-কার্য যুদ্ধের ইতিহাসে পূর্বে কখনও হয়েছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এতেও যখন উত্তর কোরিয়ান ও চীনাদের ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন জেনারেল ম্যাকআর্থার ম্যাঞ্চুরিয়ার ওপর বোমা-বাজি করার প্রয়োজনীয়তার কথা আবার অবিশ্যি তুলবেন। যুদ্ধে যদি ম্যাকআর্থার ফৌজ হেরে ক্রমশ পিছু হটতেই থাকে তবে মার্কিন গভর্নমেণ্টও উত্তরোত্তর চঞ্চল হয়ে উঠবেন এবং চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের নীতি বলবৎ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হবেন। এ-বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের মনোভাব একরূপ নয়। ইংরেজেরা চীনের সঙ্গে সরাসরি ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে একান্ত অনিচ্ছুক কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা এবং আমেরিকার চাপ কতদূর ঠেলে নিয়ে যায় বলা কঠিন।

তিব্বত

তিব্বতের ব্যাপারে যে কোনটা সংবাদ আর কোন্‌টা গুজব, কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে দলাই লামা যে লাসা ছেড়ে এসেছেন এ সম্বন্ধে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। দলাই লামা ভারতবর্ষে আসছেন বলে শুনা গিয়েছিল। এখন শুনা যাচ্ছে তিনি আপাতত ভারতবর্ষে প্রবেশ করবেন না, তিব্বতের ভিতরেই ইয়াটুং অথবা অন্য কোনো স্থানে থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরে অনিবার্য হলে তিব্বতের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেবেন।

কী অবস্থায় দলাই লামা লাসা ত্যাগ করে এলেন এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বুঝা যাচ্ছে না। তবে শোনা যাচ্ছে যে চীনাদের সঙ্গে আপোষ বিরোধী দলের পরামর্শ অনুসারেই তিনি লাসা ত্যাগ করেছেন। এই দলের বোধ হয় আশা যে দলাই লামাকে তিব্বতের বাইরে এনে তাঁর পক্ষে আমেরিকা প্রভৃতি চীনের বিরোধী শক্তিসমূহের সহায়তা লাভ সম্ভব হবে। পূর্বে এক দলাই লামা বহু বৎসর তিব্বতের বাইরে নির্বাসিতের জীবনযাপন করে পরে লাসায় পুনর্প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন, বোধ হয় সেই কথা স্মরণ করেই বর্তমান দলাই লামার পরামর্শদাতারা অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু তখনকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার কোনো মিল নেই। বর্তমান চীনাদের দ্বারা তিব্বত একবার 'মুক্ত' হলে সেখানে যে দলাই লামা আবার ফিরে গিয়ে নতুন করে স্থান করতে পারবেন সেরূপ আশা করা যায় না। আপোষ-নিষ্পত্তি যা করবার তা 'মুক্তি' কার্যের অঙ্গ হিসাবেই করা উচিত ছিল। যেরূপ শোনা যাচ্ছে তাতে চীনারা বহু তিব্বতীর সহযোগিতা পাচ্ছে। তিব্বতে চীনা অভিযান যাতে বিদেশী আক্রমণরূপে সাধারণ তিব্বতীদের কাছে প্রতিভাত না হয় তার জন্যে চীনা কর্তৃপক্ষ খুবই সচেষ্ট বলে মনে হয়। চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লামা এবং সাধারণ তিব্বতীদের মধ্যেও অনেকে উৎসুক হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর উপর পাঞ্চেন লামার অনুরাগীদের চেষ্টা তো আছেই। মোটের উপর তিব্বতী সমাজ এখন দো-টানার মুখে। অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ও প্রাচীনপন্থীরা দলাইলামার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে। এ'দের পরামর্শ দলাই লামার ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ হবে বলে মনে হয় না।

নেপাল

নেপালের রাণাশাহীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতগভর্নমেণ্টের যে আলোচনা চলছিল সেটা সফল হবার আশা হয়েছে। মাঝখানে একবার সব ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ যে, রাণা সরকার এখন ভারত গভর্নমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে শাসনসংস্কারে স্বীকৃত হয়েছেন। রাজাকে নিয়ে একটা মত-দ্বৈধ ছিল, সেটাও নাকি মিটেছে। রাণা ত্রিভুবন বিক্রমকে পুনরায় স্বীকার করে নিতে রাণা সরকারের আপত্তি ছিল। সে আপত্তি এখন নেই। নেপালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১৯৫২ সালের মধ্যে গণ-পরিষদ্ গঠিত হবে। ইতিমধ্যে যে অন্তর্কালীন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হবে তাতে জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকবেন। নেপালী কংগ্রেসের লোককে এই মন্ত্রিমণ্ডলীতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হবে। বর্তমান প্রধান মন্ত্রীই প্রধান মন্ত্রী থাকবেন। ভারত গভর্নমেণ্ট ও রাণা সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার এই সকল সর্ত স্থির হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বটে তবে রাণা সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো ঘোষণা করা হয় নি। ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত সর্তগুলির বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে না এবং বিস্তৃত বিবরণ না জানলে সেগুলির দ্বারা নেপালের জনমত কতখানি সন্তুষ্ট হবে ঠিক বলা যায় না। কারণ, প্রস্তাবিত মন্ত্রিমণ্ডলীকে জনসাধারণের প্রতি-নিধিস্থানীয় লোকের সংখ্যা কিরূপ হবে এবং তাঁরা কিরূপে ক্ষমতার অধিকারী হবেন তার ওপর জনমতের সম্মতি অসম্মতি নির্ভর করছে। এটা ঠিক যে, নেপালকে এখন আর মাকাল ফল দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না। নেপালী কংগ্রেসের সশস্ত্র অভিযান এখনও চলছে এবং বেশ জোরের সঙ্গেই চলছে। 'বিদ্রোহী'দে'র পরাজিত করার শক্তি রাণা সরকারের নেই। খাস কাঠমাণ্ডুতেও জনবিক্ষোভ থেকে থেকে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে। তাই বলছিলাম এখন আর মাকাল ফলে কাজ হবে না।

ইন্দোনেশিয়া

পশ্চিম নিউগিনি নিয়ে ডাচদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার আবার একটা গোলমাল বাধার উপক্রম দেখা যাচ্ছে। ১৯৪৯ সালের নিষ্পত্তির সময়ে কথা ছিল যে, তখন থেকে এক বছরের মধ্যে পশ্চিম নিউগিনি সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা হবে। ইন্দোনেশিয়ার দাবী পশ্চিম নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ডাচেরা পশ্চিম নিউগিনি ছাড়তে রাজী নয়। সম্প্রতি হেগে যে কনফারেন্স হয়ে গেল তাতে কোনো মীমাংসা হয়নি। ফলে ইন্দোনেশিয়ার জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রিমণ্ডলী ইতোমধ্যেই নাকি স্থির করেছেন যে, হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার 'ইউনিয়ন' বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের এখনও 'প্রভূত পরিমাণ ভূসম্পত্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য আছে। ইন্দোনেশিয়রা যদি ডাচদের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগ আরম্ভ করে তবে ডাচদের বিষম মুস্কিল হবে। আপাতত হাতাহাতি বোধহয় হবে না।

৩।১।৫১

ইন্দ্রজিতের আসর

অনেক দিন আগের কথা বলছি। তখন রবিবার দিন খবরের কাগজের অফিস বন্ধ থাকত, সোমবার দিন খবরের কাগজ বেরোত না। আমার একটি বন্ধু খবরের কাগজের তেমন ভক্ত ছিলেন না। খেয়াল খুশি মতো কখনো সখনো পড়তেন, বেশির ভাগ দিনই পড়তেন না। অথচ দেখতুম সোমবার এলেই খবরের কাগজের জন্য তাঁর বিষম ছটফটানি শুরু হ'ত। মুহুর্মুহুঃ কাগজের খোঁজ করতেন। তাঁর এই ব্যাপার দেখে আমার বড় কৌতুক বোধ হ'ত। একদিন কারণটা জিগগেস করেছিলাম। তিনি প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেন। পরে বললেন, কি জানি, অন্যদিন ইচ্ছে করলেই পড়তে পারি, এইজন্য বোধকরি পড়বার তেমন তাগিদ থাকে না। সোমবার দিন ইচ্ছে করলেও পড়তে পারব না বলেই মনের কোণে একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে। সেই অস্বস্তিটাই সারাদিন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে। এটা নিশ্চয় অবচেতন মনের ক্রিয়া।

আমার বন্ধুর এই অদ্ভুত অভ্যাসটির কথা এতদিন বাদে কি সূত্রে মনে পড়ে গেল সে কথাটি বলছি। আমার চিঠিপত্র লেখার বড় একটা অভ্যাস নেই। চিঠি লিখে অনেকেই আমার কাছ থেকে জবাব পান না ; কিম্বা এত দেরি করে জবাব পান যে সে জবাব পাওয়া না পাওয়া সমান হয়ে যায়। যাঁরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁরা সে কথাটি ভালো করেই জেনে নিয়েছেন। কখনো চিঠি লিখলে নিতান্ত নিষ্কামভাবে লেখেন, জবাবের প্রত্যাশা রাখেন না। অবশ্য তাই নিয়ে আমাকে খোঁটা দিতে ছাড়েন না। সেদিন একটি বন্ধু সুদীর্ঘ চিঠি লিখে পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন— চিঠির জবাব দিতে হবে না। আমি জীবনে কেবল একটিবার পত্র পাঠ মাত্র জবাব দিয়েছিলাম। জনৈক বন্ধুর চিঠির উত্তরে ফেরৎ ডাকে দুলাইন লিখে পাঠিয়েছিলাম— তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হ'লাম ; কিন্তু জবাব দিতে দেরী হবে। সে চিঠি পেয়ে তিনি মনে মনে কি ভেবেছিলেন জানিনে।

চিঠি লিখতে যেমন আমার আলস্য, চিঠি পেতে তেমনি আমার আনন্দ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পোস্টাপিসে one way traffic চলে না। চিঠি লিখলে তবে চিঠি আসে। ইনভেস্ট না করলে ডিভিডেন্ড মেলে না। কাজেই যে পরিমাণ চিঠি পেলে আমি খুশি হই সে পরিমাণে চিঠি আমি পাই না। সপ্তাহের আর্ধেক দিন আমাকে নিষ্পত্র কাটাতে হয়। তথাপি ডাকের সময় হলেই মন ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠে। ডাক পিয়নের পরিচিত পদ-শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকি। সে পদ-শব্দ যেখানটায় এসে থামবে আশা করি প্রায়ই সেখানটায় থামে না। আমার গৃহ দ্বার অতিক্রম করে চলে যায়। মন বিষম দমে যায়, মনে হয় আমাকে যেন প্রত্যাখ্যান করে গেল। রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সম্মুখ পথে। রবীন্দ্রনাথ রাজার দুলাল কাকে বলেছেন কে জানে। আমি তো ডাকপিয়ন ছাড়া আর কোনো রাজার দুলালের খবর রাখি না। সত্যি বলতে কি, ডাকপিয়ন রাজ কর্মচারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

একেই তো পোস্টাপিস আমার প্রতি বিমুখ, এখন আবার নতুন নিয়ম হয়েছে রববার দিন পোস্টাপিস বিলকুল বন্ধ। খেয়াল থাকে না, রববার দিনও ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। অধৈর্য হয়ে ছেলে-মেয়েদের ডেকে জিগগেস করি, কইরে, আজকে চিঠিপত্র কিছু এল ? ওরাই মনে করিয়ে দেয়, আজকে রববার, পোস্টাপিস বন্ধ। দেখছি রববারদিনই আমার অস্বস্তিটা একটু বেশি-মাত্রায় প্রকাশ পায়। আমার সেই বন্ধুটির কথা মনে পড়ে যায় যিনি বেছে বেছে সোমবারদিনই খবরের কাগজের খোঁজ করতেন। পোস্টাপিস বন্ধ বলেই কেবলি মনে হতে থাকে আমার অনেকগুলো চিঠি ডাকঘরে থলির মধ্যে আটকে আছে। কি যে অস্বস্তি হয় কি বলব। অবশ্য সোমবার দিন হয়ত প্রমাণ হয়ে যায় আগের দিন পোস্টাপিস খোলা থাকলেও আমার ভাগ্যে কিছুই জুটত না। কিন্তু তা হলে কি হবে, রববারের অস্বস্তি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না।

খুব জরুরী প্রয়োজন থাকলেও এখন আর রববার দিন চিঠি লিখি না। লিখলেও ডাকে দিই না। চিঠি সচল পদার্থ। সেটা যদি অচল হয়ে ডাক বাক্সে পড়ে থাকে তবে ডাকে দিয়ে লাভ কি ? রববারের ডাক বাক্সটার কথা মনে হলে আমার কেমন গা বমি বমি করতে থাকে। চিঠির ভারে বেচারী আকণ্ঠ পূর্ণ, আই ঢাই করছে। বমি করে খানিকটা উগড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। আমার চিঠিটা আবার জোর করে ওকে গেলাতে যাই কেন? বেচারী মিছিমিছি পেট ফেঁপে মরবে।

সেদিন আপনাদের কাছে দেশের স্বাধীনতার কথা বলছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার পরে এইটেই সবচাইতে বড় পরিবর্তন। সপ্তাহে একদিন আমরা cut off from the outside world. দেশ যে এগুচ্ছে এইটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুনিয়ার কোথাও এমন উদ্ভট ব্যবস্থা আছে বলে আমি জানিনে। তেমন নিষ্ঠাবান খৃষ্টান দেশেও এসব সাংঘাতিক sabbath এ যুগে অচল। লড়াই-এর সময় আমাদের সহরগুলিতে ব্লাক-আউটের ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এই পোস্টাপিস বন্ধটাও তেমনি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। নিষ্প্রদীপ রাত্রি আর নিষ্পত্র দিন দুটোই বর্বর যুগের লক্ষণ।

মানুষের প্রয়োজন মেটানো সরকারের দায়িত্ব। আমাদের স্বাধীন সরকারের প্রধান কাজ হয়েছে মানুষের প্রয়োজনকে ছেটেকেটে কমানো। অর্ধাহারী মানুষকেও যারা miss a meal এর উপদেশ দিতে পারে তারা miss a mail এর বিধান দেবে তাতে আর বিচিত্র কি ? কোন্ দিন হয়ত নিয়ম হবে সপ্তাহে একদিন রেল কোম্পানি বন্ধ থাকবে। কিন্তু আগের মতো সপ্তাহে একদিন যদি খবরের কাগজ বন্ধ থাকে তাহলে মন্ত্রী মশাইরাই মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। তাহ'লে যে তাঁদের বক্তৃতা আর স্টেটমেন্ট ছাপতে বিলম্ব হয়ে যাবে। বলি, রেডিয়ো একদিন বন্ধ থাকতে দোষ কি? কাণটা একটু জিরিয়ে বাঁচে। সেটি হবার নয়। রেডিয়ো যে সরকারের বাকযন্ত্র। বাকযন্ত্র বন্ধ হ'লে মন্ত্রীদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবে।

ভেবেছিলাম স্বাধীনতার স্ট্যাম্প বা ছাপ পড়বে মানুষের মুখে চোখে। আমাদের স্বাধীনতার ছাপ পড়েছে পোস্টাপিসে। স্বাধীনতার স্ট্যাম্প দেখতে চান তো পোস্টাপিসে যান। এই তিন বছরে ডাক টিকেটের গায়ে কত রকমারি স্ট্যাম্প যে দেখলুম! মন্ত্রী মশাইরা যদি ভেবে দেখতেন যে মানুষের আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রীই স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক তবে ডাক টিকিটের মূর্তি নিয়ে মাতামাতি না করে মানুষের মূর্তির কথাই ভাবতেন। মানুষের যেখানে কঙ্কালসার মূর্তি সেখানে টিকিটের গায়ে ত্রিসিংহ মূর্তি এঁকে কি হবে? ইংরেজের আমলে ছিল একটা সিংহ, এখন হয়েছে তিনটে। অর্থাৎ দুর্দশা তিনগুণ বেড়েছে। জীবনের চক্র যদি আগের মতোই ঘোরে তবে অশোকচক্র বাঁচাবে কাকে? অন্যে পরে কা কথা। আমাদের মন্ত্রী মশাইদের মুখেই কি স্বাধীনতার ছাপ পড়েছে? ওটা স্বাধীন মানুষের মুখশ্রী না স্বাধীনতার মুখোস?

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়





নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে মিয়া বিস্‌মিল্লা ও তাঁর দলের সানাই বাজনা শেখ আবদুল্লা ও ডাঃ কাটজু তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন।

এবারকার নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন নানা কারণে সংগীত মহলে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। প্রথমে বলা যেতে পারে যে, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এ বছর এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে সংগীত সম্মেলন করার ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত তা আর করা সম্ভব হলো না। ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের নিয়েই সম্মেলন সংঘটিত হলো। ছয় দিনব্যাপী এই সম্মেলন গত ২৭শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে।

গত বৎসর থেকে এই সম্মেলনের পরিচালকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এক প্রতিযোগিতামূলক সংগীত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে সারা ভারতবর্ষের সংগীতশিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। এ বৎসরেও উক্ত পরীক্ষা সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে গৃহীত হয় এবং তাতে কমল কেট্‌কার নামে একজন মহিলা শিল্পী কণ্ঠসংগীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠানে তাঁকে গাইতে দেওয়া হয়। তার পূর্বে বিমল ওয়াকড়ে নামক আর একটি মহিলা শিল্পীর গান শোনা গেল। প্রকাশ, ইনি উক্ত পরীক্ষায় শুধু গানে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। জ্ঞানগত লিখিত পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব তেমন প্রকাশ না পাওয়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান তিনি পাননি। কিন্তু তাঁর গীতপ্রণালী অগ্রাহ্য করার নয়। প্রথম স্থানের অধিকারী কমল কেট্‌কারের গানও শুনলাম। লিখিত পরীক্ষায় অধিক কৃতিত্বের জন্যই হয়তো তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু গীত পরিবেশন-পদ্ধতির মধ্যে তাঁর কৃতিত্বের কোনও পরিচয় পেলাম না। এই প্রসংগে যে-কথা স্বতঃই মনে আসে, তা হচ্ছে কণ্ঠসংগীতে গীতপ্রণালীকে অগ্রাহ্য করে পরীক্ষা গৃহীত হলে ভুল হবে। কারণ, সংগীতের পরিসমাপ্তি প্রকাশভংগীর মধ্যেই। জ্ঞানগর্ভ সংগীত-চেতনার সংগে উপযুক্ত প্রকাশভংগীর মিলন হলে তবেই শিল্পীর রসবস্তু প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমার তাই মনে হয়, উপরোক্ত সংগীত পরীক্ষার নিয়মাবলীর মধ্যে কিছু গলদ আছে। সম্মেলনের পরিচালকবর্গের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

মূল সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেসব শিল্পী কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তার মধ্যে লাহোরের বড়ে গোলাম আলী খাঁর নাম প্রথমেই মনে পড়ে। এত নিখুঁত ও হৃদয়গ্রাহী গীতপ্রণালী খুব কমই শোনা যায়। খেয়াল গানের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ আসন সম্বন্ধে কারো মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে তিনি লাহোরের অধিবাসী, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহু পূর্বে পাতিয়ালার অধিবাসী ছিলেন। সেইখানেই ফতেআলী নামক একজন কৃতবিদ্য সংগীতজ্ঞের কল্যাণে এই ঘরানার সর্বপ্রথম ভিৎ পত্তন হয়। তারপর বাহারাম খাঁ, তাভিজ খাঁ প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের সহায়তায় এই সংগীত-ঘরানার সুনাম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বড়ে গোলাম আলী খাঁ তদীয় পিতা কালে খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুযায়ী যে নিয়মতান্ত্রিক



আনোখেলাল



গোপাল মিশির



কেরামতুল্লা



সরাফৎ খাঁ

ধারা মেনে চলতে হয়, তা থেকে ভ্রষ্ট হতে তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। ঘরানার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার দিকে তাঁর নজর এত বেশি যে, অনেকে তা সমর্থন করেন না। কিন্তু রসবস্তুর প্রাধান্য থাকলে সংগীতকে সমালোচনা দিয়ে খর্ব'ও করা যায় না। তালিমের বাইরে না গিয়ে শিল্পীর রসসিক্ত মন দিয়ে সংগীত পরিবেশন তাঁর অপূর্ব। বন্ধন ও মুক্তির এ এক অপূর্ব সমন্বয়। বন্ধন এখানে সংযমের সামিল এবং মুক্তি এখানে প্রাণধর্মী। এই দুই অবস্থার মধ্যে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা এবং শিল্পীর অবদান যুক্ত বেদীমূলে মিলিত হয়ে এক অনবদ্য অনুভূতি সৃষ্টি করে, যার পরিবেশে শ্রোতাকেই শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে হয় রসসিক্ত গীতপ্রণালীর কাছে। জড়ানো তান বা কষ্টকর রাগরূপ বর্ণন গোলাম আলীর গানে একেবারে নাই বললেই চলে। সুন্দর, স্বচ্ছ, কণ্ঠে দোলায়িত তান ও বিস্তার যখন তিন সপ্তক সুর ঘুরে আসে, তখন অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

খেয়াল ছাড়া ঠুমরী গানেও গোলাম আলীর অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু এ বৎসর ঠুমরী গানে তাঁর মেজাজ তেমন পরিলক্ষিত হলো না। সম্মেলনের ষষ্ঠ আসরে ভীমপলশ্রী ও মুলতানের খেয়াল গান গাইবার পর তিনি 'নয়না লাগে উনসে' গানখানি আরম্ভ করলেন। ঠুমরী না বলে দাদ্‌রা বললে গানখানির প্রতি সুবিচার করা হয়। কারণ ঠুমরী পর্যায়ে এ-গানখানি পড়ে না। অবিশ্যি ঠুমরী ও দাদ্‌রার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য বিপরীতধর্মী নয়। একই শ্রেণীর অঙ্গনে এসে দাঁড়াতে দুয়েরই সমান অধিকার আছে। কিছু বিভিন্নতা যে নেই এমন নয়, তবে তা নিয়ে তর্ক না তুলে গোলাম আলীর ক্ষেত্রে দেখলাম যে, তিনি খানিকটা অগ্রসর হয়ে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ঠুমরী গানের মেজাজ তাঁর আজ নেই। আবার খেয়াল শুরু করলেন—রাগ বাহার। সমস্ত সম্মেলন যেন আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এর পর এক আসরে তিনি মালকোষ রাগের খেয়াল ও কয়েকখানি ঠুমরী গান করেন।

নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে এক বিরাট অংশ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের অনুরক্ত। উত্তর ভারতের সংগীত ক্ষেত্রে যে তিনি এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু তাঁর খেয়াল গান আবেদনের ক্ষেত্রে সর্বজনীনত্ব প্রাপ্ত হয়নি। পণ্ডিত বিষ্ণু-দিগম্বর প্রবর্তিত গীতপ্রণালীতে শিক্ষালাভ করে তিনি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও উক্ত প্রণালীর সীমা লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নিজস্ব এক ধারা গড়ে তুলেছেন। সংগীতস্রষ্টা হিসেবে তাঁর এ অবদান অগ্রাহ্য করার নয়। সংগীতকে আনুষ্ঠানিক পরিধির মধ্যে বেঁধে নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলার আগ্রহ তাঁর প্রচুর। কিন্তু গীত-প্রণালীর যে-ধারা তিনি প্রবর্তন করেছেন, তা বিশেষ রসঘন নয় এবং তা কষ্টকরও বটে। এইজন্য তাঁর গান শুনতে বসে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা দেখে হতবাক হতে হয়। সংগীতে রসবস্তুর চাইতে টেকনিক প্রধান হলে উপপত্তিক বিশেষত্বের প্রতি হয়তো শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো, কিন্তু তাতে শ্রোতার মন ভরে না। এই কারণে বিষ্ণুদিগম্বর ঘরানার অন্যান্য গায়কদের গীতপ্রণালী হতে পণ্ডিত



পণ্ডিত ওঁকারনাথ

ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। সজীবতা, সক্রিয়তা দিয়ে তাকে অভিহিত করা গেলেও কষ্টকর পরিবেশন রীতির জন্য তার পূর্ণ রস গ্রহণ করা যায় না। তাঁর গানের আবেদন তাই মস্তিষ্কে, হৃদয়ে নয়। এ বৎসর এক প্রাতঃকালীন আসরে তিনি মধুমাধ সারং ও গৌর সারংএর খেয়াল গান করেন। সর্বশেষ আসরে গান দরবারী ও ভজন। এই আসরে তাঁর কণ্ঠের সজীবতা যেন মূর্ত রূপ গ্রহণ করেছিল। সুরের আন্দোলন সক্রিয় আকারে সমস্ত সভাগৃহ যেন মথিত করে তুলেছিল। তাঁর কষ্টকল্পিত এই সুরপ্রস্রবন আশা করি, কলকাতার সংগীত সম্প্রদায় অনেক দিন মনে রাখবেন। পণ্ডিতজীর ভজন গানের ধারা আমাদের বরাবরই ভালো লাগে এবং এবারেও লেগেছে। তাঁর সাত্ত্বিক জীবনে এ ধরণের গান সার্থকতা লাভ করেছে এবং তাঁরই সংস্পর্শে এসে শ্রোতারাও যেন এক উন্নত স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের ভারে মন অনেক সময় মুষড়ে পড়ে।

শ্রীমতী কেশরবাঈর অনুরক্ত শ্রোতা নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের মধ্যে বড় কম নেই। খেয়াল গানের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী যে খুবই কম, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিলম্বিত খেয়ালের মহীয়ান রূপ, যা আলাদিয়া খাঁ প্রবর্তিত ধ্রুপদ গানের গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতি নিয়ে ফুটে ওঠে, তা তাঁর গানে লক্ষ্য করবার বিষয়। এ-সংগীত বুদ্ধিবৃত্তি-ঘটিত হলেও অন্তরের খোরাক যথেষ্ট আছে এবং সেই কারণে অবিমিশ্রতার সমারোহ থাকা সত্ত্বেও হৃদয়কে মথিত করে। গায়কির শুদ্ধতা এবং অস্থায়ীর অবিকৃত রূপ তাঁর গানের প্রধান অঙ্গ। অবশ্য অন্যান্য শিল্পীর ক্ষেত্রে এসব লক্ষণ যে একেবারেই নাই, সেকথা বলছি না। বলছি এই কথা যে, অস্থায়ীতে সোম আনবার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কখনও ডোরার ছোট-বড় করেন না এবং সেইজন্যই তাঁর অস্থায়ী গাইবার অবিকৃত রূপ সকলের কাছে ধরা পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সংগীতকে জনমুখী না করে শুধু তার মৌলিক উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা একমাত্র কেশরবাঈর ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে! বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং তাতে জোয়ারীর প্রাচুর্য থাকায় তাঁর সংগীত যেন মনের দুকূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সেখানে আশা-নিরাশার সংঘাত নাই, আছে শুধু পূর্ণাঙ্গ রসানুভূতি।

সকালের এক আসরে তিনি শুক্লা বিলায়ল এবং সুহা কানাড়ার খেয়াল গান করেন। রাগের বৈচিত্র্য তাঁর ঘরানায় যথেষ্টই আছে। কিছু পূর্বেকার সম্মেলনে তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায়নি। কারণ পর পর কয়েক বৎসর ধরে তিনি একই প্রকার রাগ সম্মেলনে পরিবেশন করেছেন। এ বৎসরে তার ব্যতিক্রম দেখলাম এবং সেটা যে তাঁর পক্ষে কতটা সমীচীন হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সম্মেলনের সপ্তম অনুষ্ঠানে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা গান শুনতে এলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভজন গান করেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর উদার মনোভাবের কথা সকলেই বলাবলি করেছেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে তিনি তিলক-কামোদ ও বসন্ত বাহারের খেয়াল ও ভজন গান করেন। এই আসরে তাঁর কণ্ঠের পরিস্রুত সুরলহরী আজও মনে আছে এবং আশা করি বহুদিন থাকবে।

'বিষ্ণুদিগম্বরের কৃতী পুত্র পণ্ডিত দত্তাত্রীয় পালুশকর সংগীত জগতে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। কিন্তু এবার তাঁর গান শুনে নিরাশ হয়েছি। মনে হয়, তাঁর কৃতিত্ব এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে আর অগ্রসর হতে পারছে না। বহুবার তাঁর গানের সুস্থ ধারাটি লক্ষ্য করে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছি।

মাহুল্যবর্জিত কণ্ঠে শুধু দুনী তানের বিকাশ বেশিক্ষণ ধরে চললে বৈচিত্র্যহীন মনে হবেই এবং তাঁর এবারের গান তাই বড় বেশি 'মেকানিক্যাল' মনে হয়েছে। অবশ্য তাঁর মনের অবস্থার উপর সমস্ত নির্ভর করে। একবার গান শুনেই তাঁর মতো উচ্চাঙ্গের শিল্পী সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু একথা নির্বিবাদে বলা চলে যে, তাঁর সংগীত এবার পূর্বেকার মতো প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ পায়নি। দুটি আসরে তিনি গান করেন। প্রথমটিতে গৌড় সারংএর খেয়াল ও ভজন। দ্বিতীয়টিতে মালকোষের খেয়াল ও ভজন। তাঁর ভজন গানের ধারাটি অতি সুন্দর এবং তাতেই তাঁর দক্ষতা অধিক লক্ষ্য করা গেল। বিষ্ণুদিগম্বর ঘরানায় ভজন গানের সমারোহ ভারতের সর্বত্রই সুবিদিত। সুস্থ, সাত্ত্বিক



রশুলন বাঈ



ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী

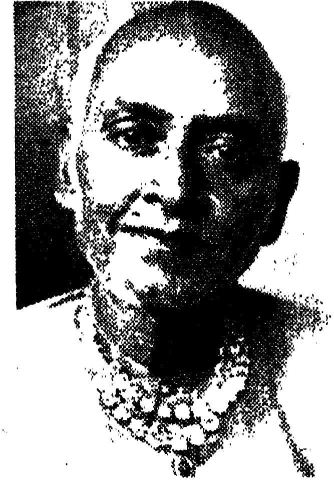
রসসিঞ্চিত এই গান দত্তাত্রয় পালুশকরের কণ্ঠে অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ভজনের স্থান আমার মনে হয়, এই ঘরানার কল্যাণেই হয়েছে।

স্বর্গীয় ফৈয়াজ খাঁর ভাগিনেয় সরাফৎ খাঁ এ বৎসর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ফৈয়াজ খাঁর জলদগম্ভীর সুরলহরী অনেক ক্ষেত্রে তর কণ্ঠে হুবহু ফুটে উঠেছে। বর্তমানে এই শিল্পীর বয়স ২৫ বৎসরের অনধিক, কিন্তু এর মধ্যেই যে সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর কণ্ঠে বাসা বেঁধেছে তার তুলনা হয় না। রঙ্গিলা বা আগ্রা ঘরানার সকল ঐতিহ্য এই কৃতী সঙ্গীতজ্ঞের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেল। বোল-বিস্তার, হলক-তান, জোয়ারী সমন্বিত কণ্ঠস্বর সবই ফৈয়াজ খাঁর অনুরূপ আকারের বলা চলে। তাঁর গান শুনে তাই এই জন্য আনন্দিত হয়েছি যে খেয়াল গান গাইবার বলিষ্ঠ প্রণালী তার ঘরানার যা বৈশিষ্ট্য তা ফৈয়াজ খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে লুপ্ত হয়নি। তাছাড়া এই শিল্পীর বিনয়নম্রতা এবং সাদাসিধে ভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। বরোদা রাজদরবারের খানিকটা জাঁক-জমক ফৈয়াজ খাঁ মেনে চলতেন, কিন্তু সরাফৎ খাঁর ক্ষেত্রে দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা। শিল্পীসুলভ বদান্যতা এবং এক মনোমুগ্ধকর সরলতা তাঁর সংগীতকে সমৃদ্ধির পথে চালিত করেছে বলে মনে হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় আসরে তিনি দরবারী কানাড়ার বিলম্বিত ও দুনী খেয়াল এবং 'না মানুঙ্গি' ঠুমরী গান করেন। ৫ম আসরে তিনি জয়জয়ন্তির খেয়াল এবং একটি ভৈরবী ঠুমরী গান গেয়ে এবার-কার মতো তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। খেয়াল গান ছাড়া ঠুমরী গানেও তাঁর সমান দক্ষতা পরিলক্ষিত হলো।



জনাব বিলায়েৎ হুসেন

এ বৎসর সম্মেলনে শ্রীমতী অঞ্জনীবাঈ কালগুতকার এবং জোৎস্না ভোলে নূতন শিল্পী। কিন্তু গান শুনে উভয়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ আশান্বিত হতে পারলাম না। প্রথম শিল্পী শুনলাম গোলাম আলী খাঁ সাহেবের শিষ্যা। বিলম্বিত খেয়াল গাইবার কৃতিত্ব তাঁর গানে লক্ষ্য করলাম না। তবলার ঠেকার সহিত অতি কষ্টে সোম রক্ষা করে তিনি গাইলেন বটে, কিন্তু তাতে আড়ষ্টভাব এতই প্রকট হয়ে পড়লো যে তা শেষ পর্যন্ত বিশেষ শ্রুতিমধুর হতে পারেনি। জ্যোৎস্না ভোলের কণ্ঠে মাধুর্য আছে এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে এক-ঘেয়েমি প্রকাশ পাওয়াতে শ্রোতৃবর্গের মনে স্থায়ী আসন সংগ্রহ করতে পারেনি। দুনী তানের ক্ষেত্রে দু এক স্থানে সামান্য কিছু কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে মাত্র। নূতন শিল্পী



কণ্ঠে মহারাজ

আহরণের প্রতি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ অধিক মনোযোগ দিলে ভালো হয়। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে সর্বশেষ আসরে পণ্ডিত নারায়ণ রাও যোশীর খেয়াল গানও বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ধরণের গায়ক বাঙলাতেও যথেষ্ট আছে এবং আমার মনে হয় তাদের ক্ষেত্রে সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করলে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বাঙলার সংগীত সমাজের ধন্যবাদার্হ হবেন।

ঠুমরী গানে এ বৎসরের সম্মেলন জয়-যুক্ত হয়েছে বলা চলে। বেনারসী ঠুমরীর ক্ষেত্রে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী রশুলনবাঈকে আহ্বান করে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতার গিরিজা চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঠুমরীর আসর যেন ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে স্থানীয়

শিল্পীরা পাঞ্জাবী ঠুমরীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট। এক্ষেত্রে ঠুমরীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতির মধ্যে 'লচাও' ঢং-এর ঠুমরী কতটা রস সৃষ্টি করতে পারবে সে সম্বন্ধে অনেকের সংশয় ছিল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা গেল রশুলেনবাঈ সভাগৃহকে অনবদ্য ঠুমরী গান দিয়ে মাতিয়ে তুলেছেন। এ-ধরণের বিস্তৃত পরিসর যুক্ত ঠুমরী অনেক দিন শুনিনি। প্রথমে তিনি টপ্পা দিয়ে আসর শুরু করেন। প্রকৃত টপ্পার সমাবেশ সম্মেলনে কেউই বিশেষ করেন না এবং সম্মেলনের কর্তৃপক্ষও সে বিষয়ে উদাসীন। কাজেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই অমূল্য সম্পদ ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। রশুলেনবাঈর টপ্পা এবং বেনারসী ঢংযুক্ত ঠুমরী এই কারণে বিশেষ



শ্রীমতী কেশরবাঈ

উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুই শ্রেণীর গানে প্রকৃত রসবস্তুর সমাবেশ করে তিনি সকলের সহানুভূতি অর্জন করেছেন। ৪র্থ প্রাতঃকালীন আসরে কয়েকটি পরিচিত ভৈরবী ঠুমরী গান তাঁর কণ্ঠে অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছিল। এই আসরটি আরও বেশি জমেছিল এই কারণে যে তাঁর সহিত তবলায় কণ্ঠে মহারাজ এবং সারেঙ্গীতে গোপাল মিশির যোগদান করেছিল। তিনজনই বেনারসের এবং সেইজন্য পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে এমন একটি সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল যে তা লিখে প্রকাশ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় দিনের আসরও নানা কারণে শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করেছিল।

এ বৎসর সঙ্গীত সম্মেলনের কৃতিত্বপূর্ণ আহরণ শ্রীমতী সোমলতা ভাট। তিনি শুধু ভজন গান করেন। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে তাঁর ভজন গান শিল্পীর কৃতিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠেনি, উঠেছে ভক্তিমুখী তন্ময়তার মধ্যে এবং সেই জন্যই তা অনাবিল আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে।

যন্ত্রসঙ্গীতে এ বৎসরের সম্মেলনে যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে জনাব বিলায়েৎ হোসেন খাঁর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় এনায়েৎ খাঁর সুযোগ্য পুত্র হিসেবে তাঁর নাম ভারতের সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সুবিদিত। কিন্তু এবার তাঁর সেতার নিসৃত সুর শুনে সকলে তৃপ্ত হতে পারেনি। সুবিখ্যাত সেতারী ঘরের সুনাম বহন করে এসে তিনি বর্তমানে মনে হয় শ্রোতাদের আগ্রহ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন হয়ে পড়েছেন। সঙ্গীত তাঁর বিশেষ সমৃদ্ধ এবং দুনী বাজনায় তাঁর সমকক্ষ খুব কমই আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রোতাদের তৃপ্তি বিধানের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে তাঁর সঙ্গীত কখনও সার্থক হতে পারে না। ৬ষ্ঠ অনুষ্ঠানে যেভাবে তিনি সারং রাগের ভিতপত্তন করলেন, অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞের তা সমর্থন লাভ করেনি। ইমনের খানিকটা ছোঁয়াচ যেন সারং রাগের পূর্ণবিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং একথা সভাস্থ অনেক সঙ্গীতজ্ঞানসম্পন্ন শ্রোতাদের বলাবলি করতে শুনেছি। নিজ কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যদি নূতন কোনও সারং তিনি সৃষ্টি করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিছু বলার নাই। কিন্তু সেকথা বাজনা আরম্ভের পূর্বে বলে দিলে শ্রোতারা অধিক সুখী হতো। সারং বাজনার পর পুনরায় অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি ধুন নাম দিয়ে যা বাজালেন তা তাঁর মতো শিল্পীর উপযুক্ত হয়নি। সর্বশেষ আসরে কণ্ঠে মহারাজের তবলা সঙ্গতের সঙ্গে তাঁর বাজনা অধিক জমেছিল। এই আসরে তিনি বাজান ময়ূর বাহার এবং ঠুমরী। ময়ূর বাহারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোঝা গেল রাগটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজ ঘরানার সৃষ্টি। কিন্তু কবে, কোথায় এবং কে এ রাগ সৃষ্টি করেছেন তার সঠিক সন্ধান দিতে পারলেন না।

সরোদ বাজনায় জনাব ইস্তিয়াক আমেদ এ বৎসর সম্মেলনের নূতন আহরণ। শোনা গেল ইনি বিখ্যাত কেরামতুল্লা খাঁর পুত্র এবং ততোধিক বিখ্যাত কুকুভ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। কুকুভ খাঁর প্রকৃত নাম আসাদ আলী। কুকুভ নামে এক রাগ সৃষ্টি করে তিনি সেই নামে পরিচিত হন। নিয়ামতুল্লা খাঁ এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর পিতা। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই নিজ নিজ সময়ে কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তার কিছুটা অংশ জনাব ইস্তিয়াক আমেদের ক্ষেত্রেও আশা করেছিলাম। কিন্তু তৈরী বাজনা ছাড়া আর কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর সরোদে ফুটে উঠলো না। এই প্রসঙ্গে কলকাতার শ্রীযুক্ত শ্যাম গাঙ্গুলীর নাম স্বতঃই মনে এলো। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে তিনি হেমন্ত নামে একটি নবরচিত রাগ বাজান। রাগটি তদীয় গুরু আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কৃত। বিলায়ল ঠাটের অন্তর্গত এই রাগে আরোহীতে রেখাব পঞ্চম বর্জিত এবং বন্দেজটি সুন্দর। নব রাগ রচনার কৃতিত্ব লক্ষ্য করলাম, কিন্তু ততোধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেলো শ্যামবাবুর বাজনার রীতিতে।

মিয়া বিসমিল্লার সানাই বাজনা স্বাতন্ত্র্যের সম্মান পেতে পারে। বেনারসের ঘরানা হিসাবে এই সানাই বাজনার মাধুর্য ভারতের সর্বত্রই সুবিদিত এবং মিয়া বিসমিল্লার ক্ষেত্রে একথা নির্বিবাদে বলা চলে যে, তাঁর বাজনা শুনে কখনও নিরাশ হতে হয় না। ঠুমরী বাজনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বেনারসী ঢংয়ের লচাও রস বস্তুর এমন অপূর্ব সমারোহ খুব কমই



নৃত্যশিল্পী মনোরমা শা

শোনা যায়। প্রথম আসরে তিনি সারং ও ভৈরবী বাজান। দ্বিতীয় আসরে মালকোশ। বেহালা বাজনায় লক্ষ্ণৌর পণ্ডিত যোগ এবৎসর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মিঠা হাতের নিক্কন সুর এবং দুনী বাজনার বলিষ্ঠ ধারা তাঁর বাজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। অষ্টম আসরে জয়জয়ন্তি ও সাঁঝ খাম্বাজ রাগের একক বাজনা সুন্দর।

তবলায় কণ্ঠে মহারাজ ও কেরামতুল্লা খাঁর কৃতিত্ব সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। প্রথম শিল্পীর সাথ-সঙ্গত এবং দ্বিতীয় শিল্পীর দুনীসঙ্গত বিশেষভাবে সকলকে মোহিত করেছে। আনোখেলালের তবলা এবার একটু মন্দার দিকে লক্ষ্য করলাম। অবশ্য তাঁর লহরা এবং শ্রীমতী মনোরমা শার কথক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গত তাঁর পূর্ব সুনাম বজায় রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বরণ নৃত্যনাট্যে দাক্ষিণী সম্প্রদায়ের কোনও মৌলিকতা দৃষ্টিগোচর

হলো না। আবৃত্তির বোঝা কমিয়ে নৃত্যের প্রতি অধিক নজর দিলে আমার মনে হয় অধিক ফললাভ হতো। নৃত্যের যা কিছু দেখা গেল তার মধ্যে 'টিম ওয়ার্ক' বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলো। গানগুলিও তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

কথক নৃত্যে শ্রীমতী মনোরমা শা মুখরক্ষা করেছেন। কারণ আর যে দুজন ভারতনাট্যমে অবতীর্ণ হলেন তাঁদের নাচ তেমন সুবিধার হয়নি। মনোরমা শা, শোনা গেল 'আচ্ছন মহারাজের ভ্রাতা লচ্ছু মহারাজের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেছেন। নৃত্যের এই ঘরানা মূলত লক্ষ্মৌর, কিন্তু শ্রীমতীর নাচে জয়পুরের কিছুটা আঙ্গিক লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু তাতে নৃত্যের রসবস্তু খর্ব হয়নি, বরং তা প্রসারিতই হয়েছে। দুই দিন তিনি নৃত্যে অবতীর্ণ হন। তাঁর বেশভূষার মধ্যে একটা আধুনিকতার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় পুরাতন বেশভূষাই এ শ্রেণীর নৃত্যের পক্ষে অধিক সঙ্গত। নৃত্যে শিশু প্রতিভার মধ্যে শিখারাণী বাগ ও উত্তমা দে তালুকদার উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে শ্রীধীরেন ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের ধ্রুপদ ও কীর্তন, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর খেয়াল এবং শ্রীমন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারমনিয়ম বাজনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয়ের আশ্রমে

স্বামীজী তখন ঢাকা শহরে, যখন একদিন নাগ মহাশয়ের ভক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন যে, নাগ মহাশয়ের স্ত্রী (বিধবা) বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন যাহাতে স্বামীজী এত নিকটে যখন আসিয়াছেন, তখন একবার এই দরিদ্র গ্রামে তাঁহার পায়ের ধুলা পড়ে এবং আমরা সকলে তাঁহার শরণ লইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। স্বামীজী তাঁহার কথা শুনিয়া পরদিনই সেই গ্রামে যাইবার জন্য স্থির করিয়া ফেলেন।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয়ের দর্শন আমাদের ভাগ্যে কয়েকবার হইয়া থাকিলেও তাঁহার পূর্ব কথা, যাহা মঠের প্রাচীন সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি, তাহা পূর্বেই এখানে বলিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছি—ইনি সেই নাগ মহাশয়, যিনি পূর্বে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে উকিল আর ডাক্তারের ধর্ম হয় না—উকিল সর্বদা মিথ্যা লইয়াই থাকে আর ডাক্তার পুঁজরক্ত অস্থান কুস্থান ঘেঁটেই বেড়ায় ভগবানের দিকে মন দেবে কখন। ইত্যাদি কথাগুলো শুনিয়াই নিজ হোমিওপ্যাথি বাক্স-শুদ্ধ ঔষধ ভাগীরথী গর্ভে সেই দিনই ফেলিয়া দেন আর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যাও ছাড়িয়া দেন। ইনি সেই নাগ মহাশয় যিনি নিজ পিতৃ-দেবের আজ্ঞায় বিবাহ করেন বটে, কিন্তু সারা-জীবন স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও কখন সঙ্গ না করিয়া সাধু জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। যাহার ফলে স্ত্রীকে বলিতে হইয়াছে যে, "বুকে আগুন চেপে" কাটাইতে হইয়াছে। ইনি সেই নাগ মহাশয় যিনি একদা পিতৃ-আজ্ঞায় নির্বিকারে পচা ভেক কচমচ করিয়া খাইয়াছিলেন। ইনি সেই নাগ মহাশয়, যিনি পিতার অন্তিমকালে তাঁহার আজ্ঞায় গঙ্গাহীন দেশে বাটির অঙ্গন খুঁড়িয়া এক ঘটি গঙ্গাজলে তাঁহাকে স্নান করান ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাগ মহাশয় যে কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে। তিনি মূর্ত দীনতা ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার দীনতার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে কয়েকটি দেখিলেও এখানে লেখকের ভাগ্যে প্রথম দর্শনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যে আত্মম্ভরিতা লইয়া সে তাঁহার দর্শনে গিয়াছিল তাহার জন্য পঞ্চাশ বৎসরের অধিক অতীত হইলেও অদ্যাবধি তাহাকে ঘটনাটি মনে হইলেই সমভাবে যে ধিক্কার ও গ্লানি আসিয়া ব্যথিত করে, তাহা সেই জানে।

ঘটনাটি এই—লেখক তখন নব-প্রতিষ্ঠিত "উদ্বোধন" পত্রের আফিসে সহকারীরূপে মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া কম্বুলিয়াটোলায় কাজ করিতেছিল। একদা নাগ মহাশয়ের দরমাহাটায় এক ধনীর কুঠিতে আগমনের খবর পাইয়া সে উদ্বোধন প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শনে যাইবার অবকাশ প্রার্থনা করে এবং তাহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামী ত্রিগুণাতীত সে কুঠীর নম্বর এবং নাগ মহাশয়ের চেহারার হুলিয়া দিয়া তাহার এভাবে যাইবার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, নাগ মহাশয় দীনতাহেতু সকলকে পূর্বেই নমস্কার করিয়া থাকেন, আর কেহ তাঁহাকে অগ্রে নমস্কার করিতে পারেন নাই—এ কথা সত্য হইলেও সে এ বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কারণ স্বরূপ সে বর্ণনা করে যে সে তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখে নাই, সেজন্য তাঁহার হুলিয়া আদি জিজ্ঞাসিল এবং তিনিও তাহাকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই, অতএব সে যে কে এবং কোথা হইতে যাইতেছে ইত্যাদি কিছুই জানেন না। এজন্য তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। দৃঢ়ভাবে সে ঐ কথাগুলি বলিল। সব শুনিয়া কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীত হাসিয়া বলিলেন—"যেতে চাও যাও, কিন্তু তাঁকে ঠকাতে পারবে না।" তখন তাহার গোঁ চাপিয়াছে, সে শুনিল না—না শুনিয়াই সে কুঠীরদ্বারে গিয়া দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, নাগ মহাশয় দ্বিতলে কাছারী ঘরে কর্মচারীদের সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তথায় গিয়া একটি থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে পূর্বের হুলিয়া অনুসারে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। নিমেষে নিকটে পৌঁছিয়াই দেখে যে, দীনতার প্রতীক মহা-পুরুষের হাত হইতে হুঁকা পাওয়া গিয়াছে এবং "আপনারা সূর্যস্বরূপ, দাসকে পরীক্ষা করিবেন না" বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়াই পূর্ব হইতেই আছেন। ইহা দেখিয়া সে হতাশ হইয়া আত্মগ্লানিজনিত ক্রন্দন অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া তড়িৎপদে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকিল। তথায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের আসায় এবং "কি হয়েছে? হেরেছ ত?" জিজ্ঞাসা করায় তাহার রুদ্ধ ক্রন্দন বাহির হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে "মহাপুরুষের কাছে হেরেই ত শিক্ষা হয়ে থাকে। কি হয়েছে" ইত্যাদি স্তোকবাক্যে আশ্বাসিত করিতে থাকেন।

পরদিন প্রাতের গাড়ীতে স্বামীজী ঢাকা হইতে লেখককে সেবকরূপে সঙ্গে লইয়া রওনা হয়েন। যথাসময়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া দেখা যায়, হরপ্রসন্নবাবু স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি পূর্ব দিনই ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। রেল হইতে নামিয়া অল্পদূরে দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের আশ্রমে পদব্রজে যাওয়া হয়। তথায় পৌঁছিলে স্বামীজীকে নাগ মহাশয়ের স্ত্রী প্রণাম করিয়া স্বামীজীর আহ্বানুসারে তাঁহাকে একে একে যথায় পিতার মৃত্যুকালে নাগ মহাশয় মৃত্তিকা খনন করিয়া ভাগীরথীর জল উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়াছিলেন এবং অন্যান্য দর্শনযোগ্য স্থান দেখান। পরে স্বামীজী নিকটস্থ

পুস্করিণীতে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে যান; সরোবরটি দেখিয়া তাঁহার বহুকাল পরে সাঁতার কাটিবার সাধ জাগে। লেখককে বলেন, "আয় খোকা, সাঁতার কাটি আয়, জানিস ত?" সে প্রস্তুত হইয়া ভয়ে খানিকক্ষণ সাঁতার কাটেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছুদূর গেলে ক্লান্ত দেখিয়া ভুলাইয়া প্রত্যাবর্তন করা হয়। আশ্রমে ফিরিলে দেখা যায়, নাগ মহাশয়ের স্ত্রী নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে করিতে ডাকিতেছেন। খাইতে বসিয়াই স্বামীজী বলেন, "খোকা একটি ভাতও ফেলবে নি, আশ্রমের পবিত্র অন্ন।" আহারান্তে চণ্ডীমণ্ডপে একখানি কম্বল পাতাইয়া তদুপরি বিশ্রামার্থে শয়ন করেন এবং শয়নমাত্রেই নাক ডাকিতে থাকে। অপরাহ্নে প্রায় ৪টার সময় নিদ্রা ভাঙ্গে। উঠিয়া নিদ্রার অবধি জানিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এতক্ষণ ঘুমিয়েছি কেন বলতে পারিস?" উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, অনেক কাল বাদে সাঁতার কেটেছেন, আর তাতে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই বোধ হয়।" তিনি বলেন, "নারে না। আমি আঙ্গুলে গুণে বলতে পারি, জীবনে কয়দিন ঘুমিয়েছি। এ সুষুপ্তি। মহাপুরুষের আশ্রম শান্তিময় স্থান, তাতেই সুষুপ্তি এনে দিয়েছে।"

প্রত্যাবর্তনের সময় আসিলে নাগ মহাশয়ের স্ত্রী অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠান এবং স্বামীজী গেলে তাঁহাকে পরিধানের জন্য একখানি ধুতি দিয়া প্রণাম করেন। তিনি সেখানি গ্রহণ করিয়া মস্তকে উষ্ণীষরূপে ধারণ করেন। পূর্ব পথে সন্ধ্যার পূর্বে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করা হয়।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটাস্থ বাটী।

স্বামীজী তখন বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে থাকেন। একদিন মহারাজার গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ নিতাই হালদার মহাশয় আসিয়া স্বামীজীর সহিত কথা কহেন। আমরা কার্যান্তরে থাকায় তাহা শুনি নাই। পরদিন কিন্তু দেখিলাম, মহারাজার গাড়ী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল এবং সংবাদ পাইয়া স্বামীজী তাড়াতাড়ি যেভাবে ছিলেন, সেইভাবে একটি মাত্র গেঞ্জী পরিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, আর কোন উত্তরীয় বস্ত্র এবং জামা দিতে গেলে লইলেন না। অন্যমনস্কভাবেই চলিয়া গেলেন। নিজ জুতা একটু তফাতে ছিল, পরিলেন না। নিকটে জনৈক ব্রহ্মচারীর চটি জুতা ছিল, তাহাই পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে কোন সেবকও লইলেন না—একাকীই গেলেন। তিনি গেলে আমরা নিজেদের ভিতর বলাবলি করিতে থাকি, শুনতে পাই মহারাজা ত সাগু খাইয়াই থাকেন। এতে ওঁকে ডাকা কেন? এতেত ডাক্তারের দরকার। এতে যোগে কি হ'বে? বোধ হয়, সেই জন্যই ওঁকে ডাকা হয়েছে।

খানিক বাদে স্বামীজী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে গম্ভীর দেখিয়া আমাদের কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কিন্তু দেখিলাম, অবশ্য কাহার নিকট মনে নাই, যে রাজযোগের দ্বারা ঐ ব্যাধি আরাম হয় কি না, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং স্বামীজী উত্তর দেন, "আমরা ব্যাধি আরাম করা বা ঐ জাতীয় কিছু করা জানি না—আমরা ধর্মের বিষয় বুঝি।"

যোধপুরের রাজা প্রতাপ সিংহের আগমন।

সেদিন স্বামীজী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মঠে ছিলেন না। বৈকালে দুইজন শরীররক্ষকসহ এক রাজপুত আসিয়া স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে চাহেন। তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন বলিলে জিজ্ঞাসা করেন, কখন আসিবেন? আসিতে সন্ধ্যার কাছাকাছি হইবে বলায় তাঁহারা চলিয়া যান। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়া যায় এবং স্বামীজী ফিরিলে তাঁহাকে জানান হয়। শুনিবামাত্র তিনি জুতা ছাড়িয়া খালি পায়ে ঠাকুরঘরে সিধা গিয়া সাষ্টাঙ্গ হয়েন। খানিক পরে উঠিয়া হন হন করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান। পরে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট শুনি, রাজা আর্যসমাজী। স্বামীজী যোধপুরে গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন নাই। তিনি মনে মনে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, ও যেন মঠে আসে। তাই আজ এসেছে, আর স্বামীজী ঠাকুরকে সেজন্য প্রণাম করে গেলেন।

"কল্লোল যুগ"

শ্রীরাজশেখর বসু

'কল্লোল যুগ' যখন মাসে মাসে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই সাগ্রহে পড়েছি, এখন পুস্তকের আকারে আবার পড়লাম। ইংরেজীতে এই ধরণের বই অনেক আছে, বাংলায় দেখেছি বলে মনে হয় না। এ দেশের ধর্মপ্রচারক সমাজসংস্কারক আর রাজনীতিক দল সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন লেখকদের ব্যাপক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে বা তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে যাঁরা সাহিত্যাদি কলার চর্চা করে খ্যাত হয়েছেন তাঁদেরও পূর্ণ বিবরণ এ-পর্যন্ত লেখা হয়নি। বোধহয় 'কল্লোল যুগ'ই প্রথম গ্রন্থ যাতে এদেশের একটি সুসম্বন্ধ সাহিত্যসেবী দলের অভ্যুদয় বিবৃত হয়েছে।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে কয়েকজন উৎসাহী নবযুবক বহু বাধা অগ্রাহ্য করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়েছিলেন তারই মনোজ্ঞ বিবরণ 'কল্লোল যুগ'। ভর্তৃহরি মিত্রের লক্ষণ দিয়েছেন—আপদি সুখে চ সমক্রিয়ং যৎ। এই সমক্রিয়তাই এ'দের মিত্ররূপে একত্র করেছিল। এ'রা সকলে একই স্কুল বা সাহিত্যপদ্ধতি আশ্রয় করেছেন এমন বলা যায় না। কিন্তু এ'দের বিভিন্নমুখী প্রতিভার সমন্বয়ে আদর্শের মিলনে এবং সমান আকুতির ফলে বাংলায় অভিনব গদ্য-পদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ'দের অনেকে নূতন বিষয়, নূতন ভঙ্গী আর নূতন ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতেই আসরে নেমেছিলেন। প্রথম পরীক্ষার ফল সকল ক্ষেত্রে নির্দোষ হয় না, এ'দেরও হয়নি; কিন্তু ক্রমশ তাঁরা নিজ প্রতিভার উপযুক্ত সন্ধান পেয়ে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং অনেকেই যশস্বী হয়েছেন।

সমকালীন নবীন প্রবীণ অনুকূল প্রতিকূল যেসব সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ'দের মিলন বা বিরোধ হয়েছিল তার কথাও এই গ্রন্থে আছে। এই বিবরণ যেমন সংযত তেমনি কৌতূহলজনক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল যুগ' একটি বিশিষ্ট স্থান পাবে। এই সুদৃশ্য সুখপাঠ্য চিত্তাকর্ষক অসাধারণ পুস্তকটির বহু পাঠক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কল্লোল গোষ্ঠীর অল্প কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আরও কয়েকজনকে শুধু দূর থেকে দেখেছি। এই বইটি পড়ে মনে হয়েছে সকলকেই এখন ভাল করে চিনেছি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক: ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা

চিত্রপ্রদর্শনী

গবর্ণমেণ্ট আর্ট কালেজ

গত ২৩শে ডিসেম্বর গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী সাধারণের জন্য খোলা হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রতিটি বিভাগে প্রতিবারের চাইতে উন্নত ধরণের কাজ সত্যই আশান্বিত করেছে। ছাত্রছাত্রীদের নানান ধরণের কাজের সংগে অধ্যাপকদেরও কিছু কিছু কাজ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনী যাঁরা দেখতে যাবেন, তাঁদের একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি কাজ ছাত্রদের করা; অতএব সুদক্ষ শিল্পীদের আঁকা ছবির কোন প্রদর্শনীর সংগে তুলনায় এই প্রদর্শনীটির বিচার করলে ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হবে। এই প্রদর্শনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে শুধু ছবি নিয়ে ছাত্ররা ব্যস্ত নয়; তাদের দৃষ্টি যে এর বাইরেও গেছে এবং শিল্পীর যা আসল কাজ—শিল্প-রচনায় প্রতিটি বিভাগে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা—সেই প্রচেষ্টায় এঁদের দৃষ্টি পড়েছে। তাই জল-রঙ তেল-রঙের কাজ ছাড়া কাঠ-খোদাই, এচিং 'কমার্শিয়াল আর্ট' দৈনন্দিন জীবনের উপকার অনুযায়ী নানান ধরণের মাটির কাজ ইত্যাদি ছাড়াও খেলনা, মুখোস প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে।

প্রদর্শনী গৃহে প্রবেশ করে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবারকার ছবি সাজানোতে প্রভূত উন্নতি, যদিও হাজারখানেকের বেশী দ্রষ্টব্য ছবি প্রভৃতি ঠিকভাবে সাজানো অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রদর্শিত ছবি প্রভৃতির সংখ্যা যদি আরও কিছু কমান যেত, তাহলে ভাল হত, যদিও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে দ্রষ্টব্য শিল্প-রচনার সংখ্যাও নিতান্ত কম হবে বলে আশা করা যায় না; কিন্তু দর্শকদের কথা মনে রেখে নির্বাচনের ব্যাপারে যে আরও কিছুটা মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। আর একটা কথা এখানে না বলে পারলাম না। বিদেশীয় অপাংক্তেয় ছবির অনুকরণে 'মডার্ন' এবং 'টাচে' ছবি করবার ফ্যাসান যেন আজকাল সংক্রামকভাবে দেখা দিয়েছে। বিদেশে যাঁরা এই ভাবের পাগলামী করেন, বা জোরালো 'টাচে' কাজ করেন, তা তাঁদের দীর্ঘ জীবনের সাধনার পরেই করে থাকেন। কিন্তু সেটা এঁরা দেখেন না। ড্রইংএ নিজের দৌর্বল্য ঢাকবার জন্য এবং নাম কেনার দুর্বার আগ্রহে এঁরা নতুন কিছু করবার মোহে তাক লাগাবার চেষ্টা করেন 'মডার্ন' আখ্যা দিয়ে—তাঁরা শিল্পের গোড়ার ভিত্তি যে ব্যাকরণ তাকে অস্বীকার করতে চান—ভুলে যান এ মোহ কেটে গেলে আর পেছনে ফেরার—সুধরে নেবার সময় পাওয়া যাবে না। এই সব শিল্পীকে একদল সমালোচক এবং পত্রিকাদল আবার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে প্রচার করেন শিল্প-শিক্ষার্থীকে বিরাট শিল্পী বলে। এর পেছনে কোন সৎ উদ্দেশ্য যে থাকে না, তা বোঝাই যায়, বরং ভারতীয় শিল্পধারাকে এঁরা অস্বীকার করতে চান—এঁদের বাহবা দিয়ে—বিপথে চালিত করে। এই প্রদর্শনীর কোন কোন কাজে এই ধরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল। অধ্যাপকদের উচিত শিক্ষানবীশীকালে অন্তত এই বিষময় ফলের হাত হতে তাদের দূরে রাখা। শিক্ষা সমাপনান্তে সারাজীবন 'মডার্ন' 'টাচের কাজ' এবং 'পাগলামী' করবার ক্ষেত্র প্রচুর পাওয়া যাবে; কিন্তু গোড়ার ভিত্তি পোক্ত না হলে কোন কিছুই হবে না।

জল রঙের কাজগুলোর মধ্যে শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় প্রথায় কাজগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাঁর 'শান্তি-শেল' সত্যই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ঘরকন্নাও আর একটি ভাল ছবি। মাছধরার ফিগারের বিকৃতি ছবিটির রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছে। মনোরঞ্জন ঠাকুরের ড্রইএর হাত ভাল—এঁর প্রতীক্ষা ছবিটির রঙ, কম্পোজিশন এবং ভাবটি সর্বাঙ্গসুন্দর। আলপনা ছবিটিও সুন্দর। উদয়গিরির দৃশ্যচিত্র ছবিটিতে সামনের পাহাড়ে আর কিছুটা রঙ যোগ করে পেছনের পাহাড়গুলোকে দূরে ফেলে দিলে ভাল হত। অরুণকুমার বসুর হাওয়ার দমক ছবিটির দুরন্ত বাতাসের ঝাপটা এবং ঝড়ের আবছায়া ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। চুনী দত্তগুপ্তের 'সান্ধ্য-প্রার্থনা'ও বেশ ভাল লাগল, কিন্তু 'ফিগার'এ গিয়ে তাল কেটেছে। ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্য ছবিটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। তাপস দত্তের তীর্থযাত্রীর রচনা বিন্যাস ও



লীনা

শিল্পী: শ্রীব্রজেন সেন

রঙের ব্যবহার ভাল। সলিল দাশগুপ্তের শহর থেকে দূরে ছবিটির মাঝে হঠাৎ মাথাবিহীন গাছ দেওয়াতে নষ্ট হয়েছে—এ'র কুয়াশা ভাল লাগল। তরুণ দাসের 'মেন স্টেশন' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ'র ছবিতে রঙের ব্যবহার বড় 'হার্ড' মনে হয়। এদিকে শিল্পীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জন দাসের দিনের শেষে এবং প্রতিকৃতিটি মন্দ নয়। 'ঘরের পথে' ছবিটির ফিগারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। ভবানী দত্তের 'বসন্ত' ছবিটা ভাল লাগল; কিন্তু অতিমাত্রায় বিদেশীয় মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ হালদারের 'দম্পতি' ছবিটির মোরগ দম্পতির রঙ এবং পরিবেশ ভাল লাগল। নিরালা ছবিটিতে হাঁস দুটির সংস্থাপন এবং শান্ত ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। মদন রায়ের আচার্য নন্দলালের নটীর কীর্পাটি সুন্দর হয়েছে। সুবল আনের 'ঘাট' একটি ভাল কাজ, রণেন্দ্রনাথ সিংহের 'মহিষ' এবং 'রেল-ইঞ্জিন' ছবি দুটি সত্যই রসোত্তীর্ণ হয়েছে—এ'র ড্রয়িং-এর হাত ভাল। রঙের স্বচ্ছতা মুগ্ধ করে। অমলেন্দু সেনের 'হ্যাপি হাউস'-এর রচনা-বিন্যাস এবং রঙ ভাল লাগল। সুমঙ্গল সেনগুপ্তের ছবিগুলোর রঙ প্রায় একই হয়ে গেছে, তাঁর সাঁওতালী কুটীরের আলোছায়ার খেলা এবং শীতের সকাল ভাল লাগল। হৈমন্তী সেনের 'ফতেমা' ভাল হয়েছে; কিন্তু 'গ্রেডেশন' আরও পরিষ্কার করে না দিলে পটভূমির সঙ্গে ছবিটি হারিয়ে যাচ্ছে। এ'র নিজের প্রতিকৃতিটা সত্যই চমৎকার হয়েছে। ব্রজেন সেনের 'নীমা', বিভূতি সেনগুপ্তের 'রূপক' এবং 'স্টিল লাইফ', আশুতোষ সামন্তের 'ক্লাস-মডেল' এবং 'ঘুমটি' ভীড়ে হারিয়ে যায় না। চিত্ত করের মজুর, ডালিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাশ্বতী ঘটকের রাঙা ছেলে এবং দুই বোন সুন্দর হয়েছে। কিন্তু ছবির ভাষা বিদেশীয়—আমাদের ভাষায় কথা বলার যে নিজস্ব ভঙ্গী আছে, তা তো এ ছবিতে পাইনে। তাঁর আয়নার সামনে আর একটি সুন্দর ছবি। শান্তু মজুমদারের কাজগুলোর মধ্যেও সেই বিদেশীয় কাজের ছাপ; তাঁকে তাঁর নিজস্ব ধারায় পাইনে। 'বাগানে' ছবিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।



পার্বত্য দৃশ্য শিল্পীঃ শ্রীতাপস দত্ত

কমার্শিয়াল আর্টের বিভাগে বিদেশী প্রভাব অতিমাত্রায় প্রকট। ভারতীয় আঙ্গিকে এবং ভারতীয় ধারায় আমাদের নিজস্ব ভাষায় এই সব কথা বললে নিশ্চয়ই আরও ভাল হত, এদের মধ্যে স্বদেশ দাশগুপ্তের ক্যালেন্ডারের ছবিটি', পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্যের 'ক্যাপস্টান সিগারেটের কাজটি', রজত সেনের 'শো কার্ড', তারাপ্রসাদ দত্তের ধ্যানীবুদ্ধের ক্যালেন্ডারটির সুন্দর 'প্রিন্টে' চমৎকার হয়েছে। অজিত ভট্টাচার্যের পত্রিকায় 'লে আউট' ভাল লাগল। সরায় আঁকা ঘোড়া, মাছ এবং দেবী প্রতিমাটি সুন্দর হয়েছে। মূর্তিগুলোর মধ্যে সুনীল ভৌমিকের বুদ্ধ সুন্দর রচনা—অন্যান্য মূর্তিগুলিও বেশ ভাল হয়েছে। কাঠখোদাই এচিং ইত্যাদির বিভাগটি এবার বিশেষভাবে উন্নত হয়েছে, কোন কাজই হারিয়ে যায় না, এদের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সসীম দাশগুপ্তের 'আপল্যান্ডস্' শাশ্বতী ঘটকের 'খোলা জায়গায় ক্লাস', গোষ্ঠবিহারী কুমারের 'স্নেহ', বীরেশ গুহের 'হৈমন্তীক,' 'দিনের শেষ', শচীন রায়ের 'বিশ্রাম,' সুমঙ্গল সেনের 'চিন্তামগ্ন', মনোরঞ্জন ঠাকুরের 'ক্রেতা-বিক্রেতা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দাসের 'বর্তমান অবস্থা' ছবিটিতে মা-এর ক্ষুধাপীড়িত চেহারার সঙ্গে মোটা সোটা ছেলেদের সামঞ্জস্য না থাকায় কাজটি ভাল হওয়া সত্ত্বেও নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন মনে হয়।

এবারকার ছাত্রদের এই শিল্পরচনার প্রদর্শনী দেখে দর্শকমাত্রই আশান্বিত হবেন। তরুণ শিল্প-শিক্ষার্থীদের এই রচনাগুলিতে যে প্রতিশ্রুতি আছে, তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।



আলপনা শিল্পীঃ শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুর



একসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

'লেডিজ সীটটা ছেড়ে দেবেন।'

অমনি বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটা নড়াচড়া ঠেলাঠেলির ঢেউ উঠলো।

যত মানুষ বসে আছে তার প্রায় তিন-ডবল দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। দুয়ারের কাছের হাতল ধরে এবং নাগালের মধ্যে যা পেয়েছে তাই অবলম্বন করে ঝুলে চলেছে আরো কয়েকজন। জীবনটা এদের কাছে যেন কিছুই নয়। একমাত্র চাকরিটাই আসল। অন্তত এদের মুখে চোখে সেই ভাবটাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই বুঝি যে কোন উপায়ে আপিশে পৌঁছাতে পারলেই হলো। কেননা, এখন একটুও দেরী করবার সময় নেই। কাঁটায় কাঁটায় আপিশে হাজিরা দিতে হবে যে!

কিন্তু এ-সময়ে আবার মেয়ে কেন? তারো কি আপিশের দেরী হয়ে গেল?

ওপাশ থেকে কে যেন অনেকের মনের কথাটা বলেও ফেললো—'একি অন্যায়—আপিশ টাইমে—'

যে দুটি ভদ্রলোক এ-পাশের লেডিজ সীটটি দখল ক'রে বসেছিল তারা রীতিমত বিব্রত বোধ করলো এবং শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালো দুয়ারের দিকে। কোন মেয়েকে আপাতত দেখা গেল না। কেবল দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের নিরন্ধ্র জমাট দেওয়াল। ভগবানের কৃপায় মেয়েটি যদি এদিকে না আসে তবে তাদের আর উঠতে হয় না। কিন্তু মাত্র একটি মেয়ের জন্যে ও পাশের লেডিজ সীট ছেড়ে কি অতগুলি মানুষ উঠে দাঁড়াবে?

সত্যই তাই। মেয়েটি এদিকে চলে এসেছে।

কি এক দুর্বোধ্য মন্ত্রবলে ফাঁক হয়ে গিয়েছে মানুষের সেই দুর্ভেদ্য দেওয়াল। যথাসাধ্য সংকুচিত হয়ে সকলে রাস্তা দিয়েছে তাকে। আর মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ভদ্রলোক দুজনের পাশে। একজনের জন্যে যে তাদের দুজনকে উঠে দাঁড়াতে হবে—তাতে একটুও লজ্জিত নয় সে বরং। কেমন যেন একটু বাঁকা হাসি তার কটকটে রং-করা ঠোঁটে।

'লেডিজ সীটটা ছেড়ে দেবেন।'

আবার কে যেন বলে উঠলো। বোধকরি কনডাক্টারই হবে।

পাশের লম্বালম্বি সীটের এক প্রান্তে আরামে বসেছিলেন একজন টাকপড়া প্রৌঢ়-মতো ভদ্রলোক। পান চিবোতে চিবোতে বাসের ঝাঁকানিতে বুঝি একটু ঘুমের ভাব এসেছিল তাঁর। প্রথমবার লেডি শুনে চোখ খুলে তাকিয়েছিলেন একবার। যদিও তিনি জানেন—যে সীটে বসে আছেন—সেটা লেডিজ সীট নয়। তবু তন্দ্রার আমেজটুকু নষ্ট করেছিলেন তিনি। এবং লেডি বলতে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তারপর আবার চোখ বন্ধ করেছিলেন।

কিন্তু এবারে আবার না তাকিয়ে থাকতে পারলেন না।

এদিক ততক্ষণে লেডিজ সীটের সেই ভদ্রলোক দুটি উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় উঁচু করে চকিত দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়েই উঠেছে প্রথম দিকে বসা ভদ্রলোকটি। বাধ্য হয়ে পাশের ভদ্রলোককেও উঠতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছায়।

মেয়েটি অবশ্য বসতে বসতে বলেছে—'আপনাকে আর উঠতে হবে না। আপনি বসুন।'

করুণা করছে যেন মেয়েটি। অন্তত পাশের ভদ্রলোকটির তাই মনে হয়েছে। সেইজন্যই বুঝি বলেছে—'থাক—ধন্যবাদ'—বলে গম্ভীরভাবে কোন রকমে পাশ কাটিয়ে সরে এসেছে এবং ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে অতিকষ্টে।

আর কাউকে বসতে বললে হয়তো বসতো। কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটি কোলের ওপর রেখে একেবারে জানালার কাছে সরে গিয়ে বসলো মেয়েটি, তারপর চেয়ে রইল বাইরের দিকে—বোধকরি মুখের ভাব গোপন করবার জন্যে।

তবু তাকে রেহাই দিলো না বাসের অনেকে। তার মুখের যে আধখানা দেখা যাচ্ছিল এ-পাশ থেকে—সেইদিকে তাকিয়ে দেখছে সব। এদিকে না চেয়েও মেয়েটি

বুঝতে পারলো মনে মনে। আর অমনি নড়েচড়ে আরো একটু ভালো হয়ে বসলো সে। এবং আড়চোখে বাসের ভিতরের দিকটা দেখে নিলো একবার। তারপর আরো একবার। অনেকেরই সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি তাদের চোখে।

তাতেও একটু লজ্জাবোধ নেই মেয়েটির। ক্ষণকাল আগে তার বসতে বলা অনুরোধ যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল ভদ্রলোকটি—খুবই অপমান করা হয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল তখন। তার কোন আভাসই নেই এখন মেয়েটির মুখেচোখে। একটা যেন উদ্ধতভাব তার সমস্ত শরীরে—তার ব'সে থাকার ভঙ্গীতে।

আর কেমন একটা নির্লজ্জতা তার সাজপোষাকেও। একে কালো লম্বা মতো চেহারা মেয়েটির। তার ওপরে একখানা সস্তা ছাপা-শাড়ী পরেছে—সামনে সামান্য একটু কুঁচি দিয়ে। হাতকাটা পাতলা ফিনফিনে ব্লাউজের তলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যৌবন আবরণী অন্তর্বাস। রুজ, পাউডার এবং লিপষ্টিকে মুখখানাকে প্রতিভাত করবার চেষ্টা করেছে। আর চোখের সূক্ষ্ম রেখার কাজলে একটা দুর্বোধ্য রহস্য। যে রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে পুরুষেরা হয় পাগল।

তাই কি সকলে তাকে দেখছে বারে বারে?

মদিরচোখে আর একবার তাকালো সে সকলের চোখের দিকে। তাড়াতাড়ি অনেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে। যেন লজ্জায় নয়—ঘৃণায়।

'এই রোক্কে—একদম রোক্কে—'

বাসটি থেমে গেল আবার। তারপরই একটি ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

'এইরে—আবার লেডি নাকি?' কার উদ্দেশে কে যেন জিজ্ঞাসা করলো।

কিন্তু কোন উত্তর আসবার আগেই এক ভদ্রলোক এসে উঠলো বুকের ওপরে একটি ছেলে চেপে ধ'রে। ভিড়ের চাপে এবং গরমে ছেলেটির কান্না যেন গেল আরো বেড়ে। একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সকলে।

'এতো ভিড়ের মধ্যে এইটুকু ছেলে নিয়ে কি ওঠে মশাই'—দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বললো—'একটু পরে গেলেই তো পারতেন—'

'পরে ভিড়তো আরো বেড়ে যাবে। তখন যে একেবারেই ওঠা যাবে না।'

কান্নায় অস্থির ছেলেকে সামলাতে সামলাতে ভদ্রলোকটি বিশেষ বিব্রত হ'য়ে পড়লো। বললো—'একে বাড়িতে রেখে আমাকেও যে আবার আপিশ যেতে হবে।'

ব'লে ছেলেটিকে এবার একেবারে কাঁধের ওপরে তুলে নিলো সে। বাঁ হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছিল ক্রমশ। তাই হয়তো ছেলেটি নেমে পড়ছিল নিচের দিকে।

ওরই মধ্যে একজন আবার ছেলেটিকে একটু আদর করবার চেষ্টা করলো—'আরে তুমি তো খুব ভালো ছেলে—সোণাছেলে—এরকম ক'রে কাঁদে নাকি?—এ্যাঁ?'

ছেলেটির কান্না থামলো না তাতে। বরং আরো বেড়ে গেল।

'তাইতো আপনার মহামুশকিল হলো দেখছি—তাছাড়া এইভাবে দাঁড়িয়ে—'

'বসুন না'—এইতো এখানে একজনের বসবার জায়গা রয়েছে।' ব'লে একজন মেয়েটির পাশের জায়গাটি দেখিয়ে দিলো।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ আপনি বসুন।' অনেকে বললো একসঙ্গে।

এবং কোনরকমে সরে গিয়ে ভদ্রলোকটিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ ক'রে দিলে তারা।

শরীরের ভারসাম্য অতিকষ্টে বজায় রেখে ভদ্রলোকটিও এগিয়ে গেল। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে। কেমন যেন ভরসা হলো না তার বসতে।

প্রতিশোধ নেবে নাকি মেয়েটি? প্রবল আপত্তি তুলে অপমান করবে কি তাদের—যারা মনে মনে উল্লসিত হয়েছিল সে সময়ে?

কেননা, তারাইতো বসতে বলছে এই ভদ্রলোককে।

কিন্তু না—মেয়েটি একটু আগ্রহ দেখিয়েই বললো—'বসুন।'

তারপর যতদূরে সম্ভব স'রে গিয়ে বসবার জায়গাটাকে আরো প্রশস্ত করে দিলো সে।

কোন দিকে না তাকিয়ে ভদ্রলোকটি বসে পড়লো সেখানে এবং ছেলেটিকে নামিয়ে আনলো কোলের ওপরে।

তাতেও কোন শান্তি হলো না। কান্নার ধমকে আরো ঝেঁকে ঝেঁকে উঠতে লাগলো ছেলেটি। আর ঐটুকু শিশুর শক্তির উৎক্ষেপবিক্ষেপে রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো ভদ্রলোক। কিসে যে শান্ত হবে সে তা যেন কেউ-ই বুঝতে পারছে না। বাস শুদ্ধ সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলো মনে মনে।

'আচ্ছা—আমার কাছে দিন তো'—মেয়েটি বললো অপ্রত্যাশিতভাবে। এবং কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই দু' হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে টেনে নিলো সে নিজের কোলের ওপরে। হঠাৎ ছেলেটিও একেবারে চুপ ক'রে গেল অপরিচিতার মুখের দিকে চেয়ে। সেই সুযোগে মেয়েটি তার লাল রং-এর ভ্যানিটি ব্যাগটি ছেলেটির হাতে দিলো। ব্যাগটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ছেলেটি আবার তাকালো মেয়েটির মুখের দিকে।

'কি—ব্যাগটি তোমার পছন্দ হয়েছে?—' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো সহাস্যে।

তার উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না ছেলেটির দিক থেকে। কেবল মুখ তুলে আর একবার তাকালো সে। অশ্রুর দাগে মুখখানি মলিন হয়ে গেছে। চোখ দুটি যেন মায়াময় হয়ে রয়েছে। থেমে যাওয়া কান্নার ফোঁসানি উঠছে তখনো—থেকে থেকে।

তাড়াতাড়ি মেয়েটি কোথা থেকে একটা রুমাল বার করে ছেলেটির চোখমুখ মুছিয়ে দিলো এবং কপালের দিকে নেমে আসা চুলগুলিকে সরিয়ে ওপরের দিকে তুলে দিলো সস্নেহে।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো ভদ্রলোকের। তাই মৃদু স্বরে বললো—'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো—'

'থাক—ধন্যবাদ না হয় নাই জানালেন,'—বলে মুখটিপে একটু হাসলো মেয়েটি।

তারপর আর কোন কথাই বলতে পারলো না ভদ্রলোক। তার বিব্রত জীবনের অনেক কথাই হয়তো বেরিয়ে আসতো এখনই। যে উপকার মেয়েটি করছে—সামান্য সময়ের জন্যে হলেও—অনেকটা স্বস্তি পেল সে এতক্ষণে। কাল রাত্রি থেকে যে বিভ্রাট চলেছে তার।

কাল আপিশ থেকে ফিরে এসেই দেখে বিনতার বিষণ্ণ ভাব। চোখের দৃষ্টিতে একটা করুণ কাতরতা।

অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। বলেছে—'কিগো—শরীর খারাপ বোধ করছো নাকি? ট্যাক্সি ডাকবো?'

'না—না, এখনো সেরকম কিছু নয়।' বিনতা যেন ম্লান হেসেছে।—'একটুতেই তুমি বড়ো ব্যস্ত হয়ে ওঠো।'

'তুমি কিছু বোঝ না—এখনই তোমার হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

আপিশের জামা-কাপড় না ছেড়ে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসেছে সে এবং বলেছে—'এরপর আরো যখন বাড়বে—এমন মুশকিলেই পড়ে যাবো আমি—'

'মুশকিলে পড়বে তুমি আরো খোকনকে নিয়ে। আপিশ থেকে ছুটি যখন পাবে না বলছো—কালীঘাট থেকে পিসিমাকে নিয়ে এসো বরং।'

'তাই যাই।'

কিন্তু পিসিমার কাছে কিছুতেই থাকবে না খোকন। কাল রাতে ঘুম ভেঙে তার মাকে না পেয়ে কি কান্নাই আরম্ভ করেছে সেই থেকে।

রাত বারোটা হয়েছে তার কাল হাসপাতাল থেকে ফিরতে। যদিও তখনো বিনতার কিছু হয়নি। ডাক্তার এসে বলেছে—'আপনার স্ত্রী বললেন বাড়ি যেতে—'

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে তাকিয়েছে সে ডাক্তারের দিকে। অর্থাৎ বিনতার কি হয়েছে—কেমন আছে এখন? ডাক্তার তখনই বুঝতে পেরেছে তার মনের ভাব। বলেছে—এখনো কিছু হয়নি। আর আজ রাতেও

হবে কি না ঠিক নেই। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। বাড়ি যান।'

সম্ভব হলে কাল সারারাতই হাসপাতালে থাকতো সে। কিন্তু খোকনের কথা ভেবেই বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। আর এসেই দেখে পিসিমা অস্থির হয়ে উঠেছেন খোকনকে নিয়ে।

তাকে দেখে পিসিমা যেন বেঁচেছেন। বলেছেন—'একে তো কোন রকমেই রাখতে পারছি না সরোজ!'

সেই কথাই সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে সে। হঠাৎ যদি খোকনের ঘুম ভেঙে যায় এবং জেগে যদি তার মাকে না পায়—কি কান্ড হবে তখন!

অবশ্য তার কাছে এসে খোকন চুপচাপ ছিল খানিকক্ষণ। কামড়ে কামড়ে বিস্কুট খেয়েছে আর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখেছে—তার মা গেল কোথায়?

হাতের বিস্কুট ফুরিয়ে গেলে আবার কান্না জুড়েছে—'মা যাবো।'

এইভাবে বিস্কুট খাইয়েই বা রাখা যায় কতক্ষণ?

সত্যি—কি ভাবে যে কাল বাকী রাত কেটেছে খোকনকে নিয়ে।

আজ সকালে উঠেও আবার সেইরকম কান্না।

বিনতার কাছে যে সর্বদাই থাকে খোকন—এমন নয়। এর ওর ঘরেই ঘুরে বেড়ায়, হাঁটতে শেখা থেকে। খেলা করে অন্যান্য ভাড়াটেদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আর এখন মনে হবে—মাকে ছাড়া বুঝি একদণ্ডও থাকে না সে।

অগত্যা ওকে সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাকে। যদি অন্য পরিবেশের মধ্যে তার মাকে দেখে একটু শান্ত হয়।

কিন্তু ওর মাকে দেখিয়ে আনা হয়নি, ওরা গিয়ে শোনে—বিনতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডেলিভারি রুমে। তারপর শুনেছে—একটি বোন হয়েছে খোকনের।

আর বিনতা—বিনতা কেমন আছে?

ভালোই আছে। নিশ্চিন্ত হতে পারে সরোজ।

তা হলেও এখন আর দেখা হবে না। দেখা হবে সেই বিকালে।

তাই বাড়ি ফিরে চলেছে সে। সকাল সকাল যখন সমস্ত মিটেই গেল—আপিশটা আর কামাই করে কেন?

এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে হবে তাকে। সেইজন্যেই উঠেছে এই বাসে—অত্যধিক ভিড় থাকা সত্ত্বেও।

কিন্তু এ-সব কথা তো বলা যায় না। বিশেষত এতগুলি মানুষের সামনে।

তবে আর একটু হলেই বলে ফেলতো হয়তো। খুব সংযত করেছে নিজেকে।

সলজ্জ মেয়েটির দিকে একবার তাকালো সরোজ। রং-করা মুখখানা দেখা গেল না সম্পূর্ণভাবে। এখন সে খোকনকে কোলের ওপরে দাঁড় করিয়েছে এবং দেখাচ্ছে তাকে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া এক-একটা গাড়ি।

'এই একটা গড়ি চলে গেল—ঐযে আবার একটা আসছে।' একটু যেন গানের সুরে বলছে সে।

খোকনও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।—'আল কই—আল?'

কাজেই মেয়েটির একটু ঘুরে বসতে হয়েছে, এদিকে পিছন ফিরে।

নয়তো মেয়েটি দেখতে পেতো সরোজের চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে আর সকলেরও। একটা যেন শ্রদ্ধার ভাব জেগেছে সকলের মনে।

এমন সময় বাসটি এসে থামলো এলগিন রোডের মোড়ে।

অমনি সরোজ উঠে দাঁড়ালো। এবং কুণ্ঠিত হয়ে বললো— এইখানে নামবো আমি। বলে ব্যস্তভাবে খোকনকে তুলে নিলো সে মেয়েটির কোল থেকে। তারপর আবার বললো—'অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। মনে কিছু—'

বলতে বলতে সরোজ নেমে গেল বাস থেকে—কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই। কারণ, এক্ষুণি আবার বাস ছেড়ে দেবে যে!

মানুষের সেই জমাট দেওয়াল আর একবার ফাঁক হলো শুধু এবং আবার এক হয়ে গেল চোখের ওপরে।

আর মেয়েটির চোখমুখের ভাব একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো; যেন শিথিল হয়ে এলো তার সমস্ত শরীর।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো কি?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই কারোর। তাদেরও মনের ভাব হয়ে গেছে তখন বুঝি অন্যরকম।

তারপর একসময়ে বাসটি এসে থামলো এস্‌প্লানেডে। কিছু মানুষ নেমে গেল এখানে। আবার কয়েকজন উঠলো।

কিন্তু মেয়েটি নামলো না এখানে। নামলো ডালহাউসীতে—ডেড্‌লেটার আপিশের সামনে।

তবে মেয়েটিও চাকরি করে নাকি?

একজন চশমাপরা ভদ্রলোক বসেছিল মেয়েটির পিছনের সীটে। সে চেনে মেয়েটিকে। আর মেয়েটি তাকে চেনে কিনা তা সে জানে না। সে অবশ্য জানে—মেয়েটি চাকরি করে এক জায়গায়। সেখানকার বস্‌ তার কাছে শুধু আপিশেরই কাজ চায় না। আরো অন্য কিছু চায়।

সেইজন্যেই বুঝি এইরকম ভাবে সাজ-গোজ করে যেতে হয় তাকে।

একটু আগে যে কমনীয়তা এসেছিল তার চোখে-মুখে—সেটা আর দেখা গেল না তার নামবার সময়ে। অনেকটা সামলে নিয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার আগেকার মন।

তাই সে নেমে গেল সদর্পে। শরীরের ঐশ্বর্য বিকীর্ণ করতে করতে।

'তবু যদি রূপ থাকতো।' ঝুলে যাওয়া যাত্রীদের মধ্যে একজন বলে উঠলো।

কিন্তু সে কথার কোন সমর্থন পাওয়া গেল না বাসের ভিতর থেকে। বরং মনে মনে অনেকে ক্ষুণ্ণ হলো এই নির্লজ্জ উক্তিতে।

কাজেই কথাটা হারিয়ে গেল ধাবমান বাসের গোঙানির মধ্যে। মিশে গেল পেট্রোল-পোড়া গন্ধে আর ধোঁয়ায়।

মোড় ঘুরে বাসটি চলে গেল সবেগে।

আর মেয়েটি মিশে গেল নেমে যাওয়া কেরাণীদের মধ্যে।



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

...আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম, বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের অনুপস্থিতির জন্য ততটা নয় যতটা ধবল এবং চন্দনা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া। তাহারা যে সংবাদ আনিয়াছিল, তাহা সত্যই চাঞ্চল্যকর। ধবলকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়াছিল।

ধবল বলিতেছিল—"আমরা যখন এখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন কিছুক্ষণ গজন্ধর কোনও কথা বলে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল। আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেহ মরিয়া গেলে আমরা কিভাবে তাহা সৎকার করি। আমি উত্তর দিলাম—'আমরা মৃতদেহকে পুঁতিয়া ফেলি। মৃতদেহের সহিত খাদ্যদ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্রও দিই। বিশেষ করিয়া যে জিনিস তাহার প্রিয় ছিল, সেই জিনিসগুলি আমরা যত্নের সহিত শবের নিকটে রাখিয়া দিই। তাহার পর প্রতি মাসে মাসে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সেই কবরের পাশে বসিয়া প্রার্থনা করে যেন তাহার প্রেতাত্মা নিম্ব সম্প্রদায়ের সহায়ক হয়। তাহাদের তুষ্ট রাখিবার জন্য আমরা তাহার কবরের পাশে পশুবলিও দিয়া থাকি।' আমার কথা শুনিয়া গজন্ধর একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। ঘিসু নিম্নকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, সহসা এসব কথা তুলিবার অর্থ কি। ভংগা ফিসফিস করিয়া বলিল, মৃত্যুপ্রসঙ্গ বড়ই অমঙ্গলসূচক। আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আবার কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর বলিল—নিম্ব সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। তাহার প্রথম প্রমাণ পাইয়াছি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া, দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলাম তোমাদের শব সৎকারের ব্যবস্থা শুনিয়া। প্রেতাত্মার প্রতি কি করিয়া সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা এখনও তোমরা শিখ নাই। শবদেহকে কেবল মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই প্রেতাত্মা শান্ত হয় না, অশান্ত হয়। মাটির কীটপতঙ্গ যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খায়, তখন প্রেতাত্মা অস্থির হইয়া ওঠে। তাহারা অস্থির হইয়া উঠিলে চতুর্দিকে অমঙ্গল হয়। এই যে দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি হইতেছে, তাহার কারণ ইহাই। অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মাদের উষ্ণ নিশ্বাসে দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে। সেইজন্য উলম্ভন নিয়ম করিয়াছে যে, মাটির নীচে পাথরের ঘর প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে শবদেহকে স্থাপন করিতে হইবে। তবে সে শান্ত থাকিবে। মাটির কীটপতঙ্গদল যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে পশুবলি দিলে তাহার অশান্তি কমিবে না, বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অশান্তি বাড়িবে। দলপতি উলম্ভন, সেইজন্য স্থির করিয়াছে যে, তাহার রাজত্বে কাহাকেও সে শবদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে দিবে না। কি করিয়া শবদেহকে সৎকার করিতে হয়, তাহা হাতে-কলমে সে সকলকে শিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তোমরাও তাহা শিখিয়া আসিবে।—এই পর্যন্ত বলিয়া গজন্ধর আবার চুপ করিয়া গেল। এসব আলোচনার কোনও তাৎপর্য আমি ধরিতে পারিলাম না। নীরবে গজন্ধরের অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না, মনে মনে নিম্বদেবতাকে স্মরণ করিয়া তাহাই করিতে লাগিলাম। বড়ই অস্বস্তি হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিবার পর দিগন্তবিস্তৃত এক বিরাট অরণ্য দেখা গেল। সে অরণ্য শুধু বিরাট নয়, তাহা অদ্ভুত। তাহা জীবন্ত নয়, মৃত। বিশালাকৃতি গগনচুম্বী মহীরুহদল প্রেতের মতো সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে রাশি রাশি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটিও ফাটিয়া গিয়াছে। মাটির রঙ কৃষ্ণ নয়, পিঙ্গল বর্ণ। কোথাও কোথাও বালুকা ধু ধু করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া একটা চাপা কান্নার মতো শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, বহুদূর হইতে বহুলোক যেন আর্তনাদ করিতেছে। তাহার পরই একটা হাওয়া উঠিল, শুষ্কপত্রের রাশি হাওয়ায় আবর্তিত হইতে লাগিল, দেখিলাম বিরাটাকৃতি বৃক্ষ-কঙ্কালগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম হাওয়ার জন্য অরণ্যের ভিতর হইতে ওই প্রকার শব্দ হইতেছে। কিন্তু তাহা মর্মরধ্বনি নহে, তাহা মৃত অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস। গজন্ধর সেই অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিল। একটু ইতস্তত করিয়া আমরাও করিলাম। মৃত অরণ্যে আর কখনও প্রবেশ করি নাই। মনে হইল যেন, মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। অরণ্যের ভিতর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মনে হইল কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছে। শিহরিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই গজন্ধরের কথা শুনিতে পাইলাম। গজন্ধর বলিল, 'তোমাদের অনাচারের জন্যই নিদারুণ অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনাবৃষ্টির ফলে এই বিরাট অরণ্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার জন্য তোমরাই দায়ী। এই মৃত অরণ্যের ভিতর দাঁড়াইয়া আজ তোমরা শপথ কর যে, এইবার মৃতের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করিবে। শপথ কর যে, উলম্ভনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তোমরা তাহার নিকট হইতে কবর-প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবে। যাহারা তোমাদের শিক্ষা দিবে, তাহারা তোমাদের লইতে আসিয়াছে, তোমরা ইহাদের সঙ্গে যাও। আমি দুইদিন পরে গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি অরণ্যের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমাদের তিনজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিলাম, প্রত্যেকটি লোকই বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি। সংখ্যাতেও তাহারা অনেক। যদিও আমরা তিনজনই সশস্ত্র ছিলাম, কিন্তু তবু দেখিলাম, ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। গজন্ধর বলিল, 'কোনও ভয় নাই, ইহাদের অনুগমন কর। আপাততঃ তোমাদের প্রস্তর বহন করা ছাড়া আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি বলিলাম, 'তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা আসিয়াছিলাম তোমাদের দলপতি উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। এখন আমাদের প্রস্তর বহন করিতে বলিতেছ কেন।' গজন্ধর বলিল, 'প্রস্তর বহন না করিলে উলম্ভন কাহারও সহিত দেখা করে না। তোমরা প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া গেলেই সে তোমাদের সহিত আলাপ করিবে।' ঘিসু এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বলিল, 'প্রস্তর লইয়া উলম্ভন কি করিবে বুঝিতে পারিতেছি না।' গজন্ধর উত্তর দিল, 'প্রস্তর দিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়াই তোমরা শিক্ষালাভ করিবে কি করিয়া কবর প্রস্তুত করিতে হয়। যাও, শোহানুকি পর্বত হইতে প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।' ঘিসু প্রশ্ন করিল—'প্রস্তর কি আমাদের মাথায় করিয়া বহন করিতে হইবে?' গজন্ধর বলিল, 'না। টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শোহানুকি পর্বতে বহু কর্মী পর্বতগাত্র হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতেছে। সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলিতে দড়ি বাঁধিয়া বহুলোক মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যায়।

যাও, তোমরা গিয়া সেই দলে যোগদান কর।' ভংগা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'যদি আমরা না যাই—' গজন্ধর উত্তর দিল, 'তাহা হইলে ইহারা বলপূর্বক তোমাদের বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধের মতো আচরণ করিও না। ইহাদের অনুগমন কর।' গজন্ধরের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিংগ ছুটিয়া বাহির হইল। আমি মনে মনে নিম্ব দেবতাকে ডাকিতেছিলাম। চক্ষুর ইসারায় ভংগাকে প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলাম। কারণ নির্বোধের মতো বাদানুবাদ করিয়া লাভ হয় না, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আকস্মিক কিছু করিলে ক্ষতিই হয়। গজন্ধর আর কিছু না বলিয়া বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল। তাহার পর সেই লোকগুলি আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধিতে উদ্যত হওয়াতে আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম, আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব, দড়ি বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। আমার এই কথায় তাহারা নিবৃত্ত হইল, নিম্ব দেবতাই বোধ হয়, তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন। তাহার পর তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কিছুদূরে অগ্রসর হইবার পরই ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা গেল। নিম্ব দেবতাই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া বোধ হয় গর্জন করিলেন। সহসা দেখিলাম, সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি লোকগুলি সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। আমরাও সকলে পলায়ন করিতে লাগিলাম। সেই গভীর অরণ্যে ছত্রভংগ হইয়া কে যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আমি একা একটা কণ্টকবনের ভিতর আটকাইয়া পড়িয়াছি। চতুর্দিকে কেহ নাই। ভংগা ঘিসুর নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। অতিকষ্টে আমি তখন নিজেকে সেই কণ্টকবন হইতে উদ্ধার করিলাম। সর্বাংগ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। আবার ভংগা এবং ঘিসুকে ডাকিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। তখন একাই নিম্বদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে বনের মধ্যে যদৃচ্ছ চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর সহসা দেখিলাম বন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রান্তরের অপর প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে চন্মনাকেও দেখিতে পাইলাম। চন্মনাকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া নিনানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। তখন যদি আমি চন্মনাকে দেখিতে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। গজন্ধরের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলাম, রাত্রিও অন্ধকার ছিল, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়াছি এইটুকু মনে ছিল শুধু, চন্মনাকে না পাইলে আমি হয়তো পথই চিনিতে পারিতাম না। নিনানি কোথায়, তাহাকে দেখিতেছি না—"

ধবলী সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু কেহই কোনও উত্তর দিতে সাহস করিল না। অবশেষে ধবলের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল এবং নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

আমি বলিলাম, "নিনানি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রিতে সে কন্যা নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

"কেন!"

ধবলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি তখন তাহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সমবেত সকলেই রুদ্ধশ্বাসে আমার বর্ণনা শুনিল। জনতার মধ্যে বিঘাও ছিল, সে-ও শুনিল। দেখিলাম তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে তাহার মুখমণ্ডল হইতে এক অস্বাভাবিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমার বর্ণনা শেষ হইলে ধবল বিঘাওয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, কোন কথা বলিল না। বিঘাওয়ের আচরণের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিত না, এমন কি দলপতি ধবলও না। ধবলের মৌন দৃষ্টি কিন্তু নীরব ভাষায় যাহা বলিল কথা দ্বারা তদপেক্ষা বেশী সে বলিতে পারিত না। সে চাহনি বিঘাওকেও বিচলিত করিল।

বিঘাও বলিল, "তুমি চলিয়া যাইবার পর আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। তাহার পর আমার মধ্যে তোমার প্রমাতামহ আসিয়া আমার মুখ দিয়া কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমার মূর্ছা যখন ভাঙিল তখন দেখিলাম নিনানিও মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া গান করিতেছে। আমি তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে বলিলাম। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে আমিও জানি না। জংলা যাহা বলিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং মর্মান্তিক। জংলা তুমি কি স্বচক্ষে দেখিলে সে ডুবিয়া গেল?"

আমি তখন মিথ্যা কাহিনীটা বিশদতর করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, "আমি গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। মনে হইল আমাদের ক্ষেতে বোধহয় কোনও জানোয়ার আসিয়াছে। বাহির হইয়া কিন্তু কোনও জানোয়ার দেখিতে পাইলাম না। ক্ষেতের যে অংশটুকু আমাদের আস্তানা ছাড়াইয়া কন্যা নদীর বাঁকের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে মনে হইল সেই অংশে কি যেন নড়িতেছে। আমার সন্দেহ হইল হয়তো খরগোসের দল আসিয়াছে। ক্ষেতের ভিতর দিয়াই আমি আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে সহসা কন্যা নদীর জলে একটা আলোড়ন শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন ঝপাং করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সন্দেহ হইল—হয়তো উদবিড়াল বা অন্য কোনও জলজন্তু। ছুটিয়া কাছে গিয়া কিন্তু দেখিলাম নিনানি। নিনানিও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—কানার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমি স্নান করিতে আসিয়াছি। বিঘাওয়ের ঘায়ের পুঁজরক্ত মাথায় করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। ইহার জন্য কানা যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় দিক। এইটুকু বলিয়াই কিন্তু পরমুহূর্তে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে জলের তলায় কে যেন টানিতেছে, আমি তলাইয়া যাইতেছি, গেলাম, গেলাম। নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমিও সংগে সংগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু নিনানিকে আর পাইলাম না। বহুবার ডুবিয়া ডুবিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাহাকে আর ধরিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া আসিয়া সকলকে খবর দিই, কিন্তু আবার মনে হইল খবর দিতে গেলে দেরি হইয়া যাইবে, নিনানিকে পাইবার আশা তাহা হইলে একেবারেই আর থাকিবে না। আমার চক্ষুর সম্মুখে সে যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে আমিই বরং সেই স্থানটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি। পাগলের মতো আমি ক্রমাগত ডুবিয়া ডুবিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। ক্রমশ মনে হইল কন্যা নদীর স্রোতের বেগ বাড়িতেছে, তাহা যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই স্রোতের বেগে গা ভাসাইয়া দিলে নিনানি যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় আমি স্রোতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলাম। কন্যা নদীর সহিত কাল সমস্ত রাত্রি মল্লযুদ্ধ করিয়াছি। আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কন্যা যে অবশেষে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল একটু আগে তাহার প্রমাণ পাইলাম। ওই বাঁকের মুখে যে গাছ তিনটি জলের উপর ঝুঁকিয়া আছে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি সেই গাছের তলায় পড়িয়া আছি। ও স্থানে যে কি করিয়া আসিলাম তাহা জানি না। মনে হয় আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম; আমার অবশ দেহটাকে কন্যা নদী ভাসাইয়া আনিয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

সকলে আমার এই কল্পিত কাহিনী নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল, আমার নিজের কাহিনী শুনিয়া আমি নিজেই মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিলাম। আমি যে এমন রূপকথা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা আমি নিজেও জানিতাম না। আমার কাহিনী শেষ হওয়ার সংগে সংগে সকলে একটা ভয়সূচক আর্তধ্বনি করিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকে অশ্রুমোচন করিতে

লাগিল, পুরুষদের মধ্য অনেকে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। সকলেই যে শোকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা মনে হইল না, ধবলের তুষ্টি বিধানের জন্যই অনেকে শোকের অভিনয় করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ধবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রবীণা পত্নী ইলচি আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, "তুমি যখন ওই অজ্ঞাত-কুলশীলা বিধবাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে মানা করিয়া-ছিলাম। অপরাজিতা বংশের নামও আমরা কেহ কখনও শুনি নাই। আমাদের কলঙ্গা জমির সন্ধানে বাহির হইয়া কোথা হইতে যে উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কাহাকেও বলে নাই। উহাকে বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্গা মারাও গেল। আমার বিশ্বাস নিনানি মায়াবিনী ছিল, এখন তোমার না কোনও অমঙ্গল হয়। তাহার প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা কর। ওঠ—"

ধবল উঠিয়া দাঁড়াইল। ইলচির জ্যেষ্ঠ পুত্র মোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"নিনানি ফুল ভালবাসিত। তাহার তৃপ্তির জন্য তোমরা আজ কন্যা নদীকে ফুল দিয়া সাজাও। তুমি সকলকে লইয়া যাও, ফুল সংগ্রহ করিয়া আন।"

ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল।

নারো বলিল, "ঘিসু কবে ফিরিবে—?"

সাংরা বলিল, "আমি আর কতদিন উপবাস করিব?"

ধবল বিপন্ন বোধ করিলে চক্ষু বুজিয়া ফেলিত। সে কোনও উত্তর না দিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল।

নারো বলিল, "আমি গোক্ষুর বংশের মেয়ে। আমি প্রতিশোধ লইব। ঘিসু যদি দুই এক-দিনের মধ্যে না ফিরিয়া আসে আমরা সকলে উলম্ভনের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিব, উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া আসিব।"

"আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঘিসুর দ্বাদশ পত্নী এবং চল্লিশটি পুত্র কন্যা নারোর পিছনে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সকলেরই দক্ষিণ বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। পর-মুহূর্তেই সাংরা এবং সাংরার সপত্নীগণ পুত্র-কন্যাসহ নারোর দলে আসিয়া যোগদান করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল—"আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ধবল চক্ষু বুজিয়া ছিল, বুজিয়াই রহিল। তাহার পর কলরব যখন একটু প্রশমিত হইল তখন ধীরে ধীরে বলিল—"ঘিসু এবং ভংগার জন্য আমিও কম চিন্তিত নই। তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমিও নিম্বদেবতার নিকট প্রতি-মুহূর্তে প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছি। চিন্তাও করিতেছি তাহারা যদি না ফেরে কি উপায়ে তাহাদের ফিরাইয়া আনা সম্ভব। কিন্তু গজন্ধরের আচরণ হইতে এবং অরণ্য মধ্যস্থ ওই লোকগুলির আকৃতি প্রকৃতি হইতে এইটুকু আমি বুঝিয়াছি যে হঠকারিতা করিলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। উলম্ভন শক্তিশালী দলপতি, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমার প্রমাতামহ কানাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া নিনানিকে তিনি যে শাস্তি দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রোষেরই পরিচয় পাইতেছি। তিনি কেন রুষ্ট হইয়াছেন তাহা আগে আমাকে জানিতে দাও। আমাকে কিছু সময় দাও তোমরা। তোমরা যদি শোকাবেগে অধীর হইয়া এখনই উলম্ভনের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর তাহার একটিমাত্রই সুনিশ্চিত ফল হইবে। কয়েকদিন পরে তোমাদের জন্যও আমাদের শোক করিতে হইবে। তোমরা ধৈর্য ধরিয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর। যে বৃক্ষ আমাদের কুলদেবতা তিনি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তাই তিনি ফলবান। তোমরা অধীর হইও না। নিনানির প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য মোকা ফুল সংগ্রহ করুক, কানাকে তুষ্ট করিবার জন্য এস আমরা সকলে নিজ নিজ শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিম্ব বৃক্ষতলে উপহার দিই। ইহাতেই সুফল ফলিবে। অধীর হইলে কোন লাভ হইবে না। তোমরা এই সবেরই আয়োজন কর। আমি একবার আমাদের ক্ষেতগুলি পরিদর্শন করিয়া আসি।"

দলপতি ধবলের এই কথাগুলিতে কাজ হইল। সাংরা এবং নারোর দল ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিঘাও এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ধবল উঠিয়া যখন ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল তখন সহসা সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ মাটির উপর সে ভেকের মতো শুইয়া পড়িল এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদ্ভুত একটা শব্দ করিতে লাগিল "ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক"। বালক-বালিকারা তাহাকে ভয় করিত, তাহারা পলায়ন করিল। আমরাও অনেকে ভীত হইলাম, আবার কোন উপদেবতা আসিয়া ভর করিলেন নাকি! বিঘাও কিন্তু একটি কথাও বলিল না। সে কেবল ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর ভেকের মতোই লাফাইতে লাফাইতে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বিঘাও যে শব্দ করিতেছিল তাহা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো, কিন্তু ভেকের অনুকরণে সে কেন যে লাফাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভীত হইয়া পড়িলাম।

......কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পুষ্পসম্ভার দুলিতে লাগিল। যে ক্ষুদ্র নিম্ব বৃক্ষটি আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতাম সেই বৃক্ষের তলদেশ, কাণ্ড, এমনকি শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত আমাদের রক্তে চর্চিত হইয়া গেল। আমরা যখন পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম তখন কয়েকটি নিম্ব বৃক্ষের চারা এবং বীজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলি আমাদের ক্ষেতের ধারে ধারে রোপণ করা হইয়াছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল নূতন স্থানে নিম্ব বৃক্ষ যদি না থাকে আমরা মুশকিলে পড়িব। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছিল, উন্নগা পর্বতের সানুদেশে একটি ক্ষুদ্র নিম্ব বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। বিপদে পড়িলে এই বৃক্ষতলেই আসিয়া আমরা পূজা করিতাম। আমাদের ক্ষেতের ধারে যে ছোট ছোট চারাগুলি আমরা পুঁতিয়াছিলাম ধবলের নির্দেশ অনুসারে সেগুলিকেও রক্তসিক্ত করা হইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়া যে রক্ত বাহির হইল সেই রক্তবিন্দুগুলি তাহা-দের শাখায় পত্রে চম্মনা লাগাইয়া দিল। চম্মনার উপরই এই ভার পড়িয়াছিল। সেই তীক্ষ্ণমুখ এক প্রস্তর ছুরিকা দিয়া সকলের অঙ্গুলি হইতে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম এই সুযোগে সে কয়েকটি আসন্ন যৌবনা কিশোরীর নিকট প্রণয় দাবী করিতেছে। বলিতেছে তাহারা যদি অসম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাদের অঙ্গুলিতে এমনভাবে ছুরিকাঘাত করিবে যে রক্ত আর বন্ধ হইবে না। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র নিম্ব বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল সেখানে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল ধবলের পত্নীরা। তাহাদের সহায়তা করিতেছিল সাংরা এবং নারো।

(ক্রমশ)



অনুবাদ সাহিত্য

সাপ

ভ্লাডিমির নাজোর

[লেখক পরিচিতি—ভ্লাডিমির নাজোর যুগোস্লাভিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম। তিনি কবি ও গল্প লেখক। ডালমেসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ব্রাস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়েন জাগ্রেভ ও ভিয়েনাতে এবং কিছুকাল ক্রোসিয়া ও ইস্ট্রিয়াতে মাস্টারি করেন। তিনি লিখেছেন প্রচুর কবিতা, ছোট ও বড় গল্প এবং প্রবন্ধের ত্রিশটি গ্রন্থ তিনি রেখে গিয়েছেন। তার প্রাথমিক রচনাবলী বিদেশী শাসনপিষ্ট ছোট্ট জাতকে সান্ত্বনা দিত। জাতির মুক্তির জন্য যাটষট্টি বছর বয়সেও তিনি সংগ্রাম করেছেন; জাতি তাকে সম্মানিত করে ১৯৪৫ সালে প্রথম স্বাধীন রিপাবলিক ক্রোসিয়ার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত ক'রে। ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'সাপ' গল্পটি তার 'শৈশব-স্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত।]

শৈশব স্মৃতির পুরোভাগে আজও মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে—বিরাট সাপের কথাটা।

তখন সে-বছরের বসন্তের গোড়া, যে-বছর শরৎ আসতে দিদিমার বাড়ি ছেড়ে গ্রাম থেকে আমরা বন্দরে গিয়ে উঠেছিলুম।

সেই তখনই আমি পাই প্রথম পুলক এবং প্রথম হৃদয়বেদনা, কাজেই সেই ঘটনাতেই এই বিবৃতির সূত্র।

দৃশ্য প্রাচীন বাস্তুভিটের উঠোন।

প্রকাণ্ড উঠোন, শান বাঁধানো, জায়গায় জায়গায় অসমতল, বাড়ি থেকে বারবাড়ির প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; ছোট বাগানের ধার পর্যন্তও খানিকটা। শানের ওপর পাথরের একটা ঢিবি যার ওপরে বাদাম ভাঙা হয় আর থাকে কুয়োর বালতিটা। বাড়ির একটা ধার আর পাশের বাড়ির পরিত্যক্ত বাগানকে পৃথক ক'রে রাখা পুরণো দেওয়াল নিয়ে যে-কোন সৃষ্টি হয়েছে—কুয়োর বালতিটার কাছে—সেখানে কতকগুলো পাথরের ডাবনা। সারাদিন ধরে খচ্চরগুলো এগুলোতে জল খেতে আসতো, ওগুলোতে সব সময়েই জল থাকতো।

ওইটেই ছিলো আমার প্রিয় স্থান, যেখানে আমি সম্পূর্ণ একা থাকতে পারতুম এবং কাগজের নৌকো আর কাঠের কুচি নিয়ে খেলতুম।

বাড়ির চাকররা আমাদের পরিবারটিকে দেখতে পারতো না ব'লে নৌকো আমি নিজেই তৈরী করতুম। ঠাকুমা আর ছোট কাকার কাছে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ভাগ দাবী করতে আসিনি, না নিয়ে অন্যত্র চলে যাবো না? বাবা কাজ করতেন নেরেৎভার খাস জমিতে, যেখানে তিনি স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেন, আর যার জন্যে তাকে সময় হবার আগেই চলে আসতে হয় তার অংশ নেবার জন্যে এবং আলাদা হয়ে জীবনযাপনের জন্যে। গোলার বেলিফ্ শান্টো, খচ্চরপালক ইয়াকভ, এবং ঝিয়েরা, উরে আর কেকা, ওখেনে চাকরী করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে এবং আমরা উড়ে এসে জুটে এক-তৃতীয়াংশে ভাগ বসিয়ে সরে পড়বো বলে আমাদের দেখতে পারতো না।

এই জন্যেই ইয়াকোভ খচ্চরদের যেখানে জল দিতো সেই সব জলের ডাবনাগুলোর কাছ থেকে আমাকে কেবলই হঠিয়ে দিতো। আমি তবু গুঁড়ি মেরে আবার ফিরে যেতুম সেখেনে; কেন না, গাঁয়ের এখেনে-ওখেনে হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চুপ করে ওখেনে থাকাটা মা নিশ্চয়ই পছন্দ করতো। আমি প্রায়ই ওখেনেই খেলতুম, কারণ ইস্টারের আগের সপ্তাহ সেটা, যখন স্কুল নেই, আর বসন্তের আগমনী বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে যায়।

(২)

একদিন আমার ছোট নৌকাগুলো ডাবনাগুলোর একটার জলে দুলে দুলে ভাসচে। মাথার ওপরের দেয়াল থেকে একটা মৃদু খস্‌খসে শব্দ কাণে এলো।

ওপরে যেই চাইলুম, মুহূর্তের জন্যে ভয় পেয়ে গেলুম।

একটা প্রকাণ্ড সাপ পাশের বাড়ির বাগান থেকে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে চলেছে।

মনে হ'লো তখনই যেনো ও আমাকে দেখতে পেয়েছে, কারণ হঠাৎ ও থেমে গল। শক্ত হ'য় উঠলো, আইভীর ডালের মতো, পুরণো দেয়ালের পাশটে পাথর আঁকড়ে।

আমি একটুও নড়লুম না, একটাও শব্দ করলুম না। ওকে ভয় পাবার মতো নাগালের ঠিক বাইরে আমি।

সামান্য একটু নীচে নামলো ও, হাওয়ায় ঘাড়টা একটু দোলালে, তার চ্যাপ্টা মাথাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বেশ ভালো ক'রে আমায় খতিয়ে নিতে লাগলো।

সাপ তার দৃষ্টি দিয়ে সম্মোহিত করতে পারে ব'লে ইতিমধ্যেই গল্প শুনেছি—কিন্তু আমি তার কোন চিহ্নও পেলুম না। গোল গোল ক্ষুদে চোখ আমার ওপরে নিবিষ্ট, চক্‌চক্ করছে, প্রায় হাসির মতো। তক্ষুণি আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো যে, ভয় করবার কিছু নেই; তখন আমার একমাত্র চিন্তা হলো ভয় না খাইয়ে সাপটাকে তাড়িয়ে দেওয়া।

হঠাৎ ওটা ফোঁস করে হলদেটে দুটো চন্দ্রাংশ কাণের পাশে বের করলে এবং হাঁ করে লক্‌লকে জিভ বের করে মাথাটা তিনবার ঝাঁকুনী দিলে, যেনো কিছুর ওপরে টোকা মারলে।

ভাবলুম ও কি চায় আমাকে দিয়ে করাতে তা বুঝতে পেরেছি। চট্ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলুম, এবং আবার স্থির হয়ে দাঁড়ালুম।

তারপর এঁকেবেঁকে ও সমস্তটা নেমে এলো এবং সবচেয়ে বড়ো ডাবনাটার ভেতরে ঢুকে পড়লো। দু'বার কি তিনবার এপার-ওপার সাঁতরালে, তারপর গেলো পরের ডাবনাটায় এবং সেটাতেও ঘুরলে, যেনো কি খুঁজছে। আরও বার কয়েক এ-ডাবনা থেকে ওটাতে ক'রে বেড়ালে, সীমাবদ্ধ জায়গার সমস্ত দৈর্ঘটা জুড়ে সাঁতারের সুবিধে হ'বে বলে জোটগুলো ছোট ছোট করতে লাগলো। তারপর ও দেয়ালের ওপর চড়লো এবং এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'ওঃ!' তাহলে একটা সাপ দেখতে পেয়েছি বলে মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম, আর অতো বড়ো, অতো ভালো একটা সাপ! 'সাপ' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'একটা সাপ দেখতে পেয়েছি!' চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে উঠোন পার হ'য়ে বাড়িতে ঢুকলুম।

প্রথমেই ঢুকে পড়লুম যে ঘরে সেটা রান্নাঘর। ইয়াকভ এবং বেলিফ শান্টো তাদের ভালো পোষাক পরে বসে বসে মেয়েদের কাজ দেখছে। 'একটা সাপ!' আমি বলে উঠলুম।

'সত্যি নাকি? সাপ!'—ইয়াকভ যেন বিস্মিত হ'য়ে গেছে।

'হ্যাঁ,' বললুম, 'খুব বড়ো। পাশের বাড়ি থেকে এলো। ডাবনার ভেতরে নামলে। সাঁতার কাটলে। জল খেলে।'

'যীশু মেরী, আমাদের বাঁচাও!' কেকা অবাক হয়ে বললে।

'কিন্তু সে কী করে হবে! আমি যে তাকে দুবার মেরে ফেলেছি।' ইয়াকভ বললে।

বেলিফ তাতে হাসিতে ফেটে পড়লো, 'কেনো, প্রতি বছরেই তো এক একটা নতুন!'

'তা নয়! তা নয়!' মেয়ে দুটো আর ইয়াকভ একসঙ্গে মন্তব্য করলে। ইয়াকভ তো বলতে গেলে চীৎকারই করে উঠলো, আর

তার নিজের খচ্চরেরই মতো চড়াটে কদাকার মুখটা রোষে লাল হয়ে উঠলো।

সাপ কি তা সে জানতো। জানোয়ারদের চরাতো বলে সাপের ব্যাপার সে জানতো। একাধিকবার সে পাশের বাগানে খুঁজেছে, কিন্তু সাপের কোন কিছুই পায়নি, কিন্তু তবুও প্রতি বছর, ঠিক ইস্টারের আগে, এসে হাজির হতো, বাগানের দেয়ালের গায়ে বড়ো গোছের একটা। প্রতিবার ইস্টারে সে ওটাকে মেরেও ফেলতো, কিন্তু পরের বছর ঠিক ঐ সময়েই আবার ও হাজির হতো, তফাৎ শুধু আরও একটু বড়ো হয়ে—এবং ঘন রঙে। হ্যাঁ, সে তো প্রতি ইস্টারেই মেরে ফেলতো।

'সেইজন্যেই তো ইয়াকভ মশাই, তুমি যেমনকে তাই।' কেকা বললে অনুকম্পা প্রকাশ করে। 'ও তোমার সব রক্ত শুষে নেবে।'

'দেখো, এই বুড়ো হাড় যদি কালও মরে,' ইয়াকভ হেঁকে উঠলো, 'আমিও ঐরকম হবো।'

'যীশু মেরী! ঈশ্বর আমাদের মার্জনা করো।' মেয়ে দুটো চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু বেলিফ শাল্টা, রোগা, বেঁটে বুড়ো, সরু সরু হাড় কিন্তু শক্ত, পাকা চুল, শুধু মুচকে হাসলে এবং পাইপের ডগাটা চুষতে লাগলো।

'শোন হে ঈশ্বরের সন্তানরা, সাপ আর পাখী নিয়ে সারা জীবনই আমি নেজেরীনে কাটিয়ে দিলুম, আর আমিও একটু আধটু কিছু জানি বৈকী।'

তখনো পর্যন্ত একটু একটু ঘাস এবং ঝোপের ছায়া ছিলো এবং সেসবখানে ছোট-খাটো প্রাণীও। তার কুটিরের ঠিক ডাইনেই ছিলো একটা পুকুর, আর ঐরকম সাপ জল খেতে আসতো। ওরা কোন ক্ষতি করতো না। ওরা কামড়াতো না। ভয় শুধু ছোট সাপগুলোকে। সাপ যতো বড়ো ততো ভালো। বড় সাপকে সে পোষও মানিয়েছে। তাদের দুধ মাংস খাইয়েছে। ওরা তাকে চিনতো। ওর কাছ থেকে পালাতো না। আসতো ওর কাছে......

(৩)

এবারে জানলুম যে, বড়ো সাপরা ভালো হয়, কামড়ায় না, মানুষের হাতে এসে চড়ে।

সেদিনই বিকেলে কাঠের রেকাবী একটা জোগাড় করলুম, খানিকটা দুধ তাতে রাখলুম এবং ডাবনাগুলোর কাছে গেলুম।

সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলুম, কিন্তু সাপের দেখা নেই। দেয়ালের একটা খাঁজে রেকাবীটা রেখে দিলুম, সাপটা যেখান-কার নাগাল পাবে বলে মনে হলো, তারপর চলে এলুম।

পরদিন রেকাবীটা সেখানেই আছে, কিন্তু খালি। নিশ্চয়ই তাহলে—ঐ!

আবার রেকাবী ভর্তি করলুম, সবচেয়ে বড়ো ডাবনাটার কিনারার ওপর রেখে দিলুম, এবং অপেক্ষা করতে লাগলুম, দেয়ালের ওপর আর তাকেই ছাউনী দেওয়া পল্লবোন্মুখ বাদাম গাছের ডালটার দিকে চোখ রাখলুম।...অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এবং যাবো যাবো করছি, তখন কে যেনো এসে কোণ থেকে উঁকী মারলে—বেলিফ শাল্টা......আমার দিকে মাথা নাড়লে, যেন জিগ্যেস করতে, 'হলো কিছু?'

'কালকে কোন্ সময়ে এসেছিলো,' ফিস্-ফিস্ করে আমাকে জিগ্যেস করলে।

'প্রায় এই সময়েই।'

'তাহলে এখুনি আসবে। মহাজনরা সময় রাখে ঠিক। ওটা কি? দুধ?'

'কালকে এক রেকাবী খেয়ে গিয়েছে।'

'হুঁ!' বলে উঠলো সে, 'সেইজন্যেই কোন তাড়া নেই। কিন্তু ওতো জলে এসে নামবে, কারণ স্নান ভালোবাসে ওরা সবচেয়ে বেশী।'

কিন্তু হঠাৎ বলে উঠলো, 'আচ্ছা, ও যদি নিজে না আসে তো আমি ওকে ডেকে আনবো।' বলেই পকেট থেকে লাল কাপড়ে জড়ানো কি একটা ও বের করলে এবং যন্ত্রের সঙ্গে পাক খুলে ফেলতে দেখলুম, এল্ডার-কাঠের তৈরী একটা বাঁশী, তে-মুখো বাঁশী......বুড়ো সেটাকে ঠোঁটে পুরে শীষ দেবার মতো ক'রে বাজাতে লাগলো।

তিনটে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, সংক্ষিপ্ত, ভাঙা ভাঙা, কিন্তু মৃদু, তিন ফোঁটা খাঁটি-জলের মতো খাঁটি। প্রথমে পড়লো তারা একটার পর একটা, তারপর একসঙ্গে পাক খেয়ে একটা যাযাবরী সুরে পরিণত হলো...... গাছের ডালে ডালে বাতাসের, দীঘিতে জল ছলকানোর, চারণে কুটিরের পাশে ভেড়ার, আর দূরে থেকে বুড়োর দিকে দৃষ্টি রাখা খরগোসের......আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, আমাকে কনুই ঠেলে দেয়ালের দিকে চাইলে। দেয়ালের কানাচে সাপটা রয়েছে, আমাদের দিকে চেয়ে।

এবারে ও আরও মৃদুভাবে বাজাতে লাগলো, একটা থামা-থামা সুর, বিরতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। দৈব কিনা বলতে পারি না, কিন্তু মনে হলো, সুর আরম্ভ হলেই সাপটা যেনো চুপ করে শুনতে থাকে এবং থামলেই দেয়াল বেয়ে নামে। এরপর বুড়ো কেবল থেমে থেমে বাজাতে থাকে।

সাপটা গুঁড়ি দিয়ে দুধ পর্যন্ত গেলো, কয়েক ফোঁটা চেটে নিলে, তারপর জলে গিয়ে ঢুকলো। এবার শাল্টা তার চোয়াল ফুলিয়ে আবার বাজাতে লাগলো, কিন্তু খুব কড়া করে, দ্রুত লয়ে, স্পষ্ট করে, তাতে জীবটা যেনো প্রেরণা পেলে, সঙ্গীতের তালে তালে দ্রুত থেকে দ্রুততর এঁকেবেঁকে সাঁতার দিতে লাগলো যে পর্যন্ত না ডাবনাটা খুব অপরিসর ঠেকলো। আবার বাঁশী থামতেই জল থেকে সামান্য একটু মাথা তুলে বাদকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে, এবং সেইভাবে রইলো খানিকক্ষণ।

শেষে ওর সুর যখন বন্ধ হলো, সাপটা ডাবনা থেকে বেরিয়ে এলো। আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম। 'না,' বুড়ো ফিস্‌ফিস্ করে জানালে, 'বড়ো তাড়াতাড়ি হচ্ছে।' আর সত্যিই আমার নড়াচড়া ওকে যেনো ভয় পাইয়ে দিলো, এবং দেয়াল বেয়ে উঠে ও আস্তে আস্তে পার হয়ে গেলো।

'কিন্তু কাল?' আমি বলে উঠলুম।

'না, কাল আমি থাকবো না......'

'তাহলে মিঃ বেলিফ যদি দয়া করে...... আপনার বাঁশীটা, সাপটাকে খেলাবার জন্যে।'

(৪)

আবার আমি ডাবনার কিনারে দেয়ালের দিকে পিছন ক'রে বসলুম বাঁশীটা অভ্যেস করতে করতে, কারণ অতো তাড়াতাড়ি সাপটাকে আমি আশা করি নি। বাঁশীটা আওয়াজ বের ক'রলে বটে, কিন্তু বুড়ো বেলিফের ঠোঁটে প'ড়ে যে রকম কথা বলতো, তা যেন আর জানে না সে। আমার আশঙ্কা আরম্ভ হয়েছে যে, আমি ওকে ভয় পাইয়ে দেবো। কিন্তু মনে হলো কি যেন একটা আমার কাঁধ বেয়ে নামছে। সেই সাপটা। বাহু অতিক্রম ক'রে আমার হাতে ঝুলে পড়েছে। মাথাটা বেঁকিয়ে সে আমার হাতে দুবার টোকা দিলে। স্পর্শটা অনুভব করলুম, বরফের মতো ঠান্ডা। তারপর সমস্তটা আমার কব্জি বেয়ে, কোমর ঘিরে আমার হাঁটুতে এসে আস্তে আস্তে পা বেয়ে মাটিতে গুঁড়ি মেরে নামলো। ওর মাথাটা আমার পায়ের পাতার ওপরে, লেজটা তখনও হাঁটুর গায়ে।

এখন বলতে পারি না, সে সময়ে আমার ঠিক কি অনুভূতি ছিলো, তবে মনে পড়ে যে সে সময়টা খুবই দীর্ঘ লেগেছিলো। আমাকে যখন ও জড়িয়ে তখন মনে হচ্ছিলো যেন একটা ঠান্ডা দড়ি আমাকে ক্রমশঃ কষে পাকিয়ে তারপর পায়ের কাছে আলগা হয়ে গেলো। আমার কেবল স্পর্শানুভূতিটাই ছিলো। বাজনার আওয়াজে আমি বধির, যদিও একটা সুর আমি তখনও তুলেই যাচ্ছি। সাপটা মাটিতে নামতে আবার তা কাণে আসতে লাগলো—কিন্তু তখন তা একেবারে পাল্টে গেছে, আমার ঠোঁটের স্পর্শমাত্রেই বাঁশী যেন ভাষা পেতে লাগলো।

একটা জলের তোড় পুকুরে এসে পড়লো। সব কিছুই মুখরিত, গাছে গাছে পাখীদের গান, বিশাল বিশাল গাছ দুলছে বাতাসে শন্ শন্ করে গভীর নিশ্বাস নিয়ে। ....বাড়িটা একটা বন আর উঠোনটা সবুজ মাঠ, দেয়ালটা ফুলভরা ঝোপ আর ডাবনাগুলো—স্বচ্ছ জলের হ্রদ.........

আর আমার পায়ের ওপর সেই দীর্ঘ

অনবদ্য সাপ আমাকে আর ভয় খাওয়াতে পারলে না, কারণ আমাদের মধ্যে একটা কিছু ছিলো, আর তা জমে গিয়েছিলো, আমাকে দেখায়, আমার সঙ্গীত শোনায়, দুধ বা জলকে অগ্রাহ্য করেই। আমি বুঝতে পারছিলুম না যে, ও আমাকে বশ করেছে, অথবা আমি—ওকে………

কিন্তু কে যেন আসছে। "দেখ! কী ভয়ানক! সাপ! ছোট কর্তা!" ভয়ে আমি তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। খচ্চর-পালক আর মেয়ে দুটো আতঙ্কে দেয়ালের কোণের দিকে দেখছে, চীৎকার করছে, হাত নাড়াচ্ছে। "শীগ্গির! মেরে ফেলো ওটাকে। ছেলেটাকে সরিয়ে নাও!" মেয়ে দুটো আর্তনাদ করে উঠলো আর লোকটা লাঠি বাগিয়ে একটা পাথরের খোঁজ করতে লাগলো।

"না।" আমি চেঁচিয়ে বললুম, "থামো।"

কিন্তু ইয়াকভ আমার কথা হুঁস করলো না। সে এগিয়ে চললো। সাপটা ভয় পেয়ে গেলো এবং নিকটতম পথে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি ওকে দিলুম আমাকে বেয়ে উঠতে, আমি হাত বাড়িয়ে ধরলুম লোকটার কাছ থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে। আমার পা বেয়ে ও উঠলো, তারপর লুকিয়ে পড়লো আমার পিঠে গিয়ে। দেয়ালে পৌঁছে চট্ করে পার হয়ে গেলো—ইয়াকভ্ তখন তার লাঠিটা ছুঁড়ে দিয়েছে। এক চাবড়া পাথর তাতে ভেঙে পড়তে পারতো, কিন্তু আমি ভাবনার ভেতরে লাফিয়ে পড়ে তাকে কাটিয়ে দিলুম।

"বেঁচে গেছে!" বলে চেঁচিয়ে উঠলুম, আমার সাপটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে………

অনুবাদক—**পংকজ দত্ত**

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

যক্ষ্মা সম্বন্ধে গৃহস্থের জ্ঞাতব্য

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

এ রোগটি সম্বন্ধে আর কিছু না জানতে চাইলেও, এ রোগ কেন আজকাল এত বেড়ে চলেছে আর কি কি উপায় অবলম্বন করলে এর প্রকোপ বন্ধ করা যায় সে সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু কিছু জেনে রাখা দরকার। এখানে আগের থেকেই এটুকু বলে রাখছি যে এ সব নিছক বৈজ্ঞানিক কথা বা ডাক্তারি কথা তেমন ধারণা করলে খুব ভুল করা হবে। বাস্তবের ক্ষেত্রে যারা গৃহবাসী এবং এই সম্বন্ধে আতংকগ্রস্ত তাদের উদ্দেশেই আমি এমন কয়েকটি কথা বলতে চাই যা বিশেষ করে সাধারণভাবেই জানা এবং মনে রাখা দরকার। কারণ এটা সাধারণেরই বিষয়।

প্রথম কথা এই যে, যক্ষ্মা রোগের নাম শুনে কিংবা এই রোগ কারো হয়েছে শুনে আজকাল আর তেমন ভয় করবার কিছু নেই। যেমন মারাত্মক একে প্রত্যেকে মনে করেন, প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে আজকাল তেমন মারাত্মক হয়ে ওঠবার এর কোনো উপায় থাকে না, অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই এর এখন বিষদাঁত অনায়াসে ভেঙে দেওয়া যায়। আগেকার দিনে কারো যক্ষ্মা হয়েছে শুনলেই মনে হোতো সাক্ষাৎ যমের ডাক তার এসে গেছে কিংবা নিশ্চিত ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। কিন্তু যারা এখনকার দিনের খবর রাখে তারা জানে যে এতে ভাবনা করবার কিছু নেই, আরো পাঁচটা রোগ যেমন হয় এও তেমনি, উচিত মতো ব্যবস্থা করলে নিশ্চয় সেরে যাবে। এতটা নির্ভয় হবার কারণ অন্য কিছুই নয়, এ রোগের কার্য কারণ এবং অন্ধি সন্ধি সমস্তই আমরা জেনে ফেলেছি, এ রোগ হওয়া মাত্রই যাতে ধরা যায় এবং চেনা যায় তার উপায়ও আমাদের হাতে মিলে গেছে, আর এর চিকিৎসার আশ্চর্য উপায়ও এমন পাওয়া গেছে যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারা যায় যে সময় মতো যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সে চেষ্টা কিছুতে ব্যর্থ হবে না। কিন্তু এই মনোভাবটি কেবল বিজ্ঞানসেবীদের মনে মনে থেকে গেলেই চলবে না, এই মনোভাব অন্য সকলের মনেও সমানভাবে জেগে ওঠা চাই, সুতরাং এই প্রশ্নকে এড়িয়ে না গিয়ে এ সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল হওয়া চাই।

আর দ্বিতীয় কথা, এ রোগের বিষয়ে বিশেষ করে আমাদের গৃহস্থ ঘরের মেয়েদেরও কতকগুলি জিনিস জেনে রাখা দরকার। একথা বলবার অনেক কারণ আছে। বাড়িতে কারো রোগ হলে সব চেয়ে বেশী মেয়েদেরই তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। ইচ্ছা করলে পুরুষেরা রোগ এবং রোগীর সংস্পর্শ থেকে একেবারে রেহাই পেতে পারে, ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারে কিংবা একেবারেই অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তেমন ধরণের সাবধান হতে জানেও না এবং পারেও না আর অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রোগের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকতে তারা বাধ্য হয়। তা ছাড়া এ রোগ নানা কারণে মেয়েদেরই শরীরে বেশি হয়। এ রোগ এবং তার বীজাণু বিশেষ করে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকতে আর কোণের মধ্যে আশ্রয় নিতে ভারী পছন্দ করে, সুতরাং যারা জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘরের মধ্যেই থেকে কাটায় আর কোণের মধ্যেই আশ্রয় নেয়, এ রোগ তাদের আক্রমণ করতেই সব চেয়ে বেশি সুবিধা পায়। যারা বাইরে বাইরে খোলা বাতাসে থাকে, যারা অনবরত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে, দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে এ রোগ প্রায় হয়ই না। যারা শহরের সরু গলির মধ্যে অন্ধকার ঘরের কোণে দিন রাতই থাকতে বাধ্য, যারা দিনান্তেও একবার রোদের মুখ দেখতে পায় না, খোলা বাতাসে বাস করবার সৌভাগ্য যাদের দিনান্তেও একবার হয় না, এ রোগ বেশির ভাগ তাদের কাছেই ছুটে যায়।

কিন্তু এ রোগের এমন অদ্ভুত ধরণের পক্ষপাতিত্ব হবার কারণ কি? সেইটেই সাধারণের সব চেয়ে ভালো করে জানা দরকার। সকলেই আজকাল জেনে গেছেন যে এই যক্ষ্মা রোগটির আসল জন্মদাতা হোলো একরকম বীজাণু, যাকে আমরা বলি টি বি। এরা খুবই সুক্ষ্ম, সাদা চোখে মোটে দেখাই যায় না, খুব জোরালো মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে খুব নিরীক্ষণ করে দেখলে এদের দেখতে পাওয়া যায় ইতস্তত ছড়ানো কতকগুলি যেন সরু সরু কাঠির মতো। এদের অবশ্য কোনো গতি-শক্তি নেই, সুতরাং এক জায়গা থেকে নিজেরা ছুটে অন্য জায়গায় চলে যেতে বা নিজেদের পছন্দ মতো কাউকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু এত সুক্ষ্ম বলেই এরা এক সঙ্গে বহু সংখ্যাতে থেকে বাতাসের সঙ্গে অনায়াসে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে পারে, ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে কিংবা জুতোর তলায় লেগে থেকে বা অসংখ্য রকম উপায়ে অসংখ্য বীজাণু বাইরের থেকে ঘরের মধ্যে চলে আসতে পারে, তারপরে ঘরের মেঝেতে আর দেয়ালের গায়ে বহুকাল পর্যন্ত লেগে থাকতে পারে, আবার ঘর ঝাঁট দিলেই অদৃশ্যভাবে ছড়িয়ে গিয়ে বারে বারে ঘরের বাতাসে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারে। বিশেষ করে যক্ষ্মাওয়ালা রোগী কেউ কাসলে কিংবা হাঁচলে তখনই

তাদের নাক মুখ থেকে বেরিয়ে এই অদৃশ্য বীজাণু বাতাসের ভিতর দিয়ে কাছাকাছি যে কোনো লোকের নাক মুখের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। বস্তুতপক্ষে এমনি নানা উপায়ে নাক মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে এই বীজাণুর দ্বারা যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। যার যক্ষ্মা হয়েছে তার নিশ্চয়ই কখনো না কখনো রোগীর নিঃশ্বাস থেকে বা ঘরের ধুলো থেকে এই বীজাণু নাক মুখ দিয়ে শরীরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। একবার মাত্র ঢোকেনি, নিশ্চয় বহুবারই ঢুকেছে এবং বহু সংখ্যাতেও ঢুকেছে। দৈবাৎ দুই একবার ঢুকে গেলে বা অল্পসংখ্যায় ঢুকলে তার থেকেই সহজে এ রোগ জন্মায় না। আর দুধ কিংবা অন্য খাদ্যাদির সঙ্গে মিশে পেট দিয়েও এ রোগ ঢুকতে পারে, তাতে পেটেরই যক্ষ্মা হয়। বিশেষ করে বেছে বেছে মানুষের মধ্যেই এ রোগটা বেশি হয়, কিন্তু গরু আর শুকরের মধ্যেও হতে পারে। ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল: ইঁদুর এদের এ রোগ হয় না, তবে খরগোস আর গিনিপিগের হতে পারে। অনেকের ধারণা যে, এই রোগ বংশানুক্রমে হয়, কিন্তু মায়ের কিংবা বাপের রক্ত পেয়েছে বলে কিংবা এই রোগের ধাত নিয়ে জন্মেছে বলেই কখনো কোনো ছেলে মেয়ের মধ্যে এ রোগ জন্মায় না। যা হয় সেটা ঐ রকমভাবে সাক্ষাৎ বীজাণুর সংক্রমণের দ্বারাই হয়ে থাকে। যক্ষ্মাওয়ালা বাপ-মায়ের সন্তান জন্মালেই যদি তাকে ওদের কাছ থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলা হয় এবং কখনো কাছে না আনা হয়, তাহলে তার এ রোগ মোটেই হবে না আর যক্ষ্মার বীজাণু দৈবাৎ কারো শরীরে ঢুকে গেলে তার নিশ্চয়ই যে যক্ষ্মা হবে, একথাও ঠিক নয়। শরীর যদি সুস্থ এবং সবল থাকে তা হলে এ বীজাণু রীতিমতভাবে ঢুকে গেলেও সহজে সেই শরীরে তারা কোনো রোগ জন্মাতে পারে না। তাই এটা অনেক সময়েই দেখা যায় যে স্বামী হয়তো যক্ষ্মায় ভুগছে, কিন্তু স্ত্রী নিত্যই তার কাছে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে তার সেবা-শুশ্রূষা করে এবং যথেষ্ট মেশামেশি করেও তার কিছু অনিষ্ট হোলো না। এর কারণ সে তার স্বাস্থ্যকে বরাবর অটুট রাখতে পেরেছে, তাই বীজাণুরা শরীরের মধ্যে ঢুকেও তার কোনো অনিষ্ট করতে পারেনি। এই কথাটা সকলের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে স্বাস্থ্য ভালো থাকলে এ রোগকে ভয় নেই। এ বীজাণু গোড়া থেকেই এমন মারাত্মক হতে পারে না যাতে সুস্থ ও সবল শরীরেও রোগ জন্মাবে।

এই যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বয়সের দিক দিয়ে কিন্তু একটা বিশেষ রকমের হিসেব আছে। সাধারণত অল্প বয়সী ছেলেপুলেদের শরীরেই এর বীজাণু ঢোকবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তার কারণ তারা একটুও সাবধান হতে জানে না, সর্বদা ধুলো-মাটি নিয়েই তাদের নাড়াচাড়া আর খেলা করা, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে, ধুলোর মধ্যে লাট্টু ঘুরিয়ে, মার্বেল খেলে অনেক রকম ভাবেই তারা ধুলো মাখে, আর নাকে মুখেও তাদের বিস্তর ধুলো ঢোকে। কিন্তু এতেও সহজে তাদের কিছু ক্ষতি হয় না, যদি স্বাস্থ্যটি ভালো থাকে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে এই বীজাণুকে তারা বেশ সহাই করে নিতে পারে। স্বাস্থ্য খারাপ হলেই এই বীজাণু থেকে তাদের গলগণ্ড প্রভৃতি কয়েক রকম রোগ জন্মায়, আর কখনো কখনো এর থেকে মেনিঞ্জাইটিস পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এমন হওয়ার সম্ভাবনা হাজারের মধ্যে হয়তো একটি। তা ছাড়া আসল যক্ষ্মা রোগ শিশুদের মধ্যে খুব কমই হতে দেখা যায়। কিন্তু এই রোগটি সব চেয়ে বেশি হতে দেখা যায় যৌবনকালে, অর্থাৎ এর বীজাণু অনেক আগের থেকে শরীরের মধ্যে ঢুকে থাকলেও তার দ্বারা রোগ জন্মাবার লক্ষণ দেখা দেয় আঠারো বছর থেকে শুরু করে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। সেইজন্য এই বয়সটাতেই সব চেয়ে বেশি সাবধান হওয়া আর শরীরকে সুস্থ সবল ও মোটা করে রাখা দরকার। মোটা করে রাখা দরকার এই জন্য বলছি যে শরীরে রীতিমত চর্বি থাকলে এ রোগের সম্ভাবনা খুব কমে যায়। সুস্থভাবে বয়সের ত্রিশটা বছর পার হয়ে গেলে এর আক্রমণের ভয়টা অনেক কমে যায়।

যক্ষ্মা রোগ প্রায়ই খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, আর সাধারণত মানুষকে বহুকাল পর্যন্ত ভোগায়। সেই জন্য এই ক্ষয় রোগটিকে গোড়ায় ধরতে পারা প্রায়ই কিছু কঠিন। কিন্তু গোড়ায় একে ধরে ফেলতে পারলে এখনকার দিনে আর কোনো চিন্তা নেই, তাকে আরোগ্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব। তবে অনেক সময় এটি এমন লুকিয়ে লুকিয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে থাকে যে বহুদিন পর্যন্ত দেহের মধ্যে মোটে কোনো রোগ জন্মেছে বলে কেউই জানতে পারে না, রোগীও না আর চিকিৎসকও না। তার পরে যখন ধরা পড়ে তখন দেখা যায় যে, ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ধরা যে একেবারেই কঠিন তা ঠিক নয়, একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখলে ধরা না যাক, অন্ততঃপক্ষে রোগের সন্দেহটা নিশ্চয়ই করা যায়। তার সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ হোলো শরীরের ওজন কমা। এর মানে হঠাৎ কোনো কারণে একটু আধটু ওজন কমে যাওয়া নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস নিয়মিতভাবে ক্রমশ একটু একটু করে ওজন কমে যেতে থাকা। যৌবন কালে দেহের ওজন বাড়ুক কিংবা নাই বাড়ুক, কমে যাওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়, ওটা অস্বাভাবিক বলেই ধরতে হবে। যাদের দেহের ওজন ক্রমশই এমনিভাবে বিনা কারণে কমে গিয়ে শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে এই ক্ষয় রোগের সন্দেহ করতে হবে। ওজন কমা অবশ্য চোখে দেখে সহজে বোঝা যায় না, সেটা শরীরের রীতিমত ওজন নিয়ে দেখতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই পক্ষে মাঝে মাঝে শরীরের ওজন দেখা খুব ভালো। দ্বিতীয় লক্ষণ দুর্বলতা ও একটু পরিশ্রমেই যেন খুব বেশি ক্লান্তি বোধ। যৌবন কালে দেহে এমন অতি অল্পেই দুর্বলতা আসা উচিত নয়। বুঝতে হবে তার একটা কিছু কারণ নিশ্চয় আছে। তৃতীয় লক্ষণ জ্বর। বেশী জ্বর হলে তখনই তো রোগও ধরা পড়বে, কিন্তু অল্প ঘুষ ঘুষে জ্বর সহজে ধরা যায় না, আর টের পেলেও মনে হয় ও কিছু নয়, শরীরটা সাময়িকভাবে হয়তো একটু খারাপ হয়েছে। কিন্তু সামান্য জ্বরও বিনা কারণে কখনো হয় না, আর এই সামান্য জ্বরকেও বেশি দিন পর্যন্ত অবহেলা করা উচিত নয়। তার পরে আরো সব লক্ষণ আছে, যেমন অনেক দিনের জন্যে লেগে থাকা খুক্ খুকে কাসি, খিদে কমে যাওয়া, হজমের দোষ হওয়া ইত্যাদি। এই সব ধরণের কয়েকটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখলেই সন্দেহ জেগে ওঠা চাই এবং একবার সন্দেহ হলেই তার একটা রীতিমত মীমাংসা করে নেওয়া চাই। তখন আর দীর্ঘসূত্রতা করলে কিছুতেই চলবে না। আজকাল এ সন্দেহের মীমাংসা করে নেবার পক্ষে কোনোই মুশকিল নেই, অথবা কারো নাড়ী পরীক্ষা, বুক পরীক্ষা বা আন্দাজের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হবারও দরকার নেই। এ রোগ খুব গোড়াতে এবং খুব সামান্য মাত্রায় হয়ে থাকলেও এক্সরে পরীক্ষায় নিশ্চয় ধরা পড়ে যায়। সুতরাং এক্সরে পরীক্ষা করিয়ে নিলেই আসল কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারা যাবে। যারা এক্সরে ছবি দেখতে জানে এমন ডাক্তারের কাছে এক্সরে পরীক্ষার ছবিখানা নিয়ে গিয়ে দেখালেই নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে এ রোগ হয়েছে কি হয়নি। এর চেয়ে সহজ নিশ্চিন্ত উপায় আর কিছু নেই।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্যে এখন বহুরকমের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে এ পি করা, অর্থাৎ বুকের মধ্যে একটু ফুটো করে সেখান দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে ফুসফুসকে চুপসে দেবার উপায়, তারপরে ইনজেকশনের জন্যে স্ট্রেপটোমাইসিন, মুখ দিয়ে খাবার জন্যে পি এ এস্ বা প্যারাঅ্যামিনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড এবং আরো বহু রকমের স্বাস্থ্যোন্নতি এনে ফেলবার উপায় রয়েছে। সুতরাং এখন আর এই রোগটিকে শিবের অসাধ্য বলে হাল ছেড়ে দেবার কোনো কথাই নেই। কিন্তু এ

রোগের চিকিৎসা কেবল ওষুধ প্রভৃতির উপর মোটেই নির্ভর করে না, তা সে যতই ভালো ওষুধ হোক। এর সার্থক চিকিৎসা প্রধানত রোগীর নিজের উপরেই নির্ভর করে, অর্থাৎ চিকিৎসকের তরফ থেকে যা করা হচ্ছে তা অবশ্যই করা হোক, কিন্তু রোগীর তরফ থেকে তিনটি জিনিস এতে বিশেষ দরকার, নতুবা হাজার ওষুধ খেলে আর ইন্‌জেকশন দিলেও বিশেষ ফল হবে না। বরং দেখা গেছে যে ঐ তিনিটি বিষয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে তখন আর কোনো ওষুধ না দিলেও এ রোগ সেরে যেতে পারে। ঐ তিনিটি জিনিস হচ্ছে—**যথেষ্ট বিশ্রাম, যথেষ্ট বাতাস**, আর **যথেষ্ট** খাদ্য। বিশ্রাম মানে যে কেবল কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে বসা তা নয়, এখানে বিশ্রাম মানে নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ করে বিছানাতে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকা, যেমন হাত পা একেবারে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে মানুষকে শুয়ে পড়ে থাকতে হয়। শরীরকে এমনি সম্পূর্ণ বিশ্রামে কিছুকাল রাখতে পারলে তাতেই এ রোগ আপনা থেকে অনেকটা আরোগ্য হয়। বিশ্রাম দিলেই শরীরের রোগ জয়ের শক্তি বাড়ে। দ্বিতীয় কথা একেবারে খোলা বাতাসে দিন-রাত পড়ে থাকা। দিন-রাত এমনভাবে থাকা সকলের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হলেও দিনের মধ্যে অন্তত আট ঘণ্টা রীতিমত বাইরের খোলা বাতাসেই থাকা চাই, তা সে বাড়ির ছাদের উপরেই হোক, কিংবা চারিদিক খোলা কোনো বারান্দাতেই হোক। ঘরের মধ্যে যতই জানালা-দরজা খোলা থাক, তথাপি সেখানকার বাতাসকে এমনি খোলা বাতাস বলা চলে না। একেবারে ফাঁকা জায়গাতেই যতক্ষণ পারা যায় রোগীকে ফেলে রাখতে হবে। এটা বলবার কারণ এই যে, মুক্ত বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা এ রোগের বীজাণু আপনা থেকেই মরে, আর তার বিষও নষ্ট হয়। তৃতীয় কথা, পুষ্টিকর খাদ্য। এমন সব জিনিস এমনভাবে খেতে হবে যাতে শরীরের ওজন যথাসম্ভব মাত্রাতে বাড়ে। শরীরের ওজন বাড়তে থাকলেই তখন জানবে যে রোগটি অবশ্যই কিছু কাবু হয়ে এসেছে। সেইজন্যে এতে প্রচুর পরিমাণে দুধ ঘি খাওয়া, ডিম খাওয়া, ফলমূল প্রভৃতি খাওয়া বিশেষ দরকারী। তেমনভাবে খেতে পেলে এবং খেতে পারলেই জানবে রোগটি নিশ্চয়ই কালক্রমে সেরে যাবে। এই তিন রকম ব্যবস্থা যদি ঠিক ঠিক মেনে চলা যায় তাহলে আরোগ্য সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই নেই। যার কোনো আপন জনের এ রোগ হয়েছে তার এ তিনটির দিকেই সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য থাকা চাই।

অতঃপর রোগ নিবারণের কথা। অনেকেই মনে করে যে বুঝি রোগীর কাছ থেকে তফাৎ হয়ে তার সঙ্গে ছোঁয়ালেপা বাঁচিয়ে চলতে পারলেই আর এ রোগ ধরবার কোনো ভয় নেই। এ ধারণা অনেকটা ঠিক বটে, কিন্তু ষোলো আনা ঠিক নয়। রোগীর কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকলেই কি বীজাণুর সংস্রব একেবারে এড়ানো যায়? যে বাড়িতে রোগী আছে, সেখানে হয়তো কত জায়গায় কত ধুলো-বালির সঙ্গে ঐ বীজানু মিশে গেছে, সুতরাং সাক্ষাৎ রোগীর কাছ থেকে না এলেও তারা অন্যভাবে নাক মুখ দিয়ে শরীরের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঢোকেও তাই। সেখানে কেবল রোগীকেই অস্পৃশ্য ভেবে নিশ্চিন্ত থেকে কি লাভ আছে? তার চেয়ে বরং এটা দেখা দরকার যাতে রোগী প্রত্যেকবার হেঁচে বা কেসে নির্দিষ্ট ওষুধ দেওয়া পিকদানির মধ্যে থুতু ফেলে, অন্য কোনো জায়গায় কোনো মতে সে থুতু যেন না পড়ে। আর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখা। আমার স্বাস্থ্য যদি আমি অটুট রাখতে পারি, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে থেকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে আর নিয়মিত খোলা বাতাস লাগিয়ে শরীরটিকে ভালো রাখি, তাহ'লে রোগীর সঙ্গে একটু আধটু ছোঁয়া-লেপা হলেও কোনো ভয় নেই। খোলা বাতাস আর পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগের চিকিৎসাতেও বিশেষ দরকার, তেমনি আবার রোগটিকে নিবারণ করবার জন্যেও বিশেষ দরকার। যে রোগটিকে সারাতে চায় তার পক্ষেও যে ব্যবস্থা, যে রোগটিকে এড়াতে চায় তার পক্ষেও সেই ব্যবস্থা।

"এসো রণে"

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মোদক

সবারে দিয়াছ তুমি দু'নয়ন পথ চিনিবারে,
দু'টি হাতে কাজ করিবারে।
দু'টি পায়ে দীর্ঘপথ দিনে রাতে চলিতে চলিতে,
পহুঁছিতে তব অবনীতে।

দিয়াছ প্রদীপ্ত বুদ্ধি ভাল মন্দ করিতে বিচার।
অন্ধকার মহান্ নিশার,
দূর করি; জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিয়া বিশ্বরঙ্গালয়
সাধিতে মানব পরিচয়।

এত শুধু দিলে তুমি, হে হিসেবী, দেখেছ কি হায়
তোমার এই বিশ্বব্যবসায়,
কত এলো, কত গেলো, কি থাকিল লাভটুকু পড়ে,—
দেখেছ কি কভু নেশাঘোরে?

তুমি চাও মাটী হতে মুঠো মুঠো মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ
উন্নত পর্বত সমান,
উদার সাগর সম, ব্যাপ্ত যারা দিগ্বিদিক ভরে।—
কি পেয়েছ ভাগ যোগ করে?

নেশা ছাড়, ছাড় ভাঙ ধুতুরার মাদক-গেলাশ
ওই হের কাঁদিছে আকাশ,
দিকে দিকে বাস্তুহারা, নিরাশ্রয় বুভুক্ষ মিছিল
ভরিয়াছে তোমার নিখিল।

নবাশার স্বপ্ন রচি রচি, নিদ্রার যুগ গেছে কেটে,
খালি পায়ে শুধু হেঁটে হেঁটে,
কবে হবে চলা শেষ! নিরাশ্রয় কোটি দুঃখীজনে
বাঁচাইতে নেমে এসো রণে।

বিজ্ঞানের কথা

কীট পতঙ্গের বৈচিত্র্য

হিমাংশু সরকার

সাধারণত আমরা পোকামাকড়দের তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু জীব-জগতের চার ভাগের তিন ভাগই কীটপতঙ্গের দ্বারা পূর্ণ। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে এখানে সেখানে প্রায় সর্বত্রই এই পোকামাকড়দের দেখতে পাওয়া যায়।

ঊনিশ হাজার ফিট্ উঁচু জায়গায়, যেখানে বায়ুর চাপ মাত্র চৌদ্দ ইঞ্চি—অর্থাৎ সাধারণত আমরা যতখানি বায়ুর চাপে থাকতে অভ্যস্থ তার অর্ধেকের কম—এরকম জায়গায়ও এক-রকম ছোট ছোট সাদা প্রজাপতি অনুর্বর পাহাড়ের আনাচে কানাচে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে বছরের প্রায় সব সময় দিন-রাত বরফে ঢাকা থাকে সেখানেও কি করে যে, এই স্বল্প-প্রাণ প্রজাপতিগুলো বেঁচে থাকে ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশেষ করে এসব জায়গায় সবুজের কোনও চিহ্নই নেই। তাছাড়া এখানে এমন ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া দেয় যে, যে সময়টুকু হাওয়া বন্ধ থাকে তারই মধ্যে প্রজাপতিগুলো একটু উড়তে পারে। অথচ এই অবস্থার মধ্যেও প্রজাপতিরা বংশানুক্রমে মনের আনন্দে বাস করে।

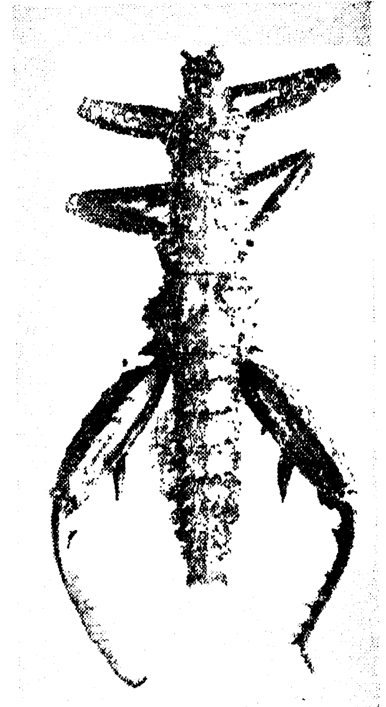
মেরুপ্রদেশেও অনেক রকম কীটপতঙ্গ বিশেষ করে মাছির বাস দেখা যায়। এখানেও কোনও রকম গাছ গাছড়ার অস্তিত্ব নেই। এখানকার উত্তাপ ছত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহিট থেকে আরম্ভ করে তিয়াত্তর ডিগ্রী ফারেনহিটের মধ্যে থাকে।

এই প্রদেশের শূককীটগুলো শীতের সময় ঠাণ্ডায় জমে ঠিক বরফের মত শক্ত হয়ে গিয়ে বরফের ওপরেই পড়ে থাকে। আবার একটু গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলে যায় আর শূককীটগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং আবার খাদ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করে এবং আগেকার মত জীবনযাত্রা প্রণালী শুরু করে।

উত্তর মেরুপ্রদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে জানুয়ারী মাসে শূন্য ডিগ্রীর ষাট ডিগ্রী থেকে একশত ডিগ্রী ফারেনহিটের নীচে উত্তাপ থাকে। তাপ এত কম হয় যে, তাপমান যন্ত্রের পারদ শক্ত হয়ে জমে যায় ফলে তাপের পরিমাণ রাখা সম্ভব হয় না। এই ঠাণ্ডার মধ্যে সাধারণভাবে দেশলাই জ্বালানও যায় না। কিন্তু মজার কথা এই যে, এত ঠাণ্ডার মধ্যেও কয়েক জাতীয় কীটপতঙ্গ বেশ স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকে।

এর ঠিক বিপরীত আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যায় বিষুব রেখার নিকটবর্তী মরুভূমি অঞ্চলে। এই মরুভূমির ছায়াবহুল কোনও জায়গায় দিনের বেলায় একশত কুড়ি ডিগ্রী তাপ ওঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১৩৬ ডিগ্রী পর্যন্ত গরম হয়। আবার খোলা জায়গার তাপ এর চেয়ে অনেক বেশী। এমন কি মাটীর উত্তাপ ১৭৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। রাতের বেলায় কিন্তু তাপ হঠাৎ নেমে যায় এবং সাধারণতঃ ৭৭ ডিগ্রী কিংবা তারও কম হয়।

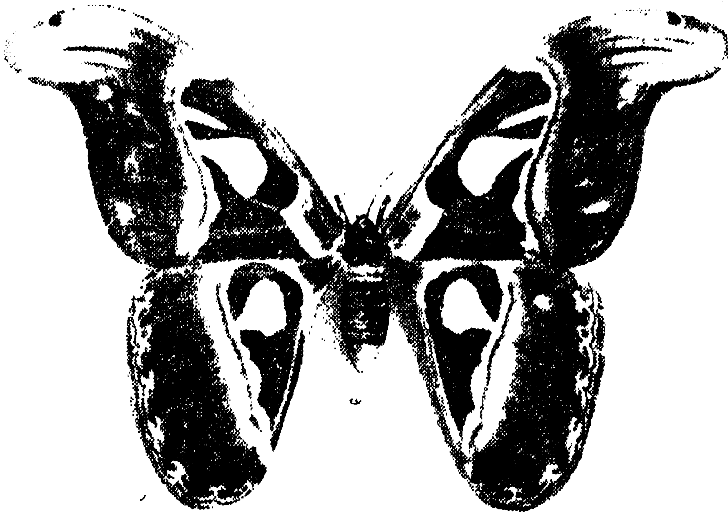
এই সব স্থানেও দিন ও রাতের তাপের এত বেশী পার্থক্যের মধ্যেও বহু জাতের কীট পতঙ্গকে বিশেষ করে এক জাতীয় মাছিকে বাস করতে দেখা যায়। এছাড়া কয়েকটি জলজ কীটপতঙ্গের শূককীটকে ১২২ ডিগ্রীর



কাঠি পোকা লম্বায় প্রায় ১৩ ইঞ্চি

ওপর তাপ বিশিষ্ট উষ্ণ প্রস্রবনের মধ্যেও বাস করতে দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভূখণ্ডে শীতকালে কতকগুলি পক্ষ-বিহীন পতঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলির শূককীটগুলি গ্রীষ্মকালে ভিজে পচা পাতার মধ্যে নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। এর পর বেশী শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়। দেখা গেছে যে, জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী শীতের সময় যখন তাপযন্ত্রের পারদ শূন্য ডিগ্রীর নীচে নেমে আসে তখন এই সমস্ত পতঙ্গগুলি বরফের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সকালের দিকে যখন সূর্যের তাপ খুব



একটা বড় প্রজাপতি, ডানার মাপ এক ফুটের ওপর

প্রখর থাকে তখন খুব অল্পসংখ্যক পতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, আবার বিকালের দিকে আবহাওয়া বদলে গিয়ে যখন বরফ পড়তে থাকে তখন এইসব পতঙ্গের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। এইসব পতঙ্গেরা গরম সম্বন্ধে এত বেশী স্পর্শকাতর যে, কোনও মানুষ যদি কখনও এদের হাতের চেটোতে করে তুলে নেয় তাহলে মানুষের হাতের সামান্য উত্তাপটুকুতেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এরা মরে যায়।

কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের ওপরেই যে, কীট-পতঙ্গের বসবাস তা নয়। কখনও বা ভূগর্ভের মধ্যে আবার কখনও বা ভূপৃষ্ঠের অনেক ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। খুব গভীর গুহা যেখানে সূর্যের আলো যায় না; কোনও শব্দ পৌঁছায় না, যেখানে বাতাসের কোনও গতি নেই, যেখানের আবহাওয়ার তাপ খুব কম এবং আবহাওয়ার কোনও বদল নেই সেখানেও কোনও কোনও জাতের পোকা-মাকড়কে বসবাস করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে কেন্নো বা গুবরে পোকা জাতীয় এবং অন্যান্য অনেকরকম পোকা এইসব জায়গায় পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইসব পোকামাকড়দের কোনও দৃষ্টিশক্তি নেই অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণ অন্ধ। এরা এইরকম আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করার জন্যই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। এদের গোষ্ঠীর অন্যান্য কীটপতঙ্গ সাধারণ-ভাবেই ভূপৃষ্ঠের ওপরেই বাস করে।

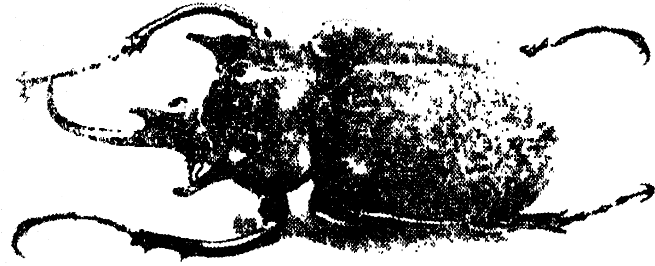
সাধারণত পোকামাকড়দের দেহের উত্তাপ তারা যে আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে প্রায় সেই রকম কিংবা কিছুটা বেশী হয়। কয়েকটি পরিণত কীটের উত্তাপ অনেক সময় আবহাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী হয়। এক ধরণের খুব বড় বড় "ভুতুড়ে প্রজাপতি" দেখা যায় তারা এই জাতীয় পতঙ্গ। এদের মানুষের হাতের মুঠোয় রাখলে বোঝা যায় যে, মানুষের দেহের উত্তাপের চেয়েও এদের উত্তাপ অনেক বেশী। এদের শরীরের তাপ অনেকটা পাখীর তাপের মত। এই ধরণের প্রজাপতিদের খাওয়ার জন্য কোনও মুখ নেই। এদের শরীরের মধ্যে যে খাদ্য সংগৃহীত থাকে কেবলমাত্র ঐ খাবারটুকু খেয়েই এরা কয়েক ঘণ্টা বাঁচতে পারে। পরিণত বয়সে এরা খুব বেশীদিন বাঁচে তো মাত্র দু'দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পোকামাকড়দের জীবনের প্রারম্ভ খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারেই কেটে যায়। পরিণত বয়সে তারা বংশ বৃদ্ধি করে। এই সময়টা প্রজাপতিরা কিছুই খায় না, নিতান্তই যদি কিছু খায় তা অতি সামান্য। বড় বড় প্রজাপতিরা কেবলমাত্র শূককীট অবস্থাতেই তাদের খাদ্য গ্রহণ করে। পরিণত বয়সে তাদের মুখের গঠন বিকৃত ধরণের হওয়ার জন্যই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।

কীটপতঙ্গেরা অনেক সময় প্রায় অনড় অচল অবস্থায় বহুকাল বেঁচে থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ত্রিশ বছর কিংবা তার চেয়েও বেশীকাল এরা এই অবস্থায় থাকে। শীত-প্রধান দেশে পোকারা সারা শীতকাল আর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কীটপতঙ্গেরা গ্রীষ্ম-কালে এইরকম অনড় অচল অবস্থায় থাকে। মরুপ্রদেশের পোকামাকড়গুলি আবার এক বর্ষাকাল থেকে আর এক বর্ষাকাল পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। আর এইজন্য এইসব জায়গায় যদি বর্ষা নামতে দেরী হয় তাহলে এরা বেশ কয়েক বছর ধরে এইরকম থাকতে পারে।

পৃথিবীতে বহু কীটপতঙ্গ আছে যাদের নাম আমাদের কাছে আজও অজানা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এক বিঘা জমীতে ১৩০০০০০ থেকে ১১৩০০০০০ কীটপতঙ্গ পাওয়া যেতে পারে। যদি শুধু পিপীলিকার কথা বলা হয় তাহলে এক বিঘা জমীতে প্রায় ২৩ মণ আর সংখ্যায় প্রায় ৩০০০০০০ পিপীলিকা পাওয়া যেতে পারে। ২০ ফিট লম্বা আর ২০ ফিট চওড়া গাছের নীচে ৩০০০০ কিংবা ৪০০০০ পঙ্গপাল অথবা ঝিঁঝিঁ পোকা থাকতে পারে। একবার সাইপ্রাস দ্বীপে প্রায় ১০০০ টন ফড়িংএর ডিম নষ্ট করার পর দেখা গেল যে, তাদের সংখ্যার খুব তারতম্য ঘটেনি। এক সময় লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে একটা ফড়িংএর ঝাঁক উড়ে গিয়েছিল সেটা প্রায় ২০০০ বর্গ-মাইল স্থান জুড়েছিল। আর এক সময়ে এই স্থানে ফসলের পোকা এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, ১০০০০০০০০ সংখ্যক এবং ওজনে ১৫০০০ টন পোকা নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল।

কীটপতঙ্গদের মধ্যে আকারের তারতম্য খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। সবচেয়ে ছোট আকারের কীটের মাপ এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ থেকে এক ইঞ্চির একশত ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। আবার একটি খুব বড় প্রজাপতির ডানার মাপ ১২" ইঞ্চি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। গুবরে পোকা-দের মধ্যে ওজনে সবচেয়ে ভারী গুবরে পোকা পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। এরা লম্বায় ৪½ ইঞ্চি আর চওড়ায় ২½ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে সবচেয়ে লম্বা যেসব গুবরে পোকা পাওয়া যায় সেগুলো লম্বায় ৫½ ইঞ্চি আর চওড়ায় ১½ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এক ধরণের গুবরে পোকা পাওয়া যায় যার



একটা বড় গুবরে পোকা

একটা পা লম্বায় ১৩½ ইঞ্চি। বোর্নিও দ্বীপে এক ধরণের কাঠি পোকা দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো ১৩" ইঞ্চি লম্বা। এই জাতীয় আর একরকম পোকা আছে যেগুলো আধ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না।

বোলতার মধ্যে সবচেয়ে বড় যারা তারা লম্বায় ১½ ইঞ্চি আর চওড়ায় ½ ইঞ্চি এবং পাখার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মাপ ৩½ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। "জলফড়িং"এর পাখার এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত মাপ ৭" ইঞ্চি আর সবচেয়ে ক্ষুদে জলফড়িং-এর এই মাপ ½ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

কীটপতঙ্গের মধ্যে ছোট ছোট পোকা-মাকড়গুলি মানুষের দৃষ্টিপথে বেশী পড়ে এবং মানুষ তাদের অস্তিত্বকেই বিশিষ্ট স্থান দেয় কারণ এরাই মানুষের ভয়ের কারণ। এদের মধ্যে আকারে যারা বড় তারা সংখ্যায় খুবই কম কিন্তু এরাই মানুষের কৌতূহলের বস্তু।

স্বাধীনতা বলতে কি বুঝি

কাশীকান্ত মৈত্র

মানবসমাজ ধারাবাহিক বিবর্তনের বহু পর্যায় অতিক্রম করে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে—যেখানে সমাজের জটিল সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান নির্ভর করে প্রধানত সমস্যাগুলির ওপর রাষ্ট্রের বা সমাজের সমষ্টিগত যুক্তিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্বের ওপর। নূতন নূতন সমস্যা বেড়েই চলেছে—সমাজ যত এগিয়ে চলেছে, তার জীবনযাত্রার জটিলতাও বেড়ে চলেছে। এদের সমাধানের জন্যে চাই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত ন্যায়-সংগত সামাজিক পরিচালনা, প্রয়োজন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমষ্টিগত, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা প্রয়াসের বিস্তৃতি। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও দিকে রাষ্ট্রের বাহু বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সমস্যাগুলির সমাধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এখানেই বিবাদের সূত্রপাত। একজন গণতন্ত্রী বললেনঃ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিস্তৃতি ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব পরস্পরবিরোধী। এই সব সমস্যা-গুলির সমাধানের জন্যে রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণের অর্থ হচ্ছে মানবসমাজের প্রগতির মূল উৎস—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়াসকে খর্ব করা, তার সৃষ্টিমুখী ইচ্ছাশক্তির স্রোতধারার স্বাভাবিক গতিপথকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের অন্যায় বাঁধ দিয়ে চিরতরে রুদ্ধ করা। কিন্তু একালের রাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার ও সাম্যবোধের যথাযথ মর্যাদা দান। স্বাধীনতা সমস্যার প্রধান প্রশ্নই হলঃ রাষ্ট্রের কতটা ক্ষমতা থাকবে, আর ব্যক্তি বা গ্রুপের-ই কতটা ক্ষমতা থাকবে। 'রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি' এ তর্ক আজকের নয়—১৯ শতক থেকেই এর সূত্রপাত। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে শুধু দুটি আপাত-বিরোধী রাষ্ট্রীয় দর্শনের জন্ম হয়েছে, তাই নয়—একে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক শিবিরেও বিভেদ দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে ধনতন্ত্রবাদে—আর নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র-সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত পরিণতি সমগ্রতন্ত্রবাদে। এখন গণতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার বিবর্তনটা কিভাবে এসেছে, সেটা দেখা যাক্।

সাবেকী লিবার‍্যালপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল-পন্থীরা মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে খর্ব করারই পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের আদর্শ ছিল "আনরেস্ট্রিক্‌টেড কম্‌পিটিসান" বাধাহীন প্রতিযোগিতা। এর ফলে সমাজে বিকট বিকট সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে রাষ্ট্রকে শিল্পপতি ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট শ্রমজীবীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাবে রাষ্ট্রকে সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্যে লেবার ও ক্যাপিট্যালের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌তে হয়েছিল। রাষ্ট্রের এই বাহু-বিস্তৃতি শুধু মাত্র এই দুই শ্রেণীর লোকেদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের প্রভাব বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের সকলকে শিক্ষা দেবার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্র আজ নিজের কাঁধেই নিয়েছে।

রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ফলে যদিও Laissez Faire-কল্পিত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়েছে, তথাপি এ যুগের পটভূমিতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রের উপর এই বিরাট দায়িত্ব অর্পণের ফলে প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। অবশ্য রাষ্ট্রের ওপর এই অধিক দায়িত্ব উত্তরোত্তর চাপিয়ে যাবার যে বিষম পরিণতি আছে, সে সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করছি। তবুও এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের বাহু-বিস্তৃতির ব্যাপারেও সব সময়ই একটা 'দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দার' পরিস্থিতি আছে। রাষ্ট্র যখন সেই নোটিশ উপেক্ষা করে- স্বাধীনতা তখনই সঙ্কুচিত হয়—তার পূর্বে নয়। শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগে অবাধ বাণিজ্য ও চুক্তি প্রথা যে দুর্বিষহ, ভয়াবহ কলাফল সৃষ্টি করেছিল, তারই অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তানায়করা বুঝলেন যে, সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতি এবং রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ এই অবাধ চুক্তি ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী। তাছাড়া রাষ্ট্র-ধারণায়ও বিবর্তন এসেছে। ১৯ শতকের কতিপয় অর্থগৃধ্নু কুচক্রী পরিচালিত রাষ্ট্রকে একটা 'কোরাপ্‌ট কর্পোরেশন' বললে অত্যুক্তি হোত না।

কিন্তু একালে রাষ্ট্র আর কোনমতেই গণ-প্রভাবমুক্ত নয়। অতএব আজ আর রাষ্ট্রের ওপর সমাজের গলদ ও যুগসঞ্চিত আবর্জনা অপসারণের দায়িত্ব অর্পণে বাধা থাকতে পারে না। তবে এই দায়িত্ব কখনও চূড়ান্ত বা একান্ত হতে পারে না। এটা আপেক্ষিক—রিলেটিভ এই জন্যেই যে দেশের ও দেশবাসীর বাস্তব ও মানসিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কমে আসবে এবং গুরুত্ব ও দায়িত্বটা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াত্মক ভিত্তিসম্পন্ন 'গ্রুপ'গুলির ওপরই গিয়ে পড়বে। রাষ্ট্রের কাজ হবে এই সব বিবিধ সংস্থা ও গ্রুপগুলিকে এক সংহত সমন্বিত সাধারণ উদ্দেশ্যের সূত্রে গ্রথিত করা।

স্বাধীনতা ও অধিকার :

স্বাধীনতার অর্থ হল সেইরূপ এক পরিবেশের সৃষ্টি যেখানে মানুষ তার পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর সেই পরিবেশ প্রধানত নির্ভর করে মানুষের বিবিধ অধিকারের প্রকৃষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ওপর। তাই 'স্বাধীনতা' হ'ল কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিগত ফল। যে সমাজে এই সব অধিকার স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায় না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তাই এই প্রসঙ্গে মানুষের 'অধিকারের' আলোচনা অনিবার্যরূপেই এসে পড়ে। এখন দেখা যাক এই অধিকারগুলি মোটামুটিভাবে কি ?

প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার অধিকার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির তার পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত মজুরী লাভের অধিকার আছে। তার অতিরিক্ত হাড় ভাঙা খাটুনির হাত থেকে রেহাই পাবার অধিকার আছে এবং তার প্রতিভার উন্মেষের জন্যে চিন্তা ও ভাবের দৈন্য দূর করার জন্যে অবকাশ ভোগের অধিকারও এরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রমিকদের সহযোগিতায় শিল্প ও কারখানার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দাবী মজুরদের আছে। তার শিক্ষার অধিকার আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের অধিকার তার আছে। তার অর্থঃ (১) প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও (২) জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হবার অধিকার। বক্তৃতা দেবার ও সাংবাদিকতার অবাধ অধিকার। এই অধিকারকে সামগ্রিক স্বার্থের কল্যাণে সংকুচিত করা হয় তখনই যখন এই অধিকারের সুযোগ নিয়ে এমন একটা দুষ্ট মতবাদ বা জনমত সৃষ্টি করা হয় যা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন ক'রে তোলে। বা ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়। সংঘ বা দল গঠনের অধিকার। আইনের সাহায্য নেবার পূর্ণ সুযোগ ভোগের অধিকার।

রাষ্ট্রাধিপত্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

পঞ্চদশ শতক থেকে আজ অবধি রাষ্ট্রের একটানা শক্তি বৃদ্ধি একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণই এ যুগে "স্বাধীনতার" সমস্যাকে পুরোভাগে এনে দিয়েছে। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা যেমন একে

একে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে সেই সংগে সংগে ব্যক্তি স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনও গড়ে উঠছে। মনে রাখা দরকার যে, এই দু'টি আন্দোলন সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী : একের বিলোপ সাধনেই অপরটির সাফল্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর-শীল। আবার একথাও সত্যি একালের কয়েকটি রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্রিকতাকে যেভাবে সর্বব্যাপী রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুশাসনে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে এক কল্পিত, মিস্টিক "সমষ্টিগত স্বার্থের" কল্যাণে—মানব সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। অধুনাতম যান্ত্রিকতা ও রাষ্ট্রশাসন পরিচালনার কলা-কৌশলের যুগে রাষ্ট্র কর্তৃক এইরূপ ব্যাপকতম ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্তির জীবনের প্রতি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রিত করা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে এবং একালের সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই যান্ত্রিক সভ্যতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। এর ফলে সামাজিক জীবনে প্রগতির গতি রুদ্ধ হতে চলেছে। কেননা স্বাধীনতা হচ্ছে প্রগতির পালের হাওয়া।

একথাও স্বীকার করতে হবে যে এক-নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমষ্টিগত জীবনে প্রভূত 'কল্যাণ' সাধিত হয়েছে : জীবিকার মান বেশ উন্নত হয়েছে, নিদয় সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর হয়েছে, নিরক্ষরতা বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে—জনস্বাস্থ্যের সুস্পষ্ট উন্নতি সূচিত হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলি যখন আমরা বলি তখন সাধারণতঃ ভুলে যাই যে, "সমাজের কল্যাণ" কথাটা খুব ব্যাপক এবং সামগ্রিক। ওটাকে টুকরো টুকরো করে আলোচনা করা যায় না। কারণ একালের সমগ্র-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এই সব নানাবিধ "উন্নতি" সাধিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আদিম কুসংস্কারগুলি এই সব 'উন্নত' সমাজের আবার পিছু নিয়েছে। তারা হ'ল নৈতিক ও মানসিক দৈন্য, অন্ধ-গোঁড়ামি, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং পাশব শক্তিকেই রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ও নিয়ামক বলে চালু করা। সেইজন্যেই আজ নূতন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান নির্ধারণ করা দরকার,—দরকার ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোরদার করার।

স্বাধীনতার সমস্যা প্রধানত রাষ্ট্রে ব্যক্তির সুসংক্ষা ও স্বতঃপ্রণোদিত প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাকে সৃজনশীল খাতে প্রবাহিত হ'বার বাধাহীন সুযোগ উন্মুক্ত রাখা;—সবচেয়ে বেশী পরিমাণ বে-সরকারী প্রয়াস বৃহত্তর ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণের সংগে সমন্বিত ভাবে মূর্ত হবার যে রাষ্ট্রে যত বেশী সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে, সেই রাষ্ট্রে ততবেশী স্বাধীনতা আছে আমরা বলতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ সেখানে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রায়ত্ব বহির্ভূত কোন শক্তি, মত বা সংগঠনকে স্বীকার করা হয় না। এ যুগের সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুটো রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে—একটা ফ্যাসিজমের রাষ্ট্ররূপ—অপরটি কমিউনিজমের বর্তমান রাষ্ট্ররূপ। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মুসোলিনী কোন ঢাক-ঢাক গুর-গুর না করেই বলেছেন: Liberty is a putrescent corpse—its body is long since dead." ফ্যাসিস্ট সাংবাদিক রাষ্ট্রে—রাষ্ট্র-ই সব কিছু—তার বাইরে তার বিরুদ্ধে কোন কিছুই থাকতে পারে না। এ কালের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতেও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা:

Totalitarian-রাষ্ট্রে বাস্তবিকই 'সিকিউ-রিটির'-র ব্যবস্থা হয়েছে, আর্থিক ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন-কি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেও পুঁজিপতিদের যদৃচ্ছ শোষণের সুযোগ ও অধিকার স্বীকৃত হয়নি—সেখানেও পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়েই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অবশ্য বলশেভিক্ রাষ্ট্র আর্থিক ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের চেয়ে বেশী দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই 'Economic Security'-র ব্যবস্থা হলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। নিশ্চয় নয়। সমাজের প্রতি স্তরে সাম্য ও ন্যায় বিচার ছড়িয়ে দেবার অর্থই হ'ল স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি না রাষ্ট্রে Emotional Securityও সমান মর্যাদা পায়। অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিন্তার সীমাহীন নীলাকাশে ডানা মেলে স্বাধীনভাবে উড়বার সুযোগ প্রতিটি ব্যক্তিকেই দিতে হবে। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা, সত্যি কথা এবং যে কোন দেশেই এই মূলে দারিদ্র্য নিরসনের সমস্যা সমাধানকারী কর্মসূচীই সব চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাবেই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও দাবী রয়েছে। সুতরাং জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার পর তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দাবীর চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই একতারায় বাঁধবার চেষ্টা হয় যাকে বলা হয় Regi-mentation—যার ফলে রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের জীবন-বীণা থেকে একটিমাত্র বিশীর্ণ সুরই ঝংকৃত হয়। তাই সেখানে বাহিক জীবন বিজ্ঞানের আলোর উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে একটা প্রাণহীন নিষ্করুণ একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রনায়করাই ঠিক করেন কোনটা খারাপ—কোনটা ভাল। শিক্ষা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অননু-মোদিত কোন বিষয়ই অনুধাবন করার ক্ষমতা বা সুযোগ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নেই।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে রাশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আলো-চনা অনিবার্যরূপেই এসে পড়ে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বাধীনতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এবং কমিউনিস্টরাও কেবলি বলেন কমিউনি-জমই গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট রূপ। অথচ এই 'উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রে' সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একেবারে লোপ পেতে বসেছে। সাহিত্য-আর্ট-কলা-শিল্প-বিজ্ঞান সব কিছুই নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সে-দেশে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় ও পরে সমগ্র রুশ দেশে শিল্প-সাহিত্য-কলার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ, যে উন্মাদনা, উৎসাহ ও সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল আজ প্রলিট-কাল্টের রথচক্রের তলায় পড়ে তা' নিষ্পিষ্ট হতে চলেছে। সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পীকেই Russian Union of Prole-tarian Writers-এর "শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টি নির্দেশ"—এই কড়া অনুশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে মেনে চলতে হয়। যিনি তা না করেন, তাঁকে নির্দয়ভাবে উৎপীড়িত করা হয়ে থাকে। যে কোন সাহিত্য বা শিল্প বা আর্ট—তা সে যত উৎকৃষ্টই হোক—যদি না সংগে তা' কমিউ-নিজম বা স্টালিনিজমের প্রচারমাধ্যম হয়—আজ 'বুর্জোয়া ভাবাদুষ্ট' বলে নিন্দিত ও বর্জিত। "We must have a strict Bolshevik vigilance on the Publish-ing Front"—এই নীতি অনুসরণের ফলে সাহিত্য-শিল্প-আর্টকে এক কেন্দ্রীভূত একতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি, রাষ্ট্রনায়ক, সেনানায়ক ও পার্টিধুরন্ধরদের প্রোপাগাণ্ডা-সর্বস্ব নির্লজ্জ মহিমা কীর্তনেই পর্যবসিত হয়েছে। শুধু যে শিল্পীরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন তা নয়—বিজ্ঞানীদের প্রতিভাও এইভাবে 'পার্টি লাইনের' ফ্রেমে জোর করে এ'টে দেওয়া হচ্ছে। শুধু রুশ দেশেই নয়—অন্যান্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিজ্ঞানীরা হয়ে পড়েছেন রাষ্ট্রশক্তির দাস। নেতারা যেভাবে চলতে আদেশ করেন—বিজ্ঞানীদের ঠিক সেই পথেই চলতে হয়। বিজ্ঞানে দলীয় চেতনা ও উগ্র দেশাত্ম-বোধের প্রভাব যে কি উৎকট রূপ ধারণ করেছে তার অধুনাতম দৃষ্টান্ত রাশিয়ায় 'লাইসেঙ্কো বায়লজির' উদ্ভব। এই নূতন প্রাণী-বিজ্ঞান-তত্ত্ব যারা অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেননি তাঁদের উৎখাত করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীতে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রের সংগে বিরোধিতা করে—আর এ যুগে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু যে-কারণে অতীতে বিজ্ঞানের বিকাশকে রাষ্ট্র-নায়করা রোধ করতে চেয়েছিলেন—একালের

রাষ্ট্রনায়করা ঠিক সেই কারণেই বিজ্ঞানকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে এনে তার গবেষণায় সহযোগিতা করছেন। অতীতে [illegible] বিজ্ঞানকে Heretic মনে করতেন কারণ সে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদই পোষণ করত। সেইজন্যে তাঁরা বিজ্ঞানকে বিকশিত হবার সুযোগ দেননি, বিজ্ঞানীদের নির্বাসন দিয়েছেন, হত্যা করেছেন। এ-যুগের রাষ্ট্রেরও ঠিক একই ভয় এবং পাছে বিজ্ঞান 'Heretic' হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে বিজ্ঞানকে রাষ্ট্র-দর্শনের বাঁদীগিরি করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই এর ওপর রাষ্ট্রনায়করা প্রত্যক্ষ নজর রেখেছেন। যখন বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক মতবাদের অনুকূল নয় বলে বিবেচিত হয়, তখন তাদের উৎখাত করার ব্যবস্থা হয়। রুশ দেশে উত্তর-লাইসেঙ্কো কালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে—তা এই উক্তিরই সাক্ষ্য দেয়। এই দেশে আবার ১৯৪৯ সালের ২০শে মার্চ সোভিয়েট লিটারারী গেজেটে বিশ্ববিশ্রুত রুশ ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কীকে রুশ-বিপ্লবের ও বিপ্লবী গণতন্ত্রী দলের চরম শত্রু বলে ঘোষণা করা হল। "গোর্কী ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার" নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক কির্পোটিনকে তাঁর পুস্তকে ডস্টয়েভস্কীর বিশ্বজনীনতার প্রশংসা করে তার অনুকূলে সমালোচনা করার অপরাধে সেই অধ্যাপক ও অপর আরও দুজনকে বহিষ্কার করা হয় উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মস্কো-বেতার ও সরকারী কাগজপত্র ইত্যাদি মারফৎ ঘোষণা করা হল ডস্টয়েভস্কীর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের কথা। তিনি এতদিন যা বিশ্ববাসীর কাছে পরিবেশন করে এলেন তা আজ "বুর্জোয়া" বলে নিন্দিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেল। মজার বিষয় এই যে ২০শে মার্চের আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট দুনিয়া এই মনীষীকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে আসছিলেন। কমিউনিস্ট মুখপত্র 'New Times'-এর এক প্রবন্ধে বলা হল:

"This anti-patriotic group of cosmopoliticians tried to rob literature, art and science of the party-spirit, of positive ideological contents, of life-giving Soviet patriotism."

সুধীসমাজ সংস্কৃতির ওপর এই হামলার সংবাদে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হয়ে উঠবেন—সন্দেহ নেই। আমাদের বক্তব্য কতকটা এই ধরনের: রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ বসুকে ভারতের শাসনকর্তারা বা শাসনকারী দল যদি কোনদিন প্রতিক্রিয়াশীল, ভ্রান্ত ও অস্পৃশ্য বলে প্রচার করেন, তাতেও আমরা তত বেশী বিচলিত বোধ করব না। কিন্তু তাই বলে যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্য ও বসু-বিজ্ঞানতত্ত্বকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে স্বীকার না করবেন তাঁদের যদি রাষ্ট্রের শত্রু বলে, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া বলে উৎখাত বা শাস্তি [illegible] ব্যবস্থা হয় তাহলে, আমরা সেই [illegible] শ্বাসরোধকারী স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী বলেই মনে করব,—তাকে কোনমতেই স্বাধীন সমাজব্যবস্থা বলে স্বীকার করবো না যদিও সেই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের দারিদ্র্য-অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হয়, শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়, বড় বড় ইমারৎ, রাজপথ, চিকিৎসালয় ও শিক্ষা কেন্দ্র নির্মিত হয়।

ধনবাদী রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মবিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে কতিপয়ের ডানা-মেলে ওড়ার সুযোগই সৃষ্টি করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনকে সর্বদিক দিয়ে ঝলমলিয়ে তোলা—ব্যক্তিত্ব বিকাশের অগণিত পথ খুলে অসংখ্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে জীবন্ত ও উজ্জ্বল করে তুলতে হলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হবে। প্রথমত, 'Publishing Front'কে কোনমতেই রাষ্ট্রের অধীনে আনতে দেওয়া চলতে পারে না। সাংস্কৃতিক সংসদ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দায়িত্ব পরিচালনার 'স্বায়ত্তশাসন' দিতেই হবে। বৈচিত্র্য ও সৌষম্য-ই হল প্রগতির প্রাণ। সুতরাং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে বাঁচাতে হলে এই বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি গণ-চিত্ত উন্নতকারী প্রতিষ্ঠান বা গণমানস প্রস্তুতি বা জনশিক্ষার মাধ্যমগুলির ওপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভুত্বস্থাপন—সংস্কৃতির স্বাধীনতার পরিপন্থী। রেডিও, সিনেমা, জনসভা এগুলো হল আসলে জনমত বা জনমন তৈরীর কারখানা। যে রাষ্ট্রে সমস্ত ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় সেখানে জন মন বা মত তৈরীর ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরদাস্ত করা হয় না। কারণ তার অর্থই হল কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল কর্তৃক রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা ও রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ-দখলের একচেটিয়া অধিকারের পথে বাধা সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে B. B. C. বা লণ্ডন বেতারের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই বেতার মারফৎ বিরুদ্ধ মতামত বা মতবাদ প্রচারের সুযোগের কথা অনেকেই জানেন। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনেকটা নির্ভর করে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর। একথা সত্যি যে দেশের অগণিত লোককে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব কেবলমাত্র বে-সরকারী প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা যে অনেকখানি তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধে তখনই যখন এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় সকল অবস্থাতেই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এবং তার মতবাদের প্রতি আস্থাশীল অনুগত নাগরিক সৃষ্টি করা। আধুনিক একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা হয়ে পড়েছে প্রোপ্যাগাণ্ডা বা বিশেষ সঙ্কীর্ণ আইডিওলজির সর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছাত্রদের মধ্যে 'labelled packages of truth' পরিবেশন করা কোনমতেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা প্রচেষ্টা হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের মনকে এমন যুক্তিবাদী সত্য ও ন্যায়ানুরাগী করে তোলা যার ফলে সে স্বতঃই বুঝতে পারবে—কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ। এ যুগের অল্প বেশী প্রায় সকল রাষ্ট্রেই, তবে বিশেষ করে সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলই হল একটা 'Dead and dull uniformity' সৃষ্টি করা। যখনই দেশের সামনে কোন সমস্যা আসে তখনই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই বলে দেওয়া হয় দেশবাসীকে কেন এই সমস্যার উদ্ভব হল এবং কি তার সমাধান। এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত-নিরপেক্ষ কোন দল বা সংস্থা বা ব্যক্তিকেই পৃথক অন্য কোন মত প্রকাশ করার সুযোগও দেওয়া হয় না। জনসাধারণ সমস্যাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগই পায় না। আর এই সুযোগের অভাবে আত্ম-বিকাশের উদগ্র বাসনাও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষের মন অন্ধ বাধ্যতাবোধ, অভ্যাস ও ভয়ের প্রভাবে জ্ঞান ও সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয় না, হয় মোহাচ্ছন্ন। তার মানসিক বৃত্তিসমূহ যার প্রকৃত উদ্বোধনের ওপরই সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণ নির্ভরশীল—বন্ধ্যা হয়ে যায়। তাই এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হতেই পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে তার আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান করে তোলা, সমাজের সকলের এক নিবিড় সম্পর্কময় সমন্বিত-আত্মোদ্বোধন—যা মানুষের অন্তর্নিহিত পরার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধেরই পরিপূরক হবে। হিংসা-লোভ-ঘৃণা-রিক্ত এক অনুভূতিশীল, সংবেদনশীল কাব্যিক মন সৃষ্টি করা। মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসাবোধ, 'Rational doubts', বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী জাগিয়ে তুলতে হবে—নির্বিচারে দ্বিধাহীন চিত্তে উদ্ধত রাজশক্তির নির্দেশ—অনুশাসন মানবার দাস মনোবৃত্তি নয়। এই মন-প্রস্তুতির ওপর এতটা জোর দেওয়া হয় এইজন্যেই যে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে সবচেয়ে আগে স্বাধীন হতে হবে নিজের মনে। স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং তাকে রক্ষা করবার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে যে-মন সেই মন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন:

"It is a halfway house between scepticism and dogmatism."

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন সরকারী শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব। কারণ এর অভাব ঘটলে—রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দেবে এবং ভারসাম্যও নষ্ট হবে। এইরূপ পরিবেশ

'Intellectual Freedom'এর মোটেই অনুকূলে নয়। তার জন্যে চাই ভিন্ন পরিবেশ। এরই সংগে এসে পড়ে প্রসংগক্রমে যে যতদিন পর্যন্ত না বিশ্বের দেশ বা জাতিসমূহ জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে যুদ্ধকে নীতিগতভাবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্জন না করছে ততদিন পর্যন্ত এই স্বাধীনতার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা এই যুদ্ধের সময়েই এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশী খর্ব করা হয়, প্রত্যেক নাগরিককে তার স্বাধীনতার কথা ভুলতে হয়—এক তথাকথিত পুণ্য জাতীয়স্বার্থের জন্যে। অবশ্য আবার এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আমরা রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অনুকূলে একথা কিছু আগেই বলছিলাম। কিন্তু এই তথাকথিত স্থায়িত্বই যে আবার এই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু সময় সময় হয়ে দাঁড়ায়—ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তও কম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অতীতের রোমকও ইজিপ্ট সাম্রাজ্যের উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং স্থায়িত্বের সংগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কি প্রকার শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব আমরা চাইছিঃ ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক না সমপ্রতান্ত্রিক।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা :

রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে পরাধীন দেশের লোকেরা সাধারণত মনে করেন বিদেশী শাসন ও শোষণের অবসান। কিন্তু এটা হল স্বাধীনতার নেতিবাচক ব্যাখ্যা। এর একটা পজিটিভ দিকও আছে। সেটা হল বিশেষ কতকগুলি অধিকার ও দায়িত্বের সমষ্টি। এই পজিটিভ সর্তগুলি প্রতিপালিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেগুলো পররাজ্য দ্বারা শাসিত নয়—অথচ সেই সব 'স্বাধীন' রাষ্ট্রে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ভারতের প্রতিবেশী নেপাল রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। ফরাসী বিপ্লব এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রথম দিকেই আমরা আলোচনা করেছি। এখন কি কি অবস্থায় এই স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে—সেই সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি।

প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দ্বিতীয়ত ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ রোধ করার জন্য ফরাসী মনীষী বহুদিন পূর্বে যে 'Separation of Powers' নীতি অনুমোদন করেছিলেন বা এ-কালের গণতন্ত্রীরা যে 'Checks and Balance' নীতি উল্লেখ করে থাকেন—তাকে কার্যকরী করা দরকার। তৃতীয় প্লুর্যালিস্ট-থিয়োরীর (Pluralist) প্রবক্তা ল্যাসকী প্রমুখ দার্শনিকরা বলেন যে, Monistic-থিয়োরী বা দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বকে এঁরা একটা 'Venerable Superstition' বলেই মনে করেন। রাষ্ট্রের যথেচ্ছ ও বাধাহীন আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে তাই সংকুচিত করা দরকার এবং সেই সংগে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংস্থাগুলিকে সেই-সব সংস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও আইন প্রণয়নের কিছু কিছু ক্ষমতা 'ডেলিগেট' করা প্রয়োজন। চতুর্থত, এক-দলীয় শাসন ব্যবস্থার অভ্যুত্থান রোধ করতে হবে। সংগে সংগে আবার বহুবিধ দলীয় শাসন ব্যবস্থা—Multiple Party System-এর উদ্ভবকে প্রশ্রয় দেওয়াও অসংগত হবে। কেননা এইরূপ ব্যবস্থা আবার রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের ভিত্তি শিথিল করে দেয়। পঞ্চমত, রাষ্ট্রে আইন ও বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে। বিচারালয়ের বিচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রীয় নেতাদের খেয়াল-খুশীমত শাস্তি দেওয়া চলবে না। এবং বিচারালয়ে প্রত্যেককেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কোন কোন রাজনীতিবিদের মতে জাতীয়বাদ স্বাধীনতা-বিরোধী। বিশেষত মার্কসীস্ট ও হিউম্যানিস্টরা এই কথা বলে থাকেন। মার্কসীস্টরা বলেন যে, জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদী মাল মাত্র এবং যেহেতু পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার স্বাধীনতা থাকতে পারে না, সেইহেতু জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই রকমফের—স্বাধীনতা-বিরোধী। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'মার্কসীস্ট'-রাশিয়াও জাতীয়তাবাদ চরম ও উগ্র রূপ নিয়েছে। কিছুকাল পূর্বে বার্নার্ড শ' বিশেষ গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির 'Jingo Patriotism'-এর ভয়াবহ সম্ভাবনা সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন। সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বুকে যে কতবার ধ্বংস ও হত্যালীলার বীভৎসতা টেনে এনেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যেহেতু বিশ্ব-জনীনতার মহাসমুদ্রে উগ্রতা-রিক্ত সুস্থ ও সহজ জাতীয়তাবোধের বিভিন্ন ধারা বেয়েই পৌঁছাতে হয়—সেইহেতু বিশ্ব রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সৃষ্ট হবার পূর্ব মুহূর্ত অবধি—গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের পর্যায়টুকু স্বীকার করে নেওয়া বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়কই হবে। তবে এই জাতীয়তাবাদকে স্বাধীনতার সংগে সংগতিশীল ও সামঞ্জস্যময় করার জন্যে এর যে-রূপ হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেনঃ

"Patriotism devoid of consideration of humanity is nothing but selfishness on a large scale."

অর্থাৎ জাতীয়তাবাদকে মানবিক মূল্য-বোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—নচেৎ তা হীন স্বার্থপরতা ও গৃধ্নুতারই চরম রূপ নেয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের রাষ্ট্র-রূপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সমাজে আর্থিক সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা একটা শব্দ-সর্বস্ব ভাঁওতাবাজী হয়ে দাঁড়ায়। তাই ফরাসী-বিপ্লব শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য আনল বটে, কিন্তু সমাজজীবন ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষে দীর্ণ-জীর্ণ হয়ে রইল। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লব অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী বহন করে আনল। ধনতান্ত্রিক সমাজে কাগজে-কলমে

প্রতিটি লোকের সর্বপ্রকার সুযোগ স্বীকৃত হয় বটে। কিন্তু আসলে দরিদ্র যারা তারা ধনী ও বিত্তশীলদের কাছে তাদের সমস্ত স্বাধীনতাই বাঁধা রাখে। সুতরাং এ কথাটা সত্যি যে, সমাজে যাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে তারাই আসলে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার পরিচালনা করে থাকে। তাই এ যুগের রাষ্ট্রকে Laissez Faire নীতি পরিত্যাগ করতেই হবে—নচেৎ মানুষের কোনই কল্যাণ নেই। যতদিন পর্যন্ত বণ্টন ও উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রথা মুষ্টিমেয় গৃধ্নু ধনিকের হাতেই থাকবে —ততদিন মুষ্টিমেয়ের ভুরিভোজনের জন্যে সমষ্টিকে উপবাসে রাখতে হবে—এই সমাজে অনিবার্য পরিণতিরূপে "wealth accumulates and men decay"। তাই রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র কর্তৃক সমষ্টির কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে। মানুষের predatory instincts এবং possessive impulse-গুলিকেই সমষ্টির স্বার্থের কল্যাণে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ ছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। বার্নহাইম তাঁর 'Managerial Revolution' পুস্তকে যে বিপজ্জনক সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন আগামীদিনের মানুষকে সেই নূতন ধরণের শোষণ থেকে মুক্ত করতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান-সম্মত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে বিকেন্দ্রীভূত করতেই হবে।

স্বাধীনতা ও হিংসা

কোন কোন দার্শনিকের মনে সংশয় জেগেছে যে, হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার সিংহাসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত হন—তাঁরা কোনদিনই রাষ্ট্রে স্বাধীনতার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন না এবং যে স্বাধীনতাকে কায়েমী করার জন্যেই তাঁরা প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসেন সেখানে সেই স্বাধীনতাকেই সর্বাগ্রে বিলুপ্ত করা হয়। ইয়োরোপের ফেবিয়ান সোস্যালিস্টরা এদেশের হিউম্যানিস্টপন্থী, গান্ধীপন্থীরাও এই ধরণের কথা বলে থাকেন। আসলে এই হল 'Ends' ও 'Means'এর দ্বন্দ্ব। একপক্ষ বলছেন উদ্দেশ্য মহৎ হলেই হল—পথ নিয়ে ঝামেলা বা তর্ক করা অর্থহীন। আর এক পক্ষ বলছেন, মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে মহৎ নীতি-গর্ভ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই সমস্যার কোন মীমাংসা আজও হয়নি,—আর পুঁথিগত আলোচনায় এর সমাধানও মিলবে না। তবে এই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনেই সমস্যার সমাধান হয়ত সম্ভব। এই সংশয় সম্বন্ধে C.E.M. Joad তাঁর Liberty to-day পুস্তকে যে প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপন করেছেন, এখানে সেটা উদ্ধৃত করছিঃ

"Employment of force throws up a new and different type of man, the dominating executive type who has been found in the past to use the powers with which successful force has endowed him for the ends very different from those which originally led his followers to embark upon a policy of force. These ends are normally found to be incompatible with liberty both during the period of revolution and during the period which succeeds it, is according eclipsed.

তারপর তিনি আরও জোর দিয়ে বলছেন ঃ

"Have those who have won power by violence ever been known voluntarily to relinquish power those who have been above criticism voluntarily to permit criticism?"

স্বাধীনতা ও ক্ষমতাবাদ

স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই দীর্ঘ আলোচনার পর একথা স্বীকার করতেই হবে যে সমাজে মূল সমস্যা হচ্ছে ক্ষমতা বা 'পাওয়ার' নিয়ন্ত্রণ বা বশীকরণের সমস্যা। ক্ষমতা-লোলুপতা এবং মুষ্টিমেয়ের হাতে তার নিয়ন্ত্রণহীন যথেচ্ছ প্রয়োগ বা ব্যবহার রাষ্ট্রে ভারসাম্য নষ্ট করে অকল্যাণ টেনে আনছে। বিশ্বজুড়ে যে টালবাহানা ও অশান্তির ঝড় চলেছে তার মূলে রয়েছে কতিপয় বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতাবাদের উগ্র মদ পানোত্তর বিশ্বশাসনের নগ্ন লালসা। এই অবস্থার পরিবর্তন একমাত্র ক্ষমতার বিকিরণ-দ্বারাই সম্ভব। তাই Laissez Faire গণতন্ত্র চেয়েছিল এই ক্ষমতাবাদকে নিয়মতন্ত্রের শিকল দিয়ে বাঁধতে। কিন্তু তার বিশেষ ফল হল না, কারণ গণতন্ত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাবাদকেই শাসনে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছে—চেষ্টা করেছে তার স্বৈরতান্ত্রিক রূপায়ণ সম্ভাবনাকে রোধ করতে। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি সে। একালে আবার এই ক্ষমতাবাদকে পঙ্গু ও বশ করে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের জন্যে মার্কসবাদের উদয় হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদও পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যে একপেশেমীর জন্যে পুরাতন গণতন্ত্র ব্যর্থ হল ঠিক সেই একপেশেমীই পরিলক্ষিত হল মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও। মার্কসবাদ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে গেল এবং সে বশীভূত হলও সত্যি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হল না। এক নূতন সমন্বয়ী দর্শনই এই অভাব পূর্ণ করতে পারবে এবং সমাজে শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও স্থায়িত্ব কায়েমী হবে।

যে স্বাধীনতার হোমাগ্নিতে যুগ-যুগ ধরে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে —সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও একটা ব্যালেন্স একটা এ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট প্রয়োজন। কারণ, এর যেখানে মাত্রাহীন আতিশয্য ঘটবে সেখানে অরাজকতা ও বৈষম্য দেখা দেবে। আবার যেখানে স্বাধীনতাকে অসংখ্য কৃত্রিম বাধা-নিষেধের আবেষ্টনে বাঁধা হয়— সেখানে প্রগতি স্তব্ধ হয়। স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে ও জীবন্ত করে তুলতে হলে প্রতিটি মানুষকে আত্ম ও সমাজ-সচেতন করে তুলতে হবে—স্বাধীনতার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। সংগ্রামশীল জাগ্রত জন-মনই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। "আমরা স্বাধীন হয়েছি" বলে বসে থাকা অর্থহীন। কারণ প্রতি মুহূর্তেই স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে—স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বিরাম নেই। সভ্যতার ঊষাকাল থেকে আজ অবধি সরকারী বাধা-নিষেধের ডোরে আবদ্ধ মানুষ পরাধীনতার দুঃসহ বোঝা কাঁধে নিয়ে 'Camel men'এর মতন দুঃখ-দারিদ্র্য-নিরাশার দুস্তর মরুপথ বেয়ে চলেছে—সামনের মরূদ্যানের আশায়। আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক যান্ত্রিকতা সমস্ত দুঃখ দূর করে মানুষকে মুক্ত করবে—এই ছিল আশা। এই আশা বাস্তব রূপ লাভ করবে হয়ত সেদিন, যেদিন যন্ত্রী তার সৃষ্ট যন্ত্র ও বিজ্ঞানকে উদার সংবেদনশীল মানবিক হৃদয় নিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের ও মানব-জীবনের সুখ-শান্তি ও আনন্দের উৎসগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করে চালনা করবে। রাসেল তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে বলেছেনঃ

"Without such understanding, we may inadvertently create a new prison, just perhaps since none will be outside it, but dreary, joyless and spiritually dead."



ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক : নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

এবার 'কে' আগের থেকেও গলার পর্দা চড়ালো। 'না তুমি আমার সঙ্গে এস।' সে যেন আদালত পরিচারককে ভুলে আঁকড়ে ধরতে চায়।

'ওভাবে চীৎকার করবেন না।' ফিস ফিস করে আদালত পরিচারক বলল। 'এখানে চারিদিকেই দপ্তরখানা। আপনি যদি একা যেতে না চান তবে আমার সঙ্গে আরো একটু আসুন। আমার খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। পরে আমি বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'না, না।' 'কে' বলল। 'আমি আর দেরী করতে পারব না। তোমাকে খবর দিতে হবে না। তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।' 'কে' এতক্ষণ তার চারিপাশে তাকায়নি। তারপর যখন অনেকগুলি দরজার মধ্যে একটা কাঠের দরজা খুলে গেল, তখন সে মাথা ফেরালো। একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল। 'কে'র চীৎকার নিশ্চয়ই সে শুনতে পেয়েছে। 'ভদ্রলোকটি কি চান?' মেয়েটির পেছনে অনেকটা জায়গা। 'কে' আরও দেখল একটি পুরুষ সেই আধো-আলোয় মেয়েটির কাছে এগিয়ে আসছে। 'কে' আদালত পরিচারকের দিকে তাকালো। সে বলেছিল, তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু ইতোমধ্যে দুজন লোক তার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করছে। আর অন্যান্য কর্মচারীরা আবার এখানে এসে হাজির না হয়। ওখানে আসার জন্য আবার যেন তার কাছ থেকে কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না করে বসে। সে এসবের একমাত্র উত্তর এই দিতে পারে যে, সে একজন আসামী। তাই সে তার সওয়ালের পরবর্তী তারিখ জানতে এসেছে। একথায় কিন্তু তার মন ভরে উঠল না। কারণ ওটা সত্য নয়। সে সেখানে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এসেছিল। সে বেশ বুঝল আইন বিভাগের ভেতরটাও বাইরের মতই নাক্কারজনক। বাস্তবিক তার মনে হল, অন্য কোনো বিষয়ে খোঁজখবর নেবার আর তার কোনো দরকার নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে যা দেখেছে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কোনো নতুন কর্মচারীর মুখোমুখি হবার মত আর এখন তার মনের অবস্থা নয়। তাদের যে-কেউ ওই অনেক দরজার পেছনে থেকে সহজেই আবির্ভূত হতে পারে। সে এখন কেবল পরিচারকটির সঙ্গে ও-জায়গা থেকে চলে যেতে চায়। যদি দরকার হয়, একাই।

কিন্তু এমন নীরবতা নিশ্চয়ই 'কে'কে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। মেয়েটি এবং আদালত-পরিচারক তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা যেন পরমুহূর্তেই 'কে'র এমন নিশ্চুপ ভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন ঘটবে আশা করছে। আর এই পরিবর্তন তারা দেখতে চায়। যাতায়াতের পথের শেষপ্রান্তে 'কে 'একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখল। যাকে সে এর আগেও দূরে দাঁড়ানো দেখেছে। সে নীচু দরজার আড়াআড়ি ফ্রেমটা ধরে পায়ের পাতার ওপর ভর করে আস্তে আস্তে দুলছে। সেও যেন একজন উৎসাহী দর্শক। কিন্তু এদের সবার মধ্যে মেয়েটিই এই প্রথম লক্ষ্য করল, 'কে'র এমন নির্বাক আচরণ তার সাময়িক মূর্ছনার অনুভূতির জন্য; সে একখানা চেয়ার এগিয়ে এনে বলল:

'আপনি বসবেন না?'

সঙ্গে সঙ্গেই 'কে' চেয়ারটায় বসে পড়ল। চেয়ারের হাতলের ওপর সে তার হাটু ভেঙ্গে রাখল। সে যেন আরো নিশ্চিন্ত হতে চায়। আরো। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল:

'আপনি বোধহয় বেশ ক্লান্তি বোধ করছেন, তাই না?' মেয়েটির মুখ 'কে'র মুখের অতি ঘনিষ্ট হল। তার চোখে সেই কঠিন দৃষ্টি। যা প্রত্যেক মেয়ের চোখে থাকে, তাদের প্রারম্ভ যৌবনে। 'আপনি ভয় পাবেন না। এমন অবস্থা এখানে স্বাভাবিক। যে-কোনো লোক প্রথম এখানে এলেই এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনিও বোধহয় এই প্রথম আসছেন। বেশ, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছাদের ওপর এখন প্রখর সূর্যের আগুন, সিলিং বেশ গরম। বাতাস তাই কেমন ভাপসা ও ভারী হয়ে উঠেছে। এই সব অবস্থা এ জায়গাটিকে অফিসের উপযুক্ত হতে দেয়নি। যদিও এ-ছাড়া অনেক সুবিধে আছে এখানে। যেদিন এখানে বেশী লোকের সওয়াল হয়। অনেক মক্কেল যখন এখানে আসে তখন এখানকার বাতাস শ্বাস প্রশ্বাস নেবারও অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। আপনি আরো অনেক কিছু দেখতে পাবেন। নানারকমের কাপড়চোপড় এখানে কেচে শুখেতে দেওয়া হয়। আপনি এখানকার ভাড়াটেদের কোনোভাবেই এ-সব ময়লা কাপড়-চোপড় মেলা থেকে নিরস্ত করতে পারবেন না। তাই আপনি যদি একটু অজ্ঞান হয়ে যান, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কয়েকদিন আসা যাওয়ার পর এ-সব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়। তখন আর অজ্ঞান হবার ভয় থাকে না। একবার কি দু'বার এখানে এলে আপনিও বুঝতে পারবেন, এখানকার সবকিছুতেই স্বৈরাচার। এখন কি একটু সুস্থ বোধ করছেন?'

'কে' মেয়েটির এত কথার কোনো জবাব দিল না। অত্যন্ত বেদনা এবং লজ্জার সঙ্গে উপলব্ধি করল, সাময়িক দুর্বলতার ফলে নিজেকে এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে কি ভুলই না করেছে। এমনকি এখন, অজ্ঞান হবার কারণ জানা সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র সুস্থ বোধ করছে না। পরন্তু আরো যেন অসুস্থ। মেয়েটি এ অবস্থা লক্ষ্য করল। তাড়াতাড়ি দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে দেয়ালে লাগানো হুকের মত কি একটা টানলো। 'কে'র ঠিক মাথার ওপরে স্কাইলাইটটা খুলে গেল। নতুন বাতাস এলো। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে কালো কালো এমন ধুলো আসতে লাগলো যে, মেয়েটি আবার তা বন্ধ করে দিল। 'কে'র ধুলোভরা হাতটা সে রুমাল দিয়ে মুছে দেয় তারপর। এ-সব লক্ষ্য করবার মত 'কে'র কোনো অবস্থা নেই। যতক্ষণ না সে চেতনায় ফিরে আসতে পারে, উঠে ওখান থেকে চলে যাবার মত যথেষ্ট শক্তি ফিরে না পায়, ততক্ষণ সে চেয়েছিল সেখানে চুপ করে বসে থাকতে। তবু তার মনে হয়, ওখানকার লোকগুলো সম্পর্কে সে যত বেশী বিরক্ত হবে, ততই তার সম্বিৎ ফিরবে তাড়াতাড়ি। মেয়েটি এবার বলল:

'আপনি এখানে আর বসবেন না। আমাদের জন্য এখানকার কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে।' 'কে' চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে আনল। ভাবল কিসের ব্যাঘাত কেমনভাবে তারা করবে। 'আপনাকে আমি 'সিক-রুমে' নিয়ে যেতে পারি। আপনি যদি তাই চান তবে আমার হাত ধরুন।' দরজায় দাঁড়ানো লোকটিকে সে ডাকলো। সে তৎক্ষণাৎ সেখানে এলো। কিন্তু 'কে'র 'সিক-রুমে' যাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। বারে বারেই তার মনে হতে লাগল, যতই তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে, ততই তার অবস্থা আরো, আরো খারাপ হবে।

'আমি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি। এবার আমি চলে যেতে পারব,' এই বলে 'কে' অমন আরাম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারটার আরাম এত বেশী তার মনে হয়েছিল যে, উঠে

দাঁড়াতেই তার পা' দুটো একবার টলে উঠল। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সে।

'আমি দাঁড়াতে পারছি না।' মাথা নেড়ে 'কে' বলল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সে বসে পড়ল। আদালত-পরিচারকটির কথা তার মনে পড়ল। সে তাকে ওখান থেকে সহজেই নিয়ে যেতে পারে। যদিও সে দুর্বল। কিন্তু অনেক আগেই সে ওখান থেকে সরে পড়েছে। মেয়েটি ও লোকটির মধ্য দিয়ে একবার 'কে' তার চোখ চালিয়ে দিল; কিন্তু কোথায়! আদালত-পরিচারকের টিকিরও পাত্তা নেই।

'আমার মনে হয়,' লোকটি বলল। 'ভদ্রলোকটির অজ্ঞান হওয়ার কারণ হল, এখানকার আবহাওয়া। তাই 'সিক-রুমে' নিয়ে গেলে তিনি সুস্থ বোধ করবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি তাকে এখান থেকে, এই বিভিন্ন দপ্তরের আওতা থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়।' লোকটির পোষাক বেশ চৌকশ। একটি উজ্জ্বল ধূসর বর্ণ ওয়েস্টকোট তার গায়ে। কোমরের কাছে তার প্রান্ত দুটো ত্রিশূলের মত। লোকটির কথায় 'কে' চীৎকার করে উঠল। তার কথাটা যেন লুফে নিল। 'ঠিক তাই।' আনন্দের আতিশয্যে সে যেন লোকটির কথায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল। 'হাঁ, ঠিক তাই। আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেই আমি সুস্থ বোধ করবো। আমি নিশ্চিত, আমি মোটেও দুর্বল নই। আমি আপনাদের কাউকে বেশী কষ্ট দেব না। শুধু একজনের কাঁধে হাত রেখে আমি দরজা পর্যন্ত যেতে চাই। সেখানে সিঁড়ির ওপর খানিকক্ষণ বসে আবার আমি চলে যাবার মত শক্তি পাব, আমি ঠিক বলছি তখন আর আমার একটুও কষ্ট হবে না! একটুও না। কারণ, এ ধরণের অসুখ এই আমার প্রথম। এর আগে আর কখনো আমার এমন অসুখে হয়নি। তাই আমি অবাক হচ্ছি। আমিও একজন অফিসার। কিন্তু বলতে কি, এ ধরণের আবহাওয়া আমার ওখানে নেই। আর আপনিও সে কথাই বলেছেন। তাই অনুগ্রহ করে আপনি কি আমায় একটু সাহায্য করবেন? আপনার কাঁধে ভর করে আমি পথটুকু পার হব। আমি ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছি। আর উঠে দাঁড়াতে গেলেই যেন কি-রকম মাথা ঘুরছে।' 'কে' তার কাঁধ ওঠালো। যাতে অপর দুজন সহজেই তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

লোকটি তবু 'কে'-র অনুরোধে হাত বাড়িয়ে দিল না। যেমন ছিল, ঠিক তেমনই পকেটের মধ্যে তার হাত থাকল। জোরে জোরে হেসে সে মেয়েটিকে বলল ঃ 'দেখলেন ত' আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। ভদ্রলোকটির যত অসুস্থতা, যত অসুবিধা সব এখানেই। অন্য কোথাও গেলে আর তিনি কোন অসুবিধে বোধ করবেন না। একথায় মেয়েটিও ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসল। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব আস্তে লোকটির হাতের ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দিল। যেন সে বলতে চায়, 'কে'-র এমন অবস্থায় ওরকমভাবে কিছু বলা উচিত নয়।

'কিন্তু শুনুন', লোকটি বলল। তখনো সে হাসছে। 'আমি কিন্তু ভদ্রলোকটিকে দরজাটি দেখিয়ে দেব।'

'বেশ তাই হবে।' মেয়েটি তার সুন্দর মাথাটা দুলিয়ে জবাব দেয়। 'কে'-কে তারপর বললঃ 'ও'র হাসিতে আপনি কিছু মনে করবেন না।' 'কে'-র চোখে তখনো সেই শূন্য দৃষ্টি, বিষাদে ম্লান। বাইরে থেকে মনে হয় কোন কথাই যেন তাকে ছুঁয়ে যেতে পারে নি। 'আপনাকে কি আমি এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি?' (সম্মতির ইঙ্গিতে লোকটি তার হাত দোলালো।) বেশ। এই ভদ্রলোকটি আমাদের অনুসন্ধান বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের এখানকার আইনকানুন সাধারণ লোক খুব ভালভাবে জানে না। তাই অনেক খবরের তাদের দরকার হয়। বিভিন্ন আসামী বা মক্কেলের কোন খোঁজ নেবার প্রয়োজন হলে ইনি-ই তা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্যই তার উত্তর ঠিক করা আছে। আপনার কিছু দরকার হলে আপনি এ'কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন; কিন্তু এগুলিই তার সমস্ত পরিচয় নয়। তার পোষাকবৈশিষ্ট্য হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আমরা ঠিক করেছি অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীকে বেশ কেতাদুরস্ত থাকতে হবে। কারণ তার সব সময়েই বিভিন্ন ধরণের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। প্রাথমিক ধারণা যাতে অনুকূল হয়, তাই এমন ব্যবস্থা। আমাদের এখানকার বাকী সকলে অত্যন্ত সাধারণ ও পুরণো ফ্যাসানের পোষাক পড়ে। আপনি নিশ্চয়ই আমার পোষাক থেকে তা অনুমান করতে পারছেন। পোষাকের জন্য বেশী অর্থব্যয়ের আমরা পক্ষপাতী নই। কারণ আমরা কদাচিৎ দপ্তরের বাইরে যাই। আমরা এখানেই থাকি। এমন কি ঘুমুই পর্যন্ত। কিন্তু আগেই বলেছি, ও'র পোষাক বেশ ভাল হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এসব বিষয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষের মনোভাব বড় অদ্ভুত। তারা কোন পোষাক কিনে দিতে রাজী নয়। আমরা তাই নিজেরাই চাঁদা তুলি, অনেক মক্কেলও এ ব্যাপারে চাঁদা দিয়েছেন। ও'র জন্য এই সুন্দর পোষাকটি এবং এছাড়া অন্য কয়েকটি পোষাক তৈরী করিয়ে দিয়েছি। এখন সাধারণ লোকের মনে ভাল ধারণার সৃষ্টি করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এমনভাবে হেসেই সব মাটি করে দেন উনি। তাই কেউ সহজে তাঁর কাছে ভিড়তে চায় না।'

'উঃ, এত বক্তৃতা।' লোকটি ঠাট্টার সুরে বলল। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ফ্রাউলিন, আমাদের এই সমস্ত গোপন বিষয়গুলো আপনি এই ভদ্রলোকটিকে বলতে গেলেন কেন? আর এসব বোধ হয় জানতেও তিনি চান না। ও'র দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি নিশ্চই তাঁর নিজের কথা ভাবতে বেশী ব্যস্ত।'

লোকটির একথার উপযুক্ত কোন জবাব দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও 'কে' অনুভব করল না। তার মনে হল, মেয়েটির সদিচ্ছা আছে। কথায় কথায় সে তাকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবে পন্থাটা যথোচিত নয়।

'আপনার হাসির ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবার দরকার ছিল। এভাবে হাসাটা অপমানকর।' মেয়েটি বলল।

'আমার মনে হয়, তাকে যদি এখান থেকে আমি অন্য কোথাও নিয়ে যাই। সে এর চেয়ে অনেক বেশী অপমান সহ্য করতে রাজী হবে।'

'কে' এবারেও কিছু বলল না। তাদের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। 'কে' যেন একটা অচেতন পদার্থ। তাই তাকে নিয়ে কথা বলাবলি হলেও তার কিছু করবার নেই। তবু 'কে' এই অবস্থাটাই পছন্দ করে নিল। তারপর হঠাৎ সে অনুভব করল, তার এক হাতে নীচে লোকটির হাত, অন্যটির নীচে মেয়েটির। লোকটি বললঃ 'উঠুন।'

আনন্দে বিস্মিত হয়ে 'কে' বললঃ 'আপনাদের অনেক, অনেক ধন্যবাদ।' এবার 'কে' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। শরীরের যেসব জায়গায় তখনো দুর্বলতার ঘোর কাটে নি, সেখানে সে তাদের হাত টেনে আনল। তারা বারান্দায় যাবার রাস্তার দিকে আসছিল। মেয়েটি 'কে'-র কানের কাছে মুখ নিয়ে নরম গলায় বলল ঃ

'আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন, অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারী সম্পর্কে আমি খাঁটি কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম। তবে সে হৃদয়হীন নয়। এখান থেকে অসুস্থ কোন লোককে তার বাইরে নিয়ে যাবার কোন কাজ সে করে না, তবুও দেখুন সে আপনাকে সাহায্য করছে। সম্ভবত আমাদের মধ্যে কারো হৃদয়ই কঠিন নয়। অপরকে সাহায্য করতে পারলেই আমরা সুখী হই। আদালতের কর্মচারী হিসেবে কাউকে কোন সাহায্য না করে চেহারায় বেশ কাঠখোট্টাভাব আনতে পারি। কিন্তু তা আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তকর মনে হয়।'

'আপনি কি এখানে একটু বসবেন?' অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীটি বলল। তারা এতক্ষণে বড় লবীতে এসে পৌঁছেছে। প্রথম যে আসামীর সঙ্গে 'কে' কথা বলেছিল, সে এখন ঠিক তারই বিপরীত দিকে। এভাবে সামনে পড়ে 'কে' অসম্ভব লজ্জা পাচ্ছিল। সে প্রথম এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, তাকে ঠিক করে বসাতে দুজন লোকের দরকার

হয়েছিল। আঙুলের ডগায় তার টুপিটা নিয়ে অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীটি ভারসাম্য পরীক্ষা করছিল। 'কে'র চুল অবিন্যস্ত। তার ঘর্মাক্ত কপালে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আসামীটি যেন এসব কিছুই লক্ষ্য করছে না। বিনীতভাবে অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীর সামনে উঠে দাঁড়াল। (ইতিমধ্যেই সে একবার তাকে দেখেছে) সে তার উপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। 'আমি জানি,' সে বলল। 'আমার এফিডেভিট সম্পর্কে কোন সিধান্ত আজ জানান হবে না। তবু আমি এসেছি, কারণ আমার অনেক সময়। এমন কি রবিবারেও আসতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। আর এখানে আমি কারো কাজে কোন অসুবিধা করি না।'

'আপনার এত লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।' অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীটি বলল। 'আপনি এভাবে কথা বলায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এখানে আপনি একটা ঘর দখল করে আছেন সত্য, কিন্তু আমার কাজের কোন অসুবিধা না হলে আপনার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমি চেষ্টা করব। এখানে অনেকেই তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অদ্ভুতরকম উদাসীন। আপনার কাছ থেকে তাদের ধৈর্যের অনুশীলন শিক্ষা করা উচিত। আপনি এখানে বসতে পারেন।'

আসামী বা মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলার কায়দা সে কি চমৎকার আয়ত্ত করেছে। ফিস ফিস করে মেয়েটি বলল। 'কে' সম্মতিতে ঘাড় নাড়ে। আবার অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীটি জিজ্ঞাসা করলঃ 'আপনি কি এখানে একটু বসবেন?' —'না'। কেমন যেন ক্ষেপে গিয়ে 'কে' বলল। 'না, আমি একটুও বিশ্রাম চাই না।' তার কথায় মনে হয় সে যেন তার বিশ্রাম করা, না-করা সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ যদি সে বসতে পেত, তবে খুসীই হত। কে তার অবস্থার সঙ্গে এক জাহাজ যাত্রীর তুলনা করে তার মনে হয় সে 'সমুদ্র-রুগ্ন।' ঢেউমুখর সমুদ্রে সে এক জাহাজে। তার চারপাশে কাঠের দেয়ালে সমুদ্রের ঢেউ যেন গর্জনে ভেঙ্গে পড়ছে। যাতায়াতের পথটির শেষ প্রান্ত থেকে আসছে এ ঢেউ। পথটি জাহাজের মতই হেলে-দুলে পড়ছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে দুলছে দুপাশের অপেক্ষমান মক্কেল ও আসামীরা। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে ছেলেটি আর মেয়েটিই যেন এক বৈষম্য। তারা তার নির্ভর। সে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়, এক খণ্ড কাঠের মত সে চুপ করে পড়ে যাবে। তারা তাদের ছোট ছোট চোখ দিয়ে তার চারদিকে দৃষ্টির পাহারা বসিয়েছে। তারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। 'ক' অনুভব করে সে-ও পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই। তাকে যেন অন্য কেউ বয়ে নিয়ে চলেছে। অবশেষে সে বুঝতে পারল, তারা তার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের কথা ধরতে পারল না। তার কানে ঐ জায়গায় এক গোলমালের সুর ছাড়া আর কিছুই আসছিল না। সাইরেনের আওয়াজের মত যেন এক তীক্ষ্ম সুর সেই গোলমাল থেকে ভেসে আসছে।

'জোরে বলুন।' নোয়ানো মাথায় ফিস ফিস করে 'কে' বলল। কথাটা বলেই সে লজ্জা অনুভব করে। কারণ তারা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল, যদিও সে তা বুঝতে পারছে না। তারপর হঠাৎ তার সামনের দেয়ালটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। অবশেষে তার জন্যই যেন এক ঝাপ্টা নতুন বাতাসের বন্যা সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। সে তার কাছে কেউ কথা বলছে শুনতে পেল। প্রথমে সকলেই যেতে চায়। কিন্তু দরজা খোলার পর নড়বার বিন্দুমাত্র লক্ষণও দেখা যায় না। 'কে ফিরে দেখল মেয়েটি তার সামনে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ এক মুহূর্তে 'কে' যেন তার সমস্ত চেতনা, সমস্ত সামর্থ্য ফিরে পেল। বিন্দুমাত্র দেরী না করে সে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে সে সিঁড়িতে পা বাড়ায়। সেখান থেকে সে তার গাড়ির কন্ডাক্টারদের বিদায় জানাল। তারা মাথা নামিয়ে তা গ্রহণ করল। 'অনেক ধন্যবাদ।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারেই একথা বলল, তারপর আবার তাদের সঙ্গে সে করমর্দন করে। যখন সে বুঝতে পারল, তারা ওই খোলা হাওয়া সহ্য করতে পারছে না, তখন তাদের যেতে দিল। 'কে'-র মনে হল, সে যেমন অফিসের আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত নয়, এরাও তেমনি এই খোলা জায়গার বাতাস সহ্য করতে পারে না। অসুস্থবোধ করে। তারা তার কথার কোন উত্তর দিতে পারছিল না। আর একটু হলে মেয়েটি হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। যদি 'কে' ইতিমধ্যে দ্রুততার সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে না দিত। তবু দরজা বন্ধ করে দেবার পর 'কে' সেখানে একটুক্ষণ দাঁড়াল। পকেট আয়নার সাহায্যে সে তার চুলগুলো পরিপাটি করে সিঁড়ির ওপর থেকে তার টুপিটা তুলে নিল। যাবার সময় বোধ হয় অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীটি টুপিটা ওভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর সে এত জোরে জোরে সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করল যে, তার প্রতিক্রিয়া দেখে ভয় হয়। তার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, এমন অভিনব অভিজ্ঞতা আর কখনো লাভ করে নি। এক পুরনো ধাঁচের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে তার দেহ কি এতক্ষণ বিপ্লব-প্রয়াসী ছিল? 'কে' একবার পরামর্শ করবার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ভাবল। তারপর ঠিক করল, সে নিজেই সব কিছু স্থির করবে। ভেবে বার করবে রবিবারের এমন দিনের বাকীটুকু কিভাবে, আরো ভালোভাবে কাটানো যায়।

ক্রমশঃ



স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৬

যে অঘটনঘটনকুশল দৈব পথের জনতা থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে ঝামাপুকুর লেনের সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীত-আসরের পীঠস্থানেই এক রূপান্তরিত আসরে সর্বপ্রধান ভূমিকায় স্থাপিত করেছিল, সেই অভিন্ন দৈবই সেদিনের তারিখটিও বেঁধে দিয়েছিল অস্টমাক্ষর যতির সহজ পয়ার ছন্দে। সাধারণ লোকরঞ্জনের অনভিপ্রেত কোনো এক প্রাচীন কবিতা থেকে দুটি পদ উদ্ধৃত করলে সে কথা প্রতীয়মান হবে,—

চিরদিন সেই দিন রহিবে স্মরণ,
তেরশ' এগার সাল তেইশে শ্রাবণ।

'স্মৃতিকথায়' ব্যবহৃত তারিখগুলির নির্ভুলতা সম্বন্ধে আমি সব সময়ে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনে এমন ধরণের কথা স্মৃতিকথার ভূমিকা-অংশে বলেছি। ছন্দ ও মিলের কঠিন সূত্রে গ্রথিত তেরশ' সালের এই তেইশে শ্রাবণ তারিখটি আমি কিন্তু অসংশয়িত-চিত্তে ঐতিহাসিককে উপহার দিতে পারি। কিন্তু এক নগণ্য ব্যক্তির তুচ্ছ জীবনের সামান্য একটা তারিখের উপহার ইতিহাসের কোন্ কাজেই বা লাগবে? তবে নাকি ঐতিহাসিকেরা তারিখ নিয়ে ভেলকি খেলতেও পারেন। সামান্য ঘটনার তারিখও তাঁরা সময়ে সময়ে অসামান্য ঘটনার প্রমাণ অথবা অপ্রমাণের কাজে ব্যবহার করে থাকেন। মিথ্যার অতি-স্ফীত রঙচঙে বেলুনকে সত্যের একটা কঠিন আলপিন দিয়ে চুপসে দিতেও সময়ে সময়ে তাঁদের দেখা যায়।

যে সময়ে আমরা কৌমার অবস্থার বেড়া ডিঙিয়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, রোমান্টিক যুগ তখনো সম্পূর্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করেনি; তখনো সে-বেচারা দূরে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে যাই-যাই করছিল। একটা অতি-অবাস্তব বাস্তবপ্রিয়তা দৈত্যের ন্যায় আবির্ভূত হয়ে তখনো তাকে গলায় হাত দিয়ে দেশান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি। চন্দ্রকিরণ এবং মলয় সমীরণকে কাব্যজগতে অপাংক্তেয় করে দিয়ে চিমনির ধোঁয়া এবং কাঁকড়ার খোলার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হতে তখনো কিছু বিলম্ব ছিল।

বিবাহ ক্ষেত্রেও তখন কতকটা একই ধরণের অবস্থা। বিবাহের দিনে বরেরা ব্যান্ড বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে, চতুর্দোলায় চড়ে বিয়ে করতে যায়। তাদের অঙ্গের চুমকি-জরির শিল্পকার্যখচিত রক্তবর্ণ মখমলের কাটা পোষাক ও নকল মুক্তার মালাশোভিত মাথার উষ্ণীষ দেখে মনেই হয় না, তারা বাঙলা দেশের বাঙালী বর, যাদের স্কুল-কলেজ অথবা অফিস-আদালতের সহিত কোন প্রকার সংস্রব থাকা সম্ভব। মনে হয়, সুদূর পাঞ্জাব অথবা রাজপুতানার কোন যুবরাজ বাঙলা দেশের কন্যাকে বিবাহ করবার অভিপ্রায়ে শোভাযাত্রা সহকারে কন্যা গৃহাভিমুখে চলেছে। চতুর্দোলার উপর বরের দুই পার্শ্বে দুই নর্তকীবেশসজ্জিত বালক লীলায়িতভাবে চামর ঢোলাচ্ছে; আর, পিছন দিক হতে যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে ঐরূপ অপর এক বালিকা-বালক ধীরে ধীরে ব্যজন করছে, যাতে-না যুবরাজের বরচন্দনের তিলকাঙ্কন ঘর্মাক্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কখনো সখনো বরের দক্ষিণ হস্তে তরবারিও দেখা যেত। তবে কোষের মধ্যে সব সময়ে যে তরবারি থাকত, সে কথা হলফ নিয়ে বলা যায় না।

আমাদের যুগ ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের যুগ। আড়ম্বর ও অবান্তরের ভার থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে সহজ ও সরল করে নিয়ে সুন্দর করা ছিল আমাদের অন্যতম আদর্শ। সুতরাং, চুমকি-জরিশোভিত লাল মখমলের কাটা পোষাকের স্বারা দেহকে লাঞ্ছিত করবার আমি যে ঘোরতর বিরোধী ছিলাম সে কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাই তার সুদূরতম সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা মাত্র বিদ্রোহের লাল পতাকা ওড়ালাম। কাটা পোষাক পরে যাত্রার দলের নকল রাজকুমার সেজে জীবনের একটা গুরুতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব না, সে কথার মধ্যে সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না। একটা প্রবল অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে কাটা পোষক থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলাম বটে, কিন্তু যে সন্ধির মধ্য দিয়ে সমর্থ হলাম, তার খাতিরেই খানিকটা আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হলাম। সন্ধি মাত্রেরই ভিত্তি হচ্ছে 'নাও এবং দাও' নীতি। সুতরাং আমাকেও দিতে হল শোভাযাত্রায় সম্মতি। তবে শোভাযাত্রাতেও একটা রফার মতো হল; বাদ পড়ল চতুর্দোলা, তৎপরিবর্তে স্বীকার পেতে হল জুড়ি গাড়িতে। তবে মাছের অভাবে মাছের ঝোলের যেমন অর্থ হয় না, তেমনি কাটা পোষাকের অভাবে চতুর্দোলারও বিশেষ কোনো অর্থ ছিল না। সুতরাং, চতুর্দোলা বাদ দেওয়ানোতে আমাকে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয়নি।

সুদীর্ঘ ছেচল্লিশ বৎসর অতীতের কথা। বৃহদাকার দুই ওয়েলার ঘোড়াবাহিত প্রকাণ্ড এক ল্যান্ডো গাড়ীর উপর মিতবর সহ সমাসীন হয়ে, ব্যান্ড ও ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে, দক্ষিণে ও বামে দুই পার্শ্বে ও সম্মুখের তোরণে অ্যাসেটিলিন গ্যাসের শত শত উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়ে, পশ্চাতে এক সার ফিটন্ গাড়িতে আরূঢ় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাত্র-মিত্রের স্বারা অনুসৃত হয়ে ভবানীপুর থেকে রওনা হওয়া গেল মাইল চারেক দূরবর্তী ঝামাপুকুরের পথে। গতিলাভোৎসুক কিন্তু আকৃষ্ট বল্গা অশ্বদ্বয়ের অধীরোদ্যত পদক্ষেপের শব্দে রাজপথ মুহূর্মুহু চকিত হয়ে উঠছে। ফুটপাথে ফুটপাথে সমুৎসুক দর্শকের ভিড়; পথপার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নসমূহে পুরসুন্দরীদের জনতা। তাঁদের মধ্যে কোনো রমণী, অজ ও ইন্দুমতীর বিবাহের পর শোভাযাত্রা কালের ন্যায়, তাঁর প্রসাধিকার হাত থেকে অর্ধেক অলক্তকরঞ্জিত পদ টেনে নিয়ে 'উৎসৃষ্টলীলাগতি' হয়ে গবাক্ষ পর্যন্ত সমস্ত পথ কাঁচা আলতার স্বারা রঞ্জিত করতে করতে ছুটে এসেছিলেন কিনা বলতে পারিনে; কিন্তু অনেকেই যে 'তক্তানাকার্যা' হয়ে সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে বাতায়ন দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

সেদিন ঐরূপ বিচিত্র ও অনভ্যস্থ অবস্থার কেন্দ্রস্থলে নিজেকে স্থাপিত দেখে মনের গতি কিরূপ হয়েছিল, তা ঠিক স্মরণ হয় না; আজকাল কিন্তু সেদিনকার উদ্ভট অভিযানের কথা চিন্তা করে মনের মধ্যে শুধু লজ্জাই বোধ করিনে, বেশ একটু সপুলক কৌতুক রসও অনুভব করি। তবে একথাও সত্য যে, আজকের দিনে যে কথা মনে করে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়, ছেচল্লিশ বৎসর পূর্বের পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে তাই হয়ত শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। দশ ভরি স্বর্ণের যে চন্দ্রহার আজ নারীগণের নিকট কুরুচির পরিচায়ক বলে নিন্দিত, ষাট বৎসর পূর্বে সেই চন্দ্রহারই হয়ত তাঁদের নিকট গর্ব এবং ঈর্ষার সামগ্রী বলে পরিগণিত হত।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অভিযান শেষ হল। গাড়ি এসে দাঁড়াল সঙ্গীতস্মৃতিবিজড়িত পূর্বপরিচিত বাড়ীর স্বারদেশে।

চতুর্দোলার দিন গত হয়েছে; জুড়ি,

চৌঘুড়িও আজকাল আর দেখা যায় না। এখন বর আসে মোটর গাড়ি চড়ে। স্থলযানের মধ্যে মোটরকার আধুনিকতম হলেও মধ্যযুগের সংস্কার ও প্রভাব থেকে সে নিজেকে ষোল আনা মুক্ত করতে পারেনি। বিবাহের রাত্রে পত্র-পুষ্প দিয়ে সে নিজেকে সজ্জিত করে, কখনো বা কঞ্চি-বাখারি-লতাপাতা-পুষ্পের সাহায্যে নিজের দেহকে রূপান্তরিত করে ময়ূরপঙ্খী অথবা রাজহংসের আকারে, তার সর্বাঙ্গ বেষ্টিত করে বৈদ্যুতিক আলোর মালা জ্বালায়। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মূল্যবান মোটরকার, তার অন্তরের মধ্যে পরাক্রান্ত দৈত্যের মতো শক্তিশালী এঞ্জিন, প্রতি ঘণ্টায় সে অবলীলাক্রমে সত্তর-পচাত্তর মাইল দৌড় দিতে সক্ষম। কিন্তু তবু যেন তার মধ্যে সেই প্রাণবত্তা সেই মহিমা নেই, যা থাক্‌ত চার-পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জুড়ি গাড়ির মধ্যে। কন্যাগৃহের দ্বারদেশে এসে জুড়ি গাড়ি দাঁড়াত; অশ্বযুগলের রাশ টেনে ধরে তকমা-উর্দি-পাতলুন-পাগড়ির দ্বারা সুসজ্জিত কোচমান পিছন দিকে হেলে পড়ত; তথাপি বেগবান তেজস্বী অশ্বদ্বয়ের অস্থিরতার দাপটে গাড়ি আগুপাছু ঈষৎ হেলতে-দুলতে থাকত; তারই মধ্যে সন্তর্পণে বরকে নামিয়ে নিতে হত।

আজকাল কন্যাগৃহের সম্মুখে মূল্যবান মোটরকার এসে দাঁড়ায়। চাবি টিপে এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে শোফার তাকে একেবারে নিষ্প্রাণ জড়পদার্থে পরিণত করে। তার না থাকে ক্ষুরাঘাতের শব্দ, না পাওয় যায় তার হ্রেম্বার ধ্বনি। সেই নিঃশব্দ নিস্তেজ মোটার হতে যে বর অবতরণ করে, তারও কতকটা সেই একই অবস্থা। যা-কিছু উত্তেজনার হেতু, অথবা আনন্দের কারণ পূর্বাহ্ণেই তা চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে আজ বেচারা এসেছে কন্ধে জোয়াল ধারণ করতে। আজ থেকে দায়িত্বের গুরুভার শকট টানাই তার প্রধান কর্তব্য হবে। এতদিন বিনা টিকিটে যা আনন্দ উপভোগ করে এসেছে, আজ তার মাশুল চোকাবার পালা। এখন থেকে তার পাওনা বড় বেশি কিছু আর রইল না, দিতে হবে কিন্তু অনেক কিছু। দরজির বিল, শাড়ি-ব্লাউসের মূল্য, সিনেমার টিকিট, সাবান-পাউডার-সেন্ট-ব্রুমের চাহিদা,—সব কিছুর জন্য এখন থেকে তাকে ঘোরাতে হবে নিজের বাক্সের চাবি।

বিবাহের দিন-দুই পরে ফুলশয্যা নামে একটা অনুষ্ঠান আছে। আজকাল ফুল আছে, শয্যাও আছে,—কিন্তু ফুলশয্যা নেই। সে বস্তু শেষ হয়ে গেছে চতুর্দোলা এবং জুড়ি গাড়ির বরদের আমলে। অদেখাকে দেখবার আনন্দ, অজানাকে জানবার কৌতূহল, অপরিচিতকে পরিচিত করবার উত্তেজনা আজকালকার ফুলশয্যার কক্ষে অপরিজ্ঞাত সামগ্রী।

সেই জন্য এখনও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে আত্মীয়-স্বজনের দৌত্যের ফলে যে বিবাহ, সেই বিবাহই উৎকৃষ্টতম বিবাহ। কারণ, সে বিবাহে, ইঁট, চুণ এবং সুরকিরূপে, প্রেম পরিচয় এবং দায়িত্বজ্ঞান যুগপৎ ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ লাভ করে যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ হয়, তার উপর নির্মিত হতে পারে দাম্পত্য-জীবনের নির্ভরযোগ্য সৌধ। ইয়োরোপের School of Wisdom-এর প্রেসিডেন্ট Count Hermann Keyserlingও কতকটা এই ভাবের মত পোষণ করেন। তাঁর লিখিত একটি পুস্তকে তিনি বলেছেন, "Marriages arranged by experienced relatives are usually happier than love marriages."

তা তিনি যাই বলুন না কেন, স্মৃতি-কথা লিখতে বসে তত্ত্বকথা আর বেশি বাড়িয়ে কাজ নেই। তেরশ এগার সাল তেইশে শ্রাবণ তারিখে রচিত একটি কবিতা এখানে প্রকাশ করে বর্তমান অধ্যায়ের শেষ করি। কোনো কবিতার খাতার ছিন্নপত্ররূপে কবিতাটি দীর্ঘকাল একটি বাক্সর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে বাস করছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পুরাতন কাগজপত্রর অনুসন্ধানকালে দৈবক্রমে কবিতাটির সন্ধান পাই। কবিতাটি এইরূপ—

অচঞ্চল জীবনের স্বল্প সুখ দুখ
আজিকে হে দয়াময়, হয়েছে বিমুখ
অশান্ত চপল একি তরঙ্গ-আঘাতে!
প্রাতঃকাল হ'তে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হ'তে প্রাতে
যে চাঞ্চল্য বহিতেছি হৃদয়ের মাঝে,
উদ্দাম সংগীত যাহা মর্ম মাঝে বাজে,
নহে তাহা প্রতি দিবসের! একি শ্রান্তি!
একি তীব্র উৎপীড়ন, একি মহাক্রান্তি!
দাও প্রভু, ফিরাইয়া সেই মনোহর
সুখ-দুখ-বিজড়িত দিবস-প্রহর।
সেই শান্ত জীবনের মৃদু স্রোতে ভাসা,
অল্প দুখে কাঁদা, সেই অল্প সুখে হাসা।
এ চাঞ্চল্য জীবনে ত' ভাল লাগে না ক,
এই সুখ দিয়া যদি শান্তি দূরে রাখ!

এ কবিতা সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সেই সুখচঞ্চল দিবসের 'তীব্র উৎপীড়নের' বিরুদ্ধে যে সুতীব্র অস্পৃহা কবিতাটির মধ্যে উচ্ছ্বাসের সহিত ব্যক্ত করা হয়েছে, তার অকপটতা সম্বন্ধে কেউ যদি সন্দেহ করেন, তাহলে হয়ত খুব বেশি আপত্তি করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, উক্ত 'তীব্র উৎপীড়নের' পরিবর্তে পুনরায় 'শান্ত জীবনের মৃদু স্রোতে ভাসাবার' জন্য কবিতাটির মধ্যে 'দয়াময়ের' প্রতি যে সনির্বন্ধ পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল, তৎপ্রতি কর্ণপাত করে 'দয়াময়' নির্দয় হন নি।

১৭

আমার জানত, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিকতম রচনা কি, মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি সর্বদাই বলি, একটি কবিতা। উত্তর শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। কি আশ্চর্য! শরৎচন্দ্রও কবিতা লিখেছিলেন নাকি?

কিন্তু এ কথায় প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই। খ্যাতনামা বহু লেখকের সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখ্‌তে পাই, তাঁদের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কবিতা রচনার দ্বারা। অবশ্য, সময়-মতো তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে গদ্যনারায়ণের সমৃদ্ধতর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন কবিতা-সাধনাকালে আহৃত ছন্দ, লয় এবং ওজন সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, গদ্য-রচনার কালে যা পদে পদে তাঁদের কাজে লেগেছিল। সতর্ক লেখক মাত্রেই অবগত আছেন, গদ্যও একেবারে ছন্দোবর্জিত বস্তু নয়। একটি বাক্য রচনার পর কান যেন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যেন ওজনের কেমন একটু ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। একটু অভি-নিবেশের ফলে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দটি সংযোজিত হওয়া মাত্র পরিপূর্ণতার মহিমায় কান খুশি হয়ে উঠল! এমন অভিজ্ঞতা পাকা প্রবীণ লেখকের নিকটও বিরল নয়।

গদ্য রচনাতে ছন্দ এবং মাত্রা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অতিসূক্ষ্ম চেতনা যে ছিল, ঈষৎ ধৈর্যের সহিত তাঁর কোনো একটা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখলেই তা ধরা পড়ে। এমন অনেকবার দেখা গেছে, সামান্য একটা, হয়ত দুই অক্ষরের, ক্ষুদ্র শব্দকে বাক্যের একই স্থানে বার বার দুবার যোগ করে দুবারই কেটেছেন, তারপর তৃতীয়বার সেই শব্দটিকেই বাক্যের অন্য এক জায়গায় স্থাপন করে তবে নিরস্ত হয়েছেন।

ছন্দ এবং মাত্রা বিষয়ে এই জ্ঞান শরৎ-চন্দ্রের কবিতা রচনার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, এমন কথা অবশ্য আমি বলছিনে; কারণ, আমি তাঁর একটি মাত্র কবিতারই সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে কবিতাটির সন্ধান পেয়েছিলাম সেটি শরৎচন্দ্রের প্রথম চেষ্টার ফল বলেও মনে হয় না। তার মধ্যে শৈশবের অপরিণতির লক্ষণের চেয়ে কৈশোরের কতকটা সুপরিণতিরই লক্ষণ ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং আলোচ্য কবিতাটির রচনা-কালের পূর্বেও শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার বিষয়ে খানিকটা হাত পাকিয়ে-ছিলেন, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে। সংসারে সতত ক্ষয়কর যে শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকে নিঃশব্দ অনিবার গতিতে সমস্ত বস্তুকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, কে বলতে পারে তার কবলে পড়ে যে কবিতাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, এক যে কবিতাগুলির

অস্তিত্ব আমি অনুমান করছি,—সবগুলিই সেই একই ধ্বংসের পথের পথিক হয়নি।

কবিতা রচনার কথা বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের ন্যায় কবিতার অনুরাগী পাঠক খুব বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল যে, পুস্তকের সাহায্য কিছুমাত্র না গ্রহণ করেও নির্ভুলভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। পরলোকগত সুকবি বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শরৎচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে আর রক্ষা থাকত না। অমনি শরৎচন্দ্র বলে উঠতেন, 'এই যে! মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে।' তারপর আরম্ভ হয়ে যেত রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ 'দেবতার গ্রাস' কবিতার নির্ভুল আবৃত্তি। এমন ঘটনা আমি অন্তত বার তিনেক দেখেছি। একবার আমরা কয়েকজনে এক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ফরিদপুরে চলেছি। ট্রেনে একখানা কামরা আমাদের জন্য রিজার্ভড্ ছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখি সুরেনবাবু সর্বাগ্রে এসে জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। আমার মিনিটখানেক পরে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র। কামরার ভিতর প্রবেশ করে সুরেনবাবুকে দেখেই শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বাসের সহিত বলে উঠলেন, 'এই যে! মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে!' তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল,

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি।

জিনিসপত্র গোছানোর হাঙ্গামায় আবৃত্তি বাধা পেলে,—'নৌকা দুটি ঘাটে প্রস্তুত' হবার পরই তা থেমে গেল। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল থেমে গেল সাময়িকভাবে? ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করবার স্পৃহা শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে গোপনে অপেক্ষা করে ছিল। মিনিট কুড়ি-বাইশ পরে গাড়িও ছাড়া,—আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল,—

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।'

এবার কিন্তু অনেক ধীরে ধীরে, অর্থাৎ কতকটা আপনার মনে। আর, বোধহয় সমস্তটাও শেষ হল না, খানিকটা এগিয়ে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মধ্যে আবৃত্তি থেমে গেল। সেদিন কামরায় আমরা পাঁচজন ছিলাম,—শরৎচন্দ্র, হুমায়ুন কবির, লাল মিঞা, সুরেনবাবু এবং আমি।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার, বিশেষত রবীন্দ্র-কাব্যের, কত বড় ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণে একটি ক্ষুদ্র গল্প বলি।

১৯২১ সাল। মাসটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি তখন বিশেষ কোনো কারণে শিবপুরে বাস করছি। প্রিন্স্ অব্ ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে হরতাল হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে আমাদের আমলের সেই প্রথম হরতাল। তার পূর্বে শান্ত সংযত ভিক্টোরিয় যুগ নির্বিবাদে অতিবাহিত হয়েছে। পরিপূর্ণ হরতাল, যান-বাহন, হাট-বাজার, দোকান-পশার সমস্ত বন্ধ।

শরৎচন্দ্রের সহিত সে সময়ে প্রতিদিনই মিলিত হতাম। সেই হরতালের দিনে সকাল আটটা সাড়ে আটটা আন্দাজ নগ্ন-পদে শরৎচন্দ্র আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন, 'উপীন, শুনেছি, হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা। ট্রেনে ট্রেনে বহু লোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা খাবার পাচ্ছে না, স্ত্রীলোকেরা বাড়ি যাবার গাড়ি পাচ্ছে না, যাবে?—যদি কোনো কাজে লাগতে পারি?'

দ্বিরুক্তি করলাম না। 'চলো' বলে খালি পায়ে শরতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। শিবপুর থেকে হাওড়া স্টেশন সুদীর্ঘ পথ, দুজনে নানাবিধ গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলাম।

হাওড়া স্টেশনের নিকট বাকল্যান্ড ব্রিজে উপস্থিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বলো ত, আমাদের ভারতবর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থেকে আরম্ভ করে শততম পর্যন্ত এক শ' স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানটি তিনি অধিকার করে আছেন?'

ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখে বললাম, 'কঠিন প্রশ্ন শরৎ, ঠিক করতে পারছিনে। তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তরও তুমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বলো, রবীন্দ্রনাথের স্থান কি।'

শরৎ বললেন, 'দ্বিতীয়। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তা হ'লে প্রথম কে তা বল?'

একটু ভেবে বললাম, 'এ প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে। এর উত্তরও তুমিই দাও।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'প্রথম বেদব্যাস।'

খুশি হয়ে, একটু বিস্মিত হয়েও, জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাল্মীকি?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'অনেক নীচে,—অনেক নীচে। এদের দুজনের অনেক নীচে।'

'কালিদাস?'

'কালিদাসও অনেক নীচে।' ব'লে শরৎচন্দ্র বললেন, 'প্রথম থেকে দ্বিতীয়র যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়র দূরত্ব তার কয়েকগুণ বেশি।'

মনে মনে একটা দর্প ছিল, আমার মতো রবীন্দ্র-ভক্ত খুব বেশি সুলভ নয়; আমার পাশে শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলাম।

যে কথা নিয়ে এ অধ্যায় আরম্ভ করেছিলাম, কথায় কথায় সে কথার শেষ ভাগটুকু বলতে প্রায় ভুলে যাবার উপক্রমই করেছি। শরৎচন্দ্রের যে কবিতাটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার আয়তনের চিত্র আমার মানসপটে এখনো সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতের মুক্তার মতো সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে বেগুনে কালিতে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকেই শেষ করা ত্রিশ-বত্রিশ লাইনের একটি কবিতা। একমাত্র প্রথম লাইন ছাড়া তার অন্য কিছুই আমার মনে নেই। প্রথম লাইনটি হচ্ছে, 'ফুলবনে লেগেছে আগুন।'

মাত্র দশ অক্ষরের একটি অতি ক্ষুদ্র লাইন, কিন্তু অসাধারণ না হলেও একেবারে সাধারণও নয়। ফুলবনে আগুন লাগার কল্পনার মধ্যে নূতনত্বই শুধু নেই, এমন একটু মর্মান্তিকতার স্পর্শ আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আহত করে। গোলাপ, মালতী, মল্লিকা, অপরাজিতা অগ্নির দহনে চড়্ চড়্ ক'রে পুড়ে যাচ্ছে, এ সত্যই একটা করুণ ট্র্যাজেডি, ফুলবন যদি উপমার ফুলবন হয়, তা হলেও।

(ক্রমশঃ)



বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

অনেক সময় চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তের বিভিন্ন উপাদান খুব তাড়াতাড়ি আলাদা করতে হয়। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এড্‌উইন কন এর জন্য একটা নতুন উপায় বার করেছেন। এতে এই সুবিধা হচ্ছে যে, রক্ত থেকে আলাদা করা লাল রক্তকণিকাগুলিকে এখন ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আগের চেয়ে এক মাস বেশী রাখা যায়। তাছাড়া সাদা রক্তকণিকাগুলি এবং রক্তের অন্য উপাদানগুলিও কোন পরীক্ষা কার্যের জন্য পাওয়ার খুব সুবিধা হয়। রক্তদাতার শরীর থেকে রক্ত টেনে নেবার ছুঁচের ভেতরে এমন একটা জিনিস লাগান থাকে যেটার দরুণ সাদা রক্তকণিকাগুলি



ডাঃ কন রক্তদাতার শরীর থেকে রক্ত টেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন

ছুঁচের গায়ে লেগে নষ্ট হয় না। এর পর ছুঁচের ভেতর থেকে রক্ত এক প্ল্যাসটিকের নলের ভিতর দিয়ে পাঠান হয়। এই নলের ভিতর এক ধরণের চটচটে বস্তু থাকে যেটা রক্তের ভেতর থেকে ক্যাল্‌সিয়ামের অংশ আলাদা করে দেয়। এর পর ক্যালসিয়ামবিহীন রক্ত একটা থলের মত জিনিসের মধ্যে এসে পড়ে—এই থলেতে dextram থাকে, আর এই dextramর দরুণ লাল রক্তকনিকা রক্ত থেকে আলাদা হয়ে থলের তলায় জমা হতে থাকে। রক্তের বাকি তরল পদার্থ যাকে প্লাজমা বলা হয়, যার মধ্যে সাদা রক্তকণিকা এবং রক্তের অন্য উপাদানগুলো আর একটা প্ল্যাসটিকের থলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এখানে সেণ্ট্রিফিউজের সাহায্যে প্লাজমা থেকে রক্তকণিকাগুলি আলাদা করে ফেলা হয়। এর পর আর একটা সেণ্ট্রিফিউজের সাহায্যে প্লাজমার মধ্যের অন্য অংশ যেগুলো রক্তকে জমে যেতে সাহায্য করে সেটাও আলাদা করে ফেলা হয়। প্লাজমা থেকে তখন এন্‌জাইম আলাদা করে ফেলে প্রটীন জাতীয় বস্তু তৈরী করে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়।

*

অষ্ট্রিয়ার প্রাণিতত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক কনরেড লরেঞ্জ হাঁস, শুয়র, গরু বেড়াল, কুকুর এদের সংগে কথা বলতে পারেন। ভিয়ানাতে তার গবেষণাগারের বাগানে অনেক সময় তাকে সার্ট আর প্যান্ট পরে বাগানের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়। এই সময় তার পেছনে এক দল হাঁসের বাচ্চা ক্যাঁক্যাঁ করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। তখন হাঁসের বাচ্চাগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন তাদের মার পেছন পেছন ঘুরছে। অধ্যাপক লরেঞ্জ তার এই জন্তু জানোয়ারদের সংগে কথা বলায় এত দূর কৃতকার্য হয়েছেন যে অষ্ট্রিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স তার গবেষণার জন্য তাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করছেন।

*

মানুষ সব কাজই কলে করতে চায়। যে কোন বড় অফিসে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে যন্ত্রের সাহায্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ করা হচ্ছে। এই যন্ত্রকে আমরা "কম্‌টো মিটার" বলি। ইংলণ্ডে একটা এই ধরণের ইলেকট্রিক চালিত যন্ত্র বার হয়েছে। পৃথিবীতে এর আগে এই ধরণের যেসব যন্ত্র তৈরী হয়েছিল বর্তমানে এই যন্ত্রটা তার সবগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করে। এই যন্ত্রর নাম দেওয়া হয়েছে 'এস্' (Ace)। ইংলণ্ডের ১৪ জন বৈজ্ঞানিক প্রায় ১৮ মাস ধরে ন্যাসানাল ফিজিকাল ল্যাবরেটোরীতে কাজ করে তবে এই যন্ত্রটা তৈরী করতে পেরেছেন। 'এসে'র সাহায্যে দুটো ১০ সংখ্যা ওয়ালা গুণ এক সেকেণ্ডের ১/৫০০ ভাগের মধ্যে করে ফেলা যায়। যে কোন অংক-শাস্ত্রবিদের এই গুণটা করতে অন্তত ৮ মিনিট সময় লাগবে। এটা দেখতে একটা অদ্ভূত ধরণের টেলিফোনের সুইচ বোর্ডের মত। এই বোর্ডটায় ধাতুর তৈরী ৩৬টা তাক আছে। এবং প্রত্যেক তাকে একটা টেলিভিসন যন্ত্রের ভালভ লাগান আছে। এটা তৈরী করতে প্রায় ৪০,০০০ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। যন্ত্রটা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, দরকারের সময় এক সেকেণ্ডে ১,০০০,০০০ বার কাজ করতে পারে। এর আগে যেসব যন্ত্র তৈরী করা হয়েছিল তাতে প্রায় ২০,০০০টা ভালভ থাকত কিন্তু এতে আছে মাত্র ৮০০টি ভালভ। এ ছাড়া এই যন্ত্র এক সংগে ১০ সংখ্যায়ক্ত যে কোন ২৫৬টি সংখ্যার একসংগে হিসাব রাখতে পারে। অংক-শাস্ত্রবিদদের যেসব হিসাব শেষ করতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে —এই যন্ত্র সেটা ১৫ মিনিটে শেষ করে দিতে পারে। এই যন্ত্রটা এক মিনিট চালাতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড খরচ পড়ে। কিন্তু এই এক মিনিটের কাজটি একটা মানুষ নিয়মিত খেটে এক মাসে শেষ করতে পারে।

*

মোটর চালকেরা যাতে খুব জোরে মোটর চালিয়ে কোন রকম দুর্ঘটনা না করে তার জন্য কর্তৃপক্ষদের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এই কারণে সব সময় মোটর চালাবার



কালো বাক্সটি মোটরের গতি নির্ধারণ করে আর নীচের যন্ত্র থেকে তা ছাপা হয়ে বের হয়ে আসে

একটা গতি নির্ধারণ করা থাকে। সেই গতি ভংগ করলেই মোটর চালকদের শাস্তি পেতে হয়। অনেক বড় বড় সহরে মোটর চালকদের গতি ধরবার জন্য বড় বড় রাস্তার ধারে একটা করে যন্ত্র বসান থাকে। এই যন্ত্রটা বাইরে থেকে দেখতে কাল বাক্সর মত দেখায়। যন্ত্রটায় একটা করে 'রাডার' লাগান থাকে যার সাহায্যে এই গতি ধরা পড়ে। এই যন্ত্রটার সবচেয়ে মজা এই যে মোটরের শুধু গতি নির্ধারণ করেই এই যন্ত্রটা ক্ষান্ত হয় না। এর সংগে এমন বন্দোবস্ত করা থাকে যে যদি কোন মোটর চালক নির্ধারিত গতির ওপর মোটর চালায় তাহলে এই যন্ত্র থেকে সংগে সংগে একটা ছাপা কাগজে মোটরের নম্বর, কত জোরে মোটর চালান হয়েছে সেটা বের হয়ে আসে। আর এই যন্ত্রের কাছে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে সে তৎক্ষণাৎ সেটা নিয়ে মোটর চালকের ওপর সমন জারী করতে চলে যায়।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ জনপরিষদ নাকি ঘোষণা করিয়াছে যে, কম্যুনিস্ট শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সিউলই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইবে।

—কিন্তু দুপক্ষের টানাটানির ফলে সিউলের যে হায়রানি হইয়াছে, তাহার পর রাজধানী হইবার যোগ্যতা তাহার আছে কি?

* * * *

জনাব সুরাবর্দী সাহেব এক নির্বাচন মামলায় লাহোর হইতে করাচী আসেন। তাঁহার মক্কেলের মামলা বহু টাল-বাহানা করিয়া পিছাইয়া দেওয়া হইতে থাকে। সিন্ধুর চীফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহার প্রার্থনামত কতকগুলি সুযোগ সুবিধা না দেওয়ায় সুরাবর্দী সাহেব অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া আদালতকে জানান যে, ত্রিশ বৎসর তিনি আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত, কিন্তু সাধারণ সৌজন্য হইতে এইভাবে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নাই।

—সৌজন্যের বঞ্চনা তবু সহ্য করা যায়; কিন্তু পাকিস্থানের কোন আদালতে জনাব সুরাবর্দীর এইরূপ লাঞ্ছনা হইতেছে, ইহা ভাবিতেও যেন অসহ্য লাগে।

* * * *

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান কোন দেশকে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতে দিবে না।

—আমরাও তাহাই বলি। তবে পাকিস্থানকে কি সেখানে তাহারা রাজত্ব করিবার সুযোগ দিবে?

* * * *

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া পার্লামেণ্টে জানানো হইয়াছে।

—কিন্তু ব্যয় করিবার ও তদারকী করিবার জন্য সরকারের কত ব্যয় হইবে, সেইটি জানিতে পারা গেলে আশ্বস্ত হওয়া যাইত।

* * * *

এসোসিয়েটেড প্রেস অফ পাকিস্থান একটি সংবাদ খুব ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়া ও কুষ্ঠিয়া সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সৈন্য ও ট্যাংক সমাবেশ করা হইয়াছে। তবুও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোকজন অবিচলভাবে তাহাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

—এদিকের খবরটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ওদিকের খবরে দেখিতে পাইতেছি পাকিস্থানের সীমান্ত অধিবাসীরা সৈন্য, ট্যাংক, গুলী কোন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। এই দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদের কয়েকজনকে কোরিয়ায় পাঠাইয়া দিলে কেমন হয়? হয়তো যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যাইতে পারে।

* * * *

জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিয়াছেন, ঐশ্লামিক নীতির উপর পাকিস্থানের ভিত্তি স্থাপিত না হইলে পাকিস্থান টিঁকিতে পারিবে না।

—তাহা হইলে আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, ইরান, আরব রাষ্ট্রসমূহ বোধ হয় কেহই টিঁকিয়া নাই—নিতান্ত ধাপ্পা দিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা দখল করিয়া আছে।

* * * *

আম্বালার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে পাঁচটি করিয়া বানরের লেজ দাখিল করিলে তবে বন্দুকের লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে। অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের সাহায্যের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—ব্যবস্থা ভালই করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে যতগুলি বানর বাধা জন্মাইবে, তাহাদের সকলেরই কি লেজ থাকিবে?

* * * *

সংবাদে প্রকাশ, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করার ব্যাপারে কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

—কি করিয়া থাকিবে? সকলে এখন নিজেদের নিরাপত্তা লইয়া এত ব্যস্ত যে, অপরকে চট্ করিয়া পাত্তা দিবেন বলিয়া তো মনে হয় না।

* * * *

জলপাইগুড়িতে প্রায় ছয়মাস পূর্বে এক ব্যক্তি বরিশালের উদ্বাস্তু বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া একটি ব্যবসায়ে জাঁকাইয়া বসে ও অতি স্বল্পমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এত স্বল্প মূল্যে সে কি করিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিতেছে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহার কাছে যায়। তদুত্তরে সে বলে পাকিস্থানের সহিত চোরাকারবার করিয়া সে মাল আনে। প্রলুব্ধ ব্যবসাদারেরা ঠিক অনুরূপ ব্যবসা করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তির হস্তে ৬০ হাজার টাকা দেয়। সে সেই টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

—চুরির উপর বাট্পাড়ি কি করিয়া করিতে হয়, তাহা এই আদর্শ পুরুষটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছে, এখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাদারেরা ঠিক অনুরূপভাবে খরিদ্দারদের উপর দিয়া লোকসানের টাকাটা না তুলিলে বাঁচি।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের স্পীকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিষদের অধিবেশনে প্রত্যেক মিনিটে ৫০ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া থাকে।

—ব্যয়সংকোচের জন্য তাহা হইলে পরিষদের অধিবেশনে কাহাকেও এক মিনিটের অধিক কথা বলিতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাকী সময়টুকু সকলে খোলা মাঠে বক্তৃতা দিতে পারেন।

* * * *

গোয়া সরকার ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত এলাকায় ৫১টি ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

—ইহা হইতেই মনে হয় যে, এদেশে পর্তুগীজদেরও লীজ ফুরাইয়া আসিয়াছে।

* * * *

জনৈক পত্রলেখক আনন্দবাজার পত্রিকায় অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, কলেজ স্কোয়ারের বাগানে অনেকগুলি বেঞ্চি আছে বটে, কিন্তু তাহার উপরের তক্তা নাই।

—বাগান বেড়াইবার জন্য। সেখানে কুঁড়ের দল বসিয়া পাছে আড্ডা দেয়, সেইজন্য তত্ত্বাবধায়করা তক্তা তুলিয়া ডাঁটিগুলি ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, আমার মনে হয় এদেশে কাহারও কোন অভিযোগ নাই; প্রত্যেকেই পার্কে আনন্দের সহিত ক্রিকেট খেলিতেছে।

—মেঞ্জিস সাহেব শুধু পার্কে ক্রিকেট খেলা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সেই সঙ্গে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের সামনে সারিবন্দী লাইন দেখিলে বোধ হয় বলিতেন, স্বর্গরাজ্য এইখানেই।

পুস্তক পরিচয়

ভারত সংস্কৃতি—মহেন্দ্র জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী, ৬৯।এ, ... রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

দার্শনিক-প্রবর ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের পঞ্চষষ্টি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলনটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গৌরব ও সারগর্ভ রচনার অনবদ্য নিদর্শন। ... ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া মনীষী মহেন্দ্রনাথ সত্যানুসন্ধান ও দার্শনিক অনুধ্যান দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার ধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন। বৈদিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজের জীবনকে গঠিত করিয়াছেন। চিন্তাজগতে তাঁহার দান অপরিসীম। বাংলার চিন্তাশীল লেখকগণের লেখনী-নিঃসৃত তথ্যপূর্ণ রচনা সমৃদ্ধ আলোচ্য সংকলনটি মহেন্দ্রনাথের মনীষার উদ্দেশ্যে অপূর্ব নিবেদন। ইহা প্রকৃত বিদ্বৎসমাজে প্রভূত সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ৩০১।৫০

রহিতে নারিনু ঘরে—শ্রীকালীপদ ঘটক। মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

পুরাতন চণ্ডীদাসকে আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করিয়া উপন্যাস রচনার এক বিকৃত প্রয়াস। শ্রীবিলাস মডার্ন চণ্ডীদাসরূপে উপন্যাসের নায়ক। সেই মৎস্য শিকার, রামী ধোপানীর পরিবর্তে রাখাল মালাকারের বিধবা কন্যা লক্ষ্মীর সহিত 'কাম-গন্ধহীন' প্লেটোনিক প্রেম, জমিদার কর্তৃক সমাজচ্যুত করার ষড়যন্ত্র সবই আছে, কিন্তু শিব গড়িতে বানর গড়ার মত একশত ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন এই অপকৃষ্ট রচনার কি সার্থকতা অনুধাবন করা দুষ্কর।

ভাষার সাবলীলতা, চরিত্র চিত্রণ, রচনা-সৌকর্য কোন দিক দিয়াই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করিবার সম্পদ আলোচ্য গ্রন্থটির মধ্যে নাই। ৩০০।৫০

নাগ দেবতার মন্দিরে—সতীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। প্রকাশকঃ দিগন্ত পাবলিশার্স ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

লেখক ছোটদের সাহিত্যে নিতান্ত নবাগত নহেন। ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকটি কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চারাস কাহিনী। তিনটি বাঙালী যুবকের নাগদেবতার মন্দিরের সেবকগণের সহিত সংঘর্ষের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। লেখকের ভাষা সরল এবং কিশোরদের উপযোগী। ...কপ্রদ রচনা বিন্যাস ও ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনায় লেখক সিদ্ধহস্ত। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, সমগ্র রচনার মধ্যে কোথাও তিনি অস্বাভাবিক অথবা অযৌক্তিক কোন ঘটনার অবতারণা করেন নাই, পরন্তু সমস্ত গল্পের কাঠামোটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। পুস্তকটি কিশোরদের যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ১৩৪।৫০

ভাষা গীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। মহাজাতি প্রকাশক, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

বাইবেল অথবা কোরাণ যে হিসাবে ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবদগীতাকে সেই হিসাবে ধর্মগ্রন্থ বলিলে ভুল করা হইবে। সমগ্র ভারত ভূমির কৃষ্টি, সভ্যতা ও উচ্চতম মননশীলতার সংমিশ্রণে এই অপূর্ব গ্রন্থ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাই ইহার এত সমাদর। শুধু ভারতের মনীষীরাই নহেন, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের মনীষীরাই এই গ্রন্থকে বহুভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীরই ইহা অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অথবা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী পাণ্ডিত্যাভিমানবর্জিত গীতার অনুবাদ এ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে ছিল না।

অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় আমাদের সাহিত্যের এই গুরুতর অভাব দূর করিয়াছেন। সরল ও সুললিত ভাষায় তিনি সমগ্র গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদকে কেহ যেন আক্ষরিক, ভাব অথবা সারানুবাদ বলিয়া ভ্রম না করেন। শৈলেনবাবুর অনুবাদে, অনুবাদের এই তিন ধারাই রক্ষিত হইয়াছে। শক্ত শ্লোকগুলির জন্য সারগর্ভ পাদটীকাও দেওয়া হইয়াছে। বহু নিন্দিত "ভাষা"র মাধ্যমে অর্থাৎ সংস্কৃত বহির্ভূত দেশজ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ যে সকলের সমাদর লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পটটি গ্রন্থোক্তভাবের দ্যোতক হইয়াছে। ১৫৪।৫০

ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য ভারত সাহিত্যভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। খুব জটিল বিষয়কে তিনি সহজ ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে। রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাকে যেভাবে তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। মার্কসীয় দর্শনকে উপস্থিত করিলে গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইত। ৩১৫।৫০

রিফিউজী—রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক। মূল্য—দুই টাকা।

সর্বনাশা ভারত-বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের এক উদ্বাস্তু পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লেখক এই নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকের বৈশিষ্ট্য, ইহা আগাগোড়া পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় রচিত হইয়াছে। অবশ্য যে দৃশ্যে পাত্র পাত্রী পশ্চিমবঙ্গীয় সেখানে এদেশী ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে। লেখক উদ্বাস্তু পরিবারের দুঃখ দুর্দশা ও সুপরিচিত সমস্যাগুলিকে রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নাটক সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন কোন বোধ না থাকায় কোথাও ঘটনা দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। ঠিক সেই কারণেই শেষ দৃশ্যে হেমনলিনীর নৈতিক অবনতির ব্যাপারে পাঠকগণের হৃদয় মোটেই দ্রবীভূত হয় না, পরন্তু সমস্ত ঘটনাটি অস্বাভাবিক বোধ হয়।

পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলিও লেখনীর দুর্বলতা বশতঃ পাঠকদের মনে কোন স্থায়ী রেখাপাতে সমর্থ হয় না। প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইলে যে সমস্যাগুলি আমাদের চিন্তার খোরাক হইত নাটকের মাধ্যমে সেগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ হইয়াছে।

মুদ্রাকর প্রমাদে পুস্তকটি আগাগোড়া কণ্টকিত। ৩২২।৫০

আওয়ার বেঙ্গল—সুপর্ণা হোম, পারমিতা প্রকাশনী, ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত ইতিহাসের জ্বলন্ত অধ্যায়গুলি এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বণিক সভ্যতার প্রথম পদসঞ্চারের যুগসন্ধিক্ষণে যেসব মনীষী ভারতের বুকে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন শ্রীমতী হোমের অপূর্ব রচনা-নৈপুণ্যে তাঁহাদের আলেখ্য রূপে, রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। শৃঙ্খলমুক্তির সর্বনাশা পণে বাংলার যে সকল বীর যুবক জীবন আহুতি দিয়া অমরত্ব বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনোরম কাহিনী সাবলীল ভাষায় অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের যুগ হইতে নেতাজীর আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রগত ও কৃষ্টিগত উত্থান-পতনের অনবদ্য ভাষ্য এই পুস্তকটি লেখিকার মননশীলতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে বিয়াল্লিশের জনজাগরণ, শাসকসৃষ্ট নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতের নব নব পরিকল্পনাসমূহ। পরিশেষে কলিকাতা মহানগরীর ইতিবৃত্তটি অতিশয় মনোজ্ঞ।

পঠনকালে মনে হইতেছিল আজিকার দ্বিধা-বিভক্ত, মুমূর্ষু বাংলার বুঝি এইরূপ একটি গীতারই প্রয়োজন ছিল। ৩২০।৫০

রঙ্গজগৎ

সহোদর—(এস দাস প্রডাকসন্স—ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও) ঃঃ কাহিনী—বীণাপাণি দেবী; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—চিত্ত বসু; গান—শৈলেন রায়; আলোকচিত্র—বিজয় ঘোষ; শব্দযোজনা—অনিল তালুকদার; সুরযোজনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ—সুধীর খান; ভূমিকায়—জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায়, হরিধন, সন্তোষ সিংহ, সিপ্রা, শোভা সেন, মনোরমা, প্রভা, রেবা, কেতকী, সুহাসিনী প্রভৃতি।

ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে ২২শে ডিসেম্বর উত্তরা, আলোছায়া ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করেছে।

দুর্নীতিকে আমরা আস্তে আস্তে সমাজগ্রাহ্য করে নিতে যে আরম্ভ করেছি তার "সহোদর"কেও তার প্রামাণ্য চিত্র বলে আমরা ধরে নিতে পারি। মূল বিষয়বস্তু দুর্বৃত্তপনার ওপরে ছকে যাওয়াতো হয়েছেই এবং শেষ পর্যন্ত শয়তানীকে মেনেও নেওয়া হয়েছে।

গল্প হচ্ছে তিনটি ভাইকে নিয়ে। বড়ো পরমেশ মোক্তার—উন্মাদপ্রায়; মেজো সুরেশ উকীল—শয়তান; আর ছোট নরেশ—জড়বুদ্ধিপ্রায়। এদের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে এলো আর এক পাগল, ডাক্তার সদাশিব, তার তেজী মেয়ে কৃষ্ণা। সুরেশের তাতে মুশকিল বাধলো। তার বন্ধু করালীর পরামর্শে এবং ইন্সিওরেন্সের ডাক্তার চ্যাটার্জির সহযোগিতায় সে তার স্ত্রী নীলিমাকে দৈনিক আর্সেনিক খাইয়ে আসছে—ঐভাবে হত্যা করে তার বীমার টাকা আদায় করার জন্যে। সদাশিবরা আসায় সে আশঙ্কায় পড়লো। সামান্য সূত্রে সুরেশ সদাশিবকে অপমান করলে কৃষ্ণা তার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নীলিমার সঙ্গে আলাপ করে এলো। নরেশকেও কৃষ্ণা দেখলে তবে তাকে বাড়ীর পাচক বলে ধারণা করে নিলে। নরেশ ছিলও তাই: বৌদির অসুখ, পাচক ছুটিতে কাজেই রান্নাটা সে-ই করে, দরকার হলে চাকরের কাজও। ভায়েদের সে গলগ্রহ। ভায়েরা বলে সে গণ্ডমূর্খ, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশুনো করতে দেখা যায় ওকে। একদিন সে সদাশিবকে পাওনাদারের অপমান থেকে বাঁচিয়ে দিলে। এই সূত্রে পরেশ কৃষ্ণা ও নরেশের একটা বেচাল ধরে ফেললে; তার পর কৃষ্ণাকে একদিন ছাদে দাঁড়িয়ে গান গাইতে দেখে পরেশ জানিয়ে দিলে যে "ওসব গানের তীর ছোঁড়াছুঁড়ি চলবে না।" ওরকম করলে তুলে দেওয়া হবে। সুরেশও তাই চায়। সদাশিবকে উঠে যাবার নোটিশ দিলে সে। কৃষ্ণা বললে মামলা করা হবে, বলেই সে তার হারছড়া বাবার হাতে দিলে বন্ধক দিয়ে মামলার টাকা জোগাড় করার জন্যে। সেই টাকা থেকে কৃষ্ণা নরেশের দেওয়া টাকা শোধ করতে গিয়ে জানলে যে যাকে সে পাচক বলে জানতো আসলে সে ঐ বাড়ীরই ছোটবাবু। জানাজানি হতেই নরেশ কৃষ্ণার কাছে একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলো। ওরা প্রেমালাপ করছে ঠিক সেই মুহূর্তেই নরেশের এক বন্ধু আবির্ভূত হয়ে জানিয়ে দিলে যে নরেশ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাশ করেছে: নরেশের ওপর স্বতঃই কৃষ্ণার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। এরপর নরেশের অনুপস্থিতিতে নীলিমা অসুস্থ অবস্থায় পরেশকে খাবার দিতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। বাড়ীতে কেউ না থাকায় কৃষ্ণা তার বাবাকে নিয়ে শুশ্রূষার জন্যে ছুটে এলো। সুরেশ এসে তাদের তাড়িয়ে দিলে। সে সময় এলো নরেশ—নীলিমার ডাক্তার বদল করা হচ্ছে না কেনো, আর বড়দার অসুখ সত্ত্বেও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেনো তার জবাব নিতে। বাকবিতণ্ডায় নরেশ দাদার সঞ্চিত লক্ষ টাকার হিসেব সুরেশের কাছে চেয়ে বসলো। ওদের ঝগড়া শুনে পরেশ এসে উপস্থিত হলো এবং সুরেশের কাছে হিসেব চাওয়ার জন্যে নরেশকে তিরস্কার করলেন এবং হঠাৎ প্রকাশ করে ফেললেন যে নরেশ হল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই। এই তথ্য জানার পর নরেশ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। নীলিমা এসে বাধা দিলে তাতে; নিজের কঙ্কণ নরেশের হাতে দিয়ে সে জানালে যে ওটা বন্ধক দিয়ে টাকা জোগাড় করে দাদার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তারপর সে যেখানে খুসী চলে যাক। নরেশ চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে সে কোত্থেকে টাকা পেলে সুরেশ তা জানতে পারলে এবং নরেশকে চুরির অপরাধে পুলিশে দেবার ব্যবস্থা করলে। নরেশের প্রফেসারীর চাকরি পাওয়া এবং এম এ পাশ করার খবর প্রকাশ করে পরেশকে বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা করে তুলেছে এমন সময় সুরেশ পুলিশ এনে হাজির করলো। পরেশ কোম্পানীকে ঠকাবার মতো সমাজ-শত্রু শয়তান ছিলো না। অথচ ঐ নজীর ধরেই মহাপাষণ্ডদের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে বলে যে ইঙ্গিত এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর। অতো ভীষণ অপরাধ সত্ত্বেও সমাজ বা আইনের দিক থেকে কোন শাস্তি হলো না—ন্যায় ও নীতির দিক থেকে যা অযৌক্তিক।

ছবির নাম থেকে যদি কাহিনীর প্রতিপাদ্যটা টানতে হয় তো সেটাও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পরেশের সহোদর দুর্বৃত্ত সুরেশ—পরেশের সহায় ও সেবক হলো বৈমাত্রেয় ভাই নরেশ। অর্থাৎ, অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সহোদরের চেয়ে বৈমাত্রেয় ভাই হয় বেশী আপনার—একথাটা আরও টেনে ধরলে দাঁড় করানো যেতে পারে যে, সকলের বৈমাত্রেয় ভাই থাকাই মঙ্গল ও নিরাপদ। অতএব—

বিকৃত চরিত্র ও শয়তানি বৃত্তি নিয়েই ছবির গল্প তৈরীর দিকে আজকাল ঝোঁক খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। এ ছবিতেও স্বাভাবিক ও সুস্থ চরিত্র একটিও নয়। পরেশ মোক্তার সর্বভোলা আধা পাগলাটে একজন; অথচ তলে তলে সে সব খবরই রাখে, সব কিছু জানে ও বোঝে। সদাশিব আত্মভোলা গোছের, কিন্তু কৃতিত্বাভিমানী অথচ চলনে বলনে পাগলাটে। সুরেশ, করালী ও ডাক্তার চ্যাটার্জি দুর্বৃত্ত। নরেশ কমপ্লেক্সগ্রস্ত যুবক। এরা সবাই মানুষের চেহারায় এক একজন পশুত্বের বড়াইনামা যেনো।

কাহিনী বিন্যাসে সাবলীল ধারাবাহিকতা প্রশংসা করার মতো, কিন্তু সেই সঙ্গে কয়েক ক্ষেত্রে বিসদৃশতাও উপেক্ষা করা যায় না। নীলিমা সাংঘাতিক অসুস্থা, কিন্তু তারই ঘরের সামনে তিন ভায়ে প্রচণ্ড ঝগড়ার ঘটনাটা নাটক জমিয়েছে বটে কিন্তু শোভনীয় মতে নয়। নীলিমাকে নিয়ে অন্য বাড়ীতে একেবারে অন্ধকারে একা ফেলে চলে আসাটা বেখাপ্পা ধরণের ক্রুর। আর্সেনিকের শিশি নিয়ে গিয়ে চম্পা ঘর বন্ধ করে তা অন্য শিশিতে ঢেলে দিয়ে তারপর সুরেশ ও করালীর অনেকক্ষণ ডাকের পর সেই অন্য জিনিষটা এনে হাতে দিলে আর ওরা জেনেশুনেও সেইটেই আসল জিনিষ বলে ধরে নিতে পারলে কি করে! শেষ দৃশ্যে মরণাপন্না নীলিমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। পুলিশ নরেশকে ধরে নিয়ে গেলো। স্বামীর কথা মনে করে নীলিমা প্রথমে চুপ করে ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুগ্না অবস্থাতেই আদালতে গিয়ে সে সাক্ষ্য দিলে। নরেশ ছাড়া পেলে, কিন্তু সুরেশ এসে নীলিমাকে নিয়ে তার দাদার টাকা আত্মসাৎ করে কেনা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললে। তার সেবার জন্যে এনে উপস্থিত করলে বন্ধু করালীর রক্ষিতা চম্পাকে। নীলিমার মৃত্যু আসন্ন দেখে 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখিয়ে নেবার জন্যে কৌশলে ডাক্তার সদাশিবকে এনে বন্দী করে রাখা হলো। কিন্তু চম্পা সদাশিব ও নীলিমাকে গোপনে মুক্ত করে দিলে। সময়ক্ষেপ সমীচীন নয় ভেবে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে দিয়েই নীলিমার প্রাণান্ত ঘটবার শেষ ইনজেকশন দিতে যাবার সময় দেখা গেলো যে নীলিমার জায়গায় রয়েছে চম্পা। ঠিক তখনই সদাশিবের কাছ থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হলো নরেশ ও পরেশ। সুরেশদের

শয়তানী সব ধরা পড়ে গেলো। সুরেশ দাদার কথায় নীলিমার কাছে মাপ চেয়ে রেহাই পেলে। কৃষ্ণা আর নরেশ মিলনাভিমুখীন হলো। করালীই বা বাদ থাকে কেনো, পরেশের কথায় চম্পাও তাকে ক্ষমা করলে। চাবুকের মার খেলে কেবল ডাক্তার চ্যাটার্জি।

গল্পটাকে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে বেশ নাটক গ্রাহ্য রস ও ঘটনার সন্নিবেশে তরতরে গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষে যে প্রতিপাদ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা মারাত্মক। সুরেশ আদির মতো শয়তান পাষণ্ডদের সীতা-সাবিত্রীর দোহাই দিয়ে ক্ষমার্হ করে তোলা সাংঘাতিক রকমের সমাজ-বিরোধী নির্দেশ। হিন্দু নারীর কাছে সীতা-সাবিত্রী আদর্শ, কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর স্বামীরা নীলিমার স্বামী সুরেশের মতো ভায়ের অর্থ আত্মসাৎ করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তাকে হত্যার চেষ্টা, বা ষড়যন্ত্র করে স্ত্রীকে আর্সেনিক প্রয়োগে হত্যা করে বীমা ঘরের মধ্যে আর একদিকে নরেশ আর কৃষ্ণা প্রেম করছে, দরজার সামনে পরেশ ও সদাশিব করছে রসিকতা—একেবারে বেম্বাই মার্কা মিলন। নরেশের বন্ধু পাশ করার খবর নিয়ে এসে নরেশ ও কৃষ্ণাকে প্রেম করতে দেখে 'প্রেমের পরশমণি' বলে গান একেবারে বেটপ্‌কা।

ছবিখানির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে অভিনয় কুশলতা এবং সাধাসিধে সংলাপের বাহার। কৌতুকাংশে হাসির যে হুল্লোড় ওঠে—কৃষ্ণার ছাদে গান গাওয়া নিয়ে পরেশের সঙ্গে বিতর্ক দৃশ্যে; নরেশ কর্তৃক কৃষ্ণার কাছে প্রেমের অনুভূতি ব্যাখ্যা; নীলিমার মাসীর মেয়ে শিবানীকে নরেশের কাছে জোর করে পাঠানো এবং শিবানী কর্তৃক নরেশকে রান্নায় জোগান দেওয়া প্রভৃতি দৃশ্য সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে মাতিয়ে তোলে। সেইসঙ্গে, আদালতে নরেশের বিচার দৃশ্য; তিন ভায়ের ঝগড়ার মধ্যে নরেশ সহোদর নয় প্রকাশ হয়ে পড়ার দৃশ্য। নরেশকে পুলিশে গ্রেপ্তার করতে আসার দৃশ্য; পরিশেষে সুরেশ ও তার সহকারীরা ধরা পড়ার দৃশ্যে নাটকীয় সজীবতা মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে—নাটকীয় রসে ও পরিবেশনে দৃশ্য-গুলি খুবই সমৃদ্ধ। 'ট্রিটমেণ্ট'-এর গুণে জমে উঠেছে এমন দৃশ্য আরও আছে।

একটা কথা আছে—শেষে যে হাসে তার হাসিটাই জমে ভালো। এখানে সুরেশরূপী কমল মিত্রের বেলায় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার অভিনয়ে দুর্বৃত্ত চরিত্রটি ফুটেছে আগাগোড়াই কিন্ত তার চেয়ে মনোজ্ঞ এবং সব চেয়ে কৃতিত্ব-সম্পন্ন অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন পরেশের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, অবশ্য তার সমস্ত 'ম্যানারিজম্' সমেত। কিন্তু শেষ দৃশ্যে ঠিক ঘটনা মাফিক একটা হাসিতে কমল মিত্র লোকের তারিফটা কেড়ে নেয়। হাসির ওপরে আর হাততালি আদায় করে নিয়েছেন করালীর ভূমিকায় হরিধন—ডাক্তার সদাশিবকে বন্দী করতে পারার উল্লাসে তার বাড়ী কাঁপানো হাসি—এটা অবশ্য 'ট্রিটমেণ্টের' অঙ্গ, ঘটনাতে প্রয়োজনীয় নাটকীয়তা যোগ করার জন্যে পরিচালকের কারসাজি। গুরুদাসের সদাশিব চরিত্রটিতে একটা মেকী ভাব লেগে আছে মনে হয়। নরেশের ভূমিকায় শুভেন্দু অনেকটা জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় ধাঁচটা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন, অনেক জায়গাতেই সে ছাপটা পাওয়া যায়, তবে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণার ভূমিকায় সিপ্রার অভিনয় যথা-যথ সংযত। গণিকা চম্পার ভূমিকায় মনোরমার কথায় মুদ্রা 'মাইরি' ধ্বনি ক... তো কিলবিল করে তোলে।

স্টুডিও সংবাদ

পি এস এস প্রডাকসন্সের প্রথম ... "দিগন্তের ডাক"এর শুভ-মহরৎ ... ডিসেম্বর রাধা ফিল্মসএ সম্পন্ন হ... চিত্রের কাহিনী লিখেছেন সুমথনাথ ... প্রযোজনা করছেন প্রমোদ গাঙ্গুলী ও পার্ব... চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন খগেন দাশগুপ্ত। অভিনয়াংশে আছেন চন্দ্রাবতী, রেণুকা, নিভাননী, প্রমোদ, বিমান, নৃপতি, পার্বতী, জীবন গাঙ্গুলী, বেণু মিত্র। সম্পাদনা করবেন বিনয় ব্যানার্জী। শিল্প-নির্দেশনায় আছেন ভূপেন মজুমদার। পরিচালনার ভার নিয়েছেন বেণু দাস।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া এই পর্যন্ত দুইটি খেলায় যোগদান করিয়াছেন। এই দুইটি খেলাই নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মুস্তাক আলীকে ভারতীয় তৃতীয় টেস্ট দলে গ্রহণ না করায় যে গণ্ডগোল কমনওয়েলথের বিভিন্ন খেলায় হইবে বলিয়া খেলার পরিচালকগণ ও দর্শকগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। দর্শকগণ সকলেই চরম শৃঙ্খলা ও আগ্রহের সহিত ছয় দিন ধরিয়া খেলা অবলোকন করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যেই যে খেলা অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই জানিতাম; সেইজন্য কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। টেস্ট খেলার সময়েও যে কোনরূপ অশুভ আচরণ করিতে দেখা যাইবে না—সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ।

কমনওয়েলথ দল প্রথম খেলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে। দ্বিতীয় খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল দলকে শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় কমনওয়েলথ দল বিজয়ী হইলেও দ্বিতীয় দিনের খেলার সময় বিভিন্ন খেলোয়াড়—বিশেষ করিয়া দলের অধিনায়ক পর্যন্ত মাঠের মাঝখানে যেরূপ "মাতলামি" করিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই সমর্থন করা চলে না। বড়দিনের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ঘরের মধ্যে যাহা করুন না কেন, তাহা লইয়া কেহ কখনও সমালোচনা করিতে পারে না। কিন্তু খেলার মাঠে যেখানে সহস্র সহস্র দর্শক সমবেত, সেখানে এইরূপ অশোভন আচরণ খুবই অন্যায়। ভবিষ্যতে এই ধরণের আচরণ করিতে না দেখিলেই সকলে সুখী হইবে।

কমনওয়েলথ বনাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল

কমনওয়েলথ বনাম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। কমনওয়েলথ দল ৯ উইকেটে ৩৪৯ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলা আরম্ভ করে। প্রথম ইনিংস্ মাত্র ১৯৫ রানে শেষ করে। ফলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলকে ফলো অন্ করিতে হয় ও দ্বিতীয় ইনিংসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ৫ উইকেটে ২০৫ রান করে। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ঃ খেলার ফলাফল ঃ

কমনওয়েলথ দল—প্রথম ইনিংস্ ঃ—৯ উইকেটে ৩৪৯ রান ডিক্লেয়ার্ড (আইকিন ৪১ রান, ওরেল ৮৩ রান, এমস্ ৬০ রান, সার্টক্লিফ ৪৯ রান, স্যাকলটন ৩২ রান; ডি সোধন ৪৯ রানে ৫টি, পি রায় ৩৬ রানে ২টি উইকেট পান)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল—প্রথম ইনিংস্ ঃ— ১৯৫ রান (সি গোপীনাথ ৯৩ রান, আদিশেষ ২১ রান; ডোভে ৪৮ রানে ৪টি, রামাধীন ৫০ রানে ৩টি ও স্যাকলটন ২৬ রানে ২টি উইকেট পান)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস ঃ— ৫ উইকেটে ২০৫ রান (বি ইরানী ৬২ রান, পি রায় ৩২ রান, সি গোপীনাথ ৩২ রান; আইকিন ৫৬ রানে ২টি, ডোভে ৩৮ রানে ১টি ও ওরেল ১৭ রানে ১টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল দল

কমনওয়েলথ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল দলের তিনদিনব্যাপী খেলায় রাজ্যপাল দল শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে।

ঃ খেলার ফলাফল ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল দল—প্রথম ইনিংস্ ঃ— ১৬৬ রান (সি এস নাইডু ৪৪ রান, পি সেন ৪১ রান, বি ফ্রাঙ্ক ২৪ রান; ট্রাইব ৬৩ রানে ৬টি ও রিজওয়ে ২৬ রানে ৩টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দল—প্রথম ইনিংস্ ঃ—১৭১ রান (ফিসলক ৫৩ রান, জি ট্রাইব ২৭ রান; সি এস্ নাইডু ৫৩ রানে ৫টি ও মণ্টু ব্যানার্জি ৪৪ রানে ৪টি উইকেট পান)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের দল—দ্বিতীয় ইনিংস ঃ— ১০৬ রান (এ দাশগুপ্ত ৩৭ রান, পি রায় ১৪ রান, সি এস নাইডু ১৭ রান; ট্রাইব ৫২ রানে ৪টি, রিজওয়ে ২৫ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দল—দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—১ উইকেটে ১০২ রান (গিম্বলেট ৬৬ রান নট আউট, এমেট নট আউট ৩৩ রান)

টেনিস

ভারতীয় জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক বৈদেশিক পুরুষ ও মহিলা টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক দর্শক সমাগম ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় টেনিস খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান পূর্বাপেক্ষা যে অনেক নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও এই প্রতিযোগিতা হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছে। নবাগত তরুণ খেলোয়াড়গণকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী না করিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় টেনিস খেলার চরম শোচনীয় পরিণতি হইবে, সে বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ন মিশরের টেনিস খেলোয়াড় জে ড্রবনী এই প্রতিযোগিতায় সিংগলস্ চ্যাম্পিয়ন হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। সুইডেনের তরুণ খেলোয়াড় ডেভিডসন ফাইন্যালে স্ট্রেট সেটে ড্রবনীকে পরাজিত করিয়া উক্ত গৌরব অর্জন করিয়াছেন। তবে ড্রবনী পুরুষদের ডাবলস্ ও মিক্সড ডাবলসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় সিংগলস্ সেমি-ফাইন্যালে ডেভিডসনের বিরুদ্ধে খেলিয়া স্ট্রেট সেটে পরাজিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় নম্বর খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র পুরুষদের ডাবলস্ ফাইন্যালে উপনীত হইয়া পরাজয় বরণ করিয়াছেন। একমাত্র তিন নম্বর খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ ডাবলস্ ফাইন্যালে ড্রবনীর সহযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন।

মহিলা বিভাগে আমেরিকান খেলোয়াড় মিস্ ডোরথী হার্ট সিংগলস্ ও ডাবলসে বিজয়িনীর গৌরবে ভূষিতা হইয়াছেন। এই বিভাগে ভারতের কোন মহিলাকেই সুবিধা করিতে দেখা যায় নাই।

খেলার ফলাফল—

পুরুষদের সিংগলস্

এম ডেভিডসন (সুইডেন) ৬—৩, ৬—৩, ৭—৫ গেমে জে ড্রবনীকে (মিশর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস্

মিস্ ডোরথী হার্ট (আমেরিকা) ৬—৩, ৪—৬, ৬—৩ গেমে মিসেস্ মোট্রামকে (গ্রেট বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্

জে ড্রবনী (মিশর) ও নরেন্দ্রনাথ (ভারত) ৮—৬, ৭—৯, ৬—৩, ৩—৬, ৬—৪ গেমে এম ডেভিডসন (সুইডেন) ও সুমন্ত মিশ্রকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস্ ফাইন্যাল

জে ড্রবনী (মিশর) ও মিসেস্ এণ্ডারসন (আমেরিকা) ৬—৩, ৪—৬, ৭—৫ গেমে ইফতিকার আমেদ (পাকিস্থান) ও মিস্ উডব্রিজকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস্ ফাইন্যাল

মিস্ ডোরথী হার্ট (আমেরিকা) ও মিসেস্ এ জে মোট্রাম (গ্রেট বৃটেন) ৬—৩, ৬—৪ গেমে মিস্ জে ইনগ্রাম ও মিসেস্ এণ্ডারসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

টেবিল টেনিস

নিখিল ভারত টেবিল টেনিস ফেডারেশন ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় পুরুষ বিভাগে বাংলার খেলোয়াড় কে জয়ন্ত শীর্ষস্থান অধিকার করায় সত্যই বাংলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের গৌরবের কারণ হইয়াছে। আমরা কে জয়ন্তকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। নিম্নে এ সম্পর্কে তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষ বিভাগ

(১) কে জয়ন্ত (বাংলা)
(২) টি তিরুভেঙ্গদম্ (মাদ্রাজ)
(৩) আর ভাণ্ডারী (বাংলা)
(৪) এম ভি এস ভিঠল (মহীশূর)
(৫) এস প্রকাশ (দিল্লী)
(৬) এইচ্ এস খালচাঁদ (বোম্বাই)

মহিলা বিভাগ

(১) মিস্ সুলতানা (হায়দরাবাদ)
(২) মিস্ রুক্মনী (মাদ্রাজ)
(৩) মিসেস্ গুল নাশিকওয়ালা (বোম্বাই)
(৪) মিসেস্ রাজাগোপালন (পাঞ্জাব)
(৫) মিস্ ভি সিরিয়াদিনী (সিংহল)
(৬) মিস্ সি ম্যাডান (বাংলা)

বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের যোগদান

আগামী মার্চ মাসে ভিয়েনাতে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল প্রেরিত হইবে বলিয়াও ফেডারেশন স্থির করিয়াছেন। এমন কি দল নির্বাচন পর্যন্ত হইয়াছে। কেবল বাধা হিসাবে দেখা দিতেছে অর্থ। আমরা আশা করি, দেশবাসী ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবেন ও মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবেন। ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যে সকল খেলোয়াড় মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইলঃ—কে জয়ন্ত, টি তিরুভেঙ্গদম্, আর ভাণ্ডারী, এস্ ভিঠল, মিস্ সুলতানা ও মিস্ রুক্মনী।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৫শে ডিসেম্বর—নেপালের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল বিজয় সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা অদ্য বিমানযোগে নয়াদিল্লীতে পৌঁছেন।

শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কালিম্পং-এ প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তিব্বতের দলাই লামা লাসা ত্যাগ করিয়া ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন দেশের সর্বত্র সকল কংগ্রেসকর্মীকে এবং জনসাধারণকে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ২৯শে ডিসেম্বর প্যাটেল দিবসরূপে পালনের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গৌহাটীতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাকিস্থান সরকার ধুবড়ীর নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ-কূলে ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করিয়াছেন।

২৬শে ডিসেম্বর—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ভারতীয় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করিয়াছেন। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন। যানবাহন মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার তাঁহার বর্তমান দপ্তর ছাড়াও দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন। শিল্প সচিব শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁহার বর্তমান দপ্তর ছাড়া বাণিজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি নূতন দপ্তর খোলা হইতেছে—এই দপ্তরের ভার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের হস্তে অর্পণ করা হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর—নেপালের পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল বিজয় সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীগিরিজাশংকর বাজপেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। নেপালের শাসন সংস্কার ও অপরাপর সমস্যা সম্পর্কিত খসড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। নেপাল সরকার যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে নেপালাধীশকে অবিলম্বে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা সম্পর্কে ভারত সরকারের পরামর্শ গৃহীত হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

অদ্য টালীগঞ্জ থানা এলাকায় হালতু ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত যাদবগড় উদ্বাস্তু পল্লীতে গুলী ও লাঠি চালনার ফলে একজন মহিলাসহ সাত ব্যক্তি আহত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চৌদ্দ দফা সাহায্য প্রদান পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অদ্য নয়াদিল্লীতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে যে সমস্ত কারুবিদের প্রয়োজন হইবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা দিয়া ভারতের সহযোগিতা করিবে। বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণকে আমেরিকায় শিক্ষালাভের সুবিধা দিবেন। ভারত আমেরিকার নিকট হইতে ইহাই প্রথম আন্তর্জাতিক সাহায্য পাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, নদীয়া ও কুষ্ঠিয়া সীমান্তে মোতায়েন নিজ নিজ পুলিশ বাহিনীর উপর গুলী চালনা বন্ধ করিবার আদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ সরকার জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ ইতোমধ্যেই কার্যে পরিণত করা হইয়াছে।

গতকল্য নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বিক্ষোভকারীদের উপর নেপালী পুলিশ গুলীবর্ষণ করায় ৬ ব্যক্তি নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে। কাঠমাণ্ডুতে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

২৯শে ডিসেম্বর—অদ্য অপরাহ্ন ১টা ১৫ মিনিটের সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চিতাভস্ম প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে বিসর্জন করা হয়।

পবিত্র প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে সর্দারজীর চিতাভস্ম বিসর্জন অনুষ্ঠান উপলক্ষে অদ্য ভারতের সর্বত্র অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়া প্যাটেল-দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

গত বুধবার টালীগঞ্জ যাদবগড় উদ্বাস্তু কলোনীর নিকট গুলীতে আহত শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র গতকল্য বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে লেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। অদ্য কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ শোচনীয় ঘটনা সম্পর্কে শাসন বিভাগীয় এক তদন্তানুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়াছেন এবং আলীপুরের মহকুমা হাকিমের যে দেহরক্ষী উপরোক্ত গুলী চালাইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ, সেই দেহরক্ষীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভাগুলিতে যাদবগড় উদ্বাস্তু কলোনীর নিকটে উপরোক্ত গুলী চালনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে বেসরকারী তদন্তানুষ্ঠানের দৃঢ় দাবী উত্থাপিত হয়।

৩০শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য অমরাবতীতে শ্রীশিবাজী লোক-বিদ্যাপীঠের (গণ-বিশ্ববিদ্যালয়) উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে যে, শহরের লোকদের ন্যায় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণও শিক্ষার ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়।

কাবুল বেতারে প্রচারিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁকে মণ্টগোমারী জেল হইতে মীরণ শা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে।

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের কার্যসূচী সম্পর্কে শেষ মুহূর্তে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ তাঁহার লণ্ডন যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন।

৩১শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য ওয়ার্ধায় 'গান্ধী জ্ঞানমন্দিরের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রস্তাবিত 'গান্ধী জ্ঞানমন্দিরে' সকল ভাষায় গান্ধীজী সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি থাকিবে এবং উহা গান্ধীদর্শনের গবেষণা-কেন্দ্র হইবে।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, গত দশ দিন ধরিয়া পূর্ব পাকিস্থানের আসাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাকিস্থানী সৈন্য চলাচল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। আকস্মিকভাবে সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যদলের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে সর্বত্র বিস্ময় সৃষ্টি হইয়াছে।

নববর্ষে জাতির উদ্দেশে এক বেতার বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ভারতের সেবায় সর্বজনের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, যাহা কিছু আমাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে, আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে পারে, উহার সমস্ত কিছুই বর্জন করিত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে ডিসেম্বর—আজ আমেরিকায় খৃস্টজন্ম দিবসের ছুটীতে যে সব দুর্ঘটনা ঘটে, তাহাতে মোট ৬৬৪ জন লোক নিহত হয়।

চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যবাহিনী ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর—গতকল্য নিউ ইয়র্কে ভারতের সাহায্যার্থ গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরুরী খাদ্য সরবরাহ কমিটি কর্তৃক এক সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের দুর্ভিক্ষের আশংকা দূর করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরুরী সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সম্মেলনে ব্যক্ত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর—চীনা বাহিনী অদ্য ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে। দক্ষিণ কোরীয় রাজধানী সিউলের ৩৫ মাইল উত্তরে ও অক্ষরেখার মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে কারেসং অঞ্চলে আনুমানিক এক লক্ষ ৭০ হাজার চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে।

২৯শে ডিসেম্বর—কোরিয়া রণাঙ্গনে কম্যুনিস্ট বাহিনী রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালাইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে হটাইয়া দিয়াছে ও ব্যূহের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া সিউলের উত্তরে রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যূহের বাম পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দ্বারা ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দক্ষিণে বিরাট শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

৩০শে ডিসেম্বর—টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ৪০খানা রুশ ধরণের জেট বিমান অদ্য অপরাহ্নে কোরিয়ার আকাশে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের নিকট মার্কিণ জেট বিমানসমূহ আক্রমণ করে। কোরিয়ায় এত বড় আকাশযুদ্ধ ইতঃপূর্বে আর হয় নাই।

কোরিয়ার পূর্ব রণাঙ্গনে কম্যুনিস্টদের আকস্মিক আক্রমণের ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী দশ মাইল পশ্চাতে হঠিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

৩১শে ডিসেম্বর—জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারের গোয়েন্দা কর্মচারীরা জানাইয়াছেন যে, ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া ত্রিমুখী আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে চীনা ও উত্তর কোরিয়ান বাহিনী রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যূহের বিপরীত দিকে প্রভূত শক্তি সমাবেশ করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬।।০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬।।০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]　　শনিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৫৭ সাল।　　Saturday, 13th January, 1951.　　[১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বশ্ব-সমস্যার সহজ সমাধান

যুদ্ধ আর নয়, শান্তির পথেই বিশ্বের কল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে—লণ্ডনে মনওয়েলথ বৈঠকে সম্মিলিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের তিনিধিগণ সমস্বরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই ভেচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিবার মত মানসিক তিবেশেরই যে সত্যকার অভাব। সুতরাং সব সিদ্ধান্তের মূল্য কি? শান্তি চাহিলেই তা শান্তি পাওয়া যায় না; প্রকৃতপক্ষে নের ভিতর যেখানে রহিয়াছে ভয়, পরস্পরের তি যেখানে রহিয়াছে অবিশ্বাস, রহিয়াছে ন্দেহ, সেখানে এইসব শুভেচ্ছা কতিপয় ব্যক্তির নসিক বিলাস-মাত্রেই পর্যবসিত হয়। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভিভাষণ দিতে গিয়া ডক্টর সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণণের মুখেও বিশ্ব-শান্তির সোজা পরামর্শ দিন আমরা পাইয়াছি। দার্শনিক উচ্চ মত-দকে রাজনীতির খাতের মধ্যে নামাইয়া নিয়া ডক্টর সর্বপল্লী বলিয়াছেন, বিশ্ব-মানবের বাই জগতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রসমূহের র্তমান আদর্শ হওয়া উচিত। মানব-সমাজের ধ্যে সদ্ভাব এবং প্রীতির সম্পর্ক তাঁহাদের দৃঢ় করিয়া তোলা কর্তব্য। দরিদ্র এবং পেক্ষিতের প্রতি করুণা ও মৈত্রীর মনো-বৃত্তিতে তাঁহাদের সমস্ত কর্মসাধনা প্রযুক্ত ওয়া দরকার। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহাদের মন ইতে ভয়ের ভাব দূর না হইতেছে, সে পর্যন্ত নতিক সাধনার এই ধারা বিশ্বের সমাজ-জীবনে সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া সম্ভব নহে। মস্যা তো এইখানেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী 'শঙ্করম্ উইকলী' পত্রের শশ সংখ্যায় কিছুদিন পূর্বে এই সমস্যার পর জোর দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, মরা যদি সকলকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি, তাহারাও আমাদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি তাহাদিগকে ভয় করি অথবা আমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করি, তবে তাহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। কথাটা অতি পুরাতন; সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানুষ এই পুরাতন সত্য সম্বন্ধে আজও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। শ্রীজওহরলাল নেহরুর উক্তি অনুসারে বোকা যাহারা, যাহারা মূর্খ তাহারাই বনে জঙ্গলে বন্দুক লইয়া ঘোরাফেরা করে, যাহা কিছু সুন্দর সেগুলি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বন্য জন্তুরাও ভীষণপ্রকৃতির নয়। আমরা যদি নিরস্ত্রভাবে এবং নির্ভয়ে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হই, তবে তাহাদের প্রকৃতিতেও অনেক বিস্ময়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীজওহরলালজী যাহাদিগকে বোকা এবং মূর্খ বলিয়া এক্ষেত্রে অভিহিত করিয়াছেন, দেখা যাইবে, বর্তমান জগতে তাহাদের সংখ্যাই বেশী হইবে। বনে জঙ্গলে কেন, সভ্যতার দোহাই দিয়াই ইহারা মানব-সমাজে বন্দুক চালায়। মানুষ মারিয়া মানুষকে উদ্ধার করিতেছে, উচ্চভাবাপন্ন ভঙ্গীতে এমন ভণ্ডামীও দেখায়। কোরিয়ায় মানব-মুক্তির জন্য এমনই পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সভ্যতার নামে এমন নির্লজ্জ অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এখন চলিতেছে এবং আরণ্য পশু জীবনের হিংস্রতাও ইহার কাছে পরাভব মানিয়াছে। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই গর্ব আমরা করি না কেন, মানুষের মহত্ত্ব বা মানবতার দিক হইতে জগৎ অদ্যাপি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এইদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক সাধনার তথাকথিত অগ্রগতির মধ্যেও অনেকখানিই আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। মনে হইবে বৈজ্ঞানিক সাধনা মানব-সমাজের কল্যাণের সাধনায় প্রযুক্ত না হইয়া ভয়াবহ হিংস্রতার অভিমুখেই কার্যতঃ মানব-জগৎকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মনে স্বতঃই এই সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছে। বস্তুতঃ মোটামুটি-ভাবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সাধনায় মানব-সভ্যতার প্রকৃত সমুন্নতি ঘটিয়াছে কি না, এ বিষয়ে সকলেরই মনে প্রশ্ন উঠিবে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে বিশ্বের ধ্বংস-লীলারই বিস্তার ঘটিতেছে, জগৎ জুড়িয়া মানুষের হাহাকার উঠিতেছে। নির্দয় নিষ্ঠুর নির্মম পশুশক্তির পেষণে মানবমণ্ডলী পিষ্ট হইতে চলিয়াছে, তবে কিসের গর্ব এ বিজ্ঞানের, কিসের গর্ব এমন সভ্যতার? প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমাজ-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তিত না হইতেছে, সমাজ-জীবনের ভিত্তির যে নীতি, পরস্পরকে ভালবাসা এবং মৈত্রী, সব শিক্ষার মধ্যে এই শিক্ষাটুকু যতদিন পর্যন্ত না মানুষকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্যন্ত জগতে শান্তি নাই; কারণ, মনুষ্যত্বের উপরই শান্তি প্রতিষ্ঠিত; বস্তুত হিংসা, বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানুষের ধর্ম নয়, সেগুলি পশুদেরই প্রকৃতি। ভারত এই সত্যই জগতে প্রচার করিয়াছে এবং মানবতার প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাহাই বাস্তব।

মিঃ লিয়াকত আলীর নীতি-চাতুর্য—

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শেষটা কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার মানভঞ্জ হইয়াছে। কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীরা কাশ্মীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছেন। এ ব্রতের যে এই ফল হইবে ইহা জানাই ছিল। কারণ, কলকাঠি পিছন হইতেই ঘুরিতেছিল। জনাব লিয়াকত আলীর অভিমান শুধু অভিনয়টিকে জমাইয়া তুলিয়াছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান লইয়া পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী, উপরে উপরে দেখিতে গেলে অনেকের মতে তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক মনে হইবে, কিন্তু পাকিস্থানের নীতি-চাতুর্যের রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাহার মূলে যুক্তি বিশেষ রকমেই আছে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের সম্বন্ধে কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিবার অধিকার পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর নাই। কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, তথাকার অধিবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া যদি সমস্যা দেখা দেয়, ভারতই তাহা বুঝিবে, বাহির হইতে পাকিস্থান সেখানে হাত বাড়াইবার কে? কিন্তু এইরূপ অবস্থার সম্বন্ধে পাকিস্থানের রাষ্ট্র-নায়কগণ তাঁহাদের কূট-বুদ্ধির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে কাশ্মীরের সম্বন্ধে নিজেদের একটা দাবী দাঁড় করাইয়া লইয়াছেন। বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদের প্রতিনিধি স্যার আওয়েন ডিক্সন কার্যত পাকিস্থানকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করাতে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকগণ কিছুটা অসুবিধার ভিতর পড়িয়াছেন। অধিকন্তু কাশ্মীরের গণ-পরিষদ গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারা অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, গণপরিষদের গঠন পদ্ধতির ভিতর দিয়া কাশ্মীরবাসীর অভিমত যদি ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র-স্বরূপে কাশ্মীরকে শাসন-তান্ত্রিক স্থায়ী রূপ প্রদান করিয়া ফেলে, তবে পাকিস্থানের সব আশা পণ্ড হইয়া যায়। এ সত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াই পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনের সম্পর্কে যে কোন অছিলায় কাশ্মীর সম্বন্ধে তাহাদের দাবীটা জীয়াইয়া তুলিয়াছেন। এই সূত্রে কাশ্মীর সম্পর্কে শক্তিবর্গকে তাঁহাদের অনুকূল মনোভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আনিয়া ফেলাই জনাব লিয়াকত আলী খাঁনের উদ্দেশ্য। ফলত দেখিতেছি, মিঃ লিয়াকত আলীর নীতি এদিক হইতে জয়যুক্ত হইয়াছে। ঘরোয়া আলোচনার ধাপ্পার আড়ালে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য টোপ ফেলা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, কমনওয়েলথের সঙ্ঘশক্তি এবং সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যের সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মনোভাব যতই মধুর হোক, আমরা সেইরূপ মত পোষণ করি না। কমনওয়েলথের প্রেমে আমাদের চিত্ত সিক্ত নয়। পক্ষান্তরে সে ক্ষেত্রে আমরা পদে পদে গুপ্ত অভিসন্ধি আশঙ্কা করি। স্বার্থপর শোষক দলের কূটচক্রই সেখানে আমাদের চোখে সহজে আসিয়া পড়ে। সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মতের পরিপোষকতা করিতে সে গোষ্ঠীর মধ্যে বিবেকে অনেকেরই বাধিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ আছে। মোটের উপর পাকিস্থানের নেতারা কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন না করার জন্য যে হট্টগোল উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাঁহারা বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, এ সবই নীতির খেলা এবং মান-অভিমানের পালা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাঁহারাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভেদনীতিকে নিষ্ঠুর-নির্মমভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে। পরন্তু এখনও তাঁহাদের স্বার্থপর সেই মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কথার মিষ্টত্বে আমরা তুষ্ট হইতে পারি না, দৃষ্টি ইহাদের কোন দিকে রহিয়াছে, আমরা তাহা ভাল রকমেই জানি। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর এই নীতি-চাতুর্যে ভারতের বিড়ম্বনা না বাড়ে, ইহাই আমাদের ভয়। কমনওয়েলথের মধ্যে মৈত্রী ও বান্ধবের মোহে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিভ্রান্ত না হইয়া পড়েন, ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কে সকল রকম দুর্বলতা হইতে ভারতের নীতিকে ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে। কাশ্মীরকে লইয়া পাকিস্থানের এই বুজরুকীর ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই এখন দরকার। ভদ্রতার নামে ভণ্ডামী আর ভালো লাগে না; সৌজন্যের নামে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বনে দৈন্য প্রদর্শনের দীর্ঘসূত্রতা ভারতের জনমনকে সত্যই উত্তক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর সমুদ্রের মাছ

বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে জাল ফেলা হইয়াছে এবং মাছ ধরা আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমুদ্রে ধৃত মৎস্য-স্তূপে পরিবেষ্টন করিয়া মন্ত্রীদের বিভিন্ন রূপে অবস্থানের বিচিত্র ছবি বাহির হইয়াছে। কলিকাতা শহরবাসীদের আর দুঃখ নাই, এবার তাহাদের মাছের অভাব দূর হইল, এমন কথা শুনিতেছি। কিন্তু সত্য কি তাহাই? পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেনমার্ক হইতে দুইখানি মাছ ধরিবার জাহাজ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। এই দুইখানা জাহাজে বঙ্গোপসাগর হইতে সর্বপ্রথম ৩৫০ মণ মৎস্য শহরে আসিয়া পৌঁছে। শুনিতেছি, ইহার পর আরও দফায় দফায় বেশী মাছ কলিকাতায় আসিবে। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র-মৎস্য ধরিবার এই বিদ্যা বাঙালীরা শিখিয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হইবে। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তবে সুখেরই বিষয়; কিন্তু এই যে বহ্বারম্ভ ইহার পরিণতি হয়ত শেষটা লঘু হইয়া পড়িবে, আমাদের মনে এই ভয় হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যের অভাব দূর করিবার অনেক পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু সে সব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের খাল, বিল, পুকুর মাছে ভরিয়া যায় নাই। আসাম হইতে উড়ো-জাহাজে মাছ আনিবার অভিনয় কয়েক দিনের উৎসাহেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার এই উৎসাহও কতদিন চলিবে, কে জানে? কারণ, এই ব্যবসা কতটা লাভজনক হইবে সে বিষয়ে এখনও সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। জলচর জীবমাত্রেই মৎস্য নয় একথা মনে রাখিতে হইবে। বস্তুত সমুদ্রের মৎস্য যদি নদী-পুষ্করিণীর মৎস্যের তুলনায় দামের দিক দিয়া সুলভ না হয়, তবে তাহা জনপ্রিয়তা লাভ করিবে না। গভীর সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার বাজারে পৌঁছানোও কম ব্যাপার নয়। শুনিতেছি বঙ্গোপসাগরের কোন্ কোন্ অংশে বেশী মাছ পাওয়া যায়, কিছুদিন পর্যন্ত প্রধানত ইহারই পরীক্ষা চলিবে এবং দিনেমার নাবিক ও ধীবরগণ ভারতীয়দিগকে এই মৎস্য ধরিবার ট্রেনিং দিবেন। এই অনুসন্ধান এবং ট্রেনিং পর্যন্ত পৌঁছিয়াই এই পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি না ঘটিলেই মঙ্গল; কারণ ব্যবসাটি যদি লাভজনক না হয়, তবে এই সব বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়ের অঙ্কটাই লাভের মধ্যে বড় হইয়া দাঁড়াইবে। খাল, বিল, পুকুরে মাছের চাষ যেখানে ব্যর্থ হইল, সেখানে এমন সন্দেহ স্বভাবতঃই দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, সমুদ্রের গভীর জলে মাছের সন্ধানের এই উদ্যমে আমরা নানা কারণেই অত্যুৎসাহ বোধ করিতেছি না। পশ্চিমবঙ্গের খাল, বিল এবং পুকুরগুলিতে যদি নির্ধারিত পরিকল্পনা লইয়া মাছের চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করা হইত, তবে এতদিনে তাহার কিছু ফল অবশ্যই ফলিত; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য-বিভাগের এদিকে আন্তরিকতার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। খাল বিলের মাছ ছাড়িয়া এখন গভীর সমুদ্রে নজর দিলেই এমন সমস্যার সমাধান হইবে কি?

খাদ্যসচিবের আশ্বাস ও উপদেশ

ভারতের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত কে এম মুন্সী কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায়

আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহার কিছু আলোচনাও হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্ত্রী মহাশয় অনেকটা অবান্তরভাবেই ভাষাগত বিরোধের প্রশ্নটা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষা সম্পর্কিত সমস্যা এদেশের একটা বড় সমস্যা। এক ভাষাভাষী লোকেরা জোট বাঁধিয়া এখানে এখনও অপর ভাষাভাষী-দিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ভাষাগত এই বিরোধ দেশের ঐক্য এবং সংহতির একটা বড় অন্তরায় ঘটাইতেছে। যদি এই বিরোধের অবসান না ঘটে, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্রীযুত মুন্সী বলেন, হিন্দী ভারতের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার ফলে প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষা-গুলিকে চাপিয়া মারিতে হইবে ইহা বোঝায় না। প্রকৃতপক্ষে সেগুলির উন্নতির জন্য সকল রকমে সুবিধা দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী-দিগকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের খাদ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু ইহাতেও বাঙালী আশ্বস্ত হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, বিভিন্ন প্রদেশের কর্তৃপক্ষ সব যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াই বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে এখনও অভিযানে ব্যাপৃত আছেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল হইতে বাঙলা ভাষাকে উৎখাত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আসামে এই আন্দোলন অধিকতর উগ্র। কিন্তু বাঙালী কোনদিনই প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্বভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। জাতীয়তা-বাদের জন্মভূমি এই বাঙলাদেশ; সুতরাং বাঙালীকে এ সম্বন্ধে অধিক উপদেশ না দিলেও চলিতে পারে। বস্তুত ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যাঁহারা অনর্থক বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের অনর্থক উদাম উপশমিত হইলে বাঙালী সবচেয়ে বেশী সুখী হইবে। বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পর বাঙলার সব গিয়াছে। বাঙালীর ঘর ভাঙ্গিয়াছে, তাহার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে একমাত্র বাঙলা ভাষাই আছে বাঙালীর ভবিষ্যতের বল এবং ভরসা। এই ভাষাকে ভিত্তি করিয়া বাঙালী এতদিন তাহার ভাঙ্গা ঘর গোছাইয়া লইতে পারিবে, ইহাই তাহার ভরসা। যাহারা এই সংকটে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিবশে বাঙলা ভাষার বিস্তৃতি, উন্নতি এবং সমৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের কাজে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতেরই ক্ষতি হইতেছে। কারণ বাঙালী যদি না বাঁচে, ভারতও নিরাপদ থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত।

বরোদার ব্যাপার

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভারতের রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি-বিরোধী শক্তি পুনরায় মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। বরোদার মহারাজা তাঁহার রাজ্যকে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার কৈফিয়ৎ এই যে, বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর শিক্ষা, অর্থ-নীতি, সংস্কৃতি, কোন দিক হইতেই বরোদার কোন উন্নতি ঘটে নাই। সুতরাং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-স্বরূপে বরোদার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহারাজা এতদিন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন নাই। তিনি বরোদা রাজ্যের বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্তিকে কার্যত সমর্থনই করিয়াছেন। এখন সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর বরোদা রাজ্যের জন্য তাঁহার ভাবনা বড় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কার্যত বরোদার পুনরায় মা-বাপগিরির শাসন হাতে পাইবার স্বপ্নে মাতিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই উদ্যম অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং অঙ্কুরেই এই অনর্থের নিরসন করা কর্তব্য, নতুবা সর্দার বল্লভভাই অখন্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য যে সাধনা করিয়াছেন এবং রাজনীতিক দূরদৃষ্টির প্রভাবে সে সাধনাকে যেভাবে সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা আছে।

কৃতিত্বের বিচার

জনাব শহীদ সুরাবর্দী বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি ঢাকা শহরে এই লীগের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সুরাবর্দী সাহেব এই উপলক্ষে তাঁহার অভি-ভাষণে নিজের অতীত কৃতিত্বের কাহিনী শুনাইয়াছেন। জনাব সুরাবর্দীর মতে তিনি যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পর কলিকাতায় একজন মুসলমানও জীবিত থাকিত না; কারণ, হিন্দু মহাসভা সমগ্র ভারত হইতে মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিত। সুরাবর্দী সাহেব শুধু বিপন্ন ইসলামেরই যে, অদ্বিতীয় পরিত্রাতা ইহাই নহেন, হিন্দুদিগকেও তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গে একজন হিন্দুও প্রাণে বাঁচিত না। সুতরাং সুরাবর্দী সাহেবের মত মানব-প্রেমিক এখনও আছেন, ইহা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে একটা কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কথাটা এই যে, হিন্দু মহাসভাই না হয় যত অনর্থের মূল। তাহারা ভারত হইতে মুসলমান উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে নিশ্চিহ্ন করিত কাহারা? তাহারা কোন দল এবং কাহার অনুগামী? জিন্নাহৎ আলীর দল নিশ্চয়ই নয়। বস্তুত মুসলিম লীগের প্রধান পান্ডাই ছিলেন স্বয়ং শহীদ সুরাবর্দী। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থানের বর্বর উন্মাদনা, তাঁহার প্রেরণা হইতেই বিস্তার লাভ করে। নোয়াখালির নর-ঘাতী উৎসব সেই উন্মাদনারই পরিণতি। ভারতের ইতিহাসে রক্তাক্ত অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়, মুসলিম লীগেরই ধর্মান্ধ মধ্য-যুগীয় অনাচার এবং উৎপীড়ন। জনাব সুরাবর্দী ভাগ্যচক্রে বর্তমানে পাকিস্থানের নেতৃত্ব হইতে অপসারিত হইয়াছেন, তাই তাঁহার মুখে এই মানবতার মধুর কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু নেতৃত্ব ও পদাধিকার যদি তিনি পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখেও লীগের সমর্থনমূলক মতবাদেরই উচ্ছ্বাস ছুটিত এবং হিন্দুদিগকে বড় জোর মুসল-মানের জিম্মিস্বরূপে কৃপাযোগ্য করিয়া তিনি কৃতার্থতা লাভ করিতেন। কারণ, দুই জাতি তত্ত্বের উপরই পাকিস্থানের ভিত্তি প্রতি-ষ্ঠিত, সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ সে রাষ্ট্রের মুখ্য নীতি হইয়া দাঁড়াইবেই। ফলত পাকি-স্থানী হিংস্র-নীতির মন্ত্রস্বরূপে জনাব শহীদ সুরাবর্দী মুসলমানদের রক্ষাকর্তা, পরিত্রাতা বলিয়া গর্ব করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গে হিন্দুদিগকে তিনি রক্ষা করিয়াছেন, এমন কথা তাঁহার পক্ষে এখন না বলাই ভালো। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে অতীতের স্মৃতিকে উস্কাইয়া তুলিয়া তাহাদের অন্তরে আঘাত না দিলেই সুরাবর্দী সাহেবের পক্ষে এখন শোভন হয়। ভবিষ্যতে তিনি পূর্ববঙ্গের জন্য কি করিতে পারেন, তাহাই দেখুন। বাস্তবিক-পক্ষে পূর্ববঙ্গকে সত্যই যদি রাষ্ট্রীয় মহিমায়-সমুন্নত করিয়া তুলিতে হয় এবং করাচীর কেন্দ্রীয় চক্রান্ত হইতে পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করিয়া সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে সর্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং পূর্ববঙ্গের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের সাধনায় তাঁহাদের যে অবদান তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কৃপার ভিখারী করিয়া রাখিয়া ইহা সম্ভব নয়—ইসলামের উদার আদর্শের দোহাই দেওয়া এক্ষেত্রে ফাঁকা কথা মাত্র।



তীর্থযাত্রী

শিল্পী—বিনায়ক মসোজী



প্রাচীন পারসীক হইতে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

মৃত্যুর অমৃতরস রেখেছ সুন্দরী
সুনিপুণ দক্ষতায় সংগোপনে ভরি
সুধাকর অধরোষ্ঠে তব। তুমি নারী
বিরহ-বেহাগ মাঝে দিয়েছ সঞ্চারি
মিলনের মধুশ্বাস। তুমি বারম্বার
প্রণয়ের হেমপাত্র ভরেছ আমার
হৃদয়ের সুধাসারে। কি বিস্ময় তবু
অধরের প্রান্তে এনে দাও নাই কভু
রসনায় স্পর্শিবারে। নিষ্ঠুর কৌতুক
অন্তরের তৃষ্ণা মোর নিত্য জাগরূক
রাখিয়াছে দীপ্যমান। সে তীব্র আলোকে
আলোক-সুন্দর ব'লে লাগিয়াছে চোখে
মূর্তি তব, মর্ত্যরাণী, ইন্দ্রাণীরে জিনি,
কামনা-সিন্ধুর তুমি কমলে-কামিনী॥

২

তৃষ্ণার অংশুকে বদ্ধ দময়ন্তী নল
মোরা দুইজনে সখী। আছে তৃষ্ণা তাই
জীবন-অরণ্য পথে চলেছি সকল
বাধা ঠেলি, কোনখানে কোন ক্লান্তি নাই।
প্রেম বটে ভালো সখী, তবু আরো ভালো
দিগন্ত-গুণ্ঠন-টানা মরীচিকা বধু,
মিলন নাহিকো সত্য, নাহিকো ঘোলালো
তৃপ্তি-নির্বাপিত আঁখি। অনাদ্যন্ত মধু
অনায়ত্ত কামনার কমলের কোষে
সেথা তুমি বীণাপাণি হাসিতেছ ব'সে।
তৃষ্ণা চাই, সুধা চাই, নাহি চাই দোঁহে
একায়ত্ত একপাত্রে। স্বর্ণ-মৃগী হেরি
ছুটিব অনন্তকাল। না-পাওয়ার মোহে
পাইব অপূর্ব স্বাদ চির উল্লাসেরি॥

৩

চাঁদ ছাড়া পারাবারে জাগেনা জোয়ার।
তুমি না আসিলে সখী এ বক্ষ আমার
ওঠেনা উদ্বেলি কভু। তুমি যবে আসো,
নবোদিত চন্দ্রসম স্থির নেত্রে হাসো
অমনি তরঙ্গদল তন্দ্রা ভেঙে উঠি
অন্তরের গুহা হ'তে রত্ন মুঠি মুঠি
আকাশে ছড়ায় উচ্চে। তুমি তার'পর
শুভ্র করে আঁকো সখী চুম্বন-স্বাক্ষর
কত যত্নে, কি লীলায়! না আসিলে তুমি
আমার এ দীন মর্ত্য ওঠেনা কুঙ্কুমি
পারিজাতপ্রভ! সখী তব অভ্যুদয়
দস্যু অন্ধকারপুঞ্জ করিয়া বিলয়
প্রণয়ের পূর্বাচল প্রকাশে আমার।
চাঁদ ছাড়া পারাবারে জাগেনা জোয়ার॥

বৈদেশিকী

নেপাল

নেপালের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শাসন সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে তার মূল কথাগুলি এই—(১) রাজা ত্রিভুবন বিক্রম শা নেপালের রাজাই রইলেন। নেপাল থেকে তাঁর অনুপস্থিতির সময় ইচ্ছা করলে তিনি একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন। (২) ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নেপালে একটি গণ-পরিষদ নির্বাচিত হবে। এই গণ-পরিষদ নেপালের স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। (৩) অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠিত হবে। এই মন্ত্রিমণ্ডলীতে ১৪ জন সদস্য থাকবেন। তার মধ্যে ৭ জন জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় লোক হবেন, বাকী ৭ জন হবেন রাণা বংশীয়। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী রাণা মোহন সমসেরই প্রধান মন্ত্রী থাকবেন। (৪) লুঠতরাজ ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী ভিন্ন সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং নেপাল ও নেপালের বাইরের নেপালীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর থেকে বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হবে, অবশ্য একথা তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে যারা হিংসাত্মক কর্মনীতিতে বিশ্বাসী নহে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয় তা এখনও নিশ্চিত বলা যায় না। ঘোষণার মধ্যেই এরূপ ইঙ্গিত আছে যে, ভারত গভর্নমেণ্টের এতে সায় আছে। অবিশ্যি ভারত গভর্নমেণ্টের দিক থেকে দৃঢ়তা না দেখালে রাণারা এত শিগ্‌গির এতটা নামতেন কিনা সন্দেহ, কারণ অন্য দিক থেকে উল্টো উস্কানিও ছিল। কিন্তু যে সর্তে রাণারা আপোষ করতে রাজী হয়েছেন সেগুলোদ্বারা নেপালে অচিরে শান্তি স্থাপিত হবে কিনা এখনও বলা যাচ্ছে না। রাজার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গণ পরিষদ নিয়োগের প্রস্তাব—এ দুটি সর্ত মোটের উপর সকলের অনুমোদন লাভ করবে। কিন্তু বাকী সর্তগুলি সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর সগোত্রীয়দের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে যদি অপ্রতিহত থাকে তবে সেই মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা জনকল্যাণের পথ কতখানি উন্মুক্ত হবে সেটা বলা কঠিন। এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে তথাকথিত ৭ জন জনসাধারণের প্রতি-নিধিস্থানীয় লোকের কর্তৃত্ব কতখানি কার্যকরী হবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি প্রধান প্রধান বিষয় ও দপ্তরগুলি প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য রাণা-বংশীয় মন্ত্রিদের হাতে থাকে তবে প্রতিশ্রুত শাসন সংস্কারের ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ হবে না। দ্বিতীয় কথা, জন-সাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রী নির্বাচনের [illegible] থেকে এবং তিনি যদি নিজের খুশীমত লোক নির্বাচন করেন তবে সেই মন্ত্রিরা জনসাধারণের আস্থাভাজন হবেন না। বর্তমানে যাঁরা বিদ্রোহী বলে পরিচিত তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া নেপালে শান্তিস্থাপন বা কোন সংস্কারের পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থায় রাণারা জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারেন। মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে কিছু লোককে হাত করা রাণাদের পক্ষে অসম্ভবও নয়। কিন্তু রাণাশাহীর বিরুদ্ধে যাঁরা বর্তমানে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন তাঁদের অনুমোদন ও সহযোগিতা না পাওয়া পর্যন্ত কোন আপোষই কার্যকরী হবে বলে বিশ্বাস হয় না। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা পড়লে কিন্তু মনে হয় যে, আসল বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষ না করে তাঁদের একপাশে ফেলে যারা সহজে সায় দেবে এমন কিছু লোককে হাত করে তাদের নিয়েই একটা মন্ত্রিমণ্ডলী খাড়া করে দেওয়ার চেষ্টাও ত াঁর হতে পারে। রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কিত সর্তটি থেকে এ সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। নেপালী কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধাদের খুনী ও ডাকাতের পর্যায়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। নেপালের অর্ধেকের বেশী অংশ থেকে এই যোদ্ধারা রাণাশাহীর শাসন দূর করে দিয়েছে। নেপালে সত্যিকারের যদি কোন শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হয় তবে তার প্রেরণা নেপালী কংগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করা চাই। নেপালী কংগ্রেস ও তার মুক্তি সংগ্রামের নেতাদের বাদ দিয়ে কোন আপোষ কার্যকরী হবে না একথা ভারত গভর্নমেণ্টও আশা করি রাণাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় নেপালী কংগ্রেস মহল বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই বলে মনে হচ্ছে। ঘোষণার অনেক অংশ বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবটির তাৎপর্য অনেকটা অস্পষ্ট রয়েছে। আমাদের মনে হয়, প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যই নেপালে শান্তি স্থাপন ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে চান তবে তাঁর পক্ষে উচিত হবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়ে নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনা করার ব্যবস্থা করা। অন্যথায় নেপালে শান্তি স্থাপনে বিলম্বিত হবে বলে আমাদের আশঙ্কা।

কোরিয়া

কোরিয়াতে উত্তর কোরীয় এবং চীনারা [illegible] কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকার করার পর ক্রমশ দক্ষিণে এগুচ্ছে। ওনজু ও ওসান থেকেও ম্যাকআর্থারী ফৌজ বেদখল হয়েছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের হেড কোয়ার্টার্স থেকে জোর সেন্সর ব্যবস্থার ফলে কোরিয়া যুদ্ধের বিস্তৃত ও সঠিক খবর আসছে না। 'রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী'র পক্ষে 'অসম্মানজনক' কোন খবর দেওয়া নাকি বারণ হয়েছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের বর্তমান রণকৌশলের ঠিক উদ্দেশ্য যে কি সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাকআর্থারী ফৌজ যেভাবে পেছুচ্ছে তা থেকে মনে হয় শেষপর্যন্ত কোরিয়া থেকে তাদের যতদূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে সরিয়ে আনাই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। একজন সংবাদিক খবর দিচ্ছেন যে, ম্যাকআর্থারী ফৌজের একটানা আশী মাইল পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর একটিও চীনা সৈন্যের সঙ্গে পথে মোকাবিলা হয়নি। অথচ আমরা কেবলই শুনেছি যে, চীনাদের সংখ্যাধিক্যের চাপেই ম্যাকআর্থারী ফৌজকে পিছু হটে আসতে হচ্ছে। কী যে ব্যাপার বোঝা কঠিন!

ইতিমধ্যে আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। আমেরিকার প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, চীন যদি অবিলম্বে কোরিয়াতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে স্বীকৃত না হয় তবে তাকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করা হোক এবং তার বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। আমেরিকার এই প্রস্তাব খুব বেশী-সংখ্যক গভর্নমেণ্ট অনুমোদন করবে বলে মনে হচ্ছে না। চীন সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গেও মার্কিন গভর্নমেণ্টের মতের মিল হচ্ছে না। এমন কি, কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত গভর্ন-মেণ্টগুলির মধ্যেও চীন সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। বর্তমানে লণ্ডনে কমনওয়েলথ দেশ-সমূহের প্রধান মন্ত্রীদের যে কনফারেন্স হচ্ছে তাতেও এই মতভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান ও সিংহল চীনের বর্তমান গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দঃ আফ্রিকা চীনের কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নেয়নি এবং এখনও নিতে রাজী নয়। সুতরাং চীন সম্পর্কে কমন-ওয়েলথ দেশগুলিও একমত হয়ে কোন নীতি অনুসরণ করতে পারছে না। এ অবস্থায় বিশ্বরাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে নীতিগত ঐক্যের আশা কোথায়? অপর দেশ যাহাই করুক, ভারতবর্ষ যে চীনের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত হতে সম্মত হবে তার কোন সম্ভাবনা নেই।

১০।১।৫১

তিব্বতে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব

শ্রীদাশরথি রায়

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ। প্রেম ও করুণার অবতার লোকপাবন প্রভু বুদ্ধ প্রবর্তিত জ্ঞানালোকে প্রায় সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড উদ্ভাসিত। কিন্তু তখনও অ-সভ্যতার ঘন তমসায় আচ্ছন্ন হইয়াছে মধ্য এশিয়ায় পৃথিবীর উচ্চতম নর-অধ্যুষিত দেশ তিব্বত। সুসংস্কৃতিবিরহিত, সভ্যতাবিবর্জিত তিব্বতী-গণ তখনও আদিম 'বন' ধর্মের আসুরিক অনুষ্ঠানে উন্মত্ত। নিশীথ রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে স্বল্পালোকিত পর্বতকন্দরে ভূত-



তিব্বতী থাংকা : সহস্র বাহু ও সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট বুদ্ধ

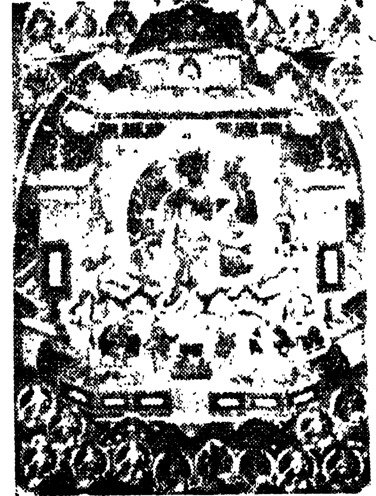
প্রেত-পিশাচ উপাসনা, পশুবলি, নরবলি ইহাই ছিল তিব্বতীদের 'বন' ধর্ম। তিব্বতের এই অসভ্য যুগে সেদেশের ভাগ্যাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তথাকার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অমিতবিক্রম স্রং-চান্-গাম্-পো। স্রং-চান্-গাম্-পো কেবল যে কুশলী যোদ্ধা ও পরাক্রমী শাসক ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী এবং সুন্দরীকামী। কুশলী যোদ্ধা ও পরাক্রমী শাসকরূপে এক-দিকে তিনি যেমন তিব্বতের তৎকালীন খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রগুলিকে নিজ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক শক্তিশালী একনায়কাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার সৌন্দর্য-রসপিপাসা, তাঁহার সুন্দরী রমণী অনুরাগ তাঁহার দেশকে পরম ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছিল।

৬৩৯ খৃঃ তিব্বতরাজ স্রং-চান্-গাম্-পো নেপাল পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন, তখন নেপালে রাজত্ব করিতেছেন রাজা অংশুবর্মা। নেপালরাজ অংশুবর্মার ত্রিশুন নামে এক পরমাসুন্দরী ও অপরূপ লাবণ্যময়ী কুমারী কন্যা ছিল। নেপাল রাজকন্যার অনুপম রূপ-লাবণ্যের কথা স্রং-চান্-গাম্-পোর কর্ণকুহরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। যদিও তখন তাঁহার অন্তঃপুরে তিনজন তিব্বতী রাজ-মহিষী বিদ্যমান, তথাপি সুন্দরী-প্রেমী তিব্বত-রাজ নেপাল রাজকন্যাকে চতুর্থা মহিষীরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া নেপাল-রাজের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। অংশুবর্মা এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রূপমুগ্ধ স্রং-চান্-গাম্-পো নেপাল রাজ অন্তঃপুর আক্রমণ করিলেন। বলী স্রং-চান্-গাম্-পোর হস্ত হইতে দুর্বল নেপালরাজ নিজ কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বীর্যলব্ধা নেপাল রাজকন্যা ত্রিশুনকে পত্নীরূপে বরণ করিয়া তিব্বতরাজ নিজ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নূতন মহিষীকে রাজান্তঃপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা ভাবিলেন যে, অপরূপ নারীরত্ন প্রতিষ্ঠা হইল তাঁহার দেশে, কিন্তু এই নারীরত্ন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতে যে শ্রেষ্ঠ রত্ন প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল, রাজা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সুন্দরী রমণী রূপাকৃষ্ট স্রং-চান্-গাম্-পো নিজের অজ্ঞাত-সারে তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম আনয়ন করিলেন—আর তৎসহিত আসিল বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত ভারতীয় শিল্পকলা।



অংকাশ ও তাহার দুই শিষ্য

স্রং-চান্-গাম্-পোর নেপালী মহিষীর পিতৃধর্ম ও নিজধর্ম ছিল বৌদ্ধমত। পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে আগমনকালে ত্রিশুন নিজ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য বহু সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সকল সামগ্রীর সহিত একটি অতিপবিত্র ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র ছিল। প্রবাদ, প্রভু বুদ্ধ একদা এই ভিক্ষাপাত্রটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রভুর পুণ্য স্পর্শপূত ভিক্ষাপাত্রটির অলৌকিক ক্ষমতাবলের সাহায্য লইয়া বৌদ্ধধর্মে অচলা অনুরাগময়ী ত্রিশুন



তিব্বতী থাংকা : শ্যামতারা

বনধর্মী তিব্বতীদের দেশে প্রভুর মতবাদ প্রচার আরম্ভ করিলেন।

পত্নীপ্রেমিক রাজা প্রথমেই পত্নীর নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং সুন্দরী মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য রাজা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অকুণ্ঠ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

নেপালী রাজকন্যাকে মহিষীরূপে আনয়ন করিবার দুই বৎসর পর স্রং-চান্-গাম্-পো ৬৪১ খৃঃ তৎকালীন চীন সম্রাট তাই-চুংএর কন্যা ওয়েন-চেঙ্গকে বিবাহ করিয়া পঞ্চমা মহিষীরূপে তিব্বতে আনয়ন করেন। ওয়েন-চেঙ্গও ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পতিগৃহে আগমনের সময় তিনি রাজকুমার গৌতমের একটি প্রতিমূর্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।



তিব্বতী থাংকাঃ শিবকালী

ওয়েন-চেঙ্গের আগমনের পর দুই সপত্নী সমবেত চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। বর্বর 'বন'ধর্ম কি করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে, কি করিয়া তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে প্রভুর প্রকৃষ্ট ধর্ম, ইহাই হইল দুই সপত্নীর একমাত্র চিন্তা। তিব্বতের মধ্যপ্রদেশ 'ইউ ও ছাং' হইল দুই রাণীর প্রধান কর্মকেন্দ্র। রূপসী পত্নীদ্বয়ের অবিরাম চেষ্টার ফলে রাজা স্রং-চান্-গাম্-পো বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগী হইলেন এবং অনুর পুত্র থনমি সামভোটের পরিচালনায় ষোলজন তিব্বতী লইয়া গঠিত একটি দলকে রাজা ভারতে পাঠাইলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ কষ্টসাধ্য দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বনধর্মী তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাহায্য করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণের কৃপায় তিব্বতে কেবল যে বৌদ্ধ-ধর্মই প্রচারিত হইল তাহা নহে—বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ভারতীয় শিল্পকলাও তিব্বতে বিস্তার লাভ করিল।

তিব্বতে স্রং-চান্-গাম্-পোর যখন রাজত্ব-কাল, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় শেষ উত্থানের সময়। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার যুগ। স্রং-চান্-গাম্-পোর রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীকাল ধরিয়া ভারত তিব্বতকে বৌদ্ধধর্ম ও তৎপ্রভাবিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় প্রেরণা দান করিয়াছে।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বঙ্গদেশে পাল রাজাদের অভ্যুত্থান হয়, তখন তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ওতন্তপুরী, বিক্রমশিলা, সোমপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয় নৃপতি-গণ যে বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিহারসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ধর্ম ও শিল্পকলা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। নালন্দার বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তন্ত্রায়ণ বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধানতম পীঠস্থান হইয়াছিল। পাল রাজাদের সময়ই বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন নূতন মূর্তি পরিকল্পনা, আসন ও মুদ্রার উৎপত্তি হয়। এই সময় বিভিন্ন বৌদ্ধমঠে যে বৌদ্ধধর্মপ্রভাবিত শিল্পকলা জন্মলাভ করে, অদ্যাপি তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। এই সকল মঠে যে অনবদ্য ভাস্কর্য-মূর্তি ও ছাঁচে-ঢালা প্রতিমূর্তি তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা শিল্পকলার উৎকর্ষের চরম নিদর্শন। এই শিল্পকলা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত হইয়া এক বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং এইরূপ বৈশিষ্ট্যময় ভারতীয় শিল্পকলাই ভারত হইতে নেপালে এবং নেপাল হইতে তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। ভগবান বুদ্ধের জীবনের অষ্টবিধ প্রধান ঘটনাবলী ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য ইষ্টদেবতার নানান ভঙ্গী প্রকাশ পাল যুগের ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পাল যুগে বঙ্গের বরেন্দ্রভূমে বিশ্ববিশ্রুত অমরশিল্পী ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপালের আবির্ভাব হয় এবং প্রতিভাবান এই পিতা ও পুত্রের ধর্মপ্রভাবিত শিল্পকলা কেবল যে সর্বভারতেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা নহে, সুদূর সুমাত্রা ও যবদ্বীপেও ইঁহাদের শিল্পকলার প্রভাব বিস্তার হয়।

খৃঃ একাদশ শতকের শেষভাগে সেনবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশের ঢাকা ও গৌড়সহ পাল-নৃপতিদের রাজ্যের বহু অংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে যখন সেন বংশের পতন হয়, তখন বঙ্গদেশ হইতে পাল-সেন যুগের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নেপালে স্থানান্তরিত হয়। বিখ্যাত তিব্বত-ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নেপালের শিল্পীগণ পাল-সেন যুগের শিল্প কলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। পাল-সেন যুগের শিল্পকলার অনুসৃত শিল্প কলাই নেপাল হইতে তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। তিব্বতের বিভিন্ন ভাস্কর্য-মূর্তি পাল-সেন



তিব্বতী থাংকাঃ তিব্বতের ধর্মপ্রচারক লং কাপার চিত্র

যুগের শিল্পকলার পরিচয় দেয়। শারু-রী নামক যে সকল ধাতুমূর্তি তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও পাল-সেন যুগের শিল্পকলার প্রভাবযুক্ত। ১০৪২ খৃঃ বাঙালী বৌদ্ধধর্ম প্রচারক অতীশ শ্রীজ্ঞানদীপঙ্কর তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন ও বহু বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতেই দেহরক্ষা করেন। পৃথিবীর বর্তমান শ্রেষ্ঠ তিব্বত জ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর জর্জ রোরিকের মতে পাল যুগের বহু ছাঁচে-ঢালা মূর্তি অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের সহিত তিব্বতে প্রবেশ লাভ করিয়া তিব্বতের শিল্পকলাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

তিব্বতী ভাষায় 'থাংকা' নামে কথিত যে ধর্মচিত্রাবলী তিব্বতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই থাংকা অঙ্কনপদ্ধতিও ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত। তিব্বতী থাংকা তিব্বতীদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। থাংকাগুলিতে বিভিন্ন দেবদেবী, তন্ত্রায়নের ইস্টদেবতাসমূহ ও সাধকদের মূর্তি অঙ্কিত থাকে। প্রতি মঠ ও মন্দিরে, দেবতার মূর্তির পার্শ্বেই থাংকাগুলি ঝুলান থাকে। কোনও কোনও থাংকা সূচীকার্য দ্বারা তৈয়ারী হয়, কিন্তু অধিকাংশই রঙে আঁকা। এক-একটি থাংকার পঞ্চাশ টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হয়। যে সকল থাংকার পশ্চাদ্ভাগে কোন অবতার লামার বাম হস্তের সম্পূর্ণ ছাপ থাকে, সেগুলি সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। তিব্বতের ধর্মচিত্র এই থাংকাগুলিতে ভারতীয় পাল যুগের সুপরিপুষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

ভারতে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে যে ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তিব্বতী হস্তলিখিত পুঁথির পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রসমূহে।

তিব্বতীদের অজ্ঞানতার জন্যই তিব্বতের ছাঁচে-ঢালা মূর্তি এবং ধর্মচিত্রগুলিকে তাহারা 'বলুরিস' বা নেপালী শিল্পকলা বলিয়া থাকে। কিন্তু তিব্বতের শিল্পকলা সম্পূর্ণ ভারত-প্রভাবিত—তাহা ভারতীয়দের অবদান—অধিকাংশই বাঙালী শিল্পীর অনুকরণ। এই শিল্পকলা নেপালের পথে ভারত হইতে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তিব্বতীরা যেমন ভারতীয় সাহিত্য, লিপি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভারতীয় চিত্রকলাকেও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণ করিয়া।

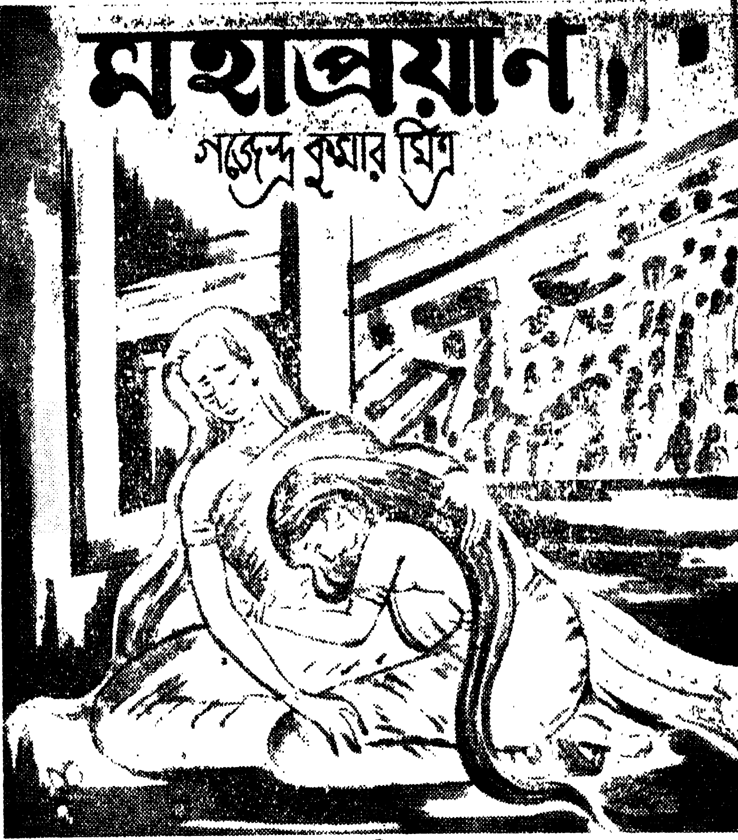
জীবন বিলাস

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত অনন্ত শূন্য
কোনোখানে সীমা তার নাই,
সমুদ্রের চেয়ে ঢের সীমাহীন অসীম-অসীম ঃ
কোটি-কোটি সূর্য তারা
কোটি-কোটি সূর্য-সূর্য আরো
কোটি-কোটি বৎসরের শূন্যে পথ ব'য়ে যেতে পারে
লক্ষ্যহীন বস্তু হের তীব্রতম ঝড়ের প্রবাহে,
স্থানে-স্থানে নীহারিকা রূপ নিতে পারে,
আলোদ্ভাসি কোনো এক স্নিগ্ধ বাস্তবের;
শূন্যতার তবু কোনো তীরাঙ্কণ নাই।
অতর্কিতে এই কথা মনে হলে বিদ্যুতের মতো
অর্জুনের বিহ্বলতা মগজের ভাঁজে ভাঁজে বসে যেতে পারে,
মানুষের সারা মন মুহূর্তের আলোড়নে শূন্য হয়ে যায়—
কেউ শুধু ভয় পায়
আর কেউ আজীবন পৃথিবী হারায়!

পৃথিবীকে ভালোবাসি,
ভালোবেসে চিরকাল ভুলে যেতে চাই।
সমুদ্রের চেয়ে অই সীমাহীন শূন্যের নিখিল
অনন্ত অনন্ত শূন্য, অন্ধকার ও আমার নয়।
শূন্যতাকে ঢেকে দিয়ে আমি দেখি চিরকাল রয়েছে আকাশ,
অসংখ্য তারার দীপে নীলোজ্জ্বল ফাল্গুনের রাতে,
পরিচিত একফালি তৃতীয়ার চাঁদ উঠে আসে,
বন্ধুর মতন সূর্য ঘুরে ঘুরে রৌদ্র দিয়ে যায়—
ছোট-ছোট কচি ঘাসে
ছোট-ছোট বালির কণায়
সবুজ সুপুরী গাছে
অশথের ডালে-বাঁধা নীড়ে
ছোট-ছোট পাখীদের
ছোট-ছোট ছানার ডানায়।

শূন্যতাকে ভুলে গেলে
র'য়ে যায় এ পৃথিবী কেবল আমার;
আমি আর আমার পৃথিবী
জীবনের রাখী দিয়ে কেমন নিবিড় করে বাঁধা!
অনেকের বাড়ী ঘেঁষে একখানি ছোট বাড়ী
একখানি ছোট গ্রাম বেঁধে তোলা চলে,
কোনো মেয়ে কোনো দিন মাঝমাঠে দেখা হ'লে
ভালো লেগে গেলে
কাঁপে না-কো আমার এ রাখীবাঁধা হাত,
হৃদয়ের মালা দিয়ে
দেহ দিয়ে পলে-পলে ভালোবাসি তাকে।
তরঙ্গিত জীবনের ধারা বেয়ে চলি।
কোনো রাতে কোনো ঝড় আমাদের গ্রাম ছেয়ে
ছোট-ছোট বাড়ী ছেয়ে এলে
আহত প্রেমিক যেন পৃথিবীর মুখ চেয়ে জাগি;
ঝড়ে ঘর ভেঙে গেলে
আবার শিশুর মত কাঁদি।
শূন্যের নিখিল ভুলে আমি এক জীবন-বিলাসী।



ঘটনাটা খুবই শোকাবহ, তাতে সন্দেহ নেই। রায় বাহাদুর কৃষ্ণকালী বসুর বড় ছেলে মণি হঠাৎ দিনপাঁচেকের বাতজ্বরে মারা গেল।

ছেলের মত ছেলে মণি। দেখতে ত খুবই সুপুরুষ, তাছাড়া এই মাত্র বছর দুই আগে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে পাশ করে মোটা মাইনের সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছে। এমন ছেলে অথচ একটু অহঙ্কার নেই, তাকে নিয়ে তার বাপ-মায়ের অহঙ্কারের অবধি ছিল না, কিন্তু মণি নিজে সকলের সঙ্গে সহজে মিশত। তার মুখের মিষ্টি হাসি যে একবার দেখেছে, সে আর কখনও ভুলবে না। মণির নিজের বিশেষ বিদ্যা ছাড়াও পড়াশুনা ছিল সব দিকেই—সেজন্য অধ্যাপক থেকে শুরু করে অনেক বিশিষ্ট লোকই তাকে সমীহ করতেন। পাড়ার ছেলেদের কাছে ত সে দেবতা, সব ব্যাপারেই ওকে তারা দলপতি করে কাজ করত, ও ছিল তাদের পাণ্ডা। মণিদাকে নিয়ে তাদের গর্বের শেষ ছিল না, আর এত রকম প্রতিষ্ঠানও মণি গড়েছিল। এত খাটতেও পারত! ওর মা প্রায়ই লোকের কাছে বলতেন, ;একটা ত মোটে মাথা, এতগুলো কথা মণি মনে রাখে কি করে, তাই ভাবি।'

শুধু ঘরের কোনে বসে পড়াশুনোই করেনি। খেলাধুলো ব্যায়ামেও সে কম যেত না কারুর চেয়ে। সেজন্য তার দেহটিও ছিল সুন্দর—লোকের ঈর্ষা করবার মত। সেই মণির এমন অকস্মাৎ মৃত্যু হবে, তা কে ভেবেছিল। তাও বাতজ্বরে।

কথাটা অবিশ্বাস্য। বড় বড় ডাক্তার ডাকবার অবসরও পাওয়া গেল না। শোকের প্রথম বিহ্বলতা কাটলে রায় বাহাদুর বার বার সেই কথা বলেই কাঁদতে লাগলেন, 'ওরা আমাকে বললে না কেন একবার যে রোগটা এত সিরীয়স্।......আমি বিধান রায়কে ডাকতে পারতুম, ডেনহ্যাম হোয়াইট্ আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড, তাকে টেলিগ্রাম করতুম সে এয়ারে এসে যেত দার্জিলিং থেকে। আমি বড় হোমিও-প্যাথও কাউকে ডাকতে পারতুম। আমার আবার ডাক্তারের অভাব! আমার নাম শুনলে যাকে ডাকা হ'ত সেই আস্ত।......এ যে আমি কিছু বুঝতেই পারলুম না। হায়, হায়—ছেলেটাকে বেঘোরে হারালুম!......এ আমার কী হল! ......আমায় কেবল ওরা বুঝোলো যে ও কিছু নয়, সেরে যাবে!......

রায় বাহাদুরের ভাই চুণীবাবুও বল্তে লাগলেন, 'হয়ত বাছা বাঁচত না, পরমায়ু ছিল না যেত্ই তবে এতটা আফশোষ ত থাকত না। বোম্বের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আমার ফ্রেন্ড্— আমি সব ক'জনকে এনে হাজির করতে পারতুম।......এ তোমরা কী করলে দাদা?'

সত্যিই চুণীবাবু বোম্বের মস্ত বড় ব্যবসায়ী, তাঁর প্রতিপত্তি কত। এই ছেলেটি ছিল তাঁরও নয়নের মণি। আর রায় বাহাদুরের ত কথাই নেই। গভর্নমেন্টের অত বড় পদস্থ কর্মচারী—মিনিস্টাররা পর্যন্ত তাঁকে খাতির করেন। সমস্ত বাঙলা দেশটা বলতে গেলে ওঁর হাতের মুঠোয়। তাঁরই একমাত্র ছেলে মারা গেল মাত্র দুজন সাধারণ এম বি ডাক্তারের হাতে—এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হতে পারে!

পাড়ার লোক বলতে লাগল, 'উচিত কিরণ ডাক্তারকে জেলে দেওয়া!'

'ওদের দফা সারা হয়ে গেল চিরদিনের মত।' একজন বললেন।

কিন্তু তাতে কি আর মণি ফিরবে?

মণি মারা গেল রাত নটার সময়। কথাটা বিশ্বাস করতে এবং শোকের প্রচণ্ডতা কাটতে কাটতে রাত বারটা বাজল। এবার আসল কথাটা না পাড়লেই নয়। পাড়ার লোকেরা উসখুস করতে লাগল। শেষে প্রবীণ গোছের একজন এগিয়ে গিয়ে মণির বড় মামা হিতেনবাবুকে ধরলেন, 'হিতেনবাবু......শোক যতই হোক— এধারেও কর্তব্যের ত্রুটি হতে দেওয়া ত চলতে পারে না। যদি অনুমতি করেন ত—'

মাথায় হাত দিয়ে একপাশে বজ্রাহতের মত বসেছিলেন হিতেনবাবু, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন মুখ তুলে।

'হ্যাঁ?'

'বলছি, তা হ'লে এবার উদ্যোগ আয়োজন ত করতে হয়—'

হিতেনবাবু অসহায়ভাবে ভগ্নীপতির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেষ্ট—'

কান্নায়-ভাঙ্গা গলায় রায় বাহাদুর বললেন, 'কি বলছ হিতু?'

'এ'রা বলছিলেন—

'হ্যাঁ—এ'রা কী বলছিলেন?' আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করেন রায় বাহাদুর।

'এ'রা বলছিলেন যে এবার তাহ'লে...... মানে—যদি—এদিকেও ত প্রস্তুত হ'তে হয়।'

'না না', আকুলভাবে যেন আর্তনাদ করে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'ওরে বাপ্‌রে, এই অন্ধকার রাত্রে বাবাকে আমার কোথায় পাঠাবো!... না না হিতু, মণি আমার ভয় পাবে যে! সকাল হোক্।'

তারপর একটু কান্নার বেগ কমলে আবার বললেন, 'তা ছাড়া খোকা ছিল এ পাড়ার রাজা, আন্‌ক্রাউনড্ কিং, রাজার যোগ্য সমারোহে ওকে পাঠাতে হবে ভাই!'

অগত্যা সবাই চুপ করে গেলেন। স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে রায় বাহাদুর ডাকলেন, 'মন্মথ,— ওরে কে আছিস রে?'

রোরুদ্যমান দু তিনটি চাকর এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। দাদাবাবুকে তারা ভালবাসত।

'ওরে এসেছিস্, মন্মথ, আমার সিগারেটের কৌটোটা দ্যাখ্‌ত—আর দেশলাইটা।'

মন্মথ সিগারেটের কৌটোটা এনে হাতে দিতে রায় বাহাদুর অদ্ভুত একটা হাসি হাসলেন, পাগলের মত।

'কাঁদছিস্ তোরা? কাঁদ্ কাঁদ্। দ্যাখ যদি তোদের কান্নায় তোদের দাদাবাবু ফেরে আবার। নিষ্ঠুর সে, বাপ-মায়ের কান্নায় তার মন ভিজল না। ওহো, বাপ্‌রে!'

সিগারেট ধরাতে হাত কাঁপে থর থর্ করে। তবু সিগারেট ধরিয়েই একটু যেন সুস্থ হলেন রায় বাহাদুর। কাকে যেন কৌটো আর দেশলাইটা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন হিতেনবাবুর কাছে দিতে—

রাত্রে নিয়ে যাওয়া হবে না শুনে একে একে পাড়ার লোকেরা অনেকেই বাড়ী চলে গেল। দু একজন, যারা রায় বাহাদুরের একটু বেশী অনুগত, তারা এদিক ওদিকে মুড়ি সুড়ি দিয়ে বসল। কেউ লাইব্রেরীতে, কেউ বারান্দায়, দু একজন মৃতের ঘরের পাশের ঘরটায়—যে যেখানে পারলে আশ্রয় নিলে। আত্মীয়রাও অনেকে এসে পড়েছেন। মেয়েরা এই দুঃসহ শোকের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে বাধ্য হয়েছেন—তবে শোবার জায়গা দেওয়া যায়নি। ছেলেগুলো যেখানে সেখানে পড়ে আছে।

ক্রমশ আরও রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মণির মায়ের একটা একটানা গোঙানির মত শব্দ শোনা যেতে লাগল। মণির বৌ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তার জ্ঞান হয়েছে বটে এখন কিন্তু সে কাঁদেনি—স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বসে আছে। সবে বেচারীর এক বছর বিয়ে হয়েছে, তায় অন্তসত্ত্বা।

একে একে ঘুমিয়েও পড়ল দু একজন করে।

সিঁড়ির মুখে কোণের রেলিংটাতে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন হিতেনবাবু। অসহ শোকের ক্লান্তির মধ্যে একটু ঢুলুনি শুরু হয়েছে তাঁর। মধ্যে মধ্যে চমকে তন্দ্রা ভেঙ্গে গিয়ে কথাটা যখনই মনে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন—ওরে বাপ্ রে!

শুধু ঘুম নেই রায় বাহাদুরের। কত কী কথা মনে পড়ছে তাঁর। ছোট বড় কত কি স্মৃতি। শৈশব থেকে এতকাল পর্যন্ত মণির বড় হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর পক্ষে ঘুমানো সম্ভব নয়।

মণির মায়ের গোঙানি থেমে এসেছে। শুধু ওরই মধ্যে এক একবার নতুন করে কেঁদে উঠছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—তারই শব্দে ঘরের অন্য আত্মীয়াদের তন্দ্রার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে সম্বিৎ ফিরে আসছে। তারা সশব্দে একবার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন।

পাশের ঘরে কার নাক ডাকার শব্দ শুরু হল।

চুণীবাবু বোধ হয়। কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বল্‌তে গেলে মৃতের ঘরেই নাক ডাকার শব্দটা অনেকেরই অশোভন লাগ্‌লে—কিন্তু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলে চুপ করে গেল। কারণ কে ওঁকে ডাকবে গিয়ে? কীই বা বলবে? প্রত্যেকেই আশা করতে লাগল অপর কেউ গিয়ে কর্তব্যটা সমাধা করবে—ফলে কারুর দ্বারাই হয়ে উঠ্‌ল না।

চুণীবাবুর ঘুম গাঢ়তর হয়ে উঠ্‌ল।

শেষ রাত্রে আবার দু একজন করে পাড়ার লোক এসে জড়ো হলো। দূরস্থিত আত্মীয়রাও আসতে লাগলেন এক এক করে। আবার নতুন করে কান্নার রোল উঠ্‌ল। নিয়ে যাবার সময় আসন্ন বুঝে মা আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগলেন। বৌমার ফিট্ শুরু হল মুহুর্মুহু।

চুণীবাবু গাঢ় নিদ্রা থেকে উঠে এসে সামনেই প্রথম দেখলেন ওঁর এক ভাগ্নী জামাইকে, অকস্মাৎ তার গলাটা জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন, 'এ তোরা কী করলি ভাই সুরেন? তোরা থাকতে বাবা আমার বেঘোরে মারা গেল!'

সুরেন মুখখানাকে যথেষ্ট করুণ করবার চেষ্টা করে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এসময়ে চোখে জলটা আসা উচিত ছিল কি না, অন্তত তার কাছে কেউ আশা করে কি না ঠিক বুঝতে না পেরে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পুরোনো ঠাকুর বৃন্দাবন বড়লোকের বাড়ী দীর্ঘদিন আছে, ইতঃপূর্বে আরও বড় লোকের বাড়ী নাকি ছিল সে, একটা হিটার জেলে জল চড়িয়ে দিলে। শশী ঝি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'এই সাত সকালে গরম জল কি হবে ঠাকুরদা? ছেলেমেয়েদের ত এখনও ঘুমই ভাঙ্গেনি।'

ঠাকুর গম্ভীর মুখে শুধু জবাব দিলে, 'চা হবে, চা।'

'চা?' শশী অবাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু কিছুক্ষণ।

চা তৈরি হলে মন্মথ একটা বড় ট্রেতে করে আট দশটা ধূমায়িত কাপ সাজিয়ে সামনে এনে ধরলে।

চা??

সবাই বিস্মিত হল। বোধ হয় একটু অপ্রতিভও।

চা খাওয়া উচিত হবে কি এ সময়ে? এই মুহূর্তে?

এই প্রশ্নটাই জাগে সকলের মনে। কিন্তু সেটা তখন এত প্রয়োজন, এত লোভনীয় যে কেউই একেবারে অস্বীকার করতে পারলে না। সকলেই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিতে লাগল অপরকে, 'ওঁকে আগে দাও।'

অর্থাৎ দু' চারজন আগে নিক্—নইলে চা খাওয়া এ সময়ে শোভন হবে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউই কিন্তু একথা বললে না যে 'আমি খাবো না।' প্রত্যেকেরই ঐ কথাটা উহ্য রইল—আগে ওঁর হোক, তারপর আমাকে দিও।

মন্মথও বহুদিনের খানসামা। সে বার তিন চার ঘুরে আর কাউকেই ট্রে থেকে কাপ তুলে নিতে বললে না—নিজেই এক এক কাপ প্রত্যেকের সামনে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেউই প্রতিবাদ করলে না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল, একজন আগে তুলে নিলেই নেওয়াটা সহজ ও শোভন হয়।

প্রথমে নিলেন চুণীবাবু। তারপর হিতুবাবু। তারপর সকলেই। পাড়ার বৃদ্ধ দ্বিজুবাবু একবার যেন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এখনও অবশ্য ছুৎ লাগেনি। তা ছাড়া...... তা ছাড়া পানকে বোধ হয় দোষ নেই—' তিনিও তুলে নিলেন চায়ের কাপ।

রায় বাহাদুর নিজেও।

চায়ের পর্ব শেষ হতে হতে রোদ উঠে গেল। রায় বাহাদুরের আশ্রিত মামাতো ভাই অজিত ইতোমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছে। সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে কখন বাইরে গিয়েছিল—এখন এক রিক্সা করে সাধারণ একটা দড়ির খাটিয়া এনে হাজির।

রায় বাহাদুর তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে

চোখ বুজে বসেছিলেন একটা ইজি চেয়ারে—সোজা হয়ে। খাটিয়া রাখার শব্দে চোখ খুলে দেখেই যেন জ্বলে উঠলেন, 'এ কী……এ কে আনলে? অজিত?……দূর হয়ে যাও, এখুনি, এই মুহূর্তে। যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।'

'আহা কেষ্ট অত অধীর হয়ো না, ছিঃ!'

সামনে এগিয়ে এলেন হিতুবাবু, 'অজিত তোমার বুদ্ধির দোষেই চিরকাল তুমি বকুনি খাও। খেটেও মরো অথচ কারুর কাছে তোমার আদর নেই—শুধু এই জন্যে!……এই খাটিয়া তুমি এনেছ মণির জন্য!'

রায় বাহাদুর সুরেনের দিকে ফিরে বললেন, 'বাবা সুরেন, যাও ত একটা ভাল বোম্বাই খাট……উহু-হু, বাবা আমার রে!'

কথা শেষ করতে পারলেন না রায় বাহাদুর, আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন।

সুরেন তৎক্ষণাৎ বললে, 'হ্যাঁ এই যে মামা-বাবু, দোকান খুলুক, এই ত সবে সাতটা।'

তারপর একটুখানি মাথা চুলকে হিতু-বাবুকে বললেন, 'আচ্ছা, তার চেয়ে যে খাট-খানাতে মণি বিয়ের আগে শুত……মানে এখন যেটা ঐ ঘরে আছে ঐটেই—'

হিতুবাবু একটু যেন বিপন্ন হয়ে মুখ তুলে রায় বাহাদুরের দিকে তাকালেন। রায় বাহাদুর ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন, 'ওটা আসল বার্মা টিকের খাট……অর্ডার দিয়ে করানো……তা ছাড়া খুলে বার করা সে-ও ত একটা হাঙ্গামা।'

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তা ছাড়া ও ত ভারি হবে— দু চার জনে নিতে পারবে না।'

'তার জন্যে কিছু ক্ষতি নেই। আমার মণিকে নিয়ে যাবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু'—বাধা দিয়ে বলে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'এতকাল মণি শুয়েছে ও খাটে, ওটাতে তার কত স্পর্শ লেগে আছে—না হিতু ও খাট প্রাণ ধরে দিতে পারব না। তা ছাড়া বৌমাই বা কি মনে করবেন?……সুরেন তুমি অন্য খাট আনিয়ে নাও।'

খাট পৌঁছবার পর বুক ফাটা কান্না এবং আকুলতার মধ্যে অতি কষ্টে দেহ বার করে এনে বাইরে শোওয়ানো হ'ল।

'ওরে, কে আছিস, মণি……মণিকে আমার সাজিয়ে দে তোরা—'

'হ্যাঁ মামাবাবু সে ব্যবস্থা হয়েছে।' সুরেনের স্ত্রী রত্না তাড়াতাড়ি চন্দনের বাটি হাতে এগিয়ে এল। একটা লবঙ্গ দিয়ে সযত্নে সে চন্দন পরিয়ে দিলে মণির কপালে। তারপর একটা নতুন দেশী ধুতি পরিয়ে দামী শাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল বুক থেকে পা পর্যন্ত।

এইবার ফুল।

এ'রাও ফুল এনেছিলেন যথেষ্ট কিন্তু তার বোধ করি প্রয়োজন ছিল না। পাড়ার অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল মণি, কোনটার সেক্রেটারী, কোনটার ভাইস প্রেসিডেণ্ট! তারা সকলেই ফুল কিনে এনেছে। এ বাজারে ফুল শেষ হতে কেউ ছুটেছে নিউ মার্কেটে—কেউ বা বৌবাজারে।

প্রথমেই এলেন পাড়ার শিশু-মিলনীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিসেস্ চৌধুরী।

অকস্মাৎ শোকার্ত বাড়ীর আবহাওয়াকে চমকে দিয়ে বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'য়্যাবাউট্ টার্ন, ফর্ম টু ঠিক আছে, মালতী তুমি এগিয়ে এস, রেবা মালতীর জায়গায় যাও। নাউ, মার্চ স্লো। মনে থাকে যেন করুণ তোমাদের কর্তব্য আজ, কেউ কথা কইবে না, কেউ অন্য কোন দিকে চাইবে না—দুজন দুজন করে এগিয়ে যাও।'

মার্চ করে এল মেয়েরা উঠান ভরে দালান সুদ্ধ লাইন দিয়ে দাঁড়াল। মুখ তাদের পাথরের মত ভাবলেশহীন, কেউ কোনদিকে চাইছে না। সত্যিই বাহাদুরী আছে মিসেস্ চৌধুরীর—এটুকু ছেলেমেয়েদের তিনি মিলিটারী ড্রিলের লৌহ স্বভাব দিতে পেরেছেন। প্রথম দুজন মেয়ের হাতে ছিল দুটি 'রিদ্', তারা ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে এসে মৃতদেহের ওপর সযত্নে ও সম্ভ্রমে সে দুটি রেখে দিল।

তারপর মিসেস্ চৌধুরী মৃতদেহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন……'হে ঈশ্বর, অত্যন্ত অসময়ে তুমি আমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতিকে কেড়ে নিলে। জানি না এতে তোমার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল। নিশ্চয়ই কোন মহত্তর মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করেছ। তাই আজ আমরা বৃথা শোক করব না। শুধু তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর আত্মা শান্তি পায়, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।'

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অস্ফুটকণ্ঠে সেই প্রার্থনা আউড়ে গেল। তারপর মিসেস চৌধুরীর ইঙ্গিতে ওরা আবার য়্যাবাউট টার্ন নিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী নিজে আর একটু রইলেন। এবার তিনি একটা সাদা রুমাল বুকের কাছ থেকে বার করে দুই চোখের কোণ অত্যন্ত সন্তর্পণে স্পর্শ করালেন।

রায় বাহাদুর অভিভূত ক্লান্ত কণ্ঠে একবার 'ও হো হো' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁরে কেউ মধুবাবুকে খবর দিয়েছে? তিনি না আমাদের আবার দোষারোপ করেন—'

মধুবাবু এক বিখ্যাত দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার।

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দাদা আমি সব ফোন্ করে দিয়েছি। এ পি আইকেও একটা ফোন করে দিয়েছি যদি ওরা কোন রিপোর্টার পাঠাতে চায়।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'এ পাড়ায় কালান্তরের কে একজন রিপোর্টার আছেন না?'

'তিনি বাড়ী নেই। বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে। দু বার লোক পাঠিয়েছি—'

'থাক। থাক। অত ব্যস্ত হবার কি আছে! ……আমাদের শুধু কর্তব্য পালন করা। বরং ভাল বোঝ একটা চিঠি লিখে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে এলেই যাতে চিঠিটা পায়—'

'আচ্ছা দাদা, এখনই পাঠাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে মৃতদেহকে নিয়ে সামান্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পাড়ার আর ডবলু-এ-সি'র ছেলেরা কোথা থেকে কয়েকটি বড় পদ্মফুল এনেছিল। সেগুলি সযত্নে ওর মাথার বালিশের ওপর, মাথা ঘিরে দুই কাঁধ পর্যন্ত সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ফুটন্ত পদ্মের মাঝখানে সেরা পদ্মটি নিমীলিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্বের। এখন মণির সম্বন্ধীরা দুটি উৎকৃষ্ট রজনীগন্ধার গোড়ে মালা এনেছে, তারা চায় মাথার ওপর দিয়ে মালাটা বুক পর্যন্ত লম্বা করে দিতে—সব ফুলের ওপর।

ছেলেরা বলছে, 'দেখুন পদ্মফুলগুলোর ভাল এফেক্ট হয়েছে, ওর ওপর দিয়ে মালা দুটো দিলে সব ফুল ঢেকে যাবে। তার চেয়ে দুটো মালা বুকের ওপর পাশাপাশি মেলে সাজিয়ে দিন।'

বড় সম্বন্ধী বঙ্কিম একটু উষ্ণভাবেই বললে, 'তাই কখনও সম্ভব! মালা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে না দিলে মালা দেওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া দেখুন, ও আমাদের ভগ্নিপতি, আমাদের এই মালা দেওয়ার একটা বিশেষ সিগ্‌নিফিকেনস্ রয়েছে যে!'

'উনি আপনাদের আত্মীয় হতে পারেন, কিন্তু উনি ছিলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণ; আমরা ছিলুম ও'র দিন-রাতের সহচর। আমাদের দাবী কারুর চেয়ে কম, এ আমরা মানব না।' একটি ছেলে ব'লে উঠল।

এগিয়ে এলেন মিসেস্ চৌধুরী। তিনি মধুর করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন ছেলেরা কিন্তু ঠিকই বলেছে। পদ্মফুলের একটা বিশেষ এফেক্ট হয়েছে, সেটা নষ্ট করা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে মাথার ওপর দিয়ে যদি দিতেই চান ত বরং মালা দিয়ে তার ওপর পদ্মফুলগুলো আবার রি-অ্যারেঞ্জ করতে হয়!'

'না না, তাহলে মালা দেওয়াও যা না দেওয়াও তা। আচ্ছা, আমরা মালা খুলে

গলায় দুপাশ দিয়ে গ‍ুঁজে দিচ্ছি, যাতে মনে হয় গলায় পরা আছে।'

খুশী হয়ে মিসেস্ চৌধুরী বললেন, 'তাই করুন। হ্যাঁ, পদ্ম, রিদ্ এগুলোর এফেক্ট আলাদা কিনা। দেখুন, কাইণ্ডলি মালা দেওয়া হলে আর একটা কাজ যদি করেন—ঐ রিদ্ দুটো চাপা পড়ে গেছে, যদি তুলে আবার পায়ের কাছে সাজিয়ে দেন। হ্যাঁ—ঐ, ঠিক হয়েছে। রিদ্ই এখানে বিশেষ উপযোগী কিনা। ওটার—'

রায় বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'কৈ মধুবাবু ত এলেন না। সুরেন বাবা, এমনি জনা-দুই ফোটোগ্রাফার ডেকে আনো। আমাদের কর্তব্য ত করতে হবে। গোটাকতক ব্লক করিয়ে কাগজে কাগজে। কাগজে—। এর পর না আমাদের কেউ দোষে।'

সুরেন বললে, 'এখানে অনেকেরই ক্যামেরা রয়েছে মামাবাবু, সাজানো কম্‌প্লিট হলেই ওরা ছবি নেবে।'

'তা হোক্। সে ও'রা নিতে চান নিন। কিন্তু প্রোফেসন্যাল দু-একজন আনা দরকার। যদি এ'দের ছবি শেষ অবধি না ওঠে। হাজার হোক্ এমেচার ত? উই কান্‌ট্ টেক্ দি রিস্ক!'

প্রোফেসন্যাল ফোটোগ্রাফার এলেন, আরও অনেকে ছবি নিলেন। ইতিমধ্যে মধুবাবুও এসে হাজির। সকলে সসম্ভ্রমে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলেন তাঁকে। চুনীবাবু তাঁকে দেখেই 'মধু ভাই, কী দেখতে এলি আর—সব শেষ যে ভাই' বলে কে'দে উঠলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার ফোটোগ্রাফার আনোনি?'

একটু ইতস্তত করে মধুবাবু চুপি চুপি বললেন, 'না।—আজকাল ওরা যেখানে সেখানে ফোটোগ্রাফার পাঠাতে চায় না দাদা। কাগজে স্পেস্ কম।'

চুণীবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'এটা যেখানে সেখান হ'ল! জানো, অন্তত সাতটা প্রতিষ্ঠানের ও এক্‌জিকিউটিভ বডির মেম্বার ছিল?'

'ঠিক আছে দাদা, ছবি ত উঠছে......আমি আমি সে ব্যবস্থা করে দেব—'

একজন ফোটোগ্রাফার বললেন, 'চুণীবাবু যদি কিছু মনে না করেন......বৌমাকে একবার এনে পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে—'

কে একজন বলে উঠলেন, 'আ ছি ছি! তাঁকে কেন আবার এমন নাটকীয়ভাবে টানাটানি করা; বেচারা একে কাতর—'

'না না। তাতে কি হয়েছে। তিনি ত আসবেনই। ঠিক বলেছেন আপনি। শেষ ফোটোগ্রাফ দুজনে—ওরে ও রত্না—'চুণীবাবু ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বৌমাকে কোনমতে ধরে এনে বসানো হ'ল। সে বেচারী কিন্তু এসে মৃতদেহ দেখেই আছড়ে পড়ল, মণির দু'পায়ের মধ্যে মুখ গ‍ুঁজে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে উঠতে লাগল।

ফোটোগ্রাফার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কৈ ছবি নিলেন না?'

'এখন, মানে এভাবে ত ছবি হয় না। একটু সামলে নিন্—মুখ তুলে না বসলে এফেক্টটা ভাল হবে না যে! ও'র মুখ ঢেকে থাকলে আর কী হ'ল।'

রায়বাহাদুর নিজেই এগিয়ে এলেন, 'ওমা—মাগো, একবার তোর মুখখানি তোল্ ত মা, ওদের কাজটা ওরা করুক। মারে—'

বিহ্বলের মত সে বেচারী মুখ তুললে।

হিতুবাবু কাকে যেন ডেকে বললেন, 'রত্নাকে বলো ওর মুখখানা একটু মণির মুখের দিকে ফিরিয়ে দিক। যেন একদৃষ্টে ও মণির মুখের দিকে চেয়ে আছে—বুঝতে পারলে না?'

ছবি তোলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বঙ্কিম ছুটে এসে বোনের মুখের ওপর থেকে এলো-মেলো চুলগুলো সরিয়ে দিলে।

'আহা হা, সরালেন কেন, এফেক্টটা ত ওতে ভালই হচ্ছিল।' মধুবাবু বললেন।

'উহু, সে রকম এলোমেলো এখনও আছে। ওটা যা সরিয়ে দিলুম, ওতে একেবারে মুখ ঢেকে যাচ্ছিল যে!'

ছবি তোলার পর মহাযাত্রার পালা।

আর এক প্রস্থ কান্না ও আকুলতা।

এরই মধ্যে এক বৃদ্ধ এসে বললেন, 'একটু প্রার্থনা করব হিতুবাবু। ইচ্ছে হচ্ছে একটু করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বেশত!'

সে ভদ্রলোক ব্রাহ্ম। তিনি নিজের মত প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, কিন্তু দু-এক লাইন বলবার পরই দেখা গেল, তিনি ঠিক প্রার্থনা করছেন না—ছোটখাটো বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার মধ্যে মণি তাঁকে কী রকম ভালবাসত এবং মান্য করত, সেই কথাই বেশি।

রায়বাহাদুর হিতুবাবুকে ডেকে বললেন, 'আমাদের মহামহোপাধ্যায়কে ডেকে আনবে নাকি, একটু স্বস্তিবাচন করতেন।'

'ঠিক। এখনই যাচ্ছি।'

মহামহোপাধ্যায় এলেন কিছু বিলম্বে। তাঁর স্বস্তিবাচন শেষ হ'তে হ'তে বেলা এগারোটা বাজ্‌ল।

হিতুবাবু বললেন,' এই পাড়াটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে ত?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ—আর যদি সম্ভব হয় ত ত্রিকোণ পার্কের দিক দিয়ে ঘুরে—ওরা সবাই ত ভালবাসত ওকে?'

ছেলেরা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একজন বললে, 'তার আর দরকার কি হবে, জ্যাঠামশাই, দু-পাড়া ত ভেঙ্গে পড়েছে। সবাই ত উপস্থিত।'

'তা বটে। যা তোমরা ভাল বোঝ বাবা!'

বঙ্কিম এগিয়ে এসে চুপি চুপি চুণীবাবুকে বললে, 'হাতে হীরের আংটিটা রইল কিন্তু কাকাবাবু, মিনে-করাটা না হয় থাক্—' তারপরই যেন একটু অপ্রতিভভাবে ম্লান হেসে বললে, 'এখনও এসব কথা চিন্তা করতে হচ্ছে এইটেই সবচেয়ে দুঃখের কথা; কিন্তু এসব ত এখন শিশুর পেটে যেটা আছে তার—নাবালকের জিনিসের জন্য জবাবদিহী ত করতে হবে আমাদের—'

চুণীবাবু শেষের কথাটায় একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'দ্যাখো, তোমরা ত যাচ্ছো—শ্মশানে গিয়ে খুলে নিও না হয়—এখানে এখন ওসব করতে গেলে বিশ্রী দেখাবে না?'

'তা ত বটেই। না, তাই বলছিলুম। কর্তব্যে ত্রুটি হলে ত চলবে না!'

ততক্ষণে মৃতদেহ গলিতে বেরিয়েছে, মিসেস্ চৌধুরী শোভাযাত্রা ঠিক করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। আগে পাড়ার ব্যাণ্ডপার্টি যাবে, তারপর ও'র শিশু মিলনীর ছেলেমেয়েরা (তারা এতক্ষণ ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে ছিল সার বেঁধে—সুতরাং ওদের দাবী অগ্রগণ্য) তারপর আর-ডবলিউ-এ-সি'র দল, তারপর মৃতদেহ, তারপর অন্যান্য ক্লাব, সবশেষে আত্মীয়রা এবং তারও পিছনে কীর্তনের দল।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

শোভাযাত্রার ব্যাগপাইপের সুর এবং কীর্তনের ধ্বনি ক্রমশ মিলিয়ে গেল—দূরে থেকে দূরান্তরে। বাড়ীর কান্নার আওয়াজও একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মার একটা একটানা গোঙানি এবং শিখরিণীর অব্যক্ত অস্ফুট একটা কাতর শব্দ শোনা যেতে লাগল শোকাহত বাড়িটার ক্লান্ত নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত।



শিক্ষা প্রসঙ্গ

গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শতাব্দীর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণ আজ অর্ধ সচেতন। অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী...এই সব জনসাধারণের মধ্যে চেতনা জাবাগার জন্য। সরকারী প্রচেষ্টায় অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ত হবে, কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষিত নারী পুরুষের সাহায্য ব্যতীরেকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার—অসম্ভব। এ কাজে দেশের প্রত্যেককে (যাঁরা শিক্ষিত) এগিয়ে আসতে হবে—তাদের অন্ধ ভাইবোনদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণের জন্য। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার বিশেষ প্রয়োজন। মনে পড়ে লেনিনের সেই ঘোষণা রাশিয়ার কর্মীদের মাঝে ১৯২১ সালে—"মনে রেখো যে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক কখনও জয়যুক্ত হতে পারে না। সাধারণ সকলে শিক্ষিত না হলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। সহযোগীতা অসম্ভব ও খাঁটি রাজনৈতিক জীবনও অসম্ভব।"

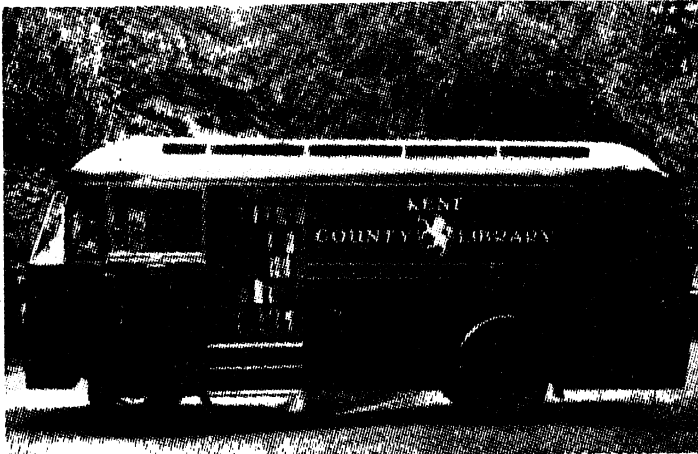
আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে যাত্রা, তর্জা, পাঁচালী, কবি গান; রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার করা হত, কিন্তু আজকালকার অর্থনৈতিক কারণে ঐ সকল ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের আর একটি প্রশস্ত পথ ছিল—দেশ ভ্রমণ। তীর্থ ভ্রমণের অছিলায় এ পথও বহুদিন খোলা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হওয়ার দরুণ এ পথও আজ রুদ্ধ।

ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক জাগয়ায় ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও আন্দোলন দ্বারা দেশের নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে। রাশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশ বিপ্লবের আগে ঐ দেশের অশিক্ষিত ও অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আমাদের দেশের মত। রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ও দেশের শিক্ষা বিস্তারের ধারারও আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই কার্য পরিচালনার ভার পড়ে সুখ্যাত Society for Combating illiteracy অর্থাৎ নিরক্ষরতা বিদূরণ সমিতি উপর। শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার; ভ্রাম্যমান পাঠাগার, স্কুল, কলেজ, শিক্ষা কেন্দ্র (Lenin Corners) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় লিখিত দৈনিক পত্রিকা বাহির করে দেশের জনসাধারণরে হাতে তুলে দেন। রুশ সরকার এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য আদৌ কার্পণ্য করেন নাই। জানা যায় যে, কেবলমাত্র য়ুক্রেন প্রদেশের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল অর্থাৎ ১০০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিস্তারের সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ঐ দেশের সহিত তুলনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সরকারী দরদ কতখানি। একমাত্র ঐরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পশ্চিমের দেখাদেখি, আমাদের দেশেও গত কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগারের মারফতে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু ঐ আন্দোলনের সুফলটুকু কেবলমাত্র বড় বড় শহরে খানিকটা ফলছে......গ্রামে তার রেশ আদৌ পৌছয় না। নানান কারণে ক্রমে ক্রমে গ্রামগুলি হতশ্রী হয়ে পড়ছে অথচ ভারতের যথার্থ উন্নতি নির্ভর করছে এই গ্রামের উন্নতির উপর। ভারত যদি গ্রামকে এভাবে আর কিছুদিন অবহেলা করে তাহলে ভারতের হতশ্রী হয়ে পড়তে আর বেশী দেরী লাগবে না।

আজকাল সরকারী তরফ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বহুল ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু ঐ প্রাথমিক শিক্ষালাভই কি তাদের শেষ গন্তব্যস্থল? প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তারা লেখা পড়ার ধার ধারে না...যেটুকু শিখেছিল তাও চর্চার অভাবে ধীরে ধীরে ভুলে যায়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত থাকলে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরও তারা ঐ সব গ্রন্থাগার থেকে বই পড়তে পারে এবং তার ফলে আয়ত্ত জ্ঞান ক্রমচর্চার দরুণ উত্তরোত্তর বাড়তে পারে। এঁদের মধ্যে হয়ত অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর আর গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের ধারে যাবেন না। তাঁদের মধ্যে পড়ার ইচ্ছা জাগাবার ও জ্ঞান-পিপাসা চালু রাখবার জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিরূপে কাজ করে তার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

সাধারণ লোক গ্রন্থাগার তো দূরে কথা গ্রন্থের ধার দিয়ে কেউ যান না। গ্রন্থাগারে যদি সাধারণে না আসেন তবে সাধারণের দোরে দোরে যেতে হবে গ্রন্থাগারকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ব্যবস্থা চালু করায় ফলে সুফল ফলেছে। প্রত্যেক পল্লীতে সপ্তাহের



ইংলণ্ডের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার

নির্দিষ্ট দিনে যানবাহনে সজ্জিত গ্রন্থাগার পল্লীবাসীদের দোরে দোরে গিয়ে উপস্থিত হয়। ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য তখন এক আধটা বই নিতে হয়। প্রথম প্রথম বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দেন—ঐ বই; আবার নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দেন বইখানি। দুচার সপ্তাহ এইভাবে যাবার পর পল্লীবাসীটির কেমন ইচ্ছা হয়, দেখিতো কি আছে বইয়ের মধ্যে। খুলে দেখেন সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি আর অল্প সহজ ভাষায় লেখা। খাওয়া দাওয়ার পর রঙীন ছবি দেখতে দেখতে নিত্য ঘুমিয়ে পড়েন ক্রমশ এই তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকে ঐ নির্দিষ্ট দিনে পল্লীবাসীটি দাঁড়িয়ে থাকে তার ঘরের সামনে উদগ্রীব হয়ে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য। নিজে আগ্রহ সহকারে বই খুঁজে বেছে নেন। এইরূপে কয়েক মাস যাবার পর যখন ধীরে ধীরে পড়ার নেশা জেঁকে বসল তখন ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সে পথে আসা বন্ধ কোরল। এতদিন গ্রন্থাগার এসেছিল পাঠকের দোরে...এখন দেখা গেল পাঠক গ্রন্থাগারের দোরে হাজির।

এছাড়া গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে স্থানীয় রুচী অনুযায়ী চিত্তাকর্ষক ছবি সিনেমার মধ্য দিয়ে দেখান যেতে পারে। এ সব ছবির মধ্য দিয়ে নানান দেশের, নানান জাতির ও নিজেদের স্বাস্থ্য, শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই সাধারণকে জানান যায়। যাঁরা পড়তে অপারগ ছবি হচ্ছে তাদের শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

তৃতীয়তঃ ব্যাপকভাবে জ্ঞান বিস্তারের জন্য সহজ ভাষায় সুন্দর অক্ষরে সচিত্র দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে সাধারণের হাতে অতি অল্প নাম মাত্র দামে তুলে দিতে হবে। সংবাদপত্র পাঠের কি উপকারিতা তা বোধ হয় অনেকেই জানেন এবং শেষে উপকারিতার মাত্রার চেয়ে পাঠের নেশা পাঠককে পেয়ে বসে। এই নেশা একবার জাগাতে পারলে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ফল দেয়। একাধারে পড়া ও শেখা দু কাজই হয়। দূর গ্রামে দৈনিক পত্রের অভাব বিশেষ লক্ষনীয়। কচিৎ কখনও একখানা আনন্দ-বাজার এসে পড়ে মাতব্বরের হাতে...সকলে তাকে বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে ঘিরে বসে আর হাঁ করে শোনে দেশ বিদেশের কত অজানা কথা ...উদগ্রীব হয়ে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাতে সস্তায় দৈনিক পত্রিকা সর্বসাধারণের হাতে গিয়ে পৌঁছায় সে ব্যবস্থা যত শীঘ্র চালু হয় তার জন্য সকল প্রকার আন্দোলন ও সুব্যবস্থা করতে হবে।

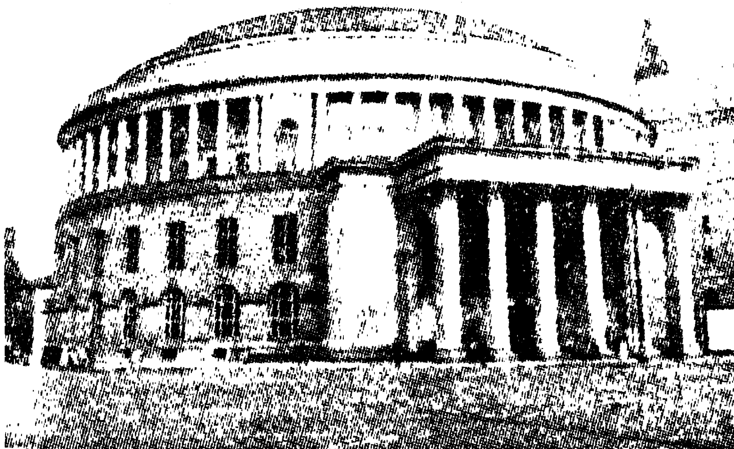


গ্রন্থাগারের ভিতর

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতিসমূহের সমকক্ষতা লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা বিশেষ করে রাশিয়া স্ব স্ব দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে কৃতকার্য। আমাদেরও আজ সেই পথ ধরতে হবে, কিন্তু সে পথে এগিয়ে চলা অত্যন্ত ব্যয় ও আয়াসসাধ্য। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে যদি কাজ চালান যায় তবে প্রচেষ্টা সফল হবেই হবে। ব্যয়ের সমস্যাটা হচ্ছে প্রধান সমস্যা। তবে সরকার যদি জন-সাধারণের সঙ্গে হাতে হাত মেলান এ কাজে, তবে সহজসাধ্য হবে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট কংগ্রেসে তাঁর বিধবা পত্নী ক্রুপস্কায়া যা বলেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

"Do not pay external respect to Lenin's personality. Do not build statues in his memory. He cared for none of these things in his life. Remember there is much poverty and ruin in this country. If you want to honour the name of Lenin—Build Childrens Homes, Kindergartens, Schools, Libraries, Ambulatories, Hospitals, Homes for Cripples and other defectives."

আমাদের দেশের নেতাদের মুখেও ঐ কথা শোনবার ও কথা কাজে পরিণত করার মত প্রেরণা পাবার জন্য আমরা উদগ্রীব।



ম্যাঞ্চেস্টার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

চার

[ফ্রাউলিন বার্স্টনারের বন্ধু]

পরবর্তী কয়েকটি দিন 'কে' ফ্রাউলিন বার্স্টনারের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারল না। তার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা অনেক-বার ইতিমধ্যে সে করেছে। কিন্তু প্রতিবারই সে পালিয়ে গেছে। অফিস থেকে রোজই সে সোজা বাড়ী ফিরে যায়। আলো নিভিয়ে দরজাটা খোলা রেখে সে তার ঘরে সোফার ওপর বসে থাকে। আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে 'এনট্রেন্স হল' দিয়ে কারা যাতায়াত করছে। যদি কোনো মেয়েলোক যাবার সময় তার ঘর খালি ভেবে দরজা বন্ধ করে দেয়, তবে সে একটু পরেই উঠে গিয়ে আবার দরজাটা খুলে দেয়। রোজ সকালে সাধারণতঃ যে সময় তার ঘুম ভাঙে তার চেয়েও ঘণ্টাখানেক আগে সে জেগে ওঠে। কাজে বেরুবার আগে যদি ফ্রাউলিন বার্স্টনারকে একা পাওয়া যায়। কিন্তু তার সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হল। অবশেষে সে একখানা চিঠি লিখল ফ্রাউলিন বার্স্টনারের জন্য। চিঠিখানা সে বাড়ি ও অফিস দুই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে আবার তার পূর্বেণ ব্যবহারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 'কে' জানতে চাইল তার জন্য ফ্রাউলিন বার্স্টনার কোনো ক্ষতিপূরণ চায় কিনা। চিঠিতে প্রতিজ্ঞা করল, এর পর থেকে সে 'কে'-র জন্য যে সমস্ত করণীয় নির্দেশ করবে, তার একটাও সে লঙ্ঘন করবে না। সে তার কাছে মিনতি জানাল। ফ্রাউলিন বার্স্টনার যেন একবার কথা বলবার সুযোগ তাকে দেয়। কারণ তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে সে ফ্রাউ গ্রুবাকের সঙ্গে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। চিঠির শেষে লিখল, পরের রোববার সে তার ঘরে সমস্ত দিন অপেক্ষা করবে। ফ্রাউলিন বার্স্টনার এসে যেন তাকে বলে যে সে তার অনুরোধ মঞ্জুর করেছে। অথবা মতানৈক্য সত্ত্বেও সে কেন তার সঙ্গে একবারও দেখা করছে না, সেকথা জানিয়ে যায়। কিন্তু তার চিঠিগুলোও ফেরৎ এলো না। আর কোনো উত্তরও এর সে পেল না। রোববার প্রথমে এমন আভাষ সে পেল, যাতে অনেক কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। খুব সকালে 'কে' দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে পেল, বাইরে 'এনট্রেন্স হলে' বেশ একটা গণ্ডগোলের ভাব। যার অর্থ একটু পরেই স্পষ্ট হল। ফরাসী ভাষার একজন শিক্ষয়িত্রী হন্তদন্ত হয়ে ফ্রাউলিন বার্স্টনারের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একজন জার্মাণ মেয়ে। নাম তার মনতাগ। বড় রুগ্ন মেয়েটি। গায়ের রঙ্ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুঝিবা একটু খুঁড়োও। এতদিন সে এ-বাড়ীর আলাদা একখানা ঘরে থাকত। এখন সে ফ্রাউলিন বার্স্টনারের সঙ্গে থাকবে। অনেকক্ষণ ধরেই সে 'এনট্রেন্স হলে' হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সব সময়েই মনে হয়, সে একটা না একটা কিছু ভুলে যাচ্ছে। হয় তার আন্ডার-ওয়ার, নতুবা কয়েকটা কাগজের টুকরো। অথবা কোনো বই। নতুন ঘরে যাবার সময় বোধ হয় ওগুলো অপরিহার্য।

ফ্রাউ গ্রুবাক এমন সময় তার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল। কে-র সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হবার পর থেকে ফ্রাউ গ্রুবাক 'কে'র প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়। মনে হয় সে যেন কে-র কাজেই তার জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু তবু 'কে' তার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু আজ আর 'কে' তার সঙ্গে কথা না বলে পারল না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল ঃ

'আজ এনট্রেন্স হলে এমন ভীড় কেন? অন্য সময়েই এইসব ঝাড়াপোছার কাজ হলে পারত। রোববারই কি এমন করতে হয় নাকি?' যদিও 'কে' ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকায় নি। কিন্তু তাকালে বুঝতে পারত সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। 'কে-র প্রশ্নটা যদিও বেশ রুক্ষ, কিন্তু তবু ফ্রাউ গ্রুবাক একে ক্ষমার নিদর্শন ভাবল। অথবা 'কে' যে তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, এই প্রশ্নে তা বোঝা যায়। সে বলল ঃ

'হের কে। আজ ত ঝাড়া-পোছার কোন কাজ হচ্ছে না। ফ্রাউলিন মনতাগ ফ্রাউলিন বার্স্টনারের ঘরে চলে যাচ্ছেন। তাই তার মালপত্র এভাবে সরাতে হচ্ছে।' আর কথা বলল না ফ্রাউ গ্রুবাক। চুপ করে থেকে সে লক্ষ্য করছে কথাটা 'কে' কিভাবে গ্রহণ করে। আর এর পরেও সে কিছু শুনতে চায় কি না। কিন্তু 'কে' কোন কথা বলল না। তাকে ভাবনার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখল। আর ফ্রাউ গ্রুবাকের কথা চিন্তা করতে করতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল। অনেকক্ষণ পর সে তার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

'আপনি আগে ফ্রাউলিন বার্স্টনারকে যেভাবে সন্দেহ করতেন, এখনো কি তাই করেন?'

'হের কে'। চীৎকার করে উঠল ফ্রাউ গ্রুবাক। বুঝিবা এই কথা শোনার জনাই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সে তার মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত আবেগে কে-র দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আপনি আমার সাধারণ একটা মন্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। আমি আপনাকে বা অন্য কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চাই না আপনি আমাকে অনেকদিন ধরে জানেন হের কে। তাই আপনিও বলবেন প্রকৃতপক্ষে আমার মনোভাব ওরকম নয়। এই কদিন আমি যে কি যন্ত্রণা অনুভব করেছি, তার আপনি কিছুই জানেন না। আপনি জানেন না আমার একজন বোর্ডার সম্পর্কে কেন আমি ওকথা বলে ছিলাম। আপনি শুধু আমার কথাটাই শুনেছেন আর কিছু নয়। তাই আপনিও আপনাকে নোটিশ দেবার জন্য আমাকে বললেন। আপনাকে নোটিশ দেব। শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে তা গলা বন্ধ হয়ে গেল। কান্নার আক্ষেপে তা বুক ফুলে ফুলে উঠছে। সে তার এ্যাপ্রন তুলে চোখ মুছল। কিন্তু তবু তার কা বাধা মানে না। হু হু করে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'লক্ষ্মীটি ফ্রাউ গ্রুবাক, কাঁদবেন না।' (বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল। তখনো ত মনে ফ্রাউলিন বার্স্টনার। অবাক হয়ে (ভাবছে, ঐ অদ্ভুত মেয়েটাকে সে তার ঘরে এ ঢোকালো কেন?

'লক্ষ্মীটি কাঁদবেন না' আবার বলল 'কে বাইরে থেকে সে তার চোখ এখন ভেত ফিরিয়ে এনেছে। সে দেখতে পায় তখ ফ্রাউ গ্রুবাক কাঁদছে।

'আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পা নি, ফ্রাউ গ্রুবাক। আমরা দুজনে দুজন ভুল বুঝেছি। আর এমন ঘটনা মাঝে সা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যেও ঘটে।'

ফ্রাউ গ্রুবাক তার চোখের ওপর থে এ্যাপ্রনের প্রান্তটা ফেলে দিল। 'কে'র দি তাকিয়ে দেখল, সত্যিই সে এবার খুসী কিনা

'যাকগে যা হবার হয়ে গেছে।' বলল। সাহসে ভর করে আবার সে গ্রুবাককে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আপনি কি কি করেন ওই অদ্ভুত মেয়েটার জন্য আপনার আমি বিরূপ হব?'

'ঠিক তাই হের 'কে'। ফ্রাউ গ্রুবা দোষই হল। গোলমাল মিটে যাবার পরেও

গোলমেলে কথা বলা। 'আমি নিজে মনে মনে ভেবেছি ঃ হের কে কেন ফ্রাউলিন বার্সংনারের জন্য এত কথা চিন্তা করেন। কেন তিনি তার জন্যে আমার সঙ্গেও ঝগড়া করেন? আর তিনিও জানেন, তার প্রতিটি কথা আমার রাত্রের ঘুম কেড়ে নেয়। আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি, শুধু তাই তাকে বলেছি।' ফ্রাউ গ্রুবোক বলল। 'কে' কোন জবাব দিল না। প্রথম কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার উচিত ছিল, ফ্রাউ গ্রুবোককে ঘর থেকে বার করে দেওয়া; কিন্তু সে তা করল না। সে চুপচাপ কফির পেয়ালায় চুমুক দিল। তার ইচ্ছা ফ্রাউ গ্রুবোক ভাবুক তার উপস্থিতি তাকে পীড়িত করে তুলেছে। ঘরের বাইরে সে ফ্রাউলিন মনতাগের ব্যস্ততার সাড়া পেল। তখনো সে 'এনট্রেন্স হলের' এধার ওধার করছে। দরজার দিকে আঙ্গুল তুলে সে জিজ্ঞাসা করলঃ

'আপনি সব শুনতে পাচ্ছেন '

'হ্যাঁ।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল ফ্রাউ গ্রুবোক। 'আমি ফ্রাউলিন মনতাগকে সাহায্য করার কথা জানিয়েছিলাম। এমন কি চাকর-দিয়েও মালপত্র সরিয়ে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনলেন না। সব কিছু তিনি নিজেই করতে চান। ফ্রাউলিন মনতাগের মত বোর্ডার সম্পর্কে সব সময়েই আমার বীতস্পৃহা। এখন আমার আরো খারাপ লাগছে দেখে ফ্রাউলিন বার্সংনার আবার তাকে তার নিজের ঘরে ঢোকালো।'

কফির কাপের নীচে জমা চিনিটুকু চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে 'কে' বললঃ 'সে সম্পর্কে এসব ভাবা আপনার অনুচিত। এর ফলে কি আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে?'

'না।' ফ্রাউ গ্রুবোকের জবাব। 'বরঞ্চ একদিক দিয়ে আমার ভালই হল। আমার একখানা অতিরিক্ত ঘরের দরকার ছিল। এখন সেটা পাওয়া গেছে। আমার ভাইপো, ক্যাপ্টেনকে আমি ওখানেই থাকতে দেব। কিন্তু বাকী এ ক'টা দিন সে যদি আপনার কোনরকম বিরক্তির কারণ হয়, তবে আমি ভারি অস্বস্তি বোধ করব। কারণ তার জন্য আমি আপনার পাশের ঘরটাই ঠিক করেছি। সে এই সব ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখে না।'

'কি কান্ড! আপনি ওসব ভাবছেন কেন? আমি ফ্রাউলিন মনতাগের এমন ব্যস্ততা সহ্য করতে পারছি না বলে কি অন্য কিছুই সহ্য করতে পারব না। ফ্রাউলিন মনতাগ এমন ঘন ঘন যাতায়াত করছে যে, তাকে সহ্য করা মুস্কিল।'

ফ্রাউ গ্রুবোক এবার হতাশ বোধ করল।

'হের কে, আমি কি তাকে বলব, আপাতত কিছুক্ষণের জন্য তার মাল সিফ্‌ট করার কাজ বন্ধ রাখতে। আপনি যদি বলেন তো আমি এক্ষুনি তাকে বলছি।'

'কিন্তু সে ত ফ্রাউলিন বার্সংনারের ঘরে যাচ্ছেন?' 'কে' উত্তেজিত হয়ে বলে।

'হ্যাঁ।' ফ্রাউ গ্রুবোক উত্তর দেয়। সে 'কে'র কথার কোন মানেই বুঝতে পারছে না। 'কে' তাই আবার বললঃ

'কিন্তু তাকে তার মালপত্র সরাতে না দিলে চলবে কেন?'

একথায় শুধু ফ্রাউ গ্রুবোক তার ঘাড় নাড়ে।

এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ফ্রাউ গ্রুবোক 'কে'-কে আরো উত্তেজিত করে তুলল। বাইরে থেকে দেখলে তাকে এখন অত্যন্ত একগুঁয়ে মনে হবে। জানালা আর দরজার পথে 'কে' এবার উঠে পায়চারী শুরু করল। তার ইচ্ছা, ফ্রাউ গ্রুবোক যেন এখন চট করে চলে যেতে না পারে। ফ্রাউ গ্রুবোক হয়ত মনে মনে সে কথাই ভাবছে।

'কে' সবে আবার দরজার কাছে গেছে, এমন সময় বাইরের কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলে 'কে' বোর্ডিংএর পরিচারিকাকে দেখতে পায়। ফ্রাউলিন মনতাগ হের 'কে'র সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান। তিনি 'ডাইনিং রুমে' অপেক্ষা করছেন। 'কে' যেন সেখানে যায়—একথা বলার জন্যই সে এসেছিল। কথা শেষ করে সে জবাবের জন্য একটু দাঁড়াল। খুব গম্ভীর হয়ে 'কে' কথা-গুলো শুনল। তারপর ফিরে ব্যঙ্গ-চোখে তাকাল ক্ষুব্ধ ফ্রাউ গ্রুবোকের দিকে। তার চোখের দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সে আগেই জানত এমন এক নিমন্ত্রণ ফ্রাউলিন মনতাগ তাকে করবে। এতক্ষণ ধরে এই রবিবারের সকালটুকু যত কষ্ট 'কে'-কে সহ্য করতে হয়েছে। তার বেশ ভাল মূল্যই এখন সে দেবে। 'কে' পরিচারিকাকে খবর দিতে বলল যে, সে এক্ষুনি যাচ্ছে। তারপর সে দ্রুতপায়ে পোষাক বদলাতে চলে গেল। ফ্রাউ গ্রুবোক এতক্ষণ ধরে ফ্রাউলিন মনতাগের ব্যবহারের জন্য বিলাপ করছিল। 'কে' এসবের উত্তরে শুধু তাকে ব্রেকফাস্টের ট্রে-টা সরিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

'কিন্তু আপনি যে কিছুই মুখে দেন নি।' ফ্রাউ গ্রুবোক বলল।

'বেশ তা হোক। আপনি এগুলো নিয়ে যান।' উত্তেজিত শোনাল 'কে'-র গলা। তার মনে হল ফ্রাউলিন মনতাগ সম্পর্কেও ফ্রাউ গ্রুবোকের সন্দেহ হতে শুরু করেছে। যত সব বাজে কান্ড!

ডাইনিং হলে যাবার সময় 'কে' একবার ফ্রাউলিন বার্সংনারের ঘরে উঁকি মারল। ঘরটার কপাট আধখোলা। এখনো তার ও-ঘরে প্রবেশে কোন অনুমতি নেই। ফ্রাউলিন মনতাগ তাকে তাই ডাইনিং হলে দেখা করতে বলেছে। কড়া না নেড়েই বা অন্য কোন আভাষ না দিয়ে 'কে' ডাইনিং হলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

সংকীর্ণ লম্বা ঘর। ঘরে মাত্র একটা জানালা। দরজার কোণাকুনি খানিকটা জায়গা ছিল। তাও জিনিসপত্র রাখার দুটো সেলফ দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ঘরের বাকী অংশটুকু বড় একটা ডাইনিং-টেবিলেই রুদ্ধশ্বাসা। ডাইনিং টেবিলটা দরজার কাছ থেকে আরম্ভ হয়েছে, আর তার প্রান্ত ছুঁয়েছে জানালাটা পর্যন্ত। টেবিলটার এক ধার থেকে অন্য ধারে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। টেবিলটা পাতাই আছে। রবিবার অধিকাংশ লোকই বাড়িতে খাবার খায় কিনা।

'কে' ঘরে ঢোকবার পর ফ্রাউলিন মনতাগ জানালার কাছ থেকে তার কাছে এগিয়ে এল। নিঃশব্দের মধ্যেই তাদের পারস্পরিক অভিনন্দন ঘোষিত হল। তারপর ফ্রাউলিন মনতাগ তার মাথাটা সোজা খাড়া করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললঃ

'আমি জানি না, আপনি আমার পরিচয় জানেন কি না।'

ভ্রূ কুঁচকে 'কে' তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ। আমি জানি আপনি অনেকদিন ধরে এখানে ফ্রাউ গ্রুবোকের সঙ্গে আছেন। তাই না?' 'কে'-র প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় এখানকার অন্যান্য বোর্ডারদের কোন খোঁজ-খবর আপনি নেন না। তাই কি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বসবেন না?' ফ্রাউলিন মনতাগ জিজ্ঞাসা করে। কথা না বলে তারা দুজন টেবিলের তলা থেকে দুখানা চেয়ার বার করে মুখোমুখি টেবিলের এক প্রান্তে গিয়ে বসল। কিন্তু হঠাৎ আবার ফ্রাউলিন উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। জানালার ফ্রেমের ওপর সে তার ছোট ব্যাগটা ফেলে রেখে এসেছে। ওটা সে আনতে গেল। প্রায় সম্পূর্ণ ঘরটাই তার ঘুরতে হল জানালার কাছে যাবার জন্য। ফিরে এসে ব্যাগটা হাতে নিয়ে অল্প দোলাতে দোলাতে সে 'কে'-কে বললঃ 'আমার বন্ধু আপনাকে কয়েকটি কথা বলতে বলেছে। আমি তা বলবার জন্য আপনাকে ডেকেছি। তার নিজের এসেই এই কথাগুলো আপনাকে বলার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু অসুস্থ থাকার জন্য সে আসতে পারে নি। তবে আমি কম অথবা বেশী কিছুই বলব না। সে এজন্য তাকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়েছে। আর বলেছে যেন তার পরিবর্তে আপনি আমার কথা শোনেন। আমি শুধু তার কথাই বলব, আর কিছু নয়। এছাড়া আমার মনে হয়, আমি সব কিছু ঠিক ঠিক বলতে পারব, তার কারণ আমি আপনাদের

ব্যাপারে নিরপেক্ষ। আপনি কি আমার কথা সত্য বলে মনে করেন না?'

'বেশ আপনি যা বলতে চান বলুন।' কে উত্তর করল। সে তখনো ফ্রাউলিন মনতাগের ঠোঁট দেখছে। তার দৃষ্টি তার কথাকে আর প্রকাশিত হবার সুযোগ দিচ্ছে না।

'ফ্রাউলিন বার্সৎনারের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি আমার সে অনুরোধ মঞ্জুর করেন নি।'

'সে কথাই ঠিক।' ফ্রাউলিন মনতাগ বলল। 'আপনি এই অনুরোধ রূক্ষ ভাষায়ও করেন নি। আর ইচ্ছে অনুসারে আমরা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে অমত করি না। তাই মনে হয় যে, এই সাক্ষাতের কোন অর্থ আছে বলে ফ্রাউলিন বার্সৎনার ভাবে না। সেজন্যই বোধ হয় এক্ষেত্রে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। আপনার সর্বশেষ মন্তব্যের পর আমার এরকমই একটা কিছু মনে হচ্ছে। আপনি আমার বন্ধুকে চিঠি লিখতে অথবা দেখা করে আলোচনা করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কি সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে চান, আমি জানি না। তবে তার হাবভাবে মনে হয়, আলোচনায় আপনাদের কারো কোন উপকার হবে বলে সে বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বলতে কি, কাল পর্যন্ত সে আমাকে কিছুই বলে নি। শুধু কথা প্রসঙ্গে সে বলল, এ ধরণের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কারণ হয়ত এই সম্পূর্ণ ধারণাটাই আপনার মনে আকস্মিকভাবে এসেছে। সেজন্যই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি বুঝতে পারবেন, কি ছেলেমানুষিই না আপনি করেছেন। হয়ত এর মধ্যেই আপনি তা বুঝতে পেরেছেন। আমি তাকে বললাম, হয়ত তার কথাই ঠিক। তবু আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে তার একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া দরকার। সে একথায় সায় দিল না। তারপর আমি যখন মধ্যস্থতা করবার কথা জানিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম, সে তখন রাজী হল। আমার মনে হয় এতে আপনারও উপকার হয়েছে। কারণ সামান্য বিষয়ের অনিশ্চয়তাও আমাদের প্রচুর উদ্বেগের কারণ হয়। আর এখন, এখন আপনি ইচ্ছে করলে সহজেই সব কিছু বেশ পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' 'কে' বলল। কথা শেষ করে সে ফ্রাউলিন মনতাগের দিকে তাকাল। তারপর টেবিলের দিকে। তারপর জানালার বাইরে—ওপাশে বাড়ির মাথায় তখন প্রখর সূর্য উজ্জ্বল। একটু পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে সে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। কয়েক পা ফ্রাউলিন মনতাগও তার পিছু পিছু এল। সে যেন 'কে'-কে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দরজার কাছে গিয়ে তাদের দুজনকেই কয়েক পা পিছিয়ে আসতে হল। কারণ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। ক্যাপ্টেন ল্যানৎস ঘরে এল। এই প্রথম 'কে' খুব কাছাকাছি তাকে দেখল। সে বেশ লম্বা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার মাংসল মুখের চামড়া যেন টান করা। ঘরে ঢুকে সে একটু মাথা নোয়ালো। 'কে' এবং ফ্রাউলিন মনতাগ এ অভিবাদন গ্রহণ করল। অভিবাদনের পালা শেষ ক'রে সে ফ্রাউলিন মনতাগের কাছে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার হাতের ওপর চুমু খেল। বেশ স্বচ্ছন্দ তার গতি। ফ্রাউলিন মনতাগের প্রতি তার ব্যবহার 'কে'-র সঙ্গে তুলনা করলে বেশ চোখে লাগে। সে 'কে'-র মত রূক্ষ মেজাজে মোটেও কথা বলছে না। তবে তার প্রতি ফ্রাউলিন মনতাগ এজন্য মোটেও রুষ্ট হয় নি। সে এখন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু কে মোটেও পরিচিত হতে চায় না। এমন কি ফ্রাউলিন মনতাগের প্রতি তার রূক্ষ ব্যবহার বদলাতে। 'কে'র মনে হয় এই হাতে চুমু খাওয়া, পরিপাটি ব্যবহার, এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুটি লোকের নাটকীয় প্রদর্শনী মাত্র। তারা অতি ভদ্রতার আবরণ দিয়ে 'কে'-কে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সব কিছুর গভীর অর্থ যেন হঠাৎ 'কে'র কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে ফ্রাউলিন মনতাগ বেশ বুদ্ধিমানের মত শত্রুর করাতকে তার অস্ত্র নির্বাচন করেছে। সে 'কে' এবং ফ্রাউলিন বার্সৎনারের মধ্যে যে পরিচয় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, আর এই গুরুত্ব আরোপ করার ব্যাপারে ফ্রাউলিন মনতাগ সমস্ত ব্যাপারটাকে কম অতিরঞ্জিত করে নি। সে ফ্রাউলিন বার্সৎনার ও তার মধ্যে যাতে আলোচনা হতে পারে, সে কথাও মেনে নিচ্ছে। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করল, যাতে মনে হবে যত কিছু বাড়াবাড়ি তার মূলে 'কে'। 'কে' জানে, এক সময় ফ্রাউলিন মনতাগ বুঝতে পারবে যে, সে প্রতারিত হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন কথা সে বলল না। সে বুঝতে পারে, ফ্রাউলিন বার্সৎনার একজন সামান্য টাইপিস্ট। সে খুব বেশীদিন এভাবে তাকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ইচ্ছে করেই সে ফ্রাউলিন বার্সৎনার সম্পর্কে ফ্রাউ গ্রুবাকের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিল। বেশ কড়া কথায় বিদায় নিয়ে তার নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে কথাগুলো ভাবছিল 'কে'। হঠাৎ পেছনে 'ডাইনিং হল' থেকে ফ্রাউলিন মনতাগের এক হাসির আঁচড় 'কে'-র গায়ে লাগল। তার হঠাৎ মনে হল, বোধ হয় তার ব্যবহার ক্যাপ্টেন ও ফ্রাউলিন মনতাগ বেশ উপভোগ করছে। বোধ হয় তাদের মনে সে খানিকটা কৌতুক সৃষ্টি করেছে। সে চারিদিকে একবার ভাল করে তাকাল। সে নিশ্চিত হয়ে জানতে চায়, এ হাসি আর কারো নয়। সব ঠিক আছে। নিথর নিস্তব্ধ। কোন কথা নয়, শুধু ডাইনিং হল থেকে তখনো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এমন সময় প্যাসেজের অপর পাশে রান্নাঘর থেকে ফ্রাউ গ্রুবাকের সাড়া পাওয়া গেল। 'কে'র মনে হল সে অপূর্ব একটা সুযোগ পেয়েছে। ফ্রাউলিন বার্সৎনারের ঘরের কাছে গিয়ে সে নরম হাতে দরজার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে কোন শব্দ না পেয়ে আবার, আবারো সে কড়া নাড়ল। কিন্তু তবু কোন উত্তর নেই। সে কি ঘুমুচ্ছে? কে ভাবল। না সে সত্যিই অসুস্থ। অথবা এ-ও হতে পারে, 'কে'-র নরম হাতে কড়া নাড়া বুঝতে পেরে অনুপস্থিতির ভাণ করছে। 'কে' এবার নিশ্চিত, এ ফ্রাউলিন বার্সৎনারের ভাণ। সে অবশেষে খুব শব্দ করে কড়া নাড়ল। কিন্তু তবু উত্তর নেই। সে দরজাটা এবার হঠাৎ খুলে ফেলল। তার একবারো মনে হল না, সে কোন অন্যায় বা অর্থহীন বাজে কোন কাজ করছে।

ঘরে কেউ ছিল না। অধিকন্তু এ ঘরের সঙ্গে 'কে'-র দেখা ফ্রাউলিন বার্সৎনারের ঘরের যেন কোন সাদৃশ্য নেই। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুটো বিছানা। দরজার কাছে খানতিনেক চেয়ার, তার ওপর জঞ্জালের মত জড়ো করা পোষাক এবং অন্তর্বাস। পোষাকের আলমারীটা খোলা পড়ে আছে। 'কে'র মনে হল। ফ্রাউলিন মনতাগ যখন তার সঙ্গে ডাইনিং হলে বসে কথা বলছে, তখন ফ্রাউলিন বার্সৎনার বাইরে চলে গেছে। 'কে' খুব আশ্চর্য হয় নি। কারণ সে আশা করে নি এত সহজেই ফ্রাউলিন বার্সৎনারের দেখা পাওয়া যাবে। তবু ফ্রাউলিন বার্সৎনারকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা সে করল শুধুমাত্র ফ্রাউলিন মনতাগকে চটিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু হঠাৎ তাকে হোঁচট খেতেই হল। দরজাটা বন্ধ করে দেবার সময় সে দেখে ফ্রাউলিন মনতাগ ও ক্যাপ্টেন ল্যানৎস 'ডাইনিং হলের' খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তারা সম্ভবত অনেকক্ষণ ধরেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের মত একবারো প্রকাশ করে না যে, তারা 'কে'র সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করেছে। তারা খুব নীচু গলায় কথা বলছিল 'কে'-র দিকে তারা শুধু ভাসা ভাসা চোখে একবার তাকাল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা বলার সময় সাধারণত এইভাবেই লোকে আশেপাশে মানুষের দিকে তাকায়। কিন্তু তাদের এই ভাসা ভাসা দৃষ্টিও 'কে' সহ্য করতে পারছিল না। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেয়ালের গা ঘেঁষে তার ঘরের দিকে গেল।

বাংলার পল্লীচিত্র

অনিরুদ্ধ

কাব্য ও কথা-সাহিত্যের যতটা আদর বা আলোচনা এদেশে আছে, চিত্র ও মূর্তি কলার তেমন নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্রষ্টার সংখ্যা বা সৃষ্টির পরিমাণ অল্প, এ কথায় আমাদের জাতীয় অসাড়তার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ হয় না। অবনীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়কাল হইতে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি যে হয় নাই বা তাহার পরিমাণ যে নিতান্ত কম, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বাঙালী যে পরিবেশে শৈশব হইতে গড়িয়া ওঠে, যে শিক্ষা পায়, তাহাতে কলা-চর্চার স্থান বড়ো একটা নাই; তাই জাতি হিসাবে নানা চারু ও কারু-কলার সমজদারিতে আমরা আজও কত পিছাইয়া আছি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সমস্ত সমাজ ব্যাপিয়া যে সংস্কৃতি, যে শিক্ষা ও যে রুচি ছিল তাহা যেমন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাকে অব্যাহত রাখিবার কোন সম্ভাবনা ও সার্থকতা নাই। অন্যদিকে নূতন সংস্কৃতি, নূতন শিক্ষা ও নূতন রুচি সমাজ-জীবনকে অধিকার করে নাই। সমাজবাদের * বিতর্ক সকালে খবরের কাগজ খুলিলেই চোখে খোঁচা মারে এবং মনটাকে সজাগ করিয়া তোলে যে হয়তো ভালোই; কিন্তু দেখিতেছি সমাজ কেবলই হাজার টুকরা হইয়া যাইতেছে, সকল ক্ষেত্রেই মানুষ আপনাকে বা আপনার ছোট গোষ্ঠীকে বাঁচাইতে প্রাণপণ লড়াই করিতেছে—আর্টেও ছাড়া-ছাড়াভাবেই সৃষ্টি এবং তাহার উপভোগ হইতেছে। সমস্ত সমাজকে লইয়া—সমাজের অধিকাংশকে লইয়া যেখানে আনন্দের প্রবাহ নাই, জীবনের প্রবাহ নাই, অমৃতের অধিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলে এমন কি, গোষ্ঠীতেও সীমাবদ্ধ হইতে বসিয়াছে, সেখানে আজও কবি যে কবিতা লেখে, পটুয়া যে ছবি আঁকে, রূপকারী যে নীরস কাঠ কুরিয়া কুরিয়া রূপের আলোছায়ার চমকে রসের অনুভূতি জাগাইতে ইচ্ছা করে—তার কারণ আর কিছুই নয়, 'স্বভাব যায় না মলে।'

একজন নবীন শিল্পীর কয়েকখানি কাঠ-খোদাই ছবির উপরে এতটা ভূমিকা ফাঁদা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। কবিতা বা গল্প আলোচনা করিতে বসিলে বাগ্‌বিস্তারের এবং তাহার ফলে কিছু একটা ভাব বা তত্ত্ব পাঠকের প্রত্যক্ষে আনিবার যে সুযোগ ছিল, এক্ষেত্রে তাহা নাই। কথা দিয়া কি ছবি বুঝানো যাইবে? জানি না সম্পাদক মহাশয় দু-একখানি ছবি পত্রস্থ করিতে উদ্যোগী হইবেন কিনা।

চিত্রকলার চর্চায় মানস সংস্কৃতির মান উন্নয়নের যে অপরিসীম সম্ভাবনা আছে, সে কথাটা আজ আমাদের দেশে, সুযোগ পাইলেই বলা দরকার। চিত্র বলিতেই পোস্টার বা প্রচার-চিত্র নয়, সিনেমা বা চলচ্চিত্র নয়; এ কথাটা আমাদের ভালভাবে জানা দরকার।

ভাষা-শিল্পে আমাদের মনটাকে যেমন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, এক ভাব হইতে আর এক ভাবে, এক রস হইতে অন্য রসে বা একই রসের নূতন কোন ব্যঞ্জনায় চালনা করে, কখনো বা একেবারে অনন্তে, অনির্দেশ্যে উদাস করে; রূপশিল্পে তেমন করে না। ইহাতে ছড়ানো মনকে বরং গুটাইয়া আনে; অশান্ত ভাবনাকে শান্ত করে; যাহা স্বপ্নলোকে আভাসে আবছায়ায় ধরাছোঁয়ার বাহিরে ছিল, তাহাকে স্থির-প্রসন্ন মূর্তিতে চোখের সমুখে ও মনের সমুখে উপস্থিত করে। শুধু যদি চোখের সম্মুখেই আনিত, তাহাকে ছবি বলিতাম না। তেমনি যদি কেবল স্থির হইয়াই থাকিত, তাহা হইলেও প্রাণে সাড়া জাগিত না। স্থির রূপের রেখায় রেখায় গতির ইঙ্গিত থাকে, আলো-ছায়ার বিচিত্র সম্মিলনে যেন কোন গানের তানে মীড়-মূর্ছনা বাজিতে থাকে।

হরেন দাসের আটখানি কাঠ-খোদাই দৃশ্যে সে গুণ প্রচুর পরিমাণেই আছে। অপরাধী যক্ষের মতো, প্রভু-শাপেগ্রস্ত মহিমা, লেখক এই শহরে নির্বাসিত; নবমেঘোদয়ে কুটজ-কুসুমে উদ্ধৃত অঞ্জলি রচনা করিয়া বিচ্ছেদ-কৃশা, কৃষ্ণা-একাদশীর শশিকলাসদৃশী, কোন প্রিয়তমার উদ্দেশে বার্তা পাঠাইবার কাল কিন্তু অতীত; সময়ও নাই, বেকার বসিয়া থাকার চেয়ে দশটা পাঁচটার একটা চাকরি জুটাইয়া লওয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি দৈবের দয়া বলিতে হইবে, সাদা কাগজে কালো ছাপের এই ছবি বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘের মতোই সহসা চোখে পড়িল; সঙ্গে সঙ্গেই দিক্‌ দিগন্তরের বাধা দূর হইয়া, রসাল-শাল-তাল-খর্জুর শালিনী অজয়-কপোতাক্ষ-ভৈরব-ভাগিরথী-শতনরী-হার-শোভিনী শ্যামলা, সুফলা বাঙলার দূরপ্রসারিত মাঠ বাট লোকালয়ের মূর্তি অন্তরে ছুটিয়া আসিল।

এই প্রিয় আর পরিচিত বাঙলার সব দিক দিয়াই আজ কী দুর্দশা সেকথা তুলিব না। কারণ, নানা বিপর্যয় বিপ্লব পার হইয়াও, এই ছবিতে যেমন দেখিতেছি, জেলে মাঝি-নদীতে জাল ফেলিবে, শালবনে, তালবনে রাখাল গরু-মহিষ চরাইবে, শিউলী শীতের সকালে খেজুর গাছে হইতে কলসী নামাইবে বা গুড় জ্বাল দিবে, খেয়া-নৌকা নদীর এপারের লোককে নদীর ওপারের পল্লীতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং পল্লীবালারা কোমল পদাঘাতে কঠিন কাষ্ঠ-খণ্ডকে তালে তালে তুলিয়া ও ফেলিয়া ঢেঁকি শালে ধান ভানার রীতি হয়তো একেবারেই ত্যাগ করিবে না। অন্তত যন্ত্রবাহন পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্ত্রণায় একেবারে হতবুদ্ধি হয় নাই, মুনাফা-শীকারবৃত্তির মদে একেবারে বেহুঁশ হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিমাত্রের মনেই এমন আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকাই স্বাভাবিক। এবং দুঃসাহস সঞ্চয় করিয়া একথা বলিলেও মিথ্যা বলিব না, যে অতিস্ফীত কলিকাতা শহর হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে বা বিপ্লবে বা আণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংস হইয়া যাইতেও পারে (গেলে বাঙালীর সংস্কৃতির আসলে কোন ক্ষতি হইবে বা শেষ পর্যন্ত কল্যাণই হইবে, তাহা বলিতে পারি না)—কিন্তু এই বনপ্রান্তর নদ-নদী আকাশ এগুলি শীঘ্র লুপ্ত হইবে না; গিরিরাজ



হাটের পথে (কাঠ খোদাই) — শিল্পী—হরেন দাস

---

* 'কম্যুনিজম' কথাটার বাংলা 'সমাজবাদ' হওয়াই ভালো মনে হয়।

হিমালয় পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিতে আসিতে আরও লক্ষ বৎসর অনায়াসে কাটিয়া যাইবে।

সেই কাঞ্চনার রূপকে আলোছায়ার রসে সিঞ্চিত ও ভালো-লাগার মাধুরীতে সঞ্জীবিত করিয়া শিল্পী যে আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এদেশে পুঁথি চিত্রণের কাজে কাঠ-খোদাইয়ের প্রচলন হইয়াছে বহুদিন হইল। দাক্ষিণাত্যে ছাপা পুরাণো বইয়ের ছবি বা আমাদেরই ঘরের পাশে বটতলায় ছাপা পুরানো ছবি দেখিয়াছি—উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির নিরিখে বলিতে হয় সেগুলি ভালো নক্সা বা আলঙ্কারিক রীতির কাজ, লেখাপড়ায় অশিক্ষিত কারিগরের সৃষ্টি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আর্টিস্টের কাজে ঠিক সেই রীতির বা সেই গুণের প্রত্যাশা



বিজয়া (কাঠ খোদাই) শিল্পী **হরেন দাস**

করা উচিত হইবে না। (আলঙ্কারিক রীতির কাজও কেহ কেহ করেন না এবং উপযুক্ত প্রতিভা থাকিলে তাহা আজও যে সার্থক রচনা হয় না, এমন বলিতেছি না।) রঙ-তুলি দিয়া যে দৃশ্য আঁকা যাইত, হরেনবাবু তাহাই সাদার উপর কালো মেলিয়া আমাদের গোচর করিয়াছেন। মাধ্যমের ভিন্নতায় আস্বাদের ভিন্নতা হইয়াছে। একথা সকলেই জানেন, চীনা চিত্রকরেরা যে কালো কালীর কাজ করেন, তাহা অল্প অভ্যাসে বা অল্প প্রতিভায় হইবার নয়। নানা বর্ণের সমাবেশে ও সমন্বয়ে যে চমৎকারের সৃষ্টি সম্ভব হয়, একই কালো কালীর টানে-টোনে, অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তানে, তাহার, কখনো বা তাহার বেশিও বা, প্রতীতি আনিয়া দেওয়া শুধু চিত্রবিদ্যা নয়, যাদুবিদ্যাই বলিতে হইবে। কাঠ-খোদাই কাজে কালীর কাজের অনুরূপ স্পষ্ট টোনের সম্ভাবনা নাই; একই কালোকে গাঢ়, অতি-গাঢ়, ফিকা আরো-ফিকা নানা পর্দায় ব্যবহার করা যায় না; সুতরাং সূক্ষ্মতার অবকাশ কম বলিতে হইবে এবং তুলি আর ছেদন-যন্ত্র, কাগজ আর কাঠ, ভিন্ন বলিয়াই উভয়ে একই প্রকার সাবলীল সাহস বা সুইপ বেগ ও বিস্তার সম্ভবে না। তা হউক, তবু একমাত্র সাদা-কালোর বিচিত্র সমাবেশে সব কথা বুঝাইতে হয় বলিয়া ইহাতেও বিস্ময় কম নাই, অল্প দক্ষতা থাকিলে চলে না। তিন আয়তনের বস্তুকে দুই আয়তনে (প্রধানত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে) দেখাইতে হয় বলিয়া প্রাচ্য চিত্রে কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অনেকটাই ইশারায় কথা বলিতে হয়, আর সুস্পষ্ট বাচন অপেক্ষা আর্টে তাহা বেশি বৈ কম সুন্দর নয়, তাহা কে না জানে। তেমনি বিচিত্র বর্ণের এই বিশ্ব দৃশ্যকে একটি বর্ণে ফুটাইতে হইলেও আভাসের ভাষা জানা দরকার; যতটা চোখে আসিতেছে, তাহার অনেক বেশি যাহাতে মনে আসে, শিল্পী ও রসিক উভয়েরই তেমন ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়া চাই।

সাদা-কালোর এইজাতীয় বাস্তব চিত্রের আবার দুই কোটি আছে—এক আলোতে কালোকে ধরিয়া দেখান; আর এক কালোর ভিতরে আলোর চমক, আলোর ইশারা, আলোর উঁকিঝুঁকি। বর্তমান শিল্পীর ঝোঁক দ্বিতীয় প্রকারের কাজেই। এটি হয়তো রুচির কথাই, কোন যুক্তি দিয়া ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা যায় না; তবু লেখকও এইপ্রকার ছবিই পছন্দ করেন। বিখ্যাত চিত্রকার রেমব্রান্ট যদিও রঙ দিয়া ছবি আঁকিয়াছেন, তবুও তাঁহারও এই একই আলো-আঁধারি মায়া সৃজনের দিকে ঝোঁক ছিল এবং একই কারণে তাঁহারও ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। (উল্লিখিত অক্ষয়-কীর্তি শিল্পীর কাজের সহিত বর্তমান শিল্পীর কাজের সর্বাঙ্গীণ তুলনা করিতেছি না।) হরেনবাবুর চতুর্থ চিত্রটি এই জাতীয় রচনার সুন্দর নিদর্শন। নদী আর আকাশ সব মিলিয়া একটি নিকষ-কৃষ্ণ পট; কয়েকটি আলোক-বিন্দুর চলস্ফুরণে স্পন্দনে শিল্পী ঊর্ধ্বে অদৃশ্য চন্দ্রলেখা আর নিম্নে গতিশীল বারিরাশি উভয়ই বুঝাইয়াছেন। সপ্তম চিত্রে কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া যে সাঁওতাল মেয়েরা চলিয়াছে, তাহাদের পা তোলা, পা ফেলা যেন দেখা যায়, যেন অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সকলেই চলিয়া গেলে কেবল চিত্রের একদিক হইতে অন্য দিক পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ শৈলমালা আর এই শাল-সেগুন গাছ দুটি, ইহারাই নিশ্বাস রোধ করিয়া ধু ধু দ্বিপ্রহরে সূর্য-মন্ত্র জপ করিবে।

কিন্তু কথা দিয়া ছবি ফুটানো যায় না, তাহার প্রয়োজনও দেখি না। কাজগুলি আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে। ইহার মধ্যে যথেষ্ট তারুণ্য ও সজীবতা আছে, শিল্পীর দূরব্যাপী সার্থক সম্ভাবনার যথেষ্ট আশা আছে। কবিতা নয় যে, কষ্ট করিয়া পড়িয়া তাহার অর্থবোধ করিতে হইবে, প্রবন্ধ নয় যে, ঘুম আসিবে, অসাধারণ মলাটে মণ্ডিত সর্বসাধারণ গল্প-উপন্যাস নয় যে, হয় রাজনৈতিক প্রচার, নয় বাস্তব জীবনের অনুচ্চারিত হাহাকার, নয়তো বেশিরভাগ যা দেখা যায়, বাড়ি-গাড়ি ও অবাস্তব প্রেমস্বপ্ন এই একঘেয়ে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে (পনেরো আনা আধুনিক গল্প, উপন্যাস কাহারও ভালো লাগে না বা লাগা উচিত নয়, একথা আমি বলিতে চাই না)—



দিগন্তের প্রহরী (কাঠ খোদাই)
শিল্পী—**হরেন দাস**

ছবির একটি সুবিধা এই আছে যে, তাহার প্রতি একবার কেবল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে হইবে। অবশ্য, ভালো করিয়া চাহিতেও যে সকলেই জানে তা নয়। তাহা হইলেও কিছু শিক্ষার দ্বারা, কিছু চর্চার দ্বারা, একবার চোখ খুলিয়া গেলে ঘরের বাহিরে আর ঘরের ভিতরে নয়নের আনন্দ, মনেরও আরাম, এমন অনেক কিছু পাওয়া যাইবে। এমন কি দিন-শেষে কর্মক্লান্ত, শহরবাসী, চাকরীজীবীরও ক্লান্তি দূর হইতে পারিবে। সমস্ত আকাশ পৃথিবী যে কথা বলিতেছে, কবি যে কথা বলিতেছে, চিত্রকর যে কথা বলিতেছে, আমরাও সেই কথাই বলিতে চাই, 'দ্যাখো! চাহিয়া দ্যাখো!'*

***Bengal Village in Wood Engravings by Haren Das Published by G. C. Laha Limited, 1, Dharamtola Street, Calcutta 13. Rs. 5|- per copy.**

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

......নিম্ব বৃক্ষতলে রত্নদান করিয়া আমি তাড়াতাড়ি ভীড় হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। উন্নগা পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়া শিলাঙ্গীর সহিত দেখা করিবার জন্য আমার সমস্ত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেখা পাইব কিনা কিছুই ঠিক ছিল না, তবু সেই উদ্দেশ্যেই আমি উন্নগা পর্বতের দিকেই চলিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে সহসা আমার বিঘাওয়ের কথা মনে হইল। সে ওরূপ করিল কেন? আমার মিথ্যাচরণ সে কি যাদুশক্তি বলে জানিতে পারিয়াছে? ভেকের মুখে কুকুরের ভাষা দিয়া সে কি এই কথাই বলিতে চাহিল যে ভেকের মুখ হইতে কুকুরের ডাক বাহির হওয়া যেমন অসম্ভব বিঘাওকে প্রতারণা করাও তেমনি অসম্ভব? সে কি যাদুশক্তি বলে সব জানিতে পারিয়াছে? ধবল চলিয়া যাইবার পরই সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল—"তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে"—তাহা তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। গজন্ধরের আচরণ, খিসু, ভংগার অন্তর্ধান সত্যই অমঙ্গল-সূচক। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছিলাম। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু যে ক্ষতি আমাদের হইয়াছিল তাহাও ভয়াবহ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।. মনে হইল বিঘাওয়ের খবরটা একবার লওয়া যাক। দেখা যাক আমাকে দেখিয়া সে কিছু বলে কিনা। এখন তাহার কুটীরের কাছে কেহ নাই (তাহার কুটীরের কাছে কেহ থাকিতেও চাহিত না) আমাকে দেখিলে হয়তো সে কিছু বলিত পারে। বিশেষত তাহার অদ্যকার অদ্ভুত আচরণের কারণ যদি আমিই হই নিশ্চয় কিছু বলিবে। উন্নগা পর্বতে কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছিলাম পুনরায় নামিয়া আসিলাম।

......বিঘাও কুটীরের বাহিরে বসিয়াছিল। তাহার হস্তে ছিল মৃত বাঘের থাবাটা। এটি তাহার অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল। কবে কোথা হইতে কোন মৃত বাঘের দেহ হইতে যে সে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। বাঘের সম্মুখের একটা পা-কে সে যষ্টির মতো ব্যবহার করিত। তাহার ভিতরের মাংস ছিল না, হাড়টা ছিল, চামড়াটা ছিল আর ছিল নখগুলি। চামড়ার খোলটার ভিতর বিঘাও নানাপ্রকার মাটি, পাথরের টুকরা, গাছের শিকড় প্রভৃতি পুরিয়া রাখিত। অদ্ভুত জিনিস ছিল সেটা একটা। আমি দূর হইতে দেখিলাম বিঘাও নিবিষ্টচিত্তে বাঘের নখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছে। নখগুলিকে সে সূক্ষ্ম লতা দিয়া এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া যায় নাই। আমি গিয়া তাহার সম্মুখে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে এইভাবেই তখন আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। তাহার পর উঠিয়া অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও কিন্তু এমনভাবে ব্যাঘ্রনখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল যেন সে আমাকে দেখেই নাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর অবশেষে আমি কথা কহিলাম।

বলিলাম, "আমাদের এই বিপদে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

বিঘাও ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার পর উত্তর দিল, "প্রস্তরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। প্রস্তরের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেও হয় না। প্রস্তরকে বাহুবলে সরাইয়া দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করিলে অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা আছে।"

এই কথা কয়টি বলিয়া আবার সে বাঘের থাবাটি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি আবার একটি প্রশ্ন করিলাম।

"নিনানির প্রেতাত্মা কিসে তৃপ্ত হইবে? শুধু ফল দিলেই হইবে কি?"

"নিনানির মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখা যাইবে ততক্ষণ তাহার প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার বিশ্বাস তাহার যদি কোনও কারণে অতৃপ্তি হয় সে নিজেই আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিবে।"

তাহার পর সহসা সে আমার মুখের উপর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাঘের থাবাটি তুলিয়া ধরিল এবং নখরগুলি দেখাইয়া বলিল, "ইহাদের তীক্ষ্ণতার মধ্যেই আমি প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছি। ইহারা মৃত নয়, জীবন্ত। ইহাদের নির্দেশ অমোঘ, লক্ষ্য সুনিশ্চিত।" আমি সভয়ে বাঘের থাবাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম, মনে হইল সেগুলি নড়িতেছে। আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, দ্রুতবেগে উঠিয়া পলায়ন করিলাম। বিঘাও অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

......দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ধবল নদীতীরে একা বসিয়া আছে। তন্ময় একাগ্র হইয়া বসিয়া আছে, কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যে কলধ্বনি জাগিয়াছে তাহারই নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস করিতেছে মনে হইল। আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম সে প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, পাণিদ্বয়যুক্ত। ধবলও প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু ভিন্নপথে।

......শিলাঙ্গীর সন্ধানে উন্নগার উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন সুড়ঙ্গের যে মুখটি দিয়া প্রবেশ করিয়া আমি কথকের অদ্ভুত কথকতা শুনিয়াছিলাম সেই মুখের ভিতর ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যদি তাহার দেখা না পাই নিনানির কাছে যাইব। নির্জন সুড়ঙ্গমুখে বসিয়া বসিয়া বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল কন্যা নদীর তীরে প্রথম ফসল বেশ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, ফলিয়াছিলও প্রচুর। কিন্তু দ্বিতীয় ফসলের বেলায় একটা না একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য কন্যানদীতে বান হয় নাই, ফসলও তাই এবার কম ফলিয়াছে। সহসা মনে হইল নিনানিকে এমনভাবে লুকাইয়া রাখা কি ঠিক হইয়াছে? তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটু আগে যে মিথ্যার জাল রচনা করিলাম সেই জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িব না তো? আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় জড়াইয়া পড়িবে না তো? বিঘাওয়ের কথা শুনিয়া মনে হইল নিনানির মৃত্যুসংবাদ সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নাই। বাঘনখের মধ্যে সে কিসের প্রতিকার সন্ধান করিতেছিল? আমাকে সন্দেহ করে নাই তো? একটা অনির্দিষ্ট ভয় আমার সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ভয় হইতে লাগিল কান্না যদি ভীষণ প্রতিশোধ লয়? নিনানিকে এমনভাবে শুধু শুধু লুকাইয়া রাখিতে গেলাম কেন! ধবল এবং বিঘাওয়ের নিকট যদি সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করি তাহা হইলে কি হয়? তাহারা এখন এই সত্যের মূল্য দিবে কি? নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভীড় করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সে তাহার গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল।

"দধু—নী, দুধু—নী"

মনে হইতেছিল কোনও অচেনা পাখীর ডাকে সমস্ত উপত্যকাটাই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি সুড়ঙ্গমুখ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম শিলাঙ্গী এক বোঝা সবুজ ঘাস লইয়া একটা গাছের ডালে বসিয়া আছে। সবৎসা গাভীটি মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কিন্তু কাছে আসিতেছে না।

"আমি তাহা হইলে ঘাস এইখানে ফেলিয়া দিয়া চলিলাম। অন্য গরু যদি খাইয়া যায় আমি জানি না।"

শিলাঙ্গী তখনও আমাকে দেখিতে পায় নাই। গাভীর উদ্দেশ্যে উক্ত কথাগুলি বলিয়া সে অধীরভাবে পা দুইটি দোলাইতে লাগিল। গাভী আর একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাছে আসিল না।

"দুধুনী—আহ্—আহ্—আহ্। মধুনী, মধুনী—"

সহসা দুধনী মধুনী ঊর্ধ্বপুচ্ছে পলায়ন করিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। শিলাঙ্গীও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। ঘাসের বোঝাটাও নীচে পড়িয়া গেল।

"উহাদের অদৃষ্টে আজ আর ঘাস নাই দেখিতেছি। এখনই অন্য গরু আসিয়া খাইয়া যাইবে।"

"তুমি গাছে উঠিয়াছিলে কেন? উহাদের কাছে গিয়া দিলেই পারিতে।"

"কাছে গেলে গুঁতাইতে আসে।"

"তুমি ঘাস দাও তবু গুঁতাইতে আসে।"

"বোকা যে"

হাসির আভা তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল ভিতর হইতে কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। পরমুহূর্তে কিন্তু আবার গম্ভীর হইয়া গেল সে। চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

বলিল, "একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, জান? আমাদের হয় তো এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে"

"কেন—"

"উলম্ভন নামে এখানে কোথায় যেন একজন রাজা আছে। সে নাকি এ অঞ্চলের সমস্ত বন পাহাড় প্রান্তর নদীর অধিপতি। রোহার নিকট সে লোক পাঠাইয়াছিল বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য। রোহা বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে যদি প্রয়োজন হয় এস্থান পরিত্যাগ করিব তবু বশ্যতা স্বীকার করিব না। ঝোনাঝিরা বলিতেছে এস্থান পরিত্যাগই বা করিব কেন, যুদ্ধ করিব। রোহা কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে আমাদের জনবল কম, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর নাই, যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের গরুর দল এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িবে—"

"উলম্ভন আমাদের নিকটও লোক পাঠাইয়াছিল। লোকটির নাম গজন্ধর। ভীষণাকৃতি দৈত্য একটা। আমাদের দলপতি ধবল আমাদের দলের ঘিসু ও ভংগাকে লইয়া গজন্ধরের সহিত গিয়াছিল উলম্ভনের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য। কিন্তু গজন্ধর তাহাদের উলম্ভনের কাছে না লইয়া গিয়া লইয়া গেল একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে। সেখানে আরও কয়েকজন দৈত্যাকৃতি লোক লুকাইয়াছিল। তাহারা ধবল ঘিসু ভংগাকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দী করিতে চাহিল। বলিল তাহাদের কোন পাহাড় হইতে নাকি পাথর বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। উলম্ভন নাকি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রস্তর নির্মিত কবর প্রস্তুত করাইতেছে। বনের মধ্যে হঠাৎ একটা বাঘ বাহির হইয়া পড়াতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ধবল কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘিসু ভংগার এখনও কোন পাত্তা নাই"

শিলাঙ্গী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার কথা শুনিতেছিল।

"তোমরা এবার কি করিবে?"

"এখনও কিছুই ঠিক হয় নই। ধবল বলিতেছে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক কি হয়। যুদ্ধ করা তাহারও ইচ্ছা নয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের লোকবলও প্রচুর নয়। ক্ষেতের কাজ করিতেই বহু লোকের প্রয়োজন যুদ্ধ করিবার লোক কই?"

শিলাঙ্গী বলিল—"আমরা দুই দল যদি একত্রিত হই তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। তাহার এই স্পর্ধা সহ্য করা উচিত নয়। ধবল যদি রোহার কাছে যায়—"

"ধবল কোথাও যাইবে না। তুমি যদি রোহাকে আনিতে পারে—"

"রোহাও আসিবে না—"

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হাসিয়া উঠিলাম সহসা। জগদ্দলবৎ অনড় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আজও উদীয়মান যৌবন যে অট্টহাস্য করে আমাদের মুখ দিয়াও সেই হাসি নির্গত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল, "তুমিই রোহার কাছে চল; আমিও ধবলের কাছে যাই।"

"তাহার পর?"

"তুমি রোহাকে গিয়া সোজা বলিবে আমরা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাই। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোমাদের শিলাঙ্গীকে আমি বিবাহ করিব। উলম্ভন আমাদেরও অপমান করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আমরা উভয় দল একত্রিত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিব"

"কিন্তু সব শুনিয়াও রোহা যদি আমাকে দূর করিয়া দেয়?"

"চলিয়া আসিবে"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"ধবলের কাছে যাইতে তোমার ভয় করিবে না?"

"একটুও না"

"তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও একথা তুমি ধবলকে বলিতে পারিবে?"

"স্বচ্ছন্দে। আমাকে বিবাহ করিলে তোমাদের কি কি সুবিধা হইবে তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব। তোমাদের ধবল লোক কেমন?"

"লোক খুব ভাল। রোহা?"

"রোহাও ভাল। তাহাকে একটা কথা বলিও তাহা হইলে সে খুব খুশী হইবে"

"কি কথা"

"বলিও যে তোমার বিশ্বাস গরুই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। ঝোনাঝিরা একথা স্বীকার করে না বলিয়া রোহা ঝোনাঝিরার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট। ঝোনাঝিরা বলে কোন প্রাণীকে ছোট করিয়া দেখা বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ। প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ গুণে শ্রেষ্ঠ। বাঘের যে গুণ আছে তাহা গরুর নাই। শশকের যে গুণ আছে তাহা আবার বাঘেরও নাই, গরুরও নাই। গরুকে শ্রেষ্ঠ বলার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এসব কথা বলিয়া রোহার মনে কষ্ট দেওয়া কি ঝোনাঝিরার উচিত? তুমিই বল।"

আমি একটু মুচকি হাসিলাম শুধু।

শিলাঙ্গী বলিল—"এই সবের জন্য ঝোনাঝিরাকে আমার ভালও লাগে কিন্তু। ঝোনাঝিরা বেশ নূতন রকম করিয়া সব জিনিস ভাবিতে পারে। খুব বুদ্ধিমান—"

"ঝোনাঝিরা তোমাকে তো বিবাহও করিতে চায়"

"চায়। কিন্তু শুধু আমাকে নয় আরও অনেককে। টংখীরা, মাজুম, মাদারী এই তিন জনকে সে ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়াছে। ভিদা, হৈনু, জাংটির সঙ্গেও বেশ ভাব হইয়াছে তাহার। হয়তো সে তাহাদেরও বিবাহ করিবে। আমি রাজি হইলে আমাকেও করিবে। কিন্তু আমি ওই ভীড়ে যাইতে রাজি নই"

সে যুগের পক্ষে কথাটা অদ্ভুত। এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাই নিয়ম ছিল সে যুগে।

"আমার যে স্ত্রী নাই তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?"

"খবর লইয়াছি"

"কি করিয়া খবর পাইলে"

"তোমাদের দলের সকলকে আমি চিনি। খুব ভোরে দেবদারু গাছের উপর উঠিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেকের কুটীর লক্ষ্য করিয়াছি। কে কে কোন কুটীরে থাকে সব জানি। তোমার সহিত আলাপ হইবার পূর্বেও জানিতাম তুমি কোন ঘরটিতে থাক। তোমার ঘরে কখনও কোনও স্ত্রীলোক দেখি নাই। তুমি বিবাহিত হইলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক থাকিত"

ভুরু নাচাইয়া শিলাঙ্গী হাসিয়া উঠিল, তাহার পর লাফাইয়া আমার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া ঝুলিতে লাগিল।

"সব জানি, তোমার সম্বন্ধে সব জানি"

"কিন্তু আমি যে নিনানিকে ভালবাসি"

"বাসিলেই বা। তাহাকে বিবাহ তো করিতে পারিবে না"

"তোমাকে বিবাহ করিলে আর কখন বিবাহ করিতে পারিব না বলিতে চাও?"

"না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার ইচ্ছাও হইবে না। আমি একাই তোমার চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া রাখিব।"

"একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকাই তো নিয়ম। তুমি ইহাতে আপত্তি কেন করিতেছ?"

"বড় ঝগড়া হয়। টংখীরা, মাজুম, মাদারী অহোরাত্র কলহ করিতেছে। কাল মাজুম টংখীরার নাক কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, জান?" শিলাঙ্গী আমার কণ্ঠ ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

"সে যে কি কাণ্ড যদি দেখিতে! মাজুম কিছুতেই টংখীরার নাক ছাড়ে না। ঝোনঝিরাও হিমসিম খাইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত প্রহার করিতে তবে ছাড়িল। টংখীরার নাকের খানিকটা একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়াছে! তোমাদের নিনানিরও নিশ্চয় সপত্নী আছে?"

"আছে বই কি"

"মারামারি করে?"

"করে। সকলেরই নিনানির উপর আক্রোশ"

"হইবেই। সে যে দেখিতে সুন্দর। টংখীরাও খুব রূপসী, তাই বেচারীর নাকটি গেল। আমি ওসবের মধ্যে কখনও যাইব না। আমার মনে হয় তোমার নিনানিও পলাইয়া আসিয়াছে সপত্নীদের জ্বালায়—"

"সে স্বেচ্ছায় আসে নাই, আমিই তাহাকে আনিয়াছি। আমারই অনুরোধে সে যক্ষিণীর গুহায় আশ্রয় লইয়াছে"

"সে কি আসিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। যক্ষিণীর সহিত তাহার ভাবও হইয়া গিয়াছে। যক্ষিণী তাহার দিদিমা হয়—"

"বল কি!"

শিলাঙ্গী ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "চল তাহার সহিত ভাব করিয়া আসি"

"আমি আগে যাই, তুমি একটু পরে আসিও। দুইজনকে এক সঙ্গে দেখিলে নিনানির মনে সন্দেহ জাগিবে। সে বড় হিংসুক"

"আমি তাহা হইলে কিছু দুধ আনি। যক্ষিণীকে তো আমি প্রায়ই দুধ দিতে যাই, সেইভাবেই যাইব। আজ কিছু বেশী দুধ আনিব যাহাতে নিনানিও একটু ভাগ পায়। দেখিও, দুধ খাওয়াইয়া ঠিক তাহাকে বশ করিয়া ফেলিব"

"বেশ"

"তুমি রোহার নিকট কখন যাইবে?"

"নিনানিকে আগে দেখিয়া আসি।"

"তোমার দেখা কখন পাইব।"

"সন্ধ্যায়"

"কোথায়"

"ওই ঝোপের নিকটই আমি অপেক্ষা করিব"

"আমি এখন যাই তাহা হইলে। রোহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিব। নিগম বন হইতে রোহা আজ আসিয়াছে। আবার হয়তো সেখানে ফিরিয়া যাইবে। তোমাকে হয়তো নিগম বনেই যাইতে হইবে। বেশী দূর নয়—"

"যত দূরেই হোক যাইব। কিন্তু তাহার আগে ধবলের সহিতও এবিষয়ে আলাপ করিতে হইবে একটু। তোমাদের দলের সহিত যোগ দিয়া আমরা উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব কি না তাহা ধবলই ঠিক করিবে, কারণ সেই আমাদের দলপতি। ঘিসু এবং ভুংগা যদি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে একটা কিছু করিতেই হইবে। ফিরিয়া আসিলেও হয়তো করিতে হইবে, কারণ উলম্ভন যে আমাদের সহজে নিস্তার দিবে তাহা মনে হয় না"

"দেখ, দেখ, দুধুনী মধুনী ফিরিয়া আসিয়া ঘাস খাইতেছে। প্রায় সবটাই খাইয়া ফেলিয়াছে। কখন চুপি চুপি আসিয়াছে আমরা জানিতেও পারি নাই"

শিলাঙ্গী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। যে যুদ্ধপ্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছিলাম মনে হইল তাহা তাহাকে মোটেই বিচলিত করে না। সহসা বলিল—"খুব সুন্দর, নয়?"

"উহাদের ধরিয়া রাখিলেই পার"

"ঝোনঝিরা ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নাই। ধরিলে কষ্ট হইবে না উহাদের? তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয় আমার"

"কি"

"ধরিলেই উহারা ফুরাইয়া যাইবে। এখন যেমন সকালে উঠিয়াই উহাদের খোঁজে বাহির হই, কোথায় আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াই, উহাদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করি, দূরে হইতে ঘাস ছুঁড়িয়া দিয়া দেখি উহারা খাইতেছে কি না—তখন আর এসব হইবে না। উহারাও ফুরাইয়া যাইবে, আমারও কাজ থাকিবে না।"

আমার মনে একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল।

বলিলাম, "আমার সহিত তোমার যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে আমিও তো তোমার কাছে ফুরাইয়া যাইব!"

"তুমি কি গরু না কি! তুমি যে মানুষ"

"হইলই বা"

"মানুষ অত সহজে ফুরায় না। প্রত্যেক মানুষে এক একটি ধাঁধাঁ। তাহাকে চিনিতেই অনেক দিন লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে, তাহার আদি অন্ত জানিতে জানিতে জীবনই শেষ হইয়া যায়"

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"এসব কথা আমার নয় কিন্তু, আমাদের কথক নীল-মিল একদিন বলিয়াছিল। আমার মনে হয় নীল-মিল ঠিকই বলিয়াছে। তোমাকে আমি মোটেই চিনিতে পারি নাই। ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তুমি আমাকে পারিয়াছ কি?"

"না—"

"কিন্তু একদিন আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিব। পারিব না?" শিলাঙ্গী সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

"নিশ্চয়ই পারিব"

সেদিন একথা বলিয়াছিলাম বটে কিন্তু সত্যই কি শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়াছিলাম? পারি নাই। আমার ভোগের নাগালের মধ্যে তাহাকে যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই তাহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু আমার ভোগের নাগাল কতটুকু? সেই ক্ষুদ্র পরিধিকে অতিক্রম করিয়া যে মহিমময়ী শিলাঙ্গী আমার ভোগাতীত লোকে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম যখন সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল।

"তুমি তাহা হইলে নিনানির কাছে যাও। আমিও একটু পরে আসিতেছি। তুমি কতক্ষণ থাকিবে?"

"বেশীক্ষণ নয়। তাহার খবরটা লইয়া চলিয়া যাইব। আমাকে আজই আবার ধবলের সহিত দেখা করিতে হইবে। কাল সময় পাওয়া যাইবে না, কারণ, কাল আমাদের খনিত্র পূজা, ধবল ব্যস্ত থাকিবে"

"খনিত্র পূজা কি"

"আমরা গাছের শাখা সূচালো করিয়া তাহা দিয়াই জমি খুঁড়ি। কাল সেইগুলিকে একত্রিত করিয়া আমরা তাহাদের পূজা করিব। মেয়েরাই করিবে, আমরা কেবল উপবাস করিয়া থাকিব। আমাদের মেয়েরা এতক্ষণ বোধহয় ইঁদুর খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। এবার আমাদের ফসল তেমন ভাল হয় নাই। প্রথম বৎসর খুব ভাল হইয়াছিল। এবার তাই পূজাটা ভাল করিয়া করিতে হইবে—কাল ধবল হয়তো সমস্ত দিনই প্রার্থনা করিবে। আজই তাহার সহিত কথাবার্তা বলিব। নিনানির কাছে বেশীক্ষণ থাকা চলিবে না"

"আমি সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ঝোপের মধ্যে আসিয়া বসিয়া থাকিব। তুমি যেন বেশী দেরি করিও না"

"না, দেরি করিব না। আমি তাহা হইলে যাই এখন"

"বেশ—"

যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশে আমি যাত্রা করিলাম। শিলাঙ্গী কিন্তু গেল না। সে তাহার দুধুনী মধুনীকেই দেখিতে লাগিল। আমি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে তাহাদের কি যেন বলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের ডাকিতেছে, কিন্তু দুধুনী মধুনী কিছুতেই কাছে আসিতেছে না। (ক্রমশ)

অনুবাদ সাহিত্য

লাঞ্চ

সমরসেট মম

নাটক হচ্ছিল। মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ডাকলেন। বিরামের সময় তার পাশে গিয়ে বসলাম। অনেককাল আগে দেখা। ভুলেই গিয়েছিলাম। নামটা কেহ বলে না দিলে মনেই পরত না। বেশ উজ্জ্বলভাবে বললেন, কতকাল আগে দেখা। সময় যেন ছুটে পালায়! বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আপনার মনে আছে সে সাক্ষাতের কথা? আপনি আমায় লাঞ্চে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

ভাবছি, সত্যি কি আমার মনে আছে?

কুড়ি বছর আগে। তখন প্যারিসে ছিলাম। কবরখানার ধারে ছোট্ট ঘর। ওটাই ছিল আমার আস্তানা। কষ্টেসৃষ্টে দিন চলছিল। মহিলাটি আমার লেখা একটি বই পড়ে সে সম্বন্ধে চিঠি দেন। ধন্যবাদ জানাই। কিছু পরে আরেকটি চিঠি লেখেন। জানান, তিনি প্যারিসে আসছেন এবং এ অবসরে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তবে সময় বড় কম। আগামী বিসুদবার শুধু তার অবসর হবে। লুক্সেমবুর্গে সকালটা কাটাতে হবে তাকে। আমি যদি ফয়াটে ছোটখাট একটা লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তার খুব সুবিধা হয়। ফয়াটের রেস্তোরাঁয় ফরাসী দেশের উচ্চ আইন পরিষদের সভ্যরা পানআহার করেন। এর ব্যয় বহন করবার মত সামর্থ্য আমার নেই। ওখানে খাবারের কথা কোনদিনও ভাবিনি। এদিকে মনে মনে বেশ গর্ব বোধ করছিলাম। বয়সও অল্প, কোন মেয়েকে বিমুখ করবার মত মন তখনও তৈরী হয়নি। (খুব কম লোকই খুব বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন মেয়েকে বিমুখ করতে পারে)। আমার হাতে তখন মাত্র আশীটি সুবর্ণ ফ্রাঙ্ক। গোটা মাসটা পড়ে আছে। হিসেব করে দেখলাম, ছোটখাট একটা লাঞ্চ পনেরো ফ্রাঙ্কের মত হলেই চলবে। দু'সপ্তাহ কফি না খেলে বাকী ফ্রাঙ্ক দিয়ে মাসটা চালিয়ে নিতে পারব।

বিসুদবার সাড়ে বারোটায় ফয়াটে লাঞ্চের আয়োজন করে ফেললাম। মহিলা এলেন। যতটা কম বয়স ভেবেছিলাম তা নয়। চেহারাটা আকর্ষণীয়ের চেয়ে সম্ভ্রমযুক্ত বেশী। বছর চল্লিশ হবে। (বয়সটা লোভনীয় বটে। অবশ্য দেখে হঠাৎ উগ্র প্রেম জাগবার বয়স নয়)। শুভ্র বড় সমান দাঁতের পাটি। অনেক কয়টা দাঁত। এতগুলো না থাকলেও চলতে পারত। বেশী বকেন। আমাকে কেন্দ্র করেই কথা হচ্ছিল অবিশ্যি। কাজেই শুনতে মন্দ লাগছিল না।

দামের চার্ট দেখে চমকে উঠলাম। আশাতীত দাম। যাহোক মহিলা আমাকে আশ্বস্ত করলেন, লাঞ্চে আমি কিছু খাই না।

উদারভাবে বললাম, তা কি করে হয়।

আমি এক-আধ পদের বেশী খাই না আমার মনে হয় লোকেরা আজকাল বড় বেশী খায়। সামান্য কিছু মাছ হলেই চলবে আমার ভাবছি এখানে স্যালমন পাওয়া যাবে কি না

স্যালমনের সময় নয় এটা। মেনুতে উল্লেখও নেই। তবু ওয়েটারকে জিজ্ঞে করলাম। সে জানাল, চমৎকার এক স্যালম সবে আনা হয়েছে। এবার এই প্রথম। আমা অতিথিকে দিতে বললাম। সে মহিলাটিে বলল, রান্না হতে একটু সময় লাগবে, ইতিমধে অন্য কিছু দেবে নাকি।

না। এক পদের বেশী দু'পদ আমি খা না। তবে ক্যাভায়ার থাকে তো দিতে পার ওটা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি না।

দমে গেলাম। আমার পক্ষে ক্যাভায়ারে দাম দেওয়া কম কথা নয়। অথচ কিছু বলতে পাচ্ছিলাম না। ওয়েটারকে আনতেই বলা হল। নিজের জন্যে মেনু খুঁজে সবচেয়ে ক দামের জিনিস মাটন চপ একটা আনতে বা দিলাম।

মাংস খাওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ বলে ম হয় না। মহিলা বললেন। চপের মত গুরুপ জিনিস খেয়ে আপনি কি করে কাজ কে বুঝতে পারি না। আমি কিন্তু পেট বোঝ করে খেতে রাজী নই।

এবার পানের প্রসঙ্গ এল।

মহিলাটি বললেন, আমি লাঞ্চের সময় কোন কিছু পান করি না।

আমিও না। তাড়াতাড়ি বললাম।

অবিশ্যি সাদা মদ ছাড়া। সে বলে চলল। ভাবটা, যেন আমি এর মাঝখানে কিছুই বলিনি। ফ্রান্সের এ মদ সত্যি খুব তরল। পরিপাকের পক্ষেও ভালো।

কোনটা পছন্দ করেন? বললাম। আতিথেয়তার ভাবটা তখনও আছে, তবে আন্তরিকতায় টান পড়েছিল ঢের।

ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে সে উজ্জ্বল হেসে, বলল, শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু পান করা ডাক্তারের নিষেধ।

ফ্যাকাশে হয়ে উঠলাম। কি করি, আধ বোতল শ্যাম্পেনই দিতে বললাম। কথার মাঝে জানিয়ে দিলাম, আমার আবার শ্যাম্পেন পানে ডাক্তারের ভয়ানক নিষেধ।

তাহলে আপনি কি পান করবেন।

জল।

তিনি ক্যাভিয়ার খেলেন, স্যালমন খেলেন। খুব খোস মেজাজে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলাপ করলেন। আর আমি ভাবছিলাম বিলের অঙ্কের কথা। আমার মাটন চপ এলে তিনি বেশ গম্ভীরভাবে আমাকে মন্দ বললেন, লাঞ্চে আপনার বড্ড বেশী খাবারের অভ্যাস। এটা ভালো নয়। আপনি কেন আমার মত শুধু এক পদ খান না? তাতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

আমি শুধু এক পদই খাব। ওয়েটার বিল নিয়ে আসতেই আমি এ কথাটা বললাম।

ওয়েটারকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, না, না, লাঞ্চে খাবার অভ্যাস আমার নেই। এই এক-আধ কামড় যা এর বেশী নয়। তাও নেহাৎ না খেলে গল্প স্বল্প জমে না বলে। ওর বেশী আমি খেতেও পারি না—যদি না বেশ বড় অ্যাসপারাগাস থাকে। ও না খেয়ে প্যারিস ছেড়ে চলে যাওয়াটাও আক্ষেপের।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। অ্যাসপারাগাস দোকানে দেখেছি এবং জানি এ দুর্মূল্য। কতদিন জিবে জল এসেছে দেখে, শুধু সামলে নিতে হয়েছে।

ওয়েটারকে বলতে হল, ইনি জানতে চাচ্ছেন তোমাদের এখানে অ্যাসপরাগাস পাওয়া যাবে কিনা।

সাধ্যমত চেষ্টা করলাম যাতে সে 'না' বলে। কিন্তু ওর প্রশস্ত সদাশয় চোখেমুখে হাসি উপচে উঠল। বলল, তাদের গোটাকয়েক খুব বড়, চমৎকার, নরম মানে অপূর্ব আস্বাদযুক্ত অ্যাসপারাগাস রয়েছে।

—আমার খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। মহিলাটি বললেন। একান্ত পীড়াপীড়ি করলে অবিশ্যি না খেয়ে পারব না।

ওয়েটারকে আনতে বললাম।

আপনি?

আমি অ্যাসপারাগাস কখনও খাই না।

অনেকে আবার পছন্দ করেন না। আসলে মাংস খাওয়াতেই আপনার ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে।

অ্যাসপারাগাস তৈরী হতে লাগল। মনে মনে ভয়। মাসটা কি করে চলবে এ ভাবনার চেয়ে সঙ্গে যা আছে তা দিয়ে বিলের টাকা মিটাতে পারব কিনা সে চিন্তা আমায় পেয়ে বসল। বিল মিটাতে যদি মহিলাটির কাছে হাত পাততে হয় তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। এক কাজ করা যেতে পারে। পকেটে কত আছে তাতো জানাই আছে। বিল যদি বেশী হয়, পকেটে হাত দিয়ে নাটকীয়ভাবে বলে উঠব, পকেটমার হয়েছে। কিন্তু মহিলাটির কাছে যদি বিলের পাওনা মিটাবার মত টাকা না থেকে থাকে তাহলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হবে। শেষটা দেখছি হাত ঘড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে আনতে হবে।

অ্যাসপারাগাস এল। জিবে জল আসে। ঘিয়ের গন্ধ ভুরভুর করে নাকে যাচ্ছিল। যেন সেমের পুণ্যাত্মা বংশধরগণ কর্তৃক প্রদত্ত হোমাহুতির আঘ্রাণ জেহোবার নাকে। লক্ষ্য করলাম, মহিলাটি বড় বড় গ্রাস ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে মুখে। বল্কানের নাটক নিয়ে নম্রভাবে আলাপের চেষ্টা করলাম। অবশেষে তার খাওয়া শেষ হল।

বললাম, কফি দেবে?

হাঁ, কিন্তু আইসক্রিম ও কফি।

সব গা সয়ে গেছে। ওয়েটারকে আমার জন্যে কফি আর তার জন্যে কফি ও আইসক্রিম আনতে বললাম।

একটা বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, বুঝলেন, আইসক্রিম খেতে খেতে তিনি বললেন, প্রত্যেকের উচিত আরেকটু খেতে পারত এভাব নিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়া।

অস্ফুটভাবে বললাম, আর কিছু দেবে?

না না, ক্ষুধা আমার নেই; লাঞ্চে খাবারের অভ্যাস আমার নেই। সকালে এক কাপ কফি খাই, তারপর ডিনার। লাঞ্চে এক পদের বেশী কখনও খাই না। আপনার জন্যে বলছিলাম।

ওঃ!

ভীষণ একটা ঘটনা ঘটে গেল। কফির অপেক্ষা করছি। প্রধান ওয়েটার কপট মুখো কৃপা আকর্ষণ করবার মত হাসি টেনে এনে এক ঝুড়ি পীচ ফল নিয়ে আমাদের সামনে এল। অনাঘ্রাতা তরুণীর সলজ্জতার রক্তিমতা ওদের সর্বাঙ্গ; আর ইতালী দেশীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুউচ্চ আভিজাত্য।

পীচফলের সময় এখন নয়। ভগবান জানেন এর কত দাম। কিন্তু একটু পরে আমাকেও জানতে হল। মহিলাটি কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে একটা পীচফল তুলে নিলেন।

মাংস খেয়ে পেট বোঝাই করে ফেলেছেন, এখন আর খেতেও পারবেন না। দেখুন দেখি আমি পরিমিত খেয়েছি তাই এখন অনায়াসে পীচ ফল উপভোগ করছি।

বিল এল। চুকিয়ে দেখি যা আছে তাতে ওয়েটারকে বখশিশস্বরূপ যৎসামান্য দেওয়া চলে। তিন ফ্রাঙ্ক দিলাম। মহিলাটির দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ওতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম, আমাকে খুব ছোট মন ভাবছে। রেস্তোরা থেকে যখন বেরোলাম পুরো মাসটা আমার সামনে পড়ে। পকেটে এক কানাকড়িও নেই।

আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন, করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন, লাঞ্চে কখনও এক পদের বেশী খাবেন না।

তার চেয়েও ভাল কাজ আমি করব। আজ রাত্রে ডিনার খাব না।

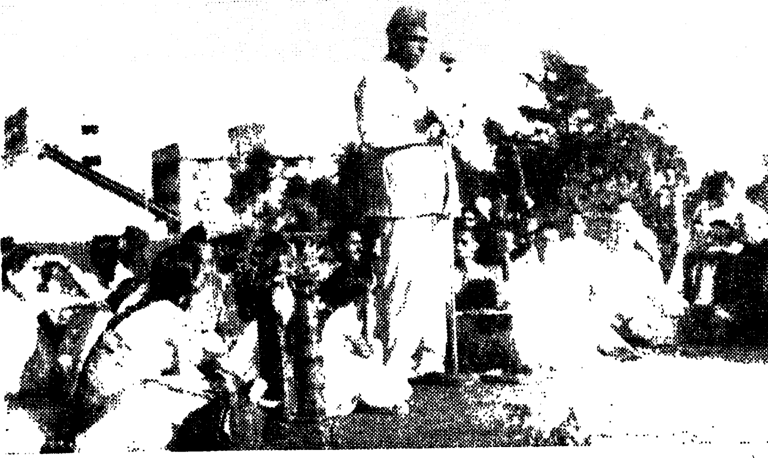
রসিক বটে! খুশিতে বলে উঠে তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। সত্যি আপনি খুব রসিক।

কিন্তু এর প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি। প্রতিশোধ নেবার স্বভাব আমার নয়। তবে ভগবান নিজ হাতে সে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তা সন্তুষ্ট মনে উপভোগ করাটা দোষণীয় নয়। মহিলাটির ওজন বর্তমানে তিন মণ সাতাশ সের।

অনুবাদক ঃ শ্রীহিমাংশু রায়



৬ষ্ঠ বার্ষিক মণিমেলা মহাসম্মেলন



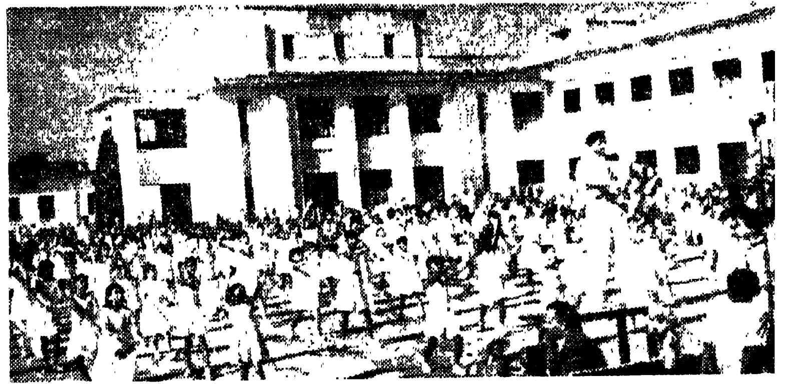
মূল সভাপতি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শেখ মঃ আবদুল্লা ভাষণ দিচ্ছেন



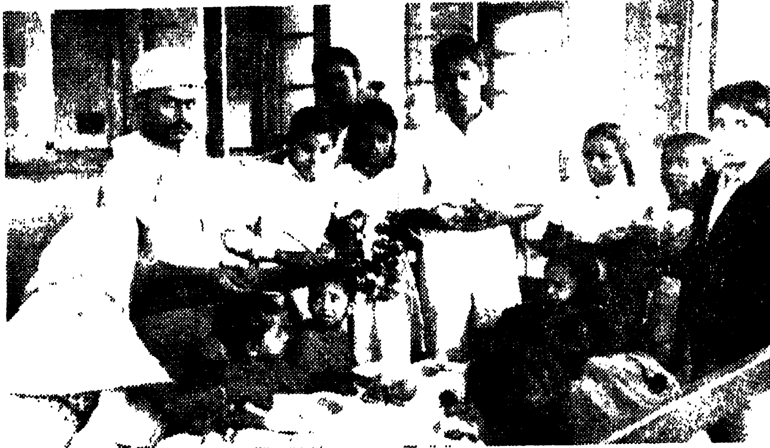
সতীস্মৃতি মণিমেলার বোনেরা মারোয়াড়ী নৃত্য করছে



পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু প্রদর্শনী দেখছেন



সমবেত ব্যায়ামের একাংশ



মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগে রোগীদের ফল ও ফুল বিতরণ করছে



পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় বিধানচন্দ্র রায় পুরস্কার বিতরণ করছেন

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮

শরৎচন্দ্রের 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতার সমসাময়িক আর একটি লেখা আমার মনে পড়ে। সেটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলা সংক্রান্ত একটি ছোট গল্প। কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি উত্তেজনার সহিত খেলা শেষ হল। খেলা শেষ হল মাঠে, কিন্তু মাঠের বাইরে প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে চলল তার জের। গুরুতরভাবে আহত হলে কি হবে, মাঠে এবং মাঠের বাইরে, উভয় স্থানেই, গল্পের নায়ক জ্যোতিষচন্দ্র যথাক্রমে ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয়ের দ্বারা পাঠকদের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

আমার বেশ মনে পড়ে, একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজকে তিনবার ভাঁজ করলে, অর্থাৎ সাধারণ এক্সারসাইজ বুককে একবার ভাঁজ করলে, যে আকার হয়, সেই আকারের ঘরে-বাঁধা খাতার দশ-বারো পৃষ্ঠায় গল্পটি শেষ হয়েছিল।

বহুদিনের কথা, কিন্তু আমার যেন মনে হয়, 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতা এবং জ্যোতিষচন্দ্রের গল্প, দুটি লেখাই, শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন বেগুনে রঙের কালিতে। এ দুটি লেখা যখন লিখিত হয় তখন ফাউণ্টেন্ পেনের সৃষ্টি হয়নি, অন্তত আমাদের দেশে চলন হয় নি, সুতরাং সে সময়ে বেগুনে রঙের কালি কতকটা দুষ্প্রাপ্য ছিল বলেই মনে হয়। তথাপি সে দুটি লেখার কথা চিন্তা করলে বেগুনে কালিতে লিখিত বলেই যেন মনে পড়ে। পরবর্তীকালে, ফাউণ্টেন পেনের যুগে, শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই বেগুনে রঙের কালি ব্যবহার করতে দেখা যেত। বেগুনে রঙের কালির প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাত ছিল বলে মনে হয়।

আমাদের বাল্যকালে ভাগলপুরে এক শ্রেণীর মনসাগাছ থেকে আমরা পাকা মনসা ফল সংগ্রহ করতাম। বাইরে থেকে দেখতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণের মনে হত, কিন্তু ভিতরে পাওয়া যেত গাঢ় লাল বর্ণের, কতকটা বেগুনে রঙের, এক প্রকার ঘন নির্যাস। ছোট ছোট ফলগুলির অগ্রভাগ ছুরি দিয়ে কেটে ফেললে তৎক্ষণাৎ সেগুলি একযোগে বেগুনে রঙের কালি এবং দোয়াতে পরিণত হত। পরম আনন্দের সহিত আমরা সেই দোয়াতে স্টিল পেন চুবিয়ে চুবিয়ে লেখার কার্য চালাতাম। উপকারিতার দিক দিয়ে সে বেগুনে কালির তেমন কিছু মূল্য ছিল বলে মনে হয় না। এক একটা ফল একদিনেই শুকিয়ে শেষ হয়ে যেত, সুতরাং পরিশ্রম ঠিক পোষাত না। প্রকৃতির পণ্যশালা থেকে বিনা পয়সায় বেগুনে কালির দোয়াত ছিঁড়ে নিয়ে আসা আমাদের একটা কৌতুক ও সখের ব্যাপার ছিল। কিন্তু পয়সা দিতে না হলেও ভিন্ন প্রকারে আমাদিগকে ও সখের মাশুল জোগাতে হত বড় কম নয়। কণ্টকসংকুল মনসাগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে কষ্টে এবং কৌশলে ফলগুলি আহরণ করতে অনেক সময়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হত। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবেরাও সখ করে আমাদের মতো মনসা ফলের বেগুনে কালি ব্যবহার করতেন, সে কথা যেন মনে পড়ে। কিন্তু সেই মনসা ফলের রঙ থেকেই শরৎচন্দ্রের বেগুনে কালির প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল কি-না, সে কথা বলা কঠিন।

যত দূর অনুমান হয়, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন পনের-ষোল বৎসর বয়স কালে। কিন্তু পাঠক সমাজে তাঁর যথার্থ আত্মপ্রকাশ হয় বহু বিলম্বে, ১৩১৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায় তাঁর 'রামের সুমতি' নামক সদ্য রচিত গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর। সে সময় তাঁর বয়ক্রম ৩৬ বৎসর।

ষোল বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-অভিযানের এই বিশ বৎসরের সুদীর্ঘ পথখানি ভারি বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। একটু লক্ষ্য করে দেখলে এর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের কয়েকটি প্রধান সময়-পর্ব এবং দুটি দুয়ের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নস্থলী (Landmark)।

প্রথম অর্থাৎ আদি পর্বের বিস্তৃতি বৎসর দুয়েকের অধিক হবে বলে মনে হয় না। এই পর্ব-কালে শরৎচন্দ্র 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতা, জ্যোতিষচন্দ্রের গল্প এবং সম্ভবত এই ধরণের আরও কিছু কবিতা ও গল্প রচিত করে হাত মক্স করেন। এই সময়ের লেখাগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে, হয় শরৎচন্দ্র নিজেই স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছিলেন, অথবা অবহেলা অনাদরে তারা নিজেরাই দৃষ্টিপথের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল।

এই আদি পর্বের অব্যবহিত পরের আট বৎসর কালকে বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের উদ্যোগ পর্ব। উদ্যোগ পর্বের শেষ হয়েছিল ১৯০০ খৃস্টাব্দে, যখন শরৎচন্দ্র সহসা সংসার পরিত্যাগ করে বৎসর দুয়েকের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। এই আট বৎসরব্যাপী উদ্যোগ পর্ব যৎপরোনাস্তি বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারখানায় যেমন লোকচক্ষুর অগোচরে সামগ্রী উৎপন্ন হয়ে জমা থাকে ভাণ্ডারশালায়, তারপর সময়-মত একদিন বাজারে মুক্তিলাভ করে; ঠিক সেই প্রকারে এই পর্বকালে 'বোঝা', 'কোরেল', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস শরৎচন্দ্র কর্তৃক রচিত হয়ে বহুকাল পাঠকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাস করেছিল। এগুলির মধ্যে সাধারণ পাঠক সমাজে প্রথম প্রকাশ লাভ করে 'বড়দিদি' ১৩১৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের তিন সংখ্যায়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার লেখায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নি। আষাঢ় সংখ্যায় উপন্যাস সমাপ্তির সহিত লেখকের নাম দেখা গেল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বড়দিদি' উপন্যাস সম্বন্ধে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। 'বড়দিদি'র প্রকাশ কালে নব পর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কার্যাধ্যক্ষ। বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' উপন্যাস পাঠ করে অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে শৈলেশবাবু জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, "এ কাজ আপনি কেন করলেন?—না, না, এমন কাজ করা আপনার কখনই উচিত হয় নি!"

শৈলেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথ শৈলেশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। শৈলেশচন্দ্রের মুখে এমন গুরুতর অভিযোগের ইঙ্গিত শুনে বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, "বল কি হে! কি এমন অন্যায় কাজ আমি করেছি?"

শৈলেশচন্দ্র বললেন, "আপনার নিজের কাগজকে বঞ্চিত করে অমন লেখাটা আপনি 'ভারতী'তে দিলেন?"

ততোধিক বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কোন্ লেখা শৈলেশ? কই, আমি ত' ভারতীতে কোনো লেখা দিই নি। কোন্ লেখার কথা তুমি বলছ?"

এ কথার পর ঈষৎ বিমূঢ় হয়ে শৈলেশ-চন্দ্র বললেন, "কেন, বড়দিদি?"

শৈলেশচন্দ্রের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ শহাস্যে বললেন, "না হে, ও লেখা আমার নয়। কিন্তু কার লেখা বল ত? ভারি চমৎকার লেখা।"

এ প্রশ্নের উত্তরে শৈলেশচন্দ্রের কি আর বলবার থাকতে পারে? বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে মৃদুস্বরে শুধু বললেন, "আপনার লেখা নয়?"

বড়দিদি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে বিষয়ে শৈলেশচন্দ্র বোধ হয় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়েছিলেন আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে শরৎ-চন্দ্রের নাম প্রকাশিত হওয়ার পর।

১৯০০ খৃস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে আরম্ভ করে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে অথবা ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুণে যাত্রা পর্যন্ত আড়াই বৎসর—তিন বৎসরের সময়কে নৈষ্কর্মের পর্ব বলা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে, একমাত্র কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য 'মন্দির' নামক গল্প রচনা ভিন্ন শরৎচন্দ্র আর কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি।

এই নৈষ্কর্মের পর্ব বর্মা প্রবাস কালেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯০৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যে বার-তের বৎসর শরৎচন্দ্র বর্মায় ছিলেন, তার অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছিল সাহিত্যকে, অন্তত সাহিত্য-সৃষ্টিকে, বিস্মৃত হয়ে থেকে। ১৯০৭ সালে ভারতীতে 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর আমাদের চিঠি-পত্রে তার প্রভূত প্রশংসার কথা অবগত হয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রচেষ্টা হয়ত খানিকটা উজ্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু সেও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯১২ সালের শেষভাগে শরৎচন্দ্র যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁর কাছে মাত্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ এবং সম্ভবত 'নারীর মূল্য' নিবন্ধ দেখেছিলাম। শরৎচন্দ্র অবশ্য আমাকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের মূল্য,' 'ধর্মের মূল্য', 'সমাজের মূল্য', 'পুরুষের মূল্য' ইত্যাদি নামে বারোটা বিভিন্ন বিষয়ের 'মূল্য' লেখবার তাঁর কল্পনা ছিল। তন্মধ্যে পাঁচ ছয়টা লিখেও ছিলেন, কিন্তু আগুন লেগে সবগুলিই নষ্ট হয়, শুধু 'নারীর মূল্যই' রক্ষা পায়।

কিছু পূর্বে শরৎচন্দ্রের বিংশ বর্ষব্যাপী সাহিত্য-অভিযানের প্রসঙ্গে যে দুইটি চিহ্ন-স্থলীর উল্লেখ করেছিলাম, তার প্রথমটি হচ্ছে ১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত কুন্তলীন পুরস্কারের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত বেনামি গল্প 'মন্দির'; এবং দ্বিতীয়টি, ১৩১৪ সালে ভারতীতে প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি'।

আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকের অগোচরে নিজের লেখার মূল্য যাচাই করে নেবার উদ্দেশ্যেই 'মন্দির' গল্পটি শরৎচন্দ্র নিজের নামে না পাঠিয়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতি-যোগিতায় প্রেরণ করেছিলেন। গল্পটি প্রথম পুরস্কার লাভ করা সত্ত্বেও বেনামিবশত সাহিত্য-সমাজে তদ্দ্বারা শরৎচন্দ্রের নাম প্রচারিত হতে পারেনি বটে, কিন্তু তিনি যে আপন মনের মধ্যে কতকটা আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নেই। প্রতিযোগিতায় যতগুলি লেখক অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের বিচারে, তন্মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এ আশ্বাসের মূল্য নিতান্ত কম ছিল না।

'বড়দিদি' যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয়, তখন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভারতীর অন্যতম সম্পাদক। সুরেনদাদার নিকট হতে পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হয়ে তিনি ভারতীতে 'বড়দিদি' প্রকাশিত করেন।

মন্দির এবং বড়দিদি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা। ঐ দুটির প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহিত হবার কথা ছিল। কিন্তু স্বভাবত-অলস শরৎ-চন্দ্র বড়দিদি প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্টতার মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। ১৩১৯ সালে তাঁর নব অধ্যায়ের নূতন প্রচেষ্টার সদ্যলিখিত গল্প 'রামের সুমতি' যমুনায় প্রকাশিত হল; এবং তারপর শরৎ-সাহিত্য গগনে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফুটে উঠতে লাগল। বিস্ময় এবং আনন্দের সহিত বাঙলী পাঠক দেখলে বাঙলা সাহিত্যের একটা দিক আলোকিত হয়ে উঠছে!

কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল, এবার সেই কৌতূ-হলোদ্দীপক কাহিনী বলি।

১৯

১৯১২ সালের শেষভাগ। তখন আমরা ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়া রোডের বাড়িতে বাস করি। কিছুকাল পূর্বে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ১৯১৩ সালের সূত্রপাতেই ভাগলপুরে গিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হব, অন্তরে বাইরে তারই সুর ভাঁজছি। এতদিন দাদার মক্কেলদের নিয়ে আড্ডা দিয়েছি, ফূর্তি করেছি, থিয়েটার দেখেছি, এবার নিজের মক্কেলদের পেষণ করে তৈল বার করতে হবে। কঠিন কথা।

সন্ধ্যার পর একদিন বাড়ি ফিরতে চাকর একটা ছোট কাগজ হাতে দিলে। পড়ে দেখি শরতের লেখা। অতি ক্ষুদ্র দু-চার লাইনের চিঠি। তার সম্পূর্ণ বাণী এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। চিঠিখানা ঠিক এইরকম,—

প্রিয় উপীন,

কয়েকদিন হল রেঙ্গুণ থেকে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা পেলাম না। আর একদিন আসব। ইতি,—

'শরৎ'

শরৎ এসেছিল, অথচ দেখা হল না! মনটা একেবারে বিগড়ে গেল। চাকরকে প্রশ্ন করে জানলাম, বাড়ির ভিতর না গিয়ে চিঠিখানা তাকে লিখে দিয়ে বাইরে-বাইরেই সে চলে গেছে। অযথা চাকরের উপর খাপ্পা হয়ে উঠলাম:—হতভাগা! বাবু কবে আবার আসবে, কোথায় থাকে,—এসব কথা লিখিয়ে নিলিনে কেন?

সাধারণতঃ ভৃত্যের পক্ষে এ সব কথা নিজের বিবেচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখিয়ে নেবার কথা নয়; অসুবিধেয় পড়ে এ নিতান্তই আমার আপন রাগের কথা, সুতরাং এই অসঙ্গত দাবীর প্রতিবাদ করা চলত। কিন্তু তখনকার দিনের ভালমানুষ চাকর, মৌনর দ্বারা অপরাধ খানিকটা স্বীকার করে নিয়ে অপ্রতিভ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল। ভাবটা, সত্যিই! লিখিয়ে না নেওয়া ভারি অন্যায় হয়ে গেছে!

বললাম, "এবার বাবু এলে আমি যদি তখন বাড়ি না থাকি তাহলে বাবুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবি, আর বাবুর কাছ থেকে বাবুর কলকাতার ঠিকানা লিখিয়ে নিবি। ঠিকানা, ঠিকানা! ঠিকানা কি জিনিস, বুঝলি?"

ঘাড় নেড়ে ভৃত্য বললে, "হাঁ দাদাবাবু, সমঝা। পত্তা লিখা লেঙ্গে।"

বললাম, "হাঁ, হাঁ, পত্তা। পত্তা লিখিয়ে নিস্।"

শরৎ এসে দেখা না করে ফিরে গেছে শুনে বাড়ির লোকেরাও খুব দুঃখিত হলেন। তাঁদেরও সতর্ক করে দিলাম, আমার অনু-পস্থিতিকালে সে যদি আসে তাহলে অন্ততঃ তার ঠিকানাটাও যেন লিখে নেওয়া হয়।

ভারি রাগ হতে লাগল শরতের উপর। এমন বে-আক্কেলে মানুষও ভূ-ভারতে থাকে! আর একদিন আসব! কবে আসবে, কোন্ সময়ে আসবে, না জানলে একজন পুরুষ-মানুষের পক্ষে সমস্ত দিন বাড়ি বসে প্রতীক্ষা করা কি সম্ভব? দেখা হলে তার সঙ্গে এ অবিবেচনার জন্যে রীতিমতো হুজ্জোৎও লাগাতে হবে।

দিনকয়েক একটু সতর্ক হয়ে রইলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে না বেরিয়ে বাড়ি বসেই কাটালাম। দুই-এক দিন বেশি বিলম্ব না করে সকাল সকাল বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু ক'দিনই বা এ-রকম

করে পারা যায়? দিন পাঁচ-সাত পরে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি ঠিক সেই একই কাহিনী! শরৎ এসে, আমি বাড়ি নেই শুনে, প্রথম দিনের মতো একটা ছোট চিঠি লিখে চাকরের হাতে দিয়ে সরে পড়েছে। চিঠিখানা এইরকম,—

প্রিয় উপীন,

আজও এসে তোমার দেখা পেলাম না। শীঘ্রই রেঙ্গুনে ফিরে যাচ্ছি। এ যাত্রায় বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হল না। ইতি,—

'শরৎ'

চিঠি পড়ে যুগপৎ ভৃত্যের উপর এবং শরতের উপর পিত্ত জ্বলে উঠল! সতর্জনে ভৃত্যকে বললাম, "উল্লুক কোথাকার! এবারও খবরের পত্তা লিখিয়ে নিসনি?"

এই অন্যায় মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধকণ্ঠে অথচ ঈষৎ দর্প সহকারে ভৃত্য বললে, "জরুর লিখা লিয়া! ঠিকসে পরিয়ে, উসমে জরুর লিখা হোগা।"

তিন লাইনের ওটুকু ক্ষুদ্র চিঠি আর কত ঠিকসে পড়ব! বুঝলাম, ঠিকানার জন্য ভৃত্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু ঠিকানা লেখবার অভিনয় করে শরৎ তাকে প্রতারিত করে গেছে; ইচ্ছা করেই ঠিকানা দেয়নি। সে যাই হোক্, সুদূর বর্মা দেশ থেকে কলকাতায় এসে শরৎ ফিরে যাবে, অথচ তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না,—এর চেয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর কি হতে পারে! কি কারণে, তা ঠিক নির্ণয় করে বলা শক্ত, শরতের প্রতি আমাদের, বিশেষতঃ সুরেন দাদা, গিরীন ও আমি আমাদের এই তিন ভাইয়ের, লৌহ-চুম্বকের আকর্ষণের মতো একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল। চুম্বক অবশ্য শরৎ, আমরা লৌহ। কিন্তু লৌহ হলেও, সময়ে সময়ে প্রমাণ পাওয়া যেত, চুম্বকও লৌহের দ্বারা একইমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অস্থিরচিত্তে ভাবতে লাগলাম, কি উপায়ে শরৎচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কেমন করে তার ঠিকানা সংগ্রহ করি! দ্বিতীয় চিঠির মর্মানুযায়ী মনে হয় রেঙ্গুনে ফিরে যাবার পূর্বে আর সে ভবানীপুরের বাড়িতে সম্ভবতঃ আসবে না। কি করা যায়! কার কাছে যাওয়া যায়!

হঠাৎ মনে পড়ল প্রভাসের কথা। প্রভাস শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা, কিছুকাল পূর্বে সে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছে। যতদূর মনে পড়ে, তখনো সে প্রভাস ব্রহ্মচারী, তখনো স্বামী বেদানন্দ হয়নি। প্রভাসের কথা খেয়াল হতেই মনটা আশার আনন্দে ভরে উঠল। প্রভাস নিশ্চয়ই শরতের সন্ধান দিতে পারবে।

কিছুমাত্র কালক্ষয় না করে পরদিনই সকাল সকাল আহারাদি সেরে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মঠে উপস্থিত হয়ে প্রভাসকে খুঁজে বার করতে বিলম্ব হল না। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে আমার কাছে এসে প্রভাস বললে, "দাদা তোমাদের ভবানীপুরের বাসায় দু-দিন গেছল উপীন মামা। একদিনও তোমার দেখা পায় নি।"

বললাম, "যেমন তোর দাদার বুদ্ধি! কবে যাবে, কোন্ সময়ে যাবে, আগে থেকে জানা না থাকলে কেমন করে আমার দেখা পেতে পারে? আমি কি সংসারের কনে বউ যে, দিনরাত বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকব? সে ত' আমাদের ঠিকানা জানে, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও ত খবর দিতে পারত? দে, তার ঠিকানা দে, আমিই তার সঙ্গে দেখা করব।"

প্রভাস বললে, "তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই উপীন মামা, তোমার কষ্ট হবে। তার চেয়ে একটা দিন আর সময় ঠিক করে দিয়ে যাও, আমি দাদাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোবো।"

উত্তরে শরতের ইতিপূর্বের দুইদিনের কাহিনী প্রভাসকে জানিয়ে বললাম, "আমি অত কাঁচা লোক নই যে, ভবানীপুর থেকে বেলুড় মঠ—এই দীর্ঘ পথ এসে ধ্রুব পরিত্যাগ করে একটা অধ্রুব নিয়ে বাড়ি ফিরব। দিন-সময় ত ঠিক করে দিয়ে যাব, কিন্তু তোমার দাদা যা অদ্ভুত মানুষ, হয়ত ঠিক-করা দিনের পূর্বে দিন গিয়ে আগের দু-দিনের মতো একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে আসবে, আজও তোমার দেখা পেলাম না।"

শরৎ যে ঠিক এইরকমই অদ্ভুত মানুষ, সে কথা প্রভাস অস্বীকার করতে পারলে না,—কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে বললাম। "কি ঠিকানা বল্।"

এবারও ঠিকানা দিতে প্রভাস আপত্তি করলে; বল্লে, "সে ভারি গোলমেলে জায়গা উপীন মামা, বিশ্রী গলি-ঘুঁজির পথ; খুঁজে বার করতে তোমার কষ্ট হবে।"

এবার বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বললাম, "তোর পাকামি রাখ্ প্রভাস! বালক-কাল থেকে এতটা বয়স পর্যন্ত কলকাতায় কাট্‌লে, এখন একটা ঠিকানা-পাওয়া বাড়ি খুঁজে বার করতে কষ্ট পেতে হবে! কোন্ জায়গায় শরৎ থাকে বল্?"

প্রভাস বললে, "হাওড়ায়।"

"হাওড়া চিনি। হাওড়ার কোন্ অঞ্চলে?"

"খুরুট রোডের কাছে, একটা গলিতে।"

"খুরুট রোড জানি। গলির নাম জানিস্?"

"জানি।"

"বাড়ির নম্বর?"

"জানি।" প্রভাসের মুখে অত্যাসন্ন পরাজয়ের মৃদু কৌতুকের হাসি।

কাগজ-পেন্সিল তার হাতে দিয়ে বললাম, "নে, লিখে দে।"

গেরুয়া বসন পরিধান করে প্রভাস সাধু হতে পারে, কিন্তু আমিও ত নিতান্ত অসাধু নই, তাছাড়া সম্পর্কে তার মাতুল, বয়সেও এক-আধ বছরের বড়। সুতরাং বেশিক্ষণ সে প্রতিরোধ চালাতে পারলে না,—ঠিকানা লিখে দিলে।

ঠিকানা পকেটস্থ করে প্রসন্ন চিত্তে স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন অবলম্বন করে হাওড়ায় পৌঁছলাম। তারপর, সরাসরি শিবপুরের ট্রামে উঠে বসে আরোহীদিগকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যথাসময়ে খুরুট রোডের মোড়ে এসে অবতরণ করলাম। প্রভাসের নির্দেশ অনুযায়ী খুরুট রোডে প্রবেশ করে খানিকটা

পথ অগ্রসর হয়ে ডান দিকে অভিপ্রেত গলিটি পাওয়া গেল। গলিতে প্রবেশ করে নম্বর দেখতে দেখতে উপনীত হলাম একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহের সম্মুখে। গলির নাম এবং গৃহের নম্বর যখন অবিকল মিলে গেছে, তখন ঠিক স্থানে পৌঁচেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। বহুপরিচিত স্থানে যেমন অবলীলাক্রমে উপনীত হওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবেই এসে পড়েছি যথোদ্দিষ্ট স্থানটিতে। কোথায় ফেলে এসেছি প্রভাসের গোলমেলে জায়গার গলি-ঘুঁজির পথ, তা কিছুই বলতে পারিনে।

ঠক্ ঠক্ করে ধীরে ধীরে দরজার কড়া নাড়লাম।

ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর এল, "দরজা খোলা আছে।"

দরজা ঠেলে ভিতরে একটু প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে এখানে থাকেন?"

"কে শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে বলুন ত?"

বললাম, "দিন পনের-ষোল হল বর্মা থেকে এসেছেন?"

"ও! তাই বলুন, দাদাঠাকুর।"

চাটুজ্জেমশায় এখানে এসে যে দাদাঠাকুর হয়েছেন, তা কেমন করে জানব? জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি বাড়ি আছেন?"

"আছেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছি। একটু ডেকে দিলে ভাল হয়।"

ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে লোকটি হাঁক দিলে, "দাদাঠাকুর! তোমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।" কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "আপনি ওপরে চলে যান না। দোতলার বারান্দায় উঠে বাঁ হাতে গেলেই কোণের দিকে দাদাঠাকুরের ঘর দেখতে পাবেন।"

দোতলার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে শরতের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখি, ভূমিতলে প্রশস্ত শয্যার উপর ইতস্ততঃ বই-খাতা-পত্র ছড়ানো, তার মধ্যস্থলে উপবেশন করে শরৎ অবনত মুখে কি লিখছে। একটু চমকিত করে দেবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দে জুতো খুলে সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করলাম। শব্দ কিছুই করিনি, কিন্তু দ্বারপথ অতিক্রম করে যাওয়ার ফলে ঘরের আলো-ছায়ার যেটুকু ইতরবিশেষ হয়েছিল তার দ্বারাই সচেতন হয়ে শরৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে। আমি অবশ্য আমার কোনও কৌশলের দ্বারা শরৎকে চমকে দিতে পারিনি; কিন্তু পারলে যতটুকু পারতাম, শুধু আমার উপস্থিতিই বোধকরি তার চতুর্গুণ চমকাতে সমর্থ হল। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র চমকিত হয়ে সে বললে, "এ কি! তুমি এখানে কি করে এলে?"

শয্যার উপর সামনা-সামনি বসে পড়ে বললাম, "অনেক কৌশলে আর অনেক কষ্টে। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমার এ কি কাণ্ড বল দেখি?"

"কিসের কাণ্ড?"

"খুরুট রোড থেকে ভবানীপুরে এই দীর্ঘ পথ গিয়ে লিখে রেখে আস, 'আবার একদিন আসব; তারপর কবে আসবে, কখন আসবে কিছুমাত্র না লিখে এসেও আবার একদিন হঠাৎ গিয়ে দেখা পাওনা,—সেই কাণ্ডর কথা বলছি।"

এককথায় শরৎ এ প্রসঙ্গের শেষ করলে। বললে, "দেখা পাইনে সেটা তোমার-আমার বরাৎ। কিন্তু যাই যে, তাতে কোনও ভুল হয় না। দেখা পাব মনে করেই ত যাই; দেখা পাব না মনে করে কেউ কখনো এতটা পথ কষ্ট আর পয়সা খরচ করে গিয়ে থাকে?"

এরকম উদ্ভট যুক্তি একমাত্র কৌতুকপরায়ণ শরৎই সৃষ্টি করতে সমর্থ। বললাম, "বাঃ! চমৎকার কৈফিয়ৎ!"

কিন্তু এ প্রসঙ্গের কৈফিয়তের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত ছিলাম না, এর চেয়ে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ অপেক্ষা করে ছিল।

দেখলাম, আট দশটা ফাউণ্টেন পেন ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। কোনোটার নিব তীক্ষ্ণ, কোনোটার তীক্ষ্ণতর, কোনোটা বা ততোধিক তীক্ষ্ণ; কোনোটায় ব্লু-ব্ল্যাক্ কালি, কোনোটায় বেগুনে, কোনোটা বা সবুজ রঙের।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এতগুলো কলম এক-সঙ্গে বার করে কি কর শরৎ?"

মৃদু হেসে শরৎ বললে, "ও আমার একটা সখ। যখন যেটা ভাল লাগে তখন সেটায় লিখি।"

"এখন কোনটায় লিখছিলে?"

একটা কলম তুলে ধরে শরৎ বললে, "এইটেতে।"

"কি লিখছিলে?"

"চরিত্রহীন"

"সে কোন্ পদার্থ?"

"উপন্যাস।"

"কতটা লিখেছ?"

"গোটা পাঁচ ছয় পরিচ্ছেদ হবে।" ব'লে শরৎ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপির শিলপগুলো আমার হাতে দিলে।

পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ছাড়তে আর কিছুতে পারিনে; অথচ, শরৎ মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা তুলছে, তারও ঠিক মতো উত্তর দেওয়া হ'য়ে উঠ্‌ছে না।

অত মনোযোগ সহকারে আমাকে পড়তে দেখে শরৎ বল্‌লে, "কি উপীন, অত মন দিয়ে পড়ছ, ভাল লাগছে না-কি?"

বললাম, "অত্যন্ত।"

"এখনি শেষ পর্যন্ত পড়বে?"

"পড়তে পারলে ত' ভাল হয়।"

"কিন্তু তাতে ত' অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগবে, ততক্ষণ আমি কি করি?"

"তুমি যেমন লিখছিলে, লেখো।"

মাথা নেড়ে শরৎ বললে, "সামনে কাউকে বসিয়ে রেখে লেখা হয় না। তার চেয়ে এক কাজ কর,—ওটা তুমি আজ নিয়ে যাও, কাল বৈকালে আমি না-হয় গিয়ে নিয়ে আসব অখন।"

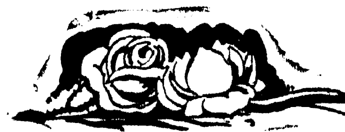
চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে একটা মৎলব মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। বল্‌লাম, "এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কিছু হ'তে পারে না। তবে কাল আমি বাড়ি থাকব না, কাল তুমি যেয়োনা। পরশু আমিই বেলা একটা-দেড়টা আন্দাজ এখানে আসব।"

শরতেরও এ প্রস্তাব ভাল লাগ্‌ল। বল্‌লে, "তুমি পরশু যতক্ষণ না আসছ, আমি কোথাও বেরোবো না। চরিত্রহীন প'ড়ে কিন্তু তোমার অকপট মতামত আমাকে জানানো চাই।"

তথাস্তু!

খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে, চা-খাবার খেয়ে, গোটা দুয়েক শিলপ শরতের লেখার সুবিধার জন্য ফেলে রেখে বাকি শিলপগুলো কাগজমুড়ে সযত্নে বেঁধে নিয়ে উঠে পড়লাম। সকাল দশটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর এখন বেলা চারটে বেজে গিয়েছে।

শরৎ আমাকে ট্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চলল। **(ক্রমশঃ)**



ইন্দ্রজিতের আসর

গত সপ্তাহে কলকাতার স্বর্গোদ্যানে যে সব দেশী বিদেশী খেলোয়াড় ক্রিকেট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাঁরা কেউ যখন শত রান্ কিম্বা অর্ধশত রান্ সমাপ্ত করেছেন তখন দর্শকবৃন্দের করতালি শব্দ আমরা মর্তবাসীরাও অর্থাৎ মফস্বল বাসীরাও শুনতে পেয়েছি, বিপুল জনতার হর্ষধ্বনি ইথারের কম্পনে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছে। আর ঠিক সে সময়টাতেই বিংশ শতাব্দীও তার অর্ধশত রান্ সমাপ্ত করেছে। কিন্তু তাতে যে কলরোল উঠেছে সে শব্দটা করতালির শব্দ না হয়ে কপালে করাঘাতের মতো শুনিয়েছে। হর্ষধ্বনিটা আর্তধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। ভাবটা যেন, আহা, বিংশ শতাব্দী মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ে কি খেলাই খেলছে। কাগজে কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। ব্যাঙ্কের Half yearly closing এর মতো গত পঞ্চাশ বছরের হিসেব নিকেশ, লাভালাভের খতিয়ান হচ্ছে। তাছাড়া অতীতের পটভূমিকায় ভবিষ্যতকেও দেখবার চেষ্টা আছে।

আমার অধ্যাপক বন্ধুটিও এই নিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। তিনি রাজনীতির অধ্যাপক, কাজেই দুনিয়ার হাল চাল তিনি আমার চাইতে ভালো বোঝেন। তিনি দুনিয়ার কোষ্ঠী বিচার করে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সে সব বিশ্বাস করতে গেলে চোখে আর ঘুম থাকে না। রাজনীতি আর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সান্ত্বনার বাক্য আশা করা বৃথা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কোনো ব্যাপারই সহজ দেখেন না। যে কোনো ব্যাপারেই মাথা নেড়ে বলেন, তাইতো, গতিক বড় সুবিধের নয়।

আমি নিজে পঞ্চাশোত্তর বিংশ শতাব্দকে বড় একটা তাৎপর্য দিইনি। আমার কাছে যাহা পঞ্চাশ তাহা একান্ন। জীবনে যতগুলি পয়লা জানুয়ারীর কথা মনে পড়ছে তার কোনোটাই এমন কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে আসেনি। এ শতাব্দীর প্রথম তিনটি বছর ছাড়া আর সবগুলো বছরই আমি দেখেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি হবার পর থেকে প্রতি পয়লা জানুয়ারীতেই অনুরূপ অনুশোচনা শুনে আসচি। গত শতাব্দী যখন শেষ হয়েছিল তখনও শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘে অস্ত গিয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর সূর্য যদিচ এখন মধ্য গগনে তথাপি ইতিহাসের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে গেলে দেখতে পাবেন শতাব্দীর প্রারম্ভেই বুয়রযুদ্ধ এবং রুষ জাপানের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে আজকের কোরিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত গত পঞ্চাশ বৎসরের প্রায় প্রতিটি বৎসর রক্তমেঘে অস্ত গিয়েছে।

যুদ্ধ কিম্বা যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই যদি আমাদের দুর্গতির একমাত্র কারণ বলে মনে করি তাহ'লে ঐতিহাসিকদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—পৃথিবীর কোন্ শতাব্দীটা যুদ্ধ ছাড়া কেটেছে? আগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। গত দু হাজার বছরের ইতিহাস আমরা ভালো করেই জানি। এর মধ্যে কম্‌সে কম দু হাজার যুদ্ধ হয়ে গেছে—গড়পরতা বছরে একটি করে। আমি যদিচ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নই তথাপি বকরূপী ধর্ম এসে যদি আমাকে পৃথিবীর অত্যাশ্চার্য ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন তবে আমি বলব—পৃথিবীর আদিকাল থেকে আমরা এত যুদ্ধ দেখে এলাম তথাপি যুদ্ধের আতঙ্ক আমাদের গেল না—এইটেই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার। পৃথিবীতে যুদ্ধটাই নিয়ম, শান্তিটা ব্যতিক্রম।

কেউ যদি বলেন পুরাকালের যুদ্ধ এ কালের যুদ্ধের মতো অমন ধ্বংসাত্মক ছিল না তাহলেও তর্ক উঠবে। তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিসখান এর যুদ্ধাভিযানে লোকক্ষয় এবং ধনক্ষয় কি কিছু কম হয়েছিল? সেকালে মারণাস্ত্রের যেমন অভাব ছিল আত্মরক্ষার কৌশলও তেমনি দুর্বল ছিল। কাজেই ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ এ যুগে আর সে যুগে একই। আপাততঃ যুদ্ধের ভয়ে যাঁরা মুহ্যমান তাঁরা বলবেন একটা যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে যদি আরেকটা যুদ্ধ এসে যায় তবে পৃথিবী বাঁচবে কেমন করে? আমি বলব শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (Hundred years' war) পরেও যদি পৃথিবী বেঁচে থাকে তবে আজও বাঁচবে। ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল দশবর্ষ-ব্যাপী। বাস্তব যে কবি কল্পনাকে কতখানি ছাড়িয়ে যেতে পারে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ তার প্রমাণ।

ক্ষয় ক্ষতির কথা বলছিলাম। লক্ষ্য করবার বিষয় যে শত শত প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের পরেও পৃথিবীর ধন সম্পদ এই বিংশ শতাব্দিতে যতখানি হয়েছে এমন কোনোকালে ছিল না। পৃথিবীর লোকসংখ্যাও এ যুগেই সর্বাধিক। ধনে জনে পৃথিবী অক্ষয়—ক্ষয় না হ'লে অক্ষয় ভাণ্ডারের সন্ধান আমরা পেতাম না। আমাদের ধরিত্রী মাতার যে কি অসাধারণ Vitality ভাবলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর গায়ে যে আঘাত লাগে, জলের উপরে তরবারির আঘাতের মতো মুহূর্তে তার দাগ মিলিয়ে যায়। আজকে যে যুদ্ধের ভয়াবহ ছায়া আমাদিগকে আতঙ্কে অভিভূত করেছে শতাব্দী পরে সে যুদ্ধের কাহিনী শিশুপাঠ্য ইতিহাসে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। পৃথিবী যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকবে। আজকের খণ্ড প্রলয় 'জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখবে না।'

পৃথিবীর অকল্যাণ যুদ্ধের ফলে বেশি হয়েছে না শান্তির ফলে সে বিষয়েও যথেষ্ঠ মতদ্বৈধ আছে। আমাদের এ শতাব্দীতে সব চাইতে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ হয়েছে চীন দেশে। এখন কেউ যদি বলেন যুদ্ধের ফলে চীন দেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে তবে সে কথা আজকের দিনে কেউ বিশ্বাস করবে না। যুদ্ধ অগ্নি পরীক্ষা। পৃথিবীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতি শতাব্দিতে একাধিক-বার এই অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মানব সমাজের মেদ বৃদ্ধি করে; কিন্তু মেধা নষ্ট করে। গত দু'শ বছর ভারতবর্ষ পরম শান্তিতে ছিল; তাতে আমাদের কতখানি পতন ঘটেছিল একবার ভেবে দেখুন। মহাত্মা গান্ধী সেই শান্তিকে Peace of the graveyard আখ্যা দিয়েছিলেন। যে দিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হয়েছে এবং আমরা শান্তিভঙ্গ করতে শিখেছি সেদিন থেকে আমাদের মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছি। এথেন্স এবং স্পার্টা এই দুই নগর রাষ্ট্রের মধ্যে যতদিন নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলছিল তখনই এদের সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছে। গত শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কো-জার্মেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জার্মেনি মুহুর্মুহু য়ুরোপ তথা পৃথিবীর শান্তি ভংগ করেছে—কিন্তু তাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের সাধনায় সে পশ্চাৎপদ এমন কথা তার শত্রুরাও বলবে না। ইতিহাস ঘেঁটে এমন বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান ভীষণ ভবিষ্যৎ ভীষণতর এই কথা বলে অনেকেই বিলাপ করে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে শৈশবের কথা স্মরণ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলবার মামুলি রীতি আছে। এঁরাও তেমনি অতীতকেই একমাত্র স্বর্ণযুগ বলে বিশ্বাস করেন। এ যুগের এ্যাটম্‌বম্-এর ভয়ে যাঁরা আজ জড়সড় তাঁদের যদি এইচ্ জি ওয়েলস্ এর Time Machine-এ চাপিয়ে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে তাঁরা কি খুব স্বস্তি বোধ করবেন? বিংশ শতাব্দীর লোকের কাছে দ্বাদশ শতাব্দী itself একটি atom bom বিংশ শতাব্দীর জীব দ্বাদশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় দম আটকে মরবে। শৈশবের নির্বোধ নির্জ্ঞান আনন্দ বড় না পরিণত বয়সের পরিণত উপলব্ধি বড়?

আজ যে সংসারকে ভয়াবহ মনে হচ্ছে সেই জন্যও বিংশ শতাব্দীর পরিণত বুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। সেই সত্যজ্ঞানেরও মূল্য আছে, হোক্ না সেই মূল্য দুঃখের। সেইদিক থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক যুগই সত্য যুগ।

যুদ্ধের মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণ প্রচ্ছন্ন থাকে। সর্বদেশে সর্বকালে যুদ্ধের দেবতারই পুজো হয়েছে, শান্তির দেবতার নাম তো শুনিনি। গ্রীস রোম সংগ্রামেশ Marsএর পুজো করেছে। সেই Mars আমাদের ভাষায় মঙ্গল। এই যে আমরা শান্তির পূজারী বলে বড় গর্ব করে থাকি সেই আমাদের দুই দেবী—তার একজন দশ প্রহরণধারিণী, আরেকজন নৃমুণ্ডমালিনী। দুজনেরই যোদ্ধৃবেশ।

আলোচনা

প্রিয় ইন্দ্রজিৎ,

আজকে, এই মুহূর্তে যদি আপনার কাছে একখানা চিঠি লিখতে না বসি, তবে আর কোন দিন লেখা হ'য়ে উঠবে না; আমার অনেক অলিখিত চিঠির মত এটাও মনের মধ্যে কিছু দিন থেকে পরে হারিয়ে যাবে। বিষয়টি যেহেতু ব্যক্তিগত কিছু নয় এবং মগজের চিন্তা মাঝে মাঝে কালি-কাগজে লিখে রাখি ব'লে যেহেতু আপনার সঙ্গে খানিকটা মগজী ভ্রাতৃত্ব দাবী করতে পারি, সেহেতু আপনার সময় এবং মনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হচ্ছি।

কথা হচ্ছে বার্নার্ড শ'কে নিয়ে। শ'র মৃত্যুতে এদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা-গুলো যেন একটা খবর পেয়ে বসল এবং শ' সম্বন্ধে রাশি রাশি লেখা উদ্গীরণ করল। লেখা-গুলোর নিরানব্বুই ভাগই বাজে। কেবল বাজে নয় কতকগুলো মারাত্মক রকমে misinformative. এই হাসাকর পঙ্ককেলির মধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় শ'কে নিয়ে লেখা আপনার ছোট রচনা দুটোতে একটু স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ-স্রোতস্বিনীর সাক্ষাৎ পেলাম। আপনি রসিক, তাই আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে দুটো কথা নিবেদন করতে চাই।

আমি বার্নার্ড শ'র শিষ্য। যেমন আমি শিষ্য স্যামুয়েল বাটলারের, সোহংস্বামীর, বুদ্ধের, মার্ক্সের এবং আরও অনেকের। আপনার সহজাত রসিকতা হয়ত এখুনি প্রশ্ন ক'রে বসবে—গুরুমারা শিষ্য কি না! আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেব না; কেন না, এ বিষয়ে জোর ক'রে 'না' বললেও প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করান যায় না। এর একমাত্র উত্তর আমার চিন্তায়।

আমি শ'র লেখা পড়েছি। এটা জোর দিয়ে বলা দরকার এই কারণে যে, যারা শ'র ওপর লেখা-লেখি করেন, তাদের অনেকেই তাঁর লেখা পড়েননি। আর যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের অনেকেই তা' বুঝতে পারেননি। আমি একবার পরিহাস-গর্বে বন্ধু মহলে বলেছিলাম যে, এমন যদি হয় যে, বার্নার্ড শ'র চিন্তাধারা পৃথিবীতে দু'টি মাত্র লোক বুঝতে পেরেছে; তবে তার একজন হবেন শ' স্বয়ং এবং আর একজন হবো আমি। অত্যুক্তি নিশ্চয়ই! আপনি যদি মনে করেন যে, এভাবে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে আমি বার্নার্ড শ'র অনুকরণ করছিলাম মাত্র, তবে আপনি ঠিকই করবেন। শ'র সঙ্গে আমার মনের দিক থেকে মিল আছে এবং তাঁর পরে জন্মেছি ব'লে অনুকরণের অপবাদে আমার লজ্জা নেই। শ'র আগে এমনি আত্মগর্বী ছিল সোপেন-হওয়ার, তাঁর আগে মন্টেস্কুই, তাঁর আগে ব্রুনো। কিন্তু সেকথা যাক্।

শ' সম্বন্ধে আমার প্রথম ও প্রধান মন্তব্য এই যে, শ'কে আমি কখনও পরিহাস-রসিক ভাঁড় হিসেবে নিতে পারিনি। তা' যদি করতাম, তবে তাঁকে নিয়ে আজ একটা লাইনও লিখতাম না।

শ'র চিন্তাধারার তিনটি fundamental points আছে,—অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং দার্শনিক।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি 'equality of income' মতবাদের প্রচারক। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যদি জাতীয় আয় সকল মানুষের মধ্যে সমান-ভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া না হয়, তবে সমাজের মঙ্গল নেই। তাঁর এই মতবাদ অনেক সমাজ-তান্ত্রিক বন্ধুদেরও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁদের কাছে শ'র মতবাদ অনেকখানি অবাস্তব ব'লে বোধ হয়েছে। সত্যকথা যে, নিকট ভবিষ্যতে আমরা এ-হেন সোভিয়ান সমাজে প্রবেশ করতে পারছি না; কিন্তু আরও সত্যকথা এই যে, অসাম্য পীড়িত রুগ্ন সমাজকে স্বাস্থ্য ও মুক্তি পেতে হলে ক্রমাগত এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শ'র মত কোন অবাস্তব পাগলের স্বপ্নমাত্র নয়!

সবচেয়ে সুন্দর এবং উজ্জ্বল শ'র নীতিবিষয়ক ধারণা। পুরোন এবং প্রচলিত নীতিশাস্ত্র থেকে শিক্ষা পেয়ে পেয়ে আমাদের মনে এই রকম একটা ভাব জন্মলাভ করেছে যে, নীতি হচ্ছে একটা নিষেধ, আমাদের বাসনা কামনার ওপর বাইরে থেকে চাপান একটা নিয়ম। কিন্তু শ' এসে একেবারে এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি বললেন যে, নীতি এবং বিবেক অন্তরের জিনিস। এরাও আমাদের মনের passions ইন্দ্রিয়ের কাম-কামনা যেমন মানুষকে আকর্ষণ করে, তেমনি নীতি এবং বিবেকও তীব্রতম কামনা হয়ে মানুষকে পরিচালিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, শ'র চরমপন্থীদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, সম্ভোগবাসনাকে বল্গাহীন করে দিলে যেমন ব্যক্তির সর্বনাশ হয়, তেমনি নীতি-বিবেকের কামনাকেও উপযুক্ত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে না রাখতে পারলে সর্বনাশ ঘটবে। সংযম প্রয়োজন কেবল স্থূল প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে নয়, সংযম প্রয়োজন আত্মিক প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেও। শ'র এই মতবাদের তুলনা নেই! অথচ আশ্চর্য, সমালোচকরা এ বিষয়ে নিশ্চুপ, যেন শ' ethics এবং morality সম্বন্ধে constructive কিছু বলেননি, যেন একমাত্র হাস্য-পরিহাসের ভেতর দিয়ে শ' তাদের আক্রমণই করেছেন। অতি বৃহৎ ব্যক্তিদের ট্র্যাজেডি এইখানে! তাঁদের চিন্তা ও কল্পনার বহুলাংশ সাধারণ পণ্ডিতদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

শ'র দর্শনকে বলা যায় জীবনীশক্তি-বিধৃত বিবর্তনবাদ। তিনি ক্রমবিবর্তন স্বীকার করেন। কিন্তু ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের সঙ্গে তাঁর অহি-নকুল সম্বন্ধ। উদ্দেশ্যবিহীন, যান্ত্রিক Natural selectionকে তিনি বলেছিলেন Unnatural selection. তাঁর মতে জীবনীশক্তি সহস্র-কোটি জীব পর্যায়ের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত আপনাকে উপলব্ধি করে করে উন্নততর হচ্ছে। মানুষ আজ পর্যন্ত এই জীবনধারারই চরম অভিব্যক্তি। কিন্তু এই মানুষের সীমাকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। তার মানে কিন্তু এই নয়, [যা অনেকেই মনে করে থাকেন এবং শ'র Superman-এর ধারণাকে ঠাট্টা করেন], সে অন্য এক আকারের দীর্ঘ অবয়বীতে মানুষে রূপান্তরিত হবে। যে রূপান্তর চলেছিল এতকাল বাইরে, এবার সেই রূপান্তর আসবে মানুষের অন্তর্লোকে, তার চেতনসত্তায়। মানুষের চেতনা প্রকৃতিরই অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং মানুষের এই চেতনার মাধ্যমেই প্রকৃতি আপনাকে অবলোকন করছে। এ প্রসঙ্গে শ'র Man and Superman নাটকের নরক-দৃশ্যের বাদানুবাদ মনে পড়া খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু আর একটি বইয়ের খবর আমি জানি যা মোটেই বিখ্যাত নয়, কিন্তু শ'র দর্শন তাতে যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বইটির নাম Miraculous Birth of Language, লেখক—Wilson. বইটি পেলে আপনাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

এখন, এরকম গভীর দর্শনের ব্যাখ্যাত বার্নার্ড শ'কে clown এবং paradoxmonger বলে যখন পঞ্চম শ্রেণীর লেখকরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তখন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে এদের বিরুদ্ধে কলম নিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু আর একটি কল্পনা মনে জেগে ওঠায় নিবৃত্ত হই। আমার ভয় হয়—হয়ত কবরের নীচে থেকে ছ'ফুট দীর্ঘ বার্নার্ড শ' উঠে এসে আমার মুখের ওপর ঘুষি মেরে বলবেন, 'তুমি কে যে আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য অন্যের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছ? সারা জীবন কি আমি নিজেই এই নির্বোধদের সহ্য করিনি? কেবল সহ্য করা কেন, এদের এতটুকু আনন্দ দেবার জন্য প্রাণপণ করিনি? যারা ভুল বুঝবে, তাদের ভুল বাছতে গেলে অনন্তকালেও তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

সুতরাং আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। কি করতে পারি বলুন—আর একজন শ-রসিকের কাছে মনোক্ষোভ লিখে জানান ছাড়া! আপনার আমার মত দু'একজন পাঠককে নিয়েই যদি শ' সন্তুষ্ট থাকতে চান, তবে থাকুন তিনি।

কিন্তু আমি জানি, শ'কে নিয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া না করলেও শ'র সঙ্গে একদিন আমাকে ঝগড়া করতে হবে। তাঁর জীবন-দর্শনের কতটুকু গ্রহণীয় আর কতটুকু অযৌক্তিক, তার হিসেব-নিকেশ জাহির করে একদিন এই আইরিশ দৈত্যটির সঙ্গে আমি লড়ব এবং সেদিন আপনাকে বলা বাহুল্য, শ' আমার ওপর না রেগে বরং ভয়ানক খুশিই হবেন। নমস্কার জানবেন। ইতি—নির্মল চট্টোপাধ্যায়।

বেতার প্রসঙ্গ

বেতারের পল্লীমঙ্গল আসর বিষয়ে দুটি প্রস্তাব

পল্লীমঙ্গল আসরের বিষয়ে আমরা এই কথাই পূর্বে বলতে চেয়েছিলাম যে, এই আসরটিকে পল্লীবাসীদেরই আসর করে গড়ে তুলতে হবে, কলিকাতার বেতার পরিচালকদের যেন এই হয় একমাত্র চিন্তা। কলিকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য থেকে এই আসরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে পল্লীবাসীদের এ আসরের দ্বারা কোনই উপকার হবে না।

বর্তমানে যে অবস্থায় ও যে আবহাওয়ার মধ্যে এই আসর বসছে তা পল্লীর আসরের পক্ষে উপযুক্ত কিনা সেটাও ভাবা দরকার। এ আসর বসে কলিকাতায়। এর ব্যবস্থাপকরা সকলেই কলিকাতাবাসী। সেখানে নিয়মিত আসর বসানোর ব্যবস্থা করার দরুণ তাদের কলিকাতায় থাকতে হয় বারমাস। তাই তাদের পক্ষে নিজে থেকে শহরের বাইরে গিয়ে পল্লী থেকে লোক জুটিয়ে আনা কোনদিনই সম্ভব নয়। বেতারের এই বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত পল্লী-জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত ও কলিকাতা নগরীর সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিখ্যাত ডালহাউসী স্কোয়ার অঞ্চলে। এ অঞ্চলটি পল্লীবাসীর পক্ষে সুদৃঢ় একটি দুর্গস্বরূপ। তারা কোনদিন নিজের চেষ্টায় এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে বলে কল্পনাও করতে পারে না। এই রকমের একটি দুরূহ অঞ্চলে বসে বেতারের পল্লীমঙ্গল আসর। সুতরাং এ আসরকে পল্লীর আসর না বলে আমরা যদি বলি কলিকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসর তাহলে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হবে না। শহরের এই মধ্যবিত্তশ্রেণী বেতারে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের সুযোগ পাওয়া সত্বেও পল্লীর নামে, অথচ তাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, এই আসরটিকে আত্মসাৎ করেছে। তাই পল্লীর দিক থেকে বিচারে এই আসরের কোন সার্থকতা দেখি না। কি করে গ্রামের লোক এইরূপ একটি দুরূহ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে তার কোন উপায় আজও তো কাউকে ভাবতে দেখলাম না। আমরা সকলেই জানি গ্রামের স্থায়ী বাসীন্দারা কোনদিনই নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আসতে সাহস করে না। তাছাড়া তারা এসে থাকবে কোথায়, বেতার কেন্দ্রে চিনে যাবে কি করে, কে তাদের এসবের জন্যে সাহায্য করবে দিনের পর দিন, এই রকমের নানা প্রশ্ন মনে জাগে। গ্রামের মেয়েদের ত এর মধ্যে ধরছিই না। এককথায় গ্রামবাসীদের কলিকাতাবাসীরা সাহায্য না করলে কলিকাতার এ অঞ্চল তাদের পক্ষে চিরকালের মত অজ্ঞাত ও দুর্ভেদ্যই থেকে যাবে। এবং আসরে প্রবেশের বাধা কিছুতেই দূর হবে না।

গান ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিক্ষিত শহরবাসী মধ্যবিত্তরা গ্রামের নাম করে সব সময় দাবী করে যে, তারা গ্রাম থেকে তা সংগ্রহ করেছেন। তারাই হলেন এদিক থেকে গ্রামবাসীদের প্রকৃত প্রতিনিধি। তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে যে, গ্রামের নামে প্রতিনিধিত্ব না করে সোজাসুজি তাদেরই এইখানে হাজির করতে পারলেই আমরা খুশী হব। শহরবাসী এই সব তথাকথিত গ্রামের প্রতিনিধিরা গ্রামের নাম করে এ যুগের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের মত কতখানি ভেজাল চালাচ্ছেন, তা যারা এবিষয়ে কিছু জানেন তারাই বোঝেন। গ্রামের নামে বেতারের যাবতীয় কার্যসূচীতেই এইরূপ নানা ভেজাল চালান হচ্ছে বলেই আমরা সন্দেহ করি।

বেতারে শিশুমহল আছে, নারীমহল আছে, বিদ্যার্থীমণ্ডল আছে। আজ যদি শিশু-মহলে বৃদ্ধারা, নারীমহলে পুরুষরা, ও বিদ্যার্থীমণ্ডলে বাবা মা-রা যোগ দিয়ে আসর সরগরম করে রাখেন, যাদের নামে আসর তাদের যদি সেখানে স্থান না হয়, তাহলে দেশের শিক্ষিত মহল থেকে কি পরিমাণ প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। অথচ পল্লীমঙ্গল আসরে ঠিক সেই অবস্থা ঘটাসত্ত্বেও দেশের কোন অঞ্চল থেকে তার এতটুকু এখনো প্রতিবাদ উঠল না দেখে আমরা অবাক। ইংরাজদের শাসনের যুগে যেভাবে দেশকে ফাঁকি দিয়ে এইসব অকেজো আসর সাজানো হয়েছিল, সেই একই মনোভাব পল্লীমঙ্গল আসরের পরিচালক ও বেতার কর্তৃপক্ষের মধ্যে আজও বর্তমান। ইংরেজরা চলে গেছে বটে কিন্তু তারা যেভাবে বেতারের কর্মীদের মনকে গড়ে দিয়ে গেছে, তার আর পরিবর্তন ঘটল না। এবং তাদের হাতেই আসরের ভার থাকাতে এইরূপ মিথ্যা ও অকেজো আসর আজও দেশের উন্নতির নামে চলে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য হচ্ছে গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করে এই অকেজো আসর সাজানোর ফাঁকিকে ক্রমাগত আঘাত করা। বেতার কর্তৃপক্ষ কিছু করতে পারছে না, কেবল এই কথা বলেই সমালোচনা শেষ করা উচিত নয় মনে করে, আজ পল্লীমঙ্গল আসর কিভাবে ভাল কাজ করতে পারে তা নিয়ে দুটি প্রস্তাব পেশ করছি দেশের সামনে।

পল্লীমঙ্গল আসরকে প্রকৃতপক্ষে পল্লীর আসর করে তুলতে হলে বেতার কর্তৃপক্ষ দুইদিক থেকে কাজে নামতে পারেন। প্রথম পথ হল, বেতার কেন্দ্রের এই বিভাগে পল্লী-দরদী একদল কর্মী থাকবে, আরম্ভে তাদের কাজ হবে কেবল গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা। তারপরে সেই তথ্য অনুসারে প্রকৃত পল্লী-আসর কিভাবে হতে পারে তার একটি পরিকল্পনা তৈরী করা। সেই পরি-কল্পনায় থাকবে দুটো দিক। তার একটি হল শিক্ষামূলক, অপরটির দ্বারা গ্রামের নিজস্ব প্রাণটিকে গ্রামবাসীরা যাতে খুলে ধরতে পারে সেইরকমের চেষ্টা। শিক্ষামূলক কার্যসূচীতে শহরের অধিবাসীরাও সাহায্য করতে পারবে; গ্রামবাসীদের না জানা নানারূপে জ্ঞানের বিষয়ে। কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা তাদের জীবনকে নিজেই দেশের সামনে প্রকাশ করবে। এইখানে শহরবাসীদের কোন হাত থাকা উচিত হবে না। বেতারের পরিচালক মহাশয়ই এই কার্য-সূচীকে নিয়ন্ত্রিত করবেন বেতারের উপযোগী করে। কেবল তাদের বলে দিতে হবে যে, তাদের গান যেন তারাই গায়, তাদের কবি যেন তাদেরই কবিতা শোনায়, গ্রামে প্রচলিত যাত্রার অভিনয় গ্রামবাসীরাই যেন করে। গ্রামের কথকতা যেন শোনায় গ্রামবাসীরা। যারা অভিজ্ঞ চাষী তারাই এসে বলবে সম্বৎসর কিভাবে তারা নানা ফসলের চাষ করে। বলবে চাষের বিষয়ে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। তাঁতী বলবে তাদের বিষয়ে, ছুতোর, কামার, কুমোর, জেলে, মুচি ইত্যাদি সকলেই তাদের সমগ্র জীবনকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে ধরবে। তারা বলবে তাদের মাটি, তাদের জলবায়ু যেভাবে তাদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে তার কথা, তাদের সুখ সুবিধার কথা, তাদের রাস্তাঘাটের অবস্থার কথা। গ্রামের

পটুয়া শিল্পী, পুতুল যারা করে তারা, দেব-দেবীর মূর্তি যারা তৈরী করে তারা, সকলেই এই আসরে জায়গা পাবে। এর সঙ্গে তাল রেখে সহরবাসী শিক্ষিতরা মাঝে মাঝে বলবে, তারা যা বলতে পারে গ্রামের উন্নতির জন্যে। কিন্তু গ্রামবাসীকে হটিয়ে দিয়ে নয়। গ্রামের সমগ্র জীবনটিকে যদি আমরা এইভাবে খুলে ধরবার সুবিধা করে দিতে পারি, সেইটিই হবে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে একটি মস্ত বড় শিক্ষা। দেশের প্রত্যেক স্তরের লোকই এইভাবে পরস্পরকে জানবার সুযোগ পাবে এবং বহু রকমের নতুন তথ্য জানার দ্বারা দেশ তখন সত্যই আরো আপনার হয়ে উঠবে। বর্তমানে গ্রাম থেকে সকলকে কলকাতায় আনা হয়তো সহজ হবে না কিন্তু; বেতারের শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের কথা, তাদের গান, অনায়াসে সংগ্রহ হতে পারে। বেতারের কর্মীরা যখন গ্রামেতে যাবেন তখন গ্রামেতে বসেই তাদের পরীক্ষা করে নিতে পারেন, তাদের শহরে আনবার প্রয়োজন হবে না।

আর একটি উপায় হল গ্রামাঞ্চলে বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের কিছু ঘাঁটি তৈরী করা। আর সেই সব ঘাঁটিতে গ্রাম অঞ্চলের লোকদের এনে পল্লীমঙ্গল আসর বসানো। এই উপায়ে গ্রামবাসীদের আরো সহজে বেতারে টানতে পারা যায়। তখন তাদের কাছে এই সব ঘাঁটি-গুলি সত্যিই আপনার হয়ে উঠবে। এই ঘাঁটি থেকে তারা তাদের অনুষ্ঠান কলকাতার মূল কেন্দ্রের সাহায্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে।

এই দুই উপায়কে কাজে রূপ দিতে হলে চাই প্রচুর সাহস ও কল্পনার প্রসার ও উদ্যম। উপস্থিত যেভাবে কাজ চলেছে, সেই মনোভাব নিয়ে এই রূপ একটি গঠনমূলক কাজকে রূপ দেওয়া যাবে না। দেশের বর্তমান আর্থিক অনটনের কথা তুলে অনেকে বলবেন যে এই পরিকল্পনার জন্যে বেতারের যে ব্যয় বাড়বে তাতে তা করা সম্ভব নয়। এর উত্তরে আমাদের কথা হচ্ছে যে একদিনেই সব কিছু করবার চেষ্টা না করে একটু একটু করে এই পরিকল্পনা অনুসারে আসরকে গ্রাম মুখী করতেও পারা যায়। অন্তত সেই দিকে যাওয়াই যে বেতারের কর্মীদের উদ্দেশ্য এ কথাটাও ত তারা বোঝাতে পারেন! তাই আমরা বলছি একটু একটু করেও তারা সেই আদর্শের দিকে এগুতে চেষ্টা করুন। মাসে অন্তত কয়েকটা দিন না হয় শহরের বাইরে বেতারের কর্মীরা যান, গ্রামের থেকে দু একজনকেই না হয় বেছে আনুন। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিন্। বেতারে কি করে বলতে হবে, গাইতে হবে, অভিনয় করতে হবে সে ভাবে তাদের করতে বলুন।

দেশের বেতার শ্রোতারা অনেকেই জানেন যে, কিছুদিন হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বেতার কেন্দ্রের একটি ছোট ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে সেখান থেকে সেখানকার কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের গানবাজনা দেশবাসীকে শোনান। বহু টাকা ব্যয়ে এই Studio রচিত হয়েছে কেবল মাত্র বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গান শোনাবার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে কার্যসূচী প্রচারিত হচ্ছে দুতিন মাস অন্তর একবার করে। বাকি সময়টা Studio-র কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই Studio শান্তিনিকেতনের জন্যে রচিত হলেও ঐ ঘাঁটিতে বীরভূম জেলার বা শান্তিনিকেতনের আসে পাশের যে সব গ্রাম রয়েছে সেখানকার গ্রামবাসীদের কাজে লাগানো হবে না কেন? পল্লীমঙ্গল আসর বসার উপযুক্ত এই রকম একটি ঘাঁটিকে কেন সেদিক থেকে অকেজো করে রাখা হবে। আমরা জানি, বিশ্বভারতীর কথা ভেবেই এই Studio রচিত হয়েছে, কিন্তু সেই Studioকে দেশের কল্যাণের জন্যে আরো নানাভাবে ব্যবহার করা কি অন্যায়? পল্লীমঙ্গল আসরের কর্ণধারকে আমরা প্রতিদিন সেখানে আসর বসাতে বলছি না। তাদের বর্তমান লোকবল ও অর্থবলের মধ্যেই সে কাজে তারা হাত দিন্। উপস্থিত তাঁরা মাসে অন্তত একবার করেই না হয় তা করুন, তারপরে সুবিধামত অবস্থা বুঝে দিন বাড়িয়ে দেবেন। দেশের বর্তমান অবস্থায়, অল্প অর্থ ও সামর্থের মধ্যে যতটা বেশি কাজ পাওয়া যায় আমাদের তাই ভাবা উচিৎ নয় কি? বিশ্ব-ভারতীর সেই Studio-র সাহায্যে গ্রামবাসীও যে নানা দিক থেকে উপকৃত হতে পারে সে কথা বেতারের কর্তৃপক্ষের প্রথমেই ভাবা উচিৎ ছিল। এইরূপ একটি কার্যসূচী যদি সেই Studio থেকে পল্লীর জন্যে প্রচারিত হয়, বিশ্বভারতী কখনই কোন আপত্তি তুলবে না। অন্তত আমরা তাই বিশ্বাস করি। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পল্লী দরদী কবি। সেখানে শ্রীনিকেতনের মত প্রতিষ্ঠান গড়ার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মৃতপ্রায় এই গ্রামবাসীদের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করা। আত্মবিশ্বাসে তাঁদের উদ্বোধিত করা। সেখানকার কর্মীরা বহু বৎসর ধরে গ্রামবাসীদের মধ্যে নানারূপ গঠনমূলক কর্মে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং আজ যদি এই Studio গ্রামবাসীদের একটু উপকারে লাগে তবে বিশ্বভারতীর খুশী হয়েই তাতে সম্মতি দেওয়া উচিৎ। আমরা আশা করি তাঁরা তা দেবেন।

বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠিত এই Studio-টিকে গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত বলা চলে। শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের চারিদিকে আছে বহু গ্রাম। এখানে আছে চাষী, কুমোর, জেলে, তাঁতী, মুচি ও নানা প্রকার শিল্পী। এখানে এখনো নানা প্রকার গান রচিত হচ্ছে ও তারা নিজেরাই তা গাইছে। এদের মধ্যে আছে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রের যন্ত্রী। এদের, জীবনযাত্রা, এদের নানা উৎসব ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে এরা অনেক কিছু খবর দেশবাসীকে আজও দিতে পারে। এর পরে আছে বীরভূম অঞ্চলের বিরাট সাওতাল সমাজ। তাঁদের আছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা. নিজেদের ভিন্ন ভাষা, নিজেদের গান, নিজেদের নাচ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। বাঙলাদেশের এই সমাজ বেতারে আজ পর্যন্ত স্থান পেল না এ বড়ই দুঃখের কথা। এদের বিষয় কি আমাদের কিছুই কর্তব্য নেই? এদের কি নিজেদের বিষয়ে কিছুই বলবার বা শোনবার অধিকার নেই? এই ভাবে নানা বর্ণের নানা কর্মের গ্রামবাসীদের একত্র করে কার্যসূচী রচনায় যদি উৎসাহ থাকে আমাদের বিশ্বাস শ্রীনিকেতনের সেবাব্রতীরা বেতারের কর্মীদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বেতার Studioটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ যদি বেতার পরিচালনকরা তাদের জড়তা ও বুদ্ধির অভাবে নষ্ট হতে দেন তবে তাতে দেশের অসংখ্য জনসাধারণের প্রতি শত্রুতা করা হবে বলেই আমরা মনে করব। তারা শান্তি-নিকেতনের এই Studioটিকে বেকার ফেলে না রেখে পল্লীর মঙ্গল কাজে ব্যবহার করুন; কিন্তু এখানেও সতর্ক থাক্‌তে হবে যে, সেই Studio থেকে প্রচারিত পল্লীমঙ্গল আসরে যেন গ্রামবাসীরাই প্রধান স্থান গ্রহণ করে, তাদের নামে শিক্ষিত "বাবু"-রা আবার যেন আসর সম্পূর্ণ জুড়ে না বসেন।

আলোক চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী

ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (প্রাক্তন রেনেসাঁস ক্যামেরা গ্রুপ)-এর উদ্যোগে আগামী ১৫ই মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত ভারতীয় আলোকচিত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য ভারতের সর্বপ্রদেশের অগ্রণী আলোকচিত্রশিল্পীদের আহ্বান করা হইতেছে। আশা করা যায়, এই প্রদর্শনী আধুনিকতম আলোকচিত্রের উৎকর্ষের মূল্যবান নিদর্শন হইবে। প্রদর্শনীর জন্য ছবি পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫১। প্রদর্শনীতে যোগদানেচ্ছুরা যাবতীয় জ্ঞাতব্যের জন্য এবং ভর্তি ফর্মের জন্য ২৪।বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা—২৯, ব্রজেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখুন।

টেনিসে নৈপুণ্য, চাতুর্য ও মনের প্রভাব

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মাত্র কয়দিন হইল, এ দেশের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। আমন্ত্রিত হইয়া বিদেশ হইতে যে সব খেলোয়াড় এবারকার এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও নৈপুণ্যের আভিজাত্যে, তাঁহাদের সমশ্রেণীর কোন খেলোয়াড় বিগত বৎসরে প্রথম প্রবর্তিত এসিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলেন নাই। গতবার এসিয়ান প্রতিযোগিতায় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সব খেলোয়াড় আসিয়াছিলেন খেলার নৈপুণ্যে বিচারে, স্বল্প পরিসর জগৎ-কোঠায় স্থান পাইবার মত যোগ্যতা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। তাহা ছাড়া ইতিপূর্বেই তাঁহাদের অনেকের খেলায় ভাটার টান দেখা গিয়াছিল। এসিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের বৈশিষ্ট্য ছিল মহিলা খেলোয়াড়দের লইয়া। ইঁহাদের সমতুল্য মহিলা খেলোয়াড় ইতিপূর্বে বড় একটা দেখা যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ মিসেস্ প্যাট্রিসিয়া টডের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। খেলার উৎকর্ষ বিচারে ন্যাশন্যাল র‍্যাঙ্কিন বা জাতীয় তালিকায় ইঁহার স্থান চতুর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ইঁহার "মারের" তীব্রতা পুরুষোচিত বলিয়া অনেকেই মানিয়া লইয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৩২ সালে ইটালি দলের সিনিওরিনা ভ্যালেরিওর খেলা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত, চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইটালিয়ান এই মেয়েটি এদেশের মিস্ জেনি স্যান্ডিসনের সহিত খেলিয়া হারিতে হারিতে কোনমতে বাঁচিয়া যান। ইহার পূর্বে তাঁহার সমকক্ষ কোন খেলোয়াড় এদেশে খেলেন নাই, একথা সত্য—কিন্তু তাহা হইলেও প্যাট্ টডের সহিত তাঁহার কোনরূপ তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু এবারকার এই জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রধান খেলোয়াড় ছিলেন ড্রবনী। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্তমানে ড্রবনীর স্থান কোথায়।

বিগত বৎসরের বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর খেলায় জয়-পরাজয়ের হিসাবে এবার কোন খেলোয়াড়কেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান খেলোয়াড় বলিয়া অভিহিত করা চলে না। আমেরিকার বিল্ টিলডেন্, জ্যাক্ ক্রামার বা টেড্ শ্রেডারের মত এবার আর কাহাকেও টেনিস-জগতের "একচ্ছত্র সম্রাট" আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহা হইলেও, সব কিছু বিচার করিয়া ড্রবনী পৃথিবীর পঞ্চম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রতিভার এইরূপ তালিকা রচনা করিবার পদ্ধতি অবশ্য নাই। কিন্তু যাঁহারা টেনিস জগতের একেবারে প্রথম শ্রেণীর খেলার উৎকর্ষের তুলনামূলক স্থান নির্ণয় করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজনের প্রকাশিত প্রবন্ধে ড্রবনীর স্থান পঞ্চম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি সম্প্রতি আমেরিকার লন টেনিস সংঘের মুখপত্র লন টেনিস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ড্রবনীকে আমরা সাউথ ক্লাবের সেন্টার কোর্টে প্রথম দেখিয়াছিলাম ১৯৪৬ সালে। সেবার চেকোশ্লোভাকিয়ার আমন্ত্রিত দল ড্রবনী ও চ্যাস্কা এখানে খেলিতে আসেন। ড্রবনী সেবার মনমোহনের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে পরাভূত হন। ভারতীয় তালিকায় তখন মনমোহনের স্থান চতুর্থ। সেদিনকার খেলায় কোর্টের দূরত্ব স্থান হইতে মনমোহন যেভাবে বল ক্রমান্বয় ফিরাইতেছিলেন—সেকথা সহজে ভুলিবার নয়। সেদিন ড্রবনীর খেলার প্রচণ্ড দাপট সম্পূর্ণ প্রত্যাহত হইয়া পরিশেষে পরাভবের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। ড্রবনী নিজের ব্যর্থতা সহজভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই। হাতের বল সজোরে মারিয়া মাঠ পার করিয়া দিয়া তিনি যে মানসিক অবস্থার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাও সহজে ভুলিবার নয়। ড্রবনীর পক্ষে নানা কথা উঠিয়াছিল—তাঁহার হাতে ফোস্কা গলিয়া ক্ষতে পরিণত হইয়াছিল—তিনি ভাল করিয়া ব্যাট ধরিতেই পারিতেছিলেন না—ইত্যাদি নানা ওজর নানা বিপত্তির উত্থাপন। হয়ত ইহার অনেকখানিই সত্য—কিন্তু তাহা হইলেও প্রিয়দর্শন মনমোহনকে তাহার পর বড় একটা দেখা যায় নাই।

বিগত মহাযুদ্ধের পর স্বদেশ ছাড়িয়া কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ড্রবনী কিছুকাল এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক অধিকার পাইবার চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয়। বর্তমানে ইনি মিশরের নাগরিক অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহার খেলা দেখিয়া বিশেষজ্ঞের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন—"চেক্ ড্রবনী ও মিশরীয় ড্রবনীর খেলায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য—মিশরীয় ড্রবনীর খেলা স্বয়ংসিদ্ধ—মিশরীয় ড্রবনীর খেলায় সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা"

ড্রবনী প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের কলেবর ইতিমধ্যে যথেষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। একটা কথা বলিয়া ইহাকে সমাপ্ত করিতে চাই। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ড্রবনী এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতায় খেলিয়া অপরাজিত ছিলেন। ফ্রান্সের মণ্টি-



ড্রবনিকে পরাজিত করিবার পর সমর্থকবৃন্দের অত্যধিক অভিনন্দের উচ্ছ্বাসে ডেভিডসনের দূরবস্থা

কার্লো, রোম, বোর্নমাউথ সকল জায়গাতেই ইনি পুরুষদের প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য অর্জন করেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি জগতের সেরা খেলোয়াড়দের কাহাকে কাহাকেও পরাভূত করেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি আমেরিকার ব্যজ পার্টিকে একবার, সুইডেনের টি জোহানসন ও ডেভিডসন, অস্ট্রেলিয়ার ব্রাউনকে একবার, আমেরিকার বিল ট্যালবার্টকে দুইবার, অস্ট্রেলিয়ার এড্রিয়ান কুইস্টকে দুইবার পরাজিত করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার নিকট হইতে একটি সেটও লইতে পারেন নাই।

তারপর লাহোরে এসিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে পুরুষদের খেলার ফাইনালে আমেরিকার ফ্রেড্ কোভালেস্কিকে পরাজিত করিয়া ড্রবনী এদেশের জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলিতে আসিয়া সুইডেনের তরুণ খেলোয়াড় ডেভিডসনের নিকট পরাভূত হন। এদিনকার খেলায় দেখা গেল ড্রবনী এই ২২ বৎসর বয়স্ক ছেলেটির হাতে নাস্তানাবুদ হইতেছেন। দেখা গেল তাঁহার মারের তীব্রতা, খেলার চাতুর্য-লীলা, সুযোগ সন্ধান, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও পরিবেশ কোনটাই কোন কাজেই লাগিতেছে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়নের সুইডেনের ছেলেটি ড্রবনীর আক্রমণ-পদ্ধতিকে অসীম দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সহিত আঁটিয়া উঠিয়া সহজ, তীব্র, অব্যর্থ, 'ব্যাক'-হ্যান্ড ভলির সাহায্যে ড্রবনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। দেখা গেল লম্বা পা ফেলিয়া, দুই চার ধাপেই, প্রয়োজন মত ডেভিডসন নিজের কোর্ট ভালভাবেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন—প্রায় সকল জায়গায় প্রত্যাশিত "সটের" বিরুদ্ধে সময় মত হাজির হইতেছেন। এইভাবে নিজের কোর্টের বিশেষ কোন ফাঁক না রাখিয়া বিপক্ষের কৌশল পরিচালিত খেলার পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া পরিশেষে মারের আদান-প্রদানের মধ্যে আক্রমণ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এইসব লইয়া বল দুই চারিবার এ কোর্ট ও কোর্ট চালিত হইয়াই 'র‍্যালির' সমাপ্তি হইতেছে। ডেভিডসনকে ড্রবনী কোনমতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তৃতীয় সেটে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই সেটে কখনো কখনো মনে হইয়াছে হয়ত বা ড্রবনী খেলার মোড় ঘুরাইতে পারিবেন। গোড়ার দিকে ডেভিডসন্ পর পর তিনটি গেম জিতিয়া ৩—০ মাত্রায় আগাইয়া পড়েন। এই সময় মনে হইল হয়ত বা ড্রবনীকে ১টি গেম না পাইয়াই সেট্ হারাইতে হইবে। এইরূপ হইলে ড্রবনীর অবস্থাটা দাঁড়াইত অনেকটা "পূর্ণগ্রাসের" মত।

তারপর নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত ড্রবনীর খেলার দীপ্ত প্রতিভা দেখা গেল। তিনি উপর্যুপরি ৪টি গেমে ডেভিডসনকে পিছাইয়া ফেলিয়া ৪—৩ গেমে আগাইয়া পড়েন। ইহার পরের গেমে তাঁহার সার্ভিস—



পরাজিত ড্রবনি

এই গেমটি যে তাঁহার করায়ত্ত হইবে সে একরকম সকলেই ধরিয়া লইল। কিন্তু যাহা সর্ববাদীসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহা হইল না। ড্রবনীর মনোনিবেশের আবার ভাঙ্গন দেখা দিল। এই গেমটি তিনি হারাইলেন এবং তারপর একবার ৫—৫ গেমে বিপক্ষের সহিত সম্মিলিত হইবার পর ড্রবনীকে ৭—৫ গেমে সেট হারাইতে হইল। ডেভিডসন ফাইনালে জয়ী হইলেন—৬—৩, ৬—৩, ৭—৫ সেটে।

খেলার এই ফলাফল যেমন অপ্রত্যাশিত—তেমনিই আপেক্ষিক উৎকর্ষের অনুবর্তী হইয়াছে—তাই দেখা গেল হঠাৎ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আবেগের সঞ্চারণ হইয়াছে। দেখা গেল, জনকয়েক দর্শক ডেভিডসনকে হঠাৎ ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে মাথার উপর শায়িত অবস্থায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। ডেভিডসনের নড়িবার-চড়িবার কোন উপায়ই নাই—তিনি এইরূপ প্রচণ্ড অভিনন্দনের প্রকোপে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় হাসিতেছেন।

এই খেলা। এই বিজয়ীর সম্মান। ইহারই মধ্যে দেশ, জাতি, বর্ণ বিচারের সর্বব্যবধান প্রতিহত করিয়া আনন্দোচ্ছাস পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

কিন্তু কেন এমন হইল? ড্রবনীর এই পরাজয়ের কি কারণ থাকিতে পারে। ইতিপূর্বে ডেভিডসন স্বদেশে খেলিয়া স্বজাতি খেলোয়াড়দের মধ্যে যাহারা প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লেনার্ট বার্গলিন ও জোহানসনকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু রোম, উইম্বলডন বা প্যারিসে ইনি এমন কিছু সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার খেলায় নৈপুণ্য ও উৎকর্ষের এতখানি সমাবেশ হইল? কেমন করিয়া ড্রবনীর খেলা অবনতির পথে চলিয়া পড়িল। ইহার হেতু কি হইতে পারে?

টেনিস খেলা শুধুই হাত, পা, চোখ ও সহজ, স্বাভাবিক নির্ভুল মারের উপর নির্ভর করে না। এইগুলি ত চাই—ইহার সঙ্গে বিশেষ করিয়া চাই একনিষ্ঠ মনের সন্নিবেশ। কতদিন ধরিয়া মনকে খেলায় এইরূপভাবে বাঁধিয়া রাখা চলে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সম্বৎসর ধরিয়া মনকে এরূপ একনিষ্ঠভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে রাখিতে হঠাৎ মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তারপর তাহাকে আবার শাসনের অনুবর্তী করিয়া চালান প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ যেন অনেকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত—প্রতিক্রিয়া কোন কোন সময় নিশ্চয় দেখা দিবে। তখন খেলার মান বিপরীত পথে চলিবে। তাই প্রথমে কলিকাতায় ও তৎপরে কোভালেস্কির নিকট বোম্বাই-এর হার্ডকোর্টের খেলায় ড্রবনীকে পরাভূত, বিপর্যস্ত হইতে হইয়াছে। অথচ হার্ডকোর্ট খেলায় ড্রবনী একজন বিশিষ্ট ধুরন্ধর। ঠিক এই কারণে আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্রের খেলায় গ্লানি দেখা দিয়াছে। ইহা বিগত বৎসরের এসিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় একাগ্র মনোনিবেশের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—অন্য কিছুই নয়।



সাহিত্য প্রসঙ্গ

নবযুগের কাব্য

শ্রীভবতোষ দত্ত

কোনো ভাব নূতন বা সুন্দর হতে পারে, কিন্তু জাতির অন্তরে সে স্থায়ী আসন পেয়েছে কি না তা বোঝবার একটা উপায়ই আছে—শিল্পে তার প্রকাশ। শিল্পই ভাবের অকৃত্রিমতার একমাত্র প্রমাণ। যুগের এবং সমাজের বিশিষ্টতায় সাহিত্যের ধর্ম না বদলালেও রূপের ভঙ্গি যে পরিবর্তিত হয়, শুধু রসিকের কাছে সে-কথা বিশেষ করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ভাষা সাহিত্যের, রেণাশাঁ-পূর্ববর্তী য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে রেণাশাঁ-পরবর্তী সাহিত্যের যে প্রভেদ, তার ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক সঙ্গতভাবেই ধাবমান কালের মধ্যেই নির্দেশ করে থাকেন। পলাতক ও [illegible] ছায়াপাতে সাহিত্য হয়ে ওঠে বিচিত্র। জাতি যাকে মর্মে গ্রহণ করেছে, সমাজের বিভিন্ন দিকে যেমন তার স্বতঃস্ফূর্তি দেখা যায়, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে সত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য যেন হিরন্ময় পাত্র, তার জ্যোতিরাবরণের অন্তরালেই সত্যের অধিষ্ঠান।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে এর চমৎকার নিদর্শন পাই ঊনবিংশ শতকে। নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে মধুসূদন বঙ্কিম বিহারীলালের রচনায়। নব-জীবনের রথের অভ্রান্ত চক্রচিহ্ন পড়েছে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যে-সাহিত্যে। একটা যুগ ছিল যখন পথ ছিল বাঁধা, যাত্রা ছিল সহজ। ছিল মঙ্গলকাব্য, কিংবা পদাবলীর গান। দীর্ঘকাল প্রচলিত বিধি-বিধানে সাহিত্যের পায়ে যে নিগড় পড়েছে, সেটা সেই প্রাচীন বাঙালী সমাজেরই। অদৃশ্য-দেবতার রোষে ত্রস্ত হয়ে তার বন্দনা করেই দিন কেটেছে; সে-দেবতার ভৃঙ্গারে হয়ত বা কৃপা ছিল, কিন্তু মহত্ত্ব ছিল না। এই সাহিত্য পড়ে যে বস্তুটা বিশেষ করেই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এই দীর্ঘ কালের সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের অভাব। কোনো চরিত্রের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বা কর্মশক্তির প্রসার দেখিনি। দেবতার হাতে ক্রীড়নক হয়ে দৈব ইচ্ছাকেই করেছে মানুষের ইচ্ছা; দেবতার শাসনে তারা ভুলেছে সত্য-মানুষের ছোটখাট সুখ-দুঃখের কথা। মঙ্গল-কাব্য পড়ে এরকম ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, মানুষের মনুষ্যত্বের চেয়ে দেবতার স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠাই এই সাহিত্যের আদর্শ। মানবতার অপমান দিয়েই সে যুগের কবিরা কাব্যের উপসংহার টেনেছেন। মনসামঙ্গলের বিষয় অভিনবত্বে সে যুগে সত্যই অনন্যসাধারণ, কিন্তু এই প্রচণ্ড শক্তিকে নত না করে যেন কবির উপায় ছিল না; বিশেষ করে দেবলোকে থেকে মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনায় সতীত্বের আদর্শ হয়েছে উজ্জ্বল, কিন্তু ট্র্যাজেডির তীব্রতা পেয়েছে হ্রাস। এই পৃথিবীর রূপ-রস মানুষের চিত্তে অমৃত হয়ে উঠতে পারে, সে কল্পনা মধ্যযুগের কবি করতে পারে নি। কল্পিত ধর্ম-সংস্কারে মানুষ স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু হৃদয়ের ভিক্ষাপাত্র রয়েছে অপূর্ণ। ভাবের এই সংকীর্ণতার কারণ অবশ্যই সমাজ-জীবনের সংকীর্ণতা। পল্লী-কেন্দ্রিক স্বল্পতুষ্ট বাঙালী জীবনের দৈব দুর্যোগের অপ্রতিবিধেয় অমোঘতার রূপ ফুটে উঠেছে তাদের সাহিত্যে। আত্মবিশ্বাসী বাঙালী সমাজে কেমন করে হবে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব?

কেবল মঙ্গল-কাব্য বলে নয়—বৈষ্ণব কবিতাই কি এই ব্যক্তিত্বের সত্যকার মূল্য দিতে পেরেছিল? প্রথম যাঁরা গান ধরেছিলেন, চৈতন্যদেবের অভিনব প্রেমের উত্তাপে তাঁদের কাব্যেও রঙ্ ধরেছিল, কিন্তু অচিরেই কাব্য হলো রসশাস্ত্রের অনুগত। পদাবলীর দেহাতীত প্রেমের সাধনায় স্বাতন্ত্র্য আর থাকে নি। রাধা তো আর বিশেষ ব্যক্তি নয়, সে ভাবমাত্র। তাই তাতে বিরহ-জ্বালা নেই, ট্র্যাজেডি নেই। বিরহ তো সেখানে মিলনেরই নামান্তর। দেহ-দেবতার ব্যর্থ পূজারতি সেখানে অশ্রু জাগায়নি। সাধারণ মানুষের হৃদয় সেখানে কোথায়? পার্সোনালিটির যে স্পর্শ সাহিত্যকে জীবন্ত করে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তা পাই না।

ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যে এই উপেক্ষিত হৃদয় সাড়া দিয়ে উঠেছে। রাবণের সর্বহারা রিক্ততায়, হীরা-রোহিণী, প্রতাপ-গোবিন্দলালের নিরাশ্বাস ব্যর্থতায় এই মানব-হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। বিহারীলালের কল্পনাতেও ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন অশ্রুত থাকেনি। তাঁর কাব্যেও জীবন ও প্রকৃতিকে দেখবার একটা স্বাধীন ভঙ্গি আছে। এই ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব দিয়েই সাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠেছে। সেকালের সমাজ-বিপ্লব বহন করেছে এর বাণী। ইংরেজি শিক্ষা ও আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্ধর্ষ জীবনাবেগের সন্ধান দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে গ্রীক সাহিত্যে এবং তার নব-রূপায়ণ রেণাশাঁর পরের সাহিত্যেও মানব-হৃদয়ের বিচিত্র শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছে। মর্ত্য-জীবনের দুঃখকে কবি স্বীকার করেছেন। এই স্বীকারের প্রণালীও বিচিত্র। দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রতিবাদ করে তারা মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুঃখের দহন-দীপ্তি কবি-হৃদয়কে আলোকিত করেছে। মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তার হৃদয়ের আকূতি নীতি-ধর্মকে মানে নি; ভোগে, প্রেমে, অধিকার-স্পৃহায় তার অন্তর হাহাকার করে ওঠে, কিন্তু বিশ্ববিধানে তার চরিতার্থতা নেই। বাধা রয়েছে প্রকৃতিতে—সমাজে—এমন কি নিজের হৃদয়ের মধ্যেই। প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির, প্রবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক শিববুদ্ধির, কিংবা প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্যতর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও বাধায় যখন মানুষের অন্তর-ক্ষেত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখনই সেই শক্তি ও অশক্তির সংঘর্ষে মানুষের চরিত্রও ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই মানুষের কাব্যই তাদের দেশের কাব্য। অবাস্তব আদর্শলোকের কল্পনা দিয়ে বিস্মরণী মন্ত্র তারা গড়ে নি। তাই তাদের সমাজে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে মানবতার সাধনাকে অক্ষুণ্ণ থাকতেই দেখি।

এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি এলো বাঙলা দেশে। এইভাব বিদেশী ভাব বটে, কিন্তু আমাদের সমাজে সে যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ সাহিত্যের সাক্ষ্য। নতুন ভাবসম্পদে ধনী হয়ে ঊনিশ শতকের বিস্তীর্ণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভাবযুদ্ধের মর্মবাণী প্রকাশ পেয়েছে একটি কাব্যেই—মেঘনাদ বধ কাব্যে। এই কাব্যে রাবণ হোলো জীবনরস-পিপাসু ভোগের প্রতীক। রাবণ জীবনকে ভোগ করতে চায়, পুত্রকন্যা সংসার পরিজন নিয়ে সে বাঁচতে চায়, অথচ জীবধর্মের অমোঘ নিয়মে তার মন রূপে বিবশ। সে জানকীকে অপহরণ করেছে প্রবৃত্তির উত্তেজনাবশেই সম্ভবতঃ, যদিও সূচনাটি করে দিয়েছে তারই অপমানিতা ভগিনী শূর্পনখা। 'কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা এ ভুজঙ্গে?' ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার মহৎ কারণে সে তার নিজেরও মোহ খানিকটা মিশে জয়ের নেশাকে রঙিন করেনি, মন কথা জোর করে বলা শক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয়—কোনোটাতেই নীতিধর্মের কথা নেই। ভগিনীস্নেহ যেমন মানুষেরই স্বাভাবিক বৃত্তি,

তেমনি রূপের নেশাও তো একটা জৈব প্রবৃত্তি। সমাজ-ধর্ম এই প্রবৃত্তিকে মানে না। প্রবৃত্তিকে সংযত করে সংসারের মনোহর উদ্যান নির্মাণের জন্য আত্মরক্ষার্থেই মানুষ এই রুচির সৃষ্টি করেছে। নীতিধর্মই মানব-চরিত্রকে কতটা ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভস্মে আচ্ছাদিত করে সন্ন্যাসী করে তুলতে পারে. সীতা পরিত্যাগের কাহিনীতে মহাকবি অশ্রুর অক্ষরে সে কাব্য রচনা করেছেন। এই আদর্শই ভারতবর্ষকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে, শ্রদ্ধায় করেছে নতশির। বিস্ময়ের বিষয় মেঘনাদ বধের আধুনিক কবি এই নীতি-আদর্শকে ধিক্কার দিয়েছেন; স্বাধীন চিত্ত-বৃত্তিকে অনুসরণ করবার সাহস নেই বলে একে ঘৃণা করেছেন। সেই ভীরুতার প্রতীক হোলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্র দৈবকে বিশ্বাস করেন; দৈব এবং কল্পিত ধর্মের আশ্রয়ে তিনি সযত্নে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন; স্নেহে তিনি দুর্বল, শঙ্কায় তিনি বিবর্ণ। কিন্তু রাবণের চরিত্রে যে স্নেহ-পরবশতা আছে, তা ঠিক দুর্বলতা নয়। সেই স্নেহই রাবণকে শক্তিতে প্রবুদ্ধ করেছে। স্নেহ রাবণকে কাপুরুষ করে নি, করেছে হৃদয়বান পুরুষ। স্নেহ-বৃত্তিও মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ, স্নেহহীন মানুষও যথার্থ মানুষ নয়। স্নেহ যখন মানুষকে অন্ধ করে, তখন সে হয় দুর্বল অমানুষ। লক্ষ্মণের প্রতি রামের স্নেহের আতিশয্য রামকে এইজন্যেই করেছে হীন।

কাব্যের শুরু হয়েছে রাবণের এক পুত্রের মৃত্যু দিয়ে। রাবণকে দেখলাম শোকে মুহ্যমান। শুধু তাই নয়। বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদার উপস্থিতিতে রাবণের সে-শোক হয়েছে দ্বিগুণিত। কিন্তু

শোকে, অভিমানে
ত্যজি সুকনকাসন উঠিলা গর্জিয়া
রাঘবারি। "এতদিনে" (কহিলা ভূপতি)
বীরশূন্য লঙ্কাধাম!.........
সাজহে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"

বীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কবি বীরমাতার অবতারণা না করে পারেন নি। জননীর শোক এবং পিতার শোক—দুয়ে মিলে রাবণের যোদ্ধৃ হৃদয়ে রণডঙ্কা বাজিয়েছে। আর একবার ইন্দ্রজিতের পতনের পর সদ্যোপুত্রবিয়োগবিধুরা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রাবণ

"বাম এবে রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছ
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে—
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?"

এর পাশেই রামচন্দ্র কী দীন! বীরবাহুর মৃত্যুতেও জয়ী রামচন্দ্রের মুখে স্বাভাবিক উল্লাসের চিহ্ন নেই। মায়ার অব্যর্থ সহায়তায় দেবঅস্ত্রে অস্ত্রবান অতি-সুরক্ষিত লক্ষ্মণ। নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে যাবার সময় অগ্রজের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রঘুকুলা-বতংশ বললেন—

দেব-নর ভস্ম যাব বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা হে জলধি! আমি বাঁধিনু তোমারে;

রাবণের ক্ষেত্রে স্নেহ রূপান্তরিত হোলো শক্তিতে আর রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে স্নেহ হোলো অভিশাপ। সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হয় না মাটিতে। এ-সত্য প্রমাণিত হোলো।

স্নেহে-মোহে প্রবুদ্ধ আত্মশক্তিতে প্রত্যয়-বান এই যে অত্যন্ত আত্মধর্মী ভোগী মানুষের আদর্শ—এমন চরিত্র-কল্পনা তো কোনো কালেই আমাদের দেশে ছিল না। কারণ ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে। মানুষকে বোঝবার কোনো অবকাশই যে আগে আমাদের সমাজে ছিল না। এমন চরিত্র, এমন জীবন, এমন আদর্শ এনেছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। বাঙলার শুষ্ক তৃণে সেই দীপ্ত আদর্শ আগুন ধরাল। জীবনকে ভোগ করবার একটা অভিনব উৎসাহ পেয়ে বসল। মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের প্রকৃতি, মানুষের হৃদয়বত্তা, মানুষের শক্তি—এর চেয়ে বড়ো বলে আর কিছুকেই মনে হোলো না। মানুষের দেহ-মনের স্বাভাবিক স্ফুরণকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল যে কৃত্রিম সমাজ-নীতি বা ধর্ম-নীতি বাঙালীর চিত্তক্ষেত্র থেকে তাকেই এবার সমূলে উৎপাটিত করা হোলো। এটা যে বানানো কথা নয়, তার প্রমাণ বহন করছে সে-যুগের সমাজ। বিজ্ঞানের চর্চায় বস্তুজগতকে জানবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল, দর্শনে জগত-দর্শনই হোলো ব্রহ্মদর্শন। রামমোহন বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে অনন্যপরবশ ব্যক্তি-চেতনা আমাদের মুগ্ধ করলো। সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীই ছিল প্রাচ্য আদর্শ আর পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষে মুখর। স্বর্ণলঙ্কার প্রান্তরে সমুদ্রতীরে মেঘনাদ বধ কাব্যে যে যুদ্ধ বেধেছে সেটা আসলে এই দুই আদর্শেরই যুদ্ধ—রাবণ শক্তিমদমত্ত পাশ্চাত্য জীবনসংস্কার আর রাম-চন্দ্র দৈবনির্ভর আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল জীর্ণ প্রাচ্য সংস্কার।

কিন্তু কবি মধুসূদন এই যে নবযুগকে ভাষা দিলেন তাঁর মহাকাব্যে, সে-জন্য তাঁকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, সে-যুগে তা ছিল অপরিসীম। তাঁকে বিদেশী জীবন যাপন করতে হয়েছে; দেশের সমাজ, ধর্ম, নীতি তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। রাবণ যেমন আত্মশক্তির প্রতি একান্ত বিশ্বাসে এই সবই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, রাবণের স্রষ্টাও তেমনি বাইরের সব-রকমের শাসন-অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে ছুটে বেরিয়েছে। গৃহের নিশ্চিন্ততা, জননীর স্নেহ-চ্ছায়া, পিতার বিপুল ঐশ্বর্য, সমাজের পরম নির্ভর—কিছুই কবিকে বাঁধতে পারল না। মধুসূদনের জীবনকে তাই এক এক সময়ে মনে হয় যেন রূপক। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেন রূপান্তরে যাত্রা করেছে; তারি পূর্ণ মর্ম বোঝবার জন্যে মধুসূদন হলেন খৃষ্টান, আর কাব্যে ঘৃণা বর্ষণ করলেন রামচন্দ্রকে, যাঁর ক্লাসিক সৌন্দর্য ভারতকে অভিভূত করেছে এতকাল।

'আত্মবিলোপ' এবং 'শ্যামা পক্ষী' নামে দুটি কবিতা ছাড়া কবির মনে কোনো দ্বন্দ্বের ইতিহাস আমরা তাঁর রচিত চিঠিপত্রে বা জীবনীতে পাই না। কিন্তু কাব্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে কবির চরিত্রকে মিলিয়ে নিয়ে এ-বিষয়ে যদি একটা অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ সেটা খুব ধিক্কৃত হবে না। বিশেষতঃ এই কাব্যে সর্বত্রই যে তিনি আদি কবির আদর্শ লঙ্ঘন করেছেন, তা নয়। চতুর্থ সর্গের কাব্যলক্ষ্মী-সীতা স্বয়ং। সর্গের প্রারম্ভেই কবি নমস্কার করেছেন পূর্বসূরীদের। এ যেন উদয়-দিগন্ত থেকে অস্তদিগন্তের উদ্দেশ্যে প্রণাম। স্বদেশের নারীত্বের মহিমা কবিকে করেছে মুগ্ধ। মহা-কাব্যের ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে নারী-ভাগ্যের সকরুণ সঙ্গীত। এই মহিমায় আমাদের কাব্য-সাহিত্য ব্যাপ্ত। কিন্তু কেবল সাহিত্যের কথাই বা কেন, কবির ব্যক্তিগত জীবনকেও নারীর জায়া-জননীর রূপ করেছিল স্নিগ্ধ। পিতার সঙ্গে মধুর বনিবনা ছিল না। কিন্তু মায়ের স্নেহ দেবতার আশীর্বাদের মত তাঁর জীবনকে রয়েছে ঘিরে, যেমন করে লক্ষ্মণকে ঘিরেছিল মায়াদেবীর অদৃশ্য প্রভাব। আর দুঃসহতম দিনে বরণ করেছিল যে নারী স্বামীর দুঃখের অগ্নিপরীক্ষাকে, প্রমীলা-নায়িকার দীপ্ত বেশে সে-ও কাব্যে হয়েছে উজ্জ্বল। সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে বর্জন করে মহাদম্ভভরে কবি নেমেছিলেন বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করতে; কিন্তু স্নেহপ্রেমের দুর্বলতাকে পারলেন না তিনি বশে আনতে; উদ্যত ফণাবিকাশ হোলো শান্ত; শিবানী মুগ্ধ করলো শিবকে। পুত্র-স্নেহের সঙ্গে তার প্রাণের বিজয়যাত্রা যে যুদ্ধ করে পেরে উঠলো না। মৃত ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে রাবণের বীর-হৃদয় ব্যথাভরে কেঁদে ওঠে। বিস্মিত হয়ে ভাবি, যে-প্রবৃত্তি আত্ম-চরিতার্থ করতে স্নেহ-বেদনার আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সে-প্রবৃত্তি কেমন? রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে রাবণ দেখে, যুদ্ধ তো রামের সঙ্গে নয়, যুদ্ধ তার নিজেরই সঙ্গে। এই ট্র্যাজেডি শুধু মেঘনাদ বধের রাবণ-চরিত্রের নয়,—এ সেই যুগের আকাঙ্ক্ষামুখর তরুণদলেরই ট্র্যাজেডি।

এই যে দুই দিক—শক্তির আর স্নেহের—এর কোনোটাকেই কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। শক্তির মন্ত্র যদি তিনি সংগ্রহ করে থাকেন বিদেশী সংস্কৃতি থেকে, তবে মাধুর্যের রক্ষা-মন্ত্র তিনি পেয়েছেন আমাদেরই দেশে। মন্দো-

দরী-চিত্রাঙ্গদার জননী-হৃদয়ের সঙ্গে যশোদা-সনকা-রঞ্জাবতীর স্নেহাভিষিক্ত হৃদয়ের দূরত্ব সামান্যই। এ-স্নেহ অবুঝ, এ-স্নেহ অচঞ্চল। আবার প্রমোদ-উদ্যানে বিরহ-বিধুরা প্রমীলার মধ্যে যেন বিরহিনী রাধিকার অভিসার-পথটি হয়েছে প্রসারিত। পদাবলীর বৈষ্ণব কবি বিরহকে করেছেন রসতন্ময়। মধুসূদন সেই প্রেমকেই সাজিয়ে ছিলেন রূপে। নাটকীয় দৃশ্যের পারম্পর্যে সেই ভাবই হোলো বস্তুতে লীলায়িত। কিন্তু এও সেই গান, সেই প্রেম, সেই ব্যথা। পদাবলীতে রাধিকার প্রেম নির্বাক, অনন্ত ধৈর্যে শান্তদীপ্তি। আর এখানে প্রমীলা রাধিকা তার হৃদয়-সাগরের কল্লোল-তরঙ্গে দিগন্তকে করেছে মুখর, মহাবীর রাঘবকে করেছে সচকিত, দেবলোককে করেছে ত্রস্ত। তাতে আছে ঝঞ্চা, বিক্ষোভ, অশান্তি। তাই প্রমীলা বীরভূষণা। বীরের তনু গ্রহণ করল অতনু। স্নেহ-প্রেমের রসমাধুর্য রক্ষা করল কবিকে—বাঁধলো ঐতিহ্যের অমোঘ বন্ধনে বাঙলার উদ্ধত তারুণ্যকে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে বীণায় সুর বাঁধলেন, তাও সেই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদেরই বিরহ-প্রশান্ত বীণাযন্ত্র।

প্রমীলাই যে এই মহাকাব্যের নায়িকা এবং কবির মানস-কন্যা, তাতে আর সন্দেহ নেই। গত যুগের দ্বন্দ্বসংঘাতে এই মহাকাব্য ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, আর সেই ট্র্যাজেডি রূপ পরিগ্রহ করেছে মূর্তিমতী প্রমীলায়। প্রমীলার ব্যক্তিত্বের উপাদান একটি প্রেম। প্রেমেই অচরিতার্থ হয়ে হয়েছে বহ্নিমান। সে যুদ্ধ করবার জন্যে যাত্রা করেনি। স্বামীর সঙ্গে মিলনেই এই রণোচ্ছ্বাস হয় সংযত। অক্ষুণ্ণ নারী-আদর্শের সঙ্গে রাজসিক ঐশ্বর্য মিলিত হয়ে আধুনিক নারী-সমাজের উদ্বোধন হয়েছে। মেঘনাদ বধ কাব্য যিনি ভালো করে পড়েছেন, দুটি রসধারা কেমন করে এখানে এসে মিশেছে, তাঁর অজ্ঞাত নয়।

পিরামিডের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে; মহাকায় সাহিত্যও মানব-সংস্কৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে; মহাকাব্য রচনাও আর হয় না। মেঘনাদ বধ কাব্য রচিত হওয়ার পর কয়েকটি অক্ষম মহাকাব্য ইতিহাসে হয়তো স্থান পেয়েছে, কিন্তু তে হি নঃ দিবসাঃ গতাঃ। মেঘনাদ বধ কাব্য রচিত না হয়ে সম্ভবতঃ উপায় ছিল না। এমন বিষয়-গাম্ভীর্য বোধ হয় আর কখনও দেখা যায়নি। দুটি বিরাট কালচারের সম্মুখ-সমরের ঐতিহাসিক বজ্রগর্ভ মুহূর্ত এই মহাকাব্যের জন্মলগ্ন। কিন্তু এই ভাববস্তু যে জাতির জীবনে গৃহীত হয়েছে, সে-কথা বলা যায় কেমন করে? এই ভাবের এই কাব্য যদি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে, তবে এই ভাব যে অকৃত্রিম সে কথা বলা চলে কি? কিন্তু মেঘনাদ বধের পর বাঙলা দেশে যে বিস্তীর্ণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তার রূপের কথা বাদ দিলেও এই নূতন ভাবসম্পদই যে তাকে এত বিচিত্র করে তুলেছে, সে-কথা স্বয়ংপ্রমাণিত। উনবিংশ শতকেই বঙ্কিমের উপন্যাসের মূল আইডিয়াও ছিল নবযুগেরই আইডিয়া। রাবণ লঙ্ঘন করতে চেয়েছে নীতি-ধর্মের প্রাচীরকে, লঙ্ঘন করতে গিয়ে মুখোমুখী হয়েছে ভীষণতম দুঃখের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদেরও স্বাধীন প্রেমের বশে দাম্পত্য-ধর্ম লঙ্ঘন করতে গিয়ে বরণ করতে হয়েছে দুঃখ-দহন। পুরুষ ও নারী জীবনের এই ট্র্যাজেডিকে আশ্রয় করেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। অহংকেন্দ্রী প্রেমের সঙ্গে জীবনের নিত্যধর্মের বিরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি ফেনিল হয়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্যে এমনি করে ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হল। সাহিত্য হোলো জীববস্তু। বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে পেঁছিল বাঙলার সাহিত্য।

পুস্তক পরিচয়

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা (১৯৫০) অষ্টাত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ, সম্পাদক—শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস। ৩৯নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই সংখ্যায় বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী প্রবন্ধগুলিতে বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকার ঐতিহ্য বজায় আছে দেখিলাম, কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে বিদ্যাসাগর কলেজের সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেখিয়া দুঃখবোধ করিতেছি।

জাতীয়তার বাণী মূর্তি হার্ডার—শ্রীদিলীপকুমার মালাকার; ডক্টর বিনয় সরকার লিখিত ভূমিকা সম্বলিত; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য এক টাকা।

য়োহান গটফ্রীড হার্ডার অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর একজন বিশিষ্ট চিন্তাগুরু। খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জার্মানদের অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এক সূত্রে যিনি গেঁথেছিলেন তিনি এই হার্ডার। হার্ডার জাতীয়তার একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনকল্পে তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করে গিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর একটি প্রধান কীর্তি জার্মানীর লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্য উদ্ধার ও প্রচার। বস্তুত লোকসাহিত্য পুনরুজ্জীবনের যে ঐকান্তিক প্রয়াস দেশে দেশে আজ দেখা দিয়েছে হার্ডারই তার পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। লোক-সাহিত্যকে তিনি জাতীয় মনের দর্পণ মনে করতেন।

এমন একজন স্বদেশপ্রেমিক বিশিষ্ট চিন্তানায়কের জীবনচরিত বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মালাকার বাঙালী পাঠক সমাজের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ভাষা সরল, সুবোধ্য, হার্ডারের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পূর্বাপর ক্রমানুযায়ী বিবৃত হওয়ায় আকর্ষণীয়। শেষাংশে নানা বিষয়ে হার্ডারের কথিত বাণীর সার সংকলিত হওয়ায় পুস্তকটির মূল্য আরও বেড়েছে। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

হিং টিং ছট্—দেড়কড়ি শর্মা। প্রকাশক—এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভোলানোর জন্যে, অথচ তারা আবৃত্তি ভালো করে আনন্দ পায় এমন ভালো কবিতা সব কিছু লিখেছেন সুকুমার রায়। তারপরে সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী এবং আরও অনেকে অনেক কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' আজও অদ্বিতীয়। 'হিং টিং ছট' এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে নূতন যোজনা হলেও, কবিতা হিসেবে বেশ ভালো হলেও, 'আবোল-তাবোলে'র চেয়ে ভালো নয়। শিশুসাহিত্য শিশুদের জন্যে হলেও তারও তো একটা অগ্রগতি আছে—সুতরাং এরচেয়ে ঢের বেশী সুন্দর কবিতা যদি আজও ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিতে না পারি, তা হলে আর এতদিনে শিশুসাহিত্য এগুলো কি! তবে সাধারণত যে সব কবিতা আজকাল শিশুপাঠ্য কাব্য ব'লে চালানো হয় 'হিং টিং ছট' তাদের তুলনায় অনেক ভালো। এবং এ বইটি যদি উপহার ব'লে পায়, ছেলেমেয়েরা ঠকবে না। ২০৫।৫০

সাহিত্য ও আলোচনা—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত। প্রকাশকঃ নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাহিত্য ও উপন্যাসের প্রকৃত সংজ্ঞা, রোমান্টিসিজম্ ও ক্লাসিসিজমের বিভেদ, বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সীমারেখা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর প্রভৃতি সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠগণের রচনাশৈলি ও বিষয়বস্তুর তারতম্য সম্বন্ধে লেখক আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি লেখকের অধ্যাপনাকালীন 'লেকচার নোটস্' হইতে গৃহীত এবং ছাত্রদের উদ্দেশে মুদ্রিত কি না জানি না। আমাদের মনে হয়, রচনাগুলি আরো সাবলীল ও জড়তাশূন্য হইলে সহজ বোধগম্য হইত। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট সাহিত্যিক মনীষীগণের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনাগুলি আদৌ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। প্রবন্ধ হইলেও নীরস পাণ্ডিত্যপ্রয়াসী দুরূহ শব্দের সংগ্রহ হইবে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ইদানীং অনেকেই পোষণ করেন না। আসল কথা এই সকল রচনা রসাশ্রিত না হইলে পাঠকসাধারণের মনোজ্ঞ হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রমথনাথ বিশীর এই-জাতীয় রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলি রসাল বলিয়াই রসোত্তীর্ণ।

The Constitution Of India—By Amar Nandi পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—বুকল্যান্ড লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। পৃঃ i—xii+১—২৬৭ মূল্য তিন টাকা মাত্র।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের এইরূপ সহজবোধ্য আলোচনা

সচরাচর দেখা যায় না। বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত তুলনামূলক বিচার পুস্তকখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য; এইরূপ বিচারের ফলে আলোচনা সত্যই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে উচ্চতর কোর্টগুলির ব্যাখ্যা এবং শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের প্রধান বিষয়গুলিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৩২৯।৫০

জনক-জননী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য দুই টাকা।

জনক-জননী—ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সহধর্মিনী দেবী সারদামণির জীবন কাহিনী। বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বের বিকৃত সভ্যতার বুকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের আশ্বাসে মানবসমাজ ছুটিয়া চলিয়াছে অন্ধকার হইতে অন্ধকারতম কক্ষের দিকে। আলো নাই। জীবনের ভরসা নাই। উন্মত্ততা, উত্তেজনা স্নায়ুকে করিয়া ফেলিয়াছে দুর্বল, জীবনকে করিয়া ফেলিয়াছে জুয়াড়ীর দাবার বড়ি। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের সাফল্যের তুঙ্গ শ্রেণীতে আজ মানুষ মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছে। বিজ্ঞানের এই শেষ প্রান্তে ভারতীয় সাধনার যাত্রা। এ যাত্রা পথেই আমরা রামকৃষ্ণের মত অতিমানবকে দেখি। তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনার অমরধারাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোতে জীবন আর জীবনাতীত দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়াছে। তাঁহার এই দিব্য জীবনের সঙ্গে দেবী সারদামণির জীবন অবিনাশী পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিব্য-জীবন কাহিনীই মর্তলোকে স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহাদেরই পুণ্য কাহিনী পুণ্য-স্মৃতি আঁকা আছে। নৃপেনবাবু ভাষার যাদুকর, তাঁহার লেখনশৈলী স্পষ্ট। জনক-জননী তাঁহার তুলির টানে এক বিচিত্র রঙেরসে পূর্ণ হইয়া এক সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের শিশুদের হাতে এই বইখানি তুলিয়া দিয়া নৃপেনবাবু সমাজের এক মহদুপকার করিলেন। জনক-জননী প্রতিগৃহে শান্তি সুখ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ৩১৪।৫০

বিবাহের পরে—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য। প্রার্থনা পাবলিশার্স ১১৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বাঙালী জাতির যৌন অজ্ঞতা দূরীকরণার্থে যৌন সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার হিড়িক লাগিয়াছে। কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ পরিশ্রম কম। খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বিদেশী পুস্তক হইতে সহজ অনুবাদ। দ্বিতীয়ত বাজারে এই জাতীয় পুস্তকের যথেষ্ট চাহিদা আছে। দৈন্যপীড়িত লেখককুলের পক্ষে ইহা কম আকর্ষণের কথা নহে।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে রচিত তথ্যপূর্ণ এই ধরণের বলিষ্ঠ পুস্তক অবশ্যই কাম্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু নিছক নগ্ন সত্যকে মানুষের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেই চলিবে না, রচনা বিজ্ঞানসম্মত এবং সমাজ জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদও হইতে হইবে। তাহা না হইলে যৌনতত্ত্বমূলক পুস্তকের সহিত বাজারে প্রচলিত পর্নোগ্রাফিক পুস্তকগুলির কোন প্রভেদ থাকিবে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ জাতীয় পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কারণ, নিশ্চয় উপযুক্ত লেখকের অভাব। 'Dangerous Zone'-এ ভ্রমণ করার মত এই ধরণের পুস্তকের লেখককেও সকল সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। কোথাও কোন রকমে যেন মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়। শুধু Biology বা Sexology-র জ্ঞান থাকিলেই চলিবে না, পাঠক সাধারণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের যথোচিত তৃপ্তি দিতে পারে নাই। রচয়িতা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁহার লেখনী হইতে আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থই আশা করিয়াছিলাম। ৯১।৫০

INDO-PAKISTAN TRADE & ITS PROSPECTS. By Prof. Shiba Prasad Mukherjee, M.A., Baikuntha Book House, 183, Cornwallis Street, Calcutta —6. Price 6 annas only.

দেশ বিভাগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, "ভারত-পাকিস্থানের বাণিজ্য" তাহারই অনুবৃত্তি মাত্র। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস হইতে আজ পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ সংস্থাপন সম্পর্কে সকল তথ্যই আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে বিবৃত হইয়াছে। লেখক এই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, করাচী চুক্তির মত কোন সাময়িক চুক্তিবিশেষ দ্বারা এই জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তাহার মতে একমাত্র উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন শুল্ক রীতিই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পুস্তিকাখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। ২২৫।৫০

প্রাপ্তি-স্বীকার

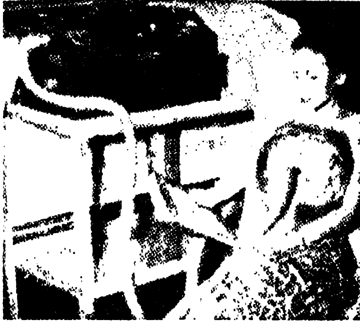
কিরীট এডভার্টাইজিং এজেন্সী ৭২-২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ১৯৫১ সালের পকেট ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার। এই এজেন্সী এক জন্মান্ধ ব্যক্তি দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। অন্ধের এই স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ফুস ফুস যন্ত্রের কাজ বন্ধ হলেই মৃত্যু নিশ্চিত একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজকাল কৃত্রিম উপায়ে এই ফুস ফুস যন্ত্র তৈরী করা হচ্ছে।

"আয়রণ লাঙ"-এর কথা আমরা অনেকেই জানি। আজকালকার বড় বড় হাসপাতালে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আজকাল আবার "আয়রণ লাঙ"-এর বদলে "প্লাস্টিক লাঙ" ব্যবহার করা হচ্ছে। এটার ওজন "আয়রণ লাঙে"র চেয়ে অনেক কম। এটার ওজন মাত্র



প্ল্যাস্টিক লাঙের সাহায্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

এক পাউণ্ড। আয়রণ লাঙের মত এর যন্ত্রপাতি এত জটিল নয়। দরকারের সময় এটা ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে "প্লাস্টিক লাঙ" "আয়রণ লাঙের" চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী।

*

আজকালকার দিনে পেট্রোল একটা বড় সম্পদ। সব দেশের উৎপন্ন পেট্রোলের একটা হিসাব করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে রাশিয়াতে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী পেট্রোলের খনি আছে। সারা পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় একশত ভাগের চৌদ্দ ভাগ রাশিয়ার অধীন। আর এই চৌদ্দ ভাগের মধ্যে বেশ ভাগ জমিতে পেট্রোলের খনি আছে। আবার সারা পৃথিবীর পাঁচ ভাগ স্থলভাগ আমেরিকার অধীনে তার মধ্যে ১২ ভাগ হচ্ছে পেট্রোলের খনি।

*

প্যারী শহরের এক স্থাপত্য শিল্পী এক নতুন ধরণের ইট তৈরী করেছেন। এই ইটগুলো ঠিক মদের বোতলের মত দেখতে। ঐ স্থাপত্যশিল্পীর মতে ইটগুলো মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহার্য কোনও জিনিসের মত দেখতে হওয়া উচিত এবং এমন হওয়া দরকার যাতে যে কোনও লোক সহজেই এগুলো নাড়াচাড়া করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই বোতল-আকৃতির ইট দিয়ে সাধারণ চৌকা আকৃতির ইটের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি এবং অল্পায়াসে দেওয়াল গাঁথা যায়। সাধারণ ইট দিয়ে যেটা গাঁথতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগে সেটা এখন নতুন ইট দিয়ে করতে ১০ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

*

আমেরিকার সৈন্য বিভাগ টিনের ভেতর সংরক্ষিত খাদ্য এক্স-রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখবার বন্দোবস্ত করেছে। এই উপায়ে পরীক্ষা করার ফলে এখন টিনের ভেতর রক্ষিত খাদ্য ভাল কি মন্দ নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি এই সব খাবার টিনের মরচের দরুণ বা অন্য কোনও কারণে কিংবা ভেজাল দেওয়ার ফলে খারাপ হয় তাহলে এক্স-রের সাহায্যে সেটা সহজেই ধরা পড়বে। এইভাবে পরীক্ষা করার সবচেয়ে লাভজনক ফল এই যে, টিনগুলোর মধ্যের খাবার পরীক্ষা করবার জন্য টিন তো খুলতেই হয় না, উপরন্তু এই সব টিন কাঠের বাক্সে প্যাক করা অবস্থাতেই পরীক্ষা করা যায়। এই এক্সরে যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, যদি কোন টিনের খাবার খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঐ টিনের ওপর একটা চিহ্ন করে দেবে। লরী অথবা ট্রেলারে যদি মাল তোলা থাকে তাহলে সে মাল না নামিয়ে পরীক্ষার যন্ত্রটি লরী বা ট্রেলারে নিয়ে গিয়ে টিনগুলো পরীক্ষা করে দেখা যায়।

*

বিমান ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনাও বেড়ে চলেছে। এই দুর্ঘটনার পর বিধ্বস্ত বিমানটিকে খুঁজে বার করা বিশেষ দুরূহ কাজ। অনেক সময় এর জন্য দিনের পর দিন অনুসন্ধান করতে হয়। ওয়াশিংটনের বিমান বিভাগ এই কাজটি



দুজন লোক বিপদবার্তা পাঠানোর যন্ত্রটি ধরে আছে

সহজ করার একটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক উড়োজাহাজের সঙ্গে এমন একটা যন্ত্র থাকবে যেটা বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে বিপদসূচক খবর পাঠাতে থাকবে। এই বিপদবার্তা কোথা থেকে আসছে সেটা অনুসন্ধানকারী বিমানের পক্ষে খুঁজে বার করা খুব অসুবিধাজনক হবে না।

*

এই জন্তুটির নাম হাতী-ইঁদুর (Elephant shrew)। ইঁদুরের সঙ্গে হাতীর তুলনা



হাতের চেটোর তুলনায় হাতী ইঁদুরটিকে কত ছোটো মনে হচ্ছে

করা সত্যিই খুব অদ্ভুত ব্যাপার। তবুও এটাকে হাতী ইঁদুর বলা হয় এর ঐ শুঁড়ের মত লম্বা নাকটির জন্য। এই জন্তুটি মানুষ আর বাঁদরের মত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেজন্য এই জন্তুটি ডাক্তারদের খুব প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়া রোগের কোনও নতুন ওষুধ পরীক্ষা করতে হলে এই জন্তুটির দরকার।

*

ডেনমার্কের অস্ত্র চিকিৎসক Eric Husfeldt হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচারের জন্য এক নতুন ধরণের ছুরি তৈরী করেছেন। ডাক্তারটির মতে এইরকম ছুরি অস্ত্রোপচারে পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। ছুরিটা অস্ত্রোপচারের সময় হাতের তর্জনীর সঙ্গে আটকান থাকে। ছুরিটায় এমন একটা হাতল লাগান আছে যাতে ছুরিটা যখন দরকার করে না তখন গুটিয়ে রাখা যায়। এই হাতলটা আবার হাতের উল্টো পিঠের সঙ্গে আটকানো থাকে। দরকারের সময় একটু চাপ দিলেই ছুরির ফলাটি আবার তর্জনীর কাছে বের হয়ে আসে। এই ব্যবস্থার ফলে অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তারদের ছুরি নেওয়া এবং রাখার জন্য একটা মুহূর্তও নষ্ট হবার সুযোগ পায় না।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভূশণ্ডী

শ্রীযুত জওহরলাল নেহরু শল্য চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমরা এখন উন্মাদের জগতে বাস করিতেছি। ইহার বিরুদ্ধে আমরা যাহাই বলি না কেন, ক্রমশ আমরা অধিকতর উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছি।

—সে বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের এখন সামলাইবে কে? শল্য চিকিৎসার সাহায্যে পাগলামি সারাইবার পূর্ণ ব্যবস্থা হওয়া কি সম্ভব?

* * * *

কোরিয়া রণাঙ্গনে অষ্টম আর্মির পরিচালক লেঃ জেঃ রিজওয়ে নববর্ষ উপলক্ষে সৈন্যদের বাণী প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হইব।

—কিন্তু শেষ দেখিতে দেখিতে এদিকের সবই তো শেষ হইয়া আসিল।

* * * *

ফরিদপুরের এক গ্রামে জনৈক মুসলমান কোন হিন্দু বিধবাকে তদীয় নাবালক পুত্র সমেত জোর করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করার পর নিকা করে ও উক্ত বিধবার সম্পত্তি নিজ নামে লিখাইয়া লয়। হিন্দুরা আতঙ্কিত হইয়া স্থানীয় দারোগাবাবুর শরণাপন্ন হইলে তিনি বলেন, তোমরাও সকলে মুসলমান হইয়া যাওনা কেন, তাহা হইলেই আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না।

—মিঞা সাহেব উপায়টা ভালই বাতলাইয়াছেন; কিন্তু ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেলে ডাঃ মালেক ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়েরা করিবেন কি?

* * * *

লণ্ডনে বামপন্থী দলের মুখপত্র রেনল্ড নিউজ স্তালিন সাহেবকে সকাতরে অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারই কথামত গণতন্ত্র ও সোবিয়েৎতন্ত্র কেমন পাশাপাশি বাস করিতে পারে, তাহা তিনি দয়া করিয়া দেখাইয়া দিন।

—স্তালিন সাহেব অত বোকা কিনা? একবার যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিতে সোবিয়েৎ রমণীরা দলে দলে তাহাদের গলায় মালা দিয়া তাঁহাকে বেইজ্জৎ করিয়াছে। আবার কখনও তিনি সে ভুল করেন?

আসাম সীমান্ত এলাকার খবরে প্রকাশ যে, সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর ধর্মান্ধ মোল্লাগণ বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠান করিয়া বলেন, এইবার পাকিস্থানের সুবর্ণ সুযোগ, আর উপেক্ষা করা চলিবে না।

—খবরটা প্রায় যুদ্ধং দেহির অনুরূপ ভাবিয়া মনটা দমিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভাল করিয়া পড়িয়া যখন দেখিলাম মোল্লারা এই কথা বলিয়াছেন, তখনই এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, ইঁহাদের দৌড় কতদূর তাহা আমাদের জানা আছে।

* * * *

বহরমপুরে একটি চিতাবাঘকে একদল বানর সমবেত হইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

—যুগ যা পড়িয়াছে তাহাতে বহু ব্যাঘ্রকে এখন বানরদের হাতেই মারা পড়িতে হইবে।

* * * *

বোম্বাইয়ের এক সভায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস সরকার দেশ হইতে দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিতে পারে নাই। এইবার নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী দল গভর্নমেণ্ট অধিকার করিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

—শ্রীজয়প্রকাশ কাপড়ের কলে ধর্মঘট বাধাইয়া শ্রমিকদের অভাব মোচনের যেভাবে সমাধান করিয়াছিলেন ঠিক অনুরূপ সমাধান করিলে দেশবাসীর যে ধনপ্রাণটুকুও খোয়া যাইবে তাহা সকলেই বোঝে।

* * * *

বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আণে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিস্টদের প্রচারকার্যের প্রতি কেহ যেন কান না দেন।

—কিন্তু না দিয়া উপায় কি? কম্যুনিস্টরা যেরূপ দেশের চতুর্দিকে ছবি, পুস্তক, পত্রিকা বাহির করিয়া চার ফেলিতেছে তাহার সহিত পাল্লা দিতে গেলে নেতাদের চক্ষু ও কর্ণ আর একটু সজাগ হইলে ভাল হয় নাকি?

* * * *

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিতে হইবে।

—বাঙালীরা সে মোহ ত্যাগ করিলে সে স্থলে আরও মাদ্রাজী আসিয়া বসিয়া পড়িবে, সেই তো ভয়।

বর্তমান বৎসরের প্রথমভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করিবে।

—আমাদের ঘরের পাশে এ পরীক্ষা না চালাইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন দ্বীপপুঞ্জে কায়দাটা দেখাইলে ভাল হইত না কি?

* * * *

প্রকাশ দলাই লামা ভারতে পলাইয়া আসিতেছেন। যাতুংয়ে দলাই লামাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। তিব্বতীরা মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়।

—ইহাকেই সার্থক পশ্চাদপসরণ বলা যাইতে পারে।

* * * *

বোম্বাইয়ের মত মদ্য বিবর্জিত শুষ্ক শহরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ গিল্ডারের বহির্বাটিতে বসিয়া তাঁহারই ভৃত্য মদ্য চোলাই করিয়া রাখে। ডাঃ গিল্ডার পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন।

—ওঃ ধন্য সাহস! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ইহাকেই বলে।

* * * *

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাঁকোরঘাটে চতুঃপার্শ্ববর্তী এক মাইলের মধ্যে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

—কিন্তু আর কিছুদিন পূর্বে ১৪৪ ধারা জারী করিলে সাঁকোটা বাঁচিত। লোকে জিভ দিয়া চাটিয়া চাটিয়াই সাঁকোর অর্ধেক সাবাড় করিয়া দিল।

এবারের উদয়শঙ্কর

প্রায় দেড় যুগ আগে কলকাতা থেকেই উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যাভিযান আরম্ভ করেন। সেই থেকেই তিনি কলকাতার একটি নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে আছেন। আমরাও তাঁকে এবং তাঁর পরিচালিত সম্প্রদায়কে প্রায় প্রতি বছরই দেখে আসছি। তাই প্রতি বার দেখবার সময় তখনকার কৃতিত্বকে তার পূর্ববর্তী কীর্তির সঙ্গে তুলনা করার ইচ্ছা স্বতঃই মনে জেগে ওঠে। প্রতিবারই, দর্শক-মনকে সম্পূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরার তাঁর একটা অদ্ভুত কৌশল অনুভব করে এসেছি। তার আসরে এমন একটা ব্যক্তিত্ব, এমন একটা জৌক ফুটে থাকে যে তার পাল্লা থেকে রেহাই পাওয়া একরকম অসম্ভবই বলা যায়। নাচিয়ে বা বাজিয়ে নির্বাচনে বা তাদের পরিবেশনে ও তাদের নিয়ে অনুষ্ঠানসূচী রস ও রুচিবোধের ওপরেও উদয়শঙ্কর যে অতিরিক্ত শক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছেন তা হ'লো 'শোম্যানসিপ' অর্থাৎ লোকের মন জাগিয়ে যাওয়ার কৌশল। তাই নৃত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর যে আসন, 'শোম্যান' হিসেবে তাঁর আসন সবায়ের চেয়ে ওপরে। তাই নাচিয়েদের মধ্যে আমাদের দেশে তাঁর গুরুস্থানীয় অনেকে থাকলেও উদয়শঙ্কর তাঁর বর্ণসংকর নাচ দিয়েই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছেন, নিখাদ খাঁটি জিনিস দিয়েও কেউ তা পারেন নি। কিন্তু এবারের উদয়শঙ্করকে দেখে মনে হলো তাঁর সেই 'শোম্যানসিপ' প্রতিভা যেন অস্তের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আগেকার জৌলুষ আর যেনো নেই।

তাঁর এবারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে ৪ঠা জানুয়ারী থেকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। প্রথম চারদিনের পর আসর স্থানান্তরিত হয় ছায়া চিত্রগৃহে। এখান থেকে সম্প্রদায়টি ভারতের বিভিন্ন শহর ঘুরে ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণে যাবেন। এবারকার অভিযানের অনুষ্ঠানসূচীতে ভিন্ন ভিন্ন বত্রিশটি নাচের বিবরণ দেওয়া আছে; গুটি চারেক ছাড়া তার সবই পুরাতন ও বহু-পুরাতন রচনা। আমাদের তার মধ্যে মোট ১০টি ভিন্ন ভিন্ন নাচ পরিবেশন করা হয়। উদয়শঙ্কর ছাড়া নাচিয়েদের মধ্যে আর একমাত্র আকর্ষণ অমলাশঙ্কর। প্রদর্শিত নাচগুলির মধ্যে সাতটি নাচ হচ্ছে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক আখ্যানের ভিত্তিতে ক্লাসিকাল নৃত্য ভেঙে রচিত, আর বাকী তিনটি লোকনৃত্য। উদয়শঙ্কর সবশুদ্ধ পাঁচটি নৃত্যে অবতরণ করেন, দুবার একক,— ইন্দ্র ও গন্ধর্বের ভূমিকায়; এবং বাকী কবার সমগ্র দলসহযোগে—বিদায়, প্রমীলা-অর্জুন ও তাণ্ডব-নৃত্যে। অমলাশঙ্করকে দেখা যায় সাতটি নৃত্যে, তার মধ্যে একটিতে এককভাবে, কৃষ্ণ-নী' নৃত্যে। সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিল্পীরা হচ্ছেন প্রীতি, স্মৃতি, গীতা, উমা, শঙ্করণ ও রাঘবন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সরোদী বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে আছেন জলতরঙ্গের বাদল ধর, তবলায় শিশির ভট্টাচার্য, বাঁশীতে পরেশ ধর, সেতারে রবীন মিত্র, তবলা-তরঙ্গে কমলেশ মৈত্র এবং মঞ্চ ব্যবস্থায় চিরঞ্জী শা।

রঙ্গজগৎ

নাচগুলির মধ্যে নতুন রচনা কয়েকটি থাকলেও সব দিকেই নতুনত্বের অভাবটা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। না নৃত্য পরিকল্পনায় আর না সুরযোজনায় মন বেশ চাঙা হয়ে ওঠার মতো জোর একটি ক্ষেত্রেও পাওয়া গেলো না। এবারের নৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে জমেছিলো প্রমীলা-অর্জুন ব্যালেটি। নতুন রচনা। এতে পাশ্চিমিশেলী নৃত্যধারা অবলম্বন করা হয়েছে; সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুরের আশ্রয় না নিয়ে বিবিধ যন্ত্রের বিশিষ্ট ঝঙ্কারের ওপরে তাল ও পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। নৃত্য-রচনা ও উপস্থাপন কৌশল উদয়শঙ্করের আগের প্রতিভার কথা মনে করিয়ে দিলেও এর মধ্যে তেমন কোন মৌলিকত্ব পাওয়া যায় না।

অন্য নাচগুলির মধ্যে কিছুটা জমে উঠেছিলো লোকনৃত্যদুটি গ্রাম্য উৎসব ও বিদায়। দুটোই হাল্কা ধরণের নাচ। প্রথমটি ফসলের আনন্দে মাতোয়ারা কৃষকদের আনন্দ-উৎসব এবং দ্বিতীয়টি কনের শ্বশুরালয়ে যাওয়ার বিদায়-পর্ব। বাকী নৃত্যগুলি খুবই নিষ্প্রভ মনে হ'লো; এমন কি বিশ্ববিশ্রুত তাণ্ডব নৃত্যটিও। আগেকার সে চটকও আর যেনো নেই। প্রথম নাচ, মণিপুরী রাস, পোষাকের জাঁকে চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও মনে নাড়া তোলে সামান্যই।

'ভারতী'র উদ্বোধন

গত ৫ই জানুয়ারী নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে দক্ষিণ কলকাতায় শহরের নবতম চিত্রগৃহ 'ভারতী'র উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। "রূপবাণী" ও "অরুণা" পরিচালনা করে' দেশের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকরূপে যাঁরা আসন লাভ ক'রেছেন "ভারতী"-রও কর্ণধার তাঁরাই। "ভারতী" তাঁদের কীর্তিকে আরও সমুজ্জ্বল ক'রে তুলবে। এই নিয়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে চিত্রগৃহের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৮— প্রাচ্যের যে কোন শহরের চেয়ে বেশী।

"ভারতী"-র নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় গত যুদ্ধের মাঝেই। কিন্তু সম্পূর্ণ হ'তে এতোগুলি বছর লাগার কারণ চিত্রগৃহটিকে সর্বদিক দিয়ে আধুনিক ক'রে তোলার প্রচেষ্টার দরুণ। চিত্রগৃহের কেবলমাত্র ইমারৎটাই দিশী জিনিসের ওপর নির্ভর ক'রে খাড়া করা যায়, তাছাড়া সমস্ত কিছুর জন্যেই আমাদের বিদেশের ওপর নির্ভর ক'রতে হয়। সাধারণ চালু জিনিসই বিদেশ থেকে এখন আনানো আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তার ওপর বেশী দামের জিনিস আনতে বহুবিধ বাধার সামনে পড়তেই হয়। সব বাধা কাটিয়ে বিদেশী যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছতে দেরী হওয়ার জন্যেই চিত্রগৃহটি সম্পূর্ণ হ'তে এতো সময় লেগেছে। তবে বলা যেতে পারে যে, অপেক্ষা সার্থক হ'য়েছে। "ভারতী" কেবল দক্ষিণ কলকাতায়ই নয়, আধুনিক আরামপ্রদ যাবতীয় ব্যবস্থা রুচিসম্মতসাজে "ভারতী" শহরের যাবতীয় চিত্রগৃহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃতিলাভ ক'রবে। "ভারতী" শহরের শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংযুক্ত দশম চিত্রগৃহ; এবং এইটে হ'লো চতুর্থ চিত্রগৃহ যেখানে ওঠানামার জন্যে 'লিফ্ট'-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশেষভাবে নজরে পড়ে আসন ব্যবস্থাটা; বসবার আরামের দিকে নজর রাখা হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে আসনশ্রেণীর মাঝখানকার চলাফেরার পথের প্রশস্ততাও দর্শকদের অনেকখানি স্বস্তি এনে দেবে। চিত্রগৃহটি সাজাবার কৃতিত্ব শিল্পী খগেন রায়ের।

"ভারতী"র উদ্বোধন চিত্র হরিশ্চন্দ্র পিকচার্সের "বহুরূপী"। উদ্বোধন উপলক্ষে সেদিন সকালে শহরের চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, শিল্পী, কলাকুশলী, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে চিত্রগৃহটি ভরে যায়। উদ্বোধনে চিরাচরিত কোন অনুষ্ঠানাদি পালন না করা একটা লক্ষ্য করার মতো বৈশিষ্ট্য।

নতুন ছবির পরিচয়

সরগম (ফিল্মিস্তান)—পরিচালনা : সন্তোষী; সুরযোজনা : সি রামচন্দ্র; ভূমিকায় : রেহানা, রজকাপুর, পারো প্রভৃতি।

জালান ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ৫ই জানুয়ারী কলকাতায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

গত মাসে দিল্লীর ওডিয়ন সিনেমাতে বসে ছবি দেখতে দেখতে ফিল্মিস্তানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর চুনীলাল অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেন। তিনি দেখছিলেন এই 'সরগম' ছবিখানিই, তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানেরই তোলা। এখন আমরা ছবিখানি দেখবার পর, বুঝতে পারছি যে, এ-ছবির দায়ীত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়ার লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তিনি মৃত্যু-বরণ ক'রে নিয়েছেন। বাস্তবিকই ছবির নামে যে উৎকট পাগলামী দেখানো হ'য়েছে তাতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপাত্র চুনী-লালের পক্ষে সেই ছবিরই প্রযোজকরূপে জীবন ধারণ দুঃসহ হ'য়ে ওঠারই কথা।

ছবিখানিতে হলিউডের "মিউজিক্যাল 'কৃষ্ণ-নী' নৃত্যে। সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিল্পীরা এর মধ্যে দিশী হ'চ্ছে কেবল পাত্রপাত্রীর নাম-ধাম আর রীতি-যুক্তি-বিহীন কাহিনী, ঘটনা, দৃশ্যাদি, সাজপোষাক ও দৃশ্যাদির পরিকল্পনা। ইতিপূর্বে বহু ন্যক্কারজনক ছবি বম্বে থেকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু "সরগম"-এর সামনে সেগুলি উপহাস ব'লে মনে হবে—ছ্যাবলামোতে আর পাগলামোতে এমন ছবি আর দ্বিতীয় দেখা যায়নি।

ছবিখানির দশখানি গানের মধ্যে পাঁচখানি হ'চ্ছে হলিউডি প্যাটার্নে বিরাট নৃত্য সহযোগে এবং নাচগুলির জন্যে সৃষ্ট দৃশ্যাদি নির্মাণের খরচ থেকে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র ছবি-খানির খরচ দশ-বারো লক্ষ টাকার কম নয়। কি বিরাট অপব্যয় এবং মহার্ঘ সামগ্রীর অপচয়, দেখলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। বিলিতী ঢঙ ও ধরণ অনুকরণে সুবিধে হবে ব'লে গল্পের ক্ষেত্রকে, এমন কি ইরাণ, আফ্রিকা ও জাহাজের ডেকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে।

গল্পের উদ্দেশ্য মারোয়াড়ী সম্প্রদায়কে যেনো হেয় করার জন্যেই রচিত। কারণ, এতে দেখানো হ'য়েছে, রূপচাঁদ নামক জনৈক মারোয়াড়ী ধনী থিয়েটারের মালিক তাঁর প্রাক্তন সহযোগী সঙ্গীতবিদ্ পণ্ডিত জ্ঞানশঙ্করের বাড়ি নিলাম ক'রে তার মেয়েদের গৃহহীনা ক'রে দেওয়া থেকেই যাবতীয় ঘটনার আরম্ভ। শেষ পর্যন্ত রূপচাঁদকে এমন অর্থপিশাচ দেখানো হ'য়েছে যে, সে যখন তার বিলেত ফেরৎ ছেলে বিনোদের সঙ্গে ক্রোড়পতি রাজা সাহেবের একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যবস্থা করে তখন ঘটনাচক্রে বিনোদের অনুপস্থিতিতে, বিনোদের বন্ধু শ্যামকে রাজা সাহেবের মেয়ে বিনোদ মনে করে প্রেম করতে থাকে। রূপচাঁদ যখন তা জানতে পারলো তখন হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়লো যে, শ্যাম তারই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজা সাহেবের টাকাটা যখন ঘরেই আসবে তখন শ্যাম রাজা সাহেবের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করায় তার আপত্তি নেই। এমনি ধারা আগাগোড়া মারোয়াড়ী রূপচাঁদের অর্থগৃধ্নুতার অশোভনীয় পরিচয় এনে দেওয়া হ'য়েছে। গল্পের আর একটা দিক হ'চ্ছে নায়ক বিনোদকে নিয়ে, সে জ্ঞানশঙ্করের কন্যা ভৈরবীকে বার বার অপহরণ করার বাহাদুরী দেখিয়ে গিয়েছে। যুক্তি, রুচি বা শালীনতার কোন বালাই নেই বিনোদের—যখন তখন যে কোন অবস্থায় ও স্থানে সে আলাদীনের জিনের মতো আবির্ভূত হয় একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—ভৈরবীকে অপহরণ করা। কি উদ্দেশ্য নিয়ে যে ছবিখানি পরিকল্পিত হ'য়েছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু অতো বিপুল অর্থের এমন অপব্যয় কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রতিপত্তি জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে, কাজেই পৃষ্ঠপোষকদের সামনে যা তা জঘন্য জিনিস এনে দেবার অধিকার কারুর নেই।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ও ভারতীয় দলের বে-সরকারী তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ কলিকাতায় অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল এই খেলায় বিজয়ী হইবার মত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা রক্ষা করিতে পারে নাই। কমনওয়েলথ দলের দৃঢ়মনা খেলোয়াড়গণ ভারতীয় দলের ত্রুটি ও বিচ্যুতির সুযোগে খেলার গতি বিপরীত মুখী করিয়া অপ্রত্যাশিত ফলাফলেই খেলা শেষ করিয়াছে। এইবারের টেস্ট পর্যায়ের খেলায় কমনওয়েলথ দল বোম্বাইর মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় যেরূপ শোচনীয়ভাবে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে তাহার পর ঐ পরাজয়ের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দানের সম্ভাবনায় ভারতীয় দল এইভাবে বঞ্চিত হইল ইহাই সকলকে ব্যথিত ও মর্মাহত করিয়াছে। ক্রিকেট খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে সুতরাং দুঃখ করিয়া কোনই লাভ নাই। অবশিষ্ট দুইটি টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল যাহাতে জয়ী হইতে পারে তাহার জন্যই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে পূর্বের ভারত ভ্রমণকারী কমনওয়েলথ দলকে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পরাজিত করিয়া ভারতীয় দল যে গৌরব অর্জন করে তাহার পুনরাবৃত্তি এইবারে করা কোনরূপেই সম্ভব হইবে না।

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় দল কেন বিজয় গৌরবে ভূষিত হইল না এই বিষয় লইয়া অনেকেই অনেক তথ্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন হইলেও আমাদের চক্ষে যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়িয়াছে তাহা না বলিয়া পারি না। সর্বপ্রথম ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণের মধ্যে বিজয়ী হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিজয় হাজারে পর পর তিনটি টেস্ট খেলায় শতাধিক রাণ করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিলেও তৃতীয় টেস্ট খেলায় যেভাবে শতাধিক রাণ করিয়াছেন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা চলে না। তিনি ২৬০ মিনিটে শতাধিক রাণ করিয়া ও শেষ পর্যন্ত ৩৩৫ মিনিট খেলিয়া যেভাবে আউট হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইলেও দলকে বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে খেলা শেষ করিতে হইবে তাহার গতি মন্থর হইলে কখনই অভিষ্ট ফললাভ করা যায় না। ইহার জন্যই কমনওয়েলথ দল অবশিষ্ট সময় দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া সময় ক্ষেপণ করিয়া খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে পারিয়াছেন। শেষ সময় যে দুইজন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়াছেন উহাদের ক্রীড়া-কৌশল অবলোকন করিলেও দেখা যাইবে দলের শোচনীয় অবস্থা জানা সত্ত্বেও দ্রুত রাণ করা বিষয়ে কখনই পশ্চাদপদ হন নাই। একটি বিষয় উল্লেখ না করিলে খুবই অন্যায় হইবে যে খেলাটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কয়েক মিনিট ছাড়া উত্তেজনামূলক হয়। ফিল্ডিং বিষয়ে ভারতীয় দলের যে অখ্যাতি আছে এই খেলায় তাহার কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। উইকেটরক্ষক হিসাবে যাহাকে দলে গ্রহণ করা হইয়াছিল তিনিও শেষদিকে বহু সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছেন। বোলিং বিষয় বলিতে গেলে বলিতে হয় আক্রমণকারী বোলারের সত্যই অভাব ছিল। ইহার উপর অধিনায়ক দুর্বলচিত্ত হওয়ার অহেতুক বোলিং পরিবর্তন করিয়াও কমন-ওয়েলথ দলের ব্যাটসম্যানদের রাণ তোলার বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। একটি বিষয় এই খেলায় লক্ষ্য করিবার—তাহা হইল দিনের মোট রাণ সংখ্যা। উহা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে চতুর্থ দিন ব্যতীত অন্য সকল দিনেই মন্থর গতিতে রাণ উঠিয়াছে। নিম্নের প্রতি দিনের মোট সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

প্রথম দিন—১৯৯ রাণ; দ্বিতীয় দিন—১৯৯ রাণ; তৃতীয় দিন—২২১ রাণ; চতুর্থ দিন—৩১৫ রাণ ও পঞ্চম দিনে—২৫৬ রাণ সংগৃহীত হয়। পিচ শেষদিন পর্যন্ত ভাল অবস্থাতেই ছিল ইহাও না বলিয়া পারা যায় না। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক এই খেলার শেষে বিবৃতি মারফৎ বলিয়াছেন:—"এই খেলার সকল গৌরব ভারতীয় দলের।" কিন্তু আমরা বলিব এই খেলার সকল গৌরবের অধিকারী কমনওয়েলথ দল। কারণ তাঁহারা ভারতীয় দলের জয়লাভের সকল সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া পরাজয়ের গ্লানি হইতে দলকে মুক্ত করিয়াছেন।

খেলার ফলাফল:—

কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস:—২২৭ রাণ (আইকিন নট আউট ৯৬, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬১, বি ডুল্যান্ড ২৭; ডি ফাদকার ৬০ রাণে ৪টি, এন চৌধুরী ৩৭ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস:—৭ উইঃ ৪৬৭ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (বিজয় মার্চেণ্ট ২৯, এন আর রেগে ৪৮, পি আর উমরিগার ৯৩, বিজয় হাজারে ১৩৪, ডি ফাদকার ৪২, সি এস নাইডু ৫৪; রিজওয়ে ১৩২ রাণে ৪টি, ওরেল ৯৬ রাণে ২টি, রামাধীন ৮৬ রাণে ১টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৪৫৭ রাণ (জেোট আইকিন ১১১, এফ ওরেল ৫৮, বি ডুল্যান্ড ১০৬, জি ট্রাইব ৩৯, স্টিফেনসন নট আউট ৬০; এন চৌধুরী ৭৬ রাণে ৩টি, বিনু মানকড় ১০২ রাণে ৪টি, বিজয় হাজারে ৫৪ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১ উইঃ ৩৯ রাণ (এন চৌধুরী নট আউট ১২, বিনু মানকড় নট আউট ১২; এমেট ১৯ রাণে ১টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ বনাম বিহার রাজ্যপাল দল

জামসেদপুরের কীনান স্টেডিয়ামে কমনওয়েলথ বনাম বিহার রাজ্যপাল দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। কমনওয়েলথ দলের সহ অধিনায়ক ওরেল এই খেলায় ভ্রমণের দ্বিতীয় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জর্জ ট্রাইব দুই ইনিংসে ১৬২ রাণে ১০টি উইকেট লাভ করিয়া বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিহার রাজ্যপাল দলের পক্ষে বাঙলার দুইজন খেলোয়াড় পি রায় ও পি চ্যাটার্জি যোগদান করিয়া ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পি চ্যাটার্জির খেলা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে ইনি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় দলের মধ্যে স্থান লাভ করিবেন বলিয়া সকলেই আশা করেন। পি রায়ের খেলাতেও যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

খেলার ফলাফল:—

বিহার রাজ্যপাল দলের প্রথম ইনিংস:—১৯৩ রাণ (পি রায় ৪১, পি চ্যাটার্জি নট আউট ৩৩, বি ফ্রাঙ্ক ২৩, সুটে ব্যানার্জি ২০; স্যাকলটন ২৬ রাণে ৩টি, ট্রাইব ৬১ রাণে ৩টি ও রিজওয়ে ১৫ রাণে ২টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস:—৮ উইঃ ৩৪৩ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (ফিশলক ৪২, গিম্বলেট ৩৩, সার্টক্লিফ ৩৭, ওরেল ১১৬, আইকিন ২৪; পি রায় ১৪ রাণে ৩টি, বিমল বসু ৫৯ রাণে ২টি উইকেট পান।)

বিহার রাজ্যপাল দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৯ উইঃ ২৪৮ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (রাজেন্দ্রনাথ ৭৮, বিমল বসু নট আউট ৩০, পি চ্যাটার্জি ৪৭, নাখুদা ২৮, পি রায় ২৪; ট্রাইব ১০১ রাণে ৭টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—২ উইঃ ৪০ রাণ (গিম্বলেট ১৮ রাণ নট আউট; মণ্টু সেন ১৯ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ভারতীয় চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড়গণ খেলিবেন তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। তৃতীয় টেস্ট খেলায় যোগদানকারী চারিজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তে অপর চারিজন খেলোয়াড়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। নবমনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্যে মুস্তাক আলী, পি জি যোশী ও বি সি আলভা ইতিপূর্বেই টেস্ট খেলায় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে খেলিয়াছেন। কিষেণ-চাঁদ খেলিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং পূর্বের তিনটি টেস্ট খেলার ভারতীয় দলের পক্ষ সমর্থন করেন নাই এইরূপ কোন খেলোয়াড়কেই চতুর্থ টেস্ট দলে গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভা-পতি খুব জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের টেস্ট খেলার উপযুক্ত করিবার জন্যই বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। পর পর চারিটি টেস্ট খেলার দল মনোনয়ন অবলোকন করিয়া তাঁহার উক্তির সমর্থনযোগ্য কোনই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া গেল না ইহাই আশ্চর্য। দুর্বল চিত্ত অধিনায়ক, আক্রমণকারী বোলারের অভাব ও ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং যতদিন ভারতীয় দলের মধ্যে থাকিবে ততদিন ভারতীয় দল টেস্ট খেলায় জয়-লাভ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়দের একটি দল লইয়া কমন-ওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্ট খেলায় যোগদান করিলে ভারতের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আর একটিমাত্র টেস্ট খেলা বাকী রহিয়াছে যাহার দল নির্বাচন সময়ে পরি-চালকমণ্ডলী উক্ত রীতি অনুকরণ করিলে বিশেষ সুখী হইতাম। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—বিজয় মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), বিজয় হাজারে (সহ অধিনায়ক), এস মুস্তাক আলী, সি এস নাইডু, বিনু মানকড়, ডি জি ফাদকার, জি কিষেণচাঁদ, পি আর উমরিগার এন চৌধুরী, পি জি যোশী ও বি সি আলভা। দ্বাদশ ব্যক্তি এম আর রেগে। অতিরিক্ত হিরালাল গাইকোয়াড় ও রাজেন্দ্রনাথ।

প্রধান মন্ত্রীর দল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কমনওয়েলথ দলের সহিত প্রধান মন্ত্রীর দলের এক চারি দিনব্যাপী খেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই খেলা ৩রা মার্চ হইতে বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১লা জানুয়ারী—নেপালে শাসন সংস্কার প্রবর্তন সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে ভারত ও নেপাল গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, অদ্য নববর্ষের প্রথম দিবসে উহার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিহারের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ অদ্য পাটনা হইতে ৫০ মাইল পূর্বে অবস্থিত মোকামা উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বাস্তুদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য বিহার গভর্নমেণ্ট পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের তিনি আশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, শীঘ্রই তাহাদের পুনর্বসতির কাজ আরম্ভ করা হইবে।

২রা জানুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৮তম এবং ভারত মহাসাগরীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এইচ জে ভাবা।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে অদ্য বিমান যোগে বোম্বাই হইতে লণ্ডন যাত্রা করেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, বিমান হইতে জরীপ চালাইয়া পূর্ববঙ্গের রাজসাহী জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে নদীর সীমানার মানচিত্র প্রস্তুত সম্পর্কিত কার্য অদ্য আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতে আফগানিস্থানের রাষ্ট্রদূত ডাঃ নজিবউল্লা খাঁ নয়াদিল্লীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আফগানিস্থান পাখতুনিস্থানের স্বাধীনতা চায়, কারণ ঐ স্থানে শান্তি বজায় রাখার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন।

৩রা জানুয়ারী—খাদ্য মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী অদ্য কলিকাতার রাজ্যপাল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণকালে বিদেশ হইতে যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণ খাদ্য আমদানী করিয়া এবং আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টাসমূহ প্রবলতর করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট কিভাবে আগামী বৎসরের (১৯৫১-৫২ সাল) খাদ্য সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেনমার্ক হইতে যে দুইখানি মাছ ধরা জাহাজ আনাইয়াছিলেন, সেই জাহাজ দুইটি বঙ্গোপসাগরের জলে মাছ ধরার প্রথম পর্ব শেষ করিয়া অদ্য কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। জাহাজ দুইখানিতে এবার ৩৫০ মণ মাছ আনা হইয়াছে।

অদ্য গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় দূত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সমাবর্তন ভাষণ দেন।

৪ঠা জানুয়ারী—আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী গৌহাটীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদের আসাম সীমান্তের নিকট তিব্বতে উপস্থিতির দরুণ ভারতের বিপদ ঘটিতে পারে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি কয়েক দিন যাবৎ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নূতন নূতন বহু পাকিস্থানী সৈন্যের সমাবেশ হইতেছে। এই সীমান্ত প্রায় ৭৫ মাইল দীর্ঘ এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

৫ই জানুয়ারী—নিবারক নিরোধ আইন অনুসারে বিভিন্ন জেলে আটক ৮৮ জন রাজবন্দী তাহাদের আটকাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, সেই আবেদন সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত সেন অদ্য রায় দেন। বিচারপতি শ্রীযুত সেন ও শ্রীযুত চন্দ্র পূর্বেই আবেদনকারীদিগকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন। রায় দান প্রসঙ্গে শ্রীযুত সেন কম্যুনিস্ট দলকে অবৈধ ঘোষণা বেআইনী বলিয়া মন্তব্য করেন।

আঞ্চলিক বাহিনী সপ্তাহ উপলক্ষে ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং ভারতের যুব সমাজকে দলে দলে উক্ত বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করা হইয়াছে; দেশরক্ষা কার্যে আঞ্চলিক বাহিনীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজস্থানের রাজপ্রমুখ মহারাজ সোয়াই সিং অদ্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীহীরালাল শাস্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার নয়জন সহকর্মীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি দুইজন সরকারী কর্মচারী লইয়া অন্তর্বর্তী মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

১৯৫১ সালে বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতার প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, গত সোমবার ও মঙ্গলবার পাকিস্থানী হানাদারেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মাথাভাঙ্গা নদী পার হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত করিমগঞ্জ থানা এলাকায় হানা দেয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর চড়াও হইয়া তাহাদের গরু ও বলদ লইয়া পলায়ন করে।

৬ই জানুয়ারী—বরোদার মহারাজা বরোদা রাজ্যকে বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি জানাইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র দিয়াছিলেন, ভারতের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী ভি পি মেনন তাহা খণ্ডন করিয়া মহারাজার পত্রের জবাব দিয়াছেন।

গ্যাংটক-এ (সিকিম) প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অনতিবিলম্বে দলাই লামার ভারতে আগমনের সম্ভাবনা নাই এবং দলাই লামা কিছুকাল যাতুং-এ অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী—গ্যাংটক-এ (সিকিম) প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কিছুকাল নীরব থাকার পর চীনের কম্যুনিস্ট বাহিনী তিব্বতে পুনরায় দুই তিন দিক হইতে আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

অদ্য ৭ই জানুয়ারী হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সপ্তাহ পালিত হইবে।

অদ্য কলিকাতায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী সপ্তাহের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে আঞ্চলিক বাহিনীর সৈন্যগণ কুচকাওয়াজ সহ বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করে।

কেন্দ্রীয় পাখতুনীস্থান জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট জনাব জহিরুদ্দীন খান রমজানী অদ্য নয়াদিল্লীতে বলেন যে, শীঘ্রই পাখতুনীস্থানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, এই কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ৫০ লক্ষ পাখতুন একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসিবে।

বিদেশী সংবাদ

১লা জানুয়ারী—চীনা কম্যুনিস্ট ও উত্তর কোরিয় বাহিনীর দুই লক্ষ সৈন্য সিউল অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ যে, কম্যুনিস্ট বাহিনী ইমজিন নদীর দক্ষিণে দশ মাইল অগ্রসর হইয়া সিউলের ২০ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ এস এন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২রা জানুয়ারী—পশ্চিম কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর রক্ষা ব্যূহের উপর আক্রমণকারী কম্যুনিস্ট বাহিনীর অগ্রগামী চীনা সৈন্যদল অদ্য রাত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের ১২ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

৩রা জানুয়ারী—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী ও গভর্নমেণ্টের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সিউল পরিত্যাগ করিয়া অদ্য দক্ষিণ উপকূলবর্তী নূতন আপৎকালীন রাজধানী পুসানে পৌঁছিয়াছেন।

৪ঠা জানুয়ারী—টোকিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী সিউল পরিত্যাগ করিয়াছে।

অদ্য লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রিগণ বিশ্বপরিস্থিতির আলোচনা করেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার বিচারের সময় আমরা যেন আমাদের মূল লক্ষ্য বিশ্বশান্তির কথা বিস্মৃত না হই। শ্রী নেহরু চীন তথা এশিয়ার সমস্যার আলোচনা করেন। অদ্যকার অধিবেশনে পাকিস্থান যোগদান করে নাই। সম্মেলনে স্থির হয় যে, সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাক প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাইয়া তার প্রেরণ করা হইবে।

৫ই জানুয়ারী—সিউল ত্যাগের ২৪ ঘণ্টা পরে গতকল্য রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর এবং সহস্র সহস্র কোরিয়ান অধিবাসী রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ জাহাজযোগে ইনচন বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—অদ্য রাত্রে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর লণ্ডন যাত্রার সংবাদ করাচী হইতে ঘোষিত হওয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে পাক্ প্রধান মন্ত্রীর যোগদান সম্পর্কে জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জ যাহাতে চীনা কম্যুনিস্টগণকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করিতে সম্মত হয় তজ্জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অপর ৩৩টি রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ। শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 20th January, 1951. । ১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপালের শাসন-সংস্কার

নেপালাধীশ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ নেপালে প্রত্যাবর্তন করিবেন, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, নেপালের প্রধান মন্ত্রীও তাঁহাকে এজন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এতদিনে তাঁহার এই শুভবুদ্ধি দেখা গিয়াছে যে, নেপালাধীশ ত্রিভুবন নেপালে প্রত্যাবর্তন না করিলে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়া আসিতে পারে না। বলা বাহুল্য এটুকু শুভবুদ্ধি সহজে তাঁহার চিত্তে উদয় হয় নাই, কার্যত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এমনভাবে নতি মানিতে হইয়াছে। নেপালে গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক জাগরণ, স্বৈরতন্ত্র শাসনে অভ্যস্ত সেখানকার রাণাগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাইয়া তবে ছাড়িয়াছে। তাঁহার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেখানকার গণ-আন্দোলন দমিত করিতে সমর্থ হন নাই। নেপালের বীর সন্তানগণ নিজেদের রক্ত দিয়া নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারত সরকারও এই গণ-আন্দোলনের শক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া রাণাগোষ্ঠীর উপর চাপ দিয়াছেন। তবু নেপালের প্রধানমন্ত্রীর এই শুভবুদ্ধির জন্য আমরা তাঁহাকে সুখ্যাতি করিব; কারণ বাহির হইতে প্ররোচক দলের অভাব ছিল না। ইহারা শিশু রাজা জ্ঞানেন্দ্রকেই সমর্থন করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। নেপালের প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের মতে মত দিতে সাহস পান নাই। পরে শিশু-রাজাকে পুনরায় পদচ্যুত করিতে হইয়াছে। নেপালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখন অবসান ঘটিবে আমরা ইহাই আশা করি। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্তরায় এখনও কিছু যে না আছে এমন নয়। কারণ, নেপালের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের জন্য গণপরিষদ গঠনে বিলম্ব আছে। মধ্যবর্তীকালের জন্য সেখানে যে মন্ত্রী-পরিষদ গঠিত হইবে তাহার উপর সমস্যার সমাধান অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। কারণ, মধ্যবর্তীকালীন পরিষদে যদি জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য না থাকে, তাহা হইলে গণ-পরিষদের কাজ স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে সম্ভব হইবে না বলিয়া নেপালী কংগ্রেসের নায়কগণ আশংকা করিতেছেন। বলাবাহুল্য, এমন অশংকার কারণ আছে। এই সন্দেহ দূর করা কর্তব্য এবং মধ্যবর্তীকালীন গভর্নমেন্টে জনগণের যাঁহারা প্রকৃত প্রতিনিধি তাঁহাদের হস্তে শাসন বিভাগের দায়িত্বসম্পন্ন প্রধান অধিকারগুলি প্রদান করা উচিত। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর উপর ইহা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞান-নেত্র সম্যকরূপেই উন্মীলিত হইয়াছে এবং নেপালে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জনসাধারণের হাতে শাসনাধিকার প্রদান করিতে হইবে, এসত্য তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং নেপালের স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানদের সহযোগিতা লাভের পথই তিনি আন্তরিকভাবে অনুবর্তন করিবেন বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ যদি তিনি সেক্ষেত্রে সংকুচিত হন, তবে অপরাজিত গণতান্ত্রিক শক্তির আঘাতে রাণাগোষ্ঠীকে উৎখাত হইতে হইবে; রক্তপাত-বহুল সে অধ্যায়ের পুনরভিনয় না ঘটে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাশ্মীর

কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া ঘরোয়াভাবে আলোচনার এক অধ্যায় চুকিয়া গেল; কিন্তু ইহার ফল হইল কি? বলা বাহুল্য এমন আলোচনার ফলে কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, হইতেও পারে না। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিজেও তাহা না জানেন, ইহা নয়। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরকম। বস্তুতঃ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যথোচিত বাস্তব পরিণতি লাভ করে নাই; এদিকে ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কিত নীতিও যেন অনেকটা বাষ্পীয় আকারেই রহিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই নীতিকে ক্রমে ক্রমে চাপ দিয়া কোণঠাসা করিয়া নিজেদের সুবিধার দিকে লইবার ফিকিরে আছেন। ক্রমে ক্রমে কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁহাদের দাবী ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর স্বার্থমূলক চক্রের মধ্যে লইয়া গিয়া কমনওয়েলথ মৈত্রীর ভাবপ্রবণতার দুর্বলতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আদর্শবাদকে অভিভূত করিবার জন্যই তাঁহাদের গূঢ় অভিসন্ধি চলিতেছে। এই চাল বড়ই সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী। তাঁহার আশা, এইভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য যদি আপাতত ষোল আনা হাসিল নাও হয়, অন্ততঃ কিছু না কিছু লভ্যাংশ জুটিবেই। তারপর তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আবার কূট-নীতিকে সম্প্রসারণ করা চলিবে। বস্তুত, কাশ্মীরের সমস্যাটিকে জিয়াইয়া রাখিবার মূলে পাকিস্থানের বর্তমান শাসকচক্রের অন্যরকম উদ্দেশ্যও রহিয়াছে। কাশ্মীরের মুসলমানদের মুক্তির ধুয়া তুলিয়া তাহারা মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর নিজে-

দের স্বৈরাচারের ঘাঁটি বজায় রাখিতেছেন। কার্যত তাহাদের মধ্যে সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার পক্ষে পাকিস্থানের কূটনীতিকদের কাশ্মীর সমস্যা অন্যতম কৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক নীতি বা যুক্তির দোহাইতে তাঁহারা এই কৌশল ছাড়িবার মত পাত্র নহেন। আমরা এ খেলা ভালো করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছি। বলা বাহুল্য, ভারতের স্বার্থের জন্য কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রীদের তেমন মাথাব্যথা নাই এবং আন্তর্জাতিক নীতির যৌক্তিকতার মূল্যও তাহাদের কাছে অতি সামান্য; নহিলে কাশ্মীরের প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করাই কর্তব্যবোধ করিতেন না। ফলত কমনওয়েলথ বৈঠকে আলোচনার এতৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের নীতিকে এ সম্পর্কে বিভ্রান্ত না করে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। কাশ্মীরের ব্যাপারে জগতের শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে, সুতরাং বিশ্ব-শান্তির দিকে তাকাইয়া কমনওয়েলথের বিশ্বপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রীদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এই যুক্তি দেখাইয়াছেন, বস্তুত কাশ্মীর সমস্যার জন্য বিশ্বশান্তি সত্যই যদি ব্যাহত হইয়া থাকে, তবে সেজন্য পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকগণই বিশেষভাবে দায়ী। কাশ্মীরকে উৎসন্ন করিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভেদমূলক নীতিকে জিয়াইয়া রাখিতে চাহেন এবং প্রগতিবিরোধী শক্তির সাহায্যে পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উপদ্রবের অবসান কাশ্মীরবাসীরা করিবে; কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রীদের কৃপায় তাহারা ভিখারী নয়—এই সত্য অবলম্বে বুঝাইয়া দেওয়াই এখন দরকার। বস্তুত বাহিরের রাজনীতিকদের আলোচনা-গবেষণায় এই সমস্যার সমাধান হইবে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না এবং এ সম্বন্ধে কমনওয়েলথ সম্মেলনের মতকেও আমরা কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের মতে এ সম্বন্ধে আলোচনার অধ্যায় শেষ হইয়াছে এবং সে অধ্যায়কে বাড়াইতে দেওয়া বিপজ্জনক; বিশেষত ভারতের দিক হইতে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতিক দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করা হইবে।

পরলোকে নিরুপমা দেবী

বাঙলার স্বনামধন্যা সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদে বাঙলার যে কয়জন সাহিত্যসাধিকার লেখনী বাঙলার পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের স্পন্দনকে ছন্দায়িত করিয়াছিল, বাঙলার মূক, মৌন, নারীহৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি বাণী দিয়াছিল, দেখাইয়াছিল নারীহৃদয়ের রহস্যময় মাধুর্য-মহিমা, শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। শ্রীযুক্তা নিরুপমা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগিণী ছিলেন এবং সাহিত্য-সাধনায় শরৎচন্দ্রের নিবিড় সাহায্য লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার পক্ষে ঘটিয়াছিল। তিনি নারী-মহিমায় হিন্দুধর্মের আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন এবং সেই আদর্শের প্রাধান্য কীর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার লেখা উপদেশে ভারাক্রান্ত হয় নাই; অন্তর-রসে তাঁহার লেখনী সঞ্জীবিত ছিল। শেষ জীবনে বহুদিন তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভগবৎ-নিষ্ঠিত জীবন অবলম্বন করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনে এই মহীয়সী মহিলার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আমরা তখন কিছু অনুযোগও করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি স্নেহপূর্ণ ভাষায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন না করিতে পারিলে এখন তাঁহার কোন স্ফুরণ হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলার প্রাণের ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপার দিকে তিনি তাকাইয়া আছেন। যিনি চিরসুন্দর এবং মধুর তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনই তিনি কামনা করেন। দেবী নিরুপমা সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা দেশবাসীর অন্তরে তাঁহার স্মৃতিকে সঞ্জীবিত রাখিবে। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শিক্ষার আদর্শ

পর পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক নৈতিক আদর্শের সমুন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-অভিভাষণে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের এবং সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণের অভিভাষণ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত আণে খোলাখুলিভাবে ধর্মশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইদিক হইতে তাঁহার অভিভাষণ অনেকের কাছে প্রাচীনপন্থী বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অন্যে যাহাই বলুন, আমরা তাঁহার অভিভাষণে স্বদেশী যুগের সুরেরই আভাস পাইয়াছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহ এবং জড় বিজ্ঞানের নিরীশ্বরবাদের বিভ্রম হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া বাঙলার অন্তর-সাধনা সেদিন ভারতে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে জাগাইয়া তোলে। বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্তী আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া ও কমিউনিস্টবাদের ঐহিক উপচারসর্বস্ব মানসিকতার আলোড়নে সেই আদর্শ বর্তমানে অনেকটাই বিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুত আণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। স্বদেশী যুগে বাঙলাদেশের শিক্ষাব্রতী আচার্যগণের অধ্যাত্মনিষ্ঠ মনীষার অবদান, বিশেষভাবে এখানে নবজাগরণ ঘটায়। বাণীসেবায় তাঁহারা রক্তপদ্মের যে অর্ঘ্যোপচার আহরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই বাঙলাদেশের তরুণদের মধ্যে নবীন জীবন সাড়া দিয়া উঠে। বস্তুত রাজনীতিকদের প্রেরণা বা ভাবোন্মাদনা এক্ষেত্রে পরোক্ষ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বাঙলার সেই পূর্বতন আচার্যগণের অনুপ্রেরণার আলোক শ্রীযুতে আণের মনের উপর উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত জগতের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একটা জাতি যখন জাগে, শুধু রাজনীতিকদের প্রতিভা বা সামরিক শক্তিই তাহার মূলে কাজ করে না। পরন্তু শিক্ষাব্রতীদের সাধনাই জাতির জাগরণ-মূলে স্থায়ী শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। শিক্ষাব্রতী মহনীয় আচার্যগণের তেমন উদার আপ্যায়নে বাঙলার সংস্কৃতিও একদিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালী ভারতের নেতৃত্বের আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, মানুষের মনোবৃত্তিসমূহের উদারতা সাধনের পথে সমগ্রভাবে সমাজের চরিত্র-শক্তিকে সমুন্নত করিয়া তোলাই এই সব আচার্যগণের লক্ষ্য ছিল। বিশেষ ধর্মসংস্কার বা আচারের গণ্ডীর উর্ধ্বে তাঁহারা মানব-মহিমাকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে ইহার প্রয়োজন বিশেষভাবেই রহিয়াছে। ছাত্রসমাজ বর্তমানে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট—তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ আদর্শের কোন প্রেরণাই নাই। লোক-সেবা, দেশ-প্রেম এসব তাহাদের কাছে শুধু কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যার্থি-সমাজের এই যে মানসিক দৈন্য, এই যে অবসাদ, ইহার প্রতিকার করা দরকার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশপ্রীতির প্রেরণাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া শ্রদ্ধা ও সংযমের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু শুধু বক্তৃতার দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, প্রয়োজন জীবনাদর্শের। বস্তুত যাঁহারা শিক্ষাব্রতী, যাঁহারা আচার্য, তাঁহাদের আদর্শই প্রতিবেশকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। তাঁহাদের অন্তরের শক্তিতেই তীর্থ প্রকৃত তীর্থে পরিণত হয়। নতুবা, ইট পাথরের বাহার বাড়াইয়া কিংবা পুঁথি-কেতাবের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষার আদর্শকে সমুন্নত করা সম্ভব হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে প্রয়োজন

আদর্শনিষ্ঠ বহু শিক্ষাব্রতীর। জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। নিজেদের সাধনার গরিমায় তাঁহারাই জাতির অন্তরশায়ী নরনারায়ণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষাব্রতীদের এই যে আদর্শনিষ্ঠা ইহা তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে; সস্তা ভাবপ্রবণতায় সেই কঠোর সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না—গৌতম-যাজ্ঞবল্ক্যের যুগের কল্পনা করা এক্ষেত্রে বৃথা। অথচ শিক্ষক-সমাজের আর্থিক অভাব পূরণের দিকই কার্যত বর্তমানে শোচনীয়ভাবে উপেক্ষিত হইতে চলিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষাকে সমুন্নত এবং সম্প্রসারিত করিবার দিকে রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি যতদিন প্রযুক্ত না হইবে, ততদিন, এই সমস্যার সমাধান হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পূর্ববঙ্গে কয়লা-সংকট

পূর্ববঙ্গ সফরে আসিয়া পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান গর্বভরে বলিয়াছিলেন যে, ভারত হইতে কয়লা না পাইলেও পাকিস্থানের ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই কয়লার অভাবে পূর্ববঙ্গে দারুণ সংকট দেখা দিয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন, জল সরবরাহের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, ট্রেন চলাচল বন্ধ, কলকারখানা সব অচল। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ বিদেশ হইতে কয়লা আমদানী করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা পোল্যাণ্ডের কয়লার উপর ভরসা করিয়া থাকিলে যে বহু বিড়ম্বনা ঘটিবে, এই আশঙ্কা ক্রমেই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিদেশ হইতে কিছু কয়লা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা সমগ্র পূর্ববঙ্গের অভাব যে মিটিবে, এমন আশা সুদূরপরাহত। এইরূপ অবস্থায় ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্থান কংগ্রেস সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারাও এই দাবী করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রনিয়ামকগণ নিজেদের আর্থিক নীতিই আকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা কিছুতেই ঘাটি ছাড়িবেন না, পূর্ববঙ্গবাসীদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন। তাঁহাদের এইরূপ মতিগতির জন্য ভারত-পাকিস্থানে বাণিজ্য-চুক্তি অদ্যাপি কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রের বাস্তব প্রয়োজন এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের এইরূপ মনোভাব পরিবর্তন করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে ভারত ও পাকিস্থান এই দুইটি প্রতিবেশী শক্তির বাণিজ্যের আদান-প্রদানের পথ যদি সুগম হয়, তবে উভয় রাষ্ট্রের অনেক সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। নিজেদের রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তাহাও স্বীকার, তবুও উভয় রাষ্ট্রের সুবিধার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্থানের নিয়ামকগণ রাজী নহেন, তাঁহাদের এমন মনোবৃত্তি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নব্য কাব্য

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

অনেক দুস্তর স্বর্গ
আর কৃষ্ণমসী কুইস্কের সঞ্চিত সাগর।
মাগ্‌গী-ভাতা, বিদুর-খোরাক
দ্বিপ্রহরে করে হাহাকার ভিক্ষারতী নেপথ্য-বায়স
এই এক বেনামী বন্দর—
কালো আঙুরের থোলো শুধু দেয় হাতছানি!
কালোবাজারের কাশি
লাল-বাজারের হাসি
হুঁশিয়ার ভাই সব
রক্তচক্ষু নয় প্রহেলিকা
পদতলে ফসকায় রোমশ-বালুকা!

অনেক দুস্তর স্বর্গ
আর কৃষ্ণমসী কুইস্কের সঞ্চিত সাগরে
এই এক জাহান্নী জগৎ!

অনেক দুস্তর বাঁধ দমোদর হাসে খিল্ খিল্
রাঙামাটি চমকায়, পলিটিক্স শেখে কোলভীল,
হুঁশিয়ার অগ্নিহোত্রী ভাই,
এসো মোরা আগুন নেভাই!
ফাইলের ফন্দী-আঁটা সমস্যা মেটাই!
দিল্লীর দিল্লাগী আর রেডিয়ো-ভাষণ
ক্রুর-ক্রীপ্স্—কাশ্মীর—ডিভ্যালুয়েশন!*

* দ্রষ্টব্যঃ—এটি কমিক কবিতা নহে—সিরিয়াস গদ্য।



নবসৃষ্টির সাধনা

সৃষ্টির সাধনায় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই সাধনার ভিতর দিয়া ত্যাগ এবং সেবাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া মানুষ তাহাদের সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে নবসৃষ্টির সাধনায় আত্মনিয়মনের রসধারা যতটা স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক, সমাজ-জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের দিক হইতে তাহার সার্থকতা সমধিক। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির এই যে, সহজাত প্রবৃত্তি, ইহা যে পথে স্বাধীনভাবে সমাজের ব্যক্তিজীবনে পরিস্ফূর্ত হইয়া ব্যাপ্তি-জীবনকে সমুন্নত করে, সেই নীতিই কার্যকর। ফলত গঠন-মূলক কার্যের অভাব শুধু উপদেশের দ্বারা পূরণ করা যায় না, পরন্তু আইনের জোরেও তাহা সম্ভব নয়। প্রীতি এবং আনন্দের পরিবেশের মধ্যে নবসৃষ্টির শতদল বিকশিত হইয়া শোভা বিস্তার করে। ব্যক্তি এক্ষেত্রে তাহার সাধনার মধ্যে ব্যাপ্তি-চেতনায় আপনার মহিমাকে মানবত্বের উদারতার মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া পায়। সোনার কাঠির ঘুমন্ত রাজকন্যা তখন জাগিয়া উঠে। পরন্তু আইনের লৌহ-দণ্ডের আঘাতে সে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং কার্যত তাহাতে বাঁচিবার নিষ্প্রেরণা জাতিকে ক্লিষ্ট করে আর মানুষ যন্ত্র মাত্রে পরিণত হয়। ইহার ফলে তাহার দাস-জীবনের তপ্ত নিঃশ্বাস সব সঞ্চয়কে নিঃশেষ করিয়া দৈন্যভরে দুর্বহ করিয়া তোলে। এই পথে অন্তরের দৈব-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বাহিরের বিরোধ বাড়িয়া চলে এবং ক্রমে সমাজজীবনের সুষমা ও শান্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতা সমাজ-জীবনে এই বিরোধকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঋষির দৃষ্টিতে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্য এবং সুন্দরের সাধনায় সমাজ-জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য জাতিকে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, বিশ্বকবি এই সাধনায় নিজের জীবনকে নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীনিকেতনে কবির এই সাধনারই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের সেই সাধনার ধারা ধরিয়া এখনও পরিচালিত হইতেছে এবং অর্থকরী বৃত্তির সঙ্গে মানব-চিত্তের স্বচ্ছন্দ অবদান মহিমায় পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, পল্লীই ভারতের সমাজ-জীবনের প্রাণস্বরূপ এবং পল্লীর প্রাণপূর্ণ প্রতিবেশকে নবসৃষ্টির আনন্দ রসে পূর্ণ করিয়া তোলার উপরই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভারতের জাতীয়তার জনক মহাত্মা গান্ধী এই সত্যের উপরই জোর দিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, গান্ধীজীর সেই জীবন-দর্শনকে আমরা আমাদের সমাজ-সাধনায় সার্থকতাদানে আন্তরিকতাহীন হইয়া পড়িতেছি। ফলে পল্লীর প্রাণরস হইতে জাতি বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার দৈন্য ভার বৃদ্ধি পাইতেছে। গঠন-মূলক কাজের জন্য নেতাদের অজস্র উপদেশেও কোন কাজ হইতেছে না। অথচ জাতির দৃষ্টিকে পল্লীর এই প্রাণসম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেই হইবে, নহিলে আমাদের আর্থিক দুর্গতি দূর হইবে না এবং সমাজ-জীবনও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত পল্লী-সেবা বিভাগ শ্রীনিকেতন এই-দিকে জাতিকে সচেতন করিতে ব্রতী আছেন। বর্তমান সপ্তাহে শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে নিখিল ভারত কুটীর শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই প্রদর্শনী নবসৃষ্টির আনন্দ সমাজ-জীবনে পরিব্যাপ্ত করিতে সাহায্য করিবে এবং বাঙলার জল মাটি আবার সরস হইয়া উঠিবে।



১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী শ্রীনিকেতনে কুটীর-শিল্প পরিদর্শন করেন। একটি সাঁওতাল পরিবার খেজুরের পাতা দিয়া মাদুর তৈয়ারী করিতেছে।



বিশ্বভারতী ও কুটীরশিল্প

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

। অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী শিল্পভবন।

বিশ্বভারতীর শাড়ী, চামড়ার ব্যাগ, মোড়া, ফুলদানি, পরদা, চাদর ইত্যাদি আজ শিক্ষিত সমাজের কাছে অপরিচিত নয়। লুপ লাইনের ট্রেনে যাদের যেতে আসতে হয়, তাদের কাছে বিশ্বভারতীর পাউরুটি ও কেক সম্প্রতি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা বিশ্বভারতী দেখতে এসেছেন, তাঁরা উত্তরায়ণে সুন্দর ভারতীয় সজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানায় দেখেছেন বিশ্বভারতীর তৈরী আসবাবপত্র। এখানকার স্থাপত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেখানে এই সব কাঠের, সুতি ও রেশমের, চামড়ার ও মাটির শিল্পদ্রব্য তৈরী হয় তার নাম বিশ্বভারতী শিল্পভবন।

শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দুই দূরে সুরুল গ্রামের প্রান্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা কুঠিবাড়ি ছিল। কালক্রমে রায়পুরের সিংহ পরিবার সেই কুঠির মালিক হন। পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছ থেকে এই কুঠি কিনে নেন। ১৯২২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী সুরুলের এই কুঠিকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা সুরু করেন মিঃ এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রমুখ কয়েকজন কর্মী ও একদল উৎসাহী যুবককে নিয়ে। পরে এই কেন্দ্রটির নতুন নামকরণ হয় শ্রীনিকেতন।

ভারতীয় সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক একথা আজকাল অনেকেই মানেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মন প্রথমে গ্রামের দিক থেকে সহরের দিকেই ঝুঁকেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক, তাই ভারতবাসী পাশ্চাত্যশিক্ষা পেয়ে ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

দেশের ঐশ্বর্যের উৎস তখন ছিল গ্রামে। সেই ঐশ্বর্য যাতে স্রোত বয়ে বন্দরে আসে এবং সেখান থেকে সহজে আহরিত হয়ে বিজেতাদের দেশে যেতে পারে তাই ইংরেজ সহর ও বন্দর গড়তে সুরু করল।

গ্রামে উৎপাদিত শস্য ও শিল্পদ্রব্য রেল-স্টীমার যোগে শহরে আসতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য লোকেরা সহরে এসে জড় হতে লাগলেন। ক্রমে হৃতসম্পদ ও হৃতবীর্য হয়ে, কর্মঠ ও উচ্চাভিলাষী দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে গ্রামগুলি অশিক্ষিত ও রোগজীর্ণ কৃষি ও শিল্পজীবীদের বসতিতে পরিণত হল।

তারপর ইউরোপে এল যান্ত্রিক বিপ্লব। সেইসঙ্গে গ্রামের শিল্পগুলির ওপর পড়ল কঠিন আঘাত—গ্রামগুলি আর্থিক অবনতির দিকে আরো এক ধাপ নেমে গেল। তার ফলে গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষির চরম দুর্দশা ঘটল।

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ দেশের এই সর্বনাশের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা দিয়ে তিনি ভারতীয় সভ্যতার মূল যে সাতলক্ষ গ্রামে সঞ্চারিত হয়ে আছে এবং সেই মূলে যে আঘাত লেগেছে একথা দেশের লোককে বোঝাতে লাগলেন। তাঁর ডাকে সেদিন খুব অল্প-লোকেই সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নিজে কবি হয়েও এই দুরূহ কাজে এগিয়ে গেলেন। সাতান্ন বছর আগে এই কাজে নামবার যে প্রতিজ্ঞা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে তার স্পষ্ট স্বীকার আছে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের আকাশে উদিত হলেন ১৯১৭ সনে। তিনি সহরের ছেলে, বিদেশে ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। ভারতের গ্রামের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় সামান্যই ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগের পর তিনি প্রথমে এলেন শান্তিনিকেতনে। গোখলের পরামর্শে ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি সত্যিকার ভারতবর্ষ যে গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত তা উপলব্ধি করে গ্রাম পরিক্রমা করে সেই ভারতের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রায় ত্রিশবছর ধরে তিনি ভারতের গণনায়ক ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল ধরে তিনি দেশের লোকের মন গ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দেবার সাধনা প্রাণপণে করে গেছেন। একাজে তিনি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাক্যে ও মনে গুরুদেব বলে মেনে গেছেন।

গ্রামের দিকে এই যে অভিযান রবীন্দ্রনাথ তা প্রকাশ্যভাবে শুরু করেন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে। শুধু চরকা চালিয়ে যে ভারতবাসী জাগতে পারে না তা 'সত্যের আহ্বানে' ব্যক্ত করে তিনি সামগ্রিক গ্রাম উন্নয়নের কাজ সুরু করলেন দেশবাসীর শক্তির অস্তিত্বে পূর্ণ-বিশ্বাস নিয়ে তাদের আত্মবিস্মৃতি থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে।

গ্রামের উন্নতিসাধন করতে হলে কি কি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কাজ করতে হবে তা জানবার জন্য শ্রীনিকেতনে রক্ষিত একটা ছক নীচে দিলাম—

শিল্পভবনের উদ্দেশ্য

এই সর্বাঙ্গীন চেষ্টার কোনটি প্রধান তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। তবু আজকের সবচেয়ে বড় রব উঠেছে সম্পদবৃদ্ধির। খাদ্য, কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। স্বাধীন হয়েও যদি দেশের লোক খেতে পরতে না পায় তবে সমাজের যারা নীচের তলার লোক তাদের কাছে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু।

বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র ধনতান্ত্রিক দেশে মুষ্টি-মেয় ধনপতিদের হাতের মুঠোর মধ্যে উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। যারা সমাজতান্ত্রিক প্রথায় বৃহৎ শিল্প সংগঠন করতে চাইছে সেখানেও উৎপাদন ক্ষমতা কর্মীদের হাত থেকে কর্তাদের হাতে চলে যাচ্ছে, যদিও





শিল্পভবনের চামড়ার কাজ

মুনাফার মোটাভাগ রাষ্ট্রের দখলে আসছে। আর্থিক গণতন্ত্র কেন্দ্রীয় শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় মোটেই সম্ভব কিনা সে চিন্তা আজকাল অনেকের মনেই জেগেছে। চীনে তাই বিকেন্দ্রীভূত শিল্প উৎপাদন প্রচেষ্টা রাষ্ট্র-নেতারা উপস্থিত করছেন।

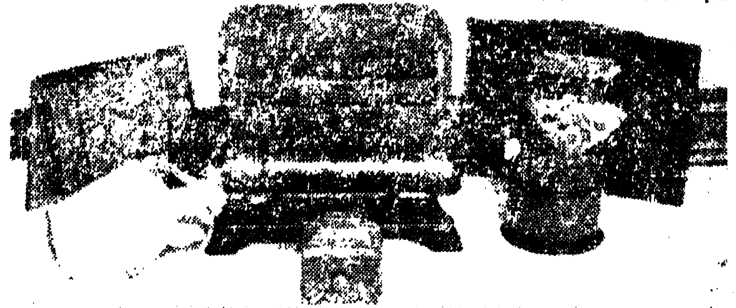
ভারত বা চীনের মত জনবহুল ও যন্ত্র-বিরল দেশে আধুনিক শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র বসিয়ে ধনোৎপাদন করা কেবল যে দুরূহ তা নয়। পরন্তু যন্ত্রের সাহায্যে অল্প লোক দিয়ে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করলে উদ্বৃত্ত শিল্পীদের নতুন কাজ দেবার সমস্যাও এসব দেশে প্রবল। ভারতে শ্রমনিয়োগের সমস্যা আজকের দিনেও শ্রমলাঘব সমস্যার চেয়ে অনেক বড়।

উদ্ভাবনীশক্তি যখন অধুনা ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন না করে ভবিষ্যতে সহজে বেশী উৎপাদনের পন্থা আবিষ্কার করে তখনই পুঁজি বা ক্যাপিট্যালের জন্ম হয়। টাকা হচ্ছে সেই পুঁজির উপর অধিকারের চিহ্ন-মাত্র। আজ এদেশে পূর্বসঞ্চিত ক্যাপিটাল বা টাকা দুই-ই অপ্রতুল। মেসিনও নেই, মেসিন চালাবার পটুতাও নেই দেশের অধিকাংশ লোকের। মেসিন এবং চালাবার পটুতা অর্জন করবার জন্য বেঁচে থাকবার মত মূলধন যখন যথোপযুক্ত পরিমাণ নেই তখন সামান্য মূল-ধনে ও সহজলভ্য পটুতায় যে যন্ত্র ব্যবহার করা চলে, তাই দিয়েই আমাদের শিল্পসংগঠন করতে হবে। নইলে বহুলোকের ধ্বংস অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পভবন প্রতিষ্ঠার সময় এইসব ভেবেই বড় মেসিনের কারখানা না করে, সাধারণ গ্রাম্য যন্ত্রের ব্যবস্থা ও উন্নতিসাধনের দিকেই ঝোঁক দিয়েছিলেন। নইলে যে টাকা শ্রীনিকেতনে আজ অবাধ ঢালা হয়েছে সেই টাকায় কাপড়, চিনি, কাগজ বা চালের কল করে বিশ্বভারতী যা লাভ করতে পারত তা থেকে সেই কারখানার খরচ চালিয়ে বিশ্ব-ভারতীর অন্যান্য বিভাগের খরচও উঠে আসত। অন্তত শিল্পভবনের পক্ষে লাভজনক দু-একটি শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প প্রচেষ্টায় হাত দিয়ে বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থ অপব্যয় হতে দিতেন না। যাঁরা মনে করেন শিল্পভবন করা হয়েছে বিশ্বভারতীকে কিছু অর্থলাভের জন্য তাঁদের এই কথাটা মনে রাখতে অনুরোধ করছি।

গুরুদেব মেসিনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না, কিন্তু মানুষকে যন্ত্রদাসে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। রক্তকরবী ও মুক্তধারা যাঁরা পড়েছেন তাদের একথা অজানা নয়। শিল্পভবন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সম্পদ বাড়াবার জন্য গ্রামের মৃতপ্রায় শিল্প-গুলিকে বাঁচিয়ে তোলা। তার জন্য (১) উৎকৃষ্ট শিল্পী গড়ে তোলা, (২) শিল্পীদের ব্যবহারোপযোগী উন্নততর যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা আবিষ্কার করে তার প্রয়োগ সেই শিল্পীদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে সহায়তা করা এবং (৩) সম্পদসৃষ্টি যাতে শিল্পীকে কাজে আনন্দ দেয় সেই মনোভাব ও পরিবেশ গ্রামে সৃষ্টি করা।

এই সাধনায় শিল্পভবন অর্থাভাব ও অন্য নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে বারে বারে। এমন সময়ও গেছে যখন মূল আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করে প্রধানত অর্থোপার্জন করে তহবিলের ঘাটতি পূরণ ও ভবিষ্যতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করতে হয়েছে। কিন্তু সুযোগ ফিরে পাওয়ামাত্রই মূল উদ্দেশ্যে আবার ফিরে গেছে। দেশে কুটিরশিল্পকে পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার ভার দেশবাসীর এবং সরকারের। বিদেশে বা দেশী বড় কারখানায় উৎপন্ন সামগ্রী সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিনে কুটির-শিল্পজাত জিনিস শুধু অর্থবান সৌখীনদের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করলে অধিকাংশ গ্রাম শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য। সেই-জন্য যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবার আদর্শে জনমানসকে দীক্ষিত করতেই হবে। তাহলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার কাজ সহজ হয়ে যাবে। সংরক্ষণ নীতি সরকারকে প্রয়োগ করতে হবে কেবল বিদেশী শিল্পদ্রব্যের বিরুদ্ধে নয়, বড় কারখানায় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বিরুদ্ধেও। ক্রমোন্নতিশীল কুটিরশিল্প স্থায়ীভাবে গড়ে তোলা যদি সরকারের নীতি হয়, তবে কারো প্রভাবে পড়ে এই নীতি খর্ব করা উচিত হবে না। বিদেশী শাসনকালেও বিলাতি কাপড়, লৌহদ্রব্য, চিনি প্রভৃতির উপর মোটা হারে রক্ষণশুল্ক বসানো হয়েছে, ল্যাঙ্কাশায়ার, বার্মিংহামের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে। সেজন্য দেশবাসী প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার মায়া ত্যাগ করে বেশীদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস



চামড়ার বাটিক এম্‌বস্‌ ও আপ্লিকের কাজ

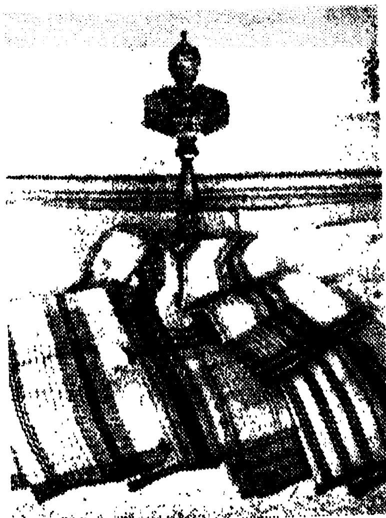
করেছে। আজ আমাদের জাতীয় সরকার কি মুষ্টিমেয় দেশী ধনপতির হুমকিতে বিচলিত হয়ে দরিদ্র গ্রামশিল্পীর স্বার্থ ও দেশের ভাবী আর্থিক স্বাধীনতা বিসর্জন দেবেন? একাজে দেশবাসীকে ও সরকারকে ব্রতী করবার জন্য বিশ্বভারতী শিল্পীসংঘ গড়া সুরু করেছেন। তার কথাও পরে বলব।

বয়ন-বিভাগ

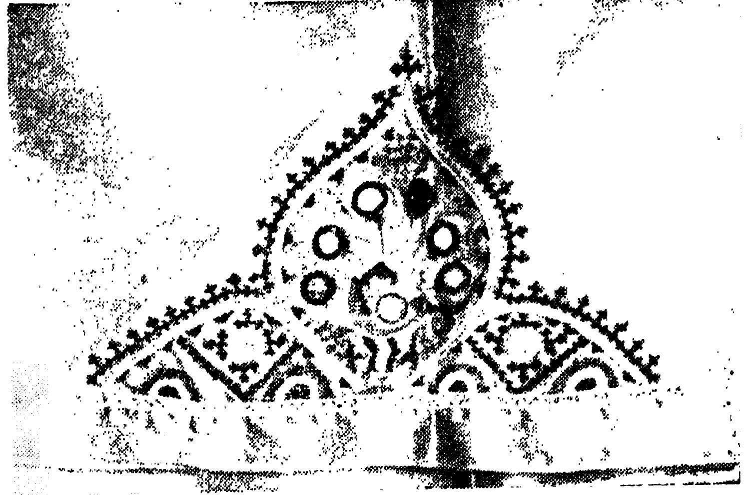
শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র হাতের তাঁত সম্বল করে যে শিল্পপ্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল; আজ আটাশ বছর পরে সেই কাজ অনেক বড় হয়েছে ও প্রসারলাভ করেছে। প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, তৈরী শিল্প-দ্রব্য এখন শিল্প ভবনে ও বিভিন্ন গ্রাম কেন্দ্রে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও তার অনুপ্রাণনা এই প্রসার সম্ভব করে তুলেছে। সরকারী সাহায্য আগে কখনও কখনও পাওয়া গেছে; কিন্তু টাকার অঙ্কেও তা এই প্রসারের পক্ষে যথোপযুক্ত ছিল না। বর্তমানে সরকারী সাহায্য আগের চেয়ে সহজলভ্য হয়েছে; কিন্তু যা শিল্পভবনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে তা গুরুদেবের আদর্শ, এবং বহু কর্মীর প্রাণ-পণ চেষ্টা। সরকারের উদাসীনতা সত্ত্বেও আগে যেমন শিল্পভবন এগিয়ে গেছে, তেমন অতঃপর আরো দ্রুত এর কাজ এগোবে এই আশাই মনে জাগে।

বয়নবিভাগ নিয়েই শিল্পভবনের প্রারম্ভ, তাই বয়নবিভাগ সম্বন্ধেই সর্বাগ্রে বলছি।

আজকাল হাওড়ার হাটে বা কলকাতার যে-কোন কাপড়ের দোকানে খোঁজ করলে বিশ্ব-ভারতীর শাড়ী প্রায় সব দোকানদারই দেখাবে। এই শাড়ীর অধিকাংশই ধনেখালি, রাজবল-হাট প্রভৃতি নামকরা বয়নকেন্দ্রে প্রস্তুত।



গ্রামে তৈরী রকমারি শাড়ী ও কাঠের গৃহসজ্জা



পল্লী কারুকারী কেন্দ্রের মেয়েদের এমব্রয়ডারী

শিল্পভবনে তৈরী শাড়ীর সৌন্দর্যের জন্য সাধারণের মধ্যে এর প্রচুর চাহিদা হওয়ায় এইসব কেন্দ্রে সেই ধরণের শাড়ী আজকাল প্রচুর তৈরী হয়। অর্থোপার্জনের দিক দিয়ে এতে বিশ্বভারতী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, দেশের রুচি যে পরিচ্ছদে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকেছে এটা কম লাভের কথা নয়। বিশ্বভারতী শিল্পভবন প্রতিষ্ঠার আগে যে এলাকায় শুধু মোটা চাদর, কাপড় ও গামছা তৈরী হত, সেই এলাকায় এমন শিল্প ও শিল্পী তৈরী হয়েছে এই ২৮ বছরে যে প্রসিদ্ধ কেন্দ্রেও তার অবিকল নকলের চেষ্টা চলছে; এতে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পপ্রচেষ্টার সার্থকতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

বর্তমানে ৪২টি তাঁত চলছে। তাছাড়া আরো ১৬টি গ্রামে আরো ১৪০ তাঁত শিল্প-ভবনের প্রযোজনায় চলে। কাপড়ে ডিজাইন তোলা যায় ঝাপের সংখ্যা বাড়িয়ে কিম্বা ডবি, বা জ্যাকার্ড তাঁতের সংগে যুক্ত করে। এই অঞ্চলে আগে ডবি বা জ্যাকার্ড ছিল না। বর্তমানে শিল্পভবনেই ডবি তৈরী করে গ্রামের তাঁতিদের তার ব্যবহার শিখিয়ে তাদের তাঁতে ডবি সংযোগ করা হয়েছে পাঁচটি জায়গায়। সেই সব গ্রাম থেকে ডবিতে তোলা নক্সাপাড় শাড়ী ইতিমধ্যেই বাজারে বিক্রী আরম্ভ হয়েছে। এইসব ডবির দাম সহজ কিস্তিতে আদায় করা হয় তাঁতিদের কাছ থেকে। অর্থানুকুল্য লাভ করলে আরো অনেক ডবি তাঁতিদের সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হতে পারে। তিনটি জ্যাকার্ড মেসিন এনে শ্রীনিকতনে তাঁতের সংগে লাগান হয়েছে। টাঙগাইলের চারটি উদ্বাস্তু তাঁতিকে সুরুল গ্রামে বসিয়ে জ্যাকার্ড মেসিন দিয়ে টাঙগাইল শাড়ী তৈরী হচ্ছে। সেইসংগে স্থানীয় তাঁতিদের ও শিক্ষার্থীদের জ্যাকার্ড ও ডবির কাজ এখানে শেখানো হচ্ছে। টাঙগাইলের প্রসিদ্ধ বয়ন শিল্প পূর্ব বাঙলা থেকে উৎ-পাটিত হয়ে, বীরভূমে স্থান পেয়েছে বিশ্ব-ভারতীর চেষ্টায়। এখন চেষ্টা হচ্ছে ঢাকাই তাঁতি এনে এখানে জামদানী ও বুটিদার শাড়ী তৈরীর শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠার।

সম্প্রতি শিল্পভবনে পশমী কাপড় বোনা শুরু হয়েছে। দার্জিলিং, নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের বহু লক্ষ টাকার পশমী সুতো ও পশম বাঙলা দেশের ভিতর দিয়ে এতদিন বাইরে চালান হচ্ছে। বাঙলায় পশমী কাপড় বোনবার শিল্প গড়ে তুললে বহুলোক এই শিল্পে নিযুক্ত হয়ে জীবিকানির্বাহ করতে পারবে এবং এদেশের পশমী বস্ত্রের চাহিদা কালক্রমে এদেশের গ্রাম শিল্পীদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারাই মিটতে পারবে। ত্রিপুরা জেলার একটি উদ্বাস্তু কিশোরকেও এই কাজ শেখানো হচ্ছে।

শ্রীনিকেতন থেকে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে গ্রামের মেয়েদের অবসরকালে চরকায় সুতো কাটার অভ্যাস প্রবর্তন করবার। বাঁধগড়া, ভুবন-ডাঙ্গা, আদিত্যপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে অনেক মেয়ে চরকা কাটতে শিখেছিল, কিন্তু তুলোর ও হাতে-কাটা সুতোয় কাপড় বুনতে জানা তাঁতির অভাবে এ পর্যন্ত সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এখন চেষ্টা হচ্ছে শ্রীনিকেতনের কৃষিকেন্দ্রের মারফৎ তুলো গ্রামে জন্মাবার এবং শিল্পভবনের দুয়েকটি তাঁতিকে হাতে কাটা সুতোয় কাপড় বুনতে অভ্যাস করান হচ্ছে। শ্রীনিকেতনে প্রতি বছর ৫০ জন গ্রাম্য শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার যে 'শিক্ষাচর্চা' রয়েছে, সেখানে তুলো পেঁজা, সুতো কাটা শেখানো হচ্ছে;

যাতে তারা গ্রামের লোকদের সুতোকাটা শেখাতে পারে।

যুদ্ধের আগে দশটি যন্ত্রচালিত তাঁত জাপান থেকে শিল্পভবনে আনা হয়েছিল। নানা কারণে সেগুলো আগে রীতিমত চলেনি। অদূর ভবিষ্যতে ময়ূরাক্ষী ও দামোদর ধৌত অঞ্চলে বিদ্যুৎসরবরাহ হবে; তখন গ্রামের তাঁতিরাও ছোট মোটর বসিয়ে কলের তাঁত চালাতে পারবে। তাই শিল্পভবনে সম্প্রতি কলের তাঁত চালিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ শেখানো শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মেসিনের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু কারখানা গড়ে মানুষকে যন্ত্রদাসে পরিণত করার বিরোধী ছিলেন এবং গ্রামে যে যন্ত্র ব্যবহার্য নয়, তা শিল্পভবনে চালাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আর কয়েকবছর পরে গ্রামে কলের তাঁত চালান সম্ভব হবে, তাই গ্রামের তাঁতিদের একাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিল্পভবনে কার্পেট আসন, সতরঞ্চি বোনা বহুকাল থেকেই হচ্ছে। অধিকাংশ আসন গ্রামে বোনা হয় এবং অনেক গ্রামের মেয়ে আসন বুনে পারিবারিক আয় বাড়াচ্ছে। সতরঞ্চি ও কার্পেট শিল্পভবনের মধ্যেই বোনা হয়।

রঞ্জন-বিভাগ

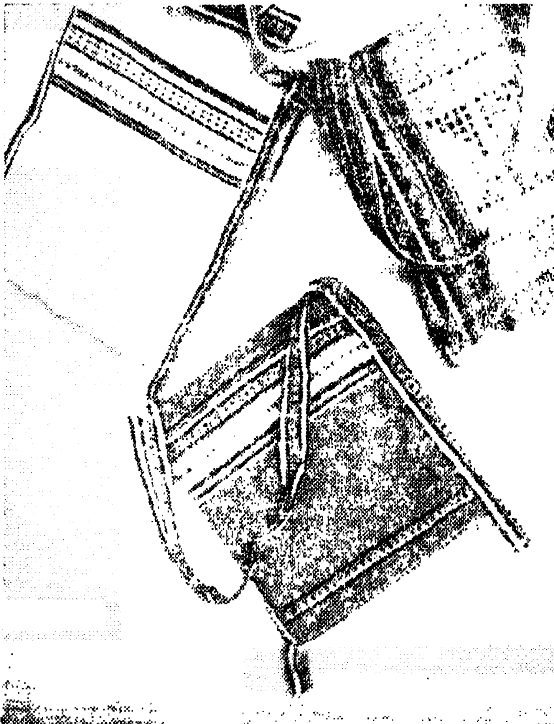
সুতো, কাপড় ও সিল্কের রং করা শিল্পভবনেই হয়। গ্রামের প্রায় দুশ তাঁতির প্রয়োজনীয় রঙ্গীন সুতো এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন হাতে ১০০ পাউন্ড সুতো রংকরা হচ্ছে আজকাল। যাতে আরো বেশী পরিমাণ রঙ্গীন সুতো, আরো বেশীসংখ্যক তাঁতিকে সরবরাহ করা যায় সেজন্য রঞ্জন বিভাগের নতুন ঘর তৈরী হবে, তার প্রয়োজনীয় লোহা, টিন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। রঙের জল-নিংড়াবার যন্ত্র ইত্যাদিও কেনবার আয়োজন হচ্ছে। এ ব্যবস্থা ১৩৫৭ সালের মধ্যে শেষ হবে ও ৫০০ তাঁতির প্রয়োজনীয় রঙ্গীন সুতো এখানে প্রস্তুত হবে।

সুতি কাপড় ও সিল্কের উপর মোম, রঞ্জন দিয়ে চিত্রিত করে এবং বারবার ভিন্ন ভিন্ন রং করে পরে সেই মোম, রঞ্জন উঠিয়ে ফেললে পর সুন্দর কারুকাজ খচিত রঙ্গীণ ছবির মত কাপড় তৈরী হয়। বিশ্বভারতী কলাভবন জাভার এই বাটিক শিল্পটি ভারতে প্রচলিত করেছেন। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের এই শিল্পটি শেখা আবশ্যক। শান্তিনিকেতন ও ভারতের অন্যত্র অনেকে এই শিল্পটি শিখে নিজেদের জামাকাপড় ও গৃহসজ্জা বাটিকের তৈরী করেন, অনেকে বাটিকের জিনিস তৈরী করে শিল্পভবনের মারফৎ বা সরাসরি বিক্রীত করেন। দেশবিদেশের সৌখীন লোকেরা বেশী দাম দিয়ে তা কেনেন। ঠাণ্ডা জলে বাটিক রং করতে হয়। শিল্পভবনের রঞ্জনবিভাগে সপ্তাহে একদিন বাটিক রং করা হয়। যে সব মেয়েরা ভাল আলপনা দিতে শেখে প্রধানতঃ তারাই বাটিকের কাজ পারে। শিল্পভবন কাপড় ও ডিজাইন দিয়ে এইসব মেয়েদের দিয়ে বাটিকের কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করিয়ে নেয়। চামড়ার ওপরও বাটিকের কাজ করা হয়।

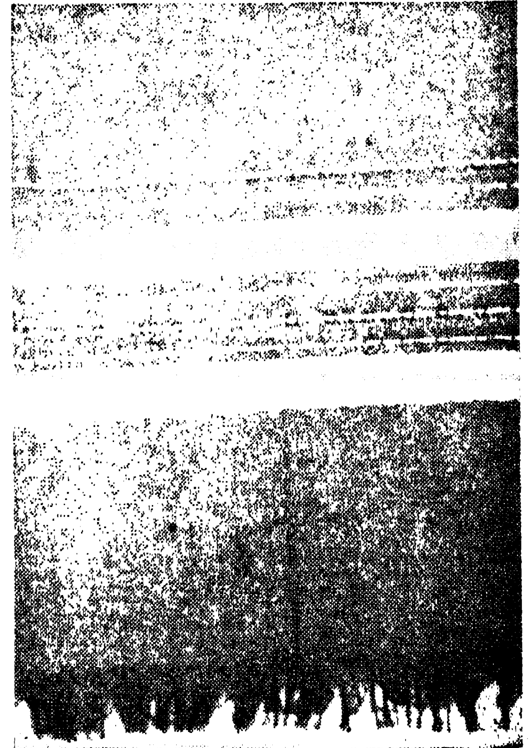
শিল্পভবনের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী গ্রামে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের আলপনা, বাটিকের কাজ ও সাধারণ জামাকাপড় কাটা ও সেলাই এবং এমব্রয়েডারী শেখান। এই বিভাগটির নাম পল্লীকারুকারী কেন্দ্র। বর্তমানে পাঁচটি গ্রামের প্রায় ৮০ জন মেয়ে এই কেন্দ্রের শিক্ষয়িত্রীদের কাছে কাজ শিখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈরী জিনিস বিক্রী করে অবসরকালে উপার্জন করছে। অল্প আয়েও যে শোভনভাবে সাজা ও সাজান যায় এ শিক্ষাও তারা শিল্পভবনের কাছ থেকে পাচ্ছে। শিল্পভবন থেকে শীঘ্রই বাটিক ও এমব্রয়ডারীর ডিজাইনের বই ছাপিয়ে বের করা হবে।

চর্মশিল্প-বিভাগ

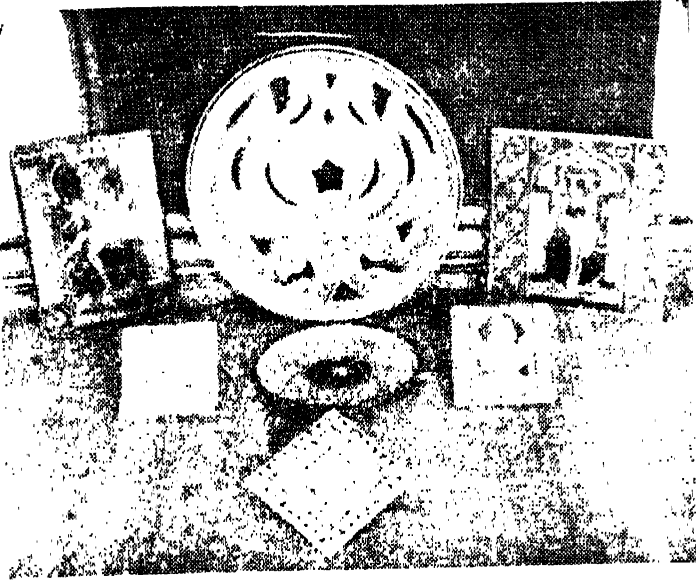
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপে ভ্রমণকালে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী চামড়ার ওপর কারুকাজ করা শিখে এসে শান্তিনিকেতনে এই



শিল্পভবনে তৈরী কাপড়ের ব্যাগ



মেয়েদের স্কার্ফ



শিল্পভবনের মাটির আসবাব

কলাকৌশল শেখান। চামড়ার ওপর মডেলিং, এমবসিং, বাটিকের কাজ, অ্যাপ্লিকের ও লেকারের কাজ এখন ভারতের অনেকে শিখেছেন।

শিল্পভবনের চর্মশিল্প বিভাগে প্রধানত এসব কারুকাজ শেখানো হয়। যুদ্ধের সময় বিদেশী আগন্তুকেরা লক্ষ লক্ষ টাকার চামড়ার জিনিস কিনে নিয়ে গেছেন। প্রধানত যুদ্ধের সময় সৌখীন কাপড় ও চামড়ার জিনিস এখানে বিদেশীদের কাছে বেচে যে লাভ হয়েছিল, সেই সঞ্চিত টাকা দিয়েই শিল্পভবনের শিক্ষাদানের ব্যয় এখন নির্বাহ হচ্ছে। সরকারী যে সাহায্য পাওয়া যায় তা থেকে গ্রামশিল্পীদের শেখানো, যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল সরবরাহ ও তৈরী মাল বিক্রীর খরচের এক-চতুর্থাংশ কুলোয় না। শিল্পশিক্ষা দিতে যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তার আর পূর্বসঞ্চিত তহবিল দিয়ে বাকী খরচ কুলিয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বভারতীর সাধারণ তহবিল থেকে শিল্পভবনের জন্য অর্থের প্রয়োজন এখনও হচ্ছে না।

শিক্ষার্থীদের আয়ের উপায়

শিল্পশিক্ষাদানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ টাকায় শুধু যে শেখাবার খরচ চালানো হয়, তা নয়। ছাত্রদের খাওয়াপরার খরচও অনেক পরিমাণে এই টাকাতেই চালানো হয়। শিল্পভবনের ছাত্রদের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি বাইরের বৃত্তি বা নিজের টাকা খরচ করে ট্রেণিং ও বোর্ডিং ফি চালায়। শিল্পভবন থেকে স্টাইপেণ্ড, এলাওয়েন্স বা পারিশ্রমিক নিয়ে তারা খোরাকী চালায়। Learn while you earn—এই প্রথাটি শিল্পভবনে বহুকাল হল প্রচলিত আছে। পরে বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতীরাও এই প্রথাটি তাঁদের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। নইলে ভারতের মত গরীব দেশে শিক্ষাবিস্তারের বিপুল খরচ কোথা থেকে আসবে? এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান অধিনেত্রীদ্বয় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যোগ দেবার আগে বিশ্বভারতীর কর্মীরূপে রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু গত আটাশ বছর এই নীতি অনুসরণ করে বিশ্বভারতীর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, শিল্পশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ কাঁচা শিক্ষার্থীর উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে হতে পারে না। কারণ বেশী পরিমাণে ভাল জিনিস তৈরী করতে হলে অনেকদিন শেখা ও চর্চা থাকা দরকার। শিল্প-ভবনের শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভে পরেও কয়েক বছর শিল্পভবনে থেকে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে তার লাভের টাকার কিয়দংশ শিল্পভবনে দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয়। এতে পুরাণো শিক্ষার্থীর জায়গায় নতুন শিক্ষার্থী নিতে স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু শিল্পবিদ্যার অর্থকরী দিকটা এভাবে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে শিখতে পায়।

বর্তমানে কারুকাজ করা চামড়ার জিনিস ছাড়া আটপৌরে চামড়ার জিনিস তৈরীর কাজও শিল্পভবনে হচ্ছে। এখন বিদেশী খরিদ্দারের ভিড় নেই, দেশের লোকও প্লাস্টিকের জিনিসের দিকে ঝুঁকেছে, তাই আগে যেমন গ্রামে বসে অনেক শিল্পী বাইরের সৌখীন চামড়ার জিনিসের চাহিদার জোগান দিত এখন তা সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশে রপ্তানি কিছু কিছু হয়, কিন্তু বড় রপ্তানি-ব্যবসা চালাবার মূলধন বা অভিজ্ঞতা এখনও অর্জিত হয় নি। তাছাড়া উৎকৃষ্ট চামড়া দেশে পাওয়া দুষ্কর। তাই চর্মশিল্প বিভাগের কাজ আগের চেয়ে সঙ্কুচিত হয়েছে।

মৃৎশিল্প-বিভাগ

মাটির তৈজসপত্র প্রতি ঘরেই লাগে। সৌখীন লোকেদের ঘরে ফুলদানি, কৌটো, চায়ের বাসন দরকার হয়। বিশ্বভারতী শিল্পভবনের মৃৎশিল্প বিভাগে প্রধানত সৌখীন সুদৃশ্য ফুলদানি, প্রদীপ, ধূপদানি, প্লেট, কৌটো, চায়ের বাসন তৈরী হয়। যুদ্ধের সময় এখানকার মাটির জিনিস বজারে দেবার মত উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু তখন মাল রপ্তানি ছিল দুরূহ। তাই সম্প্রতি মাটির তৈরী বিশ্বভারতীর কারুকাজ করা তৈজসপত্রের সঙ্গে বাইরের জগতের পরিচয় ঘটছে সম্প্রতি। চীনামাটি বা কাওলিন শিল্পভবনে ব্যবহার করা হয় না। স্থানীয় লালমাটি দিয়ে নতুন ধরণের এই তৈজসপত্রের সুষমা ক্রমেই দেশবিদেশের লোক বেশী করে বুঝছে। চীনদেশ, ফ্রান্সের সেভরে, জার্মানীর ড্রেসডেনের চীনামাটির বাসনের মত বিশ্বভারতীর লালমাটির বাসনও হয়ত একদিন দেশবিদেশের রুচিবান লোকেদের সমাদর লাভ করবে।

টুলে বসে পা দিয়ে চাক ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে বাসনগড়ার জন্য একরকম নতুন ধরণের চাক শিল্পভবনে তৈরী হয়েছে। দেশী চাকে হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে তারপর বাসনগড়া এবং ঘূর্ণিবেগ কমে গেলে আবার গড়া বন্ধ করে হাত দিয়ে ঘোরাবার অসুবিধা এতে দূর হয়েছে। গ্রামের কুমোরেরা শিল্পভবনের এই নতুন চাক দেখতে ও চালাতে শিখতে আসে। এখানকার মাটি ছানবার পদ্ধতিও এরা শেখে। এই চাক বেশী দামী নয়, তাই গ্রামের কুমোরদের সাধ্যের অতীত নয়। এতে চাক টাল খায় না এবং উপযোগিতা আরো বেশী। কাঁচা-বাসন পোড়াবার সময় যাতে নষ্ট না হয় তারজন্য অল্পব্যয়সাধ্য নতুন ধরণের ভাঁটিও শিল্পভবনে আবিষ্কার করা হয়েছে। দুজন জার্মান শিল্পী যুদ্ধের পরে কিছুদিন এই বিভাগে কাজ করে অনেক উন্নতি করে গেছেন। এবিষয়ে আরো উন্নতিসাধনের উপদেশ দেবার জন্য শীঘ্রই জাপানে শিক্ষিত কলাভবনের এক প্রাক্তন ছাত্র কিছুদিনের জন্য শিল্পভবনে আসবেন।

দারুশিল্প-বিভাগ

জাপানী দারুশিল্পী কাসাহারা সাহেব শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই সেখানে বহুদিন ছিলেন। তিনি শিল্পভবনের

দারুশিল্প বিভাগের প্রথম শিক্ষক। শিল্পভবনের দারুশিল্প বিভাগের গরুর গাড়ী, দরজা জানলা, খাট টেবিল আলমারী থেকে খোদাই কাজ করা অপূর্ব সুন্দর কাঠের যাবতীয় জিনিস তৈরী হয়। এখন ৩৪টি ছাত্র কাজ শিখছে। অনেকে গ্রামে বসে কাঠের জিনিস তৈরী করে জীবিকা-নির্বাহ করছে শিল্পভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করে। কোন কোন প্রাক্তন ছাত্র কার্পেণ্ট্রী শিক্ষকের কাজও করছেন। বিশ্বভারতীর প্রয়োজনীয় কাঠের জিনিস এবং এই অঞ্চলের গ্রামের গরুর গাড়ি ও অন্যান্য আসবাব শিল্পভবনে ও শিল্পভবনের প্রাক্তন ছাত্রদের কাঠের কারখানায় তৈরী হয়। রেলওয়ে ও সরকারী কাঠের কারখানায় শিল্পভবনের প্রাক্তন ছাত্রদের বেশ চাহিদা আছে।

কাঠ চেরা, পালিশ করা, কোঁদার কাজ যন্ত্র দিয়ে করবার জন্য আগেই কিছু যন্ত্র শিল্প-ভবনে বসান হয়েছিল। আরো কয়েকটি যন্ত্র সম্প্রতি আনা হয়েছে। শিল্পভবনের প্রাক্তন ছাত্ররা নিজেদের কাঠের কারখানায় প্রয়োজনীয় কাঠ মাপ মতন সাইজে এখান থেকে সুলভে কেনে। অন্য ছুতোররাও অনেকে এখান থেকে সাইজকরা কাঠ কেনে অথবা নিজের কেনা কাঠ এখান থেকে সাইজ করে কাটিয়ে ও পালিশ করে নেয়।

বয়নশিল্প বিভাগের প্রাক্তন ছাত্ররা কাঁচা-মাল কেনা ও তৈরী মাল বিক্রী করাতে শিল্প-ভবনের সংগে যুক্ত; কিন্তু দারুশিল্পের প্রাক্তন ছাত্ররা বিক্রী বিষয়ে শিল্পভবনের নিরপেক্ষ। কিন্তু দারুশিল্প বিভাগে যখন বেশী কাজের চাপ থাকে, তখন নিকটবর্তী গ্রামের প্রাক্তন ছাত্রদের দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। মাত্র ৫।৬ মাস আগে বিশ্বভারতী শিল্পবিভাগ যে টেবিল-তাঁত উদ্ভাবন করেছে, নানা জায়গা থেকে তার অর্ডার আসছে। সুতো পাকাবার একটি সস্তা যন্ত্রও বয়নবিভাগ ও দারুশিল্প বিভাগের মিলিত চেষ্টায় উদ্ভাবিত হয়েছে। তাঁতি ও জেলেদের প্রয়োজনীয় দুতার বা তিনতার সুতো পাকাবার পক্ষে এই যন্ত্রটি যেমন সস্তা, তেমনি উপযোগী। উত্তরায়ণ অথবা শ্রীনলিনী-রঞ্জন সরকার মহাশয়ের বাড়ীর আসবাবপত্র ভারতীয় শিল্পরুচির অপূর্ব নিদর্শন। ক্রমে এদেশের অর্থবানদের বিদেশী রুচি ঘুচে স্বদেশী রুচি আসবে এবং ঘরে ঘরে শিল্প-ভবনে নির্মিত ডিজাইনের আসবাব দেখা যাবে।

বই বাঁধাই ও কাগজ-শিল্প

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবার পর মুসলমানেরা পশ্চিম বাঙলা ছেড়ে যায়। পশ্চিম বাঙলার দপ্তরী, দরজি ও নাবিক প্রায় সবই ছিল মুসলমান। তাই এদেশে বই বাঁধাই ও কাপড় সেলাইয়ের কাজ প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হয়। বিশ্বভারতীতে বই বাঁধাই ও সেলাই শেখাবার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগের বই সেইজন্য বাঁধাই হয়ে বেরিয়েছে অথচ অন্য অনেক প্রকাশকের ছাপা বই বাঁধানোর অভাবে প্রকাশিত হতে পারে নি। সাধারণ বাঁধাই ছাড়া কারুকাজ করা চামড়া ও কাপড়ের বাঁধাইও শিল্পভবনে শেখানো হয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ও শান্তি-নিকেতন প্রেসেও শিল্পভবনে শিক্ষিত স্থানীয় গ্রামীনরা দপ্তরির কাজ করছে।

ছেঁড়া কাগজ, চটের টুকরো, খড়, পাট শণ, নেকড়া ইত্যাদি জঞ্জালের সদ্ব্যবহার করা হয় শিল্পভবনে। এইসব জিনিসের মণ্ড তৈরী করে তা থেকে হাতে কাগজ তৈরী হয়। শিল্প-ভবন ও বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগের খাতা-পত্র, চিঠির কাগজ প্রভৃতি হাতে তৈরী কাগজেই হয়। তাছাড়া ছবি আঁকার কাগজও হাতে তৈরী হয়। সম্প্রতি সরকারী ব্যবহারের জন্য কিছু বিশেষ ভাল কাগজ শিল্পভবনে করিয়ে নিচ্ছেন পশ্চিম বাঙলার শিল্প-অধিকর্তা।

শিল্পভবনের কাগজ তৈরী ও বই বাঁধাই বিভাগে শিক্ষাদানই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু উৎপাদনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা না দিলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না সেইজন্যই উৎপন্ন কাগজ ব্যবহার ও বিক্রয় হয়। এখানকার কাগজ তৈরী বিভাগটি আরো বাড়ানো দরকার; সেজন্য মণ্ড করবার দুতিনটি মেশিন বসাবার পরিকল্পনা আছে।

শিল্পভবনের দরজি বিভাগে সাধারণ জামা, মশারি ইত্যাদি তৈরী হয়, স্থানীয় লোকেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। গত বছর চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ে যে পোষাক লেগেছিল, তা শিল্প-ভবনের দরজি তৈরী করেছিল। এছাড়া গ্রামের মেয়েদের সেলাই শিক্ষয়িত্রী একজন আছেন শ্রীনিকেতনে; তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেলাই শেখান।

রুটি তৈরী

শিল্পভবনে রুটি তৈরী বিভাগে আজকাল দৈনিক আড়াই মণ ময়দার রুটি, কেক, বিস্কুট বাকরখানি তৈরী হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্র ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় রুটি ছাড়াও গ্রামের লোকদের এবং বোলপুর ও লুপ লাইনের অন্যান্য স্টেশনে রেলযাত্রীদের রুটি সরবরাহ করা হয়। বিদেশ থেকে আমদানী চালের চেয়ে গমের দাম কম পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী তাই এ প্রদেশে আটাময়দার ব্যবহার বাড়াতে চেষ্টা করছেন। শিল্পভবন সস্তায় রুটি সরবরাহ করে ও গ্রামবাসীদের পাউরুটি করতে শিখিয়ে এ অঞ্চলে গমজাত খাদ্যের ব্যবহার প্রচলিত করছেন। একজন বাস্তুহারা কারিগরের তত্ত্বাবধানে নিকটস্থ গ্রামের ছেলের এই আড়াই মণ রুটি রোজ তৈরী করে।



পর্দার আঁচল

মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত গ্রামোদ্যোগ সংঘ ১০।১২ বছর আগে বিনুরী গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করে নিকটবর্তী ৪।৫টি গ্রামে তেলের ঘানি চালানো শুরু করেন। ১৯৪২ সনের আন্দোলনের সময় ঐ সংঘ বে-আইনী ঘোষিত হওয়া শিল্পভবন ঐ কেন্দ্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত চালিয়ে এসেছেন। তারপর খাঁটি সরষে সংগ্রহের দুরূহতার জন্য এ কেন্দ্রের কাজ বন্ধ আছে। সমবায় সমিতি স্থাপন করে সরকারী সাহায্য নিয়ে ঘানিগুলি আবার চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।

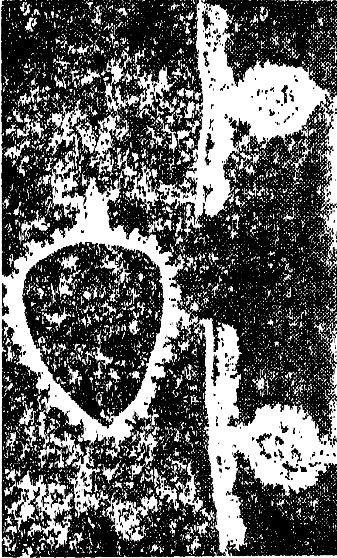
পেতল, কাঁসার কাজ আগে বাঙলার এক বিশিষ্ট কুটীরশিল্প ছিল। ক্রমে এনামেল ও এলুমিনিয়মের বাসন প্রচলিত হয়ে এ শিল্পটিকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। শিল্পভবন অতঃপর এই শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন।

কামারশালা অনেক গ্রামেই আছে, কিন্তু লোহা ও কয়লা কামারদের কিনতে হয়, কালো বাজার থেকে। শিল্পভবন এ অঞ্চলের কামারদে

নিয়ন্ত্রিত দরে লোহা, ইস্পাত ও কয়লা সরবরাহ করবার জন্য শিল্পবিভাগের সাহায্যে পারমিট সংগ্রহ করেছেন। ২৩ জন গ্রামের কামার এই পারমিটের সাহায্যে সস্তায় কাঁচামাল কিনতে পারছে। শিল্পভবনেও কামারশালা বসিয়ে লৌহ-শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থা

গ্রামের শিল্পীদের তৈরী মাল শহরের বাজারে ও বিদেশে বিক্রী করবার উপায় অনভিজ্ঞ গরীব গ্রামশিল্পীদের নেই। আড়তদার ও মহা-



গ্রামের মেয়েদের সূচীশিল্প

জনেরা অতি অল্পমূল্যে তাদের উৎপাদিত জিনিস কিনে বড় শহরে বেশী দামে বিক্রী করে অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়। অথচ গ্রামের শিল্পীরা "যে তিমিরে সে তিমিরেই" থেকে যায়। বিশ্বভারতী শিল্পভবন এরকম শিল্পদ্রব্য ভাল দরে বিক্রী করে সামান্য কমিশন কেটে শিল্পীদের দিয়ে আসছেন অনেকদিন থেকে। শিল্পভবনের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র আছে কলকাতায়। তাছাড়া ভারতের অধিকাংশ বড় শহরেই সরকারী বা বে-সরকারী সেলিং এজেণ্টও শিল্পভবনের আছে। এদের মারফতে গ্রামশিল্পীদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করা হয়। সরকারী সহায়তা পেলে এবং সমবায়-পদ্ধতি আরো প্রচলিত হলে আরো কম খরচে বড় শহরে ও বিদেশে সরাসরি গ্রামে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রী করা সম্ভব হবে। তাহলে শিল্পীরা আরো বেশী দাম পেতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও সুবিধা

শিল্পভবনে এ বছর ২৫টি শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। তাদের মধ্যে ৮টি বয়ন বিভাগের ও ১৭টি কার্পেণ্ট্রী বিভাগের। এদের গ্রামে গিয়ে নিজেদের কারখানা খোলবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সরঞ্জাম শিল্পভবন থেকে কেনা দরে সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এ সমস্তের দাম মাসিক ৫৲ কিস্তিতে পরিশোধ করবে। তাছাড়া কাঁচামাল সস্তায় দেওয়া, অল্প কমিশনে তৈরী মাল বিক্রী করে দেওয়া ও উদ্বৃত্ত অর্ডারী কাজ এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে।

বিগত পূর্ব বাঙলার গোলযোগের পর থেকে ১৫টি বাস্তুহারা শিল্পী বিশ্বভারতী শিল্পভবনে যোগ দিয়ে সংসার প্রতিপালন করছে। এছাড়া ১৬টি বাস্তুহারা যুবক শিল্পভবনে বয়ন, দারুশিল্প, রুটি তৈরী বিভাগে কাজ শিখছে। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের ভাল করে থাকার বন্দোবস্থা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি সরকার থেকে দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের পুনর্বসতি মন্ত্রী এবং বাঙলার শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী সম্প্রতি শিল্পভবনে পরিদর্শন করে গেছেন। আশা করা যায় এঁরা এই বন্দোবস্ত করবেন।

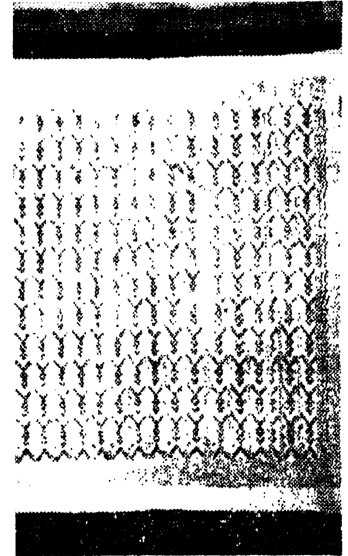
১৯৪৯ সনে ১২টি বাস্তুহারা পাঞ্জাবী ও সিন্ধী যুবক কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে শিল্পভবন থেকে বয়ন, চর্মশিল্প, বই বাঁধাই ও রুটি তৈরী শিখে গেছে।

নেপাল সরকার ৬টি নেপালী যুবককে বিভিন্ন কুটীরশিল্পে শিক্ষিত করবার জন্য শিল্পভবনে দুই বছরের জন্য বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এদের শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এল। দেশে ফিরে এরা শিল্পশিক্ষক ও শিল্প-ব্যবস্থাপক হবে। এজন্য এ বছর নেপাল সরকার বিশ্বভারতীকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন। কাবুলের ভারতীয় দূত ৮টি আফগান ছাত্রের জন্য বিশ্বভারতী শিল্পভবনে ব্যবস্থা করতে লিখেছেন। এরাও নেপালী ছাত্রদের মত এখানে শিল্পশিক্ষা লাভ করে দেশে গিয়ে শিল্পশিক্ষক ও পরিচালক হবে।

এই সব বিদেশী ছাত্ররা বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভ করে নিজেদের দেশের শিল্পোন্নতি করলে পর ভারতের সঙ্গে এ সব দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়া অনিবার্য। তাছাড়া নেপাল আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ বিশ্বভারতী নির্দিষ্ট পথে কুটির-শিল্প গড়ে তুললে এ সব দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগও ঘনিষ্ঠ হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সভ্যতা দেশে দেশে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন স্থাপন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত কেন্দ্রের বিদেশী ছাত্রেরা যদি তাঁর বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নিজেদের দেশে ছড়াতে পারে, তবে "ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"। শাসন ও শোষণ করবার জন্য বিদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ভারত আগেও করেনি। আশা করা যায় নতুন স্বাধীনতা পেয়ে ভারতবর্ষ আগের মতই বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে।

কুটির-শিল্পীদের সংগঠন

ভারতবর্ষে "টি এসোসিয়েশন", "জুট মিল এসোসিয়েশন," "সুগার মিল এসোসিয়েশন," "মিলওনার্স এসোসিয়েশন" প্রভৃতি ধনবান উৎপাদকমণ্ডলীদের সঙ্ঘ আছে। শ্রমিক সভা, কৃষক সভাও অনেক হয়েছে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চেষ্টায়। বৃটিশ আমলেও



ট্রে ঢাকনি

ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের উপর শতকরা ২৫ টাকা আমদানী শুল্ক ধার্য হয়েছিল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের চেষ্টায়। দেশের লোক প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বেশী দিয়ে কাপড় কিনে ভারতের সুতাকলগুলিকে সমৃদ্ধ করে বস্ত্র বিষয়ে ভারতকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। জাভার চিনির উপর মোটা আমদানী শুল্ক বসাবার জন্য বহু লক্ষ টাকা বেশী দিয়ে ভারত-বাসী চিনি খাচ্ছে ও চিনির কলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখছে। এদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলি কারখানার মজুরদের মজুরী বাড়ান, শ্রমিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আবাসগৃহের উন্নতি প্রভৃতি বহু হিতকর কাজ করিয়ে নিয়েছে। কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত করা, টাকা-কড়ি ঋণ সংগ্রহ করা, জমিতে স্বত্ব দৃঢ়তর করার কাজ কৃষক সমিতির সাহায্যে হয়েছে।

কুটিরশিল্পীদের অনুরূপ কোন সংগঠন নেই। যাও বা আছে, তা অতি ছোট এবং শক্তিহীন। বিশ্বভারতী শিল্পভবন তাই "বিশ্ব-

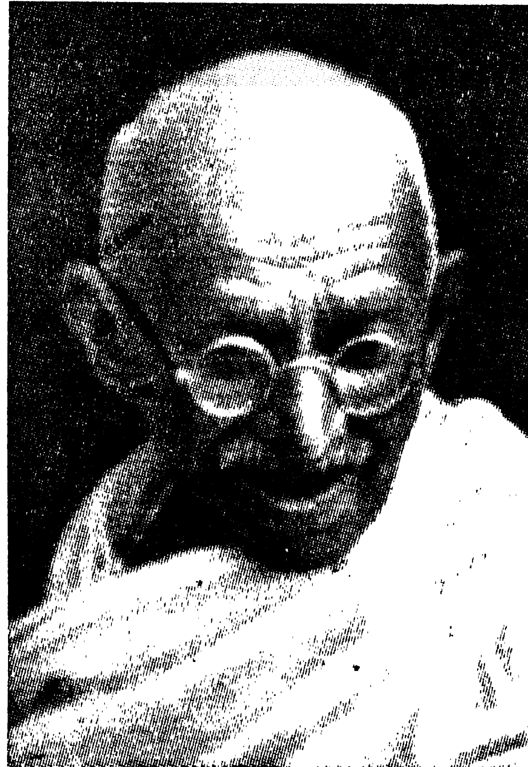
ভারতী কুটির শিল্প সংঘ" গড়তে সুরু করেছেন। গত ১৩৫৬ সনের ভাদ্র সংক্রান্তিতে শিল্পোৎসবের সময় শিল্পভবনে কর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় এই সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রথম হয়। গত ২৫শে মাঘ শিল্পভবন সচিব শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের সময়ে শিল্পী সম্মেলন আহ্বান করেন। তাতে সংঘের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংঘ গড়ার উদ্যোগ করার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। ১৩৫৭ সনের শিল্পোৎসবে সেই সমিতি খসড়া গঠনতন্ত্র পেশ করেছেন। সেই গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে শিল্পীদের সাধারণ সভায়। বিশ্বভারতী কুটিরশিল্পী সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হল (১) কুটিরশিল্পী ও কুটির-শিল্পের উন্নতি সাধন এবং (২) দেশবাসী ও সরকারকে কুটিরশিল্পে সহায়তা করতে প্রণোদিত করা। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য (ক) কুটিরশিল্পীদের উপযোগী উন্নততর যন্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ভাবন ও স্বল্পমূল্যে সহজ কিস্তিতে সরবরাহ করা, (খ) উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন, (গ) কাঁচা মাল যথাসম্ভব কম দরে সরবরাহ করা, (ঘ) তৈরী মাল সরকারী খরচে ভাল দরে বিক্রয় ব্যবস্থা করা, (ঙ) সরকারী প্রয়োজনে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার, (চ) সাধারণকে প্রচার ও আইন দ্বারা কুটির শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করতে প্রণোদিত করা এবং (ছ) দেশী ও বিদেশী বৃহৎ শিল্পের উপর শুল্ক ধার্য করে কুটির শিল্পকে সাহায্য করা দরকার। নইলে প্রতিযোগিতায় কুটির-শিল্পের বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে পারা দুঃসাধ্য। আশা করা যায় এই সংঘের সঙ্গে দলে দলে যুক্ত হয়ে গ্রামশিল্পীরা আবার সতেজ হয়ে উঠবে এবং অন্যত্র এর অনুরূপ সংঘ গড়ে তুললে ভারতের গ্রামগুলি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদে সমুজ্জ্বল ও কর্মে ও আনন্দে মুখর হয়ে উঠবে।

গ্রামশিল্প ও গান্ধীজী

শ্রীমনকুমার সেন

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সূত্রধর ও গ্রামীণ স্বরাজের উদ্ভাবক গান্ধীজীর কর্মসূচীতে স্বভাবতঃই গ্রাম শিল্প একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত চরখা তথা বয়নশিল্পের দিক্ থেকে বিচার করলে গান্ধী-পরিকল্পিত সমাজদর্শনের কেন্দ্রমূলে আমরা দেখি গ্রামশিল্পকে। স্মরণ রাখতে হবে, গ্রামশিল্পের উদ্বোধন, মৃত এবং মুমূর্ষু গ্রাম-শিল্প ও কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুদ্ধার গান্ধীজীর দৃষ্টিতে শুধু একটা অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, নৈতিক প্রয়োজনও বটে। অর্থ-নীতির ও নীতির এই দ্বিবিধ প্রয়োজনই গান্ধীজীর গঠনকর্মসূচীতে গ্রামশিল্পকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দাঁড়িয়েছে।

ভারতে গ্রামশিল্প নিছক একটা জীবিকা-র্জনের পন্থা নয়, কোটি কোটি মানুষের জীবন তথা ভারতের সামাজিক জীবন গঠনে গ্রাম-শিল্পের দান ও দায়িত্ব অসামান্য। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের মনোহারী চাকচিক্য মহাত্মার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি—ভারতীয় সভ্যতার মূলে কোথায়, কোন শক্তি অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের শান্তি ও সমতার মহান্ ঐতিহ্য বহুশতাব্দীর ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্যেও অতল গভীরে তলিয়ে যায়নি সমগ্র ভারত-জীবনকে কিসের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ, সুস্থ ও প্রাণবন্ত করে তোলা যেতে পারে—ঋষির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি তা সম্যক্ অনুভব করতে পেরেছিলেন। আজীবন প্রয়াসের মধ্যে, তাঁর এই অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও সবলতারই আমরা পরিচয় পাই।



স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ

গান্ধীজীর নেতৃত্বলাভের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একান্তরূপেই রাজ-নৈতিক আবেদন-নিবেদনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত ছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাবের ফলে দ্রুত কংগ্রেসের কর্মনীতিতে রূপান্তর ও সতেজ কর্মণ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। বিদেশীর কূটকৌশল ও স্বার্থ-সিদ্ধিমূলক শিল্পনীতির ফলে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি মানুষ নিজ নিজ শিল্প ব্যবসায় ও বিচ্যুত হয়ে যে মুমূর্ষু জীবন যাপন করছিল, জাতীয় সংগ্রামের মুখে বৃহত্তম জনশক্তির এই মৃতকল্প জীবন যে কত বড় প্রতিবন্ধক গান্ধীজী তা' উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করেছে, সেই পথের মুখে দাঁড়িয়েই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, অন্যত্র অযথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। কিন্তু বিদেশীর প্রতি বিরাগ অপেক্ষা স্বদেশীর প্রতি অনুরাগের গুরুত্বই ছিল তাঁর কাছে বেশী। এর অর্থ হচ্ছে এই, স্বদেশীর মূল্যে ও অন্তর্নিহিত নৈতিক সার্থকতাকে উপলব্ধি না করে, নিছক সংগ্রামের খাতিরে বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালালে তার আয়ুষ্কাল স্বল্প হতে বাধ্য। বেদনার সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য

করছি, গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বহুজনই মর্যাদা দিতে পারেন নি, কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যকে বিচার করেছিলেন বহুজনই তা বুঝবার চেষ্টা মাত্রও করেন নি—তাই স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ জাতির জীবনে একদা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বটে, স্থায়ী সার্থকতা ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির বিচারে এই বিরাট আন্দোলন থেকে আমরা কতটুকু ফল পেয়েছি! স্বদেশী শিল্প প্রথম পর্যায়ে যে অর্থই বহন করে থাকুক, পরবর্তী পর্যায়ে সহস্রবার গান্ধীজী তাঁর রচনায় ও উক্তিতে স্বদেশীর মর্মার্থ ঘোষণা করেছেন, বলেছেন, "কুটির-শিল্পে প্রেরণা ও উৎসাহদান, উহার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস,—ইহাকেই আমি যথার্থ স্বদেশী বলি। একমাত্র ইহাই কোটি কোটি মূক মানুষকে বাঁচাতে পারে, তাদের সৃজনীশক্তি ও সম্পত্তিকে বাড়াতে পারে।" স্বদেশীকে গান্ধীজী গীতায় উক্ত 'স্বধর্মের' তুল্য অর্থে ব্যবহার করেছেন, এবং ভয়াবহ পরধর্মের মতই পরদেশী বা বিদেশী বর্জন করতে বলেছেন। এই 'বিদেশী' শুধু ভৌগোলিক 'দেশ'-এর বিচারে নয়, দেশের জনগণের কল্যাণের বিচারেও। দেশের জনগণের গ্রাম-ভারতের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ সাধনের বিরোধী যে শিল্প তাহাই যে তিনি বিদেশীর পর্যায়ে ফেলেছেন, তাঁহার অসংখ্য উক্তি ও উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যায়। গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনে গান্ধীজীর পরিকল্পনা ও কর্ম-প্রয়াসকে বুঝতে হলে আগে বুঝা দরকার কী আমরা হারিয়েছি যা' পুনরুদ্ধার করবার জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল অবিশ্রান্ত; বুঝা দরকার, গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের সমাধির উপরে যে যন্ত্রশিল্প বা বৃহৎ কারখানাশিল্পের পত্তন হয়েছে, গান্ধীজী তা জনকল্যাণকর বলে ভাবতে পারেন নি কেন।

আমরা যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গৌরব করি, তার ভিত্তিভূমি ও লীলাক্ষেত্র ভারতের অগণিত গ্রাম। সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে সমতা, শান্তি ও প্রীতি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই জীবন-বিভূতি যে পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল, দেশী ও বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণী অকুণ্ঠ ভাষায় তা' স্বীকার করেছেন। বস্তুত ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশই এমনি যে, গ্রামকে ভিত্তি করেই তার সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে ওঠা স্বাভাবিক,—এবং আজও সেই সভ্যতা ও কৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখতে হলে গ্রামের পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গুণ ও সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে কর্ম নির্ধারিত, মানুষের মূল্য বিচারের মাপকাঠি যেখানে কোন একটা বস্তুবিশেষের মালিকানা নয়—তার বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতা, সমতা ও শান্তি শুধু সেখানেই সম্ভব। প্রাচীন ভারতের সমাজজ্ঞানীগণ এই মানদণ্ড দিয়েই সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবিকা ও জীবন তথা সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার খসড়া করেছিলেন। গুণ অনুযায়ী কর্মের এই বিভাগ থেকেই এসেছিল বিভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকার্জনের পথ। কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতার, তেলী, কলু এরা সবাই গুণগত যোগ্যতা নিয়ে সম্পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গেই সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। সমাজের বসন ও বাসব্যবস্থার জন্যে কাপড়ের কল ছিল না, ছিল না লোহালক্কড় ইট-সিমেন্টের কারখানা। সত্য বটে সেদিনের জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদার সঙ্গে আজকের দিনের জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদার কোন তুলনা হয়



ওয়ার্ধা গ্রাম উদযোগ কার্যালয়ে গান্ধীজী

না,—কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? বহু-বিচিত্র জীবনোপকরণ, জীবনযাত্রার বহির্দৃশ্যগুলোকে বাদ দিলে মূলত কোন পার্থক্য আছে কি? জীবিকার দিকে আমরা যত জটিলতা বাড়িয়েছি (আর সঙ্গে সঙ্গে এই জটিলতাকেই জীবন-প্রগতি ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছি), জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে আমরা ততটাই পিছিয়ে গেছি—অতীতের জীবনধারার সঙ্গে বিচার করলে আজ শুধু এই পার্থক্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। বহির্জীবনের আড়ম্বর ও কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যটুকু সরিয়ে ফেললে আজ মনুষ্যসমাজে একটা ভদ্রবেশী বর্বরতাই চোখের সামনে ফুটে উঠবে। হিংসা-স্বার্থ-হানাহানির ক্ষুদ্রতা নিত্য যেখানে জীবনের পথে বাধা, শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়—এমন কি দেশে দেশে আত্মঘাতী সংগ্রাম যেখানে প্রায় অনিবার্য, তাকে সভ্যতা বলি কি করে?

গ্রামশিল্পের মৃত্যুবাণ

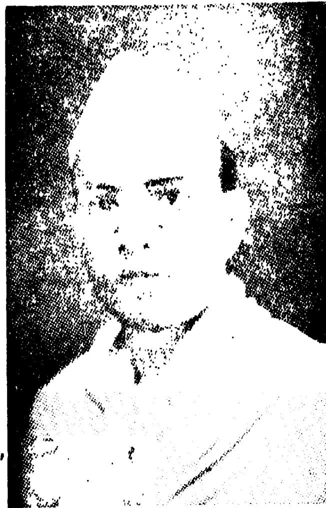
গ্রাম-ভারতের এই শিল্প-বৃত্তি ও সংযত-শান্তিপূর্ণ জীবনের মৃত্যুবাণ তৈরী হয় ব্রিটেনে—ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবে। নিত্য নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্রিটেনের বিকেন্দ্রিক ও গ্রামীণ শিল্পব্যবস্থাকে দ্রুত কেন্দ্রীভূত করতে থাকে, ছোটখাট চেষ্টাই ছিল যে-উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ, গুটিকয় স্থানীয় মুষ্টিমেয় অর্থশালীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যাপক ও বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্পন্ন হতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি-নিধিগণ ঠিক ঐ পথেই গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন, গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পগুলিকে কোথাও হাতে কোথাও বা ভাতে মেরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে যান্ত্রিকশিল্পের প্রবর্তন করেছেন। তাতে ব্রিটেনের দুটো খুব মোটা লাভ হয়েছে,—যথা, (১) ব্রিটেনের যন্ত্র-পাতি আমদানী করে এদেশে যান্ত্রিক উৎপাদন প্রবর্তনের নামে ব্রিটেনের পুঁজি ও শিল্প-ব্যবসায় ভারী করা গেছে এবং (২) একদা যে গ্রামগুলো নিজেদের কাঁচামাল যথা তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি ব্যবহার করে বয়নশিল্প, ঘানিশিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলে' বহুলাংশে স্বয়ংনির্ভর হয়েছিল তার সেই কাঁচামাল সস্তায় কিনে বিলাতী কোম্পানীর যানে বহন করে সমুদ্রের ওপারের শিল্প-কারখানার উদরপূর্তির জন্য পাঠানো গেছে। এটি হল প্রথম পর্যায়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কীর্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে—দেশেই যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল এবং ভারতের বুকের উপর বসেই ভারতীয় ও অভারতীয় পুঁজির সমন্বয়ে সৃষ্ট বৃহৎশিল্পের সৌধ গ্রামের ও গ্রামশিল্পের জীবন-শোণিত অবাধে নিংড়ে নিতে লাগল। উৎপাদনের এই বৃহৎ ও ব্যাপক প্রণালীকে আমরা এমন নির্বিচারে হজম করেছি যে, আজ জাতি ক্ষয়িষ্ণু না হয়ে বর্ধিষ্ণু হলেই বরং আশ্চর্য হতে হত। গ্রামের বয়নশিল্প মরল, তুলা চালান হতে লাগল হয় ভারতেরই যন্ত্র-শিল্পের কেন্দ্রে কিম্বা ভারতের বাইরে। তাঁতি করবে কি? খাবে-পরবে কি? এমনি করে বছরের পর বছর বৃত্তিহারা হয়ে তাঁতিশ্রেণীর মধ্যে সহস্রে সহস্রে বেকার হয়েছে,—এবং বাধ্য হয়ে অনেকে এমন বৃত্তিতে হাত দিয়েছে যার সঙ্গে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিজ্ঞান ও অতীত দিনের অভিজ্ঞতার কোন যোগ নেই। ফলে তাঁতি তার নিজের সামাজিক মূল্য ও গুণগত যোগ্যতাই হারায়নি, নূতন বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করে' এই বৃত্তির পুরনো কর্মীদের সম্মুখেও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গ্রামের তৈলবীজ সরবরাহ হয়েছে শহরের তৈলকলগুলিতে, তেলী ও কলুর জীবিকার পথ হয়েছে রুদ্ধ। এমনি করেই গ্রামের গুড়শিল্পের কবরে গড়ে

উঠেছে আধুনিক চিনির কল, ধানভানার গ্রাম্য পদ্ধতির বিনাশ করে চালের কলের হয়েছে প্রতিষ্ঠা। এই মর্মান্তিক ইতিহাস একটানা *কখনও ধীরে কখনও দ্রুত বহুদিন ধরে সৃষ্ট হয়েছে.—আজ ব'লে এই সর্বনাশা ক্ষতিকর রূপ ততটা বোঝানো যাবে না যতটা বুঝতে হবে অনুভূতি দিয়ে, এবং আজকার শোচনীয় অর্থ-নৈতিক ও নৈতিক দুর্দশা থেকে।*

আমাদের সমস্যা ও কর্তব্য

কোটি কোটি মানুষ যে এইপথেই দীন-দুঃখী, শোষিত ও বঞ্চিতের জাতে পরিণত হয়েছিল, গান্ধীজী অতি নিখুঁতভাবে তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ "আজ আমার কর্তব্য হচ্ছে, গ্রামের চরখা, গ্রামের পেষাইকল, গ্রামের ধানভানাই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা; এদের উৎপন্ন দ্রব্য বিজ্ঞাপিত করে, গুণাগুণ আবিষ্কার করে, কর্মিগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে কর্মীদের মধ্যে যারা বেকার হয়েছে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা; এবং গ্রামীণ পদ্ধতি বজায় রেখেও যাতে এরা উন্নত হয় এবং মিলের প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করা।" পরবর্তীকালে গান্ধীজীর উদ্‌যোগে 'অখিল ভারত গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘ' (All India Village Industries Association) এবং চরখা সঙ্ঘ (All India spinners Association) গঠিত হলে ঠিক এই কর্মসূচীই তার উপর অর্পিত হয়। চরখা সঙ্ঘ শুদ্ধ চরখার জনপ্রিয়তা ও সময়োচিত উন্নতির কাজে নিবদ্ধ রয়েছে, অপরাপর সমস্ত গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসারণের গুরু দায়িত্ব বহন করে চলেছে গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘ। গোড়ায় যে চরখা নিয়ে গান্ধীজী শুরু করেছিলেন, জীবিতকালে তিনি বহু চিন্তা ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তার বহুল উন্নতিমূলক পরিবর্তন করে গেছেন। এই অনুসন্ধান, এই পর্যবেক্ষণ ও যথোপযুক্ত পরিবর্তন বা উন্নতির অভাবেই না গ্রামের শিল্প ও শিল্পী বাজারে অচল হয়ে পড়েছে—তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তারা 'inefficient' ও 'uneconomic'! কিন্তু এর জন্য দায়ী কি তারা, না আমরা—যারা নতুন সভ্যতা ও শহুরে বিলাসী উৎপাদন সামগ্রীর মোহে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা ভুলে গেছি?

গ্রামশিল্পের পুনরুজ্জীবন বলতে গান্ধীজী শিল্প যন্ত্রের প্রয়োগের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু আমাদের সমস্যা ও আমাদের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে নির্বিচারে বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা যে দিন দিন আত্মহত্যার পথকেই প্রশস্ত করে চলেছি একথাই তিনি বলেছেন। গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ কুটিরশিল্পী যখন বেকার হয়ে বসে আছে, *লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর যখন বছরে প্রায় ছ'মাস জীবিকার্জনের কোন পথ নেই, তখন এই বেকার জীবন্ত যন্ত্রগুলোকে চালু করাই আমাদের অধিক প্রয়োজন নয় কি?*—গান্ধীজীর কথায় বলিঃ "আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা আমাদের সমস্যা নয়, আমাদের সমস্যা হচ্ছে তারা যে বছরের প্রায় ছ'মাস নিষ্কর্মা বসে থাকে সেই সময়ের জন্যে কর্মসংস্থান করা। অদ্ভুত মনে হলেও, সাধারণভাবে প্রত্যেকটি কারখানা আজ গ্রামবাসীর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সংখ্যা হিসেব করে দেখিনি, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্রামে দশজন কর্মী যে কাজ করে,

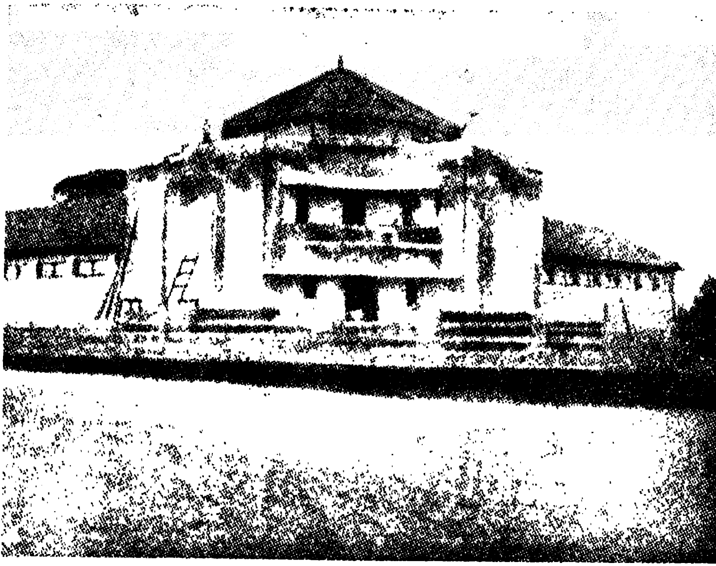


গ্রাম উদ্‌যোগ সঙ্ঘের সংগঠক ও কর্মসচিব
শ্রী জে সি কুমারাপ্পা

একা কারখানার একজন কর্মীই সে-কাজ করছে। অর্থাৎ গ্রামে বসে একজন কারখানাকর্মী পূর্বে যা রোজগার করত এক্ষণে গ্রামের দশজন সহকর্মীর স্থানে সে একা বসে তার অধিক রোজগার করছে। এইভাবে সুতা ও বস্ত্র বয়নের কারখানাগুলি গ্রামবাসিগণকে জীবিকা-নির্বাহের একটা সংগতিযুক্ত উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রত্যুত্তরে একথা বললে কোন অর্থ হবে না যে, কারখানাগুলি সস্তায় ভাল কাপড় দিচ্ছে—যদি সত্যসত্যই তারা তা দেয়ও; কেননা, তারা যখন হাজার হাজার গ্রামশিল্পীকে বৃত্তিচ্যুত করেছে, তখন তাদের তৈরী কাপড় সবচেয়ে সস্তা হলেও গ্রামের সবচেয়ে দামী খাদি কাপড়ের চাইতেও তা' দুর্মূল্য। কয়লাখনির মালিকের খনি অঞ্চলের গৃহে কয়লা মোটেই দুর্মূল্য নয়, তেমনি গ্রামে নিজের হাতে নিজের প্রয়োজনীয় খাদি যে প্রস্তুত করে তার কাছে খাদিও দুর্মূল্য নয়। কারখানায় প্রস্তুত কাপড় গ্রামবাসীকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে, আর চালের কল ও ময়দার কল শুধু হাজার হাজার দরিদ্র নারী-শ্রমিককে জীবিকাচ্যুতই করে না, ব্যবসা করতে গিয়ে স্থানীয় জন-স্বাস্থ্যকেও দূষিত করে। যেখানকার লোকের মাছমাংস খেতে আপত্তি নেই এবং খেতে তারা পারেও, কলে পেষাই ময়দা ও কলে ভানাই চাল তাদের কোন ক্ষতি না করতে পারে; কিন্তু ভারতে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের খাবার ইচ্ছে থাকলেও মাছমাংস পাবার উপায় নেই সেখানে ময়দা ও চালের পুষ্টিকর উপাদানটুকু থেকে তাদের বঞ্চিত করা অপরাধজনক।" কিছুটা দীর্ঘ হ'লেও—গান্ধীজীর এই উদ্ধৃতি-টুকু থেকে গ্রামীণ পদ্ধতির শিল্প ও কারখানা শিল্পের অর্থনৈতিক এবং পুষ্টিবিষয়ক গুণাগুণ বিচার করা সহজ হবে মনে করেই আমরা তার উল্লেখ করলাম। বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনধারণের বস্তুসামগ্রীর ব্যাপারে গ্রাম-ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা, শহর ও শহরের কল-কারখানার উৎপাদনের উপর কোটি কোটি মানুষের অসহায় নির্ভরতা দূর করা, স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীর জীবনকে বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিসম্পন্ন করা—মূলত এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই গান্ধীজীর পরি-কল্পিত গ্রাম উদ্‌যোগ সঙ্ঘ ও চরখা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্থানাভাবহেতু আমরা এক্ষণে শুধু গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং কর্ম-ধারার আর একটু বিশদ বিবরণ দেব—চরখা সঙ্ঘের কথা পরে বলবার ইচ্ছে রইল।

গ্রাম উদ্‌যোগ সঙ্ঘ

১৯৩৪ সালে ২৭শে অক্টোবর বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অষ্ট-চত্বারিংশৎ অধিবেশনে গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘ গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির খসড়া করেন গান্ধীজী নিজেই—এবং উহার মর্ম ছিল এইরূপঃ যেহেতু দেশের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসসেবিগণের সহযোগিতায় বা সহযোগিতা ব্যতিরেকে বহু 'স্বদেশী-সংগঠন' গড়ে উঠেছে এবং জনসাধারণও তার ফলে স্বদেশীর প্রকৃত অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না; এবং যেহেতু কংগ্রেস বরাবরই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ রক্ষা করে এসেছে এবং কংগ্রেসের গঠন-কর্মসূচীতে [illegible] পুনরুদ্ধার ও সংগঠন কর্মিটি গৃহীত হয়েছে, সেইহেতু বলিষ্ঠ ও ব্যাপকভাবে এই কর্ম সম্পাদনের জন্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক নীতি-নিরপেক্ষভাবে একটি পৃথক সংগঠন স্থাপন করা প্রয়োজন। অতএব, গান্ধীজীর পরামর্শ ও পরিচালনাধীনে 'অখিল ভারত গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘ' গঠনের জন্য



'মগন সংগ্রহালয়'—গ্রামশিল্প প্রদর্শনী ভবন

শ্রী জে সি কুমারাপ্পার উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে :

মহাত্মাজী আজীবন এই সঙ্ঘের সভাপতির গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন,—আর আজ অবধি একে অনন্যসাধারণ কর্মপ্রতিভা দিয়ে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও আদর্শসিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবেদ্, গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ কর্মশিষ্য শ্রী জে সি কুমারাপ্পা। শ্রীকৃষ্ণদাস জাজু, ডাঃ খানসাহেব, শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেহ্‌তা, শ্রীধীরেন মজুমদার (বর্তমানে চরখা সঙ্ঘের সভাপতি) প্রমুখ চিন্তানায়ক ও সেবাব্রতী কর্মবীরগণ কেউ বা অছি-কমিটির, কেউ বা পরিচালক-সঙ্ঘের সদস্যরূপে সঙ্ঘের ক্রমোন্নতি সাধন করেছেন।

ভারত-তীর্থ মগনবাড়ি

পূর্ণ স্বরাজ লাভের সাধনায় মগনবাড়ি আজ জাতির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ওয়ার্ধা স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ—গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় মগনবাড়ি। সেবাব্রতী ও চরখা আন্দোলনে গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী স্বর্গীয় মগনলাল গান্ধীর নামানুসারে এই আদর্শ ভারতীয় গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে—এই বিরাট জায়গাটি দান করে গেছেন মহানুভব দেশদরদী যমুনালাল বাজাজ।

সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় মগনবাড়িতে কিন্তু অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ও ভ্রাম্যমান বিশেষজ্ঞ কর্মীদের মারফত সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গেই রয়েছে সঙ্ঘের যোগাযোগ। কী করে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পদ্ধতিতে ও উপকরণে, স্বল্প মূলধন ও সরল ব্যবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের উৎপাদন হতে পারে, হাতে-কলমে তারই দৃষ্টান্ত হচ্ছে মগনবাড়ির কর্মকেন্দ্র। হস্তনির্মিত কাগজ, ঘানিতে পেষাই তেল, ভানাইকরা চাল, মৌমাছি পালন, সাবান তৈরী প্রণালী, তাল গুড় তৈরী প্রভৃতি ছোটবড় প্রায় সকল শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্প ব্যবস্থা নিয়েই সঙ্ঘের কর্মসূচী। এই শিল্পগুলিতে অভিজ্ঞ কর্মিগণ অন্যান্য রাজ্য-কেন্দ্রগুলিতে গমনাগমন করে তাদের কার্যে সহায়তা করেন,—রাজ্যসমূদয় থেকে শিক্ষার্থীরা এসে মগনবাড়িতে বিশেষজ্ঞদের অধীনে হাতে-কলমে কুটিরশিল্প ও গ্রামশিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সঙ্ঘের ব্যয়ের বৃহত্তর অংশই হচ্ছে কর্মীদের পারিশ্রমিক,—অর্থাৎ কলকারখানার মুনাফাবৃত্তির ফলে যা ঘটে থাকে তার ঠিক উল্টো। বৃহৎ শিল্পকারখানায় মজুরী হিসাবে ব্যয়িত হয় সবচেয়ে কম টাকা, বেশী টাকাই জমা হয় পুঁজিপতির তহবিলে কিম্বা ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণে। যে অসমবণ্টনের সুযোগ নিয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী কারখানার প্রসার বাড়ছে, গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘ তথা যাবতীয় গ্রামশিল্পের কর্মনীতি ও পরিচালননীতির আদর্শ হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত—অর্থাৎ অসমের স্থলে সুসম বণ্টন, ধনসম্পদ পুঁজিবদ্ধ হতে না দেওয়া।

কেন্দ্রীভূত শিল্প-কারখানার মধ্যে ক্রমে দেশের বৃহত্তর অংশ ধনসম্পদ এসে জমা হচ্ছে—যার ফলে অর্থনীতির ভারকেন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়েছে। আর্থিক ব্যবস্থায় সম-বণ্টনের অভাবহেতু আজ একদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য, অপরদিকে ধনৈশ্বর্যের উচ্ছল লীলাবিলাস। একমাত্র বিকেন্দ্রিক পন্থায় শিল্পের পুনর্গঠন ও প্রসারণ ছাড়া যে এই বিপজ্জনক ও অশেষ ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, মগনবাড়ি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। প্রসঙ্গক্রমে মগন সংগ্রহালয়ের কথাও বলা দরকার। এটি হচ্ছে সংগ্রহশালা, সুতা, চরখা, তকলির রকমারি সমাবেশ তো আছেই, তদুপরি রয়েছে বিভিন্ন গ্রামশিল্পের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের প্রদর্শন ব্যবস্থা। এই স্থায়ী প্রদর্শনী বা সংগ্রহালয়ের আকর্ষণ ও সার্থকতা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। গোড়ায় গ্রাম-উদ্‌যোগ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খাদি ও গ্রামশিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে।

গ্রামশিল্প প্রদর্শনী

১৯৩৬ সালের ২৮শে মার্চ সর্বপ্রথম লক্ষ্ণৌতে এইরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং চরখা সঙ্ঘ ও গ্রাম-উদ্‌যোগ সঙ্ঘের সম্পাদকদ্বয় শ্রীশঙ্করলাল ও শ্রীকুমারাপ্পার সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। গান্ধীজী স্বয়ং এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে আবেগময়ী ভাষায় দর্শকগণকে গ্রামশিল্পানুরাগী হওয়ার অনুরোধ জানান। দর্শকগণকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, "প্রত্যহ আপনাদের এই প্রদর্শনী দেখা উচিত এবং যত্নসহকারে প্রত্যেকটি বিভাগের কাজ লক্ষ্য করা উচিত। তবেই আপনারা বুঝে অবাক্ হবেন; এই প্রদর্শনীর আয়োজনে কী পরিমাণ উদাম ও শ্রম নিয়োজিত করতে হয়েছে। সেবার ভাব নিয়ে যদি আপনারা দেখেন, তাহলে এতে আকৃষ্ট না হয়ে আপনারা পারবেন না। কাশ্মীর হতে কুমারিকা, সিন্ধু হতে আসাম পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা কুটিরশিল্পিগণের পরিচয় আপনারা এখানে পাবেন এবং জানতে পারবেন, কী করে এই শিল্পিগণ তাদের সামান্য রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকেন। আপনারা বুঝবেন, এদের রুজি-রোজগার অন্তত খানিকটা বাড়িয়ে দেবার সামর্থ্য আপনাদের আছে—এদের পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য দিয়ে এদের দুবেলা অন্নসংস্থানের সামর্থ্যও আপনাদেরই হাতে আছে।" এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, গান্ধীজীর আমন্ত্রণে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় সহশিল্পীদের নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে যান এবং এই প্রদর্শনীর যাবতীয় চিত্র অংকন করেন। প্রদর্শনীর আর্ট গ্যালারীটিও গড়ে ওঠে শিল্পাচার্যেরই অকুণ্ঠ যত্ন ও শ্রমের ফলে। গান্ধীজী নন্দবাবুর এই শিল্প-সৌকর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং দর্শকগণের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করেন। ঐ বৎসরেরই ২৫শে ডিসেম্বর ফৈজপুরে পুনরায় অনুরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এবং এই প্রদর্শনীর

অঙ্গসজ্জার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন শিল্পাচার্য বসু মহাশয়—মহাত্মাজীর অনুরোধে। সহকর্মিগণ সহ দীর্ঘদিন ফৈজপুরে অবস্থান করে নন্দবাবু প্রদর্শনীটিকে শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত করেন এবং এবারও দর্শকসমাগমের মধ্যে অকুণ্ঠ ভাষায় তার কৃতজ্ঞতাসূচক স্বীকৃতি ও প্রশংসা করেন গান্ধীজী। তিনি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেন,—সেটি হচ্ছে—

Nanda Babu has depended entirely on local material and local labour to bring all the structures here into being—

গ্রামশিল্প ও কুটিরশিল্পের প্রদর্শনীতে স্বভাবতঃই শিল্পাচার্য নন্দলালও গ্রামীণ আদর্শেই চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। এই অ-পরনির্ভরতা প্রচেষ্টা যে গ্রামশিল্পেরও লক্ষ্য, গান্ধীজীর উক্তিতে তারই ইঙ্গিত নিহিত ছিল। গ্রামশিল্পীর দুঃস্থ জীবন যে জাতির পক্ষে কলঙ্ক ও জাতীয় প্রতিভার নিদারুণ অপচয়, এই মর্মবেদনা গান্ধীজী অনুক্ষণ অনুভব করতেন। আলোচ্য বৎসরের ১২ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর মর্মস্পর্শী ও ব্যাকুল আবেদন বহুজনকেই বিচলিত করেছে। গান্ধীজী সমাগত দর্শকদের বললেন, "এই প্রদর্শনীটিকে একটি পুণ্য ও পবিত্র ভূমিতে পরিণত করতে, আপনাদের চক্ষু ও কর্ণের বিনোদন-উৎসবের ব্যবস্থা করতে—যে উৎসবের আধ্যাত্মিকতা অনুভূতিকে শুচিতায় ভরে তোলে তারি ব্যবস্থা করতে আমরা চেষ্টা করেছি। কেন করেছি তাই আমি আপনাদের বলছি। আপনারা কী উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যার নরকঙ্কালগুলির কথা জানেন? অন্নাভাব ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট নরকঙ্কালের দেশ এই উড়িষ্যা থেকে লোক এসেছে যারা হাড়, শৃঙ্গ ও রৌপ্যাধারে বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। আপনারা গিয়ে দেখুন, এইসব জিনিস যেগুলোর কাজ শেষ হয়েছে বা কাজ হয়ে চলেছে; আপনারা দেখুন, কঙ্কালসার দেহ নিয়েও মানুষের আত্মিক শক্তি শৃঙ্গ ও ধাতুদ্রব্যের ন্যায় জড় পদার্থকেও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে! কাদামাটি দিয়ে এক দরিদ্র কুমোর কী অপূর্ব মৃৎশিল্প সৃষ্টি করেছেন! যে সব জিনিসের দাম আমি ভেবেছিলাম কয়েক আনা, তার মাত্র এক পয়সা কি দু' পয়সা হচ্ছে দাম—তবু তারাও অতি সূক্ষ্ম শিল্প-নিপুণতারই নিদর্শন।"

গান্ধীজীর ভাষণের শেষ কথা ক'টি ছিল এইঃ "আমরা পতাকা উত্তোলন উৎসবে সমবেত হই,—জাতীয় পতাকা নিয়ে গর্ব করি। আমি আপনাদের বলছি, যদি আমরা ভারতের তৈরী জিনিস পছন্দ না করি এবং বিদেশী জিনিসের প্রতি লুব্ধ হই, তাহলে আমাদের এই গর্ববোধ একেবারেই অর্থহীন। আমাদের স্বদেশের পুরুষ ও নারী কুটিরশিল্পিগণের নিপুণ শিল্পদ্রব্য দেখে যাঁদের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না এবং এই শিল্পীদের জন্যে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে যাঁরা প্রেরণা বোধ করেন না তাঁদের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতার কথা বলা শুধু অর্থহীন ভাববিলাস।" আজ যাঁরা গান্ধীজী পরিকল্পিত শ্রেণীহীন, শোষণহীন অহিংস সমাজে রূপায়িত করবার সংকল্প পোষণ করেন, গান্ধীজীর এই ক'টি কথা তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে প্রেরণা দান করুক।

ভারতের লুপ্তপ্রায় কুটীরশিল্প

শ্রীকানাইলাল বসু

প্রদীপ প্রায় নিভে এসেছে। আলো তার এখনও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হয়তো একটু পরেই নিভে যাবে। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, যার জোরে জ্বলবে প্রদীপ—সেই তেল এসেছে ফুরিয়ে। তেল দাও আবার প্রদীপ জ্বলবে, আবার সে ছড়াবে স্নিগ্ধ জ্যোতি, না দাও ক্ষীয়মান প্রদীপ শিখা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে চির অন্ধকারে অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে। প্রদীপ শিখা তাই আজ লুপ্তপ্রায়। ভারতের মহান ঐতিহ্যগুলির মধ্যে কুটির-শিল্প একটি। কিন্তু তাও আজ নিভন্ত প্রদীপ শিখার মতই লুপ্তপ্রায়। অতীতের শ্রীমণ্ডিত, সৌন্দর্যে, শিল্পনৈপুণ্যে অতুলনীয় ভারতের বিভিন্ন কুটীর-শিল্প আগে কি অবস্থায় ছিল আর এখনই বা কি অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে—বর্তমান প্রবন্ধ তারই পরিচয় দেবে।

বছর পাঁচিশেক যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার অধুনা অসহায় ও লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি ও সংস্কারের দিকে মন দিয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯২১ সালে যখন ভারতময় জেগে উঠলো রাজনৈতিক চেতনা, জেগে উঠলো বিদেশীর কবল থেকে সব রকমে মুক্তি পাবার দুর্নিবার বাসনা—তখন থেকেই শুরু হলো ভারতের আধমরা কুটীর-শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা। আমাদের তখনকার জাতীয় সংগঠন ভারতীয় কংগ্রেসের নীতি ছিল একতরফা—সে নীতি রাজনীতি ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই ভুল সংশোধনে এগিয়ে এলেন। কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির পাশে গঠনমূলক নীতি থাকার যে প্রয়োজন আছে, গান্ধীজীর কাছে কবিগুরুর অনুরোধ সেই বার্তাই পৌঁছে দিল। সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে কবিসম্রাট স্বয়ং নিজের ধারণা কাজে ক'রে দেখলেন—"শ্রীনিকেতন" পেল প্রাণ। ১৯৩৪ সালে মহাত্মাজী কংগ্রেসের কার্যসূচীর মধ্যে গঠন-মূলক কাজের (কুটীরশিল্প) অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিলেন। "অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ্ ইন্ডাসট্রীজ এসোশিয়েসন" সেই নির্দেশেরই সাক্ষাৎ ফল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিগণের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই সর্বপ্রথম তাঁর সভাপতির ভাষণের মধ্যে কুটীর-শিল্পের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আনার মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পোন্নতিও প্রয়োজন—সেখানে বড় বড় শিল্পের যেমন গুরুত্ব বা স্থান আছে, কুটীর-শিল্পেরও তাই। নেতাজীর চেষ্টাতেই 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির' সৃষ্টি হয় ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে।

এখন বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক যুগ চলেছে। কিন্তু কুটীরশিল্প যে এযুগের তালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে চীন জাপানই তার সাক্ষ্য। কিছু অদল বদল করে নিয়ে, মানে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কুটীরশিল্পজাত মাল, বড় বড় কল কারখানায় উৎপাদিত মালের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্রেতাদের কাছে পাল্লা দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—ষষ্ঠ জর্জের যখন রাজ্যাভিষেক হয় তখন খাস বিলেতেও জাপানের কুটীরশিল্পজাত "ইউনিয়ন জ্যাক" (বিলেতের জাতীয় পতাকা) আমদানী করতে হয়েছিল—এত উন্নতি করেছে জাপানের কুটীরশিল্প। জাপান যদি এতটা করতে পেরে থাকে আমরাই বা পারবো না কেন?

এখন আলোচনা করে দেখা যাক যে আমাদের দেশের কুটীরশিল্পের অবনতি কেন হয়েছে? এর প্রধান কারণ পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতি আর উন্নতি। এতকাল বিদেশী অধীনে ছিলাম আমরা—স্বাধীনতা কোন বিষয়েই ছিল না—চলতে হয়েছে পরের মর্জিমাফিক। পরের আওতায় দেশীয় বৈশিষ্ট্য বা নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রাখা কি সম্ভব? ভারতের ঐতিহ্য যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে চলে আসছে। ভারতীয় শিল্পীর হাতে তৈরী কাপড়, বাসনপত্র, ছবি, মন্দির, ভাস্কর্য প্রভৃতিই তার সাক্ষ্য। কত রকম জিনিসই যে এদেশে কুটীর-শিল্প মারফৎ তৈরী হতো তার ইয়ত্তা নেই। বলতে গেলে যতরকম কাঁচা মাল ব্যবহার করা হতো ততরকম জিনিস তৈরী হতো।

ভারতের কুটীরশিল্পজাত জিনিষগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—দৈনিক ব্যবহারে লাগে এমন জিনিস (মাটির বা ধাতুর থালা, বাটি, হাঁড়ি, খুন্তি ইত্যাদি) আর সৌখীন জিনিস, যেমন কাপড় (সুতো, রেশম বা পশম), ধাতুর জিনিস, পাথর, কাঠ, মাটি (ceramics), কাঁচ ইত্যাদি।

তাঁতশিল্প

ভারতের বিভিন্ন কুটীরশিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্পই প্রধান। স্মরণাতীত কাল থেকেই এর অস্তিত্ব চলে আসছে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ৫০০০ হাজার বছরেরও আগে থেকে আমাদের দেশে তাঁতশিল্প বর্তমান। অতীতে মিশরের মামিগুলো ভারতীয় কুটীরশিল্পজাত কাপড়ে মোড়া হ'তো। হেরোডোটাস্ (Herodotus) আরিয়ান্ (Arrian), মেগাস্থানিস্ (Megasthenes), স্ট্রাবো (strabo), প্লিনী (pliny) প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রীকগণের বিবরণে ভারতজাত কাপড়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ১৩শ শতাব্দীতে ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কোপোলো ভারত ভ্রমণে আসেন; তাঁর বিবরণেও ভারতের কাপড়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন কালে বাংলা দেশের ঢাকা, মসলিপট্টম, করমণ্ডল, গুজরাট, সিন্ধু উপত্যকা তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকার "মসলিন"কে গ্রীক ভাষায় "গ্যাঙ্গেটিকা" (gangetica) বলতো। 'মসলিন' কাপড় এত পাতলা ছিল যে তার তুলনা হয় না—তার বর্ণনা দিতে ভাষায়ও বোধ হয় অক্ষম। একবার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা একটি মসলিন কাপড় সাতপাক গায়ে জড়িয়ে পিতার সামনে আসায়, ঔরঙ্গজেব মেয়ের শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মেয়েকে তিরস্কার করেছিল—এমনি ফিন্‌ফিনে পাতলা ছিল ভারতের মসলিন। মসলিন ছিল তিন রকমের, যেমন "আবরোয়া" (জলের মত), "বাফৎওয়া" (বাতাসের মত) আর "সাব্বনাম্" (শিশিরের মত)। এই নামগুলো থেকেই মসলিন যে কত পাতলা তার পরিচয় পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের নর্দার্ন সারকাস এবং মসলিপট্টম ও ভিজাগাপট্টমের মসলিনও ছিল প্রায় ঢাকার তৈরী মসলিনের মতই। নেলোর, পুলিকাট ও আর্কট প্রভৃতি যায়গাও পাতলা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

পশম শিল্প

ভারতের বহু পুরাতন কুটীরশিল্পগুলোর মধ্যে পশম একটি। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার যুগেও এর নিদর্শন মেলে। কাশ্মীরের তৈরী গরম শাল পৃথিবী বিখ্যাত। রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প একদিন শিল্প-নৈপুণ্যে ও উন্নতিতে চরম-শিখরে উঠেছিল।

মোগল সম্রাটগণ বিশেষতঃ আকবরের সময় ভারতের পশমশিল্প বিশেষ সহায়তা পায়। লাহোর, অমৃতসর, রামপুর প্রভৃতি ছিল শিল্পকেন্দ্র। এখানে আরও একটি জিনিসের নাম করা যেতে পারে—সেটাকে বলতো 'চাদর' —বরদা রাজ্যের নাম এই চাদরের জন্য বিখ্যাত ছিল।

শালেরই মত প্রাচীন ভারতের কার্পেট-শিল্প। কাশ্মীর ও মুলতান এই শিল্পে অগ্রণী ছিল। মুসলমান শিল্পীগণই এই শিল্পে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পারসী চিত্র-কলার অনুকরণ প্রবর্তন করেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের আগমনের ফলে কার্পেটশিল্প সেখানে বিস্তার লাভ করে, আর মসলিপট্টম, ইলোর, ওয়ারাঙ্গল প্রভৃতি হয়ে উঠে শিল্পকেন্দ্র। ফোঁড় সেলাইয়ের জন্য ওয়ারাঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধ। এমনও দেখা গেছে যে এক বর্গফুট কার্পেটের মধ্যে প্রায় ১২০০০ সেলাইয়ের ফোঁড় আছে। কত সূক্ষ্ম শিল্প জ্ঞান ও পাকা হাত হলে তবে এটা সম্ভব হয়,—সেটাও ভাববার বিষয়।

রেশম শিল্প

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার আগে থেকেই এদেশে রেশম শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। হিউয়েনসাঙের বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষ প্রয়াগে বুদ্ধদেবের কাছে মণিমুক্তাখচিত বহু রেশমের জিনিস উৎসর্গ করেন। দিল্লীর সুলতানদের আমলে রেশম-শিল্প বিশেষ উন্নতি করে। শুধু তাই নয় হিন্দু রাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যের বিজয়-নগরে রেশমশিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। এককথায় বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন কালে ভারতীয় রেশমের চাহিদা ছিল পৃথিবীব্যাপী। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ), বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি জায়গার রেশমশিল্প ছিল বিখ্যাত।

কাপড়ের রঙ্ ও ছাপাশিল্প

কাপড় রং করা ও ছাপান পৃথিবীর মধ্যে এদেশেই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। মিশরের মামিগুলি অনেক সময় এদেশের রঙীন কাপড়েই জড়ানো হতো। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত থেকে ফিরবার পথে এদেশের রঙীন কাপড়ের কিছু নমুনা সঙ্গে নিয়ে যান। মসলিপট্টম নেলোর, সুতী; কাশ্মীর এবং যুক্তপ্রদেশ পশম; মহীশূরে ও বাংলার রেশমের কাপড় রং করায় ও ছাপানোয় প্রসিদ্ধ ছিল। দু'রকমভাবে ভারতে কাপড় ছাপানো হ'তো—যেমন কাঠের ব্লকের সাহায্যে ও হাতে এঁকে। সময় সময় একটি ছাপার কাজে ৩০ থেকে ৬০ রকম ব্লক ব্যবহার করা হ'তো। কাপড়ে হাতে এঁকে নক্সা তোলার কাজকে "কলমকারী" বলা হতো। একদিন এই "কলমকারীর" কাজে মসলিপট্টম বিখ্যাত ছিল। মার্কোপোলোর বিবরণে উল্লেখ আছে যে, আলেকজাণ্ডার কাপড়ের ওপর হাতে আঁকার কিছু নমুনা নিয়ে গিয়েছিলেন। বৃটেনের রাজা প্রথম চার্লসও নিজের প্রাসাদের জন্য এদেশ থেকে "কলমকারী" করা কাপড় আমদানী করেছিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর যুগেও এই জিনিসের কদর আছে। কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে আজও "কলমকারী" করার কাজ হয়ে থাকে।

ধাতুশিল্প

বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা লোহার ব্যবহার জানতেন। সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে এদেশের কুটীরশিল্প-জাত "সাদা লোহা" (white iron) উপহার দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে "সাদা লোহার" একটি স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল। ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল যে এতে মরচে পড়ে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ঠিক সেই শ্রেণীর লোহা তৈরী সম্ভব হয় নি। এথেকেই আমাদের দেশের কুটীরশিল্প যে একদিন কতটা উন্নত ছিল তা বোঝা যায়। বলা বাহুল্য নানারকম অস্ত্রশস্ত্রও এদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই তৈরী হয়ে আসছে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, বাংলা হায়দ্রাবাদ প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে পেতল, তামা, প্রভৃতির ব্যবহার আছে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতাই তার সাক্ষ্য। নিত্য প্রয়োজনে লাগে এমন জিনিস ছাড়াও এই সকল ধাতু থেকে

বিভিন্ন রকম সৌখীন জিনিসও তৈরী হতো। হায়দ্রাবাদের তৈরী "বিদারী" মানে ধাতুর উপর ফুল লতাপাতার নক্সা তৈরী; জয়পুর ও পাঞ্জাবের তৈরী উজ্জ্বল পালিশ করা পেতলের জিনিস; কাশ্মীরের তৈরী ধাতুর ওপর খোদাই করা জিনিস; মাদুরা ও তাঞ্জোরের তৈরী ঢালাই জিনিস প্রভৃতি তাদের চারুকলার জন্য বিশেষ খ্যাত। সোনা ও রুপোর কাজ তো সারা ভারতে বহু কাল থেকেই চলে আসছে।

ধাতুর ওপর কলাই করার কৌশলও ভারতীয় শিল্পীর আয়ত্তে ছিল। দুরকমভাবে কলাই করা হতো। যেমন প্রথমতঃ ধাতুর ওপর সরু তার জড়িয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ধাতুর উপর খোদাই করে সেটার মধ্যে গলা রং ঢেলে দিয়ে নক্সা তোলা। এই রকম কাজের জন্য জয়পুর (সোনা); লক্ষ্ণৌ ও রামপুর (রুপো) এবং কাশ্মীরের (তামা) সুনাম ছিল।

পাথরের কাজ

পাথর কেটে ঘরবাড়ী তৈরী ও পাথর খোদাই-এর কাজ ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। সিন্ধু সভ্যতায় তার নির্দেশ মেলে। হিন্দু রাজাদের আমলে পাথরের স্থাপত্যশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। অশোক স্তূপ, পল্লভদের প্যাগোডা, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি তার নিদর্শন। ভাস্কর্য না হলেও অন্যান্য পাথর খোদাই শিল্প দিল্লীর সুলতানদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করেছিল। তখনকার আমলের পাথর কেটে 'জালি' বা জাফরির কাজ আজও পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। এই শিল্প উন্নতির চরমে উঠে মোগল আমলে। স্যার জর্জ ওয়াট তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, আকবরই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ রঙীন পাথর ব্যবহারের পরিবর্তে পাথর খোদাই করে সেই জায়গায় রঙীন পাথরের টুকরো বসাবার রীতি প্রচলন করেন। মির্জাপুর ও আগ্রার বালি পাথরের কাজ; জয়পুর ও যোধপুরের শ্বেত পাথরের কাজ; যোদপুর ও দিল্লীর ভেরার কাজ; এবং আগ্রা ও মহীশূরের রঙীন পাথরের কাজের একদিন বিশেষ সুনাম ছিল।

কাঠের কাজ

খোদাই শিল্পের ব্যাপারে কাঠ খোদাইকেই গোড়াপত্তন বলা যেতে পারে। ভারতজাত বিভিন্ন রকম কাঠ এদেশের কাঠ খোদাই শিল্পকে এত উন্নতি করতে সাহায্য করেছে। এত রকম কাঠ না পাওয়া গেলে বোধ হয় এই শিল্পের উন্নতি সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। বৈদিক যুগ থেকেই এদেশে কারুশিল্পের প্রচলন। হিন্দু রাজাদের আমলে জাহাজ তৈরী শিল্প বিশেষ উন্নত ছিল। দ্বিতীয় চৌলুক্য পুলকেশীর বহুশত জাহাজ ছিল বলে জানা যায়। আঠারশ' শতকে লর্ড ওয়েলেসলীর সময় বাংলা দেশের জাহাজ তৈরী শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রপোকূলে জাহাজ তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এদেশে কাঠ খোদাই শিল্পও বহু প্রাচীন। বরাবরই ভারতের হিন্দুরা কাঠ খোদাইয়ের বিশেষ অনুরাগী। পাঞ্জাবের বিভিন্ন নগর ও মাদুরার নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ভারতীয় শিল্পীর কাঠ খোদাই শিল্পে ব্যুৎপত্তি ও নৈপুণ্যের অবিস্মরণীয় নিদর্শন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ভারত বিশেষতঃ কোণ্ডাপল্লী এবিষয়ে বিশেষ খ্যাত। কাঠ ছাড়া খোদাই শিল্পের আরও একটি শাখা আছে, যেমন হাতির দাঁত খোদাই। মহীশূর, ভিজাগাপট্টম, ও ত্রিবাঙ্কুরের হাতির দাঁতের কাজ পৃথিবী বিখ্যাত।

মাটির কাজ

চারুকলা ও শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে ভারতের মৃৎশিল্প বা মাটির কাজের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এমনকি রং করা মাটির কাজ সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে এদেশে প্রচলিত। মাটির কাজের ওপর পালিশ ও গালার কাজও ভারতে ছিল। মাটির কাজে পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ, মাদুরা ও বাঙলার নাম ছিল।

কাঁচ শিল্প

জয়পুরের কলাই'এর কাজের কথা আগেই বলা হয়েছে—কলাই'এর কাজকে কাঁচ শিল্পেরই অঙ্গ বলা যেতে পারে। ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, বৈদিক যুগেও মেয়েরা কাঁচের গহনা পরতেন। খৃষ্টীয়ান যুগের প্রথম সময় থেকে এদেশে কাঁচের আয়না বা বাসন ব্যবহার করা হতো। মুসলমান সুলতানেরা কাঁচের ওপর নানারকম ছবি আঁকার প্রথা প্রবর্তন করেন। দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বিভিন্ন কুটীরশিল্পের অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের পেছনে বৈজ্ঞানিক কৌশল কোনদিনই বিশেষ ছিল না। শিল্পীরা যে যার ঘরে বসে কাজ করতো। কেউ কেউ দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, আমেদাবাদের সরকারী কারখানায়ও কাজ নিত। যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার করা হতো তা খুবই সাধারণ। ভারতীয় শিল্পীদের প্রধান সম্বল ছিল তাদের সূক্ষ্ম সুরুচি ও কাঁচা মাল সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে সাধারণভাবে মাল তৈরী হলেও শিল্পীরা ছিল সংঘবদ্ধ। ভিটেমাটির মত শিল্প-কৌশলও একটা পৈতৃক সম্পত্তির মত ছিল। পিতা যে কাজে ওস্তাদ কালক্রমে দেখা গেল পুত্রও সেই কাজে ঠিক পিতার মতই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। এক একটা পরিবার এক একরকম কাজ পুরুষানুক্রমে করে আসছে। হিন্দু, মুসলমান, মোগল বাদশারা এই সকল কুটীরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন, ফলে এরা রাজপরিবারের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহায়তা পেত। আবুল ফজলের বিবরণ পড়লে দেখা যাবে যে, আকবর দেশের কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী কারখানায় শিল্পীদের শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন।

কুটীরশিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য বিক্রীর বাজার থাকা দরকার আর প্রাচীনকালে তা যথেষ্টই ছিল। দৈনিক ব্যবহারে লাগে এমন-সব জিনিস কেনবার জন্য জনসাধারণ তো ছিলই, উপরন্তু সৌখীন জিনিস কেনবার জন্য সেই রকম ধনী লোক বা রাজারাজড়ার অভাব তখন এদেশে মোটেই ছিল না। যে যে কারণে ভারতের কুটীরশিল্প একদিন এত নাম করেছিল, তার মধ্যে (ক) শিল্পীর সৃজনী-প্রতিভা, (খ) শান্তিতে বসবাস করা এবং (গ) দেশব্যাপী সহযোগিতা পাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থানিসের বিবরণ পড়লে দেখা যাবে যে, মৌর্য রাজাদের আমলে যদি কেউ কোন শিল্পীর শারীরিক ক্ষতি করত তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ছিল। আফিফ-এর বিবরণে দেখা যায় যে, সুলতান তোগলাক্ দেশের পুলিশকে স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন শিল্পী বেকার থাকলে বা হয়ে পড়লে সরকারী কারখানায় তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ দেবে। ওপরের নিদর্শনগুলো থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীনকালে দেশে কুটীরশিল্পগুলি শাসকদের কাছ থেকে কি পরিমাণ সহযোগিতা ও সাহায্য পেত।

ভারতের এত উন্নত কুটীরশিল্প কেন আজ অবনতির পথে?—এ বিষয়টাও ভেবে দেখা দরকার। এক কথায় এর প্রধান কারণ ইংরেজ। তাদের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রুচি ও বণিক মনোবৃত্তিই আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। পরাধীন হয়ে, প্রভুর হিংসা ও বিদ্বেষের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের জায়গা বজায় রাখা সত্যিই অসম্ভব। বাঙলার তাঁতি-দের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলার ব্যাপার কে না জানে?—কারা করেছিল এই হীন কাজ? সে ঐ একদা প্রভু, ইংরেজই।

উপযুক্ত সাহায্য পেলে, উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে আবার ভারতের কুটীরশিল্প এই বিংশ শতাব্দীর যুগেও, সেই অতীত দিনের ফেলে আসা গৌরবের আসন দখল করতে নিশ্চয়ই পারবে।

ভারতের শোলা শিল্প

কালীচরণ ঘোষ

চলতি কথায় বলে "যত গর্জায়, তত বর্ষায় না।" আবার এমনও হয়, কেবল গর্জনই সার হইল, বর্ষণের সঙ্গে দেখা নাই। ভারতের কুটীরশিল্প প্রচেষ্টার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে মনে হয়, কেবল গর্জনই সার। যতদিন ধরিয়া কুটীরশিল্পের উন্নতির বিষয় লইয়া বড় বড় মাথা ঘামিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, তাহার মধ্যে অপরাপর দেশ কত বিরাট ব্যাপারের পরিকল্পনা করিয়াছে এবং তাহা কার্যে পরিণত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতেছে। আমাদের দেশে আড়ম্বরের অভাব নাই, কাজের কথা উঠিলেই মহাসমস্যা।

সারা দেশ, সকল পল্লীর মধ্যে ছোটখাটো শিল্প ছিল, তাহার উপার্জনে লোকে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছে। সেই সকল শিল্পের বিলোপই পল্লীর দিকে অর্থকষ্ট সৃষ্টি করিয়াছে বেকার লোকে ভরিয়া গিয়া গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নূতন শিল্পের পরিকল্পনা সৃষ্টি হইতে তাহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের কাজ, বৈজ্ঞানিকের, চিন্তাশীল লোকের কাজ। আমাদের দেশে তাহার কোনও প্রমাণ নাই উপরন্তু যাহা আছে তাহাকে উন্নত করিবার কথা দূরে থাকুক, যাহা ছিল তাহাকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব তাহাও এ পর্যন্ত স্থির হয় নাই। তাহার জন্য বক্তৃতা আছে, সহানুভূতি আছে, কমিটি আছে, আলাপ-আলোচনা ও অর্থব্যয়ের ব্যর্থতা আছে।

একটি একটি করিয়া বহু মুমূর্ষু শিল্পের নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু আজ একটি সামান্য শিল্পের বিষয় আলোচনা করিব। শোলা লইয়া যাঁহারা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল উপজীবিকার পথ ধরিয়া বসিয়া থাকেন নাই, শোলাকে তাঁহারা কারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। ইহার সমসাময়িক বহু শিল্পের ন্যায় এখনও শোলা আপনার গুণে এবং উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়িয়া দর্শককে মোহিত করিয়া থাকে, ক্রেতা শিল্পীর কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রার্থিত মূল্য দিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

শোলা জলার উদ্ভিদ, জলের নয়। পানা, পানিফল, পানকলস, ঝাঁঝি শ্যাওলা জলে জন্মে, হয় জলে ভাসিয়া বাঁচে আর না হয় জলের নীচে মাটি অবলম্বন করিয়া জলের ভিতরেই বাঁচিয়া থাকে। শোলা স্যাঁৎসেঁতে ভিজে এমনকি জলের ভিতর মাটীতে শিকড় বা মূলে স্থাপন করিলেও জলের উপর গাছ হিসাবে বৃদ্ধি পায়। জলে বা ভিজা মাটিতে ইহার শিকড় পচিয়া যায় না; শুষ্ক উচ্চভূমিতে শোলা গাছ জন্মে না। সুতরাং এই শিল্পের কাঁচামাল বিনা যত্নে জলাভূমিতে স্বতঃই জন্মে, এক সময় দানা পড়িয়া থাকিলে পরের বর্ষায় অসংখ্য চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জমি কোনও কাজেই লাগে না, শোলার জন্ম এমন একটি স্থানে।

গাছগুলি নিতান্ত ছোট নয়। কোনও কোনও গাছের কাণ্ড তিন চার ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সবল শোলা গাছ ঊর্ধ্বে ১৫।২০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। দেখিতে অনেকটা বাবলা গাছের ন্যায়; ছোট হরিদ্রা বর্ণের ফুল ফুটে। ফুলটি ঝরিয়া গেলে যে ক্ষুদ্র ফল হয়, তাহা অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র বীজের আধার। কোন জমি হিসাবে নয়, যত্ন হিসাবে নয়, ইচ্ছা করিলে এক গাছ হইতে অসংখ্য যে চারা পাওয়া যাইতে পারে তাহাও শোলা শিল্পের প্রকাণ্ড সুযোগ।

সুযোগ হইলেই যে সকল সময় তাহার সদ্ব্যবহার হয় তাহা নহে। শোলা শিল্প প্রাণে আজও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু কুটীরশিল্প হিসাবে একেবারে নিস্তেজ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে শিল্প গড়িয়া উঠে, সাধারণতঃ সেখানে কাঁচামালেরও ব্যবস্থা হয়। সকল ক্ষেত্রেই যে হয়, তাহা নহে, অপর স্থান হইতে শিল্পীর জন্য কাঁচামাল আনিয়া হাজির করিতে হয়। বাঙলার কুটীরশিল্প হিসাবে শোলা সে অভাব দূর করিয়াছে।

দুই শ্রেণীর শোলা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা নানারূপ শিল্পের উপযোগী, নরম, ধবধবে সাদা তাহা ফুল শোলা বা ভাত শোলা নামে পরিচিত। অপর শ্রেণী তুলনায় হীন, কাণ্ড ও শাখা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং অন্তরভাগ ঈষৎ লাল। ইহা কাঠশোলা নামে পরিচিত।

শোলা গাছ শুকাইয়া গেলে কাণ্ডের উপরের সবুজ ছাল পিঙ্গল হইয়া যায়। এই আবরণ দূর করিলে সাদা শোলা পাওয়া যায়। সামান্য তীক্ষ্ণধার যন্ত্রপাতি এই শিল্পের হাতিয়ার। বাকী হইল শিল্পীর জ্ঞান। এমন দিন ছিল যখন শোলার ফুল, শোলার মালা বড় বড় আসরের সৌন্দর্য বর্ধন করিত। আজকাল আর তত দেখা যায় না। মেলাপার্বণে শোলার পণ্য চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইত। শিশুকালের খেলনার মধ্যে শোলার ঝারা, শোলার ঝালর প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। শিশুর বিছানা হইতে একটু উপরে রঞ্জিত শোলার ঝালর টাঙ্গাইয়া সংসারের কাজে মাতা ব্যস্ত থাকিতেন। হাল্কা জিনিস, অল্প বাতাসে নড়িয়া শিশুর মনে সজীবত্বের একটা ভ্রম জন্মাইত; হাত-পা নাড়িয়া শিশু আপন মনে লেজঝোলা পাখী, ফুলের ঝালর দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইত।

এইখানেই শেষ নয়। "হাঁটি হাঁটি পা-পা" অবস্থা কাটিয়াছে, হয়ত একটু যত্ন লইয়া খেলনা রাখিতে পারে, তাহার জন্য পাখী, পশু, রথ প্রভৃতি তৈয়ারী হইত। শোলার তৈয়ারী কাকাতুয়া দেখিয়া বয়স্করা সজীব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাসের উৎসবের সঙ্গে শোলার ফুলের সজ্জা একান্ত নিবিড়ভাবে জড়াইয়াছিল।

প্রতিমা বিশেষত দুর্গা প্রতিমায় শোলার ঝারা বা চাঁদমালা কি অপরূপ শোভাই বিস্তার করে। চাঁদমালায় কত নিপুণ কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়। দরিদ্র ঘরের প্রতিমায় মৃত্তিকার আভরণ যেমন স্থান লাভ করিয়াছে, শোলাও কতক পরিমাণে এই অভাব দূর করিয়াছে। শোলার পদ্ম ও অপরাপর ফুল আপন স্থান অধিকার করিয়া শোভা বিস্তার করে। সেকালের জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শোলার শিল্পী, মালাকারদিগকে বাঁচাইবার জন্য শোলাকে পূজা ও বিবাহের উপকরণের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। হিন্দুর বিবাহে শোলার টোপর অপরিহার্য। বধূর মুখের আবরণ হিসাবে ঝালর হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। মুসলমানদিগের মধ্যে বরের মুখ ঢাকিয়া সেইরূপ আবরণের বিধি আছে। মহরম প্রভৃতি মুসলমান পার্বণে, তাজিয়া গঠনে, শোভাযাত্রায় শোলার ফুলের কি অসম্ভব প্রাচুর্য।

এ সকল ব্যবহার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, শিল্পী মরিতেছে। আর কিছু দিয়া অভাব পূরণ হয় না বলিয়া "সাহেবী" টুপি নির্মাণে শোলা আপন স্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্তমানে শোলার ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ব্যবহার আর নাই। ভারতের 'শোলা হ্যাট' দেশবিদেশের আদরের বস্তু। নিতান্ত কুটীরশিল্প হিসাবে চলে না, কিন্তু ইহাতে মূলধনও বেশী প্রয়োজন হয় না। বিশেষত উপরে বস্ত্রের আবরণ দিবার পূর্বে পর্যন্ত যে শোলার কাঠামো

তৈয়ারী হয়, তাহা সর্বত্রই বসিয়া তৈয়ারী করা চলে। কাঠ বা লোহার ছাঁচ অর্থাৎ বিভিন্ন মাপের নরমুণ্ডের আকৃতি ঘিরিয়া কমবেশী এক-অষ্টাংশ ইঞ্চি স্থূল শোলার পাত সরু কাঠি, গালা প্রভৃতির সাহায্যে জমাইয়া দেওয়া হয়। এই "ফ্রেমের" উপর স্তরে স্তরে শোলার "পাত" বা চাদর সাজাইতে হয়। ভেজাল সর্বত্র; এখানেও ভেজাল চলে [illegible] য়ের কিছুই নাই; শোলার পরিবর্তে সাদ [illegible] জ দিবার ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য ব [illegible] শোলা অপেক্ষা ভারি এবং জলে ক্ষতিগ্রস্ত [illegible] সুতরাং সে সকল টুপি যে ভেজালহীন [illegible] া অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। শোলার টুপির এখনও বহু রপ্তানি আছে, তাই বাঙলার উপেক্ষিত শোলা দেশবিদেশ গিয়া বড় বড় "সাহেব সুবো"র মাথায় চড়িয়া সগর্বে ভ্রমণ করে। সাহেবী "হ্যাট" ছাড়া অপরাপর শ্রেণীর টুপির আকৃতি, ধাঁচ বা 'সেপ' (Shape) ঠিক রাখিবার জন্য বস্ত্রের মধ্যে শোলার পাত দেওয়া হয়। বড় বড় স্থায়ী পাগড়ি এবং পরচুলার ছাঁচে অনেক সময় শোলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোলার ফুল, পুতুল হইতে টুপি প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে শোলা কাটিয়া, চাঁচিয়া পাত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু শোলার ভেলা তাড়া-বাঁধা শোলার কাণ্ড বা শাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে যে ভেলা বা Life belt থাকে, তাহাতে কর্ক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শোলা সে কার্যেও বিশেষ উপযোগী। শোলার ছাঁট লইয়া তাহা হইতে বহুবিধ খেলনা প্রস্তুত হয়। এই ছাঁট শোলার পশু পক্ষীর রূপ দিয়া চট, ক্যাম্বিস এবং পশুলোম বা পক্ষীর পালকের সাহায্যে অতি সুদৃশ্য, দৃঢ় খেলনা নির্মিত হইয়া থাকে।

শোলার পাত হইতে গৃহ, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতির অনুকরণে অতি সুন্দর এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উত্তর ভারতের কোথায়ও বিশেষ দেখা যায় না। দক্ষিণে তাঞ্জোর ইহার প্রধান কেন্দ্র। পৃথিবীর প্রায় নানা সৌখীন সভ্য সমাজে তাঞ্জোরে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অপরাপর মূল্যবান আসবাবের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি সস্তার যন্ত্রাদির সাহায্যে শোলা শিল্প পরিচালিত হয়। শোলার পাত করিবার সময় শোলাকে চাপ দিয়া ত্রিভুজের আকারে পরিণত করিয়া তাহা হইতে পাতলা পাত চাঁচিয়া তোলা হয়। টুপির জন্য যে পাত হয়, তাহা উদ্ধার করিবার অন্য প্রণালী আছে। একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি একস্থানে বাঁধিয়া গোল শোলা তাহার ফলায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাত তোলা হয়। যাঁহারা দিয়াশলাই তৈয়ারী বা প্লাইউডের জন্য তক্তার পাত উদ্ধার করা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার ধারণা করা সহজ। বিরাট গোলাকৃতি গাছের গুঁড়ি যন্ত্রসাহায্যে অতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার উপর ঘুরিতে থাকে, তাহার গা চাঁচিয়া কাঠের "পাত" বা চাদর উঠিয়া আসে। তাহা হইতে দিয়াশলাইয়ের খোল বা বাক্স, কাঠি প্রভৃতি নির্মিত হয়। শোলার পাত উদ্ধার হয় হাতের সাহায্যে। নিপুণ কারিগরের হাতে শোলার পাত না ভাঙিয়া বা ছিঁড়িয়া একটি দীর্ঘ কাগজের পাতের মত উদ্ধার করা যায়। যতক্ষণ না হাতের শোলা শেষ হইতেছে, শিল্পী ততক্ষণ শোলার "কাঠ" ঘুরাইয়া ছুরির ফলায় চাঁচিয়া পাত করিতে পারেন। প্রয়োজনের অনুপাতে শোলার কাণ্ডের প্রস্থ স্থির করিয়া লওয়া হয়। সাধারণত টুপির কাজে এই পাতের বিশেষ ব্যবহার আছে এবং তাহার জন্য চার হইতে ছয় ইঞ্চি প্রস্থের চাদর বা পাত উদ্ধার করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা অতি কোমলস্পর্শ কাগজের মত দেখায়। ইহা এত পাতলা করিয়া উদ্ধার করিবার কৃতিত্ব বহু শিল্পীর আছে যে সেই শোলার পাত চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। এই পাত প্রতিমার বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

শোলার অশেষ গুণ; রঙ দিলে ইহার গায়ে রঙ ধরে, সুতরাং নানা রঙের ফুল পাতা এবং জীবন্ত বস্তুর অথবা ইমারত প্রভৃতির অনুকরণে দ্রব্যাদি করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। শোলা হইতে পদ্মের যে পাপড়ি বা সম্পূর্ণ পদ্ম তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা বিস্ময়ের বস্তু। সেইভাবে অন্য ফুল তৈয়ারী করা চলে। অর্থ দিয়া, সহানুভূতি দিয়া সাহায্য করিলে এমন এ টোপর, চাঁদমালা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে যাহা অতি বিশেষজ্ঞের নিকট সমাদর লাভ করিতে সমর্থ। "সিভিল ম্যারেজের" কৃপায় টোপর নির্বাসন লাভ করিতে বসিয়াছে।

শোলা, ছুরি, নারিকেল, কাঠি বা বাঁখারি হইতে প্রাপ্ত সরু কাঠি, কিছু রঙ, অভ্র, ধুনোর বা অন্য বস্তু হইতে প্রাপ্ত আঠা এবং গালা—ইহাই হইল শিল্পের মূল সরঞ্জাম। ঘরে বসিয়া, অবসর সময়ে পরিবারের লোক এমন কি অশক্ত লোকের সাহায্যে, নিজের বা আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে সংগৃহীত মূলধনে শোলা শিল্প বাঁচিয়া আছে। এই সকল দিক বিচার করিলে ইহা আদর্শ কুটীর শিল্প রূপে গ্রহণ করা যায়। কিভাবে ইহা আরও উন্নত ধরণে পরিচালিত করা যায়, নূতন কাজে শোলা প্রয়োগ করা যায়, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাহেবী টুপিতে শোলার ব্যবহার প্রবর্তিত না হইলে এতদিনে শোলার ব্যবহারের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। ধনীর ঘরে, নানা কাচের পর্দা, দেওয়ালে নানা তসবির ও আসবাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলের মধ্যে শোলার চাঁদমালা প্রভৃতি আলমারির মধ্যে তাঞ্জোরের দ্রব্যাদি সামান্য স্থান পাইতে পারে। রঙীন কাগজের ফুল প্রভৃতি শোলার শত্রুতা করিতেছে। দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিবে; কিভাবে ইহা অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাই শোলার শিল্পী মালাকার বন্ধুদিগের প্রধান কর্তব্য।

ইন্দ্রজিতের আসর

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই সম্বন্ধে একজন ফরাসী লেখক বলেছিলেন, রাজ দরবারে যতক্ষণ তাঁর স্তুতিগান চলত ততক্ষণই তিনি ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করতেন। আর স্তুতিগান যেই ক্ষান্ত হ'ল অমনি তিনি হাই তুলতে থাকতেন কিম্বা উঠে যাবার জন্য উসখুস করতেন। ছোটর সংগে বড়'র তুলনা ভালো দেখায় না, তথাপি বলতে বাধা নেই যে এবিষয়ে আমি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমগোত্রীয় অর্থাৎ বন্ধু মজলিশে আলোচনাটা আমার সম্বন্ধে না হয়ে অপরের সম্বন্ধে হ'লে আমিও হাই তুলতে থাকি। আমার বন্ধুরাও যে মাঝে মাঝে হাই না তোলেন এমন নয়। হয়তো বা অনুরূপ কারণ বশতঃই তাঁরাও ক্ষণে ক্ষণে মুখব্যাদান করে থাকেন। তবে আমি এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ কখনো বিশ্লেষণ করে দেখিনি। যে মানুষ সারাক্ষণ নিজের মন নিয়েই ব্যস্ত তার পক্ষে অপরের মনের খোঁজ রাখা সম্ভব নয়। শরীরতত্ত্বে বলে হাই তোলাটা বায়ুর প্রকোপবশতঃ ঘটে থাকে। মানুষের অনেক রকম বাই আছে। শুচিবাই-এর মতো স্তুতিবাইও মানুষের উনপঞ্চাশ বাই-এর এক বাই; একবার পেয়ে বসলে আর রক্ষে থাকে না।

কথায় যেমন কথা বাড়ে, প্রশংসায় তেমনি প্রশংসা বাড়ে। আমি যখন অপরের প্রশংসা করি তখন নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে করি না। জানি বন্ধুকে একটি প্রশংসার কথা বললে তিনি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেও আমার সম্বন্ধে অন্ততঃ দুটি প্রশংসাবাক্য নিশ্চয় উচ্চারণ করবেন। বন্ধুর প্রশংসাবাক্যও যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। আমার কাছ থেকেও তিনি অনুরূপ উদারতা প্রত্যাশা করেন। এটিকে বলতে পারেন প্রশংসার জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি। তা ছাড়া প্রশংসার ব্যাপারে অপরের উপরে পুরোপুরি নির্ভর করে আমি কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে। এজন্য আমার প্রশংসার ভারটি আমি নিজের মুখেই নিয়েছি। আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত নির্গুণ ব্যক্তিদের এটি না করে উপায় কি? প্রশংসার খিদে যদি থাকে তো মুখের লাজটি ছাড়তেই হবে। লজ্জার মাথা খেয়ে একবার ধুয়োটা ধরিয়ে দিতে হয় তারপরে মুখে মুখে আপনিই প্রচার হতে থাকে।

আমাদের মতো নির্গুণ ব্যক্তিদের কথা না হয় ছেড়েই দিলেন। রীতিমতো গুণী ব্যক্তিদের মধ্যেও আমি এই পরম দুর্বলতাটি লক্ষ্য করেছি। তাঁরা অবশ্য অতটা নির্লজ্জ না হলেও পারেন। ওঁরা ভুলে যান যে, ওঁদের গুণগান সর্বত্রই হচ্ছে; কিন্তু বেশির ভাগ প্রশংসা ওঁদের কর্ণগোচর হয় না বলে সেটাকে তাঁরা হিসেবের মধ্যে ধরেন না। এজন্যে আমি বলি কি, প্রশংসা যদি করতেই হয় তো শুনিয়ে করাই ভালো। মানুষের অগোচরে যে প্রশংসা করা হয় সেটা প্রশংসার বাজে খরচের মতো। ন দেবায় ন ধর্মায়—কারো ভোগেই লাগে না। তার ফলে তেমন তেমন মহারথীরাও আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনারা সবাই যদি শুনিয়ে শুনিয়ে ওঁদের প্রশংসা করতেন তা'লে আত্মপ্রশংসার ধিক্কার থেকে অনায়াসে ওঁদের রক্ষা করতে পারতেন। কারণ একথা স্বীকার করতেই হবে যে আত্মস্তুতি জিনিসটা আসলে বাঞ্ছনীয় নয়। নিজ প্রশংসা নিজের কানে যতটা মিষ্টি শোনায় পরের কানে ঠিক ততটাই কটু শোনায়। ফলে সতীর্থদের গুণীনিন্দিত দলের সমাজে শেষ পর্যন্ত ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ান। "ঐরে, উনি আসছেন এখুনি নামকীর্তন অর্থাৎ স্বনাম-কীর্তন শুরু হবে।" গুণীব্যক্তির পক্ষে এর চাইতে শোচনীয় পরিণাম আর কিছু হতে পারে না। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি আপন খ্যাতির কবর খুঁড়েছেন নিজ হাতে। এমার্সন hero-worshiper ছিলেন—অন্ততঃ তাঁর Representative Men নামক গ্রন্থ পাঠ করলে তাই, মনে হয়। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন যে—Every hero becomes a bore at last. এর মূল কারণটি গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখুন, দেখবেন গোড়ায় রয়েছে প্রশংসার উপবাস। যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসা যদি এঁরা স্বকর্ণে শুনতেন তা হলে নিজেরা আর কথা বলতেন না, অপরকেই কথা বলতে দিতেন।

সংসারের বারো আনা মানুষ পরশ্রীকাতর, আবার তার চাইতেও বেশি মানুষ পরস্তুতিকাতর। অপরের প্রশংসা তাঁরা সইতে পারেন না, ভাবেন অপরের সম্বন্ধে যে প্রশংসাটুকু করা হল সেটুকু নিজের ভাগ থেকেই খসে গেল। এজন্য অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু সম্বন্ধে প্রশংসা হলেও অনেকে মনে মনে সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই বলে এঁরা কেউ লোক খারাপ এমন কথা আমি বলব না। এসব হচ্ছে মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং মানসিক দুর্বলতা। এই আমার কথাই ধরুন না। আমার একটি বন্ধু কিছুদিন আগে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—অনেকটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধাঁচে। আপনারা জানেন এ ধরণের প্রবন্ধ আমিও লিখে থাকি। প্রবন্ধটি পড়ে আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। এই ক'দিন আগে লেখাটি তিনি আমাদের মজলিশে পড়ে শোনালেন। শুনে শ্রোতারা সবাই যখন লেখাটির প্রশংসা করতে লাগলেন তখন হঠাৎ আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। মনে হ'ল উনি যেন আমার সুখ্যাতির খানিকটা জোর করে কেড়ে নিলেন। অথচ একথাও সত্য যে, আমরা দু'জনে বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধু। লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য সে সব উপদেশ শুনে পুত্রটি বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে হয়েছিলেন কি না জানিনে। আমরা তো পিতার কথাই বরাবর শুনে আসছি, পুত্রের কথা কখনো শুনিনি। যাই হোক, বন্ধু নির্বাচন সম্বন্ধে লর্ড চেস্টারফিল্ড পুত্রকে যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তাতে অনেকখানি সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় আছে, বলেছিলেন, most people enjoy the inferiority of their best friends. লক্ষ্য করে দেখবেন দুই সমকক্ষ ব্যক্তির বন্ধুত্ব কখনো বেশি দিন টেকে না। বসওয়েল যদি ডক্টর জনসনের সমকক্ষ ব্যক্তি হতেন তা'হলে এমন অনুক্ষণ তাঁর অনুচর হয়ে ঘুরে বেড়াতেন না আর ডক্টর জনসন তো বসওয়েলকে আদবেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। গুণী লোকদের ধারণা স্তুতিবাদটা সব সময়েই একতরফা হবে। ডক্টর জনসন বসওয়েল সম্বন্ধে একটিও স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন বলে আমি জানিনে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত নাটক 'যুগ বিপ্লব' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক দেশ



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

......যক্ষিণীর গুহার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম যক্ষিণী একদল কাকের সহিত কাকের ভাষায় কথোপকথন করিতেছে। যক্ষিণী আমার আগমন টের পায় নাই, আমি একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার কান্ড দেখিতে লাগিলাম। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আমি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। মনে হইল কাকগুলি হরিণের মাংসে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে। বিদ্রোহী জনতা রাজশক্তির নিকট যেমন খাদ্যের দাবী করে তাহারাও যেন ঠিক তেমনিভাবে যক্ষিণীর নিকট দাবী জানাইতেছে। যক্ষিণীও তাহাদের দাবীর উত্তরে 'কা কা 'ক-আ' 'ক্যক্ ক্যক্' শব্দ করিয়া বায়স-ভাষায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখিলাম তাহার গুহার সম্মুখে অনেক কাক উড়িতেছে, আশেপাশে যে সব বৃক্ষ ছিল তাহাদের শাখায় শাখায় বহু কাক বসিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই চীৎকার করিতেছে। যক্ষিণীও চীৎকার করিতেছে। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেস্থান হইতে যক্ষিণীর গুহার ভিতরটা সব দেখা যাইতেছিল না, যক্ষিণীর মুখের খানিকটা অংশ কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল তাহার চোখের দৃষ্টি ভীত ত্রস্ত, তাহাতে ক্রোধ বা স্পর্ধার প্রকাশ নাই, তাহা যেন আর্ত অসহায়। যক্ষিণী কাকগুলিকে তাড়াইয়া দিতেছে না কেন এই কথাই বারম্বার আমার মনে হইতেছিল। তাহার কাছে কি কোনও অস্ত্র নাই? এমন কি লাঠি পর্যন্ত নাই না কি? যদি না-ও বা থাকে কাক তাড়াইবার মতো অস্ত্র সংগ্রহ করিতে কতটুকু সময় লাগে? উঠিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইলেই তো হইল। তা ছাড়া নিনানি কোথায় গেল? সে কি তাহার নিজের গুহায় চলিয়া গিয়াছে? সে থাকিলে নিশ্চয় কাকগুলোকে তাড়াইয়া দিত। এইসব চিন্তা পরম্পরায় মগ্ন হইয়া আমি দূর হইতে কাক-কোলাহল শুনিতেছিলাম এমন সময় আর একটা কান্ড ঘটিল। একটা প্রকান্ড শকুনি শোঁ করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল এবং ডানা ঝটপট করিয়া যক্ষিণীর গুহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। যক্ষিণীর আর্ত চীৎকারে মনে হইল পঞ্চ-পর্বত বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কাকেরা মহা উৎসাহে কলরব করিতে লাগিল, মনে হইল তাহারা যেন একজন নেতা পাইয়াছে। আমি আর নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া যক্ষিণীর গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শকুনি এবং কাকের দল নিমেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি দেখিলাম যক্ষিণী হরিণের কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরও জোরে কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। আমি যে তাহার উপকারী বন্ধু এ কথা সে যেন বুঝিতেই পারিল না। মনে করিল আমিও একজন আততায়ী, তাহার হরিণটাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আমি সবিস্ময়ে যক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মুখের চতুর্দিকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া আছে মাংস, অস্থি এবং চর্বির টুকরা। তাহার ওষ্ঠ এবং অধরের আশেপাশে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নও দেখা যাইতেছিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন অদ্ভুত বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। হয়তো আমার কোনও পূর্বজন্মে এতদপেক্ষা বীভৎসতর কোন দৃশ্যের আমি সাক্ষী ছিলাম, হয়তো বা কারণও ছিলাম, কিন্তু সে কথা আমার মনে ছিল না, মনে হইতেছিল এ দৃশ্য আর দেখি নাই, মনে হইতেছিল ইহা আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব, ইহা যে আমারই অতীত জীবনের প্রেত-মূর্তি একথা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে তখন। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম যক্ষিণীর অঙ্গে কোন আবরণ নাই, তাহার বৃহদাকৃতি স্তনযুগল স্ফীত উদরের উপর প্রলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। স্তন যুগলও হরিণরক্তে রঞ্জিত, হরিণ-বসায় পিচ্ছিলীকৃত। তাহার উদরদেশ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত মনে হইল। তাহা শরীরের একটা অংশই মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল কে যেন বাহির হইতে একটা বোঝা বা স্তূপ তাহার বুকের নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার উপরও রক্ত এবং চর্বির দাগ। সহসা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, যক্ষিণী এত খাইয়াছে যে, নড়িতে পারিতেছে না। প্রায় একটা গোটা হরিণ গলাধঃকরণ করিয়া সে চলচ্ছক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছে। কাক এবং শকুনির নিকট তাই তাহাকে হার মানিতে হইয়াছে। আমার আচরণে যক্ষিণী কিন্তু একটুও আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে ছিলাম সে চীৎকার করিতেছিল। কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে আমাকে গালি দিতেছে। নিনানি কোথায় গেল? ময়াল সাপটাই বা কোথায়? এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। শেষে গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, ভয় হইল ময়াল সাপটা নিনানিকে আক্রমণ করে নাই তো। তাড়াতাড়ি গুহার নিকট হইতে নামিয়া গেলাম, নামিয়া যাইবামাত্র কিন্তু কাকের দল আবার আসিয়া গুহামুখে হানা দিল, তাহারা নিকটেই বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিল। দেখিলাম শকুনিটাও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পর সহসা আগড়টা নজরে পড়িল। সেটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। আগড়টা তুলিয়া যক্ষিণীর গুহামুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। আগড়টা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই যক্ষিণী বিপদে পড়িয়াছিল। হয়তো নিনানিই আগড়টা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়? তাহার পর মনে পড়িল ময়াল সাপের গুহাও তো যক্ষিণী আগড় দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উঁকি দিয়া দেখিলাম, সেটা বন্ধই আছে। ময়াল সাপ তাহা হইলে বাহির হয় নাই। নিঃসংশয় হইবার জন্য তবু সে গুহাটার কাছে গেলাম একবার, ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম সাপটা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, একটা মৃদু শোঁ শোঁ শব্দও শোনা যাইতেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন নিনানির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিনানির গুহায় গিয়া দেখিলাম সেখানে সে নাই। কোথায় গেল? যে শুষ্ক খড়ের বোঝা রাখিয়া গিয়াছিলাম সেগুলি দেখিয়া মনে হইল না যে নিনানি তাহার উপর শুইয়াছে। সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন গান গাহিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিনানি কি? কিন্তু সেই দূরাগত সংগীত এত মৃদু যে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে সেই মৃদু সংগীত ভাসিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ভ্রম হইতেছিল তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর কি না। বাতাসের আলোড়নে অরণ্যানি গর্জন করিতেছিল, সেই গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার মৃদু সংগীত শুনিতে পাইতেছিলাম। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল উন্নতশীর্ষ পাষাণময় গম্ভীর পঞ্চ-পর্বতই কি গান গাহিতেছে?

তাহার আপাত-কঠিন মূর্তির অন্তরালে যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে এই মৃদু সংগীত হয়তো সেই হৃদয়েরই প্রকাশ। বিস্মিত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। সে যুগে আমরা বিশ্বাস করিতাম যে সমস্ত জগৎই প্রাণময়। জড় ও জীবের বিশেষ পার্থক্য ছিল না আমাদের কাছে। পশু-পর্বতের নিগূঢ় বাণী হয়তো শুনিতে পাইলাম এই ধারণাটা কিছুক্ষণ আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিল, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর সংগীতটাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পরই কিন্তু ভুল ভাঙিল, নিনানির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম, আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহার গানের কথাগুলিও শুনিতে পাইলাম। কন্যানদীর তীরে নিম্ব সম্প্রদায়ের মেয়েরাও আজ এই গান গাহিতেছে। আজ খনিত্র পূজা। নিনানিও সেই পূজা করিতেছে না কি? নিশ্চয়ই করিতেছে। নিনানি চরিত্রের একটা নূতন দিক সহসা আমার কাছে পরিস্ফুট হইল। বিদ্রোহ করিয়া সে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু দলের সহিত তাহার আন্তরিক যোগ ছিন্ন হয় নাই। দলের মঙ্গলের জন্য সে গোপনে গোপনে পূজাও করিতেছে। বিস্মিত হইলাম।

......একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া আমি নিনানির পূজা দেখিতেছিলাম। সে খনিত্র পূজাই করিতেছিল, কিন্তু নিজের পদ্ধতিতে করিতেছিল। খনিত্র পূজায় ইঁদুর বলি দেওয়া হয় কারণ ইঁদুর মাটিতে গর্ত খনন করে। খনিত্রের সঙ্গে ইঁদুরের রক্ত লাগাইয়া দিলে তাহাও ইঁদুরের মতোই খননশীল হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। তখন আমাদের খনিত্র ছিল সূচ্যগ্র গাছের ডাল। খনিত্র পূজার দিন প্রত্যেক নারীই একটি সূচ্যগ্র বৃক্ষশাখাকে মূষিক-রক্ত-চর্চিত করিয়া পূজা করিত। গানও গাহিত। নিনানিও একটি মোটা গাছের ডালকে পূজা করিতেছিল। দেখিলাম ডালটি সে একটি প্রস্তরের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে তাহার পাদদেশে ছোট একটা বেদীর মতও করিয়াছে। সেই বেদীর উপর দেখিলাম কয়েকটি ছিন্ন-মুণ্ড মূষিক ও শশক স্তূপীকৃত রহিয়াছে। দেখিলাম বৃক্ষশাখাটি শুধু রক্ত-রঞ্জিতই হয় নাই তাহার উপরিভাগে কয়েকটি রক্তবিন্দু দিয়া নিনানি সেটিকে মনুষ্য-মুখাকৃতি করিবার চেষ্টাও করিয়াছে। মূষিক এবং শশক শব-গুলির পার্শ্বে কিছু সবুজ তৃণগুচ্ছ এবং বন্য পুষ্পও বেদীটির উপর সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। সেই পুষ্পগুলিকে ঘিরিয়া কয়েকটি মধুকর গুঞ্জন করিতেছিল। রক্তাক্ত বৃক্ষদণ্ডটির উপর রক্তলোভী পতঙ্গ ও মক্ষিকা দল বসিতেছিল এবং উড়িয়া যাইতেছিল। দূরে শোনা যাইতেছিল একটা ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ। এই পটভূমিকায় নিনানি নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল। তাহার অঙ্গে কোনও আবরণ ছিল না, এমন কি আমি তাহার জন্য যে শিরস্ত্রাণটি করিয়া দিয়াছিলাম সেটিও তাহার মাথায় ছিল না। তাহার কুঞ্চিত কেশদাম নৃত্যবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল কোন বৃহৎ বনপুষ্পের অসংখ্য কেশর যেন তাহার মস্তক ঘিরিয়া আস্ফালন করিতেছে। আমাদের দলের পরিচিত সংগীতটিই নিনানি গাহিতেছিল।

"ওগো, বৃক্ষশাখা, যে শক্তিবলে তুমি একদিন বীজের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলে, তোমার যে শক্তি তোমাকে মাটির অন্ধকার হইতে আকাশের আলোকের দিকে লইয়া আসিয়াছিল তোমার সেই শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি হোক। সেই শক্তি দিয়া আবার তুমি মৃত্তিকার কঠিন বক্ষ কর্ষণ কর। তাহাকে বিদ্ধ কর, তাহাকে চূর্ণ কর, তাহাকে শিথিল কর। আলোকের প্রত্যাশায় অসংখ্য বীজ মাটির অন্ধকারে এখনও অপেক্ষা করিতেছে, ওগো বৃক্ষশাখা, তুমি তাহাদের পথ সুগম করিয়া দাও। তুমি অগ্রণী, তুমি প্রবীণ, তুমি দলপতি, তুমি বনস্পতি, পথভ্রান্ত শিশু তরুদের তুমি পথ দেখাও। মৃত্তিকার বাধা অপসারিত করিয়া দাও। তাহাকে কর্ষণ কর, বিদ্ধ কর, চূর্ণ কর, শিথিল কর—"

নিনানি নাচিতে নাচিতে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শাখাটি তুলিয়া লইতেছিল। তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছিল, তাহা দিয়া নিজের সর্বাঙ্গ বিদ্ধও করিতেছিল। মনে হইতেছিল সে যেন নিজেকেই মৃত্তিকার প্রতীকরূপে কল্পনা করিতেছে। তাহার অঙ্গের নানা স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল, কিছু কিছু ক্ষতও হইয়াছিল। নিনানির কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদিনীর মতো নাচিয়া গাহিয়া খনিত্র পূজা করিতেছিল সে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে বসিয়াছিলাম। পূর্বেও নিনানিকে খনিত্র পূজা করিতে দেখিয়াছি, তখন সে সকলের মতো চিরাচরিত রীতিতেই পূজা করিয়াছে। সে পূজাতেও বৃক্ষশাখা, মূষিকরক্ত এবং সংগীত ছিল, কিন্তু তাহাতে এ মহিমা ছিল না।

......নিনানির পূজা শেষ হইল। মনে হইল সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৃত্য বন্ধ করিয়া সে স্খলিতচরণে পাশের ঝোপটার ভিতর ঢুকিল এবং দুইটি জীবন্ত মূষিক লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মূষিক দুইটির মুণ্ড ছিন্ন করিয়া সে বৃক্ষশাখাটিকে শেষবার রক্তে স্নান করাইল। স্নান করাইয়া জানু পাতিয়া লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তাক্ত বৃক্ষশাখার সম্মুখে। ঝর্ণার ঝরঝর শব্দটা সহসা বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলাম ফুলের উপর মধুকরবৃন্দও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

"নিনানি—"

আমার ডাক শুনিয়া নিনানি উঠিয়া বসিল।

"তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ?"

"অনেকক্ষণ। বসিয়া বসিয়া তোমার পূজা দেখিতেছিলাম।"

"আমি ঝর্ণায় স্নান করিব। আমাকে তুমি কোলে করিয়া লইয়া চল। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

আমার দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। আমি উঠিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সে বলিল, "আমার ভয় হইতেছিল তুমি বুঝি আর আসিবে না।"

"কাল কি তুমি সমস্ত রাত যক্ষিণীর কাছেই ছিলে?"

"হ্যাঁ, শালসিটিনাকে কোলে করিয়াই বসিয়াছিলাম। কাল কিছুক্ষণের জন্য অতীত আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল, আমার কোলের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর সহসা চাঁদ উঠিল, আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম, মনে পড়িল আজ আমাদের খনিত্র পূজা। সেই মুহূর্তে শালসিটিনাও আমার কানে কানে বলিল,—যাও, খরগোস ধরিয়া আন। ময়াল সাপটাকে কিছু খাইতে দিতে হইবে। না দিলে ও শেষে আমাকেই খাইয়া ফেলিবে। শালসিটিনা আমাকে শিখাইয়া দিল কি করিয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়া ফাঁদ পাতিতে হইবে। তাহার নিজের গাত্রাবরণটাও খুলিয়া আমাকে দিল। বলিল, ঝোপের ধারে এইটা টাঙাইয়া রাখিলে খরগোসেরা সেদিকে যাইবে না, ফাঁদের দিকে যাইবে। খরগোস ধরিতে গিয়া ইঁদুরও অনেক ধরিয়াছি। শালসিটিনার ফাঁদগুলি চমৎকার। তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?"

"আমি ফিরিয়া দেখিলাম ধবল আসিয়াছে।"

"তাহার পর?"

যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বিশদরূপে বর্ণনা করিলাম।

"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ধবল কাঁদিল না?"

"না।"

"কেহই কাঁদিল না?"

"মেয়েদের মধ্যে অনেকে আর্তনাদ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ শোকোচ্ছ্বাস আন্তরিক কি না বলা শক্ত। দলপতির প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদে শোকপ্রকাশ না করিলে দলপতিকেই অপমান করা হয় যে—"

নিনানি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মৃত্যু-সংবাদ কাহাকেও বিশেষ বিচলিত করে নাই। এ সংবাদটা তাহাকে যেন বিচলিত করিল।

তাহার নীরবতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিনানি বলিল—"ঘিসু থাকিলে ঘিসু ঠিক কাঁদিত"

"সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"

"আমি যখন মরিয়া যাইব, তুমি কাঁদিবে?"

"কি যে বল—"

নিনানি দুই বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিল,—"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে আর একজনও কাঁদিত। সে কিন্তু নাই।"

সীংরার কথা বলিতেছ?"

"না, কলঙ্গা, যে আমাকে তোমাদের দলে আনিয়াছিল"

একটা অদ্ভুত কথা সহসা মনে হইল। কলঙ্গার বিধবা, ধবলের পত্নী, ঘিসুর প্রণয়িনীকে আমি কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছি। নারী সম্বন্ধে আজ তোমাদের যে শুচিতা-বোধ প্রবল হইয়াছে তখন তাহা তত প্রবল ছিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। যে প্রয়োজনের দাবী আমাদের পর-স্ত্রীর সম্বন্ধে সংযত করিতেছিল সেই প্রয়োজনের দাবীই ক্রমশঃ ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। প্রয়োজনের দাবীতেই আমরা একদিন প্রস্তরকে বৃক্ষকে পূজা করিতাম, প্রয়োজনের দাবীই তাহাদের দেবতা পদে উন্নীত করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের শুচিতাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল। পর-স্ত্রী সম্বন্ধেও আমরা ক্রমশ তেমনি সচেতন হইতেছিলাম। আমার অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন বলিয়া উঠিল—তুমি অন্যায় করিতেছ। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ। ধবলের সহিত মিথ্যাচরণ করিয়া তুমি পাপ করিতেছ। এখনও সময় আছে, এখনও নিনানিকে ত্যাগ কর, এখনও গিয়া ধবলকে সত্য কথা খুলিয়া বল......।

"তুমি চুপ করিয়া আছ কেন, কথা বল। আমার সম্বন্ধে সকলেই তো চুপ করিয়া গেল, আমার মৃত্যুসংবাদে কেহ কাঁদিল না পর্যন্ত। তুমি চুপ করিও না, তুমি কথা বল। আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, চুপ করিয়া থাকিও না—"

"কি কথা বলিব?"

"আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর তুমি কি কি করিয়াছ সমস্ত বল—"

"সমস্তই তো বলিলাম"

"মনে হইতেছে তুমি কিছু গোপন করিতেছ"

"না, কিছুই তো গোপন করি নাই। তোমার ঝরণা কতদূরে"

"এই চড়াইটা শেষ হইলেই দেখিতে পাইবে"

"তুমি ঝরণাটা আবিষ্কার করিলে কিরূপে?"

"কাল রাত্রে শাল্মমিটিনার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা ঝরণার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল ঝরণা আমাকে যেন ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না কিরণের মধ্যেও যেন সেই ডাক সঞ্চারিত হইয়াছে। আমার সর্বাঙ্গে যেন ঝরণার আহ্বান জ্যোৎস্না রূপে জড়াইয়া ধরিল। আমি অভিভূতের মতো শব্দ অনুসরণ করিয়া ঝরণার কাছে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম জান?"

"কি—"

"দেখিলাম আমাদের কুল-দেবতা সেখানে বসিয়া আছেন। ঝরণার দুই পাশে অপরাজিতার কুঞ্জ আর তাহাতে অজস্র অপরাজিতা ফুল। দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকে দেবতা ঘুমাইতেছেন, মনে হইল চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। ধবলকে মনে পড়িল। তাহাকেও কন্যানদীর তীরে গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবতা আমাকে দেখা দিলেন কেন, ঝরণার অশ্রান্ত শব্দে জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া আমাকেই কি তিনি ডাকিতেছিলেন? কেন! দেখিলাম তাঁহাকে ঘিরিয়া ঝরণার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা আবর্তিত হইতেছে, প্রতিটি বুদ্বুদে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হইল, আকাশের চন্দ্র যেন লক্ষ লক্ষ রূপে নামিয়া আসিয়া আমার দেবতাকে পূজা করিতেছে। আমিও প্রণত হইলাম। তুমি যে শিরস্ত্রাণটি আমার মাথায় পরাইয়া দিয়াছিলে তাহা খুলিয়া পড়িল দেখিলাম তাহা জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি আর তাহা তুলিবার চেষ্টাও করিলাম না। শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকিবার আর প্রয়োজনও তো নাই, সেইজন্য হয়তো দেবতাই উহা আমার মাথা হইতে খুলিয়া দিলেন—"

আমরা ঝরণার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। ঝরণা খুব বড় নয়, কিন্তু উচ্চ পর্বতশিখর হইতে নামিতেছিল বলিয়া শব্দ বেশী হইতেছিল। ঝরণাধারা যেস্থানে সমতলে নামিয়াছে তাহার আশেপাশে দেখিলাম সত্যই অনেক অপরাজিতা লতা। ফুলও অনেক ফুটিয়াছে। পর্বতগাত্রে ঝরণাধারার দুইপাশেও অপরাজিতা দুলিতেছিল। সহসা মনে হইল এই অপরাজিতার দলই যেন পথ দেখাইয়া ঝরণাধারাকে পর্বত শিখর হইতে নামাইয়া আনিয়াছে। যতদূর দেখিতে পাইলাম ঝর্ণাধারার উভয় তীরে অপরাজিতার বনই দেখিলাম। কিছুদূর গিয়া জলস্রোত দিক পরিবর্তন করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছিল। তখন জানিতাম না যে, ইহাই কিছুদূরে গিয়া সরসরা নদীতে পরিণত হইয়াছে, যে সরসরা নদীর তীরে গজন্ধরের দলপতি উলম্ভন রাজত্ব করে।

"আমাকে তুমি নিজে হাতে স্নান করাইয়া দাও—"

আবদারমাখা কণ্ঠে নিনানি অনুরোধ করিল।

স্নান শেষ হইলে সে বলিল—"আমার মাথায় অপরাজিতা ফুল পরাইয়া দাও।" তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল ছিল না।

নিনানিও আমার মাথায় কানে ফুল পরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম—"উলম্ভনের সহিত আমাদের হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। পাহাড়ের অপর পারে যে জাতি থাকে—যাহারা গরুর দুধ খায়—তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিতে পারে!"

কথাটা অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলাম, বলিয়াই কিন্তু বিপদে পড়িলাম। নিনানি পরমুহূর্তে প্রশ্ন করিল,—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সত্য কথাই বলিলাম।

"সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইয়াছিল"

"কোন মেয়েটির?"

"যে তোমাকে সেদিন রাত্রে লতা দিয়াছিল।" নিনানির মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

'ও, কখন দেখা হইল তাহার সহিত?"

"যখন এখানে আসিতেছিলাম"

নিনানি আমার মুখের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়াছিল, সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল, "মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখিতে, নয়?"

"সুন্দর বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়"

আজ মনে হইতেছে, সেই মুহূর্তে নিনানিকে যদি সরল সত্য কথা খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। তাহাকে অনায়াসেই বলিতে পারিতাম—'হাঁ, শিলাঙ্গী খুবই সুন্দর, তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, হয়তো তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' সে যুগে একথা বলা মোটেই অশোভন ছিল না। সে যুগে প্রত্যেক পুরুষই প্রকাশ্যে একাধিক রমণীর প্রণয় কামনা করিত। আমি তাহা হইলে শিলাঙ্গীর কথা গোপন করিয়াছিলাম কেন? আজ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি কারণ ছিল। সে যুগেও আমার অন্তরতম সত্তা অনুভব করিয়াছিল যে, প্রেমাস্পদা একজনই হয়। যৌন লালসায় আমি একাধিক স্ত্রীলোককে কামনা করিতে পারি কিন্তু ভালবাসিতে পারি মাত্র একজনকে। আমি নিনানির কাছে ভালবাসার ভান করিতেছিলাম, তাই তাহার

কাছে শিলাঙ্গীর কথা বলিতে পারি নাই। আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি ভান করিতেছিলাম, কারণ ভালবাসার ভান না করিলে গরবিনী নিনানিকে লাভ করা সম্ভব ছিল না। নিনানি তাহার দেহ দান করিয়া বিনিময়ে ভালবাসাই চাহিয়াছিল। ভালবাসার সন্ধানেই সে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলঞ্জা তাহাকে লাভ করিয়াছিল প্রেমের অভিনয় করিয়াই। তাহাকে বিবাহ করিবার কিছুদিন পরে কলঞ্জার হৃদয় আমাদের দলের কাংকা নাম্নী যুবতীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হইবার পর কিন্তু কলঞ্জা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। সহসা একদিন তাহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করে নিনানি কলঞ্জাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। কাংকাও বাঁচে নাই, তাহারও কিছুদিন পরে মৃত্যু হইয়াছিল। বিঘাও বলিয়াছিল কণ্টক কণ্টককে উৎপাটিত করিল। ছলনাময়ী নিনানিকে ঘিরিয়া যে রহস্যলোক আমি কল্পনায় সৃজন করিয়াছিলাম, সে রহস্যলোকে দ্বিতীয় কোনও রমণীর অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিতে পার নাই। শিলাঙ্গী কথা তাই তাহার নিকট হইতে সযত্নে গোপন করিয়াছিলাম।

ক্রমশ

বিজ্ঞানের কথা

কর্টিসোন

অমরেন্দ্রকুমার সেন

মানুষের যত রকম যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি আছে তার মধ্যে গেঁটে বাত অথবা আরথ্রাইটিস অন্যতম। এমন পঙ্গু খুব অল্প রোগেই করতে পারে। আরথ্রাইটিস কথাটি এসেছে দুটি গ্রীক কথা থেকে; 'আর্থ্রস' যার অর্থ সন্ধি এবং 'আইটিস' অর্থাৎ প্রদাহ। আমাদের শরীরের ভেতরে অনেক সন্ধি আছে, যেমন হাঁটু, কনুই, কোমর গোড়ালি, আঙুলের গাঁট ইত্যাদি। অ্যাপেন্ডিক্সের প্রদাহ হলে হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস, টনসিলের প্রদাহ হলে হয় টনসিলাইটিস এবং আরও বহু 'আইটিস' অর্থাৎ প্রদাহ হয়।

এই ব্যাধিটি মানুষকে বহু দিন থেকে যন্ত্রণা দিয়ে আসছে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রাচীনতম যে মানুষটির কঙ্কালের অংশ খুঁজে পাওয়া গেছে যবদ্বীপে তার নাকি ছিল আরথ্রাইটিস। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুগুলির মধ্যেও নাকি এই রোগের অল্পবিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু ব্যাধির ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান, ব্যাধি উপশমে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না। ব্যাধিটি আরম্ভ হয় অতি চুপে চুপে নিঃসাড়ে। একদিন দেখা যাবে গাঁটগুলি সব ফুলে উঠেছে, যন্ত্রণা ভীষণ, সেখানটা আঙুল, পা অথবা কোমর, আর মোড়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আনুষঙ্গিক উপসর্গও থাকে, ক্লান্তি, শরীরের ওজন এবং ক্ষুধা কমে যাওয়া। এই সব রোগীরা রক্তাল্পতাতেও ভোগে, অনেক সময় ন্যাবা অথবা জনডিস্ও হয়। এই ব্যাধি কেন হয় অথবা কি করে হয় তার মূলে কারণ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। খারাপ দাঁত থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুকেই এই রোগের জন্য দায়ী করা হয় এবং অ্যাসপিরিন থেকে সুরু করে সাপের বিষ পর্যন্ত যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবু কিছুতেই কিছু হয় না।

পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সালফানিলঅ্যামাইড ইত্যাদি ওষুধগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ডাক্তারবাবুদেরও বুকে যেমন সাহস বেড়েছে তেমনি তারা বহু রোগীকেও বাঁচিয়ে তুলছেন। কর্টিসোন নামে এই রকম একটি ওষুধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা আরথ্রাইটিসগ্রস্ত রোগীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। কর্টিসোন উপরোক্ত ওষুধগুলির সমশ্রেণীর নয়, বলতে গেলে ওষুধটি আমাদের শরীরের মধ্যেই তৈরী হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থি আছে, যেমন থাইরয়েড, পিটুটারি ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থি থেকে রস, যাদের ইংরেজী নাম হর্মোন,—নিঃসৃত হয়ে আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এক এক প্রকার গ্রন্থির এক এক প্রকার রস আছে যেমন থাইরয়েডের রসের নাম থাইরক্সিন। কর্টিসোনটিও এইরকম একটি গ্রন্থির রস। বলা যেতে পারে যে এই কর্টিসোনের অভাবে আরথ্রাইটিস হয় এবং তখন এই কর্টিসোন প্রয়োগ করলে আরথ্রাইটিস সেরে যায়; ঠিক যেমন ইনসুলিন নামে হর্মোনের অভাবে ডায়াবেটিস হয়, কিন্তু ইনসুলিন ইঞ্জেকসান নিলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কর্টিসোনও ইনসুলিনের মতো একটি ওষুধ। ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন রিউম্যাটিক ডিজিজ্-এর মতে কর্টিসোন আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ। কর্টিসোনের আবিষ্কারকরূপে গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামখ্যাত জৈববিদ্ ডক্টর এডওআর্ড সি কেন্ডাল এবং আরথ্রাইটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ফিলিপ এস হেঞ্চকে ভৈষজবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত পর্যায়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বলতে গেলে কর্টিসোনের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে ১৯২৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে। তখন ডক্টর হেঞ্চ মেয়ো ক্লিনিকের একজন উদীয়মান জৈববিদ্, যদিও ইতঃপূর্বে সুচিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ঐ তারিখে তাঁর ডাক্তারখানায় আগমন হল একজন ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ চিকিৎসকের। তিনি জনডিস অর্থাৎ ন্যাবা রোগে ভুগছেন। কিন্তু তাঁর রোগের ইতিহাস ডক্টর হেঞ্চকে কৌতূহলান্বিত করল। সেই ডাক্তারবাবু চার বৎসর যাবৎ গোড়ালি, কব্জি, পা ও হাতের আরথ্রাইটিসে কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু গত কয়েকদিন পূর্বে তিনি জনডিস রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যেদিন থেকে তাঁর জনডিস হয় ঠিক তার পরদিন থেকে তাঁর আরথ্রাইটিসের যন্ত্রণার উপশম হয়েছে এবং গাঁটের ফুলোগুলিও কমে গেছে। তাঁর জনডিস রোগ অবশ্য নিরাময় করা হল এবং তারপর কয়েকমাস তিনি আরথ্রাইটিসের বেদনা থেকে মুক্ত ছিলেন। ডক্টর হেঞ্চ্ এর পর থেকে লক্ষ্য করেন যে, সাধারণতঃ আরথ্রাইটিস রোগীদের জনডিস হয়ে থাকে এবং জনডিস হলে আরথ্রাইটিসের ব্যথার উপশম হয়।

ডক্টর হেঞ্চ্ আরও লক্ষ্য করেন যে, আরথ্রাইটিসগ্রস্ত নারীগণ গর্ভবতী হলে তাদের আরথ্রাইটিসের ব্যথার উপশম হয় এবং গর্ভকালে এই যন্ত্রণাদায়ক রোগের কোনো লক্ষণই আর থাকে না। ব্যাধি সেরে যাবে এই আশাতেই বহু নারী প্রতি বৎসরই গর্ভবতী হয়েছেন, কিন্তু হায়! তাদের সে আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। সন্তান প্রসবের কিছুদিন পরেই আরথ্রাইটিস আবার ফিরে এসেছে। ডক্টর হেঞ্চ্ অনুমান করলেন যে নারীর অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয় যেগুলি সন্তান প্রসবের পর আর হয় না। নিশ্চয়ই এমন কোনো হর্মোন আছে যা আরথ্রাইটিসের শত্রু। কিন্তু পুরুষ জনডিস রোগীর বেলায় ত এই যুক্তি খাটে না। তবে?

তখন উভয় প্রকার রোগী ও রোগিণীর রক্ত পরীক্ষা করে স্টিরয়েড শ্রেণীর রসায়নের প্রাচুর্য দেখা গেল আবার এই স্টিরয়েডে এক প্রকার রসায়নগুচ্ছ থাকে যাদের নাম পারত। আর এখন, কোনো কিছু লাভ না করেও তাকে প্রচুর পরিমাণে কর্তব্যভ্রষ্ট হতে হল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার এই কর্তব্য-

ক্রিনাণ্থ্রিন। ডক্টর হেণ্চ্ তখন স্থির করলেন যে ভবিষ্যতের বাত-ব্যাধির ওষ্ধে এই ক্রিনাণ্থ্রিনকে রাখতে হবে।

এই সময়ে মেয়ো ক্লিনিকে ডক্টর এডওআর্ড সি কেন্ডাল নামে একজন জৈব রাসায়নিক এই স্টিরয়েড নিয়েই গবেষণায় নিরত ছিলেন। ডক্টর কেন্ডাল ইতঃপ্বেই থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন থাইরক্সিন আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ম্ত্রাশয় অর্থাৎ কিড্নির ওপরে অ্যাড্রিন্যাল নামে গ্রন্থি আছে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির দ্বটি অংশ আছে, কর্টেক্স এবং মেডালা। ডক্টর কেন্ডাল এই কর্টেক্স থেকে তখন পর্যন্ত ছ'টি স্টিরয়েড খ্ৰজে পেয়েছিলেন,

ডক্টর এডওআর্ড সি, কেন্ডাল

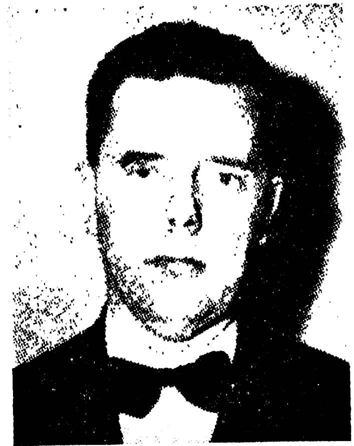
পরে অপর বিজ্ঞানীরা আরও ২২টি স্টিরয়েড খ্ৰজে পেয়েছেন। ১৯৩৬ সালে ডক্টর কেন্ডাল ডক্টর হেণ্চ্কে বলেন যে তিনি একটা স্টিরয়েড খ্ৰজে পেয়েছেন যার নামকরণ করেছেন "কম্পাউন্ড ই" কিন্তু এই "কম্পাউন্ড ই" প্রস্তুত করা অত্যন্ত দ্বরূহ ব্যাপার। গর্র অর্ধ টন অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে মাত্র এক আউন্সের শত ভাগের এক ভাগ "কম্পাউন্ড ই" পাওয়া যায় এবং তার জন্য দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

পাঁচ বৎসর কেটে গেল। ডক্টর হেণ্চ্ তাঁর নোট ব্ৰকে লিখলেন "আরথ্রাইটিসে কম্পাউন্ড ই পরীক্ষা করে দেখ," কিন্তু লেখা যত সহজ "কম্পাউন্ড ই" সংগ্রহ করা তত সহজ নয়। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ডক্টর কেন্ডাল মাত্র দ্বই আউন্স উক্ত হর্মোনটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর আবশ্যক হয়েছিল গর্র ৭৫ টন অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি। তখন আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান উক্ত রসায়নটি কিছ্ কিছ্ তৈরী করত অ্যাডিসনস্ ডিজিজ্ নামে রোগ সারাবার জন্য কিন্তু তাদের খরচ পোষাতো না সেই জন্য তারা এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল; কিন্তু ডক্টর হেণ্চের বিশেষ অন্বরোধে তারা কিছ্ কম্পাউন্ড ই প্রস্তুত করে দিতে রাজী হলেন, আর তা ছাড়া সত্যই যদি ওষ্ধটিতে কাজ হয়, তাহলে তাদের লাভ বিনা ক্ষতি নেই। কিছ্ কম্পাউন্ড ই তৈরী করে দেওয়া হল। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গেল যে, কম্পাউন্ড ই-এর প্ররো নাম ১৭-হাইড্রক্সি-১১ ডিহাইড্রো-কর্টিকোস্টিরোন। ডক্টর কেন্ডাল ও ডক্টর হেণ্চ ওষ্ধটির সংক্ষিপ্ত নামকরণ করলেন "কর্টিসোন", কিন্তু নাম সংক্ষেপ হলে কি হয়, ওষ্ধটি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতে হলেও ৩৭টি ধাপের আবশ্যক এবং তার জন্য কয়েকটি মাস এবং কঠিন পরিশ্রম দরকার।

১৯৪৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে কর্টিসোন নিয়ে পরীক্ষা স্বর্ হল। একটি মহিলা চার বৎসর আরথ্রাইটিসে পঙ্গ্ হয়েছিলেন, তাঁরই ওপর প্রথম পরীক্ষা স্বর্ হল। তিন দিন কর্টিসোন ইঞ্জেকসান দেবার পর চতুর্থ দিন থেকে তিনি এমন স্বস্থ বোধ করলেন যে, বিছানায় নিজে নিজেই পাশ ফিরতে সক্ষম হলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর বাতবেদনা অদ্শ্য হল এবং কয়েক বৎসর পরে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। এর পর আরও চৌদ্দটি রোগীকে কর্টিসোন ইঞ্জেকসান দেওয়া হল এবং সকলেই বেদনাম্বক্ত হল। তারপর থেকে কর্টিসোন আরও অনেক রোগীকে আরাম দিয়েছে। কিন্তু কর্টিসোনের কিছ্ কিছ্ অস্ববিধাজনক প্রতিক্রিয়া আছে এবং সেগ্বলি যাতে না হয়, বিজ্ঞানীরা সে চেষ্টা করছেন। তবে এর বড় অস্ববিধা এই হল যে কর্টিসোন ইঞ্জেকসান নিলেই আরথ্রাইটিস একেবারে সেরে যায় না, ডায়াবেটিসের জন্য যেমন ইনস্বলিন ইঞ্জেকসান বরাবর নিতে হয়, কর্টিসোনের ইঞ্জেকসান সেই রকম বরাবর নিতে হয়; কর্টিসোনের দামও বেশী এবং বরাবর ইঞ্জেকসান নিতে হলে আন্বষঙ্গিক খরচও বেড়ে যায়।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসান ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স-এর ম্খপত্র "সায়েন্স" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে, কর্টিসোনের বড়ি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে এবং তা খেলে কাজও হয়। কিন্তু তারও দাম বেশী। সস্তায় কর্টিসোন বিক্রয় করতে না পারলে জনগণের উপকার হতে পারে না, সেই জন্য গাছ থেকে কর্টিসোন তৈরী করবার চেষ্টা চলছে।

আফ্রিকায় স্ট্রোপ্যান্থাস সারমেণ্টোসাস নামে একপ্রকার গাছ জন্মায় যার বীজ থেকে কর্টিসোন তৈরীর কাঁচামাল পাওয়া যেতে পারে। সাড়ে বারো হাজার টন ওজনের গর্র অ্যাড্রিন্যাল থেকে যে পরিমাণ কর্টিসোন পাওয়া যাবে, স্ট্রোপ্যান্থাসের এক টন বীজ থেকে সেই পরিমাণ কর্টিসোন পাওয়া যাবে। কিন্তু এই গাছ বড় হয়ে বীজ দেবার উপয্ক্ত হতে পাঁচ বৎসর সময় লাগবে এবং প্রচুর গাছ ও বিস্তৃত জায়গার আবশ্যক। তবে ডিস্কোরিয়া নামে একরকম থাম আল্র গাছ পাওয়া গেছে। এই গাছের ম্লগ্বলি এতই প্ৰষ্ট হয় যে, ওজনে এক একটি পনেরো সের পর্যন্ত হয় এবং এই ম্লে বটোজেনিন নামে এক প্রকার রসায়ন পাওয়া যায় যা থেকে কর্টিসোন প্রস্তুত করা যাবে। এই কর্টিসোন দামে সস্তা হবে আশা করা যায়।,



ডক্টর ফিলপ এস্, হেণ্চ্

কিছ্বদিন হল ডক্টর জন আর মোট নামে এক বিজ্ঞানী এ-সি-টি-এইচ নামে একটি হর্মোন বিশ্লেষিত করেছেন যার দ্বারাও আরথ্রাইটিস এবং কিড্নি সংক্রান্ত নানাপ্রকার অস্বখ এবং লিউকিমিয়া নামে অস্বখ সারানো যাচ্ছে। এই হর্মোনটির প্ররো নাম অ্যাড্রিনো-কর্টিকো-ট্রপিক-হর্মোন। এত বড় নাম সর্বদা ব্যবহার করা অস্ববিধা সেইজন্যই সংক্ষেপে এ-সি-টি-এইচ বলা হয়। এই হর্মোনটি কর্টিসোন হর্মোন নিঃস্ত করতে সাহায্য করে। কিন্তু এও প্রস্তুত করা দ্বঃসাধ্য ব্যাপার। এক পাউন্ড এ-সি-টি-এইচ প্রস্তুত করতে চল্লিশ হাজার শ্করের পিট্ইটারি গ্রন্থির দরকার। তবে হর্মোনটি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করবার চেষ্টা চলছে এবং সম্ভবত শীঘ্রই সাফল্যলাভ করা যাবে। কিন্তু তা হলেও ওষ্ধটি প্রয়োগ করার আবার কিছ্ অস্ববিধা আছে, কারণ রোগীর রক্তাদি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হয়; তাহলেও ওষ্ধটি খ্ব কম মাত্রায় কার্যকরী।

ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

পাঁচ

[চাবুকওয়ালা]

কয়েক সন্ধ্যা পরে 'কে' একদিন তার অফিস থেকে সিঁড়িতে আসবার পথে ব্যাঙ্কের বারান্দা পার হচ্ছিল। সে ছাড়া আর প্রায় সকলেই তখন অফিস থেকে চলে গেছে। শুধু ডেস্‌পাচ বিভাগের দু'জন কর্মচারী ছাড়া। ল্যাম্পের মিটমিটে আলোয় তখনো তারা কাজ করছে। বারান্দা পার হবার সময় 'কে' একটা বন্ধ ঘরের ওপাশ থেকে ঘনঘন নিঃশ্বাস নেবার আওয়াজ শুনতে পেল। তার ধারণা ছিল ঘরটা ভাঙাচোরা জিনিসপত্র রাখবার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই এর দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকে। সে দরজাটা কখনো খোলেনি। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে সে বিস্মিত হয়ে একটু দাঁড়াল। নিশ্চিত হয়ে জানতে চায়, সে ভুল শুনছে না। সব ঠিক আগের মত শান্ত। কিন্তু একটু পরে আবার সেই নিঃশ্বাসের আওয়াজ। প্রথমে সে একজন ডেস্‌পাচের কেরানীকে ডেকে আনার কথা ভাবল। একজন সাক্ষী থাকা দরকার। কিন্তু অদম্য কৌতূহলে সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। নিজেই দরজাটা খুলে ফেলল। ঠিকই ধরেছিল সে। ঘরটায় বাজে জিনিসপত্র রাখা হয়। চৌকাঠ পার হলেই দেখা যাবে কালির শূন্য বোতলগুলো মাটির ওপর স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। কোনো কোনোটা বা গড়াগড়ি খাচ্ছে! অন্য এক জায়গায় পুরনো বাজে কাগজের বাণ্ডিল। মধ্যখানে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। ঘরের সিলিংটা নীচু থাকায় ওরা একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় তাদের দেখা যাচ্ছে। মোমবাতিটা বুক কেসের ওপর।

'তোমরা এখানে কি করছ?' 'কে'র মনের উত্তেজনা স্পষ্ট। গলার পর্দা নীচু। লোক তিনজনের মধ্যে একজনকে তাদের ঊর্ধ্বতন মনে হয়। সে চামড়ার কালো একটা পোষাক পরেছে। কিন্তু পোষাকটা দিয়ে তার গলা-বুকের খানিকটা অংশ এবং হাতের সমস্তটা ঢাকা পড়ে না। সে কোনো উত্তর করল না। অপর দু'জন চিৎকার করে উঠল। 'মশাই আমাদের চাবুক মারা হবে। কারণ আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করেছেন।' এ কথার পরই 'কে' প্রথম লোক দু'জনকে চিনতে পারল। তারা ফ্রানৎস ও উইলেম। তৃতীয় ব্যক্তির হাতে একটা লাঠি, যা দিয়ে তাদের মারা হবে। তাদের দিকে তাকিয়ে 'কে' জিজ্ঞাসা করল ঃ 'কেন'? আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করিনি। কেবলমাত্র আমার ঘরে যা' ঘটেছিল, আমি তা-ই বলেছি। আর তোমাদের ব্যবহারও সেদিন প্রশংসার যোগ্য ছিল না।'

'মশাই,' উইলেম বলল। ফ্রানৎস তখন নিজেকে উইলেমের পেছনে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। 'আপনি যদি জানতেন আমাদের বেতন কত কম, তবে আপনি এমন কাজ করতে পারতেন না। আমার একটি পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয়। ফ্রানৎস আবার বিয়ে করতে চায়। মানুষ তার সাধ্যমত কাজ শুধু করতে পারে। কিন্তু খুব বেশী পরিশ্রম করে এমন কি দিন রাত খেটেও আপনি বড়লোক হতে পারবেন না। আপনার সুন্দর শার্টগুলো আমাদের মনে লোভের সৃষ্টি করেছিল, যদিও তা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেকদিন থেকে এটা একটা রেওয়াজেই দাঁড়িয়ে গেছে যে, গায়ের পোষাকগুলো ওয়ার্ডাররাই পাবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, এতদিন পর্যন্ত এমনই চলে আসছে। তাছাড়া একথা সহজেই বোঝা যায় যে, দুর্ভাগ্যবশত যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার আর ও সমস্ত জিনিসের দরকার কি? তবু যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লাগায়, তবে আমাদের সাজা পেতেই হবে।'

'দেখ, আমি এসব নিয়মের কিছু জানি না। একটি নীতির পক্ষেই আমি আমার কথা জানিয়ে দিলাম।'

'দেখলে ফ্রানৎস।' অপর ওয়ার্ডারটির দিকে ফিরে উইলেম বলল, 'আমি বলিনি, আমাদের শাস্তি হোক, তা তিনি চান না?'

'ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না।' তৃতীয় ব্যক্তির মন্তব্য। 'ওদের সাজা পাওয়া উচিত। আর তা' তাদের পেতেও হবে।'

তৃতীয় লোকটির মুখে হাত চাপা দিয়ে উইলেম বলল ঃ 'এর কথা শুনবেন না।' কিন্তু তার হাতের ওপর লাঠি দিয়ে একটু আঘাত করতেই সে হাতটা সরিয়ে নিল।

'আপনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বলেই আমাদের শাস্তি পেতে হবে। আমাদের শাস্তি পাবার এছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। আপনি যদি আমাদের সম্পর্কে ওকথাগুলি না বলতেন, তবে কোনো অপরাধই ওরা খুঁজে বার করতে পারত না। এভাবে শাস্তি দেওয়া কি আপনার উচিত মনে হয়। আমাদের দু'জন, বিশেষ করে আমি বহুদিন যাবৎ একান্ত বিশ্বস্ত ওয়ার্ডার হিসেবে নাম কিনেছি। আপনিও নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন। সরকারী দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় আমরা আপনার সঙ্গে ঠিক ব্যবহারই করেছিলাম। তার জন্য আমাদেরও পদোন্নতির আশা ছিল। আমরাও এই চাবুকওয়ালার মত হতে পারতাম। কিন্তু আপনার অভিযোগ সব মাটি করে দিল। এই চাবুকওয়ালাটির ভাগ্য ভাল। তার বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ হয়নি। আর এ ধরণের অভিযোগ, আপনি যা' করেছেন তা খুব অল্প লোকের বিরুদ্ধে কদাচিত এযাবৎ আনা হয়েছে। এখন সব পণ্ড। আমাদের ভূত-ভবিষ্যতের সকল আশা এখন নির্মূল। এরপর আর আমাদের ওয়ার্ডারেরও কাজ করতে দেওয়া হবে না। সে কথা যাক্। এখন আমাদের এমনভাবে মারা হবে, যা' সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন।'

তার সামনে চাবুকওয়ালার হাতে চাবুকটি তখন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। এ পাশ থেকে সে পাশ। চাবুকটার দিকে তাকিয়ে 'কে' বলল, তা ত ঠিক।'

উইলেম আবার বলল ঃ 'প্রথমে আমাদের গা থেকে সমস্ত পোষাক খুলে ফেলা হবে।'

'আহা হা!' সহানুভূতিতে 'কে'র গলা কাঁপল। এবার সে আরো মনোযোগের সঙ্গে চাবুকওয়ালার দিকে তাকাল। নাবিকদের মুখের মত তার মুখের চামড়াও যেন ট্যান করা। সমস্ত মুখের চেহারা অত্যন্ত কঠিন। নিষ্ঠুর। 'কে' তাকে জিজ্ঞাসা করে,

'চাবুক না মেরে কি ওদের অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া যায় না?'

'না।' মাথা নাড়িয়ে হেসে জবাব দেয় লোকটি। তারপর 'কে'-কে বলল, 'আপনি ওদের কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। চাবুকের ভয়ে ওরা ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে কি তারা বলছে বা বলতে চায়। ধরুন এই উইলেমের কথাই।' উইলেমের দিকে সে আঙুল তুলল। 'ও ওর উচু কাজ পাবার যে কথা বলছে, তা কোনো কালেই ফলবে না দেখুন, ও কেমন মোটা। চাবুকের প্রথম মার ওর চর্বিতেই ডুবে যাবে। ওকে যাদের গ্রেপ্তার করতে পাঠান হয়, তাদের ব্রেকফাস্টও ও খেয়ে ফেলে। ও বোধহয় আপনার ব্রেক-ফাস্টও খেয়ে ফেলেছিল। অতএব আপনি

বুঝতে পারছেন, অতবড় যার পেট সে কোনো কালে চাবুকওয়ালা হতে পারে না। এ স্রেফ বাজে কথা।'

প্যাণ্টের বেল্ট খুলতে খুলতে উইলেম বলে, 'কেন, আমার মতন ত অনেক চাবুক-ওয়ালা আছে।'

'না'। চাবুকওয়ালা তার চাবুকটা উইলেমের পিঠের কাছে নিয়ে গেল। যাতে ও ভয় পায়। 'এসব কথা তুমি কেন শুনছ? নাও ঝটপট তোমার জামা-কাপড় খুলে ফেল।'

'আমি তোমাকে বেশ পুরস্কার দেব, যদি তুমি এদের ছেড়ে দাও।' চাবুকওয়ালার দিকে এক পলকও না তাকিয়ে কথাগুলো 'কে' বলল। এসব ব্যাপারে চারিদিকে বেশ সতর্ক হয়ে তাকাতে হয়। কথা শেষ করে সে তার পকেট-বইটা বার করল।

'তাহলে আমার বিরুদ্ধেও আপনি নালিশ করবেন। আমাকে চাবুক পেটা করাতে চান?'

'না না। একটু বিবেচনা করে দেখ। কাউকেই আমি মার খাওয়াতে চাই না। আমার মনের ইচ্ছা যদি তাই থাকত, তবে আমি তোমাকে টাকা দিতে চাইতাম না। ধীরে সুস্থে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতাম। তারপর চোখ কান বন্ধ রেখে এখান থেকে চলে যেতাম। কিন্তু তা' আমি চাই না। আমি এদের মুক্ত দেখে যেতে চাই। আমি যদি কোনোক্রমে জানতে পারতাম যে, এদের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে কস্মিনকালেও এদের নাম বলতাম না। আর বাস্তবিকপক্ষে ওয়ার্ডারদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না। আমার অভিযোগ হল বিচার বিভাগীয় সংস্থানের বিরুদ্ধে। উচ্চ কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে।'

'ঠিক বলেছেন।' ওয়ার্ডার দু'জন চেঁচিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের একটা আওয়াজ হল তাদের পিঠে। চাবুকের আওয়াজটা বেশ জোর। কিন্তু এটা নমুনা মাত্র।

চাবুকওয়ালা আবারও চাবুক চালাতে যাচ্ছিল। তার হাতটা নামিয়ে দিয়ে 'কে' জিজ্ঞাসা করল, 'যদি কোনো প্রথম শ্রেণীর জজের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগই করতাম তবে তাকে কি তুমি এভাবে পেটাতে? আর এটাও তুমি ভেবে দেখ, তোমাকে আমি শুধু একাজ থেকে নিবৃত্ত করছি না। ভাল কাজে উৎসাহ দেবার জন্য টাকাও দিচ্ছি।'

'আপনার কথা যুক্তিসংগত সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘুষ আমি নেব না। আমার কাজ শুধু অপরাধীদের চাবকানো। আমি তা-ই করব।'

ফ্রানৎস আশা করেছিল যে 'কে'র কথায় হয়ত কিছু হবে। তার সর্বাঙ্গে প্যাণ্টটা ছাড়া তখন আর কিছু নেই। তাও পা পর্যন্ত খোলা। সে এগিয়ে এবার দরজার কাছে এল। এতক্ষণ সে পেছনেই ছিল। 'কে'র কাছে এসে, তার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল:

'আপনি যদি আমাদের দু'জনকে ছাড়াতে না পারেন, তবে অন্তত আমাকে একাই এর হাত থেকে খালাস করে দিন। উইলেম বুড়ো হয়ে গেছে। তাই ওর বোধ বালাই তেমন নেই। তাছাড়া বছরখানেক আগে ওকে একবার পেটানো হয়েছিল। কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম অপমান! আমার নিজের কোনো দোষ নেই। ভাল কি খারাপ সব ব্যাপারে আমি উইলেমের শিক্ষা মেনে চলি। ও সবক্ষেত্রেই আমার গুরুদেব। আমার বান্ধবী, যাকে আমি ভালবাসি সে বেচারী ব্যাঙ্কের দরজায় এখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। এখন এর চেয়ে লজ্জাকর আর আমার কাছে কি থাকতে পারে। দুঃখে অপমানে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।' 'কে'র জামা দিয়ে সে চোখের জল মুছল।

'আমি আর দেরী করতে পারব না।' চাবুকওয়ালা চিৎকার করে ফ্রানৎসের সামনে বার কয়েক চাবুক ঘুরিয়ে নিল। উইলেম ভয় পেয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেছে। এত ভয় সে পেয়েছে যে, মাথা ঘুরিয়ে অন্য কোনদিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ ফ্রানৎসের এক ভয়ার্ত আর্তনাদ শোনা যায়। সেই স্বর এক সুরে বাঁধা। মনে হয়না কোনো মানুষের গলা থেকে এমন শব্দ বার হতে পারে। বুঝি বিক্ষত কোনো যন্ত্রের শব্দ। সেই চিৎকারে ও-বাড়ির বারান্দাগুলো কেঁপে উঠল। সমস্ত বাড়িটা যেন সেই আর্তনাদের গভীরে ডুবে গেছে।

'চিৎকার করো না।' জোরে জোরে 'কে' বলল। সে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যেখানে বেত খেয়ে ফ্রানৎস এল। সে তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়। খুব জোরে ঠেলা অবশ্য দেয়নি। কিন্তু ফ্রানৎসের পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। মার খাবার পর তার চেতনা ছিল না। ঠেলা খেয়ে সে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তবু তার নিস্তার নেই। সেখানেও তার পিঠে বেত পড়তে লাগল। সে সময় একজন কেরানীকে একটু দূরে দেখা গেল। তার কয়েক পা পেছনে আর একজন। 'কে' তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খোলা জানালাটার কাছে গেল। সেখান থেকে আদালত প্রাঙ্গনের সামনের অংশটুকু দেখা যায়। ফ্রনৎসের আর্তনাদ থেমে গেছে। কেরানী দু'জন যাতে আরো এগিয়ে না আসে তার জন্য 'কে' চিৎকার করে বলল,'

'এখানে আমি।'

তারাও চেঁচিয়ে জবাব দিল। 'গুড ইভিনিং। এ্যাসেসর বাবু। এখানে কিছু হয়েছে নাকি?'

'না না। একটা কুকুর বোধ হয় বাইরে চিৎকার করছিল।' তবুও কেরানী দু'জন যাচ্ছে না দেখে 'কে' আবার বলল। 'যান, আপনারা এখন, আপনাদের কাজে যান।' অন্য কথা পাছে আবার তাকে বলতে হয়, তাই সে জানালায় ঝুকে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে সে আর তাদের দেখতে পেল না। তবু সে জানালার কাছ থেকে চলে এল না। ময়লা রাখার ঘরটায় যাবার তার আর ইচ্ছে নেই। এমনকি বাড়ি ফিরে যাবার কথাতেও মন তার সায় দিতে চায় না। আদালতের সামনে ছোটো চৌকো এক টুকরো মাঠ। তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে। মাঠটুকুকে ঘিরে চারপাশে বিভিন্ন অফিস। সেখানে জানালাগুলো যেন অন্ধকার। কিন্তু সবচেয়ে উঁচু জানালার সার্সিতে চাঁদের আলোর রেখা একটু লেগেছে। 'কে' তবু তার দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে মাঠের দিকে তাকায়। অন্ধকারের মধ্যে সে দেখতে পেল এক কোণে কতকগুলো ছোট ছোট নুড়ি জমা করে রাখা হয়েছে। তার অশান্ত মনকে একই কথা নাড়া দিচ্ছে। সে চাবুকওয়ালার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারল না। কিন্তু সে ত' এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী নয়। ফ্রানৎস যদি ওভাবে আর্তস্বরে চিৎকার করে না উঠত, তবে সে হয়ত চাবুকওয়ালাকে নিবৃত্ত করবার জন্য অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারত। একথা সে মানে, চাবুকের সামান্য আঘাতও অত্যন্ত সাংঘাতিক। কিন্তু সমস্যার সামনে নিজেকে সকলেরই একটু সংযত রাখা উচিত। আদালতের নিম্নপদস্থ সকলেই যদি বদ হয়, তবে আর একা চাবুক-ওয়ালাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া 'কে' লক্ষ্য করেছে ব্যাঙ্কের নোট দেখে তারো চোখ লোভে জ্বল জ্বল করে উঠেছিল। একটু বেশী টাকা পাবার জন্যই হয়ত সে ওসব ঐকান্তিক আনুগত্য দেখায়। কিন্তু 'কে' শুধু ওয়ার্ডার দুজনকে মুক্ত করতে চায়। সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে যখন তার অভিযান, তখন এদের মুক্ত করাও তার কর্তব্য। কিন্তু ফ্রানৎসের চীৎকারের পর থেকে সব অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কে' ডেসপাচের কেরানী দু'জনকে আগে ছুটি দেয়নি। এখন তারা এবং অন্য কেউ এসে তাকে ময়লা রাখার ঘরে এই তিনজনের সঙ্গে একত্র দেখে আশ্চর্য হবে। কিন্তু এমন এক দৃশ্যের অবতারণায় তার কোনো অংশ নেই। এদের জন্য কোনো আত্মত্যাগ করতে কেউ তাকে বলেনি। আর যদি সে আত্মত্যাগই করতে চেয়েছিল তবে অমন পন্থা কেন। তার উচিত ছিল, নিজের পোষাক খুলে দাঁড়ান। ওদের বদলে তার পিঠে চাবুক মারতে বলা। একথাও ঠিক, চাবুকওয়ালা এমন এক বিকল্প প্রস্তাবে কোনক্রমেই রাজী হত না। কিন্তু তবু সে অন্তত তার কর্তব্যবোধকে তুলে ধরতে

চ্যুতি নয়। কারণ তার মামলা যতদিন চলবে ততদিন আদালতের কোনো কর্মচারীই তার গায়ে হাত তুলতে পারবে না। যদিও এখানকার বিধিনিয়ম স্বতন্ত্র হতে পারে। সে সব সময়ে দরজা বন্ধ করেছে। কিন্তু তার ফলে বিপদের সম্ভাবনা দূরে হয়নি। শেষ মুহূর্তে ফ্রানৎসকে ওভাবে ঠেলে ফেলে দেওয়াটাও কি লজ্জার ব্যাপার নয়?

তখনো সে সামান্য দূরে কেরানীদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে। সে আর তাদের দৃষ্টি তার দিকে ফিরিয়ে আনতে চায় না। জানালাটা এবার সে বন্ধ করে দিল। মৃদুপায়ে হেঁটে বড় সিঁড়িটার মুখে এসে দাঁড়াল। ময়লা রাখার ঘরটার সামনে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কান পাতল। কিছু শোনা যাচ্ছে না। সব কিছুই কবরখানার মত স্তব্ধ। চাবুকওয়ালাটা বোধহয় এতক্ষণ ধরে ওদের ভূত তাড়ানোর মার মেরেছে। আর ওয়ার্ডার দুজন একান্তভাবে তার শক্তির প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। তার অজান্তেই তার হাত দরজার আগল ধরবার জন্য এগিয়ে গেল। লক্ষ্য পড়তেই হাতটা সরিয়ে নিল সে। তাদের আর এখন সাহায্য করবার কোনো মানে নেই। এই মুহূর্তে অন্যান্য কেরানীরা এসে পড়বে। তবু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল এ বিষয়টির ক্ষমতানুযায়ী উপযুক্ত তদ্বির সে করবে। খুঁজে বার করবে আসল অপরাধীদের। যারা অফিসারদের মত মুখ দেখাতে সাহস করছে না। ব্যাঙ্কের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সে চারিদিকের লোক-জনকে তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার চারিদিকেও সে চোখ ফেরালো। কিন্তু কোনো মেয়েকে সে অপেক্ষা করতে দেখতে পেল না। অতএব বোঝা যায়, ফ্রান্ৎস তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তার বান্ধবীর কথা একটা বানানো গল্প মাত্র। একটা মেয়ের গল্প সাজিয়ে সে শুধু 'কে'র অতিরিক্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল।

তার পরের সমস্ত দিন 'কে'র মাথায় যেন ওয়ার্ডারদের ভূত চেপে রইল। কাজে তার মন নেই। বারে বারে কাজের বাইরে তার মন উধাও হয়। কাজ শেষ করতে তাই তার আগের দিনের চেয়েও বেশীক্ষণ অফিসে থাকতে হল। অফিস থেকে ফেরবার পথে আজো সে ময়লা জিনিসপত্র রাখার ঘরটার সামনে এসে উপস্থিত হল। মনে তার আবার আগের দিনের কৌতূহল। দরজাটা না খুলে যেন সে আর পারে না। কিন্তু একি দেখল সে। ভেবেছিল ঘরটা এখন অন্ধকার। কিন্তু মোটেও তা' নয়। সে দেখতে যা পেল তাতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘরটা ঠিক আগের দিনের মতই আছে। চৌকাঠ পেরিয়ে একগাদা শূন্য কালির বোতলের স্তূপ। তার মধ্যে কয়েকটা পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক তাড়া পুরনো কাগজের ফাইল এক পাশে বিক্ষিপ্ত। একটা মোমবাতি বুককেসের ওপর জ্বলছে। ঘরের মধ্যে চাবুকওয়ালা এবং ওয়ার্ডার দুজন আগের দিনের মত পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠল। দেখুন, দেখুন!'

মুহূর্তমাত্র আর 'কে' সেখানে দাঁড়াল না। দরজাটা দুম করে বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর হাত দুটো চেপে ধরল। ওর ভাব দেখে যেন মনে হয় যেন এর ফলে দরজাটা নিশ্চিতই বন্ধ থাকবে। কেরানীরা তখন শান্তভাবে বসে কাজ করছিল। 'কে' যেন কাঁদতে কাঁদতে তাদের কাছে দৌড়ে এল। তাকে দেখে তারা অবাক।

'কে' চীৎকার করে বলল: 'আপনারা কি ময়লা রাখার ঘরটা পরিষ্কার করতে পারেন না? ধুলোয় যে আমাদের প্রায় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম"

কেরানীরা তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, পরের দিন ওটা তারা পরিস্কার করার ব্যবস্থা করবে। 'কে' ঘাড় কাত করল। এমন সময় এ নিয়ে আর তার চাপ দেবার ইচ্ছা হল না। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। এখন আর এসব কাজ করানো চলে না। কিন্তু আগে সে ভেবেছিল, তৎক্ষণাৎ ওটা পরিস্কার করিয়ে ফেলবে। সে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তাদের গল্প সে এখন চায়। কিন্তু তা সে প্রকাশ করতে রাজী নয়। কতকগুলো নকল তাই পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিল সে। যেন সে তাদের কাজের তদারক করছে। কিন্তু কেরানীরা তার সঙ্গে বেরুতে সাহস করছে না। অগত্যা সে একাই বাড়ী ফিরল। সে নিত্রস্ত, শ্রান্ত। সমস্ত মন যেন তার ফাঁকা হয়ে গেছে

(ক্রমশঃ)



খুন করে নয়, ফাঁসি মকুব হয়ে না, অগ্নিযুগের দাদাগিরির দৌলতেও নয়—দ্বীপান্তর ছিলো আমার অদৃষ্টে। কপালের ফেরে আন্দামানে যেতে হলো আমার……কোনো ফেরেববাজি না করেও……

এই তো সেদিন—দেশ স্বাধীন হবার কদিন পরে…রবীন সেন বাত্যাতাড়িত হয়ে এলো ঢাকার থেকে। এসে, না থেমেই, সেই বন্যার মুখে কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়—ধারণাতীত তাড়ায়—আমার আন্দাজের বাইরে—একেবারে আন্দামানে।

সে বল্লে, না ভাই, আর এই সভ্যতার পাপ সংস্পর্শে নয়। কলিযুগের এই কলুষতা—বিংশ শতাব্দীর এই বিষ—এই সভ্যতা, এই সংঘাত, এই সংকটের থেকে এসো আমরা সুদূরপরাহত হয়ে যাই। রাজধানীর এত সব হানাহানি আর কেন? নাগরিক জীবনের ঐ আঁচ থেকে এসো আমরা পালিয়ে যাই—চলে যাই—দূরে—অতি দূরে অন্য কোথাও। আর কোথাও।

"নাগরিক জীবনের কথা বলচো? কিন্তু এখানকার এই জীবনের মান—" বলতে যাই আমি।

"জীবনের মান? মান আছে, কিন্তু মর্যাদা কই? হাই স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর কথা তুমি তুলচো? কিন্তু এই মানদণ্ডেই তো এর প্রাণদণ্ড হয়েচে ভাই, টের পেয়েচো সেটা? জীবনের মান নয়, জীবনের মানে। তাই খুঁজতেই বেরুনো যাক্ এবার।"

রবীন সেন যে ভাবে, আমার ভাষায় আমাকে পরাস্ত করলো তারপর আস্ত থাকা গেল না আর। কালাপাণি পার হতে হোলো তার সঙ্গে।

জীবনের মানে টের পেতে আন্দামানে এসে পৌঁছলাম।

পোর্ট ব্লেয়ারে পা দিয়েই থামলো রবীন। সে বল্লে—আরে রাম! এতো দেখছি আধা



আরামের শহরবাস থেকে রামের বনবাস

শহর। যুদ্ধের মরশুমে ইয়াঙ্কিদের দৌলতে ফুলে ফেঁপে সভ্যভব্য হয়ে উঠেচে। না ভাই, এখানে থাকা পোষাবে না আমাদের। নির্জন জায়গা দেখতে হবে একটা।

"দ্যাখো, কবিগুরু বলেছেন বটে 'হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোনোখানে' কিন্তু তার মধ্যে কি বন্য কোনোখানের ইঙ্গিত ছিলো? তাছাড়া, তুমি ভুল করছো…" বলে' আমি ওর প্রুফ্ সংশোধন করি—"তুমি রবিন্‌সন্ নও, রবীন সেন।"

"রবিন্‌সন্ ছিল না কোনোদিন, ওটা গল্পকথা। তবে এইবার থাকবে। এই রবীন সেনই ক্রুসো হবে, তুমি দেখে নিয়ো।" আমার কথায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লো।

আন্দামানের গা-লাগাও কিন্তু ছোটখাট দ্বীপ ছড়ানো। সেই দ্বীপপুঞ্জের পরিধি কোনোটার বিশ মাইল, কোনোটার বিয়াল্লিশ। কিন্তু ওসার কম বলে' কি অসার বলে' কে জানে, এখনো সে সব অঞ্চলে জনপ্রাণীর আমদানী হয়নি। সেই অচলিত সংগ্রহের একটাকে বেছে নিয়ে খুঁটি গাড়লাম আমরা। গলা বাড়ালাম আমার ক্রুশকাঠে—রবীন সেনের ক্রুশোত্বের পরাকাষ্ঠায়।

শুরু হোলো আমাদের নির্বাণদশা। সভ্যতার শূন্যলোকে অক্ষুণ্ণ শান্তির জীবন। জীবন্দশায় মোক্ষলাভ। জীবনের মোক্ষম্ চোট্।

রোজ সকালে উপলাহত ঢেউয়ের কলস্বরে আমাদের ঘুম ভাঙে। সূর্যের মুখ দেখে আমাদের বউনি, সকালের রোজগার। শুষ্ক ঘাসের শয্যা ছেড়ে তুড়ি লাফ মেরে উঠি। খড় বাঁশ দিয়ে যে-ঘর আমরা বেঁধেছিলাম—তার মধ্যে খড় ছিলো, কিন্তু খড়খড়ি ছিল না। কিন্তু না থাক্ গে, বিছানায় বসে সমুদ্র দেখার বাধা ছিল না একটুও। কেননা, ঘরের মাথায় ছাউনি উঠলেও, কোনো দেয়াল খাড়া হয়নি তখনো।

বিছানা ছেড়ে সটান্ সমুদ্রে গিয়ে পড়তাম। সেই ছোট্ট দ্বীপের মুঠোয় সমুদ্র তার গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেকে গলিয়ে অতি ছোট্ট এক উপসাগর গড়েছিল। বৃহদাকার না হলেও, হ্রদাকার সেই সামুদ্রিক গলিতে সমুদ্রের সুবিধা ছিল, কিন্তু দাপট ছিল না একটুও। বঙ্গোপসাগরের বড় রাস্তায় পা বাড়াতে যারা নারাজ (যেমন আমি), মনে হয়, সেই সব ভয়-পেছলাদের জন্যই বিধাতা বিরলে বসে জল-পথেও যেসব গলিঘুঁজি বানিয়েছেন এটি তার অন্যতম।

সমুদ্রস্নান সেরে আমরা কোদাল নিয়ে পড়ি তারপর। সেইটেই আমাদের সকালবেলার পড়া। নিজের ফসল নিজেই ফলাও—তার প্রথম পাঠ। একটুখানি জমি কুপিয়ে সংসার করে শাকসব্জি গাজর ভুট্টা-ফলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরো জমিদের কোপান্বিত করে তরিতরকারির উচ্চ স্তরে কলামুলোর ফলাকাঙ্ক্ষায় এগুবার কল্পনা ছিলো আমাদের।

ভুট্টার চাষে দুজন খোট্টা আমাদের সাহায্য রতো। কিছুদিন আগে পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে বীন নিয়ে এসেছিল তাদের। কালাপাণির াসামী—বকেয়া কয়েদী দুজনা। জেলের াটনি খতম্ হবার পরেও থেকে গেছল ান্দামানে, নিজের মুলুকে ফেরেনি। নাগরিক ীবনের আওতায়, সভ্যতার ছোঁয়াচে ফেরৎ াতে রাজি হয়নি বোধ হয়। আদর্শ সাকরেদ্ ান করে তাদেরকে বেছে এনেছে রবীন। নেক বাছবিচার করে এক দ্বীপান্তর থেকে ারেক দ্বীপান্তরে নিয়ে আসা ওদের।

আজকাল জমি কোপানের তাল ওরাই মিলায়, আমরা তালগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম রি। মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ি, হুকুম ছাড়ি ার গলার—ওতেই হয়। এরকমের জীবন-াপন মন্দ না। শহরের অ-বিশ্রাম অশান্তির াকে এখানকার অবিশ্রাম শান্তি, একেক সময়ে ির্বিষহ বলে ঠেকলেও, ক্রমেই বেশ ভালো াগে। নবদাম্পত্যের মতই, সবকিছুই গা-সওয়া য়—হয়ে যায় এককালে।

তবে অসুবিধা আছেই। মাঝে মাঝেই খা দেয় নানারূপে—অভাবিতভাবেই। প্রকৃতি-তার স্তন্যদানে কি লালনপালনে কার্পণ্য না কলেও প্রকৃত মতি বুঝে ওঠা দায়। এক ক সময় মনে হয়, মাতৃস্নেহ নয়, জামাতৃস্নেহ া নয়ই, মাতা-প্রকৃতির যেন বিমাতার প্রকৃতি। াই সময়ে সভ্যতার পুনর্মুষিক হয়ে শহুরে-শুড়ির জামাই আদরে ফিরে যাবার জন্যে াটা ছট্‌ফট্ করে।

করে বেশির ভাগ আমারই।...একদিন আর ামি থাকতে পারি না। সকালের জলকেলির কে বলে ফেলি ওকে—"দ্যাখো রবীন, মাদের যেন একটু আদিখ্যেতা হচ্ছে। ড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে রোজই। এতটা না রলেও চলে। শহরে নাই বা গেলাম, নাই বা াম শহুরে, কিন্তু সেখান থেকে একালের িনিসের এটা সেটা এখানে আনলে মহাভারত চ্ছু অশুদ্ধ হয় না। তাতে সভ্যতার স্পর্শেও যেতে হয় না, নাগরিকতার লেশ-াত্রও লাগে না গায়, সরল জীবন আর সমুচ্চ ন্তার হানিও হয় না একটুও—অথচ বেঁচে কার আরাম বাড়ে।"

"যথা?" রবীন আমাদের সর্বদাই যথাযথ। সময়েই সে উদাহরণের মুখাপেক্ষী।

"অযথা বলছিনে।" বলে যথারীতি নিবেদন রঃ "মনে করো গোটাকতক মুর্গি নিয়ে ল পোর্টব্লেয়ার থেকে—যেখান থেকে ঐ ধুদের এনেচো। মুর্গিরা কিছু সভ্যভব্য । কিন্তু ডিম পাড়ে। ডিম কিছু সভ্যতার িডিম্ নয়। গভীর জঙ্গলেও পাড়া যায়—াকুক্কুটেরা পাড়েন। মুর্গির সঙ্গে একটা াইমাস্ স্টোভও আনলে না হয়। আর নুষাঙ্গিক কিছু মাখন টাখন। সকালে নেয়ে উঠে অম্‌লেট খাওয়াটা মন্দ কি? খালি খালি গাজর চিবিয়ে কী হয়?"

"গায়ের জোর বাড়ে।"

"আমার জ্বর আসে গায়। আমি বলি কি, দরকারী দু'একটা টুকিটাকি জিনিস এখানে নিয়ে এলেও এ জায়গা কিছু রাতারাতি শহর হয়ে উঠবে না।"

"সুতানটির থেকে কি করে কলকাতার সূত্রপাত হয়েছিলো তুমি জানো?"

"জানিনে; ঐতিহাসিক নটিনেসের কত-টুকুই বা জানি! তবে একথা আমি বলতে পারি যে আমরা দুজনে মিলে যত চেষ্টাই



সূর্যই রোজকার রোজগার

করি না কেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপকে কিছুতেই কলকাতা বানিয়ে তুলতে পারবো না। আমাদের এ-জীবনে নয়, এক পুরুষে তো নয়ই। আমাদের দু' পুরুষেরা কম্মো না। হলফ করেই তা বলা যায়।"

"তা ঠিক। কিন্তু ক্রমেই তুমি তাও চাইবে। সেই দিকেই ঠেল্‌চো বলে মনে হয়। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছেদ আনবে শেষটায়।" বলে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"তার মানে?"

"তার মানে—দু' পুরুষের কম্মো নয় বলচো যখন—তুমি জানো না? তারপরেই তুমি আনাতে চাইবে কোনো এক নারীকে।"

"আনাড়ির মতন বোকো না বাজে।"

"আর, একটা নারী হলেই সব হয়। ষোলোকলা পূর্ণ হয়—সর্বনাশের কিছুই আর বাকী থাকে না। সভ্যতা সমাজ সব তখন আসে আপনা থেকেই। শহর গড়ে ওঠে, সংঘাত লাগে। দুই পুরুষের মাঝখানে এক নারী—বাবা, তার চেয়ে সাংঘাতিক আর কিছুই হতে পারে না। সুন্দ-উপসুন্দর উপাখ্যান তোমার অজানা নয় নিশ্চয়?"

সে মহাভারত এনে ফ্যালে। আমি ভারতের দিকে ফিরি—"তেমন দুর্ঘটনা যদি বাধে, বেশ, আমি দেশেই ফিরে যাবো। এক নারী আর এক পুরুষই না হয় থাকবে এখানে।"

"তাতেই কী বাঁচোয়া? তাই-তো ছিলো হে সবার গোড়ায়—ইডেন উদ্যানে—আদম আর হবা। তাই থেকেই তার পর যা হবার সবই তো হোলো। সবাই হলাম। হোলো সব-কিছু। আজকের এই কোটি কোটি মানুষ এলো কোথ্থেকে শুনি? সেই এক কটিতট থেকেই না?" মহাভারতেরো আগেকার আদিমপর্ব টেনে আনে রবীন—"সেই প্রথম আদম্‌সুমারির থেকেই তো আজকের এই মহামারি। ভারতের ত্রিশকোটি, চীনের যাট—আর তারপরে অধুনা এই কোরিয়ার লড়াই। কি করিয়া শুরু হোলো একবার ভেবে দ্যাখো ভাই।"

আমি আর ভাবতে পারি না, পাগল হয়ে যাই।

জেলোডিঙির মতন একটা আমরা পেয়ে-ছিলাম। সেইটেয় করে মাঝে মাঝে রবীন পোর্টব্লেয়ারে যেতো—নুন মশলা ইত্যাদি আনাজপাতি আনার জন্যই। আর ফিরে আসতো কোনোবারে কোরিয়া, কখনো বা অ্যাটম্ বোমার খবর নিয়ে।

এবার গিয়ে কী মতি হোলো ওর কে জানে, অ্যাটম্ বোমায় পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনাতেই কি না, বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবদের বাঁচাবার মৎলবেই হয়ত ফিরে এলো গোটাকতক মুর্গি নিয়ে। আর, সেই সঙ্গে একটা সেকেণ্ডহ্যান্ড স্টোভও। আরো আশ্চর্য, সভ্যতার আরেক বাহনকে অযাচিত সাথী করে আনলো সে, ভারতীয় চা নিয়ে এলো না চাইতেই।

বাস্, আর আমাদের পায় কে তখন? যে-জীবন ঢিমিয়ে পড়েছিলো ডিমিয়ে উঠলো মুর্গিদের সৌজন্যে। চান্‌কে উঠলো চায়ের সৌরভে। চাঙ্গা হয়ে উঠলো দেখতে না দেখতে। চাখতে না চাখতেই।

চায়ের কথা বলতে পারি নে, সোমরসের আধুনিক সংস্করণ কিনা পণ্ডিতেরাই জানেন, তবে বিচার করে দেখলে, ব্রহ্মাডিম্বের পরেই বিধাতার সেরা আমদানী বলতে হয় এই মুর্গির ডিম। ব্রহ্মাণ্ড থেকে এ জিনিস বাদ দিলে দুনিয়ায় যা থাকে তা অশ্বডিম্ব। তাকে শুধু উদরের শূন্য পূরণই বলা যায় (জীবনের শূন্য পূরণও বলতে পারেন)। এই ডিম্ব,

আহা, অখণ্ডমণ্ডলাকারের খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি —এই অন্ডরূপান্তর। পরাৎপরের পরমাত্মীয়তা, পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা এই ডিম। জিভে দয়ার চরম পরখ।

তারপর দিনকতক কাটলো বেশ আরামেই। মুর্গির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে উঠেই ডিম ভাঙি। অমল প্রভাতের সাথে সাথে অম্‌লেটের দেখা মেলে হাতে হাতেই।

জীবনকে সহনীয় বলেই মনে হয়। এমন কি, এই দ্বীপান্তর বাসও এক এক সময়ে উপাদেয় ঠ্যাকে। রমণী ছাড়াও রমণীয় ভ্রম হয়।

ইতিমধ্যে একদিন, ঘুম ভাঙতেই, আমি মুর্গিদের চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। রবীনকে ডেকে দেখালাম, আমার ঘাসের বিছানার পাশে একটা বিছা। আমার পাশাপশি শুয়ে রাত কাটিয়েছেন বাছাধন!

"কাঁকড়া বিছে।" রবীন বললে।

"কাঁকড়াই হোক্ আর কাঁকড়ই হোক্—এ কিছু সরকারী রেশন্ নয় যে ঘাড় পেতে নিতে হবে। বরদাস্ত করতে হবে মুখ বুজে। নাঃ, আজকেই আমি শহরে যাবো, নিজেই যাবো ডিঙি চালিয়ে বুদ্ধুদের নিয়ে, নিয়ে আসবো চৌকি চেয়ার টেবিল। লেপ আর তোষক।"

"আনবে আনো, কিন্তু মনে রেখো এই-ভাবেই সভ্যতার নাগপাশে বন্ধ হচ্ছো, সেঁকোবিষ ঢোকাচ্ছো শরীরে। নাগরিকতার আবর্জনা এনে জমাচ্ছো এখানে।"

"জমছে জমুক। জমা খরচের হিসেব আমার। সভ্যতার যমালয় আমার; তোমার জন্য নয়। আমি চৌকিতে শোবো আজ থেকে, মাটিতে শুয়ে পোকামাকড়ের চৌকিদারি করা আমার কম্মো না। তুমি না হয় জমিদার হয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থেকো, তোমার বিছাদের নিয়ে আরামে।"

"চৌকিতে শোবে? শোবে তুমি, আমাকে মাটিতে ফেলে রেখে? পারবে?"

"আলবৎ। চৌকিতে তো শোবোই, লেপও গায়ে দোবো তার ওপর। তোমাকে আর ওসব আবর্জনায় জড়াবো না আমি। সভ্যতার প্রলেপ একাই সইবো কষ্ট করে।"

"বেশ।" বলে' ও গুম্ হয়ে থাকে। আমি বুধ আর বেহপ্পেৎ-টাকে নিয়ে ডিঙি মেরে বেরিয়ে পড়ি।

(বুধ আর বেহপ্পেৎ—চাকর দুটোর এই নতুন নামকরণ করেছিল ও-ই। রবিন্‌সনের ছিলো ফ্রাইডে আর আমাদের রবীন সেনের এই বুদ্ধু আর বৃহস্পতি।)

শহরে গিয়ে বিছানাপত্র তো নিলামই, সব আগে কিনলাম একটা ল্যাম্প্। এখানে এসে সন্ধ্যার পরে পড়াশোনার পাট বন্ধ হয়েছিল। সূর্যি ডুবলেই অন্ধকার, আর সন্ধ্যা হলেই শুতে যাওয়া। বাতি নেই, সারা রাতই শুয়ে থাকা, নভেলপড়া নাস্তি! বাধ্যতামূলক শোয়া—তার মতন অসোয়াস্তি আর হয় না।

আলো ছাড়াও আরেকটা জিনিস কেনা গেল। রবীনকে না জানিয়েই কিনলাম। আধুনিক মেকারের অল্‌ওয়েভ্ এক রেডিও সেট্—সেই সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক্‌বেল্ একটা।

রেডিও চালাবার জন্য ডাইনামো কেনা হোলো—তার সাথে পেট্রল ইঞ্জিন্ ইস্পাতের ফ্রেমে বসানো—পাওয়া গেল একেবারে রেডি।



সামুদ্রিক লম্ফ-ঝম্প!

গত যুদ্ধের বাড়তি আমেরিকানদের ফেলে যাওয়া কতো জিনিস যে পড়েছিলো! কিছুরই অভাব ছিল না পোর্টব্লেয়ারে। লোহার ফ্রেমের খাটও নিলাম দুখানা—দু' সেট্ বিছানা। জানি রবীনের লোভ নেই, তবু তারো যেন কোনো ক্ষোভ না থাকে। সব নিয়ে আমাদের ছোট্ট ডিঙিতে কুলোলো না, বলাই বাহুল্য! মালবাহী একটা বড়ো নৌকা ভাড়া করে আনতে হোলো আবার।

ফিরে আসতেই রেডিয়ো সেট্‌টা রবীনের নজরে পড়লো, দেখে যেন ক্ষেপে গেল সে। সমস্তই সে টান্ মেরে সমুদ্রগর্ভে ফেলে দেয় আর কি! অনেক কষ্টে সভ্যতাকে জলাঞ্জলির হাত থেকে বাঁচালাম।

"এই যে তুমি শহরের আবহাওয়া টেনে নিয়ে এলে এখানে, দেখো এর ফল কী হয়। বেশ জানি, তুমি এখানেই থামবে না—" মুখ-গম্ভীর করে' ও জানায়—"একদিন তুমি সিনেমাও আনাবে। নিয়ে এসে খাড়া করবে এই খোড়ো ঘরের পাশটায়। কী সর্বনাশটাই যে হবে!"

"মাভৈঃ! কথা দিচ্ছি তোমায়—অদ্দূর আমি এগুবো না।" অভয় দিয়ে ওকে উৎফুল্ল করতে আমি চাই ঃ "এই বিজন বিভুঁয়ে আমাদের চিত্তবিনোদনের খাতিরে যেটুকু দরকার তার জন্য এই রেডিয়োই ঢের। আর, এর দ্বারা, তুমি ভেবে দ্যাখো, সভ্যতা আমাদের মোটেই চালিত করছে না, বরং আমরাই সভ্যতাকে চালাচ্ছি। সভ্যতার ক্রীড়নক না হয়ে সভ্যতার সঙ্গে ক্রীড়া আমাদের। সভ্যতা আমাদের কাহিল করতে পারছে না একটুও, উল্‌টে সে-ই এখানে কাবু। রেডিয়ো কমানো-বাড়ানো, খোলা, বন্ধ করা—আমাদের ইচ্ছে। ওর চাবি আমাদের হাতে।"

রবীন কিছু বলে না, খালি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

আমি ডাইনামো বসাই। পেট্রল-ইঞ্জিনটাকে এনে পাড়ি খোড়োঘরের পেছনটায়। উঁচু করে এরীয়াল্ খাটানো হয়। ইলেক্‌ট্রিক্ জেনারেটর খাড়া হলে বিদ্যুতের তার টানা হয়—টেনে নিয়ে যাই শোবার ঘরে। ল্যাম্পের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগসূত্র স্থাপিত করি। তারপরে আরেকটা তারকে তারিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সমুদ্রের ধার বরাবর—যেখানে আমরা জলকেলি করি সকালে। আমাদের ঘরের পাশের উঁচু টিলার ওপরে থাকে তারের একধার, তার সাথে সুইচ্; আর অন্যধারে, সমুদ্রের ধারেই, লাগানো হয় ইলেক্‌ট্রিক্ বেল্‌টা।

"এই বেল্ কেন এখানে?" স্নানযাত্রায় এসে রবীন জিগেস করলো আমায়।

"আমরা এখানে চান্ করি তো।" আমি জবাব দিলাম।

"এর পর কি তাহলে আমরা ঘণ্টা ধরে চান্ করবো? না কি, ঘণ্টা বাজিয়ে?"

"না, তা নয়।" নিজের পুরো কীর্তি আমি প্রকাশ করিঃ "আমার ধারণা এই সমুদ্রে হাঙর আছে। সব সমুদ্রেই থাকে। বঙ্গোপসাগরেও তার ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়। সেই হাঙরদের এক আধটা hungry হয়ে কখনো ছুট্‌কে এই সামুদ্রিক গলির মধ্যে এসে সেঁধুতে পারে। যদিও গলির মুখ খুব সংকীর্ণ তাহলেও একটা হাঙরের গলবার পক্ষে—গলা বাড়াবার পক্ষে—যথেষ্টই। আমরা যখন চান্ করি তখন দেখেছি বুদ্ধুরা ঐ টিলার ওপর বসে থাকে। বসে বসে দ্যাখে আমাদের লম্ফ ঝম্প। ওখান থেকে এই জলপথের গলির মুখ অব্দি দিব্যি দেখা যায়। জলও তো এখানকার বেশ পরিষ্কার। যদি হঠাৎ কোনো হাঙর ঢুকে পড়ে ওদের চোখে পড়বেই। আর তক্ষুণি ওরা

ইচ্ টিপে ঘণ্টা বাজিয়ে সাবধান করবে মাদের। ঘণ্টাধ্বনিতে সারা সৈকত জুড়ে ড়া পড়ে যাবে। তবে হাঙ্গর ব্যাটা ভয় য়ে নাও যদি পালায়, যথাসময়ে সতর্ক হতে লে আমরা তো পালিয়ে আসতে পারবো— াণ বাঁচাতে পারবো আমাদের।" নিজের ীর্তিকাহিনীতে নিজেই ফুলে ডগমগ হই।

এতক্ষণে রবীনের মুখে একটু হাসি দেখা য়—"হ্যাঁ, একটা বুদ্ধির কাজ হয়েছে বটে। নে, বুদ্ধুরা এটা পারলে হয়।"

বুদ্ধুরা পারে। ঘণ্টা বাজাতে তাদের রে হয় না। ভারী আমোদ পায় বাজিয়ে। টায় ঘণ্টায় বাজায়—যখন তখন—যখন কোথাও নো বিপদের চিহ্নমাত্রও নেই তখনো। আর ন বাজায় না, তখন কান খাড়া করে রেডিয়োর না শোনে। অল ইন্ডিয়া বেতারের গান, না, নাটকে পালা, খবর বলা—সব কিছুতেই দর কান। হিন্দি অনুষ্ঠান হলে তো কথাই , বাঙলাও বাদ দেয় না।

খাসা কাটে দিন। নগরজীবনের নাগর- লার বাইরে, নাগরিকতার গরল লেশমাত্র টেস্ট্ করেও কাটে বেশ। সভ্যতার গ আড়াআড়ি করেও কোনো অসুবিধা নেই। ব নেই কোনো। দিব্যি কাটাই।

কিন্তু প্রকৃতির প্রতিহিংসা বলে তো একটা ছই! সভ্যতাও প্রকৃতির মধ্যে—সভ্য তির মধ্যেই। সভ্যতাও একদিন হিংস্ররূপ এসে আক্রমণ করলো—করলো আমাকেই ার—অতর্কিতভাবে—অসভ্যের মতন!

একদিন বিকেলে গরম বোধ করে সমুদ্রের নেমেছি। সাঁতার কাটছি মনের স্ফূর্তিতে.



আইনের বেপরোয়া

এমন সময়ে অনতিদূরে হাঙ্গরের মতন কী যেন দেখা দিলো। হাঙ্গরই তো! তীর্যক নেত্রে তাকিয়ে দেখলাম। আরো দেখলাম, সেটা তীরবৎ বেগে এগিয়ে আসছে—আমার দিকেই।

তারপর আর তাকালাম না। পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে ছুটলাম তীরের দিকে। পঞ্চাশ গজ সাঁতার-বাজির রেকর্ড রেখে কিনারায় উঠে হাঁপাচ্ছি যখন, দেখতে পেলাম রবীনকে। হাসতে হাসতে আসছে সে।

রবীন আমাকে হাঙ্গরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দেখেছিলো। তাকে বেশ খুশি দেখা গেল।

"সভ্যতার ক্রীড়নক না হয়ে সভ্যতার সঙ্গে ক্রীড়া করা এতদিনে সার্থক হোলো আমাদের।" সহাস্য মুখে সে বললো।—"আরেকটু হলেই সব লীলাখেলা শেষ হয়ে যেত। পুরোপুরি হোলো না যে, এই দুঃখ।"

"মানে? তার মানে?" আমি চটে উঠি—"ইলেকট্রিক্ জেনারেটরটা কি অচল হয়ে পড়েছে? বেলের আওয়াজ পেলাম না কেন?"

"বেল পাকলে কাকের কী? থাকলেই কি, না থাকলেই বা কী! ডাইনামো চলছে ঠিকই, তবে ডাইনরা নেই। চম্পট দিয়েছে একটু আগে। কার বেল্ কে বাজায়?"

"তবে বেল্ বাজলো না কেন? হতভাগা-গুলো গেল কোথায়?" আমি আরো স্বর-গরম হই : "বুদ্ধুচাকরগুলো গেল কোথায় আমাদের?"

"আর কিছু নয় ভাই, সভ্যতার এই সংকট। ছুটি নিয়েছে তারা।"

"ছুটি নিয়েছে! কে ছুটি দিলো? তুমি?"

"আজ্ঞে না। গতকাল বেতারের হিন্দি ভাষণে তারা জেনেছিল বিহারী সরকারের আইন জারি। বাড়ির চাকরবাকরের জন্যে তাদের গভর্নমেন্ট যে বিল্ পাশ করেছেন তার খবর পেয়েছে তারা। মাস মাস মোটা মাইনে, রোজ আট ঘণ্টার মোট খাটুনি, আর শনিবারের আধ-বেলা কামাই। আজ শনিবার না? তারা নিজের থেকেই ছুটি নিয়েছে আজ বিকেলে। আমাকে না জানিয়ে—আমাদের পরোয়া না করেই! সরকারী পরোয়ানা যে!"

প্রসন্ন ভোর

সঞ্জীবকুমার চৌধুরী

যদি কোন দীপ্ত ভোরে যাত্রা করো,
ওপারের গ্রামে যাবে বলে
শিশিরের টিপপরা ফসলের আলপথ দিয়ে;
শ্রীমতী নদীর বুকে পাখামেলা কয়েকটি তরী
সমুদ্রের অনুভব করে।

যদি, হরিণনয়না মেয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়
হৃদয়ের আরো কোন অন্ধকার কোণে,
স্মরণ উচ্ছল হয়, আকাশেরা গেয়ে ওঠে গান,
দিগন্ত পাঠায় ডাক, তাল ও তমাল ঘেরা শ্যাম বাহু তুলে
যদি, হেমন্তের সেই ভোর অভিমানী শিশুর মতন,
তবে, হৃদয় বিছায়ে দিও, কুমারী মাটির কাছে
আনত করিও মন, ফলভরে অবনত মেঘের মতন॥

অবাক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নক্ষত্র আকাশে জ্বলে। পৃথিবীরে দেখে অনিমেষ
অতন্দ্র রজনী জেগে, কাল গোণা কবে হবে শেষ!
কবে শেষ হবে, এই অন্ধকার রাতের প্রহরা,
কবে এসে দেবে আলো—দ্বিতীয়বার চাঁদ মধুঝরা।

শতলিপ্সু চৌর্য-বৃত্তি, কত চুপিসারে
অলিগলি খুঁজে নেয় জীবনের ক্ষণ অন্ধকারে।
দেউলে ফাটল ধরে, ঘুণ্ লাগে—খসে চুণবালি
তবুও দ্বিতীয়া চাঁদ, আকাশে ওঠে না এক ফালি!

হে পৃথিবী, হে আকাশ, নিদ্রাতুর আশ্চর্য সময়!
এখনো হয়নি লগ্ন? এতো এক অবাক্ বিস্ময়!

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২০

হাওড়া থেকে যখন ভবানীপুর পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একদফা চা ও খাবার খেয়ে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়তে বসলাম। রাত্রি নয়টা আন্দাজ নৈশ আহারের ডাক পড়ল। ও কার্য শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় পড়া আরম্ভ করে দিলাম।

এক নিঃশ্বাসে যাকে বলে, প্রায় সেই ভাবেই পাণ্ডুলিপি যখন শেষ করলাম তখন রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। যতদূর মনে পড়ে, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে উপর্যুপরি পাঁচ ছয় পরিচ্ছেদ ছাড়া আরও দুই একটি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদও পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে দু-চার পরিচ্ছেদ টপকে গিয়ে একটা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলবার অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল। কোনো উপন্যাসের মাঝ-বরাবর ক্রমান্বয়ে লিখে এসে কখনো কখনো হয়ত একেবারে শেষের দিকে একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন। ওরূপ করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'হঠাৎ কোনো এক জায়গার কতকগুলো ঘটনা আর সংলাপ মনের মধ্যে একটু বিস্তারিতভাবে এসে পড়লে লিখে ফেলে জমা করে রাখি।' উপন্যাসের কাহিনী (plot) বিশেষ স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ভাবে মনের মধ্যে ছকা থাকলে তবেই এভাবে বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ লেখা এবং পরে যথাস্থানে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

চরিত্রহীনের সূত্রপাত পাঠ করে মুগ্ধ হলাম। অবশ্য 'বড়দিদি' এবং অন্যান্য লেখায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এ লেখার মধ্যে শিল্প-শৈলীর সুপরিণতির যে বলিষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেল, তা সত্যই অপূর্ব! একজন মেসের ঝিকে অবলম্বন করে চরিত্রহীনের গল্প আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য সে মেসের ঝি যে আমাদের নিত্য পরিচয়ের সাধারণ মেসের ঝি নয়, তা সাবিত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও সাবিত্রী যে একেবারে 'সতী-সাবিত্রী' নয়, সেকথা বুঝতেও বাকি ছিল না। একজন মেসের ঝি উপন্যাসের নায়িকা অথবা উপনায়িকা হতে চলেছে। শরৎচন্দ্রের এই দুঃসাহস এবং একজন শিল্পীর পক্ষে সৎসাহস, দেখে খুশি হলাম। এতদিন বাস্তব জগতের পঙ্কের উপরেই পঙ্কজিনীকে ফুটতে দেখে এসেছি, এবার সাহিত্য জগতেও সেই ব্যাপার ঘটতে চলল। 'পঙ্কের মাঝে যে ছিল মলিন করিলে তাহার পঙ্কজিনী'— শরতের বিষয়ে এত বড় কথা বলবার উপকরণ পাওয়া গেল।

পরদিন সকালে চা-পানের পর আর একবার চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম। গত রাত্রে যেকয়েকটা স্থান বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল, সেগুলোর উপর আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কাল হাওড়ায় শরৎ-চন্দ্রের বাসায় অবস্থানকালে মনের মধ্যে যে মতলব দেখা দিয়েছিল, তার সফলতার বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হলাম। জহুরীর কষ্ঠি-পাথরের উপর এ লেখা খাঁটি সোনা বলে স্বীকৃত না হয়ে যাবে না। পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

বেলা দুটো আন্দাজ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি বগলদাবায় চেপে জহুরীর গৃহাভিমুখে রওনা দিলাম। উত্তর কলিকাতার রামধন মিত্রের লেনে তিনি বাস করেন, নাম সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" নামক মাসিকপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিন্দা-সুখ্যাতির কথা, বিশেষত নিন্দার কথা, কল্পনা করে নবীন লেখকেরা কাঁটা হয়ে থাকতেন। বিস্তৃত সমালোচনা সুরেশচন্দ্র সাধারণত করতেন না; কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত যেটুকু করতেন, মৌমাছির হুলের মতো, তা সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে জ্বালা ধরিয়ে দিত। মৌমাছির হুলের সঙ্গে তুলনা করলাম এই কারণে যে, সুরেশ-চন্দ্রের সমালোচনায় সমালোচিত লেখকের জন্য যেমন থাকত হুল, অপর সকলের জন্য তেমনি থাকত মধু। চটকদার ভাষা এবং চটুল ভঙ্গীর গুণে সুরেশচন্দ্রর সমালোচনা এমন মুখরোচক এবং উপাদেয় বস্তু হোত যে, 'সাহিত্য' আসা মাত্র মোড়ক খুলে প্রথমেই আমরা মাসিক সাহিত্য সমালোচনার কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম। কোন্ হতভাগ্য লেখককে সুতীক্ষ্ম শরাঘাতে কি রকম মাত্রায় জর্জরিত করা হয়েছে, দেখবার জন্য আমাদের কৌতূহলের অন্ত থাকত না।

আমাকে বিদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে একবার সমাজপতি মহাশয় অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক সময় ব্যয় করে একটি সুদীর্ঘ বাণ নির্মিত করেছিলেন; সে কথা আজও ভুলতে পারিনি। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বিভ্রম' নামে আমার লিখিত একটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি সুরেশচন্দ্রের মোটামুটি প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হলেও, তার একটি দুর্বল স্থান লক্ষ্য করে শরত্যাগ করতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। গল্পটির মধ্যে দুটি শব্দকে আমি সন্ধিযুক্ত করে এক করে দিয়েছিলাম, যে-দুটির মধ্যে সন্ধি না হওয়াই হয়ত ভাল ছিল। আমার সেই দুটি শব্দের সামান্য সন্ধিকে ব্যঙ্গ করবার অভিপ্রায়ে তিনি পাঁচ ছয়টি শব্দ বিশিষ্ট একটি তিন হাত লম্বা অসঙ্গত সন্ধি রচিত করেছিলেন। তার প্রথম অংশটা আমার মনে আছে, যদ্যপ্যাপনরৈরূপ; অর্থাৎ যদ্যপি আপনারা ঐরূপ। সমস্তটার অর্থ, যদ্যপি আপনারা ঐরূপে উদ্ভট সন্ধি করেন তা হ'লে তা নিয়ে আমাদের বিপদে পড়তে হবে, এই ধরণের কিছু। শরাঘাত আমাকে কিন্তু ঘায়েল করতে পারেনি; মোটের উপর খুসিই হয়েছিলাম, অমন চমৎকার একটি কৌতুকজনক বস্তু সমাজপতি মহাশয়কে দিয়ে রচিত করতে বাধ্য করে।

সে সময়ে সমাজপতি মহাশয়ের সহিত আমাদের ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির সদস্য-দের বিশেষত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেন, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী-মোহন শাস্ত্রী ও আমি এই কয়জন সদস্যের বিশেষ দহরম-মহরম। কয়েকবার তিনি আমাদের সমিতির উৎসবাদিতে সভাপতি ও বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ট পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা ত' স্থাপিত হয়েছিলই, তা ছাড়া আমাদের সমিতির মুখপত্রিকা হস্তলিখিত মাসিক 'তরণী'র বাঁধানো খাতাগুলি থেকে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিনি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রের উদরপূর্তির জন্য ছাপাখানায় সোজা চালান দিতে আরম্ভ করেছিলেন বলে তাঁর ওপর খানিকটা আবদার-আব্দার খাটাবার পথও আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম।

রামধন মিত্র লেনে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে যখন পৌঁছলাম, তখন তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে মনোযোগ সহকারে একটা লেখা পাঠ করছেন; আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "এস, এস। খবর কি বল?"

শয্যার উপর বসে পড়ে বললাম, "খবর ভাল, বোধ হয় খুসি করতে পারব আপনাকে।"

জাত সম্পাদক, আমার কথা শুনে এবং হাতে খবরের কাগজ মোড়া পুলিন্দা দেখে বুঝেছেন, পুলিন্দার মধ্যে মাল আছে এবং সেই মালের মধ্যেই খুসি হবার কারণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে বাণ্ডিলটা নিয়ে বললেন, "কই দেখি, কি এনেছ।"

বাণ্ডিল খুলে সমাজপতি মহাশয় হাতের লেখা দেখে বোধহয় প্রথম দফা খুসি হলেন। সুন্দর হাতের লেখা লোভনীয় তোরণ, যার ভিতর দিয়ে পাঠকচিত্ত সহজেই লেখার মধ্যে

বেশ করে। সমাজপতি মহাশয় পড়তে আরম্ভ করলেন, আমিও তীক্ষ্ণনেত্রে তাঁর মুখে-চক্ষে উৎসাহ নৈরাশ্যের রেখাঙ্কন পাঠ করবার চেষ্টায় ব্যস্ত হলাম।

প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা পাঠ করবার পর মনে হল যেন তাঁর ললাটদেশ ঈষৎ দীপ্ততর হয়ে উঠেছে; পাতা ওল্টাবার সময়ে এমন একটু দক্ষপ্রতার সহিত ওল্টালেন, যার মধ্যে উৎসাহের পরিচয় আছে বলে মনে হয়; দেখতে দেখতে অনেক পাতাই পড়া হয়ে গেল। বোধকরি, প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করে আমার দিকে চেয়ে দেখে বললেন, "এ কার লেখা? তোমার যে নয়, তা বুঝতেই পারছি। এত নাম থাকতে নিজের নাম নিশ্চয়ই উপন্যাসে ব্যবহার করবে না।"

মৃদু হেসে বললাম, "ঐটেই যদি আমার লেখা না হওয়ার একমাত্র প্রমাণ হত তা হলে খুশি হতাম। আমার লেখা যে নয়, তার আরও দৃঢ়তর প্রমাণ লেখার মধ্যে আছে। এ লেখার লেখক আমার ভাগ্নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিস্মিতকণ্ঠে সমাজপতি বললেন, "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? নতুন লেখক?"

বললাম, "একেবারে নতুন নয়। বছর পাঁচেক আগে ভারতীতে 'বড়দিদি' নামে ওর একটা ছোট উপন্যাস তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে হঠাৎ একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাবে চতুর্দিকে বেশ-একটু সাড়া পড়ে গিয়েছিল।" আমার শেষোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে 'বড়দিদি' সম্বন্ধে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আলাপ-আলোচনার গল্পটাও করলাম।

'বড়দিদি' উপন্যাসের কথা সমাজপতি মহাশয়ের মনে পড়ল কিনা বলতে পারিনে, জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁচ বছরের মধ্যে আর কোনও লেখা কোথাও বের হয়নি?"

বললাম, "না।"

"অলস প্রকৃতির মানুষ না-কি?"

"ভারি খেয়ালি মানুষ; আলস্যটাও তার একটা খেয়ালেরই মধ্যে। যখন আলস্য করতে আরম্ভ করে তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তাকে তৎপর করতে পারে না।"

"কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?"

"বর্মায়, রেঙ্গুনে।"

"কি করেন সেখানে?"

"ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলস্ অফিসে চাকরি করে।"

"তোমাকে লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

বললাম, "না, কয়েকদিন হল সে এখানে এসেছে। তার হাত থেকেই লেখা পেয়েছি।"

সমাজপতি মহাশয়ের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, "এখানে এসেছেন তিনি? কোথায় থাকেন এখানে?"

বললাম, "হাওড়ায়।"

"আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও উপেন!"

বললাম, "সেই মতলবেই ত' আপনার কাছে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ করে ঐ অলস মানুষটাকে একটু যদি উৎসাহ দেন।"

সমাজপতি মহাশয় বললেন, "উনি নিজে আমাকে যে-রকম উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আমি ওঁকে আমার সাধ্যমত উৎসাহ দিতে ছাড়ব না। এই কাজ ত' দিবারাত্র করছি উপেন, একথা ভাল করেই বুঝি, যে-লেখক একটা পাতাও এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে লিখতে পারে, বিধাতার হাত থেকে লেখক হবার বর নিয়েই সে এসেছে। কবে শরৎবাবুকে নিয়ে আসবে বল?"

বললাম, "কাল এই সময়ে আপনার সুবিধে হবে?"

প্রসন্নমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। তাই এসো। লেখাটা আজ আমার কাছে থাক্, রাত্রে সবটা পড়ে ফেলব। কি বল?"

বললাম, "লেখাটা আপনাকে দিয়ে যাবার জন্যেই এনেছিলাম। আপনি যে আমার সামনেই এতটা পড়ে ফেলবেন, তা আশা করিনি।"

উঠে পড়ে বললাম, "শরৎকে আপনার কথা কি বলব বলুন?"

মুহূর্তকাল চিন্তা করে সহাস্যমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "বলবে, বাঙলা দেশের একজন শক্তিমান লেখককে আমি সাদরে আহ্বান করছি।"

বললাম, "একথা শুনলে সে হয়ত' আসবে না, কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে পড়বে।"

স্মিতমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "আর একটা কথা উপেন।"

"বলুন।"

"এ লেখাটি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হওয়া চাই।"

বললাম, "নিশ্চয় হবে। আপনি চাইলে সে না দিয়ে পারবে না।"

প্রসন্ন মনে বেরিয়ে এলাম। কাজ অর্ধেক পথ এগিয়েছে। এই অবুঝ অলস মানুষটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে টেনে বার করতেই হবে। যেন তেন প্রকারেণ।

২১

পরদিন প্রত্যুষে উঠে দেখি রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে একরাশ হাল্কা ধূসর মেঘ এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বৃষ্টি তখনো পড়ছিল না বটে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে পড়তে পারে, আবহাওয়ার মধ্যে তার ইঙ্গিত।

সকাল-সকাল আহারাদি সেরে বেলা দশটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লাম। শরতের বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা।

আমি যে অত শীঘ্র আসব, শরৎ তা প্রত্যাশা করেনি। কারণ, কাল একটা-দেড়টার সময়ে আসবার কথা ব'লে গিয়েছিলাম। শরৎ বললে, "কি উপীন, এত সকাল-সকাল এসেছ, খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসেছ ত?"

বললাম, "খাওয়া-দাওয়া না ক'রে ভবানীপুর থেকে খুরুট রোডে বারোটার সময়ে হাজির হই, এত কাঁচা লোক নই। তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শরৎ বললে, "মিনিট দশেক হ'ল হয়েছে। সাধারণতঃ এত শীঘ্র খাইনে, একটার আগে প্রায়ই হয় না, তুমি আসবে বলে আজ একটু সকাল-সকাল সেরে নিয়েছি।"

বললাম, "ভালই করেছ; চল, বেরিয়ে পড়ি।" বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বললে, "এই দুপুর বেলায় কোথায় যাবে?—ভবানীপুরে?"

হাসি মুখে বললাম, "কোনো পুরে নয়, একেবারে বাজারে। বাজারে তোমার অত্যন্ত অখ্যাতি রটেছে, নিজের কানে শুনবে চল।"

মৃদু হেসে শরৎ বললে, "আমার মতো লোকের বাজারে অখ্যাতি রটবে, সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রহস্য রেখে আসল কথাটা বলে ফেল।"

বললাম, "শ্যামবাজারের রামধন মিত্তির লেনের একটি বাড়িতে তোমার তলব পড়েছে, —সমন ধরাতে এসেছি।"

কৌতূহল সহকারে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কার বাড়িতে বল ত?"

"সুরেশ সমাজপতির বাড়িতে।"

"সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি?"

"হ্যাঁ।"

তাচ্ছীল্যের সঙ্গে শরৎ বললে, "ওর বাড়ি আমি কেন যেতে গেলাম, ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক!"

বললাম, "সম্পর্ক এখনো নেই, কিন্তু শীঘ্রই হবে।"

"কিসের সম্পর্ক?"

"লেখক-সম্পাদকের সম্পর্ক। সমাজপতি 'সাহিত্যে' তোমার লেখা বার করবার জন্যে উৎসুক।"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে শরৎ বললে, "আমি লিখি কেমন ক'রে সে জানলে? তুমি বলেছ বুঝি?"

বললাম, "শুধু বলিইনি, পড়িয়েওছি।"

শরতের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, "কি পড়িয়েছ উপীন? চরিত্রহীন নয় ত?"

বল্লাম, "তা ছাড়া আর কি পড়াব?"

আমার কথা শুনে শরতের মুখমণ্ডলে একটা আর্ত বিহ্বলতার ভাব ফুটে উঠল। কাতর কণ্ঠে বললে, "না, না, উপীন, এ তুমি অন্যায় কাজ করেছ, এ কাজ একটুও ভাল করনি!"

কপট রোষের ভাব দেখিয়ে বললাম, "বড়দিদি প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ পাঁচ

বৎসর চুপ ক'রে নিঃশব্দে ব'সে থেকে তুমিই বা কি-এমন ভাল কাজ করেছ শুনি? এতটা কাল বাঙলা দেশের পাঠকদের সৎসাহিত্য থেকে বঞ্চিত ক'রে যে গুরুতর অপরাধ করেছ, তার জন্যে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। তোমার মতো অলস আর ভীতু লোককে জবরদস্তি করে ঘরের কোণ থেকে টেনে না বের করলে কি উপায় আছে বলো?"

"কিন্তু ঘরের কোণ থেকে টেনে বের ক'রে তুমি যে একেবারে পথে বসালে উপীন!"

বললাম, "সেও ভাল, কিন্তু ঘরের কোণ ভাল নয়। পথে বসলে পথিকেরা তোমাকে দেখে খুশি হবে।" তারপর কতকটা ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "শোন শরৎ, পথে বসানোই বল, আর যাই বল, পরশু তোমার এখানে বসে চরিত্রহীন পড়তে পড়তে এই ধরণের একটা কিছু করবার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হয়েছিল। সেই কথা ভেবেই আজ আমার এখানে আসবার ব্যবস্থা সেদিন ক'রে গিয়েছিলাম। পরশু বাড়ি ফিরে রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি শেষ ক'রে কি যে ভাল লাগল, তা কি আর বলব! সে ভাল লাগার মধ্যে আত্মীয়-প্রীতির খাদ যে নেই, সে কথা যাচাই করবার জন্যে কাল বৈকালে বাঙলা দেশের সবচেয়ে কঠিন কষ্টিপাথর সুরেশ সমাজপতির কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তোমার চরিত্রহীনের প্রথম পরিচ্ছেদটি শেষ ক'রে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, আমার ভাল লাগার মধ্যে আত্মীয়-প্রীতির খাদ নেই। তাঁরই হুকুমে আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।"

আমার কথা শুনে শরতের মুখে বিহ্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠল; আর্তকণ্ঠে সে বললে, "এর চেয়ে তুমি যদি আমার ফাঁসির হুকুম আনতে, সে বরং ভাল ছিল! আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টানাটানি করলেও আমি যাব না উপীন! ও লোকটির প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা নেই তা নয়, কিন্তু ওকে আমি বিষম ভয় করি। অত বড় দুর্মুখ মানুষ ভূভারতে আর নেই। দোহাই তোমার, ওকে দিয়ে আমাকে বকুনি খাওয়াবার ব্যবস্থা কোরো না!"

বললাম, "তোমার বিষয়ে সুরেশ সমাজপতি কি বলেছেন শুনবে?"

শরৎ বললে, "শুনে কোনো লাভ নেই। বুঝতেই পারছি খুব ভাল ভাল কথা বলেছে, কিন্তু বাগে পেলে বকুনি দিতেও ছাড়বে না।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "কি হবে সুরেশ সমাজপতির মতামত শুনে? তার চেয়ে তোমার কেমন লাগল, তাই বল।"

বললাম, "চরিত্রহীন নিয়ে এত দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করছি, তবুও বলতে হবে আমার কেমন লাগল?"

শরৎ বললে, "তোমার যদি ভাল লেগে থাকে তাই যথেষ্ট। সুরেশ সমাজপতির মতামতের জন্যে আমি ব্যস্ত নই।"

কি বিপদেই না পড়লাম এই অবুঝ অচল খামখেয়ালি লোকটিকে নিয়ে! বললাম, "জানো? সে ভদ্রলোক ব'সে আছেন বাঙলা দেশের শক্তিমান সাহিত্যিক ব'লে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে?"

অত্যন্ত সহজ সুরে শরৎ বললে, "এখন আর ব'সে নেই, এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে। তুমিও শুয়ে প'ড়ে একটু গড়িয়ে নাও, কিম্বা এ দুদিনে চরিত্রহীন যতটুকু লিখেছি, প'ড়ে ফেল। আমি ততক্ষণ একটু তামাক খাবার জোগাড় দেখি।" ব'লে একটা চামড়ার কেস থেকে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি বার ক'রে আমার সম্মুখে রেখে উঠে পড়ল।

কি উপায় করা যায় এই মহাস্থাবর এঞ্জিনকে নিয়ে, উৎসাহ-বাষ্পের শত তাড়না সত্ত্বেও যে তার চাকা ঘোরাতে চায় না! একটা বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে চরিত্রহীন পড়তে আরম্ভ করলাম। শেষ পর্যন্ত শরৎকে সুরেশ সমাজপতির গৃহে নিয়ে যেতেই হবে তদ্বিষয়ে মনে মনে নিজেকে শক্ত ক'রেও নিলাম।

ক্ষণকাল পরে কাঠের নলওয়ালা একটা ফরসি নিয়ে এসে আমার সামনে ব'সে শরৎ নির্বাক হ'য়ে তামাক খেতে লাগল। পাণ্ডুলিপির গোটা-কয়েক পাতা প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছিল। দু-চার মিনিট পরে একেবারে শেষ ক'রে চামড়ার কেসের ভিতর রেখে দিলাম।

তামাক খেতে খেতে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "যেটুকু পড়লে, কেমন লাগল তোমার?"

বললাম, "ফিরে এসে বলব।"

বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বললে, "ফিরে এসে বলবে? কোথা থেকে ফিরে আসবে হে?"

"সমাজপতির বাড়ি থেকে।"

"সেখানে আজ যাবে না-কি?"

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললাম, "অতি অবশ্য যাব। সেখান থেকে তোমার চরিত্রহীনের কপি ফিরিয়ে নিয়ে তোমাকে দিয়ে যেতে হবে।"

তামাক খাওয়া বন্ধ ক'রে আমার দিকে তীক্ষ্ম নেত্রে চেয়ে শরৎ বললে, "চরিত্রহীনের কপি সমাজপতির কাছে আছে না-কি?"

বললাম, "থাকাই ত' উচিত। কাল পাণ্ডুলিপির শুধু প্রথম পরিচ্ছেদটুকু আমার সামনে পড়েছিলেন, বাকিটা রাত্রে শেষ ক'রে রাখবার কথা। প্রথম পরিচ্ছেদ প'ড়েই ত' তোমাকে শক্তিমান্ বলেছেন, সবটুকু প'ড়ে কোন্ মান্ বলেন দেখা যাক্।"

শরতের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যের রেখা দেখা দিলে ;বললে, "মর্তমান না বলেন। কিন্তু যাই বলুন না কেন, আর কোনো দিন গিয়ে না-হয় শুনো,—বৃষ্টি আসতে পারে, আজ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে যাও।"

বললাম, "কথা দিয়ে কথা না রাখবার মতো প্রবল বৃষ্টি হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। তোমার লেখাটা ত' ফিরিয়ে নিই, তারপর আকাশের অবস্থা অনুযায়ী হাওড়ায় আসা-না-আসা বিবেচনা করা যাবে। তবে সাধ্যমত আজই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। রোজ-রোজ আসার চেয়ে একদিনেই কাজ শেষ করতে পারলে ভাল হয়। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে। সম্ভবতঃ আবার আসছি।" ব'লে ওঠবার উপক্রম করলাম।

হাত দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শরৎ বললে, "অনেকক্ষণ বেরিয়েছ, চা-খাবার খেয়ে যাও।"

বললাম, "বেলা দেড়টার সময়ে চা-খাবারের কোনও প্রয়োজন দেখছিনে। ফিরে এসে খাব।"

আমার কথা শুনে এবার শরৎ হেসে ফেললে। বললে, "আচ্ছা, তাই খেয়ো। বিষম মোগলের হাতে পড়া গেছে দেখছি!" তারপর ফরসিটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, "তুমি উঠছ কেন?"

"চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

সহজ সুরে শুধু বললাম, "চল।" বেতো ঘোড়া অবশেষে যখন চলবার উপক্রম করেছে, তখন আর তাকে বেশি তাড়না দিতে নেই।

শরৎ জামা পরলে, গায়ের কাপড় নিলে, তারপর মনিব্যাগটা পকেটে ফেলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চল।"

পথে বেরিয়ে দেখি আকাশের আক্রোশ বেড়ে গেছে। মেঘ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

পথ চলতে চলতে শরৎ বললে, "চরিত্রহীনে তোমাকে নামিয়েছি উপীন; এমন কি, তোমার ডাকনাম যে উপীন, তাও ব্যবহার করেছি। সেইজন্যেই তোমার এতটা উৎসাহ হয়নি ত?"

বললাম, "বলা যায় না কিছু; আমাদের ত' একটা গোপন মনও আছে, সেখানে কি ব্যাপার চলেছে কে বলতে পারে?"

কথায় কথায় আমরা ট্রামের রাস্তায় এসে পড়লাম । ট্রাম এলে শরৎ আগে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম।

হাওড়ার ট্রাম শেষ ক'রে, হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধ'রে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে উপনীত হ'য়ে আমরা যখন শ্যামবাজারের ট্রামে আরোহণ করছি, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে অবতরণ ক'রে একটিমাত্র ছাতার মধ্যে কোনো প্রকারে দুজনে মাথা গুঁজে, একজন উৎসাহ-দীপ্ত চিত্তে এবং অপরে উদ্বেগচঞ্চল হৃদয়ে সুরেশ সমাজপতির গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলাম।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আমাদের চোখের মধ্যে যদি ধূলোর একটি কণিকা মাত্র ঢোকে তাহলে সেটা না বার করতে পারা পর্যন্ত আমরা যে অস্বস্তি ভোগ করি তা আমাদের পক্ষে দুঃসহ মনে হয়। এটাকে বার করার জন্য প্রথমত চোখটি রগড়ে রগড়ে, কিংবা জলের ঝাপটা দিয়ে, না হয়তো রুমাল বা কাপড়ের খুঁট দিয়ে বার করতে গিয়ে চোখটি আরও বিপর্যস্ত করে তুলি। এবার এর একটা সহজ উপায় বার হয়েছে—ইংলণ্ডের এক কোম্পানি এমন একটা যন্ত্র বার করেছেন যেটার সাহায্যে চোখের মধ্য থেকে এই ধরণের



যন্ত্রের সাহায্যে চোখ থেকে ধূলো বার করা হচ্ছে

ছোটখাট জিনিস অনায়াসে বার করে ফেলা যায়। যন্ত্রটির নাম "আই ম্যাগনেট"। খোলা চোখটির সামনে যন্ত্রটি ধরলেই এটি চোখের মধ্যে থেকে ধূলোটি টেনে বার করে আনে।

*

বর্তমানে কুইনাইন ছাড়া ম্যালেরিয়ার জন্য অনেক নতুন নতুন ওষুধ বের হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে দু একটা সত্যই খুব কার্যকরী। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ রবার্ট এলডারফিল্ড এবং সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জন এজকম্ব দুজনে মিলে ম্যালেরিয়ার একটা নতুন ওষুধ বার করেছেন। এই ওষুধের নাম হচ্ছে primaquine। অবশ্য এখনো এটা বাজারে চালু হয়নি। তাঁদের মতে এই ওষুধে শতকরা একশত জনের ম্যালেরিয়া সারবে। এই ওষুধটা আলকাতরা এবং শসার মাথার অংশ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তৈরী। এই ওষুধটা অল্পদিনের চেষ্টাতে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এর গবেষণাকার্যে প্রায় প্রত্যেক জাতিই কিছু না কিছু সাহায্য করেছে। ১৯২০ সালে জার্মান এবং ফরাসী সরকার প্রথম এর গবেষণা আরম্ভ করে। পরে ১৯৩০ সালে ইংরাজ সরকার এদের সংগে এসে যোগ দেয়। এর পর ১৯৪২ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল ডাঃ এলডারফিল্ডকে এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে বলে। এর ফলে প্রায় তিন বৎসর আগে ডাঃ এলডারফিল্ড প্রথম isoente-quine নাম দিয়ে একটা ওষুধ তৈরী করেন যাতে শতকরা ৯৫ জনের ম্যালেরিয়া সারত। তারপর ডাঃ এলডারফিল্ড এবং ডাঃ এজকম্ব এই primaquine তৈরী করেন।

*

বেশী রক্তের চাপের জন্য নানাবিধ চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে আমেরিকার মেডিক্যাল এসোসিয়েশন থেকে 'veriloid' বলে একটা ওষুধ বার করেছে। এটা একটা খাবার ওষুধ। এই ওষুধ খেলে ছোট ছোট রক্তের শিরাগুলো ফুলে ওঠে আর তার জন্য রক্তের মোটা শিরাগুলো থেকে রক্ত ছোট শিরাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে রক্তের চাপও কমে যায়।

যাদের রক্তের চাপ খুব বেশী হয়নি এমন রোগীদের পক্ষে এটা খুবই উপকারী। ওষুধটা খাবার পর এটা দেখা গেছে যে, অন্ততঃ রোগীর মাথার যন্ত্রণা এবং অন্যান্য উপসর্গও খুবই তাড়াতাড়ি কমে যায়। পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে, 'veriloid' যদি একটু বেশী খেয়ে ফেলা হয় তাহলে বমি বমি ভাব হয়। ডাক্তাররা বলেন যে, এতে কোন ক্ষতি হয় না—কারণ, এই বমি বমি ভাব রোগীর পক্ষে ভাল লক্ষণ। এই 'veriloid' অবশ্য ইন্সুলিনের মত এত তাড়াতাড়ি রোগ সারাতে পারে না, তবে নিয়ম মত যদি এটা খাওয়া যায়, তাহলে রোগ সম্পূর্ণ সারে। এই ওষুধটা একজাতীয় গাছের শিকড় থেকে তৈরী করা হয়।

•

ফিলাডেলফিয়ার এক ইহুদি হাসপাতালের ডাঃ জে কোহেন টেলিভিসন এবং একসরে যন্ত্রের যৌথ শক্তির সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন—এটাকে 'ভাইডিওগ্নসিস' (videognosis) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে একজন ডাক্তার সহরে বসে শত শত মাইল দূরের গাঁয়ের কোন রোগী বা আহত লোকের একসরে ছবি দেখতে পারেন। শুধু এই নয় এর সংগে সংগে সহরের ডাক্তার রোগীর কাছে বসা গাঁয়ের ডাক্তারের সংগে রোগীর রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে।

ডাক্তাররা বলেন যে এই পদ্ধতিতে যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সেটা সাধারণ একসরে ছবির চেয়ে অনেক অংশে ভাল। প্রয়োজন অনুসারে কোন বিশেষ অংশ বর্ধিত করে দেখবারও সুবিধা এতে আছে—তা ছাড়া ছবিটাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য আলো কমান বাড়ানও যায়।

সাধারণত নৌকা কাঠের তৈরী হয়। অবশ্য রবার, ক্যানভাস বা প্লাস্টিকের নৌকাও হয় আর এগুলো বেশ হাল্কা হয়। এইবার কিন্তু নৌকা কাঁচ দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। ছয় ফুট লম্বা কাঁচ দিয়ে তৈরী একটা নৌকার ওজন মাত্র ১৫ সের। যে কাঁচ দিয়ে এই নৌকা তৈরী হচ্ছে সেটা সাধারণ কাঁচ নয়—এটা একটু আলাদাভাবে তৈরী করে নেওয়া হয়। এই



কাচের নৌকা পাল তুলে চলেছে

ধরণের কাঁচকে ফাইবার গ্লাস (fiber-glass) বলা হয়। এই সব কাঁচ এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগের মত মোটা হয়।

*

চীন দেশের এক মনুষ্য বর্জিত স্থানে উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌রা 'ডন রিড উড্' নামক একটি গাছের সন্ধান পেয়েছেন। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদদের মতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই গাছ পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে চীন দেশ থেকে এই গাছের চারা এনে আলাসকার বিভিন্ন স্থানে লাগান হয়েছিল; বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এখানে এই গাছগুলো বাঁচবার দরুণ একটু আশ্চর্য হয়েছে—কারণ, 'ডন রিড উড' গাছ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বাঁচে অথচ আলাসকায় যে সব স্থানে গাছগুলো লাগানো হয়েছে সে সব স্থানে ঠাণ্ডা খুব বেশী। আলাসকায় এই গাছগুলো এনে লাগাবার কারণ, আগেকার কালে 'রিডউড' গাছের বন এই আলাসকায় ছিল। ঠাণ্ডা বাড়বার সংগে সংগে গাছগুলো ক্রমশ মরতে মরতে একেবারে এখান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন এই গাছগুলো আবার আলাসকায় বাঁচবার দরুণ বৈজ্ঞানিকেরা এইটেই ধরে নিচ্ছেন যে খুব সম্ভবত এখানকার ঠাণ্ডা কমে গিয়ে আবার আগেকার কালের মত হতে আরম্ভ করেছে।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার (জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) শতবার্ষিকী উৎসব কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতের এবং ভারতের বাইরে থেকে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিকগণ এই উৎসবের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ব্রিটেনের ডাঃ পিউ (Pugh), দক্ষিণ রোডেসিয়ার মিঃ ফার্গুসন, ফ্রান্সের মঃ জুর্নো (Jurnot), অস্ট্রেলিয়ার মিঃ ফিনুকেন (Finucane), ক্যানাডার মিঃ কনডন (Condon) ও মিঃ টাইয়ার (Thyer), ডাঃ ম্যাকে, জার্মানীর ডাঃ আলফ্রেড বেঞ্জ (Alfred Bentz), তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেরি (Carey) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টরদের মধ্যে স্যার লুইস ফের্মর (Sir Lewis Fermor), ডাঃ হেরন (Heron) এবং স্যার সিরিল ফক্সও শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে তিন জন রুশীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বগোমলভ, অধ্যাপক ভ্যারেনৎসভ এবং মঃ আইভ্যান টারাসভ—বর্মার বা থি, অস্ট্রিয়ার ডাঃ এণ্ডার্ল (Enderl), সিংহলের ডাঃ ব্যাপ্টিস্ট, ইটালীর অধ্যাপক লিপারিনি (Lipparini), জাপানের অধ্যাপক মিৎসুচি, নেদারল্যাণ্ডের ডাঃ এডেলম্যান (Edelmen), মার্কিনের ডাঃ জনস্টন।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে কার্যসূচী প্রকাশিত হয় তার মধ্যে এইরকমের একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল—"শুক্রবার সকাল দশটায় ভূতাত্ত্বিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণ কলকাতায় সেণ্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে জব চার্নকের সমাধি দেখতে যাবেন।"

ভূবিদ্যাবিশারদ বিজ্ঞানীর দল জব চার্নকের সমাধি দেখতে কেন গেলেন? জব চার্নক, যিনি কলকাতায় প্রথম ইংরাজের কুঠি স্থাপন করেছিলেন, যাঁকে আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে, তাঁর সমাধি দেখবার জন্য ভূতাত্ত্বিকদের আগ্রহ হবার কি কারণ থাকতে পারে? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ইংরাজের সমাধির সংগে ভূতত্ত্বেরই বা কোন সম্পর্ক আছে?

একটা সম্পর্ক আছে বলেই ভূতাত্ত্বিকেরা জব চার্নকের সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন। ভূতাত্ত্বিকের কাছে কৌতূহল ও আকর্ষণের বিষয় হলো জব চার্নকের সমাধি যে পাথরে নির্মিত, সেই পাথর। ১৮৯৩ সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডিরেক্টর ডাঃ হল্যাণ্ড মাদ্রাজে অদ্ভুত রকমের কৃষ্ণবর্ণ গ্রানিটের মত এক-প্রকারের পাথর আবিষ্কার করেন, এই পাথরের মধ্যে হাইপার্সথিন (Hypersthene) নামক খনিজ রয়েছে। প্রায় এই সময়েই কলকাতার সেণ্ট জর্জ গির্জার আঙিনায় জব চার্নকের সমাধিটিও আবিষ্কৃত হয় এবং দেখতে পাওয়া যায় যে, সমাধিটি মাদ্রাজের ঐ অদ্ভুত রকমের কৃষ্ণবর্ণ গ্রানিট সদৃশ পাথরে তৈরী। সুতরাং অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্নকই মাদ্রাজ থেকে ঐ বিশেষ শ্রেণীর পাথর কলকাতায় আনিয়েছিলেন। যাই হোক, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্ন ছিল, এই শ্রেণীর পাথরের বৈজ্ঞানিক নাম কি হবে? নাম রাখা হয় চার্নকাইট (Charnockite)। আজ পৃথিবীর সর্বত্র ভূতত্ত্বের অভিধানে ঐ বিশেষ শ্রেণীর পাথরের পারিভাষিক নাম হয়েছে চার্নকাইট, যার মধ্যে প্রাচীন কলকাতার এক ঐতিহাসিক ইংরাজের নাম ও পরিচয়ের সাক্ষ্যটুকু রয়ে গেছে।

ভূতত্ত্ব এই পৃথিবীরই গড়ে উঠবার এক বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাস, জড় ও প্রাণের এক বিরাট আখ্যায়িকা। ভূতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানও এক একটি বিচিত্র ও বিস্ময়কর অধ্যবসায়ের কাহিনী। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারত সরকার যে বিশেষ ডাক টিকিট ছেপেছেন, তার মধ্যে যে অতিকায় বৃহদ্দন্ত হস্তীর ছবি মুদ্রিত হয়েছে, সেটাও অতি দূর অতীতের ভারতভূমির জীবজগতের আবির্ভাব ও লুপ্তির একটি বিরাট কাহিনীর স্মারকচিহ্ন। সিওয়ালিক-গিরিমালার প্রস্তরপুঞ্জের মধ্যে সমাহিত এক প্রাচীন ঐরাবতের শিলীভূত কংকাল ভূতাত্ত্বিক উদ্ধার করেছেন, এই ঐরাবতের বংশধারা লুপ্ত হয়ে গেছে। আজ শুধু তার একটি কংকাল যাদুঘরের নিদর্শনী হ'য়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভূতাত্ত্বিক এর নাম দিয়েছেন—স্টেগোডন গণেশ (Stegodon Ganesha')। শুধু স্টেগোডন গণেশই নয়, সিওয়ালিক গিরিমালার ভূস্তর থেকে ভারতের একটি লুপ্ত জীব-জীবনের আরও অনেক সাক্ষ্য উদ্ধারিত হয়েছে। সেই বৃহদাকার 'পৌরাণিক' জিরাফগোষ্ঠীর কপালফলক পাওয়া গেছে, বৈজ্ঞানিকেরা ভারতীয় পুরাণ থেকে নাম বেছে নিয়ে যার নাম দিয়েছেন—বিষ্ণুথিরিয়াম, শিবথিরিয়াম ও ব্রহ্মথিরিয়াম। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক ডাঃ ওয়াডিয়া সিওয়ালিক জীব-গোষ্ঠীর পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"The prolific remains of their skeletons, skulls, teeth, bear witness to the abundance of the higher terrestrial life of those days before which the present world looks impoverished. The siwairks have preserved the remains of nearly 15 genera of anthropoid apes, the highest mammal in the then exist-



কলিকাতায় ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় যাদুঘরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বিশিষ্ট বৈদেশিক ভূতাত্ত্বিকগণকে প্রদর্শনীতে দেখা যাইতেছে।

ing living world, some of which are believed to be links in the line of human ancestry, and it is possible that future research may bring to light some remains of Primitive Man from the top beds of the siwaliks".

সিওয়ালিকের ভূস্তর অতীত ভারতের জীব-জীবনের এক মহাশ্মশানের মত। বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করেছেন, সেই বৃহদাকার ও বিচিত্র জীবগোষ্ঠীর তুলনায় বর্তমানকালের জীবগোষ্ঠীকে কত দীন মনে হয়। স্তন্যপায়ী জীব-জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ যে দ্বিপদ বানর-জাতীয় জীবরূপে বিকশিত হয়েছিল, তারও সাক্ষ্য সিওয়ালিক হতে পাওয়া গেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক এই আশাও করেন যে, ঐ সিওয়ালিকেই হয়তো আদিমতম মানবের আবির্ভাব হয়েছিল এবং খুঁজলে মানুষ জাতির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের দৈহিক গঠন ও রূপের কোন কোন নিদর্শন, শিলীভূত অস্থি ও করোটি পাওয়া যাবে।

বুঝা যায়, ভূতত্ত্ব শুধু বিজ্ঞানই নয়, ভূতত্ত্ব পৃথিবীর জড় জীবনের আবির্ভাব, অভ্যুদয় বিবর্তন ও বিকাশের এক বিস্ময়কর ইতিহাস অথবা কাহিনী। কোটি কোটি বৎসরের এবং লক্ষ লক্ষ শতাব্দীর কাহিনী, যা অদৃশ্য লিপিতে লিখিত রয়েছে প্রতি ভূস্তরের পাষাণের গঠনে, শিলীভূত উদ্ভিদ ও জীবের অবয়বে। সভ্য মানুষের লিখিত ইতিহাসে রাজবংশ ও সম্রাটবংশের রাজত্বের যুগব্যাপী পরিচয় বিবৃত আছে। পৃথিবীর ভৌম গঠনের ইতিহাসে এবং প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসেও তেমনি এক একটি যুগ আছে এবং সে ইতিহাসের কাহিনী কোন সম্রাটের শাসন অভিযান ও যুদ্ধের কাহিনীর চেয়ে কম মনোজ্ঞ নয়।

ভারতীয় ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন—কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। কোথা থেকে এই সৃষ্টি এল? ভূতাত্ত্বিক যদিও ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর দেননি, কিন্তু এই প্রশ্নেরই আর একটি দিকের উত্তর দিয়েছেন। কেমন করে সৃষ্টি এই রূপ গ্রহণ করলো? ভূতাত্ত্বিকের কাছ থেকেই জানতে পারা গেছে, তুষারমৌলী হিমালয়ের শৈশবের ইতিহাস। এক একটি তুষার যুগের ইতিহাস, আগ্নেয় প্লাবনের ইতিহাস। কত কোটি বৎসর ধরে নিষ্প্রাণ বিশ্বের পদার্থ কত বিপ্লবে রূপান্তরিত হলো। পলি মাটি থেকে আরম্ভ করে কয়লা ও হীরকের আবির্ভাব ও গঠনের ইতিবৃত্ত ভূতাত্ত্বিক রচনা করেছেন। বিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রগুলি সেই অতীতের এক একটি যুগে কিরূপ ছিল, তার পরিচয় দিয়েছেন ভূতাত্ত্বিক। সেই অতীতে যেখানে সমুদ্র ছিল, সেখানে আজ পর্বত—যেখানে পর্বত ছিল সেখানে আজ জলধির বিস্তার। আজ যে মরুভূমিতে মরীচিকা জ্বলে, সেখানে কোন্ সাগরের জলে প্রাচীন চন্দ্রের রশ্মিপাতে জোয়ার জাগিয়ে তুলতো, রূপকথার চেয়েও কৌতূহলকর সে কাহিনী ভূতাত্ত্বিকের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্যেই বিশ্ববাসী আজ জানতে পেরেছে।

ভারতে আধুনিক ভূতত্ত্বের চর্চা আরম্ভ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে। সে সময়ের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রধান প্রেরণা ছিল কয়লার অনুসন্ধান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'কয়লা কমিটি' (Coal Committee) কয়লা খুঁজছিলেন, ভূতাত্ত্বিক ডাঃ ম্যাকক্লেল্যান্ড (MCclellend) ছিলেন এই কমিটির সেক্রেটারী কয়লার সন্ধান করতে গিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে ইংরাজ ভূতাত্ত্বিক ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলে যে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন তাই বস্তুতঃ ভারতে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সূত্রপাত।

১৭৭৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে আডাম হচিক্স (Adam Hotchicks) ভারতে প্রথম কয়লার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তিন বৎসর চেষ্টার পর তাঁর কাজ আর অগ্রসর হতে পারেনি, কারণ গুপ্ত-ঘাতকের হাতে তাঁর প্রাণান্ত হয়। এর পর ১৮১৭ সালে লেডল (Laidlaw) এবং লেডলর পরে ডাঃ ভোসে (Vosay) ভারতে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ডাঃ ভোসে অরণ্যে অরণ্যে সন্ধান কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই রোগাক্রান্ত হন, এবং মারা যান। তাঁর পরে আসেন ডাঃ উইলিয়ামস্। ইনি ছোট নাগপুরের জঙ্গলেও কয়লার অনুসন্ধান করেন এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৮৪৮ সালে হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৪৬ সালে ইনি অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন এবং গিরিডির কয়লা অঞ্চল আবিষ্কার করেন। তিনিই ১৮৪৮ সালে তাঁর কর্ম বিভাগকে সর্বপ্রথম 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' আখ্যা দান করেন। একটি বিভাগ হিসাবে গঠিত হয়ে অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫১ সাল থেকে। ডাঃ টমাস ওল্ডহ্যাম প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তারপর থেকে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের কাজ অব্যাহতভাবে চলে আসছে, তাই ১৯৫১ সালে এই বিভাগের শতবর্ষ পূর্তির উৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডিরেক্টর পদে গত একশত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের নামের তালিকাটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ—

(১) ডাঃ ওল্ডহ্যাম (১৮৫১—১৮৭৬), (২) মিঃ মেডলিকট (১৮৭৬—১৮৮৭), (৩) ডাঃ কিং (১৮৮৭—১৮৯৪), (৪) মিঃ গ্রীসবাখ (১৮৯৪—১৯০৩), (৫) স্যার টমাস হল্যান্ড (১৯০৩—১০), (৬) স্যার হেনরি হেডেন (১৯১০—২১), (৭) স্যার এডুইন প্যাস্কো (১৯২১—৩২), (৮) স্যার লুইস ফের্মর (১৯৩২—৩৫), (৯) ডাঃ হেরন (১৯৩৫—৩৯), (১০) স্যার সিরিল ফক্স (১৯৩৯—৪৩), (১১) ডাঃ ক্লেগ (১৯৪৩—৪৪) এবং বর্তমান ডিরেক্টর ডাঃ ওয়েস্ট (১৯৪৫)।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডিরেক্টরের পদে এ পর্যন্ত অর্থাৎ বিগত একশত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ব্রিটিশ নহেন। এই নামের তালিকায় য়ুরোপের অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের নামও রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু কোন ভারতীয় আজ পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হননি। বর্তমান স্বাধীন ভারতেও ডিরেক্টরের পদে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়েস্ট নিযুক্ত রয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে বিসদৃশতা কিছু নেই, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পরিচালনার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী প্রভেদের কোন অর্থ হয় না। বৈজ্ঞানিক কার্য ঠিক অন্যান্য সরকারী বিভাগের কাজের মত নয়। দেশের বিজ্ঞান চর্চার আয়োজনে বিদেশের যোগ্য মনস্বীদের সহযোগিতা যদি পাওয়া যায় এবং তাঁদের নিযুক্ত করা হয়, তবে সেটা দেশের জাতীয় স্বার্থেরই অনুকূল ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে এবং ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার পরিচালনায় বস্তুতঃ এই নীতির মর্যাদাই রক্ষা করা হয়েছে। এই সঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের ভূতাত্ত্বিক অন্বেষণের কার্যে ও সফলতায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরও দান আছে। টাটার যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আজ ভারতের গৌরবের বিষয় হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে জনৈক ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকের প্রতিভার দান। ভূতাত্ত্বিক পি এন বসু সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে লৌহের আকর আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ফসিল বা শিলীভূত অস্থি আবিষ্কারে ডাঃ সাহানীর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ বিগত একশত বৎসরে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি জন্য যা করেছে, ততখানি কৃতিত্ব অন্য কোন সরকারী বিভাগ দাবী করতে পারে কি না সন্দেহ। খনিজ শিল্পে বর্তমান ভারতের যেটুকু সম্পদ ও শক্তি দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে আছে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের সাধনা। ভারতের কয়লা, লৌহ, তাম্র, পেট্রোলিয়াম ও অভ্রের এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি খনিজ শিল্পের প্রথম দিকের ইতিহাস অন্বেষণ করলে জানা যায় যে, প্রত্যেকটি খনিজের আবিষ্কার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে অথবা সহযোগিতায় সম্ভবপর হয়েছে। বিশ বৎসর আগে ভারতের উৎপাদিত খনিজ দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি টাকা, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি টাকা। ভারতের এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির

ভূমিকাটি রচনায় ভূতত্ত্ব বিভাগের সমীক্ষা এবং গবেষণার দানই সর্বাধিক।

ভূতাত্ত্বিকের দায়িত্ব আধুনিককালে খুবই বেশী প্রসারিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে নয়, বহু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিকের সহযোগিতা আজ অপরিহার্য। নদীর বাঁধ নির্মাণে এবং সেচ-ব্যবস্থার জন্য খাল খননে ভূতাত্ত্বিকের অভিজ্ঞতা এবং সহযোগিতার ওপরেই আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারকে বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। অন্তর্ভৌম বিভিন্ন সম্পদের মত, ভূমিস্তরের বিভিন্ন গভীরতায় নিহিত জল-সম্পদের অস্তিত্ব এবং পরিচয় ভূতাত্ত্বিকই অনুসন্ধান করে জেনে থাকেন, সেই কারণে বাঁধ নির্মাণে ও সেচ-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় ভূতত্ত্ববিৎ বিজ্ঞানীর সাহায্য প্রয়োজন। রেলপথ, ব্রিজ এবং সড়ক নির্মাণেও ভূতাত্ত্বিকের সহযোগিতা চাই—কারণ স্থানীয় ভৌম গঠন এবং ভূমির প্রকৃতি ভূতাত্ত্বিকেরই জ্ঞাত তথ্য। সড়ক নির্মাণের উপযোগী পাথরের সন্ধান ভূতাত্ত্বিকই দিতে পারেন।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হলেন ভূতাত্ত্বিক। এই বিশেষ কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানীকে প্রত্যেক বৃহৎ নির্মাণ কার্যে ভূতাত্ত্বিকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিগত একশত বৎসরে ভারতের এই ধরণের সকল প্রকার উদ্যোগে সাহায্য দান করেছে—বাঁধ নির্মাণে, পথঘাট নির্মাণে, খনিজের আবিষ্কারে, ভারতীয় ভূতত্ত্বের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় এবং সেচ-ব্যবস্থার প্রসারে। প্রধানতঃ ভারতের এই সরকারী বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান সমীক্ষা এবং গবেষণার ফলেই আজ 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব' নামক বিজ্ঞানটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

ডাঃ ওয়েস্ট ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার বিগত একশত বৎসরের কৃতিত্বের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করেছেনঃ (ক) ভারতের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা একরকমের সম্পূর্ণ হয়েছে। (খ) ভারতের বহু খনিজ সম্বন্ধে বিশেষ করে অভ্র, লৌহ-আকর, পেট্রোলিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তথ্যানুসন্ধান হয়েছে। (গ) সিংভূমে তাম্র খনিজের আবিষ্কার। (ঘ) বক্সাইটের আকর আবিষ্কার এবং অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার বিশুদ্ধ গবেষণার কাজ বহু তথ্যের সন্ধান ও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাচীন 'গণ্ডোয়ানা ভূমির' আবিষ্কার, যে ভূমি একদিন বর্তমানের ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। গণ্ডোয়ানা ভূমি আজ আর পাষাণ সূত্রে গ্রথিত এক অখণ্ড মহাদেশ নয়, বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরের জলরাশির দ্বারা বহুভাবে খণ্ডিত। আসামের ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানের ও গবেষণার ফলে ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছে, সে তথ্য সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে এবং ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাও করেছে। সিওয়ালিক গিরিমালায় অবস্থিত প্রাচীন জীব-জীবনের শিলীভূত নিদর্শন মানুষেরই জৈবিক বিবর্তনের একটি বিশেষ সূত্র সন্ধানে সাহায্য করেছে। ভূতাত্ত্বিকের এই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology) নামক আর একটি বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।

আধুনিক ভারতের সমৃদ্ধি সাধনায় ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কীর্তি ও কৃতিত্ব স্মরণীয়। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী উৎসব বস্তুতঃ জাতীয় জীবনে সেই শতবর্ষব্যাপী কৃতিত্বের মর্যাদা ও মূল্য স্মরণ করবার আনুষ্ঠানিক ব্রত।

বৈদেশিকী

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের পরিকল্পিত প্রস্তাবটি ইউনো কর্তৃক গৃহীত হয়ে বর্তমানে পিকিং সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ইউনোর রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচনার সময়ে রাশিয়া প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে। তবে রাশিয়া প্রস্তাবটির বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে কিছু না ব'লে চীন ও উত্তর কোরিয়ান প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে আলোচনা অবৈধ এই ব'লে আপত্তি প্রকাশ করে। আমেরিকা প্রস্তাবটি সমর্থন করেছে বটে, কিন্তু বোধ হয়, এই আশায় যে, পিকিং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হবে। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের পরিকল্পিত প্রস্তাবের একটা মুখ্য অংশ হল এই যে, সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের আলোচনা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও নবাচীনের প্রতিনিধি নিয়ে ইউনো একটি কমিটি বা ঐ ধরণের কিছু একটা খাড়া করে দেবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ফরমোজার সমস্যা এবং ইউনোতে নবাচীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও এঁদের বিবেচ্য বিষয় হবে। যুদ্ধবিরতির চুক্তি হবার পরেই উল্লিখিত শক্তি-চতুষ্টয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। সর্বাগ্রে যুদ্ধবিরতি চাই। যুদ্ধ-বিরতির পরে উপযুক্ত ধাপে ধাপে সমস্ত অ-কোরীয় সৈন্য কোরিয়া থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে কোনো পক্ষই যাতে পুনরাক্রমণের উদ্যোগ না করে সেটা দেখা হবে। সমগ্র কোরিয়াকে এক করে কোরিয়াবাসীরা কিরূপ গভর্নমেণ্ট চায় সে বিষয়ে তাদের স্বাধীন মত নেয়া হবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ইউনোর নীতি অনুযায়ী কোরিয়াতে শাসন, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

যুদ্ধে উত্তর কোরীয় ও চীনাবাহিনী এখন জিতছে। এই জয়ের মুখে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তারা স্বভাবতঃই সন্দেহের চক্ষে দেখবে। আগে যুদ্ধবিরতি, তারপর অন্য সব কিছু—এই কার্যক্রম পিকিং-এর পছন্দ হবে বলে মনে হয় না। চতুঃশক্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে যে আলোচনার প্রস্তাব হচ্ছে তাও যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে নয়, পরে। মার্কিন নীতি সম্বন্ধে চীনের বর্তমান সংশয়াকুল মনোভাবের সহিত এই প্রস্তাবকে খাপ খাওয়ানো সহজ হবে না। ইউনোতে নবা চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ভবিষ্যতে আলোচনার বিষয় করে রেখে অগ্রসর হওয়া পিকিং সরকারের নিকট অপমানজনক মনে হতে পারে, যদিও কার্যত শক্তি হিসাবে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার পর্যায় গৃহীত হবার পরে চীনের মর্যাদা ইউনোর আসনের উপর থোড়াই নির্ভর করবে। আসল কথা, কোরিয়াতে অন্তর্বর্তী-কালে কী ব্যবস্থা হবে, ধাপে ধাপে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার মানে কী এবং ফরমোজায় নবাচীনের কর্তৃত্ব স্বীকারের ভিত্তিতেই ফরমোজা-সমস্যা সমাধানের আলোচনা হবে—এসব বিষয়ে কিছুটা নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি না পেলে পিকিং সরকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে চট্ করে সম্মত হবেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ পিকিং যুদ্ধবিরতি ও অন্যান্য প্রশ্ন-গুলির আলোচনা একসঙ্গে চাইবে।

অপরপক্ষে আমেরিকার জনমতকে এমন করে ক্ষেপানো হয়েছে এবং বিশেষ করে কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন ফৌজের দশাবিপর্যয়ের ফলে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তার দরুণ চীনের সঙ্গে কোনোরকম আপোষের কথা উঠলেই আমেরিকার কাছে সেটা অসহ্য বোধ হয়। সেইজন্য কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের পরিকল্পিত প্রস্তাবও আমেরিকার খুব মুখ-রোচক হয়নি; যদিও ইউনোতে আমেরিকা উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেছে। চীন যদি উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে কিছু অদলবদল করে বা যুদ্ধবিরতিতে স্বীকৃত হবার পূর্বে প্রস্তাবের অন্য অংশগুলি আরও পরিষ্কার করে নিতে চায় তবে আমেরিকা তাতে সম্মত হবে কিনা সন্দেহ। আমেরিকার মতিগতি দেখে মনে হয় না যে, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের পরিকল্পিত ও ইউনো কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি পিকিং সরকার প্রত্যাখ্যান করলেই যেন মার্কিন গভর্ন-মেণ্ট বেঁচে যান। তা'হলে চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবের পক্ষে মার্কিন গভর্নমেণ্ট আরও জোর দিতে পারেন। সোভিয়েট ব্লকের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশের গভর্নমেণ্টের নিকট মার্কিন গভর্নমেণ্ট কিছুদিন পূর্বেই এক নোট পাঠিয়েছেন, তার বক্তব্য এই যে, যেহেতু চীন কোরিয়াতে ইউনোর বিরুদ্ধে লড়ছে সেইজন্য তাকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করা হোক এবং চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হোক। মার্কিন গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাবের পক্ষে কিন্তু অন্যান্য গভর্নমেণ্টের দিক থেকে কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। ইউনোর সর্বশেষ প্রস্তাবে যদি পিকিং গভর্নমেণ্ট সরাসরি রাজী হয়ে না যান, তবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট সেই ওজুহাতে তাঁদের নিজেদের প্রস্তাব অর্থাৎ চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করাবার জন্য অন্যান্য দেশের গভর্নমেণ্টের উপর জোর দেবার সুবিধা পাবেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কী ফল হবে বুঝা যায় না। ইউনোর জেনারেল এসেম্ব্লীর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে যদি আমেরিকার কোনো প্রস্তাব গৃহীতও হয় তা'হলেই যে কার্যত তার খুব একটা ফল হবে তা মনে হয় না। ইউনোর ৫২টি সদস্য-গভর্নমেণ্ট উত্তর কোরিয়ানদের শায়েস্তা করার নীতি ভোট দিয়ে সমর্থন করা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে অতি অল্প-সংখ্যক গভর্নমেণ্টই আমেরিকার সহযোগী হয়েছে। যারা যুদ্ধে আমেরিকার অংশীদার হয়েছে তারাও যতদূর সম্ভব অল্পের ওপর দিয়ে দায় সারার চেষ্টায় আছে। সর্বোপরি আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিত্র—বৃটেন। সেও চীনের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। সুতরাং আমেরিকার চাপে কতকগুলি দেশের গভর্নমেণ্ট যদি চীনকে অন্যায় আক্রমণ-কারী আখ্যা দিয়ে চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থনও করেন তবে আপাতত সে অনেকটা নামকোওয়াস্তেই হবে, কারণ কার্যত—এখন যেমন হচ্ছে—চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বা আর কিছু করার ভার প্রায় সবগুলি আমেরিকাকেই বইতে হবে।

পুস্তক পরিচয়

স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা—গোপাল হালদার। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উভয় পুস্তকের মূল্য ৩৷৷৹ টাকা।

চিন্তাশীল-প্রবন্ধসাহিত্যের দিক্‌পাল গোপাল হালদারের কথাসাহিত্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা 'একদা' উপন্যাস। যদিও তাঁর আরো কয়েকটি ধারাবাহিক উপন্যাস ইতিমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু যে কারণেই হোক্‌, তারা 'একদা'র একাংশ খ্যাতিও পায়নি। 'স্রোতের দীপ', 'উজান গঙ্গা' এই শ্রেণীগত। এ-দুটি কোন বিচ্ছিন্ন উপন্যাস নয়—এমন কি দুটো মিলে সম্পূর্ণও নয়। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'ভাঙনে'র ক্রমিক হিসেবে এ-দুটি রচিত।

উপন্যাসের ঘটনাকাল এ-শতাব্দীর তৃতীয় দশক। প্রথম যুদ্ধোত্তর সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা, প্রবীণদের দৃষ্টিতে তার প্রতিফলন দেখানোই এ-রচনার উদ্দেশ্য—ভূমিকাতেই লেখক একথা বলেছেন এবং সেই হিসেবে এই উপন্যাসধারাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা অমূল্য। জীবন যে জীর্ণ আবরণ ত্যাগ ক'রে নবীনত্বের সন্ধান নিচ্ছে, জীর্ণ মন সে-নূতনকে কিভাবে কতোটুকু গ্রহণ করতে পারলো 'ভাঙন-স্রোতের দীপ উজান গঙ্গা' তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণ। ঘটনাকালের কুড়ি পঁচিশ বছর পরে আজ এ ভাঙনের ছবি ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই মৃত,—এ কোনো বিশেষ সমস্যা নয়। উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র তাই কোনো সমস্যাতে নয়, ঐতিহাসিক চিত্রে।

চিত্রিসারের জমিদার জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর আমৃত্যু ইতিহাসে এই 'বিষমকালে'র ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনের প্রত্যেক কোণ থেকে জ্ঞানশঙ্করের অবসিত মন আর সংস্কার ক্রমাগতই আহত হচ্ছে, লীয়ারের মতো তিনিও bound upon a wheel of fire। তাঁর জীবনদর্শ যে কেবলই পীড়িত হচ্ছে, সমাজের কেন্দ্রে যে ঘুণ ধরেছে—একথা স্পষ্ট বুঝেই তাঁর মুহূর্তের স্বস্তি নেই। তিনি জেনেছেন, দুঃসহ হলেও এ অপ্রতিরোধ্য। 'স্রোতের দীপে' নীলমাধবের মন্দিরের ফাটল সারাবার জন্যে তাঁর যে সংকল্প, কালগ্রস্ত হয়ে তা অপূর্ণই রইলো, 'উজানগঙ্গা'য় সে মন্দিরকে পদ্মাস্রোতে বিলীন হতে দেখলাম। এই মন্দিরকে স্পষ্টতঃই লেখক প্রাচীন সংস্কারের রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন; এবং এই মন্দিরের বিলয় আর জ্ঞানশঙ্করের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি বিলীয়মান যুগের জীবনপন্থার সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

লেখকের বক্তব্য কাহিনীতে চমৎকার ফুটেছে, সংশয় নেই। জ্ঞানশঙ্কর-হৈমবতীর মননধারার বিশ্লেষণ মনকে প্রায়ই নিবিষ্ট করে। কিন্তু উপন্যাসের দৈর্ঘ্য পাঠকমনের পীড়ার কারণ। ঘটনার পর ঘটনার অনুবর্তনে লেখক ভাঙনের ছবিকে স্পষ্টতর করতে চেয়েছেন, কাহিনীর পক্ষে এ দৈর্ঘ্য অনিবার্য নয়। এই জন্যেই 'স্রোতের দীপে'র পর 'উজানগঙ্গা'র বহুলাংশ কষ্টপাঠ্য এবং চিন্তাধারার বিশেষ কোনো নূতনত্বের অভাবে উপন্যাসের সজীবত্ব অনেক সময়েই নষ্ট হয়ে গেছে। কাহিনীর আয়তন নিয়ন্ত্রণে লেখকের এই শৈথিল্য কিছুটা অসংযমের পরিচয়।

অথচ, বিক্ষিপ্তভাবে, অধিকাংশ ঘটনার বর্ণনাতেই লেখক আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। দুয়েকটি কথার ইঙ্গিতে, দুয়েকটি মনন-সূত্রের বিন্যাসে একটি সমগ্র ঘটনাকে প্রচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলে সহজেই তিনি পাঠকের ঔৎসুক্য জাগিয়েছেন এবং বলবার ভঙ্গিতে একটা অবিচ্ছিন্ন টান বজায় রেখে কাহিনী-দৈর্ঘ্যের ক্লান্তিকে যথাসাধ্য কমিয়েছেন। 'স্রোতের দীপে'র প্রথমাংশে ইন্দুমতীর অংশ অতি সামান্য এবং সে অংশও পরোক্ষ। কিন্তু এই সামান্য অবকাশেই তার ছবি একটা করুণমধুর রেশে চমৎকার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অশোক-অমর—নূতন যুগের পুরোধা এই দুই তরুণের চরিত্র-আভাস জ্ঞানশঙ্করের চরিত্রের মতো এতো ব্যাপক এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। বিশেষতঃ, রাজনীতির সঙ্গে অশোকের কিছুটা হলেও অমরের যোগাযোগ কখনোই নিবিড় হয়ে উঠতে পারেনি। নিতান্ত প্রয়োজনবোধেই লেখক এ-দুই চরিত্রের সঙ্গে রাজনীতির সংস্পর্শ ঘটিয়েছেন। বরং অমিতার দুরন্ত স্বভাবের সঙ্গে তার হঠাৎ বিয়ের, হঠাৎ হৈ চৈ ক'রে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সামঞ্জস্য সহজ।

একটি জীবনের ইতিহাস ফুটিয়ে তোলার জন্যে কাহিনীকার যে loose plot-এর আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে যেমন বহু-বিচ্ছিন্ন ঘটনার তেমনি বহু ইতস্ততঃ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। মনোজগতের এই দীর্ঘধ্বংসের ইতিহাসে অমর-শান্তা, কমলা-মনোজ, অশোক-মালিনী, অরুণ-নিতুর কথা মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্তই থেকে যায়। সংস্কার-ভীরু জ্ঞান-হৈম-কাদম্বিনী অমর-শান্তা আর ইন্দুমতী-হীরেন্দ্রের বিয়েকে কি এতো সহজ-ভাবেই গ্রহণ করতে পারেন?

২১১।৫০, ২১২।৫০

ভারতবর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম এ। এইচ চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹।

যে সকল মূলগত কারণ দ্বারা বর্তমান যুগে আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার অন্যতম পরিবহন ব্যবস্থা। সেইজন্যই পরিবহন ব্যবস্থাকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। মোট কথা পরিবহন ব্যবস্থা যত উন্নত ও সুপরিকল্পিত হয়, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদও সেই পরিমাণে সুদৃঢ় ও সবল হয়। যথা-যোগ্য উপমা প্রয়োগ করিয়া লেখক বলিয়াছেন—"শিরা ও ধমণী প্রবাহিত রক্ত যেমন মনুষ্য দেহকে সরস ও সজীব রাখে, পরিবহন প্রণালীও সেইরূপ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, কৃষি অঞ্চল ও সহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উহাদিগকে সতেজ ও কর্মচঞ্চল রাখে।"

লেখক এই পুস্তকে ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র অংকন করিয়াছেন। রাজপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথসমূহের বিশদ বিবরণী তিনি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থার গলদ্ কোথায় এবং কোথায় বা ভারত পরিবহন ব্যবস্থা গঠনে সফলতা লাভ করিয়াছে, লেখক তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য কোন দিকে কি করা প্রয়োজন, তাহারও নির্দেশ তিনি যথাযথ স্থানে দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ভারতের বিভিন্ন পরিবহন প্রণালীর মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, পুস্তকখানি সুধীসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

২২৬।৫০

বিখ্যাত বিচার কাহিনী—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এম-সি সরকার য়্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ভারতীয় আদালতের নথিপত্র থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে লেখক কয়েকটি বিখ্যাত মামলা গল্পাকারে এই বইতে প্রকাশ করেছেন। ক্লার্ক-লাম হত্যা-রহস্য, ভাওলা হত্যাকাণ্ড, সামসেদবাঈ হত্যা, প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড, পাগলা খুনের মামলা, সতীদাহ-রহস্য ও রাজার কামলীলা নামক সাতটি কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। এই মামলা-গুলি বেশী দিনের পুরোন নয়। খবরের কাগজে যখন এই মামলার বিবরণগুলি কয়েক বছর আগে প্রকাশ হয়েছিল তখন জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হয়। স্থানাভাবে খবরের কাগজে সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে প্রকাশিত হয়নি। এখন পুস্তকাকারে সেগুলি পড়ে নতুন করে আবার একত্রে সবগুলি পড়বার সুযোগ পাওয়া গেল।

লেখকের ভাষায় "ভালোবাসার জন্যে, প্রেমের জন্যে মানুষ পৃথিবীতে করেনি এমন কাজ নেই। নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে বিড়ম্বিত হয়েও স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের যেমন সে পরাকাষ্ঠা

দেখিয়েছে, তেমনি মোহাবিষ্ট কামাতুর হয়ে সমাজের সমাজ-সংস্কৃতি ন্যায় ধর্ম কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেনি—বর্বরতার চরম সীমায় নেবে গেছে, কুৎসিত ঘৃণিত নৃশংসতার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু পরিণামে দুষ্কৃতির ফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়েছে, এর হাত থেকে কেউ-ই নিষ্কৃতি পায়নি—বিচারের ন্যায়দণ্ডে তার জীবনান্ত ঘটেছে হয় ফাঁসির মঞ্চে, না হয় অপঘাতে আততায়ীর হাতে।"

সমাজের সর্বস্তরের লোকের জীবনী থেকে এই ধরণের সত্য কাহিনী আদালতের নথিপত্রের সাহায্যে গল্পাকারে প্রকাশ করা বাঙলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রত্যেকটি কাহিনী একবার পড়তে আরম্ভ করলে চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত না পড়ে ছাড়া যায় না। আদালতের কাহিনী লেখকের লেখার গুণে সার্থক সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কয়েকটি কাহিনী পূর্বে যখন মাসিকপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল তখনি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটির ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

নিউ এম্পায়ারে 'অমর সংগ্রাম'

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ললিত-কলা কেন্দ্র। জনপ্রিয় শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত এই কেন্দ্র আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় 'নিউ এম্পায়ারে' কেন্দ্রের সাহায্যার্থে নৃত্য-নাট্যের আয়োজন করেছেন।

বর্তমান গ্রামজীবনের আলেখ্যকে সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত করে পরিবেশন করা হয়েছে এই নৃত্য-নাট্যে; নৃত্য ও সংগীতের সমন্বয়ে 'যারা যোগায় সোনার ধান', সেই কৃষকের জীবনকে দেখবার নূতনতম দৃষ্টিকোণ 'অমর-সংগ্রাম'।

শতাধিক শিল্পীর সমন্বয়ে অভিনীত নৃত্য-নাট্যের সংগীত পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা তরুণ রবীন্দ্র সংগীতকার শ্রীমান অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন নৃত্য-শিক্ষক, জনপ্রিয় বালকৃষ্ণ মেননের নৃত্য-পরিচালনা। আবহ-সংগীত পরিচালনা করছেন অভিজ্ঞ শিল্পী ধ্রুব চক্রবর্তী। রচনা করেছেন রবীন্দ্র নাগ।

সংগীতের মাধ্যমে নূতনভাবে নৃত্য-নাট্যের প্রযোজনা, রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যগুলি পরে এই সর্বপ্রথম। 'ললিত-কলা' কেন্দ্রের সংগঠকদের এই ধরণের 'দুঃসাহস' রসিক-জনের চিত্তজয়ে সমর্থ হবে, এ-আশা অযৌক্তিক নয়।

পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতায় 'অমর-সংগ্রাম' নৃত্য-নাট্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মৌলিক পটভূমিকা রচনা করবে, এটা স্থির নিশ্চিত। নৃত্য-নাট্য ও সাহায্য অভিনয়ের আমরা সাফল্য কামনা করি।

এ্যাথলেটিকস্

এশিয়ান গেমসের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান আগামী মার্চ মাসে দিল্লীতে হইবে। এইজন্য উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হইয়াছে। অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঠিক মত হইয়াছে কি না, এমন কি ট্রাক ও মাঠের আয়োজন আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে হইয়াছে কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য আন্তর্জাতিক এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন ভারতের প্রতিনিধি শ্রী জি ডি সোন্ধীর উপর ভার দিয়াছেন। তিনি ভারতেরই লোক; সুতরাং আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব ভারত বহন করিয়া যাহাতে সুনাম অর্জন করে, সেই দিকে ইহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবেই। দোষত্রুটি যাহা কিছু আছে, তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারেই করিয়া লইবেন। কেবল একটা চিন্তা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না যে, ভারত এই প্রতিযোগিতায় সকল গৌরবের অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য ভারতের এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন কি করিয়াছেন? উদ্যোগ আয়োজনে দীর্ঘ দেড় বৎসর অতিবাহিত করিলেন, অথচ ইহার মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য-মণ্ডিত হয়, তাহার উপযুক্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা কেন করিলেন না—ইহাই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন পর্ব এখনও শেষ হয় নাই। যখন শেষ হইবে, তখন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান উন্নততর করিবার কোনই সময় থাকিবে না—ইহা পরিচালকগণ কেন প্রথম হইতেই চিন্তা করিলেন না ইহা আমাদের বোধগম্য হয় না। শিক্ষার ব্যবস্থা কয়েক স্থানে হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার ফল কি হইল তাহারও প্রমাণ কোন অনুষ্ঠানেই পাওয়া গেল না। পূর্বাপেক্ষা ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে উন্নততর হয় নাই, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। তাহার উপর নির্বাচকমণ্ডলী যে শ্রেণীর লোকদের লইয়া করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন লোক আছেন, যিনি জীবনে কোন দিন কোন স্পোর্টস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন নাই। এই সকল লোকদের বাদ দিয়া ঠিক এ্যাথলেটিকস্ বিষয় জ্ঞানী এইরূপে লোকদের লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথাও আমরা ইতঃপূর্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পরিচালকগণ একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর কি করিয়া আশা করিতে পারা যায় যে, ভারতের প্রতিনিধিগণ এশিয়ান গেমস্ অনুষ্ঠানে দেশের ও জাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিবেন। জাতির স্বার্থ যে অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত, সেই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনই স্থান থাকিতে পারে না। এই সকলের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিত, যদি ভারত সরকারের এই দিকে দৃষ্টি থাকিত। স্বাধীনতা লাভের পর বহু ক্রীড়া-সাংবাদিক এই দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। পূর্বের ব্যবস্থাই এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে—এইরূপ আশঙ্কাও করা চলে।

বাঙলা দেশের প্রতিনিধিগণ ভারতীয় ট্রায়ালেই প্রতিনিধিত্ব করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধি হইবার সৌভাগ্য হইবে ইহা সম্পূর্ণ দুরাশা। কয়েকটি বিশিষ্ট এ্যাথলেটিক স্পোর্টস্ অনুষ্ঠান ইতোমধ্যে বাঙলায় হইয়া গেল, তাহা অবলোকন করিয়াই আমরা উপরোক্ত উক্তি করিতে সাহসী হইতেছি। বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের পরিচালকগণ যাঁহারা বৃটিশ আমলে খোসামোদ করিয়া পদ লাভ করিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা সেই পদেই সমাসীন আছেন। আইনকানুনের জোরে তাঁহারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অপসারণ বা বিতাড়ন করে—এই শক্তি কাহারও নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না, যদি না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল চিরাচরিত প্রথার অদল বদল করিয়া নূতন আইনকানুন গঠন না করিয়া দেন। জানি না সেইরূপ প্রচেষ্টা কোন দিন হইবে কি না!

খেলাধূলা

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলায় তাঁহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পর পর তিনটি টেস্ট খেলাতেই ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংলণ্ড দল প্রথম দুইটি টেস্ট খেলায় পরাজিত হইলে কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন, তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়া দলকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দান করিবেন; কিন্তু ফলতঃ তাহা হইল না। এমন কি ইংলণ্ড দল তৃতীয় টেস্ট খেলায় প্রথম ব্যাটিং করিবার সুযোগ পাইয়াও মিলার ও জনসনের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যও প্রথম ইনিংস্ ২৯০ রানে শেষ করিতে বাধ্য হয়। পরে অস্ট্রেলিয়া দল খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪২৬ রান করে। ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসেও রান তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় ইভারসনের বোলিংয়ের জন্য। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস্ মাত্র ১২৩ রানে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া খেলায় ইনিংসে বিজয়ী হয়। টেস্ট পর্যায়ের পর পর তিনটি খেলায় ইংলণ্ড দলকে অস্ট্রেলিয়া পরাজিত করিয়া পূর্ব অর্জিত "এসেজ" নিজেদের আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অবশিষ্ট যে দুইটি টেস্ট খেলা আছে, ইহার পর আর তাহার কোনই গুরুত্ব রহিল না।

:: খেলার ফলাফল ::

ইংলণ্ড দল:—প্রথম ইনিংস্—২৯০ রান (হাটন ৬২ রান, সিম্পসন ৪৯ রান, ব্রাউন ৭৯ রান, পার্কহাউস ২৫ রান; মিলার ৩৭ রানে ৪টি উইকেট, লিণ্ডওয়াল ৬০ রানে ২টি উইকেট ও জনসন ৯৪ রানে ৩টি উইকেট পান)

অস্ট্রেলিয়া দল:—প্রথম ইনিংস্—৪২৬ রান (মিলার ১৪৫ রান, আর্চার ৪৮ রান, হ্যাসেট ৭০ রান, নীল হার্ভে ৩৯ রান, আইয়েন জনসন ৭৭ রান; বেডসার ১০৭ রানে ৪টি উইকেট ও ব্রাউন ১৫৩ রানে ৪টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড দল:—দ্বিতীয় ইনিংস্—১২৩ রান (ওয়াসব্রুক ৩৪ রান, কম্পটন ২৩ রান, ব্রাউন ১৮ রান; ইভারসন ২৭ রানে ৬টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ বনাম মাদ্রাজ রাজ্যপাল একাদশ

কমনওয়েলথ বনাম মাদ্রাজ রাজ্যপাল একাদশের তিনদিনব্যাপী খেলা সম্প্রতি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় কমনওয়েলথ দল ১০ উইকেটে বিজয়ী হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও শেষ সময় মাদ্রাজ রাজ্যপাল দলের পক্ষে টি কানন ও তরুণ খেলোয়াড় গোপীনাথ যেরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করিয়াছেন, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহা ছাড়া কানাইয়ারাম ও শার্ঙ্গপানির বোলিংও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। ভবিষ্যতে এই সকল খেলোয়াড় ভারতীয় দলে স্থান পাইবেন—এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কমনওয়েলথ দল প্রথম ব্যাটিং করিয়া ৮ উইকেটে ৩১৯ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। মাদ্রাজ রাজ্যপাল একাদশ তাহার প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংস্ ১০১ রানে শেষ করিয়া "ফলো অন্" করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে কানন ও গোপীনাথ একত্রে দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া মাদ্রাজ রাজ্যপাল দলকে ইনিংস-এ পরাজয় হইতে রক্ষা করে। দ্বিতীয় ইনিংস্ ২৯২ রানে শেষ হইলে কমনওয়েলথ দলের কেহ আউট না হইয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৫ রান সংগ্রহ করে ও রাজ্যপাল দলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

:: খেলার ফলাফল ::

কমনওয়েলথ দল:—প্রথম ইনিংস্—৮ উইকেটে ৩১৯ রান ডিক্লেয়ার্ড (গিম্বলেট ৭৫ রান, ফিসলক ৪২ রান, আইকিন ৬২ রান, এমস্ ৬৯ রান, সার্টক্লিফ নট আউট ২৯ রান; কানাইয়ারাম ৩৮ রানে ৩টি উইকেট, শার্ঙ্গপানি ৯২ রানে ৪টি উইকেট পান)

মাদ্রাজ রাজ্যপাল একাদশ:—প্রথম ইনিংস্—১০১ রান (বি আলভা নট আউট ৪৭ রান, গোপীনাথ ১২ রান, কানন ১০ রান; স্যাকলটন ৩৩ রানে ৪টি উইকেট, সার্টক্লিফ ১২ রানে ২টি উইকেট, রামাধীন ১৬ রানে ২টি উইকেট ও ডোভে ২৭ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন)

মাদ্রাজ রাজ্যপাল একাদশ:—দ্বিতীয় ইনিংস্—২৯২ রান (টি কানন ৯৮ রান, গোপীনাথ ৮৫ রান, ডিকেনসন ২৪ রান, রঙ্গচারী নট আউট ১৬ রান; স্যাকলটন ৭৮ রানে ৬টি উইকেট, রামাধীন ৭৬ রানে ২টি উইকেট ও সার্টক্লিফ ৩১ রানে ১টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দল:—দ্বিতীয় ইনিংস্—কেহ আউট না হইয়া ৭৬ রান (গিম্বলেট নট আউট ৩৪ রান, এমেট নট আউট ৪২ রান)

আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা

বি ওয়াই এম এ'র (২৫৬, রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ) উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ—১।২।৫১। আবৃত্তির বিষয়:—সাধারণ "১৪০০ সাল"; স্কুলছাত্র—"কৃপণ"; স্কুলছাত্রী—"শঙ্খ"—রবীন্দ্রনাথের। ৮ বৎসর বালকবালিকা—সুনির্মল বসুর "সামিয়ানা"। রচনা—স্কুলছাত্রছাত্রীদের—"আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়ে একটিমাত্র বর প্রার্থনা করতে হলে তুমি কি প্রার্থনা করবে।"

(সি ৮৬৪১)

দেশী সংবাদ—

৮ই জানুয়ারী—নেপালের প্রধান মন্ত্রী অদ্য কাঠমান্ডুতে নেপাল পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, রাজা ত্রিভুবনই পূর্ববৎ নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। একটি গণপরিষদ নেপালের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র ১৪ জন সদস্য লইয়া একটি অন্তর্বর্তী-কালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে। রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়াও প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন।

অদ্য অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি নূতন মাঝারি তরঙ্গের বেতার প্রক্ষেপক যন্ত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব অদ্য মাদ্রাজে ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার সিমেণ্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, কয়লা সঙ্কটের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪০টি দৈনিক ট্রেন সার্ভিস বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

৯ই জানুয়ারী—খ্যাতনামা উপন্যাস লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী অদ্য বৃন্দাবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

অদ্য কলিকাতা সেনেট হলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চারি দিনব্যাপী সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনায় ১৯৪৯ সালে কলা ও আইন শাস্ত্রে (বি-এ এবং এল-এল-বি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৮০ জন উপস্থিত ছাত্রছাত্রীকে স্নাতক উপাধির প্রমাণ-পত্র দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩৯।

১০ই জানুয়ারী—অদ্য উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে উত্তর প্রদেশ জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার বিল (১৯৫০) বিনা ডিভিসনে পাশ হইয়াছে।

গত রবিবার রাত্রে সীমান্তবর্তী মালদহ জেলার অন্তর্গত কালিকে থানা এলাকায় অবস্থিত চরনন্দপুরে পাকিস্থান হইতে আগত একদল দুর্বৃত্তকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ গুলী চালনা করে।

১১ই জানুয়ারী—ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী অদ্য নয়াদিল্লীতে গণপরিষদ ভবনে তিনটি আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনীয়ারিং সম্মেলনের যুক্ত অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ৩৮টি দেশ হইতে আগত ৩৪০ জন শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার ও ভারতের ৪৩০ জন ইঞ্জিনীয়ার এই সকল সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। এই সকল সম্মেলনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বাঁধ ও সেচ সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা হইবে।

আজাদ পাখতুনিস্থান আন্দোলনের প্রতিনিধি স্থানীয় তিনজন নেতা কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা অদ্য এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে পাকি-স্থানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুই লক্ষ বর্গ মাইল জুড়িয়া যে ৮০ লক্ষ পাঠান বসবাস করিতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃতির দৃঢ় দাবী জানান। তাহারা ঘোষণা করেন যে, স্বাধীন পাখতুনিস্থানের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পাঠান জনসাধারণ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য ভারত সরকার উহার পরিচালনভার গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী—বোম্বাই সরকারের অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীদিনকর রাও দেশাই এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, বোম্বাই সরকার আগামী ১৪ই জানুয়ারী হইতে বোম্বাই রাজ্যের সর্বত্র রেশন এলাকার বরাদ্দ খাদ্যশস্যের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের সকল রাজ্যে রেশন এলাকায় প্রদত্ত খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই বিভিন্ন সরকারকে এক নির্দেশ দিবেন।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিন ব্যাপী সমাবর্তন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অদ্যকার অনুষ্ঠানে বিহারের রাজ্যপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি আণে সমাবর্তন ভাষণ দেন।

১৩ই জানুয়ারী—কলিকাতার যাদুঘর প্রাঙ্গণে ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ মন্ত্রী শ্রী এন ভি গ্যাডগিল দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন সাধনের পথে অধিকতর সক্রিয় ও ব্যাপক ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা চালাইবার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। শ্রীযুত গ্যাডগিল জানান যে, বিশ বৎসর পূর্বে ভারতে যে-সব খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইত সেগুলির মূল্য ২০ কোটি টাকা কম ছিল। কিন্তু আজ ভারতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য সম্ভারের মূল্য ৭৫ কোটি টাকারও অধিক দাঁড়াইয়াছে।

ঢাকাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ অধি-বেশন হয়। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে সর্ব-শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার, প্রত্যাবর্তনকারীদের যথাযথ সাহায্য দিবার, পাক-ভারত বাণিজ্যের অচলাবস্থার অবসান করিবার দাবী জানান হইয়াছে।

গ্যাংটকের (সিকিম) সংবাদে প্রকাশ, তিব্বতে ভারতের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে কিছু-কাল যাবৎ যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী নেপাল সরকারী পুলিশ ভৈরব শহরে প্রায় ২৫ হাজার শান্তিপূর্ণ নেপালী সত্যাগ্রহীর উপর গুলী ও লাঠিচালনা করায় ৫ জন স্ত্রীলোক সহ ১১ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

ত্রিবান্দ্রামে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের ১৮তম বার্ষিক অধিবেশন শেষ হইয়াছে। পরিষদে অদ্য গান্ধী-সাহিত্য প্রচার সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং স্কুল ও কলেজগুলিতে গান্ধীজীর রচনাগুলি যাহাতে আরও বেশী পঠিত হয় তজ্জন্য সরকারী শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ জানান হয়।

অগ্নিযুগের ঋত্বিক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের ৭১তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে অদ্য হাওড়া টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিদেশী সংবাদ—

৮ই জানুয়ারী—টোকিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট বাহিনী মধ্য কোরিয়ায় অবস্থিত ওনজু শহর দখল করিয়াছে। কম্যুনিস্ট বাহিনী অদ্য সিউলের ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ওসান দখল করিয়াছে।

১০ই জানুয়ারী—জেনারেল ম্যাকআর্থার অদ্য এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, ওনজু ও ওসানের মধ্যে ৭০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে আড়াই লক্ষাধিক চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। একই সঙ্গে বহু স্থানে আক্রমণ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। গতকল্য এই এলাকায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সৈন্যগণ কম্যুনিস্টদের এক পাল্টা আক্রমণ হটাইয়া দিয়া যজু ও ইনচনে প্রবেশ করে।

১১ই জানুয়ারী—অদ্য মার্কিন, ফরাসী ও ওলন্দাজ সৈন্যদল মধ্য কোরিয়া অভিযানে চীনা ও উত্তর কোরীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করে।

১২ই জানুয়ারী—লণ্ডনে দশদিনব্যাপী কমন-ওয়েলথ সম্মেলনের শেষে প্রধান মন্ত্রিগণ যুক্ত ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে জার্মানি ও জাপানের সমস্যাবলীর দ্রুত মীমাংসার কথা বলা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রিগণ জেনারেলিসিমো স্টালিন অথবা নব্য চীনের মাও সে তুং-এর সহিত খোলাখুলি আলোচনার জন্য যে কোন সম্ভাব্য ব্যবস্থার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইস্তাহারে জানানো হইয়াছে।

উত্তর ইংলণ্ডে মহামারীর আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যুদ্ধবিরতি কমিটি অদ্য সুদূর প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও নব্য চীন—এই বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের এক বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করিলে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহা সমর্থন করিয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় ঘরোয়া বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

টোকিও-র সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী অদ্য যুদ্ধের প্রচণ্ডতম আক্রমণের সম্মুখে অবিচলিত-ভাবে সংগ্রাম করে। ওনজুর দুই মাইল দক্ষিণে কম্যুনিষ্টদের দুইটি প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়।

১৪ই জানুয়ারী—মস্কো বেতারে প্রচারিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্য-পুষ্ট কম্যুনিষ্ট ও উত্তর কোরীয় পুরোগামী সৈন্য-দল আনসং-এর নিকট ৩৭ ডিগ্রী অক্ষরেখায় উপনীত হইয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কে জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আমেরিকার ঊর্ধ্বতন সমরনায়কগণ গতকল্য রাত্রিতে বিমানযোগে টোকিও গিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 27th January, 1951. [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কর্ম-সন্ন্যাসী যতীন্দ্র রায় এবং সমাজসেবক ঠক্কর বাপা

পর পর কয়েক দিনের মধ্যে ভারতের সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবন হইতে দুইজন প্রকৃত কর্ম-সন্ন্যাসীর তিরোভাব ঘটিয়াছে। গত ৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার বগুড়ার প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং



ঠক্করবাপা

৫ই মাঘ, শুক্রবার শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর পরলোক-গমন করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ যতীন রায়ের কর্মকেন্দ্র ছিল। কিন্তু তিনি সমগ্র বাঙলার অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাঙলা দেশে অনেক স্বদেশপ্রেমিক কর্মী পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে যতীন্দ্রমোহনের নিষ্কাম কর্মজীবন এবং ত্যাগময় সেবার আদর্শ এখানেও বিরল। স্বদেশী যুগে যতীন্দ্রমোহন দেশের মুক্তি-সাধনায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। উত্তরবঙ্গের ছাত্র-সমাজের মধ্যে তাঁহার প্রচেষ্টায় নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। দেশ-মাতৃকার আহবানে বাঙলার যেসব তরুণ তখন আত্মদানে অগ্রণী হন, তাঁহাদের অনেকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রমোহন মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রধানত গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। প্রবল চরিত্রশক্তি এবং আদর্শনিষ্ঠার প্রভাবে যতীন্দ্র-মোহন জনগণের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নাম, যশের তিনি কাঙ্গাল ছিলেন না। চিরদিন তিনি অর্থ ও প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়াছেন। দারিদ্র্যকে তিনি ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কর্ম-সন্ন্যাসের পবিত্র-প্রভাবে উজ্জ্বল মাধুর্যময় ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্রমোহনের সংস্পর্শে যিনি একবার গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্রের অনাবিল ঔদার্যে এবং মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। মিষ্টভাষী, বিনয়ী যতীন্দ্রমোহনের অন্তরে ছিল আদর্শের বলিষ্ঠতা এবং অনপেক্ষতা। আত্মাতেই ছিল তাঁহার সংস্থিতি। এমন মানুষ কয়জন মিলে? স্বাধীনতা লাভ করিবার পর যাঁহারা কর্মী, তাঁহারাও অনেকে আদর্শনিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন সেবাধর্মে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠিত ছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে যতীন্দ্রমোহন শক্ত মানুষ ছিলেন। ত্যাগের শক্তি, চরিত্রের মহিমা, অকিঞ্চন সেবা-ব্রতের আদর্শকে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন উদ্দীপ্ত রাখিবে। ঠক্করবাপা ভারতের সর্বজন-মান্য পুরুষ ছিলেন। কুড়ি বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচরস্বরূপে তিনি দুঃস্থ ও নির্যাতিত জনগণের সেবায় তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। রাজনীতিক আন্দোলনের আবর্ত এবং আড়ম্বর হইতে দূরে থাকিয়া তিনি



যতীন্দ্রমোহন রায়

সমাজ-সেবায় ব্রতী ছিলেন। নিখিল ভারত হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক স্বরূপে তাঁহার সেবা ও সাধনা ভারতের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও এই সেবা-নিষ্ঠায় তিনি অতন্দ্রিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে ঠক্করবাপা মহাত্মাজীর সঙ্গে নোয়াখালিতে আগমন করেন। তিনি কিছুদিন সাম্প্রদায়িকতা বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবস্থান করিয়া

সেবাব্রত পরিচালনা করিয়াছিলেন। নোয়াখালির হাইমচরেই তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল। ঠক্কর বাপার ন্যায় সমাজ-সেবক সাধুপুরুষের অভাব সহজে পূরণ হইবার নহে। আমরা এই দুইজন আদর্শ-চরিত্র পুরুষের উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

লিয়াকৎ আলীর লক্ষ্য

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী বিগত কমনওয়েলথ বৈঠক সম্পর্কে কাশ্মীরের সম্পর্ক লইয়া যে খেলা খেলিয়াছেন, তাহাকে কেহ কেহ প্রহসন বলিয়া উপেক্ষা করিবার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিষয়টিকে তেমন উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। জনাব লিয়াকৎ আলী কূটনীতিক পুরুষ এবং কেমন করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। বস্তুত ইতোমধ্যেই তিনি কাজ অনেকটা বাগাইয়া লইয়াছেন। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে তাঁহার মতের পরিপোষকতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দুই জাতিতত্ত্বের ভেদবাদকে সমর্থন করিয়া ইংরেজ এবং মার্কিন ভারত ও পাকিস্থান উভয়ের সর্বনাশ সাধনের রাস্তা খুলিয়া দিতেছে। কাশ্মীরের জনসংখ্যায় যখন মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন পাকিস্থানের সে রাষ্ট্রে দাবী রহিয়াছে, এমন যুক্তি তাহারা দেখাইতেছে। পাকিস্থান যে কাশ্মীরে পররাজ্য-আক্রমণকারী, এ-যুক্তি হাজার বুঝাইলেও তাহারা কানে তুলিয়া লইতেছে না। ফলত এ সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মুখে নীতির যত দোহাই, সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। অথচ ভারতীয় সেনাদল যদি কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী হানাদারদের শস্ত্রবলে সোজা বাহির করিয়া দিত, তবে সব সমস্যা এতদিন চুকিয়া যাইত এবং দফায় দফায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে নীতি ও যুক্তি প্রয়োগে তাঁহার মূল্যবান মস্তিষ্কেরও অপব্যবহারের প্রয়োজন পড়িত না। গোড়াকার সেই ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্তের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে? ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনা সাধারণ্যে প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ। জনাব লিয়াকৎ আলী এই নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন; শুধু গোপনীয় কথাই প্রকাশ করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে সত্যকে বিকৃতভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযোগী করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কাশ্মীরের সম্পর্কে তিনি যে-কোন মীমাংসায় রাজী হইতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী যত অনর্থ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি শান্তির পথে মীমাংসার কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেন নাই। ইহার ফলে বিশ্ব-শান্তি বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া কমনওয়েলথ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই জনাব লিয়াকৎ আলীর এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। রাজনীতিতে কার্য-সিদ্ধির জন্য কোন উপায়ই নিন্দনীয় নয়—'চাতুর্যং কেবলা নীতি'—এই যুক্তিই লিয়াকৎ আলী সাহেব সার বুঝিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার এতৎসম্পর্কিত ব্যক্তিগত আচরণ বড় কথা নয়। কার্যসিদ্ধির পক্ষে নিজের নীতির অনুকূল প্রতিবেশ তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন কি না, ইহাই বড় কথা। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টায় আছেন। একদিকে তিনি ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সহযোগিতা আকর্ষণ করিয়া কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর অবলম্বিত নীতিকে ব্যর্থ করিতে চাহেন, অপরদিকে বিপন্ন ইস্‌লামের উদ্ধারকর্তা এই মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়া পাকিস্থান গণ-পরিষদের মৌলিক নীতি নির্ধারণ কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে বিক্ষোভের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি উৎসুক। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে চাপা না দিলে করাচীর কর্তাদের কার্যসিদ্ধি হয় না। সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচিত করিয়া তোলাই এপক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। কাশ্মীরকে উপলক্ষ্য করিয়া বিপন্ন ইসলামের উদ্ধারের জন্য জেহাদের জিগীর উঠা একেবারেই বিচিত্র নয়। ইহার মধ্যেই তাহার আভাস অনেক দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে। ফলত এই ব্যাপার সম্পর্কে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নীতি কোন্ আকার ধারণ করে, তজ্জন্য পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বঙ্গের কল্যাণকামীদের মনে উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে।

বরিশালের শুভেচ্ছা মিশন

বরিশাল হইতে আগত শুভেচ্ছা মিশনের সদস্যগণ কলিকাতা এবং উপকণ্ঠবর্তী কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় বরিশালে ফিরিয়া গিয়াছেন। মিশনের সদস্যগণ উদ্বাস্তুদের শিবিরে গিয়া তাঁহাদিগকে বরিশালে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পক্ষে তাঁহারা যুক্তিও প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদের কথায় তেমন কোন জোর ছিল না। এজন্য উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাঁহারা উৎসাহ-আগ্রহ জাগাইতে পারেন নাই। মোটামুটি তাঁহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, বরিশালের অবস্থা দিল্লী-চুক্তির পর অনেকটা ভাল হইয়াছে। মুসলমান জন-সাধারণের মনেরও প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, হিন্দুরা না থাকিলে কত ক্ষতি হয়। তাহারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে যে, হাঙ্গামার ফলে হিন্দুরা চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের আয় সাধারণভাবে অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা সব বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আশার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির শুভবুদ্ধির এই যে সূচনা লক্ষিত হইতেছে, তাহার সম্ভাব্যতা কতখানি, স্থায়িত্ব কতদূর, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রকৃত-পক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির এমন শুভবুদ্ধি বরাবরই ছিল এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এমনই পাপ যে, শুভবুদ্ধিকে তাহা আকস্মিক বিক্ষোভে বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং সমষ্টি-চেতনা ভাঙ্গিয়া ফেলে, ফলে ব্যক্তির বেদনা বা ভাবনা সেই আসুরিকতা রোধ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ সংকট পূর্ববঙ্গে আর ঘটিবে না, এরূপ কথা বলা চলে কি? প্রকৃতপক্ষে মিশনের সদস্যগণ সেরূপ কোন নিশ্চয়তা দান করিতে পারেন নাই। বস্তুত সেইরূপ আশ্বাস দান করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না; কারণ আইন ও শান্তিরক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে, শাসন-ব্যবস্থার যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহাদের পক্ষেই ঐরূপ আশ্বাস দান করা কতকটা সম্ভব। সমষ্টি-মনের বিকার এবং বিক্ষোভকে সংযত করিবার শক্তি তাঁহাদের হাতেই কতকটা আছে। মিশনের সদস্যগণ মানসিক বল এবং আত্মশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু মানসিক বল কিংবা আত্মশক্তির প্রেরণা ইচ্ছা করিলেই গড়িয়া তোলা যায় না, পরন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে, নির্ভর করে সামাজিক আদর্শের উপর। হিন্দুরা যেখানে 'জিম্মী', মুসলমানদের আশ্রিত। এই অবস্থায় মুসলমান সমাজের মধ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে বৈষম্য-বিচারটি স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুদের মধ্যে অসহায়ত্ব বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি দৃঢ় করিয়া সেখানকার সামাজিক সংস্থিতির যদি উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রনীতি হইতে ধর্মের সাম্প্রদায়িকতার সংস্রব আগে দূর করিতে হইবে; অর্থাৎ পাকিস্থান ইস্‌লাম-রাষ্ট্র এই নীতি ছাড়িতে হইবে। প্রগতি এবং সমুন্নত সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার জন্য বৈপ্লবিক প্রেরণা যদি জাগ্রত হয়, তবেই পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনে নব জাগরণ ঘটিতে পারে। আমরা সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছি।

ভারতের সাধারণতন্ত্র

২৬শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এই দিবস জাতীয় মহা-সমিতির লাহোর অধিবেশনে স্বাধীন ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির সংকল্প ঘোষিত হয়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতির সেই সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে। জাতি স্বাধীনতা পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা কাহারো দানস্বরূপে পাওয়া যায় না। সে বস্তু বীর্য-শুল্কে অর্জন করিতে হয়। স্বাধীনতার বা মুক্তির যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি রুধির-লোলুপারূপেই সাধকদের কাছে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং রক্ত দিয়া তাঁহার তুষ্টি অর্জন করা প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা ইংরেজের দানস্বরূপে আসিয়াছে এবং ইংরেজ উদারতা-বশে কিংবা নিষ্কাম প্রেমের পরমার্থ-প্ররোচিত হইয়া তাহারা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে, আমরা এমন কথা বিশ্বাস করি না। রাজনীতির প্রতিবেশকে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য ভ্রান্তবোধে কেহ কেহ ঐরূপ কথা বলেন, আমরা ইহা জানি এবং তেমন কথা এখনও শুনি; কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়া তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার জন্য ভারতকেও মূল্য দিতে হইয়াছে। সেজন্য রক্ত ঢালিতে হইয়াছে এবং ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণের রক্ত-স্রোতের সে উষ্ণতা আজও শীতল হয় নাই; প্রত্যুত জ্বালা তাহার এখনও যায় নাই। ভারতের বুকে নানা বেদনার আকারে সে রক্তধারার তপ্ততা এখনও ব্যাপ্ত হইতেছে। ইংরেজের মহিমা গাহিয়া সেই যে দাহ এবং তাপ আমরা তাহা চাপা দিতে পারি না। ভারতের দেশ প্রেমিক বীর সন্তানদের আদর্শ এবং লক্ষ্যকে আমরা সেইভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত নহি।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত রক্ত দিয়াছে, দিয়াছে এই বাঙলা। খণ্ডিত বাঙলার বুক বিদীর্ণ করিয়া আত্মদাতা সেই বীরগণের আত্মদানের উষ্ণতা আমরা তীব্র-ভাবেই অনুভব করিতেছি। ভুলিতে পারি না তাঁহাদের কথা। আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ এবং অসম্মান বরণের পথে ভারতের আত্ম-শক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য সেই যে তপস্যা, তাহার স্মৃতি। ফাঁসীর কাষ্ঠে যাহারা মরণের গান গাহিয়া গিয়াছে, তাহাদের ব্যথাকে অন্তর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন এখানে নাই। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, প্রেমের জন্যই দিয়াছেন, দেশের নরনারীর দুঃখ-দুর্দশা ও পরাধীন জীবনের দুর্গতি দূর করিবার মত মহা-প্রাণতার আকর্ষণেই তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে যাঁহারা এইভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের অনেকের নাম হয়ত লিখিত থাকিবে না। তাঁহারা কোনদিন নিজেদের যশ বা প্রতিষ্ঠা কামনা করেন নাই। ইতিহাসকে তাঁহারা গড়িয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সমষ্টি-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া স্বাধীন ভারতে ইতিহাসে নব সৃষ্টির সম্ভাবনা তাহাদেরই অমোঘবীর্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ দিয়া তাঁহারা প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনির্বাণ তাঁহাদের মহিমা।

ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা সেই সব আত্মদাতা সাধকগণই ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রাণবলে সে পতাকার ভিত্তিমূলে দৃঢ় হইয়াছে। তাঁহাদেরই মহিমায় আমরা আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদেরই শৌর্যবলে এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহারা এদেশ ছাড়িয়াছে। অনুগ্রহ, অনুকম্পা, উদারতার কোন প্রশ্ন এখানে উঠে না। ঐসব বুলি যাহারা ভীরু, তাহারা মানে, দেশাত্মবোধ যাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে নাই, তাহারাই তেমন মানসিক বিকারে বিহ্বল হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা ভারতের সেই আত্মদাতা সন্তানগণের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধায় অবনত হইতেছি। বস্তুতঃ স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব-আড়ম্বর অপেক্ষা ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণের স্মৃতির উদ্দেশে নীরব শ্রদ্ধা-নতিই জাতিকে আমাদের সাধনায় সমধিক শক্তি দান করিতে পারে। সেই পথে জাতির বৃহৎ বেদনাকে যদি আমরা ধরিতে পারি এবং বুঝিতে পারি, তবেই এই স্মরণীয় দিবস আমাদের পক্ষে সার্থক হইবে। আমাদের পক্ষে এ সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও বেদনার তাহার অবসান হয় নাই এবং দুর্গতি তাহার ঘোচে নাই। রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য গর্ব আমরা করিব, কিন্তু সেই গর্বে আত্মচেতনা যদি না থাকে এবং সেই পথে সংহতিবোধ যদি সুদৃঢ় না হয়, তবে তাহার কোন মূল্য নাই। অন্তত দেশের নরনারী, সমগ্রভাবে দেশের জন-জীবনের সঙ্গে যদি সেই প্রেরণায় আমাদের রাষ্ট্র-সাধনার নিবিড়ভাবে সংযোগ না ঘটে, তাহা হইলে এই দিবসের কৃত্য আমাদের সমাজ-জীবনে শক্তিকে জাগ্রত করিতে সার্থক হইবে না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা সন্তানগণের স্মৃতি এবং তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা আমাদের সব অবসাদ দূর করুক এবং আত্মতৃপ্তির মোহজাল হইতে আমাদের অন্তরকে মুক্ত করিয়া প্রাণবীর্যে আমাদের সকল কর্ম-সাধনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক।



প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভই যথেষ্ট নয়, বৃহত্তের বেদনা যে জাতির অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে এবং সেই প্রেরণায় যে জাতি স্বার্থ-সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়, মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করিতে শুধু তাহাদেরই অধিকার আছে এবং তাহাদের স্বাধীনতাই এ জগতে সত্যকার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। ফলত স্বাধীনতা দুর্বলের জন্য নয়। ভীরুর ভাগ্যে সে বস্তু জোটে না। স্বাধীনতা অর্জন করিতে যেমন প্রাণ দিতে হয়, স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও সেইরূপ প্রাণ-বলের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণ-বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করাই মনুষ্যত্বের মূলে রহিয়াছে। স্বাধীনতা মানুষেরই জন্য—পশুর জন্য নয়। স্বাধীনতা-দিবসের সাধনা সেই মনুষ্যত্বের প্রেরণা আমাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলুক। আমরা যেন প্রাণ দিয়া প্রাণের অমৃত-তত্ত্বকে উপভোগ করিতে পারি।

মহামানব গান্ধিজী

৩০শে জানুয়ারী ভারতের, শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের চিন্তার মূলে গাঢ় এবং গভীর অনুধ্যান জাগ্রত করে। এই দিন মহামানব গান্ধীজী আত্মদান করেন। ভারত তাঁহার স্বাধীনতার জনককে হারায় এবং সমগ্র জগৎ বর্তমান যুগের অদ্বিতীয় মহাপুরুষের মর্ত্য-লীলার প্রত্যক্ষ স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয়। এ-বেদনা সত্যই গভীর। এ-ক্ষতি অত্যন্তই মর্মান্তিক। তবে সান্ত্বনা এই যে, আততায়ীর গুলীতে গান্ধীজীর স্থূল দেহই অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ত্যাগময় জীবনের ব্যাপ্ত মহিমা তাহাতে সমধিক দীপ্তিই লাভ করিয়াছে। বস্তুত মহাত্মাজীর তিরোভাবে তাঁহার আদর্শের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পক্ষান্তরে সে আদর্শের অনুপ্রেরণা বৃহত্তর বেদনায় মানব-সমাজের সাধনায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাজীকে আমরা হারাই নাই; সমগ্র মানব জাতির কাছে কল্যাণ-মূর্তিস্বরূপে চিন্ময় লীলায় তিনি জাগিয়াছেন। আমাদের সকল শুভ ভাবনার মধ্যে আমরা তাঁহাকে সমধিক সত্য করিয়া পাইয়াছি। আমাদের পথের যত আঁধার, সব আলো করিবার জন্য গান্ধীজীর স্নিগ্ধহাস্য এখনও ফুটিয়া উঠিবে। আমাদের যত দুঃখ, যত দৈন্য, তাঁহার মধ্যে তাঁহার অভয় আশ্বাসকে আমরা একান্ত করিয়া পাইব। আমাদের সকল সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে মহামানব গান্ধীজী আমাদের মনের মূলে সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং সেগুলির সমাধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। একথা সত্য যে, যে আদর্শের জন্য মহাত্মাজী আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং যে আদর্শ-সিদ্ধির জন্য অবশেষে তিনি জীবন দিয়াছেন, আমরা সে আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই। অধিকন্তু গান্ধীজীর তিরোভাবের পর আমরা যেন ক্রমেই তাঁহার আদর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। এ-আশঙ্কা অমূলক নয় যে, জাতি তাহার আত্মাকে হারাইয়া পুনরায় অনাত্ম-পথে গিয়া পড়িতেছে এবং অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, আমাদের এ-ভ্রান্তি অচিরেই কাটিয়া যাইবে। গান্ধীজীর জীবন দান ব্যর্থ হইবে না, হইতে পারে না। এদেশের সমষ্টি-মনের মূলে গান্ধীজীর কল্যাণময় আদর্শের প্রভাব এমনই সত্য হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের সাময়িক ভুলে তাহা নষ্ট হইবার নয়। সে



আদর্শের জয় হইবেই এবং সে আদর্শের প্রেরণায় সমষ্টি-চেতনা পুষ্ট হইয়া উঠিবেই। ব্যক্তির ভুল এবং ভ্রান্তি জাতি শোধরাইয়া লইবে। গান্ধীজীই জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। বস্তুত গান্ধীজীর ন্যায় মহামানব মৃত্যুর অতীত। ইঁহাদের আদর্শের মধ্যেই ইঁহারা সঞ্জীবিত থাকেন এবং মানব-সমাজের উন্নততর অভিব্যক্তির পথ ইঁহারা প্রদর্শন করেন। যে দেশ, যে জাতির মধ্যে এমন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে, সেই জাতি এবং সেই দেশ ধন্য হয়। তাহাদের চিরন্তনের সম্বল জোটে। মহামানব গান্ধীজীকে আমরা নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলাম, এজন্য আমরা ধন্য হইয়াছি এবং আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এমন একজন মহামানবের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছে, ইহাতেও আমাদের পরম অভয়ত্ব রহিয়াছে। ফলত কোন দেশ এবং কোন জাতিই এই হিসাবে আমাদের মত গর্ব করিতে পারে না। কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম জগতের এমন অদ্বিতীয় মহামানবের মানবতাময় বেদনায় অনুপ্রাণিত এবং বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রভাবিত হয় নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, ভারতের স্বাধীনতা জগতে এক অভিনব সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে। গান্ধীজী অন্ধকারের মধ্যে মানব-সমাজকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছেন। আসুরিক বলে নিপীড়িত বিশ্বের নর-নারীকে তিনি আশার বাণীতে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। বিশ্বকে তিনি বাঁচিবার পথ দেখাইয়াছেন। বস্তুত গান্ধীজীর আদর্শই বর্তমানে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে, রক্ষা পাইবার অন্য পথ নাই—জগৎ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসঙ্ঘের সঙ্ঘাতে এমনই সংকট-সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। গান্ধীজীর আদর্শ সত্যই আমাদের পক্ষে বড় সম্বল এবং বিশ্বের পক্ষেও তাহা একান্ত আশ্রয়। ভারতের রাষ্ট্রীয়-সাধনার আদর্শে আজ বিশ্ব নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। ভারতের কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে গান্ধীজীর উদার বীর্য মহিমায় এক হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা, সামান্য ব্যাপার নয়। এই দিক হইতে গান্ধীজী শুধু আমাদেই গুরু বা আমাদেরই উপদেষ্টা নহেন, তিনি বিশ্বমানবের গুরু এবং উপদেষ্টা, বিশ্ব-মানবের মুক্তি ও স্বাধীনতার তিনি মূর্ত বিগ্রহ। ৩০শে জানুয়ারীতে গান্ধীজীর অন্তর্ধানের স্মৃতিতে তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাকে আমরা অনুধ্যান করিব এবং মহামানব মহাত্মাজীর আদর্শ যাহাতে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে সত্য হইয়া উঠে, সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র



গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতাজীর ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষের জাগরণ এক যুগান্তকর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার জন-জাগরণের যে কথা আমরা বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নেতাদের মুখে শুনিতে পাইতেছি, নেতাজীর প্রদীপ্ত প্রতিভা পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের মত তাহারই সূচনা করে। দীর্ঘ পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এশিয়ার পরাধীন জাতি-সমূহের অন্তরে যে বেদনা গূঢ়রূপে ছিল নেতাজীর সাধনার প্রভাবে তাহা সংকল্পশীলতায় আবর্তিত এবং রূপায়িত হইয়া উঠে। নেতাজীকে এই দিক হইতে এশিয়ার নব চেতনার উদ্বোধক. শক্তিধর, স্রষ্টা পুরুষ বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু বীর্যবান্ পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। জাতিকে তাঁহারা ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িয়াছেন এবং মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাণপূর্ণ পৌরুষের শক্তি তাঁহারা বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষের প্রাণশক্তির প্রচণ্ড বৈভব-বিলাস সত্যই বিরল। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতায় জাতির অন্তরে যে দুর্বলতার পাক জমিয়া উঠে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া মুক্তির আনন্দে উন্মত্ত করিয়া তোলা সহজ ব্যাপার নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের কূটচক্রের ফলে ভেদ-বিরোধজনিত কুসংস্কার ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করিয়া জাতিকে যেখানে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে ঐক্যের শক্তিকে সংহত করিয়া তোলা শুধু নীতি-উপদেশের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। সমষ্টি-মনের চেতনায় আত্মশক্তি যাঁহার মধ্যে ব্যাপ্ত এবং দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শুধু এমন পুরুষই তেমন বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারেন এবং প্রাণশক্তির অগ্নিময় সেই আলোড়নে, সেই বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝাবেগে যুগান্তের পুঞ্জীভূত দুর্বলতা কাটিয়া যায়। বিরাট সেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেশ এবং জাতি আত্মশক্তির সন্ধান পাইয়া নাড়াচাড়া দিয়া উঠে। উদার সে অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করিবে, এমন সামর্থ্য পশুবলের থাকে না।

ভারতের স্বাধীনতার মূলে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার বীর্যময় অবদান অমোঘরূপে কাজ করিয়াছে। নেতাজীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিল্লীর লাল কেল্লার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে পারে নাই, ইহা সত্য; কিন্তু সেখানে আজ যে জাতীয় পতাকা উড়িতেছে, তাহার মূলে নেতাজীর আদর্শের অগ্নিময় প্রভাবই রহিয়াছে। বস্তুত নেতাজীর নেতৃত্ব-কৌশলে ভারতের সমর-সাধনায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার সম্ভাব্যতা সাম্রাজ্য-বাদীদের অন্তরে শঙ্কা জাগাইয়া তোলে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, দিন তাহাদের ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতার মূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদানের ইহাই সর্বময় স্বরূপ নয়। ভারতের সমাজ-জীবনের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তিকে তাহা দুর্ধর্ষ করিয়া তোলে। বাস্তবিকপক্ষে নেতাজীর আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজকে সর্বজনীন সত্যে সমীহিত করিয়াছে। বুঝাইয়া দিয়াছে, যাহা-দিগকে এতদিন দুর্বল মনে করা গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল অসহায়, তাহারা বস্তুত দুর্বল নয়, অসহায়ও তাহারা নয়। প্রাণময় স্পর্শ অন্তরে পাইলে প্রচণ্ড পশুশক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার মত সামর্থ্য তাহারাও লাভ করে। এই সত্যটি সম্যক্‌রূপে অবধান করিবার প্রয়োজন আমাদের এখনও রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে নেতাজীর জীবনাদর্শকে যদি আমরা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, তবে আমাদের উন্নতির গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। সে আদর্শের প্রভাবে আমাদের পথে যত অন্তরায়, জাতির ভিতরকার অভ্যন্তরীণ যত দুর্বলতা সব দূর হইবে।

বৈদেশিকী

কোরিয়াতে যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে ইউনোতে পূর্বে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় গত ২২শে ডিসেম্বর পিকিং গভর্নমেণ্ট উহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাতে ইউনোর তিনজনের যুদ্ধবিরতি কমিটি হাল না ছেড়ে মীমাংসার নূতন সূত্র খুঁজতে থাকেন। জানুয়ারীর গোড়ায় লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের কনফারেন্স হোল। তাতে কোরিয়া সম্পর্কে একটি নূতন প্রস্তাবের পরিকল্পনা আলোচিত হয় এবং পরে উহাই উনোর তিনজনের যুদ্ধবিরতি কমিটির পক্ষ থেকে উনোর রাজনীতিক কমিটিতে পেশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের মুখ্য কথা ছিল এই যে, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হবে। উপযুক্ত ক্রম অনুসারে বিদেশী সৈন্য কোরিয়া থেকে সরিয়ে আনা হবে, সমগ্র কোরিয়াতে এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কোরিয়াবাসীদের স্বাধীন মত প্রকাশ ও কোরিয়াবাসীদের স্বেচ্ছানুমোদিত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে, অন্তর্বর্তীকালের জন্য ইউনোর নীতি অনুসারে কোরিয়াতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা হবে এবং যুদ্ধবিরতির চুক্তি হবার পরেই সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য ইউনো একটি কমিটি নিযুক্ত করবে, যাতে বৃটিশ, মার্কিন, রুশ ও চীনের পিপলস্ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরা থাকবেন। ফরমোজার সমস্যা এবং ইউনোতে চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও এই কমিটির আলোচ্য বিষয় হবে।

পিকিং গভর্নমেণ্ট উপরোক্ত প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য না করে ১৭ই জানুয়ারী কতকগুলি পাল্টা প্রস্তাব করেন। পিকিং গভর্নমেণ্টের উত্তরের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, প্রস্তাবিত চতুঃশক্তির আলোচ্য বিষয়গুলির ভিত্তি পূর্বে স্থির না করে নিয়ে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার কোনো সার্থকতা হয় না। পিকিংএর সন্দেহ যে তাতে কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্যদের একটা দম নেবার সুযোগ দেওয়া হবে মাত্র। পিকিং চায় যে, প্রস্তাবিত কন্‌ফারেন্স আগে বসুক এবং তাতেই যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী স্থির হবে। কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের নীতির ভিত্তিতে পিকিং প্রস্তাব করে যে, কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের ভার কোরিয়াবাসীদের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে। ফরমোজা ও ফরমোজার নিকটবর্তী সমুদ্র থেকে মার্কিন সৈন্য ও নৌশক্তিকে সরে যেতে হবে। ইউনোতে চীনের প্রতিনিধি হিসাবে পিকিং গভর্নমেণ্টের স্থান চাই। পিকিং গভর্নমেণ্ট চান যে, প্রস্তাবিত কমিটিতে বৃটিশ, মার্কিন, রুশ ও চীনা গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি ছাড়া ভারতবর্ষ, মিশর ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিও থাকবেন। পিকিং গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা যে, এই সপ্তশক্তির কনফারেন্স চীনে হয়।

চীনের এই উত্তর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সরকারী মহল উহাকে ইউনোর প্রস্তাবের পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বলে অভিহিত করা হয় এবং চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রস্তাব আমেরিকা ইউনোকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল তার ওপর আবার জোর দেয়া হয়। কিন্তু চীনের উত্তর আলাপ-আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, এ মত সকলের নয়। বিশেষ করে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীন সরকারের উত্তর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, উহাতে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আলোচনার পথ খোলা আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এই মত আরও অনেক দেশের নেতারা গ্রহণ করেন এবং কোনো কোনো দেশের গভর্নমেণ্ট চীনা সরকারকে তাঁদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে জানাতে অনুরোধ করেন। এই সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এক প্রতিনিধি পিকিংএ চীনা গভর্নমেণ্টের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। পিকিংএ অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে চীনা সরকারের ১৭ই জানুয়ারী তারিখের উত্তরের তাৎপর্য আরও স্পষ্ট করে জেনে নেবার জন্যে কানাডার তরফ থেকে ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানানো হয়। তার ফলে চীনা গভর্নমেণ্ট আবার স্বীয় মতামত জানিয়েছেন, যাতে বুঝা যায় যে, চীনা গভর্নমেণ্ট শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বিরোধী নন এবং সেই উদ্দেশ্যে আলোচনা চালাতে তাঁহাদের আগ্রহ আছে।

২২শে তারিখে ইউনোতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবেনেগল রাউ ইউনোর রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে চীনা সরকারের নূতন উত্তর উপস্থিত করেন। তাতে চীন সরকার বলেছেন যে, কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশীসৈন্য অপসারণের নীতিটি স্বীকৃত হয় এবং তদনুসারে কাজ হয় তবে চীনা 'স্বেচ্ছাসেবকদের' কোরিয়া ত্যাগ করার উপদেশ দেবার দায়িত্ব চীনা সরকার নিতে পারেন। সপ্তশক্তির কন্‌ফারেন্সের প্রথম কাজ হবে একটা পরিমিত সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে সেটা কার্যে পরিণত করা যাতে আলাপ আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। যুদ্ধের অবসান এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সর্ত নির্ধারণ অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি আবশ্যক—কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের কী ব্যবস্থা হবে, কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা কীভাবে কোরিয়াবাসীদের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে, পিকিং সরকার কর্তৃক ফরমোজা অধিকারের পথে বর্তমান প্রধান অন্তরায় মার্কিন শক্তিকে ফরমোজা থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা। ইউনোতে পিকিং সরকারের ন্যায্য আসন দানের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সমাধান।

ইউনোর রাজনৈতিক কমিটিতে আমেরিকার প্রতিনিধি বলেন যে, চীনা সরকারের উপরোক্ত প্রস্তাব এবং তাঁহাদের ১৭ই জানুয়ারী তারিখের উত্তরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তিনি চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবটি আর দেরী না করে পাকা করিয়ে নিতে চান। কিন্তু ইউনোর রাজনৈতিক কমিটি ইহাতে সম্মত হন নি এবং দুইদিনের জন্য আমেরিকার প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রেখে বিভিন্ন গভর্নমেণ্টকে চীনা সরকারের উত্তর ভালো করে বিবেচনা করার সময় দেয়া হোক—ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবেনেগল রাউ-এর এই প্রস্তাব সোমবার ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। ইহার গুরুত্ব কম নয়। অতঃপর চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব আমেরিকা ইউনোতে পাশ করিয়ে নিতে পারবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা বুঝে মার্কিন সরকার নীতিপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেও পারেন। তাহলে কোরিয়া যুদ্ধের আরও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আপাতত কিছুটা কমে।

২৪।১।৫১

স্বাধীনতার সাধনা

ক্ষিতিমোহন সেন

বহু যুগব্যাপী অন্ধকার রাত্রির অবসানে ভারতে স্বাধীনতার নব প্রভাতের উদয় হইল। বহু দুঃখ, বহু তপস্যার পরে আশার আলোক যেন দেখা দিল। স্বাধীনতার প্রভাত তো আসিল, কিন্তু আমরা কি স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম এখনো বুঝিতে পারিয়াছি?

বহু দুঃখের ধন এই স্বাধীনতা। প্রমত্ত দৃষ্টিতে ইহাকে দেখা চলিবে না। ইহাকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। দুঃসহ প্রসব-বেদনার পরে জননী আগে দেখিতে চাহেন তাঁহার সন্তানকে। বিষম বেদনার দৃষ্টিতে সন্তানকে প্রথমে চিনিয়া লওয়া চাই। মাতার মনে তখন কোনো বিলম্ব সহে না। অথচ অন্যের কথায় বা অন্যের চোখের দেখায় জননীর মন মানে না। আপন দৃষ্টিতে আপনার সন্তানকে নিবিড় করিয়া পাওয়া চাই।

আমাদের এই বহু দুঃখ-লব্ধ সাধনাকে ভারতের চিতন্তন দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে হইবে। বিদেশীর দৃষ্টি যতই বিচক্ষণ হউক, তাহাতে আমাদের চেনা হইবে না, তাহাতে হৃদয় তৃপ্ত হইবে না। প্রাচ্য ভারতের ও প্রতীচ্যের দৃষ্টির মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। সেখানে স্বাধীনতার নাম Independence অর্থাৎ অন্যের নিয়ন্ত্রণের অভাব। আর ভারতে বলে স্বাধীনতা। তাহা 'স্ব' অর্থাৎ আত্মার নিয়ন্ত্রণ। বিলাতী সংজ্ঞা হইল 'অসৎ' নেতিবাচক (Negative) আর ভারতের নাম হইল 'সৎ' অর্থাৎ অস্তিবাচক (Positive)। আস্তিকে নাস্তিকে অনেক প্রভেদ।

"স্ব" অর্থাৎ আপনার বা আত্মার হইলেও লোকে মনে করিবে অধীনতা হইল নিজেকে সংকীর্ণ করা। কাজেই স্ব-অধীনতাতে মুক্তি কৈ? ইহাও তো বন্ধন মাত্র।

কিন্তু 'স্ব' বলিতে কি সংকীর্ণ কোনো ব্যক্তি-সীমা বুঝায়? স্ব বলিতে বুঝায় আত্মাকে।। আত্মা শব্দের দ্বারা ভারত চিরদিন চরাচরব্যাপী পরম সত্যকে বুঝিয়াছে। 'স্ব'-কে পাইতে হইলে সমস্ত সংকীর্ণভৌতিক (Materialistic) সীমাকে অতিক্রম করিতে হয়। কাজেই স্ব-অধীনতা অর্থ চরাচরব্যাপী পরম সত্যের অনুবর্তিতা। ইহাতে সংকীর্ণতা আসে কিসে?

গায়ের জোরে আমি অর্থ করিতে গেলেও সকলে মানিবেন কেন? দেখিতে হইবে 'স্ব' বা 'আত্মা' বলিতে চিরদিন ভারত কি বুঝিয়াছে? এই বিষয়ে উপনিষদই সেরা প্রমাণ। উপনিষদেই সন্ধান করা যাউক।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে উষস্ত চাক্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে আত্মার তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "যিনি তোমার মধ্যে প্রাণবান্, তিনিই তোমার আত্মা। তোমার সেই আত্মাই সকলের অন্তরে বিরাজমান।"

স ত আত্মা সর্বান্তর
এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের ইহা শুধু একটা মতবাদ (Theory) মাত্র বা কথার কথা নহে। ইহা তাঁহার জীবনের সার-সর্বস্ব উপলব্ধি। তাই তিনি আপন পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, "এই যে ব্রাহ্মণ, এই যে ক্ষত্রিয়, এই যে সব সাধারণ লোক এই যে দ্যুলোকবাসী বা ভূলোকের সব জীব ও বস্তু, ইহারা সবাই এই আত্মা।"

ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা।
(বৃহদারণ্যক)

কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই আত্মা নয়। তাই কৌষীতকি উপনিষদে পুরোহিত শ্বেতকেতুকে রাজা চিত্র বুঝাইতেছেন, "তুমিও যে আত্মা, আমিও সে-ই আত্মা। এই আত্মার দিক দিয়া তুমি আর আমি সবই এক; কোনো প্রভেদ নাই।"

ত্বমাত্মাসি, যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি।

শুধু তুমি আমি নহে, পশু পক্ষী জীব অজীব চরাচর সবাই আত্মা। সকল সমুদ্রে এই আত্মাই তরঙ্গিত, সকল পর্বতে এই আত্মাই উন্নত। সর্বরূপে সকল নদ-নদীতে এই আত্মাই প্রবহমান। সকল শস্যও এই আত্মা, সর্বভূতের অন্তরাত্মার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ যে অন্ন ও রস তাহাও এই আত্মা। এই আত্মাই পুরুষ। আবার এই পুরুষই সকল কর্ম, সকল তপস্যা। পুরুষই পরম অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম। সবার অন্তরে নিহিত এই পুরুষকে জানিলে অবিদ্যার সকল বন্ধন তখনই ছিন্ন হইয়া যায়। মানুষ মুক্তিলাভ করে।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে-
ঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং
কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥
(মুণ্ডক)

মনীষী উদ্দালক আরুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "এই আত্মা সূক্ষ্ম হইলেও সর্বগত ও বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব। ইহাই পরম সত্য। হে শ্বেতকেতো, তুমিও সেই আত্মা। আত্মার সত্য তাতেই—তোমার যাহা কিছু সত্যতা।

স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।
(ছান্দোগ্য)

ছান্দোগ্য আরও বলেন, সর্ব লোকই বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের বিচ্ছেদের মধ্যেও ঐক্য ও যোগ স্থাপন করিয়া আত্মাই সেতুস্বরূপে বিরাজমান। এই আত্মার জন্যই লোক সকল পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

অথ য আত্মা স সেতুং বিধৃতি রেষাং লোকনাম্
অসং ভেদায়॥

আত্মাই সকলের বিধৃতি। কাজেই ইহাই সকলের ধর্ম ধর্মস্বরূপ।

আজ জগদ্ব্যাপী দ্বেষ-বিদ্বেষ দুঃখ-দুর্গতি। আমরা যদি স্বাধীনতা লাভ করিয়া এই কল্যাণস্বরূপ সর্বলোকবিধৃতি উদার ধর্মকে সবার সম্মুখে ধরিতে পারি, তবেই তাহা ভারতের উপযুক্ত হয়। সেই ধর্ম শুধু মুখের কথা বা আচারের বস্তুমাত্র হইলে চলিবে না। তাহা আমাদের জীবনে ও চরিত্রে সত্য হওয়া চাই। বিরোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে আত্মাকে আশ্রয় না করিলে আর গতি নাই। এই স্ব অর্থাৎ আত্মার অধীনতা স্বীকারের দ্বারা অর্থাৎ স্বাধীনতার দ্বারাই আমরা সকল বিরোধকে জয় করিতে পারি।

'স্ব' বা আত্মার অনুগত হওয়া অর্থ বিশ্বের সর্বদিকের কল্যাণের অনুগত হওয়া। কারণ এই আত্মাই আমাদের অধোভাগে-উর্ধ্ব-ভাগে, পশ্চাতে-সম্মুখে, দক্ষিণে-বামে। আমাদের সব দিকে বিশ্বময় এই আত্মাই বিরাজমান।

অথাত আত্মা দেশ এবাত্মৈবাধস্তাদ্ আত্মো-পরিষ্টাদ্ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আ উত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্ ইতি।
(ছান্দোগ্য)

এই দৃষ্টি, এই চেতনা, এই ধ্যানযোগ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি আত্মার আনন্দ-লীলার সঙ্গসুখ লাভ করিবেন। তিনি আত্ম-যোগের পরিপূর্ণতা ও আত্মানন্দ লাভ করিবেন। তিনিই তখন আপনি আপনার রাজা অর্থাৎ 'স্বরাট্' হইবেন।

সবা এষ এবং পশ্যন এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্ম রতি আত্ম মিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি॥
(ছান্দোগ্য)

স্ব-অধীনতাই হইল স্বরাট্ হইবার সাধনা। স্বরাট্ হইলে সে সকলের মধ্যে সর্ব-লোকে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারে। এই 'স্বারাজ্য সিদ্ধি'ই ভারতীয় সাধকদের চিরকাম্য ছিল। স্বারাজ্য সিদ্ধি বেদান্তের বিখ্যাত গ্রন্থ।

স স্বরাড ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। (ছন্দোগ্য)

এই কথাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানেও বলিয়াছিলেন ঃ

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা নাহি কোনো ডর।"
(গীতাঞ্জলি)

স্ব অর্থাৎ বিশ্বের (আত্মার) রাজা 'স্বরাট্' হইতে চাও? তবে 'স্ব' অর্থাৎ বিশ্বের আত্মার অধীন হও। বিশ্বের অধীন বিশ্বের সেবক হইয়াই স্বারাজ্যের পথ ঈশ্বর দেখাইতেছেন। বিশ্বের যদি রাজা হইতে চাও, তবে সেবক হও। যদি সেবা করিতে চাও, তবে কোনো খাম-খেয়ালী বা Vagary চলিবে না। এমন উদার অথচ এমন সুনিয়ন্ত্রিত অধিকার আর নাই। জগতের সব রাষ্ট্রবিধির (Constitution) মূল সত্য ও মূল সূত্র এইখানে নিহিত।

এই কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, "স্ব" কথার এই উদার অর্থ আমরা বহুদিন অনুসরণ করি নাই। করি নাই বলিয়াই আমাদের এই দুর্গতি। আজ আমাদের মূলে সত্যে না দাঁড়াইলে আর চলিবে না। আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই এই দুর্গতি। এই আদর্শের কথা বারবারই পূর্বে মনীষীরা স্মরণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের দোষ নাই।

মৈত্রী উপনিষদও বলেন, বিশ্বাত্মা হওয়ার অর্থই হইল বিশ্বের সেবা, বিশ্বের কর্মসাধনা করা।

বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মকৃৎ।

মহাত্মা হইতে হইলে বিশ্বের সেবার দ্বারা আপন অধিকারটি লাভ করিতে হইবে। সবার অন্তরঙ্গ হইয়া, সবার হৃদয়ে যুক্ত হইয়া যদি সবার সেবা করিতে পার, তবেই তুমি যথার্থ মহাত্মারূপে আপনি দীপ্যমান হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥

এই কারণেই এই মন্ত্রের বলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লোকগুরু গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নাম দেন; সেই নামেই পরে তিনি সর্বত্র প্রথিত হন।

হয়তো কোন বিশেষ জনকে সেবা করিতে গেলে বা কোন বিশেষ গুরুর অনুগত হইলে সেবা ও অনুগতির বন্ধনবশত আমরাও সংকীর্ণ হইতে পারি। যেমন, স্বজাতির সেবায় (Nationalism) পাশ্চাত্ত্য জাতিরা সংকীর্ণ। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতায় আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত। এই সংকীর্ণতা তো আত্ম-ঘাতেরই নামান্তর। কিন্তু বিশ্বের অনুগতিতে সেই দোষ নাই। 'স্ব' যখন বিশ্ব, তখন যথার্থ স্বাধীনতার মধ্যে এই বিপদ কেন থাকিবে?

এক গুরুর অনুবর্তনে যাহাতে সংকীর্ণতা না ঘটে, তাই ভাগবতে আছে, সাধক বলিতে-ছেন, "আমি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র সূর্য নানা জীব চরাচর বহু গুরুর শিষ্য।"

পৃথিবী বায়ুরাকাশ মা গোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
..........এতে মে গুরবো রাজন্........।

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন, আমার নাথ ও জগতের নাথ একই। আমার গুরু ও জগতের গুরু একই। কারণ আমার আত্মাই সর্বভূতাত্মা। তাই চরাচর গুরুকে নমস্কার।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
(বিশ্ব সারতন্ত্র, রুদ্র যামল)

দাদু বলিলেন, নিরঞ্জন দেবতাকে নমস্কার। গুরুদেবকে নমস্কার। এই নমস্কার যাহাতে সকীর্ণ না হয়, তাই জগতের সকল সাধনা ও সাধকগণকে নমস্কার। তবেই প্রণতি সকল সংকীর্ণতা পার হইয়া যাইবে।

দাদূ নমো নিরঞ্জনং নমস্কার গুরু দৈবতঃ।
বন্দনং সর্ব সাধব প্রণামং পারং গতঃ॥

দাদুর শিষ্য রজ্জবজী বলিলেন, "বিশ্বই পরিপূর্ণ গুরু, বিশ্বাত্মার উপদেশই সারতত্ত্ব। ......চন্দ্র সূর্য অগ্নি ভূমি জল পবন আকাশ এই সব মহাগুরুর মর্ম সত্য যদি অন্তরে গ্রহণ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারো, তবে ষড়দর্শন তোমার দাস হইয়া থাকিবে। অনন্ত কোটি জীবের সত্য অখিল মানবের সার সত্য যদি মর্ম ভরিয়া লইতে জান, তবে হে রজ্জব তোমার অপার মানব-জন্ম সার্থক হইবে। অখিল চরাচরের বিন্দু-সিন্ধু সকলের সার সত্যকে অন্তরে বরণ করিয়া লও। সকল চরাচর যাহার গুরু, কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই।

সকল চরাচর পাকে গুরু, পাকে পর লয় নাহি"॥

'স্বাধীনতা' অর্থই হইল বিশ্বগুরুকে স্বীকার করা। এত বড় মুক্তি আর কোথাও নাই। ভারতীয় ধর্মকে স্থাপনা করিতে গিয়া তাই রাজা রামমোহন রায় সর্বধর্মের সত্যকে মহত্ত্ব দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সর্বসত্যকে স্বীকার করাই মহৎ স্বাধীনতা।

জগদীশ্বর যদি জগতের সেবক হন, তবে আমাদের পক্ষেও জগতের সেবাতেই এই জগদীশ্বরের আসল পূজা। আর্য-অনার্য উভয় সাধনার সর্বোৎকৃষ্ট মিলনের ফল হইল ঋগ্বেদের ঐতরেয় মহীদাসের সাধনা। তাঁহার রচিত ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখি, বিধাতার সাধনাকে অনুসরণ করিয়াই আমাদের সাধনাকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিতে হইবে। তাহাই হইল যথার্থ যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলে যজমান বিশ্বের ছন্দে ছন্দোময় হইয়া আপনাকে সার্থক করিয়া তোলেন। এই যজ্ঞে স্বর্গাদি ক্ষুদ্র ফল কামনা নাই।

ছন্দোময়ং বা এতৈ র্যজমান আত্মানং সংকুরুতে।

স্বাধীনতা হইল উদার অসীম লোকে আপনাকে বিস্তৃত করার অধিকার প্রাপ্তি। উদার আকাশকে যদি উপাসনা করা যায়, তবে সাধকও আপনাকে অসীম আকাশের মত প্রকাশবান্ করেন।

স য আকাশং ব্রহ্ম ইতি উপাস্ত আকাশ বতো বৈ স লোকান্ প্রকাশ বতো অসং বাধান্ উরু গায় বতো অভিসিধ্যতি॥ (ছান্দোগ্য উপনিষদ)

সাধনায় সিদ্ধির পরিচয়ই হইল সে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে।

এ য আত্মানম্ প্রকাশয়তি।
(নৃ. উত্তর. তাপনী উপনিষৎ)

এতদিন স্বাধীনতার অভাবে আমরা যে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারি নাই, তাহাই আমাদের ছিল যথার্থ দুর্ভাগ্য। পরাধীনতার মত এত বড় দুর্গতি আর নাই। এখনই আমরা আত্মপ্রকাশশক্তি লাভ করিতে পারিব। কিন্তু তাহার জন্য নিরন্তর বিশ্বের সর্বসত্যকে গ্রহণ করিয়া সব সেবায় ব্রতী হইতে হইবে। সেবাব্রতে যে সদাই চলে, তাহার প্রকাশের অভাব কখনো ঘটে না। সূর্য সকলকে আলোক-দান ব্রত লইয়াছে। সেই ব্রতে সে সদাই চলিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহার প্রমাদ বা আলস্য নাই। তাই তাহার আলোক-সম্পদের আর কখনো অভাব ঘটে না

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

আত্মপ্রকাশের এই অধিকারই স্বাধীনতার সর্বোত্তম লাভ। সাড়ে তিনশত বৎসর হইতেও পূর্বে সাধক রজ্জবজী বলিয়া গেলেন, "হে সাধক, আপনি প্রকাশিত হও এবং সব কিছুকে প্রকাশিত কর, ইহাই সাধনা। যাহা রূপ পায় নাই, তাহাকে রূপ দাও, যাহা ভাষা পায় নাই, তাহাকে ভাষা দাও। বাণী দও, বাণী দাও, দাও দাও প্রকাশ দাও।"

গৈব কূঁ রূপ দে মৌন কূঁ ভাষ দে।
বাণী দে বাণী দে দে দে প্রকাশ দে॥

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এখন অন্যায় ও অসাধু উপায়ে যদি কুবেরতুল্য সমৃদ্ধিও লাভ করি, তবে তাহাও আমাদের চরম দুর্গতি। নানা উপায়ে যদি প্রচণ্ড দল ও শক্তিলাভ করি, তবে তাহাও ঘোর দুর্লক্ষণ।

আজ ভারত নবজন্ম লাভ করিয়াছে। প্রথম তাহাকে কাঁদিয়া উঠিতে দাও, তাহার স্বকীয়

শ্বাসযন্ত্র এই কান্নায় প্রথম আপন কর্মশক্তি পাইবে। এতদিন সে পরের গর্ভে ছিল, পরের শ্বাসেই তাহার এতদিন শ্বাসপ্রশ্বাস চলিয়াছে। এখন যদি নিজেদের শ্বাসযন্ত্র কাজ না করে, তবে নবজাত এই স্বাধীনতাশিশু জাতমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। জন্মশাস্ত্রবিদেরা এই তত্ত্ব জানেন।

আজ ভারতের নব চেতনা জাগুক, নব বেদনা জাগুক, নব সাধনায় প্রবৃত্ত হউক। আজ আমরা স্বাধীনতার প্রাচীন দীক্ষামন্ত্রগুলি যেন অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি।

শোনো ভারতের পুরাতন গুরুগণ বৈদিক ভাষায় স্বাধীনতার কি মন্ত্র বলিতেছেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অমূরাঃ।

তোমরা মহনীয়, আজ শোনো। কোন মূঢ়তা যেন আজ আর তোমাদিগকে অভিভূত না করে।

আ ত্বাগন্ রাষ্ট্রম্।
সহ বর্চসো দিহি॥

আজ রাষ্ট্র ও দায়িত্ব তোমাদের কাছেই সমাগত। আর অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিও না। মনুষ্যত্বের পূর্ণ দীপ্তিতে আজ উদিত হও।

উত্তিষ্ঠ পুরুষ। উত্তিষ্ঠ বিরাড় ভব।

জাগো হে মানব, উঠিয়া দাঁড়াও, বিরাট হও।

কৃচ্ছ্রেশ্রিতাঃ শক্তিতো গভীরাঃ।

গভীরের শক্তিতে শক্তিমন্ত হও। যত দুঃখ, যত কৃচ্ছ্রতাই আসুক, তাহাতে টলিও না। কারণ

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

যে দুর্বল অশক্ত, সে কখনো আপনাকে পায় না। কিন্তু ভয় কিসের?

ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি।

তুমি দীপ্ত তেজ, তুমি সর্বংসহা শক্তি, দুর্জয় তোমার বল।

বলমস্তু তেজঃ।

আজ আরও নব বল, আরও নব তেজ লাভ কর।

আত্মা বৈ বলম্।

আজ সেই বল আসুক আপন আত্মার মধ্য হইতে।

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়ঃ।

আত্মার সেই বল বিজ্ঞান-শক্তি হইতে মহনীয়।

ওজস্বান্ মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ।

এই রহস্য যে জানে, সে-ই যথার্থ ওজঃ এবং মহত্ত্ব লাভ করে।

আত্ম কেতুং সমাপনুহি।

হে সাধক। আত্মপরিচয়ই তোমার পতাকা। সেই আত্ম-পতাকা লাভ কর।

উং কেতু না বৃহতা প্রেহি যুক্তঃ।

আত্মপরিচয়ের সেই মহনীয় বিশাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া সকলে যুক্ত হইয়া আজ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চল।

আত্মপরিচয়হীন দুর্বলদের প্রতিও তোমাদের কর্তব্য আছে—

কেতুং কৃণ্বন্ অকেতবে সমৃষদ্ভি রজায়থতাহি॥

যাহারা কেতুহীন, তাহাদিগকে কেতুযুক্ত কর। সমুদিত ঊষার মত আজ নবজন্ম লাভ কর।

সর্ব এব স্বমহিম্নি তিষ্ঠন্তু।

সকলেই যেন আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেহ যেন স্ব-মহিমা হইতে বিচ্যুত না হয়।

সংজ্ঞানং নঃ স্বেভিঃ সংজ্ঞানম্ অরণেভিঃ।

আত্মপর, পরিচিত-অপরিচিত সবার সহিতই আজ আমাদের মৈত্রীর ও প্রীতির যোগ হউক।

সা মুক্তিঃ সাতি মুক্তিঃ।

এই মৈত্রী ও কল্যাণের যোগই মুক্তি। ইহা মুক্তি হইতেও মহত্তর।

ছিন্না তন্তুং ন বধ্যতে।

স্বার্থ ও মিথ্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই যে মুক্তি—কোন বন্ধনেই আর সেই মুক্তির অবসান ঘটে না।

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষম্
অভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদ্
উত্তরাদ ধরাদ্ অভয়ং নো অস্তু॥
অভয়ং মিত্রাদভয়ং অমিত্রাদ্
অভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তং ভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

অন্তরীক্ষ আমাদের অভয়দান করুক। দ্যুলোক-ভূলোক উভয় আমাদের অভয়দান করুক। পশ্চাৎ-সম্মুখ উভয়ই আমাদের অভয়-দান করুক, ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ আমাদের অভয়দান করুক।

মিত্র হইতে আমাদের অভয় হউক, অমিত্র হইতেও আমাদের অভয় হউক। পরিচিত-অপরিচিত উভয়ই আমাদের অভয় হউক। দিনরাত্রি উভয়ই আমাদের অভয় হউক। সর্ব-দিক আমাদের মিত্র হউক।

স্মরণীয় ছাব্বিশে জানুয়ারী

শ্রীপ্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

এক একটি দিন ইতিহাসের রক্ত-স্বাক্ষরে অম্লান! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে ছাব্বিশে জানুয়ারীও এমন একটি রক্ত-ঝরা দিন, শত শহীদের দুর্জয় প্রাণের সংকল্প ঘোষণায় অবিস্মৃত আসন অধিকার করে আছে। আজ থেকে একুশ বছর আগে এই দিনটিতে বৃটিশ শাসনের নাগপাশে বন্দী ভারত-আত্মা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংকল্প গ্রহণ করে জাতীয় সংগ্রামের নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। সেই সংকল্প, সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে ১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী, তাই আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই স্বপ্নসাধনার দিনটিকে স্মরণ করি। ইতিহাস এ দিনটিকে সমাদরে বরণ করে নিয়েছে দু'শত বছরের বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত ভারত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাদিবসরূপে। ভারত ও ভারতীয় জন-সাধারণের কাছে ছাব্বিশে জানুয়ারী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনটি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসাধন করেছে। এই বর্তমান অতীতের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে। ১৯৩০ সালের এমনদিনে ভারতবাসী ত্যাগপূত চিত্তে জাতীয় পতাকার তলে প্রথম যে শপথ গ্রহণ করেছিল, তা ১৯৫০ সালের ঠিক ঐদিনে বাস্তব রূপ লাভ করল। এ বিশ বছর ধরে ভারত ক্রমাগত সংঘাত, সংগ্রাম. ব্যর্থতা ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে এসেছে। প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র জাতি স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করেছে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে জনসমাজ এক হয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে জাতির মুক্তিকল্পে। এই দিনের পর নানা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল কেটে গেছে। আবার আমরা আজ সমগ্র ভারতবাসী প্রতি প্রান্তে মিলিত হয়েছি ভারত-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনে, সেইদিনকার গৃহীত সংকল্প সার্থক হওয়ার আনন্দ উৎসবে। রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে, আজ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে ভারতবাসী। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল।

আজিকার এই শুভক্ষণে জাতীয় সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়ের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়—"পূর্ণ স্বরাজ অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার বার্তা ভারতের দূর গ্রাম গ্রামান্তরে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য এ সমিতি ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী 'স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালন করার ঘোষণা করছে। ঐ দিবস সর্বত্র প্রাদেশিক ভাষায় সভা-সমিতিতে স্বাধীনতার সংকল্প পঠিত হবে এবং সভা-সমূহে উপস্থিত সকলকে তাঁদের সম্মতি হাত তুলে জানাতে হবে।" কংগ্রেসের নির্দেশমত সমগ্র ভারতের প্রতি জনপদ ও প্রতি প্রান্তরে ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। এবং এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, সভা, শোভাযাত্রায় জাতীয় সঙ্গীত এবং স্বাধীনতার সংকল্প পঠিত হয়। জনসাধারণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে 'পূর্ণ স্বরাজই' ভারতবাসীর একমাত্র দাবী। জাতি দেশকে সাম্রাজ্যবাদী পর-শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এই শপথ নিল—"আমরা বিশ্বাস করি অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার আছে।"...... "আমরা এও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন সরকার জনসাধারণকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের উৎপীড়ন করে, তবে তাদের সেই সরকারের পরিবর্তন কিংবা বিলোপ সাধনেরও অধিকার আছে।" "ভাতবর্ষে বৃটিশ সরকার শুধু যে, ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা হরণ করেছে তাই নয়, তারা জনগণের শোষণের উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ভারতকে রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও ধ্বংস করেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের পক্ষে বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন।" "আমরা স্বীকার করি, হিংসার পথ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ নয়। বৈধ ও শান্তিপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করে ভারত শক্তি ও আত্মনির্ভরতা লাভ করেছে। এবং এই পথেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে। আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনার সংকল্প পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করছি।" এর পরেই শুরু হোল গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট সংগ্রাম। ১৯৩০ সাল ভারতের ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ২৬শে জানুয়ারীর সংকল্পবাক্যে যে প্রতিজ্ঞা দেশবাসী গ্রহণ করল তাকে কার্যে রূপ দেবার জন্য আহ্বান এল। দিকে দিকে জন জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। এখানেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায় সূচিত হল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁকে অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী অনুগামীদের সহযোগিতায় নিজেদের বিবেচনা-মত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করবার অধিকার দেওয়া হয়। ৪ঠা মার্চ গান্ধীজী বড়লাটের কাছে নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে চরমপত্র দেন। কিন্তু গান্ধীজী সদু উত্তর পেলেন না। সেইদিনই বোরসাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রচারকার্য পরিচালনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডির সমুদ্র-কুলাভিমুখে রওনা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে গান্ধীজী বলেন, "আমাদের দাবী দুর্দমনীয়, উপায় সাধু, সহায় ভগবান। সত্যাগ্রহী যদি সত্য ত্যাগ না করেন, তবে তার পরাজয় নেই। আমাদের আরব্ধ সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক।" পদব্রজে আড়াইশ' মাইল অতিক্রম করে ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডিতে পৌঁছিলেন এবং ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। সেইদিনই ভারতের সর্বত্র লবণ আইন ভঙ্গ করলেন জনসাধারণ। সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশবাসী মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণায় জাগ্রত হল, আর বৃটিশ সেনা সারা ভারতে টহল দিতে আরম্ভ করল। পুলিশ জুলুম, গ্রেপ্তার ও মারধোর প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সরকার গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করল। জুন মাস পর্যন্ত সারা ভারতে ৪৩৭৭ জন সংগ্রামী কারারুদ্ধ হল। কিন্তু এতেও আন্দোলন থামল না, বাঙলা দেশে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী করে সরকার ৪০০ বাঙালী যুবককে বন্দী করল। এত করেও যখন আন্দোলন থামল না, তখন সরকার

গান্ধীজীকে বন্দী করতে মনস্থ করল। ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে অর্তাকর্তে রাত্রে গান্ধীজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। তবুও সর্বত্র মদ-গাঁজার দোকানে ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চলতে লাগল। এদিকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসল। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হল এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল। সরকার সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিলেন।

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে ৫৪,০৪৯ জন দণ্ডিত হয়। তন্মধ্যে বাঙলায় সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ ১১,৪৬৩ জন দণ্ডিত হন। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর ভারতবর্ষ তার শ্রেষ্ঠ নেতাকে প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠান, গান্ধীজী ভারতবাসীর পক্ষ থেকে মূক-দরিদ্র, নিপীড়িত মানবাত্মার দাবী জগৎ সভায় উপস্থিত করেন। চার মাস পরে গান্ধীজী স্বদেশে ফিরে এলেন। পুনরায় জাতিকে মহা-অগ্নি পরীক্ষায় আহ্বান করা হল। গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে বৃটিশ সরকারের মর্যাদার ওপর যে আঘাত পড়েছিল, সরকার সেই মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার মানসে সমগ্র দেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন, সামরিক আইন জারী করা হয়। ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসে কংগ্রেস এক প্রস্তাবে বলেছিল যে, কংগ্রেসের যে পূর্ণ স্বরাজ কাম্য রয়েছে, সে কথা এখনও (অর্থাৎ গান্ধী-আরুইন চুক্তির পরেও) অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে। ১৯৩২ সালে ২রা জানুয়ারী গান্ধীজী বড়লাটকে বিরাম-সন্ধির অবসান জানিয়ে তার করেন—সুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ অনতিবিলম্বে সরকার গ্রেপ্তার করল। নেতারা জেলে থাকলেও দেশবাসী ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন করে নিষ্ঠুর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। সরকার ১৯৩২, ৩৩ সালের কংগ্রেস অধিবেশন হতে দেন নি। কিন্তু জাকজমক্ ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণ নিজেদের সভাপতি মনোনীত করে কংগ্রেসের অধিশেবন করে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ভারতবাসীর স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়সংকল্প জাতির জয়যাত্রা সূচিত করে। মহাত্মাজীর প্রয়োপবেশন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে ক্লান্ত জাতিকে শান্ত আবহাওয়ায় সজীব করে তোলার আশায় কিছুদিনের জন্য সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখা হল এবং সরকারকে পুনরায় সহযোগিতার সুযোগ দেওয়া হল। ১৯৩৩ সালের ১লা মে তারিখে গান্ধীজী যারবেদা জেল থেকে ঘোষণা করেন যে, তিনি হরিজন উন্নয়নের দাবীতে ২১ দিন উপবাস করবেন। ৮ই মে উপবাস শুরু করলেন, সেদিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। গান্ধীজী মুক্ত হয়ে ঘোষণা করেন যে, এক মাসের জন্য আপাততঃ আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ থাকবে। ১৯৩৩ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এ আন্দোলন বন্ধ থাকে। এরপর বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেখা দেয়। আবার নেতারা গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজীকে আবার ২৩শে আগস্ট সকার মুক্তি দেয়। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, ১৯৩৪ সালের ৩রা আগস্ট পর্যন্ত তিনি আর আন্দোলন চালাবেন না। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতারা স্থির করলেন যে, সরকারের অর্ডিনান্স রাজত্ব বন্ধ করতে হলে আইন সভায় যোগদান আবশ্যক। তদনুযায়ী ১৯৩৪ সালে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে আইন সভায় প্রবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে বে-আইনী আদেশ তুলে নিল। নিষেধাজ্ঞা রহিত হবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশনে 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন'র নীতি অনুমোদিত হয়। এই সময় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দানা বেধে উঠে। ১৯৩৫ সালের ২রা জুলাই বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ভারত শাসন আইন রাজার অনুমোদন লাভ করল। ১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতন্ত্রের ধারা মত ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুলভাবে জয়লাভ করল। এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেস আন্দোলনের গতিপথ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তার উপর বিশ্বাস করে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আটটি প্রদেশে কাজ আরম্ভ করল। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কাজ আরম্ভ করে। দু'বছর তিন মাসকাল এ মন্ত্রিসভা কাজ চালায়। এই স্বল্পকাল মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য আইন ও বিধিব্যবস্থা স্থিরিকৃত হয়। করাচী কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক অধিকার, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষক কুলের সুখবিধানের জন্য সরকার সচেষ্ট হন। কিন্তু বেশীদিন কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না।

এর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল। বৃটিশ সরকার ভারতকে এ যুদ্ধে টেনে নিতে চাইল। ফলে দেশে দেখা দিল তীব্র অসন্তোষ। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের মর্যাদা কিরূপ লাভ করবে সেই সম্পর্কে সঠিক উত্তর চাইলেন সরকারের কাছে। বড়লাট এ প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন না। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা-সমূহে অক্টোবর মাসে পদত্যাগ করল। সমরানল চারিদিকে অনল ধ্বংস এবং শঙ্কা ভয়-ভীতি। এমন সময় কংগ্রেস বৃটিশের নিকট নতুন প্রস্তাব ঘোষণা করল—তোমরা ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে সুস্পষ্ট ঘোষণা করত, কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের আস্থাভাজন লোকায়ত্ত সরকার গঠন কর।" কিন্তু ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্টে প্রকাশিত হোয়াইট পেপারে নির্মূল হল। কংগ্রেস ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধে অগ্রণী ছিল, কিন্তু সরকারী ঔদাসীন্য ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য কংগ্রেস কোনদিকেই অগ্রসর হল না। নতুন সংকটের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ১৯৪২ সালে জাপান দ্রুত সাফল্য লাভ করে ভারত সীমান্তে সে পৌঁছিল। বৃটিশ রাজ এতে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ সরকার ভালভাবেই বুঝল। বৃটেন এ সময়ে ঘোষণা করল যে ভারতের সঙ্গে আপোষ করার জন্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে যাচ্ছেন। ক্রীপস্ ১২ই মার্চ ভারতে এলেন নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে—এ প্রস্তাবে সবই ছিল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেস নেতারা বৃটিশ প্রতিশ্রুতির মূল্য কি তা ভালভাবেই জানতেন। বহু আলাপ-আলোচনা হল; কিন্তু কোনই শুভ ফল হল না। কংগ্রেস অবিলম্বে জনপ্রিয় লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাতে রাজী না হওয়ায় সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ হল।

ক্রীপসের দৌত্য একদিকে ব্যর্থ হল, আর অন্যদিকে জাপান এগিয়ে এল ভারত সীমান্তে, এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তকে কংগ্রেস ভালভাবে বিচার বিবেচনা করল। ইংরেজ ভারত ত্যাগ না করলে কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না—এটা সকলেই বুঝলেন। নতুন সংগ্রাম শুরু করবার জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হতে লাগল। সরকারও এই বিরাট সংগ্রাম দমনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে গান্ধীজীর উপর জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার ভার দিয়ে ঘোষণা করা হল "ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার

আছে। এই স্বাধীনতার জন্য দেশের সর্বত্র গণ-আন্দোলন শুরু করার সময় এসেছে; এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালিত হবে। কংগ্রেস কর্মীদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অহিংসাই এই সংগ্রামের ভিত্তি। বৃটিশ যদি ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে তবে ভারতবাসী নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করবে।" ৮ই আগস্ট এ প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবের মূল কথাই হল—'Do or die' করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ঐদিন রাত্রেই সমস্ত নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। সমস্ত দেশব্যাপী অসন্তোষের তীব্র বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সরকার নিষ্পেষণের রথচক্র চালাল ভারতবাসীর ওপর। সমগ্র ভারতের নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হলেন, কিন্তু তাতে আন্দোলন থামল না। আগস্ট বিপ্লবে বৃটিশ সাম্রাজ্য কেঁপে উঠল। কংগ্রেস বে-আইনী হলেও জনসাধারণ তাদের শক্তি ও প্রতিজ্ঞা মত কাজ করতে লাগল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নিপীড়ন ও অত্যাচারে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হল—দিকে দিকে দেখা দিল ভীষণ কান্ড। সরকার এ বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত হল; কিন্তু নেতাহীন এই আন্দোলনকে একেবারে দমন করতে পারল না। সরকারী বিবরণেই প্রকাশ পেয়েছে যে, আগস্ট আন্দোলনে মোট ৬০,২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ৫৮৩টি ক্ষেত্রে গুলী চালায়, ফলে ৯৪০ জন নিহত এবং ১৬৩০ জন আহত হয়। কংগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২ সাল বিশেষ স্মরণীয়।

ঠিক এই সময়ে ভারতের দ্বারপ্রান্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে হানা দিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদকল্পে। সেদিন নেতাজীর নির্ঘোষিত 'দিল্লী চলো' ধ্বনি ভারতবাসীর কানে এসে পৌঁছয় নি। যুদ্ধ শেষে সারা ভারত মুগ্ধ চিত্তে জানল এই অপূর্ব বীরত্বগাথা। নেতাজী সুভাষের সার্থক প্রচেষ্টা ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘনিয়ে আনল। আত্মবিস্মৃত ভারত নেতাজীর বাণীতে আবার জেগে উঠল। ইংরেজ এবার বুঝল তাদের যাবার দিন সমুপস্থিত। তাই বহু ছল-চাতুরী শুরু করল। কিন্তু ভারতবাসী সংগ্রামী, তাকে ফাঁকি দিতে গিয়ে ইংরেজ পদে পদে আঘাত পেল। এ সময়ে বড়লাট ওয়াভেল ১৯৪৫ সালে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে ডাকলেন এক বৈঠক। সিমলা সম্মেলনে ওয়াভেল পরিকল্পনা আলোচিত হল। কিন্তু এই আলোচনায় মিঃ জিন্নার একগুঁয়েমী ও চাতুর্য বাধা সৃষ্টি করল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। মুসলিম লীগ নতুন দাবী নিয়ে বৃটিশের যোগসাজসে পুষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেস কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছাড়ল না। ১৯৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্স ঘোষণা করলেন যে, শীঘ্রই ভারতে এক মন্ত্রী-মিশন পাঠান হবে। মন্ত্রী-মিশন ভারতে এসে বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। ভারত তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কদের বিচারে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এর কিছুদিন মধ্যে দেখা দিল নৌ বিদ্রোহ। এদিকে সম্মেলন চলল—মিঃ জিন্না পাকিস্থান দাবীতে তুমুল আন্দোলন চালাবার হুমকী দিলেন। লীগের অনমনীয় মনোভাবে মন্ত্রী-মিশনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। মন্ত্রী-মিশন ভারত ত্যাগের পূর্বে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দুটি প্রস্তাব ঘোষণা করেন। কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করল। লীগ প্রথমে উভয় প্রস্তাবই ঘোষণা করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে। কংগ্রেস এ সময় বৃটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয় এবং শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও মুসলিম লীগ এ সরকারে যোগ দিল না। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু হল মুসলিম লীগের পরিচালনায়। এদিন মহানগরী কলকাতার বুকে শুরু হল নরহত্যা, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক কার্য। এই সাম্প্রদায়িকতার আগুন ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ল। এই নাটকীয় ঘটনায় এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় যোগ দিল; কিন্তু গণ-পরিষদের বৈঠক বয়কট করল। ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে গভর্নর জেনাল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাব মত সমস্ত মীমাংসা না হওয়ায় আর একটি নতুন প্রস্তাব রচিত হল। বৃটিশ সরকারের ইতিহাসখ্যাত ৩রা জুনের পরিকল্পনা ঘোষিত হল। ঐ পরিকল্পনাই বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সিদ্ধান্তে ঘোষিত হল এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবীও আনন্দে মেনে নেওয়া হল—লীগ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু ভারতবাসী অখণ্ড ভারতের পূজারী, তাদের কাছে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মৃত্যুর আঘাতস্বরূপ লাগল। শেষ পর্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের কথা ভেবে কংগ্রেস ৩রা জুনের পরিকল্পনা মেনে নিতে সম্মতি জানাল। দেশ বিভাগ স্থিরিকৃত হল।

দেশ বিভাগের প্রস্তাব কার্যকরী হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দুটি পৃথক ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্র জন্ম নিল। ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্ট ভারতে স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হল। কিন্তু ভারতবাসী এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে না করতেই পাঞ্জাবে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক গোলযোগ। ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে গেল, কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হল না। অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন নতুন সমস্যা এই জাতীয় সরকারের সম্মুখে এল। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতার গুলীতে মৃত্যুবরণ করলেন। তথাপি রাষ্ট্রনায়করা তাদের কর্তব্যে অবহেলা করেন নি।

গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ দু-বছর এগার মাস ও সতের দিন পরিশ্রম করে ভারত সাধারণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র রচনা করেন। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতে পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। নতুন শাসনতন্ত্রে গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হল। চারিদিকে কম্বুকণ্ঠে গীত হল স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী ভারতের জয়গাথা।

হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত বিশাল ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর সমক্ষে আপন জনগণের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকার ঘোষণা করল। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছিল, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তা পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করল। ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল সার্বভৌমত্ব, সূচনা হল জয়যাত্রার।



যুগ-বিপ্লব

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য :

স্থান—দিল্লী শহরের বহির্ভাগ। শহর হইতে বাহিরে যাইবার একটি ফটকের মুখ। ফটকটি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে কোন রক্ষী নাই।

কাল—১৭৫৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস, শীতার্ত প্রথম প্রহর রাত্রি।

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। শহরের কোথাও আলো নাই। অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়াছে কুয়াসা। মনে হইতেছে এ যেন রাত্রির অন্ধকার নয়, এ যেন নিয়তির অন্ধকার। শাহ্ আবদালী আমেদ দুরাণী চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে। গত তিনবার সে দিল্লী প্রবেশ না করিয়া পাঞ্জাব হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিল। এবার সে আটক অতিক্রম করিয়া লাহোর পর্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। লাহোরকে পিছনে রাখিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়াছে। কোথাও কেহ একটি আঙুল তুলিয়াও বাধা দিতে সাহসী হয় নাই। আটক হইতে সরহিন্দ পর্যন্ত যে পথে তাহারা আসিয়াছে সে পথের দুই পাশের বসতি শ্মশান হইয়া গিয়াছে। সমস্ত হিন্দুস্থান আতংকিত। দিল্লী শহর হতচেতন। শহরে আলো নাই, পাহারা নাই, বাজার হাট বন্ধ, শহরের শাসন-শৃংখলা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা পলায়ন করিয়াছে। বাদশাহী সিপাহিরা নিজেরাই লুঠতরাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ। মূল বাহিনী আফগান রোহিলা মনসবদার নাজিব খাঁর নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আবদালীর পক্ষে যোগ দিবার জন্য দিল্লী ত্যাগ করিয়াছে। হতাশায় আতংকে মধ্যবিত্তেরাও পলাইতে শুরু করিয়াছে। সহসা যেন কেহ কোথাও কোন নারীকে ছুরিকাঘাত করিল।

যবনিকা অপসারিত হইবার মুহূর্তেই একটা মরণার্ত নারীকণ্ঠের চীৎকারে এই অন্ধকার চিরিয়া গেল। সুদীর্ঘ একটি আ—শব্দ। শব্দটি শেষ হইল—বোধ হয় তার মৃত্যুতে। তারপর সব স্তব্ধ। শুধু অতি করুণ যন্ত্র সংগীতের মত একটি ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে প্রবেশ করিল একদল পলায়নপর নরনারী। নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কাঁধে কাঁথে পোঁটলা, কাঠের তোরংগ। মেয়েদের দু'তিনজনের কোলে শিশু। দুই তিনটি বালক হাত ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে।

তাহারা প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয় পাইল তাহারা। যন্ত্র-সংগীতের মত ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি যাহা বাজিয়াই চলিয়াছে সেই ধ্বনি কয়েক মুহূর্তের জন্য উচ্চ হইয়া উঠিল। অগ্রবর্তী ব্যক্তি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সকলের পিছনের প্রবীণ ব্যক্তিটি চাপা গলায় বলিল—

প্রবীণ ব্যক্তি—আঃ! দাঁড়ালে কেন? (চাপা-গলার কথা কয়টি ভয়কে যেন বাড়াইয়া দিল)

অগ্রগামী—(আঙুল তুলিয়া ইংগিত করিয়া বলিল) শুনেছ?

প্রবীণ—শুনেছি। কান্না। কাঁদছে। চল—চলে চল।

অগ্রগামী—কান্না?

অনাজন—রোদন? রোতি হ্যায়? কৌন?

প্রবীণ—দিল্লী। দিল্লী রোতি হ্যায়।

একটি বালক—(সভয়ে চাপা গলায়) মা!

প্রবীণ—চুপ! চুপ! শুনতে পাবে। চারিদিকে বাদশাহী সিপাহী লুঠ করে বেড়াচ্ছে।

অগ্রগামী—দিল্লী? দিল্লী কাঁদছে?

প্রবীণ—হাঁ—হাঁ। দিল্লী। দিল্লী কাঁদে। বিপদের সময়—

[দূরে কোথায় বন্দুকের শব্দ হইল, সকলে চমকিয়া উঠিল।]

প্রবীণ—চলে এস—চলে এস। বাদশাহী সিপাহী লুঠেরা! নিঃশব্দে চলে এসো! নিঃশব্দে পা চালিয়ে চলে এস।

(তাহারা সভয় দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল)

[তাহারা চলিয়া গেল। জনহীন নগর প্রান্তের বুকে শুধু সেই একটানা ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি বাজিয়া চলিল। ইহার মধ্যে নেপথ্য হইতে কথা বলিতে বলিতে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। দুইজনেরই সর্বাঙ্গ কালো আঙরাখায় আবৃত। একজন বয়স্ক সম্ভ্রান্ত দর্শন ব্যক্তি; ইনি সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র কামবক্সের পৌত্র নাম মহি-উল-মিল্লাত, পরে ইনি কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় সাজাহান নামে বাদশাহ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন একজন অনুচর নাম আশরফ।]

নেপথ্য হইতে মিল্লাত বলিতেছিলেন—তাই তো এ কোথায় এসে পড়লাম আশরফ?

[প্রবেশ করিলেন]

এ যে শহর শেষ হয়ে গেল! এই তো ফটক। এ কোন্ ফটক?

আশরফ—তাই তো আলি জাঁহা! আঁধিয়ারায় কিছু ঠাওর করতে পারছি না! একটা লোক নেই যে পথ জিজ্ঞাসা করি।

মিল্লাত—আমার তো কিছুই ঠাওর হচ্ছে না আশরফ। সারা জীবনটাই কাটল বন্দী-দশায়। অভিশপ্ত বাদশাহী! বাদশাহ বংশে জন্মগ্রহণ করে অভিশাপের ভাগ না-নিয়ে উপায় নাই। বাদশাহ বংশের একজন হয় বাদশাহ—বাকী সব সাহ-জাদা থাকে বন্দী। ভাঙা থালায় পোড়া রুটি, ফুটো গেলাসে জল আর চারি-পাশে শক্ত পাথরে গাঁথা দেওয়াল—এই তার ভাগ্য! প্রথম যৌবনে দেখা দিল্লী শহর সে প্রায় ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এখন যাবে কোথায়?

আশরফ—ওদিকে হজরত সাহফানা অধীর হয়ে উঠেছেন আপনার জন্যে।

মিল্লাত—গুরু, আমাদের পাগল আশরফ, পাগল! নইলে ভেঙে পড়া একটা ইমারত বাবরশাহী বাদশাহী, তাকে তিনি আবার খাড়া ক'রে তুলতে চান! মিছেই আমাকে কয়েদখানা থেকে বের করলেন!

[নেপথ্যে কোথাও বন্দুকের শব্দ হইল আশরফ ব্যস্ত হইয়া মিল্লাতকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]।

আশরফ—গুলি! গুলি ছুটছে! চলুন জনাবালি,—এদিক থেকে ফিরতে হবে।

মিল্লাত—ফিরতে তো হবে। কিন্তু সে কোন দিকে?

আশরফ—বুঝতে পারছি না। আলো নাই, পাহারা নাই, মানুষ নাই—আঁধিয়ারায় ঢেকে গিয়েছে! জিজ্ঞাসা করব কাউকে এমন একটা মানুষ নাই!

মিল্লাত—চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তার সঙ্গে সফেদ মিহি মসলিনের মত কুয়াসা! একেই বলে নসীব! দিল্লীর নসীব! রোশনে, মহফিলে, জলষায়, গানে, হাসিতে হল্লায় ঝলমল হজ হজ শহর দিল্লী! সিরাজীর আমেজে মশগুলে শহর দিল্লী, আতরগুলাবের খুসবয়ে দিল্লীর বাতাস ময়-ময়। সেই দিল্লী আজ আঁধিয়ারায় থম থম করছে! ভয়ে বেহোঁস হয়ে গিয়েছে। কবরস্তানের মত খাঁ খাঁ করছে। বাতাসে উঠছে পচা মুর্দার বদ্‌বয়। মানুষ পালিয়েছে, পালাচ্ছে—ভেড়ির পালের মত। রাস্তায় ঘুরছে চোর-ডাকাত, লুঠেরা, গুণ্ডা! বাবরশাহী বাদশাহী! হিন্দুকুশ পার হয়ে আফগানেস্তান পর্যন্ত তার এলাকা! তার তোপ আর ফৌজের ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপত দুনিয়া। আজ আফগান-লুঠেরা আহমদ শাহ আবদালী আটক থেকে দিল্লীর ফটক পর্যন্ত এসে গেল, কেউ আঙুল তুলে একটা বাধা দিতে সাহস করলে না। হা-রে-হা! বাদশাহী ফৌজ লড়াইয়ের

ভয়ে কেল্লা থেকে পালিয়ে শহর লুঠ করতে মেতে উঠেছে! আবদালী দিল্লী ঢুকবে, তারা ভাগবে লুঠের মাল নিয়ে!

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেই কান্না উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।]

আশরাফ! শুনছ আশরফ!

আশরফ—শুনেছি জনাবালি। চলে আসুন। ও কান্না শুনবেন না।

মিল্লাত—কেন আশরফ?—ও! তুমি সেই কান্নার কথা বলছ? এ কান্না সেই কান্না? দিল্লীর কান্না?

আশরফ—হ্যাঁ জনাবালি। শুনেছি দিল্লী কাঁদে। যখনই বিপদ আসে—

মিল্লাত—হ্যাঁ, যখনই বিপদ আসে, তখনই দিল্লী কাঁদে। নাদিরশা যখন এসেছিল, তখন দিল্লী কেঁদেছিল। শুনেছি—তার আগেও কেঁদেছে দিল্লী। কিন্তু—

[মাটিতে বসিয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেন।]

মাটির ভিতর থেকেই যেন কান্না উঠছে।

আশরফ—জনাবালি, কে আসছে। জনাবালি!

মিল্লাত—স্পষ্ট জেনানীর আওয়াজে কাঁদছে দিল্লী!

আশরফ—জনাবালি। (সে বাহির করিল তার তলোয়ার)।

[প্রবেশ করিল একজন যুবক চাষী। জাঠ রাজপুত—নাম জবাহির সিং গ্রাম্য যুবক।]

আশরফ—কে? কে তুমি?

জবাহির—(পিছাইয়া গিয়া তলোয়ারে হাত দিয়া বলিল) আমি একজন জাঠ-চাষী। তুমি আপনারা? আপনারা কে?

আশরফ—কি মতলব তোমার?

জবাহির—দোহাই ভগবানকে, কোন বদ মতলব আমার নাই। আমি একটু বিপদে পড়েছি—

মিল্লাত—বল জাঠ জোয়ান—কি বিপদে পড়েছ?

জবাহির—আপনারা এখানকার লোক জনাব?

মিল্লাত—হ্যাঁ, আমরা এই শহরেরই লোক।

জবাহির—আঃ বাঁচলাম, এত বড় রাস্তাটায় একজন লোক পাই নি। একটি মেয়েকে আপনারা আশ্রয় দিতে পারেন?

মিল্লাত—মেয়ে?

জবাহির—হ্যাঁ জনাব! দেখে মনে হল খুব বড় ঘরের মেয়ে। কুঁইয়ার ভিতর পড়ে গিয়েছিল, যন্ত্রণায় বেহোঁস হয়ে কাতরাচ্ছিল। মাটির ভিতর থেকে কাতরানী—সে শুনে থর থর করে ডরকে মারে—কেঁপে উঠেছিলাম প্রথমটা, তারপর সাহস করে খুঁজে দেখতে গিয়ে তাকে পেলাম। তাকে তুললাম কুঁইয়া থেকে। বড় ঘরের মেয়ে, রাধারাণীর মত সুরত। এখনও বেহোঁস হয়ে রয়েছে। তার ভার যদি দয়া করে আপনারা নেন জনাব! আমি দেহাতী চাষী বাড়ি চলে যাচ্ছি—ভেবে পাচ্ছি না তাকে নিয়ে কি করব?

মিল্লাত—চল জাঠ জোয়ান চল, কোথায় সে মেয়ে?

জবাহির—আসুন জনাব। আর এই কাঁকনিটা, এটা কি করে খুলে গেল তার হাত থেকে। আমি কুড়িয়ে রেখেছি। এটা তাকে দেবেন।

[কাঁকনিটি দিল এবং সকলে চলিয়া গেল কান্না উঠিতে লাগিল। কাতরানি শব্দ!]

[প্রবেশ করিল আর চারজন লোক। প্রথমেই একজন সিপাহী। তাহার পিছনে, দিল্লীর উজীর ইতিহাসে কুখ্যাত আমিদুল মুল্ক গাজিউদ্দীন, বয়স ৩০ বৎসর। অপরজন বৃদ্ধ, নাম রেজা খাঁ; অন্য জন ইয়াকুব আলি খাঁ পাঠান—দিল্লীর বাসিন্দা, আবদালীর উজীর ওয়ালী খাঁর সহোদর, প্রৌঢ় ব্যক্তি। সিপাহীটা সর্বাগ্রে প্রবেশ করিয়া ওই কান্নায় ভয় পাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া আর্তনাদ রোধ করিবার চেষ্টা করিল।]

সিপাহী—আ—। (গলা টিপিয়া ধরিল নিজের)

ইয়াকুব—(দ্রুত পিছন হইতে আসিয়া পিঠে হাত দিয়া) এই—এই! কি হয়েছে? এই!

সিপাহী—(আতঙ্কের সঙ্গে) রোতি হ্যায়, হুজুর—দিল্লী রোতি হ্যায়!

ইয়াকুব—ডর নেহি হ্যায়। ডর নেহি হ্যায়? (গায়ে হাত দিয়া অভয় দিলেন)

গোটা শহর ভয় পেয়েছে। ওর দোষ কি! এই কান্না সর্বত্র। কে জানে—বলছে—দিল্লী রোতি হ্যায়।

আমিদ—জাহান্নমে যাক দিল্লী! রেজা খাঁ—আমি কি করব বল?

ইয়াকুব—কি করবেন? চলুন আপনি শাহ আবদালীর কাছে।

আমিদ—আমি তার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে? ওঃ! আবদালীর সেই ভয়ঙ্কর মুখ। কান নাই, বসা নাক—ওঃ! আমি মারাঠাকে ডেকে পাঞ্জাব থেকে তার সুবাদারনী মুঘলানীকে তাড়িয়েছি। রোহিলা পাঠানদের দোয়াব লুঠিয়েছি। আবদালী হুকুম দিয়েছিল—মুঘলানী বেগমের বেটি উমধা বেগমকে আমাকে সাদী করতে হবে, সে আমি করি নি। রেজা খাঁর হাতে সোনার থালায় দু' দু'লাখ টাকা পাঠালাম, সে তা ছোঁয় নি।

রেজা—মাটির উপর থুথু ফেলে—পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে থালাখানা। হা হা করে হেসে মুঘলানীকে ডেকে বললে—আরে বেটী তোর হবু দামাদ কি নজর পাঠিয়েছে দেখ! নে তুই এটা নিয়ে যা। আমাকে বললে—আরে রেজা—কম্‌সে কম্ দু ক্রোড় রুপেইয়া তো লে আর পহেলে?

আমিদ—দু' ক্রোড় রুপেইয়া। সারা দিল্লীতে দু ক্রোড় দামড়ীর জোগাড় করতে পারব না আমি।

ইয়াকুব—তা হোক। তবু আপনি চলুন আমার সঙ্গে। রেজা খাঁ কাজ গুছিয়ে আসতে পারে নি, কিন্তু আমি গুছিয়ে এসেছি। আমার দাদা শাহ আবদালীর ওয়াজীর ওয়ালী খাঁর সঙ্গে পাক্কা বাত বলে এসেছি।

আমিদ—কি সে পাক্কা বাত?

ইয়াকুব—প্রথম বাত আপনাকে নিয়ে। আপনি মুঘলানীর অপমান করেছেন, তার বেটী খানদানী বংশের বেটী উমধাকে সাদী না করে, এক তয়কাওয়ালীর বেটী গন্না বেগমকে সাদী করতে চেয়েছেন, এর জন্যে আপনাকে মাফ চাইতে হবে।

আমিদ—চাইব।

ইয়াকুব—উমধা বেগমকে সাদী করতে হবে।

আমিদ—রাজী।

ইয়াকুব—গন্না বেগমকে শাহ বাঁদী করে পাঠিয়ে দেবেন কন্দাহার, ঝাড়ুদারকে দিয়ে দেবেন—

আমিদ—তাতেও আমার আপত্তি নাই ইয়াকুব আলি খাঁ। কিন্তু গন্না কোথায় আমি জানি না। কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করব আমি। তয়কাওয়ালীর নেশা আমার মিটে গেছে। আমি তার খবর রাখি না। শুনেছি তারা দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছে।

ইয়াকুব—আচ্ছা—সে ওয়ালীসাহেব আবদালীকে বুঝিয়ে দেবেন। আর—

আমিদ—আর?

ইয়াকুব—শাহ আবদালী নতুন সাদী করবেন। মুঘলানী তাকে বলেছে দিল্লীর হারেমে দুই শাহজাদী আছে—যাদের সুরতের মত সুরত—ইরান থেকে হিন্দোস্তানে আর নাই! এক মহম্মদ শাহের বেটী হজরত বেগম ,আর কে এক ফাকিরণী বেগম। তাদের দুজনকেই চাই।

আমিদ—পাবেন।

ইয়াকুব—শাহের বেটা শাহ তৈমুর সাদী করবেন, বাদশাহ আজিজুদ্দীন আলমগীরের বেটী গোহরউন্নেসাকে।

আমিদ—তাই হবে।

ইয়াকুব—তামাম পাঞ্জাব এলাকা—আফগানেস্তানের সরহদ্দির মধ্যে ভুক্তান হবে।

আমিদ—হবে। তাও হবে।

ইয়াকুব—আর টাকা—

আমিদ—টাকা আমার নাই ইয়াকুব আলি খাঁ।

ইয়াকুব—ভাল—টাকা তিনি এসে দিল্লীতে আদায় করে নেবেন।

আমিদ—দিল্লীর কাছে আদায় করুন—আমার আপত্তি নাই, আমার উপর জুলুম না হলেই হ'ল।

ইয়াকুব—মুঘলানীর বেটীকে সাদী করলে আপনাকে রক্ষা করবে মুঘলানী বেগম। শাহ আবদালী মুঘলানীকে বলে বেটী। ওয়াজির সাহেব—মুঘলানীই শাহকে দিল্লীর তামাম খবর জোগাচ্ছে।

[দূরে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল ডুগ-ডুগ-ডুগ।]

ইয়াকুব—(শব্দ লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তভাবে বলিল) ওয়াজির সাহাব—শাহ আবদালীর নাশাকচি আসছে। এক পাশে সরে আসুন। সরে আসুন। বড় ভয়ংকর ওরা।

[দু'জন নাশাকচি প্রবেশ করিল। নাশাকচি সেকালের মিলিটারী পুলিশ জাতীয় সিপাহী। একজনের কাঁধে একটা নাকাড়া। অপরজনের কাঁধে শিঙা জাতীয় একটা বাঁশী।]

নাশাকচি—(ঘোষণা করিতে করিতেই প্রবেশ করিল) পীর আলম, আল আমীন, দুরি দুরাণী, শাহ আহমদ আবদালী বাদশাকে হুকুমৎ জারী— । (প্রবেশ করিয়াই ইহাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)—কোন হ্যায় তু লোক? আ—! ইয়াকুব আলি সাহাব! ওয়াজির ওয়ালী খাঁ সাহাবের ভাই! আমি আপনাকে চিনি, বন্দেগী হুজুর। ইন লোক্?

ইয়াকুব—দুরি দুরাণী বাদশাহের তাঁবেদার সবাই। ইনি দিল্লীর শাহনশাহের ওয়াজির খানি খানান—আমিদুল মুল্ক—নজফর জঙ্গ।

নাশাকচি—আ! আচ্ছা! এই ওয়াজির আমিদুল মুল্ক! (হাসিল) মুঘলানী বেগমের হবু দামাদ! চলে যাও ওয়াজির সাহাব—আমাদের ওয়াজির সাহাবের আদমী ছাউনির বাইরে তোমার জন্যে খাড়া রয়েছে। জলদি যাও। ঘড়ি-ঘড়ি শাহ আবদালী হিন্দোস্তানের সুরুযের মত তেতে উঠছে। আরে ভাই বাজা নাকাড়া।

[ডুগ্-ডুগ শব্দে নাকাড়া বাজাইতে লাগিল।]

[ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ।]

নাশাকচি—এই ঘড়ি থেকে সারা শহর দিল্লী—তামাম মুলুক হিন্দোস্তানে শাহ আবদালীর এক্তিয়ার, বাদশাহী হক কায়েম হল।

[ডুগ-ডুক-ডুগ-ডুগ]

নাশাকচি—দিল্লী শহরওয়ালে—মুসলমান—কাফের—ফিরিঙ্গী—জেনানা, মর্দানা—

[প্রস্থান করিল।]

ইয়াকুব—আর দেরী করবেন না ওয়াজির আমিদুল মুল্ক।

আমিদ—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) চলুন খাঁ সাহেব। রেজা খাঁ—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ইয়াকুব—(সিপাহীকে) আরে সিপাহী, তুই ফিরে যা। ওয়ালী খাঁর তাঁবুতে আমরা বাঁচব, তোকে বাইরে মেরে ফেলবে। ফিরে যা তুই—

[তিনজনে প্রস্থান করিলেন।]

সিপাহীটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উর্ধ্ব-মুখে বলিল।—দিল্লী রোতি হ্যায়। এয় খোদা—দোয়া করো—দোয়া করো—মেহের-বা-ন!

[প্রস্থান করিল।]

[তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে অভিশম্পাত দিতে দিতে প্রবেশ করিল গন্না বেগম। সে আহত। কপাল হইতে রক্তের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পিছনে প্রবেশ করিলেন মিল্লাত এবং তাঁহার অনুচর আশরফ।]

গন্না—এয় খোদা, হে ঈশ্বর, হে বিচারক, তুমি আকাশ থেকে বিজলী হানো অত্যাচারীর মাথায়। আর ধ্বংস করো অক্ষম, অপদার্থ, ভীরু মুঘল বাদশাহ বংশকে। ভূমিকম্পে দিল্লীর কেল্লাটা ভেঙ্গে চুরমার করে ওদের চাপা দিয়ে দাও। কবরশাহী করো। কবরশাহী করো।

আশরফ—কেন মা মিথ্যা অভিসম্পাত দিচ্ছ? থামো, থামো।

গন্না—কেন? কেন থামব?

মিল্লাত—তুমি জখম হয়েছ বেটী—। তুমি অসুস্থ।

[গন্না কপালে হাত দিয়া রক্ত অনুভব করিয়া অন্ধকারের মধ্যেও হাতখানির রক্ত দেখিতে চেষ্টা করিল।]

আশরফ—কপালে তোমার চোট লেগেছে। কুঁইয়ার মধ্যে তুমি পড়ে গিয়েছিলে।

গন্না—পড়ে যাই নি, নিজেই আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম।

আশরফ—(সবিস্ময়ে) কেন? নিজে লাফিয়ে পড়েছিলে কেন?

মিল্লাত—বুঝতে পারছ না আশরফ—কোন অত্যাচারীর হাত থেকে ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে ঝাঁপ খেয়েছিল।

আশরফ—কে? এক জাঠ চাষী?

গন্না—জাঠ চাষী? না। বাদশাহের বাদাক-শাহী সিপাহী। আবদালী আসছে, লড়াইয়ের ভয়ে তারা কেল্লা থেকে পালাচ্ছে। পথে শহর লুঠছে, জেনানীর ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। দেব না অভিসম্পাত আমি? আমার মা—আর আমি দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম, পথে তারা আমাদের উপর পড়ল। মাকে খুন করলে। লুঠে নিলে আমাদের বয়েল গাড়ির সব কিছু জিনিস। আমি ছুটে গিয়ে কুঁইয়া দেখে তাতেই পড়লাম ঝাঁপ দিয়ে। আমার নসীব। কুঁইয়াতে জল ছিল না ছিল ঘাস আর ছিল আমারই মত ক'জন হতভাগিনীর শবদেহ। তাদের উপর পড়লাম, চোট খেলাম, মরণ হল না।

মিল্লাত—জন্ম-মৃত্যুর মালেক খোদাতয়লা বেটী। তুমি বেঁচেছ—সে তাঁর মর্জি।

গন্না—ঝুট! ঝুট! ঝুট! বিলকুল ঝুটা-বাত। আঃ। তোমরা আমাকে কেন বাঁচালে বল তো?

আশরফ—তুমি কুঁইয়ার ভিতর পড়ে আর্তনাদ করছিলে মা—

গন্না—আমার হোঁস ছিল না। হোঁস থাকলে মুখ টিপে পড়ে থাকতাম। যে মরণ হয় নি, সে মরণ হ'ত আমার শেষ রাত্রির শীতে। না হ'ত, আর কোন জেনানী আমার উপর লাফিয়ে পড়ত—আমি মরতাম। না খেয়ে শুকিয়ে, তিয়াসে ছাতি ফেটে আমি মরতাম। কেন তোমরা আমাকে তুললে? হায় পুণ্য-লোভী ফকীর! আমাকে বাঁচিয়ে সেই পুণ্যে তোমরা যাবে বেহেস্তে—আর আমার—আমার কি হবে—সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না।

মিল্লাত—না মা, তোমাকে বাঁচানোর পুণ্য আমাদের নয়। তোমায় বাঁচিয়েছে একজন জাঠ-জোয়ান, দেহাতি চাষী। সে আশীর্বাদ অভিসম্পাত কিছুই কামনা করে নি। তোমাকে আমাদের হাতে দিয়ে চলে গেল।

গন্না—আরে রে-রে—মেরি নসীব! বাঁচালে একটা চাষা। তার যেমন বুদ্ধি সে তেমনি করেছে। এখন আর একটা মরণের উপায় আমাকে বলে দিতে পার?

মিল্লাত—কেন? মরবে কেন মা? খোদা যখন তোমাকে বাঁচিয়েছেন, তখন বিশ্বাস কর তোমাকে দিয়ে তাঁর কাজ আছে।

গন্না—খোদা, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য এ সবে বিশ্বাস আমার ছুটে গিয়েছে ফকীর। তুমি জান না আমার পরিচয়—

মিল্লাত—তুমি কে মা?

গন্না—বলতে পারব না। জিজ্ঞাসা করো না।

[মাথার উপরে একটা প্যাঁচা ডাকিয়া গেল।]

আশরফ—প্যাঁচা ডেকে গেল আলি জাঁহা। ঠিক এই সময়ে ফকীরসাহেব হাজির থাকবেন রঙমহলের দরজায়। আর দেরী করবেন না।

গন্না—আলি জাঁহা? রঙমহল? কে আপনি জনাবালি? হতভাগ্য বাদশাহ বংশের কে আপনি?

মিল্লাত—পরিচয় দিলে কি চিনবে মা? বাদশাহ বংশ তো বহু-বিস্তৃত।

গন্না—বলুন আপনি। আমি চিনব।

মিল্লাত—শাহানশাহ আলমগীরের পুত্র কামবক্সের পৌত্র আমি।

গন্না—বন্দেগী জনাবালি। আপনি আলি-জাঁহা মহিউল মিল্লাত সাহেব। জনাব আলি, খোদাতয়লার কাছে আরজ জানাই—আপনাদের দুর্ভাগ্যের শেষ হোক। তৈমুরেশাহী বংশ পচে গেছে, খসে গেছে, এবার ধ্বংস হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাক।

মিল্লাত—(কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মা। তাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তুমি কে?

গন্না—আমি তরকাওয়ালী যমনা বাঈয়ের বেটী গন্না বেগম। রট্টা বাই।

মিল্লাত—তুমি—গন্না বেগম? কবি গন্না বেগম? কবি কুইলি খাঁর বেটী?

গন্না—হ্যাঁ—আবদালী আসছে, আমাকে বাঁদী করে পাঠাবে কন্দাহার। তার ঝাড়ুদারকে দেবে বকশিস। বুঝতে পারছেন আমার বুকের জ্বালা? কি অন্ধকার আমাকে গিলতে আসছে কল্পনা করতে পারেন? কেন আমি কুঁইয়ার ভিতর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম—বুঝতে পারছেন?

মিল্লাত—তুমি তোমার পিতৃবন্ধু নবাব বাঙগাশের কাছে যাবে মা?

গন্না—না। আমার বাবা মাকে ধর্মমতে সাদী করেন নি। আমি রইস সমাজে অচল। আর তাদের আমি বিশ্বাসও করি না।

মিল্লাত—তবে?

গন্না—আমাকে যমনা পার করে দিন। দেহাতে দেহাতে গরীবের ঘরে আশ্রয় চাইব। আর চীৎকার করে বলব, আবদালীকে তোরা খেদিয়ে দে। দিল্লীর বাদশাহের তোরা বিচার কর। আর খোদাকে ডেকে বলব—। না—খোদাকে ডাকব না। যে আগুন সে আমার নসীবে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই আগুন আমি মানুষের বুকে বুকে জ্বালিয়ে দোব। আমাকে যমনা পার করে দিন।

মিল্লাত—কিন্তু—তুমি এই আহত দেহে যাবে কি ক'রে?

গন্না—আবদালী এসেই আমাকে জানবারের মত বেঁধে কান্দাহার পাঠাবে; আহত দেহ বলে তো মানবে না। রেয়াত করবে না।

মিল্লাত—তুমি ঠিক বলেছ মা। অক্ষম বাদশাহী বংশ খতম হয়ে যাক্—শেষ হয়ে যাক।

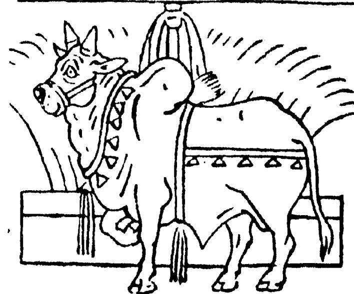
গন্না—(বলিয়াই চলিয়াছিল) তা ছাড়া—শক্তি আমার আছে। হাউই তো দেখেছেন জনাব। জ্বলতে জ্বলতে নিজেকে সে যত ক্ষয় করে, তত সে ছোটে। আমার বুকে আগুন জেবলেছে, সেই আগুনের পোড়ার জ্বালায় আমি ছুটব। আমি পারব।

[নেপথ্যে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল।]

মিল্লাত—এস মা—তাই এস।

[সকলে প্রস্থান করিল।]
নাকাড়া বাজিয়াই চলিল।

(ক্রমশ)



হার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



সেদিন সকালে কাজ করতে এসে আমাদের ঠিকে ঝি নন্দর মা আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলল, 'দেখুন তো বউদিদি, জিনিসটা খাঁটি কি-না। না-কি আবাগী সোনা ব'লে গিল্টি চালাল আমার কাছে।'

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে লাবণ্য হেসে বলল, 'তোমাকে ঠকাবে, এমন লোক সারা শহরে কেউ আছে নাকি নন্দর মা। বাঃ, বেশ জিনিসটি তো।'

দাড়ি কামাতে কামাতে স্ত্রীর হাতের দিকে আড়চোখে আমিও একটু চেয়ে দেখলাম। সরু একছড়া পেণ্ডেণ্ট হার। লাবণ্য বার বার ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

'একেবারে খাঁটি জিনিস। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিনলে নাকি নন্দর মা। কত পড়ল?'

আত্মপ্রসাদে নন্দর মা দাঁত বের করল, 'তা একরকম কেনাই বলতে পারেন বউদি। যত দেমাক আর বড়লোকীপনাই দেখাক, আর জাতের বড়াই করুক চক্কোত্তি বউয়ের সাধ্যি নেই তিরিশ টাকা দিয়ে এ হার ফের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তিন টাকায় একটা নতুন কলসী বাঁধা রেখেছিল। আজ চার মাস হয়ে গেল তাই ছাড়াতে পারল না।'

লাবণ্য বলল, 'তাহলে হারছড়া একরকম তোমারই হয়ে গেল কি বল নন্দর মা। আঁচলে বেঁধে আর কাজ কি। এখন থেকে গলায় পরে বেরিয়ো, বেশ দেখাবে।'

নন্দর মা লজ্জায় জিভ কেটে বলল, 'কি যে বলেন বউদি, হার পরবার বয়স কি আর আমার আছে, না-কি সেই ভাগ্যিই ক'রে এসেছি। যদি সুদিন পাই এ হার আমি আমার নন্দর বউকে পরাব। আশীর্বাদ করবেন বউদি,—'

লাবণ্য বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আশীর্বাদ করব বইকি। বেশ সুন্দর দেখে একটি বউ আনো ঘরে। তাকে মনের সাধে গয়নাগাঁটি পরাও। আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াও-টাওয়াও। কি বল? খাওয়াবে তো?'

লাবণ্য হাসল।

নন্দর মা বলল, 'সে ভাগ্যি কি আমার হবে বউদি?'

লাবণ্য বলল, 'হবে হবে। ভালো কথা, আজ কিন্তু এ-বেলাই কয়লা ভাঙতে হবে নন্দর মা। কয়লা একেবারে নেই।'

'আমাকে তা বলতে হবে না বউদি। আমি সব দেখে নিয়েছি। সব ক'রে দিয়ে তবে যাব।'

বলতে বলতে নন্দর মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে পিছনে গেল লাবণ্য, ওকে একটু সতর্ক ক'রে দিয়ে বলল, 'জিনিসটা ফের আঁচলে বাঁধলে? দামী জিনিস। একটু পুরোন হলেও এখনও শ' খানেক টাকার কম হবে না। শহর বন্দর জায়গা। একটু সাবধান-টাবধানে রেখ, বুঝলে?'

নন্দর মা-র গলা শুনতে পেলাম, 'সাবধানেই রেখেছি বউদি। আমার আঁচলে এর চেয়েও অনেক দামী জিনিস কতসময়ে থাকে। কোনদিন একটা পয়সা হারায় না। অত বেহুঁস মেয়েমানুষ নই বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'তা ঠিক। তোমার হুঁস খুব বেশি। আঁচলের গিঁট থেকে কিছু খোয়া যায় না। কেবল নন্দর হতভাগা বাপটাই গিঁট খুলে পালাল। আচ্ছা, সে বুঝি এখনও একবার খোঁজখবর নিতেও আসে না।'

নন্দর মা কয়লা ভাঙতে সুরু ক'রে বলল, 'তার এসে আর কাজ নেই বউদি। তার নামও আমি আর মুখে আনিনে। আমার নন্দ, কমলা বেঁচে থাকুক। আমার দেহ যতদিন আছে আর আপনারা পাঁচজন আছেন, ততদিন আমার ভাবনা কি বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'তাছাড়া নন্দর মত অমন ছেলেও হয় না। শুনেছি তোমার খুব বাধ্য।'

নন্দর মা সগর্বে বলল, 'বাধ্যের কথা কি বলছেন বউদি। এই একুশ বছর বয়স হোল, আমার মত না নিয়ে ঘরের একগাছা কুটো পর্যন্ত এদিক-ওদিক করে না। হাতে তুলে না দিলে কোন একটা জিনিস নিজে থেকে খাবে না—এমনি ছেলে। আমি এসব কাজ করি নন্দর মোটেই আর তা ইচ্ছা নয়, বুঝলেন বউদি। রোজ বারণ করে। বলে এখন ওসব ছেড়ে দাও মা। আমি ফ্যাক্টরী থেকে যা পাই তাতেই আমাদের চলে যাবে। আমি বলি আর একটু শক্ত হয়ে নে বাপু, তারপর আমাকে বসিয়ে খাওয়াস। বসে খাওয়ার দিন তো আমার সামনে পড়েই আছে। নাতি-নাতনী কোলে নিয়ে দিব্যি দিনরাত বসে বসে খাব। আর তোর বউ সংসারের সব কাজ করবে। বউয়ের হয়ে তুই-ই তখন কত ঝগড়া করবি।'

নন্দর মা-র এই ভবিষ্যৎ পারিবারিক চিত্র অত্যন্ত মধুর। কিন্তু মাধুর্যের আস্বাদনের জন্য লাবণ্যকে আমি বেশিক্ষণ ছেড়ে দিতে পারি না। সংসারে আরও অনেক কাজকর্ম আছে। আমি তাই স্ত্রীকে ডেকে ক্ষৌরী হবার সরঞ্জামগুলি ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললাম, 'আর বাজারের থলিটলি কি দেবে দাও। বসে বসে নন্দর গল্প শুনলেই তো আর দিন যাবে না। 'ভারি বক বক করতে পারে তোমার এই ঝিটি।'

লাবণ্য হেসে বলল, 'তা করুক। কিন্তু এমন কাজের লোক আর মেলে না। এত ঝি দেখলাম কিন্তু নন্দর মা-র মত কেউ না। ওকে কোন কাজ বলে দিতে হয় না, সব নিজে দেখে শুনে করে, আর বেশ পরিষ্কার কাজ।'

বললাম, 'আর বেশ পরিষ্কার জিভ।'

লাবণ্য হাসল, 'না গো না। ঝিদের জিভ তুমি আর কতটুকু দেখলে। ওদের যা মুখ হয়, সে তুলনায় তো আমাদের নন্দর মা বোবা। সত্যি, অমনিতে বেশ মুখ বুজে কাজ করে যায় শুধু ছেলের কথা উঠলে ওর আর কথা ফুরোতে চায় না। রাতদিন কেবল ছেলে আর ছেলে। হবে না? ছেলে ছাড়া সংসারে ওর আছে কি। বদমাস স্বামীটা অমন ক'রে ফাঁকি দিলে। ওই নন্দর দিকে তাকিয়েই তো ও বুক বেঁধেছে, এত খাটুনি খাটছে বুড়ো বয়সে।'

মাতা পুত্রের খবর স্ত্রীর কাছে এর আগেও শুনেছি। স্বামী প্রবঞ্চনা করবার পর নাবালক ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে নন্দর মা ভেসে যায়নি। বরং শক্তভাবে নিজের সংকল্পকে আঁকড়ে ধরেছে। বাড়ি বাড়ি ঝি গিরি করে কখনো বা চিঁড়া মুড়ি বিক্রি ক'রে নন্দ আর কমলাকে সে মানুষ করে তুলেছে। ছেলে মেয়েরাও বাপের পরিচয় কাউকে দেয় না একমাত্র মাকেই চেনে। তাকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। বাপের কথা উঠলে তারা নাক সিঁটকায়। কখনো সখনো হরলাল তাদের খোজ-খবর নিতে এলেও তারা তার সামনে যায় না, কথা বলে না, বাবা বলে ডাকে না। সবই নন্দর মার শিক্ষা। হরলাল সুন্দরী মেয়েমানুষ চেয়েছিল থাকুক সেই মেয়েমানুষ নিয়ে। সন্তানে তার দরকার কি। সন্তানের কিছু সে পাবে না। মায়ামমতা ভালোবাসা ভক্তিশ্রদ্ধা কিচ্ছু নয়। শুধু মরে গেলে নন্দর মা পিণ্ডি দেওয়ার অনুমতি দেবে নন্দকে। কিন্তু যতদিন বেঁচে অছে ততদিন একটা কাণাকড়িও যেন হরলাল প্রত্যাশা করে না। মেয়ের বয়স বার পেরুতে না পেরুতে শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম জোয়ান ছেলে দেখে নন্দর মা তার বিয়ে দিয়েছে। ছেলেকেও স্কুলে দিয়েছিল। কিন্তু মা সরস্বতী তো আর সকলের দিকে মুখ তুলে চান না। তা না চাইলেন। সে জন্য নন্দর মার দুঃখ নেই। কোন দুষ্টা সরস্বতী তো তার ঘাড়ে চাপে নি। তাই ঢের। এত বয়স হয়েছে কিন্তু সামান্য বিড়িটা আরটা ছাড়া নন্দর কোনরকম নেশা ভাং নেই কোনরকম বদ খেয়াল নেই। মা ছাড়া অন কোন মেয়েছেলের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না। কে বলবে ও হরলাল দাসের ছেলে। কেউ তা বলুক নন্দর মা তা চায়ও না এ সবও তারই শিক্ষা। নন্দর মা ছেলেকে উঠতে বসতে শিখিয়েছে মেয়েমানুষের মত সংসারে অনাসৃষ্টি আর দুটি নেই। ওর পুরুষের কত যে ক্ষতি করতে পারে তা তে নিজের বাপকে দেখেই শিখতে পারে নন্দ সমাজ গেল, সংসার গেল, অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা স্ত্রী এমন কি নিজের রক্তের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত ভেসে গেল আর কারেতে ছেলে হয়ে একটা নাপতিনীকে নিয়ে কিন সারা জীবন মেতে রইল হরলাল। নন্দ যে আগে থেকেই সাবধান হয়। কোন দিন যে ছায়াও না মাড়ায় মেয়েমানুষের।

'তবে যে অত বিয়ের জন্য তাগিদ দিচ মা।'

নন্দ একদিন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল।

নন্দর মা বলেছিল, ওমা পুরুষ ছেলে বিয়ে করবি না, বউ ঘরে আনবি না? বিয়ে করা বউ হোল ঘরের লক্ষ্মী, তারা পুরুষের ক্ষতি করে না, ধর্মে কর্মে সহায় হয়।

নন্দ একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলে ছিল 'ও ঘরের সুধাবউদিওতো হরিপদদার বিয়ে করা বউ। ঘরের লক্ষ্মী। তবু যে হরিপদদা তাকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না বলে অপয়া অলক্ষ্মী ও এসে আমার সংসারে সব খুইয়েছে। তুমি ও তো তাই বল বউটা লক্ষ্মীছাড়া।'

নন্দের গলায় একটু সহানুভূতি আমেজ লেগে থাকবে। নন্দর মা তা ভালো লাগেনি। সে বলেছি 'বলিই তো, একশবার বলি। অলক্ষ্মী ছা কি। ও ঘরে আসার পর থেকে ছেলেটা হাঁড়িতে আর কালি পড়ল না। এ চাক ছেড়ে সে চাকরি, সে চাকরি ছেড়ে ও চাক আজ ক' বছর ধরে এই তো করছে। কে নাই নাই খাই খাই রব। আর কেবল ঘ জিনিস বাঁধা দিয়ে খাওয়া। অলক্ষ্মী ছা কি। কেবল গায়ের চামড়াটাই সাদা, ছাড়া আর কোন্ গুণ আছে ওর।'

নন্দ মৃদু প্রতিবাদ করেছিল 'যাই বল ওপর থেকে কিন্তু তা মনে হয় না। অভাব অনটন, তবু কেমন হাসিখুসি, মিষ্টি কথাবার্তা। আমার এক বন্ধু সে এসেছিল বেড়াতে। তুমি তো ছিলে না। স

বউদিই চা টা করে দিল। অমূল্যে তো ভারি খুশি। খাওয়ার সময় বলল কি জানো একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা।'

নন্দর মা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'থাক থাক, আর লক্ষ্মী লক্ষ্মী করতে হবে না। যার ঘরের লক্ষ্মী তার ঘরের লক্ষ্মী। এক ঘরের লক্ষ্মী আর এক ঘরে এসে অনর্থ ঘটায়। ওর সঙ্গে তোর অত মেশামেশি ক'রে দরকার কি।'

নন্দও মৃদু প্রতিবাদ করেছিল 'কি যে বল, কারো সঙ্গে মেশামেশি করবার সময় কই আমার।'

তা ঠিক। সময় নেই নন্দর। বেলা আটটা বাজতে না বাজতে খেয়ে দেয়ে ইণ্টালীর এক এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে গিয়ে ঢোকে আর বেরিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে যায়। সর্বদিন সোজা বাসায় আসে না। ওর বন্ধু অমূল্যদের বাসায় গিয়ে গল্পটল্প করে। অমূল্যও কাজ করে ওই ফ্যাক্টরীতে। মোটেই মিশুকে ছেলে নয় নন্দ। এ বয়সে যত ইয়ার বন্ধু ছেলেদের থাকার কথা তা ওর মোটেই নেই। নন্দর মার ধারণা ওই বউটাই মন্দ। সেই ফাঁক পেলে যেচে যেচে আলাপ করতে আসে তার ছেলের সঙ্গে। চাটুকু দিয়ে পানটুকু দিয়ে সোহাগ দেখায়। নিজের স্বামী রোগা-পটকা বাউণ্ডুলে হতচ্ছাড়া বলে তার সবল স্বাস্থ্যবান ছেলের দিকে মাগীর চোখ পড়েছে। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিয়ে ওর চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবে নন্দর মা। সুধা দিন রাত হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে সেই হবে ওর যোগ্য শাস্তি। নন্দর মা ছেলেকে আশ্বাস দিয়েছে 'তোর বন্ধুর চোখ নেই। ওই ধুমসী মাগীকে লক্ষ্মী প্রতিমা বলে না। আসল লক্ষ্মী আমি ঘরে এনে তোদের দেখাব। দুটো দিন সবুর কর। সুন্দরী মেয়ের সন্ধানে লোক লাগিয়েছি আমি।'

লাবণ্য এ কাহিনী বিবৃত ক'রে আমাকে সেদিন হেসে বলেছিল 'সুধার ওপর নন্দর মার ভারি রাগ।'

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'রাগ তো হতেই পারে।'

আর একদিন লাবণ্য বলল জানো আজ কমলা এসেছিল বেড়াতে।'

বললাম 'কমলা আবার কে।'

লাবণ্য বলল 'অবাক করলে। কমলা নন্দের বোন। তিন তিনটি ছেলে মেয়ে হয়ে দিব্যি গিন্নীবান্নীর মত চেহারা হয়েছে। ঝির মেয়ে বলে মনেই হয় না। স্বামী ভালো কাজকর্ম করে কিনা বেশ সুখেই আছে। দু' দিনের জন্য এসেছে মার কাছে।'

বললাম 'ভালোই তো।'

লাবণ্য বলল 'ওর কাছেও সুধার অনেক খবর শুনলাম।'

বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম, 'তাই নাকি।'

লাবণ্য বলল, 'হ্যাঁ। দেখ আগে আমার ধারণা ছিল বউটা সত্যিই বুঝি নন্দকে গোপনে গোপনে ভালোবাসে। আসলে কিন্তু তা নয়।'

বললাম 'আসল ব্যাপারটা তা হলে কি।'

লাবণ্য বলল 'ওর ঘরের অনেক জিনিস-পত্রই তো নন্দর মার ঘরে বাঁধা কিনা, সেই সব জিনিসের মায়াতেই আসে। পরের ঘরে বাঁধা রাখা নিজের জিনিস যেন চোখে দেখে হাতে ছুঁয়েও সুখ। জিনিসের উপর ভারি মায়া বউটার।'

বললাম 'কেবল ও বউটার কেন সব বউয়েরই তাই। মায়া তোমারই বা কোন্ জিনিসে কম।'

লাবণ্য বলল 'আহাহা কথায় কথায় কেবল আমার তুলনা। কিন্তু যাই বল আমি সুধার মত অমন নির্লজ্জ হ'তে পারতাম না।'

বললাম 'কেন, নির্লজ্জতার কি হোল।'

লাবণ্য তখন সব ঘটনা খুলে বলল। সুধা নির্লজ্জ বইকি। নিজের জিনিস বাঁধা দিলে কি বিক্রি করলে তা যে আর নিজের থাকে না তা কে না জানে। কিন্তু সুধা তা বুঝতে চায় না। সে দিন বুঝি বড় ঘটিটা মেজে এনে একটু শব্দ ক'রেই সেটাকে মেঝের ওপর রেখেছিল কমলা। তাই শুনে পাশের ঘর থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসেছিল সুধা। তার সে কি মুখ 'জিনিস বাঁধা রেখেছি বলে ভেঙে চুরে ছত্রখান ক'রে ফেলতে তো আর দিইনি কমলা। আমার জিনিসের ক্ষতি হলে ভালো হবে না কিন্তু; কমলাও যে সে মেয়ে নয়, সেও মুখের উপর জবাব দিয়েছে, 'জিনিসতো আগে খালাস কর, তারপর ওসব কথা বলতে এসো। কই দু'মাস ধ'রে ঘটিটা পড়ে রয়েছে পারলে তো না ছাড়িয়ে নিতে, কি দুটো পয়সা মাকে সুদ দিতে। ছাড়াবার দরকারও তো নেই। কাজ পড়লে অমনি আমাদের ঘরের জিনিস ধ'রে টান দাও। এমন বাঁধা বিক্রিতে মজা মন্দ নয়।'

সুধা আর কোন জবাব দেয়নি।

'কিন্তু শুধু ওকে দোষ দিলে কি হবে, আমার নিজের দাদাটির পর্যন্ত ওই সব ঘটি বাটির মধ্যে প্রাণ।'

কমলা মুখ টিপে হেসেছিল।

লাবণ্যও না হেসে পারে নি, 'তাই নাকি? কি রকম?

কমলা জবাব দিয়েছিল, 'ওদের ঘরের বাঁধা রাখা কোন জিনিসের বিন্দুমাত্র হেনস্থা সহ্য করতে পারে না দাদা। ঘটিটায় কলসীটায় কোন সময় যদি একটু ঠোক্কর লাগল, দাদার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ে। মুখ কালো হয়ে যায়। বলে পরের জিনিস একটু সাবধানে নাড়তে চাড়তে পারিস নে? তা ছ... ওসব জিনিস আমাদের ব্যবহার করবার দরকারই বা কি। তুলে রাখলেই হয়। কমলাও ছাড়বার পাত্রী নয়, বলে তুলেই রাখতাম দাদা। কিন্তু এ ঘটির জল খেলে প্রাণ যত ঠাণ্ডা হয়, আর কোন ঘটির জলে তেমন হয় না। শুনে কমলার দাদা গম্ভীর হয়ে থাকে। বললাম আর হরিপদ? এ সব শুনে সেও কি শুধু গম্ভীর হয়েই থাকে নাকি? কিছু বলে না?'

লাবণ্য বলল, 'বলবেনা কেন? সে সব চেয়ে সেয়ানা। সে চোরকে বলে চুরি করতে গৃহস্থকে বলে জেগে থাকতে। নন্দর সঙ্গে কথা বলার জন্য বউকে শাসায় আবার দরকার পড়লে আড়ালে আবডালে ওই নন্দর কাছেই হাত পাতে। দিব্যি হেসে বলে তোমাদের সম্পর্ক তো দেওর বউদির মত। একটু রঙ্গ রসিকতা করলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাকি। তবে মেয়ে মানুষকে আস্কারা দিতে নেই। ওদের সিধে রাখতে হলে নরম গরম সব-রকমই চল রাখতে হয়, বুঝলে ভায়া? দাও দেখি গোটা তিনেক টাকা। সামনের সোমবার ঠিক দিয়ে দেব। কথার নড়চড় হবে না।'

বললাম ' এ সব তুমি পেলে কোথায়? নন্দ কি এ সব কথাও কমলাকে বলেছে নাকি?'

লাবণ্য বলল, 'রাম বলো। নন্দ তেমন মানুষই নয়। কমলাই আড়াল থেকে সব শুনেছে, স্বচক্ষে দেখেছে।'

বললাম, 'যাই বল নন্দর এবার বিয়ে দেওয়া উচিত।'

লাবণ্য বলল, 'নন্দর মাও তো মেয়ে খুঁজছে। কিন্তু পছন্দ মত মেয়ে নাকি মিলছে না। নন্দর মা আর বোনের যদি বা পছন্দ হয়, নন্দর নাকি মোটেই পছন্দ হয় না।'

লাবণ্য একটু হাসলো।

বললাম, 'ভারি ভাবনার কথা তো।'

মাস তিনেক বাদে কি একটা বই পড়ছিলাম, বাইরের গোলমালে শান্তিভঙ্গ হোল। কান পেতে শুনলাম লাবণ্যের সঙ্গে নন্দর মা কি নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। স্ত্রীকে ডেকে বললাম 'দেখ, ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে অনর্থক নিজের গলা খারাপ কর কেন, পোষায় রাখ, না পোষায় ছাড়িয়ে দাও।'

লাবণ্য বলল, 'তাই ছাড়াতে হবে, আজ-কাল বড় খিটখিটে হয়েছে আর কেবল মুখে মুখে তর্ক করে। আগে এমন ছিল না।'

বললাম, 'ওদের মুখ আর মেজাজ খারাপ হবে তা আর বিচিত্র কি। তিন বাড়ি না চার বাড়ি কাজ করে—'

লাবণ্য বাধা দিয়ে বলল, 'তা তো আগেও করত। কিন্তু আজকাল ওর স্বভাবই যেন কেমন হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে এসে একথা সে কথার পর লাবণ্য হঠাৎ বলল, 'দেখ একটা কাজ ক'রে বসেছি। নন্দর মা এমন ক'রে ধরে পড়ল যে, কিছুতেই আর না করতে পারলাম না।'

বললাম, 'ভূমিকা রেখে ব্যাপারটা বল।'

ব্যাপার আর কিছুই নয়, নন্দর মা তার সেই বন্ধকী হারছড়া লাবণ্যের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। ও হার নিজের বাড়িতে রাখতে তার নাকি আর সাহস নেই। লাবণ্য কিছুতেই রাখতে চায়নি, কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতি ক'রে নন্দর মা লাবণ্যকে হারগাছা গছিয়ে গেছে। এই হার নিয়ে ছেলের সংগে কদিন ধরেই কথান্তর চলছে, সেইজন্যই নন্দর মার মন মেজাজ ভালো ছিল না, সকাল বেলা লাবণ্যের সংগে অমন তর্ক করেছিল। লাবণ্য যেন তা মনে না রাখে নিজগুণে যেন সব ক্ষমা করে।

বললাম, 'তোমার অগাধ গুণের কথা না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু ব্যাপারখানা কি, হার নিয়ে নন্দই বা অমন হঠাৎ মেতে উঠল কেন।'

লাবণ্য বলল, 'সে নিজে কি আর মেতে উঠেছে, তাকে মাতিয়ে তুলেছে যে।"

সমস্ত ঘটনাই খুঁটে খুঁটে নন্দর মার কাছ থেকে লাবণ্য শুনেছে, কিন্তু আমাকে না শোনান পর্যন্ত তার পুরোপুরি তৃপ্তি নেই।'

সব দোষ ওই সুধার। দিন কয়েক আগে নন্দর মা বুঝি কমলার সংগে বলাবলি করছিল নন্দ যাই বলুক গোবরার ওই ফটিক দাসের মেয়েটির সংগেই তার বিয়ে দেবে। মেয়েটি বেশ লক্ষ্মীমন্ত। পাকা কথা দিয়ে দিন ক্ষণ শিগগিরই ঠিক ক'রে আসবে নন্দর মা। কিন্তু আসবে তো এদিকে খরচ যে কি ক'রে কুলোবে তা তো নন্দর মা ঠিক করতে পারছে না। হাতে যা ছিল, সবই তো পরকে ধার দিয়ে রেখেছে। আর মানুষেরও এমন আক্কেল, নেওয়ার বেলায় কাক পক্ষীর মত উড়ে আসে, কিন্তু দেওয়ার বেলায় ছ'মাসের মধ্যেও একটি পয়সা হাত উপুড় করবার লক্ষণ নেই। অথচ নতুন বউয়ের মুখ তো কিছু দিয়ে দেখতেই হবে। যে হারছড়া আছে ওইগাছাই কর্মকারের দোকানে দিয়ে নতুন করে পালিস করিয়ে নেবে নন্দর মা। ওই দিয়েই মুখ দেখবে বউয়ের।

কমলা বলেছিল, 'সেকি মা ও হারতো ও ঘরের সুধা বউদির। শেষে যদি সে এসে গোলমাল করে।'

নন্দর মা বলেছিল 'ঈস, গোলমাল করলেই হোল। জিনিস বন্ধক দিয়ে ফিরিয়ে না নিলে কতকাল আর তা নিজের থাকে লো। দু' মাসের কড়ারে টাকা ধার নিয়ে আজ চার চার মাস হয়ে গেল মাগী একটা পয়সা আমার হাতে ছোঁয়ালে না। আমার টাকার দাম নেই? মুখে রক্ত তুলে টাকা রোজগার করতে হয় না আমাকে? নাকি লোকে টাকা আমাকে মুখ দেখে দেয়? তুই দেখে নিস কমলি, এই হার যদি দু'চার দিনের মধ্যে ও ছাড়িয়ে না নেয়, দরকারের সময় আমি আমার টাকা ফেরৎ না পাই তা হলে এ হারও সে কোনদিন পাবে না।'

কমলা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, 'আস্তে, আস্তে। সুধা বউদি বোধ হয় বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে।'

নন্দর মা বলেছিল, 'আড়ালে কেন, বুকের পাটা থাকে সামনে এসে দাঁড়াক না। আমি যা বলবার মুখের ওপরই বলব। ভয় করি নাকি কাউকে। হার যদি ও দু'দিনের মধ্যে না ছাড়িয়ে নেয় এই দিয়ে আমি ছেলের বউয়ের মুখ দেখব। আমার ছেলের বউ এই হার পরে ওর চোখের সুমুখ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে তাই দেখব আমি।'

আশ্চর্য, তৃতীয় দিনেই সুধা দশটাকার তিনখানা নোট আর একটা কাঁচা রুপোর টাকা নিয়ে এসে হাজির, 'আমার হারছড়া এবার ফিরিয়ে দাও মাসী।'

নন্দর মা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'রাত পোহাতে না পোহাতে তুমি এত টাকা পেলে কোথায় বউ। দশটাকা ঘরভাড়া দিতে পারনি বলে কাল রাত্রেও বাড়িওয়ালা তোমাদের কতকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। তাই নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তোমাদের সারারাত ঝগড়া। দুদণ্ড সুস্থ হয়ে ঘুমোতে পারিনি। আর আজ ভোর হতে না হ'তে এত টাকা তুমি কোথায় পেলে।'

সুধা জবাব দিয়েছিল 'অত কথায় তোমার কাজ কি মাসী। জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছ। তোমার টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার জিনিস আমাকে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক।'

নন্দর মা রুক্ষস্বরে বলেছিল, 'ল্যাঠা অত সহজে চোকে না বউ। এর মধ্যে তোমার অনেক কারসাজি আছে। এবার সব বুঝতে পারছি আমি। অন্যবার নন্দর কাছে টাকা চাইতে হয় না, মাইনে পেয়েই আমার হাতে দেয়। এবার একদিন গেল, দু'দিন গেল, টাকা আর দেয় না। শেষে নিজেই বললাম, নন্দ মাইনে পাস নি, আজ সাত তারিখ হয়ে গেল মাসের। ছেলে বলল, পেয়েছি মা। হেসে বললাম একেবারে বউয়ের হাতে দিবি বলেই বুঝি জমিয়ে রেখেছিস। মার হাতে দিতে আর ইচ্ছা করে না। এত কথা বলবার পর নন্দ টাকা এনে হাতে দিল। দেখি তিরিশ টাকা কম। জিজ্ঞেস করলাম টাকা এত কম কেনরে। ছেলে বলল, এক বন্ধুর বিপদে ধার দিতে হয়েছে মা, কদিন বাদেই শোধ দেবে। তিরিশ তিরিশটে টাকাই ধার। ভাবলাম হবেও বা। এখন সে বুঝতে পারছি বিপদটা কিসের আর তার সেই পরম বন্ধুটিই বা কে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখ তেরছা করে নন্দর মা সুধার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টি সুধা সহ্য করতে পারে নি। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পর মুহূর্তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নন্দর মার দয়া হয় নি, লজ্জিত অপমানিত থেকে সুধার দিকে তাকিয়ে সে ফের চেঁচিয়ে উঠেছিল—'পাবি নে, ও হার তুই কিছুতেই পাবিনে। আমার ছেলের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে আমার দেনা শোধ করতে এসেছিস, লজ্জা করে না? দে, টাকা দে, আমার ছেলের টাকা ফিরিয়ে দে শিগগির।'

টাকা জোর করে কেড়ে নিতে গিয়েছিল নন্দর মা; কিন্তু সুধা তাকে টাকা দেয় নি, বলেছিল, 'আমার হার ফিরিয়ে না দিলে এ টাকা আমি দেব না।'

বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল সুধা। কিন্তু সেখানে যে হরিপদ ওৎ পেতে বসে আছে, তা তার নজরে পড়ে নি।

ঘরে ঢুকবার সংগে সংগে হরিপদ তাকে সাদরে জাপ্টে ধরেছিল 'বলি ও সতীলক্ষ্মী, এত টাকা রোজগার করেছ, আর নাকি তোমার হাতে টাকা নেই! দাও দাও, কিছু ভাগ দাও, কিছু ভাগ দাও। আরে এখন না হয় ফেলনা গেছি, কিন্তু মন্তর পড়ে বিয়ে তো আমিই করেছিলাম। স্বামী সেজে এখনও চারদিক আগলে কুল-মান লাজ-লজ্জা সব রক্ষা করছি, আমার ন্যায্য পাওনাটা দেবে না আমাকে?'

সুধার হাত থেকে কুড়ি টাকা ছিনিয়ে নিয়ে হরিপদ সেই যে চলে গিয়েছিল, সারা দিনরাত আর বাড়ি-মুখো হয় নি।

কিন্তু নন্দ বাসায় ফিরেছিল সন্ধ্যার পরই, আর সংগে সংগে তার মা তাকে পাকড়াও করেছিল, 'হ্যাঁরে নন্দা, এই নাকি সব কাণ্ড হচ্ছে আজকাল?'

ধরা পড়বার পর নন্দ সবই স্বীকার করেছে। সুধা বউদিকে সে ধার দিয়েছে তিরিশ টাকা। মা যেন তার হার তাকে ফেরৎ দেয়। পরের জিনিস ঘরে রাখবার তারই বা এত লোভ কেন?

নন্দর মা বলেছে, টাকা সে ফেরৎ পায় নি। সুতরাং ও হার ন্যায্যত এখনও তারই। ছেলের বউ এলে এ হার নন্দর মা তাকে প্রথমে পরাবে। তারপর সে হার নিয়ে নন্দ যা খুসি তাই করুক, সোহাগ ক'রে পরের বউয়ের গলায় দিক কিংবা বাজারের বেশ্যাকে পরিয়ে আসুক, নন্দর মা তা দেখতেও যাবে না।

নন্দ তবু জিজ্ঞেস করেছে, 'কই সে হার?'

নন্দর মা জবাব দিয়েছে সে হার তার কাছে নেই, অন্য লোকের কাছে রেখেছে।

বুদ্ধিটা সেই কালই মাথায় খেলেছে নন্দর মার। লাবণ্যের কাছে আজ হার রাখতে এসে নন্দর মা তাকে পই পই ক'রে নিষেধ ক'রে গেছে তাকে ছাড়া এ হার যেন লাবণ্য আর কাউকে না দেয়। নন্দর মার নিজের বাপ এলেও নয়।

'তোমার বাবা এখনও আছে না কি?'

লাবণ্য জিজ্ঞেস করেছিল।

নন্দর মা বলেছিল, 'না নেই, কিন্তু আমার সেই মরা বাপ যদি শ্মশান থেকে উঠে এসে হার চায়, তবু তাকে দেবেন না বউদি, আমার দিব্যি রইল।'

নন্দর মার মরা বাপ অবশ্য হার চাইতে এল না, এল তার তাজা জোয়ান ছেলে। রবিবার। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে হুড়কো খুললাম। এই অসময়ে কে এল আবার, দেখি লম্বা-চওড়া একুশ-বাইশ বছরের এক যুবক। রঙ শ্যামবর্ণ, কিন্তু বেশ সুপুরুষ। মাথার চুল কোঁকড়ানো, টানা টানা নাক চোখ, পাতলা ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁৎভাবে কামানো। পরনে ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়ে নতুন সাদা স্ট্রাইপের স্যান্ডাল।

বললাম, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো?'

ছেলেটি একটু হাসল—'আমার নাম নন্দলাল দাস। আমার মা আপনাদের বাড়িতে—'

বললাম, 'ও, তা তোমার মা তো এখন নেই। সে তো এখানে সকালে আর সন্ধ্যায় কাজ করতে আসে।'

নন্দ বলল, 'তা জানি। আমি তার খোঁজে আসিনি। আপনাদের সঙ্গে অন্য কথা আছে।'

বললাম, 'কথা আছে? বেশ তো ভিতরে এসো।'

ঘরে এসে বসবার জন্য ওর দিকে টুলটা এগিয়ে দিলাম। একটু বাদে কৌতূহলী লাবণ্যও এক পাশে এসে দাঁড়াল। ওর চোখ হাতের বোনা জাম্পারের দিকে, কান আমাদের কথাবার্তায়।

নন্দ বেশি ভূমিকা করল না, একটু ইতস্তত করে বলল, 'দেখুন আমি কমলার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়েছি। মা রাগ করে হারছড়া আপনাদের কাছেই রেখে গেছে, জিনিসটা আমাকে দিয়ে দিন।'

বললাম, 'তার উপায় নেই নন্দ, এ জিনিস আমরা যার কাছ থেকে পেয়েছি, তার হাতেই দেব। তোমার মার মত ছাড়া এ হার তোমাকে দিতে পারি নে।'

নন্দ একটু রুষ্ট ভঙ্গীতে বলল, 'পারেন না? কিন্তু এ হার তো মার নয়। এ যার হার; সে টাকা নিয়ে সাধাসাধি করছে। তবু দেবেন না? বেশ আমি দিচ্ছি টাকা।'

এবার আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললাম, 'তুমি ভুল করছ নন্দ। আমরা টাকা দিয়ে তোমার মার কাছ থেকে হার বন্ধক রাখি নি। তোমার মা অমনিই বিশ্বাস করে তার জিনিস আমাদের কাছে রেখে গেছে। বেশ, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। সে যদি বলে, তার হার এক্ষুনি দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।' বলে নন্দ উঠে পড়ল। তার ভাবে-ভঙ্গীতে মনের রাগ গোপন রইল না।

সন্ধ্যার একটু আগে আগে কাজে এল নন্দর মা। লাবণ্য বলল, 'একেবারে বেলা শেষ করে এলে, তা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু তোমার হার তুমি নিয়ে যাও বাছা। তুমি আমার কাছে জিনিস রেখে যাবে, আর তোমার ছেলে এসে সেই জিনিস দাবী করবে, এত ঝামেলা-ঝক্কি পোহাবার সময় আমাদের নেই নন্দর মা। তার চেয়ে তোমার হার তুমি নিজের কাছে নিয়ে রাখ সেই ভালো।'

নন্দর মা বলল, 'ও এসেছিল বুঝি হার নিতে? আসবে, তা আমি জানতাম। লাজ-লজ্জা বলতে ওর কিছু নেই। সব সেই মাগীর পায়ে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু আপনার ভাবনা নেই বউদি। আর ও আসবে না, আজ আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এক বাড়ি লোকের সামনে ওকে শাসন করেছি। যদি বাপের জন্ম হয়, তবে আর হারের জন্য কোনদিন এ-মুখো হবে না।'

শাসনের কথাটাও নন্দর মা সবিস্তারে বলল লাবণ্যকে। এক বস্তী লোকের মধ্যে গলা ছেড়ে নন্দর মা ধমকেছে ছেলেকে। হরিপদর ওই বাঁজা বউটাই যে তার ছেলের মাথা খেয়েছে, তা সবাইকে ডেকে শুনিয়েছে নন্দর মা। যত সব ফিস ফিস গুজ গুজ ওই বউটার সঙ্গে। তার জন্য নন্দ টাকা খরচ করে। সাবান, স্নো থেকে শুরু করে শাড়ি, গয়না পর্যন্ত জোগায়। এদিকে মা পরের বাড়িতে ঝিগিরি করে মরে, তার জন্য একটু হা-হুতাশ নেই ছেলের। নন্দর মা ভালো করতে চাইলে হবে কি! যে মানুষের রক্তে জন্মেছে, তেমন তো হবে। সব সেই রক্তের দোষ। এর পর অসহায়ভাবে সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছে নন্দর মা। সে আর পারে না। তার আর সাধ্য নেই। সে বলে বলে হয়রান হয়ে গেল। এবার দশজনে ভার নিক। দশজনে মিলে শুধরে দিক তার ছেলেকে, তার দেহের বদ-রক্ত সব বের করে ফেলুক। শুনে বস্তীর কেউ কেউ হেসেছে, কেউ বা নন্দর মাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, সত্যিই তো ভদ্দরলোকের বাড়ির মধ্যে এসব কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড! ফের যদি নন্দর কোন বেচাল দেখে তারা, তার হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়বে।

পরদিন সকালে কাজে এল নন্দর মা। মেজাজ তেমনি বিগড়ানো। বকুনি খেয়ে সেই যে ছেলে সন্ধ্যায় বেরিয়েছে, আর সারারাতের মধ্যে ফেরে নি। ভোরেও আসে নি ঘরে।

নন্দর মা নিজেই বলল, 'না এসে যাবে কোন্ চুলোয়। ফ্যাক্টরীতে বেরুতে হবে না? গিলতে হবে না পিণ্ডি?'

ছেলের 'পিণ্ডির' ব্যবস্থা করবার জন্যই যেন নন্দর মা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আগে আগে বিদায় নিল। বাটনাটুকু পর্যন্ত ক'রে দিয়ে গেল না—বলল, 'যা আছে তাই দিয়েই এবেলা চালিয়ে নিন বউদি, ওবেলা এসে সব করব। যাই, সময়মত ভাত না পেলে বাবু আবার কুরুক্ষেত্র বাধাবে, ওবেলা সকাল সকালই আসব।'

কিন্তু আমি অফিস থেকে ফিরলাম, সন্ধ্যা উৎরে গেল। তবু নন্দর মা কাজে এল না। লাবণ্য নিজেই সব সারতে সারতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, ওকে দিয়ে আর চলল না দেখছি। মায়ে-ছেলে ঝগড়া করবে, আর আমার কাজে করবে কামাই। এবার আসুক, আচ্ছা করে বলে দেব।'

পাশের ডাক্তার বাড়িতেও নন্দর মা কাজ করে। উনুনে তরকারি চাপিয়ে লাবণ্য এক সময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'নন্দর মা এবেলা আপনাদের বাড়িতে কাজে এসেছিল দিদি? বলা নেই, কওয়া নেই, দেখুন তো, হঠাৎ এমন কামাই করলে কি চলে? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর জন্য বসেছিলাম।'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও তাঁর জানলায় এসে দাঁড়ালেন, 'ও মা, তুমি কিচ্ছু শোন নি? তুমি ছিলে কোথায় এতক্ষণ?'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন কি হয়েছে?'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আর যা হবার তা হয়ে গেছে। নন্দ বিষ খেয়েছে। উনি খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। নন্দর মা ওঁর পা ধরে কত কান্নাকাটি না করেছে। বলে, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন। আমার যা আছে সব দেব। এসব কথা শুনে ঠিক থাকা যায় না লাবণ্য। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল; কিন্তু হলে হবে কি। এ তো যে সে জিনিস নয়—একেবারে পটাসিয়াম সায়ানাইড। সাক্ষাৎ যম। বিষ অবশ্য হাসপাতালে বের করে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণবায়ুও বেরিয়ে এসেছে। এই সন্ধ্যার একটু আগে সব শেষ হয়ে গেছে।'

দুজনে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। লাবণ্যের কড়া থেকে তরকারির পোড়া গন্ধ এ ঘরে ভেসে এল।

দিন দুইর মধ্যে আর কারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। না নন্দর মা—না কমলা—কেউ আর এ-মুখো হোল না।

লাবণ্য বলল, 'ঠিকানা আমার কাছে আছে। তুমি একবার যাও।'

বললাম, 'গিয়ে আর কি করব।'

লাবণ্য বলল, 'ওদের জিনিসটাও তো আছে আমার কাছে। কাজ না করুক, সেটা তো নেবে।'

বললাম, 'রেখে দাও, যখন দরকার হয় এসে নেবেই।'

দরকার তার পরদিনই হোল। সকালবেলায় এসে হাজির হোল নন্দর মা। ওর দিকে আর তাকানো যায় না। এই ক'দিনে বয়স যেন আরো দশ-পনের বছর বেড়ে গেছে। আগে ওর চুল এত পাকা ছিল না। দুটো গাল তোবড়ানো, ঘোলাটে চোখ দুটো গর্তে ঢুকেছে। ময়লা শাড়িখানা নানা জায়গায় ছেঁড়া। গা'রও এখানে-ওখানে ছড়ে গেছে।

লাবণ্য ওর চেহারা দেখে বলল, 'আজকে আর তোমার কাজ করতে হবে না নন্দর মা।'

নন্দর মা বলল, 'কাজ আমি একটু বাদে এসে করব বৌদি। সেই হার-ছড়া এখন দাও। তাই নিতেই এসেছি। সেই রাক্ষুসী সর্বনাশীর চোখের সামনে এ হার আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ব, তবে ছাড়ব। জন্মের মত হার পরাব সর্বনাশীকে। ওর জন্যই তো, ওর জন্যই তো আজ আমার এই দশা—নইলে সোনার সংসার আমার—'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নন্দর মা।

লাবণ্য আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'দেব নাকি হার? ওর তো এখন মাথার ঠিক নেই।'

বললাম, 'চাইছে যখন দিয়ে দাও। ও হার তুমি রেখেই বা কি করবে?'

লাবণ্য আর কোন কথা না বলে ট্রাঙ্ক খুলে হারছড়া বের করে দিল।

বিকালবেলা কোলের ছেলেকে কাঁখে নিয়ে কমলা এসে কাজে হাত দিল, বলল, 'মা বড় কান্নাকাটি করছে, আপনার শরীর ভাল না, আমিই এলাম কাজ করতে।'

লাবণ্য লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তোমাদের। তুমি যাও, তোমার মাকে সান্ত্বনা-টান্তনা দাও গিয়ে। কাজ যা আছে, আমিই করে নেব।'

একটু চুপ করে থেকে লাবণ্য ফের বলল, 'হ্যাঁ, কমলা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। হারছড়া কি সত্যিই নষ্ট করে ফেলেছে নাকি তোমার মা?'

চা খেতে খেতে উৎসুক হয়ে জবাবের জন্য আমিও কমলার মুখের দিকে তাকালাম। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি শান্ত, সরল মেয়ে। বেশ ভরাট গোলগাল মুখ। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। কপালে ফোঁটা। রঙ কালো। কিন্তু মুখে যেন আরো একপোঁচ বেশি। মনে হল সমস্ত মুখখানায় কে যেন খুব ঘন করে কালি লেপে দিয়েছে।

মুখ নীচু করে কমলা বলল, 'না নষ্ট করে নি। নষ্ট করতেই গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি।'

লাবণ্য বলল, 'তোমরা পাঁচজনে বাধা দিলে বুঝি?'

কমলা বলল, 'না, আমরা কাছে যাই সাধ্য কি। হার নিয়ে ছুটে নিজেই সুধা বউদির ঘরে ঢুকেছিল মা। তারপর সব দেখে শুনে একেবারে থ' হয়ে গেল।'

লাবণ্য বলল, 'কি এমন দেখল সুধার ঘরে গিয়ে।'

কমলা বলল, 'দেখল দেয়ালে মাথা গুঁজে সুধা বউদি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, শুধু চোখের জল ঢালু মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার দিকে যাচ্ছে।'

জিজ্ঞেস করায় কমলা সবই খুলে বলল। এই দুদিন ধরে নন্দর মা যখন দিনরাত উঠানে গড়াগড়ি করে চীৎকার করেছে, কমলাও কেঁদেছে গলা ছেড়ে, তখন সুধাকে দেখা গেছে সবান্ধব স্বামীর জন্য সে রান্না করছে, তাদের ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে, ঘর-সংসারের অন্য কাজকর্ম করছে। সুধা তাদের প্রবোধ দিতে আসেনি, সান্ত্বনা দিতে আসেনি। একটা হা-হুতাশের শব্দও মুখ থেকে বেরোয়নি তার। কমলা গলা ছেড়ে বলেছে, 'ওতো মানুষ নয়, পাষাণ, পাষাণ। রাক্ষুসী। আমার দাদাকে আস্ত গিলে খেয়েছে।'

অমন মুখরা স্বভাবের বউ কিন্তু এসব কথার কোন প্রতিবাদ করেনি।

তারপর আজ যখন হার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকল নন্দর মা, কেউ যে ঘরে এসেছে, তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সুধা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেরই পেল না। কিন্তু ওর কান্না দেখে কোন মায়া হয়নি নন্দর মার। তার নিজের চোখে তখন আর জল নেই, শুধু আগুন। বুকে আগুন, মুখে আগুন, চোখে আগুন, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নন্দর মা বিষঢালা কণ্ঠে বলল, 'না-ও বউ, হার নাও। হারের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলে, হারের জন্য আমার ছেলের হাত জড়িয়ে ধরেছিলে, এই না-ও সেই হার। সোহাগ করে গলায় পর, আমি দেখে চোখ জুড়াই।'

মানুষের সাড়া পেয়ে প্রথমে সুধা চমকে উঠেছিল। ফের দেয়ালের কোণে মুখ লুকিয়েছিল লজ্জায়। তার এই গোপন শোকের কেউ সাক্ষী থাক, এ যেন তার ইচ্ছা নয়। কিন্তু নন্দর মা তাকে লুকিয়ে থাকতে দিল না, ফের ডেকে বলল, 'কই গলা এগিয়ে দাও, এস এদিকে।'

সুধা আর সামলাতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দিচ্ছি মাসীমা, দিচ্ছি। গলা এগিয়েই দিচ্ছি। কিন্তু ওই সরু সোনার হারে তো এ-অভাগীর গলার ফাঁস তৈরি হবে না। আরও মোটা করে দড়ি পাকিয়ে নিয়ে এস। সেই হার পরাও আমাকে, সেই হার পরাও।'

হঠাৎ নন্দর মার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সুধা, 'মাসীমা, কি হোল, কি সর্বনাশ হোল। কেন সে এমন সর্বনাশ করে গেল।'

আর কোন লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, ভয় নেই। শুধু মাথার আঁচলই খুলে পড়েনি সুধার, সমাজ-সংসারের সমস্ত বাঁধন আলগা হয়ে খসে পড়েছে।

সুধা বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আমি তার কাছে হার চেয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমার হার উদ্ধার করে দাও। কিন্তু সেকি এইরকম করে? কিন্তু সেকি আমি দেখতে চেয়েছিলাম, সে আমার জন্য কি করতে পারে, কি দিতে পারে। কিন্তু এছাড়া দেওয়ার জিনিস সেকি আর কিছু চোখে দেখল না? আমার সব অহংকার গুঁড়ো করে দিয়ে গেল, দশজনের কাছে আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু সে নিজেই কি জিততে পারল, তারই কি মুখ রইল এতে?'

নন্দর মা আরও খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হারছড়া আস্তে আস্তে সুধার গলায় পরিয়ে দিল।

সুধা আর্তনাদ করে উঠল, 'মাসীমা'!

নন্দর মা বলল, 'আমি দিচ্ছি বউমা, পর। তার বড় সাধ ছিল যার হার তাকে ফিরিয়ে দেবে। সে তা দিয়ে যেতে পারল না, দেখে যেতে পারল না। আমাকে দেখতে দাও, তার হয়ে আমাকে দেখতে দাও বউমা। আমার চোখ জুড়াক; বিষের জ্বালায় যে জ্বলে পুড়ে গেছে তার বুক জুড়াক।'

কমলা আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছিল এবার ঘরে ঢুকবে। কিন্তু কথা শেষ করতে না করতে নন্দর মা দুহাতে সুধার গলা জড়িয়ে ধরল। সুধাও ছোট্ট মেয়ের মত নন্দর মাকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এর পর কমলা আর ঘরে ঢুকতে পারেনি, সেখানে দাঁড়িয়েও থাকতে পারেনি। বাড়ি থেকে সোজা চলে এসেছে কাজে। লাবণ্য তাকে আজ কাজ করতে দিক।

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া ওষ্ঠভঙ্গী সহকারে বলিল, "তুমি তো আমার চেয়ে সুন্দর কাহাকেও দেখ না। কিন্তু আমি যদি মরিয়া যাই ?"

"ও কথা বলিও না"

"আমি তো মরিয়াই গিয়াছি। তুমি নিজেই তো আমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়াছ"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক ভয় পরিস্ফুট হইল। দেখিলাম মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে সে কৌতুকান্বিত হইয়াছে, ভীতও হইয়াছে। মৃত্যুকে লইয়া মিথ্যা রসিকতা করিতেও আমরা ভয় পাইতাম তখন। নিনানি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিল বলিয়াই কৌতুকও অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার এইসব গুণের জন্যই সে সকলকে আকৃষ্ট করিত।

"ওসব কথা ছাড়িয়া দাও। চল এবার ফেরা যাক। তুমি নিশ্চয় যক্ষিণীর কাছে ফিরিবে। বেচারাকে কাকের দল আবার হয়তো বিরক্ত করিতেছে!"

"হাঁ, চল! ময়াল সাপটার জন্য কয়েকটা খরগোসও ধরিয়া রাখিয়াছি। সেগুলোকে লইয়া যাইতে হইবে।"

"কোথায় খরগোস"

"ঝোপের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি"

সহসা আমি কয়েকটা পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। মনুষ্য পদচিহ্ন। মনে হইল একাধিক মনুষ্যের। কারণ কয়েকটা চিহ্ন বড় বড়, কয়েকটা ছোট ছোট।

"এসব পদচিহ্ন কাহার ?"

নিনানির চোখের দৃষ্টি হইতে হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

"কাল রাত্রে গজন্ধর এখানে আসিয়াছিল। আমি যখন ঝোপের মধ্যে খরগোসের ফাঁদ পাতিতেছিলাম তখন দেখি বিরাট প্রেতের মতো সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—"

"বল কি! সে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল ?"

"আমি নিজেই আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি"

"তাই না কি, এতক্ষণ তো এসব কথা বল নাই"

মুচকি হাসিয়া নিনানি উত্তর দিল—"সব কথা কি সব সময় বলিতে আছে? আলাপ করিয়া দেখিলাম, গজন্ধর লোক ভাল—"

"এখানে সে কি করিতে আসিয়াছিল ?"

"এখানে আসিয়াছিল পাথরের খোঁজে। তাহাদের দেশে নাকি পাথরের বড় বড় মন্দির হইতেছে—"

"তোমাকে দেখিয়া কি বলিল"

"খুব ভাল কথাই বলিয়াছে"

"কি"

নিনানি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর নিনানি বলিল—"যাহা বলিব তাহা আর কাহাকেও বলিও না। শুনিয়া তুমি বিচলিত হইবে না তো ?"

"শুনিই না,"

"আমাকে দেখিয়া গজন্ধরও কম বিস্মিত হয় নাই। ভয়ও পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল কোনও প্রেতিনী বোধহয়। চিনিতে পারিবামাত্র কিন্তু হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। বলিল—'ধবলের প্রিয়তমা পত্নী এত রাত্রে এখানে কি করিতেছে ?' আমি উত্তর দিলাম, 'স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমি উন্নগাকে পূজা করিতে আসিয়াছি, প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি বিপদের সময় ধবল যেন উন্নগার মতো ধৈর্যশীল ও শক্তিশালী হয়। ধবল কোথায়, সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে ? গজন্ধর বলিল—'ধবলের ফিরিতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে। আমার অনুচরেরা তাহাকে উলম্ভনের নিকট লইয়া গিয়াছে। উলম্ভনের সহিত আলাপ শেষ হইলে ধবল ফিরিবে। তাহার জন্য তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর খানিকক্ষণ নীরব রহিল, তাহার পর আবার বলিল, 'যদি তুমি রাগ না কর একটা কথা বলি। আমি বলিলাম —কথাটা না শুনিয়াই কি করিয়া বলিব যে, রাগ করিব কি না। গজন্ধর তখন এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। সহসা আগাইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, ধবলের মতো দুর্বল ভীরু বৃদ্ধ তোমার উপযুক্ত স্বামী নয়। সে দলপতি বলিয়াই বোধহয় তোমাকে দখল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমাদের দেশে চল। উলম্ভন তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। উলম্ভন তোমাকে এ প্রদেশের রাণী করিয়া দিবে। যে তিনশত রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে তাহারা তোমারই দাসী হইবে। তুমি যদি সম্মত হও এখনই তোমাকে আমি স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইব। আমার অকপট বিশ্বাসই তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অপূর্ব রূপসী, তুমি সুলক্ষণা, তুমি যে পুরুষের নিকট থাকিবে তাহার সৌভাগ্য বর্ধিত হইবে। ধবল তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি উলম্ভনের কাছে চল। এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি উত্তর দিলাম—তোমার স্পর্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত আর অধিক বাকবিতণ্ডা করিতে চাহি না। তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি ওই অসংগত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। তুমি কি এই কথা বলিবার জন্যই আবার ফিরিয়া আসিয়াছ? গজন্ধর বলিল, একথা বলিবার জন্য একদিন তোমার নিকট আসিব ঠিক করিয়াছিলাম, এখন আসিয়াছি প্রস্তরের সন্ধানে। ভাগ্যক্রমে তোমার দেখা পাইয়া গেলাম। তাহার পর গজন্ধর সাড়ম্বরে বর্ণনা করিতে লাগিল প্রস্তর দিয়া উলম্ভন কেমন বড় বড় সমাধি-গৃহ, বড় বড় মন্দির প্রস্তুত করাইতেছে। ধবলের মুখে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, গজন্ধরের মুখে আমি আমিও তাহাই শুনিলাম।"

এই পর্যন্ত বলিয়া নিনানি চুপ করিয়া গেল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—"বড় বড় পায়ের দাগগুলি গজন্ধরের। কিন্তু ছোট ছোট পায়ের দাগগুলি কাহার ?"

"ওগুলি আমার। গজন্ধর আর এক কাণ্ড করিয়াছিল"

"কি"

"আমি যখন কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না তখন সে বলপ্রকাশ করিয়াছিল, হঠাৎ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়াছিল"

"বল কি! তাহার পর ?"

নিনানি হাসিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ দন্তগুলি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দন্তগুলি আরও বিকশিত করিয়া সে বলিল, "আমার এই দন্তের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করিয়াছি। গজন্ধরকে রক্তাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে"

নিনানির চোখে, মুখে, আলুলায়িত কেশপাশে, নগ্নদেহের বন্যশ্রীতে ক্ষণিকের জন্য যাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহা ভয়ংকর। মনে হইল কোন পুরুষের শৌর্যই তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এই মূর্তি যে কোনও পুরুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল।

আমার কটি-বেষ্টন করিয়া কোমলকণ্ঠে সে কহিল—"আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি জংলা। আমার ঘুমে পাইতেছে। আমি আর চলিতে পারিতেছি না।"

আমি আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। একটু পরেই কিন্তু সে নামিয়া পড়িল আবার।

"ঝোপের মধ্যে খরগোসগুলোকে রাখিয়া আসিয়াছি। অন্য কোনও জানোয়ার আসিয়া আবার লইয়া না যায়। গর্তের মধ্যে রাখিয়াছি অবশ্য, কিন্তু শৃগালগুলো বড় চতুর—"

দ্রুতপদে সে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কে বলিবে একটু আগে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল!

খরগোসগুলি লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমরা যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহার মুখ বন্ধ। কাকের দল উড়িয়া গিয়াছে। হরিণ কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যক্ষিণী ঘুমাইতেছিল নিনানি চুপি চুপি বলিল—"এখন উহার ঘুম ভাঙাইবার প্রয়োজন নাই। ময়াল সাপটাকে খরগোসগুলো দিয়া চল আমরা আমাদের গুহায় যাই"

ময়াল সাপের গুহায় উঁকি দিয়া দেখিলাম সে আর কুণ্ডলী পাকাইয়া নাই, দেহ বিস্তার করিয়াছে এবং আগড়টাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিনানি ছয়টি খরগোস আনিয়াছিল। তিনটি খরগোসকে আমরা গুহার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিলাম। বাকী তিনটিকে নিনানি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

"চল এবার যাওয়া যাক"

......নিনানির গুহার ভিতর খড় বিছাইয়া আমরা শয্যা রচনা করিয়াছিলাম। তাহার উপরেই পাশাপাশি শুইয়াছিলাম দুইজনে। নিনানি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া আমার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিতেছিল, "আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইও না জংলা। দেখ, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। গজন্ধরের প্রলোভনপূর্ণ প্রস্তাবও উপেক্ষা করিয়াছি তোমারই জন্য। তুমি আমাকে ছাড়িবে না তো?"

বলিলাম—"না—"

শিলাঙ্গীর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সত্য কথাটা কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গী যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে একথাটা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না বটে, কিন্তু নিনানিকে দেখিয়া কে বা কাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে নিনানির তো একবারও বাধিতেছিল না। তাহা লইয়া সে বরং আস্ফালনই করিতে লাগিল। ভাবটা যেন—'দেখ, ইহারা সকলেই আমাকে চায়, কিন্তু আমি তোমার জন্য ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।' আমিও তো বলিতে পারিতাম—'দেখ শিলাঙ্গী আমাকে চায় কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।' কিন্তু আমি একথা বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই কারণ তাহা সত্য নহে। সত্যই আমি শিলাঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া নিনানির কাছে আসি নাই। নিনানি কি সত্য কথা বলিতেছিল? তাহার পরবর্তী আচরণ

দেখিয়া আমারও পরে সন্দেহ হইয়াছিল যে, নিনানি মিথ্যাবাদিনী। আজ কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি যে নিনানি একান্তভাবে আমাকেই চাহিয়াছিল। আমাকে পাইবার জন্যই সে কখনও কোমলা কখনও নিষ্ঠুরা হইতেছিল। আমি তাহার আন্তরিকতা অনুভবও করিয়াছিলাম, কিন্তু লোভের বশবর্তী হইয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। নিনানি কেবল আমাকেই চাহিয়াছিল, বহু-বল্লভ-প্রার্থিতা সে একমাত্র আমাকেই নির্বাচন করিয়াছিল, আমাকে পাইবার জন্য সে নিজেকে নির্যাতিত নিপীড়িত করিয়াছিল, আমিও তাহাকে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীও আমাকে কম মুগ্ধ করে নাই। শিলাঙ্গীর উল্লেখ নিনানি সহ্য করিতে পারিবে না আমি জানিতাম, তাই সত্য গোপন করিতে হইতেছিল। নিনানির সে প্রয়োজন ছিল না, শিলাঙ্গীরও ছিল না।

"আমি এবার যাই, অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি। সকলে হয়তো আমাকে খুঁজিতেছে। খনিত্র পূজায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে ইলচি দুঃখিত হইবে"

আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচিরও আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পাইলেই সে আমার ঘরে আসিয়া আমাকে খাওয়াইত, আমার পরিচর্যা করিত।

নিনানি বলিল, "তুমি যাইবার সময় ওই খনিত্রটিকে লইয়া যাও, আমি যেটির পূজা করিয়াছি, তুমি গিয়া ইলচিকে বলিও যে, আমি উন্নগা পর্বত হইতে এই খনিত্রটি মূষিক-রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছি, তোমরা এইটির পূজা কর। মূষিক খুঁজিতেছিলাম বলিয়াই এত দেরি হইয়াছে"

"কিন্তু নিয়ম যে অন্যরকম। মেয়েরা নিজের হাতে মূষিক ধরিয়া—"

অধীরভাবে নিনানি বলিল—"তাহা জানি। কিন্তু আমি চাই যে, আমি যে খনিত্রটি পূজা করিয়াছি ইলচি সেইটিরই পূজা করুক। আমি যদি থাকিতাম নিম্ব সম্প্রদায়েরই সমস্ত নারী আসিয়া আমার খনিত্রকে পূজা করিত, এমন কি ইলচিও। ধবলের প্রিয়তমা পত্নীর খনিত্রকে অবহেলা করিবার সাহস কাহারও হইত না। আমার ইচ্ছা এবারও আমার খনিত্র যেন অবহেলিত না হয়। তুমি ওটিকে লইয়া যাও। হয়তো আগামীবারে আমি আর খনিত্র পূজা করিতে পাইব না—"

কথাটা বলিয়াই নিনানি থামিয়া গেল। আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, কানা তো আমার কিছু করিল না। আমি তাহার আদেশ অমান্য করিলাম কিন্তু আমাকে কোনও শাস্তিই তো সে দিল না। সকলে জানে কানার আদেশ অমান্য করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়, কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমার তো কিছুই হইল না—"

যে সন্দেহ আমি মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়াছিলাম নিনানির কথায় তাহা যেন দৃঢ়তর হইল।

বলিলাম, "আমার বিশ্বাস তোমার কিছুই হইবে না, কারণ মূর্চ্ছিত বিঘাওয়ের মুখ হইতে যেসব কথা আমরা সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহা কানার আদেশ নয়, তাহা বিঘাওয়ের আদেশ। বিঘাও তোমাকে শাস্তি দিয়াছে, কারণ বিঘাওয়ের বাসনা তুমি চরিতার্থ কর নাই"

নিনানির চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার কথার তাৎপর্য যে তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ছলনাময়ী মুখে কিন্তু বলিল, "না, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নয়। বিঘাও শক্তিশালী

লোক। তাহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গিয়াছে। মনে নাই সে বলিয়াছিল যে, অন্ধকারের সহিত মিশিয়া নিম্ব সম্প্রদায়ের সর্বনাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে? উলম্ভন যদি নিম্ব সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার কথা ঠিক ফলিয়া যাইবে। কানা কবে কিভাবে আমাকে শাস্তি দিবে তাহা কে বলিতে পারে। না, না, বিঘাওকে অমনভাবে অবিশ্বাস করিও না, তাহা হইলে হয়তো আমাদের আরও অমঙ্গল হইবে—"

নিনানি শিহরিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম—"যদি ফিরিয়া গিয়া দেখি যে সত্যই উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, অবিলম্বে আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে তখন তুমি কি করিবে?"

"আমি ওই দেবদারু বৃক্ষের নীচে আগুন জ্বালাইয়া যুদ্ধের নাচ নাচিব। ওই দেবদারু বৃক্ষকে উলম্ভন কল্পনা করিয়া তাহার বুকে তীর হানিব, অগ্নি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিব ধবল যেন জয়ী হয়—"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিন্তু প্রার্থনা করিবার পূর্বে অগ্নি দেবতাকে তোমার প্রণয়ীর নামগুলি উপহার দিতে হইবে তাহা মনে আছে তো?"

"আছে বই কি। এই দেখ—নামের মালা আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এইটিই আমি অগ্নিকে উপহার দিব—"

নিনানি যে কড়ির মালাটি পরিত সেইটি তুলিয়া দেখাইল।

হাসিয়া বলিল—"জীবনে আমার যতগুলি প্রণয়ী জুটিয়াছে প্রত্যেকের নামে এক একটি কড়ি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। অগ্নি দেবতাকে এইটিই সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিব—ইহারা আমাকে ভালবাসিয়াছিল, ইহাদের স্মৃতি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখিতেছি, এই স্মৃতিগুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এইগুলি তোমাকে দিতেছি, ইহার বিনিময়ে হে দেবতা, তুমি ধবলকে জয়ী কর। আমাকে কিন্তু আরও কিছু কড়ি আনিয়া দিও, আর একটা মালা গাঁথিয়া রাখিব—"

পাথরের সূঁচ দিয়া মেয়েরা সেকালে কড়ির মালা, ঝিনুকের মালা গাঁথিত। সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করিত লতা বা পশুর অন্ত্র।

"কড়ি কোথায় পাইব?"

নিনানির চক্ষু দুইটি আবার হাসিতে লাগিল।

"পাহাড়ের কাছে যে বড় নিমগাছটি আছে, তাহারই তলায় খুঁড়িয়া দেখিও, সেখানে কিছু কড়ি আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি"

"তুমি কড়ি কোথায় পাইলে?"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"সত্য কথা যদি বলি রাগ করিবে না তো?"

"না—"

"বিঘাও দিয়াছিল। মীংরাও দিয়াছিল কিছু। কড়িগুলি আমাকে আনিয়া দিও তুমি"

"আচ্ছা"

"তুমি আবার কখন ফিরিবে?"

"যত শীঘ্র পারি"

"অনর্থক দেরি করিও না। তুমি কাছে না থাকিলে একটুও ভাল লাগে না। আমার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া দিয়া তুমি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতাম। এভাবে কতদিন থাকিব? সত্যই যদি আমার মৃত্যু না হয়, সত্যই যদি কানা আমাকে ক্ষমা করে তাহা হইলে এই গুহাতেই চিরকাল বাস করিব না কি?"

"করিলেই বা ক্ষতি কি। তুমি আমার একার হইয়া থাকিবে"

"না, একা আমি বেশীদিন থাকিতে পারিব না। কোনও বুদ্ধি করিয়া তুমি আবার আমাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি আবার ফিরিয়া যাই"

"যক্ষিণীর কি দশা হইবে?"

"আমি যদি ফিরিয়া যাই যক্ষিণীকেও লইয়া যাইব। ধবল আপত্তি করিবে না"

"দেখি এখন ওদিকের অবস্থা কি রকম। তাহার পর যেমন বুঝি ব্যবস্থা করিব।"

...ফিরিয়া দেখিলাম ধবল কন্যা নদীর তীরে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাহার মুণ্ডটা জলের দিকে। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। মনে হইল নিবিষ্টচিত্তে সে কন্যা নদীর ভাষা শুনিতেছে। কন্যা নদীতে পুষ্পগুচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে। ধবলের কাছে কেহ নাই। নদীর বাঁকে একাই সে শুইয়া আছে। আমার বর্ণনা অনুসারে এখানেই নিনানির মৃত্যু হইয়াছিল। দূরে ক্ষেতের ভিতর মেয়েরা কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। নীরবেই কাজ করিতেছে। কোথাও কোন কলরব নাই। এমন কি, শিশুদেরও গোলমাল নাই। সকলেই নিজ নিজ কুটিরের ভিতর ঢুকিয়াছে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। আমি নীরবে ধবলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধবলের কিন্তু কোন ভাবান্তরই লক্ষ্য করিলাম না। মনে হইল, সে যেন কন্যা নদীর কলকলধ্বনিতে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি উপবেশন করিলাম। তাহার সহিত কথা না বলিয়া আমার কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তাহার ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে, কিন্তু কোনও কথা শোনা যাইতেছে না। মনে হইল, নীরব ভাষায় সে যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে। সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার পর আমাকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া বসিল।

"জংলা, তুমি কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছ?"

"অনেকক্ষণ—"

"খনিত্রপূজার সময় তুমি কোথায় ছিলে, সকলে তোমাকে খুঁজিতেছিল"

"আমি ইঁদুরের সন্ধানে উদগা পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। ইঁদুর রক্ত মাখাইয়া একটি খনিত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, ইলচিকে পূজা করিবার জন্য দিব"

নিনানির সেই রক্তমাখা শাখাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেটি ধবলকে দেখাইলাম।

ধবল সেটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, আমার মনে হইল সে যেন অন্য কিছু ভাবিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়াই সে যেন বলিল, "চমৎকার হইয়াছে। ইলচিকেই দিও। সে তোমাকে খুঁজিতেছিল"

তাহার পর সে আবার নীরব হইয়া গেল। আমিও নীরবে বসিয়া রহিলাম।

"ঘিসু বা ভংগার কোনও খবর কি পাওয়া গিয়াছে"—কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম।

"ভংগা ফিরিয়াছে, ঘিসু ফেরে নাই। ঘিসুর মৃত্যু হইয়াছে। সেই অরণ্যে গজন্ধরের অনুচরেরা ঘিসু ও ভংগাকে পুনরায় বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঘিসু যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছে, ভংগা আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ভংগা বলিতেছে—উলম্ভনের দল যে কোনও মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। সে আরও বলিতেছে যে, তাহাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদেরই গিয়া তাহাদের আক্রমণ করা উচিত। তাহারা যখন ঘিসুকে হত্যা করিয়াছে তখন সে অধিকার আমাদের অবশ্যই হইয়াছে। আমি এতক্ষণ কন্যা নদীর নির্দেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়াছিলাম। নির্দেশ পাইয়াছি" এই পর্যন্ত বলিয়া ধবল চুপ করিল এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)



মারাঠা ঘাট

অ্যালান লুইস

[অ্যালান লুইস প্রতিভাবান ইংরেজ কবি। এম-এ ডিগ্রী নিয়ে ১৯৪২ সালে তিনি লেফটেন্যান্ট হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। এখানে এসে তিনি সাধারণ লোকজনদের সংগে মেলামেশা করতেন খুব বেশি। লুইস বলতেন যে, তাঁর মাতৃভাষার চাইতে বরং তিনি হিন্দুস্থানীই বলেন ভাল। ১৯৪৪ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে আরাকানের কোনো দুর্ঘটনায় নিহত হন। 'The Mahratta Ghats' কবিতাটি তাঁর 'Ha! Ha! Among the Trumphets' নামে কবিতার বই থেকে নেওয়া।]

উপত্যকা ফুটি-ফাটা রোদ্দুরের তাতে
পরিশ্রান্ত সমতল বেঁধে কালো দাঁতে
পাহাড়ের আরক্ত ঊরুর বাঁকা শিরায় শিরায়।
ঘাস-পাতা মুখে ক'রে ছাগলের পাল ফিরে যায়
আদিম পথের গ্রন্থি দিয়ে
বেঁধে রাখে পাহাড়ের চূড়ো এলো-মেলো ঃ
কালো কালো কৃষকেরা পিঠে ক'রে ক্লান্ত সূর্য টেনে নিয়ে এল।

ওলটানো মাটির ডেলা লাল,
সূর্যদেব গুঁড়ো করে লাল মাটি সারাদিনভোর
শিব যেন বীজ বুনে গেছে এই দেশের ওপর।

এ-মাটি কি তেতেপুড়ে শুধু ম্লান হবে
ঘুঁটের আগুনে আর কম্পিত পশুর আর্তরবে,
ক্ষুদে দেবতার দল আর পুরুতের ভীড় ঠেলে
এ-মাটির প্রাণ কবে উড়ে যাবে ঈগলের মত ডানা মেলে
পর্বত-শয্যায় সুবিশাল,
যেখানে মাটির গুঁড়ো ময়দার মত ধুলো-ধুলো—রক্তের মত লাল-লাল।

এ-প্রাণ নিশ্চল
ব'সে ব'সে শুধু দিন গোনে
কঠিন পাথর ভেঙে রুগ্ন কৃশ কৃষকের দল
শুকনো জমির ফালি চষে, বীজ বোনে
আর ভূমি-দেবতারা—নেই কোনো বোধ-নীতি-ন্যায়
চাষীর পঞ্জর থেকে মজ্জা শুষে নেয়।

কে যেন বন্ধুর পথ পার হ'য়ে গেল ?
বোধ হয়, বোঝা নিয়ে ভিখিরির হানা !
নক্ষত্র-পতন দেখে ককিয়ে উঠেছে কেউ ?
শুধু কোনো ভূমিহীন সৈনিকের মৃত্যুর নিশানা !

হাজার বছর শুধু ব'য়ে গেল কান্নায় অঝোর !
আবার নতুন ক'রে সুরু হবে শূন্য ধু-ধু হাজার বছর ?

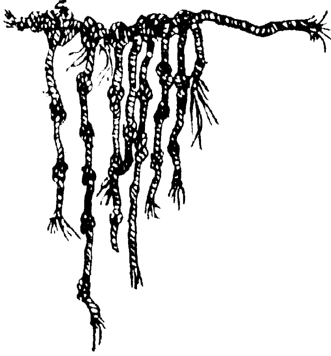
অনুবাদক ঃ দিনেশ দাস

মহাচীনের লিপিরহস্য ও ভাষা

শংকরানন্দ

স্মরণাতীতকাল হইতে চীনে ও ভারতে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল। শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পর এই আদান-প্রদান মৈত্রীবন্ধনে পরিণত হইয়াছিল। ইস্‌লাম বিজয়ের পর হইতে চীন-ভারতের এই মৈত্রী-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এই মৈত্রীবন্ধন সবে মাত্র পুনঃগ্রথিত হইতে চলিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই নব মৈত্রীবন্ধন গ্রন্থনে অগ্রদূত। তাঁহার প্রচেষ্টায় চীন-ভারত মৈত্রীর যে প্রথম পাদ-পীঠ রচিত হইয়াছিল তাহারই ফলস্বরূপ বিশ্বভারতীতে চীনা সংস্কৃতিমূলক আলোচনার ব্যবস্থা এবং চীনাভবন প্রতিষ্ঠা। চীনা-ভবনেই ভারতে সর্বপ্রথম চীনা ভাষার গ্রন্থাগার স্থাপন এবং চীনা ভাষা শিক্ষা দিবার অতি সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন চীনের পরস্পরকে আবার নূতন করিয়া বুঝিবার সময়



কিপাস (পেরু)

আসিয়াছে। চীন ও ভারতে দূত-বিনিময় হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ যেন গভীর রাত্রির অবসানে নিদ্রিত বন্ধু-দ্বয়ের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত। পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা।

এই সময়ে চীনাভাষা ও চীনালিপি সম্বন্ধে আলোচনার অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, ভাষাই মৈত্রীবন্ধনের প্রধান উপায়। চীনদেশীয় ভাষা খুব কঠিন নহে। চীনের লিপিই অত্যন্ত কঠিন। কারণ, পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য লিপির ন্যায় চীনালিপির গঠনপ্রণালী নহে। আধুনিক জগতে বর্ণ বা অক্ষর বলিতে যাহা বুঝায় চীনালিপিতে তাহার একান্ত অভাব বলিয়াই মনে হয়। চীনালিপির অক্ষর আর শব্দ একই। প্রত্যেকটি অক্ষরই এক একটি শব্দ। সেইজন্য চীনা ভাষাতে যে পঁয়তাল্লিশ হাজার শব্দ রহিয়াছে তাহা পঁয়তাল্লিশ হাজার অক্ষর বা চিত্র দিয়া লিখিতে হয়। প্রাচীন চীনে এই সকল শব্দের জন্য রীতিমত চিত্রের ব্যবহার ছিল। আধুনিক লিপিতে চিত্রগুলি মাত্রিক সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতে যেমন চীনা ভাষাতেও পঁয়তাল্লিশ হাজার শব্দ কখনই ব্যবহৃত হয় না। হাজার তিনেক শব্দ শিখিলে এবং তাহাদের অক্ষর চিনিতে পারিলে, মোটামুটি চীনা ভাষায় কাজকর্ম চালাইতে পারা যায়। যাহারা পণ্ডিত হইতে চান তাঁহাদিগকে অন্তত বার হাজার শব্দ এবং সেই সংখ্যক অক্ষর শিখিতে হইবে।

অন্যান্য লিপির ন্যায় চীনদেশীয় লিপিরও ক্রমবিকাশ হইয়া বর্তমান "কাই শূ" লিপির উদ্ভব হইয়াছে। চীনা লিপির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

চীনের লিপিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়।

১। গ্রন্থিলিপি (Knotted cord)।
২। চিত্রলিপি।
৩। মাত্রিকা লিপি।

চিয়ে শেং বা গ্রন্থিলিপি

দড়িতে গ্রন্থি দিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা আদিম মানবসমাজের সর্বত্র লক্ষিত হয়। কেথলিকগণ জপের মালার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বিবরণ মনে রাখিতেন। পেরুবাসিগণ নানাবর্ণের পশমের সূত্রনির্মিত 'কিপাস' নামক স্মারকরজ্জু ব্যবহার করিতেন। এতদ্ব্যতীত এই জাতীয় স্মারক চিহ্নের ব্যবহার তিব্বত, বাঙলা, হাইনান, রিকুদ্বীপ, পলিনেশীয় দ্বীপমালা, মধ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকা, কেরোলিনা, পেলিউ এবং মার্কুয়েসান্ দ্বীপপুঞ্জে এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চীনদেশে এই জাতীয় প্রতীক-রজ্জুর নাম ছিল 'চিয়ে শেং'। ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হইত তাহার কোনও নিদর্শন নাই। চীনের প্রাচীন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উক্তি হইতে ইহার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়। ইহাকে লিপি বলা ভুল। ইহা স্মারকচিহ্ন মাত্র।

চিত্রলিপি

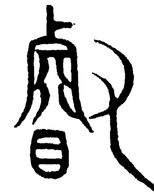
লিপির আদি অবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র চিত্রপ্রতীকের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মিশর. ক্রীট, পশ্চিম এসিয়া, সুমেরিয়া, ভারত এবং চীন সর্বত্রই লিপির প্রথম অবস্থা চিত্রের বহুল ব্যবহারে ভারাক্রান্ত।

চীনদেশের চিত্রলিপিতে তিনটি বিশিষ্ট যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। এক এক যুগে চিত্রলিপির পৃথক্ পৃথক্ এক একটি নাম ছিল। যেমন:—

১। আদিম যুগের "কু উয়েন"
২। মধ্যযুগের "টা চুয়ান"
৩। শেষ যুগে "সিয়াও চুয়ান্"

এই তিন যুগের চিত্রলিপির প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের প্রতীকসমূহের সম্পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু তৃতীয় বা শেষ যুগের চিত্রলিপিরই সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে।

কু উয়েন (প্রাচীন চিত্রলিপি)—ইহা প্রাচীনতম চিত্রলিপি। ইহার লুপ্তাবশেষ অতি অল্পসংখ্যক প্রতীকই পরবর্তী গ্রন্থকার 'সু' ওয়েন নামক অভিধানে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন চিত্রলিপির বহু প্রতীক পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কচ্ছপের খোল, ব্রোঞ্জ (Bronze) পাত্র এবং মাটির পাত্রের গায়ে এই প্রাচীন লিপি খোদিত ছিল। এই জাতীয় লিপি আনুমানিক খৃঃ পূঃ দুই হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে প্রচলিত ছিল।



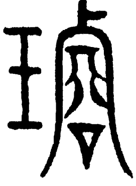
কু উয়েন

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে 'চৌয়ের' গ্রন্থে এই প্রাচীন চিত্রলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই লিপি অক্ষরাত্মক নহে। ইহা ভাবদ্যোতক (ideographic)।

টা চুয়ান (সর্পিলরেখাযুক্ত চিত্রাক্ষর)

টা চুয়ান বর্ণমালাতে সর্বপ্রথম প্রাচীন গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিতে প্রত্যেক শব্দের সহিত একটি স্মৃতি সহায়ক চিত্রের বহুল ব্যবহার হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ লিপিকর 'চৌ' সরকারী সেরেস্তার ব্যবহারের জন্য প্রাচীন চিত্রাক্ষর বা 'কুউয়েন'কে



টা চুয়ান

সংকার করিয়া প্রচলিত শব্দ-রাশির এক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন। প্রাচীন চিত্রলিপিতে একই চিত্র বহু অর্থে ব্যবহৃত হইত। আবার একই ধ্বনির দ্বারা প্রকাশিত বহু ভাবের জন্য বহু চিত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। ফলে লিপি বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। চৌয়ের দৃষ্টি প্রথমেই এইদিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই তিনি প্রাচীন লিপি সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই লিপি সংস্কারে তাঁহাকে দ্বিবিধ পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছিল।

(১) একই ধ্বনিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের যাহাতে ধ্বনি সম্বন্ধে গোলযোগ না ঘটে, সেইজন্য, ঐ ধ্বনির বহুল প্রচলিত ও বহুজ্ঞাত কোনও একটি প্রতীককে সকল শব্দের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। তাহাতে ধ্বনি সম্বন্ধে সর্বপ্রকার গোলযোগ চিরকালের জন্য বন্ধ হইল।

(২) একই ভাব প্রকাশক বহু চিত্রের দ্বারা যখন সেই ভাবের অন্তর্বর্তী ভাবসমূহ প্রকাশিত হয়, তখন সকল অন্তর্বর্তী ভাব প্রকাশক শব্দের সহিত মূল ভাব-প্রকাশক প্রতীকটি যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে শব্দের অর্থ গ্রহণে কোনওপ্রকার বাধা উপস্থিত হয় না এবং একই ভাব প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জন্য ভিন্ন প্রতীক ব্যবহৃত হইলেও মূল ভাব-প্রকাশক প্রতীক সহায়ে তাহার মর্মার্থ অতি সহজে বোধগম্য হয়। মূল প্রতীকটি বর্গজ্ঞাপক। অর্থাৎ শব্দটি কোন বর্গের, উক্ত প্রতীক হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

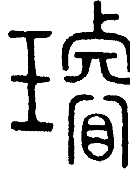
নব পদ্ধতি কিভাবে 'টা চুয়ান' লিপি-মালাকে 'কুউয়েন' লিপিমালা হইতে পৃথকীকৃত করিয়াছে তাহা প্রদর্শিত চিত্র দুইটি হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। 'টা চুয়ানে' বর্গনির্দেশক চিত্রটি উপরে রহিয়াছে, ইহা দামী মণি বাচক, 'কুউয়ানে' ইহা নাই।

যে সকল শব্দ একাধিক প্রতীক দ্বারা লিখিতে হয় সেই সকল শব্দেরই এইপ্রকার বিভাগ সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঁশ হইতে প্রস্তুত পাতলা পাতের উপর লৌহ শলাকা দ্বারা লেখা হইত। সেইজন্য অক্ষরের রেখাসমূহ সর্পিল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সকল পাতলা বাঁশের পাতের এক পাশে ছিদ্র থাকিত, সেই ছিদ্রে দড়ি দিয়া পাতসমূহ এক করিয়া গ্রথিত হইত।

বাঁশের পাতে লেখার প্রচলন এখনও সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের ভিতর প্রচলিত আছে। ভারতে ভূর্জপত্র এবং তাল-পত্রের উপর শলাকার সাহাযে লেখার প্রচলন এককালে ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে সরকারী পুস্তকাগারে সংগৃহীত তালপাতার পুঁথি শলাকার সাহায্যেই লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে শরের কলমের সাহায্যে কালির দ্বারা লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

সিয়াও চুয়ান বা সংস্কৃত লিপিমালা

'টা চুয়ানের' সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া যে নব এবং বৈপ্লবিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলস্বরূপে 'সিয়াও চুয়ান' লিপিমালার উদ্ভব। ইহাই চীনের প্রথম সার্বভৌম বর্ণমালা। চীনের পরবর্তী লিপি সংস্কার-সমূহ 'সিয়াও চুয়ান'কে ভিত্তি করিয়াই সাধিত হইয়াছে।



সিয়াও চুয়ান

কথিত আছে, চীনের ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সম্রাট "চীন্ সি হোয়াংটির" রাজত্বকালে এই সংস্কার হইয়াছিল। তাহার রাজত্বকালের ২১৩ খৃঃ পূঃ অব্দে ইহা সাধিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বাহুবলে এবং মন্ত্রী লি সি-র পরামর্শে একে একে চীনের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া সমগ্র চীনের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত চীনে তখন বহুপ্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনাতে এই বিভিন্ন লিপি এক মস্ত সমস্যার সৃষ্টি করিল। মন্ত্রী লি সির সহিত পরামর্শ করিয়া 'হোয়াং টি' সমগ্র চীনে একটি সার্বভৌম বর্ণমালা প্রচলন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে মন্ত্রী লি সি সরকারী লিপি-কারগণের সাহায্যে 'টা চুয়ান' বর্ণমালা হইতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়া নূতন সংস্কৃত বর্ণমালা প্রস্তুত করেন। এই বর্ণমালাতে সর্বশুদ্ধ তিন হাজার চিত্র ছিল। হোয়াং টি ও লি সি কর্তৃক সাধিত সংস্কার সম্বন্ধীয় কোনও সমসাময়িক গ্রন্থ বা নির্ঘণ্ট পাওয়া যায় না। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত 'সু ওয়েন' নামক গ্রন্থে এই বর্ণমালা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে তিন হাজারের পরিবর্তে প্রায় নয় হাজার শব্দ এবং সেই-সংখ্যক চিত্র বা প্রতীক রহিয়াছে।

'ট চুয়ান' লিপিমালার কোনও গ্রন্থাদি না থাকাতে শব্দের বিভাগ কিভাবে সাধিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। 'সিয়াও চুয়ান' বর্ণমালায় লিখিত 'সুওয়েন' নামক অভিধান ভারতীয় অভিধানের বিভাগ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্গে বিভক্ত হইয়াছিল। 'সুওয়েনে' এই বর্গের সংখ্যা চারিশত চল্লিশ। এই সকল বর্গের কোনওটিতে একটি মাত্র শব্দ রহিয়াছে আবার কোনটিতে পাঁচশতেরও অধিক শব্দ বর্তমান! মোটামুটিভাবে বর্গগুলি অমর-কোশের বর্গের সদৃশ। এক-একটি বর্গ এক-একটি পৃথক বিষয়ক। প্রতি বর্গে সেই বিষয়ক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। উপাসনা-বর্গে যেমন দেবতা, উপদেবতা ও পিতৃগণের উপাসনা বাচক শব্দ এবং সেই সকল উপাসনাতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বাচক শব্দ রহিয়াছে তেমনি মূল্যবান প্রস্তরবর্গে ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য প্রভৃতি মূল্যবান মণির নামের সহিত অল্প মূল্যের প্রস্তরসমূহের এবং কৃত্রিম প্রস্তরাদিরও নাম রহিয়াছে।

হোয়াং টি—লিপির লিপি সংস্কার মহা বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল। প্রাচীনপন্থী লিপিকরগণ একযোগে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহার ফল বিষময় হইয়াছিল। নব-সংস্কার প্রবর্তনের প্রবল বাধা দূর করিতে চীনে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুঁথি-মেধ অনুষ্ঠিত হইল। লক্ষ লক্ষ পুঁথি অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইল। শত শত লিপিকরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। ফলে প্রাচীন চীনের সহিত ভাবী চীনের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। সংস্কৃতলিপি প্রবর্তিত হইল।

চীনের এই লিপিসংস্কার এবং সার্বভৌম লিপি প্রচলনের সহিত ভারতে সম্রাট অশোকের সময় সার্বভৌম ব্রাহ্মী লিপি প্রচলনের সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ হোয়াং টি এবং অশোক সমসাময়িক এবং ভারত এবং চীনে অশোক এবং হোয়াং টি সর্বপ্রথম একচ্ছত্র সম্রাট। ভারতীয় লিপি-সংস্কার যে কিভাবে হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। ললিতবিস্তারে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতে চৌষট্টি প্রকার লিপির প্রচলন ছিল। জৈন-গ্রন্থকারগণ ভারতে প্রচলিত অষ্টাদশ প্রকার লিপির সন্ধান দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন লিপিসমূহকে ব্রাহ্মী লিপি কি করিয়া গ্রাস করিয়াছিল তাহারও কোন ইতিহাস নাই।

হোয়াং টি-লিপির লিপি-সংস্কার সার্থক হইয়াছিল। কারণ এই লিপিই সমগ্র চীনকে এক করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা যেমন সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল তেমনি চীনের সংস্কৃত বর্ণমালাও সমস্ত চীনকে এক করিয়াছে।

মাত্রিকা বা রেখা লিপি

পাকুয়া—(আটটি রেখাসমষ্টি) চীনের প্রাচীনতম রেখা বা মাত্রিকা লিপির নিদর্শন 'পাকুয়া' আটটি রেখা সমষ্টিতে তিনটি হইতে ছয়টি রেখার ব্যবহার হইয়াছে। একটি তিন রেখার, তিনটি চারি রেখার, তিনটি পাঁচ রেখার এবং একটি ছয় রেখার সমষ্টি। রেখার কতকগুলি পূর্ণ এবং কতকগুলি ভগ্ন। এই সকল মাত্রিকা বা রেখাসমষ্টি কোন কোন ধ্বনির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা এখন অজ্ঞাত। বর্তমানে পাকুয়া অষ্টকোণাকার



পাকুয়া

সজ্জিত করিয়া ভাগ্য-গণনার কার্যে ব্যবহৃত হয়। অষ্টকোণ চিত্রের মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত থাকে। তাহার অর্ধেক সাদা অর্ধেক কাল। সাদা অংশ দিন বা সূর্য এবং কাল অংশ রাত্রি বা চন্দ্রজ্ঞাপক।

প্রত্যেকটি পাকুয়ার একজন করিয়া অধিষ্ঠাতা আছেন। যথা—বজ্র, অগ্নি, জল, জলাভূমি, পৃথিবী, গিরি, আকাশ ও বায়ু। ভারতেও অক্ষরের অধিদেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। কাদি তন্ত্রোক্ত অভিধানে প্রত্যেকটি বর্ণের একজন করিয়া অধিদেবতা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্ত্রসারকার বর্ণের অধিদেবতাগণকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যেমন, আকাশ, মরুত, অগ্নি, পৃথ্বী ও জল। সুতরাং সকল অক্ষরগুলিই এই পাঁচটি অধিদেবতার অধীনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্ত্রোক্ত বর্ণের অধিদেবতা বিভাগ এবং চীনের পাকুয়ার অধিদেবতা বিভাগ একই মূলনীতি অনুযায়ী সাধিত হইয়াছে। কারণ 'পাকুয়ার' অধিদেবতার সংখ্যা আট জন হইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে পাঁচজন। কারণ, বজ্র ও অগ্নি, জল ও জলাভূমি, পৃথিবী ও গিরি প্রকৃতপক্ষে অগ্নি, জল ও পৃথিবীর দুইটি দুইটি করিয়া প্রকাশ মাত্র। সুতরাং তন্ত্রসারোক্ত (কুলাকুলচক্র) ধ্বনির অধিদেবতা এবং পাকুয়ার প্রতীকের অধিদেবতা এক। এই দুইটির সম্মেলনে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

চীনদেশের পৌরাণিক যুগের রাজর্ষি সম্রাট ফুসি কর্তৃক আটটি মাত্রিকা সমষ্টি বা পা কুয়ার আবিষ্কার হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তিনি ইহা চীনের ড্রাগনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

"ই চিং"—ফুসির দেহত্যাগের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে চীন সম্রাট 'উয়েন' এবং তাহার পুত্র সম্রাট 'উ' 'পাকুয়ায়' দুইটি দুইটি এক সঙ্গে করিয়া চৌষট্টী মাত্রিকা-সমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল মাত্রিকা-সমষ্টি সম্বন্ধে উক্ত সম্রাটদ্বয় লিখিত এক দুর্বোধ্য গ্রন্থ ছিল। ইঁহাদের তিরোভাবের প্রায় সহস্র বৎসর পরে এই সকল মাত্রিকা-সমষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া কনফুসিয়াস 'ই চিং' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতীয় বৈদিক ভাষাতে চৌষট্টী ধ্বনির প্রচলন ছিল। ষড়ঙ্গ বেদের শিক্ষা নাম অঙ্গে বৈদিক চৌষট্টী ধ্বনির বিস্তৃত আলোচনা আছে। সুতরাং শ্রবণমাত্রেই ই চিংএর চৌষট্টী মাত্রিকা সমষ্টি ও বৈদিক চৌষট্টী ধ্বনির পরস্পরের ভিতর কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু 'ই চিং'এ বর্ণিত চৌষট্টী মাত্রিকা-সমষ্টির সহিত বৈদিক চৌষট্টী ধ্বনির কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ, চীনের মাত্রিকা-সমষ্টি ধ্বনির নহে শব্দের প্রতীক।

"লি শু" ও "কাই শু"—কনফুসিয়াসের তিরোভাবের প্রায় সহস্র বৎসর পরে জনৈক নির্বাসিত রাজকর্মচারী এক প্রকার মাত্রিকালিপির উদ্ভাবন করেন। তাঁহার লিপিপদ্ধতি চীনে গৃহীত হয়। ইহাই আধুনিক 'কাই শু' নামক চীনা লিপির ভিত্তি। এই নব মাত্রিকালিপির সহিত পাকুয়া বা ই চিং-এর চৌষট্টী রেখা সমষ্টির যে কি সম্বন্ধ তাহা জানা যায় নাই।

কাই শু

মাত্রিকা লিপির ব্যবহার আরম্ভ হওয়াতে মনে হয় চীনে নূতন ভাবে লিপিসংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। এই লিপিসংস্কারে পারসীক শূলমুখ মাত্রিকালিপির প্রভাবও থাকিতে পারে। মাত্রিকালিপির প্রবর্তনের সহিত চীনের অভিধানও সংস্কৃত হইল। 'সুওয়েনের' ভাব বা অর্থসূচক বর্গ-বিভাগের স্থান মাত্রিকা সংখ্যা অধিকার করিল। এই বর্গ-বিভাগে সকল শব্দকে এক হইতে সপ্তদশ মাত্রিকার সমষ্টির বর্গে ভাগ করা হইয়াছে।

মাত্রিকা লিপির প্রচলন হইলেও, 'লি শু' বা 'কাই শু' লিপি চীনের লিপিসংস্কারে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কারণ মাত্রিকালিপিতে ধ্বনির জন্য পৃথক পৃথক মাত্রিকা প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ পারসীক বা অন্যান্য শূলমুখ মাত্রিকা লিপিতে যেমন এক-একটি মাত্রিকা বা রেখা-সমষ্টি এক-একটি অক্ষর, চীনা 'লি শু' বা 'কাই শু'তে তাহা হয় নাই। চীনের এই লিপি সংস্কারকে বড় জোর শূলমুখ লিপির প্রথম অবস্থার সহিত তুলনা করা চলে। কারণ সুমেরীয় লিপি বা অন্যান্য শূলমুখ লিপির প্রথম অবস্থায় মাত্রিকা বা রেখাগুলিকে চিত্রলিপির আকারেই সাজাইয়া মাত্রিকা-প্রতীক সৃষ্টি করা হইত। চীনেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। মাত্রিকাগুলিকে প্রাচীন চিত্রাক্ষর বা 'সিয়াও চুয়ান' প্রতীকের আকারেই সাজাইয়া নূতন মাত্রিকা বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রকার লিপি সংস্কারের ফলে মাত্রিকাগুলি কোন্ কোন্ সমষ্টিতে কোন্ কোন্ বর্ণ বা অক্ষর হইবে বা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। যেন কতকগুলি বাঁধাধরা শব্দ প্রস্তুত হইয়া রহিল, যাহাদের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কোনও তথ্যই উদ্ভাবক ব্যতীত কাহারও জানিবার উপায় নাই।

শূলমুখ লিপির প্রথম অবস্থায় এইভাবেই মাত্রিকা বা রেখা সাজাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও পরবর্তী পারসিক, এশিরীয় বা মিত্তীয় শূলমুখ লিপি পদ্ধতি প্রাচীন চিত্রাক্ষরের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছিল। শূলমুখ মাত্রিকা লিপি সম্পূর্ণরূপেই বর্ণাত্মক বা অক্ষরাত্মক। চিত্রাক্ষরের সহিত একসঙ্গে মাত্রিকা বা রেখা লিপির ব্যবহার মহেঞ্জোদরোর ও হিটাইট লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চীনা বা সুমেরীয় লিপি ক্রমবিকাশের এক বিশেষ অবস্থাতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। পরের অবস্থা ইহারা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুমেরীয় ও চীনা লিপি অক্ষরাত্মক না হইয়া ভাবাত্মক (Ideographic) অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।

এই অর্ধপথে থামিয়া যাওয়া সুমেরীয় এবং চীনা লিপি যেভাবে সংস্কৃত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য লিপি সংস্কৃত হয় নাই। সেইজন্য অনুমান হয় যে, জাতি সর্বপ্রথমে ভাবদ্যোতক প্রতীককে (Ideograms) অক্ষরাত্মক প্রতীকে (Phonograms) পরিণত করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই আধুনিক অক্ষরের স্রষ্টা।

চীন দেশের লিপির ন্যায় ভাষাও কম প্রহেলিকাময় নহে। এই ভাষাতে একধ্বনি শব্দের বহুল ব্যবহার রহিয়াছে। ভারতীয় শব্দশাস্ত্র আলোচনাতে জানা গিয়াছে যে, ভারতেও এককালে একধ্বনি শব্দের প্রচলন ছিল। একাক্ষর কোশ, মাতৃকানিঘণ্টু প্রভৃতি অভিধান সেই প্রাচীন একধ্বনি ভাষারই সন্ধান দিয়া থাকে। ভারতের ভাষা ক্রমবিকশিত হওয়ার ফলে প্রাচীন একধ্বনি শব্দ ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও এখনও দুই-চারিটি একধ্বনি শব্দ ভাষাতে বর্তমান থাকিয়া প্রাচীন ভাষাতে যে একধ্বনি শব্দ এককালে ব্যবহৃত হইত, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চীন দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল বলিয়া প্রাচীন ভাষার পরিবর্তন হইতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগিতেছে।

হিন্দুকোডে বিবাহে নববিধান

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুকোডের কথা প্রায় সব হিন্দুই কিছু না কিছু শুনেছেন। এই নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা, বহু সভা-সমিতি, অনেক তর্ক-বচসা, মনোমালিন্য, কথা-কাটাকাটি,—এমন কি হাতাহাতি, মারামারি পর্যন্তও হয়ে গেছে। কিছুদিন এসব ঠান্ডা ছিল; কিন্তু ঘুমন্ত শিশুর মতন অসময়ে জেগে উঠে, এই হিন্দুকোড আবার উপদ্রব করতে শুরু করেছে। কেননা, এই কোডটি ভারতীয় পার্লামেণ্টে পাশ হবার জন্য অপেক্ষা করছে; একদল প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন যাতে এই অধিবেশনেই এটাকে পাশ করান যায়। আর একদল চেষ্টা করছিলেন এ সম্বন্ধে পুনর্বার ধীরে-সুস্থে, ভাল করে বিচার করার জন্য যেন এটা মুলতুবী থাকে। শেষ পর্যন্ত স্থগিতই রইল। বোধ হয়, শেষের দলের আসল মনোগত ইচ্ছা যেন এটা শেষ পর্যন্ত একেবারেই পাশ না হয়।

হিন্দুকোডের যাঁরা জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন যে, সনাতনী হিন্দু আইনের সবটাকেই তাঁরা রাতারাতি সংশোধন করে ফেলতে চান না। তবে কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে পুরোণো হিন্দু আইনের সংস্কার এখুনি দরকার; নতুবা পৃথিবীর ভদ্রসমাজে ভারতবর্ষের আর মান থাকে না। যে দুটো বড় ব্যাপারে এঁরা হাত দিয়েছেন, তার একটা হচ্ছে বিবাহ; আর একটা হচ্ছে দায়াধিকার বা উত্তরাধিকার। এ দুটো ব্যাপারেই তাঁরা স্ত্রীজাতির উপর সদয় হয়ে তাঁদের বর্তমান অবস্থা থেকে আইনের দ্বারা, উন্নতির একেবারে চরম সীমায় নিয়ে যাবার সংকল্প করেছেন।

আর স্ত্রীজাতিদেরও হিন্দু আইনের এই দুটি বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ থাকবার কথা। কারণ, বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের বাদ দিয়ে কাজ চলা একেবারেই অসম্ভব; আর উত্তরাধিকার বিষয়ে মেয়েদের স্বার্থ পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে এক বিন্দুও কম নয়। হিন্দুকোডে অবশ্য অন্যান্য বিষয়েও দু-চার কথা বলা আছে, কিন্তু সেগুলো তেমন মারাত্মকও নয়, আর খুব এমন কিছু বড় ব্যাপারও নয়,—যা নিয়ে মাথা-ঘামাবার দরকার। সুতরাং ঐ দুটি বিষয়ই—বিবাহ এবং দায়াধিকার—আলোচনাযোগ্য। পুরুষদের (অবশ্য আইনজ্ঞ পুরুষ ছাড়া) কাছেও, ঐ একই কারণে, অন্যান্য বিষয়গুলি ছেড়ে, এই দুটোই বেশী উপাদেয় বস্তু হবে।

আমাদের দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা বার বার করে বলে গেছেন, শ্রুতির পরিবর্তন হয় না; দেশ-কাল-পাত্র ভেদে স্মৃতিরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দেখা যায়, এই পরিবর্তন বরাবরই অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়েছে। পূর্বের কোন কিছু হঠাৎ বদলাতে গেলে, মানুষের মনে কেমন একটা স্বাভাবিক আশঙ্কার উদয় হয়। এই আশঙ্কা থাকে বলেই, অনেক সময় হঠাৎ নতুন কিছু করে বসবার ঝোঁকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালের আইন সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে, এই স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রগুলো, স্মৃতিরই কতকগুলো সংগ্রহগ্রন্থ বা নিবন্ধ, আর সেই স্মৃতিরই উপর বিভিন্ন লোকের লেখা, টীকা-টীপ্পনী, ক্রোড়পত্র,—এইগুলোই নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে হয়। বৈদিক যুগে স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমাজ তখন ভাসমান অবস্থায় টলটল করছে; দানা বাঁধতে পারে নি। সুতরাং ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধি-বিধান তখনকার সে সমাজে আবশ্যক ছিল না। পরে যখন ব্রাহ্মণ্য যুগে ভারতীয় সমাজ বেশ গুছিয়ে বসল, তখনই বড় বড় স্মৃতিকারেরা ধর্মশাস্ত্রের সূত্রগুলো দিয়ে সমাজকে বন্ধন করলেন; যাতে কেউ স্বেচ্ছাচারে না চলে। যাতে সকলের কল্যাণ হয়, যেন তেমনি আচারে চলে,—যাকে এক কথায় সদাচার বলা হয়।

ব্রাহ্মণ্য যুগের সবচেয়ে বড় স্মৃতিকার হচ্ছেন মনু। এঁর পরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক রকমের স্মৃতি দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাল রক্ষা করতে গিয়ে, অনেক রকমের প্রাদেশিক ব্যাবহারিক শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তবে সকলেরই এক কথা যে, মনুসংহিতার বিধানের সঙ্গে, এই সব নতুন নতুন স্মৃতির কোন জায়গায় যদি বৈষম্য দেখা দেয়, তাহলে সেই সব বিরুদ্ধকালে, কিম্বা সংশয়ের স্থলে, মনুর বিধানই সর্বদা শিরোধার্য করে নিতে হবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-ব্যবহারগত প্রভেদের জন্য, মূল স্মৃতির উপর ভিত্তি করে, যে সব স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাবহারিক শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়েছিল, সেগুলোকে একে একে ধরলে, সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি শাখায় ভাগ করা যায়। শাখাগুলোর নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশের নাম অনুসারে। যেমন—কাশী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র (এখন বোম্বাই), দ্রাবিড় (এখন মাদ্রাজ), আর গৌড় বা বাঙলা। বাঙলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী দেশগুলির ইদানীন্তন ব্যবহারশাস্ত্রীয় বড়ো স্মৃতি হচ্ছে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকা-গ্রন্থ, মিতাক্ষরা। এরই উপরকার টীপ্পনি প্রভৃতি সম্বলিত প্রাদেশিক ছোটখাটো স্মৃতিগুলোর মধ্যে প্রভেদ, মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত বচনের বিভিন্ন রকমের মানে বা ব্যাখ্যা করার জন্য। সেই কারণে, কোন কোন জায়গায় একটু-আধটু ভিন্ন রকমের হলেও, এই সব আলাদা আলাদা অঞ্চলের হিন্দু আইন মোটের উপর একই ধারার অন্তর্গত।

সবচেয়ে প্রভেদ হচ্ছে কিন্তু বাঙলা দেশের সঙ্গে। ব্যবহারশাস্ত্রে বাঙলা দেশের একেবারে নিজস্ব প্রধান স্মৃতিকার হচ্ছেন জীমূতবাহন; তাঁর রচিত পুঁথির নাম দায়ভাগ। খৃষ্টীয় ১২ শতকের লেখা বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

বিজ্ঞানেশ্বরের রচিত স্মৃতি মিতাক্ষরা, প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিরই একটি বিস্তৃত টীকা। খৃষ্টীয় ১১ শতকের লেখা বলা হয়। এই মিতাক্ষরাকেই একপ্রকার সমগ্র ভারতবর্ষের আইন বলা যেতে পারে। এমন কি, যেখানে বাঙলা দেশের আইন দায়ভাগ কোন উচ্চবাচ্য করেন নি, সেখানে বাঙলা দেশেও মিতাক্ষরার বিধানই বলবৎ হবে।

ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁরা বলেন যে, বাঙলাদেশ বরাবরই সমস্ত ভারতবর্ষের থেকে একটু সৃষ্টিছাড়া রকমের। বাঙলাদেশের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরা, জাতিবিভাগ, পূজা-পার্বণ এমন কি দেব-দেবী সবই, বাকী ভারতবর্ষের থেকে কিছু না কিছু তফাৎ। বাঙলাদেশে সন্যাসী আচার্যদের কোন-কালেই বড় খাতির ছিল না, বাঙলার নব্য-ন্যায় বাঙলারই নিজস্ব, বাঙলাদেশের কীর্তনের সুরও বাঙলার বাইরে চলিত নয়। সুতরাং বাঙলা-দেশের আইনও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে ভিন্ন হবে—এতে আর আশ্চর্য কি?

সারা ভারতবর্ষের আইনের উপর জীমূত-বাহন তাঁর দায়ভাগ দিয়ে কলম চালিয়ে গিয়েছেন। আইনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো পার্থক্যের মধ্যে, সবচেয়ে বড় প্রভেদ সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলাদেশের হচ্ছে, মোটা-মুটি দুটো বিষয়ে। এক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে, আর এক স্ত্রীলোকদের নিজস্ব সম্পত্তি—যাকে

স্ত্রীধন বলা হয়—সেই সম্পর্কে। একটু অবান্তর হলেও এই প্রসঙ্গে ওই দু' বিষয়ে অন্তত ইঙ্গিতেও কিছু বলতে হয়। মিতাক্ষরা আইনে, পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত ধনের থেকে, কিম্বা পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা অর্জিত নবলব্ধ সম্পত্তির থেকে, কোন লোক তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিকে বঞ্চিত করতে পারেন না; জন্মমাত্রেই তাঁরা সেই সব ধনে এক একটা অংশের ভাগী হন। কিন্তু বাঙলাদেশের নিয়ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙলাদেশের বাপ, পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি একবার হস্তগত করতে পারলেই, পুত্র-পৌত্রাদিকে তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, যাকে ইচ্ছা তাকে সেই সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেন,—এতে কোনই বাধা নেই।

পণ্ডিতেরা বলেন, এর একটা মানে আছে। বাঙলাদেশের বাইরে জমি এদেশের মত তত উর্বরা নয়। সেখানে মাটির থেকে জীবিকার উপায়স্বরূপে ফসল উৎপন্ন করার জন্য, বহু-সংখ্যক লোকের একত্র পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সকলকেই সম্পত্তিতে কিছু কিছু ভাগ দিতে হয়। না দিলে, তাঁরাই বা কেন যৌথ পরিশ্রম করতে স্বীকার করবেন? বাঙলাদেশে এর ঠিক উল্টো। একাই কোদালের এক কোপে মাটি কেটে, শস্য উৎপাদন করা বাঙলাদেশে কিছুই দুষ্কর নয়। সুতরাং এখানে লোকে একটু স্বাধীন প্রকৃতির হবেই না বা কেন? পণ্ডিতেরা দেখান, মুসলমান আইনে এতগুলো ভাগীদার কেন?—এর একমাত্র কারণ যে আরব দেশে ধনসম্পত্তি বলতে গেলে যা বোঝাত, সে সবই ছিল অস্থাবর,—খেজুর, মণিমুক্তা, কার্পেট এই সব ত ছিল সেখানকার মূল্যবান জিনিস। বহুভাগে হবার পক্ষে কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষের মতন কৃষিজীবী দেশে এসে বাস করলেন, তখন তাঁদের এই আরবী আইনের ফলে বহু ভাগীদার হওয়ায়, তাঁদের জমিজমা বিক্রী করা, বন্ধক দেওয়া বিশেষ কষ্টকর হোল। অংশীদার অনেক বলে, সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়েও যায় অনেক ভাগে। সমৃদ্ধির চেয়ে ক্ষয় হয় অনেক বেশী। সম্পত্তি মজুদ রাখবার জন্য, তাঁদেরও আইনকে ফাঁকি দিয়ে, আমাদেরই দেশের দেবোত্তরের মতন, সম্পত্তি পীরোত্তর বা ওয়াকফ্ করার প্রথায় সৃষ্টি করতে হোল। বোধ হয়, এইসব দেখেই পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষকে যখন বিচিত্র রকম করেই ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তখন তার সব জিনিসেই বৈচিত্র্য থাকবে,—এ তো ধরা কথা।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দায়ভাগ একটু উদার-ভাব দেখিয়েছেন। জীমূতবাহনের মতে, স্ত্রীধন সত্যই স্ত্রীলোকের নিজস্ব ধন। অর্থাৎ স্ত্রীধনের উপর স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ অধিকার। তাই দিয়ে তাঁরা দান-ধ্যান করতে পারেন, সেটা বিক্রী করতে, বন্ধক দিতে পারেন। মিতাক্ষরা কিন্তু এ সম্বন্ধে যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, আত্মীয়দের, কাছে দানে পাওয়া সম্পত্তি ছাড়া, অন্য স্ত্রীধন সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ অধিকার নেই। দান বিক্রী করতে গেলে বা বন্ধক দিতে গেলে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন।

এইখানেই বলে ফেলা ভাল যে, হিন্দু-কোডের কর্তারা স্পষ্টই অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁরা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা একই রকমের আইন প্রচলনের ইচ্ছা করেছেন। এতদিনে হাজার হাজার বছর ধরেও, ভারতবর্ষে যা কেউ করতে পারেন নি, তাই তাঁরা করবার চেষ্টায় আছেন। যদি এটাকে তাঁরা গায়ের জোরে, বাস্তবিকই সম্ভব করে তুলতে পারেন, তাহলে একটা অসাধ্য সাধন করা হবে বটে। শুধু তাই নয়; এই একাকার করার চেষ্টায় হিন্দুকোডে অনেক অহিন্দুকেও হিন্দু বানান হয়েছে। হিন্দুকোডের নতুন হিন্দু আইনের বিধানে,—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সব এক; সবাই হিন্দু আইনের বশবর্তী হবেন। আবার ছোট ছোট সব সম্প্রদায়ই আইনের চোখে এক হয়ে যাচ্ছে। নতুন হিন্দু আইন—বীরশৈব, লিঙ্গায়েৎ, ব্রাহ্মসমাজী, আর্যসমাজী, প্রার্থনা-সমাজী সকলেরই উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে মুসলমান, ইহুদী বা খৃষ্টানরা এখনও এই আইনের খপ্পরে পড়েন নি। তাঁদের নিজেদের আলাদা আলাদা যে সব আইন আছে, সেই আইন মতনই তাঁরা চলতে পারবেন।

প্রচলিত সাধারণ হিন্দু আইন কিন্তু এ সম্বন্ধে এত বেশী সতর্ক যে, ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত মিতাক্ষরা আইনের বশবর্তী কোন লোক, যদি বাঙলা মুলুকে এসে, বরাবরের জন্য বসবাস করেন, তবুও তিনি তাঁর সেই মিতাক্ষরা আইনই অনুসরণ করবেন। আবার কোন বাঙালী যদি বাঙলা দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও গিয়ে বাসিন্দা হন, তাহলে দায়ভাগের আইনও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটবে।

কোন আইন কি রকমটা দাঁড়াতে যাচ্ছে, সেটা ভাল করে বুঝতে হলে, সে আইনটা যে কি রকম ছিল এটা জানলে, বোঝবার পক্ষে একটু সুবিধা হয়। অর্থাৎ জিনিসটার ইতিহাস জানা থাকলে, জিনিসটার স্বরূপে সহজেই বোধ-গম্য হতে পারে। বৈদিক যুগে আইনের কোন সুস্পষ্ট চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা যাকে আইন বলে মানি, সেইরকম আইন অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড, অনেক পরের কালের সৃষ্টি।

আর্য পিতামহরা যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল খুবই কম; একেবারে ছিল কিনা, অনেক পণ্ডিতেরা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা এদেশের আদিমবাসীদের মধ্যে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেইজন্য বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ বাছবিচার, বা কোন ধরাকাটা বিধি-নিষেধ এমন কিছু বৈদিককালে দেখতে পাওয়া যায় না। বহু বিবাহ ত' ছিলই, কারণ তখন প্রজা-বৃদ্ধি করার সময়; এমন কি, বিধবা-বিবাহও কোন দূষণীয় ছিল না। দেবর কথার থেকেই ত দেখা যাচ্ছে, মৃত স্বামীর ছোট ভাইকে দ্বিবর, অর্থাৎ দ্বিতীয়বর বলে, মনে করা হোত। দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বেশ উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করতেন। এই সময়ে বাল্য-বিবাহের কথা নজরে পড়ে না। জাতি ইত্যাদির তখন ত সৃষ্টিই হয় নি।

এর পর আর একদল যে আর্যরা আসেন, তাঁরাও বোধ হচ্ছে, ঐ রকম স্ত্রীবিবর্জিত অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁরা এসে পূর্বকার আর্য ও আদিমবাসীদের বিবাহজনিত কন্যা-সন্তানদের স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে, সুখে বসবাস করতে লাগলেন। তবে একটা কথা,—বৈদিককালেও আর্য পিতামহীদের আজকালকার মেয়েদেরই মতন সপত্নী-বিদ্বেষ ছিল। ঋগ্বেদে সপত্নী-কণ্টক দূরে করবার জন্য কয়েকটি মন্ত্রে রচিত গোটা একখানা স্তবই আছে। অথর্ববেদেও এ সম্বন্ধে অনেক মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, যাগ-যজ্ঞের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

মহাভারতে গল্প আছে, উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু ভারতবর্ষে প্রথম জাতি বা বর্ণভাগ করে, সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটা যদি নিছক আখ্যায়িকা না হয়, তবে বৈদিক যুগের অনেক পরে ভারতবর্ষে বর্ণ বা জাতিগত সমাজ সৃষ্ট হয়।

উত্তরাধিকারের বেলায়ও তাই। এ সম্বন্ধেও বৈদিক যুগের কোন স্পষ্ট নিয়মকানুন নাই। আর থাকবেই বা কেন? তখনকার দিনে জমির ত এত খাঁকতি ছিল না। আর বাকী সম্পত্তি আর্য পিতামহদের কিই-বা ছিল?—কিছু গরু, কৃষিকার্যের জন্য সাধারণ কয়েকটি যন্ত্রপাতি, আর সামান্য কিছু যজ্ঞপাত্র ও তৈজস-পত্র। এর উত্তরাধিকার নিয়ে আর মাথা ঘামায় কে?

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য যুগেই আসল আইনের উদ্ভব হয়। এই সময়কার বড় বড় ঋষি-মুনিরা রাতদিন ধরে ভেবে-চিন্তে বড় বড় সংহিতার সৃষ্টি করে ফেল্লেন। এ'দের মধ্যে মনু ছিলেন সর্বপ্রধান। আরও অনেকের মধ্যে উনিশজনের নামই প্রধানত উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য (বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা এ'রই সংহিতার টীকা), বৃহস্পতি, পরাশর, বিষ্ণু, নারদ—এই সব মুনির সংহিতা-গুলোই সুপ্রসিদ্ধ। সংহিতা নামক এইসব স্মৃতির পুঁথির থেকেই, সেকালের আইনের চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর সেই সময় থেকে খৃষ্টীয় ১৬ শতক পর্যন্ত, একের পর এক ক্রমাগত স্মৃতির গ্রন্থ, নিবন্ধ গ্রন্থ, টীকা-টিপ্পনী, আবার তস্য অনু-টীকা-টীপ্পনী লেখা চলে এসেছে। কিন্তু ব্যাখ্যায় কিছু কিছু তারতম্য থাকলেও, পরবর্তী সব স্মৃতিকাররাই পূর্ববর্তী সংহিতাগুলিকে প্রমাণ বলে মেনে, তাদেরই দোহাই বার বার দিয়ে এসেছেন। এই কারণে ব্রাহ্মণ্য যুগের আইনের সঙ্গে, ইংরেজ রাজ্য ভাল করে আরম্ভ হবার পূর্বের পর্যন্ত হিন্দু সমাজের আইনের মধ্যে, মূলত বিশেষ কোনই প্রভেদ নেই। ইংরেজদের আমলে হিন্দু আইনের কিছু কিছু সনাতনী নিয়ম বদলেছে বটে; কিন্তু সে সব বদল করা হয়েছে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে। ইংরেজরা ভাল করে রাজ্য চালাবার ইচ্ছায়, এদেশের ধর্ম কর্ম, সামাজিক আইনকানুনের উপর হস্তক্ষেপ করতে বড়ই নারাজ ছিলেন' সেইজন্য যা কিছু সামাজিক আইন খৃষ্টীয় ১৮ শতক থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেগুলো ইংরেজদের মধ্যস্থতায়, দিশী লোকদের দ্বারাই সম্পন্ন করান হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতির সৃষ্টি হলেও, এবং ভারতবর্ষীয় সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত করা হলেও, বিবাহ ব্যাপারে জাতের কড়াকড়ি তখনও খুব কঠিন হয়ে ওঠে নি। তবে এই বলা হয়েছে যে, প্রথম বিবাহ স্বজাতির মধ্যেই করা বাঞ্ছনীয়। তারপর আবার বিবাহে প্রবৃত্তি হলে, উচ্চ বর্ণের পুরুষে নিম্ন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন। যেমন ব্রাহ্মণ-কুলের পুরুষ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন; আবার ক্ষত্রিয় পুরুষ, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা এবং বৈশ্য, শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন। এই রকম বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হোত। কিন্তু এইরকম বিবাহ ব্রাহ্মণ্য সমাজে কিছু দৃষ্টিকটু ছিল, এবং এই প্রকার বিবাহের সন্তানদের নীচোদ্ভব বলে অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিলোম বিবাহ,—অর্থাৎ নিম্ন বর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের কন্যার বিবাহ,—ব্রাহ্মণ্য সমাজে অচল এবং অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ব্রাহ্মণ্য যুগের পরবর্তী হিন্দু সমাজে, বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির মধ্যে বিবাহ, কালক্রমে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ, সামাজিক দিক থেকে অপ্রশস্ত হলেও, আইনের চোখে একেবারে অসিদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণকুলের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিকে বিবাহ; এ সম্বন্ধে লোকেদের বিশেষ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, এ রকম বিবাহ বেআইনী নয়। আবার শূদ্র জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয়, এবং বৈদ্যরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করলেও, আইনের মতে তাঁরা শূদ্র। সুতরাং বৈদ্য-কায়স্থে বিবাহ অসিদ্ধ নয়। পূর্বাঞ্চলের অনেক জায়গায়, যেমন মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে, ঐরকম বিবাহ হামেশা হাল হতে দেখা যায়। কয়েকটি মামলায় জজের রায়ে, কায়স্থর সঙ্গে ডোম, কায়স্থ-তাঁতি, কায়স্থ-শুঁড়ি, এই-রকম বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ, আইন-সঙ্গত বিবাহ বলেই স্থির হয়ে গেছে। বাঙলাদেশে বৈশ্যবৃত্তি যাঁদের, তাঁরাও শূদ্রের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছেন।

বর্ণ বা জাতিগত বাধা ছাড়াও, ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাবে হিন্দু সমাজে বিবাহে আরও কয়েকরকম বাধা আছে দেখা যায়। একই গোত্রের, একই প্রবরের মধ্যে, বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্র হচ্ছে একরকম সম্প্রদায়ের মতন। অর্থাৎ যাঁরা একটি কোনো বিশেষ ঋষির থেকে নিজেদের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন, তাঁরা সকলেই এক গোত্রীয়। আটজন ঋষির থেকে প্রধান আটটি গোত্র উৎপন্ন হয়েছে,—জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য—এই আটজন ঋষিই প্রধান গোত্রকারী। সুতরাং, ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় কন্যা বিবাহ করতে পারেন না। সেইমতন আবার কাশ্যপ গোত্রীয় বর, কাশ্যপ গোত্রীয় কনে বিবাহ করতে পারেন না। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকদের আসলে গোত্র নেই। কিন্তু তাঁরাও নিজেদের নিজেদের গুরু পুরোহিতদেরই গোত্রকে আপন আপন গোত্র বলে চালিয়ে দিয়েছেন। প্রবর হচ্ছে এক এক গোত্রের মধ্যে, সেই সেই গোত্রের প্রধান প্রধান মুনিদের নাম অনুসারে, তাঁদের বংশ-ধরদের চিহ্নিত করে রাখবার এক উপায়। যেমন ভরদ্বাজ গোত্রে, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য এই তিন প্রবর; কাশ্যপ গোত্রে, কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব এই তিন প্রবর। সাধারণত গোত্র পিছু তিনটি করে প্রবর থাকে; কোনো কোনো গোত্রে পাঁচটি পর্যন্ত প্রবরও পাওয়া যায়। এখন ভরদ্বাজ গোত্রের আর কাশ্যপ গোত্রের প্রবর যদি এক হোত, তাহলে এই দুই গোত্রীয় স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ চলত না। যেমন বাৎস্য ও সাবর্ণ উভয় গোত্রের একই প্রবর—ঔর্ব, চ্যবন, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। আর সেইজন্য, বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঘোষালদের সঙ্গে, সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলীদের বিবাহ করণকারণ চলে না। উপরের উদ্ধৃত আটটি প্রধান গোত্র ছাড়া, আরও অনেক গোত্র আছে। যেমন,—শাণ্ডিল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, মৌদ্গল্য, সৌকালিন ইত্যাদি। এঁরাও এক একজন বড় কম মুনি ছিলেন না।

হিন্দু যে অহিন্দুকে বিবাহ করতে পারে না, এত সকলের জানা কথা। কিন্তু হিন্দু যে কে, আর কে যে নয়, সেটা পরিষ্কার করে বলা শক্ত। এর এক ব্যাঁকা জবাব আছে,—যাঁরাই হিন্দু আইনের বশবর্তী—তাঁরাই হিন্দু। জবাবে হয়ত অনেকে সন্তুষ্ট হবেন না, কিন্তু আমি নিরুপায়।

হিন্দুকোড আইনে পরিণত হবার আগেই, ধর্মগত, বর্ণগত, গোত্রগত, প্রবরগত, এ রকম সব বাধাগুলি, বিশেষ বিশেষ আইন বা অ্যাক্ট পাশ হওয়ার দরুণ, এখন অনেকটা উঠে গেছে। ১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন,—যা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় পাশ হয়,—এই আইনের পদ্ধতিতে, জাতি, গোত্র, প্রবর না বিচার করেও বিবাহ করতে ইচ্ছা হলে, বৈধ বিবাহ করতে পারা যায়। এই আইন অনুসারে হিন্দুদের হিন্দু নই বলে স্বীকারোক্তি করতে হয় দেখে, স্যার হরিশঙ্কর গৌড় চেষ্টা করে ১৯২৩ সালে ৩০ নম্বরের আইনের দ্বারা আর এক বিবাহের পদ্ধতি চালু করান। এই আইনের মতে বিবাহ পদ্ধতিতে, হিন্দুকে আর অহিন্দু বলে পরিচয় দিতে হয় না। পরিশেষে হিন্দুবিবাহে সগোত্র ও সপ্রবরের যে দুটো বাধা ছিল, তাও কেটে গেছে—১৯৪৬ সালের ২৮ নম্বরের আইন দিয়ে। তারপর আর যা কিছু বাকী ছিল,—অর্থাৎ জাতধর্ম,—তাও গেল, ১৯৪৯ সালের ২১ নম্বরের আইনে। এখন ভিন্ন ধর্মে, ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন উপজাতিতে, ভিন্ন সম্প্রদায়ে, কোনটাতেই হিন্দু বিবাহ আইনের চোখে অসিদ্ধ নয়। এখানে ধর্ম বলতে শিখ ও জৈন ধর্ম বোঝাচ্ছে।

পর পর এতগুলো আইনের কথা শুনে ধৈর্যহারা হয়ে, যদি কেউ প্রশ্ন করে বসেন,—তাহলে সনাতন হিন্দু আইনের আর রইল কি? —তাহলে শুধু এইটুকুই বোলব যে, এই প্রশ্নটা একেবারেই অসঙ্গত নয়। কিন্তু এ প্রশ্ন আমাকে করলে, আমি তার সদুত্তর দিতে পারব না। তবে এইমাত্র বলতে পারি, এসব আইনে কোনরকম বাধ্যবাধকতা নেই। যাঁর ইচ্ছা তিনি এইসব মতে চলতে পারেন, আবার যাঁর অন্য ইচ্ছা, তিনি সনাতনী মতেও চলতে পারেন। দুদিকেই পথ খোলা আছে।

কিন্তু এসব আইনে এত সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও, হিন্দুদের মন থেকে বিবাহ ব্যাপারে জাতির সংস্কার, উঠি উঠি করেও উঠে যায়নি। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে এ সংস্কার দেখছি প্রায় চলে গেছে; কিন্তু বিয়ের বেলা যেন কেমন মন খুঁত খুঁত করে,—এ সংস্কার যেন মরেও মরে না। এমন কি, হিন্দু থেকে যাঁরা ক্রীশ্চান হয়েছেন, ব্রাহ্ম হয়েছেন,—বাহিকে হাজারও জাত-মানি না বল্লেও, তাঁদেরও মনের গহন কোণে বিবাহের বেলায় এই জাতের সংস্কার এখনও বেশ রয়ে গেছে। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করি। এই দুটিই আমার স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা। একটি ছেলেবেলাকার কথা, আর একটি এই সেদিনকার।

কোলকাতার এক প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশের এক শাখা একসময়ে ক্রীশ্চান হয়ে যান। এ'দের বংশে বহু কৃতবিদ্য, গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন। এ'দের একজন আমার এক খুড়োমশায়ের সঙ্গে একত্র চাকরী করতেন। খুড়োর প্রতি প্রণয় বশত আমাদের বাড়িতে এ'র প্রায়ই আসাযাওয়া ছিল। সে সময় আমাদের আলাদা পড়বার ঘর ছিল না। বাবা খুড়োদের বৈঠকখানায় জাজিম-পাতা তক্তাপোষেরই উপর এক ধারে বসে, আমাদের লেখাপড়া চলত। ক্রীশ্চান ভদ্রলোকটি একদিন দেখি খুড়োমশায়কে প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলছেন, দেখুন রমণীবাবু, আমরা হলুম কায়স্থ ক্রীশ্চান, আর আমার মেয়ে কিনা তাঁতি ক্রীশ্চানকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! কথা-গুলোর মানে তখন অবশ্য ভাল করে বুঝিনি; কিন্তু সেগুলো এত অদ্ভুত শুনতে লেগেছিল যে, এতদিন পর্যন্ত তা বেশ মনে আছে।

আর একটি লোক,—ইনি দাক্ষিণাত্যের দিশী ক্রীশ্চান—আমার কাছে একবার বৈষয়িক পরামর্শের জন্য এসেছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, তাঁর ছেলে নাকি এক নীচু জাতের ক্রীশ্চান মেয়েকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি যদি তাঁর ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলি, তাহলে সেই ছেলে এই কুকার্যের থেকে নিরস্ত হতে পারেন। আমি বললুম, সে কি মশায়! আপনি তো ক্রীশ্চান—আপনার আবার জাত সম্বন্ধে অত ভাবনা কেন? ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি স্যার, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ-ক্রীশ্চান। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্রীশ্চান ছাড়া অন্য ক্রীশ্চানে বিয়ে করাটা এক অতিশয় কদর্য ব্যাপার।

আমি দু-এক ঘর ব্রাহ্ম পরিবারেও দেখেছি, তাঁরা জাত না মানলেও, বিবাহের সময় স্বজাতীয় ব্রাহ্ম পাত্রপাত্রীর খোঁজ করেন। আমার এক মুসলমান প্রজা (তিন পুরুষে মুসলমান) কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন দেখে, আমি তাঁকে বলেছিলাম, সে কি! তুমি ত মুসলমান, তোমার আবার কালীপুজো কেন? তিনি বললেন, মুসলমান হয়েছি বলে কি মা-কালীর পুজোটাও দেবো না? জাতির সংস্কারের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, হিন্দুদের মুসলমান পীরের দরগায় সিন্নি দেওয়াটা এখনও ধর্মে বাধে না। আগেকার কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও যুদ্ধে জয়লাভ করে, কিম্বা বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্যে, কালীঘাটে পুজো দেবার ব্যবস্থা করতেন। একথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এবার আরও ক'টা বাধার কথা বলি। হিন্দু-মতে সপিন্ড বিবাহ, নিষিদ্ধ বিবাহের মধ্যে। নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহটা অনেক সমাজেই আপত্তিকর। হিন্দু সমাজে বিবাহ ক্ষেত্রে, বাপ-মায়ের সাত পুরুষ বাদ দিলেই, সপিন্ড দোষ খণ্ডন করা যায়। বাঙলা দেশে রঘুনন্দনের মতে কার্যত তিন গোত্র পার হয়ে গেলেই, বিবাহে আর সপিন্ড বাধা থাকে না। রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও, বিবাহ-সূত্রে কাউকে কাউকে সপিন্ড বলে গণ্য করা হয়। যেমন খুড়ি, মামী, মেসো, পিসে।

নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কিন্তু নানা দেশে নানা মত। পূর্বকালে মিশর দেশের রাজা ফ্যারোরা নিজেদের ভগ্নীদের বিবাহ করতেন। ঋগ্‌বেদে যম তাঁর ভগ্নী যমীতে সমাগত হবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন দেখা যায়। ইংরেজী সমাজে এতদিন রক্তের সম্পর্কহীন শ্যালীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল; আইন পাশ করে সেটা উঠিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো, খুড়তুতো ভাই-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহেতে কোন আপত্তি বা বাধা নেই। আইনেও নয়, রুচির দিক থেকেও নয়। মুসলমান সমাজেও ঠিক তাই। এদেশে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে, মামাতো ভগ্নী বা পিসতুতো ভগ্নী বিবাহ করা, অতি-প্রশস্ত বিবাহ। মহাভারতে দেখা যায়, স্বয়ং সব্যসাচী অর্জুন তো তাঁর মামাতো ভগ্নী সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন। উত্তর প্রদেশের জাঠেরা এক সময় তাঁদের নিজেদের বিধবা পুত্রবধূকে বিবাহ করতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে—যেমন উড়িষ্যায়, দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর প্রদেশের স্থানে স্থানে, বড় ভাইয়ের বিধবাকে বিবাহ করা দোষের নয়। এরকম অনেক দেশাচারগত বিবাহ আছে, যেগুলো কোনক্রমেই শাস্ত্রসম্মত নয়; তবে দেশাচার, লোকাচার, কুলাচার বলে আইনে চলে যায়।

আর এক রকমের বাধা আছে। সেটা আইনের বাধা নয়, বা রক্তের নিকট সম্বন্ধের জন্যও বাধা নয়; সদাচার হিসেবে পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ এর বিপরীত প্রকারে বিবাহ করলে, সেটা অসিদ্ধ হবে না বটে, তবে সমাজে নিন্দনীয়। যেমন ভদ্র সমাজে বিমাতার ভগ্নী, বিমাতার ভাইয়ের মেয়ে, খুড়ীর ভগ্নী, শ্যালীর মেয়ে, গুরুর মেয়ে, শিষ্যের মেয়ে, বিবাহে বাদ দেওয়ারই যোগ্য। তাছাড়া বয়সে বড় মেয়ে, বা মায়ের একনামধারী কন্যা, কিম্বা অলক্ষণা কন্যা—এসব সেকালে বিবাহের ব্যাপারে পরিত্যাজ্য ছিল, কিন্তু আইনে অবৈধ বিবাহ নয়। শুভ দিনক্ষণ দেখে বিবাহ করাটা সাধারণত প্রচলিত থাকলেও, যদি কেউ সেটা না মেনে, পাঁজি-পুঁথি না দেখেই বিবাহ করেন, তাহলে সে বিবাহও অসিদ্ধ বিবাহ হবে না। আবার বড় ভাই অবিবাহিত থাকতে, ছোট ভাই-এর বিবাহ, বড় ভগ্নীর বিবাহ না হলে, ছোট ভগ্নীর বিবাহ, এসব পুরাকালে অচল হলেও, অবৈধ নয়।

অলক্ষণা কন্যাদের লক্ষণ সম্বন্ধে মনু-মহারাজ কি বলেছেন, তা জানতে অনেকের কৌতূহল হতে পারে। তিনি বলছেন,—

> নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
> নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
> নালোমিকাং নাতিলোমাং
> ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥

অর্থাৎ—যে কন্যার চুল কটা, ছয় আঙ্গুল, যিনি রুগ্না, যাঁর লোম নেই (পুরুষের বেলায় মাকুন্দ), বা যাঁর অত্যন্ত বেশী লোম, যিনি বাচাল ও কর্কশভাষিণী, যাঁর চোখ কটা (বেড়ালের মতন)—এই সব কন্যা বিবাহের উপযুক্ত নন।

আবার নামেতেও সুলক্ষণ, কুলক্ষণ আছে,—

> নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
> ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥

অর্থাৎ—নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদীর নামে যে কন্যার নাম, কিংবা যাঁর ম্লেচ্ছ নাম, বা পাহাড়ের নাম, যাঁর পাখী, সাপ, দাসদাসীর নাম, যাঁর নাম অতি-ভীষণ, এসব কন্যাও বিবাহে যোগ্য পাত্রী নন।

একালে এত বাছাই করতে গেলে ত' গাঁ উজাড় হয়ে যাবে; অনেক সুযোগ্য পাত্রীও বাদ পড়ে যান। তবে আজকালকার দিনে ইচ্ছা করে কোন বাপ-মা কন্যাসন্তানদের ভীষণ নাম রাখেন না। কিন্তু পুরাকালে রামায়ণে শূর্পনখার বিবরণ পাওয়া যায়। বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে দানবজাতীয় এক সমান-সমান যোগ্য পাত্রে এ'র বিবাহ হয়েছিল। মহাভারতের হিড়িম্বার কথা অনেকেই জানেন। মধ্যম পান্ডব ভীমের সঙ্গে এ'র বিবাহ হয়। একজন স্ত্রী কবির—ইনি বেশ ভাল সংস্কৃত কবিতা লিখতেন,—নাম পাওয়া যায়—বিকট-নিতম্বা। এই নাম সত্ত্বেও এ'র কপালে ভাল বর জুটেছিল, ভরসা করি।

মোট কথা, বিবাহ একটা করা চাই। হিন্দু-শাস্ত্র বলেন, বিবাহটা একটা সংস্কার। দশটা সংস্কারের মধ্যেই একটা। সুতরাং পাপমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হবার জন্য, বিবাহটা সকলেরই পক্ষে অবশ্য করণীয়। মেয়েদের পক্ষে তো আরো দরকার; কারণ তাঁদের তো এই একটি বই অন্য সংস্কার নেই। শূদ্রদের বেলাও ঠিক তাই। শাস্ত্র মতে, তাঁরাও এই একই মাত্র সংস্কারের অধিকারী। বিবাহটা এত বড় একটা আবশ্যকীয় জিনিস বলে, হিন্দুসমাজে কানাখোঁড়া, বোবা-কালা, পাগলা-আধপাগলা, ক্লীব-নপুংসক—কারুরই বিবাহে বাধা নেই। এই কথা বিংশ শতাব্দীর বেয়াল্লিশ সালেও মান্দ্রাজ প্রদেশের জজেদের ফুলবেঞ্চের এক রায়ে বলা হয়েছে।

বিবাহ যখন সকলেরই করা উচিত, তখন সে কার্যটি সকাল সকাল সেরে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ। শাস্ত্র অনুসারে, পূর্বকালে পাঠ সমাপনান্তে বিবাহ করে গৃহস্থ হবার উপদেশ

দেওয়া আছে। তখনকার দিনে অধ্যয়ন শেষ করতে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হয়ে যেত। এখন দ্বি-জাতিদের—অর্থাৎ যাঁদের পৈতা হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের—উপনয়ন সংস্কার শেষ করে তবে বিবাহ সংস্কার করতে হয়। উপনয়ন সাধারণত আট বছর থেকে তের বছরের মধ্যেই হয়। কিন্তু মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স শাস্ত্র যা ভেবে-চিন্তে বলে দিয়েছেন, আজকালকার অনেকের মতে, সেটা তখন তাঁদের পুতুল খেলার বয়স। বস্তুত স্ত্রীজাতির আর শূদ্রজাতির বিবাহটাই একমাত্র সংস্কার বলে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোন সময়ই তাঁদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত সময়।

ছেলে বয়সের বিবাহ বন্ধ করবার জন্য, ১৯২৯ সালের ১৯ নম্বর আইনে—যাকে চলিত কথায় সর্দা এ্যাক্ট বলা হয়—বিবাহের বয়স ছেলেদের পক্ষে আঠার বৎসরের, আর মেয়েদের পক্ষে চৌদ্দ বৎসরের কম হতে পারবে না বলে বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁদের গৌরী-দান করে পুণ্যসঞ্চয় করার ইচ্ছা আছে, এই আইন সত্ত্বেও, তাঁরা ঠিক তাই করে চলেছেন। কারণ, এই আইনে ধার্য বয়সের চেয়ে কম বয়সের বিবাহ, একবার কোনক্রমে হয়ে গেলে, সেটা আর আইনমতে অসিদ্ধ বিবাহ হবে না। তাছাড়া এই আইন অমান্য করলে, অত্যন্ত লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা। আবার অন্য দিকে আইন থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষিত ভদ্র সমাজ থেকে অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা একেবারেই উঠে গেছে। সংশিক্ষা ও সুবুদ্ধির দ্বারাই মানুষের কল্যাণ হয়। আইনের দ্বারা যে মানুষকে সৎ করা যায় না—উৎসাহের বেগে অনেক আইনকর্তারাই তা ভুলে যান।

বাইওলজি নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা বলেন, বিবাহ ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীর বয়স, অন্ততপক্ষে সাত বছর কম হওয়া উচিত। দশ বছরের পার্থক্য হলেই ভাল হয়। তাঁরা কারণ দেখান, মেয়েরা পুরুষদের অনেক আগেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ-কারণটা সুষ্ঠু কারণ কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আইনে বিশেষ কোন বাধা না থাকলেও, পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই সাধারণ নিয়ম এই দেখা যায় যে, পুরুষেরা তাঁদের চেয়ে কম বয়সী মেয়েই বিবাহ করেন। তবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যখন চব্বিশ বছরে পুরুষের এবং মেয়েদের আট থেকে তের বছরের মধ্যে বিবাহ দেবার নির্দেশ দেওয়া ছিল, তখন বয়সের পার্থক্যটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়ে পড়ত।

অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়াটা হিন্দু সমাজে একসময়ে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলেই, বিবাহ ব্যাপারে অভিভাবকদের একটা ফর্দ হিন্দু আইনে পাওয়া যায়। এঁরাই কন্যা সম্প্রদানের অধিকারী। মিতাক্ষরা আইনে, প্রথম কনের বাপ, তারপর ঠাকুরদাদা, তারপর ভাই, আর এঁরা কেউ না থাকলে, অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় (রক্তের সম্বন্ধে নিকট-আত্মীয়রা আগে, দূরসম্পর্কের পরে), এবং সবশেষে কনের মা। দায়ভাগের মতও এই রকমের—কেবল কনের মায়ের আগে আসেন, কনের মাতামহ ও মামা।

হিন্দু বিবাহ যখন একটা সংস্কার, তখন তার একটা ধর্মানুষ্ঠান বা কর্তব্যবোধে পালনীয় কতকগুলি আচার আছে। এখনকার দিনে যে অনুষ্ঠানগুলি না করলেই নয়, অর্থাৎ যা না করলে বিবাহ সুসিদ্ধ হয় না, সে হচ্ছে কুশণ্ডিকা-হোম, আর সেই হোমের কুণ্ডেরই চারপাশে সপ্তপদীগমন। সপ্তপদীর সাত-পা ফেলা শেষ না হলে, হিন্দু বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। আর সপ্তপদীগমন শেষ হইলেই, বিবাহও সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্রই সব রকম বিবাহে যে কুশণ্ডিকা-হোম হয়, বা সপ্তপদী-গমন অনুষ্ঠানটা করা হয়,—তা নয়। যেসব বিবাহে এসব ধর্মানুষ্ঠান হয় না, সেসব বিবাহ দেশাচার বা কুলাচার মতে হয় বলে প্রমাণ হলে, আইনেও সেগুলো সুসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হবে। দু-একটা উদাহরণ দিলেই বেশ বোঝা যাবে। প্রথমে রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর। ত্রিপুরার রাজাদের ঘরে 'শান্তিগৃহীতা' বলে এক রকম বিবাহ আছে। এতে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর মূর্তির সামনে পূজো করে, তারই শান্তিজল মাথায় ছিটিয়ে দিলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে শুধু মালাবদল করে, 'ফুল-বিয়া' চলে। মানভূম অঞ্চলের জঙ্গল প্রদেশে (আগে বাঙলা দেশের, এখন বিহারের অন্তর্গত), শুধু সিন্দুর ছুঁইয়ে "সিন্দুরদান" বিবাহ প্রচলিত আছে। আবার অনেক ঘরোয়ানা ঘরের বর পদাভিমানবশত কনের বাড়ী যান না; প্রতিনিধি স্বরূপ তলোয়ার বা কাটারী পাঠিয়ে দেন। তারই সঙ্গে কন্যার প্রথম পর্বের বিবাহ দেওয়া হয়। কামাখ্যায় পান বদল করে বিবাহের প্রথা আছে। বাঙলায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কণ্ঠী বদল করে বিবাহ দেখা যায়। নমশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান বিবর্জিত সাগাই (সাঙ্গাই, সাঙাৎ, সখ্য) বিবাহ প্রচলিত। এইসব জাতীয় নানা প্রকারের অশাস্ত্রীয় বিবাহের সমস্ত গুলোর বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়।

হিন্দুদের মধ্যে পুরুষের পক্ষে একসঙ্গে বহু বিবাহ কোনো কালেই অবৈধ ছিল না। কুলীন সমাজে বহু বিবাহ একসময়ে বড় গৌরবেরই ব্যাপার ছিল। সে বেশীদিন আগেকার কথা নয়, আমাদেরই তিন চার পুরুষ পূর্বে। কিন্তু এখনকার ভদ্র সমাজে বহু বিবাহ আইনে অসিদ্ধ না হলেও, সামাজিক হিসেবে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলে, একেবারে উঠে গেছে বললেই চলে। এটা যে সবসময় শুধু ইচ্ছার অভাবে, তা না হতেও পারে। অর্থ সমস্যাটা এক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় কারণ হয়ত হতে পারে। আজকালকার দিনে এক স্ত্রীরই ভরণ-পোষণ, আবদার-অভিযোগ, মান-অভিমান পূরণ করা এতই কণ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা তো দূরের কথা, একবার বিবাহ করতেই অনেক সুযোগ্য পাত্রের অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখতে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের একই সঙ্গে একাধিক পতি ছিল না বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য যুগে শুধু একটিমাত্র দৃষ্টান্ত মেলে দ্রৌপদীর বেলায়। কিন্তু সেটা বোধ হয় ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ নিয়ম নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় স্বামী থাকতেও স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারেন, এরকম একটি সূত্র নারদ ও পরাশর মুনির সংহিতায় পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহের সময় অনেকে এক সময়ে এই সূত্রেরই উদ্ধার করে দোহাই দিতেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ স্বামী যদি মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট হন; স্বামী যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বা ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন; কিম্বা যদি স্বামী (সামাজিক হিসেবে) পতিত হন, তাহলে এই পাঁচ রকম আপদে, স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারেন।

হিন্দু সমাজে নারদ ও পরাশরের এই সূত্রের জোরে কোনো উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিধবা না হয়ে অন্য আপদে যে স্বেচ্ছায় আবার বিবাহ করেছেন, এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া বড়ই শক্ত। বিধবা বিবাহও ভদ্র সমাজে খুবই কম।

হিন্দু সমাজে কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ। তখনও তাই ছিল, এখনও পর্যন্ত তাই আছে। কিন্তু অসিদ্ধ বলে যে একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না, তা নয়। পণ্ডিতেরা বলেন, যে দেশে বহু কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, সেখানে প্রাকৃতিক এইরকম একটা নিয়ম আছে যে, সেখানে মেয়ের চেয়ে ছেলে অনেক বেশী সংখ্যায় জন্মায়; আর সেই জন্য সেসব জায়গায় স্ত্রীজাতির একসঙ্গে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকে, দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, হিমালয়ের নীচে নেপাল তেরাই অঞ্চলে, নেওয়ার বলে যে এক সম্প্রদায়ের উপজাতি আছে, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে খুব কম এবং মেয়েদের এক-

সঙ্গে বহু বিবাহের চলনও সেখানে আছে। আবার দাক্ষিণাত্যে কানাড়া ও মালাবারে; তেলেগুদের মধ্যে তোত্তিয়র উপজাতির মধ্যে; মাদুরার কল্লার সম্প্রদায়ে;—স্ত্রীলোকের এক-সঙ্গে বহু বিবাহ প্রসিদ্ধ। এসব স্থানে পিতৃত্বের অনিশ্চয়তার জন্য উত্তরাধিকারের দাবী জন্মায় মায়ের দিক থেকে।

১৮৭২ বা ১৯২৩ সালের পূর্বোক্ত দুটি বিবাহের আইনের মতে যাঁরা বিবাহ করতে চান, তাঁদের পক্ষে পুরুষ হলে স্ত্রী, বা স্ত্রী হলে স্বামী জীবিত থাকলে, বিবাহ করা একেবারেই চলবে না, এবং তা না মেনে তার উল্টো করলে, আইনমতে দণ্ডনীয় হতে হয়।

বহু বিবাহের প্রসঙ্গের সঙ্গেই বিধবা বিবাহের কথা আপনিই এসে পড়ে। বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ একেবারে অচল ছিল না। কারণ বিবাহের উপযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা তখন ছিল কম। ব্রাহ্মণ্য যুগে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বোধ হয়, এ নিয়মটা উঠে যাবার মতন হয়েছিল। পরবর্তী যুগে সামাজিক দিক থেকে এবং আইনের দিক থেকে, এই দু'দিক থেকেই, বিধবা বিবাহ অসিদ্ধ ও অবৈধ হয়ে গিয়েছিল। তবে সেটা উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দ্বিতীয়-বার বিবাহে একটা স্বাভাবিক অনিচ্ছার ফলে, না আইনের জন্য, তা খুব নিশ্চয় করে বলা যায় না। কারণ, দেখা যায়, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিধবা বিবাহ তখনও বেশ প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। এসম্বন্ধে ইতঃপূর্বেই কিছু কিছু ইঙ্গিত করেছি।

১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বরের আইনে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, এদেশে বিধবা বিবাহ, আইনে চোখে বৈধ হয়েছে। কিন্তু এই আইনের ফলে বিধবা বিবাহ কটা হয়েছে? যে কটা হয়েছে, সে কটা অঙ্গুলেই গোনা যায়। কারণটা আগেই বলেছি, এসম্বন্ধে মেয়েদেরই স্বাভাবিক অনিচ্ছা। ১৮৭২ ও ১৯২৩ এর বিবাহ আইনে বিধবা বিবাহ আটকায় না; সধবা না হলেই হোল।

বিবাহের স্বাভাবিক নিয়ম হোল, স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসবাস করে ঘরকন্না করবে। সব দেশেই এই একই নিয়ম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে আলাদা বসবাস করার ব্যবস্থা অন্য দেশের আইনে থাকলেও, হিন্দু আইনে ছিল না, কি মিতাক্ষরায় কি দায়ভাগে। হাজার কষ্ট হলেও, মেয়েরা মুখ বুঝে সব উৎপাত, সমস্ত উপদ্রব নীরবে সহ্য করেন। স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করার চিন্তাও তাঁদের কারো মনে আসে না। ১৯৪৬ সালের ১৯ নম্বরের আইনে হিন্দু সমাজে সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন কতকগুলো ন্যায্য কারণে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারেন; এবং তার জন্য আলাদা খোরপোষও দাবী করতে পারেন। কারণগুলি এই,—যদি স্বামী কোনরকম কুব্যাধিতে আক্রান্ত হন (অবশ্য নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হলে নয়); স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি এমনি মারাত্মক ব্যবহার করেন, যাতে স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে বসবাস করলে তাঁর জীবনের আশঙ্কা হতে পারে; যদি স্বামী স্ত্রীর অনিচ্ছায় বা অসম্মতিতে তাঁকে নিয়ে ঘরকন্না না করে, তাঁকে ত্যাগ করেন; স্বামী যদি পুনর্বার বিবাহ করেন; যদি ধর্মান্তর গ্রহণ

করে অহিন্দু হন; যদি একই বসতবাড়ীতে কোন উপপত্নী নিয়ে এসে রাখেন; যদি স্ত্রী ছেড়ে, উপপত্নীর সঙ্গে সাধারণত বসবাস করেন। এইসব কারণ ছাড়াও আদালত যদি আরো অন্য কোন কারণকে ন্যায্য কারণ বলে মনে করেন, তাহলেও স্বামীদের কাছ ছেড়ে স্ত্রীদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সে কারণগুলোর বিশেষ করে কোনো বিবরণ দেওয়া নেই।

এর পরই আসে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা। হিন্দু বিবাহ সংস্কারবিশেষ বলে, হিন্দু আইনে বিবাহযোগেরই কথা লেখা আছে, বিচ্ছেদের কথা নেই। হিন্দু বিবাহের বন্ধন মরণ পর্যন্ত থেকে যায়। এমনকি, অনেকে বিশ্বাস করেন যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মরণের পরও অন্যলোকে তাঁদের এসম্বন্ধের আবার উদ্ভব ঘটে। হিন্দু স্ত্রীরা ত কামনাই করে থাকেন, যেন জন্ম-জন্মান্তরে ইহলোকের এই স্বামীকেই তাঁরা আবার স্বামিরূপে পান। কিন্তু এখানেও সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে এনিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে অল্প কারণে, অল্প কথায়, স্বচ্ছন্দে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে দেখা যায়, এবং সে বিচ্ছেদ লোকাচার বলে, আইনের দিক থেকেও গ্রাহ্য হয়ে থাকে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গোসাভি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাড়চিঠি দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করার প্রথা আছে। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের রীতি অজ্ঞাত নয়। বাঙলা দেশে বোষ্টমদের (জাত বোষ্টম বা বৈরাগী,—ধর্মে বৈষ্ণব নয়) মধ্যেও এই প্রথার চলন আছে।

সমস্ত ক্রীশ্চান সমাজের আইন, মূলত রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোমান আইন অনুসারে বিবাহটা একটা চুক্তিগত ব্যাপার। চুক্তি যেখানে করা যায়, সেখানে চুক্তি ভাঙগাও যায়: এইত স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং বিবাহ যেখানে চুক্তির উপর নির্ভর করে, সেখানে বিবাহ ভঙ্গ করতে কি আর বাধা? অন্তত চুক্তিভঙ্গ অর্থাৎ ব্রীচ অফ্ কণ্ট্রাক্ট-এর আইনে ত এই কথাই বলে। কিন্তু ক্রীশ্চানদের মধ্যে আবার যাঁরা রোমান ক্যাথলিক, তাঁরা বিবাহটাকে সংস্কারমূলক ব্যাপার বলেই মনে করেন। সেইজন্য আইনমতে তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারলেও, ধর্মের দিক থেকে ভঙ্গ করা যায় না বলে, গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকরা এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন না। এই নিয়েই তো ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সঙ্গে রোমান ক্যাথলিকদের শিরোমণি পোপের সঙ্গে বিবাদ বেধে গিয়েছিল। হেনরী তাঁর প্রথম রাণীকে ডিভোর্স অর্থাৎ ত্যাগ করতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মই পরিত্যাগ করে প্রোটেস্টাণ্ট হন। এই জন্যই ঐতিহাসিকরা বলেন, ইংলণ্ডে রিফরমেশন সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে, অন্দরমহল দিয়েই প্রবেশ করেছিল। মুসলমান সমাজে যখন অতি অল্প সময়ের নিমিত্তও বিবাহ করতে পারা যায়, তখন ছাড়ার ব্যবস্থা তো সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। মুসলমান সমাজেও বিবাহটা একটা চুক্তিমূলক ব্যাপার।

হিন্দু হয়ে যাঁরা অহিন্দু পরিচয় দিয়ে, ১৮৭২ সালের বিবাহ আইনে বিবাহ করেন, তাঁদের পক্ষে যথোপযুক্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আবার ১৯২৩ সালের বিবাহ আইন মতে যেসব হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন তাঁদের ধর্মকে অস্বীকার না করেও, ঐ পদ্ধতিতে বিবাহ করেন, তাঁরাও বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকারী হন। এ দুই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, দম্পতির মধ্যে কোনো একজনের ব্যভিচার।

এবার হিন্দুকোড বিবাহ সম্বন্ধে কি কি বিধান দিচ্ছেন দেখা যাক্। প্রথমতঃ হিন্দু-কোড হিন্দু বিবাহকে দুভাগে ভাগ করে, দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে ফেলেছেন। একটির নাম দেওয়া হয়েছে স্যাকরামেণ্টাল ম্যারেজ (sacramental marriage), যাকে সংস্কার-গত বিবাহ বল্লেই চলবে; আর একটার নাম সিভিল ম্যারেজ (হিন্দুকোডের কর্তারা অন্য-রকম বিবাহকে অসভ্য বিবাহ বলে মনে করেন নাকি?), অর্থাৎ চুক্তিমূলক বিবাহ; যার ভাল বাঙলা নাম না পাওয়ায় তাকে সিভিল বিবাহ বলেই বর্ণনা করলে, বোঝবার পক্ষে বোধ হয় কিছু অসুবিধা হবে না।

সংস্কারগত বিবাহে প্রচলিত আচার ও ধর্মানুষ্ঠানের দরকার হবে। যেখানে যেখানে সপ্তপদী গমন প্রথার চলন আছে, সেখানে হোমাগ্নি জেলে তার সামনে সাতবার পা ফেলতেই হবে। এক কথায় আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহে যেসব আচার-বিচার, যেসব অনুষ্ঠান যেমনটি ছিল, সংস্কারগত বিবাহ, তেমনিটিই রইল। তবে একটু কথা আছে। হিন্দুকোড অনুসারে পাত্রপক্ষের পূর্বের বিবাহ করা স্ত্রী, বা কন্যাপক্ষের পূর্বের বিবাহিত স্বামী যদি বর্তমান থাকেন, তাহলে কিন্তু সংস্কারগত বিবাহও একেবারে অসিদ্ধ হয়ে যাবে। আবার কোন পক্ষ যদি পাগল বা আধপাগলা হন, তাহলেও বিবাহ নিষিদ্ধ। পাত্রের বয়স আঠার বছর, আর পাত্রীর বয়স চোদ্দ বছর পার হওয়া চাই। আর পাত্রী যদি ষোল বছর পার না হয়ে থাকেন, তাহলে এ বিবাহে তাঁর অভিভাবকদের মত নিতে হবে। বরকনে যেন নিকট আত্মীয় না হন; আর হিন্দু মতে যাকে সপিণ্ড বলে, তাও যেন না হন।

প্রাচীন হিন্দু আইন আস্তে আস্তে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকটগুলোর দ্বারা সংশোধিত ও পরি-বর্তিত হয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে তো হিন্দুকোডের বিবাহ বিধানে বিশেষ কিছু তফাৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, কেবল পরিষ্কার করে উচ্চকণ্ঠে এতে বলে দেওয়া হয়েছে, হিন্দু পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। আর পাগলা ও আধ-পাগলাদের বিবাহযোগ্য পাত্রদের পর্যায় থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হোল। এছাড়া আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বিশেষভাবে বিধি না দেওয়ার জন্য বর্ণভেদ বা জাতিভেদটা বিবাহক্ষেত্রে উঠে গেল; অর্থাৎ এই বিধানে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের মধ্যেও সংস্কারমূলক আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহে আর কোনো বাধা রইল না। হিন্দুকোডে বলা হয়েছে, সংস্কার-মূলক হিন্দু বিবাহগুলোও রেজেষ্ট্রীর ব্যবস্থা করার ভার বিভিন্ন প্রদেশের সরকারের উপরে রইল। তাঁরাই এ বিষয়ে প্রয়োজনমত আইন পাশ করবেন।

বিবাহ ব্যাপারে অভিভাবকদের বা সম্প্রদাতাদের একটা ফিরিস্তি হিন্দুকোডেও আছে। সেটাতে পাত্রীর মাকে বেশ একটু উঁচু স্থানই দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেটা এই রকম গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—পাত্রীর বাবা, মা, ঠাকুরদা, ভাই, খুড়ো, দাদামশায়, মামা; তারপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন; নিকট আত্মীয়রা আগে, দূরের আত্মীয়রা তার পরে। বলাই বাহুল্য যে, অভিভাবকরা নিজেরাই যদি নাবালক, অর্থাৎ একুশ বছর বয়সের কম হন, তাহলে তাঁরা আর বিবাহ ব্যাপারে মুরুব্বী হবার পদ নিতে পারবেন না।

এখন সিভিল বিবাহ। এ বিবাহের অন্যান্য নিয়ম প্রায় সংস্কারগত বিবাহেরই মতন। তফাৎ এইটুকু যে, পাত্র-পাত্রী যে কেউ যদি একুশ বছরের কম বয়সী হন, তাহলে তাঁদের অভিভাবকদের মত নিতে হবে। কেবল বিধবা পাত্রীর চোদ্দ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে, তাঁর পক্ষে নিজের ছাড়া আর কারোর মত নেবার দরকার নেই। তিনি স্বচ্ছন্দে স্বয়ংবরা হতে পারেন। অভিভাবকের সংখ্যা ও পর্যায় একটু আগে যা বলা হোল, সেই মতনই।

সিভিল বিবাহে যাঁর যে রকম ইচ্ছা অনুষ্ঠান করতে পারেন; আবার কোন অনুষ্ঠান না-ও করতে পারেন। কিন্তু বিবাহটি রেজিস্ট্রী করতেই হবে; হয় রেজিস্ট্রারের বাড়ি গিয়ে, না হয় তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনে। আর চাই তিনজন সাক্ষী। তিনজন সাক্ষী ও রেজিস্ট্রারের সামনে বর-কনেকে একটি ছোট্ট, খুব সোজা মন্ত্র পড়তে হবে, সেটা হচ্ছে এই—বর কনেকে বলবেন,—আমি তোমাকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম; কনেও বরকে বলবেন,—আমি তোমাকে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ

করলাম। ১৮৭২ সালের আর ১৯২৩ সালের যে দুটো বিবাহের আইন বর্তমান আছে, তাদের সঙ্গে এর বড় কিছু প্রভেদ নেই।

হিন্দুকোডটি আইনে পরিণত হবার আগেই যাঁরা হিন্দুমতে বিবাহ করেছেন, বা এই কোড আইন হলে, যাঁরা সংস্কারমূলক বা স্যাকরামেণ্টাল বিবাহ করবেন, তাঁদের মনে যদি নিজের নিজের বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, বা সে বিষয়ে একটুকুও দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ হয়, তাহলে তাঁরা তাঁদের বিবাহটা রেজিস্ট্রী করে পাকা করে নিয়ে ঐ রকম সন্দেহের হাত এড়াতে পারবেন। এর ব্যবস্থা হিন্দুকোডে দেওয়া আছে।

বিবাহ সংস্কারগতই হোক বা সিভিল বিবাহই হোক, হিন্দুকোড পাশ হবার আগেই হোক, আর পরেই হোক, নির্বিচারে নির্বিশেষে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই উপযুক্ত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এইটিই হচ্ছে হিন্দুকোডের এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলো ছোট ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারে নতুন ধারা না হলেও, বর্তমানকালের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে এরকম ব্যাপারটা একেবারে অভাবনীয়। এটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্র। একবার ছুঁড়লে এর ফল কতদূর গিয়ে যে পৌঁছবে, বা সেটাতে সুফল হবে কি কুফল হবে, এ কেউ বলতে পারে না। সেই কারণে এটার জন্যই সকলের এত ভাবনা, এত মাথাব্যথা; কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই। আর এইটিই হোল হিন্দুকোডের প্রতিপক্ষদের আসল ব্যথার স্থান। অনেক হিন্দু বিয়েতে সুখ না থাকতে পারে বটে, কিন্তু বিচ্ছেদের ব্যবস্থার ফলে শেষ পর্যন্ত সোয়াস্তিটুকু না খোয়া যায়, সেই দুর্ভাবনা অনেকেরই হয়েছে। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আপনা-আপনি আপোষে করা যাবে না। আদালত থেকে এর জন্য ডিক্রী নিতে হবে। অনেকে হয়ত ঘরের কেচ্ছা বাইরে প্রকাশ করতে সম্মত না হতে পারেন। কিন্তু হিন্দুকোড এ বিষয়েও খুব সতর্ক। এসব মামলা দরজা বন্ধ করে, কিম্বা জজের খাস-কামরায় শোনাবার ব্যবস্থাও এই কোডে পাওয়া যায়। যথা লাভ।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ন্যায্য কারণগুলো এই রকমের। উপরে বিবাহের যে সব নিয়মগুলো বলা হয়েছে, সেগুলোর ব্যতিক্রম ঘটলে, বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যেতে পারে। তাছাড়া আরও কয়েকটি কারণ আছে;—ক্লীবত্ব; স্বামী যদি কোন স্ত্রীলোককে উপপত্নী রাখেন বা স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হন; কোন পক্ষ যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করে আর হিন্দু না থাকেন; কোন পক্ষ যদি বিবাহের পর পাগল হয়ে যান, আর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনার পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত, চিকিৎসায় সে রোগের যদি কোন ফল না পাওয়া গিয়ে থাকে; কোন পক্ষ যদি মারাত্মক কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হন, যার চিকিৎসা শিবেরও অসাধ্য; বিবাহ-বিচ্ছেদ করণের এই পাঁচ রকম অতিরিক্ত কারণ দেখা যাচ্ছে। তুলনার জন্য এই সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত নারদ ও পরাশর সংহিতার শ্লোকটি দেখে নিতে পারেন।

আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলে, তার ছয়মাস পরে (যদি ইতিমধ্যে কোন পক্ষ আপীল না করে থাকেন এবং আপীলে যদি রায় বাহাল থাকে, তাহলে আপীল শেষ হবার পরই), পুরুষ আবার দারান্তর এবং স্ত্রী আবার পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারেন। এই সব ব্যবস্থাগুলো ইংরেজি ডিভোর্স আইনেরই সমান। আমরা যদিও ইংরেজদের হাত এড়িয়ে স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু কার্যত তাঁদের মোহপাশ এখনও ছিন্ন করতে পারিনি; এবং কখনও যে আর পারব, তাও মনে হয় না। মোহই হচ্ছে কলিযুগের প্রধান লক্ষণ।

পুরোপুরি বিচ্ছেদ ছাড়া এরকম আধাআধি বিচ্ছেদেরও কথা হিন্দুকোডে লেখা হয়েছে। এটা হচ্ছে স্ত্রী পুরুষের আলাদা হয়ে থাকার এক আইনসম্মত ব্যবস্থা। এর ইংরিজি নাম দেওয়া হয়েছে,—জুডিসিয়াল সেপারেসন। ব্যাপারটা হিন্দু আইনে পাওয়া যায় না বলে, ছোট কথায় এর বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া মুশকিল। তবে জিনিসটি সহজেই সকলে বুঝতে পারবেন। বেশী ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন হবে না। এই বিষয়টা যে একেবারে নতুন,—তাইবা আর কি করে বলি? পূর্বেই দেখিয়েছি যে, ১৯৪৬ সালের ১৯ নম্বর আইনে স্ত্রী-পুরুষের আলাদা হয়ে বসবাস করার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। হিন্দুকোডের নববিধান এরই অনুরূপ।

হিন্দুকোডে বলা হয়েছে যে, উভয়পক্ষের যে কেউ, ন্যায্য কারণে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকবার নিমিত্ত আদালতে দরখাস্ত করতে পারেন। কারণগুলো সংখ্যায় ছ'টি। যদি কোন পক্ষ অপর পক্ষকে দু'বছরকাল ত্যাগ করে থাকেন; যদি কোন পক্ষ অপর পক্ষের উপর এমন অত্যাচার করেন, যাতে অপর পক্ষের পূর্ব পক্ষের সঙ্গে বাস করা বিপজ্জনক; যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সহবাসের ফলে কোনরকম কু-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন (দরখাস্তের পূর্বে এক বছরের মধ্যে); এক পক্ষ যদি মারাত্মক রকম কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হন; যদি কোন পক্ষ বিবাহের পর পাগল হয়ে যান; কিংবা যদি কোন পক্ষ ব্যভিচারে রত হন,—এই ছয় রকমের কারণ, আলাদা হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত কারণ। এই কারণগুলির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণগুলি তুলনীয়। দুইই প্রায় একই রকমের। আদালত থেকে আলাদা হওয়ার ডিক্রী পাবার পর, দু-বছর যদি এমনিই চলে, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষে আর সহবাস না করেন, তাহলে এরই বলে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটতে পারে।

হিন্দুকোডের বিবাহ সম্বন্ধে নববিধান-গুলির পালা এইখানেই শেষ হোল। আমি কিন্তু আগাগোড়া খুবই সংক্ষেপে বলে গেলাম। আইনের কচকচানিগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে, দিশি ভাষাতেই বলবার চেষ্টা করেছি, যাতে সকলে মোটামুটি ব্যাপারটা কি দাঁড়াল, তা' সহজেই বুঝতে পারেন। এর অতিরিক্ত কিছু জানবার ইচ্ছা হলে, হিন্দু-কোডের একখানা ছাপা খসড়া-পত্র কিনে পড়ে দেখতে পারেন। দাম বেশী নয়। হিন্দু-কোড সম্বন্ধে যাঁদের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাঁরা এই খসড়া-পত্র ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকেন বলে শুনতে পাই। খোঁজ করে এক খণ্ড চাইলেই বোধ হয় পাবেন; যদি দাম দিয়ে কেনাটা অপব্যয় বলে মনে করেন। হিন্দুকোডের সম্বন্ধে এইটুকুই মনে রাখার বিষয় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটাই হচ্ছে আসলে এর নববিধান। এইটুকু জানলেই এ নিয়ে লড়াই করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে যদি শুনি, বিবাহের নববিধান পড়ে পাঠকদের হিন্দু-কোডের দায়াধিকার বা উত্তরাধিকারের সম্বন্ধে নববিধান জানবার আগ্রহ হয়েছে, তাহলে বারান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। এখন এই পর্যন্তই থাক্।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২২

বোধকরি, আমাদের অপেক্ষাতেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বাইরের ঘরে বসে কাজ করছিলেন। ছাতা মুড়ে আমাদের দুজনকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে দেখে সোজা হয়ে উঠে বসে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনিই শরৎবাবু?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই।"

নিজের সম্মুখের কাগজপত্র একটু সরিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের বসবার মতো জায়গা করে দিয়ে সাগ্রহে সুরেশচন্দ্র বললেন, "আসুন, আসুন! বসুন। আপনার লেখা পড়ে ভারি খুশি হয়েছি। একেবারে পাকা হাতের সম্পূর্ণ নতুন ধাঁজের লেখা। দয়া করে ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চুপ করে বসে যদি না থাকেন, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

শরতের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। দেখলাম, তার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট লালচে আভা। অবশ্য ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেও মুখের উপর খানিকটা লালচে আভা ছিল; কিন্তু সে ছিল উদ্বেগের আগুন-লাগা আকাশের রক্তিমা, আর এ রক্তিমা আনন্দর ঊষাকালীন আকাশের। বর্ণ এক হলেও উভয়ের গোত্র বিভিন্ন।

এ প্রশস্তির উত্তরে যা হয় একটা কোনো বিনয়-বাক্য না বললে ভাল দেখায় না। শরৎ বললে, "সামান্য লেখা, কি করে আপনার ভাল লাগল তাই ভাবছি!"

মাথা নেড়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "না, না, সামান্য নিশ্চয়ই নয়। আপনার লেখার মধ্যে সেই যাদু আছে যা পাঠককে একান্তভাবে পেয়ে বসে। কাল উপেন চলে যাওয়ার পর তার সামনে যতটা পড়েছিলাম তার পর থেকে আপনার লেখার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম যে, শেষ-পর্যন্ত শেষ না করে থাকতে পারলাম না।" তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "চরিত্রহীন সাহিত্য যাতে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাল তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে সে বিষয়ে মত বদলেছি। সাহিত্যে ও লেখা বার করা চলবে না।"

একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বলুন ত'?"

সুরেশচন্দ্র বললেন, "ও লেখা সাহিত্যে বের হলে সাহিত্য উঠে যাবে। অবশ্য, যে-সকল সাহিত্যিককে আমি কম্‌প্লিমেণ্টারি কাগজ দিই তারা, আর তাদের সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবেরা, কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করে চরিত্রহীন পড়বে; কিন্তু তা ছাড়া আর সব গ্রাহকেরা সাহিত্য ছেড়ে দেবে। পয়সা দিয়ে আমাদের দেশে যারা কাগজ কেনে, মেসের ঝিকে হজম করবার মতো জোরালো পরিপাক শক্তি এখনো তাদের হয়নি।" বলে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন।

তখনকার দিনের আবহাওয়ার হিসাবে কথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা হয়ত চলত না; কিন্তু তথাপি শরৎ মৃদু ধরণের একটু প্রতিবাদ না করেও থাকতে পারলে না। বললে, "কিন্তু হয়নি যে, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেও ত' একটা মেসের ঝি চাই সুরেশবাবু? বাজরার রুটি আমার পাকস্থলীতে হজম হবে কি হবে না, সে সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমত বাজরার রুটি প্রস্তুত হওয়া দরকার, তারপর সে রুটি আমার খেয়ে দেখা চাই।"

সুরেশচন্দ্র বললেন, "আপনার এ যুক্তিতে কোনো ভুল নেই। আপনি শক্তিমান সাহসী শিল্পী, আপনি উৎকৃষ্ট বাজরার রুটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন; আমরা যদি আমাদের পরিপাক শক্তির দুর্বলতা অনুমান করে সে রুটি উদরসাৎ করতে ভয় পাই, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি বলি শরৎবাবু, আপনি যখন বাজরার রুটি এত চমৎকার প্রস্তুত করতে পারেন, তখন গমের ময়দার লুচিও আপনার কাছে আটকাবে না। আপনি আমাদের জন্যে ময়দার লুচি করে দিন, আমরা পেট ভরে খেয়ে বাঁচি।" বলে পুনরায় হেসে উঠলেন।

শরৎ বললে, "কিন্তু আগেও ত' আপনারা বাজরার রুটি খেয়েছেন?"

"কোথায়, কৃষ্ণকান্তর উইলের রোহিণীর চরিত্রে?"

মাথা নেড়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্রের সঙ্গে আপনার সাবিত্রী চরিত্রের বেশ খানিকটা প্রভেদ আছে। প্রথমত, রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সমাজে তার প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না, তার একমাত্র অপরাধ সে বিধবা হয়ে গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। আপনার সাবিত্রী চরিত্রের কিন্তু সেরূপ কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই। দ্বিতীয়ত, রোহিণী ও গোবিন্দলালের মধ্যে ভালবাসাকে অনিবার্য করবার জন্যে বঙ্কিমবাবুকে অনেক কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। লজ্জা ও নৈরাশ্যের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, আর দৈবাৎ তা দেখতে পাওয়ায় গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজের চক্ষে রোহিণী ও গোবিন্দলালের ভালবাসার যা-হোক একটা কিছু কৈফিয়ৎ আছে, আপনার সাবিত্রী ও সতীশের ভালবাসার তেমন কোনো কৈফিয়ৎ নেই। একটা ঘটনাক্রমে, অপরটা ইচ্ছাক্রমে।"

ঠিক কোন্ ভাষায় কি ভাবে সেদিনকার আলোচনা চলেছিল, এত দীর্ঘকাল পরে তা মনে করে লেখা সম্ভব নয়; কিন্তু এ কথা বেশ মনে আছে, রোহিণী এবং সাবিত্রীকে সূত্রপাত করে সে আলোচনা নানা শাখা-প্রশাখায় নানা বিষয়-বিষয়ান্তরে বিস্তার লাভ করে করে দীর্ঘ এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল। বর্মা দেশে শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা আলোচিত হল।

বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, পথ কর্দমাক্ত, আকাশ মলিন। শরৎকে যেতে হবে হাওড়ায়, আমাকে ভবানীপুরে। অধিক বিলম্ব করা সমীচীন হবে না মনে করে আমরা ওঠবার জন্য তৎপর হলাম। শরৎ বললে, "এবার তা হলে আমরা আসি। আমার লেখাটা দিন।"

পাশের বাক্স থেকে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি বার করে শরতের হাতে দিয়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "এ লেখা আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি একমাত্র এই সর্তে যে, শীঘ্রই আপনি আমাকে অন্য লেখা দিচ্ছেন।"

স্মিতমুখে শরৎ বললে, "আগে লুচি ভাজি।"

উত্তরে সুরেশচন্দ্র বললেন, ভাজতে আরম্ভ করে দিন শরৎবাবু,—বিলম্বও করবেন না, আলস্যও করবেন না। ভাজা লুচি যদি কিছু আপনার ভাণ্ডারে থাকে, বাসি হলেও নিতে রাজি আছি।" বলে শরতের লেখার বিষয়ে আর এক দফা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুধাবর্ষণ করলেন যে, আমাদের দুজনের চিত্ত আনন্দের পরিপূর্ণতায় ভরে উঠল। চরিত্রহীনের বিষয়ে ঈষৎ বিরুদ্ধ মন্তব্যের ফলে যদিই বা কিছু মালিন্য আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল,

এই উচ্ছল প্রশস্তির প্লাবনে তা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুরেশচন্দ্রের নিকট বিদায় নিয়ে পুনরায় দুজনে এক ছাতার মধ্যে মাথা গুঁজে কর্ন-ওয়ালিস স্ট্রীটের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে কিন্তু রাস্তা পার হয়েও ট্রামে উঠতে ইচ্ছা হল না। ট্রামের ভিড়ের মধ্যে দুজনে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়, বোধ করি দুজনেরই অজ্ঞাতসারে দুজনের নিশ্চেতন মনের মধ্যে সেই ভয় বর্তমান ছিল। নিমগাছ আজ ইক্ষুরস নিঃসৃত করেছে; কঠিনতম পাষাণ খাঁটি সোনার রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গভীর আনন্দে বুঁদ হয়ে আমরা দুজনে বৃষ্টির জল এবং পথের কাদা ভুলে গিয়ে পূর্ব পটির ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলাম, মনের তন্ত্রী এমন চড়া সুরে বাঁধা যে, বেসুরো মারবার ভয়ে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হবারও আগ্রহ ছিল না। মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প যা একটু-আধটু হচ্ছিল, তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশই অবান্তর। ডান দিক দিয়ে ঢং ঢং করে ট্রামের পর ট্রাম আমাদের অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। তাদের প্রকোষ্ঠে আমাদের কিরূপ সঙ্কলান হতে পারত, তা একবার চেয়ে দেখার কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

বহুক্ষণ পরে প্রথম যখন আমাদের গতি-রোধ করবার প্রবৃত্তি হল, সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে পড়েছি বউ-বাজারের মোড়ে। অজ্ঞাতসারে কখন পিছনে ফেলে এসেছি হ্যারিসন রোডের মোড়, সেখান থেকে শরতের হাওড়া ফিরে যাবার পথ।

ছাড়াছাড়ি হবার জন্যে দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। শরৎ বললে, "তোমার কথা শুনে, সুরেশ সমাজপতির কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছুদিন যদি বাঁচতাম তা হলে বাঙলা দেশকে হয়ত কিছু দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয় উপীন!"

কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বল ত?"

শরৎ বল্লে, "বেশি দিন বাঁচব না আমি। কঠিন রোগ হয়েছে আমার।"

"কি রোগ?"

"তা ঠিক বলতে পারিনে' হয় হার্টের, নয় লাঙসের। ডাক্তার বলেছে, বর্মায় থাকলে এ রোগ সারবে না।"

কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলাম না। বল্লাম, "চমৎকার রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা ত' ডাক্তারের? হয় হার্ট ডিজিজ, নয় টি বি! হয় মাথা ধরা, নয় ফোড়া!"

মৃদু হেসে শরৎ বল্লে, "না, না, ঠাট্টা নয়; ডাক্তার ভাল।"

বললাম, ডাক্তার যদি ভাল, তা হলে তার উপদেশ পালন করলেই ত হয়। বর্মা ছেড়ে চলে এস এখানে।"

"খাব কি এখানে?"

বললাম, "ডাল-ভাত-চচ্চড়ি।"

"জোটাবে কে?"

"যে রামজী সেখানে জোটাচ্ছে সেই রামজীই জোটাবে।"

'সাহিত্যে' সুরেশচন্দ্র চরিত্রহীন প্রকাশ করবার মত পরিবর্তন করায় মাথার মধ্যে একটা মতলবের উদয় হয়েছিল। বল্লাম, "শোন শরৎ, কাল বৈকালে তুমি অতি অবশ্য ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে আসছ।"

"কেন, কি হবে সেখানে?"

"একটা ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে তোলবার ভার নিতে হবে তোমার। শিশু-চারাকে মহীরুহে পরিণত করতে হবে।"

"বাপ রে! এ যে এক বিরাট পরিকল্পনা! এর সরল অর্থ কি, শুনি?"

বললাম, "এর সরল অর্থ শুনতে অনেক সময় লাগবে, কাল শুনো। এখন বৃষ্টি কতকটা থেমেছে বটে, সন্ধ্যার ঝোঁকে কিন্তু প্রবল হয়ে নামতে পারে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, তোমার আবার ছাতা নাই।"

"কাল বৈকালে কখন বাড়ি থাকবে তুমি?"

একটু ভেবে বললাম, "ধর, বেলা চারটেয়। নিশ্চয় কিন্তু আসা চাই তোমার।"

শরৎ কোনো উত্তর দিলে না। বুঝলাম মৌন সম্মতির লক্ষণ। মৌনের দ্বারা অনেক সময়ে সম্মতি জ্ঞাপনের অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল।

শিয়ালদা স্টেশনের দিক থেকে একটা ডালহাউসীগামী ট্রাম আসছিল। তাইতে শরৎকে তুলে দিয়ে ভবানীপুরে ফিরলাম।

২৩

ভবানীপুরে আমাদের কাঁসারিপাড়া রোডের বাড়ির ঠিক অপর দিকে সপরিবারে বাস করতেন আমার পরম বন্ধু 'যমুনা' পত্রিকা সম্পাদক ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্রনাথ পাল। তাঁর মতো উন্মুক্ত হৃদয়, বন্ধুবৎসল, আত্মভোলা, আমোদপ্রিয়, আড্ডাজীবী মানুষ জীবনে খুব কম দেখেছি। আপন হৃদয়ের প্রীতির রসায়নের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরকে পরমাত্মীয় করতে পারতেন। দিন পাঁচেক আলাপ-পরিচয়ের পর যে মানুষের ফণীবাবুর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপিত হয় না, বুঝতে হবে সে কঠিন হৃদয়ের প্রাণী।

ফণীবাবুর গুণাবলীর যে তালিকা উপরে দিয়েছি, তা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যায়, আড্ডা গড়ে তোলা এবং চালু রাখার জন্য যে-সকল গুণের একান্ত প্রয়োজন, তা তাঁর প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে একটি যে যৎপরোনাস্তি লোভনীয় আড্ডা সতত চলমান থাকত, তাতে বিস্ময়ের কোন কথা ছিল না। গান-বাজনা, চা-খাবার, তাস-পাশা, আলাপ-আলোচনার কল্যাণে এই আড্ডা নিতান্ত কাজের মানুষকেও প্রলুব্ধ করত। কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠাও এর মায়া বেষ্টনীর মধ্যে

এসে পড়লে আত্মবিস্মৃত হয়ে দু-দণ্ডের জন্যও গতি হারাত।

আমি ছিলাম এই আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। দীর্ঘকালব্যাপী আড্ডা দিতে পারার প্রতিযোগিতায় আমি থাকতাম ফণীবাবুর সহিত এক গুম্ফবন্ধনীতে আবদ্ধ। ক্লান্ত হয়ে আর সকল সদস্যেরা যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে একে একে সরে পড়ত, তখনো ফণীবাবু এবং আমি, রণক্ষেত্রে-শয়ান আহত বীর সৈনিকের মতো, তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে আড্ডার বাতি জ্বালিয়ে রাখতাম।

আড্ডা দেওয়ার বিষয়ে এই উপযুক্ততা অর্জন করেছিলাম বাল্যকাল থেকে আড্ডা দিয়ে দিয়ে। জীবনের বেশ একটা ভগ্নাংশ আড্ডা দিয়েই কেটেছিল। যেখানে যখন গেছি এবং থেকেছি, আড্ডার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি; অনেক সময়ে আড্ডাই আমাকে পথ দেখিয়ে যথাস্থানে নিয়ে গেছে। এর একটা কারণও ছিল। সঙ্গীত এবং সাহিত্য বিষয়ে সামান্য যে একটু অধিকার ছিল, তাই আমাকে আড্ডার প্রবেশপত্র জুটিয়ে দিত। আমার মনে হত, মাত্র তিসি-গম-যব কেনা-বেচার কাজে যারা আত্মনিয়োগ করতে চায় না; সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার দ্বারা নন্দিত সুন্দরতর এবং সূক্ষ্মতর জীবনের সহিত যারা যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে চলতে চায়, তাদের পক্ষে আড্ডা দেওয়া অপরিহার্য।

ফণীবাবুর বৈঠকখানা-বাড়ির একটি বড় ঘরে দু-তিন দিন অন্তর বসত আমাদের পূর্ণাঙ্গ আড্ডা। অপর একটি ঘরে চলত 'যমুনা' পত্রিকার কাজকর্ম।

আমাদের পাড়ায় ফণীবাবুরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আসার পর ফণীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হল ঘনিষ্ঠ। তখন অভাব-অসুবিধার উভয়কূলব্যাপী বালুকারাশির মধ্যে যমুনা নিতান্তই শীর্ণকায়া। গ্রাহক সংখ্যা শ দুই-আড়াইয়ের বেশি নয়, নগদ বিক্রয় তদপেক্ষাও কম। কার্তিক মাসের পূজার সংখ্যা বাজারে নামে পৌষ মাসে, তাতে পূজার সময়ের উপযোগী জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন; বিজ্ঞাপন-দাতারা অসময়ে প্রকাশিত নিষ্ফল বিজ্ঞাপনের বিল শোধ করতে চায় না। সাধারণ নিয়মিত বিজ্ঞাপন অতি সামান্য যা আছে, তার মূল্যের অর্ধেকও আদায় হয় না। অনিয়মিত প্রকাশের জন্য অসন্তুষ্ট গ্রাহকেরা কাগজ ছেড়ে দেবার ভয় দেখায়। বিনা পয়সার কম্‌প্লিমেণ্টারি কাগজ প্রতি মাসে বোধ হয় শ' দেড়েক দুই বিতরিত হয়। ডাকে যা যাবার তা'ত যায়ই, অধিকন্তু বাড়িতে যে আসে সেই একখানা করে সদ্য প্রকাশিত যমুনা হাতে নিয়ে যায়। কেউ আশ্বিন মাসের কাগজ চাইলে দারুণ চক্ষুলজ্জা-গ্রস্ত ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, ভাদ্র মাসের কাগজ পেয়েছিলেন ত? নগদ বিক্রয়ের হকারদের কাছে মাসে মাসে বকেয়ার তায়দাদ স্ফীততর হচ্ছে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থা; শান্তি সন্তুষ্টি কোনো দিকেই দেখা যায় না, একমাত্র বিনা-পয়সার খদ্দেরদের দিক ভিন্ন।

প্রতিদিনই যমুনার অফিস ঘরে ক্ষণকালের জন্য এক-আধবার এসে বসি। দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করছিনে, কিন্তু যে অযত্ন যে অনিষ্ঠা পলে পলে ব্যবসায়কে বিনষ্টির দিকে টেনে নিয়ে যায়, ফণীবাবুর যমুনা পরিচালনার মধ্যে তার অস্তিত্ব চোখে পড়তে লাগল। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি; কিন্তু নূতন পরিচয়, কিছু বলতেও কুণ্ঠিত হই।

একদিন সহসা একটা সুযোগ উপস্থিত হল। সকাল বেলা যমুনার অফিস ঘরে বসে ফণীবাবুর সহিত আলাপ-আলোচনায় রত আছি, এমন সময়ে একটি লোক উপস্থিত হয়ে একখানা চিঠি ও কিছু অর্থ টেবিলের উপর স্থাপন করলে। চিঠি পড়ে রসিদ বই বার করে চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে ফণী-বাবু লোকটিকে বিদায় করলেন। তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্মিতমুখে বললেন, "ওঃ! অনেক কষ্টে অনেক তাগাদা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আদায় করা গেছে!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের টাকা?"

"যমুনার এক বৎসরের চাঁদার। কাগজ পেতে দেরি হলে ভদ্রলোক তাগাদার চোটে অস্থির করে মারে, কিন্তু চাঁদার জন্যে তাগাদা করলে সাড়া শব্দ দেয় না।"

মনে মনে বললাম, আমি হলে আমিও দিতাম না; প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফণী-বাবু, আপনার সাব্‌স্‌ক্রাইবার বুক আছে ত?"

সহাস্য মুখে ফণীবাবু বললেন, "সাব্‌স্‌-ক্রাইবার বুক না থকলে কখনো চলে? নিশ্চয় আছে।"

"তবে তার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে রসিদ দিলেন যে?"

মাথা নেড়ে ফণীবাবু বললেন, "না, না,—ও ঠিক আছে। ও বিষয়ে গোলমাল করবেন না।"

উত্তরে খুশি হতে পারলাম না। গোলমাল করবে না, সে বিশ্বাস মনে মনে থাকলেও মিলিয়ে নেওয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা অপরিহার্য সবল নীতি, সে বিষয়েও তর্ক তুললাম না। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হল তাতে প্রতিবাদ না করেও থাকতে পারা গেল না।

একজন চাকর এসে সংসারের কয়েকটা খুচরো জিনিস ক্রয় করবার জন্যে ফণীবাবুর কাছে কিছু পয়সা চাইলে।

চাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলে, "কত চাই তোর?"

চাকর বললে, "আনা বারো দিন।"

সামনে যমুনার যে চাঁদা রাখা ছিল তা থেকে একটা টাকা চাকরের হাতে দিয়ে ফণী-বাবু বললেন, "যে পয়সা ফিরবে আমাকে দিয়ে যাস।" তারপর বাকি অর্থটা দেরাজের মধ্যে ফেলে আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন।

আমি বললাম, "মাপ করবেন ফণীবাবু, এই যে যমুনার তবিল থেকে একটা টাকা সংসার খরচে দিলেন, পরে এর মোকাবিলা হবে ত?"

ফণীবাবু বললেন, "হওয়াই ত' উচিত; কিন্তু কখনো হয়, কখনো হয়ে ওঠে না। সংসারের তবিল থেকে যমুনায় যে-টাকা দিই তারই কি সব সময়ে মোকাবিলা হয়?"

বললাম, "কিন্তু তবিলে তবিলে এ রকম অসঙ্গত জড়াজড়ি ত' ভাল কথা নয়। এর দ্বারা উভয় ব্যাপারেরই পরিচালনার বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অবশ্য, সংসার আর যমুনা দুই-ই আপনার নিজের বটে; কিন্তু সংসার আপনার যতটা নিজস্ব, যমুনা ততটা নয়। যমুনার বিষয়ে বাইরের লোকের কাছে আপনার জবাবদিহি আছে। যমুনার গ্রাহক আর বিজ্ঞাপনদাতারা আপনাকে অর্থ দেয় এই বিশ্বাসে যে, যমুনার সুপরিচালনার দ্বারা সেই অর্থের পরিপূর্ণ বিনিময় আপনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন। আর, তবিলের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক না হলে সুপরিচালনা যে সম্ভব নয়, এ কথা ত আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

কথায় কথায় সেদিন অনেক কথাই উঠল। আমার সুস্পষ্ট মন্তব্য সব সময়ে হয়ত ফণী-বাবুর তেমন ভাল লাগেনি, কিন্তু যা কিছু আমি বলেছিলাম, সবই যে তাঁর হিতার্থেই বলেছিলাম, একথা বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না। এক সময়ে তিনি দুঃখার্ত কণ্ঠে বললেন, "কিছু ভাল লাগে না উপেনবাবু! প্রতি মাসে লোকসান খেতে হচ্ছে, কি করে কত দিনে যে সামলে উঠব, কিছুই বুঝতে পারিনে!"

আমি বললাম, "লোকসান খেতে হচ্ছে, কে আপনাকে তা বললে?"

সবিস্ময়ে ফণীবাবু বললেন, "কে আবার বলবে? আমি নিজেই ত' তা বুঝতে পারি।"

বললাম, "আপনি নিজে হয়ত তা বুঝতে পারেন, কিন্তু অপরে বুঝবে না। অপরে যমুনার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখতে চাইবে। সন্ধ্যার দিকে আপনার অল্প অল্প জ্বর হয়, আপনি নিজে তা বুঝতে পারেন; কবিরাজকে তা বুঝতে হলে সন্ধ্যার সময়ে সে এসে আপনার নাড়ী টিপে দেখবে। আছে আপনার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান?"

অত অব্যবস্থার মধ্যে, যেখানে খরচ আছে ত' খাতা নেই, খাতা আছে ত' জমা নেই, সেখানে খতিয়ান যে ছিল না, তদ্বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। উত্তর দেবার কিছু না

পেয়ে নিরুপায় বিমূঢ়তায় ফণীবাবু আমার দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ভারি মমতা হ'ল এই ঢিলা-প্রকৃতির কাজেহারা ভালোমানুষটির জন্য। যার হাড়ের মধ্যে ব্যবসার ভেল্‌কি খেলে না, সে কেন লিপ্ত হয় এমন দুঃসাধ্য কাজের অধিকার চর্চায়! আইন পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি, ১৯১৩ সালের প্রারম্ভ থেকে ভাগলপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করব। মনে করলাম, যতদিন সম্ভব 'নেই কাজ ত খই ভাজ' নীতি অনুসরণ করে একটু বন্ধুকৃত্যই করা যাক্। সামান্য মানুষের সামান্য ক্ষমতার প্রচেষ্টায় ফণীবাবুর তেমন কোনো উপকার না হোক, নিজের ত' কিছু হবে। ধীরে ধীরে যমুনার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম।

ব্যবসার দিকে ফণীবাবুকে একটু সুযোগ এবং সময় করে দেবার উদ্দেশ্যে প্রুফ্ দেখার প্রায় সব কাজটাই নিজের হাতে নিলাম; প্রবন্ধ পাঠ এবং বিষয় নির্বাচনও করতে লাগলাম। যমুনার জন্য নিজে লিখতে প্রবৃত্ত হলাম, অপরের লেখাও সংগ্রহ করতে লাগলাম; এমন কি, সময় এবং সুযোগ মত ব্যবসায় পরিচালনার কার্যেও ফণীবাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করতে শুরু করলাম। লেবেলের উপর গ্রাহকদের নাম ও ঠিকানা লিখি, 'ভি পি'র ফর্ম পূরণ করি, অভিযোগ পত্রাবলীর উত্তর রচনা করে দিই। এমন কি, বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এলে পীড়াপীড়ি করে কাউকে কাউকে যমুনার গ্রাহক করেও নিই। মনের মধ্যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির ভারি এক সুমিষ্ট রস অনুভব করতে লাগলাম।

নিঃস্বার্থ পরোপকারের দ্বারা আত্মার একটু উন্নতি সাধন করবার সংকল্প ছিল, কিন্তু অযথা কৃতজ্ঞতাভারপীড়িত ফণীবাবু তার পরিপন্থী হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর যমুনা অফিসে গিয়ে বসলে চায়ের ছলে তিনি নোনতা এবং মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট স্বার্থের এমন বিরাট স্তূপের আয়োজন করতে লাগলেন যে, তার উপর হোঁচট খেয়ে নিঃস্বার্থপরতা বেচারা মারা যাবার দাখিল হল। মনকে কিছুতেই আর নিঃস্বার্থ পরোপকারের মহিমান্বিত উচ্চতায় তুলে রাখা যায় না।

একদিন বললাম, "যে রকম ব্যাপার আপনি লাগিয়েছেন ফণীবাবু, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে ফণীবাবু বললেন, "তা যাক্। আপনার মতো পিঁপড়ে লাভের গুড় খেয়ে গেলে আমি দুঃখিত নই। যে রকম অন্তর দিয়ে আপনি......ইত্যাদি ইত্যাদি।"

'অন্তর দিয়ে', সে কথা বোধ করি নিতান্ত মিছে নয়। আর, তারই পুণ্যে বোধ হয় ভাগ্যদেবতা কিছু প্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হয়। অনুযোগের চিঠিপত্র হ্রাস পেয়েছে, প্রকাশ-তারিখের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে গ্রাহকেরা সন্তুষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, জমার খাতার জমা এবং খরচের খাতায় খরচ দিনের দিন যথানিয়ম স্থান পাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সর্বত্র একটা যেন শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার আরাম দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। মাস তিন-চার পূর্বের অশান্তি এবং অসন্তোষের কর্কশ শব্দ বেশ খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

যমুনার যখন এই অবস্থা, সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের উদয়।

যমুনার পরিবর্তে সাহিত্যের ন্যায় খ্যাতনামা মাসিকপত্রে চরিত্রহীন প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্রের স্বার্থে আমি নিশ্চয়ই অধিকতর খুশি হতাম, কিন্তু সুরেশ সমাজ-পতি চরিত্রহীন প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা মাত্র যমুনার কথা মনে করে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, তবে বুঝি যমুনায় সৌভাগ্যের বান একান্তই দেখা দিলে।

ডালহৌসির ট্রামে শরৎকে তুলে দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে যখন বাড়ি পৌঁছলাম, তখন ক্লান্তি এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় দেহ অবসন্ন। মুখ হাত ধুয়ে দুপেয়ালা চা এবং তদুপযুক্ত খাবার উদরসাৎ করে অবিলম্বে যমুনা অফিসে উপস্থিত হলাম।

চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ফণীবাবু প্রুফ দেখছিলেন। পদশব্দে মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "কি উপেনবাবু, সমস্তদিন কোথায় ছিলেন? দুবার আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা পাই নি।"

বললাম, "দেখা যে পান নি, তাতে যমুনার কোন ক্ষতি হয় নি, বোধ হয় খুব বড় রকমের মঙ্গলই হয়েছে।"

সকৌতূহলে ফণীবাবু বললেন, "কি ব্যাপার বলুন ত?"

"শরৎ কলকাতায় এসেছে।"

"কে শরৎ?"

শরতের কথা ফণীবাবু আমার মুখে বহুবার শুনেছেন, মায় ভারতীতে বড়দিদির প্রকাশ এবং তৎসংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ও শৈলেশ মজুমদারের কাহিনী পর্যন্ত। বললাম, "শরৎ মানে বড়দিদি লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বর্মা থেকে এক বহুমূল্য রত্ন নিয়ে হাজির হয়েছে।"

যৎপরোনাস্তি উৎসুক হয়ে ফণীবাবু বললেন, "সে রত্ন কি কলম দিয়ে লেখা রত্ন?"

বললাম, "অতিশয় শক্তিশালী কলম দিয়ে লেখা।" তারপর শরতের প্রথমদিন আমাদের বাড়ি বিনা-নোটিশে আসা থেকে আরম্ভ করে সেদিন বৈকালে বউবাজার স্ট্রীটের মোড়ে ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলাম।

টেবিলের অপর দিক থেকে দু'হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরে ফণীবাবু ডাকলেন, "উপেনবাবু।"

স্মিতমুখে বললাম, "কি ব্যাপার?"

"আমাকে চরিত্রহীন জোগাড় করে দিন,—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

বললাম, "তা না থাকলেও চলবে। কিন্তু পেলে ছাপবেন ত?"

"একশ বার!"

"সুরেশ সমাজপতি কিন্তু সাহস পান নি।"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত ফণীবাবু বললেন, "সবাই সুরেশ সমাজপতির মতো ভীতু নয়।"

"কিন্তু সুরেশ সমাজপতির ভয়ের কারণ যদি সত্যি হয়?—যমুনা যদি উঠে যায়?"

"তাহলে সাহিত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কাঁধে কাপড়ের বোঝা ঝুলিয়ে আর হাতে লোহার গজ নিয়ে কলকাতার পথে পথে ফেরি করে বেড়াব।"

খুশি হয়ে বললাম, "সাবাস! কিন্তু শুনুন, কাল বিকেল চারটের সময়ে শরৎ আমাদের বাড়ি আসবে। আমি খবর দিলে আপনি গিয়ে তাকে এখানে ধ'রে নিয়ে আসবেন। তারপর আপনার এই যমুনার বৈঠক তাকে যাতে আকৃষ্ট করতে পারে, তার চেষ্টা দেখতে হবে।"

দীর্ঘকাল ধরে নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনার পর যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত্রি ন'টা বেজে গেছে। (ক্রমশ)



ধূসর পৃথিবী

ফ্রানৎস্ কাফকা

অনুবাদক : নৃপেন্দ্র সান্যাল

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছয়

['কে'র কাকা—লেনী]

একদিন দুপুরে কাজকর্মে ভারী ব্যস্ত 'কে'। কোনোদিকে নজর দেবার ফুরসৎ নেই। দুজন কেরানী কয়েকটা কাগজপত্র সই করাতে নিয়ে এল। কিন্তু সই করা আর হল না। তার কাকা কার্ল অফিসে ঢুকেই সেগুলি তার টেবিল থেকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিল। কাকা তার গ্রাম থেকে আজই শহরে এসেছে। কাকা আসায় 'কে' অবশ্য খুব আশ্চর্য হল না। কারণ বেশ কয়েকদিন থেকেই কাকার আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তার কাকা যে একবার আসবেনই, মাসখানেক আগেই সে তা বুঝতে পেরেছিল। কাকার আসার কথা এতবার সে চিন্তা করেছে যে, একটা ছবিই তার মনে আঁকা হয়ে গেছে। প্রায়ই সে ছবি দেখে যেন তার কাকা এলেন। তাঁর সামান্য কুঁজো পিঠ। বাঁ হাতের চাপে পানামা টুপিটা চেপ্টে গেছে। দরজার মুখ থেকেই তিনি ডান হাত বাড়িয়ে আসছেন। যেন সামনের সব বাধা সরিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। তারপর টেবিলের কাছে এসে সবকিছু তছনছ করে ফেলবেন। সব সময়েই তার কাকার এমন বাস্তবাগীশ ভাব। শহরে এসে একদিনের মধ্যেই তিনি সব কাজ সেরে ফেলতে চান। তাই মুহূর্ত মাত্র নষ্ট না করে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা তার। পাছে যদি আবার অন্য কাজ না হয়, তাই সময় নষ্ট হবার এমন ভয়। অথচ যা যা কাজ মনে মনে ঠিক করেছেন, তার একটাও বাকী থাকতে পারবে না। সব করা চাই। এমন কি একটু ঠাট্টা আমোদও বাদ থাকতে পারবে না। আর এ-সমস্ত কাজেই 'কে'কে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। কোনো কোনো সময় আবার তিনি 'কে'র সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। 'কে'রও উপায় নেই। এ সব কিছুই তার করতে হয়। কারণ, 'কে' তার কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ।

কাকা ঘরে ঢুকতেই 'কে' চেয়ার এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু বসবার তার সময় কই। না বসেই 'কে'কে জানালেন, তার সঙ্গে তিনি কয়েকটি কথা খুব গোপনে আলাপ করতে চান। 'কে'র কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'এ-সব আলাপ না করে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না জোসেফ।' 'কে' একথা শুনে তার কেরানী দুজনকে বাইরে যাবার নির্দেশ দিল, আর বলল কাউকে যেন ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

'জোসেফ এসব কি শুনেছি, এ্যাঁ।' ঘরে কাউকে না দেখে কাকা চীৎকার করে উঠলেন। এতক্ষণে তিনি টেবিলের ওপরে বসে কাগজপত্র ঘাঁটিতে শুরু করেছেন। কিন্তু কাগজের কোনো লেখাই তিনি পড়ছেন না। 'কে' কিছুই বলল না। বুঝতে তার কষ্ট হয়নি তার কাকা কি বলতে চান। কিন্তু তবু তার ভাল লাগল। তার অফিসের কাজের তাড়া থেকে সামান্য মুক্তি পেয়েছে এখন। মনে মনে ভারি আরাম বোধ করে সে। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার অপরদিকে 'কে' তার দৃষ্টি চালিয়ে দিল। সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে একটা খালি বাড়ির দেয়ালদুটোর ত্রিকোণাকৃতিক সংযোগ চোখে পড়ে।

হাত দুটো শূন্যে তুলে আবার চেঁচিয়ে উঠল তার কাকা। 'বেশ কথার জবাব না দিয়ে তুমি বসে আছ? ভগবানের দোহাই জোসেফ, তুমি বল আমি যা শুনেছি তা সত্যি কি না?'

'তবে শুনুন কাকা'। কে-র শান্ত মগ্নতা ছিঁড়ে গেল। 'আমি বুঝতেই পারছি না আপনি কোন কথা জানতে চান।'

কাকা এ কথায় হঠাৎ একটু হোঁচট খেলেন। তারপর তাকে সতর্ক করে দেবার ভঙ্গীতে বল্লেন, 'দেখ জোসেফ, যতটুকু আমি জানি, তুমি সব সময়েই সত্যি কথা বল। কিন্তু তোমার এখনকার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার একথার অর্থ কি কোনো কিছু অমঙ্গলসূচক?'

কাকার সঙ্গে যেন সে বিবাদ এড়াতে চায়। 'কে' তাই বলল, 'অবশ্য আমি অনুমান করতে পারছি আপনি কি জানতে চান। সম্ভবত আপনি আমার বিচারের কথা বলছেন; তাই না?'

'হাঁ, ঠিক তাই।' গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে জবাব দেন তিনি। 'হাঁ, তোমার বিচার সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জেনেছি।'

'কিন্তু কার কাছ থেকে?'

'এরনা আমাকে লিখে সব জানিয়েছে। এও শুনলাম, তুমি নাকি তার সঙ্গে আজকাল দেখা সাক্ষাৎও কর না। এ বড় দুঃখের বিষয়। কিন্তু তবু সে তোমার খবর রাখে। আজ সকালেই আমি চিঠি পেয়েছি। তারপর প্রথম ট্রেনেই এখানে চলে এলাম। এখানে আসার আমার কোনো দরকার ছিল না। শুধু তোমার জন্যই আমায় আসতে হল। সব কিছু আমি জানতে চাই। চিঠিতে এরনা খোলাখুলিভাবে সব লেখেনি।' কথা শেষ করে তিনি তাঁর পকেটবুক থেকে চিঠিটা বার করলেন। 'এই যে, এই তার লেখা। সে লিখেছেঃ অনেকদিন হয় জোসেফের কোনো খবর আমি পাই না। গত হপ্তায় আমি একবার তার ব্যাংকে গিয়েছিলাম। কিন্তু জোসেফ ব্যস্ত থাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম। আরও দেরী হয়ত করতাম। কিন্তু সেদিন আমার পিয়ানো শেখার ক্লাস ছিল। জোসেফের সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় ভাল লাগে। বোধহয় শীঘ্রই আমি তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব। আমার জন্মদিনে সে আমাকে সুন্দর একটা চকোলেটের বাক্স উপহার দিয়েছে। উপহারটি এত ভাল যে, শুধু তার কথা ভাবতে ইচ্ছে করে। একথা আমি জোসেফকে লিখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার কথায় তা মনে পড়ল। চকোলেটগুলো বোর্ডিংয়ে এসে পৌঁছুনোমাত্র সব উধাও হয়ে গেল। আর যে উপহার স্বল্পস্থায়ী তার কথা কি কারো বেশীক্ষণ মনে থাকে? যাই হোক, জোসেফ সম্পর্কে আপনাকে কিছু লেখা দরকার। আমি যেদিন ব্যাংকে গিয়েছিলাম, সেদিন শুনলাম তার কি এক ব্যাপারে মামলা চলছে। প্রথমে আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। কারণ, জোসেফ তখন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর একজন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম জোসেফের ঘরের লোকটি কাজ সেরে কখন বার হবে? একথায় পরিচারকটি বলল, লোকটির সঙ্গে তার আলোচনা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে কারণ, তারা একটা মামলা সম্পর্কে আলাপ করছে। আর মামলাটা নাকি তারই বিরুদ্ধে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের মামলা, অথবা সে ভুল করছে কি না। কিন্তু জবাবে পরিচারিকটি বলল, সে ভুল করছে না। এসেসর বাবুর বিরুদ্ধেই মামলাটা চলছে। মামলাটি বেশ গুরুতরও বটে। কিন্তু তার বেশী আর সে কিছু বলতে পারে না। পরিচারকটি আরো বলল যে, সে এসেসরবাবুকে সাহায্য করতে চায়। কারণ, তিনি অত্যন্ত ভাল লোক। তবে কিভাবে যে সে সাহায্য করবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তবে তার

মনে হয় কোনো প্রতিপত্তিশালী লোক যদি এবিষয়ে তদ্বির করেন, তবে একটা সুরাহা হওয়া সম্ভব। হয়ত ভবিষ্যতে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে এসেসরবাবুর মনের অবস্থা লক্ষ্য করে কিছু ভাল মনে হয় না। আপনি বুঝতেই পারছেন, লোকটির কোনো কথা আমি বিশ্বাস করিনি। সবটাই আমার কাছে আজগুবি মনে হয়েছিল। তবে ভালর জন্য আমি তাকে এসব কথা অন্য কাউকে না বলতে বলে দিলাম। সবচেয়ে ভালহয় বাবা, এরপর যখন আপনি শহরে আসবেন, তখন যদি এ সব কিছুর খোঁজখবর নেন। আপনার পক্ষে হয়ত এর খোঁজ পাওয়া তেমন কঠিন হবে না। আর যদি সম্ভব হয়, আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে দিয়ে এ ব্যাপারের একটা তদারক করেন। হয়ত এর কিছুরই দরকার হবে না। কিন্তু আপনি যদি এই উপলক্ষ করে আসেন, তবে আমি আপনাকে একটু আগে দেখবার সুযোগ পাব। আর তাই বা কম আনন্দের কি?—বড় ভাল মেয়ে আমার এই এরনা।' চিঠি পড়া শেষ করে কে-র কাকা মন্তব্য করলেন। চোখে তার জল এসে গেছে এরনার কথায়।

'কে' মাথা নাড়ল সম্মতিতে। সত্যি সাম্প্রতিক নানা কাজে এতদিন সে এরনার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। আর চকোলেটের কথা তার বানানো গল্প। সে কোনো চকোলেটের বাক্স তাকে উপহার পাঠায়নি। কাকা ও কাকীমার কাছে কে-র মুখ রক্ষা করবার জন্যই সে ও গল্প বানিয়েছে। সত্যি বেচারা মনে বড় দুঃখ পেয়েছে। 'কে' একবার ভাবল সে এবার থেকে নিয়মিতভাবে তার জন্য থিয়েটারের টিকিট কিনে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আবার তার খটকা লাগে। এই কি যথেষ্ট? কিন্তু কি সে করবে। এখন আর তার ভাল লাগে না আঠারো বছরের একা স্কুলের মেয়ের সঙ্গে বোর্ডিংয়ে গিয়ে গল্প করতে।

'বল, এখন তুমি কি বলতে চাও?' কাকা জিজ্ঞাসা করলেন। সাময়িকভাবে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর তাড়াহুড়োর কথা। চিঠিটা এই নিয়ে তিনি অনেকবার পড়লেন।

'হাঁ কাকা। সত্যিই আমি একটা মামলায় আসামী।'

'এ্যাঁ সত্যি? কি বলছ তুমি জোসেফ। এও আবার সম্ভব নাকি! তবে কোনো ফৌজদারী মামলা নয় নিশ্চয়ই?'

'হাঁ কাকা! ফৌজদারী মামলাই।'

'আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে মাথার ওপর এক ফৌজদারী মামলা নিয়ে বসে আছ?' কাকার গলার পর্দা ক্রমেই ধাপ পার হচ্ছে।

'আমি যত শান্ত থাকতে পারি ততই ভাল।' কে জবাব দিল। 'যাই হোক, আপনি এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।'

'তোমার পক্ষে এটা বলা বেশ সহজ জোসেফ কিন্তু তুমি তোমার কথা ভাব। ভাব তোমার আত্মীয় পরিজনদের কথা। এতদিন পর্যন্ত আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জল তুমি করেছিলে। লোকে তোমার প্রশংসা করত। কিন্তু এখন তোমার জন্য আমাদের পরিবারের নাম কলঙ্কিত হতে পারে। না এ কিছুতেই আমি হতে দেব না।' একটু থেমে মুরগীর মত গলা ছোট করে তিনি কে-র দিকে তাকালেন। 'তোমার মনোভাব আমার মোটেও ভাল লাগছে না জোসেফ। একজন নির্দোষ লোক এধরণের ব্যবহার কখনই করতে পারে না। সত্যি করে আমায় সমস্ত ঘটনাটা বল জোসেফ, যাতে আমি এ বিষয়ে কিছু করতে পারি। নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে তুমি জড়িয়ে পড়েছ।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কে বলল, 'না কাকা। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কিছু নয়। কিন্তু আপনি বড় জোরে জোরে কথা বলছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যাঙ্কের বেয়ারারা সব আসে-পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে। এসব আমার মোটেও ভাল লাগছে না। তার থেকে চলুন, আমরা বাইরে কোথাও যাই। সেখানে আমি আপনার সব কথার জবাব দেব। অবশ্য, যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব। আমি বুঝি কাকা। পরিবারের কাছে এবিষয়ে আমার জবাবদিহি করতে হবে।'

'বেশ তাই হোক। তবে বেশ চটপট্ তৈরী হয়ে নাও।' চীৎকার করেই কাকা বল্লেন।

'না আমার দেরী করার কোনো কারণ নেই। শুধু কতকগুলি কাজ বুঝিয়ে দিলেই আমার চলবে।' এই বলে সে টেলিফোনে তার চীফ এ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকল। একটু পরেই সে এসে হাজির হল। 'কে' টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। কতকগুলি কাগজপত্রের দিকে আঙুল দিয়ে কি যেন সে সব তাকে বুঝিয়ে দিল। ভদ্রলোকটির বয়স বেশ অল্প। মাথা নীচু করে শান্ত হয়ে সে-সব বুঝে নিচ্ছে, 'কে' চলে যাবার পর কি কি তাকে করতে হবে। কাকা তাদের কাজে বড় বাধা দিচ্ছিল। তিনি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। চোখ গোল গোল করে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। আর মধ্যে মধ্যে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। তিনি হয়ত 'কে'র কোন কথার প্রতি মনোযোগী নন। কিন্তু তবু তাকে দেখে মনে হয় যেন সব কথা শুনতে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন। আর এই ভঙ্গীটাই তাদের কাছে ভারী বিরক্তিকর ঠেকছিল। এবার তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় পায়চারী করতে আরম্ভ করে দিলেন। আর মাঝে মাঝে কি ভাবতে ভাবতে হয় জানালার পাশে, নতুবা কোন ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আর হঠাৎ মধ্যে মধ্যে হাত-পা নেড়ে বলছেন 'না, না এ ভাবাই যায় না।' 'ভগবানই জানেন কি হবে।' চীফ এ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোকের ভাব দেখে মনে হয় না তিনি এসব কিছু শুনছে। পরন্তু শান্ত হয়ে 'কে'র প্রতিটি কথা শেষ পর্যন্ত

মনোযোগের সঙ্গে বুঝে নিচ্ছে। নির্দেশ-গুলির একটি নোট করে নেবার পর সে 'কে' ও তার কাকাকে মাথা নুয়ে অভিবাদন করে বিদায় নিল। 'কে'র কাকা হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর জানালার পর্দাটা হঠাৎ মুঠির মধ্যে চেপে ধরলেন। ঘরের দরজাটা তখনো খোলা। 'কাকা' চেঁচিয়ে উঠলেনঃ

'যাই হোক, লোকটা গেল তাহলে এতক্ষণে। তবে আর দেরী কেন। চল আমরাও যাই।'

তারা অফিস থেকে বার হল। বারান্দায় কয়েকজন কেরানী ছিল। ডেপুটি ম্যানেজারও কি কাজে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানেও কোনভাবে 'কে' তার কাকাকে মামলার আলোচনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। অপেক্ষমান কেরানীদের অভিবাদনের উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে জোসেফ শুনি এখন তোমার মামলার কথা।'

'কে' সাধারণভাবে কয়েকটি কথা একটু হেসে হেসে বলল। তারপর সিঁড়ির কাছে এসে কাকাকে জানাল যে, কেরানীদের সামনে সে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় না।

'তা অবশ্য ঠিক।' এতক্ষণে তার কাকা যেন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। যাই হোক, এখন ত আর কেউ ধারে-কাছে নেই। এখন বলে ফেলত ব্যাপারটা।' মাথা নীচু করে তিনি 'কে'র কথা শুনতে লাগলেন। হঠাৎ এর মধ্যে কখন একটা সিগারও ধরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'প্রথম কথা হল কাকা, যে এ মামলা সাধারণ কোন আদালতে হচ্ছে না।'

'তাহলে ত ভারী খারাপ।'

কাকার দিকে তাকিয়ে 'কে' জিজ্ঞাসা করল 'কেন, খারাপ কেন?'

'অতশত বলতে পারি না বাপু। তবে আমার মনে হচ্ছে এটা খারাপ।' ব্যাঙ্ক থেকে বার হবার বাইরের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। মনে হল দ্বাররক্ষী তাদের কথা শুনছে। 'কে' তাড়াতাড়ি তার কাকাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনল। তারা রাস্তার জনতার ভীড়ে এসে থামল। কাকা 'কে'র হাত ধরে আছেন। এখন আর তিনি মামলার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন না। সত্যিই এই এতক্ষণ পর তারা খানিকটা পথ নীরবে হাঁটল।

'তাহলে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল।' এতক্ষণ থেমে থেকে আবার তিনি প্রশ্ন করেন। এমন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য পেছন পেছন যে লোকগুলো আসছিল, তারা আর একটু হলে ধাক্কা খেত আর কি।

'আর এ ধরণের ব্যাপার ত হঠাৎ ঘটে না। নিশ্চই অনেকদিন ধরে তুমি এর আভাষ পাচ্ছিলে। তখন আমায় জানালে না কেন? জান, এখনো এক অর্থে আমি তোমার অভিভাবক। আর তার জন্য আমার মনে গর্বও আছে। তোমার জন্য তাই আমি সব কিছু করতে রাজী। অবশ্য এখনো যতটুকু সম্ভব, আমি তোমার জন্য করব। তবে দেরী হয়ে যাওয়ার ফলে একটু অসুবিধা হবে আর কি। আর মামলা বোধ হয় এখন বেশ জোরদমে চলছে। ব্যাপারটা বুঝতে তাই একটু অসুবিধা হতে পারে। যাই হোক, এখন আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হবে, যদি তুমি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে আমাদের কাছে যাও। তুমি একটু রোগাও হয়ে গেছ। গ্রামে গেলে তোমার শরীরটাও একটু ভাল হবে। মামলার ধকল ত কম নয়। শরীরে সব সহ্য হওয়া চাই ত। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই আদালতের আওতার বাইরে ত' তুমি কিছুকাল থাকতে পারবে। আদালতের হাতে এখানে সব উপকরণই আছে। যা' দিয়ে ইচ্ছে করলে তারা তোমার নানারকম অসুবিধা করতে পারে। কিন্তু গ্রামে গেলে এতটা সুবিধা তাদের থাকবে না। তোমার জন্য তাদের আলাদা লোক রাখতে হবে। যদি বিশেষ দরকার পড়ে তবে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা পোস্টঅফিস ত আছেই। এর ফলে মামলা সাজানোয় তাদের বেশ অসুবিধা হবে। তুমি ত' আর পালাচ্ছ না। কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছ মাত্র।'

কাকার মনোভাব এতক্ষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা করছে সে। এবার সে জবাব দিলঃ 'তারা ইচ্ছে করলে আমাকে না-ও যেতে দিতে পারে।'

বেশ একটু ভেবে তার কাকা আবার বল্লেন, 'আমার মনে হয় না তাদের কোনরকম আপত্তি হতে পারে। কারণ তুমি এখান থেকে গেলে তাদের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।'

'কে' কাকার হাত ধরে চলতে আরম্ভ করল। 'আমার প্রথমে মনে হয়েছিল কাকা। আপনি বোধ হয় আমার মামলার ব্যাপারটা তত গভীরভাবে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনি বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন।'

[অনিবার্য কারণবশত 'ধূসর পৃথিবী' প্রকাশ বন্ধ রাখিতে হইল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার জন্য আমাদের ক্ষমা করিবেন—সম্পাদক, দেশ]

চৌরাস্তার ধারে

কাকভূশণ্ডী

বিহার পুলিশ পুরা সাতদিন ধরিয়া সৌজন্য সপ্তাহ পালন করিয়াছে।

—অষ্টম দিন হইতে তাহার প্রতিক্রিয়া কেমন হইতেছে, তাহা বিহারের জনসাধারণ নিশ্চয়ই মালুম পাইতেছে।

* * * *

গ্যাংটক হইতে ভারতের জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানাইতেছেন যে, অতীতে বিভিন্ন চুক্তির ফলে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যে ব্যবসায়িক সুবিধা বর্তমান, কম্যুনিস্ট চীন তিব্বত অধিকার করিলে ভারতকে সেই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নাই।

—ঘটিলে খবরের কাগজ মারফৎ আমরা প্রতিবাদ জানাইব, ইহার বেশি আর কি আমরা করিতে পারি?

* * * *

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, চীন তিব্বতে অতীত চুক্তি অনুসারে ভারতকে সামান্য সৈন্যও রাখিতে দিবে না।

রাখিবার জন্য ভারতের যে খরচা হইতেছিল,

—ভালই করিবে। মিছামিছি ঠাট বজায় সেটা কমিবে।

* * * *

কয়লার অভাবে পূর্ব-পাকিস্থানের নিয়মিতভাবে বহু ট্রেন ও স্টীমার চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

—প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ কমনওয়েলথ সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেই সেগুলি পূর্বেকার মত চালু হইবে।

* * * *

সম্প্রতি কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মধ্যম তরঙ্গের এক বিক্ষেপক যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। দিনের বেলার গোলমাল সত্ত্বেও ১২০ মাইল দূর পর্যন্ত খুব ভালভাবে অনুষ্ঠান শোনা যাইবে। রাত্রে ব্রহ্মদেশেও বেতারবার্তা পৌছাইবে।

—অর্থাৎ, এতদিন যাহারা কোনক্রমে

কানটা বাঁচাইত, তাহাদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল আর কি!

* * * *

হরমপুরের একটি সংবাদে প্রকাশ, চরকুঠিবাড়ি এলাকায় সম্প্রতি একদিন রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকায় পাকিস্থান সীমান্ত-রক্ষীরা সহসা এলোপাথাড়ি কয়েক রাউন্ড গুলী চালাইতে থাকে। ভারত সীমান্তরক্ষীরা এ বিষয় জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোনপ্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করে নাই। তাহারা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে।

—ভালই করিয়াছে। পাকিস্থান দেখুক, আমরাই প্রকৃত সাম্প্রদায়িক মিলন-সপ্তাহ মনেপ্রাণে পালন করিতেছি কি না!

* * * *

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করা মাত্র ধুতি পরিহিত এক ব্যক্তি মঞ্চে আরোহণ করিয়া কিছু বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করে। জনসাধারণ গান্ধী নীতি অনুসরণ করিতেছে না, অসংলগ্নভাবে ইহাই সে বলিতে চাহিয়াছিল। ইতিমধ্যে পুলিশ আসিয়া তাহাকে হাজতে লইয়া যায়।

—আহা বেচারী! স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখে গান্ধী নীতি প্রচার করিলেও যে হাজতে বাস করিতে হইবে, সেটা তাহার মগজে ঢোকে নাই।

* * * *

জনৈক প্রসূতি সংবাদপত্রে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনিয়া বলিয়াছেন যে, কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে (ক্যাম্বেল) তিনি প্রসব-বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্নচিত্তে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবুকে তাঁহাকে দেখিয়া যাইবার জন্য বিশেষ তাগাদা দিতে থাকেন। তখন ডাক্তারবাবু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠেন যে, মহাশয়, অত ব্যস্ত হইবেন না, এটা হাট নয় হাসপাতাল।

—হাটের চেয়ে ডাক্তারবাবু ঘোড়দৌড়ের মাঠের সহিত এই স্থানের তুলনা দিয়া বলিতে পারিতেন যে, আমরা ঘোড়া নই যে, ইঙ্গিত পাইলেই ছুটিয়া যাইব।

* * * *

মার্কিণ সরকার কূটনৈতিক দূত মারফৎ অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কোরিয়ায় কম্যুনিস্ট চীনকে আক্রমণকারীরূপে ঘোষণা না করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিবে।

—ঘোষণা তো প্রায় সকলেই করিয়াছে, কিন্তু ঘোষণার সাহায্যে তো যুদ্ধে জেতা যায় না। এখন সেইটাই তো সকলের গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

* * * *

মুদ্রা সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ভারতবর্ষ পাকিস্থান হইতে চাল ক্রয় করিতে পারে নাই। পাকিস্থান তাই অন্যত্র চাউল বিক্রয় করার চেষ্টা করিতেছে, নতুবা চাউল বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

—তাহাতেও পাকিস্থানের ক্ষতি নাই, ভারতকে তো চাল দেখাইতে পারিল।

* * * *

গত ৯ই জানুয়ারী টোকিও ও ইয়োকোহামায় ৪০ সেকেন্ড কাল প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। যুদ্ধের পর এইরূপ প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর হয় নাই।

—ইহার কারণ, ভগবানও বোধ হয় কম্যুনিস্ট হইয়া গিয়াছেন, নচেৎ ম্যাকআর্থার সাহেবের হেড কোয়ার্টার্সেও এরূপ উৎপাত শুরু করিবেন কেন?

* * * *

কুয়ালালামপুরে এক মোটর ড্রাইভার মারা যায়। মৃতের আত্মীয়স্বজন তাহার চারিধারে বসিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে। কিছু পরেই লোকটি উঠিয়া বসিয়া কথাবার্তা শুরু করে। মৃতের পুনর্জীবন দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা মূর্ছা যায়, বালকেরা কাঁদিতে থাকে, বৃদ্ধেরা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে শুরু করে। এক ঘণ্টা পরে লোকটি বলে, তাহার ঘুম পাইতেছে। সেই ঘুমই তাহার চিরঘুমে পরিণত হয়।

—ইহাকেই বলে সংসার! মরিয়াও যদি বাঁচিয়া ওঠা সম্ভব হয়, তাহা হইলে চতুর্দিকে আত্মীয়স্বজনের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আবার না মরিলে বোধ হয় শান্তি পাওয়া যায় না।

* * * *

পাকিস্থানের কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, পাকিস্থান রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে। পাকিস্থান পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

—উক্ত সংবাদপত্রগুলি যদি তাক্ লাগাইবার জন্যই এমন সংবাদ পরিবেশন করিল, তখন আর একটু ঘুরাইয়া লিখিলেই তো ভাল হইত যে, রাশিয়া পাকিস্থানের সহিত অনাক্রমণ চুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

* * * *

ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত সিন্ধ্রি সার উৎপাদন কারখানা দশ কোটি ব্যয়ে সম্পূর্ণ হইবার কথা ছিল। ইতিমধ্যে নাকি ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কত টাকা খরচ করিলে যে তাহা সম্পূর্ণ হইবে, সে হিসাব জানা যাইতেছে না।

—সার বস্তু পাইতে হইলে অসার অর্থের হিসাব নিষ্প্রয়োজন।

বেতার প্রসঙ্গ

বিদ্যার্থীমণ্ডল

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিভিন্ন কেন্দ্রে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও আনন্দদানের জন্য বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা আছে। কল্‌কাতা কেন্দ্রে যে বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হয়, তার নাম 'বিদ্যার্থী-মণ্ডল।" বিদ্যার্থীমণ্ডলের শ্রোতাদের বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে—খুব সম্ভবত ১০ আর ১৪ বৎসরের অন্তর্বর্তী বয়সের ছেলেদের জন্যেই এই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। স্কুলের ঐ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের স্কুল পাঠ্য বিষয়গুলির আনুষঙ্গিক হিসাবে কিছু অতিরিক্ত বিষয় রেডিওর মাধ্যমে শিখতে পারে, তার জন্যেই মুখ্যত এই বিশেষ প্রোগ্রামের পরিকল্পনা।

ইতিহাস অন্যতম স্কুলপাঠ্য বিষয়; কিন্তু স্কুলে ইতিহাস যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে খানিকটা কিতাবী গল্প থাক্‌বেই থাকবে। ইতিহাসের পাঠ্যতালিকাকে যতই আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হোক্ না কেন এবং যতই সরস-ভাবে সে পাঠ্য ছেলেদের সামনে তুলে ধরা হোক্ না কেন, বিরস ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা এবং সন-তারিখের অস্বস্তিকর বন্ধন থেকে ছেলেরা কোনক্রমেই সম্পূর্ণ মুক্তি আশা করতে পারে না। সে রকম আশা করা বোধ করি উচিতও নয়। পাঠ্যবস্তু সবটাই আনন্দময় হবে, তাকে জীর্ণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে অধ্যবসায় আর শ্রমসাপেক্ষ চেষ্টার স্থান থাক্‌বে না, এটা কখনও শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। তবে শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে আনন্দের উপাদান অবশ্যই আরও বাড়াবার অবকাশ আছে এবং এ বিষয়ে আমাদের অনেক বেশী সজাগ হওয়া দরকার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

রেডিওর বিদ্যার্থীমণ্ডল তাঁদের প্রোগ্রামে উপরিউক্ত আনন্দসমন্বিত শিক্ষার আদর্শের উপর জোর দিতে চাইছেন। ইতিহাসের—তেমনি অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ভিতর এমন অনেক জিনিস আছে, যা বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে পড়ানো সম্ভব নয়। সে সব সরস ক'রে বলতে গেলে গ্রাহিষ্ণুতার দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে কৃত্রিম বাধা-বন্ধনমুক্ত সহজ স্ফূর্তি থাকা দরকার প্রচলিত বিদ্যায়তনের বিধিনিষেধ জর্জরিত আবহাওয়ায় তা বোধ করি দুর্লভ। রেডিওর শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম-গুলি এই দিক থেকে অনেকখানি কাজ করতে পারে এবং এটা সুখের বিষয়, কল্‌কাতা কেন্দ্রের বিদ্যার্থীমণ্ডল এই প্রশংসনীয় আদর্শ সম্মুখে রেখে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু কিছুই কিছু নয় যদি আদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করবার পথে উপযুক্ত সুবিধা-সুযোগ না থাকে। বিদ্যার্থীমণ্ডলের প্রোগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবার পথে সব চাইতে বড় বাধা সংশ্লিষ্ট শ্রোতাদের শোন্‌বার সুযোগের অভাব। যে কথা আমরা পূর্বেও বলেছি, এদেশে রেডিও যন্ত্রটি এখন পর্যন্ত বিলাসের দ্রব্যরূপে গ্রাহ্য—নিতান্ত ভালো অবস্থার, নিদেন, মোটামুটি রকমের চলনসই অবস্থার লোকের ঘরে ছাড়া রেডিও আর কোথায় বড়ো একটা রাখা হয় না। স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কতজন সম্পন্ন গৃহের সন্তান? হিসাব করলে দেখা যাবে, এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি, বহুগুণ বেশি, যাদের গৃহে রেডিও থাকা তো দূরের কথা, রেডিও যন্ত্রটি ভালো ক'রে দেখ্‌বার সুযোগ পর্যন্ত যাদের জীবনে হয় নি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বিদ্যার্থীমণ্ডল কাদের জন্যে প্রোগ্রাম পরিবেশন করছে এবং সে প্রোগ্রাম যথাস্থানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে কিনা, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

প্রতিবন্ধক দূরীকরণের একটি উপায় হলো স্কুল-গৃহে গ্রাহক-যন্ত্র স্থাপনা কিন্তু এই দিকে কতোদূর কাজ এগিয়েছে সে প্রশ্ন সংগত-ভাবেই করা যেতে পারে। সরকার-পরিচালিত এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট কোন কোন স্কুলে অবশ্য রেডিও যন্ত্র বসাবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এই ধরণের স্কুলের সংখ্যা সমগ্র স্কুল-সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ মাত্র হবে। অধিকাংশ স্কুল আজও অবাধ রেডিওর সুযোগে বঞ্চিত। আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, যতোদিন স্কুল-গৃহগুলিতে ব্যাপক ভিত্তিতে রেডিও যন্ত্র বসাবার ব্যবস্থা না হয়, ততদিন বিদ্যার্থী-মণ্ডলের প্রোগ্রামের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। বিদ্যার্থীদের জন্য প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হলো, অথচ সে প্রোগ্রাম কেউ শুনতে পেলো না, কিম্বা লক্ষ্যগোচর শ্রোতাদের একটি সামান্য অংশই মাত্র শুনতে পেলো, এটা বাঞ্ছনীয় অবস্থা নিশ্চয়ই নয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ভাববার আছে। বিদ্যার্থীমণ্ডলের প্রোগ্রাম পরিবেশিত হয় সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটের সময়। এ সময় কোন স্কুলই খোলা থাকে না। কল্‌কাতার কয়েকটি কলেজ, যেখানে পাইকারী হারে দিনের মধ্যে তিন দফায় বিদ্যা খয়রাত করা হয়, এ সময় খোলা থাকে বটে, কিন্তু তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যার্থীমণ্ডল উদ্দিষ্ট নয়। যাদের জন্যে বিশেষভাবে বিদ্যার্থীমণ্ডল, ততক্ষণে তারা গৃহগত, পাঠরত কিম্বা আর কোন কাজে ব্যস্ত।

সুতরাং কেনই বা প্রোগ্রাম? আর কাদের জন্যই বা প্রোগ্রাম? রেডিও কর্তৃপক্ষ হয়তো এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে, তাঁরা স্কুলের একটা নির্দিষ্ট বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছেন এবং সে ব্যবস্থায় কাজও হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। কেন বিপরীত, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক গৃহে এবং যথেষ্টসংখ্যক স্কুলে রেডিও যন্ত্র স্থাপনার ব্যবস্থা না হলে শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের অর্থ হয় না।

রেডিওতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রোগ্রাম আছে, শিশুদের জন্য প্রোগ্রাম আছে, শিশুদের মায়েদের জন্য প্রোগ্রাম আছে, মজদুরদের জন্য প্রোগ্রাম আছে, পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রোগ্রাম আছে, আরও কত কী আছে। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে সব দিক ভেবে-চিন্তে বার-করা বেশ গাল-ভরা প্রোগ্রাম; পরিকল্পনায় খুঁত ধরবার যো নেই। কিন্তু কার্যত তাদের রূপ কি দাঁড়াচ্ছে, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। কেননা, আঁটঘাঁট বেঁধে প্রোগ্রামের ছক কয়লেই হল না; প্রোগ্রামগুলি যাদের জন্য করা হয়েছে, তাদের তার দ্বারা উপকৃত হওয়া আবশ্যক। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, সস্তা বাহবা নেবার লোক-দেখানো প্রয়াস ছাড়া তাকে আর কী বলা যায়।

বিদ্যার্থীমণ্ডল-এর প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই শুধু বলা যায়, এই বিভাগের সব প্রোগ্রামই খারাপ নয়, আবার সব প্রোগ্রামই ভালো নয়। কোন কোন কথিকা আমাদের আনন্দ দিয়েছে, সেকথা স্বীকার করবো। আনন্দ দিয়েছে তার অর্থ উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের প্রত্যাশা পূরণের মতো উপাদান কথিকাগুলিতে আছে দেখে খুশি হয়েছি। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান যদি বিদ্যার্থীমণ্ডলের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আলোচ্য কথিকাসমূহ সেই মানদণ্ড উত্তীর্ণ হয়েছে, একথা বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে য়্যুনিভার্সিটির ভারী ভারী অধ্যাপকদের নিয়ে। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া কলকাতা রেডিওর কথিকা বিভাগ এক-পাও নড়ে না, অথচ এঁদের অনেকেই—সবিনয়ে কথাটা বলছি—জানেন না যে, রেডিও-বক্তৃতার একটি বিশেষ আঙ্গিক আছে এবং সে-আঙ্গিক চেষ্টা ব্যতিরেকে অধিগম্য নয়। রেডিওর বক্তৃতায় বিষয়-সমৃদ্ধি কতোটা থাকা দরকার, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই যে, মাইকের মাধ্যমে যা কিছু বলা হবে, তা সহজ করে বলতে হবে, চিত্তাকর্ষক করে বলতে হবে। বিশেষ করে বিদ্যার্থীদের জন্য যে প্রোগ্রাম, সেখানে তো এই প্রয়োজন আরও বেশি অপরিহার্য। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে শিক্ষণীয় বিষয় মনোজ্ঞভাবে পরি-বেশন করা হচ্ছে কি না। দুঃখের বিষয়, রেডিওর শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের এই বিশেষ

দাবীটুকু অনেক নামজাদা অধ্যাপকই পূরণ করতে অপারগ। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের ক্ষেত্রে কৃতী সন্দেহ নাই এবং বক্তব্য-বিষয়কে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের দ্বারা পূর্ণ করবার ব্যাপারে তাঁদের নিঃসন্দিগ্ধ যোগ্যতা আছে, সেকথাও স্বীকার্য। কিন্তু যে বিশেষ ধরণের কলাকৌশল আয়ত্তগম্য থাকলে রেডিওর কথিকা শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কথাটা অপ্রিয় হলেও না বলে পারছি না যে, অনেক সুযোগ্য অধ্যাপকেরই তা জানা নেই। বিষয়বস্তুর মহিমা এবং তথ্যের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও অনেক কথিকা কেন ব্যর্থ হয়, সেকথা উপরের বক্তব্য একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিদ্যার্থীমণ্ডল যথার্থ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে দুটি জিনিস দরকার। এক, রেডিও শোনবার সুযোগ-সুবিধার প্রসারণ; দুই, প্রোগ্রামের আকর্ষণীয়। এই দুটি সর্ত যতদিন না পূরণ হচ্ছে, ততদিন বিদ্যার্থীমণ্ডল সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ থেকেই যাবে।

ইন্দ্রজিতের আসর

গত সপ্তাহে যা লিখেছিলাম তারই জের টেনে আরো দুটো কথা বলছি। মানুষ মাত্রেই যে প্রশংসার কাঙ্গাল একথা সবাই বলে থাকেন। অবশ্য এই বলার মধ্যে খানিকটা অবজ্ঞার ভাব লেগে আছে। কিন্তু ঠিকভাবে ভেবে দেখলে এর মধ্যে অবজ্ঞার প্রশ্নই ওঠে না। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসা জিনিসটা অপরিহার্য। মনের জমিতে ওটা সারের কাজ করে। জলের অভাবে যেমন গাছ শুকিয়ে যায়, কিঞ্চিৎ প্রশংসাবারি নিক্ষিপ্ত না হলে মানুষের গুণও শুকিয়ে মরে যায়। আমি গত কিস্তিতে যে ফরাসী লেখকের কথা উল্লেখ করেছিলাম তিনি বলেছেন, কবি এবং সাহিত্যিকরা সবাই অল্প বিস্তর চতুর্দশ লুইএর মতো। এঁরা সবাই অতিমাত্রায় প্রশংসালোভী। কেউ যদি নিত্য প্রশংসার যোগান দিতে পারেন তবেই তাঁদের প্রতিভার স্ফূরণ হবে নতুবা অকালে নষ্ট হয়ে যাবে। এঁর লেখাটি পড়বার পরে আমার মন থেকে বহুকালের একটি সন্দেহের নিরসন হয়েছে। আমি সাহিত্যিক কিনা সে বিষয়ে আমার নিজের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এখন ভাবছি আমার মনে যে অপরিমিত প্রশংসালোভ তাই থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমি নিশ্চয় একজন খুব ভারী রকমের সাহিত্যিক। অমনিতে আমি সারাদিন শুয়ে বসে কাটিয়ে দিই। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনেও দু পা হেঁটে যেতে আমার আলস্য; কিন্তু কেউ যদি এসে বললেন, অমুকে আপনার প্রশংসা করছিলেন, ব্যস্ তবে আর কথা নেই। সেই প্রশংসাটুকু স্বকর্ণে শুনবার জন্যে আমি অনায়াসে দু কোশ রাস্তা হেঁটে চলে যেতে পারি।

আমাদের এই প্রশংসাকাতর দেশে নতুন প্রতিভাকে উদ্দীপিত করবার কোনো চেষ্টাই নেই। বরং কেউ যদি নিজগুণে মাথা তুলবার একটু চেষ্টা করেন তো তাঁকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে দল পাকিয়ে সমালোচনার পত্রিকা বের করা হয়। নিত্য প্রশংসার যোগান দিয়ে এমন কি মোসাহেবি করে যাঁরা সাহিত্যিকদের মনে নিত্য প্রেরণা জুগিয়েছেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। ফরাসী কবি শাতোব্রিয়াঁর নিত্য সহচরী ছিলেন মাদাম রেকামিয়ে। কারো কারো মতে তিনি তাঁর প্রণয়িনী ছিলেন। ফরাসী সমালোচক সাঁৎ বাভ্ বলেছেন,—

Madame Recamier had everyday a thousand gracious inventions wherewith to renew for Chateaubriand the word of praise, and to give it freshness.

শাতোব্রিয়াঁর লেখা কোনো কবিতা আমি পড়েছি বলে মনে পড়ছে না; কিন্তু মাদাম রেকামিয়ে সম্বন্ধে দুটি একটি প্রবন্ধ পড়ে পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমার কাছে কবির চাইতে কবির স্তুতিবাদিনীর স্থান বড় হয়ে আছে। গায়টের কাছে আমার ঋণ যতখানি তাঁর প্রণয়িনীদের কাছেও ততখানি। এঁরা না থাকলে গায়টের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা পাওয়া সম্ভব হত বলে আমি মনে করিনে। সাহিত্যের ইতিহাসে এজাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সুইফ্‌টএর সাহিত্যিক প্রতিভার পশ্চাতে কি শ্রীমতী ইস্থার জনসনের অণুপ্রেরণা কিছুই ছিল না? অন্ততঃ এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি না থাকলে 'জার্নেল টু স্টেলা' কখনো লেখা হ'ত না। পোপ্‌এর নিত্য সহচরী মার্থা ব্লাউন্টের নামও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রশংসা অমৃতস্বরূপা। সে জিনিস যদি সুন্দরী রমণীর মুখনিঃসৃত হয় তবে আর কথাই থাকে না। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন লেখা কবিতা পেশ করতেন নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর দরবারে। নতুন বৌঠানের প্রশংসাটা নির্জলা প্রশংসা ছিল না। হ্যাঁ, তা—ভালোই হয়েছে। তবে যাই বল, বিহারী চক্রবর্তীর মতো তোমার হয় না। খোঁটা দিয়ে কথা বলতেন; কিন্তু ঐ খোঁটার মধ্যে যে অম্লমধুরের আভাসটুকু আছে, নিতান্ত বালক হলেও রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পারতেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষে নতন বৌঠানের দান বড় কম নয়। রবীন্দ্র-সম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের নাম কাদম্বরী উপাখ্যান।

আগেকার দিনে মানুষের মন ছিল দরাজ। তাঁরা প্রাণখুলে অপরের প্রশংসা করতে জানতেন। তাছাড়া সে কালের মানুষ আত্মপ্রশংসা শুনবার জন্য পয়সা দিয়ে মোসাহেব রাখতেন। সেটা আর যাই হোক্, আমার মতে বাজে ব্যয় নয়। আমার পয়সা থাকলে আমিও মোসাহেব রাখতুম। অবশ্য আমি নিজে অপরের মোসাহেবি করতে পারতুম কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, অধিকাংশ লোকের মতো আমিও পরস্তুতিকাতর। অপরের প্রশংসা সহজে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। সবাই যে মোসাহেবি করতে পারেন না তাই থেকেই বুঝতে পারবেন স্তুতি-বাক্য বলা কিম্বা অপরের মন জুগিয়ে চলা বড় সহজ কাজ নয়। মোসাহেবি করতে হলে মনের বেশ খানিকটা উদারতার প্রয়োজন।

আর কিছু না হোক্ সে কালের লোকেরা জীবনধারণের আর্ট জানতেন। গান শোনবার জন্যে ওস্তাদ রাখতেন, হাসাবার জন্যে ভাঁড় রাখতেন আর বাজস্তুতির জন্য রাখতেন মোসাহেব। এককথায় পয়সা খরচা করতেন, জীবনের মূল্য দিতে জানতেন। একালের মানুষ সব সস্তায় সারতে চায়। ঘরে একটি রেডিও রাখেন—তাইতেই গান শোনা হয়, ভাঁড়ামি শোনা হয়, বাজস্তুতিও কম হয় না। সেটাই সব চাইতে হাস্যকর। আগে জনসাধারণ শাসকবর্গের স্তুতিবাদ করত, এখন শাসকবর্গই জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন—রেডিয়োর মারফৎ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছেন—তোমার জন্য হ্যান করছি, ত্যান করছি ইত্যাদি। এইভাবে কি আর শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রেস্টিজ থাকে?

আজকের সমাজে কারোই প্রেস্টিজ নেই। ফলে কেউ কারো প্রশংসা করে না, সুযোগ পেলেই নিন্দে করে। আগেই তো বলেছি, সেকালে লোকের মন ছিল দরাজ। বলত, সব ভালো, সবাই ভালো। এখন সব মন্দ, সবাই মন্দ। সাংসারিক দৈন্যের ছাপ পড়েছে মানুষের মনে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে। সবারই মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ভালো জিনিস চোখেই পড়ে না। বিশ্বশুদ্ধু মানুষ বিশ্বনিন্দুক হয়েছে। এই আমার কথাই ধরুন না। বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি আমার মুখে অপরের নিন্দা কিম্বা প্রশংসা 'প্রাইস্ ইন্ডের'এর সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আজকাল যে রকম জাল নোটের চলন হয়েছে তাতে একখানা ভাল নোটও নির্বিচারে পকেটে পুরতে ভয় হয়। অবশ্য সঙ্গে যদি একটা স্পিউরিস্কোপ (spuriscope) থাকে তাহলে আর কোনও ভাবনাই থাকে না। এই স্পিউরিস্কোপ জাল নোট ধরবারই যন্ত্র। এই যন্ত্রটার চাক্‌তিতে কতকগুলি সংখ্যা লেখা থাকে। কোন একটা নোট জাল কিনা ধরতে গেলে ট্যাকশাল থেকে যে সব নোট ছাপা হয়েছে তার ক্রমিক সংখ্যাটি যদি যন্ত্রটার চাকতিতে ঘোরান যায় তাহলে ভাল নোট হলে সেই নোটের নম্বরের সঙ্গে মিলে যাবে; আর জাল নোট হলে নম্বরটা মিলবে না।



স্পিউরিস্কোপ যন্ত্রটির চাক্‌তি ঘোরানো হচ্ছে

*

আমেরিকার হ্যারিরাওয়েসের সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় জীব পোষা একটা সখ। তিনি তাঁর মেয়েকে এই সব সাপ ও সরীসৃপ খাঁচায় পুরে খেলা করতে দেন। তাঁর মতে ছোটবেলা থেকে এইরকম খেলা করলে এদের আর এই সব জানোয়ারে ভয় থাকবে না।

*

আমেরিকার জেফারসন মেডিক্যাল কলেজের চোখের ডাক্তার A. E. Town "টেরামাইসিন" বলে একটা নতুন ওষুধ বার করেছেন। যে সমস্ত বীজাণুর জন্য চোখের রোগ হয় এই টেরামাইসিনের সাহায্যে সেই সব বীজাণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা যায়। তিনি ১২৩টি রোগীর চিকিৎসা করে ১১১টি রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পেরেছেন। এই ডাক্তারটি টেরামাইসিনের সাহায্যে প্রায় ১৫ রকম চক্ষুরোগের চিকিৎসা করে দেখেছেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, এই ওষুধ ব্যবহার করায় প্রায় ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেক শক্ত শক্ত রোগের বিশেষ উপকার পাওয়া গেছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এতে রোগটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়নি বটে, তবে আশু ফল পাওয়া গেছে। টেরামাইসিন সাধারণত অন্যান্য তরল ওষুধের মতই চোখের ভেতর ফোঁটা ফোঁটা করে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এর আবার ক্যাপসুলও তৈরী করা হয়েছে। যৌনব্যাধির জন্য অনেক সময় চোখের ভিতরে দুষ্ট ক্ষত হয়। তখন এই টেরামাইসিনের ক্যাপসুল রোগীকে খাইয়ে চিকিৎসা করা হয়। টেরামাইসিনের ক্যাপসুল খাওয়ায় এই সব দুষ্ট ক্ষতের পক্ষে যে কাজ হয় তা যে কোনও ওষুধের চেয়ে অনেক ভাল।

*

যন্ত্রের যুগে বোধহয় সবই সম্ভব হয়। মস্কোতে মোটরের যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্য একটা কারখানা আছে, যেখানে মানুষের দরকার হয় না। যন্ত্রের সাহায্যেই যন্ত্র তৈরী হয়। কাঁচা মাল কারখানায় আনা-নেওয়া থেকে আরম্ভ করে তৈরী জিনিস প্যাক করে বাজারে ছাড়া পর্যন্ত সব কিছুই যন্ত্রে হয়। একজন লোক কেবলমাত্র বোতাম টিপলেই খবর পাবে, কতখানি মাল মজুত আছে, আর কি হারে মাল প্রস্তুত হচ্ছে।

*

আমরা সব সময় 'পড়াশোনা' কথাটা একসঙ্গেই ব্যবহার করি। কথায় বলে—ছেলেটার 'পড়াশোনা' ভাল লাগে না। কিন্তু 'পড়া' আর 'শোনা' এক নয়। যার পড়তে ভাল লাগে না, তার যে শুনতে ভাল লাগে না, এমন নয়। নিউ ইয়র্কের একটি রেডিও কর্পোরেশন এক রকম 'কথা বলা বই' বার করেছে। এরা সমস্ত বইখানা গ্রামোফোন রেকর্ডে তুলে রাখে। যাদের শেখবার, জানবার ইচ্ছে থাকে অথচ চোখের কোনও অসুখের জন্য বা নিতান্ত কুঁড়েমি করে পড়তে চায় না, তাদের পক্ষে এই ধরণের বই বেশ কার্যকরী। সাধারণ রেকর্ডের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, এই ধরণের রেকর্ড খুব ধীরে ধীরে ঘোরে। একখানি রেকর্ডের দু পিঠ বাজাতে দু ঘণ্টা সময় লাগে। যেখানে সাধারণ রেকর্ড মিনিটে ৭৮ বার ঘোরে, সে জায়গায় এই রেকর্ডগুলি মিনিটে ১৬ বার ঘোরে।

জার্মানীতে প্রাথমিক চিকিৎসার বেশ ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট ঘর করে তাতে প্রাথমিক চিকিৎসার সবরকম আয়োজন রাখা থাকে। এখানে খুব হাল্কা ধরণের চাকাওয়ালা স্ট্রেচার রাখা হয়। এগুলো এত হাল্কা যে, একটি ছোটছেলেও অনায়াসে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। এই ঘরটির সঙ্গে একটি করে টেলিফোন থাকে, দমকল ডাকার ব্যবস্থাও এখানে পাওয়া যায়। কোনও কিছু বিপদ ঘটলেই রাস্তার পাহারাওয়ালা এখান থেকে প্রয়োজনীয় খবর পাঠাতে পারে। এই ঘরটি দেখতে অনেকটা চিঠি ফেলার বাক্সের মত, অবশ্য আকারে একটু বড়ই হয়। এর মাথার ওপরে একটা আলোওয়ালা ঘড়ি থাকে। যদি কেউ পাহারাওয়ালাকে ডাকতে চায় তাহলে ঘরে ঢুকে একটা সুইচ টিপলে ঘরের মাথার ওপর একটা সবুজ আলো জ্বলে ওঠে।



প্রাথমিক চিকিৎসার ঘর থেকে টেলিফোন করা হচ্ছে

*

বর্তমান যুগে মানুষ 'রাডার'কে (Radar) সব কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। শব্দের সাহায্যে অন্ধকে দৃষ্টিদান করার জন্য 'রাডার' ব্যবহার করা হচ্ছে। —লণ্ডনের এক ইঞ্জিনীয়ার এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটি দেখতে একটি বড় টর্চের মত। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আর ব্যাটারী ভরে রাখা হয়, আর এর থেকেই এক ধরণের শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ অন্ধের কানে যখন যায়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সামনে কোনও বাধা আছে।

কিছুকাল পূর্বে একই বিষয়বস্তু বা একই লোকের লেখা বই অবলম্বনে একাধিক লোকের ছবি তোলা নিয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলুম। তখন কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার স্বত্বাধিকারী কেউ না থাকায় তাঁর একই রচনা নিয়ে একাধিক জনে ছবি তোলায় ঝুঁকে পড়ে এবং কারুর কথা না শুনে কয়েকজনে ঐরকম ডবল ছবি তোলায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখন আরম্ভ হয়েছে আর এক নির্বুদ্ধিতা—বড় লোকের জীবনী অবলম্বনে ছবি তোলা নিয়ে। রামমোহন রায়ের জীবনীর ওপরে কারুর স্বত্ব নেই, কাজেই অমর মল্লিক তাকে নিয়ে ছবি তুলবেন, হেমচন্দ্রও তুলবেন, আবার বম্বে টকীজও তুলবেন। সিরাজদ্দৌলার জীবনী সাধারণ সম্পত্তি, সুতরাং বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিও যদি তা নিয়ে ছবি তুলতে যায় তো অপরে 'পলাসী' বা 'আমাদের সিরাজ' প্রভৃতি নাম দিয়ে একই বিষয় হলেও ছবি তুলতে যাবে না কেন? একজন যদি 'মহারাজ নন্দকুমার' নামে ছবি তুলতে পারে তো আর একজনের 'নন্দকুমারের ফাঁসী' নামে ছবি তোলার অধিকার থাকবে না কেন? 'নীলদর্পণ' নিয়ে জনচারেক ছবি তোলায় নেমেছিলেন, শেষ পর্যন্ত এখন একজনই ময়দানে থেকে গিয়েছেন।

আইনত এ নিয়ে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের লাভ-লোকসানের কথাটা ভাববার বিষয়। একই বিষয় নিয়ে একাধিক ছবি তোলার নতুন বাহাদুরী কিছু প্রকাশ পাবে না, কারণ আমাদের দেশে চিত্রগ্রহণ কৃতিত্ব এমন ধাপে চড়ে নেই, যা নিয়ে মাতামাতি করার মতো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তেমন কোন আশা নেই, আর এমন প্রতিযোগিতার কোন মানেও হয় না। উল্টে ব্যবসার দিক থেকে কোন-না-কোন ছবিখানি মার খেয়ে যেতে বাধ্য হবেই। আমাদের দেশে লোকের বেশি ঝোঁক বিষয়বস্তুর ওপর। একই বিষয়ের দু-তিনখানি ছবি তোলা হলে সবাই মিলে সব ছবিগুলিই দেখবে না—ব্যবসার দিক থেকে সেটা মস্ত লোকসান। যে টাকায় তিনখানি আলাদা আলাদা ছবি হয়ে তিনগুণ আমদানীর সুযোগ দিত, সে জায়গায় তিনখানি ছবি মিলে বলতে গেলে একখানি ছবির মতো আমদানী করিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে মোটেই মঙ্গলের নয়, এ-বিলাসিতার সময়ও এটা নয়। প্রযোজকরা মিলে বা বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন থেকে এর একটা প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বম্বে বা অন্যান্য দেশে টাইটেল রেজিস্ট্রি করার নিয়ম আছে; এখানেও অচিরেই ঐরকম কোন ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েছে।

রঙ্গজগৎ

কলকাতায় পুডোভকিন

সুবিখ্যাত রুশীয় চিত্র-পরিচালক পুডোভকিন, রুশীয় অভিনেতা চেরকাশভ সমভিব্যাহারে গত ১২ই জানুয়ারী ছয় দিনের জন্য কলকাতা পরিভ্রমণে আসেন। পুডোভকিনকে আমন্ত্রণ করে আনেন সোভিয়েট সিনে-আর্ট ফেস্টিভ্যাল কমিটি। কলকাতার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ, চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকরা রুশীয় শিল্পীযুগলকে বিভিন্ন সভায় সম্বর্ধনা জানান এবং মানপত্র প্রদান করেন। পুডোভকিন ও চেরকাশভ এখানকার দুখানি সম্পূর্ণ এবং কতকগুলি ছবির নির্বাচিত অংশ দেখেন, উদয়শঙ্করের নাচ দেখেন, শিশিরকুমারের 'ষোড়শী' অভিনয় দেখেন, যামিনী রায়ের আর্ট গ্যালারী প্রদর্শন করেন এবং নিজের নির্মীয়মান একখানি ছবি এখানকার কলাকুশলীদের দেখান ও সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ক্রমপর্যায় বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাংবাদিকদের বৈঠকে পুডোভকিন জানান যে, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ওপর তাঁরা অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বাঙলা লোকচিত্র ও লোকসঙ্গীতে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি জানান যে, যে দেশের লোকসঙ্গীত ও লোকচিত্র এতো সমৃদ্ধ, সে দেশও মহান্। এদেশের চলচ্চিত্রের বাস্তবানুগতার তাঁরা প্রশংসা করেছেন।

মহরৎ

গত ১৯শে জানুয়ারী বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান 'লাইট এণ্ড শেড'-এর প্রথম ছবি 'প্রার্থনা' মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা হচ্ছেন প্রণব রায় ও কমল দাশগুপ্ত এবং ছবিখানি পরিচালনা করছেন প্রণব রায়।

বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওর আগামী দ্বিভাষী ছবি 'সিরাজউদ্দৌলা'র প্রবর্তনা উপলক্ষে প্রযোজক এস ডি নারাং গত ২০শে জানুয়ারী সাংবাদিকদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। ছবিখানি পরিচালনা করছেন মধু বসু এবং পরিবেশনের ভার নিয়েছে গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারত ও কমনওয়েলথ দলের চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ মাদ্রাজে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। গতবারের ভারত ভ্রমণকারী কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলকে ভারত টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পরাজিত করিয়া যে গৌরবে ভূষিত হইয়াছিল, এইবারে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার সকল সম্ভাবনাই অন্তর্হিত হইল। এখনও আশঙ্কা আছে, ভারতীয় দলের পরাজিত হইবার। কারণ, কমনওয়েলথ দল চারিটি টেস্ট খেলার মধ্যে তিনটি অমীমাংসিত ও একটিতে বিজয়ী হইয়াছে। পঞ্চম বা শেষ খেলা যদি অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে পারে, তবে ভারতীয় টেস্ট দলই পরাজিত হইবে। আর যদি ভারতীয় দল খেলায় কমনওয়েলথ দলকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় জয়-পরাজয় সমান সমান হইবে। ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে অন্য কাহার কি ধারণা আছে জানি না; তবে আমরা একেবারেই আশা রাখি না।

খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর আচরণ অন্য সকলের মনঃপূত হইলেও আমাদের কখনও হয় নাই। কতকগুলি অক্ষম, অনভিজ্ঞ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের একত্র করিয়া দল গঠন না করিয়া যদি তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিতেন, তাহা হইলে ফলাফল অন্যরূপ হইত—ইহা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতে বাধ্য। শেষ টেস্ট খেলায় হয়তো বা অনেকগুলি তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হইবে; কিন্তু সেই বিষয়েও বলিব, অন্যায় করা হইবে। খেলা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখানে নূতন অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিলে টেস্ট পর্যায়ের খেলা সমান সমান অবস্থায় শেষ হইবার যে সম্ভাবনা আছে, তাহা থাকিবে না। চতুর্থ টেস্ট দল হইতে দুই তিনটি খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা কাহারা তাহা আর বলিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। ঐ সকলের পরিবর্তে গোপীনাথ, এইচ্ গাইকোয়াড় ও এম আর রেগেকে গ্রহণ করিলে দলের শক্তি সত্য সত্যই বৃদ্ধি পাইবে—এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ

অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলেও খেলার পরিসমাপ্তি খুবই উত্তেজনামূলক হয়। কমনওয়েলথ দল অবশিষ্ট ৩ ঘণ্টায় ২২৫ রান করিয়া এক নূতন আদর্শ খেলায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ উহা লক্ষ্য করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইব। বিজয় হাজারে পর পর তিনটি টেস্ট খেলায় শতাধিক রান করিবার বিজয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার দুঃখিত হইলেও আমরা তাহা হইলেও উহাকে অভিনন্দিত করি। তিনিই বর্তমানে ভারতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ইহা আমরা স্বীকার করি। দ্রুত রান তুলিবার বিষয় একটু মনোনিবেশ করিলে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে আরও অনেক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন—এই ভরসা আমরা তাঁহাকে দিতে পারি। বোলিংয়ের দিক হইতে ভারতীয় দলের বিনু মানকড়ের কৃতিত্বই উল্লেখযোগ্য। ইহার পরেই ফাদকার। বাঙ্গলার খেলোয়াড় এন চৌধুরী ভাল বল করিলে কি হয়—সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে করিবেন—যদি নিরাশ হইয়া না পড়েন। ক্রিকেট খেলার দিন এখনও তাঁহার আছে। অদূরভবিষ্যতে যাহাতে আরও কৃতী বোলার হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদের কামনা। ফিল্ডিংয়ের দিক হইতে এই টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আরও দক্ষ ও তৎপরতাসম্পন্ন যাহাতে খেলোয়াড়গণ হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ব্যাটিংয়ে উমরিগরের শতাধিক রান উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য। শত রান পূরণের মুখে বিচলিত না হইয়া পর পর দুইটি ওভার-বাউণ্ডারী করিয়া দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। প্রতি খেলায় এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিলে খুবই সুখী হইব।

ঃঃ খেলার বিবরণ ঃঃ

ভারতীয় দল প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করিয়া প্রথম দিনের শেষ সময় ৪ উইকেটে ২৫৭ রান করে। উমরিগার ১১০ রান ও হাজারে ৮০ রান করিয়া আউট হন। ইহাতে আশা হয়, ভারতীয় দল চারি শতাধিক রান করিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের পরই ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস্ ৩৬১ রানে শেষ হয়। ওরেল ও স্যাকলটনের বোলিংই এই বিপর্যয়ের কারণ হয়। পরে কমনওয়েলথ দল খেলিয়া দিনের শেষে ১ উইকেটে ১১২ রান করেন। কমনওয়েলথ দল তৃতীয় দিন সারাদিন খেলিয়া ৭ উইকেটে ৩৮০ রান করিয়া প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হয়। চতুর্থ দিনে মাত্র ২৫ মিনিট খেলা চলিবার পরই কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ৩৯৩ রানে শেষ হয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৯৭ রান করে। ইহাতেও উপলব্ধি করা যায়, খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে। পঞ্চম দিনে ফলাফল তাহাই হয়। ভারতীয় দল মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত খেলিয়া ৫ উইকেটে ৩০২ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। কমনওয়েলথ দল ৩ ঘণ্টায় ২৭১ রান করিলে বিজয়ী হইবে—এইরূপ অবস্থায় খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২২৫ রান করিতে সক্ষম হয়। কমনওয়েলথ যেভাবে দ্রুত রান তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে হঠাৎ ৩ জন খেলোয়াড় আউট না হইলে ফলাফল কি হইত বলা কঠিন ছিল। তাহা হইলেও যেভাবে শেষ খেলোয়াড়গণও খেলিয়াছেন, তাহারও প্রশংসা করিতে হয়।

ঃঃ খেলার ফলাফল ঃঃ

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস্—৩৬১ রান (পি আর উমরিগার ১১০ রান, বিজয় হাজারে ৮০ রান, বিনু মানকড় ৫২ রান, বি সি আলভা ২৬ রান, কিষেণচাঁদ ২৪ রান, বিজয় মার্চেণ্ট ২১ রান; স্যাকলটন ৭৯ রানে ৩টি উইকেট, রিজওয়ে ৭৯ রানে ২টি উইকেট, ওরেল ৫০ রানে ৩টি উইকেট ও ট্রাইব ১০২ রানে ২টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দল ঃ—প্রথম ইনিংস্—৩৯৩ রান (আইকিন ১১০ রান, এমেট ৯৬ রান, ওরেল ৭১ রান, কিশলক ৩৮ রান, কেন গ্রিভস্ ২৬ রান, গিম্বলেট ২০ রান; ফাদকার ৯৯ রানে ৫টি উইকেট ও মানকড় ৯০ রানে ৪টি উইকেট পান)

ভারত ঃ—দ্বিতীয় ইনিংস্—৫ উইকেটে ৩০২ রান (মার্চেণ্ট ৭২ রান, মুস্তাক আলী ৩৮ রান, হাজারে ৭৫ রান, ফাদকার ৬১ রান, সি এস নাইডু ২৯ রান (নট আউট); স্যাকলটন ১৫৩ রানে ৪টি উইকেট ও ওরেল ৮৮ রানে ১টি উইকেট পান)

কমনওয়েলথ দল ঃ—দ্বিতীয় ইনিংস্—৬ উইকেটে ২২৫ রান (গিম্বলেট ৩৩ রান, আইকিন ৮৬ রান, এমেট ৫৩ রান, গ্রিভস্ (নট আউট) ৩১ রান; এন চৌধুরী ৫৮ রানে ২টি উইকেট ও মানকড় ৭৫ রানে ৩টি উইকেট পান)

ভারত ও কমনওয়েলথ দলের টেস্ট খেলার ফলাফল

(১) **প্রথম টেস্ট ম্যাচ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।**

(২) **দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়।**

(৩) **তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।**

(৪) **চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।**

বাঙলা ও বিহার দলের খেলা

বাঙলা ও বিহার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা ২৭শে জানুয়ারী হইতে জামসেদপুরে আরম্ভ হইবে। বাঙলা দল নির্বাচন পর্ব লইয়া পরিচালকদের মধ্যে যেরূপ অন্তর্কলহ সৃষ্টি হইয়াছিল, ইতঃপূর্বে কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যাহার ফলে খেলোয়াড়দের নামের তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন কিছু না হইলেই আমরা আনন্দিত হইব। নিম্নে বাঙলা দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—

সি এস নাইডু (মোহনবাগান) অধিনায়ক
পি সেন (কালীঘাট)
পি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
এস ব্যানার্জি (কালীঘাট)
শিবাজী বসু (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
জি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
পি বি দত্ত (কালীঘাট)
ডি ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
জে মিত্র (পুলিশ এ সি)
এম সেন (মোহনবাগান)
এস খান্না (মোহনবাগান)
এন চৌধুরী (মোহনবাগান)
পি ভট্টাচার্য (এরিয়ান)
পি চ্যাটার্জি (মোহনবাগান)
এস রায় (মিলন সমিতি)
এস সরকার (এরিয়ান)
শিশির ঘোষ (ইস্টবেঙ্গল)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—বরিশাল হইতে শ্রীযুত সতীন সেনের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা জ্ঞাপক এক প্রতিনিধিমণ্ডলী অদ্য কলিকাতায় আগমন করেন।

কালীঘাট রেল স্টেশনে এক সশস্ত্র ডাকাতির ফলে যাত্রিপূর্ণ এক ট্রেনের কামরা হইতে রেলের ২৪০০০৲ টাকা লুণ্ঠিত এবং একজন সশস্ত্র রেল রক্ষী পুলিশ কনস্টেবল ডাকাত দলের গুলীতে নিহত হয়।

রাজসাহীর দায়রা জজ মিঃ এস আমেদ গত ১১ই জানুয়ারী নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। দায়রা জজ অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া পাকিস্থান দণ্ডবিধির ৩০২।১৪৯ ধারা অনুসারে শ্রীমতী ইলা মিত্র প্রমুখ ২৩ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শনিবার পাকিস্থান এলাকা হইতে পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত লালবাজার এলাকায় পুনরায় গুলী চালনা করা হইয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী—নেপাল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ করিবার জন্য নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী এম পি কৈরালা অদ্য নির্দেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিবগণের ২০তম সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এই সম্মেলনে দেশত্যাগী উদ্বাস্তুগণের শুল্ক বিভাগায় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ সম্বন্ধে এবং উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক স্বর্ণালঙ্কারাদি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে আনয়ন সম্বন্ধে উভয় গবর্নমেন্টের মতৈক্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭ই জানুয়ারী—পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুগণকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে বরিশাল জেলা হইতে যে শুভেচ্ছা মিশন কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার সদস্যগণ অদ্য কলিকাতার উপকণ্ঠে ভদ্রকালী উদ্বাস্তুশিবিরে গমন করিয়া তথাকার বরিশালের উদ্বাস্তুগণের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। মিশনের সদস্যগণ উক্ত উদ্বাস্তু নরনারীগণের নিকট বরিশালে ফিরিয়া যাইবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন অদ্য কটকে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা উড়িষ্যায় কতকগুলি প্রাকৃতিক অসুবিধা ভোগ করিতেছে। এজন্য বর্তমানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বাসনের জন্য আর উড়িষ্যায় প্রেরণ করা হইবে না।

কলিকাতায় কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে। এই দিবস ৩২নং আপার সার্কুলার রোডে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার আড়াই শতাধিক কংগ্রেস কর্মীর এক সম্মেলনে ঐ নূতন দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৮ই জানুয়ারী—উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত জননায়ক ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কলিকাতায় **স্কুল অব ট্রপিক্যাল** মেডিসিনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কারাগারে ১০৮ জন রাজবন্দী তাঁহাদিগের আটক বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া হাইকোর্টে আবেদন করেন। বিচারপতি কে সি দাশগুপ্ত এবং মিঃ পি এন মুখার্জি অদ্য আবেদনকারীদের মধ্যে ৪৩ জনকে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন।

১৯শে জানুয়ারী—ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতের সর্বত্র বরাদ্দ খাদ্যের শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে সমগ্র দেশে অতঃপর মাথাপিছু নয় আউন্স করিয়া খাদ্য শস্য দেওয়া হইবে।

বিখ্যাত সমাজসেবী শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর (ঠক্কর বাপা) ভবনগরে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশে ২৮টি চিনি মিলের ৫০ হাজার শ্রমিক অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

২০শে জানুয়ারী—শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারত কুটীরশিল্প বোর্ডের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে ভারতের শিল্পমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য স্বদেশী মনোভাব সৃষ্টির অনুরোধ জানান। এই অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের চারিদিনব্যাপী এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। শ্রীযুত মহতাব উহার উদ্বোধন করেন।

অদ্য কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্বোধনকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১০ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই বৎসর হইতেই উহার আয়োজন শুরু হইবে।

২১শে জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করেন। যে সকল উদ্বাস্তু পতিত জমি উদ্ধারের দ্বারা ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত জৈন বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত উদ্বাস্তু তাঁহাদের পুনর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদের উচ্ছেদ করা সরকারের নীতি নহে।

উত্তর প্রদেশে চিনিকল মজদুর ধর্মঘট সম্পর্কে গত দুই দিনে এক শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জনুয়ারী—মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান অদ্য কংগ্রেসে ৭১৫১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করার এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪১৪২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশক্তি গঠনের জন্য, ৭১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রবর্গের অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

বৃটিশ সৈন্য ও অস্ত্রবল বৃদ্ধির এক বিরাট পরিকল্পনা অদ্য বৃটিশ মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়।

১৬ই জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাঁজোয়া বাহিনী অদ্য সিউলের ১৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সুওন শহর পুনরাধিকার করিয়াছে।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে কাশ্মীরে কমনওয়েলথ সেনাদল প্রেরণের প্রস্তাব কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ উত্থাপন করেন; ভারতের প্রধান মন্ত্রী উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৭ই জানুয়ারী—নিউ চীনা (কম্যুনিস্ট) নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছে যে, চীনের কম্যুনিস্ট গবর্নমেণ্ট অদ্য রাত্রিতে কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কিত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

উত্তর ইন্দোচীনের বদ্বীপ এলাকার রাজধানী হ্যানয় হইতে ৩২ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম টংকিং রণাঙ্গনে ভিয়েৎমিন বিদ্রোহীরা নূতন করিয়া বড় রকমের পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য প্যারিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবিলম্বে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানান।

২০শে জানুয়ারী—জেনেভার সংবাদে প্রকাশ, তুষারস্তূপে চাপা পড়ায় ও প্রবল তুষার ঝটিকার দরুণ গত ২৪ ঘণ্টাকালের মধ্যে আল্পস্ পর্বতমালা অধ্যুষিত সুইজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অংশে ৯ জন নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক নরনারী তুষারস্তূপে জীবন্ত সমাহিত হয়।

কম্যুনিস্ট চীনকে কোরিয়া আক্রমণকারী হিসাবে অভিহিত করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জানাইয়া অদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী গত দুই সপ্তাহের মধ্যে অদ্য দ্বিতীয়বার যুদ্ধবিধ্বস্ত ওনজু শহর ত্যাগ করে।

২১শে জানুয়ারী—কম্যুনিস্ট বাহিনী কর্তৃক কোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল ওনজু ত্যাগ করার ২৪ ঘণ্টা পর রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাদল অদ্য পুনরায় যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরে প্রবেশ করে।

বৃটেন ও ফ্রান্স ৫ই জানুয়ারী তারিখে পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে সোভিয়েটের নিকট যে নোট প্রেরণ করিয়াছিল, গত শনিবার সোভিয়েট সরকার তাহার জবাব দিয়াছেন। সোভিয়েট নোটে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জা ও বন (পশ্চিম জার্মানী) গভর্নমেণ্টের সহিত সরাসরি সামরিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েটের সহিত তাহাদের মৈত্রী চুক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অষ্টাদশ বর্ষ

(১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 3rd February, 1951. [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের আদর্শের উজ্জীবন

সম্প্রতি আমেদাবাদে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শুধু আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্তের কোন শক্তি নাই। কংগ্রেস ভারতের সর্বপ্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। জনমতের সহযোগিতা এবং সমর্থনের উপরই কংগ্রেসের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে এবং তাহার আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিবার সামর্থ্য গড়িয়া উঠে। বলা বাহুল্য, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেস উত্তরোত্তর জনমতের এই সহযোগিতা এবং সমর্থন হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। কংগ্রেসের কাজের নামে জাতির অন্তরে আর পূর্বের মত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় না। ইহার কারণ কি? ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নীতিগত এই সাম্প্রতিক দুর্বলতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কমনওয়েলথ বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি প্রথমে জাতিকে উদ্দেশ করিয়া যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতেই এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়। তিনি উপদলীয় ভেদ-বিভেদ বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেসের বৃহত্তর আদর্শে কর্মীদিগকে সংহতিবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে গঠিত গণতান্ত্রিক দল এবং ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র নূতন দলের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। আচার্য কৃপালনী এবং ডক্টর ঘোষ উভয়েই আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্মী। কংগ্রেসের আদর্শ সাধনায় ইঁহাদের কাহারো ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ সামান্য নয়, তবে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ইঁহারা কেন উপলব্ধি করিলেন? কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতা স্বীকার না করিবার অপরাধে ইঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিলেই কি কংগ্রেসের ভিতরের সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? শ্রীজওহরলালজী সেরূপ অভিমত পোষণ করেন না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসকর্মীদের আদর্শনিষ্ঠার অভাবে, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য প্রভৃতি দুর্বলতার জন্যই এই ধরণের ভেদ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে জনসেবার ত্যাগমূলক প্রেরণায় তাহাকে জীবন্ত করা প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে কংগ্রেসের শক্তিকে এইভাবে সংহত করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে; সময় থাকিতে কংগ্রেস যদি জনগণের চিত্ত অধিকার না করিতে পারে এবং আদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা জাতির অন্তরে সঞ্চার করিতে অসমর্থ হয়, তবে বিভিন্ন মতবাদের বৈষম্যের সংঘাতে এবং তজ্জনিত বিড়ম্বনায় সমগ্র ভারতের ভাগ্যে কি দাঁড়াইবে, কেহই বলিতে পারে না। ফলতঃ দেশের জনগণের অন্তরে যদি রাষ্ট্রসাধনা চেতনা সংহত না হয়, দেশ ও জাতির স্বার্থ-ভাবনা যদি শিথিল হইয়া পড়ে, তবে তাহার ফলে অন্তর্বিপ্লবের দুর্দৈব জাতিকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে, এমন আশঙ্কাও অমূলক নয়। সুতরাং কংগ্রেসের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার উপর জাতির ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে বর্তমান ঐক্যবোধকে একান্ত করা প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের সকল দলকে যদি দেশের স্বার্থ প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হয়, তবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংহতি আগে সুদৃঢ় করা দরকার। বলা বাহুল্য গান্ধীজী যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, ততদিন ভেদ-বিরোধের বিড়ম্বনা কংগ্রেসের সাধনাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। কংগ্রেসের নীতিকে বাস্তব অবস্থার উপযোগী সমন্বয়ের পথে সংহত করিয়া তুলিবার শক্তি মহাত্মাজীর ছিল। এইভাবে জনশক্তিকে আদর্শ-সিদ্ধির প্রয়োজনে দেশের জনমতকে অব্যর্থ-ভাবে তিনি প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বর্তমানে সেই প্রয়োজন সমধিকভাবে দেখা দিয়াছে। সমগ্র জাতির অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণে জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা বর্তমানে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গান্ধীজীর সাধনা প্রভাবে পবিত্র আমেদাবাদে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশন সেই দিক হইতে সার্থক হইবে, দেশবাসী ইহাই কামনা করে।

মিঃ লিয়াকত আলীর আশা

কমনওয়েলথ বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী কাশ্মীর সম্পর্কে সম্মেলনে যে আলোচনা হয়, তৎসম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার বক্তৃতাসমূহ পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে, নিরাপত্তা-পরিষদ কাশ্মীর সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা পাকিস্থানেরই অনুকূল হইবে। লক্ষণও ইহার

সুস্পষ্ট। পাকিস্থানের দাবীর পক্ষে কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত উত্তরোত্তর অনুকূল হইয়া উঠিতেছে, ইহা সহজেই বোঝা যায়। ইহার কারণও আছে। পাকিস্থান পুরাপুরি রকমে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর পররাষ্ট্র-নীতিকে সমর্থন করিতেছে। চীনের সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বর্তমানে পুরাপুরি রকমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে না হইলেও ঘটনার গতি যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি অবশেষে খুবই সম্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই গিয়া দাঁড়াইবে। ইঙ্গ মার্কিন রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর মধ্যে পাকিস্থানের সমর্থকই বেশী। ইহাদের চাপে পড়িয়া কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত ভারতের প্রতিকূলে গিয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা সহজেই মনে উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে বর্তমানে শুধু যুক্তির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের নীতিই আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিন্তু রাজনীতি উদ্দেশ্য সিদ্ধিকেই বড় বলিয়া বুঝে এবং যুক্তির মূল্য সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত টিকে না। সুতরাং ভারত গভর্নমেণ্টকে এ সম্বন্ধে শুধু যুক্তি ছাড়িয়া কার্যকর নীতি অবলম্বনে সমধিক জাগ্রত হইতে হইবে এবং কাশ্মীর যাহাতে বৈদেশিক শক্তিসমূহের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নকে পরিণত না হইতে পারে, তাঁহাদের নীতিকে তেমন করিয়া তুলিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কাশ্মীরের প্রশ্নটি পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের আপোষ-নিষ্পত্তির বিষয় হইতে পারে না; কারণ কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের ন্যায়ত কোন দাবীই নাই। কাশ্মীরে পাকিস্থান পর-রাজ্য আক্রমণকারীস্বরূপে প্রবেশ করিয়াছে, আন্তর্জাতিক নীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানের সেনাদলকে বিতাড়িত করাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। নতুবা কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ণয়ে তথাকার জনগণের স্বাধীনতার সকল কথাই অবান্তর এবং অনর্থক বলিয়া আমরা মনে করি।

সুদিনের স্বপ্ন

পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন করাচীস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসব অনুষ্ঠানে যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। খাজা নাজিমুদ্দীনের মতে বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বিযুক্ত বা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার উপায় নাই। কারণ, কোন রাষ্ট্রের ঘটনাবলী ও কার্য অপর রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষভাবেই ইহা প্রযোজ্য। তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্থান নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যই একান্তরূপে কাম্য। পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেলের এই উক্তি সকলেই সমর্থন করিবেন। কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন এ কথাটি এমনই সোজা যে, বর্তমান জগতের রাজনীতি এবং অর্থ-নীতি সম্বন্ধে যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সকলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। ভারত কিংবা পাকিস্থানে মনীষার এত অভাব নিশ্চয়ই ঘটে নাই যে, এই সত্যটি সেখানে অনধিগম্য থাকিবে। রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনায় যাঁহারা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এমন লোক উভয় রাষ্ট্রেই আছেন। তথাপি পরস্পর প্রতিবেশী এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব-সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কেন? খাজা নাজিমুদ্দিনকেই বা কেন দুঃখ করিয়া আজ বলিতে হইয়াছে যে, গত সাড়ে তিন বৎসরে আমাদের উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। এ বিষয় লইয়া আলোচনা না করাই এখন অবশ্য ভাল। কিন্তু একটা কথা আমরা এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন মনে করি। বস্তুতঃ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, সে সব প্রয়াস সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যে স্থায়ী কোন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেছে না। আমাদের মতে ইহার মূলে গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ রহিয়াছে। পাকিস্থান শুধু ইসলামেরই জন্য এবং সে রাষ্ট্র পুরাপুরি ইসলাম রাষ্ট্র এই ধারণা সদাসর্বদা পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে ভারতের সম্বন্ধে একটা বিরোধ ভাবনা জাগরিত রাখিয়াছে। ভারতের সম্বন্ধে সদ্ভাব-সৌহার্দ্যের সব ভিত্তি ইহা শিথিল করিয়া দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের এই মধ্য-যুগীয় কুসংস্কার হইতে যদি মুক্ত না হয়, এবং এইদিক হইতে তথাকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিকতার পরিবর্তন না ঘটে, তবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে শান্তি এবং সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। ফলতঃ সাম্প্রদায়িক সংস্কার-গত এই মনস্তাত্ত্বিকতাই পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কদের নীতিকে নানা কূট পথে পরিচালিত করিতেছে। এই সমস্যা যদি না থাকিত, তবে উভয় রাষ্ট্রের ভিতরকার অনেক প্রশ্নই এতদিনের মধ্যে সমাধান হইয়া যাইত। কাশ্মীরের কথাই এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী অপরিসীম সহিষ্ণুতা এবং তিতিক্ষার সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথেই এই সমস্যার মীমাংসায় চেষ্টিত আছেন। তাঁহার কথার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নাই। কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কদের সুর এ সম্পর্কে আগাগোড়া অন্যরকম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী সেদিনও রণহুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা কাশ্মীর দখল করিয়া ছাড়িবেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খোলা-খুলিভাবে তেমন কথা বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার উক্তিও এ সম্বন্ধে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যদি পাকিস্থানের মতানুকূলভাবে না হয়, তবে তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন করিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেদিনও গম্ভীরভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তখন পাকিস্থান কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তিনি এখন তাহা বলিবেন না। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। পাকি-স্থানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাহা বেশই বুঝিবে। অথচ ভারত পাকিস্থানের কল্যাণই কামনা করে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব গড়িয়া উঠে, সে আগাগোড়াই ইহা দেখিতে চায়; কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কদের মতিগতিই সে পথে অন্তরায় ঘটাইতেছে। তাহাদের এইরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের আশা সাফল্য লাভ করে, আমরা ইহাই কামনা করি।

নেপালের ব্যাপার

অল্পদিনের মধ্যেই নেপালের সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু নানারকমে সে পথে নূতন নূতন অন্তরায় দেখা দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক এইরূপ পরিবর্তনের মুখে, যাঁহারা জননায়ক, তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি-বোধের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদে নিজের ভিতরকার ভেদ-বিরোধ বিস্মৃত হওয় কর্তব্য। নেপালের ব্যাপারে এইটির অভা দেখা যাইতেছে। সেখানে কয়েকজন নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া নানা মত গড়িয় উঠিতেছে। নেপালের শাসন-সংস্কার কোন আকার ধারণ করিবে, এখনই নিশ্চয়রূপে কিছ বোঝা যাইতেছে না। নেপালের প্রধান মন্ত্র মধ্যবর্তীকালীন গভর্নমেণ্ট গঠন করিবেন ইহাই আশা করা গিয়াছিল। ইহাতে জনগণে প্রতিনিধিগণ সে গভর্নমেণ্টের সংখ্যাধিক্য লা করিবেন কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ অবশ্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নেপালের মহা রাজাধিরাজ যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। তিনি নিজে গভর্নমেণ্ট গঠন করিবেন; তিনি গণতান্ত্রি অধিকারেরই সমর্থক। সুতরাং মধ্যবর্তীকালী গভর্নমেণ্ট জনমতের বিরোধী হইবে, এম আশঙ্কার কারণ নাই। এরূপ অবস্থায় নেপাল কংগ্রেসের নেতৃবর্গের নিজেদের ভিতরকা ভেদ-বিরোধ মিটাইয়া ফেলা উচিত। আমাদে মতে নেপালকে যাঁহারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ঐক্য এবং সংহতিকে ভিত্তি করিয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকে দৃঢ় করিবার নীতিই তাঁহাদের বর্তমানে অবলম্বন করা কর্তব্য। রাজনীতি ভাবপ্রবণতার ব্যাপার নয়, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে হয়। এক্ষেত্রে অবিবেচনার ফলে গুরুতর অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। নেপালের কংগ্রেসী নেতৃবর্গ বর্তমানে যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ষোল আনা সদ্ব্যবহার করা উচিত। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সমর্থক; সুতরাং নেপালে স্বৈরাচারী শক্তি পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠিবে, এমন সুযোগ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। নেপালের প্রধান মন্ত্রী কিংবা রাণাগোষ্ঠী যদি তেমন চেষ্টায় উদ্যত হন, তবে তাঁহাদিগকে তজ্জন্য আক্কেল-সেলামী দিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আমরা আশা করি ভারত গভর্নমেণ্টের মধ্যস্থতায় নেপালের শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত সমস্যার অচিরেই সমাধান সম্ভব হইবে।

দায়ী কাহারা?

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা এবং সুনাম বাড়িতেছে; কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিতেছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিউ' পত্রের সাধারণতন্ত্র দিবস-সংখ্যায় এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'রিভিউয়ে'র মতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের এই ক্রমাবনতির জন্য ভারতীয় শিল্পপতিগণের অতিলোভই দায়ী। তাঁহাদের অতিলাভের লোভ এবং গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের জন্য দর-কষাকষির ফলেই ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের সুযোগ লইয়া ভারতের ব্যবসায়ীরা সমাজ-বিরোধী অপকার্যে লিপ্ত হইতেছেন। তাঁহারা উৎপন্ন মাল লুকাইয়া রাখিতেছেন। চোরাবাজার চালাইতেছেন এবং অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতেছেন। কথাগুলির সত্যতা কেহই অস্বীকার করিবে না। অতি লাভের লোভে ব্যবসায়ী সমাজ ক্রমেই যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। ভারত সরকারের বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের আর্তনাদই এ পক্ষে প্রচুর প্রমাণ। 'ইকনমিক রিভিউ' এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে প্রস্তাব করিয়াছেন, চোরাবাজার এবং দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বলিয়া গণ্য করা হোক্। বলা বাহুল্য এ প্রস্তাব নূতন কিছু নয়। দেশবাসীর পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং কঠোর হস্তে এই শ্রেণীর পাপ ব্যবসাকে দলন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চোরাবাজারী এবং মুনাফা-শিকারীর দল এখনও দমিত হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শদানই পর্যাপ্ত নয়। তাঁহারা যাহাতে সমাজ-বিরোধী এই শ্রেণীর পাপে যাহারা লিপ্ত, তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার নীতি কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেন, সেজন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ শুধু কথায় কিছু কাজ হয় না, কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। আমরা ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র এবং মূর্তিমান দেখিতে চাই।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বরূপ

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু দেশের ভবিষ্যৎ-গঠনে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তরুণ সমাজের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজ বর্তমানে তাঁহাদের জীবন গঠনের মূলে জীবন্ত কোন আদর্শের প্রেরণা পাইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা যেন স্রোতের সেওলার মত বিভিন্ন মতবাদের আলোড়নে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্রের আদর্শের অন্তরে নৈতিক শক্তির প্রভাব তেমন স্পষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। ইহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের মধ্যে একটা অসংযম এবং অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিবে ইহা বিচিত্র নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহাকে একথা ভাঙ্গিয়া বলিতে হইয়াছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে নিরীশ্বরবাদ এবং অজ্ঞেরবাদ বুঝায় না। ফলত ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিও ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই ভারতের ধর্ম এবং সেই ধর্মকেই ভারতের সাধনা সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রে ভারত-ধর্মের আদর্শকে স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই হিসাবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সার্থকতা। রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু হিন্দু-ধর্মের সত্যাদর্শের ব্যাখ্যা করিয়া তরুণদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত হিন্দুর নিকট, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা কিংবা অন্য কোন ধর্মোপাসনার স্থানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এই কারণেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের কাছে ধর্মের এই অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বভৌম-স্বরূপের কথা অবশ্যই নূতন নয়। নবীন বঙ্গের জাগরণের মূলে ভারত-ধর্মের এই অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শই বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। বিবেকানন্দের বীর বাণী সেই আদর্শেই উদ্দীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের উদাত্তকণ্ঠে বাঙলার তরুণেরা ভারত-ধর্মের সেই উদার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সে আদর্শ তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির বাহ্য আলোড়ন এবং বিলোড়নে সেই আদর্শ ব্যক্তি-জীবনে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কার্যতঃ সমষ্টি মনের সঙ্গে সংবেদনশীল নেতৃত্বের ঐকান্তিক সাধনার অগ্নিময় প্রেরণার প্রতিবেশের জন্য বাঙলার তরুণদের সেই জাগরণ অপেক্ষা করিতেছে। রাজ্যপাল সত্যই বলিয়াছেন, বাঙলা দেশ জুড়িয়া বড় রকমের বিপর্যয় চলিতেছে। বাঙলার প্রতি গৃহই এই বিপর্যয়ের ফলভোগী হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের অবসাদ-গ্রস্ত হইলে চলিবে না। বহু সাধকের সাধনায় এবং বহু মনীষীর মনীষা-প্রভাবে বাঙলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সেই শক্তি বিঘ্ন-বিপর্যয় হইতে বাঙালীকে বাঁচাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অভ্যুত্থানে সমগ্র ভারত নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। ভারত-ধর্মের ধারক, ও বাহক এই বাঙলা। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা এই বাঙলারই সাধনা জীবন্ত করিতে সমর্থ।



স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়

স্বামী শ্যামলানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-বিজয় ভারতবাসীর গৌরবের ও আনন্দের নিদান। বৌদ্ধযুগের পর ভারতবাসীর ভাগ্যে এরূপ বিজয়োল্লাস আর ঘটে নাই। বহুকালের অধঃপতন ও পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা বিস্মৃত হইতেছিল, এমন সময় স্বামিজীর এই বিজয়-অভিযান—ভারতবাসীর নিকট মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের ন্যায় কার্যকরী হইয়াছিল। স্বামী বি বে কা ন ন্দে র আমেরিকা-বিজয়—আলেকজান্ডারের ভারতবিজয় অথবা কলম্বাসের আমেরিকা-বিজয় নয়। ইহা কোন রাজনৈতিক অভিযান নয়—তথাকথিত ধর্মীয় অভিযানও নয়, কারণ ধর্মীয় অভিযান যে ভয়াবহ ও নৃশংস-ব্যাপার হইতে পারে—ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহা সাংস্কৃতিক বিজয় বা শিক্ষার সহিত শিক্ষার মিলন, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সংযোগ।

ভারতের অতীত গৌরব যাহাই থাকুক না কেন, আমেরিকাবাসীরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহারা বর্তমান ভারত সম্বন্ধে অতি বিকৃত বার্তাই পাইয়া থাকেন। সুতরাং ভারত-সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিকট মোটেই অনুকূল নয়।

পাশ্চাত্যদেশে বর্ণ-সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। কৃষ্ণকায় লোক দেখিলেই তাঁহারা হীনব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজ-শাসিত কৃষ্ণকায় ভারতীয়ের প্রতিনিধি। তদুপরি তিনি নিজে স্বাধীন, নিঃস্বম্বল কপর্দকহীনভাবে বিচরণে অভ্যস্ত। সামাজিক আচার ব্যবহার মানিয়া চলা তাঁহার প্রকৃতিগত নয়। পাশ্চাত্য জগৎ অর্থ-গৌরবকেই যথার্থ গৌরব বলিয়া মনে করেন। অর্থহীনের স্থান পাশ্চাত্যদেশে নাই। অর্থহীন ব্যক্তি তস্কর প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহারা সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ। ঐ দেশের ব্যয়বহুল জটিল আচার মানিয়া চলিতে না পারিলে কেহই ভদ্রলোক বলিয়া মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা-লাভের অনুকূল কোন বিষয়ই ছিল না। তিনি ঊনত্রিংশৎবর্ষীয় অনভিজ্ঞ যুবকমাত্র। বিদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তাঁহার ছিল না। অর্থ ত দূরের কথা প্রচুর শীতবস্ত্রও তিনি সঙ্গে লইয়া যান নাই। ভোগবিলাসপূর্ণ পাশ্চাত্য জগৎ—হিমালয়বাসী, ঈশ্বরমাত্র সম্বল কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও স্বামিজী সাহস হারান নাই ও উদ্যম-হীন হন নাই। তিনি কিরূপে এই অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা নিম্নলিখিত পত্রে বুঝিতে পারা যায়—"যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমায় ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতোমধ্যে আমিও যে কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি তৎক্ষণাৎ তার করিব।"

স্বামিজী আমেরিকায় গিয়া প্রথম সেখানকার বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোকদের সহিত দেখা করিতে থাকেন। ইহাতে সেখানকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে. এইচ. রাইট মহোদয় তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার সাহায্যেই তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে কোন পরিচয়পত্রই তাঁহার ছিল না। এই অসুবিধার কথা রাইট মহোদয়কে জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন "স্বামিজী, আপনার নিকট পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি—জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" রাইট মহোদয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি-নির্বাচন সভার সভাপতিকে স্বামিজীর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিলেন "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ-ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করিলেও ইঁহার বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।"

রাইট মহোদয় এইরূপ চিঠিপত্র লিখিয়া ও অর্থাদি দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামিজী মহাসভার ঠিকানাপত্র হারাইয়া ফেলেন। পথচারী লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ঠিকানা উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন। অসহায় হইয়া তিনি রেল-স্টেশনের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গণে একটি



বাক্সের মধ্যে থাকিয়া রাত্রি যাপন করেন। ভারতবর্ষে ভিক্ষুক, ফকির, সন্ন্যাসীকে লোকে আদর করিয়া ভিক্ষা দেয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইহা অতি নিন্দনীয়। স্বামিজী অসহায় হইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। লোকেরা সাহায্যের পরিবর্তে ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও অপমান করিতে লাগিল। অবশেষে মিসেস জর্জ. ডব্লিউ. হেন নামক একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রণী হন এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশন সম্বন্ধে স্বামিজী লিখিয়াছেন: "চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সে সভায় নানাদেশের ধর্মপ্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার। তদ্বৎ সমগ্র খৃষ্টান জগৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্ব-মহিমা কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন।"

এই সভায় পৃথিবীর সমস্ত বিশিষ্ট ধর্মের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বামিজী একে যুবক তদুপরি শূন্যহস্ত। তিনি কোন বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া লইয়া যান নাই। স্বামিজী ইতঃপূর্বে কখনও বড় সভায় বক্তৃতা করেন নাই। ধর্মমহাসভায় ছয় সাত সহস্র মহাপণ্ডিত সমবেত হইয়াছেন। ইঁহাদের দেখিয়া স্বামিজী প্রথমতঃ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রারম্ভেই "Sisters and Brothers of America"—আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ বলিয়া বিরাট জনসংঘকে সম্বোধন করিলেন। এই কথা বলিবামাত্র চতুর্দিক হইতে করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। আনন্দের আতিশয্যে কয়েকমিনিট বক্তৃতা বন্ধ রহিল। স্বামিজীর পূর্ববর্তী বক্তারা "Ladies and Gentlemen"—ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী চলিত প্রথা অনুসরণ না করিয়া পূর্বোক্তভাবে আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করিলেন। আমেরিকাবাসীরা স্বামিজীর এই নূতন ধরণের সম্বোধনে বুঝিলেন—স্বামিজী তাহাদিগকে কত আপনার জন বলিয়া মনে করেন। মহাসভায় যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—সকলেই স্ব স্ব ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হইয়াও বলিলেন "সকল ধর্মের গন্তব্যস্থান এক।" তিনি ধর্মের যে বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণপ্রান্তে বসিয়া শিখিয়াছিলেন—তাহাই জগৎ সমক্ষে প্রচার করিলেন। সার্বজনীনতাই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্ম কাহাকেও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিতে বলে না। কোন মত বিশেষে বিশ্বাসই ধর্ম নয়—মতানুযায়ী চরিত্র-গঠনই ধর্ম—এইভাবে তিনি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুভূতির কথা নির্দেশপূর্বক ধর্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের আরও অনেক ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার শেষের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে না বা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না করিয়া অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইবে। উন্নতি বা বিকাশের নিয়মই এই......শীঘ্রই সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, সমর নহে—সহায়তা, বিনাশ নহে—বরণ, দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি।" স্বামিজীর বক্তৃতার প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃবৃন্দকে সভার শেষ পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিবার জন্য সভার পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখিতেন—স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশেষ বক্তৃতা করিবেন। ওদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন সংবাদপত্র-সমূহের মধ্যে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র তুল্য গোঁড়া কাগজ আর নাই। তাহাতেও স্বামিজী সম্বন্ধে লিখিত হইল "ধর্মমহাসভায় ইনিই নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান ব্যক্তি। ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খৃষ্টধর্মপ্রচারক প্রেরণ কতদূর নির্বুদ্ধিতা তাহা বেশ বুঝিতেছি।" মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড ব্যারোজ মহোদয়ও বলিয়াছেন "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায়—আমেরিকাবাসীর উপর স্বামিজীর বক্তৃতার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল। যে জাতি চিরকাল ঘৃণ্য, পদদলিত, অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছিল—সে হঠাৎ একমাত্র প্রতিনিধির বক্তৃতায় "পণ্ডিতের জাতি" আখ্যা লাভ করিল। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের কম কৃতিত্বের কথা নহে। স্বামিজীর বক্তৃতার পর হইতে গোঁড়া খৃষ্টানদের মতবাদ পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। আমেরিকায় বিপুলভাবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামিজীর দর্শনেচ্ছু জনতাকে সংযত করিবার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হইত। স্বামিজী পূর্বে যে কঠোর দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগের মধ্যে বাস করিতেছিলেন—তাহা একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানকার ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের দ্বার তাঁহার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার প্রচুর অর্থ, মান, যশ লাভ হইয়াছিল—কিন্তু এ সমস্তই তাঁহাকে ভোগের দিকে আকৃষ্ট না করিয়া অধিকতর বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়াছিল। তিনি একদিন "আজ হইতে আমি নির্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম" বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিমন্ত্রিত হন। তাহার ইন্দ্রপুরীসদৃশ অট্টালিকা, রত্নাবলী-ভূষিত দীপালঙ্কৃত গৃহদ্বার দুগ্ধফেণনিভশয্যা—স্বদেশের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য-রোগ-শোকের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহার চক্ষের জলে উপাধান ভিজিয়া গেল। শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তিনি গৃহতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন—"হা আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ! আমি এ সুখ সৌভাগ্য ও নামযশঃ লইয়া কি করিব?"

এই জগদ্ব্যাপার আপেক্ষিক সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজনের কল্যাণে আর একজনের অকল্যাণ। একজনের উন্নতিতে আর একজনের অবনতি। একজনের সৌভাগ্যের উদয় হইলে অপর একজনের দুর্ভাগ্য। একজনের নামযশ প্রভাব প্রতিপত্তিতে অপরের অপযশ ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি। স্বামীজী যখন বক্তৃতা দ্বারা অকাট্য যুক্তি ও উদাহরণ সহযোগে ভারতের কলঙ্ক অপনোদনপূর্বক তাহার গৌরবময় যথার্থরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন—তাঁহার প্রভাবে আমেরিকাবাসীর মন হইতে ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীচ মনোভাব বিদূরিত হইল এবং শ্রদ্ধার ভাব সমুদিত হইল। যাহারা পূর্বে ভারত সম্বন্ধে কুৎসা প্রচারপূর্বক বেশ দুই পয়সা করিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, তাহাদের প্রতি লোকের সন্দেহের উদয় হইল। ইহাতে উহারা স্বামিজীর প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিল—নানাভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল—এমন কি, তাঁহাকে চরিত্রহীন প্রমাণ করিবার জন্য জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিতেও ত্রুটি করিল না। উদ্দেশ্য যাহার মহৎ, হৃদয় যাহার উদার শ্রীভগবান তাহার সহায়।

"যোগ্য যেই ভাগ্য তার কিছুতে না টুটে
ডুবিলেও তরী তার পুনঃ ভাসি উঠে।"

খাঁটি সোনা অগ্নিতপ্ত হইলে উজ্জ্বলতর হয়। জঘন্য লোকদের বিদ্রোহানলে বিবেকানন্দের মহান্ স্বরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশিত হইল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অধিকতর

আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এক শ্রেণীর স্বার্থপর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমেরিকায় স্বামিজীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া ভারতে তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ জঘন্য সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও স্বামিজী বিচলিত হইলেন না। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে অচল অটল রহিলেন—যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতেছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। নিম্নলিখিত পত্রেই ইহা জানিতে পারা যায়—"বাস্তবিক তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তিসমূহ এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে, উহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা আর কিছুতেই টিঁকিতেছে না। অবশ্য মিশনরীদের জন্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশের লোকেরা দলে দলে এখানে আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান প্রধান ধর্মোপদেশকের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাহা হউক, যখন পুষ্করিণীতে নামিয়াছি, তখন শেষ পর্যন্ত ভাল করিয়াই দেখিব।"

স্বার্থপর লোকেরা আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানাভাবে আলোচনা করিলেও স্বামিজী তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—সত্য একদিন আপনিই প্রকাশিত হইবে। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার নিকট নাম, যশ, মান, অপমান সবই সমান। 'সহনং সর্বদুঃখানাম প্রতিকারপূর্বকম্'—সন্ন্যাসীর ধর্ম। তাই যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বিদ্রোহের সমালোচনায় অধীর হইয়া পড়িতেন তিনি শুধু বলিতেন, "ক্রোধ করিতেছ কেন? নিন্দুক ও নিন্দিত, প্রশংসক ও প্রশংসিতের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে?"

স্বামিজীর সময় পর্যন্ত যে সকল ভারতবাসী আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অল্প বলিয়া খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধেই অধিক বলিতেন এবং খৃষ্টধর্মের সঙ্গে যেখানে হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য আছে তাহাই বলিতেন। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রধান বৈসাদৃশ্য—মূর্তিপূজা, পরলোকবাদ ইত্যাদি বিষয়ে। সেই প্রধান বিষয়সমূহে সম্বন্ধে তহারা নীরব থাকিতেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাও খুব ভয়ে ভয়ে বলিতেন। সংস্কৃত জ্ঞান হিন্দুধর্ম বুঝিবার একমাত্র উপায়। সংস্কৃত তথা হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প ছিল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব জ্ঞান না থাকায় এই সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কিছু বলিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। স্বামিজীর সে অসুবিধা ছিল না। স্বামিজীর ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার ছিল। হিন্দুধর্ম ও খৃষ্ট প্রভৃতি জগতের অন্যান্য প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক যথার্থ জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই ছিল। তাঁহার কোন ধর্মের বা জাতির প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের প্রভাবে সকল ধর্মমতকে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। স্বামিজী ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কথা বলিতেন, বক্তৃতাদি করিতেন। তাঁহার কথায় ও বক্তৃতায় অস্পষ্টতা, দীনতা, অজ্ঞতা—বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁহার পাণ্ডিত্য অতুলনীয়, কণ্ঠস্বর সঙ্গীততুল্য, দৃষ্টি মনোমুগ্ধকর, ব্যবহার মধুর ও চিত্তাকর্ষক। তিনি যে সব সময় শ্রুতি-সুখকর, মনোরঞ্জক প্রিয়বাক্যই বলিতেন তাহা নহে। তিনি সত্যদর্শী, সত্যবাদী। সুতরাং সত্যরক্ষা করিতে গিয়া অপ্রিয় কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি স্পষ্ট কথা বলি বটে, সে আপনাদেরই ভালোর জন্য। আমি এখানে আপনাদের মনযোগান কথা বলিতে আসি নাই। সত্য কথা বলিতে আসিয়াছি। মনযোগান বা খোসামোদে কথা বলা আমার ব্যবসায় নহে। আমি আপনাদের ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া ভগবানের দিকে আপনাদের লইয়া যাইতে চাই, সুতরাং সব সময় আপনাদের প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ও সভ্যতার গুণগান করিতে পারিব না।" আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "আপনাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম কৈ? এই মারামারি, কাটাকাটি ও স্বার্থ সংঘর্ষের মধ্যে যীশুর স্থান কোথায়? যদি আজ তিনি এখানে উপস্থিত হইতেন, মাথায় দিয়া শুইবার জন্য এক খণ্ড প্রস্তর পাইতেন কিনা সন্দেহ।" মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোল নামক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে এইরূপ প্রচার করিতে আসিতেন, তবে ইহারা আপনাকে ফাঁসিতে লটকাইত বা পুড়াইয়া মারিত। এমন কি, কিছুদিন পূর্বে আসিলেও আপনাকে ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিত।"

স্বামিজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য পূর্বেও মধ্যপশ্চিম প্রদেশের প্রত্যেক বৃহৎ ও প্রধান প্রধান নগরে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি চিকাগো, আইওয়া সিটি, ডিসময়েনিস, সেন্টলুই ইণ্ডিয়ানা পোলিস, মিলিয়াপোলিশ, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বস্টন, কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন এবং নিউইয়র্ক ভ্রমণ করিলেন এবং আমেরিকাবাসীদের মন হইতে 'ভারতবর্ষ বর্বরের দেশ, উহার ধর্ম অতি অকিঞ্চিৎকর এবং উহার অধিবাসীরা দারুণ অসভ্য' এই সকল মিথ্যা কুসংস্কার দূর করিয়া তৎপরিবর্তে প্রাচ্যদেশ, ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ও যথার্থ ধারণা স্থাপন করিতে বহুল পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামিজীকে সপ্তাহে বার চৌদ্দ বা ততোধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। যখন তিনি নিজকে রিক্ত—যাহা বলিবার ছিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ করিতেন—তখন গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পাইতেন পরদিন তাঁহাকে যে সব কথা বলিতে হইবে কে যেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নিকট বলিতেছেন। সময়ে সময় এই অদ্ভুত উপায়ে অনেক নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইত। নিদ্রাভঙ্গে এ সকল কথা স্মরণ করিয়া তিনি পরদিবসে বক্তৃতায় বলিতেন।

স্বামিজীর অলৌকিক অসামান্য প্রতিভা, মানসিক দৃঢ়তা, অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে আমেরিকা বিজয় সম্ভব হইয়াছিল। লৌকিক দৃষ্টিতে স্বামিজী কর্তৃক ইহা সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু সুক্ষ্মদৃষ্টির নিকট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রত্যক্ষ নির্দেশই প্রতিভাত। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে প্রথম প্ররোচনা দান করেন ও পরিচালিত করেন। বর্তমান জগতে দেখিতেছি আমেরিকাই প্রথম স্থানীয় শক্তি। জগদ্ব্যাপার পরিচালনে এমেরিকাই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপারেও আমেরিকার দান কম নয়। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট মহামান্য রুজভেল্টের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বহু পূর্ব হইতেই আমেরিকার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের পর হইতে আমেরিকার সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। বহু ভারতীয় অধ্যাপক, লেখক প্রভৃতি সুনামের সহিত আমেরিকায় বসবাস অর্থোপার্জনাদি করিয়া আসিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার সঙ্গে যে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গেলেন তাহা বহুকাল বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণের কারণ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের অভিযানে কোন রাজশক্তির সহায়তা ছিল না। উহা শুধু অন্তরের প্রেরণামাত্র। তিনিও প্রেমের প্রেরণায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমেরিকাবাসীরাও প্রেমবশেই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ভয়বিস্ময় প্রভৃতির কোনও স্থান নাই। এই অসাধারণ অমানুষিক সাফল্যে স্বামী বিবেকানন্দও অহঙ্কৃত নন, কারণ তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের বিষয় সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাই ধর্ম মহাসভায় সভাপতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আহূত হইয়াও তিনি আমেরিকার জনসমুদ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সহাস পান নাই। কিন্তু বক্তৃতান্তে অপ্রত্যাশিত সাফল্য দর্শনে বলিয়াছিলেন—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

বিভূতিভূষণের পত্রাবলী

(শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

(১)

ঘাটশিলা
১২—১২—৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আমার আজ ৭।৮ দিন জ্বর। এখনো পথ্য পাইনি। আপনার পূর্বের পত্রখানা যখন এসেছিল, তখন আমি সারাণ্ডা, সুন্দরগড় ও বোনাই স্টেটের অরণ্যে ভ্রমণ করছিলাম ১৩ দিন ধরে। এই ১৩ দিনে অন্ততঃ ৬০০।৬৫০ মাইল গভীর বনপথ অতিক্রম করেছি মোটর যোগে। কত পাহাড়ি ঝর্ণা পার হয়েছি, কত পাহাড়ের ওপর উঠেছি, কত পাহাড় থেকে নেমেছি, কত নদীর ধারের ভিজে মাটিতে বন্য বরাহ ও বাইসনের পায়ের দাগ গুণেছি, কত বনবিহঙ্গের কলতান কান পেতে শুনেছি, কত অপূর্ব বনকুসুমের বিচিত্র ঘন-সন্নিবেশ দেখেছি আর্দ্র ঝর্ণার পাষাণ তটে মাইলের পর মাইল ধরে, কত রাত্রির গভীর তৃতীয় যামে বনবিভাগের বাংলোর ঘরের মধ্যে তপ্ত বিছানায় শুয়ে বন্যহস্তীর বৃংহতি শুনেছি বাংলোর নিচেকার সমতল-ভূমির জঙ্গলে, কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার সবটাই কেটেছে রাজগাংপুর ও বোনাই স্টেটের অরণ্যভূমিতে, নির্জন গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবহমানা পার্বত্য নদী দুটি, কারো ও দক্ষিণ কোয়েল, জ্যোৎস্না-প্লাবিত ওদের পাষাণ তটে যেন অনন্তের স্বপ্ন রচনা করে চলেছে, অথচ কেউ দেখবার নেই সেখানে সেসব অপরূপ সৌন্দর্য, বাঘ-ভালুকে তো সৌন্দর্য দেখে না, মানুষ সেসব অঞ্চলে বড় কম, দু চারটি হো বা মুণ্ডা গ্রাম ছাড়া অন্য লোকালয় আমার চোখে অন্ততঃ পড়েনি।

একদিন একটা বড় বাঘ মোটরে যেতে দূরে দেখেছিলাম পথের ওপরে। দলে দলে ময়ূর আসতো রোদ পোহাতে ছোটনাগরা বাংলোর সামনের পাহাড়ে। কি আনন্দে কাটিয়েছি এই ১২।১৩ দিন। খাওয়া দাওয়া মন্দ নয়। ও অঞ্চলে দুধ ঘি এখনো খাঁটি পাওয়া যায়, মাংস সস্তা, বন্য মুরগি মারলে খাওয়া যায় যত ইচ্ছে, হরিণ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, তবে বন্য কুক্কুট শিকার যত সহজসাধ্য, হরিণ শিকার তত সহজ নয়, এইটুকু যা তফাৎ।

সব ছিল ভালো—কিন্তু সেখান থেকে এসেই জ্বরে পড়লাম। জঙ্গলের মশা কামড়েছে, তাছাড়া জলও ভাল নয়। এখনো ভুগছি; কাল জ্বরটা আসেনি এই যা একটু ভরসা। 'ইছামতী' শেষ হয়ে গিয়েছে গত ৮ই নবেম্বর। কলকাতা গিয়ে ওদের কপি দিয়ে এসেছি। কলকাতা থেকে ফিরেই অরণ্যভ্রমণে বার হয়েছিলাম—সঙ্গে ছিলেন মিঃ সিনহা ও রাসবিহারী গুপ্ত, দুজনেই D. F. O. একজন বিহারী একজন বাঙ্গালী। এ'দের চাকরবাকর সঙ্গে ছিল ও দু'জনের দুখানা মোটর গাড়ি ছিল। থলকোবাদ থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পাই রাজগাংপুর থেকে, সেখানে British Timber Trading Co.-র স্থানীয় ম্যানেজার লেসলি কার্ক প্যাট্রিক তাদের মোটরচালিত করাতের কারখানা দেখাতে আগ্রহান্বিত হয়। ওখানে আমরা ২দিন থাকি এবং ওর্কসিরি জলপ্রপাত দেখতে যাই। অতি দুর্গম ও বন্য হস্তীসংকুল গহন অরণ্যপথে ৫ মাইল পদব্রজে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই, মোটর যাবার রাস্তা নেই সে দুষ্প্রবেশ্য বনের মধ্যে। সে জলপ্রপাতটির আশেপাশে ভিজে মাটি ও বালুর ওপর কত যে বাইসন ও হস্তীর পদচিহ্ন! কি গম্ভীর অবর্ণনীয় শোভা সে জলপ্রপাতের। অথচ জনহীন আরণ্য-ভূমির মধ্যে লুকানো এই অপূর্ব সৌন্দর্যময় স্থানটির কথা কেই বা জানে, কেউ কখনো আসে না পিপাসার্ত বাঘ ভালুক হস্তী বাইসন ছাড়া।

আপনার ভ্রমণের কথা পরে আমাকে লিখবেন কিন্তু। বাবলু ও আপনার বোন ভাল আছে। বৌঠাকুরাণীকে নমস্কার জানাবেন, খোকনকে আশীর্বাদ। এখানে শীত পড়েছে খুব, তার ওপর আমার জ্বরের শীত তো আছেই। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২)

বারাকপুর
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৫৬

প্রীতিভাজনেষু,

পলাশ ফোটে না আপনাদের দেশে? কি সুন্দর ঘেঁটু-ফুলের শোভা হয়েচে আমাদের মাঠে, বাঁশবনে, নদীতীরে! শিমুল ফুলের কি যে শোভা নদীর ঘাটে ঘাটে! আমার মন এসময় যেন কোথায় চলে যায়, এ জগতের পারে একটা অপূর্ব অদৃশ্য স্বপ্নলোক আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যায় এই বসন্তের ঘেঁটুবন, কোকিলের ডাক, ফুলন্ত বাঁকা শিমুলডাল, ঘেঁটুফুলের ঘনসুগন্ধ!

এরই নাম ব্রহ্মের লীলা। এই অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে আমরা যে চিরকাল থাকবো বেঁচে। অনন্ত আকাশের এখানে ওখানে সর্বত্র অমৃতের পুত্রগণ শাশ্বত সময় ব্যেপে আলোর সন্ধানে শিবির স্থাপন করে বিশ্রাম করচে—আমরা সেই অমৃতের পুত্র। স্বেচ্ছায় আমাদের এই নিরাসক্ত খেলা, খেলার মধ্যে নেমে আমরা স্বরূপকে ভুলে গিয়েছি—আমাদের জ্বরা নেই, মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই বন্ধু, দু'দিনের লীলা এই পৃথিবীর জীবন, কতবার ইচ্ছে করে আসবো বসন্তে পলাশফোটা বনভূমির আহ্বানে, আকুল কোকিলের ডাকে—কতবার যাবো!

"আসিব যাইব এইখানে বার বার
দেখিব গাইব জয় তব মহিমার
ও বিশ্বরূপে হারাইতে চাই দিশে।"

বন্ধুবর, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনি মহদান্তঃকরণ তাই আপনার বাড়িতে বিপদের সময় আশ্রয় দিতে চেয়েছেন—আপনার বোন বড্ড খুসি হয়েচে চিঠিখানা পেয়ে। এইতো সত্যিকার মানুষের পরিচয় পেলুম।

এখন হঠাৎ যাওয়া হবে না। কাল জওহরলাল নেহরু আমাদের গ্রামের মাঠ দিয়ে গেলেন সনেকপুর—আমাদের পাশের গ্রাম। কাগজে দেখে থাকবেন। আমার আজ যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল টাটানগর—চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদে। আমার ওপর এখন Peace

Meeting করবার ভার দিয়েচে Dt. Magistrate—তাই গ্রামে গ্রামে করে বেড়াচ্ছি। সেইজন্যেই এখন যাওয়া হোল না।

পলাশ ফোটে কিনা লেখেন নি কেন? ওটা কি পলাশ-ফুলের দেশ নয়?

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন বন্ধু! পত্র দেবেন ঠিকই। ইতি—

গুণমুগ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩)

বারাকপুর
গোপালনগর পোঃ
(যশোহর)
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫।

প্রিয়বরেষু,

দেশে এসেছি ধানকাটাতে। কি ভীষণ ম্যালেরিয়া এবার দেশে, বাড়ি বাড়ি প'ড়ে। কে কার মুখে জল দেয়। কিন্তু কি অপূর্ব বনশোভা! কাল পূর্ণিমার রাত্রে বনমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছিল বনমরচেলতা ও সাঁইবাবলার ঝোপে। এই সৌন্দর্যের জন্যে এর ম্যালেরিয়াকে কখনো কখনো ভুলে যাই। হয়তো মনে মনে ক্ষমাও করি।

মাঘ মাসে আপনাদের ওখানে যেতে পারবো কিনা জানি না। তবে ওদেশে যেতে বড় ইচ্ছে করে। কাছে বেশ নিভৃত শালবন, বন-তুলসীর জঙ্গল, শিলাস্তৃত প্রান্তর আছে? পলাশ ফোটে প্রথম বসন্তে? ধনেশপাখী ডাকে গহন অরণ্যের নিঃশব্দতার মধ্যে?

'হে অরণ্য কথা কও' কলকাতায় গেলে পাঠিয়ে দিতে বলে দেবো প্রকাশককে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন্। আবার বুঝি আমায় জ্বরে ধরলো—কি করি অনেক ধান। নিজে এসে ব্যবস্থা না করলে কিছুই পাবো না। ওদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে একখানা চিঠি দিন না। আমার বড় ভালো লাগে। ইতি—

প্রীতিবন্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪)

15C, Swinhoe Street
Ballygunj
4—9—49

সুহৃৎবরেষু,

দেশে কেউ নেই। সবাই ঘাটশিলায়। ভাদ্রমাস পড়বার আগেই চলে গিয়েছে। আমাকে থাকতে হয়েছিল জরীপের attestation এর জন্যে এবং নির্জনে বসে 'ইছামতী' শেষ করবার জন্যে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার এক জ্ঞাতি কাকা আমার অংশের জমি তাঁর নিজের নামে করে নিয়েছিলেন। মানুষ সোজাপথে আদৌ চলে না।

একা ছিলাম, খাওয়া দাওয়ার কষ্টও ছিল—কিন্তু বনে বনে সে কি বন্যফুলের প্রস্ফুটন, ঝোপে ঝোপে বন্যলতার কি অজস্র সম্ভার, বনবিহঙ্গের অশ্রান্ত কাকলি! ইছামতী এখন কূলে কূলে ভরা, ঝুঁটিবাঁধা কাঠঠোকরা পাখী বাবলার ডালে যখন ঠক্ ঠক্ করে, তখন লতাদোলানে বনসিমতলার ঘাটে নাইতে নামতাম, কেউ কোথাও নেই, পাকা টুকটুকে মাকাল ফল দুলচে জলের ওপর, বাবলার হলুদরঙ-এর ফুল ঝরে পড়চে, নদীর ওপারে কাশফু মাথা দোলাচ্চে—নীল আকাশের তলায় স্নান করতে করতে মনে হোত—

"রূপে রূপে এলে চুপে চুপে,
অপরূপ ওগো অরূপ দেবতা।"

তিনিই ভূমা, তিনিই বিশ্বের মহাকবি নয় কি? স্নান শুধু দেহে ন্যাস—অন্তরের স্নান আছে, আত্মার স্নান আছে, বনসিমতলার ঘা সন্ধ্যায় নাইতে নেমে দেখেচি সেই ভূমার রূপ, সকালে নাইতে নে দেখেচি সেই ভূমার রূপ, শুচিস্নাত হবার এক মস্ত সুযো অন্তরের ও প্রাণেরও।

উপনিষদের বাণী এই জন্যেই জন্ম নিয়েছিল লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যে, যখন বনে দেখি দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। বন ব্যানাফুলের অতি সুকুমার পাপড়ির পাশে বসে মধু খাচ্চে অতি সুকুমার রঙীন প্রজাপতিটা, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো জ্বলন্ত নীহারিকার অগ্নিবাষ্প থেকে কে এদের জন্ম দিলে? কে এদে গড়লে? কার মহাপুণ্য আবির্ভাব এই নির্জন বনতলে এই বনপুষ্প রাজির পাপড়ির গায়ে, প্রজাপতির ডানায় ডানায় কার স্বাক্ষর আঁকা?

না! থাক! আজ আমি ঘাটশিলায় যাচ্চি। আজ অবিশ্যি রবিবার সজনীর ওখানে দুপুরে নিমন্ত্রণ আছে। ওবেলা ঢকুরিয়াতে প্রবো সান্ন্যালের বাড়ি নিমন্ত্রণ। ....গল্প লিখতে পারিনি 'ইছামতী' নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দিয়েছি ৩।৪টি যুগান্তর, আনন্দ বাজার, দেশ, বসুমতী, কালান্তর ইত্যাদিতে—'ইছামতী'র আর দু'টি অধ্যায় বাকী, ঘাটশিলায় গিয়ে লিখবো। পত্র দেবেন ঘাটশিলায়।

ভগবান সম্বন্ধে আপনার ধারণা ও বিশ্বাস কি, লিখে পাঠাবেন? বৌঠাকরুন কেমন আছেন? কালীপুজোয় যদি যাই পায়েস খাওয়াতে হবে কিন্তু বৌঠাকরুনকে। বাবলু ভালো আছে, চিঠি পেয়েছি। বৌঠাকরুন যেন বাবলুর মাকে চিঠি দেন, ও খুব খুশি হয়। ঘাটশিলায় চিঠি দেবেন এখন থেকে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন্। ইতি—

গুণমুগ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

বারাকপুরে
গোপালনগর পোঃ
১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৬।

বন্ধুবরেষু,

আজ একমাস হোল কার্বঙ্কল রোগে শয্যাগত। শরী দুর্বল। তবে আগের চেয়ে অনেক সেরেচে। সেইজন্যেই আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি। কিন্তু আপনি সন্ধান নেন নি কেন? আপনার একখানাও চিঠি পাইনি এখানে এসে পর্যন্ত। আপনার ৭ই বৈশাখের লেখা চিঠি পেলাম আজ ১৯শে বৈশাখে। ডাক বিভাগে গত একমাস থেকে এই বেবন্দোবস্ত সুরু হয়েছে।

ভাই, রোগের যন্ত্রণায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেনাগাড়ির হাসপাতাল, চারিদিকে তার বনভূমি আর নীল পাহাড় শ্রেণী! আমি দেখতে পেলুম না?

আপনার খোকার হাত ভেঙে গিয়েচে শুনে বড় দুঃখিত হোলাম। ভাববেন না সেরে যাবে শীগগির। বৌঠাকরুণের উচিত ছিল ছেলের দিকে নজর রাখা যখন সে অত দুষ্টু ছেলে। আপনার বোন এখানে নেই, আমার পিসতুত বোনের ছেলের বিয়েতে কাল বিকেলে বনগাঁ গিয়েচে। আমার এক খুড়িমা এখানে আছেন। তিনিই এ দু'দিন দেখাশুনা করচেন। ওরা যেতো না আমিই জোর করে পাঠালুম।

কি সুন্দর কালবৈশাখীর আকাশ হয় রোজ বিকেলে। ভগবানের কি বিরাট শিল্প অথচ তাঁকে কেউ চিনলে না। কালিদাস রায় এসেছিলেন দেখা করতে। ঘাটশিলা থেকে আমার ভাই ও বৌমা এসেছিলেন। প্রার্থনা করি খোকার হাত শীগ্গির সেরে উঠুক তার আরোগ্যসংবাদ যেন পাই। কি জানি এ চিঠি কবে পাবেন। তারাশংকর দার্জিলিংএ গিয়েচে। চিঠি দিয়েচে তার ছেলে সনৎ। ভাই, চিঠি দেবেন ও খোকার কথা লিখবেন। বৌঠাকরুণকে বলবেন ছেলে সামলাতে।

ব্রহ্ম সর্বত্র, বেনাগড়িয়া ও বারাকপুরের বনভূমিতে। সন্ধ্যার সময় তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করি ওই বনভূমিতে। ইতি—

প্রীতিবন্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬)

বারাকপুর
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬।

প্রীতিভাজনেষু,

সত্য বলচি, আপনার কথা ক'দিন খুব মনে হচ্ছিল। আমি ১০ দিন পরে কাল এখানে ফিরেচি কলকাতা থেকে। আপনার বোন ও বাবলু এখানে নেই, কলকাতায় আমার মামাশ্বশুরের ওখানে। সামনের সপ্তাহে আসবে। আপনার কাছে একটি অনুরোধ, ওদিকের বন-বর্ণনা করে একখানা পত্র দেবেন? মধ্যে মধ্যে এক আধখানি যা লেখেন ওদিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাতেই আমার মন নেচে ওঠে। কি সুন্দর আপনার বর্ণনার হাত! কুশলী শিল্পী আপনি।

আমার ঘা এখনো সম্পূর্ণ সারেনি। কলকাতায় পশুপতিবাবুকে পরশু দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ৬।৭ দিনে সেরে যাবে। বাড়িতে কেউ নেই খাওয়া দাওয়ার একটু অসুবিধা হচ্ছে।

সোঁদালি ফুলের কি দুলুনি ইছামতীর তীরের মাঠে বনে। ইচ্ছে করে কোথাও না গিয়ে এই রূপচ্ছটা দেখি চোখ ভরে।

সেদিন লেডি রাণু মুখুজ্যের বাড়িতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেখানে বসে বসে ইছামতীর তীরের বনানীর কথা ভেবেছি। আপনাকে আমার নতুন গল্পের বই 'জ্যোতিরিঙ্গণ' শীগ্গির পাঠাবো।

বৌঠাকরুণকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন। খোকার দিকে নজর রাখতে বলবেন তাঁকে। ইতি—

গুণমুগ্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৭)

বারাকপুর
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৬।

সুহৃদ্বরেষু,

বন্ধু না হোলে কে খবর নেয় ব্যস্ত হয়ে। সত্যি আপনার পত্র পেয়ে উত্তর দিতে দেরী হোল বলে লজ্জিত আছি। পুজোর সময় এবার অন্য লেখা বোধহয় লিখতে পারলাম না। 'ইছামতী' উপন্যাসখানা পাবলিশার ঠিক এই সময়েই প্রেসে দিয়েচে। শেষের ১০।১২ ফর্মা লিখে দিতে হচ্ছে। সেজন্যে বড় ব্যস্ত আছি বন্ধু। তা'বলে আপনি কিন্তু চিঠি বন্ধ করবেন না—কারণ আপনার সংবাদ পেলে মনে বড় আনন্দ হয়।

আমি ১৫ই ভাদ্র ঘাটশিলায় যাবো। এখানে এখনো ম্যালেরিয়া দেখা দেয়নি—কিন্তু ভাদ্রমাসের শেষ হতে জেঁকে বসবে।

পুজোর পরে মলুটি গেলে হয়—শালবোনা পাহাড় দেখতে। জানেন, সেদিন বাবলুর মা বলচে—চলো, আমরা কেন কোথাও দুদিন ঘুরে আসি না?

বল্লাম—কোথায় যাবে?

—চলো মলুটী যাই।

কথাটা আমার ভাল লাগলো।

আপনার প্রাকৃতিক বর্ণনা আপনার বোনের খুব ভাল লাগে। বাবলু ভালো আছে। পায়ের ঘা সেরেচে। খাঁটি দুধ পায় বলে। স্বাস্থ্য ভাল হয়েচে। তবে দুধ সস্তা নয়, সহরের টান, বেশ আক্রা—/২॥ সের টাকায়।

ইছামতীর জলে ঢল নেমেছে। মাকাল ফলে রঙ লেগেছে। নদীর দু'ধারের উলুবন জলে ডুবু ডুবু। রোজ সন্ধ্যায় যখন নদীতে নামি স্নান করতে, সাঁইবাবলার ডালে ডালে গাঙশালিখ কিচ কিচ করে, জলমগ্ন নলখাগড়ার ঝোপের ভেতর ডাহুক ডাকে, রঙীন মেঘলোকের ছবি কত স্বপ্ন রচনা করে মনে মনে—স্বপ্ন মাত্রেই অলস নয় বন্ধু, স্বপ্ন হোল 'a dimension of consciousness' চৈতন্যশক্তির একটি নববর্ত্ম।

বৌঠাকরুণকে নমস্কার দেবেন। ছেলে কেমন আছে?

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৮)

ঘাটশিলা
3. 11. 49.

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও লেখাগুলো পেয়ে উত্তর দিতে পারিনি, তার কারণ 'ইছামতী' এখনো শেষ করতে পারিনি। ওটা নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি বন্ধু রোজ খাটতে হচ্ছে। ১৯ ফর্মা ছাপা হয়ে গিয়েচে। প্রেস তাগিদ দিচ্ছে, আপনিও ক্ষমতাবান লেখক, যা কিনা বুঝলাম আপনার গল্প ও রচনাগুলি থেকে—অতএব আপনি আমার অবস্থা বুঝবেন।

কালীপুজো তো দূরের কথা জগদ্ধাত্রী পুজোতেও যেতে পারতুম না মলুটি—কোথাও যেতে পারচিনে—কাজ শেষ না করে ভালো লাগে না।

এই জ্যোৎস্না আপনাদের দেশে নিশ্চয় অদ্ভুত হয়েচে। এখানকার শালবন, টিলা, পাহাড় অপূর্ব হয়েচে ক'দিন থেকে। শীত পড়ে গিয়েচে কাল থেকে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পেয়েছেন কি? আমি গজেনবাবুকে মুখে বলে দিয়েছি। সেদিন এখানে এসেছিল।

বৌঠাকরুণকে নমস্কার জানাবেন। খোকাকে আশীর্বাদ দেবেন। আপনি প্রীতি-সম্ভাষণ জানবেন। বাবুল ও আপনার বোন ভাল আছে। আচ্ছা মলুটি কি ম্যালেরিয়ার জায়গা? ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৯)

ঘাটশিলা
বিজয়া দশমী
১২. ১০. ৪৮।

প্রীতিভাজনেষু,

বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। এই পত্র পাবার আগেই আমি আপনাকে একখানি পত্র দিয়েছি। তাতে সবই লিখেছি। আমি বনগাঁ সভাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। সেখানে সভা ভালোই হয়েছিল। পবিত্র গাঙ্গুলী সভাপতি ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ছিলেন। বনগাঁর এস্ ডি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বনগাঁ কলেজের বাংলার অধ্যাপক শৈলেন দত্ত আমার রচনা

সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন আমার সম্বন্ধে। আপনার প্রেরিত বাণীটি পঠিত হয়েছিল বলে শুনিনি। ওরা পায়নি বোধ হয়। যদি ওর নকল থাকে এক কপি আমাকে পাঠাবেন কি?

এখানে ডাঃ কালিদাস নাগ এসেছেন, প্রমথ বিশি, অধ্যাপক অরুণ সেন, অধ্যাপক বিজন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী—সবাই এসেছেন। খুব বেড়াচ্চি ও গল্প করচি। আগামীকাল বিজয়া সম্মেলন হবে নদীর ধারে জ্যোৎস্নায়। আমারই প্রস্তাব। শালবনে নদীতীরে জ্যোৎস্না রাত্রে বনশ্যাম প্রকৃতির কোলে বন্ধু-সম্মেলন ও কুশল প্রশ্নের আদানপ্রদান। ভালো না? এই সময় আপনি এলে কত আনন্দ হোত। দেশে ২ দিনের জন্যে গিয়েছিলাম। শীঘ্রই শিমুলতলা ও কাশী যাবো। এখন ভালো আছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন্। ইতি—

গুণমুগ্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১০)

ঘাটশিলা
৩রা অক্টোবর, ১৯৪৯

বন্ধুবরেষু,

'বিজয়ার শুভ সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। কালীপুজোর সময় যাবার বিশেষ ইচ্ছে সত্ত্বেও বোধহয় ঘটে উঠবে না। প্যালামৌ ও সারাণ্ডা অরণ্য আবার বেড়াতে যাবার কথা উঠেছে। তা যদি ঘটে, তবে আমাকে নিয়ে যাবে তারা। জীপ্ গাড়ি করে তোড়জোড় করে বেরুনো হবে, দূর পথে বনভ্রমণে! কত কি ফুটবে বনে বনে, কত ময়ূরের ডাক শুনতে শুনতে যাবো পাহাড়ী নদীর উপলবিছানো তট বেয়ে বেয়ে।

তবে যদি না যাওয়া হয়, তবে মলুটি যাবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই রইলো। 'ইছামতী' প্রায় শেষ হয়ে এলো। বড় ব্যস্ত আছি এই নিয়ে।

আপনার চিঠিখানা একটি সাহিত্য হয়েছে। এখানা আমি কিছুতে ছাপানোর চেষ্টায় থাকবো। এ ধরণের চিঠি ক'জনই বা লিখতে পারে?

আমার সাধ জ্যোৎস্না রাতে আপনাদের গ্রামের শালবনে পাহাড়ি টিলায় বসে ভগবানের কথা, সাহিত্যের কথা, প্রকৃতির কথা চর্চা করে মশগুল থাকবো দু'জনে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পাঠিয়ে দিতে বলেছি প্রকাশকদের, এখন বন্ধু ওরা এখানেই এসেচে। আজ সবাই মিলে বনবেষ্টিত একটা হ্রদে বেড়াতে যাবো জ্যোৎস্না রাত্রে। সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত মহাশয় এখানে বেড়াতে এসেছেন, প্রবোধ সান্যাল আসবে পূর্ণিমার দিন। সন্ধ্যার পর প্রমথ বিশির বাড়িতে আমাদের একটা সাহিত্যিক মজলিস বসে রোজ!

নমস্কার বন্ধু!
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১)

3. 10. 49.

বৌঠাকরুণ,

'বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। সৌরীন্দ্রবাবু ও খোকা ভালো। আমার নিজের খুব ইচ্ছে আছে মলুটি যাবো কালীপুজোর সময়ে। কিন্তু কয়েকটি বাধাও দেখ্‌চি। এর মধ্যে আমাকে একবার নেতার হাট যেতে হবে। রাঁচি থেকে ১০০ মাইল দূরে। অপূর্ব মালভূমি, পাইন বন, জলপ্রপাত, নির্জনতা, বিহার লাটের আবাসস্থল ছিল আগে, এখনো রাঁচির একজন বনবিভাগের বড় কর্মচারীর সঙ্গে তাদের মোটরে কথা আছে। তিনি টেলিগ্রাম করলেই চলে যেতে হবে। কিন্তু কথা হচ্চে এই সেখানের চেয়ে আপনাদের বাড়ি যেতে অনেক ইচ্ছে আমার। দেখি কি হয়। ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১২)

ঘাটশিলা—
(গৌরীকুঞ্জ)
সিংহভুম—
১৬, ১, ৫০।

বন্ধুবর,

'ইছামতী' বেরিয়েছে। আপনাকে ২ কপি 'কথাসাহিত্য' এক কপি 'ইছামতী' সেদিন পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছিলাম এর দোকানে—পাঠিয়েছে কিনা জানাবেন। 'কথাসাহিত্য' হোল মা[illegible] পত্রিকা। এ ঠিকানায় আর চিঠি দেবেন না এখন। আমরা চলে যা[illegible] এ সপ্তাহে মোটরে সস্ত্রীক চাইবাসা হয়ে পাটনা, নালন্দা, বুদ্ধগ[illegible] রাজগির, রাঁচি, হাজারিবাগ হয়ে কলকাতা ১০।১২ দিন হবে.....

বন্ধু, আপনি সত্যিকার দরদী সাহিত্যিক। আপনার বর্ণ[illegible] এমন নিপুণ হাত যে আমি আপনার চিঠি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ[illegible] যাই। একটা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে পাঠাবেন দেশে ফিরলে, আমি এ[illegible] ভাল কাগজে বের করবো। রসসৃষ্টি আপনার আছে। 'ইছাম[illegible] কেমন লাগলো লিখবেন কি? আপনার বোন এ দুদিন বড় ব্য[illegible] আছে গোছানো নিয়ে এরপর ও চিঠি দেবে।

প্রীতি নমস্কার নেবেন। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধেয়া বৌঠাকরুণ!

আমার নমস্কার নিন্! কবে আপনাদের বাড়ি গিয়ে আপ[illegible] হাতের পিঠে খাবো তাই ভাবছি। কিন্তু নানান কাজের ঝঞ্ঝাটে স[illegible] করে উঠতে পারচিনে দিদি। কিছু মনে করবেন না। যাবে[illegible] শীগগির। 'ইছামতী' কেমন লাগলো জানাবেন। আশাকরি খুক[illegible] শরীর এখন ভালোই আছে। ইতি—

বিভূতিভূষণ

(১৩)

বারাকপুর
2—3—50.

প্রীতিভাজনেষু,

সুহৃদ্বর, বহুস্থান ভ্রমণ করে মাত্র ৩ দিন হোল দে[illegible] ফিরেচি। দেশে এসে দেখচি এদেশের অবস্থা ভাল নয়। আব[illegible] বোধহয় ঘাটশিলা যেতে হয়। আপনার 'কথাসাহিত্য' সেদিন মলু[illegible] পাবলিক লাইব্রেরী ঠিকানা থেকে ফিরে এসেচে, গজেনবাবু সে[illegible] জানালেন। আপনার নামে পাঠাতে বলেচি। মনের অবস্থা ভাল [illegible] —দেশের এই দারুণ দুরবস্থায়। প্রতিদিন হাজার হাজার নরনা[illegible] নিঃস্ব অবস্থায় বনগ্রাম স্টেশনে এসে পড়ছে। দলে দলে ভিক্ষা কর[illegible] আসচে বাড়ি বাড়ি। তাদের কাহিনী অতীব করুণ। সব কথা লে[illegible] যায় না।

জহরলালজীর birthday volumeএ আমার লেখা বেরিয়েছে গত সপ্তাহে পাঠিয়ে দিয়েচে দিল্লী থেকে। আপনাকে দেখাবে[illegible] দিল্লীতে আমি নিমন্ত্রিত ছিলুম—কিন্তু যাওয়া হয়নি।

আপনার কন্যা নিরাময় হয়েচে শুনে বড় সুখী হয়েচি। এদিকের গোলমাল যদি না থামে—তবে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পরে পত্রদ্বারা জানাবো।

'যাতায়াত' নামে নতুন উপন্যাস বিজয় মিত্রের মাসিক পত্রে এমাস থেকে বেরুচ্চে।

আপনার শক্তিশালী লেখনী যদি ও অঞ্চলের বসন্ত বর্ণনা আমাকে পাঠিয়ে দেয় এ সময়—তবে আমি কি সুখীই হবো। বড় ভালোবাসি আপনার লেখা পড়তে। আপনার কবিদৃষ্টি আছে—বর্ণনার মাধুর্য ও সরসতায় আপনি যে কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের সমান একথা আমি জোর গলায় বলবো বন্ধু, আপনার একটি বসন্ত বর্ণনা কিন্তু চাই-ই।

বাবুল ভালো আছে। বড় দুষ্টু হয়ে উঠেছে। কলম নিয়ে কেবল লিখতে বসবে সকাল থেকে। শেষপর্যন্ত মলুটি যেতে হয় বা —দেখি কি হয়। ইতি—

প্রীতিবন্ধ—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৪)

বারাকপুর
৪—১—৫০।

সুহৃদ্বরেষু,

বন্ধু, আপনার পত্রে আপনার নাতিনীর বিয়োগ সংবাদে আমি ও কল্যাণী অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছি। কালরাত্রে কল্যাণী অনেকবার সে কথা বলেচে। আপনার এখন কর্তব্য শোকার্তা বৌ-ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা দেওয়া। 'দেবযান' পড়িয়ে শোনাবেন।

পরশু সকালে সজনীর বাড়ি বসে আছি, সে একখানা বই আমার পড়তে দিলে, নাম, 'অমরলোক'। একটি মেয়ে মারা গিয়েছিল এলাহাবাদের এক ভদ্রলোকের। তিনি প্ল্যানচেটে মেয়েটিকে এনে স্বর্গলোকের কত সংবাদ সংগ্রহ করেচেন। 'দেবযানে'র সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। আমি গত ২৫ বৎসর ধরে স্পিরিচুয়েলিজম আলোচনা করেছি—মৃত্যু যে বৃহত্তর জগতের দ্বার সে কথা আমি জানি যখন আমার বয়স ২৭ বৎসর তখন থেকেই।

তারাশংকরের ওখানে তারপর দুজনে গেলুম। তার জ্বর হয়েচে। কিছুক্ষণ গল্প করলে, আমায় বললে—ফুলের বীজ নিয়ে যা, ভালো ফুলের বীজ দিচ্ছি।

বন্ধু, এখন দেখা যদি হোত, কত কথা বলতুম দুজনে। কিন্তু এখন দুর্দান্ত গরম কোথাও যাওয়া যাবে না। বাবলু একমাস টাইফয়েডে ভুগলো—সে কি দুর্ভাবনা। ও সময় কোনো কাজ করতে পারিনি।

আপনার কোনো পত্র বা পত্রিকা আমার হস্তগত হয়নি জানবেন। আবার হয়তো আপনি ঠিকানা ভুল করে থাকবেন। গোপালনগর পোঃ, বারাকপুর গ্রাম। এই ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[বারান্তরে বিভূতিভূষণের আরও পত্রাবলী প্রকাশিত হইবে—সঃ দেঃ]

কোন বন্ধুকে

দেবদাস পাঠক

এই তো শীতের শুরু, জড়সড় বিষণ্ন অঘ্রাণ
এখনও দুয়ারে। আছে পৌষ আর স্থবির মাঘের
নির্জীব বিবর্ণ মুখ। ফাল্গুনে এখনও বহু দূরে।
তবু আশ্চর্য বন্ধু, এ-শীতেও বসন্তের গান
তুমি ঠিক খুঁজে পেলে, পেলে সেই জীবনের সুর।

এ-জীবনে একবার হয়তো বা একবারই বুঝি
গান আসে, বান আসে দুকূল ছাপিয়ে একাকার
হৃদয়ে গানের নদী। তারপর যত তারে খুঁজি
পায়ে পায়ে রুখু বালি, ধু ধু বালি, সে সুরের নদী
কখন হারিয়ে যায়, থেমে যায় সে সুর বাহার।

সেই গান সত্য হোক, সে উদার বসন্তবাহার
শীতের জীর্ণবাস খুলুক, তুলুক তবে ঢেউ
তুষারকঠিন এ হৃদে। ফুটুক দুর্লভ শতদল
সে সুরের মূর্ছনায়। দীর্ঘ হোক চৈত্ররাত্রি আর
সব কথা গান হোক, প্রাণ হোক গানের ফসল।

কালো আকাশ

শ্রীঅর্চনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

মাথার উপরে আকাশ বিছানো সীমানাহীন,
কী কালো আকাশ! ভীরু তারাগুলি কম্পমান!
বড় ভয় করে; স'রে এসো আরও, অনির্বাণ
তোমার চোখের শিখাতে জ্বালাও প্রখর দিন।
কী কালো আকাশ! তমোসমুদ্রে খরজোয়ার!
মহাশূন্যের বিস্তার জুড়ে ঘূর্ণি ঘোরে,
গ্রহপুঞ্জের ফেনিল বাহু চূর্ণ ক'রে
হয়তো ঘনাবে গাঢ় হ'য়ে আরও অন্ধকার।
ভয় করে শুধু নিভে যাই যদি আমি হঠাৎ,
ডুবে যাই যদি আরও কালো কোনো শূন্যতায়,
তোমার চোখের শিখা দু'টি যদি হঠাৎ হায়
নিভে যায় আর—খুঁজে বা না পাই তোমার হাত!
কী যে ভয় করে! মাথার উপরে অন্তহীন
আকাশ বিছানো, তারাদীপগুলি ক্রমশ ক্ষীণ॥



সংস্কারবাদীরা আপত্তি প্রকাশ করলেও সেকথা ধোপে টি'কলো না। পাত্র যখন নিজেই প্রস্তাব করেছে, সব জেনে-শুনে আর নমিতা যখন লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তখন এ বিয়েতে আর কিন্তু করবার কিছু নেই।

তবুও রাঙা পিসিমা ভাঙা গলায় ভাইকে ডেকে বলেন—রাজু, কাজটা কী ভালো হয়েছে? হিন্দুর মেয়ের দুবার কখনও বিয়ে হয়?

রাজেনবাবু দিদির একথা মোটে কানেই নিলেন না—তোমাদের সে আমল আর নেই রাঙাদি। বিয়ে দেবো না তো কী মেয়েটা আজীবন শুধু কে'দে কে'দে বেড়াবে?

—কাঁদারই যে বরাত করে এসেছে ও; এ যে ভগবানের বিধান।

রাজেনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—না, কক্ষনো নয়। ভগবানের বিধানে একথা বলে নি। এ মানুষের বিধান, আমাদের এই নিষ্ঠুর সমাজ এবং লোকাচারের বিধান। এ বিষয়ে তুমি কিছু কথা বলো না রাঙা-দি।' এ বিয়ে হবেই। আর ওর ভবিষ্যৎটাও তো আমাকে দেখতে হবে।

তবু রাঙা পিসিমা আশা ছাড়েন না। বলেন—সেইজন্যেই তো মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছো; আর তোমার অবস্থাও তো ভগবানের ইচ্ছায়—

রাজেনবাবু বাধা দেন—জীবনের আরও একটা দিক আছে রাঙাদি'; সে তুমি বুঝবে না।

রাজেনবাবু আর কোন বাদানুবাদের সৃষ্টি না করে চলে গেলেন। নমিতার বিয়ের তারিখ এগিয়ে আসছে; জিনিসপত্তর কেনাকাটা করার ব্যবস্থায় আর গড়িমসি করলে চলবে না।

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আরও দু-চারজন এসেছিলেন হিতোপদেশ দিতে; রাজেনবাবু তাদের কথার কোন জবাব পর্যন্ত দেন নি—জীবনে তিনি একবার ভুল করেছেন—দ্বিতীয়-বার তার সংশোধন করবেন।

মেয়েদের তরফ থেকেও নমিতাকে বাধা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু পাপ-পুণ্যির সংস্কারগত কথায় তার মতন মেয়েকে বশীভূত করা যায় না।

তবুও রাজেনবাবু একবার সচকিত হয়ে উঠলেন, হঠাৎ মনটা তাঁর দুলে উঠলো সংশয়ের দ্বিধায়—যখন তিনি তাঁর মৃতা স্ত্রীর ফটোটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মনে তাঁর একবার যেন প্রশ্ন জাগলো—কাজটা সত্যিই কী ভালো হচ্ছে?

আর তাই দেখে ফেললে নমিতা আর নারীজাত সংস্কারের চোখে। মৃতা মায়ের চোখ দুটি ফটোর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে যেন তার সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে।

নমিতা সেই মুহূর্তেই বাপের কাছ ঘে'সে দাঁড়ালো।

—বাবা।

রাজেনবাবু যেন অনুভব করেন এই দুর্বল মুহূর্তকে। নমিতার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বলেন—কেন মা?

—কাজটা কী ভালো হচ্ছে? আর বিশেষ করে এত লোকের আপত্তি যখন।

রাজেনবাবু ঠিক এই আশঙ্কাই করে-ছিলেন। নিজেকে দৃঢ় করে নিয়ে তিনি বলেন, লোকের আপত্তির কথায় কান দিও না মা। তোমার কী সত্যিই এতে আপত্তি আছে?

নমিতার চোখের কোন বেয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। ভাঙা গলায় সে বলে—কিছুই যে ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা।

রাজেনবাবু উপদেশ দেন—ও তোমার সংস্কার মা; তোমার মায়ের সংস্কার তোমার ওপর ভর করছে। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। তাকিয়ে দেখো সমস্ত সভ্যজাতির দিকে। জীবনকে এমনি করে বঞ্চনা করবার কোন নীতি কোনও দেশের ধর্মশাস্ত্রে নেই—এমন কি আমাদের ধর্মশাস্ত্রও তা বলে না। এ আমাদের অন্ধ-সংস্কার—আমাদের দেশের কদর্য লোকাচার। শেখরকে তুমি জান। তার মতন

ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করাও মস্ত বড় অপরাধ।

বি-এ পাশ করা মেয়ে নমিতা বাপের একথা বোঝে। শুধু বোঝে নয়, মর্মে মর্মে তা অনুভবও করে সমাজের এই নিষ্ঠুর বিধির বিধানে কত সুকুমার জীবন নিয়ত মৃত্যুর প্রেত-পুরীতে জীবন্ত দগ্ধ হয়।

বাপের কথায় প্রতিবাদ তাই আর সে করতে পারে না। অন্তর তায় পরিপূর্ণ আগ্রহেই সায় দেয়; তবুও দুর্বল চোখ দুটিতে অশ্রুবাষ্প জমে ওঠে।

রাজেনবাবু বলেন— হৃদয়ের সত্যকে কখনও অস্বীকার করো না মা।

সংস্কারবাদী আত্মীয়স্বজন অতঃপর এ প্রসঙ্গে আর কোন কথাবার্তা বলে না রাজেনবাবু আর নমিতা উভয়কেই এ সংকল্পে দৃঢ় হতে দেখে।

শেখরকে নমিতা জানে।

জানে মানে জীবনের গভীর আন্তরিকতায় নয়, বাইরে থেকে ভাসা ভাসা যতটুকু সে তাকে দেখতে পেয়েছে ঠিক ততটুকুই। আর তার চেয়ে বেশি জানবার প্রয়োজনই বা কী তার?

শেখর শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান। তার তুলনায় বয়েস কিছু বেশি বটে; কিন্তু তার আসন্ন প্রৌঢ়ত্ব ঘিরেও যৌবনের পূর্ণদীপ্তি বিরাজমান। শেখর নমিতাদের কলেজের অধ্যাপক। নমিতাকে পড়াতো সে দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু বিয়ে তো দূরের কথা, নমিতার প্রতি কোন অনুরাগের লক্ষণও শেখরের চোখে-মুখে কিংবা কথাবার্তায় প্রকাশ পায় নি কোনদিন। নমিতা জানে শেখর বিপত্নীক। সন্তানসন্ততি না থাকলেও শেখরের বিবাহিত জীবনে ছেদ পড়ে নি কোনদিন; অর্থাৎ বিবাহিত জীবন তার সুখময়ই ছিল। আর পূর্বের স্ত্রীকে সে অন্তর দিয়েই ভালবাসত—এ অবিশ্যি নমিতার শোনা কথা।

নমিতা বালবিধবা।

নমিতার মা ছিলেন সেকালের সংস্কার-বাদিনী নারী। একেলে-ভাবাপন্ন রাজেনবাবু কিছুতেই তাঁর স্ত্রীর সংস্কারের বাঁধ ভাঙতে পারে নি। তাই স্ত্রীর অনমনীয় জেদের জন্যেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে নমিতার বিয়ে দিতে হয়েছিল। অল্পবয়সের মেয়েকে গৌরী-দান করে তিনি বেদনা পেয়েছিলেন প্রচুর; আর তাঁর স্ত্রী এতে অক্ষয় স্বর্গবাসের পুণ্য অর্জনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। পরম রূপবান কিশোর জামাই যেদিন বরবেশে এসে তাঁর বাড়িতে উৎসব-আলোকিত রাত্রের শোভা বর্ধন করেছিল,, সেদিন সকলের মুখেই পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। সকলেই সেই আনন্দ-উৎসবে মুখর হয়েছিল। নমিতার বয়েস তখন অল্প হলেও সে রমণীয় রাত্রের ছবি তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায় নি আজও। সেকথা নমিতার বেশ মনে পড়ে। খুশীর প্লাবনে নমিতার অন্তর প্রবাহিত হয়েছিল সেদিন। সেদিনকার সেই রমণীয় অনুভূতি আজও মনে তার জাগ্রত। ফুলশয্যা রাত্রে তার কিশোর স্বামীর ছেলেমানুষী-ভরা আদর, তার মনে প্রথম প্রেমকে জাগরিত করেছিল। সেই বয়সেই নারীর সহজাত বুদ্ধিতে সে বুঝেছিল নারীর জীবনে প্রেমাস্পদ পুরুষের আকর্ষণকে। আজও তার শূন্য অন্তরকে আচ্ছন্ন করে আছে সেই মধুময় স্মৃতি।

তারপর তার কপাল পুড়লো। সে শোকের কথা মনে পড়লেও সারা শরীর তার শিউরে ওঠে। বিয়ের এক বছর পরেই তার স্বামী কঠিন রোগের আক্রমণে মারা গেল। সে মৃত্যুকে সে চোখের সামনে দেখেছিল। দেখেছিল জীবনের কী ভীষণ পরিণতি। কী নিষ্ঠুর বিয়োগের ব্যথা। সে ব্যথা আজও তার মনে চাগাড় দিয়ে ওঠে; বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে হৃদয়াবেগ। সেই শোকেই মা তার রোগশয্যা নিলেন এবং সেই শোকেই তাঁর মৃত্যু হল। রাজেনবাবু স্ত্রীকে ভালবাসতো যথেষ্টই। যদিও তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, তবুও ভাবাবেগকেই প্রাধান্য দিলেন। অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় জীবনে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে মৃতা স্ত্রীর প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে নি আর। তারপর নমিতাকে ঘিরেই সকল উদ্যম তাঁর মুখর হয়ে উঠলো। স্ত্রীর শোকে ভেঙে পড়লে চলবে না তার। নমিতা আছে। নমিতা তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যা। নমিতার ব্যর্থ নারী জীবনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে হবে। নমিতাকে পড়াতে লাগলেন তিনি। নমিতা বি-এ পাশ করেছে। এইবার দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়বে সে। এমন দিনে শেখর এলো নমিতাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব নিয়ে।

নমিতা বিস্মিতা হলো শেখরের ব্যবহারে। ফিলজফির কড়া অধ্যাপক বিয়ে করতে চেয়েছেন তাঁর ছাত্রীকে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। এ ঘটনার পূর্বে কোন রোমাঞ্চ নেই; বর্তমানে শুধুমাত্র বিস্ময়! ভবিষ্যতের কথা নমিতার জানা নেই। তাই জানবার জন্যে নমিতার কল্পনাপ্রবণ মন আবার সজাগ হয়ে উঠলো। জীবনের ঘোলাটে আকাশে আবার রঙের সমারোহ দেখা দিলে।

নমিতার বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন রাজেনবাবু কিছুদিন ধরে। শেখরের প্রস্তাবে তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে পাত্র হিসাবে শেখর চমৎকার; বিশেষ করে সে যখন বিপত্নীক, আর নমিতা যখন বিধবা।

রাঙা পিসিমা কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেললেন। বাল্যকালে বিধবা হয়ে ছোট ভাইয়ের সংসারে তিনি আছেন। ভ্রাতৃবধূ জীবিত থাকতেও তিনি ছিলেন সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। নিজের সংসার কপালগুণে তাঁর শেষ হয়ে গেলেও নারী-জীবনের সার্থকতাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের সংসারে। তাই নমিতার জীবনের শূন্য দিককে অনুভব করতে পারেন না তিনি। নমিতার পুনর্বার বিয়ের কথায় ছোট ভাজের শোক তাঁর উথলে ওঠে—সে থাকলে এমন সর্বনাশের ব্যাপার কখনও ঘটতে পারতো না।

নমিতার বিয়ের সব ঠিকঠাক।

রাজেনবাবু খুব ঘটা করেই বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু নমিতা তাতে বাধা দিলে। তার একান্ত কাকুতি-মিনতিতে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছে তাঁকে। নমিতা শুনলে শেখরের মনোভাব। বিয়েটা যখন নিছক প্রয়োজনের তাগিদে, তখন শানাই বাজিয়ে বাড়িঘরদোর সাজিয়ে, আলোর রোশনাই জেলে অতিথি-পরিজনে মুখর হয়ে উৎসবের বহিরঙ্গকে এমন করে প্রচার করবার সার্থকতাকে পরিণত বয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবার সময় দার্শনিক শেখর অনুভব করে না। তাই অত্যন্ত অনাড়ম্বরের মাঝেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হতে লাগলো।

নমিতার এ ইচ্ছা, শেখরেরই ইচ্ছা। রাজেনবাবু এতে আর আপত্তি করলেন না। এরই মাঝে নমিতা কিন্তু অতি আকস্মিকভাবে শেখরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। শেখর তখন তার শোবার ঘরে শুয়ে নীট্‌সের দার্শনিক তত্ত্বে মনোনিবেশ করেছিল। মোটা চুরুটের ধোঁওয়ায় অধ্যাপক দর্শন চিন্তার ধূম্রজাল বিস্তার করে চলেছে। নমিতার উপস্থিতিকে এমন কী অনুভব পর্যন্ত করে নি। অকস্মাৎ নমিতার কথায় তার চমক ভাঙলো।

নমিতাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেখর অত্যন্ত সহজভাবে প্রশ্ন করলে—হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হলে? ব্যাপার কী?

নমিতা প্রথমেই ধাক্কা খেলে। তার প্রত্যাশা ছিল অনেকখানি। তাকে এমনিভাবে আকস্মিক দেখে শেখর হয়ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। আজ সে তার ভাবী স্ত্রীর কাছে তার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাবকে উন্মুক্ত করে মেলে ধরবে। কিন্তু শেখর সেদিক থেকে একেবারেই উদাসীন।

নমিতা শেখরের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে সামনের কৌচটায় উপবেশন করলে শেখর আবার তার বইএর পাতায় দৃষ্টিমগ্ন হয়ে রইলো। এমন একটা ভাব যে অভাবনীয়, অসঙ্গত এবং অসামাজিক; বিশেষ করে তার ভাবী স্ত্রীর পক্ষে অসম্মাজনক, সে কথা একবারও শেখরের মনে উদিত হল না। আশ্চর্য! নমিতা আশ্চর্য হয়ে যায় শেখরের ব্যবহারে। অধ্যাপক শেখরকে সে চেনবার

সুযোগ পেয়েছিল, তাতে তার প্রতি নমিতার শ্রদ্ধা হয়েছিল; কিন্তু প্রেমিক শেখরের এ রূপ তার কল্পনারও বাইরে। অধ্যয়নরত শেখরকে সে দেখলে যেন একটি প্রাণহীন পাথরের মূর্তি। নমিতা তাকে সহ্য করতে পারে না। শেখরের ঘরের এই অবচেতন বাতাসে তার শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। নীরবে নমিতা উঠে দাঁড়ালো।

—আচ্ছা, চলি তবে।

বইএর পাতা থেকে মুখ তুলে শেখর বললে—এরই মধ্যে কেন? চা খাও।

নমিতা উত্তর দিলে—না, এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি। এখন আর চা খাবো না।

শেখর অনুরোধ জানালে—আর একটু বসো। ভয়ানক জমে গেছি বইটাতে। এই অধ্যায়টুকু শেষ করে ফেলি। তুমি কিছু পড়বে? নাও না ওখান থেকে হেগেলের বইখানা।

নমিতা বললে—না, এখন আমি আপনার কাছে ছাত্রী হয়ে পড়তে আসিনি।

কিন্তু নমিতার এ কথার শ্লেষটুকু দার্শনিক শেখর অনুভব করতে পারলে না।

সে তার বইএর পাতায় দার্শনিক তত্ত্বে মশগুল হয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে আবার প্রচ্ছন্ন নীরবতা। এত ঘন নীরবতা যে, নমিতার উদ্বেলিত বক্ষের চঞ্চল শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনিটুকু পর্যন্ত শোনা যায়। নমিতা তাকিয়ে দেখে শেখরের টেবিলের সামনে একখানি ফটো। অনুমান করে নমিতা ফটোখানি শেখরের স্ত্রীর। ভাবাবেগের আতিশয্যে শেখর কবে না জানি ফটোটার পর একছড়া জুঁইয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছিল—এখন তা বিবর্ণ, শুষ্ক এবং ম্লান। মোটা কাচের ফ্রেমের অন্তরালে সে প্রতিমূর্তিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে নমিতা হঠাৎ আঁৎকে ওঠে। এ যেন তারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। মৃতা অশরীরী শরীর এবং মনকে বেঁধে রাখা হয়েছে স্থূলে চিত্রের আলোকরেখায়। শুকনো ফুলের মালা তাই চরম ব্যঙ্গ করছে যেন।

নিঃশব্দে উঠে পড়লো নমিতা।

শেখর বললো—চললে?

নমিতা উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

শেখর বললে—একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।

নমিতা বললে—বলুন।

—বিয়ের পর কিন্তু পড়াশোনা ছাড়লে চলবে না। ফিলজফিতে তোমাকে এম-এ পড়তে হবে। আমাদের দুজনেরই যখন বয়েস হয়েছে, তখন জীবনের প্রয়োজনের দিকটাই সবচেয়ে আগে দেখা উচিত। কী বলো?

শেখরের একথায় নমিতা বিরক্তি প্রকাশ করলে—সে তো বিয়ের পর; যখন আপনার স্ত্রী হব। এখন আর একথায় প্রয়োজন কী?

শেখর বললে—কিন্তু সে তো আর বেশী দেরী নেই। আর এম-এ'র এ্যাডমিসন শুরু হয়ে গেছে। অযথা দেরী করলে হয়ত এবারে আর সীট্ পাবে না। একটা বছর শুধু শুধু নষ্ট হবে।

নমিতা বললে—এই মাত্র। আমি কিন্তু আপনাকে বিয়ে করবো না।

শেখর বিস্মিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তার মানে?

নমিতা বললে—হ্যাঁ, এই কথাই বলতে এসেছিলাম।

—কেন?

—আমার মতে নিছক প্রয়োজনের বিয়ে না হওয়াই ভালো—আপনার পক্ষে এবং আমার পক্ষেও।

শেখর প্রতিবাদ জানায়—না, ওকথার কোন অর্থ নেই। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। জীবনের মস্ত বড় প্রয়োজনের দিককে অস্বীকার করবে তুমি কোন্ যুক্তি দিয়ে?

নমিতা উত্তর দেয়—বুদ্ধির বাইরে হৃদয়ের দিক থেকে।

শেখর বলে—এ তোমার সংস্কার, এ তোমার হৃদয়াবেগ।

নমিতা উত্তর দেয় দৃঢ়কণ্ঠে—তবুও।

দার্শনিক শেখর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে নমিতার দিকে। তার দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে নমিতার আর এক চেহারা—যে চেহারার সঙ্গে ভীরু, সলজ্জ, স্বল্পভাষিণী ছাত্রী নমিতার কোন সৌসাদৃশ নেই।

আর কিছু বলবার আগেই নমিতা চলে গেল সে ঘর পরিত্যাগ করে। অধ্যাপক শেখর তখন আবার নীট্সের দর্শন অধ্যায়ে মনোনিবেশ করে। তার মুখের জ্বলন্ত মোটা চুরুটের ধোঁওয়ায় ঘরখানি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

আর নমিতা দ্রুতপদে শেখরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজপথের একখানি ট্যাক্সিতে চেপে বসে বলে—চালাও জোরসে।

জীবনে এখন তার আরও উত্তেজনা, আরও গতির প্রয়োজন এখন।

পলাতক

জয়শ্রী চৌধুরী

এই জীবনের বাণী আমি শুনেছি
ভেবেছি মনের প্রত্যন্তে, আর ফিরব না,
ফিরবো না কোলাহল ভরা তোমাদের রাজ্যে
বিষবাষ্পে যেখানে মনোরাজ্যও প্রধূমিত।

যেখানে দুর্বলের অশ্রুবন্যায়
তোমাদের মাটি ভেজে না
যেখানে রক্তাপ্লুত পটভূমিকায়, ফোটে না রক্তকমল
অমারাত্রির অন্ধকারে, শুধু
না-পাওয়ার ব্যথা স্তব্ধ

এখানে শ্যামশষ্পের বুকে
অচঞ্চল সহিষ্ণুতা
আশ্রয় মেলে বনস্পতির দৃঢ় কাঠিন্যে,
পুষ্পিত বনলতায় প্রাণের হারানো মাধুর্য
নিয়ত ভাষা পায়।

জাগরিকতার বিচিত্র স্পন্দন
এখানে শোনা যায় না।
বর্ণশোভিত এ আমার নব বেশ
তোমাদের চোখে বিস্ময় আনে;
এর আড়ালে, চিনেছি জীবনকে
যা বঞ্চিত, কিন্তু জানে না প্রবঞ্চনা।

দয়া করো আমাকে,
অনুরোধ ক'রো না ফিরে যেতে
তোমাদের জীবনচক্রের তলে মথিত প্রাণ আমি
ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত
এখানে পেয়েছি আশ্রয়।*

* Matthew Arnold-এর 'The Scholar Gypsey' অবলম্বনে।





আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না

শিবরাম চক্রবর্তী

অনিমেষ আমায় নিয়ে চা-খানায় ঢুকলো। সবে সে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে ফিরেছে. সংগ দিচ্ছে সবাইকে। সবার কাছেই পাড়ছে তার শিকার-কাহিনী। আমাকেও না শুনিয়ে ছাড়বে না।

তা ভালোই, বাঘ-ভালুক আর মন্দ কি? চা-অমলেটের সংগে সে হলে কারো রাজা-



পাখিস্থানের খবর

উজীর মারাতেও নারাজ হতে নেই। ওর শিকারোক্তি অস্বীকার করতে পারিনে।

রেস্তরাঁর নিরালা ধারটা বেছে নিয়ে বসতে যাচ্ছি, কে যেন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো চাঁছাছোলায়—"আসুন মশাই! বসুন! কী চাই?"

চমকে ফিরে তাকালাম। খাঁচার মধ্যে এক কাকাতুয়া, তীর্যক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে। তিনিই চাঁচাচ্ছেন। তাঁরই বাক্য-তীরবিদ্ধ আমরা।

রেস্তরাঁওয়ালা এগিয়ে এসে আশ্বস্ত করলো—"ঘাবড়াবেন না মশাই। ডজনখানেক বুলি ওর মুখস্ত। তবে অচেনা নতুন কোন মুখ দেখলে এইটেই বেশি আওড়ায়।"

আমরা ঘাবড়াইনে। আমি তো নয়ই। চা-খানায় এসে খানা আর চা না ঠেসে (পরের পয়সায় খাবার!) ঘাবড়াবার ছেলে বাঙলা দেশে আছে নাকি আবার?

রেস্তরাঁওয়ালাকে চা-ইত্যাদির হুকুম দিয়ে অনিমেষ পাখীটার দিকে তাকালো। তারপরে তার অনিমেষ-দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো আমার ওপর—

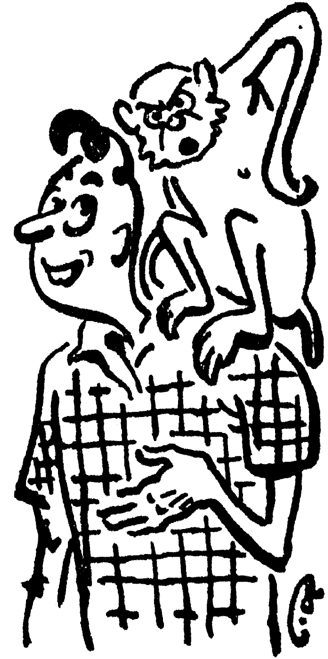
"কাকাতুয়ার কথা যদি বলো, তাহলে টুনটুনির মত আর হয় না।" বললো সে : "তোমাকে আমার টুনটুনির কথা বলেছি?"

ওর কথায় আমার ধাক্কা লাগে। পক্ষীতত্ত্বে আমি বিমলাচরণ লাহার ন্যায় বিশারদ নই, তা জানি, কেবল পাখা দেখে কি গাছের শাখায় দেখে পাখী চেনা আমার পক্ষে শক্তই। চড়ুই, পায়রা, দাঁড়কাক আর অমনি গোটাকয়েক ছাড়া (পক্ষীজাতের মধ্যে যারা নিতান্তই উড়ে!) আর কাউকে সনাক্ত করতে পারব কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহলেও পাখীদের পক্ষপাতী না হয়েও আর এ বিষয়ে ইলাহী জ্ঞান না থেকেও কাকাতুয়া আর টুনটুনি যে এক জাতের নয়, এ আমি বেশ ধরতে পারি। শুনেই আমার কেমন খট্‌কা লাগে। ময়নার থেকে টিয়াকে আমি পৃথক্ করতে পারব না, তা ঠিক, কিন্তু টুনটুনি যে কাকাতুয়া নয়, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। ময়না-তদন্ত না করেই বলা যায়।

টেকনিক্যাল ভাষায় আমার সংশয় ব্যক্ত করি—"দ্যাখো অনিমেষ, লাহা আর দুলাহায় যে তফাৎ, যতোটা পার্থক্য জামাই আর জামায়, তোমায় আর আমায়, আমার ধারণা, একটা সাধারণ কাকতুয়া আর টুনটুনিতে—"

সে বাধা দিয়ে বলে, "আহাহা! টুনটুনি আর কাকাতুয়া এক, কে তোমায় বলেছে? আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি আমার টুনটুনি। আমার কাকাতুয়াটার নাম রেখে-ছিলাম টুনটুনি। লোকে কি আদর করে ছেলেকে বাঁদর বলে ডাকে না? বাঁদর হয়ে যায় নাকি তাই বলেই?"

হ্যাঁ, একটা কথা বটে! ভেবে দেখলে, পাখী বাঁদর আর পাড়ার ছেলে তিনিই গাছের শাখায়



অনিমেষের বাঁদরামি

সমান্তরাল। সমান শোভমান। আর সম-ভাবে সুদূরে থেকে আদরণীয়।

"বলেছি তোমায় আমার টুনটুনির কথা? কথাবার্তায় অবিকল মানুষের মতন। আহা, পাখীটা অনেকদিন ছিলো আমার কাছে, বলিনি তোমায়?"

"না। তোমার বাঁদরের কথা আমায় বলেছো, শয়তান, না কী যেন তার নাম। তবে

সে তোমার আদুরে ছেলে কিনা, তা আমি বলতে পারব না—"

"ওঃ, সেই শয়তান? সেই বাঁদরটা?"

"হ্যাঁ, যে তোমার ঘাড়ে বসে পিঠ চুলকাতো—তোমার কি তার নিজের পিঠ তা তুমিই জানো। আর তোমার সেই মোহনপ্রসাদ—রাজহস্তী! যে শুঁড় দিয়ে জল তুলে ফোয়ারার মতো ঢালতো তোমার মাথায়—চান্ করবার কালে। তুমি চান করতে নামলেই সেও পুকুরে নামতো শুড় শুড় করে এবং ভাইসিভার্সা। কিন্তু তোমার টুনটুনি নামক কাকাতুয়ার কোনো কথা ঘুণাক্ষরেও তুমি আমায় বলোনি।"

"ঘুণাক্ষরেও না? তাহলে বলছি শোনো। এক্ষুণি বলছি, চা দিয়ে যাক্ আগে।"

চায়ে গলা ভিজিয়ে সুরু করলো অনিমেষ—"ভারী ইলমদার ছিল হে পাখীটা! মুখস্ত বুলি আওড়ানো নয়, রীতিমত মুখে মুখে জবাব দিত কথার। ভারী বোলচাল্ ছিলো হে! ঠিক মানুষের মতোই কথা কইতো। হুবহু। আর যেমন চৌকস্ তেমনি কি চোখা? সেই জন্যেই, ওর টনটনে জ্ঞানের জন্যেই তো আদর করে নাম দিয়েছিলাম টুনটুনি। সব-সময়ে সে বসে থাকতো আমার কাঁধে। যখন যেখানে যেতাম, একদণ্ডের জন্যও কাঁধছাড়া হোতো না।......"

"ওকে এমন করে কাঁধাতে তোমার কষ্ট হোত না? আমি জিজ্ঞেস করি।

"আর, কী কাজ দিতো যে পাখীটা! কাঁধে বসে বসে দৃষ্টি রাখতো চারদিকে, চারধারেই চোখ ঘুরতো তার, লক্ষ্য ছিল সকলের ওপর। বিশেষ করে মেয়েদের দিকে নজর দিতো বেশ। রূপসী মেয়েদের দিকেই যেন ঝোঁকটা আরো বেশি ছিলো। কোনো সোমত্ত মেয়ে পাশ দিয়ে গেলে অমনি সে চেঁচিয়ে উঠতো—ওব্বাবা!........"

"ওব্বাবা!" আমিও চেঁচাই : "পাখীর মধ্যে তোমার show-মত্ততাই যে হে! তোমার অদূরদৃষ্টি পেয়েছিলো পাখীটা মনে হচ্ছে।" দার্শনিকের মতন বলি।

"ওর এই নেকনজরের জন্যে একেক সময়ে যা মুস্কিলে পড়তাম। এমন অপ্রস্তুত হতে হোতো, কী বলবো! ফের কখনো কখনো সেই মুস্কিলের থেকে, আপনাআপনি আসান্ হয়ে, ভাব জমে যেত আবার! ঐ পাখীর সূত্র ধরেই অচেনা মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমতো এমন! আহা, সেইসব মেয়েদের গায়ে-পড়া ভাব......সেইসব ভাবের কথা ভাবলে......"

অনিমেষকে বেশ ভাবালু দেখা যায়। গভীর দৃষ্টি যাকে বলে সেইরকম ওর দুই চোখে দেখা দেয়। নিখুঁত করে বললে গাভীর দৃষ্টিও বলা যায়। এই ফাঁকে আমি ওর প্লেটের অমলেটটা সরিয়ে নিজের পেটে পাচার করে দিই—"বলে যাও। থামলে কেন?"

"অ্যাঁ?"

"টুনটুনি।"

"ও হ্যাঁ, টুনটুনি......" চমক্ ভাঙে ওর। মুহ্যমান অনিমেষ মনের উহ্যস্থান থেকে গুহ্য কথাগুলি নামাতে থাকে আবার—"এই-ভাবে কতো মেয়ের সঙ্গে যে যোগাযোগ ঘটিয়েছিল সে, তা বলবার নয়! শিকারে বেরুতাম তো, রাজপুতানায়, কি আসামের জঙ্গলে, কি বেহারের দেহাতে—সেও যেত আমার সাথে। কাঁধে কাঁধেই থাকতো আমার। মাঝে মাঝেই উড়ে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে



কাকস্য পরি-বেদনা!

আসতো চার তল্লাট—দশ বিশ মাইল্ চক্কর মেরে আসতো এক এক পাল্লায়—"

"পাখীদের মধ্যেও চক্রবর্তি আছে তাহলে?" জেনে আমি খুসি হই।

"ঘুরে এসে খবর দিতো আমায়......"

"বাঘ-ভালুকের বার্তা বুঝি?"

"মেয়েদের খবরই বেশির ভাগ। কোথায় কাকে দেখে এলো, কে কেমন দেখতে, এই সব। জংলা জায়গায় দূরে দূরেই তো বাড়ি ঘর—গাঁয়ে গাঁয়ে দশবিশ মাইলের ফারাক্—গায়ে গায়ে লাগাও না আদপেই। কাজেই, বুঝতেই পারছো, ওর খবরে সুরাহা হোতো খুবই। শিকার-পর্ব সেরে টেরে মনের মত জায়গায় খুঁটি গাড়তে পারতাম।"

"সে আবার আরেক শিকার?"

"হ্যাঁ। আরেক পার্বণ।" অনিমেষ অস্বীকার করে না। আবার সে খানিকক্ষণ অতীতের দিকে নির্ণিমেষ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরে স্মৃতিভারমোচন করতে সুরু করে—"অবশ্য, পথঘাটের হদিশও যে না দিত তা নয়। কোথায় জলা, কোন্ ধারে জঙ্গল, কোন্খানে নদী—এসব খবরও বাৎলাতো। সামনে চড়াই থাকলে তাও এসে বলতো আমায়......"

"চড়াই? চড়াইয়ের কথা কেন?" আ কৌতূহলী হই; "তুমি কি অতো ছোটং পাখীও মারতে নাকি?"

"আহা-হা, সে-চড়াই কেন? চড়াই উৎর কাকে বলে তাও জানো না? পাহাড়ী দেশে রাস্তার উঁচু-নীচুকেই বলে থাকে। একা কাকাতুয়াও যে জানে বাপু?" সে বিরক্ত হ ওঠে।

"ও, সেই চড়াই? পাহাড়ে পথঘাটে চপেটাঘাত? জানি বই কি।" জানাই আমি: "সে-চড়াই তোমার জলপথেও আছে। পদ্মা-গর্ভেও দেখা যায়।"

"তারপর শোনো, এবারের কথা বলি। গেছি সুন্দরবনে। বাঘটাগ বাগাবার মতলবেই। আমার এই শেষবারের শিকারের কথাই বলছি। এবার শিকারে গিয়ে আমার সেই টুনটুনিকে হারাতে হয়েছে ভাই......" সে ছল ছল কণ্ঠে বলে। "চিরকালের মতই।"

"মারা গেল বুঝি পাখীটা?"

"না, মারা যায় নি। তবে সে মারা যাবার মতই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের। চিরবিচ্ছেদ যাকে বলে—দুঃখের কথা আর বোলো না। যা কষ্ট পেলাম এবার শিকারে গিয়ে—! কিন্তু সে কষ্ট কিছুই না। সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছি আমার টুনটুনিকে হারিয়ে!"

বেদনায় ও টনটন্ করে। আমি সান্ত্বনার ভাষা পাই না। পাখীস্থানী বিচ্ছেদের সান্ত্বনা কী আছে?

"গেছি সুন্দরবনে। নৌকাতেই আছি। জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটছে দশ-বারোদিন। টুনটুনিও আছে আমার সঙ্গে। এধারে ওধারে উড়ে গিয়ে ঘুরেও আসছে মাঝে মাঝে, কিন্তু কোনো খবরই আনতে পারছে না।......"

"বাঘের খবর?"

"না বাঘের, না বাঘিনীর। না কোনো মেয়েমানুষের। মনে হচ্ছিলো যেন এক যুগ ধরে একটা মেয়েছেলের মুখ দেখি নি। এমন বিশ্রী লাগছিলো! তুমি কী বলবে জানি না, একেক সময়ে আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় যে, বাঘ-ভাল্লুক না হলেও চলতে পারে আমাদের—চলে যায় কোনরকমে—সংসারযাত্রায় বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় না—কিছুই যায় আসে না জীবনের; কিন্তু ভাই, নারী ছাড়া এ দুনিয়া অচল। এ বিষয়ে তুমি কী বলো?

"নাড়ি ছাড়া যে কী জিনিস, সে আর বলতে হয় না।" আমি বাৎলাই—"তখন মকরধ্বজ লাগে।"

"থাক্ গে! লাগুক্ গে!" বলে বড়-গুণবলিজারিত আমার জীবন-দর্শন সে উড়িয়ে দেয়—তার কাকাতুয়ার মতই। —"রোজই নৌকো থেকে নেমে শিকারে বেরুই। জঙ্গল ভাঙি। টুনটুনি থাকে আমার কাঁধে। এমন

সময়ে হঠাৎ একদিন কোথ্থেকে উড়ে এসে খবর দিল টুনটুনি—"উঃ, কী মেয়ে গো বাবু? কী বলবো, এমন চেহারা আর হয় না।" শুনেই আমি চমকে উঠ্লাম। সুন্দরবনের কোনোখানে সুন্দরীর দেখা পাবো, সে ভরসা যখন ছেড়েই দিয়েছি, সেই সময়ে টুনটুনির খবরে টনকো হয়ে উঠতে হলো। একটু অবাকও হলাম বইকি! য্যাদ্দিন ধরে খালি সে কুমীরের পাত্তাই আমায় দিয়েছে, কোনো কুমারীর বিষয়ে টুঁ-শব্দও করে নি। বাঁদর আর খ্যাঁকশেয়ালের সম্বন্ধেই হুঁসিয়ার করেছে আমাকে। আদর করবার মতো সম্বন্ধস্থল তার চোখে পড়ে নি কোথাও। তবে য্যাদ্দিনে কি তার হুঁস হোলো এবার? বনে-জঙ্গলে থেকে জংলী বনেও ফের কি তার রূপ-গুণের দিকে নজর গেল আবার? টুনটুনির কথায় ওর নিশানা ধরে তক্ষুণি আমি রওনা দিলাম। টুনটুনিও ছুটলো আমার সঙ্গে। তাকে যা উৎসাহিত দেখলাম! এই ও উড়ে যায়, এই ঘুরে আসে, ঘুরে এসে আবার উড়ে যায়। এমন উড়্তি আর ফূর্তি কখনো তার আমি দেখি নি।"

"পক্ষি-চরিত্র ভাই, দেবতাদেরও অজানা।" আমি জানাই—"প্রায় নারী-চরিত্রের মতই।"

"যা বলেছো। টুনটুনি বার বার যায়, বারে বারে ফিরে আসে। আর এসে বলে—"আহা, কী মিষ্টি মেয়ে বাবু? কী সুন্দর! মরি মরি! এমন পরির মত মেয়ে আর হয় না! কখনো দেখি নি বাবু! তার কথায়, না দেখেই যেন আমি ক্ষেপে গেলাম। ছুটলাম জঙ্গল ভেদ করে। পড়ি কি মরি করে ছুট্ লাগালাম।"

"দেখা পেলে?"

"সেই কথাতেই তো আসছি হে! টুনটুনি এসে খবর দিলো আবার—'ওমা, কী চুমু খায় গো মেয়েটা! কী আদর গো তার! আমার যেন উড়তে ইচ্ছে করে।' শুনে তো বলবো কি ভাই, আমারো উড়তে ইচ্ছে করলো। সাধ হলো এক্ষুণি উড়ে যাই সেই মেয়েটার কাছে। আমার মনটা চন্‌মন্ করে উঠলো কেন জানো? চুমু যে খায়, সে আবার খাওয়ায়ও। সন্দেশের মতন মধুর হলেও, ও জিনিস একলা খাবার মিষ্টি না। একা একা খাওয়া যায় না, অপরকে খাইয়ে খেতে হয়। সত্যি বলতে, ওর খাওয়া আর খাওয়ানো এক কথা। কাজেই টুনটুনির কাছে



সুন্দরবনে সুন্দরীর খোঁজ

সেই খাইয়ে মেয়েটির কথা না শুনে চমৎকৃত হয়ে আমি—"

"চুমুৎকৃত হবার জন্যে ছুট্ লাগালে? কিন্তু ভাই, লিপ্সা জিনিসটা কি ভালো?" আমি বলি—"পরনারী LIPসা তো আরো ভারী খারাপ।"

"একাদিক্রমে, দিনের পর রাত, যার জঙ্গলে কাটে, তার কি তখন সে খেয়াল থাকে? কান্ডজ্ঞান থাকে তার কোনো? তুমি আর কী বলবে, তারপরে আমি নিজেই তা টের পেয়েছি। কতো ধিক্কার দিয়েছি যে আপনাকে! এখনো দিচ্ছি।—ছি ছি ছি! এমন ভুল পথে কি মানুষ যায় কখনো, উজবুক একটা পাখীর কথায়? এমন আহাম্মুকিও করে! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। যাক্, তখনকার কথাই বলি। ছুটেছি হন্যে হয়ে—শরবন সরিয়ে, কাঁটা ঝোপের পাশ কেটে, জলা সাঁৎরে, লতাগুল্মের মধ্যে না লট্‌কে, বনবাদাড় পার হয়ে ছুটেছি উধাও। মাইল দশেক পেরিয়ে গেছি দেখতে না দেখতে—"

"আহা, শেষে তো দেখলে।" আমি বল্লাম: "তখন তো দাম উঠলো তোমার এই উদ্দামতার।"

"হ্যাঁ, দেখলাম বই কি! অবশেষেই দেখলাম। দিনভোর ছুটে সন্ধ্যের মুখে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে মেয়েটির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। টুনটুনিই দেখিয়ে দিলো মেয়েটিকে—"

"কি রকম দেখতে? ভয়ঙ্কর রূপসী? আহা মরি ক্লাসের?" আমি টান্ হয়ে বসি আমার চেয়ারে। সৌন্দর্যের টান একটা আছেই।

"আহামরিই বটে! টুনটুনির একটা কথাও মিছে নয়। যেমন অপরূপ দেখতে, তেমনি নিজের গুণপনা দেখাতে। আদর করতেও ওস্তাদ খুব। সত্যিই।"

"বলো কি হে?" আরো শুনতে আমি উন্মুখ হই। পরের মুখের ঝাল খাওয়ার মতন হলেও, ম্রিয়মাণ হয়েও, পরের মুখের ঝালানো অমিয়-কাহিনী শুনতে হয়।

"কী বলবো ভাই...... " বলতে গিয়ে সে চুপ করে। মুখর হতে পারে না।

"সেই মেয়েটি গো।" আমি খেই ধরিয়ে দেই।

"হ্যাঁ, সেই মেয়েটি," ঢোঁক গিলে সে জানায়— "আরেকটা কাকাতুয়া।"

"কাকাতুয়া?"

"কাকাতুয়া বা কাকীতুয়া—যাই বলো।"



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

"কন্যা নদী কি নির্দেশ দিল?"

"কন্যা যাহা বলিল তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। কন্যা বলিল, মূল্য না দিলে কোনও কিছুই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তোমরা নিনানির সম্যক মূল্য দাও নাই তাই নিনানি তোমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। যে জমি তোমরা ভোগদখল করিতেছ তাহারও মূল্য দিতে হইবে। মূল্য না দিলে তাহা তোমাদের থাকিবে না, থাকিলেও তাহা তোমাদের ফসল দিবে না। বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ধরণের মূল্য দিতে হইবে। কন্যা তাহার ছল ছল কলকলধ্বনিতে কি যে উত্তর দিতে লাগিল প্রথম বুঝিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ নিবিষ্ট-চিত্তে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। শুনিলাম, কন্যা বলিতেছে—যাহা তোমার প্রিয়তম মূল্য-স্বরূপ তাহাই তোমাকে দিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে, কারণ প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম মানুষের আর কিছু নাই। যাহা চাও তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হও তবেই তাহা পাইবে। পাহাড় সমুদ্রকে কামনা করিয়াছিল, আমি তাহারই ফল। আমি জল-ধারা নই, আমি পাহাড়ের বুকের রক্ত-ধারা, আমিই তাহার প্রাণ। আমাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, আমাকে সে বিলাইয়া দিয়াছে তাই আমিই তাহাকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়াছি। তোমাদের প্রাণ দিতে হইবে, রক্ত দিতে হইবে। কন্যার কলকলধ্বনিতে আমি ইহাই শুনিলাম"

"তাহা হইলে আমাদের কি যুদ্ধই করিতে হইবে?"

"যুদ্ধই করিতে হইবে"

"আমরাই প্রথমে আক্রমণ করিব?"

"ভংগা তাহাই বলিতেছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি যুদ্ধ করিবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের তো প্রচুর নাই। সমর্থ পুরুষের সংখ্যাও আমাদের দলে বেশী নয়। আমরা সকলে যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই আমাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, এমনিই তো ফসল খুব বেশী হয় নাই"

আমি তখন বলিলাম—"উন্নগা পর্বতের অপর পারে কিছুদিন হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা গোদুগ্ধ পান করে, একদল বন্য গরুকে ঘিরিয়া তাহাদেরই তত্ত্বাবধান করিয়া তাহারা বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের দলের একটি মেয়ের সহিত আজ আমার দেখা হইয়া-ছিল। শুনিলাম, গজন্ধর তাহাদের দলেও হানা দিয়াছে। হয়তো তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিবে। সেই মেয়েটি বলিতেছিল, আমাদের মধ্যে কেহ গিয়া যদি তাহাদের দলপতি রোহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে আলাপ করে রোহা হয়তো আমাদের সহিত যোগদান করিবে। আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি সম্মিলিত হই তাহা হইলে উলম্ভনকে এখনই আমরা আক্রমণ করিতে পারি"

ধবল সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাহারা গোদুগ্ধ পান করে? কি করিয়া?"

শিলাঙ্গীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম ধবলকে বলিলাম। ধবল আরও বিস্মিত হইল। তাহার পর বলিল, "তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কি সম্ভব? গরু তৃণভোজী আমরাও তৃণ-ভোজন করিয়া থাকি। সে হিসাবে গরু আমাদের শত্রু। সেই গরু যাহারা পালন করে তাহাদের সহিত মিত্রতা হইবে কিরূপে?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ধবল বলিল—"তাছাড়া তাহাদের নিকট এ প্রস্তাব লইয়া যাইবে কে?"

"আমি যাইতে পারি"

"যে মেয়েটির সহিত তোমার আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কি"

"সে দলপতি রোহার কন্যা"

"বিবাহিতা?"

"না"

"বিবাহযোগ্যা?"

"হাঁ"

ধবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "যুবতী দেখিয়া আকৃষ্ট হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি যুবক তোমার পক্ষে আরও স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিও, যাহা স্বাভাবিক তাহাই নিরাপদ নয়। বজ্র স্বাভাবিক, সর্পও স্বাভাবিক, ঝঞ্ঝা, বন্যা ইহারাও স্বাভাবিক কিন্তু ইহারা সব সময় নিরাপদ নয়। ইহাদের রূপ ধরিয়া অনেক সময় দেবতার রোষ আত্ম-প্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মারা অনেক সময় ইহাদের রূপ ধরিয়া আমাদের শাস্তি দেয়। সুতরাং স্বাভাবিক বাসনার স্রোতে অবগাহন করিবার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাহা নিরাপদ হইবে কিনা, তাহা কোনও দেবতার বা অপদেবতার বিশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে কি না"

আমি বলিলাম—"আমি সমস্তই অকপটে বলিয়াছি। তোমরা আমাকে যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপই আমি করিব। তবে আমার মনে হয়, রোহার সহিত আলাপ করিলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই। ওই মেয়েটিকেও দেবতার ছদ্মবেশী রোষ বলিয়া মনে হয় না আমার। মেয়েটি খুবই সরল—"

ধবল বলিল—"চল ভংগাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক সে কি বলে। একাধিক লোকেব সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল"

ভংগার পরামর্শ দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। পৃষ্ঠের কয়েকটি নিদারুণ ক্ষত তাহাকে কাতর করিয়াছিল। নিজের কুটিরে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল সে, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল তাহার পত্নীরা। সকলেই নিমপাতা চিবাইতেছিল। সেই চিবান নিম-পাতাগুলি লইয়া ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতেছিল।

ধবলের কথা শুনিয়া ভংগা আর্তনাদ করিয়া শুধু একটি বাক্যই বলিল—"প্রতিশোধ চাই—"

ভংগার পত্নীরাও চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রতিশোধ চাই—"

ঘিসুর পত্নীদের মধ্যেও কয়েকজন ভংগার নিকটে বসিয়াছিল, তাহারাও বলিল, "প্রতিশোধ চাই—"

বিব্রত ধবল ভংগার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়াই দেখা হইয়া গেল ইলচির সংগে।

ইলচি ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার মনে হয় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তুমি নিজের বুদ্ধিতে আমাদের এখন চালিত করিতে চাহিও না। তুমি বিঘাওয়ের পরামর্শ লও। সে যাহা করিতে বলে তাহাই কর!"

ধবল চকিতে আমার দিকে একবার দৃষ্টি-পাত করিল। তাহার পর বলিল, "বেশ তাহাই হইবে। জংলা পাহাড় হইতে তোমার জন্য এই খনিত্রটি মূষিকরক্ত মাথাইয়া আনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তুমি ইহার পূজা কর—"

"তাই নাকি, তাই নাকি"

বৃদ্ধা ইলচি যেন বিগলিত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত হইতে শাখাটি লইয়া বলিল—"আজ সকাল হইতে আমার কেবলই জংলার কথা মনে হইতেছিল, কেবলই ভাবিতেছিলাম, আমার জংলা কোথায় গেল। জংলা যে আমার জন্য পাহাড়ে গিয়াছে তাহা কি জানিতাম—"

ইলচি আমার থুতনিতে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল।

...বিঘাও তখনও সেই বাঘের থাবাটি হাতে করিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম সেটির সাহায্যে সে মাছি মারিতেছে। মাছি তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত। পায়ের ক্ষতগুলি সর্বদাই সে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিত তবু তাহাকে ঘিরিয়া একদল মাছি ভনভন করিত সর্বদা। অন্যান্য দিন সে গাছের পত্রসমেত ছোট একটা ডাল ভাঙিয়া কাছে রাখিত এবং তাহা দিয়াই মাছি তাড়াইত। সেদিন দেখিলাম বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতেছে। মৃত মক্ষিকাগুলিকে সে কোথাও বৃত্তাকারে, কোথাও ত্রিভুজাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। পিপীলিকার দলও আসিয়া জুটিয়াছিল প্রচুর। তাহারা বিঘাওয়ের বৃত্ত এবং ত্রিভুজ নষ্ট করিয়া মৃত মক্ষিকাগুলিকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বিঘাও তাহাদের বাধা দিতেছিল না, পুনরায় নূতন মাছি মারিয়া বৃত্ত এবং ত্রিভুজ গঠন করিতেছিল। ধবল এবং আমি যখন তাহার নিকট গেলাম তখন সে একবারমাত্র আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় বৃত্তগঠনে মন দিল। আমরা উভয়েই অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও আর একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। লক্ষ্য করিলাম, তাহার নাসিকাগ্র কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ধবলই কথা কহিল। বলিল, "বিঘাও, আমাদের এই বিপদের সময় তোমার উপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। মীংরা যখন তোমাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল তখন বলিয়াছিল যে, তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি, বলিয়াছিল যে, আমাদের বিপদের সময় তুমি সাহায্য করিবে। আজ বিপদে পড়িয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। উলম্ভনের সহিত আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। জংলা বলিতেছে যে, উন্নগা পর্বতের অপর পারে একটি গো-পালক সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা নাকি গো-দুগ্ধ-পায়ী। তাহাদের সহিতও উলম্ভনের বিবাদ বাধিয়াছে। হয়তো যুদ্ধও বাধিবে। জংলা বলিতেছে যে, আমরা যদি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হই তাহা হইলে সুবিধা হইবে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। আমাদের লোকেরা এখনও কোনও বৃহৎ প্রস্তরখনি আবিষ্কার করিয়া দখল করিতে পারে নাই। প্রস্তরখনির সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছে তাহারা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং ইদানীং নূতন কোনও প্রস্তরের অস্ত্রই আমরা প্রস্তুত করিতে পারি নাই, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই চালাইতেছি। খঞ্জকদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কিছু অস্ত্র আমাদের নষ্টও হইয়াছে। আমাদের লোকবলও কম। সুতরাং ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমাদের এই প্রস্তাব লইয়া জংলা উহাদের দলপতি রোহার নিকট যাইতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু আমার একটা ভয় হইতেছে। উহারা গো-পালক আমরা তৃণ-পালক। তৃণের সহিত গরুর ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্পর্ক। সেইজন্য আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, উহাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব নিরাপদ হইবে কিনা। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, বিঘাও, তুমি উপদেশ দাও, কি করিব।"

বিঘাও নীরবে বৃত্তরচনা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে কেবল বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতে লাগিল। ধবল এবং আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। বৃত্তের পরিধিতে একটি মক্ষিকা নিপুণভাবে বসাইয়া সহসা বিঘাও ধবলের দিকে চাহিল এবং বৃত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—"ইহার ভিতর কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

"আমি তো মৃত মক্ষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না"

"মৃত মক্ষিকারা তো বাহিরে রহিয়াছে। এই বৃত্তের ভিতরে কিছু দেখিতে পাইতেছ কি না"

ধবল এবং আমি উভয়েই মনোনিবেশ সহকারে বৃত্তের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ধবল বলিল, "আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

"সামান্য ধূলিই যদি তোমার চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেখা শক্ত—ভাল করিয়া দেখ—"

"কি দেখিতে পাইব?"

"তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর। আমি এতক্ষণ সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম, এই বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা মূর্ত হইয়াছে। ওই দেখ, ভাল করিয়া দেখ—"

বিঘাও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বৃত্তের দিকে চাহিয়া রহিল। আমরাও চাহিয়া রহিলাম। আমি কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ধবলও পাইল না, কারণ সে ক্ষণকাল পরে বিমর্ষকণ্ঠে বলিল, "আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—"

বিঘাও যেন সর্পের মতো গর্জন করিয়া উঠিল।

বলিল, "কিন্তু আমি পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, যেন বিরাট বন্যায় চতুর্দিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্থল নাই, কোথাও কোন বৃক্ষ বা গুল্ম দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকেই কেবল জল। সেই জলের ভিতর হইতে একটিমাত্র শাখা বিরাট অঙ্গুলির মতো উত্থিত হইয়া আকাশের দিকে কি যেন নির্দেশ করিতেছে। শাখাটি সম্ভবত কোনও ভূপাতিত বৃক্ষের। আমি দেখিতেছি, সেই শাখার উপর একটি মূষিক এবং সর্প রহিয়াছে। মূষিকটি সর্পের মুখের নিকটই বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু সর্প তাহাকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে না।..."

বিঘাও চুপ করিল। আমরাও চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা ধবল আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিঘাওয়ের উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি। জংলা তুমি অবিলম্বে রোহার নিকট গিয়া প্রস্তাব কর যে, আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছি—"

ধবল এবং আমি উঠিয়া পড়িলাম। বৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিঘাও বসিয়া রহিল। কিছুদূর গিয়া শুনিতে পাইলাম, বিঘাও অট্টহাস্য করিতেছে।

...শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় ঝোপের ভিতর বসিয়াছিল। কতক্ষণ হইতে বসিয়াছিল জানি না, কারণ যখন ঝোপে উপস্থিত হইলাম তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, আমার কথা ছিল সন্ধ্যা-বেলা আসিব, একটু আগেই আসিয়া পড়িয়া-ছিলাম। আমি ঝোপে প্রবেশ করিবামাত্র কিন্তু শিলাঙ্গী একটা গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল।

"তুমি আসিয়াছ? বাঁচা গেল। আমি ভাবিতেছিলাম না-জানি কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নিন্নানিকে কেমন দেখিলে? সে ভালো আছে তো? আমি ভাবিয়াছিলাম তাহার জন্য দুধ লইয়া যাইব কিন্তু গিয়া দেখি দুধ নাই, আমার দুধটা পর্যন্ত চিহাই খাইয়া বসিয়া আছে—"

"চিহাই আবার কে"

"চিহাই আমার একজন সখা। ভাবিলাম দুধ যখন পাওয়া গেল না তখন যক্ষিণীর কাছে যাওয়া বৃথা। যক্ষিণী কেমন আছে?

"যক্ষিণী মহা বিপদে পড়িয়াছিল"

"কি"

তাহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিলাম।

"ওরকম বিপদে যক্ষিণী মাঝে মাঝে পড়ে—শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল—"আমি একদিন গিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। সেদিন

যক্ষিণী একটা আস্ত ছাগল গিলিয়া নড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনও কাক আর শকুনির দল উহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নিনানি কেমন আছে?"

"বেশ ভাল আছে। যক্ষিণীর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে"

"আমার সঙ্গেও ভাব হইয়া যাইবে। তুমি রোহার সঙ্গে দেখা করিতে কখন যাইবে? ধবল কি বলিল?"

"ধবল রাজি হইয়াছে। তুমি আমাকে রোহার নিকট লইয়া চল, আমি ধবলের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার নিকট যাইব এবং গিয়া বন্ধুত্বের প্রস্তাব করিব। রোহা এখন কোথা?"

"রোহা নিগম বনেই আছে। তাহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখনই কি যাইবে?"

"যাইতে পারি"

"তাহা হইলে চল। ঝোনঝিরা এখন নাই, এখনই যাওয়া ভাল।"

সুড়ঙ্গপথে শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিলাম। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যখন উন্নগার অপর পারে উপস্থিত হইলাম তখন শিলাঙ্গী আমার কানে কানে বলিল, "তোমাকে কেহ যদি কোন প্রশ্ন করে তুমি কেবল বলিও, আমি নিম্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রোহার নিকট বন্ধুত্ব কামনায় যাইতেছি. শিলাঙ্গী সব কথা জানে। ইহার বেশী আর কিছু বলিও না"

পথে বিশেষ কাহার সহিত দেখা হয় নাই। দেখা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ শিলাঙ্গী আমাকে গাছের আড়ালে আড়ালে লইয়া যাইতেছিল। একটা ছোটখাটো বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল। সে স্থানে সে সময় কাহারও থাকিবার কথা নয়। শিলাঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমি অন্ধকারে তাহার অনুসরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

"শিলাঙ্গী একটু ধীরে ধীরে চল, আমি অন্ধকার পথ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি কোথায়—"

"এই যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই যে এই গাছের তলায়"

গাছের তলায় উপস্থিত হইবামাত্র শিলাঙ্গী আমার হাত ধরিল।

"আমি তোমার হাত ধরিতেছি, এইবার চল। একটু তাড়াতাড়ি চল, ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িলে সব গোলমাল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু রোহা যদি একবার তোমার প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায় তাহা হইলে ঝোনঝিরা আর কিছু করিতে পারিবে না। রোহার কথা তাহাকে মানিতে হইবে। ঝোনঝিরা নাই, এই সুযোগ। চল, চল—"

আমার হাত ধরিয়া শিলাঙ্গী আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে শিলাঙ্গী এখনও থামে নাই। আমার হাত ধরিয়া এখনও সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহার স্পর্শটুকু আমার হাতে লাগিয়া আছে, তাহার অস্ফুট 'চল চল' ধ্বনি এখনও শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে আজও তাহাকে আমি খুঁজিতেছি। ঝোনঝিরা আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঝোনঝিরা আসিয়াছিল ভিন্নরূপে, ঝোনঝিরারূপে নয়, তাই তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীও পারে নাই।

...অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া ঝিল্লীধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তের আলোড়ন যেন বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছে। সহসা একটা নূতন ধরণের তীক্ষ্ম শব্দ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল সহসা।

"মনে হইতেছে হাতী আসিয়াছে। নিগম বনে মাঝে মাঝে হাতীর দল আসে। হাতী আসা খুব সুলক্ষণ। চল, চল, এখনও অনেকটা পথ যাইতে হইবে"

আবার শিলাঙ্গী ছুটিতে লাগিল।

কিছুদূরে গিয়া শিলাঙ্গী বলিল, "রোহা কিন্তু যাহা বলিবে তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না। করিবে না তো?"

"রোহা কি বলিবে তাহা না শুনিয়াই কি করিয়া প্রতিশ্রুতি দিব! তাহার প্রস্তাব যদি আপত্তিজনক হয়—"

"আপত্তিজনক হইবে না—"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি জানি"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি নিশ্চয়ই হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহা দেখিতে পাই নাই।

"তাহা হইলে বল, শুনি—"

"আমি বলিব না. রোহার মুখে শুনিও"

...রোহা চতুর্দিকে মশাল জ্বালিয়া বসিয়াছিল। একা বসিয়াছিল সে। তাহার সম্মুখে বাঁধা ছিল একটা গাভী, তাহাকেই সে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল, তাহার পর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "ওই রোহা। আমি তোমাকে রোহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিব। তাহার পর তুমি তোমার বক্তব্য বলিও। বেশী জোরে কথা বলিও না যেন, গাভীটা তাহা হইলে ভয় পাইবে, রোহাও চটিয়া যাইবে। জোরে কথা বলা রোহা পছন্দ করে না। ঝোনঝিরার উপর এইজন্যই রোহা চটা, সে বড় বেশী চীৎকার করে—"

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নিগম বনের চতুর্দিকেই মশাল জ্বলিতেছে এবং প্রত্যেক মশালকে কেন্দ্র করিয়া সশস্ত্র একদল লোক নীরবে বসিয়া আছে।

শিলাঙ্গী চুপি চুপি বলিল—"উহারা আমাদের গরুর দলকে পাহারা দিতেছে"

দেখিলাম শিলাঙ্গীকে সকলেই চেনে। সকলেই তাহার সহিত সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিল। আমার দিকে চাহিয়া দুই একজন ভ্রূকুটি করিল বটে, কিন্তু শিলাঙ্গীর সঙ্গে ছিলাম বলিয়া কেহ কোনও প্রশ্ন করিল না। রোহার নিকট গিয়া শিলাঙ্গী জানু পাতিয়া বসিল এবং নিম্নকণ্ঠে বলিল, "নিম্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়াছে। উহারাও উলম্ভনের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। উলম্ভন উহাদের দলের একজনকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর একজনকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছে। উহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনকে আক্রমণ করিতে চায়। তোমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য নিম্বসম্প্রদায়ের দলপতি ধবল এই যুবকটিকে পাঠাইয়াছে। তুমি ইহার সহিত কথা বল"

রোহা গাভীটির দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়াই রহিল। শিলাঙ্গী আমাকে ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমিও রোহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং অনুচ্চকণ্ঠে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।

ক্রমশ



দেহ-দেউলের উপাদান কি

পশুপতি ভট্টাচার্য

মন কিংবা আত্মা যে ধরণের জিনিসই হোক, দেহ যে কোন যন্ত্র ধরণের স্থূল জিনিস এ বিষয়ে মতভেদ নেই। সুতরাং যেটা যন্ত্রের মতো চলবার জিনিস তাকে যন্ত্রের মতোই চালাতে হবে। কিন্তু জিনিসটাকে জেনে চালানো এক কথা, আর না জেনে চালানো অন্য কথা। কোন যন্ত্রকেই না-জেনে চালানো সব সময় তেমন নিরাপদ হয় না। যা নিয়ে আমাদের নিত্যই চালিয়ে যেতে হচ্ছে তার সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি কিছু জেনে রাখা ভালো।

কিন্তু কেবল একটা যন্ত্র বললে দেহ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণাও কিছু দেওয়া হোল না। একে যন্ত্র-দেউল বলা উচিত, অর্থাৎ এ যেন বহু যন্ত্র সম্বলিত এক বিরাট কারখানা গৃহ। প্রত্যেক কারখানাতে যেমন অনবরত কল চলছে, কাজ হচ্ছে, আর সকল বিভাগের কাজ মিলিয়ে অবশেষে তার থেকে কিছু একটা উৎপাদিত করা হচ্ছে, এই কারখানাতেও ঠিক তাই হয়। মানুষের দেহের কারখানার সমস্ত কাজগুলির ফলে তার থেকে উৎপাদিত হয় মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি, মানুষের নব নব সৃষ্টি। কিন্তু এর সকল বিভাগের কাজগুলি আলাদা আলাদা করে জানলে তবেই এর সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা করা যায়।

এই সাড়ে পাঁচ বা ছয় ফুট মাত্র পরিমাণ মনুষ্যদেহকে বিরাট কারখানা বলাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় নি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আপন দেহকে বিরাটরূপ ধারণ করিয়ে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। অর্জুন দেখলেন তাঁর প্রত্যেক লোমকূপে যেন এক এক সম্পূর্ণ জগৎ। এটা নিছক কল্পনামাত্র নয়। ছোট জিনিসকে বড়ো করে দেখাতে পারলে তার প্রত্যেকটি উপাদান সম্বন্ধে ঐ রকমই বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরাও যদি মানুষের দেহকে অনেকখানি বড়ো করে দেখাতে পারতুম, তাহলে সকলেই অনায়াসে এর সম্বন্ধে ঐ প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারতেন।

কিন্তু উপস্থিত তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং একে টুকরো টুকরো করে ভেঙে তার থেকে যে-কোন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরো নিয়ে আলাদা করে এবং বড়ো করে দেখাতে পারলে এখানে আরো বেশি কাজ হবে। তার একটি চমৎকার কারণ আছে। এই দেহের প্রত্যেক অংশটি প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক জায়গাতেই আসলে একই মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি। যে-কোন একটি কারখানা গৃহ গড়তে গেলে তার জন্যে ইট-পাথর, কাঠকুটরো এবং লোহালক্করের দরকার হয় এবং তার প্রত্যেকটাই হোলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা রকমের উপাদান। কিন্তু দেহ কারখানার মধ্যে যত রকমেরই বৈচিত্র্য ও বিভাগ থাকুক, তার গঠনের আসল উপাদানটি আগাগোড়া সেই একই জিনিস, এর মধ্যে দুই রকমের উপাদান কিছু নেই। অর্থাৎ সব জায়গাতে একই উপাদানকে নানারূপে অদলবদল করে নিয়ে নানারূপ কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই একই জিনিস আলাদা আলাদা জায়গাতে থেকে আলাদা ধরণের কার্যক্ষেত্র অনুসারে আলাদা রকমের আকার নিয়ে নিয়েছে। যেন এই কারখানাটা গড়তে কেবল একই রকমের জিনিস আমদানি করা হয়েছিল, অগত্যা যেখানে কাঠের দরকার সেখানে সেই জিনিসই দাঁড়িয়ে গেল কাঠের মতো, যেখানে লোহার দরকার, সেখানে তাই দাঁড়িয়ে গেল লোহার মতো, আবার যেখানে ইটপাথরের দরকার সেখানেও সেই একই জিনিস হয়ে গেল ইটপাথরের মতো। এই হলো এর গোড়ার কথা।

শুধু তাই নয়। এখানে আবার আরো একটা আশ্চর্য কথা বলতে বাকি রয়েছে। সেটা হোলো অঙ্কশাস্ত্রের তরফের কথা, অর্থাৎ সংখ্যা এবং পরিমাণের কথা। একটা বড়ো রকমের কারখানা তৈরি করতে গেলে কি মালমশলার কোন অবধি থাকে। অন্য সব জিনিস বাদ দিয়ে কেবল ইটই লেগে যায় কত কোটি কোটি। কিন্তু এখানে অতো বেশি জিনিস আমদানি করবার কোনই দরকার নেই, গোড়াতে মাত্র একটি জিনিস আমদানী করলে তাতেই যথেষ্ট। সেই একটিমাত্র উপাদানের এমন ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে একটির থেকে আপনিই সে দুটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, দুটি থেকে হবে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এমনি করে অল্প সময়ের মধ্যে সেই একটি বস্তু, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, অসংখ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। এবং তারা আপন শক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ দেহটিকে গড়ে তুলবে। এই আশ্চর্য শক্তিটি হোলো ওর নিজস্ব জীবনী-শক্তি। জীব গড়তে এই উপাদানই প্রকৃতির একমাত্র সম্বল।

অতএব এই উপাদানটিকে ভালো করে বুঝে নিতে পারলে প্রথমেই মোটামুটি খানিকটা আন্দাজ হয়ে যাবে। এইজন্যই আমরা বলছিলুম সবচেয়ে ছোটো একটি যে-কোন টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার কথা। তার থেকেই পাওয়া যাবে ঐ উপাদানের পরিচয়।

যাকে আমরা এমন অদ্ভুত উপাদান বলছি সে কোন জিনিস? তাকেই আমরা অনেককাল আগের থেকে যা-হোক একটা নাম দিয়ে বলে আসছি 'সেল' (cell), বাঙলায় যাকে বলা যেতে পারে জীবকোষ। জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতে যত কিছু দেখা যায় তা আগাগোড়া এই সেল দিয়েই তৈরি। এই সেল অতি সূক্ষ্ম জিনিস, সহজ চোখে দৃষ্টিগোচর তো নয়ই, মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের তলায় ফেলে বহু গুণ বড়ো করে দেখলে তবে তাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেল বলতেও অবশ্য ছোট বড়ো নানারকম আকারের আছে, তার একটা আন্দাজ দেবার জন্য বলা যেতে পারে যে, একটি মাঝারি রকম সেলের মাপ হবে—এক ইঞ্চিকে একশো থেকে পাঁচশো ভাগে ভাগ করলে তার একটি ভাগের মাপ যতটুকু হবে তাই। অথচ এইটুকু মাত্র জিনিসের মধ্যেই প্রাণী জীবনের যতরকম বৈচিত্র্য আছে তার সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। একটিমাত্র সেলকে নিয়ে তার স্বভাবচরিত্র পরীক্ষা করে দেখলেই গোটা প্রাণীটার সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে। তার কারণ ওর সমস্ত দেহটা যে নিয়মে চলছে, ওর প্রত্যেক সেলটিও ঠিক সেই নিয়মেই চলছে। গোটা প্রাণীটার মধ্যে রয়েছে যেমন এক সম্পূর্ণ জীবন, প্রত্যেক সেলটির মধ্যেও আছে তেমনি এক এক সম্পূর্ণ জীবন।

কিন্তু এতটুকু সূক্ষ্ম জিনিসের সম্বন্ধে আমরা এত রকমের কথা জানি কেমন করে? তার জন্যে আজকাল দুটি উপায় আছে। একটি উপায় হোলো যার নাম টিসু কাল্‌চার। মরা সেলকে নিয়ে পরীক্ষা করে লাভ নেই. কারণ ওতে তার স্থূল আকৃতিটুকু দেখা ছাড়া অন্য কিছুই জানা যাবে না। কিন্তু এই টিসু কালচারের দ্বারা কোন প্রাণীর শরীর থেকে সামান্য একটু অংশ কেটে নিয়ে তার সেলগুলিকে অনুকূল খাদ্য দিয়ে অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে রক্ষা করতে থাকলে বহুকাল এমন কি পঁচিশ বছর পর্যন্তও বাঁচিয়ে রাখা যায়, আর সুবিধামত সেইগুলিকে জীবন্ত অবস্থায় মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়। আর দ্বিতীয় উপায় হোলো, কাচের স্লাইডে সেলগুলিকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে রেখে নীচের থেকে তার উপর তীব্র আলোকপাত করে সেলগুলির সমস্ত গতিবিধির সরাসরি চলন্ত

ফোটো (যাকে বলে মাইক্রো-ফোটোগ্রাফ) তুলে নেওয়া এবং তার পরে সেই ছবিকে আরো বড়ো করে পর্দার উপরে প্রতিবিম্বিত করে সিনেমা করে দেখানো। এই উপায়ে অতি সূক্ষ্ম জীবন্ত এবং চলন্ত জিনিসকেও অত্যন্ত বড়ো করে দেখানো যায়। এতে অতোটুকু ক্ষুদ্র একটি জীবন্ত সেলকে সিনেমার পর্দায় শেষ পর্যন্ত দেখাবে যেন একজন মানুষের মতো প্রকান্ড। এও কতকটা শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরাট-রূপ দেখানোর মতোই হোলো। অতো সূক্ষ্ম সেলটির সম্বন্ধে অস্পষ্ট তখন কিছুই থাকবে না।

এমনিভাবে পরীক্ষা করে এক একটি জীবন্ত সেলের কি কি পরিচয় পাওয়া গেছে তাই এখন দেখা যাক। আমরা আগেই বলেছি যে, একটি প্রাণীর মধ্যে জীবনের যত কিছু লক্ষণ দেখা যায়, একটি সেলের মধ্যেও তার সমস্ত কিছুই দেখা যায়। সেই সব লক্ষণ কি কি?

প্রথম লক্ষণ **নড়াচড়া।** প্রাণী মাত্রেই হবে নড়ন্ত এবং চলন্ত, জড় পদার্থের মতো একভাবে স্থির হয়ে সে কখনই থাকবে না। তবে আমরা যেমন হাত-পা নাড়ি, দূরে কাছে ঘুরে বেড়াই, অতি ক্ষুদ্র সেলের পক্ষে তেমনভাবটা সম্ভব নয়। এবং সেটা সম্ভব হলেও তেমনি ধরণের অসংখ্য সেলকে শরীরের মধ্যে ধারণ করে থেকে আমাদের পক্ষে বিপদ ঘটতো। সেল মাত্রই নড়াচড়া করে তার দেহটুকু গড়িয়ে গড়িয়ে এবং তার দেহের আকারের নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে। অবশ্য এ কথা বলা হচ্ছে স্বতন্ত্রীকৃত এবং মুক্ত অবস্থার এক একটি সেলের সম্বন্ধে প্রাণীদেহের মধ্যে যেখানে সেলগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান করছে সেখানে এতটা নড়াচড়াও তারপক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, এই নড়াচড়ার উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবেই বা সাধিত হয় তা বুঝতে গেলে ওর ভিতরকার গঠন কিছু আগে জানা দরকার। সেলের দেহবস্তু হোলো জেলির মতো টলটলায়-মান এক খন্ড অর্ধতরল পদার্থ, যার বিশেষ কোন বর্ণ নেই, বিশেষ কোন আকার নেই। এই বস্তুটিকে বলে প্রোটোপ্লাজম। কিন্তু কোন তরল জাতীয় বা নরম জাতীয় জিনিস আধার ব্যতীত থাকতে পারে না, অতএব একেও ধারণ করবার মতো একটি পাতলা ঝিল্লী জাতীয় আধার বা খোলস আছে, সেটাও ঐ প্রোটো-প্লাজম থেকেই তৈরি, ভিতরকার জিনিসের চেয়ে একটু বেশি স্থিতিস্থাপক। কিন্তু এই ঝিল্লী জাতীয় খোলসটি কোন দুর্ভেদ্য রকমের দেয়াল নয়, এর ফাঁকের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু বাইরের জিনিস ভিতরে ঢুকছে এবং ভিতরের জিনিস বাইরে আসছে। বস্তুত এমনিভাবেই সেলের প্রোটোপ্লাজম বাইরের থেকে তার খাদ্যাদি গ্রহণ করে। সেই খাদ্য সংগ্রহের জন্যই ভিতরকার প্রোটোপ্লাজম শুঁড় বাড়ানোর মতো দেহবস্তুটিকে বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে একটু গড়িয়ে যায়, তার পরে খাদ্যকণিকা পেলেই তাকে আবরণের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ধরে নেয়। তাই সিনেমার ছবিতে দেখা যায় যে, সেলের ভিতরে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু কণিকা চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ চালিত হচ্ছে। সেইগুলি প্রোটোপ্লাজমকে খাদ্য সরবরাহ করে, আবার তার আবর্জনাকেও বাইরে নিস্কাশিত করে দেয়। এমনিভাবে চলে ওর বিচিত্র জীবনলীলা। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এক জায়গাতে রয়েছে ওর চেয়েও কিছু ঘনতর এক খন্ড কেন্দ্র পদার্থ, তার নাম নিউক্লিয়াস। ঐ কেন্দ্র পদার্থই হোলো সেলের মস্তিস্ক বা হৃদয়স্বরূপ এবং সেইটুকুই সেলের সব কিছু গতিবিধির পরিচালনা করে। ঐ টুকুর অভাবে সেলটি বাঁচতে পারে না। অবশ্য ঐ যে চাঞ্চল্য বা গতিবিধির কথা বলা হোলো, বিভিন্ন সেল অনুযায়ী এর অনেক ইতরবিশেষ আছে। আমাদের রক্তের মধ্যে যে সব কণিকা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা যথেষ্ট চঞ্চল এবং তাদের গতিবিধি খুবই বিচিত্র। তারা অনবরতই আকার বদলাচ্ছে। মাংসপেশীর ভিতরকার সেলগুলির দুই রকম গতিবিধি, একবার তারা লম্বা হয় আবার কিছু পরেই সংকুচিত হয়। নার্ভের সেলের কিন্তু বিশেষ কিছু গতিবিধি নেই বললেই হয়, যা কিছু চাঞ্চল্য সেটা কেবল ভিতরে ভিতরে।

দ্বিতীয় লক্ষণ **প্রতিক্রিয়া বা সাড়া।** প্রোটোপ্লাজমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের শক্তি সদাই জাগ্রত। বাইরের ঘটনাবৈচিত্র্যে বিচলিত হলে তাতে সাড়া দেওয়া প্রাণের একটা বিশেষ লক্ষণ, এই শক্তিটুকু না থাকলে বাইরের বিভিন্ন পরি-স্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কেউই বাঁচতে পারে না। এই শক্তি সেলের মধ্যেও যথেষ্টই আছে। কোন মুক্ত সেলকে কুইনিন মেশানো জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে তখনই সে গুটিয়ে গিয়ে দারুণ অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করবে। চিনি মেশানো জলে ছেড়ে দিলে তখনই খুশি হয়ে নড়াচড়া করতে থাকবে। আমাদের শরীরস্থ বিভিন্ন সেলগুলির মধ্যে এই শক্তিরও আবার অনেক ইতরবিশেষ আছে। নার্ভের সেলগুলির শক্তি এ বিষয়ে অপরিসীম। আবার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সেলগুলির সাড়া দেবার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চোখের ভিতরকার সেলগুলি কেবল আলো-আঁধারের উত্তেজনা পেলেই বিচিত্রভাবে তার সাড়া দেবে, কানের ভিতরকার সেলগুলি সাড়া দেবে কেবল শব্দ তরঙ্গে, জিভের সেলগুলি সাড়া দেবে খাদ্যের আস্বাদ পেলে। যার যাতে যেমনভাবে সাড়া দেওয়া দরকার সেটা তাদের অভ্যস্ত হয়ে আছে।

তৃতীয় লক্ষণ **খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টিলাভ।** আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি দেহের পুষ্টিরক্ষা করতে এবং কার্যশক্তি সঞ্চয় করতে। আমরা যা-কিছু খাই তাই হজম হয়ে যাবার পরে ঐ কাজে লাগে। কিন্তু আমরা সেগুলি মুখ দিয়ে খেয়ে পেটের মধ্যে গ্রহণ করি, তার সার অংশটি শেষপর্যন্ত আমাদের দেহের যাবতীয় সেল-গুলিই গ্রহণ করে এবং নিজেদের কাজে লাগায়। আমাদের দেহের শক্তি সঞ্চয় মানেই শেষপর্যন্ত সেলগুলির মধ্যে শক্তিসঞ্চয়, দেহের পুষ্টি মানেই সেলের পুষ্টি। সেল খাদ্যকে গ্রহণ করে তার প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এবং সেই প্রোটো-প্লাজমই তখন পুষ্টি ও শক্তির আধার হয়ে ওঠে। এটা একরকম জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা জীবন্ত সেলগুলি অনবরতই করে যেতে সক্ষম।

চতুর্থ লক্ষণ **রেচন বা আবর্জনা নিক্ষেপ।**

খাদ্য গ্রহণের পরিণামে এই কাজটি করতে আমরা প্রত্যেকেই বাধ্য। এটাও জীবনের লক্ষণ এবং আমাদের সেলগুলির প্রত্যেকটিকে এই কাজও করতে হয়। যে সমস্ত ভাসমান কণিকা সেলের মধ্যে ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে ঘোরাঘুরি করছে দেখা যায়, সেগুলির কাজই এই, খাদ্যকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া আর আবর্জনাকে ঝিল্লীর দেয়ালের বাইরে বের করে দেওয়া। এইজন্য কোনো মুক্ত সেলকে পরিষ্কার জলের মধ্যে রাখলে কিছুকালের মধ্যেই সেই জল আবর্জনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পঞ্চম লক্ষণ বায়ু গ্রহণ। বায়ু গ্রহণ মানে বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ, যা প্রাণী মাত্রকেই নিরন্তর করতে হয়। অক্সিজেন ব্যতীত খাদ্যবস্তু স্বরূপে ইন্ধনের দহন হয় না, এবং শক্তি ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় না। আমরা নিজেরা বায়ু গ্রহণ করি স্বতন্ত্র শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা, কিন্তু আমাদের সেলগুলি সেই কাজ করে তার প্রোটোপ্লাজমেরই দ্বারা।

ষষ্ঠ লক্ষণ **প্রজনন**। জীব ও জড়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য। জড়বস্তুর কখনো বংশবৃদ্ধি হতে পারে না, অর্থাৎ জড়বস্তু কখনো আপনাআপনি একটা থেকে দুটো হতে পারে না। কিন্তু যার প্রাণ আছে তার বংশবৃদ্ধি হবেই, সেটা যে-কোনো প্রকারেই হোক। উদ্ভিদের মধ্যেও প্রাণ আছে, তাই গাছ থেকে বীজ জন্মায়, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আবার কত নতুন গাছ জন্মায়। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের বেলাতে বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গম হয়ে তারই ফলে ঠিক সেই জাতীয় আরো কতকগুলি জীব জন্মায়, একেই আমরা বলি প্রজনন। কিন্তু খুব নিম্নশ্রেণীর এবং তার চেয়েও অতি সূক্ষ্ম প্রাণীদের বেলাতে প্রজনন হয় অন্যরকম উপায়ে। কিন্তু এক একটি সেলের বেলাতে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ সেগুলি ক্রমশ সংখ্যায় অনেক বেড়ে যেতে থাকে দ্বিধা বিভক্তির দ্বারা। এস্থলে প্রত্যেকটি সেল আপনা থেকেই সোজাসুজি দুই ভাগে ভাগ হয়ে একটা থেকে দুটো হয়ে যায়, আবার সেই দুটোরও প্রত্যেকটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে চারটে হয়ে যায়। আমরা যে আগে বলেছি, আমাদের দেহের একটিমাত্রই সেল থেকে আপনাআপনি অসংখ্য সেল জন্মায়, আর তার থেকে গোটা একটি মানুষের দেহ গড়ে ওঠে, সেটা এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই ঘটে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া যতটা সোজা শোনাচ্ছে ততটা সোজা মোটেই নয়। এর মধ্যে চলতে থাকে খুবই একটা সূক্ষ্ম এবং জটিল ব্যাপার। এই ভাগের প্রথম সূচনা ঘটে সেলের ভিতরকার কেন্দ্রবস্তু বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে। হঠাৎ এই নিউক্লিয়াসের দুই পাশে দুটি বিন্দুবৎ পদার্থ দেখা দেয়, তাকে বলে আকর্ষণী বৃত্ত। এই বৃত্ত দুটি প্রথমে সেলের দুই অন্তিম প্রান্তের দিকে সরে যায়। তার পরে নিউক্লিয়াসের ভিতরকার অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রোটোপ্লাজম্ সূত্রবৎ ছিন্ন ছিন্ন হয়ে কতকগুলি ছাড়া ছাড়া সুতোর মতো ভাগ হয়ে যায়, এবং সেই সুতোগুলি তখন আকর্ষিত হয়ে সমান সমান সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে দুই আকর্ষণ-বৃত্তের কাছে গিয়ে জড়ো হয়। এই সুতো-গুলিকে বলে ক্রোমোসোম। এই দুই গুচ্ছ ক্রোমোসোম থেকেই আকর্ষণ বৃত্তটিকে ঘিরে আবার দুটি নতুন নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। তার পরে বাকি প্রোটোপ্লাজমটুকু ক্রমশ ভাগ হয়ে সেই দুটির দিকে সরে যেতে থাকে এবং সেটাও শেষ পর্যন্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আর তার মাঝখানটুকু ছিন্ন হয়ে গিয়ে দুটি আলাদা আলাদা সেল তৈরী হয়ে যায়। ঠিক কিসের প্রেরণাতে এই আশ্চর্য প্রক্রিয়াটি অতো সূক্ষ্ম সেলবস্তুর মধ্যে অনবরতই ঘটে যেতে থাকে সে কথা বলা কঠিন, কিন্তু এর চেয়েও আরো আশ্চর্য জিনিস এই যে প্রত্যেক জাতীয় জীবের মধ্যে তার নির্দিষ্ট সেলগুলিতে যে কতগুলি সংখ্যার ক্রোমোসোমের ছেঁড়া সুতো জন্মাবে তা একেবারে নির্দিষ্ট করা আছে, অর্থাৎ একই জাতীয় সেলের মধ্যে একই সংখ্যার সুতো জন্মাতে দেখা যাবে, সেই সংখ্যার কোনো-রকম কমবেশি হবে না। এই কারণে একই জাতের সেল থেকে সেই একই জাতের সেল জন্মাতে পারে, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। এই ক্রোমোসোম সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলবার রইল।

এই যে ছয় রকম লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হোলো এগুলি জীবকোষ সম্পর্কে নিতান্ত সাধারণভাবের পরিচয়। বিশেষত সেলগুলি যখন একক অবস্থায় থাকে, অথবা যে সকল অতি সূক্ষ্ম প্রাণীর জীবন একটিমাত্র সেলের মধ্যেই সম্পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে এইসকল অভিব্যক্তি ঐভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের দেহের মধ্যে যেখানে কোটি কোটি সেল এই একটিমাত্র দেহ গঠনের কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে, সেখানে সম্পূর্ণ অন্যরকমের ব্যাপার। সেখানে ওদের ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে বহু স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে সমষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে, এবং আপন আপন স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে সমগ্র মানুষটির কল্যাণে তারই জীবনরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হচ্ছে ও যেখানে যেমন দরকার সেইভাবে নূতন নূতন চরিত্র গঠন করে নিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে কর্তব্যের ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার দরুণ তাদের আকার এবং ব্যবহারেরও অনেক অদলবদল হয়ে গেছে। তাই দেহের এক জায়গার সেল অন্য জায়গার সেল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রকমের দাঁড়িয়ে যায়। এর কারণ, প্রত্যেক সেলটিকে জীবন-রক্ষার জন্য যে সব কাজ করতে হয়, গোটা মানুষটার বেলাতে জীবনরক্ষার জন্য তাকেও তাই করতে হয়। কিন্তু একটি সেলের বেলাতে যেখানে সেই কাজগুলি একমাত্র তার প্রোটো-প্লাজমের দ্বারাই সাধিত হয়, সেখানে গোটা মানুষটির বেলাতে তার প্রত্যেক কাজটি আলাদা আলাদা বিভাগের দ্বারা সাধিত হয়। সুতরাং যে বিভাগের যে কাজ, সেখানকার যাবতীয় সেলগুলিকে অন্য সব ছেড়ে কেবল সেই কাজেই লেগে থাকতে হয়। এর ফলেই তাদের অমন রূপান্তর ঘটে। তাই দেখা যায় যে, মাংসপেশী-গুলির সেল হয় লম্বা ধরণের এবং তাদের স্থিতিস্থাপক গুণটাই সবচেয়ে বেশি। নার্ভের সেলগুলি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয়, আর সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য সুদীর্ঘ তারের মতো তন্তুবিশিষ্ট হয়। হাড়ের ভিতরকার সেলগুলি হাড়ের মতোই কঠিন হয়ে ওঠে। হজমযন্ত্রের সেলগুলি হজম রসের ক্ষরণকারী হয়। শ্বাসযন্ত্রের সেলগুলি ফাঁপা বেলুনের মতো বায়ু আদানপ্রদানের উপযোগী হয়। এমনিভাবে যদিও আমাদের প্রত্যেকটি জীবকোষ গোড়াতে সেই একই পিতৃ-মাতৃ কোষ থেকে একই চরিত্র নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু শেষে এমন হয় যে, পরস্পরকে পরস্পরের সমগোত্র বলে আর চেনাই যায় না। চামড়ার কোষের সঙ্গে হাড়ের কোষের যেন কোনোই মিল নেই, মাংসের কোষের সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষের যেন কোনোই মিল নেই। অথচ প্রত্যেকেই যে তারা কোষধর্মী তাতেও সন্দেহ নেই। আবার যদি তাদের সমষ্টিগতভাবে না রেখে পৃথকভাবে বাঁচিয়ে রাখা হবে তখন হয়তো দেখা যাবে যে, তারা অনেকটা আগেকার সেই কোষচরিত্রেই ফিরে গেছে।

এই জাতীয় উপাদানে আমাদের প্রত্যেকের দেহাধারটি তৈরী। সেই আধারের মধ্যে বিরাজ করছে একজন মানুষ। তার প্রত্যেকটি কোষ নিজেরা বেঁচে থেকে তাকে বাঁচিয়ে রখবার চেষ্টা করছে। তেমনি তাকেও ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করতে হয় যাতে দেহের ভিতরকার সেলগুলি নির্বিবাদে বেঁচে থাকে। তারা রয়েছে ভিতরে আবদ্ধ হয়ে, স্বাধীনভাবে তারা নিজেদের জন্য খাদ্য জল বায়ু প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিতে পারে না। আমাদের প্রধান কাজই হোলো তাই, সমুচিত খোরাকাদি সরবরাহ করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা।

ইন্দ্রজিতের আসর

আমার ঠিক পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ভদ্রলোক ক'দিনের জন্য সপরিবারে বাইরে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাঁর গৃহ-পালিত দুটি হাঁস আমার জিম্মেয় রেখে গিয়েছিলেন। আর কোন গত্যন্তর ছিল না বলেই আমার উপরে ভারটা চাপাতে হয়েছিল। নইলে আমাকে যাঁরা ভালো করে জানেন, তাঁরা সজ্ঞানে কখনো কোন কাজের ভার আমাকে দেন না। সত্যি বলতে কি, মাত্র সাত-আট দিনের জন্য হলেও এই রিফিউজি হংস দম্পতি আমার গৃহে এসে আশ্রয় নেওয়াতে আমি প্রথমটায় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করেছিলাম। রিফিউজি-সমস্যা যে কি ঘোরতর সমস্যা, সেটা আমি সেদিনই প্রথম টের পেলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই দেখলুম, এরা অত্যন্ত সংস্বভাব প্রাণী। অতি অল্পে সন্তুষ্ট, আপন মনে থাকে, গৃহ এবং গৃহস্থের সঙ্গে সম্পর্ক যৎসামান্য। একমাত্র ভয় ছিল, ছেড়ে দিলে পাছে সন্ধ্যাবেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে—নতুন মনিবের ঘর তো অচেনা। সে এক বিষম বিভ্রাট হত। বুনো হাঁস তাড়ানোর তবু একটা মানে হয়—Domestic goose chase-এর কোন মানেই হয় না! গোড়ার দিকে আমার প্রতিবেশী বন্ধুকে এই নিয়ে বিষম বিব্রত হতে দেখেছি। উনি যাবার বেলায় আমাকে একটি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—বলা বাহুল্য, এটি অভিজ্ঞতা-প্রসূত—কিছু মুশকিল নেই, হংসীটির পায়ে একটি দড়ি লাগিয়ে কোথাও বেঁধে রাখুন; ব্যস্, হংসটি ঠায় এক জায়গায় দিনমান বসে থাকবে। নিমেষের জন্য সঙ্গিনীকে চোখের আড়াল করবে না। দেখলুম সত্যি তাই। এমন দাম্পত্যনিষ্ঠা মনুষ্য সমাজে কদাপি সম্ভব নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর কাছে ইতর মনুষ্যদের অনেক কিছু শিখবার আছে। Go to the ant, thou sluggard—নিশ্চয় মিথ্যে উক্তি নয়। আমার সম্বন্ধে আমার গৃহিনীর অনেক অভিযোগ আছে। মুখের বাক্য উহ্য থাকলে কি হবে, চোখের দৃষ্টিতে বক্তব্যটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল—এদের দেখে শেখ। শিখবার আছে বৈকি। সাধে কি আর বিষ্ণুশর্মা নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন পশুপক্ষীর জীবনকে আদর্শ করে? পাশ্চাত্ত্য জগতেরও নীতি শিক্ষা হয়েছে জীব-জন্তু, পশুপক্ষীর গল্প দিয়েই। ওদের বিষ্ণুশর্মা ঈশপ। পশুপক্ষীর সমাজে দুর্নীতি নেই, এজন্যেই তারা নীতি শিক্ষা দেবার অধিকারী। ওদের মধ্যে দুর্নীতি নেই, কেননা, ওদের ধর্ম নেই। আর ধর্ম যদিবা থাকে, সেটা অত্যন্ত ব্যাপক ধর্ম। পশুর ধর্ম পশুত্ব। কিন্তু মনুষ্যের ধর্ম তো মনুষ্যত্ব নয়। তাদের বেলায় ধর্মটা একটা আলাদা জিনিস। মানুষকে শুধু মানুষ হলে চলবে না, হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয়তো খৃস্টান কিম্বা বৌদ্ধ, একটা কিছু হতে হবে। পশুপক্ষীর মধ্যে অধার্মিক নেই বটে, কিন্তু বিধর্মী আছে। আমার মতে ওদের সমাজে বিধর্মী তারাই, যারা মানুষের অনুকরণ করে। যে-পাখী আপন কণ্ঠের গান ভুলে গিয়ে মানুষের বুলি আওড়ায়, বলে—জয় রাধে কেষ্ট—সে-পাখী ঠাকুর-দেবতার নাম করলে কি হবে, আসলে সে স্বধর্মচ্যুত। আর বউ কথা কও পাখীটা তো অত্যন্ত বেয়াড়া। অমনিতেই আমরা কথার জ্বালায় অতিষ্ঠ। উনি আবার উস্কানি দেন।

আমার শিক্ষার মধ্যে মস্ত বড় একটি ত্রুটি থেকে গেছে। পশুপক্ষী জাতীয় জীবদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। খাঁচার পাখীকেই চিনি, বনের পাখীকে নয়। বড় জোর এদের আস্বাদ জানি, স্বভাব জানিনে। সদ্য নোবেল প্রাইজ পাওয়া উইলিয়ম ফকনার-এর বইতে পড়ছিলাম—

I don't suppose you'd know a bird at all without it was singing in a cage in a hotel lounge or cost four dollars on a plate.

বেশির ভাগ লোকের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এ-কে শিক্ষার ত্রুটি ছাড়া আর কি বলব? অশিক্ষিত ব্যক্তির সহানুভূতি আপন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিক্ষিত মনের সহানুভূতি ক্রমঃপ্রসারিত। পরিবারের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী, প্রতিবেশী ছাড়িয়ে সমাজ। সমাজকে অতিক্রম করে সমগ্র জাতি এবং দেশ, দেশকে অতিক্রম করে দেশান্তর। সমগ্র মানব-পরিবারকে নিয়ে তার সংসার। তারও বাইরে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফল নিয়ে যে বিশ্ব-সংসার, শিক্ষিত ব্যক্তি সেই বৃহত্তম সংসারের মানুষ।

এখানে সহানুভূতি কথাটার অর্থ কেবলমাত্র sympathy নয়, interest, অর্থাৎ যাঁরা জীবে দয়া করেন, কেবল তাঁদের কথাই বলছি না, যাঁরা জীব হত্যা করে মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁরাও সেই বিশ্ব-সংসারের মানুষ। রক্ষক এবং ভক্ষক, উভয়েই পশুপক্ষীর প্রতি যথা-কর্তব্য সম্পাদন করেন। কোলরিজ এ্যালবেট্রস পাখীর শোকে রোমহর্ষক কবিতা রচনা করেছেন। এমন কি, জীবে দয়া সম্বন্ধেও উপদেশও দিয়েছেন; কিন্তু তাই বলে তিনি কি লক্ষ্মীর মতো পক্ষীর মাংস খেতেন না?

পক্ষীজাতীয় জীবদের রূপ গুণ বর্ণনা করে কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। ওঁদের লেখা পড়ে মনে হয়, বিধাতা পাখীর কণ্ঠে শুধু গান দিয়েই পাঠিয়েছেন; তাদের দেহে যে অতি সুমিষ্ট মাংসও দিয়েছেন, সেকথা তাঁরা ভুলে যান। আধুনিক কবিরা অবশ্য পাখীর গান কিম্বা ফুলের গন্ধ নিয়ে কবিতা লিখতে রাজি নন; কিন্তু পাখীর মাংস নিয়ে তো অনায়াসে লেখা যেতে পারত। যাক্, কবিরা ভুললে কিছু এসে যায় না, ভবী না ভুললেই হল। পক্ষী-বিশারদ যাঁরা, তাঁরা গান শুনে ভোলেন না, জানেন পাখীর আসল মাধুর্য কোথায়। তবে আমার যদ্দুর মনে হয়, যে-পাখীর গান যত উৎকৃষ্ট, সে-পাখীর মাংস তত নিকৃষ্ট। স্কাইলার্ক, নাইটিঙ্গেল-এর সম্বন্ধে জগৎ-প্রসিদ্ধ কবিতা লেখা হয়েছে। ওদেশের লোকেরা তাদের মাংস কখনো খেয়ে দেখেছেন কিনা, জানিনে। আমাদের দেশে কোকিল, দোয়েল, শ্যামা কিম্বা বসন্তবৌরির মাংস কেউ চেখে দেখেছেন বলে শুনিনি। এদের কেবল যে গান মিষ্টি এমন নয়, নামেরও আশ্চর্য বাহার। সেজন্যই বোধহয় খেয়ে সুখ নেই। খাদ্য কোনটা—না কাঁদা খোঁচা। যেমন নাম, তেমনি তার কৌলিন্য। বক ফুল, কুমড়ো ফুল ভেজে খাওয়া চলে; কিন্তু গোলাপ কিম্বা পদ্মফুলের পাপড়ি ভেজে খাওয়ার কথা কারো মনেই হয় না। ডালিয়ার ডালনা বোধ করি সাবানের সূপের মতোই সুস্বাদু। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে বলেছিলেন—সজনে ফুল দেখতে ভালো হলে কি হবে? সাহিত্যে ওর জাত গিয়েছে রান্নাঘরে ঢুকে। ঠিক সেই কারণেই যে পাখীর মাংস খেয়ে কবিতা লিখতে বসি, সে পাখীর সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখি না। দেবী সরস্বতীর বাহন হলে কি হবে হংসের প্রতি কাব্য-সরস্বতী কতটুকু কৃপা প্রদর্শন করেছেন? বরং যিনি হাঁসের মাংস খেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন, তিনি কৃপা প্রদর্শন না করলেও হাঁসের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তর।

একেবারে নিচের তলায় 'দেউড়িই-সালাতিন' নামক অংশ। এই স্থানটি সম্রাট বংশের অবহেলিত অবজ্ঞাত পোষ্যবর্গের আশ্রয়। এই অংশে তাঁহারা বাস করেন; সামান্য তনখায় গ্রাসাচ্ছাদন চলে। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত দিন যাপন করেন। এই দেউড়িই সালাতিনের মধ্যে দুখানি ঘরের একটি মহল। একদিকে মূল রঙমহলের বিশাল প্রাচীর। মাঝখানে ছোট একটুকরা উঠানের মত ছোট জায়গা। সেই উঠানে একটি বেদী, বেদীর উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন—এক অপরূপ সুন্দরী কুমারী কন্যা। তাঁহার অঙ্গে সবুজ রঙের আলখাল্লা জাতীয় ফকিরিণীর পরিচ্ছদ। দীর্ঘ রুক্ষ কেশভার অবেণীবদ্ধ। রাত্রিকাল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু বেদীর উপর কুমারীটির সম্মুখে বাতিদানে একটি বাতি জ্বলিতেছে। একটিমাত্র বাতির আলো মেয়েটির মুখের সামনে একটি স্বল্পপরিধির আলোকমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। বাকী অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। কুমারীটি ভূতপূর্ব সম্রাট বর্তমানে অন্ধ এবং বন্দী আহমদ্ শাহের মাতা উধম বাঈয়ের কন্যা। নাম নসীবন্নেসা সাধারণত 'ফকিরিণী বেগম' বলিয়া পরিচিত। উধম বাঈ তাহাকে ফকিরণীর জীবনে অভ্যস্ত করিয়াছেন।

বাতিদানের সামনে কিতাবদানে একখানি বই খোলা রহিয়াছে। কিন্তু নসীবন্নেসা বই পড়িতেছেন না। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দূরে কেল্লার ফটকে নাকাড়া বাজিতেছে এবং ঘোষণা চলিতেছে তাই শুনিতেছেন।

[প্রথম দৃশ্যের শেষে যে নাকাড়া বাজিতেছিল —সেই নাকাড়া বাদ্য দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ের মধ্যেও বাজিয়া চলিবে। এবং দুইটি দৃশ্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার সূত্র টানিয়া রাখিবে।]

নাকাড়া বাজিতেছে—ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্! নাকাড়া থামিল।

ঘোষণা শুরু হইল ঃ—হুকুম জারী শহর দিল্লীর কাজী, ইমাম, মুফতি মৌলানা লোগোঁকো পর!

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর ঃ—কাল ফজর নামাজ থেকে মসজেদে মসজেদে, খুদবা পড়া হবে—আফগানেস্তানের বাদশা পীর আলম, আল আমীন দুরি দুরানি শাহ আবদালীর নামে। অন্য কোন বাদশাহের নামে খুদবা পড়া কাল থেকে বন্ধ, বাতেল!

নাকাড়া আবার বাজিল ঃ—ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্! ঠিক এই সময়ে রঙমহলের অর্থাৎ ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—নসীবন! বেটি!

নসীবন—চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ঃ—মা!

[দরজা দিয়া হাতড়াইয়া অন্ধ উমধা বেগম প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন।]

উমধা—হাঁ বেটী! আবদালী পাঠানের হুকুম-জারী শুনলি? দিল্লীর বাদশার নামে আর খুদবা পড়া হবে না। রদ হয়ে গেল তৈমুরশাহী বাদশাহের নাম!

নসীবন—শুনেছি মা! কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

উমধা—প্রাণের আশঙ্কায় ছুটে গিয়েছিলাম!

নসীবন—কিন্তু তোমার যে দৃষ্টি নাই—তুমি অন্ধ—আর এই পাথরের কেল্লা—

উমধা—পাঁচ বছরের অভ্যাসে দিল্লী কেল্লার গলিঘুঁজি সব আমি দেখতে পাই! একটা বাঁদী আমাকে বলে গেল। —একি—একি? নসীবন!

(নসীবন ছুটিয়া গিয়া উমধার হাত ধরিল)

নসীবন—সরে এস মা, সরে এস, ধরিত্রি কাঁপছে!

উমধা—ভূমিকম্প! (তীক্ষ্ণকণ্ঠে আক্রোশভরা উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন) জয় মেহেরবান খোদা, হে ভগবান, দুনিয়া ধ্বংস করে দাও! চুরমার করে দাও সব! কি হ'ল? থেমে গেল? আঃ ছি-ছি-ছি!

নসীবন—বস তুমি এইখানে, বস।

উমধা—বসব? না! আঃ—মা ধরতি আর একবার তোমার মাথা নাড় মা! আর একবার! অন্তত এই মুঘল কেল্লাটা ধ্বসে পড়ে যাক, বাদশাহ বংশ কবরশায়ী হোক!

নসীবন—মা!

(নেপথ্যে আবার নাকাড়া বাজিয়া উঠিল)—ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্!

উমধা—চুপ কর! শোন আবার কি হুকুমৎ জারী হচ্ছে।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ঘোষণা করিল—কাল পহর ভর বেলার সময়, শাহ দুরিদুরানী শাহানশাহী তসলীম নিয়ে লাহোর দরওয়াজা দিয়ে উ'চলাকি শড়ক বরাবর এসে পৌঁছুবেন লাল কেল্লায়। সঙ্গে আসবে আবদালশাহী বেগম মহল! উচলাকি শড়ক বরাবর দু-পাশের বাড়ির কোন দরওয়াজা কি জানালা খোলা থাকতে পাবে না। ঝরোকার কি ছাদের উপর কোন আদমী থাকবে না। কাল তামাম দিন শহরে বাজারে কেউ বের হবে না! দিল্লীর বাদশাহ শড়ক বরাবর এগিয়ে গিয়ে শাহ দুরানিকে নজরানা দিয়ে কেল্লায় নিয়ে আসবেন!

(ঘোষণা শেষ হইল, নাকাড়া বাজিল)—ডুগ্-ডুগ্ ডুগ্-ডুগ্!

উমধা—শুনলি নসীবন?

নসীবন—শুনলাম মা!

উমধা—আমি অন্ধ হয়েও ছুটে গিয়েছিলাম—বাঁদী আমাকে বলে গেল—আবদালীর মনসবদার জেহান খাঁ এসেছে রঙমহল দখল করতে। আজিজুদ্দিন আলমগীর দাঁতে কুটো করে আবদালীর সঙ্গে আপোষ করেছে। আপোষ—ঝুটা বাত বেটী—গোলামের মত তার হুকুমৎ মেনে নিয়েছে। আমি জানি যে, আমার মন যে আমাকে বললে। আঃ-ছি-ছি-ছি!

নসীবন—মা—তুমি কি বলছ?

উমধা—বুঝতে পারছিস নে? পারবিনে বুঝতে। আমি দিল্লীর বাদশাহী চালিয়েছি, আমি বুঝি। আপোষ শুধু হয় না। ক্রোড়-ক্রোড় রুপেয়া চাই, গোটা একটা মুলুক চাই। আর চাই—। চাই বাদশাহ ঘরের শাহজাদী! রুপা—মাটি—বেটী; দৌলত, রাজ, ইজ্জত—এই হ'ল আপোষনামার দাম। সে দাম দিতে হবে তৈমুরশাহী বাদশাহ বংশকে! আমি শুনে এলাম—শাহনশাহ সাজাহানের পিয়ারী বেগম মমতাজমহলের পবিত্র কামরা খোলা হচ্ছে। শাহ আবদালীর বাসর হবে।

নসীবন—মমতাজমহলের পবিত্র কামরা! যা আজও কেউ কখনও ব্যবহার করেনি? শাহ আবদালীর বাসর হবে!

উমধা—হাঁ। শাহ আবদালী সাদী করবে।

নসীবন—বেমারীতে আবদালীর নাকটা বসে গিয়েছে, শুনেছি দুটো কানই তার নেই, মাথার চুল সফেদ হয়ে এসেছে—সে সাদী করবে?

উমধা—হাঁ—হাঁ—বাদশাহী লালস, দৌলতী লালস, বয়স মানে না—বেমার মানে না। শাহ আবদালী সাদী করবে।

নসীবন—মা তুমি কি বলছ বল তো?

উমধা—বুঝতে পারছিস না?

নসীবন—মা! (চীৎকার করিয়া উঠিল)

উমধা—আরে না! ভয় করিস নে বেটী! সে আমি হতে দেব না। আমার গুরু বলেছেন, তোর নসীব গুণে—কি—এই

মেয়ের লগ্নে আছে রাজযোগ, এই মেয়ে করবে সাক্ষাৎ সয়তানের দর্প-চূর্ণ! তোকে বসাব আমি দিল্লীর তক্তে! ভয় কি?

নসীবন—ভয় আমি করি না মা! মরণে আমার ভয় নেই। ভয় তোমাদের এই খেলাকে। এক পাগল ফকীরকে নিয়ে দিনরাত নসীব গুণছ আর তক্ত নিয়ে এক সর্ব-নাশা খেলার জাল বুনছ।

[বাহিরের দিক হইতে প্রবেশ করিলেন শাহ ফানা নামক ফকীর। ইতিহাসে উল্লিখিত ব্যক্তি। ভাগ্যগণনায় প্রায় সিদ্ধপুরুষ। ফকীর উমধা বাঈয়ের গুরু। দিল্লীতে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উত্তেজিতচিত্তে প্রবেশ করিলেন।]

ফানা—রাজমাতা উমধা বেগম! বেটী ফকিরিণী বেগম নসীবন! (বাহির হইতে)

উমধা—হজরত! গুরু!

ফানা—নসীবন কই? (প্রবেশ করিলেন) নসীবন!

নসীবন—মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে আছি হজরত!

ফানা—না-না মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়। সে হবে না।

উমধা—তা হলে যে গুজব শুনে এলাম সে মিথ্যে? আবদালী যে সতনামা পাঠিয়েছে সে দেখেছেন আপনি?

ফানা—দেখেছি। আজিজুদ্দিন আলমগীর এক-রারনামা হাতে নিয়ে পুতুলের মত বসে আছে। একরারনামা নয় আফগান বাদশাহের হুকুম নামা।

উমধা—কি তার দাবী?

ফানা—যা শুনেছ তাই। তামাম পাঞ্জাব এলাকা, দু ক্রোড় টাকা, পানশোও উট, পানশও খোরাসানী ঘোড়া, দু শও হাতী, চার শও বাঁদী আর দিল্লী হারেমের তিন শাহজাদী। আবদালীর বেটা তৈমুর শাহ আবদালী সাদী করবে আজি-জুদ্দিন আলমগীর বাদশাহের বেটী গৌহরউন্নিসাকে। আর দুরিদুরানি আহমদ শাহ আবদালী চেয়েছেন মহম্মদ শাহের দুই বেটী—মালকাই জমানির বেটী হজরত বেগম আর উমধা বেগমের বেটী—

নসীবন—ফকিরিণী বেগম নসীবন্নেসা।

ফানা—হাঁ বেটী তাই। শয়তানী মুঘলানি বেগম লাহোর থেকে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে তাকে দিল্লীর সমস্ত খবর যোগাচ্ছে। সে তাকে বলেছে, এই দুই শাহজাদী—দুনিয়ায় এদের তুলনা নাই। হজরত বেগমের মত সুরত নাকি ইরান থেকে হিন্দোস্তান পর্যন্ত দুসরা নাই। আর ফকিরিণী বেগমের সুরত আর নসীব দুইয়েরই জোড়া মেলে না। শাহ নাদির দিল্লী হারেমের যে বিখ্যাত সুন্দরী আয়ফৎ উন্নেসাকে বেটার বহু করে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে নিকা করে আবদালী নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে—সে আয়ফৎ এদের কাছে চাঁদের কাছে মিট্টির চেরাগ।

উমধা—হাঁ! তাই রাহুর মত আবদালী আসছে সেই চাঁদকে গ্রাস করতে! না-না সে আমি দেব না হজরত, সে আমি দেব না! নসীবন!

নসীবন—ভয় কর না মা, আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি মরব।

ফানা—না-না-না। সে হয় না, সে হবে না; সে তুমি পারবে না।

নসীবন—পারব না? ফকীর সাহেব, আমার উপর যেদিন বৃদ্ধ আজিজুদ্দিন বাদশার লালসা দৃষ্টি পড়েছিল, সেই দিনই তো আমি মরতাম। বিষ খেতে তো গিয়ে-ছিলাম। আপনি, আমার মা, আর চাচা মহি-উল-মিল্লাত আমাকে নিবৃত্ত করেছিলেন। নসীব গণনা করে ভবিষ্যৎ রচনা করবার নেশায় তিজনে মশগুল আপনারা! বলেছিলেন, অতি পুণ্য লগ্নে আমার জন্ম, আমার ভাগ্যে আছে নাকি বাদশাহী যোগ; আর আছে এক অমৃতযোগ, যার ফলে আমি পাব নাকি হিন্দু-মুসলমানের ভালবাসা, আমি নাকি পরাজিত করব সাক্ষাৎ সয়তানকে। আমি তক্তে বসলে আবার হিন্দোস্তানে শান্তি, বাবরশাহী বংশের ফিরে আসবে সেই পুরানো গৌরব। বলে-ছিলেন—বিশ্বাস কর! তাই সেদিন মরি নি। কিন্তু প্রলোভনে ভুলি নি, আপনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হই নি। খোদা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন তার মৃত্যুদূতকে। মৃত্যু-দূত আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—ভয় কী বেটী? আমি রইলাম তোর পাহারায়। তোর অন্ধ মা তোকে রক্ষা করতে পারবে না, ফকীর তোকে রক্ষা করতে পারবে না, কিন্তু আমি পারব!

উমধা—নসীবন! কার কথা বলছিস? সেই—সেই?

নসীবন—হাঁ। সেই। সেই দেখবেন জনাব?

[সে আলোটি তুলিয়া লইয়া দেওয়ালের দিকে প্রসারিত করিল। দেখা গেল দেওয়ালের গায়ে একটি প্রকাণ্ড গোখরো একটি গর্ত হইতে বাহির হইয়া আর একটি গর্তে প্রবেশ করিতেছে। এক গর্তে মুখ—অন্য গর্তে লেজ।]

উমধা—নসীবন!

নসীবন—(কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া গেল) আমি বীণা বাজাই ও শোনে। ফাটল থেকে মুখ বের করে দোলে। কখনও কখনও গর্জন করে শাসায়। গভীর রাত্রে আমার আঙিনায় শুয়ে থাকে, পাহারা দেয়।

[ঠিক সেই মুহূর্তে বাহির হইতে প্রবেশ করিল মহিউল মিল্লাত ও তাহার সহচর।]

মিল্লাত—(প্রবেশ করিয়াই আলোর শিখা লক্ষ্য করিয়াই আতঙ্কে বলিয়া উঠিল)—আ!

ফানা—মিল্লাত! এসেছ তুমি? আঃ! বাচলাম। আর ভয় নাই!

নসীবন—(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল) আর আপনাদের অভয়ে আমার বিশ্বাস নাই। ওর মুখে আমি হাত দেব। ওই আমাকে দেবে অনন্ত আশ্বাস!

উমধা—নসীবন! না-না না। বড় জ্বালা, বড় জ্বালারে।

নসীবন—মুঘল বংশের উপর অনেক অভি-সম্পাত মা! অনেক জ্বালাই তো নসীবে থাকার কথা!

ফানা—মিথ্যে সময় নষ্ট কর না মা। তোমার নসীবে এখন মৃত্যু যোগ নেই। ওতেও তোমার মৃত্যু হবে না।

নসীবন—ওর বিষেও আমার মৃত্যু হবে না! হজরত আপনার মগজ ঠিক নেই।

ফানা—নসীবের যাদু মগজ দিয়ে কিনারা করা যায় না বেটী!

মিল্লাত—সাপের বিষকে হজরত অমৃতে পরিণত করতে পারেন বেটী!

ফানা—পারি। ও যদি তোমাকে আজ কামড়ায় তবে সে বিষ থেকে আমি বাঁচাতে পারব। কিন্তু সেও তো তোমার নসীবে নাই আজ। আমি যে আজই তোমার নসীব গুণেছি।

[নসীবন এবার দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়া সাপটার গায়ে হাত দিল।]

মিল্লাত—(আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল) আ—। নসীবন বেটী!

উমধা—(দাঁড়াইয়া উঠিল) নসীবন!

[নসীবন সাপটাকে স্পর্শ করিতেও সাপটা নড়িল না।]

নসীবন—এ কি?

ফানা—নসীবের যাদু মা। দেখছ না সাপটা মরে গেছে। ওর মুখ যে ফাটলটায় রয়েছে সেখান থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে দেখছ না। ফাটলের একখানা পাথর খসে চেপে পড়েছে ওর মুখের উপর। কিছুক্ষণ আগে ধরতি কেঁপে-ছিল বুঝতে পেরেছিলে? তখনই—বোধ হয় তখনই নসীব এ খেলা খেলে রেখেছে।

নসীবন—তবে? তবে আমার কি হবে?

ফানা—অধীর হয়ো না মা। তোমার নসীবে একটা কঠিন লগ্ন এসেছে। মৃত্যু নয়। সাদীর একটা আভাসও আছে। আবার স্বস্থানচ্যুত হওয়ার যোগও রয়েছে।

নসীবন—স্থানান্তর কি দিল্লী থেকে কাবুল? ওই বৃদ্ধ বর্বর ব্যভিচারীকে বিবাহ করে কি আমাকে নসীবের খেলা সম্পূর্ণ করতে হবে? তক্তে বসার যোগ সফল করতে হবে?

ফানা—না-না। লড়াই করব। তার জন্যে আমি লড়াই করব। আবদালীর সঙ্গে—দরকার হলে নসীবের সঙ্গে লড়াই করব আমি। তোমাকে রক্ষা আমাকে করতেই হবে। হিন্দোস্তানে মুসলমান বাদশাহীকে রাখতে হবে বাঁচাতে হবে আমাকে। (আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া উদ্ভ্রান্তের মত বলিয়া গেলেন) তামাম হিন্দোস্তানে নেমে আসছে আঁধিয়ারা। পূরব, পাচ্ছিম, উত্তর দক্ষিণ সব ঢেকে যাচ্ছে। সবার আগে দেখতে পাচ্ছি মুসলমান বাদশাহী কাটা ঘুড়ীর মত কাঁপতে কাঁপতে সেই আঁধিয়ারার মধ্যে কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে! আঃ। চোখ আমার জলে ভরে যাচ্ছে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ইসলামী বাদশাহী যদি যায়! (আর্তনাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন) হা! হা! না-না সে আমি যেতে দেব না। তাকে রাখব আমি! লড়াই করব আমি! তোমার নসীবে তোমার অঙ্গে খোদার দয়ার রৌশনের মত পবিত্র লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি; জন্ম লগ্নে আছে বাদশাহী যোগ, তোমার চরিত্রে আছে সয়তানকে হার মানাবার গ্রহসমাবেশের শুভ-দৃষ্টি। তোমাকে যদি সুলতানা করে বসাতে পারি তবে জিতব। আজকের দুর্যোগ পার হতেই হবে!

নসীবন—কি করে পার হবেন ফকীর? আবদালীর বাড়ানো হাতের মুঠো থেকে কি করে রক্ষা করবেন আমাকে? মরণ হাত বাড়ালে অনুনয় করলে কখন কখনও ফেরে। মরা মানুষ কখনও কখনও বাঁচে। কিন্তু সয়তান হাত বাড়ালে সে হাত শুধু ফেরে না হজরত!

ফানা—ফেরাতেই হবে উমধাবাঈ!

উমধা—হজরত।

ফানা—নসীবনকে আমি এই পাথরের কেল্লা থেকে বের করে—দুনিয়ার খোলা বাতাসে আকাশের নীচে মাটির বুকে ছেড়ে দেব।

উমধা—হজরত আমি জন্মেছিলাম হিন্দুর ঘরে। হিন্দুরা মেয়েকে দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দেয়, ভাবে দেবতা নিলেন হাতে তুলে! আমি তাই ভাবব।

ফানা—ঠিক আছে বেটি। মিল্লাত!

মিল্লাত—হজরত।

ফানা—তুমি ঠিক সময়ে এসেছে। যোগাযোগ শুভ মনে হচ্ছে। আজ তিনদিন অপেক্ষা করে ভেবেছিলাম—তুমি এলে না, আসতে পারলে না।

মিল্লাত—অনেক কষ্টে এসেছি হজরত! পথ ভুল করে, আজ তিনদিন ঘুরছি।

ফানা—আজই এই মুহূর্তে তুমি নসীবনকে নিয়ে দিল্লী ছেড়ে চলে যাও! (বাহিরের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন)—আশরফ।

[একজন দরিদ্র ব্যক্তি প্রবেশ করিল]

আশরফ আমার শিষ্য। নৌকার মাঝি। কিন্তু ধার্মিক। ওর নৌকা বাঁধা আছে যমুনার ঘাটে। নির্ভাবনায় চলে যাও। আশরফ, ফরিদাবাদের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। সেখানে থাকবে আমার শিষ্য মহবুব আলি ফকীর। সে তোমাদের নিয়ে যাবে দূর দেহাতে আমার প্রথম জীবনের আস্তানায়। আবদালী যতদিন হিন্দোস্তান থেকে না যায় ততদিন সেখানে থাকবে তোমরা। তারপর—তারপর খেলা শুরু করব আমি।

মিল্লাত—আমাকে যেতে বলছেন হজরত?

ফানা—হাঁ—হাঁ! তোমার নসীবে আছে তুমি বসবে তক্তে। এ সতরঞ্চ খেলায় তুমিও আমার ঘুঁটি! তোমাকে আমি প্রথমে বসাব তক্তে। তারপর তোমার উত্তরাধিকারিণী হয়ে বসবে নসীবন। নইলে প্রথমেই সুলতানাকে তক্তে বসাতে গেলে অনেক অনেক আপত্তি হবে।

নসীবন—হজরত!

ফানা—বেটী!

নসীবন—কিন্তু সেখান পর্যন্ত যদি আবদালীর হাত যায়?

ফানা—(চমকিয়া উঠিল) সেখান পর্যন্ত যদি আবদালীর হাত যায়?

নসীবন—হ্যাঁ! যদি যায়?

ফানা—দাঁড়াও। (মাটিতে বসিয়া দাগ কাটিয়া কিছু গণনা করিল)

[উপরের দিকে চাহিল]

নসীবন—হজরত!

ফানা—সব আঁধিয়ারা বেটি। কিছু বুঝতে পারছি না!

নসীবন—বলুন হজরত, আমি কি করব?

উমধা—মরবি। বেটি আমি মা হয়ে বলছি—তুই মরবি! মিল্লাত—তুমি ওকে খুন করো!

মিল্লাত—হজরত!

ফানা—হাঁ! তুমি ওকে খুন করো। নসীবন তুমি মরতে চেষ্টা করো।

[নেপথ্যে দুপহরের ঘড়ি বাজিতে লাগিল]

আশরফ—হজরত! দু পহর পার হয়ে গেল!

ফানা—মিল্লাত, নসীবন! চলে যাও! আর দেরী করো না।

নসীবন—(মায়ের কাছে গেল) মা!

উমধা—চলে যা বেটি! আমার দিকে তাকাস না। চলে যা!

ফানা—যাও নসীবন, চলে যাও!

নসীবন—চলুন, আমি তৈয়ার!

[মিল্লাত-নসীবন ও আশরফের প্রস্থান]
(সেই যন্ত্র সংগীতের মত ক্রন্দন ধ্বনি বাজিয়া উঠিল)

ফানা—**উমধাবাঈ!**

উমধা—হজরত!

ফানা—শুনছ? দিল্লী কাঁদছে!

উমধা—শুনেছি! এই মাসেই আমার মৃত্যু হবে না—হজরত?

ফানা—হ্যাঁ! উঁচু জায়গা থেকে পড়ে তুমি মরবে। সম্ভবত আবদালী নসীবনকে না পেয়ে তোমাকে কেল্লার নীচে ফেলে দেবে!

উমধা—এয় খোদা!

ফানা—আফশোস কর না উমধা। কিসের আফশোস? শোন, দিল্লী কাঁদছে শোন!

[যন্ত্র সংগীতের মত ক্রন্দনধ্বনি ক্রমশ উচ্চ হইতে লাগিল।]
(পরবর্তী দৃশ্যপট অন্ধকারের মধ্যে আবৃত করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

মথুরা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে যমুনা তীরবর্তী বনপথ।

[আবছা অন্ধকারাবৃত স্থান। পূর্ববর্তী দৃশ্যের যন্ত্রসংগীত দৃশ্যান্তরের মধ্যেও বাজিয়া আসিতেছিল। যেন একটানা একটা কান্নার সুর বাজিয়া চলিয়াছে। দৃশ্যাভিনয় শুরু হইল—ওই যন্ত্রসংগীত—কণ্ঠসংগীতে পরিণত হইল। যমুনার বুকে নৌকা হইতে গান ভাসিয়া আসিল। প্রথম চরণ গীত হইবার পরই প্রবেশ করিল দুইজন বিস্ময়াভিভূত রোহিলা পাঠান রিসালা অর্থাৎ সৈনিক! হাতে খোলা তলোয়ার, পিঠে লম্বা নল বন্দুক! তাহারা সন্তর্পিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিল—চারিদিক খুঁজিতেছিল।]

প্রথম জন—(শংকাভিভূত ভাবে বলিয়া উঠিল) আ—! এ কেয়া হ্যায়? রোতি হ্যায়?

২য় জন—(তাহার হাত টিপিয়া বলিল) ডরো মৎ।

১ম জন—দিল্লী রোতি হ্যায়!

২য় জন—চুপ!

১ম জন—হিন্দোস্তান রোতি হ্যায়।

২য় জন—(এবার তাহাকে ঝাঁকি দিয়া বলিল) এঃ—তুম্ সিপাহী হ্যায়!

১ম জন—(সম্বিত পাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল)—আঁ!

২য় জন—চুপ রহো। (আঙুল দেখাইয়া বলিল) রোতি নেহি। গীত!

১ম জন—গীত!

২য় জন—শুনো কোন আওরৎ গান গাইছে।

[দুইজনে গান শুনিল]
[গান শেষে ২য় জন আঙুল দেখাইয়া বলিল]

২য় জন—উও—পানসী! শেষ রাত্রের মরা

চাদনীতে নজরে আসছে? উহু! রোদন না—গীত। দেও না, দানা-না, মানুষ। বহুত এলেমদারনী কেউ গাইছে।

১ম জন—তাজ্জব মিঠি গলা!

২য় জন—শীতকালের শেষ রাত, দুনিয়া ঠাণ্ডিতে আর ঘুমে বেহোঁস হয়ে গেছে ভেবে দেওয়ানা গীত গেয়েছে। পানসী চলেছে—পশ্চিম থেকে পুবে। জরুর দিল্লীর পানসী। রুখ্ পানসী, ফুকার—!

১ম জন—এ—! এ—পানসীওয়ালে—! এ—! আরে—!

২য় জন—হো পানসীওয়ালে—রোখো পানসী! —হো!

[তলোয়ার পুরিয়া পিঠ হইতে সে বন্দুক টানিয়া লইল।]

১ম জন—ভাগছে। জোরে চলছে পানসী!

২য় জন—(বন্দুক তুলিয়া) চালাও বন্দুক।

[দুইজনেই বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া বন্দুক ছুড়িল। মুহূর্ত পরে পরে দুটি শব্দ হইল।]

১ম জন—(লাফাইয়া উঠিয়া) উয়ো। গিরেছে আদমী দরিয়াতে! চলো জল্‌দি!

[দুজনেই ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

[পিছন হইতে প্রবেশ করিল—একজন দেশোয়ালী জোয়ান। প্রথম দৃশ্যের জাঠ চাষীর ছেলে। এখন তাহার পিঠে ঢাল ও বন্দুক—কোমরে তলোয়ার। সেও রঙ্গমঞ্চের এ প্রান্তে আসিয়া বন্দুক লইল। পিছন দিকে চাহিল, নেপথ্যে কাহাকেও দেখিয়া বলিল—]

জাঠ যুবক—হে—ই!

[প্রবেশ করিল আর একজন জাঠ]

১ম জাঠ যুবক—খবর? কারা ওরা জঙ্গলে নিদ যাচ্ছে?

২য় জাঠ যুবক—রোহিল্লা নাজিব খাঁর পাঠান পল্টন।

১ম জাঠ যুবক—কত জন?

২য় জাঠ যুবক—দু শও—তার জাস্তি না।

১ম জাঠ যুবক—হাতিয়ার কি? তোপ? তোপ আছে?

২য় জাঠ যুবক—দুটো হাল্কা তোপ! বাকী বন্দুক—বর্শা—তলোয়ার।

১ম জাঠ যুবক—বাস। লুঠ! পহেলেই দখল করো তোপ! আওয়াজ না, চিতার মত লাফিয়ে পড়ে চালাও তলোয়ার জলদি! ভোর হয়ে আসছে!

[আবার নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ হইল]

১ম জাঠ যুবক—দুটো পাঠান একটা পানসীর উপর গুলী চালাচ্ছে। আমি দেখছি! তোরা ভাইয়া জলদি—জলদি। সাফা কর দো।

দেখো—এক্‌কো—ঘোড়া—না-মরে!

[২য় জন চলিয়া গেল। ১ম জন বন্দুক তুলিয়া দ্রুত আগাইয়া গেল।]

নেপথ্যে রোহিলা—রোখো পানসী!

নেপথ্যে মিল্লাত—হে খোদা! হে খোদা!

[পর পর—দুইবার বন্দুকের শব্দ হইল]

নেপথ্যে ১ম জাঠ—জয় মথুরা নাথ! আ!

নেপথ্যে মিল্লাত—হে খোদা।

নেপথ্যে প্রথম জাঠ—ভয় করো না মুসাফের! আমি ডাকু নই। উতারো—জলদি উতারো! জলদি! (ক্রমশঃ)

অক্ষর

সুশীল রায়

আমার তো ধারণা, ধৈর্য ধরে গুণতে আরম্ভ করলে পাঁচ সাতদিনের মধ্যে অনায়াসেই তা শেষ করা যায়। স্বচ্ছ আকাশ যদি পাওয়া যায় আর অবিচ্ছিন্ন অবসর, তাহলে তারা গোনা কিছু না। কিন্তু সবচেয়ে অসম্ভব কাজ যেটা সেটা হচ্ছে, অক্ষর গোনা। যে কোনো একটা মাঝারি আকারের বইতে যতগুলি অক্ষর আছে আকাশের তারার সংখ্যা তত। কিন্তু সারা পৃথিবীর ছোট বড় মাঝারি আকারের যত গ্রন্থাগার আছে এবং সেখানে থরে থরে যে সব বই সাজানো আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে যতগুলি অক্ষর চাপা আছে, তা ভাবলে যে কোনো শক্ত মানুষের মাথাও ঘুরে যাবে নির্ঘাৎ। তা ছাড়া, কত আজে-বাজে কাগজে, দৈনিক মাসিক সাময়িক সাপ্তাহিক কত অগণিত পত্রে পত্রিকায় কত অক্ষরের স্তূপ নিত্য জমে উঠছে তার কোনো হিসেব নেই। যখন তখন যে কোনো দিকে তাকালে আর কিছুর ওপর চোখ পড়ুক বা না পড়ুক, একটা না একটা অক্ষর দেখা যাবেই যাবে।

পৃথিবীর একটি কোণে তো আমাদের বাস। সেই কোণটিতেই যদি অক্ষরের এত সমাবেশ, তাহলে সহজেই বোঝা যায় সারা পৃথিবীতে এর আধিপত্য কতটা। তা ছাড়া নিত্য নতুন অক্ষরের সমাবেশ তো ঘটছেই. এর ওপর আছে পুরাতন কালের সংরক্ষিত অক্ষরের সমাবেশ। বিবিধ গ্রন্থের অরণ্য, বিচিত্র গ্রন্থাগার।

কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না; কাউকে দেখেছি, কাউকে দেখিনি, কখনো দেখবোও না—এমনি এক অক্ষরের জনতার মধ্যে আমাদের বাস। এই অক্ষরদের সাজিয়ে গুছিয়ে কত কি যে বানানোর চেষ্টা ও বানানের চিন্তা চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার ফলে হল কি। কিছু পাওয়া গেল কিনা, কিছু লাভ করা গেল কিনা—তার হিসেব করা দরকার। যদি তাই করতে হয়, তাহলেও দ্বারস্থ হতে হবে অক্ষরেরই। এদের ছাড়া আর কোনো নিস্তার নেই।

এই অক্ষরের হাতে আমরা এমন বাঁধা পড়ে গিয়েছি যে, এদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে হলে এদেরই ডেকে এনে জড়ো করতে হয়। মানুষ তার নিজের আবিষ্কার নিয়ে কতটা বিব্রত হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে অক্ষর। এরা মানুষকে প্রত্যহ ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, কিন্তু তা'তে এদের কোনো ক্ষয় বা ক্ষতি হচ্ছে না।

যদি এ জগতে না থাকত কোনো অক্ষর, তাহলে পৃথিবীর বালুকার ওপর স্বাক্ষর এঁকে রেখে যাবার জন্যে এই ঐকান্তিক আগ্রহও থাকত না কারো; তাহলে কত নির্বিকার ও নিরুত্তাপ জীবন যাপন করাই না সম্ভব হত।

সারা পৃথিবীতে অক্ষরের আজ এত ছড়াছড়ি দেখে এক এক সময় দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। আগে জানতাম, বালুকার সংখ্যাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি, তার পরেই তারা অথবা তারাই বেশী, বালুকা তার পরে। কিন্তু সে ধারণা বদল করতে হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সকলকে ছাপিয়ে যে আসর দখল করেছে একা, সে হচ্ছে অক্ষর।

পৃথিবীময় কত যে কথামালা আর কত বর্ণমালা, তার অন্ত নেই। এই মালার এক একটি ক্ষুদে ফুল হয়ে বিরাজ করছে এই অক্ষর। অতলান্তিকের উপকূল থেকে প্যাসিফিকের পরপার পর্যন্ত বড় বড় ভূখণ্ড আর বিন্দু বিন্দু দ্বীপ। চোখ বুজে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। এই এত বিচিত্র দেশে কত বিচিত্র বর্ণমালা যে আছে তার কিনারা পাওয়া দুষ্কর। একটি দ্বীপ থেকে লাফ দিয়ে আর এক দ্বীপে গিয়ে পড়ামাত্র গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, এলেম নতুন দেশ। এই নিত্য নতুন দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সবার আগে জানতে হবে তার ভাষাটা। তা যদি না জানা হয়ে ওঠে তাহলে সে দেশের গভীরে তো প্রবেশ করা যাবে না; তার সম্বন্ধে তা হলে যা ধারণা হবে, সে ভাসা-ভাসা ধারণা ছাড়া কিছু না। সে দেশের গন্ধের ও বর্ণের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা করতে হলে তার বর্ণমালার সঙ্গে গভীর আলাপ দরকার।

তারা নাকি গুণে শেষ করা যায় না।

অক্ষরের আমদানী ঠিক কবে থেকে তা জানিনে। প্রাগক্ষর যুগের দু-চারটে যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তার মধ্যেও অক্ষরের অঙ্কুর যেন দেখা যায় একটু-আধটু। অকৃত্রিম নিরক্ষর যুগের সন্ধান ঐতিহাসিকেরা পেয়েছেন বলে মনে হয় না, যদি বা পেয়ে থাকেন তাহলেও তাঁরা তা অক্ষরেরই আঁকসি দিয়ে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সেই ধরাটা নেহাত হাতে-নাতে ধরার পর্যায়ে অতএব পড়ে না। সেটা তাঁদের আলগোছে দূরে থেকে ধরারই সামিল। সেই আন্দাজ আর অনুমানই যদি মেনে নিতে হয় তাহলে ইতিহাসের অক্ষরগুলি মুছে ফেলে দিয়েই বলা চলে, পৃথিবীর নিরক্ষরতার প্রমাণ এই সাদা পাতায় লেখা রইল।

আসলে অক্ষরের অক্টোপাশ থেকে নিষ্কৃতি নেই কারো। কোন দাগ বা কোন্ চিহ্ন ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে আজকের বর্তমান এই অক্ষরের আকার ধারণ করেছে, সেটা আমার দেশের বর্ণমালার পক্ষে যতটা খাপ খায়; তোমার দেশের পক্ষে হয়তো ততটা নয়; কিন্তু যেহেতু তুমি আর আমি দুজনেই একই সামাজিক জীব, সুতরাং দুজনেই এই এক সূত্র আঁকড়ে বসে আছি, আর প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐ বিন্দু চিহ্নটি তোমার দেশের অনুস্বর হয়েছে এবং আমার দেশের বিসর্গ। মৌলিক সেই বিন্দুর সঙ্গে যোগ হয়তো তোমারও নেই, আমারও নেই, কিন্তু তবু আমরা একই উৎপত্তির সূচনা খুঁজে সারা হচ্ছি, একই উৎপাতের সন্ধানে বিভোর হয়ে আছি। কবে কোন্ এক আদিম অক্ষর তার সঙ্গিনী অক্ষরকে সঙ্গে করে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল, তা আমরা জানিনে, কিন্তু তার ডালপালা ও শাখাপ্রশাখার ভিড়ে আজ যে আমরা পথ হারিয়েছি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ যদি মুখে মুখে কথা বলেই তৃপ্ত থাকতে পারত, তাহলে এই চরম অতৃপ্তির ফাঁদ তাকে পাততে হত না। কে নাকি কবে বলে গেছেন যে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আহাম্মকি হয়েছে এই লেখা আবিষ্কার করাটা। লেখা যদি আবিষ্কার করা না হত তাহলে পৃথিবীর এত ঝঞ্ঝাট যে বাড়ত না, একথা নিশ্চিত। মানুষে তাহলে এক মনে বসে কিছু ভাবতে পারত। আজ অক্ষরের উৎপাতে ভাবনা-চিন্তা সব কিছু সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। যখনি তার মনে কোনো চিন্তার উদয় হচ্ছে, তখনি সে চিন্তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে অক্ষরের খেলনা নিয়ে খেলা শুরু করে দিচ্ছে। চিন্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে অক্ষর। মনের নীরব চিন্তারা খসখসে কাগজের ওপর ফিসফিস শব্দে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

এত জেনে শুনেও অক্ষরের ওপর মানুষের এত আকর্ষণ কেন, তাই ভাবি। এরা আমাদের মন্দ ছাড়া ভালো যে কিছু করতে পারেনি, মোটামুটি একটা হিসাব করলেই তা টের পাওয়া যাবে। অক্ষরের জন্ম হয়তো হয়েছে আদিম আদমেরও আগে, কিন্তু তাদের প্রচার ও প্রসার যে বেড়েছে হালে এটা তো সকলেরই জানা। আদমের মনের সঙ্গে আমাদের মনের যদি তুলনা করা যায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে, সেই আদিম মানুষটি সেদিক থেকে অনেক উন্নতই ছিল; তার মনে এত বিকার ও বিকৃতি নিশ্চয় ছিল না। অক্ষর এসে চারদিকে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

এক একটি অক্ষরের দিকে আলাদা আলাদা-ভাবে তাকালে তাদের তেমন বীভৎস ও বিকৃত বলে ঠেকে না। কিন্তু যখনি তারা সারি সারি দাঁড়ায়, যখনি তারা দল বাঁধে, তখনি চকিতে কী একটা অর্থ যেন নিয়ে আসে। মনের মধ্যে অমনি জমে ওঠে ক্লেশ, অমনি দেখা দেয় গ্লানি। মনকে নিংড়ে নিংড়ে তার সব রস নিঃশেষে শুষে নেবার পক্ষে অক্ষরেরা হচ্ছে অগস্ত্য। তাদের গণ্ডূষে কত নিরীহ সমুদ্র যে মরুভূমি হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। অক্ষরে অক্ষরে জর্জরিত হয়েছে কত রাত্রির নিঃশব্দ প্রহর, কে তার হিসেব করবে?

তবুও সেই অক্ষরকে আহ্বান করি, তবুও তাকে ডেকে কাছে বসতে বলি। নিঃসঙ্গ প্রহরের সহচররূপে তাকে পাওয়ার জন্যে লালসার শেষ নেই তবু। কী আছে ওর মধ্যে, এখন চলেছে তারই অনুসন্ধান। ওই নির্বাক ও নিস্তব্ধ চিহ্নগুলি হঠাৎ কোনো সঙ্গীত বা সংগতি এনে দিতে পারে কিনা, একটানা চলেছে তারই পরীক্ষা।

এলোমেলো হয়ে ওরা ছড়িয়ে থাকে, কোনো শৃঙ্খল নেই ওদের, কোনো শৃঙ্খলাও নেই। এই বিশৃঙ্খলাকে কী করে শৃঙ্খলিত করা যায় তার চেষ্টাই এখন চলেছে সর্বত্র। এই চেষ্টাটাই আমাদের আস্কারা দিচ্ছে বলে আমার ধারণা। তাদের নিয়ে যতই মাতামাতি করা হচ্ছে ততই তারা নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার হয়ে পড়ছে, ততই যেন গা ছেড়ে দিচ্ছে। তাদের দায়িত্ববোধ কোনোকালেই ছিল না, এখন যেন আরো নেই।

ওদের প্রকৃতিই আলাদা, একেবারে বিপরীত। ওদের নিয়ে যত বেশী একাগ্রতা দেখানো যায়, ততই যেন ওরা পেয়ে বসে; যত বেশী যোগ্য লোকের হাতে ওরা পড়ে, তত বেশী ওরা বিব্রত ও বিচলিত করে তাকে।

এলোমেলো অসমান অক্ষম অক্ষর যারা আঁকে তাদের কাছে অক্ষরেরা কাবু। চট করে তাদের কাছে ওরা ধরা দেয়; ধরা দেবার সময় এতটুকু লুকোচুরি খেলা খেলে না। কিন্তু ওদের নিয়ে বিনয় করতে গেলে, ওদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে গেলে কিংবা ওদের নিয়ে পারিপাট্য করতে গেলেই ওদের অহমিকা যেন বেড়ে যায়। তখন ওরা বিশেষ কোনো মানে হয়ে সামনে দাঁড়াবার আগে কত রকম চটুলতাই যে করে, যার কোনো ইয়ত্তা নেই।

অক্ষরের হাত থেকে আমি তাই রেহাই চাই। ওদের সৌজন্যের অভাব তো আছেই, তার ওপর ওদের মর্যাদা বোধ যেন আরও উৎকট। ওদের ওপর সম্ভ্রম দেখাতে গেলেই ওরা লোক চিনতে পারে, তখনি ওরা শুরু করে বিপরীত ব্যবহার। যে কাজে নিয়োগ করার জন্যে তাদের খুঁজে পেতে টেনে আনা হয়, সে কাজ সুচারুভাবে সমাধা করা হোক, ওটা যেন তাদের অভিপ্রেত নয়। যে জায়গায় সসম্ভ্রমে তাদের জন্যে আসন পাতা হয়, সে জায়গায় বসতে কিছুতে যেন রাজি হয় না ওরা।

পৃথিবীর অক্ষরদের এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। পৃথিবীর লোক-সংখ্যার থেকে এদের সংখ্যা যে অনেক বেশী। সংখ্যাধিক্যতার দরুণ মানুষকে এরা পরোয়া করতেই যেন ভুলে গেছে। তবুও ওদের খুশি করার জন্যে সাধনার বিরাম নেই মানুষদের। এ কথাও অবশ্য ঠিক যে, অতি সহজেই যদি ওদের বশে আনা যেত তাহলে অক্ষরদের ইজ্জৎ বাড়তো না আদপে। ওদের ইজ্জতের মূলে আছে ওদের অহমিকা।

নীলকণ্ঠ পৃথিবীকে নির্বিষ করেছেন; পৃথিবীকে নিরক্ষর করার জন্যে যদি পাওয়া যেত কোনো দুর্ধর্ষ মহেশ্বরকে তাহলে পৃথিবীর পরিত্রাণ হয়তো ঘটত। যতদিন তা পাওয়া না যায়, ততদিন অক্ষরদের নিয়ে এইভাবেই আপোষ করেই থাকতে হবে। তার কোনো মানে থাক বা না থাক।



অনুবাদ সাহিত্য

জাদেদ্‌সূদে

মালেক হানুম্‌

[মালেক হানুম তুরস্কের একজন খুব জনপ্রিয় লেখিকা। তুরস্কের নারী-আন্দোলনের তিনি একজন অগ্রবর্তিনী নেত্রী।

জাদেদ্‌সূদে তুরস্কের হারামের একটি খুব জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা হয় রমণী বা পুরুষ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী-দ্বয়ের মধ্যে একজন যদি অপরের কাছ হতে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বে জাদেদ্‌সূদে (I think of it) এ কথাটি উচ্চারণ করতে হবে। যতবার যে-কোন জিনিস নিতে হবে, ততবারই তাকে এই কথাটি পূর্বে বলে নিতে হবে। বলতে যার ভুল হবে, তারই হবে হার। এই খেলা দু-প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মাসাধিক, এমন কি, বৎসরাধিক কালও চলতে পারে। খেলায় বাজিও রাখা হয়।]

একবার কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছে হোল দেশ ভ্রমণের। দেশ ভ্রমণে বের হবার পূর্বে তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করে নিলেন রমণীর নানাবিধ ছলাকলা-চাতুরী ও শঠতার অস্ত্র হতে। মরুপ্রান্তর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, খেজুর গাছের ছায়ায় একটি তাঁবু-গৃহ। তাঁবুর নিকটবর্তী হলে তিনি দেখতে পেলেন সামনে প্রসারিত রয়েছে একটি বহু মূল্যের গালিচা। আর তারি উপরে বসে আছে একটি অপরূপ সুন্দরী রমণী।

রমণী সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখবামাত্র গালিচা হতে উঠে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো তাঁবুতে প্রবেশ করবার জন্যে। তিনি রমণীর অনুরোধে আপত্তি জানাতে পারলেন না, কারণ তাতে তার অভদ্রতাই প্রকাশ পেতো।

তাঁবুতে রমণী ছিলো একা। কার্যোপলক্ষে তার স্বামী তখন গিয়েছিলো শহরে। জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁবুতে প্রবেশ করে সম্মুখে বিস্তৃত সুকোমল গালিচায় উপবেশন করতে না করতেই রমণী একপাত্র সুপক্ক খেজুর তার সামনে এনে উপস্থিত করলো। রমণী পাত্রটি তাঁর সামনে ধরবার সময় রমণীর দুই বাহুর উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হলো। এমন কোমল বাহুডোল ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হাত তিনি পূর্বে আর কখনো দেখেন নি। তদ্দণ্ডে তিনি অতিশয় ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ তখনি তাঁর মনে পড়ে গেল, একটি প্রবাদ বাক্য। প্রবাদ বাক্যটি এই—"রমণীর হাত শয়তানেরই থাবা।" তিনি আত্ম-রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি তার কোমরবন্ধ হতে বের করলেন একখানা কেতাব। বইখানা তাঁর নিজেরই রচিত—এবং তা তাঁর নিজেরই জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। পুস্তক-খানার তিনি নাম দিয়েছেন 'রমণী চরিত্রের এক সহস্র ছলাকলা ও চাতুরী।' ,

রমণী তার অতিথির এরূপ অদ্ভূত ব্যবহারে অতিশয় বিস্মিত হয়ে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে পুস্তকখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো—"নিশ্চয়ই এ একখানা খুব উঁচু-দরের বই। নতুবা আপনি এ সময় আমার সঙ্গে বাক্যালাপে রত না হয়ে পুস্তক পাঠে এতটা মনোনিবেশ করতেন না। এই পুস্তকে কি লেখা আছে, তা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

রমণীর কথা শুনে পাণ্ডিতপ্রবরের মনে হলো, এমন সুললিত মধুর কণ্ঠ তিনি যেন পূর্বে আর কখনো শোনেন নি।

তিনি উত্তর করলেন, এই পুস্তকে যা লেখা আছে, তা মেয়েদের পক্ষে জানা নিতান্তই অপ্রয়োজন।"

এ কথায় রমণী স্বভাবতঃই মনে মনে রুষ্ট হলেও বাইরে তা কিছুমাত্র প্রকাশ না করে নিতান্ত সহজভাবে একটি চুরুট ধরালেন ও বহু মূল্যের পাদুকায় শোভিত অতি ছোট এক-জোড়া পা বস্ত্রাবরণ হতে উন্মুক্ত করে তাঁর আরো নিকটবর্তী হলেন। তারপর মস্তক নত করে তাঁর স্কন্ধের উপর হতে অতিশয় আগ্রহপূর্ণ নয়নে বইখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে বললো—"এই পুস্তকখানায় কি আছে, তা জানতে আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।"

তখন পাণ্ডিতপ্রবর পুস্তকের সব বিষয় তাকে পড়ে শোনালেন।

সব শুনে রমণী অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললো—তাহলে রমণী-চরিত্রের কোন ছলাকলাই আপনার আর অজানা নেই। তাদের জীবনের সর্বপ্রকার জটিল রহস্যের ভিতরই আপনি প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন।"

তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, সব রহস্যের ভিতরই।"

"তাহলে আপনি তো জ্ঞানী-শিরোমণি আখ্যা পাবার যোগ্য। আমার বিশ্বাস ছিলো, এ-রহস্যের বুঝি আর শেষ নেই।"

"না, না, তা নয়। মাত্র সহস্রটি। তাও আমার এ-পুস্তকেই লেখা আছে।"

এই কথা শুনে রমণী তীব্র কটাক্ষ হেনে যেরূপ কপট বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো, তাতে পাণ্ডিতপ্রবরের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন সব লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই রমণী তড়িৎগতিতে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। মনে হলো, তার মুখে যেন এক-ফোঁটা রক্তও নেই। একবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে কি যেন শুনলো। তার পরেই সভয়ে বলে উঠলো—"আল্লা আমাদের রক্ষা করুন। শুনতে পাচ্ছ ঘোড়ার পায়ের শব্দ? ঐ আমার স্বামী আসছেন। তিনি এসে যদি আপনাকে এখানে দেখতে পান, তাহলে আমাদের দুজনেরই আর রক্ষা থাকবে না। আপনাকে এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি? —হ্যাঁ, ঐ সিন্দুকটার ভিতরে আপনি ঢুকে পড়ুন।"

অদূরবর্তী সিন্দুকটার ডালা খোলাই ছিলো। রমণীর ইঙ্গিতে পাণ্ডিত শিরোমণি এক লাফে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে তার ভিতরে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লো। রমণী অমনি চাবি দিয়ে সিন্দুকটা বন্ধ করে তড়িৎগতিতে ছুটে গেলো তার স্বামীকে অভ্যর্থনা করতে।

স্বামীর সঙ্গে দেখা হতেই রমণী বলে উঠলো—"আল্লাকে বহু ধন্যবাদ। যথাসময়ে তিনি তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"কেন, কি হয়েছে? আমার হরিণীকে এত ভীত ত্রস্ত দেখছি কেন?" এই কথা বলে অশ্বারোহী তার অশ্ব হতে অবতরণ করে রমণীকে তার দুই সুদৃঢ় ভুজে আবদ্ধ করলো।

রমণী উত্তরে বললো—"তুমি যখন ছিলে না, তখন এখানে এসেছিলেন একজন পাণ্ডিত ব্যক্তি—খুব বড় পাণ্ডিত। তিনি এসেই বললেন রমণী চরিত্রের সব রকম ছলাকলা-চাতুরীই তার জানা আছে। এই কথা বলেই তিনি আমার নিকট প্রেম নিবেদন করতে আরম্ভ করলেন।"

অমনি সেই দুর্দান্ত আরব রোষে গর্জে উঠলো—"সেই পাষণ্ডটা কোথায়?"

"প্রথমটায় তো ভয়ে আমার গায়ের রক্ত একরকম হিম হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে এমনি আবেগভরে তার প্রেম......"

"থাক থাক আর নয়।"

ঠিক সেই সময়েই তুমি এসে পড়লে, আমিও বেঁচে গেলাম।"

"কোথায় সেই কুকুরটা? আজ এখনি তাকে আমি খুন করবো।"

রমণী সিন্দুকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো—"ঐ সিন্দুকটার ভিতরে আছে। আমি তাকে চাবি-বন্ধ করে রেখেছি।" এই বলে চাবিটা তাকে দেখালো।

সে অমনি চাবিটা একরূপ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সবেগে ছুটে চললো সিন্দুকটার দিকে। আর অমনি রমণীর খিলখিল হাসিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। সে পরমুহূর্তেই হেসে দু-হাত তালি দিয়ে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলো—'জাদেদস্দে।' আমার হাত থেকে চাবি নিলে, কিন্তু তুমি তো 'জাদেদস্দে' বললে না।"

তার স্বামী ক্ষণকালের জন্য হতভম্বের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কপট ক্রোধে চাবিটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললো—"এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায়। শুধু বাজি জিতবার জন্য তুমি আমাকে এভাবে রাগালে!"

রমণী দুই কোমল বাহুতে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—"আমার হারটা কখন পাব? আমি তো বাজি জিতেছি?"

সে কথায় তার স্বামী হো-হো করে উচ্চৈস্বরে হেসে বললো—"এখনি পাবে। এই আমি শহরে যাচ্ছি নিয়ে আসতে।"

এই বলেই সে ঘোড়ায় চেপে শহরের দিকে চলে গেল। রমণী আর কালবিলম্ব না করে চাবিটা তুলে এনে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললো। পণ্ডিতপ্রবর তখন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার লাভ করে সিন্দুকের ভিতর হতে বাইরে আসতেই রমণী তাঁকে দ্রুত তাঁবু ত্যাগ করতে বলে ঈষৎ হাসিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"এই চাতুরীটি আপনার পুস্তকে লেখা আছে তো?"

অনুবাদক: শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

সাহিত্য প্রসঙ্গ

কিপলিঙের কলঙ্কমোচন

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

১৯৩৬ সালের শীতকালে একদিন শোনা গেল, সম্রাট পঞ্চম জর্জের জীবনাবসান হয়েছে; দিন দুই আগে কবি রাড্ইয়ার্ড কিপলিঙের মৃত্যুসংবাদ জানা গিয়েছিল। এই দুটি খবর একত্র করে তখন লণ্ডনের সাংবাদিক মহলে একটা তামাসা সৃষ্টি হয়েছিল। লোকে বল্তো, কিং হ্যাজ টেকন্ হিজ ট্রাম্পেটার উইথ হিম—রাজা তাঁর ঘোষককে সাথে করেই নিয়ে গেছেন। সত্যি সত্যি দেশে-বিদেশে এ রকম রাজভক্ত বা সাম্রাজ্যবাদী বলেই ছিল কিপলিঙের পরিচয়।

কিপলিঙের জন্ম ভারতে; প্রথম এবং প্রধান কর্মস্থলও ছিল ভারতই। তবু এদেশে তাঁর পরিচয় ভারত তথা প্রাচ্য-বিদ্বেষের অখ্যাতির সাথে যুক্ত। তাঁর বিখ্যাত প্রাচ্য-প্রতীচ্য গাথা (ব্যালাড অফ দি ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট) নিয়ে যত অনুযোগ, অভিযোগ হয়েছে, এমন খুব কম লোকের বা কম লেখার ভাগ্যেই জুটে। অথচ সেটি যে প্রায় নির্দোষ ,বরং দৃপ্ত এবং মহিমময় ভাষায় এবং ভঙ্গীতে লেখা, তা কবিতাটি না পড়লে বোঝানো কঠিন। অতএব তারই গল্প নিয়ে এ আলোচনা শুরু হোক।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ধর্ষ পাঠানদের সায়েস্তা করার জন্যে একদল ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন থাকে। একদিন সেই সেনাদলের অধ্যক্ষের প্রিয় ঘোড়াটা লুঠ হয়ে যায়। নিয়েছে এক উপজাতি নেতা কামাল। কর্নেলের তরুণ এক ছেলেও ছিল সেই সেনাদলে; খবর শুনে সে ছুট্লো ঘোড়াটাকে উদ্ধার করতে—কারুর নিষেধ মান্লে না, কারুর সাবধান-বাণী শুনলে না। সেই উপজাতি এলাকাতে এসে যখন পৌঁছুলো, তখন পশ্চিমদিক রাঙা হয়ে উঠেছে। দেখা গেল, দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কামাল সর্দার সেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছেন। যেই দেখা, অমনি পিস্তল ছুট্লো। অল্পের জন্য কামালের গায়ে গুলী লাগ্লো না, কিন্তু বিস্মিত সর্দার দাঁড়িয়ে গেলেন; হেসে বললেন,—

বাহাদুর ছেলে, বটে। পিস্তল ধরতে তো বেশ শিখেছো, ছুট্তে জানো?

—আলবৎ, বলে কর্নেলের ছেলে নির্দেশিত দিক লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই সর্দার কামাল খান তাকে হাত ধরে টেনে তুলে নিলেন; বল্লেন—

আজ আমার দয়াতে জান ফিরে পেলে। তা'ছাড়া এই যে পাথরের ঢিবি দেখছো, এই সবগুলোর পেছনে লুকিয়ে আছে আমার লোক, বন্দুকে তাক্ করে—আমি একটিবার ইসারা করলেই হয়!

উদ্ধত তরুণ উত্তর দেয়,—জানের পরোয়া করিনে। আমার জান নিতে হলে হাজার জান দিতে হবে। এখন দেখো কোন্টা সস্তা—আমার জান, তার সাথে তোমাদের হাজারটা? না, আমার বাবার ঘোড়াটা?

হাসিমুখে সর্দার বলেন,—ছোকরা, তোমার কথার ভারী খসুী হয়েছি। তোমার জান আর কে নেয়? কিন্তু এত সাহস তুমি পেলে কোথায়?

—এ আমার বংশেরই ধারা, উত্তর দেয় গর্বিত তরুণ।

সর্দার বলেন, দেখো বাপু, আমরা উভয়েই হলাম সাচ্চা মরদ; বীর। আমাদের ঝগড়া সাজে না। ঘোড়াটা ফিরিয়ে দিলাম; ভয়ে নয়, ভালবাসায়।

কর্নেলের ছেলে বলে, এই পিস্তলটাও তোমায় আমি দিলাম ,যেটা এনেছিলাম শত্রুতার উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বে তার চরম উৎসর্গ হোক।

সর্দার সেটি গ্রহণ করলেন; কিন্তু পাঠান বীরের মনে কি ভাবনা খেলে গেল, কে জানে? হয়তো ভাবলেন, উদারতায় পাঠানকে হার মানাবে আর কেউ, তা কি হয়? কর্নেলের ছেলেকে বললেন, তোমার বাবা এই বিপদের মুখে তোমায় ঠেলে দিতে সাহস পেয়েছেন; আমিও তাই দিচ্ছি। এই বলে তিনি একটা ইঙ্গিত করতেই তাঁর ছেলে এসে হাজির। বল্লেন তাকে—

—আজ থেকে তুমি রাণীর নুন খাবে, তাঁর বেইমানি করো না। এমনও হতে পারে যে, পেশোয়ারে আমি ধরা পড়ে ফাঁসী ঝুলছি; তাতে তুমি উন্নীত হলে রিসলদার পদে। তবু এদেরই তুমি; আমরণ এদের সাথে থাক্বে।

পিতা-পুত্রে ক্ষণিকের জন্য চোখাচোখি হল; তারপর দুজন দুজনের পথে চলে গেলো। এরই পরে উপসংহারে কবি বলছেন, পূব-পশ্চিমে দুস্তর ব্যবধান; কিন্তু বীরের ধর্মে পূব নেই, পশ্চিম নেই; জাত নেই, বেজাত নাই—কোন বাধা-বন্ধই নেই:

::Oh, the East is East,
the West is West
And never the twain shall meet
But there's is no border,
nor breed, nor birth
When two strongmen stand
face to face
Though they come from the
ends of the earth.

এতে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কোনরকম হিংসা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ আছে বলে তো মনে হয় না। বরং পাঠানের বলবীর্য, আদিম কৌমজীবনের প্রতি কবির শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাচ্ছে। উদারতায়, ক্ষমাশীলতায় আরেকটি কামাল খান তো ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারো লেখায় পাই নি। বস্তুত কিপলিং কর্মেরই জয়গান করেছেন। যে সাহসী, সেই প্রকৃত কর্মী—আর যে কর্মী, সেই বীর, বীরের জাত নেই, ধর্ম নেই। তিনি সবাকার নমস্য।

পূর্বাপর সংগতি না রেখে সাধারণত দুটি চরণ উৎকলিত করে যে দোষ ধরা হয়, সে রকমভাবে উদ্ধৃত হলে বহু কবির বহু কবিতায়ই দোষ পাওয়া যায়। তাছাড়া কারুকে হেয় না করেও তো বলা যায় যে, পূর্ব-পশ্চিমে পার্থক্য আছে এবং থাকবে। পশ্চিমের মত হতেই হবে, পশ্চিমের সাথে মিলতেই হবে, মনের গভীরে এই গোপন আকাঙ্ক্ষাই কি ধরা পড়ে না, যারা এরকম মিল আবশ্যিক মনে করেন, তাদের? একেই বলে হীনম্মণ্যতা (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) এবং এরাই তো নিজেদের অপমান করছেন। এক্ষেত্রে বরং পরলোকগত প্রমথ চৌধুরী মশায়ের মত বলা উচিত,—

"আমরা, আমরা; তোমরা, তোমরা। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু "ভূ", তোমাদের ভাষায় "কৃ"। সুখ তোমাদের আইডিয়েল, দুঃখ আমাদের রিয়্যাল। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম। প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক। আমরাও ভাল, তোমরাও ভাল—শুধু তোমাদের ভাল, আমাদের মন্দ ও আমাদের ভাল, তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে—তাও অসম্ভব।"

তবে কি কিপলিঙের কোন দোষই নেই? তাও সত্যি নয়। তবে বড়ো বড়ো আন্দোলনের মুখে উচ্ছ্বাস বাঁধ মানে না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন ভারতবর্ষকে এশিয়ার বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলেন, কবি সত্যেন দত্ত যখন বাঙলাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলেন, তখনও এমনি অর্ধ-সত্য বলেন। বাঙালীর তাতে রোমাঞ্চ হয় পুলকে, অন্যের হয় ক্ষোভ এবং ঈর্ষা। এক্ষেত্রে যদি অবাঙালী ঐ দুটি কবিকে হেয় করতে চেষ্টা করেন, তবেই হবে ভুল। প্রথমত, এদের ঐসব কাব্য ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে বলে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয়ত, এদের কবিতার অপূর্ব সাহিত্যিক রস থেকে অনর্থক নিজেকে উপবাসী রাখা হবে মাত্র। বাইবেলের "ওল্ড টেস্টামেন্টে" ইহুদীদেরকে ভগবানের নির্বাচিত জন বলে যে ধারণা প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে বাইবেল নিন্দিত এবং অপাঠ্য হয়ে যায় নি। কিপলিঙের লেখাও তাই।

আরেক দিক থেকে বিচারে—মনোবৃত্তি বিচারে—কিপলিং সাম্রাজ্য বিস্তারটাকে দেখেছেন একটা দুর্জয় অভিযান হিসেবে। তাঁর এ মনোবৃত্তিকে বলা যায় ভারতের ইংরেজ সমাজের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ। ইংরেজ এখানে সেই বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান। জীবনটা 'লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ, কলহ-সংশয়পূর্ণ'। সিমলার সুদৃশ্য নাচঘরে পরস্ত্রীর দেহাকর্ষণ বা পীনপয়োধরাদের কটাক্ষ বিলাস—এই কী জীবন? বাইরের অনন্ত প্রসারতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দাও—বলে কবি আহ্বান করলেন। তাঁর চোখে পড়েছিল তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা। তিনি বললেন শ্বেত-জাতির কাঁধে বিধাতা দিয়েছেন দুনিয়ার ভার—

> Take up the Whiteman's burden
> Send forth the best ye breed
> Go bind your sons to exile
> To serve your captives' need;

একটা হীনতা থেকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি আরেকটা হীনতার পথে তাদের এগিয়ে দিলেন। কেননা কল্পনায় ও কাব্যে যাকে তিনি ত্যাগ বলে ভেবেছেন, দুনিয়ার ভার বহন করার কথা বলেছেন, বাস্তবে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হীনতর ভোগ—দুনিয়ার কাঁধে দাসত্বের জোয়াল বেঁধে দিয়ে। তার এই অন্যায় সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বড় দেরীতে। বয়সে ভাঁটা পরার সাথে যেন বুঝতে পেরেছিলেন এই আত্মাদর, এই অহংকারের সীমা কোথায়? কেন এই অহংকার?

> Far called, our navies melt away;
> On dune and headland sinks
> the fire:
> Lo, all our pomp of yesterday
> Is one with Nineveh and Tyre!
> Judge of the nations, spare us yet,
> Lest we forget, lest we forget!

কাল সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে যেন দেখছেন, সব শেষ হয়ে গেল। কত কত শক্তি, কত সাম্রাজ্য এমনি দৃপ্তভাবে জেগে উঠেছিল—সেই নিনেভে, সেই টায়ারের সাথে তাঁর সাধের সাম্রাজ্যও এক হয়ে গেল বুঝি? তাই আক্ষেপ, তাই কত ভয়! এই ভয়, এই সংশয়েরও ইতি হলো আরো কিছুদিন পরে—

> Cities, thrones and powers
> Stand in time's eyes
> Almost as long as flowers
> Which daily die

এতে আর আক্ষেপ নেই। এই যে বিশ্ব-সংসারের ধারা! ইহজগতের নশ্বরতার কথা বলতে এমন সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষা ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। এ যে কবির হৃদয়ের পরম অনুভূতির চরম প্রকাশ! এতে প্রায়শ্চিত্তের সুর আছে। আর প্রায়শ্চিত্তবোধ মানেই পাপের সম্পর্কে সচেতনতা। সাম্রাজ্যবাদ যে অন্যায় ও অহিতকর, তা দেরীতে হলেও, বুঝতে পেরেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত এবং অনুতাপের সাথে সাথে তাকে এই ত্রুটি থেকে মুক্তি দিতে আর কিসের আপত্তি? আর তাঁর কল্পনার সাম্রাজ্যবাদের কারণ ও দায়িত্ববোধের মধ্যে হীনতা নেই; যদিও তা অবাস্তব। কল্পনার সাথে উগ্র, ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ যুক্ত হয়ে তার সৃষ্টি। তাতে ঘৃণা বা বিদ্বেষ ঠিক ছিল না। যুক্তি তাঁকে কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিক।

অপসৃত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সেই-যে গান গেয়েছি কাল, সেই-যে কাল গান
গেয়েছি, আজ হারিয়ে গেছে—পাবো না কোনোখানে;
পুবের হাওয়া যদিও তার ছড়িয়ে যায় মানে
সে মানে কেন ব্যথায় শুধু ভরিয়ে দেয় প্রাণ!

সেই-যে কথা বলেছি কাল বিকেলে, সেই কথা
বলেছি কাল বিকেলে, আর সহজ ছিলো বোঝা
তার যে-মানে, আজকে এই মনের ব্যাকুলতা
উতল যত হোক না কেন ব্যর্থ তাকে খোঁজা।

সেই-যে মন ছুঁয়েছি কাল, সেই-যে কার মন
ছুঁয়েছি কাল, পুবের হাওয়া সরায় তাকে দূরে—
যা-কিছু-চাওয়া মিথ্যে তাই, যতই মরে ঘুরে
পাবে না তাকে, অন্বেষণ তা'হলে অকারণ॥

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৪

পরদিন যথাসময়েই, অর্থাৎ বৈকাল প্রায় চারটের সময়ে, শরৎ আমাদের বাড়ি উপস্থিত হ'ল। এবার কথাটা পরিপূর্ণভাবে রাখার জন্য খুশি হ'য়ে তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আসন গ্রহণ করা মাত্র শরৎ বললে, "কই, তোমার চারাগাছ কোথায়, দেখাও।"

কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম; বললাম, "কোন্ চারাগাছ?"

"যা আমাকে মহীরুহে পরিণত ক'রতে হবে বলে কাল বলেছিলে?"

সহাস্যে বললাম, "ও' দেখাচ্ছি। আগে চা-খাবার খাও। চল, ভেতরে চল।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে শরৎ বললে, "না উপীন, ভেতরে আমি কিছুতেই যাব না। বোম মামাকে ('লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়) না জানিয়ে তাঁর অনুমতি না নিয়ে এই বাড়ি থেকে একদিন রেঙ্গুনে পালিয়েছিলাম। আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই!"

বললাম, "সে আজ আট-দশ বৎসরের কথা হ'ল, কারো সে কথা মনে নেই। থাকলেও, সে কথা তুলে কেউ তোমাকে ধমক দেবে না। তা ছাড়া, দাদা এখনো হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি।"

আমার আশ্বাসে এবং অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শরৎ অন্দর মহলে প্রবেশ করতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতলে আমার নিজের ঘরে নিয়ে তাকে বসালাম।

শরৎ আজ বৈকালে আসবে, সে কথা বাড়িতে সকলেরই জানা ছিল। একে একে সকলে এসে জুটতে লাগল। দেখতে দেখতে গল্প উঠ্‌ল জমে। ক্ষণকাল পরে যখন চা ও খাবার উপস্থিত হ'ল তখন, গল্প বলবার গুণে, মগের মুল্লুকের আজব কাহিনী তার ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে বসেছে। ইত্যবসরে আমি ফণীবাবুর কাছে শরতের আসার সংবাদ পাঠিয়ে আধ ঘণ্টাটাক পরে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। আমাদের চা পান শেষ হবার কিছু পরেই তিনি এসে হাজির হলেন। শরৎকে নিয়ে একতলার বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করলাম।

একটা চেয়ারে ফণীবাবু ব'সেছিলেন,—আমাদের দুজনকে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে শরৎকে নমস্কার করলেন। প্রতিনমস্কার ক'রে আমার দিকে চেয়ে শরৎ জিজ্ঞাসা করল, "ইনি?"

বললাম, "ইনি আমার বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ পাল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।"

"কোথায়?"

"ও'র বাড়ি।"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বল্‌লে, "সেখানে কি হবে?"

সহাস্যমুখে বললাম, "সেখানে তোমাকে ও'র সেই চারাগাছটি দেখাবেন, যেটিকে তোমার মহীরুহে পরিণত করতে হবে।"

উকিল যখন হাকিমের নিকট আবেদন-নিবেদন করে, তখন আবেদনকারী যেমন সাগ্রহে হাকিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে ফণীবাবু এ পর্যন্ত নিঃশব্দ স্মিতমুখে শরতের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবটা, উপেনবাবুর মুখে যা-কিছু শুনছেন, সব আমারই অন্তরের কথা। এবার কিন্তু মৌন পরিত্যাগ ক'রে বললেন, "শুধু আমার চারাগাছ বলছেন কেন উপেনবাবু?—সে ত' আপনারও চারাগাছ।"

আমাকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে ফণীবাবুর প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে শরৎ বল্‌লে, "কাল থেকে চারাগাছ চারাগাছ শুনছি,—ব্যাপার কি বলুন ত' মশায়?—কিসের চারাগাছ?"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে ফণীবাবু বল্‌লেন, "আপনার জন্যে চারাগাছ অফিস ঘরে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে এসেছি; দেখবেন চলুন।"

সবিস্ময়ে শরৎ বললে, "আমার জন্যে সাজিয়ে রেখে এসেছেন? দেবেন না-কি আমাকে?"

হাসিমুখে ফণীবাবু বল্‌লেন, "নিশ্চয় দেবো। ট্রামে তুলে দিয়ে আসব।"

"কত দূরে আপনার বাড়ি?"

"রাস্তার ও-পারে।"

আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে শরৎ অগ্রসর হ'ল। পথে নেমে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ বাড়িটা?"

পথের অপর পার্শ্বে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মোড়ের বাড়িটা দেখিয়ে ফণীবাবু বললেন, "ঐ সাদা রঙের বাড়ি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে হন্ হন্ ক'রে শরৎ ফণীবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল; আমরা তাকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করলাম। দ্বারদেশে পৌঁছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফণীবাবু শরৎকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লেন। অফিস-ঘরে টেবিলের সম্মুখে উপনীত হ'য়ে বললেন, "বসুন।"

অফিস-ঘর আজ গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সকালের দিকে ঝুল ঝাড়াও হয়ত হ'য়ে থাকবে। প্রতিদিন টেবিলের উপর এলোমেলো কাগজ-পত্রের যে বন-বাদাড় দেখা যায়, তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে অপসারিত হয়েছে চক্ষুর অন্তরালে কোনো গোপন স্থানে। টেবিলের উপরিভাগ তক্‌তকে ঝকঝকে। শুধু কোণের দিকে ফুলদানিতে একটা পুষ্পগুচ্ছ, এবং মধ্যস্থলে পরিপাটি ক'রে বাঁধা এক থাক 'যমুনা' মাসিক পত্রিকা। উপরে দড়ির তলায় একটা সাদা কাগজে লেখা,—পরম শ্রদ্ধার সহিত ভবিষ্যৎ বাঙলার শক্তিমান্ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে উৎসর্গ করিলাম। স্নেহাকাঙ্ক্ষী শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

টেবিলের সম্মুখের প্রধান আসনটি দেখিয়ে ফণীবাবু বললেন, "বসুন শরৎবাবু।" সেই চেয়ারটির উপরে পশমের একটি সুদৃশ্য পুরু আসন পাতা। তার উপরে উৎকীর্ণ লাল রঙের ফুলগুলি যেন মান্য অতিথিকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

চেয়ারের উপর ধীরে ধীরে উপবেশন ক'রে শরৎ প্রথমে সাদা কাগজের উপরকার লেখাটুকু পাঠ করলে; তারপর, বাঁধন খুলে যমুনাগুলো একে একে নিবিষ্টচিত্তে বহুক্ষণ ধ'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে বললে, "এই তোমাদের চারাগাছ?"

বললাম, "হ্যাঁ, এই আমাদের চারাগাছ,—একে তোমার বড় করতে হবে শরৎ।" তারপর, একজন নিরীহ অব্যবসায়ী ভাল মানুষ নিছক সাহিত্যের নেশায় পড়ে সেই নেশার ব্যবসায়ের দিকটা নিয়ে কিরূপ বিব্রত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে চলেছে, তার একটা সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে বল্‌লাম, "যে-সব কাগজ বড়লোকের কাগজ, পাকা বিষয়-বুদ্ধির প্রভাবে যারা সুদৃঢ় ব্যবসায়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কি হবে তাদের তেলা মাথায় তেল ঢেলে? বিপন্নকে নিরাপদ ক'রে তোলবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ লাভ করবার সুযোগ তোমার সম্মুখে উপস্থিত; সে সুযোগকে অবহেলা কোরো না শরৎ।"

আমার আবেগময় আবেদন শরতের উপর খানিকটা কাজ করেছে ব'লে মনে হ'ল; ঈষৎ গভীর কণ্ঠে সে বললে, "তা না-হয় না-ই

করলাম; কিন্তু সে আনন্দ লাভ করবার শক্তি কোথায় আমার উপীন?"

বললাম, "শক্তি তোমার কলমের মুখে। তুমি যদি দয়া ক'রে তোমার চরিত্রহীন যমুনায় প্রকাশ করবার অনুমতি দাও, সে শক্তির পরিচয় লাভ করতে তোমার অসুবিধে হবে না।"

শরৎ বললে, "আমার অসুবিধে হবে না কি-না, তা জানিনে; কিন্তু ফণীবাবুর হবে। চরিত্রহীন যমুনায় প্রকাশিত হ'লে তাঁর সামান্য যা গ্রাহক আছে, একে একে যমুনা ছেড়ে দেবে। কাল শুনলে ত' সুরেশ সমাজপতির কথা?"

বললাম, "সে কথা ফণীবাবুকে বলেছি। চরিত্রহীনের কাহিনীও যতটুকু পড়েছি, তা শুনিয়েছি। সব শুনে উনি কি বলেছেন জানো?"

"কি বলেছেন?"

"বলেছেন, চরিত্রহীন প্রকাশিত হওয়ার ফলে যমুনা যদি উঠে যায় তা হ'লে সাহিত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কাপড়ের বোঝা কাঁধে ফেলে পথে পথে ফেরি ক'রে বেড়াবেন।"

ফণীবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শরৎ বললে, "অর্থ যদি আপনার কাম্য হয় ফণীবাবু, তা হ'লে চরিত্রহীন প্রকাশিত হ'য়ে যমুনা উঠে যাওয়াই ভাল। কাঁধে কাপড়ের বোঝা ফেলে পথে পথে ফেরি ক'রে বেড়ানো অর্থোপার্জনের একটা ভাল উপায়। অনেক কোটিপতির জীবনের প্রথম দিককার ইতিহাস ঐরকমই।"

আড্ডা দেওয়ার বড় ঘরে ফণীবাবু আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিন প্রস্থ চা ও দুই প্রস্থ খাবার এল,—ধূমায়িত সুগন্ধ চা, এবং প্রচুর উৎকৃষ্ট খাবার।

খাবার দেখে শরৎ লাফিয়ে উঠল; বললে, "মামার বাড়িতে যে খাবার খেয়ে এসেছি, তাই হজম করতে এখনো অনেক দেরি। তার ওপর লোভে প'ড়ে অথবা ভদ্রতার খাতিরে এর সামান্য অংশও যদি খাই, তা হ'লে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর একটি দানাও মুখে তোলা যাবে না। চা থাক্, খাবার ফেরৎ দিন।"

বোধ করি আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ফণীবাবু দুই প্লেট খাবার ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। পীড়াপীড়ি ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন না।

আলাপ-আলোচনায়, হাস্য-কৌতুকে, কল্পনা-জল্পনায় আড্ডা দেখতে দেখতে জ'মে উঠল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতও বাদ পড়ল না। ফণীবাবু জোর ক'রে আমাকে গোটা'দুই গান গাওয়ালেন; আমিও শরৎকে পীড়াপীড়ি ক'রে একখানা গাওয়ালাম। আমি সেদিন কি গেয়েছিলাম তা মনে পড়ে না, কিন্তু শরৎ গেয়েছিল নিধুবাবুর প্রসিদ্ধ টপ্পা 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।' সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। শরতের সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা, মিহি, সুমিষ্ট; কতকটা মেয়েলি ধরণের। গিটকিরি ও মিড়ের অলঙ্কারের দ্বারা তার কণ্ঠস্বর ছিল সমৃদ্ধ।

ডাক পড়ল অন্দর মহলে।

সকৌতুকে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "সেখানে আবার কি হবে ফণীবাবু?"

মৃদু হাস্যের সহিত ফণীবাবু বললেন, "মা সামান্য আয়োজন করেছেন আপনাদের জন্যে।"

"কিসের আয়োজন?"

আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে অপ্রতিভ স্মিত মুখে শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ফণীবাবু বললেন, "সামান্য একটু খাওয়ার।"

শরৎ বললে, "খাবার ত' একটু আগে ফেরৎ দিলাম। আবার খাওয়ার কথা তুলছেন কেন?"

ফণীবাবু বল্লেন, "সে ত' অনেক আগে চারটের সময়ে উপেনবাবুর বাড়ি খেয়েছেন, এখন আটটা বেজে গেছে।"

আমি বল্লাম, "ডাক যখন মা'র, তখন ফণীবাবুর সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই। চল, সেরে আসা যাক্। তোমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে।"

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল, পাশাপাশি তিনখানা পাত পড়েছে, পরিপূর্ণ আয়োজন,—একেবারে দস্তুর মতো নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা। মাছ, মাংস ডিম, চাটনি, মিষ্টান্ন, দধি—কিছুরই অভাব নেই। চায়ের সহিত কিছু পূর্বে যে-খাদ্য এসেছিল, পীড়াপীড়ি ক'রে ফণীবাবু কেন তা আমাদের খাওয়াননি, সে কথা আর অস্পষ্ট রইল না। গৌণের দ্বারা অগৌণকে তিনি নষ্ট হতে দেন নি। অন্তরাল হ'তে পুরমহিলাগণের অদৃশ্য কিন্তু অনজ্ঞেয় যত্ন ও তত্ত্বাবধানের ফলে সাধ্যাতিরিক্ত আহার সমাপন ক'রে পুনরায় বৈঠকখানায় এসে আমরা বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য শরতের সম্মুখে একটা আলবোলা স্থাপন ক'রে নলটা তার হাতে দিয়ে গেল। মূল্যবান অম্বুরী তামাকের সুমিষ্ট সৌরভে আমার মতো অতাম্রকূটসেবীও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, মাথা ঘোরে ঘুরবে, এই সুযোগে দু-চার টান দিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শরৎ অর্ধ-শায়িতভাবে অবস্থান করছিল। আলবোলার নল হাতে পেয়ে আনন্দিত হ'য়ে নড়ে-চড়ে একটু খাড়া হ'য়ে উঠে প্রসন্নমুখে বল্লে, "এতখানি ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন ফণীবাবু? নাঃ! আপনাকে আর কোনোমতেই সামলাতে পারা গেল না দেখছি!"

ফণীবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে আমি বললাম, "তৎপর হোন্ ফণীবাবু, গুড়ুকের প্রসাদে আপনার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। এই সময়ে চরিত্রহীনের অনুমতি আদায় ক'রে নিন।"

এ কথার উত্তরে ফণীবাবু মৃদুস্বরে শুধু একটু হাসলেন; তা' ছাড়া আর কিছুই করলেন না। কপট বিরক্তির সুরে বললাম, "তখন থেকে শুধু আমিই উপরোধ-অনুরোধ করছি, আপনি বিশেষ কিছুই বলছেন না। শরৎ হয়ত মনে করছে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।"

মুদিত নেত্রে শরৎ আলবোলা টানছিল, চোখ খুলে বল্লে, "উকিল যখন মক্কেলের হ'য়ে কথা কয়, তখন অমন কথা কেউ মনে করে না উপীন। তা ছাড়া, শুধু কি মানুষের সরব ভাষাই কথা কয়?"

সে কথা সত্যি। ফণীবাবুর মুখ চক্ষের নিঃশব্দ হাসির মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার ছাপ, যা, শরতের মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ত' কথাই নেই, যে-কোনো লোকের পক্ষে ভুল করা কঠিন। বললাম "তা হ'লে অনুমতি দিচ্ছ ত?"

"যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়, যদি ভয় না পাও, তা হ'লে ছেপো।"

"একেবারে ঠিক কথা ত?"

শরৎ বল্লে, "মানুষে নেশার জিনিস হাতে ক'রে কখনো বেঠিক কথা বলে না।"

শরতের কথায় আমি ও ফণীবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম।

আরও ক্ষণকাল কথাবার্তার পর আল-বোলায় দু-চারটে বড় বড় টান দিয়ে শরৎ উঠে পড়ল। বল্লে, "আর দেরি করলে ওপারে হয়ত ট্রাম পাব না।"

ফণীবাবু বল্লেন, "কাল আসছেন ত' এখানে?"

সবিস্ময়ে শরৎ বল্লে, "কি আশ্চর্য! আজ এতক্ষণ আড্ডা দিয়ে গিয়ে আবার কাল? তা ছাড়া, খাওয়া-দাওয়ার এ রকম হাঙ্গামা করলে আর কোনো দিনই আসব না।"

হাসিমুখে ফণীবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে না-হয় কিছু কম ক'রে করলেই হবে। রেঙ্গুন যাওয়ার আগে যে ক'দিন কলকাতায় আছেন, এখানে এসে বসলেই ভাল হয়। আজ ত' যমুনা সম্বন্ধে আপনার কোনো উপদেশ কোনো পরামর্শই নেওয়া গেল না। এবার যেদিন আসবেন, যমুনার বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাবে।"

আমি বল্লাম, "আমরা যে ক'জন আছি, দাঁড়ে ব'সে যাই শরৎ, তুমি হাল ধ'রে পথ দেখিয়ে চল।"

মনে হ'ল, কথাটা শরতের কতকটা ভাল লেগেছে। নিঃশব্দে মনে মনে একটা কিছু ভেবে বললে, "আচ্ছা, এবার যেদিন আসব, সেদিন দাঁড় আর হালের বিষয়ে কিছু আলো-চনা করা যাবে। দিন তিনেক পরে একদিন আসব।"

তার প্রত্যাশায় আমি ও ফণীবাবু প্রত্যহ বৈকাল থেকে যমুনা অফিসে উপস্থিত থাকব, সে কথা তাকে জানিয়ে দিলাম।

ক্ষণকাল পরে শরৎকে ট্রামে তুলে দিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে দুজনে বাড়ি ফিরলাম। যে সংকল্প নিয়ে কাল থেকে আমাদের কল্পনা-জল্পনা উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না, তা যে কতকটা সহজেই সফল হয়েছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যমুনার পৃষ্ঠায় যেদিন চরিত্রহীন প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিনকার যমুনার সেই পাতাটির মহিমান্বিত চিত্র কল্পনা ক'রে আমাদের উভয়ের মনে একটা সুমিষ্ট আনন্দের সুর ঝংকৃত হ'তে লাগল।

২৫

প্রতিদিন আমরা আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যমুনা অফিসে ব'সে থাকি, শরৎ কিন্তু আসে না। আবার একদিন হাওড়ায় খুরুট রোডে তার সন্ধানে যাব কিনা মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এসে উপস্থিত হ'ল।

যমুনার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'তেই বুঝলাম, যমুনার প্রতি বেশ-একটু দরদ নিয়েই সে এসেছে। যমুনাকে বড় ক'রে তোলবার ইচ্ছায় এবং আগ্রহে সে যেন আমাদের দুজনের কারোর চেয়ে কম নয়; এমন কি, সময়ে সময়ে তার উৎসাহ যেন আমাদের দুজনের উৎসাহকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

কলিকাতায় অবস্থানকালে যমুনার বিষয়ে শরৎ ক্রমশ কত যে উৎসাহশীল হ'য়ে উঠেছিল এবং রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়ার পর আমাদের নিকট হ'তে চিঠি পেতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের উৎসাহের শৈথিল্য ঘটেছে কল্পনা ক'রে আমাদের প্রতি কিরূপ বিরক্ত হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় রেঙ্গুন থেকে আমাকে ভাগলপুরে লিখিত তার ১৯১৩ সালের ১০ই জানুয়ারীর পত্রে। সে পত্রের কতক-কতক অংশ এইরূপ,—

> প্রিয় উপীন, তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দুদিন পূর্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশী দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয়না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। × × × আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না। ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও × × × তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণীকে?

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৫৩-৫৪]

যমুনার প্রতি শরৎচন্দ্রের উৎসাহের এবং ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় রেঙ্গুন হ'তে ভাগলপুরে আমাকে লিখিত শরৎচন্দ্রের ১৯১৩ সালের ১০ই মে তারিখের চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি থেকেও প্রকাশ পায়,—

> × × × ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধকরি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এইভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। × × × ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু (পথ নির্দেশের মত) বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। × × × তারপরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত' আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধকরি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য ক'রেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাজটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৫৯-৬০]

যমুনার প্রতি শরতের অনুরাগ কত বেশি ছিল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে যমুনার জন্য কতটা পরিশ্রম করতে সে চেয়েছিল, এবং কলিকাতা পরিত্যাগ করবার পূর্বে যমুনার বিষয়ে যা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করবার কতটা তার সংকল্প ছিল, ১৯১৩ সালের মাঘ মাসে ফণীবাবুকে লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হ'তে তা জানা যায়।

> × × × গল্প ছাড়া সমস্ত রকম Subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি। তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন Subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। × × × আর একটি কথা,—আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্বাচন ক'রে দিতেও পারি। × × × আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি সে মত কাজও করব।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৭১]

সুতরাং, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ১৯১২ সালের শেষভাগে শরৎচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনের পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত পরিচয় সাধন ও তাঁর নিকট হ'তে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ, এবং বিশেষ ক'রে যমুনার সহিত অতি নিবিড় সংযোগ স্থাপন গভীরভাবে তাঁর সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত এবং উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন কথা শরৎচন্দ্র নিজেও বিবৃত করেছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের যে কথোপকথন হয়, তা 'শরৎ-প্রসঙ্গ' নামে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'স্বদেশী বাজারে' প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ব'লেছিলেন,—

> আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বল্‌তে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণী পালের 'যমুনা' মাসিক পত্রখানা মর মর—আমিও সবে মাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল, আমি লিখলেই তাঁর কাগজখানা বেঁচে যাবে। আমি তাঁর অনুরোধ পালন ক'রে স্বনামে-বেনামে অনেক কিছুই লিখতে লাগলুম।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ১১-১২]

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির সহিত তাঁর আরও দুটি উক্তি যুক্ত হ'লে কথাটা স্পষ্টতর হবে। কলিকাতা হ'তে রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তনের পর ২৬শে এপ্রিল ১৯১৩ তারিখে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন, তার এক স্থানে নিম্নলিখিত প্রথম উক্তিটি আছে।

> তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৫৭]

যৎপরোনাস্তি সঙ্কোচের সঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম। আমি যে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, সে কথা একান্তই সত্য। কিন্তু সেই সত্য অবগত থাকার ফলে শরৎচন্দ্র ভাল ক'রে গল্প লিখতে পেরেছিলেন, এমন অসার অহংকার কোনো দিনই আমার মন অধিকার ক'রেছিল না। এ উক্তির দ্বারা আমি শুধু এই কথাটুকুই বলতে চাই যে, শরৎচন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থানকালে যে-ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলবার কারণ হয়েছিল, শরৎচন্দ্র মনে করতেন তদ্বিষয়ে আমার চেষ্টাও সেই ঘটনাবলীর একটা অংশ।

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উক্তিটি উল্লিখিত প্রথম উক্তিরই সমর্থক। রেঙ্গুন হ'তে ১০ই মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন,—

> তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যতকিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্র কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছি। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই

ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৬১]

সেদিন যমুনা অফিসে ব'সে শরৎ পূর্ব-দিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাঁড় ও হাল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা চালালে। কে কে গল্প এবং উপন্যাস লিখবে, কাদের ওপর প্রবন্ধ লেখবার ভার দেওয়া হবে, কবিতা কার কার নেওয়া যেতে পারে,—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্তগুলি খাতায় লিখে ফেলা হ'ল। ব্যবসায় সংক্রান্ত আলোচনাও একেবারে বাদ পড়ল না। তিনজন অব্যবসায়ী মিলে ব্যবসায়ের মূল নীতির অবলম্বনে হয়ত কতকগুলি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেল।

এর পর দিন-কতক শরৎ প্রায় প্রত্যহই যমুনা অফিসে আসতে লাগল। দিন-দিন ক্রমশঃ তার আসবার লগ্ন হ'তে লাগল ত্বরিত, আর বিদায়ের ক্ষণ বিলম্বিত। বুঝলাম, সাগরপারের পাখী ফণীবাবুর সহৃদয়তার পিঞ্জরে ধরা পড়েছে। আড্ডা এবং আলোচনার যুগল অশ্বের দ্বারা দিনগুলি বাহিত হ'য়ে ছাড়াছাড়ির মুহূর্তে ঘনিয়ে এল। শরৎ জমাবে রেঙ্গুনে পাড়ি; তারপর আমি একদিন যাত্রা করব ভাগলপুরের পথে।

জাহাজ ছাড়বার কয়েকদিন পূর্বে বুক-পকেট থেকে একটা ফাউন্টেন পেন খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে শরৎ বল্‌লে, "আমার এই পছন্দসই কলমটা তোমাকে দিলাম উপীন, কাজে লাগিয়ো।" পরম শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সহিত এই স্নেহের উপহার হৃৎপিণ্ডের নিকটতম স্থানে স্থাপন ক'রে শরৎকে ধন্যবাদ জানালাম।

১৯১৩ সালের ১০ই জানুয়ারীর পূর্বোল্লিখিত পত্রে এই কলম সম্বন্ধে শরৎ লিখেছিল, "আমার ফাউন্টেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেছে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।"

খাটিয়ে নিতে কসুর করিনি। চিঠিপত্র কবিতা-গল্প থেকে আরম্ভ ক'রে 'শশিনাথ' উপন্যাসের প্রায় সমস্তটাই ঐ কলমে লিখেছিলাম। কিন্তু শরতের মঙ্গল কামনা সফল হবার অবসর পায়নি; ফাউন্টেন পেনটি আমার হাতে অক্ষয় ব'লে প্রতিপন্ন হবার পূর্বেই কোনো সমঝদার ব্যক্তির গোপন পকেটে বন্দী হয়েছিল। অনেক দিনের কথা, কিন্তু এখনো অতি আদরের সেই স্নেহের নিদর্শনটি হারানোর বেদনা মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।

আর একটি যৎপরোনাস্তি কৌতুকজনক কাহিনী বিবৃত করলেই শরতের সাহিত্য-জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ যুগের কথা বলা মোটামুটি শেষ হয়।

যমুনায় চরিত্রহীন প্রকাশিত হবে স্থির হওয়ার পর, শুধু সে কথাই নয়, 'বড়দিদি' উপন্যাসের শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতঃপর প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে যমুনায় লেখা দেবার ভার গ্রহণ করেছেন, যমুনার প্রচারকল্পে ফণীবাবু ও আমি এ সংবাদ কলিকাতার সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে বহুলভাবে প্রচারিত করতে লাগলাম। পৃথক্‌ভাবে ও একত্রে আমরা দুজনে বিভিন্ন সাহিত্যিক আসরে গিয়ে বসি ও ফলাও ক'রে সংবাদ রটাই। দেখতে দেখতে কথাটা সর্বত্র রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। টনক পড়ল বিশেষ ক'রে দুটি জায়গায়,—'সাহিত্য' ও 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রদ্বয়ের চৈতন্যে।

'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি চরিত্রহীন হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে পরে বোধহয় কতকটা অনুতপ্ত হয়েছিলেন; তারপর যখন দেখলেন, যমুনার মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত ক'রে উন্নতির পথে অগ্রসর হবার ব্যবস্থা করেছে এবং 'চরিত্রহীন' অপরে প্রকাশিত করলে তাকে অতিক্রম ক'রে শরৎচন্দ্রের নূতন লেখা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে, তখন 'চরিত্রহীন' ফিরে পাবার জন্য তিনি রেঙ্গুনে শরৎকে চিঠি লিখতে ও টেলিগ্রাম পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে 'ভারতবর্ষ' শরতের মজঃফরপুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দিয়ে 'চরিত্রহীন' হস্তগত করবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করছে। রেঙ্গুন থেকে শরৎ আমাকে লিখলে,—

> আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে, কি আর বলিব। × × সে জিদ করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায়......প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই হইতেছে 'ভারতবর্ষের' মোড়ল। এখন দ্বিজুবাবু প্রভৃতি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registry চিঠি ক্রমাগত লিখিতেছেন। কোন দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম। সে বলে, এটা সে না পেলে আর তার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি, পুরাতন বন্ধুবান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর শুরু থেকে history জান।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পৃঃ ৫৭-৫৮]

কি উপদেশ শরৎকে দিয়েছিলাম তা মনে নেই; সম্ভবতঃ তারই ওপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়েছিলাম, কিন্তু ভারি চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম! ত্রিশক্তির দ্বারা তিন দিক থেকে চরিত্রহীন নিয়ে টানাটানি পড়েছে! 'সাহিত্যে'র জন্যে তেমন ভয় নেই; হাতে পেয়ে প্রত্যা ক'রে সে তার মামলা দুর্বল ক'রে ফেলে ভয় শুধু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী 'ভারতবর্ষ'কে নি প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থ—কোনো বিষ আমরা তার সমকক্ষ নই। এদিকে ফণী প্রতিদিন কান্নাকাটি ক'রে চিঠি লিখে যাচ্ছি আমাকে উপেনবাবু, যমুনায় বিজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ার পর চরিত্রহীন যদি অ কাগজে প্রকাশিত হয় কলকাতা ছেড়ে আমা পালাতে হবে!

ঘটনাচক্রে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি শে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল প্রমথনাথ ভট্টাচাযে হাতে! 'ভারতবর্ষের' দৃঢ় মুষ্টি থেকে 'চরিত্রহীন'কে উদ্ধার করবার কোনো উপায় মাথার মধ্যে আসে না! ফণীবাবু ত পাগ হবার জোগাড় করলেন।

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! যে মেসে ঝি একদিন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির হাত থেকে 'চরিত্রহীন'কে উদ্ধার করে আমাদের হাতে স'পে দিয়েছিল, এবারও সেই 'মেসের ঝি হল চরিত্রহীনের উদ্ধারকর্ত্রী! ফণীবাবু আমি, দুজনে, প্রাণ ভ'রে সাবিত্রীকে আশীর্ব করলাম।

শরৎ আমাকে লিখলে, "তাহারা ('ভারত বর্ষ') সাবিত্রীকে 'মেসের ঝি' বলিয়া দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত এবং কি গ কি চরিত্র কিভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লা খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদি আপশোষ করিবে কি রত্ন হাতে পাইয়াও তা করিয়াছে।"

সেই চিঠিতেই ("শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" ৬০) শরৎ আমাকে লিখেছিল, "চরিত্রহ আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণী পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব ন তবে প্রমথ ফণীর হাতে ওটা দিবে না, কেন ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকে পরস্পরকে দেখিতে পারে না।"

দুবার সাগর পার হ'য়ে তারপর চরিত্রহ আমাদের হাতে পৌঁছবে, আমরা কিন্তু বিলম্বিত প্রণালীর অপেক্ষায় রইলাম শুভস্য শীঘ্রং নীতি অবলম্বন ক'রে ভাগলপ থেকে প্রমথবাবুকে চিঠি লিখে দিন, সময় ও স্থান ঠিক করলাম। তারপর কলিকাতা এসে নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে প্রমথবা স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিসে উপস্থিত হলাম।

আমার হাতে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলি অর্পণ ক'রে প্রমথবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যা করলেন। তার ঘণ্টাখানেক পরে ভবানীপ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ফণীবাবু ত্যাগ করলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। উভয়ে সংকট মোচন হ'ল। (ক্র

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

মাজদিয়া হইতে একটি প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সীমান্ত হইতে ১২ মাইল দূরে পাকিস্থানী চমূ তাহাদের ঘাটি স্থাপনা করিয়াছে। কামান, বন্দুক, সৈন্য, জীপ প্রভৃতি যুদ্ধায়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

—অনেকে হয়তো ভাবিতেছেন পাকিস্থান যুদ্ধ করিবে, কিন্তু কাহার সহিত? আমরা কোনমতেই যুদ্ধ করিব না, অতএব পাকিস্থানী সেনাবাহিনী হাওয়ায় গুলী বারুদ ছুঁড়িয়া যদি খানিকটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে তাহা হইলে দূর হইতে দূরবীণ লাগাইয়া আমরাও তাহা উপভোগ করিতে পারি।

* * * *

লণ্ডন স্যাভয় হোটেলে অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোজসভায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে উহার মীমাংসার জন্য অস্ট্রেলিয়া চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।

—কিন্তু চেষ্টার ফলে সেই দুয়ে দুয়ে চারই হইবে। অস্ট্রেলিয়ার ডিক্সন সাহেব মীমাংসায় যতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা যাইবে মেঞ্জিস সাহেবও ঠিক সেইখানে আসিয়াই পাক খাইতেছেন। পাক না খাওয়াইলে পাকিস্থানের আর বাহাদুরী কি!

* * * *

জনৈক সোভিয়েট বৈমানিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আর অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহে যাতায়াত করিতে পারিবে।

—আর কেহ চাঁদের রাজ্যে যাতায়াত করিতে পারুক বা নাপারুক কম্যুনিস্টদের হাতে যে সব চাঁদকেই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে সেটা আমরাও বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেছি।

* * * *

গৌহাটিতে একটি পঁয়ষট্টি বৎসরের তরুণের সহিত একটি সাতচল্লিশ বৎসরের তরুণীর প্রণয় হয়, সম্প্রতি উভয়েই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। পাত্রটি বিপত্নীক, ৪টি পুত্র, ৩টি কন্যা ও কয়েকটি নাতি-নাতনি মাত্র তাঁহার সম্বল। পাত্রী বিধবা, ২টি বিবাহিতা কন্যা বর্তমান।

—বর বড় না কনে বড় সেইটাই ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

* * * *

সম্প্রতি ডিভনের নিউটন এবটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'ফ্যারাডে স্মারক বক্তা' ডাঃ এ জে প্লাবেস্কি বলিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ দেওয়ালের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিতে পারিবে, বাতাসের মধ্য দিয়া ভাসিয়া বেড়াইবে, একটা মানুষকে ইউরোপে ভাঙিয়া আবার আমেরিকায় গড়া হইবে।

—অদূর ভবিষ্যতে কেন এরূপ ব্যাপার তো এখনই ঘটিতেছে। কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকান—বাড়ী নাই দেওয়াল আছে, তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে সৈন্যরা যাতায়াত করিতেছে, গোলায় উৎক্ষিপ্ত মানুষ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে, একদেশে মানুষকে গড়িয়া তুলিবার যে আয়োজন হইতেছে অপর দেশ তাহাই ভাঙিয়া গুঁড়ো করিতেছে।

* * * *

ধর্ম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করায় পাকিস্থান কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নাকি ভাঙনের সৃষ্টি হইয়াছে।

—হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ধর্ম বাদ দিলে আর হিন্দুস্থান কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত পাকিস্থান কম্যুনিষ্ট পার্টির তফাৎ রহিল কি?

* * * *

মস্কোর সরকারী পুস্তক বিভাগ হইতে একটি অভিনব অভিধান বাহির হইয়াছে। ভগবানের সংজ্ঞা কি সেই প্রসঙ্গে গবেষণা করিয়া বলা হইয়াছে ভগবান মানে এমন একটি কাল্পনিক বিশ্বাসের বস্তু বিজ্ঞানের দিক হইতে যাহার কোন অস্তিত্বই নাই।

—হায় ভগবান! তোমার অবস্থাও শেষ পর্যন্ত এই হইল?

* * * *

জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যদের দক্ষিণ চীন আক্রমণে নিয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

—বিবেচনাটা যথাসময়েই হইয়াছে। ঘরশত্রু বিভীষণদের সাহায্যে যদি নয়াচীনকে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে কোরিয়া রণাঙ্গনে ম্যাকআর্থার সাহেবের মান বজায় থাকে।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুইখানি মাছ-ধরা জাহাজ দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করিয়া ফিরিবার সময় এবার ৬১০ মণ মাছ লইয়া আসিয়াছে। পমফ্রেড, গলদা, চিংড়ি প্রভৃতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বহু মাছ এবার পাওয়া গিয়াছে।

—খবরটি মৎস্যাশীদের পক্ষে এত উত্তেজক যে মনুমেণ্টের পাদদেশে সভা ডাকিয়া আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও খানচারেক জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ জানাইব কিনা ভাবিতেছি।

* * * *

জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়া রণাঙ্গন পরিদর্শনান্তর টোকিওতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, চীনারা আমাদের সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া বহু বাজে সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। কেহই আমাদিগকে সমুদ্রে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

—আর ঠেলিয়া লইয়া যাইলেই বা কি ক্ষতি? আমেরিকার যত জাহাজ আছে তাহাতে চটপট সকলেই উঠিয়া পড়িতে পারিবে এবং এ বছরের বড়-দিনের বহু পূর্বেই ঘরের ছেলেরা যে-যার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া যাইবে।

* * * *

বিহার আইনসভায় গৃহীত ১৯৫০ সালের চোরাবাজার বিল পুনরায় পরিত্যাগ করা যাইতে পারে কিনা এই আইন ও বিধানগত প্রশ্ন

উঠাইয়াছেন বিহার আইনসভারই জনৈক সদস্য।

—আইন মতে পরিত্যাগ না-করা যাইলেও বিহারের সমস্ত ব্যবসায়ীরা যদি প্রকৃতপক্ষে সাধু বনিয়া গিয়া আইনকেই অকার্যকরী করিয়া রাখেন তাহা হইলে সে পোড়া আইন রাখিয়াই বা ফল কি? শুধু শুধু ছাপার খরচা বাড়িবে।

* * * *

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্বোধন দিবসে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শিক্ষা বিস্তারের বাধা স্বরূপ সরকারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শিক্ষামন্ত্রীর তহবিলে টাকাকড়ি আছে কিনা তিনি একথা জানিতে চাহেন না। তাঁহার দাবী এই যে, এদেশের সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেই হইবে। অর্থ সংগ্রহের জন্য যদি শিক্ষামন্ত্রীকে কারাবরণও করিতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

—কারাবরণই বা করিতে হইবে কেন? এইরূপ সৎকার্যের জন্য শিক্ষামন্ত্রী বে-আইনী-ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইলেও ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় হাইকোর্টের জজ হিসাবে তাঁহাকে আপীলে খালাস দিয়া দিবেন। জজ সাহেব ও শিক্ষামন্ত্রীর এই ব্যবস্থার ফলে মাঝখান হইতে ছেলেগুলোও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিবে।

* * * *

ভাবুয়া মহকুমার সীমায় সীমান্ত প্রহরীরা খাদ্যের চোরাই চালান নিবারণে ব্যাপৃত ছিল। চোরাই চালানকারীরা প্রহরীদের বন্দুকগুলি কাড়িয়া লইয়া কর্মনাশা নদীতে ফেলিয়া দেয়, তাহার পরই ১২ জন লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

—বন্দুকগুলি হাতে থাকায় পুলিশ চোরাকারবারীদের সম্ভবত ধরিবার জুৎ পাইতেছিল না, সেগুলির বিসর্জনের পর হাতখালি হইতেই বোধ হয় চোরেদের পাকড়ানো সহজ হইল।

* * * *

লণ্ডনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরের নদীসমূহ যখন পাকিস্থানের দিয়া প্রবাহিত হয় তখন কাশ্মীর পাকিস্থা প্রাপ্য।

—খাঁ সাহেবের এ যুক্তি সত্যই অক নদীর জল গড়াইবে পাকিস্থানে আর তা উৎপত্তিস্থানে বসিয়া অপরে অপ্রতিহত গতি অবিরাম জল ছাড়িয়া চালিবে এরূপ ব্যাক সত্যই অপমানজনক!

* * * *

সুন্দরবন প্রজা সম্মেলনে ডাঃ শ্যামাপ্র মুখোপাধ্যায় সরকারের খাদ্য উৎপা ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, স বৎসরেও ভারত খাদ্য বিষয়ে স্বয়ং সম্পূ হইতে পারিবে না।

—আমাদেরও তাহাই মনে হয়। ই উপর ভারতে বৎসরে ৩০ লক্ষ করিয়া য লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে স পৃথিবীর লোকে খাদ্য জোগাইবার ব্যব করিলেও মালে শর্ট পড়িবে।

ইউনো'র রাজনৈতিক কমিটিতে শেষপর্যন্ত কোরিয়া সম্পর্কে আমেরিকার প্রস্তাবই ভোটাধিক্যে গৃহীত হবে দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষ প্রমুখ বারোটি এশিয় ও আরব দেশের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছিল তার সাফল্যের আশা নেই। বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই ভোটাভুটি হয়ে যাবে।

আমেরিকা ইউনোকে দিয়ে পিকিং গভর্নমেণ্টকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও আমেরিকার প্রস্তাবে আছে। সেজন্য মার্কিন প্রস্তাব সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মনে একটা দ্বিধা ছিল। কারণ, চীনের সঙ্গে কোনরকমে একটা ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে একেবারেই আকাঙ্ক্ষণীয় নয়। কিন্তু আমেরিকাকে নারাজ করার সাধ্যও বৃটেনের নেই। অবশ্য বৃটিশদের আশঙ্কা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যে আমেরিকার প্রস্তাবের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টার একটা কথাও জুড়ে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আসলে মার্কিন প্রস্তাবের ভিত্তি হচ্ছে আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত বা ওজুহাত যে ইউনোর যুদ্ধবিরতি এবং মীমাংসার আলোচনার প্রস্তাবের উত্তরে পিকিং গভর্নমেণ্ট যা বলেছেন সেটা ইউনোর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষ প্রমুখে বারোটি এশিয় দেশের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গীই হোল এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এশিয় দেশগুলির প্রস্তাবের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আলোচনার জন্য পিকিং গভর্নমেণ্টের যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং পিকিং থেকে যে পাল্টা প্রস্তাব ও পরবর্তী সংশোধনী ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ইউনোর পূর্ববর্তী প্রস্তাবের সামঞ্জস্য করে মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই বিশ্বাস ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাতেই শ্রীবেনেগল রাউএর প্রস্তাব রচিত হয়েছে।

বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলী পর্যন্ত ইতিপূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, চীন গভর্নমেণ্টের উত্তর আলাপ আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে বলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মনে করেন না। কিন্তু আমেরিকার চীনের বিরুদ্ধে

বৈদেশিকী

এই অভিমত বজায় রেখে কাজ করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হল না এবং শেষপর্যন্ত সম্ভব হবে না জেনেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আগে থেকেই একটা গোঁজামিলের সন্ধানে ছিলেন। আমেরিকার এই সমালোচনা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছিল যে বৃটিশরা হংকংএর নিরাপত্তা এবং নিজেদের বাণিজ্যিক সুবিধা বজায় রাখার জন্যে চীনের কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টকে চটাতে চায় না। অথচ কোরিয়ার যুদ্ধে রক্তক্ষয় হচ্ছে প্রায় সবটাই আমেরিকার। আমেরিকার এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ইউনো চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করুক, এই দাবী জানিয়ে আমেরিকার আইন পরিষদ প্রস্তাব পাশ করেছে। এ অবস্থায় আমেরিকার মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বৃটিশ জনমত এমন কিছু করার পক্ষপাতী নয় যাতে চীনের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা বাড়ে। এ্যাটলী গভর্নমেণ্ট কোনোরকমে দুকূল বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে চীনকে কোরিয়ায় অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবে সায় দিয়েও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মনে হয়ত এই আশা আছে যে, চীনের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধ তাঁরা কোনোরকমে এড়াতে পারবেন। এ সম্বন্ধে মার্কিন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা বোঝাবুঝি হয়ত হয়ে গিয়ে থাকবে। মার্কিন গভর্নমেণ্টেরও যে চীনের সঙ্গে একটা ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার খুব আগ্রহ আছে, এরূপ মনে করার হেতু নেই, কারণ, আমেরিকাও তো দেখতে পাচ্ছে যে, এশিয় দেশগুলির তো দূরের কথা, আমেরিকার য়ুরোপীয় মিত্রেরা পর্যন্ত তা চায় না—অবশ্য নিজেদেরই স্বার্থে। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্য চীনের সঙ্গে অবিলম্বে ব্যাপক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া, এরূপ নাও হতে পারে। হয়ত আমেরিকার নীতির উদ্দেশ্য অন্যরকম।

শ্রীবেনেগল রাউ বলেছেন যে, চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। সম্ভবত মার্কিন নীতি তাই চায়। কারণ, মীমাংসার আলোচনায় অংশ নিলে তো কেবল কোরিয়া নয়—ফরমোজা, ইউনোতে চীনের স্থান ইত্যাদি সকল প্রশ্নের মীমাংসাই করতে হবে। সম্ভবত আমেরিকা সেইটেই চাচ্ছে না। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার মানের ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের চেয়ে আমেকিার বেশি স্বার্থ এখন অন্যত্র এ মতও বর্তমান আমেরিকায় কম প্রবল নয়। কোরিয়ার যুদ্ধে যাওয়াই আমেরিকার পক্ষে ভুল হয়েছে। এরূপ যারা মনে করে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বাড়ছে, বিশেষ করে কোরিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখে। এদের মতে কোরিয়ায় না গিয়ে ফরমোজা, জাপান—এই সব জায়গায় মার্কিন ঘাঁটি বেশি শক্ত করার দিকে ঝোঁক দেওয়া উচিত ছিল। এরা বলে কোরিয়ার যুদ্ধে এখন আমেরিকানরা যে বেকায়দায় পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে কোরিয়া ছেড়ে আসাও বরঞ্চ ভালো। চীনের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনায় না গিয়ে যদি কোরিয়া ছেড়ে আসতেও হয় তাহলেও এদের মতে পরিণামে আমেরিকার বেশি স্বার্থসিদ্ধি হবে। কারণ তাহলে ইউনোতেও পিকিং গভর্নমেণ্টকে স্থান দিতে হবে না, ফরমোজার ঘাঁটিও ছেড়ে আসতে হবে না এবং চীন ও রাশিয়াকে এড়িয়ে জাপানেও ইচ্ছামত মার্কিন নীতি চালাবার সুবিধা থাকবে। চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করা এই নীতিরই পরিপোষক হবে। অথচ এর ফলে চীনের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয় বা এর দ্বারা এখনই হঠাৎ হংকং বিপন্ন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সায় থাকা অস্বাভাবিক নয়।

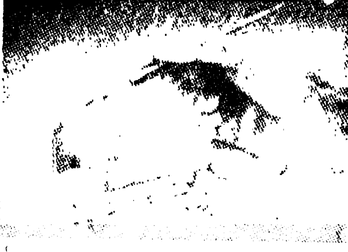
এই যদি ভিতরের কথা হয়, তবে কোরিয়া যুদ্ধের কী গতি হবে? মনে হয় কোরিয়ায় একটা দাঁড়াবার ঠাঁই রাখার চেষ্টা চলতে থাকবে। যদি তার জন্যে বেশি মূল্য দিতে না হয়। আর যদি দেখা যায় যে, মার্কিণ ধনপ্রাণের ক্ষয় বড় বেশি হচ্ছে তবে হয়ত কোরিয়া থেকে স্থলসৈন্য সরিয়ে আনা হবে। কোরিয়ার যুদ্ধ জয় করা অথবা কোরিয়ার সমস্যা সমাধান করার চেয়ে চীনের সঙ্গে মীমাংসা না করাই মার্কিন নীতির বর্তমান লক্ষ্য বলে মনে হয়।

৩১।১।৫১

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে হলে "বার্নার"-এর দরকার হয়। এক ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী Touch-O-Matic নামে একটা নতুন রকম বার্নার বার করেছে। এটার মজা এই যে, এর



Touch-O-Matic বার্ণার-এর ওপর কেবলমাত্র হাত রেখে এটি জ্বালান হয়েছে।

একদিকে হাত রাখলেই এটা জ্বলে উঠবে। হাতটা তুলে নিলেই বার্নারের আগুনটা মৃদু হয়ে গিয়ে একটি শিখা মাত্র জ্বলবে।

*

লোকে কথায় বলে—একেবারে "ঘড়ির কাটার" মত সময়ের ঠিক থাকে। কিন্তু সবসময় কি ঘড়ির কাঁটা ঠিক সময় দেয়? দেয় না। তবে কোপেনহেগেন টাউন হলে একটা ঘড়ি রাখার বন্দোবস্ত হয়েছ সেটি নির্ভুল সময় দেয়। এই ঘড়িটি ৭৫০ বছরে মাত্র ঠিক সময় থেকে এক সেকেন্ডের তফাৎ হতে পারে। জিনস্ অলসন নামক একজন দিনেমার তার সারাজীবনের চেষ্টায় এই ঘড়িটি তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য ঘড়িটি সম্পূর্ণ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘড়িটি ওজনে ১০৮ মণ এবং এতে ১১০০০০টি অংশ আছে। এর আগে যেটিকে নির্ভুল ঘড়ি বলে ধরা হতো সেটি ১০০ বছরে ৮ সেকেন্ডের তফাৎ হয়। জিনস্ অলসনের এই ঘড়িটির বিশেষত্ব এই যে, এটি ১২ রকমের সময় এক সঙ্গে রাখতে পারে। অর্থাৎ অক্ষরেখা দ্রাঘিমার তফাৎ অনুসারে সময়ের যে পরিবর্তন হয় সেটা এই ঘড়িতে পাওয়া যায় এছাড়া স্থানীয় সময় তো ঠিক থাকবেই।

*

আমেরিকায় একধরণের প্লাস্টিক তৈরী হয়েছে সেটার ওজন এলুমিনিয়মের চেয়ে অনেক কম। বন্দুকের গুলী এটাকে ভেদ করতে পারে না। এই নতুন ধরণের প্লাস্টিক দিয়ে এখন বিমান তৈরীর চেষ্টা চলেছে। এই প্লাস্টিকটা এপি-ক্লোহাইড্রিন এবং বিসফেনল নামক দুটি রসায়ন দ্রব্যের সাহায্যে তৈরী হয়। এই দুটি রসায়ন দ্রব্য মেশানর সঙ্গে সঙ্গে এক-রকম চটচটে জিনিস হয়। এর ওপর একটা কাচের পাতলা চাদর লাগালেই আসল প্লাস্টিকটি তৈরী হয়। এই গবেষণাকার্যে ১৩৫ জন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন কলেজ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগদান করেছেন।

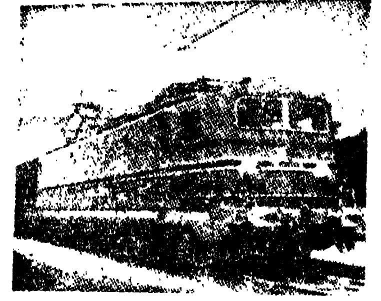
পেরুর Dr. Jorge Voldeavellano-র মতে যেসব লোকেরা সমতলভূমি থেকে খুব বেশী উঁচুতে বাস করে তাদের প্রায়ই চোখ খারাপ হতে দেখা যায়। অবশ্য এর কোনও নির্দিষ্ট কারণ তিনি দেখাতে পারেননি তবে রোগটা যে কি ধরণের হয় তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—চোখের ভিতরের রক্তবাহী শিরাগুলো ফুলে ওঠে বলেই দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন—এ্যান্ডেস নামে একটি জায়গা সমতলভূমি থেকে ১৫ হাজার ফিট উঁচু। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই শহরের লোকেদের মধ্যে কেবলমাত্র তিন ভাগের দু'ভাগ লোকের সাধারণ দৃষ্টিশক্তি আছে।

*

চিকাগোর একটি কোম্পানী এক নতুন ধরণের "সার্চ লাইট" বার করেছে এটা বেশ সহজেই বহন করা যায়। এই আলোটির জ্যোতি এত বেশী যে, প্রায় এক মাইল দূরে থেকে এই আলোর সাহায্যে পড়াশোনা করা সম্ভব হয়। এতে ২০০ ওয়াটের বাল্‌ব লাগান থাকে এবং ১১০ ভোল্টের সাহায্যে একে জ্বালান যায়। যেসব ফ্যাক্টরীতে রাতে কাজ হয় বা যেসব মিস্ত্রী রাত্রে কাজ করে এই আলো তাদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক।

*

বৈদ্যুতিক যুগে মানুষে সব কাজই "সুইচ টিপে" করতে চায়। বাস্তবিকই বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি কাজ হয় যে, মানুষ সব কিছুতেই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। আজকাল প্রায় সব জায়গায় ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু মানুষ এতেও তৃপ্ত হয়নি। এই বিদ্যুৎ-



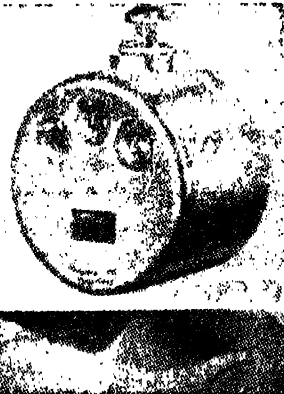
ফ্রান্সের নতুন বৈদ্যুতিক ট্রেন

চালিত গতিকেও দ্রুত থেকে দ্রুততর করতে চেষ্টা করছে। ফ্রান্সে যে নতুন বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রচলন হয়েছে সেটার গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল। আর এইটিই বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বৈদ্যুতিক ট্রেন।

*

আজকালকার দিনে সব মোটর গাড়ীরই "সেলফ্ স্টার্টের" ব্যবস্থা থাকে। এই "সেলফ্ স্টার্ট" ব্যবহার করতে হলে মোটর চালকের গাড়ীর ব্যাটারী সম্বন্ধে বেশ সচেতন থাকা প্রয়োজন। ব্যাটারীর অবস্থা যাতে সহজে বোঝা যায় তারজন্য একটি মোটর কোম্পানী একটি নতুন উপায় বার করেছে। গাড়ীর ভেতরে যে সুইচটি টিপে সেলফ্ স্টার্ট দেওয়া হয় তার ওপরে তিনটি ছোট ছোট আলো থাকে। চালক এই বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি আলো সমানভাবে জ্বলে উঠলে ব্যাটারীর অবস্থা যে ভাল তা বুঝতে পারবে। যদি এর মধ্যে কোন আলো কম জ্বলে তাহলে বোঝা যাবে যে, ব্যাটারীর কোনও একটি 'সেল'এর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আর যদি কোনও আলো মিট মিট করে জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে যে, ব্যাটারীতে জলের অভাব হয়েছে। এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "ডিটেক্টো সেল"।





ছবিটির বাঁ দিকে গাড়ির চালককে সেলফ্‌স্টার্টের বোতাম টিপ্‌তে দেখা যাচ্ছে। এর পাশে যন্ত্রটিকে বর্ধিতভাবে দেখান হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প— প্রকাশক—চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৫৮, মূল্য ৪৲ টাকা।

বাঙলা শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা বাঙলা ভাষায় ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়—এইরকম কয়েকজন ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেননি আর শিশুদের জন্য বই অনেক বেরোয় কিন্তু তার অধিকাংশই অপাঠ্য। এ ধারণা যে কত ভুল তা বোঝা যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও অনেকের লেখা পড়লে। কবিতার দিক দিয়ে বাঙলা শিশুসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়ের পর কিছুই এগোয়নি একথা ঠিক, কিন্তু গল্পের দিক দিয়ে তার সমৃদ্ধি বেড়েছে। তবে নানা মাসিক পত্র আর বার্ষিকীতে ছড়িয়ে থাকে বলে সব সময় সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই ভাল গল্প সংগ্রহের প্রয়োজন খুবই বেশী। চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ছোটদের গ্রন্থাবলী সিরিজ প্রকাশ করে এই প্রয়োজনীয় কাজটি শুরু করেছেন। তাঁরা প্রথমে প্রকাশ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শিবরাম চক্রবর্তীর সেরা গল্প। আশা করি, ভবিষ্যতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির গল্প সংগ্রহও এঁরা পরিবেশন করবেন। তবে বইয়ের প্রচ্ছদপট আর ছবিগুলি আরও অনেক ভাল হওয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য বইটি হাতে পাওয়া মাত্রই শুধু ছোটরাই নয় বড়রাও উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। আর নিজেদের ছেলেমানুষী প্রকাশ করতে এতটুকু লজ্জা পাবেন না বরং খুশীই হবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, 'গল্প যেখানে সত্যিই সেরা, সেখানে ছোট আর বড়র কোন ভাগ-বিচার করাই ভুল।' তার প্রমাণ এই বইটিই।

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প" পড়ে প্রথমেই যা নজরে পড়ে, তা' হল বইটির বহুবৈচিত্র্য। অন্য অনেক লেখকের বেলায় বলা চলে—অমুক ভাল হাসির গল্প লেখেন, বা ভূতের গল্প লেখেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র কী যে ভাল লেখেন না, জানি না। হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রূপকথা প্রভৃতি সবরকম গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আর কারো মত নয়। তিনি নানা ধরণের গল্প লিখেছেন, আর সবদিকেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বপ্ন আর কল্পনার জাল নানা-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এই একটি সংকলন হয়ত যথেষ্ট নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বৈজ্ঞানিক গল্প-গুলি আমাদের ভাষায় খুবই নতুন। বাঙলা ভাষায় এ ধরণের গল্পের বোধ হয় তিনিই প্রথম প্রবর্তক, অন্তত তিনিই প্রথম এই জাতীয় ভাল গল্প লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর "পৃথিবী ছাড়িয়ে" উপন্যাসটি স্মরণীয়। এই গল্পগুলি কল্পনা হলেও অসম্ভব বলে মনে হয় না। যেমন মনে হয় না এইচ জি ওয়েলস্-র "টাইম মেশিন" বা "ওয়্যার অফ্ দি ওয়ার্ল্ডস্" জাতীয় গল্প পড়ে। "আকাশের আতঙ্ক" আর "মঙ্গল বৈরী" মত গল্প যে কোন ভাষাতেই সমাদৃত হবে। শুধু গল্পের বিষয়বস্তুতেই নয় গল্প বলার ভঙ্গীতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রতি গল্পেই নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। "রামরাজ্যে বিদ্রোহ" আর "নিরুদ্দেশ" দুইটি হাসির গল্প কিন্তু তার গড়নে আর বলার ভঙ্গীতে কত তফাৎ। "ইতুন্দ পুতুন্দ" আর "ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা" দুইটি রূপকথা, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নতুন আর অন্যরকম। একই ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি কোথাও নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প আসলে মোটেই ছোট ছেলেদের জন্য লেখা নয়। অন্যেরা লেখেন ছোট ছেলেদের জন্য, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন তাঁর নিজের জন্য। ছোটবেলাকার নানা স্বপ্ন ও কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পগুলি। ছোটদের জন্য আলাদা করে, চেষ্টা করে কিছু লিখতে হয়নি। আর ছোটরাও তাই গল্পগুলো পড়ে কারো কাছে গল্প শুনছে একথা বুঝতে পারে না, মনে করে নিজেরাই এসব ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে। সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিকদেরই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে এই কথাটি—এই "ছেলেবেলাকার খেলাঘরের কাজভোলান দৃষ্টি।"

একেত বইটি একটি সেরাগল্পের সংকলন, তার ওপর আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের, কাজেই কোন গল্পের চেয়ে কোন গল্পকে যে ভাল বলব, ভেবে ঠিক করা মুশকিল। তবে মনে হয় "পঙ্গপাল" গল্পটির জায়গায় "গোপনবাহিনী" গল্পটি স্থান পেলে ভাল হ'ত। আরও দুটি গল্পের অভাব কিছুতেই ভোলা যায় না—"অপরূপ রূপকথা" আর "পরীরা কেন আসে না"। এই বইটিতে বিভিন্ন ধরণের গল্প পরিবেশনের দিকে বোধ হয় সংকলকের দৃষ্টি ছিল, হয়ত স্থানাভাবে এই গল্পগুলি বাদ পড়েছে। তাই আবার বলতে হয়, শুধু এই একটি সংকলনই যথেষ্ট নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের আরও সংকলন প্রয়োজন। শেষকালে প্রকাশককে এরকম চমৎকার একটি বইয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাই, তবে একথাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে বইয়ের মলাট, আর ছবি আরও ভাল করা উচিত।

জল—লেখক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৯৩নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালার ষষ্ঠ পুস্তক।

পৃথিবীতে এমন প্রাণী বা উদ্ভিদ নাই যাহারা জল ব্যবহার করে না। জলের সহিত আমাদের নিরন্তর পরিচয়, জল বিনা আমাদের চলে না। আমরা যে পরিমাণ ও যেভাবে জল ব্যবহার করি সেই পরিমাণে কিন্তু জলের সংবাদ রাখি না অথচ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে জল সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। পুস্তকখানিতে রোগবাহী জল সম্বন্ধে যে-কোনো জল পান করিতে কি প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত থাকিলে ভাল হইত। ছাপা উৎকৃষ্ট। ৩১৩।৫০

মহেন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী—মহেন্দ্র-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। প্রাপ্তিস্থান—ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ, ৩০/৬সি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা—১৪।

ভারতীয় দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদকে যে সব মনীষী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন, আচার্য মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি মহেন্দ্র-জয়ন্তী গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। এখানা মহেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ-জীবনী নয়; তথাপি মহেন্দ্রনাথের তপঃপ্রভাবপূর্ণ শুদ্ধ জীবনের মূলে যে প্রাণরসের আপ্যায়ন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে উৎসারিত হইয়া তাঁহার মনীষার প্রোজ্জ্বলতাকে প্রভাবিত করিয়াছে, গ্রন্থের আলোচনায় অন্তরে তাহার স্পর্শ পাওয়া যায়। এইভাবে মহেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনার ধারাটি ইহাতে ধরা যায় এবং সমগ্রভাবে বাঙলার এই মনীষিপুরুষকে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। বস্তুত এমন জীবন ও সাধনায় কর্মবহুল আড়ম্বর বেশী থাকে না। পরন্তু আত্ম-সমাহিত উদার অনুভূতির প্রভাবে তাহা মানুষের মহত্ত্বকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। মহেন্দ্রনাথের জীবন এমনই সংযত, সুসমাহিত এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধির আগ্রহ ও এষণার তাঁহার কর্মজীবন সুসম্ভৃত। মহেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সিলভাঁ লোভ, বার্গসোঁ, রোমা রোঁলা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা গ্রন্থখানাকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সত্যানু-সন্ধিৎসার জাগ্রত চেতনায় বাঙলার এই মনীষীর একান্ত সাধনায় ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের যে অমৃতত্ত্ব উন্মুক্ত হইয়াছে, মহেন্দ্র-জয়ন্তী সমিতি আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশের দ্বারা দেশবাসীকে তাহা আস্বাদের সুযোগ দান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। ৩৩৪।৫০

বাঙলার পাঁচজন ঔপন্যাসিক—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসমীরকুমার বসু, ৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৩। মূল্য—১৷৷০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সমালোচনামূলক। অন্নদা-শঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র সেন—এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের অবদানের সম্বন্ধে গ্রন্থখানাতে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়া লইয়াছেন যে, এই পাঁচজনের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট, সে বিচারের চেষ্টা তিনি করেন নাই। বাঙলার উপন্যাস-সাহিত্যে ইঁহাদের

পাঁচজনের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তিনি তাহারই বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বাঙলার সমাজ-চেতনা এবং বেদনাকে আশ্রয় করিয়া বাঙলার উপন্যাস-সাহিত্য যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাতির জীবন-দর্শনে উন্মুক্ত করিতে চলিয়াছে, তিনি তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহার মতে এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের রচনায় বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে সাধারণভাবে একটি ঐক্যও রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে গ্রন্থকার বাঙলাদেশের ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় ৫ জন সাহিত্যিকের বিষয় আলোচনা করিয়া বাঙলার অতি-আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের মর্মকথাটি উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের রচনাশৈলীর দক্ষতা এবং জাতির প্রাণ-রহস্য উন্মোচনে তাঁহাদের সংবেদনশীল মননের গভীরতার পরিচয় তিনি দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙলার জনজীবনের স্বাভাবিক গতি ও স্ফূর্তির ধারাটি তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন; বস্তুত শক্তিশালী সাহিত্যের এই ধারাটির সঙ্গে নিবিড় স্পর্শের রঙ্গময় ভঙ্গীতেই জাতির অন্তরে নব সৃষ্টির সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া থাকে। সুনীলবাবুর সমালোচনা চিন্তাশীল সমাজের সাহিত্য-রসোপলব্ধির পক্ষে সাহায্য করিবে এবং জাতির প্রাণধর্মকে সমাজজীবনে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে আনুকূল্য বিধান করিবে।

শ্রীবৃন্দাবনলীলা—লেখক "ভাই"। প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ গুহ, সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১১৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ১২/১, কালিদাস পাতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা—২৬।

কৃষ্ণলীলাকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুত পুরাণাদিতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকে লেখক তত্ত্বের দিকে লইয়া গিয়াছেন। তত্ত্বের বিচারে অনেক ক্ষেত্রে শুধু কথা বাড়ে; চিত্তে ব্যথা জাগে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণলীলারসের আস্বাদনে কৃষ্ণের জন্য ব্যথা জাগিলে আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্বই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা কৃষ্ণলীলায় আত্মনিবেদনোন্মুখ হইতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে তত্ত্ববিচার অবশ্য মন্দ নয়। তাঁহারা গ্রন্থকারের আলোচনা পাঠে উপকৃত হইবেন।

গীতা-লিপি—লেখক "ভাই"। প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ গুহ, সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১১৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২/১, কালিদাস পাতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য—দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকখানি পুস্তক ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গীতা-লিপি পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইলাম। 'আমি—আমার' এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মনিবেদনই গ্রন্থকারের মতে গীতাধর্মের তাৎপর্য। মায়াতত্ত্ব শীর্ষক আলোচনাতে গ্রন্থকার এই তত্ত্বটি সংক্ষেপের মধ্যে অথচ অতি সহজভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গীতা-লিপির আলোচনা বিশদ এবং সে আলোচনা বেশই বিস্তৃত। গ্রন্থের জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য যোগ প্রভৃতি আলোচনাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের অপেক্ষা অন্তর-ধর্ম বিকাশের অধিক অনুরাগী। সর্বজনীন উদারতাকে তিনি ত্যাগ ও সেবার পথে সত্য করিয়া তুলিবার উপর জোর দিয়াছেন। গীতা-লিপির আলোচনায় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ৩৩১।৫০

ক্ষুধিত ঈশ্বর—করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—হিন্দুস্থান লাইব্রেরী, করিমগঞ্জ, কাছাড়। মূল্য—এক টাকা।

কবিতার বই। লেখক তরুণ। তাঁহার লেখায় মানবতার একটা অগ্নিময় আবেগ মনকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। তাঁহার সুর বলিষ্ঠ, সহজ এবং সতেজ। কবির আঘাত তীক্ষ্ম এবং ক্ষুরধার। শোষিত এবং নিপীড়িত মানবসমাজের প্রতি নবীন কবি বিদ্রোহের যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার আন্তরিকতা সত্যই অগ্নিগর্ভ। উল্লেখযোগ্য এই যে, কবিতাগুলির ভাষার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নাই এবং আধুনিক অনেক কবিতার মত উৎকট মস্তিষ্ক সঞ্চালনের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্লিষ্ট করিয়া সেগুলির রসধর্মকে উপলব্ধি করিতে হয় না। ৬।৫১

শকুন্তলা—সতীন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। মূল্য আড়াই টাকা।

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য অভিজ্ঞান শকুন্তলা ভারতের একখানি জনপ্রিয় নাটক। মহাভারতের এই অনবদ্য প্রেমোপাখ্যান লইয়া কালিদাস যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা মূল রসের সহিত বাঙলার কিশোর কিশোরীদের পরিচয় সমাধানের জন্য আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অতি যত্ন সহকারে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মূল কাহিনীটি গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের রচয়িতা শিশু-সাহিত্যের একজন পাকা লেখক শুধু নন, একজন পাকা শিল্পীও বটে। কাহিনীর মূল ঘটনাগুলি অবলম্বনে পাতায় পাতায় বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং তারমধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তিনখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী চিত্র। ইহা ছাড়া ১৫খানা হাফটোন একরঙা ছবিও গ্রন্থে রহিয়াছে যাহার সবগুলিই গ্রন্থকারেরই স্বহস্তে অঙ্কিত। ছবিগুলির আবেদন রেখায় ও রঙে যেমন প্রাণবন্ত হইয়াছে, লেখকের রচনাভঙ্গিও তেমনই জীবন্ত ও সাবলীল। কিশোর কিশোরীদের হাতে তুলিয়া দিবার মত এমন একখানি সচিত্র গ্রন্থ সচরাচর নজরে পড়ে না, সেই দিক দিয়া আলোচ্য গ্রন্থটি একখানি সার্থক সৃষ্টি। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ১১।৫১

রঙ্গজগৎ

বাঙলা ছবির নয়া অভিযান

গত বছর বাঙলা ছবি নিঃসাড়ে একটা কীর্তি স্থাপন করে বসেছে। এটা সবায়ের দৃষ্টিতে এনে দেওয়া দরকার, বিশেষ করে, বাঙলা ছবির বাজার-চল্ বিষয়ে যারা একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে তাদের চোখের সামনে। ঘটনাটি খুবই উৎসাহোদ্দীপক।

গত বছর কলকাতা অঞ্চলে যে ১৭১ খানি ভারতের তৈরী ছবি মুক্তিলাভ করে, প্রথম মুক্তিতে তাদের প্রদর্শনকালের সমষ্টি হচ্ছে ২০৬৪·৫০ সপ্তাহ। এর মধ্যে বাঙলা ছবিগুলি মিলে দখল করেছে ৮৮১ সপ্তাহ অর্থাৎ মোট সমষ্টির শতকে ৪৭·৬৮ পারসেণ্ট। স্বতন্ত্রভাবে একএকখানি ছবির হিসেবেও বাঙলা ছবির প্রতিখানির গড়পড়তা চলার হার হচ্ছে ২১·৫ সপ্তাহ, আর তার সঙ্গে তুলনায় হিন্দী ছবির গড়পড়তা চলার হার হচ্ছে মাত্র ৯·৬২ সপ্তাহ। একথাটাও এখানে মনে রাখতে হবে যে, বাঙলা ছবি জনপ্রিয়তার কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা মাত্র ৪৩ খানি ছবি নিয়ে, অর্থাৎ হিন্দী ছবির ধরতে গেলে, এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক। বাঙলা চিত্রশিল্পের এ একটা মস্ত আশার কথা।

গত বছর (১৯৪৯) পর্যন্তও হিন্দী ছবির প্রদর্শনকাল সমষ্টি বাঙলা ছবির প্রায় দ্বিগুণ ছিলো। এবার (১৯৫০) বাঙলা ছবি গতবারের চেয়ে সংখ্যায় কম হয়ে প্রদর্শনকালের দীর্ঘতায় হিন্দী ছবির প্রায় পাশে এসে যে দাঁড়াতে পেরেছে তার কারণ দুটি। দুটি কারণই বিষয়বস্তুর দিক থেকে। কারণ দুটি হচ্ছে হিন্দী ছবির নিদারুণ অধঃপতন, আর দ্বিতীয়, বিষয়বস্তুতে বাঙলা ছবির সমৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা।

বিগত বছর-কতক ধ'রে বম্বের ছবি গানে, গল্পে, আঙ্গিক সাজ-পোষাকে ছলনা ও চটুলতায়, ইৎরমো আর দুশ্শীলতার সম্ভারে বোঝাই হ'য়ে বাঙলার ছবিকে বাঙলা দেশেও কোণঠাসা ক'রে ফেলেছিলো। বাঙালী দর্শক ফেটে পড়ছিলো হিন্দী ছবির সিনেমায় সিনেমায়। কিন্তু দেখা গেলো, এখানকার দর্শকদের রুচিকে বম্বের ছবি শেষ পর্যন্ত ধ'রে রাখতে পারলে না। বম্বাই ছবির অসারত্ব এবং কেবলমাত্র যৌনাবেগতোষণের কুৎসিত প্রকৃতি দর্শকদের কাছে ধরা পড়ে গেলো। শহরমোড়া প্রাচীর-পত্র, কাগজের পাতাভরা বিজ্ঞাপন, এমন কি, বিশিষ্ট তারকাদের সশরীরে উপস্থিতি, কোন কিছুই এখন তাদের ফের ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। দর্শকরা এখন ধারণা পাকা ক'রে নিতে আরম্ভ ক'রেছে যে, বাঙলা ছবির অতি নিকৃষ্টখানিতেও যেটুকু সার পাওয়া যায়, এখনকার বম্বের সেরা ছবিও সেটুকু থেকে তো বঞ্চিত করেই, উপরন্তু কৃত্রিম প্রকরণের সাহায্যে শিরায় শিরায় এমন একটা উত্তেজনার প্রবাহ সৃষ্টি করিয়ে দেয় যা সুস্থতাকে অহেতুক বিরক্ত ক'রে তোলে।

আরও একটা বিশেষভাবে প্রণিধান করবার বিষয় হ'চ্ছে যে, বাঙলা ছবির এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ঘটেছে কোনরকম কৃত্রিম প্রচারযন্ত্রের বিনা সাহায্যেই—একেবারেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বরং গত দু'বছর ধ'রে বাঙলা ছবির প্রযোজকরা ছবির প্রচারে দৃঢ়তার সঙ্গেই সংযম অবলম্বন ক'রে আসছেন। কাজেই বাঙলা ছবির এই জনপ্রিয়তা, এ শুধু ছবির গুণের জোরেই হ'তে পেরেছে। আর সত্যিই, বাঙলা চিত্রশিল্পের বড়াই করার মতো গত বছর পাওয়াও গিয়েছে বেশ কয়েকখানি। "বাণপ্রস্থ", "মাইকেল", "বিদ্যাসাগর", "পহেলা আদমী", "রূপকথা" ও "তথাপি" কেবলমাত্র চিত্রশিল্পের ইজ্জৎই বাড়ায়নি, সেই সঙ্গে "কঙ্কাল", "বৈকুণ্ঠের উইল", "মেজদিদি" প্রভৃতি বাঙলা ছবির ভূতপূর্ব দর্শকদের বম্বাই ছবির মোহ ভাঙিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, এ ছবিগুলিকে বরণ ক'রে নিয়ে দর্শকরা চিত্রনির্মাতাদের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত ক'রতে পেরেছে। দর্শকদের উৎসাহই হ'চ্ছে চিত্রশিল্পের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ ও প্রেরণা। তাকে এমনিভাবে জাগিয়ে রেখে দিতে পারলে বাঙলা চিত্রশিল্প শত দুর্গতিকেও অতিক্রম ক'রে যেতে পারবে।

গত বছরের অভিনয়

গত বছরের বাঙলা ছবিগুলি তৈরীর দিক থেকে দু একখানি ছাড়া দৈন্যদশারই পরিচয় দেয়। আয় কমে যাওয়ায় চিত্রনির্মাতারা খরচ কম করার দিকে তৎপর হ'য়েছেন এবং তৎপরতা এতদূর পৌঁচেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনকেও অবহেলা ক'রে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু গত বছরের ছবির মান বাড়িয়ে দিয়েছে গল্পের দিক আর সেই সঙ্গে অভিনয়। কোন ছবির ক্ষেত্রেই একেবারে বাজে অভিনয় বড়ো একটা দেখা যায়নি, বরং অধিকাংশ ছবিতেই অভিনয় প্রাণবন্ত বা চরিত্রানুগই দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

বেশ চৌকশ সামঞ্জস্য রেখে অভিনয়ের সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য—গত বছর অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্য তাঁরই। 'কঙ্কাল', 'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে', 'পথহারার কাহিনী', 'একই গ্রামের ছেলে' ছবি চারখানিতে প্রধান দ্রষ্টব্য হয়েছে ও'র অভিনয়। সাধারণের কাছ থেকে তিনি তার জন্যে সম্বর্ধনা লাভ ক'রেছেন এবং সেটা যোগ্য সমাদরই হ'য়েছে। আর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 'বিদ্যাসাগরে' নাম ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল এবং 'মাইকেলে'র নাম ভূমিকায় নবাগত উৎপল দত্ত। জীবনী চিত্র দুখানি বছরের সেরা অবদান হ'য়ে ওঠার জন্যে এদের কৃতিত্বই হ'চ্ছে সবচেয়ে বেশী। এরা ছাড়া চট ক'রে মনে পড়ে যায় যে ক'টি অভিনয় তা হচ্ছে 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'সহোদর', 'কাঁকনতলা'য় 'বাণপ্রস্থে' জহর গাঙ্গুলী, 'সমর'-এ অশোককুমার, 'দ্বৈরথে'-এর একটি দৃশ্যে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে '১০৯ ধারা'য় তুলসী চক্রবর্তীকে 'মানদণ্ড' ও 'দ্বৈরথে' বীরেশ্বর সেনকে, 'মেজদিদি'-তে সকুরকে, আর 'তথাপি'তে-তে সুনীল দাশগুপ্তকে। এসব অভিনয়গুলো না ভাবতেই মনে পড়ে যায়।

নারী চরিত্রের অভিনয়ে এ বছরের সেরা কৃতিত্ব হ'চ্ছে 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'মেজদিদি', 'বাণপ্রস্থ' ও 'কৃষাণ' চিত্রে রেণুকা রায়ের। 'বাণপ্রস্থ' ও '১০৯ ধারায়' মলিনার অভিনয়ও বহুকাল স্মরণে থাকবে। নবাগতা প্রণতীর 'তথাপি'তে মূক অভিনয় যে কোন শিল্পীরই গৌরব। হঠাৎ মনে ক'রতে গেলে প্রথমেই মনে জাগে 'মাইকেল' চিত্রে মিরিয়াম স্টার্ককে; 'সুধার প্রেমে' বাসন্তীকে—এরাও দুজনেই নবাগতা এবং বেশ গভীর ছাপ দিয়েছেন। আর যাদের মনে পড়ে তারা হ'চ্ছেন '১০৯ ধারায়' স্মৃতিকে, 'বিদ্যাসাগরে' শোভাকে, 'সহোদরে' সিপ্রাকে, 'অমর' চিত্রে রুমাকে আর 'রূপকথা'য় অসিতাকে।

এক বছরের মধ্যে এতো জনের অভিনয় যে হঠাৎ মনে ক'রতে পারা যায়, যে কোন দেশের চিত্রশিল্পের পক্ষেই এটা পরম গৌরবেরই বিষয়। অভিনয়ের উন্নতি ছবির মান উঁচু হওয়ারই প্রমাণ দেয়।

খেলাধূলা

স্টেডিয়াম

ভারতীয় ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের পরিকল্পিত তিনটি স্টেডিয়ামের মধ্যে দিল্লীর 'জাতীয় স্টেডিয়ামে'র নির্মাণকার্য শেষ হইয়া উদ্বোধন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই স্টেডিয়ামের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা খুবই আনন্দদায়ক ও উৎসাহবর্ধক। তিনি বলিয়াছেন, "এই স্টেডিয়ামকে মনোনীত বা নির্বাচিত কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া সাধারণে যেন ধারণা না করেন, ইহা সর্বসাধারণের। এইভাবে শারীরিক পটুতার প্রয়োজনীয়তা ভারতের প্রতি শহরে ও গ্রামে প্রচারিত হউক।"

ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের পরিচালকগণ প্রধান মন্ত্রীর উক্তি অনুযায়ী যদি কার্য করেন খুবই মঙ্গলের কারণ হইবে। জানি না পরিচালকগণ ঠিক এইরূপ মনোভাবের পরিচয় ভবিষ্যতে দিবেন কিনা। ব্যবসাবুদ্ধি ইহাদের একেবারেই নাই ইহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

স্টেডিয়াম উদ্বোধন সময় মাননীয় মন্ত্রীর অন্তরে দেশের সকলের শারীরিক পটুতার কথা স্মরণ হইয়াছিল দেখিয়াও আমরা অনেকখানি আশ্বস্ত হইলাম। ভবিষ্যতে ইহার ব্যাপকতার জন্য বিধিব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলে আরও আনন্দিত হইব। সরকারের তরফ হইতে এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি যে দেওয়া হইয়া থাকে না ইহা উল্লেখ করিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইতেছে না।

ক্রিকেট

ভারত বনাম কমনওয়েলথ দলের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচ আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে কানপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই খেলার ফলাফলের উপর এইবারের টেস্ট পর্যায়ের জয় পরাজয় বিশেষভাবেই নির্ভর করিতেছে। কমনওয়েলথ দল খেলাটিতে বিজয়ী হইতে না পারিলেও অমীমাংসিতভাবে শেষ করিবারই চেষ্টা করিবে এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। অপর দিকে ভারতীয় দল সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জয়ী হইবার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। এই বিষয় সম্প্রতি বেতার বক্তৃতায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট ও উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার দলের সকলেই যাহাতে খেলা সম্মানজনক অবস্থায় শেষ হয় তাহার জন্য সব প্রকার প্রচেষ্টা করিবেন। ইহার উক্তির পরিচয় খেলার সময়ই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতেই ভারতীয় দল বিজয়ী হইবেই বলিয়া ধারণা করা অন্যায় হইবে। খেলাটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হইবে এইটুকু আশা করা অন্যায় হইবে না। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী হঠাৎ পূর্ব রীতি অনুসরণ না করিয়া কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট দলে গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হইল। ইতিপূর্বে এই নীতি অনুসরণ করিলেই ভাল হইত। বর্তমানের খেলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় পরীক্ষামূলক কোন নীতিই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্য আমাদের আশঙ্কা হয় ভারতীয় দল হয়তো বা অভিষ্ট লাভে সক্ষম না হইতে পারে। যদি সফলকাম হয় খুবই আনন্দের বিষয়। আমরা আশা করি তরুণ খেলোয়াড়গণ যাঁহারা দলে স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই দৃঢ়চিত্তে নিজ নিজ সাধ্যমত দলকে সাহায্য করিবেন। নিম্নে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলার ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

(১) বিজয় মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), (২) বিজয় হাজারে (সহঃ অধিনায়ক), (৩) এস মুস্তাক আলী, (৪) বিনু মানকড়, (৫) ডি জি ফাদকার, (৬) পি আর উমরিগার, (৭) এইচ গাইকোয়াড়, (৮) রাজেন্দ্রনাথ (উইকেট রক্ষক), (৯) এম আর রেগে (১০) সি ডি গোপীনাথ, (১১) জি এস রামচাঁদ।

দ্বাদশ ব্যক্তি:—কিষেণচাঁদ।

অতিরিক্ত: এন চৌধুরী ও পি এস যোশী।

কানপুরের খেলা ঘাসের মাঠে হইবে

কমনওয়েলথ দলের ভ্রমণ আরম্ভের পূর্বে ও পরে বহুবারই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ এস ডিমেলো প্রচার করেন যে, কানপুরের টেস্ট ম্যাচ ম্যাটিং উইকেটেই হইবে। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমারের নিকট হইতে জানা গেল পূর্ব প্রচারিত সংবাদ ঠিক নহে খেলা ঘাসের মাঠেই হইবে। এই মাঠ নূতনভাবে একজন বিশেষজ্ঞ নির্মাণ করিয়াছেন। দীর্ঘ চারি মাস সাধারণকে এইরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী রাখিবার কি যে কারণ থাকিতে পারে আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় উক্ত মহারাজকুমারই কয়েকমাস পূর্বে এক বিবৃতিতে প্রচার করিয়াছিলেন যে, অভিনব পদ্ধতিতে কানপুরের ম্যাটিং পিচ গঠন করা হইতেছে। হঠাৎ করে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া ঘাসের মাঠের আয়োজন করা হইল তাহা তিনি কেন প্রচার করিতে বিস্মৃত হইলেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুরুতর দায়িত্ব পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সাধারণে এইরূপ আচরণ নিশ্চয়ই আশা করে না।

কমনওয়েলথ বনাম মহীশূর রাজ্য দল

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভ্রমণের ২৩নং খেলায় মহীশূর রাজ্য একাদশ দলকে শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে পরাজিত করিয়া ভ্রমণের একাদশ জয়লাভে সক্ষম হইয়াছেন। ক্রীতি খেলোয়াড় ওয়ার্সেল হঠাৎ পিঠের মাংসপেশীতে টান লাগায় তিনি খেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কমনওয়েলথ দল বিজয়ী হইয়াছেন। মহীশূর রাজ্য দল সম্পূর্ণ স্থানীয় খেলোয়াড়দের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া কমনওয়েলথ দলের বিশেষ কৃতিত্বের কিছুই হয় নাই। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহীশূর রাজ্য একাদশের প্রথম ইনিংস:— ১৩৭ রাণ (রামদেব ৫৫, চৌধুরী ২৪, থিম্মায়া ২১ রাণ নট আউট, ট্রাইব ৫০ রাণে ৫টি, ডুল্যাণ্ড ৩৫ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস:—২৬০ রাণ (এমস ১১০, সাটক্লিফ ৬০, কস্তুরীরঙ্গম ৪৮ রাণে ৩টি, কৃষ্ণস্বামী ৫৮ রাণে ৪টি, থিমাপ্পিয়া ২০ রাণে ২টি উইকেট পান।)

মহীশূর রাজ্য একাদশের দ্বিতীয় ইনিংস:— ১৫৭ রাণ (শ্রীনিবাসম ৪৬, থিমাপ্পিয়া ১৪, ডুল্যাণ্ড ৭৮ রাণে ৮টি, ট্রাইব ৪৩ রাণে : উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস:- উইঃ ৩৫ (স্টিফেনসন নট আউট ২১, এমেট আউট ১৪, কস্তুরীরঙ্গম ১২ রাণে ১টি উইকে পান।)

ভারোত্তোলন

বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম দীর্ঘকাল হইতে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিতেছে ইতিপূর্বে এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগি পরিচালনা করিতেন। সম্প্রতি উক্ত প্রতিযোগিত নাম পরিবর্তন করিয়া পরলোকগত সার আর (মুখার্জির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার " "রাজেন্দ্র প্রতিযোগিতা" নামে অভিহিত করিয়াছে নিখিল ভারত ভারোত্তোলন ফেডারেশনের অধিকা সভ্য উক্ত প্রতিযোগিতার সহিত জড়িত থাক এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের ভারতীয় । নির্বাচনের ক্ষেত্র হিসাবেই প্রতিযোগিতাটি পরি চালনা করেন। ইহার ফলে ভারতের সকল রাজে বিশিষ্ট ভারোত্তোলনকারীরা বাধ্য হইয়াই রাজে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তবে আল আলোচনা হইতে যতদূর দেখা যায় অন্যান্য প্রদেশে ভারোত্তোলনকারীগণ খুব আনন্দের সহিত ইহা যোগদান করেন নাই। তাঁহাদের অনেকে বলিতে শুনা যায় "নিখিল ভারত প্রতিযোগিত ব্যবস্থা করিলেই হইত এইভাবে জোর ক আইনের বলে যে কোন প্রতিযোগিতাকে নিখি ভারত পর্যায়ে উন্নীত করা কখনই সমীচীন । নাই।" এই বিষয় নিখিল ভারত ভারোত্তোল ফেডারেশনের পরিচালকগণই আলোচনা করি বিহিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াই আমাদের ধারণ আমরা এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দি বাঙলার ভারোত্তোলনকারীগণ কোন স্তরে আছে তাহা জানিতে পারিলাম ইহাতেই আমরা সন্তু বাঙলার ভারোত্তোলনকারীদের এখনও দীর্ঘ সাধনা করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমকক্ষ হই হইবে এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। প্রতিযোগিত বোম্বাইর প্রাধান্যই বিশেষভাবে চোখে পড়িয়াছে ইহার পরই মাদ্রাজের। বাঙলার গুরুভার ওজ ব্যায়ামবীরগণ যে আন্তরিকতার সহিত সা করেন না ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে ভারতীয় দল নির্ব করা হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙলার কয়েকজন স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে অন্য সকলে সন্ হইলেও আমরা বলিতে কোনরূপ দ্বিধা (করিতেছি না যে, বাঙলার একজনেরও দলে স্ পাওয়া উচিত ছিল না। নির্বাচকমণ্ডলীতে স্ আছে বলিয়াই জোর করিয়া নিজ রাজ্যের ব্যা বীরের স্থান করিয়া দিতে হইবে ইহা আ সমর্থন করিতে পারিলাম না। ভারতের সম্ যে প্রতিযোগিতার সহিত জড়িত তাহার নির্ব সময়ে উপযুক্ত লোক মনোনীত করাই যুক্তিসঙ্গ

নিম্নে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের ভারত দলের মনোনীত ভারোত্তোলনকারীদের তালি প্রদত্ত হইল:—

ব্যাণ্টম ওয়েট

আর এস দেশাই (বোম্বাই), কে এস কানাই (মাদ্রাজ), ভি ডবলিউ ফেনানি (বোম্বাই), এস সরকার (বাঙলা)।

ফেদার ওয়েট

জি জি সেথুরমন (মাদ্রাজ), কে ভি থির লাইয়া (দক্ষিণ মাদ্রাজ), আর বি নেটো (বাঙ এবং অপর একজন প্রতিযোগী।

লাইট ওয়েট

ডি পি মণি (দক্ষিণ মাদ্রাজ), বৈদ্যনাথ ঘোষ (বাঙলা), এম এ রঙ্গস্বামী (দক্ষিণ মাদ্রাজ), ডোবিয়াস ইরাণী (বাঙলা)।

মিডল ওয়েট

গুরুদেব সিং (দিল্লী), এস বি ইরাণী (বোম্বাই), জোসেফ এলেক (বাঙলা), সি এইচ শেষ্যাগিরিয়াও (অন্ধ্র)।

লাইট হেভী ওয়েট

এন কে নায়ার (বোম্বাই), জে ডি তেলাং (বোম্বাই), ই রেজোরিও (বোম্বাই), সুধীন্দ্র চৌধুরী (বাঙলা)।

মিডল হেভী ওয়েট

কে ঈশ্বর রাও (অন্ধ্র), এম পি ঘোলে (বোম্বাই), বি বি ব্যান্ডো (বাঙলা)।

হেভী ওয়েট

ডি আর গোপাল (অন্ধ্র)।

"ভারত শ্রী" দেহগঠন প্রতিযোগিতা

দেহগঠন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে ভারোত্তলনকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাজেন্দ্র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার পরিচালকগণ নিখিল ভারত "ভারত শ্রী" দেহগঠন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ভারতে এই ধরণের প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইল। খুবই আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে, এই প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের পরাজিত করিয়া বাঙলার প্রতিনিধি পরিমল রায় শ্রেষ্ঠ দেহী হিসাবে পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালে অমরাবতীতে নিখিল ভারত শারীরিক শিক্ষা সম্মেলনে এইরূপ দেহগঠন প্রতিযোগিতা হইলে বাঙলার প্রতিনিধি মনোতোষ রায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পুনরায় বাঙলার প্রতিনিধি সাফল্যমণ্ডিত হইলেন ইহা সত্যই সুখের বিষয়। নিম্নে "ভারত শ্রী" প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

১ম শ্রেণী (সাড়ে ৫ ফুট পর্যন্ত)—১ম—পরিমল-কুমার রায় (বাঙলা); ২য়—কে ঈশ্বর রাও (অন্ধ্র); ৩য়—বি ই বুলসারা (বোম্বাই)।

২য় শ্রেণী (৫ ফুট ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত)—১ম—রাসমোহন ব্যানার্জি (বাঙলা); ২য়—আরনল্ড ইলিয়াস (বাঙলা); ৩য়—ডি গোপাল (অন্ধ্র)।

৩য় শ্রেণী (৬ ফুট পর্যন্ত)—১ম—জনার্দন রাও (বাঙলা)।

সর্বশ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিযোগিতা—১ম— পরিমল রায় (বাঙলা)।

আলোচনা

"নবযুগের কাব্য"

১১শ সংখ্যায় দেশে প্রকাশিত 'নবযুগের কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমার মত-দ্বৈধতা না থাকলেও তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লেখক যে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করেছেন—আমি সেগুলি সমর্থন করতে পারছি না।

প্রথম—প্রাচীন সাহিত্য সমাজ বা ধর্ম-সংস্কারকে লেখক সঙ্কীর্ণ ও ব্যক্তিত্বের প্রসার-শূন্য বলে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। চাঁদসদাগরের কাহিনীর অবতারণা করে তিনি বলেছেন—"কল্পিত ধর্ম-সংস্কারে মানুষ স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেছে......ভাবের এই সঙ্কীর্ণতার কারণ সমাজ-জীবনের সঙ্কীর্ণতা। ......আত্মবিশ্বাসী বাঙালী সমাজে কেমন করে হবে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব?"

লেখক যে মনোভাব নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যকে সমালোচনা করবার চেষ্টা করেছেন, নিশ্চিতই সে মনোভাব অত্যধিক পাশ্চাত্ত্য-প্রীতির অনুকরণে পুষ্ট। মধ্যযুগের বা মুসলমান সংস্পর্শে হিন্দু তথা বাঙালী-মানসের প্রগতিশীলতা কিছুটা স্তব্ধ হয়ে থাকলেও কোনদিন বাঙালীমানস আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকেনি—সঙ্কীর্ণ হয়ে ত' নয়ই। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই জাতীয় মানসের প্রগতিশীলতা বাঙালী-জীবনে অসম্ভাব্য পরিবর্তনের সূচনা দিয়েছে। বেহুলার কাহিনীতে দেবতার প্রকোপ যেমন অমোঘ, মানুষের ব্যক্তিত্বও তেমনি অমোঘ। মনসাদেবী তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চাঁদের সবক'টি সন্তানকে হত্যা করেও চাঁদের মনোভাবকে এতটুকু নত করতে পারেন নি। পরিশেষে পরাজয় প্রায় স্বীকার করে নিয়েই তাঁকে আপোষে চাঁদের বাঁম হাতের অর্ঘ্য নিতে হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, সেই ধর্মান্ধ যুগের মধ্যে থেকেও লেখক কিভাবে দেবতার মহত্ত্বকে মানুষের চেয়েও নীচে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। লখিন্দরের জীবন-প্রাপ্তিতে কাব্যের ট্রাজিক-রস হয়ত নষ্ট হতে পারে; কিন্তু তার চেয়েও বড়—যা তাঁর প্রতিপাদ্য ছিলো, তাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে চাঁদের দুর্বার ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে বেহুলার সাধনা ও মাধুর্যের ও প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাঙালীমানস যে কত প্রগতিশীল ছিলো, তার পরিচয় এই বৈষ্ণব সাহিত্য। আশ্চর্য বর্তমান লেখক এখানেও ভারতীয় সাহিত্যকে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। যথা—"পদাবলীর দেহাতীত প্রেমের সাধনায় স্বাতন্ত্র্য আর থাকে নি......পার্সোন্যালিটির যে স্পর্শ সাহিত্যকে জীবন্ত করে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তা পাই না।"

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অনুরোধ করতে হচ্ছে লেখককে—বৈষ্ণব সাহিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ুন। বৈষ্ণব সাহিত্যের রস অত সহজবোধ্য নয়। লেখক বোধ হয় দেখার চেষ্টা করেন নি যে, দেবতার প্রেমকে সে যুগের কবি ঘরের মধ্যে টেনে এনেছেন। নিজেকে স্থাপিত করেছেন প্রেমিকরূপে, তাঁদের বিরহী চিত্তের মর্মজ্বালা যে কত জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের কাব্য—

সখি, বলিতে বিদরে হিয়া,
আমারি বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।

এর চেয়েও তীব্র বেদনারসকে, এর চেয়েও গভীর মর্মজ্বালাকে যে লেখক পাশ্চাত্ত্য কাব্যের কোথায় আবিষ্কার করেছেন, তা জানি না। তবে ভারতীয় কবিরা দেহকে সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেন নি। লেখকেরও ত' সেখানেই আপত্তি, কারণ হিন্দু-দর্শন প্রাচীন যুগে যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, বহু পথ পরিক্রম করে পাশ্চাত্ত্য-দর্শন আজ সেইদিকেই চলেছে। প্রাচ্য-দর্শন আত্মা ও দেহ, বস্তু ও বস্তুর অতীত চিদ্-শক্তিকে অভিন্ন করে দেখেছে। গীতার দর্শনই এই সমন্বয় রূপের সাক্ষ্য বহন করে। তবে মায়াবাদের প্রভাব ভারতকে আরও বেশি আচ্ছন্ন করেছিলো বলেই বস্তুর অস্তিত্ব আস্তে আস্তে আমাদের কাছে অলীক হয়ে আসে। পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদ নিঃসংশয়ে প্রাচ্য গোঁড়ামির বুকে ধাক্কা দিয়ে নতুন সূর্যোদয়কে সম্ভব করেছে।

দীর্ঘ আলোচনা প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়। দেশ-সম্পাদক অনুমতি দিলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। শুধু আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেই এ আলোচনা শেষ করবো। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবমুগ্ধ লেখক রামচন্দ্রকে অন্যায় ও অশোভন মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে "রামচন্দ্র দেব-নির্ভর আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল জীর্ণ প্রাচ্য-সংস্কার।"

লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় এখানে পেলাম না। জানকীর বিসর্জনে মহাকবি রামচন্দ্রের লোকভীতি বা সংস্কারপ্রবণতাকে দেখাতে চান নি। আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রাজা বা জনগণের প্রতিভূকে রাষ্ট্রের নগণ্যতম প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য বুকের রক্ত ক্ষইয়ে প্রিয়তমাকে বিসর্জন দিতে হলো—এর চেয়ে বড় আদর্শ পৃথিবীতে আর কেউ দেখিয়েছেন কিনা, জানি না। এই আদর্শ গান্ধীজীকে মুগ্ধ করেছিলো বলেই তিনি আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে 'রামরাজ্য' বলে প্রচার করতে চেয়েছেন।

অবশ্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য' নিঃসন্দেহে মহাকাব্য। মাইকেলের দুর্জয় প্রতিভার তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক বোধ হয় জানেন না, পাশ্চাত্ত্য ভাবমুগ্ধ মাইকেল গভীর আগ্রহে প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্য পড়েছিলেন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিনবত্বে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সন্তোষকুমার অধিকারী

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২২শে জানুয়ারী—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে পুরাপুরি ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। গত ২০শে জানুয়ারী সভাপতিরূপে জনাব আবদুল্লা হিল বাকীর নির্বাচন বে-আইনী হইয়াছে বলিয়া জানাইয়া লীগ কাউন্সিলের ১৫০ জন সদস্য মূল প্রতিষ্ঠানটির সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। গতকল্য ঢাকা বার লাইব্রেরীতে একটি সভায় বিরোধী দল একটি পাল্টা মুসলিম লীগ কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতায় গণ-চেতনার উচ্ছ্বসিত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সারা-দিনব্যাপী অগণিত অনুষ্ঠানে ভারতের তপঃসিদ্ধ বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে সমবেত লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধাবনত নরনারী নেতাজীর মহান আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে দশ লক্ষাধিক নর-নারীর এক বিরাট সমাবেশ হয়। স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। নেতাজীর সুযোগ্য অনুচর আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ সভায় নেতাজীর পৌরুষমহিমান্বিত জীবনাদর্শ আলোচনা করেন।

২৪শে জানুয়ারী—সমগ্র জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, চীনকে আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে না। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পিকিং-এ নিযুক্ত ভারতীয় দূতের নিকট হইতে আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে আমার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, কোরিয়া ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার জন্য আলাপ আলোচনা চালাইতে কম্যুনিস্ট চীন আগ্রহান্বিত রহিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উত্তর প্রদেশ জমিদারী প্রথা রহিত বিলে সম্মতি দিয়াছেন।

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীনলিনী-রঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে ঐ পরিষদটিকে আইনানুগ প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ অদ্য রাত্রে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় জনসাধারণকে দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত তাঁহাদের সর্ববিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইবার আহ্বান জানান।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিন-দিন ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। আগামী ২৯শে জানুয়ারী ও ৩০শে জানুয়ারী আমেদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন বসিবে, তাহার কার্যসূচী ও প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহূত হয়।

অদ্য বরানগরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শাখা অফিসে এক সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং দুর্বৃত্তেরা নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য ভারতের সর্বত্র অভাবনীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে এক মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বীরত্বের জন্য ৪জনকে স্বাধীন ভারতের বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'পরম বীরচক্র' প্রদান করেন।

২৭শে জানুয়ারী—অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। আগামী ২৯শে জানুয়ারী আমেদাবাদে কমিটির পুনরায় অধিবেশন বসিবে। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতের ঘটনাবলীর ফলে যে গুরু-তর সংকট দেখা দিয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত অথবা কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক শূন্য দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী নেতা ও দায়িত্বশীল নাগরিককে একযোগে কর্মে ব্রতী হইবার আহ্বান জানাইয়া কমিটির আমেদাবাদ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ববঙ্গ হইতে ট্রেনযোগে কলিকাতায় বর্তমান সপ্তাহে নবাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ত্রিশটি পরি-বারের আড়াই শত উদ্বাস্তু নরনারীকে অদ্য শিয়ালদহ মেইন স্টেশন প্লাটফর্মের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র লইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অদ্য যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে প্রত্যহ গড়ে ৯০০ জন করিয়া নূতন উদ্বাস্তু বিভিন্ন ট্রেনযোগে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে জয়নগর থানার অন্তর্গত কুলটলি গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ বিভাগের টহলদারী দলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এক সংঘর্ষের ফলে উক্ত টহলদারী দলের তিনজন লোক নিহত হইয়াছে।

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সন্ধ্যায় নেপালের প্রধান মন্ত্রীর শতাধিক দেহরক্ষী কাঠমাণ্ডুর প্রধান রাজপথে বহু নির্দোষ নরনারী ও শিশুকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। ইহার ফলে অনেকে আহত হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—গতকল্য নয়াদিল্লীতে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির বৈঠকে উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকারের কয়েকটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কয়েকটি নূতন পরিকল্পনা আছে।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে অদ্য তাঁহার জন্মভূমি দেবানন্দপুরে তাঁহার বহু অনুরাগী ও ভক্ত সমবেত হন এবং বাঙলার সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই মরমী শিল্পীর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্র অর্পণ করেন। শরৎচন্দ্র স্মৃতি সমিতি উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ ক

বিদেশী সংবাদ

২২শে জানুয়ারী—চীনা কম্যুনিস্ট গভর্ন অদ্য কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপু নিকট একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনার জন্য রাজনৈ কমিটির অধিবেশন দুই দিনের জন্য মুলতু রাখা হইয়াছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী বি এন রাও চী কম্যুনিস্টদের এই নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করে কম্যুনিস্ট চীন প্রস্তাব করিয়াছে যে, কোরি হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্যাপসারণের নীতি য কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে চীনও তাহ স্বেচ্ছাসৈনিকদিগকে সেখান হইতে সরিয়া আসিব জন্য পরামর্শ দিবে।

কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ইচন, ওসান ওনজু বিমানক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী—নিউগিনির ল্যামিং পর্বতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার ঘটায় হাজারেরও বেশী লোক নিহত হইয়াছে।

২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জ রাজনৈ কমিটিতে গত রাত্রে এশিয়ার ১২টি জা সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সুপারিশ এই যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূরপ্রাচ্য সমস সমাধানকল্পে যথাসম্ভব শীঘ্র পিকিং কর্তৃ প্রস্তাবিত সপ্তজাতি কমিটির বৈঠক হওয়া উচি

৪৮ ঘণ্টা পরে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভু করার প্রশ্ন সম্পর্কে পিকিং সরকারের নূ প্রস্তাব সম্বন্ধে রাজনৈতিক কমিটিতে আলো আরম্ভ হইলে মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ওয়া অস্টিন সরাসরি উহা অগ্রাহ্য করেন।

অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নৌবহর কোরিয়ার প উপকূলবর্তী ইনচন শহর ও বন্দর এলাকায় শত টন গোলা বর্ষণ করে।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহি কম্যুনিস্ট অধিকৃত দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধ সিউলের ১৭ মাইল দক্ষিণ দিকবর্তী সুওন শ দখল করে।

অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি কানাডার প্রতিনিধি মিঃ পিয়ার্সন একটি দূর প্র সম্মেলন আহ্বানের জন্য ছয় দফা পরিকল্প পেশ করিয়া সপ্তাহকালের মধ্যে লেক সাকে অথবা নয়াদিল্লীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃ ফ্রান্স, রুশিয়া, ভারত, মিশর এবং কম্যুনি চীনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বা প্রস্তাব করেন।

২৭শে জানুয়ারী—ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—অদ্য কম্যুনিস্টদের বর্ধমান প্রতিরোধের মুখে পঞ্চ জাতির সৈন তাহাদের 'সীমাবদ্ধ লক্ষ্যবস্তুর' বিরুদ্ধে অভি অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইয়া কোরিয়ার রাজধ সিউলের কয়েক মাইলের মধ্যে উপস্থিত হয়।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥৹
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥৹ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 10th February, 1951. [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের আদর্শে ঐক্য

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির আমেদাবাদ অধিবেশনে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা-সমূহের সমাধানে সর্বদলের ঐক্য এবং সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আমরা একথা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও আমরা শুধু প্রস্তাব পাশের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবটি যতই সদিচ্ছাপূর্ণ হোক এবং তাহার রচনা পরিবেশনে ভাষাগত যেমনই পারিপাট্য থাকুক, আন্তরিকতার সঙ্গে সে প্রস্তাব কতটা কার্যে পরিণত হইবে, তাহার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বস্তুত ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেসের আদর্শ যে প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হয় এবং এজন্য জাতিকে দোষ দিয়াও লাভ নাই। আমাদের মতে জাতির অন্তরে বৃহত্তর স্বার্থের উদ্দীপনা এখনও সমানভাবেই রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেসকর্মী, বিশেষভাবে কংগ্রেসের পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, আদর্শ সম্বন্ধে আন্তরিকতা তাঁহাদেরই নাই। তাঁহারা শুধু কথাই বলেন; কিন্তু জাতির চিত্ত যাহাতে কংগ্রেসের আদর্শে আকৃষ্ট হয়, এমন কোন কর্মপদ্ধতি তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে ঐক্য বা সংহতি সম্বন্ধে কতকগুলি বাছাবাছা কথা লইয়া একটা প্রস্তাব গাঁথিয়া তুলিলেই এই অভাব দূর হইবে না। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল এবং মৌলানা আজাদ উভয়েই কংগ্রেসের পূর্বতন আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হইয়া গেল কেন? এই প্রশ্নটি তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। শ্রীজওহরলালের মতে কংগ্রেসের মধ্যে ত্যাগী কর্মীর অভাব ঘটিয়াছে। পূর্বে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইলে ত্যাগের ঝুঁকি কিছুটা লইতেই হইত। অন্ততঃপক্ষে কারাবরণ করিবার মত সাহসও থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন দরজা একেবারে খোলা। কংগ্রেসের নাম করিয়া এবং গান্ধীজীর দোহাই দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপে বর্তমানে অনেকে কংগ্রেসের আশ্রয় লইতেছে। ইহারা গায়ে খদ্দর জড়াইয়া কিংবা মহাত্মা গান্ধীর নির্বাণ দিবসে সখের সূত্রযজ্ঞের অভিনয় করিয়া নেতৃত্বাভিমান চরিতার্থ করিতেছে। এইভাবে কংগ্রেসের কাজে বঞ্চনা দেখা দিতেছে এবং কংগ্রেসের আদর্শ সাধনায় আন্তরিকতার প্রেরণার স্পর্শ কার্যতঃ জনসমাজ কিছুই পাইতেছে না। জাতির প্রাণশক্তির উৎস হইল তরুণ সম্প্রদায়। যে কোন বৃহৎ আদর্শে সব দেশে এবং সব সমাজই তরুণদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আজ কংগ্রেসের আদর্শ জাতির তরুণদের অন্তরে কোনরূপ সাড়া জাগাইতেই সমর্থ হইতেছে না। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতিতে ত্যাগমূলক প্রেরণার অভাবই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। জাতির জনগণের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি বা সাধনার এতদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সেই স্বার্থের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের প্রাণবল প্রযুক্ত হইত। এইভাবে জাতির সমষ্টি চেতনা বৃহত্তর স্বার্থ-ভাবনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের শক্তিকে সংহত করিয়া তুলিয়াছিল। সে অবস্থা এখন কোথায়? চোরাবাজারী এবং মুনাফা-শিকারীরা জাতির সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত আছে, কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীরা প্রাণবলে তাহাদের পাপ-ব্যবসা প্রতিহত করিতে উদ্যত নহেন। গলদ তো এইখানেই। অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের প্রতিবিধানে কংগ্রেসকর্মীদের আন্তরিকতা বা নৈতিক কর্তব্যবোধের অভাব। কংগ্রেসকে যদি তাহার পূর্ব গৌরবে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হয়, তবে জনগণের স্বার্থ-সাধনায় কংগ্রেসকর্মীদের বিবেকের প্রেরণাকে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে হইবে; নতুবা ঐক্যের উপদেশ কিংবা জাতির সংহতির মৌখিক মাহাত্ম্য প্রচারে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

নীতিহীন বনাম নীতিনিষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বর্ধমান জেলায় যত সরকারী আশ্রয় শিবির আছে, ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে সেগুলি সব খালি করিতে হইবে। হুকুম অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বর্ধমান শহরে ৬৫০টি পরিবারের পুনর্বসতির জন্য ৯০ একর জমি অবশ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার পর অপসারণ। ৩১শে জানুয়ারী পার হইবার পূর্বেই অপসারণের কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইবে, সুতরাং সরকারী কর্মচারীরা নিয়মানু-বর্তিতার নিরিখ ধরিয়া প্রত্যহ উদ্বাস্তুদিগকে লরী বোঝাই করিয়া গরু-ভেড়ার মত নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া ফেলিতেছেন। এইভাবে যে স্থানে শত শত পুরুষ ও নারীকে চালান দেওয়া হইতেছে সেখানে পানীয় জল কিংবা পায়খানার কোন ব্যবস্থা নাই। গত ২৭শে

জানুয়ারী রাত্রিকালে একটি লরীযোগে যে সমস্ত উদ্বাস্তুকে শাথীরীপুর মৌজায় চালান দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে আটজন বসন্ত রোগী ছিল। ইহার পর আরও ছয়জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। উদ্বাস্তুদের থাকিবার জন্য আধ হাত অন্তর একটি করিয়া তাঁবু খাটানো হইয়াছে; কোন কোন তাঁবুর মধ্যে রোগী সহ ৫।৬ জন করিয়া লোক বাস করিতেছে। ফলতঃ সরকারী পুনর্বাসন বিভাগের এমন কর্ম-তৎপরতার ফলে উদ্বাস্তুগণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, হেলথ অফিসার প্রভৃতি বিপদ বুঝিয়া প্রতিষেধক-ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের মন সত্যই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি; কিন্তু সেই স্বাধীনতা আমাদের কতটা নৈতিক অধঃপতনের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে, এই ব্যাপারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর যাহারা বর্তমানে পদাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, উদ্বাস্তুস্বরূপে আজ যাহারা নিগৃহীত এবং পশুর চেয়েও দুর্গত জীবন ভোগ করিতেছে, স্বাধীনতা প্রধানত তাহাদের ত্যাগের ফলেই আসিয়াছে। ইহারাও মানুষ এবং মানুষ হিসাবে ইহাদের মর্যাদা আমরা যদি স্বীকার না করিতে পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই; অধিকন্তু আমাদের সেই যে স্বাধীনতা তাহাও টিকিবে না। মানুষের অপমানের যে অপরাধ সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করিতে হইবে, রুদ্র দেবতার আঘাত আমাদের উপর আপতিত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। অবশ্য, উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সমস্যা সহজ নহে, তাহা গুরুতর: এ সবই আমরা বুঝি। কিন্তু উদ্বাস্তুদের বেদনা আমাদের সকলকে সমভাবে বহন করিতে হইবে। তাহাদের দুর্ভোগের অংশ আমাদের প্রত্যেককে লইতে হইবে। মুখের কথায় এতৎ-সম্বন্ধীয় দায়িত্ব প্রতিপালনে যদি আমরা স্বার্থবুদ্ধির বশে পরাঙ্মুখ হই, তবে সরকারকে আইন করিয়া সেই কর্তব্য প্রতিপালনে সমাজকে বাধ্য করা উচিত। অর্থের অভাবে যদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে অন্তরায় ঘটে, তবে যাহারা বিত্তশালী তাহাদের উপর কর ধার্য করা প্রয়োজন। তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এ সংকট জাতির সর্বজনীন সংকট। বস্তুত উদ্বাস্তুদের নিজেদের কোন অপরাধ নাই। দেশের স্বাধীনতার জন্যই তাহাদের এই দুর্দশা। স্বাধীনতার জন্য প্রকৃত মর্যাদা বোধ যদি আমাদের থাকে তবে উদ্বাস্তদের প্রতি মমত্ব-কিন্তু বর্তমানে ইহারা অবাঞ্ছনীয় একটা দায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারী নীতির প্রয়োগ-ক্ষেত্রে সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভাবের পরিচয় সর্বত্র আমরা পাইতেছি। বস্তুত এতৎসম্পর্কিত সরকারী নীতিতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবই প্রতিফলিত হইতেছে—মানবতার তাহাতে স্পর্শ নাই। সরকারী এই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুধু এই কয়েকটি কথা বলিয়াই আমরা আপাতত ক্ষান্ত থাকিলাম।

শাসন ও সংস্কৃতি

গত ২রা ফেব্রুয়ারী চন্দননগর পুরাপুরি রকমে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারত সরকার এবং ফরাসী গভর্ন-মেণ্টের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতে ফরাসীদের চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে এবং ইয়েনান এই পাঁচটি উপনিবেশ ছিল। এইগুলির মধ্যে গণভোটের জোরে চন্দননগর ভারতের অংগীভূত হইল, এবং অপর কয়েকটি উপনিবেশ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, এখনও অনিশ্চিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি দখল করিয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারই ফরাসীদের নাই। এইসব স্থানের অধিবাসীরা ভারতবাসী এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই তাহারা অধিকারী। ফরাসীরা কোনকালে বিজেতা-স্বরূপে এই সব স্থান দখল করিয়াছিল, শুধু এই যুক্তিতেই তাহারা চিরদিনের জন্য সেগুলি অধিকার করিয়া থাকিবে এমন যুক্তির কোন অর্থই এ যুগে হয় না। ফরাসী সরকারের এক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি এই যে, ঐ সব স্থানে ফরাসী সংস্কৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, তাঁহারা ইহাই কামনা করেন। এমন কথা একান্তই উদ্ভট। ভারতবাসীরা জুলু বা হটেনটট নয়, যে ফরাসী প্রভুরা আসিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতবাসীদের নিজেদেরই সুদীর্ঘকালের সংস্কৃতি রহিয়াছে। সুরেন্দ্র-নাথের ভাষায় আমরাও ফরাসী রাজনীতিক-দিগকে এই কথা শুনাইয়া দিতে পারি যে, তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যখন বৃক্ষশাখায় উল্লম্ফন করিয়া ফিরিতেন, ভারতবাসীরা সেই যুগেই সভ্যতার আলোক চারিদিকে বিকীরণ করিয়াছে। ফরাসীরা ভারতের কোন স্থান শাসন করিয়াছে বলিয়াই সেখানে ফরাসী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবে, সেখানকার অধিবাসীরা সব ফরাসী বনিয়া গিয়া ভারত হইতে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি লাভ করিবে এমন যুক্তি একান্তই ভ্রান্ত। ইংরেজেরা তো দীর্ঘকাল ভারত শাসন করিয়াছে, কিন্তু সেজন্য ভারতবাসীরা সব ব্রিটিশ সংস্কৃতিসম্পন্ন হইয়াছে, ইংরেজ বনিয়া সাম্রাজ্যবাদের সংস্কার এখনও ছাড়িতে
পারিতেছে না। চন্দননগরের গণভোট তাহ
দিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে; এজ
তাহারা নানা অছিলায় ভারতস্থ তাহাদে
অপর কয়েকটি উপনিবেশের গণভোট গ্রহ
বিলম্ব ঘটাইতেছে। কিন্তু ইতিহাসের গ
রুদ্ধ করিবে এমন সাধ্য তাহাদের নাই
যাহারা ভারতবাসী, স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভু
হইবার জন্য তাহাদের স্বাভাবিক আগ্রহে
কোনক্রমেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল প্রতিরু
করিতে সমর্থ হইবে না। চন্দননগরের গণভে
হইতে যত সত্বর তাহারা শিক্ষালাভ করে তত
মঙ্গল।

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র সঙ্কট

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত কে এম মু
আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন, কয়েক সপ্তাহে
মধ্যেই খাদ্যসংকটের অনেকটা সমাধান হই
যাইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিরাপ
পরিষদে কমিউনিস্ট চীনের সমর্থনসমূলক
নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর চটিয়া গিয়াছে
এ অবস্থায় সেখান হইতে খাদ্য শস্যের সাহ
লাভ করিবার পক্ষে ভারত মার্কিনের কৃপাদ
আকৃষ্ট করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে সন্দে
দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ভয় ন
ভারতের খাদ্য সচিবের মতে রেশনের পরি
হ্রাস করিবার ফলে যে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইয়
তাহার দ্বারাই কিছুদিন চালাইয়া লওয়া যা
ইহার উপর পরিবর্ত খাদ্যের ক্ষেত্র
পড়িয়াই আছে। ছোলা, বাজরা, কলা, ম
শকরকন্দ আলু এসব বাতিল হইয়া
ইরাকের পিন্ড খেজুর আসরে অব
হইয়াছে। বস্তুত এ দেশের মাটিতে ধ
বালু, কাঁকর, পাথর থাকিতে খাদ্য হি
পরিবর্তের অভাব ঘটিবে না। কিন্তু
সম্বন্ধেই সংকট বেশী রকম। কিছুদিন হ
মিলের কাপড় বিশেষভাবে ধুতি ও
কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়
দোকানীদের মুখে একই কথা যে, তাহাদি
রীতিমত কাপড় সরবরাহ করা হইতেছে
কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় সপ্তাহ অতি
হইলে তবে কিছু মাল পাওয়া যায়, ত
প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এই যৎস
পরিমাণ কাপড়েরও শতকরা ৪০ ভাগ
এবং ২০ ভাগ শাড়ী তাঁহারা পান, বাকী
থাকে সেগুলি বাজারে বিক্রী হয় না। প
বঙ্গে বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ গত ১
সালের নবেম্বর মাস হইতে ক্রমেই হ্রাস
হইতেছে, সরকারী সূত্রে ইহা জানা
এবং তাহার ফলেই এই সমস্যা। ব
বরাদ্দের পরিমাণ অর্ধেকেরও কমে
দাঁড়াইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে স

নাকি নাই। সুতরাং মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র যাঁহারা তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু বস্ত্রের সরবরাহ যদি হ্রাস পায় তবে বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনেও সমস্যা যে মিটিবে না ইহা সহজেই বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্রের বাজারে এই সংকটের ফলে কালাবাজারী এবং মুনাফা-শিকারীদেরই শুভ সুযোগ দেখা দিবে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বিশেষভাবেই জানি, তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে কসুর করিবে না। তাহারা ইহার মধ্যেই বাজার হইতে তাঁতের কাপড় এবং সিট কাপড় সরাইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতেছি, দেশের দুর্দশা লইয়া ইহাদের এমন ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সরকারী অবস্থার ফলে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতেই চলিয়াছে। কর্তৃপক্ষের নৈতিক উপদেশ কোনই কাজে আসিতেছে না। স্বাধীনতা যদি জনগণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্টই এইভাবে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলে এবং জনসাধারণের সেই দুর্গতির সুযোগে দুর্নীতিই ক্রমাগত প্রশ্রয় পাইতে থাকে, তবে তেমন স্বাধীনতার প্রতিবেশের মধ্যেও যে মন-প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক।

ঐক্যের ভিত্তি কোথায়

পূর্ববঙ্গে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক ঐক্য সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়া গেল। এই সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের গভর্নর মালিক ফিরোজ খাঁ নুন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঐক্য সপ্তাহটি প্রতিপালন করার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনবোধ যেন শেষ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐক্য সপ্তাহের প্রেরণা যাহাতে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে সম্প্রসারিত হয়, সেইদিকেই সকলের লক্ষ্য থাকে। কথাগুলি অবশ্য খুব ভাল; কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের গভর্নর যে ঐক্য ও সদ্ভাবের কামনা করিয়াছেন, সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, রাষ্ট্র নীতি এবং সমাজ-ব্যবস্থা তদনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ইসলাম ধর্মের সৌভ্রাত্র, সাম্য এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই মানুষকে হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। কিন্তু জগতের ইতিহাস এই মর্মান্তিক সত্য প্রতিপন্ন করে যে ধর্মের নামেই মানুষের মধ্যে বর্বরতা সর্বাধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং হিংস্রতার তান্ডবে সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্মের আদর্শ যতই উদার এবং মহানুভব হোক না কেন, রাষ্ট্রের রূপ যদি হয় ইসলামী অর্থাৎ বলা হয়, এই রাষ্ট্র ইসলাম রাষ্ট্র, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক একটা ভেদবাদই রাষ্ট্রনীতির ভিতর দিয়া সমাজ-জীবনে জাগিয়া উঠে। যাহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাহারা অপর সম্প্রদায়কে বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখিতে স্বভাবতই প্ররোচিত হয় এবং যাহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয়, রাষ্ট্রে সমাধিকারের চেতনা তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠে না। এই সমস্যার সমাধান সহজ নহে, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। কারণ, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন। দেশপ্রেমের অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শ সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা এবং সমাজ-জীবনের সর্বত্র সম্প্রসারিত ছিল, এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশের সেবায় জাতির সেবায় ধর্মের বিচার কোনদিন তাঁহারা করেন নাই। ভাগ্যবিপর্যয়ে, এখন সেই কথাই অনবরত তাঁহাদিগকে শুনিতে হইতেছে। রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে ধর্মবিশেষের প্রাধান্যের নীতি তাহাদের মনোবৃত্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে তাঁহারা অসহায়ত্ব বোধ করিতেছেন। অথচ পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে এইভাবে জড়াইবার কোন কারণই ছিল না; কারণ, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী, সুতরাং গণতান্ত্রিক অধিকার-সূত্রে রাষ্ট্রীয় আদর্শ তাহাদের দ্বারাই কার্যত রূপায়িত হইত; কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মধ্যযুগীয় ধর্ম সংস্কারকে সেখানে জিয়াইয়া রাখিতে হইতেছে। কারণ, শুধু এই উপায়েই পশ্চিম পাকিস্থান এবং পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ রাখা যায়। বস্তুত এই উপায় প্রগতি-বিরোধী, গণতান্ত্রিকতার ইহা পরিপন্থী এবং কৃত্রিম। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্রের দোহাই দিয়া পূর্ববঙ্গকে এমন অবস্থার মধ্যে লইয়া ফেলিবার জন্যই কেন্দ্রীয় পাকিস্থানের সমগ্র নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমাদের মতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-নীতির এই নাগপাশ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে পূর্ববঙ্গের স্বাভাবিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির পথ প্রশস্ত হইবে না এবং তাহার দুর্গতিরও অবসান ঘটিবে না। ঐক্য সপ্তাহের প্রেরণা পূর্ববঙ্গে দেশাত্মবোধের মর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত করিয়া যদি তাহার দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার সার্থকতা।

শ্রীযুত মুন্সীর গবেষণা

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত কে এম মুন্সী সম্প্রতি মাদ্রাজ শহরে ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় মৎস্য পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মৎস্য সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণুর মৎস্যাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া মহেঞ্জোদোড়োর প্রত্নতাত্ত্বিকতা এবং সম্রাট অশোকের অনুশাসন প্রভৃতি ঐতিহ্য হিসাবে মূল্যবান অনেক কথাই তাঁহার বক্তৃতায় আছে। ভারতের ধীবরগণ মৎস্য পালন ও মৎস্য শিকারে যে যথেষ্ট জ্ঞান ও নিপুণতা অর্জন করিয়াছে, শ্রীযুত মুন্সী তাঁহার বক্তৃতায় এসব প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মৎস্যের অভাব পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কিরূপ চেষ্টা হইতেছে, মুন্সীজীর বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই। মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের এজন্য বিশেষ আগ্রহ কিছুই নাই। মৎস্য চাষের উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টা এ পর্যন্ত কোনপ্রকার কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য বিভাগ বলিয়া একটা বিভাগ অবশ্য আছে এবং সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও একজন রহিয়াছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা লইয়া এই বিভাগের কার্য পরিচালিত হয় না। বস্তুত এই বিভাগ খেয়ালমত চলে। শ্রীযুত মুন্সীজীর মতে মৎস্য চাষের উন্নয়ন করিতে হইলে মোটা রকমের মূলধন নিয়োগ বা বিদেশ হইতে মৎস্য ধরিবার জাহাজাদির আমদানীর প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমবঙ্গে এ সুযোগ যথেষ্টই রহিয়াছে। বাঙলাদেশ বিভক্ত হইবার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু ধীবর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ যদি জলাশয়গুলির সংস্কার সাধন করিতেন এবং গ্রামে গ্রামে এই সব ধীবরদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বাঙলাদেশ বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রয়োজনীয় মৎস্যের সংস্থান করা অনেকটা সম্ভব হইত এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিরও উন্নতি ঘটিত। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রাম এখনও জনশূন্য; বহু জমি পতিত এবং জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সুযোগ ছিল; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। এত বড় জনসম্পদ পাইয়াও তাঁহারা রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে সে সম্পদকে সার্থক করিতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নীতি যদি সুবিবেচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, তবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার ইহার মধ্যেই অনেক উন্নতি ঘটিত বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু গতানুগতিকতার মোহ সময়োপযোগী সংস্কার-ব্যবস্থা অবলম্বনে আদর্শনিষ্ঠ সৎসাহসের অভাব এ পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



শ্মশান

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কতদিন কত বর্ষ ধরে
সূর্যের অজস্র আলো পড়েছে নগরে—
তবুও নগর বুঝি অন্ধকার হারাতে নারাজ;
অন্ধকার ভালোবাসে মানব সমাজ।

মানুষ আঁধার ভালোবাসে—
আঁধারেই চিরকাল যায় আর আসে।
সরাইখানার যেন কোনো এক রাত ঃ
খানিক পুতুল নেচে আসরেই কাৎ;
সে' জবাকুসুম সঙ্কাশ
দেখেনাক' কোনো দিন ঊষার আকাশ।

তামসিক জীবনের মর্মন্তুদ গ্লানি
ভালোবাসে এ জগতে প্রতি কীট, প্রাণী;
আহার, মৈথুন, নিদ্রা—নিদ্রা ও আহার
সেই তীব্র, তিক্ত স্বাদ—তবু বারংবার
তারি লাগি সর্ব আয়োজন ঃ
জীবনের যা-কিছু স্বপন।

আদিম বিকার সেই ধিকৃত, ঘৃণিত
আজো ঠিক দুর্নিবার নিত্য নিয়মিত;
নিত্য সেই দাবদগ্ধ ভয়াবহ স্মৃতি ঃ
রাহুগ্রস্ত চেতনার বিবর-বিধৃতি

এর থেকে বুঝি নেই কোনো পরিত্রাণ!

সত্য এই অন্ধকার
পিশাচ-শাসিত আর সত্যের শ্মশান।



বৈদেশিকী

সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ নীতি

মার্কিন গভর্নমেণ্টের চাপে ইউনোতে চীন সরকারকে কোরিয়ায় অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রুশ "ব্লক"-এর বাইরে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও বর্মার প্রতিনিধি মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করেন। অবশ্য কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা ভোট দিতে বিরত ছিলেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি বারোটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলে যে প্রস্তাবটি এনেছিলেন সেটি ভোটাধিক্যে বাতিল হয়ে যায় যদিও বিতর্কের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের মনে এই প্রস্তাব গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমেরিকাকে অসন্তুষ্ট করার সাধ্য তাঁদের ছিল না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি বারোটি এশিয় দেশের প্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব রচনা করেন তার দৃষ্টিভঙ্গী আমেরিকার প্রস্তাবের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং অন্তত এশিয় প্রস্তাবটির রচয়িতারা সকলে আমেরিকার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এটা মনে করা যেতে পারত। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। উপরে উল্লেখ করেছি, কেবল বর্মার প্রতিনিধিই ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ চীনকে অন্যায় আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। বাকী দশজনের মধ্যে বেশির ভাগ ভোট দিতে বিরত ছিলেন কিন্তু কয়েকজন আমেরিকার প্রস্তাবের পক্ষেও ভোট দিয়াছেন—এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার। এই থেকেই বুঝা যায় যে, ইউনোতে ছোট দেশগুলির পক্ষে নিজেদের বিবেক এমন কি, নিজেদের প্রকৃত জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দেওয়া কত কঠিন। ছোট দেশগুলির কথা ছেড়ে দিই—বৃটেনের মত দেশের অবস্থাও তাই। বৃটেনের জনমত আমেরিকার প্রস্তাব আদৌ অনুমোদন করেনি। বৃটেনে যেসব মহল সর্বদাই আমেরিকার পক্ষপাতী সে সব মহলে পর্যন্ত এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবার জন্য আমেরিকার জবরদস্তিতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কয়েকদিন মাত্র পূর্বে পার্লামেণ্টে যে কথা বলেন, তা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমেরিকার প্রস্তাবটিকে মোটেই সময়োচিত বলে মনে করছেন না। তৎসত্ত্বেও দেখা গেল যে, লেক সাকসেস-এ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি আমেরিকার প্রস্তাবটিকে সমর্থন করলেন এবং দুদিন বাদে মিঃ এ্যাটলীও বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইউনো কর্তৃক গৃহীত আমেরিকার প্রস্তাবটিকে অভিনন্দন জানালেন। অবশ্য, এ বিষয়ে বৃটেনের দ্বিধার প্রধান কারণ হোল এই যে, চীনের সঙ্গে একটা ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বিশেষভাবে বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে হানিকর হবে। চীনের সঙ্গে সকল বিষয়ে একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে খুব বেশী ব্যাকুল তা মনে করার কোনো কারণ দেখি না। তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চান না যে, গোলমালটা এত বেড়ে যায় যাতে সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ অবস্থান, বিশেষ করে হংকং-এর বৃটিশ স্বার্থ এবং নিরাপত্তা হঠাৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে। মার্কিন নীতি যে পথে চলেছে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকা সহজে ফরমোজা হাতছাড়া করবে না, চিয়াং কাইশেকের বেনামীতে ধরে বসে থাকবে। রাশিয়া এবং চীনকে এড়িয়ে জাপানের সঙ্গে একটা আলাদা বন্দোবস্ত করতেও আমেরিকা অনেক দূর এগিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে যেমন জার্মানদের অস্ত্র-ধারণের জন্য সাধাসাধি চলছে, তেমনি মার্কিন নীতির কাজে লাগাবার জন্য জাপানী রণশক্তির পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাবের আলোচনাও অনেক দূর এগিয়েছে বলে মনে হয়। এই মোটামুটি মার্কিন নীতির ধারা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়। কোরিয়ার সমস্যা এখন গৌণ—কোরিয়ার সমস্যা মেটাতে গিয়ে যদি মার্কিন নীতির অপর লক্ষ্যগুলি হারাতে হয় তবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট সেদিকে যাবেন না। সেইজন্যই ইউনোতে যখন ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবেনেগল রাও এশিয় প্রস্তাবটির সমর্থনে বার বার বললেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট পিকিং-এর সর্বোচ্চ মহল থেকে এই নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছেন যে, চীন সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনার জন্য আগ্রহশীল এবং শ্রীযুক্ত রাউ বিশ্বাস করেন যে, এশিয় প্রস্তাবটি গৃহীত হলে এক সপ্তাহের মধ্যে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘটত পরন্তু আমেরিকার প্রস্তাব গৃহীত হলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন সে কথায় মার্কিন গভর্নমেণ্ট কর্ণপাত করলেন না। ইউনোতে আমেরিকার প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে চীনের সরকারী মহলের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, শ্রীবেনেগল রাউ ঠিকই বলেছিলেন। মার্কিন গভর্নমেণ্টও বোধ করি, জানতেন যে, শ্রীযুক্ত রাউ ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু সেকথা গ্রাহ্য করার প্রবৃত্তি আমেরিকার হোল না, যেহেতু মার্কিন গভর্নমেণ্ট আপাতত চীনের সঙ্গে এমন কোনো আলাপ-আলোচনায় যেতে চান না যাতে ফরমোজা ও জাপানের সম্পর্কে বর্তমান মার্কিন নীতির ধারা ব্যাহত হতে পারে। চীনের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির কথায় গেলে ইন্দোচীনেও মার্কিন নীতির সংশোধন আবশ্যক হতে পারে। মার্কিন গভর্নমেণ্ট তাও চান না। তারপর ইউনোতে চীনের আসনদানের প্রশ্নও আছে। সেখানেও মার্কিন নীতির ধুয়ো হোল—নট নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু। সুতরাং মার্কিন গভর্নমেণ্ট সেই পথই নিয়েছেন যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়া চীনাদের সঙ্গে (অবশ্য চিয়াং কাইশেকের অনুচরগণ বাদে) দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়।

তিব্বত

তিব্বতের ভিতরের প্রকৃত খবর যে কী তা অনুমান করা মুশ্‌কিল। তবে এটা নিশ্চিত যে চীনা সৈন্যেরা যে কিছুটা পথ এসে থেমে রইল, লাসা অধিকারের চেষ্টা করল না—সেটা তিব্বতী প্রতিরোধের দরুণ নয়। দলাই লামার সঙ্গে একটা আপোষের কথা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। সেকথা কতদূর সত্য বা তার প্রকৃত তাৎপর্য কী তা বলা কঠিন। দলাই লামা এখন ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী চুম্বী উপত্যকায় ইয়াটুং নামক স্থানে আছেন। লাসা ত্যাগ করার পূর্বে তিনি যাঁদের হাতে শাসনভার দিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে চীনাদের সঙ্গে একটা আপোষের পক্ষপাতী, এরূপ শোনা যাচ্ছে। তিব্বতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী দলও আছে, যাদের উপর স্বভাবতঃই কিছুটা কম্যুনিস্ট প্রভাব পড়েছে। তিন চার বৎসর পূর্বে তিব্বতে যে অভ্যন্তরীণ গোলমাল হয়—যাতে বহু সহস্র লামা গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে—তাতে যারা যোগ দিয়েছিল তাদেরও অনেকে সেই দলে আছে। এদিকে চীনারাও ঘোষণা করেছে যে, তারা তিব্বতের অভ্যন্তরীণ শাসন বা তিব্বতীদের ধর্ম ব্যবস্থায় হাত দিতে চায় না—তিব্বতের বৈদেশিক নীতি, নিরাপত্তা ও পথঘাট রক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে তাদের হাত দিবার ইচ্ছা নেই। সামরিক শক্তির দ্বারা তিব্বতকে কবলিত করার অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা পিকিং বোধ হয় করছে। হয়ত, ভারতবর্ষকে আশ্বস্ত করার ইচ্ছাও আছে। মোট কথা, আর বেশি যুদ্ধবিগ্রহ না হয়ে তিব্বতী সমস্যার একটা সমাধানের সম্ভাবনা হয়ত হয়েছে।

নেপাল

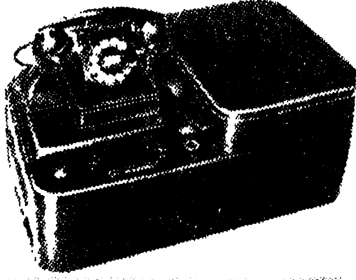
নেপালের শাসন সংস্কারের নূতন পরিকল্পনা ঘোষিত হবার পরেও গোলমাল মেটেনি। বর্তমানে ভারত গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় নূতন দিল্লীতে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে পরস্পরের সন্দেহভঞ্জন ও মতানৈক্যের কারণগুলি দূর করার চেষ্টা করছেন। আশা করা যায়, এইবার গোলমাল মিটবে এবং অবিলম্বে নেপাল শান্তিপূর্ণভাবে গণকল্যাণের পথে যাত্রা আরম্ভ করতে পারবে।

৬।২।৫১

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

এক নতুন ধরণের টেলিফোন যন্ত্র বার হয়েছে এটি প্রায় প্রতিনিধির কাজ করে। টেলিফোনের মালিকের অনুপস্থিতিতে যদি বাইরে থেকে কোন ডাক আসে তাহলে এই যন্ত্রই



প্রতিনিধি টেলিফোন যন্ত্র

মালিকের হয়ে প্রয়োজনীয় উত্তর দিয়ে দিতে পারে এবং এই খবর সংগ্রহ করে রাখে। আর মালিক ঘরে এলে ঐ সব খবর আবার মালিকের কানে তুলে দিতে পারে।

*

চুরি করেই "চোর" ধরতে হয়। এর জন্যই গোয়েন্দা বিভাগ—চোরের বুদ্ধির ওপর টেক্কা দেবার জন্য মানুষ কত চেষ্টাই না করছে। কত নতুন নতুন যন্ত্র মানুষ চোর ধরবার জন্য বার করছে। এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দুইবৎসর ধরে চেষ্টা করে এই চোর ধরার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রটিকে এক হিসাবে Amplifier বলা যায়। এই যন্ত্রটির দ্বারা কোনও একটি শব্দকে ১০০০০০ গুণ বেশী জোরে শোনা যায়। এই যন্ত্রটি আজকাল অনেক বাড়ীতে ও কারখানায় লাগান হচ্ছে। এই যন্ত্রটির দাম ১৮ গিনি থেকে ১০০ গিনির মধ্যে। ঘরের ছাদে যদি কেউ আস্তে আস্তে চলে বেড়ায় তাহলে তার পায়ের মৃদু আওয়াজ কিংবা কোথাও আগুন লাগলে কোনও কিছু পোড়ার যে সূক্ষ্ম আওয়াজ এই Amplifier-এ অনায়াসে ধরা পড়ে। একবার এক পশমের কারখানায় একটি জলের পাইপ ফুটো হয়ে জল বার হতে থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জল বার হওয়ার ঝিরঝির শব্দ অল্পক্ষণের মধ্যে ধরা পড়ে, ফলে অনেক টাকার পশম রক্ষা হয়। এই যন্ত্রটির সবচেয়ে বড় সুবিধে এই যে, যে কোনও বড় বাড়ি বা কারখানায় এইরকম একটি যন্ত্র লাগান থাকলে একটির বেশী আর প্রহরীর দরকার হয় না।

*

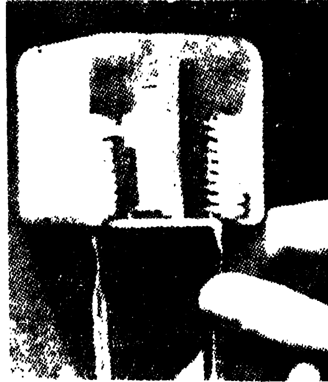
বর্তমান যুগকে আমরা 'আণবিক বোমার' যুগ বলতে পারি। এখন প্রত্যেক দেশই এই বোমা তৈরী করবার চেষ্টা করছে। আণবিক বোমা তৈরী করতে যেসব কাঁচা মাল লাগে সব দেশই সেইসব মালমশলা নিজের দেশ থেকেই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। এইসব কাঁচা মালের মধ্যে Plutonium অন্যতম। এই Plutonium তৈরী করবার জন্য বৃটেনের কাম্বারল্যাণ্ডে একটা কারখানা হয়েছে।

*

মানুষে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে পাশের লোকের বিরক্তি ঘটে। অনেকের ধারণা যে, নাক ডাকিয়ে ঘুমোন এক একজনের স্বভাব। কিন্তু এটা ঠিক স্বভাব-জাত নয়। ঠিকমত আরামে না শুতে পাওয়ার দরুণই বোধ হয় নাক ডাকে। ট্রেণে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে সহযাত্রীদের সত্যিই খুব খারাপ লাগে। ফরাসী দেশে এক ধরণের "রকিং চেয়ার" তৈরী করা হয়েছে যাতে শুয়ে ঘুমোলে এত আরামে ঘুমোন যায় যে, যাদের নাক ডাকিয়ে ঘুমোন "স্বভাব" তাদেরও নাক ডাকে না। এই চেয়ারগুলো ফরাসী দেশের ট্রেণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

*

দাঁত মাজার ব্রাশ খুব বেশী যত্ন করে না রাখলেই বীজাণুদুষ্ট হয় এ কথা সকলেই জানি। আজকাল এক রকম প্লাষ্টিকের তৈরী খাপ হয়েছে যার মধ্যে ব্রাশ রাখলে আর



খাপের মধ্যে দুটো দাঁতমাজা ব্রাশ ও রসায়ন দ্রব্যের শিশি আছে।

বীজাণুদুষ্ট হতে পারে না। এক ধরণের রসায়ন দ্রব্য এই খাপের মধ্যে শিশিতে থাকে আর এতে ব্রাশটি ভরে রাখলে সমস্ত বীজাণু নষ্ট হয়ে যায়। এটা প্রায় এক বছর কার্যকরী থাকে।

বাইরের ধুলো ময়লা যাতে এর মধ্যে না যায় সেজন্য এই খাপের মুখে একটা ঢাকা লাগান থাকে।

বাজারে জুতো কিনতে গেলে অনেক দেখা যায় যে, জুতো পায়ে ঠিক লাগ দোকানদারও ঠিক বুঝতে পারে না খরিদ্দারের কোথায় অসুবিধে হচ্ছে।



একপায়ে প্লাষ্টিকের জুতো এর অন্য পা চামড়ার জুতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অসুবিধে দূর করার জন্য নানারকম মা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের তৈরী জুতো দোকানে র থাকে। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে জুতো কে আগে তার পায়ের মাপের প্লাষ্টিকের জু পরে দেখে নেয় তার পায়ে কেমন "ফিট" করা পায়ে যে জুতোটি ঠিক হবে সেই মা চামড়ার জুতো নেবে।

*

যদি কোনও কারণে মানুষের শরীরের ক্ষয় হয় কিংবা হঠাৎ কোনও রকম মানসি আঘাত পেয়ে মানুষ অসুস্থ হয় তাহ রোগীর শরীরে অন্যের রক্ত প্রবেশ কর রোগী সুস্থ হতে পারে। বহুকাল থে এই পদ্ধতির প্রচলন আছে। আগে এই রক্তবাহী শিরার মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ ক হতো এখন ধমনী দিয়ে রক্ত চালানো হয়। এ অনেক তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায় ধমনী দিয়ে রক্ত পাঠানোর দরুণ তাড়াত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। পাঁইট রক্ত ধমনীর মধ্যে দিয়ে শরীরে মাত্র চার মিনিট সময় লাগে। এ ছাড়া সঙ্গে প্রায় ২০ পাঁইট রক্ত রোগী গ্রহণ ক পারে। কিন্তু এক পাঁইট রক্ত শিরার মধ্য দি পাঠাতে প্রায় একঘণ্টা থেকে তিনঘণ্টা স লাগে। আর এক সঙ্গে বেশী রক্ত শিরার দিয়ে শরীর গ্রহণ করতে পারে না।

যে সব ডাক্তার এই উপায় আবিষ্ করেছেন তাদের মতে থ্রম্বসিসে অথবা শরী মধ্যে রক্ত দানা বাধার দরুণ যে রোগ হয় এইভাবে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত পাঠিয়ে সার সম্ভব হবে।

অন্ধ কারা ?

তরুণকুমার ঘোষাল

মানুষ সুন্দরের উপাসক। এজন্যই বোধ হয় সে "সত্যশিবসুন্দরের" শয়ের কথাটিকেই বেশী আপনার করে নিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যেখানেই কুরূপ, মানুষ সেখানেই বিরূপ। বাইরের চাকচিক্য, তা সে মরীচিকাই হোক বা বুদ্বুদের উপর প্রতিফলিত সূর্যকিরণই হোক, তার চপল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কথায় কথায় সে জাহির করে, "প্রথমে দর্শনধারী, পরে গুণ-বিচারি!" অন্তর্দর্শনে তার অভিলাষও নেই, ফুরসতও নেই; যথাযোগ্য বিচারের বিশিষ্টতাও নেই। তাতে বিশ্বাসও নেই। তাই বিকলাঙ্গ দেখলে তার 'অক্ল্' বিকল হয় এবং 'শকলে'ও ধখল পড়ে এবং প্রাণে তার অনেক রকম সম্ভব-অসম্ভব অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সকালবেলায় বাসিমুখে ধোপা বা কলু বা মাকুন্দের প্রথম দর্শন তার কাছে অশুভ সঞ্চারক। ছত্রিশ জাতের ময়লা কাপড়চোপড় বয়ে বেড়িয়ে ধোপার গায়ে কেন এত ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, ঘানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলুর গায়ে কেন এত তেল চড়বড় করে, মাকুন্দের কেন গোঁফ-দাড়ী গজায় নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি কেনর অর্থহীন অজুহাতে মানুষ যেন সদাই ত্রাস্ত। সাধারণ দৃষ্টি-সহা জিনিসে যে সদা-অভ্যস্ত, অসাধারণ তার তবুও বরদাস্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টি-কটু?—দেখলেই যেন তার অন্তর্দাহ। এমনি যে ভগবানের অজীব সৃজন 'মানব',—এর কাছে অন্ধরা অপয়া অ-মানব ছাড়া আর কি? অন্ধদের যেন কোন অন্য বিধাতা এই ধরাধামে এনেছেন!

অন্ধদের প্রতি চক্ষুষ্মান আমাদের কত অবজ্ঞা, কত উদাসীনতা, এর ভূরি ভূরি প্রমাণ বিভিন্ন দেশের নানারূপ কটু-অকটু প্রবাদ বাক্যগুলির অনুশীলনেই স্পষ্ট হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে অবশ্য আজকাল শিক্ষা-বিস্তারের ফলে অন্ধদের বিষয়ে অন্ধ সংস্কার-গুলি ধীরে ধীরে চলে যেতে বসেছে। কিন্তু আমাদের এই বেদ উপনিষদের দেশে, এই দেবগণের অধিষ্ঠিত স্বর্গময় মর্তভূমে?—এখনও আমাদের মুখের বুলি—কাণা-খোঁড়ার শতেক দোষ, কাণা-পুতের নানা রোগ, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, অন্ধ জাগো—না কিবা রাত কিবা দিন। কাণা-কড়ির যোগ্যতা। কাণা গরুর ভিন্ন গোয়াল, কাণা গরু ব্রাহ্মণকে দান, প্রভৃতি। বাঙলা ভাষায় এগুলি তবু পদে আছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষায় এ জাতীয় কহাবত্ তো আরো চমত্‌কার। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে, **সৌমে কুলী, হাজার মে কানা,** তো একটি বিখ্যাত ছড়া, যার জুড়ি বোধ হয় অন্য কোন ভাষাতে নেই। তাছাড়া **অন্ধেকী লকড়ী, অন্ধা ক্যা চাহে দো আঁখে, অন্ধোমে কানা রাজা, অন্ধী পীসে কুত্তে খায়, অন্ধকে হাত বটের লগনা, অন্ধা বাটে রেবড়ী অপনো অপনো কো দে** ইত্যাদি সব তো আছেই। অন্ধদের কাছে এগুলি যে খুব শ্রুতিসুখকর, এ তো আমাদের মনে হয় না। ক্লাসে হিন্দী মুহাবিরা পড়াবার সময় লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়, কালো মুখ আরো কালো হয়ে যায়। সৌভাগ্য যে, আমাদের এই কালো মুখ অন্ধদের দেখতে হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ দৃষ্টিশক্তিহীনদের অনেক কিছুই যে সয়ে যেতে হবে, এর আর আশ্চর্য কি!

আমরা বলি যে, শিক্ষার জ্যোতির তীব্র আলোকে কুসংস্কারের ছায়া ক্রমশই কায়াহীন হতে থাকে; কিন্তু তাই কি? তা যদি হয় তো আমরা এত লেখাপড়া শিখেও হাঁচি টিকটিকি, মঘা-অশ্লেষা, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, গ্রহণ, ইত্যাদি কেন এত মানি? কেন আমরা বিবাহ, যজ্ঞোপবীত, ইত্যাদি শুভকর্মে বিধবা বা অন্ধদের এড়িয়ে চলি? কেন আমরা নিজেরা কর্মফলের মিথ্যা জালে জড়িয়ে অন্ধদের শুধু জড়াইনে, জ্বালাইও? কেন আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, অন্ধরা অন্ধ হয়েছে, স্রেফ পূর্বজন্মের পাপে? আমরা কি একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করি যে, অন্ধদের মধ্যে শতকরা কতজন জন্মান্ধ এবং যারা জন্মান্ধ, তাদের এই অ-ক্ষমতার (ডিসএবিলিটি) জন্য তাদের বাপ বা মা বা উভয়ের কুৎসিত রোগ কতখানি দায়ী? এবং যারা বয়সে অর্থাৎ জন্মের পর অন্ধ হয়েছে, তারা কত বয়সে, কি রোগে এবং কেন চক্ষুরত্ন দুটি হারিয়েছে?—এই সমস্ত গভীর প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করবার অবসর আমাদের নেই। আমরা কেবল গতানুগতিক "অখণ্ডনীয় কর্ম-ফল"কে ধ্রুবতারা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমাদের মহৎ প্রাণের উদার দৃষ্টি আশেপাশের ক্ষুদ্র অন্ধ জোনাকীদের উপর পড়বার অবকাশ পায় না।



স্কুলের বিস্তৃত জিমন্যাসিয়মে ছেলেরা শরীরচর্চা করছে



ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান করতে করতে মাঠে ধান কাটার অভিনয় করছে



বেতের একটি মোড়া তৈরী হচ্ছে

মর্দুমশুমারির গণনায় ভারতবর্ষে খুব কম করে ধরেও, প্রায় পৌনে সতর লক্ষ অন্ধ আছে। জন্মান্ধের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বড় বড় চক্ষু-চিকিৎসাবিশারদের মতে এই বিরাট সংখ্যার শতকরা নব্বইজনের অন্ধ না হওয়াই উচিত ছিল, অর্থাৎ সময়ে চিকিৎসা করালে এদের কেউই অন্ধ হোত না। বাকী দশজনের অর্ধেকের এখনও আশা আছে, অর্থাৎ এখনও চেষ্টা করলে এরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারে। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে সেটি হবার যো নেই। কারণ চিকিৎসকের এতই অভাব এদেশে। এখনও এখানে প্রতি দু'হাজার লোকের পিছু মাত্র একটি করে ডাক্তার এবং তাও যাঁরা বেরিয়েছেন বা বেরুচ্ছেন, তাঁরা শহরের আবহাওয়াতেই মানুষ বলে শহরেই গাদাগাদি করাটা বেশী পছন্দ করেন। গ্রামাঞ্চলে, অশিক্ষিত জনের সংস্পর্শ এঁদের অস্পৃশ্য। সাপ আর মশার কামড়ে এঁদের নেহাৎই অনিচ্ছা। কাজেই, ডাক্তারের অভাবে এবং হাতুড়ে শতমারী বৈদ্যের প্রভাবে, ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামে অন্ধের সংখ্যা হ্রাস হওয়া দূরে থাক, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। শোনা যায় যে, ১৯০১ সালের গণনায় ভারতে অন্ধের সংখ্যা যত ছিল, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১এ সেই সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যায়। ১৯৪১এর বিশেষ কোন খবর নেই, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—১৯৫১-এর সেন্সাসে ব্যাপারটি ভাল করে বোঝা যাবে। দেশ এখন স্বাধীন, বিদেশী শাসনের ওজর আর নেই। আশা আছে যে, মর্দুমশুমারির বড়কর্তারা আমাদের এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানাতে পারবেন।*

পৌনে সতর লক্ষ অন্ধ। চিন্তা করলেও মাথাটা ঘুরে ওঠে। পৌনে সতর লক্ষ অন্ধ যাবজ্জীবন অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে। না আছে তাদের জীবনে একফোঁটা আলো, না আছে তাদের স্বাধীনতা। পরাধীনতাকে সম্বল করে বেঁচে আছে এই লাঞ্ছিত, অপমানিত মানবতা—হয় পরান্ন-নির্ভরতা, না হয় ভিক্ষান্ন-ভোজন, সেও পরতন্ত্রতা ছাড়া আর কি? ওঃ, দেশের কি দারুণ দুর্ভাগ্য, জাতীয় সম্পদের কি অকল্পনীয় লোকসান। সংখ্যা-বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের মতে সামান্য (অ্যাভারেজ) ভারতীয়ের বাৎসরিক আয় খুব বেশী হলেও ১০০ টাকা। অর্থাৎ এই আয় থেকেই সাধারণ গৃহস্থ তার জীবিকা সংস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করে—খাওয়া, পরা, শোওয়া, ইত্যাদি সব পৌনে সতর লাখকে একশ' দিয়ে গুণ করলে পৌনে সতর কোটি টাকা হয়, অর্থাৎ অন্ধদের পরনির্ভরতার ফলে এই এতগুলি টাকা বৎসরে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এই অন্ধদের অন্ধত্ব যদি ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, এদের শিক্ষা দিয়ে কর্ম ও উপার্জনক্ষম যদি করে তোলা যায় তো জাতীয় সম্পদের ক্ষতি তো দূরের কথা, অন্তত পৌনে সতর কোটি টাকা বাৎসরিক লাভ হবে। বড় কম কথা নয়। শুধু লোকসানটিই পূর্ণ হবে না, স্থিতির ঘরে আরো পৌনে সতর কোটি টাকা যোগ হবে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের কারো এ বিষয়ে এতটুকু খেয়াল নেই।

জন্মান্তরবাদে অবিচল বিশ্বাসী হিন্দুর কাছে আত্মার নির্বাণের অনুপন্থী হচ্ছে জপ-তপ, দানধ্যান, ধর্মকর্ম, পূজাপার্বণ। দানের মোহে হিন্দু পাত্রাপাত্র বিচার করে না। উপযুক্ত অনুপযুক্তের কথা আমলে আনে না, ন্যায়-অন্যায় দেখে না। পাত্র চোর, ডাকাত, খুনে, গাঁঠকাটা, মাতাল, ব্যভিচারী, যাই কিছু হোক না কেন, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সামনে দাঁড়ালে সে দয়াদাক্ষিণ্যে গলে যায় এবং তাকে কিছু দিয়ে বিদায় দেবার জন্য তার হাত সুড়সুড় করে। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীনের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে থাকা বা আঁচল বিছিয়ে বসে থাকা কোন অন্ধ অভাগাকে একটি পয়সা দিতে হিন্দু কার্পণ্য করে না, কেননা এর ফলে তার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হয়ে যায়। তার আজন্ম সঞ্চিত পাপের প্রক্ষালণ হয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, যে দশের কল্যাণে দেশের কল্যাণ হয়, সেই দশের মধ্যে এই অভাগারা পড়ে না। কারণ সত্যকার কল্যাণ এই দানের ভিতর নেই। এর দ্বারা আমরা যে শুধু দেশেরই সর্বনাশ করছি, কেবল তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে এই "বিশেষ জাতি"টিকে শ্রমবিমুখ করে সাংসারিক বোঝা

* সরকার থেকে আমাদের এ সালের Provincial Council on Blindnessএ লেখা একটি চিঠিতে দেখলুম, অন্ধদের আলাদা গণনার কোন বন্দোবস্ত হয়নি এবার।



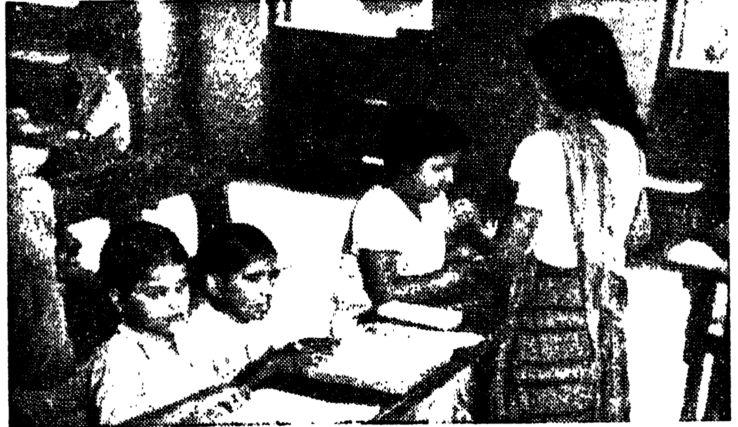
মেয়েরা আম্বেরি নামক শন্ জাতীয় hemp ফাইবার থেকে চটি জুতো, মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ, প্রভৃতি তৈরী করছে



মণ্টেসোরি ক্লাসে Object lessons-এর কাজ চলছে। শিক্ষয়িত্রীর বাঁদিকে একটি দু'বছরের ছেলে

করে ফেলছি। বৎসরে যতগুলি পয়সা আমরা এমনি উদ্দেশ্যহীন দানের পিছু অনর্থক খরচ করি, সে পয়সা যদি আমরা অন্ধ বা এজাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করি, তো শহরে শহরে এমনি অনেক আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, যেগুলি ধীরে ধীরে এই অঙ্গহীনের দলকে শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমপরায়ণ করে তুলে জনসাধারণের দানকে সার্থক করে তুলবে। শিক্ষার ফলে বিকলাঙ্গ তার বিকলতার ব্যথা ভুলে গিয়ে আমাদেরই মত মনুষ্যত্ব অর্জন করে আপনার জীবিকা সংস্থান করবে। দানের সময় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অন্ধরাও আমাদের মত অস্থি-চামড়া ও রক্তের মানুষ এবং "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" কাকে বলে বেশ বোঝে। অঙ্গহীনতার অজুহাতে কারো কাছে এমনি দান গ্রহণ করা তারাও ঘৃণা করে। হেয়-প্রতিপন্নতার (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) লজ্জায় এমনিই তারা মরে আছে। কেবল শিক্ষার দ্বারাই তাদের "শ্রেয়-প্রতিপন্ন" করা সম্ভব, অন্য কোন উপায় নেই এবং এটা করতে হলে, চাই দেশময় অন্ধ প্রতিষ্ঠান, দেশময় জাগরণ।

ভারতবর্ষে প্রথম অন্ধ-বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ তেষট্টি বৎসর পূর্বে। এই তেষট্টি বৎসর পরেও আজ আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়ে আছি। পৌনে সতর লক্ষ অন্ধের সেবার জন্য ভারতে মাত্র চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সওয়া দুই হাজার শিক্ষার্থীর স্থান আছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষা পায় এর অর্ধেক। অর্থাভাবই এর মূল কারণ। সরকারী আর্থিক সাহায্য যে পরিমাণ মেলে, তাতে কোন সংস্থারই আত্মনির্ভর হবার উপায় নেই। সবাইকেই ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে দাতৃবৃন্দের করুণার উপর নির্ভর করতে হয়। এই লজ্জাকর দশার জন্য যে ইংরাজ শাসনই ছিল সম্পূর্ণ দায়ী, এর প্রমাণ স্বাক্ষরতা থেকে উপলব্ধি হয়। ১৯০ বৎসরের যে শাসনের শেষে দেশে শতকরা ১২ জন তথাকথিত শিক্ষিত এবং বাকী ৮৮ জন "অজ্ঞানতিমিরান্ধ" ছিল, সে শাসনে অবহেলিত অন্ধদের জন্য যে ৩৭টি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে পেরেছিল, এটিই সংবাদ। আজ তিন বৎসরের স্বাধীনতায় সংস্থার সংখ্যা ৩৭ থেকে ৪০শে উঠেছে এবং স্বাক্ষরতাও শতকরা ৪ ভাগ বেড়েছে, অর্থাৎ স্বাক্ষরের সংখ্যা ১২ থেকে ১৬ হয়েছে। আমরা সাম্যবাদী না হলেও বলতে ইচ্ছা করে যে, সোভিয়েট রাশিয়া হলে এই তিন বছরে কাজ অন্তত এর ডবল এগোত। অবশ্য, শরণার্থী সমস্যা, ভূকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সমস্যায় আমাদের সরকার দিশেহারা; কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়াকেও কম ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় নি। ইচ্ছা (আয়রন উইল) থাকলে কি না সম্ভব হয়।



Standard II Class-এর একটি দৃশ্য। মেয়েরা Braille বই আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ছে, আর শিক্ষয়িত্রী দাঁড়িয়ে পাঠ নিচ্ছেন



স্কুলের বড় বড় মেয়েরা, যাঁদের মধ্যে চারজন শিক্ষয়িত্রীও আছেন

সোভিয়েট রাশিয়ার কথা তুলতেই আমেরিকার কথাও মনে পড়ে যায়। অন্ধদের শিক্ষা বিস্তারে আমেরিকা আজ অগ্রণী। "অন্ধ-জাগরণ" সম্বন্ধে ওদেশে যে পরিমাণ গবেষণা হয়, সে আর অন্য কোথাও হয় না, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়। অন্ধদের দ্বারা কি পরিমাণ এবং কি জাতীয় কাজ করা সম্ভব, মেট্রো-গোল্ডুইনের একটা ডকুমেণ্টারী—নাম তার "সীইংগ হ্যাণ্ডস্"—দেখলেই বেশ বোঝা যায়। চক্ষুষ্মান আমাদের অহংকার আছে যে, আমরা অন্ধ নই, আমাদের চোখ খোলা। এ ছবিখানি দেখলে আমাদের এ অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়ে সত্যকারের চোখ খুলে যাবে। বড় বড় কারখানার বিরাট বিরাট দানবীয় যে সব যন্ত্রের কাছে যেতেও আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসব, সে সব যন্ত্রের পরিচালনা এই অন্ধরা নির্ভয়ে করছে। এক সেকেণ্ডের অসাবধানতায় যেখানে প্রলয়ের ভেরী বেজে উঠবে, সেখানে কি প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে অন্ধরা অন্যদের সঙ্গে টেক্কা মারছে। অন্ধদের মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনা এত কম এবং দৃষ্টিশক্তিধারী শ্রমজীবীদের তুলনায় এদের একাগ্রতা এত বেশী যে, কারখানার কর্তারা অন্ধদের নিয়োগ করতে এতটুকুও পিছ্‌পা হন না। ফোর্ডের কারখানা এই পক্ষপাতহীনতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৪৩ সালে মিঃ এডসেল ফোর্ড অন্ধদের সম্বন্ধে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সেই রিপোর্টের কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—


ছেলেরা রণ-পা চড়ার অভ্যাস করছে

"অন্যান্য কম্পনীর মত আমরাও আমাদের কম্পনীতে শারীরিক বিকলতায় অক্ষম (ডিসএবল্‌ড) কর্মীদের কাজে লাগানয় অনেকদিন থেকেই অভ্যস্ত। আজ আমাদের কারখানায় কর্মনিরত শ্রমজীবীদের মধ্যে ১২০৮ জন পূর্ণ বা আংশিক অন্ধ এবং ১১১ জন মূক-বধির। বিভিন্নরূপ অংগহীনতায় বিকল সর্বশুদ্ধ ১১,১৬৩ জন শ্রমজীবী আমাদের কম্পনীতে পূর্ণ মাইনেতে (ফুল পে) আছে। সাধারণত অন্ধ শ্রমজীবী ঘণ্টায় ৯৫ সেণ্ট থেকে এক ডলার ১৫ সেণ্ট মজুরী পায় (অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের বিনিময়ের হারে ঘণ্টায় ৩৷৷ টাকা থেকে ৪৷৴ আনা পর্যন্ত) আমি যে হারের (রেট) কথা বলছি, সেটা হচ্ছে রিভার রেঞ্জ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া'র ব্যাপার। আমাদের কারখানায় একজন ৭৪ বছরের অন্ধ শ্রমজীবী আছেন, যিনি এখানে আজ ২৪ বৎসর একাদিক্রমে কাজ করছেন। অন্ধদের কর্মে নিয়োগকে আমরা কোন কম্পনীই দয়া-দাক্ষিণ্য মনে করিনে। আমাদের বিকলাংগ শ্রমজীবীদের যে পরিমাণ মজুরী দেওয়া হয়, ঠিক সেই পরিমাণই কাজ তাদের কাছ থেকে আমরা পাই। এদের জন্য কোন বিশেষ ভাতাও নেই, আলাদা বন্দোবস্তও নেই। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, অন্ধদের কর্মে নিয়োগ ও কর্মপ্রবণতাটিকে বাড়ানই হচ্ছে এঁদের সত্যকারের সাহায্য করা।"—আমাদের কাছে, দৃষ্টিযুক্তদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে দৃষ্টিহীনদের এই ঘণ্টায় ৩৷৷ টাকা থেকে ৪৷৴ টাকা রোজগার করা একটা মস্তবড় অর্বাচীনতা। যেন মুড়ি-মিছরীর সমান দর, নয় কি?"


স্কুলের ছেলের দলকে Phisical Education দেবার পূর্বে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে



না না, ওকে আমি ছাড়তে পারব না, কিছুতেই না। ও চলে গেলে আমার অনেক ক্ষতি, অনেক দুর্ভোগ। মনে মনে বললুম আমি।

ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছি না। কি করে আমি ওর যাওয়া বন্ধ করতে পারি? কেমনভাবে আমি ওকে ভুলিয়ে রাখব?

নবেম্বরের এই সান্ধ্য-হিমে আমার হাত-পা যত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, মাথার ভেতরটা যেন তত গরম হয়ে উঠছে, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সবকিছুর, মানস-দর্পণের অনেকগুলো ছবি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, রঙ আর রেখা একাকার হয়ে যাচ্ছে মিলেমিশে।

অস্বস্তিভরে পায়চারী করতে করতে আমি ঘরের পূব জানালাটা খুলে দিলুম। চোখে পড়ল শহরের চওড়া রাস্তা, সত্যনারায়ণ পার্ক আর এক ফালি আকাশ। ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলটা ছুটির শনিবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। কর্ম-কোলাহলের প্রতিটি কেন্দ্রে তালা পড়েছে, সন্ধ্যার তুহীনশীতল মৌনতা পার্কের গাছে-বেঞ্চিতে গাঢ় হয়েছে। লম্বা কটন স্ট্রীটের ওপর ব্যস্ততার ভারী বোঝা অবিরাম বৃষ্টি-পাতে লঘু হয়ে আসছে।

বৃষ্টি নেমেছে, নবেম্বরের মধ্যপাদে এ এক আশ্চর্য অলক্ষণে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়, ঝাপসা ঝাপটায় একাকার হয়ে গেল সব। পার্কের লম্বা গাছগুলোয় কে যেন সুর করে করে কেঁদেই চলেছে।

আমায় ছেড়ে চলে যাবে মান বাহাদুর। চলে যাবে তার আপন দেশ নেপালে। সত্যিই কি চলে যাবে? কিছুতেই রাখতে পারব না তাকে? রুখতে পারব না কোনক্রমে?

তাহলে কে আমার গিনি সোনার দোকানে বন্দুক হাতে পাহারা দেবে? ব্যাঙ্কে যখন ক্যাশ জমা দিতে যাব, কে তখন মুণ্ডমালার মত কার্তুজের বন্ধনী বুকে বেঁধে মোটরের সামনে গিয়ে বসবে? কে আমার বড় ছেলেকে মিলিটারী মার্চ শেখাবে? আমার ছোট্ট মেয়ের কাছে অনেক দূরের এক মোকাই-ফলা উপত্যকার গল্প করবে?

পুবালি হাওয়ায় অশুভ পঙ্গপালের মত মেঘের পাল নেমে আসছে আকাশক্ষেত্রে। ভরসন্ধ্যা মূর্তিমান অকল্যাণের মত ম্লান হয়ে উঠল দিকে দিকে। কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে পার্কের ধারে।

ঐ কান্নায় অতীতের অনেক স্মৃতিচিত্র অনেক প্রীতিনির্ভরতা।

আমি চাইনে সে সব মনে করতে।

না চাইলেও বোধ করি শাসনহীন মনকে সংযত করা যায় না।

দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিলুম। ফিরে এলুম ইজি-চেয়ারের কোলে, আলো-য়ানের উত্তপ্ত আশ্রয়ে। ভাবতে লাগলুম মান বাহাদুর কবে থেকে আমাকে ছেড়ে দেশকে ভালবাসতে শিখলে।

বোধ হয় খুব ইদানীং। যেদিন ওদের রাজা কাঠমাণ্ডুতে ভারতীয় দূতের কাছে পালিয়ে এল, সেদিন আমি ওকে লক্ষ্য করেছিলুম, খবরটা শুনেই কেমন যেন মুষড়ে পড়ল, ভবিষ্যতের কথা হয়তো ভাবছিল, হয়তো অনিশ্চয়তার অন্ধকারে কূল পাচ্ছিল না। সেইজন্যে সব কাজেই তার ঢিলেমি পড়ল। বন্দুক হাতে নিয়ে আমার জুয়েলারী দোকানের দরজায় যতটা বুক উঁচিয়ে পাহারা দিত, সেদিন ততটা দিলে না, এক কোণে টুলটা টেনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল।

রাত্রিবেলাতেও সেদিন ছোট মেয়ের কাছে গল্প বললে না। তার নীচের তলার ছোট ঘরটাতে চুপচাপ বসে রইল।

আমি একবার ভাবলুম দোতলা থেকে নেমে গিয়ে ওর ঘরে উঁকি মারব, দু-চারটে

কথা কয়ে সান্ত্বনা দেব ওকে। বহুবার এমনি হয়েছে। দেশ থেকে মায়ের অসুখ-বার্তা নিয়ে চিঠি এসেছে। মুখ মলিন হয়েছে মান বাহাদুরের। আমি কোমল সুরে দু-চারটে কথা বলে মানিঅর্ডারের টাকা হাতে তুলে দিয়েছি আর ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

সাত পাঁচ ভেবে আমি আর ওর ঘরে হানা দিলুম না। কারণ আসল ঘটনাটা যে কি, তা জানতুম না আমি। আমার পক্ষে কথার সান্ত্বনা জমানো সেজন্য শক্ত ছিল।

আরো শক্ত ছিল সেইটে অনুমান করা যা দুদিন পরে কাগজের খবরে বড় অক্ষরে ফুটে উঠল। অনুমানকে ছাপিয়ে এমনি এক শনিবারে নেপালাধীশ নয়াদিল্লীতে পালিয়ে এলেন।

সেদিন রাত্রে মান বাহাদুরকে না ডেকে পারিনি। আজকের মত সেদিনও এই ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসেছিলুম, মান বাহাদুর বসেছিল সামনেটায়। ছিপছিপে লম্বা সুঠাম চেহারা, চ্যাপটা নাক, চোখ দুটো ছোট ছোট, বড় বড় বাড়ীর দোরে যাদের পাহারা দিতে দেখা যায়, তাদের সঙ্গে তার চেহারার অমিল নেই এতটুকু। তবু আমার চোখে মান বাহাদুরকে অন্যরকম ঠেকত। অনেক কম বয়সী, অনেক কোমল, অনেক বিশ্বস্ত।

মনে পড়ছে, বড় ছেলে, ছোট মেয়ে কেমন আগ্রহ করে আমার ইজিচেয়ারের ডালপালাতে বসেছিল, স্ত্রী পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন। সবায়ের মনে একই চেতনা, একই কৌতূহল। মান বাহাদুর সেই দেশের লোক, যে দেশ থেকে রাজা পালিয়ে এসেছে। যে দেশে ঝড়ের মেঘ থম থম করছে। কি যেন হতে চলেছে সেখানে।

মান বাহাদুর গল্প করল। আমার ছোট্ট মেয়ের মত আমরা সবাই শ্রোতা। হিন্দীমেশান ভাঙা বাংলায় সে কথা কইলে, কিন্তু বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না। কথার তুলি দিয়ে একটা ছবিকে সে মনের পটে এঁকে দিলে।

ওঃ কতবার আমি সেই ছবির রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। বেড়াতে বেড়াতে অনেকবার মনে হয়েছে, একী বৈপরীত্য, কুণ্ডু জুয়েলারীর মালিক-মহাজনটির মনে কোন অসঙ্গতির ছায়া নিক্ষেপ হল নাকি! নইলে এত কল্পনা কেন তার! সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবোধের প্রলেপ পড়েছে। সে যে এককালে আর্টস পড়েছে, শেলী-কীট্‌স নিয়ে মাতামাতি করেছে, স্বরচিত কবিতায় খুঁজেছে আত্মপ্রসাদ, খুঁজেছে মুক্ত-পক্ষ মনের ঔজ্জ্বল্য, এ সব গিনি সোনার পৈতৃক উজ্জ্বলতার কাছে হয়তো ম্লান হয়েছে, কিন্তু বিবর্ণ-বিকৃত হয়নি আদৌ। হিসেবের কলমে এখনো মাঝে মাঝে অন্য সুরের সুড়-সুড়ি লাগে, মান বাহাদুর হয়তো সেই সুরের আলাপ আমার কানে শুনিয়ে দিলে।

আমি তার কথায় চলে গেছি বিহারের শেষ প্রান্তে। রক্সৌল থেকে নেপাল সরকারের ন্যারো গেজ রেলগাড়ী ধরতে। সে নড়বড়ে গাড়িতে একবার উঠতে পারলেই ভরসা হয় আমলেকগঞ্জ পৌঁছতে পারব। সেখানে পৌঁছেও আমার নিস্তার নেই, মান বাহাদুর আমাকে বাসে চড়াবেই। সরু রাস্তা, ছোট্ট বাস, দারুণ কষ্ট। মান বাহাদুরের কিন্তু তত আনন্দ। সে তার ঘরের দিকে চলেছে।

ভীমফেরী এসে বাস থেমে গেছে। আর ভাল রাস্তা নেই। একটা চড়াইউৎরাইয়ের সরু ইঙ্গিত আছে কাঠমাণ্ডুর দিকে। হাঁটা পথেই চল দশ বিশ মাইল। আগেই জেনেছি, কিছু-দূর গিয়েই আমাদের থেমে যেতে হবে, ঐ দেখা যায় চিটলাং, মান বাহাদুরের বাড়ি। গেঁহু-বাজরা বার্লি ক্ষেত থেকে আশ্রয় পাওয়ার আনন্দবায়ু আমাদের সবাইকে অভিষিক্ত করছে।

বাস, এইটুকু? কাঠমাণ্ডুর গল্প বলবে না বাহাদুর?

সে আর এক দেশ, তরাইএর মশা-ম্যালেরিয়ার জঙ্গল ছাড়িয়ে, সমান সমতল ভূমির পারে সে এক নিষিদ্ধ নগরী। কাছে নীল নীল পাহাড়, দূরে উঁকি মারে গোঁসাই-থান, গৌরীশঙ্কর, আরো দূরে শুভ্রদীপ্ত এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা।

মানুষের মন যদি ঐ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরের মত শুভ্র হোত, যদি হোত ঐ শিখরসানুদেশে রডোডেনড্রন অরণ্যের গায়ে বিকশিত বসন্তের মত রঙে রঙীন তাহলে বোধ হয় কারা যেন সুখে থাকত। কিন্তু তা হয়নি। জঙ্ঘার অস্থি দিয়ে তৈরী বাঁশী বাজায় শান্তিকামী বৌদ্ধ-ভিক্ষু, যুগের পর যুগ ধরে শক্তিহীন রাজা বসে থাকে রাজপ্রাসাদে, যথেচ্ছ অত্যাচারে আনন্দ করে বেড়ায় রাণাবংশ।

কোথায় রাজধানী, কোথায় দেশ! ষোড়শ শতাব্দীর কোলে সবাই ফিরে গেছে। সব অন্ধ-কার। সমতল উপত্যকায় শুধু গেঁহু বাজরা মকাইএর ফসল ফলে। তাতে পেট ভরে না। দেশের পুরুষ ভাড়াটে সৈন্যদলে নাম লেখাতে চলে আসে রক্সৌল।

তেমনিভাবেই চলে এসেছে মান বাহাদুর। কিশোর ছিল বলে ছিটকে পড়েছে কুণ্ডু জুয়েলারীতে।

সেদিনের গল্প শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেই পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে মান বাহাদুর। নইলে যা কখনো হয়নি তা হবে কেন! আমাকে না বলে তার পরদিন দুপুরে সে উধাও হল কেন?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করেছি। সে ফেরেনি। কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে? আমার অনেক কাজ তার জন্যে আটকে যাচ্ছে। তাকে নইলে চলবে না। মস্ত বড় সোনারুপোর দোকান, আর এই বাজার। যা ডাকাতির হিড়িক!

বড় ছেলে সেই রাত্রে গল্প শুনতে চাইল। আমি খুব চাপাস্বরে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। এ সব কথা জোরে বলা যায় না, একটু সজোর উচ্চারণে সব ছবি ভেঙে যাবে।

বড় ছেলে অবাক হয়ে বললে, তুমি এত সব জানলে কি করে?

খুব সহজে, বললুম আমি, মান বাহাদুরের বন্ধুরা এসেছিল দোকানে। তাকে খুঁজে গেছে। আমি বলেছি, সে আমাকে কিছু বলে যায়নি। তোমরা দেখা পেলে তাকে একবারটি আমার কাছে আসতে বোলো।

তারপর গল্প শুনেছি। সে কি গল্প! সে যে ছবি। পশ্চিম নেপালের কর্ণালি নদীর ধারে হাতী চড়ে বেড়াচ্ছি আমি। চতুর্দিকে পাহাড়ের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর, অরণ্যের দুর্ভেদ্য পরিখা। তার মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা কর্ণালি বয়ে চলেছে। দূরে দু-চারটে হরিণ দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটা বনবিড়াল উঁকি মারল ঝোপের ভেতর, বাঘের ডাক প্রতিহত হল ঘন অরণ্যে। নদীর জল ছেড়ে আকাশে উড়ল মারগ্যানসারের ঝাঁক।

আমার মানসভ্রমণ পশ্চিম থেকে পূবে দিকে ফিরল। ভারত সীমান্ত ছাড়িয়ে আবার ছুটেছি আমলেকগঞ্জের দিকে। কিন্তু অত-দূর যেতে হয়নি। অল্প গিয়েই থামতে হয়েছে। বীরগঞ্জ গিয়ে রেল দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এখন রক্তবর্ণের বিপ্লবী পতাকা উড়ছে।

আর কোনো খবর পাওনি তোমরা? মান বাহাদুরের দেশভাইকে প্রশ্ন করেছি। না, বীরগঞ্জে এসেই গল্প শেষ হয়ে গেল। বাকীটা ঘটনা। কংগ্রেসের বীরগঞ্জ অধিকার করার ঘটনা।

এই ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘটনার ঢেউ এসে লেগেছে বাহাদুরের বুকে। এটুকু বুঝলুম তার পরদিন। দুপুরবেলা বড় খোকা চুপি চুপি বললে, বাবা, মান বাহাদুর এসেছে।

কই, কোথায় গেল, ডাক শিগ্‌গির, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলুম আমি। মান বাহাদুর এখনি আমার সঙ্গে দেখা করুক, জরুরী কাজ আছে।

সে সোজা দোতালায় আমার ঘরে এল। মুখে অনিদ্রার ক্লান্তি। ছোট ছোট চোখ দুটো জ্বলছে।

বললে, স্পষ্টই বললে, কালকে সে ওয়ে-লিংটন স্কোয়ারে প্রবাসী নেপালীদের সভায় যোগ দিয়েছিল। সেখান থেকে এক গোপন আলোচনা সভায় গিয়ে রাত হয়ে গেল। তখন সে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে—

তোমার বন্ধুরা এখানে খুঁজতে এসেছিল। এখন বুঝেছি কেন। ওরা সবাই যাচ্ছে নেপালে? সবাই নয়? তাহলে তুমি কেন? একটু অপেক্ষা

কর। দেখবে এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কাঠমাণ্ডুতে কংগ্রেসের পতাকা উড়েছে। রাণার দম্ভ ধুলোয় লুটিয়েছে। রাজা আবার ফিরে গেছে সিংহাসনে।

আমার কথা বুঝলে কিনা কে জানে, সে দিনটা মান বাহাদুর থেকে গেল। আমি চোখে চোখে রাখলুম। রাত্রি গভীর পর্যন্ত গল্প করলুম দুজনে।

বললুম, মনে আছে মান বাহাদুর, আমি যখন কলেজে পড়ি তখন বাবা তোমায় কোত্থেকে ধরে আনলেন। আমার ছোট ভায়ের বয়েসী তুমি। সে তোমার সংগে বন্ধুর মত খেলাধুলো করেছে।

এর বেশী আমার কথা এগোয়নি। পুরোণো স্মৃতির পাঁজি ছিল গভীর। সব সময়ে তাকে গল্প করে বলা যায় না।

সে কিন্তু আমার সামনে বসে অনর্গল কথা বলে গেছে। শুধু সেদিন নয়, তারপরে আরো কয়েকদিন, কয়েক রাত। আমি ইজি-চেয়ারে চোখ বুঁজে বসে থাকতুম আর সে হাত নেড়ে নেড়ে কথা কইত। কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়ত। কখনো দুঃখে মাথা নীচু করত, কতক্ষণ কথাই বলতে পারত না। আমি অভ্যাসের বশে তার কথার মধ্যে ছবি দেখতুম।

দেখতুম, তরাইএর জঙ্গল ফেলে, শিবালিক রেঞ্জ পিছনে রেখে, তাম্বুর নদী পেরিয়ে উত্তর নেপালে দুরূহ উচ্চতায় অধিরোহণ করছি। অবশেষে মঙ্গলবারীতে তাঁবু পড়ত। আরো উত্তরে তাকিয়ে দেখতুম কুচি কুচি বরফে রডোডেনড্রন ফুলগুলি ঢেকে গিয়েছে, দূর দিগন্তবলয়ে পর্বতের ঢেউ উঁচু হতে হতে এভারেস্টের শাদা চুড়োয় এসে থেমে গেছে। পূবে রাণা-মন্ত্রীর মত শাদা ঝুঁটি উড়িয়ে সবুজ অরণ্য-সভায় বসে আছে মাকালু পর্বত, তার মুখোমুখী পশ্চিমে রয়েছে উন্নতশির গৌরীশঙ্কর।

দেখতে কি পেতুম! বোধহয় না। দুধের ফেনার মত রাশি রাশি উড়ন্ত শাদা মেঘ এসে শুষে নিত পার্বত্য রূপ সমারোহ। সেই সংগে বরফ জমত চারধারে। ক্লান্ত পদবিক্ষেপে নামতে হত। চলতে চলতে বিরাটনগরে গিয়ে আশ্রয় নিতুম।

বাঃ এইত বেশ জায়গা, খাঁটি শহর, চারদিকে কলকারখানা, ইলেক্‌ট্রিক, বাঁধানো রাস্তা, অভাব নেই কিছুর। কাছেই কোশী নদী। সেখানের স্রোতোধারায় আগল পড়েছে, বিরাট বাঁধ তৈরী হচ্ছে। কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন জলবিদ্যুতে বিরাট নগরের শিল্পপ্রসার হবে, পাহাড়ী মাটিতে ফলবে সোণার ফসল, জীবনের নতুন ছবি উঠবে জেগে। সারা নেপাল ঘুরে বেড়িয়ে শেষে এমন একটা জায়গা পেয়ে খুশী হতুম আমি।

আমার হাসিকে থামিয়ে দিত সে। সেদিনকার খবরের কাগজের মত খুব বড় বড় করে বলত, বিরাট নগরের দিকে হাজার হাজার সরকারী সৈন্য ছুটে আসছে, কংগ্রেস বাহিনীর গোলাগুলি ফুরিয়ে এসেছে, এবার বুঝি সব যায়।

মুখ কালো হয়ে যেতো তার। আমি জোর করে থামিয়ে দিতুম। ওসব কিচ্ছু না। ভারত সরকার সব মিটিয়ে ফেলবে। একটুখানি ধৈর্য ধরো।

শেষপর্যন্ত সে ধৈর্য ধরতে পারলে না। আমি অনেক বুঝিয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিলুম আর সে ছুটল চাল্লিশ চৌরঙ্গীতে।

আজ বেলা দুটোয় আমি দোকান বন্ধ করে দোতালায় উঠে এসেছি আর মান বাহাদুর পেছু পেছু এসে আমার হাতে বন্দুকটি সমর্পণ করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম দেবার জন্যে চলে গেছে।

এবারে ওর হাতে নতুন বন্দুক উঠবে। সে বন্দুকের নাসারন্ধ্রে অগ্নিবিন্দুর অমেয় উচ্ছ্বাস। কুণ্ডু ব্রাদার্সের ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলারী দোকানে আর সেই পরিচিত মান বাহাদুরকে পাওয়া যাবে না। স্নেহ ভালবাসা হার মেনেছে স্বদেশপ্রীতির কাছে।

আর ভাল লাগছে না এই বসে বসে ভাবতে। পূব জানালাটা আবার খুলে দিলুম আমি। আধো অন্ধকারে অনুভব করলুম, সারা আকাশ জুড়ে মোষের চামড়ার মত কালো কর্কশ দেহ মেলেছে মেঘের দল। গুঁড়ো তুষারের মত একটানা বৃষ্টি ঝরছে। ঝাপটার দাপটে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর রং, বরফের মত শীতকঠিন হাওয়া ভিজে বাড়িগুলোর মজ্জায় কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটু দূরে সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে কে যেন মৃদু করুণ সুরে কাঁদছে।

এ কান্না হয়তো সর্বনাশের। আর যদি মান বাহাদুরের দেখা না পাই!

আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, বললেন, মান বাহাদুর ফিরেছে।

তাই নাকি? চল চল আমরা ওকে ডেকে নিয়ে আসি। কখন যেতে হবে কিছু বললে? বোধহয় কালকের দিনটা থাকতে পারবে। সোমবার যদি এখান থেকে রওনা হয় তাহলে বিরাটনগরে পৌঁছতে ওর—

কথা বলতে বলতে আমি দ্রুত পদে ঘরের দরজা ছাড়িয়েছি এমন সময়ে স্ত্রী বাধা দিলেন, বললেন, এখন ডেকে কাজ নেই, ওকে একটু শান্ত হতে দাও।

খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বুঝি? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

না, সে তার ঘরের এক কোণে বসে বসে কাঁদছে, সহজ কণ্ঠে বললেন আমার স্ত্রী।

কাঁদছে? কেন? কি হল আবার? ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলুম আমি। আমার তখন দেরী সইছে না।

এবারে হেসে উঠলেন আমার স্ত্রী। হাসতে হাসতে বললেন, ভারত থেকে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক আইনে এ বিষয়টা অবৈধ কিনা তার জন্যে উকিলের পরামর্শ নেয়া হচ্ছে।

মান বাহাদুর এযাত্রা থেকে গেল। খুসী হয়ে উঠলেন আমার স্ত্রী।

আমার চোখের সামনে তখনো ছবি ভাসছিল। দুটো ছবি, পাশাপাশি।

বিরাটনগর যায় যায়, কংগ্রেস বাহিনী হারলো বুঝি। এই বুঝি জিতে গেল শতাব্দীর পাপ। নগর ঘিরে দাউ দাউ দাবাগ্নিশিখায় আগুন জ্বলছে, পরাজয় মানে গণতন্ত্রের মৃত্যু, জাতির ধ্বংস। পরাজয় মানে অত্যাচারীদের বেড়াজালে পা দেয়া, জীবনকে শৃঙ্খলিত করে ফেলা।

কারা যেন এগিয়ে চলেছে সেই বহ্নিবলয়ের দিকে। কে যেন পিছে পড়ে রইল। কে যেন যেতে পারত। বুক দিয়ে পড়তে পারত আগুনের ভেতর। কঠিন বাহু তুলে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারত শত্রুর শিরে। বন্দুকের দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে কে যেন ছুঁড়তে পারত মৃত্যুবাণ। কে যেন হতে পারত স্বদেশের প্রচণ্ড পাহারাদার!

তার বদলে সে প্রতিদিনের একঘেয়ে অভ্যস্ত জীবনে ফাঁকো কার্তুজের রঙগীন মালা বুকে ঝুলিয়ে শূন্যগর্ভ বন্দুক নিয়ে মাইনে করা পাহারা দেবে, পাহারা দেবে আমারি দরজায়।

আমার খুসী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতে পারলুম না।

পূবের জানালাটা এবার বন্ধ করে দেব। কে যেন কাঁদছে।



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

রোহা গাভীটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল। মনে হইল চুপি চুপি সে যেন কোনও গোপন কথা বলিতেছে।

বলিল, "আমি শান্তিপ্রিয় লোক। অশান্তকে শান্ত করাই আমার ধর্ম। আমি বন্য গাভীকে ঘিরিয়া রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া শান্ত করিতে চাই। ওই গাভীটিকে প্রথম যেদিন বন্দী করিয়াছিলাম সেদিন ও খুব বেশী ছটফট করিতেছিল। এখন আর তত ছটফট করিতেছে না। কিন্তু আহার ত্যাগ করিয়াছে। কাল উহাকে ছাড়িয়া দিব, আবার কিছুদিন পরে ধরিব। আমার বিশ্বাস বন্দী অবস্থাতে ক্রমশঃ ওই গাভী আমাদের প্রদত্ত খাদ্য আহার করিবে। আমার বিশ্বাস ক্রমশ উহার অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এই নির্জন নিগম বনে গরুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি। আমি কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে চাই না। ভাবিয়া ছিলাম উলম্ভন যদি আমাকে বেশী বিরক্ত করে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গরুর দল লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। কিন্তু অন্য কারণে এখন আবার অন্য প্রকার ভাবিতেছি। আমার কন্যা শিলাঙ্গীকে লইয়া আমি একটু বিব্রত হইয়াছি। তাহার জন্য আমার শান্তি বারম্বার বিঘ্নিত হইতেছে। প্রথমত আমার পত্নীদের মধ্যে যাহারা শিলাঙ্গীর সমবয়সী তাহারা কেহ উহাকে সুচক্ষে দেখে না। শিলাঙ্গী সুন্দরী এবং আমার প্রিয়পাত্রী বলিয়াই সম্ভবত তাহারা ঈর্ষান্বিতা। শিলাঙ্গীকে প্রায়ই তাহারা কষ্ট দেয়, প্রহার পর্যন্ত করে। দ্বিতীয়ত, শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া আমাদের দলের একদল যুবক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই রক্তারক্তি হইতেছে। শিলাঙ্গী কিন্তু উহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না। শিলাঙ্গীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। আমার জননী যমক্ষী বলিত যদি কোন মেয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই দলপতির কর্তব্য। যমক্ষী তাহার নিজের একটি কন্যাকে এজন্য হত্যাও করিয়াছিল। আমি কিন্তু যমক্ষীর এ নির্দেশ মানিতে পারিব না। শিলাঙ্গীকে হত্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু কাল তাহার মুখে একটি সংবাদ শুনিয়া মনে হইতেছে যে হয়তো আমার মানসিক উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে, হয়তো আবার শান্তি ফিরিয়া পাইব। শিলাঙ্গী নাকি তোমাকে পছন্দ করিয়াছে, তোমাকেই বিবাহ করিতে চায়। সেইজন্য আমি ঠিক করিয়াছি যে তোমরা সত্যই যদি আমাদের সহিত মিলিত হইতে চাও দুইটি সর্তে মিলিত হইতে পার। প্রথম সর্ত তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবে। দ্বিতীয় সর্ত আমাদের গরুর জন্য তোমাদের তৃণশস্য দিতে হইবে। তোমরা যদি এই দুইটি সর্তে সম্মত থাক আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমি নিজে করিব না, আমার সম্প্রদায়ের যুবকেরা করিবে। ঝোনঝিরার নেতৃত্বে একদল যুবক যুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া আছে। তাহারা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে। তুমি তোমার দলপতিকে গিয়া এই সকল কথা বল, তিনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন আমরাও সম্মত আছি জানিবে। আগামী পরশ্ব পূর্ণিমা। সেই দিনই তাহা হইলে তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দিব"

রোহা নীরব হইল। আমিও নীরব হইয়া রহিলাম। আমি কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এত সহজে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে যে শিলাঙ্গীকে পাইব তাহা কল্পনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহাকে পাইলে যে আনন্দলাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা যেন পাইলাম না, বরং মনে হইল একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্রের জালে বোধহয় জড়াইয়া পড়িতেছি। ভয় হইল। সহসা নিনানির বিবর্ণ মুখটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহার কথাগুলি আবার যেন আমি শুনিতে পাইলাম —"আমার ভয় হইতেছে, তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, তুমি চুপ করিয়া থাকিও না—"

রোহা ফিস ফিস করিয়া বলিল, "তোমার আর যদি কিছু বক্তব্য না থাকে তুমি যাইতে পার—আমি একা থাকিতে চাই"

আমি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া শিলাঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া আমার অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটু আগে আমার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল তাহা প্রবলতর হইয়া আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে আমি মূঢ়ের মতো একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল শিলাঙ্গীকে আমি কয়দিন দেখিয়াছি? তাহার কতটুকু চিনি আমি? সে যে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া একটা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিতেছে না তাহার প্রমাণ কি? তখন বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। নানারূপে অহেতুক ভয়ে ভীত হইয়া আমি জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আজ বুঝিতে পারিতেছি ভয়ের কোনও হেতু ছিল না, আমি ভয় পাইতেছিলাম শিলাঙ্গীকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবার শক্তি আমরা তখনও অর্জন করি নাই। আমরা সকলকেই সন্দেহ করিতাম, সকলকেই স্বার্থপর মনে করিতাম, এমন কি দেবতাকেও। পুরোহিতের সহায়তায় স্বার্থপর দৈবী শক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া আমরা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতাম। দেবতার মহত্ত্বেও আমরা আস্থাবান ছিলাম না। মানুষের মহত্ত্বেও ছিলাম না। যে শিলাঙ্গীকে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এত ভাল লাগিতেছিল তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ বিভীষিকা আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথ যদি জানা থাকিত আমি হয়তো পলায়ন করিতাম। কিন্তু অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবার সাহস ছিল না। দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিঘাওয়ের বর্ণিত চিত্রটি মনে পড়িল—বন্যা বিধ্বস্ত মূষিক সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। শিলাঙ্গী কি সত্যই মনুষ্যরূপিনী সর্পিণী ? আর আমি কি মূষিক?

শিলাঙ্গী কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিল।

"জংলা, জংলা, কোথায় গেলে তুমি—"

"এই যে এখানে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

"তোমার জন্য দুধ আনিতে গিয়াছিলাম। নাও, একটু দুধ খাও চল—একটা মশালের কাছে যাই—"

শিলাঙ্গী একটা বাঁশের কোঁড়ে করিয়া আমার জন্য দুধ আনিয়াছিল। পান করিয়া শরীরে যেন নূতন শক্তি সঞ্চার হইল। শুধু

শান্তি নয় একটা অভিনব অনুভূতির বন্যায় আমার মনের সমস্ত গ্লানিও যেন ভাসিয়া গেল। শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া যে ভয় ভাবনা সন্দেহ আমাকে এতক্ষণ আকুল করিতেছিল তাহা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে শিলাঙ্গীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই শিলাঙ্গীকে আবার যেন ফিরিয়া পাইলাম। মশালের নিকট কয়েকজন 'সশস্ত্র যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিল এবং আমাকে প্রশ্ন করিল—" উলম্ভনের দূত কি তোমাদের কাছেও আসিয়াছিল?"

"হাঁ"

"তোমরা কি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ঠিক করিয়াছ?"

"আমাদের দলপতি তোমাদের দলপতির নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে আমরা উভয় দল মিলিত হইয়া যদি উলম্ভনকে আক্রমণ করি তাহা হইলে উভয় দলেরই সুবিধা হয়। রোহা দুইটি সর্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে রাজি আছে। আমাদের দলপতি ধবলকে গিয়া সর্ত দুইটি বলিব, ধবল যদি আপত্তি না করে আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব"

"সর্ত দুইটি কি—"

"প্রথম সর্ত—"

শিলাঙ্গী ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"না, না, বলিও না।"

তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

যুবকটির দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম—"ধবল যদি রাজি হয় কালই আমি আবার আসিব, তখন সমস্ত কথাই জানিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস ধবল আপত্তি করিবে না, কারণ উলম্ভনের স্পর্ধা আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে"

"আমাদেরও করিয়াছে। ধবল বা রোহা যদি যুদ্ধ না করে আমরা যুদ্ধ করিব"

"আমাদেরও তাহাই ইচ্ছা। দেখা যাক কতদূর কি হয়।"

শিলাঙ্গী বলিল—"চল, তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। বেশী রাত হইয়া গেলে আবার মুশকিল হইবে"

"চল—"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আমরা আবার বনের ভিতর পড়িলাম। মনে হইল যেন সুর-লোকে প্রবেশ করিলাম, ঝিল্লীদলের সম্মিলিত ঝঙ্কার যেন আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য অরণ্যের অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চমকাইয়া উঠিলাম যখন আমাকে শিলাঙ্গী জড়াইয়া ধরিল।

"রোহা কি সর্ত করিয়াছে আমি জানি। বলিব? প্রথম সর্ত তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, দ্বিতীয় সর্ত আমাদের গরুর জন্য ঘাস দিতে হইবে। তুমি রাজি আছ তো?"

"আমি রাজি থাকিলে তো হইবে না ধবল যদি রাজি হয় তবেই তো"

"ধবল নিশ্চয় রাজি হইবে"

"কি করিয়া জানিলে?"

"দেখিও"

কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটিবার পর শিলাঙ্গী আবার বলিল—"ধবল ঠিক রাজি হইবে। সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি"

"কি ব্যবস্থা?"

"আমাদের পুরোহিত নম্বরুকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। নম্বরু একটা তুক করিয়াছে। একটা বন্য মোরগ এবং একটা বন্য মুরগীর কানে কানে কি বলিয়া তাহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইয়াছে। নম্বরু বলিল ইহাতেই কাজ হইবে, ধবল আর অমত করিবে না। বন্য মোরগ এবং বন্য মুরগীর মিলন অগ্নিশিখার মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে, তোমাদের মিলনও হইবে"

শিলাঙ্গী আবার আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমিও তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলাম। সেদিন সেই ঝিল্লীমন্দ্রিত পরিবেশে অরণ্যের অন্ধকারে আমরা যেন পরস্পরের অন্তরতম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "ইহাতে তুমি সুখী হইয়াছ তো? তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে আমি যেন জোর করিয়া তোমাকে নিনানির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছি। আমি জীবনে যাহা চাহিয়াছি চিরকালই তাহা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি, রোহা আমার কোনও বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখে নাই। কিন্তু তুমি যদি সুখী না হও তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। বল, তুমি সুখী হইয়াছ তো?"

শিলাঙ্গীকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া তাহার কানে কানে বলিলাম—"খুব সুখী হইয়াছি। তোমাকে যে পাইব ইহা আমার আশার অতীত ছিল—"

শিলাঙ্গীকে মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই আমি সুখী হইয়াছিলাম। আমার অন্তরতম সত্তা শিলাঙ্গীর অন্তরতম সত্তাকে আপন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। যেদিন শিলাঙ্গীকে প্রথম দেখি সেইদিনই পারিয়াছিল। একটা কথা সেদিন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। আমার অন্তরতম সত্তাকে ঘিরিয়া যে আর একটা প্রবলতর পশু-সত্তা আছে যাহা লোভে লীলায়িত হয়, ভয়ে ভীত হয় স্বার্থে বিচলিত হয়, যাহা অন্তরতম সত্তার প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে যে কোনও দিকে চালিত করিতে পারে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেদিন আমি সচেতন ছিলাম না, তাই শিলাঙ্গীর পরবর্তী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমার দ্বিধা হইল না। শিলাঙ্গী বলিল, "আমি পূর্বে যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহা আশা করি ভুলিয়া যাও নাই।"

"কি কথা?"

"আমি তোমার বন্ধু হইতে চাই, কেবল স্ত্রী নয়। আরও চাই যে তুমিও কেবলমাত্র আমার স্বামী হইও না, আমার বন্ধুও হও। এস আমরা শপথ করি যে সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিব না। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় শিথিল, কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করে না, বিপদের সময় পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে ইতস্তত করে না। তাহারা পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নয়, তাহারা কেবল স্বামী-স্ত্রী মাত্র। একজন স্বামীর বহু স্ত্রী থাকে, একজন স্ত্রীলোকের বহু পুরুষ থাকে, তাহারা কেহ কাহারও বন্ধু নয়। আমার ইচ্ছা আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হোক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আরও বিবাহ করিতে পার আপত্তি করিব না। তুমি নিনানিকে ভালবাস তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, আমি কেবল তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি। তুমি আমার কাছে তোমার কোনও কথা গোপন করিও না, আমিও তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করিব না। তোমার বিপদে আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করিব না, আমার বিপদের সময় আমাকেও তুমি কখনও ত্যাগ করিও না। আমাদের সম্পর্ক শুধু যেন দেহের সম্পর্ক না হয়। ইহাতে তুমি রাজি আছ তো?"

"যদি রাজি না হই তুমি কি করিবে?"

"আমি উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। বুঝিব এ সমাজে আমার স্থান নাই, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল"

শিলাঙ্গীর মুখে এ কথা শুনিয়া আমি সেদিন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছায় কেহ যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে ইহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তখন। যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য এত আয়োজন, এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত আরাধনা, এত যুদ্ধবিগ্রহ—সেই জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছে আমাকে পাইবে না বলিয়া? কি এমন আছে আমার মধ্যে? আমার মধ্যে কি চায় ও? অন্ধকারে সেদিন তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই, বলিতে পারি না তাহার মুখে কি ভাব সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমারও মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় ভাব সঞ্চারিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন এক নূতন দেশে সহসা নীত হইয়াছি, যেখানে আত্মত্যাগ করাই নিয়ম,

মনে হইতেছিল আদর্শের জন্য আমিও হয়তো উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিব। সেই ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রস আমার চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দিল, চকিতের মধ্যে আমি যেন এক নূতন জগতের আভাস পাইলাম।

"উত্তর দিতেছ না কেন। বল না তুমি রাজি আছ কি না"

লক্ষ্য করিলাম শিলাঙ্গীর স্বর কাঁপিতেছে।

"নিশ্চয় রাজি আছি"

পরমুহূর্তেই শিলাঙ্গী আমাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি, বহুদিন পরে পাইয়াছি। জোলমার কথা তখন মনে থাকিবার কথা নয়, জোলমাই যে শিলাঙ্গীরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে একথা মনে আসিবার কোনও সম্ভাবনাই তখন ছিল না, তখন অস্পষ্টভাবে এইটুকুই শুধু মনে হইয়াছিল যাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, জোলমা ওহালির রঙীন বৃক্ষকান্ডে বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তসীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল সেই জোলমাই বহু শতাব্দী পরে অন্ধকারে সেদিন শিলাঙ্গীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেদিন আমি চিনিতে পারি নাই।

আমরা কতক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া ছিলাম জানি না, ব্যাঘ্রের নিদারুণ গর্জনে আমাদের চমক ভাঙিগল। নিগম বনের মশাল-ধারী প্রহরীরাও চীৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "সেই বাঘটা বোধহয় আজও বাহির হইয়াছে। গরু মারিবার জন্য নিগম বনে আসিয়া প্রায়ই হানা দেয়। কিন্তু রোহার প্রহরীরা খুব সতর্ক, এখনও পর্যন্ত একটাও গরু মারিতে পারে নাই। চল আমরা যাই—"

"যদি বাঘের মুখে পড়ি"

"বাঘ আমাদের কিছু বলিবে না। চল না, আমি তোমাকে পাশ কাটাইয়া ঠিক লইয়া যাইব। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকিতে পারিলে বাঘ আমাদের আর কি করিবে"

শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আর আমাদের মধ্যে কোনও বাক্য বিনিময় হইল না। বাঘের ভয়েই যে আমি কথা কহি নাই তাহা নয় একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি আমাকে নির্বাক করিয়া দিয়াছিল. মনে হইতে-ছিল কথা কহিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। শিলাঙ্গীর হয়তো তাহাই মনে হইতেছিল। সে-ও একটি কথা বলে নাই। কিন্তু আমাদের নীরবতা আমাদের উভয়ের অন্তরে যে বার্তা বহন করিয়া আনিতেছিল বাক্য দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। একটু পরে আমরা উভয়ে আসিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গের ভিতরও আমাদের একটিও কথা হইল না। শিলাঙ্গী প্রথম কথা কহিল সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইবার পর। চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভাসিয়া যাইতেছিল। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পরও আমরা নীরবে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। শিলাঙ্গী বাম বাহু-দ্বারা আমার কটি বেষ্টন করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল।

"গাছের উপর ও কে! মানুষ কি?"

তাহার অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম একটি বৃক্ষচূড়ায় সত্যই মনুষ্য-মূর্তির মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া পড়িতেই কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল, "বোধহয় কোনও শিকারী হরিণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে"

আমাদের দেখিয়া তবে লুকাইয়া পড়িল কেন?

"আমাদের বোধহয় হরিণ ভাবিয়াছিল, কিন্তু আমরা হরিণ নয় দেখিয়া আবার আত্ম-গোপন করিয়াছে। আমরা হরিণ হইলে তীর ছুঁড়িত। আমাদের দলের ঘীটা প্রায়ই হরিণ-শিকার করিতে আসে—হয়তো ঘীটাই গাছে চড়িয়া বসিয়া আছে"

"তবু চল একবার দেখিয়া আসি"

গাছটা খুব কাছে ছিল না। তাহার নিকট পৌঁছিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়া গেল। শিলাঙ্গী হরিণীর মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, পাহাড়ের চড়াই উতরাই অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইতেছিল। আমিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতেই চলিয়াছিলাম, তবু সেই বৃক্ষতলে পৌঁছিতে অনেকটা সময় লাগিল। সেখানে গিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গাছের উপরে উঠিয়াও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও কেহ নাই। শিকারীই যদি হয় কোথায় সে আত্মগোপন করিল? কেনই বা করিল? আমরা পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তাহা হইলে ভূত বোধহয়। চল পালাই—। তুমি তোমার ধবলের কাছে যাও আমি রোহার কাছে যাই। রোহা আমার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। এবার বোধহয় তুমি একা যাইতে পারিবে?"

"পারিব"

আবার দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলাম। বৃক্ষ-চূড়ালগ্ন সেই মনুষ্যমূর্তিটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনড় হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথাই যদি সত্য হয়, উহা যদি ভূতই হয়, তবে কাহার ভূত, কেন এভাবে দেখা দিল, বৃক্ষচূড়ায় আবির্ভূত হইল কেন, নানা প্রশ্ন মনে জাগিতে লাগিল, কিন্তু কোনটারই সদুত্তর আমার মাথায় আসিল না।

"কি ভাবিতেছ"—শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল সহসা।

"ওই ভূতটার কথা। কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছে। তোমার?"

"আমার ভয় করে না। কেন করে না জান? আমি মরণকে মানিয়া লইয়াছি। মরণকে যখন কিছুতেই এড়ানো যাইবে না তখন তাহাকে মানিয়া লওয়াই ভাল। মানিয়া লইলে আর ভয় থাকে না। দেখ, দেখ, কি সুন্দর ফুল-গুলি। জ্যোৎস্না উঠিলে ওগুলি ফোটে বলিয়া আমি উহাদের নাম জ্যোৎস্নামণি দিয়াছি—"

শিলাঙ্গী লাফাইয়া লাফাইয়া ফুলগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমি তখন গাছে উঠিয়া লতাশুদ্ধ ফুলগুলি তাহাকে পাড়িয়া দিলাম।

"আমাকে পরাইয়া দাও"

আমি তাহার চুলে, গলায়, বাহুমূলে, কোমরে ফুলের অলংকার পরাইয়া দিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অলংকারগুলি পরিল। তাহার পর বলিল—"এস তোমার মাথাতে আমি ফুলের চূড়া করিয়া দিই"—

আমি মাথা পাতিয়া বসিলাম। সে আমার মাথায় পুষ্পচূড়া রচনা করিতে লাগিল। সহসা আমার মনে হইল কয়েকদিন পূর্বে নিনানির মাথাতেও আমি শাখাপত্র দিয়া আবরণ রচনা করিয়াছিলাম এমনি জ্যোৎস্নালোকে, এই উন্নগা পাহাড়েই। তাহার সে শিরস্ত্রাণ নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নিনানিও কি ভাসিয়া যাইতেছে না? সে-ও কি আমার নাগালের বাহিরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে? নিনানির জন্য সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল সে আমার জন্য তাহার স্বামী তাহার প্রতিপত্তি, তাহার সমাজ, ত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় আসিয়া বাস করিতেছে কিন্তু আমি কি করিতেছি? এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটিল, শিলাঙ্গী কি করিয়া জানি না আমার মনের কথা টের পাইয়া গেল।

বলিল, "তুমি কি ভাবিতেছ বলিব? নিনানির কথা। নয়?"

"তুমি কি করিয়া টের পাইলে?"

"এমনি মনে হইল। নিনানির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দাও, আমি ঠিক তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিব—"

"আমাদের বিবাহ হইয়া যাক তখন দিব"

"এইবার চল আমরা যাই। রোহা নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে"

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই একদল হরিণ সচকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। তাহারা বোধহয় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

......ধবল আমার অপেক্ষায় সাগ্রহে বসিয়া-ছিল। ঠিক পথের ধারেই বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অগ্রসর হইয়া আসিল।

(ক্রমশ)

অনুবাদ সাহিত্য

ফাদার পিটারের কাহিনী

নোরা হোল্ট্

[আইরিশ লেখিকা নোরা হোল্টের জন্ম ডাব্লিনে। দশ বছর বয়সে তিনি অনাথা হন। ইংলণ্ডে তাঁর শিক্ষা ও জীবিকার্জন। প্রথম গল্প-গ্রন্থের নাম 'পুওর উইমেন'—'গরীব মেয়েরা'। তারপর একখানি উপন্যাস প্রকাশ ক'রে কিছুদিন ডাব্লিনে এসে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিলেন আমেরিকায়, এখন আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন।]

বহুদিন বাদে কোথাও ফিরে এলে দু-একদিন পরেই কেমন একটা অতৃপ্ত অস্বস্তি জাগে, যেন মনে আরও কিছু আশা ছিল। অন্ততঃ তাই আমার মনে হচ্ছিল সেই রবিবার সন্ধ্যেবেলা ও-কনেল্ ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, মনের একাংশ দিয়ে ভাবতে ভাবতে, যে স্যাক্ভিল্ স্ট্রীট্টা—এখন নাম ও-কনেল্ স্ট্রীট—আরও ভালো করে ফিরে গড়া যেতে পারত। বড্ড বেশি আধুনিক হয়ে গেছে আমার মতে।

আর মনের অপর অংশটা দিয়ে কামনা করছিলাম যে, কিছু একটা এখন ঘটুক, কেউ আমাকে দেখে অভিনন্দন জানাক, ডাব্লিন আবার আমার লণ্ডন প্রবাসের সেই নিঃসঙ্গ প্রথম দিনগুলোর মত বন্ধুত্বের পুণ্যতীর্থ হোক! অবশ্য এবার আমি অন্য মানুষ—বিয়ে-থাওয়া করেছি, স্ট্রেথামে বাসা করেছি, একটি ছেলেও হয়েছে—কিন্তু কোন জায়গাই আপন দেশের স্মৃতির কাছে লাগে না—কী বলতে চাই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। সর্বদাই মনে হয়, কী যেন নেই তাকে পেতে হলে ফিরে যেতে হবে। অন্ততঃ জাহাজঘাট বরাবর ঐ চ্যাপ্টামুখো জীর্ণ বাড়িগুলো তো তেমনিই আছে!

অবশেষে একটি চেনামুখ এদিকে আসছে দেখে উৎফুল্ল হলাম—উইলি ও-ডনোভান্। আমায় না দেখেই বোধহয় চলে যেত, যদি না আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরতাম।

তখনই আমায় চিনতে পেরে ও বলে উঠল, 'আরে, ফ্রাঙ্ক ফ্যারেল যে। এখানে কী করছ?'

বললাম, দিনকয়েকের ছুটিতে এসেছি, কিছুটা হারাণো দিনের স্মৃতির মোহে, অবশ্য ব্যবসার স্বার্থও আছে। স্বাধীন রাষ্ট্র আয়ার-এর কতকগুলো ব্যাপার আমার ব্যবসার পক্ষে সুবিধের হতে পারে। তখন খেয়াল হল যে, আমাদের এই পুনর্মিলনে একটু আমোদ করা যেতে পারে। উইলি বলল:

'দাঁড়াও দেখি, কোথায় তোমায় নিয়ে যেতে পারি। কেনেডিদের রেস্তোঁরায় যাবে? নতুন মিসেস্ কেনেডি আসার পর থেকে ওরা খুব জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে: তিনি নিজেই অনেক-সময় পরিবেশন করেন। এই তো জাহাজ-ঘাটের খুব কাছে।'

—'তোমার মিসেস্ কেনেডিকে দেখতে আমার আপত্তি নেই। তবে আমাদের অকপট জন্ জেমসেন্‌কে দেখতেই আমার বেশি ইচ্ছে। আমাদের ওদিকে হুইস্কিটাকে যে কতদূর মাটি করতে পারে, তোমার ধারণা নেই।'

উইলি বলল, 'শুনেছি বটে। তা তোমার চিন্তা নেই। যেখানে নিয়ে যাব, এখানেও পানীয়টা ভালোই—মিথ্যে বলছি না।'

তা কেনেডিদের দোতালার খাবার ঘরখানা বেশ আরামেরই ছিল, অবশ্য একটু ঘিঞ্জি, লণ্ডনের দোকানপাট দেখার পর। তবে মিসেস্ কেনেডিকে দেখার কথা উইলি ঠিকই বলেছিল, মহিলা দেখতে বেশ সুন্দরী। বয়েস বছর তিরিশেক হবে, চিবুকের তলায় চর্বির ভাঁজ জমেছে, কিন্তু রংটা বেশ। আর তারই সঙ্গে মিশমিশে কালো চকচকে চুল। উইলি তো আমাদের অর্ডার দিতে গিয়ে সময়টা ও'র সঙ্গেই কাটাতে লাগল। কেমন একটি হাসিহাসি অথচ চাপা ভাব মেয়েটির, দেখে আমার ভালোই লাগল।

উইলি ফিরে আসতে বললাম, 'বেশ দেখতে তোমার মিসেস কেনেডিকে।'

সে বলল, 'একটা গল্প আছে ওর নামে। জানো নাকি?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানব? দশ বছরের ওপর ডাব্লিন ছাড়া, সেই যখন এ দেশের আন্দোলন আমার পক্ষে বড্ড বেশি তেতে উঠল।—

সে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি একাই নও। তোমায় দোষও দিচ্ছি না অতি সাবধান হবার জন্যে। তবে এটা ঘটেছিল তারও আগে।'

—'কী ঘটেছিল?'

তখন উইলি আমাকে গল্পটা শোনাল।

'ওর নিবাস হল মীথ্ পরগণায়। তখন ওর নাম ছিল ব্রিজেট্ কেলি। অল্প বয়সেই ওকে এক পাদ্রীর বাড়িতে রাখা হয়েছিল, কারণ ওর স্বভাবটা ছিল নির্মল আর নম্র, বোধহয় ব্রহ্ম-চারিণী (Nun) হবার কথা চলছিল ওর। অন্ততঃ সেইরকমই শুনেছিলাম। মানে যতদূর নিষ্পাপ হতে হয়।

সবই ঠিক হত যদি পাদ্রীটি হতেন বুড়ো-গোছের—অনেক দেখেছেন শুনেছেন, দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই ধরণের। কিন্তু এই ফাদার—ফাদার পীটার বলাই ভালো, আসল নামটা চেপেই যাই, যদি মেয়েটির নামেও পাঁচ কথা শুরু হয়ে যায়।"

আমি বুঝতে পেরে সায় দিলাম।

'তা এই বেচারা ফাদার পীটারের বয়স ছিল অল্প, সবে মাত্র যাজকবৃত্তি নিয়েছেন। বুঝতেই পারছ কী কঠিন পথে তাঁকে চলতে হচ্ছিল পুরো একখানা নিরালা গ্রামের আধ্যা-ত্মিক তদারকের ভার তাঁর ওপর। আর গাঁয়ের সব ছোকরারা তখন গরম। যুদ্ধ আর রাজ-নীতিতেই তাদের আগ্রহ, পাদ্রীর কথায় কে কান দেয়! আর গাঁয়ের আর একমাত্র শিক্ষিত লোক ছিল ডাক্তার, তা সে এক তিরিক্ষি বুড়ো, নিজের কাজের বাইরে কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। ফলে এ বেচারার কথা বলারও একটা লোক ছিল না। অবশ্য এই মেয়েটি ছাড়া—এই মেয়েটি, এত সুন্দর, এত শান্ত, মুখে 'হ্যাঁ, ফাদার, না ফাদার' লেগেই আছে, আর একটু পরিচয় হলে হয়তো মাঝে মাঝে 'এবার একটু শোবেন না ফাদার? আপনাকে যে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে!—'

উইলি একটু থামল, দৃষ্টি বহুদূরে। ও একবার উৎসাহ পেলে এমনভাবে গল্প বলতে পারে, যে মনে হয় সব যেন পরিষ্কার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে; আমার মনে হল যেন আমি একটা পুরোনো স্যাঁৎসেঁতে গীর্জার দিকে চেয়ে আছি—ঠিক তাই যে কেন মনে হল, বলতে পারি না—আর লক্ষ্য করছি সেই নবীন সন্ন্যাসীটিকে—নিঃসঙ্গ, বিব্রত। ও অবস্থায় যে কোন সন্ন্যাসীরই খারাপ লাগতে বাধ্য। মনে আছে কয়েক বছর আগে তাদের একজন আমায় বলেছিল সবাই যখন দিনরাত তোমায় ফাদার বলে ডাকে, তখন একএকসময় মনে হয় পৃথিবীতে তোমার প্রকৃত বন্ধু আর কেউ নেই, কোনদিন হবেও না।' তাই যা বলছিলাম—স্পষ্ট চোখে আমি দেখতে পেলাম, বেচারা যুবকটিকে—পাপ স্বীকারের সব কাহিনী শুনে শুনে উদ্ভ্রান্ত, বিব্রত, আর এই কিশোরী তার করুণাভরা হাসিটি নিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে, সময়মত খাবার নিয়ে আসছে।

'তুমি তো বোঝো সবই, কোন গোঁড়ামিও তো নেই, কাজেই অবস্থাটা বেশ ভাবতে পারছ। সঙ্গে যদি আর একজনও লোক থাকত, আর একজন পাদ্রীও যদি থাকত—কিন্তু তা ছিল না, কাজেই তার পতন হল।'

আমি ঘাড় নাড়লাম, দুজনে গেলাস তুলে ধরলাম। আমি বেচারাকে কল্পনা করছিলাম—গায়ের রং ঘোর, গম্ভীর অস্থিবহুল মুখ, কালো চুল। দেখতে পাচ্ছিলাম রাত্রে অস্থির-ভাবে ও বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে; প্রার্থনার পর প্রার্থনা করছে এই অপবিত্র চিন্তার হাত থেকে মুক্তির জন্যে। কল্পনা করতে পারছিলাম ও মেয়েটির সঙ্গে রুক্ষভাবে কথা বলছে, যাতে মেয়েটি আরও লজ্জাভয়ে ওর ঘরে

ঢুকছে, কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। তাতে ওর নিজের ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে, পাছে মেয়েটিকে দুঃখ দিয়ে থাকে, ইচ্ছে করছে সে আবার ঘরে এলে ও ক্ষমা চাইবে; কেমন করে ওর ধর্মভাষণ লেখার মধ্যে মেয়েটির মুখ ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে, আর ও কলম ফেলে দিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে স্নিগ্ধ আকাশ আর গ্রামের সবুজ প্রান্তর। আর যেখানেই যাচ্ছে, যাই করছে, মনে শুধু ঐ এক বাসনা, দুহাতে মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরবার। ওঃ, আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম; এক অদ্ভুত তৃপ্তি নিয়ে গেলাসটা তুলে ধরলাম।

'তা এই হল ব্যাপার। কিন্তু এখানেই শেষ হল না। একদিন তো মেয়েটি এসে জানাল যে সে অন্তঃস্বত্ত্বা। আমার বিশ্বাস এরকম ব্যাপার এর আগেও ঘটেছে, আমাদের এই দ্বীপের ইতিহাসে নতুন নয়। আর এ অবস্থায় পড়লে পাদ্রীদের পক্ষে আর বেশি বাছবিচার করে উপায় বাৎলানো সম্ভব নয়। হয় মেয়েটিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে ব্যাপারটাকে চেপে দাও, নয় একটি পাত্র খুঁজে বিয়ে দিয়ে দাও। কী বলছি, বুঝতে পারছ নিশ্চয়! ধর্মের যাজক—সাধারণ মানুষের মতো তো নয়! একবার কলঙ্ক রটলে তাদের অবস্থাটা হয় ডানাকাটা পাখীর মতো—মাথার ওপর দিয়ে অন্য পাখীর ঝাঁক ভ্রূক্ষেপ না করে উড়ে চলেছে, আর এদের শুধু বিষণ্ণ-মুখে একটুখানি জমির ওপর লাফিয়ে বেড়ানোই সার।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তা বলে আমাদের এরা যে তাদের সঙ্গে ভালো, সদয় ব্যবহার করে না, তা কিন্তু নয়।'

—'সদয়, হ্যাঁ! দয়াই পায় শুধু, আর কিছু নয়। মুখ মেরে দেয় ওতে।'

সত্যি কথা। আমি ঘাড় নাড়লাম।

'কিন্তু এই ছেলেটি, ফাদার পীটার নাম দিয়েছি যার, ঠিকই করুক আর ভুলই করুক, এ মেয়েটিকে ছাড়ল না। ও সত্যিই তাকে ভালোবাসত, জানো। আর যতই বই পড়ুক, আর যতই কথা শুনুক, আসলে ও কাঁচাই ছিল মনে মনে। নিশ্চয় চোখে সর্ষেফুল দেখছিল, কিন্তু ওদের কেউ একটা কথাও প্রকাশ করল না, আর যদিই কোন কথা উঠে থাকে তা গুজবের অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছল না। সময় হলে পরে ও মেয়েটিকে ডাবলিনে নিয়ে গিয়ে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিল, যাহোক একটা গল্প বানিয়ে বলল। খুব যুৎসই গপ্প হয়েছিল বলে তো মনে হয় না। আর এদ্দুর অবধি ওকে তারিফ না করে পারা যায় না—সে যতই কাঁচা যতই অনভিজ্ঞ হোক না কেন! আরে ঐ সব নামকামের দড়াদড়ি সরিয়ে নিলে ও কী-ই বা ছিল? এক জোতদারের পড়ুয়া ছেলে, চোখ

নীচু করেই পথ চলেছে এদ্দিন। সত্যিকারের জীবনের কতটুকুই বা জানত?

—'সত্যি কথা,' আমি সায় দিলাম।

—'সত্যি তো বটেই। ও নিজেই তা প্রমাণ করে দিল। যদিও সে দিক দিয়ে ও নিজেকে গীর্জার খাঁটি সন্তান প্রমাণ করেছে।'

—'অর্থাৎ?'

—'বলছি। শোনোই না চুপ করে। মেয়েটি হাসপাতালে থাকার সময় ও বোধকরি কিছু ভাববার সময় পেল। আর বুদ্ধিমানের মত না ভেবে সব ফেলল ঘুলিয়ে। তারপর ও যা করল, তার জন্যে আর তারিফ করতে চাইবে না। হাসপাতাল থেকে মেয়েটি যখন বাচ্চা কোলে করে বেরোল, ও তার সঙ্গে দেখা করল। দুজনে তারপর স্টেশনের দিকে চলেছিল, হঠাৎ ও কী করল মনে করো? বাচ্চাটাকে না তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে, এক বাড়ির দোরগোড়ায় শুইয়ে দিল।

বোধহয় ওরা ভেবেছিল কেউ দেখছে না। কিন্তু তখন প্রখর দিনের আলো। রাস্তাঘাট যতই জনহীন হোক, দু-একটা বাড়ি কি আর জানলা দিয়ে বা দোকানের ভিতর থেকে চেয়ে না ছিল! ডাব্‌লিনে সর্বদাই কেউ না কেউ আছে, যে নিজের চরকায় তেল দিচ্ছে না। যাহোক, দু এক পা যেতে না যেতেই ওদের পিছু ডাকতে শুরু করল—তারপর একটা গলা কঁকিয়ে উঠল—এসব কী করছে তারা, অ্যাঁ?

ঐ না শুনে ফাদার পীটারের মাথা গেল একদম খারাপ হয়ে; মেয়েটিকে টানতে টানতে ও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে লাগাল। একটুও আশা ছিল না, বলাই বাহুল্য। সামনের লোকেরা ঐ সোরগোল শুনে চোরটোর ভাবল। দু-একজন হয়তো ধরে ফেলল। তখন পুরো এক দঙ্গল বুড়ী মহা চটে মটে বাচ্চাটিকে নিয়ে এসে দাঁড়াল। খুব একচোট গালাগাল বৃষ্টি হল—শিশুখুনেটুনে এই সব। ও মেয়েটিকে টেনে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করল, মেয়েটি কেঁদে অস্থির, কিন্তু কে শোনে সে সব? টানাটানির ফলে ওর বর্ষাতি তো এল খুলে, বেরিয়ে পড়ল পাদ্রীর কলার।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ওরা খুবই আঁৎকে উঠল বোধহয়?'

—'ঠিক তাই। বুড়ীর দল তো চোখ ছানা-বড়া করে পিছিয়ে গেল, বিড় বিড় করতে লাগল, 'ও ভগবান্! এ যে দেখি পাদ্রী! কী করছি আমরা?' ছেড়েই দিত ওকে, হাজার হলেও সেই ক্যাথলিক আয়ার্ল্যাণ্ডেই তো আমরা আছি। আর ওদিকটায় আবার এসব বিষয়ে খুবই কুসংস্কার। কিন্তু ইতিমধ্যে এক পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল—সে ওদের দুজনকেই হাজতে নিয়ে গেল। থানায় নিয়ে গেল ধরে পিছনে ডাব্‌লিনের ঐ একপাল ছেলেবুড়ো।'

একটু থেমে উইলি ওর গেলাস সাবাড় করল। জিজ্ঞেস করল, 'আর কী?' আমিও পাল্‌টে তাই প্রশ্ন করলাম। ও আরও অর্ডার দিতে গেল বার্‌-এ, আমি ওর বলা ঐ সব দৃশ্য আবার কল্পনা করতে লাগলাম। যেন আমার সামনে দিয়েই পুরো দলটা চলে গেল। তরুণ পাদ্রীটির মুখ ভয়ে বিবর্ণ, বর্ষাতি ছেঁড়া; মেয়েটি হাপুস নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে চলেছে। বুড়ীগুলো তাদের কালো শালের ঘোমটা টেনে, বিড়বিড় করতে করতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে—দাঁড়কাকের মতো। আর কালিঝুলি মাখা একঝাঁক ছেলেপুলে। সত্যি, এটা আমি এবারের যাত্রায় লক্ষ্য না করে পারিনি, ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তায় ঘাটে খেলা করছে, বাসাবাড়িগুলো থেকে ভিড় করে বেরিয়ে আসছে এমন হুড়হুড় করে, যে ধাঁধাঁ লাগে কী করে এতটুকু জায়গাতে এত লোক ধরে! ওদিকে থাকতে থাকতে এটাকে আর স্বাভাবিক বলে মনে করতে পারছিলাম না।

এমন সময়ে উইলি ফিরে এল। প্রশ্ন করল, 'তারপর কী রকম মনে হচ্ছে? পুণ্যভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে বেড়ে দৃশ্য, না? আইরিশ হগার্থ্ কেউ থাকলে জিনিসটাকে কাজে লাগাতে পারত। এটাই ডাব্‌লিনের বড় অভাব। জয়েস্ ভাষায় যা করেছেন, কোন আর এক হগার্থ্ যদি ছবিতে তাই করতে পারতেন!'

উইলির বড় বড় কথায় একটু বইয়ের গন্ধ ছিল। কয়েক পাত্র খেলে ওর অমনিই হয়ে থাকে। আগেও লক্ষ্য করেছি। তাই শুধু বললাম, 'তারপর কর্মসূচীতে আর কী লেখা ছিল?'

—'দুঃখের কথা। বড়ই দুঃখের কথা। বেচারী ফাদার পীটারের ছ-মাস সশ্রম কারা-দণ্ড হল। তবে মেয়েটিকে সাবধান করেই ছেড়ে দেওয়া হল। বড়ই ছেলেমানুষ ছিল তখন, বছর সতেরো হবে, তাই মঠবাসিনীরা ওকে আর বাচ্চাটিকে আশ্রয় দিল।'

—'ফাদার পীটারকে কি ধর্মচ্যুত করা হল?'

—'হ্যাঁ। গীর্জা যে উপায়ে করল, তার চেয়েও কঠিনভাবে।'

—'মানে?'

উইলি জবাব দেবার আগে পান করে নিল। তারপর গেলাসটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বলল, 'জেল্ থেকে বেরিয়েই সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল।'

—'বটে?'

—'বটে। ঈশ্বর দয়া করুন তাকে!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম দুজনে। একটু দুঃখ হতে লাগল ভিতরে ভিতরে। তরুণ পাদ্রী বেচারা পাপ করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্তও করেছে। উইলি বলেছে ঠিকই, এসব ব্যাপার সাধারণ মানুষের চেয়ে পাদ্রীদের পক্ষে বেশি দুর্বহ। অনুতাপের বেদনায় আর দুর্নামের লজ্জায় ও যে পাগল হয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনও কি গারদেই আছে?'

—'তাই তো থাকার কথা। ঠিক জানি না। কে না বলছিল ও মারা গেছে? সঠিক বলা কঠিন। একবার সরে গেলে তো আর এদের কথা বেশি শোনা যায় না!'

ফিরে তাকালাম মিসেস্ কেনেডির দিকে। সে ঐদিকের কোণে যাচ্ছিল, দেখলাম বেশ একটা সতেজ ভঙ্গী আছে। যেন অন্য মেয়ে-দের থেকে আলাদা। হবেই বা না কেন? কম তো নয়, সন্ন্যাসীর সর্বনাশ করতে পেরেছে, এমনি মেয়ে!

উইলি আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল, তা মেয়েটি বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। আগের মিসেস্ কেনেডি বেঁচে থাকতেই ও এইখানে কাজ নেয়। টম্ কেনেডি বোধহয় ওকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে এল, আর ওর ধরণধারণ তখনই বেশ আলাদা রকমের ছিল, দেখতেও সুন্দর। মানে প্রথম স্ত্রীর মরণের পর টম্ মাত্র এক বছর অপেক্ষা করেছিল—সেও প্রায় বছর ছয়েক হল। ওর সেই বাচ্চাটা বোধহয় সেই মঠেই আছে। কিম্বা কোন গাঁয়ের বাড়িতে। এখানে নেই এটুকু জানি। এখানে থাকলে, লোকেরা আবার সেই পুরোনো কেলেঙ্কারির কথা রটাতে শুরু করত। মজার কথা এই যে, টমের সঙ্গে বিয়ের পর আর ওর ছেলেপিলে হয়নি। অবশ্য সময় আছে যথেষ্ট।'

—'তাহলে এই তোমার গল্প।' আমি বললাম, 'বড় অদ্ভুত, বড় করুণ সে-ই পুরোনো ব্যাপার!'

যাক্ এবার তোমার নিজের খবর কি বলো। এতকাল কী কী করলে?' উইলি প্রশ্ন করল।

আমি নিজের জীবনের ওঠাপড়ার উপা-খ্যান কিছু বলতে শুরু করলাম। বলা বাহুল্য সেটা অত উপভোগ্য নয়।

অনুবাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রমজীবী মুসলমানের সেবা

বলবন্ত সিং

জীব-সেবা দ্বারা উপাসনা

একদিন গো-শালার কুয়াতে কিছু কাজ হইতেছিল। কাজ করিতেছিলেন রাজ-মিস্ত্রী সকরু খাঁ। জনৈক সহকর্মী তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া বলিল, ইঁনি বড়ই পরিশ্রমী ও ধার্মিক প্রকৃতির। সারা জীবনের উপার্জন দিয়া একটি সুন্দর ইঁদারা ইনি খনন করিয়া দিয়াছেন। একদিন কুয়াটি আপনি দেখিয়া আসিবেন। কথাটার উপর তখন বিশেষ মন দিয়াছিলাম তা নয়। শুনিয়া বলিয়াছিলাম আর একদিন যাইয়া দেখিয়া আসিব। মনে করিয়া-ছিলাম লোকটির সম্ভবত কেহ নাই, আর হাতে কিছু টাকা আছে। তাহা দিয়া কুয়া বানাইয়া দিয়াছে। পরে একদিন সকালে সকরু খাঁ আসিয়া হাজির হইলেন ও বলিলেন আপনি আমার কুয়া দেখিতে যাইবেন বলিয়াছিলেন, চলুন। আমার অন্য কাজ ছিল, কিন্তু তাঁহার সাগ্রহ ভালবাসার টান আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; তাঁহার সঙ্গে গেলাম। কুয়া দেখিলাম। উহার গঠন ও জল তোলার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। কুয়াটি ৯৯ ফুট গভীর। উহার উপরে চারিদিকে দাঁড় খাটাইয়া জল তোলার উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরের মণ্ডলের চতুষ্কোণ চত্বরের ক্ষেত্রফল ৩৬'×৩৬'। জমি হইতে মণ্ডলটি এতটা উঁচু যে তার নীচে তিনখানি কামরা ও একদিকে একটি ট্যাঙ্ক আছে।

আর মণ্ডলটির নির্মাণ এরূপ যে বৃষ্টির জল তাহা হইতে আপনা-আপনি গড়াইয়া গিয়া চৌবাচ্চাতে জমা হয়। বৃষ্টি অধিক হইলে জল বাহিরে চলিয়া যায়, কুয়াতে প্রবেশ করিতে পায় না। ইহার স্মরণযোগ্য বৃত্তান্তও একটি সকরু খাঁজী শুনাইলেন—'কুয়া তৈরি হইয়া গিয়াছে; চৌবাচ্চা খালি। বুঝিতেছিলাম না ভরিব কিনা, আর ভরিতে হইলে কিভাবে সুরু করিব। আকাশে মেঘ দেখা দিল, হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। দেখিলাম চৌবাচ্চা অর্ধেক ভরিয়াছে। পরের দিন আবার বৃষ্টি হইল, চৌবাচ্চা কানায় কানায় ভরিয়া গেল। এইরূপে স্বয়ং ভগবানই আমার জলছত্র ভরার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।' ট্যাঙ্কটি এগার ফুট দীর্ঘ, সাত ফুট চার ইঞ্চি প্রস্থ ও সাড়ে পাঁচ ফুট গভীর। উহা সর্বদা নির্মল জলে পূর্ণ থাকে। পশুদের জলপানের জন্য নীচে জলাশয় আছে—দুইটি। একটি সাফ করার সময়ে অন্যটি হইতে পশুরা যেন জল পায়। সকরু খাঁজী নিজ হাতে চালুনি দিয়া জল পরিষ্কার করিয়া থাকেন, আর জল পাইতে ছাগলের বেশী ঝুঁকিতে না হয় তাই জলাশয় সর্বদা ভরিয়া রাখেন। নিজ হাতেই জলাশয় সাফ করেন এবং নিজ হাতেই তাহাতে চূণকাম করেন। এই কুয়াই তাঁহার প্রার্থনার স্থান। পশুদের জলপান করিতে ও হরিজন প্রভৃতি গরীব লোকদের দলে দলে জল ভরিতে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া যান।

... কঠোর শ্রমে অর্জিত অর্থে মহৎ সেবা

সকরু খাঁজীর পরিবারে চারিজন লোক। স্বামী-স্ত্রী, এক ছেলে ও ৮৩ বছরের মা। মা এখনও নিজের কাজ নিজেই করেন; ছাগল চরাইতে বাহির হন। সকরু খাঁজীর বয়স ৬৩। কিন্তু এ বয়সেও কর্মে তাঁহার প্রবৃত্তি পূর্বেরই মত। রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। দিনে দুই টাকা, আর কখনও বা কিছু বেশীও পান। কিন্তু কাজ করেন তিনি যুবসুলভ একাগ্রতা, তৎপরতা ও কুশলতা সহকারে। এই কুয়া নির্মাণে সকরু খাঁজী ৪০৫০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন। আর গোটা গাঁথুনির কাজটা নিজ হাতেই করিয়াছেন। এইরূপে কায়িক শ্রমেই ঐ অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন। ৩৩ বৎসর নিরন্তর শরীরে খাটিয়া, খাওয়া-পরার ব্যয় সংকোচ করিয়া একটি একটি করিয়া ঐ অর্থ তিনি জমাইয়াছিলেন। সংবৎ ১৯৬২ সালে তিনি মজুরের কাজে ঘরের বাহির হন। সংবৎ ১৯৯৫ সালে কুয়া-নির্মাণ আরম্ভ করেন। ২৮ দিনে জল উঠে, আর সব কাজ শেষ হইতে চার মাস সময় লাগে। সে আজ এগার বছর আগের কথা। জল-তোলার সাধন বলদ, চরস* ইত্যাদি তাঁহার ছিল না। তাহা তিনি ভাড়ায় লইলেন, জলাশয় ভরাইলেন; জল সেচিতে তাঁহার কঠোর শ্রমে অর্জিত অর্থের ২,৭০০৲ টাকা খরচ হইয়া গেল।

গায়ের-ঘামে রোজগার করা চাই

ইঁহার ঘরে চলুন, দেখিবেন অপরিগ্রহের ছবি! তাবৎ জিনিষপত্রের মূল্য ২৭৲ হইবে কিনা সন্দেহ। গায়ে খাটিয়া পয়সা কামান, খরচ করিয়া খেলেন, জমিবে কোথা হইতে? সম্পত্তির মধ্যে ছোট একখানা চারপাই, একখানি কাঁথা, একটা জাঁতা, কিছু ঘুঁটে। ব্যাস ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট, সকল সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত। কুয়া ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ নাই, আশঙ্কা নাই, ভাবনা নাই। সকরু খাঁজীর ছেলে এক মুসলমান দর্জির কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখিত। পাকিস্তান যাওয়ার কালে দর্জি তাহাকে সেলাই কল, আলমারি ইত্যাদি পাঁচ শত টাকার জিনিষ এক শত টাকায় দিয়া যাইতে চাহে। ছেলে একথা সকরু খাঁজীকে বলিলে, সকরু খাঁজী বলেন,—পাঁচ শত টাকার জিনিষ কি করিয়া এক শত টাকায় লওয়া যায়? তা আমাদের সইবে না। নিতে হইলে ন্যায্য মূল্য দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ মাল নেওয়া হয় নাই। সকরু খাঁজীর ছেলে সখেদে নিজ মুখেই আমায় একথা বলিয়া-ছিল—সখেদে তার কারণ সকরু খাঁজীর দৃষ্টির কথা সে বুঝে না। সকরু খাঁজী প্রবুদ্ধজ্ঞান বলে গায় খাটিয়া পয়সা রোজগার কর। তাঁহার বিচারে, এই মাল লওয়া নয়ত চুরি করা, তাই সাফ না বলিয়া দিলেন। এই উদাহরণ হইতে অস্তেয় ব্রতীদের শিক্ষার আছে।

সূত্রপাত কিভাবে হয়

সকরু খাঁজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই কূপ খননের কল্পনা আপনার মনে কি ভাবে আসে? তিনি বলিলেন,—"তখন আমি ছোট। ছাগল চরাইতে যাইতাম। রোদে দারুণ পিপাসা পাইত, জলের জন্য ছটফট করিতাম। জল যখন পাইতাম ও এত খাইতাম যে পেট বুঝি এই ফাটিয়া যায়। পানীয় জলের জন্য কুয়া তৈরি অপেক্ষা পুণ্য কার্য আর কিছু নাই একথা আমার মনে হয়। পয়সা রোজগার করিতে পারিলে কুয়া বানাইব। কিন্তু সে কল্পনা ত ছিল বালকের কল্পনা। ঘরের বাহির হইলাম। দুনিয়া খানিকটা দেখিলাম। দেখিলাম হিন্দুরা জলাশয় খনন করিয়া দেয়, ধর্মশালা বানাইয়া দেয়। ভাবিলাম, মুসলমানদেরও কি ইহা কর্তব্য নহে? আমরাও কি এরূপ ধার্মিক ও সার্বজনিক হিতের কাজ করিতে পারি না? মন এই ভাবনায় ভরপুর, সীকার (রাজস্থান) আসিলাম। সেই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটিল। আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে কুমার, চারণ, দরোগা, স্বামী ইত্যাদি গরীব অস্পৃশ্য বলিয়া কথিত লোক আছে। তাহাদের বড়ই জলকষ্ট ছিল। দেখিতে পাইলাম কোন কুয়াতে যখন তাহারা জল ভরিতেছিল তখন উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা তাহাদের বড়ই অপমান করে। প্রাণে বেদনা বোধ করিলাম। কহিলাম—'এদেরও ভরিতে দিন।' আমার উপর তাহারা রাগিয়া গেল ও বলিল—'বড় লোক! এদের জন্য একটা কুয়া বানাইয়া দিলেই হয়।' অন্তরে বড়ই

---

* কুয়া হইতে জল তোলার জন্য মহিষের বা গরুর মোটা চামড়ার তৈরী ঢোলাকৃতি বড় সেচনি।

লাগিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম—খোদা আমায় শক্তি দাও, কুয়া খননের শক্তি দাও। সংবৎ ১৯৬২ সালে আমি বোম্বাই যাত্রা করি। কোনও রাজমিস্ত্রীর অধীনে দৈনিক চৌদ্দ পয়সা মজুরীতে কাজ আরম্ভ করি। ধীরে ধীরে কাজ শিখিয়া লইলাম। দিনে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতাম, রাত্রে পাহারা দিতাম। দিনে যাহা পাইতাম তাহা জমাইতাম, আর রাত্রের মজুরি দিয়া পেট চালাইতাম। ঐ সব পয়সা আমার এক বিশ্বস্ত ধনী ব্যক্তির কাছে জমা রাখিতাম। কিছু কথা কাটাকাটি ও বাধা-বিঘ্নের পরে সীকর দরবার কুয়া খোদার জন্য আমাকে ৩৬´×৩৬´ ফুট পরিমিত একটি সমতল জমি দেন। ১৯৯৫ সম্বতের প্রারম্ভ। আমি সীকর আসিলাম, কুয়া খোদার কাজ আরম্ভ করিলাম। হাসি-ঠাট্টাও লোকে করিল, —বলিল, 'এখানে কুয়া খোদা নয়ত হাতে চাঁদ ধরা—এ কাজ পুরা করা আমার কর্ম নয়।' খোদা আমার সহায় হইলেন, আমার চির-জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। কুয়া তৈরী হইয়া যখন ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তখন আমাদের জাতভাই জনকয়েক মুসলমান নীচ জাত বলিয়া কথিত হিন্দু ভাইদের কুয়া হইতে জল ভরিতে বাধা দিল এবং দাবি করিল যে মুসলমানের সম্পত্তিতে একমাত্র মুসলমানদেরই অধিকার। আমি বলিলাম,—'তাহা হইতে পারে না। আমার কুয়া ভগবানের সকল জীবের জন্য সমান খোলা। এই উদ্দেশ্যেই তাহা আমি বানাইয়াছি। সকলের সহিত জল ভরিতে যাহার আপত্তি নাই সে ভরুক, যাহার আপত্তি আছে সে না আসিল ক্ষতি নাই।' মুসলমানরা ঝগড়া বাধাইতে যখন নেহাতই উদ্যত হইল, আমি দরবারে গিয়া নালিশ করিলাম। দরবার তখন মাঝে পড়িয়া মিটমাট করিয়া দিলেন,—হিন্দুরা তিন দিক হইতে আর মুসলমানেরা একদিক হইতে জল তুলিবে। আর লোকসংখ্যার অনুপাতে হয়ত তাহাই। কারণ, মুসলমান মাত্র তিন ঘর, আর হিন্দু পঞ্চাশ ষাট ঘর। এখন সকলেই আনন্দে জল ভরে।"

ট্যাংক বা চৌবাচ্চা পশুদের ব্যবহারের জন্য আলাদা করা। অতএব তথায় কাহাকেও নাইতে-ধুইতে দেওয়া হয় না। ট্যাংক হইতে জলও নিতে দেওয়া হয় না। সকরুখাঁজী বলেন যে, এক সময়ে মুসলমানেরা তাঁহাকে এতই উত্যক্ত করিয়াছিল যে, রাগ করিয়া তিনি জল তোলা বন্ধ করিয়া দেন। একটি তৃষ্ণার্ত গাই জল খাইতে আসে। জলাশয়ে জল না পাইয়া, পাশেই সকরুখাঁজীর যে খাটিয়াটা ছিল সিং দিয়া সে তাহা উল্টাইয়া দিয়া গেল। সকরুখাঁজীর হুঁশ হইল, গাইয়ের কথা তিনি বুঝিলেন—বুঝিলেন যে, গাইয়ের পিপাসা লাগিয়াছে, তাই এইভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সেই দিন হইতে তিনি আবার জল ভরিতে লাগিলেন। জল ভরিতে আর কখনও তিনি ভুল করেন নাই।

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা

সকরুখাঁজীর একটি মাত্র অভিলাষ—তাঁহার মৃত্যুর পরেও জলছত্রে জল ভরার কাজ যেন অব্যাহত চলে। তিনি বলিতেছিলেন—'রাজদরবার যদি আমাকে কিছু জমি দেয় ত তাহা আমি মালীকে দিয়া দিব। সে সেই জমিতে সেচ দিবে, আর আমার মৃত্যুর পরে জলছত্রে জলও নিয়মিত ভরিবে। আমাদের কবরস্থান পাশেই। একদিন আমাকে ত ওখানে যাইতেই হইবে। তাই এই সব মূক পশু ও এই সব গরীব লোকদের যতটুকু সেবা, এই শরীর দিয়া যতদিন সম্ভব করিতেছি।

তাঁহার এই কাজ দেখিয়া সীকর দরবার ও অপর অনেক ভাল লোক খুব সন্তুষ্ট হন এবং এই পুণ্য কার্যের জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থ দেওয়ারও চেষ্টা করেন। কিন্তু সকরুখাঁজী কিছু নিতে অস্বীকার করেন। শুনিলাম, এই ধরণের কুয়া খাস সীকরের কোথাও বা আশপাশের কোনও বড় গ্রামে বা শহরে নাই। এই মরুভূমিতে এইরূপ কুয়া খনন যে কত বড় মহৎ কর্ম তার সম্যক্ ধারণা অপর স্থানের লোকের পক্ষে করা সম্ভব নহে।

অপূর্ব দৃষ্টান্ত

এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি অন্তরে অশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল, মন আনন্দে ভরিয়া গেল। দেহ দিয়া যদি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতাম ত তিনি বিব্রত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু মনে মনে আমার মস্তক তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। সকরুখাঁজীর সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়াইতে পারে এমন লোক বড় বেশি নাই। এই উদাহরণ এ কথার সাক্ষ্য যে, মানবতা জাতি বা ধর্ম বিশেষের একচেটিয়া নহে। বস্তুত এইরূপ পরোপকারী পুণ্যব্রত লোকই ধর্মের রক্ষক। আমাদের সৌভাগ্য গো-সেবাশ্রয়ের ভিত্তি তাঁহার হাতে গড়িয়া উঠিতেছে।

[সর্বোদয় হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক অনূদিত]

ইন্দ্রজিতের আসর

ইংরেজ কবি সাদে রাজকবির সম্মান লাভ করেছিলেন। অবশ্য আজকাল খুব কম লোকেই তাঁর কাব্য পাঠ করে থাকেন। কবি হিসেবে তিনি উক্ত সম্মানের যোগ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। একথা নিশ্চিত যে তিনি যে দরের পদ্য লিখেছেন তার চাইতে ঢের ভালো দরের গদ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নেলসনের জীবনচরিত অতিশয় সুখ-পাঠ্য গদ্য রচনা। কিন্তু তাঁর গদ্য পদ্য সব মিলিয়ে যে কথাটি সব চাইতে আমার মনে ধরেছে সেটি তাঁর আঁকা একটি সুখী পরিবারের চিত্র। সুখী পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তিনি দুটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। সে দুটি বস্তু হচ্ছে—a girl rising six years and a kitten rising six weeks. এর চাইতে ভালো কথা সাদে সারা জীবনে কোথাও লেখেননি। সামান্য ক'টি কথার মধ্যে একটি সুখী পরিবারের অতি আনন্দোজ্জ্বল চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ছ'বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে আর হপ্তা ছয়েকের শাদা ধবধবে একটি বেড়াল ছানা। ছবির বাকী অংশটুকু—আপনারা কল্পনা করে নিন। ঘরের মধ্যে দুটি শিশু খেলা করছে—একটি মানব শিশু, অপরটি মার্জার শিশু। কন্যাটি কানাই মাস্টার, পোড়ো তার বিড়াল ছানাটি। কখনো আদর করছে, কখনো ধমকাচ্ছে। অদূরে বসে পিতামাতা স্মিতহাস্যে দুই শিশুর খেলা দেখছেন। এটি যে পারিবারিক সুখের একটি অতি মনোরম চিত্র এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। একজন ইংরেজ লেখক সাদেকে তারিফ করে বলেছেন, সাবাস কবি, খাসা কথা লিখেছ। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটু খুঁত ধরে বলেছেন—But rascally poet, why not a puppy rising six months? বেড়ালের কথা যদি বললে তবে কুকুরটি বাদ যায় কেন? এবার তিনটি জিনিস পাশাপাশি রেখে দেখুন—ছ'বছরের একটি কন্যা, ছ'মাসের একটি কুকুর ছানা আর ছ'হপ্তার একটি মার্জার শাবক। এবার চিত্রটি সুসম্পূর্ণ হল। অবশ্য কুকুরে বেড়ালে খুব যে একটা সম্প্রীতির ভাব আছে এমন নয়; বরং একে অন্যকে বেশ একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখে। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে উক্ত কন্যাটির কড়া শাসনের গুণে কুকুরে বেড়ালে একপাত্রে দুধ খাবে। আসল কথা কন্যাটির সঙ্গীর প্রয়োজন। 'বনবাস' কবিতার (ডেঁপো?) বালকটির ন্যায় কন্যাটি এসে যদি মায়ের কাছে আবদার ধরে—'মাগো, আমায় দে না কেন একটি ছোট ভাই' আজকালের মা কিছুতেই সে আবদার সইবেন না। তার চাইতে একটা বেড়াল কিম্বা কুকুর ছানা জুটিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।

এসব কথা বইতে পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু গত হপ্তায় আমি যা লিখেছি তাই থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমার গৃহে কোনো গৃহপালিত জন্তু নাই। মানুষ ছাড়া আর কোনো জীব আমি একেবারে সইতে পারিনে আর মনুষকেও যে খুব একটা আমল দিই এমন নয়। সত্যি কথা হল আমার মনে স্নেহ মমতা এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে নেই যে মানুষকে দিয়ে থুয়ে পশুপক্ষীকে পর্যন্ত বিলাতে পারব। অবশ্য এমন মানুষ দেখেছি যাঁরা পোষা কুকুরকে যতখানি দরদ দেখান মানুষকে ততখানি দেখান না। মানুষকে ছাড়িয়ে যাঁর প্রীতি পশুতে গিয়ে ঠেকেছে তিনি তাঁর স্বভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে brutalize করেছেন।

নখী দন্তী প্রাণীকে আমি আদবে বিশ্বাস করিনে। বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে কানঝুলে-পড়া, মিশমিশে কালো, বেঁটে কুকুর যখন সামনের দু পা আপনার হাঁটুতে তুলে দিয়ে আঘ্রাণ নিতে থাকে তখন আপনার মনের অবস্থা কি হয় বলতে পারিনে! আমার তো খুন চেপে যায়। কুকুর এবং কুকুরের মালিক দুজনকে এক সঙ্গে মধুর ভাষণে আপ্যায়িত করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার এক বন্ধুগৃহে এত বিচিত্র জন্তুর সমাবেশ দেখেছি যে, আমি সে গৃহের নাম দিয়েছি Noah's ark. আপদ্ধর্মে দুনিয়া রসাতলে গেলেও ঐ একটি বাড়ি টিকে থাকলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাবে। আমার বন্ধুপত্নীটি শুধু পতিপরায়ণা নন, পশুপতিপরায়ণা। বন্ধু সুরসিক। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, খোঁচাটা বুঝলে তো, অর্থাৎ কিনা পশু এবং পতি—এই দুই এর মধ্যে তোমার ভেদজ্ঞান নেই।

আমার ঘরকরণা এত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ যে সেখানে মানুষেরই স্থান সংকুলান হয় না। মানুষ ব্যতিরেকে অন্যবিধ জীবকে আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা প্রশ্রয় দেওয়াও সম্ভব নয়। আমার গৃহে বেড়াল এক জানলা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়; কারণ প্রবেশমাত্র বেচারীকে প্রচণ্ড তাড়া খেতে হয়। বেড়ালের যেখানে এই দশা সেখানে কুকুরের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন। কুকুর জীবটা আমাদের দেশে অমনিতেই জল-চল নয়। ও জীবটাকে আমাদের ঘরে ঢুকিয়েছে ইংরেজ। বিলিতি ইস্কুলের ডিগ্রী আর বিলিতি কুকুরের পিডিগ্রী ওদের আমলেই এদেশে এসেছে। শিক্ষিতের ডিগ্রী যেমন সমাজের পাসপোর্ট কুকুরের পিডিগ্রী তেমনি গৃহ-প্রবেশের পাসপোর্ট। দিশী কুকুর দেশ স্বাধীন হবার পরেও অন্ত্যজ। ভুক্তাবশেষের জন্য বহির্দ্বারেই অপেক্ষা করতে হয়।

স্ত্রীকন্যা সমেত আমার গৃহে যে কয়টি অধিবাসী তাদের সকলেরই পশুপ্রীতি সম-পরিমাণ। পশুপক্ষীর প্রতি আমার যে ঔদাসীন্য আমার পুত্রকন্যারা সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। অর্থাৎ আমার শিক্ষার মধ্যে যে ত্রুটি ছিল সেটি ওদের মধ্যেও বর্তিয়েছে। গত সপ্তাহে যে হংস দম্পতির কথা বলেছিলাম লক্ষ্য করে দেখেছি সে হংসের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রায় পরমহংসের তুল্য। একমাত্র আমার কনিষ্ঠা কন্যা—a girl rising two years—কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দু'একবার ওদের কাছে ঘেঁসবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হংস দুটি গ্রীবা উত্তোলনপূর্বক সরব হর্ষ প্রকাশ মাত্র দ্রুতপদে পলায়ন করেছে।

জন্তু, জানোয়ার পোষাটা মানুষ সমাজের সঙ্গে প্রকৃতিরাজ্যের সেতুবন্ধন, এ ধরণের কথা অনেকের মুখে শুনেছি। মানুষে মানুষে প্রীতিবন্ধনকেই আমি মূল্য দিই, যদিচ ব্যবহারিক জীবনে সে আদর্শকে সব সময়ে উপযুক্ত মূল্য দিতে পারিনি। গোড়ায় আমি সাদে'র উক্তিকে তারিফ করেছি। সেটা অবশ্য সাহিত্যের খাতিরে, বেড়ালের খাতিরে নয়। কথাটি শুনতে ভালো, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বলে আমি ওসব কথায় বিশ্বাস করি, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। আমি সাহিত্যাশ্রমে পশুপক্ষীকে স্থান দিতে রাজি আছি, গৃহস্থাশ্রমে নয়। গার্হস্থ্য সুখের জন্য কুকুর বেড়ালের সাহায্য প্রার্থনা করা আমি অত্যন্ত undignifild মনে করি। স্ত্রীর সঙ্গে আমার যদি মনোমালিন্য ঘটে তবে কুকুর বেড়ালের মধ্যস্থতায় কি হবে? তবে হ্যাঁ, এসব ব্যাপারে মানুষের মধ্যস্থতা আরো সাংঘাতিক। আর কুকুর যে এসব সমস্যার সুরাহা করতে পারে এমন তো কোনো প্রমাণ নেই। রিপ্ ভ্যান্ উইংকল্-এর স্ত্রী তার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর চাইতে হতভাগা কুকুরটার উপরেই বেশি ক্ষিপ্ত ছিল। তার ধারণা ঐ কুকুরটাই তার স্বমীকে বখিয়ে দিচ্ছে।

পূরবীর গীতিরস

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ lyric poet বা গীতি-কবি। তাঁহার সমগ্র কাব্য সম্ভার অপরূপ গীতিচ্ছন্দমাধুর্যে সম্পূর্ণ। কোথাও বা কোনো বিশেষ কবিতায় ব্রাউনিঙের ধরণে ruggedness বা স্থূল প্রয়োগ যে নাই তাহা নহে, তবে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য ইহার গীতিমাধুর্য। এই গীতিমাধুর্য তাঁহার একেবারে কৈশোরের কবিতা হইতে সুরু করিয়া বার্ধক্যের শেষ সীমার রচনা পর্যন্ত সর্বত্রই সুস্পষ্ট। আশ্চর্যের বিষয় এই কাব্যমাধুর্য তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাতে কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্যগুলির মধ্যে 'পূরবী'তেই যেন lyricism বা গীতি-মাধুর্য চরমে উঠিয়া 'মহুয়া'র মধ্য দিয়া অপ্রতিহত ধারায় চলিয়াছে।

একথা প্রথমেই বলা আবশ্যক যে পূরবীর যে lyricism বা গীতিরস তাহা ঠিক 'ক্ষণিকা' বা এমন কি 'বলাকা'র ধরণেরও নহে। 'পূরবী'র মধ্যে হাল্কা ভাব স্বল্পই দেখা যায়। 'পূরবীর' অধিকাংশ কবিতাগুলির মধ্যে যে গীতিমাধুর্য চোখে পড়ে তাহার মধ্যে বেশ একটি গাম্ভীর্য, একটা উদাত্ত ধ্বনি আছে। একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলির মধ্যে যে lyrical sweetness (বা গীতিমাধুর্য) তাহার তুলনা অন্যত্র মিলে কি না সন্দেহ; এবং টমসন সাহেব যে রবীন্দ্র-নাথের গানগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "They were composed to be sung but they sing themselves."—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অবশ্য সাধারণ সঙ্গীতের মিষ্টতার সহিত সাধারণ কবিতার মিষ্টতার একটি চিরন্তন প্রভেদ আছে, যদিও এই দুরতিক্রম্য প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রায় পরাজয় মানিয়াছে। তথাপি তাঁহার সঙ্গীত-গুলিকে বাদ দিলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, Euphony এবং গীতিরসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কাব্যের মধ্যে মিলে তাহাদের মধ্যে 'পূরবী' অন্যতম। কিন্তু 'পূরবী'-পর্যায়ের গীতিরসকে 'ক্ষণিকা'-পর্যায়ের গীতিরস হইতে কিছু পৃথকভাবে দেখিতে হইবে।

গীতিরসের দিক দিয়া 'লিপিকা'র সহিত 'গল্পগুচ্ছ' বা 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভাষার যে পার্থক্য, 'ক্ষণিকা'র সহিত 'পূরবী' বা 'মহুয়া'র বেশীর ভাগ কবিতার সেই পার্থক্য। এমন কি পূরবীর "শিলঙের চিঠি" দিনেন্দ্রনাথকে লেখা 'চিঠি' অথবা ঐ ধরণের যে দুই একটি কবিতা আছে সেগুলির অর্থ-গৌরবে হাল্কাভাব থাকিলেও পদলালিত্যে গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণের রেশ একেবারে লোপ পায় নাই।

পূরবীর হাল্কা কবিতা এইরূপঃ

"গর্মি যখন ছুট্‌ল না আর পাখার হাওয়ায়
শরবতে
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক
পর্বতে।"

—এখানেও ছন্দ বিশেষ হাল্কা নহে, গজেন্দ্র-গমনে চলিয়াছে। কিন্তু 'ক্ষণিকা'র গীতিচ্ছন্দ ভিন্ন প্রকারঃ

"দুটি বোন তা'রা হেসে যায় কেন
যায় যাবে জল আনতে?
দেখেছে কি তা'রা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?"

—ছন্দ লঘু পদবিক্ষেপে দ্রুত তালে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'পূরবী', 'মহুয়া' ছাড়াইয়া এমন কি 'সেঁজুতি'তেও গিয়া এই হাল্কা ভাব ফিরিয়া আসে নাই। 'সেঁজুতি'র হাল্কা ভাবের ভিতরেও গাম্ভীর্য সুস্পষ্টঃ

"ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকার পরুষ রবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন।"

—ছন্দ এমনি দীর্ঘায়িত চরণক্ষেপে বিলম্বিত গতিতে চলিয়াছে যে দ্রুত উচ্চারণে পড়িবারই উপায় নাই।

এইবার 'পূরবী'র গীতিরসের স্বরূপ সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। 'বিজয়ী' কবিতাটির গীতি-বেগ কিছু দ্রুত লয়ে হইলেও গাম্ভীর্যবর্জিত নহে, অধিকন্তু অভিনব উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে বিশিষ্ট মহিমায় মণ্ডিতঃ

"ভাবলো তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;"

এখানে বিজয়ী সৈন্য কর্তৃক শত্রু দুর্গ ভেদের যে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অভিনবত্বের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রকাব্যেও অবিরল নহে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার গীতিচ্ছন্দ সর্বত্র সমমাধুর্যমণ্ডিত না হইলেও গীতিরসের গুণেই ইহার কয়েকটি স্তবকে সুর দেওয়া হইয়াছেঃ

"হে নূতন
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"

ইত্যাদি। যেখানে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ সেইখানেই গীতিরস স্বভাবতঃই নিবিড় হইয়া দেখা দিয়াছেঃ

"দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।"

ইহার পরেই 'পূরবী'র শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'তপোভঙ্গে'র অপূর্ব ছন্দোমাধুর্য, প্রসাদ-গুণ ও গীতিঝঙ্কারের কথা বলিতে হয়। ইহার উৎপ্রেক্ষাও যেমন অনন্যসাধারণ, ইহার গীতিরসও তেমনি অসামান্যঃ

"কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।"

এই অপূর্ব উৎপ্রেক্ষাটির মূল ইঙ্গিতটুকু বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে মিলেঃ

"ক্বাপি বিহূত্য দিবাবসানে লোহিত তারকা
তপোবন ধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা
মুদিতৈস্তপোধনৈরদৃশ্যত।"

—অর্থাৎ লোহিত-তারকা সন্ধ্যাকে দেখিয়া তপোধনদের মনে হইল যেন সারাদিন ঘুরিয়া লোহিত-তারকা আশ্রমধেনু কপিলা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'পূরবী'তেই এই উপমাটি আরও একবার ব্যবহৃত হইয়াছে "শেষ" নামক কবিতাটিতেঃ

"যখন কর্মের দিন, ম্লান ক্ষীণ, গোষ্ঠে চলা
ধেনু সম।"

ইহার পার্শ্বে 'সোনার তরী'র অনুরূপ একটি অপূর্ব উৎপ্রেক্ষা ধরিয়া দেখা যাক্ঃ

"বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়, অপরিচিতা,
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।"

—দিন শেষে পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভা যেন মৃত দিবসের প্রজ্বলিত চিতাবহ্নির প্রদীপ্ত আভা।

অর্থগৌরবে এই উৎপ্রেক্ষা 'পূরবী'র দিবসান্ত বর্ণনের উৎপ্রেক্ষার সমপর্যায়ের হইলেও 'তপোভঙ্গে'র গুরু গাম্ভীর্য ইহার মধ্যে নাই এবং ধ্বনি ও গীতিরসের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষু-কর্ণ এড়াইতে পারে না। 'তপোভঙ্গে'র মধ্যে যেখানে আলেয়ার আলোদীপ্ত জনশূন্য প্রান্তরে বিদ্যুৎ-চমকের চিত্র ফুটিয়াছে তাহাও অতুলনীয়ঃ

"নির্জন প্রান্তর তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।"

—ইহার সহিত বহু পূর্বের লেখা—"দেখিছ না কি, ওগো সাহসিকা, ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা" ইত্যাদি ছত্রের তুলনা করিলে লিরিকের পার্থক্যটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"লীলাসংগিনী" কবিতার গীতিরস অপেক্ষাকৃত হাল্কা, কিন্তু চপল নহেঃ

ইংরেজ কবি সাদে রাজকবির সম্মান লাভ করেছিলেন। অবশ্য আজকাল খুব কম লোকেই তাঁর কাব্য পাঠ করে থাকেন। কবি হিসেবে তিনি উক্ত সম্মানের যোগ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। একথা নিশ্চিত যে তিনি যে দরের পদ্য লিখেছেন তার চাইতে ঢের ভালো দরের গদ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নেলসনের জীবনচরিত অতিশয় সুখ-পাঠ্য গদ্য রচনা। কিন্তু তাঁর গদ্য পদ্য সব মিলিয়ে যে কথাটি সব চাইতে আমার মনে ধরেছে সেটি তাঁর আঁকা একটি সুখী পরিবারের চিত্র। সুখী পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তিনি দুটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। সে দুটি বস্তু হচ্ছে—a girl rising six years and a kitten rising six weeks. এর চাইতে ভালো কথা সাদে সারা জীবনে কোথাও লেখেননি। সামান্য ক'টি কথার মধ্যে একটি সুখী পরিবারের অতি আনন্দোজ্জ্বল চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ছ'বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে আর হপ্তা ছয়েকের শাদা ধবধবে একটি বেড়াল ছানা। ছবির বাকী অংশটুকু—আপনারা কল্পনা করে নিন। ঘরের মধ্যে দুটি শিশু খেলা করছে—একটি মানব শিশু, অপরটি মার্জার শিশু। কন্যাটি কানাই মাস্টার, পোড়ো তার বিড়াল ছানাটি। কখনো আদর করছে, কখনো ধমকাচ্ছে। অদূরে বসে পিতামাতা স্মিতহাস্যে দুই শিশুর খেলা দেখছেন। এটি যে পারিবারিক সুখের একটি অতি মনোরম চিত্র এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। একজন ইংরেজ লেখক সাদেকে তারিফ করে বলেছেন, সাবাস কবি, খাসা কথা লিখেছ। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটু খুঁত ধরে বলেছেন—But rascally poet, why not a puppy rising six months? বেড়ালের কথা যদি বললে তবে কুকুরটি বাদ যায় কেন? এবার তিনটি জিনিস পাশাপাশি রেখে দেখুন—ছ'বছরের একটি কন্যা, ছ'মাসের একটি কুকুর ছানা আর ছ'হপ্তার একটি মার্জার শাবক। এবার চিত্রটি সুসম্পূর্ণ হল। অবশ্য কুকুরে বেড়ালে খুব যে একটা সম্প্রীতির ভাব আছে এমন নয়; বরং একে অন্যকে বেশ একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখে। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে উক্ত কন্যাটির কড়া শাসনের গুণে কুকুরে বেড়ালে একপাত্রে দুধ খাবে। আসল কথা কন্যাটির সঙ্গীর প্রয়োজন। 'বনবাস' কবিতার (ডেঁপো?) বালকটির ন্যায় কন্যাটি এসে যদি মায়ের কাছে আবদার ধরে—'মাগো, আমায় দে না কেন একটি ছোট ভাই' আজকালের মা কিছুতেই সে আবদার সইবেন না। তার চাইতে একটা বেড়াল কিম্বা কুকুর ছানা জুটিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।

ইন্দ্রজিতের আসর

এসব কথা বইতে পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু গত হপ্তায় আমি যা লিখেছি তাই থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমার গৃহে কোনো গৃহপালিত জন্তু নাই। মানুষ ছাড়া আর কোনো জীব আমি একেবারে সইতে পারিনে আর মনুষ্যকেও যে খুব একটা আমল দিই এমন নয়। সত্যি কথা হল আমার মনে স্নেহ মমতা এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে নেই যে মানুষকে দিয়ে থুয়ে পশুপক্ষীকে পর্যন্ত বিলাতে পারব। অবশ্য এমন মানুষ দেখেছি যাঁরা পোষা কুকুরকে যতখানি দরদ দেখান মানুষকে ততখানি দেখান না। মানুষকে ছাড়িয়ে যাঁর প্রীতি পশুতে গিয়ে ঠেকেছে তিনি তাঁর স্বভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে brutalize করেছেন।

নখী দন্তী প্রাণীকে আমি আদবে বিশ্বাস করিনে। বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে কানঝুলে-পড়া, মিশমিশে কালো, বেঁটে কুকুর যখন সামনের দু পা আপনার হাঁটুতে তুলে দিয়ে আঘ্রাণ নিতে থাকে তখন আপনার মনের অবস্থা কি হয় বলতে পারিনে! আমার তো খুন চেপে যায়। কুকুর এবং কুকুরের মালিক দুজনকে এক সঙ্গে মধুর ভাষণে আপ্যায়িত করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার এক বন্ধুগৃহে এত বিচিত্র জন্তুর সমাবেশ দেখেছি যে, আমি সে গৃহের নাম দিয়েছি Noah's ark. আপদ্ধর্মে দুনিয়া রসাতলে গেলেও ঐ একটি বাড়ি টিকে থাকলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাবে। আমার বন্ধুপত্নীটি শুধু পতিপরায়ণা নন, পশুপতিপরায়ণা। বন্ধু সুরসিক। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, খোঁচাটা বুঝলে তো, অর্থাৎ কিনা পশু এবং পতি—এই দুই এর মধ্যে তোমার ভেদজ্ঞান নেই।

আমার ঘরকরণা এত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ যে সেখানে মানুষেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না। মানুষ ব্যতিরেকে অন্যবিধ জীবকে আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা প্রশ্রয় দেওয়াও সম্ভব নয়। আমার গৃহে বেড়াল এক জানলা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়; কারণ প্রবেশমাত্র বেচারীকে প্রচণ্ড তাড়া খেতে হয়। বেড়ালের যেখানে এই দশা সেখানে কুকুরের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন। কুকুর জীবটা আমাদের দেশে অমনিতেই জল-চল নয়। ও জীবটাকে আমাদের ঘরে ঢুকিয়েছে ইংরেজ। বিলিতি ইস্কুলের ডিগ্রী আর বিলিতি কুকুরের পিডিগ্রী ওদের আমলেই এদেশে এসেছে। শিক্ষিতের ডিগ্রী যেমন সমাজের পাসপোর্ট কুকুরের পিডিগ্রী তেমনি গৃহ-প্রবেশের পাসপোর্ট। দিশী কুকুর দেশ স্বাধীন হবার পরেও অন্ত্যজ। ভুক্তাবশেষের জন্য বহির্দ্বারেই অপেক্ষা করতে হয়।

স্ত্রীকন্যা সমেত আমার গৃহে যে কয়টি অধিবাসী তাদের সকলেরই পশুপ্রীতি সম-পরিমাণ। পশুপক্ষীর প্রতি আমার যে ঔদাসীন্য আমার পুত্রকন্যারা সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। অর্থাৎ আমার শিক্ষার মধ্যে যে ত্রুটি ছিল সেটি ওদের মধ্যেও বর্তিয়েছে। গত সপ্তাহে যে হংস দম্পতির কথা বলেছিলাম লক্ষ্য করে দেখেছি সে হংসের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রায় পরমহংসের তুল্য। একমাত্র আমার কনিষ্ঠা কন্যা—a girl rising two years—কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দু'একবার ওদের কাছে ঘেঁসবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হংস দুটি গ্রীবা উত্তোলনপূর্বক সরব হর্ষ প্রকাশ মাত্র দ্রুতপদে পলায়ন করেছে।

জন্তু জানোয়ার পোষাটা মানুষ্য সমাজের সঙ্গে প্রকৃতিরাজ্যের সেতুবন্ধন, এ ধরণের কথা অনেকের মুখে শুনেছি। মানুষে মানুষে প্রীতিবন্ধনকেই আমি মূল্য দিই, যদিচ ব্যবহারিক জীবনে সে আদর্শকে সব সময়ে উপযুক্ত মূল্য দিতে পারিনি। গোড়ায় আমি সাদে'র উক্তিকে তারিফ করেছি। সেটা অবশ্য সাহিত্যের খাতিরে, বেড়ালের খাতিরে নয়। কথাটি শুনতে ভালো, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বলে আমি ওসব কথায় বিশ্বাস করি, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। আমি সাহিত্যাশ্রমে পশুপক্ষীকে স্থান দিতে রাজি আছি, গৃহস্থাশ্রমে নয়। গার্হস্থ্য সুখের জন্য কুকুর বেড়ালের সাহায্য প্রার্থনা করা আমি অত্যন্ত undignifild মনে করি। স্ত্রীর সঙ্গে আমার যদি মনোমালিন্য ঘটে তবে কুকুর বেড়ালের মধ্যস্থতায় কি হবে? তবে হ্যাঁ, এসব ব্যাপারে মানুষের মধ্যস্থতা আরো সাংঘাতিক। আর কুকুর যে এসব সমস্যার সুরাহা করতে পারে এমন তো কোনো প্রমাণ নেই। রিপ্ ভ্যান্ উইংকল্-এর স্ত্রী তার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর চাইতে হতভাগা কুকুরটার উপরেই বেশি ক্ষিপ্ত ছিল। তার ধারণা ঐ কুকুরটাই তার স্বামীকে বখিয়ে দিচ্ছে।

পূরবীর গীতিরস

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ lyric poet বা গীতি-কবি। তাঁহার সমগ্র কাব্য সম্ভার অপরূপ গীতিচ্ছন্দমাধুর্যে সম্পূর্ণ। কোথাও বা কোনো বিশেষ কবিতায় ব্রাউনিঙের ধরণে ruggedness বা স্থূল প্রয়োগ যে নাই তাহা নহে, তবে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য ইহার গীতিমাধুর্য। এই গীতিমাধুর্য তাঁহার একেবারে কৈশোরের কবিতা হইতে সুরু করিয়া বার্ধক্যের শেষ সীমার রচনা পর্যন্ত সর্বত্রই সুস্পষ্ট। আশ্চর্যের বিষয় এই কাব্যমাধুর্য তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাতে কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্যগুলির মধ্যে 'পূরবী'তেই যেন lyricism বা গীতি-মাধুর্য চরমে উঠিয়া 'মহুয়া'র মধ্য দিয়া অপ্রতিহত ধারায় চলিয়াছে।

একথা প্রথমেই বলা আবশ্যক যে পূরবীর যে lyricism বা গীতিরস তাহা ঠিক 'ক্ষণিকা' বা এমন কি 'বলাকা'র ধরণেরও নহে। 'পূরবী'র মধ্যে হাল্কা ভাব স্বল্পই দেখা যায়। 'পূরবীর' অধিকাংশ কবিতাগুলির মধ্যে যে গীতিমাধুর্য চোখে পড়ে তাহার মধ্যে বেশ একটি গাম্ভীর্য, একটা উদাত্ত ধ্বনি আছে। একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলির মধ্যে যে lyrical sweetness (বা গীতিমাধুর্য) তাহার তুলনা অন্যত্র মিলে কি না সন্দেহ; এবং টমসন সাহেব যে রবীন্দ্র-নাথের গানগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "They were composed to be sung but they sing themselves."—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অবশ্য সাধারণ সঙ্গীতের মিষ্টতার সহিত সাধারণ কবিতার মিষ্টতার একটি চিরন্তন প্রভেদ আছে, যদিও এই দুরতিক্রম্য প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রায় পরাজয় মানিয়াছে। তথাপি তাঁহার সঙ্গীত-গুলিকে বাদ দিলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, Euphony এবং গীতিরসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কাব্যের মধ্যে মিলে তাহাদের মধ্যে 'পূরবী' অন্যতম। কিন্তু 'পূরবী'-পর্যায়ের গীতিরসকে 'ক্ষণিকা'-পর্যায়ের গীতিরস হইতে কিছু পৃথকভাবে দেখিতে হইবে।

গীতিরসের দিক দিয়া 'লিপিকা'র সহিত 'গল্পগুচ্ছ' বা 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভাষার যে পার্থক্য, 'ক্ষণিকা'র সহিত 'পূরবী' বা 'মহুয়া'র বেশীর ভাগ কবিতার সেই পার্থক্য। এমন কি পূরবীর "শিলঙের চিঠি" দিনেন্দ্রনাথকে লেখা 'চিঠি' অথবা ঐ ধরণের যে দুই একটি কবিতা আছে সেগুলির অর্থ-গৌরবে হাল্কাভাব থাকিলেও পদলালিত্যে গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণের রেশ একেবারে লোপ পায় নাই।

পূরবীর হাল্কা কবিতা এইরূপঃ

"গর্মি যখন ছুট্‌ল না আর পাখার হাওয়ায়
শরবতে
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক
পর্বতে।"

—এখানেও ছন্দ বিশেষ হাল্কা নহে, গজেন্দ্র-গমনে চলিয়াছে। কিন্তু 'ক্ষণিকা'র গীতিচ্ছন্দ ভিন্ন প্রকারঃ

"দুটি বোন তা'রা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে?
দেখেছে কি তা'রা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?"

—ছন্দ লঘু পদবিক্ষেপে দ্রুত তালে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'পূরবী', 'মহুয়া' ছাড়াইয়া এমন কি 'সেঁজুতি'তেও গিয়া এই হাল্কা ভাব ফিরিয়া আসে নাই। 'সেঁজুতি'র হাল্কা ভাবের ভিতরেও গাম্ভীর্য সুস্পষ্টঃ

"ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকার পরুষ রবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন।"

—ছন্দ এমনি দীর্ঘায়িত চরণক্ষেপে বিলম্বিত গতিতে চলিয়াছে যে দ্রুত উচ্চারণে পড়িবারই উপায় নাই।

এইবার 'পূরবী'র গীতিরসের স্বরূপ সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্‌। 'বিজয়ী' কবিতাটির গীতি-বেগ কিছু দ্রুত লয়ে হইলেও গাম্ভীর্যবর্জিত নহে, অধিকন্তু অভিনব উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে বিশিষ্ট মহিমায় মণ্ডিতঃ

"ভাবলো তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;"

এখানে বিজয়ী সৈন্য কর্তৃক শত্রু দুর্গ ভেদের যে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অভিনবত্বের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রকাব্যেও অবিরল নহে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার গীতিচ্ছন্দ সর্বত্র সমমাধুর্যমণ্ডিত না হইলেও গীতিরসের গুণেই ইহার কয়েকটি স্তবকে সুর দেওয়া হইয়াছেঃ

"হে নূতন
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"

ইত্যাদি। যেখানে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ সেইখানেই গীতিরস স্বভাবতঃই নিবিড় হইয়া দেখা দিয়াছেঃ

"দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।"

ইহার পরেই 'পূরবী'র শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'তপোভঙ্গে'র অপূর্ব ছন্দোমাধুর্য, প্রসাদ-গুণ ও গীতিঝঙ্কারের কথা বলিতে হয়। ইহার উৎপ্রেক্ষাও যেমন অনন্যসাধারণ, ইহার গীতিরসও তেমনি অসামান্যঃ

"কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।"

এই অপূর্ব উৎপ্রেক্ষাটির মূল ইঙ্গিতটুকু বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে মিলেঃ

"ক্বাপি বিহৃত্য দিবাবসানে লোহিত তারকা
তপোবন ধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা
মুদিতৈস্তপোধনৈরদৃশ্যত।"

—অর্থাৎ লোহিত-তারকা সন্ধ্যাকে দেখিয়া তপোধনদের মনে হইল যেন সারাদিন ঘুরিয়া লোহিত-তারকা আশ্রমধেনু কপিলা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'পূরবী'তেই এই উপমাটি আরও একবার ব্যবহৃত হইয়াছে "শেষ" নামক কবিতাটিতেঃ

"যখন কর্মের দিন, ম্লান ক্ষীণ, গোষ্ঠে চলা
ধেনু সম।"

ইহার পার্শ্বে 'সোনার তরী'র অনুরূপ একটি অপূর্ব উৎপ্রেক্ষা ধরিয়া দেখা যাক্‌ঃ

"বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়, অপরিচিতা,
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।"

—দিন শেষে পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভা যেন মৃত দিবসের প্রজ্বলিত চিতাবহ্নির প্রদীপ্ত আভা।

অর্থগৌরবে এই উৎপ্রেক্ষা 'পূরবী'র দিবসান্ত বর্ণনের উৎপ্রেক্ষার সমপর্যায়ের হইলেও 'তপোভঙ্গে'র গুরু গাম্ভীর্য ইহার মধ্যে নাই এবং ধ্বনি ও গীতিরসের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষু-কর্ণ এড়াইতে পারে না। 'তপোভঙ্গে'র মধ্যে যেখানে আলেয়ার আলোদীপ্ত জনশূন্য প্রান্তরে বিদ্যুৎ-চমকের চিত্র ফুটিয়াছে তাহাও অতুলনীয়ঃ

"নির্জন প্রান্তর তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।"

—ইহার সহিত বহু পূর্বের লেখা—"দেখিছ না কি, ওগো সাহসিকা, ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা" ইত্যাদি ছত্রের তুলনা করিলে লিরিকেল পার্থক্যটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"লীলাসংগিনী" কবিতার গীতিরস অপেক্ষাকৃত হাল্কা, কিন্তু চপল নহেঃ

"নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসি
কেতকীর রেণু মেখে।"

এই কবিতাটির মধ্যে একটি শ্লেষ অলঙ্কার অতি চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে:

"বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিনীর বীণ।"

—এখানে পূরবী ও রবি দুইটি শব্দেই শ্লেষোক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

পূরবীর দ্বিতীয়ভাগে "পথিক"। এই খণ্ডের কবিতাগুলি আরও গম্ভীর। "আহ্বান" কবিতার গীতিমাধুর্য যেমন আশ্চর্য সুন্দর ইহার ধ্বনিও তেমনি ধীর গম্ভীর:

"হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।"

—প্রত্যেকটি শব্দ গতি-বেগ মন্থর করিয়া ধরে, ছন্দ গম্ভীর চালে ধীর চরণে চলিয়াছে।

"ক্ষণিকা" নামক কবিতাটির imagery বা কল্পনা যেরূপ অদ্ভুত ইহার গীতিরসও তেমনি নিবিড়:

"খোলো খোলো হে আকাশ স্তব্ধ তব
নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা॥"

"আনমনা" কবিতাটি গীতিরসগুণে সুরসংযোগে একেবারে গানের পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যেও এমন দুই একটি উৎপ্রেক্ষা আছে যাহাকে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায় Cosmic Metaphor বলা যায় (দ্রষ্টব্য:—"বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস" ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭):

"ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।"

"আশা" কবিতার গীতিরসমাধুর্য সহজ সুন্দর, কিন্তু একেবারে গাম্ভীর্যবর্জিত নহে, বিশেষ ছন্দ বেশ ধীর গামী:

"বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা করেছিনু আশা।"

"সমুদ্র" কবিতাটির গীতি-রসের নিবিড় মাধুর্য বেশ উপভোগ্য; উপরন্তু স্থানে স্থানে সহজ, সুন্দর অনুপ্রাস সহযোগে ইহার গীতি-ঝঙ্কার অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে:

"হে সমুদ্র, স্তব্ধ চিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপন ওঠে কেঁদে কেঁদে।"

ইহার সহিত "সোনার তরী"র "সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটির একটু তুলনা করিলেই গীতিরসের সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু ধরা পড়িবে:

"হে আদি-জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব।"

এখানেও অনুপ্রাসের অভাব নাই, ছন্দোগাম্ভীর্য ন্যূন নহে, তথাপি পদলালিত্যগুণেই হোক অথবা অর্থ-গৌরবের কারণেই হোক, "পূরবী"র "সমুদ্র" কবিতার গীতিরস অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে জমিয়াছে।

"পূরবী" যে যুগের রচনা অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় সেটিকে রবীন্দ্র-কাব্যের Retrospective বা পরাংমুখীন যুগ বলিয়াছেন (দ্রষ্টব্য:—"বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস" ৩য় খণ্ড, ৪ ও ১৮ পৃষ্ঠা)। এই যুগ-বিভাগ খুবই সমীচীন হইয়াছে। বস্তুতঃ পূরবীর একাধিক কবিতার গীতি-রসই বিগত যুগের স্মৃতি-বিজড়িত হইয়া অনুপম মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। "কৃতজ্ঞ" কবিতাটিতে কোন্ বিস্মৃত বসন্তের বেদনা-বিহ্বল একটি স্মৃতি অপরূপ গীতিরসে নিষিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে:

"বলেছিনু 'ভুলিব না,' যবে তব ছল ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নব বসন্তের মাধবী মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে;..."

"কিশোর প্রেম" ও "বিদেশী ফুল" কবিতা দুইটির গীতি ভঙ্গিমা কিছু চপল হইলেও হাল্কার পর্যায়ে নামে নাই। "শেষ বসন্ত" কবিতাটি গীতিরস-মাধুর্যে অপূর্ব সুন্দর:

"ফিরিয়া যেও না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধ'রে ঝলুক তোমার কালো কেশে।"

"তৃতীয়া" কবিতাটির সুর বেশ কিছু চপল, কিন্তু এখানেও "পূরবী"র গাম্ভীর্য লোপ পায় নাই:

"কবি ব'লে লোক সমাজে আছে তোমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।"

"অদেখা" কবিতার সুরও চপল, কিন্তু সে চাপল্যে "ক্ষণিকা"র সুরের স্পর্শ নাই:

"আসিবে সে আছি সেই আশাতে
শোনেনি কি, দুজনাকে
নাম ধ'রে ওই ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে।"

"আকন্দ" এবং "কঙ্কাল" কবিতা দুইটির গীতি-রস যেমন মধুর "পূরবী"র গম্ভীর বৈশিষ্ট্যও ইহাদের মধ্যে তেমনি লক্ষ্যণীয়। "পূরবী"র অবশিষ্ট কবিতাগুলি প্রায় সমস্তই গীতিরস মাধুর্যে মধুর। "বদল" কবিতাটিতে "প্রবাহিনী"র একটি গানকে কিছু গম্ভীর করিয়া "পূরবী"র যোগ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র।

এই যে মাধুর্য, এই যে অপরূপ গীতিরস যাহার কথা এতক্ষণ বলিলাম ইহা মহুয়াতেও স্থানে স্থানে চূড়ান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। "সাগরিকা" কবিতার দৃষ্টান্ত ধরা যাইতে পারে:

"সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি পাশ।"

—যুক্তাক্ষরহীন ছত্রগুলিতে স্বভাবতঃই একটা লঘু-ভাব থাকিবার কথা এবং হয়ত আছেও; কিন্তু এই লঘু-ভাব "পূরবী"র বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত নহে, ইহার মধ্যে "ক্ষণিকা"র লঘু চাপল্য মোটেই নাই। নিতান্ত সহজ শব্দ প্রয়োগ ও অনুপ্রাস যোগে ইহার গীতি-মাধুর্য অনুপম হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও সুমধুর শব্দপ্রয়োগে উদ্বেলিত গীতিরসই রবীন্দ্রকাব্যের সর্বপ্রধান সৌন্দর্য, ruggedness বা স্থূল, অমধুর শব্দ প্রয়োগও তাঁহার কাব্যে স্থানে স্থানে মিলে অনেকটা ব্রাউনিঙের ধরণে। এখানে "পূরবী" হইতে অল্প কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"বৈঠিক পথের পথিক" কবিতাটির নাম হইতেই বুঝা যায় কবি ইহার মিষ্টতাকে ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিবার উদ্দেশ্যের "বৈঠিক" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। "অপরিচিতা" কবিতাটির মধ্যে গীতি-মাধুর্যের অভাব চোখে পড়ে:

"পথ বাকি আর নাইতো আমার, চ'লে এলাম একা;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা।"

বিস্মরণ কবিতাটিতে স্থানে স্থানে গদ্য-ময়তা প্রকট হইয়াছে :

"ধূলায় তারি শান্তি, তারি গতি
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি—"

"মুক্তি" কবিতাটিতে গীতি-রস-শূন্যতা একেবারে সুস্পষ্ট, মনে হয় যেন নীরস গদ্য পড়িতেছি:

"মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানাজনে,
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।"

"বিদেশী ফুল" কবিতাটি খুবই মধুর, কিন্তু প্রথম ছত্রে কবি ইচ্ছা করিয়া "পুছিলাম" কথাটি ব্যবহার করিয়া শব্দমাধুর্যের (Euphony) স্বল্প ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন।

"ইটালিয়া" কবিতাটি গীতিরসমাধুর্যে অপূর্ব। কিন্তু একটি ছত্রে আছে—"উতারো ঘোমটা তব"। এখানে কবি ইচ্ছা করিয়া "উতারো" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই; মনে হয় একটানা শ্রুতিমাধুর্যে ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্যই কবি এই প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই যে স্থানে স্থানে স্থূল প্রয়োগের কথা বলিলাম, কাব্যের উৎকর্ষের পক্ষে ইহা সর্বত্র হানিকর নহে। কবিতায় এইরূপ প্রয়োগকে কবির বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই ধরণের স্থূল প্রয়োগের অভাব শেক্সপীয়রেও নাই। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যে এইরূপ প্রয়োগ তাঁহার কবিতায়

অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

"পূরবী" কাব্যের বহিরঙ্গের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। ইহার অন্তরের কথা আরও সংক্ষেপে কিছু বলিব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে "পূরবী" রবীন্দ্রনাথের Retrospective যুগের রচনা। "বলাকা" হইতে এই যুগের সূচনা। অতীতের বসন্ত-বায়ু-হিল্লোলিত যৌবনোচ্ছল তরুণ দিনগুলির জন্য একটি সকরুণ বেদনা এই যুগের কাব্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়—কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও স্থূলভাবে। এই বেদনা জমাট বাঁধিতে সুরু করিয়াছে। "পূরবী" হইতেই এবং এই বেদনারই অমৃত-স্পর্শ পরবর্তী যুগের কবিতাগুলির মধ্যে (যেমন "মহুয়া"য়) নবযৌবনের তরঙ্গ তুলিয়াছে। এমন কী "বীথিকা"য় পর্যন্ত এই যৌবনস্পর্শ উচ্ছল হইয়া দেখা দিয়াছে:

"তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনও আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।"

বেদনার দক্ষিণ পবন স্পর্শে উদ্বেলিত এই যে যৌবনানন্দ ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহা রসজ্ঞ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথ "তে হি নো দিবসা গতাঃ" বলিয়া কখনও হাল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। বিগত দিনের সুখস্মৃতি-মঞ্জরীগুলি চিরকাল চৈত্রপবনে তাঁহার চিত্তবনে সঞ্চালিত হইয়াছে। তাই "পূরবী"র কবিও কালগর্ভে বিলীন আনন্দের দিনগুলিকে আবার সজীব করিয়া তুলিবার নিরুদ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিয়াছেন:

"...যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগুলি..."

একদা যে আনন্দ-ঘন দিনগুলি কবিচিত্তকে পরমানন্দরসে নিত্য অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলি আজিও মহাকালের "পিঙ্গল জটাজালে" অম্লান হইয়া আছে। সেই "নিত্য নূতনের লীলা" দেখিবার জন্যই "পূরবী"র কবির অভিযান:

"বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খল হীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

"পূরবী"র কবির কানে "বিদায়"ের আহ্বান ধ্বনি বাজিলেও কবি তাহাকে নূতনের উদ্বোধনের মন্ত্রে শুদ্ধ করিয়া লইবেন—

"বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে
বাহিরে পাস ছুটি,
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক্ টুটি।"

চিরকালের "লীলাসঙ্গিনী" আজ কবির জীবনের সন্ধ্যাকালে তমসান্তরালে হারাইয়া যাইবার মতো হইয়াছে, কিন্তু তাহাকেও কবি আজন্ম পরিচয়ের হৈমসূত্রে বাঁধিয়া রাখিবেন, অন্ধকারের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না:

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী?"

যৌবন-মধ্যাহ্নের কবে অবসান ঘটিয়াছে, আসন্ন সন্ধ্যায় মনে হয় কত পূর্ণ স্থান আজ শূন্য, নিবিড় মিলনের কত চিত্র আজ অপার বিচ্ছেদে ম্লান! কবি-চিত্তে কিন্তু সে সমস্ত লুপ্ত স্মৃতিই অটুট রহিয়াছে, কাহাকেও তিনি "শূন্যের অকূলে" ভাসিয়া যাইতে দেন নাই—

"তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে
সৃষ্টি করি স্বপনের ভুবন।"

মনের মধ্যে কবি সৃষ্টি-প্রবাহ অনন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

যে সর্বশেষ চরম উপলব্ধির বাণী যুগে যুগে রবীন্দ্র কাব্যের মূল মন্ত্র হইয়া অনন্ত জিজ্ঞাসাকারে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, "পূরবী"তে তাহাতেও ছেদ পড়ে নাই। "কড়ি ও কোমলে" এই জিজ্ঞাসা প্রথম সুস্পষ্ট অক্ষরে দেখা দেয়:

"মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

"গীতাঞ্জলি"তে এই চরম বাণীর জন্য কবির অপরিসীম ব্যাকুলতা—

"জীবনের শেষ গানে
জীবনের শেষ দানে
হে দেবতা তাই আজি দিব সকাশে
প্রভাতের আলোকে যা ফোটে নাই প্রকাশে।"

"বলাকা"র ভিতরেও এই অনুপলব্ধির বেদনা পরিস্ফুট রহিয়াছে—

"যে কথা বলিতে চাই
বলা হয় নাই।"

"পূরবী"তেও কবি সেই মহত্তম উপলব্ধির অতৃপ্ত আশায় আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন—সেই চিরস্পর্শাতীত সুদূরবাসিনী বাণী-মূর্তিকে এখানে অনন্তপথচারিণী অভিসারিকার বেশে কল্পনা করা হইয়াছে:

"দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ,
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস।"

রসজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন, ইহাই "রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির শেষ অভিব্যক্তি"। এই অভিব্যক্তি পরেও বহুভাবে রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দিয়াছে। কিন্তু "পূরবী"তে যে অনুপম রূপ সে পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাই এ-বিষয়ের চরম প্রকাশ। "পূরবী"তেই কবি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছেন যে, এই চরম উপলব্ধি শুধু অনন্ত প্রত্যাশা হইয়াই থাকিবে— "অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি নিতে হলো তুলে।"

এই পরিচয়কে কবি অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যধারা এমনি অবাধ, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বহিয়া চলিয়াছে। এ পরিচয় সমাপ্ত জানিলে আর কিছুত জানিবার থাকিতে পারে না, মানবজীবনের সমস্ত জানার শেষ হইয়া যায়। তাই রবীন্দ্র-কাব্য অনন্ত প্রত্যাশায় প্রাণবান্, অসীম ব্যাকুলতায় নিত্যস্পন্দিত:

"আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবনমৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুর পুরে।"

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৬

মধুসূদনের একটা কাজ হচ্ছে অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করে বেড়ানো। যেখানে দর্প তার উদ্ধত ফণা উঁচু করে অভিমানের বিষ-বাষ্প ত্যাগ করতে থাকে, নিঃশব্দে সেখানে উপস্থিত হয়ে লগুড়াঘাতের দ্বারা মধুসূদন তাকে চূর্ণ করেন। তাই মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় নাম দর্পহারী মধুসূদন।

পৌরাণিক কালে দেব, দৈত্য, মুনি-ঋষিদেরও মধুসূদন রেহাই দিতেন না; সুযোগ উপস্থিত হলেই তাঁদের দর্প চূর্ণ করতেন। তাঁরই প্রতি ভক্তিমত্তার বিষয়ে একজন সামান্য কৃষকের সহিত মহামুনি নারদের পরীক্ষায় কিরূপে তিনি নারদের দর্প চূর্ণ করেছিলেন, সে কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। আধুনিক কালে দেব, দৈত্য, মুনি-ঋষির শ্রেণী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মধুসূদন সুযোগ মত মানুষের দর্প চূর্ণ ক'রে ক'রে নিজের অভ্যাস এবং শক্তি বজায় রেখে চলেছেন। একবার আমার উপর দিয়েও কিরূপে তিনি তাঁর অভ্যাসের অনুশীলন করেছিলেন, সেই কথাটা বলি।

আজকাল যেমন ঘরে ঘরে বক্স-হারমোনিয়ম্ দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের বাল্যকালে তেমন ছিল না। তখন হারমোনিয়ম বিদেশের নূতন আমদানি,—একটা যৎপরোনাস্তি বিস্ময় এবং কৌতূহলের সামগ্রী। ঠোঁটকাটা মানুষের দাঁতের মতো সাদা সাদা পরদাগুলি সর্বদা উন্মুক্ত অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে আছে, পিছনের হাপরে একটু চাপ দিয়ে যে-কোনা পরদায় আঙুল বসালেই পোঁ করে আওয়াজ মারে! এ হেন কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যখন একেবারে পুরানো হয়ে বাসি মেরে যায়নি, সেই সময়ে আমাদের পূর্ণিয়ার সংসারে একটি হার-মোনিয়মের শুভ প্রবেশ হল।

দাদা ছিলেন আমাদের সংসারে সবরকম নূতন ধারার ভগীরথ। রামায়ণ-মহাভারত-অন্নদামঙ্গল-আরব্য উপন্যাসকে অতিক্রম করে বাঙলা ভাষার নূতনতম সাহিত্যের ধারা সংসারে তিনিই এনেছিলেন, সঙ্গীতের ধারাও তিনিই আনলেন।

যেদিন হারমোনিয়মটি আমাদের সংসারে প্রথম প্রবেশ করল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। একটি মজবুত দেবদারু কাঠের বাক্সের মধ্যে সযত্নে প্যাক করা হারমোনিয়মের নিজস্ব বাক্স এবং সেই বাক্সের ভিতর কাগজ ও তুলার নানা প্রকার চাপাচাপির মধ্যে হারমো-নিয়মটি এমন দৃঢ়ভাবে রক্ষিত যে, পথের টানা হেঁচড়ার মধ্যে বাক্সের মধ্যে নড়ন-চড়নের দ্বারা আহত হবার তার তিলার্ধ সুযোগ ছিল না। দুটি কাঠের আবরণ ভেদ করে হারমোনিয়মটি আত্মপ্রকাশ করা মাত্র তার সুঠাম কমনীয় মূর্তি দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল পালিশ করা কালো রঙের কাঠের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা টি ই বিভান এণ্ড কোং, ক্যালকাটা। প্যারিসের বুসনের (বুসোঁ?) হারমোনিয়ম। বাক্সের মধ্যে রাখবার সময়ে দুদিকের দুটি মসৃণ মোটা পিন (Knob) টিপে সামনের দিকের খানিকটা অংশ পিছনের দিকের অংশে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। ব্যবহারের পূর্বে সামনের দিকে টান দিলে গুপ্ত অংশটা বেরিয়ে এসে স্প্রিং-এর পিনের জোরে দৃঢ় হয়ে আটকে থাকে। স্বরটি সুমিষ্ট সুরেলা এবং ঈষৎ মিহিধরণের। পিছন দিকে হাওয়া দেবার বেলো আজকালকার হারমোনিয়মের বেলোর ন্যায় একহারা নয়, চার-পাঁচ ভাঁজের দীর্ঘটানা বেলো।

সন্ধ্যার পর দাদা এবং মেজদাদা হার-মোনিয়ম নিয়ে স্বরসাধনায় বসতেন। সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা,—সে সাধনার ছিল প্রথম পাঠ। কিছুদিনের পর সুরের অক্ষর পরিচয় ছেড়ে গতের দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করলেন। প্রথম যেদিন দাদা 'সা রে গা মা'র পরিবর্তে 'নি সা ধা নি পা গা মা পা মা গা রে সা' গৎটি বাজাতে আরম্ভ করলেন, সেদিন আমাদের মনে হল, হারমো-নিয়ম কেনা সার্থক হয়েছে, দাম উঠেছে; এখন যদি হারমোনিয়ম চুরিও যায়, খুব বেশি দুঃখের কথা হয় না।

তখনকার দিনে এই 'নি সা ধা নি পা' গৎটি ছিল স্বর পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ। সঙ্গীতের দুরূহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার এটি ছিল ছাড়পত্র। সুতরাং সুর সপ্তকের আরোহণ অবরোহণ আয়ত্ত করার পর সারা বাঙলা দেশ এই 'নি সা ধা নি পা' গৎটির সাধন আরম্ভ করত। কোন্ সঙ্গীতসাগর স্বরপরিচয়ের এই দ্বিতীয় ভাগটি রচিত করেছিলেন তা জানিনে, কিন্তু বহুদিন ধ'রে এটি ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়েরই মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিপুল প্রচলনের অধিকারী হয়েছিল। আজকালকার বাজারে বহু-বিচিত্র স্বরপরিচয় প্রচলিত হওয়ার ফলে 'নি সা ধা নি পা' বোধকরি অপ্রচলনের অন্ধকার গহ্বরে আত্মগোপন করেছে।

দাদাদের হারমোনিয়ম্ বাজানো শেষ হওয়ার পর বাক্সর ভিতর হারমোনিয়ম্ তুলে রাখার অপ্রীতিকর কাজের ভার আমি নিজের কাঁধে নিতে লাগলাম। এই ভার গ্রহণ করাকে নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তি ব'লে মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে। বাদামের কঠিন খোলার মধ্যে নরম শাঁস যেমন লুকিয়ে থাকে, আমার হারমোনিয়ম্ তুলে রাখার মধ্যে তেমনি লুকিয়ে থাক্‌ত একটা লোভনীয় উদ্দেশ্য। বেলো বন্ধ করবার সময়ে যথাসম্ভব দীর্ঘ চাপের সুযোগে কয়েকটা পরদা টিপে সুর বার ক'রে মনুষ্যজন্ম সার্থক করাই ছিল আমার প্রকৃত অভিপ্রায়।

কিন্তু অল্প আস্বাদনের অতৃপ্তির তাড়নায় ক্রমশঃ লোভ উঠল বেড়ে। কি উপায়ে একটু জুৎ ক'রে হারমোনিয়ম্ বাজানো যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করতে করতে অবশেষে মনের মধ্যে একটা ফন্দী দেখা দিলে। বউদিদিকে বোঝালাম, যে সময়ে বাবা এবং দাদা আদালতে থাকেন সেই সময়ে আমাদের দুজনের পক্ষে লুকিয়ে লুকিয়ে হারমোনিয়ম্ শিখে ফেলার মাহেন্দ্রক্ষণ। হারমোনিয়ম্ শেখবার লোভে প'ড়েই হোক, অথবা আমার অন্তরের আকুতি উপলব্ধি ক'রেই হোক, বউদিদি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। তবে আর ভাবনা কিসের? হারমোনিয়মের বাক্সের চাবি ত' বউদিদির আঁচলেই ঝোলে!

তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরে বই-খাতা ফেলেই হারমোনিয়ম্ খুলে বসি। কাজকর্মের সময়,—পাঁচ-সাত মিনিট অভ্যাস ক'রেই বউদিদি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়েন, আমি একান্ত মনে সাধনায় রত হই। তারপর, বাবা ও দাদা বাড়ি ফেরবার অব্যবহিত পূর্বে হারমোনিয়ম্ তুলে রেখে ভালমানুষ সাজি।

কিছুকাল এইভাবে চলার পর একদিন বউদিদি আমাকে দাদার কাছে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিলেন। দাদা 'নি সা ধা নি পা' সাধ-ছিলেন, অকস্মাৎ আমার উপস্থিতিতেই বউদিদি ব'লে বসলেন, "ও গৎ উপীন তোমার চেয়ে ভাল বাজাতে পারে।"

বউদিদির কথা শুনে আমি ত' আর আমাতে রইলাম না! ভারি রাগ হ'ল তাঁর ওপর;—প্রথমত, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে ধরিয়ে দিলেন ব'লে, এবং দ্বিতীয়ত, দাদার তুলনায় আমাকে বড় করার জন্যে।

শুধু ধরিয়ে দিয়েই বউদিদি নিরস্ত হলেন না, পীড়াপীড়ি ক'রে দাদার সম্মুখে আমাকে বাজাতেও বাধ্য করলেন। নাচ্‌তে উঠে ঘোমটা টানার নিষেধ আছে, আমিও সেদিন ঘোমটা না টেনে যথাসাধ্য ভাল ক'রেই বাজিয়েছিলাম। মনে হ'ল, আমার বাজনা শুনে দাদা খুসি হয়েছেন, কিন্তু পঠদ্দশায় গানবাজনার সখ জ'মে উঠ্‌লে পাছে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, বোধকরি সেই কথা ভেবেই উৎসাহ কোনো রকম দিলেন না, নিষেধ-নিবারণও অবশ্য করলেন না। আমি কিন্তু নিষেধ না করাকেই উৎসাহ দানের সমার্থবাচক বিবেচনা ক'রে উৎসাহেরই সহিত হারমোনিয়ম্ সাধনায় প্রবৃত্ত হলাম। সুযোগও উপস্থিত হ'ল। সম্মুখে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের অবকাশ। পূর্ণিয়া সহরের নাতি-উত্তপ্ত মনোরম মধ্যাহ্নগুলিকে নিযুক্ত করলাম হারমোনিয়ম্ শিক্ষার কাজে। আমার সহপাঠীগণ যখন ছুটির দিনের গৃহপাঠের গণিতশাস্ত্র নিয়ে ঘর্মাক্ত হ'ত আমি তখনকার সুখদ মধ্যাহ্ন-প্রহরগুলি অতিবাহিত করতাম সংগীত শাস্ত্রের নিরলস চর্চায়। ফলে, পুস্তকহস্তা দেবী সরস্বতী হয়ত' আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি; কিন্তু দেবী বীণাপাণি কতকটা প্রসন্ন হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। হারমোনিয়ম্ বাজাবার খানিকটা দক্ষতা বাল্যকালের তরুণ বয়সেই আমার হস্তগত হয়েছিল।

বছর ছয়েক পরে এই বক্‌স্ হারমোনিয়ম্‌টি যখন আমার একাধিপত্যে এসেছিল তখন আমি ভাগলপুর গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান প্রসারের কারণে দাদা তখন এই বাদ্য-যন্ত্রটি হ'তে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়েছেন। তখন তাঁর দক্ষিণ হস্ত হারমোনিয়মের সাদা কী-বোর্ডের (Key-board) পরিবর্তে মামলা-মোকদ্দমার সাদা কাগজের উপর চালিত হ'য়ে যে সুর সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে, তার ঝঙ্কার তখনকার দিনের খাঁটি রজতখণ্ডের ঝঙ্কার।

হারমোনিয়মটিরও তখন অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা। এত অল্প সময়ের মধ্যে অতটা জরাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। বোধহয় পূর্ণিয়ার স্যাঁৎসেঁতে সিক্ত আবহাওয়া ক্ষীণাঙ্গী প্যারিস-নন্দিনীর ধাতে সয়নি। আঠা তরল হওয়ার দরুণ তার দেহের কতকগুলি জোড় শিথিল হ'য়ে পড়েছে; ফুসফুসের গাত্রে ছোট-বড় কয়েকটি ছিদ্র, তার অবকাশ দিয়ে যে-পরিমাণ বায়ুর অপচয় ঘটে, তাতে স্বরনির্গমের জন্য শ্বাসপ্রণালীর প্রভূত বেগ পেতে হয়; দশনপাঁতি হ'তেও দু-চারটে দন্ত খ'সে গিয়েছে। থাকবার মধ্যে অবিকৃত আছে শুধু একটিমাত্র জিনিস। কষ্ট এবং কৌশলের ফলে তার জর্জর দেহ ভেদ ক'রে যেটুকু স্বর নির্গত হয়, তার মধ্যে পাওয়া যায় সেই প্রথম দিনের তরুণী-কণ্ঠের মাধুর্য। পূর্ণিয়ার আবহাওয়া প্যারিসের মূল্যবান ফ্রেঞ্চ রীডের উৎকর্ষের লাঘব করতে পারেনি।

সে হারমোনিয়মের বস্তু-সত্তা বহুদিন পূর্বে অদৃশ্য লোকে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু আমার সংগীত-জীবনের সেই প্রথম অনুরাগের যন্ত্রসহচরীর যে-সত্তা এখনো বিলুপ্ত হয়নি, তার অল্প একটু অংশ এই স্মৃতি-কথায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভবানীপুরে আসার কিছুকাল পরে আমাদের গৃহে টেব্‌ল্ হারমোনিয়মের রেওয়াজ প্রবর্তিত হল। একটি সুবৃহৎ মূল্যবান টেবল হারমোনিয়মের উপর বাড়ির লোকের যত্ন এবং মনোযোগ লক্ষ্য ক'রেই বোধহয় বিগতযৌবনা বক্‌স্ হারমোনিয়মটি অভিমান ভরে অবহেলার কোনো নিভৃত কোণে গিয়ে আত্মগোপন করলে। এতদিন যে বাম হস্ত বায়ু সরবরাহের নিকৃষ্টতর কার্যে ব্যবহৃত হ'ত, তা' থেকে মুক্তিলাভ ক'রে এখন থেকে তা দক্ষিণ হস্তের সহকারীরূপে প্রধান সুরকে স্ফীত ও অলঙ্কৃত করবার কার্যে নিযুক্ত হ'ল। বাম হস্তের বায়ু সরবরাহের কর্তব্য পদতলে অবতরণ করলে।

কিছুদিনের অনুশীলনের দ্বারা দুই হাত এবং দুই পায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার পর আমার বাজনার ঔৎকর্ষ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ধিত হ'ল। বক্স হারমোনিয়মের একহারা সুরের মধ্যে মিষ্টত্ব নিশ্চয় ছিল, কিন্তু শক্তিশালী পাঁচ-অক্টেভ অরগ্যানের গভীরঘন স্বরের যে মহিমা, তার পরিচয় সেখানে পাওয়া যেত না। ভাগলপুরে অবস্থান কালে আদমপুর ক্লাবের অধিনায়ক কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে যে দু-চারটি ইংরাজি গৎ আয়ত্ত করেছিলাম, অরগ্যানের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বরসম্পদের কল্যাণে সেগুলি ইংরাজিতর হয়ে উঠল। এতদিন একহারা কোট পরিধানের ফাঁকে যতটা দেশী ভাব আশ্রয় বেঁধে ছিল, কোটের উপর পাতলুন চড়িয়ে দিয়ে টেবিল হারমোনিয়ম বেশ-খানিকটা তা কমিয়ে নিয়ে এল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন চলেছে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবার' যুগ। চটুল সুরের আলিবাবার গানগুলি সে সময়ে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে চলেছিল। রাজার প্রাসাদ থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত কোনো স্থানে তাদের অনুপস্থিতি দেখা যেত না। ব্যাণ্ড বাজাতো, 'লেও সাকি দেও ভরপিয়ালা'; ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান গাইত, 'ছি, ছি, এত্তা জঞ্জাল'; বিড়িওয়ালা শিস্ দিত, 'বাজে কাজে মিন্‌সে কে আর'; আর, বাসরঘরে বাসর-জাগানিয়ারা গান করত, 'চাঁদ চকোরে অধরে অধরে'।

পাঁচসিকে দিয়ে একখানা আলিবাবার গানের স্বরলিপির বই খরিদ ক'রে গানগুলি উদ্ধার করবার নিরলস তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলাম। কঠোর সাধনার ফলে ভাগ্যদেবতা যেন কিছু প্রসন্ন হলেন; গানগুলি আয়ত্ত হবার সংগে সংগে দেখলাম, আমার অদৃষ্ট-গগনে খ্যাতির শশাঙ্ক দেখা দিয়েছে। প্রথমে অবশ্য কিছুদিন সে খ্যাতি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ রইল; কিন্তু ছড়িয়ে পড়তেও খুব বেশি বিলম্ব হ'ল না। গৃহ থেকে গৃহান্তরে, এবং পল্লী থেকে ভিন্ন পল্লীতে বিস্তারলাভ করতে করতে অবশেষে একদিন প্রবেশলাভ করল ভবানীপুর নীলকুঠির

জমিদার হরি ঘোষ মহাশয়ের কর্ণে। বন্ধুবর গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় একদিন তিনি আমাকে অতি আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে কিন্তু প্রমাদ গণলাম! বাজাতে হবে সেখানে হারমোনিয়ম্ নয়, হারমোনিয়মের পিতৃপুরুষ পিয়ানো, যা এ পর্যন্ত কোনো দিন বাজাই নি! সেদিন হরিবাবুর বাড়িতে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ। কিন্তু সে ত' ঘণ্টা দুই আড়াই পরের কথা। তার পূর্বে সে নৈশ ভোজনের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য যে-অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে, তার উপায় কি করা যায়!

তবে একটা ভরসার কথা আছে। পিয়ানোর কী-বোর্ড যখন হারমোনিয়মের কী-বোর্ডের অবিকল অনুরূপ; তখন হারমোনিয়ম্ বাজাবার যে-সামান্য কৌশল অর্জন করেছি, নিঃশেষে তা পিয়ানোর কী-বোর্ডের উপর বর্ষণ করতে পারলে কতকটা কিনারা হয়ত হ'তে পারবে।

ক্ষণকাল আলাপ-আলোচনার পর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হ'ল। বিনয় সহকারে হরিবাবু বললেন, "উপেনবাবু, এবার তা হ'লে একটু হোক্।"

নিঃশব্দে অল্প হেসে মিউজিক-স্টুলের উপর গিয়ে বসলাম। অর্গানের যে স্থানে দুটি পা-দান (Pedal) থাকে, সুরের মধ্যে ঝঙ্কার তোলার জন্য পিয়ানোরও ঠিক সেই স্থানে দুটি ছোট ছোট পা-দানের ব্যবস্থা আছে। পিয়ানো বাজাতে বাজাতে অভ্যাস-বশতঃ হারমোনিয়ম্-ভ্রমে পাছে সেই দুটি পা-দান দুই পায়ে পর্যায়ক্রমে চালিত করতে আরম্ভ করি, সেই দুশ্চিন্তায় মনটা একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে রইল।

ডালা খুলতেই দৃষ্টিগোচর হ'ল সাত-অক্টেভের শুভ্র সুদীর্ঘ সুশ্রী কী-বোর্ড। আমার বাজাবার স্কেলের প্রধান সুর লক্ষ্য ক'রে তিনটে আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ এক আঘাত করলাম। সজীব প্রাণীর মতো পিয়ানো একটা তীব্র আনন্দনাদ ক'রে উঠল,—সেই গভীর মধুর নিনাদের তাড়নায় সমস্ত ঘরটা যেন সুরের আবেশে জ'মে এল।

মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলাম। সুরের রেশ মিলিয়ে আসা মাত্র সহসা সকলকে (নিজেকেও) চকিত ক'রে দিয়ে পিয়ানোর কী-বোর্ডের উপর ঝড় বওয়াতে লাগলাম, 'লেও সাকি দেও ভর পিয়ালা' গানের সুরের। দুনে চৌদুনের দ্বারা বারম্বার পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে অবশেষে পা-দান চেপে ধরে ঝঙ্কারের কলরোল তুলে অকস্মাৎ একসময়ে যখন সমের মাথায় একেবারে নিঃশব্দ হলাম, তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ প্রশংসামুখর হ'য়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মৃদু স্বরে গোলোক বললে, "আমার মুখ রেখেছ উপেন!"

হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে হরিবাবু বললেন, "কোথায় শিখলেন উপেনবাবু, এমন অদ্ভুত পিয়ানো বাজানো?"

অসুবিধাজনক প্রশ্ন! সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, "আপনার বাড়িতেই,—এই মাত্র।" তাতে হয়ত' অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সে পরিচয়ের মধ্যে আসল মাল ডুবে মারা যাওয়ার আশংকাও থাকে। যে বাজনায় এতখানি প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হল, তার পিছনে যদি একটা সাধনার ইতিহাস না থাকে, তা হ'লে সে প্রশংসাকে অবিবেচিত ভ্রান্ত প্রশংসা ব'লেই মনে করতে হয়। কপট বিনয়ের দ্বারা এই প্রশ্নের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করলাম; বললাম, "কিছুই এখনো শিখতে পারিনি। মাত্র দু-চারটে শামুকের খোলা কুড়িয়েছি; রত্ন যা-কিছু, সাগর গর্ভেই আছে।"

আরও গোটা দুই আলিবাবার গান ও কুমার সাহেবের কাছে শেখা পোল্কা (Polka) নাচের একটা গৎ বাজিয়ে সেদিনের পালা শেষ করলাম। বাড়ি ফেরবার জন্যে বিদায় নেবার সময়ে সদা সর্বদা ইচ্ছামতো এসে পিয়ানো বাজাবার জন্য হরিবাবু পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

পিয়ানোর বিষয়ে একটা দুর্মদ মোহ নিয়ে গৃহে উপস্থিত হলাম। টেবল্ হারমোনিয়মের উপর দৃষ্টি পড়তে কেমন যেন একটু করুণা বোধ হ'তে লাগল। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাবে সে তার খানিকটা মহিমা হারিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে হরিবাবুর বাড়ি গিয়ে পিয়ানো বাজাই। তাতে হাত পাকে, কিন্তু মন ভরে না। পরের ধনে পোদ্দারগিরি ক'রে রিক্ত পকেটেই গৃহে ফিরি, কিন্তু মন পূর্ণ ক'রে নিয়ে আসি লালসায়। দিনমানে চিন্তা করি পিয়ানোর, রাত্রে দেখি তার স্বপ্ন। মনে হয়, যার পিয়ানো আছে, এ সংসারে একমাত্র সেই সুখী। যাদের নেই, তাদের কথা চিন্তা ক'রে মনে বেদনা জাগে; বেচারারা খেয়ে-দেয়ে হেসে-খেলে মনে করে সুখে আছে; কিন্তু প্রকৃত সুখের উপায় যে বেভান কিংবা হ্যারল্ডের দোকানে না গেলে পাবার যো নেই, সে খবর তারা রাখে না। একটা পরিবর্তিত অবস্থার কল্পনায় মাঝে মাঝে মন আনন্দের রসে সিক্ত হ'তে থাকে,—আমাদের নিজেদের একটা পিয়ানো হয়েছে; কি ক'রে হয়েছে, সেই অতীব কঠিন প্রশ্নকে অবশ্য এড়িয়ে যাই, যে ক'রেই হোক, হয়েছে; আমার ঘরেই তার স্থান; যখন খুসি বাজাই; রাত্রে কানাড়া রাগ বাজিয়ে শয্যা গ্রহণ করি, প্রত্যূষে ডালা খুলে রামকেলী বাজাই।

একটা সুতীব্র বাসনার দ্বারা পীড়িত মনের যখন এইরকম অস্থির-চঞ্চল অবস্থা, দাদা ও মেজদাদার সঙ্গে একদিন বেন্টিঙ্ক্ স্ট্রীটে জি, ও, পি, অ্যাল্সনের নিলামের দোকানে গেলাম। সেখানে সংসারের যাবতীয় পুরাতন জিনিসপত্র নিলামের দ্বারা বিক্রয় হয়। বড় বড় তিন চারটে হল ঘরে জিনিস-পত্র সাজানো; যে-গুলি নিলামের জন্য প্রস্তুত, সেগুলিতে লট্ নম্বরের টিকিট বাঁধা; ছাপানো ক্যাটালগের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই সেগুলির হদিস পাওয়া যায়।

কাঠ-কাঠরার আসবাবপত্রের নিলাম চলেছে, দাদারা প্রয়োজন মত এক আধটা জিনিস কিনছেন, আমি ঘরে ঘরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো, আমার অন্তরের চরমতম সামগ্রী! তার একটা পায়ায় লট্ নম্বরের টিকিট ঝুলছে, সুতরাং সেই-দিনই নিলামে চড়তে পারে। ডালা খুলে দু' চারটে পরদায় আঘাত করলাম। অবশ্য স্কেল ধরে টিউন্ বাঁধা নেই, কিন্তু যে পরদায় আঘাত করি, সেই পরদাই গভীর মিষ্ট আওয়াজ ছাড়ে। লালচে রঙের উৎকৃষ্ট মেহগিনি কাঠের কেসিং। আয়তন এত দীর্ঘ যে পরিণত বয়সের একটা মানুষ তার ডালার উপর শয্যা রচনা করে পা ছড়িয়ে অনায়াসে শয়ন করতে পারে। দেখতে হবে, এই অপরূপ পদার্থটির গতি হয় কিভাবে, কোন্ ভাগ্যবান এটিকে গৃহে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। সে-সব দেখেও খানিকটা আনন্দ লাভ করা যাবে!

তখন নিলাম চলছিল একটা কাঠের আলমারির। নিলামদারের কাছ ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু সুযোগ বুঝে মৃদু স্বরে বললাম, "মশায়, শুনছেন?"

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ভদ্রলোক বললেন, "কি বলছেন?"

"ও ঘরের লট নম্বর এত গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটা নিলাম করবেন না?"

"হ্যাঁ করব, একটু পরে।"

অপেক্ষা করে রইলাম। একটু পরে বোধ হয় বার পাঁচ-সাত শেষ হয়ে হয়ে অনেক পরের দাগে এসে পৌঁচেছে। ভদ্রলোক কাঠ-কাঠরার জিনিস নিলাম করতেই ব্যস্ত, বোধ করি তার খদ্দেরই বেশি।

ফাঁক পেয়ে মৃদু স্বরে আর একবার ডাক দিলাম, "মশায়, শুনছেন?"

চশমার উপর দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত করে নিলামদার বললেন, "কি বলছেন, পিয়ানোর কথা?"

কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এইবার করছি,—দেরি হবে না।"

আমার মতে কিন্তু দেরি হতে লাগল। বেশ খানিকটা অপেক্ষা করে তৃতীয়বার তাগাদা দিলাম। ভদ্রলোকের বুঝতে বাকি রইল না, পিয়ানোর পালা শেষ না করা পর্যন্ত এই নাছোড়বন্দ লোকের হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। বললেন, "এই নিলামটা শেষ করেই ও ঘরে যাচ্ছি।"

আমি আগে-ভাগে গিয়ে পিয়ানোর পাশে মোতায়েন হলাম। বেশ ভাল করে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে, মায় খরিদ্দারের চেহারা পর্যন্ত।

ও ঘরের নিলাম শেষ করেই নিলামদার পিয়ানোর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মৌচাকের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মৌমাছির ঝাঁক দল বেঁধে ছোটে, নিলামদারের পিছনে পিছনে তেমনি খরিদ্দার, দালাল ও ফড়ের দল হন্-হন্ করে এসে পিয়ানোর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়াল।

ডালাটা খুলে কী-বোর্ডের উপর দু-চার-বার আঘাতের দ্বারা শব্দ উত্থিত করে নিলাম-দার নিলাম আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে জনতাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন,

"This is Doring's Piano—a famous make-original price twelve hundred rupees. How much for this Grand Piano? Come on, come on!"

মনে ভাবলাম, প্রথম ডাক ত শ দেড়েক টাকা নিশ্চয়ই হবে, তারপর পাঁচ-সাত ডাকে একেবারে শ ছয়েকে গিয়ে দাঁড়াবে। অকস্মাৎ মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সাধ দেখা দিলে;—এই সুযোগে গোটা দুত্তিন ডাক দিয়ে নিলে মন্দ হয় না!—অবশ্য নিম্ন দিকে নিরাপদ এলাকার মধ্যে; তিন শ টাকা ছাড়িয়ে ওঠা হবে না। এর দ্বারা এই কথা ভেবে ভবিষ্যতে বারম্বার তৃপ্তি পাওয়া যাবে যে, একদিন পিয়ানোকে অন্ততঃ আহ্বান করবার পথেও দাঁড়িয়েছিলাম!

কিন্তু কেউ ডাক দেয় না যে! হল কি এদের? তবে কি এরা সকলেই সেই গোত্রের প্রাণী যারা মাত্র খেয়ে-দেয়ে হেসে-খেলে সুখী হতে জানে? নিলামদার আবার হাঁকলেন,

"How much for this Grand Piano? Come on, Come on '

তারপর নিজেই ডাক দিলেন,

"Ten rupees for this Grand Piano. Original price Twelve hundred rupees. Come on"!

আমি ত আর আমাতে নেই! দশ টাকা এই গ্র্যান্ড পিয়ানোর ডাক! তাহলে ত ডাক শেষ হতে হতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। খরিদ্দার পক্ষ থেকে আমিই দিলাম প্রথম ডাক, বললাম, "Fifteen rupees."

বাঁ হাতের টিনের বাক্সে ঝমর-ঝমর শব্দ করে নিলামদার হাঁকলেন,

"Fifteen rupees for this Grand Piano. Doring's piano, Original price Twelve hundred rupees. Come on, Come on!'

আমার বিপরীত দিক থেকে এক অ-বাঙালী হাঁকলে, "পচিশ রুপৈয়া।"

আমি হাঁকিলাম, "Thirty five rupees"

আমার দক্ষিণ পাশ থেকে এক ব্যক্তি হাঁকলে, Forty five rupees."

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে আমি হাঁক দিলাম, "Fifty rupees."" রোক চেপে গেছে!

নিলামদার ঝমর-ঝমর করে বাক্স বাজিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন,

"Fifty rupees for this Doring's Piano—a famous make-Original Price Twelve hundred rupees- Come on, Come on, Come on!'

বার দুই তিন তিনি বাক্স বাজিয়ে বাজিয়ে এই সব প্ররোচক বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু আর যে কেউ সাড়া দেয়না! তবে কি,—তবে কি.........কিন্তু তাও কখনো সম্ভব!

নিলামদার পুনরায় চিৎকার করে উঠলেন,

"Fifty rupees for this Grand Piano, Fifty rupees one......Fifty rupees two

সমূহ বিপদ বুঝে আমি তখন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালিত করছি! কেউ ডাকলে বাঁচি! এমন সময়ে কানে প্রবেশ করলে......Fifty rupees three —এবং সংগে সংগে পিয়ানোর ওপর নিলামদারের দক্ষিণ হস্তের হাতুড়ির শব্দ হল, ঠক!

সংগে সংগে আমিও ইঞ্চি তিনেক কোঙা হয়ে গেলেন। মনে হল, শুধু নিলামদারের হাতুড়িই নয়, তার সংগে ঐ বিপর্যয় পিয়ানোটাও যেন আমার মাথার উপরেই ভেংগে পড়েছে। দাদার দিকে চেয়ে দেখতেই তিনি অপ্রসন্ন বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন, "ঐ দিগধড়ংগা ভাঙা পিয়ানোটা ডেকে কি করলে বলো দেখি!"

যা করলাম ,তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা মানুষ এ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে নি। উত্তর না দিয়ে চড়ুকে হাসি হেসে নিঃশব্দে দাদার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই চড়ুকে হাসি, যা কান্নার চেয়েও করুণ।

মৃদুস্বরে মেজদাদা দাদাকে কিছু বললেন। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দাদা বললেন, "যা হবার তা'ত হয়েছে, এখন মণ্ডল মশায়কে ডেকে আনো। তিনি কি বলেন দেখি।"

মণ্ডল মশায় অর্থে কলিকাতার খ্যাতনামা বাদ্যযন্ত্রনির্মাতা মণ্ডল এণ্ড কোম্পানীর মালিক। বহুবাজার স্ট্রীট ও বেণ্টিঙ্ক্ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁর দোকান। পথে বেরিয়ে পূর্বদিকের ফুটপাথ ধরে উত্তর দিকে চললাম। মনে মনে পিয়ানোকে সম্বোধন করে বললাম, সেই যদি দয়া করে এলে, এমন দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে না এলেই হোত! যাই হোক, এসেছ যখন সাদরে তোমাকে গ্রহণ করছি।

আমার মুখে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বোধ করি মণ্ডল , মশায়ের মনে করুণা উদ্দীপ্ত হল। তরুণ যুবকের মুখ-চক্ষের ভাষা পাঠ করে তার অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করতে বাকি রইল না। একটা ছোট হাতুড়ি ও একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পকেটে ফেলে বললেন, "চল, দেখি।"

নিলামের দোকানে এসে মণ্ডল মশায় পিয়ানোর নিকট উপস্থিত হয়ে ডালা খুলে দু-চারটা ডুং ডাং শব্দ করলেন; তারপর হাতুড়ি দিয়ে পিয়ানোর দু-চার স্থানে বোধ হয় অকারণেই অল্প ঠোকাঠুকি করে দাদার দিকে চেয়ে দেখে বললেন, "তা হলে কি ঠিক করছেন লালমোহনবাবু?"

দাদা বললেন, "কিসের ঠিক?"

"পিয়ানোটা রাখাই ঠিক করছেন ত?"

দাদা বললেন, "না রেখে উপায় কি?"

মণ্ডল মশায় বললেন, "উপায় আছে। মালটা খুবই সুবিধের দরে কেনা হয়েছে। মেহগিনি কাঠ এর মধ্যে যা আছে, তারই দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি। আপনি যদি না রাখেন, আমি এক শ' টাকা দিয়ে নিতে রাজি আছি। ডোরিং-এর পিয়ানো আজকাল সহজে মেলে না। আমার খদ্দের জুটতে অসুবিধে হবে না।"

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম! মনের মধ্যে কে একজন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বলতে লাগল, Come on, come on! হাতে-হাতে পঞ্চাশ টাকা লাভ। বহন করবার জন্যে একটা কুলির প্রয়োজন হবে না, মনিব্যাগের মধ্যে নিয়ে গেলেই চলবে। ভার থেকে মুক্ত হয়ে 'দিগধড়ংগা' পাঁচখানা দশ টাকা নোটের কাগজে পরিণত হয়েছে।

ঝানু লোক মণ্ডল মশায়, খদ্দের চরিয়ে খেয়ে বছর ষাটেক বয়সে উপস্থিত হয়েছেন, দাদাকে কাবু করতে বিলম্ব হল না। এক মুহূর্ত চিন্তা করে দাদা বললেন, "না, যখন এসেছে রাখাই ভাল। ভাল করে সারিয়ে নিতে কত পড়বে?" দাদাও ত' সংগীতপ্রিয় মানুষ, বোধ হয় যন্ত্রটার উপর একটু একটু মায়া পড়তে আরম্ভ করেছিল।

একদৃষ্টে পিয়ানোর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে মণ্ডল মশায় বললেন, "শ দেড়েক টাকা খরচ করলে জিনিসটা আট শ' টাকার মালে উৎরোবে।"

দাদা বললেন, "তাহলে সেই কথাই ভাল, আপনি দোকানে নিয়ে গিয়ে সারাবার ব্যবস্থা করুন।"

দাম চুকিয়ে দিয়ে রসিদটা দাদা মণ্ডল মশায়ের জিম্মা করে দিলেন।

চোখের দৃষ্টি দিয়ে মণ্ডল মহাশয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। মুখের হাসি দিয়ে তিনি সে কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলেন। তা করুন, কিন্তু তাঁকে ডেকে আনা আমার পক্ষে পরে খাল কেটে কুমীর আনার সমান হয়েছিল।

কি করে এবার সেই কথা বলি।

(ক্রমশঃ)



যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

৪র্থ দৃশ্য

মথুরার সন্নিকটস্থ মহাবন

গোকুল তীর্থ।

গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম।

একটি গাছতলায় বেদীর উপর বসিয়া আছেন নরিন্দর গিরি গোস্বামী মহারাজ! ইতিহাস বিখ্যাত মহাযোদ্ধা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগিরি মহারাজের প্রধান শিষ্য ও গিরি সম্প্রদায়ের প্রধান। যোগ-দণ্ডের উপর ভর দিয়া তিনি বসিয়া আছেন। গায়ে তুলা ভরা মোটা কুর্তা, মাথায় কান ঢাকা টুপির উপর গেরুয়া কাপড়ের শিরবন্ধ। গলায় কাঠের মালা। হাতে বাহুতেও মালা। একদিকে ত্রিশূল গাড়া রহিয়াছে, অন্যদিকে সযত্নে রক্ষিত খোলা তলোয়ার। বেদীর দুই পাশে কাঠের ন্যায় দড়ির ছাউনি দুইটি আসন। নরিন্দরগিরি একটি বন্দুক লইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলেন।

'নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রবেশ করিলেন একজন দীপ্তিমান পুরুষ। দেখিয়া বুঝা যায় **মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; কপালে ত্রিপুণ্ডক, কানে টাপের মত কর্ণভূষা, হাতে গুপ্তি লাঠি;** পরিধানের বেশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। তিনি ছদ্মবেশী মারাঠা পেশবা-বালাজী বাজীরাও।

বালাজী—নমো নারায়ণায়! নমস্তে গিরি মহারাজ!

গিরি—(হাত তুলিয়া) নম নারায়ণায়! আরে ভাই রাওজী পণ্ডিত! এস এস এস। বস ভাই। (আসন দেখাইয়া দিলেন। বালাজী বসিলেন।) তীর্থভ্রমণ হয়ে গেল। ফিরলে কবে?

বালাজী—এই পথে পথে ফিরছি মহারাজ। আপনার আশ্রমের দরজায় ঘোড়া ছাড়লাম।

গিরি—আনন্দ রহো ভাই, আনন্দ রহো! তারপর কি দেখে এলে বল!

বালাজী—দেখা হল না মহারাজ; আবদালী আহমদ শাহ তৃতীয়বার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে। আটক থেকে সরহিন্দ পর্যন্ত শত শত ক্রোশ পথের দু পাশ শ্মশান হয়ে গেছে। মানুষ নাই মরেছে নয় পালিয়েছে। মাটি নাই ছাইয়ে ঢেকে গেছে; গ্রাম পুড়ে গেছে শহর এখনও পুড়ছে। এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে মশাল নিয়ে ঢুকেছে আফগান!

গিরি—হাঁ-হাঁ পণ্ডিত ওই, ওই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমাকে। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করে পণ্ডিত—মন্দিরে পাথরের বিগ্রহে দেবদর্শন তো তাদের নয়। আমি বলছি গ্রাম পোড়া শহর-পোড়া দেখে এলে চোখে?

বালাজী—চোখে দেখি নি। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি।

গিরি—হায়-হায় পণ্ডিত! করেছ কি? এমন জ্বালামুখী তীর্থ, দেখে পুণ্য সঞ্চয় করে এলে না? কোন্ পুণ্যে তোমরা হিন্দু পাদ পাদশাহী প্রতিষ্ঠা করবে রাওজী! অগ্নি মুখ দৈত্য জালন্ধর আবার মুক্তি পেয়ে যে আগুন জ্বালিয়েছে সে আগুন চোখে না দেখলে অন্তরের আনন্দময় শঙ্কর রুদ্ররূপে জাগবে কেন পেশবা?

বালাজী—গোস্বামীজী! (চকিত হইলেন)

গিরি—পেশবা! (হাসিলেন)

বালাজী—কাকে কি বলছেন?

গিরি—তোমার ওই চোখ দুটি তোমাকে ধরিয়ে দেয় পেশবা! পেশবা বালাজী রাওয়ের চোখের তারা দুটো মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে যায়। ভূত ভবিষ্যতের অন্ধকার আর কুহেলিকা ভেদ করতে চায় যেন যুগল শুক্র গ্রহের মত! তোমার বুদ্ধি-দীপ্ত চিন্তাকুল ললাটের সারি সারি ওই রেখার মহিমা ত্রিপুণ্ডকের ভস্ম লেপনে ঠিক ঢাকা পড়ে না বালাজী রাও।

বালাজী—আপনাকে নমস্কার গিরি মহারাজ। কিন্তু ও নামে আমাকে সম্বোধন করবেন না।

গিরি—ঠিক হ্যায় ভাই ঠিক হ্যায়। তাই হবে। পণ্ডিতজী! রাওজী! (হাসিলেন)

বালাজী—তাহলে আমার কথার জবাব দিন। দু মাস আগে যাবার সময় আপনাকে নিবেদন জানিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন—পরে জবাব দেবেন। সেই জবাবের জন্যই ফেরার পথে আমি এসেছি। নইলে আমি দেখে এসেছি আহমদশা আবদালী দিল্লী প্রবেশ করেছে। মহম্মদ শাহের কন্যা ফকিরিণী শাহজাদী হজরত বেগমকে সে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে কন্যা বিচিত্র-ভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে। আবদালী শিকার কেড়ে নেওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে দিল্লী শহর বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। শুনে এসেছি সে দিল্লী থেকে বাহিনী নিয়ে গোটা দেশ খুঁজবে। আমার সময় নেই গোস্বামীজী। নাজিব খাঁর রোহিল্লা সওয়ারের ছোট ছোট দল বেরিয়ে পড়েছে। আমার নিবেদনের উত্তর দিন।

নরিন্দর—কি উত্তর দেব পণ্ডিতজী?

বালাজী—উত্তর ভারতে, আপনাদের গিরি সম্প্রদায়ের অসীম আধিপত্য। লোকে বলে শক্তিতে আপনারা অপরাজেয়। আপনাদের স্বর্গীয় গুরু রাজেন্দ্রগিরি গোস্বামী ছিলেন ভীষ্মের মত যোদ্ধা। আপনি নিজে মহাযোদ্ধা; রণপণ্ডিত। আপনার পাঁচ হাজার গোস্বামী সৈন্য নারায়ণী সেনার মত দুর্দ্ধর্ষ। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অনুপগিরি গোস্বামী অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করছেন; আমার নিবেদন, মারাঠার এ উদ্যমে হিন্দু পাদ পাদশাহী স্থাপনে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

নরিন্দর—এইবারেই কি তোমরা আবদালীকে বাধা দিয়ে তার শুভারম্ভ করবে পণ্ডিত?

বালাজী—না গোস্বামীজী এবার নয়।

নরিন্দর—এত বড় অত্যাচার হত্যাকাণ্ড বর্বরতায় বাধা দেবে না?

বালাজী—এখনও সময় হয় নি গিরিমহারাজ। এখন আমরা বাধা দিতে গেলেই আফগান মুঘল এক হয়ে যাবে। এদিকে হিন্দু রাজারা আমাদের পিছন থেকে আঘাত করবে। আবদালী এবার মুঘল শক্তিকে ধ্বংস করে যাক, তার নিষ্ঠুরতায় তাদের মন আফগানের উপর বিরূপতায় ভরে উঠুক। ওদিকে আমরা হিন্দুরাজাদের আয়ত্তে আনা শেষ করি। তারপর অগ্রসর হব। তখন আমার বিশ্বাস আবদালী আর অগ্রসর হতে সাহস করবে না। যদি করে তবে নির্মম আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দেব।

নরিন্দর—ভাল ভাই পণ্ডিত। আর একটা প্রশ্ন করব। আমি বুঝতে পারছি না।

বালাজী—বলুন।

নরিন্দর—তোমার হিন্দু পাদ পাদশাহী হলে আমি—

বালাজী—আপনাকে আমি হিন্দুর ধর্ম-জগতের শিরোভূষণ করে দেব। জগদ-গুরুর মত আপনার আসন হবে।

অনুপগিরিকে আপনার অধীন হয়ে থাকতে হবে।

নরিন্দর—(হাসিয়া উঠিলেন) আরে না-না-না ভাই। সে কথা আমি বলি নি। গুরুর আসন শিষ্যে দেয় পণ্ডিত, রাজা তা দিতে পারে না। আর আমার সে কামনাও নাই। আমি বলছি ভাই—আমি বুঝতে পারছি না, তোমারই বা কি হবে? দেশেরই বা কি হবে?

বালাজী—(অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ঈষৎ তিক্ত চিত্তেই বলিলেন) হবে বৈ কি গোস্বামীজী, কিছু অবশ্যই হবে। ঈশ্বরকে পেলে আপনার যা হয় আমার হবে তাই। দেশেরও কিছু শান্তি ফিরবে দেশে।

নরিন্দর—(প্রশ্নের সুরেই বলিলেন) শান্তি ফিরবে দেশে। (কয়েক মুহূর্ত ভাবিলেন) হবে ভাই রাওজী! তোমার মত পণ্ডিত যখন বলছে তখন হয়তো ফিরবে।

বালাজী—সন্দেহ হচ্ছে আপনার?

নরিন্দর—হচ্ছে। সবাই যখন অশান্ত ভাই তখন সবাইকে শান্ত করতে না পারলে তো শান্তি ফিরবে না ভাই! সবাইকে শান্ত করবার পথ তুমি পেয়েছ পণ্ডিত?

বালাজী—অশান্তির সৃষ্টি যারা করছে তাদের আমি কঠিন শাসনে দমন করব। সাধারণ মানুষ আপনি শান্ত হবে।

নরিন্দর—হ্যাঁ। তা পারবে। তা তুমি পারবে। কিন্তু ভাই মারাঠা যে অশান্তির সৃষ্টি করে তাকে রোধ করবে কে? সে তো অশান্তি কম করে না ভাই। লুঠ, ঘর জ্বালানো মানুষের অঙ্গচ্ছেদ সবই করে সে! দোয়াবে যদি তুমি তীর্থ পরিক্রমা করে থাক তবে নরদেবতার ভগ্ন মন্দির অঙ্গহীন বিগ্রহ তো তুমি দর্শন করেছ পণ্ডিত!

বালাজী—মারাঠার অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তার রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হবে গোস্বামীজী!

নরিন্দর—রাষ্ট্রনীতি? তবেই তো গোল লাগল ভাই রাওজী! শান্তি তো হল না ভাই!

বালাজী—কেন গিরি মহারাজ?

নরিন্দর—উঁহু! আরে ভাই আমি যা জানি তাতে এক ধর্ম ছাড়া শান্তি হয় না।

বালাজী—(সবিস্ময়ে) ধর্ম ছাড়া শান্তি হয় না? সংসারে তো ধর্মের সংখ্যা নাই মহারাজ, তবে—

নরিন্দর—না ভাই সে ধর্ম নয়। সত্য ধর্ম। পণ্ডিত ধর্ম ছাড়া শান্তি নাই, ন্যায় ছাড়া ধর্ম নাই। সত্য ছাড়া ন্যায় নাই। তাই সত্য হল একমাত্র ধর্ম, ওতেই আছে শান্তি ওতেই আছে সুখ, ওতেই মানুষের মুক্তি। তোমার রাষ্ট্রনীতিতে সত্য বর্জিত। কৌটিল্য বলেছেন, মনোভাব গোপনই অর্থাৎ প্রকারান্তরে মিথ্যাশ্রয়ই রাষ্ট্রনীতির মূল কথা! ওতে সত্যও নাই, ন্যায়ও নাই, ধর্মও নাই।

বালাজী—ধর্ম সবার এক নয় মহারাজ। রাজার ধর্ম এক প্রজার ধর্ম অন্য। মহারাজ—আপনাদের গুরু আর শিষ্যের ধর্মও এক নয়!

গিরি—ঝুট ঝুট ঝুট পণ্ডিত। সত্য কথা বলা রাজারও ধর্ম, প্রজারও ধর্ম, গুরুরও ধর্ম শিষ্যেরও ধর্ম। সব মানুষের ধর্ম। তাই সত্যই হল সনাতন ধর্ম।

বালাজী—প্রজার মিথ্যা বোধের দাবীকে রাজাকে মানতে হয় গিরিজী, রামচন্দ্রকেও সতী সীতাকে বনবাস দিতে হয়েছিল। আপনাদের চোখের সামনে গিরিজী সত্য ভগবানকে বোঝাতে পাথরের মন্দির গড়ে লক্ষ লক্ষ বিগ্রহের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

গিরি—হাঁ—হাঁ পণ্ডিত—যা মিথ্যা—তা মিথ্যা। সেই সব মিথ্যাকে সত্যের নামে গ্রহণ করার জন্যেই জমে উঠেছে এত জঞ্জাল। সব—সব—দূর করবে, কালই তোমার হিন্দুপাদ পাদশাহী তা করবে?

বালাজী—গিরি মহারাজ। আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী?

গিরি—পণ্ডিত—সন্ন্যাস মানে সব ত্যাগ; বর্জন। জাতি, কুল, ধরম—সব—সব! এক সত্য ছাড়া সব। ইহকাল, পরকাল ভূর্লোক, ভুবর্লোক—

(নেপথ্যে নাকাড়া সিঙ্গা বাজিয়া উঠিল)

গিরি—(তলোয়ার লইয়া অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া ঘুরিয়া তাকাইলেন)

বালাজী—কি হ'ল? নাকাড়া? কিসের নাকাড়া?

গিরি—বস, বস রাওজীভাই।

বালাজী—আবদালীর অভিযানের উদ্যোগ আমি দেখে এসেছি গোস্বামীজী।

গিরি—মহিন্দর গিরি মহারাজ!

(মহিন্দর গিরি প্রবেশ—হাতে তলোয়ার)

মহিন্দর—গুরু মহারাজ! নাকাড়া বেজেছে!

গিরি—কিসের নাকাড়া? কোথায় বাজল?

মহিন্দর—যমুনার কুলে কুলে নাকাড়া বেজে বেজে চলে আসছে। গাঁয়ে গাঁয়ে বাজছে। আগের নাকাড়ার শব্দ পেয়ে আমরা নাকাড়ায় ঘা মেরেছি।

গিরি—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন) শঙ্কর! শঙ্কর!

(বালাজীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

বালাজী—(হাসিয়া) কাকে ডাকছেন গোস্বামীজী!

গিরি—অন্তরের রুদ্রকে জাগাচ্ছি রাওজী! (হাসিলেন) তুমি চলে যাও রাওজী! আফগান আসছে—তাতে সন্দেহ নেই।

বালাজী—আপনার সৎসঙ্গে যখন তীর্থপুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ মিলে গেল, তখন সে পুণ্য সঞ্চয় না করে আমি যাব না।

গিরি—(হাসিয়া উঠিলেন) বহুত আচ্ছা পণ্ডিত। পুণ্য তোমার অক্ষয় (অক্‌ছয়) হোক! তুমি ওই মন্দিলের দরজায় থাক! বিগ্রহ রক্ষা কর। দেখ—মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে কি না!

(ছুটিয়া আসিল একজন সন্ন্যাসী)

সন্ন্যাসী—বল্লভগড়। জাঠ সুরযমলের বল্লভগড়ে তোপ দাগছে শাহ আবদালী। জেহান খাঁ—আর নাজিব খাঁ ছুটে আসছে মথুরার দিকে!

গিরি—শঙ্কর—শঙ্কর!

[অগ্রসর হইলেন। তাহার পূর্বে বন্দুক পিঠে ঝুলাইলেন। কাঁধে লইলেন বারুদের ঝুলি। নাকাড়া বাজিতেছে।]

পঞ্চম দৃশ্য

জাঠ গ্রাম চৌমুহা। নাকাড়া বাজিতেছে বাহিরে। বৃদ্ধ জাঠ সর্দার রঘু জাঠ প্রবেশ করিল। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বকিতেছে তাহার স্ত্রীকে। বন্দুকের নল পরিষ্কার করিতেছে। জাঠ পুরুষেরা দুইজনে হাল্কা কামান ঠেলিয়া লইয়া গেল। কয়েকটি মেয়ে ঝুড়িতে ছোট গোলা ও পিঠে বস্তায় বারুদ লইয়া গেল।

রঘু জাঠ—আরে কেঁও রোতি হ্যায়? আরে তুই কাঁদবি কেন? এ—? এ বুঢ়ীয়া ভঁইযী!—মর যা, তু মর যা, তু মরযা। ভরকে মরে বুদ্দীয়া তু রোতি হ্যায়!

(রঘুর স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রী—আরে—! ডরকে মারে আমি কাঁদছি? বুঢ়া ভাল্লু একমুখ দাড়ী গোঁফ নিয়ে নিজেকে বুঝি সিংহী ভাবছিস তুই! (হাত তুলিয়া) এই হাতের কাঁকনির ঘায়ে তোর মুখ থুড়ে দোব আমি!

রঘু—আরে মিথ্যে বোলনেওয়ালী ঝগড়াটে বুড়ী! তুই ভাবছিস তোর মুখ, ঝামটানিতে আমি বোকা বনে যাব? ভয়ে কাঁদছিস্ না? নিজের জানের ভয়ের কথা বলছি না। বেটা জবাহিরের জন্যে ভয়ে কাঁদছিস না। আবদালী দিল্লীতে মানুষ খুন করে শ্মশান বানিয়ে দিয়ে বল্লভগড় পর্যন্ত এগিয়ে এল দেশের আমীরওমরা শেঠ গৃহস্থি ভিখিরী পালিয়ে এসে দেশ ছেয়ে ফেললে আজও জবাহির এল না এই কথা তুই বলিস নি আমাকে? বলিস নি আমাকে কেন তুমি তাকে এই সময়ে দানা বেচতে দিল্লী পাঠালে?

(একটি মেয়ে ঝুড়িতে গোলা লইয়া

যাইতে যাইতে গোলা পড়িয়া গেল। রঘুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল।)

স্ত্রী—আরে মেইয়া আরে বেটী। ফেলালি? পড়ে গেল? বস্ বস্ তুলে দি আমি।

(মেয়েটি বসিল। রঘুর স্ত্রী কুড়াইয়া তুলিয়া নিল)

রঘু—(বন্দুকে সাফ করিতে করিতে আপন মনেই বকিয়া গেল) আরে সে হ'ল জাঠজোয়ান, রঘুজাঠের বেটা সে, তার নাম জবাহির জাঠ! দশখানা গাঁওয়ে তার পাঞ্জা ধরবার মত জোয়ান নাই। তার তলোয়ার খানা ইস্পাহানী ইস্পাতের, আড়াই হাত লম্বা, মান্দ্রাজী ফিরিঙ্গীর বন্দুক তার পিঠে। খোরাসানী ঘোড়া আছে সঙ্গে আর আছে যাঠ যাঠ জাঠ জোয়ান। ক্ষেতিতে কাম করা পথলের দেহ তাদের। তাদের কোন দুষমণ কি করবে?

(মেয়েটি এই বার চলিয়া গেল)

স্ত্রী—আরে লুঠেরা অধরমী আমি তার জন্যে কাঁদিনি!

রঘু—ফের তুই লুঠেরা অধরমী বলছিস বুড়ী! তোকে না বারন করেছি!

স্ত্রী—তোর বারন আমি শুনব কেন? ছিলি চাষী জাঠ, লুঠেরা বনিস নি তোরা? লুঠ করিস না তোরা? চাষী জাঠ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বেড়াস না হরদম।

রঘু—(বন্দুক পিঠে ঝুলাইয়া) করি, করি, করি! খুব করি, বেশ করি। দোব এই লকড়ির বাড়ী দেখিবি! লুঠেরা আমরা লুঠ করি। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়েছি আমরা! তলোয়ার না নিলে তোকে আজ এমন ক'রে তোকে আমার সামনে মুখ নেড়ে কথা বলতে হ'ত না। কোন দিন তোকে চুলের মুঠী ধরে নিয়ে গিয়ে আফগান কি বাদাকশাহী কি রোহিল্লা কি বাদশাহী লুঠেরারা কোন হাটে কি শহরে দো তিন কি চার রুপেয়া দামে বেচে দিত। করতিস কারও বাড়িতে বাঁদীগিরি। লুঠেরা! আমরা লুঠেরা! আমরা অধরমী!

স্ত্রী—না—না। বহু ধরমী; ধরমবীর তোরা। আফগান আসছে, তোরা সব লুঠকরা তোপ নিয়ে, বন্দুক নিয়ে—গাঁও বাঁচাবার জন্যে—তৈয়ার হচ্ছিস! ওরে অধরমী, আকাশের পানে তাকাস কখনও? তাকা তো দেখি! যদুবর—কিষেণচাঁদ—মথরানাথের মন্দিলের চুড়া নজরে পড়ছে না? ওরে—ব্রজরাজকে বাঁচাবে কে রে? লুঠেরা আফগান এলে কি ওই রাজার ভাণ্ডার ছেড়ে তোর এই গাঁওয়ে—দামড়ী লুঠতে আসবে? —আমি কাঁদছি সেই জন্যে! সেই চাঁদমুখ মনে পড়ছে আর কাঁদছি। দুরানী আফগান আমার মথরানাথকে টেনে নামাবে—

[রঘুজাঠ মাথা নাড়া দিয়া বিকারগ্রস্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল]

রঘু—না—না—না!

[ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই উপর হইতে কোন গাছের মাথা হইতে পর্যবেক্ষক জাঠ যুবক চীৎকার করিয়া উঠিল]

পর্যবেক্ষক—হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার!

রঘু—সতর্কবাণী কানে গেল না। প্রবল উত্তেজনায় প্রচন্ড বেগে কোষ হইতে তলোয়ার বাহির করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিল—ওই প্রথম না—না—না'র সঙ্গেই যোগ রাখিয়া। চীৎকার করিয়া উঠিল। জয়মথরানাথ!)

পর্যবেক্ষক—ছোট একদল সওয়ার; জোর কদমে চলে আসছে। আরে বাপ।

রঘু—মথুরা—মথুরা—মথুরা! হে-হে জাঠ জোয়ান!

পর্যবেক্ষক—পাঁচ সওয়ার। এসে পড়ল। সর্দার!

রঘু—হে—জাঠ জোয়ান! তোলো ঘাটি, উঠাও তোপ। আগে বাড়ো। মথরা—মথরা!

পর্যবেক্ষক—জবাহির! জবাহির! হে জবাহির!

নেপথ্যে জবাহির—হে—!

রঘুর স্ত্রী—(চীৎকার করিয়া উঠিল) জবাহির!

রঘু—(চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্নের সুরে বলিল) জবাহির?

[সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল জবাহির—তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম জাঠ যুবক। তাহার পিছনে মিল্লাত ও নসীবন বেগম। জবাহির আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল]

জবাহির—মা—!

রঘু—জবাহির—(আগাইয়া আসিতে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল মিল্লাত ও নসীবনকে দেখিয়া) এ—কে? জবাহির!

জবাহির—(মাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল) কে জানি না। রোহিল্লা পাঠান এদের লুঠে নিয়ে যাচ্ছিল—আমি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি!

রঘুর স্ত্রী—(বিস্মিত হইয়া নসীবনকে দেখিতেছিল। সে মুগ্ধ হাস্য উদ্ভাসিত মুখে আগাইয়া গিয়া নসীবনের চিবুকে হাত দিয়া বলিল) রাধারাণী! হা—! মেরে শ্যামপিয়ারী! দুনিয়া ভুলানি রূপ, এ আমার রাধারাণী!

(নসীবন দুই পা পিছাইয়া গেল)

রঘুর স্ত্রী—মথ্রানাথের জন্যে ভাবনায় আকুল হয়ে ছুটে এসেছ মহারাণী!

মিল্লাত—না—না—মায়ী। আমরা মুসলমান!

[রঘুর স্ত্রী নসীবনের হাত ধরিয়াছিল—নসীবন হাত টানিয়া লইয়া আরও পিছাইয়া গেল]

জবাহির—ফকীর সাব আপনি? আপনি কি দিল্লীর সেই ফকীর? (নসীবনকে) তুমি কি সেই?

নসীবন—না—না—না।

রঘুর স্ত্রী—হাঁ—হাঁ—হাঁ। নতুন জনম নিয়েছ—মুসলমানী দেওয়ানা হয়ে জনম নিয়েছ! দেখেই চিনেছিলাম—তুমি রাধারাণী।

নসীবন—(তিক্তভাবে মাথা নাড়িয়া) জনাবালি! এখান থেকে চলুন—এখান থেকে চলুন। এখানে থাকতে আমি পারব না!

মিল্লাত—(জবাহিরকে চিনিতে পারিলেন না) জাঠ জোয়ান, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন। যা করেছ—সে কখনও ভুলব না।

জবাহির—না—না—না আমীর। রাধারাণীকে বাঁচিয়েছি—সে আমার ভাগ্য। কোন ভয় করব না। আসুক আবদালী—আমরা রুখব। রাধারাণী তোমার মথরানাথকে আমরা বাঁচাব।

নসীবন—না—না। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

রঘু—ভয় নাই মাতাজী! কোন ভয় নাই তোমার! রঘু সর্দারের তাঁবে পঞ্চাশ-খানা গাঁওয়ের দশ হাজার জাঠ।

রঘুর স্ত্রী—ভয় করো না মহারাণী। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। ঘন জঙ্গল গোকুল মহাবন—আমরা সব মেয়েরা যাব সেখানে। সেইখানে তোমাকে লুকিয়ে রাখব। এমন পাহারা দোব তোমাকে—। (হাসিল)

পর্যবেক্ষক—সর্দার—বল্লভগড় পুড়ল। আগুন জ্বলছে, ওঃ—আরে বাপরে বাপ—গোটা আকাশ কাল হয়ে গেল! সর্দার!

রঘু—সেখানে গিরি গোঁসাইদের আট হাজার গোঁসাই আশ্রম বেঁধে রয়েছে। হিন্দুস্থানের রুদ্রদেওয়ের সিদ্ধ ভক্ত—সিংহের মত সাহসী, রাজেন্দ্রগিরি গোস্বামীর নাম শুনেছ? তারই দল। নরেন্দ্র গিরি গোঁসাই মোহান্ত এখন। সেখানে চলে যাও!

মিল্লাত—রাজেন্দর গিরি গোঁসাই। তার শিষ্য নরিন্দর গিরি?

স্ত্রী—আরও আছে। আরও আছে আমীর। গোকুলনাথ—গোকুলনাথ আছে। এস মহারাণী!

(নসীবনের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল)

মিল্লাত—চল—চল—বেটী—তাই চল।

(তাহারা চলিয়া যাইবামাত্র বন্দুকের আওয়াজ হইল)

জবাহির—(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)—হে—!

পর্যবেক্ষক—আসছে! আসছে! আসছে!

রঘু—(নাকাড়া পিটিতে লাগিল)

আগে বাঢ়ো ভাই! আগে বাঢ়ো ভাই!

জাঠ জোয়ানো মর্দানা কো শেরোঁ,—
রুখো দুষমনো কো! ফাড় দো ছাতিয়া!
হাঁকো ভাই জোয়ানো যদুনাথ কি জয়!

সারি বন্দী জাঠ চলিল। রঘুজাঠের শেষ কথা—যদুনাথ কি জয়! বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা লম্বা ধ্বনিতে হে—শব্দ তুলিল; ওদিকে নেপথ্য হইতে হা—শব্দ উঠিয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধ্বনিতে পরিণত হইল। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। নাকাড়া বাজিয়া চলিয়াছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গোকুল তীর্থ

গাঢ় অন্ধকার রাত্রি

দৃশ্যারম্ভের সূচনায় প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ দ্যোতক শব্দ হইল। আবদালী স্বয়ং গোকুল তীর্থ আক্রমণ করিয়াছেন। গোস্বামী সৈন্যদল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছে। আফগান সৈন্য প্রচণ্ডবেগে আসিয়া চার্জ করিল। সেই শব্দে সমস্ত পারিপার্শ্ব কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে ওপারে মথুরা পুড়িতেছে। একা বালাজী রাও দাঁড়াইয়া আছেন বন্দুক হাতে। নাকাড়া বাজিতেছে। বন্দুকের শব্দ হইতেছে। দৃশ্য আরম্ভ হইল সংঘর্ষ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে। নেপথ্যে আর্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল হজরত বেগমের।

নেপথ্যে নসীবন—তামাম হিন্দুস্থান আঁধিয়ারায় ঢেকে যাচ্ছে। তারই মধ্যে মুঘল বাদশাহী কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে যাচ্ছে। আমার নসীবও অন্ধকার। ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মরব—আমি মরব।

নেপথ্যে বুড়ী কোন ভয় নেই—তুই মন্দিরে গোকুলনাথের পাশে বস। কোন ভয় নেই—ভগবান—ভগবান রক্ষা করবেন।

নেপথ্যে নসীবন—না—না। পাথর! পাথর কি রক্ষা করবে। ছেড়ে দাও আমাকে।

নেপথ্যে নরিন্দর—আরে বেটী কি বলছ তুমি? পাথর ফেটে ভগবান বেরিয়েছে—দেখতে পাচ্ছ না? লড়ছে কে? বস তুমি মা—কোন ভয় নাই!

(প্রবেশ করিলেন রনোন্মদনায় মত্তের মত)

নরিন্দর—রুদ্র না জাগলে—অগ্নিমুখ আক্রমণকে বাধা দিলে কে? জ্বালামুখী! জ্বালামুখী! আ—পণ্ডিত দাঁড়িয়ে আছ!

বালাজী—হ্যাঁ গিরি মহারাজ! জ্বালামুখী তীর্থ দেখছি। ওপারে সাত দিন আজ মথুরা পুড়ছে! দশ হাজার জাঠ প্রাণ দিয়ে বাধা দিতে পারেনি। আপনারা গোকুল মহাবনে আবদালীকে বাধা দিয়েছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত আপনারা! কিন্তু—কে যেন একটি মেয়ে—পাগলের মত চীৎকার করে উঠল?

নরিন্দর—কে জানে ভাই রাজলছমীর মত এক কুমারী। সহ্য করতে পারছে না। জলমগ্নের মত হাঁপাচ্ছে—চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি।

(বাহিরে আবার শব্দ উঠিল)— আ— !

(প্রত্যুত্তর শব্দ উঠিল)— এ— !

বালাজী—মহারাজ! আবার ছুটেছে আফগান সওয়ার।

নরিন্দর—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আসছে—আবার ঢেউ আসছে।

তিনি ফুলিতে লাগিলেন। হাতের তরবারি নাচিতে লাগিল। বাহিরের এ শব্দ শেষ হইতেই তিনি এ শব্দ করিয়া ছুটিয়া গেলেন। দ্বিতীয় আফগান আক্রমণ সশব্দে আসিয়া প্রতিহত হইল। বিস্ফোরণোদ্যোতক শব্দ হইল। বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল নসীবন।

নসীবন—না—না—না। এ আমি সহ্য করতে পারব না। কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। মৃত্যু আমাকে দয়া কর। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

(কোষ হইতে ছুরি বাহির করিয়া তুলিল)

বালাজী—(চীৎকার করিয়া উঠিল) না—না—না!

(হজরত চকিত হইল—ফিরিয়া চাহিল। বালাজী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন)

আমি তোমার সন্তান। হাত ধরার অপরাধ মার্জনা কর। কিন্তু এ কি করছ তুমি।

নসীবন—মরব—আমি মরব। আমি মরব। ছেড়ে দাও, মরে আমাকে বাঁচতে দাও।

আবদালী—ভয়ঙ্কর আবদালী আসছে।

বালাজী—আসুক। ভয় কি? কোন ভয় নেই তোমার! আমার পিছনে এসে দাঁড়াও তুমি।

নসীবন—তুমি উন্মাদ।

বালাজী—না—মা। উন্মাদ তুমি। নইলে যে মৃত্যুর চেয়ে জীবের কাছে ভয়াল কিছু নেই, তাকে তুমি ভয় কর না, মরতে ভয় নেই তোমার—আবদালীকে এত ভয় কেন?

নসীবন—প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বলের মত প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? তুমি কি দেবদূত?

বালাজী—আমি মারাঠা পেশবা বালাজী বাজীরাও!

নসীবন—মারাঠা পেশবা বালাজী বাজীরাও!

(কাঁপিতে লাগিল)

বালাজী—আমি শপথ করছি মা—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে রক্ষা করব। কোন ভয় নেই তোমার।

নসীবন—খোদা মেহেরবান!

(বসিয়া পড়িল)

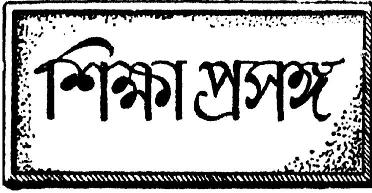
(নেপথ্যে শিঙা বাজিয়া উঠিল)

নেপথ্যে নরিন্দর—জল! জল! একলোটা জল! জলদি!

(সঙ্গে সঙ্গে একজন গিরির প্রবেশ)

গিরি—(ঘোষণার মত উচ্চকণ্ঠে বলিতে বলিতে দ্রুত প্রবেশ করিল) শাহ আবদালী তৃষ্ণার্ত। উকীল যুগলকিশোর এসেছে! যমুনার জল গলিত শবের বিষে পচে উঠেছে। এক লোটা জল। আফগান ফিরে যাচ্ছে! এক লোটাজল! (ক্রমশ)





শিক্ষক বিনিময়

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

"খুব বেশী দিনের কথা নহে, প্রায় দুই বৎসরকাল পূর্বে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ ভারত ভূখণ্ডের সন্নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত সুবিধামত শিক্ষক-বিনিময়ের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দেশের সহিত রাজনৈতিক আদান-প্রদান ব্যপদেশে প্রীতি ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন দিকে দিকে রাষ্ট্রদূতে প্রেরিত হইতেছিল—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের জন্য শিক্ষক-বিনিময়ের ব্যবস্থা করাই সে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত চিঠিপত্র এবং সার্কুলারও তখন বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল এবং বিষয়টি লইয়া সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষ অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ অস্ট্রেলিয়ার অনতিদূরে টাসমানিয়া নামে যে ক্ষুদ্র দ্বীপটি আছে তাহারই সহিত দুইজন শিক্ষক বিনিময়ের প্রস্তাব সে সময় প্রায় কার্যে রূপান্তরিত হইতেই চলিয়াছিল। দুই বৎসরকাল সময়ের জন্য দুইজন যোগ্য ভারতীয় শিক্ষক টাস্‌মানিয়ায় যাইয়া তথাকার বিদ্যালয়ের সহিত সংশিলষ্ট হইয়া কাজ করিবেন এবং টাস্‌মানিয়ার দুইজন শিক্ষক ঐ কালের জন্য এদেশে আসিয়া শিক্ষকতা করিবেন—পরিকল্পনায় এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল। তারপর অকস্মাৎ কি কারণে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু যে কারণেই হইয়া থাকুক, চতুর্দিকের নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও বিবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন ভারতবর্ষ আর যে শীঘ্র ঐ জাতীয় কোন পরিকল্পনায় হাত দিতে সক্ষম হইবে না তাহা সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যে বহির্ভারতে, বিশেষ করিয়া ইউরোপখণ্ডে, এইদিকে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। অতি সম্প্রতি ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগ হইতে একথা ঘোষিত হইয়াছে যে অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত ইংলন্ড শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা করিবে। প্রথম দিকের আরম্ভকালে সাহিত্যের শিক্ষক যাঁহারা—কেবল তাঁহাদের মধ্যেই এ বিনিময় ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু পরে, পরিকল্পনার কার্যকারিতা আকর্ষণীয় হইলে এবং ফলাফল সন্তোষজনক হইলে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক-বর্গকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। ......"

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার শতবিধ জটিল সমস্যার বিপরীত চাপ এড়াইয়া আমাদের পক্ষে ইংলণ্ডের ন্যায় কোন ব্যাপক পরিকল্পনা আজ আর গ্রহণ করা সম্ভব নহে। অন্য কোন হেতু না থাকিলেও একমাত্র অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্যই ঐরূপ ব্যয়সাধ্য কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়ত ভারতবর্ষের পক্ষে সহজ হইবে না। অতএব বহির্ভারতের কোন দেশের সহিত শিক্ষক বিনিময়ের পরিকল্পনা এখনকার মত একেবারে স্থগিত রাখিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে, শিক্ষক বিনিময়ের প্রস্তাব সুপরিকল্পিত-ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত কি না তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি।......

একথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে, ভারতের উপকূল ত্যাগ করিবার কাল অনিবার্যগতিতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া কূটনীতি-পারদর্শী ইংরাজ বিগত শতাব্দীর প্রায় শেষ দিক হইতেই ভারতের জাতীয় জীবনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে—সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার কালগরল প্রভূত পরিমাণে প্রবিষ্ট করাইয়াছিল অভিনব কৌশলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া। আর দুর্ভাগা ভারতবর্ষ যথোপযুক্ত দৃঢ়তার অভাবে সে অপক্রিয়ার প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছিল। তারপর দিনে দিনে, ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার সে উগ্র হলাহল কিভাবে আমাদিগকে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত করিয়াছে, কিভাবে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের অমর মরণেও তাহার বিষক্রিয়ার হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই—আধুনিককালের সে জঘন্য ইতিকাহিনী আজ আর বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর বক্ষরক্তের লোহিত লিখায় কালের বুকে তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে। উহারই ফলে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে ভারতবর্ষ, দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে আমাদের জন্মভূমি সোণার বাঙলা। উহারই ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী বহু পুরুষের শতস্মৃতি বিজড়িত বাস্তুভিটার মায়া ছাড়িয়া আজ পথের ভিক্ষুক হইতে বাধ্য হইয়াছে, অকালে বিনষ্ট হইয়াছে অগণিত অমূল্য জীবন। কিন্তু তথাপি সে আসুরীশক্তির দানবীয় ক্ষুধা মেটে নাই, নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়া অশ্রু ও রুধিরসিক্ত দীর্ঘপথের শেষ এখনো দেখা যাইতেছে না।......

প্রাদেশিকতার উগ্রমনোভাব ও তিক্ত বিদ্বেষ আজও অবশ্য ঠিক অতখানি বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। এখনো তাহার নগ্নরূপ ব্যাপক ক্ষেত্রে ততখানি নারকীয় ভয়াবহতার সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু সময় থাকিতে সতর্ক না হইলে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বিত না হইলে কালে সেও তাহা করিবে এমন আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

একথা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে, ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত, বহু বিপর্যয়-বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসী আমরা, আমাদের পক্ষে অন্যান্য দূরবর্তী প্রদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক ও বিস্তারিত সংবাদ সবসময় পাওয়া হয়ত সহজ হয় না, হয়ত উহার মধ্যে অতিশয়োক্তিও কিছুটা থাকিয়া যায়। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার জঘন্য মনোভাব প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দ হইতে শুরু করিয়া সামান্য পথচারী নাগরিক পর্যন্ত সকলের মধ্যেই অল্প-বিস্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অত্যাধুনিককালে। বিহারের সহিত বাঙলার, বাঙলার সহিত আসামের, উড়িষ্যার সহিত বিহারের বিবাদ-বিসম্বাদের আজ আর যেন অবধি দেখা যাইতেছে না। এমনকি, যে সকল স্থান অদ্যাবধি একই প্রদেশের ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত থাকিয়া স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় নির্বিরোধ জীবন-যাপন করিতেছিল, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতেছিল আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সে সকল প্রদেশের মধ্যেও আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিকৃত অভিব্যক্তি তীব্র বিরোধের আকারে দেখা দিয়াছে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি প্রদেশের যে-সকল বিশিষ্ট অংশ সেদিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা চিন্তাও করে নাই—আজ তাহারাও সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশনের ধুয়া ধরিয়া প্রাদেশিকতার উৎকট চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে প্রতিরুদ্ধ না হইলে—অদূরে বা দূরভবিষ্যতে বর্বর সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস পরিণতির মত প্রাদেশিকতার চরম পরিণতিও নিঃসন্দেহে ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। অতএব, শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই উৎকট

ব্যাধিটির নিরসনকল্পে আমরা যাহা করিতে পারি, আমাদের দ্বারা যেটুকু হওয়া সম্ভব—তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদের প্রস্তাব এই যে, ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর অনতিবিলম্বে আন্তঃপ্রাদেশিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বিনিময়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার মধ্যে এই পরিকল্পনা আপাততঃ সীমাবদ্ধ রাখা হউক। পরে আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিলে—প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহাকে প্রসারিত করা চলিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রারম্ভের দিকে এক বৎসরকালের জন্য দশ কিংবা বারোজন যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং উৎসাহী শিক্ষক এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিয়া তথাকার বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের সহিত সংশিলষ্ট হইয়া কার্য করিতে থাকিবেন এবং তথাকার সমসংখ্যক শিক্ষাব্রতী তৎস্থলে আসিয়া শিক্ষকতাকার্য গ্রহণ করিবেন। এইভাবে বঙ্গদেশের কয়েকজন শিক্ষক আসামে গিয়া এবং আসামের কয়েকজন শিক্ষক বঙ্গদেশে আসিয়া যদি অনুকূল পরিবেশে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে পারস্পরিক আদানপ্রদানে রত হন, যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সহৃদয় উদারতায় তরুণ সমাজের সম্মুখে প্রতিবেশী প্রদেশের একটি নিখুঁত ছবি ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহারা সচেষ্ট ও সক্ষম হন তবে ধীরে ধীরে যুবক সম্প্রদায় হীন-প্রাদেশিকতার গণ্ডীমুক্ত হইয়া একটি সর্বভারতীয় ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে সক্ষম হইতে পারে, দ্বেষ-হিংসার পরিবর্তে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে ক্রমশ অনুপ্রাণিত হইতে পারে। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বিকৃত, বীভৎস ছবি এবং সর্বৈব মিথ্যা বিবরণের বদলে একটি সত্যকারের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি সাহায্যে একটা স্বাধীন মতামত গঠন করিয়া তুলিবার সুযোগ তাহা হইলে তাহারা পাইতে পারে।......

আরও একটি কথা আছে। একই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীন হইলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাদি আজও ঠিক একইভাবে নিয়মিত নহে। বেতনের হার, পাঠ্যতালিকা, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রভূত পার্থক্য এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষক বিনিময় প্রস্তাব কার্যকরী হইলে এসকল অত্যাবশ্যক বিষয়েও তুলনামূলকভাবে কাল আহরণের সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকগণ সহজে লাভ করিতে পারেন। বনিয়াদী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা, এন সি সি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশ আজ কিভাবে অগ্রসর হইতেছে, কি প্রণালীতে কার্য করিতেছে তাহারও একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহারা এইভাবে লাভ করিতে সক্ষম হন। যে-সকল শিক্ষক এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিতে প্রেরিত হইবেন —অল্প পরিসরে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূতরূপে, কালচেরেল্ এম্বেডেসররূপে তাঁহারা বিবেচিত ও সম্মানিত হইবেন এবং তাঁহারাও নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনা দ্বারা, জ্ঞানতপস্যার মাহাত্ম্য দ্বারা সে উচ্চমর্যাদার সম্মান রক্ষা করিতে সর্বথা যত্নশীল থাকিবেন। তাঁহারা একদিকে যেমন নিজ প্রদেশের যাহা কিছু উত্তম ও অনবদ্য, যাহা কিছু প্রাচীন অথচ মূল্যবান তাহা অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিবেন অন্যদিকে তেমনি নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন লইয়া জিজ্ঞাসুর উৎসুক দৃষ্টি লইয়া—যাহা কিছু শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয়, যাহা কিছু নূতন ও মূল্যবান তাহাই নিজের জন্য ও নিজ প্রদেশের জন্য সর্বপ্রযত্নে আহরণ করিয়া লইয়া আসিবেন। শিক্ষক বিনিময় পরিকল্পনা এইভাবেই ক্রমশঃ সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

অতীতের গ্লানিকর কাহিনী এই প্রসঙ্গে একটু মনে আসে। বৃটিশ শাসনের পরাধীনতার সেই অভিশপ্তযুগে এদেশ হইতে বিদেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে, বহু ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন ব্যপদেশে গমন করিত। তদানীন্তন সরকারী নীতি পরোক্ষ এবং অপরোক্ষভাবে সে গমনাগমনের পৃষ্ঠপোষকতা করিত। কেন করিত, তাহা আর আজ বিশদ করিয়া বলিতে হইবে না। তখনকার দিনে সমুদ্র পারের রহস্যাবৃত পাশ্চাত্য দেশের সোনার মাটির স্পর্শ লাভ করিয়া কোন প্রকারে কয়েকটা মাস তথায় কাটাইয়া যাহারা দেশে ফিরিতে পারিত তাহারাই উচ্চ বেতনের নূতন পদলাভ বা বিশেষ পদোন্নতি দাবী করিত এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পুরস্কারস্বরূপে তাহা লাভও করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীন ভারতেও সে অবাঞ্ছিত, অদ্ভুত নীতি যে কেবল অব্যাহতভাবে ক্রিয়াশীলই রহিয়াছে তাহা নহে বরং অধিকতর নিষ্ঠায় ও মোহমুগ্ধতায় অনুসৃত হইতেছে। যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও অধ্যাপকবর্গের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া বিশেষ উন্নত দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থাদি পরিদর্শনার্থে লোক প্রেরণের বিরুদ্ধবাদী আমরা নহি। উহার উপকারিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু অধুনা প্রচলিত দাসসুলভ মনোভাবপুষ্ট, অর্থহীন পন্থাটিকে আমরা সমর্থন করি না। একথা না বলিয়া পারি না যে বিগত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল এ ব্যবস্থার অনুসরণে ইহাই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কেবলমাত্র বিদেশের মাটি ছুঁইয়া আসিলেই কোন মানুষ অকস্মাৎ কোন অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় না। বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কি দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, কি শিক্ষার স্বল্প পরিসরবিশিষ্ট ক্ষেত্রে কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোন মহত্তর স্বার্থ ইহা হইতে সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এ অর্থহীন, ব্যয়বহুল এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ব্যবস্থার পরিবর্তে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে শিক্ষক বিনিময়ের প্রস্তাব আমরা কর্তৃপক্ষের সহৃদয় মনোযোগের সম্মুখে বিশেষভাবে উপস্থিত করিতে ভরসা পাইতেছি।

এ পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে হইলে প্রথমাবস্থায় শহরস্থ কয়েকটি বিশিষ্ট বিদ্যালয় লইয়াই কার্য শুরু করিতে হইবে। এইরূপ এক একটি বিদ্যালয়ের সহিত ভিন্ন প্রদেশাগত দুইজন কি তিনজন শিক্ষক সংযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের জন্য বিশেষ কার্যব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। স্থানীয় শিক্ষক সংঘ, ছাত্র-সংঘ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত যাহাতে তাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত ও মিলিত হইতে পারেন—সেইরূপ ব্যবস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্য করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সহজে সম্ভব হইবে এবং ভাবের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মিলন-সূত্র অনুকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে গ্রথিত হইয়া উঠিবে।

অর্থের দিক দিয়াও এই পরিকল্পনা স্বতঃই আকর্ষণীয় হইবে। কারণ, অতি অল্প ব্যয়েই ইহাকে কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। নির্বাচিত শিক্ষকগণের যাতায়াত, বেতন ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচাদি দুইটি প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেলে কোন প্রদেশের পক্ষেই অধিক অর্থ এই পরিকল্পনার পশ্চাতে ব্যয় করিতে হইবে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, দুই তিনটি অযোগ্য ব্যক্তিকে ইংলন্ড প্রমুখ দূরদেশ হইতে কেবলমাত্র স্বজন বা স্বগোষ্ঠী পোষণোদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া আনিতে সরকারী তহবিল হইতে প্রতিনিয়ত একান্ত নিরর্থকভাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক কম ব্যয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে শিক্ষক বিনিময় অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। এবং একজন বা দুইজন নহে—প্রায় দশ বারোজন শিক্ষককেই প্রায় বৎসরকাল সময়ের জন্য দুই প্রদেশের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থায় নিযুক্ত রাখিয়া উহাদের মধ্যে স্থায়ী ও গভীর সৌহার্দবন্ধন স্থাপন করা সম্ভব হইবে। এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের যে বিপরীত প্রতিযোগিতা, যে বিদ্বেষ ও বৈরীভাব আজ সকল একতার, সকল সংহতি ও দেশাত্মবোধের মূল শিকড়টিতে গুরুতর আঘাত হানিতেছে, ভূঁয়া ও অভিসন্ধিমূলক বিবৃতি-ভাষণের পশ্চাত হইতে অহরহঃ যে প্রাদেশিক মনোভাবের বিষক্রিয়া বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পর্যন্ত পরচুলা ও মুখোস খসাইয়া ফেলিতেছে—তাহার যথার্থ প্রতিকারও এইভাবে ধীরে ধীরে, অন্ততঃ কতক পরিমাণেও সাধিত হইতে পারিবে।

বস্তুত একথা এখন আর অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, আমরা যাহারা আজ বয়োধিকার বলে সমাজের, রাষ্ট্রের ও শিক্ষার সকল কার্য পরিচালনা করিতেছি, সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেছি—তাহাদের সমগ্র চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীই বোধ করি সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষবাষ্পে দূষিত হইয়া গিয়াছে। বাহ্যতঃ বড় বড় আদর্শের যত বড় কথাই আমরা বলি না কেন, যত সার্বভৌম উদারতার বাণীই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি না কেন—কঠোর বাস্তবতার সম্মুখে প্রায় সকলেরই নগ্নরূপ মুহুর্মুহুঃ উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং বর্তমান জেনারেশন দ্বারা, পরিণত ও বদ্ধ-সংস্কার আজিকার কর্তৃস্থানীয়দের দ্বারা সর্বথা প্রাদেশিকতা দোষমুক্ত কোন বৃহৎ কার্য সাধিত হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা আমাদের ধারণা নাই, তাহাদের উপর আর আমদের বড় একটা ভরসা নাই। এখন ভরসা শুধু সেইসব উত্তরসাধকগণের উপর যাহারা এখনো নিসর্গের নিষ্কলুতায় স্বাভাবিক নিয়মে বাড়িতেছে, যাহারা এখনো অভিসন্ধিমূলক শিক্ষার কুব্যবস্থায় কিংবা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায় অনভিপ্রেত প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি হইয়া ওঠে নাই। যদি সেই সকল নিষ্পাপমন ও অবিকৃত-বুদ্ধি তরুণদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য যথার্থ বর্ণবৈচিত্র্যে উপস্থিত করা যায়, যদি শিক্ষক বিনিময়ের দ্বারা এক প্রদেশের ছাত্র সমাজের কতকাংশকেও অন্য প্রদেশের যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকবর্গের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে নিয়া তথাকার সাহিত্য, শিল্প, আচার-ব্যবহারাদি সম্পর্কে একটা নিখুঁত ধারণা লাভের সুযোগ দেওয়া যায় তবেই হয়ত সময়ে প্রাদেশিকতার জঘন্য নীচতা হইতে মুক্ত হইয়া সমগ্র ভারতভূখণ্ডকেই আপন মাতৃভূমি বলিয়া বোধ করিবার, ভারতের সর্বপ্রদেশের নরনারীকেই স্বদেশবাসী স্বজন বলিয়া জ্ঞান করিবার মনোভাব তাহারা লাভ করিতে পারিবে। অখণ্ড হিন্দুস্থানের স্বপ্ন, 'হিন্দুস্থান হামারা' উক্তি তবেই হয়ত সার্থক হইতে পারিবে, সফল হইতে পারিবে।

যুগে যুগে ভারতের ঋষি, ভারতের মনীষী—ভারতবর্ষের সাগরতীরে মহামানবের মহা-মিলনক্ষেত্র রচনা করিবার প্রয়াসে দিকে দিকে প্রেমের বাণী, অক্ষয় আত্মার অমরবাণী প্রেরণ করিয়া আসিয়াছেন। এইদিকেই ভারতের বৈশিষ্ট্য স্মরণাতীত কাল হইতে বিকশিত হইতে চলিয়াছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ধর্মসাধনায়, সাহিত্য সাধনায় যে উদার, সার্ব-ভৌম ও সমন্বয়ের বাণী রূপ লইতে চাহিয়াছে—তাহারও উদ্ভব এই ভারতবর্ষেরই বুকে, বঙ্গ-দেশেরই বুকে সংঘটিত হইয়াছিল। অথচ জাতির কোন মহাপাতকের ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়া সেই বঙ্গদেশকেই, সেই ভারত-বর্ষকেই নীচ সঙ্কীর্ণতা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার আবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার নিরন্ধ্র তমিস্রায় আবরিত হইয়াছে ইহার নিঃসীম আকাশ ও প্রশস্ত আঙিনা। কোন ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহামনীষীর আবির্ভাব ভিন্ন এ দুস্তর সমস্যাশতকের সত্যিকার সমাধান ভারতবর্ষ আর করিয়া উঠিতে পারিবে কি না জানি না। কিন্তু জাতির যথার্থ সংগঠন যাহাদের হস্তে, যাহাদের করস্পর্শে গড়িয়া উঠিবে ভাবীকালের সমাজসেবক ও সেবিকাদল—উপেক্ষিত ও বঞ্চিত সেই শিক্ষক সমাজকে সুযোগ দিলে এখনো গঠনমূলক কাজ, জাতীয়জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার গোড়ার কাজ কিছুটা হয়ত হইতে পারে। সেই আশা ও ভরসা বুকে লইয়াই আজ দেশের যাঁহারা কর্ণধার ও ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁহাদের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা আমরা উপস্থিত করিলাম—ইহা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেই ইহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইবে।

কোনও বান্ধবীকে

শ্রীনির্মল চৌধুরী,

God is in his heaven,
All's right with the world!
—Browning.

কাল বিকেলে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার সাথে
উল্লোল উল্লাসে, উর্বীর 'পরে নেমে এলো
প্রথম বর্ষার প্রখর ধারা।

তোমাকে পেলাম কাছে— একান্ত আপনার করে।
তোমার কবোষ্ণ সুরভি নিঃশ্বাস
নামহারা ফুলের সুবাসের মতো রইলো ভেসে।
তোমার কৃষ্ণকেশের রেশম পরশ
উড়ে এসে লাগ্‌লো চোখে, মুখে, মনে।

ভেজামাটির গন্ধে মদির হোল বাতাসঃ
ধারা-স্নাত নব কদম্বের শিহরণ লাগলো শিরায় শিরায়!
আঁধার যবনিকা সরিয়ে
'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'
'মেঘোলোকার্ভবতি'র অর্থ-খুঁজে পেলাম যেন
এতদিন পরে—
সেই মুহূর্তের বুকে।

আকাশের জলের সাথে
চোখের জলের ধারা মিশে গেল;
ভরা-কোটালের ঠেলা-জোয়ারের
স্তব্ধ কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠলো কণ্ঠ,
তোমার কথার উত্তর হারিয়ে গেল

অব্যক্ত বাণীর গহ্বরে!
কথা ভরা, ব্যথা মাখা তোমার চোখে,
চোখ রেখে স্মরণ করলাম
অতিক্রান্ত ঊষর অতীতকে;
যেদিন তুমি ছিলে বহুদূরে
আমার সমস্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে।
আর আজ!
আজ তুমি আমার সমস্ত অনুভূতিতে
আমার রক্তে—আমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনে।
আজ তোমাকে পেয়েছি সম্পূর্ণ করে
সেদিন তোমাকে পাইনি এতটুকুও।
এ দুই-ই সত্য
বাইরের বর্ষণমুখর ওই নির্বাণী নিশীথিনীর মতো।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডী

হোয়াইট হাউসের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে লেখা ভয়-দেখানো চিঠির সংখ্যা ইদানিং খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

—ট্রুম্যান যদি সত্যই ট্রুম্যান্ হন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি বলিবেন 'চিঠি দিয়ে মোরে সব কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

* * * *

নেপালের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানকার প্রধান মন্ত্রীর শতাধিক দেহরক্ষী অকস্মাৎ কুক্‌রি ও তরবারি লইয়া কাঠমাণ্ডুর দোকানপাটে হানা দেয় ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন।

ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! সম্ভবতঃ উপরওয়ালারা বলিয়া দিয়াছেন, বাপু সকল গণেশ কাৎ হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর দেহরক্ষীর বাজেট পাশ হইবে না বোধ হয়। তোমরা এই বেলা নিজেদের দেহরক্ষা করিবার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাটা করিয়া রাখ।

* * * *

পাক্ গণ সমিতির সম্পাদক শ্রীআশুতোষ সিংহ সম্প্রতি যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা আন্দোলন চালাইবার জন্য সেখানকার হিন্দু-মুসলমানের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত মহম্মদ যে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করিয়াছিলেন উহাতে তিনি দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান ও অ-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে এক মিলিত জাতি গঠন করিবে। অতএব হজরতের সে ইচ্ছার অনুবর্তী হওয়া ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

—তা কখনও হয়? হজরতের সব ভাল ভাল কথা মানিয়া চলিতে গেলে পাকিস্থানের গোঁড়া মোল্লা ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বিশিষ্ট নেতাদের তো আর ক্ষেপাইবার মত হাতিয়ার কিছু থাকে না।

* * * *

অবিভক্ত বাঙলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক্ সাহেব পূর্ব পাকিস্থানের এড্‌ভোকেট্ জেনারেল হইয়াছেন।

—খবরটা শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। পাকিস্থানে এতদিন পরে তাঁহার জন্য এতটুকু স্থান হইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, হক সাহেবের নসীবের জোর আছে। ভদ্রলোক বহু দাগা পাইয়াছেন।

* * * *

ব্রহ্মের কম্যুনিস্টপন্থী শ্রমিক ও কৃষক দল রাষ্ট্রদ্রোহ দমন আইন রদ করিবার জন্য একটি আন্দোলন চালাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। এইজন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

—কোন কম্যুনিস্টশাসিত রাষ্ট্রে এইরূপ পরিকল্পনা করিলে তাঁহাদের যে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইতে হইত, সেটা বোধ হয় ব্রহ্ম কম্যুনিস্টরা ভাবিয়া দেখেন নাই।

* * * *

নোয়াখালিতে জনৈক দরবেশ, আলী আমেদ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলে যে, খুব শীঘ্রই তাহার সর্বস্ব চুরি হইয়া যাইবে। ব্যবসায়ী তখন দরবেশবাবার শরণাপন্ন হয়। দরবেশ সাহেব তখন তাহার টাকাকড়ি ও গহনাগুলিকে একটি ট্রাঙ্কে পুরিয়া সেটি বাক্সবন্দী করিতে বলেন ও তিনি সেই বাক্সটি মন্ত্রপূত করিয়া দেন। পরদিন বাক্স খুলিয়া ব্যবসায়ী দেখে, মন্ত্রের জোরে গহনাগাটির ট্রাঙ্কটি অন্তর্হিত ও দরবেশ-বাবাও নিখোঁজ হইয়াছেন। আলী আমেদ পুলিশে খবর দিয়াছে।

—আলী আমেদের পুলিশে খবর দেওয়াটা তাই বলিয়া ঠিক হয় নাই, কারণ দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী যে বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে, সে কথা তো সে অস্বীকার করিতে পারিবে না?

* * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ধারা ও প্রকৃতির পরিবর্তন করিতেই হইবে।

—কিন্তু কবে হইবে, সেই তারিখটা জানিতে পারিলে ভাল হইত। আমরা তো ছেলেদের নিত্য নূতন বই কিনিতে কিনিতে কাহিল হইয়া পড়িলাম!

* * * *

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কোরিয়ার ব্যাপার লইয়া ভারত যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে মার্কিন মুলুক চটিয়া গিয়াছে।

—চটিলে আর কি করিতেছি? আমরা নিরপেক্ষ। একবার ইহাকে চটাইব, উহাকে গলাইব, আবার প্রয়োজন হইলে উল্টাটিও করিব। এইভাবে ব্যালেন্স রাখিয়া যাইতে পারিলে আমাদের কেহই চটাইতে সাহসী হইবে না।

* * * *

জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়া রণাঙ্গনে গিয়া লেঃ জেঃ রিজওয়েকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, এই ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করিবার সাত মাস পূর্বে আমি ঠিক এই স্থানেই আসিয়াছিলাম। আমরা শুধু কোরিয়ার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না, সমগ্র এশিয়ার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করিতেছি।

—সেটা তো আমরাও ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সাত মাস পূর্বে যেখানে তিনি আসিয়াছিলেন, ঘুরপাক খাইয়া পুনরায় যদি তাঁহাকে সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমগ্র এশিয়া আর কোন্ ভরসায় তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকে?

* * * *

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা হেনা সেন নারী সমাজের পক্ষ হইতে হিন্দু সংহিতা বিল সমর্থন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, ভারতীয় নাগরিক বিল রচনা করিবার সময় যেন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না করা হয় এবং বিবাহ অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে যেন স্বামী বা স্ত্রীর জাতিগত পরিবর্তন সাধিত না হয়।

শ্রীযুক্তা সেন নিশ্চিন্ত থাকুন সহস্র আইন করিলেও বিধাতার আইনে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বিলুপ্ত হইবে না এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ফলেও উভয়ের জাতিগত পরিবর্তন ঘটিবে না।

* * * *

মাদ্রাজের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি এস রাজনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দুই মাসের ছুটি লইয়াছেন। ছুটির সময় তিনি পূর্ণ সহস্র মুদ্রা পাইবার অধিকারী হইলেও মাত্র এক টাকা বেতন লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

—কী সর্বনাশ! তাঁহার এই দৃষ্টান্তের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আবার অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীদের স্বাস্থ্য না ভাঙ্গিয়া পড়ে।

* * *

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে শ্রীযুত জওহরলাল নেহরু শ্রীআলগুরায় শাস্ত্রীর একটি প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, টুপি, পতাকা ও চারি আনার সদস্য-পদকেই কংগ্রেসের মূল ভিত্তি ভাবিয়া তিনি ভুল করিতেছেন। টুপির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে মস্তকে টুপি পরিধান করা হয়, তাহার গুরুত্ব টুপি অপেক্ষা অধিক।

—কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রীরা ছাড়া মস্তক বাঁচাইয়া এই টুপি পরিধান করিয়া সর্বত্র বিচরণ করা যে কতখানি বিপজ্জনক হইয়াছে, জওহরলালজী তাহা বুঝিতে পারিলে টুপির গুরুত্ব তিনি নির্ধারণ করিতে পারিতেন।

* * * *

করাচীতে পাকিস্থানের অন্যতম ভূতপূর্ব হিন্দু মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সুখনিবাসটি অতিথিভবনে রূপান্তরিত করা হইতেছে।

—পাকিস্থানে হিন্দু মন্ত্রী, সুখের নীড় বাঁধিতে গেলে তাহার কী দশা হয়, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত।

* * * *

রং পুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, পাকিস্থানে একটি অদ্ভুত ভূগোল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হইয়াছে। ইহাতে সকল দেশের কথা আছে, শুধু ভারতের কথা নাই। পৃথিবীতে ভারত নামে যে একটি ভূখণ্ড আছে, তাহা এ ভূগোল পাঠ করিলে বুঝা যায় না।

—যাক্, তাহা হইলেও অনেক গোলমালের হাত হইতে সকলে বাঁচিয়াছে, শেষে পরিচয় দিতে গিয়া যদি লেখক লিখিয়া বসিতেন যে, ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে মুসলমানরা অবিরত ঠেঙানি খায়, তাহা হইলেই গিয়াছিলাম আর কি!

* * * *

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী মালান সাহেব পার্লামেণ্টে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি ধ্বংসও হইয়া যায়, তাহা হইলেও তিনি অশ্রুবর্ষণ করিবেন না।

—প্রেস ফটোগ্রাফারদের একটি দুর্লভ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবেন আর কি!

* * * *

রাষ্ট্রপুঞ্জের লবীকে তিনি একটি ঘোড়ার হাটের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

—যাক্, রাগের বশে যে তুলনা আর বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়!



শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

সমাবর্তন, সমাবৃত্ত, স্নাতক প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙলা ভাষায় আজকাল খুব বেশি চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ লব্ধোপাধিক ছাত্রগণের সভায় সমাবর্তন ভাষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এম্ এ শ্রেণীতে 'স্নাতকোত্তর বর্গ' বলা হয়—এরূপও শোনা যাইতেছে। বস্তুত এই প্রাচীন শব্দগুলির এরূপ অপব্যবহার একান্তই আধুনিক।

প্রাচীন প্রয়োগে দেখিতে পাই, এই শব্দ-গুলিই একপ্রকার শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত এবং স্বভাবতঃই গম্ভীর অর্থের প্রকাশক হইত। সেই প্রাচীন অর্থ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজের দ্বিজাতি শিশু শৈশবেই উপনীত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিতেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিপূর্ণ যৌবনে গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দানের পর ব্রতের উদ্‌যাপন করিতেন। উদ্‌যাপনের সময় শাস্ত্রে স্নানাদি নানা অনুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে। এই হেতু ব্রতোদ্‌যাপক ব্রহ্মচারীকে 'স্নাতক' বলা হয়। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনের নামই সমাবর্তন। সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী এবং স্নাতক একই কথা।

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ। যিনি আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন, তাঁহাকেই বলা হইত 'নৈষ্ঠিক'। 'নিষ্ঠা' শব্দের অর্থ—মৃত্যু। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমস্ত জীবন গুরুগৃহেই কাটাইয়া দিতেন। যে ব্রহ্মচারী যথাশাস্ত্র গুরুদক্ষিণাদি প্রদানের পর সমাবৃত্ত হইয়া গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারই সংজ্ঞা 'উপকুর্বাণ'। দক্ষিণাদির দ্বারা গুরুর এবং গার্হস্থ্যে নানা হিতকর্মের দ্বারা সমাজের উপকার করার নিমিত্ত 'উপকুর্বাণ বলা হইত। এই উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীই ব্রতসমাপনান্তে গার্হস্থ্যে প্রবেশের মুখে স্নাতক সংজ্ঞায় অভি-হিত হইতেন।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে—গুরু-গৃহ ত্যাগের পরেও আমরণ শিষ্যকে গুরুর সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। আত্মপরিচয়ে গুরুপরম্পরার উল্লেখও বিরল নহে। আচার্য শ্বেতকেতু বলিয়াছেন, গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়াও প্রতি বৎসরে ন্যূনকল্পে দুই মাসকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রচর্চা করা উচিত। তাহাতে বিদ্যা সমধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (আপ ধর্মসূত্র ১।৪।১৩।১৯,২০)

শ্বেতকেতুর এই উপদেশ অনেকেরই মনঃ-পূত হয় নাই। তাঁহারা বলেন, গৃহস্থকে যেভাবে কর্মে লিপ্ত থাকিতে হয়, তাহাতে শিরঃ-কণ্ডুয়নেরই অবকাশ নাই, গুরুগৃহে বাস করিবার মত অবকাশ কোথায়? (আপ ধর্মসূত্র ১।৪।১৪।২—উজ্জ্বলা টীকা)।

গৃহ্যসূত্রাদিতে স্নাতকের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। সকল আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। কারণ গৃহস্থের ত্যাগ ব্যতীত কাঁহারও বাঁচিবার উপায় নাই।

স্নাতক তিন প্রকার—বিদ্যা-স্নাতক, ব্রত-স্নাতক এবং বিদ্যাব্রত-স্নাতক। যাঁহারা গুরু-গৃহে সমগ্র বেদ অথবা একটিমাত্র বেদশাখায় বিদ্যালাভ করিয়া সমাবর্তন করিতেন তাঁহারাই 'বিদ্যাস্নাতক'।

গুরুগৃহে যাঁহারা বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সাবিত্র ব্রত, গোদানিক ব্রত, জৈষ্ঠসামিক ব্রত, আদিত্য-ব্রত প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াই সমাবর্তন করিতেন, পরন্তু যাঁহাদের বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইত না, তাঁহারাই ব্রতস্নাতক। আর বিদ্যা এবং ব্রত এই উভয়ের অনুশীলন ও অনুষ্ঠানেই যাঁহাদের সমান আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকিত, তাঁহারাই বিদ্যাব্রত-স্নাতক।

গুরুগৃহে বাস করিবার কাল সম্বন্ধে নানা-প্রকার অভিমত দেখা যায়, কিন্তু ন্যূনপক্ষে বারো বৎসরের পূর্বে কিছুতেই সমাবর্তন করা চলে না।

মনুসংহিতায় (১১।১) স্নাতক শব্দটিকে অধিকতর ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সন্তানকামনায় বিবাহার্থী, যাগেচ্ছু, পান্থ বা পরিব্রাজক, যজ্ঞে দত্তসর্বস্ব, গুরু ও পিতামাতার ভরণপোষণকারী, বেদাধ্যায়ী এবং রোগী—ইহাদিগকেও স্নাতক বলে। এইস্থলে স্নাতক শব্দের গৌণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। দানের পাত্র নির্দেশ করিতে যাইয়া মনু এই সকল স্নাতকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা আর্থিক সংকটে পতিত হইলে গৃহস্থ ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য দান করিবেন—মনুর ইহাই অভিপ্রায়।

স্নাতকের কর্তব্য ও অকর্তব্যের একটি তালিকাও গৃহ্যসূত্রেই পাওয়া যায়। আশ্বলায়ন গোভিল প্রমুখ গৃহ্যসূত্রকারগণ সেইগুলিকে 'ব্রত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্নাতক কখনও নগ্ন হইবেন না। বৃক্ষারোহণ, কূপে অবরোহণ, সাঁতার কাটিয়া নদী উত্তরণ, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দ্রুত ধাবন প্রভৃতি স্নাতকের পক্ষে নিষিদ্ধ।'

পরাস্কর-গৃহ্যসূত্রে অসংখ্য স্নাতকব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণের সময় স্নাতক সুগন্ধি মালাচন্দনে ভূষিত হইয়া সুন্দর বস্ত্র, শোভন উত্তরীয়, কর্ণভূষণ, ছত্র, পাদুকা, উষ্ণীষ প্রভৃতি ধারণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দারপরিগ্রহের পূর্ব পর্যন্তই সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীকে 'স্নাতক' বলা হইবে—পারস্করের এইরূপ অভিপ্রায়। পারস্কর বলিয়াছেন—স্নাতক দ্বিজাতি নৃত্যগীত ও বাদি—বাদি বিষয়ে অত্যাসক্তি পরিহার করিবেন। রাত্রিকালে ভ্রমণ করিবেন না। পর্বত-গুহাদি বিপৎসঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ, অশ্লীল ভাষণ, জল-প্রতিবিম্বে সূর্য-দর্শন, গ্রহণের সময় চন্দ্র বা সূর্যের দর্শন, ভিক্ষাচরণ, উপহাস প্রভৃতি স্নাতকের পক্ষে নিষিদ্ধ।

পারস্কর আরও বলিয়াছেন, স্নাতক 'গর্ভিণী' শব্দ উচ্চারণ করিবেন না। গর্ভিণী শব্দের পরিবর্তে 'বিজন্যা' বলিতে হইবে। নকুল, কপাল, ইন্দ্রধনু শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে সকুল, ভগাল, মণিধনু বলিতে হইবে। (পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ২।৭ কণ্ডিকা)

এই সকল নিয়মের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পারস্কর যে দেশের লোক ছিলেন, সেই দেশের প্রাদেশিক বা গ্রামভাষায় গর্ভিণী প্রভৃতি শব্দকে হয়তো অশ্লীল বলিয়া মনে করা হইত।

গোবৎস দুগ্ধ পান করিতেছে—ইহা দেখিলেও গাভীর মালিককে বলিতে নাই। অযত্নলভ্য শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা শৌচ করিবার ব্যবস্থা। এইগুলিও পারস্করেরই উক্তি। পারস্করের দেশে জলের অভাব ছিল, এইরূপ অনুমান করাও একেবারে অমূলক নহে। এই সকল নিয়ম সকল সমাজে কখনও চলিয়াছে—এরূপ মনে হয় না।

সমাবর্তনের পর তিন দিন স্নাতক কতকগুলি নিয়ম পালন করিবেন—ইহাও পারস্করই তাঁহার গৃহ্যসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২।৮ কণ্ডিকা)

যথা—মাংসাহার বর্জন, মৃন্ময় পাত্রে জলপান বর্জন, স্ত্রীলোক, শূদ্র, কাক ও কুকুরের অদর্শন, স্ত্রীলোক ও শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ বর্জন, শূদ্রের ও অশৌচের অন্ন পরিত্যাগ, মিথ্যা বর্জন প্রভৃতি।

আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থানে উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীকে তিন দিন এক গৃহে আটক করিয়া রাখা হয় এবং উপরি-উক্ত নিয়মগুলিও পালন করান হয়।

মানব গৃহ্যসূত্র (২।২০, ২১) হইতে জানা যায়, স্নাতক পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে পশুযাগ করিতেন। সেই যাগাবশিষ্ট হবিঃপ্রাশনের পর মাংস, ক্ষারলবণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আর কোন বাধা থাকিত না।

স্নাতক উঞ্ছবৃত্তি, শিলবৃত্তি ও অযাচিত প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। বিপন্ন হইলে বৈশ্যবৃত্তিও অবলম্বন করিতেন। কিন্তু এরূপ কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন না, যাহাতে বেদচর্চার ব্যাঘাত ঘটে। (বারাহ গৃহ্যসূত্র ১।২০, ২১)

গোভিল গৃহ্যসূত্র (৩।৫।১), খাদির গৃহ্যসূত্র (৩।১।৩১ এবং দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্রে (৩।১।৩২) উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী বৃদ্ধশীলী হইবেন, অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিবেন। যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহারা সাধারণত অশাস্ত্রীয় কোন আচরণ করেন না, আর যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, তাঁহারাও দেখিয়া শুনিয়া এবং ঠেকিয়া সংসারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ সুচিন্তিত ও সুসংগত হওয়াই স্বাভাবিক। এই হেতু স্নাতক ব্রহ্মচারী পণ্ডিত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকিয়া আপন কর্তব্য স্থির করিবেন। ইহাই সংক্ষেপতঃ স্নাতকধর্মের সার উপদেশ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে লব্ধবিদ্য অন্তেবাসীকে আচার্য 'সত্যং বদ, ধর্মং চর' ইত্যাদি নানা সদুপদেশ দিয়া পরে বলিয়াছেন, যদি কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, তবে তোমার প্রতিবেশী শীলবান্ শান্ত-দান্ত ধর্মকাম ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া কর্তব্য স্থির করিবে। তাঁহারা যেভাবে চলিবেন, তুমিও সেইভাবে চলিবে। ইহাই আমার আদেশ, ইহাই উপদেশ।'

ভারতের গুরুগৃহ বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত শিক্ষার টোল বা চতুষ্পাঠীতে (কোন কোন স্থলে পুরুষানুক্রমে) অধ্যাপকগণ অন্তেবাসীদিগকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিয়া গুরুগৃহের আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরাপর তথাকথিত আশ্রমগুলিতে বিদ্যা ও অন্ন কোনটিই দান করা হয় না। সর্বত্রই বেতন গ্রহণপূর্বক অধ্যাপনা চলিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অর্থের বিনিময়ে যাহারা বিদ্যা বিক্রয় করিত, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তাহাদিগকে অধ্যাপক বলিত না। শুধু বিদ্যাদাতৃগণই এই সম্মানসূচক শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেন। আজ নানাবিধ দুর্বিপাকে তাঁহাদের স্বল্পাবশেষ আদর্শও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

জীবনযাত্রা প্রণালীর কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রতিযোগিতায়, দীর্ঘকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রসারে, পরীক্ষোত্তরণের নানাবিধ স্বল্পায়াসসাধ্য কূট কৌশলে, সর্বোপরি সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাজনিত অভূতপূর্ব রাষ্ট্রবিপ্লবে 'অধ্যাপক' আর দেখা যাইবে কি না, ইহাই আশংকার বিষয়।

আমরা এখন যত্রতত্র সেই শ্রদ্ধার উদ্বোধক শব্দগুলির প্রয়োগই করিতেছি। অন্তর্নিহিত অর্থের অনুসন্ধান প্রায়ই করি না।

পুস্তক পরিচয়

(১) অখণ্ডের অভিযাত্রী—॥৹

(২) প্রেমের বাণী—৷৵৹

(৩) সাধনায় শরীরতত্ত্ব—৸৹

প্রথম পুস্তিকাখানি মহর্ষি প্রেমানন্দের একটি বক্তৃতা, দ্বিতীয়খানি তাঁহার কতকগুলি বাণীর সংগ্রহ, তৃতীয়খানা তাঁহার নিজেরই লিখিত। পুস্তিকা তিনখানাই আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কিত। বক্তৃতার তাৎপর্য অত্যন্ত উদারভাবমূলক, আধ্যাত্ম সাধনার অনেক গূঢ় সত্যের ইঙ্গিত তাহার ভিতর পাওয়া যায়। 'প্রেমের বাণীতে' একই সার্বভৌম সত্য যে মানবতার মূলে রহিয়াছে, তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং মনের মূলে সেই সত্যকে সাধনার প্রভাবে উপলব্ধির উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। সাধনায় শরীরতত্ত্ব শীর্ষক পুস্তিকায় দেহতত্ত্ব বিষয়ক এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া কিভাবে চলিতেছে এবং কিভাবে সেই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই ষটচক্র প্রভৃতি যৌগিক সাধনার ধারায় অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম-জীবনে আগ্রহশীল সমাজ এই পুস্তিকা তিনখানা পাঠ করিলেই উপকৃত হইবেন। প্রাপ্তিস্থান—অধ্যক্ষ গীতা-ভারতী মিশন, পোঃ হাতীয়া, জেলা নোয়াখালি, পূর্ব পাকিস্থান।

আঁধারে আলো—আলোক দাতা ভাই। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা।

'ভাই' এই আখ্যার আড়ালে প্রচ্ছন্ন কোন সাধক পুরুষের বাণী লইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলিত হইয়াছে। অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধকের উপদেশগুলি সহজ, সুন্দর এবং উদার। অন্ধ-সংস্কার হইতে মনকে উত্তীর্ণ করিয়া বলিষ্ঠ সত্যের উজ্জ্বল আলোকে জীবনের বিকাশ সাধনের প্রেরণা এইসব বাণীতে পাওয়া যায়। নৈতিক বল, তেজস্বিতা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা জীবনকে উন্নত করিবার পথ এই গ্রন্থের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আত্মশক্তির জাগরণকেই ধর্মজীবনে মুখ্যস্থান দান করা হইয়াছে। ২৪৫।৫০

বাঙলায় নয়, সভ্যতার সংকট—পুলকেশ দে সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রতিভা প্রকাশিকা, ৩১নং স্কট লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—আট আনা।

লেখক বাঙলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক বাঙলার চিন্তাশীল পাঠকসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানাতে তিনি ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় বাঙলার বর্তমান সংকটের কারণস্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতির অর্থনৈতিক জীবন লইয়া যাহারা পাশা খেলিতে পারে না, তাহাদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কোন মর্যাদা বর্তমান যুগে টিকে না। তাঁহার মতে, ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বাঙলার অবদানেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে ধনিক সমাজের প্রাধান্য। তাহারা সভ্যতা বুঝে না; শুধু ব্যবসায়ের মুনাফাই জানে। ভারতেও ইহাদেরই বর্তমানে কর্তৃত্ব। বাঙালীদের আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি নাই; তাই রাষ্ট্রনীতিতেও তাহাদের স্থান নাই। অর্থনীতি তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তজ্জন্যই বাঙলার দুর্গতি, উদ্বাস্তু সমস্যা বা স্থানাভাব নেতাদের চিত্তে দোলা দেয় না। যুক্তি-বিন্যাসে লেখকের পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ব্যাধির নিদান-নির্ণয়ই শুধু কিছুটা করিয়াছেন; বস্তুত তাহার প্রতিকারের কোন পন্থা নির্দেশ করেন নাই। বাঙালীর সম্মুখে বর্তমানে যে সমূহ সংকট দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জাতিকে সজাগ করাই সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের সমগ্র আলোচনায় সে সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩২৭।৫০

জ্যোতির্বাণী—হিমালয়বাসী শ্রীজগদ্গুরু শংকরাচার্য মহারাজের সংক্ষিপ্ত উপদেশ ও জীবনী—মূল হিন্দী হইতে বাঙলা অনুবাদক—ব্রহ্মচারী দয়ানন্দজী। প্রাপ্তিস্থান—পরমার্থ কার্যালয়, ৪৪৫, বাদশাহীমণ্ডী, এলাহাবাদ। মূল্য—পাঁচ আনা।

জ্যোতির্মঠের জগদ্গুরু শ্রীশংকরাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর এই জীবনী এবং তাঁহার উপদেশসমূহ পাঠ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী-মাত্রেই আনন্দ লাভ করিবেন। ৮।৫১

মৃত্যু রহস্য—লেখক "ভাই"। প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ গুহ, সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১১৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১২/১, কালিদাস পতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য—পাঁচ সিকা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের ও পরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের মতে চিত্তের প্রশস্ততা ও অশান্ত ভাবের উপর স্থূলরাজ্য হইতে আত্মার উত্থান-পতন নির্ভর করে। যাঁহারা নিবৃত্তি-পরায়ণ তাঁহাদের ঊর্ধ্বগতি হয়; পরন্তু যাঁহারা প্রবৃত্তিপর, তাঁহাদের অসংযমই পারলৌকিক দুর্গতি এবং অশান্তির কারণ ঘটায়। আলোচনা শিক্ষাপ্রদ। এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। ৩৩২।৫০

চূর্ণী—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উমা প্রেস, রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। মূল্য—চার আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি একটি কবিতা সংগ্রহ। পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ, কবিতার সমষ্টি চার। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, কবিতাগুলির রচনাকাল লেখকের ষোল হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যে। অবশ্য এই বয়সে কবিতা রচনা করা কিছু অন্যায় নহে, এইরূপ বয়ঃসন্ধিক্ষণে অনেকেই কবিতা লেখার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই বয়সের অপটু রচনা প্রকাশিত করার চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-সাধনা নীরব সাধনার পথ। লেখক এই বাক্যটি স্মরণ রাখিলে সুফল ফলিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ছোট্ট রবি—শ্রীযামিনীকান্ত সোম। রীডার্স কর্ণার। ৫, শংকর ঘোষ লেন। মূল্য এক টাকা চার আনা।

এই জাতীয় রচনায় যামিনীবাবু সিদ্ধহস্ত। ইতঃপূর্বে এই ধরণের একাধিক পুস্তক বাজারে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জনে সহায়তা করিয়াছে। ছোট্ট রবি মনীষী রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরেরর অপরূপ আলেখ্য। লেখকের অনবদ্য রচনা কৌশলে রবীন্দ্রনাথের শিশু-জীবনের সামান্য ঘটনাগুলিও রূপে রসে সঞ্জীবিত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির শিশুদের জন্য রচিত ছড়াগুলিও সুসন্নিবিষ্ট হওয়ায় খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পুস্তকটি ছোটদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ১২।৫১

যাযাবরী—তারক হালদার ও গোপী ভট্টাচার্য। প্রগতি পাব্লিশিং লিমিটেড, ৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা।

বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা বিপর্যয়ের অন্তরালে ভারতীয় নার্সদের নারীত্ব লইয়া যে অবাধ ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছিল, তাহারই বেদনাময় কাহিনী বিবৃত করার অছিলায় লেখকদ্বয় চূড়ান্ত অশ্লীল, সামঞ্জস্যহীন দুটি কাহিনী ফাঁদিয়াছেন। দেশী-বিদেশী নানা বয়সী মেয়েদের দেহ ভঙ্গীমার অসংযত বর্ণনায় গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। আরো অসহ্য স্থানে অস্থানে দেশাত্মবোধের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। এ সমস্ত অপরাধও কিছু পরিমাণে ক্ষমার্হ হইত, যদি উপন্যাস দুটি প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপন্যাস দুইটির কোনটিতেই সুসমঞ্জস আখ্যান-ভাগ অনুসৃত হয় নাই। নায়কের বিভিন্ন দেশীয় যুবতীগণের সহিত নিছক যৌবন উপভোগের কুৎসিত চিত্রই উপন্যাস দুইটির একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে।

লেখকদ্বয়ের ভাষাজ্ঞান প্রশংসনীয়, কিন্তু কফিনের উপরিভাগের কারুকার্যের ন্যায় তাহা শুধু শবাধারের সজ্জারূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জাতীয় পুস্তক আমাদের ভাষায় যত কম প্রকাশিত হয়, ততই সাহিত্যের পক্ষে মংগল।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২য় খণ্ড)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর প্রবেশ হইতে শুরু করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের সশস্ত্র দিকটা আলোচ্য গ্রন্থে নিপুণ লিপিকুশলতা সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের বেদীমূলে কত সহস্র জীবন আহুতি দিতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। লেখক এই সব সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত বীরগণের জীবনচরিত ও কর্মপদ্ধতি বহু যত্ন সহকারে উদ্ধার করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে সক্ষম হইয়াছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের সমান্তরাল-ভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাও আলোচিত হইয়াছে। সংযম, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোজ্ঞ বিবৃতি পুস্তকটির প্রধান আকর্ষণ! কোথাও উচ্ছ্বাসের আস্তরণে ঘটনা বা কাহিনী মলিন হয় নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস নাই, যথাযথ ঘটনার সন্নিবেশ পুস্তকটিকে ঐতিহাসিক মর্যাদাদানে সক্ষম হইয়াছে।

আগষ্ট বিপ্লব, নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রভৃতি ইদানীন্তন ঘটনাগুলিও লেখকের লিপিচাতুর্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য-সেবার অন্তরালে এই প্রকার নিষ্ঠা না থাকিলে কোন সাহিত্যই এমন উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না। পুস্তকটির বহুল প্রচার বিধেয়।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রথম শ্রেণীর।

৩৩০।৫০

মারকে লেঙ্গে—শ্রীপরিমল গোস্বামী। রীডার্স কর্ণার; ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম চার টাকা।

ওষ্ঠাধারের বিচ্ছেদের নাম হাসি। হাসির আবার রকমফের কত। খুশি খুশি হাসি, ফাঁসির হুকুম-শোনা হাসি। যা অসহ্য, যা দেখে শরীর রী-রী করে ওঠে, তাকেও গিলতে হয় বাধ্য হয়ে, হাসি হাসি মুখে। হজম হয় না, ঢেঁকুর ওঠে, তখনো হাসি।

কখনো আবার এই হাসির ধারালো ফলা। ধার তলোয়ারেরও আছে, ব্লেডেরও। তবে ব্লেড আরো নিঃশব্দ, নিপুণ।

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর আধুনিকতম ব্যঙ্গ গল্প সঙ্কলন মারকে লেঙ্গের ছত্রে ছত্রে এই এই ব্লেডের ধার। প্রায় সব গল্পেরই স্থান কলকাতা; কাল দাঙ্গার, রেশনের, চোরাকারবারের। পরিমলবাবু বলেছেন, জাত-লেখকদের লেখায় যুগের ছাপ পড়ে, এগুলোতে আছে হুজুগের ছাপ। সে-বিচারে পরিমলবাবু শুধু জাত লিখিয়ে নন, একেবারে নৈকষ্য; হুজুগ এবং যুগ দুটোকেই তিনি পঞ্চোর্ধ আড়াইশো পাতার একটি বইয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। ভণ্ডামি পাগলামি ন্যাকামি বোকামি সব কিছু তাঁর নিরিখের লেন্সে ধরে ফেলেছেন। আতিশয্য অবশ্য আছে, কোন্ এনলার্জ করা ছবির না থাকে।

সবশুদ্ধ ত্রিশটি গল্পের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, সে-চেষ্টাও করব না। কোন কোন রচনার গল্পাংশও স্বল্প, নটে গাছটি মুড়োনোর অবসরই পায়নি। তবু, এর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেখেছে 'হিটলার ও আমি'—কলকাতায় পৈতৃক বাড়ী নেই, এমন সবারই লাগবে।

বাঙলা ভাষায় সরস লেখা কম, আমরা স্বভাবতই কাঁদোকাঁদো, ছলছল। মুষ্টিমেয় হাস্য-রসিকদের আসরে পরিমলবাবুর আসর একেবারে প্রথম সারিতে, কায়েমী ইজারা। সেরেফ ছুরি চালিয়ে এতটা হয় না, যদি না আস্তিনের তলায় মলমের কৌটোও থাকে। আপন লোকের হাতের কিলটা চড়টাও সয়। পরিমলবাবু নিঃসন্দেহে ভ্রষ্ট-চরিত্র বাঙালীর সেই আপনলোক। মার খেয়ে মুখ হয়ত একটু কাঁচুমাচু হবে; বিশেষ "গুহ আর পালে"দের। ক্লিষ্ট একটু হাসিও ফুটতে পারে। বোকা বনে গিয়েও তো লোকে হাসে।

রঙ্গজগৎ

ওরে যাত্রী (কল্পচিত্র মন্দির—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও)

—কাহিনী, সংলাপ, গান ঃ নিতাই ভট্টাচার্য, পরিচালনা ঃ রাজেন চৌধুরী, আলোক-চিত্র ঃ অনিল গুপ্ত, শব্দযোজনা ঃ সত্যেন ঘোষ, সুর-যোজনা ঃ কালীপদ সেন, শিল্প-নির্দেশ ঃ সত্যেন রায় চৌধুরী। ভূমিকায় ঃ দীপক মুখোপাধ্যায়, উত্তম চ্যাটার্জি, নিতাই ভট্টাচার্য, ডি জি, হরিদাস চ্যাটার্জি, অনুভা, নমিতা রায়, প্রভা, রেণুকা রায়, কল্যাণী দেবী প্রভৃতি।

বম্বে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশন; ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রী, পূরবী ও উজ্জলায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

যুদ্ধের জেরে বাঙলা চিত্রশিল্পে উল্লেখযোগ্য আমদানীর মধ্যে নিতাই ভট্টাচার্য একজন। গানে গল্পে সংলাপে চিত্রনাট্যে বাঙলা চিত্রজগতে তিনি বেশ ব্যাপকভাবে নিজেকে ছেয়ে ফেলেছেন। যে কৃতিত্ব তার এই পরিব্যাপ্তিকে সাহায্য করেছে তা হচ্ছে কথার প্যাঁচ। এ কায়দাটা তিনি ভালো জানেন এবং যে কোন পাত্রপাত্রীকে যে কোন পরিস্থিতিতেই কথার লাফালাফি খেলায় মত্ত করিয়ে দিতে তিনি ওস্তাদ। তিনিই সম্ভবতঃ প্রমাণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে সবাক চিত্রে বাক্‌টাই হচ্ছে সবকিছু, আর সবই হচ্ছে বাক্যবাহন—হয়তো ভেবে থাকবেন যে বাক্যবাগীশ দেশে আসর মাৎ করার এইটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বাঙলা ছবি, ভালো হোক, মন্দ হোক সরল ও বাস্তব ছিলো, এখন তিনি এসে একটা আড়ষ্ট অবাস্তবতাকে এনে বসিয়ে দিয়েছেন—বাঙলা ছবিতে এইটেই হচ্ছে তার দান। কথা, আরো কথা, আরো আরো কথা, তার জায়গায় ক্রিয়া এসে গেলেই নিতাই ভট্টাচার্য আর যেনো নিজেকে খুঁজে পান না, তাই সেদিক দিয়ে তিনি যেতেও চান না। "ওরে যাত্রী" তার সেই অক্ষমতাকে বেশ স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কাহিনীকে স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্যের মধ্যে রেখে যাওয়াকে এড়িয়ে গিয়ে অসাধারণত্ব পাইয়ে দেবার চেষ্টাই হচ্ছে নিতাই ভট্টাচার্যের গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য। কথার মতো চরিত্র ও ঘটনা নিয়েও তিনি লোফালুফি খেলেন। "ওরে যাত্রী"তে তিনি এই দুবিষয়েই তার নিজের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। গল্পটা সমান্তরলতা বা Parallelism-এর চূড়ান্ত। জোড়া জোড়া চরিত্র, আর তাদের জন্যে জোড়া জোড়া, মুখোমুখি ঘটনা। ফলে গল্পের কৌতূহল না ধরিয়ে চরিত্র ও ঘটনাগুলো দর্শককে কৌতুক জুগিয়েছে যথেষ্ট।

রামপুরের জমিদার রাজকুমার। বংশধরের অভাবে তিনি পালন করেন ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রনাথকে এবং তার বিয়ে দেন উমাতারার সঙ্গে। পাঁচ বছরের মধ্যেও এদের সন্তানাদি না হওয়ায় রাজকুমার ডাক্তার দিয়ে উমাতারাকে পরীক্ষা করিয়ে তাকে বন্ধ্যা ধরে নিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে বংশধরের জন্যে তিনি চান চন্দ্রনাথের আর এক বিবাহ দিতে তা না হলে তিনি দত্তক গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। উমাতারা নিজেই উদ্যোগী হয়ে চন্দ্রনাথের বিবাহ দিলে নয়নতারার সঙ্গে এবং তার এই ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ অগুনতি টাকা পেয়ে সে ফুলশয্যার রাত্রে গৃহত্যাগ করে চলে গেলো। জানিয়ে গেলো যে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে কিন্তু তা না করে সে উঠলো ট্রেনে এবং কামরায় তার দেখা হয়ে গেলো তার ধাইমার সঙ্গে। ধাইমা নার্স, নাম মহামায়া। উমাতারাকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়েই তিনি জানিয়ে দিলেন উমাতারা সন্তানসম্ভবা। সঙ্গে সঙ্গে রামপুরে পাড়ায় বামুনদি অর্থাৎ যোগমায়া রাজকুমারের কাছে ঘোষণা করলেন যে নয়নতারা সন্তান-সম্ভবা। দুটি শিশুপুত্র জন্মালো—উমাতারার ছেলের নাম মহামায়া দিলেন চন্দ্রশেখর, আর নয়নতারার ছেলের নাম দিলেন রাজকুমার শঙ্কর। বয়োপ্রাপ্ত হতে রাজকুমার শঙ্করকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন, ঠিক যে স্কুলে শেখরও ভর্তি হয়েছিলো। পড়াশুনা বরাবর শেখর প্রথম আর শঙ্কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে দুজনে একসঙ্গে ডাক্তারী পাশ করে ফেললে। এই সময়ে রামপুর থেকে যোগমায়া চিঠি লিখলেন কলকাতায় মহামায়ার কাছে তার অবর্তমানে তার পালিতা কন্যা শতদলের একজন অভিভাবক চেয়ে পাঠিয়ে। জানা গেলো যোগমায়া ও মহামায়া দুই বোন, একই বরে তাদের একই সঙ্গে বিবাহ হয়। বর পছন্দ না হওয়ায় মহামায়া গৃহত্যাগ করে নার্সবৃত্তি অবলম্বন করে, আর যোগমায়া গ্রামে তার পৈতৃক সম্পত্তি দেখতে থাকে। শতদল যোগমায়ার সতীন কন্যা। শঙ্কর শতদলের পাণিপ্রার্থী, সে শতদলকে প্রেম জানাচ্ছে, ঠিক তার মুখোমুখি ঘটনায় দেখা গেলো, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ যিনি তার কন্যার সঙ্গে শঙ্করের বিবাহ দেওয়া ঠিক করেছিলেন তিনি ভুল করে শেখরকে শঙ্কর ভেবে বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন আর শেখর সেই উপলক্ষ্যে তার কন্যা ডলির অনুরাগ অর্জন করছে। এইখানেই জানা গেলো শেখর একজন সন্ত্রাসবাদী এবং তার ওপর পুলিশের নজর আছে। পুলিশের নজর এড়িয়ে যাবার জন্যে শেখর দিনকতক বাইরে কাটাবার উদ্দেশ্যে যোগমায়ার কাছে রওনা হলো। যোগমায়ার বাড়ীর সামনে পৌঁছতেই দেখা গেলো শতদল দৌড়ে এসে ওকে শঙ্কর বলে ধরে নিয়ে ভালবাসা জানাচ্ছে। শেখর ফিরে দাঁড়াতেই শতদলের ভুল ভাঙলো কিন্তু সেই সঙ্গে সামনে হাজির হলো এক সি-আই-ডি। শেখর নিজেকে শঙ্কর বলে পরিচয় দিতেই সি-আই-ডি অমনি তার উদ্দেশ্য ও কাজ প্রকাশ করে দিলে। বাড়িতে যেতেই দু-এক কথার পরই শতদল শেখরের প্রতি গদগদভাব হয়ে উঠলো। শতদল শেখরের শুধু প্রেমেই পড়লো না, শেখরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও নির্দ্বিধায় যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো। এই সময়ে চন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেখর তাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজের আসল পরিচয় জেনে ফেলে। শেখর কলকাতায় ফিরে গিয়ে শতদলকে ডেকে পাঠাতে শতদল গিয়ে হাজির হলো এবং নার্সের পেশা গ্রহণ করলে। ইতোমধ্যেই মহাযুদ্ধ বেঁধে উঠলো এবং শেখর পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দেশ থেকে পালালো। এর পরেরই ঘটনা-স্থল মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে আজাদ হিন্দ দলের মেজর জেনারেল শেখর আর ঝাঁন্সি বাহিনীর ক্যাপ্টেন শতদল। উল্টো দিকে শঙ্কর এক মেজর। শঙ্কর শেখরদের গুলীতে আহত হয়ে বন্দী হয়। শেখর তাকে নিজের ক্যাম্পে এনে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণে শেখর ও শতদল ঘাঁটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপরই তাদের দেখা গেলো ভারতবর্ষে। শঙ্করও সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এই সময়ে হঠাৎ রাজকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেবা করার জন্য মহামায়া নার্সের তখন ডাক পড়ে। মহামায়া অনুপস্থিত থাকায় উমাতারা টেলিফোনে কাজটি স্বীকার করে নেয় এবং মহামায়ার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে রাজপুর যাত্রা করে। বাড়িতে ফিরতেই সে চিঠি পড়লো শেখরের হাতে। শেখরও শতদলকে নিয়ে উপস্থিত হলো রামপুরে। উমাতারা রামপুরে পৌঁছে রাজকুমারের পাশে গিয়ে বসার অব্যবহিত পরই রাজকুমার দেহত্যাগ করেন। উমাতারা তার পরই সেখান থেকে চলে যায়, কোন পরিচয় না দিয়েই। শঙ্কর নীচে তখন শেখর ও শতদলের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ওরা ওপরে এসে দেখলে রাজকুমার মৃত এবং শেখর দেখলে তার মা ইতোমধ্যেই অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। শেখরও বেরিয়ে পড়লো আর তার পিছনে ছুটলো শতদল।

রামপুর থেকে কোহিমা হয়ে আবার রামপুরে সবাইকে জড়ো করানোর অনেকখানি ক্ষেত্র

ও সময় নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঘটনাগুলোকে আকস্মিকভাবে জোর করে টেনে আনা হয়েছে। একটা ধাপের সঙ্গে আর এক ধাপের যোগও নেই, সাবলীলতাও নেই। এতে সব ঘটনাই হচ্ছে দৈবজ। আত্মহত্যার নামে উমাতারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েই পেয়ে গেলো তাকে ছেলে-বয়সে পালন করে তোলা ধাইমাকে; শেখর ও শঙ্কর ভর্তি হলো একই স্কুলে; শেখরকে শঙ্কর বলে ভুল করে তাকে টেনে আনা শঙ্করের প্রণয়-প্রার্থিনীর কাছে, শঙ্কর বলে ভুল করিয়ে শতদলকে দিয়ে প্রেম নিবেদন করানো; শেখরকে চন্দ্রনাথের চিকিৎসার অজুহাতে রাজকুমারের বাড়ীতে হাজির করে যেখানে তাকে উমাতারার ছবির সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করানো; কোহিমা রণাঙ্গনে দুই ভাইকে পরস্পর শত্রুদলে এনে ফেলা; রাজকুমারের অসুখে মহামায়াকে সেবার জন্যে ডাকতে তার অনুপস্থিতি এবং সেবার জন্যে উমাতারার রামপুর যাওয়া; উমাতারার চিঠি শেখরেরই হাতে পড়া; ইত্যাদি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একের এর এক প্রত্যেক ঘটনাকে দৈবাতের আশ্রয়ে মিলিয়ে যাবার কৃত্রিম চেষ্টা কাহিনীকে সর্বত্রই রসসৃষ্টি থেকে হঠিয়ে রেখে দিয়েছে।

ছবিখানির নাম থেকে কাহিনীর কোন মর্মই উদ্ধার করা যায় না। গল্পটা যে কাকে নিয়ে এবং কি নিয়ে তাও বুঝে ওঠা দুষ্কর। প্রধান চরিত্র কে—উমাতারা, না শেখর, সেইটাই কাহিনীকার ঠিক করতে পারেননি! উমাতারাকে ডাক্তার, সংলাপে যা প্রকাশ, পরীক্ষা করেও তার সন্তানধারণ ক্ষমতার পরিচয় পেলে না, অথচ মাত্র কয়েকদিন পরই সে মহামায়ার আশ্রমে গিয়ে পড়তেই তার সন্তানসম্ভাবনা মুখেচোখে এমন ফুটে উঠলো যে বৃদ্ধা ধাত্রী মহামায়া দেখেই তা ধরে ফেলতে পারলেন। উমাতারার প্রত্যাবর্তনে রাজকুমারের প্রত্যয় ছিলো, অর্থাৎ উমাতারা ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করায় বাধা ছিলো না; কিন্তু সে নিয়ে উমাতারার পিতৃকুল থেকে কোন সাড়াই নেই যদিও উমাতারা নিজেকে রাজার-কন্যা বলেও পরিচয় দিয়েছে। এমনিধারা যুক্তির বাইরেকার অনেক কিছুও গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। কোহিমার রণাঙ্গনে যুদ্ধ থামিয়ে শতদলকে দিয়ে প্রেমের গান গাইয়ে দেওয়া উদ্ভটত্বে বম্বেকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

একমাত্র শেখরের ভূমিকায় দীপক এবং শতদলের ভূমিকায় অনুভা ছাড়া একধার থেকে সবাই বুলি পাঠের মতো সংলাপ আওড়ে গিয়েছেন। এবিষয়ে সবচেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন কাহিনীকার নিজে, রাজকুমারের ভূমিকায় আর অন্যতমা প্রধানা চরিত্র উমাতারার ভূমিকায় নমিতা রায়। সবাইকে জড়িয়ে এমন দুঃস্থ অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না।

৬

অ্যাথলেটিকস

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষ সমর্থনের যোগ্যতা নির্ণয়কল্পে যে নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতা লুধিয়ানাতে হইবে তাহাতে বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাহিনীর এ্যাথলিটগণের নামের দীর্ঘ তালিকাও তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। নামের তালিকা দেখিয়া অন্য সকলে কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন জানি না, তবে আমরা সত্য সত্যই আশ্চর্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। আমরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না ইহারা কোন সাহসে ও কোন নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এই নির্বাচন করিয়াছেন। এই তালিকার মধ্যে এমন সকল এ্যাথলিটদের নাম আছে যাহাদের প্রতিযোগিতা হইতেই অবসর গ্রহণের সময় বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে নিখিল ভারত এ্যাথলিটদের বিভিন্ন বিষয়ের যে মানের বা স্টাণ্ডার্ডের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়াও আমরা বর্তমানে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। মান তালিকা দেখিয়া আমাদের তখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বাঙলার প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় উহা অনুসরণ করা হইবে, কিন্তু বর্তমানে আমরা বলিতে বাধ্য যে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরিচালকগণ কেবল প্রতিযোগীদের প্রাণে উৎসাহ জাগরণের জনাই ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা যদি আমরা বর্তমানে বলি তাহা হইলে কি খুব অন্যায় হইবে? নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মানের সীমানায় পৌঁছিতে পারেন নাই ইহা পরিচালকগণও অস্বীকার করিতে পারেন না। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের স্পোর্টস অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয়েরই প্রতিযোগিতার ফলাফল বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রকাশিত ফলাফলের সহিত মানের বা স্টাণ্ডার্ডের তালিকা যদি তুলনামূলক হিসাবে বিচার করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে অধিকাংশ বিষয়েই মনোনীত এ্যাথলিট মানের সমান করা দূরের কথা তিসীমানায় পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের উক্তির সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

১১০ **মিটার হার্ডল:**—অলিম্পিকের বিজয়ীর ফলাফল হইল:—১৬ ৩/৫ সেকেণ্ড—নিখিল ভারত মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—১৬ সেকেণ্ড।

২০০ **মিটার দৌড়**—অলিম্পিকে বিজয়ীর ফলাফল হইল:—২৩ ২/৫ সেকেণ্ড নিখিল ভারত মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—২৩ সেকেণ্ড।

হপ স্টেপ জাম্প:—অলিম্পিকের বিজয়ীর ফলাফল হইল—৪৪ ফিট ৬ ইঞ্চি। নিখিল ভারত এ্যাথলেটিকসের মানের নির্দিষ্ট দূরত্ব হইল—৪৫ ফিট।

১০০ **মিটার দৌড়:**—অলিম্পিকের বিজয়ীর ফলাফল হইল:—১১ ১/২ সেকেণ্ড। নিখিল ভারতের মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—১১ সেকেণ্ড।

১০০০০ **মিটার দৌড়:**—অলিম্পিক বিজয়ীর ফলাফল হইল—৩৫ মিঃ ১৮ সেকেণ্ড। নিখিল ভারতের মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—৩৪ মিনিট।

৮০০ **মিটার দৌড়:**—অলিম্পিক বিজয়ীর ফলাফল হইল—২ মিঃ ১০ সেকেণ্ড। নিখিল ভারতের মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—২ মিঃ ২ সেঃ।

উচ্চ লম্ফন:—অলিম্পিক বিজয়ীর ফলাফল হইল—৫ ফিট ৮ ইঞ্চি। নিখিল ভারতের মানের নির্দিষ্ট উচ্চতা হইল—৫ ফিট ১০ ইঞ্চি।

খেলাধুলা

৫০০০ **মিটার দৌড়:**—অলিম্পিক বিজয়ীর ফলাফল হইল—১৮ মিঃ ২০ ২/৫ সেকেণ্ড। নিখিল ভারত মানের নির্দিষ্ট সময় হইল—১৬ মিঃ।

ডিসকাস ছোড়া:—অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিজয়ীর ফলাফল—৯৯ ফিট ১০ ইঞ্চি। নিখিল ভারতের মান হইল—১১৫ ফিট।

৪০০ **মিটার দৌড়:**—অলিম্পিক বিজয়ীর ফলাফল হইল—৫১ ৩/৫ সেকেণ্ড। নিখিল ভারত মানের নির্দিষ্ট সময় হইল ৫১ সেকেণ্ড।

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় বাঙলার প্রতিনিধিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পুরুষগণ:—আর স্টেনার (গ্রেণ ক্লাব), আই টি বদিয়ানী (রেঞ্জার্স ক্লাব), এফ ফোর্ড (গ্রেণ ক্লাব), কে পি কার্ভেলো (রেঞ্জার্স ক্লাব), পি সিং (আর্মি) এইচ মল্লিক (মহঃ স্পোর্টিং), লায়েন্স নায়ক জফর সিং (আর্মি), রণজিৎ সিং (আর্মি), মহেন্দ্র সিং (আর্মি), বলাই দাস (২৪ পরগণা), এ কে দত্ত (আই এ ক্যাম্প), এন দাস (আই এ ক্যাম্প), বি দাস (বাগবাজার ইউনাইটেড), কে চ্যাটার্জি (২৪ পরগণা), ল্যান্স নায়েক কাশিম (আর্মি), এ দত্ত (ইস্টবেঙ্গল), এস চক্রবর্তী (আই এ ক্যাম্প), এস মুখার্জি (ইস্টবেঙ্গল), ডি ঘোষ (ইস্টবেঙ্গল), কে ব্যাপটিস্ট (রেঞ্জার্স)।

মহিলাগণ:—মিসেস বাউই (পুলিশ), মিস গল্টলেট (রেঞ্জার্স), মিস নিলীমা ঘোষ (শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান), মিস লাহিড়ী (লরেটো), মিস উইটবেকার (ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব), মিস মর্গ্যান (ওণ্ডারার্স)।

স্কুল বিভাগের স্পোর্টস পরিচালনা

বাঙলার স্কুল বিভাগের খেলাধুলা ও স্পোর্টস পরিচালনার জন্য ১৯৩৩ সালে ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। বৃটিশ সরকারের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জনাই তখন ইহা গঠিত হয়। সেই সকল অতীতের কথার পুনরাবৃত্তি করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম, দেশ স্বাধীন হইবার পর এই সকল যেমন তেমনভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নূতন করিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইবে। তিন বৎসর অতিবাহিত হইল অথচ কিছুই হইল না ইহাতে প্রকৃতই দুঃখিত হইয়াছি বলিলে খুব অন্যায় হইবে না। স্কুলের ব্যাপারে স্কুলের সহিত যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে জড়িত তাঁহাদেরই পরিচালনার ভার গ্রহণ করা উচিত। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমস্ত পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের উপর দিয়াছেন এবং কেবল কলেজের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক আছে তাঁহাদেরই পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলী ঠিক সেইভাবে গঠিত নহে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের স্কুল কলেজের সহিত সম্পর্ক অতীতে ছিল না, বর্তমানেও নাই এমন কি ভবিষ্যতে হইবার পর্যন্ত যোগ্যতা নাই। ইহার জন্য অনেক সময়েই বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের বেশ কিছু দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। বাঙলার শিক্ষা বিভাগের সরকারী দপ্তরের বিশিষ্ট কর্মচারিগণ কেহ কেহ পরিচালকমণ্ডলীতে থাকিলেও ঠিক ইহার দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া উপযুক্তভাবে গঠনের জন্য সেইরূপ প্রয়াস করেন না। ইহার ফলে যাঁহারা একবার কোন এক সুযোগে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আর বাহির হইয়া যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান দিতেছেন না। আইনের অজুহাতে দপ্তর করতলগত থাকায় যাহা খুশী তাহাই করিয়া চলিয়াছেন। নিরীহ স্কুল শিক্ষক বা স্কুল পরিচালকগণ ঠিক ইহাদের সহিত পাল্লা দিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় দপ্তরে স্কুলের সম্পর্কহীন ব্যক্তিগণ থাকায় জেলা কমিটিসমূহ যাহা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে স্কুলের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত তাহারা ঠিকমত কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। ইহার জন্য বাঙলার স্কুলের খেলাধুলা ও ব্যায়ামের যে দ্রুত উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তাহা একেবারেই হইতে পারিতেছে না। গত তিন বৎসর হইল আমরা এই বিষয় সরকারী শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফলকাম হই নাই। কেন হওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা আমরা যে জানি না, তাহা নহে তবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যতে যদি নেহাৎ প্রয়োজন হয় বলিতে বাধ্য হইব।

মহিলাদের বার্ষিক স্পোর্টস

উইমেনস স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত পশ্চিম বাঙলা রাজ্যের মহিলাদের স্পোর্টস অনুষ্ঠান এইবারে আশানুরূপ হয় নাই। প্রতিযোগিতা রাজ্যপাল ভবনের প্রাঙ্গণে হওয়ায় যোগদানকারী মহিলা এ্যাথলিটদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। পরিচালকমণ্ডলী কি বিবেচনা করিয়া এইরূপ অপরিসর স্থানে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে এ্যাথলিটদের সাবলীল ভঙ্গীমায় বাধাপ্রাপ্ত হয় এইরূপ স্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না হইলেই আমরা সুখী হইব। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ফলাফলের উপর নির্ভর করে ইহা পরিচালকদের সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

ক্রিকেট

কমনওয়েলথ ও ভারতীয় দলের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। কমনওয়েলথ দলের বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান ম্যাটা খেলোয়াড় জর্জ ট্রাইব সাংসারিক প্রয়োজনে দল ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করায় ভারতের ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়গণ অনেকখানি আশান্বিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু জয়লাভ খুব সহজে হইবে ইহা আমরা এখনও মনে করি না। ডুল্যাণ্ড ও রামাধীন কমনওয়েলথ দলের সহিত আছেন ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। হায়দরাবাদে ইহাদের বোলিং সাফল্যই কমনওয়েলথ দলকে ইনিংসে বিজয়ী করিয়াছে। হায়দরাবাদ দলে খ্যাতনামা কোন বিশিষ্ট ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন না ইহা সত্য হইলেও কমনওয়েলথ দল শেষ টেস্ট খেলায় রীতিমত লড়িবার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ওরেল এই খেলাতেই ভ্রমণের দ্বিতীয় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। শেষ টেস্ট খেলায় ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। নিম্নে কমনওয়েলথ ও হায়দরাবাদ রাজ্য দলের তিনদিনব্যাপী খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংস:—১৯৭ রান (এ রব্বানি ৫৪, নাসির আলী ৫৬, ডুল্যাণ্ড ৩৩ রাণে ৪টি ও স্যাকলটন ৩৫ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস:—৬ উইঃ ৪০৭ রান (ওরেল ১০২, গিম্বলেট ৫৬, কিশলক ৮০, আইকিন ৫৪, গোলাম আমেদ ১৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান।)

হায়দরাবাদ দ্বিতীয় ইনিংস:—১৩৪ রান (গোলাম আমেদ ৩৮, ইব্রাহিম খাঁ ২৪, হোসেন ২৮, রামাধীন ৫০ রানে ৪টি ও ডুল্যাণ্ড ৫১ রানে ৪টি উইকেট পান।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৯শে জানুয়ারী—আমেদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অদ্যকার অধিবেশনে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের আটটি অনুচ্ছেদ গৃহীত হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অদ্য প্রাথমিক সদস্যদের চাঁদা দেওয়ার রীতি পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ইহা রহিত করা হইয়াছিল। সদস্যগণের দেয় চাঁদার পরিমাণ এখন হইতে এক টাকা হইবে।

অদ্য গৌহাটীতে আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড-এর শাখা অফিসের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সমবেত আসামের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের অতুলনীয় ও নিঃস্বার্থ সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

জাতির বর্তমান সংকট উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেশের সর্বস্তরের অধিবাসীর ঐক্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন, অদ্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস কর্মিগণ সমবেতভাবে কাজ করিলে কংগ্রেসকে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠন করা সম্ভব হইবে।

৩০শে জানুয়ারী—আমেদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে 'ঐক্য প্রস্তাব' উত্থাপন করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, কংগ্রেসের প্রাণশক্তির দ্রুত বিলোপ ঘটিতেছে—সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া কংগ্রেসকর্মীদের বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত ঐক্য প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস গঠনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী—তিনদিন সভার পর অদ্য আমেদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই তিনদিনে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রের মুশাবিদা, ঐক্য প্রস্তাব এবং বনস্পতি বর্জন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের চারিদিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পূর্বে হিন্দু কোড বিলের মূল নীতি সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও সহযোগিতা সম্পর্কে যে সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কালবিলম্ব না করিয়া উহাকে কার্যে রূপদানের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহকে অনুরোধ জানান হইবে।

১লা ফেব্রুয়ারী—আণবিক শক্তি কমিশন ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, উহা হইতে জানা যায় যে, ভারতে প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বেরিল ও মোনেজাইট রহিয়াছে। আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এ সকল খনিজ পদার্থের অবস্থান স্বভাবতঃই গোপন রাখা হইতেছে।

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী মাদ্রাজে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বর্তমানের ছাটাই রেশন কবে পুরা পরিমাণে দেওয়া হইবে, তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই খাদ্যাবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন অদ্য আমেদাবাদে গুজরাট উদ্বাস্তু সম্মেলনে বক্তৃতাকালে বলেন, উদ্বাস্তু সমস্যাকে একটি অতি জরুরী সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য যেভাবেই হউক অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে।

২রা ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীর এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্টের জনৈক প্রতিনিধির মধ্যে চন্দননগরকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার পর ফরাসী পার্লামেণ্ট এই সন্ধিপত্র অনুমোদন করিলেই চন্দননগর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা মহানগরী সমেত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রসংকট চরম আকারে দেখা দিয়াছে। বাজারে মিলজাত বস্ত্রের একান্ত অভাব। ফলে স্বল্প আয়ের লোকদের দুর্দশার সীমা নাই।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশনে ভারতীয় নাগরিক হইবার যোগ্যতা বর্ণনা করিয়া একটি ব্যাপক বিল আনয়ন ও গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের নামকরণ করা হইয়াছে 'ভারতীয় নাগরিক অধিকার' বিল। জানা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্থানের যে সকল উদ্বাস্তু ভারত ইউনিয়নের নাগরিক অধিকার অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহারাও এই বিলের আওতায় পড়িবেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পার্লামেণ্টের কংগ্রেস দলের সভায় জানাইয়াছেন যে, চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া সাধারণ পরিষদে গৃহীত মার্কিণ প্রস্তাবে উল্লিখিত সদিচ্ছা কমিটির সদস্যপদ ভারত গ্রহণ করিবে না।

নিঃ ভাঃ উদ্বাস্তু সমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানীর সহিত উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের যে পত্র বিনিময় হইয়াছে, ডাঃ গিদোয়ানী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ গিদোয়ানী বলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া বর্তমানে তাহা প্রত্যাহার করিতেছেন এবং ইহার ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের ৫০ লক্ষ ব্যক্তির নিকট তাঁহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে জানুয়ারী—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় বৃটেনের বহুপ্রতীক্ষিত নয়া দেশরক্ষা পরিকল্পনার বিবরণ দিতে গিয়া বলেন যে, ১৫ দিনের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগামী গ্রীষ্মকালে রিজার্ভ বাহিনীর দুই লক্ষ ৩৫ হাজার সৈনাকে তলব করা হইবে। মিঃ এটলী ইহাও প্রকাশ করেন যে, ১৯৫৩-৫৪ সালে বৃটেনের ট্যাঙ্ক ও বিমান উৎপাদনের হার চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৮ লক্ষ করা হইবে।

৩০শে জানুয়ারী—অদ্য উত্তর কোরীয় ও চীনা কম্যুনিস্ট ফৌজ অগ্রসর রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড পাল্টা আঘাত হানে।

৩১শে জানুয়ারী—চীনকে কোরিয়ার যুদ্ধে আক্রমণকারী বলিয়া নিন্দা করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা ৪৪—৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদান করিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কম্যুনিস্ট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ৪৪—৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

২রা ফেব্রুয়ারী—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোরিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী উত্তরাভিমুখী অভিযান চালাইয়া যদি ৩৮ অক্ষরেখা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে সেইখানে অভিযান বন্ধ রাখা হইবে।

পাইপিং বেতার হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উত্তর কোরিয়া বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মিঃ কিম চইক গত ৩০শে জানুয়ারী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী চীনকে কোরিয়া আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, কম্যুনিস্ট চীন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। চীন সরকার বলেন যে, এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা অথবা কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভবপর হইবে না।

চীনের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌ এন লাই পিকিং বেতার কেন্দ্র হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কোরিয়া, ফরমোজা আক্রমণকারী এবং ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ভবিষ্যৎ আক্রমণকারী বলিয়া বর্ণনা করেন।

কোরিয়ার পশ্চিম রণক্ষেত্রে চীনাদের পাল্টা আক্রমণে অগ্রগামী রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী হটিয়া যায়। সিউলের প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে অরণ্যসঙ্কুল দেশের মধ্য দিয়া উত্তরাঞ্চলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী যুদ্ধ করিতেছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—অদ্য কোরিয়া রণাঙ্গনে সুওন ও যজুর মধ্যবর্তী নেবু-যুজ-এর ১ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকবর্তী মার্কিণ ঘাঁটিসমূহের সম্মুখে ও পার্শ্বভাগে চীনা সৈন্যরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।॰ আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥॰

পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥॰ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড. ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]　　শনিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।　　Saturday, 17th February 1951.　　[১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা

গত ২৫শে মাঘ হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশনের উদ্বোধনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে। মোটামুটিভাবে ডক্টর কাটজুর বক্তৃতার আগাগোড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে একটা প্রশস্তির ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের ফলোপধায়কতা সম্পর্কে তাহাতে বেশ একটু আত্মতৃপ্তি বা সন্তুষ্টির সুরই বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের দিক হইতে এতৎসম্পর্কে আশ্বস্তির কারণ সত্যই সৃষ্টি হইয়াছে কি না ইহাই বিচার্য। ডক্টর কাটজুর বক্তৃতা অনুসারে দিল্লী-চুক্তির ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে ৩৫ লক্ষ নরনারী উদ্বাস্তু-স্বরূপে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে ১২ লক্ষ পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে। সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গ হইতে ১১ লক্ষ মুসলমান পূর্ব-বঙ্গে গিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের প্রদত্ত এই হিসাবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা এক্ষেত্রে আলোচনা উত্থাপন করিতে চাহি না। আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, পশ্চিম-বঙ্গ হইতে যে ১২ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে সত্যই তাহারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই সম্প্রতি উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি পুনর্দখলে এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান জারী করিয়াছেন। আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গে এই বিধান কার্যকর করিবার পক্ষে বিশেষ কোন অন্তরায় ঘটিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিম-বঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার ভাব মানসিক একটা সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারে নাই; কিন্তু পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধে সে কথা প্রযুক্ত নহে। 'হিন্দু-মুসলমান' ভাই ভাই, পাকিস্থানে এক ঠাঁই' এই ধরণের কথা পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর মুখে গত কয়েক সপ্তাহে আমরা স্থানে স্থানে অবশ্য শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু পাকিস্থান মুসলমান রাষ্ট্র মুসলমানেরই সেখানে প্রভুত্ব এবং প্রাধান্য, পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূলে এই সংস্কারের জট সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে গভীরভাবে পাকাইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে স্থায়ী করিবার এই মনোভাব করাচীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনে স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মবিশেষকে ভিত্তি করিয়া ভেদবাদের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার এমন চেষ্টা এ যুগে শুধু পাকিস্থানেই সম্ভব হইতেছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য মাঝে মাঝে উপর-টপকা ধরণের আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ীভাবে কতটা নিরসন হইবে, এ সম্পর্কে আমাদের মনে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি পুনর্দখলের প্রশ্নে সে সংস্কার কার্যতঃ প্রতিবেশের মধ্যে স্থানীয় প্রতি-কূলতা সৃষ্টি করিবে এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কারে প্রভাবিত সরকারী কর্মচারীদের বিচারবুদ্ধি তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্টই রহিয়াছে। বস্তুত পূর্ববঙ্গের সমাজ-সংস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্র-দায়িক সম্প্রীতির ভাব এখনও বাষ্পীয় আকারেই রহিয়াছে; পরন্তু তাহা বাস্তব স্বার্থে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রত্যুত বাহির হইতে একটু আলোড়ন-বিলোড়নেই আবার ইহা ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটির বিচার সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর এবং সুনির্ধারিতভাবে ব্যাপক আকারে করিতে হইবে।

উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের সমস্যা

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপালের উক্তি হইতে একটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়া-ছেন, পুনর্বাসন ব্যাপারে উদ্বাস্তুগণ নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোগী হইয়াছে। রাজ্যপালের মতে এই কাজে তাহারা সরকারের সাহায্যও লাভ করিয়াছে। বস্তুত উদ্বাস্তুদের কয়েকটি স্থল হইতে উৎখাত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এই উক্তি সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন

উঠিবে। রাজ্যপাল ডক্টর কাটজুও প্রশ্নটি একেবারে এড়াইয়া যান নাই। তাঁহার মতে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু অনভিপ্রেত উপায়ে কোন ব্যক্তির অথবা সরকারের জমি ও গৃহ দখল করিয়াছে, ইহাতে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ, লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত আছে। তবে কি নিরাশ্রয়, নিঃস্ব এইসব উদ্বাস্তুদিগকে নির্দয় এবং নিষ্ঠুরভাবে উৎখাত করিয়াই সরকারের সে কর্তব্য প্রতিপালন করা উচিত? ডক্টর কাটজু ইহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মানবতার উপরই সমাজের স্থিতি এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থসাধনে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গতি নির্ভর করে। আইন ও শান্তিরক্ষার নামে সেই নৈতিক আদর্শ যদি লঙ্ঘিত হয়, তবে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয় এবং জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা হইতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভয়াবহ হইয়া পড়ে। সুখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃপক্ষে ডক্টর কাটজুর বক্তৃতা হইতে আমরা তেমন পরিচয় পাইয়াছি। ডক্টর কাটজু বলিয়াছেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিলে, তাহাদের পক্ষে অশেষ দুর্গতির কারণ হইতে পারে। আমরা বলিব, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে এবং অবিবেচিতভাবে আইনের বিধান উদ্বাস্তুদিগকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেসব কথা উত্থাপন করিয়া এখন আর কিছু লাভ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য একটি আইনের খসড়া উত্থাপন করিতেছেন। ইহার স্বরূপ কি এখনও জানা যায় নাই, অথচ এ সম্বন্ধে নানা রকমের কথা শুনা যাইতেছে। আমরা আশা করি, এই ক্ষেত্রে জাতির বৃহত্তম স্বার্থের দিকে তাকাইয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে জমির মালিকদের অনুচিত অর্থগৃধ্নুতা সংযত করিতে তাঁহারা সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পরিত্যক্ত, পতিত এবং এতৎকাল পর্যন্ত যেসব স্থান মনুষ্যাবাসের অযোগ্য অবস্থায় ছিল, সেগুলি স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বাঙালী জাতির এই সঙ্কটের সময় ক্ষুদ্র স্বার্থের যাহারা দাস, দেশের দুর্দশা লইয়া যাহারা ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার কোন প্রশ্নই উঠে না—সোজা কথা ইহাই।

কোটিপতির কি ভয় আছে

ভারত সরকারের সার-সংক্রান্ত বিভাগের ডিরেক্টরকে ভাগ্যবান পুরুষ বলিতে হইবে। তিনি এক কোটি টাকা গায়েব করিয়া স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়িয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের দুর্নীতি দমন বিভাগ নামে একটি বিভাগ অছে। সার-বিভাগের এই কর্তা ব্যক্তিটির কৃতিত্ব কিন্তু সেই বিভাগের কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে ধরা পড়ে নাই। বাহির হইতে একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি গভর্নমেণ্টকে এই কথা জানান যে, তিনি সার বিভাগের ডিরেক্টার শ্রী সি ডি স্বামীকে উৎকোচ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ভদ্রলোক যদি না জানাইতেন, তবে কৃষি বিভাগের এই এক কোটি টাকা লোপাটের ব্যাপারটা একেবারেই চাপা থাকিয়া যাইত। চুরির ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে যোগসাজস কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ইহাতেই বোঝা যায়। এত বড় একটা চুরি যখন ধরা পড়িল, তখন সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল সে কাহিনী আরও বিচিত্র। চোর যে, আইনত তাহাকে দণ্ডবিধান করাই কর্তব্য; কিন্তু কোটি টাকা যিনি এমন স্বচ্ছন্দে সরাইতে পারেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। এই সার সত্য উপলব্ধি করিয়া কৃষি বিভাগের মন্ত্রী তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কৃষি মন্ত্রী শ্রী মুন্সীজীর মুখেই প্রকাশ, সার ক্রয়-বিক্রয় লইয়া দুর্নীতির খেলা চলিয়াছিল বৎসরকাল ধরিয়া। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেশ্যাল পুলিশ এ সম্বন্ধে তদন্ত করে, তদন্ত করিয়া প্রমাণও পায়। কিন্তু তথাপি স্বামীজীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয় নাই; কারণ, সাক্ষীরা আদালতে তাহাদের কথা ঘুরাইয়া লইতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিল। অপরাধী যদি কোটিপতি হয়, তবে এমন সম্ভাবনা সত্যই থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরাধীকে অভিযুক্ত করা হইবে না, ন্যায় বা নীতির ক্ষেত্রে এমন যুক্তি একেবারে অদ্ভুত। যাহা হোক, সার বিভাগের ডিরেক্টরের নামে ফৌজদারী মামলা আনা হইল না, বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হইল। এই যে তদন্ত, ইহা আরও বিচিত্র। তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিটি এ সম্বন্ধে শ্রীস্বামীর মত জানিতে চাহিয়া তাঁহার নিকট এক আরজী পেশ করিলেন। স্বামীজী অনুগ্রহ প্রকাশে এই উত্তর দিলেন যে, বিভাগীয় তদন্ত না চালানোই ভাল। কমিটি সে আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং স্বামীজীকে বরখাস্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিলেন। বলা বাহুল্য, অপরাধী শ্রীস্বামী যে এক্ষেত্রে তদন্ত না হয়, ইহা চাহিবেন, ইহার কারণ সুস্পষ্ট; কারণ, তদন্ত বিশেষভাবে পরিচালিত হইলে এই ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহার আরও অনেক কীর্তি প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং কৃষি বিভাগের ভিতরকার অনেক রহস্য উন্মুক্ত হইত। বিভাগীয় তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিটি ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যে কেন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন ইহা রহস্য বিশেষ। এই ব্যাপারে শ্রীস্বামীও দৈবক্রমে ধরা পড়িয়াছেন; কিন্তু অপরাধী তিনি যে একা নহেন, আরও অনেকে যে ইহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু আর কাহারো সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে কেবলমাত্র সরকারী বিরক্তির কথা জানানো হইয়াছে। জনসাধারণের অর্থ লইয়া সরকারী দুর্নীতি এবং তাহার প্রতিকারে এই ধরণের শৈথিল্য আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে। ফলতঃ শ্রীস্বামী এবং তাঁহার সঙ্গে যোগ-সাজসে যাঁহারা এইরূপ কুকার্য করিয়াছেন, শুধু তাঁহাদিগকেই আমরা এজন্য দায়ী করিব না, যাঁহারা অপরাধীদের সাজা দিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও এই কার্যের জন্য দায়ী করিব—আমরা বলিব, যে বিভাগে এত বড় চুরি চালানো সম্ভব হইয়াছে, সেই বিভাগের কার্য পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর সেই মন্ত্রীরাও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে এজন্য দায়ী।

সমস্যার প্রকৃত প্রতীকার

ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। খাদ্য সম্পর্কে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার যে মেয়াদ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। খাদ্যের জন্য ভারতকে এখনও বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। এই অবস্থা কতদিন চলিবে? ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত মুন্সী সম্প্রতি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশব্যাপী চেষ্টা চলিলে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৬ লক্ষ গাঁইট তুলা এবং ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন করিয়া আমরা আমাদের নির্ধারিত কৃষিপণ্য উৎপাদনের কর্মসূচীকে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হইব। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দেশব্যাপী যদি চেষ্টা চলে, তবেই এ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে, মুন্সীজীর উক্তির মধ্যে এই একটি সর্ত রহিয়াছে। কিন্তু দেশব্যাপী সেই যে চেষ্টা তাহা দিল্লীর সরকারী দপ্তরের কাগজপত্রের হিসাবের প্রভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। দেশের জনসাধারণের আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার উপর তাহা নির্ভর করে। এ পক্ষে মুন্সীজীর পরামর্শ এই যে, দেশের সর্বত্র এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যে, যাহাতে যে চাষী সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল উৎপন্ন করিবে সে যেন জাতি ও গভর্নমেণ্টের নিকট বীর ও শান্তি-সেনারূপে যুদ্ধাগত সৈনিক বা রাজনীতিবিদ্ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদা লাভ করে। মুন্সীজীর কথার মর্ম এই যে, কৃষি পণ্য

উৎপাদনে সমগ্র জাতির প্রচেষ্টাকে সংহত করিয়া এক নূতন পারিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সমস্যা তো এইখানেই। এই যে পরিবেশ, কি করিয়া তাহার সৃষ্টি হয় এবং কৃষি-পণ্য উৎপাদনে জাতির স্বার্থবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করার সেই যে প্রেরণা জাতির মধ্যে তাহা জাগে কেমন করিয়া? আমাদের মতে এ সম্বন্ধে সরকারী যেসব প্রচেষ্টা তাহা জাতির অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে যত আলোচনা এবং গবেষণা বা উপদেশ সবই ফাঁকা হইয়া পড়িতেছে। জাতির মনে ঝাঁকা লাগে, এমন শক্তির পরিচয় সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, জনচিত্তের সঙ্গে সংবেদনশীল উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, জাতির যাঁহারা নেতা, বৈদেশিক বিভাগে অথবা বিশ্বশান্তি রক্ষার চিন্তাতেই তাঁহারা যেন অতিরিক্ত আগ্রহসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা আমরাও স্বীকার করি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বাড়ে, ইহারও অবশ্যই মূল্য আছে; কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ভিখারীর সম্মান কোনদিনই মিলে না। যাহারা নিজেরা দুর্বল, তাহাদের মুখে বিশ্বশান্তির কথায় কার্যত মূল্য বর্তে না, পরন্তু তাহাদিগকে বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে অতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামকালে জনগণের অন্তরে নেতৃবৃন্দের শক্তির যে প্রেরণা তাহাদের প্রাণে যে উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল, আজ তাহা নিভিয়া গিয়াছে। আমাদের অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিকার সাধনে তাহাদের প্রাণশক্তি আর তেমন করিয়া কাজ করে না; বাস্তবিকপক্ষে সংগ্রামের ভিতর দিয়াই প্রাণশক্তির বিকাশ হয়। এই সংগ্রামের প্রেরণা এখন আর নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহার সঙ্গে সংগ্রাম! তখন ইংরেজ ছিল, এখন তো তাহারা নাই; কিন্তু ইংরেজ নাই বলিয়া যে সংগ্রামের ক্ষেত্র নাই, একথা আমরা স্বীকার করি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্য কথায় জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যাহারা অন্তরায় ঘটাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যাহারা দুর্গত দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র, সকল ক্ষেত্রে সংগ্রাম, মান, যশ প্রতিষ্ঠাকে যাহারা বড় বলিয়া বুঝিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সেবার আদর্শের সংগ্রাম। দেশব্যাপী সংগ্রামের সেই প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়াই জাতিকে নূতন করিয়া গঠন করা সম্ভব হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পরলোকে যোগেশ চৌধুরী

গত ২৭শে মাঘ শনিবার স্বদেশী যুগের স্বনামধন্য জননায়ক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পরলোকগমন করিয়াছেন। ব্যবহারজীব স্বরূপে শ্রীযুত চৌধুরী এক সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে বাঙলা দেশের রাজনীতিক, সামাজিক এবং আর্থিক উন্নয়নের জন্য জে চৌধুরী বহুভাবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তীক্ষ্ণধী, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী এবং উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার মর্যাদাবোধ অতি প্রবল ছিল এবং কোনরূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুত চৌধুরী ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী স্বরূপে অন্যতম অগ্রণীর স্থান অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার এবং বিদেশী বর্জনের প্রতি পূর্ব হইতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির উদ্যোগে কলিকাতায় স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। ডন সোসাইটির সে যুগে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া বাঙলা দেশে একদল দেশ সেবক কর্মী তখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। শ্রীযুত চৌধুরী এই প্রথম স্বদেশী প্রচলন চেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সঙ্গে কলিকাতায় সর্বপ্রথম যে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, শ্রীযুত চৌধুরী তাহা সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার পর এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে সব যুবক অন্তরীণ আবদ্ধ ছিলেন, শ্রীযুত চৌধুরী তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেন। তিনি সুদীর্ঘ এবং স্বদেশ সেবায় সার্থক জীবন অতিবাহিত করিয়াই পরলোকগমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী যুগের বাঙালী নেতৃত্বের মনীষার ধারাটি হইতে বাঙলা দেশের অন্তরের যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং বাঙলায় গণ-নেতৃত্বের ইতিহাসের এদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতিনিষ্ঠ পুরাপুরি স্বাদেশিকতার আদর্শোজ্জ্বল এক অধ্যায়ের অবসান ঘটিল! আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

নেপালের নূতন শাসন

নেপালে নূতন শাসনের যুগ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় কাহারা আসন গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারত সরকার বিশেষভাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলালের চেষ্টার ফলেই এত শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। তিন মাসকাল নেপালের বাহিরে অবস্থান করিবার পর নেপালাধীশ ত্রিভুবন বিক্রম শাহ কাঠমাণ্ডুতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার সম্পর্কে দুই একদিনের মধ্যেই তিনি ঘোষণা প্রদান করিবেন। মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েকটি বিভাগের ভারই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হইতেছে, ইহা আরও সুখের বিষয়। নেপালের জনসাধারণ যেরূপ উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে নেপালাধীশকে এবং নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই গণতান্ত্রিক শাসন-সম্প্রসারণে তাঁহাদের আনুকূল্য সূচিত হইয়াছে এবং নেপালীরা গণতান্ত্রিক অধিকারলাভে এখনও যোগ্যতা অর্জন করে নাই, সুতরাং মধ্যযুগীয় সামন্ত-নীতিই সেখানে অন্তত কিছুকালের জন্য বলবৎ রাখা উচিত, এইরূপ মতবাদ যাঁহারা পোষণ করিতেছিলেন তাঁহাদের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা সুদীর্ঘকাল স্বৈরাচারমূলক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি; সুতরাং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেপালের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ যে বৈপ্লবিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা সর্বতোভাবে তাহার সমর্থন করিয়াছি। এজন্য নেপালে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এই উপক্রম এবং স্বৈরাচারমূলক শাসনের অবসান-পর্বের সমারম্ভে আমরা সত্যই আনন্দ বোধ করিতেছি। আমাদের আশা আছে, এই উদ্যম অল্পকাল মধ্যেই গণপরিষদ গঠনের ভিতর দিয়া পূর্ণতা লাভ করিবে। স্বাধীনতার পিপাসা জাতির মধ্যে একবার যদি জাগিয়া উঠে, তবে পশুশক্তি যতই প্রবল হোক্ না কেন, তাহাকে পিষ্ট করিতে পারে না; নেপালেও এই সত্যের অন্যথা ঘটিবে না। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে দোষ-ত্রুটি যদিও কিছু থাকে, স্বাধিকার বোধে জাগ্রত জনশক্তির প্রভাবে তাহার প্রতিকার সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।



প্রাচীন পারসিক হইতে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

প্রণয়ের কাক-জ্যোৎস্না! বুঝিতে পারিনা,
বুঝিতে পারিনি সত্য, ভালোবাসো কিনা!
অধরে ঊর্বশী হাসে, নয়নে অতলা
শিশিরিত পদ্মদলে লক্ষ্মী অচপলা।
চরণে যখন বাজে রতির নূপুর,
বুকভাঙা হতাশ্বাস কাণে আনে দূর
নিখিল বিরহীজন সম্মিলিত শ্বাস,
রক্তে শুনি বেদনার সমুদ্র উচ্ছ্বাস।
নটী তুমি, সখী তুমি, পূর্ব জনমের
কামনার মন্ত্রপড়া অলব্ধা প্রেয়সী,
নিষ্ঠুর লীলায় ডাক দাও সমুদ্রের
মণি-জ্বালা ঊর্মিদলে তুমি পূর্ণশশী।

সুরাসায়রের তুমি উচ্ছ্বসিত ফেণা,
চিরস্মরণের বৃন্তে তুমি যে অচেনা॥

২

তুমি আধুনিকা সখী, নিত্য পুরাতন,
সদ্য বিকশিত এই পদ্মের মতন,
আজিকার বৃন্তপরে উঠেছ ফুটিয়া
তবু তব মর্মকথা আছে বিজড়িয়া
কত দীর্ঘ ছায়ালোকে রচি ইতিহাস;
কত প্রমোদের স্মৃতি, কত হতাশ্বাস
সুদীর্ঘ মৃণাল বাহি নেমে গেছে নীচে
মানব মানস-সর যুগান্তের পিছে।

একে একে দলগুলি খুলি কমলের
চির নব নব বেশ। তব স্বরূপের
অন্ত যে না পাই সখী, কভু শকুন্তলা,
দময়ন্তী, মালবিকা, স্খলিত অঞ্চলা
স্বর্গের কলঙ্কবাহী আদিম ঊর্বশী;
তোমার মৃণাল কোথা রহিয়াছে পশি।

৩

তরঙ্গ-উল্লোল সিন্ধু চন্দ্রেরে না পায়,
শুধু মাথা কুটে মরে মাটির খাঁচায়
আবদ্ধ গরুড় সম; আত্মা আপনার
ঊর্ধ্বপানে প্রক্ষেপিয়া সপ্ত পারাবার
আকাশে কি সৃষ্টি রচে! কত বর্ণ তাহে,
কত ঢেউ, কত লীলা, উদ্দাম প্রবাহে
কি দুরন্ত ফেণিলতা দ্বীপপুঞ্জ ঘেরি;
আকাশের মেঘ সে যে আত্মা সমুদ্রেরি!

আমার কবিতা সখী আমারি প্রক্ষেপ,
ছন্দের গরুড় মোর করেছি উৎক্ষেপ
ওই সুধা অপহারে; 'পাবো না, পাবো না'
'পেয়েছি, পেয়েছি' সাথে হয়ে গেছে বোনা
শিল্পের কল্পনাজালে। আমি না পেলেম
তোমারে পেয়েছে সখী আমার যে প্রেম॥

বৈদেশিকী

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ভারতে খাদ্যশস্য সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব করে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট অনুমোদন চেয়েছেন। অনেকদিন ধরেই ভারত গভর্নমেণ্ট আমেরিকা থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের অভিপ্রায় ছিল এরূপ সর্তে মাল সংগ্রহ করা যাতে দামটা সব নগদ একসঙ্গে দিতে না হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসের নিকট যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন তাতে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য হিসাবে দেওয়ার কথা আছে। (কী কী সর্তে এই সাহায্য দেওয়া হবে পরে তার উল্লেখ করছি। তার) আগে একটা কথা বলা আবশ্যক --সেটা হোল মার্কিন কংগ্রেসের নিকট ট্রুম্যান সরকারের প্রস্তাব প্রেরণের সময় নির্বাচন নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট অনেকদিন ধরেই আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। ইচ্ছা করলে মার্কিন গভর্নমেণ্ট বহু পূর্বেই এ বিষয়ে যা একটা কিছু করতে পারতেন। বিলম্বের হেতু সম্বন্ধে হয়ত বলা হবে যে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট ভারতে প্রকৃত খাদ্য পরিস্থিতি কী সেটা জানবার অপেক্ষায় ছিলেন, এখন সেটা জেনে কর্তব্য স্থির করেছেন। কিন্তু ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করার জন্য এতদিন অপেক্ষা করার কোনো সত্যকারের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। যা জানবার তা মার্কিন সরকার অনেক আগেই জেনেছিলেন বা জানতে পারতেন। মজার ব্যাপার হোল এই যে, আমেরিকার সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে ভারত গভর্মেণ্টের নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা চরমে উঠার সুযোগ দিয়ে তবে ট্রুম্যান সরকার মার্কিন কংগ্রেসের নিকট ভারতে খাদ্যশস্য সাহায্য পাঠবার প্রস্তাব পাঠালেন। মঃ স্ট্যালিন ও মিঃ এ্যাচিসনকে ব্যাক্তিগতভাবে চিঠি লিখে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক কোরিয়া সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টার অব্যবহিত পরে একবার সরকারী আমেরিকা এবং আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি ভারত গভর্নমেণ্টের ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তারপর কিছুদিন আসর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। পরে যখন কোরিয়ায় ভারত গভর্নমেণ্টের পূর্বের সাবধান বাণী ফলতে থাকে এবং ম্যাক-আর্থার বাহিনীর একটার পর একটা পরাজয় ঘটতে থাকে ও চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকার জনমতকে ক্ষেপিয়ে তোলা হতে থাকে তখন আবার নূতন করে ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু হয়। বিশেষ করে যখন একদিকে মার্কিন গভর্নমেণ্ট ইউনোকে দিয়ে চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে চেষ্টিত হলেন এবং অন্য দিকে ইউনোতে ভারত গভর্নমেণ্টের চেষ্টা হোল কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি ও সুদূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য চীনের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপোষ আলোচনার ভিত্তি স্থাপন, তখন আমেরিকার লোকচক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের নীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার সর্ববিধ চেষ্টা হতে লাগল। লণ্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্সের সময় পর্যন্ত কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে কেউ কেউ কোরিয়া সমস্যা ও চীন সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গীর মোটামুটি সমর্থক ছিলেন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরে মার্কিন গভর্নমেণ্টের চাপে লেক-সাকসেসে তাঁদের প্রতিনিধিরা সকলেই অন্য সুরে কথা বলেন। একমাত্র ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিই শেষ পর্যন্ত স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ না করে মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ইচ্ছা করলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গভর্নমেণ্ট ভারতে খাদ্যশস্য সাহায্য পাঠবার প্রস্তাব পূর্বেই মার্কিন কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত করতে পারতেন অর্থাৎ যখন আমেরিকার জনমতকে ভারত গভর্নমেণ্ট বিরোধী সমালোচনার দ্বারা উত্তেজিত করার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কিন্তু তা না করে ট্রুম্যান সরকার ভারতে খাদ্যশস্য পাঠাবার প্রস্তাব কংগ্রেসের নিকট পাঠালেন তখন, যখন সবেমাত্র ভারতীয় গভর্নমেণ্ট ইউনোতে মার্কিন গভর্নমেণ্টের নীতির সর্বপ্রধান (রুশ ব্লকের কথা বাদ দিয়ে) প্রতিপক্ষের ভূমিকা গ্রহণের কর্তব্য পালন করেছেন। (এরূপ সময় নির্বাচনের নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে।)

মার্কিণ কংগ্রেস চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার জন্যে ইউনোকে সুপারিশ জানিয়ে ছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট সেই সুপারিশের মর্যাদা না রেখে মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। সেই রাগে মার্কিন কংগ্রেস ভারতে খাদ্য সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব অনুমোদন করতে না পারেন--প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মনে এরূপ কোনো আশঙ্কা আছে বলে ভাববার কোনো হেতু দেখি না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চান বলে মনে হয়। একদিকে তাঁর প্রস্তাবের সর্তগুলি এরূপ যে, তাতে কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ আদৌ কঠিন হবে না, অপরদিকে ভারত গভর্নমেণ্টের সহিত মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও যে মার্কিন সরকার কিরূপ উদার সেটা প্রমাণ করার একটা সুযোগ হবে। লেক-সাকসেস-এ মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের ভোট দেবার পরেও আমেরিকা ভারতে দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য দান করতে প্রস্তুত, ভারত গভর্নমেণ্ট ও ভারতের জনমতের উপর এর সম্ভাব্য "নৈতিক" ফলের হিসাব নিশ্চয়ই ট্রুম্যান সরকার করছেন।

প্রথম কথা, মার্কিন গভর্নমেণ্টকে যে সাহায্য দিতে চাচ্ছেন আমেরিকার সঞ্চিত ভাণ্ডারের তুলনায় তা অতি নগণ্য। আমেরিকা এত জমিয়েছে যে, ১০ লক্ষ ২০ লক্ষ টন কেন, ১০ কোটি ২০ কোটি টন পাঠালেও আমেরিকানদের গ্রাসে একটি কণাও কম পড়বে না। বরঞ্চ কিছু বাইরে গেলে আমেরিকার বাজারে ব্যবসায়ীদের একটু সুবিধা হতে পারে। তা সত্ত্বেও ট্রুম্যান সাহেব এখন ১০ লক্ষ টনের বেশি দিতে চাচ্ছে না। এর একটা উদ্দেশ্য হতে পারে এই যে, ১০ লক্ষ টন দিয়ে দেখা যাক ভারত গভর্নমেণ্টের নীতি কোন পথে যায়। এই ১০ লক্ষ টন "দান" হিসাবে দেওয়াতে এর "নৈতিক" চাপের গুরুত্ব বাড়বে। ভারত গভর্নমেণ্টের মনে তখন এই ভাবটা কাজ করতে থাকবে যে কী ভাবে চললে প্রয়োজনীয় বাকী ১০ লক্ষ টনও দান হিসাবে পাওয়া যাবে। তারপর "দানের" যে সমস্ত সর্ত হচ্ছে তার ভিতর দিয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের হালচালের উপর সর্বদা নজর রাখার সুবিধা হবে এবং ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে যার প্রভাব থেকে ভারতের বৈদেশিক নীতির সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা কঠিন হবে। (মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে যে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমেরিকা থেকে আসবে মার্কিন জাহাজে তার আনবার খরচ (অনুমানিক ১০ কোটি টাকা) ভারত গভর্নমেণ্টকে দিতে হবে।) ভারতবর্ষে পৌছবার পরে মালের বণ্টনও আমেরিকা থেকে প্রেরিত "ইকনমিক কো-অপারেশন এ্যাডমিনস্ট্রেশনের" একটি "মিশনের" তত্ত্বাবধানে হবে। আমেরিকার এই দানের খাদ্যশস্য এখানে বিক্রয় করে সেই টাকা ভারত গভর্নমেণ্টকে একটি আলাদা তহবিলে জমা রাখতে হবে, যাতে উহা ভারতীয় কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য ব্যয়িত হতে পারে। সম্ভবত এই সকল পরিকল্পনাও মার্কিন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হবে। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন খয়রাতি মালের ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের ব্যয় ও ব্যবহারের ভার বিশ্বাস করে নেহরু গভর্নমেণ্টের উপর ছেড়ে দিতে রাজী নন। চীনে, গ্রীসে, ফিলিপীনে মার্কিন "দানের" ইতিহাস স্মরণ করে যদি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই ব্যবস্থা প্রস্তাব করে থাকেন তবে তা থেকে পণ্ডিত নেহরুর প্রতি মার্কিন গভর্নমেণ্টের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। মার্কিন ব্যবসায়ীদের দিক থেকে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের প্রস্তাবের বেশ একটা লোভনীয় দিক আছে। আমেরিকার জাহাজ ব্যবসায়ীরা ১০ কোটি টাকার মাশুল আদায়ের সুযোগ পাবে।

১০।২।৫১

ইন্দ্রজিতের আসর

একটি অনতিবৃহৎ পল্লীর প্রত্যন্ত প্রদেশে আমার গৃহ। আমার বাড়ির ঠিক পেছন দিকটাতে একটি বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বোধ-করি দু'মাইলের মধ্যে কোনো লোকালয় নেই। নতুন যায়গায় আমি অমনিতেই দিগ্বিদিকজ্ঞান-শূন্য অর্থাৎ কোন্‌টি পূব কোন্‌টি পশ্চিম ঠিক চিনতে পারিনে। আর দিগন্ত বলে যে একটা জিনিস আছে সে কথা কতকাল ভুলে গিয়েছি তার ঠিক নেই। বহুদিন বন্ধ যায়গায় থেকে থেকে এই উন্মুক্ত প্রান্তরটিকে বিধাতার দান বলে মনে হচ্ছে। এটি আমার কাছে এক মহামূল্য সম্পদ।

চোখ দুটোকে বহুদূরে ছড়িয়ে দিতে পারার মধ্যে ভারি একটি স্নিগ্ধ আরাম আছে। অথচ এখানটায় খুব যে একটা সবুজের আভাস আছে এমন নয়। রুক্ষ পাথুরে জমি। লাল মাটির সরু পায়ে চলা পথ। এ যেন প্রকৃতি দেবীর গেরুয়া বসন। সন্ন্যাসিনী মূর্তি। বাঙলা দেশের বাইরে কোথাও কোথাও প্রকৃতির অত্যন্ত কঠোর মূর্তি দেখেছি, সে যেন কাপালিকের মূর্তি। কিন্তু এর যে কাঠিন্য সেটা মনকে পীড়া দেয় না। এর মধ্যে বিশেষ একটি শ্রী আছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরা সন্ন্যাসিনীর যেমন নিরাভরণ মূর্তি, এও তেমনি। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাল গাছের সারি। তাল গাছ দেখতে এমন কিছু সুদৃশ্য নয়; কিন্তু ঠিক এই স্থানটিতে এদের যে কি সুন্দর মানিয়েছে কি বলব। সংখ্যায় শক্তি বৃদ্ধি পায় শুনেছিলাম, কিন্তু সংখ্যায় যে সৌন্দর্য-বৃদ্ধি পায় এই প্রথম আমি দেখলুম। মাত্র একটি দুটি তাল গাছ হলে এরা এই স্থানটির তালভঙ্গ করত, এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে নিশ্চয় খুব বেখাপ্পা লাগত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ' দুই তিন তাল গাছ মিলে শুধু যে এর শ্রীবৃদ্ধি করেছে এমন নয়, একে বিশেষ একটি চরিত্র দান করেছে। গাছগুলি দৃষ্টিকে ব্যাহত করে না বরং আরো দূরে আহ্বান করে।

আমি নিচু নায় যেমন শরীরটাকে এলিয়ে দিই, মনটাকে তেমনি এই খোলা প্রান্তরে এলিয়ে দিতে পারি। সারাদিন কাজের ধাঁধায় মনটা কুণ্ঠিত কুঞ্চিত হয়ে থাকে। এই অবারিত মাঠের মধ্যে চোখ দুটোকে অবাধে দৌড় করিয়ে আনা যায়, সেই সঙ্গে মনটাকেও। চোখ এবং মন দুই এরই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। সত্যি এর মধ্যে বেশ একটি গোপন শুশ্রূষা আছে। আর কিছু না হোক এই বাড়িটিতে এসে অবধি আমার যে দূরদৃষ্টি কিঞ্চিৎ বেড়েছে একেবারে কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল বেশির ভাগ লোক যে দূরদৃষ্টি শূন্য সে কি খামোকা হয়েছে? চতুর্দিকে দেয়ালবেষ্টিত হয়ে থাকলে দূরদৃষ্টি আসবে কোত্থেকে? চোখের দৃষ্টি যেখানে আবদ্ধ মন সেখানে নিভ্রান্ত। দৃষ্টি সংকীর্ণ হলে মন সংকীর্ণ হতে বাধ্য। আমার এ পাশের এবং ও পাশের প্রতিবেশী গৃহ যদি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকে আমার চোখের আড়াল করে রাখে তবে তাঁদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক আমি বজায় রাখব কেমন করে? প্রীতির সম্পর্ক কি শুধু মানুষের ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে? সঞ্জীববাবু বললে কি হবে, আমি যখন যেখানে থেকেছি আমার প্রতিবেশী-দের সজ্জন ব্যক্তি বলেই জেনেছি। কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে তাঁদের গৃহের দেয়াল এবং গৃহসংলগ্ন গাছপালা। এদের ব্যবহার মোটেই সৌজন্যসম্মত হয়নি। চোখ মেললেই যার গায়ে চোখ ঠেকে যায় তাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। চক্ষুশূল আর কাকে বলে?

ভেবে দেখলুম যে সামান্য কটি জিনিসের জন্য আমি বিধাতার কাছে যথার্থই ঋণী এই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠটি তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের কাছে আমি যে পরিমাণ ঋণী বিধাতার কাছে সে পরিমাণে নই। তার কারণ মানুষের কাছে যখন যা চেয়েছি তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছি। আর বিধাতার কাছে যেসব বর প্রার্থনা করেছিলাম তার বেশির ভাগই অপূর্ণ থেকে গেছে। অবশ্য খুব বেশি চাইতে সাহসও হয়নি। বিজ্ঞজনের কাছে শুনেছি বিধাতা বড় কড়া মহাজন। ওঁর ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে হয়। আমি আমার ঋণ গ্রহণ করতেই জানি, শোধ করতে জানিনে। মানুষের ঋণের আইন কানুন আছে, আদালত আছে। তেমনি আবার আইন ফাঁকি দেবার জন্য উকিল আছে। কিন্তু বিধাতার ঋণ কি করে শুধতে হয় কিম্বা শোধ না করলে কি শাস্তি হয় এসব আমার জানা নেই। ও পারের আইন আদালত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট। এ সব কারণে আমি পারৎ পক্ষে বিধাতার কাছে ঋণী থাকতে চাইনে।

অন্তত এই ব্যাপারে খুব যে বেশি দিন ঋণী থাকতে হবে এমন মনে হচ্ছে না। কিছু-দিন ধরে এদিকটাতে লোকজনের খুব আনা-গোনা দেখছি। শুনতে পেলুম এ সমস্ত যায়গাই বিক্রি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ইঁট কাঠ লোহালক্কড়ের লরী একটি দুটি করে আসতে শুরু করেছে। বিধাতার দেওয়া এই সামান্য সুখটুকুও কপালে সইল না। ধন নয় মান নয়, শুধু একটি ভাল বাসা চেয়েছিলাম। ভাল বাসা মানে মস্ত বড় বাসা নয়। বাড়ির ভেতরটা ছোট হলেও চলে যদি বাইরেটা বড় হয়। তাই পেয়েও ছিলাম—দিগন্তব্যাপী দৃষ্টির অবকাশ এখানটায় ছিল। আমাদের এই পল্লীর নাম দিয়েছিলাম দিগন্তপল্লী। সেই দিগন্ত চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি মহাপুরুষরা কেন বলেছেন দিগন্তের যত কাছে যাবে, দিগন্ত তত দূরে সরে যাবে।

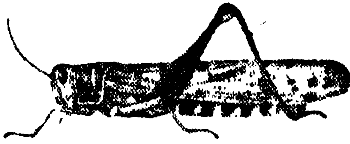
সেদিন যখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হচ্ছিল তখন বন্ধুবর বলেছিলেন, আগে যেখানে ছিল ময়দান এখন সেখানে এসেছে ময়দানব। ময়দানব স্বর্ণলঙ্কা নির্মাণ করেছিল। যেখানে একটু ফাঁকা যায়গা মিলছে সেখানেই এ যুগের যন্ত্রদানব কলকারখানার স্বর্ণলঙ্কা নির্মাণে লেগে গেছে। বন্ধুর উক্তিটি শুনে অবধি আমি ওঁর কথাটা ভাবছি। সত্যিই তো এ যুগের বাল্মিকী যদি নবপর্যায় রামায়ণ লেখেন তো স্বর্ণলঙ্কা খুঁজতে কি সাগর লঙ্ঘন করতে হবে? লঙ্কাধিপতিকে চিনতেও বিলম্ব হবে না। কারণ ক্যাপিটালিস্ট নামক রাবণটিও দশানন—দশের ধন ও একাই গ্রাস করছে। আর রাবণ যদি হয় যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক তো সীতাহরণের রূপকটি একবার ভেবে দেখুন। কর্ষিত ভূমির মাঝখান থেকে সীতার উদ্ভব। সীতাহরণের কাহিনী কৃষিসভ্যতা ধ্বংসের প্রতীক। Industry-র হাতে Agriculture-এর ধ্বংস। মানুষ ক্ষুধার্ত জীব। অত্যাবশ্যক খাদ্যের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অনাবশ্যক বিলাস সম্ভারের আয়োজন কত বড় মূর্খতা ভেবে দেখুন। আজ পৃথিবীজোড়া খাদ্যসঙ্কট কেন? প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য এবং প্রকৃতির প্রতিশোধের নামই লঙ্কাকাণ্ড। জিগগেস করতে পারেন এই রূপক কাহিনীর মধ্যে রাম কে? রাম নিশ্চয় সেই মহামানব যিনি মানুষের মনকে যন্ত্রের থেকে মাটির দিকে ফিরিয়ে আনবেন। যিনি বলবেন—ফিরে চল মাটির টানে—যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে। লোকে যখন বলে, জয় সীতারাম—তখন সে মাটির আর মানুষেরই জয়গান করে, কোনো ঠাকুর দেবতার নয়।



পঙ্গপাল

ডাঃ শ্রীতারেশচরণ রায়

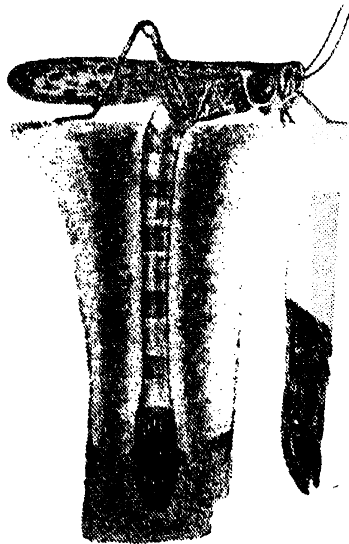
পংগপাল বিভীষিকা বহুকাল ধরে মানব-সভ্যতাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। মানুষের বাঁচবার জন্য শস্যোৎপাদনের দুরূহ প্রয়াস বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে পংগপালের আক্রমণে। অসহায় মানুষ ভয়ার্ত হৃদয়ে পতংগের আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুবরণ করেছে বহুবার। ইতিহাসের পাতায় ঈজিপ্টের অষ্টম প্লেগ রেখে



ধেড়ে একক স্ত্রী পংগপাল

গেছে পংগপালের বিজয় বৈজয়ন্তীর নির্দয় নিশানা। লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্নাভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে গরু ছাগলের সংগে। আজও এই সামান্য কীট যুদ্ধবিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত মানব গোষ্ঠীর ওপর চালিয়ে চলেছে তার আক্রমণ। তার যাত্রাপথের শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, অগণিত মানবের মুখের অন্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, রেখে গেছে শুধু রিক্ত ধরণী আর হাহাকার।

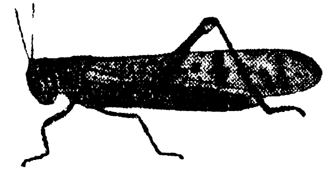
বছর দশেক পূর্বে পংগপালের আক্রমণে শস্যহানির একটা হিসাব নেবার চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ হিসাব নেওয়া সম্ভব নয়। তবু যা আভাষ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, প্রাক্‌যুদ্ধ-কালে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২০ কোটি টাকার শস্য থেকে এই পংগপাল গোষ্ঠী মানুষকে বঞ্চিত করেছে। প্রতিরোধের নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯২৬ থেকে ৩১ সালের পংগপালের আক্রমণে ভারতে প্রায় ১০ কোটি টাকার শস্যহানি হয়েছিল। এর উপর ছিল খাদ্যাভাবে গবাদি পশুর ক্ষতি। এই পংগপাল মানুষের শ্রমলব্ধ শস্যে পুষ্ট হয়ে এবং বংশবৃদ্ধি করে অপ্রতিহত প্রতাপ চালিয়ে চলেছে মানুষের সর্বনাশে। এই আন্তর্জাতিক মহাশত্রু ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা আর রাজনৈতিক সীমারেখা তুচ্ছ করে দেশের পর দেশের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে, নীচে রেখে গেছে সাদাকালোর ভেদাভেদহীন মহাশ্মশান। ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, পারস্য, ইরাক, দক্ষিণ রাশিয়া, উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চায়না, বলকান রাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি কোন রাষ্ট্রই এদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। ভারতে বর্তমান



ডিম পাড়া অবস্থায় স্ত্রী পংগপাল

শতকের মধ্যে চারবার পংগপালের আক্রমণ হয়েছে। সাম্প্রতিক আক্রমণ হয় ১৯৪০ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে। বর্তমানে ১৯৪৯ সালে আবার নূতন আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। শোকার্ত মানুষ বার বার প্রশ্ন করেছে নিজেকে এর কি কোন প্রতিবিধান নেই? শুরু হয়েছে দেশে দেশে বিজ্ঞানের সাধনা মানুষের ত্রাণকল্পে। পংগপাল গোষ্ঠীর জন্ম ও বংশধারা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে তিন জাতীয় পংগপাল দেখা যায়, যেমন বম্বে লোকাস্ট (Patanga succinata L.), ভ্রাম্যমান বা মাইগ্রেটোরী লোকাস্ট (Locusta migratoria L.) এবং মরুপতংগ বা ডেজার্ট লোকাস্ট (Schistocerea gregaria Frosk.)। এদের মধ্যে মরুপতংগ বা ডেজার্ট লোকাস্টই সব চাইতে সর্বনাশা। মরুপতংগ আবার দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত "একক" বা সলিটারী প্রকৃতির। এ অবস্থায় এরা অক্ষম বৈরাগী, মানুষের দৃষ্টিপথের বাইরে একক



সংগবদ্ধ অবস্থায় ধেড়ে পতংগ

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মরুভূমিতে বাস করে। ভারতে রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, বরোদা, কচ্ছ, হিসার ও মহিন্দ্রগড়ের মরুময় প্রান্তরে এই প্রকৃতি পংগপালের জীবন-অববাহিকা প্রবাহিত। বর্ণবৈচিত্র্যেও এদের বিশিষ্টতা দেখা যায়। কখনও এরা ছাইরংয়ের আভাযুক্ত কখনও বা সবুজ। ধেড়ে (adult) একক পতংগ দেখতে সবুজ। তবে যদি অবস্থান্তরে দল বাঁধবার সুযোগ পায় তবে এরাই হলুদ বর্ণে পরিবর্তিত হতে পারে। গঠনবৈচিত্র্যে "একক" পতংগ "সংঘবদ্ধ" বা Gregarious পতংগ থেকে বিভিন্ন। একক পতংগের ইলাইট্রা (Elytra) ও ফেমুরের (Famu) দৈর্ঘ্যের ক্রম ২·০৫, চক্ষুর আড়াআড়ি দাগ ৭টি কখনও কখনও ছয়টিও হইতে পারে। খুব কম সময়েই ৮টি দাগ দেখা যায়। এন্‌টিনার খণ্ড (antennal segment) ২৭টি থেকে ৩০টি। দ্বিতীয় প্রকৃতির পংগপালেরা সংঘবদ্ধ বা Gregarious অবস্থায় দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে বেড়ায়। এই অবস্থায় এরা দ্রুত প্রজননশীল এবং পালে পালে প্রজনন-ক্ষেত্র ত্যাগ করে দেশান্তরী হয় আর এদের যাত্রাপথে শুরু হয় ধ্বংসের রুদ্রলীলা।

সঙ্ঘবন্ধ পতঙ্গের বর্ণ সাধারণতঃ কালদাগ-খচিত হলুদ অথবা গোলাপী। পূর্ণবয়স্ক অথবা উড়ন্ত অবস্থায় এরা দেখতে গোলাপী। যৌন বিকাশের সাথে সাথে এদের বর্ণপরিবর্তন হয়। ক্রমশ ছাইরং ধারণ করে, পরিশেষে হলুদ বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এই সময় এরা দলত্যাগ করে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গী পতঙ্গের ইলাইট্রা ও ফেমুরের দৈর্ঘ্যের ক্রম ২·১৫ চক্ষুর দাগ ৬টি এবং এনটিনার খণ্ড ২৬টি মাত্র।

ডিম, হপার বা ডানাহীন পতঙ্গ ও পূর্ণ-বয়স্ক এই তিন অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া



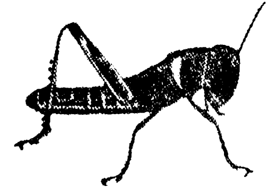
সঙ্গমরত দুইটি পঙ্গপাল

পতঙ্গের জীবনধারা পরিস্ফুট হয়। যৌন সম্ভোগের অব্যবহিত পরে স্ত্রীপতঙ্গ ৫০টি থেকে ১০০টি ডিম পাড়ে। আর্দ্র বালির মধ্যে সরু গর্ত খুঁড়ে এই ডিমগুচ্ছ পেড়ে নিজের শরীর-নিসৃত লালার সাহায্যে গর্তমুখে বন্ধ করে রাখে। এই তরল পদার্থ ক্রমে কঠিন হয়ে গর্তের মুখে জলনিবারণী আবরণের সৃষ্টি করে। ঝাঁকে ভ্রমণ করে বলে স্ত্রীপতঙ্গগুলি প্রায়ই খুব কাছাকাছি জায়গায় ডিম পাড়ে। বসন্তকালে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই ডিম ফুটে পতঙ্গ বার হয়। ক্রমবর্ধমানকালে নবজাত পতঙ্গগুলি ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে একবার খোলস ছাড়ে। একটু বড় অবস্থায় ৭ দিন বাদেও খোলস ত্যাগ করে থাকে। পতঙ্গ হপার অবস্থায় সর্বসমেত পাঁচবার এইভাবে খোলস ছেড়ে ডানাযুক্ত পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গে পরিণত হয়। এই রূপান্তর হতে গ্রীষ্মকালে ৪ সপ্তাহ লাগে এবং বসন্ত-কালে প্রায় ৬ সপ্তাহ লাগে। খোলস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হপারের বর্ণ পরিবর্তন শুরু হয় এবং সর্বশেষে কালো ও হলুদের মিশ্র নমুনা ধারণ করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হপার

বৃহদাকারে প্রদর্শিত পঙ্গপালের ডিম

উজ্জ্বল গোলাপী বর্ণের কিন্তু যৌন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। গোলাপী রংয়ের পতঙ্গই সর্বাপেক্ষা শস্যহানি-কারক। ঝাঁকে ঝাঁকে শস্যক্ষেত্র আক্রমণ করে নিমেষে ধ্বংস করে। হলুদ বর্ণের পতঙ্গ এরকম সর্বগ্রাসী না হলেও এদের দ্বারা অনিষ্ট আশঙ্কা কম নয়, কারণ অনতিবিলম্বে এরাই উৎপাদন করবে লক্ষ লক্ষ বংশধর। পঙ্গপালের ঝাঁক এবং হপারদল সাধারণত সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত গাছে বা ঝোপে ঝাড়ে আত্মগোপন করে থাকে। অতিরিক্ত শীতাতপেও এরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকে।

মরুপতঙ্গের আবাসস্থল শুষ্ক তৃণভূমি অথবা মরুময় স্থান। পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে রাজস্থান ও তার সন্নিকটবর্তী এলাকা হতে পাকিস্থান, আরব এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহ, পূর্বে আফ্রিকা সুদান এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তারিত এদের আবাস-স্থল। ঝাঁকে ভ্রাম্যমান অবস্থায় এদের গতিবিধি বহুধা বিস্তৃত। দলবদ্ধভাবে এরা দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান, পারস্য, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ রাশিয়া, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পরিক্রমণ করে। সাধারণত ভারতের সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অংশে ও পর্বত-সংকুল উত্তর প্রদেশে এদের আক্রমণ হয়ে থাকে। পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে এদের কার্যক্রম বিস্তারলাভ করতে পারে। অনুকূল পরিবেশে এদের ভ্রাম্যমান দলগুলি দ্রুত প্রজনন করে গতিপথে ক্রমশ দলভারী করে নেয়। তবে ভারতে পূর্বে যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত স্থান ও দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের উত্তর সীমান্তবর্তী এলাকার বাইরে অদ্যাবধি এদের প্রজনন ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায় নি।। পঙ্গপালের সঞ্চরণ ক্ষমতা অসীম। সমুদ্রের ওপর ১২০০ মাইল পর্যন্ত পঙ্গপালের উড়ন্ত ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়। সোজাসুজি আফ্রিকার উপকূল থেকে ভারতের সৌরাষ্ট্র প্রদেশে এরা পাড়ি দিতে পারে। এলজিরিয়া থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান থেকে আরব পাড়িও মরুপতঙ্গের পক্ষে সহজ-সাধ্য। এদের



হপার পঙ্গপাল সঙ্ঘবন্ধ অবস্থায়

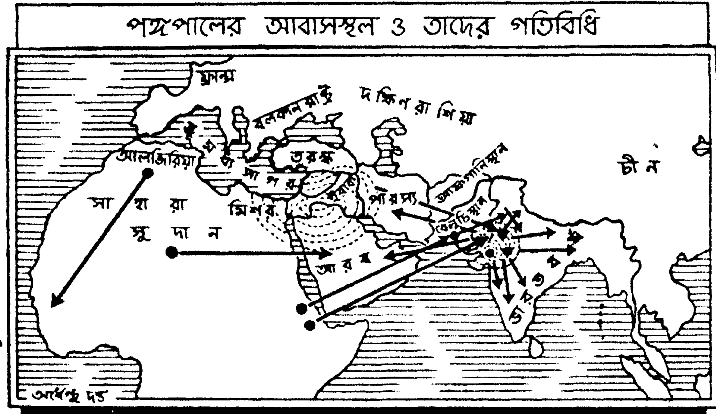
এক একটি ঝাঁক ৫।৬ মাইল দীর্ঘ ও ২।৩ মাইল চওড়া হতে পারে।

অনির্দিষ্টকাল পরে কোনও এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা দেয়। নিরুপদ্রব কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ পাঁচ দশ বৎসর পঙ্গপালের প্রকোপ দেখা দেয়। আবহাওয়ার তারতম্যে ঘটে এই আক্রমণের প্রভেদ। ১৯শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে পঙ্গপাল আক্রমণের যে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো হয়েছে ১৮৬৩—৬৭ সালে, ১৮৬৯—৭৩ সালে, ১৮৭৬—৮১ সালে ও ১৮৮৯—৯৮ সালে। বর্তমান শতকেও ১৯০০-০৭ সালে, ১৯১২—২০ সালে ১৯২৬-৩১ সালে এবং ১৯৪০–৪৬



আহার্য বস্তুরূপে পঙ্গপাল

সালে এই চারিটি আক্রমণ দেখা গিয়াছে। মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেও কখন কখন পঙ্গপাল হঠাৎ দেখা দিয়েছে; কিন্তু সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। ভারতের বর্তমান পঙ্গপাল আক্রমণ শুরু হয়েছে ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে। এরা প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে বংশবৃদ্ধি করে। পরবর্তী বসন্তকালে বেলুচিস্থানে সঙ্ঘী পতঙ্গের প্রজনন হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই পঙ্গপালের ঝাঁক হানা দেয় সিন্ধু, খইরপুর, মিরস, বাহাওয়ালপুরে এবং রাজস্থানে। এইসব জায়গায় এরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়ে। গত ১৯৫০ সালের বসন্তকালে সঙ্ঘী (Gregarious) পতঙ্গের প্রজনন চলে পশ্চিম পাকিস্থানে, দক্ষিণ ইরাণে এবং লোহিত

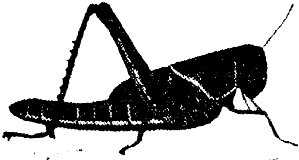




একক হপার পঙ্গপাল

সাগরের উপকূলবর্তী জায়গায়। মে মাসের মধ্যভাগে এদের প্রায় ছয়টি ঝাঁক পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে।

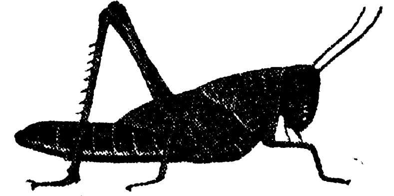
স্ত্রীপতঙ্গ বালি মাটিতে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটবার জন্য বালিতে আর্দ্রতার প্রয়োজন।



সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় বড় হপার

এইজন্য পতঙ্গের প্রজনন বৃষ্টিপাতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পতঙ্গের প্রজনন কাল তাই বছরে দুবার দেখা যায়। বসন্তকালে ও বর্ষায়। দক্ষিণ-পূর্ব আরব, লোহিত সাগরের উপকূলভাগ, দক্ষিণ ইরাণ, বেলুচিস্থান প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে শীত ও বসন্তের প্রারম্ভে বারিপাত হয় সেখানে পতঙ্গেরা বসন্তকালেই একটি অথবা দুটি বংশ (ব্রুড) উৎপাদন করে। যেমন বেলুচিস্থানে প্রথম প্রজনন শুরু হয় জানুয়ারী মাসে এবং দ্বিতীয় প্রজনন দেখা দেয় এপ্রিলে। আবার ভারত ও অন্যান্য স্থানে বর্ষাতেই পতঙ্গেরা প্রজনন করে থাকে। তবে যেসব অঞ্চলে যেমন পাঞ্জাবে বসন্তকালে বারিপাত হয় সেখানেও পতঙ্গরা প্রজনন করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে ও বেলুচিস্থানে বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যে পঙ্গপালের ঝাঁক দৃষ্ট হয় তারা সাধারণত পূর্ববাহিনী হয়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে মে, জুন ও জুলাই মাসে হানা দেয়। সিন্ধু, খইরপুর, বাহাওয়ালপুর ও রাজস্থান এই কয়েকটি জায়গাতেই বিশেষ করে এরা সীমাবদ্ধ থাকে। বর্ষা সমাগমে এরা এই সমস্ত জায়গায় প্রজনন শুরু করে সেপ্টেম্বর এমনকি অক্টোবর ও নভেম্বর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলে। এদের ঝাঁক আবার পশ্চিমবাহিনী হয়ে বেলুচিস্থান, পারস্য, পূর্ব আরব প্রভৃতি স্থানে আবির্ভূত হয় এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার প্রজনন করে। রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের কিছু পঙ্গপাল উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য জায়গার খরিফশস্যের ক্ষতি করে। সৌভাগ্যক্রমে এরা সংযুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বাইরে প্রজনন করতে পারে না এর জন্য দলবৃদ্ধি করতে পারে না ও বেশীদিন বেঁচে থাকে না। কিছু কিছু দল উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় শীতকাল কাটিয়ে উপযুক্ত ঋতুর প্রারম্ভে অর্থাৎ বসন্তকালে বংশবৃদ্ধি করে—রবিশস্য নষ্ট করে। এরাই বেলুচিস্থান আগত ঝাঁকের সঙ্গে মিলে গ্রীষ্মে দলে ভারী হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ঋতুতে ঋতুতে বছরের পর বছর ক্রমান্বয়ে পঙ্গপালের ধ্বংসলীলা চলতে থাকে। যদি কখনও প্রজননের সময় আবহাওয়া পরিপন্থী হয় কিংবা



একক অবস্থায় বড় হপার

যদি কোথাও পতঙ্গ দমনের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলে তবে এই সঙ্ঘী পতঙ্গের সংখ্যাল্পতা ঘটায়—এরাই একক বা সলিটারী অবস্থায় উপনীত হয়। অবস্থান্তরে আবার একক পতঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ পঙ্গপালে রূপ নেওয়া বিচিত্র নয়।



স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

"জংলা, শীঘ্র বল তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ। তুমি চলিয়া যাইবার পর উলম্ভনের নিকট হইতে আর একজন লোক আসিয়াছিল। সে আসিয়া দাবী করিতেছিল শোহানুকি পর্বতে প্রস্তর বহন করিবার জন্য আরও লোক দিতে হইবে। এ লোকটিও দীর্ঘাকায় ও বলিষ্ঠ। আমি তাহাকে বলিয়াছি কয়েকদিন পরে লোক পাঠাইতে পারিব। এখন আমাদের মাঠের কাজ আছে। মাঠের কাজ শেষ হইলে লোক দিব। আমার স্তোকবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া লোকটি চলিয়া গিয়াছে। ঘিসু এবং ভংগার পরিবারবর্গ উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। তাহারা উলম্ভনের লোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাদের নিরস্ত করিয়াছি। আমি এখন দেখিতেছি, যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। নিম্ব দেবতারও হয়তো ইহাই ইচ্ছা। কারণ আমি লক্ষ্য করিলাম, বাতাসের বেগে নিম্ববৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে যে ধরণের শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা শান্তি-সূচক নয়। কিছু পূর্বে তাহার মধ্যে আমি তর্জন গর্জনের আভাস পাইয়াছি। তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ শীঘ্র বল"

আমি সমস্ত কথা ধবলকে খুলিয়া বলিলাম। ধবল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "রোহার প্রথম সর্তে আমি সম্মত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের তৃণশস্য তাহাদের গরুর মুখে সমর্পণ করিব কি করিয়া? তুমি তো জান, আমাদের শস্য এবার ভাল জন্মে নাই। প্রথম ফসলের সঞ্চিত শস্য আহার করিয়াই হয়তো আমাদের এবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহার উপর যদি উহাদের গরুদের জন্য শস্য দিতে হয় একদিনেই হয়তো আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য হইয়া যাইবে। আমরা তখন কি আহার করিব?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আমিও চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু রোহার সহিত আলাপ করিয়া আর একটি কথাও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। রোহা কিছুতেই তাহার মত পরিবর্তন করিবে না। আমরা যদি যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সাহায্য চাই, এই দুইটি প্রস্তাবেই আমাদের রাজী হইতে হইবে। রোহার চরিত্রে আর একটি আশ্বাসজনক বৈশিষ্ট্যও আমি লক্ষ্য করিলাম, সে শান্তিপ্রিয় লোক। কাহারও সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট খুলিয়া বলি সে আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য করিয়া দিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে আমাদের তৃণশস্যের কিছু অংশ তাহাকে দিতেই হইবে। পরিবর্তে হয়তো তাহারা দুগ্ধের কিছু অংশ আমাদের দিতে পারে—"

ধবল অসহায়ভাবে বলিল—"দুগ্ধ আমরা কখনও খাই নাই। দুগ্ধ খাইয়া কি আমরা বাঁচিতে পারিব?"

"উহারা তো বাঁচিয়া আছে"

"কি জানি"

ধবল অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। রোহার প্রিয়তমা কন্যা শিলাঙ্গী যখন আমাদের আপন লোক হইতেছে তখন রোহা এমন কিছুই করিবে না যাহাতে আমাদের অনিষ্ট হয়—"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ধবল সহসা প্রশ্ন করিল "শিলাঙ্গী দেখিতে কেমন?"

"সুন্দরী"

"বয়স কত"

"অল্পই হইবে। নিনানির অপেক্ষাও ছোট মনে হয়"

ধবলের চোখের অসহায় দৃষ্টি সহসা জীবন্ত হইয়া উঠিল।

"আমি একটা কথা ভাবিতেছি—"

"কি"

"আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি কেমন হয়। নিনানি তো চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী যদি আমার পত্নী হয় উহাদের উপর তাহার প্রভাব বেশী হইবে"

এইবার বাধ্য হইয়া আমাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল।

বলিলাম—"সে প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম কিন্তু রোহা তাহাতে সম্মত নয়। শিলাঙ্গীর মতের বিরুদ্ধে রোহা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবে না। উহাদের দলেরই বহু যুবক শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু এই কারণেই রোহা কাহারও সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দেয় নাই। শিলাঙ্গী বলিয়াছে আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

ধবল নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল তাহার শান্ত দৃষ্টির অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন বহ্নির আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধবল অবশেষে বলিল "চল, বিঘাওয়ের সহিত পরামর্শ করি। সে কি বলে শোনা যাক—"

আমরা বিঘাওয়ের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বিঘাওয়ের নিকট যাইবার ততটা ইচ্ছা ছিল না, কারণ বিঘাওয়ের রহস্যময় কথাবার্তা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে আমার এইরূপ একটা আশঙ্কা হইতেছিল। তবে একটা আশা আমার ছিল, হয়তো গিয়া দেখিব বিঘাও ঘুমাইতেছে। নিদ্রিত বিঘাওকে তুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস ধবলের হইবে না। কারণ ধবল বিঘাওকে মনে মনে বেশ ভয় করিত। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, বিঘাও জাগিয়া আছে। আগুনের ধারে বসিয়া একটা কাঠবিড়ালী পুড়াইতেছে। তাহার পুচ্ছটাকে কাটিয়া মাথার চুলে পরিয়াছে দেখিলাম। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার মেজাজটাও ভাল আছে। আমাদের সে সাদর সম্ভাষণ করিল।

"এস, এস, তোমরা যে আসিবে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেইজন্য তোমাদের অপেক্ষায় জাগিয়া আছি"

"কি করিয়া বুঝিতে পারিলে—"

"এই যে"

কাঠবিড়ালীর কর্তিত পুচ্ছটি সে মাথা হইতে নামাইয়া দেখাইল।

"অনেক কষ্টে আজ জানোয়ারটিকে ধরিয়াছি। ইহারা পুচ্ছের সাহায্যে অনেক দূরের খবর পায়, সেইজন্য পুচ্ছটিকে সর্বদাই তুলিয়া রাখে। ইহার পুচ্ছ যাহার মাথায় থাকে সে-ও অনেক দূরের খবর পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারে। আর একটা যদি ধরিতে পারি তোমাকেও একটা পুচ্ছ দিব। মাথায় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর একটু খুলিবে"

অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বিঘাও ধবলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কাঠ-বিড়ালীর মাংস একটু খাইবে? খাও। জংলাকেও একটু দাও—"

অগ্নিকুণ্ড হইতে সে ঝলসানো কাঠ-বিড়ালীটিকে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল—

"মুন্ডটি এবং বুকটি আমি খাইব, বাকীটা তোমরা দুইজনে ভাগ করিয়া খাও"

ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটি খাইতে বেশী সময় লাগিল না। আহার শেষ করিয়া ধবল বলিল, "একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকট আসিয়াছি। জংলা রোহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ হইতে সব কথা শোন, শুনিয়া এখন কি করা উচিত তাহা বল"

"রোহা কে?"

"উম্নগার অপর পারে যাহারা থাকে তাহাদের দলপতির নাম রোহা। তাহারা গরুর দুধ খায়। তোমার পরামর্শ অনুসারেই তো জংলা সেখানে গিয়াছিল। জংলা সব কথা বিঘাওকে বল"

আমি সমস্ত ঘটনা বিঘাওকে পুনরায় বিবৃত করিয়া বলিলাম। বিঘাও বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধবল পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বল, এখন কি করা উচিত"

বিঘাও সহসা মাটিতে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া আবার ভেকের মতো বসিল এবং বলিতে লাগিল—"ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্"। বলিতে বলিতে সে ঘুরিতেও লাগিল।

ধবল ভয় পাইয়া গেল, চক্ষু দিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিল, চল আমরা সরিয়া পড়ি। আমরা উভয়ে পরমুহূর্তে তাহার কুটীর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিঘাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার কথাও শোনা গেল।

"ধবল শোন শোন, ভয় পাইও না, আমার উত্তরটা বুঝিতে পারিলে কি না বলিয়া যাও"

আমরা পুনরায় তাহার কুটীরে প্রবেশ করিলাম। ধবলের কথা শুনিয়া মনে হইল, সে একটু চটিয়াছে।

ধবল বলিল, "এইটুকু শুধু বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিপদের সময় তোমার পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ভয় দেখাইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিতেছ"

বিঘাও আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"ভয় দেখাই নাই, উত্তরই দিয়াছি। আমি যে সম্প্রদায়ে মানুষ হইয়াছিলাম সেখানে ইঙ্গিতের ভাষায় গোপন কথাবার্তা বলা নিয়ম ছিল। ভেকের অনুকরণ করিয়া আমি তোমাদের জানাইয়াছিলাম যে, ভেকের মতো আচরণ করাই এখন আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। স্থলে যদি অসুবিধা হয় জলে নামিতে হইবে। জলে অসুবিধা হইলে স্থলে উঠিব। কিন্তু ভেকের মতো আচরণ করিয়াও আমাদের কুকুরের মতো সতর্ক থাকিতে হইবে—ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি"

"রোহার সর্তে তাহা হইলে আমি সম্মত হই?"

বিঘাও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কি যেন শুঁকিতে লাগিল।

"বাতাসে আমি যেন বিপদের গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যুগপৎ ভেক এবং কুকুর না সাজিলে উপায় নাই"

পুনরায় সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বাতাস শুঁকিতে লাগিল। আর কোনও উত্তর দিল না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, "যতদূর বুঝিতেছি বিঘাও সম্মত আছে। কিন্তু আর একটা কথা তো বিঘাওকে জিজ্ঞাসা করা হইল না—"

ধবল আবার বিঘাওয়ের কুটীরে প্রবেশ করিল।

"আচ্ছা বিঘাও, জংলার পরিবর্তে আমি যদি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করি তাহা হইলে সর্তটা কি আর একটু জোরালো হইবে না? শিলাঙ্গী যদি দলপতির পত্নী হয় তাহা হইলে তাহার প্রভাব আরও বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা"

বিঘাও পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"প্রস্তরকে যাহারা আরও কঠিন করিতে চায় তাহারা মূর্খ। জলকে যাহারা আরও তরল করিতে চায় তাহারাও মূর্খ। শিলাঙ্গীর কথা ভাবিবার আগে চিন্তা কর নিনানি কোথায় গেল? কেনই বা গেল?"

বিঘাও আবার হাসিয়া উঠিল।

পাংশুমুখে ধবল বাহিরে আসিয়া বলিল, "ইহার নিকট আসাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। লোকটা পাগল। মীংরারা যে কোথা হইতে এটাকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়া গেল জানি না। চল, এখন বিশ্রাম করা যাক, কাল সকালে উঠিয়া যাহা হয় ঠিক করিয়া ফেলিব"

আমি ঘরে গিয়া দেখি প্রৌঢ়া ইলচি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমার জন্য আহার শয্যা সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। "আমি জানিতাম তুমি আসিবে, তাই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। ধবলের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তুমি সারা হইয়া গেলে। দিবারাত্রি ক্রমাগত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছ। এখন খাইয়া একটু বিশ্রাম কর। আমার নিজের ভালুকের চামড়াটা তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। ওটা যেমন নরম তেমনি গরম। আরামে ঘুমাইবে। এখন খাও কিছু। কন্যা নদী আজ আমাকে একটা কাছিম উপহার দিয়াছে। সেটা তোমার জন্য ঝলসাইয়া রাখিয়াছি। উহাদের সহিত কি ঠিক হইল?"

"উহারা আমাদের সহিত যোগ দিতে রাজি আছে, কিন্তু দুইটি সর্তে"

সর্ত দুইটি বলিলাম।

"ধবল কি বলে?"

"ধবল নিজেই শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে চায়"

"তাই না কি!"

ইলচির চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "তুমি এক কাজ করিতে পার?"

"কি"

"একটা পাথর বাঁধিয়া আমাকে কন্যা নদীতে ডুবাইয়া দাও। এ দুর্বহ জীবন আমি আর বহিতে পারিতেছি না"

ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "ধবল শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ, শিলাঙ্গীই তাহাকে বিবাহ করিবে না"

"কিন্তু শিলাঙ্গী তোমাকে তো বিবাহ করিবে? তাহাও কি আমার পক্ষে কম মর্মান্তিক?"

ইলচির কান্না কিছুতেই আর থামে না।

তাহার নিকট বারম্বার শপথ করিতে হইল যে, শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিলেও তাহাকে আমি অবজ্ঞা করিব না।

"নিম্বদেবতার নামে শপথ করিতেছ?"

"তাহাই করিতেছি"

ইলচির মুখে হাসি ফুটিল। তাহার পীতবর্ণ অসম বৃহদ্দন্তগুলি মশাল আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। আমাকে সযত্নে সে আহার করাইতে লাগিল।

"সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিশ্চয় তোমার পায়ে খুব ব্যথা হইয়াছে"

"না, তেমন ব্যথা হয় নাই"

"নিশ্চয় হইয়াছে। আমার কাছে কি লুকাইতে পারিবে? তুমি খাইয়া শোও আমি তোমার পা টিপিয়া দিতেছি"

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, নিদারুণ কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম ইলচি পাশে নাই, ভোর হইতেছে। কোলাহলের কারণ কি জানিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম, কন্যা নদীর তীরে একটা ভীড় জমিয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে অনেকেই চীৎকার করিতেছে। আমিও সেদিকে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ধবল তাড়াতাড়ি ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আজ সকালে কন্যা আমাদের কি উপহার দিয়াছে, দেখ"

নিনানির জন্য শাখাপত্র দিয়া আমি যে শিরস্ত্রাণটি রচনা করিয়াছিলাম সবিস্ময়ে দেখিলাম, ধবলের হাতে সেই শিরস্ত্রাণটি রহিয়াছে। আমার সৃষ্টি আমার কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছে আবার। নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল নিনানিও কি

ফিরিয়া আসিবে আবার? অনেকক্ষণ নিনানির সহিত দেখা হয় নাই। সে এখন কি করিতেছে? তাহার জন্য মনটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কানে গেল ধবল বলিতেছে, "ইচ্ছা করিলে শাখাপত্র দিয়া আমরাও এইরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি, ইহাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখিতে পারি"

বেসু বলিল, "ইহার চতুর্দিকে যদি কাদার প্রলেপ দেওয়া যায় চমৎকার একটি পাত্র হইবে!"

আর একজন বলিল, "ঠিক বলিয়াছ—!"

আমাদের সমাজে এই শিরস্ত্রাণই বাসন সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ধবলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সহসা সে শিরস্ত্রাণটি মাটির উপর রাখিয়া করজোড়ে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি সকলেই করজোড়ে বসিল। আমিও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, আমিও নিজের সৃষ্টির সম্মুখে করজোড়ে বসিয়া পড়িলাম। কন্যার তরঙ্গে তরঙ্গে একটা মৃদু কলতান জাগিয়া উঠিল।

ধবল বলিতে লাগিল—"নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া কন্যা আজ আমাদের একটি সুপরামর্শ দিয়াছে। শাখাপত্রময় এই বস্তুটি শুধু যে আমাদের পাত্র প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিতেছে তাহা নয়। আমাদের এই বিপদের সময় কন্যা আমাদের যেন বলিতেছে, একত্রিত হইলে সামান্য শাখাপত্রও যেমন অসামান্য বস্তুতে রূপান্তরিত হইতে পারে একত্রিত হইলে তোমরাও সেইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পার। উলম্ভনের যে শক্তি তোমরা দুর্জয় মনে করিতেছ একত্রিত হইলে তাহা আর দুর্জয় থাকিবে না। কলস্বরা কন্যা যেন বলিতেছে, তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকিবে না"

আমি চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলাম। মনে হইল, সুদূর অতীত হইতে কে যেন কথা বলিতেছে। তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, এই বাণী যেন নূতন নয়। মনে হইল, এই বাণী আশ্রয় করিয়া আমরা কবে কোথায় যেন কোন দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছিলাম। তুষার যুগের কথা মনে ছিল না, কাঁচনের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে যে আমরা বাঁচিতে পারি না এই সত্য মনের প্রচ্ছন্ন স্তরে যেন সুপ্ত ছিল, ধবলের কথায় তাহা যেন আবার জাগ্রত হইল। পুরাতন কথা যেন নূতন করিয়া শুনিলাম।

ধবল সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"ওই দেখ, কন্যার পরপারে যে কুয়াসা জমিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে কেমন কাটিয়া যাইতেছে। ওই শোন, কলস্বরা কন্যা বলিতেছে, তোমরা যদি একত্রিত হও তোমাদের ভয়ও কাটিয়া যাইবে"

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, সত্যই নদীর পরপারে কুহেলি-যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। আমরা সকলেই সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রত্যহ যেমন হয় প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ-কিরণজালে সেদিনও ধীরে ধীরে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেদিন তাহা অপূর্ব মনে হইল। একটু পরেই কিন্তু সভয়ে আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কুহেলিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, পরপারের অরণ্য-প্রান্তে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ এক ব্যক্তি বিরাট একটি প্রস্তরশূল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটি যে উলম্ভনের চর তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া সহসা অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমরা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। নারীরা আর্তনাদ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটি যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

"জংলা, আমি মতি স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। রোহার সর্তে আমি রাজি আছি। তুমি এখনই গিয়া তাহাকে সংবাদ দাও। আমরা সম্মিলিতভাবে অবিলম্বে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব। তুমি এখনই চলিয়া যাও—জংলা, আর দেরি করিও না—" ধবল আমার দুই হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। দলপতি হিসাবে সে আমাকে আদেশ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। শুধু সে নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীর হিসাবে দলের মধ্যে আমার খ্যাতি ছিল, ধবলের আচরণ দেখিয়া সকলে মনে করিল, বর্তমান বিপদে আমিই বোধ হয় একমাত্র উদ্ধারকর্তা। সকলেই যুগপৎ বলিতে লাগিল—'জংলা, আর দেরি করিও না, চলিয়া যাও।' আমি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উগ্নগা পর্বতের উদ্দেশ্যে আমাকে যাত্রা করিতে হইল।

...উগ্নগা পর্বতে উঠিতেছিলাম। কিছুদূর উঠিয়া দেখিলাম পাহাড়ী ছাগলের দল উপত্যকায় নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিনানির কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন শরীরী জনতা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল অশরীরী স্মৃতিসমূহ তেমনি আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। নিনানির অসংখ্য স্মৃতি আমার মানসপটে অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া যেন বলিতে লাগিল—'জংলা, তুমি এ কি করিতেছ। আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছ তুমি? তোমার জন্যই যে আমি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় বাস করিতেছি তাহা কি ভুলিয়া গেলে? শিলাঙ্গী কি আমার চেয়েও বেশী সুন্দর? সে কি তোমার প্রতিশ্রুতির চেয়েও বড়?

রোহার কাছে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম পণ্ড-পর্বতের উদ্দেশ্যে। ঠিক করিলাম, নিনানির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পর রোহার সহিত দেখা করিব। ইহাও ঠিক করিয়া ফেলিলাম যে, নিনানিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব, শিলাঙ্গীর কথাও তাহার কাছে গোপন করিব না। তাহাকে বলিব যে, আমাদের দলের হিতার্থে উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতেছি। কথাটা মিথ্যা হইবে না এবং দলের জন্য বাধ্য হইয়া কিছু করিলে নিনানি আপত্তিও করিতে পারিবে না। আজও যেমন তোমরা সত্যকে নানা মুখোষ পরাইয়া আবৃত করিবার প্রয়াস পাও আমরাও ঠিক তেমনই পাইতাম। আমরা আরও বেশী করিয়া পাইতাম, কারণ যে ষড়রিপু আমাদিগকে সত্য পথ হইতে বারম্বার ভ্রষ্ট করে সে যুগে আমরা সে ষড়রিপুর দাস ছিলাম। তাহাদেরই নির্দেশে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত! সামাজিক প্রয়োজনে আত্মত্যাগমূলক যে সকল আইন আমরা করিয়াছিলাম সেই আইনকেই অনেক সময় আমরা মুখোষ করিতাম, তখন আমি যেমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে হইতেছে তখন নিনানি আইনত কিছুই বলিতে পারিবে না। তাহার অন্তর্যামী মন হয়তো সব কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু সে মনকেও কালক্রমে আমি প্রতারিত করিতে পারিব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কি করিয়া তাহার কাছে কথাটা পাড়িব, তাহাকে কি কি বলিব, তাহার প্রতি আমার ভালবাসা যে অটুট আছে এং চিরকাল যে অটুট থাকিবে তাহার কি প্রমাণ দিব, এই সব ভাবিতে ভাবিতেই আমি উগ্নগা পর্বতের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বাসনা আমার গতিরোধ করিল। মনে হইল, নিনানি ছাগলের মাংস খুব ভালবাসে। তাহার জন্য একটা ছাগল শিকার করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! যদিও সঙ্গে তীরধনুক ছিল না, তবু মনে হইল পর্বতের সানুদেশে যে অরণ্য আছে তাহার ভিতর ঢুকিয়া সঙ্গোপনে যদি ওই পর্বতের নাতি-উচ্চ চূড়াটার উপরে উঠিতে পারি তাহা হইলে প্রস্তর ছুঁড়িয়াই একটা ছাগলকে বোধ হয় ঘায়েল করিতে পারিব। একটা ছাগলের মাথায় কিম্বা পায়ে যদি মারিতে পারি...! সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম এবং লোলুপ সরীসৃপের মতো পর্বতের সানুদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

(ক্রমশ)

যুগ-বিপ্লব

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

সূর্যোদয় হইতেছে। আকাশে মেঘ থাকায় সারা আকাশ লাল। তাহারই ছটায় চারিদিক রক্তাভ আলোয় উজ্জ্বল।

আবদালীর আক্রমণ বিধ্বস্ত উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চল। সেই জাঠ গ্রাম 'চৌমুহা'। গ্রাম্য পথের ধারে রঘুনাথ জাঠের বাড়ী। সবটাই পুড়িয়া গিয়াছিল; তাহারই খানিকটা মেরামত করিয়া তাহারা বাস করিতেছে। একদিকে একটা পোড়া ঘরের দাওয়া। পোড়া খুঁটি একটা দাঁড়াইয়া আছে। অন্যদিকে একখানা নতুন খাপরা ছাওয়া ঘর। গন্না বেগম—ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু গায়িকা ভিখারিণীর বেশে, এই আক্রমণের বেদনা ও ক্ষোভ লইয়া গান রচনা করিয়া পথে পথে গাহিয়া ফিরিতেছে। কবি পিতামাতার সন্তান, সে নিজেও কবি। সঙ্গে লইয়াছে একদল পিতৃমাতৃহীনা অনাথা মেয়ে। সে গাহিতেছে মূল গান—তাহারা গাহিতেছে ধুয়া। রঘুনাথের বাড়ীতে কাহাকেও দেখা যায় না। পথ দিয়া দুই চারিজন লোক যাইতেছে। তাহারা দাঁড়াইয়া একটু শুনিয়াই চলিয়া যাইতেছে।

গন্না প্রারম্ভেই শুরু করেঃ—তামাম হিন্দুস্থানে নেমে এল আঁধিয়ারা। অংক শুরু হইবার কিছু আগে হইতেই তাহার কথা শোনা গেল।

গন্না—(দৃশ্যোন্মোচনের পূর্বে) হায় রে—হায়! হায় রে হায়! (দৃশ্য উন্মোচিত হইল) তামাম হিন্দুস্থান ঢেকে নেমে এল আঁধিয়ারা। সেই আঁধিয়ারায়—মুঘল বাদশাহী—কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে চলে যাচ্ছে। আমাদের নসীবেও নামল আঁধিয়ারা! সেই আঁধিয়ারার সন্ধান পেয়ে দানার মত এল তারা; এক হাতে মশাল এক হাতে তলোয়ার! হা-রে হা! হা-রে হা! পুড়ে গেল ঘর, পুড়ে গেল ক্ষেত, জ্বলে গেল বুক, কাটলে মানুষের গলা, দরিয়ায় দিলে ভাসিয়ে! হা-রে হা! সেই সঙ্গে আমার গান—তাও গেল পুড়ে—তাও গেল ভেসে!—

মেয়েরা—(ধুয়া গাহিয়া উঠিল কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে) হায়. দরদী!—হায়! হায়! হায়! আমার গান ফিরে দাও, আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন—! হায়—হায়—হায়! হায় দরদী হায়!

গন্না গাহিল—(আমার) সুরের তার ছিঁড়েছে, সকল ভাবের ঘর পুড়েছে—
গানের কথা ভাসিয়ে দিলে রক্তনদীর বান!

মেয়েরা—হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!—
আমার গান ফিরে দাও! আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না—কয় যে দরদী, আছে আছে রে!
মাটির মাঝে—নদীর কাছে রে!
বুক পেতে দে মাটির বুকে নদীর ঘাটে কান!

মেয়েরা—হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!—
আমার গান ফিরে দাও! আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না—বুক যে মাটির ছাইয়ে ঢাকা গো!
আমার বুকের রক্ত মাখা গো!
ধুলোর মাঝে মিশিয়ে গেল আমার
প্রাণের প্রাণ!

মেয়েরা—হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!—
আমার গান ফিরে দাও! আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না—নদীর বুকে চলেছে ভাসি রে!
আমার সকল কথা হাসি রে!
(আমার) সকল সুখ সকল আশা সকল
অভিমান!

মেয়েরা—হায়—হায়—হায়! হায় দরদী হায়—
আমার গান ফিরে দাও! আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

(গন্নার সুর, স্বর, ভঙ্গি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে নূতন সুরে এবার গান ধরিল।)

গন্না—বলছে মাটি—না—ই! বলছে—!
তোর সে ব্যথা আমার বুকে আগুন হয়ে
জ্বলছে!—জ্বল-ছে—! অগ্নি জ্বালায়!

(মেয়েরাও পরিবর্তিত সুরে ভঙ্গিতে গাহিয়া উঠিল নূতন ধুয়া!)

মেয়েরা—(তবে) জ্বালা জ্বালা রোশনি জ্বালা,
বুকের জ্বালায় জ্বালিয়ে তুলে রোশনি
জ্বালা!

গন্না ও সকলে—নসীবের রাতের পালায় মশাল
জ্বালা—লালচে আলোর উল্কা মালা!
আগুন জ্বালা!

গানের ঠিক মধ্যস্থলে ছাওয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল জবাহির সিং। শীর্ণ দেহ, কপালে একটি দীর্ঘ ক্ষত চিহ্ন; সদ্য শুকাইয়াছে। মাথায় পাগড়ী নাই; মাথার চুল উড়িতেছে; চোখে অসুস্থ দৃষ্টি। মথুরার যুদ্ধে সে মাথায় আঘাত পাইয়াছিল। স্মৃতি বিভ্রম ঘটিয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল। আজই এই প্রথম সে বিছানা হইতে উঠিয়াছে। মা-বাবা কেহ বাড়ীতে নাই। গান শুনিয়া সে বাহিরে আসিয়া ঘরের পোড়া খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল! একাগ্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে গন্নার দিকে চাহিয়াছিল। গানের শেষে সে আসিয়া গন্নার সামনে দাঁড়াইল। সে আসিয়া দাঁড়াইল বলিয়াই গানটি ওখানে শেষ হইল। নহিলে গান আরও আছে! তাহাকে দেখিয়াই গন্না গান থামাইয়া বলিল—

গন্না—ছোট সর্দারজী! (পিছনের দিকে জবাহির ছিল বলিয়া গন্না তাহাকে দেখে নাই)

জবাহির—মশাল জ্বালিয়ে আগুন লাগাতে লাগাতে এসেছিল, তারা, তারা কে? এ্যাঁ? আর—আর—তুমি কে?

গন্না—(জবাহিরের অবস্থা সে জানে তাই ও প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল) তুমি নিজে উঠে এলে সর্দার? উঠতে পেরেছ তুমি? ভাল মনে হচ্ছে? (সস্নেহে সহর্ষে সে দীপ্ত হইয়া উঠিল)

জবাহির—হাঁ—হাঁ! আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু তারা কারা? কোথায় গেল তারা? কোন্ দিকে?—আ! আকাশ লাল হয়ে রয়েছে! আবার কোথায় আগুন লাগালে তারা? আঃ—আমার তলোয়ার আও বন্দুক? মা—মা!—মা!

গন্না—না সর্দারজী না। আগুন নয়, আগুন নয়।

জবাহির—নয়?

গন্না—না। দেখছ না সূর্য নারায়ণ উঠছেন! সূর্য নারায়ণ!

জবাহির—হাঁ—হাঁ! (ঘাড় নাড়িল)। হে সূর্য নারায়ণ; হে দেওতা, প্রণাম! তাহলে তারা চলে গেছে?

গন্না—হাঁ। তারা চলে গেছে। বহেনো—তোরা চল—সর্দারের মাতাজী আসুক আমি যাচ্ছি।

(মেয়েরা চলিয়া গেল)

জবাহির—কিন্তু—কিন্তু—।

গন্না—আবার কি? তুমি ঘরে চল। তুমি কাঁপছ—তুমি

জবাহির—হাঁ—হাঁ—হাঁ। তুমি, তুমি, তুমি কে? কে বলতো তুমি?

গন্না—আমি ভিক্ষা (ভিখ্‌সা) মেগে বেড়াই সর্দার—গীত শুনাই—ভিখ্‌সুকের কন্যা!

জবাহির—(ঘাড় নাড়িল প্রত্যেক বার) উঁ-হু! উঁ-হু! উঁ-হু! আমি যে তোমাকে দেখেছি! হাঁ দেখেছি!

গন্না—না—না—না। এদেশে আমি এসেছি নতুন। এই আফগানেরা যখন এসেছিল তখন। তোমার মা আমাকে বাঁচিয়েছিল, তুলে এনেছিল জংগলের ভিতর

থেকে। তখন তুমি মাথায় চোট লেগে বেহোঁস। কি করে দেখবে আমাকে?

জবাহির—তবে সে কে?

গন্না—কে?

জবাহির—সেই—। হাঁ-হাঁ। সে তো তুমি। তোমার সংগে এক বুড্ঢা—আমীর; না—না। (ভাবিয়া) ফকীর। হাঁ ফকীর। আর তুমি—? দাঁড়াও—মনে করি! পানসীর অন্দরে—বেহোঁস হয়ে কাতরাচ্ছিলে—আমি তুললাম। বললাম তুমি রাধারাণী। তুমি বললে—না-না, এখানে থাকব না আমি! সে তুমি নও?

গন্না—না সর্দার। তোমার ভুল হচ্ছে। তুমি যার কথা বলছ সে আমি জানি। আমি শুনেছি তুমি তার পানসী পাঠানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, সে আমি নই। সে হ'ল শুনেছি মুঘল বাদশাহ বংশের রাজলছমী। লোকে বলছে সে নাকি যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছে।

জবাহির—মুঘল বাদশাহের ঘরের রাজলছমী?

গন্না—হাঁ সর্দার।

(জবাহির মাথায় হাত দিয়া বসিল)

গন্না—ওঠ সর্দার। চল ঘরে তোমাকে শুইয়ে দিয়ে যাই।

জবাহির—(হঠাৎ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল) যমনায় ঝাঁপ খেয়েছে?

গন্না—না খেয়ে কি করবে বল? আঃ—চীৎকার করে বলে গেছে—"তামাম হিন্দুস্থানে আঁধিয়ারা নেমে আসছে। আঁধিয়ারার অন্দরে—মুঘল বাদশাহী—কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে! আমার নসীবও অন্ধকার। আমায় ছেড়ে—আমায় ছেড়ে দাও!

জবাহির—(অভিভূত ভাবে বলিয়া উঠিল) হা-হা-হা! হা-রে!

গন্না—ওঠ, সর্দার ওঠ!

(জবাহিরের হাত ধরিয়া। জবাহির উঠিতে গিয়া তাহার হাতের কঙ্কন দেখিয়া মুখের দিকে চাহিল।)

জবাহির—(তাহার হাতের কঙ্কন দেখিয়া) তা হ'লে এ কাঁকনি? এ কাঁকনি যে তার হাতে ছিল! আমি দেখেছি যে!

গন্না—সে সোনার—এ পিতলের, তাতে ছিল সাচ্চা জহরত, এ হ'ল ঝুটা কাচ সর্দার!

জবাহির—ওঁ—হুঁ—স্পষ্ট মনে পড়ছে—সন্ন্যাসিনীর মত পোষাক—হাতে কঙ্কণ। নও—সে তুমি নও?

গন্না—না—না। অই-অই তোমার মাতাজী আসছে। অই!

নেপথ্যে রতনবাঈ (জবাহিরের মা)—হে ভগোয়ান! হে সুরুয নারায়ণ, তুমি এর বিচার করো। তোমার আঁখে তো কিছু ছিপা থাকে না! সব তো দেখছ তুমি! আমার রোগা বেটাকে এক মুঠ্ঠি মুংদালের সুরুয়া করে দেব, তা মিললনা পরভূ! আমার মরদ আমার বেটা—তিন তিন পহর বেলা লড়াই দিয়ে পুরো দিন আফগানকে রুখেছিল—তাই না বানিয়ারা শেঠেরা পালাতে সময় পেয়েছিল মথুরা থেকে? নইলে?—হা-রে-হা! হারে—হা! তারাই আজ এক মুঠ্ঠি মুংদালের দাম চাইছে এক সিক্কা! আমার মরদ মরে গেল—আমার জবাহির—

(প্রবেশ করিয়াই গন্নাকে দেখিয়া বলিল)

আ! আ মেরি বেটী! আরে তুই কতক্ষণ? আ—মেরে জবাহির—মেরে বেটা! বেটা আমার উঠে এসে দাঁড়িয়েছিস! কি আনন্দ রে—আমার কি আনন্দ! হে দীনদয়াল—হে আমার মথুরানাথ—আমার গোকুলনাথ! আমার জবাহির যে উঠে দাঁড়াবে তা আমি ভাবি নি! (পরমানন্দে) মেরে জবাহির, মেরে গোপাল, মেরে দুলাল! কিন্তু তোকে আজ আমি খেতে কি দোব বলতো? এক মুঠ্ঠি মুংদাল—তার দাম এক রুপেয়া? পাঠান চলে গেছে, বানিয়ারা আজ ফিরে এসে দেশের সব চিজ কিনে চেপে বসেছে, গর্দানায় ছুরি দিচ্ছে, জিরা বেচছে হীরার দামে!

গন্না—হে ভগবান—এর খোদা! তুমি কি নাই?

জবাহির—কি? এ কার কথা? তোমার? তবে? তবে? মা—মা। এ নয় সে? সে?

রতনবাঈ—সে? না বেটা এ সে নয়। এও তারই মত একজন। পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। কোন রাজার না-কোন বাদশার বেটী, কি যে মনের দুখ ওই জানে। বললাম—তবে বল্ বেটী কোন রাজপুরীতে কি—কোন মতিমহলে যাবি—সেখানে রেখে আসি। তা' বললে না। বললাম—তোর বাপ মা যদি জান দিয়ে থাকে আফগানের হাতে, পুড়ে গিয়ে থাকে দৌলতখানা, তাতেই বা কি? আমার বেটী নাই—আমার বেটীর মত থাক—জীওন আমার ভরে উঠুক; তাও না। বাপ-মা মরা মেয়ের দল নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ভিখ্ মেগে বেড়াচ্ছে। বলছে—দেশে আগুন জ্বলবে!

জবাহির—হাঁ—হাঁ। জ্বলবে! জ্বলবে! আমি বেরুব মশাল নিয়ে। যেখানে তাদের পাব, আগুন জ্বালিয়ে বিলকুল পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব। ভস্ম—ভস্ম ভস্মে ঢেকে দেব মাটি!

গন্না—(হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল) আরে মেরে সর্দারজী! আ হো মেরে রুস্তম! হাঁ—(গাহিয়া উঠিল) জ্বালা-জ্বালা রোশনি জ্বালা বুকের জ্বালা জ্বালিয়ে তুলে রোশনি জ্বালা! নসীবের রাতের পালায় পোড়া বুকের উল্কামালায় জ্বালা দেওয়ালী। আগুন জ্বালা—।

জবাহির—হো—হো—হো! হো—হো—হো! হো—হো—হো!

(বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল)

রতন—বেটা! জবাহির! মেরে গোপাল!

গন্না—সর্দারজী! সর্দার!

জবাহির—জল! (ম্লান হাসিয়া ঘাড় নাড়িল) তিয়াস!

রতন—ঘরে চল বেটা! ঘরে—ঘরে। শুয়ে পড়বি, জল খাবি, আমি হাওয়া করব! বেটা! ধর—ধর বেটী!

গন্না—ওঠ, ওঠ সর্দার!

(দুইজনে জবাহিরকে ধরিয়া লইয়া গেল)
(নরিন্দর গিরি প্রবেশ করিলেন)

নরিন্দর—বেটী রতন বাঈ!

(রতন বাঈ বাহির হইয়া আসিল)

রতন—(ছুটিয়া আসিল পরমানন্দে, পা দুটি ধরিয়া বলিল)—জয় গুরু মহারাজ—হে মেরে ভগবান! তোমার কিরপায় আমার জবাহির উঠে দাঁড়িয়েছে!

নরিন্দর—উঠে দাঁড়িয়েছে?

রতন—হাঁ বাবা! বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বেটী রট্টার গীতের সংগে—হো-হো-হো করে আনন্দ করলে! বললে কি জান বাবা? বললে—মশাল নিয়ে আমি যাব—তাদের মুলুক ছাই করে দিয়ে আসব!

নরিন্দর—আচ্ছা! আচ্ছা! বীর জবাহির সিং তা পারবে! কোথায় সে?

রতন—বহুত কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি বাবা! রট্টাকে বসিয়ে তোমার আদেশ শুনে ছুটে এলাম! তোমার ওষুধ—বাবা—তোমার ওষুধ—নইলে জবাহির আমার। (ঘাড় নাড়িল) সর্দার চলে গেল। জবাহিরের জন্যে আমি যেতে পারলাম না! আমার নসীব!

নরিন্দর—কিছু ভয় নেই মাতাজী! জবাহির শিগ্গির সেরে উঠবে এইবার! এই নাও, শুনলাম তুমি মুংদাল খুঁজতে গিয়ে পাওনি। নাও, সুরুয়া করে দাও জবাহিরকে।

(ছোট একটি থলি দিলেন)

রতন—দীনদয়াল মেরে বাবা, তুমি আমার দীনদয়াল। মুল্লুক শ্মশান করে দিয়ে গেছে আবদালী পাঠান, চানা নাই, দানা নাই, সত্তু নাই, মাস দাল যা মানুষ খেতো না—গরুতে খেতো—তাও রুপেয়াতে পান সের। জাঠেরা ফকীর হয়ে গিয়েছে। লুঠে নিয়ে গিয়েছে, ঘর পুড়ে তামা পিতলের বর্তন গলে তাল বনে গেছে। দীনদয়াল তুমি—তোমার আশ্রম থেকে এক মুঠ্ঠি 'ক'রে চানা দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ। যারা

জখম হয়েছে তাদের সারিয়ে তুলেছ!

নরিন্দর—মথুরানাথের আদেশ মাতাজী! যারা তাঁকে রক্‌সা করবার জন্য এমনভাবে প্রাণ দিলে তারা কি না-খেয়ে মরতে পারে? তিনি আদেশ দিলেন আমাকে! গিরি—ওদের খেতে দেবার ভার তোর উপর দিলাম আমি। সবই তিনি করেছেন—আমি না, আমি সে আদেশ পালন করছি শুধু। প্রণাম জানাও তাঁকে!

রতন—বাবা! একটি আরজ আমার তা' হ'লে মথুরানাথকে জানিয়ো গুরু মহারাজ! (হাতজোড় করিয়া বলিল)

নরিন্দর—বল বল! তোমরা যা বলবে তিনি তাই শুনবেন।

রতন—সরম লাগছে বাবা! কোন মুখে বলব! পরভুকে রক্‌সা করতে গিয়ে তো পারি নি রক্‌সা করতে, তা হ'লে বড় মুখ করে বলতাম, যদুনাথ গরীব মুরুখ্‌ চাষী, পেটের জ্বালায় বুকের দুখে ওরা লুঠেরা হয়েছিল—গরীব যাত্রীদের লুঠ করেছে, তাতে পাপ হয়েছে, কিন্তু দেওতা ওরা তোমার রাজধানী রেখেছে, তোমার নিদ্‌ ভাঙতে দেয় নি, সেই পুণ্যে ওদের গতি কর। কসুরের সাজা মাফ দিতে তুমি হুকুম দাও! কিন্তু তা তো পারে নি! তুমি তাঁকে বলো মহারাজ আমার বুড়োয়ার যেন গতি হয়। জাঠ চাষীদের দণ্ড দণ্ড-দাতা যেন মাফি দেন।

নরিন্দর—জাঠেদের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়েছে মাতাজী, জাঠ সর্দার রঘুনাথ পরমগতি লাভ করেছে। তাদের সকল পাপ ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে বুকের রক্ত ঢেলে। আমি বলছি তোমাকে!

রতন—আঃ—আঃ! জয় মথুরানাথ, জয় গোকুলনাথ! এ না হ'লে যুগে-যুগে মানুষে তোমার জন্যে কাঁদে কেন? কিন্তু দেওতা, তুমি একবার নিজে তলোয়ার ধরে জাঠেদের পিছনে এসে দাঁড়ালে না কেন? তা হ'লে কি জাঠ হটে, না জাঠ মরে! তোমাকে একবার চোখে দেখলে এক জাঠ দশ দশ জাঠের জোরে জোর-দার হয়ে উঠত। কোথায় ভেসে যেত তিশ হাজার আফগান! হা! হা-হা-হা-হা! দশ হাজার জাঠের ছ' হাজার খতম হয়ে গেল। চার হাজার রইল—তাও জখম হয়ে বাঁচল। ক্ষেত কাঁদছে গরু, চাষী নেই; জেনানীরা কাঁদছে—স্বামী নাই—বেটা নাই—বাপ নাই! হা-রে-হা!

নরিন্দর—আমি বলছি মাতাজী, আবার জাঠ-দেশ নওজোয়ানে ভ'রে উঠবে। ভগবান মঙ্গল করবেন। যখন প্রলয় হয় মা—তখন এমনি হয়। তখন যারা কষ্টের মধ্যে জ্বলে ওঠে তারাই পৃথিবীতে বড় হয়।

রতন—তা হ'লে বাবা, ওই যে রাজলছমী বলে গেল সে কথা সত্যি? গোটা দেশে তো ওই ছাড়া কথা নাই। হিন্দুস্থানে আঁধার নামছে, মুঘল বাদশাহী যাচ্ছে? পাথর ফেটে দেবতা বেরুবেন?

নরিন্দর—হ্যাঁ মা। খুব দুঃসময় তাতে ভুল নেই। এ সময়ে দেবতা তো জাগেন—জাগারই তো কথা। মথুরা লুঠের সময় তিনি তো পার্শ্বপরিবর্তন করেছেন জাঠেদের মধ্যে—আমি তো দেখেছি! সেই জন্যেই তো পেশবা জবাহিরকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। জবাহিরকে সম্মান ক'রে তিনি সেই দেবতাকেই পূজো দেবেন।

রতন—বাবা, তুমি বলছ বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পেশবা যে জবাহিরকে নেওতা পাঠিয়েছেন সে আমার বেটা চাষা জবাহির নয়, ও বাবা রাজা সুরয-মলের বেটা কুমর জবাহির হবে। পেশবা সে হ'ল মারাহাঠার শাহান শা, ব্রাহ্মণ, বড়া ভারী পণ্ডিত, সে কেন ডাকবে গরীব চাষীর বেটাকে?

নরিন্দর—না-মাতা—না। আমাকে তিনি লিখেছেন, চৌমুহা গ্রামের বীর জাঠ-সর্দার জবাহির সিংকে নিয়ে আসবেন, তাকে আমি সম্মান করব।

রতন—আমার যে ডর লাগছে বাবা! চাষীর ছেলে, রোগা দেহ, মগজের গোলমাল—কি হবে—কি করবে, রাজার দরবার! ওরা বাবা লড়াই করে, লুঠ করে—তখন ঠিক থাকে রাজা মহারাজা, যে হোক তার সামনে দাঁড়ায় মরণের সিপাহীর মত—কিন্তু দরবারে কি আসরে একদম বুড়বক—বোকা চাষা—

নরিন্দর—আমি সঙ্গে থাকব মা। কোন ভয় নাই। আর ততদিনে জবাহির সেরেও উঠবে। মা—তোমাকে বলি—মারহাঠা পেশবা এবার ধরমপাদ পাদশাহী স্থাপন করবে।

রতন—হাঁ-হাঁ-হাঁ। হিন্দুপাদ পাদশাহী! শুনেছি বাবা। শুনেছি আর ডর-কে মারে থরথর ক'রে কেঁপেছি। আরে বাবা, কি জুলুম বাবা মারহাঠার! সমান লুঠ বাবা—সমান লুঠ! ফারক শুধু এরা জেনানী আদমী লুঠে বেঁধে নিয়ে যায় না, হাটে বেচে না! কিন্তু নাক কান কেটে দেয়! হে মথুরানাথ!

নরিন্দর—না মাতাজী! মারহাঠা এবার বদলাবে। আমাকে বলেছে পেশবা!

(গন্না বাহির হইয়া আসিল)

গন্না—মাতাজী! তুমি এবার ঘরে যাও মাতাজী, বহু কষ্টে সর্দারকে ঘুম পাড়িয়েছি।

নরিন্দর—যাও মা যাও। আবার আসব, আবার দেখা হবে। যাও। জবাহির উঠে পড়বে। ওর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

(রতন বাঈ প্রণাম করিয়া মুদ্রার থলিটা লইয়া চলিয়া গেল)

গন্না—প্রণাম গিরি মহারাজ!

নরিন্দর—রত্না দেবী! তুমি বেটী আশ্চর্য! গন্নাকে একেবারে মুছে দিয়ে রত্না হয়ে উঠেছ! বসরার গুলাব—জবা ফুল হয়ে গেলে!

গন্না—তয়ফাওয়ালী হলেও আমার মা যে হিন্দুর মেয়ে ছিলেন মহারাজ! আমার বাবা ছিলেন উদার কবি মুসলমান। তা' ছাড়া প্রভু আমি যে নিজে তয়ফা-ওয়ালী।

নরিন্দর—তুমি মা কল্যাণী, সব তোমার ধুয়ে মুছে গেছে। তুমি পবিত্র! তুমি রত্নদেবী!

(গন্না পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল)

বাহিরে তাহার গান শোনা গেল—

আমার গান ফিরে দাও—
আমার হারিয়ে যাওয়া গান।

সমবেত স্বর—

হায়—হায়—হায়, হায় দরদী হায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পেশবার প্রাসাদ

রাত্রিকাল; বাহিরের নগরপথের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে—দেওয়ালী—দেওয়ালী—দেওয়ালী! আবছা অন্ধকার কক্ষে একজন পরিচারক জানালা ও ঝরোকার খুলিল। বাহির হইতে দেওয়ালীর আলোকচ্ছটা আসিয়া প্রবেশ করিল। কক্ষে একটি আলো জ্বলিল! বাহিরে আলোকিত নগরীর একাংশ দেখা যাইতেছে। পরিচারক চলিয়া গেল।

প্রবেশ করিল—পেশবার তরুণ পুত্র বিশ্বাস রাও ও নসীবন বেগম। বিশ্বাস রাও নসীবনেরই সমবয়সী—বয়স সতের আঠারো বৎসর। রূপবান কিশোর-যুবা। ইতিহাস বলে এমন রূপ সুদুর্লভ।

["Though he was an Indian yet no man of such light complex and beautiful shape came in their (Afgan) sight. His colour was that of champa flower etc. (Sir Jadunath)]

সমগ্র মহারাষ্ট্রের সে নয়না-নন্দ। তাহার পিছনে নসীবন বেগম। তাহার অঙ্গে ফকিরিণীর পরিচ্ছদ, সে ঈষৎ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিষণ্ণ দৃষ্টি; রুক্ষ চুল—দুই পাশে অর্ধবেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে!

বিশ্বাস—মহামান্য পেশবা আসছেন। আপনি ততক্ষণ বরং আলো দেখুন। আজ দেওয়ালী। আমাদের অতি পুণ্য পর্ব আনন্দের পর্ব। দীপাবলী; আলোকোৎসব; দীপালী! সাধারণে বলে দেওয়ালী! জানেন তো তিথিতে আজ অমাবস্যা—

নসীবন—জানি। আমাদের রমজান চলছে কুমর সাহাব। কাল চাঁদ দেখতে পাব কিনা জানি না—তবে আজই আঁধিয়ারার শেষ!

বিশ্বাস—হ্যাঁ হ্যাঁ শাহজাদী জানি। আপনি উপবাস করছেন। বড় পবিত্র আপনাদের রমজান! আত্মার গ্লানি দূর করার ব্রত! উপবাস শীর্ণ মুখে ফকিরিণীর পরিচ্ছদে আপনাকে মূর্তিমতী পবিত্রতার মত দেখাচ্ছে!

নসীবন—জানি না কুমর সাহাব; আমার অন্তর বেদনায় ভরে উঠেছে—আর এক ফোঁটা ধরবার স্থান নেই। তাই আলো দেখতে ছুটে এলাম।

বিশ্বাস—আমাদের পর্বের অর্থও তাই। আলোয় আলোয় অমাবস্যার অন্ধকারকে দূর করা।

নসীবন—মনের অন্ধকার কুমর সাহেব? তাও দূর হয়? (ভাবিয়া) হয় তো হয়! গরীব দুঃখীদের আলোর সারি জ্বালে—সে কি আনন্দ তাদের! কি সুন্দর দেখায় তাদের! আলোর ছটায় লুকানো রূপ যেন ফুটে বের হয়; দিনের আলোতেও সে দেখা যায় না! আমার এক বাঁদী সে ছিল কালো মেয়ে, সে সন্ধ্যায় বাতি নিয়ে আসত—মনে হ'ত কালো মেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠেছে!

বিশ্বাস—দেখুন, দেখুন; দরবারের আলো বোধ হয় জ্বালা হল। আলোর ছটা বেড়ে উঠল!

নসীবন—(ফিরিয়া দেখিল তারপর পর্দা ফেলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল) এবার বোধ হয় দিল্লীতে দেওয়ালী হবে না। শুধু দিল্লী কেন—আগ্রা থেকে আটক পর্যন্ত আফগান যে পথে এসেছে যে পথে গিয়েছে—কোথাও হবে না।

বিশ্বাস—আগামী দীপাবলীতে জ্বলবে শাহজাদী! গোটা ভারতবর্ষকে এমন আলোর মালায় সাজাব—যে তার ছটা হিন্দুকুশের ওপর থেকে আফগান দেখবে। চোখ ঝলসে যাবে।

নসীবন—কুমরজী সমগ্র মহারাষ্ট্রের আপনি আঁখো কি রোশনি; শুধু মহারাষ্ট্রের কেন সব মানুষের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে আপনাকে দেখলে! আপনি জ্বাললে—জ্বলবে সে আলো!

বিশ্বাস—আমিই সে ভার পেয়েছি শাহজাদী; মহারাষ্ট্রের ঐ অভিযানে আমিই হব প্রধান সেনাপতি! আবদালীর সামনে দাঁড়াব আমি!

নসীবন—আবদালীর সামনে দাঁড়াবেন আপনি?

বিশ্বাস—হাঁ আমি। আজই আমাদের—(ঘরের আলোটা নিভিয়া গেল। নসীবনই পিছন ফিরিয়া ফুঁ দিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল। বিশ্বাস দেখিল না!)

বিশ্বাস—চকিত হইয়া এ কি? আলোটা নিভে গেল? আলো! আলো!

নসীবন—থাক কুমর জী! আমিই নিভিয়ে দিয়েছি আলো। আলো ভালো লাগছে না আমার!

বিশ্বাস—কিন্তু দীপালীতে যে ঘর অন্ধকার রাখতে নেই! (সে বন্ধ করা পর্দা খুলিয়া দিল)

(নেপথ্যে বালাজী রাও)

নেপথ্যে বালাজী—শাহজাদী!

বিশ্বাস—মহামান্য পেশবা আসছেন। আপনি এই খানেই অপেক্ষা করুন শাহজাদী! আমি আলো নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

(শাহজাদী নসীবন কয়েক পা আগাইয়া গিয়াও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ডাকিয়া কিছু বলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিলেন, সে হাত নামাইয়া লইলেন)। (পেশবা বালাজী রাও প্রবেশ করিলেন দরবারী পরিচ্ছদে।)

বালাজী—মহামান্যা শাহজাদী নসীবন উন্নিসা!

নসীবন—মহামান্য পেশবা! (অভিবাদন করিলেন)

বালাজী—শাহজাদী—আমি ব্রাহ্মণ। ভগবানের আশীর্বাদ দিয়ে অভিবাদন আমাদের প্রথা, আমার সেই অভিবাদন গ্রহণ কর তুমি। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

নবীসন—মহামান্য পেশবা, আপনি আমার পিতৃতুল্য। যে মুহূর্তে হতাশার তাড়নায় মৃত্যু ছাড়া আমার ছিল না—সেই মুহূর্তে আপনি পিতার স্নেহে আশ্বাস দিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনার আশীর্বাদ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মধ্যে মধ্যে আমার ইচ্ছা হয় হিন্দু কন্যার মত আপনার পাদস্পর্শ করে প্রণাম করি!

বালাজী—তোমাকে আমি কন্যা জ্ঞানেই গ্রহণ করেছি মা!

(মাথায় হাত রাখিলেন)

(হাত নামাইয়া লইলেন) আজ কিন্তু তোমাকে অভিবাদন জানিয়ে সসম্ভ্রমেই কথা বলতে হবে আমাকে! উত্তর ভারতে আমাদের অভিযান সুরু হবে। এই দেওয়ালীর রাত্রি আমাদের পবিত্র রাত্রি; শক্তি এবং লক্ষ্মী দুই উপাসনা এক সঙ্গে একাধারে। মহারাষ্ট্রের শক্তি আছে, মুঘল রাজলক্ষ্মীরূপা তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকেই আমরা দিল্লীর মসনদে অভিষিক্ত করব স্থির করেছি। (নসীবন চুপ করিয়া রহিলেন। মাটির পুতুলের মত স্থির তিনি)

আজই দরবারে তুমি উপস্থিত হও এই আমার অভিপ্রায়!

নসীবন—না। আমাকে আপনি মার্জনা করুন মহামান্য পেশবা।

বালাজী—কেন শাহজাদী?

নসীবন—আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে কি লাভ আপনার পেশবা? যে বিপুল শক্তির অধিকারী আপনি তাতে এর প্রয়োজনই বা কিসের?

বালাজী—প্রয়োজন আছে মা। আমি অনেক চিন্তা করেছি।

নসীবন—আপনি কি আমার ভাগ্যফলের কথা বলছেন?

বালাজী—না মা। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্বাসে আমার আস্থা নেই। সংসারে যারা দুর্বল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বৈগুণ্যকে অতিক্রম করতে পারে না—তাদেরই ভরসা ওটা। জ্ঞান এবং কর্মযোগ আমার বেদ। আমার বুদ্ধির বিচারে আমি বুঝেছি তোমাকে আমাদের উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমাদের সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত।

নসীবন—জনাব, এ আমার পক্ষে হবে কঠোর নির্যাতন। দিল্লীর মসনদে বসে—আমার জীবন শুকিয়ে যাবে! আপনি পিতা আমি কন্যা। না—না!

বালাজী—অধীর হয়ো না মা! তুমি কি বলছ—ঠিক তার অর্থ—

নসীবন—(ওই প্রসঙ্গটি চাপা দিবার জন্যই বালাজীর কথার মধ্যস্থলে বলিয়া উঠিলেন) বলিলেন (অপেক্ষাকৃত স্থির-ভাবে) তা ছাড়া মহামান্য পেশবা, আপনি পিতার স্নেহে আমাকে ধন্য করেছেন রক্ষা করেছেন, আমি কন্যার মত শ্রদ্ধাভরে আপনার মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছি। সে আশ্বাসের মর্যাদা যদি কোন মতে ক্ষুণ্ণ হয় তবে আমি বাঁচব কি নিয়ে?

বালাজী—অবিশ্বাস—?—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না মা?

নসীবন—মহামান্য পেশবা আমি বালিকা; রাজনীতিতে প্রশ্নের সীমা নাই! হিন্দোস্থানে মুসলমানের ভাগ্য, বাবরশাহী বংশের অধিকার—অনেক অনেক প্রশ্ন।

বালাজী—বাবরশাহী বংশধরদের রক্তে যত বিস্ময়কর আভিজাত্য তত বিচিত্র জটিলতা, তত ভোগ মাদকতা; সে মাদকের প্রভাব—উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জীবন পর্যন্ত অপবিত্র করে তুলেছে। এই বংশে তুমি যেন ব্যতিক্রম। তোমার মত পবিত্র আত্মাকে যদি মসনদে বসাতে পারতাম তা-হলে—

নসীবন—বাবরশাহী বংশকে তখৎ থেকে বঞ্চিত করতে হ'ত না।

বালাজী—না মা, বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। দৃষ্টির সতর্কতার খানিকটা

সিংহাসনের দিকে নিবন্ধ রেখে অপব্যয় করতে হ'ত না। বাবরশাহী বংশকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার কথা এখনও ভাবি নি।

নসীবন—হিন্দুপাদ পাদশাহীর কথা আপনার গৃহে এসে আমি না শোনা নই পেশবা।

বালাজী—এক সাধুর পরামর্শে সে কল্পনা আমি ত্যাগ করেছি হজরত। আমি এই দেশের মানুষের জন্যে ন্যায় এবং শান্তির বাদশাহী স্থাপন করতে চাই।

নসীবন—আপনি আমার পবিত্রাত্মার কি সন্ধান পেয়েছেন জানি না মহামান পেশবা কিন্তু আমি আমার রক্তে কুটীল জটিলতার সঞ্চালন অনুভব করছি। ভাবছি শাহজাদী তখ্‌তে বসবে; সুলতানা থাকবেন কুমারী। সন্তানহীনা সম্রাজ্ঞীর অন্তে—এ তখ্‌তের অধিকার আমার যাবে কার কাছে? বাবরশাহী বংশে যদি আর পবিত্রাত্মার সন্ধান না মেলে?

বালাজী—থাক না-থাক! বংশধারা বিচিত্র। বাবরশাহী বংশের রক্তের জটিলতা মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করলো তোমার মধ্যে!

নসীবন—মহামান্য পেশবা! আমি আর একবার ভেবে দেখি!

বালাজী—ভেবে দেখবে?

নসীবন—পেশবা, খোদাতয়ালার তপস্যার বঞ্চনার মধ্যেও পরমানন্দ আছে। আর রিক্ত জীবন নিয়ে কণ্টকাকীর্ণ মসনদে বসে বাদশাহীর তপস্যা। আমার রক্তে—। (থামিয়া গেলেন) আমায় ভাবতে দিন।

বালাজী—তাই হবে। তুমি ভেবে দেখ!

(চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন)

(নসীবন নিজের হাত মেলিয়া ধরিল চোখের সম্মুখে।)

বালাজী—(ফিরিয়া আসিলেন) হ্যাঁ—একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে আমার মা!

(নসীবন হাত নামাইলেন)

নসীবন—বলুন পিতা।

বালাজী—চৌমুহার যে জাঠ যুবককে তুমি পুরস্কৃত করতে চাও, সে এসেছে। দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তোমার নিজে পুরস্কৃত করাই উচিত নয়?

নসীবন—তাই হবে। (নিজের গলার হার খুলিয়া) এই হারই তাকে পুরস্কার দিতাম আমি। কিন্তু সে চাষী, এর মূল্য তার কাছে কি বলুন? তার চেয়ে এই হারের মূল্য তাকে দিতে চাই আমি। অর্থ তার উপকারে লাগবে। মণিকারের কাছে বিক্রী ক'রে এর মূল্য আমাকে দেবেন পিতা!

বালাজী—তোমাদের রক্তে বিস্ময়কর আভিজাত্য! দাও। ঋণ তোমার থাকল না! বিশ্বাস রাও তোমাকে দরবারে নিয়ে যাবে শাহজাদী।

(হার লইয়া চলিয়া গেলেন)

(নসীবন আবার জানালার মধ্য দিয়া যে আলো আসিতেছিল সেইখানে হাত মেলিয়া ধরিলেন)।

(কয়েক মুহূর্ত পরে বিশ্বাস প্রবেশ করিল হাতে তার বাতিদান। সে সেনাপতির পোষাকে সজ্জিত—কোষে তরবারি, মাথায় পাগড়ী)।

বিশ্বাস—শাহজাদী। (সে দাঁড়াইল) কি শাহজাদী—? কি হল?

নসীবন—(প্রথমটা মুখ না তুলিয়াই বলিল) আমার হাতের শিরার মধ্যে বাবরশাহী রক্তস্রোতকে দেখতে চেষ্টা করছিলাম কুমর সাহাব। পেশবা বলে গেলেন (মুখ তুলিয়া বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন)

বিশ্বাস—কি বলে গেলেন পেশবা?

নসীবন—(নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াই ধীরে ধীরে বলিয়া গেলেন, কণ্ঠস্বর—মুগ্ধ চিত্ততার গাঢ়তায় গাঢ় হইতে লাগিল) বলে গেলেন—বাবরশাহী বংশের রক্তে যত বিস্ময়কর আভিজাত্য—তত বিচিত্র—।

বিশ্বাস—কি—তত বিচিত্র?

নসীবন—তত বিচিত্র কুটীর জটিলতা—তত—।

বিশ্বাস—কি শাহজাদী?

(নসীবন অগ্রসর হইলেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। মৃদু গাঢ় স্বরে)।

নসীবন—কি অপরূপ রূপ নিয়ে তুমি জন্মেছ কুমার। চম্পা ফুলের মত বর্ণ, পদ্মের পাপড়ির মত চোখ, বাতির আলো তোমার মুখে পড়েছে—কুমার,—এর আগে আলোর আভায় এমন উদ্ভাসিত রূপ—তো তোমার দেখিনি! মাথায় শিরবন্ধ, কোমরে তলোয়ার—কুমার—

বিশ্বাস—শাহজাদী! (তাহারও কণ্ঠস্বরে নসীবনের কণ্ঠস্বরে গাঢ়তা প্রতিধ্বনিত হইল যেন।)

নসীবন—বাবরশাহী বংশের রক্তে—

বিশ্বাস—শাহজাদী! (নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল—ধীর ছন্দে ঢং—ঢং—ঢং।)

নসীবন—(থমকিয়া দাঁড়াইল) আমি বড় তৃষ্ণার্ত! রোজার উপবাস করে—আমি ক্লান্ত—তৃষ্ণার্ত; বড় তৃষ্ণার্ত আমি!

(দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন)

ঘণ্টা—ঢং-ঢং!

বিশ্বাস—শাহজাদী!—শাহজাদী আপনাকে দরবারে যেতে হবে।

ঘণ্টা—ঢং-ঢং-ঢং-।

(অনুসরণ করিল।)

(ক্রমশ)

স্বপ্নান্তিকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে

স্মৃতির বন্দরে আজ
আমি তীর—তুমি যেন কোন এক
দূরের জাহাজ। ক্ষয়িষ্ণু সূর্যের ক্ষীণ
রশ্মির আমেজ নিয়ে লীন
হয়ে যাও; দৃষ্টির অতীত সেই
মেঘাচ্ছন্ন গোধূলির শিখা—যেন মরীচিকা—
হাতছানি দিয়ে যায় শুধুঃ
পশ্চিমের অস্তরাগ-রেণু গায়ে মেখে কখনো বা ধূধূ
স্বপ্নের প্রত্যন্তে চির স্বপ্নান্তিকা!

তবু জানি ছিল একদিনঃ
চলমান গতিচক্রে এসেছিলে ধীরে
বেসেছিলে ভালো এই পৃথিবীর মন্দিরে
করেছিলে আলো।—সেই ভালো, সেই আলোঃ

হৃদয়ের কন্দরে আজ
চিকণ রোদের সাঁঝ নেমে এল।
অনেক—অনেক হাওয়ায় ঝরা
বৃন্তচ্যুত পত্র-পুষ্প—শীতের কুয়াসা ভরা—
কুহেলিকা সম; ব্যথার বলাকা হ'য়ে
হয়ত বা জল-মেঘ পার হ'য়ে যায়!
কথার জোনাকিরাও মৃত্যুলগ্ন কোন দূরে
স্মরণে ঝলকায়—তোমার হুতাশ লয়ে।

সেই ভাল? তবে থাক্ জরাজীর্ণ হৃদয়ের
এইটুকু স্বাদ
ক্লান্তির নিঃশ্বাস-ভরা উন্মুক্ত বিষাদ
স্বপনের পারে।
তারি পদ-চিহ্ন তারে মান দিক্ সাগর বেলায়ঃ
হেথা রুগ্ন প্রীতি, প্রেম পড়ে থাক্ স্মরণ-মেলায়!!



ডান পা'টা সম্পূর্ণ আছে, বাঁ-পা শুধু হাঁটু পর্যন্ত। হাঁটুর কাছের মাংস-গুলো পাকা ডুমুরের মতন থোলো থোলো। বগলে একটা ক্রাচ। বাড়ির তৈরি। এক নজরেই সেটা মালুম হয়। অর্ধেকটা পা-ই না হয় গেছে, তা বলে ঠুঁটো তো আর নয়। শক্ত বাঁশের লাঠির মাথায় পেয়ারা কাঠের হ্যান্ডেল বসানো। সাজপোষাকও অপরূপ। মাথায় গান্ধী টুপি। পরণে খয়েরী শার্ট। আধ ময়লা কাপড় টেনে মালকোচা দেওয়া কাঁধের ওপর আড়াআড়িভাবে ঝোলানো লম্বা কাপড়ের ব্যাগ।

লোকটি উঠলো সোদপুর থেকে।

শেয়ালদ থেকে সোদপুর কতক্ষণেরই বা রাস্তা; কিন্তু তার মধ্যেই দুইজন চানাচুরওয়ালা, একটি দাদের মলম, গোটা তিনেক কমলালেবু-ওয়ালা টহল দিয়ে গেছে গাড়ির কামরায়। উঠেই বিচিত্র সুরে গান গেয়ে কিংবা বক্তৃতার সুরে নিজেদের জিনিসের মহিমা কীর্তন করেছে, এ লোকটি কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেলো না। বসলো একেবারে কোণের দিকে। ক্রাচটি সাবধানে কোলের ওপর রাখলো। পকেট থেকে আধপোড়া একটি বিড়ি ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইলো বাইরের দিকে চেয়ে।

যাক কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কান ঝালাপালা হবার আশা কম। অবশ্য গাড়িতে কলরবের অন্ত নেই। সামনের বেঞ্চে গুটি তিনেক ছোকরা জোর হল্লা শুরু করেছে কোরিয়া যুদ্ধ নিয়ে। ব্যাপার দেখে মনে হলো কোরিয়ার যুদ্ধ থামাতে গিয়ে এদের মধ্যে না হাতাহাতি বেঁধে যায়। তাদের পাশেই প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক। গায়ে রেলের বোতাম লাগানো কোট। গলায় তিনরঙা কম্ফোর্টার। দুটি হাত হাঁটুর ওপর জড়ো করে রেখে দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘনগোঁফের প্রান্তভাগ কেঁপে কেঁপে উঠছে। বোধ হয় নাইট ডিউটিই হবে ভদ্রলোকের তাই একটু চোখ বুজিয়ে নিচ্ছেন। এদিকে আমি, পাশে স্ত্রী এবং শালী। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা অবশ্য বলছি, মুখরোচক কিন্তু সুউচ্চ নয়। আমাদের এপাশে জাঁদরেল চেহারার একটি ভদ্রলোক। পরনে খাকী কোটপ্যান্ট। পায়ে গরম মোজা আর পুরু চামড়ার বুট। বুকপকেটে রঙীণ রুমালের ইশারা। তার পাশে ঘোমটা ঢাকা একটি বধূ। প্রায় ভদ্রলোকের গায়ের সঙ্গে লেপটেই বসেছে। বিয়ের ঘোর কাটেনি এখনও, নেশার আমেজ অটুট। ফিস ফিস করে লোকটির কথার উত্তর দিচ্ছে। তারপর পাঁচমিশেলী ভীড়। 'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ তো আছেই আরো দূরান্তরের অধিবাসীরাও রয়েছে ছড়ানো ছিটানোভাবে।

হঠাৎ কোলাহলকে ছাপিয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ মেজাজী আওয়াজ। সাধা গলা। তাল-লয়- সমন্বিত।

'রক্তারক্তি কান্ড। এ নির্মম শোণিতপাত দেখে কোন ভদ্রলোক পারেন চুপ করে থাকতে?'

গলা উঁচু করেও বক্তা যে কে ঠাওর করা গেলো না। আরও মুশকিল হলো গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সামনের সীটের ছেলে-বুড়ো সব দাঁড়িয়ে উঠেছে। সেই প্রাচীর ভেদ করে দৃষ্টি বেশীদূর যাবার কথা নয়। আওয়াজ আরো এক ধাপ চড়াঃ 'অগণিত উদ্বাস্তু এসে শেয়ালদ প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়েছে। বালবৃদ্ধ নরনারী ধনী নির্ধন। বাছবিচার নেই। সর্বহারা ভিক্ষুকের দল। এদের সব ছিলো। গোলাভরা ধান, মাথা গোঁজবার অপর্যাপ্ত আশ্রয়, পূর্ণ সংসার। পাগলা বাতাসে সব এলোমেলো হয়ে গেলো একদিন। মানুষ সব কিছু পিছনে ফেলে দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্যে হয়ে পালিয়ে এলো বিভীষিকার আওতা থেকে। সরকার নির্বিকার। শহরের লোকেরা উপহার দিলো নির্দয় কটাক্ষ, উপেক্ষার মৃদু হাসি।'

লোক না নজরে পড়লেও আভাষে বুঝলাম কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বক্তৃতা। মাঠ-ময়দান ছেড়ে শেষকালে ট্রেনের কামরাতেও ছড়িয়ে পড়লো এভাবে। সরকারের রেলে চড়ে সরকারেই নিন্দে। যাকে বলে বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো।

'এসবও সহ্য হয়েছিলো; কিন্তু দিনের পর দিন এ রক্তপাত কি করে সহ্য করবে তারা?' বক্তা গলার আওয়াজ খাদে নামিয়ে আনলো। স্বরে বিষাদের আমেজ।

নিঃসন্দেহ হলাম। উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশী বুলেটের বিবরণ চলবে এবার। সংবাদ-পত্রের ভাষায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আরতি ভুরু কুঁচকে চাইলো আমার দিকে 'জামাইবাবু, রেলগাড়িতে এলাও করে এসব। কেউ প্রোটেস্ট করে না।'

উত্তরে বললাম, 'ডেমোক্রাসীর যুগে জন-মতকে বাধা দেওয়া বেআইনী। শোনাই যাক না ব্যাপারটা।' গৃহিণী কিঞ্চিৎ চাপা গলায় বললেন, 'শুনবো কি ছাই, লোকটাকেই দেখতে পাচ্ছি না।'

তাঁর কথায় কাজ হলো। আমাদের ওধারে বসা কতকগুলো ছোকরা হৈ হৈ করে উঠলো, 'এ কি মশাই, এরকম করে সবাই যদি আপনারা দাঁড়িয়ে ওঠেন তো পিছনের লোকেরা দেখে কি করে?'

খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। সমান পয়সা খরচ করে এক সঙ্গেই চলেছি সবাই, একযাত্রায় ভিন্ন ফল হওয়া উচিত কখনও!

কিছু লোক বসলো। কিছু লোক খানিকটা কুঁজো হয়ে রইলো। কিন্তু দেখার খুব সুবিধা হলো না তাতে।

লোকটির গলা এবার সপ্তমেঃ এ রক্তপাত বাইরের শক্তির আঘাত জনিত নয়, এ রক্তপাত দুর্ভাগা উদ্বাস্তুদের নিজেদের সৃষ্টি। অনাহারে অনিদ্রায় শরীরের পরিচর্যার অভাবে মাথার চুল জটাকেও হার মানায়। এইসব চুলের গোড়ায় গোড়ায় উকুনের লীলানিকেতন। চুলকে চুলকে পাগলের মত হয়ে যায় মানুষ। সাড় থাকে না, জ্ঞান থাকে না। চামড়া ছিঁড়ে দরবিগলিত ধারায় শোণিতপাত হয়, কিন্তু উকুনের নিপাত হয় না। এই সর্বনাশা রক্তক্ষরণের কি শেষ নেই?'

গাড়িময় চাপা হাসির আওয়াজ উঠলো। আর বসে থাকতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে উঠলাম। এরকমই কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম। সেই খোঁড়া লোকটি ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দুহাত কোমরে রেখে বক্তৃতা করে চলেছে।

সামনের বেঞ্চের কোরিয়ার সৈনিকেরা মারমুখী হয়ে উঠলো।

'উদ্বাস্তু নিয়ে রসিকতা। মানুষ ধনে প্রাণে গেলো তাদের নিয়ে ছড়াকাটা হচ্ছে।'

'কথায় বলে না, কাণা খোঁড়ার একগুণ বাড়া। বেটাচ্ছেলের তাই হয়েছে।'

'সত্যিকারের শোণিতপাত দেখাই বেটাকে একবার। হৃষ্টপুষ্ট একটি ছোকরা আস্তিন গুটিয়ে উঠলো।

ঝটোপুটি একটা বেধে যাওয়া আশ্চর্য নয়। সামনের ছোকরাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'কি দরকার মশাই ঝামেলা করার। শোনাই যাক না কি বলে। Take it lightly.

আমার সঙ্গে সঙ্গে আরতিও দাঁড়িয়ে উঠেছিলো। মুচকি হেসে বললো 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা কি আপনাদের পোষায়।'

মুহূর্তে ছোকরারা শান্ত হয়ে গেলো। একজন আরতির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'তা যা বলেছেন। ছুঁচো ছাড়া আর কি।'

খোঁড়া লোকটি ততক্ষণ ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, 'এ শোণিতপাত বন্ধ করা যায়। অনন্তকাল ধরে একে চলতে দেওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু উদ্বাস্তুদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সবাইকে এক শিশি 'উকুন-নিপাত' বটিকা কিনতে হবে। এক শিশিতে যদি সবংশে উকুন নিধন না হয়, তবে জানবেন সে জাল ওষুধ। ডাক্তার রাহার ত্রিশূলে মার্কা খাঁটি উকুননিপাত বটিকা নয়। ভেজাল, বাজে লোকের নকল। ক্রেতাদের কাছে করযোড়ে নিবেদন, কেনবার সময় যেন তাঁরা ছিপির ওপর লাল ত্রিশূলে চিহ্ন দেখে নেন। নকল কিনে তাহলে তাঁদের ঠকতে হবে না। এক শিশির দাম চার আনা, দু'শিশি এক সঙ্গে নিলে ছ'আনা। দু-শিশির বেশী এক সঙ্গে একজনকে বিক্রী করা হয় না, কারণ ডাক্তার রাহা জনসেবার জন্যই এই ওষুধের বহুল প্রচার কামনা করেন। যাতে প্রত্যেকের উপকার হয়, কাউকে বিমুখ না হতে হয়।

গলার আওয়াজের তারতম্যে বুঝলাম বক্তা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক আরোহী যাতে নিজের চোখে লাল রংয়ের ত্রিশূলে চিহ্ন দেখতে পায় সেই জন্যই বোধ হয়।

বক্তৃতার ব্যাপারে যারা উৎসাহ প্রকাশ করে-ছিলো, কেনাকিনির ব্যাপার শুরু হতেই তারা নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়লো। সামনের বেঞ্চের ছোকরারা আবার কোরিয়ার যুদ্ধে মনোনিবেশ করলো। অবশ্য দু-একজন ত্রিশূলে মার্কা বটিকা হাতে নিয়ে পরখ করতে লাগলো, কিনলোও দু-একজন।

আরতির দিকে ফিরে জামাইবাবু সুলভ রসিকতা করার চেষ্টা করলাম, 'কি চাই নাকি এক শিশি?'

আরতি ভুরু কুঁচকে খিঁচিয়ে উঠলো, 'আহা, নিজের দরকার থাকে কিনুন না। আমার মাথায় ওসব নেই কস্মিনকালে।'

পাশের বউটি জাঁদরেল ভদ্রলোকের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন বললো ফিস ফিস করে।

হয়তো এক শিশি উকুননিপাত বটিকারই আবদার করলো। উত্তরে লোকটি ধমক দিয়ে উঠলো। বৌটি ঘোমটা টেনে বুক পর্যন্ত নামিয়ে দিলো।

কথাগুলো শুনতে না পেলেও আভাষে ব্যাপারটা বুঝলাম। নববধূর জন্য এক গাড়ি লোকের সামনে তরল আলতা, সিঁদুর কিংবা চুলের ফিতেও কেনা যায়, কিন্তু উকুননিপাতের শিশি কিনলে হাসাহাসি পড়ে যাবে। নিজের মাথায় উকুন আছে এটা স্বীকার করা অনেকটা যেন নিজের মাথায় বুদ্ধি নেই স্বীকার করার মত। গাড়ির মধ্যেও যারা কিনছে দু-একজন সবাই ভাব দেখাচ্ছে যেন কিনছে পাড়াপড়শী কিংবা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্য।

লোকটি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসলো।

'মরণযন্ত্রণার তুলনায় দাম কিছুই নয়। কিনতে দ্বিধা করবেন না। এখন হয়তো আপনার মাথায় উকুনের উপদ্রব নেই; কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কিছুই বলা যায় না। এক শিশি কিনে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিন। সময়ে অসময়ে কাজে আসবে। আমি প্রত্যেক-দিন এ লাইনে আসি না। দরকারের সময় হয়তো নাও পেতে পারেন। আজই কিনে রাখুন এক শিশি। ডাক্তার রাহার অপূর্ব আবিষ্কার। এক শিশি চার আনা। লাল ত্রিশূলে মার্কা।

রেলের কোটপরা লোকটির কাছ বরাবর আসতেই লোকটি ধড়মড় করে উঠে পড়লেন, 'কি ব্যাপার, এত হৈ চৈ কিসের? নৈহাটি এসে গেলো নাকি?'

খোঁড়া লোকটি ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো, 'না, নৈহাটি এখনও আসে নি। নৈহাটি আসে নি, কিন্তু আমি এসেছি আপনার সামনে। উকুনের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। হতাশ হবার কিছু নেই।'

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় ভদ্রলোকের মেজাজ তিরিক্ষে হয়েই ছিলো, তার ওপর উঁকি মেরে যখন দেখলেন ভাটপাড়াও আসে নি, তখন একবারে তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন, 'কি ভ্যানভ্যান করছো কানের কাছে। রসিক চূড়ামণি। নৈহাটি আসে নি, আমি এসেছি। যাও, যাও, ঘাড়ের ওপর থেকে ওদিকে যাও।'

খোঁড়াও ছাড়বার পাত্র নয়, ক্রাচে ভর দিয়ে পাশ কাটাতে কাটাতে বললো, 'যাবো স্যার সকলের কাছেই যাবো ডাক্তার রাহার এই অশীর্বাদ নিয়ে বাঙলার দরজায় দরজায় গিয়ে দাঁড়াবো।'

একেবারে কোণের দিক থেকে কে একজন টিপ্পনি কাটলো, 'ওঁর কাছে গিয়ে আর লাভ কি? উকুন বাসা বাঁধবে কোথায়। সে গুড়ে তো বালি।'

চেয়ে দেখলাম কথাটা সত্যি। রেলের কোট চড়ানো লোকটির মাথায় একটি চুলেরও চিহ্ন নেই। চকচকে টাক। মাছি বসলে পিছলে পড়বে, উকুনই কি আর পারবে আঁকড়ে থাকতে।

গাড়িশুদ্ধ চাপা হাসির রোল উঠলো। ভাগ্য ভালো, ভদ্রলোক ইতোমধ্যেই নাসিকা গর্জন শুরু করেছেন। জেগে থাকলে হাতাহাতি একটা হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো।

খোঁড়া লোকটি আরো এগিয়ে আসলো। আধবুড়োগোছের একটি লোক গায়ের কাপড়ের মধ্য থেকে সিকি বের করলো একটা। ত্রিশূল-মার্কা এক শিশি। নাতিপুতিদের মাথায় উকুনের বড়ো উৎপাত শুরু হয়েছে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিনলো।

আমাদের কাছ বরাবর আসতেই আরতি বিরক্তিতে মুখটা কুঁচকে ফেললো, পা-দুটো মুড়ে বেঞ্চের ওপর তুলে বললো, 'যাও বাপু এগিয়ে যাও উকুনটুকুন এদিকে নেই।'

আরতির কথার ভঙ্গীতে খোঁড়া লোকটিও হেসে ফেললো। দুটো হাত যোড় করে বললো, 'ওসব জিনিস আপনাদের কাছে জন্ম জন্ম না থাক মাঠাকরুণ। কিন্তু ওরা একেবারে দেশছাড়া হলে আমরা পেট চালাই কি করে বলুন তো?'

লোকটি সত্যি সত্যিই আর দাঁড়ালো না। সন্তর্পণে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলো।

কিছুটা এগিয়েই কিন্তু বাধা পেলো। কোরিয়ার যুদ্ধে মশগুল ছোকরাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওহে বাপু, ওষুধ তো খুব বিলি করে বেড়াচ্ছো উকুন শেষ করবার নাম করে; কিন্তু কিসব সর্বনেশে জিনিস ওতে মিশিয়েছো ঠিক আছে। চুলে মাখলে চুলের দফা রফা হয়ে যাবে।'

কথা শেষ হবার আগেই খোঁড়া লোকটি উচ্চহাস্য করে উঠলো। হাত দিয়ে নিজের ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলের গোছা টেনে টেনে দেখালো, 'এই দেখুন চুলের বহর। দিনের মধ্যে দশবার এই ওষুধ মাখতে হচ্ছে চুলে, সেরকম কিছু থাকলে চুলের গোছা কবে ফর্সা হয়ে যেতো। বিশ্বাস না হয়, আপনাদের সামনেই মাখছি আর একবার কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি একটা শিশি উপুড় করে গোটা দুয়েক বটিকা নিজের হাতের তেলোয় রাখলো তারপর সেগুলো আঙুলের চাপ দিয়ে গুঁড়িয়ে চুলের মধ্যে বেশ করে মাখিয়ে দিলো। পাঁশুটে রংয়ের বটিকা, চুলে কপালে ছাইয়ের গুঁড়োর মতন লেগে রইলো।

খোঁড়া লোকটির মুখের হাসি কিন্তু অনির্বাণ। সকলের দিকে ফিরে বলতে লাগলো 'দেখলেন তো। যে কথা আমার সেই কাজ। চুলের কোন ক্ষতি হবে না। সচ্ছন্দে মাখাতে পারেন চুলে। শুধু মাখবার আগে দেখে নেবেন ওষুধটা ডাক্তার রাহার ত্রিশূল মার্কা কিনা। জাল ওষুধ লাগালে তার দায়িত্ব আমি নেবো না। আর এ ওষুধ যদি জাল প্রমাণ করতে পারেন' লোকটি গলা বেশ একটু উঁচুতে তুললো, 'তবে সঙ্গে সঙ্গে মূল্য ফেরৎ দেবো। জাল জিনিস নিয়ে কারবার আমি করি না।'

উকুননিপাতকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য হাঁটুর ওপর সেদিনের খবরের কাগজটা মেলে রেখেছিলাম। চোখ ছিলো অবশ্য কাগজে, কিন্তু চীৎকারের চোটে একটি অক্ষরও পড়তে পারছিলাম না। আচমকা লোকটির গলার আওয়াজ থেমে যেতেই মুখ তুললাম।

চিরন্তন ব্যাপার। উকুননিপাত বটিকা বিক্রি করে বলে কি হৃদয় বলে কিছু নেই নাকি লোকটার? ঠ্যাংয়ের মাথাই না হয় খেয়েছে, চোখের মাথা তো আর খায়নি!

চুলে ওষুধ মাখবার সময় অন্য সবাইয়ের মতন জাঁদরেল লোকটির পাশে বসা বউটিও চেয়ে চেয়ে দেখেছিলো মুখ তুলে। ঘোমটা খসে পিঠের ওপর গিয়ে পড়েছিলো খেয়ালই করেনি। একমাথা কালো চুলের গোছা পেতলের কাঁটা দিয়ে আটকানো। ভাসাভাসা চোখ, পানের রসে টসটস করছে দুটি পুরন্ত ঠোঁট। কপালের টিপ থেকে সিঁদুর ঝরে এসে নাকের ডগায়, গালের পাশে পড়েছে। শ্যামাংগী হলেও বয়সের গুণে ভালোই দেখতে মেয়েটিকে।

দু-এক সেকেন্ড। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু লোকটির আর চোখের পলক পড়েনি।

তবু একটি ভদ্রলোক খোঁচা দিলেন, 'ওহে বাপু, এগোবে তো এগোও, এমন করে মাঝমধ্যিখানে সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে থেকো না।

খোঁড়া লোকটি বগলের ক্রাচটির ওপর ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বিড় বিড় করে বললো, 'রাধা! রাধা!'

হাতের কাগজটা মুড়ে এবার সোজা হয়ে বসলাম। এতক্ষণে জমলো ব্যাপারটা। নিছক বটিকা কেনাবেচার কথা নয়, অন্তরালে আরো কি যেন রহস্য রয়ে গিয়েছে।

'কি হে কি বিড় বিড় করছো?' আমি ইচ্ছে করেই টিপ্পনী কাটলাম। কাজ হলো। খোঁড়া লোকটি এবার হাঁও-মাঁও করে কেঁদে উঠলো, 'মশাইরা, ওই আমার স্ত্রী, আমার বিয়ে করা স্ত্রী। আজ দু'বছর ধরে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি।

খোঁড়া লোকটির কথার সঙ্গে সঙ্গে জাঁদরেল লোকটি আস্তিন গুটিয়ে খাপ্পা হয়ে উঠলো, 'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো তোমার, রসিকতা করার আর জায়গা পাওনি তুমি।'

এদিকের কতকগুলো লোক বহু কষ্টে থামালো লোকটিকে। কেউ কেউ আড়াল ক'রে দাঁড়ালো। আচ্ছা মুশকিল। এর চেয়ে যে ইনিয়ে-বিনিয়ে উকুন নিপাত বটিকার গুণ-কীর্তন শোনা ভালো ছিলো।

খোঁড়া লোকটি কিন্তু কান্না থামালো না। ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'আমার বিয়ে-করা স্ত্রী মশায়রা, ওকেই জিজ্ঞেস করুন, বলুক মুখ ফুটে, ধর্ম সাক্ষী ক'রে। পাবনার চড়াইখালীর অনন্ত ঘোষের মেয়ে কিনা ও। বিলাসপুরের হারাণ বোসের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিলো কি না এক গাড়ি লোকের দিকে চেয়ে বুকে হাত দিয়ে বলুক?'

মেয়েটি অবশ্য কিছুই বললো না। মাথার ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো। সঙ্গের লোকটি কিন্তু অগ্নি-শর্মা হয়ে উঠলো। আওতার মধ্যে পেলে বুঝি খোঁড়া লোকটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে এমনি ভাব।

গাড়ির মধ্যে টিটকারী আর টিপ্পনী শুরু হলো।

—'তোমার বিয়ে করা স্ত্রী তো হাত-ছাড়া হলো কি করে হে?'

—'উকুন নিপাত বটিকার জ্বালায় নাকি?'

খোঁড়া লোকটির কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই! ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বসলো একেবারে আমার পায়ের কাছে।

আচ্ছা ঝামেলা!

'ওহে, ছেলেমানুষের মতন ভেউ ভেউ করে কেঁদে লাভ কি? ব্যাপারটি কি বলোই না শুনি?' এ ছাড়া আর বলবার কিছু খুঁজে পেলুম না।

কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাত দুটো যোড় করে লোকটা উবু হয়ে বসলো। এধার ওধার থেকে লোক এসে জমলো ধারে পাশে। মেয়েছেলেদের উৎসাহই যেন বেশি। আহা, মুখে সমবেদনারও অভাব নেই। খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। বৌ পালায় অন্য লোকের সঙ্গে।

'তেলের কলে কাজ করতাম মশায়রা। পাবনার 'অন্নপূর্ণা অয়েল মিলে।' সেখানেই ক্রাশারের তলায় অর্ধেকটা পা গেলো। দু মাস হাসপাতালে পড়ে। মরণ-বাঁচন সমস্যা। সেরে উঠতেও চাকরী হারাইনি। মনিব দয়ালু। হাল্কা কাজে লাগিয়ে দিলেন। ওয়েল মিলে নয় তাঁরই হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীতে। বসে বসে শুধু কল চালানো। পায়ের কাজ কিছু নেই।'

কথা বলতে বলতে খোঁড়া লোকটি মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিলো জাঁদরেল লোকটির দিকে। সে লোকটি কিন্তু নির্বিকার। পকেট থেকে সিগারেট বের করে নতুন করে ধরিয়েছে। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে মাঝে মাঝে। তার আড়ালে বৌটি একেবারে চাপা পড়ে গেছে। দেখাই গেলো না এপাশ থেকে।

'সেই সময় দাদা বললে এবার বিয়ে থা ক'রে সংসারী হ হারাণ। আমি আপত্তি

করলাম, খোঁড়াকে কে দেবে মেয়ে। দাদা চেঁচিয়ে উঠলো, 'রাখ, রাখ, কানা-খোঁড়ার আর বিয়ে হচ্ছে না বুঝি। কত লোক মেয়ে দেবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে। রাজী হলাম। উপায়ই বা কি। বৌদি মারা যাবার পর থেকে বাড়িতে দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই। রান্নাবাড়া, ঝাঁটপাট সবই এক হাতে করতে হয়। তার ওপর চাকরী। তাই রাজী হয়ে গেলাম।'

খোঁড়া লোকটি একটু দম নিলো। জামার আস্তিনে মুছলো চোখ দুটো। তারপর শুরু করলো, 'দেখাশোনা শুরু হ'লো। দাদার আর পছন্দ হয় না। শেষকালে চড়াই-খালীর অনন্ত ঘোষের মেয়ের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেলো। অল্প সল্প জমি-জেরাত আছে। মুদী কারবার। তবে মেয়ের পাল অনেক। কায়ক্লেশে চলে যায়। এটি ছোট। এটিকে পার করতে পারলে ঘোষমশাই নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন একটু। মেয়ের নাম রাধা। বিয়ে হ'য়ে গেলো। নৌকা করে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বেনেবৌয়ের ঘাটে এসে নামলাম। এর একটা বর্ণ মিথ্যে কিনা শুধোন রাধাকে?' কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আঙ্গুল দিয়ে বৌটির দিকে দেখিয়ে দিলো।

লোকটি আবার মারমুখী। হাতের সিগারেটটা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালো।

"আপনাদেরও বলিহারী মশাই। বসে বসে এই খোঁড়ার গালগল্প শুনছেন। আপনারা না পারেন, সরুন, ঘাড় ধরে ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছি আমি।'

হয়তো নামিয়ে দেবার জন্যই লোকটি দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করলো। বাধা দিলো কাছে বসা কয়েকজন। হৈচৈ মারাপিটে কাজ নেই, তার চেয়ে বসে বসে মজাদার কাহিনীই শোনা যাক। শীতের দুপুর। বেশ কনকনে ঠান্ডাও পড়েছে। গাড়িতে সময় কাটাবার এর চেয়ে ভালো খোরাক আর কি থাকতে পারে!

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বুড়ো এগিয়ে আসলো, 'বলি ওহে বাপু, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু বিয়ে করা বৌটি খোয়া গেলো কি করে?'

সত্যিই তো, চড়াইখালীর মেয়ে এখানে এলো কি করে, একেবারে গাড়ির মধ্যে তাও আবার অন্য লোকের পাশে।

খোঁড়া লোকটাই উত্তর দিলো, 'আর ওখানকার লোক আর এখানকার লোক। সব একাকার হ'য়ে গেছে। ভেবেছিলাম কিছুতেই আসবো না। যাই কিছু হোক, সাতপুরুষের ভিটে আঁকড়ে থাকবো। কিন্তু দিনের পর দিন খবর শুনে আর থাকতে সাহস হলো না গাঁয়ে। তার ওপর অরেন মিত্র আর হোসিয়ারী ফাক্টরী গুটিয়ে মনিবরা সরে পড়লেন। পেট চলাই দায় হয়ে উঠলো। একদিন পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে নিয়ে ভগবানের নাম করে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে চোখ কপালে উঠে গেলো। প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই। তিন দিনের পর গাড়িতে উঠলাম। গুড়ের কলসীর মতন অবস্থা। হাত-পা নাড়বার উপায় নেই। তার ওপর জিনিস-পত্তর আছড়ে ফেলে স্টেশনে স্টেশনে সার্চের হাঙ্গামা।'

থামবার নামগন্ধ নেই। একটানা চলেছে বিবৃতি। উকুন নিপাত বটিকা বিক্রীর সুর এসে যাচ্ছে। তবু একবার তাড়া দিলাম, 'নাও বাপু, কি বলবার তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমাদের আবার নামতে হবে।'

খোঁড়া লোকটি হাত দিয়ে কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিলো। আড়চোখে ঘোমটা-ঢাকা বৌটির দিকে চেয়ে নিলো একবার তারপর আবার শুরু করলো, 'বানপুরে নেমে পড়লাম। পলাশ গাছের তলায় ধুতি টাঙ্গিয়ে ছাউনী তৈরী হলো। উদ্বাস্তুদের হৈ চৈয়ের চেয়ে ভলেণ্টিয়ারবাবুদের চীৎকারে জায়গা আরো সরগম। কিছু দিন পর আস্তানা মিললো। দর্মার বেড়া, টিনের চাল। দেশের গোয়াল-ঘরের চেয়েও ছোট। তাও সবটা একলার নয়, একজনের সঙ্গে ভাগে। সে করিৎকর্মা লোক। ভলেণ্টিয়ারবাবুদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম। আমার অবস্থা দেখে সেধে ডেকে নিলো একদিন, 'আসুন এখানেই আসুন আপনারা। আমি একলা মানুষ, আমারও তো রেঁধে বেড়ে দেবার লোক চাই।' সেই হাতছানিতে ভুলেই আমার কাল হলো মশায়। শুধু তার সংসারের ভার নয়, ক্রমে ক্রমে মানুষটার ভারও বৌ নিজের ওপর তুলে নিলো।

প্রথম প্রথম একটু আধটু সন্দেহ হয়েছিলো, কিন্তু ভেবেছিলাম হৈ চৈ করলে একেবারে পথে দাঁড়াতে হবে, তাই সব কিছু জেনে শুনেও মুখটি বুজে বোবা সেজে-ছিলাম। একদিন চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছি রোজকার মতন, মাঝপথে গিয়ে মনে পড়লো পকেট একেবারে খালি। সাড়ে চার আনা পয়সা মাটির কলসীর মধ্যেই রেখে এসেছি। খোঁড়া পা টেনে টেনে আবার ফিরলাম বাড়ির দিকে। কিন্তু না ফিরলেই যেন ছিলো ভালো। খোলা জানলা দিয়ে সব কিছুই নজরে পড়ে গেলো। জন্তুর মতন চীৎকার করে উঠলাম। ডান পা দিয়ে পাগলের মতন দরজায় ঝাঁপে লাথি মারতে শুরু করলাম। আশে পাশে লোক জমে গেলো। কিন্তু কেউ একটি কথাও বললো না। মুখ টিপে হাসলো আর কানাকানি করতে লাগলো।

ঝাঁপ খুলে বৌ বেরিয়ে এলো। লজ্জাবতী লতাটি। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আছে একেবারে। বাকী মানুষটি জানলা দিয়ে সরে পড়েছে। সাধ মিটিয়ে হাতের সুখ করে নিলাম, কিন্তু আশ্চর্য চোখের জল তো নয়ই, একটু টুঁ শব্দও বের হলো না।

রাগ করে সেদিন ঘরের দাওয়াতেই শুয়ে রইলাম। অমন বৌ নিয়ে কেউ পারে ঘর করতে? উঠতি বয়সে উড়ো উড়ো মন, বিয়ে করা স্বামীকে অবহেলা। ঘরের ভাগীদার লোকটিও আর ফিরলো না। ভাবলাম, অন্যায় একটা করে ফেলে খুব মনে লেগেছে নিশ্চয়। যাক, এক সঙ্গে যখন থাকতে হবে, তখন মিটমাট একটা করে নিলেই হবে। কাঁচা-বয়সে কত ভুল করে মানুষ, সব কি আর মনে রাখলে চলে।

ভোরে উঠেই কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। জিনিসপত্তর সমস্ত লোপাট, রাধাও নিখোঁজ, এমন কি পাশে রাখা ক্রাচটারও হদিশ মিললো না। তারপর থেকে পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি মশায়রা, কোথাও পাইনি।'

আচমকা থেমে গিয়ে খোঁড়া লোকটি আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো।

কি একটা ছোট স্টেশন। হুড়মুড় করে একদল লোক উঠলো। নেমেও গেল কিছু। পাশের জাঁদরেল গোছের লোকটি পাশে-বসা বৌটির সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে। কিছুই যেন হয়নি। বাজে লোকের বাজে কথায় কান দিলে মানুষের চলে কখনো।

'বাবুমশায়, বিচার করুন। আপনাদের চোখের সামনে এমন অন্যায় আর অধর্ম হবে, চোখ-কান বুজিয়ে থাকবেন আপনারা।'

মহা মুশকিল, মাতব্বর ঠাওরে আমার পায়ের ওপরই মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করলো। উকুননিপাত বটিকার গুঁড়ো লেগে ধুতির দফা যাবার দাখিল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, 'সরো বাপু, থানা রয়েছে, আদালত রয়েছে, বৌ-চুরির নালিশ করো গিয়ে। আমরা কি করতে পারি। আর আমাদের কথা লোকে শুনবেই বা কেন?'

একেবারে কোণের দিক থেকে একটি বুড়োর খনখনে গলার আওয়াজ শোনা গেলো, 'আর ও বৌ ঘরে নিয়ে গিয়েই বা করবে কি, আবার তো পালাবে।'

গাড়ির মধ্যে আলতো হাসির হিল্লোল উঠতেই জাঁদরেল লোকটি ক্ষেপে দাঁড়িয়ে উঠলো, 'ভদ্রলোকের মেয়েছেলে নিয়ে কি রসিকতা আরম্ভ করেছেন। রাস্তার লোক কে কি বললে না বললে তাই নিয়ে মেতে উঠলেন যে একেবারে?'

ভদ্রলোকের দরাজ গলার আওয়াজে অনেকেই চুপ করে গেলো, কিন্তু সামনের বেঞ্চে-বসা ছেলে তিনটির মধ্যে দুটি রুখে উঠলো, 'খুব যে মেজাজ দেখাচ্ছেন মশাই। আমরাও কাঁচড়াপাড়ার ছেলে, মনে রাখবেন। দাবড়ানিতে দমি না।'

হুমকিতে কাজ হলো। জাঁদরেল লোকটিও কুঁকড়ে গেলো একটু। জিভ দিয়ে পুরু ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে নরম গলায় বললো, 'এ যে মিছিমিছি রাগারাগির ব্যাপার করে তুলছেন আপনারা মশাই। নিজের বৌ নিয়ে পথে বেরোনোই দেখছি বিপদ। সাতজন্মে আমার বউয়ের নাম রাধা নয়। যা তা একটা বললেই হলো।'

এবার খোঁড়া লোকটি ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো ব্যাগটা পড়ে রইলো মেঝেয়। উকুননিপাত বটিকার কথা বোধ হয় খেয়ালই নেই। জাঁদরেল লোকটির দিকে ফিরে বললো, মানুষটাই পাল্টে গেলো, নামটা পাল্টাতে আর কতক্ষণ। বেশ, বলুক ও, বলুক বুকে হাত দিয়ে কোনদিন ওর নাম রাধা ছিলো না, আমার দিকে চেয়ে বলুক আমি ওর কেউ নই, কোনদিন ঘর করে নি আমার সঙ্গে।'

জাঁদরেল লোকটি আর একবার তেড়ে উঠতেই সামনের বেঞ্চে একটি ছোকরা বাধা দিলো, 'বেশ তো এ আর বড় কথা কি। চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করে, ঘোমটার ভিতর থেকে ঘাড় নাড়লেই পারে। এ লোকটাকে চেনে কিনা, এটুকুই শুধু বলুক।'

সমস্ত ব্যাপারটি ভারী বিসদৃশ হয়ে উঠলো। ক্রমেই যেন রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। সব কিছু এতটা এগিয়েছে এখন বাধা দিতে যাওয়াই মুস্কিল। সারা গাড়ির লোক উৎগ্রীব হয়ে উঠেছে, মজা দেখবার ছুতোয় চাইছে জ্বল জ্বল করে। বিনাপয়সায় আচ্ছা রগড় শুরু হয়েছে।

গাড়ির গতি মন্দীভূত হয়ে আসছে। ভীড়ের পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। নামতে হবে এইবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নজর করলাম জাঁদরেল লোকটি কি বলছে মেয়েটিকে। মেয়েটি ঘোমটা আরো টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীর লোক চুপ। ছুঁচ পড়লেও বুঝি আওয়াজ শোনা যাবে। মেয়েটি দাঁড়াতেই সামনে বসা একটি ছোকরা বললো, 'এই উকুননিপাতের কথা সবই তো শুনেছো। এ লোকটা যা বলছে সব সত্যি?'

দু-এক সেকেন্ড। মেয়েটি টান হয়ে দাঁড়ালো তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালো 'না।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। মনে হলো বেশ কয়েকজন লোক মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লো খোঁড়া লোকটির ওপর। জাঁদরেল লোকটি সব চেয়ে আগে।

স্ত্রী পিছনেই ছিলেন, জামার আস্তিনে টান দিয়ে বললেন, 'ওই দেখো গো লোকটাকে বুঝি সবাই মিলে মেরেই ফেললে।'

দেখবার সময় ছিলো না। গাড়ি মিনিট-খানেকের বেশী থামে না। নামতে নামতে বললাম, 'উপযুক্ত সাজাই হওয়া উচিত। একটা মেয়েছেলের নামে বানিয়ে বানিয়ে যা তা বলা।'

আরতি মুচকি হাসলো, 'জামাইবাবু, লোকটির রাধাও যেমন জাল, লাল ত্রিশূলমার্কা উকুননিপাত বটিকাও বোধহয় তেমনি।'

কোন উত্তর দিলাম না। লোকজনের ছুটো-ছুটিতে মনে হলো গাড়ির মধ্যে ব্যাপার বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। নিশান হাতে গার্ড সাহেবও নেমে এলেন।

ওয়েটিং রুমের শেডের তলায় এসে দাঁড়ালাম। লোকজনের ছুটোছুটিটা কমুক একটু তারপর এগোনো যাবে।

একটু পরেই জন দুয়েক মিলে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিলো খোঁড়া লোকটিকে। পোষাক শত ছিন্ন, বাঁ চোখের কোনটা ফুলে উঠেছে, নিচের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে পড়ে গড়িয়ে ভিজেছে বুকের কাছের জামাটা। আশ্চর্য, লোকটা চীৎকার করলো না একটুও, হৈ চৈ করে লোক জমানোর চেষ্টা করলো না। মাথা নিচু করে ক্রাচটা বগলে ঠিক করে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওধারে চলে গেলো।

জনতার কোলাহল ছাপিয়ে পাথরের ওপর ক্রাচটার কর্কশ আওয়াজ শোনা গেলো ঠক্, ঠক্, ঠক্।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। খুব আস্তে। গাড়ির জানালায় জানালায় মানুষের ভীড়। অনেকে বোধ হয় জানেই না ব্যাপারটা। কি একটা গোলমাল হয়েছে এইটুকুই অনুমান করতে পেরেছে।

গাড়ির দিকে চেয়েছিলাম হঠাৎ অজানিতেই মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে গেলো।

আরতি ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'কি জামাইবাবু?'

উত্তর দিলাম না। আঙুল তুলে দেখালাম।

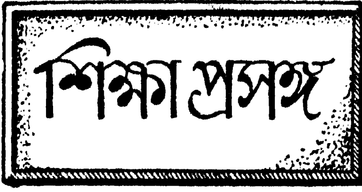
জানলার ধার ঘেঁষে সেই বউটি বসে আছে। ঘোমটা সম্পূর্ণ খোলা। কোন খেয়াল নেই। দুটি চোখ দিয়ে টস টস করে জলের ধারা পড়ছে গড়িয়ে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে থর থর করে। খোঁড়া লোকটি ওপাশের লাইনের ওপর দিয়ে চলেছে। বৌটির দৃষ্টি সেইদিকে!

আরতি মৃদুগলায় বললো, 'আহা, খোঁড়া লোকটার মার দেখে বৌটাও কাঁদছে কিরকম। এরকমভাবে মারাটা কিন্তু বাপু ভারি অন্যায়।'

কি জানি! সেইজন্যই কি কাঁদছে মেয়েটি। হবে হয়তো। মেয়েছেলের প্রাণ তো। পারবে কেন সহ্য করতে!

কিন্তু আমি ভাবতে লাগলাম ডাক্তার রাহার সেই ত্রিশূল মার্কা উকুননিপাত বটিকার শিশি-গুলোর কথা। যেগুলো জাল নয় বলে খোঁড়া লোকটা সারাটা গাড়ি চীৎকার করে বেড়াচ্ছিলো। মানুষের দাপাদাপির চোটে সেই শিশিগুলোও হয়তো গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে মেয়েটির পায়ের কাছে।





এদেশের গ্রন্থাগার

শ্রীঅমল সরকার

ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে, সভ্য-জগতের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে তার এখনও বহু সময় লাগবে, তারা সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক নীচু, অনেক ছোট, পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে এ ধারণা যেন বদ্ধমূল। সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করলে হয়তো এ যুক্তি একেবারে মিথ্যে, অলীক প্রমাণ করা যাবে না কিন্তু যদিই বা আমরা পিছিয়ে থাকি এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী কিছুটা পরিমাণে আমরা নিজেরা আর কিছুটা বিদেশী শত্রুর প্রভাব। এটা মানতে আমরা একেবারে বাধ্য নই যে আমাদের কিছু ছিলনা বা সারা জগতকে আমরা কিছুই দিই নি, অন্যদিকে নির্ভীকভাবে মাথা উঁচু করেই আমরা বলতে পারি যে, অতীতে যখন অন্যান্য দেশ অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, আমাদের দেশ সাহিত্যে, সংস্কৃতে, ধর্মে, দর্শনে, সব দেশের চেয়ে ছিল এগিয়ে, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের আকাশ ছিল আলোকে আলোকময়। তাই বোধহয় সুদূর দেশগুলো থেকে হ'ত বিদ্যার্থীদের আগমন, জ্ঞান আহরণ করতে জ্ঞান-পিপাসুদের হ'ত সমাবেশ 'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।' শৌর্যে নয়, ধর্মে নয়, সাহিত্য বা দর্শনে নয় সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতের ছিল অফুরন্ত ভান্ডার যাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে সে কোনদিন কার্পণ্য করে নি। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এই মহামন্ত্রে যে গ্রহণ করেছিল তার দীক্ষা, সারা পৃথিবীর মানুষগুলোকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করে শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছিল সে নিজের উপর।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের পরিচয় বহু শতাব্দী আগেই পাই, কিন্তু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আমরা ঐতিহাসিক যথেষ্ট প্রমাণ দিতে না পারায় সেগুলো অতীতের স্মৃতির গর্ভে লুকিয়ে আছে। গবেষণার পর চলেছে গবেষণা এবং একদিন হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন বিস্মৃতির ঐশ্বর্যের হিসাব আমাদের কাছে হয়ে উঠবে সুস্পষ্ট। তবে এটুকু পূর্ণ আস্থা রেখেই বলা যায় যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলিতে যেমন গীর্জে প্রভৃতি ধর্মস্থানে গ্রন্থাগারের অবস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায় ঠিক তেমনিভাবে বোদ্ধযুগে এবং তার আগেও মন্দির, সঙ্ঘ (Monastery) ও রাজপ্রাসাদে এমন কি বড়লোকদের গৃহেও গ্রন্থাগারের স্থাপনা করা হতো। ক্যাম্বেতে (Cambay) দুইটি জৈনমন্দিরে ও তাঞ্জোরে (Tanjore)এর রাজপ্রাসাদে প্রায় চল্লিশ হাজার হস্তলিপি (Manuscripts)র সন্ধান পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এবং তার পরেও কয়েকশত বছর বিদেশী আক্রমণের তোড়জোড় অত বেশী করে হয় নি এবং সাহিত্য ও জ্ঞান বিস্তারের এই সময়টি ছিল বড়ই প্রশস্ত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর চারশো বছর ধরে ভারত কত অভিজ্ঞতা করলো সঞ্চয়, কত দিক থেকে হলো কত পরিবর্তন। বিদেশী মোগল-পাঠানেরা ধীরে ধীরে সারা দেশকে এনে ফেলল করায়ত্বে। মোগল বা পাঠানরা আমাদের কাছে দস্যু, বর্বর, নিষ্ঠুর বলেই পরিচিত কিন্তু তাদের আরও একটা দিক ছিল ও সবাই যে নিরক্ষর, বিদ্রোহী, অত্যাচারী ছিল তা নয়। মোগল ইতিহাস থেকে কলা ও শিল্পের প্রীতি তাদের গভীর অনুরাগের যথেষ্ট উদাহরণ পাই এবং দিল্লীর লালকেল্লা, আগ্রার তাজমহল, সিকন্দরাবাদ প্রভৃতি তাদের কলা-প্রীতির সাক্ষ্য দেয়; কলাকে তারা ভালবেসেই ক্ষান্ত হয় নি, কালের কপোলতলে সেই কলাকে 'মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা তারা ক্রমাগত করেছে। স্থাপত্যশিল্পে শুধু নয় পুঁথিগত বিদ্যার প্রতিও তাদের কম অনুরাগ ছিল না, এদেশীয় শাস্ত্র পড়ে তার মধ্যে থেকে সারবস্তু বুঝে নিতে তারা কম চেষ্টা করে নি। বিদ্যানুরাগী এই সব মোগল সম্রাটদের গ্রন্থ সংগ্রহের দিকেও একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। হুমায়ুনের জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি যে, নানাভাষার গ্রন্থ, আরবী, ফারসী সংগ্রহ করা তাঁর যেন একটা নেশার মত ছিল। দিল্লীতে তাঁর একটা বিরাট গ্রন্থাগার ছিল, লাল বেগ ছিলেন এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। এই সেই গ্রন্থাগার যেখানে থেকে পাঠনিরত সম্রাট নমাজের আহ্বান শুনে পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছিলেন ও গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অকালে মৃত্যুকে সেদিন বরণ করেছিলেন। এই গ্রন্থাগার ছাড়াও তিনি শের শাহের প্রমোদগৃহকে একটি গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই অনুরাগীর মৃত্যুর পর গ্রন্থাগারের রক্ষা বা উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর পুত্র আকবর কিন্তু এতটুকু অমনোযোগী ছিলেন না। পিতার সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা তিনি অনেক বাড়িয়েছিলেন, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাষার বহু গ্রন্থ তিনি একত্রিত করেছিলেন এবং বিখ্যাত পারসিক কবি ফৈজী ছিলেন আকবরের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। মেনডেলস্‌কো যখন এই লাইব্রেরীটি সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিদর্শন করেন তখন তিনি বলেন—

"Four and twenty thousand manuscripts, so richly bound that they are valued at six millions, four hundred sixty thousand seven hundred thirty one Rupia's'..

আলমগীর ছিলেন থিয়োলজীর একজন বিশেষ অনুরাগী। ফতওয়া-ই-আলমগীরের রচনা এই সময় হয়েছিল ও তার একটি কপি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার মোগল আমলে যে সব গ্রন্থাগার ছিল, সেগুলি বাদশাহদের আপন সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না, শিক্ষাপ্রসারকল্পে এদের কোন দানই ছিল না। এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সেযুগে শিক্ষা-প্রসারের বা শিক্ষিত হবার ইচ্ছেও খুব বেশী ছিল না, কারণ তখন তো আর এখনকার মত আর্থিক বা সামাজিক এত সমস্যা দেখা দেয় নি। ইউরোপেও এই সময় প্রায় একই অবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল ও সব দেশের লোকেরাই বুঝতে পারল যে শিক্ষা ছাড়া এ সব সমস্যার সমাধান কোন-দিনই হবে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই সমস্যাগুলির সম্যক উপলব্ধি। তাছাড়া জনতাকে নিয়ে এই সমস্যাগুলির হ'ল আবির্ভাব। কাজেই জন বা গণ শিক্ষার হ'ল একান্ত প্রয়োজন। মোগলদের পরে বণিক ইংরেজেরা ছলে বলে ও কৌশলে সারা দেশকে প্রায় গ্রাস করে ফেলে। ইংরেজরা আমাদের ওপর একাধিপত্য শাসন করতে শুরু করলো বটে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেলাম। নিজেদের রাজকার্য চালানোর জন্যেই হোক ভারতবাসীদের শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু সে সময় এদেশে পুস্তকের তেমন প্রচার হয় নি—যে ক'জন শিক্ষিত ছিল, তারা প্রায় বড়লোকদের পর্যায় পড়তো, আর যে বইগুলি প্রচলিত ছিল, সেগুলো হয় সংস্কৃত নতুবা পার্সিয়ান শিক্ষা করবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হোত। জনতা শিক্ষিত হয়ে উঠবার কোন সুযোগই পায় নি। মৌলবী ও পণ্ডিত ছাড়া শিক্ষিত

সমাজে আর কেউ স্থান পেতে পারে নি তখনও পর্যন্ত। নিজেদের স্বার্থ পূর্ণ করবার জন্যে ইংরেজরা আমাদের শিক্ষিত করে তুলবার মনস্থ করলো, এতে আমরা খানিকটা লাভবান হলেও মুশকিল এই হোল যে ইংরেজী ভাষায় আমাদের শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত হোল। দেশে একটা আলোড়ন দেখা দিল, ধর্মভীরু হিন্দু-মুসলমানের দল বৈদেশিকদের এই আকস্মিক নীতিতে আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুদিন পরে অনেকেই বুঝতে পারলো, বিশেষ করে বাঙলাদেশে, যে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার দ্বারা লাভ ছাড়া লোকসান হবে না, কারণ এতদিন আমরা নিজেদের দেশের গণ্ডীর মধ্যেই বন্ধ ছিলাম, বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে এ কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। রাজা রামমোহন, মাইকেল, কেশব সেন, বিপিন পাল প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষার যথেষ্ট প্রচার আরম্ভ হলো। অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হলো। প্রায় প্রত্যেক স্কুল ও কলেজেই একটি সংশিলষ্ট লাইব্রেরী থাকবে ঠিক করা হয়। লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারের বিশেষ সুবিধা হয় এটা পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আগেই বুঝতে পেরেছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার যাতে সবাই গ্রহণ করতে পারে, তার দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সরকার সর্বদা চেষ্টা করতেন।

টিপু সুলতান যে শুধু একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন তা নয় বিদ্যার প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন ও প্রায় দু হাজার আরবী ও উর্দু হস্তলেখ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে এগুলি ইংরেজের হস্তগত হয়, ভারতবর্ষের এই সব মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেয়ে ইংরেজরা সেগুলি নিজেদের দেশে স্থানান্তরিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো। আমাদের নিজেদের জোর বলে কিছুই ছিল না, কাজেই প্রভু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু করবার কোন উপায় ছিল না, উপায় থাকলেও ইচ্ছে ছিল না। এমনি করেই দিল্লীর রয়াল লাইব্রেরী, মান্দালয়ে বর্মীয় রাজার লাইব্রেরী, বিজাপুরে আদিল শাহের লাইব্রেরী ও পুণায় মারাঠা লাইব্রেরীর সমস্ত সামগ্রী লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ও ভারতীয় সামগ্রী দ্বারা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী নিজের আভিজাত্য ও গৌরব বাড়িয়ে তুললো। একদিকে যেমন ভারতের মূল্যবান পুঁথি গ্রন্থগুলি লণ্ডনে স্থানান্তরিত করা হলো অপর দিকে অল্পদামে ইংরেজী বইএর আমদানী শুরু হলো এই দেশে। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শুধু বই পাঠিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, সেগুলির যাতে পূর্ণ উপযোগ হয় (অবশ্য একটা আচ্ছাদন রেখে)' তারও ব্যবস্থা করলেন।

আগেই বলেছি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে লাইব্রেরীর স্থাপনা করা হয়েছিল, এখন ছাত্ররা *কত সংখ্যায় লাইব্রেরীর সদ্ব্যবহার করে তার* একটা হিসাব রাখবার বন্দোবস্ত করা হলো এবং ১৮৩৯ সালে সিদ্ধান্ত করা হলো যে, লাইব্রেরীকে যে ছাত্র পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারবে তাকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। এই সময় হিন্দু কলেজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ *অন্যান্য সব লাইব্রেরী অপেক্ষা বেশী সমাদৃত* হতো। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হলেন। ঐ বছরেই কলকাতায় একটি

পাবলিক লাইব্রেরী খুলবার চেষ্টা করা হয় এবং ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে এসপ্ল্যানেড রোডে ডাঃ ই পি স্ট্রংগের বাড়িতে পাবলিক লাইব্রেরীটি খোলা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এই লাইব্রেরী যথেষ্ট প্রসার লাভ করে ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরীর প্রায় ৫ হাজার গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে আনা হয়—১৮৪৮ সালের মধ্যে প্রায় ২০ হাজারেরও বেশী গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হয়। ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরীর কোন ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত হয় নি। ১৮৮৭ সালে কলকাতা কর্পোরেশন একটি আপীল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে পাঠায় যার সারাংশ ছিল যে এখন যে পাবলিক লাইব্রেরী কলকাতায় আছে, সেখানে কেবল বিশেষ পর্যায়ের লোক (যাদের পয়সা আছে) যেতে পারে, জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের মতো লাইব্রেরীকে সাধারণ জনতার সহজলভ্য না করা হবে ততদিন শিক্ষাপ্রসার হওয়াও অসম্ভব ও গ্রন্থাগারের ব্যাপক উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে না। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল, আর্থিক সহায়তা ছাড়া কোন কিছু ভালভাবে গড়ে তোলা যায় না। আজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে, কত বড় বড় আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এই একই কারণে, অর্থাভাবে! গ্রন্থাগারের দিকে কারুর তেমন লক্ষ্য না থাকায় আর্থিক সহায়তার জন্যে কেউ বিশেষ আগ্রহশীল ছিল না। সরকারের দিক থেকেও তেমন সহানুভূতি দেখা যায় নি। এই রকম অনিশ্চিতের ওপর কয়েক বছর কেটে গেল। ১৮৯০—৯২ সালের মধ্যে একটু আলো যেন দেখা দিল। ঠিক হলো কর্পোরেশন প্রতি বছর ৮০০০ টাকার বই কেনার ভার গ্রহণ করবে। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন। বাঙলার সরকার লাইব্রেরীকে পুনঃসংগঠের জন্যে ৫০০০ টাকা সাহায্য করবার মনস্থ করলেন, কিন্তু স্থির হলো যে একটি সর্তের ওপর এই সাহায্য প্রদান করা হবে—বেঙ্গল লাইব্রেরীর সংগ্রহ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীতে যোগ করা হবে ও বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও ওই লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। এইভাবে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী কলকাতার জনসাধারণকে সাহিত্যে জ্ঞানপ্রদানের দিক থেকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থাগার বা special libraries গঠন করা হয় যেখানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তত্ত্ব অনুসন্ধান বা Research করবার সামগ্রী একত্রিত করা হয়। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটি গঠিত করা হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ও একটি সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয় নানাভাষার নানারকম পুঁথি, গ্রন্থ, হস্তলেখ আদির একত্রীকরণে। এই সোসাইটি পরে Royal Asiatic Society of Bengal (R. A. S. B.) নামে পরিচিত হয়। শুধু বাঙলাদেশে নয় বম্বে, মাদ্রাজ, জাভা আদি স্থানে এই সমিতির শাখা বর্তমান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও অন্যান্য স্থান থেকে ইতিহাস ও এশিয়ার বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ ও হস্তলিপি এখানে এনে রাখা হয়। সোসাইটির বিরাট লাইব্রেরী ছাড়া সোসাইটির অন্তর্গত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম লাইব্রেরী (Indian Museum Library) ও তার শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতো।

এ তো গেলো কলকাতা লাইব্রেরীর জন্মকথা। একই সময় বাঙলা দেশের অন্যান্য স্থানেও গ্রন্থাগারের স্থাপনা ও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার চেষ্টা চলে। ১৮৫৯ সালে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ও ১৮৫২ সালে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই সময় জনসাধারণ বেশ খানিকটা বুঝতে পেরেছিলো যে ইংরেজী শিক্ষার অধিকারী হতে গেলে গ্রন্থাগারের সাহায্য নেওয়া অনিবার্য ও এ ধারণাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে বিদেশী শাসনের প্রকোপে ভারতবাসী যতটা পিছিয়ে গেছে, সেসব সমস্যা ভারতে শিকড় জমিয়ে বসে আছে তাদের উচ্ছেদ তখনই হতে পারে যখন সেই সব সমস্যা ও তাদের কারণ নির্ধারণের সম্যক উপলব্ধি তারা করতে পারবে, যার জন্যে চাই শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা বাইরের জগতকে চেনা ও একটা মাপকাঠি দিয়ে নিজেদের দেশকে যাচাই করা এবং লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের সাহায্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষাকে আয়ত্ত করা। মাথায় ছোটো তীক্ষ্ম বুদ্ধি বাঙালী সুসন্তানেরা বেশ বুঝতে পেরেছিলো যে বিদেশী ইংরেজ সব কিছু জানতে বা শিখতে দেবে না যা আমাদের কিছু দেবে যেগুলোর দ্বারা তাদের নিজেদের রাজকাজ চালানো সহজ হবে এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে আর কিছু থাকবে যা তারা কিছুতেই দেবে না—আমাদের ওপর রইলো সেই 'কিছু দেবে' আর 'কিছু দেবে না'র মধ্যে কোনগুলো জানবো আর কোনগুলো জানবো না।

১৯২৫ সালে বাঙলা দেশে গ্রন্থাগারের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সেই বছরে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয় ও প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা স্থির হয়। প্রথম গ্রন্থাগার প্রদর্শনীও ওই বছরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৫-এর শেষভাগে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন আহূত হয় ও নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। কিন্তু প্রদর্শনী বা সমিতি গঠন দুই সময়েই বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি Bengal Library Association বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নামে পুনর্গঠিত হয়। 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা' নামে গ্রন্থাগার পরিষদের একখানি বুলেটিন বা মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সংস্করণ, শিক্ষিত বন্দীদের জন্য পুস্তক সরবরাহ, হাসপাতালের রোগীদের জন্য গ্রন্থাগারের সেবা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে উন্নতি করা হয় এবং সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা যত বেশী পরিমাণে লাভ করা যেতে পারে তার দিকে এই সমিতি অহরহ চেষ্টা করে চলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, গ্রীষ্মাবকাশে যাতে অল্প সময় গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান (Librarianship Science) শিক্ষা করা যায় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের যথাক্রমে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বাঙলা দেশে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। কিন্তু লোকসংখ্যা অনুপাতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহই প্রায় আড়াই লক্ষ ও বার্ষিক বরাদ্দ প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। এখানকার পাঠকক্ষ ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। বোলপুরে অবস্থিত বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারটি আকারে ছোটো হলেও আধুনিক প্রণালীতে সাজানো। কিন্তু তবুও যেন অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে, সেগুলি শেষ হতে সময়, অর্থ, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা, আগ্রহ ও কৌশলের প্রয়োজন। অন্যান্য প্রান্তগুলির সাথে তুলনা করলে দেখতে পাই যে, এত সব থেকেও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে ব্যাপক চেষ্টা চলেনি। এর কারণ বোধ হয় এই। বাঙলা দেশে গ্রন্থাগারের দিকে লক্ষ্য ছিলো বটে; কিন্তু সেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দেনা-পাওনার একটা হিসেব ছিলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদিকে প্রেরণা এনে দেবার উৎস ছিলো না বা গ্রন্থাগারকে সত্যিকারের শিক্ষা-প্রসারের বাহকরূপে মনে করিয়ে দেবার কেউ ছিলো না বা কেউ হতে চায়নি। কারণ এই 'কেউ' তো ছিলো ইংরেজ যারা সবসময় নিজেদের স্বার্থকে পূর্ণ করবার জনোই আমাদের 'মানুষ' করে তুলছিলো। কিন্তু ভারতের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রন্থাগারকে নেওয়া হয়েছিলো যার ফলে সে সব স্থানে গ্রন্থাগারের আসল উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিলো। অবশ্য অর্থের সুগমতা ও সহায়তা সংগঠনের কৌশল ও উপায় সেই সব প্রান্তে গ্রন্থাগারকে তার সত্যিকারের রূপ খানিকটা দিতে পেরেছিলো।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

সুইটজারল্যান্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদিও সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরিজি বলেন ভাঙা-ভাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে "হ্যাঁ, হ্যাঁ" করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগ্‌জিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যান্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, "আহা, কী চমৎকার সাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘরদোর।" সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?"

সায়েব বললেন, "মন্দ না, তবে কেতাব-পত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে-বাঘে ভর্তি, মাঝখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেক রকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?"

এই খেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হ'ল।

* * * * *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাব-পত্রের ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে, ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরী' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করছিলেন যাতে ঊনবিংশ শতকের 'মুক্ত', 'কুসংস্কারবর্জিত', 'বৈজ্ঞানিক' মন ও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্যন্ত কবুলে জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানি কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রের' অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যারা 'এহো বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধ-ধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরাজি, ফরাসী, জার্মানে বেরলো। তারই দু'একখানা 'ডা লুক্‌স্' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানিনে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাব-খানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকাটিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদের চেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশী, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়লাপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছট্' ভর্তি হতে লাগল যে, সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না।

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি যে, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছে। ধর্মচর্চা তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চার জন্য ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হল, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি, মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরতে লাগল। ইংরিজি, ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, রুশ ভাষায়, কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়, হজমের ত কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম —যা দু'একখানা বেরলো সেগুলো পল ব্রাণ্টনের রগরগে বই কিম্বা মিস মেয়োর মত প্রপোগাণ্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েণ্টালিস্‌ট্‌স্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে, কন্টিনেন্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রোমাঁ রোলাঁর মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানিনে, এ আন্দোলন খুব বেশী লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম, নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মর্নাস্থির কোরে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না। প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অন্নবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পায়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মমভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ।

বাইরের লোক তখন প্রাণপণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুরসৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া!

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইবারে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতুবি রইল।

* * * * *

ইয়োরোপে উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্ততল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্‌স্‌ যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভারত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুরই করবার নেই?

দেহ লেখনা

কোষ থেকে দেহ কি ভাবে গড়ে?

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

জীবদেহের একমাত্র উপাদান জীবকোষের কথা আগেই বলা হয়েছে। কেমন ক'রে যে এক একটি জীবকোষ বিভক্ত হয়ে বহু জীবকোষে প্রজনিত হয় সে কথাও ইতিপূর্বে জানা গেছে। মানুষ-প্রাণীদের মধ্যে মাতৃগর্ভে সন্তান উৎপাদনের কারণে যে বীজটি প্রথমে জন্মায় তারও সূত্রপাত হয় এই জীবকোষ থেকে। কিন্তু সেখানে পিতৃ-কোষ ও মাতৃ-কোষে মিলে প্রথমে সেই বীজটি বা সেই আদিকোষটি রচিত হয়। পিতার শুক্রের মধ্যে থাকে কোটি কোটি শুক্রকীট। মাতার জরায়ুতে থাকে একটি মাত্র ডিম্বকীট। এই দুই জাতীয় কীটই আসলে জীবকোষ। পিতামাতার সংগমজনিত যোগাযোগের ফলে কোনও এক শুক্রকীট ঘটনাচক্রে মাতৃগর্ভস্থ ডিম্বকীটের আবরণটি ভেদ করে তার সংগে মিলিত হয়। তাই থেকেই তৈরি হয় সন্তানের সেই আদিকোষ।

প্রত্যেক মানুষের সুবৃহৎ দেহখানা গড়বার এই হোল প্রথম ভিত্তিস্থাপনা। তার পরে সেই আদিকোষটি পূর্বোক্ত উপায়ে তার নিজের বৃদ্ধিলাভ ও পরিণতিলাভের কাজ শুরু করে দেয়। সেই একটি মাত্র কোষ প্রথমে বিভক্ত হয়ে যায় নতুন দুটি কোষে, তার পরে দ্রুতগতিতে দুই থেকে চার, চার থেকে আট; আট থেকে ষোল, এমনিভাবে নিত্যই তার সংখ্যা বৃদ্ধি চলতে থাকে। এতই দ্রুতগতিতে এই সংখ্যা বৃদ্ধির ক্রিয়া চলে যা সাধারণত অন্য কোনও জীবকোষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তথাপি ঐ সব নবসৃষ্ট জীবকোষ আকারে কিছুমাত্র ছোট হয়ে যায় না। তার কারণ প্রত্যেক জীবকোষ নবজন্ম গ্রহণ করেই তৎক্ষণাৎ বেড়ে উঠে স্বাভাবিক আকার নিয়ে নেয় এবং অনতিবিলম্বে তারও ঐ বর্ধিত আয়তনের দরুণ দুই ভাগে ভাগ হবার প্রয়োজন এসে পড়ে।

এমনিভাবে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে গায়ে গায়ে সংলগ্ন কোষগুলি একটি সুবৃহৎ কোষ-গুচ্ছে পরিণত হয়। এই গুচ্ছের কেন্দ্রস্থলে তখন অল্প একটু ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং গুচ্ছের আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ সেই ফাঁকা জায়গার আয়তনটুকুও বাড়তে থাকে। তার পরে ক্রমশ সেই কোষগুচ্ছের বর্তুলটি চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে তাতে দুটি পিঠের সৃষ্টি হয়, একটি উপর পিঠ ও একটি নিচের পিঠ। অতঃপর উপর পিঠটি ন্যুব্জ আকার নেওয়াতে সমস্ত জিনিসটা লম্বাটে ধরণের একটি ডোঙ্গার আকার নেয় এবং সেই ডোঙ্গার দুই পাশের কিনারা আরও মুখোমুখি হয়ে এসে অবশেষে সেটি এক ফাঁপা নলের আকারে পরিণত হয়। তখন দেখা যায় যে, এই নলের গায়ের দেওয়ালে কোষগুলির তিনটি স্তর জন্মে গেছে। এই তিন পুরু স্তরের সেই কোষগুলি তখন ভ্রূণ গঠনের কাজটিকে যেন তিনটি আলাদা ভাগে ভাগ করে নেয়। এই এতটা উন্নতির কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতে মাত্র তিনটি দিন সময় লাগে।

এর পরে শুরু হয় ভ্রূণটিকে বিভিন্ন অংশে গড়ে তোলবার কাজ। পূর্বোক্ত ভ্রূণ-নলিচার ভিতর দিকের যে স্তরটি তারই কোষ-গুলির দ্বারা তৈরি হতে থাকে, ওর খাদ্যনালী ও আনুষংগিক হজমযন্ত্রগুলি। বলা বাহুল্য ওর আগাগোড়া সবটাই ঐ রকম ফাঁপা অবস্থায় থেকে যায় এবং মুখ গহ্বর থেকে শুরু করে মলদ্বারে পর্যন্ত বরাবর যে খাদ্য-নলের নলটি আমাদের দেহের মধ্যে রয়েছে সেটা সেই আদিম ভ্রূণ-নলিচারই রূপান্তর।

নলের গা ঘিরে সাজানো তিন স্তর কোষের মধ্যে সব চেয়ে উপরকার দিকের যে স্তরটি তারই দ্বারা তৈরি হয় আমাদের গায়ের উপর-কার গোটা চামড়াটা। শুধু তাই নয়, এই স্তরের কোষগুচ্ছ থেকে একটা অংশ পৃথক হয়ে গিয়ে সে আবার এক স্বতন্ত্র বিভাগ তৈরি করতে শুরু করে। এই বিভাগেই জন্মায় আমাদের শরীরের যাবতীয় নার্ভ বা বায়ুনাড়ীসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি এবং মাথার ভিতরকার গোটা মস্তিষ্কটি। চোখ কান প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধরণের ইন্দ্রিয়গুলিও এই বিভাগের কোষ থেকেই তৈরি। অতএব এখানেই বোঝা যায় যে, আমাদের চামড়ার সংগে আমাদের নার্ভগুলির কত নিবিড় সম্পর্ক, বস্তুত তা একই স্তরের কোষ থেকে সৃষ্ট হয়েছে, অথচ আকারেপ্রকারে ও চরিত্রে তাদের মধ্যে এখন কত পার্থক্য।

এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী যে কোষের স্তরটি থাকে, তার দ্বারা শরীরের ভিতরকার বহুপ্রকার জিনিসের গঠন হয়। এর একটা বিভাগের দ্বারা তৈরি হয় আমাদের যাবতীয় মাংসপেশী এবং দেহ কাঠামোর হাড়গুলি। অন্য এক বিভাগের কোষগুলির দ্বারা তৈরি হয় বক্ষপিঞ্জরের ভিতরকার শ্বাসযন্ত্র দুটি ও তার আনুষংগিক যন্ত্রাদি। অপর পক্ষে এরই কোষগুলির দ্বারা তৈরি হয় হৃদযন্ত্র, যাবতীয় রক্তশিরা এবং তরল রক্ত। শুধু তাই নয়, বলতে গেলে বাইরের দিকের চামড়া ও নার্ভসংক্রান্ত জিনিসগুলি, আর ভিতর দিকে খাদ্যনালি-সংক্রান্ত জিনিসগুলি ছাড়া, এই দুই প্রকরণের মধ্যবর্তী যত কিছু মেদ মাংস ও যন্ত্রাদি আছে সবই এই স্তর থেকে সৃষ্ট।

কিন্তু একেবারেই যে সব কিছুর এক একটা নির্দিষ্ট রকম গঠন দাঁড়িয়ে যায় তা নয়। কিছুকাল যাবত স্তরে স্তরে কোষগুলির কেবল সাজানোই চলতে থাকে, তার থেকে কোথায় কোন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে, আগের থেকে তার চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমশ ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জায়গার কোষ-গুলির মধ্যে আকারপ্রকারের এক একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পেতে থাকে এবং তখন থেকে কোথায় কোন যন্ত্রটি তৈরি হচ্ছে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ওর মধ্যে প্রত্যেকটি কোষই জীবন্ত এবং প্রত্যেকটিকেই এই গঠনের কাজে নিযুক্ত থেকে নিরন্তর পরি-শ্রম করতে হচ্ছে। সুতরাং নিত্যই তাদের খাদ্য ও পুষ্টির দরকার, অথচ তাদের নিজেদের জন্য তখনও পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনও খাদ্য-ভান্ডার তৈরি হয় নি। ভ্রূণের নিজস্ব কোষ-গুলিকে খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য তাই মাতৃ-গর্ভে ঐ ভ্রূণের পাশেই স্বতন্ত্র একটি গর্ভ-ফুল রচিত হয় এবং তারই ভিতরে সঞ্চিত

মাতৃরক্ত থেকে ভ্রূণের ভিতরকার প্রত্যেকটি কোষ প্রয়োজনীয় খাদ্যপুষ্টি লাভ করতে থাকে। খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা অনবরত নিজেদের কাজই করে যেতে থাকে। এরই ফলে আগেকার বীজস্বরূপ যে আদিকোষটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি কষ্টে খুঁজে বের করতে হতো, সেটি মাত্র এক মাসের মধ্যেই আধ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয়ে ওঠে এবং তখন তাকে সহজ চোখে দেখেই চিনতে পারা যায়। তার পরে দুই মাসের মধ্যেই সেটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ বেড়ে ওঠে। তিন মাসের শেষের দিকে দেখা যায় যে, সেই সামান্য ভ্রূণটুকু প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে এবং সেটি পুরুষ জন্মাচ্ছে কি নারী জন্মাচ্ছে তাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই সময় থেকে ভ্রূণের চারিপাশে খানিকটা তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। চার মাসে দেখা যায় যে, সেই ভ্রূণ ছয় ইঞ্চি বড় হয়েছে, সে মানুষের মতই গঠন নিয়েছে এবং তার মাথাতে চুল ও হাতে পায়ে নখ জন্মাতে দেখা যাচ্ছে। পাঁচ মাসে সেই ভ্রূণ দশ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং তার নাক মুখ চোখ পরিষ্কার গঠন নিতে শুরু করে। নয় মাসের মধ্যে সেই ভ্রূণ প্রায় দেড় ফুট পর্যন্ত বড় হয় এবং তখন সে রীতিমত মানুষেরই আকার নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই নয় মাসের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ মানবদেহ গঠনের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। ভিতরকার হাড়গুলি তখনও সম্পূর্ণ হাড়ত্ব প্রাপ্ত হয় নি বটে, জায়গায় জায়গায় হাড় তখনও খুবই নরম অবস্থায় আছে, কিন্তু শীঘ্রই যে সেগুলি হাড়ের মতোই কঠিন হয়ে উঠবে তা বোঝাই যায় হৃদযন্ত্র তো রীতিমত চলতেই শুরু করেছে এবং রক্তশিরাগুলির ভিতর দিয়ে যথারীতি রক্ত চলাচল হচ্ছে, যদিও তখনও পর্যন্ত গর্ভফুলের মাধ্যমে মাতৃরক্তের সঙ্গে ভ্রূণরক্তের আদানপ্রদান চলেছে। ফুসফুস প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রগুলি তখনও পর্যন্ত ক্রিয়াশীল নয়, কারণ তখনও পর্যন্ত বাইরের বাতাসের সঙ্গে সেই নব মানবের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটে নি, কিন্তু যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণই প্রস্তুত হয়ে আছে, নব মানব যেমনি ভূমিষ্ঠ হবে অমনি তার শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া শুরু হবে। হজমের যন্ত্রগুলিও প্রস্তুত, যেমনি সে মাতৃদুগ্ধ পান করতে শুরু করবে অমনি তারা ক্রিয়া করতে থাকবে। তেমনি মূত্রযন্ত্রগুলিও তাদের কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত। স্বরযন্ত্র প্রস্তুত হয়ে আছে, ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রন্দনধ্বনির দ্বারা প্রথম শ্বাসক্রিয়াটি শুরু করে দিতে। এমনিভাবে দেহের সকল বিভাগই প্রস্তুত হয়ে উঠেছে তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলি করবার জন্যে। এবার ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে দেহযন্ত্রের সকল বিভাগের সমস্ত যন্ত্রগুলি যথারীতি কাজ করতে থাকবে ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তার আরও বেশি উন্নতি ও পরিণতি হতে থাকবে। যৌবনকাল পর্যন্তই তার চলতে থাকবে এই উন্নতি ও পরিণতির কাজ, তার পরে সে পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট মানুষ হয়ে দাঁড়াবে।

একটি পূর্ণাবয়ব মানবদেহকে দুই ভাবে দেখা যায়। একরকম হলো তাকে গঠনমূলকভাবে দেখা, আর একরকম ক্রিয়ামূলকভাবে দেখা। শরীরকে গঠনমূলকভাবে দেখার যে বিদ্যা তাকে বলে অ্যানাটমি বা শারীরসংস্থান, আর ক্রিয়ামূলকভাবে দেখার যে বিদ্যা তাকে বলে ফিজিওলজি বা শারীরবৃত্ত।

শারীরসংস্থানের দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে উপর উপর দেখলে জানা যায় যে, ভিতরে হাড়ের কাঠামো, তার উপরে মাংসাদির গঠন এবং সবার উপরে চামড়ার আবরণী দিয়ে মানুষের দেহটা তৈরি। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যায় যে, এই দেহযন্ত্রটি তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জটিল। প্রথমত এই দেহের মধ্যে তিনটি বড় বড় গহ্বর রয়েছে। একটি মাথার মধ্যে, একটি বক্ষদেশে, আর একটি উদরদেশে। মাথার গহ্বরের মধ্যে থাকে বিরাট মস্তিষ্ক যন্ত্র, আবার তার থেকে লম্বা ও মোটা একটি লেজের মতো মেরুমজ্জা সমস্ত মেরুদণ্ডের হাড়গুলির গহ্বরের ভিতর দিয়ে লম্বমান হয়ে আছে। বুকের গহ্বরের মাঝে রয়েছে দুই দিকের দুটি ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্র এবং সেই দুটির মাঝখানে এক হৃদযন্ত্র। উদর গহ্বরের মধ্যে রয়েছে পাকস্থলী, প্রকাণ্ড লম্বা অন্ত্রনালীসমূহ, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, মূত্রযন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে উপরন্তু তার জরায়ু।

এ সব মূল যন্ত্রগুলি ছাড়া আরও বহু প্রকার আনুষঙ্গিক জিনিস শরীরের মধ্যে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। শরীরের সকল অংশেই রক্তশিরা ও নার্ভতন্ত্রীগুলি জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কোথাও একটু ফাঁক রাখে নি। এগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রত্যেকটির যোগাযোগ আছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের একটা নির্দিষ্ট গতিচক্র আছে। প্রত্যেক রক্তশিরার সঙ্গে যোগ রয়েছে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক নার্ভতন্ত্রীর সঙ্গে যোগ রয়েছে মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশিষ্ট রকমের যন্ত্র রয়েছে স্থানে স্থানে। সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়।

কিন্তু কেবল কোষের উপাদান দিয়েই কি এই সব বিভিন্ন জিনিসগুলি তৈরি হয়েছে? নিশ্চয়ই, শরীরের মধ্যে অন্য কোনও দ্বিতীয় উপাদানের স্থান নেই। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আকার প্রকাশ চরিত্রও স্বতন্ত্র আর তাদের গঠনরীতিও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন জায়গাতে তারা বিভিন্ন রকমের টিস্যু বা তন্তুর সৃষ্টি করে এবং সেই তন্তুর দ্বারাই শরীরের ভিতরকার ঐ সব স্থূলে যন্ত্রাদি ও তাদের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরি হয়। এই টিস্যু বা তন্তুগুলিকে মোটের উপর চারটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়।

প্রথম পর্যায়ের জিনিস যার নাম সংযোজক তন্তু। এর দ্বারা কাঠামো বিভাগের যাবতীয় জিনিস তৈরি হয়। তা ছাড়াও এরই সাহায্যে শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত হয়। হাড় এবং উপাস্থি এই তন্তু দিয়েই তৈরি। প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠেও এই তন্তুরই বাহুল্য, অর্থাৎ যেখানেই সংযোজনার কাজ সেখানেই এর প্রয়োজন।

তার পরে আর এক রকমের তন্তু আছে যার নাম আচ্ছাদক তন্তু। যেখানেই কোনও কিছুকে ঢাকা দিয়ে আঘাত বাঁচিয়ে রক্ষা করতে হবে, একের সঙ্গে অন্যের ঘর্ষণ নিবারণ করতে হবে সেখানেই এর প্রাধান্য। গায়ের উপরকার যে চামড়ার আচ্ছাদন সেটিও এই উপাদানে তৈরি। আবার পেটের ভিতরকার অন্ত্রসমূহের ফাঁপা দিকটার গায়ে গায়ে ও রক্তশিরাগুলিরও ঐরূপ জায়গাগুলিতে আগাগোড়া এই তন্তুর চাদর দিয়ে মোড়া, যাতে কোনও কিছুর ঘর্ষণের দ্বারা নলের গায়ে কোনও আঘাত না লাগে। এই আবরণীকে ঝিল্লী বলা হয়, কারণ এর কাজ কেবল আঘাত নিবারণ করাই নয়, যেখানে যেমন দরকার সেখানে তেমন ধরণের রসক্ষরণ করাও এর এক বিশেষ কাজ।

তৃতীয় রকম পেশী তন্তু। মাংস বলতে যা কিছু, তা এই তন্তু দিয়ে তৈরি। এর কোষগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি প্রায়ই সরু সরু সুতার মতো লম্বাকৃতি হয় এবং তা রবারের মতো স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ অনায়াসে কমতে বাড়তে পারে। হৃদযন্ত্র, রক্তশিরা প্রভৃতি যা কিছুই মাংস দিয়ে তৈরি সবই এই তন্তু দিয়ে গড়া।

চতুর্থ রকম হলো নার্ভতন্তু। এ এক স্বতন্ত্র রকমের জিনিস, এর মধ্যে কোষও আছে, আবার টেলিগ্রাফের তারের মতো ওর থেকে নির্গত লম্বা লম্বা তন্ত্রীও আছে। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং যাবতীয় নার্ভ এই তন্তু দিয়ে তৈরি।

মোটের উপর দেহের গঠন সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিলুম। অবশ্য অ্যানাটমির দিক দিয়ে এতে কিছুই বলা হলো না। কিন্তু সাধারণ পক্ষে আমাদের গঠনমূলকভাবে দেখার চেয়ে ক্রিয়ামূলকভাবেই শরীরের কথা জানা দরকার। সেই হিসাবে আপাতত গঠনের ঐ গোড়ার কথাটুকু জানলেই আমাদের কাজ চলবে।

মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

বহুদূরে হইতেও ইংলণ্ডের দিকে তাকাইলে দেখা যায় আধুনিক কালের তিনজন মনীষীর মূর্তি ইংলণ্ডের সব কিছু জয়, গৌরব, শক্তি, সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে আপন ভাস্বরতায় ঝলমল করিতেছে। মনীষী তিনজন হইতেছেন, বার্ণার্ড শ', এইচ জি ওয়েলস এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার আওতায় সাবালক হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও পক্ষে সাধ্য নাই এই তিনজনের চিন্তাধারার প্রভাবকে অস্বীকার করা। আপনি শ', ওয়েলস, কিংবা রাসেলের সঙ্গে একমত না হইতে পারেন, প্রচণ্ডভাবে তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারেন, কিন্তু একথা কখনও বলিতে পারিবেন না যে, তাঁহারা নাই, তাঁহাদের চিন্তাভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনি আপনার পথে আসিতে পারিয়াছেন।

আমি এই তিনজনেরই ভক্ত। তাহার মানে এই নয় যে, তাঁহাদের সকল মতকেই আমি মানিয়া নিতে পারিয়াছি; বস্তুত তাহা অসম্ভব। তিনজনের মতের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, স্থানে স্থানে একেবারে বৈপরীত্য। শ' যাহা বলিতেছেন, ওয়েলস তাহা বলেন না, আবার ওয়েলস যাহা বলেন, রাসেলের তাহাতে বিষম আপত্তি। কিন্তু শ্রদ্ধা করা মানে ত' একই মতের অনুগামী হওয়া নয়; শ্রদ্ধা করা মানে মনীষার মহত্ত্বকে স্বীকার করা, যাহা গ্রহণীয় অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করা এবং সেই ঋণের জন্য এতটুকুও লজ্জিত না হইয়া যেখানে মতের বিরোধ ঘটিতেছে, সেখানে সকল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আক্রমণ করা। আমার মনের পেশী কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে যদি আমি আমার ভাবজগতের গুরুদের সঙ্গে লড়াই করিতে না পারি, আমার হাতের তলোয়ার কি করিয়া শাণিত হইবে যদি তাহা তাঁহাদের তলোয়ারের সঙ্গে সংঘাতে নিযুক্ত না হয়! সুতরাং শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্থে যাহারা নিরুপদ্রব বিনয় এবং শিষ্টতা বুঝিয়া লন, তাঁহারা আমার উপর অবিচার করিবেন।

বলিতেছিলাম যে শ', ওয়েলস এবং রাসেলের আমি ভক্ত। এই তিনজনের সম্বন্ধে আমার কল্পনাজগতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আছে। শ'কে আমার মনে হয় তিনি যেন কোন এক দূর দেশের রাজপুত্র; একদিন পথে চলিতে চলিতে ভুল করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। আপন রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার পথ যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন উচিত কর্তব্য হইতেছে এই দ্বিতীয় রাজ্যের উপরেই কর্তৃত্ব বিস্তার করা। শ' তাহা করিয়াছেন; এই পৃথিবীর তিনপুরুষের মানসলোকে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সেই বিদেশী রাজপুত্রগোছা ভাবটি কাটিয়া যায় নাই। চলায় বলায় ভাবনা চিন্তায় সর্বদাই প্রকাশিত হইয়া পড়িত যে তিনি এই রাজ্যের অধিবাসী নহেন। কিন্তু ওয়েলস ছিলেন একেবারে এই পৃথিবীর মানুষ। ওয়েলসকে আমার মনে হয় এই বিরাট পৃথিবীর প্রধান শিক্ষক। তিনি যেন কোন অনাদিকাল হইতে আমাদের শিখাইতেছিলেন, পড়াইতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে সকল ঘণ্টাতে সব বিষয়েই তিনি পড়াইবেন। অন্য কেহ পড়াইলে যেন তাঁহার মনঃপূত হইত না। এই শিক্ষাদানে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না, আমাদের অমনোযোগে তিনি ব্যথিত হইতেন না, আমাদের মূর্খতা তাহাকে নিরুৎসাহিত করিত না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল আবার একেবারে অন্যরূপে আমার কল্পনায় উপস্থিত থাকেন। রাসেল যেন মিলটন বর্ণিত ঈশ্বরবিরোধী Satan-এরই পরিমার্জিত আধুনিক রূপ। মিলটনের Satan-এর সকল দৈহিক প্রতাপ রাসেলের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষমতায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। Satan-এর চেয়ে অনেক বেশি



চিন্তান্বিত তিনি। কিন্তু Satan-এর মতই তাঁহার বিদ্রোহী আত্মা, স্থিতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উজ্জ্বল সাহস, দুঃখ-লাঞ্ছনা সহিবার ক্ষমতা এবং অন্তরের আলোকের উপর অপর্যাপ্ত বিশ্বাস। রাসেলকে সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাঁহার এই নৈতিক সাহসের জন্য। তাঁহার অতিবড় শত্রুও তাঁহাকে নমস্কার জানাইবে (সত্য কথা বলিতে কি, যত বড় শত্রু তত বড় তাঁহার নমস্কার হইবে) এই কারণে যে তিনি তাঁহার আদর্শের পতাকার নীচে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন; সেই আদর্শ ভুল হইতে পারে, কিন্তু নিজের সুখ-ঐশ্বর্য দিয়া যাঁহারা আদর্শের মূল্য দেয় তাঁহাদের প্রতি মানুষ চিরদিনই একটা সম্ভ্রম অনুভব করে।

রাসেল গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত এবং দার্শনিক। কিন্তু ইউরোপে, ধরুণ, এক হাজার গণিতজ্ঞ আছে, দার্শনিক আছে দশ হাজার—কিন্তু রাসেল একটি। রাসেল মানুষের জীবন ও জগতের বিভিন্ন দিক নিয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন, মানুষের ভীড়ে, সমাজের বিরুদ্ধ শক্তিগুলির দ্বন্দ্বস্থানে আসিয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে কোন আত্মনিষ্ঠ, স্বার্থপর দূরত্বের অভিযোগ আমরা তুলিতে পারি না। সমাজ-পরিবর্তনের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করিয়াছেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শান্তি প্রচারের জন্য কারাবরণ করিয়াছেন, শিশুদের শিক্ষার অব্যবস্থা দেখিয়া আদর্শ বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। সকল বাস্তববাদী কাল্পনিকের মতই রাসেল তাঁহার মনোজগত এবং বাস্তবজগতের এক মিলিত চেহারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের সকলের মতই তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। নিকটকালে শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিদের স্বপ্ন সফল হয় না, ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের চক্রান্ত তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয়। রাসেল একদা শান্তির বাণী প্রচার করিতে গিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। যে বিদ্যালয় তিনি খুলিয়াছিলেন, তাহা অর্থাভাবে বেশি দিন বাঁচিতে পারে নাই. যে সুখী এবং স্বাধীন সমাজের কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা আজও কল্পনায় রহিয়া গিয়াছে। বৃহৎ ব্যক্তি-দের পরিমাপ তাঁহাদের সফলতায় নয়, তাঁহাদের ব্যর্থতায়।

রাসেল সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলিতে হইলে আমি বলিব—রাসেল এই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অসমন্বিত ব্যক্তি। রাসেলের রচনার মনোযোগী পাঠকরা জানেন যে রাসেলের ভাব-লোকে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সমস্ত রচনাকে এক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে। একদিকে রাসেলের নৈতিমূলক যুক্তিবাদ, অন্যদিকে তাঁহার নীতি, আবেগ এবং বিশ্বাস। রাসেলের এই দ্বৈতসত্ত্বাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় উইল ডুরাণ্ট বলিয়াছেন—

'There have been two Bertrand Russels.'

কিন্তু কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। দ্বন্দ্ব বা বিরোধ কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই বা নাই? সব ভাবুকের মনেই বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা আছে। কিন্তু তফাৎ এই যে তাঁহারা একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন চিন্তাগুলিকে গ্রথিত করিয়া থাকেন এবং রাসেল তাহা করেন না। তাঁহার মনের দ্বিমুখী চিন্তাগুলি সমন্বিত হয় নাই। উপমা দিয়া বলিতে পারি—রাসেলের মনে যেন দুইজন চিন্তানায়ক চলিয়াছে। তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে খুব বেশি দূরে নাই, পরস্পরকে তাহারা অবলোকনও করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ঠিক মাঝখানে যেন এক স্বচ্ছ অথচ সুদৃঢ় প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে, পরস্পরকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। রাসেলের মনের এই রহস্যটি যাহারা ধরিতে পারে নাই, তাহারা তাঁহার জীবনদর্শনের ভুল ব্যাখ্যা করিবে।

দ্বন্দ্বটি কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা একবার দেখা যাক। রাসেল সংশয়বাদী বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, যে বিশ্বাসের মূলে কোন যুক্তিপ্রমাণ নাই, তাহা অগ্রাহ্য। সমাজের অগণিত নরনারীর মনে কুসংস্কারের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। সেই অন্ধকারকে আক্রমণ করিতে হইলে সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসার প্রদীপটি জ্বালাইতে হইবে। আপনি হয়ত পরমভক্তিভরে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন যে, এক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করিতেছেন এবং পুণ্যবানদের তিনি স্বর্গে আনন্দ এবং পাপীদের তিনি নরকে সাজা দিতেছেন। আপনার এই বিশ্বাসের মূলে কি কোন যুক্তি আছে? বুদ্ধির মাধ্যমে বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে আপনার বিশ্বাস যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। সুতরাং, রাসেল বলিবেন, এইরূপে অন্ধভাবে ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অথবা ধরুণ, আপনি এই ভাবিয়া গর্ববোধ করেন যে, আপনার দেশ পৃথিবীর মধ্যে সকল বিষয়ে সেরা। যতবার সে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছে, প্রতিবারই অন্যায়টা প্রতিপক্ষের ছিল, আপনার দেশ কেবল

স্বাধীনতা রক্ষার্থে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে। রাসেল আপনাকে বলিবেন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়া বিচার করিতে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে আপনার দেশ অন্যান্য দেশের মতই দোষগুণসমন্বিত; দেশপ্রেমের অন্ধ আবেগে আপনি আপনার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইভাবে লোকে যদি তাহাদের বিশ্বাসগুলিকে যে সব বিশ্বাসের জন্য তাহারা প্রাণ দিতেছে এবং নিতেছে, বিচার করিত তবে পৃথিবী এতদিনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত, রাসেলের ভাষায়—

'If only men could be brought into an agnostic frame of mind, ninetenths of the evils of the modern world would be cured.'

প্রমাণহীন ধারণা গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে মর্যাদাহানিকর। হয় আপনার অনেক সুখকর ধারণা যুক্তির আঘাতে ভাঙিয়া যাইবে, আজন্ম যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতে আপনি অভ্যস্ত ছিলেন বুদ্ধির জিজ্ঞাসায় তাহা খণ্ডিত হইবে, আপনি ক্ষতবিক্ষত হইবেন, কিন্তু তবু আপনার অবদমিত, নিরুৎসাহিত হওয়া অনুচিত। যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াইবার মধ্যে একটা উল্লাস আছে। রাসেল উদাত্তকণ্ঠে আপনাকে উৎসাহ দিবেন—

'There is a stark joy in the unflinching perception of our true place in the world, and a more vivid drama than any that is possible to those who hide behind the enclosing walls of myth.'

কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠিবে, আমরা কি তাহা হইলে সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করিব? ইহার উত্তরে রাসেল বলিবেনঃ না. এমন কতকগুলি মূল্যবান বিষয় আমাদের জীবনে আছে যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের তার্কিকের ভঙ্গি নেওয়া উচিত নয়, কারণ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহাদের গতিপ্রকৃতি ঠিক বুঝিয়া উঠা যাইবে না। আমাদের গভীর আবেগ এবং চরম মূল্যগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। ভালবাসার কথা ধরা যাক। রাসেলের মতে ভালবাসা নিয়া তর্ক করিতে যাওয়া নিরর্থক, কেননা ভালবাসার উৎপত্তিস্থল আমাদের বুদ্ধিমণ্ডলে নয়, আমাদের আবেগমণ্ডলে। এই ক্ষেত্রেও যদি সংশয়বাদী রাসেলের কোন গোঁড়া শিষ্য তাঁহার সংশয়বাদের মানদণ্ড ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, তবে রাসেলই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন,—'We must be sceptical even of our Sceptimism.' রাসেল একবার আমাদের সংশয়ী হইতে উৎসাহিত করিতেছেন, আবার তিনিই সাবধান করিয়া দিতেছেন,—

'There are very definite limits, to my mind, within which rationality should be confined. one of the most important departments of life are ruined by the invasion of reason.'

কখন রাসেলের সংশয়ী মন সকল প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, নিয়ম প্রথাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া শূন্যে উড়াইয়া দিতেছে, আবার কখন তাঁহার অনুভূতিশীল মন শিল্পে, সৌন্দর্যে প্রেমে, জ্ঞানের বিশুদ্ধ আনন্দের মর্মস্থলে বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি খুঁজিতেছে। তিনি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত দেখিতে চাহেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি তাঁহার কাম্য, কিন্তু আবার শুধুমাত্র যুক্তি-বিচার বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার সম্বন্ধেও তাঁহার আশঙ্কার অন্ত নাই, কারণ তিনি জানেন সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌন্দর্যানুরাগ যদি না থাকে, তবে সেই সমাজ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিবে।

'The scientific society in its pure form is incompatible with the pursuit of truth, with love, with art, with spontaneous delight'. [B. Russell]

এখন আপনি বলিতে পারেন যে, আমি যে বিরোধের উল্লেখ করিলাম তাহা যথেষ্ট নয়, কারণ যুক্তিবাদী ব্যক্তিমাত্রেই যে সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় যুক্তির পন্থা অনুসরণ করিবে বা অপরকে বলিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, যুক্তিবাদ এবং ভক্তি বিশ্বাস একই চেতনায় সুসমঞ্জস রূপে থাকিতে পারে। আমি ইহার উত্তরে বলিব—নিশ্চয়ই থাকিতে পারে, থাকা উচিত; রাসেলের চেতনায় বিচার এবং বিশ্বাসের দ্বিমুখীবৃত্তি আছে, কিন্তু সুসমন্বিত অবস্থায় নাই। কি প্রকারে নাই তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

নীতিজ্ঞান আমাদের মনের নানারকম বাসনা-কামনা এবং আমাদের বাস্তব কার্যগুলিকে ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ দুই ভাগে ভাগ করিতেছে। কোন্ বাসনা এবং কোন্ কাজগুলি ভাল? ক খ'কে ভালবাসিতে পারে, আবার ঘৃণাও করিতে পারে। এখন, ক-এর পক্ষে কোনটা ভাল? ভালবাসা না ঘৃণা? রাসেল বলিবেন ভালবাসা ঘৃণা হইতে ভাল। কেন? যেহেতু তাহাতে দুই পক্ষেরই সুখ। ঘৃণার ভিতরে দুই পক্ষেরই অসদ্ভাব এবং অশান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সুখ অসুখ হইতে ভাল হইবে কেন? রাসেল বলিবেন ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। জীবনের চরম মূল্যগুলিকে নিয়া তর্ক চলে না। তেমনি সৌন্দর্য কেন কদর্যতা হইতে বেশি কাম্য হইবে তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝান অসম্ভব। সুখ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, তৃষা প্রভৃতি আমাদের মূল্যমণ্ডলের (Sphere of Values) অন্তর্গত। মূল্যমণ্ডল জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমানার বাহিরে। আমরা স্বভাবতই বুঝি যে সুখ দুঃখ হইতে ভাল, সৌন্দর্য ভাল কদর্যতা হইতে, জ্ঞান অজ্ঞানতা হইতে। এই পর্যন্ত রাসেলের সঙ্গে আসিতে তেমন কোন আপত্তির কারণ দেখিতেছি না। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই রাসেলের সঙ্গ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। এই যে আমাদের মূল্যমণ্ডল যাহার প্রশংসায় রাসেল এত উচ্ছ্বসিত, তাহার অস্তিত্ব কি কেবল মানুষের কল্পনায়, না প্রকৃত জগতের মাপকাঠিতেও তাহার কোন মূল্য আছে? রাসেল মানুষের চেতনাতিরিক্ত মূল্যমণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন না যে এই বিরাট বিশ্বে একটি জিনিস অন্য একটি জিনিষ অপেক্ষা স্বভাবতই সুন্দর, বা উন্নত। জীবজগতে প্রগতিবাদীদের লক্ষ্য করিয়া রাসেল তাঁহার উপহাসের ভঙ্গিতে বলিয়াছিলেন—

'A process which led from amoeba to man appeared to the philosophers to be obviously a progress,—though whether the amoeba would agree with this opinion is not known.'

এক সময় আমি রাসেলের এই মতের সমর্থক ছিলাম। তখন ঠিক ধরিতে পারি নাই এই মতের অসম্পূর্ণতা কোথায়। পরে স্যামুয়েল বাটলার, বার্ণার্ড শ' এবং অধ্যাপক উইলসন আমার চোখ খুলিয়া দিলেন। মানুষ প্রকৃতিরই অবিচ্ছিন্ন অংশ। ক্রমাগত জীববিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবনীশক্তি মানুষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মানুষেরই সজ্ঞান চেতনার আলোকে প্রকৃতি পশ্চাৎ ফিরিয়া নিজেকে অবলোকন করিতেছে। মানুষের চেতনা এবং চেতনোত্থিত মূল্যমণ্ডল মহাজীবন ধারারই সৃষ্টি; সুতরাং প্রকৃতিজগতে তাহার স্থান রহিয়াছে। বস্তুবাদী দার্শনিক রাসেল মানুষের জীবন ও চেতনাকে কতকগুলি বস্তুসমষ্টির এক একটি বিশেষ গুণ বলিয়া মনে করেন। মনকে বস্তুর গুণবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিলে মনের স্বাধীন সত্তা নষ্ট হয় এবং মনের স্বাধীন সত্তা নষ্ট হইলে একটি ধারণা বা কার্য সত্য কি মিথ্যা অথবা ভাল কি মন্দ এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হয় না। আমার মনের দুইটি অভীপ্সাই যদি শরীরের স্নায়ুরাশির দুইটি বিশেষ অবস্থার ফল হয়—তবে তাহাদের একটিকে অন্যটি অপেক্ষা বেশী মূল্য দিবার কি অধিকার আমাদের আছে? তাহা ছাড়া, বস্তুবাদীদের কথা মানিয়া নিলে আর এক মহাগোলযোগে পড়িতে হয়। তাহা হইলে, তাহাদের দর্শনকে খাঁটি এবং বিপক্ষদলের দর্শনকে ভ্রান্ত মনে করিবার কারণ পাওয়া যায় না, কেননা, বস্তুবাদীদের মতে, উভয়পক্ষের চিন্তাধারাই কতকগুলি বস্তুর বিভিন্ন রকম অবস্থার ফল। তাহাদের মধ্যে বাছিয়া একটি বিশেষ অবস্থাকে সত্য বলা নিরর্থক। সুতরাং

স্বীকার করিতে হইবে যে মন আছে, মনের স্বাধীনসত্তা রহিয়াছে, জীবন আছে, জীবনধারা যুগের পর যুগ ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে বিকশিত করিতেছে।

বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় যে মানব মনের বিচিত্র, সূক্ষ্ম প্রকৃতির পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয় না, মানুষকে যন্ত্রের মত দেখিলে যে মানুষকে অনেক নীচস্তরে নামান হয় তাহা রাসেলও জানেন এবং সেইজন্যই অনেকটা যেন নিজেরই নির্মম logicএর বিরুদ্ধে সজোরে ঘোষণা করেন,

'The sphere of value lies outside science'. 'Even more important than knowledge is the life of emotion.'

Logic এবং Mysticism এই দুই-এর মূল্য তিনি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু কিছুতেই দুইকে এক সমন্বয়ে মিলাইতে পারেন না। রাসেল দর্শনের দ্বৈতাভাস এইখানে।

আমার স্থান সংক্ষিপ্ত। যথেষ্ট সময় এবং স্থান থাকিলে দেখান যাইত যে রাসেলের এই দ্বৈত চেতনা কিভাবে তাঁহার মূল জীবনদর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহার অন্যান্য মতবাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব—তাহা রাসেলের রাজনৈতিক ধারণা। রাসেল সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু এমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনি বিরোধী যেখানে সর্বময় কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের করায়ত্ত, যেখানে ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার উষ্মা এই কারণেই। ব্যক্তির স্বাধীনতা সভ্যজগতের এক বিরাট অর্জিত মূল্য সন্দেহ নাই। রাসেলের সঙ্গেও সায় দিব যে,

'The problem of individual liberty does not arise among savages because they feel no need of it.'

কিন্তু ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা যে সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর Laissez fair থিয়োরীর প্রভাবে, আজ তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক ব্যক্তিকে অবাধ অধিকার দিবে না অপর এক ব্যক্তির শ্রমের ফল উপভোগ করিতে। আজ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তির কর্তৃত্বে এবং স্বার্থে পরিচালিত, আগামীকাল সেই উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের কর্তৃত্বে এবং স্বার্থে পরিচালিত হইবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং অধিকার বহুগুণে বৃদ্ধি না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্যক্তির চিন্তার অভিমত প্রকাশের সমালোচনার স্বাধীনতা না থাকিলে সমাজের সকল উন্নতি প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সমস্যা হইতেছে এই দুয়ের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান করা এবং রাসেলের রাজনৈতিক দর্শনে এই সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

আজকাল শিক্ষিত মহলে রাসেল সম্পর্কে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি তাঁহার মনোভাব। রাসেলের সাম্প্রতিক প্রবন্ধাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় সোভিয়েট রাশিয়া এখন তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যাহারা রাসেলের মন ও মননধারাকে তলাইয়া দেখে নাই তাহাদের কেহ কেহ পরম উৎসাহে রাসেলের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ভাবিবে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ নস্যাৎ হইয়া গেল, আবার কেহ বা আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিবে, রাসেল পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়াদের ভাড়াটিয়া দার্শনিক। কিন্তু যাহারা রাসেলকে জানে, যাহারা দেখিয়াছে এই দার্শনিকের চিন্তাকল্পনা কিভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ দ্বৈতধারায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহারা বর্তমান শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী এবং সমাজতান্ত্রিকের সোভিয়েট বিদ্বেষের নাটকীয় অপ্রত্যাশিততায় একপ্রকার কৌতুক অনুভব করিবে। মানব সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা অর্থাৎ অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার অনেকখানি সুরাহা সোভিয়েট রাশিয়া করিয়াছে —অন্তত এই কার্যটির জন্য সে সমাজতান্ত্রিক রাসেলের অভিনন্দন দাবী করিতে পারে। কি সে করিতে পারে নাই, কি তাহার ত্রুটি তাহা রাসেল মনীষার প্রণিধানযোগ্য নিশ্চয়ই, রাসেলের মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পাঠ সংগ্রহ না করিলে কে করিবে? কিন্তু সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যদি তিনি আজ প্রস্তরখণ্ডের মত লাল রাশিয়ার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিতে যান, তবে রাসেলভক্ত আমি অন্তত এই কমেডির অভিনয়ে কৌতুকবোধ করিলেও আনন্দবোধ করিতে পারিব না। রাসেল, আমি, আমরা সবাই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কাঁচের গৃহে বাস করিতেছি, সুতরাং যতবারই তিনি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবেন, ততবারই আমাদের ঘরের কাঁচগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িবে। রাসেল আজ পশ্চিম ইউরোপের শান্তি ও সভ্যতা রক্ষার্থে যথেষ্ট সমরোপকরণ এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দাবী করিতেছেন; কিন্তু তিনিই কি একদিন বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন নাই যে, যুদ্ধপ্রস্তুতির পথে শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না? তিনি কি এক সময় বিদেশীর আক্রমণের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও অহিংসা এবং অসহযোগের বাণী প্রচার করেন নাই? সোভিয়েট রাশিয়ার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এমন অভিমত কি তিনি ব্যক্ত করেন নাই যাহার ফলে সাক্ষাৎকারিণী এথেল ম্যানিন লিখিয়াছিলেন,—

'Russia he (Bertrand Russell) regards as the intellectual hope of the world with the possible exception of China and Japan. Civilisation, he said, is moving Eastward, Western Civilisation being crushed out by 'American barbarism'.

এইভাবে রাসেলের উক্তি এবং মন্তব্য দ্বারাই রাসেলকে আক্রমণ করিতে থাকিলে আমার প্রবন্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না, কারণ, পূর্বেও বলিয়াছি, রাসেলের বিরোধ রাসেল নিজেই। এবং তাঁহার এই দীর্ঘজীবনে এই বিরোধের সংখ্যা অনেক।

রাসেলকে অসমন্বিত ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করি নাই। কে তাঁহার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে? দুরূহ গাণিতিক তত্ত্ব-বিজ্ঞান হইতে লঘু সরস প্রবন্ধ রচনা পর্যন্ত চিন্তারাজ্যের এমন কিছু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, অথচ অলঙ্কৃত করেন না। সামান্যতর ব্যক্তিদের চিন্তার তীব্রতা কম থাকে বলিয়া তাহার সমন্বয় অনায়াসে ক্ষুদ্র স্তরে হইয়া যায়। তাহার চেয়ে কত বেশি শিক্ষাপ্রদ এবং গভীর রাসেলের এই মানসিক অসমন্বয়। তাঁহার মনের যেদিক ধরিয়াই আপনি আগাইয়া যান দেখিবেন একটি নির্দিষ্ট পথে একটি লক্ষ্যের অভিমুখে আপনি আসিতে পারিতেছেন। কয়জনের মন সম্বন্ধে আপনি এই কথা বলিতে পারেন?

রাসেল অনন্য!

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৭

নিলামে সোফা এবং আলমারি কিনতে গিয়ে দৈবক্রমে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো কেনা হয়ে গেছে অবগত হ'য়ে বাড়ির মেয়েরা যৎপরোনাস্তি খুসি হলেন।

বউদিদি বললেন, "বেশ করেছ উপীন, জিনিসের মতো একটা জিনিস হ'য়ে গেল। ঝোঁকের মাথায়, ও-সব কাজ অমন ক'রে না করলে সলা-পরামর্শ ক'রে কখনো করা যায় না।" ঝোঁকটা যে আমার ক্ষেত্রে কতটা অস্বেচ্ছাপ্রসূত ছিল, সে কথা স্পষ্টরূপে ফাঁস ক'রে নিজের কৃতিত্বের লাঘব করলাম না। উপরন্তু ঈষৎ গভীর স্বরে বললাম, "হাতে হাতে পঞ্চাশ টাকার লাভটা ঘরে তুলতে পারলেও মন্দ ছিল না বউদিদি।"

মাথা নেড়ে বউদিদি বললেন, "না, না, তা করলে ঘরে লাভ তুলতে না, লোকসানই তুলতে।"

দাদাদের মন থেকে বিরক্তির মেঘ একরকম কেটেই গিয়েছিল; বউদিদিদের মুখে এখন এই সকল সানন্দ অনুমোদনসূচক মন্তব্য শুনে, যদিই বা কিছু তার অবশেষ ছিল, নিঃশেষে অপসৃত হ'য়ে উৎসাহ দেখা দিলে। যেদিন পঞ্চাশ টাকার পিয়ানো আট শ' টাকার মালে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের গৃহে প্রবেশ ক'রে ঝঙ্কার ছাড়তে আরম্ভ করবে, আমরা সমস্ত পরিবার যৌথ-আগ্রহে সেই শুভদিনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দাদা বললেন, "পিয়ানো যখন তোমার দ্বারাই কেনা হয়েছে, তোমার ঘরেই তা থাকবে।"

শুনে মনের আবেগ দমন করা কঠিন বোধ করলাম। সৌভাগ্য যখন নিজের পথ নিজে ক'রে আসে, তখন এমনি ক'রেই আসে। দিন কুড়ি-প'চিশের পূর্বে পিয়ানো সারিয়ে আসবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমার সবুর সচ্ছিল না। পাঁচ-সাত দিন পরেই আমার ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের জিনিসপত্র সরিয়ে-সারিয়ে 'দিগ্‌-ধড়ঙ্গার' জন্যে জায়গা খালি ক'রে রাখলাম। নবপরিণীতা স্ত্রীর জন্যেও বোধ করি পুরুষ মানুষ এত আগেভাগে তৎপর হয় না। বউদিদিরা নানাভাবে পরিহাস করতে আরম্ভ করলেন। এমন কি, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আবার একদিন বাক্স-ট্রাঙ্ক-সুটকেসের নূতন আমদানীর জায়গা করবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের ঐ স্থানটাই খালি করতে হবে, এমন ইঙ্গিত দিতেও ছাড়লেন না।

দীর্ঘ দুঃসহ অপেক্ষার কাল অবশেষে শেষ হ'ল। একদিন বৈকালে পথে লোকজনের ভন্‌ভনানি শুনে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, আট-দশ জন কুলির মাথায় 'দিগ্‌ধড়ঙ্গা' হাজির হয়েছে। ঈষৎ লালচে রঙের মসৃণ মেহগিনি কাঠের উপর উজ্জ্বল পালিশ করা তার কমণীয় শ্রী দেখে মন উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম।

বহু কষ্টে ও কৌশলে, এবং বহু বিলম্বে, সেই যৎপরোনাস্তি ভারি এবং বৃহৎ যন্ত্রটিকে দ্বিতলে তুলে আমার ঘরে স্থাপিত করা হ'ল। দাদা তখন হাইকোর্ট থেকে গৃহে ফিরেছেন। চালানে নিরাপদ ডেলিভারির সই নিয়ে কুলিরা প্রস্থান করার পর আমি পিয়ানোর ডালা খুলে বসলাম। সাত অক্টেভের বৃহৎ ঝক্‌ঝকে কী-বোর্ড প্রসন্ন হাস্যে আমাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করলে। নিঃশব্দ নীরব ভাষায় যেন আমাকে বললে, 'বন্ধু! তোমার দুর্বার আকর্ষণের অনতিবর্তনীয় পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি।' মনে মনে উত্তর দিলাম, 'আমার মন উজ্জ্বল ক'রে, আর গৃহ সুরেলা ক'রে বহাল তবিয়তে অবস্থান কর।'

দুই হাতে পিয়ানোর তিনটে সি সুরের উপর যুগপৎ তীক্ষ্ণ আঘাত করলাম। একটা গভীর গোল সুমিষ্ট সুরের আনন্দে সমস্ত বাড়িটা যেন কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল! হৃষ্ট কণ্ঠে দাদা বললেন, "বাঃ! চমৎকার আওয়াজ ত!"

তখন দ্রুত লয়ে বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি পোল্‌কা নাচের মনোরম গৎ সাসা নিনি ধাধা পা মামা গাগা রেরে। সানিধাপা। ততক্ষণে বাড়ির সকল স্ত্রী-পুরুষ এসে জমায়েৎ হয়েছেন পিয়ানোর পাশে। দু-তিন বার পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে আসা মাত্র বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের ভিতর হ'তে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হল, 'বাঃ!' 'বাঃ!' চমৎকার! সুন্দর!

আরম্ভ ক'রে দিলাম আলিবাবার পর্যায়। একেবারে শুরু থেকে ধরলাম, 'বাজে কাজে মিন্‌সেকে আজ যেতে দোব না।' গোটা চার পাঁচ গান বাজানোর পর মা বললেন, "এবার তোমরা চা-খাবার খেয়ে নাও, সন্ধ্যার পর আবার বাজিয়ো।" শুনলাম নীচে ঠাকুর বার তিনেক চায়ের জল গরম করেছে, আর নতুন বাজনা আরম্ভ হ'তেই ফেলে দিয়েছে,—জলে পাতা ফেলবার সুযোগ পায়নি। আদালতের পোষাক-পরিচ্ছদ না বদলেই দাদা তখনো প্রসন্ন মুখে আমার খাটে ব'সে আছেন।

সন্ধ্যার পর পিয়ানো সংযোগে আমার ভাইঝি সুশীলা নির্মলা সরলা ও ইন্দুবালার গান আরম্ভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলার' বহুবার-শোনা গান 'দেলো সখি, দে, পরাইয়ে গলে',—কিন্তু ঝঙ্কারময় নূতন সুরের সহযোগিতায় নূতন মাধুর্যের দ্বারা মণ্ডিত হ'য়ে এই পুরানো গানও অপূর্ব হ'য়ে উঠ্‌ল। নূতন স্বর্ণাধারের মধ্যে আশ্রয়লাভ ক'রে পুরাতন মণি যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করলে। রাত্রি দশটা—সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গান বাজনা চল্‌ল। যখনকার কথা বলছি, তখন বাঙালি পাড়ায় পিয়ানোর প্রচলন অল্পই ছিল। শুনলাম, গান-বাজনার সময়ে মাঝে মাঝে পথে ভিড় জ'মে যাচ্ছিল।

আহারাদির পরে ঘরে ঘরে যখন দোরে দোরে খিল প'ড়ে গেল, পিয়ানোর ডালা খুলে ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুগ্ধ চিত্তে কল্পনার চেয়েও যা চিন্তার অতীত সেই করতলগত বাস্তবকে ধারণায় আনতে লাগলাম। এ-ও তাহ'লে হ'ল! এমনও তা হ'লে হয়! কিছুদিন থেকে মনে করতাম, সুখ বলতে যথার্থ যা বোঝায়, তার একমাত্র আশ্রয় পিয়ানো;—এ সংসারে কেবলমাত্র সেই সুখী যার একটা পিয়ানো আছে। সুখের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেকে সুখী ব'লে স্বীকার না করবার আর উপায় রইল না। মনে হ'তে লাগল, এখন যদি কিছুদিন পিয়ানো চুখে করে রোগ-শয্যায় পড়ে থাকি, তাতেও দুঃখ নেই!

ধীরে ধীরে ক্ষণকাল শঙ্করা রাগে 'শুনলাম না-কি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছ সই' গানটি বাজিয়ে ডালা বন্ধ করলাম। যতই মৃদু স্বরে বাজাই না কেন, ঘরে ঘরে তা শোনা গেছে এবং সম্ভবতঃ নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু তথাপি কাউকে বিরক্ত করেনি, সে কথা বুঝতেও বাকি রইল না। বার কয়েক পিয়ানোর উপর স্নেহনিষিক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে পিয়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম কি-না মনে নেই, প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ল পিয়ানো। মনটা খুশিতে ভরে উঠ্‌ল! ডালা খুলে আরম্ভ করলাম রামকেলী সুরের গান 'মিলো আঁখি চিড়িয়া মিঠি বোলে! মিলো আঁখি, মিলো আঁখি, মিলো আঁখি!' রামকেলী সুরের এই ঘুম-ভাঙানো গানের

ফলে কেউ আঁখি মেলেছিল কি-না বলতে পারিনে, কিন্তু অচিরে দরজায় করাঘাত পড়ল। দ্বার খুলে দিতেই হাসিমুখে কয়েকজন আগ্রহী শ্রোতা প্রবেশ করলে। তারপর ক্ষণকাল ধ'রে চল্‌লো গান-বাজনার অতি চিত্তাকর্ষক এক প্রভাতী আসর।

এইরূপে, এক পক্ষের উৎসাহে এবং অপর পক্ষের ঐকান্তিক অনুমোদনে আমাদের আনন্দময় দিনগুলি গানে ও বাজনায় আবর্তিত হ'তে লাগল; এবং তারই অবসরে নিরলস যত্ন ও সাধনার ফলে পিয়ানোর উপর আমার দুই হাতের গতি ক্রমশ হয়ে চল্‌ল দ্রুত এবং অবাধ। মনে হ'ল, এই কঠিন যন্ত্রকে আয়ত্ত করবার উচ্চাঙ্গের শৈলী আমার হাতে ধরা দিতে আর অধিক বিলম্ব নেই।

যেদিন আলিবাবার পালা বাজাতে বসতাম, সেদিন ঘরে-বাইরে, পথে সামনের বাড়ির দ্বিতলের গবাক্ষে—সর্বত্রই উৎকর্ণ শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনত। অনেকে আমার বাজনার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখতে আরম্ভ করেছিলেন; আমিও যে তাঁদের দৃষ্টির সঙ্গে কতকটা দৃষ্টি মেলাতে আরম্ভ করেছিলাম, সেকথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

দাদাও বোধ হয় আমার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, "তুমি যখন নিজে নিজেই এতটা ভাল বাজাচ্ছ, তখন একটু ভাল করেই শেখ। পিয়ানোর পক্ষে ইয়োরোপীয়ান মিউজিক বিশেষ উপযোগী। ইয়োরোপীয়ান মিউজিক শেখাতে পারে, এমন একজন শিক্ষক রাখবার ব্যবস্থা কর।"

প্রস্তাব শুনে ত মনে মনে লাফিয়ে উঠলাম; বললাম, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না কি?"

দাদা বললেন, "তার দরকার হবে না; মণ্ডল মশায়ের কাছে একদিন যাও, তিনি হয়ত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

পরদিনই মণ্ডল মশায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে কথাটা পাড়লাম।

অল্প একটু চিন্তা করে মণ্ডল মশায় বললেন, "আমার একটি ভাগ্নে আছে, জেনেরাল অ্যাসেমব্লিতে প্রেয়ারের সময়ে অর্গ্যান বাজায়। তাকেই ঠিক করে দোবো।" মণ্ডল মশায়রা খ্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অর্গ্যান বাজান শুনে মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "পিয়ানো নিশ্চয়ই ভালরকম জানেন?"

সহাস্যমুখে মণ্ডল মশায় বললেন, "না জানলে তোমাকে শেখাবে কেমন করে? অর্গ্যান, পিয়ানো, বেহালা,—সবই সে বাজাতে পারে।"

আমি ত চাই মাস্টার অফ পিয়ানো,—জ্যাক অফ অল ট্রেডস্ না হলেই বাঁচি! বললাম, "মণ্ডল মশায়, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

স্মিতমুখে মণ্ডল মশায় বললেন, "কি কথা?"

"সেদিন আপনি সত্যি সত্যি এক শ' টাকা দিয়ে পিয়ানোটা কিনতেন?"

আমার কথা শুনে মণ্ডল মশায় হাসতে লাগলেন; বললেন "তোমরা যখন আমাকে সুযোগই দিলে না, তখন আর সে কথায় কাজ কি? কিন্তু তোমার কাজ আমি ক'রে দিয়েছিলাম।"

সকৃতজ্ঞকণ্ঠে বললাম, "সম্পূর্ণভাবে! শুধু সেদিনই নয়,—পরেও।"

সকৌতূহলে মণ্ডল মশায় জিজ্ঞাসা করলেন "পরেও মানে?"

মৃদু হেসে বললাম, "মানে, পিয়ানোটা আপনি চমৎকার সারিয়ে দিয়েছেন। আপনি বলেছিলেন, সারানোর পর আট শ' টাকার মালে দাঁড়াবে, আমার কিন্তু মনে হয় হাজার টাকার মালে দাঁড়িয়েছে।"

মণ্ডল মহাশয় বললেন, "ভাল ক'রে না সারিয়ে দিলে তোমার কাজ করা হবে কেমন ক'রে? লালমোহনবাবুকে খুশি করা ত চাই। খুশি হয়েছেন তিনি?"

"যথেষ্ট! আর একটু কম হ'লেও ক্ষতি ছিল না।"

মণ্ডল মশায় হাসতে লাগলেন।

মণ্ডল মশায়কে দিয়ে তাঁর ভাগিনেয়ের পারিশ্রমিক প্রভৃতি একেবারে ঠিক ক'রে নিলাম। সপ্তাহে দুদিন ঘণ্টা দেড়েক ক'রে শেখাবেন, সন্ধ্যার পর। মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা, তা ছাড়া যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া।

দিন পাঁচেক পরে অপরাহ্ণকালে চাকর একটা চিঠি এনে দিলে। মণ্ডল মশায় লোক পাঠিয়েছেন।

তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে চেহারা দেখে ভড়কে গেলাম! একেবারেই ভক্তি হল না। বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোঁট্টা একটুখানি মানুষ; চোয়াল ভারী কঠিন রেখার কৃষ্ণবর্ণ মুখ: আকৃতি দেখে বয়স নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। দেহ দেখলে মনে হয় আমার চেয়ে তিন চার বছরের ছোট, মুখ দেখলে মনে হয় পাঁচ-সাত বছরের বড়। অবয়বের কোন্‌খানটা যে সত্য কথা বলছে, তা সহজে বোঝবার উপায় নেই।

যাই হোক, নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "মণ্ডল মশায়ের কাছ থেকে আসছেন?" বিমূঢ় অবস্থার অযৌক্তিক প্রশ্ন।

প্রতি নমস্কার ক'রে আগন্তুক বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"মণ্ডল মশায় আপনার মামা?"

"হ্যা, মামা।"

"আপনিই শেখাবেন?"

এবার আগন্তুকের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললেন, "সেই রকমই ত' আমাকে তিনি বলেছেন।"

এর ওপর অবশ্য আর কথা নেই। কিন্তু বড় হতাশ হলাম, এই ছোটখাটো মানুষটির মধ্যে কি এমন বিদ্যে থাকা সম্ভব যাতে সে আমার মতো উন্নত মানের ছাত্রকে শিক্ষাদানের অভিমান নিয়ে আসতে পারে! মণ্ডল মশায় আমাকে যে একেবারে জানেন না, তাত' নয়। আমি যে কতকটা দক্ষতার সঙ্গে হারমোনিয়ম এবং টেবিল হারমোনিয়ম্ বাজাতে পারি, তার পরিচয় ত' তিনি নিজের দোকানে ব'সেই একাধিকবার পেয়েছেন। তবে তিনি কি কারণে মনে করলেন যে, যে কোনো ডোবায় ডুব দেবার মতো আমি খাটো?

যাই হোক, যখন আমাদেরই অনুরোধক্রমে তিনি পাঠিয়েছেন, তখন অমনি-অমনি ত বিদায় দেওয়া চলে না; বললাম, "চলুন, ওপরে যাই।"

ওপরে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রে ভদ্রলোক পিয়ানোর ডালা খুলে দেখে ঢং করে একটা শব্দ করলেন, তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "কে শিখবেন? আপনি?"

বললাম, "হ্যাঁ, আমিই।"

"বাজানোর কিছু অভ্যেস আছে আপনার?"

মনে মনে বললাম, 'কিছু নয়, যথেষ্ট আছে। যখন পিয়ানোর চাবির ওপর সুরের ঝড় বওয়াতে থাকব তখন তার মধ্যে আপনার দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে। হয়ত মাঝে মাঝে স'রে পড়বার পথ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।' কিন্তু বিনয় প্রকাশ করার যখন একটা লৌকিক প্রথা আছে, তখন একটু না হয় বিনয় প্রকাশ করাই যাক। মৃদু হেসে বললাম, "তেমন কিছু নয়, যৎসামান্য আছে।" মনে ভাবলাম, বাজানোর পর এই বিনয়টুকু বিদ্যার সহিত যুক্ত হ'য়ে কমনীয় হ'য়ে প্রকাশ পাবে।

ভদ্রলোক বললেন, "একটু বাজান ত দেখি।"

স্মিতমুখে বাজাবার টুলে গিয়ে বসলাম। কি বাজানো যায়? পোল্কা ডান্সটা? নাঃ, ভদ্রলোক যখন ইউরোপীয় সঙ্গীত শেখাতে এসেছে, তখন বিলিতি গৎ-টৎ নিশ্চয় কিছু জানা আছে; সুতরাং পোল্কা ডান্সে হয়ত' তেমন সুবিধা করা যাবে না। তার চেয়ে দিশির ওপর দিয়েই যাওয়া যাক। প্রতিপক্ষ যখন বক্সিং-এ পটু হয়, তখন তাকে পাড়ু করতে হয় কুস্তির প্যাঁচে। সুতরাং 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা'ই ঠিক। তা ছাড়া আলিবাবার সমস্ত গানের মধ্যে ঐ গানের সুরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, আর আমিও গানটা পিয়ানোয় কর্ড দিয়ে ভাল ক'রে বাজাতে পারি।

আরম্ভ ক'রে দিলাম 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা'। প্রায় মিনিট দশেক ধ'রে নানা কায়দা করণের মধ্য দিয়ে গানটা বাজালাম। কখনো জোরে, কখনো ধীরে; কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত; কখনো সোজা, কখনো আড়ে। দু হাতের আঙুলগুলো কী-বোর্ডের উপর এমন দৌড়োদৌড়ি ক'রে বেড়াতে লাগল যে, দেখে আমারই তাক লেগে যায়! অবশেষে অতি দ্রুত লয়ে মিনিট দুই প্রবলভাবে বাজিয়ে হঠাৎ সমের মাথায় একেবারে যাকে বলে 'চরম ক্ষান্তি' dead stop) তাই ক'রে দিয়ে দু'কান পাতলাম প্রশংসার বাণী শোনবার জন্যে। 'অদ্ভুত বাজান আপনি! আপনাকে আমি আর কি শেখাব? বরং আপনিই আমাকে—ইত্যাদি ধরণের কথা ভদ্রলোককে বলতে হবেই। না ব'লে উপায় নেই। কান পেতে প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষণকাল, বোধ হয় বিস্ময়াহত হয়েই নির্বাক হয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আপনাকে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে দেখছি!"

মনে মনে বললাম, 'বিপদে পড়তে হবে, তা আমি আগে থাকতেই জানি। ওস্তাদে-সাকরেদে সময়ে সময়ে যখন পাল্লা চলবে, তখন কে ওস্তাদ আর কে সাকরেদ সব সময়ে ঠাহর হবে না। তবু কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে বললাম, "কি বিপদে পড়তে হবে বলুন দেখি?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনার আঙুলগুলো এমন বদভাবে পেকে গেছে যে, আপনাকে শেখাতে খুব বেগ পেতে হবে। আপনি যদি কিছুই না জানতেন তা হ'লে আপনাকে শেখানো মোটের ওপর অনেক সহজ হ'ত। দেখুন, মিস্টার গাঙ্গুলী, teach করার চেয়ে unteach করা অনেক শক্ত। আপনাকে unteach করতে হবে অনেক-কিছু। যা এতদিন শিখেছেন তা একেবারেই ভুলতে হবে।"

সর্বনাশ! লোকটা বলে কি! এ যে আমার বাজনাকে এক কানাকড়ি মূল্যেও দিতে চায় না! মনে হ'ল, এ বলার অন্য কিছুই নয়, স্রেফ হিংসের কথা। দেখা যাক্, ও পক্ষেরই বা কতখানি মুরদ! টুল থেকে উঠে এসে বললাম "আপনি একটু বাজান ত, শুনি।"

বলা মাত্র ভদ্রলোক টুপ ক'রে, কতকটা যেন লাফ মেরেই, টুলের উপর উঠে বসলেন; তারপর, খাদের দিক থেকে আরম্ভ ক'রে চড়ার দিক পর্যন্ত দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডের উপর দু'হাত চালিয়ে ভর্‌ভর্ ক'রে কটা শব্দ বার ক'রে গৎ বাজাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল! মনে হ'ল, সমূলে উৎপাটিত হয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে নীত হয়েছি, আর, সেখানে অপরূপ ব্যান্ড বাজছে সুবিখ্যাত ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেন্টের। মাত্র একটা পিয়ানো, কিন্তু বাজাবার কৌশলে বাজছে যেন আরো কত প্রকার যন্ত্র! পিয়ানো-বাজানো বলতে যদি কিছু বোঝায়, তা হ'লে তা এই। তা নইলে, কতকগুলো ঝমর্ ঝমর্ ক'রে 'লেও সাকি, দেও ভর্ পিয়ালা'—ছি, ছি, ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল! মনে হ'ল, মা ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও!

একটা তীব্র অভিমানে, রাগেও বলা যেতে পারে, মনটা বিরূপ হ'য়ে উঠল পিয়ানোর প্রতি! অকৃতজ্ঞ! আমার হাতে তুমি ব্যাঙ ডাকো—আর, পাপিয়ার তান ছাড়তে আরম্ভ করেছ ঐ বেঁটেখাটো মানুষটির হাতে!

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হল, পিয়ানো বেচারির অপরাধ কোথায়? যা ঘট্‌ল, তা ত দর্পহারী মধুসূদনেরই কর্ম। বাজাতে ওস্তাদ ব'লে মনের মধ্যে অহেতুক দর্প হয়েছিল, আমারই পিয়ানোকে নোড়ারূপে ব্যবহার ক'রে আমার সেই দর্পের দাঁতের গোড়া ভেঙেছেন। মনে মনে বললাম, এ তুমি ভালই করলে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আর যেন কোনো দিন নির্বস্তু দর্পের কুলোপানা চক্র এমনভাবে উঁচু হ'য়ে উঠতে না পারে।

গৎ বাজানো শেষ হ'ল। বাজনা শুনতে শুনতে ভদ্রলোককে ওস্তাদ ব'লে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে মনে-মনে প্রণাম করেছিলাম। বললাম, "কি অদ্ভুত বাজান মাস্টার মহাশয়, আপনি! যখন বাজান্, মনে হয় আপনার আঙুলগুলো যেন আঙুলই নয়। যেন কোনো একটা যন্ত্রের অংশ যান্ত্রিক অবলীলার সঙ্গে চলছে।"

মিস্টার মশায় (এখন থেকে মাস্টার মশায় বলাই উচিত) বললেন, "সেই যান্ত্রিক অবলীলা লাভ করবার জন্যেই আপনাকে আপনার পূর্ব অভ্যাস ভুলতে হবে। হারমোনিয়মের আঙুল চালানো আর পিয়ানোর আঙুল চালানো ঠিক এক জিনিস নয়।"

এক জিনিস যে নয়, তার প্রমাণ ত' হাতে-হাতেই পাওয়া গেছে। মহাদেবের ধুতরা ফুল দিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করা চলে না, একথা বুঝতে আর বাকি ছিল না।

মাস্টার মশায় সঙ্গে একটি লম্বা-চওড়া কিন্তু পাতলা ধরণের বিলাতি নোটেশনের বই এনেছিলেন। সেই বই থেকে আমার সাধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুশীলনী নির্বাচিত ক'রে দিলেন। তারপর পিয়ানো বাজানোর জন্য মৌখিক এবং লিখিত কয়েকটি উপদেশ দিয়ে, যাবার সময়ে শেষ উপদেশ দিলেন, "যতদিন আমি পরামর্শ না দিই, পিয়ানোর কোনো গৎ বা গান বাজাবেন না। হারমোনিয়ামেও নয়।"

বুঝলাম, আমার কুশিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল। (ক্রমশঃ)

গণিত

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মোদক

দুই শুধু দুই-ই, এই গণিতের কঠিন প্রমাণ।
আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরণীর বুকে বাঁধে বাসা
এখানে তো শূন্য সব, মানুষের প্রেম ভালবাসা,
তুচ্ছ বন, তুচ্ছ মাটী, তরুলতা, উদার পরাণ।

এও সত্য জানি মনে, দুই শুধু দুই কভু নহে,
একের প্রদীপ্ত প্রভা বিকীরিছে সত্তা আপনার
তবু কোন্ রসায়নে হারালো সে স্বকীয় আকার,
দু-য়ের এ গুরুভার রাত্রিদিন স্কন্ধে তার বহে!

বৃত্ত পরিক্রমা বহে অন্তরেতে শুধু বিন্দু এক—
গণিতজ্ঞ তুলে ধরে স্থির চিত্তে আবিষ্কার তার।
তবু আজো জীবনের মসীকালো গাঢ় অন্ধকার
মেটে নাই; হেরি শত-ছিন্ন-আত্মা বিভক্ত অনেক।

সত্যও কি সত্য নয়? কি তোমার অদ্ভুত সৃজন
ইহারি উত্তর মাগে, আমার এই চিরোন্মুখ মন।

অনুবাদ সাহিত্য

তাবুস ও তার তিন কুকুর

আঁদ্রে সামস

যে-সময়ের কথা বলছি তখন শ্রমজীবী যুবক তাবুস গ্রাম থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে গভীর বনের মধ্যে এক খুপরীতে থাকত, সেটা এখনো রয়েছে তার নাম বহন করে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়িকাঠ লেগেছিল এতে ঃ চারিদিকে দেয়ালের গাঁথুনির ওপর তোলা হয়েছিল সেগুলি, চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে ছাওয়া হয়েছিল সমস্তটা ছাদ। এর ভেতর থেকে চোখে পড়ত পাহাড়ের একটা দিক, একটা উঁচু উপত্যকা, যৌবনদীপ্ত সতেজ গাছে তা পরিপূর্ণ; এই গাছগুলি কাটা এখন সবে শুরু হয়েছে। এ-সবের তাবুস নাম দিয়েছিল তার 'শিশু আমেরিকা', কেননা এত পরিপাটি করে আগুন-রেখাগুলি রচিত এখানে, ঘন ঝার গাছের বনটি কি অসংখ্য সমকোণে চিহ্নিত, এজন্য পাহাড়ের এই গায়ের দিকে দেখলে মনে হয় কেমন অদ্ভুৎ, এর শেষ নেই যেন।

নিলামের সময়ে সে-ও এক অংশের গাছ কাটবার স্বত্ব কিনে নিয়েছে, তারপর প্রাণপণে লেগে গিয়েছে এর থেকে দু'পয়সা করে নেবার জন্য। সে ঠিক করল এ-জমির কাজে আর সঙ্গীসাথী কাউকে ডাকা হবেনা, একলা খাটতে হবে, তাতে ত তারই লাভ, পরের গাঁট ভারী করা কোন কাজের কথা নয়। এমনি করে দিন চলল, সকলের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে, আর সম্প্রতি এক ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত তার যে সঞ্চিত সামান্য পুঁজিটুকুও খোয়া গিয়েছিল তার দুশ্চিন্তা কাঁধে বয়ে। এক ইঞ্জিনীয়ার এল পাহাড়ে নদীর ওপরের দিকে তিনটি বাঁধ তৈরী করার জন্য, জলের উচ্চতা বাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়ে মাসের পর মাস কাজ করল সে, তার পরামর্শে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার লোভে সে তার সর্বস্ব ধার দিয়ে বসল। এখন, গত তিন সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র নির্মাণের কর্তাটি জেলে পড়ে রয়েছেন, আর তাবুসও প্রতিজ্ঞা করেছে এমন পৃথিবীর কারো সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কারও সঙ্গে দেখা করতেও চায়না সে, একথা সবাই জেনে রাখুক। এই অঞ্চলের যে-দিকটায় তার কুটীর সেই অংশটা সবচেয়ে নির্জন। ক্বচিৎ কখনো এক আধজন পথচারী যাওয়া-আসা করে। কয়েক মিনিটের জন্য কেউ দেখা করতে এলেও তার সহ্য হয় না। সাত দিনের বাসি পদচিহ্ন দেখলেও তার গা জ্বলে যায়; নিত্য নূতন ফন্দী আঁটে যাতে কেউ এপথ মাড়াতে না পারে।

তার কুকুর তিনটি দিন রাত্তির এই পাহাড় অঞ্চলে অবাধে ঘুরে, বেড়ায়। আশেপাশের সকলেই এই তিন রত্নের কথা জানে। লোকে বলে সবচেয়ে কদর্য বেলজিয়ান আর জার্মানের সংমিশ্রণে মাদি কুকুরটার জন্ম; পুরুষ দুটো নাকি আরও জঘন্য রকম বর্ণসংকরের ফল।

অদ্ভুত নিঃশব্দচারী জন্তু এরা, কখনো ডাকে না, গলার ভেতর একটা চাপা গম্ভীর শব্দ করে, কাউকে মানে না, মনিবকেও না-মানার মতই, সব রাস্তাগুলি বন্ধ করে রাখে শুয়ে গড়িয়ে, গায়ে কাঁটা তুলে, বাষ্পাচ্ছন্ন লকলকে জিব বের করে।

অরণ্যরক্ষীরা ভুলেও এ অঞ্চলে পা ফেলে না। 'এস্পেরুয়্য'-র লোকেরা এদিকে ব্যাঙের ছাতা তুলতে আসা ছেড়ে দিয়েছে, শহরে যাবার পথে এর ওপর দিয়ে চলে পথ সংক্ষেপ করতেও তারা চায় না।

একটা ভয় বনের এই অংশ নির্জন করে তুলেছে। এর জন্য তাবুসের গর্ব, ন'মাসে ছ'মাসে যখন দরকারী জিনিসের জন্য সে শহরে আসত, মুদির দোকানে কিম্বা সরাইয়ে, তখন কারো সঙ্গে দেখা হলেই ঠাট্টা করে বলত, কি হে আজকাল যে গরীবের ঘরে আর পায়ের ধুলো দাওনা?

'এত শান্ত জায়গা কোথাও নেই', সে বলে। 'কোনও জনপ্রাণী নেই। বিধাতার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য মাটিতে পচছে। সত্যি বলছি, ইচ্ছে করলে যে-কেউ এক ঘণ্টায় একশ' কিলো ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতে পারে। আঙুর আর কুলের ত পাহাড় জমেছে। মাছ? যে রেটে তারা বংশবৃদ্ধি করছে তাতে দু'চারদিন বাদে জলাশয়ে জল থাকলে হয়।'

এস্পেরুয়্য-র লোকেরা রাগে গরগর করতে থাকে। কেউ কেউ বলছিল বন্দুক দিয়েই তারা এই কুকুরগুলির দফা রফা করে দেবে, কিন্তু একাজ বুনো বরাহ শিকার করার চেয়েও বিপজ্জনক, তাছাড়া তাবুস-এর নিজের বন্দুক থেকেও যে কোন উত্তর আসবে না তাই বা কে জানে।

এমনি করে শীতকাল এসে গেল। আঙুর গাছের ডালেই শুকিয়ে শুকিয়ে ধুলোয় পড়ল; ব্যাঙের ছাতা মাটিতেই পচল, যত আগাছা বৃষ্টির জলে স্যাঁৎসেতে হয়ে উঠল। একদিন যা ছিল জীবন্ত, নানা গাঢ় রঙে ঝলমলে, এখন বসুন্ধরা তার সে-সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছে, এক বৃষ্টিসিক্ত অরণ্যের বিশ্রী বিশালতার মধ্যে। সবতাতে যেন লেগেছে পচনশীল আবর্জনার হলদে রঙ। তারপর শুরু হয় বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে বরফের তুলো মেশা ঃ তারা হাওয়ায় নেচে নেচে নামে, মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। গাছের ডালে, লতার ওপর তাদের দেখায় এক ঝাঁক প্রজাপতির মতন, সন্ধানী পশুদের কবলে হঠাৎ বন্দী যেন।

কয়েক রাত্রি ঠান্ডা যাবার পরে মাটি শক্ত হয়ে উঠল, তারপর অকস্মাৎ বরফ পড়তে আরম্ভ করল। প্রথম পড়ল খুব বেশী, হাওয়ায় ভেসে আসা বড় বড় টুকরো, ক্রমে তারা পুঞ্জীভূত হল ঃ শেষে দ্রুত পড়ে বিঁধে যেতে লাগল ছুঁচের মত ধারাল বরফের টুকরোগুলি। গর্ত সব ভরে গেল, ওপর থেকে বাতাসে উড়ে এসে জমা হল গুহার নীচে, তাবুসের ঘরও আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না।

নির্জনবাসী লোকটি একদিন সকালে উঠে দেখল চারিদিকে একটা অদ্ভুত রকমের থমথমে জমাট নিস্তব্ধতা। বরফ পড়ে দরজা জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সব দিকেই বরফের স্তূপ। বিছানায় শুয়ে তাবুস ছাদের পাটাতন বেয়ে যে ক্রমাগত জলের ফোঁটা পড়ছিল আর জমা হচ্ছিল তার শব্দ শুনে বাইরের নিস্তব্ধতার গভীরতা অনুমান করে নিল।

দরজার সামনে থেকে বরফ সে সরিয়ে ফেলল, জানালার গায়েও খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলল। দেখা গেল বাড়ীর চারপাশে অগণিত মণ বরফের পাউডারের ওপর দিয়ে এক ঝড় চলেছে। সামান্য একটু ধূসর আলো, এক হাতের বেশী দূরের জিনিস দেখা যায় না ঃ বাইরে যেতে গিয়ে কুকুরগুলির পা বরফে ডুবে যায়, ঝড়ের মুখে তারা মাটির সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে পড়ে, তারপর কেঁউ কেঁউ করতে করতে আশ্রয় নেবার জন্য ঘরে ফিরে আসে। অকস্মাৎ একটা ভয়ে তারা তাবুসের কাছে ছুটে গেল, তাবুস তখন ঢালু জমির ওপর দিয়ে পা দুটো কোনরকমে টেনে নিয়ে চলেছে, তার গাল চুপসান, চোখ দুটি বন্ধ হ'য়ে আলপিনের ডগার মত ছোট, মুখ দিয়ে থুতু পড়ছে।

শীত বরফের পর্যায়ে নামল, ঢেউয়ের চূড়ার মত বেগে জোরে বাতাস বেড়ে উঠল, একটা পাথর অতল গহ্বরের মধ্যে ফেলে দিলে যে-গতিতে ছুটে চলে ঝড়ের গতিও হল তাই।

তাবুস ঢালু জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলছিল। একেবারে চৌকাঠে এসে তার পা ঠুকে গেল, দৈবাৎ কেউ যেন তাকে দেখে ফেলেছে এমনিভাবে সে মুখ বিকৃত করল, গরম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে প্রতিজ্ঞা করল আকাশ পরিষ্কার হবার আগে আর বেরুবে না।

তার ঘরে ছিল জ্বালানিকাঠ, প্যারাফিন, তামাক ঃ সে একবার দেখেশুনে নিল কতটা রসদ আছে, হিসেব করল এ ঝড় থাকতে পারে পাঁচ দিন, এই অনুসারে রুটি আর মাংসের ভাগ করে ফেলল।

'আজ মঙ্গলবার, সাদাসিধে স্বল্পাহার ঃ কাল, বুধবার, ভোজ ঃ বৃহস্পতিবার, এই সামান্যটুকুতেই চলবে ঃ শুক্রবার, এ দিনের সম্মানার্থ মাংস আর টিনে রক্ষিত খাবার এবং শনিবার, বাকি সব শেষ।'

রোজকার ভাগ সামান্যই, এমন কি, শুক্রবারের ভাগও ঃ ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় একদিন বেঁচে থাকতে হলে কুকুরগুলি আর মানুসটির পক্ষে এ-রসদ নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। এখন তাদের একমাত্র কাজ হল শুয়ে বসে কুঁড়েমি করা, একটা মন্থরগতি কৌতুক, নিজেকেই কেন্দ্র করে শুধু ঘোরা, অনেকটা রোমন্থনের মত, ঘুমের মত শক্তিশালী। তাবুসের অবশ্য এমন অপ্রত্যাশিত নির্জনতা পেয়ে আনন্দ বেড়ে গেল। চোখ বুজে সে বলল, 'আমি শপথ করে বলতে পারি চারপাশে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে একটিও জীবন্ত প্রাণী নেই।'

কুঁড়েমি আস্তে আস্তে তাবুসকে পেয়ে বসল। গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়া যেমন অভিভূত করে তার অবস্থাও সেই রকম। জলের জন্য ঝরণার বরফ ভেঙে আনতে যাবার তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। একমুঠো তুষার দিয়ে সে কফি বানাল, দেখছিল প্যানের ওপর তা কেমন গলে যায়। কুকুরদের জন্য আর কোন ভাবনা নেই। কখনো সখনো, যেন নেহাৎই ভুল করে, এক আধ টুকরো রুটি কিম্বা পাতের এঁটো মাংস তাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

জন্তু তিনটে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে জলন্ত আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল, তাপে তাদের জামা পুড়ে যাবার মত, মুখাবরণ গরম খটখটে। অনাহারী প্রাণীগুলি তাদের চোখ রেখেছে মানুষটির ওপর, গলা লম্বা করে মুখটি সামনের দুই থাবার ওপর রাখা, প্রত্যেকটি মুহূর্তে তারা গুণছে। আগুনের সামনে নিঃশব্দে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা দরজার কাছে গেল, তলা দিয়ে একটুখানি মাথা বের করে সাদা বরফ কামড়ে নিল।

তিন দিন তিন রাত্রি কাটল তাবুসের আগুন জ্বালিয়ে রেখে, স্বপ্নাবিষ্টের মত, নিজের সম্বন্ধে নানা রকম ঘটনার কল্পনা করে।

'কেউ একশ মিটারের মধ্যেও এসে চেঁচামেচি করে যদি, ভাবতেও পারি না। যত সব উল্লুক! বেটাদের একটাও বেঁচে থাকা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। বরফ সময়ে সময়ে বড় কাজ দেয়। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও আমি আমার একচ্ছত্র সম্রাট রইলাম!'

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা, ঘরের ভেতর সে পায়চারি করছে, তামাকু ফুঁকছে, থুতু ফেলছে আর নির্জন গণ্ডীর বাইরের লোকদের বাপান্ত করছে, এমন সময় কুকুরগুলি একটা আওয়াজ করে তার পায়ের কাছে এগিয়ে এল। তাবুসে এতক্ষণ বেশ খোশমেজাজে ছিল, এবার তার মনে হতে লাগল স্নায়ুতন্তু সব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এদের মুখ বন্ধ করবার জন্য বেঁটে চাবুকটা তুলে নিল সে, এর একটি আঘাতেই একজন মানুষকে ঠাণ্ডা করতে যথেষ্ট।

'যা', চেঁচিয়ে বলল সে, 'আগুনের কাছে যা, একদম চুপ!' সঙ্গে সঙ্গে সপাসপ্ চাবুক। জানোয়ারগুলো শান্ত হল যেন, তারা আবার আগুনের পাশে ফিরে গেল। তাবুস পায়চারি আরম্ভ করল, মুখে পাইপ, নিজের মনেই সে কথা বলছে, প্রত্যেকবার ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে গোড়ালির ওপর ভর করে ফিরতে লাগল। এক-ঘেঁয়ে এমন হাঁটাহাঁটি, যেন কোন এক সেপাই, নির্জন পেছন-দরজার রক্ষী।

'যত সব উল্লুক', সে বলল, 'আমার লোক-সানে বেটাদের আনন্দ আর ধরে না। অসুখে পড়লে কামনা করে যেন যমে তাড়াতাড়ি নেয়। এখন সব জব্দ। বাছাধনরা এবার টেরটি পেয়েছেন। সব কটাকে জোঁকের মত নিংড়ে মারব।'

সে হাঁটছে আর কুকুরগুলি একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছে। শেষে মাদি কুকুরটা উঠে গর্জন করতে করতে তার অনুসরণ করতে লাগল। সে তার চাবুকটা ফের যেই তুলে নিতে যাবে অমনি জানোয়ারটা দাঁড়াল গায়ে কাঁটা তুলে, মুখ হাঁ করে, নিঃশব্দে। তাবুস এক লাথি চালাল, কিন্তু সেটা গিয়ে লাগল তার পায়ে, জুতোর চামড়া খানিকটা ফেঁসে গেল। সে সরে এল, পেছুল এক পা, জানোয়ারটা তখনো অনুসরণ করছে, আরো পেছিয়ে আসতে হল তাকে।

মরদা কুকুর দুটো উঠে দাঁড়াল, এসে মাদিটার পাশে দাঁড়াল।

'আমার মুখ দিয়ে আর চীৎকার বেরোয় নি', বলেছে তাবুস। 'মানুষ হলে না হয় গালমন্দ করা যেত, কিন্তু এদের সঙ্গে, রাম বল........ একটা অর্ধচন্দ্রের ব্যূহ রচনা করে এরা তিনটি একই সঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল —মাদিটার দু'পাশে মরদা দুটো এগিয়ে, আমি তখন দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছি। একটু চীৎকার না করে তারা আমাকে দিব্যি জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পারত।'

গোড়ালি দেয়ালে লাগতেই তাবুস কোন চিন্তা না করে এক নিমেষে যে-প্রকাণ্ড কড়ি-কাঠটি অন্যগুলোর চেয়ে একটু নীচে ছিল প্রাণপণে লম্বা হয়ে সেটি ধরে ফেলল। তারপর চট করে ওপরে উঠে পড়ল, অনেকটা প্যারালাল বারে ব্যায়াম করার মত, পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে, মাথাটা যদিও শূন্যে ঝুলছিল, যাহোক কুকুর-গুলোর নাগালের অনেক বাইরে।

কুকুর তিনটি মাথা তুলে মুখ হাঁ করে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে, তাবুস বুঝতে পারল একটু নামবার লক্ষণ দেখালেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। অগত্যা তিনটি কুকুরের পাহারায় তাকে সমস্ত রাত্তির ঠায় একভাবে কাটাতে হল। তা সত্ত্বেও, নির্বিবাদে ঘণ্টাগুলি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। ভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছিল সে, দুশ্চিন্তাও ছিল না।

ভোর হল। অবশেষে সূর্যের আলো এসে পৌঁছুল সবচেয়ে লম্বা জানালাটি ভেদ করে। যেখানে বহুক্ষণ হল বাতি নিভে গেছে, আগুন জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে সেই জায়গায় দেয়ালের গায়ে এক ফালি কিরণ পড়েছে। বাইরে হাওয়ায় ভেসে আসছে চকোর-চকোরীর ডাকাডাকি।

গুঁড়ি মেরে বসা তিনটে জন্তু সমানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মানুষটির দিকে। এখন, ঝড় থেমে গিয়ে যখন দিনের আলোর আধিপত্য, তখন তাবুসের অবসাদ এল। আলোর প্রথম রশ্মি দেখা দেবার সাথে সাথে যেন তার সমস্ত শক্তি চলে গেল। এমন জায়গা নেই কড়িকাঠের ওপর যে একটু ভর দেবে, তাই নীচে ঝুলেই থাকতে হল তাকে। তার মাথায় এল ঃ 'এক লাফ দেব, একেবারে দরজার কাছে, তারপর চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে চম্পট।' কিন্তু যেই সে একটু নড়ে অমনি কুকুরগুলোও উঠে দাঁড়ায়, লাফ দেবার জন্য তৈরী হয়। তাবুস মাদি কুকুরটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

'চুচু-চুচু ঃ এই, আয় আয় রূপসী!' কিন্তু এই ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা আর স্নেহের ভণ্ডামীও তার ভাল লাগে না, অযথা দম নষ্ট না হয় যাতে সেজন্য আবার সে মুখ বন্ধ করল। মনে মনে ভাবল, 'ব্যাঙের মত এই ছাদের সঙ্গে লেপ্টে থাকি।'

তার চোখের সামনে দিয়ে সকাল ছুটে চলেছে, সূর্য তার ঘরের সামনে এল, তারপর ঘর ছাড়িয়ে পাশে মসৃণ দেয়ালের ওপর ফেলল তার আলো। চকোর পাখীদের কাকলি দূরে মাঠে মিলিয়ে যায়, অনেকটা পাহাড়ী নদী দিয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যাওয়া নুড়ির মত।

'মাসের পর মাস কেটে গেলেও কেউ এ-ঘরে পা দেবে না', নিজের মনে সে বলল, 'এরপর কেউ এলে আমার হাড় ক'খানিই শুধু দেখতে পাবে।'

মাথাটা সরিয়ে নিতে চিমনির গায়ে ঝোলান বন্দুকটা তার চোখে পড়ল, যে-কড়িকাঠ ধরে ছিল সে, তার বরাবর চিমনি। একবার ভাবল এগিয়ে যাবে, কিন্তু আবার মনে হল তাতে হাত আল্‌গা হবার সম্ভাবনা, তাছাড়া এখন তার স্পষ্ট মনেও পড়ছে না

ওতে গুলী ভরা আছে কিনা। 'সোমবার বেরিয়েছিলাম, দুটো ভারী কার্তুজ ভরেছিলাম যদি শুয়োর টুয়োর নজরে পড়ে ......না, গুলী ছুঁড়িনি...সোজা ফিরে এসেছিলাম...এসেই ঝুলিয়ে রাখি ওখানে...বুড়ো বন্দুকটা হলে না হয় একবার দেখতাম. কিন্তু এই হতচ্ছারা নতুন বন্দুকগুলো...'

তারপর হঠাৎ নিজের মনে সে বলে উঠলঃ 'ওখানে যাবার চেষ্টা করলে মাটিতে পপাত ত নিশ্চয়।' তাই মত বদলাল, আবার ডাকতে লাগল মাদি কুকুরটাকে। 'এই, এই, চু-চু চু-চু...' জানোয়ারটা উঠে গর্জন করে থাবা দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল।

শেষে তাবুস ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হল, ছাদের সঙ্গে পা ঠেকিয়ে এগুতে লাগল সে। অপরিষ্কার কাঠের আঁশ কয়েকটা তার আঙুলে বিঁধল। কিছু বিবর্ণ ধুলোও পড়ল চোখে। হাঁচি ফেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে নড়তে লাগল, কুকুরগুলিও তাকে অনুসরণ করে চলে। প্রতি মুহূর্তে তাবুসের মনে হতে থাকে এবার হাত আলগা হয়ে যাবে আর সে চিৎ হয়ে পড়বে জানোয়ারগুলোর মাঝখানে, মাথার কিছু আস্ত থাকবে না। শেষ পর্যন্ত একেবারে বন্দুকটির কাছে এসে পৌঁছুল, কিন্তু কি করে সেটা হাতে নেওয়া যায়? কড়িকাঠটা এত চওড়া, দুই হাত এবং দুই পা দিয়ে তা ধরতে হচ্ছিল। এক আধ সেকেণ্ডের জন্যও কেমন করে যে এক হাত একটুখানি ছাড়িয়ে নেওয়া চলে তা সে ভেবে পেল না। মাথাটা এদিকে ওদিকে নাড়িয়ে টের পেল ছাদের ঠিক তলায় যেখানে খাঁজ মতন হয়ে দেয়াল-গা একটু বেরিয়ে এসেছে। সঙ্কুচিত হয়ে কষ্টেসৃষ্টে মাথাটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে, মেরুদণ্ড সোজা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে, দু' পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে এক হাত ছাড়িয়ে নিল। হাতড়ে হাতড়ে বন্দুকটা পেয়ে পায়ের কাছে টেনে আনল। আঙুলের ডগা দিয়ে অনেক চেষ্টা করে বন্দুকের হ্যামারটা সে ঠেলে দিল। দুটো মৃদু আওয়াজে তার সন্দেহ হল হয়ত তাতে গুলী ভরা নেই। 'সোমবার বেরিয়েছিলাম...'আপন মনে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল সে।

তখনো তার পা ছাদের সঙ্গে লেগে, মাথাটি দুখানি তক্তার মধ্যে, তিনটে পাহাড়াদার জন্তুর কানের ডগাটুকু শুধু চোখে পড়ছিল। নলটা আন্দাজে আন্দাজে সামনের দিকে ঠেলে ঠিক কায়দামত জায়গায় আনল। মাদি কুকুরটার একেবারে মাথার কাছে নলের মুখটা নিয়ে যেতে চাইল সে, তাকে চিনতে পারল কাটা কান দেখে, কিন্তু যতবারই একটু বেশী এগিয়ে যাওয়া হয় অমনি সেটা যেন খেলার ছলে লাফিয়ে কামড়ে ধরতে আসে ঃ কিন্তু তার গর্জন তবু থামে না। এক সময়ে তাবুসের মনে হল জন্তুটা যেন দোনলা বন্দুকের সামনে স্থির হয়ে আছে ঃ ট্রিগার টানল, কুকুরটা পড়ে যাবার সঙ্গে নিজের গলাই শুনতে পেল সে, 'যাঃ, কিচ্ছু নেই এতে।' কিন্তু সেই কামান দাগার মত শব্দ করে উঠল বন্দুক, অমনি নিস্পৃহকণ্ঠে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আমার নিজের কুকুরটাকেই মেরে ফেললাম!' ধাক্কার জোরে হাতিয়ার তার হাত থেকে ফস্কে গিয়েছিল আর কি!

ভারী গুলীতে কাজ ঠিকই হয়েছিল। কোন রকম দাপাদাপি না করে, যন্ত্রণাভোগ না করে, থাবা না ছাড়িয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই মাদি কুকুরটা পড়ে গেল। কুকুর দুটো চেঁচাতে আরম্ভ করল এবং এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল।

তাবুস দেখল কুকুর দুটোর গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, জিব ঝুলে পড়েছে, রাগান্বিত কিন্তু যেন করুণাপ্রার্থী, অথচ আক্রমণ করার জন্যও প্রস্তুত। তার মনে হতে লাগল কড়িকাঠের গা থেকে যেন পা দুখানি খুলে পিছলে যাচ্ছে ঃ ঘাড় ফুলে উঠেছে, জামার বোতাম মাংসের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে। পেশীগুলিকে শক্ত করে অনেকখানি বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে ভিতরে নিল, আবার টেনে তুলল বন্দুকটা, এবার লক্ষ্য বড় কুকুরটা। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, হাতে জোর কমে আসছে যখন দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল—কুকুরের মাথা আর বন্দুকের বাঁট এক হয়ে গিয়েছে। গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সে।

গুলী লেগে কুকুরটাও তখনি পড়ে গেল। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি। মাদি কুকুরটার পাশে তাবুস চিৎপাত হয়ে পড়ল, সর্বাঙ্গে তার বেদনা, এক হাত তুলে স্নেহভরে স্পর্শ করল শক্ত লম্বা লোমগুলি আর ঠাণ্ডা নাক। একমাত্র জীবিত ছোট কুকুরটা দরজার সামনে শুয়ে পড়ে, তার গলায় মিনমিনে কেঁউ কেঁউ ডাক।

তাবুস উঠে দাঁড়াল, ছুটে গেল আলমারির কাছে, হাত ভরে টুকরো টুকরো রুটি আর মাংস এনে নিবেদনরত কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। 'খা, খা,' চেঁচিয়ে বলল সে, আর বলার সঙ্গে নিজেও সেগুলি খেতে লাগল। মুখ ভরতি, তবু সে বলে চলে, 'খা-না...' জন্তুটার সামনে সে তার ভাণ্ডার খুলে ধরে।

একটুক্ষণের মধ্যে জন্তুটা শান্ত হল। না উঠে, গুঁড়ি মেরে মাথা বাড়িয়ে তাবুসের ছুঁড়ে দেওয়া খাবারের টুকরোগুলি খেতে শুরু করে সে।

দিন তখন শেষ হয় হয় ঃ ঘরে অন্ধকার জমে উঠেছে। নির্জনবাসী তার আলো জ্বালল, আগুনের মধ্যে ঢেলে দিল প্যারাফিন, তারপর গোটা এক বাক্স দেশলাই, তারপর গাছের ডালপালা, অবশেষে মোটা মোটা কাঠ। ঘরে আলো ভরে উঠল।

ভাঁড়ারে যা ছিল সে-সব বের করে টেবিলের ওপর সাজাল তাবুস, মানুষ এবং কুকুরটি দুই ভাইয়ের মত ভাগ করে খেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। তাবুস মাত্র দুবার থেমেছিল, জলের জন্য বরফ ভেঙে আনতে। ফিরে এসে এক গামলা জল কুকুরটার সামনে রাখল, একটু কফি তৈরী করল, আর চলল খাওয়া, ধূমপান করা ও কুকুরটার সঙ্গে কথা বলা।

খাবার নিঃশেষ হলে তাবুস ঘুমিয়ে পড়ল, কুকুরের মাথাটি তার কোলের ওপর নিয়ে।

পরদিন সকালে জন্তু দুটোকে কবর দিল, মাটি দিয়ে ঢেকে আবার স্তূপীকৃত বরফ চাপিয়ে দিলে তার ওপর। ঘরে আর খাদ্য নেই, চমৎকার দিনটি, সূর্যের আলো বরফের ওপর দিয়ে যেন ছুটে চলেছে, উপত্যকাটি ঝক্‌ঝক্‌ করছে, কোথাও কুয়াসা নেই। কুকুর সঙ্গে করে বড় রাস্তাটা ধরে তাবুস গ্রাম পর্যন্ত গেল। দোকানে দোকানে থামতে লাগল সে, সবার সঙ্গে কথা বলে হাসিঠাট্টা করে, রাত্তিরে খেল সরাইখানায়, পান করল অতিরিক্ত, মদের সব পাওনা চুকিয়ে দিল, তারপর চাকরটার আস্তানায় রাত্তিরের মত আশ্রয় নিলে।

সেই দিন থেকে তার মত নিজের ঘরে অতিথি ডাকার আগ্রহ আর কারো দেখা যায়নি। যে ক'দিন সে ওখানে ছিল—পরের বছর শরৎকাল পর্যন্ত—সেক'দিন সবার জন্য দরজা খোলাই রাখত, এমন দিন ক্বচিৎ কখনো গিয়েছে যখন তার ঘরে কোন না কোন অতিথি আসেনি।

সে বলত, 'এখান দিয়ে গেলে ঢুকে পোড়ো, একটু পানীয় কিছু জুটবেই। না, না, কুকুরটা কিছু বলবে না...ও বড় ভাল কুকুর...আর যদি কিছু গোলমাল করে ত ওর মাথা গুঁড়ো করে দেব...'

অনুবাদক—**শ্রীসমীরকান্ত গুহ**



বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

বোমা কথাটা শুনলেই ভয় করে। অবশ্য সব বোমাই ভীতিজনক নহে। আমেরিকার নৌ বিভাগ যে নতুন বোমা আবিস্কার করেছে সেটি মানুষের প্রাণরক্ষা করে।

জাহাজ বা উড়ো জাহাজের দুর্ঘটনা বশতঃ কখনও কখনও মানুষ অতল এবং অপার



ছবিতে প্রাণরক্ষাকারী বোমা দেখা যাচ্ছে; তার পাশের স্কেলটি এটির মাপ বোঝাবার চেষ্টা করছে।

সমুদ্রে পড়ে। তখন নৌকায় উঠে সাময়িকভাবে তারা প্রাণরক্ষা করে বটে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যদি কেউ তাদের উদ্ধার না করে তাহলে খাদ্য পানীয়ের অভাবে মৃত্যু অনিবার্য হয়। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের খবর তারা উদ্ধারকারীদের পাঠাতে পারে না এবং নিজেরাও বুঝতে পারে না তারা কোথায় আছে। এই ধরণের বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই এই নতুন বোমা। বিপন্ন লোকেরা এই বোমাটি জলে ফেলে দিলে সমুদ্রের তলায় গিয়ে বোমাটি সশব্দে ফেটে যায় আর সংগে সংগে এই শব্দের তরংগ চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়ায় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই শব্দ তরংগ বিশেষ যন্ত্রে ধরা পড়ে। যেখানে বোমা ফাটে সেখান থেকে ৩০০০ মাইল দূর পর্যন্ত এই শব্দ তরংগ ছড়িয়ে পড়ে। এই শব্দ এক সেকেণ্ডে ৪৮০০ ফিট্ ভ্রমণ করে। শব্দটি পৌঁছানোর সংগে সংগে শব্দের গতি ও স্পন্দন থেকে তারা হিসাব কষে বার করতে পারে যে, এই শব্দ কত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমায় উৎপত্তি হয়েছে। আর সেই অনুযায়ী সেখানে উদ্ধারকারী জাহাজ বা উড়ো জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

*

সব সময় মোটা হওয়াই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এমন কি, অতিরিক্ত মোটা হওয়াটা ডাক্তাররা একটা রোগবিশেষ বলে মনে করেন। কিন্তু মজা হচ্ছে যে, এই সব ডাক্তাররা কোনও রোগা লোককে যত সহজে মোটা করতে পারেন, একজন মোটা লোককে তত সহজে রোগা করতে পারেন না। এক পাউণ্ড ওজন কমাবার জন্য ডাক্তাররা ঘণ্টায় সাড়ে তিন মাইল বেগে সত্তর মাইল হাঁটিবার ব্যবস্থা দেন। মুশকিলটা এই যে, এতখানি হাঁটার জন্য যে প্রচণ্ড ক্ষিদে হয়, তা মেটাতে গিয়ে যতখানি খাবার খাওয়া হয়, তাতে আরও এক পাউণ্ড চর্বি বেড়ে যায়। ডাক্তার স্পেনস্ বলেন যে, অনেক সময় মোটা লোক বিছানায় শুয়ে থেকেও চর্বি কমাতে পারে।

*

এক রকম নতুন দেশলাই বার হয়েছে। এগুলোতে তাপ আছে, কিন্তু আগুন নেই। সাধারণ দেশলাই-এর বাক্সর মতই দেখতে, আর সাধারণ দেশলাই জ্বালানোর মতই এগুলোরও কাঠি বাক্সর গায়ে ঘষতে হয়। এটা ঘষার সংগে সংগে তাপ পাওয়া যায়, কিন্তু আগুন পাওয়া যায় না। যেখানে খুব ঝড় বাতাস থাকে, সেখানে এই ধরণের দেশলাই খুব সুবিধাজনক।

*

নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ডাক্তার মেগন (Magoun) জীব-জগতের ঘুমের রহস্য ভেদ করেছেন। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কের নীচের দিকে একটা স্নায়ুকেন্দ্র থাকে। ঘুম পাড়ানো বা ঘুম থেকে জাগানো এই স্নায়ুকেন্দ্রেরই কাজ। এটা বেশি বড় নয়— আকারে মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের সমান। এটা ঘাড়ের থেকে আরম্ভ হয়ে পিঠের শির-দাঁড়ার সংগে মিশে গেছে। ডাক্তার মেগন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কোনও প্রাণীর স্নায়ুকেন্দ্রটিকে যদি সোজাসুজি উত্তেজিত করা যায়, তাহলে ঘুম ভেংগে যায়। আবার ঠিক যদি উল্টোটা করা যায়, অর্থাৎ স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্ষমতাটা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে ঘুম পাড়ানো যায়।

*

লোকে কথায় বলে "মশা মারতে কামান দাগা।" কিন্তু এরকম প্রয়োজনও মানুষের জীবনে ঘটে। যে পংগপালকে এককভাবে আমরা নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সংগে "ফড়িং" বলে থাকি সেই 'ফড়িং' যখন দলবদ্ধভাবে শস্য জগতে হানা দেয় তখনই তার নামকরণ হয় পংগপাল। আর এই পংগপাল মনুষ্য জগতে যে কি ভয়ানক বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। এরা দলবদ্ধ-ভাবে যখন শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে বিচরণ করে তখন যে কত কোটি কোটি টাকা শস্যহানি হয় তাও বিস্ময়কর। মানুষের এই "ফড়িং" শত্রুকে দমন করার চেষ্টার অন্ত নেই। মানুষ দৈহিক শক্তিস্বারা এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে এই শত্রু-বিনাশের চেষ্টায় বিফল হয়েছে। আজও এদের সম্পূর্ণ দমন করতে পারেনি। বর্তমানে মধ্য-প্রাচ্যে পংগপালের বিরুদ্ধে মানবের সংগ্রাম সুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার মাইল জায়গা জুড়ে (ইজিপ্ট, সুদান, কেনায়া, আবিসিনিয়া ইরাক সৌদি আরবিয়া ইরাণ এবং পাকিস্থান) পংগপাল তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এক রকম বিষাক্ত রসায়ন দ্রব্য নিয়ে পংগপাল বিধ্বস্ত জায়গায় তাদের অভিযান সুরু করেছেন। তারা এই যাত্রা দ্রুততর করার জন্য মোটরের সাহায্য নিয়েছেন। যদি তাদের এই পরীক্ষা কার্যকরী হয় তবে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

*

আমেরিকার দুজন বৈজ্ঞানিক এক রকম কঠিন ইস্পাত তৈরী করেছেন। এটা সাধারণ ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয়। তারা ফ্যারণহাইটের শূন্য ডিগ্রীর ৩০০ ডিগ্রীর নীচে তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে ইস্পাতকে ডুবিয়ে নিয়ে এই শক্ত ইস্পাত তৈরী করেছেন। সাধারণ অবস্থায় ইস্পাত উত্তাপের সাহায্যে তৈরী করা হয়। এই শক্ত ইস্পাত এই রকম ঠাণ্ডা নাইট্রোজেনের সাহায্যে তৈরী করলেও এটা উত্তাপেও কোন ক্ষতি করতে পারে না।

চৌরাস্তার ধারে

কাকভুশুণ্ডি

কোরিয়া যুদ্ধের সম্প্রতি ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে প্রকাশ যে, যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় চার লক্ষ অসামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে। ৩১ হাজার ৫০০ বাসভবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ও ৯০ হাজার বাড়ি নড়বড় করিতেছে।

—কোরিয়া সম্বন্ধে হিসাব করিয়া এ তথ্য প্রকাশ না করিলেও চলিত। সকলেই জানে যাহাদের মুক্তির জন্য লড়াই, তাহারা বহু পূর্বেই ইহলোক হইতে সকলে সরিয়া পড়িয়াছে। এখন ঊর্ধ্বে চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় তাঁহারা পাতা ভর্তি করিতেছেন।

* * * *

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ফিলাডেলফিয়ায় একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, নেতৃত্ব গ্রহণের গুরুদায়িত্ব এখন আমাদের উপরে বর্তাইয়াছে। সকলে যাহাতে মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারে তজ্জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে।

—কমরেড স্টালিনও ঠিক ঐ কথা বলিতেছেন। দুঃখ এই যে, উভয়ের নেতৃত্বের ঠেলায় বিশ্বশান্তির যে চেহারা দাঁড়াইতেছে, তাহা উঁহারা দুজনেই 'Zনতি' পারিতেছেন না।

* * * *

ভারতীয় পার্লামেণ্টে ডাঃ আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে, রাজস্থানে মহিলাদের ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কারণ সেখানে কেহই স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না।

—ভোটার তালিকায় নাম দিতেই যাঁহাদের এত লজ্জা, ভোট দিবার সময় তাহা হইলে তো ঠাকুরুণেরা হরিনাম ডাকাইয়া ছাড়িবেন!

* * * *

পার্লামেণ্টে হিন্দু কোড বিলের আলোচনা সভায় জনাব নাজিরুদ্দীন আমেদ বলেন যে, বিবাহ হিন্দু ধর্মের অঙ্গবিশেষ। পুত্র লাভের জন্য একজন হিন্দু একাধিক দার পরিগ্রহ করিতে পারেন। কারণ পুত্র বিনা স্বর্গলাভ হয় না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তদুত্তরে শ্রীমহাবীর ত্যাগী বলিয়া ওঠেন, থামুন, থামুন, আমার কোন পুত্র নাই।

—আমেদ সাহেব না থামিয়া তৎক্ষণাৎ পার্লামেণ্টে যদি ত্যাগী মহাশয়ের জন্য একটি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিতেন তাহা হইলেই বোঝা যাইত যে, তিনি ভবিষ্যৎ স্বর্গ প্রাপ্তির এমন সুযোগটা ত্যাগ করিতে সত্যই প্রস্তুত কি না!

* * * *

হিন্দু কোড বিলের সমর্থক ও বিরোধীদল উক্ত বিলের আলোচনাকালে পার্লামেণ্টের চারিটি প্রবেশপথে নানারূপ ধ্বনি করিতে থাকেন। বিরোধীদলে মধ্য ভারতের গৈরিক-বস্ত্র পরিহিত সাধুরা ছিলেন।

—সাধুরা হিন্দু বিবাহের ব্যাপারে ও সম্পত্তি পাইবার অধিকারের প্রশ্ন লইয়া যে বিলে আলোচনা হইতেছে সে সম্পর্কে এতটা আগ্রহী হইয়া উঠিলেন কেন? ভবিষ্যতে গেরুয়া ছাড়িবার ইচ্ছা আছে নাকি?

* * * *

শ্রীযুত এস সি গুহ পার্লামেণ্টে শ্রীযুত দেশমুখকে প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শতকরা ৮৫ ভাগ শেয়ার ভারতীয়দের হাতে সুতরাং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা কর্তব্য নহে কি? দেশমুখ ইহার কোন জবাব দেন নাই।

——খুব ভাল করিয়াছেন। যে বিষয়ে দেশের লোকের কাছে মুখ খুলিলে বিপদ সে বিষয়ে মূক হইয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য।

* * * *

জনৈক ট্র্যাফিক পুলিশ বড়বাজারের কোন এক দোকানে ঢুকিয়া একজন নির্দোষ বোবা ও কালাকে প্রহার করে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় উক্ত আচরণের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, সরকার যে পুলিশকে দেশসেবক বলিয়া প্রচার করেন ইহা কি ঠিক?

—কেন ঠিক নয়, সরকারের কার্য প্রচার, পুলিশের কার্য প্রহার। উভয়েই দেশসেবা করিতেছেন, তবে ভিন্ন রীতিতে, এই যা।

* * * *

রোটক জিলার হরিরাম নামে জনৈক কৃষক প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত নেহরুকে একটি দড়ির খাটিয়া উপহার দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সানন্দে এই উপহার গ্রহণ করিয়াছেন।

—ভাগ্যে অপর কোন মন্ত্রীকে বেচারী এই উপহারটা দেয় নাই! একে তাহার নাম হরিরাম, তাহার উপর দড়ির খাটিয়া লইয়া হাজির হইলে তাহার অবস্থা যে কি ঘটিত তাহাই ভাবিতেছি।

* * * *

বৃটেনের নব নিযুক্ত শ্রমমন্ত্রী মিঃ বীভান লণ্ডনের একটি অভিজাত ক্লাবে ঢুকিয়া বৃটিশ এয়ার চীফ মার্শাল স্যর জন স্লেশারের সহিত ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নিভৃতে এক কোনায় বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময় অভিজাতবংশীয় চার্লস জেমস্ ফকসের এক বংশধর আসিয়া তাঁহার নিতম্বদেশে এক লাথি মারে। তাঁহার অপরাধ ওয়েস্ট এণ্ডের এই অভিজাত ক্লাবে তিনি নিতান্ত সাধারণ বংশে জন্মিয়া ঢুকিতে সাহসী হইয়াছেন কোন আক্কেলে?

—বীভান সাহেব লাথি খাইয়া নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন, হায়রে, তোমাদের নিতম্ব বাঁচাইবার জন্য যখন ভাবিতেছি, তখন তোমরাই উল্টা কীর্তি করিয়া বসিলে—ভবিষ্যতে স্বয়ং বিধাতা আসিয়াও তোমাদের সম্প্রদায়টিকে আর বাঁচাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ!

* * *

দিল্লীতে চাঁদনি চকের মধ্যস্থলে অবস্থিত ঘড়ি ঘরের চূড়াটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থানেই ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা বর্ষিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে ইহারই পাদদেশে কংগ্রেসের জরুরী অধিবেশন বসে ও এইখানে বহু কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ সুরু করেন।

—স্বাধীনতা লাভের পর এত বড় একটি ঐতিহাসিক স্তম্ভের চূড়া বোধ হয় সকলের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার হিন্দু সংহিতা বিলের একটি ধারার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার জন্মিলে বহু মেয়েই অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে তাহার সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবে যে, আর দেশ উদ্ধারের আশা থাকিবে না।

—কিন্তু এখন মেয়েদের নিরাশ করিলে যে তাঁহারা পুরুষদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিবেন, সে বিষয়টা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

"রাজা ও রাণী"

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করেছি। ছোট-খাট লেখক, শিল্পী ও সংগীতজ্ঞদের প্রতি বেতার কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অন্ত নাই; তাঁদের রচনাদির উপর কলম বা কাঁচি চালাতে কোনো দ্বিধাও তাঁদের নেই। এসব সম্বন্ধে অনেক রকম আপত্তি ও প্রতিবাদ হয়েছে; কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয় নি। এইসব ব্যাপারে বেতার কর্তারা যা-কিছু তাই করার সুবিধে পেয়েছেন, তাই তাঁদের 'কর্মক্ষেত্রে'র পরিধি বেড়ে যায়। এবং শেষবেশ তাঁরা তাঁদের বুদ্ধির ও বিবেচনার চরম প্রমাণ দিয়েছেন গত ৫ই জানুয়োরি তারিখে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে তাঁরা কাঁচি চালিয়েছেন এবং তার চেয়েও বড় মারাত্মক কথা এই যে, কবিগুরুর লেখার ওপর কলম চালাতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, এতদুর স্পর্ধা তাঁদের হল কী করে?—তাঁদের এত খুঁটির জোর যখন, তখন সেই খুঁটিটি কে? কলকাতা কেন্দ্রের কলমচি সেই মহাকবিটি কে, যিনি রাজা ও রাণী 'সংস্কার' করেছেন? এটা আহাম্মকির চরম দৃষ্টান্ত ও বুদ্ধিহীনতার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইল। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের কথা এই যে, যিনি এই কাজ করেছেন তিনি নিজের বুদ্ধির ও ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। কে এই কাজটি করেছেন, দেশের লোকের তা জানার অধিকার আছে। সুতরাং দেশের সকলে তা জানবার দাবি করতে পারেন।

দেশের লোক যে সজাগ ও সচেতন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নাটকটি বেতারে প্রচারিত (অপপ্রচারিত?) হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বেরিয়েছে। আমরা এইরূপ সচেতনতার তারিফ করি। দেশের সকলে এতদিন নির্বিবাদে ও নিরাপত্তিতে থেকে বেতার কর্তাদের অশেষ আস্কারা দিয়েছেন। এইরূপ আস্কারা পাওয়ার ফলে তাঁরা সরাসরি মাথায় উঠতে আরম্ভ করেছেন দেখা যাচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাদিতে প্রতিবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা প্রহসনও হয়েছে। এভাবে হাতে-নাতে তাঁরা ধরা পড়বেন, তাঁরা হয়তো তা কল্পনা করেন নি। কেননা, বেতারের প্রচার তো বাতাসে ধ্বনি তুলে বাতাসেই মিলিয়ে যায়;

বেতার প্রসঙ্গ

কোনো চিহ্ন তো রেখে যায় না। প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না ভেবেই হয়তো এ কাজ করা হয়। তাই বেতার কর্তাদের কোনো হাতের লোক (অথবা নিজেরাই বেনামে?) এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে চিঠিপত্র স্তম্ভে জানান যে, কবিগুরুর লেখার কোনো বিকৃতি ঘটানো হয় নি, তাঁর লেখার মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে কোনো রচনা ঢুকে পড়ে নি। এরও প্রতিবাদ হয়েছে। এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, বেতার কর্তারা রাজা ও রাণীর অনেক পরিবর্তন করেছেন। কোন্ কোন্ স্থলে তাঁরা পরিবর্তন করেছেন, সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে এখানে আমরা তার কয়েকটির উল্লেখ করছি—পৃ ২০, ২৬, ২৯, ৪০, ৫৪, ৫৫, ৬১, ৬৩, ৭৮, ৮০, ৮৯, ৯২, ১০৫, ১১১ ও ১৫৫। ১৩৫২ সালের রাজা ও রাণীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, সেই সংস্করণ অনুসারে এই পৃষ্ঠাঙ্কগুলি দেওয়া হল।

আমরা জানি, মঞ্চ-নাটকে বেতার-নাট্যে রূপান্তরিত করতে হলে কিছু কিছু অদল-বদল দরকার হয়। কিন্তু সে অদল-বদলের জন্যে কাঁচি চলা বরদাস্ত করা যায়, কলম নয়। যদি কলম না চালিয়ে বেতার-নাট্যে রূপান্তরিত করার শক্তি না থাকে, এবং টেকনিক জানা না থাকে তাহলে এই অব্যাপারেষু ব্যাপার কেন? নিজেদের অক্ষমতা জাহির করার জন্যে এত উৎকট আগ্রহ কেন? বেতার মারফত নিজেদের নির্বুদ্ধিতা প্রচার করার অনেক সুযোগ-সুবিধে আছে, সেজন্যে কবিগুরুর স্কন্ধে ভর না করাই সংগত।

একদিক দিয়ে কাজটি অবশ্য ভালো হয়েছে। বেতারের আসরে কত অশিক্ষিত আনাড়ির ভিড় জমেছে, এর দ্বারা দেশবাসীর সুস্পষ্টভাবে তা জানবার সুযোগ ঘটল। কিন্তু এইখানেই এর শেষ যেন না হয়। বেতারকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার জন্যে সকলে যেন উদ্যোগী হন—এই কামনা আমরা করব। দেশবাসীর সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে যে জঞ্জাল বেতারে জমে উঠেছে, তা ঝেড়ে সাফ করতে হবে। এদিকে দিল্লীর দৃষ্টি যা'তে আকৃষ্ট হয় তার চেষ্টা আমরাও করব, এবং আরও পাঁচজনে এ কাজে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন, এ ভরসাও আমরা রাখব।

শৃঙ্খলার সঙ্গে ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে যদি কোনো কাজ করতে হয়, তাহলে Right man for the Right job নিয়োগ করাই সমীচীন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার বিপরীত ব্যাপারটিই দেখা যাচ্ছে। দেশের সমাজ সংস্কার আচার ব্যবহার আচরণ আদব কায়দা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাঁরা পুরোপুরি অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ বেতারে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরাই। বেতার প্রচারের জন্যে যে সরকারী ব্যয় সেটা দেশের শিক্ষা খাতের ব্যয় বলেই আমরা জানি। শিক্ষার নামে জনকয়েক অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা যা প্রচার করা হচ্ছে তা যদি শিক্ষা হয়, তাহলে আমরা বলব—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। কোনো রুচিবান জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা রাজা ও রাণী নাটকের তথা রবীন্দ্রনাথের এই অবমাননা সম্ভব হত না।

বেতারের সাহিত্যবাসর যাঁর পরিচালনাধীনে তিনি দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অজ্ঞ; বেতারের সংগীতের আসর যাঁর হাতে তিনি দেশের সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না। এটা একটা আজব দেশের কাহিনীর মত মনে হয়। বেতার এখন পরস্পর-পিঠ-চুলকানি-সমিতির (প, প, পি, চু) মত হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা—'তুমি আমাকে রেখ, আমি তোমার প্রোগ্রাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব'। দুর্জনেরা বলেন, এর তলে অনেক রহস্য আছে। আমরা সে রহস্যের কথা এখন বলতে চাই নে। অচিরেই তা প্রকাশিত হবে।

কিছুদিন পূর্বে একটি কাব্য-নাটক নিয়ে বেতার কর্তৃপক্ষ এইরূপ স্বৈরাচার করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ তেমন কার্যকরী হয় নি, সম্ভবত নাট্যকার তেমন জোর প্রতিবাদ জানান নি বলেই! এমনি আরও কত নাটকেরই যে অপঘাতে মৃত্যু ঘটেছে বেতার কর্তাদের কৃপায়, তার ইয়ত্তা হয়তো নেই। এইসব অচিরে বর্জিত হোক, এবং বেতার প্রতিষ্ঠান তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হোন—সকলে এই প্রত্যাশাই করে।

অবিলম্বে বেতার প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই হওয়া দরকার। এর জন্যে দরকার সূক্ষ্ম চালুনি। যাঁরা সত্যি যোগ্য তাঁরা থাকুন, যাঁরা অযোগ্য ও অপদার্থ, তাঁদের অবিলম্বে অপসারিত করা হোক।

রঙ্গজগৎ

"অমর সংগ্রাম"

ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্র কর্তৃক ৮ই ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য। রচনা—রবীন্দ্র নাগ; নৃত্য পরিচালনা —বালকৃষ্ণ মেনন; সুর—অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীত পরিচালনা—ধ্রুব চক্রবর্তী; প্রযোজনা—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

নৃত্যশিল্পী—বালকৃষ্ণ মেনন, শক্তি নাগ, বিনয় ঘোষ, মণিশঙ্কর, কালুশঙ্কর, সলিল মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

যন্ত্র-সংগীতে—সন্তোষ চন্দ্র, বিজয় পাঠক, জয়দেব গড়াই, অনিল দাস, সুখলাল কুণ্ডু, ধনঞ্জয় মল্লিক, বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও মনি চট্টোপাধ্যায়।



'অমর সংগ্রামের' নায়িকা সবিতা চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য-গীতাদির শিক্ষায়তন হিসেবে ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্র বেশী পুরনো নয়। ইতিপূর্বে কয়েকবার মঞ্চানুষ্ঠানের উদ্যোগ করলেও বড়ো কিছু সংগঠিত করে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা "অমর সংগ্রাম"—তিন অঙ্কের নৃত্যনাট্য। অনুষ্ঠানটিতে পেশাদারী আঁচড় বুলিয়ে দেবার একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও শিক্ষানবীশী টান আরও স্পষ্ট। তাই নাটকখানি দেখবার সময় এর সংগঠক একটি শিক্ষায়তন এবং শিল্পীরা প্রায় সকলেই তার শিক্ষাধীন ছাত্র-ছাত্রী, এ ভাবটা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং বিচারও করতে হবে সেই দৃষ্টি দিয়েই। এই অনুভূতি ধরেই প্রচেষ্টাটিকে প্রশংসার ধাপে তুলে আনা যায়।

নাটকের বিষয়বস্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে। জলের অভাবে চাষীদের ফসল নষ্ট হতে বসেছে আর ওদিকে জমিদারের জোড়া-দীঘি ভরা জল। গ্রামের পুরোহিত, যাকে প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসের প্রতীক দাঁড় করানো হয়েছে, সে এসে জানায় যে, পাপের ফলেই এই দুরবস্থা, দেবতার কাছে পুজো দিতে হবে। কিন্তু আধুনিক বৈপ্লবিক প্রগতির প্রতীক অমর এসে জানায় যে, তাদের জল নিতে হবে জমিদারের দীঘি থেকে জোর করে। তাকে উদ্দীপিত করে তোলে কুমারী। জমিদারের নজর পড়লো কুমারীর ওপর। অমর কুমারীকে জমিদারের কবল থেকে রক্ষা করলো। চাষীরা ক্রমে অমরের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করলে। চাষীরা দল বেঁধে দীঘিতে গিয়ে পৌঁছতে জমিদারের পাইকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধলো। জমিদার জানালে যে, কুমারী যদি তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে পথ ছেড়ে দেবে। এরই মধ্যে পাইকদের লাঠিতে অমর ঘায়েল হলো। পাইকের দল জমিদারকে ত্যাগ করে লাঠি ছেড়ে দিলে। অমরের আত্মাহুতিতে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হলো।

বিষয়বস্তুর পরিচর্যায় গল্পটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে অন্য রকম। এখানে দেখানো হয়েছে যেনো জমিদাররা কুমারীদের হরণ করে বলেই তাদের উচ্ছেদ হওয়া দরকার। রচনা বেশ দুর্বলই বলা যায়। শেষ দৃশ্য এতো আকস্মিক ও অসাড় যে, নাটকের বার্তা সম্পর্কে মনে তেমন স্পষ্ট রেখা টানতে পারে না।

ঘটনাগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে নৃত্যের সাহায্যে এবং তা ব্যক্ত হয়েছে গানে। গান ও নাচ এখানে কেউ কারুর অনুপূরক নয়; একজন আর একজনের অভাব পূরণ করে যাবার মতো করে কাজে লাগানো হয়নি; দুই-ই একই ভাবকে একই সঙ্গে অভিব্যক্ত করে কেবলমাত্র বাহুল্যই বাড়িয়ে গিয়েছে। তবে ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে আঙ্গিক অভিব্যক্তি ও নৃত্য রচনার চেয়ে স্বর ও সুরের ব্যঞ্জনাই কার্যকরী হয়েছে বেশী। এবং সত্যি বলতে কি, নৃত্য-নাট্যটির মধ্যে গানের দিকটাই হয়েছে প্রকৃত উপভোগ্য এবং প্রশংসনীয়—কণ্ঠ এবং আবহ-সঙ্গীত উভয়ই। নায়িকা কুমারীর কণ্ঠ ধার দিয়েছিলেন মাধবী ঘোষ এবং নায়কের ও কুমারীর পিতার কণ্ঠ দুটিও মনোজ্ঞ।

বিভিন্ন চরিত্রের জন্যে আলাদা আলাদা কণ্ঠ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সুরযোজনাও অনেকখানি ঘটনা ও চরিত্র অনুযায়ী হয়েছে, এ বিষয়ে বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। নাচের বেলায় কিন্তু একথা এতোটা খাটে না। একটা অঙ্ক শেষ হবার পরই নৃত্য রচনার বৈচিত্র্যহীনতাই উপভোগ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বেশী. তার ওপর পর্যাপ্ত মহড়া না দেওয়ার ছাপও চোখে পড়ে যায়।

প্রারম্ভেই দিন ফুটে ওঠার দৃশ্যটি আলোকসম্পাতে, সুরে-গানে মনকে চট করেই নাটকের ওপরে টেনে নেয়, বেশ সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কিন্তু পরবর্তী অংশের সঙ্গে তার যেনো আর সমতা পাওয়া যায় না। পুনরনুষ্ঠানের আগে এই সব ত্রুটিগুলি শুধরে নিতে হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আলোকসম্পাতের ত্রুটি নাচের ভাবকে ব্যাহত করেছে।



'অমর সংগ্রামে' বালকৃষ্ণ মেনন ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যনাট্যে কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক ছন্দের সঙ্গে আঙ্গিক সজ্জার মধ্যেও একটা ছন্দ থাকা দরকার। এখানে তার অভাবটা চোখে পড়ে।

নাচের দিকে পার্শ্ব চরিত্র কুমারীর পিতা শ্রীদামের ভূমিকায় মনিশঙ্কর এবং নায়েবের ভূমিকায় সলিল মুখোপাধ্যায় বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদু ঠাকুরের ভূমিকায় বিনয় ঘোষকেও পাকা নাচিয়ে মনে হয়। নায়ক অমর ও নায়িকা কুমারীর ভূমিকায় যথাক্রমে মেনন ও

সবিতা চট্টোপাধ্যায় দৈবে নাচেই হাততালি পেয়েছেন, নয়তো তাঁদের কারুরই মনকে আঁকড়ে ধরার মতো ব্যক্তিত্ব পাওয়া গেলো না। ললিতকলা কেন্দ্রের এই অবদানটি উদ্যমের দিক থেকে বরণীয় এবং আশা করা যায়, কলা-রসিকরা তাদের এ ধরণের আরও প্রচেষ্টার পরিচয় পাবে।

অপরাজিতা (বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিও)—

কাহিনী—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পার্থসারথি; আলোকচিত্র—ডি মেহতা; শব্দযোজনা—অবনী চট্টোপাধ্যায়; সুরযোজনা—গোপাল মল্লিক; রবীন্দ্রসঙ্গীত-পরিচালনা—দ্বিজেন চৌধুরী; নৃত্য পরিচালনা—বালকৃষ্ণ মেনন ও পিনাকী; শিল্প-নির্দেশ—অনিল পাল।

ভূমিকায়—পাহাড়ী, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ দাস, গৌতম, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, নবী মজুমদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা, স্মৃতি, নীলিমা দাস, প্রভা, অপর্ণা প্রভৃতি।

মতিমহল থিয়েটার্সের পরিবেশনে ছবিখানি শ্রী কেওড়ারী রূপবাণী, অরুণা ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করেছে।

আড়ম্বরের যতো অভাবই ঘটুক সরাসরি ঘরোয়া জিনিসের আবেদন যে শাশ্বত এবং অনেক সহজেই মনকে আঁকড়ে ধরে এ ছবিখানি তারই একটি প্রমাণ।

সবায়ের আশেপাশে ঘোরে এবং সবায়ের মনে গ্রাহ্য এমন সব চরিত্র ও ঘটনা নিয়েই হচ্ছে "অপরাজিতা"। কল্পনার কেলেঙ্কারি এতে নেই; বেশ সাবলীল গতিতে বাস্তবতার সমাবেশে আবেগকে ফুটিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কাহিনী হচ্ছে দুই ভাইকে নিয়ে—রামলাল আর হীরালাল। রামলাল কল্যাণপুরে স্টেটের ম্যানেজার। ছুটিছাটায় সে সত্যগ্রামের বাড়ীতে আসে এবং সাহিত্য রচনা নিয়েই থাকে। হীরালালকে সে সত্যগ্রামে একটা দোকান করে দিয়েছে; নিজের পরিশ্রমে হীরালাল দোকানের উন্নতি করতে থাকে। দুষ্টগ্রহ এলো হীরালালের শ্যালকপুত্র জলধররূপে। জলধর প্রথমে হীরালালের স্ত্রী তুলসীকে রামলালের স্ত্রী সতীর ওপরে বিরূপ করে তুললে এবং ক্রমে হীরালালকেও তার বৌদির সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করতে সমর্থ হলো। জলধর শেষে রামলাল ও সতীকে হীরালাল ও তুলসীর কাছে দুষমন প্রতিপন্ন করে তুললে। অথচ অসহায় বলে রামলালই জলধরকে সেরেস্তায় কাজ জোগাড় করে দেয়। জলধর হিসাবে গরমিল করার জন্যে রামলালের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে প্রবৃত্ত হলো। জমিদার শঙ্করনাথের পুত্র অমর শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসায় একটি উৎসবের আয়োজন হয়। শঙ্করনাথ নিজে সত্যগ্রামে এসে রামলালকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে যান। জলধর এই সময়ে সতীর সঙ্গে হীরালালের ঝগড়া বাধিয়ে দেয় যার ফলে নিমন্ত্রণে রামলালই তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যায়। উৎসব উপলক্ষে শঙ্করনাথের আবাল্য বন্ধু এবং অমরের ভাবী শ্বশুর কেটি সাহেবও কন্যা মিলিকে নিয়ে আসেন। উৎসব রাত্রে মিলির হীরের হার চুরি যায়। পাকে চক্রে রামলালই চোর সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষোভে ও লজ্জায় রামলাল পাগল হয়ে যায়। পাগল স্বামী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরে সতী দেখলে যে সেখানে সংসারের হাওয়া বদলে গিয়েছে। জলধরের চক্রান্তে হীরালাল সব গ্রাস করে নিয়েছে, এমন কি শেষে হীরালাল একদিন পাগল রামলালকে প্রহার করতেও দ্বিধা করলে না। সতী স্বামী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় তার প্রাক্তন আশ্রয়দাত্রীর কাছে এসে আশ্রয় নিলে এবং স্বামীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হলো। পাগল স্বামী, বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং আরও তিনটি ছেলে মেয়ে—সংসারের অবস্থা সংকট। কল্পনা কবিতা লেখে এবং তার জন্যে সামান্য কিছু পায়; বড়ছেলে খবরের কাগজ বিক্রী করে সামান্য কিছু রোজগার করতে চেষ্টা করে। শঙ্করনাথ কিন্তু রামলালকে অবিশ্বাস করেননি। রামলালের ওপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। পাগল হয়ে ওরা কলকাতায় চলে আসার পর শঙ্করনাথ অমরকে পাঠালে ওদের খোঁজে। অমর খোঁজ করতে থাকে কিন্তু সন্ধান পায় না। এই সময়ে মিলির জন্মদিন আসে। অমর সেখানে পৌঁছয় দেরীতে এবং আর একজনকে মিলির কণ্ঠে হার পরিয়ে দিতে দেখে সে চলে আসে সেখান থেকে। এ ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে কেটি সাহেব শঙ্করনাথকে ডেকে পাঠান। শঙ্করনাথ এসে সব বুঝলেন এবং মিলির সঙ্গে অমরের বিবাহ বাতিল করে দিলেন। কলকাতায় এসে শঙ্করনাথ জানতে পারলেন যে কল্পনা রামলালের আগেকার লেখা ছাপাবার চেষ্টা করছে। শঙ্করনাথ বেনামে প্রকাশক সেজে বইগুলির স্বত্ব হিসেবে বারো হাজার টাকার চেক পাঠালেন। রামলাল তখন সুস্থ হবার পথে। চেক দেখেই সে শঙ্করনাথের সই চিনতে পারল। সতী সে দান নিতে অস্বীকার করলে। সেটা শঙ্করনাথকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক করলে। ইতিমধ্যে শঙ্করনাথ সেই চুরির ব্যাপারে আসল অপরাধী ধরবার জন্যে পুলিশ নিযুক্ত করেন। রামলাল ও সতী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কল্যাণপুরে এলো চেক ফিরৎ দিতে। এই সময়ে জলধরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে হীরালাল নিজেই ফাঁদে পড়ে এবং এতদিনে সে তার দাদাকে চিনতে পারে এবং অনুশোচনা-দগ্ধ হয়ে দাদা-বৌদিকে আনার জন্যে জমিদার বাড়িতে এসে হাজির হয়। পুলিসও এলো আসল অপরাধীর খোঁজ নিয়ে। জলধরই সংসারে আগুন ধরাবার মূল; সে-ই হার চুরি করেছিলো। ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ির মধ্যে দিয়ে শঙ্করনাথ কল্পনাকে তাঁর পুত্রবধূ করে নিলেন।

কাহিনীটির মধ্যে প্রাণের বেশ সাড়া পাওয়া যায়। "স্বয়ংসিদ্ধা"র সঙ্গে এর মিল হচ্ছে

যে এখানেও, দুভাই নিয়ে ব্যাপার এবং তার মধ্যে এক ভাই বিকৃতমস্তিষ্ক এবং তাকে অবলম্বন করে এক নারীর সকল বাধা জয় করে যাবার সংগ্রাম। তবে "স্বয়ংসিদ্ধা"তে পাগল ছিলো গোড়া থেকেই এবং অপর ভায়ের মতলব *ছিলো অন্যদিকে; এখানে পাগল হয় পরে* এবং ভায়ের মতলব আর এক দিকে। এখানেও সতীর মধ্যে দিয়ে একটি আদর্শ নারী-চরিত্র সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েও স্বাভাবিক মানুষের সাড়া পাওয়া যায়। ন্যায়ের পথে মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবার তেজ; পিতামাতার দুঃখ ঘোচাবার জন্যে এবং তাদের সহায়ক হওয়ার জন্যে ছেলেমেয়েদের দুর্জয় প্রযত্ন; শিশুদের প্রগাঢ় সারল্য ও নিষ্ঠা—ছবিখানিতে অনন্যসাধারণ মাধুর্য এনে দিয়েছে।

বিন্যাস-চাতুর্য ঘটনাবলীকে সাবলীলভাবেই টেনে নিয়ে গিয়েছে। শেষেতে চেক ফেরৎ দেবার জন্যে দলবেঁধে কল্যাণপুরে যাওয়ার ঘটনাটাই যা ঠেলে নিয়ে আসা বলে মনে হলো। তা নয় তো কোথাও কোন ঘটনাই জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে মনে হয় না। আগাগোড়া বেশ পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ. একটি জায়গা ছাড়া—অমরনাথের আগমনে কল্যাণপুরের উৎসব দৃশ্যে। শান্তি-নিকেতনের বলে পরিচয় দিয়ে একটি তরুণীকে এমনি ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে, যা অত্যন্ত কুৎসিত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। অর্ধনগ্ন, উন্নত-বক্ষের ভঙ্গীটি এতোই আপত্তিকর যে, দর্শকদের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধিক্কারের ধ্বনি উপচে পড়ে। বিশ্ববরেণ্য আদর্শ শিক্ষায়তনের ছাত্রীকে এমনভাবে বিকৃতভাবে দেখানো মারাত্মক অপরাধ—অচিরেই এ দৃশ্যটি অপসারিত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আমরা এখানকার সেন্সর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

চরিত্রগুলি স্বাভাবিক মানুষ বলে অভিনয়-শিল্পীরাও তাদের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে পেরেছেন। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্তও প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি করে তোলে। সতীর ভূমিকায় মলিনাই অবশ্য সবচেয়ে কৃতিত্ব দাবী করেন। সহনশীলা অথচ তেজস্বী নারীর একটি আদর্শ চিত্র তিনি এঁকে গিয়েছেন। পাহাড়ী সান্যালও রামলালের ভূমিকায় চরিত্র সৃষ্টির মনোজ্ঞ কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবি বিশ্বাসের শংকরনাথ সংযত অভিনয়ের সুন্দর নিদর্শন। অমরের ভূমিকায় গৌতমকেও এই দিক থেকেই প্রশংসা করা যায়। হীরালালের ভূমিকায় প্রাক্তন খেলোয়াড় ধীরাজ দাস, তাঁর স্ত্রী তুলসীর ভূমিকায় মনোরমা ও মার ভূমিকায় প্রভার অভিনয় যে কি পরিমাণ সাফল্যলাভ করেছে, তা বোঝা যায়, ও'দের দুর্বৃত্তপনায় দর্শকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ধিক্কার ধ্বনি ওঠার মধ্যে। ডিটেক্‌টিভের ছোট ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় আশাপ্রদ শিল্পীদের একজন বলে পরিচয় দিয়েছেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলধর, হয়তো ঘটনা *বিন্যাসের মুখে অনেকখানি চাপা পড়ে গিয়েছে।* জমিদারবাড়ির চাকরের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী দৃষ্টি টেনে নেন। কল্পনার ভূমিকায় স্মৃতি ও নিলির ভূমিকায় নীলিমার অভিনয়েও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সবায়ের চেয়ে বেশী মনকে ভরিয়ে তুলেছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলির অভিনয়। ওরা সবাই মনের ওপরে গভীর রেখা টেনে দেয়। ওরা ছবিখানির বিশেষ আকর্ষণ।

চারখানি গান আছে এবং সব কখানাই সুসংযোজিত। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের "নৃত্যের তালে তালে" নৃত্য-সংযুক্ত সমবেত গানখানি একটি সম্পদ গড়ে তুলেছে। বাকী তিনখানি গান রচনা করেছেন শৈলেন রায়। আবহসংগীতে পল্লী অঞ্চলের দৃশ্যেও বিদেশী গৎ-এর ঝংকার অনেকক্ষেত্রেই খাপ খায় নি। কয়েক জায়গার আলোক-সমতার কথা বাদ দিলে আলোকচিত্র প্রশংসনীয় বলা যায়। শব্দগ্রহণেও সমতার ব্যতিক্রম কানে লাগে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারত বা **কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের** বেসরকারী টেস্ট পর্যায়ের খেলায় কমনওয়েলথ দলই শেষ পর্যন্ত সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলায় ভারত অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া **কমনওয়েলথ** দলকে "রবার" লাভের সম্মান হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া যাহা অনেকে মনে মনে ধারণা বা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। ভারত পঞ্চম টেস্ট খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করা দূরের কথা অমীমাংসিতভাবেও খেলা শেষ করিতে পারেন নাই। পূর্বের চারিটি টেস্ট খেলার মধ্যে ৩টি খেলা অমীমাংসিত ও ১টি খেলায় কমনওয়েলথ দল বিজয়ী হইয়া টেস্ট পর্যায়ের গৌরব লাভের যে সূচনা করেন পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়ী হওয়ায় তাঁহাদের বিজয় গৌরব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কমনওয়েলথ দলের এই কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে আশ্চর্যের কিছুই হয় নাই। কমনওয়েলথ দল টেস্ট পর্যায়ের খেলায় "রবার" লাভ করিবেন ইহা কলিকাতার তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ অবলোকন করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। জয়লাভ যখন কমনওয়েলথের তখন অহেতুক বোলার পরিবর্তন ও প্রতিপক্ষ দলকে অধিক রান করিবার সুযোগদান করিতে দিয়া ভারত দলের অধিনায়ক যে দুর্বলচিত্ত ও জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার পর আমরা অন্ততঃপক্ষে ভারতের জয়লাভ কল্পনা করিতে পারি নাই। এইজন্যই একরূপ স্পষ্ট ভাষায় লিখিতে সাহসী হই "এইরূপ দুর্বলচিত্ত ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি যতদিন ভারতীয় দলের গুরুদায়িত্ব-পূর্ণ অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততদিন ভারতীয় দলের জয়লাভ অসম্ভব।" আমাদের ঐ উক্তি অনেককেই বিচলিত করে এবং অনেকেই তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের পর বোধহয় তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আমরা একটুকুও ভুল করি নাই। সুন্দর আবহাওয়া, নূতন ঘাসযুক্ত মসৃণ মাঠে টসে জয়ী হইয়া প্রতিপক্ষ দলকে প্রথম ব্যাট করিতে দিবার যুক্তি ভারতীয় দলের অধিনায়ক কি দিতে পারেন? তিনি বলিবেন "পিচ নরম ছিল।" কিন্তু আমরা বলিব তাহা হইলে কমনওয়েলথ দলের পক্ষে প্রথম দিনেই তিন শতাধিক রান করা কোনরূপেই সম্ভব হইত না। ভাল পিচের সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিয়াই রান তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় দিনের পর যখন প্রাকৃতিক আবহাওয়া খারাপ হয় তখন কমনওয়েলথ দলের পক্ষে সুবিধা হয় ভারতের প্রথম ইনিংস অল্প রানে শেষ করা। প্রথম ইনিংসে অধিক রানে অগ্রগামী থাকিয়া "ফলো অন" করিবার সুযোগ তাঁহারা লাভ করেন, কিন্তু বিচক্ষণতা তাঁহাদের "ফলো অন" প্রথা অবলম্বন করিতে নিষেধ করে। জয়লাভ যখন একমাত্র কাম্য তখন ইনিংসে না হইয়া যেভাবেই তাহা আসুক না তাহাই তাঁহাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। সেইজন্য তাঁহারা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া ভারতকে চারিশতের অধিক রান পশ্চাতে ফেলিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন "কমনওয়েলথ দল এইভাবে ৪৮০ মিনিটে ৪৪০ রান করিয়া জয়ী হইবার সুযোগ দান করিয়া খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিব তাহা নহে। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক পিচের অবস্থা দেখিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় দলের পক্ষে ঐ মাঠে অত অধিক রান করা সম্ভব নহে এবং সেইজন্যই দ্বিতীয় ইনিংস খেলিবার সুযোগ দান করেন। মাঠ যে সম্পূর্ণ খারাপ হইয়াছিল তাঁহার প্রমাণ স্লো বোলার রামাধীনের সাফল্য। ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর খেলোয়াড় যাহাতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হইতে না পারেন সেইদিকে পরিচালকগণ দৃষ্টি দিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। গতবারের কমনওয়েলথ দল শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও ভারতের নিকট টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পরাজিত হইলেন অথচ এইবারে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াও পরাজিত হইলেন ইহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

পঞ্চম টেস্ট খেলার বিবরণ

ভারতের অধিনায়ক টসে জয়ী হইয়া কমনওয়েলথ দলকে ব্যাটিং করিতে দেন। প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০৭ রান করে। ওরেল শতাধিক রান করেন। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ৪১৩ রানে শেষ হয়। কেন গ্রীভস বেপরোয়া ব্যাটিং করেন। ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৪৩ রান করেন। তৃতীয় দিনে প্রাকৃতিক আবহাওয়া খারাপ হয়। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ে। ভারতীয় দল মধ্যাহ্ন ভোজের পরে মাত্র ২৩ মিনিট খেলিয়া ২৪০ রানে ইনিংস শেষ করে। কমনওয়েলথ ১৭৩ রান অগ্রগামী থাকিয়া ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করায় ও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও তৃতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৩৮ রান করে। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত খেলিয়া ৬ উইকেটে ২৬৬ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। ভারত ৪৩৯ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৪১ রান করে। পঞ্চম দিনে ভারতীয় দল রান তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। ঠিক চা-পানের পূর্ব মুহূর্তে ৩৬২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ও কমনওয়েলথ দল খেলায় ৭৭ রানে বিজয়ী হয়।

খেলার ফলাফল:—

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—৪১৩ রান (ওরেল ১১৬, আইকিন ৪১, কেন গ্রীভস ৯৯, ডুল্যান্ড ৩৩, রিজওয়ে ২৭, ফিশলক ২৯, মানকড় ১৬৪ রানে ৪টি, হাজারে ৩২ রানে ৩টি, ফাদকার ১২৫ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতের প্রথম ইনিংস—২৪০ রান (বিজয় মার্চেণ্ট ২৬, উমরিগার ৫৭, হাজারে ৪৭, ফাদকার ৪১, মানকড় ২২, রাজেন্দ্রনাথ নট আউট ১২, রামাধীন ৯০ রানে ৪টি, ডুল্যান্ড ৭০ রানে ৪টি ও ওরেল ৪৫ রানে ২টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংস—৬ উইকেটে ২৬৬ রান (গিম্বলেট ৪৭, আইকিন ৬৩, ওরেল নট আউট ৭১, ডুল্যান্ড নট আউট ১৮, এইচ গাইকোয়াড় ৮৩ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—৩৬২ রান (বিজয় মার্চেণ্ট ১০৭, উমরিগার ৬৩, মুস্তাক আলী ৪০, গোপীনাথ নট আউট ৬৬ রান, রামাধীন ১০২ রানে ৫টি, ওরেল ১১১ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ভারত ও কমনওয়েলথ দলের টেস্ট পর্যায়ের বিভিন্ন খেলার ফলাফল

প্রথম টেস্ট ম্যাচ—দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ফলাফল :

ভারতের প্রথম ইনিংস—১৬৯ রান (হাজারে ৩১, ফাদকার ৪১, উমরিগার ২৬, রামাধীনন ৪৪ রানে ৪টি, ট্রাইব ৪৭ রানে ৩টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথের প্রথম ইনিংস—২৭২ রান (ডুল্যান্ড ১০৮, এমেট ৫৫, ট্রাইব ৩৮, এন চৌধুরী ৮১ রানে ৩টি, মানকড় ৬৬ রানে ৪টি উইকেট পান)।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—৬ উইঃ ৪২৯ রান ডিক্লেয়ার্ড (হাজারে নট আউট ১৪৪, মার্চেণ্ট ৪৮, মুস্তাক ৬১, উমরিগার ৫৬, অধিকারী ৫৬, ওরেল ১২০ রানে ৩টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইঃ ২১৪ রান (ফিশলক নট আউট ১০২, গিম্বলেট ৬৩, এমেট নট আউট ৪৩, মানকড় ৬১ রানে ১টি উইকেট পান)।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ—বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথ এই খেলায় ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে পরাজিত করে। খেলার ফলাফল:—

ভারতের প্রথম ইনিংস—৮২ রান (মার্চেণ্ট ৩৭, সি এস নাইডু ২৯, রিজওয়ে ১৬ রানে ৪টি, লেকার ৩২ রানে ৩টি ও ওরেল ২৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—৪২৭ রান (গ্রীভস ৮৯, আইকিন ৭৭, ওরেল ৫৫, স্পুনার নট আউট ৬২, বি আলেন্ডা ৭০ রানে ৩টি, সি এস নাইডু ৮৩ রানে ৩টি, পি উমরিগার ৬৮ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—৩৯৩ রান (উমরিগার ১৩০, হাজারে ১১৫, মার্চেণ্ট ৬২, মানকড় নট আউট ২৭, জিম লেকার ৮৮ রানে ৫টি, ট্রাইব ১০০ রানে ২টি উইকেট পান)।

কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ৪৯ রান (গিম্বলেট নট আউট ৩০, আইকিন নট আউট ১৮)।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ফলাফল:—

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—২২৭ রান (আইকিন নট আউট ৯৬, ওরেল ৬১, ডুল্যান্ড ২৭, ফাদকার ৬০ রানে ৪টি, এন চৌধুরী ৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ভারতের প্রথম ইনিংস—৭ উইঃ ৪৬৭ রান (হাজারে ১৩৪ রান, রেগে ৪৮, উমরিগার ৯৩, ফাদকার ৪২, সি এস নাইডু ৫৪।

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংস—৪৫৭ রান (আইকিন ১১১, গিম্বলেট ৪০, ওরেল ৫৮, ডুল্যান্ড ১০৬, স্টিফেনসন নট আউট ৬০, মানকড় ১০২ রানে ৪টি, এন চৌধুরী ৭৬ রানে ৩টি, বিজয় হাজারে ৫৪ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইঃ ৩৯ রান (এন চৌধুরী নট আউট ১২, এমেট ১৯ রানে ১টি উইকেট পান)।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ—মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইলে হিন্দু কোড বিলের দফাওয়ারী আলোচনা আরম্ভ হয়। বিলের ২নং ধারার আলোচনা আরম্ভ হইলে সে সম্পর্কে ২৬টি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

১৯৫০ সালের কেন্দ্রীয় অন্তর্ঘাতী কর্মনিরোধক আটক আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী অদ্য পার্লামেণ্টে একটি বিল উত্থাপন করেন। সংশোধন বিলটিতে বর্তমান আইনের মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে; তদুপরি আইনের কতকগুলি বিধানের কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী বলেন, "দেশব্যাপী চেষ্টা চলিলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে অর্থাৎ ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টন খাদ্য, ৬ লক্ষ গাঁইট তুলা এবং ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট ও বিকল্প তন্তু উৎপাদন করিয়া আমরা আমাদের সুসংহত কৃষিপণ্য উৎপাদন কর্মসূচীর বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হইব।"

আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ বি আর আম্বেদকর পার্লামেণ্টে জানান যে, যে সব ব্যক্তি ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাইয়ের পর পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের ভোটাধিকার প্রদানের জন্য সরকার কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খুলনার সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রিতে একদল ডাকাত খুলনা জেলার ডাকোপ থানার অন্তর্গত গুনারি গ্রামের ধনী জমিদার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতা শীতল সর্দারের গৃহে হানা দেয়। এই সময় ডাকাত দলের সহিত সংঘর্ষে শীতল সর্দার ও তাঁহার ভ্রাতা নিহত হন।

অদ্য সকাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার প্রায় ২০০ কর্মচারী ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—গত বৎসর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যে সকল ব্যক্তি কৃষি জমি ও বসতবাটী ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জমি চাষ ও বাটী ভাড়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল উদ্বাস্তু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স নামে এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টও বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি সম্পর্কে এইদিন দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত যে গ্রামটি পাকিস্থানী বাহিনী জোরপূর্বক অধিকার করিয়াছিল, তাহা এখনও তাহাদের অধিকারেই আছে। অদ্য পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ বি ভি কেশকার বলেন যে, এই সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের ঊর্ধ্বতন মহলের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের সার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লজ্জাকর কাহিনী অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রী আর কে সিদ্ধের এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী কৃষি দপ্তর কর্তৃক সার ক্রয়ের ব্যাপারে প্রায় এক কোটি টাকা ক্ষতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী মুন্সী বলেন যে, সার সংক্রান্ত ডিরেক্টর শ্রী সি এস ডি স্বামীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

অদ্য পার্লামেণ্টে পুনরায় হিন্দু কোড বিলের দফাওয়ারী আলোচনা হয়। কংগ্রেস দল বর্তমান অধিবেশনে এই বিলের দফাওয়ারী আলোচনার জন্য যে তিনদিন নির্দিষ্ট করেন, অদ্য তাহা সমাপ্ত হয়। কিন্তু তিনদিন আলোচনার পরেও বিলের বিশেষ কোন অগ্রগতি না হওয়ায় বিলের সমর্থকগণ হতাশ হন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে দেশের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য সমগ্র ভারতে লোক গণনা আরম্ভ হয়। ইহা স্বাধীন ভারতের প্রথম লোক গণনা।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের ব্যয় বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় রিপোর্টে ভারত সরকারের মন্ত্রিদপ্তর ও বিভাগসমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারত গভর্নমেণ্টের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবকে অদ্য পার্লামেণ্টে বস্ত্র সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। উত্তর দান প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, ১৯৫০ সালে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে এবং যথেষ্ট বস্ত্রের অভাবে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য প্রত্যুষে কলিকাতা বড়বাজার অঞ্চলে একটি বাড়িতে এক সশস্ত্র ডাকাতিতে উক্ত গৃহস্বামীর জহরতাদি অলংকারপত্র ও নগদ টাকা মিলাইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানায় লক আউট ঘোষণা করেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরকে অদ্য বোম্বাইয়ে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী—ভারত গবর্নমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং আসাম রাজ্য গবর্নমেণ্ট ব্যতীত অন্য সকল গবর্নমেণ্টকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, যে সকল উদ্বাস্তু এখনও শিবিরে বা তাঁবুতে বাস করিতেছে আগামী বর্ষা ঋতুর পূর্বেই তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে "বিহার ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ বিল" গৃহীত হইয়াছে। এই বিলে ভিক্ষাবৃত্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য রুড়কীতে কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এক বক্তৃতা দেন।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আঞ্চলিক আত্মনির্ভরশীলতার পরিকল্পনার কথা বলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীতে নেপাল কংগ্রেস, রাণাদল ও নেপালাধীশের মধ্যে এক ঘরোয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নেপাল কংগ্রেস ও রাণা দলের দশজন সদস্য লইয়া নেপালের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে শীঘ্রই বাণিজ্যিক আদানপ্রদান আরম্ভ হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—কোরিয়া রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাঁজোয়া বাহিনীর বৃহত্তম আক্রমণের মুখে চীনা সৈন্যদল পার্বত্যাঞ্চল ত্যাগ করিয়া উত্তরে সিউল অভিমুখে পলায়ন করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্যাঙ্কবহর ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং সামান্য প্রতিরোধের মুখে অগ্রসর হইয়া সিউলের দক্ষিণ দিকবর্তী হ্যান নদীর সাত মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গনের পূর্বভাগে রাষ্ট্রপুঞ্জ সৈন্যদল ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অভিমুখী অভিযানে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা হইতে বিমান পথে উহার দূরত্ব ২৮ মাইল মাত্র।

৭ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন অষ্টম বাহিনীর জনৈক মুখপাত্র অদ্য বলেন যে, পশ্চিম কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ১৪ দিনব্যাপী আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইয়া সিউলের রক্ষাব্যূহ হইতে কম্যুনিস্টদের বিতাড়িত করিয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী—মধ্য কোরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সংগ্রামরত রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার ১২ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে।

বৃটেনের ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বন্ধ করার জন্য কমন্স সভায় মিঃ উইনস্টন চার্চিলের রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল, অদ্য রাত্রিতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট উহা ১০ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিল গত বৎসর কমন্স সভায় গৃহীত হয়। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে উহা বলবৎ হইবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাদল অদ্য সিউল নগরের উপকণ্ঠে হ্যান নদীতীরে উপনীত হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর পুরোগামী সেনাদল সিউল নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিযাত্রী সেনাদল সিউলের জনশূন্য বন্দর ইনচনে প্রবেশ করিয়াছে। মার্কিন ২৫ সংখ্যক পদাতিক ডিভিসন সিউলের ৫ মাইল পশ্চিমে কিম্পো বিমানঘাঁটিটি অধিকার করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।• আনা বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥•
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) বার্ষিক—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥• (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।   Saturday, 24th February, 1951.   [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেপালের বিপ্লব

নেপালে নূতন যুগের প্রবর্তন হইতে চলিয়াছে। নেপালাধীশ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ জাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া গত ৬ই ফাল্গুন যে ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্বজনীন সমর্থন লাভ করিয়াছে। বস্তুত দীর্ঘকালীন সামন্ত-প্রথায় শাসিত নেপালের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার এতটা সহজে যে সমাধান সম্ভব হইবে, অনেকেই ইহা মনে করিতে পারেন নাই। প্রকৃত-পক্ষে নেপালের গণতান্ত্রিক শক্তির এই যে সাফল্য, ইহার মূলে নেপালের বিপ্লবী সন্তান-দের প্রাণ-বলই বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন-আন্দোলনের সঙ্গে নেপালাধীশের সহানুভূতি ছিল এবং ভারত সরকারের সমর্থন ছিল, একথা সত্য, কিন্তু আমাদের মতে সমস্যার সমাধানের পক্ষে তাহাও ছিল পরোক্ষ। নেপালী কংগ্রেসের নেতারা যদি সেখানকার স্বৈরতন্ত্র শাসনকে উচ্ছেদ করিবার জন্য জীবন-মরণ পণে ব্রতী না হইতেন, তবে সমস্যার এতটা সহজে সমাধান হইত না, নানারূপ বিচার-বিবেচনার জট পাকাইয়া তাহা আরও জটিল হইয়া উঠিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত নেপালের কংগ্রেসী নেতারা পশুবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বদেশের কল্যাণ-সাধন-ব্রতে তাঁহারা আত্মাহুতি দানে উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই এই সাফল্যলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে দেখিতেছি, স্বৈরাচারমূলক সংস্কারে যাহারা অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে সহজেই শুভ-বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। নেপালের স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গ কিছুদিন আগেও যাঁহাদিগকে সম্মুখে পাইলে হাতে মাথা কাটিতেন, তাঁহাদিগকেই আজ সসম্মানে তাঁহাদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। দেশপ্রেমিক সন্তানদের চরণ-শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে। নেপালের স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি পরিচালনার ভার আজ নেপালের বিদ্রোহী বীর সন্তানদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বাঙলার কবি বলিয়াছেন, "সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে।" নেপালের বিগত বিপ্লব আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে নেপালের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য এই সংগ্রামে মনুষ্যত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে ঐকান্তিকতা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। নেপালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই অবসরে আমরা তথাকার দেশপ্রেমিক সন্তানদের সাধনা চরম সিদ্ধিলাভ করুক, ইহাই কামনা করিতেছি।

অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিল

অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিলটি পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু অন্যায়ভাবে গভর্নমেণ্ট ও বেসরকারী মালিকদের জমি এবং বাড়ী দখল করিয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে উদ্বাস্তুগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা-সমূহ বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। অধিকন্তু এই অবস্থার সুযোগ লইয়া 'প্রকৃত' উদ্বাস্তু নহে এমন লোকেরাও আইন-বিগর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আইনের খসড়ায় একটি বিষয় বিশেষ সুস্পষ্ট, তাহা এই যে, যাহারা প্রকৃত উদ্বাস্তু অর্থাৎ যাহারা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুণ অথবা এইরূপ হাঙ্গামার ভয়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে এবং ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অথবা তাহার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছে, তাঁহাদের বসবাসের জন্য অন্যত্র জমির ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে না। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, যে সকল উদ্বাস্তু নিজেদের সম্বল নিঃশেষ করিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের অন্য স্থান দেখাইয়া দিলেই তাহাদের পক্ষে চলিয়া যাওয়া সহজ হইবে কি? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিজেই এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহারা অনেকেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক এবং ইঁহারা একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। বিশেষত কলিকাতা শহরের নিকটে না থাকিলে ইহাদের পক্ষে জীবিকা অর্জনের সমস্যাও গুরুতর হইয়া উঠিবে। সুতরাং বিশেষ সহানু-ভূতির সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফলত শুধু মানবতার প্রশ্নই যে এই সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে এমন নয়, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বও সে সঙ্গে আছে। বাস্তবিকপক্ষে উদ্বাস্তুদের এই সমস্যাটি রাষ্ট্রীয় সঙ্কট-কালীন অবস্থাস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত এবং সেই দিক হইতে ইহার সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত আইনের একটি ধারার প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই ধারায় এইরূপ নির্দেশ

আছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন অনুসারে সরকার স্বীয় উদ্যোগে যে কোন সময় অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক দখলীকৃত যে কোন জমি দখল করিতে পারেন এবং সরকার যদি বিবেচনা করেন যে, উক্তরূপ জমি গ্রহণ জনসাধারণের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন এবং ঐরূপভাবে জমি দখল করিলে তাহা জমির মালিকের পক্ষে অযথা দুর্গতির কারণ হইবে না, তবে সেই ক্ষেত্রে তাঁহারা উহা দখল করিতে পারিবেন। আমাদের মতে উদ্বাস্তুদিগকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সরকারের এই ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা কর্তব্য। বস্তুত উদ্বাস্তুগণের মধ্যে অনেকে যে সব জমি দখল করিয়া নিজেরা তাহাকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, সেগুলির বেশীর ভাগই পূর্বে পতিত অবস্থায় মনুষ্য বাসের অযোগ্য জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল। সরকার সেই সব জমি দখল করিয়া মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপে সঙ্গত মূল্য দিতে পারেন, পরে সেই টাকা সুবিধামত কিস্তিতে উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব হইতে পারে। সেই সব জমির সম্বন্ধে মালিকদের অর্থগৃধ্নুতা যাহাতে সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি না করে, সেদিকে সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। দেশের বর্তমান সংকটের জন্য দায়িত্ব সমাজের সকলেরই গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিপন্ন নরনারীর দুর্দশার সুযোগ লইয়া একটা বিশেষ শ্রেণী নিজেদের স্বার্থকে পুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবে, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া কেবল নিজেদের সুবিধার দিকটাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, ইহা সমীচীন হইতে পারে না। অবশ্য যাহারা প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু নহে, এমন কেহ যদি উদ্বাস্তু বলিয়া নাম ভাড়াইয়া সরকারী সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহাদিগের ফন্দী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য সরকারী ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইলে সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুত দিল্লী চুক্তির ফলে এই সমস্যার যতটা সহজে সমাধান হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহা হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে রাজ্যপালের অভিভাষণকে উপলক্ষ্য করিয়া চার দিবসব্যাপী দীর্ঘ বিতর্কের অবসানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী যে বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার রায়ের অভিমত এই যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্বাস্তুগণ যাহাতে পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, সেখানে অবস্থা তদুপযোগী নহে। যাহারা পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারা প্রধানত কৃষিজীবী এবং কারিগর শ্রেণীর লোক। ডাক্তার রায় একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি যতদূর জানেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইহা অভিপ্রেত নয়; কারণ, তাহারা তাহাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া মনে করে। এমন অবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইতেছে না। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সেখানে বসবাস এবং জীবিকা অর্জন করিতে পারেন, এমন প্রতিবেশ সেখানে বর্তমানে নাই, এমন অভিযোগও শোনা যায়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হইয়াও এই সম্প্রদায় এখানেই অবস্থান করা শ্রেয় মনে করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের পক্ষে পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তনে যে অন্তরায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। বস্তুত প্রশ্নটি অত্যন্তই গুরুতর; কারণ, ইহার উপর সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতির শিক্ষা-দীক্ষা গড়িয়া তুলিয়াছে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবদানই সমগ্রভাবে বাঙালীর সমাজ-জীবনে সংস্থিতি দান করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবন হইতে যদি হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এইভাবে উৎখাত হয়, তবে, আমাদের আশঙ্কা হয়, অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ হইতে বাঙালী জাতির সুদীর্ঘ কালের সংস্কৃতির ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—সেখানে বাঙালীর গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে তাহাদের ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত হইবে এবং উভয় বঙ্গের মধ্যে ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বাস্তবিকপক্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া সেখানে বসবাস করিতে পারেন, এমন আর্থিক অবস্থা সেখানে নাই। কি শিক্ষা বিভাগ, কি সরকারী চাকুরী, কি আইন ব্যবসা সকল দিক হইতেই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের একটা প্রভাব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের পক্ষে সেখানে নিদারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্য—সে ক্ষেত্রে হইতেও হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে উৎখাত করিবার জন্য সেখানে নানাভাবে চাপ পড়িতেছে। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকার নূতন উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কাজ পূর্ববঙ্গে বন্ধ রহিয়াছে, সেগুলি তাঁহারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক। প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ পুনরায় চালু করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এই ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ কেন বন্ধ হইল, তৎপূর্বে সে সম্বন্ধে তদন্ত করা প্রয়োজন। কাজ চালাইবার পক্ষে আবশ্যক উপকরণের অভাবেই সেগুলি বন্ধ হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের সরবরাহ ব্যবস্থাই প্রধানত সেজন্য দায়ী। এইভাবে পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক বিপর্যয়ের দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ সরকার এড়াইতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি পূর্ববঙ্গ হইতে এইরূপে উৎখাত হইতে বাধ্য হয়, তবে তাহার ফলে সমগ্রভাবে বাঙলার ভাগ্যে যে বিপর্যয় দেখা দিবে, তাহা ভাবিয়া আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি এবং দিল্লী চুক্তির তথাকথিত সাফল্য আমাদিগকে কোনক্রমেই আশ্বস্ত করিতে পারিতেছে না।

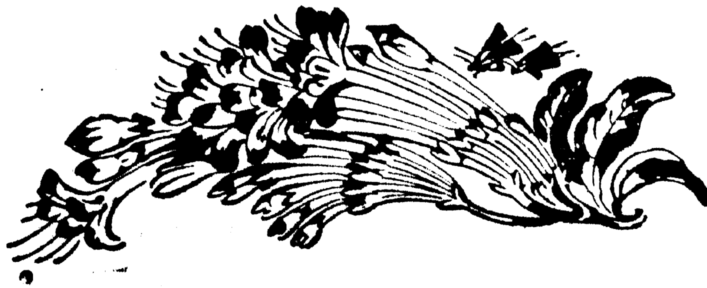
বস্ত্র সমস্যার কারণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ হইতে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জনসাধারণকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন কাপড় ক্রয় করিবার সময় ছাপমারা দামের অধিক দাম না দেন এবং যদি কোন বস্ত্রব্যবসায়ী কাপড় বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হন, তবে যেন পুলিশে জানানো হয়। অনুরোধ অবশ্য মন্দ নয়; কিন্তু দোকানে যদি উপযুক্ত কাপড় না থাকে, তবে দোকানদার করিবে কি? এই সমস্যাই তো কলিকাতায় দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ইহাই সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের সংভরণ সচিব সেদিন বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। ভারত সরকারের শিল্প এবং বাণিজ্য সচিবের এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ এই যে, বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, সেইজন্য বিভিন্ন প্রদেশে বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ তাঁহারা হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার মতে বস্ত্রের অভাবজনিত এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গে দেখা দেয় নাই, পরন্তু ভারতের সব প্রদেশেই ইহা ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের সরকার এজন্য ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বস্ত্র সংকট সত্ত্বেও পহেলা নম্বর বস্ত্র রপ্তানিকারকস্বরূপে ভারতের সুনামের এখনও হানি হয় নাই। ভারত সরকারের বস্ত্রবিভাগের কর্তৃপক্ষ বিশেষ গর্বের সহিত এইকথা জানাইয়া দিয়াছেন। গর্বের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতের নরনারীদিগকে বস্ত্রহীন অবস্থায় রাখিয়া বিদেশে বস্ত্র রপ্তানির এমন গর্বের মধ্যে আমরা কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই না। সম্প্রতি ভারত

সরকারের বস্ত্র বিভাগীয় কমিশনার বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের উপর নাকি এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ভারতের কলের উৎপন্ন বস্ত্রের অন্যূন শতকরা ৬০ ভাগ তাহাদিগকে ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপন্ন মালের ৪০ ভাগ মিলওয়ালারা বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিবেন। সুতরাং বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াই যে, বর্তমান বস্ত্রসংকটের মূল কারণ, একথা বলা চলে না। বস্তুত বস্ত্রের উৎপাদন কম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালের অপেক্ষা ১৯৫০ সালে বিদেশে ভারত হইতে বস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে এ তথ্যও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত সরকার যে শ্রেণীর কাপড় রপ্তানি দেশের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শ্রেণীর কাপড়ও কার্যত রপ্তানি করা হইয়াছে। ভারতের বাণিজ্য সচিব আমাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যে, বস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস করিবার জন্য তাঁহারা বর্তমানে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফাঁসাইয়া দিবার জন্য যে মিলওয়ালাদের মহল হইতে কৌশল অবলম্বিত হইবে না এমন কি নিশ্চয়তা আছে? প্রকৃতপক্ষে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াই বস্ত্রের সংকটের একমাত্র কারণ নয়। দেশের দুর্দশা ভাঙ্গাইয়া চোরাবাজারী এবং মুনাফাশিকারীদের তৎপরতা মোটা টাকা লুঠিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় মিলের মালিকেরা তাঁহাদের মিলের উৎপন্ন মালের এক-তৃতীয়াংশ কণ্ট্রোলের দরে বিক্রয় করিতে পারেন। ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু এই এক-তৃতীয়াংশই যে কালাবাজারে চালান হইতেছে, এমন নয়, অপর দুই-তৃতীয়াংশ হইতেও বহু মাল কালাবাজারে গিয়া পড়িতেছে। কালাবাজার দমনে সরকারী ব্যবস্থা যথোপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে ইহা সম্ভব হইত কি? ভারতের বাণিজ্য সচিব বলিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র যাহাতে নিয়মিতভাবে সরবরাহ এবং বণ্টিত হয়, সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের কথায় আমরা ভরসা কিছুই পাইতেছি না, আমাদের মতে মিলে উৎপন্ন বস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিতে মিলের মালিকদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা উচিত; কারণ, সে অধিকারের তাঁহারা অপপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিলগুলির গুদামে মাল জমা পড়িয়া থাকাতেই নাকি এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু উৎপাদন হ্রাসের প্রশ্ন যেখানে দেখা দিয়াছে, সেখানে মাল জমিবার কোন কথাই উঠে না। প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের ব্যবসায়ে কালাবাজারী এবং মুনাফাশিকারীরা কঠোরহস্তে দমিত হয়, জনসাধারণ ইহাই চায়।

পশ্চিম বাঙলার বাজেট—

গত ৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৫১—৫২ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। এই ঘাটতি বাজেটের অবস্থা বিবেচনা করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অবস্থার অবনতি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। শ্রীযুক্ত অর্থসচিব স্বাধীনতা লাভ করিবার পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং গঠনমূলক কাজের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় হইতেছে এই দাবী করিয়াছেন। এইদিকে মন্ত্রিমণ্ডলের কৃতিত্বেরও একটা মনোমদ বর্ণনা তিনি প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের সড়ক সংগঠন পরিকল্পনা, দামোদর এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, কৃষি এবং সেচ বিভাগের জন্য কর বৃদ্ধি, সামুদ্রিক মৎস্য সরবরাহের সাম্প্রতিক ব্যবস্থা, ইহার উপর ভারতে অধুনা হরিণঘাটায় দুগ্ধ উৎপাদন এবং পশুপালনের প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্যতা, রাণাঘাট এবং শান্তিপুরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এসব কথাই তাঁহার বক্তৃতায় আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব যাহাই বলুন, সরকারী পরিকল্পনার এই ফিরিস্তি পাঠ করিয়া দেশের লোকে নিশ্চয়ই আত্মতৃপ্তি বোধ করিতে পারিবে না; কারণ, এইসব পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার একটুও উন্নতি সাধিত হয় নাই; পক্ষান্তরে নানাভাবে তাঁহাদের জীবিকা সমস্যা দুর্বহ হইয়া পড়িতেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা যে বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শ্রীযুক্ত সরকার নিজেও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় উদ্বাস্তুদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের সাহায্যের খাতে ব্যয়ের যে বরাদ্দ হইয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিপুল এই উদ্বাস্তু নরনারীর শ্রেণী এখনও স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই জনবলকে জাতির কল্যাণ প্রয়াসে নিযুক্ত করিবার সুপরিকল্পিত চেষ্টা এখনও বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। বাস্তবিকপক্ষে অতীতের ত্রুটি এবং ভবিষ্যতের ভরসার কোন হিসাবেই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান হইবার নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় চার বৎসর শেষ হইতে চলিল, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার অন্তত কিছু উন্নতি ঘটিবে, দেশের লোক এ আশা করিয়াছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে কার্যত তাহারা নিরাশ হইয়াই পড়িতেছে। জনগণের এমন মনোভাবের মনস্তাত্ত্বিক কিংবা দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক অভাব ও অনটনের প্রতিবেশই ইহার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বক্তৃতায় দেশ-বিদেশের বহু তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই সকলের সাহায্যে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহা পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহাদিগের খুব দোষ দেওয়া চলে না। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সতর্কতা, সুবিবেচনা, প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন এ সবই আমরা বুঝি। তৎসত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতির গঠন পরিকল্পনায় যথোচিত দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনানুরূপে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছেন না। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের নীতির মধ্যে সর্বত্রই যেন একটা সংশয় সংকোচের ভাব রহিয়া যাইতেছে। এই মনোভাব তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং দেশের সর্বত্র যাহাতে প্রাণময় সাড়া জাগে—গঠনমূলক কার্যে এমন আন্তরিকতা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।



অন্বেষণ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তোমাকে দেখেছি আমি, হে প্রিয় সুহৃৎ, রাত্রিদিন
কী আনন্দে মগ্ন থাকো, কী প্রগাঢ় নিবিড় বিশ্বাসে
বঞ্চিত-বুদ্ধির জ্বালা ক্রমশঃ প্রশান্ত হয়ে আসে
সমাহিত সান্ত্বনায়, কী পরম প্রার্থনায় লীন
জিজ্ঞাসার সমস্ত যন্ত্রণা; শুভ্রতার অন্তহীন
অপরূপ রৌদ্রময় উন্মোচিত উদার আকাশে
স্বপ্নের মুহূর্তে মূর্ত স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের পাশে
তোমার বিহঙ্গমন আনন্দের পাখায় উড্ডীন।

এখানে বিক্ষত আমি, সারাক্ষণ প্রশ্নের পাথরে
মাথা খুঁড়ি; শান্তিহীন বুদ্ধির আগুনে দুই পাখা
পুড়িয়ে সর্বস্বরিক্ত। তবু শোনো, যে-উত্তর আঁকা
তোমার সহাস্য-শুভ্র শান্ত মনে, আমিও কান্নার
প্রহারে তাকেই খুঁজি, খুঁজি তাকে বিক্ষোভের ঝড়ে,
আমারো এ রক্তঝরা জিজ্ঞাসায় অন্বেষণ তার।

অরুন্ধতী

বটকৃষ্ণ দে

আবারও আজ মেঘের ফাঁকে, অরুন্ধতী
নীল তারাটা উঠলো কেন, ফুটলো বলো---
আবারও আজ ঢেউএর মতো নদীর জল-ও
শোনালো কেন, ছড়ালো বলো আয়ুষ্মতী
এ-সব সুর! এই তারার আলোর তারে
কথার সুর, সুরের নীল জড়িয়ে এলো!
ওই তো দ্যাখো, স্মৃতির বনে কলাবতীর
নরম রং-এ বাতাস কাঁপে সুখ-স্মৃতির
তবু সে-নীড় ভেঙেছে। তবু কেন আবার
বালির বুকে আঙুলে আঁকো ব্যথার নাম—
আবার কেন হাওয়ার মেয়ে আলতো হাতে
আশার সুরে বাঁধলো বাসা? কে তার দাম
চেয়েছে বলো, অরুন্ধতী, এ-সন্ধ্যাতে—
আবার কেন তারার গান, লাল-তারার?

এই যে তারা, অরুন্ধতী, এ-এক সুর,
এ-এক রং-এ আকাশ কাঁপে,—কৃষ্ণচূড়া
উষ্ণ হয়। এ-এক ঢেউ,—সাগর, দূর
সবুজ-রঙা দিগন্তের বাষ্পধূরা
এ-এক মেয়ে। মেয়ের চোখে চকমকিতে
আলোক জেবলে, একদিন তো মন জেনেছি—

তখন কতো স্বপ্ন গেঁথে শিল্পী-আঁখি
এঁকেছি, আহা, অরুন্ধতী,—তখন আমি
জানিইনি তো এই তারার—নীল-তারার,
এতোই ভাব,—ব্যথার আর সব-হারার!

আলোই যদি পাঠিয়েছিলে, শুধাই আজ
অরুন্ধতী, বলো কী ক্ষতি, আলোক দিলে
ছড়িয়ে মনে, যেখানে ভীরু কথার কলি
চোখ মেলে না, তুমি না এলে,—না হয় তারে
সময় ক'রে দু'ফোটা গান, আলোর প্রেম
দিলেই। তাতে একটি প্রাণ জাগেই যদি
অরুন্ধতী, সে তো তোমার, তোমারি দান—
শরীরে তার আঁকা যে নাম, দু'চোখে তার
যে আলো, দাম—সে যে তোমার, তোমার প্রাণ!

তবু তো তুমি দিলে না আলো। বিকেল গেলো,
সন্ধ্যা এলো; সময়-ঝরা বালুর তটে
হৃদয়-ক্ষরা পথের ধুলো সুর মিলালো,—
হারালো আশা, সেই সে ভালোবাসার আলো!
তাই তো বলি আজকে থাক এ-সব গান
সে সব কথা, এ সব সুর, রোমন্থন
আবার কেন জাগাও তারে, অরুন্ধতী—
শীতের পীত পাতার মতো ঝরে যে মন!

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য আমরা Sunglass বা পরকলা ব্যবহার করি। বাজারে এই Sunglass বহুরকম কাচের ও নানা রঙের কিনতে পাওয়া যায়। কাচের রঙের তারতম্যের ওপরই সূর্যের আলো চোখে কতখানি এসে পড়ে তা নির্ভর করে। বাজারে এক নতুন ধরণের Sunglass বার হয়েছে, এই



মেয়েটি চশমার Leverটি ঠিক করছে

Sunglass এর ফ্রেমের তলার দিকে একটা ছোট Lever থাকে সেটা সরিয়ে নাড়িয়ে কাচের রঙকে কম বেশী করা যায়, ফলে সূর্যের আলো ইচ্ছামত চোখে কম বেশী পড়ে।

*

টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখলে আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হতে পারি। শুধু টাকা পয়সা কেন, যে কোন মূল্যবান জিনিস যদি ব্যাঙ্কে রাখা যায় তবেই আমাদের শান্তি। আজকাল আবার গায়ের রক্ত জমা রাখবার জন্যও ব্যাঙ্ক হয়েছে। এই সব Blood-Bank-এর নাম আমরা সকলেই জানি। ব্লাড ব্যাঙ্ক ছাড়াও আজকাল চোখ জমা রাখবার জন্য Eye-Bankও হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম এই আই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এরপরে নিউইয়র্ক শহরে একটা আই ব্যাঙ্ক হয়। এই সব আই ব্যাঙ্কে লোকে চোখ জমা রাখে। অনেকে তাদের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাদের চোখ অপারেশন করিয়ে আই ব্যাঙ্কে দান করে যায়, কেউ বা মৃত্যুর পর মুহূর্তে তার চোখ আই ব্যাঙ্কে দেবার জন্য উইল করে যায়। ফরাসী দেশের এক খুনে আসামী তার ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে তার নিজের চোখ দুটি একজন অন্ধ সৈনিককে দান করে যায়। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এক বইওয়ালা দশ বৎসর অন্ধ হয়ে থাকার পর এই আই ব্যাঙ্কের দৌলতে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। এই বইওয়ালাটি বলে—তার এই দৃষ্টিহীন চোখের বদলে যখন ভাল চোখ লাগান হলো তখন প্রথম সে শুধু মাত্র চোখের সামনে একটা সাদা পর্দা দেখে, তারপর ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলি দেখতে পায় অবশেষে তার শুশ্রূষাকারিণী নার্সটিকে পরিষ্কার দেখতে পায়।

*

পশমী বা রেশমী জামা কাপড় পোকার হাত থেকে রক্ষা করা সত্যিই একটি সমস্যা হয়ে উঠেছে। অনেক সময় ন্যাপথলিন দিয়েও রক্ষা করা যায় না। ন্যাপথলিন ছাড়াও আমরা তামাক-পাতা, কালোজিরে, শুখনো লঙ্কা ইত্যাদি অনেক কিছুই ব্যবহার করি। সময় সময় রোদে দিয়ে দেখা হয়: কিন্তু কিছুই যেন কার্যকরী হয় না। একদল বৈজ্ঞানিক বর্তমানে এর একটা উপায় বার করেছেন। তারা ক্রমান্বয়ে তিন বছর ধরে এই পরীক্ষা করে, তবে কৃতকার্য হতে পেরেছেন। ডি ডি টির সঙ্গে 'ক্লোর্ডেন' নামক পদার্থ মিশিয়ে এই রসায়ন দ্রব্যটি তৈরী হয়। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—এই তরল রসায়ন পদার্থটি কোন কাপড়ের ওপর খুব ভাল করে ছিটিয়ে দিয়ে সেই কাপড়টি পোকা ধরার উপযোগী কোনও জায়গায় রাখলেও এক বছরের মধ্যে কোনও রকম পোকাই এই কাপড়ের কোনও ক্ষতি করতে পারে না। এরপর এই সব কাপড় দিয়ে জামা কাপড় তৈরী করে সেগুলো যদি সাধারণভাবে আলনা আলমারীতে রাখা যায় তাহলে অন্তত দু বছর পোকা ধরে না। এই পরীক্ষার জন্য ৫০০০ গজ পশমী কাপড় আর ১২০০ গরম প্যাণ্ট নষ্ট করা হয়েছে।

*

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরণের কালো কাঁচ আবিষ্কার করা হয়েছে, যেটা সূর্যের থেকে তাপ সংগ্রহ করে ঘর গরম রাখতে পারে।

*

বর্তমানে খাদ্য সমস্যার ফলে মানুষ অনেক কিছু খেতে শিখেছে এবং শিখছে। শুখনো আলু, মিশরীয় শুখনো খেজুর, ডিম-পাউডার ইত্যাদি। খাদ্য গবেষণাকারিগণ, যাতে সঙ্কটের সময় খাদ্যের অভাব না হয় তার জন্য অনেক গবেষণা করছেন। তারা এই সব খাবার গুড়ো করে রাখার ব্যবস্থা করছেন। এরা আঙুরের পাউডার তৈরী করে দেখেছেন যে, এই পাউডার গুলে খেলে টাটকা আঙুরের রসের মত খেতে লাগে আর টাটকা আঙুরের সমস্ত উপাদান-গুলিও এতে থাকে। এ ছাড়া মটরশুটি, টোম্যাটো, মিষ্টি আলু ও কমলা লেবু প্রভৃতির পাউডার করে দেখা গেছে যে, এগুলি বেশ কার্যকরী হয়। তবে কমলা লেবুর পাউডার করতে বেশ একটু কষ্ট পেতে হয়েছে। কারণ এতে লেবুর আসল গুণটি বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়।

*

প্রাণীদের জীবনযাত্রা প্রণালী বড় বৈচিত্র্য-ময়। দক্ষিণ আমেরিকার বনে শ্লথ নামে একরকম স্তন্যপায়ী জন্তু দেখা যায়; এরা পাখী নয় কিন্তু গাছেই বসবাস করে। এদের দেখতে



একটি শ্লথ কেমন "বাদুড় ঝোলা" হয়ে রয়েছে

অনেকটা ভাল্লুকের মত। এদের বিশ্রামের প্রয়োজন হলে এরা গাছের ওপরই বিশ্রাম করে। মাথাটা নীচের দিকে করে কোনও একটা ডাল ধরে শরীরটা গাছের ডালে ঠেসিয়ে 'বাদুড়-ঝোলা' হয়ে থাকে। শ্লথেরা এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাবার সময় এমনি করে মাথাটা নীচের দিকে রেখে ঝুলে ঝুলেই যায়। ডালের ওপর পা রেখে এরা চলতে পারে না। এদের পায়ের গঠন এমন যে, এরা মাটির ওপর পা ফেলে হাঁটতে পারে না, সেইজন্য এরা কোনও সময়ই গাছ থেকে মাটিতে নামে না।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরা এইভাবে গাছের ডালে ডালেই কাটিয়ে দেয়। এদের পায়ের ডগার কাছে দু' তিনটি বড় বড় বাঁকানো আংটার মত নোখ থাকে। এই নোখের সাহায্যেই এরা গাছের ডালে ঝুলতে পারে।

এই সব শ্লথেরা অত্যন্ত নিরীহ জীব এরা গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই খায় না। এরা খুব ধীরে ধীরে চলে, খায় ধীরে ধীরে এবং এমনি করে ধীরে সুস্থে অনেক কাল বাঁচে।

*

পৃথিবীতে উৎপন্ন আঙুরের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ আঙুর দিয়ে মদ তৈরী হয় ১১ ভাগ কাঁচা খাওয়া হয় আর মাত্র ৫ ভাগ শুখিয়ে কিসমিস মনাক্কা তৈরী হয়।

পুস্তক পরিচয়

শিবরাম চক্রবর্তীর সেরা গল্প—প্রকাশক : চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প শুধু শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় বাঙলা রসরচনার আসরেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত। ছোটদের গ্রন্থাবলী সিরিজের শিবরাম চক্রবর্তীর সেরা গল্পের সঙ্কলন তাই আমাদের ভাষায় একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসরচনা সঙ্কলন। তাঁরলেখা "মন্টুর মাষ্টার" বা "কলকাতার হালচাল"এর সঙ্গে পরিচয় নেই, এরকম সাহিত্য-রসিক এদেশে খুব কমই আছেন। এই বইয়ে 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসটি ধরে ১৫টি লেখা আছে। "শিশুশিক্ষার পরিণাম", "প্রকৃতি-রসিকের রসিক প্রকৃতি", "অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ" তারপর "কালান্তক লালফিতে" প্রভৃতি সব কটি গল্পই উঁচুদরের রসসৃষ্টি। "অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ" গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন বাংলা ছোট গল্প সঙ্কলনে এই গল্পটি এবং শিবরাম চক্রবর্তীর অন্য আরও গল্পের স্থান পাওয়া উচিত।

হাসির গল্প লিখতে পারলে যেমন সহজেই মন কেড়ে নেওয়া যায়, হাসির গল্প লেখা কিন্তু তেমন সহজ নয়। রসিকতার প্রধান গুণই হল স্বতঃস্ফূর্ততা। ঘটনাচক্রে আপনা থেকে এসে যাওয়া। হাসির গল্প হালকা গল্প হলেও সেই লঘুতার সীমা মেনে চলা খুব কঠিন। এই মাত্রা ঠিক রেখে চলা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ শিবরাম চক্রবর্তী নিজেই। শিবরামবাবুর মত শ্রেষ্ঠ রসিকও সময় সময় এই মাত্রা মেনে চলতে পারেন নি। তাই কোন কোন জায়গায় একটু loud মনে হয়।

শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর গল্পের ভঙ্গীতে আর বিষয়ে দুদিকেই নতুনত্ব এনেছেন। তাঁর গল্প বলার রীতির প্রভাব আজকাল অনেক লেখকের ওপরেই পড়েছে। বিশেষ ক'রে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বৈচিত্র্য, জোর দেবার জন্য দ্বিতীয়বার ব্যবহার, তাঁর লেখার ভঙ্গীর আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এছাড়া আছে শিবরামবাবুর Pun করার ক্ষমতা। তাঁর এই ক্ষমতার অপব্যবহারও শিবরামবাবুর দোষ। Punning-এর মজাই হল তার আকস্মিকতায়। কিন্তু এই বইয়ের কয়েক জায়গায় অনাবশ্যক কষ্টকল্পিত Pun পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। গল্পবলার বেলায়ও একই ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি ক্লান্তিকর। তবে এরজন্য শিবরামবাবুর অনুকারকরা অনেকটা দায়ী।

এখানে যে এই কয়টি দোষ দেখান হ'ল তার কারণ শিবরামবাবুর মত উঁচুদরের রসসাহিত্যিকের এই দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। এই বইয়ের গল্প-গুলিযে কত ভাল তার ব্যাখ্যা করা যায় না। পড়ে উপভোগ করতে হয়। বহুবার পড়লেও, হাসি ফুরোতে চায় না। অনেকে হাসির খোরাক হিসেবে অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্য নেন। অনেকে আবার অসম্ভবের দেশের কল্পনা করেন। শিবরামবাবু এর একটাও করেন নি। তাঁর গল্পে এমনি সাধারণ জীবনেই কত মজার জিনিস ঘটতে পারে, অসম্ভব সম্ভব হতে পারে—তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই মজা বা Pun-ই হ'ল তাঁর লেখার অবলম্বন। তাই তাঁর গল্পের অবিমিশ্র আর অজস্র হাসির খোরাকে ছোট বড় কোন পাঠকেরই যোগ দিতে বাধা হবে না। বইটি উপভোগের পর প্রত্যেক সাহিত্যরসিকই শিবরাম চক্রবর্তীকে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প লিখিয়ে ব'লে স্বীকার করে নেবেন। শ্রীশৈল চক্রবর্তীর ছবিগুলিও গল্পের রসের উপযোগী হয়েছে।

প্রকাশককে বইটির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, বইটির বহির্দৃশ্য যে ভাল হয়নি, সে কথা মনে করিয়ে দিই।

বন্ধু চেনা বিষম দায়—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। প্রকাশক : রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

শিবরামবাবু ছোটদের জন্য যে সব গল্প রচনা করিয়াছেন তাহারই কতকগুলি একত্র করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে। ইহাতে ষোলটি সংকলিত এবং প্রথম গল্পের নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। সংগৃহীত গল্পগুলি কোন না কোন পত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শিবরামবাবুর গল্প বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। তাঁহার এই ভঙ্গী, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, সর্বোপরি 'পান্' করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা—গল্প-গুলিকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। আলোচ্য পুস্তকের গল্পগুলিও সরস ও আনন্দদায়ক, ছেলে-মেয়েরা ইহাতে প্রচুর হাস্যরসের সন্ধান পাইবে। শৈলবাবুর রেখা চিত্র পুস্তকখানাকে আরও জীবন্ত ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ৩৮।৪৯

The Economic Weekly, Annual Namber 1951. Editor, Sri Sachin Chaudhuri, 15-16, Tamarind Lane, Fort, Bombay. Price 1|8.

পত্রিকাখানিতে প্রতি সপ্তাহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চলতি ঘটনাসমূহের সংবাদ ও আলোচনা এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থাকে। পৃথিবীর সকল প্রধান সহর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ পরিবেশন করার জন্য পত্রিকাখানি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। সম্পাদকীয় আলোচনার একটি বিশিষ্ট ধারা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে কোনও পক্ষাপক্ষ সমর্থন করা হয় না। উপরন্তু যাহা দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহাই নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা হয়। ভারতের সাধারণতন্ত্রের প্রথম বর্ষ লইয়া প্রথম প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যাখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অতীত ভুলভ্রান্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ নহেন। ভারতের আর্থিক অবস্থা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, স্বল্প পরিসরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে; ইহা লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। জগতে বিবদমান দুই প্রধান মতবাদের মধ্যে ভারতের মধ্যস্থতা ও তাহার ভবিষ্যৎ ফলাফল ও কার্যক্রম সুন্দরভাবে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বিবিধ প্রবন্ধে জাতীয় আয়, পাটের অবস্থা, কালোবাজার, বিদেশী মূলধন প্রভৃতি লইয়া প্রচলিত মতবাদের বিভিন্ন দিক হইতে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। শেয়ার মার্কেট, শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যাদির অনটন দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সুনির্বাচিত চুম্বক থাকায় ইহা বহু তথ্যপূর্ণ হইয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক মঙ্গলে স্বার্থবান লোকমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত গান্ধীবাদ—শ্রীহরিনন্দন ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত। লেখক কর্তৃক অহিংস আশ্রম, সিংহাবাদ পোঃ, মালদহ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৵—।৵০ ও ১—৫৮। মূল্য ৷৷০ আনা।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা নিজেদের জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যার সীমা নাই। কিন্তু তবুও মনে হয় ঋষিকল্প মহাপুরুষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শ হইতে অনেকেই বিচ্যুৎ হইয়াছেন। অথচ তাঁহার নাম লইয়া এই পথে চলিতেছেন। তাহার প্রধান কারণ মহাত্মাজীর কর্মনীতি সম্বন্ধে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নাই এবং তাঁহার পুস্তকাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দৈনন্দিন জীবনে সেই আদর্শ পালন করিবার ধৈর্য রাখেন না। লেখক তাঁহাদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য "সংক্ষিপ্ত গান্ধীবাদ পুস্তকের ব্রত খন্ড" প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সত্য, অহিংসা, অভয়, ব্রহ্মচর্য, অস্বাদ, অচৌর্য, অপরিগ্রহ, শরীর শ্রম, স্বদেশী, স্পর্শদোষ, সর্বধর্ম সমভাব ও নম্রতা বিষয়ে গান্ধীজীর মতের সারাংশ গ্রহণ করিবার পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ সহায়তা করিবে।



শ্রীরাধা-বিনোদ মন্দির

আনুমানিক সাতশ' বছর আগে গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের সঙ্গে যেমন যুক্ত হয়ে আছে কোমলকান্ত পদাবলী, তেমনি যুক্ত হয়ে আছে কেন্দুবিল্ব।

বীরভূম জেলার ছোট একটি গ্রাম। সংক্ষেপে কেন্দুলী বলেই এর পরিচয় হয়তো কিছু বেশি। কিন্তু গ্রামের কাছে গিয়ে জানা গেল, এর নাম জয়দেব-কেন্দুলী, অথবা কেবল জয়দেব।

শহরের সঙ্গে যোগ এর খুব বেশি নয়। বৎসরান্তে একবার এখানে জনসমাবেশ হয়, বাঙলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন স্নানী ও পুণ্যার্থীরা আসেন, তেমনি সন্নিকটের গ্রাম থেকে লোকজন এসে জড়ো হয় এখানে। এই সময় জয়দেব-কেন্দুলী লোকারণ্যে পরিণত হয়।

প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির দিন এখানকার স্মরণীয় দিন। এই সময় কেন্দুলী পরিণত হয় এক তীর্থে। দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে যাত্রী এসে এখানে সমবেত হন। কেন্দুলীর পৌষ-মেলা বাঙলার এক বিখ্যাত মেলা। অন্যান্য নানা রকমের মেলা থেকে এর পার্থক্যও আছে। এই মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে বাউল-সমাবেশ। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাউলের দল এসে এখানে উপস্থিত হন এই দিনটিতে। সাতদিন ধরে মেলা চলে; সেইসঙ্গে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অশ্বত্থ বট ও পাকুড় গাছের নীচে বাউলদের গান বিভিন্ন সুরে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

কেন্দুলীর এই মেলার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু এর তেমন প্রচার নেই। এই কারণেই এখানকার মেলাতে যাওয়ার পথ সম্বন্ধে খোঁজ পাওয়া অনেকটা দুরূহই। কলকাতা থেকে কোন্ রাস্তায় যাওয়া সুবিধে তার খোঁজ-খবর নিয়ে যেটুকু জানা গিয়েছিল, তার থেকে আমরা ঠিক করলাম যে, শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চেপে সাঁইথিয়ায় নামব, সেখানে গাড়ি বদল করে দুবরাজপুরে নেমে বাস্ নেব।

শিয়ালদহ-দিল্লী এক্সপ্রেসে রাত দেড়টা নাগাদ সাঁইথিয়ায় নামলাম। কনকনে শীত। কম্বল-মুড়ি দিয়ে ঘণ্টা চারেক প্ল্যাটফরমে কাটিয়ে দুবরাজপুরের ট্রেনে উঠে সকাল ছটায় দুবরাজপুর স্টেশনে এলাম। ভেবেছিলাম, স্টেশনেই বাস্ পাব, কিন্তু বাস্ নাকি ছাড়ে বাজার থেকে। স্টেশন থেকে বাজার দেড় মাইল রাস্তা। ঘোড়ারগাড়ি ছিল, গাড়ি চেপে বাজারে এসে শুনলাম, এ বছর বাস্ সার্ভিসের অনুমতি পাওয়া যায় নি। স্টেশনে ফিরে এসে উখরার টিকিট কাটলাম। বেলা দেড়টার সময় উখরা থেকে বাস্ পেলাম। ঘণ্টাখানেক বাদেই আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল অজয়ের এপারে।



অজয়ের বালুকাময় বুক অতিক্রম করে যাত্রীরা মেলায় আসছে



অজয়ের বারো আনাই বালু, চার আনা জল। ওপারে বর্ধমান এপারে বীরভূম

এপার বর্ধমান, ওপার বীরভূম। অজয়ের ঠিক ওপারে নদীর কিনারেই কেন্দুলী। এপারের বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম কাতারে কাতারে লোক। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা গরুর গাড়িতে অজয় পাড়ি দিচ্ছে।

নদী নয়, ঠিক যেন মরুভূমি। বালির অরণ্য বলা যায়। সেই অরণ্যের মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল—আখ, আকন্দ ও কাশ।

দলে দলে লোক কেউ মেলা থেকে ফিরে আসছে, কেউ বা মেলার দিকে চলেছে। যারা ফিরে আসছে, তারা সব কাছেভিতের মানুষ। সকালের দিকে তারা মেলায় গিয়ে জোটে, দুপুরে বা বিকেলের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু মেলায় গিয়ে কয়েকটা দিন কাটাবার মত লোকের সংখ্যাও কম নয়।

অজয়ের এপারেও ছোটখাট একটা মেলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নানা জায়গা থেকে যাত্রী-বোঝাই বাস্ হরদম এসে পোঁছুচ্ছে। অনবরত যাত্রী নামছে। বাস্ থেকে নেমেই তারা ঢুকছে দোকানে—সোডা-লিমনেড, চা-পান, দধি-সন্দেশ নানারকমের দোকান গজিয়ে উঠেছে এখানেও। রাঙা ধুলো উড়িয়ে বাসেদের যাতায়াতের বিরাম নেই। বাস্এর সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা—জয়দেব। কোন বাস্ আসছে উখরা থেকে, কোনটা বর্ধমান থেকে, কোনটা আসানসোল, অন্ডাল, দুর্গাপুরে বা পানাগড় থেকে। কলকাতায় আপিসের সময় চৌরঙ্গীতে যেমন ট্রাম-বাসের ভিড় আর হৈ-চৈ, এই নিভৃত গ্রামের এই কোণটি এই সময় তেমনি সরব ও সচেতন হয়ে ওঠে। দোকানে দোকানে বাজছে রেডিও। তাতে সেই চেনা সুর আর চেনা গলা—কলকাতার প্রোগ্রাম বাজছে, অনুরোধের আসরের কলের গান। এই নিভৃত পল্লীতে এসেও এই সুর শুনে কানে তা বড় বেসুরো বাজতে লাগল, কিন্তু সে অন্য কথা।

এখানে আসবার এত রাস্তা আছে জানলে আমরা হয়তো এতটা ঘুর-পথে আসতাম না; কেন্দুবিল্বের তত যে প্রচার নেই, আগেই বলেছি। এইজন্যে হয়তো আরো অনেককে এমন দুর্ভোগে ভুগতে হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়েছে যে, কোনরকম প্রচার না থাকাতেই যদি এই ভিড়, সামান্য প্রচারের ব্যবস্থাও যদি থাকত, তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াত কেমন!

লোকে বলে, গুণের আকর্ষণ



অশ্বত্থ পাকুড় আর বটের জটলায় পল্লীগীতির আসর



বীরভূমের বিখ্যাত বাউল ফটো—অজিত সোম

নাকি একেবারে আলাদা আকর্ষণ। সাধারণ মেলার একটা টান থাকে বটে, সেটা পণ্যের টান। মেলায় নানা পণ্য এসে জমে, তাই ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার আকর্ষণের সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ একটা আছে, সে আকর্ষণ হচ্ছে বাউল। এই নেপথ্যবাসী গ্রাম্য গুণীদের টানেই চারদিক থেকে এত লোক যে জমেছে, সেটা অনুভব করছিলাম, অজয়ের এপারে উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে। পিছনের দোকানে সস্তা রেডিওতে কলের-গানের কর্কশ আওয়াজ বাজছে একটানা, মোটরের ধুলোয় আর হর্নে চারদিক ধূসরিত আর মুখরিত। তবু মনে হতে লাগল, অজয়ের ওপারে ওই যে দেখা যাচ্ছে মানুষের মিছিল, ওরাই নিভৃতে টুংটুং শব্দে বাজছে কাদের যেন একতারা।

বাঁধ থেকে নামলাম অজয়ের বুকে। মরুভূমির মত এই বুক, কিন্তু নিভৃতেও আছে অন্তঃসলীল। মাঝে মাঝে ভিজে বালির মধ্যে পা ডুবে যেতে লাগল। নদীর বারো আনাই বালুতে ভরতি, শেষের চার আনা জল। হাঁটুও ডোবে না, কিন্তু স্রোত আছে। জুতো হাতে নিয়ে জল পার হলাম। তার পর খাড়াই-টুকু উঠেই পৌঁছে গেলাম কেন্দুলীতে—জয়দেবে।

মেলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপলে খুব বড় মেলা বলে হয়তো একে গণ্য করা যাবে না; কিন্তু লোকসমাগম মেলার তুলনায় বেশি। তিনটে সার্কাস-পার্টি এসেছে, দুটো ম্যাজিক-দল, মোটর-সাইকেলের খেলা দেখাবার জন্যে চিমড়ে চেহারার একজন বর্মী। তাছাড়া আছে দোকান আর দোকান। দশ হাত অন্তর তেলে-ভাজা আর চায়ের দোকান। ধামা, কুলো, চুপড়ি, বাক্স-তোরঙ্গ, খেলনা, পুতুল, খাবার, জাঁতি, কাঁচি, হাতুড়ি, বাটালি—না আছে এমন জিনিস নেই। আর সবচেয়ে বড় হয়ে জেঁকে বসেছে যে জিনিস, তা হচ্ছে কলা—কলার কাঁদি। অজয়ের বুক থেকে উঠে মেলায় ঢুকতেই রাস্তার দু'পাশে চাঁচের বেড়ার সারি সারি ঘর—সব কটাই কলার কাঁদিতে ঠাসা।

এখন মেলার সময়, লোকে তাই লোকারণ্য। কিন্তু এখানে লোকের বসতি খুব কম। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে অবশ্য নানা জাতির লোক আছে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, অগ্রদানী, তাম্বলী, কামার, নাপিত, ছত্রী, বৈরাগী, শুঁড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগ্দী, হাড়ি, বাউড়ি ইত্যাদি। এখানে মন্দির আছে একটি। এই মন্দিরে যে বিগ্রহের পুজো হয়, তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই গদীর একজন মোহান্ত আছেন। এখানকার জমিদারী ও অন্যান্য দেবোত্তর সম্পত্তির আয় নাকি খুব সামান্য নয়। অর্থাৎ যা আয় হয়, তার থেকে অনায়াসে চতুষ্পাঠী চালানো যেতে পারে। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা নেই, হয়তো যোগ্যতর পরিচালক বা মোহান্তের অভাবের দরুণ এমন হয়ে থাকবে। কোন চতুষ্পাঠী তো নেইই, এমন কি জয়দেবের কেন্দুবিল্বে শ্রীগীত-গোবিন্দ পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাও নেই। এর জন্যে অনেককেই আক্ষেপ করতে শোনা যায়; কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রবর্তন কিভাবে করা যেতে পারে, সে বিষয় আলাপ-আলোচনা বিশেষ শোনা গেল না। রাধাবিনোদের মন্দিরেরও সংস্কার আবশ্যক।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে পা দিয়েই এই কথাগুলি বার বার মনে হতে লাগল। এত দোকানপাট এবং এত লোকের ভিড় দেখে ভাবছিলাম, এখানে এত লোকের সমাগম যাঁকে উপলক্ষ্য করে, তাঁর সঙ্গে এই জনতার কোন পরিচয় আছে কি না। জয়দেব ব্যক্তিটি কি ছিলেন, কে ছিলেন এবং কেন ছিলেন—এই সংবাদটি এদের জানাবার কোন ব্যবস্থা নেই কেন? কেবল দেখলাম, মেলার এক পাশে এক খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় দড়ি টাঙিয়ে জয়দেবের পুঁথির বটতলা-সংস্করণ ঝোলানো আছে। কিন্তু লোকের ভিড় সেদিকে নেই। ওর জন্যে দায়ী অবশ্য লোকেরা নয়, এর জন্যে দায়ী অনেক পরিমাণে মন্দিরাধ্যক্ষ। এইসব ভেবে মন বিষিয়ে উঠছিল; কিন্তু হঠাৎ কিসের মিষ্টি আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হলাম।

রাধা-কৃষ্ণের দল। বাচ্চা একটি ছেলে কৃষ্ণ সেজেছে, মাথায় চূড়া, এক হাতে রূপোর মোহন-বাঁশি, আর এক হাতে একটি থালা। দলে আর যারা আছে, তাদের একজন বাজাচ্ছে জুড়ি বাঁশি, একজন মৃদঙ্গ, একজন মাদল, একজন করতাল। মৃদঙ্গ-করতালের আওয়াজটা তেমন রোমাঞ্চকর নয়, যেমন জুড়ি বাঁশিটা। এই বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে রাধা-কৃষ্ণের দল মেলা

প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। মেলার নানা কোলাহল ছাপিয়ে জুড়ি বাঁশির শব্দটা মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করল যেন হঠাৎ।

এখান থেকে দেখা যায় মেলার অন্যদিকে অজয়ের তীরে নৈবেদ্যের মতন সার সার কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরে কাছে গিয়ে দেখেছি ওগুলি তাঁবু। যাঁরা দূরে থেকে এসেছেন, কেন্দুলীতে দিনকতক কাটাবার যাঁদের ইচ্ছে, তাঁরা শীতের রাত কাটাবার সরঞ্জাম হিসেবে তাঁবু বয়ে নিয়ে এসেছেন। সেই তাঁবু খাটিয়ে তাঁরা বাস করছেন এখানে। এরই কাছে দেখা গেল গরুর গাড়ির সমাবেশ। এক-একটা গাড়ি এক একটা সংসার। সপরিবারে যাঁরা কিছু দূরের গ্রাম থেকে এসেছেন, তাঁরা এই গরুর গাড়িকেই করে নিয়েছেন তাঁদের আস্তানা। কাচ্চাবাচ্চা বৌ-ঝি সমেত পুরো সংসারটাই উপড়ে এইসব গরুরগাড়িতে বোঝাই দিয়ে আনা হয়েছেন যেন এখানে।

এইটেই এই মেলার বিশেষত্ব বলে বোধ হল। শহর আর গ্রামকে একসূত্রে বাঁধা হয়েছে এখানে। তাই ওপাশে তাঁবুর মিছিল, আর তারই একপাশে গরুরগাড়ির এই নিশ্চল প্রসেশন। শহরের সঙ্গে গ্রামের গৈরিক যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গেরুয়া আলখাল্লা-পরা দরিদ্র আর নিঃস্ব বাউলেরা মেলার একটি প্রান্তে এসে বসেছে। পৃথিবীর সঙ্গে বছরে এই একবার যেন তাদের দেখা-শুনো। এ বছর বাউলের সংখ্যা অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক নাকি কম হয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করি নি। তবে শুনেছি, বাউল নাকি ক্রমে ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এর পিছনে অর্থনৈতিক কারণ থাকা খুব স্বাভাবিক। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যাঁরা এই মেলায় এসেছেন, তাঁদের কাছে বাউলদের ও বাউল-গানের যে গল্প শোনা যায়, তা যে অচিরে কাহিনীতে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙলার এই সম্পদ কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে, বাঙলার সে বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক।

জন-আটেক বাউল এবার দেখলাম। তাঁদের গানে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু মোহিত হওয়া গেল না। বাঙলার যে সব বাউল তাদের পল্লী-জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা থেকে নেহাৎ সহজ ভাষায় গেয়ে গেছেন

"কাজলে আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে।
প্রেম যদি না মিলল খ্যাপা
(ও তোর) সাধন পূজন কদিন রাখে?"

সেসব বাউল কি আজ আছে?

শীতের রাত। আকাশ চুয়ে যেন হিম নামছে। আখড়ায় আখড়ায় মৃদঙ্গ আর করতাল বাজছে, আর হচ্ছে নাম সংকীর্তন। কোথাও শোনা যাচ্ছে কথকতা। দিনের আর রাতের মধ্যে একটা ভীষণ রকমের পার্থক্য দেখা গেল। দিনের আলোতে দোকানে দোকানে চলেছে পণ্যের বেসাতি; রাত্রের অন্ধকারে পণ্যের কথা সকলে ভুলে গিয়ে এসে জড়ো হয়েছে সংগীতের আসরে।

অশ্বত্থ পাকুড় আর বটের জটলা যেখানে, সেইখানে জড়ো হয়েছেন সাধু ফকির আর বাউলের দল। ছোট ছোট দল। ধুনি জ্বলছে, সেই আগুন ঘিরে বসেছে এক এক জায়গায় পাঁচ বা সাতজন। বুড়ো বাউল উঠে দাঁড়িয়ে আলখাল্লা সমেত নেচে উঠছে আর গাইছে—

যে জন প্রেম জানে না ভব-কানা
বদ-রসিক হয় সে জনা।
পেটুক হংস হইছে যারা
তারা খায় আগড়া-বাগড়া
রসিক হংস হলে পড়ে
ক্ষীর ফেলে নীর ছুঁবে না।

উবু হয়ে বসলাম বাউলের আসরে। একটু পরেই ভালো হয়ে বসার জায়গা পাওয়া গেল। বুড়ো বাউলের গলার জোর কম, তবুও উৎসাহের আতিশয্যে সে তার দুর্বল শরীর দুলিয়ে নাচতে লাগল—

চাতক যেমন কেঁদে মরে
পিপাসায় প্রাণ যায় গো
সমুদ্রে সে পান করে না।
ভেক কি জানে পদ্ম-মধু?
বদ-রসিক হয় সে জনা।"

রাত বারোটা বা একটা বেজে যায়। এই গাছের জটলার নীচে যেন জীবনের সব জটিলতা নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে যায়। ধুনির নীচে নিস্তেজ উত্তাপে যেমন শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে, দুর্বল রচনার এই দুর্বল গানও মনকে তেমনি তাতিয়ে তোলে, মাতিয়েও দেয় হয়তো।

সেখানে কে উঠে দাঁড়াতেই কানে এলো কাঁচ গলার কীর্তন। কিন্তু পথ-চলা যে দায়, পা ফেলার জায়গা নেই। তবু ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক ক্ষুদে কীর্তনীয়া ক্ষুদে খোল কোল পর্যন্ত ঝুলিয়ে গাইছে দেহতত্ত্ব। এ তত্ত্ব সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা থাকা সম্ভব নয়, কেননা সে নেহাত কাঁচ এবং নেহাতই কাঁচা। কিন্তু গানে তার গলার যে দরদ ফুটে উঠছিল তাতে মনে হল সে যেন সব তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও পরিচিত। ক্ষুদে কীর্তনীয়া একা আসে নি, তার মা মাসি পিসি সঙ্গে আছেন। পয়সা-কড়ি যা সে পাচ্ছিল তা পিসিকে ডেকে জমা দিয়ে দিচ্ছিল।

ছেলেটির গান শুনে তার ওপর শ্রদ্ধাই হল। কিছু দেবার আগে সংকোচ হচ্ছিল। বুঝে পাচ্ছিলাম না, কত দিলে ওর মর্যাদা হানি হবে না। গেরুয়া কাপড়ের টুপী মাথায় গেরুয়া কাপড়পরা এক আধ-বুড়ো ভদ্রলোক বসে বসে গান শুনছিলেন, আর তারিফ করছিলেন এই বালক-কীর্তনীয়াকে। একটা গান শেষ করে যখন সে বসল, তখন গেরুয়াপরা ভদ্রলোকটি আদর করে ছেলেটিকে কোলে টেনে বসালেন। তার গানের অপর্যাপ্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, এই নাও বাবা। এর থেকে দু পয়সা তুমি নাও, আর চট করে আমার জন্যে দু পয়সার বিড়ি এনে দাও।



মেলার উপকণ্ঠ। গরুর গাড়িই ঘর-বাড়ি

চমকে গেলাম। এই কীর্তনীয়াকে বিড়ি আনার ফরমাশ তাহলে করা চলে? তাই যদি করতে হয় তাহলে তার গলার এত তারিফ না করাই ভালো ছিল বলে কেন যেন আমার মনে হতে লাগল। যে সংকোচে সংকুচিত হচ্ছিলাম, সে সংকোচ আমার কেটে গেল। বালক-কীর্তনীয়ার হাতে একটা আনি গ‍ুঁজে দিলাম। কিন্তু তার গানটা মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে লাগল—

কই রইল সুজন-মিস্তিরী
মন অব্যাপারী।
মন উহারে বিনে কাঠে বিনে লোহায়
নাও গড়াইল চোদ্দ পোয়ায়
মুড়া গোছা দিয়ে দুখান সারি।
রজে-বীজে জরিপ দিয়ে দশ মাসে তৈয়ারি।
কই রইল সুজন-মিস্তিরী।
মিস্তারী তরী গড়ায়ে
তরীতে আছে লুকায়ে
এক নৌকাতে এক জাগাতে
চিনিতে না পারি।
গোঁসাই বলে কথা ধর
সেই মানুষের সঙ্গ কর
বেলা মোটে আছে দণ্ড চারি।
কই রইল সুজন-মিস্তিরী।
ভাঙা নৌকায় সারাই দিয়ে
ধরবি ভবের পাড়ি।

এই এক বালক সেদিন মাতিয়েছিল আসর। তার কথা আজ মনে পড়ে। এই বালক-কীর্তনীয়া হয়তো বাউলদের সঙ্গে সঙ্গে একদিন উহ্য হয়ে যাবে—কেন যেন এমনি আতঙ্ক হল। কেবলই মনে হতে লাগল কোলের ওপর থেকে খোল ফেলে দিয়ে ওকে হয়তো দুর্জনের ফরমাশ খেটেই বেড়াতে হবে এরপর। তাকে রক্ষা করার জন্যে কোনো সুজন-মিস্ত্রীর সন্ধান হয়তো আর পাওয়া যাবে না সেদিন।

ঘুমহীন রাত। দিনের বেলাকার মেলায় যে উন্মত্ত কোলাহল শোনা যায় রাত্রের মেলায় তা নেই। কিন্তু রাতের এই মেলাটাই আসল মেলা; এইটেই জয়দেব মেলা। গীতগোবিন্দের কবি যে কান্ত পদাবলী দিয়ে কেন্দুলীকে একদিন ভাব-বিহ্বল করেছিলেন সে বিহ্বলতা আজ না থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর গ্রাম যে আজও মধুর পদাবলী দ্বারা মুখরিত হয়—এইটেই বড় কথা—

তুমি হলে আপন জাতি
তোমা ছাড়া সকলি অলীক
তুমি হে মালিক।
পরাণের পরাণ তুমি
কৃপাবিন্দু বিতর খানিক।
মনের কথা কইব দুটো
দাঁড়াও হে খানিক।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। বাউলের মনের কথা শোনার জন্যে আর দাঁড়ানো গেল না। পিছন থেকে বাজতে লাগল তার একতারা, সেখান থেকে চলে এলাম ডেরায়। *

---

*বাউলের ফটো ছাড়া অন্যান্য ফটোগুলি অনিল মিত্র কর্তৃক গৃহীত

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

...আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রস্তরের আঘাতেই একটা বড় ছাগলকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ছাগলটা মরে নাই। তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার আর্তস্বর পার্বত্য বনস্থলীকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। আমার অন্তরে পুলক সঞ্চারিত হইতেছিল, আমি আশা করিতেছিলাম, আমার অদর্শনে নিনানির মনে যদি কোনও ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়া থাকে এই পুষ্ট দেহ বন্য ছাগটি তাহা নিশ্চয়ই নিঃশেষে বিদূরিত করিবে। সে যখন প্রসন্ন হইবে তখনই শিলাঙ্গীর সহিত বিবাহের প্রসঙ্গটা তাহার নিকট উত্থাপন করিব। সমস্ত কথা শুনিয়াও কি সে আপত্তি করিবে? হয়তো সে মুখে কিছুই বলিবে না, কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, তাহার অনুরাগ-ভরা চাহনি, আবদার-মাখা ওষ্ঠভঙ্গী নীরব ভাষায় হয়তো এমন কিছু বলিবে যে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িব। শিলাঙ্গী আমার মনের কথা বুঝিয়াছে, তাহারও প্রথমে ইচ্ছা ছিল না যে আমি একাধিক স্ত্রীর সহিত যুক্ত থাকি, কিন্তু এখন সে মত পরিবর্তন করিয়াছে। বলিয়াছে, আমি যদি নিনানিকে বিবাহ করি তাহাতে সে আপত্তি করিবে না, নিনানিকে সে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নিনানিই বা শিলাঙ্গীকে সহ্য করিবে না কেন? নিনানি অবুঝ, তাহাকে বুঝাইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক বুঝাইতে হইবে যে, শিলাঙ্গী যদিও আমার জীবনে অপরিহার্য কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও আমি থাকিতে পারিব না। তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, শিলাঙ্গীকে আমি বাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলপতি ধবলের আদেশে বিবাহ করিতেছি কিন্তু আমি তাহাকেই ভালবাসি। শিলাঙ্গী নামে মাত্র আমার পত্নী থাকিবে নিনানিই হইবে আমার হৃদয়েশ্বরী। এই সব তাহাকে বুঝাইতে হইবে। কত কথাই সেদিন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা আশঙ্কা-সংশয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—নিনানি আমার প্রস্তাবে রাজি হইবে। সে রাগ করিবে, কাঁদিবে, অসম্মত হওয়ার ভাণ করিবে, হয়তো আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হইবে সে।

যক্ষিণীর গুহার নিকটবর্তী হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। প্রথম দিন গিয়া গাছে-গাছে যে বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুল দেখিয়াছিলাম সেদিনও তাহারা ঠিক তেমনি-ভাবে বসিয়াছিল। আর কাহাকেও কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, এমন কি ময়াল সাপটাকেও না। এলোমেলো হাওয়ায় দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপত্রে একটা অদ্ভুত মর্মরধ্বনি উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল বহুদূরে কে যেন রোদন করিতেছে। অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। গুহার দ্বারের কাছে আসিতেই দুইটা শকুনি ডানা ঝটপট করিয়া গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুহার ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই। মৃত হরিণের কঙ্কাল ও অন্ত্রগুলা চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। শকুনি দুইটা এইগুলার লোভেই আসিয়াছিল। কিন্তু যক্ষিণী কোথায় গেল? ময়াল সাপের গুহার আগড়টাও দেখিলাম খোলা রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখি, ময়াল সাপটাও নাই। কোথায় গেল সব? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নিনানির গুহার কাছে গেলাম। নিনানিও নাই। গুহার ভিতর ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। খড়ের স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নিনানি নাই।

"নিনানি—"

কেহ সাড়া দিল না।

"নিনানি—"

পরিচিত উত্তরের আশায় উৎকীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

"নিনানি—নিনানি—নিনানি—"

আমারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি বারম্বার আমার কাছে ফিরিয়া আসিল, নিনানি আসিল না।

উন্মত্তবৎ চতুর্দিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিনানিকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। যেখানে নিনানি খনিত্রপূজো করিয়াছিল সেখানে গেলাম, ভূমিতে প্রস্তরে মূষিকরক্তের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ফুলের পাপড়িও পড়িয়া আছে কিন্তু নিনানি নাই। যে ঝর্ণায় নিনানিকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ছুটিয়া সেখানে গেলাম কিন্তু সেখানেও নিনানি ছিল না। অপরাজিতা পুষ্পদল আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক রহস্যময় হাসি হাসিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা বুঝি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অপরাজিতা কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু নিনানিকে পাইলাম না। নদীতট অরণ্য উপত্যকা সর্বত্র খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। যক্ষিণী অথবা নিনানি কাহারও সন্ধান না পাইয়া শুধু যে বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা নয়, ভীতও হইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, যে অনির্দিষ্ট অদৃশ্য শক্তি নিনানিকে এমনভাবে অপহরণ করিয়াছে, সে কি আমাকেও নিস্তার দিবে? দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূরে ছুটিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম সহসা, মনে হইল, নিনানিকে এই নির্জন অরণ্যে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতেছি! আমিই যে তাহাকে এ স্থানে আনিয়াছিলাম, আমারই প্ররোচনায় সে যে এই ভয়াবহ স্থানে নির্জন গুহায় বাস করিতে সম্মত হইয়াছিল! এখন তাহাকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি? আবার ফিরিলাম। নিনানির গুহায় ফিরিয়া আসিলাম আবার।

"নিনানি— নিনানি— নিনানি— নিনানি— নিনানি—"

আমার চীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পক্ষীকুল চঞ্চল হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিন্তু নিনানির সাড়া পাইলাম না। আমি তখন সেই শূন্য গুহায় সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শুষ্ক খড়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার হৃৎপিণ্ডটিকে দুই হাতে কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে, কোন অদৃশ্য হস্ত আমাকে যেন নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে। অসহায়ভাবে আমি সেই পরিত্যক্ত গুহায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না, একটা তর্জন শুনিয়া আবার আমাকে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিতে হইল। দেখিলাম, গুহার সম্মুখে গাছের যে প্রকাণ্ড শিকড়টা বাহির হইয়াছিল সেই শিকড়টাকে বেষ্টন করিয়া ময়াল সাপটা আমার দিকে নিষ্পলক হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পরমুহূর্তেই আমি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা প্রস্তর খণ্ড পড়িয়াছিল সেগুলি তুলিয়া তুলিয়া আমি তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম ময়ালের মুখে কয়েকটা লাগিল কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না। দেখিলাম, ধীরে ধীরে সে গুহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি এক লম্ফে গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূরে গিয়া আবার একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। আহত ময়ালটা আমাকে অনুসরণ করিতেছে না কি? ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর পাইলাম। দেখিলাম, আর একটা ময়াল। আমি যে ছাগলটাকে যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছিলাম দেখিলাম আর একটা ময়াল সেইটাকে পাকে পাকে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছে। আমি আবার ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আশে পাশে বোধ হয় আরও ময়াল সাপ আছে, তাহারা হয়তো এইবার আমাকে আক্রমণ করিবে।

...সুড়ঙ্গের অপর পারে শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি বাহির হইতেই সাগ্রহে সে ছুটিয়া আসিল।

"তুমি কত দেরি করিলে। কতক্ষণ যে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি—"

আমি যে নিনানির খোঁজে গিয়াছিলাম সে কথা তাহাকে আর বলিলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন বলি নাই?

"চুপ করিয়া আছ যে। ধবল কি বলিল?"

"রোহার সর্তে ধবল রাজি হইয়াছে"

"হইয়াছে?"

শিলাঙ্গী হাততালি দিতে দিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ঝোনাঝিরা এখনও ফেরে নাই। চল, রোহার কাছে যাওয়া যাক। রোহা নিশ্চয় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে"

"চল"

রোহা আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া সে চুপি চুপি বলিল, "সুখী হইলাম। কাল তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ হইয়া যাক। তাহার পর আমাদের লোক তোমাদের ক্ষেত হইতে তৃণশস্য কাটিয়া আনিতে যাইবে"

"তাহারা কত তৃণশস্য কাটিবে তাহা কি ঠিক হইয়াছে?"

"হইয়াছে। আমাদের দুইজন লোক সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত তৃণ কাটিয়া আনিতে পারে প্রতি পূর্ণিমায় তত তৃণ তোমাদের দিতে হইবে, আপাতত ইহাই আমি ঠিক করিয়াছি। ইহাতে ধবল আশা করি আপত্তি করিবে না। সমস্ত দিনে দুইজন লোকে কত তৃণই বা সংগ্রহ করিবে? তোমাদের কথা ভাবিয়াই আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমার আশা করি ইহাতে আপত্তি নাই"

"না"

"বেশ, তাহা হইলে আমি বিবাহের আয়োজন করি। আমাদের বিবাহের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। তুমি ধবলকে লইয়া কাল সকালেই এখানে চলিয়া আসিও। শিলাঙ্গী কিন্তু কাল সকাল হইতে লুকাইয়া থাকিবে। তুমি আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহাকে। যতক্ষণ না খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে ততক্ষণ বিবাহ হইবে না। এই ব্যাপারটাতেই একটু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইবার পর অবশ্য বেশী বিলম্ব হইবে না। তোমরা তখন উভয়ে একপাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিবে। তাহার পর আমি এবং তোমাদের দলপতি ধবল উভয়ে মিলিয়া তোমাদের এক সঙ্গে বাঁধিয়া দিব। দীর্ঘ বনলতা দিয়া তোমার হাতের সঙ্গে শিলাঙ্গীর হাত, তোমার কোমরের সঙ্গে শিলাঙ্গীর কোমর, তোমার পায়ের সঙ্গে শিলাঙ্গীর পা বাঁধিয়া দিয়া আমরা দুইজনে সরিয়া যাইব। তাহার পর আমাদের পুরোহিত নম্বরু আসিয়া তোমাদের কানে কানে কি বলিবে। কি যে বলিবে তাহা নম্বরু ছাড়া আর কেহ জানে না, জানিবেও না, কারণ, নম্বরু তাহা তোমাদের প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। তাহার নিষেধ অমান্য করিলে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। নম্বরু বেশী সময় লইবে না। তাহার পর আসিবে কথক এবং আমাদের দলের যুবক যুবতীরা। তাহারা তোমাদের ঘিরিয়া নৃত্য গীত করিবে। তোমাদেরও তাহাদের সহিত নৃত্য গীত করিতে হইবে। নৃত্যগীত শেষ হইলে তাহারা মশাল জ্বালিয়া তোমাদের সঙ্গে করিয়া কন্যা নদীর তীরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। ইহাই হইল আমাদের বিবাহের পদ্ধতি। কাল একটু সকাল সকাল আসিও।"

আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া রোহা ফিস ফিস করিয়া কথাগুলি বলিল। মনে হইল সে যেন বিবাহের কথা বলিতেছে না, কোন ষড়যন্ত্রের কথা বলিতেছে। আমি রোহার কাছে একাই ছিলাম, শিলাঙ্গী বাহিরে কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ আর একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া রোহার কোলের উপর গিয়া বসিল। তাহার পর এক হাত দিয়া রোহার কণ্ঠ বেষ্টন

করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল সে। রোহা বিব্রত বোধ করিতেছিল, কিন্তু শান্তিপ্রিয়তার জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, সে মেয়েটির এই আচরণের কোনও প্রতিবাদ করিল না।

মেয়েটি বলিল—"রোহা, শুনিতেছি নাকি শিলাঙ্গীর বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। এই যুবকটির সহিত কাল তাহার বিবাহ হইবে"

মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যেন এতক্ষণ সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। এক নজরে আমাকে দেখিয়া তাহার পর এমন বিশ্রী মুখভঙ্গী করিল যাহার অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—'আহা, কি পছন্দ!'

রোহা আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"এটি আমার কনিষ্ঠা পত্নী হিং"

হিং তর্জন করিয়া উঠিল, "কেবল কনিষ্ঠা পত্নী? আর কিছু নই নাকি?"

"হাঁ, প্রিয়তমা পত্নীও"

হিং আবার তাহাকে চুম্বন করিল। এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রোহা তখন চুপি চুপি বলিল, "ইহারাই শিলাঙ্গীর শত্রু। তুমি ইহাদের সহিত সাবধানে কথাবার্তা বলিও।"

"আমি কোন কথাই বলিব না"

"সেই ভাল। নীরবতাই শান্তিলাভের সহজ উপায়"

আমি তখন রোহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম। কারণ ফিরিয়া গেলেই ধবল আমাকে এই প্রশ্নটি করিবে।

"বিবাহ হইয়া গেলেই কি আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব?"

"সেটা নির্ভর করিতেছে ঝোনঝিরার উপর। সে ফিরিয়া আসুক, তখন এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। আমি নিজে যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। তুমি কি যুদ্ধ চাও?"

"না। এখন যুদ্ধ হইলে শিলাঙ্গীকে ফেলিয়া আমাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। তাহা আমার ইচ্ছা নয়"

গম্ভীর রোহাকে এতক্ষণে হাসিতে দেখিলাম। আমার এই কথায় তাহার দন্তরাজি নীরবে বিকশিত হইল এবং কিছুক্ষণ বিকশিত হইয়াই রহিল।

"আমি চেষ্টা করিব যাহাতে যুদ্ধ এখন না হয়। ঝোনঝিরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তো কিছুই স্থির হইবে না"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হিং আর একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

রোহা বলিল, "তোমার আর যদি কোনও বক্তব্য না থাকে, তুমি যাইতে পার। ধবলকে লইয়া কাল খুব ভোরেই এখানে চলিয়া আসিবে কারণ শিলাঙ্গী যে কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই"

আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শিলাঙ্গী বাহিরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"রোহার কাছে সমস্ত শুনিলে তো? কাল সকাল সকাল আসিও, আমি এমন জায়গায় লুকাইব যে সহজে আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তোমাকে নাকাল করিয়া তাহার পর ধরা দিব"

"ঠিক তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিব, দেখিও"

"আচ্ছা, দেখা যাইবে। শেষে খোসামোদ করিতে হইবে, শিলাঙ্গী কোথায় আছ দেখা দাও, যাহা চাও তাহাই দিব দেখা দাও'"

"তোমাকে খোসামোদ করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি কি চাও বল না, তাহাও তোমাকে আনিয়া দিব। মীংরা এবার আসিবার সময় আমার জন্য কুমীরের দাঁতের হার আনিবে বলিয়া গিয়াছে। যদি আনে তাহাই তোমাকে দিব"

"তাহা দিও। কিন্তু সত্য সত্যই যে জিনিসটি আমি প্রাণ দিয়া চাই তাহা দিবে তো?"

"কি সেটি?"

"তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব"

"নিশ্চয় দিব"

"কাল আমাকে খুঁজিবার সময় বারম্বার এই প্রতিশ্রুতিটি চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে কিন্তু। নিগম বনের বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সকলে সাক্ষী থাকিবে, উন্নগা পর্বত সাক্ষী থাকিবে, আমাদের দলের সকলেও সাক্ষী থাকিবে। বলিবে তো?"

"নিশ্চয় বলিব"

"কাল কখন আসিবে তোমরা?"

ধবলকে গিয়া বলি। তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন আনিতে হইবে তখন তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না। তবে চেষ্টা করিব খুব সকাল সকাল যাহাতে আসিতে পারি। আর একটা কথা। ধবল ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কি আসিতে পারিবে? এখানে আসিবার আর কোন পথ আছে?"

"আছে। কিন্তু তাহাতে অনেকটা ঘুরিতে হইবে। চল, সেটাও তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি"

আমরা উভয়ে উন্নগা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...আমি চলিয়া আসিবার পর কন্যা নদীর পরপারে শূলধারী ব্যক্তিটিকে আবার না কি দেখা গিয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম, নিম্ব সম্প্রদায়ের সকলেই বেশ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। ধবলের মুখ দেখিলাম ভয়ে পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

"কি হইল? রোহা কি বলিল?"

ধবল ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল আমাকে।

"রোহা সম্মত হইয়াছে। কাল প্রত্যুষে উঠিয়া আমাদের দুইজনকে রোহার নিকট যাইতে হইবে। কালই সে শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চায়। আমাদের শস্যও সে অধিক লইবে না। তাহাদের দলের দুইজন লোক প্রতি পূর্ণিমায় আসিবে এবং সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত তৃণ কাটিয়া লইতে পারে তত তৃণ লইয়া যাইবে। বিবাহের পরদিন তাহার লোক দুইটি প্রথমে আসিবে, তাহার পর প্রতি পূর্ণিমায় আসিবে। আমার মনে হইল এ দাবী অন্যায় নয়, তাই আমি সম্মত হইয়া আসিয়াছি।"

"আমিও সম্মত। কালই বিবাহ হোক। আমাকেও যাইতে হইবে?"

"তাহাদের বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে দলপতির থাকা প্রয়োজন।"

"কিন্তু উলম্ভনের লোক যেরূপ ঘন ঘন হানা দিতেছে তাহাতে আমার অনুপস্থিত থাকা কি সঙ্গত হইবে?"

এমন সময় বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। এরূপ শব্দ আমরা আর কখনও শুনি নাই। সকলেই ভীত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। শব্দটা ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মেয়েরা এবং শিশুরা সবেগে নিজ নিজ কুটিরের দিকে ধাবিত হইল। ধবল আদেশ করিল—"সকলে নিজ নিজ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ কুটিরের দ্বারে গিয়া অবস্থান কর। বিপদ কোন দিক হইতে আসিতেছে সন্ধান করিয়া দেখি। তোমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া থাক।"

ধবল সবেগে নিম্ব বৃক্ষটির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিপন্ন হইলে সে নিম্ব-দেবতারই আশ্রয় লইত। আমিও আমার নিজের কুটিরের দিকে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সেখানে ইলচি এবং ধবলের অন্যান্য পত্নীগণও সন্তান-সন্ততি সহ সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা,—"এইবার আমাদের সর্বনাশ হইল, এইবার আমরা সদলে সবংশে নিহত হইলাম। ধবল আমাদের বাঁচাইতে পারিল না। জংলা চল তোমার সহিত আমরা পলায়ন করি"

বিশেষ করিয়া ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত এই কথা বলিতে লাগিল। আমি দ্বারপ্রান্তে বিব্রত বিপন্ন হইয়া সবলে প্রস্তর কুঠারটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া-ছিলাম। আমারও মনে হইতেছিল এইবার বুঝি সব শেষ হইয়া গেল। শিলাঙ্গীকে আর দেখিতে পাইব না। নিনানির মুখটাও মনের

মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন সুদূরে লোকে বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহস্যময় হাসি হাসিতেছে। যেন বলিতেছে—'আমাকে প্রতারণা করিয়া শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে যাইতেছিলে, দেখ এইবার কি হয়! বিম্বাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিশ্বাস করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিয়া আমার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে, আমার কিছু হইবে না, কানা কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে ভোলে নাই, আমার মৃত্যুই হইয়াছে। এইবার তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তোমার এবার আর শিলাঙ্গীকে লাভ করা হইল না। শিলাঙ্গীর পরিবর্তে কঠোর মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রস্তুত হও।

হঠাৎ বোঁ বোঁ শব্দটা থামিয়া গেল। আমার হৃৎস্পন্দনও সহসা থামিয়া গেল যেন। কুঠারের হাতলটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কাহারও মুখ দিয়া একটি শব্দ নির্গত হইতেছিল না, অন্ধকার ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমরা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একটু পরেই একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। মনে হইল গল্প করিতে করিতে কাহারা যেন আমাদের কুটিরের দিকেই আসিতেছে। ধবলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আর একটু পরেই ধবল আমার কুটিরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল।

"জংলা, বাহির হইয়া এস। মীংরা আসিয়াছে—"

আশঙ্কা মুহূর্তেই আনন্দে রূপান্তরিত হইল। আমরা সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, "এখন মীংরা আসাতে আমার একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কাল আমাকে রোহার নিকট যাইতে হইবে ভাবিতেছিলাম কাহাকে এখানে রাখিয়া যাইব। মীংরা থাকিলে চিন্তার কোনও কারণ নাই। তোমরা মশাল জ্বাল, মীংরাকে খাবার দাও—"

মীংরাকে ঘিরিয়া আমাদের উৎসব জমিয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই মীংরা কিছু না কিছু উপহার আনিয়াছিল। কাহারও জন্য রঙীন ঝিনুক, কাহারও জন্য কড়ি, কাহারও জন্য অদ্ভুতাকৃতির প্রস্তরখণ্ড, কাহারও জন্য পাখীর পালক, কাহার জন্য পশুচর্ম। আমার জন্য কুম্ভীর দন্তের মালা আনিতে সে ভোলে নাই। নিনানির জন্য সে একটি ভল্লুক-চর্ম আনিয়াছিল, কিন্তু ইলচি সেটি অধিকার করিল।

মীংরা প্রশ্ন করিল, "তোমাদের ফসল কেমন হইতেছে?"

"প্রথম প্রথম ভাল হইয়াছিল, এবার কিন্তু তেমন ভাল হয় নাই। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।"

ধবলের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মীংরা বলিল, "চিন্তার কোনও কারণ নাই। জমিকে ভাল করিয়া পূজা করিতে হইবে। পূজা করিবার নূতন পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখাইয়া দিয়া যাইব। আমি নানাস্থান ঘুরিয়া অনেক নূতন জিনিস শিখিয়া আসিয়াছি।"

(ক্রমশ)

গ্রহান্তর

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ-ই একদিন আলাপ হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের তীরে। এখানে এসে অবধি লক্ষ্য করছি ওঁদের, ওঁরাও সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন আমাকে। সমুদ্র-তীরবর্তী ওই কালো রাস্তাটার এক প্রান্তের এক হোটেলে থাকি আমি, অপর প্রান্তের ছোট একটি বাসায় ওঁরা—এ সংবাদ উভয় পক্ষেরই জানা হয়ে গেছে এতদিনে।

বছর চারেকের একটি ছেলে বালির ওপর ছুটোছুটি করতে গিয়ে পড়ে যায়, তখন আমিও বেড়াচ্ছিলাম ওখান দিয়ে; তুলে ধরলাম ছেলেটিকে। এগিয়ে এলেন ওঁরা। আলাপের সূত্রপাত।

কিন্তু এরই জের টেনে পরিচয়ের গভীরে গিয়ে দেখা গেল, আমরা আজ ঘটনাচক্রে দূরে ছিটকে পড়লেও নিতান্ত কাছের লোক ছিলাম একদা। কলকাতার পুরানো রাস্তার ওপর পাশাপাশি দুটো ভিৎ-নড়া পুরানো বাড়ি, সেই দুই বাড়ির দুই পুরানো পরিবারের দুই সংকীর্ণ ঘরে আমরা পৃথিবীর মুখ দেখি।

অধ্যাপক চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে আমাকে আরেকবার ভালো করে দেখলেন, বললেন, তুমি হরিভূষণের ছেলে? সে যে আমার বন্ধু লোক! কোথায় সে এখন?

বিহারের এক অখ্যাত পল্লীতে। মাস্টারী করছেন।

হুঁ। তা বেশ কাজ। আমিও মাস্টারী করছি।

অধ্যাপক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপরে খানিকটা যেন চমক ভেঙেই বলে উঠলেন—তোমার মা ত মারা যান একেবারে তোমার ছোটবেলায়, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ছোটবেলায়।

মুখ তুললেন আমার দিকে, বললেন—আমার স্ত্রী, অর্থাৎ তোমার কাকীমাও মারা গেছেন আজ বছর ছয়-সাত। খুব ভারী দুঃখই হয়েছিল।

ছোট ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখতে চেষ্টা করছে বার বার, আর তার সঙ্গের



তরুণীটি তার মুখখানা বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছে অপর দিকে, ফিসফিসিয়ে সম্ভবত বলছে—অসভ্যতা করো না খোকা।

অধ্যাপক আবার বলতে শুরু করলেন, একে একে সব গেছে বাবা। ঋণভারে যেমন ধ্বসে গেছে তোমাদের বাড়ি, তেমনি আমাদেরও। আজ আমরা যাযাবর। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কী করো?

আমি? সরকারী চাকর। আপাতত ছুটি কাটাচ্ছি।

তাই নাকি? বেশ বেশ। কোন্ বিভাগে হে?

একটু হাসলাম, বললাম, বাঙলা করে বলতে গেলে বলতে হয় আবহবিদ্যাবিষয়ক সরকারী বিভাগে।

অধ্যাপক কৌতুক অনুভব করলেন আমার কথায়, হেসে উঠলেন উচ্চগ্রামে, তারপরে বললেন—বেশ—বেশ।

কী নাম বললে যেন? সনৎ? না-না, তোমার ডাক-নাম কী যেন একটা ছিল?

একটু লজ্জিত হয়েই পড়লাম বলা যায় এই প্রশ্নে, কিন্তু পাশের তরুণীটি ঈষৎ মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট করেই বলে উঠল—কানু।

তুই কী করে জানলি রে পাগলী?

মেয়েটি বললে, জেনেছি। জিজ্ঞাসা করো না ওঁকে?

অধ্যাপক সস্নেহে বললেন, সে কী আজকের কথা! তুই ত অনেক ছোট তখন।

ঈস্! ছোট না আরো কিছু! ন-দশ বছর তখন বয়স আমার।

অধ্যাপক হেসে উঠলেন—তা বটে! অনেক বড়ো তখন তুই। ওকে তোমার মনে আছে সনৎ? আমার মেয়ে? ছোট মেয়ে। মনে আছে?

আছে।

মেয়েটি একটু যেন হেসে উঠল মনে হলো, বলল—ছাই আছে। জিজ্ঞাস করো ত বাবা, আমার নাম কী?

বললাম, দাঁড়ান, এখুনি বলে দিচ্ছি। সাবিত্রী!

খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, বলল, হলো না, হলো না! দেখলে ত বাবা, কেমন মনে আছে? সাবিত্রী ত আমার দিদির নাম।

অধ্যাপক বললেন, তা ওর দোষ নেই। আজ ক' বছর পরে আমাদের দেখা? দশ-এগারো বছর হবে, কী বলো?

তা হবে।

ছোট ছেলেটি হঠাৎ এই সময় উঠে দাঁড়ালো, বলল, বাড়ি চলো।

অধ্যাপক বললেন, সে কীরে! এরই মধ্যে?

ছোট ছেলেটি একবার অধ্যাপকের, একবার মেয়েটির হাত ধরে টানতে লাগল, বাড়ি চলো।

অগত্যা উঠলেন ওঁরা। অধ্যাপক আহ্বান জানালেন, এসো না সনৎ, বেশ গল্প করা যাবে।

চলুন।

ছোটর মধ্যে বাড়িটি বেশ গুছানো। অধ্যাপক বললেন, সীতা, চা করবি নাকি রে?

করব। কিন্তু তুমি ভদ্রলোককে বলে দিলে ত আমার নামটা।

বললাম, না বলে দিলেও ক্ষতি ছিল না! আটপৌরে আরেকটি নাম মনে পড়েছে ভদ্রলোকের।

হেসে উঠলেন অধ্যাপক, বললেন, বুঝেছি। ডাকব নাকি সেই নামে?

না—না!

বলেই ছুটে পালালো। হাসতে লাগলেন অধ্যাপক, বললেন, খুকী বলে ডাকলে রাগ করে হে আজকাল!

শৈশবের স্মৃতির প্রতি মানুষের মোহ অসাধারণ, একথা যতই বয়স বাড়তে থাকে, ততই হতে থাকে স্পষ্ট। এই মোহই ক্রমে আমাকে টানতে লাগল সীতাদের দরজায়। ওদের দরজায় পা দিয়েই মনে হতো আমাদের সেই কলকাতার হারানো বাড়ির হারানো দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি! কিন্তু শীঘ্রই ছুটি ফুরালো, চলে এলাম কর্মস্থলে। আবহ-বিদ্যাবিষয়ক বিভাগ! মনে মনে হাসি, কথাটা সেদিন বেশ বলেছিলাম কিন্তু! পরের অবকাশে আবার আকর্ষণ করলে সমুদ্র, অধ্যাপকের পত্রে জেনেছি, তাঁরাও এসেছেন সেখানে, সেই বাড়িতে।

প্রথম সাক্ষাতেই সীতা বলল, বেশ লোক! হোটেলে ওঠবার কী দরকার ছিল? আমাদের এখানে উঠতে পারতেন না বুঝি?

হেসে বললাম, তাতে কী হয়েছে? কাছাকাছিই ত থাকলাম।

ছাই কাছাকাছি।

ঘুমিয়ে, বসে, বই পড়ে আর সমুদ্রের ধারে বেড়িয়েই ত এখানকার সময় কাটে। সমুদ্রের ধারে সীতাকে পাই। অধ্যাপক এবার পরীক্ষার খাতা দেখছেন, তিনি নিমগ্ন তাঁর কাজে। ছোট ছেলেটি মাসীর আঁচল ছাড়ে না। মাসীর কাছে কাছে থাকে, আর কেন জানি না অদ্ভুত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আমার দিকে!

জিজ্ঞাসা করি, মাকে ভুলে বেশ থাকে কিন্তু তোমার কাছে।

ভুলে আছে মাকে? আমার ত মনে হয় না? দেখছেন না, কী রকম করুণ ওর মুখ, সব সময় যেন দিদিকে ও ভাবছে!

ওর বাপ?

সীতা একটু হাসল, তিনিও পেশায় অধ্যাপক, ছেলের সঙ্গে কী-ই বা এমন খাতির? ওই দেখুন না, থাকে ও বাপের কাছে?

না। তা ও থাকে না দেখছি। তুমিই ত ওর সব।

সীতা ছেলেটির মাথায় রাখলে হাত, কাছে টেনে নিলো নিবিড় করে, তারপরে বলল, যাও ত সন্তু, বালির ওপর একটু ছুটোছুটি করো।

ছেলেটি মুখ লুকালো মাসীর আঁচলে, না কেন? ঐ দেখ কতো ছেলে খেলছে। খেলুকে।

সীতা ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বলল, দেখেছেন?

বললাম, তা দেখেছি। ও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

অথচ এমনটি ছিল না কিন্তু। দিন দিন বড়ো হচ্ছে, আর কেমন হয়ে উঠছে যেন!

আমরা ততক্ষণে সমুদ্রের তীর ধরে ধরে অনেকদূর গিয়ে পড়েছি, সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে, বললাম, চলো, এবার ফেরা যাক্।

ফেরার পথে নিঃশব্দে চলতে চলতে সীতা হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, আচ্ছা, সনৎদা?

কী?

মানুষ মরার পর কোথায় যায়?

হেসে বললাম, পুরাতন প্রশ্ন।

আচ্ছা, দিদি দেখতে পাচ্ছে আমাকে? তার ছেলেকে এত ভালবাসছি, খুশি হচ্ছে সে?

কে জানে!

আমার কিন্তু মনে হয়, দিদি আমাকে আশীর্বাদ করছে। কী সন্তু? পারছিস্ না চলতে? কোলে আসবি?

না।

দেখছেন, ওদিকে লজ্জাও আছে ছেলের! লোকের সামনে বুড়ো খোকা কোলে উঠবেন না!

আবার নীরবতা। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। চলতে চলতে আবার প্রশ্ন করলে সীতা, জামাইবাবুকে আপনি দেখেছেন?

না। কোত্থেকে দেখব?

খুব ভালো লোক। তবে খুব চাপা। এমনি দেখে মনে হবে বাইরে নির্বিকার, কিন্তু ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। দিদিকে ভালবাসত খুব।

বললাম, বছরখানেক হলো না?

কে, দিদি? না, দু বছরেরও বেশি।

এর পরেরই চিরাচরিত প্রশ্ন, হয়েছিল কী? —কিন্তু এ প্রসঙ্গ তুলতে মন আর চাইছিল না। নীরবে পথ পার হয়ে আমরা বাড়ির দরজায় পৌঁছিলাম। সামনের ঘরে আলো, ঘরের পাশ কাটিয়ে ভিতরে যেতে যেতে সীতা হঠাৎ আমার গায়ের চাদরের লম্বমান কোণটা ধরে একটু আকর্ষণ করল, চাপা কণ্ঠে বলল, বাবার ঘরে অনেক লোক। আড্ডায় যোগ দিতে হবে না আপনাকে। তার চেয়ে আসুন আমার ঘরে। সন্তু, দাদুর কাছে যাবি?

না।

সীতার ঘরে এলাম। ছোট্ট গুছোনো ঘরখানা। ওর ঘরে এই আমার প্রথম প্রবেশ। বলল, একটু বসুন। আমি রান্নাঘর ঘুরে আসি। ঠাকুর কতদূর কী করল, কে জানে। সন্তু, আয়।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো একা, বলল, সন্তুকে খেতে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। সন্ধ্যার পরই ওর খিদে পায়, তারপরেই ঘুম। ছেলেটি কী শান্ত দেখেছেন?

তা বটে। শুধু তুমি ছাড়া আর কারুর কাছে যায় না।

হেসে বলল, অর্থাৎ আপনার কাছে ঘেঁষে না, এই ত?

হেসে উঠলাম।

বলল, সনৎদা, রোজ রোজ আসেন না কেন?

রোজই ত আসছি।

সকালে?

ভেবে বললাম, সকালে কতো কাজ করি।

কী কাজ?

দোহাই তোমার, ফিরিস্তি দিতে পারব না, সে সাত-সতেরো বহু প্রকারের কাজ।

কাছে এসে বসল সীতা, বলল, ছোটবেলার কথা আমার কিন্তু সব মনে আছে, জানেন?

হেসে বললাম, থাকাই ত স্বাভাবিক।

আপনার মনে আছে?

উত্তর ত আগেই দিয়েছি।

সীতা এবার হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, দিদিকে মনে পড়ে?

পড়ে।

চুপ করে রইল সীতা। তারপরে এক সময় উঠে পড়ল, সন্তুর বোধ হয় খাওয়া হয়ে গেল। আহা, একা একা খাচ্ছে বেচারা! বসুন, এখুনি আসছি।

বসেই আছি। জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশ। চাঁদ বোধ হয় দেরি করে উঠবে আজ। সীতার টেবিলে খানকতক বই সাজানো। বাঙলা বই, সব গল্পের, আধুনিক-অনাধুনিক উভয় স্তরের। চুপ করে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার মধ্যে বোধ হয় কোন মাদকতা আছে, তারই রসে ডুবে ছিলাম। সীতা ফিরল বেশ দেরি করে, কিন্তু তার দেরী-করাটা দেরি বলে মনেই হলো না।

বলল, সনৎদা, জানেন? ছেলে মুখ গোঁজ করে বসেছিল, একটু খাবারও মুখে তোলেনি। আমি গিয়ে খাওয়ালাম, তবে উনি খেলেন। আয় সন্তু, শুবি আয়।

সন্তুকে বিছানার ওপর তুলে দিলো সীতা। বললাম,—এবার উঠি, কী বলো?

ওমা, কেন! আটটাও বাজেনি। বসুন না? গল্প করি।

করো। তোমার ঘরখানা কিন্তু বেশ।

একটু হাসল, তারপরে আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালো সন্তুর দিকে, বলল, ঘুমো সন্তু। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

সন্তু সম্ভবত সত্যই নিদ্রাতুর, তার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সীতা আবার বলে ওঠে,

ওকে দেখতে কার মতো হয়েছে আন্দাজ করুন ত?

তোমার দিদির মতো?

খানিকটা। কিন্তু বেশীর ভাগই ওর বাপের মতো। চোখ, নাক, কপাল ত একেবারে জামাই-বাবুর বসানো। দাঁড়ান, জামাইবাবুর ফটো দেখাচ্ছি আপনাকে। ভদ্রলোক বেশ সুপুরুষ।

এই সময় অধ্যাপকের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, সীতা? সীতা কইরে?

কিন্তু সীতা সাড়া দিতে না দিতেই ঘরের ভিতরে এলেন তিনি, বললেন,—এই যে সনৎ। কতক্ষণ বেড়িয়ে ফিরলে? শোনো, তোমাকেই দরকার। যাকে বলে অঘটন ঘটে যাওয়া, তাই ঘটেছে। তোমার বাবা চিঠি লিখেছে আমাকে।

আমার বাবা?

অধ্যাপক হেসে উঠলেন,—হ্যাঁ হে, হরিভূষণ। লিখেছে তোমার বিয়ের কথা। কী রে সীতা, যাস্ নি, যাস্ নি, শোন? ছেলে বিয়ে করতে চায় না। তাই আমাকে......। আরে, যাচ্ছিস্ কোথায় সীতা? ওরে সীতা?

কিন্তু সীতা ততক্ষণে ওখানে নেই। অধ্যাপক মুহূর্তে বিছানায় একবার ঘুমন্ত সন্তুর দিকে, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা, একথা পরে হবে এখন। তুমি যেও না সনৎ, এখানেই এবেলা খেয়ে যাবে কিন্তু। ওরে, ও সীতা, ও'ঘরে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দে শীগ্‌গির।

সম্ভবত চা পাঠাবার ব্যবস্থা করেই একটু পরে ফিরে এলো সীতা। চাপা হাসিতে ভরে গেছে মুখ, বলল,—শেষকালে বাপকে দিয়ে উমেদারি?

সবটা মিলিয়ে হঠাৎই বড়ো দীন মনে হলো নিজেকে, যেন জোর করে সমস্ত মহিমা থেকে আমাকে অকস্মাৎ চ্যুত করে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে! আস্তে সরে গেলাম ঘরের প্রখর আলো থেকে বারন্দায় আবছা অন্ধকারে। দরজার কাছ থেকে সীতা প্রশ্ন করল,—ছাদে যাবেন?

যাব।

যান। আমি এখুনি আসছি।

আন্দাজে আন্দাজে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে এলাম। ছোট্ট ছাদ, নিরিবিলি,—তারার ভারে আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে! সীতা এলো, লঘু পায়ে এসে দাঁড়ালো কাছে, চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে বলল,—কী তারা ফুটেছে দেখেছেন! আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, সব থেকে কী তুমি ভালোবাসো, আমি বলব,—আকাশ! কী জানি, আকাশের দিকে তাকালেই আমার দিদিকে মনে পড়ে। কী ভালোই না আমাকে বাসত দিদি!

চুপ করে রইলাম। সীতাও নিশ্চুপ। বোধ হয় একটু ঝুঁকে পড়েছিলাম আলসের ওপর, শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, বললাম—সীতা?

কী?

শোনো। বাবা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। বহুদিন থেকেই।

হেসে উঠল—হুঁ। তারপর?

বিয়ে এবার আমি করব। মত দেবো।

খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল,—তারপর?

অনর্গল বলে যেতে লাগলাম, মেয়েটিকে আমি জানি বাবা যেখানে মাস্টারী করেন, ওখানে থাকে।

আমার সঙ্গে আলাপ অনেকদিনের। অনেকটা তোমার মতই দেখতে। বলতে বাধা নেই, আমরা বহু দিন থেকেই ভালবাসি। বাবা বোধহয় তার কথাই লিখেছেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই নীচে চলে এলাম। এক-সঙ্গে খেতে বসে অধ্যাপক বললেন,—কী হে, হরিভূষণকে কী লিখব? দেখ সনৎ, তোমার মা নেই, তোমার বাপই সব, তার ইচ্ছাটা পূর্ণ হতে দাও। কী বলো, লিখব? রাজী ত বিয়ে করতে?

লিখুন।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। যথারীতি কলকাতার ভাড়া-করা বাসা থেকে পত্র দিলেন বাবা। যাবার আগে সীতাকে বললাম,—আসা চাই কিন্তু।

নিশ্চয়ই যাবো। বাবাই ত' নিয়ে যাচ্ছেন। কী উৎসাহ বাবার।

সন্তুও যাবে ত?

একটু হেসে বলল,—যাবে বই কি! কী ছেলে হয়েছে জানেন? খেলা নেই ধুলো নেই, শুধু আমার চারপাশে ঘুরঘুর করবে।

কণ্ঠস্বরে বোধহয় রূঢ়তার স্পর্শই লাগল, বললাম,—থাক ওকথা।

একটু যেন আশ্চর্য হলো মনে হলো, বলল, ওমা, কেন!

না, এমনি।

কয়েকটি মুহূর্ত নিশ্চুপে কেটে গেল।

সীতা বলল,—কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে যে? আপনার বাবা যেখানে থাকেন, মেয়েটিও সেখানে থাকে বলেছিলেন না?

হ্যাঁ। কিন্তু ওদের আসল বাসা কলকাতায়। তাই কলকাতা থেকেই বিয়ে হচ্ছে।

সীতা হঠাৎ বলল,—জামাইবাবুও কলকাতায়। বেশ হবে, দেখা হবে বিয়ে বাড়িতে।

বিয়েবাড়িতে প্রায় সমস্ত পরিশ্রমের ভারই গ্রহণ করল সীতা। সন্তুকে সামলে, তদুপরি, তার বাপকে দেখলাম, আরেকটি শিশু,—এদের সামলে সমস্ত কাজ করে ওঠা একার পক্ষে কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজই সীতা করছে।

ফুলশয্যার রাত্রে ফুল-সাজানো ঘরের বাইরে বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, রাত অনেক। সীতা ঘরে ঢুকল নবপরিণীতাকে নিয়ে, তাকে ভিতরে রেখে বাইরে এলো আমার পাশে অন্ধকারে।

কী সীতা?

বৌ আমাকে সব বলেছে।

চমকে বললাম—কী?

বিয়ের আগে জানাশোনা ছিল না তোমাদের। বিয়ের আগে তোমাকে ও চিনতই না।

হঠাৎ চেপে ধরলাম ওর হাত।

আঃ! ছাড়ো না!

একটু পরেই সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল সম্ভবতঃ সেখানে, যেখানে ওর জামাইবাবু আর সন্তু মিলে ওর চারিদিকে সৃষ্টি করে রেখেছে পৃথক কোনো জগৎ,—এ জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, শুধু মাত্র আলো আসে যায় এপার থেকে ওপারে।





মনোতোষের মনটা আজ বেজায় চওড়া। কালোবাজারে মোটা রকমের দাঁও পিটেছে। অন্য লোকের আয় হলে এটাকে সে খুবই অন্যায় ভাবতো, কিন্তু নিজের হিতকে কে আর গর্হিত মনে করে?

চওড়া মন নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ি ফিরলো মনোতোষ। পকেটের সঙ্গে মনের কেমন রহস্যময় যোগ আছে। পকেটে চড়া পড়লে মনেও চিড় খায়, আবার যদি সেটা দৈবাৎ ফেঁপে ওঠে, দিল্‌দরিয়া হয়ে উঠতে দেরি হয় না মানুষের।

দিল্‌দরিয়া মনোতোষ বাড়ি ফিরেই ভাবলো বৌকে আজ খুশি করবে। আজ কিছু খরচ করবে ওর জন্যে। হোলোই বা নিজের স্ত্রী, নিজের স্ত্রীকে কি সুখী করতে নেই? পরস্ত্রীকাতর হওয়া দুনিয়ার দস্তুর হলেও, আর স্ত্রৈণতা নিতান্ত দোষের হলেও, কালে-ভদ্রেও নিজের বৌকে কি ভালোবাসতে নেই? কখনো কদাচ সিনেমায়, রেস্তরাঁয় নিয়ে গেলে, নিয়ে একটু বেড়ালে-টেড়ালে হয় কী? অপরা কাউকে ধরতে না গিয়ে সেই অপরাধই না হয় করলো সে আজ? করলো না হয় একদিন?

"কোথায় যাবে আজ বলো?" বৌকে বললো মনোতোষঃ "থিয়েটার, সিনেমা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? কি লেক্ বা বোটানিকসে—কিম্বা বেড়াতে আর কোথাও? যা খুশি তোমার, যেখানে খুশি।"

"তাহলে তুমি আমায় সেই সাহেবি হোটেলে নিয়ে চলো," জবাব দিল শ্রীলতা; "সেই যেখানে তুমি খানা খেতে যাও।"

"সেই চৌরঙ্গীর হোটেলে?"

"হ্যাঁ, খেয়ে দেখবো এমন কী খানা! যা খেয়ে বাড়ির রান্না তোমার মুখে রোচে না।"

বৌয়ের কথায় মনোতোষের মুখ যেন কেমন একখানা হয়ে ওঠে। সেখানে কি খানাই খালি? আরো কি নানান্ খানা নেই?

নিজের খোঁড়া পা নিয়ে (বৌকে কাঁধে করে আবার!) সেই খানার মধ্যে গিয়ে পড়তে সাহস হয় না মনোতোষের।—"সে যে সাহেবদের হোটেল গো? সাহেবসুবোরা খায়। তার চেয়ে চলো কোন চীনে রেস্তরাঁয় যাই। কিম্বা আমজাদিয়ায় গেলে হয় না? তাদের মোগলাই খাবার-দাবারও বেশ তো।"

"হোলোই বা সাহেবি হোটেল—সেখানে তো বাঙালীরা যাচ্ছে আজকাল? মেয়েদেরও নিয়ে যায় বলে শুনেছি।" মোগল-চীনে উৎসাহ নেই শ্রীলতার। সাহেবি হোটেলটাই সে চিনে নিতে চায় একবার। সব গোল মেটাতে চায় একেবারে।

"বেশ, চলো তাহলে।" রাজি হতে হলো মনোতোষকে। কথা দিয়ে ফেলেছে যখন, আর কথা দিয়েও তেমন অসন্তোষ নেই মনে—"আচ্ছা, তাই হোক তবে, যেতে চাইছো যখন তুমি। ছটার শোয়ে সিনেমা দেখে তারপর যাবো সেখানে, কেমন?"

সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর এক সিনেমায় সখ করে একটা পুরনো ছবিই তারা ফিরে দেখলো ফের আবার।

মধ্য-বিরতির অবসরে মনোতোষ ফিস্ ফিস্ করে—"দ্যাখো, চৌরঙ্গীর যে হোটেলটায় আমি খেতে যাই সেখানে—" বলে সে একটু থামে—"সেখানে কেউ ঘরের বৌকে নিয়ে যায় না বড় একটা।"

"তবে কি পরের বৌকে নিয়ে যায়?" ফোঁস্ ফোঁস্ করে শ্রীলতা—"তুমি বুঝি তাই যাও?"

"আমি? না, আমি আবার কাকে নিয়ে যাবো? কোথায় পাবো? একা তুমিই আমার একশ।" পত্নী-স্তবের একশা করে বসে মনোতোষঃ "সত্যি বলতে, তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার—"

"হয়েছে। থামো।" তোষামোদে ভোলার পাত্রী সে নয়। মনোতোষের আমোদের আমদানীতেই সে বাধা দেয়। —"কেন যে রোজ রোজ সেখানে যাও তুমিই ভালো জানো।"

"এম্‌নি খেতেই আমি যাই। অত রকমের ভালো-মন্দ খাবার আর কোথায় মিলবে এখানে?"

"শুধু কি খেতেই যাও? পান করতে নয়?"

"পান? সে তো নামমাত্র। খাদ্যের সঙ্গে পানীয় একটা নিতেই হবে, সাহেবি হোটেলের দস্তুর কিনা! খেতেই হয় তাই একটু—সেইজন্যেই। তুমি যদি যাও আজ, তোমাকেও খেতে হবে।"

"আমি? মরে গেলেও না।"

"সেইজন্যেই তো বলছিলাম গো, সেখানে গিয়ে কাজ নেই। বয়গুলো আবার এম্‌নি বয়াটে যে, খাবারের সঙ্গে এক-আধ পেগ আনবেই।"

"পিক্‌দানীতে ফেলে দেব আমারটা" শ্রীলতা জানায়।—"টেরও পাবে না কেউ। তাহলে তো হবে?"

"পিকদানি কোথায় সেখানে?" মনোতোষের শ্রীমুখ পিকাসোর ছবির মতই দেখা দেয়। পিকাসো যদি কোনদিন পিক্‌দানি আঁকতেন।

"পিক্‌দানি না থাক্, অ্যাশ-ট্রে তো আছে? সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

শ্রীলতা স্বামীর দুর্ভাবনা দূর করতে চায়।

শো ভাঙলে জনতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়েই একটা ফীটন গাড়ি পেয়ে গেল তারা।

ফীটনওয়ালা সাদর অভ্যর্থনা জানালো ওদের—"আইয়ে জী সাহেব, আইয়ে।"

শ্রীলতা যেন পা তুলেই ছিল, কিন্তু মনোতোষ কেমন একটু উন্মন।—"এইটুকুই তো পথ," বল্লে সে—"হেঁটে গেলেই হয়। ঐ তো দেখা যাচ্ছে—চৌরঙ্গী। এই মোড়টা পেরিয়েই। এসব রাস্তায় বেড়াতেই তো আরাম।"

"মাথা-খোলা ঘোড়্‌গাড়িতে চাপি নি কখনো। অনেকদিনের সখ আমার যে—"

"তাহলে ওঠো।" তাহলে মনোতোষের কোন আপত্তি নেই। বৌয়ের সবরকম সখই সে মেটাবে আজ, সখির মতই জ্ঞান করে'।

"চৌরঙ্গীর একটা সাহেবি হোটেলে নিয়ে চলো আমাদের।" হুকুম দিল মনোতোষ।

"জী হুজুর। জানতা হ্যায়।" জানান্ দেয় গাড়োয়ান।

হোটেলের সামনে এসে খাড়া হতেই মনোতোষ যেন খাঁড়া হয়ে ওঠে—"আহা, এখানে কেন? এখানে কে আনতে বল্লে? চৌরঙ্গিতে কি আর কোন ভালো হোটেল ছিল না?" ধমক্ লাগায় সে ফীটনওয়ালাকে।

শ্রীলতা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে—"এটাও একটা বিলিতি হোটেল তো? এখানেই চলো না। একটা যাহোক হলেই হোলো। কেন, এখানে কি তুমি খাও না কখনো?"

মনোতোষ একটু ইতস্তত করে নামে বৌয়ের সাথে—"কম। খুব কম। তবে হ্যাঁ,



বামালের বখ্‌রাদারি

বিলিয়ার্ড খেলতে এসেছি বটে মাঝে সাঝে। কখনো সখনো।"

হোটেলে পা দিতেই একটি বয় এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে—"আসুন মিত্তির সাহেব, আসুন।"

"লোকটা তোমায় চেনে দেখছি।" শ্রীলতা একটু অবাক হয়। —"বেশ ভালো করেই চেনে।"

"আমাদের আপিসের বেয়ারা। ছুটির পরে এখানে বয়ের কাজ করে' বাড়তি কিছু উপায় করে। দেখচ না, কিরকম বেয়াড়া বেয়াড়া ভাব।"

শ্রীলতা ভালো করেই দেখেছে। যদ্দুর বেয়াড়া হতে হয়। আপিসের বেড়া ডিঙোবার জন্যই হয়ত বা।

নানান্ খানা-টেবিলের ঘোরপ্যাঁচের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। যেতে যেতে এক সুবেশিনী তরুণীর সামনে পড়ে। মেয়েটি এক সুবেশ যুবকের পাশে বসেছিলো টেবিল আলো করে।

"ভালো আছেন মিস্টার মিত্র?" সহাস্য সম্ভাষণ মেয়েটির।

"হ্যাঁ, আপনিও বেশ ভালো তো?" কাষ্ঠহাসি হেসে কেটে পড়তে চায় মনোতোষ। —"আমাদের আপিসের লেডি-টাইপিস্ট।" শ্রীলতাকে জানায়—একটুখানি এগিয়ে গিয়ে।

"তোমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি।" শ্রীলতা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় তার দিকে—"কেমন ঢং করে মিস্টার মিত্র বলে ডাকলো......"

সম্বোধনের সুরে মিত্রতার রেশ বেশ পরিস্কার। ঢাকবার উপায় নেই। ঢাকা দেবার চেষ্টাও করে না সে।—"এক আপিসে কাজ করি, রাখতেই হয় ভাব। মেয়েটা আবার আমাদের বড়কর্তার ভারী পেয়ারের।"

বড়কর্তার বৃহৎ ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চায় সব মোট—সমঝদারি-হাসি হেসে। কিন্তু গুমোট বুঝি কাটে না।

একটা ছোট্ট টেবিল দখল করে বসে দুজনে। খাবারের তলব দেয়; কিন্তু জমাটি হয়ে না বসতেই—

"এই যে, মিত্তির যে?" ওপাশের টেবিল থেকে হাঁক আসে। আরেক চিত্তির! আবার বুঝি সব মাটি?

একটুক্ষণের জন্যে তার টেবিলে গিয়ে বসতেই হয় মনোতোষকে।

"খাসা মেয়েকে তো নিয়ে এসেছো আজ হে?" উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওর বন্ধু।—"বলি, জোটালে কোথ্থেকে?"

"আরে, বৌ যে—!" ব্যস্ত হয়ে বলে মনোতোষ। উৎসাহের উৎসমুলেই চাপা দেবার চেষ্টা ওর। কী জানি, ওর কথা যদি শ্লীলতা আর শ্রীলতার সীমা লঙ্ঘন করে। বৌয়ের কানে পৌঁছায় যদি।

"বৌ যে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কার বৌ, সেই কথা। তবে আমাদের মত ঘর-পোড়া গরু কি আর সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় হে? বলি, কোথ্থেকে বাগালে এটিকে?"

"আমার বৌ।" গম্ভীর হয়ে ওঠে মনোতোষ।

"কে বলেচে? আমাকে ওর ঠিকানাটা দেবে? দেখব একবার চেষ্টা-চরিত্তির করে'—তুমি যা হিংসুটে বাপু, তুমি তো আর পাইয়ে দেবে না—"

মনোতোষের টেবিলে খানা এসে পড়াতে সে ছাড়া পায়। নিজের টেবিলে এসে হাঁপ ছাড়ে।

"ঐ অসভ্য লোকটা কে গো?" জিগেস করে শ্রীলতা।

"আমাদের আপিসের—"

"বুঝতে পেরেছি। বলতে হবে না আর।"

কী যে সে বোঝে, সেই জানে। মনোতোষকে বুঝতে দেয় না। গোমড়া মুখে এটার সেটার থেকে একটু-আধটু চাখে। খাওয়ার তার রুচি নেই যেন আর।

আরো মনমরা হয়ে পড়ে মনোতোষ। ঘরজোড়া ঔৎসুক্য, যে কোনধারে তাকালেই চোখে পড়ে। জোড়ায় জোড়ায় চক্র—জোড়ে-বিজোড়ে। আর চক্রে চক্রে ঘর্ঘর। সেই ঘর্ঘর-ধ্বনি যতই অনুচ্চ হোক, অনুচ্চারিত থাক্—তার ঘরণীকে নিয়েই যে, যতই সে রোখো হোক্, টেবিলে-টেবিলের চক্রান্ত থেকে বুঝতে বেশি বেগ পায় না।

উদ্বেগ পায়। চক্‌চকে চোখ চারধারে—ধারণাতীত চাকচিক্যে উদ্ধত। চোখা চোখা মুখ আর চোখে চোখে মুখরতা। সমস্ত ধার ধারালো হয়ে ঘনিয়ে আসবার আগেই শ্রীলতাকে নিয়ে সে সরে পড়তে চায় এখান থেকে—এই বিশ্রী পরিবেশ থেকে—সব কিছু সঙ্গিন হয়ে ঘোরালো হয়ে ওঠার আগেই। জীবনসঙ্গিণী



শেষ কিলোমিটার!

নিজেই যদি সঙ্গিন হয়ে ওঠেন, তাহলে তো আর রক্ষাই নেই! আমরণ তার খোঁচা।

"হ্যালো, মিটার! ডার্লিং!" রণস্থল থেকে বেরুবার মুখে শেষ কিলোমিটারে এসে আরেক সংঘর্ষ।

ইঙ্গিতে আর ভঙ্গীতে তরঙ্গিত হয়ে মেমটি যেন ওর গায়ের ওপরে এসে পড়ে। কোনরকমে আত্মরক্ষা করে মনোতোষ।

ফীটন গাড়িটা তখনো ছিল দাঁড়িয়ে। শ্রীলতা যন্ত্রচালিতের মতই ওঠে। —"যা মাথা ধরেছে, বাবাঃ!"

"ময়দানে একটু হাওয়া খেলেই ছেড়ে যাবে।"

"হাঁ, সব ঠাণ্ডা হোবে।" কোচমানও উৎকোচ দান করে।

রেড রোড ধরে গাড়ি চলে। খানিক বাদে, মাথা ছাড়ে কি না বলা যায় না, কথা ছাড়ে শ্রীলতার—"রঙ্গিণীটি কে শুনি? তোমার আপিসের কেউ?"

না। এবার তার আপিসের নয়। আপিসের বাইরে তার যে এক আলাদা ব্যবসা আছে, কালোয়াতির বাজারে সেই ওস্তাদি কারবারে যিনি তার অর্ধেক অংশীদার—তাঁরই অর্ধাংশিণী ইনি। সেই ভদ্রলোকেরই পরমার্ধ, পরমার্থ।

"রঙ্গিণী নয় তো, চৌরঙ্গিণী!" ফোড়ন কাটে শ্রীলতা।—"বুঝতে পেরেছি, ইনিয়ে বিনিয়ে আর বলতে হবে না তোমায়।"

"কী বুঝেছো শোনাই যাক্ তো!" আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষায় সেও এবার একটু চড়বড় করে ওঠে—বৌয়ের ফোড়নেই।



কোচম্যানের মেহেরবানী!

"কী বুঝেছি শুনবে? যখন তুমি হোটেলের বয়কে তোমার আপিসের বেয়ারা বলে চালালে আমি অবিশ্বাস করিনি। তারপর সেই মেয়েটিকে বল্লে তোমাদের আপিসের টাইপিস্‌ট্, তাও আমি বিশ্বাস করেছি। আর সেই হতচ্ছাড়া লোকটা তোমায় ডাকলো—যে নাকি তোমাদের ক্যাশিয়ার না কে, তখনো আমি কোনো সন্দেহ করিনি।......"

বৌয়ের অভিযোগের ফিরিস্তি বাড়ে, মনোতোষ কোনো জবাব দিতে পারে না, আ-স্বামী-সুলভ আমতা আমতা ছাড়ে।

শ্রীলতা তার নামতা আওড়ায়—"সবই মানলুম, সমস্তই। কিন্তু—কিন্তু—ঐ রঙমাখা পটের বিবিটি যে তোমার অংশীদারের বৌ, একথা আমি কিছুতেই মানতে পারবো না। একথা আমি বিশ্বাস করবো না কিছুতেই। অমন বিচ্ছিরি আখ্‌খুটে মেয়ে যে কারু—"

এমন সময়ে ফীটনওয়ালা তাদের মধ্যে মাথা গলায়—"মিটিয়ে দিন্ না বাবু। যা দিবার দিয়ে ছোড়ে দিন্ না ওকে। হামি আপনাকে আচ্ছা আওরতের কাছে লিয়ে যাবে। রোজ যেমন লিয়ে যাই।"

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

অভিধান-পাঠ

ছোকরা বদলের উত্তম কবিতা রচনা আরম্ভ করাতে তাঁরই এক মুরুব্বি তাঁকে নিয়ে গেলেন বুড়ো তেয়োফিল গতিয়েরের কাছে। মুরুব্বিটি ভেবেছিলেন কবিতাকলা নিয়ে ছেলেবুড়োতে বিস্তর তত্ত্বালোচনা হবে আর তিনি ফাঁকতালে কিঞ্চিৎ রসাস্বাদ করে নেবেন। আদপেই তা হল না—গতিয়ের মাত্র একটি প্রশ্ন শুধালেন, 'কি হে ছোকরা, অভিধান পড় তো?' বদলের বললেন, 'আজ্ঞে পড়ি।' গতিয়ে খুশী হয়ে বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে।' ব্যস্, আর কোনো কথাবার্তা হল না।

'চলন্তিকা' পড়ছিলুম। কত আজব আজব শব্দের সঙ্গে দেখা। এদের আমি চিনি কিন্তু বহুকাল ধরে কোনো কেতাবপত্রে আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। অর্থাৎ 'আলাল' 'হুতোমের' কৃপায় এদের সঙ্গে আমার প্রথম আর শেষ পরিচয় হয়েছে তারপর মাঝে মাঝে কলকাতার বনেদী বাসিন্দাদের মুখে সেগুলো শুনেছি কিন্তু আজকাল যে-সব বাঙলা বই বেরোয় সেগুলোতে এ-সব শব্দের সন্ধান পাইনে।

রবীন্দ্রনাথ যে রকম 'কবি তাঁহার কল্পনা উৎসের যত করুণা বারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন' লিখতেন ঠিক তেমনি 'শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে,' 'আব্রু দিয়ে ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের — [illegible] লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে রকম 'লীলা-চঞ্চলা রঙ্গ-নিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি' লিখতেন ঠিক সে-রকমই 'ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকী'ও লিখতেন। অর্থাৎ ভাষার হাটে ভশ্চায থেকে আরম্ভ করে মৌলোবীর সঙ্গেও এদের লেনদেন ছিল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের পূর্বে বাঙলা ভাষা দুই কায়দায় লেখা হত—হয় আরবী ফারসীতে ভর্তি, কিম্বা আরবী ফারসী বর্জন করে—কিন্তু দুটোর কোনোটাই ঠিক সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেনি। বিদ্যাসাগর মশায় আরবী ফারসী বর্জন করা সত্ত্বেও তাঁর ভাষা প্রায় সবাই মেনে নিলেন কারণ সে ভাষায় কাঠামো ছিল দড় আর শ্রুতিমাধুর্যে সে ভাষা পরবর্তী যুগের তাবৎ গদ্যকেও হার মানাতে পারে।

আলাল আর হুতোমের লেখাতে এন্তার আরবী ফারসী শব্দ থাকাতে ভাষা সেখানে গতি পেয়েছে দ্রুততর, রস জমেছে নানাপ্রকারের, মোজায়িক বনেছে নানা রঙের কিন্তু দুখানা কেতাবেই আরবী ফারসী শব্দ নেওয়া হয়েছে অকাতরে কোনো প্রকারের বাছ বিচার না করে। আরবী ফারসী শব্দেও গ্রাম্য (স্ল্যাঙ) নাগরে ফারাক আছে বিষয়বস্তু বিবেচনা করে শব্দ বাছতে হয় সন্তর্পণে, যত্রতত্র যাচ্ছেতাই লাগানো চলে না।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, সুকুমার রায় আর নজরুল ইসলাম শব্দ ব্যবহার করেছেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে তাই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে এঁদের অনেক লেখাই পেরিয়ে গিয়েছে শুধু শব্দসম্পদের জোরে। সব রচনাই ঠাসবুনিতে তৈরী করা যায় না —মোদ্দা কথাটা বোঝাবার জন্য গোড়াতে অনেক সময় নানা প্রকারের জানা প্রস্তাবের অবতারণা করতে হয়। জানা কথা বলে সেগুলো তখন বড্ডই রসকষবর্জিত বলে মনে হয়। তখন যদি কিছুটা জানা-অচেনা শব্দ দিয়ে মামুলী জিনিস বলা হয় তাহলে তারই ধাক্কায় পাঠক মোদ্দা কথাতে পৌঁছতে পারে।

আজকের দিনে অবস্থাটা কি?

ঊনবিংশ শতকের লেখকদের প্রায় সকলেই সংস্কৃত জানতেন ভালো। কাজেই তাঁরা যখন লিখতেন তখন সংস্কৃতের বিরাট বিপুল শব্দ ভাণ্ডার রইত তাঁদের হাতের নাগাল। সেখানে কি সব মাল রয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁরা অষ্টপ্রহর সচেতন থাকতেন বলে লেখার সময় তাঁদের ভাষা নিজের থেকেই নানা রকমের বেশভূষা পরতো। আরবী ফার্সী এ সব

লেখকেরা জানতেন না কিন্তু একবার শব্দ-সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেলে পর আপনার থেকেই মানুষ সর্বপ্রকার শব্দের জাত-গোত্র, গুরুচণ্ডাল, মানান-বেমানান সব কিছুই চিনে ফেলতে পারে।

তাই মোটামুটি বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-নাথের আমল পর্যন্ত (সে আমলের শেষ লেখক পরশুরাম) বাঙলা ভাষা অনবরত শব্দ সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটা বিপদ এসে দেখা দিয়েছে। বাঙলাদেশের অধিকাংশ লেখক এবং পাঠক আর আলাল হুতোম পড়েন না এবং ইস্কুল কলেজে সংস্কৃত এতই কম পড়ানো হয় যে, তা দিয়ে সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের সঙ্গে আর কোনো যোগসূত্র রাখা যায় না। আরবী ফারসীর কথা বাদ দিন—আলাল হুতোমের ব্যবহৃত আরবী ফার্সী শব্দই যখন আজকার দিনের বাঙালী পাঠক চিনতে পারে না তখন নূতন শব্দ আমদানী করার কথাই ওঠে না। যতদূর মনে পড়ছে গত ত্রিশ বৎসরের ভিতর 'জেহাদ,' 'ইনকিলাব' এবং 'কায়েদ-ই-আজম' ছাড়া আর কোনো আরবী কিম্বা ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকতে পারে নি।

এবং নূতন করে যে সংস্কৃত শব্দ বাঙলাতে ঢুকতে পারবে সে আশাও দুরাশা। নূতন শব্দ ঢোকে কি প্রকারে? কোনো দেশের লোক যখন প্রচুর পরিমাণে ক্ল্যাসিকস্ পড়ে (ইয়োরোপে একদা যে রকম লাতিন গ্রীক, ভারতবর্ষে যে রকম সংস্কৃত) তখন সেই ক্ল্যাসিকসের শব্দ ইচ্ছা অনিচ্ছায় মাতৃভাষায় ঢুকে গিয়ে ভাষাকে বিত্তবতী করে তুলে। যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই গণতন্ত্রের যুগে এ-দেশে ক্ল্যাসিকসের চর্চা ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং আর যে কখনো ক্ল্যাসিকস ব্যাপকরূপে পড়ানো হবে তার সম্ভাবনাও কম তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে, সংস্কৃত থেকে নূতন শব্দ আহরণ করার মত লেখক এদেশে আর জন্মাবেন না।

শব্দ সম্পদ বাড়াবার আরেকটা কৌশল হচ্ছে দেশবিদেশে ভ্রমণ। আমরা ভ্রমণ যে নিতান্ত কম করেছি তা নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ঔপনিবেশিক বাঙালীরা নানা-প্রকারের সাহিত্য সম্মেলন প্রতি বৎসরে জমান বটে কিন্তু সাহিত্যসেবার দিকে তাঁদের ঝোক নেই। যে সব ইংরেজ হাতী শিকার আর হুইস্কি নিয়ে মেতে থাকে তারা যে খুব সুসাহিত্যিক হয় তা নয় কিন্তু ক্রমাগত আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলে আস্তে আস্তে বহু বিদেশী শব্দ ইংরেজীতে প্রবেশলাভ করতে পেরেছে। অথচ বাঙালী দিল্লীতে বৎসরের পর বৎসর কাটানোর পরও পাঠান-মোগল স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে না, জব্বলপুরে বিশ বৎসর কাটানোর পরও চন্দ্রালোকে মর্মর প্রস্তরের স্বপ্ন নিয়ে উচ্ছ্বসিত গদ্য কিম্বা পদ্য রচনা করে না।

তবে কি পূর্ব বাঙলা পাকিস্তান হয়ে যাওয়াতে ঢাকার বাঙলা সাহিত্যে বিস্তর আরবী ফার্সী শব্দ ঢুকবে? তাও তো মনে হয় না, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি ব্যাপক-ভাবে ক্ল্যাসিকস্ না পড়ালে প্রাচীন ভাষা থেকে নূতন শব্দ আহরণ করা যায় না। পূর্ব বাঙলায় নূতন করে জোর আরবী ফার্সী পড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে খবর পাইনি, হবে যে সে সম্ভাবনাও কম তাই উর্দুর মাধ্যমে দু চারটি শব্দ ঢুকবে নিশ্চয়ই কিন্তু শব্দ সম্পদ নিয়ে কোনো মন্বন্তরকারী আন্দোলন সেখানে হবে না।

তাই শেষ পর্যন্ত সাত দুগুনে চোদ্দর চার নেমে হাতে রইবে পেনসিল। অর্থাৎ যে শব্দ সম্পদ এতদিনে গড়ে উঠেছে তাই ভাঙিয়ে খাওয়া। তার মানে হল, যে বাক্য নিয়ে এ-রচনা শুরু করেছিলুম,—অভিধান পাঠ। সাধারণ পাঠক আর লেখকের শব্দভাণ্ডার প্রায় একই, এমন কি বহুস্থলে দেখা গিয়েছে অনেক পাঠক গণ্যমান্য লেখকদের চেয়েও বেশী শব্দ জানে কিন্তু লিখতে গেলে সাধারণ পাঠক যদি ব্যবহার করে পাঁচশ শব্দ, তবে অতি সাধারণ লেখকও ব্যবহার করে সাত শ। অর্থাৎ লেখকের মনে নানা রকমের শব্দ আনাগোনা করছে এবং লেখার সময় সেগুলো মনের সামনে ভিড় লাগায় বলে আপনার থেকেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণের বেলা তা হয় না।

শব্দভাণ্ডার যাতে করে অহরহ চোখের সামনে খাড়া থাকে বিস্মৃতির অন্ধকার কোণে মণি যাতে করে লোপ না পায় তার জন্যই গতিয়ে বদলেরকে বলেছিলেন অভিধান পড়তে।

তোমার মন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পাখীর পালক যেন; যেন কোনো আদিম কালের
নভোচারী পারাবত, কিংবা স্নিগ্ধ শ্যামল মাটীর
সদ্যোজাত জীয়ানো কুসুম। দীপ্ত, আবেগে অধীর
এই মন নিয়ে আমি খেলা করি যুগ-যুগান্তের!
এই মন কী-যে নয়, এই মনে কী-যে আছে ভাবি!
সমস্তই সুধি ক'রে সুরক্ষিত গভীর ভাণ্ডারে
রেখেছো কী সুকৌশলে! যত কিছু ভালো-মন্দ দাবী
করো পূর্ণ অকপটে, নির্ভয়ে নিয়েছি বারে বারে।

কী আশ্চর্য এই মন; সংসারের বিচিত্র মধুর
অজ্ঞাত দুর্জ্ঞেয় যত সবই স্নিগ্ধ মনের গভীরে
ফোটায় বিচিত্র ফুল; বার বার তাই ফিরে ফিরে
পুণ্য পূর্ণিমার রাতে নীপবনে বাঁশরীর সুর!
পৃথিবীতে শান্তি নেই; কিন্তু রম্য, গহনপ্রদেশে
তোমার হৃদয়লোকে ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে হেসে॥

ঝিনুক

নির্মাল্য বসু

ঢেউয়ের পর ঢেউয়েরা যায়, ঢেউয়েরা আসে মেলা—
অবিশ্রাম। হিসেবহীন। মুখর বালুবেলা।
ধূসর এই দিগন্তের সীমানাহীন পারে—
ঢেউয়ের আসা-যাওয়াই শুধু দেখছি বারে বারে।

এ ঢেউ তবু থাকছে না তো, মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পালায় দূরে। স্মৃতির রঙু অনেক গেছে ধুয়ে:
অভিজ্ঞান হারিয়ে গেল। এ প্রেম কানামাছি;
হাত বাড়িয়ে পাইনে তাই কারেও কাছাকাছি।

তবুও ঢেউ আবার আসে। আবার বালুবেলা
মুখর হয়। স্মৃতির ভীড়। ঝিনুক জমে মেলা।
কত না রঙে রঙীন সেই নিমেষগুলো সবই
গড়িয়ে পড়ে। আবছা নাম। ঝাপ্সা জলছবি।

ঝিনুক নিয়ে অনেক খেলা। কেবল দেখা বাকী—
কোথাও কিছু মুক্তো হয়ে লুকিয়ে আছে না কি!

ইন্দ্রজিতের আসর

রাজকোষ হ'তে চুরি! ধরে আন্ চোর—সেদিন আমাদের বন্ধুমহলে বিষম উত্তেজনা। ছোটখাটো চুরি তো নয়, এক কোটি টাকা চুরি! সে কি তর্ক—সবাই একসংগে কথা বলছে, কেউ শুনছে না। খাদ্য আসবে কোত্থেকে ফসল যদি না ফলে? ফসল ফলবে কোত্থেকে সার যদি না জোটে? সার আসবে কোত্থেকে যদি সার-এর টাকা চুরি যায়? এই হ'ল তর্কের সারমর্ম। আমার এক দোষ, সব তাতেই কথা বলা চাই। অবশ্য এমন কিছুই বলিনি; সার-এর তর্ক যে কত অসার সে কথাটাই বলতে গিয়েছিলুম। বলেছিলাম গৌরী সেনের টাকা সোয়ামীনাথন্ নেবে আর মুন্সীর খাদ্য uncle sam দেবে। হিসাবে বিশেষ গড়মিল হবে না। আমার বন্ধুদের মেজাজ একটুতেই বিগড়ে যায়। মুন্সীকে তো এ'রা গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিলেন, শেষটায় মুন্সীকে ছেড়ে আমাকেই ধরেন আর কি! আমি নাকি গুরুতর ব্যাপারকে লঘুতর করে দিই। অনেক ক্ষেত্রে আমার লঘু গুরু ভেদ থাকে না, একথা ঠিক। তবে এককালে আমিও কতকটা এ'দের মতোই ছিলাম, অল্পেতেই অর্থাৎ লঘু ব্যাপারেও বিচলিত হ'তাম। ইদানীং আমার মেজাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এখন সব সমস্যাকে আমি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক মতে বিবেচনা করে দেখি। লঘুকরণের বিদ্যে যদি জানা থাকে তো কোনো ব্যাপারই গুরুতর ঠেকে না।

আমাকে ওঁরা কথাটা শেষ করতেই দিলেন না। দশের টাকা কিনা, তাই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বাঁধছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ঠিক এই কথাটাই ওঁদের বোঝাতে চেয়েছিলাম, টাকাটা যে দশের টাকা এই কথাটা বুঝে নিলেই অতটা আর উত্তেজিত হতে হয় না। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি ঐ এক কোটি টাকা বুঝি আমারই সিন্দুক থেকে চুরি গেছে। একটু ঠাণ্ডা মেজাজে হিসেব করে দেখুন, ভারতবর্ষের প্রায় বত্রিশ কোটি লোকের সম্পত্তি থেকে যদি এক কোটি টাকা চুরি যায় তো প্রত্যেকের পকেট থেকে কত যায়—না দু পয়সা। ঐ সোয়ামীনাথন্ লোকটা তাহলে আমার দুটি পয়সা চুরি করেছে। সেই দু পয়সার জন্য দেখুন দেশশুদ্ধ তোলপাড়। এটা কি দেখতে ভালো দেখায় না শুনতে ভালো শোনায়। আর দুটো পয়সা যদি লোকে এদিক ওদিক না করতে পারে তো কোন্ সুখে চাকরি করবে? দু পয়সার জন্য পার্লামেণ্টে বাকবিতণ্ডা, খবরের কাগজে প্রবন্ধ, চায়ের দোকানে হাতাহাতি এসব করতে গেলে জাতি হিসেবে আমাদের প্রেস্টিজ কেমন করে থাকবে? আমাদের গভর্নমেণ্ট বরঞ্চ এ বিষয়ে যথেষ্ট dignity দেখিয়েছেন। শ্রীমৎ সোয়ামীজীকে আড়ালে ডেকে বলেছেন, তুমি বাপু দুদিন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাক। নইলে লোকে আমাদের বড্ড গালাগাল দিতে থাকবে। জানই তো ঐ public নামক জীবটা একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের, একটা কিছু নিয়ে ওকে মেতে থাকতে হয়। তা, আরেকটা চুরি ধরা পড়ুক, অমনি তোমার কথা বেমালুম ভুলে যাবে। সোয়ামীনাথন্ লক্ষ্মী ছেলে। বলেছে, যে আজ্ঞে, আপনাদের দয়ায় আপাততঃ আমার চাক্‌রী বাক্‌রীর দরকার হবে না। অবশ্য এমন করিৎকর্মা ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকবার পাত্রই নয়। শিগ্‌গীরই আবার চাক্‌রী হবে। উনি যে রকম যোগ্যতা দেখিয়েছেন তাতে এ্যাণ্টি-করাপসন ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলে তবেই যোগ্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে।

আমার বন্ধুরা তো আমার কথায় কর্ণপাত করেন না। কিন্তু আপনাদের বলছি দেশ স্বাধীন হয়েছে এই আনন্দেই এখন কিছুদিন মশগুল হয়ে থাকুন। স্বাধীনতাটা যে কত সস্তায় পেয়েছি সে হিসাব করি না বলেই আমরা মনে মনে দুঃখ পাই। স্বাধীনতা অর্জনের মূল্য যত কম হবে স্বাধীনতা রক্ষার ব্যয় তত বাড়বে। দেশকে যা দিইনি এখন চোর জোচ্চোরকে তাই দিতে হবে। সেটা ট্যাক্সের সামিল বলে ধরে নিলে আর কিছু না হোক্ মনে শান্তি পাওয়া যায়। আর দেশের টাকা দেশে থাকছে সেটাই বা কম সান্ত্বনা কি? স্যাম্ খুড়ো যা নিতে পারত সেটা সোয়ামী খুড়ো না হয় নিল। জন বুলের পাওনা না হয় শ্রীবিড়লা নেবেন। এতকাল শাদা আদমির দেশে যা যেত এখন তা কালা (আদমির) বাজারে যাচ্ছে। আমরা দেশভক্ত মানুষ, আমাদের দেনা আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি, এতেই আমাদের তৃপ্তি।

মনটাকে একটু দার্শনিক ভাবাপন্ন করে নিতে পারলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই তো দেখুন না আমি ধরেই নিয়েছি সরকারী তহবিল থেকে অন্তত বত্রিশ কোটি টাকা প্রতি বছর চুরি হবে। তা হোক্। কারণ আমার পকেট থেকে যাবে মাত্র একটি টাকা। ব্যস্ এই সোজা হিসেবটি করে রাখুন। তাহলে আপনারাও আমার মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। তাছাড়া, দেশে চুরি জোচ্চোরি ঘুষ তহবিল তছরূপ ইত্যাদি ব্যাপার না থাকলে দেশের শাসনকার্য চলতে পারে না। এসব না থাকলে শাসনকর্তা শাসন করবে কাকে? চোর জোচ্চোর না থাকলে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট থাকে না, পুলিশ না থাকলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকে না। সবাই যদি খেয়ে পড়ে আরামে থাকে তো খাদ্য মন্ত্রীর দরকার কি? দেশে starvation death আছে বলেই খাদ্য মন্ত্রীর চাক্‌রি বজায় আছে। লোকের যদি কোনো অভাব অভিযোগ না থাকে তবে তো শাসন কর্তৃপক্ষ বেকার। অভাব অভিযোগকে জিইয়ে রাখাই শাসকবর্গের প্রধান কাজ। সেইজন্যই বলছিলাম যে, নিজ নিজ চাক্‌রি রক্ষার জন্যই চোর প্রবঞ্চককে প্রশ্রয় দেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। দেশশুদ্ধ সবাই যদি সাধুসজ্জন ব্যক্তি হয়, তবে তো মন্ত্রীদের সমূহ বিপদ। অতএব নিরাপত্তা আইন তৈরি করে চোর জোচ্চোর ঘুষখোরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা থাকলে তবে আমরা আছি। we rise or fall together. আমাদের মন্ত্রীরা গভীর জলের মৎস্য শিকারের জন্য সমুদ্র অবধি ধাওয়া করেছেন। কিন্তু গভীর জলের মৎস্যেরা যে ডাঙ্গায় থাকে আপনারা ভাবছেন সেকথা ওঁরা জানেন না। খুব জানেন। মৎস্যেরা পাছে ধরা পড়ে যায় সেইটেই ওঁদের সব চাইতে বড় ভয়।

মন্ত্রীমশাইরা কত কষ্টে চাক্‌রি বাগিয়েছেন এবং কত কষ্টে চাক্‌রি রক্ষা করছেন এসব কথা ভাবলে স্বভাবতই ওঁদের প্রতি সকলের সহানুভূতি হবে। আর ওঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গেলেই চোর জোচ্চোরের প্রতিও দেখাতে হয়; কারণ আগেই তো বলেছি এরা একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। আমার বন্ধুদের সংগে এই নিয়েই তো আমার বিতণ্ডা। ওঁদের মনে দয়া মায়া নেই। চোর জোচ্চোর মন্ত্রী—কারো প্রতিই এ'রা সহানুভূতি দেখাতে রাজি নন। এমন সহানুভূতিশূন্য শাসনকার্য কেমন করে চলে?

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৮

ভাগলপুরের বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালীটোলার গাঙ্গুলী পরিবার তথাকার একটি প্রাচীন বংশ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমার পিতামহ ৺রামধন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তথায় আগমন ক'রে বসবাস আরম্ভ করেন। বাঙালীটোলার অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর পূর্বে মাত্র একটি পরিবার তথায় বাস স্থাপনা করে।

ভাগ্যান্বেষণের জন্যই হোক, অথবা অপর কোনো কারণ বশতই হোক, প্রথম যুগে যে সকল বাঙালী ভাগলপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, স্বজাতি-বৃদ্ধির প্রতি স্বতঃই তাঁদের প্রবল আগ্রহ এবং উদ্যম দেখা যেত। সুযোগ-সুবিধা ঘটলেই বাঙলা দেশ থেকে তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসতেন এবং স্থায়ীভাবে যাতে তাঁরা ভাগলপুরে বসবাস করতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থাদিও ক'রে দিতেন। এমন কি স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাঁরা অল্পদিনের মেয়াদে ভাগলপুরে আসতেন, তাঁদেরও স্থায়ীভাবে আটকে ফেলবার জন্য তদানীন্তন প্রবাসী বাঙালিগণের চেষ্টা চারিত্রের ত্রুটি দেখা যেত না। বসত-বাটির জন্য আমার পিতামহ বাঙালীটোলায় গঙ্গার অতি নিকটে বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ভূমির দক্ষিণ দিকের বেশ খানিকটা অংশ মাত্র চৌদ্দ টাকার বিনিময়ে তিনি একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারকে দিয়েছিলেন, শুধু তাঁদের স্থায়ী প্রতিবেশীরূপে পাবার প্রলোভনে। সে চৌদ্দ টাকাকে উক্ত ভূমির মূল্য ব'লে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে; ভূমি গ্রহণ করা রূপ পুণ্য কার্যের দক্ষিণা স্বরূপই ছিল ঐ চৌদ্দ টাকা।

ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের দল বাড়াবার কার্যে সর্বদা সচেতন থাকতেন বটে, কিন্তু সে কার্য তেমন কিছু কঠিন কার্যও ছিল না। কোনো গতিকে ভাগলপুরের চতুঃসীমার মধ্যে একবার এসে পড়লে, ভাগলপুরের অতীব স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু এবং প্রচুর ও সুলভ খাদ্যসম্ভার পিছনে ফেলে বাঙলা দেশে ফিরে যাওয়াই ছিল আগন্তুকের পক্ষে কঠিন কার্য। তখন আগন্তুক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কোনো প্রকারে ভাগলপুরে টিঁকে থাকবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'তেন এবং স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ফলে সে উপায় খুঁজে বার করতেও তেমন কিছু বেগ পেতে হ'ত না।

ভাগলপুর অবশ্য এখনও বিহারের উৎকৃষ্টতম স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম, কিন্তু এখনকার তুলনায় পূর্বের স্বাস্থ্য আরও অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। দার্জিলিং প্রবর্তিত হবার পূর্বে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র শাসক লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল প্রতি বৎসর তিন মাসের জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভাগলপুরে গমন করতেন। তাঁর সঙ্গে যেত তাঁর খাস দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিবৃন্দ। ভাগলপুরের খঞ্জনপুর অঞ্চলে উপস্থিত যেখানে প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের 'ঝাউয়াকুঠি' নামক অট্টালিকা অবস্থিত, শুনেতে পাওয়া যায়, সেই বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রাসাদ। ভাগলপুরের জল-বায়ুর সুনামে আকৃষ্ট হ'য়ে শুধু যে 'ছোট লাটই' ভাগলপুরে আসতেন তা নয়, ম্যালেরিয়া পীড়িত সারা বাঙলা দেশের ধারণা ছিল যে, তিনদিন ভাগপুরের জল পান করলে সুকঠিন যকৃৎ গলতে আরম্ভ করে এবং তিনদিন তথাকার বায়ু সেবন করলে জমাট প্লীহাও ওড়বার উপক্রম দেখায়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের যুগে ভাগলপুরে খাদ্য-দ্রব্যাদি কিরূপ সুলভ ছিল, সে কথা শুনলে আজ বিশ্বাস করা কঠিন হবে। কিন্তু ঠিক তার একশত বৎসর পরের, অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের, সামান্য একটি ঘটনাকে যদি ভিত্তি করা যায়, তা হ'লে সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অনুমান করলে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের কথা যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদন ক'রেও একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হবে না।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমার সেজদাদা ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত একটি মকর্দমা উপলক্ষে আমি বাঁকায় গিয়েছিলাম। ভাগলপুরের অন্যতম সাব ডিভিসন বাঁকা ভাগলপুর থেকে ত্রিশ-প'য়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। একদিনেই মকর্দমা শেষ না হ'য়ে পরদিনও যদি খানিকটা সময় নেয় তা হ'লে বাঁকায় আমাদের রাত্রি-যাপন করতে হবে ভেবে আমরা সঙ্গে শয্যা এবং বস্ত্রাদি নিয়েছিলাম। বেলা ৩টা নাগাদ যখন বোঝা গেল যে, প্রয়োজন হ'লে খানিকটা অতিরিক্ত সময় এজলাস ক'রেও সেইদিনই হাকিম মকর্দমা শেষ করতে তৎপর হয়েছেন, তখন সেজদাদা তাঁর পুরাতন ভৃত্য ভজুয়ার মারফৎ একটা টমটম ক'রে আমাদের জিনিসপত্র মাইল সাতেক দূরবর্তী এক জমিদারের কাছারী বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কাছারীতে নৈশ আহার সমাপন ক'রে আমরা রাত্রি যাপন করব এবং পরদিন প্রাতে চা-পানাদির পর ভাগলপুরের পথে অগ্রসর হব। যাবার সময়ে সেজদাদা ভজুয়াকে ব'লে দিলেন, "আমাদের জন্যে আনা দুয়েকের দুধ কিনে রাখিস।

মকর্দমা শেষ হ'তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মকর্দমায় আমাদের পক্ষের বাঁকার উকিল ছিলেন শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় চৌধুরী। তাঁর গৃহে সোপকরণ চা-পান ক'রে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলাভিমুখে রওয়ানা হলাম। কাছারি-বাড়িতে পেঁছিতে প্রায় রাত্রি আটটা হ'ল।

আহারে ব'সে দুই 'কটোরায়' দুজনের দুধের বহর দেখে আমাদের ত চক্ষুস্থির! ভজুয়াকে ডেকে তিরস্কারের কণ্ঠে সেজদাদা বললেন, "তোর মতো বেহুদা (নির্বোধ) ত' আর দেখিনি! আমরা কি দুধে আচমনও করব যে, এত দুধ কিনেছিস্?"

এই অকারণ অনুযোগে বিস্মিত হ'য়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভজুয়া বললে, "আপনি দু আনার দুধ কিনতে বলেছিলেন, আমি দু আনার দুধই কিনেছি। কসুর তা হ'লে কোথায় হ'ল?"

উত্তর শুনে সেজদাদা ভজুয়াকে আর কিছু বললেন না; আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ইঙ্গিত সহকারে মৃদুস্বরে বললেন, "ক-দন্ত্য স-য়ে হ্রস্ব উ-র (কসুর) কোথায় হয়েছে জানো? ডবলিউ-এ-টি-ই-আর water মেশাবার বে-আন্দাজে। পিওর মিল্কের হাফ্ নিজের জন্যে রেখে, বেটা আমাদের দুধে বে-আন্দাজ ডবলিউ-এ-টি-ই-আর ঢেলেছে।"

খেতে গিয়ে কিন্তু দেখি, গাভীমাতার স্তন হ'তে ক্ষরিত হওয়ার পর সে দুগ্ধে এক বিন্দুও ডবলিউ-এ-টি-ই-আর পড়েছে ব'লে বিশ্বাস হয় না। ঘন, মিষ্ট, সুস্বাদু, উপাদেয় দুধ!

সকৌতূহলে ভজুয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দু আনায় কতটা দুধ পেয়েছিস ভজুয়া?"

ভজুয়া বললে, "দু সের।"

সে অর্থে কলকাতার আশি তোলার সের মনে করলে ভুল হবে; ভাগলপুরের এক শ' এক

তোলার সের। সুতরাং দু সের অর্থে কলকাতার আড়াই সেরেরও সামান্য কিছু বেশি।

১৯১৮ সালে যে বাঁকায় টাকায় ষোল সের দুধ পাওয়া যেত, ১৯৫১ সালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে সেখানে বড় জোর সের দুই পাওয়া যায়। ১৯১৮ সালের 'টাকায় ষোল সের' যদি ১৯৫১ সালে 'টাকায় দু-সের'-এ দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ১৮১৯ সালের 'টাকায় কত সের' ১৯১৮ সালে 'টাকায় ষোল সেরে' দাঁড়িয়েছিল,—সে গোলমেলে অঙ্ক না হয় নাই কষলাম; কিন্তু কেউ যদি দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ১৮১৯ সালে ভাগলপুরে টাকায় আড়াই মণ দরে দুধ পাওয়া যেত, তা হ'লে সে কথায় আপত্তিই বা করি কোন্ হিসেবের জোরে?

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পিতামহর আমলের কথা না হয় ছেড়েই দিই। আমাদের বাল্যকালে ভাগলপুরে পাওয়া যেত টাকায় বারো-তের সের খাঁটি দুধ, সওয়া সের বিশুদ্ধ ঘি, তিন আনায় এক সের রুই মাছ, দু পয়সায় এক সের চুনো মাছ, আট আনায় একশত ভুতো বোম্বাই, আর চার আনায় একটা দশ সেরি তরমুজ, যার আধখানার শাঁসে আর জলে পনের ষোলজন মানুষের একটা সমগ্র পরিবার পরিতৃপ্তির সহিত সরবৎ খেতে পারত।

সুতরাং আজ হ'তে একশত বত্রিশ বৎসর পূর্বে উৎকৃষ্ট জল-বায়ু এবং অতি সুলভ বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের মণি-কাঞ্চন যোগের প্রভাবে অচির কালের মধ্যে ভাগলপুরে যে বাঙালীর বৃহত্তম উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল, তা'তে আর বিস্ময়ের কি এমন থাকতে পারে? যখনকার কথা বলছি, তখন ভাগলপুরে রেল হয়নি:—হালিসহর থেকে নৌকাযোগে ভাগলপুরে পৌঁছতে প্রায় একমাস সময় লাগত।

বাঙলা দেশে আমাদের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্তী হালিসহর গ্রামে। নিবাস ছিল বললে কতকটা ভুল হয়, কারণ এখনও সেখানে পৈতৃক বাড়ি এবং কিছু জমি-জমা আছে। উপস্থিত সে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন আমাদের খুড়তাত ভাই সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা দেশকর্মী শ্রীমান বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্তমানকালে হালিসহর রীতিমত শহরেই পরিণত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু প্রাচীনকালেও এ গ্রামখানি সুবৃহৎ ভদ্র এবং বিদগ্ধ সমাজ অধ্যুষিত নাগর মর্যাদাসম্পন্ন একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। এখানে গণ্ডগ্রাম শব্দ অবশ্য আমি গণ্ডগ্রামের প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ 'বৃহৎ জনাকীর্ণ গ্রাম' অর্থে, ব্যবহার করছি। গণ্ডগ্রাম শব্দটি কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র নগণ্য 'অজ পাড়াগাঁ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহু খ্যাতনামা লেখকও তাঁদের লেখার মধ্যে ঐ অর্থেই গণ্ডগ্রাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুর্দৈবের কোন প্রথম দিবসে কিরূপ বিপাকের অবস্থায় প'ড়ে 'গণ্ডগ্রাম' তার মহিমার শাল-দোশালা থেকে রিক্ত হ'য়ে দৈন্যের দোলাই গায়ে দিতে আরম্ভ করলে, সে ইতিহাস নিশ্চয়ই কৌতুকপ্রদ। গণ্ড শব্দের একটা অর্থ বুদ্বুদ। এই তুচ্ছার্থবোধক অর্থটিই গণ্ডগ্রামের গণ্ডের উপর আরূঢ় হ'য়ে তার মহিমাচ্যুতি ঘটিয়েছে কিনা কে বলতে পারে?

সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালিসহরে জন্মগ্রহণ এবং জীবনযাপন করেন। শুনেছি তনু গাঙ্গুলী নামে

আমাদের এক পিতৃপুরুষ রামপ্রসাদের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। প্রতিদিন বেলা সাড়ে নটা-দশটার সময়ে আমাদের শিবের গলির বাড়িতে রামপ্রসাদ এসে হাজির হতেন। তিনি আসামাত্র মেয়েরা একটা বাটী করে আধ পোয়াটাক সরিষার তৈল সম্মুখে ধরে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'য়ে যেত কয়েকজনে মিলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে সর্বাঙ্গে তৈল-মর্দন এবং তেল মাখতে মাখতেই আরম্ভ হ'ত, প্রথমে মৃদুস্বরে ক্রমশঃ উচ্চরোলে গান ও নৃত্য। বলা বাহুল্য গান অর্থে শ্যামাসঙ্গীত।

তেল মাখার পালা শেষ হ'লে ক্ষণকাল গৃহাঙ্গণে নৃত্য-গীতের পর সকলে বাহির হ'য়ে পড়তেন পথে। নিয়মিত জনতা তথায় যথারীতি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকত। রাম-প্রসাদকে পাওয়া মাত্র তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে সকলে উল্লসিত চিত্তে নৃত্য এবং গীতে যোগদান করত। গ্রামের পথে পথে চলতে চলতে জনতা স্ফীত থেকে স্ফীততর হ'তে হতে ক্রমশ বিপুল আকার ধারণ করত। শত শত কণ্ঠের গীত-রবে সমস্ত গ্রাম মুহুর্মুহু চকিত হ'তে থাকত। অবশেষে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময়ে সকলে উপনীত হতেন ভাগীরথীর উপকূলে।

তখন রামপ্রসাদ তাঁর কয়েকজন স্নানার্থী সঙ্গীসহ নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অর্ধ পোয়া সর্ষপ তৈল লোমকূপ হতে নিষ্কাশিত ক'রে জলস্রোতে মুক্তিদান করতে সকলের ঘণ্টা দুই সময় লাগত। জল ছেড়ে তীরে উঠে গা মুছতে আর সবুর সইত না,—পাকাশয়ে তখন দুর্দান্ত ক্ষুধার দাবানল জ্বলেছে। মাথা মুছতে মুছতে সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে দৌড় মারতেন; গৃহে উপনীত হয়ে তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন করে বসে পড়তেন সব্যঞ্জন এক থালা বাড়া ভাতের সম্মুখে।

প্রতিদিন চলত ঠিক এই একই পদ্ধতির অনুবর্তন।

পশ্চিমবঙ্গের হালিসহরে এসে বসবাসের খোঁটা গাড়বার পূর্বে আমাদের নিবাস ছিল পদ্মানদীর পূর্ব পারে খাস পূর্ববঙ্গের বিদ্বজ্জনসমৃদ্ধ কোনো এক সুবিখ্যাত গ্রামে। বিহারেই বাস করি, আর পশ্চিমবঙ্গের ভাষাতেই কথা কই, মূলত আমি যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে একবার সে কথার একটা 'ঝেলো' প্রমাণ দেবার কারণ ঘটেছিল। কাহিনীটা শুনলে এ বিষয়ে সকল কথাই সুস্পষ্ট হতে পারবে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। বিখ্যাত লছমীপুরের মামলায় প্রতিবাদিনী রাণী কুসুম-কুমারীর পক্ষ অবলম্বন করে ভাগলপুরে এসেছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদীদের পক্ষে আছেন প্রফুল্লরঞ্জন দাস এবং স্যার (পরে লর্ড) এস পি সিংহ, কলিকাতা হাইকোর্টের দুই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার। পূর্ব হইতেই আমি রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে উকিল ছিলাম; দাশ সাহেব আসার পর থেকে আমি তাঁর অধীনে জুনিয়ারের কাজে ব্যাপৃত হয়েছি।

মকর্দমায় বাদীপক্ষ সমগ্র লছমীপুর স্টেট দাবী করেছেন। কোর্টফিস ও জুরিসডিক্‌শনের হিসাবে মামলার মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে চল্লিশ লক্ষ টাকা; কিন্তু বহু মূল্যবান খাদ-খনি পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে সমৃদ্ধ সমগ্র জমিদারীর মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশী। এই বৃহৎ ও জটিল মামলায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করে আছে চল্লিশটি বিভিন্ন ইসু। সুদীর্ঘ আট মাস কাল অতিবাহিত হয়েছিল সেই চল্লিশটি ইসুর দুর্গম পর্বত-প্রান্তর এবং দুস্তর নদী-নালা অতিক্রম করে সমাপ্তির সীমান্ত রেখায় উপনীত হতে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়ে মকর্দমা শেষ হয়েছিল ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

পূজার ছুটি আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে 'গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ভাগলপুরে উপস্থিত হলেন। পূজার ছুটিতে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে মায়াবতী যাবেন এবং অবসরকাল তথায় বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন, এমন ব্যবস্থা পূর্বেই চিঠিপত্রে ঠিক হয়ে ছিল; ইনি এসেছেন মায়াবতী যাত্রার ঠিক দিনটি অবগত হতে এবং চিত্তরঞ্জন যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তা হলে ভাগলপুর থেকে তাঁদের অনুগমন করতে। চিত্তরঞ্জনের নিকট ইঙ্গিত লাভ করে গণেন মহারাজ মায়াবতী যাবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন;—মৌখিক নয়, সুস্পষ্ট আন্তরিকতারই সহিত। ছুটিতে কলিকাতা যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে মায়াবতী যাওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রবলতর ইচ্ছার কাছে কি প্রকারে নিজের ইচ্ছাকে হার মানিয়ে শেষ পর্যন্ত মায়াবতী যেতে হয়েছিল, সে সকল কথা অন্যত্র সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছি। পুনরায় সে বিষয়ে বেশী কিছু বলতে গেলে পুনরুক্তির অপরাধে অপরাধী হতে হবে। সুতরাং এক দৌড়ে মায়াবতী পৌঁছানোই যাক।

কাঠগুদাম রেল স্টেশন থেকে নব্বই মাইল দূরে আলমোরা জেলার এক নিভৃত প্রদেশে হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে অপরূপ লাবণ্যময়ী মায়াবতী অবস্থিত। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রম ব্যতীত সেখানে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মনুষ্য সমাজ আর তার সাধারণ ক্রিয়াকলাপ সেখানে অবর্তমান ও অপরিজ্ঞাত। পূর্ণকুম্ভে জল যেমন কুম্ভের সমস্ত অবকাশকে আচ্ছন্ন করে থাকে, অদ্বৈত আশ্রম তেমনি মায়াবতীর সমস্ত অবকাশকে পূর্ণ করে আছে।

অনুচরবর্গ ব্যতীত মায়াবতীর দলে আমরা ছিলাম সবশুদ্ধ আট জন। চিত্তরঞ্জন, বাসন্তীদেবী, অপর্ণা ও কল্যাণী দুই কন্যা, পুত্র চিররঞ্জন, বাসন্তীদেবীর সম্পর্কীয় ভাই সতীন্দ্রনাথ, ল-ক্লার্ক ললিতমোহন সেন ও আমি। দুই বেলা আমরা একত্রে আহারে বসতাম এবং প্রায় প্রত্যহই মেয়ে দুটি বাসন্তী দেবীকে অনুরোধ করত, "মা, একদিন মরিচ ঝোল কর!"

মরিচ অর্থে লঙ্কা। মায়াবতীতে এক রকম লঙ্কা পাওয়া যায় যা সাধারণ লঙ্কার ন্যায় লম্বা নয়, গোল। তাই বলে গোলমরিচও নয়। লঙ্কাগুলি বৃহদাকার এবং কাঁচালঙ্কার ভুরভুরে সুগন্ধে মনোরম।

এই লঙ্কার ঝোলের জন্যই মেয়েরা সর্বদা পীড়াপীড়ি করত। শীঘ্র একদিন করবেন বলে বাসন্তী দেবী নিত্যই তাদের আশ্বাস দিতেন; কার্যত কিন্তু হয়ে উঠছিল না। পুরুষেরা

অবশ্য পীড়াপীড়ি করতেন না,—কিন্তু মেয়েদের প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের যে সাগ্রহ সমর্থন ছিল, সে কথা ভাবে ইঙ্গিতে বুঝতে অসুবিধে হোত না।

আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য বাসন্তী দেবীর দুইজন সুদক্ষ বাবুর্চি ছিল, কিন্তু তাদের দিয়ে মরিচ ঝোল প্রস্তুত করাবার কথা কেউ বোধ হয় চিন্তাও করত না। যে বিশেষ একটা মৃদু স্বাদ এবং সুরভির জন্য মরিচ ঝোল খাবার এত আগ্রহ, বাবুর্চিদের মোগলাই হাতের ফাঁক দিয়ে ঝোলের বাইরে কোথায় তা পথ হারাবে, তাই বোধ হয় ছিল সকলের আশঙ্কা। ভাল মৃদঙ্গ বাজাতে পারার গুণেই ভাল ডুগ্‌ডুগি বাজাতে পারা যায় না, এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

অবশেষে একদিন বহু-আকাঙ্ক্ষিত মরিচ ঝোল প্রস্তুত হল। বলা বাহুল্য, রেঁধেছেন বাসন্তী দেবীই। ছেলেমেয়েদের উৎসাহের অন্ত নেই,—আজ অর্ধেক অন্ন মরিচ ঝোল দিয়েই সাবাড় করতে হবে!

আমরা আট জনেই একটা বড় টেবিলের দুদিকে একত্রে খেতে বসতাম। সাতজনে বসেছি; বাসন্তী দেবী পাতে পাতে বাটি বাটি মরিচ ঝোল পরিবেষণ করছেন; ছেলেমেয়েরা মরিচ ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে 'হা-হু হা-হু' করছে, আর বলছে, "বেশ হয়েছে মা!" "খাসা হয়েছে মা!" "চমৎকার হয়েছে মা!" চিত্তরঞ্জন 'হা-হু'ও করছেন না, কোনো মন্তব্যও ছাড়ছেন না, কিন্তু তাঁর খাবার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মতেও চমৎকারই হয়েছে।

আমাকে বাদ দিয়ে বাকি সাতখানা পাতে মরিচ ঝোল পরিবেষণ করে বাসন্তী দেবী নিজে বসবার উপক্রম করছেন দেখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, "আমার মরিচ ঝোল কই?—আমাকে দিলেন না ত?"

বসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাসন্তী দেবী স্মিতমুখে চিত্তরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ভাবটা, দোবো না-কি একটু?

ব্যস্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না, না, মরিচ ঝোল আপনাকে দেওয়া হবে না। ও আমাদের বাঙ্গালে খাওয়া,—আপনি সহ্য করতে পারবেন না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম, "বাঃ! সে কি কথা! এতদিন ধরে 'মরিচ ঝোল', 'মরিচ ঝোল' শুনেছি,—সেই মরিচ ঝোল হল,—আর আমি খেতে পাব না কি রকম?" বাসন্তী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললাম, "খুব সহ্য করতে পারব। আপনি দিন!"

আহার্য বস্তু প্রার্থনা করলে মেয়েরা সহজে সে প্রার্থনা রোধ করতে পারেন না, বিশেষত সে আহার্যবস্তু যদি স্বহস্ত প্রস্তুত হয়। ঝোল ভাগ করবার সময়ে আমার ভাগেও বোধ হয় একটা বাটি পড়েছিল, তাড়াতাড়ি বাসন্তী দেবী পাশের ঘর থেকে এক বাটি ঝোল নিয়ে এসে আমার সম্মুখে স্থাপন করলেন।

প্রথমে সামান্য একটু ঝোল ভাতে মেখে ভয়ে ভয়ে চেখে দেখলাম;—তারপর হঠাৎ করে সমস্ত ঝোলটা ভাতের ওপর ঢেলে দিয়ে বেশ করে ঝোলে-ভাতে মেখে সপাসপ্ লাগিয়ে দিলাম। সত্যিই চমৎকার হয়েছে! খাসা হয়েছে! যেমন সুতার আস্বাদ, তেমনি ভুরভুরে গন্ধ!

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে হাত নেড়ে আমার আহারে বাধা দিয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "থামুন একটু! খাবেন অখন। আগে বলুন ত' কোথায় বাড়ি? ভাঁড়াবেন না, সত্যি করে বলবেন।"

বললাম, "কেন? আপনি ত' জানেন ভাগলপুরে।"

"তার আগে?"

"তার আগে চব্বিশ পরগণায় হালিসহরে।"

"তার আগে?"

"তার আগে দস্তুরমতো ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বাইগ্যা গ্রামে। জানেন, আমরা বেগের গাঙ্গুলি?"

উল্লসিত কণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "তা হলে নির্ভয়ে খেয়ে যান,—কোনো চিন্তা নেই! আপনি যখন ঢাকায় বাঙ্গাল, তখন ত আমরা এক জেলার মানুষ।"

বললাম, "কিন্তু আমার মধ্যে এখন আর বাঙ্গালত্ব আছে কি কিছু? ভাগলপুরে ত' একশ' বছর হল, তার আগে তিন শ' বছর হালিসহরে। চার-শ বছরের প্রবাস-জীবনের পর আমাদের বাঙ্গালত্বের এক ছিটে ফোঁটাও কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "কেন? পাওয়া ত' গেছে আজ মরিচ ঝোলের মধ্যে। ও জিনিস একেবারে লুপ্ত হবার নয়—গোত্রের মতো পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে। বাঙ্গালদের আছে দুটো গোত্র,—এক ঋষিদের কাছে পাওয়া গোত্র, আর মরিচ গোত্র। চার শ' বৎসর পূর্ববঙ্গ ছাড়া হলেও মরিচ গোত্র রক্তের মধ্যে প্রবাহিত থাকে।"

চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য শুনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন।

এর পর প্রায়ই মাঝে মাঝে মরিচ ঝোল রাঁধা হতে লাগল; আর আমার পাতেও পড়তে লাগল নির্বিবাদে সকলের সঙ্গে। 'ঝোলো' প্রমাণের দ্বারা বাঙ্গাল দেশের মানুষ বলে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিলাম, বোধ করি সেই কারণেই।

'ঝোলো' প্রমাণের অর্থ এখন বোধ হয় কারো কাছে আর অস্পষ্ট নেই।

(ক্রমশ)

যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

তৃতীয় দৃশ্য

ঘণ্টা বাজিতেছে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। মহারাষ্ট্র দরবারের প্রশস্ত চত্বর। চারিদিকে চারটি থামের উপর ছাদ, নীচে আলিশার বেষ্টনী। চারিদিকে আসন। মধ্যস্থলে প্রশস্ত একটি আসনে বালাজী রাও, বসিয়া উত্তর ভারত অভিযানের নির্দেশনামা নীরবে পাঠ করিতেছেন। গোপন নির্দেশনামা তিনি নিজেই রচনা করিয়াছেন। সম্মুখে একদিকে রঘুনাথ রাও অন্যদিকে সদাশিব রাও ভাও। বালাজী হাত তুলিয়া বলিলেন—

বালাজী—দরবারের ঘণ্টা এখন বন্ধ করতে বল। সদাশিব!

সদাশিব আগাইয়া গেলেন—এ—! বন্ধ কর! ঘণ্টা!

(ঘণ্টা বন্ধ হইল। বালাজী রাও নির্দেশনামা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন)

বালাজী—শাহজাদী ফকিরিনী বেগম নসীবয়েসার নামে দিল্লী দখল হবে না। কার নামে দিল্লী দখল করবে সে নির্দেশ আমি পরে পাঠাব। বাকী সমস্ত নির্দেশ এর মধ্যে রইল।

(নির্দেশনামা রঘুনাথের দিকে বাড়াইয়া দিলেন)
(রঘুনাথ সদাশিব দুইজনেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিল)

বালাজী—বালিকাটির চরিত্র অত্যন্ত জটিল! আমার প্রস্তাবে সে সম্মতি দেয়নি। উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রের মর্যাদা তোমার উপর নির্ভর করছে রাঘব!

রাঘব—আমার জীবন দিয়ে সে মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করব মহামান্য পেশবা!

বালাজী—লাহোরে আবদালীর পুত্র তৈমুর শাহ আবদালীর উপর প্রচণ্ডতম আঘাত হানবে। সমগ্র উত্তর ভারতে যেন একটি আফগান পাঠান না থাকে। এর চেয়ে বড় সুযোগ আর আসবে না মনে রেখো। সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে—হিন্দুস্থানে আঁধিয়ারা নামছে, মুঘল বাদশাহী যাবে। বিগ্রহমূর্তি ফেটে বেরিয়ে আসবেন দেবতা নিজে। লোকে পরিবর্তন প্রতীক্ষা করে রয়েছে। প্রতিষ্ঠা মাত্রেই অবনত মস্তকে মেনে নেবে।

(নির্দেশনামা দিলেন।)

(প্রশ্নের সুরে বললেন) বাহিনীর যাত্রা শুরু হবে দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম পাদে মহাকালীর পূজারম্ভ হওয়া মাত্র?

রাঘব—(মাথা নত করিয়া সম্মতি জানাইয়া) হ্যাঁ মহামান্য পেশবা!

বালাজী—তাহলে তুমি যাত্রা কর! একটি কথা আর একবার মনে করে দিচ্ছি—এবার আমরা চৌথ আদায়ে যাচ্ছি না! বিরুদ্ধ শক্তিকে কঠোর হাতে দমন করবে! অথচ সাধারণের উপর যেন অত্যাচার না হয়! উত্তর ভারতে দুটি প্রবল শক্তির সহযোগিতা পাবে। গোস্বামী সৈন্যদের সাহায্য আর জাঠ চাষীদের আনুগত্য, যাও—শিবাস্তে পন্থানঃ!

(রাঘব অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল)

সদাশিব! দাক্ষিণাত্যের ভার তোমার উপর। সর্বাগ্রে নিজাম। তুমি যাত্রা করবে ত্রয়োদশীতে?

সদাশিব—হ্যাঁ!

(বাহির হইতে নরিন্দর গিরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল)

নেঃ নরিন্দর—নমো নারায়ণায়! ভাই পণ্ডিত নানাজী রাও; পেশবা বালাজী রাও!

(প্রবেশ করিলেন)

বালাজী—(উঠিয়া) নমো নারায়ণায়। নমস্তে গিরি মহারাজ!

নরিন্দর—আনন্দ রহো ভাই! আনন্দ রহো! কল্যাণ করুন কল্যাণের দেবতা।

বালাজী—আসন গ্রহণ করুন মহারাজ!

নরিন্দর—কর্মে ব্যাঘাত করলাম পেশবা?

বালাজী—না গোস্বামীজী, আমি প্রতীক্ষাই করছিলাম।

নরিন্দর—পাণ্ডিত্যের ফল—এই বাক্য আর ব্যবহার বড় উজ্জ্বল ভাই পণ্ডিত। (আসনে বসিলেন) আমি একটু ব্যস্ত হয়ে কিছু আগেই হয়তো ঢুকলাম। জাঠ সর্দার জবাহির আর তার একজন সঙ্গী আমার সঙ্গে এসেছে তোমার আহবানে, তাদের কথা মনে করে দিচ্ছি ভাই। গ্রাম্য চাষী তারা, নগরে এসে পীড়া অনুভব করছে। তার উপর জবাহির এখনও অসুস্থ। তাদের শীঘ্র বিদায় কর। একটু অধীর হয়েছে তারা।

বালাজী—আজই দরবারে তাদের আহবানের ব্যবস্থা করেছি মহারাজ। তাদের কথা আমি ভুলিনি। সদাশিব, তুমি তাদের নিয়ে এস।

(সদাশিবের প্রস্থান)

মারাঠা তো অগ্রসর হল গিরি মহারাজ! আপনাদের সক্রিয় সাহায্য আমি প্রত্যাশা করব।

নরিন্দর—পণ্ডিত, তোমাকে ভাই আমি ভালবাসি। বিপদে ভ্রমে আমি ভাই তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। কিন্তু গিরিদের সম্পর্কে গুরুর নির্দেশ আছে। সে অমান্য করতে পারব না। গুরুর আদেশ—রুদ্রের আবির্ভাব না হলে তোমরা অস্ত্র ধরবে না! রুদ্র কি জেগেছেন ভাই পণ্ডিত?

বালাজী—আপনারা দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে দেখেন—

নরিন্দর—না না ভাই। দিব্য-দৃষ্টি না, অলৌকিক শক্তি না, জ্যোতিষ গণনা না। ও সব কিছু নয় ভাই। আমি বুঝি মন দিয়ে। সাধারণ জীবের মত। আমাদের আশ্রমে একটা বিড়াল ছিল, বিপদ আসবার আগে সেটা কাঁদত! কেমন মন দিয়ে বুঝতে পারত। আমার বুঝা ভাই তাই। আফগান এল ভাই, বুকের ভিতরটা হুংকার দিয়ে উঠল, বাস, বুঝলাম রুদ্র জেগেছেন। উঠে দাঁড়ালাম। আমি হারিয়ে গেলাম। সে তুমি দেখেছ। আমার সেই মন দিয়ে বুঝা ভাই!

বালাজী—আমার তো সে মন নেই মহারাজ, আমি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝি। আমার বিচারে আমি বুঝেছি ভারতবর্ষে একটা বিপর্যয় আসন্ন। এ বিপর্যয়ে যে প্রচণ্ডতম আঘাত হানতে পারবে, সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আমি সর্বাগ্রে সেই আঘাত হানব। সময়ের দিক থেকে অত্যন্ত সুসময়। প্রবাদে গুজবে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। মহারাষ্ট্রকে আমি রুদ্রভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছি।

নরিন্দর—তাইতো আমার প্রশ্ন। পেরেছ? জেগেছেন তিনি?

বালাজী—আজই চোখে দেখতে পাবেন। মহারাষ্ট্র বাহিনী যাত্রা করবে।

নরিন্দর—দেখি ভাই। কিন্তু তোমার ভিতরে তাকে দেখছি কই? সে যার ভিতর নাচে পণ্ডিত, দেখেছিলে আমার সেদিনের নাচন, সে কি আমার নাচন ভাই, সে তার নাচন!

বালাজী—না মহারাজ, নেচে কোন কাজ আমি করি না। আমার আদর্শ কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ।

নরিন্দর—শঙ্কর! শঙ্কর! শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—ভগবান আমি। কিন্তু ভাই দ্রৌপদীর অপমানে, দাসত্বের অমর্যাদায় শঙ্কর যদি রুদ্ররূপে পান্ডবদের বুকে না জাগতেন, তবে কি কুরুক্ষেত্র হতো? তাই তো বলছি ভাই, উত্তর ভারতে আফগান যাদের বুকে রুদ্রকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, তাদের নিয়ে যাত্রা করো। সেই জন্যেই জবাহিরকে নিয়ে এসেছি আমি!

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদাশিব—মহামান্য পেশবা! জাঠ সর্দার জবাহির সিং।

(জবাহির ও তাহার সংগী প্রবেশ করিল)

জবাহির—(বিভ্রান্তের মত দাঁড়াইল)

নরিন্দর—জবাহির! ইনি পেশবা!

জবাহির—হাঁ? পেশবা মহারাজ? হিন্দু পাদ পাদশাহীর প্রথম ব্রাহ্মণ শাহানশাহ?

জবাহির সিং পল্লীবাসী জাঠ; সে মারাঠা রাষ্ট্রনায়ককে সম্মুখে পাইয়া কথা বলিতে বলিতেই মুগ্ধের মত অগ্রসর হইয়া গেল, তাঁহার আসনের দিকে। বালাজী রাও হাত তুলিলেন, তাঁহার নিষেধ ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল না। জবাহির কি অন্যায় হইতেছে না বুঝিয়াও থামিয়া গেল।

বালাজী—জাঠ সর্দার, তোমরা মথুরা রক্ষার জন্যে আফগানের সঙ্গে যে-যুদ্ধ করেছ, সে যুদ্ধ আমি দেখেছি। ধর্মের জন্য—দেবতার জন্য তোমরা যে আত্মোৎসর্গ করেছ তার প্রকৃত পুরস্কার দেবেন ঈশ্বর। আমি হিন্দু-ভারতের নেতা, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি বীর, মহাবীর! তোমার বাপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। তোমাকে আমি পুরস্কার দেব।

জবাহির অবাক হইয়া শুনিতেছেন। সহসা সদাশিব রাও ভাওয়ের ঝাঁকিতে সে চমকিয়া উঠিল। ভাও আসিয়া তাহার কাঁধে ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন।

সদাশিব—এ জাঠ জোয়ান! (ঝাঁকি দিলেন)

জবাহির—(চমকিয়া উঠিল)—আঁ!

সদাশিব—মহামান্য পেশবাকে প্রণাম কর।

নরিন্দর—ভাও সাহেব, এ জাঠ জোয়ানের মস্তিষ্ক কিছু অসুস্থ। মথুরার যুদ্ধে আঘাত পেয়েছিল মাথায়। এখনও ঠিক সুস্থ হতে পারে নি। তুমি ওকে ছেড়ে দাও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে। জবাহির! বেটা! পেশবা মহারাজকে পরণাম করো!

জবাহির—হাঁ—হাঁ! [সে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, এবং সেই অবস্থাতেই হাত জোড় করিয়া বলিল] বাবা পেশবা, ব্রাহ্মণ শাহন-শাহ, কসুর আমার মাফ করো বাবা দেওতা!

বালাজী—ওঠ তুমি, ওঠ জাঠ জোয়ান! উঠে দাঁড়াও!

(জবাহির উঠিয়া দাঁড়াইল)

বালাজী—জাঠ জোয়ান জবাহির, শুধু তুমি দেবতার জন্য যুদ্ধ করার পুণ্য এবং গৌরব অর্জন করনি;—বিপন্ন নারীকে রক্ষা করে সে পুণ্য এবং গৌরবকে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর করে তুলেছ। তুমি বিপন্ন শাহজাদী নসীবন্নেসাকে রক্ষা করেছ। তার জন্য শাহজাদী নিজে

তোমাকে স্বতন্ত্রভাবে পুরস্কৃত করবেন।

জবাহির—[বিস্মিত হইয়া নরিন্দরের দিকে চাহিল] শাহজাদী? গুরু মহারাজ—

নরিন্দর—(হাত তুলিয়া তাহাকে স্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন)

বালাজী—(বলিয়াই গেলেন; ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন) কুমার বিশ্বাস রাওকে সংবাদ দাও, আমরা শাহজাদীর জন্য অপেক্ষা করছি!

কথা শেষ করিয়া তিনি পাশের কর্মচারীর দিকে চাহিলেন, সে তাঁহার হাতে একখানি তলোয়ার ও একটি মুদ্রাপূর্ণ থলি তুলিয়া দিল।

বালাজী—জাঠ সর্দার, এই ধর তোমার পুরস্কার। এই তরবারি আর এক সহস্র মুদ্রা!

জবাহির অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইল। নরিন্দর গিরি বলিলেন—

নরিন্দর—বসে যাও বেটা! হাঁটু গেড়ে বসে নিতে হয় ইনাম।

(জবাহির বসিল। নরিন্দর স্মিতহাস্যে বলিলেন) হাঁ।

জবাহির—(পুরস্কার লইয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল) এ—বাবা পেশবা মহারাজ কি জয়!

বালাজী—(হাসিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে নীরব করিলেন) জাঠ সর্দার! তোমার সমস্ত জাঠ ভাইদের গিয়ে বলবে, আর তাদের চিন্তা থাকবে না, আবার মারাঠা পেশবা গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, যে অত্যাচার করে গেছে আফগান—তার প্রতিকারও আমি করব। রোহিলখণ্ডের যে সমস্ত রোহিলা আফগান—যোগ দিয়েছিল—এই অত্যাচারে, তাদের শান্তি দেব আমরা। তোমাদের জাঠ চাষীদের কিন্তু সংযত হতে হবে। হিন্দুপাদ পাদশাহীর প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। আমাদের সাহায্য করতে, আমাদের আদেশ প্রতিপালন করতে তারা যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

জবাহির—হাঁ বাবা থাকব। মানব হুকুম তোমার। কিন্তু বাবা পেশবা—মারাঠা পল্টনকে তুমি হুকুম দাও বাবা, তারা যেন গরীবদের উপর—

বালাজী—(বুঝিয়াছিলেন জবাহির কি বলিতেছে, তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টি তীক্ষ্ম হইল, তিনি মধ্যপথে বাধা দিয়া বলিলেন) আশ্বাস আমি দিয়েছি জাঠ সর্দার।

(ঠিক এই সময়েই নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল)

বালাজী—(ধ্বনি শেষ হইতেই বলিলেন) তুমি তোমার স্থানে গিয়ে দাঁড়াও সর্দার। ওইখানে।

(জবাহির ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইল। তলোয়ারখানি কোমরে বাঁধিতে রত হইল।)

ওদিকে প্রবেশ করিলেন পুরোহিত; তাঁহার হাতে একখানি পূজার নির্মাল্য; ধান দূর্বা চন্দন। তাঁহার সঙ্গে একজন শঙ্খধারিণী, একজন পূর্ণকুম্ভ ও একজন ঘণ্টাধারিণী প্রবেশ করিল। আরও প্রবেশ করিল মারাঠাপ্রধানগণ। হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতি। বালাজী রাও দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

পুরোহিত—পেশবা, মহালক্ষ্মীর পূজা শেষ হল। মহাশক্তির পূজা আরম্ভ হবে। যাত্রার লগ্ন উপস্থিত। মহালক্ষ্মীর আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

পেশবা দরবার মণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখে মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইলেন। পুরোহিত ধান দূর্বা এবং নির্মাল্য মাথায় ধরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

গম্যতাম অর্থলাভায়, ক্ষমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষঃ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ॥

(সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টা বাজিল)

জবাহির—[সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে ধ্বনি দিয়া উঠিল; ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] এ—ব-লো ভা-ই মথুরা নাথ কি—জয়—! রাধারাণী কি—জয়!

২য় জাঠ—জয়। জয়। (জয়ধ্বনি দিল)

সদাশিব—(ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন) এই সা নেহিরে জাঠ চাষা! ইয়ে দরবার হ্যায়!

আগাইয়া আসিয়া জবাহিরের কাঁধ ধরিয়া আবার ঝাঁকি দিলেন

নরিন্দর গিরি—(আপন আসনে বসিয়া ছিলেন এতক্ষণ, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ভাও সাহেব, আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—যুবক রুগ্ন।

সদাশিব—গোস্বামীজী তার রোগের সন্ধান যতটা পেয়েছেন—আমি তার চেয়ে আরও অনেক বেশী রোগের সন্ধান পেয়েছি। মূর্খতা এবং বর্বরতা এ দুটো ব্যাধির সন্ধান পেয়েও আপনি গ্রাহ্য করেন নি। হিন্দু-পাদ পাদশাহীর অর্থ বর্বর মূর্খের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা নয়।

গিরি—(এবার অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইলেন)—শঙ্কর! শঙ্কর!

সদাশিব—মহামান্য পেশবা আপনি এই চাষাদের সহযোগিতা নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন?

বালাজী—সদাশিব ভাও, তোমার স্থান গ্রহণ কর তুমি। গিরি মহারাজ এইবার আশীর্বাদ করবেন। সদাশিব। [সদাশিব স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে গিরি নামিয়া আসিতেছিলেন, বালাজী তাঁহার সম্মুখে গিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিকে দাঁড়াইতে হইল] আশীর্বাদ করুন গিরি মহারাজ।

গিরি—[আকাশের দিকে চাহিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া] সত্যমেব জয়তে! পণ্ডিত পেশবা, আমি আশীর্বাদ করি, সত্যের জয় হোক। শিবমেব জয়তে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। পৃথিবী সুন্দর হোক—সুন্দরমেব জয়তে! সুন্দরের জয় হোক!

সদাশিব—(প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠিলেন) আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—মারাঠার জয় হোক। হিন্দুপাদ পাদশাহীর প্রতিষ্ঠা হোক, অক্ষয় হোক—সে——

একটা ধাতুপাত্র পতনের ঝন ঝন শব্দে দরবার ভরিয়া গেল; সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন। সদাশিব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। বালাজী রাও দ্রুত অগ্রসর হইয়া দরবার ও অন্দরের মধ্যবর্তী প্রবেশ পথের পর্দা অপসারিত করিয়া দিলেন। দেখা গেল, বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—নসীবন্নেসা বেগম। তাঁহার হাত হইতে একখানা থালা পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বাস রাও মেঝে হইতে থালাখানি ও মুদ্রাপূর্ণ থলি কুড়াইয়া তুলিতেছেন।

নসীবন—মহামান্য পেশবা! আমার লজ্জার সীমা নাই। আমি চকিত করে তুলেছি সকলকে। রমজানের উপবাস করে শরীর আমার দুর্বল হয়েছে; কিন্তু এতখানি দুর্বল হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি নি। হাত থেকে থালাখানা পড়ে গেল!

বালাজী—এখন সুস্থ বোধ করছ।

নসীবন—হ্যাঁ পেশবা। (হাসিয়া) এখন যদি আমার হাতে মরণের পরোয়ানাও তুলে দেন তাও হাত পেতে নিতে আমার হাত কাঁপবে না।

গিরি—এই তো তুমি দুনিয়ার লড়ায়ে জিতে গেলে বেটী, মরণকে সুন্দর দেখতে পেলে তুমি।

নসীবন—গিরি মহারাজ! আমার সালাম গ্রহণ করুন হজরত!

গিরি—আনন্দ্ রহো! আনন্দ্ রহো বেটী!

(জবাহির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নসীবনের দিকে চাহিয়া ছিল।)

জবাহির—(মৃদুস্বরে বলিতেছিল) রাধারাণী? রাধারাণী?

বালাজী—(ঘোষণার সুরে বলিলেন) এইবার শাহজাদী বেগম স্বহস্তে পুরস্কৃত করবেন জাঠবীর জবাহিরকে। বীর জবাহির তাঁকে রোহিলা পাঠানের হাত থেকে রক্ষা করে সারা হিন্দুস্থানের মর্যাদা রক্ষা করেছে। (নসীবনকে) এস মা, এইখানে দাঁড়াও।

জবাহির—(এতক্ষণে যেন স্মরণ করিয়াছে—এই-ভাবে হঠাৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল) রাধারাণী! রাধারাণী! —হাঁ—হাঁ! তুমি সেই রাধারাণী!

বিশ্বাস রাও—(নিজের তলোয়ার খুলিয়া পথ-রোধ করিল) জবাহির সিং!

জবাহির—[নিজের কোষের তলোয়ার খুলিতে গিয়া —খানিকটা টানিয়া—বিশ্বাস রাওয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া তলোয়ার ছাড়িয়া দিয়া মুগ্ধকণ্ঠে কহিল]

জবাহির—আ—হা—হা! তুমি! তুমি কি মথুরা-নাথ? রাধারাণীকে রক্সা করতে, এতদিনে তলোয়ার ধরতে মনে পড়েছে? হায় মথরানাথ, সে দিন তারা যখন এল, মশাল জ্বালিয়ে, দানার মত; আ—তখন যদি তুমি এমনি করে দাঁড়াতে মথরানাথ!

বালাজী—(মধ্যস্থলে আসিয়া) জবাহির সিং—উনি পেশবাকুমার বিশ্বাস রাও।

জবাহির—পেশবা যুবরাজ! পরণাম!

বালাজী—বিশ্বাস রাও—তুমি সরে দাঁড়াও। জবাহির সিং তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও। শাহজী তোমাকে ইনাম দেবেন।

জবাহীর—ইনাম দেবেন? কে? রাধারাণী?

নসীবন—জাঠ জোয়ান, আমি মুসলমান। তোমাদের দেবীর নামে আমাকে ডেকো না!

জবাহির—না—না। তুমি রাধারাণী—

নসীবন—ধর—ইনাম ধর—

জবাহির—না—।

বালাজী—জাঠ যুবক।

নসীবনের হাতে থালা কাঁপিতে লাগিল। বালাজী ধরিলেন।

গিরি—জবাহির!

জবাহির—না—না—না। রাধারাণীকে বাঁচানের দাম—ইনাম— নিতে আমি পারব না!

বালাজী—জবাহির!

জবাহির—না—না—না। কি জবাব দেব আমি ভগবানকে? কি বলব আমি আমার দেমাককে, আমার মেজাজকে? না—না —না—।

(সে ছুটিয়া চলিয়া গেল)

(বাহির হইতেও শোনা গেল—) না—না—না!

জাঠ সংগীও ছুটিল—সর্দার! সর্দার!

(ঠিক সেই মুহূর্তেই বাহিনীর যাত্রার বাদ্য-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বালাজী হাত তুলিলেন।)

বালাজী—চঞ্চল হয়ো না কেউ!

(নরিন্দর গিরি মহারাজ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন)

(বাদ্যধ্বনি বাজিয়া চলিল বাহিনীর অগ্রগমন ঘোষণা করিয়া)

বালাজী—সদাশিব, মলহর রাও, বিশ্বাস রাও বাহিনী বোধহয় তোমাদের প্রতীক্ষা করছে!

(নসীবয়েসা, বালাজী রাও ও নরিন্দর ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন)

(বাদ্যধ্বনি অগ্রসর হইল)

নরিন্দর—পণ্ডিত! আমাকে বিদায় দাও ভাই! আমি চললাম! (হঠাৎ তিনি যেন নাড়িয়া উঠিলেন। চলিলেন।)

বালাজী—নমস্তে গিরি মহারাজ! আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি! দুঃখ করি না। তবে আপনাকে পেলে আনন্দ হ'ত।

নরিন্দর—(চলিতে চলিতে দাঁড়াইলেন) আনন্দ্ রহো ভাই। আনন্দ্ রহো। দুঃখ কেন করবে? আনন্দ করো! আনন্দ রহো। (চলিলেন)

নসীবন—দাঁড়ান হজরত!

নরিন্দর—বেটি! (দাঁড়াইলেন)

নসীবন—আপনি কি মথুরা ফিরবেন? আমি দিল্লী ফিরব। আপনার সঙ্গে আমি মথুরা পর্যন্ত যেতে চাই। সেখান থেকে আমি গুরুর কাছে চলে যাব।

বালাজী—মা! এখানে থাকতে কি বেদনা অনুভব করছ?

নসীবন—জনাব, সেখানকার জন্য বেদনা অনুভব করছি। দিল্লীর বাদশাহী তখত্ থেকে বাবরশাহী বংশ যদি নামে তবে সে চোখে দেখে কাঁদতে পাব না? তা ছাড়া—!

বালাজী—কি মা!

নসীবন—লজ্জা করব না পেশবা। সত্যকে প্রকাশ করব। বাবরশাহী বংশের রক্ত তার সমস্ত দোষগুণ ধর্ম-অধর্ম নিয়ে আমার কলিজায় আমার সর্বদেহে আজ টগবগ করে ফুটে উঠেছে! মুসলমানের বাদশাহী ঘুচিয়ে হিন্দুপাদ পাদশাহী প্রতিষ্ঠার কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে—উন্মাদ হয়ে যাই। তা ছাড়া বাবরশাহী রক্তের রূপতৃষ্ণা আজ আমার। ও—পেশবা—।

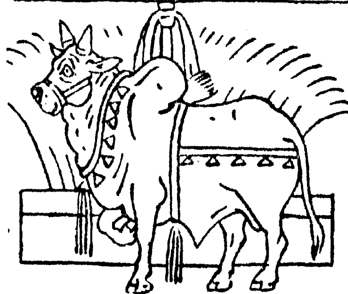
বালাজী—আমি ব্রাহ্মণ, আমি আশীর্বাদ করি তোমার রক্তধারা শান্ত হোক, পবিত্র হোক!—

নরিন্দর—চল বেটি, আমি তোমাকে দিল্লী পোঁছে দিয়ে তবে মথুরায় ফিরব।

(নসীবন ও নরিন্দর চলিয়া গেলেন। বালাজী দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাদ্যধ্বনি একবার বাজিয়া দূরে চলিয়া গেল। একে একে বাতিগুলি নিভিতে লাগিল। অন্ধকার হইতে লাগিল।)

(পরবর্তী দৃশ্যের অন্ধকারের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃশ্য আবৃত হইল। বাজনাও দূরে মিলাইয়া গেল।)

(ক্রমশ)



বীরবল ও গায়কের কাহিনী

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

[মনে পড়ছে ইং ১৯১৪ সালের 'পূজার কয়েকদিন পূর্বে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের ভবনে খেয়ালী কালে খাঁ সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং প্রাণভরে গান শুনেছিলাম। সে অবকাশে মহারাজা একটি গল্প বলেছিলেন। তাঁর মুখের সমস্ত কথাগুলি, অথবা তাঁর গল্প বলার ঢং অবিকল রাখতে পেরেছি বলে মনে করিনে; হয়ত কিছু বাদ দিয়েছি। কিছু যোগও করেছি। কিন্তু সারাংশ পরিবর্তন করিনি।]

আকবর বাদশাহের সঙ্গীতের দরবারে নানারকম গুণীদের জমায়েত হত। গুণীরা সকলেই তানসেনের মত না হলেও বাদশাহের দাক্ষিণ্য ও দানশীলতার কারণে কোনও গুণী ক্ষুণ্ণ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন না। প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সম্মান, অর্থ ও ভূষণাদি উপহার লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

প্রথম প্রথম উপস্থিত সভাসদ্‌বর্গের কেউ না কেউ গুণীকে পেশ করতেন সভায় বাদশাহের সম্মুখে। পেশকার বলতেন, 'এই গুণীর নিবাস অমুক স্থানে, ইনি অমুকের সন্তান বা শিষ্য; অমুক অমুক রাজা এঁকে এই পাগড়ী ইত্যাদি দান করে সম্মানিত করেছেন; ইনি পঞ্চহাজারী ধ্রুপদীয়াদের অন্যতম গায়ক, বা ঐ রকম কিছু' ইত্যাদি করে শেষের দিকে উচ্চৈঃস্বরে পেশকার বলতেন, 'শাহানশাহ্ আকবরই একমাত্র সর্ববিদ্যাবিশারদ আদম-বংশোদ্ভব মহামানব। একমাত্র আপনিই এঁর গুণাগুণ বিচার করে পুরস্কৃত করতে পারেন এই ভরসায় গুণী বাদশাহের অনুমতি নিয়ে বিদ্যার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। গুণগ্রাহক বাদশাহের হুকুমের প্রতীক্ষায় এই গুণী নত মস্তকে অপেক্ষা করছেন।' বলাই বাহুল্য কদরদান বাদশাহ কখনও 'না' বলে গুণীর অসম্মান করেন নি।

শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বাদশাহ, বীরবল ও তানসেন। সমস্ত গুণীর কৃতিত্ব এঁদের ভাল লাগত না। তাতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু—গুণীদের পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে পেশকার সভাসদদের স্বার্থ জড়িত আছে এরকম খবর প্রায়ই বাদশাহের কানে পৌঁছতে লাগল। তখন বাদশাহ ও তানসেন নানারকম চিন্তা করে ঠিক করলেন বাদশাহের নিঃস্বার্থ সুহৃদ সঙ্গীতরসিক বীরবলের উপর একটি কাজের ভার দিতে হয়; নয়ত অযোগ্য শিল্পীদের কৃতিত্বের চোটে কান বা প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সভার মধ্যে বাদশাহের পাশে বীরবল চুপ করে বসে থাকতেন; ভাল গান বাজনা হ'লে মুখ ফুটে তারিফ করতেন। মামুলী রকমের অর্থাৎ দু'কুড়ি সাতের খেলা দেখলে তিনি মৌন অবলম্বন করে থাকতেন; সভায় কে কি করছে সমধর্মী জীবদের মুখভঙ্গি বা আচরণে কিরকম ভাবান্তর হচ্ছে ইত্যাদি লক্ষ্য করে সময় কাটাতেন। আর অবসরকালে, সভাসদেদের অতিশয়োক্তি ও ফিকির-ফন্দীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে বাদশাহ ও তানসেনের চিত্ত-বিনোদন করতেন হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-রসিকতা করে। এ বিষয়ে বীরবলের জোড়া কেউ ছিল না বললেই হয়।

আকবর বাদশাহ সবই বুঝতেন; কিন্তু ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু। একদিন আকবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন বীরবলকে 'আচ্ছা বীরবলজী! বলুন ত' দেখি ভগবান আমাকেই বা বাদ্‌শাহী দিলেন কেন, আর আপনাকেই বা বীরবল করে পাঠালেন কেন?' বীরবল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার মেল আছে বলেই আপনি ও আমি বন্ধুর মত' একসঙ্গে উঠি বসি। কিন্তু পার্থক্যও আছে। আপনি দয়ালু, আমি সেরকম নই। আমার হাতে বাদ্‌শাহী দিলে পাছে অনেক লোক মারা যায় এই ভেবে ভগবান বাদশাহিটা আমাকে না দিয়ে আপনাকেই দিয়েছেন'।

আকবর ও বীরবলের মধ্যে ছিল যথার্থ প্রণয়ের সম্বন্ধ। তিনি বীরবলের উপরই ভার দিলেন গুণীদের বিদ্যা প্রথমে পরীক্ষা করে পরে যোগ্য ব্যক্তিকে সভায় প্রবেশ করার অনুমতিপত্র দেবেন। বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে বীরবল ঐ বিড়ম্বনা সহ্য করার ভার নিয়ে বললেন "আমার পরমায়ুর থেকেও আপনার পরমায়ুর সার্থকতা বেশী। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করার উপায় বাত্‌লে দিলেন আমাদের। তাই হ'ক"।

তখন থেকে গুণীদের ভীড় লেগে গেল বীরবলের নিজস্ব বৈঠকখানায়।

গায়কেরা এসে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কেউ বলতেন, "আমার ঘরে দশ হাজার ধ্রুপদ আছে"; কেউ বলতেন "আমি পঞ্চহাজারী"; কেউ বল্‌তেন "আমি চৌকাবন্দী পাঁচ শ' রাগের গান জানি" ইত্যাদি। চৌকাবন্দী অর্থাৎ সুরফাঁকতাল, বিক্‌তাল, রুদ্রতাল আর চৌতাল—এঁদের চারখানা করে গানের ছক। মাত্র সংখ্যার কথা মনে করেই বীরবল চমৎকৃত, অভিভূত হয়ে যেতেন, কারণ একে একে সব গান শুনতে গেলে কল্পই ফুরিয়ে যায়, মানুষের আয়ু ত' ছার কথা। বীরবলের কায়দা ছিল গুণীর নিজের ধারণায় যে কখানা উৎকৃষ্ট বলে মনে হয় তারই দু' একখানা শুনে যোগ্যতা পরীক্ষা করা, হাঁড়ির মধ্যে থেকে দু' চারটে ভাত টিপে দেখার মতো।

আর একটা পেঁচ ছিল যা দিয়ে বীরবল গুণীদের অনুভবের সংবাদ নিতেন। বীরবল জিজ্ঞাসা করতেন "দিল্‌-রিঝানা ধ্রুপদ গান ক'খানা জানা আছে"? দিল্‌-রিঝানা অর্থাৎ হৃদয়ে আনন্দ দিতে পারে এমন গান। প্রশ্ন শুনে গুণীরা একটু ইতস্তত করে বলতেন, "জনাব! কার পক্ষে কোন গানটি রিঝানা হবে তার ত' ঠিক নেই; অতএব আপনার প্রশ্নের মতলব বুঝতে পারলাম না"। তখন বীরবল জিজ্ঞাসা করতেন "ধরুন এমন ধ্রুপদ আপনার জানা আছে কি, যা গাইবার সময়ে আপনি দেখেছেন আপনার পরিবার সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এসে একমনে গানই শোনেন? অথবা আপনার বাড়ির ছেলে মেয়েরা বা ঝি চাকর গান শুনে সুখী হয়"?

এ রকমের প্রশ্ন শুনে গুণীরা একটু হতভম্ব হয়ে যেতেন। পরে বলতেন, "বীরবলজী! আপনি একজন সাচ্চা সমঝদার। আপনি ত জানেন স্ত্রীলোক বা রাস্তার লোকের এমন সমঝ্-বুঝ নেই যে ধ্রুপদ শুনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরকম লোকের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য ত' আমরা ধ্রুপদ গান শিখিনি, বা গাইনে"। প্রকারান্তরে গুণীরা স্বীকার করতেন তাঁদের পরিবারের লোকজন মোটেই ধ্রুপদ গান পছন্দ করে না। এরকমের স্বীকারোক্তিই ছিল বীরবলের পক্ষে যথেষ্ট।

একদিন এক গায়ক এসে বীরবলের কাছে উমেদারী করতে আরম্ভ করলেন; বললেন, "বীরবলজী! আমার অনেক ধ্রুপদ জানা আছে"। বীরবল শুনেই বললেন, "বেশ কথা! তবে এখন বড্ড ভীড়। আপনি একমাস পরে দেখা করবেন"। বীরবল খাতায় তাঁর নাম-ধাম লিখে নিলেন। এরকম প্রায়ই হ'ত, গত্যন্তর ছিল না বলে।

এক মাস পরে সেই গুণী আবার এসে উপস্থিত। বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সবশুদ্ধ ক'খানা গান জানেন"? গুণী বললেন, "আমি প্রায় শ'খানেক চৌকাবন্দী রাগের গান জানি"। কথা শুনে বীরবল চমৎকৃত হলেন, চৌকাবন্দী সংখ্যার অল্পতা দেখে। বললেন, "তাই না কি? আপনি ত' দেখছি সামান্য গুণী নন! মিঁয়া তানসেনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতলব না কী"? বীরবল রঙ্গপ্রিয় একথা সকলেই জানত। গুনী বললেন, "আপনার কথার পাল্‌লা কাটিয়ে উঠলে পরে

দেখা যাবে গানের পাল্লা, ভগবান যদি দিন দেন; আপাতত আপনি দিন না ফেললে যে কিছুই হয় না"! বীরবল তাঁর রসিকতায় মনে মনে খুশী হলেন; দু'তিনখানি গান শুনে তাঁকে বললেন, "আচ্ছা, একমাস পরে আসবেন, দেখা যাবে তখন"।

একমাস পরে গুণী এসে হাজির। বীরবল এবার তাঁকে বললেন, "ওস্তাদ! আপনি ঠিক করে বলুন খুব ভাল বাছাই ধ্রুপদ গান কখানা আপনার তৈয়ারী আছে।" গুণী তার উত্তরে বললেন, "যথার্থ ভাল গান প্রায় এক শ' খানা তৈয়ারী আছে, যা আমি এখনই শুনিয়ে দিতে পারি"। বীরবল দেখলেন গানের সংখ্যা চার শ' থেকে একশ'তে নেমেছে। সেবার তিনি আরও দু-পাঁচখানা গান শুনে বললেন, "ওস্তাদ! এর পরের চাঁদে আসবেন; তখন দেখা যাবে কি করতে পারি।" গুণী একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলেন।

একপক্ষ যেতেই গুণী এসে উপস্থিত। বীরবল তাঁকে আদর করে বসালেন, পান-এলাইচ দিয়ে আপ্যায়িত করলেন, আর নানা-রকমের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করে তার মনের ধার ভেঙ্গে দিলেন। সুখ-দুঃখের কথায় সমানুভূতি দেখালে কার না মন গলে! গুণী বললেন, "সুখে দুঃখে একরকমে দিন কেটে যাচ্ছে। শ্বশুর মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে গোয়ালিয়র অঞ্চলে কিছু আবাদী সম্পত্তি পেয়েছি। আর শ্বশুর নিজেই ছিলেন সৌখীন গায়ক; তাঁর কাছ থেকে গানও পেয়েছি অনেক। মোটের উপর দিন কেটে যাচ্ছে। ভাবলাম দিল্লী গিয়ে দরবারী গান শুনে দেখি, নিজের গানও যাচাই করে দেখি। তাইতে সস্ত্রীক এখানে এসে একটা সামান্য বাসা ভাড়া করে আছি। ছেলে-পিলে হয়নি, তা সেটা অদৃষ্টের কথা। তা সবই ভাল, আমার পরিবারটিও বড় ভাল, খুব সেবা যত্ন করে। তবে কি না, একটা বদ্-নাসিবী এই যে, পরিবারের মেজাজটি অত্যন্ত নাজুক; রেগে উঠলে কিন্তু রুক্ষ হয়ে ওঠে" অর্থাৎ স্ত্রীর হৃদয়টি খুব কোমল, কিন্তু চটলে রক্ষা নেই।

গুণীর পরিবারের হৃদয়ে কড়ি ও কোমল সুরের ঝঙ্কার আছে শুনে বীরবল অনুমান করলেন গুণীর মুখে ধ্রুপদ গান শুনেই সম্ভবত তাঁর পত্নীর হৃদয়ে চড়ি সুরগুলি বেজে ওঠে; পরে মিষ্টকথা বা কাপড়-গহনা কবুল করলে সেই হৃদয়খানি কোমলসুরে নেমে আসে। বীরবল আগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ওস্তাদ! এই যে শ' খানিক গানের কথা বললেন, যা খুব ভাল, বাছাই করা গান, মনে করে বলুন ত' ওর মধ্যে এমন গানও কি আছে যা আপনার স্ত্রী শুনে খোশমেজাজে বসে থাকেন"? গুণী জবাব দিলেন "জী হাঁ! সেরকম গান পাঁচ-ছয়খানা আছে যা আপনার সওয়ালের খাতির রাখতে পারে"।

কথাটা শুনে বীরবলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল! গুণীদের গান শুনে শুনে, ও তাদের নিজমুখের স্বীকার শুনে বীরবলের মনে যে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়ে উঠছিল, সে ধারণাটি চুরমার হয়ে যায়!

মনের আলোড়ন গোপন করে বীরবল বললেন, "আপনার মত গুণী বিরল! নেই একে-বারে একথা বলিনে। যাই হ'ক—আপনি ও আপনার পরিবার এ দু'জনের মধ্যে কে বেশী ভাগ্যবান, বিচার না করে বলা যায় না! কি বলেন"? গুণী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আমিই বেশী ভাগ্যবান, কারণ অন্তত একজন কদরদানকে গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছে। আর তিনি? তাঁর ভাগ্য খারাবই বলতে হবে! বাপের একমাত্র মেয়ে আদরে মানুষ হয়েছে। না দিতে পারি তাকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা। বুঝলেন কি না বীরবলজী"?

বীরবল রসিক লোক; বেশ বুঝলেন তাঁর অবহেলার মনোভাবের প্রতি গুণী গূঢ় বিদ্রূপের বাণ ত্যাগ করলেন। তবুও বীরবল দমে যাওয়ার পাত্র নন। গুণীর দু'খানি হাত ধরে তিনি বললেন, দোহাই আপনার, ওস্তাদ! আপনাকে একটি আখেরী সওয়াল করব, ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন কেমন? আমি এক হপ্তার মধ্যে আপনাকে দরবারে পেশ্ করছি, তার জন্য ভাববেন না। আমার জানতে ইচ্ছা করে ঐ যে পাঁচ-ছ'খানা গান বললেন, ওর মধ্যে এমন কোনও দিল্-রিঝানা গান আছে কি, যা শুনে আপনার পরিবার সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে আপনার পাশে এসে বসেন, গান শোনেন"?

বীরবলের কথা শুনে গুণীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গুণী বললেন, "হাঁ বীরবলজী! এমন দু'তিনটি প্রাণ-জুড়ান, দিল্-রিঝানা গান আছে, যা শুনে আমার পরিবার কাজে মন রাখতে পারেন না, ছুটে আমার পাশে চলে আসেন, মুগ্ধ হয়ে গান শোনেন; এমন কি তাঁর চোখে জলও এসে যায়" বলে গুণী চুপ করে গেলেন। গুণীর কথা শুনে বীরবল উত্তেজিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন; বললেন, "ওস্তাদ! আপনি সত্য কথা বলছেন"? গুণী বললেন, "বীরবলজী! আমি যথার্থই সত্য কথা বলছি। যদি বিশ্বাস না করেন চলুন আমার কুটীরে, প্রমাণ করে দিতে পারি"।

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ থেকে বীরবল বললেন, "আচ্ছা, তা যেতে পারি, তবে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। জানালার পাশ দিয়ে লুকিয়ে আপনার সেই গান শুনব, কি বলেন"? গুণী বললেন, "তাই হবে চলুন"।

দু'জনে এসে উপস্থিত হলেন গুণীর কুটীরে। বীরবল বাইরে একটি জানালার ধারে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেন। গুণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করতেই তাঁর পত্নী রুক্ষ কেশে, রুষ্ট মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বাক্য বাণ নিক্ষেপ করলেন "ঘরে আটা নেই, ঘি নেই, সব্জি নেই। কি খাবে খেয়ো। চুলার ছাইও নেই, সকালে ফেলে দিয়েছি" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভামিনী ভিতরের উঠানে চলে গেলেন। বীরবল সব কিছু শুনলেন, দেখলেন জানালার ছিদ্র দিয়ে; আর দেখলেন গুণী একটি খাটিয়ায় বসে একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন, কারণ হাওয়ার অভাবও হয়েছে এরকম অভি-যোগ ছিল না। ব্যাপার দেখে শুনে বীরবল নিরুৎসাহিত, এমন কি অনুতপ্তও হলেন। গুণীর গান ইতিপূর্বেই বীরবলের কানে ভাল লেগে-ছিল, অতএব আগেই কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল এই কথাটিই বীরবলকে খোঁচা দিচ্ছিল।

একটু পরেই শুনতে পেলেন তম্বুরার গুঞ্জন ও তার সঙ্গে গুণীর কণ্ঠস্বর। গুণী গান ধরেছেন। মধুর বাণী, মধুর সুর, মধুর ছন্দে ভগবৎ প্রেম বিষয়ে সেই গান শুনে বীরবল চমকিত হলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন গান ত' তিনি বহু বহু দিন শোনেননি! স্তব্ধ হয়ে তিনি গানই শুনতে লাগলেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর পরীক্ষা-প্রমাণের কথা। জানালার ফাঁকে তিনি ঘরের ভিতর তাকালেন।

তিনি দেখলেন গুণীর স্ত্রী গুণীর পাশে এসে বসেছেন; অপলক নয়নে কোমল বিকাশিত দৃষ্টি দিয়ে তিনি গুণীর মুখের দিকে চেয়ে যেন আকণ্ঠ পান করছেন সেই গীতসুধা। বিস্ময়ে, বিমোহিত হয়ে বীরবলও সেই গান শুনতে লাগলেন। সংগীতে মাত্র শিল্পচাতুর্যের কারণে বিচারশীল অন্তঃকরণে একরকমের চমৎকৃতি দেখা দেয়, যা একমাত্র বিদগ্ধ রসিকই উপভোগ করেন অন্য কেউ নয়। বীরবল ছিলেন বিদগ্ধ রসিক। এই গুণীর শ্রবণ-মন-সার্থক করা গান শুনতে থেকে বীরবল এমন একটি অনুরাগের রাজ্যে উপনীত হয়েছিলেন যেখানে সমস্ত বিচারবুদ্ধি বিলীন হয়ে যায় আত্ম-সমর্পণের তৃপ্তির মধ্যে, শিল্পী ও শ্রোতার পারস্পরিক অভিমান অবলুপ্ত হয়ে যায় অতলস্পর্শ অনুভবের মধ্যে। কোথায় গেল গুণীর চৌকাবন্দীর স্পর্ধা, বীরবলের বিদগ্ধ আবরণ, গুণীপত্নীর দারিদ্র্য-কণ্টকিত অভি-মানের বাণী।

কিছুক্ষণ পরে গান শেষ হলে, বীরবল চমকিত হয়ে দেখেন—গুণীর যেন চোখে জল, তাঁর অঙ্গনারও মুখে যেন অপূর্ব আনন্দ! অকস্মাৎ গুণীপত্নী তাঁর স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকালেন। বীরবল দেখলেন গুণী সজল নেত্রে ঘরের দরজার মধ্য দিয়ে যেন বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন; তাঁর বাঁ হাতখানি পত্নীর আলুলায়িত কেশদাম স্পর্শ করে রয়েছে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে গুণী বাইরে এলেন বীরবলের খোঁজে। বীরবল গুণীকে দেখেই বললেন, "ওস্তাদ! চলুন আমরা যাই বাদশাহের খাস্ কামরায়, এখুনি। বাদশাহের সঙ্গে আগে আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেই"। গুণী কী যেন ভেবে ইতস্তত করছিলেন দেখে বীরবল বললেন, "কোনও ফিকির করবেন না, ওস্তাদ্! যাওয়ার পথে আমার বাড়ীর লোক দিয়ে কিছু ভোজ্য আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গঞ্জনা আর রোষদৃষ্টি আপনাকে সহ্য করতে হবে না"। গুণী কিছু বললেন না, যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। পরে বললেন, চলুন, বীরবলজী! আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব; খোদার মর্জি যা হবে তা হবে"।

বীরবল গুণীকে সঙ্গে করে বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। যথারীতি কুর্ণীশ করার পর বীরবল গুণীকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন, "বাদশাহ! ইনি যথার্থই গানের ইমানদার। দরবারে গান পরে হবে; আপাতত অনুগ্রহ করে এখনই এ'র গান শুনলে সময়টা নষ্ট হবে না"। বীরবল নিজে একজন গুণীকে সঙ্গে করে উপস্থিত হয়েছেন, মাত্র এই কথাটি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে আকবর বাদশাহ অনুমান করে নিলেন গুণীর যোগ্যতা। তানসেনজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তানসেনকে খাতির করেই জিজ্ঞাসা করলেন "কি বলেন মিঁয়া তানসেন? তাহ'লে এখনই এ'র গান শোনা যাক্"। তানসেন, বীরবল আর বাদশাহ এ'রা ছিলেন একসুরে বাঁধা। তানসেন বলে উঠলেন, "হুজুর! আর দেরী নয়, এখনই গান হ'ক" বলে শিষ্টতা করে নিজে গুণীকে তম্বুরা উঠিয়ে দিলেন।

তম্বুরা বেঁধে নিয়ে গুণী বীরবলের মুখের দিকে চাইলেন—যার অর্থ কি রকম গান করা যায় বীরবলই ইঙ্গিত করুন। বীরবল গুণীকে বললেন, "সেই দিল্-রিঝানা গানটি বাদশাহ ও তানসেনজীকে শুনিয়ে দিন"।

গুণী সেই গানটি আরম্ভ করে দিলেন। তার সুর, তার ছন্দ, তার বাণী তম্বুরার মধুর নিক্কণকে সাথী করে নিয়ে যখন পাথরের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘরের বাইরে মুক্ত আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে বাইরের বাতাসে নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছে তখন বাদশাহ আকবর ও মিঁয়া তানসেন আবিষ্টের মত বসে আছেন নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে। কারণ যথার্থ গান বাতাসে নিলীন হয়ে গেলেও অনুভবের রেশটি সহজে মিলিয়ে যায় না। বীরবলের কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবার গানের বাঁধুনী আর কারিগরীর উপর। তিনি আত্মহারা হননি; কঠিন হয়েই যেন আত্মাকে সঙ্কোচিত করে রেখেছিলেন জ্ঞানের নিয়ম-ধর্ম দিয়ে। তিনি বিচার করে দেখলেন, দরবারী কানাড়া ও কোনও মল্লারের অভিনব মিশ্রণ দিয়ে গানটি অপূর্ব সুষমা ও সার্থকতা লাভ করেছে। গানটি যথার্থই ধ্রুপদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গান শেষ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সর্বপ্রথম কথা বললেন তানসেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি বললেন, "বাদশাহ! আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ'কে এই গানটি আর একবার গাইতে অনুরোধ করেন, তাহলে মনে করব তানসেনের উপরই কৃপা করা হল। এত ভাল লেগেছে যে, আর একবার শুনবার ইচ্ছা হচ্ছে"।

আকবর নিজেই আন্তরিক ইচ্ছা করছিলেন গুণী আর একবার গানটি করেন; কেবল অপেক্ষা করছিলেন তানসেন ও বীরবলের মন্তব্যের জন্য। বাদশাহ গুণীর মর্যাদা করে তাঁকে অনুরোধ করলেন যদি কষ্ট না হয়, আর একবার গানটি করুন। গুণী সপ্রতিভ হয়ে তাঁদের বার বার সেলাম জানাচ্ছিলেন; গুণী হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছিলেন বিনীত নিবেদন দিয়ে। বাদশাহ ও তানসেনের অনুরোধ শুনে তিনি বীরবলের মুখের দিকে তাকালেন যেন কাতর নয়নে।

সেই কাতর দৃষ্টির মর্মকথা বীরবল বুঝতে পারেননি। বীরবল মনে করলেন, গুণী হয়ত তানসেনের প্রশংসার মধ্যে কোনও গূঢ় শ্লেষ আবিষ্কার করে ভীত হয়ে পড়েছেন। দরবারী কায়দাই এই। শিল্পীর কোন সূক্ষ্ম বা লেশমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলেই সমঝদারেরা তৎক্ষণাৎ সেই দোষটিকে ধরে নিয়ে প্রশংসা করেন; এটা যারা বোঝে না তারা মনে করে বুঝি প্রশংসাই করা হ'ল আর শিল্পী যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে এরকমের বিচিত্র প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে যান। বীরবল দরবারের কায়দা জানতেন বলেই ওরকম মনে করেছিলেন। তাইতে বীরবল গুণীকে সাহস দিয়ে বললেন, "ভয় কি আপনার। স্বয়ং তানসেন ও বাদশাহ আপনাকে অনুরোধ করছেন; এ থেকে বড় সম্মান আর কেউ পায়নি। আপনি নির্ভয়ে গান করুন"। বীরবল আরও ভাবছিলেন যে, তাঁরই মত তানসেনও বোধহয় প্রথমবার গান শুনে রাগের গঠন-বৈচিত্র্য ঠিক ধরতে পারেননি; তাইতে দ্বিতীয়বার শুনতে ইচ্ছা করেন।

গুণী আর একবার তম্বুরা উঠিয়ে নিলেন। গানটি যথারীতি আস্থায়ীর শেষে অন্তরায় উপনীত হয়েছে এমন সময়ে শ্রোতারা লক্ষ্য করলেন গুণীর কণ্ঠস্বরে ভাববিকার দেখা দিল। গায়কের মনে আবেগ সঞ্চয় হলে কদাচিৎ ওরকম ভাববিকার হয়ে থাকে; তাকে কিন্তু বেসুর বলা যায় না, কারণ গানের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না। যাই হ'ক, অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন একটি অঘটন ঘটে গেল যা দরবারী গানের আসরে কখনও হয়নি। গুণীর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল অজানিত আবেগে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুবারি ঝরতে লাগ্‌ল না-জানি কোন অজ্ঞাত মনোবেদনায়।

বাদশাহ ও তানসেন বিস্মিত হলেন গুণীর ভাবান্তর দেখে। বীরবল কিন্তু এক লহমার মধ্যে এর গূঢ় রহস্যটি বুঝে নিলেন। তিনি বাদশাহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাদশাহ! আপনি এ'র অপ্রত্যাশিত আচরণ ক্ষমা করুন। এ'র পক্ষে নিশ্চয়ই একটা কৈফিয়ৎ আছে, যা ইনি একটু প্রকৃতিস্থ হলে আপনাদের সামনে নিবেদন করবেন"। বীরবলের কথার ভাব বুঝতে পেরে দরদী বাদশাহ ও তানসেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তাঁরা দেখলেন গুণী তম্বুরাটি নামিয়ে রেখে দু'হাত দিয়ে দুটি চোখ আবৃত করে অন্তরের আবেগ দমন করার চেষ্টা করছেন।

গুণী প্রকৃতিস্থ হলেন। হাত জোড় করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জনাব! আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি আপনাদের সামনে। হৃদয়ের আবেগ দমন করতে পারিনি। অপরাধের ক্ষমা বা শাস্তি বিধান অপেক্ষা করছি"।

বাদশাহ বীরবলকে বললেন, "আপনার কিছু বলবার আছে কি?"

বীরবল বললেন, "বাদশাহ! আপনি ও তানসেন যদি ধৈর্যধরে শোনেন তাহলে এই গুণীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের বৃত্তান্ত নিবেদন করি"।

বাদশাহের সম্মতি পেয়ে বীরবল বললেন, "বাদশাহ! আপনারা আমাকে সেই কঠিন কার্যের ভার দেওয়ার পর আমি ঠিক করলাম শিক্ষিতপটু গুণীদের গানের মধ্যে, বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের মধ্যে সত্যকারের প্রাণভোলানো গান আছে কি না, অথবা কোনও গুণী সেরকম গান সার্থক করে গাইতে পারেন কি না, এই ব্যাপারটিই আগে সন্ধান করতে হয়। এ কারণে আমি গুণীদের জিজ্ঞাসা করতাম তাঁদের "ধ্রুপদ গান শুনে তাঁদের পরিবার বা ছেলে-মেয়ে বা ঝি-চাকর খুশী হয় কি না, এক গান দু'বার করতে বলে কি না, না কি বিরক্ত হয়ে ওঠে।

"এপর্যন্ত যত গুণীদের জিজ্ঞাসা করেছি তাঁরা সকলেই বলেন, উচ্চ শ্রেণীর ধ্রুপদ গান জেনানা লোকে কি বুঝবে! কেউ কেউ স্বীকার করেছেন তাঁর পরিবার গান শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হন, ছেলে-মেয়েরাও দরজার আড়ালে আবডালে হাসাহাসি করে। দু'চারজন এমনও স্বীকার করেছেন যে, গান গাইলে তাঁদের পরিবার গালি-গালাজ করেন, লাঠি নিয়েও তেড়ে আসেন। এর ফলে নিজ বাড়িতে গান করা অসম্ভবই হওয়ার কথা। তবে জেনানাদের দিল্ হল তুলার মত নরম, আর হাল্‌কা, ফুঁ দিলে উড়ে যায়! যখনই আমরা তাদের দেখিয়ে দিই গান করে জরীদার টুপী, পাগড়ী আর আস্‌রফি পাওয়া যায় তখন সব চুপচাপ হয়ে যায়। তারপর থেকে নিজের বাড়িতে বসে

গান করায় আপত্তি হয় না। জেনানা আর ছেলে-মেয়েদের মন-মানিয়ে নেওয়াত' কঠিন নয়।

"একমাত্র তানসেনজীকে এরকম কথা জিজ্ঞাসা করতে বাকি আছে; পরে করব। ইতিমধ্যে, এই গুণী আমার কাছে এসে হাজির হলেন।"

বীরবলের উপক্রমণিকা শুনে সেখানকার বাতাসটা হাল্কা হয়ে গেল; গুণীর ভাবান্তরের কারণে যে গুমোটের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অন্তর্হিত হল। বাদশাহ, তানসেন, এমন কি গুণীর মুখেও হাসি দেখা দিল। বীরবলের কাজই ত' ছিল এইরকম; জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি পদক্ষেপে সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-প্রণয়, সুন্দর-কুৎসিত, ভীতি-উল্লাসের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, তাদেরকে অনাবিল হাসা-রসিকতার প্রলেপ দিয়ে সহজ ও সহনীয় করে তুলে ধরতে বীরবলের মত কেউ ছিল না।

সকলের মন হাল্কা হয়ে গেলে বীরবল এই গুণীর প্রসঙ্গ করে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলে গেলেন। তাঁর কথা শুনে বাদশাহ ও তানসেন গুণীর ভাবান্তরের রহস্য কিছুটা অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন; তবুও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। গুণীর দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বললেন, "আপনার যদি কিছু বলার থাকে, বলুন"।

বাদশাহ ও অন্যদের প্রতি সেলাম জানিয়ে গুণী বললেন, "জাহাপনা! আপনি কদরদান্, আপনি মেহেরবান্! আমার কিছু বলবার আছে, যদি অভয় দেন ত' বলি"। সকলেই কৌতূহলী; সকলেই বল্‌লেন "কোনও ভয় নেই। নির্ভয়ে বলুন"।

গুণী বললেন, "জাঁহাপনা! বীরবলজী যা বললেন তা সবই সত্য। তাহলেও তিনি আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের সব কথা জানেন না। না-জানা অংশটি আমি সংক্ষেপে নিবেদন করি। এরপর আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে ক্ষমা করবেন; না হয় শাস্তি দেবেন।

"গোয়ালিয়রে আমার নিবাস। অবস্থা মোটের উপর একরকম ছিল, সব্‌জী-রুটির জোগাড় হয়ে যেত ঈশ্বরের কৃপায়। গানের সখ্ ছিল খুব বেশী। জওয়ান বয়সের মধ্যেই নানা ওস্তাদের সেবা করে ধ্রুপদ গান শিখে-ছিলাম। গানের পেশা করব একথা ভাবিনি; এখনও ভাবিনে, তার কারণ বিদেশে হলুদ চালানের ব্যবসাতেই খোরাক জুটে যায়।

"পূর্ণ যৌবনে বিবাহ করেছিলাম, শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। শ্বশুরের আবাদী সম্পত্তি পেলাম; তা ছাড়া বিবাহের সময়ে তিনি আমাকে যৌতুকস্বরূপে অনেক ধ্রুপদ গানও দিয়েছিলেন।

"কিন্তু এক বিষয়ে তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর একমাত্র মেয়ের সবই গুণ; কিন্তু দোষ এই, সে ওস্তাদী যা ধ্রুপদ গান সহ্য করতে পারে না; সে রকম গান শুনলে তার চোখ লাল হয়ে যায়, মাথা গরম হয়, চুল ছিঁড়তে থাকে। তুমি বাপু গান করার সময়ে একটু হুঁশ রেখে গান ক'রো; এমন গান করবে যা তার মেজাজ বরদাস্ত করতে পারে।

"আমার পরিবারের মন-মেজাজ বুঝে ফেল্‌লাম পরীক্ষা করে। দেখি—ওস্তাদী কারিগরীর গান তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। হাকিম ডাকিয়ে কিছুদিন চিকিৎসা করালাম; কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল, তাঁর দেহের রোগ পয়দা হয়ে গেল, মনের রোগ থেকেই গেল। ফলে বাড়িতে বসে গান করা বন্ধ হয়ে গেল; অগত্যা মাঠে ঘাটে বসে গান করতাম। মেনে নিলাম ভগবান আমাকে বাড়িতে বসে গান করতে দেবেন না।

"একবার চালানি মাল নিয়ে মথুরায় যেতে হল। পরিবার ছাড়লেন না, আমার সঙ্গ নিলেন। জনাব! আমি সামান্য লোক, কিন্তু খোদার রহমতে আমার পরিবারের ভালবাসা আমার কাছে অমূল্য সম্পদ্ হয়ে আছে।

"পথের মধ্যে, মুসাফির খানার অদূরে একদিন দেখি একজন হিন্দু সাধুর কাছে অগণিত লোক ভীড় করেছে, শুনলাম তিনি বুজুরুগ লোক, খোদার জানিত লোক। তাঁর কাছে গেলাম; নিবেদন করলাম আমার স্ত্রীর রোগের বৃত্তান্ত। তিনি শুনে বললেন, "বেটা ভয় করিস্‌নে। ওটা রোগ নয়, ওটা ঐশ্বরিক অনুভবের আজব খেলা। তুই তাকে এখানে নিয়ে আয়"।

"বোরখা পরে আমার পরিবার আমার সঙ্গে সাধুর কাছে এলেন। সেখানে অনেক লোক, কিন্তু উপায় নেই। সাধু কোনও কথা না বলে একটি দোতারা হাতে নিয়ে গান আরম্ভ করলেন। জনাব! সে যে কী মধুর গান তা আর বলে বোঝাতে পারব না; লোকজন ছবির মত বসে গান শুনছিল। আমি লক্ষ্য করলাম আমার স্ত্রী আমার নিকটে গা-ঘেঁসে বসলেন; লোক-লাজ ছেড়ে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন তার কোমল দুটি কর দিয়ে! গান শেষ হলে লোকজন তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কিন্তু—অচানক্ আমার স্ত্রী আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত সকলে কে কি ভাব্‌ল আমার খেয়াল ছিল না। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভাবান্তর দেখে, যা কখনও হতে দেখিনি। আশ্চর্য হয়েছিলাম এ কারণে যে, সাধু যে গান করেছিলেন তার বন্দিশ ছিল ধ্রুপদের, বাণী ছিল ডাগুরবান্, বোল্ ছিল মাড়বারী, তাল ছিল চৌতাল। অথচ আমার স্ত্রীর ভাব-গতিক দেখে মনে হল না যে, তাঁর রাগ বা অস্বস্তি হয়েছে! মনে ভাবলাম সাধু-বাবা নিশ্চয়ই কিছু মন্ত্র করেছেন, না হ'লে এমন অসম্ভব সম্ভব হয় কেমন করে!

"সাধুবাবা আমাকে বললেন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে গানটি ভাল লেগেছে কি না। আমি মৃদুস্বরে তাঁর কানে বললাম, "সাধুর গান ভাল লেগেছে কি"? আমার স্ত্রী গদগদ কণ্ঠে বললেন, "বড্ড ভাল লেগেছে আমার। ও'কে অনুরোধ করলে আর একখানা গান কি গাইবেন না"? আমি পুলকিত হয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে সকলের সামনে সাধু বাবাকে আমার স্ত্রীর কথা বললাম। সাধুবাবা আমার কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভগবানের নাম করতে লাগলেন। পরে আরও দু'খানি গাইলেন। আমার স্ত্রী বিহ্বল হয়ে গান শুনছিলেন। গান শেষ হলে আমরা দুজন সাধুবাবাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম। সাধু আমাকে বললেন পরে এক সময়ে একলা এসে দেখা করতে। মুসাফিরখানায় ফিরে ঘরে পৌঁছুতেই আমার স্ত্রী একান্ত আগ্রহ আর মিনতি করে বললেন, "ওরকম গান কি আপনি গাইতে পারেন না? কী সুন্দর গান! আহা! ইচ্ছা করে সাধুবাবার কাছে পড়ে থাকি, আর গান শুনি"। আমি বললাম, "খুব সত্য কথা। কিন্তু—কে আমাকে ওরকম গান শেখাবে!" আমার স্ত্রী যেন একটু বিষণ্ন, অন্য-মনস্ক হয়ে থাকলেন, আমার কথা শুনে।

"পরের দিন সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি যখন নিজে থেকেই বললেন, আমাকে কয়েকটি গান শিখিয়ে দেবেন তখন আমার বুক আনন্দে কেঁপে উঠল; এ ত' সত্যই ভগবানের কৃপা। সেবারকার মত দুখানি গান শিখে নিলাম। মথুরা থেকে ফিরবার পথে আবার সাধুবাবার সঙ্গ করেছিলাম। মুসাফির-খানায় এক হপ্তা থেকে আরও পাঁচখানি গান শিখে নিলাম। সাধুবাবার দয়ার তুলনা হয় না।

"একদিন সাধুবাবা আমার স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা বেটি ঘরে যা! তোর হৃদয়ের খোরাকের বন্দোবস্ত পরমেশ্বরই করে দিলেন'। আমাকে আলাদা করে ডেকে বললেন, 'তোমার স্ত্রী জগতে বেশীদিন থাকবে না, তবে যে কদিন থাকবে সুখে থাকবে। ওকে কখনও রূঢ় কথা শুনিয়ো না। ওর উপর ঐশ্বরিক প্রেমের প্রভাব হয়েছে। ওর মন খারাপ হলেই তুমি ওকে এই সব গান শুনিয়ো। এসব গান মীরাবাই ভকতের তৈরী। আমরা ভকত্ সম্প্রদায়ের লোক, আমরা এইরকম গানই ভালবাসি, সাধনা করি'।

"বাদশাহ! সেই থেকে প্রতিদিন সকালে আগে আমার স্ত্রীকে দু'একখানা গান শুনাই, পরে কাজকর্মে মন দেই। কোনও কারণে যদি স্ত্রীর মন বিষণ্ন হয়, তাঁকে সাধুবাবার দেওয়া গান শুনাই আর দেখি তাঁর মনে সান্ত্বনা আসে, আনন্দ ভরে যায়। সাধুবাবার এমনি আশীর্বাদ ওর উপর!"

বলে গুণী একটু থামলেন। পরে বীর-বলের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলেন,

"আজ আমার কুটীরে বীরবলজী যখন পা রাখলেন, তখন আমার স্ত্রীর মন অত্যন্ত খারাপ ছিল। বীরবলজী হয়ত ভেবেছিলেন, সত্যই বুঝি আটা-ঘির অভাব হয়েছে। মোটেই তা হয়নি। মোটা খোরাকের অভাব কখনই হয়নি, কখনও হবে না, সাধুবাবার কথা যদি মানতে হয়। অভাব হয়েছিল হৃদয়ের খোরাকের, আজ। আজ সকালে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছিল বলে তাঁকে খোরাকী গান না শুনিয়েই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই হল তাঁর দুঃখ আর অভিমানের আসল কারণ, যা বীরবলজী তখন বুঝতে পারেননি। তারপরে আমি গান গাইলে স্ত্রীর হৃদয় থেকে দুঃখ আর অভিমান দূরে হয়ে গিয়েছিল যেমন দক্ষিণা হাওয়ায় বাদল কেটে যায়। বীরবলজী তা দেখে থাকবেন।

"বাদশাহ! আপনি যখন আমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন, তখন আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল, ভেবেছিলাম এত পরিশ্রম করে গান শিখেছি, যাচাই করতে পারিনি, আজ নিরালায় আপনাদের দিয়ে যাচাই হবে। কিন্তু—বীরবলজী যখন সাধুবাবার দেওয়া সেই দিল-রিঝানা গানটি গাইতে বললেন, তখন আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কারণ আমার ধারণা ওরকম গান ওস্তাদীর জন্য নয়, দরবারে যশলাভ করার জন্যও নয়। মাত্র আমার স্ত্রীর জনাই ত' ও সকল গান শিখেছিলাম।

"তানসেনজী যখন সেই গান শুনে খুশী হলেন, তখন আমার মন গর্বে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু যখন আপনারা ঐ গানটি আবার শুনতে চাইলেন তখন আমার মন ভারী হয়ে গেল। সত্য কথাই বলব, জনাব! সে গানের যিনি আসল শ্রোতা, যিনি সেই গানের অরমাঁকে প্রতিদিন বরণ করে নেন চোখের জল দিয়ে, সেই কদরদান অর্থাৎ আমার স্ত্রী ত' এখানে নেই! হুজুর! আপনি, তানসেনজী আর বীরবলজী যদি সেই গানের অরমাঁ পুরা অনুভব করতেন তাহলে আপনাদেরও চোখে জল এসে যেত।

"দ্বিতীয়বার গান করার সময়ে আমি সত্য সত্যই উন্মত্ত হৃদয়ে গান আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু আমারও একটা খায়েশ তৈরী হয়ে গিয়েছে; আমার স্ত্রীকে ঐ গান না শুনালে সেই খায়েশ মেটে না। হুজুর! আপনারা নিজের খায়েশ মিটাতে পারেন, কিন্তু আমার খায়েশ মিটাতে পারেননি। যাই হ'ক—আমাদের মনের আবেগ ত সব সময়ে দাবিয়ে রাখতে পারিনে। কেবলই আমার সরল হৃদয় স্ত্রীর কথা মনে হচ্ছিল, আবেগও বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর যে আমার কী হল জানিনে; জানি শুধু সে আবেগ দমন করতে পারলাম না। হয়ত আপনাদের মত মহামান্য শ্রোতাদের সম্মুখে, দরবারে বসে গান করার অভ্যাস নেই বলেই আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি।

"আপনাদের কাছে এই অপরাধের গুরুত্ব স্বীকার করছি" বলে গুণী ক্ষান্ত হলেন।

বাদশাহ, তানসেনজী আর বীরবল এর পূর্বে এমন সরল বক্তব্য ও অন্তঃসলিলা কাহিনী আর শোনেননি। এর পরিষ্কার মর্মকথাটি বুঝতে পেরে তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা তিনজনেই ছিলেন অনুভবী লোক; অনুভব দিয়েই সত্যটি উপলব্ধি করলেন।

আপাতত এই গুণীকে কি রকমে পুরস্কৃত করা যায় এই হয়েছিল তাঁদের চিন্তা। কারণ, অর্থ দিয়ে ত এঁকে সম্মানিত করা যায় না; মাত্র সম্মানিত করার জন্যও এঁকে সম্মানিত করা চলে না। বীরবল গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। বাদশাহ তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "বীরবলজী! আপনিই বলুন, এক্ষেত্রে কী করা যায়"।

তেমনি গম্ভীর হয়েই বীরবল বললেন, বাদশাহ! এর অপরাধ যে খুবই ভয়ানক, তাতে সন্দেহ নেই। অপরাধটি ঘটেছে খাস বিভাগে, ফলে বাইরে বিচার হওয়াও উচিত নয়। আমার মতে এঁকে অন্দর বিভাগের নিয়মানুসারে আগে গেরেফ্তার করিয়ে কয়েদী রাখাই আপাতত সমীচীন। বিচার পরে হবে।"

বীরবলের গম্ভীর বদনে ওরকম নির্মোহ কথা শুনে গুণীর মুখ শুকিয়ে গেল। কারণ, প্রচলিত ধারণা ছিল, বাদশাহের খাসমহলের অপরাধীরা কোনও কালেই মুক্তি পায় না, পাছে কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বাদশাহ ও তানসেনজী বীরবলের পেঁচদার কথার মর্ম বুঝতেন। তাঁরা ঐ কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন বীরবলকে, "কীভাবে গেরেফ্তার ও কতদিনের কয়েদ আপাতত হুকুম দেওয়া যায়?"

বীরবল বললেন, "বাদশাহ! এরকম আসামীকে প্রণয়ডোরে বেঁধে গেরেফ্তার করে হৃদয়ের খাস কামরায় কয়েদ করে রাখাই উচিত। তানসেনজী ও আমাকেও ঐ অবস্থায় ফেলে রেখেছেন আপনি; একটা নূতন সঙ্গী পেলে আমাদের কষ্টেরও আসানী হয়। কী বলেন তানসেনজী? আর একটা কথা, একে দরবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহলে অন্দরের এসব কলঙ্ক কথা বেফাঁস হয়ে যাবে, সমঝদারলোকে বদনামী করবে; বলবে গান শুনে আর গান গেয়ে চোখে জল! বাদশাহ, তানসেনজী আর বীরবল, কোন এক পাগলের সঙ্গে মিশে অধঃপাতে গেলেন! হায় হায়! তানসেনজী বলুন, আমি ঠিক কথা বলেছি কি না"।

"তানসেনজী বললেন, "জী হাঁ! বীরবলজীর কথা একেবারে গান্ধারগ্রামের কথা! এর রহস্য যদি বাইরে প্রকাশ হয় ত' দেওতারা আর নারদজী চটে যাবেন; আবার সমঝদারেরা এর রহস্য বুঝতে না পেরে গালাগালি করবে। বীরবলজীর কথা আমারও মনে লেগেছে"।

বাদশাহও কিছু কম যেতেন না; বললেন, "আপাতত এঁর গলাকে গেরেফ্তার করতে হয়" বলেই নিজের গলা থেকে মুক্তার মালাটি খুলে গুণীর গলায় পরিয়ে দিলেন। গুণী বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন; ভাবছিলেন কতক্ষণে বাড়ি ফিরে সেখানকার পাগলের কাছে এখানকার পাগলদের কীর্তি-কাহিনী বলবেন।

এর পরে গুণী আর বীরবল, আকবর আর তানসেন কি করেছিলেন, গুণীর পত্নী এসব কথা শুনে কি বললেন, কি করলেন—সমস্তই রহস্যে আচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। কারণ গানের অন্দরমহলের ব্যাপার এসব; গানের অন্দরমহলে ঐতিহাসিকদের প্রবেশ নিষেধ।

তা হলেও কিম্বদন্তীর গবাক্ষদ্বার দিয়ে একটা কানাঘুসো কথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। বীরবল, তানসেন আর আকবর—এঁরা তিনজন না কি অজ্ঞাতনামা গুণীর গান শুনেছিলেন, আর সেই গান শুনে তার রাগকে 'মীরাবাই কি মল্লার' বা সংক্ষেপে "মীরা কি মল্লার" নাম দিয়ে ফেলেছিলেন। এরকম কথা শুনে ঐতিহাসিকেরা দুঃখ করে বলতেন, "পাগলে কী না বলে, আর লোকে কী না শোনে"!

* * * *

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ গল্প শেষ করে বললেন—বহুদিন পূর্বে তাঁর যুবা বয়সে দিল্লীর উপকণ্ঠে ঢাড়ী সারেঙ্গীয়াদের পল্লীতে গিয়েছিলেন একজন অতি বৃদ্ধ ধ্রুপদীয়ার সন্ধানে। এই বৃদ্ধ গুণী ছিলেন শেষ বাদশাহ বাহাদুরশাহের সভাগায়ক। ধ্রুপদের কথাপ্রসঙ্গে সেই স্থবির গীতরসিকটি মহারাজকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন।

আমার অবস্থা পরীক্ষিতেরই মত; গানের তক্ষক-দংশনে আমার মরণ সুনিশ্চিত একথা জেনেছিলাম। তাইতে মহারাজাকে, অর্থাৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আগে ভাগে "অরমাঁ" শব্দটির অর্থ বলুন।

মহারাজ বললেন, "তুই বড় ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করেছিস্। কারণ আমাকে যিনি গল্প বলেছিলেন, তিনি বার বার ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; অথচ, তখন আমি ওর অর্থ বুঝতে পারিনি। পরে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—অরমাঁ বা অরমান শব্দের সাধারণ অর্থ আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু এখানে তার বিশেষ অর্থ হল—সার্থকতার বা সার্থক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এস্থলে ব্যাখ্যা করে বলা যায়—গানের বাণী, বা রাগ, বা তাল অথবা সমস্ত রূপটি একটি অরমাঁকে বহন করে নিয়ে যায় শ্রোতার হৃদয়দ্বারে; সার্থক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। তাই বলে—সেই বাণী, বা রাগ বা তালই নিজেরা অরমাঁ নয়। প্রকারান্তরে বলা যায় গান শুনে হৃদয়ের অন্তরতম রাজ্যে যে

আহবান মুখরিত হয়ে ওঠে সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সেই সার্থকতার অনুভবই হল সেই গানের অরমা। যাক্, তুই ত গান শুনিস্, গান বুঝিস্। এখন থেকে চেষ্টা করে দেখ গানের অরমা অনুভব করতে পারিস কি না।"

মহারাজার উপদেশ শিরোধার্য করলাম। সহজ কথায় সরল বুদ্ধিতেই বুঝলাম—অরমাই হল গানের তক্ষক, যার কামড়ে মৃত্যু হওয়ার আশায় ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছি।

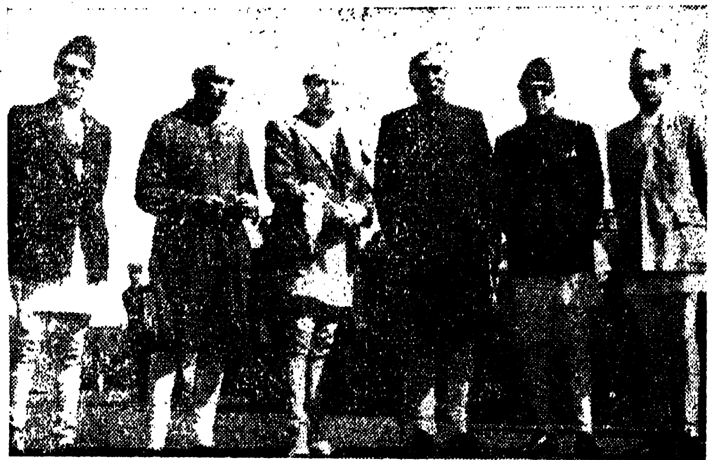
যাঁরা মাত্র রাগের নাম-রূপ-গড়ন অনুসন্ধান করেন তদের কাছে নিবেদন এই "মীরা কি মল্লার" আর "মিয়াঁকি মল্লার" এক বস্তু নয়। পরলোকগত গীতরসিক মহম্মদ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব লক্ষ্ণৌনিবাসী ধ্রুপদীয়া রেজা হুসেন খাঁ সাহেবের কাছ থেকে "মীরাবাই কি মল্লার" নামে একখানি ধ্রুপদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রণীত "মওয়ারিফ্-উন্-নগমাৎ" নামক অমূল্য গ্রন্থে গীতটি সন্নিবেশিত করেছেন। লক্ষ্মীরাম রচিত এই গানটিতে ধীরা নায়িকার রূপে শ্রীরাধিকার উক্তি যেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, সেরকম ধীর-মধুর ভাব নিয়ে ষড়জ, ঋষভ, কোমল গান্ধার তীব্র—গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত তীব্র—ধৈবত, কোমল—নিষাদ ও তীব্র নিষাদের বিচিত্র গতিবিধি নিয়ে বিকসিত হয়েছে এর রাগ-রূপটি, আস্থায়ী অন্তা সঞ্চারী ও আভোগের মধ্যে। যিনি ধ্রুপদ গান করার রহস্য জানেন তিনি নিশ্চয়ই একে রূপায়িত করতে পারবেন। তবে গানের অরমা অনুভব করা বা তাকে শ্রোতার মনে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র কথা।

নেপালে শাসন সংস্কার

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

নেপালের গণবিপ্লবের প্রথম অধ্যায় জয়যুক্ত হইল। প্রায় শত বৎসরের রাণা শাসনের অবসান হইল। এই বিপ্লবায়োজনকে অংকুরে বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কিন্তু ছিল না। স্বৈরতন্ত্রী রাণাশাহী গণ-আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য দৃঢ়হস্তে চেষ্টা করেন। জেল জরিমানা আর বহিষ্কার, এমন কি ফাঁসিও দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের। স্বদেশপ্রেমিক গণতন্ত্রকামীদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রকার নির্যাতন চালান হয়। কিন্তু কোনভাবেই জলস্রোত রোধ করা সম্ভব হয় নাই। কোন শাসক কোন কালেই পারে নাই অত্যাচার করিয়া জাগ্রত জনমতকে দমন করিতে। এখানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। রাণাশাহীকে আপোষ করিতে হইয়াছে গণ-বিপ্লবীদের সংগে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করিয়া দিবার দাবী তাহাদের মানিতে হইয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, রাণাশাহী হয়ত এত শীঘ্র গণমতের দাবী মানিয়া লইত না, যদি না, তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক চাপ থাকিত। গণ-আন্দোলনকে আরও কঠোরভাবে দমন করিবার জন্য হয়ত তাহারা চেষ্টা করিত। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সে চায় নেপাল স্বাধীন ভারতের শক্তিশালী মিত্ররাজ্যরূপে অবস্থান করুক। কারণ, তিব্বতে কম্যুনিস্ট অভিযানের পরে ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে গৃহ-বিবাদশূন্য শক্তিশালী রাজ্যরূপে গঠন করা প্রয়োজন। সেজন্যই বিশেষভাবে ভারত নেপালের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং তাহারই যত্নে ও চেষ্টায় ঐ বিপ্লবান্দোলনের সুষ্ঠু পরিণতি সম্ভাবনা স্পষ্টতর হইয়াছে। অবশ্য সেই সংগে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই গণবিপ্লবে নেপালীরা যে দৃঢ়তা, শৌর্য-বীর্য, একতা এবং শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়াছে ভারত হস্তক্ষেপ না করিলেও তাহাদের জয় অবধারিত ছিল। হয়ত বা তা ক'দিন দেরী হইত। কিন্তু জয় তাহাদের কেহই, কোন রাণাশাহী শক্তিই রোধ করিতে পারিত না। নেপালের গণবিপ্লবের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, তখন নেপালের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। গণতন্ত্র সম্বন্ধে তো দূরের কথা, কোন প্রগতিমূলক আলোচনা করাও ছিল সেখানে মারাত্মক অপরাধ। নেপালে নেপালীরা কি অবস্থায় আছে নিম্নোধৃত উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। মিঃ ডি আর রেগমি লিখিত নেপাল সম্পর্কিত পুস্তকের ভূমিকায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বলিয়াছেন, "নেপাল একটি পুলিশী রাষ্ট্র, যেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় খুশীমাফিক, যেখানে দৈহিক নির্যাতন করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, যেখানে গণজীবন একটা অভি-সম্পাত বিশেষ, শিক্ষার গতি অত্যন্ত মন্দ এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান-সমূহ কাজ করে বহু বাধানিষেধের মধ্যে।... এখানে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ। নেপালের নরনারী এখনও সেই আদিম যুগেই রহিয়াছে। নেপাল সত্যই বর্তমান যুগের অনুপযুক্ত। দেশের খনিজ ও বনজ সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। কাঠমাণ্ডুর বাহিরে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে



নেপাল প্রত্যাবর্তনের পূর্বে দিল্লীর পালাম বিমানঘাটিতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত নেপালাধীশ।



মোহন সমশের   সুবর্ণ সমশের

ইতিমধ্যেই দুইশত গ্রাম ও জেলা-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যদিও এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভা গঠনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি ১৯৫০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে পার্লামেন্টের উদ্বোধন হইয়াছে।" অর্থাৎ একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করিতে ইচ্ছুক নয় বলিয়াই ভাঁওতা দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ইংরেজের মত 'ভুয়া শাসন সংস্কার' দিয়া জনগণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাগ্রত জনমন তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। তাহারা চায় সত্যিকারের গণতন্ত্র। তাই ঐ শাসন সংস্কারে তাহারা প্রলুব্ধ হইল না। আন্দোলনের গতি তাহাদের রুদ্ধ হইল না। তাহারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল আর অপেক্ষা করিতে লাগিল অব্যর্থ সুযোগের জন্য।

এইভাবে কিছুদিন চলে। তারপর হঠাৎ এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। সংবাদটি হইতেছে এই যে, "নেপালাধীশ গত কল্য (৬ই নভেম্বর, ১৯৫০) সকালে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া একটি 'বৈদেশিক দূতাবাসে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষিত হয় যে, "বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য নেপাল সরকার নেপাল পার্লামেন্টে রাজগুরু ও গুরুদারগণের (অভিজাতবর্গের) এক জরুরী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।" এই দুইটি সংবাদ শুধু চাঞ্চল্যকর নহে, চমকপ্রদও। কিন্তু নেপালের রাজপ্রাসাদের যাঁহারা খবর রাখেন অথবা নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের নিকট সংবাদ দুইটি তেমন বিশেষ চাঞ্চল্যকর ছিল না। কারণ, তাঁহারা জানেন বাতাস কোন দিকে বহিতেছে। নেপালের বর্তমান মহারাজাধিরাজ যে অবস্থায় ছিলেন, রাষ্ট্রনৈতিক তাঁহার যেটুকু ক্ষমতা ছিল, শাসন ব্যাপারে তাঁহার যতখানি হাত ছিল, তাহাতেই এমন একটা কিছু যে হইতে পারে তাহা সূচিত হইতেছিল। তার উপর তিনি যখন গণ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া জানিতে পারা গেল, শাসন ব্যাপারে প্রজা-সাধারণকে আরও সুবিধা দিতে তিনি ইচ্ছুক বলিয়া যখন বোঝা গেল, তখন ইহাও দেখা গেল যে, তাঁহার জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।



নৃপ জঙ্গ রাণা   যজ্ঞ বাহাদুর

কারণ, স্বেচ্ছাচারী রাণাশাহী কোন প্রকারেই গণ-আন্দোলন বরদাস্ত করিতে সম্মত নহেন, লোকপ্রিয় সরকার স্থাপন তো দূরের কথা। যাহা হউক, নেপালাধীশ প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত সতর্ক পাহারাকে ফাঁকি দিয়া নিজের পরিবারের প্রায় সকলকে নিয়া ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে কোন প্রকারে হউক প্রধান মন্ত্রী নেপালাধীশের এক পৌত্রকে রাখিয়া দিতে সমর্থ হয়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বর্তমান নেপালাধীশ ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবু প্রাণের ভয়ে নেপালের রাজাকে ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রয় দানে স্বীকৃত হন এবং বিশেষ বিমানযোগে তিনি ১১ই নভেম্বর দিল্লী উপনীত হন। নেপালাধীশ এইভাবে নেপাল ত্যাগ করায় নেপাল সরকার ইহাকে বে-আইনী ও শাসনকার্য বহির্ভূত কার্য বলিয়া



বাবর সমশের   ভারতমান শর্মা

বর্ণনা করেন এবং তথাকথিত পার্লামেণ্ট কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন যে, রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ এইভাবে নেপাল ত্যাগ করায় নেপালের সিংহাসনের উপর তাঁহাদের যে অধিকার ছিল, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং রাজার তিন বৎসরের পৌত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহাকেই সম্মুখে রাখিয়া প্রধান মন্ত্রী আপন শাসন-শকট চালাইবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁহার জন্যে বহু বিস্ময় সঞ্চিত ছিল। যত সহজে তিনি কার্যোদ্ধার করিবেন ভাবিয়া ছিলেন তাহা পারিলেন না। জানা গেল, নেপালী কংগ্রেসের এক শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ভারত সীমান্ত হইতে অকস্মাৎ হানা দিয়া বীরগঞ্জ দখল করিয়া নিয়াছে (১১ই নভেম্বর, ১৯৫০)। এই অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছেন শ্রীত্রিভূম মল্ল। ইনিও রাণাবংশীয়, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই দেশ হইতে বিতাড়িত। যাহোক, কংগ্রেস বাহিনী শুধু বীরগঞ্জ দখল করিয়া ক্ষান্ত হইল না। তাহারা সেখানে প্রতিযোগী সরকার স্থাপন করিল। এই যুদ্ধে নেপাল কংগ্রেসীরা বীর শ্রীত্রিভূম মল্লকে হারায়। যুদ্ধে তিনি আহত, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

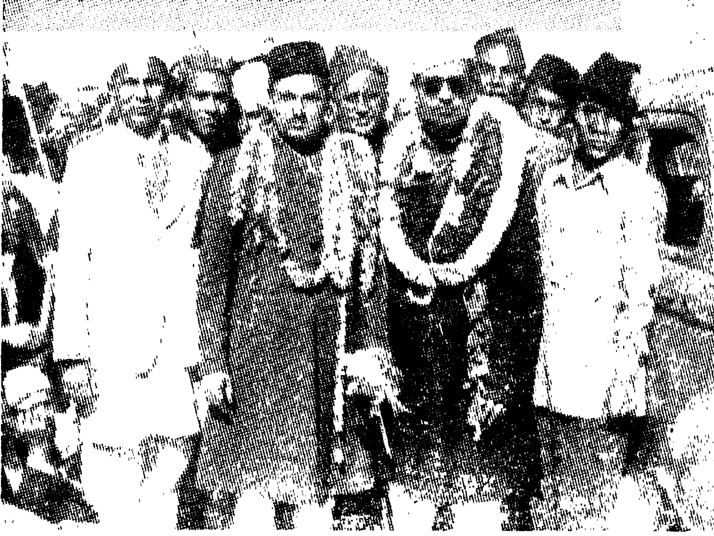
ইহার পর ১২ই নভেম্বর সরকারী সৈন্য পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে কংগ্রেসী ফৌজ আমলেকগঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর



বি কৈরালা   গণেশমান সিং



চূড়ারাজ সমশের   ভদ্রকালী মিশ্র



নেপাল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সুবর্ণ সমশের ও মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালাকে দেশবাসিগণ সম্বর্ধনা জানাইতেছেন

হয় এবং বিরাটনগর তাহাদের দখলে আসে। ইহা ছাড়া নয়টি অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও কংগ্রেসী ফৌজ আক্রমণ আরম্ভ করে। নানা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের পর কংগ্রেসী ফৌজ বীরগঞ্জ পরিত্যাগ করে। বীরগঞ্জে যে প্রতিযোগী সরকার স্থাপিত হইয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে (২০শে নভেম্বর, ১৯৫০)। কিন্তু এই নয়-দিনে যুদ্ধে ও প্রতিযোগী সরকার স্থাপনে রাণাশাহীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়িয়া উঠে। তাঁহারা বুঝিতে পারে, নেপালবাসীরা আর নিরীহ মেষশাবকের মত তাঁহাদের শাসন ও শোষণ মানিয়া চলিবে না। ভারত যদি কঠোর-ভাবে নিরপেক্ষতা নীতি পালন না করিত অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহে নেপালী কংগ্রেসকে যদি আরও কিঞ্চিৎ সুবিধা ও স্বাধীনতা দিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা নিরপেক্ষতা নীতি কঠোরভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক চাপ দিতে লাগিলেন নেপাল সরকারের উপর। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে নেপালের দেশরক্ষা মন্ত্রী ও অন্যান্যদের সহিত ভারত সরকারের এক বৈঠক হইল। রাজাকে স্বীকার করা, গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা চলিল, কিন্তু তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহারা নেপাল চলিয়া গেলেন! এই আলাপ আলোচনার মধ্যেও কংগ্রেসী ফৌজ তাহাদের আক্রমনোদ্যোগ বিন্দুমাত্রও শিথিল করে নাই। নানা ফ্রন্টে তাহাদের যুদ্ধ চলিতেই ছিল।

৬ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীনেহরু নেপাল সরকারকে সতর্ক করিয়া এক বক্তৃতা দেন এবং নেপাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জোর দেন। ২৮শে নভেম্বর নেপাল-ভারত যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরি-সমাপ্তি ঘটে ৯ই ডিসেম্বর। ভারত সরকার এই বৈঠকে তাঁহাদের শেষ কথা জানাইয়া দেন। তাঁহারা বিষয়টির উপর যেভাবে জোর দেন, তাহাতে কাজ হয়। ২১শে নভেম্বর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু পার্লামেণ্টে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, নেপালের প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, নেপালের শাসন সংস্কার ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তিনি এক ঘোষণাবাণী প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে (১) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গণপরিষদ গঠন, (২) গণপরিষদের অধিবেশন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, (৩) রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহকে নেপালের রাজা বলিয়া স্বীকার। ইহার পর নেপালের প্রধান মন্ত্রী কাঠমণ্ডু হইতে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, (১) যথাশীঘ্র সম্ভব নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত একটি একটি গণপরষদ গঠিত হইবে, (২) অন্তর্বর্তী কালের জন্য ১৪ জনকে লইয়া একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, (৩) নূতন শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন শাসন ব্যবস্থাই চালু থাকিবে, (৪) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার পরেও কংগ্রেসী বাহিনী সমানভাবে তাহাদের আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইতোমধ্যে নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, নেপালাধীশ ও ভারত সরকারের মধ্যে আরও কিছু আলোচনার পর নেপাল কংগ্রেসের সভা-পতি শ্রী এম পি কৈরালা যুদ্ধবিরতি আদেশ দেন। তারপর গত ১১ই ফেব্রুয়ারী নেপাল কংগ্রেস, রাণা দল ও নেপালাধীশের মধ্যে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, দশ জন সদস্য লইয়া অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

প্রায় তিনমাস কাল ভারতে অবস্থানের পর নেপালাধীশ নেপালে ফিরিয়া যান। বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা ও রাজনৈতিক কারণে যাঁহাদের বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাঁহারাও নেপালে প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নেপালের জীবনে একটি চিরস্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। ঐ দিন নেপালাধীশ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ নেপালের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে এক ঘোষণা প্রচার করিয়া নেপালে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সূচনা করেন। ১৯৫২ সালের মধ্যে গণপরিষদ গঠিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হয় এবং গণপরিষদ গঠিত হইবার মধ্যবর্তী-কালের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুরের নেতৃত্বে দশজনকে নিয়া এক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় আছেন কংগ্রেস দলের শ্রী বি পি কৈরালা, শ্রীসুবর্ণ সমশের, গণেশমান সিং, ভদ্রকালী মিশ্র, ভারতমান শর্মা। বিভিন্ন দপ্তর এইভাবে বণ্টন করা হইয়াছেঃ প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের—পররাষ্ট্র, শ্রী বি পি কৈরালা—স্বরাষ্ট্র, শ্রীসুবর্ণ সমশের—অর্থ, শ্রীবাবর সমশের—দেশরক্ষা, শ্রীগণেশমান সিং—শ্রমশিল্প, শ্রীভদ্র-কালী মিশ্র—পরিবহন ও বাণিজ্য, শ্রীভারত-মান শর্মা—খাদ্য ও কৃষি, কর্ণেল চূড়ারাজ সমশের—অরণ্য, শ্রীযজ্ঞ বাহাদুর বাসুআইত—জনস্বাস্থ্য ও শ্রীনৃপ জঙ্গ রাণা—শিক্ষা।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ফলে নেপালের গণ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হইল। দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে যাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের উপর। দুস্তর বাধা এবং অসীম প্রলোভন তাঁহাদের অতিক্রম কতিে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা পারেন তবেই সত্যিকারের লোকোত্তর সরকার নেপালে স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা অন্যথা তাঁহাদের সমস্ত শ্রম, দেশের লোকের সমস্ত ত্যাগ ব্যর্থ যাইবে।

বৈদেশিকী

স্ট্যালিনের উক্তি

মস্কোর "প্রাভদা" সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে মিঃ স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেন মস্কো বেতার কেন্দ্র হতে উহা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে সর্বত্র তাই নিয়ে আলোচনা চলছে। ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ পার্লামেন্টে মিঃ এ্যাটলী এই বলে রুশ গভর্নমেন্টের প্রতি দোষারোপ করেন যে, গত যুদ্ধের পরে বৃটেন ও আমেরিকা যেমন লোক ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের সৈন্য বাহিনী ছোট করে ফেলে, রাশিয়া সেরকম কিছু করেনি, বরঞ্চ রাশিয়া তার বিপুল সৈন্য বলের জোরে নিজের চারপাশে কতকগুলি তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। যাদের গভর্নমেন্ট রুশ গভর্নমেন্টের আজ্ঞাবহ। মিঃ এ্যাটলীর বক্তব্য ছিল এই যে, রাশিয়ার ক্রম-বর্ধমান সামরিকশক্তি ও তার আক্রমণাত্মক নীতির ভয়ে বাধ্য হয়েই ইঙ্গ-মার্কিন দলভুক্ত দেশগুলির অস্ত্রসজ্জা ও সৈন্য-বল বাড়াতে হচ্ছে। মিঃ এ্যাটলির কথার উত্তর দান উপলক্ষ করে মিঃ স্ট্যালিন সোভিয়েট পক্ষের বক্তব্য পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন।

মিঃ স্ট্যালিন বলেছেন যে, মিঃ এ্যাটলী ইঙ্গ-মার্কিন নীতির প্রকৃতরূপ গোপন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মিঃ স্ট্যালিন বলেন যে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭এর মধ্যে রাশিয়া তার সৈন্যবল দফায় দফায় কমিয়েছে। যুদ্ধের পর রাশিয়ার বহু বিরাট অসামরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়েছে, যুদ্ধে রাশিয়ার যে বিপুল ধ্বংস ও ক্ষতি হয়েছিল তার পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কমানো হয়েছে। মিঃ স্ট্যালিন বলেছেন যে, মিঃ এ্যাটলির যদি অর্থনীতির জ্ঞান থাকত তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে, উপরোক্ত কাজগুলির সঙ্গে সঙ্গে কোনো দেশের পক্ষেই সৈন্যবল, সমরশিল্প ও অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। মিঃ এ্যাটলি বলেন যে তিনি শান্তি চান, মিঃ স্ট্যালিন বলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। যুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়া শান্তির অনুকূলে যে সব প্রস্তাব করেছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে স্ট্যালিন বলেন. যে তার প্রত্যেকটা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ইউনো সম্বন্ধে মিঃ স্ট্যালিন বলেন যে, ইউনো এখন মার্কিন নীতির একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। মার্কিন গভর্নমেন্ট কিভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্বত্র আক্রমণাত্মক নীতি চালাচ্ছেন মিঃ স্ট্যালিন তার উল্লেখ করেন। কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে মিঃ স্ট্যালিন বলেন যে, শান্তি স্থাপনের জন্যে চীন গভর্নমেন্ট যে সব প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেগুলি যদি আমেরিকা ও বৃটেন মেনে না নেয় তবে কোরিয়ায় তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মিঃ স্ট্যালিনের মতে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যেরা জানে যে কোরিয়ায় তারা অন্যায় যুদ্ধ করছে এবং সৈন্যদের এই মনোভাবের দরুণই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কোরিয়ায় জিততে পারবে না। মিঃ স্ট্যালিনের মোট-বক্তব্য হোল এই যে, রাশিয়া সব সময়েই শান্তি চেয়েছে, ইঙ্গ-মার্কিন নীতিই পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তবে তিনি এখনও বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য বলে মনে করেন না। সকল দেশের জনসাধারণ চেষ্টা করলে এখনও যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের ঠেকানো যেতে পারে।

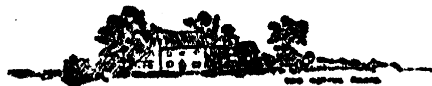
ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা যা বলেন তাও যেমন সব সত্য নয়, তেমনি মিঃ স্ট্যালিন যা বলেছেন তার মধ্যেও কোন ভেজাল নেই এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তবে মিঃ স্ট্যালিনের বিবৃতিটিকে খুব কায়দামতন সময়ে ছাড়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই এবং মিঃ স্ট্যালিন সোভিয়েট পক্ষের বক্তব্য যেভাবে গুছিয়ে বলেছেন সেটাও নিঃসন্দেহে খুবই কৌশলীর মত হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন দলীয় দেশগুলির জনসাধারণের মনের উপর মিঃ স্ট্যালিনের বিবৃতির কিছুটা প্রভাব পড়বেই। মিঃ স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে তাঁর সব উক্তি খন্ডন করা সহজ নয়। রাশিয়া যুদ্ধ চায় না, রাশিয়ার নীতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রসূত নয়, অতএব তার বিরুদ্ধে সমরসজ্জা আবশ্যক নয়—এই ধারণা বৃটেন, আমেরিকা ও ইঙ্গ-মার্কিন দলভুক্ত অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মনে জন্মানোই মিঃ স্ট্যালিনের বিবৃতির প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কোনো দেশেরই সাধারণ লোক যুদ্ধ চায় না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হলেও জনসাধারণকে অনেক রকম ত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকার করতে হবে; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য নয় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিও আবশ্যক নয়—এই বিশ্বাসের অনুকূলের যুক্তির প্রতি স্বভাবতই জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হবে। তার উপর মিঃ স্ট্যালিনের বিবৃতির মুন্সিয়ানাও যথেষ্ট। মিঃ স্ট্যালিনের কথার জবাব দিতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

আঁদ্রে জিদ্

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ্ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বর্তমান যুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। রাজনীতির দিক দিয়ে জিদ্ বামপন্থী ছিলেন এবং এক সময়ে তিনি সোভিয়েটেরও পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ায় ভ্রমণের পর তার মতের পরিবর্তন ঘটে। সেখানে মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নির্যাতন দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করেন তাতে কোন কোন বিষয়ে রুশ গভর্নমেন্টের কার্য ও নীতির সমালোচনা ছিল। তার ফলে কম্যুনিষ্ট মহল থেকে তাঁর উপর আক্রমণ চলতে থাকে। গত যুদ্ধের সময়ে জার্মানরা ফ্রান্স দখল করলে জিদ্ উত্তর আফ্রিকায় চলে যান এবং পরে জার্মান কবল থেকে ফ্রান্স মুক্ত হলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। নিজের বহুবিধ রচনা ছাড়া জিদ্ রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বই ফরাসীতে অনুবাদ করেন। ১৯৪৭ সালে জিদ্ নোবেল প্রাইজ পান।

তিব্বত

তিব্বতের সংবাদ বুঝা কঠিন। তবে বোধহয় দলাইলামা ও চীনাদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তির একটা আলোচনা চলছে। দলাইলামার প্রতিনিধিদের পিকিং যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এ রকম একটা কথাও শোনা যাচ্ছে। আশা করা যায় যে তিব্বতে যুদ্ধ আর বেশি হবে না। দলাইলামা ইয়াটুং থেকে কয়েক মাইল উত্তরে একটা জায়গায় নাকি যাচ্ছেন। হয়ত এইভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত লাসায় গিয়ে পৌছবেন।



রঙ্গজগৎ

ছিন্নমূল (দেসা পিকচার্স—রাধা ফিল্মস্ স্টুডিও)—কথা ও কাহিনী—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ও আলোক-চিত্র নির্দেশ—নিমাই ঘোষ; আলোকচিত্র—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী; শব্দ যোজনা—নৃপেন পাল; সুর যোজনা—কালোবরণ। ভূমিকায় প্রেমতোষ রায়, গঙ্গাপদ বসু, সুশীল সেন, বিজন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, শান্তা, শান্তি মিত্র প্রভৃতি। নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনে ১৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবীতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

অনেক কোণ থেকে উপরোধ এসে ছেঁকে ধ'রলো—দোষত্রুটি চাপা দিয়ে ছবিখানি সম্পর্কে ভালো ক'রে যেনো ভালো লেখা হয়। কিন্তু পরে উপরোধকারীদের বিচারবুদ্ধির দীনতায় স্তম্ভিত হ'তে হলো; দুঃখ হলো যে তারা "ছিন্নমূল"-এর মর্যাদা ও মূল্য নির্ধারণে সশঙ্ক ব'লে।

ছবিখানি দেখে বাইরে আসতেই ভীড় থেকে প্রথম মন্তব্য কানে এলো "এই আবার ছবি, নিজেরাই তো কতো দেখেছি, দেখছিও তো!" কথাটা শুনে আর একটা মন্তব্যের কথা মনে পড়লো।

সপ্তাহ কয়েক মাত্র আগেকার কথা। ইতালীতে "ক্যো ভ্যাডীশ্" তোলার সময় প্রযোজক স্যাম জিম্বালিস্ট তাঁর ইতালীয় ড্রাইভারকে প্রশ্ন করেন সে "প্যায়জা" "ওপন্ সিটি", "বাইসিক্‌ল থিফ" দেখেছে কি-না। উত্তরে ড্রাইভার বলে, ছবিতে আর দেখবে কী সে, পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়তই তো সে তাই দেখছে।

"ছিন্নমূল"-এর দর্শকদের একজনের ঐ মন্তব্য, আর ইতালীর সেই ড্রাইভারের মন্তব্য একই ভাষায় স্পষ্টভাবেই ছবিগুলির বাস্তবরূপ ও প্রকৃতির কথাই প্রকাশ ক'রে দেয়। এই সঙ্গে যদি যোগ ক'রে দেওয়া যায় যে ইতালীর ছবি যে ক'খানির নাম করা হ'য়েছে সেগুলি সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাময় এমন প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দিয়েছে যার ধাক্কায় চলচ্চিত্রের রূপ ও প্রকৃতির ভিৎ থেকে কাঠামোর আগা গোড়াটা চুরমার ক'রে দিয়ে নতুন যুগের বুনিয়াদ গেঁথে তোলায় ওদেশের চিত্রশিল্পকে মাতিয়ে তুলেছে। প্রভাবে "ছিন্নমূল" তাদের চেয়ে কম কিছু নয়।

ইতালীর ছবি কখানি দেখবার সুযোগ আমরা পাইনি। আমরা শুনেছি এবং পড়েছি, কিন্তু এতজনের কাছ থেকে এবং এতোভাবে ছবিগুলির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট একটা নির্ণয়ে পৌঁছনো সম্ভব। ছবিগুলি সরাসরিভাবে প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলতে পেরেছে কারণ সেগুলো হ'লো বাস্তব মানুষের জীবন সত্যের সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব ব'লে। এদের কাহিনীতে কল্পনার মৈকীত্বও নেই, আর কৃত্রিমতার নিকষ পরিপাটিও নেই। বাস্তবে মানুষকে মানুষ যেমন দেখছে, মানুষের জন্যে মানুষের যে অনুভূতি, মানুষ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা—অনাবৃত সত্যের মধ্যে দিয়ে তাকেই রূপায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে চলচ্চিত্রের এই নব পর্যায়। এই পর্যায়ে ইতালীয় ছবিগুলি হয়তো পথ নির্দেশক, কিন্তু "ছিন্নমূল"-কে ঠিক তাদের অনুগামী বলা চলে না, "ছিন্নমূল"কে তাদের সহগামী হবার কৃতিত্বেই বরণ ক'রতে হবে।

"ছিন্নমূল" নাম থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হ'য়ে যায়। "ছিন্নমূল" উদ্বাস্তু জীবনেরই আলেখ্য। দেশ ভাগ হবার জেরে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা বাস্তুভিটে ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হয় সেই পঁয়ত্রিশ লক্ষ আবালবৃদ্ধবনিতার পথচলার কাহিনী। এক বঙ্গ থেকে আর এক বঙ্গে চলে আসা, কিন্তু সমগ্র পরিবেশটাকে এমনিভাবে গড়ে তোলা হ'য়েছে যে এর আবেগের টানে একটা আন্তর্জাতিক সর্বজনীনত্ব ফুটে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের এই উদ্বাস্তুদের কথা যেনো কোরিয়ার উদ্বাস্তুদেরই জীবনযাত্রার কাহিনী; দেখতে দেখতে গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া হতভাগ্যের কথাও মনে জাগিয়ে তোলে। উদ্বাস্তু জীবনের প্রথম নথীচিত্র হিসেবেই শুধু নয়, মানবিক আবেদনেও "ছিন্নমূল" ভারতীয় চিত্রশিল্পের একটি মহৎ অবদান। ভারতীয় ছবির এটা নবপর্যায়ের উন্মোচন।

"ছিন্নমূল"-এর নায়ক শ্রীকান্তের বুকে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যুবকের আত্ম-কাহিনী লেখা। তার স্ত্রী বাতাসী, নলডাঙার সেই হারাণ ঢালি, ধুনকর কৈলাস, সিধু কামার, স্বর্ণকার মনোমোহন, বিশু চক্রবর্তী, মঙ্গলা সবাই যুগের প্রধানতম সমস্যার প্রতীক হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীময় স্বার্থসর্বস্ব, ধনলোলুপ বর্বরেরা যে নিদারুণ বিপর্যয় রচনা ক'রে চলেছে। এরা সব তারই জীবন্ত প্রমাণ সামনে তুলে ধ'রেছে একেবারে সোজাসুজিভাবে।

শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট গ্রাম নলডাঙ্গা। যে যার কাজ নিয়ে হিন্দু মুসলমানে আত্মীয়ের মতো বাস করে। হঠাৎ দেশ বিভাগের ঢেউ এসে লাগলো সেখানে। গ্রামের দুই দুষ্টগ্রহ মধু গাঙ্গুলী আর মোজফফর খাঁ বিপদের আশঙ্কা দেখিয়ে লোককে পালাবার পরামর্শ দিলে। গ্রামের সবায়ের পরামর্শদাতা এবং ভরসাস্থল শ্রীকান্তকে তারা কৌশলে জেলে পাঠিয়ে দিলে তার লোককে ভুলিয়ে জলের দামে তাদের ভিটেমাটি কিনে নিতে লাগলো। শ্রীকান্তের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বাতাসীকে নিয়ে বিশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সবাই ক্রমে কলকাতার স্টেশনে এসে আশ্রয় নিলে। কয়েকদিন পর এক স্বেচ্ছাসেবকের কথায় তারা একখানি বাড়ী দখল ক'রে বসলো। রাস্তায় ফিরি ক'রে, ঠোঙা বিক্রী ক'রে, আরও খুচখাচ কিছু ক'রে আর সরকারি রেশন খেয়ে তারা দিন কাটাতে থাকে। বাড়িয়ালা এসে তাদের শাসিয়ে যায়, বাড়ী না ছাড়লে সে অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। ইতিমধ্যে শ্রীকান্ত জেল থেকে ছাড়া পায় এবং বসতভিটে শূন্য দেখে সেও কলকাতায় চলে আসে। দীর্ঘদিন নানাস্থানে খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সে তার গ্রামবাসীর সন্ধান পায়। সে এসে পৌঁছনোর মুহূর্তে বাতাসী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। শ্রীকান্ত বাতাসীর কাছে গিয়ে বসেছে এমন সময় নীচে এক কোলাহল জেগে ওঠে। বাড়ীয়ালা গুণ্ডার দল নিয়ে এসেছে ওদের উচ্ছেদ করার জন্যে। শ্রীকান্ত ছুটে যায় নীচে, বাতাসী তাকে বাধা দিতে যায়। প্রসবের পরই তার অবস্থা সঙ্গীন ছিলো, এ উত্তেজনা সে সইতে পারলে না। বাতাসীর মৃত্যু হ'লো। গুণ্ডাদের প্রতিহত করার মুখেই মঙ্গলার কান্না ভেসে উঠলো। শ্রীকান্ত ওপরে ছুটলো, কিন্তু তখন সব শেষ। সন্তানকে বুকে আঁকরে ধ'রে শ্রীকান্ত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে রইলো।

নিয়মের বাঁধা ছাঁচে ফেললে এটাকে কাহিনী ব'লে স্বীকার ক'রতে পারা যাবেনা হয়তো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে কাহিনী ব'লে ধ'রাই ঠিক হবে না। কারণ এটা আসলে হ'চ্ছে ইতিহাসের একটি অধ্যায়—এ ঘটনা আজও সবায়ের সম্বিতে জ্বলজ্বলে হ'য়ে ফুটে রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে যে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা সমগ্র দেশের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনকে আলোড়িত ক'রে দিয়েছে "ছিন্নমূল" তারই সংযত ও সংক্ষিপ্ত লিপি।

আগাগোড়া ঘটনা ও বিন্যাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ স্পর্শগুলি পরিচালকের আন্তরিকতা ও অনুভূতির কথাই জাহির করে। সামান্য কথা ও সরল ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক বাস্তবতাকে মূর্ত ক'রে তোলার কৃতিত্ব বহুস্থানেই পাওয়া যায়। বসন্তের কুহুরবে শ্রীকান্ত ও বাতাসীর স্বপ্ন-নীড় রচনা মনে যেমন মাদকতার সৃষ্টি করে; গোপনে বাতাসীর আমের কাসুন্দী খাওয়ায় যে আনন্দ দিনের ইঙ্গিত এনে দেয়, তেমনি বুকের মধ্যে হাহাকার তোলে ভিটের খুঁটি জাপটে ধ'রে ভিটে ছেড়ে না যাওয়ার জন্যে বৃদ্ধার কাকুতি, তেমনি মনে মোচড় দেয় স্টেশনে বাতাসীর ফেলে যাওয়া সিঁদুরকৌটা যখন ওদেরই সন্ধানরত শ্রীকান্তর পায়ের আঘাতে ছিটকে পড়ে; আর তেমনি দীর্ঘশ্বাস পড়ে শ্রীকান্তকে জেলে নিয়ে যাবার পর উদাসিনী বাতাসীর স্বপ্নালু চোখে শ্রীকান্তের ফিরে এসে শিশুকে আদর করার দৃশ্যটা। কোথাও এতটুকুও কৃত্রিমতা নেই। সহজ ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় যা সম্ভাব্য তার মাত্রাকে ছাপিয়ে যাওয়া হয়নি কোথাও। পরিচালক উচ্ছ্বাসের প্রবাহকে যেমন রোধ ক'রে গিয়েছেন, তেমনি অতি নাটকীয়তাকেও কোথাও প্রকট হ'য়ে উঠতে দেননি। এমন একটা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ ঝোঁকটাকে সামলে নিয়ে পরিচালক বিচক্ষণ শিল্পীমনেরই পরিচয় দিয়েছেন। ভিটেমাটি ফেলে এসে স্টেশনে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই দাগ টেনে নিজের দখলকারী প্রতিষ্ঠা করা; নৈশ অন্ধকারে সিগারেট মুখে শীষ দিয়ে নারীশিকারী পিশাচের বিচরণ; গ্রামে থাকতে যে স্বর্ণকার কত্তোজনের সোনার চিরুণী বাঁধিয়ে দিয়েছে কলকাতার পথে পথে তারই চিরুণী ফিরি করা, লোহার আওয়াজে সিধু কামারের পথের মাঝে থমকে দাঁড়ানো; কুমোর আর ধুনরীর ঠোঙা তৈরী ক'রে বেচা; সবই অত্যন্ত টুকরো ঘটনা কিন্তু তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে অনেক বড়ো ইঙ্গিত।

অনেকের, বিশেষ ক'রে ভুক্তভোগীদের আক্ষেপ জাগতে পারে যে ছবিতে অনেক কিছুই দেখানো হয়নি, হয়তো কথা উঠবে যে ছিন্নমূল হওয়ার মূল কারণটা আরও স্পষ্টভাবে দেখানো উচিত ছিলো; হয়তো কেউ বলবে যে উদ্বাস্তু জীবনের দুর্বিষহতা আরও প্রকট হওয়া উচিৎ ছিলো, আরও হয়তো কারুর আশা ছিলো কোন কোন ঘটনা আরও বেশী ক'রে দেখতে পাবেন। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার ক'রতে পারবেন না যে ছবিতে যা আছে তার মধ্যে কল্পনার প্রশ্রয় নেই কোথাও, কৃত্রিমতা নেই বা সত্যের বিকৃতি নেই। পদ্মার ঢেউ আরও প্রচণ্ড, বা পূর্ববঙ্গীয় ভাষার টান কোথাও বেঠিক এগুলোকে মারাত্মক ত্রুটি ধ'রে নিলে চলে না, দেখতে হবে, যে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হ'য়েছে তার মধ্যে প্রাণের সাড়া জেগেছে কি না। উদ্বাস্তু জীবননাট্যের ভূমিকা রচনায় "ছিন্নমূল" সে বিষয়ে সার্থক সৃষ্টি হ'য়েছে ব'লে স্বীকার করতেই হবে। পরিচালক নিমাই ঘোষ একটা নব-পর্যায়ের দূতরূপে অভিনন্দন লাভ ক'রবেন।

অতি সামান্য অংশ ছাড়া ছবিখানির সবই তোলা বহির্দৃশ্যে। এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট। এর মধ্যে বেশ দুঃসাহসিকতারও

পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যামেরাকে সরাসরিভাবে মানুষের পাশে পাশে, মনের গতির সঙ্গে তাল ফেলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এতো মনোজ্ঞ চেষ্টা বোধহয় এই প্রথম। বহির্দৃশ্যে অনেক জায়গাতেই আলোর ছটাকে মাত্রার মধ্যে এনে ফেলা যায় নি বটে কিন্তু তার জন্যে প্রাণের সাড়া কোথাও মন্থর হ'য়ে পড়েনি। ট্রেনে কলকাতায় আসার দৃশ্যটি আলোকচিত্রের নাটকীয়তা সৃষ্টির একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব। শব্দ ও সুরযোজনাও জীবন্ত চরিত্রের মতোই নাটরস ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য ক'রেছে।

অভিনয়ের কথা মনে হয় না। কারণ পরিবেশের সঙ্গে সবাই নিজেদের এমনিভাবে মিশিয়ে একীভূত ক'রে নিয়েছেন যে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব চরিত্র বলেই মনে হয়। সবচেয়ে গভীর আবেগের সৃষ্টি ক'রে তোলেন বাতাসীর ভূমিকায় শোভা সেন। গ্রাম্য বধূর সলজ্জ ভঙ্গী, স্বামীর প্রতি সোহাগ, স্বামীর উপর নির্ভরতা, অভিমান, বিরহিনী মূর্তি, স্বামীর জন্য আকুলতা, কথায় ও অভিব্যক্তিতে শোভা সেন চরিত্রটিকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নারীর ছবিকে সামনে তুলে ধ'রেছেন। এটা তার নিজেরই শুধু নয়, সমগ্র ভারতীয় পর্দায় এক গৌরবময় কৃতিত্ব। শ্রীকান্তের ভূমিকায় প্রেমতোষ রায়, ইতিপূর্বে ছোট ভূমিকায় দেখা দিলেও, প্রকৃত শিল্পীর মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এই প্রথম, এবং এটা মনে ক'রে রাখবার মতো কৃতিত্ব। গঙ্গাপদ বসুর বিশু চক্রবর্তী এই বোধহয় প্রথম তাকে দুর্বৃত্ত চরিত্রাভিনয় থেকে রেহাই দিয়েছে—কিন্তু সেবাপ্রবণ সহানুভূতিশীল বৃদ্ধের ভূমিকায়ও তিনি সমান দীপ্তি এনেছেন। মঙ্গলাকে প্রাণবন্ত ক'রেছেন শান্তা। অন্যান্য ভূমিকায়ও অভিনয়শিল্পীরা সকলেই চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।

"ছিন্নমূল" হ'চ্ছে বাস্তুহারা মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের দুঃখময় ইতিবৃত্ত। একেবারেই সত্যকার বাস্তব। ছবিখানি দেখতেও হবে সেই মন নিয়েই। "সরগম" কিংবা "মর্যাদার" মতো অথবা অন্যসব বাজার চলতি ছবির মতো এর মধ্যেও কৃত্রিম জীবন ঘটনা ও পরিবেশ, আমেজ ধরানো প্রমোদ অথবা রিপুর বিলসন আশা ক'রে গেলে "ছিন্নমূল" নিরাশ করবে। এতে নাচও নেই, গানও নেই, এতে আছে একদল মানুষের উৎখাত জীবনের মর্মস্পর্শী ঘটনা। মানুষের ওপরে দরদী মনই কেবল এ ছবিকে যথার্থ সমাদর জানাতে পারবে।

ছবির কাহিনী-পুস্তিকায় একটি প্রশংসনীয় ঘোষণা দেখা গেল। চিত্রনির্মাতারা জানিয়েছেন যে, ছবিখানির লভ্যাংশের শতকরা দশভাগ বাস্তুহারা ছাত্রদের সাহায্যের জন্যে তারা ব্যয় ক'রবেন। এই ঘোষণাটিও, আশা করি, ছবিখানি দেখবার জন্যে লোককে উদ্দীপিত করবে।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় পশ্চিম বাঙগলা দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হোলকার দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। বাঙগলা দলের এই পরাজয় দুঃখের কারণ সন্দেহ নাই তবে বাঙগলার ক্রিকেট খেলার সম্মান ইহাতে একেবারেই ক্ষুন্ন হয় নাই। হোলকার দলের প্রথম ইনিংসের ৫১৫ রানের বিরুদ্ধে বাঙগলা দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ৪৪৭ রান করিয়াছেন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসে বাঙলা দলকে এইরূপভাবে খেলিতে ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। হোলকার দলে বহু অভিজ্ঞ ও কৃতি খেলোয়াড় ছিলেন সুতরাং তাঁহারা বিজয়ী হইবেনই এইরূপ ধারণা পূর্ব হইতেই করা গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত বাঙলা দল যে হোলকারের অর্জিত বিরাট রান সংখ্যার সমান করিবার জন্য এইরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়া কৌশলের অবতারণা করিবেন ইহা পূর্বে কল্পনা করা যায় নাই। ভবিষ্যতে বাঙলার তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সমপর্যায়ভুক্ত হইতে যে পারিবেন তাহার প্রমাণ এই খেলাতেই পাওয়া গেল। ইহা সত্যই আনন্দের ও সুখের বিষয়।

বাঙলা দল আরও অধিক শক্তিশালী করিয়া গঠন করা সম্ভব ছিল কিন্তু কেবল কতকগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জনাই তাহা সম্ভব হয় নাই। এই সকল লোকেদের প্রতি যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তবে বুঝিব পরিচালকমণ্ডলী সত্য সত্যই উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেদের দ্বারা গঠিত হয় নাই। যে অন্যায় উহারা করিয়াছেন তাহা ক্ষমা করা কোনরূপেই উচিত হইবে না। দেশের মান সম্মান লইয়া যাঁহারা ছিনিমিনি খেলিয়া থাকেন তাহাদের কোনরূপেই বরদাস্ত করা চলে না।

পশ্চিম বাঙগলা বনাম হোলকারের খেলা

পশ্চিম বাঙলা বনাম হোলকারের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা চারিদিনব্যাপী হয়। প্রথমেই হোলকার দল টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করেন। প্রথম দিনের শেষে হোলকার দল ৫ উইকেটে ২৫০ রান করে। সারভাতে ১০৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনের চা-পান পর্যন্ত খেলিয়া হোলকার দল ৫১৫ রানে ইনিংস শেষ করে। সারভাতে ২৪৬ রান করিয়া আউট হন। পশ্চিম বাঙগলা দলের পি চ্যাটার্জি একাই হোলকার দলের ৭টি উইকেট দখল করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। দ্বিতীয় দিনের শেষে পশ্চিম বাঙলা দলের ১ উইকেটে ৮৩ রান হয়। তৃতীয় দিনে সারাদিন খেলিয়া পশ্চিম বাঙলা দল ২ উইকেটে ২৯৩ রান করে। পি রায় ১৫৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে বাঙলা দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরেই ৪৪৭ রান করিয়া সকলে আউট হইয়া যায়।

হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে এক উইকেটে ১৫৩ রান করে। মুস্তাক আলী শত রান করিয়া নট আউট থাকেন। পশ্চিম বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে ৬৮ রান পশ্চাতে পড়িয়া খেলায় পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফল :—

হোলকার—প্রথম ইনিংস :—৫১৫ রান (সি টি সারভাতে ২৪৬, অর্জুন নাইডু ৪৫, মুস্তাক আলী ৬৩, এম, এম, জাগদেল ৫৪, আর পি সিং নট আউট ৪১, পি, চ্যাটার্জি ১৩৭ রানে ৭টি ও সি এস নাইডু ১২৭ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেন।)

পশ্চিম বাঙলা প্রথম ইনিংস—৪৪৭ রান (পি রায় ১৬৩, শিবাজী বসু ৮২, সি এস নাইডু ৬৯, পি চ্যাটার্জি ৪৯, জি রায় ২০, এস খান্না নট আউট ২৯, সারভাতে ১২২ রানে ৪টি, এ আর নাইডু ১০৪ রানে ২টি, মুস্তাক আলী ২২ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন।

হোলকারের দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইঃ ১৫৩ রান (মুস্তাক আলী নট আউট ১০০, অর্জুন নাইডু নট আউট ৪৬, পি চ্যাটার্জি ২২ রানে ১টি উইকেট পান।)

এ্যাথলেটিকস

এশিয়ান গেমসের প্রথম অনুষ্ঠান আগামী ৪ঠা মার্চ হইতে ১১ই মার্চ দিল্লীর নবগঠিত জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় আফগানিস্থান, বর্মা, সিংহল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন প্রভৃতি ১০টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করিবে। নেপাল শেষ মুহূর্তে যোগদান করিতে পারিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীর সংখ্যা হইয়াছে ৫৪৪ জন। তাহার মধ্যে ৪৪ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন বিভাগে বিচারকের কার্য করিবেন। কোন্ দেশ হইতে কতকগুলি যোগদান করিতেছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আফগানিস্থান ৪১, বর্মা ৮০, সিংহল ৪, ভারত ১৮৭, ইন্দোনেশিয়া ৩৩, ইরাণ ৪৩, জাপান ৮৩, সিঙ্গাপুর ১৮, থাইল্যাণ্ড ২২, ফিলিপাইন ৩৩।

প্রতিযোগিতার সকল বিষয়েই যোগদান করিবে ভারত ও বর্মা। জাপান কেবল সন্তরণে যোগদান করিবে না। ইরাণ হইতে কোন মহিলা এ্যাথলীট আসেন নাই এবং উহারা মহিলা বিভাগে যোগদান করিবে না।

বিভিন্ন বিষয়ের যোগদানকারী দেশের তালিকা :

এ্যাথলেটিকস্ (পুরুষদের)—১০টি দেশই যোগদান করিবে।

এ্যাথলেটিকস্ (মহিলাদের)—বর্মা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর।

বাস্কেটবল—বর্মা, ভারত, ইরাণ, জাপান ও ফিলিপাইন।

সাইক্লিং—বর্মা, ভারত ইরাণ ও জাপান।

ফুটবল—আফগানিস্থান, বর্মা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান ও ফিলিপাইন।

সন্তরণ (পুরুষদের)—বর্মা, ভারত, ইরাণ ও ফিলিপাইন।

ভারোত্তোলন—আফগানিস্থান, বর্মা, ভারত, ইরাণ, জাপান, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন।

এশিয়ান গেম্‌সের ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

এশিয়ান গেম্‌স অনুষ্ঠানের এ্যাথলেটিকস্ বিষয়ে যোগদান করিবার জন্য নিখিল ভরত এ্যাথলেটিক ফেডারেশন ৫৬ জন পুরুষ ও ২২ জন মহিলা মনোনীত করিয়াছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসিপের বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল বিবেচনা করিয়াই প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্যের এ্যাথলীটদের বিশেষ গৌরবের কারণ হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই বোম্বাইর প্রতিনিধি অধিনায়কত্ব করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। পুরুষদের বিভাগের অধিনায়ক হইয়াছেন চৌখস এ্যাথলীট বলদেব সিং, ও মহিলা বিভাগের অধিনায়িকা হইয়াছেন মিস্ বানু গাজদার। শ্রীযুত কৃপানারায়ণ ভারতীয় দলের ম্যানেজার ও মিঃ টেড গার্ণণ্ড শিক্ষক নির্বাচিত হইয়াছেন। মহিলা বিভাগের ম্যানেজার হইয়াছেন, মিসেস ই সি ধাওয়ান। খুবই সুখের বিষয় ভারতীয় দলের মধ্যে বাঙগলার কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীট স্থানলাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় ফুটবল দল

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনই তাহার পরিচালনা করিবেন। ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ২২ জন খেলোয়াড়কে ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে দিল্লীর ফুটবল শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করিতে বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতেই ভারতীয় ফুটবল দল গঠিত হইবে :—

ভরদ্বাজ (মহীশূর), এণ্টনী (বাঙগলা), আজিজ (হায়দরাবাদ) এস মান্না (বাঙগলা), প্যাপেন (বোম্বাই), এস চ্যাটার্জি (বাঙগলা), লতিফ (বাঙগলা), চন্দন সিং (বাঙগলা), নুর (হায়দরাবাদ), অভয় ঘোষ (বাঙগলা), সম্মুখম, (মহীশূর), জোন্স (সার্ভিসেস), ভেংকটেশ (বাঙগলা), আর গুহঠাকুরতা (বাঙগলা), মেওয়ালাল (বাঙগলা), আমেদ (বাঙগলা), সালে (বাঙগলা), এস নন্দী (বাঙগলা), লোকনাথম (মহীশূর), বেচন (উড়িষ্যা), সাত্তার (বাঙগলা) ও লায়েক (হায়দরাবাদ)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—পররাষ্ট্র বিষয়ে অদ্য পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করা হইবে, ইহাই ভারতের দৃঢ়সঙ্কল্প। শ্রীনেহরু এই বিবৃতিতে কোরিয়া ও দূরপ্রাচ্য সমস্যা এবং কাশ্মীর প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

ভারতের টেক্সটাইল কমিশনারের প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, মিলগুলি মাসে মোট যে পরিমাণ বস্ত্র গাটবন্দী করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অন্যূন শতকরা ৬০ ভাগ ভারতে বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার কাপড়ের মিলগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন।

অদ্য পার্লামেণ্টে অর্থসচিব ১৯৫০ সালের আয়কর তদন্ত কমিশনের বাৎসরিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। উহাতে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে কমিশন ২৩২টি ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল ঘটনায় ৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা আয় গোপন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম গতকল্য তাঁহার চেৎলাস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে নিবারক নিরোধ আইন (সংশোধন) বিলের আলোচনাকালে বিভিন্ন সদস্য উহার কঠোরতা আরও হ্রাস করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণ সম্পর্কে পুনরায় বিতর্ক আরম্ভ হইলে সরকার বিরোধী পক্ষ হইতে বিভিন্ন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে ধানের নির্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, সর্বত্র একই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেণ্ট একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত ও পাকিস্থানে যে সব অপহৃতা নারীর উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪,০৭২ ও ৭,১৭৫।

বিহার পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ বলেন যে, সংবাদপত্রে বিহার রাজ্যে ২৯৬ জনের অনশনে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত সরকারীভাবে মাত্র ৬ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রীজওহরলাল নেহরু পুনরায় দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্দার প্যাটেলের শূন্য স্থানে সহকারী নেতারূপে নির্বাচিত হইয়াছেন।

দিল্লীর বিখ্যাত ঘড়িঘরের চূড়া গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ধ্বসিয়া পড়ে। এই ঘড়িঘরের স্থানে মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হইবে।

পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী ডাঃ কেশকার এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, তিব্বত আক্রমণকারী চীনা বাহিনী উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু পরে তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যায়।

ভারত গভর্নমেণ্ট ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যৌথভাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ৭৬৫ মাইল সীমারেখা নির্ধারণের কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিলে জমির অনধিকারী দখলকারীদের উচ্ছেদ ব্যবস্থার ক্ষমতা সরকার নিযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করিবার বিধান আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল ভারতে অবস্থান করিয়া নেপালাধীশ ত্রিভুবন অদ্য কাঠমাণ্ডুতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক লোক বিমান ঘাটিতে উপস্থিত হইয়া নেপালাধীশকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে নিবারক নিরোধ আইন সংশোধন বিল সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—লক্ষ্ণৌয়ে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু কম্যুনিস্ট এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, যতদিন তাঁহার সরকারের হস্তে ক্ষমতা থাকিবে ততদিন সরকার হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনক্রমেই বরদাস্ত করিবে না।

বোম্বাইয়ের জনৈক ভাস্কর ভারত সরকারকে প্রদর্শনের জন্য ১১০ ফিট উচ্চ ও প্রায় ১২ হাজার বর্গফিট আয়তনবিশিষ্ট প্লাস্টার নির্মিত মহাত্মা গান্ধীর বিরাট আবক্ষ প্রতিমূর্তির একটি নমুনা নয়াদিল্লীতে আনয়ন করিয়াছেন। নমুনাটি অনুমোদিত হইলে রাজধানীতে এই বিরাট প্রতিমূর্তিটি স্থাপিত হইবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য কানপুরে ৪ দিনব্যাপী জাতীয় বিমান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শনের সময় অন্যতম প্রতিযোগী শ্রী এ এন মাথুর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য লক্ষ্ণৌয়ে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

অদ্য কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের এলাকাধীন গার্ডেনরীচের এক নম্বর জেটি শেডে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফলে ১৮ হাজার গাঁইট পাট ও অন্যান্য মালপত্রসহ এই বিরাট জেটি-শেডটি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—নেপালাধীশ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ অদ্য নেপালের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে এক ঘোষণা প্রচার করিয়া নেপালে গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের সূচনা করিয়াছেন। তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন—প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের, বি পি কৈরালা, বাবর সমশের, গণেশমান সিং, ভদ্রকালী মিশ্র, ভারতমান শর্মা, কর্নেল চূড়ারাজ সমশের, যজ্ঞ বাহাদুর, বাসুয়াইৎ, সুবর্ণ সমশের, নৃপজঙ্গ রাণা। রাজ ঘোষণায় যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্তি দানের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের সংযোগ রক্ষা বিভাগের সহকারী মন্ত্রী শ্রী খুরশেদ লাল অদ্য নয়াদিল্লীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—গতকল্য কোরিয়ার পূর্ব রণাঙ্গনে দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী পুনরায় ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উহারা সমুদ্র তীরবর্তী যং যং শহরটি অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে ৫ মাইল অগ্রসর হয়।

দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী বিনা বাধায় পূর্ব উপকূলভাগে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার কয়েক ঘণ্টা পর অদ্য চীনা ও উত্তর কোরীয় বাহিনী সিউল এবং মধ্য কোরিয়ায় পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য ভারতবর্ষকে কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য মধ্য কোরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চীনা বাহিনী এবং উত্তর কোরীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদল নূতন আত্মরক্ষা ব্যূহে হটিয়া আসিয়াছে। কম্যুনিস্টদের এই মারাত্মক পাল্টা আক্রমণের ফলে জেঃ রিজওয়ের অষ্টম বাহিনী ১৫ মাইলেরও বেশী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সমগ্র মধ্য রণাঙ্গন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে কম্যুনিস্ট বাহিনী অদ্য এক শক্তিশালী দ্বিমুখী সাঁড়াশি অভিযান আরম্ভ করে। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—উত্তর কোরীয়দের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে হোয়েং জং ও ওনজু এলাকা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপক্ষের কবলমুক্ত হইয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—উত্তর কোরীয়দের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে হোয়েংসং ও ওনজু এলাকা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপক্ষের কবলমুক্ত হইয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রিতে কোরিয়া রণাঙ্গনে চীনা বাহিনীর চতুর্থ অভিযান বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সাঁজোয়া বাহিনী উত্তরে হ্যান নদী তীরে আক্রমণ চালাইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।০ আনা, বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 3rd March, 1951. ১৮শ সংখ্যা]

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র-সাধনা

সুদীর্ঘ ১২ বৎসর পরে বিগত ১২ই ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিবস হাওড়াতে পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এবং তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বার বৎসরকে এক যুগ ধরা হয়। এই এক যুগের মধ্যে বাঙলাদেশে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বাঙলাদেশ বর্তমানে বিভক্ত, তদনুযায়ী বিগত অধিবেশনকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলন বলিয়া অভিহিত করিতে হইয়াছে। বিভক্ত বাঙলার এই যে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ইহার সমস্যারও অন্ত নাই। ব্যবচ্ছেদের ফলে এখানকার সামাজিক এবং অর্থনীতিক ভিত্তি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সমস্যা বা সংকট সব জাতির পক্ষেই দেখা দিয়া থাকে। ভাগ্য-চক্রের বিড়ম্বনায় পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে সেগুলি অবশ্য সমধিক গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের অন্য কোন প্রদেশকেই স্বাধীন ভারতে এমন সংকটের মধ্যে পতিত হইতে হয় নাই। কিন্তু সে হিসাব করিয়া আমাদের অবসন্ন হইলে চলিবে না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙলাদেশকে সবচেয়ে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। শহীদের বেদিমূলে এখানেই বলি পড়িয়াছে সবচেয়ে বেশী, বাঙলাদেশের ইহাই ঐতিহ্য এবং সেজন্য প্রাদেশিকতাবোধের কোন প্রশ্নই এখানে উঠে নাই। সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রী শ্রীযুত জগজ্জীবন রাম বাঙলার এই উদার প্রাণধর্মের প্রশস্তি করিয়া বলেন,—অতীতে বিদেশী শাসন-কর্তৃত্বের ফাঁসিকাঠের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাঙলা সমগ্র ভারতকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে। বাঙলা প্রচলিত চিন্তাধারার বন্ধন ছিন্ন করিয়া কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি কলাশিল্প, কি বিজ্ঞান সমাজের সমুদয় কর্মক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। বিদেশী শাসনের সীমা-বেষ্টনী ছাড়াইয়া বাঙলা বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং এই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ পুত্রকন্যাদের সাধনা প্রভাবে বাঙলা আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সেই বাঙলাদেশের অবস্থা বর্তমানে কিরূপ? শ্রীজগজ্জীবন রাম বলেন, "যে বাঙলা রাজনীতিক অচলায়তনকে প্রাণবলে অপসারিত করিয়াছিল, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্তমান দিনের চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কর্মানুষ্ঠানে সেই বাঙলার দান যেরূপটি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতেছে না—ইহার কারণ কি?" আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে শক্তিশালী নেতৃত্বের। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের ধারা দেশের জনসাধারণের সংযোগ-সূত্র হইতে ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। সমষ্টি বেদনায় সংদৃপ্ত তেমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের নৈতিক শক্তির বিকাশ এখানে আর ঘটিতেছে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলেই নেতা গড়িয়া তোলা যায় না; কিন্তু একটা জিনিস করা সম্ভব। নেতৃ-শক্তি যাহাতে সমষ্টি বেদনায় স্ফূর্ত হইয়া উঠে, জনগণের সেবা এবং তাহাদের স্বার্থ-সাধনার ভিতর দিয়া তেমন নৈতিক প্রতিবেশ এখনও গঠন করা যাইতে পারে। কার্যতঃ নিঃস্বার্থ সেবক এবং কর্মিবৃন্দের সাধনার উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে কংগ্রেসের নেতৃত্ব-শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া এই বাঙলা-দেশে একদিন যেসব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি, এই শ্রেণীর নিঃস্বার্থ সেবক এবং ত্যাগব্রতী কর্মীদের সাধনাই তাহার মূলে কাজ করিয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শকে ইঁহারাই প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। জাতির স্বাধীনতার জন্য ইঁহারাই প্রাণ দিয়াছেন। মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠা কিছুই ইঁহারা চাহেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ প্রকৃতপক্ষে এমন নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী কর্মীদের উপরই নির্ভর করিতেছে। ফলতঃ অর্থ-নীতির হিসাবের অঙ্ক কষিয়া কিংবা কয়েক দিন লোক জড় করিয়া সভা করিয়া এবং সেখানে কতকগুলি শুভেচ্ছামূলক প্রস্তাব পাশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যার সমাধান করা যাইবে না এবং সে সবই পরোক্ষ। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বেদনাসম্পন্ন প্রকৃত মানুষের আজ এখানে দরকার। আজ জাতিকে জাগাইতে হইলে মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠার উপরে এই মনুষ্যত্বের মহিমাকেই সমাজজীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেসের আদর্শকে যৌবনের প্রাণধর্মে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবারও ইহাই একমাত্র উপায় এবং ঐক্যেরও ইহাই পথ। বাস্তবিক-পক্ষে মান, যশ প্রতিষ্ঠার মোহই কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছে। সস্তায় নেতা হইবার সাধ সকলেরই। এই মোহ হইতে বিনির্মুক্ত প্রকৃত নেতৃত্বের নৈতিক শক্তির অবদান জাতির মনের মূলে সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত জাতি জাগিবে না; প্রত্যুত বাঙলার দুঃখও ঘুচিবে না। প্রাদেশিক সম্মেলনের

সাম্প্রতিক অধিবেশনে বাঙলার কর্মি-সমাজকে এই সত্যে সচেতন করিয়া তুলিবে, ইহাই আমাদের আশা।

রেলওয়ে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব

ভারতের রেলওয়ে বাজেট ভারতীয় পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই বাজেট উপস্থাপিত করিতে গিয়া রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে রেলপথসমূহের অবস্থা গত বৎসরের অপেক্ষা সুনিশ্চিতভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ভারতীয় রেলপথের উন্নতির এই দাবীতে বা যুক্তিতে দেশের জনসাধারণের পক্ষে আশ্বস্তির কোন কারণ ঘটে নাই; পক্ষান্তরে রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে তাঁহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের মতে ভাড়া বৃদ্ধির এই প্রস্তাব তেমন কিছু নয়। এক্সপ্রেস গাড়ীসমূহে শতকরা কুড়ি টাকা এবং প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে শতকরা পঁচিশ টাকা মাত্র ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। এই যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে জনসাধারণের মনে সামান্য একটু আঘাত লাগিবে, রেলওয়ে মন্ত্রী ইহাই অনুমান করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আমাদের মতে এই আঘাত সামান্য নয়, ইহা দস্তুরমতই গুরুতর। রেলপথের ভাড়া বর্তমানে যে হারে আছে, দেশের জনসাধারণের পক্ষে তাহাই গুরুতর। ইহার উপর ভাড়া আরও বৃদ্ধি করা হইলে, তাহাদের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত হারে ভাড়া বর্ধিত হইলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে প্রতি মাইলের জন্য এক পাই হিসাবে বেশী দিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যাহাকে বারো মাইল দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করিতে হয়, তাহাকে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যাতায়াতের জন্য দুই আনা অধিক দিতে হইবে। এই হিসাবে একশত মাইল দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য এক টাকার অধিক ভাড়া গরীব যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা নানাভাবেই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র এমন কি জীবিকা-নির্বাহের জন্য আবশ্যক প্রত্যেকটি জিনিসের দর অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর রেলের ভাড়া এইভাবে বর্ধিত হওয়াতে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উপর চাপ বাড়িয়া যাইবে। রেলওয়ে মন্ত্রী যত যুক্তিই দেখান না কেন, দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্টের প্রতি যে গবর্নমেণ্টের কিছুমাত্র সহানুভূতি আছে, তেমন গবর্নমেণ্টের পক্ষে এই অবস্থার মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা কোনক্রমেই সমীচীন সম্ভব হইতে পারে না। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহিত সমবেদনাসম্পন্ন বলিয়া যে গবর্নমেণ্ট সদা-সর্বদা দাবী করিয়া থাকেন, আজ দেখিতেছি, তাঁহাদেরই মুখপাত্রস্বরূপে ভারতের রেলওয়ে সচিব স্বচ্ছন্দে এবং নির্বিকারচিত্তে গরীবের পকেটে হাত দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে মন্ত্রী মহোদয় যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সতাই অপূর্ব। তাঁহার মতে সব জিনিসপত্রের দর কয়েক বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪ শত টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং রেলওয়ের খরচ সেই অনুপাতে অনেক বাড়িয়াছে; কিন্তু রেলের ভাড়া গত ১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা শতকরা মাত্র ৪৬ হইতে ৭৩ টাকা হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং ভাড়া এত কম বাড়ানো ঠিক হয় নাই; আরও কিছু বাড়ানো দরকার। এই যুক্তির তাৎপর্য এই যে, খাদ্য, বস্ত্র এবং আবশ্যক সকল জিনিসের জন্য দেশের লোককে যখন বেশী টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন রেলেই বা সস্তায় চড়িবে কেন? অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতার জন্য দেশের লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা বা সম্পদ কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। দেশের লোকের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করিতে হইলে এই দুর্মূল্যতা হ্রাস করাই গবর্নমেণ্টের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপে রেলওয়ে মন্ত্রী দুর্মূল্যতাজনিত সঙ্কটে পতিত দুর্গত জনগণের উপর আরও আর্থিক ভার চাপাইতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যম দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর এবং মর্মান্তিক পরিহাসস্বরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন গবর্নমেণ্টের যুক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদের উপর আন্তরিক বিশ্বাস আমরা কোন দিনই পোষণ করি নাই। অধিকন্তু বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উপস্থিত করাই ভারত গবর্নমেণ্টের পক্ষে ভুল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। আমাদের মতে হায়দরাবাদ সম্বন্ধে ভারত গবর্নমেণ্ট যেরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাশ্মীর সম্বন্ধেও তাঁহাদের সেইরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল। হানাদারদিগকে এবং পাকিস্থানী সৈন্যদের বিতাড়িত করিয়া সমগ্র কাশ্মীর নিজেদের অধিকারে আনাই ছিল তাঁহাদের কর্তব্য। ভারত গবর্নমেণ্টের এই ভুলের জন্য পাকিস্থান কাশ্মীর সম্পর্কে পররাজ্য আক্রমণকারী স্বরূপে বিবেচিত হইয়াও সেখানকার সমস্যা সমাধানে নিজেদের একটা দাবী দাঁড় করাইয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের উপস্থাপিত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে তাহার এই দাবীরই পরিপোষকতা করা হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার গ্লাডউইন জেব এবং মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ আর্নেস্ট গ্রস উভয়েই সেই দাবীকে ভিত্তি করিয়া কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য অকৈতব শুভেচ্ছার উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপে স্যর আওয়েন ডিক্সন কার্যত পাকিস্থানকে কাশ্মীর সম্পর্কে পররাজ্য আক্রমণকারীর পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিনের এই প্রস্তাবে এই বিষয়টি একেবারে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট; পাকিস্থান পররাজ্য আক্রমণকারী একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের বিধান অনুসারে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রকৃতপক্ষে যাহারা নিয়ন্তা—সেই ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের পক্ষে তাহা অনভিপ্রেত। কারণ কাশ্মীর কোরিয়া এবং পাকিস্থান ও চীন দেশ নহে। সুতরাং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী সৈন্যদিগকে বহিষ্কার করিবার প্রশ্ন তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিন ধুরন্ধরদের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্থান এবং ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে সমপর্যায়ে পড়িয়াছে। কাহারো দাবীকে তাঁহারা ঠেলিয়া ফেলিতে চাহেন না—উভয়েরই তাঁহারা হিতৈষী এবং কল্যাণকামী। ইঁহাদের এই শুভেচ্ছার জোরে কাশ্মীরের জনসাধারণের অধিকার যদি নষ্ট হয়, পররাজ্য আক্রমণকারীদের ভাগ্যে কাশ্মীর যদি লুঠের মাল হইয়া পড়ে, তবে দোষ তাঁহাদের নাই। বস্তুত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি যদি কার্যে পরিণত হয়, তবে কাশ্মীরের ভাগ্যে বিড়ম্বনা আরও যে বহু রকমের দেখা দিবে, আমাদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে ভারতীয় সেনাদলকে কাশ্মীর ছাড়িয়া আসিতে হইবে, পাকিস্থানী সেনাদলও অবশ্য কাশ্মীর ছাড়িয়া আসিবার একটা ভঙ্গী দেখাইবে, কিন্তু অন্তরঙ্গ-শক্তি ভিতরে ভিতরে কাজ চালাইবে। কাশ্মীরের জনসাধারণ গণপরিষদের ভিতর দিয়া তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যদি ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইবার অভিমতও প্রকাশ করে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ভারত বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের কাছে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার ভ্রান্তির ইহাই দাঁড়াইয়াছে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে, অর্থাৎ কাশ্মীরের ভাগ্য-নিয়ামক এখন আর কাশ্মীরের অধিবাসীরা নহে, বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের বর্তমান মুরুব্বী ইঙ্গ-মার্কিন চক্রই কাশ্মীরের ভাগ্য-বিধাতা। তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, কাশ্মীরের অধিবাসী-

[illegible]কে নির্বিবাদে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইভাবে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবার অধিকার বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের কি আছে? কাশ্মীরের লোকে তাহাদের এমন প্রভুত্ব কোন দিনই স্বীকার করে নাই, করিবেও না। বলা বাহুল্য পাকিস্থান ইহাই চাহিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সে এতদিন ধরিয়া ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের আনুগত্যের কূটনীতি-পথে তাহাদের উপর চাপ দিয়াছে। কিছু সুবিধাও সে করিয়া লইয়াছে। এই সব সুবিধা পাইয়াই পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জোর গলায় হাঁকিতেছেন, কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে তাঁহারা মুক্ত করিবেনই। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর মুখেও শুনিতে পাইতেছি যে, কাশ্মীরের চল্লিশ লক্ষ মুসলমানকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা কোন উপায়েই অবলম্বন করিতে সংকুচিত হইবেন না। এইভাবে রণডঙ্কার-বাদ্য শুরু হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত কি করিবে?

উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে "অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিল" একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় এমত ব্যবস্থা-সংশিলষ্ট গুরুত্ব এবং এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আ[illegible] করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি কার্যকরী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মতে যদি বিশেষ রকমের গুরুতর ধরণের কোন অন্তরায় না থাকে, তবে উদ্বাস্তুগণ যে সব জমিতে নিজেরা বসতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই সব স্থান হইতে তাঁহাদিগকে উৎখাত না করাই উচিত। আমরা তাঁহার এই মতেরই সমর্থন করি এবং আমাদেরও অভিমত এই যে, উচ্ছেদ করাটাই এক্ষেত্রে সরকারের মুখ্য নীতি যেন না হয়; পরন্তু বিশেষ প্রয়োজনেই যেন সেই চরম নীতি অবলম্বিত হয়। বস্তুতঃ আইন যাহাই বলুক, উদ্বাস্তুগণ প্রকৃতপক্ষে কোন অপরাধ করেন নাই। তাঁহারা কিরূপ অবস্থার ভিতর পতিত হইয়া মাথা রাখিবার জায়গাটুকু না পাইয়া জমি দখল করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার বন্য বিভীষিকার আলোড়নে দেশ-রাজ্য হইতে উৎখাত হইয়া তাঁহারা যখন পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু এই অবস্থার মধ্যে নিজেদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে একটু আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা বাসস্থান ও অন্ন-বস্ত্রের জন্য বহু সমস্যায় বিব্রত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধিকতর বিব্রত করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী সেদিন কাঁচরাপাড়ার নিকট "কল্যাণী" নগর উদ্বোধন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর দাবী-দাওয়া উত্থাপনের জন্য অনেক লোক আছে; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলিবার কেহ নাই। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রতিবেশে এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই সবচেয়ে বেশী দুর্গতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার উপকণ্ঠভাগে যে সব উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। শহরের নিকট হইতে যদি ইঁহাদিগকে দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়, তবে ইঁহাদের জীবিকা-সংকট জটিল হইয়া উঠিবে। সুতরাং জমির মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ইঁহাদিগকে উৎখাত না করিবার দিকে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বাস্তবিকপক্ষে উদ্বাস্তু-সমস্যাকে আমরা জাতীয় সমস্যা বলিয়া মনে করি। লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব নরনারী দুর্গত অবস্থার ভিতর পতিত হইয়া জাতির সংকট বাড়াইয়া তোলে, ইহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সরকার যদি বর্তমানের এই অব্যবস্থিত অবস্থাটা বিশেষ সুবিবেচনা এবং সহানুভূতির সঙ্গে একবার গোছাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে উদ্বাস্তুস্বরূপে বিপন্ন পূর্ববঙ্গ হইতে উৎখাত মধ্যবিত্ত সমাজের এই জন-শক্তি পশ্চিমবঙ্গের সম্পদস্বরূপেই গণ্য হইবে। কিন্তু অবস্থাটাকে গোছাইয়া লইতে গেলে প্রচলিত বিধি-বিধানের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে, ইহা নিশ্চিত; পরন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া সেজন্য সংকুচিত হওয়া সমীচীন নয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ববঙ্গের বাজেট

পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। হিসাবের অনুসারে আগামী বৎসরে পূর্ববঙ্গের বাজেটে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। পূর্ববঙ্গের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা ইহা হইতেই কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর মতে বিগত সাম্প্রদায়িক অশান্তিই প্রধানত এই অবস্থার মূলে রহিয়াছে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে পূর্ববঙ্গের আর্থিক অবস্থা যতটা বিপর্যস্ত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই কারণে ততটা সংকট দেখা দেয় নাই। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ব্যবচ্ছেদের ফলে অবিভক্ত বাঙলায় যেগুলি ছিল শিল্পপ্রধান অঞ্চল সেগুলি পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে, পূর্ববঙ্গ প্রধানত অনগ্রসর কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলি পাইয়াছে। তাঁহার মতে পূর্ববঙ্গের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকে শিল্প-সম্পদের দিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ববঙ্গ সরকার শিল্প-সম্পদ সম্প্রসারণের উপযুক্ত অবস্থা সেখানে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন কি? ব্যবচ্ছেদের পরবর্তী পূর্ববঙ্গের অবস্থা অনুরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে এই কয়েক বৎসরে পূর্ববঙ্গের যে স্থান স্থানীয় শিল্প-সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই এলাইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র পূর্ববঙ্গের কুটীর-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা শিল্পী, কারিগর, তাঁহারা উৎখাত হইয়াছেন এবং শিল্প-বাণিজ্যের সব গৌরব হইতে পূর্ববঙ্গ বঞ্চিত হইয়াছে। সেখানে সর্বত্র একটা অর্থনৈতিক অবসাদ দেখা দিয়াছে এবং আর্থিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিয়া খাঁটি ইসলাম-রাজ্য সেখানে গড়িয়া তুলিলেই সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিবে, তাঁহারাও ক্রমে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন; কিন্তু তথাপি ইশ্লামী রাষ্ট্রের মোহ তাঁহারা ছাড়িতে পারিতেছেন না। শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ যদি সত্যই পূর্ববঙ্গে সাধন করিতে হয়, তবে যথেষ্ট মূলধন এবং উপযুক্তসংখ্যক কারিকরের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনে সুদক্ষ যেসব শ্রেণী সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহাদের কর্মপ্রেরণা যাহাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পারে, এইরূপ অবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইশ্লাম রাষ্ট্রের যে বাতিক পূর্ববঙ্গের শাসন বিভাগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে সেখানকার হিন্দু জনসাধারণের মনে অদ্যাপি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর অনিশ্চয়তার ভাবই রহিয়া গিয়াছে। ফলে পূর্ববঙ্গকে শিল্প-সমৃদ্ধ করিবার উৎসাহ তাঁহাদের স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের কাছে পূর্ববঙ্গ একটা শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। তাঁহাদের আর্থিক সমস্যার যত ঝুঁকি পূর্ববঙ্গের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ইশ্লাম-রাষ্ট্রের সংহতির কূট চক্রে তাঁহাদের নীতি সকল দিক হইতে পূর্ববঙ্গকে যে অবস্থার মধ্যে লইয়া ফেলিতেছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গ সরকারের পক্ষে রাজ্যের উন্নতিসাধন দূরে থাকুক, সরকারের সাধারণ খরচ কুলাইয়া যাওয়াই দুঃসাধ্য হইয়াছে। নিজকে রিক্ত করিয়া এইভাবে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের সেবা করিবার দুর্ভোগ পূর্ববঙ্গকে কতদিন পোহাইতে হইবে, কে জানে—ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বৈদেশিকী

"প্রাভদা" সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে মার্শাল স্ট্যালিন ইঙ্গ-মার্কিন নীতির যে সমালোচনা করেন, লণ্ডন বা ওয়াশিংটন কোথা থেকেই তার ঠিক জবাব দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। না হওয়ারই কথা। কারণ স্ট্যালিন বেছে বেছে বিশেষ করে সেই সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য সোভিয়েট নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে, যার কথা তুললে স্ট্যালিনের পক্ষেও খুব ভালো জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

লণ্ডন বা ওয়াশিংটন স্ট্যালিনের উক্তিগুলির সোজা জবাব না দিয়ে সেগুলির মধ্যে স্ট্যালিনের কুমতলব খুঁজে বার করবারই কেবল চেষ্টা করেছে, বর্তমান অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন পক্ষই এখন আর অপর পক্ষের, কথার যুক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে রাজি নয়। "তুমি লোক খারাপ"—এখন এই হোল একমাত্র যুক্তি—উভয় পক্ষেরই। তাই স্ট্যালিনের বিবৃতির উত্তরে বলা হয়েছে যে, স্ট্যালিন আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তা তো করবেনই। যতদিন পর্যন্ত একদিকে সোভিয়েট ও অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন পরস্পরকে কোণঠাসা করার এবং দরকার হলে মেরে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন প্রত্যেকেই বিরুদ্ধ পক্ষের সংহতি নষ্ট করার চেষ্টা তো করবেই। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকেও সোভিয়েটের সহিত তার মিত্র ও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির বন্ধন আলগা করার কতরকম চেষ্টাই না হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং সোভিয়েটের দিক থেকেও উল্টো চেষ্টা হবেই। স্ট্যালিনের কথার মধ্যে এরকম একটা দ্যোতনা ছিল যে, রাশিয়া বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমেরিকার পাল্লায় পড়ে আমেরিকার সোভিয়েট-বিরোধী যুযুৎসু নীতির শৃঙ্খলে নিজেকে ক্রমশ বেঁধে ফেলেছে। স্ট্যালিন বলেছেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য নয়, তবে আমেরিকা পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, বৃটেন ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশগুলির জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না, তারা যদি মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে তারা যুদ্ধ আটকাতে পারে।

একথা নিঃসন্দেহ সত্য যে, বৃটেন বা য়ুরোপের জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না। সুতরাং তাদের কাছে স্ট্যালিনের কথার একটা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণকে বিফল করার জন্য যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, সেটা হোল এই যে, স্ট্যালিনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আতলান্তিক চুক্তি অনুসারে পশ্চিম য়ুরোপের সামরিক সুরক্ষার যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তা হতে না দেওয়া। বর্তমানে য়ুরোপ খণ্ডে সোভিয়েট পক্ষে যে সৈন্যবল রয়েছে, তাকে বাধা দেওয়ার মত সৈন্যবল য়ুরোপভূমিতে অন্য পক্ষের না থাকাতে সোভিয়েটের সঙ্গে রাজনীতিতে পেরে ওঠা যাচ্ছে না। সোভিয়েটের হাতে এই যে "sanction" রয়েছে, সেটা নষ্ট করা দরকার। এ পক্ষেও যদি হাতের কাছে অনুরূপ পিটবার আয়োজন থাকে, তবে সোভিয়েটের বর্তমান সামরিক বলাধিক্যের "sanction"ত্ব আর থাকবে না।

তবে রাশিয়া যে কেবল এই "sanction" হারাবার ভয়েই ভীত তা মনে হয় না। রাশিয়ার এ ভয় নিশ্চয়ই হয়েছে যে, আমেরিকা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে সে কেবল রাশিয়ার হাতের উপরোক্ত "sanction"এর মূল্য নষ্ট করেই সন্তুষ্ট থাকবে না। সুতরাং রাশিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করবেই যাতে য়ুরোপে এমন সামরিক শক্তি-সংহতি না ঘটতে পারে, যার আঘাত যে কোন মুহূর্তে রাশিয়ার ওপর এসে পড়তে পারে। রাশিয়া দেখছে যে, তার বিরুদ্ধে য়ুরোপ খণ্ডে ভূ-সৈন্যবলের সংগ্রহ কার্য খুব দ্রুত অগ্রসর হতে না পারলেও মার্কিনের সামরিক জাল ক্রমশ তাকে ঘিরে ফেলার আয়োজন করছে।

পশ্চিম জার্মানীর লোকবল না পেলে ভূখণ্ডে রাশিয়া ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সৈন্যবলের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন জেনে অনেকদিন থেকেই জার্মানদের হাতে অস্ত্র দিয়ে তাদের সঙ্গী করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তাতে নানারকম বাধাও উঠছে। জার্মানরা সহজে রাজী হচ্ছে না। জেনারেল আইসেনহাওয়ার কিছুদিন পূর্বে হিটলারী আমলের জার্মান সেনাপতিদের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করে গেছেন। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ অনেক নাৎসী "যুদ্ধাপরাধী"দের শাস্তি মকুব করেও দিয়েছেন। তবুও সশস্ত্র জার্মান সহযোগিতা লাভের ব্যবস্থা এখনও হয়ে উঠছে না। জার্মানরা আমেরিকানদের "গুর্খা" হতে মোটেই রাজী নয়। অন্যদের সঙ্গে সমান অধিকার না পেলে কারো হয়ে লড়বার জন্য তারা পরিকল্পিত "য়ুরোপীয়" সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে নারাজ। অথচ জার্মানদের একচোটে সমান আসন দিতে কারো মন সরছে না, ভয়ও করছে। নাৎসী বিভীষিকার স্মৃতি এখনো রয়েছে। তবে সমান অধিকারের প্রশ্ন ছাড়াও বেশির ভাগ জার্মান বোধ হয় পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে। কারণ তারা জানে যে, তার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। অবিশ্যি জার্মানদের মধ্যে একদল আছে, যারা প্রতিশোধের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে লড়াই লাগাতে চায়। যুদ্ধপূর্ব জার্মানীর যে যে অংশ পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে এক কোটির বেশি জার্মান বাস্তুহারা হয়ে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকে প্রতিশোধের জন্য এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য লালায়িত। কিন্তু কোন জার্মানই চায় না যে, জার্মানভূমিতে আবার যুদ্ধ হোক। অথচ যুদ্ধ লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জার্মানভূমি রণাঙ্গনে পরিণত হবে এবং প্রথম ধাক্কায় হয়ত রাশিয়া সমস্ত জার্মানী দখল করে ফেলবে। এ অবস্থা জার্মানরা কিছুতেই চাইতে পারে না। সেজন্য যারা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে অস্ত্রধারণ করতে চায়, তারাও বলছে যে, রাশিয়ার প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার মত সৈন্য-সামন্ত যদি ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী প্রভৃতিরা আগে জার্মানীতে মজুত না করে, তবে জার্মানরা এ ব্যাপারে এগুতে পারে না।

এই কারণ ছাড়া তার আরও কারণ আছে। সমরসজ্জার দিকে গেলে জার্মানীর জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অতি ধীরে ধীরে যে উন্নতিটুকু হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোকেরা আবার সর্বময় কর্তা হয়ে উঠবে। আর একটা ভয়ও আছে যেটা জার্মাণ জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। পূর্ব-জার্মাণী এখন রাশিয়ার আওতায়। পশ্চিম জার্মানী রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিনের আওতায়। জার্মান জাতি আজ বিচ্ছিন্ন, জার্মান ভূমি বিভক্ত, তবুও জার্মানদের এখনও চরম ভ্রাতৃবিরোধের হলাহল পান করতে হয়নি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী যদি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে এবং যুদ্ধ লেগে যায় তবে পূর্ব-জার্মানীর জার্মানদেরও রাশিয়া স্বপক্ষে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করবে, তখন জার্মান জার্মানকে মারবে। জার্মানীর পক্ষে সেই হবে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ।

এই সমস্ত কারণে জার্মান-জনমত মার্কিন আহ্বানে সায় দিতে চাচ্ছে না। ইতিমধ্যে পশ্চিম য়ুরোপকে "সাহস" দেবার জন্য আমেরিকা থেকে নূতন স্থল সৈন্য জার্মানীতে আনা হচ্ছে। বৃটেন থেকেও নূতন সৈন্য আনা হচ্ছে। রাশিয়ার শিল্প কেন্দ্রগুলিকে যেখান থেকে আক্রমণ করা যেত এরকম একসার বিমান-ঘাটি আমেরিকা এখন থেকেই নিজের হাতে রাখার ব্যবস্থা করছে। বৃটেনে তো আমেরিকার বিমানঘাটি আছেই। মরক্কোতেও ফরাসীরা আমেরিকাকে সামরিক বিমানঘাটি বসাতে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে খাস ফ্রান্সেও খাস মার্কিন বিমানঘাটি হচ্ছে। এছাড়া লিবিয়া, সাইপ্রাস, মাল্টা, জর্ডন, ইরাক এবং সাউদি আরবেও মার্কিন বিমানঘাটি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে, অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে নানাদিক থেকে রাশিয়ার ভিতরে বোমারু আক্রমণ চালানো যায় তার প্রস্তুতি হচ্ছে।

২৮।২।৫১

নিদারুন অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

মা সরস্বতী ও ছেলেদের মতিগতি

বুড়ো হলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে এই এতদিনের ধারণা ছিল, কিন্তু বর্তমান জগৎ যেভাবে চলেছে, তাতে ক্রমশঃ আমাদের হামাগুড়ি দেবার অবস্থা হয়ে এল দেখতে পাচ্ছি। চতুর্দিকের ধাক্কা ও ধোঁকার ফলে বুড়োখোকা বনে বসে থাকা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না। সংসারটা কোন্ দিকে চলেছে, তার দিঙ্‌নির্ণয় করতে গিয়ে দিগ্বিদিক হারা হয়ে এতখানি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ফেলছি যে, অভিজ্ঞতা জিনিসটারই আর কারুর কাছে দাম থাকছে না। কে যে কী, তা বোঝা এত শক্ত যে, চুপ করে সোজা বোকার মত চেয়ে থাকা ছাড়া আর আমাদের করণীয় কিছু নেই।

এই জন্যে পারতপক্ষে আমি একালের লোকেদের বিষয় নিয়ে মশাই, মাথা ঘামাতে চাই না, কিন্তু না ঘামিয়েই বা করি কি বলুন? পারিপার্শ্বিক ঘটনায় যে মাথায় বাড়ি মেরে মনটাকে সেই দিকে সজাগ করে তোলে। এই ধরুন না, হালে যে মা সরস্বতীর পুজো গেল, তাতে আমায় কি কেউ রেহাই দিলে? এক একটি মোচ্ছব আসবে আর চতুর্দিক থেকে আমার কচ্ছাটি ধরে (পুচ্ছটি ভগবান বহুদিন পূর্বেই খসিয়ে ফেলেছেন তাই রক্ষে) টান লাগালে, কোন্ দিক সামলে সুমলে চলা যায়?

একান্নবর্তী পরিবারে আমার বাস, অতএব সর্বসাকুল্যে একষট্টিজন ছেলেমেয়ে বাড়ীতে, একেবারে যাকে বলে চাঁদ সূর্যির হাট বসিয়ে রেখেছেন। পড়াশুনো মা বিদ্যেধরীর গর্ভে সঁপে দিয়েছেন বহুকাল, কিন্তু বিদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আহ্বানে ত্রুটি নেই। নিজেরা একটা কিছু উপায় করে করুক, তা বয়ে যাচ্ছে সব তুমি কর, তুমি টাকা দাও! আমরা শুধু তোমার পয়সায় হৈ হৈ করি আর ইয়ার্কি মারি! মানে এরা আমায় অতিষ্ঠ করে মারলে! কিছু বলুন দেখি, আপনাকেই ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেবে। আমাকে তো ধোপার পাটের মত নিত্যি আছাড় দিচ্ছে!

সেজ-কর্তার ছেলে, ভুঁটেটা একটা একের নম্বরের শয়তান! যেখানে গোলমাল, দেখবেন ভুঁটে সেখানে সর্বাগ্রে হাজির।

কতদিন বলেছি, ভুঁটে, ওসব করিস নি, আগে ম্যাট্রিকটা দিয়ে তারপর যা-খুশী কর! —বয়ে যাচ্ছে! সে আমার পেছনেই পাড়ার ছেলেগুলোকে লেলিয়ে দিলে। সকাল থেকে একত্রিশটি সরস্বতী পুজোর চাঁদার খাতা এসে হাজির।

নীচের থেকে কড়া নাড়তেই যেমনি জিজ্ঞেস করি, কে? অমনি শুনি সুধাকণ্ঠের চীৎকার, সরস্বতী পুজোর চাঁদাটা দেবেন?

তাও কি দু'-চার আনা দিলে হবে? মোটেই না। আপনি ভুঁটেদার জেটু —অতএব নিদেন এক টাকা দিতেই হবে! দর-কষাকষি করেও আট আনার কম নিলে না। এই করে পনেরো ষোল টাকা খামকা বেরিয়ে গেল।

এরপর ইস্কুল আছে, আপিস আছে, মুদিখানার দোকান আছে, সেগুলো তো বাঁধা! আমাদের পাড়ায় আবার চুল-ছাঁটায়ের দোকানে পর্যন্ত পুজো। হাজার হোক আর্টের ব্যাপার



পুজোর চাঁদার খাতা এসে হাজির

তো, সেই বা ছাড়বে কেন? অতএব বীণা-বাদিনীর ঝংকারে আমাদের মত গেরস্তর কণ্ঠে কাংস-ক্রেঙ্কার ধ্বনি ওঠবার অবস্থা হল! দলে দলে মা আসতে শুরু করলেন।

মনে করুন কুমোররা রং-বেরংয়ের ঠাকুর গড়েও আর হালে পানি পেলে না, ক্রেতার বহর দেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো যে, সারা বছর ধরে আরও ঠাকুর না গড়ে কি ভুলই করেছে!

স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের বাক্‌শক্তি যেমন অসম্ভব বেড়েছে তেমনি বাগ্দেবীর পুজোও সর্বত্র শুরু হয়েছে। কিচ্ছু বলবার জো নেই—নির্বাক হয়ে থাকা ভাল, নচেৎ এ দেশ থেকে চলে যাও! তাই চুপ মেরে জড়-ভরতের মত বসে আছি আর পৃথিবীশুদ্ধ লোক কানের কাছে বকছেন। বকা এবং বখামি এত বেড়েছে যে, বীণাবাদিনীর পুজো ছেড়ে গদাঘাতিনীর পুজোর প্রচলন না হলে আর কাউকে শায়েস্তা করা যাবে না। সে পুজো শুরু হলে আমি তো সর্বাগ্রে আনা বারো চাঁদা দিয়ে আসবো।

তারপর নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছিলেন? তার কী ভাব, কী কবিত্ব! আসবেন সকালে নিতে অঞ্জলি, সন্ধ্যেয় আসবেন দেবীর অঙ্গনে রিণিঝিনি ঝঙ্কারের তান শুনতে। একেবারে জান ঠান্ডা করে দিলে। এর ওপর আনবেন টা— সেটা অবশ্য উহ্য—কিছু দক্ষিণে!

মশাই দক্ষিণে দিয়েও কি রেহাই আছে? কোথা থেকে সব ভাড়া করা লজ্‌ঝোড় এমপ্লি-ফায়ার নিয়ে এল তিনদিন ধরে এক মিনিট কামাই নেই। বাজিয়েদের বিরাম নেই, বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই—অবিরত চলছেই। তার আবার যেমনি আওয়াজ তেমনি সুর——একে-বারে যমের দক্ষিণদ্বার দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা।

মনে করুন, বাড়ীতে একটা রেডিও থাকলেই কি অবস্থা—তার একটু খুঁৎ বেরুলে লোকে দুাৎ দুাৎ করে গাল দিতে থাকে, আর সেই জায়গায় একুশটা এমপ্লিফায়ার যদি একত্রিশটা সুরে সজোরে হরদম কানের কাছে বাজতে থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচে কি করে বলতে পারেন? মানে, একজন গায়কের গান চাপালে মনে হয় অন্তত জনা-দশেক কোরাস সুরু করেছে, একটি যন্ত্রীর যন্ত্র বাজলে মনে হচ্ছে কনসার্ট শুরু হল, ভারতীয় সিমফনির রূপ যে কেমন হতে পারে, তার একটা পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যেতে লাগলো। অটো-মেটিক কম্পোজিশন একেই বলে। এই গান আবার ফিরে ফিরতি প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর শুনছেন, কারণ রেকর্ড তো সবে পাঁচ-খানি— অতএব তাই শোন!

কিন্তু এদিকে আসল দেবীর পুজোর জোগাড় কিছু নেই, অঞ্জলি দিতে এসেছে একপাল পুঁচকের দল, বড়রা প্রাতঃকাল থেকে চায়ের ভাঁটিতে ঢুকেছেন। খরচের খাতা দেখুন—৮০্ এমপ্লিফায়ার ভাড়া, প্রতিমা ১০৫্, চাঁদোয়া ও চেয়ার ৫৫্, রান্না ও চা খরচ ৩৫্, বাজী বা বোমা তৈরীর খরচ ২৭্, প্রতিমা নিরঞ্জনের লরী ৪৪্, ভোগ-রাগাদি ও পুরুত মশায়ের দক্ষিণা বাবদ ৭৷৵৫, তাও সে ভোগ যোগবলে উড়ে যায়, আর যদি বা কিছু পাওয়া যায়, তার মধ্যে থাকে ভিটামিনযুক্ত দুটি ছোলা বা মাসকড়াই, এক কুচি শশা আর এক পয়সা সাইজের কাঁটালি কলার চাকতি—তাও কর্মকর্তাদের সঙ্গে যদি ভালবাসা থাকে তবে পাওয়া যায়।

ভুঁটে একটা মাতব্বর, অতএব তার ভাগে বেশ মোটা কিছু চাই। সে নৈবিদ্য সাজাবার আগেই তিন কুড়ি নারকেল কুল নিয়ে বাড়ী

চুকলো—ওর মধ্যে বোধ হয় কাউকে ভাগ দেবার কথা ছিল, দেয় নি; তাই নিয়ে বাড়ীর দরজার সামনে কী হাঙ্গামা! ছোঁড়ারা আমাকে পর্যন্ত গাল দিতে শুরু করলে—দরজার সামনে দিয়েও সুখ হল না, একটা মাইক্রোফোন যোগাড় করে কুলের কলঙ্ক প্রচার আরম্ভ হল। মাসখানেক পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না হতভাগাটার জন্যে। এক ভূঁটেই আমাকে ঘুঁটে বানালে ভাবছেন বুঝি? না—ইনি ছাড়াও মনে করুন, আরও একুশটি মাল বাড়িতে মজুত আছে।

মেজ-বাবুর ন' ছেলে, ভট্‌ভটেটো ভ্যারাইটি করতে বাক্স থেকে পঁচিশটি টাকা গাপ্ করলেন! তিনি মোড়ের মাথায় এক পুজোর ভ্যারাইটি ডিরেক্টর। পাড়ার গাইয়ে বাজিয়ে নিয়ে মন উঠলো না, বে-পাড়ার সেই চিরপুরাতন কয়েকটিকে আনতে হবে—অতএব পয়সা চাই, তা না হলে তারাই বা আসবে কেন? কিন্তু পয়সা কৈ?—অতএব আমার তবিল ভাঙো!

টের পেলুম ভাসানের দিনে, বকবো কি? সন্ধ্যেবেলায় তিনি কোথায় বোমা ছুঁড়তে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুলটি খুইয়ে বাড়ীতে এসে শয্যা নিলেন। আচ্ছা, এ সব ছেলে নিয়ে কি করবো বলতে পারেন? চিরকাল আমরা কালীপুজোর সময়ই ফুলঝুরি আর লাল দেশলাই ছাড়া অন্য কোন বাজীতে হাত দিইনি, আর আজকাল সব-পুজোয় এই ব্যবস্থা হয়ে গেল? বোমা, দো-দমা না ছাড়লে ভাসান হবে না! আমাদের এ মুশকিলের আসান কবে হবে তা তো জানি না!

তারপর দেবীর প্রতি কী ভক্তি! প্রথমত চিরকাল প্রথামত ঠাকুর ভাসান পুজোর পরদিনই হয়। ন'-কর্তার মেজ ছেলে নাকুদের আবার ঠাকুর গেলেন পাঁচদিন কাটিয়ে। তা না হলে নতুনত্ব হল কৈ? তাও ভদ্রলোকের মত যা—তা নয়, দলবল নিয়ে কী স্ফূর্তি! কখনও বলছে, বল হরি হরিবোল, কখনও পতিত-পাবন সীতারাম, কখনও জয় হিন্দ্, কখনও বা ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, সে বুলি কত! মানে, বাঁদরামির চূড়ান্ত যাকে বলে। আবার দেবীকে লরীতে তুলে কী শ্রদ্ধা প্রকাশ! দেখো মাসী,



এ্যাম্‌প্লিফায়ারের অত্যাচার

পাশটিতে বসছি কিছু মনে করো না যেন!—আচ্ছা, এ সব কি?

অনেক অভিজ্ঞতা জীবনে হয়েছে বাবা, কিন্তু ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এরকম চ্যাংড়ামো আমি তো আগে কখনও দেখিনি। যদি বলেন, তুমি বল না কেন? আচ্ছা, কি বলবো? বললে পার আছে? আমাকেই বলহরি হরিবোল করে জীয়ন্তে ভাসান দিয়ে আসবে। ন'-বাবুকে তবু বললুম, ছেলেটা যে একেবারে গেল, তিনি তার উত্তরে উল্টে রাগ ক'রে বললেন, তোমার যেমন কথা, ছেলেপুলেরা একটু পুজোর আমোদ করবে না? শুনুন! মা সরস্বতীকে নিয়ে যদি এই রকম আমোদ শুরু হয়, তাহলে দুদিন পরে তো এরা বাপ-দাদাদের নিয়ে আলিবাবার নাচ শুরু করে দেবে!

দেবে কি বলছি দিচ্ছেও! আপনাদের ভাগ্য ভাল তাই এ সব হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না, কিন্তু আমি গেলাম একপাল বাঁদরকে নিয়ে। পড়ার কথা বলুন—পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ফুটবল, ক্রিকেট সিনেমার বিষয় আলোচনা করুন, মনে হবে জীয়ন্ত অমরকোষের সঙ্গে কথা কইছি। সব মুখস্থ! ভাল বক্তৃতা হোক, সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে পালাবে। দৈহিক পরিশ্রম করতে বলুন, সেটা বুড়োদের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বে। পাঁচটা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে বলুন, প্রলাপ বকবে নয় তাঁর পেছনে এমন টিট্‌কিরি কাটতে শুরু করবে যে, তাঁদের তখন ভূলোক ছেড়ে গোলোকে পালাবার বাসনা জাগবে বাজারে যেতে বলুন রেগে খাপ্পা হয়ে উঠবে, সিনেমার টিকিট কিনতে দিন কিম্বা ফুটবল মাঠে পাঠান, সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত ঠিক এক-ঠ্যাংয়ে ব্যালেন্স রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি যদি এর বিরুদ্ধে কথা বলি—তাহলেই লোক খারাপ, খিটখিটে বিংশ শতাব্দীর স্থাণু জড় সেকেলে পৃথিবী যে বদলে যাচ্ছে তার খবর রাখিনা। সকালবেলা আপিস যাই, বাজার করি আর সন্ধ্যেবেলায় ঘুট্‌-ঘুট্‌ করে বাড়ি ফিরে আসি এই তো আমার কর্ম, অতএব আধুনিকতার মর্ম আমি কি বুঝি?

স্বীকার করছি বাবা, আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু দাঁড়াও, আগে সরি—তারপর সংসারের মর্ম বুঝতে তোমরা শুধু গলদঘর্ম হবে না, চর্ম ফেটে ধর্মতলার মোড়ে শুধু লোকের পকেট মারার কাজ ছাড়া আর কাজ পাবে না—এই বলে গেলুম, হ্যাঁ!

অকাল বৃষ্টি

শঙ্খ ঘোষ

মনে পড়ে এই ঘনবর্ষার সহজ কথা
তোমার চোখের মদির-রিক্ত দৃষ্টিতেই
ধরা পড়ে গেছে অর্ধেক, আর অর্ধনাভা
কবরী তোমার দোদুল্যমান প্রতীক্ষায়
আকাশে মেঘের দেহসঞ্চারে খুঁজছে যেই!

সূঁচ-বৃষ্টির ধারা নেমে মন বিহঙ্গম—
বাইরে আকাশ পাণ্ডু ব্যর্থ-রিরংসায়,
প্রসুপ্তা দেহবল্লরী জেগে মেঘঙ্গম
তোমার.—দুয়ারে তোমার শরীর বিন্ধ্যাচল,
আমার শান্তিসড়ক হেনেছো পুষ্পশরে!

মনে পড়ে এই অকালবৃষ্টি কাকলী দল
হৃদয়ের প্রেম নিঙড়ে দুহাতে বজ্রথরে
গাণ্ডীব বেঁধে,—দুহাতে স্বপ্ন হৃদয়ে টানি,
লুব্ধ কামনা চেয়েছে যা সে কি বজ্রপাণি?
পদচঞ্চলা অপ্সরীপণা কটাক্ষের

অন্তরায়িত সুধাভাণ্ডার সব অসাড়?
চোখে হিম নেই, প্রস্তরীভূত কামনাঘের—
স্থবির প্রেয়সী, অনির্বাচ্য মনক্ষেপণ
এখানেও কোরো মাঝে মাঝে এই পুরস্কার,
ঘনবর্ষায় হৃদয় আমার দুঃশাসন!

আঁদ্রে জিদ্

গোপাল ভৌমিক

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও চিন্তা-নায়ক আঁদ্রে জিদ্ গত ২০শে ফেব্রুয়ারী প্যারী শহরে স্বগৃহে লোকান্তরিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮১ বৎসর। সাধারণ মানুষের আয়ুর পরিমাপে একে পরিণত বয়েস বলা চলে এবং বিশ্বের চিন্তাভাণ্ডারে যা দান তাঁর করবার ছিল তাও তিনি নিঃশেষে করে গেছেন। সুতরাং সেদিক থেকে তাঁর মৃত্যুতে বিশেষ অনুশোচনা করার মত কিছু নেই। দীর্ঘ ষাট বৎসরের সাহিত্যিক-জীবনে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও হবে প্রায় সম-সংখ্যক। কত বিচিত্র ধরণের সে সব গ্রন্থ—উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা, দিনলিপি ও অনুবাদ। সেই সব বই-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে আঁদ্রে জিদের বিরাট মনের অতুল ঐশ্বর্য ভাবীকালের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। কিন্তু আঁদ্রে জিদের এ মৃত্যু ফ্রান্সের জাতীয়-জীবনে আর একটি কারণে খুব বেশী স্মরণীয় —তাঁর মৃত্যু ফ্রান্সের সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগাবসানের দ্যোতক। এ যুগের সূচনা হয়েছিল তাঁর জন্মলগ্নে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে। তার এক বৎসর পরে ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের জাতীয়-জীবনে তৃতীয় রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হয় আর এই তৃতীয় রিপাব্লিকের অবসান ঘটে ১৯৪০ সালে হিটলারের দুর্জয় আক্রমণে ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্যয়ে। এই ৭০ বৎসরকাল আরও অনেক রাষ্ট্রিক উন্নতি ও অবনতি, অর্থনৈতিক সুদিন ও দুর্দিন ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। আবার যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপে তার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ফিরে পাবার জন্যে ফ্রান্স যে আপ্রাণ প্রয়াস করছে তারও ছবি আমরা দেখছি চোখের উপর। আঁদ্রে জিদ্ এই সুদীর্ঘ কালের গড়াভাঙা ও ভাঙা-গড়ার দৃশ্য নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ও স্বজাতির পুনরুজ্জীবনের দৃশ্য নিজ চোখে দেখে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছেন—এই আমার বিশ্বাস। তবু আঁদ্রে জিদ্‌কে এই সংকীর্ণ স্বদেশপ্রেমিকরূপে দেখলে তাঁর উপর অবিচার করা হয় বলেই আমার ধারণা। তাঁর স্বদেশবাসী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যাদর্শের গভীর বিরোধ থাকলেও তিনি ছিলেন রোলাঁর মতই বিশ্ব-মানব-প্রেমিক। বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মনুষ্য-সমাজের আত্মাহুতির যে করুণ দৃশ্য তাঁকে দেখতে হয়েছিল তার দুরপণেয় স্মৃতি নিয়ে রোলাঁর মত মৃত্যু তাঁকে বরণ করতে হয় নি। তিনি দেখে গেছেন যে নরমেধ যজ্ঞের অগ্নি-কুণ্ডের মধ্য থেকেই ফিনিক্সের মত নব কলেবর নিয়ে জেগে উঠছে নতুন মানুষ—চোখে তাদের আগের দিনের মতই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মানুষের অধিকার নিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ষাট বৎসকাল যিনি দুর্জয় সংগ্রাম ক'রে গেছেন তাঁর পক্ষে এ কম সান্ত্বনার কথা নয়।

সমসাময়িক যুগ

আঁদ্রে জিদ্ যে যুগের মানুষ ফরাসী সাহিত্যের সেটি অতি গৌরবময় যুগ। ঐতি-হাসিক দিক থেকে সে যুগের উল্লেখ আগেই করেছি। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফ্রান্সকে শিল্পসাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন এবং বিরাট সাহিত্যশিল্পের ঐতিহ্য আছে বলেই যে ফ্রান্স স্মরণীয় তা নয়—ফ্রান্সের শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়তে বড় একটা দেখা যায় না। ফ্রান্সের জাতীয়-জীবনের উপর দিয়ে যত ঝড়ঝঞ্ঝাই বয়ে যাক না কেন ফরাসী মনীষা কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে না। গত ৮০ বৎসরের ফ্রান্সের সাহিত্যিক প্রয়াস আলোচনা করলে এ সত্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এমন যে দুর্ধর্ষ হিটলারী শাসন সে আমলেও ফ্রান্সে সাহিত্য-সৃষ্টি ছিল অব্যাহত। ভিসি ফ্রান্সের আমলে যে বিরাট প্রতিরোধ সাহিত্য ফ্রান্সে গড়ে উঠেছিল তার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। হিটলারী শাসনের দুর্ভোগ শেষ বয়সে জিদের ব্যক্তিগত জীবনকেও কম বিপন্ন করে তোলে নি। ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্যয়ের কিছুকাল পরে তিনি কোনরকমে ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে একাধিক-বারের ভ্রমণের ফলে এ অঞ্চল ছিল তাঁর কাছে সুপরিচিত এবং তিনি এ অঞ্চলকে ভালও বাসতেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন এবং যুদ্ধ শেষে আবার তিনি



ফিরে এসেছিলেন স্বদেশে তাঁর সংগ্রামী জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে। যাক, যে কথা বলছিলাম। আঁদ্রে জিদ্‌ যে যুগের মানষ সে যুগে ফ্রান্সে সাহিত্যরথী ও মহারথীর অভাব ছিল না। চিন্তাধারার মৌলিকত্ব, রচনা-শৈলীর বিশেষত্ব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি এর কোনটিতেই তাঁরা কেউ কারও চেয়ে কম যান না। আঁদ্রে জিদের চেয়ে বয়সে যারা বড় তাঁদের মধ্যে আমরা পাই আঁরি বার্গ্‌সঁ'র মত দার্শনিক, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বার্‌বুসে, পীয়েরে লোতি এবং এমিলি জোলার মত ঔপন্যাসিক। তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে আমরা পাই মার্সেল্‌ প্রুস্ত্‌-এর মত ঔপন্যাসিক, পল ভ্যালেরির মত কবি ও রোস্তাঁদের মত নাট্যকারকে। আঁদ্রে জিদের পরে যাঁরা ফ্রান্সের সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিশ্ব-প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন—উদাহরণস্বরূপ জুলে রোমাঁ, জাঁ-পল্‌ সার্ত্রার, লুই আরাগঁ প্রমুখ লেখকদের নাম করতে পারি। ফ্রান্সের এই প্রাণচঞ্চল সৃষ্টিমুখর সাহিত্যের ক্ষেত্রে আঁদ্রে জিদ্‌ শুধু যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান পেয়েছিলেন তা নয়—তিনি তাঁর সমকালবর্তী ফ্রান্সের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেও পরিগণিত হয়েছিলেন। নিছক নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা সাহিত্যশিল্পের বিচার করেন তাঁদের কেউ কেউ কিন্তু আঁদ্রে জিদ্‌কে এ সম্মান দিতে সম্মত নন। তার কারণও সহজেই বোঝা যায়। আঁদ্রে জিদের বৈপ্লবিক ভাবধারাই তাঁদের এ বিরূপতার জন্যে দায়ী। এখানে আমি বৈপ্লবিক ভাবধারা কথাটি রাজনৈতিক অর্থে প্রয়োগ করি নি। সে অর্থে আঁদ্রে জিদ্‌কে বৈপ্লবিক বলা শক্ত। তাঁর জীবনের প্রথম ৫০ বৎসরের সাহিত্যে রাজনীতি নিয়ে বড় একটা নাড়া-চাড়া দেখাই যায় না। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন অনেকটা সমাহিত সাধকের মত—বিশুদ্ধ সাহিত্যশিল্পের উপাসক। রাজনৈতিক ভাবধারা তাঁর সাহিত্যশিল্পের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের ঘটনা। সে কথা পরে যথা-স্থানে আলোচিত হবে। আমি এখানে বৈপ্লবিক ভাবধারা বলতে মানব-জীবন ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে মূলগত ভাবধারার বৈপ্লবিকত্ব বোঝানোরই প্রয়াস পেয়েছি। অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল আঁদ্রে জিদের মজ্জায় মজ্জায়। প্রচলিত কোন কিছুকেই তিনি সমালোচনার নিক্তিতে ওজন না করে গ্রহণ করেন নি। অপরদিকে প্রচলিত মতবাদে যা হয়তো অপাংক্তেয় তাকেই তিনি করেছেন তাঁর সাহিত্যের বিষয়ীভূত। তাই প্রচলিতে বিশ্বাসী সমালোচকদের খড়্গ তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় সর্বদাই [illegible]। কেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে বিশেষ করে তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীকে কেউ নিন্দা করে ছোট করতে পারে নি।

সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্‌

১৮৯০ সাল থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আঁদ্রে জিদের সাহিত্য সাধনার বিরাম ছিল না। এরূপ নিরলস সাহিত্যচর্চা করতে বিশ্বের খুব কম লেখককেই দেখা যায়। সামান্য একটি প্রবন্ধে তাঁর মহাজীবনের এই বিরাট সাহিত্যসঞ্চয়ের মূল্য নিরূপণ করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁর সাহিত্যের গভীরতা যেমন বেশী তেমনই তার ব্যাপকতাও বিস্ময়কর। খবরের কাগজে সাধারণ প্রবন্ধ রচনা থেকে শুরু করে বহু উপন্যাসনাটক তিনি রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধগুলিও ফরাসী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। রুশ ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভ্‌স্কি ও ইংরেজ নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ডের উপরও জিদের দুখানি চমৎকার বই আছে। অনুবাদ সাহিত্যের দিকেও তাঁর ঝোঁক বড় একটা কম ছিল না এবং আমরা ভারতবাসীরা এদিক থেকে তাঁর কাছে ঋণীও বড় একটা কম নই। ইউরোপে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচিতি সাধনে পরলোকগত আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের মত আঁদ্রে জিদেরও অপরিসীম দান ছিল। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং সেই বৎসরই আঁদ্রে জিদ্‌ তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'ডাক ঘরে'রও তিনি ফরাসী অনুবাদ করেন। এ ছাড়া আরও যাঁদের গ্রন্থাদি তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ঔপন্যাসিক জোসেফ কন্‌র‍্যাড্‌, কবি উইলিয়াম ব্লেক ও ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান এবং রুশ ঔপন্যাসিক পুশকিন্‌। সেক্সপীয়রের দুখানি নাটকেরও ফরাসী অনুবাদ তিনি করে-ছিলেন। 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রো' নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে আর 'হ্যামলেট' নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে।

ফরাসী ভাষায় আঁদ্রে জিদের সাহিত্য পড়বার সুযোগ না পেলে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অনেকটা দুঃসাধ্য। তার একাধিক কারণ বর্তমান। প্রথম কারণ ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রতিনিধি-মূলক সকল রচনার নির্ভরযোগ্য অনুবাদ আজও হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, ভাষান্তরিত আঁদ্রে জিদ্‌ পড়ে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পুরোপুরি পরিচয়ও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তাঁকে অনেকটা বার্নাড্‌ শ'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টপূর্ণ রচনাশৈলী হল তাঁদের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ বাদ দিলে আঁদ্রে জিদের সাহিত্যের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। জনপ্রিয় লেখক যাকে বলে আঁদ্রে জিদ্‌ তা কোন দিনই ছিলেন না এবং সেরূপ জনপ্রিয় লেখক হবার মত আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। এ বিষয়ে মার্সেল, প্রুস্ত্‌, পল ভ্যালেরি ও আঁদ্রে জিদের মধ্যে অদ্ভুত মিল ছিল। পল ভ্যালেরি অবশ্য জীবনের শেষ দিকে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পূর্বে তিনিই ছিলেন ফ্রান্সের রাজকবি। ১৯৪৪ সালে তাঁর এই কবি-বন্ধুর মৃত্যুর পর ভ্যালেরির উপর আঁদ্রে জিদ্‌ একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রাজকীয় সমারোহে পল ভ্যালেরির শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল বলে জিদ্‌ বলেছিলেন যে, ভ্যালেরির পক্ষে এ-স্বীকৃতি রীতিমত বিস্ময়কর, কেননা, তাঁর কাব্যসৃষ্টির যে মূল্য সেটা সহজে জনমানসের কাছে আবেদন জানায় না। বাহিরের সতত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ভ্যালেরির আন্তরিক যোগ বড় একটা ছিল না—একটা চিরন্তন শাশ্বত ভিত্তির উপরই তিনি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করে গেছেন। এ উক্তি আঁদ্রে জিদের নিজের সাহিত্যসম্বন্ধেও খুব বেশী করে খাটে।

এইখানে আঁদ্রে জিদের সাহিত্যসৃষ্টির একটা বড় প্রশ্নে আসতে হয়। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি হল মূলতঃ মননধর্মী। মানুষের মনের অতলে মণিমুক্তার মত যে সব ভাবরাজি লুকিয়ে আছে তাই নিয়ে ডুবুরির মত কারবার করেছেন তিনি। যুগোপযোগী ভাবধারার ঢেউ-এ তালে তালে নেচে নিজের সাহিত্য-সৃষ্টিকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও সহজ-লভ্য পণ্যে পরিণত হতে দেন নি। তাই স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি অনেক বিলম্বে। তিনি নোবেল প্রাইজ পান ১৯৪৭ সালে মৃত্যুর মাত্র ৩ বৎসর আগে—তখন তাঁর বয়েস ৭৮ বৎসর। ঐ বৎসরই কয়েক মাস আগে তিনি বিশেষভাবে আহূত হয়ে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইস্‌ মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি লিট্‌ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই বোধ হয় তাঁর প্রথম সম্মানলাভ। কিন্তু সম্মানের লোভ বা নিন্দার ভীতি কিছুই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে একাগ্র সাহিত্য সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। অকৃত্রিমতা, নিষ্ঠা, নীতিবোধ, চিন্তার মৌলিকত্ব ও রচনাশৈলীর বিদগ্ধতা আঁদ্রে জিদ্‌কে বিশ্বের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতেও তাঁকে এ সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়।

আঁদ্রে জিদের উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বাদ-

প্রতিবাদের অন্ত নেই। অনেকেই বলেন যে, তাঁর উপন্যাস সহজপাঠ্য ও সুখপাঠ্য নয়। কথাটার মধ্যে আংশিক সত্য নেই এমনও নয়। এর কারণও অত্যন্ত সোজা। মানুষের মনের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী নিয়ে যে সব উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাদের মধ্যে গল্পাংশ দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেকে বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শনও খুঁজে পান না। একটি উপন্যাসে তিনি হয়তো যা বলতে চেয়েছেন তার পরবর্তী উপন্যাসে তিনি বলেছেন ঠিক তার বিপরীত কথা। জীবন-শিল্পী সম্বন্ধে আঁদ্রে জিদের নিজস্ব যে ধারণা তার কথা যদি আমরা মনে রাখি তবে এর মধ্যে আর বিস্ময়ের কিছু থাকে না। তিনি সংশয়বাদ দিয়ে জীবনারম্ভ করেছিলেন এবং এই সংশয়বাদকে তিনি সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য বলেও মনে করেন। তাঁর কবি-বন্ধু পল ভ্যালেরির ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে জিদ্ এক স্থানে বলেছেন যে, তাঁর শোবার ঘরের দেয়ালে একটি গ্রীকভাষায় লেখা বাণী লাগানো ছিল যার অর্থ হল, 'কখনও অবিশ্বাস করায় বিরত হয়ো না।' আঁদ্রে জিদেরও জীবন-বাণী ছিল অনেকটা অনুরূপ ধরণের। শিল্পীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "বড় শিল্পী 'প্রতিবাদী' হতে বাধ্য এবং তাঁকে যুগের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে যেতেই হবে।" তা নইলে শিল্পের অপমৃত্যু অবধারিত—এই হল জিদের আন্তরিক ধারণা। এই ধারণাকে তিনি বাস্তবেও রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস-গুলিতে দেখা যায় যে, সেগুলি অনেকটা আত্ম-কেন্দ্রিক। কোন না কোন রূপে তিনি নিজেই সেগুলির প্রধান পুরুষ। অনেক সমালোচকের মতে তাই সেগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও প্রাণ-ময়তার অভাব। কিন্তু তাই বলে তাঁরা একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে আঁদ্রে জিদের অনবদ্য রচনাশৈলীর জন্যে এগুলি পরম উপভোগ্য। 'অহং'-ভাবের আধিক্য আঁদ্রে জিদের প্রথম জীবনের রচনাগুলির পরম বৈশিষ্ট্য হলেও একথা মানতেই হবে যে সেই 'অহং'-এর মাধ্যমে তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক খাঁটি সত্য বিশ্ববাসীদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর এই 'অহং' যে চারদিকের বিধিনিষেধের বেড়াজালে প্রপীড়িত বিশ্ব-মানবতারই প্রতীক। মানবমনের যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব তাকে চেপে রেখে আঁদ্রে জিদ্ মিথ্যা আত্মসন্তুষ্টির ভাণ করেন নি কখনও। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন: "আমি নিজের মনের সব বিরোধকেই অবাধে বিচরণ করতে দেই।" তাই তার অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি বহুলাংশে আত্মরতিপরায়ণ হলেও সেই আত্মরতিতেই তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। মানব মনের অন্তর্গূঢ় সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সে-গুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন পূর্ণ করেছে তেমনি রসের সঞ্চয়েও মানুষের মনকে করে তুলেছে অভিষিক্ত। তাই শিল্পী আঁদ্রে জিদ্ শুধু আজকের মানুষেরই নমস্য নন, ভাবীকালের মানুষও তাঁর জন্যে অগণিত নমস্কার সঞ্চিত করে রাখবে।

সকল দিক থেকে বিচার করলে আঁদ্রে জিদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলতে হয় তাঁর 'জার্নাল' নামক দিনলিপিকে। এই "জার্নালে" আমরা তাঁকে দেখতে পাই অনবদ্য স্রষ্টারূপে—প্রাচীনকালের মানব শিক্ষক নীতিবাদীদেরই মত সদূরপ্রসারী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আর অপূর্ব তাঁর লিখনভঙ্গী। যেমনি চিন্তাধারার বলিষ্ঠতা, তেমনই প্রকাশভঙ্গীর অকুণ্ঠতা ও ঋজুতা। মন অমনই সবিস্ময়ে সাড়া দিয়ে বলে যে, মানুষ এমন করে দুনিয়া ও জীবনকে দেখেছেন, ভাল মন্দ নির্বিশেষে তার সব কিছুকে ভালবাসতে পেরেছেন, তিনি কখনও সাধারণ মনের অধিকারী নন—তিনি বিশ্বের সকল বড় বড় স্রষ্টার সমগোত্রীয়। তাঁর এই 'জার্নাল'গুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই জার্নালই তাঁর সব চেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ। এই সব 'জার্নালে' যে সব বিষয়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ হয় তার মধ্যে আছে কুভারভিলেস্থিত তাঁর স্বগৃহ, ভ্রমণ, পিয়ানো বাজানো, ফরাসী নাট্যকার র‍্যাসাইন, রুশ ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কি, সমকামিতা, নিজের স্ত্রীর কথা, বাইবেলের বাণী, শয়তানের কথা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পাস্কাল, স্বাস্থ্যের কথা, ইংল্যান্ডের ঔপন্যাসিক জোসেফ কনর‍্যাড্, লোভ, রচনা-শৈলীর সমস্যা, জীবজন্তু, ক্যাথলিক ধর্ম ও ছোট ছেলেমেয়েদের কথা। মোটামুটি এই বিষয়বস্তুগুলির দিকে তাকালেই জিদের মানসিক প্রবণতা ও তাঁর মনের সুদূরপ্রসারী উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জার্নাল'-গুলিতে তিনি তাঁর অপূর্ব ভঙ্গীতে আলো-চনা করেন নি আধুনিক জীবনের এমন কোন সমস্যা বড় একটা দেখা যায় না। এর থেকে তাঁর অন্তর্জীবনের যে অদ্ভুত ছন্দ তারও পরিচয় আমরা পাই। প্রতিনিয়ত তিনি দুলছেন—দুলছেন দ্বিধা ও বিশ্বাসের মধ্যে, শৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে, প্রাচীন পন্থা ও বিদ্রোহের মধ্যে, ভাবপ্রবণতা ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে। এই বর্ণবৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্য আঁদ্রে জিদের 'জার্নাল'কে করে তুলেছে পরম উপভোগ্য। লেখক হিসাবে তাঁর আর একটি বিশিষ্ট মৌলিকত্ব এই যে, তিনি মুহূর্তের জন্য নিজের মনের ভাবকে চেপে মারতে চান নি—মনে যখন অসদিচ্ছার উদ্ভব হয়েছে তাও যেমন তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনি সদিচ্ছার ভাবকেও তিনি সমান যত্নে ধরে রেখেছেন। স্বর্গরাজ্যে নরক এবং স্বর্গ পাশাপাশি দুটি বস্তুরই স্থান আছে—এই হল জিদের শিক্ষা এবং তিনি নিজে এ শিক্ষা পেয়েছেন বাই-বেলের কাছ থেকে যে, বাইবেল বলেছে যে, স্বর্গরাজ্য দূরে নয়—সে স্বর্গরাজ্য আছে প্রতিটি মানুষের মনে। তাই আঁদ্রে জিদ্ মনের কুভাবকে চেপে তার বিকৃত রূপ পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেন নি—অপরিসীম বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন মানব-মনের খাঁটি রূপ বিশ্ববাসীদের চোখের সামনে। সে রূপকে অস্বীকার করতে হলে আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য পথ নেই।

আঁদ্রে জিদ্ ও কম্যুনিজম

অনেকের ধারণা আছে যে, আঁদ্রে জিদ্ কম্যুনিজম-বিরোধী—বিশেষ করে তাঁকে প্রতি-ক্রিয়াশীল লেখক বলে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বহু ফতোয়া জারী করা হয়েছে। মূল কাহিনীটি এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা আমি আবশ্যক বলে মনে করি। আঁদ্রে জিদের লেখার মধ্যে কম্যুনিজমের প্রশংসা যেমন পাওয়া যায় তেমনই কম্যুনিজমের তীব্রতম নিন্দাও পাওয়া যায়। প্রধানত দুখানি বই-এর ভিত্তিতে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী বলে প্রচার করা হয়। তার একখানি হল ব্যাক্ ফ্রম দি ইউ. এস, এস, আর (১৯৩৭) ও অপরখানি হল আফটার থটস্:-এ সিকোয়েল (১৯৩৮)। এতক্ষণ পর্যন্ত আঁদ্রে জিদের সাহিত্য জীবনের যে পরিচয় দিয়েছি তার থেকে পাঠকপাঠিকারা হয়তো বুঝেছেন যে, তিনি ছিলেন মূলতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক—যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলাঁ কিংবা টলস্টয়। এদিক থেকে ব্যক্তিগত জীবনেও জিদ্‌কে কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়-নি। অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে জন্মেছিলেন বলে সাহিত্য ছাড়া জীবিকার জন্যে অন্য কোন পেশা তাঁকে কোনদিন করতে হয় নি। পরের তাঁবেদারী করতে হয়নি বলেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচিত্ত, মোহমুক্ত পুরুষ। তাই আশে-পাশে যেখানে অন্যায় অত্যাচার তিনি দেখেছেন সেখানেই তিনি কঠোর হস্তে চালিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের চাবুক। ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, নিজের দেশ, পরের দেশ কাউকে তিনি রেহাই দেননি। ১৯২০ সালের পরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আত্ম-রতিপরায়ণ আঁদ্রে জিদের মধ্যে এই সমাজ-চেতনার বিকাশ এক বিস্ময়কর বস্তু। ১৯২০ সালের পরে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করে সেখানে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের যে নগ্ন মূর্তি তিনি দেখতে পান তার বিরুদ্ধে তিনি

তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁর দুখানি গ্রন্থে ভয়েজ অব কঙ্গো (১৯২৮) ও রিট্যুর দ্যু সাদ্-এ (১৯২৯)। কালা আদমিদের উপর শ্বেতাঙ্গ সভ্যতাগর্বীদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঁদ্রে জিদের সবল কণ্ঠে যে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠল তাকে উপেক্ষা করার মত সাহস ফরাসী গভর্নমেন্টেরও ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের জন্যে তদন্ত কমিশনও নিয়োগ করতে হয়েছিল।

মানুষের প্রতি যে ভালবাসা আঁদ্রে জিদ্‌কে নিজের দেশের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই ভালবাসাই তাঁকে* প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েট কম্যুনিজমের দিকে। ধনতান্ত্রিক জগতের অন্যায় বৈষম্য, মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ তাঁর শিল্পী মনকে প্রতিনিয়তই ব্যথিত করে তুলত। এমন সময়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্যবাদের আদর্শ। অন্যান্য বহু-বুদ্ধিবাদী শিল্পীর মত তিনিও ভাবলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়াই বোধ হয় তাঁদের কল্পলোকের ইউটোপিয়া—যেখানে অন্যায় উৎপীড়ন নেই, শাসন-শোষণের অবিচার নেই—জাতি-বিদ্বেষ নেই, নেই কোন শ্রেণীবৈষম্য। আঁদ্রে জিদ্ রাতারাতি কম্যুনিস্ট হয়ে উঠলেন। কম্যুনিস্ট মতবাদে তাঁর এ বিশ্বাস বুদ্ধিসঞ্জাত বা জ্ঞানলব্ধ নয়—অনেকটা প্রেম প্রবণতা-সঞ্জাত। তিনি ছিলেন বাইবেলের বিশ্বপ্রেমের বাণীতে বিশ্বাসী। কিন্তু যীশুখৃস্টের চেলাদের রাজত্বে তিনি প্রতিনিয়তই দেখেছেন এ বিশ্বপ্রেমের লাঞ্ছনা। সোভিয়েট প্রচার-নৈপুণ্যে তিনি ভাবলেন যে, এবার বুঝি মার্ক্সের আদর্শে সোভিয়েট রাষ্ট্রই সে বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থকে সফল করে তুলল। তাঁর এ সময়ের রচনাদি সোভিয়েট রাষ্ট্র ও কম্যুনিজমের গুণ গানে মুখর। তাঁর 'জার্নালে' তিনি বলেছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে বস্তুটি সর্বাধিক আকর্ষণ করে সেটা হল "তুমি তোমার কপালের ঘাম দিয়ে আমার জন্যে রুটির জোগাড় করবে" এই ঘৃণ্য মতবাদের অবসান। তাঁর এই সময়ের লেখায় পাওয়া যায় "যারা প্রেমের মাধ্যমে কম্যুনিজমের কাছে এসেছে আমি তাদেরই শুধু আমার ভ্রাতা বলে মনে করি।" ১৯৩১ সালে তিনি লিখেছেন, "আমি উঁচু গলায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাতে চাই এবং আশা করি যে, আমার কথা লোকে শুনবে ও তাতে কাজ হবে।" তিনি স্বতোৎসাহী হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র ভ্রমণ করে এলেন। তাঁর মত বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাবান একজন সাহিত্যিকের সমর্থন পেয়ে ইউরোপে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মর্যাদাও গেল বেড়ে। যাঁরা ভেবেছিলেন যে, পরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী জিদের সঙ্গে কম্যুনিজমের মত সর্বাত্মক মতবাদের সামঞ্জস্য হবে না—তাঁদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হল। আঁদ্রে জিদ্ লিখলেন ঃ "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করার মধ্যেই ব্যক্তির বিজয়।" তাঁর লেখায় আরও পাওয়া যায় ঃ "যে-মানুষ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাকে ভয়ংকর শূন্যতার কষ্ট পেতে হয়।"

এই আঁদ্রে জিদ্ই আবার ১৯৩৬ সনে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ শেষ করে এসে লিখলেন ঃ "সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা শোচনীয় ও অসন্তোষজনক। উন্নতির দিকে

সামান্য মাত্র পদক্ষেপ হয়েছে একথা বুঝলেও আমি চুপ করে থাকতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যে উৎরাই পার হতে পারবে বলে আমি একদা আশা করেছিলাম সে উৎরাই-এর পথেই তার অধোগতি ঘটছে এবং প্রচুর কষ্ট ও রক্তপাতের পথে বিপ্লবের মধ্যমে যে সব স্বাধীনতা সে অর্জন করেছিল, সে সব স্বাধীনতা সে বর্জন করছে একটির পর একটি করে—অনেক সময় প্রায় সামান্য কারণে। নিজের পিছনে পিছনে সে অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিকেও অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলে এসব কথা খোলাখুলি বলা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।" সামান্য ৫।৭ বৎসরের ব্যবধানে এই বিরাট মত পরিবর্তন কি করে সম্ভব হল তার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। ১৯৩৬ সনের জুন মাসে সোভিয়েট রাষ্ট্রের লেখক ইউনিয়নের আহ্বানে তাঁদের অতিথি হয়ে আঁদ্রে জিদ্ দ্বিতীয়বার সোভিয়েট রাষ্ট্র ভ্রমণে যান। সেখানে তাঁর আদর আপ্যায়নের জন্যে রাজকীয় সমারোহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমারোহই তাঁকে সর্বপ্রথমে পীড়িত করে তোলে। ধনতান্ত্রিক জগতে এরূপ বৈষম্য প্রতিনিয়তই তিনি দেখেছেন এবং মনে মনে বেদনা বোধ করেছেন। তাঁর স্বপ্নের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নেও মানুষে মানুষে এই ব্যবধানের দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বিরূপতার সৃষ্টি হল। তাঁর দ্বিতীয় পীড়ার কারণ হল সোভিয়েট রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা। বিপ্লবের প্রায় ১৮ বৎসর পরেও তিনি দেখলেন যে, সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কোন বস্তু নেই। কয়েক বৎসর আগে যেটুকু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও যেন কম্যুনিস্ট পার্টির চাপে বিলুপ্ত। এই অবস্থাকে তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে শ্বাসরোধকারী বলে মনে করলেন। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন : "যেখানে অবাধে সমালোচনা চলে না সেখানে সংস্কৃতি সর্বদাই বিপন্ন হতে বাধ্য।" সোভিয়েট রাষ্ট্র জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে, রাষ্ট্র পুনর্গঠনে 'বহুলাংশে সফলকাম হয়েছে সেকথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যা তিনি স্বীকার করেন নি সে হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া কম্যুনিজমের পথে এগিয়ে গেছে। বরং তাঁর মতে সোভিয়েট রাশিয়ায় চলেছে নিম্নশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট শাসন-বাদ—এ শাসনবাদ লোককে ভাবতে শেখায় নি তাদের শুধু বলে দাসের মত নেতাদের অনুস্মরণ করতে—'প্রশ্ন করো না, যা বলি তাই করে যাও' এই হল সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের মূল কথা। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জিদের মন এ মতবাদে সায় দিতে পারে নি। তিনি বড় সমর্থক বলে সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্বিচারে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তিনি দেখে এসেছেন যে, সেখানে প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। ঢাক ঢোল পিটিয়ে যতই শ্রমিক কল্যাণের কথা প্রচার করা হোক, জিদ্ দেখে এসেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নেও বৃহত্তর শ্রমিক সমাজ ভিন্ন উপায়ে শাসিত ও শোষিত হচ্ছে—তাদের শোষণের ফল ভোগ করছে কম্যুনিস্ট পার্টির পেটোয়া অন্য একদল শ্রমিক। আঁদ্রে জিদ্ তাঁর অনবদ্য ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে : "বিপ্লব সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে বুর্জোয়া সুলভ সঙ্কীর্ণতা ও দোষ সুপ্ত অবস্থায় আছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাইরে থেকে মানুষের পরিবর্তন ঘটানো যায় না—হৃদয়ের পরিবর্তন আবশ্যক; আমি যখন সোভিয়েট ইউনিয়নে বুর্জোয়া মনোবৃত্তির প্রশংসা ও প্রাধান্য দেখি তখন আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি ঠিক হয়তো সামাজিক শ্রেণী সেখানে গড়ে ওঠে নি—তবে এক নতুন ধরণের অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এবং এ অভিজাত শ্রেণী বুদ্ধি কিংবা সামর্থ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি—এ অভিজাত শ্রেণী হল তাদের যারা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমমতাবলম্বী। পরবর্তী যুগে এটাই ধনগত অভিজাত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াতে পারে।" এই হল মোটামুটি আঁদ্রে জিদের কম্যুনিস্ট হয়ে ওঠার এবং কম্যুনিজমের মোহ ভঙ্গের ইতিহাস। এ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান—একে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচার-বিদরা যতই প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁর মতকে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়। মনে কি গভীর আশা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি কি অপরিসীম দরদ নিয়ে তিনি এ রাষ্ট্রে পদার্পণ করেছিলেন তার কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সহজ আঘাতে সে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রাকার ভেঙে পড়ে নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্বন্ধে আঁদ্রে জিদের শেষ কথা হল এই : "সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের মনের আশাকে প্রবঞ্চিত করেছে এবং একটি খাঁটি বিপ্লব যে কি করে ভয়াবহ চোরাবালিতে ঠেকে বানচাল হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে। সেই পুরাতন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মানুষকে শোষণ ও নিষ্পেষণকারী একটা নূতন ও ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারের উদ্ভব হয়েছে এবং তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ঘৃণ্য দাস মনোবৃত্তির। ডেমো ফুলের মত রাশিয়াও দেবতা হতে পারে নি এবং সোভিয়েট পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড থেকে আর সে উঠতে পারবে না।"

বিশ্বের অন্যান্য অনেক মহামনীষীর মত আঁদ্রে জিদকেও তাই বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এক কথায় তাঁকে বলা চলে মানব প্রেমিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিনিয়ত লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের তথাকথিত সাম্যবাদের মধ্যেও তিনি মানব মুক্তি ও মানুষের কল্যাণের পথ খুঁজে পান নি। অথচ মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখে গেছেন সর্বান্তঃ-করণে। সেই স্বপ্নের প্রতিফলনে তাঁর অজস্র সৃষ্টির প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হয়ে আছে। চেষ্টা করলে সেই অশান্ত অতৃপ্ত আত্মার পক্ষ-ধ্বনি আমরা আজও শুনতে পাই। ১৯৪৭ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজ্ দেবার সময় সোয়েডিস্ অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ তাঁর সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেইটিই বোধ হয় জিদের সঠিক বর্ণনা। সেই উদ্ধৃতিটি দিয়ে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে এ প্রসঙ্গের শেষ করি। সোয়েডিস অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন যে, "তাঁর ব্যাপক ও শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা এবং তার মাধ্যমে নির্ভীক সত্য প্রীতি ও মনস্তাত্ত্বিক সংবেদনের সাহায্যে তিনি মানব সমাজের অবস্থা ও সমস্যাগুলিকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন" তার দরুণ আঁদ্রে জিদকে এ পুরস্কার দেওয়া হল। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তানায়ক আঁদ্রে জিদের এই হল প্রকৃত পরিচয়।

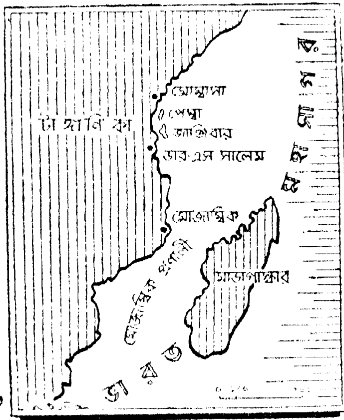


বিজ্ঞানের কথা

সমুদ্রের সুগন্ধ

ডাঃ অভীশ্বর সেন

ভারত মহাসাগরের এক কোণে; আফ্রিকার কোলে ক্ষুদ্র জাঞ্জিবার দ্বীপ পর্যটকের চক্ষুতে অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেখানে মাইলের পর মাইল ধরিয়া লাল প্রবাল সৈকতের উপর নীল ও সাদা সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম ভাঙিয়া পড়ে—যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, নারিকেল শ্রেণীর মাথাগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য লবঙ্গ বৃক্ষের শীর্ষগুলি জাগিয়া আছে। সমস্ত উপকূলে ভরিয়া, সমুদ্রের বহু-



দূর পর্যন্ত বাতাসে ভরিয়া থাকে লবঙ্গের সুগন্ধ।

সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ লবঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহার দুই তৃতীয়াংশই আসে আফ্রিকার টাংগানিকা উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি হইতে। তাহাদের মধ্যে জাঞ্জিবার ও পেম্বা প্রধান। মাত্র দেড় শত মাইল দূরে মাফিয়া দ্বীপে জার্মানরা বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীতে লবঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের মলক্কা ও সুমাত্রায়, মাডাগাস্কর দ্বীপে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজএও লবঙ্গ জন্মে কিন্তু তাহাদের সমবেত পরিমাণ জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপের তুলনায় অতি নগণ্য। লবঙ্গ দ্বীপ জাঞ্জিবার বৃহৎ দ্বীপ নহে—দৈর্ঘ্যে মাত্র পঞ্চাশ মাইল, প্রস্থে চব্বিশ মাইলের বেশী হইবে না। কয়েক মাইল উত্তরের পেম্বা দ্বীপ আরও ক্ষুদ্র।

যতদূর জানা গিয়াছে, লবঙ্গ জাঞ্জিবারের শস্য নহে। লবঙ্গ আসিয়াছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল হইতে প্রায় আটশত মাইল দূরবর্তী মলক্কা দ্বীপ হইতে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ বণিকদের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। একশত বৎসর পরে ডাচরা পর্তুগীজদের হটাইয়া, তাহাদের হাত হইতে দ্বীপগুলির শাসনভার ও লবঙ্গের ব্যবসা কাড়িয়া লয়। ডাচরা নিজেদের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লই-বার মানসে অন্যান্য দ্বীপের লবঙ্গের জঙ্গল-গুলি কাটিয়া ফেলে, কেবল মলক্কার মধ্যবর্তী এম্বয়না দ্বীপে লবঙ্গের চাষ বিস্তৃতভাবে শুরু করে। তারপর কেমন করিয়া ভারত মহাসাগরের অপর দিকে মরিশাস ও রিইউনিয়ন দ্বীপগুলিতে লবঙ্গের গাছ দেখা দেয় ১৭৭০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি। তাহার পরেই নিকটবর্তী জাঞ্জিবারে লবঙ্গের আবির্ভাব ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন আরব বণিক হারমামেলি বিন সালে মরিশাস দ্বীপে উপনীত হন। প্রায় দশ বৎসর পরে তিনি জাঞ্জিবারে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। আরবদের প্রথা ছিল, দেশবিদেশ হইতে নানা উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনা ও তাহাদের নিজেদের দেশে আপন আপন উদ্যানে জন্মানো। হারমামেলিই বোধ হয় সর্বপ্রথম লবঙ্গের বীজ লইয়া আসেন জাঞ্জিবারে ১৮১৮ খৃ অব্দের কাছাকাছি।

হারমামেলির পর লবঙ্গের উৎপাদন হইতে থাকে অতি সামান্য—লবঙ্গের ব্যবসা ভালো করিয়া জাঞ্জিবারে গড়িয়া ওঠে নাই। জাঞ্জিবারে উৎপন্ন বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবঙ্গের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে জাঞ্জিবারের সুলতান সঈদ সৈয়দ আসকট হইতে সর্বপ্রথম পাঞ্জিবারে পদার্পণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি লবঙ্গ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে লবঙ্গের উৎপাদন প্রসার করিবার জন্য জাঞ্জিবারের অধিবাসীদের হুকুম দেন। তখন হইতে জাঞ্জিবারে লবঙ্গের চাষ বিস্তৃতভাবে শুরু হয়।

জাঞ্জিবারের অধিবাসীরা সুলতানের হুকুম মত লবঙ্গের চাষ শুরু করে—এক বৎসরের মধ্যেই সারা দ্বীপটিতে লবঙ্গের চারা লাগানো হয়—পুরাতন গাছগুলি হইতে লবঙ্গ সংগ্রহ চলিতে থাকে। এই সকল সংগৃহীত লবঙ্গ ক্রয় করিতে বিদেশী জাহাজ জাঞ্জিবারে আসিতে আরম্ভ করে। দশ বৎসরের মধ্যেই জাঞ্জিবারের নারিকেল বাগানগুলি এমন কি ধানের ক্ষেতগুলি কমিয়া যায়—লবঙ্গের বাগানগুলি বাড়িতে বাড়িতে সারা দেশ ছাইয়া ফেলে। জাঞ্জিবারের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে হাতীর দাঁতের পরই লবঙ্গের স্থান হয়।



লবঙ্গের কুঁড়ি তোলা হইতেছে

বীজ হইতে চারা জন্মানোর সাত আট বৎসরের মধ্যেই গাছে লবঙ্গ ফলিতে শুরু করে। লবঙ্গ হইল বাড়িতে না দেওয়া শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি। গাছগুলি চল্লিশ ফিটেরও অধিক উচ্চ হয়। লবঙ্গের বাগানের মধ্যে সেগুলি সারি দিয়া লাগানো হয়; গাছগুলি ঢাকিয়া থাকে দীর্ঘ ও চকচকে মসৃণ পাতা-গুলিতে। পাতাগুলি হইতে লবঙ্গের পরিচিত সুগন্ধ সকল সময় বাহির হইতে থাকে। পাতাগুলি এত নিবিড়ভাবে সাজানো থাকে যে, গাছের ডাল বা কুঁড়ি কিছুই দেখা যায় না—দূর হইতে লবঙ্গের বাগানকে গুল্মে-ভরা ভূখণ্ড ছাড়া কিছুই মনে হইবে না। ফুল ফুটিবার সময় প্রতি শাখার কোলে কোলে অজস্র লবঙ্গ গুচ্ছ ঝুলিতে থাকে। তাহাদের রঙও হয় বিচিত্র। কুঁড়িগুলির বয়স অনুযায়ী

কাহারও রঙ হয় ফিকে লাল, কেহবা সামান্য লালরঙ মেশানো সবুজ রঙের—ঠিক ফুটিবার আগে তাহাদের রঙ হয় রক্তের মত গাঢ় লাল। ফুটিয়া গেলে ফুলের রঙ হয় সোনালী লাল—নীচের দিকটা থাকে ফিকে হলুদ রঙের।

যে বৎসর খুব বেশী বৃষ্টি হয় না অথচ খুব কমও হয় না সে বৎসর অক্টোবর মাস হইতে লবঙ্গ ফুলের কুঁড়িগুলির রঙ হইয়া দাঁড়ায় সবুজ হইতে ফিকে লাল, তারপর গাঢ় লাল। ঠিক এই সময় মজুরেরা ফুলের কুঁড়ি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। গলায় কাপড়ের থলি বাঁধিয়া মজুরেরা এই থলিগুলিকে ফুলের কুঁড়িতে ভরিয়া ফেলে।



দোকানে স্তূপীকৃত শুষ্ক লবঙ্গ

সকালবেলা সেগুলি সংগৃহীত হইবার পর বাগানের মাঝখানে আমগাছের ছায়ায় ডাল হইতে কুঁড়িগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হয়। তারপর সেগুলি মাদুরের উপর পাতলা করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয় প্রখর সূর্যকিরণে। পাঁচ ছয় দিন এইরূপে শুকাইয়া লইবার পর ফুলের কুঁড়িগুলির রঙ হইয়া দাঁড়ায় গাঢ় বাদামী—তাহাই হইল বাজারের লবঙ্গ। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদিনের পর তাহারা শুকাইয়া গেলে তাহাদের লইয়া যাওয়া হয় বাজারে—সেখান হইতে তাহারা দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়।

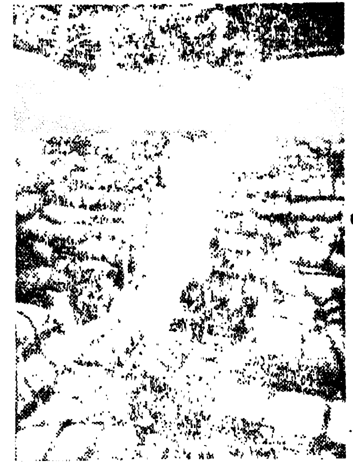
বাজারে ঘরের ভিতর তাহাদের স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখা হয়। সে সময় সমস্ত বাজার এমন কি শহরগুলি লবঙ্গের সুগন্ধে ভরিয়া যায়। ক্রয় করিবার সময় ক্রেতারা মুঠা করিয়া লবঙ্গ লইয়া চাপ দিতে থাকে। তাহাতে লবঙ্গের ভিতর জলের পরিমাণের খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। জলের পরিমাণ অনুযায়ী লবঙ্গের মূল্য নির্ণীত হয়। বেশীদিন জমা থাকিলে লবঙ্গের ভিতর জলের পরিমাণ কমিয়া যায়—তাই অসাধু বিক্রেতারা লবঙ্গ বিক্রয় করিবার আগে তাহাদের উপর জল ছিটাইয়া ভালো করিয়া জলে ভিজাইয়া লয়।

বাজার হইতে লবঙ্গ দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। চটের অথবা ঘাসের তৈরী একপ্রকার থলিতে তাহাদের ভরিয়া লওয়া হয়—এক একটি থলিতে এক মণ ত্রিশ সের করিয়া লবঙ্গ ভরিবার নির্দেশ আছে। এই লবঙ্গ দেশ বিদেশে খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধের উন্নতি করে—নানা ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। ঔষধে লবঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত তৈলের প্রচলন আছে। লবঙ্গ হইতে পাওয়া যায় ইউজিনল, তাহা হইতে পূর্বে ভ্যানিলিন নিষ্কাশিত করা হইত। এখন আলকাতরা হইতে কৃত্রিম উপায়ে ভ্যানিলিন তৈরীর প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় লবঙ্গের ইউজিনল হইতে আর ভ্যানিলিন তৈরী করা হয় না।

১৯২১ খৃঃ অব্দের পূর্বে লবঙ্গের আদর ছিল মদ্যপায়ীর কাছে। ইহা মুখে মদের গন্ধ দূর করিবার জন্য কাজে লাগানো হইত। মদের দোকানগুলিতে অতি যত্নের সহিত লবঙ্গ সাজানো থাকিত। বর্তমানে পশ্চিমের সভ্যসমাজে মুখে মদের গন্ধ আর দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করা হয় না; মদ্যপায়ীদের কাছে লবঙ্গের আদর কমিয়া আসিয়াছে। তবু জৈব ও অজৈব বহু দুর্গন্ধ দূর করিবার বা ঢাকিবার জন্য লবঙ্গের তীব্র গন্ধ ব্যবহার করা হয়। লবঙ্গ এত স্থায়ী যে কুড়ি বৎসর কোন বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেও তাহার গন্ধের বা ঝাঁঝের কোন তারতম্য হয় না।

পূর্বে জাঞ্জিবার দ্বীপের ঐশ্বর্যের কারণ ছিল তাহার হাতীর দাঁতের কারবার ও দাস ব্যবসায়। বর্তমানে এই দুই ব্যবসায়ই প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লবঙ্গ উৎপাদনই এখন জাঞ্জিবারের লোকদের জীবিকার প্রধান উপায়। লবঙ্গের উৎপাদন বাড়াইবার বোধ হয় আর কোন উপায়ই নাই কারণ জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপের সমস্ত জমিই লবঙ্গের বাগানে ভরিয়া গিয়াছে। কাজেই লবঙ্গের নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত না হইলে, লবঙ্গ কতদিন জাঞ্জিবার দ্বীপকে বাঁচাইয়া রাখিবে বলা যায় না।

তবু জাঞ্জিবারে লবঙ্গের চাষ একটি আশ্চর্য ব্যাপার কারণ জাঞ্জিবারের অধিবাসী সাহিলিরা চাষবাসের কিছুই জানে না—লবঙ্গ অতি সযত্নে বর্ধিত হয়। তাহাদের লবঙ্গের চারা লাগানোর প্রণালী দেখিয়া লবঙ্গ গাছেরা যে ফুল ফুটিবার সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে তাহা আশ্চর্য মনে হইবে। সারি দিয়া লাগানো লবঙ্গ চারার সঙ্গে সঙ্গে আগাছা ও অন্যান্য উদ্ভিদ বাড়িতে থাকে। সাহিলিরা তাহাদের তুলিয়া ফেলিবার নামগন্ধও করে না। লবঙ্গ গাছ বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের নীচের জমি প্রচুর গুল্মলতা ও উইঢিপিতে ভরিয়া যায়—সাহিলিরা শুকে ডালপালা একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত লবঙ্গ গাছের খানিকটাও বেশ পুড়িয়া যায়—তাহা যে বাঁচিয়া থাকে তাহা মনে হয় না। তবুও ঠিক সময়ে তাহাদের



বিদেশে চালান দিবার জন্য ঘাসের বস্তায় লবঙ্গ

নতুন পাতা বাহির হয় ও পাঁচ ছয় বৎসরের পর তাহারা লবঙ্গের সতেজ কুঁড়িতে ভরিয়া যায়। হয় লবঙ্গ গাছ অত্যন্ত শক্ত ও সহনশীল, না হয় জাঞ্জিবার দ্বীপের মাটির লবঙ্গ জন্মানোর বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাহা না হইলে সাহিলিদের এত অবহেলায় জন্মানো লবঙ্গ কখনও জাঞ্জিবারে বাসা বাঁধিতে পারিত না।

জাঞ্জিবারের মাটির উপরের বালি ও কর্দমেরও নীচে প্রবালস্তূপের মৌচাকের মত গড়নের স্তরের একটা বিশেষ গুণ যে লবঙ্গ সেখানে অতি অযত্নে সুস্থভাবে বাড়িতে থাকে। প্রাকৃতিক আবহাওয়াও তাহার জন্য অনেকটা দায়ী হইতে পারে। নতুবা লবঙ্গ যেখানে উৎপন্ন হয় আরও বহু দ্বীপে অতি যত্নের সহিত লবঙ্গের চাষ করা হয়। তবু, জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপের লবঙ্গ সারা পৃথিবীর লবঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ অথবা তাহা হইতেও বেশী। সেখানে সারি দিয়া লাগানো উচ্চ লবঙ্গ বৃক্ষের সারি সারা দ্বীপকে চিরদিন সুন্দর ও সুগন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

ইন্দ্রজিতের আসর

বেশ, তবে ঘুষের কথাই হোক্। বলছিলাম কি, ও'রা যে সেদিন বললেন ঘুষখোরদের ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া উচিত, সেটা কি একটা উচিত কথা হল? এমন লঘুপাপে গুরুদণ্ডের কথা আমি কস্মিনকালে শুনিনি। এ'দের তো চটে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না. আপনারা একটু শীতল মস্তিষ্কে কথাটা ভেবে দেখুন। মদখোরের যদি ফাঁসি না হয়, গাঁজাখোর আফিংখোরের যদি শাস্তি না হয় তবে ঘুষখোরের কেন হবে? ঘুষ খাক্ আর যাই খাক্, খাওয়া কখনো একটা মস্ত বড় অপরাধ হতে পারে না। মদ খাওয়া নিয়ে তবু একটা Prohibition আন্দোলন এমনকি আইনও হয়েছে। ঘুষ খাওয়া যদি তেমন একটা অপরাধ হত তাহলে এই ব্যাপারেও একটা Prohibition আইন হতে পারত। তা যখন হয়নি তাতেই প্রমাণ হচ্ছে সমাজ এবং সরকারের চোখে এটা অপরাধ বলে গণ্য নয়। তথাপি ঘুষ খাওয়া যে একটা নিন্দনীয় ব্যাপার এইটুকু আমি মেনে নিতে রাজি আছি। এর নিন্দেটুকু ঘুষখোর কথাটার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। যে ভাত খায় তাকে কেউ ভাতখোর বলে না। রুটিখোর বলেও কোনো কথা নেই। মদ গাঁজা আফিং এবং ঘুষ খাদ্য হিসাবে নিন্দনীয়—এইজন্যই এদের বেলায় 'খোর' suffixটি ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত জিনিসগুলির মতো ঘুষও নেশা বই আর কিছুই নয়।

তাহলেও কে কি খায় তাই নিয়ে কোনোরকম ইঙ্গিত করা আমি শিষ্টাচারসম্মত বলে মনে করি না। যা দিনকাল পড়েছে তাতে লোকজন ঘাস খেয়ে হোক ঘুষ খেয়ে হোক কোনো মতে দিন গুজরাণ করতে পারলেই হল। দেশজোড়া খাদ্যসংকট এইভাবে যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সমাধান হয় তো সেটা আমাদেরও লাভ, সরকারেরও লাভ। তাছাড়া আমাদের খাদ্যমন্ত্রীরাই বরাবর বলে আসছেন যে আমাদের food habits বদলানো দরকার। ভাত রুটি তো অনেকদিন চলল, এখন নতুন খাদ্যের প্রয়োজন। আমার তো মনে হয় মন্ত্রীদের আগ্রহাতিশয্যেই লোকে নতুন খাদ্য হিসাবে ঘুষ খেতে শুরু করেছে।

দুঃখের বিষয় এসব ভালো ভালো নিয়মের সুযোগ যাদের নেওয়া উচিত তারা নিতে পারছে না। নিচ্ছে যাদের প্রয়োজন নেই তারা। অর্থাৎ যাদের ভাত রুটির অভাব নেই তারা ভাত রুটিও খাচ্ছে, ঘুষও খাচ্ছে। একেই বলে wastage of food ভাত রুটি ছেড়ে এক শ্রেণীর লোক শুধু যদি ঘুষ খেয়ে থাকতে পারত—তাহলে দেশের খাদ্য-সমস্যা কতক পরিমাণে লাঘব হত। গড়াচরের মতো ডুডুও খাব টামাকও খাব—এ হলে কেমন করে চলবে? ভাতও খাব, ঘুষও খাব—দুটো এক সঙ্গে চলবে না। অথচ বরাবর এই হয়ে আসচে। চর্বচোষ্য যাঁরা খান তাঁরাই আবার ভুঁড়ি বাগিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেতেও বেরোন। আর যাদের দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না তারা যে শুধু হাওয়া খেয়ে থাকবে তারও সাধ্য নেই। খোলা হাওয়ার অভাব তাদেরই সব চাইতে বেশি। মন্ত্রী মশাইরা যাই বলুন দেশের food habits সহজে বদলাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তার কারণ আগে থেকে যারা খাওয়ার অভ্যাস করে এসেছে নতুন পুরাতন সব রকম খাদ্য তাদের বরাতেই জুটবে। এতদিন যারা খেতে পায়নি তারা এখনও খেতে পাবে না।

তবু মন্ত্রী মশাইদের ধন্যবাদ দিতে হবে যে, তাঁরা Grow more food-এর আন্দোলন করতে গিয়ে অন্ততঃ একটা নতুন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। নতুন জিনিস সাধারণ লোকের প্রথমটায় মুখে রোচে না। সংস্কার দূর হতে সময় লাগে। চারদিকে ঘুষ খাওয়ার বিরুদ্ধে এখনও একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আশা করা যায় ক্রমে অভ্যাস হয়ে আসবে, তখন সংস্কার আপনি ঘুচে যাবে। ক্রমে ক্রমে এর মধ্যে ভিটামিন আবিষ্কৃত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সর্বসাধারণের মধ্যে এর আরো ব্যাপক বিস্তার আশা করা যেতে পারে।

যাঁরা পুরাতনপন্থী তাঁরা মনে করেন এ খাদ্যটা অশাস্ত্রীয়। আমি সংস্কৃত ভাষা ভালো জানিনে, তথাপি আমাদের বেদ পুরাণে এ বিষয়ে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃত গ্রন্থাদি ঘেঁটে কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যদি দয়া করে প্রমাণ করে দেন যে শাস্ত্রমতে ঘুষ খেতে কোন আপত্তি নেই তাহলে অনেক ধর্মভীরু ব্যক্তির উপকার হয়। সামান্য সংস্কারের বাধাটুকু তাঁরা অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি শাস্ত্রবচন জানিনে, কিন্তু ইতিহাসের বচন কিছু কিছু জানি।

প্রাচীনকালের গ্রীক জাতি অতিশয় সুসভ্য ছিল, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগ থেকেই ও'দের দেশে ঘুসের যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। No Spartan could resist a bribe—এটি স্বয়ং হিরোডটাস-এর উক্তি। শুধু স্পার্টায় নয় সমগ্র গ্রীস্ দেশে এমন রাজনৈতিক নেতা খুব কমই ছিলেন যিনি পারশ্য সম্রাটের টাকা খেয়ে দেশের স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি যত জোর গলায় পারশ্য সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতেন তাঁকে তত বেশি টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া হত। শুনে পুলকিত হবেন যে এই কার্যে সব চাইতে ওস্তাদ ছিলেন সক্রেটিস এবং প্লেটোর শিষ্যবর্গ। ও'রা শুধু বিদ্বান ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিদ্যা মনকে সংস্কারমুক্ত করে। কুসংস্কারের সঙ্কোচ যখন দূর হয়ে যায় তখন আর খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। রেনেসাঁসের যুগে ইংলণ্ড যখন গ্রীক লাটিন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এল তখন যিনি ছিলেন সে যুগের সর্বোত্তম পণ্ডিত সেই লর্ড বেকনই প্রচুর ঘুষ খেয়ে ঘুষের মর্যাদা দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে খাদ্যাখাদ্যের আচার বিচার একটু বেশি। এমনও হতে পারে ঘুষ পদার্থটা এককালে নিষিদ্ধ খাদ্যের পর্যায়ভুক্তই ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমাদের আচার বিচার অনেক ব্যাপারেই শিথিল হয়ে এসেছে। যিনি যত উচ্চ শিক্ষিত খাদ্য সম্বন্ধে তিনি তত বেশি উদার। উচ্চ শিক্ষিতেরা সব ব্যাপারেই পথ-প্রদর্শক। এই খাদ্যসংকটের দিনে ঘুষকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাঁরা দেশবাসীর সম্মুখে অতি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিক্ষার প্রচার যত দ্রুত হবে ঘুসের প্রচলন তত ত্বরান্বিত হবে। একদিকে মন যদি উদার হয়, অপরদিকে উদর যদি শূন্য থাকে তাহলে আশা করা যায় ঘুষ অনতিবিলম্বে আমাদের staple food হিসাবে গণ্য হবে। ধান বা গমের চাষের চাইতে ঘুষের চাষই তখন বেশি লাভজনক হয়ে উঠবে।

নীতিবাগীশরা এখনও ঘুষ নিবারক আইনের কথা বলছেন। তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতিই মানুষের সব চাইতে বেশি আকর্ষণ। আদম এবং ইভ-এর আমল থেকেই সেটি আমরা দেখে এসেছি। ঘুষ নিরোধক আইন করেছেন তো ঘুষের বন্যা আর রোধ করতে পারবেন না। আগে যারা এর স্বাদ গ্রহণ করেনি তারাও তখন চেখে দেখতে চাইবে।





শীতের শান্ত প্রভাত,—মৌনী তাপসের মত সমাধিমগ্ন। ধূসর আকাশ থেকে কুয়াসার ধোঁয়া জমাট হয়ে নেমে এসেছে মাটির উপর। রাজপথে জনকোলাহল জাগেনি, মাঝে মাঝে চলতি ট্রামের শব্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রভাত-বেলাকে সচকিত করে তুলছে। এমনি দিনে গায়ে চাদর জড়িয়ে মেসের বাসা থেকে বাহিরের জগতে পা দিল নিশীথ। উত্তুরে হাওয়ার দমকে কুয়াসার পরদা তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা বাতাসে চারিদিক আকুলিত।

পথচলা নিশীথের শেষ হল একটা বড় বাড়ীর ফটকের সামনে। তিনতলা বাড়ী—গায়ে গায়ে একটুকরো ফুলবাগান, প্রথম সূর্যের আলোয় চকচক করছে। সপ্তাহে চারদিন নিশীথকে দেখা যায় এই বাড়ীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করছে। তারপর গৃহত্যাগের সময় একটি মেয়ে আসে বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে আসে হাসিমুখে, বাগান থেকে সদ্যতোলা একটি ফুল তার বুকে গুঁজে দেয়। নিশীথের বিবর্ণ মুখমন্ডলে নবারুণের সুষমা ঝলমল করে।

নিত্যকার মত সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটি ঘরের সম্মুখে দাঁড়াল নিশীথ। ঘরের দরজা সেদিন খোলা দেখে তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অন্য দিন দরজা থাকে বন্ধ। ঠিক সাড়ে ছটার সময় সে এখানে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। তাকে স্বাগত সম্ভাষণ করে প্রভাতের লাবণ্যবিলাস মাখানো একখানি হাসিভরা মুখ। তিন মাস পরে প্রথম এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল। উন্মুক্ত দ্বারপথে ঘরের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করল নিশীথ। আভরণমুক্ত প্রকোষ্ঠ;—টেবিল চেয়ারের চিহ্নমাত্র নাই। সারা ঘরখানি তাকে যেন রিক্ততার অহঙ্কারে বিদ্রূপ করছে। বিস্ময়াহত নিশীথকে অধিক চিন্তা করবার অবসর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনতলা বাড়ীর ম্যানেজার।

—এই যে মাস্টারমশায়, তাড়াতাড়িতে আপনাকে খবর পাঠান হয় নি। শ্বেতা চলে গেছে চেঞ্জে। অপনার টাকা অবশ্য ও'রা দিয়ে গেছেন।

নিশীথের মাথার মধ্যে কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। সে শুধু অস্ফুটস্বরে বলল,—ফিরবে কবে?

—ওসব বড়লোকের খেয়াল মশায়। ওরা আপাতত গেল সিমলা, সেখান থেকে বিলেত। শ্বেতার ভারী ইচ্ছে ওখানকার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন, বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। আপনার পড়ানোর খুব সুখ্যাতি করত কিন্তু, তবে কি জানেন বড্ড খেয়ালী। ভেরি সরি, আপনার একটা ইনকাম কমে গেল। আপনার সঙ্গে বোধ হয় ঠিক ছিল দুবছর পড়বে আপনার কাছে।

ম্যানেজারের শেষ কথা নিশীথের কানে গেল না। হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে রক্তবর্ণ একটা গোলাকার পিণ্ড নৃত্য করতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল সে তার পরিবেষ্টনীর অস্তিত্ব, এমন কি তার নিজের অস্তিত্ব। ঘরখানির মধ্যে বিচরণ করছে কালো কালো ছায়া, এগিয়ে আসছে তারই দিকে। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ থেকে শুধু করুণ একটা স্বর বেরিয়ে এল। প্রকৃতিস্থ হয়ে নিশীথ দেখলে সে বসে আছে মেঝের উপর,—সর্বাঙ্গ সিক্ত। বৃদ্ধ ম্যানেজার এক গেলাস জল উপুড় করে দিয়েছে তার মাথার উপর। জামা কাপড় গায়ের সঙ্গে খানিকটা জড়িয়ে আছে, কিন্তু শীত লাগছেনাও একটুও। সারা শরীর শুধু জ্বলে যাচ্ছে কি এক দুঃসহ জ্বালায়!

আবার পথ। গেট পার হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিশীথ। রাজপথে সাড়া পড়ে গেছে, বিচিত্র শব্দসম্ভারে চারিদিক মুখরিত। নিশীথ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল উদার পৃথিবীর বুকে। তার জলসিক্ত দেহে কোমলতার প্রলেপ বিছিয়ে দিল হেমন্তের হিমেলী হাওয়া, শিশুরবির এক ঝলক রাঙা আলো ক্ষণিকের জন্য তাকে উজ্জ্বলতর উদ্দীপনায় আচ্ছন্ন করে দিল। শুধু একটি মাত্র চিন্তা তাকে বারবার কশাঘাত করতে লাগল,—শ্বেতা চলে গেছে একটি খবরও না দিয়ে! ম্যানেজারের কথা থেকে থেকে কানে বাজছে,—বড়লোকের মেয়ে, বড্ড খেয়ালী! তাকে

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া আর বাগান থেকে ফুল উপহার,—এ সবও তার খেয়াল!

মেসে ফিরে বিছানায় একেবারে গা এলিয়ে দিল নিশীথ। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে অনেকখানি রোদ এসে পড়েছে ঘরের মলিন আসবাবপত্রের উপর। হালকা কাঠের টেবিলে খানকতক বই আর কাগজপত্র। বইগুলি দর্শন-শাস্ত্রের। বর্তমান যুগের ফ্যাসান উপযোগী হালকা দর্শন নয়, শতাব্দীর মনীষীদের চিন্তার ভারে সমৃদ্ধ। একটা প্রবন্ধ নিশীথ লিখতে আরম্ভ করছে। নাম দিয়েছে,—এ যুগের সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজের জড়ত্ব। নিশীথের মতে সভ্যতাভিমানী মানুষের মন হয়েছে অনড়, অসাড়। মানুষ পরিণত হতে চলেছে অটো-ম্যাটন যন্ত্রে, মানসিক জড়তা তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে আদিম বর্বর যুগের দিকে।

আজ আর প্রবন্ধের দিকে তাকাবার অবসর পেল না নিশীথ। বালিশে মুখ গুঁজে শ্বেতার কথাই চিন্তা করতে লাগল। কি যেন একটা অভাব রোলারের মত চেপে বসেছে তার বুকে। তিন মাস পূর্বেও সে নিঃসঙ্গ ছিল, কিন্তু আজ তার মনে হল নিঃসঙ্গতা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চিন্তার অবকাশে সারা শরীর দপদপ্ করছে, বিস্মৃতির অন্তরালে ধীরে ধীরে চৈতন্য হয়ে আসছে অবলুপ্ত। ঘরময় উজ্জ্বল আলো, বাতাসে নতুন দিনের গান। পূর্বস্মৃতি তার মন থেকে যেন একেবারে মুছে গেছে, নূতন একটা আরাম মনের মধ্যে প্রবেশপথ খুঁজছে!

কয়েকদিন পরে সকাল বেলা। কার পায়ের শব্দে নিশীথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেসের দরোয়ান টেবিলে চিঠি রেখে চলে যাচ্ছে। মজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় হাতের মুঠোয় চিঠি তুলে নিল নিশীথ। খামের উপর লেখা দেখে হতাশায় মন তার ভরে গেল। শ্বেতা নয়, মা লিখেছে কেতনপুর থেকে।

নিশীথের জন্মভূমি শহর থেকে অনেক দূরে। চারিদিকে বিশাল বৃক্ষরাজি আর ঘন আগাছার জঙ্গল। পথঘাট দুর্গম, গ্রামবাসীরা আধুনিক সুখ-সুবিধা ও আরাম সম্বন্ধে উদাসীন। এই গ্রাম তাকে শৈশবে সংপুষ্ট করেছে অন্নজল দান করে। দীর্ঘকাল পরে নিশীথের স্মৃতিপটে ফুটে উঠল শৈশবের স্নেহবন্ধনজড়িত জীর্ণকুটীরের এক রমণীয় আলেখ্য, আর তার মনের মধ্যে সাড়া এনে দিল বিস্মৃতপ্রায় দুটি রমণীমূর্তি,—মা ও দিদি!

দিদির কথা মনে হতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল। প্রায় পাঁচ বৎসর সে দিদিকে দেখেনি, এর মধ্যে সুপ্রিয়ার জীবনে কি বিচিত্র পরিবর্তন এসেছে! পাঁচ বৎসর পূর্বে দেখা দিদির একটি দিনের চেহারা সে সুস্পষ্ট অনুভব করতে লাগল। কনে সেজে আলপনা আঁকা পিঁড়ির উপর দিদি বসে আছে সুললিত ভঙ্গীতে। সেদিন মায়ের মুখে ক্ষণিক উদ্বেগ, ক্ষণিক প্রসন্নতা। প্রতিবেশীদের অকারণ উল্লাসে মাঙ্গলিকের প্রশস্তি।

অকস্মাৎ বিছানার নীচ থেকে একখানি পুরানো চিঠি বের করল নিশীথ। দিদির নিজের হাতে লেখা তিন বৎসর পূর্বে,—এখনও যেন গোটা গোটা অক্ষরগুলি জ্বল জ্বল করছে। দিদি বিধবা হয়েছে। সেদিন নিশীথ দুহাতে মাথা চেপে ধরেছিল। কি কঠিন প্রাণ দিদির! বৈধব্যের কথা ভাইকে জানিয়েছে নিজে চিঠি লিখে।

সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানার দিকে আবার সে তাকাল। শ্বেতা নয়, মা লিখেছে কেতনপুর থেকে। কী সুন্দর হাতের লেখা, দিদির চেয়েও সুন্দর। কিন্তু মা খামে চিঠি লিখেছে কেন? বোধ হয় অনেক খবর আছে কেতন-পুরের?

চিঠি পড়ে নিশীথের মনে হল আহতাবশিষ্ট শক্তিটুকু যেন তার এক অতি-নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। দিদি চলে গেছে। শেষের লাইন কটি সে আবার পড়ল,—"খোকা, তাকে ভুলে যাও। জানই তো ছেলেবেলা থেকে সে বড় খেয়ালী।" দিদি তাহলে একটুও ভালবাসত না ভাইকে, সে শুধু মত্ত ছিল নিজের খেয়াল নিয়ে। কিন্তু বিধবার বেশে কী সুন্দর মানাত দিদিকে। প্রচণ্ড একটা তেজ যেন ঢাকা পড়ে ছিল সর্বহারার আবরণে। চিন্তামগ্ন নিশীথের মনে হল চারিদিক থেকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া তাকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করছে।

তার চমক ভাঙ্গল অনেক বেলায়। আজ আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করা হবে না। ক্লাসে যোগদান করে লাভও বিশেষ নেই। সেখানে একমাত্র আকর্ষণীয় স্থান লাইব্রেরী। নিশীথ সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সাহিত্য ও দর্শনের বারিধির মধ্যে। লাইব্রেরী হলে স্বজন-পরিত্যক্ত স্পিনোজার নিঃসঙ্গ যৌবন সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, বিয়াত্রিচের চঞ্চল চরণধ্বনি বেজেছে তার কানে। এতদিন পরে কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তি এগিয়ে আসছে তার এই নীরব জ্ঞানচর্চার দিকে উদ্যত কুঠার লক্ষ্য করে।

কি একটা শব্দে তার চিন্তার সূত্র আবার ছিন্ন হয়ে গেল। সে মুখ তুলে চাইল,—টেবিলের উপর আর একখানা চিঠি, বোধ হয় পরের ডাকে এল।

খামের দিকে তাকিয়ে নিশীথ থর থর করে কাঁপতে লাগল। নিশ্চয় শ্বেতা লিখেছে। কম্পিতহস্তে চিঠিখানা তুলে নিল সে,—লিখেছে দিদি। নিশীথের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল গৃহত্যাগিনীর এই স্পর্ধায়। ইচ্ছা হল চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ফেলে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর সে পড়তে আরম্ভ করল।

কি কঠিন প্রাণ দিদির! নিজের কলঙ্কের কথা ভাইকে লিখেছে। চিঠি লিখছে সিমলা থেকে,—"নতুন করে আবার সংসার পেতেছি। কেতনপুর ছেড়ে আসার পরই আমাদের বিয়ে হয়েছে। পুজোর ছুটিতে এখানে এসো। একটা মজার খবর দিচ্ছি। তোমার একটি ছাত্রী আছে এখানে। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সম্প্রতি খুব ঝগড়া হয়েছে। শ্বেতা বলে, তুমি নাকি পাগল এবং তোমাকে সে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করে দিয়েছি। আমার উনিকে তুমি বোধ হয় চেন। কেতনপুরে আমাদের পাশের বাড়ি ওঁদের। অনেকদিন গ্রামছাড়া, বিলেতে ছিলেন দশ বছর। হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় গ্রামে বাস করতে এসে আমাকে দেখলেন। তারপর—তারপর—উনি এখানকার কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। কেতনপুরেও আজ চিঠি দিলাম।"

চিঠিটা বার বার পড়ে নিশীথ যখন রেখে দিল, তখন বিকাল হয়ে এসেছে। আকাশে-বাতাসে পূরবীর ছন্দ। নিশীথ তাকাল টেবিলের দিকে, যেখানে শ্বেতার প্রদত্ত পুষ্প-গুচ্ছ থরে থরে সাজান।

বিচিত্র পুষ্পসম্ভার! রক্তকরবী নত হয়ে পড়েছে টেবিলের উপর, রজনীগন্ধার দলবৃন্ত শোকাতুরার মত ম্লান। এক একটি ফুলের সঙ্গে শ্বেতার একটি বিশেষ স্মৃতি জড়িত। রক্তকরবী হাতে দিয়ে শ্বেতা বলেছিল,—আপনার মন রাঙা হয়ে উঠুক চিরদিনের মত।

নিশীথ গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছিল,—মন আমার রাঙা হয়েছে যেদিন প্রথম এ বাড়িতে শুভাগমন করলাম, রক্তকরবীর রং এখন তার কাছে হার মানবে।

শ্বেতা হাসিমুখে চুপ করে ছিল।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল নিশীথের, সেদিন পথে পা দিতেই উচ্চ একটা হাসির রোলে সে চমকে উঠেছিল। শব্দ আসছিল শ্বেতাদের বাড়ির দিক থেকে, অনেকটা শ্বেতার মত হাসি।

আর একদিন রজনীগন্ধা দিয়ে শ্বেতা বলেছিল,—এই ফুলের মত সৌরভ যেন চিরদিন আপনার অক্ষুণ্ণ থাকে। উত্তর দিতে গিয়ে নিশীথ থেমে গিয়েছিল,—শ্বেতার চোখের কোণে যেন বিদ্রূপের হাসি!

আজ সমস্ত ঘটনা নতুন করে বিচার করল নিশীথ। শ্বেতা আর সুপ্রিয়া—তার জীবনের উপর নির্মমভাবে পদাঘাত করে প্রস্থান করেছে। শৈশব আর যৌবনের দুটি রঙীন স্বপ্ন, প্রজাপতির মত চঞ্চল পাখায় একটু ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল মনের অন্ধকারে।

কিন্তু নিশীথ আজ বিজয়ী, সকল বেদনার ঊর্ধ্বে তার আসন। সুপ্রিয়ার চিঠি শতছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর, রক্তকরবী আর রজনীগন্ধার গুচ্ছ সে মুক্ত দ্বারপথে নিক্ষেপ করল।

পাঁচ বৎসর পরের কথা। নিশীথ কলেজ থেকে ফিরে দেখল ঘরের মধ্যে দুখানি চিঠি—বিলাতী ডাক। একখানি দিদির, গত বৎসর সুপ্রিয়া বিলেত গেছে, দর্শনের সেই অধ্যাপকটির সঙ্গে। কিন্তু আর একখানা? হাতের লেখা অতি পরিচিত। মন চিনতে পেরেছে, কিন্তু নামটা তো কিছুতেই স্মরণ হচ্ছে না।

ঠিক! কোন্ এক অদৃশ্য হাত মনের অন্ধকারে সুইচ্ টিপে দিল। মনের এই প্রগলভতায় অসহায়ের মত বসে পড়ল নিশীথ। শ্বেতা? শ্বেতা চিঠি লিখেছে এতদিন পরে! নিশীথ অনেকক্ষণ বসে রইল। একবার তাকাল টেবিলের দিকে। শূন্যগর্ভ পুষ্পাধার, রক্ত-করবী রজনীগন্ধার চিহ্নমাত্র নাই। তার মনে হল শ্বেতার সঙ্গে শেষ দেখার পর কেটে গেছে স্মরণাতীত দিনগুলি। যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে এসেছে সে একখানি চিঠির জন্য, বহু আকাঙ্ক্ষিত লিপিকা এসেছে এতদিন পরে।

নিজের দিকে একবার তাকিয়ে সে একটু হাসল। এই সময়ের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেল কেতনপুরে মা নেই, দিদি গেল বিলেত। শুধু সেই রয়েছে অপরিবর্তিত। পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা করছে এই পর্যন্ত।

শ্বেতার চিঠি চোখের কাছে তুলে ধরল নিশীথ। পড়তে সাহস হচ্ছে না। ওরা ফিরে আসছে নিশ্চয়, আবার তাকে যেতে হবে হয়তো তিনতলা বাড়ির ফটকের সম্মুখে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখবে—

নিশীথ চিঠি পড়া আরম্ভ করল। "আপনার কি সেই সব পাগলামি এখনও আছে? বিলেতে চলে আসুন না? আমরা বোধ হয় শীগ্‌গির ফিরে যাচ্ছি।"

তার শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। তাকে এভাবে পত্রাঘাত করার অর্থ কি? কিন্তু—কিন্তু—শ্বেতা—সে ফিরে আসছে! কতদিন পরে?

চিঠিটা তুলে নিয়ে আবার পড়তে আরম্ভ করল। "সুপ্রিয়াদি ভায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আপনার মধ্যে পাগলামি ছাড়া আমি কিছু পাই নি। এখানে সোসাইটিতে আমাদের দুজনেরই বেশ সুনাম হয়েছে।"

দিদির চিঠি আরম্ভ করল নিশীথ। "ওঁর সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরছি। ভারী ইন্‌টারেস্টিং। শ্বেতার সঙ্গে দেখা হয়েছে। মেয়েটা মোটের উপর বেশ সিম্‌পল। ওঁর শরীর একটু ভাল হলেই আমরা ফিরে যাব।"

নিশীথ চিঠি দুখানি হাতে নিয়ে বসে থাকল। সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল ঘরের কোণে কোণে। আলো সে জ্বালল না। অন্ধকারে ডুবে থাকতে চায়। দৃষ্টি বিস্ফারিত করে একবার শুধু তাকাল টেবিলের দিকে। সেখানে একটি সুদৃশ্য পুষ্পাধার। ফুল নেই, সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্বেকার প্রথম প্রেমের দান লুণ্ঠিত হয়ে আছে ঘরের বাইরে।

নিশীথ হঠাৎ আলো জেবলে দিল। পুষ্পাধারের বিচিত্রিত গাত্রে আলোর খেলা। সব যেন আজ রঙীন হয়ে গেল এই মুহূর্তে। এই পাগলামি অক্ষয় হোক তার জীবনে। রক্তকরবী রজনীগন্ধা সে বিনষ্ট করেছে শ্বেতার স্মৃতির প্রতীক হিসাবে, কিন্তু স্মৃতি সে লুপ্ত করতে পারে নি। তার সকল প্রয়াস হয়েছে বিফল।

দরজায় পায়ের শব্দে একটি মুহূর্তের আবেগময় স্বপ্ন গতিরুদ্ধ হল। মুখ তুলে নিশীথ দেখল টেলিগ্রাফ পিয়োন। বিরক্তির সঙ্গে খাম ছিঁড়ে পড়ল,—প্লেনে বোম্বে পৌছিলাম এইমাত্র। এই ঠিকানায় অবিলম্বে চলে আসুন। শ্বেতা।

নিশীথের কানের কাছে হাজার শানাই বেজে উঠল মধুর সুরে। মিলনের বাঁশী ডাক দিয়েছে। চোখের কোল বেয়ে নেমে এল শত শত আলোকশিখার বর্তিকা। সূর্য উঠছে,—নতুন দিনের আলো। ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌বটা ঠেকেছে আকাশের গায়ে।

সে শুধু স্বপ্নই দেখতে লাগল। কী সুন্দর খাট, নরম বিছানা। চারিদিকে কত লোক। জানালা দিয়ে চাঁদের লাল আলো এসে পড়েছে চোখের উপর। মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে কে? শ্বেতা? আর যেন চিন্তা করতে ভাল লাগছে না। শ্বেতা এসে গেছে, তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। দিদি—মা—কেতনপুর। ঝুঁকেপড়া মুখটা চীৎকার করছে,—ডক্‌টর, ডক্‌টর, হার্ট-আপ্, আর একটা ইন্‌জেকশান! নাঃ, কোন ফল নেই। মাথার শিরা ছেঁড়ে গেছে? হ্যাঁ, খুব বেশী শোক বা আনন্দে এরকম হতে পারে। আনন্দ!—নিশ্চয়ই—শ্বেতা ডাক দিয়েছে।—রক্তকরবী—আঃ—

* * * *

বোম্বেতে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দুজন সূর্যাস্ত দেখছিল।

—বিলেত থাকতে কথা ছিল, ইণ্ডিয়ার মাটিতে পা দিয়েই তুমি আমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবে।

—আমার মনে আছে সুনীল। সকালে প্লেন থেকে নেমেই টেলিগ্রাম করেছি, পরশু মূর্তিমান হাজির হবে।

—ইউ নটি গার্ল, তোমার জিনিস তাহলে মানুষ?

—ইয়েস্, একেবারে রক্ত-মাংসে গড়া। আমার ফার্স্ট লাভার, একটা রোম্যাণ্টিক পাগল।

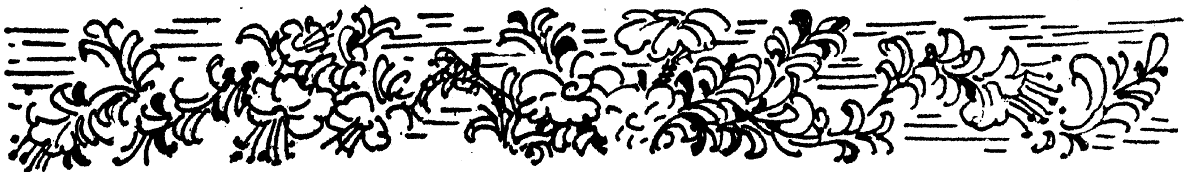
—হোয়াট? এই বিংশ শতাব্দীতে? কিন্তু বলিহারী তোমার পছন্দ শ্বেতা? এই রকম লোকের সঙ্গে প্রেম করেছ?

—অভিনয়মাত্র সুনীল, বিয়ের আগে দু'একটা প্রেমের অভিনয় তো মেয়েদের ধর্ম।

—হাউ ফানি? চল এবার হোটেলে ফিরে। তোমাদের শাস্ত্রমতে জবাকুসুমসংকাশ সূর্য অস্ত গেলেন।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সূর্য রক্তকরবীর মত—

শ্বেতার কণ্ঠ অকস্মাৎ রুদ্ধ হল। সুনীল এগিয়ে গেছে অনেকটা। চারিদিকে বালি আর বালি, সমুদ্রের নীল জল দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে একটা চিতা-বহ্নি জ্বলে জ্বলে ক্ষয় হয়ে গেল। পূর্বদিকে দ্বাদশীর চাঁদ উঠছে,—প্রভাতরবির মত রক্তরাঙা।



চিত্রপ্রদর্শনী

চিত্রাংশু

চিত্রাংশুর দ্বিতীয় চিত্রপ্রদর্শনী সম্প্রতি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত কয়েক বছর থেকে চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যা



শিবাচলমের পথ — শ্যামল রায়

ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এটা সত্যিই আনন্দের কথা। কিন্তু এই সঙ্গে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে চিত্র প্রদর্শনী তখনই করা উচিৎ যখন শিল্পীর কাজ একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয়। কিন্তু যাদের দক্ষতা এখনও শিক্ষানবিশের পর্যায়ে তাদের হাতের অপরিণত কাজ উৎসাহবর্ধক বিদ্যালয় প্রদর্শনীতেই স্থান পাওয়া উচিত, জনসাধারণের সামনে ঐ ধরণের প্রদর্শনী তুলে ধরা কোন-ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়—বরং নিন্দনীয়।

এই অপরিণত দক্ষতা, কল্পনা ও চিন্তার দৈন্য চিত্রাংশুর অধিকাংশ ছবিতে অত্যন্ত প্রকট, কোন একটি নির্দিষ্ট ধারায় তা দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে গোপাল ঘোষ শুভো ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পীর ম্যানারিজম্ অনুকৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চোখকে পীড়া দেয় এবং সঙ্গে রেখা রচনায় দুর্বলতার জন্য এই অনুকৃতি বিকৃতির পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। "মডার্ন" কাজে এই ড্রইং-এর বিপর্যয় ক্রমশঃ সহনীয় কারণ 'আধুনিক' শিল্পপ্রদর্শন এই বিপর্যয়ের জবাবদিহি করছে। কিন্তু ভারতীয় আঙ্গিকে কাজ করতে গিয়ে ড্রইং-এর এই দুর্বলতা অমার্জনীয়। অনিবার্যভাবে ড্রইং-এর অজ্ঞতায় ফর্ম এর যে বিকৃতি দেখা দেয়, তা দৃষ্টির দিক থেকে একান্ত পীড়াদায়ক।

তবুও এঁদের মধ্যে দেবনাথ মুখার্জী অনেকটা আত্মপ্রতিষ্ঠাটা লাভ করেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে 'ম্যানিফেস-টেসন' 'মংপুর পথে', 'বসন্তের আগমন' 'প্রভাত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুভাচারী দাশ-গুপ্তের দুই 'বন্ধুর' 'এফেক্ট' ভাল। শ্যামল রায়ের শিবাচলমের পথে একটি ভাল দৃশ্যচিত্র হলেও এর হলদে গাছগুলো চোখকে পীড়া দেয়—রঙটি কোমলতর হলে আরও ভাল হত। 'অরণ্যের ভিতর' ছবিটিতে অত্যন্ত বেশী রেখার জন্য রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। সুধীর বৈরাগীর 'নীল উপত্যকা' 'মধ্য রাত্রির দীপ্তি' প্রভৃতি কাজে গোপাল ঘোষের কাজের ছাপ প্রকট। ছাত্রাবস্থায় এভাবে কাজ না করে আরও 'রিজিড' কাজ করলে দৃশ্যচিত্রে তাঁর হাত আরও ভাল হবে। নিখিল বিশ্বাসের কাজে গোপাল ঘোষ শুভো ঠাকুর প্রভৃতির কাজের ছাপ প্রকট। এদের কাজের Spirit ধরতে পারেন নি তিনি তাই তাঁর রচনা এদের বিকৃত অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে। এর 'বাউল নর্তক' দেখে মনে হয়েছে কোন যোদ্ধার ছবি—বাউলের ছবি আঁকতে এতটা কসরৎ করার প্রয়োজন ছিল না। এ যেন যোদ্ধা বাউলের রূপ—এর আর সব ছবিগুলোতেও ড্রইং না জানার যে অজ্ঞতা তা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। ছাত্র জীবনে এই চমক দেবার প্রচেষ্টা লোভনীয় হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে এ পন্থা লাভজনক নয়। অমরনাথ মুখার্জির 'চিন্তিতা' মন্দ নয় কিন্তু ভারতীয় আঙ্গিকে আঁকা কখনও তার প্রাণবিহীন Formatism পীড়া দেয়।

তবুও গতবারের প্রদর্শনী থেকে এবারের প্রদর্শনী অনেকাংশে সার্থক। অতি আধুনিক হবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে যদি এঁরা শিল্পসাধনায় নিবেদিত হন—আশা করা যায়, সেইখানেই এই শিল্পীদের মুক্তি নিহিত আছে।



চিন্তামগ্ন — অমর ব্যানার্জি



প্রতীক্ষা — সুনীলমাধব

সুনীলমাধব সেন

শ্রীশিশির মিত্র আয়োজিত সুনীলমাধব সেনের একক চিত্রপ্রদর্শনী সে দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুনীলমাধব দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে কোনও ভাবে সময় বাঁচিয়ে ছবি আঁকেন। তাই ছবি আঁকায় নেশা তাঁর অন্তরের; কিন্তু তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী দেখে মনে হয়েছে যে নির্দিষ্ট পরিণতির পূর্বে সাধারণের সম্মুখে এ ধরণের প্রদর্শনী তুলে ধরা একান্ত অসার্থক হয়েছে।

সুনীলমাধবের শিল্পদৃষ্টি এখনও অপরিণত এবং কোন ধরণের কাজ যে তাঁর ভাল লাগে তা তিনি আজও ঠিক করে উঠতে পারেন নি। তাই তাঁর কাজে অতুল বোস, গোপাল ঘোষ, শৈলজ মুখার্জী, ডরোথী মেরী গগোল প্রভৃতি শিল্পীদের নানান ধারার কাজের ছাপ অত্যন্ত প্রকট। এ ছাড়া ড্রইংয়ের হাত কাঁচা থাকায় 'ফিগার'-এর কাজ দৃষ্টির দিক থেকে পীড়াদায়ক।

এর আঁকা ক্ষ্যাপা মনোহর দাস বৈষ্ণবের ছবিটি সত্যই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। 'ক্লিওপেট্রা' 'দোটানায় নায়ক' প্রভৃতি অনুকৃতিগুলো বেশ ভাল। 'তন্দ্রা' অতুল বোসের বিখ্যাত চিত্রের বিকৃত নকল। এ ছাড়া ছবিগুলোতে, দুর্বল 'স্ট্রোক' দিয়ে আঁকবার দরুণ সব ছবিগুলো মনে হয় ব্যর্থ হয়েছে।

শিল্পী 'মডার্ণ' পন্থীদের পেছনে লক্ষ্য-বিহীনভাবে ছুটে সময় নষ্ট না করে যদি সত্যিকারের ভারতীয় আঙ্গিকে কাজ করেন তা হলে তিনি তাঁর শিল্পসাধনার পথ খুঁজে পাবেন বলে মনে হয়। কিংবা যদি কিছুদিন বিলিতী 'ওল্ড মাস্টার'দের কাজ অনুশীলন করেন তবে উপকৃত হবেন। ড্রইং ও রঙে ওই ভাবে 'রিজিড' কাজ করে হাত অভ্যস্ত হলে আপনিই 'টাচ'-এর কাজ বেরুবে তার জন্য জোর করে প্রচেষ্টার দরকার হবে না।

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

"বোঁ বোঁ করিয়া শব্দটা কিসের হইতে-ছিল —"

আমি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ধবলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীংরা বলিল, "ওটি একটি প্রেতাত্মা, উহাকে আমি বশ করিয়াছি। উহার অদ্ভুত ক্ষমতা, উহা তোমাকে নির্ভুলভাবে চালিত করিতে পারে। আমি এখানে আসিবার পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ওই প্রেতাত্মাই শব্দ করিতে করিতে আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। উহার শব্দ অনুসরণ করিলে ভুল হইবার উপায় নাই। ওটি আমি ধবলকে উপহার দিয়া যাইব। আমি আর একটিকে বশ করিয়া লইব। বশ করিবার মন্ত্রটি আমি শিখিয়াছি—"

আমরা সকলে সবিস্ময়ে মীংরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মশাল আলোকে তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে চতুরতা সেদিন পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার অর্থ সেদিন বুঝিতে পারি নাই। অনেক পরে পারিয়া-ছিলাম।

মীংরা বলিল—"অনেক নূতন জিনিস আমি শিখিয়াছি, সব তোমাদের শিখাইয়া দিব। ঝিনা নদীর তীরে যে শাল সম্প্রদায় বাস করে তাহারা চমৎকার বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কয়েক দিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া আমি প্রণালীটি আয়ত্ত করিয়াছি। অনেকেই আজকাল বাসন প্রস্তুত করিতেছে। নীহু, রাবো, ঘংকাও হয়তো ইহা শিখিয়াছে। তাহারাও হয়তো একদিন আসিয়া তোমাদের ইহা শিখাইতে চাহিবে। তৎপূর্বে আমিই তোমাদের শিখাইয়া দিব। একটি পাথরের খনির সন্ধানও আনিয়াছি। কিন্তু সর্বপ্রথমে উলম্ভনের সহিত বিবাদের একটা নিষ্পত্তি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আরও অনেক স্থানে উলম্ভনের কথা আমি শুনিয়াছি। মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া বিরাট বিরাট প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। যাদুকর টম্ভা তাহাকে বলিয়াছে সে যদি শৃঙ্গধী পর্বতের উপর প্রস্তরনির্মিত একটি কবর গৃহ নির্মাণ করিতে পারে তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হইবে। সে আরও বলিয়াছে সেই কবর-গৃহের প্রাচীরে এমন একটি ছিদ্র যদি থাকে যে ছিদ্র দিয়া প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক তাহার সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা হইলে উলম্ভন অমর হইবে। যাদুকর টম্ভা বলে যদি কোন আবৃত স্থানে কেহ নিজের কবর খনন করিয়া রাখে এবং সেই কবরে যদি প্রথম সূর্যালোক প্রত্যহ প্রবেশ করে তাহা হইলে সেখানে আর কোন মনুষ্যের শবদেহ স্থান পাইবে না, কারণ স্বয়ং সূর্য দেবতা ওই স্থানটি নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। টম্ভার পরামর্শ অনুসারে উলম্ভন তাই নিজের জন্য ওইরূপ একটি কবর গৃহ প্রস্তুত করিতেছে। টম্ভার নির্দেশে সে দূরবর্তী এক পর্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রস্তরগুলি কাটিয়া শৃঙ্গধী-পর্বত-শীর্ষে লইয়া যাইতে হইলে অনেক লোক চাই। সেই-জন্য উলম্ভন লোকের সন্ধান করিতেছে। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক বহুলোক তাহাকে একত্রিত করিতে হইবে। সেইজন্য সে তোমাদের এখানে হানা দিয়াছিল। আরও অনেক সম্প্রদায়ে সে হানা দিয়াছে। শুনিয়াছি লোকটি অত্যন্ত বলশালী এবং অত্যন্ত কামুক। বহু সুন্দরী নারীকেও সে হরণ করিয়াছে। তোমরা উহার কবলে পড়িও না, পড়িলে তোমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। রোহার সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ করাই উচিত। রোহা যে সব সর্ত করিয়াছে তাহা যদিও আমাদের অনুকূল নহে, শিলাঙ্গী মেয়েটি অপয়া হইবে কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই, তথাপি বাধ্য হইয়া আমাদের এখন রাজি হইতে হইবে। রোহার গরুর জন্য কিছু তৃণ শস্য দিলে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। আরও বেশী জমি চাষ করিয়া আমরা সে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু মুশকিল হইবে শিলাঙ্গী যদি অপয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি ঈগল সম্প্রদায়ের বর্তমান দলপতি মংখীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ভালভিরা অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঈগল সম্প্রদায় বাস করে। মংখী খুব ভাল লোক। মংখীর মুখে শুনিলাম তাহার পুত্র টাকা শিকারে বাহির হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে একটি মৃত ব্যাঘ্র এবং জীবন্ত যুবতী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। বলিল যুবতীটি তাহার মোহিনী-শক্তি দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে অবশ করিতে পারিয়া-ছিল বলিয়াই টাকা ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নাকি অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ব্যাঘ্রের গুহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র এমন মুগ্ধ হইয়া যায় যে, টাকা কুঠারাঘাত করিবার পরও সে কিছুমাত্র শব্দ করে নাই। যুবতীটি পাপিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। গভীর জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষেই তাহারা সাধারণতঃ বাস করে, ফল-মূলপোকামাকড় ধরিয়া খায়। যুবতীর নাম হুঁহুঁ। অপরূপ রূপসী। মংখী বলিল, হুঁহুঁ কেবল ব্যাঘ্রকেই মুগ্ধ করে নাই তাহার শার্দুল-পরাক্রম পুত্রকেও বশ করিয়াছিল। মংখী এই অজ্ঞাত কুলশীলার সহিত পুত্রের

বিবাহ দিতে সম্মত ছিল না। টাকার আগ্রহাতিশয্যেই অবশেষে বিবাহ হইল। বিবাহের পর কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা শোচনীয়। বিবাহের পরদিন বজ্রাঘাতে টাকার মা মারা গেল। তাহার কয়েকদিন পরে মংখীর কুকুর ঘর্ষট পাগল হইয়া দলের কয়েক-জনকে দংশন করিল। যাহাদের দংশন করিল তাহারাও পাগল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা বিপজ্জনক। রাক্ষসী প্রেতিনীরা অনেক সময় মানবীর ছদ্ম-বেশে বিচরণ করিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। এই শিলাঙ্গী যে কেমন হইবে তাহা আমাদের জানা নাই তথাপি আমাদের এখন বিঘাওয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কুকুরের মতো সতর্ক থাকিয়া ভেকের মতো যখন যাহা সুবিধা তখনই তাহা করিতে হইবে। ধবল তুমি কাল প্রত্যুষেই জংলাকে লইয়া চলিয়া যাও। ইহার পর যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি আমি যে প্রেতাত্মাটিকে আনিয়াছি সে আমাদের নির্ভুল পথে চালিত করিবে। কোন ভয় নাই নিম্ব-দেবতা আমাদের ঠিক মঙ্গল করিবেন।"

...সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত মীংরা নানারূপ গল্প করিল। তাহাকে ঘিরিয়া মশাল আলোকে সেদিন আমরা অনেক অদ্ভুত কথা শুনিলাম। বিঘাও মীংরাকে পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছিল। সে তাহার ইঙ্গিত-পূর্ণ ভাষায় জানাইতেছিল যে, মীংরা যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর চিন্তার কোনও কারণ নাই। সে কখনও বলিতেছিল—'হাওয়া যখন আসিয়াছে, তখন গাছের পাতা এবার নিশ্চয় নড়িবে।' কখন বলিতেছিল—'সূর্য যখন দেখা দিয়াছে তখন অন্ধকার আর থাকিবে না'।

......পরদিন প্রত্যুষেই আমরা রোহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ ধবল আমার সহিত একটি কথা বলিল না। আমি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু ধবল আমার কথার উত্তরে যতটুকু কথা না বলিলে নয় ততটুকু কথাই বলিতেছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি কথাও বলে নাই। রাত্রে আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর বিঘাওয়ের কুটিরে গিয়া মীংরা, বিঘাও এবং ধবল আরও অনেক গল্প করিয়া নানারূপ পরামর্শ করিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ ধবল গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। ধবলের গাম্ভীর্যে আমি মনে মনে হাসিতে-ছিলাম। ভাবিতেছিলাম নিনানিকে হারাইয়া ধবল শিলাঙ্গীর মধ্যে আর একটি তরুণী ভার্যা লাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ সে স্বপ্ন সফল না হওয়াতে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাই গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

উন্নগার উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলাম বন্য গরুর দল চরিতেছে। মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধুনী মধুনীও উহার মধ্যে আছে। ধবলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলাম। ধবল কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তর দিল না। গরুগুলির দিকে চাহিতে চাহিতেই আমি পথ অতিবাহন করিতেছিলাম, গরুগুলি আমার মনে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার করতেছিল। এতদিন গরু দেখিয়া মনের মধ্যে হিংসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব উদ্রিক্ত হয় নাই, এখন

কিন্তু গরুগুলিকে দেখিয়া মন স্নেহ-রসে সিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে এ বাসনাও জাগিল যে, শিলাঙ্গীর মতো আমিও একটি গরু পুষিব। আমার মনের এই কোমল ভাব বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইতে পাইল না। আমরা একটি তরু-বীথির ভিতর দিয়া চলিতে-ছিলাম অকস্মাৎ একটি গাছের উপর হইতে কুঠারপানি এক যুবক লাফাইয়া পড়িল এবং আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল মানুষ নয়, যেন মনুষ্যাকৃতি একটি নেকড়ে বাঘ। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল সে খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল, "আমি ঝোনঝিরা। আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ শিলাঙ্গীকে লাভ করিতে পারিবে না।"

আমাদের কথা বলিবার পর্যন্ত অবসর না দিয়া ঝোনঝিরা আমাকে আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সহিতও কুঠার ছিল এবং আমরা দুইজন ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কুঠার যুদ্ধ হইল। ঝোনঝিরা আমাকেই আক্রমণ করিয়াছিল, আমিই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। দেখিলাম ঝোন-ঝিরা কুঠার চালনায় খুবই দক্ষ। আমারও এ বিষয়ে পারদর্শিতা কম ছিল না। সুতরাং অনেকক্ষণ কেহই কাহাকেও আঘাত করিতে পারিলাম না। ধবল একটু দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে আমাদের যুদ্ধ দেখিতেছিল, সহসা সে পিছন দিক হইতে আসিয়া ঝোনঝিরার মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে সজোরে কুঠারঘাত করিল। তাহার মস্তক চৌচির হইয়া গেল। ধবলের হাতের কব্জিতে যে এত শক্তি আছে তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই সে বলিল, "আমি কখনও দুইবার আঘাত করি না। এখন চল, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতে হইবে। ইহার দেহটাকে আপাতত ওই ঝোপের মধ্যে গুঁজিয়া রাখ। কেহ যেন দেখিতে না পায়। কোনও জন্তু জানোয়ারে যদি টানিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তো চুকিয়াই গেল, তাহা না হইলে উহাকে কবর দিবার ব্যবস্থা কাল কোন সময় আসিয়া করিতে হইবে। এ যুদ্ধের কথা তুমি যেন কাহাকেও বলিও না।" ঝোনঝিরার রক্তাক্ত দেহটাকে টানিয়া একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর আবার আমরা রোহার উদ্দেশ্যে পথ চলিতে লাগিলাম। ধবল পুনরায় মৌন হইয়া গেল।

...শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করা সত্যই একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যে কোথায় লুকাইয়াছিল কিছুতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। রোহা ধবলের সহিত আলাপ করিতেছিল, আমি একা একা শিলাঙ্গীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। জটিল অরণ্যের ভিতর ঢুকিয়া চীৎকার করিতেছিলাম—শিলাঙ্গী তুমি কোথায়, বাহির হইয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব। আমার চীৎকার শুনিয়া কখনও এক ঝাঁক সচকিত টিয়া কলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া উড়িয়া গেল, কখনও কয়েকটা শৃগাল একটা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঝোপে অন্তর্ধান করিল, কখনও ঘনপত্র পল্লবে একটা অদ্ভুত মর্মরে দূরাগত রোদন-ধ্বনির মতো কিসের যে আভাস দিতে লাগিল তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। অরণ্যের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলাম একটি জলাশয় রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য জলজ পুষ্প ফুটিয়া আছে। জলাশয়ের এক অংশ মরকত-শ্যাম শৈবালে আচ্ছন্ন, তাহাতেও স্বর্ণ-কান্তি অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। জলাশয়ের অপরপারে সারস জাতীয় এক পক্ষী দম্পতী ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা প্রথমে বিচলিত হয় নাই। বরং মনে হইল আমার বক্তব্যটা তাহারা প্রণিধান করিতেছে। একটি সারসের মুখভাবে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও যেন আমি লক্ষ্য করিলাম। আমি ক্রমাগত চীৎকার করিতেছিলাম—"শিলাঙ্গী তুমি কোথায় ফিরিয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব, তোমাকে বিপদে ফেলিয়া কখনও পলায়ন করিব না। আমি শপথ করিতেছি, শোন, তুমি দেখা দাও, বড়ই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে—" আমার চীৎকারে বিরক্ত হইয়াই সারস-দম্পতী অবশেষে বোধ হয় উড়িয়া গেল। জলাশয়ের পুষ্পগুলি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অরণ্যে বহু-ক্ষণ আমি ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু শিলাঙ্গীর দেখা পাইলাম না। অরণ্য পার হইয়া গিয়া পর্বত-সংলগ্ন একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, দূরে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি বন্য গরু চরিতেছে। একটি বলিষ্ঠাকৃতি ষণ্ড আমার চীৎকার শুনিয়া তাড়া করিয়া আসিল। একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। ষণ্ডটি যে ঝোনঝিরার প্রিয় ষণ্ড তাহা তখন জানিতাম না, পরে শিলাঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমিই যে ঝোনঝিরার মৃত্যুর কারণ ষণ্ডটি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল? অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় চীৎকার করিতে লাগিলাম। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ লতা গুল্মে, প্রতিটি পশু পক্ষী আমার শপথ একাধিকবার শ্রবণ করিল। শিলাঙ্গী কিন্তু দেখা দিল না। সহসা আমার ভয় হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় আর আসিবে না। ঝোনঝিরার মৃত্যু সংবাদ সম্ভবতঃ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুর আচরণে মর্মাহত হইয়া সে হয়তো আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়াছে। আর হয়তো তাহার দেখা পাইব না। কথাটা মনে হইবা মাত্র আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আমি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। সহসা আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি নীরবে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এখন ভাবিতেছি আমি রোদন করিয়াছিলাম কেন? শিলাঙ্গীকে না পাওয়ার দুঃখটা কি শিলাঙ্গীর অভাবে, না আমার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া? আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও কি আমি শিলাঙ্গীকে

চাহিয়াছিলাম? ইহার সত্য উত্তর কয়েকদিন পরেই মূর্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই।

......আমি কতক্ষণ রোদন করিয়াছিলাম জানি না, সহসা পিছন হইতে কে যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। ফিরিয়া দেখি শিলাঙ্গী। "ছি, ছি, তুমি কাঁদিতেছ? চল, আর বিলম্ব হইবে না। তুমি কোথায় কোথায় গিয়াছ আমি জানি, কি কি বলিয়াছ তাহাও আমি শুনিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, কেবল লুকাইয়া ছিলাম। ধবল রোহা বোধ হয় এতক্ষণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে চল, এবার যাই।" ......রোহা-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারেই শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। ধবল কিন্তু সমস্ত ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। রোহাও বিশেষ কিছু বলে নাই। আমার মনে হইল উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর কি যেন একটা হইয়াছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল পরদিন। রোহা ধবলকে দুগ্ধ পান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ধবল সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। ধবল বলিল যে পানীয় সে স্পর্শ করিবার কল্পনা পর্যন্ত করে নাই তাহা পান করিতে অনুরোধ করিয়া রোহা তাহাকে অপমান করিয়াছে। রোহা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ধবল তাহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে। উভয় দলপতির মনোমালিন্যের পটভূমিকাতেই সেদিন আমার সহিত শিলাঙ্গীর সামাজিক মিলনের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথা অনুসরণ করিয়া মেয়েরা যদিও নৃত্যগীত করিয়াছিল, কথক গানের সুরে সুরে লাল পাখীর সহিত নীল পাখীর প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু মৌন দুই দলপতির সৌহার্দ্যের অভাব একটা অজানিত আশংকায় সমস্ত উৎসবকে যেন ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিল। এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হইল আর একটু পরে, যখন আমি শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজেদের আস্তানার উদ্দেশ্যে পর্বত আরোহণ করিতেছিলাম। উহাদের প্রথা অনুযায়ী উহারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের সীমানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আসিল। রোহা নিজের সীমানায় শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিল। সীমানার শেষ প্রান্তে আসিয়া সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এইবার তুমি শিলাঙ্গীর ভার বহন কর।" আমি শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। রোহা তখন ধবলের হস্তে একটি জ্বলন্ত মশাল দিয়া বলিল, "অন্ধকারে তুমি উহাদের পথ দেখাও—"

......জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। একটা পার্বত্য পেচকের চীৎকার মধ্যে মধ্যে নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমার স্কন্ধারূঢ় থাকিয়াই আমাদের পথ নির্দেশ করিতেছিল। প্রথা অনুসারে তাহার নামিবার উপায় ছিল না। রাত্রে আমরা পার্বত্য পথ ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ধবল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "রোহা নিজে উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। সে বলিল ঝোনাঝিরা ফিরিয়া আসিলে সেই যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। রোহার নিজের যুদ্ধ করিবার স্পৃহা নাই। উলম্ভন যদি তাহাকে বেশী বিরক্ত করে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিতেছে। রোহার নিকট হইতে এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই। সে অবিলম্বে যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিবে এই আশাই করিয়াছিলাম। ঝোনাঝিরার সহিত আমাদের সর্তের কি কোন সম্পর্ক ছিল?" "রোহা আমাকে বলিয়াছিল যে ঝোনাঝিরা আসিলে যুদ্ধের ব্যবস্থা হইবে"

"তাহা হইলে তো মুশকিল হইল। তুমি তো একথা আমাকে ঘুণাক্ষরে বল নাই"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না। নীরবে আমরা পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অরণ্যে বৃক্ষশীর্ষে জ্যোৎস্না রহস্যময়ী হইয়া উঠিল। মনে হইল সে কি যেন একটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর ঐ কর্কশ-কণ্ঠ পার্বত্য পেচকের চীৎকার যেন হাতুড়ের মতো তাহার রহস্যপুরীর দ্বারে আঘাত হানিতেছে। আমরা একটা ঘন তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, সহসা ধবল মশালটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আতঙ্কিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিনানি, নিনানি—"

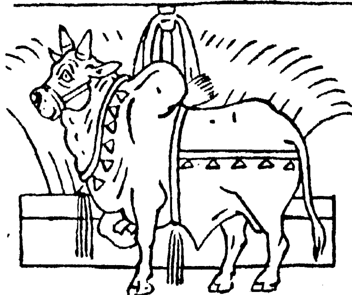
আমিও মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম একটি বৃক্ষের চূড়া হইতে ঘন পত্রপল্লব ফাঁক করিয়া নিনানি যেন আমাদের দেখিতেছে। নিমিষের মধ্যেই কিন্তু সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"নিনানির প্রেতাত্মা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আর বোধ হয় আমাদের নিস্তার নাই। সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ সে এইবারে লইবে......"

ধবল মশাল লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। আমিও কম ভীত হই নাই, আমিও ছুটিতে লাগিলাম।

শিলাঙ্গী কেবল একবার বলিল—"আমাকে কাঁধে করিয়া ছুটিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, আমাকে নামাইয়া দাও" কিন্তু তাহাকে আমি নামাইয়া দিলাম না, আমার ভয় হইতে লাগিল নামাইয়া দিলে নিনানির প্রেতাত্মা হয়তো তাহাকে আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে শিলাঙ্গীর প্রকৃত সম্পর্ক যে কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই যে নিনানির প্রেতাত্মা ওই বৃক্ষে ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিনানির আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখন মনে হইল সে মারাই গিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা দিত। কোনও বন্য পশুই হয়তো তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। কিম্বা ও সর্বগ্রাসী ময়াল সাপগুলো......। যক্ষিণীও কি মরিয়াছে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল শুধু শিলাঙ্গী নয়, নিনানিও যেন আমার স্কন্ধের উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিয়াছে এবং শিলাঙ্গীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ক্রমশ



মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মসাধনা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা একটু ঘোলাটে রকমের। তার প্রধান কারণ তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকগুলি পুঁথি এখন একেবারে লুপ্ত। যেগুলির উদ্ধার হয়েছে, সংখ্যায় সেগুলি খুবই কম এবং অধিকাংশের বিষয়বস্তুগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খণ্ড আকারে আমরা পাচ্ছি। এ বিষয়ে একটা সমগ্র ধারণা করার পক্ষে সেগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া তন্ত্রের সাধনাটা অত্যন্ত গুপ্ত ভাবে করা হয় বলে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়; আর তার সুযোগও নেই। যাঁরা তন্ত্র বা শাক্ত সাধনায় দীক্ষিত বা অভিষিক্ত হন, তাঁরাও এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান না; পাছে সাধনভ্রষ্ট হন এই ভয়ে। আর বলেও কোনো লাভ নেই। সাধকদের বিশেষ বিশেষ ইস্টদেবতাদের আরাধনা, আনুসঙ্গিক মন্ত্র ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অন্যদের ত জানাবার কথা নয়। কারণ একের ইস্টদেবতা অপরের ইস্টদেবতা না হতেও পারেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক হলেও, সে সম্বন্ধীয় সাধনার প্রণালী সাধকদের এক একজনের পক্ষে এক এক রকমের। সেইজন্য তন্ত্রশাস্ত্রের স্তুতিমূলক শ্লোকগুলি বাদ দিলে, ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান এবং সাধনভজনের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদির যে সব কথা আছে, সেগুলির কেবল ব্যাখ্যা পড়েই হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। তান্ত্রিক গুরুর সাহায্য ভিন্ন সেগুলো বোঝা বা অপরকে বোঝান,—সে এক অতি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এই সব নানা কারণে তন্ত্রবিদ্যা গুরুমুখী গুপ্তবিদ্যাই হয়ে রয়ে গেছে।

অথচ আমাদের বাঙলা দেশের প্রায় সর্বপ্রকার পূজাঅর্চনা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র, সবেরই নির্ভর তন্ত্রের উপর। তন্ত্রোক্ত আচারই হোল এর মূলে বনেদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণের পক্ষে, এ সম্বন্ধে তলিয়ে কিছু জানবার বা বোঝবার সুবিধা নেই। ঠিক যেন বাঙালীর পক্ষে হিন্দী বা উর্দু গান শোনার মতন। সুরেতে রসের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কথার ছিপিতে চারিদিক বন্ধ থাকার দরুণ পুরোপুরি সে রস উপভোগ করা যায় না। আর ঠিক এই কারণেই বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি, যাঁদের আমরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলি, তাঁদের মধ্যে প্রায় বারো আনা লোকই শাক্তধর্মাবলম্বী হলেও, তন্ত্রশাস্ত্রকে এখনও আমরা সাধারণতঃ একমাত্র পঞ্চমকারাদিরই শাস্ত্র বলে ভুল করে বসি। উপনিষদ, গীতা, মহাভারত প্রভৃতির মতন এর তেমন প্রচার নেই; আর যেটুকু ছাপা পুঁথিতে পাওয়া যায়, তা পড়ে সবটা বোঝবারও উপায় নেই। তাই ভুলই বুঝি।

তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মুনির নানান মতের মতন, পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মতামত আছে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তচর্চাটা খানিকটা সাহিত্য বা আর্টের চর্চার মতন। নানা লোক তার নানা রকমের আখ্যা-ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন। স্থিরনিশ্চয় করে কোনো কথাই বলা যায় না। এ সম্বন্ধে শেষ কথাটা যে কবে বলা হবে, তা কেউই বলতে পারেন না। কখনও যে বলে শেষ করা যেতে পারবে, তাও মনে হয় না। তবে বলতে পারলে আর কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করবে না। পণ্ডিতদের রচনাগুলোও সব নীরস বলে বোধ হবে। বৈচিত্র্যই হচ্ছে সব আনন্দের মূল।

পণ্ডিতদের কেউ কেউ তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদমূলক মনে করে থাকেন। আর যাঁরা তন্ত্রশাস্ত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা দেন, তাঁরাও তন্ত্রকে বেদেরই সামিল বলে ধরে নেন। এ দলের পণ্ডিতরা বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান সাধনা হচ্ছে মানুষের নিজের মধ্যে যে সব শক্তি গুপ্ত হয়ে আছে তারই সংকর্ষণ করা; যাতে শক্তিকে বশ করে তার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়। এর উদ্যম তাঁরা বেদেও দেখতে পান। বেদোক্ত অনেক কর্মানুষ্ঠান তাই তন্ত্রোক্ত পূজাঅর্চনা ক্রিয়াকর্মের মতনই; অন্ততঃ অথর্ববেদে তো বটেই।

বেদের সমসাময়িক বলে মেনে নিলেও দেখা যায়, তন্ত্রের ভাষা অত্যন্ত অর্বাচীন। বৈদিক সংস্কৃত ও তন্ত্রের সংস্কৃতের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন গ্রন্থকার ছাড়া প্রাচীন কোন আচার্যই ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোনো শাস্ত্রের টীকা-ভাষ্যে প্রমাণের নিমিত্ত, তন্ত্রোক্ত কোনো বচন উদ্ধৃত করেননি। এ যুগেও এক রাজা রামমোহন রায় ছাড়া অন্য কোনা আচার্যকে তা করতে দেখা যায়নি। আর রামমোহন রায়ও প্রধানতঃ মহানির্বাণতন্ত্রকেই আশ্রয় করেছেন; কিছু কিছু কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতি আরো দু'চারটি তন্ত্রের বচন উদ্ধার করলেও।

ভাষা যাই হোক, ভাবের ধারার দিক থেকে, অনেক পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদের পরম্পরা বলেই মনে করেন। সেই কারণে, অনেকে ভগবান শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী' বলে এক অতি উপাদেয় খণ্ড কাব্যকে, তন্ত্রশাস্ত্রেরই পদ্যে লেখা এক ব্যাখ্যা বলে বোধ করেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা এই কবিতার প্রথম চরণটি উদ্ধৃত করে দেখান।—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তবেই তিনি তাঁর কর্ম সমাধা করতে সক্ষম, নচেৎ দেবাদিদেবেরও নড়ন চড়ন শক্তি রহিত। সেইজন্য ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকল দেবতাই এই শক্তিরই আরাধনা করেন। এক্ষেত্রে আমার মত পুণ্যহীন ব্যক্তি কি করে তাঁকে প্রণাম করতে বা তাঁর স্তুতি গান করতে পারে?

শক্তি সঙ্গে সঙ্গে আছেন বলেই শিব সর্বশক্তিমান মহেশ্বর। শক্তি তাঁকে ছাড়লেই তিনি হন ইকার-হীন শবমাত্র। কোনো কাজই তখন তাঁর দ্বারা আর সম্ভব নয়।

কাব্যপ্রিয় লোকদের কাছে এই 'আনন্দলহরী' এক অপূর্ব মনোরম কবিতা। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার এই কবিতাটিকে শেলীর Ode to Intellctual Beauty নামের পদ্যটির সঙ্গে তুলনা করে, কাব্য পড়াবার সময় ব্যাখ্যা দিতেন। আবার তান্ত্রিক সাধকদের কাছে, তন্ত্রশাস্ত্রের সব গূঢ় রহস্যই এই কবিতার পদে পদে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁরা বলেন, সাধন রহস্যের গুহ্য ব্যাপার দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে, দিব্য দৃষ্টি থাকলেই যা কিছু গোপনে আছে, তা ব্যক্ত হয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আর একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁরা সোজাসুজি তন্ত্রশাস্ত্রগুলিকে মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র বা বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র বলেই মেনে নেন। তন্ত্রোক্ত দেবদেবী সবই, বৌদ্ধধর্মের শেষ দিককার বৌদ্ধ দেবদেবীই মাত্র। তন্ত্রের সাধনভজন, পূজাপার্বণ স্তবআরাধনা, মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠানপদ্ধতি সবই ঐ একই পর্যায়ের। প্রচার আছে, তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি কৈলাসে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম নেপাল, তিব্বত, চীনে গিয়ে, সেখানকার প্রচলিত সাধারণ ধর্মের এবং তারই আচারঅনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতির সঙ্গে মিলেমিশে, কৈলাস, অর্থাৎ হিমালয় পাহাড়ের কাছাকাছি প্রদেশগুলো প্রদক্ষিণ করে, আবার আর্যাবর্তে মহাযান বৌদ্ধধর্মরূপে প্রবেশ করল। তন্ত্রশাস্ত্রগুলো দেবদেবী, মন্ত্রতন্ত্রবহুল সেই

বৌদ্ধধর্মেরই শাস্ত্র। তখন সংস্কৃতে পারদর্শী অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত দেখা দিয়েছেন। তাঁরা পালির অসাধু ভাষা ত্যাগ করে, সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রচনা করতে মনোযোগ দেন। সেই কারণে তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষা সে যুগেরই সংস্কৃত ভাষা।

আবার একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁরা বলেন যে, এই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণের ফলে। তাঁদের মতে তন্ত্রশাস্ত্র এক প্রকার সংকর শাস্ত্র। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মকে যখন একেবারে তাড়ান হ'ল, তখন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধযুগের অনেক আচার-অনুষ্ঠান যন্ত্রমন্ত্র, দেবদেবীকে, জাতে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোঠায় উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সেগুলোকে একটু আধটু পরিবর্তিত ও মার্জিত করে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের নামে তাদের বেমালুম চালিয়ে দিয়ে গেছেন। এমন কি, বৌদ্ধ ট্রেডমার্কটা পর্যন্ত একেবারে ধুয়ে মুছে উঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দেখান, এরকম খানিকটা ক্রীশ্চানধর্মেও ঘটেছিল। ক্রীশ্চানরা যখন পেগান ধর্মকে তাড়িয়ে ক্রীশ্চান ধর্মের ভাল করে পত্তন করেন, তখনও অনেক পেগান আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কাণ্ড ক্রীশ্চান ধর্মের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল।

এই মতটা যে সব পণ্ডিতরা পোষণ করেন, তাঁদের মতে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে, এই বাঙলা দেশ। ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাঙলা দেশ বহুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের আওতার মধ্যে ছিল। বাঙলা দেশের পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁরা পুরুষানুক্রমে প্রায় ৮০০ বছর আন্দাজ বাঙলা দেশে রাজত্ব করে গেছেন। বৌদ্ধধর্মের বাতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সম্পূর্ণ নিবে যাবার পরও, বাঙলা দেশে মিটমিট করে অনেক-দিন ধরে জ্বলেছিল। তারপর একেবারে নির্বাপিত হয়, সেন রাজাদের হিন্দুয়ানীর জোরে।

সেন রাজাদের দ্বারা নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলা দেশে আবার যখন নানা জাতির সৃষ্টি বেশ পাকা হয়ে উঠল, তখন বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁদের খানিকটা বুদ্ধি-শুদ্ধি, জ্ঞানগম্য ছিল, তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ্য আচার গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উঁচু জাতের লোক হলেন, আর যাঁরা বুদ্ধি-শুদ্ধিতে ওঁর মধ্যে একটু কম ছিলেন, মাথার কাজের চেয়ে হাতের কাজে যাঁরা বেশী মজবুত ছিলেন এবং হাতের কাজ করেই দিন গুজরান করতেন, তাঁরাই হলেন নিম্ন শ্রেণীর বা নীচু জাতির লোক।

পূর্বকালের সেই বাঙালী বৌদ্ধদের উপর নতুন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে যে হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হোল, সেই হিন্দুধর্মের শাস্ত্রই হোল তন্ত্রশাস্ত্র। আর নীচু জাতের যা লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান রইল, সেটা ত মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মেরই আচার অনুষ্ঠান মাত্র। অনেকদিন ধরে তার কিছু কিছু হিন্দু সংস্করণ হলেও, তাদের এখনও বেশ সহজেই চেনা যায়। এমন কি, এই জাতের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোপুরি বৌদ্ধসম্প্রদায়কেই পণ্ডিতরা দেখতে পান। আর দেখা যায়, এ সব সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে উপরকার জাতের লোকদের দিনকারদিনের কাজ চালান না যেতে পারলেও, তান্ত্রিক গুপ্ত সাধনা ব্যাপারে, এঁদের, বিশেষতঃ এঁদের স্ত্রীজাতি-দের, বেশ একটা বড় স্থান ছিল এবং এখনও তা রয়ে গেছে।

এই দুই ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে বাঙলা দেশেই তান্ত্রিক সাধনার বিস্তৃতি ও তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলির প্রাচুর্য দেখা যায়। আর বাঙলা দেশেই দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, তারা প্রভৃতি দেবীর পূজাই বেশী। তাছাড়া ছোটখাট দেবীও অনেক আছেন, যাঁদেরও বৌদ্ধ দেবী বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। যেমন, চণ্ডী, গন্ধেশ্বরী, মনসা প্রভৃতি। চড়কপুজো, ধর্মপুজো এবং তৎসংলগ্ন গাজন প্রভৃতি এমনকি রথযাত্রাও, পণ্ডিতদের মতে বৌদ্ধ পুজো পার্বণ। সেগুলিও বাঙলা দেশেরই বিশেষত্ব। এই সব পণ্ডিতরা আরও বলেন যে, বাঙলা দেশেই জন্মগ্রহণ করে, বাঙলা দেশেরই মারফৎ, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, যেমন কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসার হয়েছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের মতন অন্য কোথাও এই শাস্ত্রকে খুব বড় এক প্রমাণ শাস্ত্র বলে দোহাই দেওয়া হয় না।

এই সব পণ্ডিতরা আরও বলেন যে, এক কালে বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজে, পুজো পার্বণ ও অন্যান্য ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও, পারিবারিক এবং সমাজগত দশ রকমের সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলি তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতেই আচরিত হোত। দায়াধিকার, উত্তরাধিকার ব্যাপারগুলোও তন্ত্রেরই বিধানে চলত। এমন কি অপরাধের দণ্ডবিধান পর্যন্ত তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশেই দেওয়া হোত। পাপকার্যের প্রায়শ্চিত্ত ত বটেই। কিন্তু বাঙলা দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকার করে, বৌদ্ধ থেকে যখন আস্তে আস্তে পুরোপুরি হিন্দু হয়ে পড়লেন, তখন থেকেই তাঁদের চেষ্টা চলতে লাগল, কি করে অন্ততঃ ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের মত স্মার্ত মতের বিধানগুলো বাঙলা দেশে বেশ চালু করতে পারা যায়; যাতে করে বাঙলা দেশেরও ভদ্র সমাজ আচারে, ব্যবহারে, উত্তরাপথের ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একই তালে চলতে পারে। ক্রমে ক্রমে স্মৃতির বিধানগুলোর চাপে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাবহারিক বিধানগুলো বাঙলা দেশের প্রকাশ্য সভা ছেড়ে একেবারে বিদায় নিলো। শুধু রয়ে গেল তন্ত্রের দেওয়া পুজোপার্বণ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, হোমযাগ, মন্ত্রযন্ত্র ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠানগুলি। সেই সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনমার্গ চলে গেল গুপ্ত পথে। তার গুপ্ত সাধন সমাধা হোতে লাগল অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর সেই কারণে কালক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রকে ভেল্কী বাজীর এক গুহ্য শাস্ত্র বলে লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল।

বাকীটা যা নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে আঁকড়ে ধরে পড়েছিল, তাও শেষ হয়ে গেল বৈষ্ণবধর্মের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে উচ্চ শ্রেণীরা নিম্ন শ্রেণীদের ঘৃণা করে যতই দূরে রাখতে আরম্ভ করলেন, ততই শেষোক্তেরা দলে দলে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করতে লাগলেন। কিন্তু শেষকালে হিন্দুসমাজের মধ্যেই চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতিদের দেওয়া খাঁটি বৈষ্ণব ধর্ম, এমন এক জাতিগত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল যে, কথাই চলে গেল,—'জাত হারালে বোষ্টম'। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যখন বৈষ্ণব হয়েও হিন্দুয়ানীর অত্যাচারের হাত এড়াতে পারলেন না, তখন আর না পেরে অবশেষে দলে দলে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে আর হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া ফকির দরবেশদের সাধনভজনের মধ্যেও আবার পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ধর্মকেই রূপান্তরিতভাবে দেখতে পান।

সেনরাজ্যে নতুন হিন্দুসমাজের অভ্যুদয়ের পরে আস্তে আস্তে শুধু যে তন্ত্রশাস্ত্রগুলোই বাঙলাদেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তা নয়, কালক্রমে অনেক ব্রহ্মণ্যশাস্ত্রও লোপ পেয়ে গেল। কেবল থেকে গেল স্মৃতি আর ন্যায়ের চর্চা। অপরাপর শাস্ত্রচর্চা গুটিকতক লোকের এক একটি ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কোনরকমে বেঁচে রইল কি না রইল। এই অবস্থা চলল সমস্ত মুসলমানী আমলের থেকে ইংরেজ রাজত্ব পাকা হয়ে বসবার আগে পর্যন্ত। তারপর বিদেশীদের অদম্য কৌতূহলের উৎসাহে এবং ইংরাজিনবীশ দিশী পণ্ডিত ব্যক্তিদের চেষ্টায় এ সব লুপ্ত শাস্ত্রের ক্রমে ক্রমে পুনরুদ্ধার হোল। এখন বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্রের কথা অনেকেই জানেন; প্রায় সকলেই কিছু না কিছু শুনেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের কথাও আজকাল অনেকে আস্তে আস্তে কিছু অবগত হচ্ছেন। তবে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা হেয় ভাব এখনও দূর হয়নি।

রাজা রামমোহন রায় যখন ইংরাজি আমলের গোড়ার দিকে তাঁর লেখা ধর্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে, তাঁর যুক্তির প্রমাণ

স্বরূপ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে দিতেন, তখন সে সময়ের পণ্ডিত লোকেরাও অজ্ঞানতা বশতঃ, সেগুলোকে রামমোহন রায়ের নিজের কল্পিত শাস্ত্রবচন বলে, হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাই করেছেন। সমগ্র মহানির্বাণতন্ত্রখানাই রামমোহন রায়ের নিজের রচিত বলে, সেকালের লোকদের বিশ্বাস ছিল। শুধু শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছাড়াও এর আরও একটা দুটো কারণ ছিল। রামমোহন রায়ের গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রের প্রচলিত একমাত্র টীকা তাঁরই বিরচিত। কিন্তু এই টীকা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তার সাহায্যে শ্লোকগুলির ভাবার্থ বোঝা মোটেই সহজ কর্ম নয়। পরম্পরাক্রমে প্রচারের নিমিত্ত রামমোহন রায় এই ধর্মগ্রন্থের অনেকগুলি শ্লোকের খানিকটা করে বাঙলা ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে গেছেন। হরিহরানন্দনাথ তান্ত্রিক সাধনায় পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে অবধূত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটান। এঁরই কনিষ্ঠ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জীবনের শেষ পর্যন্ত রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার প্রথম আচার্য পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সব ছাড়া তখনকার দিনের হিন্দুসমাজে একটা প্রকাণ্ড ব্রহ্মভীতি ছিল। পাছে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করে, লোকে প্রচলিত পূজো অর্চনায়, আচার নিয়মে ও তৎসংলগ্ন উৎসব আমোদে আস্থাহীন হয়ে এ সব বর্জন করেন, সেজন্য সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ব্রহ্ম নাম শুনলেই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়তেন। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করাও তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যার চর্চাও করতেন না এবং যখনই সুবিধা পেতেন তখনই ব্রহ্মসাধকদের কটূক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি করতেন। এ ভয় একেবারে না গেলেও এখন আর ততটা নেই।

আবার অনেক পণ্ডিতদের এই মত যে, যে সব পূজাপার্বণ দেবদেবীদের বৌদ্ধ মহাযানসংক্রান্ত বলে অন্য পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন, সেগুলি আসলে কিন্তু বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম আগত হবার অনেক পূর্বেই এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেগুলিকে এদেশ থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করতে না পেরে, প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মই এদের অনেকগুলিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর বৌদ্ধধর্ম অপসারিত হলে এগুলো পুনর্বার হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তন্ত্রোক্ত পূজোঅর্চনা, দেবদেবী সেই আদিম যুগেরই পূজোঅর্চনা, দেবদেবী; এ সবকে বৌদ্ধ বলে মনে করাটা ভ্রমমাত্র।

এসব তো গেল পণ্ডিতদের মতামত। কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী ভক্তসাধক লোকেরা বলেন, তন্ত্র যখন শাস্ত্র বটে, তখন তার উদ্ভব উৎপত্তি এই সব কথা নিয়ে, জল্পনা কল্পনা করার কি প্রয়োজন? আর তাতে শেষ পর্যন্ত কোন কিছুরই প্রতিষ্ঠা করতে পারা যায় না। অপরাপর শাস্ত্রবাক্যের মতন তন্ত্রের বচনও সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছে এবং সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। কেউই এর রচয়িতা নন, এর বিধানকর্তা নন। কালে কালে ঋষি, মুনি, জ্ঞানী, মনীষী, সাধক, ভক্তরা মানুষের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্রবাক্য ধারণ করে, সেগুলিকে উচ্চারণ করে জগতে তার প্রচার রেখে গেছেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি কোনো বিশেষ সময়ে এইসব শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন নি।

এখন তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং মহানির্বাণতন্ত্র কি বলছেন দেখা যাক। কৈলাস পর্বতের শিখরে এক সময়ে মহাদেব সুখে আসীন। তাঁর মন প্রফুল্ল, দৃষ্টি প্রসন্ন। এই সময় তাঁকে প্রশ্ন করলে, সদুত্তর পাওয়া যাবে এই ভরসায়, দেবী ভগবতী ভগবান শঙ্করকে বল্লেন,—ভগবন্! কলিযুগে মনুষ্য জাতির কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেখছেন ঃ—

> আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্বধর্মবিলোপিনি।
> দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্মপ্রবর্তকে॥
> মহানির্বাণতন্ত্র। প্রথম উল্লাস। ৩৭ শ্লোক।

সকল ধর্মনাশী পাপ কলির আগমনে দুরাচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপকর্মেরই প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এখন,—

> ন বেদাঃ প্রভবন্ত্যত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
> নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্॥
> বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
> তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্মকর্মবহির্মুখাঃ॥
> ১।৩৮—৩৯

এই কলিযুগে বেদের প্রভাব নেই, স্মৃতি ও স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত। নানা পথপ্রদর্শক বিবিধ ইতিহাসযুক্ত পুরাণও এখন বিনষ্ট। এই সময় মনুষ্যেরা ধর্মকর্মবিমুখ। এই সময় লোকেরা—

> উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্মরতাঃ সদা।
> কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্মুখাঃ শঠাঃ॥
> স্বল্পায়ুর্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ।
> নিঃশ্রীকা (১) নির্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ॥
> নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ
> পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ (২) খলাঃ॥
> পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবর্জিতাঃ।
> নির্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ॥
> ১।৪০-৪৩

কলিযুগে ব্রাহ্মণদেরও দুর্দশা দেখুন—

> বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবিবর্জিতাঃ।
> অযাজ্যযাজকা(১) লুব্ধা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ॥
> অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ (২)
> কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যা (৩) স্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ॥
> লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
> পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ (৪) শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জিতাঃ॥
> কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ (৫) শূদ্রসেবকাঃ।
> শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ। (৬)
> দাস্যন্তি (৭) ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
> ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্॥
> নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্॥
> ধর্মশাস্ত্রে সদানিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্॥
> ১।৪৫—৪৯

এই অবস্থা দেখে জীবদের প্রতি দয়াশালিনী ভগবতী মনুষ্যকুলের কিসে উদ্ধার হয়, সেই তথ্য জানতে চাইলেন। এই সম্বন্ধে সদাশিবের মুখ থেকে যে তত্ত্ব নির্গত হোল, তারই নাম আগম, আর দেবীর মুখ থেকে যা বেরোল, তার নাম নিগম। উভয় মিলিয়ে সংক্ষেপে তাকেই বলা হয় তন্ত্রশাস্ত্র।

সদাশিব বল্লেন,—এই কলিযুগে সকলেই ভোগ চায়। ভোগের কথা বাদ দিয়ে, শুধু যোগের কথা শোনালে, কেউই তা' শুনতে চাইবে না। কলিযুগে ত্যাগের কথা শোনালে তাতে বিশেষ কোনো ফল হবে না।

তা ছাড়া এসবের কথা ত অনেক বলা হয়েছে, মানুষে শুনেছে কি? আর শুনবেই বা কেন? মানুষ হয়ে যখন জন্মপরিগ্রহ করতে হয়েছে, তখন ভোগ ত করতেই হবে। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েও কি ভোগের হাত থেকে মুক্তি আছে? তখনও যে মন বিষয়াসক্তিতে জর্জরিত থাকে। তা না হলে সাধুদেরই বা কেন গুরুগিরি করার চেষ্টা? কেনই বা তাঁদের মঠ, আশ্রম, বাড়িঘরদোরের প্রয়োজন? কেনই বা চেলাচামুণ্ডার দরকার?

তন্ত্রশাস্ত্রে সেইজন্যই আছে এ কালের উপযোগী একসঙ্গে ভুক্তিমুক্তি দুয়েরই কথা। এর উপদেশ মতন চললে লোকের ব্যাবহারিক পারমার্থিক উভয় রকমেরই কল্যাণ একসঙ্গে সাধন হয়।

> ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে।
> নিগমাগমজাতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ॥ ১।৫০
> মদ্বক্ত্রোদ্দিতং ধর্মং হিত্বান্যং ধর্মমীহতে।
> অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি॥
> নানাঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
> যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥
> ২।১৯-২০

তন্ত্রমার্গে ভুক্তিমুক্তি একসঙ্গেই করায় বলে, এই মার্গে সাংসারিক সুখ আছে, আবার মোক্ষও আছে।

তবে ভোগ করারও রকম জানা চাই। যে-ভোগ করলে মানুষ কেবল ভোগীই থেকে যায়, সে ভোগে তো মানুষ ভোগের দাস হয়। ভোগকে হজম না করতে পারলে আধ্যাত্মিক অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। আবার এমন ভোগও করা

---

(১) শ্রীহীন; (২) পরগ্লানিরত।

(১) যাজনে অযোগ্য লোকেরও যাজন করান; (২) অতিশয় প্রবঞ্চক; (৩) ব্রতভ্রষ্ট; (৪) পণ্ডিত বলে নিজেকে মনে করে, অভিমান করেন; (৫) পতিত; (৬) শূদ্রস্ত্রী গমনে অভিলাষী; (৭) দান করেন।

যেতে পারে, যাতে করে মানুষ সবই উপভোগ করে, ভোগেই তৃপ্ত হয়ে, অবশেষে তাতেই মোক্ষলাভ করতে পারে। শক্তির সাধনা করে এমন শক্তি অর্জন করতে পারা যায়, যাতে মানুষ ভোগের দাস না হয়ে শক্তির দ্বারা ভোগকেই সাধনমার্গে কাজে লাগাতে পারে, তাতে ভোগ মুক্তিপথের অন্তরায় না হয়ে সহায়কই হয়।

ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে? কিন্তু এটা কি করে হয় সেই উপদেশই মহানির্বাণে আছে। সেইজন্য সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শক্তিসাধনাই ভুক্তির মধ্যেই মুক্তির রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে। এই তার সাধনা; এই তার উপদেশ; এই তার বিষয়বস্তু।

'তন্ত্রাণি ভুক্তিমুক্তি করাণি।' কিন্তু অনধিকারী, অজ্ঞানী লোকেদের হাতে পড়ে, ভোগের সাধনা থেকে পাছে মুক্তির কথা উড়ে যায়, সেইজন্য এই শাক্তধর্ম গোপনে সাধন করার আজ্ঞা দেওয়া আছে। এর অধিকারীকে অনেক কঠিন সাধনা গুপ্তভাবেই করতে হয়। কিন্তু এই গুপ্ত সাধনার জন্যই লোকের কাছে তন্ত্রশাস্ত্র এত বিভীষিকাপূর্ণ; এত অবজ্ঞার বস্তু। ভেল্কীবাজীর প্রহেলিকার মতন বলে ভ্রম হয়। কিন্তু সেটা শাস্ত্রের দোষে নয় সাধকের দোষে, এ কথাটি সর্বদাই মনে রাখতে হবে। কিছুতেই ভুললে চলবে না।

এই রহস্যই জানবার জন্য মহামায়া মহাদেবের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রেরই পরম তত্ত্ব; যাতে মনুষ্যকুল ব্রহ্মকে জানতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে, ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হতে পারে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংসারযাত্রাপথেও সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ॥
স্বদারনিরতাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥
১।৭১--৭৩

সদাশিব বল্লেন,---

অধিকারিবিভেদেন পশ্বাহুল্যতঃ প্রিয়ে।
কুলাচারোদিতং ধর্মং গুপ্তার্থং কথিতং ক্বচিৎ॥
২।২২

কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্।
যস্যোপাসনাতো মর্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি॥
৩।২

মানুষের মধ্যে পশুভাব বেশি হওয়ার জন্য সকলেই এই রহস্য জানার অধিকারী নয়; সেইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের কুলাচার-বিশিষ্ট ধর্ম, গোপনভাবে সাধন করার কথা বলা হয়েছে। এই সাধনাতে ভোগ ও মোক্ষ একই সঙ্গে হয়।

এইখানেই রহস্য সমাধানের খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা, ব্রহ্ম পরায়ণ হলে, ভোগ করেও ভোগকে অতিক্রম করা যায়। তখন সে ভোগে ক্ষয় নেই, অতৃপ্তি নেই, অমঙ্গল নেই। ঐহিক কল্যাণ না হলে ত পারমার্থিক কল্যাণ হয় না। ব্যাবহারিক মঙ্গল না হলে, পারমার্থিক উন্নতির আশা করা বৃথা। ইহকালের গতি না হলে, পরকালে মুক্তি নেই। কিন্তু এই কল্যাণ, এই উন্নতি, এই গতি সবই, নির্ভর করছে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার উপর, ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করার উপর, ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হওয়ার উপর। এককথায় ব্রহ্মসাধনার উপর। মহানির্বাণতন্ত্রের সার কথা ব্রহ্মসাধনা। আর ব্রহ্মজ্ঞ না হলে,---

পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥ ২।১৬

ভিত্তিতে ধৃত পুতুল যেমন চোখ কান নাক হাত পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়েও, কর্মব্যাপারে অসমর্থ; তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ শক্তি আশ্রয় না করলে, রাশি রাশি মন্ত্রেও অভীষ্ট কার্য সাধন অসম্ভব।

মহানির্বাণতন্ত্রে ভুক্তি আর মুক্তির উপর সমানভাবে জোর দেওয়া আছে বলে, আর তাতে ভোগ ও মোক্ষ দুয়েরই একসঙ্গে প্রাপ্তি কিসে হয়, সেই কথা বলা আছে বলে, অনেকে ভুল করে মহানির্বাণতন্ত্রকে নিবন্ধ গ্রন্থ বলে মনে করেন। অর্থাৎ, এই গ্রন্থ যেন অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করে একত্র করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। মহানির্বাণতন্ত্রটি অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থগুলির অপেক্ষা অনেকটা বেশি সম্পূর্ণ আকারে আমাদের কাছে এসেছে। আর এই তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে অনেক বেশি সম্বদ্ধভাবে সাজান বলে, অন্য তন্ত্রশাস্ত্রদের সঙ্গে এটির প্রভেদটা সহজেই চোখে পড়ে; এবং এটিকে একটা সংগ্রহ গ্রন্থ বলে ভ্রম হয়।

মহানির্বাণতন্ত্রে সরলভাবে ব্যাবহারিক, পারমার্থিক দুইদিকেই সমানভাবে উপদেশ দেওয়া আছে বলে, এই তন্ত্রটি শক্তিসাধকদের কাছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ তন্ত্র বলে গণ্য। আর বেদপুরাণাদি ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রের তত্ত্ব এই এই তন্ত্রে চুম্বকে সহজভাবে প্রকটিত হয়েছে বলে, এই তন্ত্রপাঠে ঐসব শাস্ত্রপাঠেরই কাজ হয়। কলিকালের উপযোগী করেই এই তন্ত্র মহাদেব সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন।—

কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
২।৩১

অর্থাৎ, হে শিবে বেদেই কি, পুরাণেই বা কি? আর বহু শাস্ত্রেই বা কি কাজ? এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত হলেই সর্বসিদ্ধিলাভ ঘটে। আরো বলা হয়েছে,—

কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ।
জ্ঞানম্রেতন্মহাতন্ত্রং কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে॥
১৪।১৯৭

যিনি এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত হয়েছেন, তাঁর তীর্থভ্রমণেই কি আবশ্যক; আর জপযজ্ঞ বা অন্য কোনো সাধনভজনেই তাঁর কি প্রয়োজন? এই মহাতন্ত্র জানার দ্বারাই তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

স বিজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রেষু সর্বধর্মবিদাং বরঃ।
স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য এতদ্বেত্তি কালিকে॥
১৪।১৯৮

হে কালিকে, যিনি এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত আছেন তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী; তিনি সকল ধর্মজ্ঞদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিনি জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ, সাধুপুরুষ।

অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
কিমন্যৈর্বহুভিস্তন্ত্রৈর্জ্ঞাত্বেদং সর্ববিদ্ভবেৎ॥
১৪।১৯৯

একমাত্র এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত হলেই সর্বজ্ঞ হতে পারা যায়, তখন আর বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা, অন্য তন্ত্রের, এ সবের কি আবশ্যক?

এত প্রশংসার কি কারণ? কারণ আছে। একমাত্র এই মহানির্বাণতন্ত্রেই বিশেষভাবে সবার উপর ব্রহ্মসাধনার কথা বলা আছে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলে দেওয়া আছে। ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

সর্বধর্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ॥ ১৪।২০০

এই তন্ত্র সর্বধর্মসমন্বিত। কারণ, ব্রহ্মই এই তন্ত্রের সাধনবস্তু। এই তন্ত্র পাঠ করলে ও পাঠ করালে মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানী হন।

অনেক রকম পূজাঅর্চনা, অনেক রকম যাগযজ্ঞ, মন্ত্রযন্ত্র, ধ্যানজপ, ক্রিয়াকাণ্ডের কথা এই মহানির্বাণতন্ত্রে থাকলেও, এ সবের ঊর্ধ্বের যে পরম তত্ত্বটি সেটি এর মধ্যে আছে বলেই, তার জন্য এই তন্ত্র অন্য তন্ত্রগুলির চেয়ে বড়। অন্যান্য তন্ত্রগুলি এক একটি বিশেষ বিশেষ দেবদেবী সংক্রান্ত তন্ত্র। সেই সম্বন্ধীয় সাধনভজন, স্তুতিমন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠানের আরাধনা উপাসনারই তন্ত্র। সে সব দেবদেবী বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন মানুষের বিশেষ বিশেষ ইষ্টদেবতা। সকল মানুষের জন্য সর্বকালের পরমদেবতা নন। দেশ কাল পাত্রের অতীত যে এক সার্বভৌম বিদ্যা ও তার সাধনা আছে, অন্য তন্ত্রে তার বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা নেই। ব্রহ্মবিদ্যা এবং তারই সাধনাটাকে মহানির্বাণতন্ত্রে বিশেষ করে দেখান হয়েছে বলে, এই তন্ত্রের তত্ত্ব সকলের কাছে প্রকাশ করা যায়। শক্তিমার্গের সাধকদের কাছে এই তন্ত্র তাই পরমা সম্পৎ, পরমা গতিঃ, পরম আনন্দঃ।

সমস্ত মহানির্বাণতন্ত্র চোদ্দটি পরিচ্ছেদে বা উল্লাসে বিভক্ত। মানুষের ব্যাবহারিক পারমার্থিক সমগ্র জীবনের কথা মহানির্বাণ-

তন্ত্রে পাওয়া যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দশ সংস্কারের বিবরণ, মৃত্যুর পর অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান, পাপমোচনের উপায়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অপরাধের দণ্ড, দায়াধিকার ইত্যাদি বহুপ্রকার নিত্যব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনেক কথাও এই তন্ত্রে আছে। এ ছাড়া পূজা, অর্চনা, তর্পণ, বলিদান, যজ্ঞ, হোম, ন্যাস, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, জপ, মন্ত্র, মন্ত্র-প্রয়োগ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন এসব গুপ্ত গুরুমুখী সাধন বিষয়েরও অনেক তথ্য এই তন্ত্রে আছে। এর উপর আছে আহারবিহার, ঔষধ উপচার, শোধন শান্তি ইত্যাদিরও অনেক কথা। অনুমানে মনে হয়, এই তন্ত্রোক্ত ব্যাবহারিক কর্মের বিধিনিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, অনুশাসন, দণ্ড, দায়াধিকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিগুলির পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলাদেশে হওয়ার আগে, এদেশে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্মৃতিই জয়লাভ করল, আর তন্ত্রগুলো কেবল ধর্মানুষ্ঠানও সাধনারই অঙ্গ হয়ে রইল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এসবের উপর মহানির্বাণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় করে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মসাধনার কথা। শ্রুতিমূলক ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে এই তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু শ্রুতিতে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকটাতেই বেশি করে জোর দেওয়া আছে, মহানির্বাণতন্ত্রে সেইরকম উপাসনা, আরাধনা, জপ প্রভৃতির দ্বারা সাধনার দিকটাই বেশি করে বলা আছে; যাতে কলিকালে ব্রহ্মবিদ্যা সহজেই আয়ত্ত করতে পারা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা কি রকমে শক্তিসাধনা দ্বারা ব্যাবহারিক কাজে লাগাতে পারা যায়, মহানির্বাণতন্ত্রের মূল কথাটাই এই। জ্ঞানমূলক বলেই শ্রুতির ব্রহ্মবিদ্যা বুঝতে অনেক সময় লাগে। ব্যবহারমূলক বলে মহানির্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে বোধগম্য।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা কি শ্রুতির অদ্বৈত ব্রহ্মেরই বিদ্যা? আমি এখানে আর দ্বৈতাদ্বৈতের পুরনো তর্ক তুলব না। কেবল অদ্বৈতবাদের প্রধান উদ্গাতা ভগবান্ শংকরাচার্যের একটি বচন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।

জ্ঞানে অদ্বৈতভাব সর্বদাই প্রশস্ত, এবং সেই করাই কর্তব্য। কিন্তু ব্যাবহারিক বিষয়ে অদ্বৈতভাব আনা উচিত হয় না।

এই ক্রিয়া বিষয়ে অদ্বৈতভাব আনার জন্যই, বিরোচন দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেও দৈত্যই রয়ে গেলেন; ইন্দ্র সেই একই ব্রহ্মবিদ্যা পেয়ে, ভাবাদ্বৈত করে, স্বর্গের দেবতাদের রাজা হলেন,—এ অত্যন্ত পুরণো গল্প।

ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রের গোড়াতেই আছে,—

তুষ্টে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বম্ তদাশ্রিতম্॥
২।৩৩

হে দেবি পরমেশ্বরি, বিশ্বের হিতানুষ্ঠান করলে জগদীশ্বর প্রীত হন; কারণ তিনিই বিশ্বের আত্মাস্বরূপ, সমস্ত বিশ্ব তাঁকেই আশ্রয় করে আছে।

এখন এই বিশ্বাত্মার স্বরূপ কি?

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্বিকারো নিরাধারো নির্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সর্বাত্মা সর্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ়ঃ সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্বজ্ঞ স্তং ন জানাতি কশ্চন॥
তদধীনং জগৎসর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেৎ অবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি॥
কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥
২।৩৪-৪০

সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত এই স্বরূপের সঙ্গে, শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ যা অঙ্গীকার করেছেন, তার কি প্রভেদ?

এই ব্রহ্মই তিনি, যিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত হয়ে, সকলকে স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত করে, তাদের দ্বারা আপন আপন কাজ করিয়ে নিচ্ছেন; তাঁরি শাসনে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, সূর্য তাপ দিচ্ছে, মেঘ জলবর্ষণ করছে এবং বনের মধ্যে গাছে ফুল ফুটছে। আর 'যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।'

তেনান্তর্যামিরূপেন তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম প্রকুর্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥
সর্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥
তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
২।৪৩—৪৭

শ্রুতিও সেই একই কথা বলছেন,—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
কঠশ্রুতি, ষষ্ঠবল্লী, ৩॥

বেদান্ত ব্রহ্মের যে যে ক্রিয়া বা গুণ নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে এর কিছু প্রভেদ আছে কি? এই ব্রহ্মই তিনি, যিনি বেদান্তের ব্রহ্ম। আর তিনিই সেই—

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥
৩।৯

যাঁর থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, উৎপন্ন হয়ে যাঁতে অবস্থান করছে, আবার যাঁতেই সমস্ত বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মবোধ জন্মায়। শ্রুতিও ঠিক এই স্বীকার করেছেন।—

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি॥
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতি, ১ম অনুবাক, ২॥

ব্রহ্মের এই লক্ষণ জেনেই লোকে ব্রহ্মসাধনা করে, ব্রহ্মলাভ করার জন্য ইচ্ছুক হয়। সেই ইচ্ছা উপস্থিত হলে, লোকে সাধনকার্যে ব্রতী হয়। এই সাধন কর্মের প্রথম পদ হচ্ছে মন্ত্রগ্রহণ বা ব্রহ্মদীক্ষা। এই মন্ত্র সদাশিব জগৎ হিতের জন্য পার্বতীকে গোচর করান। এই মন্ত্র, ব্রহ্মমন্ত্র বলেই, গুপ্ত মন্ত্র নয়; সুতরাং এ মন্ত্র সকলের কাছে প্রকাশ করার কোনো বাধা নেই। "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম"—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ,—এই সেই মহামন্ত্র।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে মহাদেব আরও বলছেন,—

সর্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষদঃ।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্॥
ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনং তথা।
কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে॥
৩।১৪-১৫

এই মন্ত্র সব মন্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। এই মন্ত্রের কৃপাতেই ধর্ম, অর্থ, কাম আর শেষে মোক্ষ, সবই পাওয়া যায়। অন্যান্য মন্ত্রের মতন এই মন্ত্রে সিদ্ধ অসিদ্ধের বিষয় অপেক্ষা করে না। কোন মন্ত্র শত্রু, কোন মন্ত্র মিত্র, এ সবেরও বিচার এতে নেই। এই মন্ত্র গ্রহণে তিথি নক্ষত্র রাশি প্রভৃতির শুভাশুভ গণনার প্রয়োজন নেই। অনুকূল প্রতিকূল মন্ত্রের বিচার নেই। এমন কি, দশ সংস্কারের কোনো সংস্কারই প্রয়োজন নেই। 'সর্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ম্' এ মন্ত্র সর্বতোভাবে সর্বকালে সিদ্ধ মন্ত্র।

যিনি এই ব্রহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন,—

স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥
সর্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্তপ্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ॥
৩।১৮—১৯

তিনি ধন্য, তিনি কৃতার্থ। তিনিই কৃতী পুরুষ, তিনিই ধার্মিক। যে ব্যক্তির কানে এই মহামণিরূপ ব্রহ্মমন্ত্র প্রবেশ করেছে, তাঁর সকল তীর্থেই স্নান করা হয়ে গেছে, সকল যজ্ঞেরই ফল প্রাপ্তি ঘটে গেছে। তিনিই সর্বশাস্ত্রে নিপুণ। তিনিই সর্বলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি ধন্য। আর ধন্য তাঁর কুল। ধন্য তাঁর পিতমাতা। তাঁর সমস্ত পিতৃকুল সন্তুষ্ট-চিত্তে দেবতাদের সঙ্গে আনন্দে থাকেন।—

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ॥
৩।২০

যে-কুলে কেহ ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সে কুলে আর কিসের প্রয়োজন? তখন তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিন্ডদান করার প্রয়োজন নেই, তীর্থাদি যাত্রা বা শ্রাদ্ধতর্পণেরও আবশ্যক নেই। দান, জপ, হোম আর অন্যান্য বহুপ্রকার সাধনারই বা কি দরকার? ব্রহ্মমন্ত্রলব্ধ পুরুষের পিতৃ-পিতামহেরা বলেন,—'আমরা আমাদের এই সৎপুত্রের ব্রহ্মসাধনার দ্বারাই অক্ষয় তৃপ্তি-লাভ করেছি।'

অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিম্ অস্মাকং গয়াপিন্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ॥
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্ম সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ॥
৩।২১-২২

ব্রহ্মোপাসকের বাস্তবিকই অপর আর কি সাধনার প্রয়োজন? স্বয়ং মহাদেব বলছেন, জগদ্বন্দনীয় দেবী শোন, আমি সত্যসত্যই বলছি পরব্রহ্মোপাসকের অন্য কোনো সাধনারই আবশ্যক নেই।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
পরব্রহ্মোপসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ॥ ৩।২৩

ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মমন্ত্রের বলে কারও থেকে, কোনো কিছু থেকে ভয়প্রাপ্ত হন না। কারণ ব্রহ্মমন্ত্র যে অভয়মন্ত্র। শ্রুতিও বলেছেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।" মহাদেবও সেই মতই বলেছেন,—

কিং কুর্বন্তি গ্রহরুণ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ॥
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা।
কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্তণ্ড ইব চাপরঃ॥
৩।২৫--২৬

ব্রহ্ম সাধকদের উপর গ্রহ বিরূপ হয়ে কি করবে? তালবেতাল, পিশাচ, গুহ্যক, ভূত, ডাকিনী, মাতৃকা এইসব উপদেবতা অপ-দেবতারাই বা তাঁদের কি অনিষ্ট করবে? ব্রহ্মমন্ত্র তাঁদের সমস্ত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। স্বয়ং ব্রহ্মের শক্তিই তাঁদের ঘিরে থাকেন। ব্রহ্মোপাসক সূর্যের মতন। তিনি গ্রহাদির ভয়ে ভীত হবেন কেন?

ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মমন্ত্র জপের পর, ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ। মানসিক উপচারের পর বাচনিক উপচার। এই স্তোত্রটি পাঁচটি পদের দ্বারা সম্পূর্ণ বলে, এর আর এক নাম পঞ্চ--রত্ন স্তোত্র। ব্রহ্মমন্ত্রেরই মতন এই স্তোত্রেও গোপনীয় কিছু নেই। এই স্তোত্র সকলকে শোনান যেতে পারে, সকলেরই সামনে পাঠ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে একত্র বসে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই স্তোত্রপাঠের উপদেশ মহানির্বাণতন্ত্রে দেওয়া আছে। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর শিষ্যেরা আত্মীয়সভায় ও তৎপরবর্তী ব্রহ্মসভার প্রত্যেক উপাসনায় এই স্তোত্রটি অন্ততঃ একবার ভক্তিভরে পাঠ করতেন। স্তোত্রটি এইরূপ,—

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে
বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে
নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং
বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং
নির্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং
পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং
রক্ষকং রক্ষকানাম্॥
পরেশ প্রভো সর্বরূপাপ্রকাশিন্ অনির্দেশ্য
সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ
পায়াদ পায়াৎ॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপাম স্তদেকং
জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং
শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৩।৫৯-৬৭

সংস্বরূপ সর্বলোকের আশ্রয়স্থল, চিৎস্বরূপ বিশ্বরূপধৃত বিরাটপুরুষ তোমাকে নমস্কার। ভেদাভেদরহিত, মুক্তিদাতা, সর্বব্যাপী, সর্ব-গুণের আধার সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। তুমিই একমাত্র শরণের যোগ্য, তুমিই একমাত্র বরণীয়, তুমিই একমাত্র বিশ্বের সৃষ্টিপালন-সংহার কর্তা। তুমিই একমাত্র পরম পুরুষ। তুমি নিশ্চল এবং বিকল্পরহিত। সকল ভয়ের ভয় তুমি। তুমি সব ভীষণের চেয়েও ভীষণ। তুমি সমস্ত প্রাণীদের পরম গতি। সব কিছু পবিত্রের চেয়েও তুমি পবিত্র। সমস্ত মহা-মহা উচ্চপদের তুমিই নিয়ন্ত্রণ কর। তুমি শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর। তুমি সকল পালকদের পালক। হে সকলের প্রভু, তুমি সকলের স্বরূপ হলেও, তোমার স্বরূপ কারও কাছে প্রকাশমান নয়। তোমার নির্দেশ দেওয়া যায় না, যেহেতু তুমি কোনো ইন্দ্রিয়েরই গোচর নও। তুমি সত্য-স্বরূপ অচিন্ত্যনীয়। তুমি হ্রাসবৃদ্ধিরহিত। তুমি সর্বব্যাপক, সেইজন্য তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারে কে? তুমি জগদ্ভাসক চন্দ্রসূর্যেরও অধীশ্বর। তুমি আমাদের অস্থিরমতি থেকে রক্ষা কর। একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি। একমাত্র তোমার নাম জপ করি। এই প্রকাশ-মান জগৎ যাঁর সাক্ষীস্বরূপ, সেই একমাত্র তোমাকে নমস্কার করি। সৎস্বরূপ, অবলম্বন-রহিত, সকলের আশ্রয়স্থল, সংসারসাগরে তরণীস্বরূপ সেই একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

তারপর প্রণাম। সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার পদে বার বার প্রণাম।

*ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ॥ ৩।৭৪*

পরব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচনিক বা মানসিক যেরূপে ইচ্ছা, তিন প্রকারেরই নমস্কার জানান যেতে পারে। প্রণাম যে-কোন প্রকারেই করা হোক না কেন, পরমেশ্বরের আরধনায় কিন্তু চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন।

বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে॥ ৩।৭৫

এরপর উপাসনা। ব্রহ্মোপসানার বা ব্রহ্ম-সাধনার স্থানকাল নির্দিষ্ট নেই। সর্বত্র ও সর্বকালে এ উপাসনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মোপসনায় সেইজন্য না আছে আবহনের, না আছে বিসর্জনের প্রয়োজন।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে।
সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদ্ ব্রহ্মসাধনম্॥ ৩।৭৭

ব্রহ্মোপাসক স্নাতই হোন, অস্নাতই হোন, ভুক্তই হোন, আর অভুক্তই হোন, সব অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিত্তে পরব্রহ্মের উপাসনা করতে পারেন। ব্রহ্মসাধনায় কোনো বাধাই থাকতে পারে না।

অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ॥ ৩।৭৮

ব্রহ্মোপাসনায় কোনো কষ্ট করার বা কোনো কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন হয় না। কোনো স্তোত্র কবচেরও আবশ্যক নেই। প্রণায়াম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস, হৃদয়জপ এসব ব্যতিরেকেও ব্রহ্মোপাসনা করা চলে। বিঘ্নকারী চৌর-গণেশাদির পূজা, কিম্বা কোন বিশেষ বিশেষ দেবতার মন্ত্র মস্তকে রেখে জপ, ব্রহ্মোপাসনায় এসবেরও কোনো আবশ্যক নেই। পরব্রহ্মের উপাসনা করতে করতে অকস্মাৎই ব্রহ্মদর্শন আপনা হতেই ঘটে যায়। একমাত্র ব্রহ্মের গুণ বা কার্যের চিন্তার দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা করা চলে।

বিনায়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা।
বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে॥
বিনা চৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা।
অকস্মাৎ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারো ভবেৎ ধ্রুবম্॥
৩।১১৮-১১৯

অন্য উপাসনায় যাই হোক, ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারভেদ নেই। সকলেরই এই উপাসনায় সমান অধিকার। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি ব্রাহ্মণ, কি অপর বর্ণের লোক, সকলেই ব্রহ্মোপাসনার সমান অধিকারী।

শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতা স্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥
৩।১৪২

ব্রহ্মোপাসনার পর পরব্রহ্মের উদ্দেশে ভোজ্য নিবেদন করে, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে একত্র সাধক আহারাদি করবেন। নীচে উদ্ধৃত মন্ত্র পড়ে, পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করার নামই নিবেদন। এই নিবেদন করা ভোজ্য দ্রব্যেরই ভক্তিমূলক নাম প্রসাদ। মন্ত্রটি

গীতাতেও পাওয়া যায়—৪র্থ অধ্যায় ২৪ শ্লোকে।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৩।৫৬

ভোজ্যপাত্রও ব্রহ্ম, ভোজ্যও ব্রহ্ম। যে অগ্নি একে জীর্ণ করবে, সে অগ্নিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কর্তৃকই তা' ভুক্ত হবে। ব্রহ্মকর্ম সামাধা করবার জন্য উৎসর্গীকৃত এইসব ভোজ্য দ্রব্যের গন্তব্যস্থলও সেই ব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের নামে নিবেদিত, উৎসর্গ করা প্রসাদে স্পর্শদোষ ঘটে না। বরঞ্চ গঙ্গাজলে, শালগ্রামশিলায় স্পর্শদোষ ঘটতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মে অর্পিত দ্রব্যে কখনই নয়।—

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে॥
৩।৮০

পরব্রহ্মে নিবেদিত প্রসাদগ্রহণে না আছে বর্ণ-বিচার, না আছে উচ্ছিষ্ট বিচার। এই প্রসাদ গ্রহণের কালও নেই, কোনো নিয়মও নেই। এক্ষেত্রে কোনো শৌচাশৌচেরও কথা নেই।

নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
ন কালনিয়মো হ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ॥ ৩।৮২

ব্রহ্মে নিবেদিত এই প্রসাদ ভক্ষণে জাতিভেদ করা অকর্তব্য। যিনি প্রসাদ বিষয়ে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেন, তিনি মহাপাতকী।

জাতি ভেদো ন কর্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥
৩।৯২

এখন ব্রহ্মমন্ত্রসাধক বা ব্রহ্মোপাসকের বাহ্যিক লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। ব্রহ্মসাধকের সম্বন্ধে কোনো নিয়মই খাটে না। তিনি নিজেই নিজের নিয়ম। তিনি স্বাধীন। কিন্তু তথাপি তাঁর সমস্ত কর্মই পুণ্যময়, তাঁর সব কর্মই সুকৃতি।

পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সুকৃতিঃ সুকৃতায়তে।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে॥ ৩।৯৬

ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মোপাসকের বৈদিক আচারেরও প্রয়োজন হয় না, তান্ত্রিক আচারের আবশ্যক নেই। ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিকে কোনো আচারেই তো আবদ্ধ করা যায় না।

কিং তস্য বৈদিকাচারৈ স্তান্ত্রিকৈর্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥
৩।৯৭

তাঁর আচারযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান করেও কোনো ফল-লাভ নেই, কোনো অনুষ্ঠান না করলেও তাতে কোনো পাপ নেই। বস্তুতঃ ব্রহ্মমন্ত্রসাধনে কোনোপ্রকার বাধা-বিঘ্ন বা কোনো রকম অপচয়েরও আশঙ্কা নেই।

কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষম্।
ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ॥ ৩।৯৮

কিন্তু ব্রহ্মসাধক আচারবিচার, বিধিঅনুষ্ঠানাদি বিবর্জিত হলেও, সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন হলেও, কোনো নিয়মে তাঁকে বন্ধ করতে না পারলেও, তাঁর এক স্বাভাবিক নিয়ম আছে। বাহ্যিকে তাঁর কতকগুলো লক্ষণ স্বতঃ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মোপাসক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, চিত্তবিকারশূন্য, সদাশয়, পরের গুণে অবিদ্বেষী, দম্ভরহিত, দয়ালু, শুদ্ধহৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী, তাঁদের সেবায় তৎপর। এইসব গুণই ব্রহ্ম-নিষ্ঠের স্বভাবজাত।

অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥
৩।৯৯-১০০

আরও লক্ষণ আছে।—
ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জয়েৎ॥

ব্রহ্মমন্ত্রসাধক কখনও মিথ্যা বলেন না, পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, পরস্ত্রীগমন করেন না।

ব্রহ্মোপাসক সর্বকর্মের আরম্ভে **'ওঁ তৎসৎ'** এই বাক্য উচ্চারণ করেন; আর পান-ভোজনের আগে 'ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই বাক্য বলেন। এখনও আমরা যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সংকল্প বাচনের পূর্বে **'ওঁ তৎসৎ'** —এই বলে অনুষ্ঠান আরম্ভ করি।

তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্বকর্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্মণোঃ॥
৩।১০৩

আরও কয়েকটি লক্ষণ ব্রহ্মসাধকে আপনা হতেই প্রকটিত হয়। ইনি সর্বদা ব্রহ্ম-বাক্য শ্রবণ করেন, ব্রহ্মকে মনন করেন, ব্রহ্ম-অনুসন্ধান বিষয়ে সর্বদাই মন রাখেন। ইনি সর্বদা সংযতাত্মা, দৃঢ়বুদ্ধি হয়ে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান—এই চিন্তাই করেন।

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
৩।১০১

যে উপায় দ্বারা মনুষ্যকুলের উত্তমরূপে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়, অর্থাৎ যে কর্মের অনুষ্ঠানে সকলের কল্যাণ হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই উপায়েই কর্মানুষ্ঠান করেন,—এই তাঁর সনাতন ধর্ম।

যেনোপায়েন মর্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিধ্যতি।
তদেব কার্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্মং সনাতনম্॥
৩।১০৪

এই লক্ষণ দেখে হয়ত লোকে ব্রহ্ম-সাধকদের চিনতে না পারতেও পারেন। সংস্কার-বর্জিত, আচারহীন, পূজাঅর্চনা, অনুষ্ঠান বর্জিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন, সর্বচরাচরের কল্যাণ-ব্রতী এই সাধককে চেনা দুষ্কর। কারণ, এঁর ত সমাধিস্থ হবার কথা নেই, বিভূতি দেখাবার কথা নেই, কোনোরকম অলৌকিক, অনৈসর্গিক কিছু ঘটিয়ে, ভেল্কী লাগিয়ে দিয়ে লোককে চমকিয়ে দেবার কথাও নেই। সাধুসন্তদের যে সব লক্ষণের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার কোনোটাও ত' ব্রহ্মসাধকে নেই। না আছে জটাজুট না আছে কবচ তাবিচ, না আছে চিমটা কমণ্ডলু। সুতরাং এঁকে সহজে চেনা শক্ত। সেইজন্য ব্রহ্মসাধক সত্যই সিদ্ধিলাভ করেন কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। তবে ব্রহ্মসাধকদের বাইরে আছে সর্বজীবের উপর অপার করুণা; অন্তরে আছে পরমা শান্তি, পরম আনন্দ।

পণ্ডিতরা তন্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মসাধনার প্রতি-পাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাকেই লক্ষ্য করে যদি তন্ত্রকে বেদোদ্ভব বলেন, তাতে কারও তো অমত হবার কথা নয়। কারণ শ্রুতি মতেও ত' এষাবেদদোপ-নিষৎ; এই ত বেদ, এই ত উপনিষৎ।

এরপর আর কোন কথা নেই। শাস্ত্র অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়কে বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করে, কে কবে বোঝাতে পেরেছে? আমার এই ব্যাখ্যায় যদি কোন দোষ ত্রুটি ঘটে থাকে তবে তার জন্য অকপটে মার্জনা ভিক্ষা করে দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত শান্তিবাচন উদ্ধৃত করে কথা শেষ করি।

ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥

সকলে শান্তিলাভ করুন, সকলের কল্যাণ হোক। যা কিছু অশুভ তা বিনষ্ট হোক। পাপ যেন আমাদের স্পর্শ না করে। পাপ যেন তার উদ্ভবস্থানেতেই প্রতিগমন করে।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরী করার পর ইংরেজ রাসেল পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়েনি। রাসেল পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাসেল পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইউরোপীয় বেদেই হোক আর চীনে বেদেই হোক্।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইউরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের সামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বৃহৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রুপালি ঝরণাতলায় সোনালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস করে সবুজ চা খায়।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন।

* * *

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি উঠি করছি এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনী ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ মিশকালো খোঁপা-বাঁধা চুল। কেক আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চালাল সেই তুবড়ি বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়; এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মন বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করেন। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আবার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখেমুখে হাসি মেখে, সুডৌল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি, ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছিনে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসি মুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার। তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।'

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিন তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদ-বৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউ-খেলানো। নিজের চোখ দেখনি কখনো আয়না দিয়ে—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না। হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি। ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল।' জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার, দু'হাজার বছর কিম্বা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামখা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে।'

আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারী খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানেন। কাঁচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিম্বা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশে-বিভূঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমার আপন জন' তখন কি করে বুক ঠুকে বলি--যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয়?*

* এ বিষয় নিয়ে আমি হালে দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের রজতজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যায় আলোচনা করেছি। কিন্তু সে পত্রিকা দেশের পাঠকপাঠিকা পর্যন্ত পেঁৗছবে না বলে পুনরাবৃত্তি দোষ মার্জনীয়। —লেখক।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৯

১৮১৯ খৃীষ্টাব্দে আমার পিতামহ হালি-সহর হতে ভাগলপুরে আসেন, একথা পূর্বে বলেছি। আমার বিশ্বাস, ভাগলপুরে তিনি অবিবাহিত অবস্থাতেই এসেছিলেন। কিছু-কাল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাস করার পর স্থায়ী-ভাবে তথায় বাসস্থাপনের বাঞ্ছনীয়তার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তদ্বিষয়ে প্রয়োজন-মতো ব্যবস্থাদি করে সম্ভবত তিনি বাঙলা দেশে গিয়ে বিবাহ করেছিলেন।

আমার বড় জেঠামহাশয় ও মেজ-জেঠামহাশয় হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অথবা ভাগলপুরে সে কথা বলতে পারিনে; কিন্তু ভাগলপুরে আসার আঠারো বৎসর পরে ১৮৩৭ খৃীষ্টাব্দের মে মাসে রামধন গঙ্গো-পাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র, আমার পিতা, মহেন্দ্র-নাথ ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং একথা অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, এই আঠার বৎসরের কতকটা সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অর্থাৎ ভাগলপুর আসার পর আমার পিতামহর বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ছিল বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়; তাঁর স্ত্রী ছিলেন অভয়া দেবী। বিশ্বেশ্বরের পুত্র দুর্গাচরণ; দুর্গাচরণের স্ত্রী ভগবতী। দুর্গাচরণের পুত্র ছিলেন আমার পিতামহ রামধন গঙ্গোপাধ্যায়। আমার পিতামহীর নাম ছিল গোবিন্দ-মোহিনী। রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ, মধ্যম দীননাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ, চতুর্থ অমরনাথ এবং কনিষ্ঠ অঘোরনাথ। কেদারনাথের দুই পুত্র ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস; এবং তিন কন্যা দাসী (ডাক নাম), ভুবনমোহিনী ও কাত্তমণি। কন্যাত্রয়ের মধ্যে ভুবনমোহিনী ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জননী।

কেদারনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা দাসী আমাদের বড়দিদি সংসারের প্রথমা কন্যা ছিলেন ব'লে তিনি সকলের অপরিসীম আদর যত্নের অধি-কারিণী হয়েছিলেন। পিতামাতা থেকে আরম্ভ করে আত্মীয় পরিজন, এমন কি চাকর-চাকরাণী পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত স্নেহধারা এই আদরিণী কন্যাটিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হত। নিজের অনন্যভাজ্য একচেটে সুযোগের প্রভাবে আনন্দের বিশেষ একটা দিকের তিনি ছিলেন একমাত্র চাবি-কাঠি।

কিন্তু সে চাবি-কাঠি বহুদিন ধরে আনন্দের প্রস্রবণই উন্মুক্ত করে এসেছে, এমনই দুর্দৈব। অকস্মাৎ একদিন তা উন্মুক্ত করতে আরম্ভ করলে মর্মান্তিক বেদনার নির্ঝর। বিবাহের অল্প কিছুকাল পরে যেদিন বড়দিদি অসম্ভাবিত বৈধব্যের নেত্রবিদারক মূর্তি নিয়ে শ্বশুর গৃহ থেকে ফিরে এলেন, সেদিন আনন্দরক্তিম গাঙ্গুলী পরিবার একটা রূঢ় আঘাতের মর্মন্তুদ বেদনায় নীলাভ হ'য়ে উঠল।

এই দুর্বিষহ দুঃখ ও শোকের বিরুদ্ধে যা হোক একটা কোনো উপায় অবলম্বন করবার উদ্দেশ্যে বড়দিদির প্রতি সকলের যত্ন-আদর এবং মনোযোগ চতুর্গুণ স্ফীত হয়ে উঠল; সংসারে কর্তৃপক্ষ সকল বিষয়ে তাঁকে সর্বময়ী ক'রে তোলবার উপক্রম করলেন। তা'তে আর যাই কিছু হোক না কেন শোকসন্তপ্ত জীবন-পাত্রে দুঃখ ও আদরের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বড় দিদির অন্তরের একটা নিভৃত অঞ্চলে অতি সচেতন অভিমানের একটা উৎস সৃষ্টি লাভ করলে। কথায় কথায় ছুতায়-নাতায় সেই উৎস-মুখে দুর্মদ অভিমান উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে; তার জারক রসে সকলের চেয়ে অধিক জর্জরিত হন বড়দিদি নিজেই। সেই দুর্বার অভিমান কি অবস্থায় একদিন তাঁকে জীবনের শেষ মুহূর্তে পেঁৗছে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার সামান্য ইতিহাসটুকু বললেই বড়দিদির প্রসঙ্গ শেষ হয়।

আমাদের গৃহে নারায়ণের নিত্য সেবার ব্যবস্থা ত ছিলই। তা ছাড়া নানাবিধ অতিরিক্ত পূজোপাঠ সর্বদা লেগেই থাকত। দেবার্চনার জন্য পুষ্প সংগ্রহ পুরাঙ্গনাদের পক্ষেও যাতে সহজ হয়, সেইজন্য অন্দর মহলের সংলগ্ন একটি নাতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যান ছিল। নিত্য পূজার পুষ্পচয়নের দ্বারা প্রতিদিন জীবনের সূত্রপাত করবার পবিত্র কর্তব্য ভার ছিল বড়-দিদির। অতি প্রত্যুষে, প্রায় সকলের আগে শয্যা ত্যাগ ক'রে সাজি হস্তে তিনি ফুলের বাগানে প্রবেশ করতেন। তারপর বহুক্ষণ ধ'রে বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নানাবিধ পুষ্পে সাজিখানি পূর্ণ ক'রে উদ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেন।

একদিন প্রত্যুষে পুষ্পচয়নের নিয়মিত কার্যে রত আছেন, এমন সময়ে পায়ে একটা-কিছু দংশন করলে। সারা অঙ্গের মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখেন একটা বিষধর সর্প, তখনো তার ক্রোধের বিসারিত ফণা সংকুচিত হয়নি, অনিষ্টটি সম্পন্ন ক'রে, লীলায়িত মন্থরগতিতে আত্মগোপন করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। চিৎকার ক'রে উঠলেন, "ওগো! আমাকে সাপে কামড়েছে!"

নিকটেই একজন পুরানো চাকর কাজ করছিল, বড়দিদির আর্তনাদ শুনে সে তাড়াতাড়ি একটা দড়ি নিয়ে ছুটে এসে পায়ের ডিমের খানিকটা তলায় দৃঢ়ভাবে একটা বাঁধন দিলে। যারা ইতিমধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে উঠেছিল, কলরব শুনে তারা এল ছুটে; যারা তখনো শেষ নিদ্রার সুখ-স্বপ্নে মগ্ন ছিল, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে তাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হ'ল। একটা উৎকট আতঙ্কের তাড়নায় সমস্ত বাড়িটা উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে উঠল!

সুতীব্র উদ্বেগে এবং উত্তেজনায় বড়দিদির সারা দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছিল। পাগলের

মতো ছুটে এসে জেঠামহাশয় কেদারনাথ বড়-দিদির পায়ের ডিমের উপর আর একটা শক্ত বাঁধন দিলেন, তারপর একটা চেয়ার এনে তার উপর বড়দিদিকে বসিয়ে গৃহমধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই চেয়ারের উপরেই বড়দিদি ব'সে রইলেন।

দু-চার মিনিট নিবিষ্টভাবে বড়দিদির অবস্থা লক্ষ্য ক'রে, ব্যগ্র কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ তাঁকে আশ্বাস এবং অভয় দিয়ে জেঠামহাশয় ছুটলেন সিভিল সার্জেনকে নিয়ে আসবার জন্যে। জেঠামহাশয় প্রস্থান করবার কিছু পর থেকে বড়দিদির অবস্থার কিছু যেন উন্নতিই পরিলক্ষিত হ'তে লাগল। কাঁপুনি গেল থেমে; সহজভাবে অল্প-স্বল্প কথা কইতে আরম্ভ করলেন; এমনকি, মাঝে মাঝে এক-আধটা হাস্য পরিহাসও চলতে লাগল। বড়দিদিকে পরিবৃত ক'রে যে উৎকণ্ঠিত জনতা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অবস্থান করছিল, তার শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন কতকটা সহজ হ'য়ে এল। ইতিমধ্যে সারা পল্লীতে বড়দিদির সর্পদংশনের সংবাদ রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। পাড়ার দু-চারজন মাতব্বর বৈঠকখানায় এসে বসেছেন, দু-চারজন গৃহিণী ভিতরে রোগিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বড়দিদির অবস্থার উন্নতির দ্বারা ভ্রান্ত অথবা উৎসাহিত হ'য়েই হোক, সম্ভবত কপট অনুযোগের সাহায্যে বড়দিদির মনে আশ্বাসকে প্রবলতর ক'রে তাঁকে আরও খানিকটা চাঙ্গা ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে, ঈষৎ বিদ্রূপমিশ্রিত কণ্ঠে মতি দাদা (শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়) বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নয়, খোঁচা-টোচা লেগেছে। সকাল বেলা অনর্থক এতগুলো মানুষকে অস্থির ক'রে তুলেছেন দিদি!"

ক্ষণকাল পূর্বে যে বিষধর সর্প বড়দিদিকে দংশন করেছিল, তারই মতো ফণা বিস্তার ক'রে একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অভিমান নিমেষের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল! চোখের উপর দিয়ে অত বড় সাপটা যে এঁকে-বেঁকে চ'লে গেল, সেটা তা হ'লে কিছুই নয়?......সেটা তা হলে সর্বৈব মিথ্যা? অধর প্রান্তে ঝিলিক মারলে সাংঘাতিক অভিমানের একটা তীক্ষ্ণ শীতল হাসি। মতিদাদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বড়-দিদি বললেন, "ও! সাপ-টাপ নয়?...খোঁচা-টোচা? তা হ'লে বাঁধন-টাধনেই বা কিসের দরকার!" ব'লে অতর্কিতে নিমেষের মধ্যে পটপট ক'রে দুটো বাঁধনই দিলেন আলগা ক'রে।

হাঁ-হাঁ ক'রে কয়েকজন ছুটে এল,—তাড়াতাড়ি বাঁধন দুটো দিলে আরও শক্ত ক'রে বেঁধে। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার, তার আর বাকি ছিল না কিছু। যে দুরন্ত উগ্র বিষ বাঁধনের তলায় আবদ্ধ হ'য়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় ঊর্ধ্বমুখে অবস্থান করছিল, বাঁধন আলগা পেয়ে নিমেষের মধ্যে তা রক্তপ্রবাহের উপর সওয়ার হ'য়ে বড়দিদির মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে ছুট দিয়েছে। দেখতে দেখতে মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে কথা এল জড়িয়ে, দৃষ্টি হয়ে গেল ঝাপসা, মাথা পড়ল চেয়ারের পিছন দিকে এলিয়ে। গভীর নৈরাশ্যে ও দুঃখে আত্মীয়বর্গ হায় হায় করতে লাগল। আধঘণ্টাটাক পরে সিভিল সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে জেঠামহাশয় যখন হন্তদন্ত হ'য়ে প্রিয়তমা কন্যার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন বড়দিদির পরপারের যাত্রী, টিকিট কেনা হয়ে গেছে, জাহাজের বাঁশীর শব্দে কান পেতেছেন। দুই হাত শিথিল বিলম্বিত; দৃষ্টি স্থির, অপলক; মুখ গহ্বরে ফেনোচ্ছ্বাস। মুমূর্ষু অবস্থা। কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে জেঠা-মহাশয় মস্তকে করাঘাত ক'রে রোদন করতে লাগলেন। ইংরাজ সিভিল সার্জেন সজোরে একবার বড়দিদির নাড়ী টিপে পরীক্ষা করলেন, চোখের পাতা উল্টে দেখলেন, তারপর বুকের

উপর ক্ষণকাল স্টেথোস্কোপ বসিয়ে নিবিষ্টভাবে হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণয়ের নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। জেঠা-মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার কন্যা সকল চিকিৎসার অতীত হয়েছেন। ও'র ক্ষত স্থানে ছুরি বসিয়ে আর কোন ফল হবে না।" তারপর ভিজিটের টাকার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

ব্যাগ থেকে ছুরিকা বার না ক'রে সাহেব ডাক্তারের বিদায় গ্রহণের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে মেয়েপুরুষদের কারো বাকি রইল না। একটা গভীর বেদনার আর্তনাদে সারা গৃহ মুখরিত হ'য়ে উঠল। জেঠামহাশয় স্বভাবতঃ ধীর গম্ভীর সংযত প্রকৃতির মানুষ,—তিনিও শোকে অধীর হলেন।

ইতিমধ্যে বহির্বাটিতে পাড়ার বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছিলেন। সিভিল সার্জেনকে অত শীঘ্র গৃহত্যাগ করতে দেখে এবং গৃহমধ্যে বিলাপধ্বনি শুনতে পেয়ে তাঁদের মধ্যে তিন-চারজন অন্তঃপুরে উপস্থিত হ'লেন। জেঠামহাশয়কে সম্বোধন ক'রে একজন বললেন, "শুনুন গাঙ্গুলী মশায়, সাপে কামড়ানো রুগীর প্রাণের সাড়া ডাক্তার কবিরাজে যখন খুঁজে পায় না, তখনো কিছুক্ষণের জন্যে প্রাণটা দেহের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। সুতরাং কান্নাকাটিতে সময় নষ্ট না ক'রে একবার আড়ে-হাতে চেষ্টা দেখা যাক। চলুন, মাকে নিয়ে যাই গঙ্গার তীরে। সেখানে মাকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে করিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে দিই।"

এই প্রস্তাব শোকাকুল পরিজনবর্গকে, সুদূর হলেও, একটা নূতন আশার আসবে কিঞ্চিৎ সঞ্জীবিত ক'রে তুললে। অন্তত, দুঃসহ দুঃখকে ক্ষণকালের জন্য নিবর্তিত ক'রে রাখার একটা উপায় পাওয়া যাবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে।

আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা এক মিনিটেরও পথ নয়। ইঙ্গিত মাত্র দুজন বলিষ্ঠ যুবক চেয়ারের দুপাশ ধ'রে সন্তর্পণে কিন্তু দ্রুত-গতিতে বড়দিদির দেহ বহন ক'রে নিয়ে চলল। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময় নেই। দেহের কোন্ গোপন শাখায় প্রাণটুকু লুকিয়ে ব'সে আছে কে জানে! হঠাৎ এক সময়ে মহাব্যোমের মধ্যে পক্ষ বিস্তার করলে সমস্ত গঙ্গার জল উজার ক'রে ঢাললেও দেহপিঞ্জরে আর তাকে ফিরিয়ে আনা চলবে না।

জল আর তটের দুই প্রান্তরেখা যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই মহাসন্ধিস্থলে বড়দিদির চেয়ার স্থাপিত করা হ'ল। চেয়ারের পিছনের দুই পায়া রইল জলে, সম্মুখের দুই পায়া স্থলে। বিসর্জনের সময়ে প্রতিমার যেমন থাকে, তেমনি বড়দিদির মুখ রইল স্থলের দিকে। এও গাঙ্গুলী পরিবারের একটি প্রতিমাই বিসর্জিত হ'তে চলেছে।

বড়দিদির চেয়ার স্থাপিত হওয়া মাত্র তাঁর চৈতন্যহীন মস্তকের উপর গঙ্গাজল ঢালা আরম্ভ হ'য়ে গেল;—নিরলস নিরবসর ঢালা,—তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই! কেউ ঘড়া নিয়ে এল, কেউ ঘটি নিয়ে এল, কেউ গামলা নিয়ে এল, কেউ হাঁড়ি নিয়ে এল। নিজ নিজ পাত্র ভ'রে ভ'রে সকলে ঐকান্তিক চিত্তে অবিচল উদ্যমের সহিত জল ঢেলে চলল। যে সকল স্নানার্থী এবং স্নানার্থিনীরা সে সময়ে গঙ্গার উপকূলে উপস্থিত ছিল, তারাও নিজেদের পাত্র পূর্ণ ক'রে ক'রে জল ঢালতে আরম্ভ করলে। কিন্তু জীবনের কোনো লক্ষণই ফিরে আসতে চায় না। নিষ্ফল গঙ্গাজল বড়দিদির দেহসিক্ত ক'রে ক'রে গঙ্গায় ফিরে যেতে লাগল; যে অনপনেয় বিষ বড়দিদির দেহকে অধিকার করে রেখেছিল, তার একটি কণিকাও তারা নিষ্কাশিত ক'রে নিয়ে যেতে সমর্থ হ'ল না। অতি সেচনের ফলে ক্রমশঃ চামড়া হয়ে এল কুঞ্চিত, বর্ণ হয়ে এল পাংশু। শেষ পর্যন্ত সকলেই বুঝতে পারলে—

পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার,
'দুখময়' নীড় প'ড়ে আছে তার।

অগত্যা সৎকারের আয়োজন আরম্ভ হল। একদিনের দুঃখের বন্যার জলে অনাগতকালের প্রতি দিবসের দুঃখকে টেনে নিয়ে বড়দিদি চ'লে গেলেন।

৩০

আমার জ্ঞানোন্মেষকালে ভাগলপুরের গাঙ্গুলি পরিবার তিন কর্তা, পাঁচ গৃহিণী এবং তাঁদের পুত্রকন্যাদের দ্বারা গঠিত একটি বৃহৎ এবং কতকটা জটিল পরিবার। পাঁচ কর্তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ অঘোরনাথ জীবিত আছেন; বাকি দুজন দীননাথ এবং অমরনাথ পরলোক গমন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের জন্ম পর্যন্ত এই পরিবার দুই পুরুষের পরিবার ছিল তৃতীয় পুরুষের অর্থাৎ দৌহিত্র-পৌত্র পর্যায়ের, প্রথম সন্তান দৌহিত্র শরৎচন্দ্র।

১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন; আমার জন্ম ১২৮৮ সালের ২৬শে আশ্বিন। সুতরাং আমি যখন পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের বালক, শরৎচন্দ্র তখন দশ-এগার বৎসর বয়সের কিশোর। সে সময়ে গাঙ্গুলি পরিবারের একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। "প্রাচীনেরা তখনো সংসার তরণীর হাল ধ'রে আছেন, দাঁড়ে বসেছেন নবীনেরা। তা'তে গতি বেড়েছে, কিন্তু দুর্গতি বাড়েনি। বাইরে তখনো চণ্ডীমণ্ডপে কর্তারা পাশা খেলা নিয়ে ডাকাত পড়াপড়ি করছেন, অন্দরে নবীনেরা খুলেছেন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের পাতা।" সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিকালে গাঙ্গুলি পরিবারের মতো একটি বৃহৎ ও জটিল সংসারে মানুষ হওয়ার ফলে শরৎচন্দ্র জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, উত্তরকালে সাহিত্য সাধনার প্রতিপদে যা তাঁর উপকারে এসেছিল।

"তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অবয়বে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখতে পাই, প্রাচীন গাঙ্গুলী পরিবারের কর্তাগৃহিণী বউ-ঝিদের সুস্পষ্ট ঝিলিক। মাতুলালয়ের অনেক কাহিনী অনেক ঘটনা সামান্যমাত্র পরি-বর্তিত হয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে। শুধু শ্রীকান্তেই নয়, অন্যান্য বহু গ্রন্থেও। মাতুলদের নাম দিয়ে উপন্যাসের পাত্র-দের নামকরণ করতে তিনি ভালবাসতেন। বড়-দিদিতে 'সুরেন্দ্র', পরিণীতায় "গিরীন্দ্র" চরিত্রহীনে "উপেন্দ্র" (উপীন) এবং বিপ্রদাসে "বিপ্রদাস" একথার সাক্ষ্য দেবে"

গাঙ্গুলী পরিবারের ঘটনা শরৎচন্দ্র সময়ে সময়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতেন, তার একটি দৃষ্টান্ত শ্রীকান্তে বর্ণিত ছিদাম বহুরূপীর কাহিনী। ছিদাম বহুরূপীর মূল কাহিনীটি বলবার আগে একটু পূর্বাভাস দিলে ভাল হয়।

যখনকার কথা বলছি তখন আমাদের ভাগলপুরের বাড়ি চার-মহলে বিভক্ত। রাজপথ থেকে প্রথমে যে মহলে প্রবেশ করতে হোত, সে মহলকে আমরা 'চাপরাশি বাড়ি' বলতাম। আমাদের অভিভাবকেরা পুরুষানুক্রমে ভাগলপুরের কালেক্টারিতে চাকরি করতেন। আমাদের বাড়ির হেপাজতের জন্য তাঁরা কালেক্টারির চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় চাপরাশিকে বাড়িতে সর্বদা আশ্রয় দিতেন। তারা সকালে ভাত 'পাকাতো', দিনমানে কাছারিতে কাজ করত, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ভাঙ ঘুঁটতে ঘুঁটতে গীত গাইত, তারপর রাত্রে বড় বড় রোটি অথবা চাপাটি 'বানাতো'। তাছাড়া তারা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখত যাতে চোর-ছ্যাঁচোড় অথবা আজে-বাজে লোক তাদের অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করতে না পারে।

এই দ্বিতীয় মহল ছিল চণ্ডীমণ্ডপের মহল। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি বৎসর নিয়মিত জগদ্ধাত্রী পূজা হোত। তাছাড়া ছোট কাকা-মহাশয় একবার ক্রমান্বয়ে চার বৎসর দুর্গা-পূজাও করেছিলেন। মানত থাকলে সময়ে সময়ে কালীপূজাও হোত। তাছাড়া প্রতিদিন বৈকাল হতে এই চণ্ডীমণ্ডপে পল্লীর মাতব্বরদের বৈঠক বসত।

সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের দুই পাশে দুটি ঘর, সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। পশ্চিমদিকের ঘরে পূজার সময়ে ভোগ সাজানো হত। এই ঘরের উত্তর দিকে তৃতীয় মহলে ছিল ভোগ রন্ধনের ঘর। তার সম্মুখে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে গোশালা, মরার (মরাই), এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনের ব্যবস্থা। এই তৃতীয় মহলের নাম ছিল ভোগের ঘরের মহল। এই মহল থেকে দক্ষিণমুখে প্রবেশ করতে হত চতুর্থ অর্থাৎ অন্দর মহলে। অন্দর মহলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সেই পুষ্পোদ্যান যেখানে বড়দিদির সর্পাঘাত হয়।

সারা বৎসর চণ্ডীমণ্ডপের পূর্বদিকের ঘর পরিপূর্ণ থাকত সেই সকল সামগ্রীতে, কদাচিৎ যাদের ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়। পূজার সময়ে প্রতি বৎসর এই ঘরটি খালি করা হত, এবং বাড়ি মেরামত ও চূণকাম করবার সময়ে আমাদের সনাতন রাজমিস্ত্রী হোসেনি এই ঘরটি নিয়েই সর্বাধিক বিরক্তবোধ করত। জিনিসপত্র সরানোর পর প্রতিবারই দেখা যেত বড় মাঝারি এবং ছোট ফাঁদের বিশ-পঁচিশটি গর্তে ঘরটি একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে আছে।

হোসেনি বলত, 'চুহার' (ইঁদুরের) গর্ত; ছেলের দল আমরা কিন্তু মনে করতাম, ইহ বাহ্য,—আসলে এগুলি কেউটে-গোখরোর বায়ু পরিবর্তনের প্রবাসকক্ষ। বর্ষার জল এঁদের বাসগৃহগুলি নিমগ্ন হয়ে গেলে এঁরা গঙ্গা-তীরস্থিত ঝাউ বন, রামবাবুর 'নিবিড়-ঘন বাগান প্রভৃতি নিকটবর্তী খাস-মহল থেকে শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করেন এবং চুহার গর্ত অবলম্বন করে ঠেলে ওঠেন এই তাঁদের প্রাবৃট নিলয়ে। এখানে তাঁরা নিরাপদ এবং আরাম-দায়ক 'ডেরা'ই শুধু পান না, সুকোমল চুহা-মাংসের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেও সমর্থ হন। ইচ্ছামতো গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্গত হয়ে প্রিয় খাদ্য দু-চারটে বেঙ ধরেও উদরপূর্তি করে থাকেন। বর্ষা ঋতু অন্তে অল্পকালের জন্য খাস-মহলে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর শীত পড়বার পূর্বেই পুনরায় ফিরে এসে পূর্বদিকের ঘরের উষ্ণ এবং মনোরম বিবরগুলিতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন। এই ছিল আমাদের মনের একান্ত বিশ্বাস।

হোসেনির সঙ্গে আমরা মত মিলিয়ে বলতাম, "চুহার গর্তই বটে; কিন্তু যেহেতু পূজার দিনে এই ঘরে নৈবেদ্য রাখা হয় এবং যেহেতু নৈবেদ্যের চাল-কলা চুহার পক্ষে অতিশয় প্রিয় খাদ্য, চুহার পথ তুমি বেশ ভাল করে বন্ধ কর।" আমরা নিজেদের স্বার্থে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বেশ শক্ত ইঁট-পাথরের দ্বারা হোসেনিকে দিয়ে চুহার পথ বন্ধ করাবার ছলে চুহাখাদকদেরই পথ বন্ধ করবার চেষ্টা করতাম। নিজেদের স্বার্থে কেন, সেই কথাটা এবার বলি।

চণ্ডীমণ্ডপের পূর্বদিকের এই ঘরটি চোর-কুটুরি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত সারা বৎসরই বন্ধ থাকত বলে বোধ হয় একে চোরা অর্থাৎ গুপ্ত বলা হত; আর কুটুরি হচ্ছে হিন্দী কোঠরি শব্দের বাঙলা অপভ্রংশ, অর্থ কক্ষ। চোর-কুটুরিতে শুধু চুহাই (আমাদের মতে সর্পও) থাকত না, সময়ে সময়ে আমরাও থাকতাম। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিশ্চয়ই নয়, বাধ্য হয়ে। আমাদের আচরণের মধ্যে কখনো তেমন অশিষ্টতা প্রকাশ পেলে দণ্ডস্বরূপে আমাদিগকে চোর-কুটুরিতে আবদ্ধ করে রাখা হোত। চোর-কুটুরির দণ্ড আমরা অভিভাবক-দের হাত থেকে যত না পেতাম, তার অনেক বেশি পেতাম সংসারের দুজন পুরাতন ভৃত্য মাণিক ও মুশাইয়ের হাত থেকে। মাণিক তবুও খানিকটা সদাশয় প্রকৃতির মানুষ ছিল; মুশাইয়ের তীক্ষ্ণ চক্ষু ও খাড়া নাসিকার মধ্যে দয়ামায়ার কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না।

চোর-কুটুরিতে আমরা মাণিক কিম্বা মুশাইয়ের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি সংবাদ পেলে মেয়েরা চিন্তিত হয়ে উঠতেন। কর্তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন, "ওগো, ছেলেটাকে শেষে কি সাপে খাবে? খুলে দিতে বল।" কর্তারা এমন অনুরোধে বিশেষ কর্ণপাত করতেন না; বলতেন, "না, না, এই সেদিন ভাল করে মেরামত করা হয়েছে, সাপ আসবে কেমন করে? দেবে অখন একটু পরে খুলে।" সমীচীন মনে করে মাণিক-মুশাই যা করেছে, সহজে কর্তারা তার উপর হস্তক্ষেপ করতেন না।

অগত্যা দরবার করতে হোত স্বয়ং মুশাইয়েরই কাছে। অপ্রসন্ন কণ্ঠে মুশাই বলত, "দিচ্ছি খুলে। কিন্তু তোমরা যদি এমনি করে আস্কারা দাও, তাহলে ছেলেদের দুরস্ত করি কি করে?"

এই ছিল বছর ষাটেক আগেকার কাল! মাণিক-মুশাইরা বহুকাল হল লুপ্ত হয়েছে। চোর-কুটুরিতে আবদ্ধ করা এখন ফৌজদারি ধারা অন্তর্গত। এখন যদি ছেলের বাপ চোর-কুটুরির পরিবর্তে সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে ক্ষণ-কালের জন্য ছেলেকে আটকে রাখে, তাহলে পরদিনের সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে হয়, খোকা বাপ! অন্যায় করেছি, অনুতপ্ত হয়েছি। তোমার জননী শয্যাগত। বাড়ী ভাতে বসে পড়বে এস!

তখনকার ছেলেরা কিন্তু মাণিক-মুশাইয়ের দণ্ডবিধান নীরবে নির্বিরোধে মাথা পেতে নিত।

কথায় কথায় মূল কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, গৌরচন্দ্রিকা হয়ে গেছে দীর্ঘ,—এবার শ্রীকান্ত উপন্যাসের ছিদাম বহুরূপীর মূল কাহিনীটা বলি। (ক্রমশঃ)

যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

চতুর্থ দৃশ্য

পুরানা দিল্লীর একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত দরগা। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার।

শাহজাদা মহি-উল মিল্লাত দিল্লীতে ফিরিয়া এই দরগার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। দৃশ্য সূচনার মধ্যে পূর্ববর্তী দৃশ্যের অন্ধকার ফুটিয়া উঠিল তাহারই মধ্যে দরগার ফটকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মিল্লাত।

মৃদুস্বরে মিল্লাত—কে? কে? মুসাফের তুমি কে?

(দৃশ্যপটের মধ্যস্থলবর্তী দরগার দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন শাহফানা)

শাহ-ফানা—আমি মিল্লাত!

মিল্লাত—কে?

ফানা—আমি। শাহ-ফানা।

(মিল্লাত প্রবেশ করিল)

মিল্লাত—হজরত! আঃ! প্রতি মুহূর্তে আপনাকে প্রত্যাশা করছি আজ তিন-দিন

ফানা—মাত্র আজ সকালে তোমার খবর আমার কাছে পৌঁচেছে। যে ভিক্ষুক খবর দিলে সে শুধু বললে—ফরাক্কাবাদের গাঁওয়ের আস্তানায় যে ফকীরকে পাঠিয়েছিলেন,—ভূমিকম্পের দিন যে ফকীর রওনা হয়েছিল সে ফকীর ফিরেছে। এই দরগার কথা বললে।

মিল্লাত—ও ছাড়া আর কি বলে পাঠাব?

ফানা—বুঝলাম তুমি। কিন্তু সারাদিনে বের হতে সাহস হল না। শিয়ালের মত ধূর্ত আমিদুল মুল্ক আমার পিছনে চর লাগিয়ে রেখেছে। ওদিকে আবদালীর গোলাম নাজিবখাঁর কালা-পোষ সিপাহী ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। শেষ সন্ধ্যার নামাজের আগে আমিদুলের চরটার নসীব গুণে বলবার ছলে ডেকে ভুলিয়ে সিরণীর সঙ্গে মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করে বেরিয়েছি। আসছি দিল্লীর যে অঞ্চলে জ্বরের মহামারী চলছে সেই পথ ধরে। আজও দিল্লী কাঁদছে মিল্লাত! আবদালীর হত্যা-কাণ্ডের পর দুর্ভিক্ষ—তারপর শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক বুখার—প্রবল জ্বর আসছে, যে মরছে সে বাঁচছে, যে বাঁচছে, সে হয় হচ্ছে অন্ধ, নয় যাচ্ছে মস্তিষ্ক—পাগল হয়ে যাচ্ছে। আজও রোজ রাত্রে আমি যেন কান্না শুনি। দিল্লী কাঁদে। তারপর? দীর্ঘদিন—আজ ছ'মাস তোমাদের জন্য আমার উৎকণ্ঠার পরি-সীমা নাই। মিল্লাত—হজরৎ বেগম?

মিল্লাত—হজরত হারিয়ে গেছে জনাব।

ফানা—(মিল্লাতকে ধরিয়া) মিল্লাত!

মিল্লাত—হজরত! আজ এই ছ'মাস আমি মথুরার চারিদিকে—ফকীর সেজে দোরে দোরে ভিক্ষার ছলে ঘুরে বেড়িয়েছি। পাই নি। শুধু এইটুকু শুনেছি—এক ব্রাহ্মণ তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু মথুরা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত কোথাও পাই নি।

ফানা—তুমি? তুমি কি করছিলে মিল্লাত? কি করে হারাল সে? মিল্লাত!

(তাহার কাঁধ ধরিয়া আবার ঝাঁকি দিল)

(বাহিরে পাল্কী-বাহকের হাঁক শোনা গেল)

মিল্লাত—ফকীর সাহেব ভিতরে চলুন। ডুলীতে কেউ যাচ্ছে পথে।

(উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন)

(পাল্কীর শব্দ মিলাইয়া গেল ক্রমশঃ)

(উভয়ে আবার ফিরিলেন)

মিল্লাত—(কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন) সে এক প্রলয়। তারই মধ্যে হজরত পাগলের মত আমি মরব—আমি মরব বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফানা—ছুটে বেরিয়ে গেল, ছুটে বেরিয়ে গেল। তার জন্যে আবদালীকে মুঘল হারেমে ষোল—ষোলজন বেটী বহু ঘুষ দিতে হয়েছে। বড়ি হজরত বেগম, মালকাই জমানি, সাহেবাই জমানি, সুহরতউন্নিসা আঃ—ষোলজন বেগমকে সে নিয়ে গেল। আর তুমি তাকে হারিয়ে এলে।

মিল্লাত—কি করব জনাব? আমি তাকে ধরেছিলাম, সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। আমি ছুটলাম পিছনে—কিন্তু বৃদ্ধ, কতটুকু আমার শক্তি? অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন, একটা গাছের শিকড়ে পা বেধে পড়ে গেলাম, মাথায় চোট লাগল, বেহোঁস হয়ে গেলাম। হোঁস হল তিনদিন পরে। তখন লড়াই শেষ। যমনার জল পচেছে, আবদালীর ফৌজের মধ্যে বেমার ঢুকেছে; এক লোটা পানি নিয়ে সে আগ্রা ফিরেছে। আমি পাগলের মত চারিদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। সে তখন হারিয়ে গেছে। শুনলাম এক ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে গেছে।

ফানা—সে মরে নি, কি ক'রে জানলে তুমি? এক ব্রাহ্মণ তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে গেছে—কে বললে তোমাকে?

মিল্লাত—গিরি গোস্বামীদের আশ্রমের একজন গোস্বামী।

ফানা—(বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সভয়ে বলিল) গিরি গোস্বামী? কে? কে?

মিল্লাত—নরিন্দর গিরি গোস্বামীর এক চেলা।

ফানা—আ—(আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করিল) নরিন্দর গিরি গোস্বামী। যাদু জানে নরিন্দর, জ্যোতিষ মানে না। সে, সে তাকে লুকিয়ে রাখে নি তো?

মিল্লাত—তাকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম হজরত। সেও বললে—একজন ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে গেছে। অনুনয় করে বললাম—কে সে? কি তার ঠিকানা? বললে—যা বলেছি, তার বেশী বলতে পারব না মুসলমান, অনুরোধ করো না। তবে নিশ্চিন্ত থাক, বেটী তোমার নিরাপদে আছে। তবু আমি খুঁজে বেড়ালাম গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে—

ফানা—(ব্যঙ্গ করিয়া) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। সব ঝুট—সব ঝুট। নরিন্দর গিরি—এ সেই নরিন্দর গিরি তাকে গায়েব করে রেখেছে। ভয়ঙ্কর এই হিন্দু ফকীরেরা, যাদু জানে, মুর্দা খায়, ঔরৎ নিয়ে সাধনা করে—মিল্লাত! আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমি খুন করি।

(বোরখা পরিয়া নিঃশব্দে আমিদুল মুল্ক প্রবেশ করিল। মিল্লাত শাহ-ফানা জানিতে পারিল না। বোরখা খুলিয়া সে বলিল)

আমিদ—ফকীর সাহেব। শাহজাদা মিল্লাত।

উভয়ে—কে?

আমিদ—আমি—আমিদুল মুল্ক।

ফানা—(ধীরে ধীরে সবিস্ময়ে) সাহাবুদ্দীন—আমিদুল মুল্ক।

আমিদ—হ্যাঁ আমি। আমার চরটা সিরণীর মাদকে বেহোঁস হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার হোঁস হারায় নি ফকীর। আমি পিছনেই আছি আপনার। পাছে সন্দেহ হয় বলে ডুলি চড়ে বোরখা পরে এসেছি। আমি জানতাম—আপনাদের দুজনকে একসঙ্গেই পাব। শাহ-ফানা, শাহজাদা মিল্লাত।

ফানা—(তিক্তস্বরে) উজীর, তুমি কেন—কেন আমার পিছনে চর লাগিয়েছ?

আমিদ—ফকীর, আপনি বাদশাহীর ছক নিয়ে সতরঞ্জি খেলছেন নসীবের সঙ্গে। ওই একই ছকে—আমিও খেলছি আবদালীর সঙ্গে—মারাঠার সঙ্গে, বাদশাহীর খেল। আপনার খেলার উপর আমার নজর না রাখলে চলে?

ফানা—না—না—আমিদুল মুল্ক—আমি ও-খেলা খেলতে চাই না। আমি হিন্দোস্তানে শান্তি চাই। বাবরশাহী বাদশাহীর ভাগ্যে বড় দুর্যোগ। আমি হজরত বেগমের ভাগ্যে শুভযোগ দেখে তাকে বসিয়ে তখ্‌তে কয়েম রাখতে চেয়েছিলাম। আর হজরতকে আমি বড় ভালবাসি, সন্তানের মত।

আমিদ—হজরত বেগমকে আমি খুঁজে বার করে দেব। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

ফানা—নরিন্দর গিরি গোঁসাইকে ধর আমিদুল মুল্ক—এখুনি খবর বেরুবে।

মিল্লাত—সে জানে সে ব্রাহ্মণের পরিচয়।

আমিদ—আমি তাকে এনে ফকীর তোমার পায়ে আছড়ে ফেলে দেব। আজ শাহজাদা মিল্লাতকে আমার চাই। শাহজাদা মিল্লাত—তোমাকে আমার প্রস্তাবে রাজী হতে হবে।

মিল্লাত—বল—আমিদুল মুল্ক—বল।

আমিদ—তুমি হলফ করে বল—ফকীরের সামনে। প্রস্তাব জেনে রাজী না হলে আমার পক্ষে বিপদ। সে ক্ষেত্রে তোমার গলা চিরদিনের মত বন্ধ করতে হবে। ফকীর সাহেবকেও আটক করতে হবে মাটির তলার ঘরে অন্ধকূপে।

মিল্লাত—বল—আমিদুল—বল।

আমিদ—তোমাকে তখ্‌তে বসতে হবে। মইনুদ্দীন আলমগীর আবদালীর মেহমান হয়ে আমার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাদশাহী থেকে নামাব তাকে আমি।

মিল্লাত—না—না। না।

আমিদ—শাহজাদা মিল্লাত—এ কথা শোনার পর না বললে চলবে না। বাদশা আহমদশাকে আমি অন্ধ করেছিলাম।

মিল্লাত—আমাকে হত্যা কর তুমি আমিদুল—

আমিদ—শুধু তোমাকে নয়, শাহ ফানাকে বন্দী করতে হবে অন্ধকূপে।

ফানা—আমিদুল মুল্ক—

আমিদ—ফকীর সাহেব।

ফানা—কিন্তু কেন? মিল্লাতকে এ বিপদে ফেলছে কেন?

আমিদ—আবদালীর মেহমান আবদালীর স্তাবক আলমগীরকে সরাতেই হবে আমাকে। আবদালী যে অপমান আমার করেছে, তার শোধ আমি নেব। আমাকে পায়ে করে ঠেলে দিয়েছে,—বংশ তুলে গাল দিয়েছে। আমি নিজামউল মুল্ক চিন কিলিচ খাঁর বংশধর—আমরা তিন পুরুষ হিন্দোস্তানের উজীর—এক শাখা হায়দরাবাদের নিজাম, আর আবদালী, ষোল বছর আগে সে ছিল নাদিরশাহের ছিলমবরদার। নাদিরশা যখন দিল্লীতে এসেছিলেন, তখন পূর্বপুরুষ নিজাম আসফশাহ ছিলমবরদার আবদালীর নসীব দেখে, একদিন বাদশাহ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাই শুনে শাহ নাদির ছুরি দিয়ে দুটো কান কেটে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—নাদিরের গোলামীর পরিচয় কায়েম করে রেখে গেলাম। সেই আবদালী। আমাকে লাথি মেরেছে—গন্না বেগমকে আমি পিয়ার করতাম—তাকে বাঁদী করতে চেয়েছিল। সে মরে জুড়িয়েছে।

মিল্লাত—না—না—সে মরে নি আমিদুল—তুমি তার খোঁজ কর—

আমিদ—ফুরসৎ নাই শাহজাদা। অনেক লড়াই আমাকে করতে হবে। একটা তরকা-ওয়ালীর বেটীর মোহে ঘুরবার আমার ফুরসৎ নাই। গোটা হিন্দুস্থানকে ফকীর করে দিয়ে গিয়েছে আফগান। জান ফকীর ত্রিশ হাজার হাতী-উট-বলদ, খচ্চর গাড়িতে লুঠের মাল বয়ে নিয়ে গিয়েছে নিজে একা আবদালী। গোটা দিল্লী শহরে একটা ঘোড়া নাই, ঘোড়া দূরের কথা, ধোবিদের গাধা পর্যন্ত নিয়ে গেছে মালবোঝাই করে। এর শোধ আমাকে নিতে হবে। কিন্তু চারদিকে দুষমণ আমার। আবদালী, মারাঠা, বাদশাহ, নাজিবখাঁ, ইন্তেজাম সুরজমল জাঠ, সুজাউদ্দৌলা নবাব—সব—সব—সব। এদের সঙ্গে লড়াই দিয়ে জিতে বাঁচতে হবে আমাকে। শাহজাদা মিল্লাত—আমার উত্তর দাও।

মিল্লাত—ফকীর সাহেব।

(নেপথ্যে শব্দ)

কণ্ঠস্বর—কৌন হ্যায়? (ভিতরে আমিদুল উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই নিঃশব্দে; ফকীর শাহফানা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া গভীর চিন্তামগ্ন)

কণ্ঠস্বর—উজীর রিসালা। বাদকশাহী।

কণ্ঠস্বর—হিঁয়া কাহে? কৌন কাম?

কণ্ঠস্বর—তুম কৌন ?

কণ্ঠস্বর—রোহিল্লা কালাপোষ।

কণ্ঠস্বর—বেতমিজ! নেহি পহছানতে হে' ? এ্যাঁ ?

কণ্ঠস্বর—হুজুর আলি—খোদাবন্দ—নবাব—নাজিব খাঁ বাহাদুর।

কণ্ঠস্বর—কার ডুলি? ওয়াজীর আমিদুল মুল্কের ?

আমিদ—শাহজাদা! নিজে নাজিবখাঁ। আমার অনুসরণ করেছে। বলুন—আপনার উত্তর। নইলে আপনি যাবেন—আপনার গুরু ফকীর সাহেব যাবেন—। আমার জন্যে ভাববেন না।

মিল্লাত—তাই হবে উজীর। তুমি সিংহাসনে বসাবে—আমি বসব। তুমি আমাকে হত্যা করবে—আমি মরব।

আমিদ—ফকীর সাহেব—আমার হাত দেখুন। শাহজাদা—আপনি এই বোরখাটা পরে ওদিকে আড়ালে পর্দানশীনে হয়ে বসুন। জলদি। (পোষাকের ভিতর হইতে একটা বোরখা লইয়া ছুড়িয়া দিল)।

(বোরখা লইয়া মিল্লাত ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার আসনে বসিয়া আমিদুল শাহ-ফানার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। শাহ-ফানা সচেতন হইয়া আমিদুলের মুখের দিকে চাহিল)

শাহফানা—নসীব—কিসমৎ—অদ্ভুত আশ্চর্য উজীর আমিদুল মুল্ক। হিন্দুরা বলে অদৃষ্ট—নিয়তি—সে যাকে যে ফরমান দিয়ে দুনিয়ায় পাঠায়, সেই ফরমানের বাইরে যাওয়ার কারুর শক্তি নাই। মানুষ মনে করে—চেষ্টা করে—কিন্তু। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন)

(নাজিব খাঁ প্রবেশ করিল)

নাজিব খাঁ—তাজ্জব। আরে বাপ! ওয়াস্তীর ইমাদুল মুল্কে, গাজিউদ্দীন, খান বাহাদুরে, ফিরোজজং, মীর বখশী, আমীরউলউমরা, নিজামউল মুল্কে, আসফ জা বাহাদুরে।

আমিদ—(ঘুরিয়া) কে? নবাব নাজিব খাঁ?

নাজিব—হ্যাঁ ওয়াজির সাহাব। তারপর ফকীর সাহেব—কি এমন দেখলেন ওয়াজিরের হাতে—যাতে এমন উচ্চ হাসি নিয়ে আসে?

আমিদ—ফকীর সাহেব বলছিলেন যে, এমন যোগ আমার আসছে—অত্যন্ত শীঘ্র আসছে—যেদিন আমার যে মারাত্মক দুষমণ আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে। আমি হাসব—এমনি করে হাসব।

(সে হাসিয়া উঠিল)

নাজিব—মানুষের দুষমণ মানুষ, শেরের দুষমণ শের, শিয়ারের দুষমণ শিয়ার। একটা শিয়ার মরলে এত হাসির কি আছে? সরম কি বাত! সরম কি বাত।

আমিদ—শিয়ার না নাজিব খাঁ, বান্দর, একটা বান্দর। আজই—আজই মরেছে। আমার একটা শের আছে। আর আছে একটা বান্দর। এতদিন শেরটা খাঁচায় থাকত—তার উপর হয়েছিল জখম,—বান্দরটা রোজ তার লেজ ধরে টানত—শিকের ফাঁকে কান বেরলে টানত, খোঁচা মারত; আর দাঁত বের করত। আজ শেরটার খাঁচার খিদমতগার ছিল না। বান্দরটার খেয়ালও ছিল না কি জখম শেরটা সেরেও উঠেছে; আজ বান্দর যেই টেনেছে লেজ—আর অমনি শেরটা খাঁচার দরজায় মেরেছে থাবা—;ব্যস্—। বুঝতে পারছ কি হ'ল? সে শেরটার সে কি হাসি—। কি বলব তোমাকে। পাঠানের মগজ কিছু মোটা—খুলেই বলি, খাঁচা ভেঙে শের—বান্দরটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। (উঠিয়া দাঁড়াইল)।

নাজিব—(তলোয়ার খুলিয়া) আমিদুল মুল্ক।

আমিদ—নাজিব খাঁ। হুঁশিয়ার। শেরকে যে শিকল দিয়ে বেঁধেছিল, সে আবদালী অনেক দূরে। শের শিকল ছিঁড়েছে।

নাজিব—আমিদুল মনে আছে, একদিন তোমার গোটা হারেমকে আমি পথে বের করে দিয়েছিলাম। আবার তাই করব।

আমিদ—এবার আমার হারেমে মুঘলানীর বেটী আছে। নাজিব খাঁ রোহিল্লার চেয়ে মুঘলানীর কদর আবদালীর কাছে কম নয়। আবদালী আগে তাকে বলত—বেটী এখন বলে তুই আমার বেটা।

নাজিব—(হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) তা হলে তুমি শাহ আবদালী জেনানী বেটা মুঘলানী বেগমের—মর্দানা বহুড়ী! কাল থেকে তা হলে মুঘলানীর বেটী উমধাকেই পাঠিও উজিরী করতে।

আমিদ—নাজিব খাঁ!

নাজিব—তোমাকে আমি নজরবন্দী করলাম উজীর। খবর পেয়েছি, দেওয়ালীর দিন মারাঠা কাফিরেরা পঙ্গপালের মত উড়েছে। চৌথ আদায় করতে আসছে। গোটা দোয়াব ছেয়ে ফেলেছে।

শাহফানা—(মারাঠা কাফির পঙ্গপালের মত আসছে। শুনেই) মারাঠা আসছে? চৌথ? চৌথ?

(সে বসিয়া একটা খড়ি বাহির করিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল)

নাজিব—(বলিয়াই গেল) তোমাকে আমি ছেড়ে রাখতে পারব না আমিদুল মুল্ক। চলো—উঠো। তোমার বাদাকশাহীদের গ্রেপ্তার করেছি আমি। তাদের আস্তানা মুঘলপুরা আমার পল্টন ঘেরাও করেছে। আর ফকীর শাহ ফানা,

(দূরে তোপের আওয়াজ হইল)

একটি আওয়াজ।

তোপ? মুঘলপুরার বাদকশাহী লড়াই দিয়েছে? কালাপোষ! জলদি খবর নে—।

নেপথ্যে কালাপোষ—যো হুকুম—খোদাবন্দ!

নাজিব—কার নসীব গুণছ ফকীর? আমার না তোমার নিজের?

শাহফানা—হিন্দোস্তানের নসীব গুণছি নাজিব খাঁ। কিসমতের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলছি! একদিকে দুরাণী বাদশাহী—অন্যদিকে হিন্দুপাদ পাদশাহী। বাবর-শাহীর নসীব—আঁধিয়ারা! হিন্দোস্তানী মুসলমিনের নসীব আঁধিয়ারা।

(আবার পর পর দুই-তিনটি তোপের আওয়াজ হইল) নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল—মারাঠা! মারাঠা! মারাঠা!

নাজিব—মারাঠা? দোয়াবে চৌথ আদায় ছেড়ে দিল্লী আক্রমণ করলে? সয়তানী রিসালা পঙ্গপাল পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ইন্দুর!

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী! হিন্দুপাদ পাদশাহী। এয় খোদা!

নাজিব—(ফানার কথায় কান না দিয়া মারাঠাদের একদফা গাল দিয়া মুহূর্তখানেক স্তব্ধ থাকিয়া নাজিবের হাত ধরিয়া টানিলেন।) উঠে এস উজীর! তোমাকে যেতে হবে মারাঠার তাঁবুতে; আবদালীর পয়জার খেয়েছ, তোমার অভ্যাস আছে; মারাঠার পয়জারও সহ্য হবে তোমার! দেখ কি চায় পঙ্গপালেরা। দোয়াবের সব্জী-ক্ষেত ছেড়ে দিল্লীতে মরতে এল কেন? দিল্লীর লাল কিল্লা কচিপাতা নয় লাল ফুল নয় আগুন—আগুন! পাখা পুড়ে মরবে। এস—

আমিদ—দাঁড়াও নাজিব খাঁ। আমার মা আছেন সঙ্গে!

নাজিব—তোমার মা! ডুলিতে তোমার মা এসেছেন! আ—তোমার বলা উচিত ছিল ওয়াজীর। এ—ই—ডুলি, ডুলি। কালাপোষ!

(বাহির হইয়া গেল)

(আমিদ ছুটিয়া গিয়া মিল্লাতের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া—)

আমিদ—আসুন শাহজাদা! এই অবসর! (দ্রুত টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

(তোপ পড়িল)

নাজিব খাঁ বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল—ওয়াজীর চৌথ নয়, মারাঠা দিল্লী দখল করতে এসেছে। (এখনও প্রবেশ করে নাই)

শাহফানা—(মুখ তুলিয়া) হিন্দুপাদ পাদশাহী!

নাজিব—কেউ বলছে শাহজাদী হজরত বেগমের নামে তারা দিল্লী দখল করবে! হজরত বেগমকে তারা পেলে কোথায়? (প্রবেশ করিল সঙ্গে দুইজন কালাপোষ)

শাহফানা—সেই ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ!

নাজিব—কোথায় উজীর? কই উজীর?

শাহফানা—নরিন্দর গিরির জাদু! এয় খোদা—

নাজিব—শাহ ফানা! উজীর কোথায়? শাহফানা!

শাহফানা—(প্রায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে সে একটু সচেতন হইয়া বলিল) আরে নাজিব খাঁ আমাকে উত্যক্ত করিস না তুই!

নাজিব—উজীর কোথায়? (ক্রুদ্ধভাবে বলিল সে)

শাহফানা—পালিয়েছে সে! জানি না কোথায়।

নাজিব—তবে তোকেই আমি খুন করব ফকীর!

(ফানা উন্মাদের মত হাসিতে লাগিল)

নাজিব—ফকীর! (শঙ্কিত স্বরে)

ফানা—(হঠাৎ হাসি থামাইয়া) খুন কোরো নাজিব। কিন্তু সবুর—থোড়া সবুর। আর একবার দেখি। আর একবার দেখি!

(বসিয়া চকে ঝুঁকিয়া পড়িল)

(ওদিকে তোপ পড়িল)

নাজিব—(চকিত হইল। তারপর কালা পোষদের বলিল) তোরা ফকীরকে পাহাড়া দে! খবরদার! না পালায়! আবদালীর কাছে পাঠাব ওকে!

ফানা—তামাম আঁধিয়ারা! দিল্লী রোতি হ্যায়! (কপালে হাত দিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া কালাপোষকে বলিলেন) রিসালা? শুনতে পাচ্ছিস? (আবার বলিলেন) রিসালা!

কালাপোষ—ফকীর সাহেব!

ফানা—কাদের তোপ পড়ছে? মারাঠার?

কালাপোষ—হাঁ ফকীর।

ফানা—তু মুসলমিন?

কালাপোষ—লা ইলাহি ইল্লাল্লা। হাঁ হজরত!

ফানা—তবে কাঁদ! রোদন কর! সব রোশনি মুছে গেল, হিন্দোস্তানের বাদশাহী দরবার থেকে নবাব আমীর উমরাহ সওদাগর সব সব মুসলিম দৌলতখানা থেকে রোশনি নিভে গেল! হিন্দুপাদ পাদশাহী! রোদন কর মুসলমিন রিসালা!

(নেপথ্যে নরিন্দর গিরির কণ্ঠস্বর)

নে-নরিন্দর—শাহ ফানা! এ ভাই ফকীর!

ফানা—কে? কে?

(নরিন্দর প্রবেশ করিল)

নরিন্দর—আনন্দ রহো ভাই—আনন্দ রহো!

(ফানা সভয়ে পিছাইয়া গেল)

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী? তুমি তুমি নরিন্দর গিরি গোস্বামী! জিন! যাদুবালে! কালাপোষেরা সভয়ে পিছাইয়া গেল। বলিল—জিন! যাদুবালে!

নরিন্দর—ভয় নাই শাহফানা। আমি হিন্দুপাদ পাদশাহী নই, আমি এসেছি তোমার কাছে, জ্যোতিষ গুণে এ কি ভয়ঙ্কর খেলা খেলছ তুমি!

ফানা—হজরতবেটীর কাছে শুনেছি আমি (আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলেন) হজরত-বেটী আমার হজরৎ বেগম। নসীবের আঁধিয়ারার রোশনি! তুমি—তুমি তুলে দিয়েছ মারাঠা পেশবার হাতে। নরিন্দর গিরি—যাদুবালে! আমার হজরত বেটী!

(সে ঝাঁপ দিয়া পড়িল গিরির উপর)

ওরে রিসালা—ধর সয়তানকে! আমার হজরত!

নরিন্দর—ফানা, শাহফানা আছে তোমার হজরত আছে! (ঠেলিয়া দিলেন)

ফানা—আছে! আছে! মারাঠার কয়েদখানায় আছে!

নরিন্দর—না না—

ফানা—তুই তুই তাকে মারাঠার হাতে তুলে দিয়েছিস। (আবার ঝাঁপাইয়া পড়িলেন)

নরিন্দর—ফানা। (বাধা দিলেন) কিন্তু কালা-পোষ দুইজন তাহাকে ধরিল।

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী! তোর চোখ দুটো গেলে দোব আমি। দেখতে পাবি না—হিন্দুপাদ পাদশাহী।

নরিন্দর—আ—! (চীৎকার করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন ফানাকে। কালাপোষ দুইজন সভয়ে ছাড়িয়া দিল। বলিল, জিন! জাদু জানে!)

ফানা—(পড়িয়া গিয়া উঠিতে উঠিতে) আ—! তামাম হিন্দোস্তানে বাদশা নবাব আমীর উমরা সবার ঘরের রোশনি নিভে গেল। তুই কেড়ে নিয়েছিস। তুই!

(নরিন্দর উঠিয়া দাঁড়াইলেন কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে। এক চোখে তাহার রক্ত পড়িতেছে)

নরিন্দর—(যন্ত্রণার মধ্যে বলিলেন) একটা চোখ নষ্ট করে দিলি ফানা! কিন্তু আমি তোর অনিষ্ট করতে আসিনি। এসে-ছিলাম তোর হজরত বেটীকে ফিরে দিতে। কিন্তু—। আঃ—পাছে ভয় পাস, তাই নিরস্ত্র এসেছিলাম! আঃ—। ফানা—!

ফানা—(সভয়ে পিছাইয়া গেল। কালাপোষেরাও গেল) নরিন্দর গিরি!

নরিন্দর—ভয় নেই ফানা। (কঠোর সংযমে আত্মসম্বরণ করিলেন) শোধ আমি নেব না! আমার রুদ্র জাগে নাই! তুই পাগল! কিন্তু তুই পালা। পাগল তুই পালা। আমার শিষ্যরা আসবে। তুই পালা!

ফানা—রিসালা, পালিয়ে আয়! পালিয়ে আয়! ওরে ওরা চিমটে দিয়ে বিঁধে মারে। এই দিকে। সুড়ঙ্গ দিয়ে। এই দিকে।

(ভিতর দিকে চলিয়া গেল। কালাপোষেরা অনুসরণ করিল)

নরিন্দর—হে শঙ্কর! হে দয়াল! হে সুন্দর! আমার যন্ত্রণা মুছে দাও—হে মঙ্গলময়!

(চোখ চাপিয়া ধরিলেন)

নেপথ্যে শিষ্য—গুরু মহারাজ!

নেপথ্যে হজরত—গিরি মহারাজ! ফকীর সাহেব!

নরিন্দর—(মাথা ঝাঁকি দিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন) বেটী হজরত, তুমি একা—একা চলে এস মা!

(তোপ পড়িল)

(নেপথ্যে ধ্বনি উঠিল—বিজয়ী মারাঠার)—হর-হর-মহাদেও! হর-হর-মহাদেও! হর-হর মহাদেও! (শিঙা বাজিল নাকাড়া বাজিল)

(হজরত প্রবেশ করিল)

হজরত—ফকীর সাহেব! গুরু! আমি পারব না—আমাকে মার্জনা কর তুমি! একি? গিরি মহারাজ! একি?

নরিন্দর—আস্তে মা, আমার শিষ্যরা শুনতে পাবে!

(বাজনা বাজিতে লাগিল। তোপ পড়িতে লাগিল)

(হজরত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

নরিন্দর—চল—বেটী—কোথায় তোমায় পেঁছে দিতে হবে চল।

(যবনিকা নামিয়া আসিল)

পুস্তক পরিচয়

অ্যাটম বোমা—অভিজিৎ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। দশ আনা।

বাঙালীর কৌতূহল বেড়েছে, তার লক্ষণ—জনসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আর প্রবন্ধ আজকাল অনেক ছাপা হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশে এই-রকম রচনা সহজেই জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু এদেশে অনেক বাধা আছে। যেমন অক্ষরপরিচয় না থাকলে কিছুই পড়া যায়না তেমনি বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকলে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ বোঝা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দেশের আবালবৃদ্ধ জন-সাধারণের তুলনায় এদেশের অধিকাংশ লোকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। এই কারণে সাধারণের উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা কঠিন কাজ। আজকাল স্কুলে প্রাথমিক বিজ্ঞান শেখানো হচ্ছে, তার ফলে ভবিষ্যতে লোকবোধ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা অনেকটা সুসাধ্য হবে। কিন্তু এখন যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁদের বিশেষ রকম সাবধান হওয়া দরকার।

ইংরেজী পরিভাষার বদলে বাংলা প্রতিশব্দ দিলেই লেখা সহজ হবে এমন মনে করা অত্যন্ত ভুল। সাধারণ পাঠক বরং দু-চারটি ইংরেজী পরিভাষা জানে, কিন্তু নবসঙ্কলিত বাঙ্গলা পরি-ভাষা তার কাছে অর্থহীন। অনেক লেখক ইংরেজী রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করেন, অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় ইংরেজী ইডিয়ম চালান। তার ফলে তাঁদের রচনা বিকট ও অবোধ্য হয়। যাঁরা বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে চান তাঁদের কেউ কেউ আবদার করেন যে, বাঙ্গলা পরিভাষা এমন হওয়া চাই যাতে শুনলেই অর্থবোধ হয়। এঁরা বোঝেন না যে পারিভাষিক শব্দ মাত্রেই কোনও পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্থের প্রতীক, এবং সেই অর্থ জানা না থাকলে শব্দটি নিরর্থক। বাঙ্গলা পরিভাষার সার্থকতা এই যে তা বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে খাপ খায়। যে ঘটনাকে 'প্রতিফলন' বলা হয়, বহু অল্পশিক্ষিত লোকেও তা বোঝে, এজন্য Reflection-এর প্রতিশব্দ 'প্রতিফলন' সহজেই চালানো যায়। কিন্তু যার ইংরেজী নাম Refraction সাধারণে সেই ঘটনা বোঝে না, সুতরাং বাঙ্গলায় 'প্রতিসরণ' লিখলেই অর্থবোধ হবে না, প্রথম বার প্রয়োগের পূর্বে শব্দটির মানে বুঝিয়ে দিতে হবে। পরিভাষার যদি সরল ব্যাখ্যা দেওয়া না হয় এবং ভাষা যদি ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ হয় তবে রচনা লোকপ্রিয় হবে না।

'অভিজিৎ'-এর স্বনামে ও ছদ্মনামে প্রকাশিত অনেক রচনা আমি পড়েছি। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লেখবার কৌশল তাঁর জানা আছে। তিনি পরিভাষার সার্থক প্রয়োগ করেন এবং তাঁর ভাষাও শুদ্ধ বাঙ্গলা, ইংরেজীর উদ্গার নয়। তাঁর নবরচিত 'অ্যাটম বোমা' পুস্তিকাটি সুপাঠ্য সুদৃশ্য সুলভ ও সময়োচিত। অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদে ধাপে ধাপে নানা জটিল বিষয় সহজে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি অবশেষে পরমাণু বিস্ফোরণের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। এই ধরণের আরও অনেক পুস্তক তিনি প্রকাশ করবেন আশা করি।

রাজশেখর বসু।

নির্ণয়—(মাসিক পত্র) : পরিচালক—অতুল ঘোষ। সম্পাদক—অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮-এ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা ৬। শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা, দাম এক টাকা।

জাতীয় সাপ্তাহিক 'নির্ণয়' গত কার্তিক মাস

ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। তাহা হইলেও হইতে সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার রচনা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীমতিলাল রায়, ডাঃ ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ হরিদাস চৌধুরী, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা আছে। শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে এতগুলি মূল্যবান রচনা প্রকাশ করার জন্য 'নির্ণয়' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

Musing of a Musafir: By Sri Bepin Behari Banerjee and Published by Sri A. K. Banerjee, 39A, Haldarpara Road, Calcutta-26. Pp. 113. Price Rs. 1-12.

পুস্তকে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি বহুকাল ধরিয়া ইংরাজী পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশের কালে তাহা চিন্তাশীল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "নগ্ন ফকির বা ভারতীয় কৃষ্টি" আখ্যায় তিনি মিঃ চার্চিলকে উদ্দেশ করিয়া জনসমক্ষে যে পত্র প্রচার করেন তাহা সেদিন প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে সমর্থনের সুর তুলিয়াছিল। সার আশুতোষ ভক্ত ও কর্মী, অশ্বিনী দত্ত এবং তাঁহার পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে সার পি সি রায় সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি এই সকল মহাপুরুষদিগের প্রতি মন অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করে। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক এবং সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যেই হিন্দু আদর্শ ও ভারতের প্রতি গভীর প্রেমের রেশ ধরা পড়ে। বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ হইলেও তাহা সমানভাবেই উপভোগ্য, বিশেষতঃ ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রকাশভঙ্গী প্রবন্ধগুলি আনন্দে পাঠ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

ভাঙা-গড়া——শ্রীকুমারেশ ঘোষ। প্রকাশক : রীডার্স কর্ণার, ৫, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

'ভাঙা-গড়া' যুদ্ধ-যুগের বাঙলার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা একখানা সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস। বর্ণনাভঙ্গীর গুণে ও ভাষার সাবলীলতার জন্যে উপন্যাসখানি একটানা পড়িয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তার খোরাক দিবে। ১৯।৪৮

কার্ডিনালের প্রণয়িনী—রচনা বেনিতো মুসো-লিনী; অনুবাদক : শ্রীপরেশকান্ত গাঙ্গুলী। প্রকাশক : রীডার্স কর্ণার, ৫ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—৩৷৷০।

বেনিতো মুসোলিনীকে আমরা জানি একজন বিরাট রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরূপে, কিন্তু তাঁহার যে অন্য আর একটি পরিচয়ও ছিল আমরা অনেকেই তাহা জানি না। অনুবাদক 'কার্ডিনালের প্রণয়িনী' প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে মুসোলিনীর সেই দিকটির সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইহা মুসোলিনীর লেখা উপন্যাস "La Amante de Cardi-nale"এর অনুবাদ। অনুবাদে মূল গ্রন্থের রস, স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, অনুবাদে লেখক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বইটি অনুবাদ হইলেও মূলের রস আস্বাদন করা যায়। ৮২।৪৯

কালোর বই (কিন্তু ছড়াগুলো মামার)—সুনীলচন্দ্র সরকার। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। দাম দেড় টাকা।

শিশুসাহিত্যে যাঁর রচনার তুলনা নেই সেই অবনীন্দ্রনাথ যখন ভূমিকা লিখেছেন, তখন নিঃসন্দেহেই ভেবে নেওয়া যেতে পারে এ-বই শিশু পাঠকদের মন মাতাবেই। এবং পড়া শেষ করে সত্যিই মনে হলো ছেলেদের জন্যে লেখা এত ভালো বই অনেকদিন পড়িনি। সুকুমার রায়ের হ য ব র ল ছাড়া এ ধরণের মনোহারী আর রসাত্মক বই বোধ হয় আর নেই। কালোর বই-এর লেখকের নাম বোধ হয় সাহিত্য পাঠকরা জানেন না, সুতরাং বলা যেতে পারে তিনি প্রতিভাবান লেখক। কারণ, যাঁর হাতে প্রথমেই এ ধরণের পাকা লেখা বেরোয় তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন দুঃশ্চিন্তা পোষণ করবার হেতু থাকতে পারে না। বলে রাখা ভালো যাঁরা বই পড়ে ছেলেমেয়েরা জ্ঞানলাভ করুক, শুধু-মাত্র এইটুকু চান, তাঁরা কালোর বই-কে সুচক্ষে দেখবেন না। কারণ, এখানে জ্ঞানের কথা নেই, আছে কেবলই হাসি আর আনন্দের কথা। সুতরাং যাঁরা ছেলেদের চোখেমুখে এই হাসি আর আনন্দ দেখতে চান, দ্বিধা না করে এ বই তাঁরা কিনতে পারেন।

মানুষের বন্ধু—শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রীডার্স কর্নার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম এক টাকা চার আনা।

কোটি কোটি লোক পৃথিবীতে বাস করে। প্রতিদিন কত মানুষের জন্ম হয়, আর প্রতিদিন হয় কত জনের মৃত্যু তার সীমা সংখ্যা নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন আর স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে ভবিষ্যতের জন্য? একটি দেশে হয়তো শতাব্দীতে একজনের বেশী মহৎ ব্যক্তি জন্মায় না। তাঁরা মানুষের উপকার করে গেলেন শুধু এইটুকু জানলেই তো চলে না, সে সঙ্গে তাঁদের জীবনকথাও জানা প্রয়োজন—তাতে ভবিষ্যৎ মানুষের আত্মগঠনের সুবিধা হয়। মানুষের বন্ধু বইতে লেখক এমন কয়েকজনের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন যাঁরা সত্যিই পৃথিবীকে নানাভাবে ঋণী করে রেখে গেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় তাঁরা যে অসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের যদি আদর্শ হয়, তবে আমরা মহৎ কিছু দিয়ে যেতে পারি আর না পারি অন্ততঃ নিজেদের জীবনে অনেকটাই উপকৃত হবো তাতে সন্দেহ কি! সুতরাং লেখককে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। ১৩।৫১

এ যুগের অভিযান—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান—মহাজাতি প্রকাশক, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম আট আনা।

পাঠ্যপুস্তকে ছাত্ররা যে পৃথিবী-বর্ণনা শেখে পৃথিবী সম্বন্ধে তাই সম্পূর্ণ ও শেষ কথা নয়,, তাই ভূগোল-পাঠ শেষ করেও তাদের উচিত আরও কিছু বই-এর খোঁজ নেওয়া, যাতে পৃথিবী সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু লেখা আছে। দুঃখের বিষয় এ ধরণের বই আমাদের দেশে বেশী নেই। আরও একটা কথা। মানুষ যে কত সাহসী হতে পারে তার পরিচয় মেলে তাদের নিত্যনতুন দেশ আর পাহাড়-পর্বত আবিষ্কারে। গিরি-কন্দর পেরিয়ে মানুষ আবিষ্কার করে চলেছে প্রাচীন এই পৃথিবীকে। ভূগোল পাঠের সঙ্গে এই ইতিহাসের পরিচয় পাওয়াও দরকার ছাত্রদের। 'এ যুগের অভিযান' এই কারণেই ছেলেদের উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক। তাতে পৃথিবীকে যেমন বিস্তৃতভাবে জানবার সুযোগ আছে, তেমনি এইসব অভিযান-কাহিনীও সহজেই জানা যায়। ফলে, লেখক গল্পের আমেজ রেখে জ্ঞাতব্য বিষয়ও এইটুকু ছোট্ট বই এ সুন্দরভাবে পরিবেষণ করতে পেরেছেন। ১৬।৫০

নিশান নাও—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ১বি রসা রোড, কলিকাতা। দাম এক টাকা বারো আনা।

কবিতার বই। আধুনিকতার দুর্বোধ্যতায় কুয়াশাচ্ছন্ন নয়। সবগুলো কবিতাই মুক্তিপ্রাণ ভারতবাসীর আত্মকথার ছন্দরূপ। ছন্দে কারু-কার্যের চমৎকারিত্ব না থাকলেও প্রত্যেকটি কবিতা সুখপাঠ্য। বিশেষতঃ 'আবির্ভাব,' 'জয়যাত্রা,' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'শেষযাত্রা' কবিতা কয়টি সহজ সরলতায় সুন্দর। নিষ্কলঙ্ক অনুভূতি না থাকলে এমন সহজ সুরে এ রকম গভীর ভাবাত্মক রচনাকে ছন্দোবদ্ধ করা অসম্ভব। ধীরেনবাবু কবিপ্রসিদ্ধি আগেই লাভ করেছেন, 'নিশান নাও' আশা করি তাঁর সেই খ্যাতির পথকে আরও একটু প্রসারিত করে দিতে পেরেছে।

আমরা বাঙালী মোদের বাঙলা (আবৃত্তি পুস্তক) অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী এম এ। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, ৩নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

আবৃত্তির সুবিধা এই, দক্ষতা থাকলে যে কোনো ব্যক্তিই যে কোনো কবিতাই চমৎকারভাবে আবৃত্তি করতে পারেন। যেমন ভালো গানের জন্য ছন্দোময় কবিতার প্রয়োজন হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তেমনি আবৃত্তির জন্যও সার্থক কবিতা না হলে চলতে পারে। এ কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবগুলো কবিতাই রেকর্ডে আবৃত্তি করা হয়েছে এবং আশা করি অনেকেই তা শুনেছেন। তবে এখানে বলা চলতে পারে যে, আবৃত্তির পক্ষে যত উপযোগীই হোক, কবিতা হিসাবে এ রচনাগুলো সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। অনেক জায়গায় ছন্দপতনও চোখে পড়লো। ৭।৫১

বিচিত্রিতা—সম্পাদক—রাণা বসু ও তন্ময় বাগচী। অস্মিতা বাগচী কর্তৃক ৭ই, মহীশূর রোড, কলিকাতা—২৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক-লেখিকাদের কবিতা ও গল্পে বিচিত্রিতা বাংলার কিশোরদের জন্য অপূর্বসাজে সজ্জিত হইয়াছে। বিচিত্রিতা আমাদের কাছে খুবই ভাল লাগিল। ৩১১।৫০

১। শিশু ও শৈশব।

২। শিশুপালনে কোনটি চাই বংশগতি না পারিপার্শ্বিক।

শিশু লালনী গ্রন্থমালা। মূল্য—চার আনা।

শিশু-মনোবিকাশ মনস্তত্ত্বের জটিলতম বিষয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ও প্রাচ্যের মধ্যে জাপানে শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে, নিছক শুষ্ক আলোচনা নহে, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুমনের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা। ইহার ফলে শিশুদের জন্য নানাপ্রকারের ক্লিনিক ও হসপিটাল গড়িয়া উঠিয়াছে। শিশু মনস্তত্ত্বমূলক বিভিন্ন পত্রিকারও উদ্ভব হইয়াছে। শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধেও স্বাধীন দেশগুলিতে বিবিধ শিক্ষাপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ভারতের অন্যান্য নানা সমস্যার মতন শিশুদের সমস্যাও সমাধানের পথে অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। পরাধীন দেশে হয়ত এই

উপেক্ষার পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণ ছিল, কিন্তু স্বাধীন ভারতে শিশুমনকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করিয়া তাহাকে উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শিশুলালনী গ্রন্থমালা প্রকাশিত পুস্তক দুইটির মধ্য দিয়া সেই গুরু দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া শিশুমনের বহুবিচিত্র ধারার সহিত অভিভাবকদের সম্যক পরিচয় করাইবার প্রয়াস হিসাবে পুস্তিকা দুইটি সার্থক রচনা। শিশু-মনোবিজ্ঞানের মত জটিলতম বিষয়কে সহজ সরল সাধারণ বোধগম্য রূপে প্রকাশ করিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে। অত্যন্ত আনন্দের কথা গ্রন্থকারদ্বয় এই দুরূহ কার্যে সিদ্ধকাম হইয়াছে। সমাজের কল্যাণকামী সকলের পক্ষেই পুস্তিকা দুইটি অপরিহার্য।

আমাদের কবি ঃ মনোরম গৃহঠকুরতা। মূল্য —দেড় টাকা।

সহজ মনোরম ভাষায় শতাধিক পৃষ্ঠার মধ্যে বিশ্বকবির জীবনী বিবৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পুস্তকটি যে পাঠকসমাজে সমাদৃত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লেখক শিশুরবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম স্ফুরণ হইতে শুরু করিয়া তাঁহার পরিণত বয়সে রাজনৈতিক অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও ক্রিস্টমনের অনবদ্য পরিচয় দিয়াছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যর' উপাধি ত্যাগ এবং মিস র‍্যাথবোনের অভিযোগের বিরুদ্ধে দুর্বল শরীরেও জ্বলাময়ী ভাষায় উত্তরদান প্রভৃতি কবিচিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা অপূর্ব স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক।

পুস্তকটির মধ্যে স্থানে স্থানে কতকগুলি কবিতার উদ্ধৃতি ভ্রমাত্মক। উদাহরণ স্বরূপ 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে' ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতা দুইটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি পরিচ্ছন্ন ও সুরুচির নিদর্শন। ২৮।৫১

বেতার প্রসঙ্গ

বেতারে রবীন্দ্রনাথের নাটক

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত ১০টা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত কলিকাতা কেন্দ্রের সাহায্যে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকের অভিনয় হল। আমরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ঐ নাটক শুনেছি। শুনে বুঝতে পারলাম সময়াভাবে বইটিকে সম্পূর্ণ অভিনয় করে শোনান হয় নি। বেতারের অভিনয়কালে বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি বহু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। পরে জানা গেল যে, সময়াভাবে শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা তাসের দেশ-এর প্রথম সংস্করণকে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাতেও সময় কম মনে হওয়ায় কিছু কথা এখান সেখান থেকে কাটতে হয়েছে এবং গানগুলিকেও তাঁরা গেয়েছেন যথেষ্ট সংক্ষেপ করে।

বেশ কিছুদিন থেকে আমরা লক্ষ্য করছি, রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে বেতারে বেপরোয়াভাবে কাজ চলেছে। মাসকয়েক আগে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয় অত্যন্ত হাস্যকর হয়েছিল। আরো কয়েকটি নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে, তার মধ্যে "রাজা ও রাণী"র কথা অনেকেরই মনে আছে, তা নিয়ে কাগজে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, আমরাও সমালোচনা করেছি। আমাদের প্রধান আপত্তি হচ্ছে এই সব নাটকের কাট-ছাট্ করা রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলাই যেন কাট্ছাটের উৎপাত আরো বিশেষভাবে বেড়ে যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। "রাজা ও রাণী"র অভিনয়ে নাটকের কাটছাট করা রূপ ও তাকে মেলাতে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত নতুন শব্দ যোজনার কথা অনেকেরই মনে আছে। এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ যদি সতর্ক না হন, তবে বেতারের এই সাহস বন্ধ করা খুবই মুশকিল। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমেই যখন বেতারে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় হয়, তখন সেখান থেকেই এ বিষয়ে চাপ আসা উচিত। এ বিষয়ে তাঁরা যদি সতর্ক না হন, তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে বেতার পরিচালকদের স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা কে রোধ করবে? রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান জনসাধারণের আপত্তিকে বারে বারে বেতার পরিচালকরা যে উপেক্ষা করছেন, তা কেবল ঐ কারণেই।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলায় বারে বারে এই রকম সময় সংক্ষেপের কথা বেতার পরিচালকদের মনে কেন জাগে, তা আমরা ভেবে পাই না। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সাধারণতই কথাপ্রধান নাটক। কথার মূল্যেই নাটকের মূল্য। সাধারণ রঙ্গালয়ের বা যাত্রার মত নাটকীয় বৈচিত্র এর মধ্যে থাকে না, যা দেখে বা শুনে জনসাধারণ মুগ্ধ হবে। এই সব নাটকের কথাকে বাচনভঙ্গীতে যত সুষ্ঠুভাবে ফোটানো যায়, ততই নাটকের রসে মন মুগ্ধ হয়। নাটকগুলি লিরিক কবিতার মত। যাত্রার বাচনভঙ্গীতে কোন ভাল লিরিক কবিতার আবৃত্তি যেমন শুনতে শ্রুতিকটু লাগে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে যাত্রা প্রথার বাচন-ভঙ্গী অচল, এই কথাটা সব সময় মনে রাখা দরকার। কথাপ্রধান রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই বৈশিষ্ট্য বেতারে অভিনয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু বেতারের পরিচালকদের ভাবগতিক ও তাঁদের কার্যক্রম দেখে মনে হয় যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথাকে সাধারণ রঙ্গালয় বা যাত্রার মত বাচনভঙ্গীতে অভিনয় করা যায় না, সেই হেতু তা বেতারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই তাকে যথাসম্ভব কেটে-ছেঁটে অভিনয় করতে আদেশ করেন। বেতারের পরিচালকরা নিজেদের রুচি অনুসারেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলা ঐ রকম সময় নির্দেশ করছেন, আর অন্যেরা তাই স্বীকার করে নিচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও যখন তাঁদের ইচ্ছার কাছে নিজেদের নত করেন, তখন দুঃখবোধ করি।

বেতারকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত যে সব নাটক গত এক মাসের মধ্যে কলকাতা থেকে শোনানো হয়েছে, তার সব কটির নাম ও সময়-তালিকা তুলে দিচ্ছি। তা থেকে আমাদের অনুমানের কারণ সকলের কাছে হয়তো আরো পরিস্কার হবে এবং বেশ বোঝা যাবে যে, বেতার নাটকের বেলায় তাদের ইচ্ছাটা কি।

৯ই ফেব্রুয়ারী—'অভিমান';লেখক—শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, সময়—১ ঘণ্টা।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—'কৃষ্ণতিথির চাঁদ'; লেখক—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য, সময়—১ ঘণ্টা।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—'বিশ বছর আগে'; লেখক—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য, সময়—১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—'তাসের দেশ'; লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সময়—৪৫ মিনিট।

২রা মার্চ—'সতী' (শরৎচন্দ্র); নাট্যরূপ—বাণীকুমার, সময়—১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকটি ছাড়া এই তালিকার আর কোন নাটক ১ ঘণ্টার নীচে সময় পায় নি, বরং বেশীই পেয়েছে। অথচ ঐ সব নাটক ও নাট্যকার কেউ যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, একথা কোন নির্বোধকেও বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। অন্তত যারা নাটক পড়তে জানে। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের রসোপলব্ধির জন্যে যে পরিমাণ শিক্ষা ও রুচিবোধ দরকার, তা বেতার পরিচালকদের মধ্যে নেই বলেই বোধ হয় তাঁরা উপরোক্ত অন্যান্য নাটকের অভিনয়ে যথেষ্ট সময় দিয়ে ও রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলায় যথাসম্ভব সময় সংক্ষেপ করেছেন। এই ব্যবহারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নাটককে তাঁরা উপরোক্ত তালিকা-ভুক্ত নাটকের নীচেই যে স্থান দেন, একথা কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? এরকম অশ্রদ্ধা নিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বেতারে ব্যবহার করেন, বিশ্বভারতী থেকে তার কঠোর প্রতিবাদ হওয়া উচিত এবং আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে তা হবে।

রঙ্গজগৎ

বরযাত্রী (ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স—ক্যালকাটা মুভীটোন)—কাহিনী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা : সত্যেন বসু; আলোকচিত্র : বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দগ্রহণ : তপন সিংহ; সুরযোজনা : সনীল চৌধুরী, শিল্পনির্দেশ : ধীরেন নাগ। ভূমিকায় : কালি বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, সন্ধ্যারাণী, যমুনা প্রভৃতি।

অজন্তা ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসুশ্রী বীণা ও আলোছায়া মুক্তিলাভ করেছে।

অবিমৃষ্য বাস্তব নিয়ে তোলা ছবির কথা ব'লতে এতাবৎকাল আমরা কেবল গুমোটে বিষয়বস্তুই পেয়ে এসেছি। জীবনের আরও দিক যে আছে এবং সেসব দিকেরও যথাযথ রূপায়ণ পর্দার উপযুক্ত বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠতে পারে সে তত্ত্ব নিয়ে বড় একটা কেউ নাড়াচাড়া করতে এগিয়ে আসেনি। "বরযাত্রী" সেই অন্যদিকেরই পরিচয়পত্র। বাঙালীর জীবনের একটা হাল্কা দিক নিয়েই এর বিষয়বস্তু গড়ে তোলা হ'য়েছে। একেবারেই ছাঁকা বাস্তব দিক; মধ্যবিত্ত বাঙলার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো যৌবনোন্মেষকালের রসোচ্ছল স্বপ্নাবেশ।

বিয়ে নিয়ে ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে তরুণ বয়সের উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও মোহকে ঘিরে বিশের জাতের যে প্রহসন সৃষ্টি হ'য়ে এসেছে "বরযাত্রী"কে তারই নথী চিত্র ব'লে অভিনন্দিত করা যায়। এটা হ'লো একটা জাতির বিশেষ একটা আচরণের পরিচয়—এ হ'লো নিয়ে নিয়ে তরুণ বয়সের স্বতঃস্ফূর্ত রোমান্স ও রোমাঞ্চের আবেগময় ও রসোচ্ছল পরিস্থিতি।

"বরযাত্রী"র পরিস্থিতিগুলিকে সংকলন করা হ'য়েছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গণেশ, ঘোৎনা এণ্ড পার্টির ওপরে লেখা বিভিন্ন রচনাবলী থেকে। গণেশরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর তরুণদল নয়, ওদের দলে মিশে রয়েছে বাঙলার মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় সব ছেলেরাই তরুণ। এই বয়সে তরুণরা যেমন হয়; তাদের চাপল্য, তাদের সরল রসিকতা, দুরন্তপনা, সব মিলে হাসির এমন একটা প্রচণ্ড হুল্লোড় সৃষ্টি ক'রেছে যা এর আগে আমাদের দেশের ছবিতে আর কখনো পাওয়া যায়নি। এই সঙ্গে বাঙলার সমাজজীবনের একটা সুখময় পর্যায়কেও উদ্ভাসিত ক'রে তোলা হ'য়েছে।

গল্পের আরম্ভ গণ্শাদের দলের ত্রিলোচনের বিয়ে উপলক্ষে বরযাত্রী যাওয়া নিয়ে। গণ্শার পালক মামা তাকে যেতে দেবেন না। গণ্শা শাড়ী প'রে পাশের বাড়ীর নবৌদি সেজে মামার সামনে দিয়েই পালিয়ে গেলো। বরযাত্রী গিয়েও বিপদ। খিড়কীর দিকে লুকিয়ে ওরা বাসরে আড়ি পেতে রয়েছে, ওপরের ছাদ থেকে মাথায় এসে পড়লো গেলাসপাতার জঞ্জাল। ওদের অতর্কিত চীৎকারে ডাকাত মনে ক'রে সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়লো। ওরা ছুটে পালাতে লাগলো। আর পেছনে দঙ্গল লোক ওদের তাড়া ক'রে চলেছে। রাত্রে ফাঁকা মাঠ মনে ক'রে ওরা গিয়ে পড়লো পানা পুকুরে। ধরা পড়ে গেলো ওরা। প্রথমে কেউ ওদের বিশ্বাস করে না, শেষে ত্রিলোচন বেরিয়ে এসে ওদের উদ্ধার ক'রলে। এর পর গণ্শার বিয়ের পর্ব। মামা বিয়েতে রাজী নন, অথচ বিয়ে না হ'লে গণ্শা মনমরা। ত্রিলোচন তার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের এক বাড়িতে ওদের মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেলো। গণ্শা বেশ নিলে বুড়ো দাদুর, আর একজন সাজলে পাত্রের পিসিমা। ঘোৎনা সাজলে ভট্চার্য মশাই। পিসিমা'কে নিয়েই গোল বাঁধলো। তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলো; আড়ষ্ট হ'য়ে নিজেকে গোপন রাখা তার পক্ষে মুশকিল হ'লো। বাথরুমে যাবার নাম ক'রে সে পালালো, কিন্তু যাবার সময় সে ফেলে গেলো তার পরচুলাটা। ধরা পড়ে ওরা পালালো সেখান থেকে। এরপর গণ্শার বিয়ের জন্যে আর এক অভিযান আরম্ভ হ'লো। গোরা নিয়ে এলো তার মাসীর বাড়ির সামনের পুটুরাণীর খবর। সবাই গিয়ে উঠলো মাসীর বাড়ীতে। উপযাজক হ'য়ে পুটুর দাদুর সঙ্গে আলাপ কর্তে গেলো, কিন্তু ওরাই বাগানের জামরুল ধ্বংসকারী ব'লে বৃদ্ধ তো ক্ষেপেই আগুন। শেষে গোরার মাসতুতো বোন টেপীকে পড়াবার জন্যে গণেশকে নিযুক্ত করা হ'লো। টেপীর বন্ধু পুটু, সেও আসতে লাগলো, আর গণেশ তাকে রোজ ম্যাজিক শেখাতে থাকে। বন্ধুরা বললে পুটুকে কবিতা শোনাতে। দারুণ বৃষ্টি মাথায় ক'রে গণ্শা টেপীকে পড়াতে এলো। টেপীর সর্দিজ্বর, গণ্শাকে ফিরতে হ'লো। পথে দেখা পুটুর সঙ্গে। গণ্শা নিজের বর্ষাতি খুলে পুটুকে পরিয়ে দিলে। সেই মুষলধার বৃষ্টির মাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে কবিতা পড়ে শোনালো। পুটু ছাতা ও বর্ষাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে ব'লে বাড়ির ভিতরে চলে গেলো। গণ্শা ভিজতে লাগলো দাঁড়িয়ে, পুটুর আর পাত্তা নেই। পরদিন ছাতা ও বর্ষাতি ফিরৎ নিয়ে এলেন তার মামা। সব যেন ভেস্তে যাবার উপক্রম। এবারে বন্ধুরা পুটুরাণীর মন জানবার ব্যবস্থা ক'রলে। ঠিক হ'লো গণ্শাকে নিরুদ্দেশ করা হবে। ত্রিলোচন খিদিরপুরে তার এক মামাশ্বশুরের বাড়িতে গণ্শাকে রেখে এলো। সে এক চোরের আড্ডা। একদিন গণ্শার জুতো চুরি গেলো, আর একদিন রাত্রে গণ্শা দেখে ত্রিলোচনের মামাশ্বশুর জানলা দিয়ে বাঁশ গলিয়ে ওর জামাটা চুরি ক'রলে। গণ্শা চুপি চুপি উঠে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এক ফাঁকে নিজের জামা জুতো উদ্ধার ক'রে পালালো সেখান থেকে। ইতিমধ্যে গোরা পুটুর মন বুঝতে যায়, এবং তাকে জানিয়ে আসে যে, পরদিন সকালে গণ্শা ফটো তুলতে আসবে। পুটু ছবি তোলবার আবদার ক'রতে গিয়ে দাদুকে একথাও জানিয়ে দেয়। ফটো তুলে বাইরে আসতেই গণ্শা দেখে সামনে বসে তার মামা আর পুটুর দাদু। সেই যে গণ্শা ছুট দিলে তারপর আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেলো না। পাত্তা মিললো অনেকদিন পর একটা মেলায় সাধুর বেশে। ত্রিলোচন গিয়েছিলেন সেই মেলায়। গণ্শা ত্রিলোচনকে গোপনে পত্র লিখে ধুতুরো ফল জোগাড় ক'রে দিতে বলে। রাত্রে ভাঙের সঙ্গে ধুতুরো মিশিয়ে গণ্শা তার প্রহরীদের ঘুম পাড়িয়ে টাকাকড়ি নিয়ে উধাও হ'লো। ইতিমধ্যে ত্রিলোচন তার দলের সবাইকে সেখানে এনে হাজির ক'রেছিলো গণ্শাকে উদ্ধার করার জন্যে, কিন্তু ঘোটেলে ঝগড়া হ'তে ওরা সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হ'লো। ওরা চুপি চুপি অন্ধকারে ট্রেনে চেপে বসেছে, গণ্শাও এসে হাজির। শিবপুরে ফিরে গণ্শা। দীর্ঘদিন পর পুটুরাণী দর্শনের আশায় পিছনের বাগানে হাজির। ঝোপের আড়াল থেকে পুটু আর টেপীর মধ্যে কথায় ওর মাথার চুলের নিন্দা শুনলে। আড্ডায় ফিরে সাব্যস্ত হ'লো সবাই মিলে বাবরী রাখা হবে। এর

আগে অবশ্য পুটুর সঙ্গে গণ্শার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। গুপ্ত আর ঘোৎনা গিয়েছিলো দার্জিলিঙে, ফিরে এসে ওদের সবায়ের বাবুরী দেখে তো ক্ষেপেই অস্থির। বিয়ের আর মাঝে একদিন মাত্র বাকী। ঠিক হ'লো সেই রাত্রেই গণ্শার চুল ছাঁটতে হবে। খুঁজে খুঁজে একটা পশ্চিমার সেলুনে হাজির। তাকে দশ আনা-ছ আনা ছাঁটের নির্দেশ দিয়ে ওরা একটু অন্যমনস্ক থাকবার পর চোখ ফিরিয়ে দেখে ততক্ষণে জার্মান ছাঁট হয়ে গেছে, তখন মাথা সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। গণ্শা বিয়ে ক'রতে গেলো পরচুলা প'রে। বাসরে ঘুমের ঘোরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে পরচুলা গেলো খুলে। চোখ ফিরিয়ে পাশে নেড়ামাথা একজনকে দেখে পুটু তো ডাকাত ব'লে চেঁচিয়ে কেলেঙ্কারী সৃষ্টি ক'রলে। বাড়িশুদ্ধ সব দৌড়ে এলো। গণ্শা কাপড়ের আড়ালে আত্মগোপন করলে। তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হ'লো, গণ্শা ব'লে তাকে চেনাই যায় না। প্রহার আরম্ভ হয় আর কী এমন সময় মামা এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

খুবই সাদাসিদে, সবায়েরই জানাশুনো সব ঘটনা, কিন্তু পরিবেশ মাফিক উপস্থাপন কৌশলে অনন্যসাধারণ প্রমোদ-চিত্রে পরিণত হ'য়ে উঠেছে। বস্তুত এমন নির্মল আনন্দ পরিবেশন, দিশী বিলিতী সব ছবি মিলিয়েও কচিৎ পাওয়া যায়। ছবির আদর্শ বিষয়বস্তু সম্পর্কেও "বরযাত্রী" একটা নতুন দিকের নির্দেশ দান করে। কল্পিত ঘটনা ও কৃত্রিম চরিত্র এবং পরিবেশ ব্যতিরেকেও প্রকৃত উপভোগ্য বস্তু গড়ে তোলার একটি সুষ্ঠু নিদর্শন "বরযাত্রী"। পরিচালক বিষয়বস্তুর সঙ্গে চমৎকার তাল ফেলে চলেছেন। প্রথম দৃশ্য থেকে একেবারে শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি দৃশ্য পর্যন্ত ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে সুন্দর ধারাবাহিকতা রেখে গিয়েছেন, যাতে পরম উপভোগ্য একটা আস্ত গল্প পাওয়া যায়। দু'একটি জায়গা ছাড়া গতি আগাগোড়াই বেশ তরতরে। দু'এক ক্ষেত্রে যে নীরস লাগে সেটা হ'লো হাসির চরম ধাপ থেকে নেমে আসার জন্যে, দৃশ্যগুলির দোষে নয়। আর হাসির যে জোয়ার শুরু থেকেই বইতে থাকে তাতে মাঝের ঐ ক'টি নীরস বিরতি দর্শকদের তবু দম নেবার অবকাশ এনে দেয়। এক এক সময় তো হাসতে হাসতে বসে থাকাই মুশকিল হ'য়ে দাঁড়ায়।

ছবির প্রাণ গণ্শা এবং গণ্শাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ওর মধ্যে অভিনয়ের চেষ্টা কোথাও ধরা যায় না ওর তোৎলামোটা এতো স্বাভাবিক, ওর ভাবভঙ্গী, দুষ্টু এবং ফন্দী গণ্শাকে এক অমর সৃষ্টিতে রূপায়িত ক'রে তুলেছে। ওর টক্‌টাক্ কথা, নবোদি সেজে মামাকে ফাঁকি দিয়ে পালানো, পুটুর কাছে সশঙ্কিত প্রেম নিবেদন, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়া, দাদু সেজে কনে দেখতে যাওয়া, ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সাধু সাজা, ফটো তুলতে গিয়ে মামার কাছে ধরা পড়া, সেলুনে চুল ছাঁটা, পরচুলা খুলে যাওয়ায় ধরা পড়া, স্ত্রী আচার দেখতে গিয়ে যদুদার পাল্লায় পড়া, পানাপুকুরে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণ্শার অভিব্যক্তি মনে পড়লেই পরেও হাসি চেপে রাখা দায় হ'য়ে পড়ে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা পর্দায় একটা নতুন চরিত্র সৃষ্টির জন্যে অভিনন্দন লাভ ক'রবেন।

আর সবায়েরও অভিনয় গণ্শার সঙ্গে তাল রেখেই চলেছে, অথবা বলা যায়, গণ্শা তাদেরও সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছে। নয়তো, আলাদা ধ'রে বিচার ক'রলে ওর দলের কয়েকজনের আড়ষ্টতা এড়িয়ে যাওয়া যেতো না। পুটুর ভূমিকায় নবাগতা যমুনার অভিনয় ভালো এবং মনেও ধরে। গম্ভীর স্বল্পভাষী মামার ভূমিকায় পরিচালক সত্যেন বসু এদিকেও তাঁর কৃতিত্ব আর একবার প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হ'য়েছেন। একটু মাত্রাছাড়া অভিনয় লাগলো কেবল নিয়োগী হোটেলের নিয়োগী মশাইকে।

শেষের দিকে পুটুর গান গাওয়ার দৃশ্যে বাগানটা বড়ো কট্‌কটে হ'য়ে দৃষ্টিকে আঘাত দেয়, কৃত্রিম সাজানো বাগান ব'লে চোখে লাগে; এ ছাড়া দৃশ্য সজ্জা আগাগোড়াই ভালো কলাকৌশলের অন্যান্য দিকও মানানসই হ'য়েছে। সুরযোজনায়, টাইটেলের আবহসঙ্গীত এবং গান দু'খানি খুবই মনোজ্ঞ; কিন্তু আবহসংগীতে কোন বৈচিত্র্য নেই।

সমস্ত দর্শক হাসতে হাসতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছে এমন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্যে ন্যাশনাল পিকচার্স সর্বজনের ধন্যবাদার্হ।

অভিশপ্ত

তালজ্ঞান না থাকলে ভালো গলায় ভালো সুরে ভাল গানও বেখাপ্পা হ'য়ে যাবার মতো হ'চ্ছে "অভিশপ্ত"। কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনার ধারা নির্ণয়ে এবং বিন্যাসের সর্বত্রই বেতালা সংগত। এবং তালকে বেতালে পরিণত করার জন্যে পরিচালক চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকে ফাঁকি দিতে দেননি।

"অভিশপ্ত" নাম থেকে একটা শাপগ্রস্ত অভাগার কথাই মনে হয়, কিন্তু গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বুঝতে পারা যায় না এবং শেষকালেও ও তথ্যটা খুব স্পষ্ট নয়। গোড়া থেকে যা দেখা গিয়েছে তা দাঁড়ায় একটি যুবকের জীবনে বিভিন্ন নারীর আবির্ভাব এবং তাকে আশ্রয় ক'রে নিয়ে সংসার বাঁধায় তাদের বাসনা। মূল গল্পটির নাম অবশ্য "নারীর মূর্তি"। কিন্তু বিন্যাসে বিভিন্ন মূর্তির নারীকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, নায়কের জীবনের অভিশাপের উপরও জোর দেওয়া হয়নি। মাঝামাঝি যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে তার ওপরে মনকে খাড়া রাখবার মতো তাগিদ পাওয়া যায় না।

নায়ক রাধাকান্ত জমিদারের ছেলে। মা মারা যাবার পর পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রলেন যার প্ররোচনায় সেও এক নারী, তার বিমাতা। এই বিমাতা স্বার্থসর্বস্বা নারীমূর্তির প্রতিভূ। স্বামী রোগশয্যায় দেখে সে তুলসীতলায় এসে প্রার্থনা জানায় উইলটা যেনো তার ছেলের নামে হয়। বাড়িতে থাকতে রাধাকান্ত আর এক নারীর সংস্পর্শে আসে, সে বালবিধবা নীরা। রাধাকান্তর বিমাতাই তাকে আশ্রয় দেয়। নীরা প্রাণ ঢেলে রাধাকান্তর সেবা করে যায়। রাধাকান্তের সে একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। গ্রামের এক গয়লার মেয়েকে জড়িয়ে রাধাকান্তের নামে মিথ্যা বদনাম রটনা হওয়ায় বিক্ষুব্ধ রাধাকান্ত এ বিষয়ে নীরার মন জানতে গিয়ে তার হাত ধ'রে। সরল ব্যাপার, কিন্তু বিমাতা সেটাকে অন্য চক্ষে দেখলেন এবং ফলে রাধাকান্ত বিতাড়িত হ'লো। অনাহারে, আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে রাধাকান্ত শহরের এক বাড়ির অলিন্দে পড়ে রইলো। গৃহকর্তা সকন্যা প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেই তাকে দেখলে এবং গায়ে হাত দিয়ে দেখলে সে রুগ্ন। কন্যা রেণুর আতিশয্যে রাধাকান্তকে ঘরে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'লো। রেণুর সেবায় রাধাকান্ত সুস্থ হ'য়ে উঠলো। রেণুর কথাতেই রাধাকান্ত তার শিক্ষক নিযুক্ত হ'লো এবং তার থাকবার জন্যে মেসও ঠিক হ'লো। যথাকালে রাধাকান্ত এম-এস-সি পাশ ক'রে অধ্যাপক হ'লো। স্বভাবতঃই রেণু ও রাধাকান্তর মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হ'লো, কিন্তু বিয়ে হ'তে পারলো না ওরা একই গোত্রের ব'লে। রেণুর বিয়ে হ'লো লম্পট ধনীপুত্র বীরেনের সঙ্গে। মাঝে একদিন রেণুদের বাড়ির সামনেই নীরার সঙ্গে রাধাকান্তের দেখা হ'লো। নীরাকেও কলঙ্কিনী আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। নীরা শহরে এসে অভিনেত্রী জীবন অবলম্বন ক'রে প্রভূত ঐশ্বর্য অর্জন ক'রেছে—আজও রাধাকান্তের ওপরে তার সমান শ্রদ্ধা এবং সমস্ত কিছু ছেড়ে সে রাধাকান্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রতে চায়। অধ্যাপক ব'লে বটে, আবার রেণুর প্রতি প্রেমের জন্যেও, নীরাকে সে প্রত্যাখ্যান ক'রলে। নীরা সেই জাতের মেয়ে যারা মনের দৃঢ়তায় সব বাধাকে কাটিয়ে চলতে সক্ষম, রাধাকান্তের কাছে আশ্রয় না পেয়ে সে মুষড়ে পড়েনি। বিবাহের পর রেণুর জীবনকে তার লম্পট স্বামী অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। বীরেনের সন্দেহ রেণু প্রেম করে রাধাকান্তের সঙ্গে। এই নিয়ে সে রেণুকে এক রাত্রে মত্তাবস্থায় প্রহারও ক'রলে। বীরেনের মা পরদিনই

রেণুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বীরেন রুষ্ট হ'য়ে রেণুদের বাড়িতে গেলো। রাধাকান্ত তখন রেণুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বীরেন ওদের একই বিছানার বসে থাকতে দেখলে। ক্ষিপ্ত হ'য়ে সে চলে গেলো। রাত্রে গোপনে সে উপস্থিত হ'লো রাধাকান্তের গৃহে, তাকে খুন করার জন্যে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলো। রাধা-কান্ত তাকে ছেড়ে দিলে। বীরেনের আক্রোশ তবুও কমেনি। রাধাকান্তর কলেজের কর্মচারী বিজয়বাবু অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় রাধাকান্ত শুশ্রূষার জন্য তার বাড়িতে আসতে থাকে। বিজয়বাবু মৃত্যুকালে তার কন্যা অনুপমার ভার রাধাকান্তের হাতে তুলে দেবার কথা ব'লে যান। রাধাকান্ত সে দায়িত্ব পালন করে অনুকে বিয়ে করে। বীরেনের ধারণা রাধাকান্ত রেণুকে অপহরণ করেছে, তাই সেও রাধাকান্তর স্ত্রীকে অপহরণ ক'রে প্রতিশোধ নিতে চাইলে। বীরেনের দল একদিন থিয়েটার থেকে গৃহাভি-মুখী রাধাকান্তদের আক্রমণ ক'রলে, এতে গর্ভবতী অনু নিদারুণ আঘাত পেলে এবং বীরেনের সহচরেরা ধরা পড়ে যায়। রাধাকান্ত রেণুর কথা ভেবে বীরেনকে আত্মগোপন করার জন্যে সাহায্য করে। আঘাতের ফলে অনুর মৃত্যু হয়। বিচারে বীরেনকে দোষী না পাওয়ায় সে ফিরে এসে রেণুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিজের বিগতদিনের পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে। রাধাকান্তের কথায় রেণু আবার তাকে গ্রহণ করলে। ইতিমধ্যে পিতা মরণাপন্ন খবর পেয়ে রাধাকান্ত সেখানে যায় এবং তাকে শেষ দেখার পর পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উইলে রাধাকান্তই সব সম্পত্তি পেলেও সে তার বৈমাত্রের ভাইর নামে দানপত্র লিখে চলে আসে। জীবনের সব সুখ শান্তি থেকেই সে বঞ্চিত হ'লো।

ছবির আরম্ভ রহস্য-নাটকের ধাঁচে। ঘড়ি বাজছে আর তার সামনে একটি মেয়ে, পরে যাকে নীরা ব'লে জানা গেলো। ওপর নীচে ভেঙে অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে একটা ঘরের কাছে গিয়ে আড়ি পেতে সে রাধাকান্তর বিষয়ে তার পিতা ও বিমাতার কথা শুনলে। রহস্য থেকে যায়, ঘড়ির কাছে ছিলো কেনো সে? নীরার সঙ্গে সম্পর্ক সন্দেহ ক'রে রাধাকান্ত নিজের পুত্র হ'লেও তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'লো, অথচ নীরা তারপরেও অনেকদিন সে বাড়িতে থাকতে পায় কি ক'রে? অজানা হতচ্ছাড়া রাধাকান্তকে রাস্তা থেকে তুলে এনে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জামায়ের আদরে সেবা ক'রতে লাগলো—কোন্ যুগ আর কোন্ শহর সেটা? গল্পের বাঁধুনী অত্যন্ত দুর্বল, সংলাপ তার চেয়েও। তার ওপরে দিশী গল্পকে বিলিতী কল্পনায় ট্রিটমেণ্ট ক'রতে গিয়ে পরিচালক এক বেখাপ্পা বিজাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তুলেছেন এবং তার জন্যেই তিনি প্রভূত চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিখানিকে নিষ্প্রভ ক'রে তোলার জন্যে আরও দায়ী এর অভিনয়। নায়ক রাধাকান্তের ভূমিকায় সমর রায় এবং উপনায়ক বীরেনের ভূমিকায় অবনী মজুমদার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অভিনয়ে এতটুকুও প্রাণের সঞ্চার ক'রতে পারেননি। আর তাদেরই সংস্পর্শে থাকার জন্যেই যেনো অন্যান্য সবাই, এমন কি শিপ্রা, কমল মিত্র, রেবা প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরাও নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছেন। একমাত্র রেণুর ভূমিকায় স্মৃতি একটু যা গ্রাহ্য করার মতো কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন।

আলোকচিত্র অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং এই-জন্যেই দেওজীভায়ের ওপর দুঃখ হ'লো যে, তার শ্রম ও কৃতিত্ব একটা বাজে ছবিতে পড়ে অখ্যাত হ'য়ে গেলো। সুরে অনুপম ঘটক একেবারেই বিলিতী গৎ এনে ছেড়ে দিয়েছেন; সঙ্গতে ঝাঁঝ আছে কিন্তু খাপ খায়নি কোথাও।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র মহরৎ

নৈহাটী স্টেশনের গায়ে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর অমর উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান মিত্রানি প্রডাকসন্সের উদ্যোগে বহু শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের চিত্র-রূপদানের ভার নিয়েছেন সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে সিনেমায় রূপ দেবার একটা গুরু-দায়িত্ব আছে। এতদিন কোনো সাহিত্যিক পরিচালক এই কাজে সাহস করে এগিয়ে আসেন নি। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রই অগ্রণী হয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের ভরসা আছে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি কপালকুণ্ডলা উপ-ন্যাসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে চিত্রে রূপায়িত করতে পারবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বসতবাড়িতে গিয়ে মহরৎ অনুষ্ঠান করার মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র ও কাঁঠালপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঃ—প্রেমেন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী, চামেলীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল দাশগুপ্ত, ধীরাজ ভট্টা-চার্য, শ্যাম লাহা, শিশির বটব্যাল, গৌতম মুখার্জি, নবদ্বীপ হালদার, সুশীল বন্দ্যো-পাধ্যায়, সাগরময় ঘোষ, দীপেন্দ্র সান্যাল, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অমর দে, পবিত্র চট্টো-পাধ্যায়, গোপেন মল্লিক, নীতীশ রায়, অনিল গুপ্ত, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক সোম প্রভৃতি।

খেলাধুলা

স্পোর্টস

আগামী ৪ঠা মার্চ ভারতীয় তথা এশিয়ার ক্রীড়া ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে। ঐদিন দিল্লীর নবগঠিত জাতীয় স্টেডিয়ামে সর্ব-এশিয়ার প্রথম ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। ১৯৪৭ সালের ২৩শে মার্চ দিল্লীতে সর্বপ্রথম সর্ব-এশিয়ার রাজনৈতিক সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের যোগদানকারী অনেক দেশের প্রতিনিধিই বিভিন্ন দেশের যুব-সমাজের মধ্যে সৌহার্দ ও প্রীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করেন। ঐ কল্পনা কার্যকরী রূপদান করে ১৯৪৮ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানের যোগদানকারী এশিয়ার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ। তাঁহারা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদিতক্রমে সর্ব-এশিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের খসড়া প্রস্তুত করেন। ঐ খসড়া প্রস্তুতের সময় অনেকেরই মনে মনে সন্দেহ জাগে হয়তো বা উহা বাস্তবরূপে পরিগ্রহ করিবে না। কেবল ভারতের প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানের সকল গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দৃঢ়তার সহিতই ঘোষণা করেন যে, অনুষ্ঠান হইবেই। ভারতীয় প্রতিনিধিগণের উক্তির পশ্চাতে আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার এতটুকুও অভাব যে ছিল না তাহা আর সন্দেহ করিবার মত কাহারও অবকাশ রহিল না। সর্ব-এশিয়ার যুব-সমাজের সখ্য, মৈত্রেয়ী, ভাতৃত্বের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর দিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়ামেই স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় ক্রীড়া পরিচালকগণ যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের বাস্তবরূপ দান করিলেন তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন না করিয়া পারা যায় না। তাঁহাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সর্ব-এশিয়ায় ভারতের ক্রীড়ামোদী ও পরিচালকদের গৌরব ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করিল।

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বাণী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সর্ব-এশিয়ার প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন, "এই ধরণের অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক সম্পদ উন্নীত করিবে ও বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবে। আজিকার বিশ্বের সংঘর্ষ ও সংঘাতের কৃষ্ণকায় মেঘ যখন আমাদের মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে তখন বিভিন্ন দেশের যুব-সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার এই প্রকারের সুযোগ গ্রহণ করাই একান্ত প্রয়োজন। পরাজয় বা বিজয় যাহাই আসুক না কেন প্রত্যেক যোগদানকারীই প্রকৃত খেলোয়াড় ও মাধুর্যপূর্ণ মনোভাব লইয়াই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই আমার কাম্য।"

প্রধান মন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সরকার যে জাতীয় ও সামাজিক কর্মকুশলতার দিকটা যে এতদিন তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "সমগ্র জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার দৈহিক শক্তির বিকাশের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ও তাহা কেবলমাত্র সম্ভব হইতে পারে যদি আমরা প্রতিযোগিতা সংঘটিত করিতে পারি ও আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে।" দীর্ঘ কয়েক বৎসর দেশের কর্ণধার হিসাবে গুরুদায়িত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী এতদিনে দেশের সর্বসাধারণের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করা গেল। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে না করিতেছেন ততদিন তাঁহার আন্তরিক উক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। দেশ স্বাধীন হইবার বহু বৎসর পূর্ব হইতেই দেশের সর্বসাধারণের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থার জন্য আমরা বিশেষ জোর দিয়া আসিয়াছি, এখনও দিয়া থাকি, কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। সেইজন্য প্রধান মন্ত্রীর উক্তি শুনিয়াও আমরা খুব বেশী আশান্বিত বা উৎসাহিত হই নাই।

ভারতীয় ভারোত্তোলন প্রতিনিধি নির্বাচন

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের জন্য নিখিল ভারত ভারোত্তোলন ফেডারেশন যে দল নির্বাচন করিয়াছেন তাহা শক্তিশালী দল ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা বলিতে বাধ্য যে, নির্বাচন পক্ষপাত দুষ্ট রোগ হইতে মুক্ত নহে। একই ত্রুটির জন্য একজনকে প্রতিনিধি দলে স্থান না দিয়া অপর কয়েকজনকে দলভুক্ত করার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজিয়া পাই না। দপ্তর করতলগত, সুতরাং যাহা খুশী করিয়া যাইব কোন বাদ বা প্রতিবাদ শুনিব না, ইহা কোনরূপেই স্বাধীন ভারতে বরদাস্ত করা চলে না। যিনি বা যাঁহাদের জন্য বিশিষ্ট ভারতীয় ভারোত্তোলনকারী বা কয়েকজন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে যোগদান হইতে বঞ্চিত হইল, তিনি বা তাঁহারা যত বড় বিত্তশালী, প্রতিপত্তিশালী লোক হউন না কেন, একদিন না একদিন তাঁহাদের সকলের নিকট জবাবদিহি যে করিতে হইবে এই বিষয় নিঃসন্দেহ। সকলেরই একটা সহ্যের সীমা আছে, এই সীমা অতিক্রম হইলেই কেহই কোন অন্যায় অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন না।

টেনিস

গত বৎসর আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় কোন ভারতীয় দল প্রেরিত হয় নাই। এইবারেও হইল না। কেন হইল না বা প্রেরণের কি বাধা সেই বিষয় নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর তরফ হইতে কোনই বিবৃতি প্রচারিত হয় নাই। সম্প্রতি লণ্ডন হইতে নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব বৈদেশিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিনাদুরাই যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সত্য-সত্যই বিস্মিত হইতে হইল। তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "আমি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের তীব্র প্রতিরোধমূলক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কার্য করিয়া ভারতীয় টেনিসের সম্মান বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে ইহার বিপরীত ফল লক্ষ্য করিতেছি। গত দুই বৎসর আমার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত ডেভিড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই। ইহা কিন্তু ভারতীয় টেনিসের পক্ষে সুলক্ষণ নহে। আমি না যোগদান করিবার পশ্চাতে কি যে রহস্য আছে বুঝিতে পারি না। আয়ারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন প্রভৃতি ছোট ছোট দেশের প্রতিনিধিগণ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্মানজনক স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে এখন ভারতের মত বিরাট এক দেশের যাহার সম্মানজনক দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের টেনিস ইতিহাস আছে তাহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়া কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হইলে মাত্র তিনটি খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। ৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্য হইতে তিনটি খেলোয়াড় বাহির করা অসম্ভব ইহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার কেবলই সন্দেহ হয় নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের মধ্যে কোন মারাত্মক ত্রুটি অন্তর্নিহিত আছে যাহা সমূলে উৎপাটিত করার প্রয়োজন আছে। খেলোয়াড়দের যাতায়াতের জন্য ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ গচ্ছিত ভাণ্ডার আছে। এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা এক এক বৎসর অন্তর ভারত ও পাকিস্থানে অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যবস্থা যখন হইয়াছে তখন ভারতের ডেভিস কাপে যোগদান না করা খুবই অন্যায়। আমি ইউরোপ ও আমেরিকার শুভানুধ্যায়ীদের নিকট কেন ভারত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিল না তাহার জবাবদিহি করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সম্পর্ক ত্যাগ করিলাম।"

শ্রীযুত চিনাদুরাইর বিবৃতি নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের অকার্যকারিতা ও অক্ষমতার অনেকখানি আলোকসম্পাদ করিয়াছে। ইহার পর ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হয় নাই ইহাই অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন। এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহার প্রমাণই হইল এইবারের ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় খেলোয়াড়দের সংখ্যা। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটে বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দেরই পেশাদার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এই লীগে সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসাবে যোগদান করেন স্বর্গগত অমর সিং। ইহার পর হইতেই প্রায় প্রতি বৎসর কোন না কোন ভারতীয় খেলোয়াড়কে যোগদান করিতে দেখা যায়। গত বৎসরের সংখ্যা ছিল চারিজন, কিন্তু এই বৎসরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে সাত জন। উক্ত সাত জনের সকলেই ভারতীয় টেস্ট দলে কোন না কোন সময় খেলিয়াছেন। ইঁহাদের নাম হইল যথাক্রমে—বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, ভি জি ফাদকার, পি আর উমরিগার, গুলমহম্মদ, সি এস নাইডু ও জি এস রামচাঁদ। লালা অমরনাথ গত বৎসরেও ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটে খেলিয়াছিলেন—এই বৎসরে খুব সম্ভব যাইবেন না। তিনি পাতিয়ালার খেলাধূলা বিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যাঁহারা ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটে খেলিতে যাইতেছেন তাঁহারাও লালা অমরনাথের ন্যায় সম্মানজনক পদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই বিদেশে অর্থোপার্জনের জন্য যাইতেন না ইহা আর কেহ বিশ্বাস না করিলেও আমরা করি। ভারতের ক্রিকেট খেলায় পেশাদারী খেলোয়াড়দের বন্দোবস্ত যতদিন না হইতেছে ততদিন ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিদেশে অস্তিত্ব রাখার জন্য ছুটিতেই হইবে। ইহার ফল ভাল বলিয়া অনেকে মনে করিলেও আমরা ইহা জাতীয় কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারি না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের ১৯৫১—৫২ সালের বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেটে দেখা যায় যে, আগামী বৎসর (১৯৫১—৫২ সাল) রাজ্য গভর্নমেণ্টের রাজস্বখাতে ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত সরকার মোটরযান সমূহের উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সাতদিন তুমুল বিতর্কের পর অদ্য পার্লামেণ্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিবারক নিরোধ (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। বিলে নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট আটক বন্দী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ, বন্দীদের ছুটি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে মূল আইনের বিধান কিছু উদার করা হইয়াছে।

১৯৫১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বসময়ের জন্য একজন বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ এবং একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সেনেট ও ক্ষুদ্র কার্যনির্বাহক পরিষদ (সিণ্ডিকেট) গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে এই বিল উত্থাপিত হইবে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য পার্লামেণ্টে রেলপথসমূহের জন্য অতিরিক্ত ২৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা কর্পোরেশনের বাতিলের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে বিরোধী পক্ষ হইতে গভর্নমেণ্টের কার্যের তীব্র সমালোচনা করা হয়। কর্পোরেশন বাতিলের মেয়াদ আগামী ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া গভর্নমেণ্ট হইতে এই দিবস পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। উহারই সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া বিরোধী পক্ষ হইতে আক্রমণ চালান হয়।

অদ্য পুলিশ কলিকাতায় এক বিরাট উদ্বাস্তু শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালনা করে। শোভাযাত্রাটি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। লাঠি চালনার ফলে কয়েকজন নারী সমেত ১৫ জন আহত হয়।

অদ্য কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে গভীর শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার সহিত সর্বালোকবরেণ্য জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুর প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী অদ্য পার্লামেণ্টে আসামে কামরূপ জেলার কয়েকটি অঞ্চলে এবং মণিপুর রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থাসমূহের অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপের ব্যাপকতা ও স্বরূপ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহ উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিলের মেয়াদ আগামী ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া রাজ্য সরকার যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে অধিকাংশ ভোটে তাহা গৃহীত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী—রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার অদ্য পার্লামেণ্টে আগামী বৎসরের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিতে গিয়া ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫১—৫২ সালে ২১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রেলওয়ে মন্ত্রী আগামী ১লা এপ্রিল হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে মাইল প্রতি এক পাই, মধ্যম শ্রেণীতে দেড় পাই, দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুই পাই এবং প্রথম শ্রেণীতে তিন পাই হিসাবে যাত্রীদের ভাড়া-বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাঠামো ও গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে ৬১০টি ধারা সমন্বিত একটি বিল উত্থাপন করিবেন। কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বিলটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অদ্য হাওড়ার বেলিলিয়াস পার্কে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বর্তমান মাসে ১লা হইতে ২২শে তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থান হইতে ট্রেনযোগে কিঞ্চিদধিক ২০ হাজার উদ্বাস্তু কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে নিরাপত্তা পরিষদে যে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভারত সরকার লেক সাকসেসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন। ভারত সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রস্তাবটির পর্যালোচনা করিয়াছেন। সরকারীভাবে প্রকাশ, ভারত সরকার ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে তেমন খুশী হইতে পারেন নাই।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য হাওড়ায় বেলিলিয়াস পার্কে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীজগজীবন রাম জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং মুক্তি সংগ্রামে বাঙলার গৌরবময় অবদানের উল্লেখ করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—করাচীতে ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে পাকিস্থানী মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিবার সিদ্ধান্তের পর এই প্রথমবার উভয় দেশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইল বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যায়।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য সিউড়ী হইতে ২৩ মাইল দূরে দুমকা রোডের উপর অবস্থিত মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অদ্যকার বৈঠকে নূতন কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অবিলম্বে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের জন্য সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য মার্কিন অষ্টম আর্মির অধিনায়ক জেনারেল ম্যাথু রিজওয়ে ঘোষণা করেন যে, কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে কম্যুনিস্ট পাল্টা আক্রমণ চূর্ণ করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী পুনরায় আক্রমণোদ্যোগ করিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—জেনারেল ম্যাকআর্থার অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী চীনা ও উত্তর কোরীয়দের পাল্টা আক্রমণ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে আমেরিকান নিগ্রো সৈন্যরা প্রধান কম্যুনিস্ট ঘাঁটি চুচন দখল করিয়াছে। ইহা চেচনের ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্ অদ্য প্যারিসস্থিত তাঁহার বাসভবনে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীর সম্পর্কে অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে এক যৌথ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে কাশ্মীর ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থ স্যার ওয়েন ডিক্সনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থলবর্তী একজন নূতন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়ায় কম্যুনিস্ট ব্যূহ চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী এবং বিমানবহর ও যুদ্ধ জাহাজ একযোগে আক্রমণ চালায়।

২২শে ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী মধ্য কোরিয়ায় কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে বড় রকমের আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনে মোট ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। অগ্রসর সৈন্যদলের সহিত একটি ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স ইউনিটও রহিয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য মধ্য কোরিয়ায় মার্কিন বাহিনী পাই-অং চ্যাং দখল করিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নয়া অভিযানের তৃতীয় দিবসে কম্যুনিস্ট প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর আক্রমণের গতিবেগ শ্লথ হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাশিয়া গতকল্য এক পত্রযোগে বৃটেনকে জানাইয়া দিয়াছে যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট আলাপ-আলোচনায় তাহাদের সম্মতি রহিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।॰ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥॰

পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।॰ আনা, বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥॰ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ৩রা চৈত্র, ১৩৫৭ সাল   Saturday, 17th March, 1951.   [২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গুরুতর অভিযোগ

গত ২৫শে ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী পক্ষ হইতে শ্রীযুত দেবেন সেন এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিড়লা ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে এবং তাহার সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারকে জড়িত করা হয়। অভিযোগ এই যে, বিড়লা ব্রাদার্স পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্ন ব্যবসায়-পরিচালনায় সরকারকে প্রায় এক কোটি টাকা বিক্রয়-কর ফাঁক দিয়াছেন। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বিড়লা ব্রাদার্সের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হইতে যথাযথ হিসাবে বিক্রয়-কর আদায়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। শ্রীযুত দেবেন সেন এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়া এই দাবী করেন যে, একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে সভাপতি করিয়া বেসরকারী তদন্তের দ্বারা এই সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা হোক এবং বঞ্চনা, ট্যাক্স-ফাঁকির অপরাধে যাঁহারা অপরাধী এবং সে কাজে যাঁহারা তাঁহাদের সহকারী তাঁহাদের সকলকে শাস্তি দেওয়া হোক্। প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তদন্তের প্রস্তাব স্বীকার করা দূরে থাকুক, তিনি সমস্ত অভিযোগটাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি না; আমাদের মতে তাহা অসমীচীন হইয়াছে। পক্ষান্তরে, তদন্তের প্রস্তাবে সোজাসুজি সম্মত হওয়াই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে উচিত ছিল, আমাদের এই বিশ্বাস। কারণ এই অভিযোগ লোকের মনের মূলে সন্দেহ খুবই ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত প্রায় ছয় মাসকাল পূর্বে Mystery of Birla House নামে শ্রীযুত দেবেন সেন এই অভিযোগ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিড়লা ব্রাদার্স কিংবা পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বেসরকারী তদন্তের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে উভয় পক্ষের প্রতিই সুবিচার করা হইত। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত, তাঁহারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হইতে সুযোগ লাভ করিবেন এবং আর কোন সমস্যাই থাকিত না। কিন্তু তদন্তের দাবী অস্বীকৃত হওয়াতে তাঁহারা সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং লোকের মনের সন্দেহও ঘুচিল না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী অভিযোগের যে কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বিড়লা ব্রাদার্সের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপর ট্যাক্স-নির্ধারণ কার্যে নিযুক্ত এন সি রায় নামক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীকেই বিশেষ অপরাধী করা হইয়াছে। ডাক্তার রায় বলিয়াছেন, এই ব্যক্তিটিকে আমরা সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করিয়াছি। ইঁহাকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইবে। ইনি আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন ইত্যাদি। বস্তুত, এই সব যুক্তি এক্ষেত্রে অবান্তর। জনসাধারণের অভিযোগ কর্মচারিটির বিরুদ্ধে নয় এবং তাঁহার ভাগ্য লইয়াও লোকে ভাবিতে বসে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তাঁহাদের অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ। এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিরোধী পক্ষের দাবী মানিয়া লইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চাৎপদ হইতেছেন কেন, লোকের মনে এই প্রশ্নই জাগিবে। ফলত, তদন্তে রাজী হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া পড়িত এবং দেশের লোকে বুঝিত, আইনের দৃষ্টিতে পদ, মান, মর্যাদাগত প্রশ্নের সত্তাই তাঁহারা তোয়াক্কা রাখেন না। এইভাবে এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমধিক জনপ্রিয়তাই অর্জন করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি।

মানভূমে সত্যাগ্রহ

গত ৯ই মার্চ হইতে মানভূমের একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মিগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সত্যাগ্রহের যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের একান্ত অনুগত এবং সে আদর্শের সাধনায় বহু অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ কর্মী। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিবার উদ্দেশ্যেই ইঁহাদের এই সত্যাগ্রহ। বর্তমানে অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেশ-ব্যাপী দুর্নীতি প্রসারিত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিকার সাধনের জন্য মানভূমের সত্যাগ্রহিগণ আজ অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সত্যাগ্রহে সমগ্র ভারতের কংগ্রেস-কর্মীদিগকে তাঁহাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বের সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রেরণা এবং বেদনা নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, সত্যাগ্রহীদের এই শুভ সংকল্পটিকে চাপা দিবার চেষ্টা করা হইবে এবং লোককে ভুল বুঝান হইবে। এই অভিপ্রায়ে প্রাদেশিকতার প্রশ্নটি টানিয়া আনা হইবে, ইহা খুবই সম্ভব। এ সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। মানভূমের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতারা বাঙালী; ইহাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইয়া দাঁড়াইবে, আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু মানভূমে যাঁহারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন

পরিচালনা করিতেছেন, কিংবা বিহার ব্যবস্থা-পরিষদের মানভূমের যে সব প্রতিনিধি সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালী বলিয়াই বিহার সরকারের নীতির বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইয়াছেন, ইহা নয়। ফলত মানভূম জেলা বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল বলিয়াই তাঁহারা বাঙালী। বাঙলা ভাষাভাষী প্রধান এই মানভূম এবং তাহার সংলগ্ন অঞ্চলকে হিন্দী ভাষাভাষীপ্রধান প্রতিপন্ন করিবার জন্য লোক-গণনার ব্যাপারে মিথ্যার কেমন কারসাজী চলিতেছে মানভূমের প্রতিনিধি শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বিহার পরিষদে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। মানভূম বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, ঐ অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবীর জোর বাড়িয়া যাইবে, বিহারের নেতাদের এই ভয়। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর এই দাবী পূরণের পথ একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বলা চলে; কিন্তু দেখা যাইতেছে, তথাপি বিহারী নেতাদের প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি কাটে নাই। এই প্রাদেশিকতা কংগ্রেস-প্রভাবিত বিহার সরকারকে দুর্নীতির মধ্যে লইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা আদমসুমারীর কাগজপত্রে পর্যন্ত ভ্রান্ত হিসাব উপস্থিত করিবার মিথ্যা চাতুরীতে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কংগ্রেসের আদর্শের কি পরিমাণ পতন ঘটিয়াছে, ইহা হইতেই বুঝা যায়। কংগ্রেসের আদর্শের এই ব্যতিক্রম, এই অসততা, এই মিথ্যাচার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে মানভূমের কংগ্রেসকর্মিগণ বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্রতের ফল কি ঘটিবে, তাহা সফল হইবে কি না হইবে, এ বিচার আমাদের কাছে মুখ্য নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ই'হারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মনুষ্যোচিত এই যে বীরত্ব ইহাই ই'হাদিগকে মর্যাদা দান করিবে।

পাকিস্থানে অন্তর্ঘাতী উদ্যম

পাকিস্থানকে ধ্বংস করিবার জন্য আশে পাশে শত্রুদল সজাগ রহিয়াছে, এই ধরণের কথাই আমরা এতদিন জনাব লিয়াকত আলীর মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার একটি বিবৃতিতে নূতন তথ্য উন্মুক্ত হইয়াছে। এবার জনাব লিয়াকত আলী সীমানার বাহিরে অঙ্গুলী-নির্দেশ করেন নাই। পাকি-স্থানকে ধ্বংস করিবার জন্য তথাকার সেনা-বিভাগে বড় রকমের চক্রান্ত শুরু হইয়াছিল, এইকথা প্রকাশ করিয়া তিনি সকলকে চকিত করিয়া তুলিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান সেনাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল আকবর খাঁ, কোয়েটাস্থিত সেনা-বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এম এ লতিফ, মেজর-জেনারেল আকবর খাঁর পত্নী এবং লাহোরের 'পাকিস্থান টাইমস' পত্রের সম্পাদককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ই'হাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ই'হারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা দেশময় উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি এবং পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্য ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছিলেন। ই'হাদের চক্রান্ত কতটা সম্প্রসারিত হইয়াছিল এবং ই'হাদের সমর্থকদের শক্তি কিরূপ পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে সে সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা যায় না। সে তথ্য হয়ত পরে প্রকাশ পাইবে। এই ষড়যন্ত্রের মূলে যাহাই থাকুক, মোটামুটি ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্থান যে এতদ্দ্বারা বিপন্ন হইতে বসিয়াছিল এবং পাকিস্থানের বর্তমান পরিচালক-মণ্ডলীর দৌলতেই সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে, ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে এই দিকটাই লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বিপন্ন ইসলামের জিগীর তুলিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কগণ অতীতে অনেক সমস্যার সহজে সমাধান করিয়া লইয়াছেন। বর্তমানের ব্যাপারটাও এদিক হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে। বিপন্ন পাকিস্থানের ভাবটা তাঁহারা জমাইয়া তুলিয়া ধর্ম-সংস্কারান্ধ জনসাধারণকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। নানা কারণে মুসলিম লীগের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল, এখন লীগের দলের জোর আবার বাড়িয়া যাইবে। পাকিস্থানে বিরোধী দল বলিতে কিছু থাকিবে না—সেখানে শুধু একদল এবং একাধিপত্য, মুসলিম লীগ আর সেই লীগ দলের নেতৃত্ব। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বেও জোর গলায় এই সত্য প্রচার করিয়াছেন, পাঞ্জাবের সাধারণ নির্বাচনের মুখে বর্তমান ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার ভোটে লীগের শক্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবে এবং বিরোধী পক্ষকে দাবাইয়া দিবে। সুতরাং পাকিস্থানী সেনা বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার আবিষ্কার এইদিক হইতে পাকিস্থানের বর্তমান শাসকবৃন্দের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপেই আসিয়াছে বলিতে হইবে। মোস্লেম স্বার্থের আদর্শে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইসলাম ধর্মের আধিপত্য স্থাপনের নীতিতে পরিচালিত হইতেছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী সেনানায়কদের সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে দুর্জ্ঞেয় রহস্য কি আছে, তাহা উদ্ঘাটন করা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। এক্ষেত্রে শুধু আপাতত এইটুকু আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শুধু ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার দোহাইতে রাষ্ট্রের সব সমস্যাও সমাধান করা যায় না এবং রাষ্ট্রের বিপদ শুধু বাহির হইতে আসিতে পারে, এমন নয়, প্রত্যুত ভিতর হইতে বিপদ গড়িয়া উঠাও বিচিত্র নহে।

নীতি কোন দিকে

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা অন্তত কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে, জনসাধারণ ইহাই আশা করিয়াছিল। বস্তুত এমন আশা করা তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিকও কিছু নয়। কিন্তু সুদীর্ঘ পরাধীনতার পাঁক এদেশের শাসন-নীতির মূলে জমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় রাতারাতি জন-গণের আর্থিক দুর্দশার প্রতিকার সাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু জন-সাধারণের আর্থিক সংকটের নিরসনের জন্য সরকারের নীতি যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, ইহাই শুধু আমাদের বক্তব্য। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাব আমাদিগকে আশার-বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম এই যে, আর ভয় নাই বস্ত্র-সংকটের চরম দুর্দিন দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে এবং গত জানুয়ারী মাস হইতে সরবরাহের অবস্থার ক্রমেই উন্নতি ঘটিতেছে। ইহার ফলে এপ্রিল মাসের শেষাশেষি অন্তত লোকের কাপড়ের কষ্ট কিছুটা দূর হইবে। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে যে, বস্ত্রের এই যে সংকট তাহা দেখা দিল কেন? তুলার অভাবে মামুলী যুক্তি অবশ্যই আছে; কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তুলার অভাবই একমাত্র কারণ নয়। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের উক্তি হইতে আমাদের সেই যুক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, মোটা লাভের নেশায় মিল-ওয়ালারা বিদেশে কাপড় রপ্তানির দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়। তাহার ফলে দেশের লোকের উপযোগী ধুতি ও সাড়ীর উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়। ১৯৫০ সালে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বিদেশে কাপড় রপ্তানির এই মহোৎসব চলিতে থাকে। মিল-ওয়ালারা দেশের লোকের দুর্দশার কারণ সৃষ্টি করিয়া এই যে খেলা খেলিতেছেন, ভারত সরকারের কর্তাদের এদিকে কোন খেয়ালই ছিল না। চমৎকার যুক্তি! এমন মাথা লইয়া যাঁহারা একটা বিরাট দেশের ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহাদের বাহাদুরী অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। তাঁহারা সংকট এড়াইবার জন্য মোটা এবং মাঝারী কাপড়ের

রপ্তানি হ্রাস করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহার ফলে দেশের লোকের বস্ত্রের অভাব অনেকটা দূর হইবে বলিয়া বাণিজ্য সচিব আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আশা কতটা কার্যে পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে। কারণ, সরকারী নীতি যে জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগভাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, ১৯৪৮ সালের পরবর্তী বস্ত্র-সংকটের অভিজ্ঞতা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গত জানুয়ারী মাস হইতে বস্ত্র সরবরাহের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে, বাণিজ্য মন্ত্রীর এই অভিমত; কিন্তু উন্নতি কোথায়? বাজার হইতে মিলের কাপড়ের অন্তর্ধানই তো আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সরবরাহের অভাবের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করিতে হইতেছে। মিলওয়ালাদের চাতুরীর সঙ্গে সরকারী নীতি যে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অবশ্য প্রাদেশিক বণ্টন ব্যবস্থারও ত্রুটি আছে। এগুলির প্রতিকার হইবে কবে?

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অপরাধ

মিঃ জর্জ সি ম্যাকগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্র সচিব; সুতরাং তাঁহার কথার মূল্য কিছু আছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল, একথা বলা চলে না; পরন্তু কাশ্মীর সমস্যার ফলে বিশ্ব-শান্তির বিঘ্ন ঘটিতে পারে এই কারণে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছে। ভারতবাসী আমরা, আমাদের মনে এমন জবাব নিশ্চয়ই বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে; কারণ পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করে, ভারতের পক্ষ হইতে এমন অভিযোগই নিরাপত্তা-পরিষদে উপস্থিত করা হয় এবং বিশ্বশান্তির কোন প্রশ্নই সেক্ষেত্রে উঠে নাই। পরন্তু পাকিস্থান যে কার্যত কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল, সে কথা সে নিজেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। অধিকন্তু নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে স্যার ওয়েন ডিক্সনও কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থান যে পররাজ্য-আক্রমণকারী সে সত্য স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যাহা ঘটে তাহা সব সত্য নয়। বস্তুত পাকিস্থান তো কাশ্মীর সম্পর্কে পররাজ্য-আক্রমণকারী নহে-ই প্রকৃতপক্ষে ভারতই সে ক্ষেত্রে পররাজ্য আক্রমণকারী এবং সেই হিসাবে মহা অপরাধী। সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জাফরুল্লা খাঁ ইহা জলের মত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুধু ইহাই নয় ভারতের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ আরও গুরুতর। পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিবের মতে ভারত কাশ্মীরের উপর নিজেদের প্রভুত্ব পাকা করিবার চেষ্টায় আছে। ভারতের অভিসন্ধি রহিয়াছে এই যে, কাশ্মীর হইতে মুসলমানদিগকে ক্রমে ক্রমে সে উৎখাত করিবে, তৎপরিবর্তে হিন্দু ও শিখদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের বসতি বিধান করিবে। বলাবাহুল্যে কাশ্মীর হইতে মুসলমানদের উৎসাদনের অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে আরোপ করাতে তাঁহাদের নিজেদের মনের মূলে পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের উৎসাদনের যে ঘোট রহিয়াছে, মিঃ জাফরুল্লার উক্তির ভিতর দিয়া তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইভাবে পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-সচিব নিজেদের নির্দোষিতার অভিনয় করিয়া ভারতই যে সর্বতোভাবে অপরাধী ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় সেনা দলকে কাশ্মীর হইতে অপসারণ করাই নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম কর্তব্য তিনি এমন পরামর্শ দিয়াছেন। পাকিস্থানী সেনাদলও কাশ্মীর ছাড়িতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু আজাদ কাশ্মীর বাহিনী, তাহারা কাশ্মীরের মুসলমানদের উদ্ধারকারী, সুতরাং গণভোটের সময় তাহারা সেখানে থাকিবে। ইহাতে নিরাপত্তা পরিষদের আপত্তি করিবার কোন কারণ, খাঁ সাহেব দেখিতে পান নাই। বিপন্ন ইসলামের জন্য জেহাদ ঘোষণা করিবার পবিত্র ব্রত এইভাবে বহাল রাখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব নিজেও এই কাজটা অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছেন। পাকিস্থান পশ্চিম পাকিস্থান, সিন্ধু এবং পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগকে উৎখাত করিবার যে ধর্মান্ধ নীতি লইয়া অগ্রসর হইতেছে, ভারতও কাশ্মীরে সেই নীতি অবলম্বন করিতেছে, মিঃ জাফরুল্লার বক্তব্যের তাৎপর্য ইহাই। বস্তুত পাকিস্থানের রাজনীতিকদের এই কৌশল অনেক দিন হইতেই আমাদের জানা আছে। ধর্মান্ধ বর্বরতামূলক ভেদবাদ এইভাবে জিয়াইয়া না রাখিলে তাঁহাদের কার্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বিশ্বশান্তির বুজরুকীতে যাঁহারা মধ্যযুগের এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের নির্লজ্জতা এবং বিবেকহীনতার পরিমাণ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। আমরা তাঁহাদিগকে এই সম্বন্ধে এইকথাই আজ শুনাইয়া দিতে চাই যে, পাকিস্থান কাশ্মীর সম্বন্ধে যে অন্যায় এবং অসঙ্গত দাবী লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে প্রশ্রয় দিলে বিশ্বে শান্তির পথ প্রশস্ত হইবে না। পক্ষান্তরে ইঙ্গ-মার্কিন-চক্র নিজেদের স্বার্থের দায়ে যদি কাশ্মীরের জনসাধারণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং এশিয়ায় তাহা বিস্তার লাভ করিবে।

চোরাকারবারীদের সাজা

"যাহারা আমাদের জননী-ভগিনীদিগকে বস্ত্রহীন অবস্থায় রাখিতেছে এবং যাহারা গরীবের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। তাহারা যতই আর্তনাদ উত্থিত করুক না কেন, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দলন করিতে গভর্নমেন্ট কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবেন না, কিছুদিন পূর্বে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এই কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উক্তি আমরাও সমর্থন করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর অপরাধ দমনে যতটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত কার্যত তাহা ঘটিতেছে না এবং সরকারী নীতিতে এতৎসম্বন্ধে একটা দুর্বলতা থাকিয়াই যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে আমরা এই কথাই বলিব। বস্তুত দেশের লোক এ সম্বন্ধে সরকারের নীতিকে বিশেষ সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কাপড়ের চোরাকারবার দমন করিবার জন্য কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্মতৎপরতার কিছুদিন হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কালাবাজারে যে পরিমাণ কাপড় ইহার মধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে, পুলিশের এই তৎপরতার ফলে তাহার কতটা উদ্ধার হইয়াছে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, তথাপি এই তৎপরতা শুভ লক্ষণ বলিতে হয়; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখিয়াছি, দুই দিনের মধ্যেই কলিকাতা পুলিশের এই তৎপরতা যেন স্তিমিত হইয়া না যায়। এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর ঘৃণিত অপরাধে যাহারা অপরাধী, তাহারা যাহাতে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। এই সম্পর্কে কলিকাতার একটি মামলায় দুইজন বড়বাজারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দণ্ডের কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। সাধারণত বস্ত্রের চোরাকারবারে ছোট-খাটো ব্যবসায়ী, দোকানদার এবং হকারই ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া থাকে। আলোচ্য মামলায় অন্তত দুইজন বড় দরের বস্ত্র ব্যবসায়ী—বড়বাজারের পগেয়াপটির রামধন মহেশ্বরী ও মোহনলাল মহেশ্বরী ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, এই মামলায় বিচারক অর্থদণ্ডের আদেশ দেন নাই; সুতরাং কিছু টাকা দিয়া অপরাধীরা যে রেহাই পাইবে, এমন পথ এক্ষেত্রে রাখা হয় নাই। ক্ষেত্র বিশেষে অর্থদণ্ড যদি ইহাদের সম্বন্ধে বিবেচিত না হয়, কারাদণ্ড হইতে ইহারা যেন কোনক্রমেই রেহাই না পায়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

ঘরের পাঁচালি

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানবার জন্যে দেখলুম লোকের কৌতূহলের অন্ত নেই, কিন্তু কত বলবো? এই দুনিয়ায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার মুখে জন্মে—এর মাঝামাঝি জায়গায় এসে যে এইরকম গড়াগড়ি খেয়ে বেইজ্জত হ'তে হবে এ তো ধারণার অতীত ছিল। জগত পরিবর্তনশীল—'হল্ট' করা তার রীতিবিরুদ্ধ সবই বুঝি, কিন্তু তাই বলে একেবারে এইভাবে 'সামারসল্ট্' খেয়ে যাবে, এ কি আপনারাই কেউ আগে ধারণা করতে পেরেছিলেন? গরীবরা সংসারে এসে কোনদিনই সারবস্তু পায় না—পাবেও না, কিন্তু ভবপারে পৌঁছবার আগে চতুর্দিক থেকে



......বলড্যান্সের চর্চা

অবিরত মার খেয়ে খেয়ে একেবারে কারবার ফতে করে বসবে, এটাও যে ঘুণাক্ষরে আগে বুঝতে পারিনি।

বছর পঁচিশ তিরিশ আগে ভবিষ্যতের এই ছবিটা যদি কোন ফাঁকে একটু চোখ মেরেও বিধাতা জানিয়ে দিতেন, তাহলে তখন আফিম সস্তা ছিল, ভরি দুয়েক খেয়ে কোন্‌কালে দেখতেন স্বর্গের জানলা দিয়ে (আপনাদের সেটা ঠিক পছন্দ না হ'লে, নয় নরকের ঘুলঘুলিতে দুটি চক্ষু রেখে) আপনাদের সংসার করার রগড় দেখতুম।

সেকালে, বাবা পড়াশোনাটা একটু ভাল ক'রে করতে বলতেন, শুনিনি- কিন্তু তারপর বিয়ের টাইমে যেই তিনি প্রস্তাব করে বসলেন যে, এইবার একটি তোমার জন্যে বৌ আনছি, তখন খুব খুশী না-হয়ে উঠলেও, মনের মধ্যে এতদিনের পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য যে পাপ সঞ্চয় করেছিলুম তাই ক্ষয় করার বাসনায়, একেবারে তৎক্ষণাৎ সবিনয় নিবেদন হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, ভবিষ্যতে পাপ ক্ষয় করতে গিয়ে বাপ বাপ বলবার অবস্থা ঘটবে!

অভিজ্ঞতা অল্প ছিল, আর পাঁচটা দিকে একটু জোরও ছিল, তাই অতটা বুঝিনি—ভেবেছিলুম, গিন্নি আর আমি দিব্যি বল্‌ডান্স করতে করতে বেরিয়ে যাব, কিন্তু কে জানতো তারপর নো-ম্যানস্‌ ল্যান্ড থেকে পিল্‌পিল করে ছানাপোনার দল এসে তুলোধোনার ব্যবস্থা করবে।

কর্তারা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর লোক—দিব্যি হেসে খেলে কাটিয়ে গেলেন, ছেলেদের নড়া ধরে ধরে সংসারে ঢুকিয়ে দিলেন, কিন্তু ভাবলেন না—ভবিষ্যতে বেটাদের হবে কি!

আপনারা বলবেন, তাঁরা সব পুণ্যাত্মা ধার্মিক ছিলেন, তোমাদের মত অত প্যাঁচোয়া বুদ্ধি ছিল না, তাই অত বোঝেননি।

অস্বীকার করি না। কিন্তু ধর্মের মর্ম কোনকালে দু-একটি ভদ্রলোক ছাড়া কেউই বোঝেননি ব'লে আমার বিশ্বাস। ধর্মের গুরুরা পইপই ক'রে বলে গেছেন যে বাবা, কেলেঙ্কারীর রাস্তায় পা বাড়িও না, বিপদে পড়বে। তাকি তাঁরা শুনলেন? নিজেরা মহানন্দে কাড়া নাকাড়া বাজাতে বাজাতে ঝাড়া হাত-পা চলে গেলেন, কিন্তু আমাদের যা ব্যবস্থা করে গেলেন, তাতে ফাঁড়া আর কাটে না। সর্বাঙ্গে ফোড়ার মত সংসারের সব-কিছু ফুলে আছে। ফাটেও না— বসেও না। এ কী নিদারুণ অবস্থা, ভেবে দেখুন!

জগতের যত বড় বড় ধর্মগুরু, তাঁরা দু-তিন হাজার বছর আগে থেকে ভবিষ্যতের এই অবস্থা হবে বুঝে, নিজেরা সংসার ছেড়ে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গিয়ে, আদর্শ দেখিয়ে গেছেন কিন্তু সে আদর্শ মানলে কে? এখন শুধু ঘটা করে হুজুগ করবার জন্যে লোকে তাঁদের এ্যানিভার্সারি করে। মানে না কেউ!

আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব জীবের প্রতি দয়াবশতঃ না খেয়ে-দেয়ে কত ভাল-ভাল কথা বলে গেলেন, কিন্তু তারপরই দেখা গেল যে, তেমনি তেমনি জীব দেখলেই লোকের জিব্‌ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করছে—পৃথিবী উজাড় হয়ে যায় আর কি! শঙ্করাচার্য স্ত্রী-পুত্রের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে 'কা তব কান্তা' ক'রে শোলোক রচনা করে গেলেন—যাতে করে ঢোলক বাজিয়ে গান করতে করতেও মানুষ সেগুলো আওড়ে মনে রাখে, কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে কি করলুম? কান্তার হাতে হাতা-খোন্তা দিয়ে উনুনের পাশে বসিয়ে দিতেই তাঁরা মানতাসা গড়িয়ে দেবার অর্ডার দিয়ে বসলেন, আর আমরা ভোর ছটায় উঠে পান্তা ভাত খেয়ে টাকা রোজগারের আশায় নিয়ত গলদ্‌ঘর্ম হয়ে মরতে শুরু করলুম!

এখন অবশ্য ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে, যাঁদের নিয়ে ঘর করি, তাঁরা আবার এ বিষয়ের যে কাণাকড়ি বোঝেন না। এখনও তাঁদের সাধ ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমার চাঁদমুখখানি দেখে যাবেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কার্তিক জামাইদের নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করবেন, নাতির মুখে ভাত দিয়ে তারপর সোয়ামীকে নিয়ে বৃন্দাবনের টিকিট কিনে বেরিয়ে পড়বেন। আক্কেলটা বুঝুন!

এই নিয়ে খেচাখেচির আর অন্ত নেই। আচ্ছা বলুন দেখি—নিজেরা ভুগছি, আবার জেনেশুনে ওদের গলায় পাথর ঝোলাবো? লোকের এখনও বংশরক্ষার বাতিক গেল না? সারা পৃথিবীতে যে বংশ গজিয়েছে তার তাড়না সহ্য করতে না পেরে লোকে অস্থির-পঞ্চম হয়ে উঠছে—এসব দেখে-শুনেও তবু হায়া নেই? এক একটি বংশ কাণ্ড সমেত বাড়িতে রাখার যোগ্যতা আর যে আমার নেই, তা কেউ বুঝবে না?

চোখের সামনে দেখছে, ন-বাবু বংশাবতংস হয়ে বসে আছেন সবশুদ্ধু এগারোটি ছেলে-মেয়ে। খাটে জায়গা নেই, তাক ভর্তি, মেজেতে ঠাঁই হয় না, প্যাঁট্‌কাগুলোকে মশারির চালে শুইয়ে রাখতে হয়। সেদিন আবার মশারীর একটা কোণা ছিঁড়ে তার থেকে গড়িয়ে পড়ে চিচিংয়েটার মাথা ফাটলো—রাতদুপুরে—কোথায় ডাক্তাররে, বদ্যিরে ক'রে ছুটে ছুটে সর্দিগর্মী হবার উপক্রম হ'ল—এসব দেখে শুনেও এদের চৈতন্য হয় না—সেইটেই আশ্চর্য!

বিয়ে না দিলে কি চলে? যুক্তি কি?—না, ছেলেপুলেদের বয়েস হয়েচে বখে যাবে। বখা এ-বাজারে যেন অতি সোজা কথা? এখন এধার-ওধার টোকা মেরে ফাঁকায় একটু ঘুরে বেড়ানো চলে, কিন্তু ঐ-সবের ঠেলা সামলাতে গেলে খোকাদের যে জিব্‌ বেরিয়ে পড়বে সেটা তা কেউ জানেন না? বলে, তিনদিনে বাপ্‌ বাপ্‌ বলতে বলতে পালিয়ে এসে যদি বাড়িতে না ঢোকে তো কি বলেছি!

সত্যি কথা, এখন সংসার করতে পারে কারা? যাদের চোরা কারবার কিম্বা যারা ব্যাঙ্ক-মার, নিতান্ত তা না হলেও পকেটমার। না হলে এ জায়গায় বহাল তবিয়তে থাকা অসম্ভব!

যাক্‌, ছেলেদের বিয়ে আটকানো গেল, এল মেয়েদের বিয়ের তাগাদা। আচ্ছা, দিনকাল যা পড়েছে তাতে মেয়েরা নিজেরা যদি দেখে-শুনে

ওরি মধ্যে বেছেবুছে কাউকে না ঠিক করে নিতে পারে, তা হ'লে বাপ-মার সাধ্যি আছে বিয়ে দেবার? কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েগুলোকে বলেছি একটু চট্‌পটে হ'! এখানে লাট্টুর মত ঘুরে, ওখানে একটাকে গাঁট্টা মেরে, একবার ঠোঁট ফুলিয়ে তার পরেই ভেংচে ছোটাছুটি কর্—এ বাজারে নেংচে চললে কারুর কোন আশা নেই—তা আমার কথা কেউ শোনে? দিন-রাত হয় রান্নাঘরে ময়দা ঠেসছে, আর কাপড়ে ফুল তুলচে নয় রেডিওর অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ফিলিমের গান মুখস্থ করছে।

সেদিন কেল্‌টিটা ছাতে চুল শুকোতে শুকোতে হঠাৎ দেখি হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে কি এক গান ধরেছে আয়েগা আয়েগা। ভাবলুম মাথাটা বিগড়েছে কিম্বা গরহজম হয়েছে, তা না হলে হিক্কা উঠবে কেন? গিন্নীকে জিগ্যেস করতে মারতে এলেন, বললেন, ওসব ফিলিমের গান তুমি কি জান? পাশের বাড়িতেও ঐ এক অবস্থা, সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গেলুম ঐ এক রা আয়েগা। মনে মনে বললুম কোই নেহি আয়েগা বাবা তোমাদের বাবারা যায়ে গা, জাল ফেলেগা যথাসর্বস্ব খতম করেগা তবে আয়েগা, নইলে নয়?

কিন্তু জাল ফেলিই বা কোথায়? বাজারে ছেলে নেই—যা আছে তাও ছোবার জো নেই—এত দাম! বাকী যা—তার অর্ধেক জিন্দাবাদ করতে করতে বেরিয়ে গেছে নয় সিনেমার হিরো হবার জন্যে চান্স খুঁজচে। এইরকম এক একটি কার্তিক ধরে সেঁধুলে পৈত্রিক প্রাণটিও অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে কি না সন্দেহ!

দিনকাল সত্যিই খারাপ! যাঁদের ভার আমার স্কন্ধে তাঁদের শেষপর্যন্ত যা হ'ক করে রেখে, ঘাট অবধি পৌঁছব কি না সে সম্বন্ধে প্রতিদিন সন্দেহ জাগছে! জামা, কাপড়, খাবার টাকা কিচ্ছু নেই অথচ মনে করুন সংসার করছি—আপনাদের সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছি, হাসছি ঘুরছি, ফিরছি, জন্মদিন থেকে শ্রাদ্ধদিন পর্যন্ত লৌকিকতা যুগিয়ে চলেছি, চাঁদা দিচ্ছি, সবই করছি—শুধু নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। চতুর্দিকে অনন্ত কুয়াশা—এর থেকে মুক্তির আশা কোথায় তার তো হদিস্ খুঁজে পাচ্ছি না।

একশো টাকা মাইনে পাই, সকলে মিলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে পঁচিশ টাকা দুর্মূল্যে ভাতা যোগ করিয়ে নেওয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে বাজারের খাড়া যা দর হেঁকে বসলো তা শুনে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো। অমন যে তুচ্ছ শাক পুঁই সেও তুই-মুই করে গাল দিতে শুরু করে দিলেন—এর ওপর রেশন আছে, মেয়েদের ফ্যাসান সামলাবার ধাক্কা আছে, সারা নেশনের উন্নতির কথা ভাববার জন্যে প্রত্যহ একখানি করে খবরের কাগজ আছে, কিন্তু আমার মত গরীব গেরস্থর নিশ্চিন্তে একটু ঠেসান দিয়ে অদৃষ্টের কথা ভাববার মত ঠাঁই কোথাও নেই।

অথচ আমি যে কি করি বুঝতে পারি না। পৃথিবীর সবার রাগ যেন আমার ওপর। বাড়ির সবার ধারণা—আমি দিব্যি আছি! ও'র তো বাসন মাজতে হয় না, ন-টার সময় ভাত রেঁধে গেলাতে পেটাতে হয় না, তাহলে বুঝতেন কাকে বলে ঠ্যালা!

ছেলেদের ধারণা, বাবা তো একটা আহাম্মুক! পাঁচটা ক্লাবে যায় না, খেলার খবর রাখে না, সিনেমায় কোন্ হিরোয়িনের জন্যে কারা হায় হায় করে বুক চাপড়ায় সে খোঁজ রাখে না—ও'র তো হয়ে এসেছে!

মেয়েদের ধারণা—আমি একটা আস্ত উজবুক! তা না হলে আজকালকার দিনে কেউ চটের থলির মত সস্তায় কাপড় নিয়ে আসে? নেল্ পালিশে কি রং লাগে জানে না? ফেস্ পাউডার আর ডাস্ট পাউডারের পার্থক্য বোঝে না? ভুরু কামালে কি স্টিক পেন্সিল দিয়ে আঁকতে হয় সে সব মাথায় ঢোকে না?

প্রতিবেশীদের ধারণা—আমি চামার, তা না হলে চার আনার বেশী চাঁদা চাইলে তিনবার মাথা চুলকোই! বন্ধুবান্ধবদের ধারণা—আমি একটা নিরেট বোকা ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজদের কোন্ বোলার বলের পিচ্ ওঠায় তা জানি না—পাড়ার রকে বুড়োদের ধারণা যে, আমাদের ফরেন্ পলিসিতে যে সব ভুল হচ্চে তা আমি বুঝতে পারি না—কংগ্রেসের ধারণা আমি গঠনমূলক কোন কাজ করতে পারি না শুধু টিপ্পনী কাটি, কম্যুনিস্টদের ধারণা আমি প্রতিক্রিয়াশীল আমার জন্যেই সব আটকে আছে—হিন্দু মহাসভার ধারণা আমি অপদার্থ কারণ এপর্যন্ত একটি মুসলমানেরও দাড়ি ছিঁড়তে পারিনি—মুসলমানদের ধারণা যেহেতু আমি হিন্দু সেই-হেতু সর্বশক্তিমান্ খোদাতালা আমায় সৃষ্টি করেননি, তাঁর কোন ডেপুটি বোধ হয় সৃষ্টি করেছে তাই আমি পাজী—আত্মীয় স্বজনের ধারণা আমি একাল-ষেঁড়ে, শুধু নিজের নিয়েই আছি—একবার ভুলেও তো তাঁদের বাড়ি কোন-দিন বাজার করে দিয়ে আসি না।

ভায়েদের ধারণা, আমি চাপা, বেশ দু' পয়সা করেছি—ইনকমটেক্সের কর্তাদের ধারণা, ব্যাঙ্কে না হলেও হয়তো ছাতের ট্যাঙ্কের মধ্যে আমার টাকা আছে—পেনালটি দিয়ে উসুল করে নেওয়া যাবে—উকীল বন্ধুদের ধারণা আমি একেবারে হাঁদাকান্ত, তা না হলে মামলায় জিত থাকতেও কোর্টে একটা নালিশ করি না—পুলিশের ধারণা, আমি চোর আর সর্বদাই আইন শৃঙ্খলার বিরোধী—স্ত্রীর ধারণা আমি তাঁকে ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত স্ত্রীলোককে পছন্দ করি—শত্রুদের ধারণা আমি মদ খাই রাত্তিরে বাড়ি ফিরি না—আপিসে বড়-বাবুর ধারণা আমি একেবারে অপদার্থ, তিনিই একা সব চালাচ্ছেন আর আমি বসে বসে পান চিবুচ্ছি।



ডাক্তারবাবুদের খিদ্‌মদগারি

কেবল ডাক্তারবাবুরা জানেন আমি ভাল লোক। কারণ একমাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁদের খিদ্‌মদ্‌গারি করতে সর্বদা হাজির আছি। বাজারে যত রকম ওষুধ বেরিয়েছে সব চালান করার একটা প্রশস্ত রাস্তা তাঁরা আমার বাড়িতে খুঁজে পেয়েছেন—এবার ভাবছি সব কটা ওষুধ —বাতের মালিশ থেকে আরম্ভ করে সর্দির মিকশ্চার পর্যন্ত মিশিয়ে আমি নিজেই এক-দিন খেয়ে ফেলবো—দেখি, তাতে আমার ভব-ব্যাধি সারে কি না! ঐ অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হ'লেই সব শেষ হয়!



বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

একই জাতের প্রাণীর মধ্যে আমরা আকৃতিগত অর্থাৎ চেহারায় বড় ছোটর এমন তফাৎ অনেক সময় দেখতে পাই যে, যেটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। এখানে পাখীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট পাখী হচ্ছে "বী হামিং বার্ড" অর্থাৎ ভ্রমরের ন্যায় গুঞ্জনমুখর পাখী। এটা দু ইঞ্চির চেয়েও ছোট। আর সবচেয়ে বড়



বী হামিং বার্ড হাতের তুলনায় কত ছোট দেখাচ্ছে

পাখী হচ্ছে 'ট্রাম্পেটার সোয়ান" অর্থাৎ ভেরী-নিনাদী হাঁস। এর ওজন প্রায় ৩৫ পাউন্ড। অবশ্য যে সব পাখীরা উড়তে পারে না, এমন পাখীদের ধরলে বর্তমানে "অস্ট্রিচ" পাখীর নাম করতে হয়। এরা ১৫০ থেকে ৩০০ পাউন্ড পর্যন্ত ওজনে হয়। মাদাগাস্কার দ্বীপের 'জায়েণ্ট রক' বা 'এলিফেণ্ট বার্ড' অস্ট্রিচের চেয়েও বড়। এদের অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই।

* * * * *

সময় আর সুযোগ পেলে মানুষ শখ করে অনেক কিছুই তৈরী করে। হাতের লেখা ভাল করা বা খুব ছোট ছোট করে লেখা এক একজনের শখ থাকে। এই ছোট ছোট হাতের লেখা যে কত সূক্ষ্ম হতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্য অনেকে চালের ওপর এক-শত বা দেড় শতটি কথা লেখেন। ইটালীর এক চিত্রকরের এই ধরণের অদ্ভুত শখ আছে। ইনি একটি আলপিনের মাথার ওপর নানা রকম ছবি আঁকেন। বর্তমানে ইনি একটি পিনের মাথার ওপর দ্বাদশ পোপের মুখের ছবি আঁকছেন। এই বোধ হয় তাঁর শেষ ছবি হবে। কারণ এত সূক্ষ্ম ছবি আঁকার জন্য তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। এর আগে এই চিত্রকর আরও সাতটি এই রকম ছবি এঁকেছেন। সেগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য। তিনি ছবিগুলি তেল-রং আঁকেন আর একটি দেশলাইয়ের কাঠিতে নিজের মাথার একটি চুল আটকে তুলি তৈরী করেছেন। তাঁর একটি চৈনিক বন্ধু একটি চালের ওপর বারটি কথা লিখে তাকে দেখান এবং এইটি থেকেই তিনি তাঁর এই অদ্ভুত শিল্প-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পান। এই সাতটি ছবি আঁকতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে। একটি ছবির জন্য খুব কম করে তিন মাস সময় লেগেছে। তাঁর সমস্ত ছবির মূল্য প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা।

* * * * *

স্কটল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক রবার্ট পৃথিবীতে সর্বপ্রথম টেলিভিসন মাইক্রসকোপ তৈরী করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খুব সুবিধা হয়েছে। কারণ এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি সেলকে ২৫ হাজার গুণ বড় করে দেখা যায়। কোনও সাধারণ মাইক্রসকোপ এত বেশী শক্তিশালী নয়। ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক মানুষের মস্তিষ্কে কতগুলি সেল আছে, তা দেখবার জন্য এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একটি মানুষের মস্তিষ্কে ১০০০০০ লক্ষ সেল আছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ সেল গুণতে পারা যায়। ডাঃ রবার্ট বলেন যে, চিকিৎসকেরা যদি এই যন্ত্র নিয়ে কাজ করেন, তাহলে তাঁরা রোগের জীবন্ত জীবাণুগুলি দেখতে পারেন। এই টেলিভিসন মাইক্রসকোপের দাম ১৩০০০ আর এটি তৈরী করতে ছয় মাস সময় লাগে।

* * * * *

আগুন নেভানোর জন্য জল ছাড়াও অনেক উপায় আছে। আজকাল একটি নতুন উপায় বার হয়েছে। আগুনের ওপর যদি 'বেকিং সোডা' বেশ ভাল করে ছড়িয়ে বা ছিটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আগুন নিভে যায়। এই সোডার গুঁড়ো আগুনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর জলীয় বাষ্প তৈরী হয়। যার ফলে তাড়াতাড়ি আগুন নির্ভিয়ে দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া আর একটা সুবিধে এই যে, যদি পেট্রল বা কোনও গুদামে আগুন লাগে, তাহলে এক ধরণের গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই সোডা ব্যবহার করলে ঐ জায়গায় আর কোনও রকম বিষাক্ত বাষ্প তৈরী হতে পারে না।

* * * *

ভাল আর খারাপ ডিম তফাৎ করা এক সমস্যা। এর জন্য অনেক উপায় বের হয়েছে। একজন বৈজ্ঞানিক কিন্তু একটা খুব সহজ উপায় বার করেছেন। এটা হচ্ছে ডিমগুলোর ওপর 'আলট্রা ভাইলেট রে'র কালো আলো যদি ফেলা যায়, তাহলে দেখা গেছে যে, তাজা ডিমগুলো থেকে একটা লাল রঙ-এর আভা আর পুরান ডিমগুলো



কতকগুলি ডিমের ওপর আলো ফেলা হচ্ছে

থেকে বেগুনি রঙ-এর আভা বের হবে। এই দু রঙ-এর তফাৎ থেকে ভাল খারাপ ডিম খুব তাড়াতাড়ি বলে দেওয়া যায়।

* * * * *

এয়ারোপ্লেনে করে আকাশে উড়তে বেশ মজা লাগে বটে, কিন্তু বিপদ অনেক। ঐ শূন্যমার্গে বিপদ ঘটলে প্যারাসুটের সাহায্যেই মাটিতে নামতে হয়। অনেক সময় ৪০ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু থেকে প্যারাসুট নিয়ে নামতে হয়েছে। তবে খুব বেশি উঁচুতে উঠলে বায়ুর চাপ কম থাকার জন্য মানুষ প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে নামতে অক্সিজেনের অভাবে আকাশেই মারা যেতে পারে। অবশ্য এই পথটুকু যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে পার হতে পারা যায়, তাহলে আর বিশেষ ভয় থাকে না। সুতরাং এই পথটা যদি প্যারাসুট বন্ধ রেখে নামা যায়, তাহলেই সুবিধে হয়, কিন্তু মানুষ প্লেন থেকে লাফাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারাসুট খুলে যায়। বৃটেনের এক বৈজ্ঞানিক এমন একটি যন্ত্র বার করেছেন, যেটা প্যারাসুটের সঙ্গে লাগান থাকলে প্যারাসুটটি সারাপথ বন্ধ থাকে; কেবলমাত্র মাটি থেকে দশ হাজার ফুট ওপরে থাকতে থাকতে এটি খুলবে। ফলে আকাশ থেকে খুব তাড়াতাড়ি নামা সম্ভব হয় আর অক্সিজেনের অভাবে মানুষ মারা পড়ে না।





কর্মরতা

নির্মলেন্দু সান্না

ব্যাপারটা দেখেশুনে খুব সুখী হয়েছে রেণুবালা।

আজ সারাদিন ধরে সে শুধু দেখেছে, দেখেছে আর অবাক হয়েছে। একটা মেয়েছেলে, তারই মত কমবয়েসী মেয়েছেলে, সে যে এত খাটতে পারে, তা আগে কোনোদিন ভাবতে পারেনি। তাকে যদি অমন কষ্ট করতে হোত শ্বশুরঘরে, তবে নির্ঘাৎ বাপের বাড়ি পালিয়ে আসত, ভুলেও ওদিকের ছায়া মাড়াত না। অবশ্য বৌদিকে কেউ কোনোদিন এত পরিশ্রম করতে বলেনি, সবাই সাবধান করেছে, এমনি করে উদয়াস্ত কাজ করলে শরীর টিঁকবে না. হাজার হোক্ রক্তমাংসের মানুষ তো—কিন্তু না, কোনোদিকে কারুর কথায় গ্রাহ্য নেই বৌদির। মুখ বুঁজে নিরীহ মোষের মত চব্বিশ ঘণ্টা সংসারের ভার বয়ে চলেছে। আর কোনোকিছুর প্রতিবাদ করে না বলেই সকলে চুপ করে গেছে।

আজ সকালে বাবা তাই বলছিলেন, তুই জেনে রাখিস রেণু, ঘরে আমার লক্ষ্মী ধরা দিয়েছে।

বাবা খুব খুশীতে আছেন ইদানীং। গতকাল সন্ধ্যের মুখে রেণুবালা বাপের বাড়ি ঢুকেছে। বিশেষ কিছু বলবার সময় হয়ে ওঠে নি। আজ সকালেই সেজন্যে রেণুবালার ডাক পড়েছিল সদর ঘরে।

হরিসাধন হাসতে হাসতে বলছিলেন, হ্যারে রেণু, জামাই নাকি কাল সকালেই চলে যাবে?

মুখ নীচু করে, ডুরে শাড়ির পাড়টা আঙুলে জড়াতে জড়াতে রেণুবালা বলেছে, হ্যাঁ বাবা, কি সব দরকারী কাজ রয়েছে।

—তাহলে আজই তোকে একটা কাজ করতে হচ্ছে মা, হুঁকোয় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পরিকল্পনাটা ব্যক্ত করেছিলেন হরিসাধন, এই বলছিলুম কি, আজ রাতে যদি একটা ফিস্টি মতন—অবিশ্যি তোকেই সব দেখেশুনে নিতে হবে, তোর ছোড়দার বিয়েতে তোকে আনতে পারিনি বলে আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছিস, না রে?

—একটুও রেগে যাইনি বাবা, মোলায়েম কণ্ঠে বলেছিল রেণুবালা, ছোড়দা যদি হঠাৎ লুকিয়ে বিয়ে করে, তুমি কদিক সামলাবে। তোমার চিঠি পেয়ে আমরা খুব অবাক হয়েছিলুম কিন্তু। তুমিও বোধ হয়—

বিব্রত হয়েছিলেন হরিসাধন, না, না, দুঃখু পাইনি, তবে মনে মনে একটু কষ্ট হয়েছিল, এতদিন ধরে হতচ্ছাড়াকে মানুষ করলুম, আর আমায় না বলে হঠাৎ বিয়ে করে বসল, তুই-ই বল, কষ্ট হয় কি না!

কিন্তু সে কষ্ট কদিনের, কথার খেই ধরেছিলেন তিনি, বিয়ের চার হপ্তা পার না হতেই আমার লক্ষ্মী এসে ঘরে উঠল।

লক্ষ্মী—কথাটার অর্থ খুঁজেছে রেণুবালা। মাত্র মাস চারেক সে বাপের বাড়ি আসেনি। এর মধ্যে কত না বদলে গেছে সব। বাবা তো হাঁপ-কাসে ভুগত, মা কটিবাতে। বড়দার চারটি ছেলে, বড়-বৌ নিত্য উদ্‌ব্যস্ত। সংসারে রাতদিন খিটির-মিটির, কান্নাগোল। মা এবেলা ওবেলা তুলতেন কাশী যাবার কথা, বাবা হরিদ্বার। বড়দা বলত, সংসারে সব খরচ সে একা দিতে পারবে না, তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ চেয়ে কিছু রেখে তো যেতে হবে। এ সব কথা শুনে বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ত। কত ছেলে যে বাপের সঙ্গে হাঁড়ি ভাগ করে, মাকে ভাত দেয় না। এ সব ভেবে ভেবেই শুকিয়ে যেত।

কি রকম রোগা হয়ে গিছল বাবা। বুকের হাড় কটা জির জির করতো। মনে হোত, শক্ত অসুখে পড়েছে বুড়ো। তারপর চার মাস। চার মাস বাদে বাপের বাড়ি ফিরে চোখে সব নতুন লাগল রেণুবালার। বাবার শরীরে বেশ চাকচিক্য এসেছে। মুখখানায় কেমন শেষ বয়সের শান্তি।

আমার পোড়ো জমিতে সব্জী ফলেছে, বাবা হেসে হেসে বলছিলেন, ছোট বৌমা আমায় ভিটামিন খেতে শিখিয়েছে, ঘরের গাইয়ের দুধ তো আছেই। তোর মায়ের অসুখ যে অনেকটা ভালোর দিকে, সে শুধু বৌমার চেষ্টায়। ওই রান্না-ভাঁড়ারের ভার নিয়েছে। বড় বৌমার বাচ্ছাগুলোকে নিজের মত মানুষ করছে। আর তোকে চুপি চুপি বলি শোন, সেই যে একবার কথা উঠেছিল, হাঁড়ি ভাগ হবে, তা ছোট বৌমা আসার পর থেকে বড় ছেলে আর উচ্চবাচ্য করেনি। কেন জানিস? দেখলে যে অনেক কম খরচে চলছে, একটাও লোক রাখতে হয় না। তা ছাড়া বড় বৌমার যে আর

একটি আসছে, ও অতো সামলাতে পারবে নাকি।

এইখানটায় রেণুবালা অন্য প্রসংগ তুলেছে, আচ্ছা বাবা, বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন কাকে কাকে করেছিলে?

ওঃ সেই একবার মহা মুশকিলে পড়েছিলুম, কাঁচা পাকা চুলভর্তি মাথা নেড়ে হরিসাধন আক্ষেপোক্তি করেছিলেন, হতভাগা ছেলে হুট্ করে বৌ নিয়ে এল, আরে বাঁদর, তুই যদি আমাকে জানাতিস যে, অমুককে আমার মনে ধরেছে, আমি কি না করতুম। এই তো পাশের গ্রাম, দুদিনেই সব কথা কয়ে ফেলতুম। তা নয়, লুকিয়ে লুকিয়ে—আর বলিস কেন মা, নম নম করে কাজ সেরেছি। দেখছিস না তোকে পর্যন্ত আনতে পারলুম না। তুই এলি কি না, পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন, বিয়ের ঠিক তিন মাস পরে। সেই জন্যে বলছিলুম, তোরা কাকে কাকে বলবি ঠিক করে একটু আমোদ আহ্লাদ——

আমোদ-আহ্লাদের পরামর্শ দিয়ে সেই সাতসকালে আরো কত গল্পই করেছিলেন হরিসাধন, জানিস মা রাণী, বৌমা গরীবের ঘর থেকে এসেছে বটে, কিন্তু সদ্গুণের অভাব নেই। ভালো বংশের মেয়ে যে, আজই তারা না হয় গরীব হয়ে পড়েছে। তাবলে চিরটা কাল তো আর এমনি ছিল না। বৌমার বাবা যদ্দিন বেঁচে ছিল তদ্দিন হেসে খেলে বেড়িয়েছে। তারপর নিয়তির চক্র মা, বাপ মারা গেল, কাকার সংসারে উঠতে হোল। সেইখানে রোদেজলে মানুষ। শুনিছি, লেখাপড়ার দিকে বড্ড ঝোঁক মেয়ের। তাই জন্যেই তো হারাণকে বলেছিলুম, ওরে মুখপোড়া, এবার যে বোয়ের কাছে তোকে শিখতে হবে।

বৌদি বড্ড সরল, না বাবা? সরু গলায় বলেছিল রেণুবালা।

সরল মানে? ঐটি তোমার চোখে পড়বে সব আগে, লুকোছাপা কিছু নেই। যেটি বলবে অম্লান বদনে শুনে যাবে। একরাশ কথা উড়িয়ে দম নিয়েছিলেন হরিসাধন।

সেই সুযোগে দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রেণুবালা। সদর ঘরের পেছনে দিয়ে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে তর্ তর্ করে উঠে গিছল দোতলায়।

রান্নাঘরের ঠিক লাগোয়া ওপর নীচে তিনখানা পাকা ঘর। দুখানা দু দাদা নিয়েছে। আর একখানায় মা থাকে। আজ সে এসেছে বলে যেমন সরছে।

তার অস্থায়ী ঘরটাতেই সে আগে ঢুকেছিল। কোনো দরকার ছিল না, কেউই ছিল না সে ঘরে। তবু আপনার অজান্তেই কেমন চলে এলো। মাঝারি সাইজের ঘর। তাদের জন্যে পরিপাটি করে সাজানো। একজনের হাতের ছাপ সর্বত্র অনুভব করা যায়, সে, ছোট বৌ। বিলতে গেলে আগে এই ঘরটাই ছিল ছোড়দার। পাশের ঘরে থাকত সে আর মা। তখন কি কোনদিন ভাবতে পেরেছে, ওই ঘরটাই যে নতুন বৌ আসবে সে তার প্রাইমারী স্কুলের পুরোন সই শান্তময়ী। বেশ মনে আছে তার ক্লাশ ফোরে উঠে মকর পাতিয়েছিল শান্তময়ীর সংগে, বলেছিল, মা বলেছে, মকর পাতালে নাকি বাড়ি গিয়ে ভাব করে আসতে হয়। আমাদের বাড়ি যাবে মকর? না ভাই, বড্ড লজ্জা করে, এইরকম কি একটা কথা যেন বলেছিল, হয়ত এই কথাটাই বলেছিল, কেন বলেছিল?

আপন মনে হেসে উঠেছে রেণুবালা। পাশের ঘরে গিয়ে ঠেলা মেরেছে ছোড়দাকে, এই, ওঠো ওঠো, কি যে হচ্ছো দিন দিন, কখন সকাল হয়ে গেছে আর তুমি কিনা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ।

লাল ফুলো ফুলো চোখ নিয়ে হারাণ বিছানায় উঠে বসেছে, তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় হাঁক ছেড়েছে, এই রাণী, খবর্দার ঘুম ভাঙাবি না বলে দিচ্ছি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কে কবে রাজা হয়েছে।

বাব্বা, কেমন তাকাচ্ছে দেখ না, যেন নেশা করেছে, মৃদু হেসেছে রেণুবালা।

উফ্ আর বলিস কেন, এক ঝাঁকড়া কাপ্তানী ছাঁটের চুল পেছন দিকে সরিয়ে বলেছে হারাণ, কাল রাত বারোটা পর্যন্ত ফ্লুট বাজাতে হয়েছে আখড়ায়। সত্যি বলছি, সবাই বলছিল, থিয়েটারের সময় এই রকম বাজালে একখানা আস্ত মেডেল ধড়াস করে বুকে ঝুলে পড়বে।

বেশ বাবা, বেশ, ওসব গল্প তোমার বোয়ের কাছে কোরো, আমার কাছে বলে কি হবে, মিষ্টি কথার চাপড় লাগিয়েছে রেণু।

হারাণকে কেমন যেন উন্মনস্ক দেখাচ্ছিল, বউ যে এসব গল্প পছন্দ করে না আদপে।

তবে বাঁশী বাজানো ছেড়ে দাও, হাল্কা সুরে বলেছে রেণু। যেন বাঁশী বাজানো একটা কাজই না, ছেড়ে দেব বল্লেই দেয়া যায়।

এ কথায় উন্মনা হয়ে পড়েছে হারাণ, বলেছে, ও আপনিই আমাকে ছেড়ে যাবে, বিয়ের পর থেকে কি যেন হয়েছে, ঠিক বাজছে না।

সেইজন্যেই তো বলছি, রেণুবালা সুযোগ পেয়ে বলতে ছাড়েনি, যত না বাঁশীর আওয়াজ তত ফুঁকো কথার হাওয়া। তোমার কথাতেই মুরোদ।

খবর্দার, এই সাতসকালে যা তা বলবি না, একটা অসম্ভব রাগের অভিনয় করেছে হারাণ, কুমারপুরের হারাণ প্রামাণিক ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে, ঘরের পরোয়া না করেই সে বিয়ে করেছে।

সত্যি, কি লোক তুমি দাদা, অবাক হবার ভান করেছিল রেণু, কাউকে না বলে কয়ে বিয়ে করে বসলে, তোমার একটুও বুক কাঁপেনি?

সে একটা মজার গল্প শুনবি? স্যান্ডো গেঞ্জিটা গায়ে টেনে বুক চিতিয়ে বসেছিল হারাণ। নির্ভেজ আড্ডা, তাও যদি হয় মুখরোচক বিষয় নিয়ে তাহলে আর কিছুই চায় না সে।

বুঝলি রাণী, নেশার ঝোঁকে বিয়ে করে ফেলেছিলুম, সেই অঘ্রাণ মাসটাতে, তুই শ্বশুর বাড়ি গেলি, আমিও তার দিন পনের বাদে খুড়শ্বশুরের বাড়ি গিয়ে উঠলুম। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করেছে হারাণ।

বিয়ের গল্প শুনতে পেলে মেয়েরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, অন্তত রেণুবালা। অসীম আগ্রহের সুরে সে বলে উঠেছে, তারপর? তারপর?

তার আগে কি হয়েছিল শোন, পূর্ব প্রসংগে ফিরে গেছে হারাণ, বাবা একদিন আমাকে ডেকো বললো, ওরে মুখপু লেখাপড়া তো কিছু শিখলিনি, এবারে চাবিতালার কারখানা করে দিই, যা হয় একটা কিছু কর— বাবার যেমন কথা, রাগতস্বরে মন্তব্য করেছে হারাণ, আমার সেদিন বলে বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন—

—আমি সেদিন পালালুম, এই নটা দশটা নাগাদ, যে সময়ে মাইতিদের হাইস্কুল খোলেরে, মাথার বালিশটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল সে, এইবারেই তো আসল গল্প এসে গেছে।

স্কুলে পড়তে গেলে বুঝি? রেণুবালা সত্যিই অবাক।

ধোৎ, ওসব আবার কি, আমি গিয়েছিলুম একটা মেয়েকে জব্দ করতে, একটা লেখাপড়া জানা মেয়েকে, তুই যেবার স্কুল ছাড়লি সেবার সে মাইনর পরীক্ষা দিয়ে জলপানি পায়। এবারে সে এম ই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল।

বৌদি? বিষম কৌতুক রেণুবালার।

বৌদি আবার কে? মাইতি এ্যান্ড সন্সদের ফর বয়েজ এ্যান্ড গার্লস স্কুলের ভালো ছাত্রীটি, একটু ফোড়ন দিয়ে কথা বলছিল হারাণ, ঠিক সাড়ে ন'টার সময় স্কুলের দিকে যাচ্ছিল, হাতে দোয়াত কলম। আমরা তিন বন্ধুতে তিনখানা সাইকেল নিয়ে হাজরাদের বুড়ো তেঁতুল গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যেই না দেখতে পাওয়া অমনি শন্ শন্ করে তিনখানা সাইকেল চালিয়ে দিলুম, ওর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একমুঠো গোলাপফুল ঠিক ওরই গায়ে ছুঁড়ে মারলুম। কিছুদূর গিয়েই সাইকেল ঘুরিয়ে নিলুম, আবার ওর পাশ কাটিয়ে হুস্ হুস্ করে চলে গেলুম আবার একগাদা গোলাপফুল—এমনিভাবে তিনবার। হো হো শব্দে হেসে উঠল হারাণ।

উরি বাবা, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি, হাসতে হাসতে গালে হাত উঠেছে রেণুবালার, বৌদি রেগে যায়নি?

ওঃ সে এক কাণ্ড, স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারকে সব বলে দিয়েছিল, কালকেউটে

মাস্টার চিঠি পাঠাচ্ছিল বাবার কাছে, মাঝ রাস্তায় মালীর কাছ থেকে চিঠি কেড়ে নিলে ওর কাকা, সটান আমাকে এসে ধরলে, বললে এতো ভালো কথা বাবা, তোমার বাপ রাজী না থাকে তুমি একবার সায় দাও বাবা, বুঝছো তো, পরের মেয়েকে কদ্দিন পুষে পুষে রাখব। আমি সংগে সংগে রাজী। বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন বলে সেই রাতে উধাও।

গল্পটা শেষ হয়ে গেল। এমন চমৎকার গল্পটা এইটুকু সময়েই শেষ হয়ে গেল। রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারে না হারাণ। ঐ এক মহাদোষ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ওদিকে রেণু হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছে। হাসি থামিয়ে একবার বলেছে উঃ দিন দিন কি ছেলেই হচ্ছ। তারপর আবার হাসি। শেষকালে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে তাল ভংগ করেছে, দাদা, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে এখন।

আমার দ্বারা কাজটাজ কিস্যু হবে না চাঁদ, অন্য রাস্তা দেখ, হারাণের গলায় তখন অন্য সুর।

না, না, বেশি কিছু নয়, গোটা কয়েক মাছ ধরবে পুকুর থেকে, রেণুবালাকে সামনাসামনি এগিয়ে আসতেই হয়েছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, এখন থেকে জোগাড়যন্ত্র করতে হবে তো।

মাছ? চোখের তারাগুলো কালোজামের মত ঠেলে বেরুবার উপক্রম হারাণের, মাছ আমি ধরতে পারি না। অতক্ষণ ধরে ছিপ নিয়ে বকের মত চুপ করে বসে থাকা আমার ধাতে সয় না। যদি বা টপ করে মাছ খায়, আমি খেলিয়ে তুলতে পারবো না। এক হ্যাঁচকা টানে হয় ডোর ছিঁড়বে নয় মাছ খুলে যাবে। তার চেয়ে বড়দাকে একটা জেলে ডাকতে বল।

আচ্ছা থামো, হয়েছে, রাগতস্বরে কথা বলেছে রেণু, তুমি যে কিছু কম্মের নও, তা জানি। ঘাট হয়েছে তোমাকে বলে।

ফ্যা ফ্যা করে হাসছিল হারাণ, এতটুকু লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই, বুঝলি রাণী, সেদিনের তোর বৌদি ঠিক ঐ কথাই আমাকে বলছিল। মাইতিদের স্কুল থেকে একটা ভালো ফুলের গাছ চুরি করে এনে আমাদের বাড়ির পাশগাদায় লাগিয়েছিলুম। কি যেন নাম—ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—ফুল যদি ফুটত দেখতিস, সারা বাড়িখানা গন্ধে পাগল হয়ে যেত। কিন্তু না, যত্ন করতে জানিনি বলে হতভাগী শুকিয়ে মরল।

রেণু একবার ভাবল, এই সুযোগে কিছু ফুলের জোগাড় করে দিতে বলবে। পরক্ষণেই মনে হোল, বলে যখন ফল হবে না, তখন না বলাই ভালো। এ বাড়ির সবাই বদলে গেছে, শুধু ছোড়দা ছাড়া। আগেও যেমন, এখনো তেমন।

আমি নীচে যাচ্ছি, মুখ ঘুরিয়ে বলেছে সে, জেনে রেখে দাও, আজ বাড়িতে একটা কাজ আছে, তোমার বিয়ের ভোজটা আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছিলে, তা আর হতে দিচ্ছি না।

এই বলে নীচে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে রেণু আর কঠিন হাতে দোর আটকেছে হারাণ। একটা কাজ করতে হবে, কৃত্রিম কাঠিন্যের সংগে বলেছে সে।

কি কাজ? অবাক চোখে মুখ তুলেছে রেণু।

তোর বৌদিকে শুধু জিজ্ঞেস করবি, ঢোক গিলেছে হারাণ, ভাবে-ভংগীতে একেবারে মোলায়েম হয়ে গেছে, আমাকে তার মনে ধরেছে কি না, মানে কিনা, আমি আজো ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এই কটা কথা বলতেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে, ছেড়ে দিয়েছে দরজা, গা হেলিয়ে দাঁড়িয়েছে পালঙ্কের গায়ে, অসীম ক্লান্তি আর ঔদাস্যভরে।

ওহো-হো, এই কথা, সে সুযোগ আজ রাতে তুমিই পাচ্ছ, তুমিই জিজ্ঞেস কোর, আমি কেন, আমি শুধু ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়ে দেব, কথার উত্তর দিয়েই রেণুবালা নীচে নেমে এসেছে। মনে মনে হেসেছে। দাদাটা সেই রকম বোকা বোকা রয়ে গেছে, কার সংগে কি কথা বলতে হয় আজো শিখলো না।

এরপর ছিল নেমন্তন্ন করার সমস্যা। পুরোন সখীদের কাকে বলবে কাকে না বলবে সে এক জটিল ব্যাপার।

সব প্রথমে কিন্তু একজনাকে নেমন্তন্ন করতে চেয়েছিল সে। তিনি যে সকালেই কোথায় হাওয়া হয়েছেন, তার পাত্তা মিলছিল না। দেখা হলে কি কথা যে শোনাবে সেও তার মনে ছিল। ঐ এক মানুষ বাবা, কী দুষ্টু! কী দুষ্টু!!

বলতে বলতেই দেখা হয়ে গিছল। নীচে বসবার ঘরেতেই অপেক্ষা করছিল সুধীর। রেণুবালাকে দেখেই চুপ-ইশারায় ডাকল, রাণু, শুনে যাও একবার।

মুখ ফেরাল রেণুবালা। টুপ করে ঘরে ঢুকেই বলল, মনে রেখো, এটা তোমার শ্বশুরে বাড়ি।

শ্বশুর মহাশয় সেই কথাই বললেন, একটু সহজ গলাতেই সুধীর ফিসফিস করল, হারাণদার বিয়েতে আমার শ্বশুরে বাড়ি আসবার নেমন্তন্ন হয়নি, সেজন্যে কিছু যেন মনে না করি কারণ—

—যাও যাও, ন্যাকামি কোর না, কৃত্রিম কোপে চোখ পাকাল রেণু, এসে অবধিতো বৌদির সংগে আলাপ করলে না।

সেতো আজ সন্ধ্যে বেলাতেই হবে, চটপট কথার জবাব দেয় সুধীর।

ও, তাহলে সবই শুনেছো। রেণুকে খুবই বিমর্ষ দেখায়, নেমন্তন্নটা করা হল না।

শোনো, চুপি চুপি বলল সুধীর, আজ সন্ধ্যে বেলায় তুমি সেই ফিকে নীল রঙের শাড়ীটা পরবে, আমি যেটা মুন্সীর হাট থেকে কিনে দিয়েছিলুম। ওঃ ওটা পরলে এমন সুন্দর দেখায় তোমাকে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুধীর। ওদিকে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে রেণু। ছিঃ ছিঃ এমন দুষ্টু হয়েছে আজকাল, মুখে কিছু আটকায় না।

অসভ্য কোথাকার, বলে উঠল রেণুবালা, তোমার মাথায় শুদ্ধ ঐ চিন্তা।

ঠিক তাই, মৃদুভাবে হাসল সুধীর, আমি পরব সেই ঘি রঙের পাঞ্জাবিটা, তোমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে।

আচ্ছা তাই হবে, পাশ কাটিয়ে চলে গেল রেণু। ওঃ সূর্য তখন অনেকখানি উঠে পড়েছে, ফাগুন বসন্তের আকাশটি কি পরিষ্কার, দূরে একটা ফিঙে হাওয়ার ঢেউ ভেঙে ভেঙে উড়ে গেল, নারকেল পাতায় রুপোলী রোদ ঝিকমিক করছে, থেকে থেকে এক ঝলক বাতাস বইছে আর নেড়ার ধারের ঐ নীল চোখের মত নীল অপরাজিতাগুলো দুলে উঠছে। নীল ফুল, নীল আকাশ, একজনের পছন্দ হওয়া সমুদ্র নীল, আকাশ নীল শাড়ী, সব মিলিয়ে কি ভালোই যে লাগছে তার!

* * * *

আরো ভালো লাগল যখন সে নীল শাড়ী পড়ে সন্ধ্যের আসর মাতিয়ে তুললে। অনেকেই এসেছিল। তিন চারজনকে বলতে গিয়ে আটদশজনকে বলা হয়ে গিছল। দাদার বেলাতেও তাই।

দাদা বন্ধুদের নিয়ে সদর ঘরে বসেছিল আর ওরা নীচের ঘরে। পুরোন সখীদের সংগে কত গল্পই না হোল। হাজারো সুখ দুঃখের স্মৃতি। ভাবতেও এমন আনন্দ লাগে।

সকলে ঘুরে ফিরে একটা কথাই অবশ্য বলছিল। রেবা জিজ্ঞেস করেছিল, বৌদি কোথায় গেল, তাঁকে দেখছি না কেন।

উত্তরটা দিতে সে একটু কুণ্ঠা বোধ করেছিল। বৌদি তখনো রান্নাঘরে। মা আর বড়বৌদি ওকে সাহায্য করছিল। কিন্তু সে আর কতটুকু। বলতে গেলে সবটাই বৌদির করা। এটা কি রকম একটু বেখাপ্পা লাগে, যাদের বিয়ে উপলক্ষ্য করে এই ভোজ তাদের একজন কিনা সারাদিন সেই কাজে খেটেই মরল।

তাই সকলে যখন দেখতে চাইলে তখন বৌদি রান্নাঘরের বাইরে এসেছিল বটে, কিন্তু দেখাবার মত কিছু ছিল না। কাপড় চোপড়ে হলুদ, হাতে তেলকালি, মুখখানা কয়লার আঁচে লাল হয়ে গেছে।

মা বকছিল সেজন্যে, এবার যাও না বউমা, আমরাই সব করে নিতে পারব। কিন্তু বৌ নড়েনি।

আর সেই জন্যে সকলের মুখ থেকে প্রশংসা ঠিকরে বেরুতে লাগল। এ রকম তারা কোথাও দেখেনি। কক্ষণো না। এত খাটতে হলে আধমরা হয়ে যেত সবাই।

সেই সঙ্গে রান্নার প্রশংসা। সবটাই বৌদির প্রাপ্য। এ রকম রাঁধতে পারলে তারা নাকি নিজেদের ধন্য মনে করত। খুশী হয়ে চলে গেল সকলে।

তারপর নিজেদের খাওয়া দাওয়া। সে সব সেরে পান সাজতে বসেছে রেণুবালা। সব দেখে-শুনে খুশী হয়েছে সে।

একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিল। রাত হয়ে গেছে কিনা। মা বাবা বড়দা, সবাই শুয়ে পড়েছে। ওদিকে ছোট বৌদি ভাঁড়ার ঘরে তখনো কি নাড়াচাড়া করছে। তার ফুলের মালাগুলো বোধ হয় আধশুকনো হয়ে গেছে, কতক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়েনি।

রেণুবালা দ্রুত ওপরে উঠে গেল। সুধীর তখনো জেগে। তাকে দেখেই হাতটা চেপে ধরল, রাণু, আমাকে আজ একটা মালা দিতে হবে।

মালা নিয়ে তুমি কি করবে? ফিসফিস করে উঠল রেণু।

যার গলায় মালা দিয়েছিলুম তারি গলায় দেবো, দরদভরা কণ্ঠে বলল সুধীর।

ছিঃ ছিঃ তুমি কি গো, তখন যে বললুম, আজ দাদার ফুলশয্যা করব, হাল্কা হেসে বেরিয়ে গেল সে। বলে গেল, জেগে থাকো, আমি বৌদিকে ধরে নিয়ে আসছি।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখে হারাণ চুপচাপ বসে। হ্যারিকেনটা মিটমিট করে এক কোণে জ্বলছে।

রেণু বলল, দাদা, খবর্দার ঘুমুবে না। আমি বৌদিকে নিয়ে এক্ষুণি আসছি।

হারাণ তেমনি ঘুম ঘুম চোখে বসে রইল। মনে হল অপেক্ষার শেষ প্রান্তে সে চলে এসেছে। আর কয়েক লহমার ধৈর্য।

নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল রেণু-বালা। শান্তময়ী তখনো বাসন মুছছে।

মৃদু তিরস্কার করল রেণু, কি হচ্ছে তোমার? রাত কত হয়েছে হুঁস আছে? তোমায় যে বললুম বেনারসীখানা পরে ফেলবে, আমি এসে চুলটা ঠিক করে দোব।

ওসব কথা গ্রাহ্যই করল না শান্তি। নীরবে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল। রেণু ততক্ষণে সাজির ডালাটা খুলে দেখে নিলে সব ঠিক আছে কিনা। মালা দুটো সে লুকিয়ে গেঁথেছে। গেঁথে আবার আড়াল করে রেখেছে [illegible]। কয়েক মুঠো কচো ফুল চাপা দিয়েছে বেশ করে। বেল বকুল যুঁই, শাদা শাদা ফুলগুলোর ভেতর থেকে অপরাজিতার নীলাভা উঁকি মারছে। এ ফুলটার কৌলিন্য নেই, বেড়ার ধার থেকে তুলে আনা, তবু মনে হয় বিছানায় ছড়িয়ে দিলে এত সুন্দর মানাবে। আধো বোঁজা নীল চোখের মত সারারাত পাহারা দেবে।

সাজির দিকে চেয়ে থাকতে অনেক কথা ভীড় করল রেণুর মনে। ভাবল বলবে, জানো বৌদি, আমার এক সই বলেছে, সংসারকে তুমি আপন করে নিতে পেরেছো তাই জীবনে তোমার দুঃখ নেই, কষ্ট তোমার কাছে কষ্ট নয়। বেশ সুন্দর কথা বলেছে, তাই না? আমাকে কি বলেছে জান? বলেছে, তুই দেখে রাখ সই সংসারকে ভাল বাসলে কত কাজ শুধু খেলা মনে হয়।

কিন্তু কিছুই বলা হলো না। এত চুপচাপ, এত স্থিরগতিতে কাজ করে চলেছে বৌদি, যেন একটি মাত্র শব্দের উচ্চারণে তার অনেক ক্ষতি, অসীম বিরক্তি। ডিসগুলো সাজিয়ে রাখছে, কৌটো রেখে আলমারী বন্ধ করেছে, মুড়ির টিনটা যথাস্থানে পাঠাচ্ছে, বাতাসার হাঁড়িটা শিকেয় ঝুলিয়ে দিচ্ছে—

কাজ শেষ হল তোমার? আব্দারের সুরে বলে উঠল সে, আমি যে সবুর সইতে পারছিনি।

এত ফুল তুলেছ কেন? নির্লিপ্ত স্বরে বলল শান্তি। তেলের দোনাটা পরিষ্কার করতে করতেই বলল।

দেখ, দেখ, অপরাজিতাগুলো তোমার চোখের মত সুন্দর। আলগা হাতে জল ছিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল রেণুবালা। বাঁ হাতে আলতো করে ঝুলিয়ে রাখল সাজিটা। এরি মধ্যে তোমায় দেখতে দেয়া হবে না। আগে সাজগোজ করে নাও, ঠিক আমার কথামত। ইস্ চেহারার কি ছিরি হয়েছে, কাপড়ে হলুদ, মুখটা কালচে—

সাজগোজ করে কি হবে, উদাসীনভাবে বলল শান্তি, তোমার দাদা তো আর জেগে নেই, বাইরে সারাদিন হৈ চৈ করে এসে কোনোদিন তো জেগে থাকতে পারে না।

দাদা তোমার জন্যে বসে আছে, আমি দেখে এলুম, ব্যস্ত হয়ে বলল রেণু।

শান্তময়ী আগের কথা পুনরাবৃত্তি করলে, অপেক্ষা ও কোনদিনই করতে জানে না, আজ তোমার কথাতেও পারবে না।

কি করে বুঝলে তুমি? থেমে থেমে প্রশ্ন করল রেণু।

খুব সহজে, ধীর স্বরে বলে চলল শান্তময়ী, আমি একবার ওকে ফুল গাছ লাগাতে দেখে-ছিলুম, ও অপেক্ষা করতে পারলে না। গাছ পুঁতেই ফুল চাইতে লাগল, ফুল না পেয়ে গছটার যত্ন করলে না, শুকিয়ে মরে গেল।

ওসব গল্প এখন থাক বৌদি, আমি শুনেছি।

না ভাই, এমনি বলছিলুম তোমাকে, শান্তময়ী থামল না, আমি অনেকবার ওকে দেখেছি, শখ করে ছিপ ফেলছে খিড়কীপুকুরে, ধৈর্য ধরতে পারছে না। কাউকে পেতে গেলে যে অপেক্ষা করতে হয় এটা উনি বুঝতে চান না।

কি যে বড় বড় কথা বল কিচ্ছু বুঝি না। একটা হাই তুলল রেণুবালা।

তোমার দাদাকে বুঝতে পেরেছ তো? ঘুরিয়ে কথা পাড়ল শান্তি।

তা আর পারিনি? খুব। সায় দিল রেণু ঠিক তেমনি আছে, একটুও বদলায়নি।

সেইখানেই যে আমার ভয় ঠাকুরঝি, যে নিজে এক পয়সা রোজগার করতে পারে না, এতটুকু বিদ্যে নেই, দিনরাত সখের থিয়েটারে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়, তার—

কি হয়েছে তোমার বৌদি? পাগলের মত যা তা বকছ, শান্তময়ীর কাছে সরে এল রেণু-বালা। বাঁ হাতে তার ফুলভরা সাজি। চমৎকার মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে তা থেকে।

কথাগুলো সে উড়িয়ে দিতে চাইল, ওসব কথা শোনবার সময় নেই এখন, তাড়াতাড়ি ওপরে চলো দেখি

সন্দেহ নেই যে ঐ গন্ধটাই তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। সুধীর বসে আছে। দাদাকে বলে এসেছে, বৌদি যাচ্ছে। অথচ বৌদি কেন যে এত দেরী করছে তা সে বুঝতে পারছে না। এবার জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। আর তার ভাল লাগে না।

শান্তিও অধীর হয়ে পড়েছে। এতক্ষণ ধরে ও যে যোগাযোগের মত একটা জিনিসের পাশে আর একটা রাখছিল, অপরটার পাশ থেকে আর একটা তুলে নিচ্ছিল, জ্বালা করা চোখ নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোথায় কোন কাজটা বাকী রয়ে গেছে, কিছু একটা চোখে পড়লেই ছুটে যাচ্ছিল, যে কাজ কখন শেষ হয়ে গেছে তাকে নিয়েই আবার শুরু করেছিল, এ সমস্তই নিজেকে চেপে রাখবার চেষ্টা। এতদিন ধরে যে কথা ওর মনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে, আজ এই মুহূর্তে, রাত্রির এই স্তব্ধ অন্ধকারে সে সব বলতে না পারলে ও বোধ হয় হাঁফিয়ে উঠবে। তাই রেণুবালার কাঁধে হাত দুটো রাখল, আস্তে আস্তে বলল, তোমায় সত্যি বলছি ঠাকুরঝি, এ সংসার ভাল লাগে না। এখানে যা দুমুঠো জুটছে কাকার বাড়িতে তাও জুটবে না। তাইতো খেটে যাই। এমনি করে না খাটলে বড়ঠাকুর কোনকালে হেঁসেল আলাদা করতেন। তুমি কি কিছুই শোননি?

শোনা কথা আবার শুনতে লাগল ঠাকুরঝি। সে কথার মানে তখন পাল্টে গেছে। রেণুবালার

মনে হল, ওর বৌদির মুখটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে আসছে, কপালের শিরাগুলো দব দব করছে। একবার ভাবল আর কোন কথা বলতে দেবে না, জোর করে মুখটা চেপে ধরবে হাত দিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে ঠোঁট দুটো থর থর করে উঠেছে শান্তময়ীর। কাণ দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল রেণুবালার, কিচ্ছু মনে কোর না ঠাকুরঝি। তোমার দাদাকে আজও আমি—মানে, সেই ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে ফুল ছুঁড়ে মারা থেকে আজ পর্যন্ত ওর কোন কাজ ভালোর চক্ষে দেখতে পারিনি—তোমার—তোমার দাদার কাছে ঘেঁষতে ভয় পাই, ব্যবহার এত বিশ্রী, এত অমার্জিত, আমি তাই নানা কাজের অছিলায় ওর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই...

নিথর, নিঃস্পন্দ হয়ে গেল রেণুবালা।

বাইরের আকাশে তখন বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, নভোচর চাঁদ একটা কলাই করা ডিসের মত গড়িয়ে গড়িয়ে উঁচুতে উঠছিল, কতকগুলো তারা কানা চোখে মিটমিট করছিল। আর থেকে থেকে দক্ষিণে বাতাস ঝাপটা মারছিল বুড়ো তাল গাছটাকে, যার অনেকগুলো ডানা মুচড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে, ঠান্ডা হাওয়ায় ঝটপট করছে বার বার।

কাঁধের ওপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল শান্তময়ী। রেণুবালার শাঁখাপরা হাতখানা ধরে অতি ধীর কণ্ঠে বলল, ওপরে চল ঠাকুরঝি, আমার কাজ এখনো বাকী আছে।

কি কাজ জিজ্ঞাসা করবার মত শক্তি ছিল না রেণুবালার। শান্তময়ী আস্তে আস্তে তা' প্রকাশ করে দিলে, তোমাদের বিছানায় ফুলগুলো সাজিয়ে দিয়েই আজ আমার ছুটি। এ কাজটা পারব বোধ হয়, কি বলো ঠাকুরঝি?

প্রাণপণ শক্তিতে হাসবার চেষ্টা করল শান্তময়ী। রেণুবালার হাতখানা তার শিথিল মুঠি থেকে আগেই খসে গিয়েছে। এবারে সে নিজের শুকনো শক্ত হাত দুটো দুই চোখের ওপর চেপে ধরলে।

ঠাকুরঝি মাথা নীচু করে সাজির ডালাটা তুলছিল, দেখছিল, একটা নীল অপরাজিতার বুকে এক ফোঁটা জল চিক চিক করছে।

একথা শুনেই চমকে গেল। থর থর করে কেঁপে উঠল সাজি ধরা হাত।

আস্তে আস্তে ডালাটা বন্ধ করে দিল সে।

এতক্ষণে বোধ হয় সেই কাঁপনের বেগে নীল চোখের মত নীল অপরাজিতা থেকে শুধু একটি ফোঁটা নয়, একটির পর আর একটি বিন্দু বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ল।

যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

দ্বিতীয় দৃশ্য

উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চল।

গ্রাম্য পথের ধারে একটি গাছতলা। গন্নার সঙ্গিনী দুইটি মেয়ে গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দৃশ্যারম্ভের সূচনায় গন্নার নেপথ্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"আ—ঘামি—ই—গন্না বেগম!"
অভাগিনী গন্নার কবর, মুসাফের
এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে যাও।

সঙ্গিনী—দেওয়ানা হয়ে গেল। শেষ দেওয়ানা হয়ে গেল রট্টা দিদি। গীত-গাহনেবালী, আগজ্বলানেবালী রট্টাবাঈ দেওয়ানা হয়ে গেল।

সঙ্গিনী—বরাবরই ও দেওয়ানা বহেন। আমার মন বারবার বলেছে।

সঙ্গিনী—ঘুঙুর ওড়নার কবর দিচ্ছে। মথুরা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত বুকের জ্বালায় আগুন জ্বালানো গীত গেয়ে এল যে মেয়ে—সে মেয়ের চোখে দরিয়া বয়ে গেল। হা-রে-হা।

সঙ্গিনী—কবরে লিখলে আ-ঘামি-ই গন্না বেগম; গন্নার জন্যে কাঁদ;—গন্না কে?

(গন্নার গান শোনা গেল)

(গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

ঝরা গোলাপের দলে—চাঁদ কেঁদে যায় রাতে—
মোর সমাধিতে প্রিয় তুমি কেঁদো তারই সাথে।

(গান দুকলি গাহিয়াই সে বিষণ্ণ বিচিত্র হাসি হাসিয়া আপনার কপালে হাত দিয়া সঙ্গিনীদের বলিল)

গন্না—ঝুট। সব ঝুটরে বহেন দুনিয়ার সব ঝুট। গুলাবই ঝরে যায় চিরদিন, চাঁদ কোনদিন কাঁদে না। শিশিরের ফোঁটা, ওই চোখে নিমকের গুঁড়া দিয়ে তয়ফাওয়ালীর চোখের ঝুটা পানি।

সঙ্গিনী—তুমি কি শেষে দেওয়ানা হয়ে গেলে রট্টা দিদি?

গন্না—(মুখের দিকে তাকাইল। অতর্কিতভাবে সে ধরা পড়িয়া মুহূর্তে সচেতন হইয়া উঠিল) কি? কি বললি? আমি দেওয়ানা হয়ে গেলাম? (এবার হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া ঢাকা দিতে চেষ্টা করিল।)

সঙ্গিনী—রট্টা দিদি, এমন ক'রে তুমি হেসো না।

গন্না—কেন? ভয় করছে? না রে না, আমি দেওয়ানা হই নি, মগজ আমার ঠিক আছে।

সঙ্গিনী—তবে তুমি ওসব কি করলে? মানুষ নাই—তুমি কবর দিলে কার?

গন্না—ও। সেই জন্যে ভয় লেগেছে তোদের? ও আমার এক সখীর কবর দিলাম বহেন। সে কুঁইয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। তার রেশমী ওড়না, রূপার ঘুঙুর আমার কাছে ছিল। তাই দিয়ে সে সখীর কবর দিলাম। তার গতি হওয়া চাই তো ভাই। এতদিন ভুলেই ছিলাম। এখন সে রোজ রাত্রে স্বপ্নে দেখা দেয়, বলে, সখি আমায় কবর দাও। আমার শান্তি হোক।

সঙ্গিনী—তার নাম বুঝি গন্না?

গন্না—কি করে জানলি তুই? (চমকিয়া উঠিল)

সঙ্গিনী—তুমি যে লিখলে, অভাগিনী গন্নার জন্যে মুসাফের এক ফোঁটা জল ফেলে যাও।

গন্না—হাঁ হাঁ বহেন। তার নাম গন্না। বড় অভাগিনী রে! বাপ ছিল বড়া ভারী সায়ের্ বিখ্যাত কবি—কুইলি খাঁ। মা-ও ছিল যমুনাবাঈ—সেও ছিল সায়ের,—কবি। কিন্তু সে ছিল তয়ফাওয়ালী। নাচে-গানে তার জুড়ি ছিল না। রূপেরও তুলনা ছিল না। দুজনে ঘর বেঁধেছিল; মোল্লা কি ব্রাহ্মণ ডেকে সাদী করে নি। তাদেরই মেয়ে গন্না। তারও ছিল গুলাবের মত সুরত, সে-ও ছিল বাপ-মায়ের মত সায়ের—গীত রচনা করত। নাচে-গানে সুরতের খ্যাতিতে শহর দিল্লী শহর লক্ষ্ণৌ পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমীরের ছেলেরা তাকে আপনার করবার জন্যে সোণা-রূপা-জহরত ঢেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাপ মা বলেছিল—মহব্বত সাচ্চা না হলে কারুর গলায় মালা যেন দিসনে বেটী। তুই হিন্দু না মুসলমান না, তোর জাত নাই। তুই মানুষ, তুই কবি।

সঙ্গিনী—তারপর? মহব্বত না পেয়ে কুঁইয়ায় ঝাঁপ দিলে?

গন্না—না। আবদালীর ভয়ে। আবদালী বললে—নিয়ে আয়—ওই বেসরমী তয়ফাবালীর বেটী তয়ফাবালীকে, বন্দীকে দিয়ে দেব আমার ঝাড়ুদারের হাতে। বাদশাহী সিপাহীরা তার ঘর লুঠলে। মা তাকে নিয়ে পালাল। পথে মাকে

খুন করল—দানবদের মত বদমাস সিপাহীরা। গন্না লাফিয়ে পড়ল এক কুঁইয়ায়।

সঙ্গিনী—হায়—হায়—হায়।

গন্না—সেই কুঁইয়াতে আমিও পড়েছিলাম। গন্না মরে গেল।

সঙ্গিনী—তুমিও কুঁইয়ায় লাফিয়ে পড়েছিলে?

গন্না—পড়েছিলাম। কিন্তু নসীব বহেন। আমাকে বাঁচালে এক দেহাতি চাষীর ছেলে।

সঙ্গিনী—সেই বুঝি তোমাকে এ দেশে এনেছে?

গন্না—মরণ আমার। আমি তখন বুকের জ্বালায় আর দেহের যন্ত্রণায় চীৎকার করছি, ঠিক ঠিক হোঁস ছিল না। থাকলে চাষীর ছেলেকে খুন করতাম। কেন সে আমাকে বাঁচালে? হোঁস যখন ফিরল, সে তখন আমাকে দুই আমীরের জিম্মায় রেখে পালিয়েছে। আর মরতে ইচ্ছে হল না। ইচ্ছে হল, বুকের জ্বালায় দেশে দেশে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াই। সেই গন্নার কবর দিলাম। সেই বলেছিল মরণের সময়। আমার ঘুঙুর-ওড়না নিয়ে কবর দিয়ো, আর লিখে দিয়ো—"মুসাফের, গন্নার জন্যে এক ফোঁটা জল ফেলে যাও। সে বড় অভাগিনী।"

সঙ্গিনী—হায় গন্না বেগম!

গন্না—থাক তার কথা। ভুখ্ লেগেছে। যা তো। খানিকটা দূরে আছে সরাইখানা। কিছু সত্তু কিনে আন। আর জল। দুজনেই যা।

(দুজনেই চলিয়া গেল)
গন্না আবার সেই গানটি গাহিল
পুরো গাহিল এবার।

(চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রতন বাঈ।)

রতন—হে মথুরানাথ,—হে সুরুয নারায়ণ, তুমি বিচার করো দেওতা। তুমি বিচার করো। মেরে বেটা—মেরে জবাহির-লাল—তোমার সিপাহী সে—তার উপর এমন জুলুম তুমি বরদাস্ত করছ কি করে? (সে গন্নাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল)।

গন্না—মাতাজী!—মাতাজী! (সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

রতন—রট্টা? রট্টা—আমার বেটা—আমার জবাহিরলাল—আমার দুলাল—

গন্না—কি হয়েছে মাতাজী?

রতন—মরাঠা ফৌজদার তাকে কয়েদ করেছে, তাকে নাকি এমন করে মেরেছে রে—যে পিঠখানা চষা-ক্ষেতির মত ফালি ফালি হয়ে গেছে। মাথাতে মেরেছে বেটী তলোয়ারের উল্টা-পিঠ দিয়ে—মাথা ফেটে গেছে;—বেহোঁস হয়ে গেছে।

গন্না—কেন মাতাজী? কি কসুর তার?

রতন—আরে বেটী রাজা যে—তার কাছে কসুরের দরকার কি? তার হুকুম না মানলেই সে মারবে। আরে বেটী, এ তো সেই বর্গীরা রে! যারা ঘর জ্বালিয়ে, নাক, কান কেটে চৌথ আদায় করত। আজ আবার তারা বাদশা হতে চলেছে। হুকুম দিয়েছে—ঘোড়া, বন্দুক যা জাঠেরা রোহিলাদের মুলুক লুঠে নিয়ে এসেছে, তা সব দিতে হবে। খোরাসানী ঘোড়া—হাতিয়ার। একে জাঠ, তায় জবাহির পাগল—সে বলেছে—নেহি দুঙ্গা। বলে সে—পেশোয়া তাকে যে তলোয়ার ইনাম দিয়েছিল, সেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে বলেছিল—আমি চাই না, এ ইনাম নিয়ে যাও। ফেরত দিলাম আমি। গাঁও ঘেরাও করে—ধরে নিয়ে গিয়েছে তাকে। কে—কে এর বিচার করবে? হে মথুরানাথ! তাই—তাই আমি যাচ্ছি। ফৌজদার—আমাকে খুন করুক—নয় আমি তাকে খুন করব।

(সে ছোরা বাহির করিল)

এ আমার স্বামী রঘু-জাঠের ছোরা।—

(সে চলিয়া গেল)

গন্না—হা-রে-হা। হা-রে-হা!

(অন্যদিক হইতে ছুটিয়া প্রবেশ করিল মেয়ে দুইটি)

সঙ্গিনী—দিদি! রট্টা দিদি। বর্গী সিপাহীরা ছাউনি ফেলেছে।

গন্না—হে ভগবান, জুলুমবাজদের বরবাদ করো তুমি। অত্যাচারীদের ধ্বংস করো।

সঙ্গিনী—চুপ করো দিদি, শুনতে পেলে হয়তো জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেবে।

গন্না—(হাসিয়া উঠিল) আগুনে ফেলে দেবে?

(গাহিয়া উঠিল)

ব্যথা আমার বুকের মাঝে আগুন হয়ে জ্বলছে। জ্বলছে—! অগ্নিজ্বালায়।

(হা—হা—করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মধ্যপথে থামিয়া গেল)

(টলিতে টলিতে জবাহির আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কপাল বাহিয়া রক্তের ধারা গড়াইতেছে।)

জবাহির:—(স্বপ্নচ্ছন্নের মত গাহিল, তাহার যেন যন্ত্রণাবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, সে যেন বিকারগ্রস্ত) —হো-হো-হো! হো-হো-হো! হো-হো-হো!

গন্না—সর্দারজী! জবাহির সিংজী!—মাতাজী! মাতাজী!

জবাহির:—হো-হো-হো! (সে উপুড় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল)।

গন্না:—সর্দার! সর্দার জবাহির সিং! এ কি বেহোঁস হয়ে গেছে। বহেন জল-জল।

(সঙ্গিনী জল লইয়া ছুটিয়া আসিল)
(জবাহিরের মুখে জল দিল)

একজন ছুটে যা! মাতাজীকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় জলদি!

(একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল)

সর্দার! আঃ, ভগবান! হে মথুরানাথ দয়া করো! হে খোদা—মেহেরবাণী করো!

সঙ্গিনী:—দিদি সর্দার চোখ মেলেছে! দিদি!

গন্না:—সর্দার! সর্দার জবাহির সিং! সর্দার—এমন করে চেয়ে রয়েছ কেন? সর্দার!

(জবাহির সবলে উঠিয়া বসিল)

গন্না:—না-না। এমন করে উঠো না!

জবাহির:—তুমি সেই, তুমি সেই-তুমি সেই। চিনেছি তোমাকে আমি! (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেন তুমি ঝুট বলেছিলে আমাকে?

গন্না:—সর্দার! কি বলছ? কি ঝুট বলেছি?

জবাহির:—হাতে সেই কাঁকনি! তুমি সেই! কেন তুমি আমাকে বলেছিলে—তুমি নও? তুমি সেই—আঁধার রাতে দেখে-ছিলাম তোমাকে—রাধারাণীর মত সুরত—

গন্না:—না সর্দার, সে হজরত বেগম—

জবাহির:—হাঁ-হাঁ! তাকে বাঁচিয়েছিলাম পানসী থেকে। পেশবার দরবারে তাকে দেখেছি! সে নয়। ভুল হয়েছিল আমার। আবার সব মনে পড়েছে।! আঁধিয়ার দিল্লীতে থম থম করছে সব, আবদালী আসছে। কুঁইয়ার ভিতর থেকে উঠছিল কান্না! আঃ, সে কি কান্না!

গন্না:—সর্দার! (সবিস্ময়ে তাহাকে যেন প্রশ্ন করিল)—সে—সে—?

জবাহির:—হাঁ-হাঁ সে তুমি। সে তুমি! সে কান্নার সুর এখনও কানে লেগে রয়েছে আমার! আমি কুঁইয়ায় নেমে তুললাম; আঁধিয়ারায় যেন গুলাব ফুটে উঠল! কিন্তু চাষার ছেলে আমি, সে গুলাব কোথায় রাখব? ভয় হল। দুই আমীরকে ডেকে বললাম জনাব, কোন হীরামতির ফুলদানীর গুলাব খসে মাটিতে পড়েছে। একে সেই ফুলদানীতে তোমরা রেখে দিয়ো!

গন্না:—সর্দার—সে তুমি? (চীৎকার করিয়া বলিল)

(জবাহির ক্লান্তভাবে আবার শুইয়া পড়িল—হে ভগবান!

গন্না:—সর্দার! সর্দার!

(জবাহির উত্তর দিলনা—গন্না আবার মুখে জল দিল)

(নরিন্দর গিরি ও একজন শিষ্যের প্রবেশ)

নরিন্দর:—এই পত্র পেশবার হাতে দিয়ে তার উত্তর নিয়ে আসবে তুমি। বলবে—।

গন্না:—গিরি মহারাজ! সর্দার জবাহিরকে দেখুন। একবার তাকে আপনি বাঁচিয়ে-ছেন। দেখুন আবার তার দশা।

নরিন্দর:—রট্টা বাঈ? জানি মা সব জানি! এই যে! আমি না গিয়ে পড়লে কি হ'ত জানি না! আমিই জবাহিরকে মুক্ত করে' এনেছি! সরাইখানায় আমি চিঠি লিখতে

বসেছিলাম, পাগল তারই মধ্যে উঠে চলে এসেছে! নিষ্ঠুর অত্যাচার—! ওঃ! হায় পেশবা! হায় পণ্ডিত!

গন্না ঃ—হে ঈশ্বর তুমি কি নাই? এর বিচার করবে না তুমি?

জবাহির ঃ—(ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়াছিল। সে বলিল) সেদিন তুমি আরও বলেছিলে—আকাশ থেকে বিজলী হানো অত্যাচারীর মাথায়! ধ্বংস করো মুঘল বাদশাহী বংশকে!

গন্না ঃ—তুমি? তুমি সেই? মেরে সর্দার—তুমি সেই?

জবাহির ঃ—(তাহার হাতের কংকণ নাড়িয়া) এই সেই কাঁকনি! এই সেই কাঁকনি!

(নেপথ্যে মারাঠার শিঙা বাজিল)

ঘোষণা ঃ—আগে বাঢ়ো মারাঠা পল্টন। আগে বাঢ়ো! আবদালী আফগান-পাঞ্জাব থেকে তরাইয়ের পথে—রোহিলখণ্ডে ঢুকেছে। আগে বাঢ়ো! রোহিলখণ্ড!

(জবাহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল গন্না তাহাকে ধরিল।)

নরিন্দর ঃ—(শিষ্যকে) আমি নিজে চল্লাম পেশবার কাছে। মহিন্দর গিরিকে বলো আমার আদেশ রইল—আফগান হোক, মারাঠা হোক—এদের উপর যারা অত্যাচার করবে তাদের রোধ করবে গোস্বামী সন্ন্যাসী!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে নাকাড়া বাজিতে লাগিল)

জবাহির ঃ—রট্টা! মেরি রাধা!

গন্না ঃ—মেরে সর্দার। মেরে রুস্তম!

(রতন বাঈ ছুটিয়া আসিল)

রতন ঃ—বেটা!

জবাহির ঃ—মা-মা!

রতন ঃ—চল বেটা, পাহাড়ে বনে চল। ঘরে না। ঘরে না! ওরা বাঁচতে দেবে না ঘরে।

জবাহির ঃ—রট্টা! মা! রট্টা মেরি রাধা!

রট্টা ঃ—আয় বহেন আয়।—

(সকলে চলিয়া গেল)

নেপথ্যে ঃ—রোহিলখণ্ড! রোহিলখণ্ড!

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী মহলের দেহাড়ি সালাতিন।
(প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান সংস্থান)
দৃশ্যারম্ভের সূত্রে মিল্লাতের কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইবে— হজরত!
দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—হজরত—দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে একটা সাপের কংকাল ঝুলিয়া আছে। হজরত একখানা খসিয়া পড়া ইঁট টানিয়া বাহির করিয়া ধরিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সাপের কঙ্কালটা নিচে পড়িয়া গেল।

নেঃ মিল্লাত—হজরত! (দ্বিতীয়বার)

হজরত—জাঁহাপনা। (ইট হইতে মুখ তুলিয়া)

(মিল্লাত প্রবেশ করিলেন)

মিল্লাত—একটা আনন্দ সংবাদ এনেছি মা!

হজরত—বলুন বা' জান। আমিও আপনাকে একটা বিচিত্র জিনিস দেখাব। (ইটখানি সেই দেওয়ালেই রাখিল)

(মিল্লাত কাছে আসিলেন)

মিল্লাত—কুঞ্জপুরার যুদ্ধে আফগানদের প্রচণ্ড পরাজয় ঘটেছে। দুরাণী সুবাদার নবাব আবদোস সামাদ, রোহিল্লা নবাব মিয়া কুতব খাঁ—দশহাজার ফৌজ নিয়ে শেষ হয়ে গেছে! আবদালী রোহিল্লাদের এলাকার অনুপ শহরে বসে ভাবছে—হিমালয়ের কোলে কোলে তরাইয়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আফগানীস্থানে ফিরবে কি না! কিন্তু তাতেও ভয় হচ্ছে। পাঞ্জাব থেকে জম্মু পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে দলে দলে ক্ষ্যাপা নেকড়া ঘুরচে। উৎখাৎ শিখের দল। তারা হয়তো ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলবে!

হজরৎ—খোদা মেহেরবান! বাঁদী বসবার আসন দে।

(বাঁদী আসিয়া দুইটি আসন দিল—মিল্লাত বসিলেন, হজরত বসিল না)

মিল্লাত—খোদা মেহেরবান হজরত। এইটেই কিন্তু আমার আনন্দ সংবাদ নয়।

হজরত—বা' জান—আফগান আবদালী কি মার্জনা ভিক্ষা ক'রে খত পাঠিয়েছে?

মিল্লাত—না বেটী, মারাঠা পেশবার প্রতিনিধি কুমার বিশ্বাস রাও কুঞ্জপুরার লড়াই ফতে করে আজ দশেরা উৎসব করছেন—তারই ভেট পাঠিয়েছেন, তোমাকে পাঠিয়েছেন একরাশি গুলাবফুল, একছড়া বহুমূল্যে মুক্তার মালা আর আমাকে পাঠিয়েছেন মিয়া কুতব খাঁর ঘরে যে এক মহাপুরুষ ফকীরের জপমালা ছিল—সেই জপমালা—তাঁর হাতে লেখা কোরাণশরীফ. একটি উট—অর এক খত।

হজরত—বা-জান!

মিল্লাত—খতে লিখেছে—বাদশাহ আজ থেকে উটে চড়ে ইসলামের মহাপুরুষদের দরগায় দরগায় ঘুরে বেড়াবেন। বাদশাহের ঈশ্বরানুরাগ আমাদের সুবিদিত, সুগভীর শ্রদ্ধার হেতু! আমরা আর তাঁকে বিষয়বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চাই না।

হজরত—দিল্লীতক্ত তারা অধিকার করতে চায়?

মিল্লাত—চায়। তবে আজই নয়। এখন তক্ত শূন্যই থাকবে। আফগানের সঙ্গে মীমাংসার পর। জয়লাভে তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কল্পনার সংবাদে পেয়েছি, কুমার বিশ্বাস রাও বসবেন সিংহাসনে! আমি আজ মুক্ত মা। সেইটেই আনন্দ সংবাদ! খতম—আমার বাদশাহী! শুধু একটা কাজ আমার বাকী আছে। আমি দুসরা সা-জাঁহা। আমি তৈরী করব—আমার কবর—মাটির কবর—মাহ-উলা মিল্লাতের—কবর-মাহমহল! হিন্দুরা মহীকে বলে মাটি! হজরত!

হজরত—বা' জান!

মিল্লাত—কই তোমার বিচিত্র বস্তুটি দেখি!

হজরত—অভিসম্পাত দিতে পারছি না, অথচ বেদনায় ক্ষোভে বুক যেন ফেটে যেতে চাচ্ছে—; বা-জান, বাবরশাহী বংশ—

মিল্লাত—চুপ কর মা! পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

(দুইটি বাঁদী দুইটি পরাত (ট্রে) লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইল।)

বাঁদী—জাঁহাপনা। শাহজাদী।

মিল্লাত—আ—যা বাঁদী।

(বাঁদীরা আসিয়া পরাত নামাইয়া দিল)
(গোলাপ ফুল—মুক্তার মালা। ফকীরের জপমালা ও কোরাণ শরীফ রাখিয়া বাঁদীরা চলিয়া গেল)

হজরত—(গোলাপফুল মালা একবার নাড়িয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন) বা-জান—এ ভেট আপনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিন।

মিল্লাত—মা!

হজরত—বা-জান—আমি ফকিরিণী বসরাই গুলাব—পারস্য উপসাগরের মুক্তার মালা—এ আমার জন্য নয়।

মিল্লাত—অন্যায় হবে মা।

হজরত—বা-জান, এই ফকীর জপের মালাটি আপনার সম্মতি নিয়ে নিচ্ছি। এই আমার কাছে অমূল্য বস্তু!

মিল্লাত—হজরত, আমি জানি মা—তুমি—। তুমি তো আমার কাছে সত্য গোপন করনি।

(হজরতের দৃষ্টি স্থির হইল)

হজরত—না। করিনি। করব না। পেশবাকুমার বিশ্বাস রাও—আমার আঁখোকী রৌশন—সারা জেহান কি কোহিনুর; বা-জান—আমার নয়নানন্দ সে—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সে আমার অমূল্য রত্ন। অপরূপ তার রূপ—আমার সপ্রেম দৃষ্টির আরতিতে অরূপ রতনের মত পবিত্র। আমার শিরার মধ্যে যখন বাদশাহী রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে—মনে হয়—তাকে আমার, দুনিয়ার বিনিময়ে চাই—ইহকাল পরকাল—কুল মান—সম্পদ সমস্ত কিছু, দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েও তাকে আমার চাই! কিন্তু—না—তবু সে হয় না, তবু সে হবে না। (অসহায়ের মত ঘাড় নাড়িলেন।)

মিল্লাত—কেন? কেন হজরত?

হজরত—পরক্ষণেই নিজে আমি আমার গলা টিপে কণ্ঠরোধ করি—!

মিল্লাত—হজরত, বেটী!

হজরত—নিজের কাছেই নিজে আমি হেরে যাই। না-জনাব!

মিল্লাত—তুমি জোর কর মা, তুমি জোর কর। আমার ভুল ভেঙেগছে। হিন্দু-মুসলমান আমি কিছু নই। আমি মানুষ। বাদশাহী মসনদ—তোমাকে সেলাম, তুমি আমাকে মোহমুক্ত করেছ। এই পাথরের কেল্লা ছেড়ে গাছতলায় গিয়ে মানুষের মধ্যে মিশে যাব। হজরত—ভেঙেগ ফেল সকল কুণ্ঠার বাধা! জোর কর। আমি জানি—সাগরের মুখের নদীর মত আকুল তোমার কামনা সামনে খানিকটা মাটির বাধা, মাটির কন্যা দরিয়া—সে মাটি তুমি কেটে ফেল। নইলে তুমি শুকিয়ে যাবে —মাটিই তোমাকে নিঃশেষে শোষণ করে নেবে। মালা গাঁথ হজরত, তুমি বিজয়ী বীরের জন্য মালা গাঁথবে বলেছ—সেই মালা গাঁথ। ওই মুক্তার মালা তুলে নাও, ওই মালা পরে তুমি বিজয়ী বীরকে সম্ভাষণ কর।

হজরত—(স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

মিল্লাত—হজরত। নাও মুক্তার মালা!

হজরত—না। জনাব, সে মালা আমি পেয়েছি। অপূর্ব কণ্ঠহার! দেখবেন। (সে সাপের কঙ্কালটা তুলিয়া ধরিল) এই দেখুন।

মিল্লাত—হজরত!

হজরত—সেই! সেই মৃত্যুপ্রহরী! সেই সাপটার কঙ্কাল! ঠিক তেমনিভাবে দেওয়ালে ঝুলছিল। ফকীর বলেছিলেন—সে মরে গেছে! মৃত্যু কি মরে জনাব? সে তার জীবন্ত ছদ্মবেশটা ফেলে দিয়েছে! আর দেখবেন? (ইঁটখানা দেখাইল। ইঁটে সাপের ফনাটিঠিক যেন চিত্রকরা সাপের মাথার মত শুকাইয়া সাঁটিয়া রহিয়াছে) ওর দাঁতের ধার রেখে গেছে আমার চুলের কাঁটায়। (কাঁটা বাহির করিল) আর বিষ আছে ওখানেই। মৃত্যুপ্রহরী আমাকে ত্যাগ করেনি জনাব।

মিল্লাত—না। হজরত। ওটা ফেলে দাও। আমি তোমার পিতার তুল্য। আমি বলছি মা—ফেলে দাও ওটাকে!

হজরত—থাক জনাব—ও যখন এমন বিচিত্রভাবে আছে—তখন ওকে আমি ফেলব না। জীবনের বাধাকে যদি জয় করতে না পারি, তবে হেরে গিয়ে সমস্ত জীবনটা জ্বলব কেন?

মিল্লাত—না—না। নিজেকে তুমি জয় কর। ভেঙেগ ফেল সব বাধা!

হজরত—আমি ভেঙেগ ফেলব জনাব, কিন্তু সে?

মিল্লাত—কি বলছ হজরত?

হজরত—আমার সামনে মাটির বাধা—না, সাগর তুলেছে পাহাড়ের আড়াল? আমি বুঝতে পারছি না! সাগর মরে পাহাড়ের কিনারায় মাথা কুটে; নদী শুকিয়ে মাটিতে মিশিয়ে যায়! হায়রে হায়! জনাব—এ বন্ধুঝি ভাঙেগ না, ভাঙগা যায় না! যায় না! ফিরিয়ে দিন, ও ভেট ফিরিয়ে দিন।

মিল্লাত—(চিন্তা করিয়া) তাই হোক হজরত! এ ভেট আমি ফিরিয়েই দেব। এই আমার শেষ বাদশাহী কর্তব্য!

(আশরফের প্রবেশ)

আশরফ—জাঁহাপনা!

মিল্লাত—আশরফ!

আশরফ—শাহ আবদালী—দোয়াব থেকে—বাঘপথে যমুনা পার হয়েছে—সেনাপথের দিকে এগিয়েছে!

হজরত—আবদালী?

আশরফ—ভয় নেই শাহজাদী, কুঞ্জপুরা থেকে হিন্দোস্তানী ফৌজ নিয়ে কুমার বিশ্বাস রাও, দেওয়ান সদাশিব রাও ভাও—উত্তরদিকে পাণিপথে গিয়ে তার পাঞ্জাবের পথ আটক করেছেন। পিছন ফিরে দিল্লীর দিকে আসবার তার উপায় নাই; পাঞ্জাবের পথে আফগানিস্তানে ফেরার পথ নাই।

হজরত—খোদা মেহেরবান!

মিল্লাত—(মাথায় হাত রাখিয়া) নাও বেটী—মুক্তার মালা তুলে নাও!

হজরত—না—জনাব, না। ও—নয়। ও—মালা নয়, আপনার ও ফকিরীর মালাও নয়, আমার মালা—আছে!

(সে তুলিয়া লইল কঙ্কাল)

মিল্লাত—হজরত! (শঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিল)

হজরত—সাপের মণির মালা! আমার মণির কণ্ঠহার।

(দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল)

(আগামীবারে সমাপ্য)

ছাই

অফিস-টাইম

ট্রামে কোনমতে দাঁড়াইয়া চলিয়াছি। তিল-ধারণেরও স্থান নাই।

পার্শ্ব এবং সম্মুখবর্তী দুই চারিজন ভদ্রলোক ইহারই মধ্যে সিগারেট ধরাইলেন। নাসা এবং মুখ হইতে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে ধূম্র উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন এবং আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার অধিকাংশই গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম।

সভ্যতার মূল্যস্বরূপ অনেক কিছুই সহ্য করিতে হয়, বিরক্ত হইলেও কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু যখন চারিদিক হইতে ভস্ম উড়িয়া আসিয়া মুখে-চোখে পড়িতে থাকিল তখন মৌনভঙ্গ না করিয়া পারিলাম না। বিনীত-কণ্ঠে কহিলাম, "ছাই উড়ে আসছে, একটু সাবধানে স্মোক করবেন দয়া ক'রে—।"

একমুখ ধোঁয়া উড়াইয়া একজন কহিলেন, "ও, সরি!"

আর একজন নীচের দিকে ভস্মাগ্র ঝাড়িয়া, কহিলেন, "বাতাসকে কি ক'রে কণ্ট্রোল করি বলুন!"

সম্মুখের ধূমপানরত ব্যক্তি পিছন ফিরিয়া আমাকে একনজর চাহিয়া দেখিলেন। তারপর ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এত ট্যাক্সি রিক্সা ইত্যাদি থাকতে কেন যে কষ্ট করে ট্রামে চড়েন ছাই—!" "ছাই" কথাটার উপর সবিশেষ জোর দিলেন তিনি।

একটা হাসির রোল উঠিল। ট্রামস্থ পুরুষ এবং মহিলাবৃন্দ আমাকে একবার দেখিবার প্রয়াস করিলেন। কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল।

লেখাপড়া শিখিয়া সুবোধ হইয়াছি, ভদ্র হইয়াছি, নির্বিচারে অপমান সহ্য করিবার একটা অভ্যাস আয়ত্ত করিয়াছি। তথাপি ধর্মের কাহিনী শুনাইবার মতো করিয়া কহিলাম, "সাধারণের জন্যে যেসব গাড়ি তাতে স্মোক্ করা উচিত নয়, সভ্যতাও নয়।"

সকলে আমার সম্মুখবর্তী রসিকপ্রবরের প্রতি চাহিলেন। তিনি প্রথমে চারিদিকে এক-বার চোখে বুলাইলেন, তারপর চিবাইয়া চিবাইয়া কহিলেন, "বলি সাধারণ অর্থাৎ পাব্লিক বলতে কি মশাই-ই শুধু, না আমরাও?"

আবার হাসির রোল উঠিল।

মরমে মরিয়া নির্বাক রহিলাম।

শ্রীপ্রাণবন্ধু

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

...পরদিন প্রভাতে রোহার প্রেরিত দুইজন লোক আসিয়া আমাদের তৃণশস্য কাটিয়া লইয়া গেল। সমস্ত দিনে তাহারা অনেক তৃণ-শস্য সংগ্রহ করিল। নিম্ব সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী ইহাতে বেশ অসন্তুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। ধবল নিম্ববৃক্ষের নিম্নে সমস্তদিন বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। শিলাঙ্গীর দিকে বা আমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। মীংরা প্রভাতে উঠিয়াই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত দিন তাহার আর সাক্ষাৎ পাই নাই। শিলাঙ্গী হাসিমুখে আগাইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে আমল দিল না। ইলচির চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সংরা প্রকাশ্যেই বলিল—একটা পাহাড়ী ডাইনী আমাদের জংলার উপর ভর করিয়াছে। কেবল কয়েকটি শিশু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মায়েরা তাহাদের তাহার নিকট আসিতে দিল না। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু শিলাঙ্গী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। মনে হইল এরূপ ব্যবহারে সে অভ্যস্ত। এখন মনে হইতেছে সে যেন সারাজীবন ধরিয়াই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার মর্মকথা শুনিতে চাহে নাই। তাহার শ্রীমণ্ডিত দেহটাই হইয়াছিল ইহার প্রধান অন্তরায়। তাহার আসন্ন যৌবন-পুষ্ট দেহটা কাহাকেও মুগ্ধ, কাহাকেও লুব্ধ, কাহাকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মোহ, লোভ অথবা ক্ষোভের ফেনিল স্রোতে আসল শিলাঙ্গী বারম্বার ভাসিয়া গিয়াছিল, শিলাঙ্গীর স্বরূপ কাহারও চোখে পড়ে নাই। তাহার জীবনে একমাত্র আমিই বোধহয় তাহার বন্ধুত্বের দাবী মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আমিও কি সত্যই তাহা মানিয়াছিলাম? আমি ভান করিয়াছিলাম মাত্র। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া উচ্চকণ্ঠে আমি যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিলাম সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমিও তাহার দেহটা দেখিয়াই প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম, প্রলোভনের বশবর্তী হইয়াই তাহার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার জন্যই নিনানির সহিতও মিথ্যাচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাই নাই। সেদিন বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না আজ কিন্তু বুঝিয়াছি শঠতার দ্বারা মহৎ কিছু লাভ করা যায় না। নাগালের মধ্যে পাইয়াও তাহাকে হারাইতে হয়। শিলাঙ্গী বিঘাওয়ের নিকটও আলাপ জমাইতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে পলাইয়া আসিতে হইল। বিঘাও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শিলাঙ্গী আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"ও বিঘাও নয়, বাঘ। এখনই আমাকে খাইয়া ফেলিত। চল আমার দুধুনী মধুনীকে দেখিয়া আসি—"

"চল"

...যে ঝোপে শিলাঙ্গীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই ঝোপের ভিতর আমরা দুইজন সেই গাছের উপরই পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। দুধুনী মধুনীর দেখা পাওয়া যায় নাই। দুধুনী মধুনী এ ঝোপটিতে প্রায়ই না কি আসিয়া ঢোকে, তাই আমরা আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। নিনানির কথা হইতেছিল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"আমি স্পষ্ট দেখিলাম নিনানি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া আমাদের দেখিতেছে। সত্যই কি নিনানি মরিয়া গিয়াছে? আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কিন্তু সে গেল কোথা? যক্ষিণীও নাই"

"খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ঝোনঝিরাও উলম্ভনের নিকট হইতে এখনও ফিরিল না কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এক হিসাবে অবশ্য ভালই হইয়াছে, ঝোনঝিরা থাকিলে নির্বিঘ্নে বিবাহ হইত না, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট বাধাইত সে"।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঝোনঝিরার মৃত্যুসংবাদটা তাহাকে দিতে পারিলাম না। একটা শাখা আমার চোখের সম্মুখে বাতাসে দুলিতেছিল। মনে হইল সে যেন দুলিয়া নীরব ভাষায় আমাকে বলিতেছে—"এই কি তোমার বন্ধুর মতো আচরণ? প্রথম দিন হইতেই কপটতার আশ্রয় লইলে!" সহসা আর একটা কথা মনে হওয়াতে ভীত হইয়া পড়িলাম। ঝোনঝিরার প্রেতাত্মা আসিয়া ওই শাখাটা আশ্রয় করে নাই তো? ওই শাখাটাই এত বেশী দুলিতেছে কেন? শিলাঙ্গীর দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্তে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়, অধরে স্মিত মৃদু হাসি। আমি নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে আকস্মিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম তাহা যেন আকস্মিকভাবেই অপনোদিত হইল। মনে হইল শিলাঙ্গী যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার নির্নিমেষ দৃষ্টির আকর্ষণেই শিলাঙ্গী যেন মুখ ফিরাইল, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ"?

"তোমাকে"

শিলাঙ্গীও আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, "জংলা, বল, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে তো?"

"থাকিব"।

কম্পমান শাখাটা দেখিলাম নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে। আমি নির্ভয় হইলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ভয় নূতন মূর্তিতে দেখা দিল আবার। আকাশ হইতে উড়িয়া আসিল। একটা সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পর দেখিলাম পঞ্চ পর্বতের শিখর অতিক্রম করিয়া একটা মেঘ দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনে হইল ঝড় আসিতেছে না কি?

"পঙ্গপাল, পঙ্গপাল—"

শিলাঙ্গী আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"চল, বাড়ি যাই, চল, চল, পঙ্গপাল বড় ভয়ানক পতঙ্গ"

...ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আমরা যখন উলগা পর্বত হইতে নামিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া বসিয়াছে। ধবল, মীংরা উন্মাদের মতো চীৎকার করিতেছে—"মার, মার, নিঃশেষে কর"। আমাদের দলের সকলে—এমন কি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত—পঙ্গপাল নিধনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিঘাও দেখিলাম জীবন্ত পঙ্গপাল মুখে পুরিয়া চর্বণ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া বিঘাও দন্ত বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, "কানা এইবার প্রতিশোধ লইতেছে। দেখা যাক কতক্ষণে তাহার রাগ কমে। তোমরা দাঁড়াইয়া আছ কেন? এক একটাকে ধর আর খাও——"

...আমাদের সমস্ত তৃণশস্য নিঃশেষে করিয়া পঙ্গপালের দল উড়িয়া গেল। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে হয়তো নিধন করিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা

সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের তৃণশস্যগুলি বাঁচাইতে পারিলাম না। সমস্ত মাঠ শূন্য হইয়া গেল। নিম্ব সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা কন্যা নদীর তীরে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতেছিল। ধবল বলিতেছিল, "এবার আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কন্যা আমাদের উপর বিরূপ হইয়াছে। জমি আর তেমন শস্য দিতেছে না। এবার একে শস্য কম হইয়াছিল তাহার উপর পঙ্গপাল আসিল। কোন পাপে নিম্বদেবতা আমাদের এ শাস্তি দিল? বিঘাও বলিতেছে কানা প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু কানার ক্রোধেরই বা হেতু কি? আমি তো কোনও অপরাধ করি নাই। তোমরা কেহ যদি কোনও পাপ কোনও মিথ্যাচরণ করিয়া থাক, বল, অকপটে স্বীকার কর। আমাদের জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কেহ কপটতার আশ্রয় লইও না। যদি কেহ কিছু করিয়া থাক স্বীকার করিতে ভয় পাইও না, আমি তাহার হইয়া কানার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব, আমি নিজে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। কেহ যদি কিছু করিয়া থাক, স্বীকার কর—"। কেহ কোনও উত্তর দিল না। কেবল বিঘাওয়ের অট্টহাস্যে সান্ধ্য অন্ধকার প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মীংরা ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার আমরা ভবিষ্যতে কি করিব তাহাই স্থির করা প্রয়োজন। আমি কাল প্রভাতেই উঠিয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। তৎপূর্বে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহা তোমাকে বলিয়া যাইতে চাই। নাঙ্গা নদীর তীরে নকুল সম্প্রদায়েরা বাস করে। তাহাদের ক্ষেত্রগুলি যখন শস্য দান করিতে পরাঙ্মুখ হইল তখন এক অভিনব উপায়ে নকুল-দলপতি ডোডো ক্ষেত্রগুলিকে পুনরায় উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল। ধবল, সে উপায় আমি তোমাকে বলিয়া যাইব। তুমি বিচলিত হইও না, আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন চল আমরা নিজ নিজ কুটিরে যাই। কন্যা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া এমনভাবে সকলে যদি হাহাকার করি কন্যার শান্তি বিঘ্নিত হইবে, তাহাতে আমাদের আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

মীংরার কথা শুনিয়া আমরা সকলে নিজ নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিল। আর একটু পরে সে অন্ধকার জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইল। সে আলোক কিন্তু আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না। একটা নামহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমরা মুহ্যমান হইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমিই যেন সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দায়ী। আমার কপটতা, আমার মিথ্যা আচরণ, আমার শঠতাই আমাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যেদিন হইতে আমি শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছি সেইদিন হইতেই আমি সরলতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমনকি যে নিনানির মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া আমি ধবলের সহিত প্রতারণা করিয়াছিলাম সেই নিনানির সহিতও আমি সরল ব্যবহার করি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাহাকে বলিবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহাকে ক্রমাগত

মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

...গভীর রাত্রি। কেন জানি না সহসা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক নীরব। কেবল বহুদূরে একটা টিট্টিভ পক্ষী চীৎকার করিতেছিল। আর কোথাও কোন শব্দ ছিল না। মনে হইল টিট্টিভের অশ্রান্ত চীৎকার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, একটা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমাকে যেন সাবধান করিতেছে। কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া সেই দূরাগত চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী পাশেই শুইয়া ঘুমাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে জাগাই কিন্তু কি মনে করিয়া আর জাগাইলাম না। টিট্টিভ ক্রমাগত বলিতে লাগিল—কি-যে-করিস্, কি-যে-করিস্, কি-যে-করিস্। মনে হইল সে যেন আমাকে বলিতেছে ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিস, বাহিরে আসিয়া দেখ কি হইতেছে। তবু আরও খানিক-ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে পাখীর ডাকটা আমাকে যেন পাইয়া বসিল। সম্মোহিত হইয়া আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী একা শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

...কন্যা নদীর তীরে সেদিন অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন জীবন্ত। মনে হইতেছিল কোন যাদুকরী যেন সম্মোহন মন্ত্র-বলে সকলের নয়নপল্লবে কাল-নিদ্রা বিছাইয়া দিয়া সঙ্গোপনে নিগূঢ় কিছু করিতেছে। টিট্টিভ পক্ষীটা যেন সে কথা জানে, তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে। চতুর্দিক রহস্যে পরিপূর্ণ। আমি আমাদের শস্যশূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল ধর্ষিতা নারীর মতো সে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন নীরব ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিল—"আমার এ দুর্দশা কেন হইয়াছে জান? শিলাঙ্গীর জন্য। ধবলই ঠিক বলিয়াছিল, তৃণভোজী গরুরা আমাদের শত্রু, সেই গরু যাহারা পালন করে তাহারা কখনও আমাদের মঙ্গল করিতে পারে না। শিলাঙ্গী এখানে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাই পঙ্গপালের দল আসিয়া আমাদের লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী অপয়া, শিলাঙ্গী অলক্ষ্মী, শিলাঙ্গী ছদ্মবেশিনী প্রেতিনী। তুমি এখনও সাবধান হও। তুমি নিম্ব সম্প্র-দায়ের সমর্থ যুবক, ভবিষ্যতে হয়তো তুমিই দলপতি হইবে, তুমি সামান্য একটা নারীর জন্য সকলের স্বার্থকে বিনষ্ট করিও না। যে অত্যাচার আমরা সহ্য করিলাম তোমার নিকট তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি। এ অপ-মানের প্রতিশোধ চাই।"

...ঘিসু এবং ভংগার স্ত্রীরাও বলিয়াছিল 'প্রতিশোধ চাই'। তাহাদেরই সরব দাবী যেন জ্যোৎস্নালোকে নীরব ভাষায় আমার অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইলাম দূরে নিম্ববৃক্ষতলে কাহারা যেন বসিয়া আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। নিম্ব বৃক্ষটির ঠিক পশ্চাতেই একটি ঘন ঝোপ ছিল। ঠিক করিলাম সেই ঘন ঝোপের ভিতর হইতে প্রথমে দেখিব কাহারা বসিয়া আছে, তাহার পর যদি প্রয়োজন মনে করি আত্মপ্রকাশ করিব। সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম এবং সরী-সৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া ঘন ঝোপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টিট্টিভ অবিচ্ছিন্ন সুরে বলিতে লাগিল—'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস', কি-যে-করিস'। স্বপ্নের ঘোরেই আমি সরীসৃপের মতো সেই ঝোপের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে যেন এক নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোর বেশী-ক্ষণ কিন্তু রহিল না।

...নিম্ববৃক্ষতলে ধবল, মীংরা এবং বিঘাও বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ধবলের যে কথাগুলি আমার কর্ণগোচর হইল তাহা এতই ভীতিকর যে, ঝোপের মধ্যে একা বসিয়া থাকাই শেষপর্যন্ত আমার পক্ষে শক্ত হইল। ধবল বলিতেছিল—"আমি একটু আগে স্বচক্ষে আবার নিনানির প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহার কথা শুনিয়াছি। নিনানি বলিল 'শিলাঙ্গীকে তোমরা যদি অবিলম্বে দূর করিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের আরও বিপদ হইবে। শিলাঙ্গী মানবী নয় রাক্ষসী।"

বিঘাও বলিল, "সাধারণ মানবী যে নয় তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি"

কি প্রমাণ?

"তা এখন বলিব না"

"কিন্তু কি করিয়া এখন উহার কবল হইতে আমরা উদ্ধার পাই তাহা বল"

মীংরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এইবার কথা বলিল। সে বলিল, "তোমার ক্ষেত্রের উৎ-পাদিকা শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা তো তোমাকে বলিয়াছি। শিলাঙ্গীকে তুমি ব্যবহার করিতে পার!"

"তাহা তো পারি। কিন্তু সে কথা শিলাঙ্গীকে বলিব কি করিয়া?"

"শিলাঙ্গীকে পৃথক করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাল সকালে ঘোষণা করিয়া দাও যে কন্যানদীর কলকলধ্বনিতে তুমি কর্তব্যের নির্দেশ পাইয়াছ। তুমি আমাকে যাহা বলিতেছিলে সকলকে তাহাই বল। বল কন্যা বলিতেছে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। উপর্যুপরি শস্য দান করিয়া জমি ক্লান্ত ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়াছে। নর-রক্ত না দিলে সে তৃপ্ত হইবে না, সঞ্জীবিত হইবে না। তাহার পর, তুমি ঘোষণা কর যে মীংরা যে ভূতটি আমাকে দিয়া গিয়াছে সেই ভূতটির উপরই আমি নির্বাচনের ভার দিলাম। সেই ঠিক করিবে কাহার রক্ত আমরা ভূমিতে সেচন করিব। তাহার পর গভীর রাত্রে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে তখন যে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠ-খণ্ডটি তোমাকে উপহার দিয়াছি সেইটি মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিলাঙ্গীর কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিবে"।

ধবল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"জংলা যদি বাধা দেয়"।

"জংলাকেও হত্যা করিবে—সঙ্গে অস্ত্র লইয়া যাইও। নিমাওকে সঙ্গে রাখিও"।

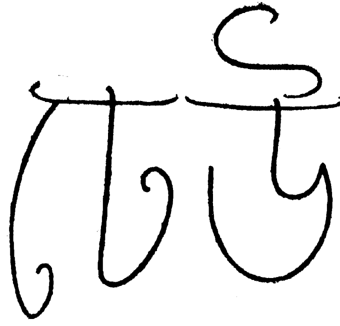
নিমাও বলিল, "জংলাকে হত্যা করিতে আমার আপত্তি নাই। আমার ধারণা জংলাই নিনানির মৃত্যুর কারণ। নারত এইজন্যই তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত"

একথা শোনার পর আমি আর সেই ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পৃষ্ঠে যেন কাহার স্পর্শ অনুভব করিলাম, মনে হইল অশরীরী নিনানি আমাকে যেন উহাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া নিনানিকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলাম তাহাতেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটি গাছের চারার পত্র-পল্লবের মধ্যে দুইটি ছোট ছোট ফাঁক ছিল। তাহার ভিতর জ্যোৎস্না প্রবেশ করাতে মনে হইতেছিল যেন দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে, একপায়ে দাঁড়াইয়া কোনও প্রেতিনী ঝুঁকিয়া যেন আমাকে নির্নিমেষে দেখিতেছে। আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুকে ভর দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। কিছুদূরে গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিতে লাগিলাম। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গীর কথা আর মনে রহিল না, তাহার নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম সে কথাও আর মনে রহিল না।

...উয়গা পর্বতের যে গুহায় যক্ষিনী থাকিত সেই গুহায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল মরাল সাপের মূর্তি ধরিয়া মৃত্যু বুঝি অতর্কিতে পিছন হইতে আসিয়া আক্রমণ করিবে। গুহার ভিতর খস খস শব্দ শুনিয়া বার বার ছুটিয়া বাহির হইয়াও আসিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গুহায় প্রবেশ করিতে হইতেছিল, ভয় হইতেছিল বাহিরে কেহ যদি আমাকে দেখিতে পায়। অনাবিল জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে আলোকে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। গুহার অন্ধকারেও আমি স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আলোক অন্ধকার উভয়ই আমার নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আমি খস খস শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, আবার একটু পরেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি এইরূপ ছুটাছুটি করিয়াই কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে গুহার ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা সমবেত একটা কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বুঝিতে পারিলাম, মানুষ নয়, পাখী ডাকিতেছে। লক্ষ লক্ষ পক্ষীর প্রভাতী কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গুহার ভিতর আবার খসখস শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া এইবার দেখিতে পাইলাম সর্প নয়—শশক। অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর দেখিতে পাইলাম আগড়টা। ঠিক নীচেই পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া সেটাকে তুলিয়া আনিয়া গুহামুখে লাগাইয়া ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। ভয় কিন্তু মানুষকে কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। মনে হইল আগড়ে ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়া কেহ হয়তো আমাকে দেখিতে পাইবে, ফাঁক দিয়া সাপও ঢুকিতে পারে। আবার বাহির হইলাম, গাছের ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আগড়ের ফাঁক বন্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলাম। আমার মধ্যে যে ভীত পশুটা আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকক্ষণ সে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না যতক্ষণ না সে নিরাপদ হইয়া বসিল। তুষার যুগে যে পশু আত্মরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গিনীকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছিল, সে পশু আমার মধ্যে তখনও বাঁচিয়া ছিল। আমার মানসপটে শিলাঙ্গীর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল তাহাতে বহুকাল বিস্মৃত আমার সেই অন্ধ সঙ্গিনীর আর্ত আকুলতাও নিশ্চয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অনুভব করিতেও পারি নাই। বরঞ্চ ইহাই আমার মনে হইতেছিল যে, শিলাঙ্গী কোনও মোহিনী প্রেতিনী, আমাকে মুগ্ধ করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছে। মনে হইতেছিল তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার পর হইতেই যেন আমাদের সমাজে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। ইহাও মনে পড়িল প্রথম দিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে সেইদিনই আমার মৃত্যু হইত। মনে হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সাধারণ অস্ত্র দিয়া সহজে আমাকে কাবু করা যাইবে না, তাই সে মোহিনী অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে নিধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ধবল বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক, সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, যাহাদের গরু পালন করাই ধর্ম তৃণ-পালকদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইতে পারে না। আর একটা কথা মনে হওয়াতে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, শিলাঙ্গী নিশ্চয়ই প্রেতিনী। সাধারণত যুবকেরাই যুবতীদের প্রণয় কামনা করিয়া তাহাদের খোশামোদ করে, যুবতীরা তাহাদের এই প্রচেষ্টায় হয় বাধা দেয়, না হয় বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু শিলাঙ্গী ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছে। সে নিজেই যাচিয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে। আমার সহিত কি উপায়ে তাহার বিবাহ হইতে পারে তাহা আমি আবিষ্কার করি নাই, শিলাঙ্গীই করিয়াছে। কাঙালিনীর মতো সে বারম্বার আমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছে। মনে হইল ইহা সাধারণ যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়, ইহা ঠিক প্রেতিনীর কারসাজি। নিনানিকেও হয়তো ওই প্রেতিনী কোনও অচিন্ত্যপূর্ব উপায়ে নিধন করিয়াছে। এইভাবে নির্জন গুহায় বসিয়া পলাতক কাপুরুষ আমি আমার ভীরুতার সমর্থনে নানা যুক্তির জাল বয়ন করিতে লাগিলাম, মনে হইল আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই। সেই অসভ্য প্রস্তর যুগে আমি যাহা করিয়াছিলাম আজও তোমাদের মধ্যে অনেকে কি তাহাই করিতেছ না? ভীরুতার সহিত অহমিকা যুক্ত হইয়া আজও কি তোমাদের পথভ্রান্ত করিতেছে না? যে নারী সভ্যতার জননী, যাহাকে ঘিরিয়া পুরুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা যুগে যুগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রেমে মানবজীবন ধন্য, মানব সভ্যতা পুষ্ট সেই নারীকে সম্যকরূপে চিনিবার শক্তি আমার তখন ছিল না আজও তোমাদের অনেকের নাই। আজ কিন্তু আমি জানিয়াছি নারীই শক্তি। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় নিজেদের সমর্পণ করিয়াও নারীরা যুগে যুগে মানবের অগ্রগতির পথ আলোকিত করিয়াছে। পুরুষেরা যাহা কিছু করিয়াছে নারীর জন্যই করিয়াছে। তাহার উৎসাহ, তাহার প্রেরণা, তাহার প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে নারী-প্রেমেই। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় বারম্বার পুড়িয়া ওই নারীরাই অবশেষে পুরুষদের ভোগের কবল হইতেও উদ্ধার করিয়াছে। নারীর সহায়তা না পাইলে পুরুষেরা নিরাসক্ত হইতেও পারিত না। যাঁহারা শক্তিকে নারীরূপে পূজা করিয়াছেন তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু আমার এ জ্ঞান তখনও হয় নাই, তাই আমি জোলমাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারি নাই।

(আগামীবারে সমাপ্য)





সুশীল রায়

দূর দিগন্তে হারিয়ে গেছে জল আর আকাশ। কোথায় জলের শেষ আর আকাশের আরম্ভ, কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু তার সন্ধান বলে দিল বিকালের সূর্যটা।

সূর্য তো নয়, আগুনের একটা গোলা। পশ্চিম আকাশের দিকে হেলে নামতে নামতে যেখানটায় সে তলিয়ে গেল, সেইখানেই তবে আছে নিশ্চয় একটা ফাঁক। ওইটেই তবে এই সমুদ্রের দিগন্ত।

উঁচু পাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। চিকচিকে জলের ওপর আবির গুলে দিয়ে ধীরে ধীরে সে নেমে গেল দূরে সমুদ্রের ওই কিনার ঘেঁষে। এই দৃশ্য দেখে অনেকে মুগ্ধ হয়, শুনেছি। কেন মুগ্ধ হয়, তাই খুঁজতে লাগলাম। ইচ্ছে করে হয়, না, আপনিই মুগ্ধ হয়ে যায়, জানিনে অবশ্য। মুগ্ধ হওয়াটা হয়ত নিয়ম, সেই জন্যেই হয়। এই নিয়ম মানার আগ্রহ কম ছিল না, এবং হয়তো মুগ্ধ হয়েও যেতাম। কিন্তু সূর্যের ওই হোলি-খেলাটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারছিলাম না কিছুতে। রূপ হয়তো আছে ওর, আগুনের গোলা বলেই তাকে অবজ্ঞা করা শোভা পায় না। সেই রূপটা পরখ করার জন্যে ওই রূপের সাগরে ডুব তো দিতে হবে। অথচ কিছুতে ডুব দেওয়া ঘটে উঠল না। অনবরত বিরক্ত করতে লাগল ওরা—ওই ঢেউয়েরা।

ওরা কি বলতে চায় তার এক বর্ণ বোঝা গেল না। কিসের খুশিতে তারা এমন আত্মহারা, তাও বুঝতে পারলাম না। ওদের পিছনে ওই যে রঙের সুষমা ঢেলে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা ডুবতে চলেছে, ঘাড় ফিরিয়ে একবারও তারা চেয়ে দেখছে না সে দিকে। এত বড় একটা সৌন্দর্য উপেক্ষা করে তারা হাসছে কিসের আনন্দে, ভেবে পাওয়া গেল না।

ছোট বড় মাঝারি নানা জাতের ঢেউ, তাদের বয়সেরও হয়তো কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু চালচলনে, হাসিতে ফুর্তিতে তারা যেন সব শিশু। পিছনের দিগন্তকে অবহেলা করে তারা নির্বিবাদে শুকনো বালু নিয়েই মেতে আছে। তারা সমুদ্রের ওই জল থেকে ফুর্তি আহরণ করে নিয়ে এসে বালুর বুকের ওপর তা ঢেলে দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে একে একে।

ওরা উচ্চকিত করে তুলেছে সমুদ্রকে। কলরব পড়ে গেছে ওদের মধ্যে। অনেকটা কাড়াকাড়ি বলেই যেন বোধ হয়। সকলের মধ্যেই আগে যাবার তাড়া।

ঢেউয়েদের এই ফুর্তির মহোৎসব দেখতে গিয়ে দূরের সূর্যাস্তটাকে উপেক্ষাই করলাম। কিন্তু এতে লোকসান বোধ হল না এতটুকু। স্পষ্ট দেখলাম, ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে যেতে লাগল ঢেউয়েরা। পাড়ে এসে আছাড় খেয়ে প'ড়ে ওরা লীন হয়ে যেতে লাগল একে একে। আর সেই অদম্য খুশির ছাপ এঁকে দিতে লাগল বালুর উপর।

এই দৃশ্যটাকে উপেক্ষা করে ওই আগুনের গোলার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। ওই ঢেউয়েদের খুশির উৎপাতে বিরক্ত হতে লাগলাম। এ ভাবে বিরক্ত হতে ভালোই লাগতে লাগল।

মুঠোর মধ্যে ধরে কয়েকটা ঢেউকে যদি কুড়িয়ে আনা যেত সেই সমুদ্রের উপকূল থেকে, তা হলে তারা জীবনের মনোরম সঙ্গী হয়েই হয়তো থাকত। কিন্তু হাসি আর উল্লাসই যাদের জীবনের সম্পদ, তারা এমন ধরা দেবে বলে তো বোধ হয় না। তারা উন্মুক্ত ও উদার আকাশব্যাপী জীবনই হয়তো পছন্দ করে বেশি।

হাতের মুঠোর মধ্যে বা কোটের পকেটে ফুর্তি বয়ে বেড়ানো যায় কি না, ভাবলাম। তা যদি যেত তা হলে নিজেদের সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে নিতে হয়তো বেগ পেতে হত না আমাদের। মন-মেজাজ পাঁচ-সাত রকম হয়ে গেলে পকেট থেকে তা হলে বের করে নেওয়া যেত হয়তো আনন্দের এই জীয়ন্ত এমনি দু-চারটি তরঙ্গকে। কিন্তু উদার আকাশ যাদের সঞ্চরণের চন্দ্রাতপ, বিশাল সমুদ্র যাদের বিচরণের লীলভূমি, তারা সংকীর্ণ পকেটে ঢুকে কতটা পরিতৃপ্ত হবে তাই ভাবি। পরীক্ষা করে না দেখেছি, এমন নয়। সবচেয়ে ফুর্তিবাজ যে ঢেউটা, এমনি একটা বাছাই করে তার কাছে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম একদিন। তাকে ধরেই হাতের মুঠ খুলে দেখি এক নিমেষে নিস্তব্ধ জল হয়ে গেছে। তাতে নেই কোনো আনন্দ, নেই কোনো উল্লাস, নেই কোনো খুশির ফোয়ারা। একটা নির্জীব তরল পদার্থ হয়ে গেছে সেই উচ্ছল ঢেউ।

এও তো সমুদ্র, জলের না হোক মানুষের তো বটে—এই যেখানে ফিরে এসেছি সেই সমুদ্রতট থেকে। জলের না হোক জনের এই সমুদ্র দেখে মনে হল পাব বুঝি দু-চারটে ঢেউ। এটা দুরাশা কেন হবে তাই ভাবছিলাম। কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও কোনো ঢেউ খুঁজে পেলাম না। আশ্চর্যই বোধ হল। জলের কণিকারা যেমন একসঙ্গে দল বেঁধে আনন্দে উতরোল হয়ে উঠতে পারে, এখানে তেমন কেউ পারবে না কেন।

হয়তো পারবে। কিন্তু তার আগে এর হয়তো প্রয়োজন একটা সুদূর-প্রসারী দিগন্তের। দিগন্তদের আড়াল করে এর চারধারে যে কাঠ আর কোঠার সমাবেশ হয়েছে, তাদের তা হলে বুঝি সরিয়ে ফেলতে হবে। সকালে সোনার গোলক ও সন্ধ্যের আগুনের গোলা যদি দেখতে এ না পায় তা হলে এরা নাকি হাসবে না কিছুতে। হয়তো সেই গোলা আর গোলকের দিকে ফিরেও চাইবে না কেউ, কিন্তু দুপাশে দুবেলা তাদের থাকা চাই নাকি। হবেও—বা।

এখানে সব ঢেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে। হাতের মুঠির মধ্যে ঢেউ যেমন নির্জীব ও নিস্তেজ দেখেছি, এখানে সবাই যেন অবিকল তাই।

কিন্তু তবু যে এরা ঢেউ, সে কথা ভোলা যায় না। মহাসমুদ্রের মাঝখানে চৌকো একটা চৌবাচ্চা বসিয়ে দিলে সেই চৌহদ্দি দিয়ে বাঁধা জলের ঢেউয়েরাও নাকি সব অনড় ও অচল হয়ে যাবে এক নিমেষে। এটা হয়তো অনুমানের কথা। কেউ এমন পরীক্ষা করে দেখেছে কি না, আমি জানিনে। নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি যে, এমন পরীক্ষা করে আমি দেখিনি কখনো। এই জন-সমুদ্রটা নাকি আসল সমুদ্র নয়, তাই তার চেহারা এমন নীরব আর নির্জীব, এমন নিস্তেজ আর অসহায়। এ নাকি বিরাট সমুদ্রের একটা অংশ—এটা নাকি একটা চৌবাচ্চা। তাই এর বাঁধনে বাঁধা এলাকায় কোনো তরঙ্গ নেই, বা কোনো আনন্দ নেই, কোনো উল্লাস নেই। তাই নাকি এখানে সকলে এমন নিষ্প্রাণ এবং বিষণ্ণ।

যদি ভেঙে দেওয়া যায় এর চারটি প্রাচীর, যদি মিশিয়ে দেওয়া যায় একে মহাসমুদ্রের সঙ্গে তাহলে এই বদ্ধ জলের বুকেও নাকি উল্লাসের ঢেউ জেগে উঠবে। এদের ছোট বড় মাঝারিরাও নাকি একই নৃত্যে উদ্দাম হয়ে উঠবে।

নগরের রাজপথে দাঁড়িয়ে জনস্রোত দেখি, কিন্তু কোনো ঢেউ কিছুতে খুঁজে পাইনে। দৃষ্টি যেদিক দিয়ে গেলে সূর্যাস্তটা দেখা যেত, সেখানে বিরাট একটা অট্টালিকা দম্ভের মূর্তি-রূপে দাঁড়িয়ে আছে। সকালে প্রথম আলো যেখান দিয়ে এখানে এসে পৌঁছবার কথা, চেয়ে দেখি, সেখানে রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া উঠছে।

কিন্তু স্রোত বয়ে যায়, এ-স্রোতে বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। কোনো সহজ স্বাভাবিক স্রোত বলে ঠেকে না একে। যেন আলকাৎরার বন্যা বয়ে চলেছে। সে বন্যায় ঢেউ কখনো জাগে না, জাগতে পারে না। সে কেবল অনন্ত

নাগের মত হামাগুড়ি দিয়ে নিস্তরঙ্গ বয়ে যেতেই পারে।

কিনারে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে থাকি। যদি দৈবাৎ একটা ছোট ঢেউও ভুল করে লাফিয়ে ওঠে, ভুল করে ফূর্তির ফোয়ারা ছিটিয়ে দেয়। হয়তো তার সে ফূর্তিটা নিঃশেষ হয়ে যাবে এক নিমিষেই, যাক। তাতে ক্ষতি নেই। কিনারে হয়তো সেই ক্ষণিক আনন্দের ছাপ সে এঁকে যেতে পারবে। এই জন-সমুদ্রের তটে তেমন একটা রেখাও যদি চিহ্নিত হয়, তাহলে এ নগরের জীবনে আশীর্বাদ এসেছে মনে করা যাবে। কিন্তু না, বিরাট সরীসৃপের মত মসৃণ-গতিতে একটানা বয়ে গেল স্রোত, একটা তরঙ্গও উঁকি দিয়ে পৃথিবীটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করল না।

কবে কোন সুযোগে রঙিন সূর্যাস্তের এপারে দেখেছিলাম, অগণিত ঢেউয়ের মিছিল, সেই দেখাটা চোখ থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না কিছুতে। অফুরন্ত ফূর্তির আবেগ বয়ে ফেনার দন্ত বিকশিত করে তারা তেড়ে এসেছিল তটকে। তটের সঙ্গে সে তাদের বৈরিতা নয়, সে তাদের আনন্দ নিবেদনের প্রশস্ত বেদি যেন। তারা নিবেদন করেই নিজেদের ফুরিয়ে ফেলেছে। নিজেদের নিঃশেষ করাতেই এত আনন্দ তারা পেলো কোথা থেকে তাই ভেবে পাচ্ছিনে।

অগণিত চাইনে, আঙুলে গোণা যায় এমনি গুটিকতক ঢেউও যদি পাওয়া যেত এখানে, আমাদের এই জন-সমুদ্রের মাঝখানে—তাহলে এই সমুদ্রটা হয়তো সার্থক হয়ে যেত। তাহলে সেই জন-রত্নাকরকে মন্থন করার জন্যে উৎসাহ হয়তো-বা পাওয়া যেত কিছুটা।

শুনতে বেয়াড়া বোধ হতে পারে, কিন্তু স্রোতের চেয়ে ভালো লাগে আমার ঢেউ। কেবল গতি নিয়ে ধন্য হতে লোভ হয় না, লোভ হয় প্রাণ-চাঞ্চল্যের সঙ্গে খুশির ঝরণাকে পেতে। যে কিনারের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ব, সেই কিনার যেন আঘাতে আহত না হয়, তার কোমর ঘিরে যেন জেগে ওঠে ঢেউয়েরই মেখলা।

সূর্যাস্ত দেখে যার মনে কোনো তৃপ্তির আস্বাদ লাগে না, তার এতটা তরঙ্গ-প্রীতি কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানিনে, সূর্যোদয় দেখেও মন এতটা পরিতৃপ্ত হয় না। সোনালী আলোর বন্যা তখন দেখিনে, মনে হয় আলোর তরঙ্গরা যেন আকাশের ওপর আনন্দে আছাড় খেয়ে পড়ছে—সারা আকাশ যেন মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে রোদের আলপনায়। আলোর প্লাবনে পৃথিবীকে আলোকিত পুলকিত করে দেওয়াটা সামান্য কাজ বলে ভাবিনে অবশ্য; কিন্তু তবু মনে হয় ওটা আলোর তরঙ্গরাই যেন করেছে—আলোরা নয়।

কোনো দাগ কি আঁকতে পেরেছে কোনো আলো? কোনো শব্দ কি রেখাঙ্কন করে রেখে যেতে পেরেছে কোনো শব্দ-পটকে? যদি পেরে থাকে তাহলে তাদের ঢেউয়েরা এসেই সে কাজ তাদের হয়ে করে দিয়ে গেছে। এতে কারো দ্বিমত আছে বলে তো আমার বোধ হয় না।

তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি অনবরত। মণি নয়, মাণিক্য নয়, আলো নয়, হাওয়া নয়;—খুঁজছি ঢেউ। যদি কোন খুশি দিয়ে কোনো দাগ এঁকে রেখে যাওয়া যায় কোথাও। যদি নিজের মনের তীব্র হাসিটাকে আলপনার মত ফেলে রেখে যাওয়া যায় কোনো অঙ্গনকে উজ্জ্বল করে দিয়ে।

এমন ঢেউ হয়তো আছে আমাদেরি মধ্যে; হয়তো আছে আমাদের আশে-পাশে, আমাদেরই অতি নিকট আত্মীয় হয়ে। কিন্তু তারা কোথায়, তা যে খুঁজে বার করা দরকার।

কত ঢেউ হয়তো উঠি-উঠি ফুটি-ফুটি করতে করতেই তার সব শক্তি নিঃশেষ করে কিনারে এসে পৌছবার আগেই ডুবে গেছে মহাসমুদ্রের বুকের মধ্যে। সেই সমাধি খুঁড়ে যদি তাদের দু-চার জনকেও তুলে আনা যায় তাহলে তাদের প্রাণের স্তিমিত হাসির সঞ্চয় দিয়েই জাগিয়ে তুলতে পারা যায় হয়তো এই পৃথিবীকে।

কত অখ্যাত আর অজ্ঞাত ঢেউ যে লুকিয়ে আছে এখানে তার ইয়ত্তা হয়তো নেই। তাদের আনন্দের দাগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে আমরা আলো-ঝলমল মুমূর্ষু সূর্যের চিতাগ্নি দেখেই মুগ্ধ হয়ে বসে আছি। এটা কম আক্ষেপের বিষয় নয়।

চোখের পিপাসাটা এত বড় করে দেখা হয় কেন, এই আমার জিজ্ঞাসা।

ইন্দ্রজিতের আসর

আমার একটি বন্ধু সম্প্রতি আমাকে খুব জব্দ করেছেন। আপনাদের হয়তো মনে আছে কিছুদিন পূর্বে আমি গৃহপালিত পশুপক্ষী সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করেছিলাম। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন অনেক বিষয়েই আমার মতামত অত্যন্ত একপেশে ধরণের, কাজেই পাঠকদের সঙ্গে মতান্তর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সব কিছুতে আপনাদের সঙ্গে আমার মতের যদি হুবহু মিল থাকত তাহলে আমার এই সব লেখা পড়ে আপনারা একটুও আরাম পেতেন না। বলতেন, এতো জানা কথাই, নতুন কথা আর কি হল? পদে পদে মতান্তরের সম্ভাবনা থাকলে তবেই লেখা পড়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়, আর কিছু না হোক একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই কারণে নতুন কথা বলবার জন্য আমাকে কখনো মিথ্যে কথা, কখনো উদ্ভট কথা বানিয়ে বলতে হয়; কিন্তু তাই বলে সবাইকে নতুন কথা শোনাতে পারব, এমন কখনো মনে করিনে। জানি, আপনাদের মধ্যে অনেকে আমার চাইতেও সেয়ানা অর্থাৎ মিথ্যে এবং উদ্ভটের কল্পনায় বুদ্ধিমান পাঠকরা আমার চাইতে ঢের বেশি ওস্তাদ। যাই হোক গৃহপালিত জীবজন্তু সম্বন্ধে আমি যে সব কথা বলেছিলাম সে সব কথা আমার বন্ধুটির মনঃপূত হয়নি। তিনি নিজে পশুপক্ষী ভালোবাসেন। সম্প্রতি তিনি পশুপক্ষীদের কাহিনী নিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য একখানি অতি মনোরম বই লিখেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর যে মতান্তর তাই নিয়ে তিনি অনায়াসেই দেশ পত্রিকার ঠিকানায় আমার নামে পত্র প্রেরণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি রসিক ব্যক্তি। চিঠি না পাঠিয়ে তাঁর বই-এর এক খন্ড তিনি আমার ছেলেমেয়েদের নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর সে বই-এর উপহার পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছেন—পৈত্রিক প্রভাব কাটিয়ে পশুপক্ষীদের একটু ভালোবাসতে শিখবে, এই আশায়—।

আমি তাঁর এই সরস ইঙ্গিতটি সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করেছি। শুধু এই ব্যাপারে নয়, আরো অনেক ব্যাপারে পৈত্রিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলে আমার ছেলেমেয়েদের অশেষ কল্যাণ হবে। বন্ধুবর জেনে খুশি হবেন যে, তাঁর বই পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি এবং কতক কতক অংশ নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়ে শুনিয়েছি। জীবজগতের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রধানত বই-এর মারফতে। জ্যান্ত পশু পাখী আমার ভালো লাগে না, একথা সত্য। কিন্তু বই-এর পাতায় তাদের গল্প পড়তে আমার ভালোই লাগে। লেখা পড়ার এমনি গুণ পুঁথির পাতায় প্রবেশ করলে এরাও অনেকখানি ভদ্র হয়ে উঠে। ধরুন জেরোম কে জেরোম্ এর লেখা Three men in a boat নামক পুস্তকে তিন বন্ধুর গল্পে যে চতুর্থ সঙ্গীটির উল্লেখ আছে তাকে ভাবে ভঙ্গীতে আচারে-ব্যবহারে এমন উচ্চ শ্রেণীর জীব তৈরী করা হয়েছে যে, তাকে কুকুর বলে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। মনে আছে কলেজে পড়বার সময়ে আমার একটি সহপাঠি বন্ধু খুব গম্ভীর ভাবে আমাকে বলেছিলেন যে, ঐ চতুর্থ ব্যক্তিটির চরিত্র তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, তাঁর উক্তি শুনে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়েছিল। অবশ্য বই-এর মলাটে গ্রন্থের নামের সঙ্গেই ব্র্যাকেটএ লেখা রয়েছে—to say nothing of the dog—এই dogটিই 'চতুর্থ ব্যক্তি'।

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে স্বয়ং ধর্ম কুকুরের রূপ ধারণ করেছেন। কুকুরকে এত বড় সম্মান আর কোনো সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি। গ্রীক পুরাণের Cerberus নামক কুকুর যমরাজের দ্বার রক্ষক, ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ কুকুরের সমাদর হয়েছে ওসব দেশেই। আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে স্বয়ং ধর্মও কুকুরটাকে জাতে তুলতে পারেননি। ও বেচারী অন্ত্যজ হয়েই আছে। আমাদের দেশে কুকুরের সমাদর হালের আমদানী একথা আমি ওবারেই উল্লেখ করেছিলাম। ঐতিহাসিক হিরোডটাস বলেছেন পাশ্চাত্যরা কুকুরের ভক্ত, প্রাচ্যবাসীরা বিড়ালের। প্রাচ্য বলতে অবশ্য আমি শুধু ভারতবর্ষই বুঝি, অন্যান্য দেশের কথা আমি জানিনে। তবে মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কুবলাই খানের পশুশালার এক বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় উক্ত পশুশালায় কম্ সে কম্ পাঁচ হাজার শিকারী কুকুর ছিল। তাছাড়া চীন দেশে যদি কুকুরের সমাদর না থাকত তো Pekinese কুকুর জগদ্বিখ্যাত হতে পারত না।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশুপক্ষী যতখানি যায়গা জুড়েছে আমাদের সাহিত্যে ততখানি তাদের স্থান নেই। তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের জীবনেও এরা খুব বেশী যায়গা দখল করতে পারেনি। যাহা নাই সাহিত্যে তাহা নাই জীবনে। রবীন্দ্র সাহিত্য বিরাট ব্যাপার। অথচ তার মধ্যে আমি একটি মাত্র কুকুরের সন্ধান পেয়েছি যার উপরে কবিগুরু তাঁর কবিকমন্ডলুর কৃপাবারি কিঞ্চিৎ সিঞ্চন করেছেন। ও কুকুরটার কৌলিন্য নেই, নিতান্তই বঙ্গজ। 'পুনশ্চ'র সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত আপনাদের মনে থাকবার কথা। রবীন্দ্র সাহিত্যে এছাড়া আরেকটি কুকুরের উল্লেখ আছে। ইনি হচ্ছেন কোটি মিত্তিরের ট্যাবি নামধারী বেঁটে কুকুর। জাতে কুলিন কিন্তু ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য। কবি তাকে ক্ষমা করেননি, আমরাও করতে রাজি নই। শরৎবাবুর কুকুরের গল্প আমরা নানা লোকের মুখে শুনেছি। তাঁর সৃষ্ট বহু চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুরটার কোথাও যেন একটা মিল আছে। লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে মানুষের প্রতি তাঁর মমতা। এই কুকুরটাও রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বোহিমিয়ান জাতের কুকুর। ওর প্রতি স্বভাবতই তাঁর যথেষ্ট মমতা ছিল; কিন্তু তাই বলে তিনি ওকে তাঁর সাহিত্যের আসরে ঢোকাননি। ভালোই করেছেন। গল্প উপন্যাসে অমনিতেই বহু চরিত্রের গঞ্জনা, তার উপরে কুকুর বেড়ালও যদি উপন্যাসের একটা চরিত্র হয়ে বসে তবে তো বিপদের কথা। ঐ ট্যাবির কথাই ধরুন না। বেঁটে খাটো হলে কি হবে, রবীন্দ্রনাথ যেখানটায় এনে ওকে হাজির করেছেন সেখানটায় ও একটা প্রচন্ড উৎপাত। আমাদের মতো ভালোমানুষ পাঠকের পক্ষে ও দৃশ্যটা অমনিতেই অত্যন্ত বিভ্রান্তকর। একেই তো কোটি মিত্তির মুখে সিগারেট ধরিয়ে বসেছেন। তার উপরে শ্রীমতী ট্যাবি সামনের দু পা তুলে দিয়ে যোগমায়ার শুভ্র নির্মল শাড়িতে কলঙ্ক লেপন করছেন। আমরা কাকে ছেড়ে কাকে সামলাই! লাবণ্য তো পালিয়ে বেঁচেছেন। ব্যাপার দেখে তিনি পূর্বাহ্নেই অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছেন। এবার এর symbolismটুকু ভেবে দেখুন। লাবণ্য পালিয়েছে অর্থাৎ কি না grace পালিয়েছে। ট্যাবির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, ট্যাবির মনিব কোটি মিত্তিরের ব্যবহারটাকে কি আপনারা graceful বলবেন? আমি যে কুকুর বেড়াল পোষার পক্ষপাতী নই, তার কারণটি প্রধানতঃ এই। সঙ্গদোষে স্বভাব নষ্ট হতে বাধ্য। গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যকে প্রবহমানা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও নাটক—প্রধানতঃ এই তিনটিকে অবলম্বন ক'রেই সাহিত্যের মূল প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সাহিত্যের আরও কতকগুলি শাখা-প্রশাখা মূল প্রবাহকে পরিপুষ্ট করেছে, যেমন প্রবন্ধ-সাহিত্য, সমালোচনা-সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, রচনা-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য ইত্যাদি। অনুবাদ-সাহিত্য যে সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ, এখন সাহিত্যরসিক মাত্রেই একথা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

সাহিত্যিক হ'লেন স্রষ্টা। অনুবাদকও স্রষ্টা। অনুবাদকদের সাহিত্যিক পর্যায়ে স্থান দিতে অনেকের মনেই এক সময় দ্বিধা ছিল। প্রথম যুগের অনুবাদকরা অনুবাদ কার্যকে বিশেষ একটা শিল্পরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু ক্রমে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদ উপযুক্ত মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃত সাহিত্যিক না হ'লে সার্থক অনুবাদক হওয়া যায় না, একথা রসিক ব্যক্তি মাত্রেই অসংকোচে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত অনুবাদও সৃষ্টিকার্য। সৃষ্টির যে অতুলনীয় আনন্দ, অনুবাদক তা পূর্ণমাত্রায়ই উপলব্ধি করেন। সমালোচকরাও মেনে নিয়েছেন যে, অনুবাদ কার্য একটা স্বতন্ত্র শিল্প। তার নিজস্ব ধর্ম আছে, আইন-কানুন আছে। রসের দিক থেকে তার একটা স্বতন্ত্র আবেদনও আছে। বিশেষ ক'রে গল্প-উপন্যাস অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে যে কতখানি অসুবিধা ভোগ করতে হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তা আমরা জানি। বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদককে প্রধানত শব্দ ও ভাবগত অসুবিধায় পড়তে হয়। অনুবাদককে একদিকে যেমন মূল সৃষ্টিটিকে নিজের দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি মূল সৃষ্টির মৌলিক রসটিকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়; মূলের ভাব, ভাষা, শব্দঝঙ্কার, অলঙ্কার-উপমাদি সব কিছুকে বজায় রেখে ভাষান্তরিত করতে হয়। অর্থাৎ অনুবাদককে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, তাঁর অনুবাদের মধ্যে যতদূরসম্ভব মূল লেখককে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং কতখানি সাহিত্যিক মন থাকলে প্রকৃত অনুবাদ-সাহিত্যিক হওয়া যায় তা সহজেই অনুমেয়।

অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ করে পাঠক সমাজের আগ্রহের জন্য এর প্রসার ও প্রচার বেড়ে চলেছে। বাঙলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বিভিন্ন দেশের গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সব কিছুই অনূদিত হয়ে বাঙলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলছে। অবশ্য এর মধ্যে যে অপকৃষ্ট রচনা দেখা দিচ্ছে না, এমন কথা আমরা বলছি না।

ইংরেজী সাহিত্য অনুবাদের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি ইংরেজী ভাষার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যের গৌরব এতে বহুগুণে বেড়েছে। অনুবাদ যে সাহিত্যে কতখানি বিশালতা ও ব্যাপকতা এনে দেয় তার দৃষ্টান্তস্থল ইংরেজী সাহিত্য।

সকল দেশের সাহিত্যেই এমন এক একটা যুগ আসে যখন মৌলিক রচনার অভাব ঘটে তখন এই অনুবাদ-সাহিত্যই গতিধারাকে অব্যাহত রাখে। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজনকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আবার মৌলিক রচনার পাশাপাশিও অনুবাদ সৃষ্টি চলতে পারে, তাতে মৌলিক রচনার চলার পথে কোনই বাধা সৃষ্টি হয় না। কারণ অনুবাদ-সাহিত্য সাহিত্যেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা।

বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের প্রবল ঢেউ উঠলো বিশেষ করে যুদ্ধযুগে ও যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্যে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে বইয়ের পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। একদিকে যেমন সাধারণ পাঠাগারগুলিতে পাঠক-সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, তেমনি নূতন পুস্তক ক্রয় করে পাঠ করবার মত লোকেরও অভাব হয় না। যুদ্ধের দৌলতে সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণ পৃথিবীর নানা স্থানের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যাদি জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের সাহিত্য সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিন্তু সরাসরি ইংরেজী থেকে পাঠ করে বিদেশী সাহিত্যের রস গ্রহণ করার যোগ্যতা অথবা অবকাশ বা ধৈর্য আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠকেরই নেই। ফলে অনুবাদের চাহিদা দেখা দেয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বটা সংকুচিত হয়ে এল মানুষের হাতের কাছে। মানুষের জ্ঞানের গণ্ডী গেল বেড়ে। বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সে উন্মুখ হয়ে উঠলো। সংবাদপত্র তার সামনে বিশ্বের বৈচিত্র্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, অজস্র কৌতূহল এসে জড়ো হয়েছে তার মনে, তাই অনুবাদের সাহায্যে বিশ্বের ঐশ্বর্যকে সে নিজের ঘরে এনে হাজির করলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসারের অন্যতম মূল কারণ আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ এবং এই চেতনাবোধ উদ্রেক করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

আধুনিক যুগে সাহিত্য সৃষ্টির পরিসর খুব প্রশস্ত নয়। অল্প পরিসরে আবদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে ক্রমে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটতে থাকে। বস্তুতঃ প্রায় সকল দেশের সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর এ রকমটা ঘটে থাকে। সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ মানসিক গঠন থাকে এবং আপন দেশের ঐতিহ্য, ভাবধারা, সংস্কৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পী মন। তাই তাঁর সৃষ্টি সেই বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতারই প্রকাশ, তাই তাঁর সৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তাঁর দেশের সেই মৌলিক রূপ। কাজেই ব্যাপক বৈচিত্র্য তাঁর লেখায় সকল সময় সম্ভব নয়।

কিন্তু সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে তার আকারগত প্রসারেরও প্রয়োজন রয়েছে। মানুষে চায় সাহিত্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যহীন স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ সাহিত্য মানুষের মনের অসাড়তা এনে দেয়। এদিক থেকেও অনুবাদ-সাহিত্যের দাম কম নয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেরই এক একটা নিজস্ব ঐতিহ্য ও কৃষ্টি রয়েছে। সেই কৃষ্টিকে ঘিরেই তাদের সাহিত্য রূপলাভ করেছে। কিন্তু একটিমাত্র সংস্কৃতি একটি দেশের সাহিত্যে ব্যাপকতা আনতে পারে না। ফলে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই দেশগুলি আপন আপন সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধ বটে, কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্য ব্যতীত তারাও অসম্পূর্ণ।

অনুবাদ-সাহিত্য যে দেশের কতখানি উন্নতি সাধন করতে পারে তার স্বাক্ষর রয়েছে

নয়া চীনের ইতিহাসে, আর দেশের উন্নতির পথে অনুবাদকের দান যে কতখানি হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চীনা সাহিত্যিক লু শুন। লু শুন অনুবাদের মাধ্যমে চীনকে পরিচিত করে তুলেছিলেন সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্যের সঙ্গে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৬ সালে মৃত্যু পর্যন্ত লু শুন সোভিয়েট সাহিত্য ও মার্ক্সীয় সাহিত্য নীতির যে সকল অনুবাদ করে গেছেন, তাঁর জীবনে তা অক্ষয় কীর্তি। চীনের সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষা গ্রহণের পশ্চাতে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস ও সাফল্য অনস্বীকার্য।

অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা ক'রতে হ'লে সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে হবে। প্রথম যুগে সাহিত্যের গতি অব্যাহত রাখার কাজে অনুবাদের দান অনেকখানি। ইংরেজী সাহিত্য ও বাঙলা সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনুবাদকে আশ্রয় ক'রেই সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্ফূরণ হয়েছিল।

ইংরেজীতে অনুবাদ-সাহিত্যের স্থান কোথায় এখানে তার কিছু আলোচনা করলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। সাহিত্যিক গদ্য যাকে বলা যায়, ৯ম শতাব্দীর আগে ইংরেজী সাহিত্যে সেরকম কিছু সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে জানা যায় না। ৯ম শতাব্দীতে রাজা আলফ্রেড তাঁর রাজ্যে লুপ্ত জ্ঞান পুনরুদ্ধারের কাজে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ল্যাটিন শিক্ষা ক'রে নিজে অনুবাদ কার্যে ব্রতী হ'লেন এবং অপরকে এই কাজে নিয়োগ করলেন। ফলে Pope Gregory the great এর "Cura Pastoralis." Drosieos এর History of the world, Boethins এর "De consolatione Philosophiae."

প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ পাই। হয়ত এই অনুবাদ সার্থক হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ঐকান্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মগ্রন্থ ধরণের পুস্তক রচিত হ'তে লাগলো। এগুলির অধিকাংশই ফরাসী বা ল্যাটিন গ্রন্থের অনুবাদ।

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি পাওয়া যায়, তা' প্রধানতঃ ধর্মকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠলেও এরই পাশাপাশি লৌকিক কাব্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। waee-এর 'Brat' অনুবাদ ক'রে Layanon এই ধরণের একখানি কাব্য দেশকে উপহার দেন।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে Havelok ও Horn-এর রোমান্স অবলম্বনে দু'খানি কাব্য লেখা হয়। স্কান্দিনেভীয় মূল থেকে ইতোমধ্যেই এগুলি ফরাসীতে ভাষান্তরিত হয়েছিল। ফরাসী থেকেই ইংরেজীতে গ্রহণ করা হয়। তবে কোনটিই ফরাসী থেকে হুবহু অনুবাদ নয়। ইংরাজ অনুবাদকেরা কিছু কিছু বর্জন ক'রেছিলেন। তবে এটুকু নিঃশঙ্কোচে বলা চলে যে, ইংরেজী ভাষান্তরে কাব্যদ্বয় অনেক নাটকীয় ও প্রাণের স্পন্দনযুক্ত হয়েছে।

চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে গদ্য রচনা পাই, তার সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নেই, তবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনুবাদকার্য এসময়েও অব্যাহত দেখা যায়। গ্লস্টারশায়ারের জনৈক পুরোহিত ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে Higden-এর 'Polychronicon' অনুবাদ করলেন; তবে অনুবাদকের ইংরেজী ভাষায় মোটেই সাবলীলতা ছিল না। ১৩৭৭ সালে রচিত "Travls of Sir John Mandaville"কে বহুকাল যাবৎ মৌলিক রচনা মনে করা হ'লেও এখানি ফরাসীর অনুবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা চসারের কথা বলার আগে আমরা এ যুগের প্রধান গদ্য লেখকদের অন্যতম John wyclif-এর নাম করবো। ইংরেজী গদ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ১৩৮৪ সালে ল্যাটিন থেকে ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ।

চসারের প্রতিভার পরিমাপ ক'রতে গিয়ে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে তাঁর সমকক্ষ কোন কবির আবির্ভাব হয় নি। সামান্য পরিচারক থেকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত নানারকম কাজে তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল এবং কর্মব্যপদেশে নানা দেশও তাঁকে ভ্রমণ ক'রতে হয়েছিল। ফলে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন এবং অন্য বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও পড়েছিল তাঁর রচনায়—বিশেষ ক'রে ফরাসী ও ইটালীয় প্রভাবের উল্লেখ করা যায়। এ থেকেই চসার অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'Canterbury Tales'-এর অন্তর্ভুক্ত Tale of melibeus ফরাসীর অনুবাদ এবং Parson's Taleও ফরাসী রচনা অবলম্বনে লেখা। চসারের আর একটি প্রশংসনীয় কার্য Boethius-এর De Consolatione Philosophiae-র অনুবাদ। রাজা আলফ্রেডও এর অনুবাদ করেছিলেন, পূর্বেই আমরা তার উল্লেখ করেছি।

১৩৭২ সালে ইটালী সফরকালে ইটালীয় সাহিত্য তাঁকে মুগ্ধ করে। বোকাচিও থেকে তিনি অনেক কিছু নিয়েছিলেন। চসার এ'র দুখানি গ্রন্থের অনুবাদও করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দু'জন ফরাসী কবির লেখা Roman de la rose সমস্ত রূপক কবিতার আদর্শ ছিল। চসার এরও কিছু অংশ সুন্দর ইংরেজী ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন।

চসারের মৃত্যুর পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁর কয়েকজন অনুগামী প্রধানতঃ অনুবাদই ক'রে গেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতেও বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকের অনুবাদ পাওয়া যায়।

এইভাবে হ'ল ইংরেজী সাহিত্যের গোড়াপত্তন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম রূপটি ফুটে উঠেছে অনুবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদের এই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ইংরেজী সাহিত্যের সুবিশাল মনোরম সৌধটি গ'ড়ে উঠেছে। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত বহু প্রাচীন ও সমসাময়িক বহু খ্যাতনামা গ্রন্থ অনূদিত হয়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভিত্তিকে দৃঢ় ক'রে তুলেছে। এমন কি অনেক অনুবাদ গ্রন্থ মৌলিক রচনার মতই জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেছিল। এপ্রসঙ্গে প্লুটার্কের 'Lives', মনটেইনের 'Essais', ওভিডের 'metamorphoses, প্রভৃতির অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যমঞ্চ ও ইংরেজী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের পথেও অনুবাদের দান অসামান্য। সাহিত্য সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন যে, Boccaccio, Cinthio, Bandello প্রভৃতি লেখকেরা নাট্যরস সমৃদ্ধ গল্প না লিখলে নাট্যমঞ্চ সৃষ্টিতে যথেষ্ট বাধা দেখা দিত। ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৭ সালের মধ্যে এই সকল গল্পের অনেকগুলির অনুবাদ হয়েছিল।

ইংরেজী সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে অনুবাদের প্রাধান্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এরপর কয়েক শতাব্দী হয়ত প্রধানতঃ মৌলিক রচনাই প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আবার দেখা দিল অনুবাদের ঢেউ। পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের সেরা সৃষ্টিগুলি অনূদিত হ'তে লাগলো আর ইংরেজী সাহিত্য হয়ে উঠলো মহান ঐশ্বর্যশালী।

ইংরেজীর পাশাপশি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে আদি যুগ থেকে এখানেও অনুবাদের প্রাধান্য কতখানি। ইংরেজীর মত বাঙলা সাহিত্যেরও কিছুটা ভিত্তি গ'ড়ে উঠেছিল অনুবাদের মাধ্যমে। হয়ত বা সকল দেশের সাহিত্যেরই গোড়াকার ইতিহাস এই রকম।

ভারত একটি বিস্তীর্ণ মহাদেশ। এর বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা ও লিপির প্রচলন রয়েছে। কাজেই এক প্রদেশের কাছে অন্য প্রদেশের ভাষা ও লিপি অবোধ্য। ফলে প্রাচীনকালেই সকলের ব্যবহারযোগ্য একটি ভাষা ও লিপি প্রবর্তনের সমস্যা দেখা দেয়। আর্যরা ভারতে পদার্পণ করলো। তাদের ভাষাই ক্রমে সুসংস্কৃত হয়ে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হ'ল অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত হ'ল পণ্ডিতদের

ভাষা। এর অন্তরলোকে প্রবেশের পথ সাধারণের পক্ষে সুগম ছিল না। বিশেষ ক'রে বাঙলা দেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজদরবারে সংস্কৃতের প্রভাব হ্রাস পেতে লাগলো। ফলে সংস্কৃতের প্রসার ক'মে যেতে লাগলো। মুসলমানেরা সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙলা ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন দলিলাদিতে ফার্সির সঙ্গে বাঙলা অনুবাদও দেখা যায়। এইখান থেকেই হিন্দুরা পুরাণাদির অনুবাদের প্রেরণা লাভ করে।

বাঙলা অনুবাদের সর্বপ্রথম রূপ পাওয়া যায় কথকতার মধ্যে। পণ্ডিতেরা ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ ক'রে সরস ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে শোনাতেন। ফলে লোকের কৌতূহল ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রামায়ণাদি অনুবাদ হয়।

রামায়ণের আদি অনুবাদক কৃত্তিবাস। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতেই কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করেন। চতুর্দশ শতকের একেবারে শেষভাগে রাজা কংস বা গণেশ গৌড় সিংহাসন অধিকার করলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের একটা সুযোগ ঘটলো। রাজা কংস ও তাঁর পুত্র যদু বাঙালী কবি ও পণ্ডিতদের যথেষ্ট সমাদর করেছেন ও তাঁদের রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। যদু পরে মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করলেও বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত হ'ন নি। সে যুগের দু'জন বিশিষ্ট কবি কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু যথাক্রমে রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ ক'রে অমর হয়ে আছেন। এঁরা দু'-জনেই গৌড় দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রেছিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অবশ্য খাঁটি অনুবাদ গ্রন্থ বলা চলে না। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে তিনি রামায়ণ রচনা ক'রেছেন। কিছু সংক্ষেপ ক'রেছেন, কিছু বিস্তৃত করেছেন, কোথাও সংযোজনা ক'রেছেন, কোথাও বা বর্জন করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি অনেকটা বাঙালী ধাঁচে ঢেলে নিয়েছেন। কালক্রমে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশও অনুপ্রবেশ করেছে।

মালাধর বসুর 'কৃষ্ণবিজয়'ও আক্ষরিক অনুবাদ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-দিকে গ্রন্থটি রচিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী মহাভারত অনুবাদ করেন। গৌড়ের সুলতান হোসেন শা'র অন্যতম প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র মহাভারত অনুবাদ করেন এবং পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগবতের আরও অনুবাদ হয়। রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র ১২টি স্কন্ধের অনুবাদ, শেষ তিনটি স্কন্ধে একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলা সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার হ'ল। এই সময়ের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব। এযুগে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র ক'রে অনুবাদ-সাহিত্য প্রসার লাভ করে। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক, রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিত-মাধব' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এই শাখা পুষ্ট হ'ল। লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে আকিঞ্চনদাস নাটকটির আর একটি অনুবাদ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে শ্রীরূপ প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু মূলগ্রন্থ সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। কাজেই শ্রীনিবাস অনুবাদের আশ্রয় নেন। তিনি অপরকে দিয়েও অনুবাদ করান। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব, দানকেলি কৌমুদী প্রভৃতির কিছু কিছু অনুবাদ হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কাশীরাম দাসের মহাভারত। এই শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরাও অনুবাদের দিকে দৃষ্টি দেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলাওলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'সেকন্দর-নামা' ফারসী 'হসকন্দর-নামা' কাব্যের অনুবাদ। এছাড়া তাঁর 'পদ্মাবতী', 'সপ্তপয়কর'ও হিন্দী ও ফরাসী কাব্যের ভাবানুবাদ। মহম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' আরবী কাব্যের অনুবাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনুবাদের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রইল। সপ্তদশ শতাব্দীর মতই কিছু কিছু গোস্বামী গ্রন্থ অনূদিত হ'ল। শচীনন্দন বিদ্যানিধি রচিত 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা' শ্রীরূপের 'উজ্জ্বল নীলমণির' সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এছাড়া গোস্বামিদের স্তবাদির কতকগুলি অনুবাদও এই সময় পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভাষা পরিচ্ছেদের' অনুবাদ এই শতাব্দীর স্মরণীয় কীর্তি।

অনুবাদ-সাহিত্যের যে প্রাচীন ধারা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে চ'লে আসছিল, উনবিংশ শতাব্দীতেও তা নিশ্চিহ্ন হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণারণ কাব্য কিছু কিছু পাওয়া যায়, তেমনি সেই সঙ্গে গদ্য সাহিত্য রচনার মধ্যেও অনুবাদ কার্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

গদ্য রচনার একেবারে আদি যুগ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু গদ্য অনুবাদ হয়েছিল। সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্য এগুলিতে ছিল না। ১৮শ শতকের একেবারে শেষে কয়েকটি ইংরাজী আইন পুস্তকও বাঙলায় অনূদিত হয়।

পরবর্তী যুগে দেখা যায়, বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙলা গদ্য রচনা ক'রতে গিয়ে অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। শ্রীরামপুরে মিশনারী কর্তৃক বাইবেল অনুবাদ, রামমোহন রায় কর্তৃক বেদান্ত গ্রন্থ ও কয়েকটি উপনিষদের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে অনুবাদ-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে

উইলিয়াম কেরীর দান অসামান্য। এই সময়ের সমস্ত বাঙলা রচনার পিছনে ছিল তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হ'ল ও ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত থেকে হিতোপদেশ অনুবাদ করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত গোলকনাথ শর্মা। ১৮০২, ১৮০৩ ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বত্রিশ সিংহাসন, ঈশপের গল্প ও তোতা ইতিহাস অনূদিত হ'ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হ'লে দু'জন সাহিত্যিক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন—'সমাচার চন্দ্রিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এ'রা দুজনেই কিছু কিছু অনুবাদ কার্যে হাত দিয়েছেন। ভবানীচরণের হিতোপদেশ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ঈশ্বর গুপ্তের চতুর্থ গ্রন্থ 'হিতপ্রভাকরে'র দ্বিতীয় অংশ হিতোপদেশেরই অনুবাদ। এ ছাড়া তাঁর 'বোধেন্দু বিকাশ' (১৮৬৩) সংস্কৃত রূপক নাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের প্রায় অনুবাদ। তত্ত্ববোধিনী যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের অন্যতম তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, পশ্বাবলী, রাসেলাস অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়া সে যুগের সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবীরাই অনুবাদের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের বেণীসংহার নাটক, রত্নাবলী নাটক, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, রাম রাম বসুর খৃষ্ট সঙ্গীতাদির অনুবাদ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের ভগবদ্গীতা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সুবুদ্ধি ব্যবহার, সাংখ্যদর্শন, তারিণীচরণ মিত্রের ঈশপের গল্প, চণ্ডীচরণ মুনশীর তোতা ইতিহাস, রামকিশোর তর্কচূড়ামণির হিতোপদেশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রসতরঙ্গিনী প্রভৃতি সে যুগের অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

সর্বশেষে আমরা নাম করবো কালীপ্রসন্ন সিংহের, বাঙলা ভাষার প্রতি যাঁর দরদ ছিল অসীম, বাঙলা ভাষার প্রসারকল্পে যাঁর উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অফুরন্ত। কালীপ্রসন্নের রচনাবলীর মধ্যে তিনখানি অনুবাদ গ্রন্থ পাই—বিক্রমোর্বশী নাটক, মালতী মাধব নাটক ও পুরাণ সংগ্রহ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের গদ্যানুবাদ। এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন জুলিয়াস সীজরের জীবনচরিত বাঙলায় অনুবাদেরও সংকল্প করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকে শরৎচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের দিকটা প্রায় অবহেলিত থাকে। এ সময়টাতে বিশেষ ক'রে মৌলিক সৃষ্টি চলতে থাকে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর রচিত ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's wife' গ্রন্থের প্রথম সাতটে অধ্যায় বাঙলায় অনুবাদ ক'রেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের জোয়ার এল নতুন ক'রে। এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি প্রবন্ধের প্রারম্ভে। তবে প্রাচীন যুগের অনুবাদ-সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের অনুবাদ সাহিত্যের রূপগত ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। সে যুগের অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্বোধ্যতা দূর করা এবং সে যুগে অনুবাদকে করা হয়েছিল প্রচারকার্যের বাহন। বাঙলা সাহিত্যের মধ্য যুগে যেমন শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের জন্য অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশনারীরা অনুবাদকে নিজেদের প্রচারকার্যে লাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে অনুবাদ-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রাচীন যুগে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এক কারণে, আর এখন দেখা দিয়েছে আর এক কারণে। এ বিষয়েও আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, কাজেই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যুদ্ধের যুগে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অজস্র পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো। ফাঁপাই টাকার দৌলতে তাদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু অর্থোপার্জন যে না করেছে এমন নয়। কিন্তু যুদ্ধের অন্তিমকালের সঙ্গে সঙ্গে এই সব হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা পত্র-পত্রিকার অন্তিম মুহূর্তও এল ঘনিয়ে। আজ এদের অনেকগুলিই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এরাও বাঙলা সাহিত্যের কিছুটা কল্যাণ ক'রে গেছে; অনুবাদ শাখাকে এরা সাধ্যমত পুষ্ট করেছে। পাঠকের পক্ষ থেকে অনুবাদ গল্প বা উপন্যাসাদি পাঠ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাওয়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পত্রিকাই অনুবাদ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। পুস্তক প্রকাশরাও নিষ্কর্মা থাকেন না। তাঁরাও অনুবাদ উপন্যাস ও গল্প সংকলন বই আকারে প্রকাশ ক'রতে উঠে প'ড়ে লেগে যান। কোন কোন প্রকাশক বিশেষ একটি অনুবাদ সিরিজ নাম দিয়ে একটির পর একটি দেশী বিদেশী উপন্যাসাদির অনুবাদ বার করতে থাকেন। ফলে লেখকদের মধ্যে একটা অনুবাদক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। এ'দের মধ্যে অনেকেই অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের একটি অপূর্ণ শাখাকে পরিপুষ্ট করেছেন।

কিশোর পাঠকরাও এই অনুবাদ সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত রহিল না। বিদেশী সাহিত্যের কিশোর পাঠ্য পুস্তকগুলিও যেমন অনূদিত হ'ল, তেমনি বয়স্কদের পাঠ্য পুস্তকের অনেকগুলিই কিশোরোপযোগী ক'রে পরিবেশিত হ'তে লাগলো। বস্তুতঃ খাঁটি কিশোর সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, বাঙলা সাহিত্যে তা খুব বেশী স্থান জুড়ে নেই। এ বিষয়ে আমাদের দেশের কিশোরদের খুব বড় রকমের একটা অভাব রয়ে গিয়েছিল। অনুবাদ সাহিত্য এদিক থেকে কিশোরদের যথেষ্ট করেছে।

বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদ শাখাকে সম্পদশালী ক'রে তুলতে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির দান অতুলনীয়। বস্তুতঃ আজকাল নানাকারণে বইয়ের পাঠকের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে; এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। তবে এটুকু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পুস্তক অপেক্ষা মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ার দিকেই আজকাল জনসাধারণের ঝোঁক বেশী। কাজেই এই সকল পত্রিকা যদি অনুবাদ সাহিত্য প্রচারে দৃষ্টি দেন, তাহলে তাঁদের উদ্যম অনেক বেশী কার্যকরী হবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, অনুবাদ-সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্র শুধু মাত্র প্রকাশক আর পত্র-পত্রিকাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। এর জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া আবশ্যক। শুধু গল্প-উপন্যাসের অনুবাদেই কাজ শেষ হ'ল না, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই উদ্যম নিয়োজিত ক'রতে হবে। এলোমেলোভাবে কতকগুলি অনুবাদ করে গেলেও চলবে না। সমগ্র প্রচেষ্টা ও শক্তিমত্তাকে সংহত করবে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি। অনুবাদ যাতে প্রথম শ্রেণীর হয় এবং অনুবাদক যা'তে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভে বঞ্চিত না হ'ন, সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্বও থাকবে এই প্রতিষ্ঠানের ওপর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ কাজের ভার নিতে পারেন কিনা দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের চিন্তা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি।

হাফ প্যান্ট

অরুণ সরকার

হাফ-প্যান্ট ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, হকি-ফুটবল মাঠে,
বঙ্গ-মন্ত্রী আনিল তাহাকে গোবেচারাদের হাটে।
ফেটে পড়ে পরিষদ
মালকোঁচা মেরে দাঁড়ায় সকলে আইন করিতে রদ।

বিরোধী-পক্ষ ফুলায়ে ফাঁপায়ে বাইশ ইঞ্চি ছাতি
হুঙ্কারি' কহে, আমরা বাঙালী, আমরা লাজুক জাতি
হাফ-প্যান্ট নাহি পরি,
মরিতে হলেও আমরা নূতন কাপড় পরিয়া মরি।

লোকে করে ছি, ছি, কুলোকের মুখে কুৎসার খই ফোটে,
ব্যঙ্গচিত্রে, সম্পাদকীয়ে, কাগজ জাঁকিয়া ওঠে,
সবে করে হায়, হায়
হাঁটু-কাটা সাজে সাজিয়া এবার মাথা-কাটা বুঝি যায়।

ব্যাপার দেখিয়া চক্ষু আমার উঠেছে চড়ক গাছে
জানিতে এসেছি দেশ-পত্রিকা সম্পাদকের কাছে
হাফ-প্যান্ট শুনে আজ
বাঙালী জাতির মাথায় কেনবা হঠাৎ পড়িল বাজ?

যেখানেই দেখি ঘরোয়া বাঙালী জুটেছে কয়েকজনে
কাহার কাপড় কোথায় কখন ওঠে যে অন্য মনে
খেয়াল করে না কেহ,
অশ্লীল তারা, এমন কভু ত' করিনেক সন্দেহ!

নব্য যাহারা নাক-সিঁটকায়ে তাহারা বলিতে পারো
ঘরোয়া ছাড়াও মার্জিত-রুচি বাঙালী রয়েছে আরো,
তারা সম্ভ্রমশালী,—
তাহাদের বলি, দোষটা কি ভাই হাফ-প্যান্টেরি খালি?

হাফ-শার্ট প'রে অগৌরবের কারণ ঘটে না কিছু,
"বুশ-শার্ট" মানে, "হাফ-কোট" কারো করেনাক' মাথা নীচু,
উল্টে কদর বাড়ে
স্মার্ট-ছোক্‌রারা কনুই দেখায়ে আহ্লাদে ল্যাজ নাড়ে।

গরমের দেশে বুঝিতে পারি না সরমের মাপকাঠি
হাফ-প্যান্ট নিয়ে তবে আজ কেন এত মাথা ফাটাফাটি
একথা বুঝেছি দাদা
হাফ-প্যান্ট হলে খরচ বাঁচিবে, বাঁচিবে পথের কাদা।

মন্ত্রী কিম্বা সরকারী দল উকীল রাখে নি মোরে
খেলার মাঠেতে বহুদিন গেছে এই হাফ-প্যান্ট প'রে,
সেই প্রিয় পরিধেয়
সহিতে পারি না অপমান তার, মানিতে পারি না হেয়।

ধেয়ানচাঁদের অঙ্গের শোভা, গোষ্ঠ পালের প্রিয়
ওগো হাফ-প্যান্ট লোকের কথায় অপরাধ নাহি নিও।
সবি ভাগ্যের দোষ
রাজনৈতিক মাঠে তুমি আজ কাপড়ে নন্দ ঘোষ।

কি হবে কবিতা লিখে?

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

কি হবে কবিতা লিখে? এ প্রশ্ন কোরো না মোরে আর।
আমি যে কবিতা লিখি খুশী সে আমার
কি হবে বা কি না হবে সে কথা ভাবার
নাই নাই নাই যে সময়।
বাতাস যখন বয়
সে কি কভু ভেবে দেখে কি হবে বহিয়া?
ঝর্ণা যবে পাহাড়ের গাত্র ভেদি আসে বাহিরিয়া কল কল স্বরে—
"কি হবে বাহির হয়ে?" এ প্রশ্ন তখন সে কি করে?
মেঘ কি কখনো ভাবে কি হবে আকাশে জমে জমে ক্রমে ক্রমে?
তারপর ঝর ঝর বৃষ্টিরূপে আসে যবে ধরণীতে নেমে
"কি হবে নামিয়া?" ভেবে মধ্যপথে যায় কি সে থেমে?

মোর কবিতার যদি কেহ কভু নাহি করে খোঁজ,
কম্পোজিটর যদি না করে কম্পোজ,
যদি নাহি ছাপে কোনো সম্পাদক মাসিকে বা সাপ্তাহিকে—
তবু আমি লিখে যাবো, ভাবিব না "কি হবে কবিতা লিখে?"



দমনের উপায়—

পঙ্গপালের মত বহু ব্যাপক মহাশত্রু নিধনের জন্য সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ প্রয়োজন একথা বোঝা কঠিন নয়। পূর্বের প্রসঙ্গেই দেখান হয়েছে যে এদের গতিবিধি বহুরাজ্যব্যাপী এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে ও ঋতুতে এরা প্রজনন ও বংশ বিস্তার করে থাকে। পঙ্গপালের ঝাঁক প্রতিহত করতে হলে তাই এদের প্রজনন ও গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। পূর্বাহ্নেই এদের দলগত শক্তি ও যাত্রাপথের নির্দেশ রেখে সতর্ক থাকতে না পারলে পরে এদের ধ্বংস করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে এর মূলে করতে হবে আঘাত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুচারটি পঙ্গপালের ঝাঁক নিয়ে মাতামাতি করে কিছুই হবে না। তাই প্রয়োজন সংঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের যাদের কাজ হবে ধারাবাহিকভাবে এই পঙ্গপালদের প্রজনন ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা, এদের রীতিনীতি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, গতিবিধি নির্ধারণ, আশঙ্কিত স্থানে আগে থেকে বিপদ জ্ঞাপক বার্তা প্রেরণ ও সম্ভব হলে যথোপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে প্রয়োজনানুরূপ দমন কার্য গ্রহণ করা। এই কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পঙ্গপাল সতর্কীকরণ বিভাগ বা (Locust warning organisation) নামে দিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। এদের লোক রাজস্থান, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থায়ী প্রজনন ক্ষেত্রে বহিরাগত পঙ্গপালের বংশ বিস্তার ও অন্যত্র গতিবিধির ওপর নজর রেখে থাকেন। এদের একটি শাখাকেন্দ্র যোধপুরেও আছে। পঙ্গপালের হ্রাস বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে কখন এরা 'একক' এবং কখন "দলবদ্ধ" হচ্চে তার খবর এদের রাখতে হয়। ভারতে পঙ্গপালের আবির্ভাব অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পতঙ্গের জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান তাই এ বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকেন। ভারতের যে সমস্ত রাজ্যে পতঙ্গের স্থায়ী প্রজনন ক্ষেত্র নাই সেখানে প্রাদেশিক কীটতত্ত্ববিদদের সর্বদা পঙ্গপালের গতিবিধি সম্বন্ধীয় খবরাখবর জানিয়ে দেওয়া হয়। স্থায়ী প্রজনন ক্ষেত্রে লোক সংগ্রহ করে এই প্রতিষ্ঠান পতঙ্গধ্বংসী কাজ চালিয়ে থাকেন।

দু চারখানা ক্ষেত পঙ্গপালের কবল থেকে বাঁচানোর চাইতে এদের সবংশে নিধন করার চেষ্টাই প্রশস্ত। এরজন্য প্রয়োজন পতঙ্গ নাশক কার্যকরী উপায় স্থির করা।

পতঙ্গ বা পঙ্গপাল এক জাতের ফড়িং। এদের জীবন-ইতিহাসের বিভিন্ন অবস্থাতেই ধ্বংস করা যায়।

ধেড়ে পতঙ্গ ও পঙ্গপালের উড়ন্ত ঝাঁক:—

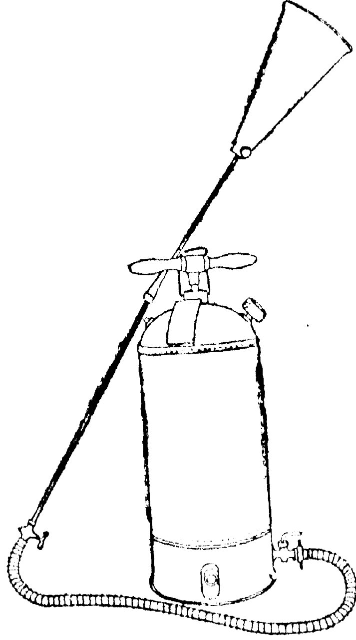
পাঁচ ছয় মাইল দীর্ঘ ও দুই তিন মাইল প্রস্থ কোন উড়ন্ত ঝাঁককে বিনাশ করা সহজ নয়। মানুষের নানাবিধ চেষ্টার মধ্যে উড়ো জাহাজ থেকে পতঙ্গনাশী কোন রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে এদের ধ্বংস করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বর্তমানে চেষ্টা হচ্চে; কিন্তু আজও কার্যত প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

এরাই আবার নেমে এসে জঙ্গলা ঝোপ-ঝাড়ে অথবা পতিত জমিতে চুপ করে বসে বিশ্রামকালীন সুখ উপভোগ করে। এ অবস্থায় ধ্বংস করা সহজ। রাত্রিতে অথবা ভোরবেলার ঠাণ্ডায় যখন এরা বেশী



অগ্নিনিক্ষেপক দিয়ে গাছের ওপর পঙ্গপাল মারা হচ্ছে।

নড়াচড়া করতে পারে না সেই সময় ঝাড় দিয়ে নড়াচড়া করতে পারে না সেই সময় ঝাটা দিয়ে যায়। পঙ্গপালের ঝাঁক যদি অদাহ্য সবুজ ঝোপে ঝাড়ে অথবা প্রয়োজনীয় বৃক্ষের ওপর নেমে এসে বসে তবে অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে এদের নষ্ট করা হয়। এ কাজ খুব ভোরবেলায়



অগ্নিনিক্ষেপক যন্ত্র।

করতে হয়। বিশ্রামকালীন অবস্থায়, যৌন-সম্ভোগের সময় কিংবা ডিমপাড়ার সময় এরা সঞ্চরণশীল নয়, সাধারণত এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। সে সময় হাতে পিয়ে মারতে গেলে বহু পরিশ্রম ও সময়ের দরকার। অগ্নি-নিক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে এই অবস্থায় পঙ্গপাল নিধন বেশ সহজ। পতঙ্গের ডানাহীন হপার অবস্থায় ধোঁয়া বা মশাল প্রয়োগ করা হয়। অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অভিজ্ঞ লোক দিয়ে চালান দরকার নতুবা বিপদাশঙ্কা আছে।

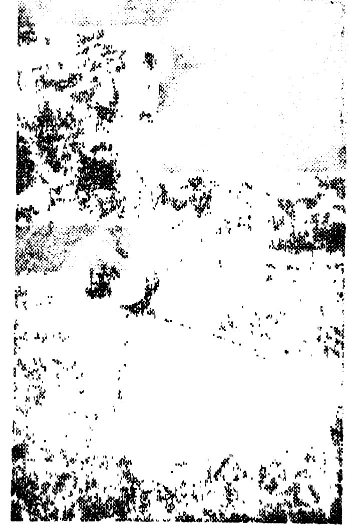
পঙ্গপাল ধ্বংসের জন্য আজকাল নানারকমের কীটনাশকের প্রচলন হয়েছে। এই সব বিভিন্ন কীটনাশক গুঁড়ো পতঙ্গের গায়ে লাগলে হপারগুলো সহজেই মরে যায়। বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড (গামা আইসোমার) ডানাহীন পতঙ্গ দমনে বেশ ভাল ফল দিয়েছে। ডানাহীন পতঙ্গের ছোট বা প্রাথমিক অবস্থায় এই কীটনাশক ঔষধের শতকরা ৫ ভাগ বিশিষ্ট গুঁড়াই যথেষ্ট মারাত্মক। অবস্থা ভেদে বেশী শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। মাঠে ছড়ানোর সময় এই ঔষধের সঙ্গে রাস্তার শুকনো ধুলো, ছাই ইত্যাদি মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের দোকানে বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড কিনতে পাওয়া যায়। চূর্ণ ছড়ানোর যন্ত্র দিয়ে ভোর বেলায় অথবা সন্ধ্যাবেলায় পঙ্গপাল ঢাকা ঝোপ ঝাড়ে ছড়িয়ে দিলে এরা মরে যায়। ডাই নাইট্রো, অর্থো সেরল (DNOC) আর একটি পতঙ্গ নাশক বিষ। কোন কোন দেশে এই রাসায়নিকের ব্যবহার বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। তবে তীব্র বিষ বলে এর ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। গবাদি পশুর প্রাণনাশের সম্ভাবনা ও যেখানে সেখানে এর ব্যবহার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে ভারতে ব্যাপকভাবে এই কীটনাশকের প্রচলন হয়নি।

কীটনাশক চূর্ণ প্রয়োগের জন্য নানা-প্রকারের যন্ত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের শস্যরক্ষা শাখায় খোঁজ নিলে এরজন্য উপযুক্ত নানাপ্রকারের যন্ত্র সম্বন্ধে জানা যাবে। প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্যও এরা যন্ত্র দিয়ে সাহায্য করে থাকেন।

পঙ্গপালের ঝাঁক শস্যক্ষেত্রে নেমে এসে শস্য নষ্ট করবার আগেই চাষীরা মাঠে নেমে এদের বিতাড়িত করে থাকেন। এই চিরাচরিত প্রথায় সাময়িকভাবে পঙ্গপাল ঠেকিয়ে রাখা হয়। বলা বাহুল্য কিছু ক্ষেত এইভাবে রক্ষা করা গেলেও এতে কোন স্থায়ী ফল লাভের আশা নেই।

পতঙ্গনাশের জন্য কীটনাশক টোপও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পতঙ্গের কোনও খাদ্যের সঙ্গে কীটনাশক বিষ ও পরিমাণমত জল মিশিয়ে টোপ তৈরী করা হয়। সোডিয়াম আরসেনাইট, সোডিয়াম ফ্লুয়ো সিলিকেট, বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড প্রভৃতি নানারকমের রাসায়নিক টোপে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সোডিয়াম আরসেনাইট পতঙ্গনাশে খুব কার্যকরী হলেও অত্যন্ত তীব্র বিষ বলে আমাদের দেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড অনেক দেশে টোপে ব্যবহৃত হলেও ভারতে ব্যাপকভাবে পতঙ্গ নিধনে পরীক্ষিত হয় নাই। সোডিয়াম ফ্লুয়োসিলিকেট অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত হলেও বেশ কার্যকরী। এতে আর একটা সুবিধা এই যে, খুব বেশী পরিমাণ না খেলে গবাদি পশুর কোন জীবনাশঙ্কা নাই। ৩৩ সের গম বা ধানের কুড়ার সঙ্গে ১ সের সোডিয়াম ফ্লুয়োসিলিকেট প্রথমে হাত দিয়ে বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজন মত জল দিয়ে ময়দা মাখার মত মেখে নিতে হয়। ভোরবেলা একর প্রতি ১০ থেকে ২০ সের টোপ মাঠে ভেজা ভেজা অবস্থাতেই ছড়িয়ে দিতে হয়। টোপ এমনভাবে জল দিয়ে মাখা দরকার যাতে মাঠে ছড়িয়ে দিতে গেলে আপনা থেকেই গুঁড়া হয়ে সমস্ত মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। পঙ্গপাল আহার্যের জন্য দল বেঁধে নেমে এসে এই টোপে আকৃষ্ট হয় এবং বিষের টোপ খেয়ে মারা যায়।

হপার বা ডানাহীন অবস্থায় এরা মাটির ওপর দঙ্গল বেঁধে লাফিয়ে চলে। বিষাক্ত টোপ এদের দঙ্গলের ওপর ছড়িয়ে দিতে হয়। দল যেদিকে এগুতে থাকে সেই যাত্রাপথে দলের সামনে আড়াআড়িভাবে বেশ চওড়া করে টোপ ছড়িয়ে দিতে হয়। এই চওড়া বিষ-টোপের

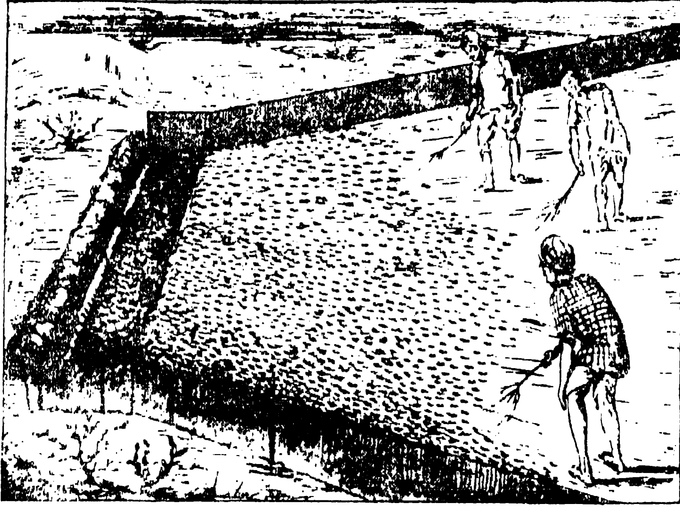


যন্ত্র দিয়ে কীটনাশক গুঁড়ো ছড়ান হচ্ছে।

এলাকা ডানাহীন পতঙ্গদের লাফিয়ে পার হওয়া সম্ভব হয় না। গতিপথের সামনে আহার্য পেয়ে বুভুক্ষু পতঙ্গের দল সাগ্রহে এই বিষাক্ত টোপ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

ডিম নষ্ট করা :—

পতঙ্গের জীবন বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় যে এদের ডিম অবস্থায় ধ্বংস করাই সব চাইতে সহজ, সস্তা ও প্রকৃষ্ট। ডিম অবস্থায় নষ্ট করতে পারলেই লক্ষ লক্ষ বংশধরদের গোড়াতেই ধ্বংস করে ভবিষ্যতকে অনেকটা নিরাপদ রাখা যায়। আগেই বলেছি যে, আর্দ্র বালুর মধ্যে স্ত্রী পতঙ্গ ডিম পাড়ে। এর জন্য পতঙ্গ অধ্যুষিত বিশেষ বিশেষ জায়গায় বারিপাতের নির্ভুল হিসাব রাখার প্রয়োজন। ডিমপাড়ার জায়গা নির্ণয় করে চিহ্নিত করে রাখতে হয়। ডিমের গর্ত কাছাকাছি জায়গায় থাকার জন্য গর্ত খুঁজে ডিম নষ্ট করে দেওয়া কর্তব্য। অবশ্য এতে সমস্ত ডিম নির্মূল করা সম্ভব নয়। সেইজন্য চিহ্নিত এলাকার চারদিকে পরিখা খুঁড়ে রাখা দরকার। ডিম ফুটে হপার বেরুলে পর পরিখা পার হতে না পেরে সহজেই তার মধ্যে গিয়ে পড়ে ও মরে যায়।



পরিখা ও খেদার সাহায্যে পঙ্গপাল ধ্বংস করা হচ্ছে

হপারের সংখ্যা বেশী হলে পরিখায় মাঝে মাঝে গভীর গর্ত খুড়ে দেওয়া হয় যাতে পরিখায় পতিত হপারগুলোকে জড় করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়। প্রয়োজন হলে গর্তের মধ্যে কিছু কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে হপার-গুলোকে মারা যায়। মাটির প্রকার ভেদে ও হপারের বয়স ও দলগত সংখ্যার তারতম্যে পরিখার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোট অবস্থায় পরিখা এক ফুট প্রস্থ ও দেড় ফুট গভীর হলেই চলে। হপারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিখার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ক্রমে বাড়িয়ে পঞ্চম অবস্থায় আড়াই ফিট চওড়া ও দুই ফিট গভীর করা দরকার। পরিখার দুই ধার খাড়া হওয়া উচিত। পরিখার উপরিভাগ তলদেশের চাইতে ক্রমে চাপা হলে বেশ কার্যকরী হয়। হপার যাতে পরিখার ধার বেয়ে ওপরে উঠে না আসতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। পরিখার উপরিভাগে দুইধার আমেরিকান অয়েল ক্লথ দিয়ে মুড়ে দিলে আরও বেশী মসৃণ ও কার্যকরী হয়। দুই ধারে গর্তমুখে একটু বাড়িয়ে ধাতবপাত পেতে দিলেও বেশ ভাল হয়। অনেক সময় চিহ্নিত স্থানের অন্তর্বর্তী হপার দলকে বাঞ্ছিত পথে পরিখার মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য জায়গায় জায়গায় পথের দুইধারে টিনের বেড়া দিয়ে খেদা তৈরী করা হয়।

হপার ধ্বংস :—

আহার্য ভেদে ও আবহাওয়ার তারতম্যে ডানাহীন অবস্থায় পতঙ্গ ৪ সপ্তাহ থেকে ৬৷ সপ্তাহ পর্যন্ত কাটাতে পারে। বসন্ত বা শীতকালে এই অবস্থা আরও বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে। ধেড়ে অবস্থার চাইতে এই **অবস্থাতেই পঙ্গপাল ধ্বংস করা সহজ।**

পরিখায় বেষ্টনী দিয়ে হপার ধ্বংস করা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মাঠে কূপ বা পুষ্করিণী থাকলে সেগুলোকেও হপার ধ্বংসের জন্য পরিখার অনুরূপ কাজে ব্যবহার করা চলে। জলের ওপরে কেরোসিন ঢেলে দিলে কাজ ভাল হয়।

বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক কীটনাশক দিয়ে হপার মারার কথা বলেছি। ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন স্পর্শ বিষ হপারের পক্ষে মারাত্মক হলেও কিছু ব্যয়সাপেক্ষ। এদের স্পর্শই মারক, খাবার প্রয়োজন নেই। সস্তা কেরোসিন তেল অথবা কেরোসিন তেল মিশ্রিত সাবানের জল স্পর্শবিষ হিসাবে হপার নাশে প্রয়োগ করা যায়। ফসলের ওপর অথবা যেখানে সেখানে কেরোসিন ঢালবার যুক্তি সমীচীন নয়, বিশেষত আজকাল-কার দিনে। তবে পরিখার গর্তে যখন শত শত হপারের ভীড় জমে যায়, তখন সারাদিন ধরে তাদে ঠেঙিয়ে মারার চাইতে স্তূপীকৃত হপারের ওপর কিছু কেরোসিন ঢেলে মারা সহজ। এ ছাড়া বিষের টোপ হপার ধ্বংসে ব্যবহার করা হয়।

প্রাকৃতিক শত্রুতেও কিছু কিছু পঙ্গপাল ধ্বংস করে থাকে। ফিঙে ময়না প্রভৃতি কয়েক রকমের পাখী দেখতে পাওয়া যায় যারা পঙ্গ-পালভুক। এই সব পাখী সযত্নে রক্ষা করা উচিত। আধুনিক যুগে জীবাণু যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা করে থাকেন। জীবাণুজনিত অথবা ছত্রাকজনিত রোগ ঘটিয়ে পঙ্গপাল ধ্বংস বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার বাইরে নয়; কিন্তু কার্যত আজও কোন পন্থা ফলবতী হয়েছে বলে জানা যায় নি।

আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ আন্দোলন

পঙ্গপালের জীবনবৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এদের আক্রমণ প্রতিহত করে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কয়টি দ্বিদলীয় চুক্তি ছাড়া এবিষয়ে বাঞ্ছিত সহযোগ আসে নি। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ যৎসামান্য পঙ্গপাল দমনের কাজ করেছে বটে, তবে পঙ্গপালের আবির্ভাবে একপক্ষ অন্যপক্ষকে গাফিলতির জন্য দোষারোপ করেছে বেশী। আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ আন্দোলন গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা দেয়। এই সময় পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে পঙ্গপাল আবির্ভাবের আশঙ্কা করা হয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সহজেই এইসব জায়গায় ব্যাপকভাবে পতঙ্গ দমন অভিযান গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধের শ্রমিক ও যানবাহন করে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ থেকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পঙ্গপাল উচ্ছেদ করা হয়। এই অভিযান শুরু হয় ১৯৪৩ সালে। বর্তমানেও কিছু কিছু কাজ চলছে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের ঐ সঙ্ঘবদ্ধ অভিযানে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচালিত ব্যাপক অভিযানে পঙ্গপাল দমন অসম্ভব নয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এই অপরিমিত ব্যয় যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই সম্ভব।

তবে কি পতঙ্গ দমন সম্ভব হবে না? এযাবৎ ভারত, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জায়গায় নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত গবেষণার ফলে জানা যায় যে, পঙ্গপাল সর্বদা দলবদ্ধ থাকে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভেদে ও আহার্যের প্রাচুর্যে 'একক' পতঙ্গ দল-বদ্ধ পঙ্গপালে রূপ নেয়। অনিষ্টকারিতায় একক পতঙ্গ ভয়াবহ নয় বটে তবে অবস্থান্তরে ভীতির কারণ বলে উপেক্ষণীয় নয়। খুব নির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি জায়গাতে এদের এই অবস্থান্তর ঘটে থাকে এবং একক পতঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে থাকে। এই বিশেষ স্থান-গুলোকে নির্দিষ্ট রেখে সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি স্থানে পাহারা দেওয়া দরকার। এই স্থানগুলি বহু রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত বলে প্রহরার প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে সহযোগের প্রয়োজন। আক্রান্ত দেশ ও সেখান থেকে অন্যান্য যে সমস্ত রাষ্ট্রে আক্রমণের আশঙ্কা করা হয় তাদের সম্মিলিত অর্থে ও সদিচ্ছায় এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়া সম্ভব। ১৯৪৬ সালে এইভাবে লাল পঙ্গপালের আবির্ভাব দমনের জন্য ইঙ্গ-বেলজিয়ান প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। সেবার পারস্পরিক সহযোগিতায় এই মহা-শত্রু সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে দমন করা গিয়েছিল। ভ্রাম্যমাণ পঙ্গপাল দমন করার জন্যও এরকম . কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মরুপতঙ্গ দমনের জন্যও এরকম প্রতিষ্ঠান

গঠন করা কল্পনাধীন রয়েছে। পূর্ণ সহযোগের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে পঙ্গপাল দমন যে সম্ভব সেটা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। আজ তাই সবচাইতে বেশী প্রয়োজন প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করে সমবেতভাবে এই মানব-শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করা। দিকে দিকে আর্তমানবের আজ অন্নের জন্য হাহাকার তার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। মানবের ভেদবুদ্ধি আর হানাহানি আজ শান্ত হোক! জেগে উঠুক মানবের শুভবুদ্ধি তার পঙ্গু ও আতঙ্কিত জীবনকে করে তুলুক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়।

বেতার প্রসঙ্গ

বেতারে বাঙলার প্রাচীন রচয়িতাদের গান

গত কয়েক মাস যাবৎ কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য "বাঙলার বাউল" নাম দিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। এর মধ্যে তিনি লালন ফকির, ফিকিরচাঁদ ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গান বিষয়ে মোটামুটি পরিচয় দিয়ে তাঁদের গান শুনিয়েছেন। সেই রকম "বাঙলার নিজস্ব সম্পদ" নামে আর একটি আসর বসতো। তাতেও বাউল ও অন্যান্য হরেক রকমের পল্লীগান গেয়ে শোনান হয়েছে পরিচয় সমেত। বেতারের এই পরিকল্পনাটিকে আমরা সমর্থন করি। এ ধরণের আসর সাজানো হোক এই আমরা চাই। তাতে যেন ভেজাল না থাকে।

বাঙলা দেশের সব সঙ্গীতেরই প্রথম বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের একতায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুরকার ও কবি সাধারণত হন একই ব্যক্তি। পল্লীবাসীদের গান থেকে শুরু করে এ যুগের শহরের শিক্ষিত কবিদের রচিত গানের মধ্যে একই নিয়ম লক্ষ্য করি। অর্থাৎ গানের কথা যাঁরা রচনা করেন সুরও দেন তাঁরাই। এবং তাঁদেরই গান বাঙলা গান হিসেবে সাধারণত মর্যাদা পেয়ে থাকে গানের আলোচনায়।

আমাদের দেশের গানের সুরকে কথার সঙ্গে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। বাঙলাভাষার কাব্যমাত্রই ছিল গান। সুর ও ছন্দে মিলিয়ে প্রাচীনকালের সব রকম বাঙলা কাব্যকেই গেয়ে শোনানো হতো। আমরা বাল্যকালে বাঙলা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ-করতে শুনেছি সুরে ও ছন্দে। যদিও তার সুর ও ছন্দ এক রকম ও বৈচিত্র্যহীন, তবুও তাতে যে রসটি পাওয়া যেত তাতে মন আকর্ষণ করেছে। হিন্দী ও উর্দু ভাষার কবিদের মধ্যে সুরে বা রাগিণীতে গান গেয়ে কবিতা পাঠ করতে হামেসাই শোনা যায়। বাঙলা কবিরা আজকাল কবিতাকে সেভাবে পড়েন না, কিন্তু সাম্প্রতিক কবিরা ছাড়া পূর্বের খ্যাতনামা প্রায় সব কবিই আলাদা গান রচনা করে গেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় গানের সুরের একটা বিশেষ প্রয়োজন আমাদের দেশের কবিরা চিরকালই অনুভব করে এসেছেন। গানের সুরে কবিরা কবিতা পাঠ করতে যে চাইতেন, তারও একটা বিশেষ কারণ ছিল। কবিরা তাঁদের কোন বিশেষ হৃদয়াবেগকে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেও মনে তৃপ্তি বোধ করতেন না, মনে করতেন আরো কিছু দরকার ভাবটিকে ফোটাতে হলে। সেই আরো কিছুরই ইঙ্গিত তাঁরা পেতেন সুরের আশ্রয়ে। কবিতাটির মধ্যে যে অপরিস্ফুটতা ছিল মনে হোত, সুরের আশ্রয়ে তা যেন দূর হয়ে গেল। এইভাবে কবিতাটি আরো মাধুর্যে বিস্তার করে শ্রোতার মনে একটি গভীর রসের সৃষ্টি করে। কবিতায় সুর যোজনার এইটিই হল প্রকৃত রহস্য। কবিরা নিজেই যখন তাঁদের কবিতায় সুর যোজনা করেন, তখন কথায়-মেশা সেই সুরেরও নিজস্ব একটি বিশেষ রূপ দেখা দেয় কথার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দরুণ। গানের সঙ্গে জড়িত এই ধরণের একটি বিশেষ সুর-রূপের মূল্যটিকে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। তাকে কোন রকমে অবহেলা করা উচিত হবে না। সুতরাং বাঙলাদেশের গান নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনাকালে আমাদের সব সময় চেষ্টা করা উচিত যে, কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরটিও যেন খাঁটি জিনিস হয়। অর্থাৎ যিনি রচয়িতা তাঁরই রচিত খাঁটি সুরটিও যেন সংগ্রহ করে শোনাবার চেষ্টা করা হয়।

সুর ছাড়া নানা ঢংয়ের বাঙলা গানের গীত-পদ্ধতিরও একটি বিশেষত্ব আছে। সেটিকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। যেমন কোন কোন লোকসঙ্গীতে লক্ষ্য করেছি যে, গায়ক গানের সুর নিয়ে আলাদা করে কোন প্রকার সুর বিহার করে না, কিন্তু গানের একই পংক্তিকে এমনভাবে নানাপ্রকারে বারে বারে পুনরুক্তি করেন যে, তাকেই অনায়াসে বলা চলে সুর-বিহার। প্রত্যেকবার একই পংক্তি আপন মর্যাদা ঠিক রেখে গায়কের মুখে নানাভাবে সুর-ছন্দে নতুন করে রূপ নিচ্ছে।

'বাঙলার বাউল', 'বাঙলার নিজস্ব সম্পদ' বা 'বাঙলার মায়া' নামে যে তিনটি আসর বেতারে প্রচারিত হচ্ছে, তার পরিচালকগণ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলেই তাঁদের আমরা অনুরোধ করি, বাঙলার প্রত্যেক গানের এই দুইটি দিকে তাঁরা যেন বিশেষভাবে নজর দেন। গানের কথা পাওয়া বিশেষ কঠিন নয়। ফিকিরচাঁদ, লালন বা কর্তাভজাদের বা অন্যান্য আরো নানা রকমের প্রাচীন গানের কথা নানাপ্রকার সংগ্রহের বইয়ে ছাপা পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন হল সেই সব গানের মূল সুর ও তার গাইবার আসল ঢংটিকে খুঁজে পাওয়া। আমরা চাই বেতারের এই আসরে তাঁরা সুর বিষয়েও যেন আরো সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেন। কি উপায়ে খাঁটি সুর সমেত গানগুলিকে পাওয়া যেতে পারে, সেদিকে তাঁরা আরো মনোযোগ দিন।

এই আসরের আনন্দের দিকটি ছাড়া তার শিক্ষামূলক প্রচারের দিকটিকেও ভাবতে হবে। সেই জন্যেই এত কথার অবতারণা আমাদের করতে হলো। পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি সব বেতার-কেন্দ্র থেকে মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর ইত্যাদি উচ্চ সাধকদের গান আজকাল যেভাবে শোনানো হয়, এই আসরগুলি সেই আদর্শে প্রচারিত হলে অবশ্য অন্য কথা। শোনা যায়, মধ্যযুগের ঐ সব সাধকদের গীত-সংগ্রহের বই থেকে বেতারের পরামর্শমত গায়করা নিজেরাই সুর দিয়ে গান গেয়ে থাকেন। তার দ্বারা মূল সাধকদের সুরযোজনার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কখনো শুনে মনে হয়, এ যুগের সিনেমার গান, কখনো মনে হয়, ওস্তাদের দ্রুতলয়ের ত্রিতালা ছন্দের খেয়াল গান বা প্রচলিত ঠুংরী ঢংএর গান। অথচ যে সময়ে এই সব গানের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই সময়ের ঐ সব ঢংএর গানের প্রচলন ছিল বলে শোনা যায় না। কিন্তু মূল রচয়িতার প্রযোজিত সুরে ও ঢংএ আজ যদি তাকে শুনতে পেতাম, তাহলে তা এমন একটি ঢংএর গান হতো যা এখনকার প্রচলিত ঢংএর সঙ্গে হয়তো কোন দিকেই মিলত না। আর তার রসটিও মনকে নিশ্চয়ই এমনভাবে আকর্ষণ করতো যে, তখন বর্তমান ঢংএর ঐ একই গান শুনতে ইচ্ছা করতো না।

আমরা জানি, প্রাচীন গানের নিখুঁত সুর ও তার গাইবার ঢং আজকাল অনেক ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু এও জানি যে, প্রাচীন এই সব গীত-সম্প্রদায় আজও পল্লীর আনাচে কানাচে অলক্ষ্যে বাস করছে। তারা আজো গান গায় এবং গেয়ে আনন্দ করে। তাদের মধ্যে একটা গুণ হল তারা গুরুপরম্পরায় যে জিনিস একবার গ্রহণ করে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে, তার পরিবর্তন সহজে ঘটতে দেয় না। তবে একথা ঠিক, নিজে যখন নতুনভাবে কিছু রচনা করে, তখন পরিবর্তন হয়। কিন্তু পূর্বতন রচনাকে নিজের ইচ্ছামত বদলায় বলে শোনা যায় না।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩২

লেখাপড়ার চর্যা অতিক্রম করে যখন আমরা জীবন-সংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি, সেই তরুণ বয়সে একটু নষ্টামি করা আমরা একটা বিলাসের মধ্যে পরিগণিত করতাম। নষ্টামি আমরা করতাম স্রেফ্ নষ্টামিরই জন্য। আমরা অর্থে সুরেনদাদা, গিরীন এবং আমি ক্ষণকালীন একটা হাল্কা আনন্দ উপভোগ করার অতিরিক্ত আমাদের নষ্টামির অপর কোনও সুদূর উদ্দেশ্য থাকত না।

সুতরাং আমাদের নষ্টামিকে 'অনিষ্টামি' (অনিষ্ট+আমি) বলা চলত না; এমন কি দুষ্টামিও নয়। আমাদের নষ্টামি ছিল কৌতুকপরায়ণতার কতকটা সগোত্র আত্মীয়। তার দ্বারা মধ্যম পক্ষকে যে-পরিমাণ বেকুব বানানো সম্ভব হোত, তার অনেক গুণ কৌতুকান্বিত করা চলত উত্তম পক্ষকে। এক পক্ষ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত বটে, কিন্তু অপর পক্ষ লাভবান হোত অনেক বেশী। লাভ-লোকসানের সাধারণ নিয়মই এই। একেবারে 'নঞ' (nothing) থেকে বস্তু উৎপন্ন করা যায় না। কক্ষকে আলোকিত করতে হ'লে কোথাও একটা দহন অথবা ঘর্ষণের কার্য চালাতেই হয়। তেল না পোড়ালে আলোক পাওয়া যায় না; ঘর্ষণের দ্বারা তন্তুকে (filament) ক্রুদ্ধ ক'রে তুললে তবে সে তন্তু কিরণ বিকিরণ করে। সুতরাং নষ্টামির দ্বারা মধ্যম পক্ষকে বেকুব বানাতে না পারলে, উত্তম পক্ষকে আনন্দে উদ্ভাসিত করাই বা যায় কেমন ক'রে।

গিরীন ছিল আমাদের মধ্যে ভাল মানুষ; তাই তার মস্তিষ্কে নষ্টামির উদ্ভাবনা-শক্তির কিছু অসদ্ভাব ছিল। আমরা কাটতাম সিঁধ, গিরীন বইত মাল। অর্থাৎ, আমরা ছিলাম এঞ্জিনীয়ার, সে ছিল বড়জোর আমাদের সাহায্যকারী ওভারসীয়ার। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ছিলেন কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে দাদার এক ভায়রা-ভাই। তিনি আমাদের বিরুদ্ধেও নষ্টামি করতে ছাড়তেন না। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল উচ্চ মানের। এমন পরিচ্ছন্ন নিপুণতার সহিত তিনি তাঁর কার্য সমাধা করতেন যে, উৎপীড়িত ব্যক্তির চিত্ত লাল হ'য়ে উঠত একদিক ক্রোধে, আর একদিক খুসিতে। একটা উদাহরণ দিই।

আমরা তখন ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়া রোডে বাস করি। সকালেই কামিনীবাবু আমাদের গৃহে এসেছেন। সারাদিন আমাদের সঙ্গে অতিবাহিত ক'রে অপরাহ্ণকালে ফিরে চলেছেন। কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে আমার প্রয়োজন ছিল, আমিও তাঁর সঙ্গে চলেছি। ট্রামে উঠে কামিনীবাবু জানালার ধারে একটা সীটে উপবেশন করলেন, আমি বসলাম তাঁর পাশে। লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় ছাড়াবার পর টিকেটের জন্যে কণ্ডাক্টার আমাদের নিকটে উপস্থিত হ'ল। টিকেটের ঠিক মূল্যটি দিয়ে কামিনীবাবু তাঁর নিজের টিকিট কিনলেন। মণিব্যাগ থেকে আমি একটা ঝকঝকে কর্‌করে নূতন টাকা বার করে কণ্ডাক্টারের হাতে দিয়ে বললাম, "শ্যামবাজারের টিকেট দাও।" সে সময়ে ট্রামে ট্রান্সফার টিকেট পাওয়া যেত।

টাকার মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে পাঞ্চিং যন্ত্রের উপর না বাজিয়ে শুধু এ-পিঠ ও-পিঠ দুদিক একটু দেখে নিয়ে কণ্ডাক্টার ব্যাগের মধ্যে টাকাটা ফেললে; তারপর ব্যাগটা একটু কাতকরে ধ'রে সামনের দিকে এক রাশ রেজকি টেনে এনে চেঞ্জ গুণতে প্রবৃত্ত হল।

ঠিক এই গুরুতর মুহূর্তে মাত্র দুটি কথার সাহায্যে যৎপরোনাস্তি নিপুণতার সহিত কামিনীবাবু অপকর্মটি সম্পন্ন করলেন। আমার প্রতি একবার নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে কপট চাপা গলায়, অথচ কণ্ডাক্টরের শ্রুতিপথে তাঁর কথা পোঁছতে যাতে অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হ'য়ে বললেন, "টাকাটা চালালেন?"

ব্যস' আর যায় কোথায়! নিমেষের মধ্যে ব্যাগ সোজা ক'রে রেজকিগুলো ব্যাগের তলার দিকে ফিরিয়ে পাঠিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "ছি, ছি! দেখুন দেখি, অন্যায় কথা! আমি গরিব মানুষ, এক টাকা যদি দণ্ড দিতে হয়, তা হ'লে কি ক'রে চলে বলুন ত'!" তারপর ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঝনোর-ঝনোর ক'রে টাকা পয়সাগুলো নাড়তে এক-একটা টাকা বার ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলে।

আমি বললাম "শোন কণ্ডাক্টার, যে টাকা তোমাকে আমি দিয়েছি, তার চেয়ে ভাল টাকা গভর্নমেণ্টের টাঁকশালে তৈরি হয় না। এই ফ্যাসাদে-বাবু তোমাকে আর আমাকে এক সঙ্গে ফ্যাসাদে ফেলেছেন।

ফ্যাসাদে-বাবু তখন ভিজে বেড়ালটির মতো নিঃশব্দ নির্বাক হ'য়ে চৌরিঙ্গি রোডের গাড়ি ঘোড়া লোক চলাচলের মধ্যে আত্মনিবিষ্ট হয়েছেন। একটা যে বিশ্রী রকমের গোলমালের সূত্রপাত করছেন, সে বিষয়ে যেন একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। সম্পূর্ণ নির্বিকার! এ দিকে কণ্ডাক্টার সমানে ব্যাগ থেকে টাকা তুলে তুলে পাঞ্চিং মেশিনের উপর বাজিয়ে পরীক্ষা করে চলেছে।

ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে বললাম, "যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি টাকা বাজিয়ো, আপত্তি নেই; কিন্তু তার আগে আমার টিকিট আর চেঞ্জ দাও।"

"দাঁড়ান মশাই! টিকিট আর চেঞ্জ!" ব'লে কণ্ডাক্টার আমার পাশ থেকে কামরার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, এক-এক জনকে সে টিকিট দিচ্ছে আর ব্যাগের মধ্যে হাতপুরে ঝনোর ঝনোর শব্দ ক'রে মেকি টাকা খুজছে।

ডান কনুই দিয়ে কামিনীবাবুকে একটু ঠেলা মেরে অপ্রসন্ন সুরে বললাম, "কি মানুষ বলুন ত আপনি! হঠাৎ অকারণ একটা কথা ব'লে এমন গোল বাধিয়ে দিয়েছেন যে, আমার অমন চকচকে নতুন টাকাটা বিশ হাত জলের তলায় গিয়ে পড়েছে!"

ভালোমানুষের মতো নিরীহভাবে কামিনী-বাবু বললেন, "পার্ক স্ট্রীট ত ছাড়িয়ে এসেছি, লিন্ডসে স্ট্রীটের মধ্যে ইন্সপেক্টার যদি না ওঠে, তা হ'লে দুর্গা দুর্গা ব'লে লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে নেবে প'ড়ে এসপ্লানেড্ পর্যন্ত বাকি পথটুকু হেঁটে মেরে দিলেই হবে। তবু গোটা-কয়েক পয়সা বাঁচবে ত।"

প্রস্তাব শুনে পিত্ত জ্বলে উঠল! তিক্ত কণ্ঠে বললাম, "চালাকি না কি? কি এমন অপরাধ করেছি শুনি যে, অমন খাঁটি টাকাটা ছেড়ে দিয়ে দুগ্‌গো দুগ্‌গো ব'লে ট্রাম থেকে নেমে পড়তে হবে? রাত দশটা পর্যন্ত ট্রামে ব'সে থাকব, কেমন না দেয় দেখি!"

ক্ষণকাল পরে আমাকে পাশ কাটিয়ে কণ্ডাক্টার পিছন দিকে যাচ্ছিল, রূঢ়কণ্ঠে বললাম, "কণ্ডাক্টার, আমার টাকাটা ফিরিয়ে দাও, আমি তোমাকে অন্য টাকা দিচ্ছি।"

কণ্ডাক্টার বললে, "আপনার টাকা খুঁজে বার করতে পা'রলে ফিরিয়েই ত' দিতাম।"

"তবে আমাকে টিকিট আর পয়সা দাও!"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "কি আশ্চর্য! ধর্মতলা পর্যন্ত আপনি ত যাচ্ছেনই, একটু সবুর করুন না, আর একটু খুজে দেখি।"

বললাম, "না, আর তোমার খুঁজতে হবে

না। এখন খ‍ুজে পেলেও সে টাকা আমি নোবো না।"

সবিস্ময়ে কণ্ডাক্টার বললে, "কেন?"

"সে টাকা তুমি যে আর কারো কাছে পাওনি, সে টাকা যে আমার দেওয়াই টাকা, তার প্রমাণ কি দেবে তুমি?

ঈষৎ উষ্মার সহিত কণ্ডাক্টার বললে, 'এ কথার মানে কি হ'ল মশাই?

পিছনের সীটে ব'সে দ‍ুটি ভদ্রলোক বোধহয় আগা-গোড়া সব কথা শ‍ুনেছিলেন; তদের মধ্যে একজন গর্জন করে উঠলেন, "মানে ঠিকই হ'ল। ও টাকা তোমার ব্যাগের মধ্যে মিশিয়ে ফেলার পর আর কোনো টাকাই তুমি ফেরৎ দিতে পার না!"

উক্ত ভদ্রলোকের প্রতি একবার তীব্র দ‍ৃষ্টিপাত ক'রে আর কোনো কথা না ব'লে আমাকে টিকিট ও বাকি পয়সা দিয়ে কণ্ডাক্টার প্রস্থান করলে।

এসপ্ল্যানেডে নামবার সময়ে দেখি ঘণ্টির দড়ি হাতে ধ'রে আমার দিকে তীক্ষ্ণনেত্রে চেয়ে কণ্ডাক্টার দাঁড়িয়ে আছে। দেখে কেমন মায়া হ'ল; বললাম, "ফ্যাসাদে-বাব‍ুকে চিনে রেখো কণ্ডাক্টার। আবার যেন কোনো দিন ওঁর ফ্যাসাদে না পড়।"

গম্ভীর ম‍ুখে কামিনীবাব‍ু বললেন, "এ বাব‍ুটিকেও ভাল ক'রে চিনে রাখতে ভুলো না। যে টাকা ইনি তোমাকে দিয়েছেন, অন্ততঃ আরও গোটা পাঁচেক সেই রকম টাকা এর মণিব্যাগে আছে।"

কামিনীবাব‍ুর কথা শ‍ুনে নিমেষের মধ্যে দ‍ুই চক্ষ‍ু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। বিদ্বেষ-বির‍ূপ কণ্ঠে সে বল্‌লে, "দেখ‍ুন দেখি কি অন্যায় আপনার! তা হ'লে সত্যি সত্যিই একটা টাকা আমার জলে গেল!

হেসে উঠে বললাম, "আবার তুমি এরই মধ্যে ফ্যাসাদে-বাব‍ুর ফ্যাসাদে পড়েছ কণ্ডাক্টার। ফ্যাসাদে-বাব‍ু থেকে তোমার নিস্তার নেই দেখ‍ছি।"

ফ‍ুটবোর্ড থেকে মাটিতে নেমে পড়লাম।

সজোরে দ‍ুবার ঘণ্টি মেরে তীক্ষ্ণ নেত্রে আমার প্রতি অগ্নিবর্ষণ ক'রে কণ্ডাক্টার বললে, "ফ্যাসাদে-বাব‍ু উনি নন‍্, আপনি।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে-বললাম "শ‍ুনছেন কামিনীবাব‍ু?

"তুমি মহারাজ সাধ‍ু হ'লে আজ
আমি আজ চোর বটে!"

শ্যামবাজারের গাড়ি ছাড়বার উপক্রম করছিল। দ‍ুজনে ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে গিয়ে পড়লাম।

এবার স‍ুরেনদাদার দ্বারা উদ্ভাবিত ও পরিচালিত একটা কাহিনীর কথা বলি। এই কাহিনীতে যে নষ্টামিট‍ুকু করা হয়েছিল তাকে ষোল-আনা নির্দোষ বলা যেতে পারে। আঠার-আনা বলতেও বোধকরি অন্যায় হয় না, কারণ উক্ত নষ্টামির দ্বারা স‍ুরেনদাদা উত্তম পক্ষকে যত না খ‍ুশি করেছিলেন, তার চতুর্গ‍ুণ স‍ুখী করেছিলেন মধ্যম পক্ষকে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি ভবানীপ‍ুরে কাঁসারীপাড়া রোডে বাস করি। স‍ুরেনদাদা ও গিরীন থাকতেন ভিক্টোরিয়া হোস্টেল নাম শিয়ালদহ অঞ্চলের এক মেসে। প্রতি সপ্তাহে শনিবারে শনিবারে তাঁরা আমাদের ভবানীপ‍ুরের বাড়িতে আসতেন; ফিরে যেতেন রবিবার বৈকালে অথবা সোমবার সকালে। সোমবারে ফিরলে জগ‍ুবাব‍ুর বাজারের মোড়ে ট্রাম লাইন পর্যন্ত তাঁদের এগিয়ে দিয়ে আসতাম; রবিবারে কিন্তু এগিয়ে দেবার বহরটা একট‍ু দীর্ঘ হোত। সাধারণতঃ পার্ক স্ট্রীটের মোর পর্যন্ত ত' হোতই; উৎসাহিত বোধ করলে, অথবা আলোচনাধীন কোনো চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধের পরিসমাপ্তির বিলম্ব থাকলে, এসপ্ল্যানেডের মোড় পর্যন্ত দৌড় মারতেও ছাড়তাম না। সেখান থেকে স‍ুরেনদাদা ও গিরীন অগ্রসর হতেন ভিক্টোরিয়া

হোস্টেলের অভিমুখে আমি ফিরতাম কাঁসারীপাড়া রোডে।

একটা রবিবারের পালা চলেছে। চৌরঙ্গীর ফুটপাথ ধ'রে আমরা উত্তর মুখে চলেছি। প্রসঙ্গটা সেদিন আমাদের মধ্যে যা চলছিল তা শোনবার পক্ষে উৎকৃষ্ট, কিন্তু শোনাবার পক্ষে কিছু কুণ্ঠাসঙ্কোচসাপেক্ষ। সুতরাং সেদিনকার দৌড় পার্ক স্ট্রীটে শেষ হবার মতো ছিল না, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে।

গ্র্যান্ড হোটেলের বারান্দার তলা দিয়ে আমরা তিনজনে গুটি গুটি চলেছি, এমন সময়ে অদূরে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'ল গ্র্যান্ড হোটেলের এক প্রৌঢ় মুসলমান খানসামা; সজ্জাসম্ভার দেখে মনে হয় একজন স্টিউয়ার্ড (steward) হওয়াও অসম্ভব নয়। খর্ব স্থূল নধর দেহ, মুখজোড়া ঘননিবদ্ধ কাঁচাপাকা শ্মশ্রু, শিরস্ত্রাণে রজতাক্ষরে খচিত GRAND, কটিবন্ধে উজ্জ্বল পালিশ করা তকমার মধ্যে G. H.; মুখমণ্ডলে দুরপনেয় গাম্ভীর্যের নিশ্ছিদ্র ছায়া।

খানসামার বিষয়ে গিরীন ও আমি সম্পূর্ণ নিরীহ (innocent) ছিলাম। আমাদের মনে তার সম্বন্ধে কোনো প্রকার ফিকির ফন্দির উদয় হয় নি, কিন্তু সুরেনদাদার মস্তিষ্কে নষ্টামির তাড়িৎ শিখা অকস্মাৎ চমকিয়ে গেছে। সময়ের অল্পতাবশতঃ আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় পান নি।

আমরা চলেছিলাম উত্তরদিকে, খানসামা আসছিল দক্ষিণ মুখে; সুতরাং ক্রমশই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হচ্ছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম খানসামার দৃষ্টি সুরেনদাদার উপর নিবদ্ধ, সুরেনদাদাও নিবদ্ধ দৃষ্টি হ'য়ে খানসামার দিকে চেয়ে আছেন। কাছাকাছি হ'তে সুরেনদাদা দুই এক পা এগিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্য খানসামার সামনাসামনি হ'য়ে দাঁড়ালেন, তারপর অকস্মাৎ বেশ খানিকটা নতদেহ হ'য়ে দীর্ঘ একটা সেলাম ঠুকলেন। আমাদের বুঝতে বাকি ছিল না, অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গেছে; খানসামার কিন্তু বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না! তাড়াতাড়ি নত হ'য়ে প্রত্যভিবাদন ক'রে ক্ষণকাল সে নিষ্পলক নেত্রে সুরেনদাদার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর স্থলিত বিমূঢ় কণ্ঠে বললে, "কেঁও বাবুজী, কেঁও—(কেন বাবুজী, কেন—)

সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিয়া কেঁও?" (কি কেঁও?)

"আপ কিয়া হমকো পহচানতে হেঁ?" (আপনি কি আমাকে চেনেন?)

সুরেনদাদা বললেন, "জী নহি, হরগিজ নহি।" (আজ্ঞে না, একেবারেই না।)

"তব্ কাহে, তব্ কাহে—" (তা হ'লে কেন, তা হ'লে কেন—)

একজন দস্তুরমতো বাবুলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাকে সেলাম বাজিয়েছে। কেন বাজিয়েছে, তা জানবার জন্যে মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহল; অথবা একজন বাবুলোকের সম্পর্কে সেলাম কথাটা মুখ দিয়ে বার করতেও কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে!

সুরেনদাদা বললেন, "তব্ কাহে কিয়া কহিয়ে?" (তা হলে কেন কি, তা বলুন)।

তখন বলতেই হল, "তব্ কাহে আপ হামকো সেলাম কিয়া?" (তা হলে কেন আপনি আমাকে সেলাম করলেন?)

সুরেনদাদা বললেন, "আপকা সুরৎমে অ্যায়সা খানদানি পহচন দেখা যো মজবুরন্ হমকো সেলাম করনা পড়া।" (আপনার আকৃতির মধ্যে আভিজাত্যের এমন চিহ্ন দেখলাম যে, বাধ্য হয়ে আমাকে সেলাম করতে হল)।

একথা শুনে ক্ষণকালের জন্য খানসামার বাঙ্‌নিঃসরণ হ'ল না, গভীর বিস্ময়ে এবং আনন্দে সে সুরেনদাদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর প্রগাঢ় কণ্ঠে বললে, "বাবুজী, হাম বহুৎ আদমি দেখা, লেকিন আপকা অ্যায়সা ভালা আদমি কভি নহি দেখা!" (বাবুজী, আমি অনেক মানুষ দেখেছি; কিন্তু আপনার মতো ভাল লোক কখনো দেখিনি!)

অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্য দেখে একটা দুর্দমনীয় হাস্যে আমাদের পাঁজর বিদীর্ণ হবার মতো হয়েছিল। হেসে ফেলে পাছে রসভঙ্গ করি, সেই ভয়ে দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে আমরা হাস্যরোধ করতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক সুরেনদাদা ও খানসামার মধ্যে নিবিড়ভাবে আলাপ-আলোচনা চলল; তারপর আনত-দীর্ঘ সেলামের দ্বারা উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করলেন।

সেদিন আমাদের বেশ বড় রকম একটা সুযোগ নষ্ট হয়েছিল। একটু ইঙ্গিত সুরেন-দাদা যদি দিতেন, তা হলে গ্র্যান্ড হোটেলের একটা কোনো ঘরের এক কোণে বসে তিন ভাই মিলে পরিতোষের সহিত একটা রুচিকর কার্য সমাধা করতে পারা যেত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবার যে কাহিনী বলব, তার দ্বারা পাঠকেরা শুধু একটা কৌতুক রসই উপভোগ করবেন না, সাধারণ মানব-চরিত্রের একটা দিকের সন্ধান এবং পরিচয় লাভ করে কিছু বিস্মিত এবং ক্ষুধার্ত হবেন।

ছুটির দিন। সুরেনদাদা, গিরীন এবং আমি চলেছিলাম ছোড়দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ছোড়দিদি, অর্থাৎ আমার জেঠামহাশয় কেদারনাথের কনিষ্ঠা কন্যা কান্তমণি, শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মাসী। ছোড়দিদি থাকতেন ভবানী-পুরে চক্রবেড়িয়ায় কেদার বসু লেনে।

আমরা চলেছিলাম রসা রোড ধরে। তখন লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় থেকে আরম্ভ করে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত পথটার নাম ছিল রসা রোড অথবা রসা পগলা রোড। এখন চৌরঙ্গী প্রসারিত হয়ে এসেছে এলগিন রোডের মোড় পর্যন্ত; সেখান থেকে আরম্ভ করে হাজরা রোডের মোড় পর্যন্ত রসা রোডের অংশটুকুর নূতন নাম হয়েছে আশুতোষ মুখার্জি রোড। বাকি অংশটুকু রসা রোডই আছে।

পথও তখন ছিল অতি সংকীর্ণ; প্রস্থে বর্তমান পথের এক-চতুর্থাংশও ছিল কি-না সন্দেহ। ট্রামের ডবল লাইনের স্থান করে পথের দুদিকে ফুটপাথের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই অত্যন্ত সংকীর্ণ একটু ফুটপাথ ছিল পথের পূর্ব ধারে।

জগুবাবুর বাজারের মোড় থেকে কয়েক গজ দক্ষিণে ফুটপাথের ধারে ঢিবির মতো একটা অতি ক্ষুদ্র কাঁচা মন্দির দেখা যেত। তার ভিতরে হয়ত শীতলা অথবা ঐরূপ কোনো দেবতার ক্ষুদ্র মূর্তি ছিল; বাইরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকত সিঁদুর তৈল মাখা কয়েকটি শিলাখণ্ড। দেবতা এবং মন্দিরের এই অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থার মধ্যেও নৈবেদ্যর চাল-কলার বোধ করি একেবারে অসদ্ভাব ছিল না; তারই প্রমাণস্বরূপ মন্দির গাত্রে এবং আশপাশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গর্তগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ আমার 'চিত্তদুয়ার মুক্ত পেয়ে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা' হল। মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, আজকে তোমায় বলতে হবে একটা রঙিন মিথ্যা কথা।

সুরেনদাদা এবং গিরীনের সঙ্গে অবিলম্বে একটা পরামর্শ করে নিয়ে দু হাঁটুর উপর দু হাত স্থাপিত করে নতমস্তকে সেই ঢিবির পাশের একটা গর্তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। গিরীন এবং সুরেনদাদা ডিঙিগ মেরে আমার কাঁধের উপর দিয়ে সেই গর্তের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চেয়ে রইলেন।

একটি ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে মশায়? কি দেখছেন বলুন ত?"

হাতের ইসারায় কথা কইতে নিষেধ করে চাপা গলায় বললাম, "চুপ!" পর মুহূর্তেই কিন্তু ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলাম "এবার ঘন নীল আলো ছাড়ছে!"

"কি হয়েছে মশাই?" "কি দেখছেন ওখানে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে কয়েক-জন পথিক ভিড় করে দাঁড়াল।

হঠাৎ গিরীন বলে উঠল, "এবার কিন্তু লাল্‌চে আভা!"

সুরেনদাদা বললেন, "এবার কাল্‌চে!"

আমি বললাম, "এবার কমলা নেবুর রঙ!"

ক্ষণকাল পরে গিরীন বললে, "এবার আস্‌মানি।"

ঔৎসুক্যপীড়িত পথিকদের ধৈর্য আর কিছুতেই বশ মানতে চাচ্ছিল না। খানিকটা এগিয়ে এসে ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে একজন বললে, "আরে বলুন না মশাই, কি কমলা নেবুর রঙ, কি আসমানি!"

হাত তুলে চাপা গলায় বললাম, "আস্তে কথা কন, বেশি গোল হলে আবার নেবে যাবে। একটু আগে নেবে গিয়েছিল, আবার উঠেছে।"

চাপা গলায় অধীরভাবে একজন বললে, "কি উঠেছে, সেই কথাটাই বলুন না!"

বললাম, "সাপ। গর্ত্তর মধ্যে মস্ত বড় একটা সাপ রয়েছে, মাথায় একটা মণি। সেই মণি আলো ছাড়ছে, কখনো আসমানি, কখনো কমলা নেবুর রঙের।"

সুরেনদাদা বল্‌লেন, "এবার পান্নার মতো সবুজ রঙের আভা!

"কই দেখি, কই দেখি" বলে ব্যস্ত হয়ে তিন-চারজন লোক ঠেলে এল।

আমাদের লক্ষ্য করে একজন রূঢ় স্বরে বললে, "আপনারা তিনজন একবার সরে আসুন না মশাই! আপনারা ত' দেখছি ও জায়গাটার মৌরুসী পাট্টা নিয়েছেন!"

"আস্তে! জোরে কথা কবেন না।" বলে আমি ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনদাদা-গিরীনও আমাকে অনুসরণ করলেন। হাসতে হাসতে আমরা ছোড়্‌দিদির বাড়ির অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

ছোড়্‌দিদির বাড়িতে পৌঁছে বহুক্ষণ ধরে আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলাম; কথাবার্তা চালালাম। তারপর তিনি আমাদের তিনজনকে পাশাপাশি বসিয়ে পেট ভরে খাবার খাওয়ালেন। প্রায় এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা কাল ছোড়্‌দিদির সহিত অতিবাহিত করে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম।

চক্রবেড়িয়া রোডের মোড় ছাড়িয়ে এসে দেখি অদূরে সমস্ত পথ জুড়ে বিরাট এক জনতা উচ্ছলিত হচ্ছে। যান-বাহনের পথ নেই, ট্রাম গাড়ি রয়েছে আটকে, দু-তিনজন লাল-পাগড়ী জনতাকে ছত্রভঙ্গ অথবা নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কে কার কথায় কান দেয়! সকলে মিলে একটা বিশ্রী হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি করেছে! বোঝা গেল একটা কোনো গুরুতর কাণ্ডই ঘটেছে।

গিরিন সাবধানী মানুষ; বললে, "ওদিক দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। চল, চেলোপটি রোড দিয়ে ফেরা যাক। চেলোপটি রোডের বর্তমান নাম সুবারবান্‌ স্কুল রোড।

ব্যাপারটার সন্ধান না নিয়ে আমাদের কিন্তু রণে ভঙ্গ দিতে ইচ্ছে হল না। জনতার দিকে অগ্রসর হলাম। কাছাকাছি গিয়ে এক ভদ্র-লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে মশায়, এখানে?

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বল্‌তে পারিনে, শুনেছি গর্তের মধ্যে না-কি সাপের মাথার মণি দেখা যাচ্ছে!"

সর্বনাশ! ঘণ্টা দেড়েক আগে যে চারাগাছ রোপণ করে গিয়েছিলাম, এরই মধ্যে তা এই বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে! জনতার একেবারে কাছে গিয়ে দেখি একটি মোটাসোটা মানুষ হাঁচোর-পাঁচোড় করে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। লোকটি একটু ফাঁকায় এলে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি মশায়, অনুগ্রহ করে বলুন ত?"

লোকটির মুখে পরিতৃপ্ত আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধদীপ্তি ফুটে উঠল; মৃদু হেসে বললে, "ব্যাপার চমৎকার! সাপের মাথার ওপর মণি, তাই থেকে আভা ছাড়ছে,— কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো কমলা নেবুর রঙের!"

পাশ থেকে অপর একটি লোক বললে, "আমি কমলা নেবুর রঙ দেখতে পাইনি, সবুজ আর বেগুনে দেখেছি। শুনেছি কমলা নেবুর রঙ না-কি খুব কম লোকেই দেখতে পাচ্ছে।"

মিথ্যে কথার নির্লজ্জ দাপট দেখে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল! বললাম, "আচ্ছা, যে জিনিস নিশ্চয় জানেন দেখেন নি, সে জিনিস দেখেছেন বলে এমন ফলাও করে বর্ণনা করতে মুখে বাধছে না আপনাদের?"

প্রথমোক্ত লোকটি বললে, "স্বচক্ষে দেখলাম, আর বললেই হোলো দেখিনি!"

বললাম, "স্বচক্ষে যদি দেখে থাকেন, তা হলে আজ থেকে অমন কপট চোখ দুটোকে পটিবাঁধা করে রাখবেন।"

পিছন থেকে কে একজন বললে, "ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! ও-সব ইস্কুলে পড়া ছেলেদের সঙ্গে তক্কো করবেন না। এ তো সাপের মাথার মণি, ওরা বোধ হয় মা কালীকে অবিশ্বাস করতেও ছাড়ে না।"

কঠোর কণ্ঠে বললাম, "এ রকম দল বেঁধে আপনারা সাপের মাথার মণি দেখতে আরম্ভ করলে, মা কালীকে অবিশ্বাস করিয়ে ছাড়তে খুব বেশি দেরী করবেন না আপনারা!"

রণে ভঙ্গ দিতে হল। পিছন ফিরে চেলো-পটি রোড দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কৌতুক হয়ত সেদিন কিছু পেয়েছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে মনের মধ্যে একটা কাঁটাও কম খচ্‌খচ্‌ করছিল না। পরকে ঠকাবার জন্যে মানুষ কতখানিই না নিজেকে ঠকাতে পারে! কোন্‌ পরমার্থ লাভের জন্য এরা এই অহেতুক মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নিলে, তা সম্পূর্ণ রহস্য রয়ে গেল। মনে মনেও কি এরা এর জন্যে নিজেদের কাছে কুণ্ঠিত হয় না!

মানুষ হতে মানুষের এখনো যে কত বাকি! **(ক্রমশ)**

আগের কাজ আগে

ডাঃ এইচ এল রায়

পৃথিবী জুড়ে জেগেছে বিক্ষোভ। কারণ তার বহু এবং দেশভেদে পৃথক। ঐ কারণগুলির কতকগুলি অকৃত্রিম এবং মৌলিক, আবার কতকগুলি কাল্পনিক। অত্যাবশ্যক আর অত্যাবশ্যক নয়—এ দু' ধরণের অভাবই আমরা অনুভব করছি। এ দু' শ্রেণীর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। দুয়ের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য করেও, সব মানুষের জন্য যা একান্ত আবশ্যক, তা আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি। ওগুলো একান্তভাবেই সকল মানুষের প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য চাই বিশেষ কতকগুলি দ্রব্য। এটা সবার পক্ষেই সমানভাবে প্রয়োজ্য। সবারই চাই আহার, আশ্রয় আর পরিধেয়। এ তিনটির মধ্যে খাদ্যবস্তু চাই সর্বপ্রথম।

আমাদের প্রধান প্রয়োজনকে মেটাতে হবে প্রথম। মানুষ একটি জীব এবং এই জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজন আহার। এই প্রথম চাহিদা মেটাবার জন্যই ভারত তার প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে এমন সব দেশে, যাদের খাদ্যশস্য আছে উদ্বৃত্ত। ভারত চায় কিনতে চাউল, গম ইত্যাদি। কিন্তু এই ক্রয় ব্যাপারটা অনেকটা ভিক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা বাজারে ক্রেতা পায় সাধারণত সুবিধা আর সম্মান; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী আর একান্তভাবে আবশ্যক। তাই এর সুযোগ নিতেও ছাড়ছে না দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি দেশ। অন্যের কাছে যে দরে তারা মাল বেচে, তার চেয়ে অনেক চড়া দরে খাদ্যশস্য বেচছে কতকগুলি দেশ ভারতের কাছে। জৈবিক প্রয়োজনের প্রধান দ্রব্যের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা চরম লজ্জার ব্যাপার। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা আমাদের যুদ্ধসজ্জার একটা দুর্বল স্থান।

সদাচঞ্চল ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের মন সর্বদাই চায় প্রকৃতিকে পরাভূত করতে। কিন্তু মাটির সীমানা তো বৃদ্ধি করা যায় না। আমরা কেবলমাত্র পারি, যে জমিতে চাষ হয় নি, তাতে চাষের ব্যবস্থা করতে। হল্যান্ড অনেক আগেই ব্যাপকভাবে তা করেছে। আমাদের দেশেও তা দুষ্কর কিছু নয় এবং বেঁচে যদি থাকতে হয়, আমাদের তা করতেই হবে। তবে ঘুষ দিয়ে (যা আমাদের হতভাগ্য দেশে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার) বর্তমান কৃষি জমি থেকেও আমরা বেশী ফসল পেতে পারি। ঘুষ দিতে হবে কৃত্রিম সারের আকারে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের জন্য লোকে আমাদের উপহাস করে। বিদেশীদের ভারিক্কী উপদেশ আর ব্যাঙ্গোক্তিপূর্ণ বক্তৃতাও আমাদের শুনতে হয়। দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জন্মহার পরীক্ষিত সত্য আমাদের দেশে তা নূতন কিছু নয়। আমাদের দেশের সামান্য অবস্থাপন্ন শ্রেণীর জন্মহারও কম। সুতরাং এটা স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত যে, জীবনধারণের মান উচ্চতর হলে জন্মহারও হ্রাস পাবে। এজন্যে বিদেশী বন্ধুদের আর অস্বস্তিকর নৈতিক বক্তৃতা দিতে হবে না। পাশ্চাত্যের যে সব দেশসমূহে জীবনধারণের মান উচ্চতর তারা জন্ম হ্রাস করবার জন্য কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে নি বা জিতেন্দ্রিয় হয় নি। উচ্চতর আয় এবং প্রকৃষ্টতর বাসগৃহ থাকায় তারা জন্মহারের ব্যাপারে প্রকৃতিকে আর ম্যালথাসকে ফাঁকি দিতে পেরেছে।

জনসংখ্যার তুলনামূলক হিসাব (১৯৪১ সালের) নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

রাজ্য	জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে
মাদ্রাজ	৩৯১
বোম্বাই	২৭২
যুক্তপ্রদেশ	৫১৮
পাঞ্জাব	২৮৭
বিহার	৫২৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৭০
*বাঙলা	৭৭৯
সারা ভারত	২৪৬
জাপান	৪৯৫
বেলজিয়াম	৬৯৩·৪
ডেনমার্ক	২৩৩·৩
উত্তর আয়র্ল্যান্ডসহ গ্রেটব্রিটেন	৫১১·৩
হল্যান্ড	৭১৬·৬
জার্মানী (১৯৩৯)	৩৭৩·৬
ফ্রান্স	১৯৭·৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪৬·০
ইউ এস এস আর (এশিয়া ও ইউরোপ)	২৩·১

*বিভাগের ফলে বাঙলার লোক বসতির ঘনত্বের পরিবর্তন হয়নি, বরঞ্চ যাতায়াতের ফলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলা অর্থাৎ গঙ্গার উভয় পার্শ্বে লোক-বসতি অত্যন্ত ঘন। পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের লোকবসতি সবচেয়ে ঘন।

দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহ	বোধ হয় ওর চেয়ে কম বা সমান

ভারতে মৃত্যুহার প্রতি হাজার (১৯৪২)—২২·০
" জন্মহার " " (১৯৪২)—৩০·০

বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১৯৩৯) হয় ৩,১৮০,৯১১। এই বিশাল এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন কৃষি ও শিল্পোন্নতি। এ দুটিকেই একসঙ্গে চলতে হবে। কোনটিকে বাদ দিলে চলবে না।

জীবনের মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের জন্য পুষ্টিকর পূর্ণাঙ্গ খাদ্যের ব্যবস্থা করা। চাষ করা হয় নি অথচ চাষযোগ্য সমস্ত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা। প্রতি একর জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সর্বপ্রকার কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সার ব্যবহার করা।

খাদ্য ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমাদের কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন, পতিত জমির চাষের ব্যবস্থা, যান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা, কৃত্রিম সার ব্যবহার এবং উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এত পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাভাবিক সার আমাদের দেশে নেই।

আমাদের চাহিদার পরিমাণ এবং কতটা আমাদের দরকার, তা নীচের হিসেব থেকে পাওয়া যাবে। বহু ধরণের সার রয়েছে। যথা, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম এবং ফস্ফরাস-যুক্ত, যেগুলি উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এর মধ্যে চাষাবাদের জন্য নাইট্রোজেন যুক্ত সারই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

সারের জন্য ভারতে বৎসরে প্রায় বিশ লক্ষ টন নাইট্রোজেন প্রয়োজন বলে হিসেব করা হয়েছে। এর মধ্যে ভারতে পাওয়া যেতে পারেঃ—

		(এমোনিয়ম সালফেট)
মহীশূরে	প্রতি বছর	৬,০০০ টন
ত্রিবাঙ্কুর	" "	৫০,০০০ "
সিন্দ্রি	" "	৩৫০,০০০ "
		(১৯৫১ বা তার পরে)
	মোট	৪০৬,০০০ টন

এছাড়া কোক-চুল্লীর গ্যাস থেকে পাওয়া যেতে পারে বছরে ২০,০০০ টন এমোনিয়ম সালফেট।

নূতন কোন হিসেব পাওয়া সম্ভবপর নয়। ১৯৪১ সালের বৃটিশ ভারতের যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় ঃ

মোট জনসখ্যা (১৯৪১) ৩৮৯,০০০,০০০
বনভূমি ৬৮,০০১,৩৯৭ একর
চাষ-আবাদের জন্য
পাওয়া যাবে না ৯২,৪৪১,৬০৬ „
পতিত জমি, যাতে চাষ
করা চলবে ৯১,৯৬৮,৭৫৯ „
অপ্রহৃত ভূমি ৪৫,৩৯৮,৬৩৬ „
মোট কর্ষিত জমি ২১৩,৪৯৩,৩৯০ „

স্টেট্‌সসহ বর্তমান ভারতের আনুমানিক হিসেবঃ—

মোট জমি ১,৩৬০,০০০ বর্গমাইল
মোট জনসংখ্যা ৩৩২,০০০,০০০

যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক সার কি করে আমরা আরও উৎপন্ন করতে পারি? এ পর্যন্ত আমরা এমোনিয়ম সালফেট সারই ব্যবহার করে এসেছি, কারণ এটাই হচ্ছে পুরাতন কৃত্রিম সার। সিন্ধ্রিতে এ সার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে জিপসাম এবং সেইজন্য আমদানিকৃত সালফারের উপর তাদের নির্ভর করতে হবে না। ত্রিবাঙ্কুর এজন্যে আমদানিকৃত সালফার ও দেশীয় জিপসাম দুইটিই ব্যবহার করবে। মহীশূরে সর্বতোভাবে আমদানী করা সালফারের উপর হবে নির্ভরশীল।

বিভিন্ন কারখানায় যে পন্থায় এমোনিয়ম সালফেট উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সিন্ধ্রিতে যেভাবে তা উৎপন্ন হবে, তাতে খরচ কত পড়বে? যেখান থেকে সিন্ধ্রিতে জিপসাম সরবরাহ করা হবে ঠিক হয়েছিল, তা ঠিক থাকে নি। সম্প্রতি আমেরিকা ও জার্মানীতে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ইউরিয়ার আকারে অন্যান্য যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে। এ সার ব্যবহারের ফলও পাওয়া গেছে উত্তম। এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে যে বিপদ ও অসুবিধা ছিল, তা ঐসব দেশে দূর করা হয়েছে। ইউরিয়াও অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হচ্ছে।

এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ইউরিয়া প্রস্তুত করতে আর সালফার, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম—প্রয়োজন হয় না। ভারতে কেমিক্যাল শিল্পের উন্নতির প্রধান বাধা হচ্ছে সালফার-এর অভাব। সালফার আমদানির পরিমাণ ঠিক যতটুকু না হলে চলে না, তাতেই বেঁধে দেওয়া উচিত।

ইউ এস-এর দর

সারের নাম	প্রতি টনের মূল্য	নাইট্রোজেনের অংশ	এক টন নাইট্রোজেনের দর
	ডলার	ডলার	ডলার
এ্যামোনিয়া	৭০·০	৮২·৩	৮৫·০০
এ্যামোঃ সালফেট	৩৭·০	২১·২	১৮৫·৭০
এ্যামোঃ নাইট্রেট	৬৩·০	৩৫·০	১৮০·০০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(১) কি ধরণের ও কতটা জিপসাম পাওয়া যেতে পারে, তার কোন হিসেব পাওয়া যায় নি।

(২) এক টন সালফেট প্রস্তুত করতে প্রায় ১·৫ টন জিপসাম দরকার। এই বিপুল পরিমাণ জিপসাম নাড়াচাড়া করার জন্যে দামী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। জিপসাম পাওয়া যায় রাজপুতনায় সেখান থেকে আনার খরচও কম নয়। ওখান থেকে প্রতি টন সিন্ধ্রিতে আনতে লাগবে নাকি ১৭৸৶ আনা (১৯৪৪ সালের হিসেব)। ভারত সরকারের যে টেকনিক্যাল মিশন গঠিত হয়েছিল, তাঁদের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ হিসাবে প্রতি টন এ্যামোনিয়ম সালফেট উৎপাদন ব্যয় হবে ১৮৩৷৷০ আনা। তার মানে উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ১০·৫ ভাগই লাগছে জিপসামের জন্য।

(৩) এই বিপুল পরিমাণ দ্রব্য অন্যত্র চালান দিতে গেলে যাতায়াত ব্যবস্থার উপরই চাপ পড়বে। কিন্তু এ চাপ না দিয়ে বরঞ্চ সেই সুযোগ অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারা যাবে।

(৪) এ্যামেনিয়ম সালফেট প্রস্তুতের বিভিন্ন স্তরে আনুষঙ্গিক কতকগুলি কাজও করতে হয়। সেজন্য দরকার পৃথক যন্ত্রপাতি, মানে আরও অর্থ-বিনিয়োগ।

(৫) উপজাত খড়িমাটি বিক্রয় ও নাড়াচাড়া করার জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত কারণগুলি এ্যামোনিয়ম সালফেট উৎপাদন ও সার হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর পক্ষে কেবলমাত্র একটা কথা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, কৃত্রিম সার হিসেবে ভারতে এটাই বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাই ব্যবহারকারীদের নিকট এটা বিশেষ পরিচিত। অবশ্য একথাটা বিবেচ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, চা-কর, ইক্ষু উৎপাদনকারী এবং কৃষকেরা সালফেটের কথা জানে, কারণ এটাই একমাত্র যবক্ষারজাতীয় সার, যা আই সি আই, শ ওয়ালেস ও অন্যান্যরা এদেশে এনেছে এবং জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছে। কৃষি-বিভাগ অন্যান্য যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক সার দিয়ে হাতে-কলমে কোন পরীক্ষা চালান নি। সরবরাহ নেই বলে খাদকরাও তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন নি। তাছাড়া, খুব কম খাদকই কৃত্রিম সার ব্যবহার করেন। সুতরাং ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে যারা জমিতে সার ব্যবহারে অভ্যস্ত, তারা আর সহজে নূতন সার ব্যবহার করতে রাজী হবে না বলে যে যুক্তি দেখান হয় তা টেকে না। কারণ ভারতের কৃষকদের খুব কমসংখ্যক লোকই কৃত্রিম সার ব্যবহার করে।

এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট

শুধু এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট অথবা তা অন্যান্য কেমিক্যালের সঙ্গে মিশিয়ে যে সার হয়, তা ব্যাপকভাবে ইউরোপে ও ইউ এস এ ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত আমেরিকায় সার হিসাবে এ্যামোনিয়ম সালফেটএর চেয়ে [illegible] ভাবে। আমেরিকায় উচ্চ শ্রেণীর সালফারও আছে বহুল পরিমাণে।

এ্যামোনিয়ম নাইট্রেটএর জমির সার হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখান হয়, তার কতকগুলি হচ্ছে এইঃ

(ক) বিস্ফোরণের বিপদঃ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় জার্মানীর অপাউতে এবং আমেরিকার টেক্সাসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়েছে। তাতে বহুলোক নিহত হয়েছে।

(খ) পদার্থটি হল জলাকর্ষী। এর রক্ষণ-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্যে বহু মাল অপচয় হয়।

(গ) জমি থেকে সহজে তা উবে যায়, ফলে গাছ বহুমূল্য সার থেকে বঞ্চিত হয়।

(ঘ) ভারতের জমিতে ঐ সার পরীক্ষা করে দেখা হয় নি।

(ঙ) নাইট্রেট নিয়ে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া করা হয় নি। ভারতীয় কৃষকেরা এটা ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়।

উপরের বিবৃতি সত্য হতে পারে, কিন্তু এই সার ব্যবহারের যে বিপুল সুবিধা, তা সব বাধাকেই নস্যাৎ করে দেয়। এ্যামোনিয়ম নাইট্রেটএর উৎপাদন ব্যয় কম। শিল্প-বিজ্ঞানের দিক থেকে এর উৎপাদন এ্যামোনিয়া সালফেট-এর চেয়ে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। এ্যামোনিয়া নাইট্রেট-এ আছে শতকরা ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন, সুতরাং এটা খুবই ঘনীভূত সার।

এ্যামোনিয়া নাইট্রেটকে কৃষিকার্যে ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে তার বাঞ্ছনীয় ভৌতধর্ম বৃদ্ধি করতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার এই জলাকর্ষী প্রকৃতি সহজেই হ্রাস করা যেতে পারে।

উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে নাড়াচাড়া করার সময় এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট বিস্ফোরণের সম্ভাবনা খুবই কম। যে দুটো বিস্ফোরণের কথা বলা হয়েছে, তা কৃষকদের হাতে হয় নি। ওপাউতে তৈরী করার সময় বিস্ফোরণ হয়। টেক্সাসে সম্প্রতি যে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার কারণ বোধ হয় অন্য কিছু দাহ্য পদার্থের সঙ্গে এর সংস্পর্শ। এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদনপদ্ধতি আজ এত পূর্ণাঙ্গ যে তাতে অগ্নি-প্রজ্বলনের এবং বিস্ফোরণের বিপদ একপ্রকার নেই বললেই চলে। কারণ, আজ নূ্ন তাপে শেষ কেলাসন সহজেই সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ্যামোনিয়ম উৎপাদনে যে ব্যয়, তার থেকে কম খরচে নাইট্রেট তৈরী করা যায়। অথচ গুণ তার কম নয়।

এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদনের পক্ষে আরও কতকগুলি সুবিধা আছে।

(১) দেশরক্ষার জন্য জরুরী সময়ে নাইট্রিক এসিড ও এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শান্তির সময়ে যে প্ল্যান্টে এ্যামোনিয়া নাইট্রেট তৈরী হবে, রাতারাতি তাকেই পরিবর্তিত করা যাবে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানায়। কিন্তু যে কারখানায় জিপসাম পদ্ধতিতে এ্যামোনিয়া নাইট্রেট তৈরী হয়, তা জরুরী অবস্থায় বন্ধ রাখা দরকার হতে পারে। কারণ, (ক) সবটুকু এ্যামোনিয়া লেগে যাবে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে; (খ) সে সময় যাতায়াত ব্যবস্থার উপর যে চাপ পড়বে, তাতে জিপসামএর মত বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল প্রেরণে অসুবিধা সৃষ্টি হবে; (গ) এমনিভাবে কারখানার কাজ বন্ধ থাকলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। গত বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবীতে এ্যামোনিয়া উৎপন্নকারী কারখানাগুলো যে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় পরিণত হয়েছিল, তা সবাই জানে। সুতরাং যুক্তিগুলোকে স্বকপোলকল্পিত বলা চলে না। দেশরক্ষার দিক থেকে নাইট্রিক এসিড ও এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদন অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। এ ধরণের শিল্প যাতে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এ বিষয়ে সরকারের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার।

(২) খনন কার্যে এবং খনিতে নানা ব্যাপারে বিস্ফোরণের জন্য এ্যামোনিয়ম নাইট্রেটএর প্রয়োজন রয়েছে। নানা উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনায়ও যে ঐ ধরণের বিস্ফোরক প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই।

(৩) এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট প্রস্তুতের মধ্যবর্তী ধাপে নাইট্রিক এসিড উৎপাদিত হয়। বিস্ফোরক, রং করার জিনিস, বিভিন্ন ঔষধাদি এবং অন্যান্য কেমিক্যাল শিল্পের জন্য নাইট্রিক এসিড একান্তভাবে প্রয়োজন। সুতরাং এ্যামোনিয়ম নাইট্রেটএর উৎপাদনও স্বীকৃত হচ্ছে।

(৪) এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদনের জন্য একমাত্র কাঁচামাল যা প্রয়োজন হয়, তা হচ্ছে পোড়া পাথুরিয়া কয়লা। যেখানে এই কয়লা পাওয়া যায়, তার কাছাকাছি ওই কারখানা করলে কাঁচামাল আনয়নের সমস্যাটা প্রায় থাকে না। সঙ্গে যদি প্রভূত পরিমাণে আলকাতরা উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়, তবে এমোনিয়া উৎপাদনে কোক্-চুল্লীর গ্যাস বেশ কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়। জার্মানীতে ও বেলজিয়ামে ঐ ধরণের কারখানা চালু হয়েছে। ওরা এ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের জন্য যে হাইড্রোজেন প্রয়োজন, তার উৎসস্বরূপ কোক-চুল্লীর গ্যাস ব্যবহার করে। বিদ্যুৎশক্তি যদি খুব কম খরচে পাওয়া যায়, তবে হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্যে জল অথবা লোণাজলে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে অর্থব্যয়ের সাশ্রয় হতে পারে। নরওয়ে, ইতালী, পোল্যান্ড ও ইউ এস এ-তে এমন ধরণের কারখানা চলছে।

এ্যামোনিয়া নাইট্রেট উৎপাদন ও ব্যবহারের নানা উন্নতি সাধিত হলেও এর ব্যবহার সম্পর্কে এখনও লোকে সংশয়াকুল। বলা হয়, ও ধরণের এমোনিয়া নাইট্রেট কখনও জার্মানীতে ব্যবহার করা হয় নি। এ বিতর্কের অবসানের জন্য বলা যেতে পারে যে, বাজারে কয়েক ধরণের যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়, যার একটি উপাদান হল এ্যামোনিয়া নাইট্রেট। ঐসব জিনিস সস্তা, তাছাড়া সহজেই হাতে নিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা যায়, বিস্ফোরণের কোন সম্ভাবনাই নেই। ঐসব সার জার্মানীতে খুবই চালু। ওগুলির নাম হচ্ছে, "Leuna Salpeter," "Kalk Salpeter" ও "Kalk Ammon Salpeter," ও ধরণের বিলিতি ও আমেরিকান সারও বাজারে দেখতে পাওয়া যায়।

"Kalk Ammon Salpeter"এর মত সার ভারতে প্রস্তুত করার সম্ভাবনা প্রচুর। এতে আছে ৬০% এ্যামোনিয়া নাইট্রেট, ৪০% ক্যালসিয়াম কর্বোনেট। সার যখন তৈরী হয়ে যায়, তখন তাতে থাকে ১৪% নাইট্রোজেন। জিনিসটা হল কণাময় পদার্থ। সহজে নাড়াচাড়া করা যায় বলে কৃষকেরা তা পছন্দও করে। উৎপাদন ব্যবস্থায়ও এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ইউরিয়া

১৯২৪ সাল থেকে Badische Anilin Und Soda Fabrik (I. G.) Ureaকে সার হিসাবে বাজারে ছাড়ে। ইউ এস এ ১৯৩৫ সাল থেকে সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক হারে ইউরিয়া প্রস্তুত করতে থাকে। আজকাল সার, প্ল্যাস্টিক আঁটা হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউ এস এ এবং জার্মানীতে জমির সারের জন্য ইউরিয়া ও যৌগিক ইউরিয়া বিক্রি হচ্ছে ফ্লোরানিড, উরকোর, ক্যালসিউরিয়র, ক্যাল-ইউরিয়া এবং ইউরামোন প্রভৃতি নামে। খাঁটি ইউরিয়াতে আছে প্রায় ৪৬·৬% নাইট্রোজেন।

আমেরিকায় ইউরিয়ার দাম এ্যামোনিয়া নাইট্রেটের চেয়েও কম। ওজনের দিক থেকে ভারী হওয়ায় মাল চালানের ব্যয়ও কম। ফলে দরের দিক থেকে ইউরিয়া ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি যথেষ্ট। জানা গেছে যে, অন্যান্য যবক্ষারজাতীয় রাসায়নিক সার থেকে জার্মানীতে ইউরিয়া অনেক কম খরচে প্রস্তুত হ'ত।

এ্যামোনিয়া অথবা এ্যামোনিয়ম কার্বোনেটের বিশ্লেষণ দ্বারা ইউরিয়া পাওয়া যায়। ইউরিয়াপূর্ণ সারে রয়েছে নাইট্রোজেন এবং এর অম্লত্ব কম, তাই এর ব্যবহারে অনেক সুবিধা। সহজভাবে নাড়াচাড়া করার সুবিধা বলে এটা আদর্শ যবক্ষারজাতীয় সার। ইউরিয়াকে অন্য সারের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধরণের কৃত্রিম রজন প্রস্তুত করার জন্যে কাঁচামাল হিসাবে চাই ইউরিয়া। সেজন্য ইউরিয়া শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব সমধিক। ঐ শিল্পটি স্থাপিত হলে ভারতে প্ল্যাস্টিক শিল্প স্থাপনেরও উৎসাহ জাগবে।

ইউরিয়াকে কোন কোন পশুখাদ্যের সঙ্গেও মিশ্রিত করা হয়।

এ্যামোনিয়া

সরাসরি তরল এ্যামোনিয়া প্রয়োগের যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। জার্মাণী ও আমেরিকায় তরল এ্যামোনিয়া সরাসরি জমিতে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এতে সুফলও পাওয়া গেছে। কৃষকেরা যখন সহজভাবে এই সার ব্যবহার করতে পারবে, তখন অনেক সুবিধা হবে, কারণ এই সার হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা, কিন্তু অত্যন্ত ঘন। বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষি-ফার্মগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এখানে যান্ত্রিক উপায়ে কৃষিকার্য চলে না—সুতরাং এ্যামোনিয়াকে সার হিসাবে ব্যবহার করার কথা আসতে পারে না।

উপরে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হল, তাতে দেখা যায় সর্বোৎকৃষ্ট সার হলঃ

(১) ইউরিয়া।

(২) এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট।

(৩) যে সব সারের প্রধান উপাদান হল এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, যেমন—"Kalk Ammon Salpeter."

ওগুলো ব্যবহারে জমি প্রচুর নাইট্রোজেন পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া ওগুলো প্রস্তুত করলে ইউরিয়া, নাইট্রিক এসিড, এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল অন্যান্য শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর দেশরক্ষা একটা অত্যাবশ্যক ব্যাপার। ঐ সব শিল্প স্থাপিত হলে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন উপাদান পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু সেই জরুরী অবস্থায় এ্যামোনিয়ম সালফেট কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

এটা হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের অভিমত। কিন্তু কি ধরণের সার প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করতে হবে কৃষি-অভিজ্ঞদের। ও নিয়ে তাঁদের ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালাতে হবে; দেখতে হবে উপরি-উদ্ধৃত যবক্ষার-জাতীয় সারের মধ্যে কোন্‌টা তাদের পক্ষে উপযোগী। জমিতে ঐ সার প্রয়োগের ফল, গাছের নাইট্রোজেন পাওয়ার সুবিধা, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়েও তাদের পরীক্ষা চালাতে হবে। একমাত্র তাঁদেরই সুপারিশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম সার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং ঐ সার কৃষকদের মধ্যে

জনপ্রিয় করার জন্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের জমির মূল্য তাঁদের নিরূপণ করতে হবে. বিভিন্ন চারগাছের উপযোগী যবক্ষারজাতীয় সারের উপযোগিতা নির্ধারণ করতে হবে এবং কি প্রকারে কার্যকরীভাবে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা যায়, তা ঠিক করতে হবে, তারপরেই ভারতে কত পরিমাণ কৃত্রিম সার লাগতে পারে, তা ঠিক করা সম্ভব হবে।

ও কাজ করতে গেলে এখানে যে যুক্তি দেখান হয়েছে. তার সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কৃষির সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য এবং খাদ্যসমস্যা, যা আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বপ্রধান স্থান পাওয়া উচিত, তা সমাধানের জন্য কৃষি ও কেমিক্যাল বিজ্ঞানের নেতৃবৃন্দের উচিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা।

Jadavpur College of Engineering and Technology-র Annual Exhibition Souvenir, 1950. এ প্রকাশিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

পুস্তক পরিচয়

শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : থ্যাকার স্পিংক এণ্ড কোঃ লিঃ, ৩ এসপ্ল্যানেড ইস্ট। মূল্য—১৲।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে। কিন্তু ঐ স্থানটি প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৯ সালে, নিকটবর্তী রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে। এ অঞ্চলটি তখন ছিল একটি বৃক্ষলতা ও জনমানবশূন্য বিরাট নির্জন মাঠ। নির্জনে ধ্যান-ধারণার পক্ষে জায়গাটি তাঁর কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল বলেই জায়গাটি ধর্মসাধনার ক্ষেত্রহিসেবে তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ১২৬৯ সালের পর থেকে ১৩০৭ সালের আগের এই আশ্রমটি যে কিভাবে ছিল, বা কি হত তা কেউ জানত না এবং তা জানার যে প্রয়োজন আছে একথাও কারু মনে জাগেনি। আজ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ইতিহাস আলোচনাকালে এই যুগের আশ্রম বিষয়ে যেখানে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা সত্যিই খুব সামান্য। এই বইটি সেই দিক থেকে মস্ত একটি ঐতিহাসিক ফাঁক পূরণ করবে।

বইটির প্রথম অংশটি লিখেছেন পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বইটিতে ১২৯৪ থেকে আরম্ভ করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের অনেক কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী বোলপুর শহরকে নিয়ে এই স্থানটির তখনকার একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। দস্যু সর্দার দ্বারিকের বিষয় প্রচলিত কাহিনীকেও এখানে প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সেই লাঠিয়াল সর্দারটিকে এখানে এই আশ্রম রক্ষার কাজে পাঠিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু মানকরের জমিদার, হিতলাল মিশ্র। আরো বলা হয়েছে যে, দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ এ জায়গাটি দেখে আকৃষ্ট হননি। তিনি নাকি অনেকদিন থেকেই এইরকম একটি নির্জন স্থান সাধনার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বোলপুরের দশ মাইল দক্ষিণে গুসকরা স্টেশনের নিকটবর্তী কোন আম্রকাননে তাঁবু করে বাস করতেন সেই কারণেই।

এই গুসকরা বিষয়ে সম্প্রতি আমরা একটি সংবাদ পেয়েছি। গুসকরা স্টেশনের কয়েক মাইল পশ্চিমে একটি বিরাট ডাঙগার নিকট একটি তান্ত্রিক সাধুর সমাধি মন্দির ও আশ্রম আছে। সেই মন্দিরের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের কিছুদিন আগে আলাপ হয়। তিনি বলেন যে, তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষির বিশেষ পরিচয় ছিল এবং মহর্ষি সেই সন্ন্যাসীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। মহর্ষি-বন্ধু, শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন ঐ সন্ন্যাসীর বিশেষ ভক্ত। অতি অল্প বয়সে সেই সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রীকণ্ঠবাবু বিশেষ কোন কারণে আকৃষ্ট হন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মহর্ষির গুসকরা এসে তাঁবুতে বাস করার সঙ্গে ঐ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কোন যোগ ছিল কি না ঐতিহাসিকদের সংবাদ নেওয়া দরকার। বর্তমান বইটিতে অনুমান করা হয়েছে যে শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের ঐ ছাতিম গাছটি ছিল কোন সময়ের তান্ত্রিকদের সাধনার স্থান। মহর্ষিদেব জেনেশুনে সেই রকমের একটি স্থানকে তাঁর নিজের সাধনার জন্যে যদি বেছে থাকেন তাহলে গুসকরার ঐ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর প্রভাবেই তা করেছিলেন কি না বিচার করে দেখা দরকার। অবশ্য আমাদের সবটাই হল অনুমানের বিষয়। ঐতিহাসিকের বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা না করে এ কথাকে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

এই বইয়ে উল্লেখিত ঐ আট দশ বছরের শান্তিনিকেতনের ইতিহাসটির যথেষ্ট মূল্য আছে। সেদিক থেকে বইটিকে আমরা সাদরে গ্রহণ করছি। অঘোরবাবুর লেখা অংশটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবুর অংশটি ভাল হলেও সে সম্বন্ধে কিছু প্রতিকূল মন্তব্য না করে পারছি না। তাঁর লেখার ভাষায় স্থানে স্থানে এমন একটা অনাবশ্যক ক্ষোভের সুর প্রকাশ পেয়েছে, যা এই ধরণের বইয়ে একেবারেই মানায়নি। পূর্বতন কোন লেখকের ভ্রান্তির প্রতিবাদ এভাবে হওয়া উচিত নয়। শান্তিনিকেতনের যে সব ব্যবস্থা লেখকের কাছে ঠিক বলে মনে হয়নি সে সবের জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই কি তিনি দোষী করছেন না? কারণ সে সব পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের আমলে, তাঁরই ইচ্ছায় ও সম্মতিক্রমে। আশ্রমের প্রতি লেখকের আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছার প্রকাশটি বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছে তাঁর ঐ ক্ষুন্ন মনের ভাষাতে। ১৭।৫১

যোগবলে রোগ আরোগ্য—শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। "উমাচল প্রকাশনী", ৫৮।১।১২-কে, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ।০—৸৶০ ও ১—৩১৭; মূল্য ৫৲।

এই দরিদ্র অথচ ব্যাধি-অধ্যুষিত দেশে সহজ অথচ স্বল্প ব্যয়ের চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে আয়ুর্বেদের সহজ সংস্করণ টোটকা চিকিৎসার বহুল প্রচলন ছিল এবং তাহা হইতে অধিকাংশ রোগই নামমাত্র ব্যয়ে বা বিনাব্যয়ে নিরাময় হইত। ক্রমে বিদেশী এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রভাবে এক উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হইল। পূর্ব ব্যবস্থায় আস্থাহীন, অথচ ব্যয়বহুল বিদেশী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণে আর্থিক অসংগতি, এই দুই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমরা যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করিতেছি। ইহার অবসান একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং উমাচল গ্রন্থাবলীর তৃতীয় সংখ্যা আলোচ্য পুস্তকখানি বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক মাত্রায় মনোনিবেশ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। রোগ লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা, নিয়ম ও পথ্য উল্লেখ করিয়া প্রতি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহা হইতে মুক্ত হইবার পন্থা বর্ণিত করিয়া গ্রন্থকার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। যোগের প্রক্রিয়াগুলি সহজ এবং যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন তাহার জন্য চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। যে দেশে লোক শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া সেবন দ্বারা রোগ দূর করিবার চেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেখানে যোগ অভ্যাস করার উৎসাহের অভাব বর্তমান। যাঁহারা স্বাভাবিক নিয়ম পালন দ্বারা সুস্থ থাকিতে বা রোগ নিরাময় করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ৩১৯।৫০

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভে শ্রীশ্রীশোভা মা—শ্রীমতী বীণা দেব, বি এ প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের স্নান হইয়া থাকে। ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের ইহা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বহু নরনারী এই সময় তীর্থক্ষেত্রে সমাগত হইয়া তীর্থ স্নান এবং সাধু দর্শনে পুণ্য অর্জন করেন। শোনা যায়, কুম্ভমেলায় যোগদান করিবার জন্য হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল হইতে মহাপুরুষেরাও অনেকে আসেন; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাদিগকে চিনিতে পারে না, শুধু যাঁহারা বিশেষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহাদের কাছেই এই সব মহাপুরুষের স্বরূপ উন্মুক্ত হয়। আলোচ্য পুস্তিকায় ১৩৫৬ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তিযোগে শ্রীশ্রীশোভামা যেসব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কয়েকজন মহাপুরুষের যে পরিচয় তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, লেখিকা তাঁহার অনুগামিনী স্বরূপে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাভঙ্গী সহজ, সরল এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

শান্তির সন্ধানে—শ্রীমৃণালকান্তি বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—থ্যাকার স্পিংক এণ্ড কোং লিমিটেড, ৩নং এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা—১, মূল্য এক টাকা চার আনা।

সাংবাদিক স্বরূপে গ্রন্থকার বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। অধ্যাপনা এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানির নাম দেখিলে মনে হইবে ইহাতে হয়ত নীরস আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং শম, দম নিয়মাদির প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া লেখক সম্ভবতঃ অতীন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত জগতের ইঙ্গিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভূমিকাতেই তেমন ধারণার নিরসন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই পুস্তকে উচ্চাঙ্গের ধর্মের কথা নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থকার সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ধর্মের কথা ব্যাখ্যা না করিয়া নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোককে শান্তির সন্ধানে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মন-সংযম ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস এবং অধ্যবসায়ের পথে যে জীবনের অনেক অশান্তি দূর সম্ভব হয় এবং বহুবিধ অনর্থ অতিক্রম করা যায় সাধারণভাবে ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে উচ্চাঙ্গের ধর্ম কথা তিনি বলেন নাই, এমন কথা তিনি বলিলেও তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া ধর্ম-জীবনের মূল সত্যগুলিই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি মোটামুটি গীতার কর্মযোগের সারতত্ত্বই অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তবে উপদেষ্টার অহমিকা বা দার্শনিক পাণ্ডিত্যের পাক তাহার লেখাকে আড়ষ্ট বা জটিল করে নাই। গ্রন্থকারের লেখার বিশেষত্ব এইখানে। তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের পক্ষে মনকে উপযোগী করিবার কৌশল সহজভাবে ধরাইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের দুঃসাধ্যতা কিংবা গতানুগতিক সংস্কারের জটিলতা এক্ষেত্রে কোন রকম অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার দিক হইতে পুস্তকখানি মুখ্যতঃ যে নৈতিক, একথা বলা চলে; কিন্তু সে নীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের গতির সঙ্গতি সাধন সহজভাবেই সম্ভব। পুস্তকখানি পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ৪৫।৫১

বিপ্লবের পথে : সুবোধকুমার লাহিড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

প্রবাল কীটের নিভৃত আত্মদানের ফলে একদিন লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয় প্রবালদ্বীপ, তেমনি বাঙলার তরুণ শহীদগণের যুগব্যাপী নীরব শোণিতপাতের অন্তরালে তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছিল স্বাধীনতার কঠিন ভিত্তিভূমি। জননীর শৃঙ্খলমোচনের সর্বনাশা পণ লইয়া যে যুবকগণ বিপ্লবের জ্বালাময়ী শিখার মধ্যে নিজেদের আহুতি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। লেখক নিজে অন্যতম বিপ্লবী। দেশকে ভালবাসার অপরাধস্বরূপে ইঁহাকেও অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, কারাবরণ করিতে হইয়াছিল একাধিকবার। বাঙলার সেই জ্বলন্ত যুগের প্রতিচ্ছবি লেখক সুললিত ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

পুস্তকটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ৪।৫১

সঙ্কর্ষণ—অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা, ত্রৈমাসিক। কাশীনাথ মল্লিক ভাগবত-বিদ্যালয় পত্রিকা। সম্পাদক—প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী। প্রাপ্তিস্থান—সঙ্কর্ষণ কার্যালয়, কাশীনাথ মল্লিক ভাগবত বিদ্যালয়, ১৬১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১, বার্ষিক ৪৷৷৹ টাকা।

সম্পাদকের লিখিত 'ভাগবত প্রবেশ' ভাগবত সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা, ক্রমিক চলিতেছে। শ্রীদীনশরণ দাস লিখিত "কান্তভাব ও সখীভাব" বৈষ্ণব রস-সাধনার নিগূঢ় তাৎপর্যের বিশ্লেষণ। লেখাটি সুন্দর। ডক্টর শ্রীহৃষীকেশ বেদান্ত-শাস্ত্রী লিখিত, 'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী' শীর্ষক সন্দর্ভে পুরী মহারাজ যে বাঙালী ছিলেন, ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে। আলোচনা আগ্রহোদ্দীপক। অন্যান্য আলোচনাগুলিও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। আমরা 'সঙ্কর্ষণে'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য লীলা, দ্বিতীয় (শেষ) খণ্ড—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—ভক্তি গ্রন্থ প্রচার-ভাণ্ডার। ৪৬, রসা রোড ইস্ট ফার্স্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩, মূল্য—৭৷৷৹ টাকা।

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া কলেজ ও চৌমুহনী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক সম্পাদিত এবং তৎকর্তৃক লিখিত গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার শেষ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া আরও আনন্দ লাভ করিয়াছি। আলোচ্য সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের কয়েকটি স্থান সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হইয়াছে। গোলকের স্থিতি, মুষল-লীলা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও মহিষী হরণাদির টীকা পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ব্রতের দিন নির্ণয়াদিও অধিকতর বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। অধ্যক্ষ নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, বাঙলা দেশের সুধিজন সমাজে ইহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নাথ মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুললিত, প্রাঞ্জল এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত। এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় শাস্ত্রানুসন্ধিৎসা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য কোথায়ও সাম্প্রদায়িক পারিভাষিকতায় ভারাক্রান্ত হয় নাই; কিংবা অন্তর্লঘু উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর ভাবার্থানুভূতির গাঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। ফলতঃ বিষয়-বস্তুকে বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার মত সংযত সৌষ্ঠব-সম্পন্ন দক্ষতা নাথ মহাশয়ের ব্যাখ্যায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য বৈষ্ণব দর্শনের অনেক গূঢ় এবং গভীর তত্ত্ব ও তাঁহার লেখায় সহজ, সরল এবং সরস হইয়া ফুটিয়াছে। নাথ মহাশয়ের সুদীর্ঘ সাধনা-প্রভাবে সমুজ্জ্বল এই অবদান বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র.না.বি.....

শচীশ

চতুরঙ্গের নায়ক শচীশের জীবনে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। জীবন না বলিয়া এখানে সাধনা বলিলেও চলিত, কেন না, শচীশের জীবনের যে অংশটুকু লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহা তাহার সাধনারই ইতিহাস।

প্রথম স্তরে দেখিতে পাই শচীশ নাস্তিক জেঠামশায়ের কর্মসঙ্গী। দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই যে সে লীলানন্দ স্বামীর প্রধান শিষ্য—আর তৃতীয় স্তরে সে কাহারো সঙ্গী বা শিষ্য নয়, সে নিজেকেই নিজে চালিত করিতেছে, বাহিরের সাহায্যের উপর আর তাহার ভরসা নাই, সে এখন অনন্যশরণ ও আত্মদীপ।

প্রথম স্তরে শচীশের সঙ্গী জেঠামশায়—পরে অবশ্য শ্রীবিলাসও আসিয়া জুটিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে আছেন স্বামী লীলানন্দ, আছে শ্রীবিলাস আর দামিনী নামে একটি মেয়ে। দ্বিতীয় স্তরেই প্রথম তাহার দেখা পাইলাম। তৃতীয় স্তরে শ্রীবিলাস ও দামিনী আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই—সাধক শচীশকে অনুসরণ করিয়া চলা সংসারী জীবের পক্ষে আর সম্ভব নয়, শচীশের সাধনমার্গের 'ক্যাম্প ফলোয়ার' শ্রীবিলাস ও দামিনী স্বভাবত সংসারী জীব। তাহারা তখন বিবাহ করিয়া আসিয়া সংসার পাতিয়া বসিল—শচীশকে একাই চলিতে হইয়াছে। এখানেই শচীশের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। মরুভূমির পথিককে মরীচিকার প্রান্তে এক আধবার যেমন চোখে পড়ে—শচীশকে পদ্মার চরে—তেমনি এক-আধবার দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বোধ করি দেখিতে না পাইলেই বুঝি ভালো ছিল। রৌদ্র-ভাস্বর বিরাট বৈরাগ্যের পটভূমিতে শচীশকে আর বদ্ধজীব বলিয়া মনে হয় না। সে যেন আপনার পূর্বতন রূপের ছায়ামাত্র! জেঠামশায়ের সঙ্গী ও লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য—উভয়েই সংসারী জীব—কিন্তু তৃতীয় স্তরের শচীশ নিতান্তই সংসারাতীত। এটা এমনি নির্মম সত্য যে, শেষ পর্যন্ত অমিত আশাচারিণী দামিনীকেও তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—শচীশের পায়ের কাছে শেষ প্রণতি রাখিয়া দামিনী বিদায় লইয়াছে—বিদায় লইয়াছে—তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! দামিনী বুঝিতে পারিয়াছে যে—মরীচিকাকে লইয়া ঘর করা চলে না, বুঝিতে পারিয়াছে যে মরীচিকা নদীর কূলে শ্বেত-পাথরের ঘাট বাঁধিলেও তৃষ্ণা নিবারণের উপায় হয় না। যাহাকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া দামিনী ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে—মুক্তজীবকে মুক্তিপথে ছাড়িয়া দিয়া সংসারীজীব সংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

শচীশের পরিণাম কি হইল আমরা জানি, তাহাতেই অনুমান করিতে পারি যে সাধনার বাষ্প-ভরা উন্মার্গগামী বেলুনের মতো মহাশূন্যে সে উধাও হইয়া গিয়াছে।

২

সংক্ষেপে ইহাই শচীশের সাধনমার্গের ইতিবৃত্ত। স্বল্পপরিসর গ্রন্থ মধ্যে কি বিপুল পরিবর্তন, কোথা হইতে একেবারে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! কোথায় ডফ সাহেবের ছাত্রের কর্মসঙ্গী—আর কোথায় আত্মদীপ, অনন্যশরণ মুক্তি-সন্ধানী শচীশ! কোথায় ডফ সাহেবের যুগ—আর কোথায় শচীশের পদ্মার-চর! কোথায় কলিকাতা শহর আর কোথায় অনির্দিষ্ট ভূগোল দক্ষিণ সমুদ্রের নারিকেল-পল্লব বীজিত নির্জন সৈকত! আর কোথায় বা সেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মুখগহ্বরের মতো অন্ধকার গুহা! গভীর তমিস্রায় সেখানে ইতিহাসের পরপার হইতে সমীরিত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস অনুভূত হয়, অজ্ঞাত দেহীর কোমল কেশরপুঞ্জ সুগভীর মিনতির মতো চরণ-দ্বয়কে বেষ্টন করিয়া ধরে—এ যেন কায়ালোকের অতীত কোন ছমছম ছায়ার দুস্তর দ্বীপান্তর! কেবল দামিনীর বুকের মধ্যে বেদনাটি জ্বলিতে থাকে কবির গোপন কথাটির মতো!

চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে—না আছে ইহাতে গোরার অতি বিস্তার, না আছে ছোট গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণতা! নৌকাডুবির ভাবালুতা, শেষের কবিতার দীপ্ত-রশ্মির ছুরি চালনা, মালঞ্চ ও দুই বোনের অর্ধ-মনস্ক খসড়া প্রণয়ন—সব দোষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চতুরঙ্গ! উপন্যাসের স্বাধীনতা আর ছোট গল্পের সীমাবদ্ধ দায়িত্বে মিলিত হইয়া চতুরঙ্গের অনবদ্য শিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের বিস্তারকে পাওয়া গিয়াছে অথচ কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য সদা জাগ্রত দৃষ্টির পাহারা রাখিতে হয় নাই আবার ছোট গল্পের মুক্তাসম মুহূর্তটিকে—প্রতিবেশী গল্পের ধারার মধ্যে অনায়াসে বিতানিত করিয়া দিবারও অবকাশ পাওয়া গিয়াছে—ইহা না উপন্যাস না ছোট গল্পের সমষ্টি—চতুরঙ্গ খণ্ড উপন্যাস বা অখণ্ড ছোট গল্প। ঠিক এই শ্রেণীর এ আকৃতির রচনাই রবীন্দ্র প্রতিভার অনুকূল, রবীন্দ্র কথাশিল্প প্রতিভার যথার্থ বাহন। বাহনের আনুকূল্যে গল্পের ধারাটি অভীষ্ট পরিণামে পৌঁছিয়াছে—পাত্রপাত্রীর চরিত্রের দলগুলি বিকাশে বাধা পায় নাই—উপন্যাসের পাতা পূরণের জন্য মনস্তত্ত্বের বিরক্তিকর জাল বুননও যেমন নাই, তেমনি আবার ছোট গল্পের অতিসংহত গণ্ডী অতিক্রম করিবার নিরন্তর দ্বিধাও নাই—ফলে বাহন ও বাহিত অভিন্ন হইয়া অখণ্ড একটি শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই অখণ্ড শিল্প-মূর্তির নাম দেওয়া যাইতে পারে শচীশের সাধনা।

৩

চতুরঙ্গে এমন একটা গঠনগত সৌষম্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যাহা বিরল। দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট অথচ সুস্পষ্টতার খাতিরে সৌন্দর্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই—বরঞ্চ বিরুদ্ধ-মুখী ধাক্কার টাল সামলাইতে গিয়া সৌন্দর্য আপনার বীর্যের সন্ধান পাইয়াছে এই বীর্যেরই নাম সৌষম্য। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাতেও সৌন্দর্যের অভাব নাই, কিন্তু সে যেন নারীর সৌন্দর্য—চতুরঙ্গের সৌন্দর্য বীরের সৌন্দর্য—গ্রীক athlete-এর দেহে যে বীরশ্রী পরিদৃষ্ট হয়—চতুরঙ্গের অঙ্গে—তাহাই যেন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ সৌন্দর্য এখানে গঠনগত সুষমার উপরে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় আপন ভাগবত পূর্ণতাকে শিল্পগত সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

জেঠামশায়ের প্রভাব শচীশ চরিত্রের

মৌলিক বেশ। "পজিটিভিজম্" বা নিরীশ্বর কর্মযোগ জেঠামশায় সম্বন্ধে সার্থক হইলেও শচীশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কেন হইল? প্রথমতঃ নিরীশ্বর কর্মযোগ বস্তুটাই খুব খাঁটি নয়—অর্থাৎ মানুষের স্বভাবের উপরে তার প্রতিষ্ঠা খুব দৃঢ় নয়। কাজেই এক আধ জনের জীবনে তাহা ফলপ্রদ হইলেও সাধারণভাবে মানুষকে ফলদান করিতে তাহা অক্ষম। জেঠা মশায় লোকটা খাঁটি—কিন্তু শচীশের কর্মযোগ সে কথা বলা যায় না। এ বস্তু গুরুমুখী বিদ্যার মতো পাইবার নয়, জীবন হইতে উদ্ভূত হইলেই তবে সত্য হইল। নিরীশ্বর কর্মযোগ জগমোহনের জীবন হইতে উদ্ভূত—আর শচীশের পক্ষে তাহা ধার করা বস্তু। যতদিন উত্তমর্ণ জীবিত ছিল বেশ চলিয়া যাইতেছিল—কিন্তু জগমোহনের মৃত্যুর পরেই সব কেমন ওলটপালট হইয়া গেল। নিরীশ্বর কর্মযোগী ভক্তিরস সমুদ্রের ঠিক মাঝখানটিতে ঝাঁপদিয়া পড়িল। নিরীশ্বর ও অগুরু (জগমোহন কখনো গুরুর গৌরব দাবী করিত না) শচীশ প্রচন্ড আস্তিক ও গুরুবাদী হইয়া উঠিল, তাহার কর্মযোগ ঘুচিয়া গিয়া নৈষ্কর্ম্যের লীলায় সে নাচিয়া-কুঁদিয়া পাড়া মাৎ করিতে লাগিল। দ্বন্দ্ব যত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ব তত প্রচণ্ড হইল।

কিন্তু লীলাবাদেও তাহার স্থিতি হইল না, আবার তাহাকে পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল কিন্তু এবারে আর বাঁধা পথের নিশানা ধরিয়া নয়। নাস্তিক ও আস্তিক্য, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ, লঘুবাদ ও গুরুবাদ—সবই তাহার পক্ষে সমান অবাস্তব প্রমাণিত হইল। অনন্যোপায় হইয়া তবে সে অনন্যশরণ হইল, পরের প্রদীপে যখন আর চলিল না নিজের দীপটি সন্ধান করিয়া জ্বালিয়া লইতে তখন সে বাধ্য হইল। এ পথের পরিণাম লেখক দেখান নাই, কারণ সে পরিণাম অনায়াস দৃশ্য নয়, তাহার লক্ষ্য মহৎ বলিয়াই তাহার অন্ত অনির্দিষ্ট। নিরীশ্বর কর্মযোগে ছিল নিছক অরূপের সন্ধান, ভক্তিযোগে ছিল প্রত্যক্ষরূপের সন্ধান, আর এখন? শচীশ এখন হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে রূপও নয়, অরূপও নয়, রূপারূপের সমন্বয়ের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করিতে হইবে। তাহার মতে তিনি অরূপ হইতে রূপের দিকে নামিতেছেন, তাই সাধককে রূপ হইতে অরূপের দিকে উঠিতে হইবে, তবে তো মাঝপথে দুজনের মিলন হইবার সম্ভাবনা! সেই সম্ভাবনার আয়োজনে শচীশ এখন মগ্ন—ইহাই তাহার বর্তমান সাধনার স্বরূপ। নিরীশ্বর কর্মবাদ ও গুরুবাদী ভক্তিযোগ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয় কোণটির নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্মযোগ! রূপ ও অরূপ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয়টির নাম রূপারূপের সমন্বয়! এই দুরূহ পথের সীমানায় আনিয়া লেখক শচীশকে ঘরছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া করিয়া একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন। দামিনী ও শ্রীবিলাস তাহার সঙ্গচ্যুত হইয়াছে আর যাহার মুখে শচীশের কথা জানিতে পাইতাম সেই শ্রীবিলাস সঙ্গছাড়া হওয়াতে আমরাও শচীশের সন্ধান ভ্রষ্ট হইয়াছি, মরুভূমির পথিক মরীচিকার উপকূলে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

শচীশের সাধনার ধারা বিশেষ প্রথম দুটি স্তরের, অনেকেরই জীবনে অনুরূপভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে, সে হিসাবে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই—বিশিষ্ট শচীশ মানুষটি। অনায়াসলব্ধ সিদ্ধির দৃঢ় ভূমি হইতে সুগভীর অনিশ্চয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে নাই, সাধনবেগের উল্লাসে করায়ত্ত সিদ্ধিকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় খরচ করিয়া পুরোপুরি নিঃস্ব হইয়া সে পথে বাহির হইয়াছে, সে কেবলমাত্র পথিক নয়, একেবারে দেউলে পথিক—ঘরের পথ যাহার চিরকালের জন্য রুদ্ধ—রবীন্দ্রজগতের নরনারী সমাজে শচীশ সত্যই অদ্বিতীয়, কেবল তাহার স্রষ্টার জীবনে অন্তহীন যে-সাধন বেগ অনুভব করা যায় তাহারই খানিকটা আপন বক্ষের মধ্যে লইয়া যেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর কাহারো সঙ্গে তাহার বড় মিল নাই।

* রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ

রঙ্গজগৎ

সহযাত্রী—(এম পি প্রডাকসন্স—ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিও)—কাহিনী, সংলাপ ও গান: শৈলেন রায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: অগ্রদূত; আলোকচিত্র: অগ্রদূত; শব্দ-যোজনা: যতীন দত্ত; সুরযোজনা: রবীন চট্টোপাধ্যায়; নৃত্য পরিচালনা: মণি বর্ধন; শিল্প নির্দেশ: তারক বসু। ভূমিকায়: উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভারতী, মলিনা, পদ্মা, করবী গুপ্তা, অলকা, সাবিত্রী, অপর্ণা প্রভৃতি।

ডি ল্যুক্স ফিল্মসের পরিবেশনে ৯ই মার্চ উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

গল্প ভেবে ছবি কল্পনা করা এক কথা, আর, ছবি ভেবে নিয়ে গল্প জোগান দেওয়া আর এক কথা। প্রথম ধরণটি উৎসৃত হয় মন আর মগজের চকমকিতে, আর দ্বিতীয়ের উৎপাদন ঘটে লেন্স আর মাইকের কষাকষি থেকে। একটায় প্রবাহিত হয় প্রাণের ধারা, আর একটা গড়িয়ে যায় ধারণার পথ ধ'রে: "সহযাত্রী" এই শেষ পর্য্যায়ের।

লেন্সের চোখ আর মাইকের কান পুষিয়ে যেতে হিসেবের নিয়ম করা ছকেতে সব কিছু না সাজালে আর চলে না। এখানেও তাই যা পাওয়া গেলো তা কৃত্রিমতাকে পরিহার ক'রে যেতে পারলো না কিছুতেই। যেমন ধরুননা নায়ক ও নায়িকার প্রথম মিলনের দৃশ্যটা—সুনীতিকুমার সেন তার মেসোমশাই বিরূপাক্ষ গুপ্তের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে না করার জন্যে পালিয়ে দার্জিলিংয়ে যাবার পথে প্ল্যাট-ফর্মে এবং পরে ট্রেনের কামরায় সুনীতিলতা সেনের সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা। নায়ক ও নায়িকাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে দুই সুনীতিকে এক কামরায় পুরে দেওয়ার মজাটা যতো না উপভোগ্য হ'লো তার চেয়েও গতি উন্মুখ ট্রেনের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দুজনের বাক্-বীতরাগকে দীর্ঘায়িত করার দৃশ্যটা হ'লো অনেক বেশী বিরক্তিকর। ক্যামেরার চাহিদাতে তা করতে হ'লো কিন্তু মনের আবেশে ঔচিত্যের একটা তর্ক ছাড়া আর কিছুই আঁকিয়ে তুলতে পারলে না।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় ট্রেনে চলেছে একটি স্ত্রী ও এক পুরুষ। দুজনেই যাচ্ছে ঘর থেকে পালিয়ে দার্জিলিংয়ে। দুজনেই দার্জিলিং অধিবাসীনী তাদের দিদিকে স্টেশনে আসার জন্যে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে। এ ছাড়া দুজনের নাম তো এক আছেই সুনীতি সেন—অর্থাৎ পরিচয় বিভ্রান্তি ঘটিয়ে উভয়ের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেবার একটা পাঁয়তারা মাত্র। তবুও কথা ছিলো, এটা যদি কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার হ'তো! হঠাৎ-মনে-পড়ে-যাওয়া এ-ছবি ও-ছবি থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে দৃশ্যের জোগান দেওয়া হ'য়েছে, নয়তো লেন্স আর মাইকের খাতির রেখে দেবার জন্যে যাহোক একটা কিছুকে খাটিয়ে দেবার চেষ্টা হ'য়েছে—তা সে যতোই কৃত্রিম আর অযৌক্তিক হোক।

বলা বাহুল্য, ট্রেনে যেতে যেতে দুই সুনীতির আলাপ হ'লো, এবং আপনারা যা ধ'রেছেন ঠিক সেইভাবেই—অর্থাৎ নরম সুনীতির লাগলো শীত আর গরম সুনীতি কর্তৃক নিজের চেস্টারফিল্ডটা তার গায়ে চাড়িয়ে দেওয়া। এখানে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে সুনীতি 'কুমার' লন্ডন কিংবা এফ্-আর-সি-এস ডাক্তার। সুতরাং দার্জিলিংয়ে সুনীতিলতার দিদির অসুখ না হ'লে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আবার দেখা হয় কি ক'রে! সেই সূত্রেই দেখা হ'লো; পরিচয় ঘনিষ্টতর হ'লো পরিচয় দিয়ে জেনে নেওয়া হ'লো দুজনেই বৈদ্য এবং ভিন্ন গোত্রীয়, অতএব প্রেমের পথ মসৃণ। কিন্তু অতো সহজে মিলন ঘটানো যায় না। তাই একটা চ্যারিটি শোর অবতারণা হ'লো প্রণয়ের তৃতীয় কোণ হিসেবে ডালিয়া নামের এক প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আবির্ভাব ঘটিয়ে। ব্যর্থ হ'য়ে ডালিয়া দার্জিলিংয়ে সুনীতিদ্বয়কে কেন্দ্র ক'রে কুৎসা রটালে এবং সুনীতিকুমারের মেসোমশায় বিরূপাক্ষবাবুকে বেনামী চিঠিও পাঠিয়ে দিলে ওদের নামে। ইতিমধ্যে সুনীতিকুমারেরা পরস্পরকে বিয়ে করা ঠিক করেছিলো। কিন্তু কুৎসা রটে যাওয়ায় সুনীতিলতা লজ্জায় ও ক্ষোভে দিদিকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেলো সুনীতিকুমারকে এই কথা লিখে জানিয়ে যে পয়লা অক্টোবর চাকুরিয়া লেকের ধারে একটা নির্দিষ্ট গাছতলায় ওদের দেখা হবে। (বোঝাই যাচ্ছে যে দেখা হবে না) বিরূপাক্ষ ব্যাপার জানবার জন্যে দার্জিলিংয়ে এসে হাজির হলেন আর তাকে দেখেই সুনীতিকুমার জানলা দিয়ে খাদে টপকে পড়ে কলকাতায় পালিয়ে এলো। বিরূপাক্ষ কলকাতায় ফিরে এসে বাড়িতে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সুনীতিকুমারের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের ব্যাপার নিয়ে বচসা হ'লো এবং দর্শকের অনুমান মতোই সুনীতিকুমারকে গৃহছাড়া হ'তে হ'লো। যোগাযোগ ঘটিয়ে তার তিনদিন পরই সেই পয়লা অক্টোবরকে নিয়ে আসা হ'লো। মিলনের প্রত্যাশায় দুই সুনীতিই ছুটলো সেই গাছের পথে। সুনীতিকুমার পৌঁছলো, অপেক্ষাও ক'রলো দীর্ঘকাল। কিন্তু আর এক সুনীতির গেলো টায়ার পাঙ্কচার হ'য়ে, ফলে আসতে দেরী এবং এসে অন্য সুনীতিকে না পাওয়া। (আগেই তো তা' জানা গিয়েছিলো।) সুনীতিকুমার গেলো 'লতার' বাড়িতে কিন্তু তার কাকার কাছ থেকে অপমানিত হ'য়ে একেবারে পাটনায় তার বন্ধুর কাছে গিয়ে হাজির হ'লো। আর সুনীতিলতা 'কুমার'-এর বাড়ি গিয়ে তার নিরুদ্দেশের খবর পেয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এলো। তারপর হ'লো ব্যাঙ্ক ফেল্ যাতে সুনীতিলতারও ফেল্ হ'লো। অন্নের সংস্থান এবং দিদির বিলেত-প্রবাসী স্বামীর খরচ জোগাবার জন্যে ছোটদের জড়ো ক'রে ক্লাশ খুললে। আর ওদিকে সুনীতিকুমারের স্নেহশীলা মাসীমা শোকে শয্যা নিলেন। মেসোমশায় বিরূপাক্ষ আধ-পাগলাটে গোছের ছিলেন, এখন প্রায় পুরো পাগলই হ'তে চলেছেন। এই হ'লো সুনীতিদ্বয়ের মিলন ঘটানোর উপযুক্ত সময়। রচয়িতার একখানা ছবির একটা দৃশ্য মনে পড়লো প্রায় সেই মতোই তিনি সুনীতিকে টেনে নিয়ে গেলেন রেডিওতে গান গাইতে তা না হ'লে সুনীতিকুমারের পক্ষে "লতার" খবর যাইবা কিভাবে। সুনীতিকুমার গান অবশ্যই শুনলো এবং দৌড়ে এলো ট্রেনের গতিতে এবং সটান হাজির হ'লো সুনীতি-লতাদের স্কুলে। একদিন আগেও রেডিওতে গাইবার সময় যে সুনীতিলতাকে দর্শক বেশ সুরূপাই দেখেছিলো (পাটনা থেকে কলকাতা এর চেয়ে বেশী সময় যায়নি নিশ্চয়ই) সে-ই সুনীতিকেই সুনীতিকুমার স্কুলে ঢোকবার মুখেই দেখে চিনতে পারলে না, কারণ তখন তাকে অনেক শ্রীহীনা করে দেখানো হয়েছে। সুনীতিলতা দুঃখে ও মর্মান্তিক অভিমানে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। (এখনে আর একটা ছবির একটা অংশ) আয়নার সামনে নিজেকে নিজেই নিজের রূপ নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, সুরূপা নিজে আর কুরূপা নিজের মধ্যে তর্ক করতে থাকে। পর মুহূর্তেই তার এক বান্ধবী এসে জানায় যে তার রূপ ঠিকই আছে এবং তাকে শকুন্তলার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে (না হলে অভিজ্ঞান আসে কি করে!)। সুনীতিলতা বলা বাহুল্য 'অভিনয়' করতে স্বীকার করলে অবশ্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে। পরদিন সুনীতিলতা নিজেকে তার যমজ-ভগিনী বলে পরিচয় দিয়ে সুনীতিকুমারকে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের টিকিট বিক্রী করলে। সুনীতিকুমার অভিনয় দেখতে গেলো; সুনীতিলতা অভিনয় করতে করতে মূর্চ্ছিতা হলো ঠিক সেই জায়গায় যেখানে দুষ্মন্তের সামনে অঙ্গুরীয় খুঁজে পেলে না সুনীতিকুমার ছুটে গিয়ে মূর্চ্ছিতা সুনীতি

লতাকে তুলে নিয়ে গেলো। একজনের অভিজ্ঞান হল, আর একজনের জ্ঞান ফিরল। তারপর তারা গেল বিরূপাক্ষের বাড়ীতে। তারপর বিয়ের সানাই।

এমনিধারা অর্ডার দিয়ে ঘটনা তৈরী করে যাওয়া হয়েছে গোড়া থেকেই, স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগে ঘটনাকে আসতে দেওয়া হয়নি কোথাও। যে চরিত্রের যেখানে যেমনটি হওয়া উচিত বা তাদের দ্বারা যে ধরণের ঘটনায় জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক, ঠিক তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যাওয়ার দিকেই যেনো লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে। কলকাতায় ছ' বছর পড়ে ডাক্তারী পাশ করে তারপর লণ্ডন থেকে এফ আর সি এস হয়ে আসা ডাক্তার সুনীতিকুমারকে বড়ো করে তোলা হলো গাইয়ে হিসেবে—সে যে ডাক্তার সে পরিচয় কাজে লাগানো হলো দার্জিলিংয়ে পৌঁছে সুনীতিলতার সঙ্গে প্রথমবার দেখা করিয়ে দেবার একটা ছুতো হিসেবেই শুধু। সুনীতিলতাও বাড়ী থেকে পালিয়ে যেভাবে সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলাপ করলে এবং যেভাবে এক কথাতেই বিয়েতে রাজী হয়ে গেলো তাতে মনে হয় ও যেনো প্রেমিক শিকারেই বেরিয়েছিলো। দার্জিলিংয়ে ওদের নিয়ে যখন ডালিয়া কুৎসা রটালে তখন ওরা বিয়ের সংকল্প করে ফেলেছে। সুনীতিকুমারের দিক থেকে একটা বাধার আশংকা ছিলো তার মেসোমশাই; সুনীতিলতার কোন বাধাই ছিল না, অথচ দার্জিলিং থেকে পালিয়ে গেলো সে-ই!

প্রথম দৃশ্যে সুনীতিকুমার যেভাবে মেসোমশায়ের নির্বাচিতা তার ভাবীপত্নী রমলাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেলো, আর একজনের সঙ্গে তাকে ভিড়িয়ে দিতে হবে বলে ঠিক করে নিয়েই যেনো অমন একটা দৃশ্যকে সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে বেখাপ্পা হওয়া সত্ত্বেও। মেসোমশাই আর মাসীমার প্রসঙ্গ ছবির অর্ধেক দখল করেছে তার কারণ, স্পষ্টই বোঝা যায়, সুনীতিদের নিয়ে ঘটনা তৈরীর অক্ষমতা। দার্জিলিংয়ে সাহায্য অনুষ্ঠানে নাচের দৃশ্যটি এতো দীর্ঘ যে নাচ শেষ হবার আগে মূল গল্প মন থেকে সরে যায়। শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত প্রসঙ্গ না দেখানো পর্যন্ত কি সুনীতিদের নীতিমাফিক পরিণতিতে এনে ফেলা যেতো না?

সমস্তটুকু কৃত্রিমতায় ভরা, জোর করে টেনে হাজির করা কতকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়েই এই ছবি। অগ্রদূত যন্ত্রকুশলী হিসেবে হয়তো কৃতিমান কিন্তু তাই বলে তার সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পীজনোচিত মেধাতেও চৌকষ এমন ধারণা তাদের ধরিয়ে দিলে কে? এম পি প্রডাকসন্স আজ বাঙলার সেরা প্রযোজকদের অন্যতম, কিন্তু ছবির যে মূল কথা, রসপুষ্ট কাহিনী, সে বিষয়ে তাদের এতো অবহেলা কেনো? ইতিহাসকে তারা লক্ষ্য করুন, কাহিনীর শক্তিকে অবহেলা করে কেবল যন্ত্রকুশলের বাহাদুরীর জোরে ছবি দাঁড় করাতে গিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠানকেও জনপ্রিয়তা হারিয়ে যেতে হচ্ছে—তারাও কি সেই পথই সার মনে করেন?

অভিনয়ের মধ্যে সুনীতিকুমারকে ডাক্তার হিসেবে বাদ দিলে উত্তমকুমারকে প্রশংসা করা যায়। তার চেহারা ভালো, স্বর ভালো এবং মেয়েদের 'হিরো' হবার মতো চটুল ভঙ্গীও খোলে। ভারতীর অভিনয় খুবই ভালো, কিন্তু ছবির যা বিন্যাস তাতে প্রতিভার অপচয়ই হয়েছে বলতে হবে। বিরূপাক্ষ উকীলের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী যে রূপ ফুটিয়েছেন সেটা বেশ আবেগময় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যতোই স্নেহান্ধ হোক একজন জাঁদরেল উকীলের অমন পাগলামো যুক্তির মাপে অতি বাড়াবাড়ি মনে হয়। তার চেয়ে স্নেহশীলা মাসীমার ভূমিকায় মলিনা বরং অনেক সংযত অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সুনীতিকুমারের দিদি ও তদীয় স্বামীর ভূমিকায় যথাক্রমে শোভা সেন ও কমল মিত্র মানিয়ে গিয়েছেন; সুনীতিলতার দিদির ভূমিকায় পদ্মা সম্পর্কেও ঐ কথাই। মুহুরীর ভূমিকায় হরিধন ছবিতে হাসির খোরাক। নবাগতা করবী গুপ্তা চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো কৃতিত্বও দেখাতে পারেন নি।

আলোকচিত্র মনকে টেনে নেয়। বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের বহিদৃশ্যাবলী দৃষ্টিকে জুড়িয়ে দেয়। শব্দগ্রহণে দার্জিলিংয়ের পথে ট্রেনের শব্দ কুশলতার কথা মনে করিয়ে দেয় বেশী করে, তাছাড়া অন্যদিকও মন্দ নয়। নাচটা একটা দঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। নাচের মাধুর্য মোটেই ফোটেনি, না রচনায় আর না চিত্র-গ্রহণে। সঙ্গীতাংশ, বিশেষ করে গানগুলি প্রশংসা করবার মতো। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার হয়েছে। আজকাল প্রায় ছবির সঙ্গীতাংশে দেখা যাচ্ছে ডবল বেসকে খুব জোর করে সামনে এনে ফেলার একটা রেওয়াজ। এই পদ্ধতিতে সঙ্গীত নেওয়ার কোনো দরকার হয়েছে বলতে পারি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এর ফলে সঙ্গীতের সূক্ষ্মাংশ যাচ্ছে চাপা পড়ে এবং তার চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে, খাদেতে গানের কথা যায় জড়িয়ে। এটা শব্দযন্ত্রে গ্রহণের দোষে অথবা ইচ্ছাকৃত, যে কারণেই হোক, বিরক্তিকর।

রূপান্তর—(রূপশ্রী চিত্র প্রতিষ্ঠান— রূপশ্রী স্টুডিও)—কাহিনী ও সংলাপঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়; আলোকচিত্রঃ সন্তোষ গুহ রায়; শব্দযোজনাঃ সতোন চট্টোপাধ্যায়; সুরযোজনাঃ হরিপ্রসন্ন দাস; শিল্প নির্দেশঃ ভূপেন মজুমদার; নৃত্য পরিচালনাঃ অতীন লাল। ভূমিকায়ঃ পাহাড়ী, দীপক, বিপিন মুখোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, কৃষ্ণধন, আদল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, জয়নারায়ণ, দেবযানী, শোভা সেন, শ্যামলী, শেফালী, শিখারাণী প্রভৃতি।

মানসাটা ফিল্মসের পরিবেশনে ৯ই মার্চ রূপবাণী, অরুণা ও ইন্দিরাতে মুক্তিলাভ করেছে।

তেরো মাসে পাঁচখানি ছবি তৈরী করার মতো সময়-সংক্ষেপ-বাহাদুর পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় নতুন কিছু দেবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন না, অন্তত তাঁর ধারণা তাই। তবে যাই ভেবে থাকুন তিনি তাঁর আগেকার ছবিগুলির চেয়ে ক্রমিক হারে অধোগতিশীল, দর্শকদের কাছে এইটেই বোধ হয় সান্ত্বনা। রসসৃষ্টি ক্ষমতার যে আভাস তিনি তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবিখানিতে দিয়েছিলেন সেটা যে নিতান্তই ফুকো তা আগেও বোঝা গিয়েছিলো, তবে এখন তা স্পষ্টই করে তুলেছেন। তাড়াতাড়ি করে ছবি তোলায় পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় জানতে পারলেন না, তিনি কি হারিয়ে বসেছেন।

কাহিনীকে তিনি থোড়াই গ্রাহ্য করেন, বিন্যাসকে তিনি টিকি ধরে নাচিয়ে বেড়ান, আর, রহস্য সৃষ্টি মানে তিনি বোঝেন অনর্গল বক্তৃতার ঝাঁপি খুলে দেওয়া। 'রূপান্তর' রহস্যমূলক অপরাধ-নাট্য কিন্তু এর মধ্যে থেকে পরিচালক 'রহস্য' এবং 'নাট্য' এ দু বস্তুকে গোড়াতেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং বাকী "অপরাধ"কে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে তিনি নিজেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গল্প শুধু নয়, রহস্যমূলক গল্পকে পরিপুষ্ট ও নাটকীয় করে তুলতে যথেষ্ট চিন্তার দরকার, কিন্তু সময় দিতে গেলে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তাড়াতাড়ি ছবি শেষ করার গতি-বাতিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে—অতএব সংক্ষেপে কার্যোদ্ধারের প্রকৃষ্টতম পন্থা চরিত্রদের দাঁড় করিয়ে তাদের দিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা ও ঘটনার বিবৃতি; গল্প তাতে হোক বা না হোক, ছবির ফুট তাতে বেড়ে যাবেই!

ছবির আরম্ভ মঞ্চের ওপরে নায়িকা মণিকার গান থেকে। গান শেষ হলে এলো নাট্যকার সুবীর মিত্র, মণিকাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাড়ীর পথে মাঝপথে গাড়ী থামিয়ে মাঠের মধ্যে বসে ওরা দুজনে বক্তৃতা করলে যার অর্থ হচ্ছে ওরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসে, সুবীর মণিকাকে চায় কিন্তু মণিকা কোন কারণে রাজী নয়। মাঠ থেকে ফিরে মণিকার বাড়ীতে দেখা গেলো রাম বেশী একজনকে যার পরিচয় পাওয়া গেলো মণিকার বাবা জিতেনবাবু বলে। এতোক্ষণ জিতেন-

বাবু রামের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন তার ভগিনী বলে পরিচিতা বিকৃত মস্তিষ্কা বিমলা-দেবীর সামনে। সুবীর ও মণিকা ফিরতেই জিতেনবাবু দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন সুবীরকে নিয়ে এবং একসময় আড়ালে সুবীরকে জিগ্যেস করলেন যে মণিকা সুবীরের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে কি-না। সুবীর সেখান থেকে ফিরে গেলো তার ডাক্তার বন্ধু অসীমের কাছে এবং মণিকাকে রাজী করানো নিয়ে দুজনে দীর্ঘ বক্তৃতা, তর্ক ও গবেষণা হলো। পরামর্শ করে মণিকার মনের রহস্য জানবার জন্য একটা পার্টির ব্যবস্থা হলো। অসীম ছদ্ম-পরিচয়ে মণিকার কাছে তার জীবনের তত্ত্ব সংগ্রহ করলে, কিন্তু মার পরিচয় প্রসঙ্গ আসতেই মণিকা তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলো। অসীম বন্ধু সুবীরকে এসে জানালে যে মণিকা তাকে ভালোবাসে ঠিকই তবে এমন একটা রহস্য আছে যার জন্যে মণিকা বিয়েতে সায় দিতে পারছে না। যাই হোক এর পরই দেখা গেলো একদিন মণিকাদের বাড়ীতে জিতেনবাবু যখন চাণক্য সেজে অভিনয় করছেন বিমলার সামনে সে সময়ে সুবীর আর মণিকা এসে উপস্থিত হলো—তাদের নাটকের রজতজয়ন্তীতে পুরস্কার সম্ভার নিয়ে। মেডেল দেখে জিতেনবাবুর উচ্ছ্বাসের বাঁধ গেলো খুলে সেইসঙ্গে বক্তৃতার মুখও; অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কথা তিনি বলে গেলেন যার মানে হয়, 'কাহিনী স্থিরঃ ভব'। বক্তৃতাদি শেষে সুবীর জিতেনবাবুকে জানিয়ে দিলে যে মণিকা তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। জিতেনবাবু দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তার উল্লাস প্রকাশ করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে পরদিনই তিনি তাঁর বন্ধুদের ডেকে কথাটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন। কিন্তু পরদিন বাড়ী থেকে টেলি-ফোন পেয়ে মণিকা থিয়েটার থেকে রূপসজ্জা সমেত ত্রস্তে চলে আসে। সুবীর থিয়েটারে গিয়ে সে সংবাদ পেয়ে মণিকার বাড়ীতে ছুটে এলো। দেখলে জিতেনবাবু আলিবাবার পোষাকপরা অবস্থায় খুন হয়ে পড়ে আছেন। মণিকার সঙ্গে কথা বলতে সুবীর বুঝলে মণিকা খুনটাকে চাপা দিতে চায় যেনো। পুলিশকে সে টেলিফোন করলে। পুলিশ এসে, ছবির প্রায় হাজার তিনেক ফিট ভরে এঘর সেঘর করে তদন্ত করলে। ইন্‌সপেক্টরের সঙ্গেও মণিকা আগাগোড়া মিছে কথা বলে গেলো। কয়েকদিন তদন্তাদির পর ইন্‌সপেক্টর জানালেন, তিনি মামলার হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মণিকা জানালে যে সে তার পিসিমা যমুনা দেবীকে নিয়ে রাঁচীতে রেখে আসতে যাবে। ইন্‌স-পেক্টর যাবার অনুমতি দিয়ে ভিন্ন কামরায় মণিকার পশ্চাদ্ধাবন করলেন রাঁচী পর্যন্ত এবং তারই পিছু পিছু একেবারে কলকাতায় ফিরে এলো গ্রাণ্ড হোটেল পর্যন্ত এবং সেখানে একটা ঘরে মণিকাকে একখানা চিঠি আগুনে পোড়াতে দেখে তাকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করলে। মণিকা তার বিবৃতিতে নিজেকে হত্যাকারিণী বলে স্বীকার করে নিলে। সুবীর বিশ্বাস না করে তার ফাঁড়িতে দেখা করতে গেলো। সুবীরের জেরার মুখে পড়ে মণিকা গেলো অজ্ঞান হয়ে। ফিরে গিয়ে সুবীর দেখলে জিতেনবাবুর তৈজসাদি নিলাম হচ্ছে। একজন বৃদ্ধকে জিতেনবাবুর পোষাকগুলো ডেকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে দেখে সুবীর তার পিছু নিলে এবং তার বাড়ীতে গিয়ে গোপনে তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। তারপর এলো আদালত। মণিকা আগাগোড়াই নিজেকে অপরাধিনী বলে স্বীকার করে যাচ্ছে। সুবীর আদালতে দাঁড়িয়ে জানালে যে মণিকা যে নিরপরাধ তা সে প্রমাণ করবে। বলেই সে "আলিবাবা" অভিনয় করাবার জন্যে আদালতের কাছে প্রার্থনা করলে। পরদিন "আলিবাবা" অভিনয় হচ্ছে—মর্জিনা নাচতে নাচতে দস্যুর বুকে যেই ছুরি বসিয়েছে অমনি দেখা গেলো পিসিমা যমুনা দেবীও পাগলিনীর মতো তার হাতের কাছে রাখা ছোরা নিয়ে হত্যায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। তাকে সামলে নিয়ে সুবীর তার কাহিনী আরম্ভ করলে। যাতে দেখা গেলো যে বহুকাল আগে রাজমোহন থিয়েটারের ম্যানেজার জিতেনবাবু গৃহবিতাড়িতা বিমলা নামের এক মহিলাকে সকন্যা আশ্রয় দেন নিজের ভগিনী-রূপে। ফলে জিতেনবাবু বিমলাকে অভিনয়ে নামতে সহায়তা করেন। বিমলা অভিনেত্রী হিসেবে নাম করে। একদা "আলিবাবা" অভিনয় করার সময় দস্যুর ভূমিকায় নিয়মিত অভিনেতার অনুপস্থিতিতে নীলমণি রায় নামক অন্য থিয়েটারের এক অভিনেতাকে সেই ভূমিকায় নামানো হয়। অভিনয় করতে করতে দেখা যায় যে মর্জিনাবেশী বিমলা ক্ষিপ্ত হয়ে সত্যই নীলমণিকে হত্যায় উদ্যত হয়। জানা যায় যে নীলমণিই হচ্ছে বিমলার লম্পট স্বামী যে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর বিমলার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাকে রাঁচী পাঠানো হয়। কয়েক বছর পর সে স্মৃতি হারিয়ে ফিরে আসে এবং তাকে যমুনা নাম দিয়ে জিতেনবাবুর ভগিনী বলে পরিচয় দিয়ে রাখা হয়। তারই মেয়ে মণিকা, নিজের পরিচয়ের জন্যে জিতেনবাবুকে পিতা বলে স্বীকার করে নেয়। জিতেনবাবু যমুনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য নিজে নানা ভূমিকায় সেজে তার সামনে অভিনয় করতেন। সুবীরের সঙ্গে মণিকার বিবাহটা যমুনা (বিমলা) বুঝবে না এটা জিতেনবাবু সইতে পারছিলেন না, তাই যমুনার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি সেদিন আলিবাবা সেজেছিলেন এবং তাই দেখে যমুনা উন্মত্ত হয়ে তাকে খুন করে বসে। আসল খুনী কে জানতে পারার পর মণিকা ও সুবীরের মিলন রোখে কে?

বিন্যাসের দোষে কাহিনীর কোথাও না জমতে পেরেছে কোন রস, আর না জমাট বাঁধতে পেরেছে নাটকীয় আবেদন কোথাও। দোষ কাহিনীকারের অথবা পরিচালকের তা তারা নিজেরাই বোঝাপড়া করুন, কিন্তু দর্শকের কাছে একটা অতি নীরস ও নিষ্প্রাণ কাহিনীই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, কি করে ছবির দৈর্ঘ্যটা শুধু যেমন করে হোক পুরিয়ে যাওয়া যায় পরিচালকের দৃষ্টি শুধু সেই দিকেই।

আরম্ভতেই দীর্ঘগান না দিয়েও মণিকাকে অভিনেত্রী বলে বোঝানো যেতো; জিতেন-বাবুকে বারবার সং না সাজিয়েও তার পরিচয় দেওয়া যেতো; হাজার কতক ফুট ধরে সারা বাড়ীটা ইন্‌সপেক্টরকে দিয়ে তল্লাস না করিয়েও তার উদ্দেশ্য ও কার্যধারার নির্দেশ দেওয়া যেতো; একখানা চিঠি পোড়াবার জন্যে মণিকাকে কলিকাতা থেকে রাঁচী পাঠিয়ে, আবার রাঁচী থেকে তাকে টেনে কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে টেনে নিয়ে আসার অর্থ কী? খুনী বলে সাব্যস্ত আসামীকে থানার হাজতে রাখা এবং সুবীর চাইতেই দেখা করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া, এতোই সহজ ব্যাপার কী! আদালতে সুবীর বিচারপতিকে সম্বোধন করে দাঁড়াবার অধিকার পেলে কী আমেরিকান ছবির নকল করে? এমনি ধারা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল গোঁজামিল। মনকে কোথাও আঁকড়াতে পারে না এতটুকুও।

ছবির কলাকৌশলের দিকও আশানুরূপ নয়। আলোকচিত্র কয়েক জায়গায় মাত্র রহস্য-মূলক নাটকের ভাব বজায় রেখেছে। শব্দগ্রহণ, কথা স্পষ্ট বোঝা গেলেও, অনেক জায়গাতেই শব্দসমতার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সঙ্গীতাংশ হয়েছে বড়ো বেশী জোর। গান দুখানি, সুর ভালো, আবহ সঙ্গীতও এবং বিশেষ করে টাইটেল অংশ।

অভিনয়কে দাঁড় করিয়ে দেবার মতো জোর কাহিনী বা ঘটনার তেমন না থাকায় কোন শিল্পীর পক্ষেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব হতে পারেনি বা মনেও কেউ দাগ টানেন না। তাছাড়া চরিত্রগুলির সবাইকে এতো বাক্‌সর্বস্ব করে দেওয়া হয়েছে যাতে অন্যদিকের অভিব্যক্তি প্রকাশে তাদের সুযোগই এসেছে কম।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩রা মার্চের পত্রিকায় 'বরযাত্রী' ছবিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল গণশা'র মামার চরিত্রটি সত্যেন বসু রূপায়িত করেছেন। আসলে গণশার 'মামার' ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শান্তি ভট্টাচার্য। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক, দেশ

এ্যাথলেটিকস্

সর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক প্রথম ক্রীড়া অনুষ্ঠান দিল্লীর নবগঠিত বিরাট জাতীয় স্টেডিয়ামে দীর্ঘ আট দিন ধরিয়া বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে অনির্বচনীয় আনন্দ, অপূর্ব সৌহার্দ্য, প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া বিশেষ সাফল্যের সহিতই শেষ হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঠিক একই পরিবেশের মধ্যে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সুমধুর ঐকতান ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠানের যোগদানকারী ১১টি দেশের প্রতিনিধিগণ এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের পতাকা স্টেডিয়াম হইতে বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গেলে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এত জাঁকজমক, এত উত্তেজনা, এত অর্থব্যয়ের প্রকৃত ফল কি হইল এই প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে জাগা স্বাভাবিক। আমরা ইহাদের সদুত্তর দিতে পারি না তবে ইহাদের এইটুকু বলিতে পারি, "বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান যে মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া প্রতি চারি বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এই এশিয়ান গেমসও সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পরিচালিত হইবে।" উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা বলা কঠিন, তবে ভারত যে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব বহন করিবার কিছুটা যোগ্যতা রাখে তাহারই নিদর্শন এই মহোৎসবের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ১৯৬০ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান ভারতে করিবার জন্য প্রচেষ্টা অনেকদিন হইতেই চলিয়াছে, আশা করা যায় ইহার পর তাহা ব্যর্থ হইবে না।

প্রতিযোগিতার সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছে জাপান। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই তবে আনন্দের ও উৎসাহের বিষয় যে, ভারত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের তুলনায় আশাতীত ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছে। জাপান সন্তরণ ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই যোগদান করে নাই করিলেও ভারত যে স্থান অধিকার করিয়াছে উহা হইতে সে বঞ্চিত হইত না এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই প্রতিযোগিতার অনেকগুলি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার অধিকাংশই জাপানী প্রতিনিধিগণ করিয়াছেন। অপর সকল রেকর্ড প্রতিষ্ঠার গৌরব ভারতীয় প্রতিনিধিদের কেবল ফিলিপাইনসের প্রতিনিধি উচ্চ লম্ফনে সত্য সত্যই বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরাণ ভারোত্তোলনে বিশ্ববিখ্যাত। ইহার প্রতিনিধিগণ ভারোত্তোলনের সকল বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দেহগঠন প্রতিযোগিতায় বাঙলার তরুণ ব্যায়ামবীর পরিমল রায়ের সাফল্য সত্য সত্যই আনন্দের বিষয়। দলগত প্রতিযোগিতায় ভারতের শীর্ষস্থান লাভও উল্লেখযোগ্য। আর্থিক দিক দিয়া পরিচালকগণকে বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে ইহা আর কেহ না জানিলেও আমাদের কিছুই অবিদিত নাই এবং কেন হইয়াছে তাহাও আমরা জানি। ভবিষ্যতে এইরূপ মারাত্মক ত্রুটি হইবে না এই আশায় উহা লইয়া আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

খেলাধূলা

নূতন রেকর্ডের তালিকা

(১) পোল ভল্টঃ—সাওয়াদা বুংকিচী (জাপান)। উচ্চতাঃ—১৩ ফিট ৬ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(২) ১৫০০ মিটার দৌড়ঃ—নিক্কা সিং (ভারত)। সময়ঃ—৪ মিঃ ৪·১ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

(৩) ডিসকাস ছোড়া (মহিলাদের)ঃ—(১) মিস ইয়োশিনো টোয়োকো (জাপান)। দূরত্বঃ—১৩৮ ফিট ১½ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)। (২) কোজিমা ফুমী (জাপান)। দূরত্বঃ—১১৬ ফিট ৬¼ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(৪) ২০০ মিটার দৌড় (পুরুষদের)ঃ—লেভী পিণ্টো (ভারত)। সময়ঃ—২২ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

(৫) গোলা ছোড়া (পুরুষদের)ঃ—মদনলাল (ভারত)। দূরত্বঃ—৪৫ ফিট ২½ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(৬) গোলা ছোড়া (মহিলাদের)ঃ—(১) মিস ইয়োশিনো টোয়োকো (জাপান)। দূরত্বঃ—৩৯ ফিট ½ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)। (২) ফুমী কোজিমা (জাপান)। দূরত্বঃ—৩৮ ফিট ২ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(৭) ৪×১০০ মিটার রিলে (মহিলাদের)ঃ—১ম জাপান। সময়ঃ—৫১·৪ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

(৮) বর্শা ছোড়া (পুরুষদের)ঃ—নাগাইয়াসু হারুও (জাপান)। দূরত্বঃ—২০৯ ফিট ১০ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(৯) দৈর্ঘ্য লম্ফনঃ—তাজিমা মাসাজি (জাপান)। দূরত্বঃ—২৩ ফিট ৫½ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(১০) বর্শা ছোড়া (মহিলাদের)ঃ—ইয়োশিনো টোয়োকো (জাপান)। দূরত্বঃ—১১৮ ফিট ৯¼ (নূতন রেকর্ড)।

(১১) ২০০ মিটার দৌড় (মহিলাদের)ঃ—ওকামোটো কিমিকো (জাপান)। সময়ঃ—২৬ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

(১২) উচ্চ লম্ফন (পুরুষদের)ঃ—এ ফ্রাঙ্কো (ফিলিপাইনস)। উচ্চতাঃ—৬ ফিট ৪¾ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(১৩) ৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ দৌড়ঃ—তাকাহাসি সুসুসু (জাপান)। সময়ঃ—৯ মিঃ ৩০·৪ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

(১৪) ডিসকাস ছোড়াঃ—মাখন সিং। দূরত্বঃ—১৩০ ফিট ১০¾ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(১৫) দৈর্ঘ্য লম্ফন (মহিলাদের)ঃ—মিস সুগিমুরা কিয়োডো (জাপান)। দূরত্বঃ—১৯ ফিট ৫ ইঞ্চ (নূতন রেকর্ড)।

(১৬) ১১০ মিটার হার্ডলঃ—এ জি সিয়াং চিয়াং (সিঙ্গাপুর)। সময়ঃ—১৫·২ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় যে ফলাফল হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইলঃ—

দলগত প্রতিযোগিতা

(১) ভারত—৩টি স্বর্ণপদক (ফুটবল, এ্যাথলেটিকস ও সন্তরণ), ৩টি রৌপ্যপদক (এ্যাথলেটিকস, মহিলাদের এ্যাথলেটিকস ও সাইক্লিং), ২টি ব্রোঞ্জ পদক (সন্তরণ)। মোট ৫২ পয়েণ্ট।

(২) জাপানঃ—৩টি স্বর্ণপদক (এ্যাথলেটিকস) সাইক্লিং ও মহিলা এ্যাথলেটিকস) ২টি রৌপ্যপদক (বাস্কেট বল এ্যাথলেটিকস) একটি ব্রোঞ্জ পদক (ফুটবল) মোট ৪৪ পয়েণ্ট।

(৩) ফিলিপাইনস—২টি স্বর্ণ পদক (বাস্কেট বল ও সন্তরণ), ১টি রৌপ্য পদক (সন্তরণ), ২টি ব্রোঞ্জ পদক (এ্যাথলেটিকস) মোট ৩০ পয়েণ্ট।

(৪) সিঙ্গাপুর—১টি স্বর্ণ পদক (সন্তরণ), ২টি রৌপ্য পদক (সন্তরণ) মোট ২২ পয়েণ্ট।

(৫) ইরান—১টি রৌপ্য পদক (ফুটবল), ১টি ব্রোঞ্জ পদক (বাস্কেটবল) মোট ৮ পয়েণ্ট।

(৬) ইন্দোনেশিয়া—১টি ব্রোঞ্জ পদক (মহিলাদের এ্যাথলেটিকস) মোট ২ পয়েণ্ট।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা

(১) জাপান—২০টি স্বর্ণ পদক (৩টি সাইক্লিং, ৯টি এ্যাথলেটিকস, ৮টি মহিলা এ্যাথলেটিকস)। ১৮টি রৌপ্য পদক (৩টি সাইক্লিং, ১০টি এ্যাথলেটিকস ও ৫টি মহিলা এ্যাথলেটিকস ১৩টি ব্রোঞ্জ পদক (২টি ভারোত্তোলন, ৯টি এ্যাথলেটিকস, ২টি মহিলা এ্যাথলেটিকস) মোট ১৬৮ পয়েণ্ট।

(২) ভারত—১২টি স্বর্ণ পদক (৩টি সন্তরণ, ৯টি এ্যাথলেটিকস) ১৩টি রৌপ্য পদক (৩টি সন্তরণ, ৯টি এ্যাথলেটিকস, ১টি ভারোত্তোলন, ১টি মহিলা এ্যাথলেটিকস) ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক (৩টি সন্তরণ) ২টি সাইক্লিং ১টি ভারোত্তোলন, ৬টি এ্যাথলটিকস ও ৫টি মহিলা এ্যাথলেটিকস)।

মোট ১১৬ পয়েণ্ট।

(৩) ইরান—৮টি স্বর্ণ পদক (৭টি ভারোত্তোলন, ১টি এ্যাথলেটিকস) ৫টি রৌপ্য পদক (৩টি ভারোত্তোলন ১টি এ্যাথলেটিকস ১টি সন্তরণ) ১টি ব্রোঞ্জ পদক (সন্তরণ) মোট ৫৬ পয়েণ্ট।

(৪) সিঙ্গাপুর—৩টি স্বর্ণ পদক (৩টি সন্তরণ) ৬টি রৌপ্য পদক (১টি সন্তরণ, ২টি ভারোত্তোলন, ১টি এ্যাথলেটিকস, ২টি মহিলা এ্যাথলেটিক) ২টি ব্রোঞ্জ পদক (এ্যাথলেটিকস) মোট ৩৫ পয়েণ্ট।

(৫) ফিলিপাইনস—৩টি স্বর্ণ পদক (২টি সন্তরণ, ১টি এ্যাথলেটিকস) ৪টি রৌপ্য পদক ৩টি সন্তরণ ও ১টি ভারোত্তোলন) ৬টি ব্রোঞ্জ পদক (৪টি সন্তরণ ১টি ভারোত্তোলন, ১টি এ্যাথলেটিকস) মোট ৩৩ পয়েণ্ট।

(৬) ইন্দোনেশিয়া—৪টি ব্রোঞ্জ পদক (এ্যাথলেটিকস ৩, মহিলা এ্যাথলেটিকস ১) মোট ৬ পয়েণ্ট।

(৭) বর্মা ও সিংহল—মোট ৩ পয়েণ্ট পাইয়া।

বর্মা—১টি ভারোত্তোলন ব্রোঞ্জ পদক; সিংহল ১টি রৌপ্য পদক এ্যাথলেটিকস।

[দলগত প্রতিযোগিতায় ১ম ১০ পয়েণ্ট, ২য় ৬ পয়েণ্ট, ৩য় ২ পয়েণ্ট। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ১ম ৫ পয়েণ্ট, ২য় ৩ পয়েণ্ট ৩য় ২ পয়েণ্ট।]

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৫ই মার্চ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল (১৯৫১) উত্থাপিত হয়। পরিষদ বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করেন। এই দিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের আমূল পুনর্গঠনের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটিও পরিষদে উপস্থাপিত করেন। এই বিলটিও একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৬ই মার্চ—কলিকাতা নগরীর খাস মিউনিসিপ্যাল এলাকার অধিবাসীবৃন্দের সংখ্যা ১৯৫১ সালের লোক গণনা অনুসারে ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৯০ হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে।

১৯৫০ সালের ৯ই আগস্ট যে ঘটনার ফলে মধ্য ভারতে নন্দগুল সেন্টোলীগদের কাছের দলের উপর গুলী চালনা করা হইয়াছিল ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য মধ্য ভারত গভর্নমেণ্ট বিচারপতি পি ডি দীক্ষিতকে নিয়োগ করেন। বিচারপতি দীক্ষিতের রিপোর্ট অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারপতি দীক্ষিত বলেন যে, তাঁহার মতে গুলী চালনা ন্যায়সংগত হয় নাই।

৭ই মার্চ—অদ্য পার্লামেণ্টে অধ্যাপক এস এন মিশ্রের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রীর পক্ষে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট বিশ্বভারতীকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার নিমিত্ত শীঘ্রই পার্লামেণ্টে একটি বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্ট অদ্য রেলওয়ের জন্য মোট ৩৪৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। রেল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার অদ্য পার্লামেণ্টে বলেন যে, সাপ্তাহিক টিকিট ও অন্যান্য প্রকারের কনসেসন পুনঃপ্রবর্তনের প্রশ্ন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভবপর নহে।

নয়াদিল্লীতে ভারতের বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এস ও বেঙ্কটরমণ ও পাকিস্থান জুট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ জি ন্যারুদ্দীর মধ্যে তিন দিনব্যাপী আলোচনা শেষ হইয়াছে। ইহার ফলে সম্প্রতি সম্পাদিত ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান হইতে ভারতে কাঁচা পাট প্রেরণ ও ভারত হইতে পাকিথানে কয়লা প্রেরণ সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৮ই মার্চ—ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারতে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রসঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বলেন যে, বস্ত্র ও সূতার সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ সময় প্রায় দুই মাস পূর্বে অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং গত জানুয়ারী মাস হইতে বস্ত্র ও সূতা সরবরাহের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

দক্ষিণ কামরূপ সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রীহরেশ্বর গোস্বামীকে ৮৬ ভোটে পরাজিত করিয়া আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বিহারের মুখ্য মন্ত্রীর নিকট অহিংস প্রতিরোধের একটি তিন দফা কার্যসূচী প্রেরণ করিয়াছেন। আগামীকল্য হইতে পুরুলিয়া সহরে বিহার গভর্নমেণ্টের খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে।

৯ই মার্চ—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ অদ্য লাহোরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্থানের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল আকবর খাঁকে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের দরুণ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার এম এ লতিফ, পাকিস্থান টাইমস-এর সম্পাদক মিঃ ফৈয়াজ আমেদ ফৈয়াজ এবং মেজর জেনারেল আকবর খাঁর পত্নী বেগম আকবর খাঁকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড কর্তৃক বিক্রয় কর এড়াইবার চেষ্টা প্রতিরোধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিতর্কের উত্তরে মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায় উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, বিহার পরিষদের মানভূম জেলার কংগ্রেসী সদস্যগণ শ্রীঈশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাগর মহাতো এবং নকুলচন্দ্র সহীস পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

১০ই মার্চ—আলীপুরের স্পেশাল জজ শ্রী এস এন গুহ রায়, আই সি এস, দমদম-বসিরহাট হানা মামলার রায় দিয়াছেন। প্রীতীশ দে, তারাপদ রায়, সনৎ দত্ত, মুকুন্দ গুপ্ত, বিন্দা সিং, দীনবন্ধু কুণ্ডু ও শচীন্দ্রনাথ ঘোষ এই সাতজন আসামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রবীন্দ্রনাথ রায় এবং অপর ছয়জন আসামীর প্রতি বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ছয়জন আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী সি রাজগোপালাচারী এক দীর্ঘ বিবৃতিতে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে সরকারী নীতি ও মনোভাব ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রতি কম্যুনিস্টদের ব্যাপক উপদ্রব সম্পর্কে পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান যে, সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সম্প্রতি ত্রিপুরায় সৈন্যদল প্রেরণ করা হইয়াছে।

গতকল্য বিহার ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীঈশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূম জেলায় লোক গণনা কার্যে জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, ১০।১২ জন গণনাকারীকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া লোকদের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে হিন্দী লিখিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছে।

১১ই মার্চ—গতকল্য মানভূম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বিতীয় দিবসে ৫০ জন সত্যাগ্রহী বিহার গভর্নমেণ্টের খাদ্য নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গ করিয়া ঝালদায় সত্যাগ্রহ করেন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান বিমানবাহিনীর ডিরেক্টর অব পার্সোনেল এয়ার কমোডর ঝানজুয়াকে করাচীতে নিজ গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিন্ধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী রাজা শিব বাহাদুর সিংকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তিন হাজার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই মার্চ—জেনারেল ম্যাক আর্থার অদ্য এক ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিস্টরা মধ্য কোরিয়ায় এক বিরাট আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

পিকিং বেতারে বলা হইয়াছে যে, ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তর দিকস্থ অঞ্চল মার্কিন বাহিনীর দখলে থাকিবার সময় মার্কিন সৈন্যরা উত্তর কোরিয়ার এক লক্ষ ৭০ হাজার অসামরিক অধিবাসীকে হত্যা করিয়াছে।

৭ই মাচ—অদ্য তেহরানে সোলতানে মসজিদের প্রাঙ্গণে ৪৯ বৎসর বয়স্ক পারস্যের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আলী রাজমারা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী সিউলের ১৭ মাইল পূর্বে প্রবল গোলাবর্ষণের দ্বারা কম্যুনিস্টদের ব্যূহ ভেদ করিয়া হ্যান নদী অতিক্রম করে।

৯ই মার্চ—লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে মিঃ বেভিন পররাষ্ট্র মন্ত্রিরূপে পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ হার্বার্ট মরিসন নূতন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

১১ই মার্চ—পশ্চিম মধ্য কোরিয়ায় মূল কম্যুনিস্ট বাহিনী ১০ মাইলেরও বেশী পশ্চাদপসরণ করায় অদ্য লেঃ জেনারেল রিজওয়ের ১ম ও ৯ম স্কোর ৪০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গন বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।০ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।০ আনা, বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৫৭ সাল Saturday, 24th March, 1951 [২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য-সুখ

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট সম্পর্কিত বিতর্কে প্রতিপক্ষের সমালোচনার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের একটি মনোমদচিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দাবী এই যে, চিকিৎসা-ব্যবস্থার দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন, সমগ্র ভারতে তাহার তুলনা নাই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১৪ শত লোকের জন্য হাসপাতালে একটি করিয়া বেডের ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার রায়ের মতে ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে এই অবস্থায় পৌঁছিতে এখনও কুড়ি বৎসর লাগিবে। পশ্চিমবঙ্গে ১২৫০০ জন চিকিৎসক আছেন, এই হিসাবে প্রতি ১৯৪৪ জন লোকের জন্য একজন করিয়া ডাক্তার রহিয়াছেন। ভারতের অন্যত্র ইহা নাই। পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের অভাব পরিপূরণের সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষ উদাসীন নহেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই নিয়ম প্রবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে যে, ডাক্তারী ডিগ্রি লইবার পর প্রত্যেক ডাক্তারকে অন্তত তিন মাস কাল গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকিতে হইবে। যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধ কার্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ডাক্তার রায় গর্ব প্রকাশ করেন। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসাবপত্রের দ্বারা পরিষ্কার বুঝাইয়া দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের লোকের পরমায়ু-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এমন বিবৃতি প্রদান করিবার পর আর কে আমাদের স্বাধীনতার সুফল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনায় অগ্রসর হইবে? প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘায়ুই যদি লাভ করা গেল এবং ব্যাধি-পীড়া হইতেই যদি মুক্ত থাকা সম্ভব হইল, তবে অন্নবস্ত্রের যে কষ্ট, তাহা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! কিন্তু আমরা তেমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছি কি? পরিসংখ্যানের প্যাঁচের মধ্যে আমরা যাইতে চাই না। ফলত মোটামুটি, ডাক্তার রায় যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিছু গুরুত্বও আমাদের নাগরিক এবং সামাজিক জীবনের মূলে যদি সত্যই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের অভাব অভিযোগের অন্তত চৌদ্দ আনা দূর হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতেছি না। এই কলিকাতা শহরের কথা উল্লেখ করিয়াই বলা যাইতে পারে, এখানে মহামারী এক রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করিয়াছে। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, এগুলি তো আছেই মাঝে মাঝে প্লেগের আতঙ্কও আসিয়া দেখা দিতেছে। বর্তমান বৎসরের বসন্তের প্রকোপের যে খতিয়ান কর্তারা দিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই প্লীহা চমকাইয়া যাইবে। কলেরা, টাইফয়েডের মৃত্যু-সংখ্যাও কম নয়। এসব ব্যাধি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সম্পূর্ণ প্রতিষেধক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তথাপি শহরে এসব মহামারীর মহোৎসব! ফলত শহরের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কার্যপ্রণালী ধরিয়া কর্তৃপক্ষ চলিতেছেন এ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। হাসপাতালে স্থান সংগ্রহ করা যে বর্তমানে কি দুর্ভোগ এবং শুশ্রূষার অব্যবস্থা যে সেখানে কত বেশি, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। স্থানাভাব, চিকিৎসকের অভাব, শুশ্রূষাকারিণীদের সংখ্যার স্বল্পতা, এ অভিযোগ সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হাসপাতালসমূহে উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সুবিধা লাভের সৌভাগ্য কতজনের ঘটিতেছে, তিনি যদি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তবে আমরা বেশি সুখী হইতাম। স্বাস্থ্য বিধান-সম্পর্কে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই দুইটি বিষয়ের প্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে—পরিষ্কৃত জল সরবরাহ এবং পরিচ্ছন্নতা। কার্যত কলিকাতা শহরে এই দুইটি ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টিদানের কোন বালাই-ই বস্তুত এখানে কর্তৃপক্ষের নাই। পরিষ্কৃত জলের অভাব, নূতন জল সরবরাহের যন্ত্রপাতি কবে বসান হইবে তবে কিঞ্চিৎ উপশমিত হইবে, শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারী অদ্যাপি তৃষিত কণ্ঠে সেই দিকেই তাকাইয়া আছে। এমন অবস্থায় স্বাস্থ্য-বিধানের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অপূর্ব স্থান অধিকার করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এমন উক্তি জনসাধারণ মনে কতটা আশ্বস্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহই থাকিয়া যায়।

ভারতীয় ভাষার সমন্বয় সাধন

গত ১৫ই মার্চ ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিখিল ভারত বিদ্বজ্জন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারত সরকার এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখকগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অভিভাষণ প্রদানকালে শিক্ষামন্ত্রী

গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার কিরূপ ক্রমাভিব্যক্তি সাধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া বলেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে শুধু উর্দু ও বাঙলাই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং গত কয়েক শতাব্দীতে এই দুইটি ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, হিন্দী ভাষায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কলেবর বিশাল হইলেও বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থানলাভের মত ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষ নাই। মৌলানা আজাদ উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি; বিশেষত উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান সামান্য নহে; সুতরাং উর্দু সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কিছু অনুরাগ থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। সম্ভবত এই কারণেই উর্দু সাহিত্য তাঁহার দৃষ্টিতে বাঙলার সম-মর্যাদা লাভে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উর্দু সাহিত্যের সম্পদ আছে, একথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু উর্দু সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার সমান মর্যাদা লাভ করিয়াছে, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। বাঙলা ভাষায় আন্তর্জাতিক মর্যাদার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শিক্ষা-মন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। কারণস্বরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে সম্ভবত জগতে এমন কোন ভাষা নাই, যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কোনও-না-কোন গ্রন্থ অনূদিত হয় নাই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, উর্দু ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক, এমন দাবী সে সত্যই করিতে পারে কি? বস্তুত আধুনিক উর্দু সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে স্যার মহম্মদ ইকবালের দানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইকবাল অসামান্য কবি-প্রতিভার অধি-কারী, একথা স্বীকার করিলেও তাঁহার রচিত সাহিত্যে জগতের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। ফলত বিশ্বের মূলীভূত উদার সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁহার সাহিত্য সকল দিক হইতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। অনেক ক্ষেত্রে ইকবালের সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই দিক হইতে বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সকল দিক হইতে বিচার করিলে এই ক্ষেত্রে আধুনিক জগতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা মিলিবে না। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দেই এ দাবী করিতে পারি যে, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিক হইতে বাঙলা সাহিত্যের কাছে দাঁড়াইতে পারে, সমগ্র ভারতে এমন কোন ভাষা নাই। ইহা সত্ত্বেও হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভরতের শিক্ষামন্ত্রী ইহাকে আকস্মিক ঘটনা মাত্র বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে অন্যরূপ অবস্থা থাকিলে দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষাও এইরূপ মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। মৌলানা আজাদের এই মন্তব্যের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি এবং হিন্দী ভাষা যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহার বিকাশ ও পুষ্টিসাধন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এই কর্তব্য কিরূপে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে, প্রশ্ন হইতেছে ইহাই। আমাদের অভিমত এই যে, মনীষার আলোকে যে সাহিত্য যত অধিক উজ্জ্বল, সেই সাহিত্যের সমৃদ্ধি তত বেশি এবং এক্ষেত্রে মৌলিকত্ব বিশেষভাবে কাজ করে। মৌলিকত্ব স্রষ্টার অন্তরধর্মকে সম্প্রসারিত করিয়া সাহিত্যকে সর্বজনীন করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে নব-সৃষ্টির মনীষা-দীপ্ত এই দৃষ্টিই কাজ করিয়াছে। বস্তুতঃ বাঙলার অন্তরে নব-সৃষ্টির সম্ভাব্যতাপূর্ণ বিপুল বেদনা বহুদিন হইতেই ছিল। প্রত্যুত ত্যাগমূলক সাধনার পথে বাঙলার মনস্বিতা বহুদিন হইতেই সাহিত্যের পথে আপনার উদার প্রাণধর্মকে সর্বভারতীয় চেতনায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয়। রবীন্দ্র-নাথের উজ্জ্বল অবদান বাঙলার অন্তর-শতদলকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, এবং বাঙলার সংস্কৃতিকে বিশ্বজনীন উদার সমৃদ্ধি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলত রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্টির মূলে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির বীজ-বস্তুটি নিহিত রহিয়াছে। হিন্দী ভাষায় যাহাতে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়, তৎপ্রতি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই আবেদন কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি সমগ্র ভারতের মর্যাদা-বুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলাই আমরা প্রথমে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপক্ষে এই পথেই হিন্দী সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে এবং এই কারণেই বাঙলার সাহিত্য শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ, বিশেষ-ভাবে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ারও আমরা পক্ষপাতী। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাদেশিকতার মোহ এখনও আমাদের মধ্যে যথেষ্টই রহিয়াছে। এজন্য বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকে মর্যাদাদানের মধ্যে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকটা অনেকের দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। কার্যতঃ তাঁহারা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকে পিষ্ট করিবার অভিসন্ধি বশেই পরিচালিত হইতে-ছেন। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা এবং উপেক্ষার ভাব ভারতের রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপে হিন্দী সাহিত্যের মর্যাদা লাভের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে এবং সংস্কৃতির সূত্রে ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে; আমরা এমন কথাই বলিব। প্রকৃতপক্ষে হিন্দী সাহিত্যকে যদি বিশ্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হয়, তবে সে সাধনায় বাঙলা সাহিত্যকে উপদেষ্টার মর্যাদা দান করাই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাদেশিকতার মোহে এই সত্যটি বিস্মৃত হইলে আমাদের বিড়ম্বনা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না।

পূর্ববঙ্গে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

জনাব আব্দুল হামিদ খাঁ পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিব। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, পূর্ববঙ্গের জন-সংখ্যার অধিক ভাগ যখন মুসলমান, তখন সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইতে বাধ্য। কোন আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষাসচিবের মুখে সাম্প্রদায়িকতামূলক এমন নীতির কথা অবশ্যই উৎকট শুনায় এবং অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিবের কথাতে আমরা তখন আশ্চর্য হই নাই। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করিয়াই পাকিস্থানের পত্তন হইয়াছে এবং এখনও সাম্প্রদায়িক নীতিতেই সেখানকার শাসন পরিচালিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিব পরে পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদে শিক্ষা বিভাগে অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অনুসরণ করিবেন বলিয়া যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই বরং আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পূর্ববঙ্গ পরিষদে বাজেট আলো-চনা প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরী সম্পর্কে বিতর্ক উঠিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গের টেক্সট্ বুক কমিটির বিরুদ্ধেই প্রধানত এই সব অভিযোগ ছিল। অভিযোগ এই যে, স্কুলের শিক্ষার জন্য যে-সব পুস্তক অনু-মোদিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলিতে অত্যন্ত লঘুচিত্ততার সঙ্গে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে এবং স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আনাড়ীর মত ইতিহাসকে বিকৃত করা হইয়াছে। এ-সব অভিযোগের কতকগুলির পরিচয় আমরাও রাখি। বাস্তবিকপক্ষে কাঠমোল্লাইবৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্থান শিক্ষার ক্ষেত্র নয়। ফলত পূর্ববঙ্গের টেক্সট্ বুক কমিটি তাহাই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুদের মনোভাবের উপর আঘাত করিয়া সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের অন্তরে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দৃঢ় করিয়া তুলিতেছেন। ইহার ফল রাষ্ট্রের পক্ষে কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না। ইতিহাস কিভাবে

বিকৃত করা হইতেছে সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। পূর্ববঙ্গের টেক্সট্ বুক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত একখানি পুস্তকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা যখনই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখনই হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিয়াছে। নানা সাহেব এবং ঝান্সীর রাণী মুসলমানদের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে রাজী হন নাই, এই কারণেই নাকি সিপাহী-বিদ্রোহের পথে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পূর্ববঙ্গের পাঠ্য পুস্তকে সিপাহী-বিদ্রোহের এই যে ব্যাখ্যা-ভাষ্য আমরা আজ দেখিতেছি ইহা অপূর্ব। বস্তুত কোন ঐতিহাসিক এমন তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন ভাব ছিল না বলিয়াই আমরা মনে করি। সে আন্দোলনে মুসলমানেরা যোগদান করিয়াছিল সত্য; কিন্তু নেতারা অনেকেই ছিলেন হিন্দু। নিজেদের রক্ত উৎসর্গ করিয়া ইঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেই প্রথম সংগ্রামে তাঁহাদের নেতৃত্বকে মহীয়ান্ করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানকারী নানা সাহেব কিংবা ঝান্সীর রাণীর মর্যাদা স্বীকার করিবে না এবং তাঁহাদের সাধনাকে বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব-বিনির্মুক্ত হইয়া আজ যাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মোহে ভারতবর্ষের এই সব স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের স্মৃতিকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করিতেছেন, এ দৃশ্য অত্যন্তই মর্মান্তিক। ফলতঃ যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা এই-ভাবে সম্প্রসারিত হয়, তবে কোন রাষ্ট্রেরই প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, পূর্ববঙ্গের পক্ষে তো নহেই। কারণ, ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতিকর ভাবই চিরতন্ন হইয়া উঠিবে। পূর্ববঙ্গ সরকারের পক্ষে কি তাহাই অভিপ্রেত? যদি তাহা না হয়, তবে পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিব কিংবা তথাকার গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় না কেন? পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিবই বা কেন এমন সব অভিযোগ শুনিয়াও সেদিন নীরব ছিলেন? সেগুলির সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিবেন, অভিযুক্ত অংশগুলি পড়িয়া দেখিবেন, একথা পর্যন্ত বলিতে তিনি সাহস পান নাই। এতদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিব তথাকার শিক্ষা-নীতির আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার পরবর্তী বিবৃতিতে যাহাই বলুন, তিনি পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তথাকার সরকারী নীতি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগ সাম্প্রদায়িকতার পথেই পরিচালিত হইবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা

গত ১লা চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা সম্পর্কে আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ এই রাজ্যের ভার-স্বরূপ নহেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যথাযোগ্য স্থানে বসতি বিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে যদি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তবে উদ্বাস্তুগণ এই প্রদেশে সম্পদস্বরূপে পরিগণিত হইবেন?

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর য়ুরোপ পর্যটনের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় লেখা নতুন রচনা

'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'

ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। ইহা ভ্রমণ কাহিনী না উপন্যাস তাহা রসিক পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

সম্পাদক, দেশ

বস্তুত কথাটা নূতন নহে; আমরাও এই কথাটা বহুভাবে বুঝাইবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই অবস্থাটা এখনও আসে নাই কেন? প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কি কেন্দ্রীয়, কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদুভয়ের কেহই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যাটিকে প্রথমতঃ গুরুত্বের সঙ্গে দেখিতে চাহেন নাই; পক্ষান্তরে উদ্বাস্তুগণ পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন, এই আশাতেই তাঁহারা দীর্ঘকাল দিন গণিতেছিলেন। এত দিন পরে তাঁহাদের চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, দিল্লী-চুক্তির মহিমা যতই থাকুক, উদ্বাস্তু সমস্যার সম্যকরূপে সমাধান করিতে সম্ভব হইবে না এবং ইশ্লাম রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বপর নীতির পীড়ন পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমাজ-জীবনে স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী অবলম্বনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের তাগিদটা এতদিন পরে জাগিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দিয়াছেন, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষেও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ দেখা দিয়াছে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের প্রথম স্তরে ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য অসহায়, নিরাশ্রয় অবস্থায় অগণিত নরনারীকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের আর্তনাদে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ আলোড়িত হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই যে উদাসীনতা, ইহার জন্য দায়ী কাহারা? ডাক্তার রায় এই প্রসঙ্গে যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বর্তমানে ২৩ লক্ষ। এই ২৩ লক্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১১ লক্ষ উদ্বাস্তুর বসতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮০ হাজার পরিবারে অন্যূন চার লক্ষ নরনারী স্থানত্যাগী ব্যক্তিদের জমিতে বসবাস করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইঁহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে, ইহাই বর্তমানে প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। এই সম্পর্কে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের জন্য যে আইনের খসড়া ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত হইতেছে, সে সম্পর্কে বিবেচনা করার কথা আসিয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। বাস্তবিকপক্ষে আমরা উদ্বাস্তুদের উৎখাতের বিরোধী। আমাদের মতে উদ্বাস্তুগণ যেসব জমি দখল করিয়া নিজেদের চেষ্টায় আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া লইয়াছেন, সেই সব জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দখল করিয়া লওয়া উচিত এবং এজন্য জমির মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা তাঁহাদেরই কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্তে জমির মূল্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু কর্মপ্রণালীর কথা শুনাইলেই দেশের লোকে সন্তুষ্ট হইবে না। সেই কর্মপ্রণালী সমধিক যোগ্যতা এবং আন্তরিকতার সহিত কার্যে পরিণত করা হয়, ইহাই প্রয়োজন। প্রস্তাবিত নূতন আইনের ফলে অসহায় এই সব নরনারী উৎখাত হইয়া যাহাতে অধিকতর বিপন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত না হয়, কর্তৃপক্ষের সর্বাগ্রে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন স্থান হইতে সত্যই ইহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে হয় তবে অন্যত্র তাঁহাদের জন্য আগে জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহাদের জীবিকা অর্জনের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা সমগ্রভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রেরই সমস্যা। মানবতা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ-প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া ইহার সমাধান করিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থের দাবীতে সে-কর্তব্য প্রতিপালনে যদি কোন অন্তরায় দেখা দেয়, উপযুক্ত আইন প্রণয়নের সাহায্যে অবিলম্বে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া দরকার।

বৈদেশিকী

ইরানী তেল

ইরানের গোলমেলে ঘটনার স্রোত যে কোন দিকে চলবে বলা মুশকিল। ইরান হচ্ছে রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ-দ্বন্দ্বের একটি প্রধান এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্ষেত্র। দক্ষিণ ইরান ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের তেলের খনিগুলি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের একটা বড় পুঁজি, সেগুলির কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই লন্ডন ও ওয়াশিংটনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ওদিকে আবার ইরানের উত্তরেই ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রতীরে রাশিয়ার প্রধান তেলের খনিগুলি অবস্থিত; সুতরাং ইরানে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখলেই মস্কো আঁতকে ওঠে। উভয় পক্ষেরই চেষ্টা ইরানে নিজেদের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। তার জন্য সব রকম কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বাদ-বিচার নেই। ঘুষ, স্থানীয় দলাদলির উস্কানি, প্রোপাগান্ডা—এসব তো আছেই; দরকার হলে ইরানী সরকারকে বাগ মানাবার জন্য বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটানো হয়ে থাকে। বৃটিশরা ইরানী সরকারের উপর চাপ দেবার জন্যে একাধিকবার দক্ষিণ ইরানের অর্ধসভ্য উপজাতিদের দিয়ে 'স্বতঃস্ফূর্ত' বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে আজার-বৈজানের বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতার কথাও সুবিদিত।

একভাবে দেখলে ইরানের একদিকে জলে কুমীর ও অন্যদিকে ডাঙায় বাঘ। আবার অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে, দু দিকে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির চাপ না থাকলে ইরানের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাও থাকতো না। ইরানীরা নাকি একের বিরুদ্ধে অপরকে খেলিয়ে কোন রকমে ইরানকে এপক্ষ বা ওপক্ষের সম্পূর্ণ গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এভাবে কোন রকমে আত্মরক্ষা সম্ভব হলেও এরকম অবস্থা কোন জাতির পক্ষেই স্বাস্থ্যকর নয়।

এক সময়ে ইরানের উপর প্রভাব বিস্তারের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দুই শক্তির মধ্যে—বৃটেন ও রাশিয়া। এক সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রভাবের অঞ্চল—sphere of influence—ভাগাভাগিও হয়ে গিয়েছিল, যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সুখ-সুবিধা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশির ভাগ বৃটেনই করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইরানের তেলের খনির ইজারা ছাড়াও বৃটেন ইরানের অর্থনৈতিক জীবন, বিশেষ করে ইরানের সরকারী অর্থনীতি অনেকখানি নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। এর পরে জার্মানী এসে ইরানে বৃটিশ প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করে এবং অনেকখানি সফলও হয়। জার্মানীর সঙ্গে ইরানের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে এবং ইরানের অনেক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ, যেমন রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি জার্মানরা পায়। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ইরান থেকে জার্মান প্রভাব কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। কয়েক বৎসর পরে জার্মানরা আবার ইরানে তাদের প্রভাব গড়ে তুলতে আরম্ভ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইরানে জার্মান প্রভাব সামান্য ছিল না। তার প্রমাণ এই যে, যুদ্ধে রেজা শাহ পহ্লবী ইরানকে নিরপেক্ষ রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে অবিশ্যি তিনি রাজ্যচ্যুত হলেন। ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য ইরান অধিকার করে রুশ সৈন্যদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করল, নামে ইরান 'স্বাধীন' রইল বটে, কিন্তু কার্যত তেহরান সরকারকে সর্ববিষয়ে মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্তাদের আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকতে হোল।

যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধ থামার পরেও কিছুকাল ইরান রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের আলাদা আলাদা এক্তেয়ারী অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল। রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের মধ্যে অনেক ঠেলাঠেলির পরে শেষ পর্যন্ত বিদেশী সৈন্য ইরান ত্যাগ করে। এর আগেই অবিশ্যি 'মিত্র'দের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইরানও আত্মরক্ষার জন্য তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। এরই মধ্যে এক সময়ে ইরান গবর্নমেণ্ট রাশিয়াকে একটা তেলের খনি ইজারা দেবে বলে স্বীকার করে বসল। তখন অন্যদিক থেকে জোর উল্টো চাপ এলো। 'মজলিস' অর্থাৎ ইরানের পার্লামেণ্ট রাশিয়াকে তেলের ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল করে দিল। শুধু তাই নয়, 'মজলিস' আদেশ দিয়ে দিল যে, কোন বিদেশীকেই আর তেলের ইজারা দেওয়া হবে না। তার ফলে আমেরিকানরা যে ইরানে তেলের ইজারা আদায়ের চেষ্টায় ছিল, তারাও নিরস্ত হতে বাধ্য হোল।

সঙ্গে সঙ্গে এ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ প্রবল হতে লাগল। এই বৃটিশ কোম্পানীর অর্ধাধিক অংশের মালিক বৃটিশ গবর্নমেণ্ট। ১৯০৫ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে এই কোম্পানী নীট আয় করে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ড, আর কোম্পানীর নিকট ইরান গভর্নমেণ্ট পায় মাত্র এক কোটি তের লক্ষ পাউন্ড। ১৯৩৩ সালে কোম্পানীর সঙ্গে ইরান গভর্নমেণ্টের ষাট বৎসরের মেয়াদী একটা নূতন বন্দোবস্ত হয়, তাতে ইরান গভর্নমেণ্টের প্রাপ্যের হার কিছু বাড়ানো হয় বটে, কিন্তু সে বন্দোবস্তও এত অন্যায্য এবং ইরানের পক্ষে ক্ষতিকর যে, ইরান গভর্নমেণ্ট তাতে স্বাক্ষর করতে চায় নি। শেষকালে বৃটিশের জবরদস্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সেই সময় ইরানকে ভয় দেখাবার জন্যে বৃটেন পারস্যোপসাগরে কয়েকখানি রণতরী পাঠিয়েছিল। গত তিন বৎসরে নাকি এ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর নীট লাভ হয়েছে ১৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড। এই থেকেই কোম্পানীর লাভের বহরটা বুঝা যায়। ১৯১৪ সালে বৃটিশ সরকার কোম্পানীর অর্ধাধিক শেয়ার যখন কেনেন, তখন তার জন্য মূল্য দিতে হয় মাত্র কুড়ি লক্ষ পাউন্ড।

ইরানীরা এ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর ইজারা খতম করে দিয়ে খনিগুলিকে পুনরায় ইরানের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য বহুদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি জাতীয় আন্দোলন সার্থক হয়েছে—ইরানী পার্লামেণ্ট সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোম্পানীর কাছ থেকে কাজ-কারবার কীভাবে এবং কী সর্তে নেওয়া যেতে পারে, জাতীয়করণের পরে কীভাবে কাজ চালানো হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইরান সরকারের কাজ 'বে-আইনী' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু তাতে ইরান নিরস্ত হবে বলে মনে হয় না। তবে কোম্পানীর বর্তমান বৃটিশ কর্মচারীদের ছাড়িয়ে দেবার মতলব ইরান নিশ্চয়ই করছে না এবং তৈল বিক্রয়ের ব্যাপারে ইরান বৃটিশের সঙ্গে হয়ত একটা বন্দোবস্তও করতে পারে, কিন্তু চাবিকাঠি সে নিজের হাতে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বৃটেনের লেবার গভর্নমেণ্ট স্বদেশে শিল্প জাতীয়করণের পক্ষপাতী। দেখা যাচ্ছে সোস্যালিজম্ রপ্তানির জন্য নয়।

১৯-৩-৫১

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পৃথিবীর অনেক বড় বড় ভাস্করের নাম আমাদের জানা আছে। তবে তাদের শুধু মাত্র শিল্পীই বলা যায়, কিন্তু রাশিয়ার যে ভাস্কর সম্বন্ধে আজ বলব তাঁকে এক হিসাবে মৌলিক সৃষ্টি-কর্তা বলা যায়।

এই শিল্পীর নাম Mikhaib M. Gerasimov। এর শিল্প নৈপুণ্য সত্যিই অদ্ভুত। যদি কোন মৃত ব্যক্তির মাথার খুলিটি একে দেওয়া যায় তাহলে ইনি ঐ খুলির গঠন-বৈচিত্র্য দেখে মানুষটির অবিকল মুখছবি গড়ে তুলতে পারেন।

Gerasimov প্রায় ২৫ বৎসর ধরে বহু চেষ্টার পর এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর এই শিল্প-চাতুর্যের পুরস্কারস্বরূপ ৫০০০০ রুবেল 'স্ট্যালিন প্রাইজ' লাভ করেন। এই বিদ্যাশিক্ষা করবার সময় তিনি বহু হাসপাতালের শবাগারের মৃতের মাথার খুলি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন; সময় সময় এই পরীক্ষার জন্য এক্স-রের সাহায্যও নিতে হয়েছে। এই শিল্পীর এই রকম অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য অনেক পরীক্ষাও দিতে হয়েছে।

একবার রাশিয়া গভর্নমেন্ট এই ভাস্করকে একটি একশত বছরের পুরন মৃতের মাথার খুলি থেকে মুখের চেহারা গড়তে দেয়। এই খুলিটি যে একশত বছরের পুরন একথা তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়। শিল্পী মুখটি গড়বার পর দেখা গেল যে, এইটি একটি বিখ্যাত লেখকের মাথা এবং এই খুলিটি কবর থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল! এই শিল্পীর সাহায্যে অনেক সময় গুম-খুন ধরা যায়। বর্তমানে রাশিয়া গভর্নমেন্ট তাদের দেশের পুরন ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোকেদের মাথার খুলি থেকে মূর্তি গড়ে যাদুঘরে রাখার বন্দোবস্ত করছে।

*

আজকাল পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা সচরাচর বিমান পথেই যাতায়াত করেন। খবর পাওয়া গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অজগর সাপটি সিঙ্গাপুর থেকে বিমান পথে নিউইয়র্কের একটি চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এক বছর আগে সিঙ্গাপুর থেকে আর একটি অজগর সাপ আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল সেটি ২৭ ফুট লম্বা ছিল।

*

গরম কালে কাজ করতে বসে যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠি তখন মনে হয় এবছর গরমটা বুঝি বড় বেশি পড়েছে। এত গরম আগে বোধ হয় হতো না। কথাটা সত্যি। কানাডার আবহাওয়া তত্ত্ববিদ মিঃ এ্যান্ড্রু টমসন এই ব্যাপারটি অনেক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে ১০০ বছর আগে পৃথিবীর উত্তাপ যতটা ছিল বর্তমানে তার চেয়ে চার ডিগ্রী বেড়ে গেছে।

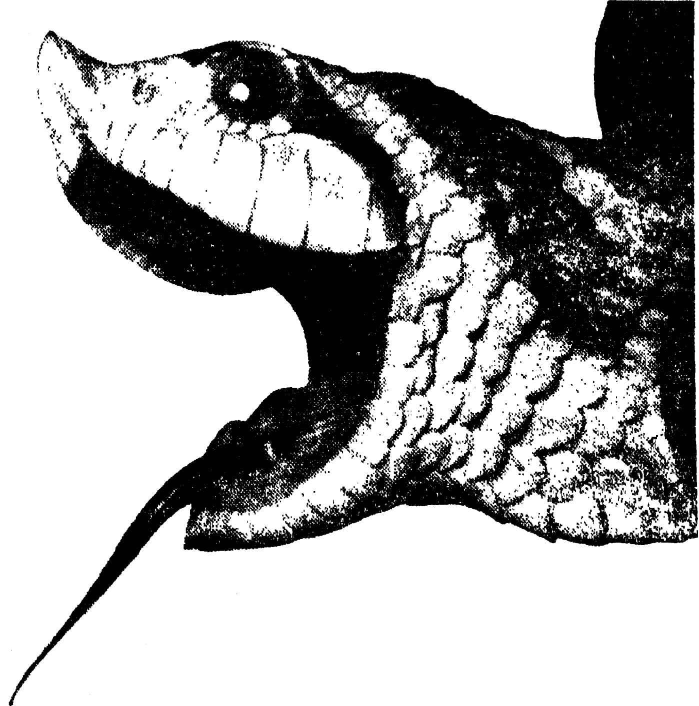
তিনি বলেন—সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীতে আসবার জন্য বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি সুড়ঙ্গের মত পথ আছে। এগুলি আমরা শুধু চোখে দেখতে পাই না। এই পথগুলো ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার দরুণ বেশি পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীতে আসতে পারছে। মিঃ টমসন বলেন যে, পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কমে যাওয়ায় বাতাসের ধূলিকণার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বাতাসে বেশি ধূলিকণা থাকার সুবিধে এই যে, সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীর দিকে আসবার সময় এই ধূলিকণার আবরণে ধাক্কা খেয়ে আবার সূর্যের দিকে ফিরে যায়। এছাড়াও বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে বাতাসের স্তরে একটা ঘন আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। এটা পৃথিবীর নিজস্ব উত্তাপ বায়ুমণ্ডলে ছড়াবার পক্ষে বাধাস্বরূপ। পৃথিবীতে সত্যিই যে তাপ বেড়ে গেছে তার আরও প্রমাণ স্বরূপ মিঃ টমসন বলেন যে, আলাস্কা এবং অন্যান্য স্থানের অনেক বরফের পাহাড় গলে যেতে আরম্ভ করেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আটলাণ্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তাপও বেড়ে গেছে।

*

মানুষ সব সময় যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করে। এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় কোন রোগের জন্য খুব বেশী যন্ত্রণা হলে রোগীকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। আজকাল প্রয়োজন হলে অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে সম্মোহিত করে যন্ত্রণার কবল থেকে রক্ষা করা হয়। সম্প্রতি লণ্ডনের এক মহিলা এই সম্মোহিনী শক্তির সাহায্যে প্রসব বেদনার হাত থেকেই রেহাই পেয়েছেন। তাঁর বেদনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাক্তার ও ধাত্রীকে সংবাদ পাঠিয়ে নিজে নিজেকে হিপ্নোটাইস করে ঘুমিয়ে পড়েন। এই ব্যাপারটি সকাল ১০টায় ঘটে এবং বেলা দুটোর সময় তিনি সন্তান সহ জেগে ওঠেন। এইভাবে সম্মোহিত অবস্থায় সন্তানের জন্ম হওয়ার ফলে তিনি কোন রকম যন্ত্রণা অনুভব করেননি।

*

এই ভীষণ সাপটি কিন্তু সত্যিই নিরীহ জীব। এই জাতীয় সাপ একেবারে নির্বিষ। মুখের সামনের দিকটা বিশেষতঃ নাকটা শূয়োরের মত বলে এদের Hognose Snake বলে। এরা এত নিরীহ যে, শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এদের অনেক সময় "মৃত্যুর ভান" করে পড়ে থাকতে হয়। এরা যখন মড়ার মত চিৎ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে, তখন মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মনে হয় যেন সত্যিই মরে গেছে। এই ধরণের "মৃত্যুর ভান" করে বাঁচবার পদ্ধতি প্রাণী জগতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইংরাজীতে একে বলে Playing opossum.



'হগ্ নোজ' সাপের মাথা

নির্বাসিতের আত্মকথা

গোপাল ভৌমিক

আমার স্বর্গের সুখ শেষ করে
এসেছি এখানে
নগ্ন হাতে;
নূতন স্বর্গের সুখ যাতে ফিরে পাই
এমন কিছুই আনি নাই।
স্বর্গ সুখ কাম্য নয় আর
খোলা পেতে চাই শুধু জীবনের দ্বার।
আমার সুখের স্বর্গে সব ছিল
ছিল না জীবন,
যে নিবিড় শান্তি ছিল
সেও ছিল মৃত্যুর মতন
নিঃসহায় গতি বেগ হীন—
অকারণে বেড়ে চলে জীবনের ঋণ।

এখানে এসেছি আমি
শুধু নিয়ে সূর্য-প্রাণ হাতে;
জীবন-জুয়াড়ী আমি
হারি জিতি ক্ষোভ নাই তাতে।
শুধু চাই সমান সুযোগ
জীবনের যজ্ঞভূমে, হবির লাড়াই-এ
আমি পান্থ একা নই
তোমাদের সীমান্ত সরাই-এ।
তুমি বর্তমানবাসী
তোমার দিনেরা তাই ভীরু সরীসৃপ,
ট্রামের চাকায় ঘোরা ক্ষীণ আয়ু
যেন ক্ষুদ্র দ্বীপ
সুবিস্তীর্ণ সাগরের বুকে—
নিত্য ঢেউ দোলা লেগে
ওঠে ফুলে, রুখে।

আমার অতীত ছিল
বর্তমান মহাশূন্য
আর আছে দূর ভবিষ্যৎ,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে
জীবনের সুদুর্গম পথ;
আমি তাই জীবন-পূজারী
পদ্মা মেঘনা এক চোখে
আর চোখ দূরের দিশারী।

এসিয়ান গেমস্

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এই যে সপ্তাহকাল ধরিয়া এসিয়ার এগারটী দেশের যুবজন, মেয়ে পুরুষ, ভারতের রাজধানী দিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়ামে এসিয়ান গেমস্ প্রতিযোগিতায় দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, সাঁতার, ফুটবল, বাস্কেটবল লইয়া মাতামাতি করিয়া গেল—সে কি তুচ্ছ খেলা, শুধুই মত্ততা, অকিঞ্চিৎকর প্রমত্ত ব্যসন মাত্র? স্বকীয় সার্থকতা যুগের অস্ফুট ইঙ্গিত বলিতে যাহা বোঝায়, সেরূপ কোন কিছুর আভাস কি এই নবপ্রবর্তিত আন্তর্জাতিক সমষ্টিগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনার কথা মনে পড়িয়া যায়। সেটা হইল এই—"রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ দিয়া।" সে যাওয়া হয়ত রুটীন-দুরন্ত—তাতে কিই বা আসে যায়! তবু তুচ্ছ সে ঘটনা হইতে যদি কোন রঙ্গীন সত্যের ইঙ্গিত অস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা হয়ত অনুভূতিগ্রাহ্য—প্রমাণ-সাপেক্ষ নাও হতে পারে!

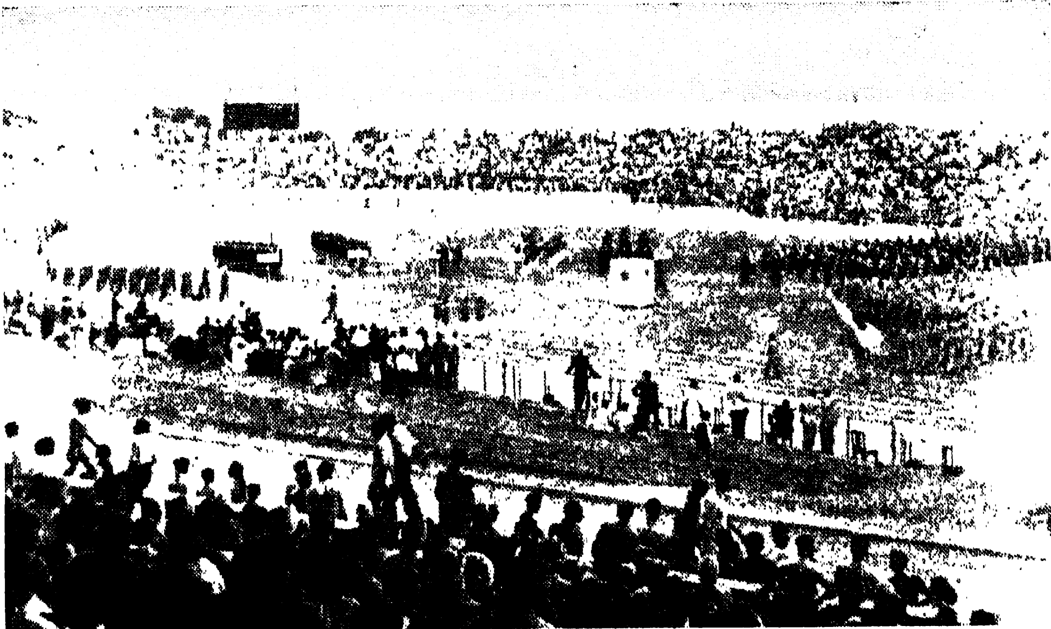
ইহার পূর্বেও একবার এসিয়ান গেমস্-এর প্রবর্তন চেষ্টা হইয়াছিল। সেটা ছিল পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। তাহা স্বল্প-আকারের মধ্যে থাকিয়াই নিঃশেষিত হয়। তারপর এইবারকার এই প্রচেষ্টা। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয়া রাজকুমারী অমৃত কাউরের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে হয়ত বা ন্যাশন্যাল স্পোর্টস্ ক্লাবের উদ্যোক্তা এন্টনি ডিমেলোর পক্ষে স্টেডিয়াম রচনা দুষ্কর হইত। হয়ত বা এ দেশের ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার প্রবর্তক হিসাবেই তাঁহার দিন নিঃশেষিত হইত; হয়ত এসিয়ান গেমস্ শুধুই গালভরা নামের শব্দ ঝঙ্কারেই মিলাইয়া যাইত।

কিন্তু রাজকুমারী কাউরের প্রভাব, প্রতিপত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহা দেশের গণ্ডি ছাড়াইয়া এসিয়ার অন্যান্য দেশের উপর উপচাইয়া পড়িবার ত কথা নয়! কিন্তু দেখা গেল, দিল্লীর এই খেলার দরবারে এসিয়ার প্রায় সব দেশই হাজির, প্রায় সব দেশেরই প্রতিনিধি-মূলক দল উপস্থিত। সবাই হাজির,—হাজির নয় শুধু প্রাচীন চীন।

বর্তমান বলদৃপ্ত চীন আজ পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের সন্ত্রাস ও সংকটস্থল। মূলতঃ তাহাকে লইয়াই পাশ্চাত্ত্য-শক্তির আজ যত কিছু মাথা ব্যথা! কিন্তু চীন দিল্লীর স্টেডিয়াম মাঠে এসিয়ান গেমস'এর এই উৎসব-ব্যসন-সম্ভূত বন্ধু-সম্মেলনের প্রতি উদাসীন ছিল না। এখানে যে বড় রকম কিছু একটা হইতেছে, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তারপর চীন যখন এই আসরে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন এসিয়ান গেমস কাউন্সিলের দরজায় খিল পড়িয়া গিয়াছে। যথাকালে নাম না পাঠাইবার ফলে প্রতিযোগী হিসাবে চীনকে এ আসর হইতে বাদ পড়িতে হইল। কিন্তু চীন উদাসীন রহিল না। প্রতিযোগিতার কর্মকর্তাদিগের অনুমতি লইয়া ব্যাপারটা যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য খেলার আসরে দূত পাঠাইল।

শতাব্দীর ব্যবধান

দেখা গেল এসিয়ার যে সব প্রতিবেশী দেশ, শতাব্দীর ব্যবধানে ছিল বিচ্ছিন্ন, ছিল পৃথক; যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া কেহ কাহারও কোনরূপ খবর রাখিত না; যাহাদের অধিবাসী-দিগের মধ্যে, দু দশ জনের হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত অন্যত্র, এসিয়ার বাহিরে, পশ্চিমাঞ্চলের বড় কোন শহরে, লণ্ডন, ভিয়েনা, প্যারি, বার্লিন, রোমে; ভারতের আহ্বানে তাহারা সম্মিলিত-



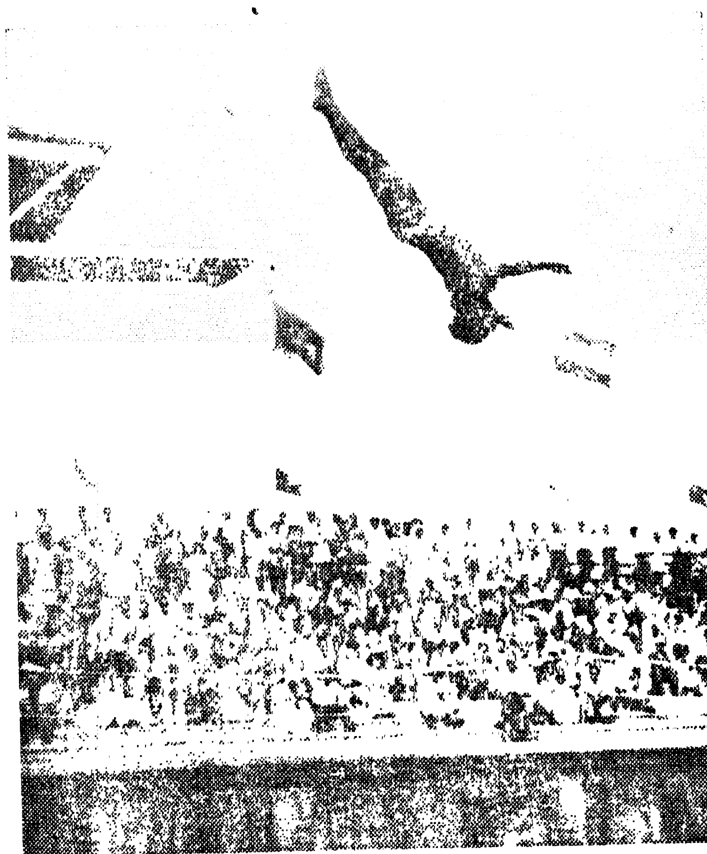
জনাকীর্ণ স্টেডিয়ামে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট



'হার্ডল রেসে'র একটি দৃশ্য

ভাবে খেলার ফেডারেশান গড়িয়া তুলিয়াছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে কি আর কার্য কারণহীন তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে? হঠাৎ দেখা গেল, এসিয়ার নানা পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিবেশী দেশসমূহের পরস্পর জানাশুনা, সদ্ভাব, মেলামেশার প্রয়োজনীয়তা আপনা হইতেই দেখা দিয়াছে। নবজাগরণের অনুভূতি এসিয়াবাসীর মনে নানাবিধ প্রয়োজন জাগাইয়া তুলিতেছে। এ সব মনে হয়, যুগ পরিবর্তনের লক্ষণ—ইহার প্রকাশ মনে ও বাহিরে—হয়ত বা ইহাই হইল রিনেসাঁসের চিরপরিচিত চেহারা!

স্বদেশের মর্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া, স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। এসিয়া এসিয়াবাসীর হইলেও নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বিশ্বকে বাহিরে রাখিয়া জীবন-যাপন করা আজিকার দিনে সম্ভব নয়। তাই যখন লণ্ডন শহরে এসিয়ার অলিম্পিক দলের প্রতিনিধিগণ ফেডারেশনের সৃষ্টিকল্পে প্রথম সম্মিলিত হ'ন তখনই বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়া-সংঘের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ঘর বাঁধিয়া রাখেন।



[illegible] স্প্রিংবোর্ড হইতে কে পি ঠক্করের (ভারত) ক্রীড়ানৈপুণ্য

শক্তি-গড় সৃষ্টি

তারপর নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে প্রায় সবাই এই ফেডারেশান বা প্রতিষ্ঠানটীর কথা ভুলিতে বসিয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় স্মৃতি জাগাইয়া তুলিলেন প্রোফেসার সোন্ধি। ভারতে এসিয়ান কনফারেন্স উপলক্ষে আগত এসিয়া দেশসমূহের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া নূতন করিয়া আবার তিনি ফেডারেশানের গোড়াপত্তন করিলেন। ইহারই অন্তর্নিহিত মিলন-ক্ষেত্র সবারই মনে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এসিয়া-বাসী সকলেরই ত এই একই প্রয়োজন। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঐক্য ও মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করিয়া বিরাট শক্তিগড় গড়িয়া উঠিবে। যে ছিল ঘুমন্ত সে হইবে কর্মচঞ্চল—সে নিজেকে সঠিক করিয়া উপলব্ধি করিবে—পরিপূর্ণ, বিকশিত জীবনের সব কিছু শক্তি, সব কিছু মাধুর্য, সব কিছু মর্য্যাদা লইয়া সে নিজেকে স্বয়ংসিদ্ধ করিয়া তুলিবে।



ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকারী ছোটা সিং (ভারত)



বাঙলার সাঁতারু শচীন নাগের সহিত প্রধান মন্ত্রী করমর্দন করিতেছেন

বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ফিলিপাইন দলকে প্রধান মন্ত্রী পুরস্কার দান করিতেছেন

ফেডারেশান সৃষ্টি-কল্পে যে সব দেশের প্রতিনিধিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কোরিয়া আজ যুদ্ধ বিধ্বস্ত; পাকিস্থান সাময়িকভাবে তাহার সদস্যপদ প্রত্যাহার করিয়াছে; ইরাক, লেবানন্ ও সিরিয়ার কোনরূপ "পাত্তাই" নাই। অপরপক্ষে লণ্ডনসভায় আহূত না হইলেও জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেসিয়া ও সিংহল ফেডারেশানে যোগদান করে। এসিয়ান গেমস-এ শেষোক্ত দেশগুলি ছাড়া ব্রহ্ম, ইরাণ, ফিলিপাইনস্, আফগানিস্থান, ভারত ও নেপাল যোগদান করিয়াছিল।


দুইশত মিটার দৌড়ে ওকামোটো কিহিকো (জাপান)

চীনকে লইয়া হয়ত বা ছোটো-খাটো একটু সমস্যা দেখা দিয়া থাকিবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চীন ও নেপাল নাম পাঠায় নাই। রাজা ত্রিভুবনের উপরোধে নেপালকে খিড়কী পথে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। কিন্তু চীনের বেলায় সে পথও বন্ধ। চীন আজ মার্কামারা দেশ। ইহাকে লইয়া পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংঘের সহিত সংঘর্ষ হওয়া বিচিত্র নয়। তাই খিড়কীপথে কেন চীনকে লওয়া হইল না তাহার কারণ অনুমান সাপেক্ষ—বিচার সাপেক্ষ নহে।

কথাটা হইতেছে যাঁহারা মনে করেন খেলার আচরণের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা, ভেদনীতি নাই; গর্ব, অহংকার, রাজনীতির ছায়া নাই—আছে শুধু স্নেহস্নিগ্ধ ভ্রাতৃভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরম পুলক, সহজ সরল আত্মতৃপ্তি, তাঁহারা হয়ত কিছু ভুল করেন। যুদ্ধ অবসানের পর, অলিম্পিক খেলায় জাপান ও জার্মানি ছিল অপাঙ্ক্তেয়। খেলার মাঠের তথাকথিত উদার হাওয়ায় তখনও তাহাদের মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

অলিম্পিকের গল্প-কথা

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত—অলিম্পিকের উদ্ভব বিনয়ের মধ্যে নয়, বিজয়ীর সাফল্য-গর্বের মধ্যেই উহার জন্ম। প্রাগৈতিহাসিক এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্ভব সম্পর্কে বহুবিধ গল্পকথা শুনা যায়। ইহার একটীর মর্মার্থ হইল—বিজয়ী যে, সে স্বয়ংসিদ্ধ, সম্পূর্ণ—দুষ্ট, বৃদ্ধ এক নরপতিকে সংহার করিয়া এক তরুণ সম্রাটের অধিষ্ঠান, পূর্ণ আধিপত্য—যেমন প্রতি বৎসর জরাতুর হেমন্তকে নিহত করিয়াই বসন্তের আবির্ভাব, আধিপত্য।

"As to the origin of the contest in distant prehistoric times there are different sets of legends: in one the Conqueror was a complete conqueror, a young king who killed a worn out and wicked old king, as the spring every year kills the winter."—Gilbert Murray,

ইহার মধ্যে আছে শক্তি-সাফল্যের দুর্বিনীত হুংকার—"পাওয়ার-পলিটিক্সের" অদৃশ্য বীজ।

রাজনীতির ছায়া?

হয়ত এই অদৃশ্য পলিটিক্স-প্রভাব-সম্ভূত মনোবৃত্তির ফলে দিল্লীর আসরে চীনকে দর্শকের স্থান দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না। অথচ কথাটা কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও সহজেই মনে পড়ে, এই পুরাতন প্রতিবেশী চীন আমাদের খাদ্য-সংকটে ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে এখনও তৎপর। বোধ হয় এই মনোবৃত্তির ফলেই এসিয়ান গেমস্-এর প্রবর্তক এন্টনি ডিমেলো প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি-মূলক প্রতিদ্বন্দ্বী কতকগুলি দল সমবেত করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের প্রচেষ্টা ইহার অপেক্ষা অনেক বড়—আমাদের উদ্দেশ্য বর্তমানের সংকটময় অবস্থার মধ্যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা।"

হায় রে দুরাশা! এই স্পর্ধা-বাণী রাজনীতির মোলায়েম সুরেই বাঁধা। "ভাজে ঝিঙে বলে পটল" এত রাজনীতিতেই সম্ভব। এণ্টনি ডিমেলোর যে কথা বলিতে বাধা লাগে নাই, ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিয়াডের শেষে সভাপতি সিগফ্রিড এড্‌স্ট্রোম সে কথা বলিতে সাহস পান নাই।" তিনি বলিয়াছিলেন —"সমগ্র মানবজাতিই চায় শান্তি, কিন্তু অলিম্পিক গেমস্ নিজের ক্ষমতায় এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম নহে; অলিম্পিক গেমস্ বড় জোর এইটুকু সুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে বিশ্বের তরুণ সকল মানুষকেই ভাইয়ের মত করিয়া দেখিতে পারে।"

অলিম্পিক খেলার সব কথা এই প্রবন্ধে শেষ করা সম্ভব নয়। প্রাগৈতিহাসিক কোন এক যুগে পুরাতন গ্রীসের রাজ্যসমূহের মধ্যেই এই ক্রীড়া উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সে আসরে যাহারা গ্রীসের অধিবাসী নয়, তাহাদের স্থান হইত না। এই উৎসব ছিল


১০০ মিটার দৌড়ের চূড়ান্ত পর্যায় এন পিণ্টো (ভারত)

গ্রীসেই সীমাবদ্ধ। গ্রীসের এই ক্রীড়া উৎসব ক্রমে সারা য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরিশেষে পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের পরিচালনায় ইহা প্রায় সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে বহুবার ইহার উত্থান পতন হইয়াছে। প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসার পরও, এই উৎসবের মূর্তি পূজা, লৌকিক আচার ও ক্রিয়াপদ্ধতি খৃষ্টধর্ম বিরোধী বলিয়া সম্রাট থিওডিসাস্ ইহাকে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক সময় আসিল যখন "ফড়িয়ার" দল এই উৎসবে "রথ দেখা-কলা বেচার" উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইত। এই স্বার্থান্বেষী "নাম-কা-ওয়াস্তের" দল সস্তায় প্রচার ও নিজেদের জাহির করিবার উদ্দেশ্যে আসিত। সে সময় এই উৎসবে যোগদান করা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অশোভন আচরণ বলিয়া গণ্য করা হইত। ইউরিপাইডিস্



৫০ কিলোমিটার দৌড়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাখতাওয়ার সিং (ভারত)

তৎকালীন এই ক্রীড়া-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"গ্রীসে সামাজিক অন্তর্জনা বা পাবলিক ন্যুইসান্সের অন্যতম হইল য়্যাথ্‌লিটদিগের দৌড়।"

অনুদার, নিষ্প্রভ আলোক

যাহা হউক এই ক্রীড়া উৎসবের ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে যে চরিত্র-সম্পদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শুধু ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল তাই নয়,—তাহাই প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা ও প্রাধান্যের একটা দিক বলিয়াই ইতিহাস মানিয়া লইয়াছে। একালে অলিম্পিকের উৎসব আচার হয়ত বা কিছু বাড়িয়া থাকিবে। একালে জাঁকজমকের অন্ত নাই; একালেও অলিম্পিকের "হোমাগ্নি" প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে—শান্তির পারাবত আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; উৎসবে আগত পরদেশীর সম্মান জ্ঞাপন করিয়া তোপ দাগা হয়;—সামরিক কায়দায় পতাকাবাহী য়্যাথ্‌লিটদল অভিবাদন জানায়,—তাহা ছাড়া মাইকের প্রগল্‌ভ বাকাচ্ছটা ত আছেই। বস্তুতঃ আচার, অনুষ্ঠান, হয়ত বা কিছু বাড়িয়া থাকিবে, কিন্তু সেই পরিমাণে কি হৃদয়ের উদারতা বাড়িয়াছে? মনে হয়, ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত পুণ্য আলোক আধার হইতে বর্তমানকালে যে আলোকচ্ছটা বাহির হয় তাহা প্রাচীনের তুলনায় অনুদার, নিষ্প্রভ ও সঙ্কীর্ণ।

কথাটা পরিষ্কার করিয়াই বলিতে চাই। প্রাচীনকালে অলিম্পিক উৎসবের এই মাসটীকে 'পুণ্য মাস" বলিয়া সকলেই মানিয়া লইত। গ্রীসের রাজ্যসমূহের মধ্যে যদি যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিত তাহা হইলে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া সকলেই এই ক্রীড়া উৎসবে যোগদান করিতে আসিত। সেই একমাসকাল পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইত। বর্তমানকালে এইরূপ হওয়া কি সম্ভব?

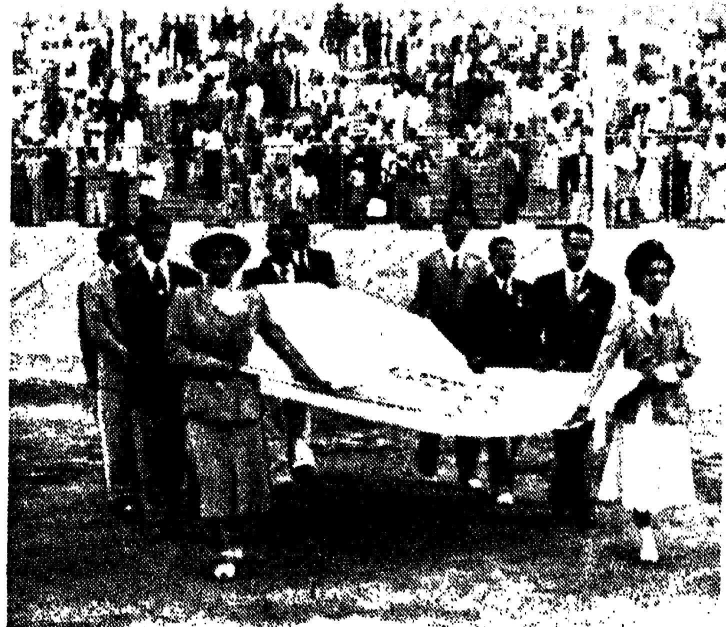
ইতিহাসের কথা। সাতাশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম যুদ্ধ চালাইবার ফলে এথেন্স, গ্রীসের অন্যান্য রাজ্যের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। পরিশেষে এথেন্সের পরাজয় ঘটে। এইরূপ অবস্থায় অলিম্পিক'এ যোগদান করা কি এথেন্সের কোন লোকের পক্ষে সম্ভব? এথেন্স বিজিত শত্রু,—এথেন্স'এর অধিবাসী দাস। কিন্তু এই দাসের বেলাতেও অলিম্পিকের পথ উন্মুক্ত, অবারিত। সে বৎসরের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন যে করিল তাহার নাম মিনন্‌ এথেনিয়াস্‌—এথেন্সের মিনন। তাহাকে বিজয়ীর অভিবাদন জানাইয়া, তাহারই মস্তকে বন্য-অলিভের মুকুট পরাইয়া, সমগ্র গ্রীস নিজেকে ধন্যবোধ করিল। প্রাচীন অলিম্পিক উৎসবের এই উদারতার ক্ষীণ আভাস কি ১৯৪৮ সালে লণ্ডনের ওয়েম্বলীর স্টেডিয়াম ক্রীড়া প্রাঙ্গণে দেখা গিয়াছিল—বিজিত জার্মানী ও জাপানের সে আসরে কি স্থান মিলিয়াছিল?

একালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণে নারীর স্থান হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক সভায় স্ত্রীলোকের স্থান ছিল না। গ্রীসের তরুণ, বস্ত্রবিহীন নগ্নদেহে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত। স্বাস্থ্য, শক্তি, সুগঠিত দেহের অধিকারী গ্রীক তরুণ ইহাকেই স্বাভাবিক ধরিয়া মনে করিত—ইহা লইয়া তাহার লজ্জা পাইবার কোনরূপ অবকাশই মিলিত না।

অতীত ও বর্তমানের এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীতেই ফিরিয়া আসা যাউক। জাতীয় স্টেডিয়ামের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে "ব্যাজধারী" অফিসারদিগের দৃষ্টিকটু জনতা। ইহা হয়ত এদেশের বৈশিষ্ট্য। ভাব দেখিলে মনে হয় সবাই ধুরন্ধর; কে সাঁচ্চা, কে মেকি চিনিবার উপায় নাই। "নাম-কা-ওয়াস্তের" গায়ে কিছু ছাপ থাকে না।

নবীন সূর্যের দেশ

প্রতিযোগী মহলে জাপানের কথা ভাবিলে মন বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। এই দেশের কথা মনে হইলে, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আণবিক বোমায় হিরোসিমা, নাগাসাকির বিদগ্ধ বাতাসে এখনও কি মৃতের ছায়া দোলে! মাত্র পাঁচ বৎসর হইল ক্লান্ত, অবসন্ন জাপান, দীন, রিক্ততায় বিলীন হইতে বসিয়াছিল। নবীন সূর্যের প্রতীক যাহার জাতীয় পতাকায় সুস্পষ্ট জাগরণের প্রেরণা জাগায়, অন্য ধাতু দিয়া সে দেশের চরিত্র গঠিত। সে জাগে নিজের স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিকতায়,

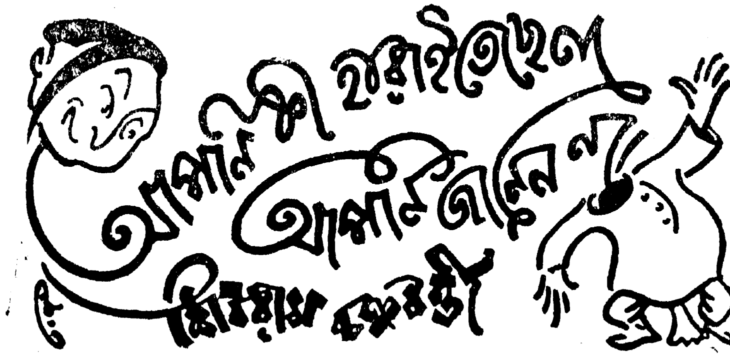


এশিয়ান গেমসের পরিসমাপ্তিতে যোগদানকারী ১১টি দেশের প্রতিনিধি ফেডারেশনের পতাকা বহিয়া লইয়া যাইতেছেন।

জাগরণের সহজ আনন্দে, নূতন আশায়, বৈচিত্র্যভরা সৃষ্টির প্রয়োজন-বিধায়। এসিয়ার পূর্বাঞ্চলের এই দেশের মেয়ের দল, দিল্লীর খেলার দরবারে সকলকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে। আগামী বৎসরে হেলসিঙ্কির অলিম্পিক উৎসবে মেয়েদের প্রতিযোগিতায় ইহাদের স্থান গৌরবের শীর্ষভাগে থাকা সম্ভব। যে দেশে নারী প্রেরণা যোগায় সে দেশ পিছনে পড়িয়া থাকিবার নয়।

অতর্কিত পথে ইরাণ যে কতখানি আগাইয়া গিয়াছে তাহা মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়াও শত্রু পক্ষের খেলার সাফল্যে ইহারা করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। রেফারির অগণিত ভুল প্রমাদের প্রতিবাদ না করিয়াই সিঙ্গাপুর ওয়াটার পোলো খেলায় পরম আনন্দে পরাভব স্বীকার করিল। ঐক্য ও স্নেহসিক্ত ভ্রাতৃত্বের প্রভাব এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে বিস্ময় ও পুলকের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা কিসের বিকাশ?

এসিয়ান গেমস'এর উপর দিয়া এ কোন স্নেহস্নিগ্ধ মৃদু হাওয়া বহিয়া গেল; কোন্ বারতা সে বহিয়া আনিল; কোন্ আশার বাণী এসিয়াবাসীর মনের কানে সে শুনাইয়া গেল? সে কি মরীচিকার আহ্বান, অজানা অদৃষ্টের সুনিষ্ট পরিহাস, না নবযুগের রহস্যাবৃত অস্পষ্ট ইঙ্গিত?



দক্ষিণার আমদানি লেখকজীবনে দক্ষিণ হাওয়ার মতই বিরল। আর যেমনিই মৃদুমন্দ। মন্দার বাজারে সম্পাদকদের দাক্ষিণ্য মন্দীভূত আরো। তাই মনে করলাম—

মনে কিছুই করিনি, এক বাবসাদার—নাম-জাদা বালতির ব্যাপারী প্রচারসচিব চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম। তখন মনে পড়লো, একদা......

শ্রী আর বিশ্রী—বাজারে দুই প্রকারের ঘি। কোনটি আপনার পছন্দ? কে দেখে কৃষ্ণপ্রাপ্তির নায় প্রহ্লাদী প্রেরণায়, ঘিয়ের নামে শ্রীকার দেখে ঐ লাইনটি মনে এসে গেছল হঠাৎ! এসে, কিছুতেই আর যেতে চায় না মন থেকে। প্রথম-গজানো প্রেম আর গোঁফের মতই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। কথাটার কী গতি করি ঠিক করতে না পেরে শ্রী-ঘৃতের ঠিকানাতেই ওটাকে পাঠিয়ে দিলাম একদিন—কিছু না ভেবেই।

অযাচিত পাঠানোর কিছুদিন পরেই অভাবিত এক চেক এসে হাজির—এক ক্রস্ চেক—ক্রস্ ষ্ট্রীটের আড়ত থেকে। একটি লাইন লেখার জন্যে একশো টাকার বেশি পেয়েছিলাম, মনে আছে আমার। শ্রী-যুত ঘিয়ের কর্তাদের ধন্যবাদ-জড়িত অনুপ্রেরণা, ভাবতে বেশ লাগে। ভাবলে আবেশ আসে এখনো।

লেখকজীবনের সেই উন্নতি বয়েসে। একশো টাকায় তখন বইয়ের কপিরাইট বেচি, আর পাঁচ হাজার লাইনের কম কি কোনো বই? প্রুফ দেখতে দিলে বাড়ে আরো, আরো ইমপ্রুভ হয়—লেখার দিকে না হলেও লাইনের দিকে তো বটেই।

সেই সময়ে এক লাইন লিখে একশো টাকা পাওয়া—এবং নিজের লেখার লাইনে নয়—আনকোরা আলাদা গলিতে—ভুলতে পারি কি কখনো? আমার রচনার সম্পাদকদুর্লভ সেই সমাদরে, বলতে কি, ঘিয়ের মতই আমি গলে গিয়েছিলাম সেদিন।

তাই মনে করলাম এই লাইনেও—এই এক আধ লাইনেও তো আমার বেশ আছে। প্রচার-সচিবের কাজটা নেবার তবে বাধা কী? লেখার এই নতুন লাইনটাই নিলাম না হয়? লেখক-জীবন থেকে একেবারে ডিরেলমেণ্ট তো নয়?

পাঠিয়ে দিলাম আবেদন। শ্রী-ঘৃত-কীর্তির উল্লেখ করতেও দ্বিধা করলাম না।......

চিঠি রওনা করার দিনকয়েক পরেই জবাব এলো। ডাক পড়েছে আমার। গেলাম মুলাকাৎ দিতে—

"দেখুন, আবেদনে জানিয়েছেন যে আপনি একজন লেখক" সুরু করলেন ভদ্রলোক, "কিন্তু আপনার লেখার কোনোই পরিচয় দেননি। কী লেখেন আপনি? সাইনবোর্ড—মণিঅর্ডার ফর্ম—না, হিসেবের খাতা?"

"আজ্ঞে না। গল্পটল্প লিখি। বইটই।" সলজ্জভাবে জানালাম।

"কিন্তু মশাই, বইতো নয়, বিজ্ঞাপন লেখার কাজ যে! দায়িত্বপূর্ণ—ভারী শক্ত কাজ।" তিনি বলেন—"আরো অনেক আবেদন এসেছে। সবাই নমুনাস্বরূপ কিছু না কিছু বিজ্ঞাপনের কপি লিখে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার চিঠির সঙ্গে তেমন কিছু তো নেই।"

ইচ্ছে হোলো যে বলি স্বয়ং কপিকুলই এসে যখন হাজির তখন বলুন না, কতো কপি চাই আপনার? কিন্তু ওভাবে না বলে ভাবটাকে ভাষান্তরিত করে দিই—"কপি লিখতে কতোক্ষণ মশাই? লেখাই তো আমাদের পেশা।"

"শ্রীঘৃতের ওটা কি আপনার সত্য ঘটনা?" উনি জিগেস করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেখুন, শখানেক আবেদনের সঙ্গে শ'পাঁচেক বিজ্ঞাপনের কপি পেয়েছি। লক্ষ্য করে দেখলাম—অবশ্যি, দেখেছি ওপর ওপর—একটাও ওর সুবিধের নয়। আমি চাই একেবারে অন্যরকমের। নতুন ধরণের এমন কিছু যা সহজেই সবার নজরে পড়বে—লোকের আলোচ্য হয়ে উঠবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

"তাইতো হওয়া উচিত। যাতে আপনার বিজ্ঞাপনে সবার চোখ পড়ে—আপনার বালতির ওপর ঝোঁক পড়ে সবার—" বলতে যাই আমি।

"গতানুগতিক—যেমন সবাই বিজ্ঞাপন দেয়—তেমনটি আমার চাইনে। আমি চাই নতুন আইডিয়া।"

"যা বলেছেন। ঐ নতুন আইডিয়ার কথাই আমি বলছিলাম।" আমি বল্লাম—"বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।"

"কিরকম শুনি?" তিনি শুধান।

সত্যি বলতে, কোনো আইডিয়াই আগের থেকে মাথায় করে আমি যাইনি। আইডিয়াটা তক্ষুণি তক্ষুণি আমার গজালো, ওঁর কথায়। ওঁর এই গজালির সঙ্গে গেঁজে গজগজ করে উঠলো আমার মগজে। জুতোর গজালের মতই খচখচ করে উঠলো ঘিলুর পাদপীঠে।

আমার আইডিয়াগুলো ঐরকমই। আগের থেকে গাদা হয়ে থাকে না, অকারণে আমাকে গঞ্জনা দেয় না—তাগাদার সময় দরকার মাফিক গজিয়ে ওঠে। মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফূর্ত হয়। যখন আসে, বিদ্যুৎচমকের মতই আসে, আমার মাথার আকাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে খেলে যায়। চমকিত করে তোলে আমায়— আমার



কপি লিখ্‌তে কতোক্ষণ মশাই?

আইডিয়ারা। চমৎকৃত করে, কিন্তু কখন আসে, কিভাবে আসে, কেন আসে—আমি তার কোনো আইডিয়াই পাই না।

"শুনি আপনার আইডিয়াটা?"

"এইমাত্র আপনি একটা কথা বল্লেন—সত্য ঘটনা।" আমি বল্লাম—"বল্লেন না?"

"হ্যাঁ বলেছি।" তিনি স্বীকার করলেন।

"ঘটনা কাকে বলে?" আমি জিগেস করি।

তাকালেন তিনি আমার দিকে। "কেন, ঘটনা—যা ঘটেছে তাই তো ঘটনা।" তিনি জানান—"আমি তো তাই জানি মশাই।"

"ঠিক তাই।" আমি সায় দিলাম—"তাহলে দেখুন, 'সত্য ঘটনা' কথাটা বেবাক ভুল। একেবারে ভুল বাঙলা। ঘটনা মানেই তো সত্য, তার ওপরে আরো সত্য চাপানো অনাবশ্যক। নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। তাই নয় কি?"

মানতে হোলো তাঁকে। ঘাড় নাড়লেন তিনি—একটু বিমর্ষ মুখেই।

"তারপরে দেখুন, আপনি বল্লেন যে বিজ্ঞাপনের কপিগুলি আপনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মানে হচ্ছে মন দিয়ে দেখা। যত্ন নিয়ে ভালো করে দেখা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওপর ওপর চোখ বোলানো আর লক্ষ্য করা এক জিনিস নয়।"

তক্ষুণি উঠে তিনি অভিধান পাড়লেন—খোঁজ নিলেন কথাটার। খুঁজে পেতে যখন দেখলেন যে আমার কথাই খাঁটি তখন কে যেন তাঁকে চাঁটি মারলো। মোটেই খুশি দেখা গেল না তাঁকে। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু উত্তর-দক্ষিণ মাথা নাড়লেন তিনি— রীতিমতন গম্ভীর হয়ে।

"এখন আমার কথা এই, আমরা বাঙালীরা হচ্ছি ভাষাগর্বিত জাত। সর্বকিছুই আমাদের ভাষা-ভাষা। 'মোদের গরব মোদের আশা—আ—মরি বাঙলা ভাষা!' শুনেছেন নিশ্চয়ই বেতারে? শোনেন নি? মনের সেতারের সঙ্গে সেই সুর বাঁধা আমাদের—" কথাটকে আমি ভালো করে তাতিয়ে নিই চারিয়ে দেবার আগে —"যদি কোনো বাঙালীকে মুখের ওপর বলা হয় তুমি ইতিহাস জানো না, ভূগোল জানো না, বীজগণিত জানো না, প্রত্নতত্ত্ব কি পুরাতত্ত্ব জানা নেই তোমার, তাহলে সে মোটেই কিছু মনে করবে না, মেনে নেবে অম্লানে, কিন্তু যদি তাকে বলি, মশাই আপনি বাঙলা জানেন না অমনি তার মনে গিয়ে লাগবে। সারাদিন মন ভার হয়ে থাকবে তার।......"

"তা ঠিক।" নিজের মনোভার তিনি মোচন করলেন। বেশ ভারিক্কি ভাবেই।

"এখন, বিজ্ঞাপনের মোদ্দা কথাই হচ্ছে, এই মনে লাগানো। যাতে কথাটা ঘুরে-ফিরেই তার মনে আসে, কিছুতেই সে না ভোলে, ভুলতে না পারে। তাই নয় কি? আমার বিজ্ঞাপনের ধারাটা হবে এই ধরণের ভাষার যতো খুঁৎ ধরে। সারাদিনের কথাবার্তায় সাধারণের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে সেইসব দেখিয়ে। যেমন, উদাহরণ-স্বরূপ—" আমি দেখাতে সুরু করিঃ

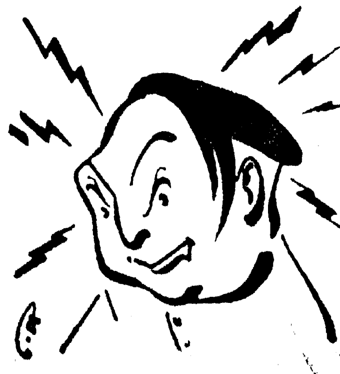
"সত্য ঘটনা কথাটা কি ঠিক? না মশাই, আদৌ না। যখন আপনি সত্য ঘটনার কথা তোলেন তখন, বলতে আমি বাধ্য, যারপরনাই ভুল করেন আপনি। ঘটনা, সত্য বলেই তো ঘটনা— তা না হলে তো তা কিছুতেই ঘটনা হতে পারে না। আপনি কি মিথ্যা ঘটনার কথা শুনেছেন কখনো? ইত্যাকারে সুরু করে একজন নামজাদা লেখকের ছবি দেব আমাদের বিজ্ঞাপনের সাথে—ইনি একজন বড় লেখক, তার কারণ এঁর লেখার প্রত্যেকটি কথা সুনির্বাচিত। আপনি যেমন টাকা বাজিয়ে নেন, ইনি তেমনি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বাজিয়ে তারপরে তা ব্যবহার করেন। তেমনি আমাদের বালতির বেলাতেও, তা বাজে কিনা, বাজারের আরো দশটা বালতির সঙ্গে বাজিয়ে দেখে তবে আপনি নেবেন।"

কথাটা ভদ্রলোকের মনে লাগে। প্রাণে বাজে। এতক্ষণে তাঁর মুখের গুমোট কেটে গিয়ে একটু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। নাতিক্ষীণ রেখার মতই, তাঁর গোঁফের দুধারে। তার ভার মুখের মেঘলার ধার ধার রূপালী হয়ে ওঠে।

"এ ধরণের বিজ্ঞাপন, দেখবেন, দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়বে দেখতে না দেখতে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে মানুষের মনে মনে। আপনার বালতি কাটবে হু হু করে—বালতি বালতি টাকা ঘরে তুলবেন আপনি।"

"তার এক বালতি আপনার।" তিনি সহাস্য বদনে বর দিলেন আমায়—"বেশ, তাহলে সুরু করে দিন। লাগুন আজ থেকেই।"

দিলাম সুরু করে। তিন মাসের মতন খোরাক তৈরি হয়ে গেল গোড়াতেই। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই। কাজটা শক্ত ছিল না আদপেই। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বেয়াদবি—ভাষায় এতরকমের গলতি বাঙালীর গলা দিয়ে গলে যে- চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এত অহেতু কথা, অযথার্থ বাক্য আমরা ব্যাভার করি—একটু তালে থাকলেই তার তালিকা মেলে। তেরোটা কপি বানিয়ে ফেল্লাম আমাদের ভাষা-তাবল্যের—মায় লে-আউট সমেত। তের হপ্তায় তের রকমের ব্যঞ্জনা—হপ্তায় হপ্তায় পালটাবার বিজ্ঞাপন। তের হপ্তার পরে ফিরে ফিরতি আবার—সেই তেরস্পর্শ পরের পর। পূর্ণগ্রহণের পর



আইডিয়ার বিদ্যুৎবিকাশ

পুনর্গ্রহণ! ......সুরু হয়ে গেল সেই সপ্তাহ থেকেই।

বিজ্ঞাপনটা হৈ চৈ তুললো। বেরুতে না বেরুতেই—প্রথম দিনেই টের পেলাম। বসে আছি ট্রাম গাড়িতে, কানে এলো আমার—একজন বলছে অপরজনকে—

"আমি ভাই জানতুমই না। আশ্চর্য্য! লক্ষ্য করা মানে একটু তাকানো—এক পলক মাত্র—য়্যাদ্দিন এই ভেবেছি......"

"আমিও তাই।"

বিজ্ঞাপনটা এদের লক্ষীভূত হয়েছে দেখছি। আরো অনেকে এটা লক্ষ্য করেছে নজরে পড়লো আমার। বাড়ি-ফিরতি বাসের একজনকে তো উচ্চকণ্ঠেই সাবাস্ দিতে শুনলাম। এমন ধারার বিজ্ঞাপন আর কখনো নাকি বেরয়নি আমাদের মুল্লুকে। সকলেই বেশ লক্ষ্য-সচেতন হয়ে উঠেছেন—একদিনেই!

পাড়ার রেস্তরাঁয় বসে চায়ের ফাঁকে ওলটাতে গিয়ে দেখতে পেলাম আনন্দবাজারের পাতার থেকে লক্ষ্যস্থলটাই উধাও! কে যেন কেটে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনটা তাহলে লক্ষ্য-ভেদ করেছে, আলবৎ!

তিন হপ্তায় সারাদেশে সোরগোল পড়ে গেল—সত্যিই! আপিসে যাই আসি—সেখানে ঘণ্টা-খানেকের মামলা আমার। প্রতি হপ্তার কপি রওনা করে দেয়া খবরের কাগজে, খবরের কাগজের আপিস থেকে লে-আউটটা কম্পোজ হয়ে এলে তার প্রুফ দেখা, ভুল শুদ্ধ করা, শুধরানো কখনো বা এক আধটু। এই তো কাজ। কর্তার সাথে মুলাকাতের দরকারই হয় না, আছি বেশ।

কিন্তু দরকার হোলো হঠাৎ। চতুর্থ সপ্তাহের গোড়ায় গিয়েই আমার টেবিলের ওপরে একটা চিঠি পেলাম—কর্তার স্বাক্ষরিত—সঙ্গে একখানা চেকঃ

"এতদ্দ্বারা আপনার এক মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে আপনাকে বরখাস্ত করা হোলো। আজ থেকে আপনার কাজের আমাদের কোনোই আর প্রয়োজন নেই। ইতি—ভবদীয় ইত্যাদি..."

এর মানে? গেলাম কর্তার কাছে। ঘরের মধ্যে আমাকে দেখেই না তিনি চোখ পাকালেন। তাঁর দুধারের রগ ফুলে উঠলো দেখতে দেখতে—রগান্বিত হয়ে সারামুখ লাল হয়ে উঠলো কিরকম—রাগান্বিত হয়েও হতে পারে হয়ত।

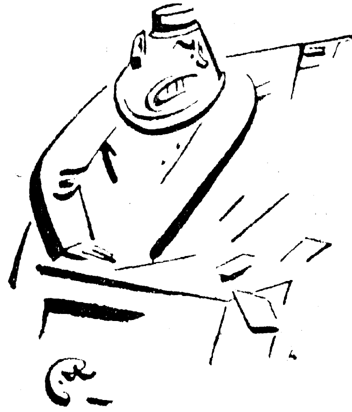
"গেটাউট গেটাউট!" ফেটে পড়লেন ভদ্র-লোক—"ঢের হয়েছে। আপনাকে আমাদের চাইনে।"

বালতি-সম্রাটকে এমন কথা বলতে শুনবো, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।—"এর মানে কী, আমি জানতে চাই।" আমি বলি।

"এর মানে? এর মানে, আমার অনেক টাকা জলে গেছে, আর নয়। গেটাউট।"

মূলধনী-সুলভ দুঃশোষণী মনোবৃত্তি, বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমার প্রচার কাজের সাহায্যে নিজের সুবিধে করে নিয়ে, যতো রাজ্যের পচা বালতি বাজারে পাচার করে অধুনা টাকার কাঁড়িতে বসে—এখন পূর্ব-প্রতিশ্রুত এক বালতি টাকা দেবার বেলায় তার বদলে আমার মাথায় এক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দেয়া! তাছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু আমিও কৈফিয়ৎ না নিয়ে নড়বার নই। গেটাউট, কিন্তু কেন গেটাউট? এরকম



গেটাউট্ গেটাউট্

অকথ্য ভাষণের সন্ধি-বিচ্ছেদে বাঙলা বৈয়া-করণিক নিয়ম লঙ্ঘনের কথা না হয় নাই তুল্লাম—সেসব 'স্খলন পতন ত্রুটি' না ধরেও, এরূপ অনুচিত কথনের অর্থ কী? সাদা বাঙলায় আমি জানতে চাই।

"আপনাকে আমাদের চাইনে। সাদা কথা।"

হায়, আপনি কী হারাতে যাচ্ছেন আপনি জানেন না! বিজ্ঞ লোকের একান্ত আপন যে বিজ্ঞাপন, তার মৌলিক কারুকলাই আপনি হারাতে বসেছেন। সেই সুদুর্লভ বিজ্ঞাপনী-প্রতিভাকেই দূর দূর করে দিচ্ছেন। সপ্রতিভ-ভাবেই বলতে যাই কথাটা—গুচ্ছের কথা হলেও গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

"গেটাউট। বাইরে গেট আছে, সেই গেট দিয়ে আউট হয়ে যাও। গেটাউট।"

আমি যেমন নাছোড়, উনিও তেমনি বান্দা। কথার প্যাঁচে পেছোবার নন। তাঁরও তেমনি আমাকে তাড়ানোর Pun-তন্ত প্রয়াস।

কিন্তু হট বল্লেই কি আমি হটবো? সেই ছেলে কি? চট্ করে কি হটবার? এমন কি, চটবারও নই সহজে। এক বালতি টাকা পাবার আবাল্য স্বপ্ন আমার—তা কি ওঁর এক কথায় জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবো এখান থেকে? অমনি অমনি?

"কেন, আমার প্রচারকাজে কি কোনোই ফল হয়নি? হাজার হাজার লোকের নজরে পড়েনি আপনার বিজ্ঞাপন? হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ্যগোচর হয়েছে, আমার নিজের স্বচক্ষে দেখা। বলুন—একি সত্য ঘটনা নয়?"

"সত্যিকার এক দুর্ঘটনা, বলছি তো।" তিনি বলেনঃ "হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ আমার। আমারো পরের স্বচক্ষে দেখা নয়।"

"হাজার হাজার বালতি কাটেনি আপনার? লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়নি আমার বিজ্ঞাপনে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে বটে—ঐ বিজ্ঞাপনেই হয়েছে—" তিনি স্বীকার করেন—"কিন্তু—কিন্তু—"

তিনি একটু কিন্তু কিন্তু হতেই আমি গর্জে উঠি—"তবে—তবে?"

"হ্যাঁ, হাজার হাজার কেটে যাবার খবর আমি পেয়েছি। এমনকি, পচা ছেঁড়া উইয়ে খাওয়া একটাও পড়ে নেই আর—তাও ঠিক......"

"হয়েছে তো? তবে?" আমার বিজয়োল্লাস দেখা দেয়।—"তবে কী?"

"তবে বালতি নয়, অভিধান। অভিধান।" শিবের গীতে তিনি অভিধান আনেন। ভানেন।—"বাজারে অভিধানের কাটতি হয়েছে হাজারে হাজারে।......এখন, দয়া করে—গেটাউট।"

লোহা, সভ্যতা ও প্রাচীন ভারত

শ্রীদানেশ সেন

কে প্রথমে লোহাকে লোহার খনিজ থেকে ধাতব অবস্থায় এনেছিলেন ইতিহাসে তা লেখা নেই। কোন জাতির মধ্যে এর চলন ছিল বেশী বা উন্নতি হয়েছিল বেশী, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আছে অনেক।

লোহার পাথর বা লৌহ খনিজ যার থেকে সাধারণত লোহা বের করা হয়, সেগুলি রাসায়নিক পরিভাষায় লৌহ নামক মৌলিক পদার্থ-এর অক্সাইড। সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় অবাঞ্ছিত জিনিস থাকে। এগুলি শক্ত, পাথরে ঘষলে লালচে, গৈরিক বা রক্তের মতন রং পাওয়া যায়। ঠিক রংটি নির্ভর করে, লোহার খনিজটি লোহার কোন জাতীয় অক্সাইড, তার উপর। আদিম কালের সুন্দরীরা এই রং-এর লালিমাতে তাঁদের রূপ বৃদ্ধি করতেন. যে বেরসিক এরকম জিনিসকে আগুনে গলিয়ে লোহার মতন কঠিন নীরস ধাতু বের করেছিলেন তাঁর উপর চটে-ছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ইতিহাসে।

প্রাচীনকালের সুন্দরীদের প্রসাধনের সামগ্রীর এরকম হীন ব্যবহার কিন্তু মানুষের তথাকথিত সভ্যতাকে অর্ধেকের বেশী আগিয়ে দিয়েছে তার কোন সন্দেহ নাই। চোখ ঝলসানো আবিষ্কারের ছড়াছড়ি এযুগে. রেডিও, র‍্যাডার, রকেট, ইলেকট্রন, মাইক্রোসকোপ, এ্যাটম বোমার প্রাচুর্যের মাঝে লোহার আবিষ্কার এখনও পর্যন্ত কারও কাছে ম্লান হয়নি। জীবনযাত্রার প্রতিটি পদে লোহা আর বিভিন্ন ইস্পাতের প্রয়োজন বেড়ে চলবে দিন দিন।

খনিজ থেকে লোহাগলানোর আগেও আদিম মানুষ হয়ত লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল। ঐ পরিচয়ের মাত্রা ছিল সীমাবদ্ধ। খসেপড়া তারা বা উল্কার সঙ্গে লোহা মিলে, এরকম লোহার খণ্ড স্বর্গীয় জিনিস হিসাবে ভেবে হয়ত পূজাই করত বা অপূর্ব জিনিস-এর নিদর্শন হিসাবে ঘরে সঞ্চয় করত। দামী বা সহজে মিলে না জিনিসের অলংকার বানায় সবাই, এর থেকে অলংকার বানানোর সম্ভানাও যথেষ্ট, কিন্তু তার পরিচয় এখন পাওয়া কঠিন, লোহা সহজেই মরিচা পড়ে। প্রাচীন যুগের ব্যবহৃত লোহার চিহ্ন মিলে না তাই।

খনিজ হিসাবে লোহা বালুর মৌলিক পদার্থ সিলিকনের মতন প্রায় সর্বব্যাপী। সাধারণত অন্য ধাতুদের খনিজে, মাটিতে সামান্য কিছু না কিছু পরিমাণে লোহা বর্তমান থাকে। শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ বলতে লৌহবিশিষ্ট সেই সব পদার্থকেই বুঝায়, যাদের থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে লাভ সহকারে লোহা গলানো যায়। পণ্ডিতরা আন্দাজ করেন প্রাচীন সভাদের কোন ভোজন উৎসবে লৌহ পাথর সাজিয়ে করা হয়েছিল 'উনুন', তখনকার দিনের একমাত্র ইন্ধন কাঠ দিয়েই ইন্ধনের কাজ হয়েছিল, উনুনটি হয়ত অনেকক্ষণ ধরেই জ্বলেছিল, তাতে দেখা যায় উনুন তৈরী করবার পাথর থেকে একরকম অস্বচ্ছ খুব শক্ত জিনিস বেরিয়ে আসে। সেইটিই খনিজ থেকে প্রথম নিষ্কাশিত লোহা। এটি নিয়ে তাঁরা দেখেন তাঁদের শিকার করবার কাজ ও তৎকালীন জীবনযাত্রার অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজে অধিকতর উপযোগী। পরে হয়ত তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যেদিকে বাতাস জোরে বয়, সেইদিকে তাপও হয় বেশি আর লোহাটাও সাজানো পাথর থেকে বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। তার থেকে তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে বেশী বাতাস দেবার চেষ্টা করেন, এক সঙ্গে লৌহ পাথর আর কাঠ সাজিয়ে। ক্রমশ আবিষ্কার হয় 'হাপরের', আর উন্নততর ভাবে লৌহপাথর আর কাঠ ও কাঠ কয়লা সাজানোর। এর পর আবিষ্কার হয় ধীরে ধীরে আধুনিককালের লৌহ চুল্লীগুলি। এতে সময় লেগেছে অনেক।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে শুরু হয় আধুনিক লৌহচুল্লীদের একটি প্রধান সংস্করণ 'ব্লাস্ট-ফারনেস' ব্লাস্ট-ফারনেস বা 'জোর চাপের হাওয়া পরিচালিত চুল্লী'। প্রথমে কাঠকয়লার সাহায্যেই ইন্ধনের কাজ হতো, ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে 'ডুডলে' সাহেব শুরু করেন 'পাথুরে কয়লার' ব্যবহার। ইংলণ্ডে 'ব্লাস্ট-ফারনেস' চালু হয় ১৫০০ খৃষ্টাব্দে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে 'ডার্বি' সাহেব শুরু করেন 'কোকের' ব্যবহার। যেখানে কাঠ সস্তা, সেখানে কাঠ কয়লার সাহায্যেই লোহা গলানো এখনও হয়।

লোহার প্রধান খনিজগুলি হচ্ছে এই। রেড হেমেটাইট বা রাসায়নিকদের ভাষায় ফেরিক অক্সাইড। 'ব্রাউন হেমেটাইট', এটি ফেরিক অক্সাইডের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় মিশানো জল। রেড হেমেটাইটের একটি অণুতে থাকে দুটি লৌহ পরমাণু আর তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। ব্রাউন হেমেটাইটে তার সঙ্গে কিছু জল। 'ম্যাগনেটাইট' বা 'লোডস্টোন' জাতীয় খনিজে থাকে তিনটি লৌহ পরমাণু ও ৪টি অক্সিজেন পরমাণুর একত্র মিলন ফল। 'সিডেরাইট' বা 'স্পাথিক আইরনওর' হচ্ছে 'ফেরাস কার্বনেট' অর্থাৎ একটি লৌহ পরমাণুর সঙ্গে একটি কার্বনেট 'র‍্যাডিকেল' বা একটি কার্বন ও তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর মিলন ফল। 'আইরন পাইরাইটিস' গন্ধক আর লোহার পরমাণুর, চ্যালকোপাইরাইটিস তামা, লোহা আর গন্ধক পরমাণুর মিলন ফল। উপরোক্ত খনিজগুলিতে উপরোক্ত জিনিস ছাড়া আরও অনেক দ্রব্য থাকে, অবাঞ্ছিত দ্রব্য হিসাবে। খনিজগুলিকে করে অবিশুদ্ধ, বিশুদ্ধখনিজ সচরাচর পাওয়া যায় না। 'অজৈব রসায়নের' বইতে উপরোক্ত খনিজদের ফরমুলা লেখা থাকে, লোহার বিশুদ্ধ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে।

লৌহ পাথরকে গলানো হয়, লাইমস্টোন এবং কোকের সাহায্যে, বিশেষ নির্মিত লৌহ-চুল্লীতে বা ব্লাস্ট ফারনেসে। এইটি লৌহ বা ইস্পাতশিল্পের প্রথম ধাপ। এইরকম ভাবে গলাবার জন্য সাধারণত অক্সাইড জাতীয় লোহা খনিজ ব্যবহার করা হয়, অন্য জাতীয় খনিজ-গুলিকে অক্সাইড অবস্থায় আনা হয় বিশিষ্ট প্রাথমিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। ব্লাস্ট-ফারনেস নির্মাণ এবং ব্যবহার করা একটি বিশিষ্ট ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ব্লাস্ট-ফারনেসে গলানো লোহাকে বলে পিগ্ আইরন। ফারনেসে ব্যবহৃত কোক থেকে গলানো লোহাতে আসে মাত্রা বিশেষে অঙ্গার। অঙ্গারের মাত্রা বিশেষের উপর নির্ভর করে এর রং আর গুণাবলী। অঙ্গারটি থাকে দুরকম ভাবে, মুক্ত অঙ্গার হিসাবে বা লোহার সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন 'লৌহকার্বাইড' হিসাবে। খানিকটা অঙ্গার থাকে আবার লোহাতে এমনি দ্রব অবস্থায়। যদি 'মুক্ত' অঙ্গারের মাত্রা অধিক হয়, তখন তাকে বলা হয় 'গ্রে পিগ আইরন', যদি দ্রব অবস্থার অঙ্গার বা রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন লৌহে কার্বাইড বেশী থাকে তখন তার নাম হয় 'হোয়াইট পিগ আইরন', এদের মধ্যাবস্থাগুলির নাম হয়, 'মটলড পিগ আইরন'। বলা বাহুল্য এদের গুণাবলীরও পার্থক্য আছে।

এ ছাড়া পিগ আইরনে থাকে সামান্য মাত্রাতে গন্ধক, সিলিকন ফসফরাস ও ম্যানগানিজ। পিগ আইরনের একটি চলতি নাম কাস্ট আইরন বা ঢালাই লোহা। ঢালাই লোহা ভঙ্গুর, ধাক্কা সইতে পারে না। ঢালাইর কাজে ও যেখানে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কম, সেইসব জিনিসে এর ব্যবহার খুব বেশী। 'রট আইরন', স্টীল প্রভৃতি তৈরীর মূলে উপাদানও এই পিগ্ আইরন। রট

আইরন, পেটাই লোহা, স্টীল বিভিন্ন ইস্পাত পিগ আইরনের গলন তাপ প্রায় ১২০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

রট আইরন—'বিভার বারেটারী ফারনেসে' পিগ আইরন অন্য ছাঁটাই লোহার সঙ্গে গলানো হয়। গলানোর সময় লোহাটা গলে তরল হয়ে গেলে খুব ভাল করে নাড়বার যন্ত্র দিয়ে নেড়ে দেওয়া হয়, উদ্দেশ্যে এর অবাঞ্ছিত অঙ্গার, সিলিকন, গন্ধক, ফসফরাস ম্যানগানিজ প্রভৃতি জিনিসগুলি 'বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অক্সিডাইজ হয়ে যাওয়া বা ফারনেসের লাইনিং' এর সঙ্গে 'স্ল্যাগ' তৈরী করে বেরিয়ে যাওয়া। 'ফারনেস লাইনিং' হিসাবে ব্যবহার করা হয় ফেরিক অক্সাইডের প্রলেপ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে 'রজার্স', চুল্লীর ভিতরে 'ফেরিক অক্সাইডে'র একটা স্তর রেখে দিয়ে ভাল ফল পান। প্রথমে লোহাটা গলে, তখন নাড়ার ফলে 'আইরন অক্সাইডের' স্তর আর লাইনিং এর সঙ্গে বেশ ভাল করে মিশে, যখন বেশ তরল হয় তখন ধাতুর উপরে 'কার্বন মনক্সাইড', গন্ধক প্রভৃতির গ্যাস ঐ তাপে ছোট ছোট শিখা হয়ে জ্বলে ওঠে। লোহাটি যখন আরও গরম হয়ে ফুটবার অবস্থায় আসে তখন অন্যান্য অবাঞ্ছিত জিনিসগুলি 'লাইনিং' আর 'স্তরের' আইরন-এর সঙ্গে 'স্ল্যাগ' তৈরী করে। 'স্ল্যাগ' কথার ব্যবহারিক অর্থ, অবাঞ্ছিত জিনিসের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরস্পর মিশে, নিম্নতর গলনতাপের দ্রব্য। গলিত লোহাটি নেড়ে বল তৈরী করে, বাষ্পচালিত হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নেওয়া হয়। তাতে লেগে থাকা 'স্ল্যাগটি' লোহার থেকে পৃথক হয়ে যায়। 'রট আইরন' নরম হয় ১০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে, তখন একে হাতুড়ি দিয়ে ইচ্ছামত পেটানো যায়। এর গলন তাপ ১৫৫০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এটা নমনীয়, 'কাস্ট আইরনের' মত 'ঠুনকো' নয়। মাইক্রোসকোপের নীচে 'কাস্ট' আইরনের দেখা যায় ছোট ছোট দানা। রট আইরনকে দেখায় লম্বা লম্বা 'আঁশের' বাণ্ডিলের মত। লোহার পাতলা আঁশের মাঝে মাঝে থাকে 'ফেরাস সিলিসাইড', লোহার সঙ্গে সিলিকনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 'ফেরাস সিলিসাইড', সামান্য পরিমাণে চুল্লীর ভিতরেই তৈরী হয়। এই আঁশগুলির জন্যই 'রট আইরন' হয় শক্ত, ভাঙ্গে না। এর থেকে প্লেট, তার, পেরেক, কোদাল প্রভৃতি তৈরী করা হয়। অনেক সময় সস্তার 'স্টীল' 'রট আইরন' বলে লোকে ভুল করেন। 'রট আইরন' গরম করে ঠাণ্ডা জলে ডোবালে শক্ত হয় না। সস্তার স্টীল ওই রকম গরম করে ঠাণ্ডা জলে ডোবালে হয়ে যায় খুব শক্ত। সস্তার স্টীলেরই চলন বেশী, কারণ 'রট আইরনের' দাম পড়ে বেশী।

ইস্পাত—স্টীল করা হয় 'কাস্ট আইরনের' কার্বনের ভাগ কমিয়ে বা 'রট আইরনের' কার্বনের ভাগ সামান্য বাড়িয়ে।

ইস্পাত তৈরী করবার প্রায় ৫ রকম উপায় আছে

(১) **সিমেণ্টেসান প্রশেস**ঃ—বিশুদ্ধ রট আইরন, ফায়ার ব্রিক নির্মিত বিশেষ রকমের চুল্লীতে কাঠকয়লার সঙ্গে প্যাক করে প্রায় ৮।১০ দিন ধরে ১০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে গরম করতে হয়। কতটা গরম করতে হবে আর কত দিন ধরে সেটা নির্ভর করে 'রট আইরনে' কতটা লোহা ঢোকাতে হবে তার ওপর। ফায়ার ব্রিক তৈরী এই চুল্লীগুলি বাইরের বাতাস যাতে না ঢোকে তার জন্য 'ফায়ার ক্লে' জাতীয় মাটি ও শানযন্ত্রের 'রেফিউজ' দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। চুল্লীগুলি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পরে দেখা যাবে লোহাটার গায়ে ছোট ছোট 'ব্লিস্টারের' মতন দাগ। এর জন্য একে 'ব্লিস্টার আইরন'ও বলে। এটাকে গরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটে তৈরী করা হয় বার, ঢালাই করে হয় উচ্চ শ্রেণীর 'ঢালাই স্টীল'।

(২) **ক্রুসিবল পদ্ধতি**—ফায়ার ক্লে ক্রুসিবলতে রট আইরনের সঙ্গে দিতে হয় নির্ধারিত মাত্রায় 'কার্বন' বা অঙ্গার। তারপর এটিকে গলানো হয়। রট আইরনটি ধীরে ধীরে কার্বনটা গ্রহণ করে হয়ে ওঠে স্টীল। অভিজ্ঞতার দ্বারা শিল্পীরা বুঝতে পারেন কতটা কার্বন বা অঙ্গার লাগবে। ছুরি, ক্ষুর ও দা প্রভৃতি নির্মাণের কাজে ক্রুসিবল স্টীল খুব উপযোগী।

(৩) **বৈদ্যুত চুল্লীর পদ্ধতি**—ক্রুসিবল প্রশেস দ্বারা স্পেশ্যাল স্টীল তৈরী করা হয়। যেখানে বিদ্যুৎ সস্তা, সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা লোহা গলানো হয়। অন্য পদার্থের সংযোগে এইরকম ভাবে গলিয়ে সাধারণ লোহা বা পিগ আইরন থেকে তৈরী বিভিন্ন ইস্পাতের গুণাবলীর পার্থক্য হয় অনেক। এগুলিকে বলা হয় স্পেশ্যাল স্টীল। স্পেশ্যাল স্টীল অনেক সময় বৈদ্যুত চুল্লীর সাহায্যে করা হয়।

(৪) **বেসিমার পদ্ধতি**—এতে প্রায় এক সঙ্গে দশ টন পিগ আইরন গলিয়ে ঢালা হয়। ডিম্বাকৃতি রট আইরন তৈরী বিশেষ চুল্লীতে। আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী চুল্লীটিকে বলা হয় বেসিমার-কনভার্টার। 'কনভার্টার' কথার ব্যবহারিক অর্থ, অবাঞ্ছিত কার্বন, সিলিকন, ফসফরাস জাতীয় দ্রব্যগুলি, যাদের উপস্থিতির জন্য পিগ আইরনের অবাঞ্ছিত গুণগুলি হয়, সেইগুলিকে দূর করে তৈরী করে ইস্পাত। এর লাইনিং হিসাবে ব্যবহার করা হয় বালু আর মাটির প্রলেপ। গলানো পিগ আইরন ঢালা হলে পরে এই গলন্ত লোহার ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়, উচ্চচাপের বাতাস। তাপ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, কার্বন, গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে। আইরনের 'কার্বন' তৈরী করে 'কার্বন-মনক্সাইড', কনভার্টারের মুখে নীল শিখা হয়ে জ্বলে। অন্য পদার্থগুলি তৈরী করে ফারনেসের বা কনভার্টারের লাইনিং-এর সঙ্গে স্ল্যাগ। অভিজ্ঞ বেসিমার কনভার্টার চালক শিখার রং দেখে বলে দিতে পারেন, উচ্চ চাপের বাতাস পাঠানো কখন বন্ধ করতে হবে। তখন পূর্বে নির্ধারিত পরিমাণ ফেরোম্যানগানিজ দিয়ে আবার খানিকক্ষণ বাতাস চালানো হয়। পিগ আইরন যখন গলে, তখন তার তাপ হয় কম, দেখতে হয় লালচে, ইস্পাত তৈরী হয়ে গেলে গলন্ত ধাতুটি হয় সাদা, আর এর তাপ অনেক বেশী। এই পদ্ধতিতে খরচ অনেক কম। কারণ ইস্পাত গলাতে যে তাপের দরকার হয়, তার খানিকটা আসে বাতাসের সঙ্গে কার্বন প্রভৃতির অক্সিজেনের ফলে। এর পরে এটিকে ছাঁচে ঢালাই করে নেওয়া হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এস জি টমাস, আর পি সি গিলক্রাইস্ট পূর্বোক্ত লাইনিং-এর জায়গায় দেন ডলোমাইট-এর লাইনিং আর পিগ আইরনের সঙ্গে দেন কিছু চূণ। তাতে যে গন্ধক আর ফসফরাস উপরোক্ত পদ্ধতিতে দূর হয়ে যায় না, তাদের অক্সাইডগুলি এসিড গুণসম্পন্ন বলে ক্ষার জাতীয় ডলোমাইট আর চূণের সঙ্গে মিশে তৈরী করে স্ল্যাগ। পূর্বের লাইনিংটি বালি ও মাটি, এটি এসিড গুণসম্পন্ন বলে বলা হয় এসিড বেসিমার পদ্ধতি, টমাস সাহেবদের আবিষ্কৃত লাইনিং ক্ষার গুণসম্পন্ন বলে সেটি বলা হয়, 'বেসিক বেসিমার' পদ্ধতি।

পঞ্চম পদ্ধতি হচ্ছে, সিমেন্স মার্টিনের 'ওপন হার্থ পদ্ধতি'। একটি অগভীর বেসিনের আকারের পাত্রে বালু আর মাটির লাইনিং দেওয়া হয়, পাত্রে রাখা হয় 'পিগ' আর 'রট' আইরন এক সঙ্গে মিশিয়ে। এর সঙ্গে খানিকটা আইরন অক্সাইড জাতীয় লৌহ খনিজও মেশানো হয়। আইরন অক্সাইডটি ভালো হেমেটাইট জাতীয় খনিজ থেকে হওয় দরকার। দেখা হয় এতে যেন কোন অঙ্গার ব কার্বন না থাকে। ফারনেসটি গরম করা হ আগের থেকে গরম করা 'প্রডিউসার গ্যাসে' আগুনে। যে বাতাসের সাহায্যে প্রডিউসা গ্যাস পোড়ানো হয়, সেই বাতাসটিকেও গর করা হয়। আগের থেকে গরম ক হলে হয়, গ্যাস আর বাতাসে পরিপূর্ণ ক্রিয়া সহজ, ফলে অধিকত উত্তাপও উৎপন্ন হয়। এতে ইন্ধন বা গ্য খরচও কম হয়। গলিয়ে নেবার পর য দেখা যায় বাঞ্ছিত পরিমাণ কার্বন বা অঙ্গ থেকে গেছে (অতিরিক্তটা যায় বাতাসের স পুড়ে), তখন নির্ধারিত পরিমাণ ফে ম্যানগ্যানিজ মেশানো হয়। এটাকে বলা 'এসিড প্রসেস', কারণ লাইনিং বালু ও ম

মিশ্রিত বলে এসিড গুণসম্পন্ন হয়। লাইনিং-টি ডলোমাইটের থেকে তৈরী করলে ফসফরাস, সালফার প্রভৃতিগুলিও ডলোমাইটের সঙ্গে 'স্ল্যাগ' তৈরী করে বের হয়ে যায়। 'ডলোমাইট' ক্ষার গুণসম্পন্ন বলে এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় 'বেসিক প্রশেস্'।

লোহার সঙ্গে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ধাতব বা অধাতব পদার্থের মিশ্রণ, দ্রবণ, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে লোহার গুণের পার্থক্য হয় আকাশ-পাতাল। এর জন্যেই এই একটি পদার্থের এত আদর বা ব্যবহার।

এমনি লোহা, এসিড, অম্ল, আর্দ্র বাতাস, ক্ষার প্রায় সবেতেই অল্পবিস্তর ক্রিয়া হয়, ক্রিয়ার ফলে লোহাটা যায় ক্ষয়ে।

এর সঙ্গে শতকরা ১৫ ভাগ আন্দাজ 'সিলিকন' মিশালে হয় 'ডুরাইরন'। এটার গুণ এত সহজে মরিচা পড়ে না, সালফিউরিক, নাইট্রিক, এসেটিক এসিড্ গরম বা ঠান্ডা অবস্থাতে ক্ষয়িয়ে দেয় না, ক্ষারজাতীয় পদার্থ হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ বা 'সালফার ডাই-অক্সাইড্' ধূম্রের বিরুদ্ধে অবশ্য অতটা কার্যকরী নয়। এটা সামান্য পরিমাণ ভঙ্গুরও। এরকম আরও অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশে এর গুণাবলী পরিবর্তন [illegible] অনেক।

কেন [illegible] হয়, বর্তমান পদার্থবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে বস্তুর গঠন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান হয়েছে, উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে আজ-কালকার ধাতুতত্ত্ববিদ্রা তা ব্যাখ্যা করেছেন। লোহার সঙ্গে বাঞ্ছিত পরিমাণ অঙ্গার বা কার্বন থাকলে হয় ইস্পাত। লোহার সঙ্গে ইস্পাতের গুণের কিন্তু কত পার্থক্য। কার্বন স্টীলের ওপর আঁচড় কাটলে দেখা যাবে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরে, লোহা আর কার্বন স্টীলের পার্থক্য। দেখা যাবে, ছোট ছোট অনেক দানাদার পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে রয়েছে। এই দানাগুলি হয় মৌলিক লোহা, বা লোহার সঙ্গে কার্বন বা অন্য পদার্থের মিশ্রণ, দ্রবণ বা রাসায়নিক সম্মেলনের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন ফেরাইট্, অস্টেনাইট্, মার্টেনসাইট্, পার্লাইট্, সিমেণ্টাইট বা অন্য মৌলিক পদার্থ, যেমন 'গ্রাফাইট্'।

এই বিভিন্ন দানাগুলির পরিমাণ, আকৃতি ও কেমনভাবে পরস্পর সংবন্ধ আছে, এর ওপর নির্ভর করে এদের একত্র থাকার ফল, ইস্পাতের গুণ।

আজকাল তাপ নিয়ন্ত্রণ উৎপাদিত তাপের মাত্রা ইচ্ছামত বৃদ্ধি, যথেচ্ছ সময় একই তাপে যে কোন জিনিস গরম করা প্রভৃতি 'চুল্লী-ব্যবহারিক-বিজ্ঞান'-এর উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। এই সবের ফল লৌহশিল্পে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাতে ইস্পাত প্রস্তুতকরণ খালি অঙ্গার আর লোহার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক এ-যুগের আবিষ্কৃত ধাতু বা মৌলিক পদার্থ, যার আগে ব্যবহার ছিল না তার ব্যবহার হয়েছে আর অধিকতর উপযোগী ইস্পাত প্রস্তুত সম্ভব হয়েছে। ভ্যানাডিয়াম এমনি একটি ধাতু, লোহার সঙ্গে ভ্যানাডিয়াম মিশিয়ে দেখা গেল, লোহ-ভ্যানাডিয়াম স্টীল খুব মজবুত, মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ নির্মাণে এরকম একটি ধাতুরই দরকার ছিল। 'টুংস্টেন' আর একটি এ যুগের ধাতু, 'লৌহ-টুংস্টেন' ইস্পাতটি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে হয়ে গেল অপরিহার্য, তার গুণে, কলের গানে রেকর্ড বাজাবার পিনেতেও তার দরকার।

২৫ ভাগ নিকেল মিশিয়ে দেখা গেল যে, তৈরী ইস্পাতে মরিচা পড়ে না, তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় না, আর চৌম্বক-শক্তিহীন। লোহাকে আর নিকেল ধাতু দুটিকেই আলাদা আলাদা অবস্থায় কিন্তু চুম্বুকে টানে। শতকরা ৩৬ ভাগ নিকেল আর ৫ ভাগ ম্যানগ্যানিজ মিশিয়ে তৈরী হয় 'ইনভার'। তাপের কমতি বাড়তির সঙ্গে এর দৈর্ঘ্যের কমতি বাড়তি হয় না। 'মেজারিং ইনস্ট্রুমেণ্ট' বা মাপবার যন্ত্রপাতিতে এর ব্যবহার হয়।

শতকরা ৪৬ ভাগ নিকেল মিশালে হয় 'প্লাটিনাইট্'। বহুমূল্যবান প্লাটিনাম ধাতুর মতনই এরও 'কাচের' মতন বাড়তি কমতি হয়, তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে। বিজলী 'বালব' শিল্পে এর ব্যবহার হয় প্রচুর, যে দুটি মোটা তার 'বালব'-এর ভিতরকার 'টুংস্টেন', 'ট্যান্টালাম' প্রভৃতি ধাতুর অতি সূক্ষ্ম তারের 'কয়েল' বা পাকানো তারের ঝোলাটিকে ধরে থাকে, সেই মোটা তার নির্মাণের কাজে লাগে।

নিকেলের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেখা গেল, তৈরী ধাতুর গুণ আবার অন্যরকম হয়। এই ধাতুটিকে দেখা গেল, এতে বিদ্যুত-চুম্বক দ্বারা যত তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ শক্তির আবেশ আনা যায়, তত তাড়াতাড়ি এই আবেশ আবার নষ্ট করাও যায়। কাজেই বিদ্যুৎ-চুম্বকের তারের ভিতর বিদ্যুতের পরিমাণ কমতি বাড়তি হলে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আবেশের কমতি বাড়তি হয়, এই অতিরিক্ত নিকেলঘটিত ইস্পাতটির। এর নাম পার্মালয়, নিকেল ৮০, লোহ ২০ ভাগ মিশিয়ে তৈরী হয়। টেলিফোন যন্ত্রে, আগের দিনের সাবমেরিন কেবলিং-এ এমনি একটি ধাতুরই দরকার ছিল।

ওপরের ইস্পাতগুলির গুণাবলীর পরিবর্তন হল খালি নিকেলের অল্পবিস্তর করে।

'ম্যানগানিজ' শতকরা ১৪ ভাগ মিশিয়ে দেখা গেল, ইস্পাতটি ভীষণ শক্ত। লোহার সিন্দুক প্রভৃতি তৈরীর কাজে লাগে। ১২ থেকে ১৪ ভাগ ক্রোমিয়াম মেশালে হলো, 'স্টেন লেশ স্টীল', অল্পক্ষয়, শক্ত আর মরিচা হয় না, উখা, বল-বিয়ারিং, ফলকাটা ছুরি ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

এই সমস্ত ইস্পাতগুলিকে আধুনিক, কুঁদ (লেদ), ছেঁদা করবার যন্ত্র (ড্রিলিং মেসিন), প্লেন করবার যন্ত্র (প্লেনিং মেসিন), আকার দেবার যন্ত্র (শেপিং মেসিন), গিয়ার প্রভৃতি করবার যন্ত্রতে (শিলিং মেসিন), বিভিন্নভাবে কাজ করবার জন্য দরকার, এদের চাইতে শক্ত, এদের কাটতে পারে এমনি শক্ত ধাতু বা ইস্পাত নির্মিত 'টুল' বা যন্ত্র। 'টুল স্টীল' তৈরী হয় বিভিন্ন ভাগে লোহার সঙ্গে (রট আইরন বা 'কার্বন' ইস্পাতের সঙ্গে), বিভিন্ন ভাগে ভ্যানাডিয়াম, মলিবডেনাম টুংস্টেন ম্যানগানিজ বা টুংস্টেন আর ক্রোমিয়াম ধাতু মিশিয়ে। আগে যে সব ইস্পাত প্রচলিত ছিল, তাদের চাইতে এসব ইস্পাত দিয়ে দশ গুণ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারা যায়। আগের তৈরী ধাতুগুলির 'টুলে' যন্ত্রের 'স্পীড্' দশ গুণ প্রায় কমাতে হতো, বেশী জোরে যন্ত্রতে কাজ করালে টুলের অগ্রভাগ গরম হয়ে 'টুলের' ধাচটা হয়ে যেত নষ্ট।

লোহার তৈরী অনেক জিনিস-এর উপরিভাগ খুব শক্ত কঠিন হওয়া দরকার হয় সময় সময়। কয়লা গুঁড়োর ভিতর জিনিসটি রেখে, অনেকক্ষণ ধরে গরম করে, বিশিষ্ট উপায়ে করতে হয় ঠান্ডা, এতে উপরিভাগের লোহার ভেতর কয়লার 'কার্বন' প্রবেশ করে, করে দেয় খুব কঠিন। এমনি করে লোহার জিনিসকে শক্ত করাকে বলে 'কেস হার্ডনিং'। লোহার সঙ্গে শতকরা বিভিন্ন ভাগে কয়লা বা 'কার্বন', ক্রোমিয়াম ও মলিবডেনাম ধাতু মিশিয়ে তার সঙ্গে প্রায় ১ ভাগ এলুমিনিয়াম দিতে হয়। এইগুলি গরম করে গলে গিয়ে যে মিশ্র ধাতু হয় তাদের থেকে তৈরী হয় 'নাইট্রালয়'। এই মিশ্র ধাতু নির্মিত জিনিস ২ ঘণ্টা থেকে ৯০ ঘণ্টা পর্যন্ত 'এমোনিয়া' গ্যাসের সংস্পর্শে রেখে বিশেষ 'চুল্লীতে' গরম করা হয়। এতে 'এমোনিয়া' গ্যাসের নাইট্রোজেনটিকে মিশ্র ধাতুর এলুমিনিয়াম গ্রহণ করে। ফলে জিনিসটির আকার একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু 'কেস হার্ডনিং'র মতন উপরিভাগ খুব শক্ত কঠিন হয়ে যায়। এগুলিকে তখন বলা হয় 'নাইট্রালয়' তৈরী জিনিস। এর আর একটা গুণ 'নাইট্রালয়' তৈরী জিনিস আয়নার মতন হাই-পালিশ করা যায়।

দেখা গেল, লোহা একটি ধাতু যা অন্য ধাতু বা মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশে, তৈরী করে নিজের গুণাবলীর আমূল পরিবর্তন। লোহার কিন্তু একটি প্রধান দুর্বলতা এর অক্সিজেনপ্রিয়তা। খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেনের সঙ্গে এর ক্রিয়া হয়। জলীয় বাষ্প বা এমনি জল থাকলে আরও তাড়াতাড়ি। অক্সিজেনের সঙ্গে তৈরী করে বিভিন্ন লোহ অক্সাইড,

এগুলিকে আমরা সাধারণতঃ বলি 'মরিচা'। মরিচা নিবারণ করবার জন্য আমরা দিই রং। অন্য ধাতু বা পদার্থের আবরণ। প্রত্যেক বছর পৃথিবীর লৌহ চুল্লীগুলি তৈরী করছে হাজার হাজার টন লোহা আর বিভিন্ন ইস্পাত।

কতটি লোহা প্রত্যেক বছর 'মরিচা' হয়ে নষ্ট হয় তার সীমা সংখ্যা নাই। এই 'মরিচা'-গুলি থেকে লোহা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা লৌহখনিজের ভিতর পাই লোহার অংশ একত্রীভূত। কোন নিয়মে পৃথিবীর লোহার অংশ লোহার খনিজে একত্রীভূত হয়ে লোহার পাহাড় তৈরী হয়েছে আর কতদিন ধরে, সেটা বর্তমান বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে। মরিচা হয়ে যাওয়া প্রকৃতির এই লোহা একত্রীভূত করার ব্যবস্থার ঠিক উল্টো। এটা ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর বুকে, কোন বিশিষ্ট ধারা না মেনে। সভ্য সমাজের নিত্য নূতন অভাব মিটাতে, লোহার প্রয়োজন বাড়ছে দিন দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। বছরের পর বছর, উৎপাদিত লোহার একটা বিশিষ্ট পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে অপচয়িত মরিচা। আমাদের ব্যবহারযোগ্য লোহার পরিমাণ যত বেশী হোক না কেন, তার একটা সীমা আছে। মরিচা হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রাপ্তব্য ও ব্যবহার্য লোহার মাত্রা কমে যাচ্ছে।

এর প্রতিকার হচ্ছে উৎপাদিত লোহার 'মরিচা নিবারণ'। এটি আধুনিক শিল্প বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট সমস্যা। এর প্রতিকার-কল্পে বিভিন্নমুখী গবেষণার বিরাম নাই। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণভাবে মরিচা নিবারণ, সুষ্ঠুভাবে এখনও সম্ভব হয়নি। ব্যবহারিক বহু ক্ষেত্রে, বিভিন্ন শিল্পে আগের চাইতে উন্নত শ্রেণীর বিভিন্ন স্টীল বহুলাংশে মরিচা-নিরোধক।

মরিচা নিবারণ করবার প্রথম চেষ্টা হয় বোধ হয় লোহার গায়ে মোম, তেল, বিভিন্ন রং-এর প্রলেপ দিয়ে। উদ্দেশ্য, পারিপার্শ্বিক অক্সিজেনের সংস্পর্শ বাঁচানো। লোহার অক্সাইডের সঙ্গে বিভিন্ন 'শুকিয়ে যাওয়া তেল' বা 'ড্রাইং অয়েল' মিশিয়ে যে রং হয়, লোহার তৈরী জিনিসের উপর তার প্রলেপ দেওয়া অনেকটা কার্যকরী।

রং-এর একটি দোষ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রং-এর প্রলেপ স্থানে স্থানে যায় ফেটে, কোন কোন জায়গায় প্রলেপ আবার চটা উঠে যায়, সেখান দিয়ে প্রবেশ করে আর্দ্র বাতাস, আর শুরু হয় 'মরিচা ধরা'। তখন শুরু হয় রং-এর প্রলেপের নীচে নীচে মরিচার আস্তরণের বিস্তারণ।

নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পাতলা আবরণ ফেলা হয় লোহার উপর, বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা। নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির উপর সহজে বাতাসের অক্সিজেনের ক্রিয়া হয় না। এগুলির কাজ বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শ বাঁচানো। এগুলি ফাটে না, ভালোভাবে বিদ্যুৎ দ্বারা প্রলেপ দিলে ফাঁকও থাকে না, এগুলি রং-এর চাইতে ভালো। আমাদের সাইকেল হ্যান্ডেল-গুলি 'নিকেল বা ক্রোমিয়ামে'র প্রলেপ দেওয়া। সাইকেলের বিভিন্ন অংশগুলিও তাই।

টিনের অক্সিজেনের সঙ্গে অত ভাব নাই বা তাড়াতাড়ি ক্রিয়া হয় না। টিনের ক্যানেস্তারা বা টিনের বাক্স আমরা যা সাধারণতঃ

উজ্জ্বল অবস্থায় দেখি, সেটি গোটাটি টিনের তৈরী নয়। লোহার পাতলা চাদরের উপরে টিনের পর্দা চড়ানো। 'টিন' নিজে অত্যন্ত নরম। এর থেকে জিনিস বইবার মত ক্যানেস্তারা বা জিনিস রাখবার বা বইবার মতন শক্ত বাক্স হওয়া সম্ভব নয়।

দস্তা ধাতুরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের 'করগেট'র পাতগুলি 'করোগেটেড্' বা ঢেউ খেলানো লোহার পাতের ওপর দস্তার পর্দা চড়ানো। এরকম লোহার পাত অনেকদিন স্থায়ী। লোহার পাতের দস্তা চড়ানোকে বলা হয় 'গ্যালভানাইজ্' করা। লোহার পাতের ওপর দস্তা চড়ানো হয় অনেকরকমভাবে। এক রকম, গলানো দস্তার ভেতরে লোহার পাতগুলিকে ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি টেনে তোলা হয়। কখন লোহার পাতে বা জিনিসের ওপর গলানো দস্তা উচ্চ চাপের বায়ুর সাহায্যেও ছোট ছোট কণিকা 'স্প্রে' করে। কখনও একটা ড্রামের ভেতর লোহার জিনিস আর দস্তা চূর্ণ দিয়ে প্যাক করে ৮০০ ডিগ্রি ফার্নাহিট পর্যন্ত গরম করা হয়। তাতে লোহার জিনিসটির ভিতর দস্তা চূর্ণ প্রবেশ করে তৈরী করে লৌহ-দস্তার বিভিন্ন মিশ্র ধাতু আর সর্বোপরি দস্তা ধাতুর একটি প্রলেপ বা পর্দা। দস্তার প্রলেপ দেওয়া থাকলে বাতাসের সংস্পর্শে আসা হয় কঠিন। আর একটি প্রধান দস্তা চড়ানোর পদ্ধতি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা।

টিনের পর্দা চড়ানোর চাইতে দস্তার পর্দা চড়ানো খুব কার্যকরী। টিনের পর্দা অনায়াসে কোন কোন জায়গায় ক্ষয়ে যায় বা সামান্য চিড় খেয়ে যায়। এই সামান্য চিড় খাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়া অংশটার থেকে শুরু হয় লোহার ক্ষয় বা মরিচা ধরা।

টিন আর লোহাকে এক সঙ্গে রেখে যদি কোন বিদ্যুৎচালক তরল পদার্থ দিয়ে সংযোগ করা যায়, সেটা হয়ে উঠে একটি বিদ্যুৎ কোষ। টিন করা বা তথাকথিত টিনের তৈরী জিনিস বাইরে থাকলে তরল বিদ্যুৎচালকের কাজ করে বৃষ্টির জল বা আর্দ্র বাতাসের জলীয় অংশ, টিনকরা বাসনপত্রের বেলায় ধোওয়া বাসনের গায়ে লেগে থাকা জল। এতে লোহাটির তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। দস্তা ব্যবহার করলেও অনুরূপ অবস্থায় বৈদ্যুৎ-কোষ তৈরী হয়, কিন্তু বৈদ্যুৎ-কোষটি হয় বিপরীত ক্রিয়াশালী। এতে লোহার জায়গাতে দস্তাটির ক্ষয় হয় বেশী লোহাটি যায় বেঁচে।

উজ্জ্বল এলুমিনিয়ামের তৈরী জিনিস, কিছুদিন রাখলে দেখা যায় এলুমিনিয়ামের রংটা হয়ে উঠে ম্লান। বাতাসের অক্সিজেন এলুমিনিয়ামের সঙ্গে তৈরী করে এলুমিনিয়াম অক্সাইড। উপরের এই পাতলা এলুমিনিয়াম অক্সাইডের আবরণ নীচের এলুমিনিয়াম ধাতুকে বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখে আর ক্ষয় হতে দেয় না। ক্ষয় হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে বাতাসের সঙ্গে নূতন করে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে অক্সিডেসন ক্রিয়া। এলুমিনিয়ামের এই গুণটি অন্য ধাতুদের উপর এলুমিনিয়ামের পর্দা ফেলে ও অন্য ধাতুদের বাতাসের সঙ্গে ক্রিয়া বা 'অক্সিডেসন' বন্ধ করার কাজে লাগানো হয়। শিল্পে এর নাম 'ক্যালরাইজিং' পদ্ধতি। লোহাকেও বাতাসের সঙ্গে ক্রিয়া বা 'অক্সিডেসন'র হাত থেকে বাঁচানোর এটি উপায় একটি।

'ক্যালরাইজ' করতে হবে, এমনি জিনিসকে বায়ু সংস্পর্শহীন অবস্থাতে একটি ড্রামের এলুমিনিয়াম চূর্ণ আর এলুমিনিয়াম অক্সাইড এর গুঁড়োর ভিতর প্যাক করা হয়, পরে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিয়ে ড্রামের ভিতরকার আবদ্ধ বাতাসকে সরিয়ে ফেলতে হয়। ভিতরকার বাতাস সরানো হয়ে গেলে এটিকে গরম করা হয়। এলুমিনিয়াম ধাতু তখন জিনিসটির উপরিভাগের স্তরের ভিতর প্রবেশ করে। ক্যালরাইজ করা সময়ের উপর কতটা গভীরভাবে এলুমিনিয়াম তৈরী জিনিসের ধাতুর ভিতর প্রবেশ করবে, নির্ভর করে।

ঠিক ঠিকভাবে ক্যালরাইজ করা হলে পরে বাতাসের সংস্পর্শে বেশী তাপ দিলে জিনিসটির উপরিভাগে ঢাকা এলুমিনিয়ামটির ওপর এলুমিনিয়াম অক্সাইডের একটা পাতলা আস্তরণ হয়ে যায়। এতে নীচের ধাতুটি তত ক্ষয় না। এতে জিনিসটি সর্ব উপরিভাগে হয় এলুমিনিয়াম অক্সাইডের আবরণ, তার নীচে হয় এলুমিনিয়াম ধাতু, তার নীচে এলুমিনিয়াম ও জিনিসটির ধাতুর মিশ্র ধাতু, তার নীচে জিনিসটির তৈরী ধাতু থাকে।

এলুমিনিয়াম আবরণ আর এক রকমেও ফেলা যায়। জিনিসটির ওপর ভাল করে এলুমিনিয়ামের উপযুক্ত 'ফ্লাক্সিং এজেণ্ট' দিয়ে মাখিয়ে গলানো এলুমিনিয়ামের ভিতর ডুবিয়ে নিতে হয়। ফলে জিনিসটির ওপর এলুমিনিয়ামের ধাতুর একটা পাতলা আবরণ পাতলাভাবে সেঁটে যায়। এইরকমভাবে 'ক্যালরাইজ' করে লোহার 'মরিচা'-ধরা রক্ষা করা যায়।

লোহার মরিচা-নিবারণ আর একরকম-ভাবে করা যায়। লোহাটার উপর পাতলা একটা লোহা অক্সাইড বা মরিচার আবরণ কৃত্রিমভাবে ফেলে দিয়ে। লোহার কালো রংএর অক্সাইডের ভিতর অক্সিজেনের পরিমাণ আছে সবচেয়ে কম আর লাল রংএর অক্সাইডের ভিতর অক্সিজেন আছে বেশী। কালো অক্সাইডটি শক্ত কঠিন, লাল রং অক্সাইডটি গুঁড়া হয়ে যায়। এর জন্য কালো কঠিন অক্সাইডটি পছন্দ করা হয়, এ যেন অল্প পরিমাণে রোগের বীজাণুর টীকা দিয়ে রোগের প্রবল আক্রমণ থেকে বাঁচানো। খুব বেশী অক্সিজেনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সামান্য 'অক্সিজেন আর লোহার মিক্সচার' লোহার অঙ্গে মাখানো।

একটি বন্ধ আধারে লোহার তৈরী জিনিস-গুলি রাখা হয়, সেটির ভিতর চালাতে হয় বেশী গরম করা (সুপার-হিটেড স্টীম) প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে। পরে কিছুক্ষণ চালানো হয় প্রডিউসার গ্যাস। বেশী গরম করা জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ার ফলে লোহার জিনিসটির উপর লোহার নিম্ন বা উচ্চ অক্সাইড (কালো ও লাল)গুলি তৈরী হয়। উচ্চ অক্সাইডগুলি প্রডিউসার গ্যাসের 'কার্বন মনক্সাইডের' সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে লোহার নিম্ন অক্সাইড'এ পরিণত হয়। এতে তৈরী হয়ে যায় লোহার তৈরী জিনিসের উপর পাতলা একটা কঠিন লোহার নিম্ন অক্সাইড'র আবরণ।

গ্যাসোলিন গ্যাসের সাহায্যেও এরকমভাবে উচ্চ অক্সাইডগুলি নিম্ন অক্সাইডে পরিণত হয়। ঘড়ির মিনিট সেকেণ্ড'র কাঁটা বকলস্ প্রভৃতি নীলাভ করা হয় এমনি করে লোহার নিম্ন অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে। উদ্দেশ্য এগুলি যাতে মরিচা না পড়ে নষ্ট হয়। গলানো সোরা বা 'সল্ট পিটার' প্রভৃতিতে লোহার তৈরী জিনিসগুলি ডুবিয়ে রাখা হয়, নিম্ন অক্সাইড'র পদার্থটি আরও পুরু করে দেবার জন্য এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়। এর অসুবিধা হচ্ছে এ পদ্ধতিতে তৈরী লোহার নিম্ন-অক্সাইড'র পর্দাফেলা জিনিসগুলির আয়তন সামান্য বাড়ে, আর গরম অবস্থায় পর্দা ফেলা হয় বলে সূক্ষ্ম জিনিস তাপে একটু এঁকে-বেঁকে যেতে পারে।

১৯০৭ সালে টমাস ওয়াট্স কসলেট লোহার মরিচা নিবারণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। লোহার চাদর বা সীট বা লোহার তৈরী জিনিস, লোহার ফসফেট লবণের পাতলা দ্রবতে ডুবিয়ে স্টীম দিয়ে গরম করেন। প্রথমে তাড়াতাড়ি, পরে আস্তে আস্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছোট বুদ্বুদের আকারে উঠতে শুরু করে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এই বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হয়। তখন জিনিসটার উপরিভাগের লোহাটা 'বেসিক আইরন ফসফেটে' পরিণত হয়। বেসিক, আইরন ফসফেটের পর্দা খুব সাঁটালোভাবে ধরে থাকে। এটা এসিড বা অম্লজাতীয় পদার্থে দ্রব হয় না, লাগানো রংএর মতন চটা উঠেও যায় না। এতে আকার বা আয়তনও বৃদ্ধি হয় না। নিকেল ধাতুর উপর এই ফসফেটিং সলিউসনের কোন ক্রিয়া নাই। লোহার তৈরী জিনিসের উপর ইচ্ছামত নিকেলের পর্দা ফেলে বা নিকেল প্লেট করে 'ফসফেটিং সলিউসন' ফসফেট করে নিতে হয়। ঈষৎ ম্লান 'বেসিক্ আইরন ফসফেটের' পরিবেশের মধ্যে উজ্জ্বল নিকেলের 'ডিজাইন'ও খুব সুন্দর দেখায়।

লোহার এই অক্সিজেনপ্রিয়তাই কিন্তু লোহাকে উচ্চ প্রাণী-জীবনের প্রাণ ক্রিয়াতে অপরিহার্য করেছে।

আমাদের রক্তে আছে লোহা, রক্তের কার্যকারিতা রক্তে লোহার এই গুণের উপর বিশেষ নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ জীবনের সবুজ পাতার ক্লোরোফিলের গঠন মানুষের রক্তের হিমোগ্লোবিনের মতনই, হিমোগ্লোবিনে থাকে, লোহা ক্লোরোফিলে তার জায়গায় থাকে ম্যাগনেসিয়াম। কিন্তু প্রথমে এতেও লৌহ অণুর দরকার, লোহা অপরিহার্য। সবুজপত্রের লোহার অংশই সৌর-শক্তি বন্দী বা রূপান্তরিত করবার সাহায্য করে। আমাদের রক্তের লৌহ-অণু করে আমাদের কার্যক্ষম। শরীরে লোহার অংশ কমলে আমরা হলাম দুর্বল, রক্তহীন। ভারতের প্রাচীন কবিরাজদের একথা জানা ছিল, প্রতিকারকল্পে তাঁরা দিতেন বিভিন্ন লৌহঘটিত বটিকা, লৌহভস্ম ইত্যাদি।

প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ধনেও লোহার দান কম নয়। লোহার বিভিন্ন অক্সাইডগুলি এ বিষয়ে সাহায্য করে। লাল মাটির রাঙা পথ, দূরের গৈরিক পাহাড় লোহার বিভিন্ন অক্সাইডের ছড়াছড়ির পরিচয় দেয়। লাল ইঁটের বাড়ি, বিভিন্ন রঙীন কাচ, রেললাইনের ধারে মাইলের পর মাইল ধরে লোহার রেলিং, খুঁটির লাল রং, আনে রংএর বৈচিত্র্য, এতেও লোহার দান আছে।

আধুনিক যুগের সভ্যতার মূলে লোহার দান কতখানি, তা সহজে অনুমেয়। লোহার এতগুলি বিভিন্ন ব্যবহার না আবিষ্কার হলে আমাদের সভ্যতা অতীতের 'আজটেক্' 'ইনকা' আসীরিয় সভ্যতার পর্যায়েই হয়ত থেকে যেত।

প্রাচীন ভারতে লৌহ-শিল্পের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল, ভারতের প্রাচীন ব্যবহৃত লোহার এখনও যা নিদর্শন পাওয়া যায়, তার থেকে অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে লোহা এবং ইস্পাত সম্বন্ধে জ্ঞান পৃথিবীর সভ্যতায়, প্রাচীন ভারতীয়গণের একটি অন্যতম দান।

কোনারকের মন্দিরের লোহার 'বীম'গুলি তাদের বয়সের তুলনায় এখনও প্রায় অক্ষত।

কোনারকের মন্দির তৈরী হয়েছিল নাকি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এটা অবশ্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে। গঙ্গা গলায় প্রাপ্ত লোহার জিনিসের বয়স নাকি তৃতীয় শতাব্দী। দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি নাকি খৃষ্টপূর্ব ৯১২ সালের। অন্য পণ্ডিতদের মতে আবার ৩০০ খৃষ্টাব্দ করা হয়েছে। এটি নাকি ২৩ ফিট্ ৮ ইঞ্চি লম্বা, গোড়া বেড় ১৬২ ইঞ্চি, উপরের বেড় ১২২ ইঞ্চি, ওজনে ছয় টন। এই স্তম্ভটির বিশেষত্ব এটাতে মরিচা পড়ে না, স্টেন লেস্ স্টীল', এ যুগের আবিষ্কার। ৩০০ খৃষ্টাব্দে মেনে নিলেও, এটা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়, ইউরোপে তখন 'স্টেনলেস স্টীল' শুধু কেন সাধারণ স্টীল বা ইস্পাতও হ'ত না।

সি ভন্ স্কোয়ার্জের মতে ইস্পাত ঢালাই খৃঃ পূর্ব ৬০০ বছর আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্য ভারতের উরিগোঁয়ার সমাধিগুলিতে ঢালাই ইস্পাতের অস্ত্র পাওয়া গেছে। তখন এখানে ইস্পাত গলানো হতো, বড় বড় তখনকার দিনের 'মুচিতে', এই ইস্পাত ঢালাই করে ডামাসকাসে চালান হতো, এই ইস্পাত খণ্ডগুলির থেকেই মধ্যযুগের বিখ্যাত ডামাস্কাস স্টীলের তরবারি, ছোরা তৈরী হতো। মাদ্রাজে 'টিনেভেলী' জেলাতে খনন কার্যের ফলে লোহার তৈরী যে তরবারি আর ছোরা পাওয়া গেছে, তাদের ঠিক ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন, সেগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের। এস এম বারোজ বলেন, 'ভ্যালি অফ গ্যাঞ্জেস' (পুরানো সাহিত্যে বাঙলা দেশকে ভ্যালি অফ গ্যাঞ্জেস বলা হয়) থেকে "এক সুন্দর রাজপুত্র 'বিজয়' সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলে অবতরণ করেন।" সিংহলের আন্দাজ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পুরানো শহরগুলি খনন করার ফলে অনেক লোহার তৈরী জিনিস পাওয়া যায়। লোহা এবং ইস্পাত সম্বন্ধে সিংহলবাসীরা ভারতবর্ষীয় লোকেদের কাছ থেকে শিখেন বলে সাধারণত মনে করা হয়।

পি নিয়োগী মহাশয়ের মতে যজুর্বেদের কয়েকটি পংক্তিতে খৃঃ পূঃ ২০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে লোহা ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়।

মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে ৩০০০ ও ৪০০০ হাজার বছর আগের লোহার চিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলি মেটিওরাইট বা উল্কার থেকে পাওয়া বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। লোহার খনিজ থেকে লোহা বের করা বা ইস্পাত প্রস্তুত প্রাচীন মিশরীদের অজ্ঞাত ছিল। এটি সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দান।

অথর্ব-বেদে লোহার বহুবার উল্লেখ আছে। এটির আন্দাজ খৃঃ পূঃ ১২০০—১০০০। খৃঃ পূঃ ৫০০ বছর বা তার কিছু আগে ভারতবর্ষের লোহা আর ইস্পাত সম্বন্ধে জ্ঞান বহু উন্নত ছিল, তা অনুমান করবার অনেক কারণ আছে। শুশ্রুতের একটি প্রাচীন কবিরাজী গ্রন্থে ১০০'র উপর সূক্ষ্ম 'সার্জারীর' বিভিন্ন যন্ত্রের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়।

জে এম হীথের অনুসরণে বলতে পারা যায়, লোহা-শিল্পে ভারতীয় পদ্ধতির শিল্প-চাতুর্য ও প্রাচীনত্ব কম আশ্চর্যজনক নয়। প্রাচীন মিশরীয়গণ ভারতীয় লোহার সাহায্যেই তাদের বিভিন্ন পাথরের কাজ করতেন, সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করতে পারি না। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে হিন্দুরা ছাড়া আর কোন জাতি ইস্পাত নির্মাণের কাজ জানতেন, তার কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন লেখকদের লেখায় এ বিষয়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটা তাঁদের এ বিষয়ে অজ্ঞতার জন্যই। স্বর্গের পারিজাত বর্ণনা, বা আমেরিকার 'এ্যাটম বোমার' এবং এ্যাটম রিসার্চের শোনা-শুনি আমাদের 'এ্যাটমিক রিসার্চ' কমিশন'এর মতন বোধ হয়) তাঁরা খালি এর 'ইস্পাত' গুণাবলীর কথা জানতেন, আর জানতেন এর ব্যবহারের কথা, কিন্তু লোহার থেকে কেমন করে ইস্পাত হয়, তা নিশ্চয়ই জানতেন না।

.....আলেকজাণ্ডার পুরু রাজার দেশ জয় করলে, পুরু তাঁকে এক খণ্ড ইস্পাত উপহার দেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, ৩০ পাঃ ওজনের এক খণ্ড ইস্পাত দিগ্বিজয়ীর উপহার হিসাবে গণ্য হতে পারতো, যদি তাঁর আমলে ইউরোপে কোথাও এই দ্রব্য প্রস্তুত হতো। প্রাচীন যুগে, প্রাচীন মিশরের সঙ্গে ভারতের নৌ-বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল, সেই পথে ভারতে দক্ষিণ প্রদেশ থেকে, ইউরোপ আর মিশরে ইস্পাত প্রবেশ করে মনে করাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ভারতের এমন একটা আবিষ্কারের দাবী, যে আবিষ্কার সভ্যতার অনুকূলে সব রকম কলা এবং শিল্পে, সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই দাবী কেউ প্রশ্ন করতে পারেন না।"

স্থাবর

বনফুল

(পূর্বানুবৃত্তি)

...কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না, হঠাৎ ঘুম ওয়া গেল। অন্ধকার গুহায় উৎকর্ণ হইয়া য়া বসিলাম। মনে হইল একটা আর্তনাদে চতুর্দিকে গুমরিয়া উঠিতেছে। সমস্ত ব প্রকৃতি অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া যেন দতেছে। আর্তধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে টতর হইতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর মাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল ওই র্তধ্বনির প্রবল বন্যায় আমার অস্তিত্ব ঝ এবার ভাসিয়া যাইবে, আমি কিছুতেই হা রোধ করিতে পারিব না। কিসের শব্দ থা হইতে আসিতেছে, অনেকক্ষণ তাহা ঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিবামাত্র কিন্তু কটা অদ্ভুত কান্ড ঘটিল। আমার মনের মধ্যে ন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। মনে হইল যে ধ ঘরে আমি এতক্ষণ বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম ই বদ্ধ ঘরটা যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া ড়িল, যে বন্ধন আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া খিয়াছিল সেই বন্ধনটা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া ল। আমার অন্তর নিবাসী যে নির্ভীক ত্তা পশুত্বের কারাগারে ছটফট করিতেছিল, য সত্তা জোলমা-শিলাঙ্গীর স্বরূপ চিনিতে ারিয়াছিল, যে সত্তা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ রিয়া সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া মহত্তর প্রেরণায় যুগে যুগে কর্তব্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে আমার সেই সত্তা সহসা যেন মুক্তি পাইল। আমি যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম য শব্দটা মীংরার মেকি-প্রেতিনীর শব্দ, ধবল ষড়যন্ত্র অনুসারে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিলাঙ্গীর কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে সেই মুহূর্তে কেমন করিয়া জানি না আমি নিঃশঙ্ক হইলাম, শিলাঙ্গীর সহিত বহুদিন পূর্বে আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা যেন সহসা আবার সজীব হইয়া আমার শ্রবণে ধ্বনিত হইল।

"শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে।"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই"

মনে পড়িল আমি শপথ করিয়াছিলাম। একবার নয় বার বার করিয়াছিলাম, তারস্বরে করিয়াছিলাম। আমার শপথ এ অঞ্চলের তরুলতা, পশুপক্ষী পর্বত-উপত্যকা সকলেই শুনিয়াছিল। আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আমাদের পল্লীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে যে শশকটিকে ভক্ষণ করিয়াছিলাম সেই আমাকে শক্তি জোগাইতে লাগিল।

...অন্ধকারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। তখনও চাঁদ ওঠে নাই। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল। ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। প্রস্তরে কঙ্করে কণ্টকে পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছিল, পদস্খলিত হইয়া দুই একবার পড়িয়াও গেলাম, তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না। একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে। মনে হইল আমার এই মহৎ অভিযান আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা উদ্ভাসিত নয়নে দেখিতেছে, ঝিল্লীর ঝংকারে তাহা সংগীতে রূপায়িত হইতেছে। অন্ধকারকে সচকিত করিয়া একটা ব্যাঘ্র গর্জন করিয়া উঠিল, আমি ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেলাম, কিন্তু ভীত হইলাম না, আমার মনে হইল শক্তিমান শার্দুল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে 'সাবাস'। আরও কিছুক্ষণ ছুটিবার পর হায়েনার হা-হা-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্য সময় হইলে হয়তো আমি অবিলম্বে কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিতাম, কিন্তু তখন আমার মনে হইল হায়েনার দল বলিতেছে—'বাহা, বাহা বাহা'। বৌ-বৌ শব্দটা লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটিতেছিলাম। সহসা শব্দটা থামিয়া গেল। আমি আমার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম।

...চাঁদ উঠিয়াছিল। আমি আমাদের শস্যশূন্য ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া একটা গাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চতুর্দিক নীরব, নির্জন। আকাশে বাতাসে একটা নির্বাক আতঙ্ক যেন মূর্ত হইয়াছিল। যে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম একটু পরে সেই গাছের তলায় একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া প্রবেশ করিল। সহসা মনে পড়িয়া গেল এই গাছের তলাতে ওই জ্যোৎস্নালোকেই আমি নিনানির মাথায় শাখা-পত্রের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলাম। একথা মনে হইবার পর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সেই জ্যোৎস্নার ফালির মুখে যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়া সে স্থান হইতে দূরে করিয়া দিল। আমার মনে হইল আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে জ্যোৎস্নার টুকরাটি বোধ হয় প্রশ্ন করিবে— "সেদিনের কথা কি মনে পড়ে?" গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া আমি আমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। কোথাও কেহ নাই, চতুর্দিক ধু ধু করিতেছে। মনে হইল, তবে কি কাল আমার শুনিতে ভুল হইয়াছিল? কিন্তু বৌ বৌ শব্দটা তো একটু আগেই শুনিয়াছি। আর একটু অগ্রসর হইলাম। সেই টিটিভ পক্ষীটা কোথা হইতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—'কি যে করিস' 'কি যে করিস' 'কি যে করিস'। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলাম এবং পর মুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ডটা একটু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কবন্ধটাও রহিয়াছে। বুঝিলাম কবন্ধটাকে টানিয়া টানিয়া ধবল ক্ষেত্রের প্রতি অংশে শিলাঙ্গীর উষ্ণ রক্তধারা সেচন করিয়াছে।

...উন্নগা পর্বতের উপর যে ঝোপে শিলাঙ্গীর সহিত আমার প্রথম দেখা হইয়াছিল সেই ঝোপে আমি ছিন্নমুণ্ডটি কোলে করিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার চোখের দৃষ্টি এতটুকু ম্লান হয় নাই। তাহার অধরে যে মৃদু হাসিটি সর্বদা ফুটিয়া থাকিত তাহাও যেন ঠিক তেমনিভাবেই ছিল। মনে হইতেছিল সেই হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"বন্ধু, কোথায় ছিলে তুমি? আমি এতবার ডাকিলাম তোমার সাড়া তো পাইলাম না—"

...তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, দূরে দূরে তখনও হায়েনার হা-হা-ধ্বনি শোনা যাইতেছিল, আমি সহসা স্থির করিলাম প্রতিশোধ লইব। ধবলকে হত্যা করিব। ছিন্নমুণ্ডটি একটি গাছের কোটরে লুকাইয়া রাখিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িলাম। টিটিভ পক্ষীটা তখনও বলিতেছিল—কি যে করিস, কি যে করিস, কি যে করিস। প্রভাতের অরুণাভা তখনও পূর্বদিগন্তকে রঞ্জিত করে নাই, জোৎস্না-স্নিগ্ধ

অন্ধকার তখনও উম্নগার উপত্যকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল অন্ধকারেই কাজ শেষ করিয়া সকলের অগোচরে আবার শিলাঙ্গীর কাছে ফিরিয়া আসিব। শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার নিকট আর শবমুণ্ড মাত্র ছিল না। তাহা আমার কল্পলোকে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইব। আর একটা অদ্ভুত বাসনাও আমার মনে জাগিয়াছিল। বাল্যকালে ধবলের মাতামহীর মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। জিহ্যা পর্বতের কন্দরে নাকি এক যাদুকরী আছে। সে নাকি কাটামুণ্ড কবন্ধের সহিত জোড়া লাগাইয়া দিতে পারে। ঠিক করিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া শিলাঙ্গীর কবন্ধটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব। তাহার পর যাত্রা করিব জিহ্যা পর্বতের উদ্দেশ্যে, যেমন করিয়া পারি, সেই ক্ষমতাময়ী যাদুকরীকে খুঁজিয়া বাহির করিব...।

...ধবলকে হত্যা করিতে হইলে প্রথমেই আমার প্রস্তর কুঠারটা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কুঠারটা ছিল আমার কুটিরে। আমি যখন কুটির ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, সঙ্গে কোনও অস্ত্র লই নাই। আমি সেইজন্য দ্রুতপদে আমার কুটিরের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হইতেছিলাম। কুটির পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছিতে পারিলাম না। উম্নগা পর্বতের পাদদেশেই উলম্ভনের লোকেরা আমাকে বন্দী করিল। বলিষ্ঠাকৃতি অষ্টাদশ জন লোক আমাকে ঘিরিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি শুনিতে পাইলাম কন্যা নদীর তীরে হাহাকার উঠিয়াছে। বহনকারীদের আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কে?"

"আমরা উলম্ভনের লোক। উলম্ভনের আদেশে আমরা তোমাদের আক্রমণ করিয়াছি"

"আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"পাহাড়ে। তোমাকে প্রস্তর বহন করিতে হইবে"

আরও কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম—"কিন্তু এমনভাবে আমাদের আক্রমণ করিবে উলম্ভনের দূত গজদন্ত তো সে কথা বলে নাই"

"আক্রমণ করিবার ইচ্ছা উলম্ভনের ছিল না। সহসা উলম্ভন মত পরিবর্তন করিয়াছে"

"কেন"

"ঠিক জানি না"

ইহার পরও আমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আর একটারও উত্তর পাই নাই।

...প্রস্তর বহন করিতেছিলাম। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা আজ তোমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। আজকাল পশুকেও তোমরা বোধ হয় অত কষ্ট দাও না। বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডকে মসৃণ করিয়া তাহার উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া আমাদের সেগুলি টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছিল। প্রস্তরখণ্ডে এবং বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে চর্ম নির্মিত বহু রজ্জু সংলগ্ন ছিল। সেই রজ্জুগুলি আমাদের কোমরে এবং বক্ষে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমরা টানিতে লাগিলাম। ঠিক টানিতেছি কিনা তদারক করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর্যবেক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের হস্তে চাবুকও ছিল এবং সে চাবুকের ব্যবহার করিতে তাহারা কার্পণ্য করেন নাই। অন্ততঃ পাঁচশত লোক মিলিয়া আমরা একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কশাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে সরাইয়া পর্যবেক্ষকগণ আর একজনের কোমরে এবং বুকে চর্মরজ্জু বাঁধিয়া দিতেছিলেন। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি নাই, দন্তে দন্ত চাপিয়া আমি নীরবে সেই গুরুভার টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। উপর্যুপরি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা পরম্পরায় আমি শুধু একটি জিনিসই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, দেবতার রোষ। সমস্ত অন্তর দিয়া আমি অনুভব করিতেছিলাম, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায়ত আমার প্রাপ্য। আমি জিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাস করিয়াছি, ধবলকে ঠকাইয়াছি, নিনানির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, শিলাঙ্গীর নিকট বারম্বার যে শপথ করিয়াছি, সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজের লালসাময় স্বার্থকে চরিতার্থ করিতে পারিব, ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সর্ব-

দ্রষ্টা দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সুতরাং পর্যবেক্ষণকারীদের কশা যখন আমার নগ্ন পৃষ্ঠের উপর পড়িতেছিল, তখন আমি বিদ্রোহ করি নাই। অবনত মস্তকে সমস্ত সহ্য করিতেছিলাম। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা কেবল মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, প্রায়শ্চিত্ত অবসানে দেবতা হয়তো প্রসন্ন হইবেন।

...সরসরা নদীর তীরে উলম্ভনের রাজধানীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। দেখিলাম একটি নাতি উচ্চ পর্বতের উপর বিরাটকায় প্রস্তরখণ্ড সকল একত্রিত হইয়াছে। মশাল জ্বলিতেছে। সেই মশাল আলোকে বহু শ্রমিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত খনন করিতেছে, শুনিলাম সেইসব গর্তে এই প্রস্তরগুলি নাকি প্রোথিত হইবে। পর্যবেক্ষণকারীদের কশাঘাতের শব্দে নৈশ অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে, শ্রমিকদের আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। বাল্যকালে এক বৃদ্ধার মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, মনে হইল, সেই নরকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

"উলম্ভন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহিত শ্রমিকদের পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও"

পর্বতের উপর হইতে একজন পর্যবেক্ষণকারী উচ্চকণ্ঠে এই আদেশ দিবামাত্র মুখে মুখে তাহা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই দেখিতে পাইলাম মশাল আলোকে পরিবৃত হইয়া উলম্ভন দম্পতী পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহারা যখন নিকটস্থ হইল, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আমার নিজের চক্ষুকেই আমি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। গজন্ধরই যে উলম্ভন এবং নিনানিই যে উলম্ভনের প্রিয়তমা পত্নী, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সন্দেহাকুল হইতেছিলাম। তাহারা যখন আরও নিকটে আসিল, তখন আর সন্দেহ রহিল না। সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায়-নগ্না নিনানির দক্ষিণ বাহু গজন্ধরের কটিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিনানির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল, তাহার পর আবার সরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিদর্শন করিয়া উলম্ভন অবশেষে আমাদের বিশ্রাম করিতে আদেশ দিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নীত হইলাম। উলম্ভনের অনুচরেরা আমাকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দিয়া গেল। আমার সমস্ত দেহমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। খাদ্য পানীয় আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিলাম না। আমি চক্ষু বুজিয়া কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে দেবতা, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মৃত্যুদণ্ড দিয়া আমার পাপের চরম শাস্তি দাও এবার। আমি পাপী, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই, আমাকে তুমি চরম শাস্তি দাও, মৃত্যুর জন্যই আমি প্রস্তুত হইয়াছি..."

...কাহার স্পর্শে গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, নিনানি বসিয়া আছে। দূরে মশাল জ্বলিতেছিল, সেই মশাল আলোকে দেখিতে পাইলাম, নিনানির অধরে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটিয়াছে।

"তুমি ভাবিয়াছিলে আমাকে সরাইয়া দিয়া শিলাঙ্গীর সহিত ঘর করিবে, কিন্তু জানিয়া রাখ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবে না। যক্ষিণীর মুখে প্রথম যখন কথাটা শুনিয়াছিলাম বিশ্বাস করি নাই। তাহার পর স্বচক্ষে দেখিলাম, তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছ। এ অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি প্রেতিনী সাজিয়া ধবলকে প্ররোচিত করিয়াছি, যাহাতে সে শিলাঙ্গীকে দূরে করিয়া দেয়, তাই আমি উলম্ভনের লালসাবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছি, যাহাতে সে তোমাদের আক্রমণ করিয়া তোমাদের বন্দী করিয়া আনে। আমি জানিতাম, বন্দী করিয়া না আনিলে তোমার নাগাল পাইব না। এইবার আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। যক্ষিণীর প্রতি আমার কর্তব্যও শেষ হইয়াছে। আমার অনুরোধে উলম্ভন তাহার ভার লইয়াছিল, গতকল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার আর কোনও বন্ধন নাই। তোমাকে চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি—অধিকার করিয়াছি। চল—"

"কোথায়?"

"আমার সঙ্গে। আমি এখনই তোমাকে সঙ্গে লইয়া উলম্ভনের এলাকা ত্যাগ করিব। এস—"

নিনানি, হাত বাড়াইয়া দিল।

...নিনানি আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত পর্বত যে পার হইলাম। জোলমা শিলাঙ্গীরাও

যুগে যুগে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাত ধরিয়া চলিবার যোগ্যতা আমার ছিল না, তাই বারবার তাহাদের পাইয়াও হারাইয়াছি। নিনানি কিন্তু আমাকে ছাড়ে নাই, যুগে যুগে নব নব-রূপে সেই আমাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ঈর্ষা, লোভ, কামনা কণ্টকিত সর্বগ্রাসী প্রেমের নিকট বারম্বার আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহার উদ্ধত অহঙ্কারের মাধুর্যে বারম্বার মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার যুক্তিহীন দাবীকে বারম্বার মানিয়া লইয়াছি। আমার প্রচণ্ড পৌরুষ বারম্বার তাহার পেলব যৌবনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমি যুগে যুগে তাহার মায়াজালে বন্দী হইয়াছি। ইকাকে আমি একদিন সবলে অধিকার করিয়াছিলাম বটে, ক্ষুধার তাড়নায় একদিন আমি জীবন-সঙ্গিণীকে আহারও করিয়াছি। কিন্তু আমার এই অপ্রতিহত প্রতাপ বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। জুসানির হস্তে পৌরুষের লাঞ্ছনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুঠা এবং লুংয়ের হস্তে আমি নিজে ক্রীড়নক-মাত্র হইয়াছিলাম, গৌয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট আমাকে হার মানিতে হইয়াছিল। শীলিনা, রাহুলা, লীরা, লালচুনের নিকট আমি বারম্বার নতশির হইয়াছি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছে যে, শক্তি একদা সশঙ্ক মিনতির মূর্তি ধরিয়া কাচিন, এলাহি টিনা, নিমার রূপে আমার নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল, নিনানি সেই শক্তিরই প্রখর প্রকাশ। আমি নিজেও মাঝে মাঝে নারী জীবনযাপন করিয়াছি, অস্পষ্টভাবে তাই নিনানির মনোভাব যেন বুঝিতে পারি। মাঝে মাঝে জোলমা, শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়ে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। মনে হয় আমার অন্তরতম সত্তা যেন জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিনানির হাত ধরিয়া জোলমা-শিলাঙ্গীকেই অনুসন্ধান করিতেছে, আর সেই অনুসন্ধানের ফলেই বুঝি মানব-সভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করিয়া আছি, সে বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে, যেদিন নিনানির সহিত জোলমা-শিলাঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে না, নিনানিই যেদিন বিবর্তিত হইয়া জোলমা-শিলাঙ্গীতে পরিণত হইবে, কল্প-লোকের স্বপ্নসঙ্গিণী যেদিন মর্তলোকের মানবীরূপে দেখা দিবে। কিন্তু সে যুগ এখনও আসে নাই। সেই অনাগত যুগের উদ্দেশ্যেই আমার যাত্রা। আমার যাত্রার যতটুকু ছবি কালের পটভূমিকায় স্থাবর হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সামান্য একটু অংশ বীভৎসতায়, নগ্নতায়, নিষ্ঠুরতায়, ছন্দে, গানে, শিল্পে তোমাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে ইতিহাস অতিশয় সীমাবদ্ধ ইতিহাস। আমার যাত্রাপথ অনন্ত অসীম। আমি চলিয়াছি, চলিতেছি এবং চলিব—ইহাই সত্য। আমি মরি নাই, আমি মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গ-মদিরা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও চাহিতেছি। দূরদিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা ভাসিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষকোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।

প্রথম খণ্ড শেষ

মামা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কি কুক্ষণেই নিরাপদবাবু ভাগিনেয় পাঁচুগোপালকে বাড়ীর কচু পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। তা' সেজন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। পাঁচুদের বাড়ীর কচু—কচু বলিয়াই উপেক্ষার বস্তু নয়। গুঁড়ি কচু নয় যে হড়হড় করিবে, বিষকচু নয় যে গলা জ্বলিয়া যাইবে, এ হইল আমতার খাস বনিয়াদী বংশের মানকচু, যাহাকে বলে দেবভোগ্য জিনিস। পুড়াইয়া খাও, ভাতে দিয়া খাও, ডালনা রাঁধিয়া খাও, মাখনের মতো গলিয়া যাইবে, গালে ধরিবে না, দাঁতে ঠেকিবে না। ওজনে এক একটি পাঁচ সের হইতে দশ সের, স্বাদে আলু, কফি ধারে ঘেঁসে না। কিন্তু হইলে কি হইবে, লোকে তো বোঝে না। ভাবে কচুতো কচু! পাঁচুগোপাল কালে-ভদ্রে মামারবাড়ী আসে, বছর দুই পূর্বে যখন আসিয়াছিল, তখন দুইটা বাড়ীর মানকচু আনিয়াছিল। সেবার নিরাপদবাবুকে দিন দশেক বাজার করিতে হয় নাই। তিনি বড়োই আনন্দ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এপথে এলে গেলে এক-আধবার আসিস গরীব মামার বাড়ী, আর এলে বাবা দু'একটা মানকচু আনতে ভুলিসনি।" পাঁচুগোপাল বোধ হয় বুঝিয়াছিল, মামার ভাগিনেয়ের চেয়ে কচুর প্রতি প্রীতিটাই বেশী আন্তরিক, তাই সে আর দীর্ঘকাল এপথ মাড়ায় নাই। সম্প্রতি তাহার এক বন্ধু কার্যোপলক্ষে বর্ধমান আসিতেছিল, পাঁচুর মা ভ্রাতার মানকচু-প্রীতি স্মরণ করিয়া তাহার ঘাড়ে এক বোঝা মানকচু চাপাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "তোমাকে গাড়ী থেকে নামতে হবে না, বাবা। হালুমপুরে গাড়ী থামলে জানলা দিয়া তোমার মামাকে ডেকে ব'ললেই তিনি কুলি দিয়ে নামিয়ে নেবেন। সেখানে সেই হ'ল ইস্টিশন মাস্টার, তার খাতির কি! হালুমপুরে দাদাই জজ, দাদাই ম্যাজিস্ট্রেট। ভারে ভারে মাছ, তরকারী, হাঁড়ি হাঁড়ি দই-দুধ, মুখের কথা না ফেলতে লোকেরা বাড়ী পেঁ'ছে দেয়। ইস্টিশনেই 'তোলা' ওঠে কত! একবার দেখি কুলিরা খাবলা খাবলা তুলছে, দুটো ঝুড়িই ভ'রে গেল দেখতে দেখতে। শেষে বাড়ী এল কিনা এক ঝুড়ি। আমি বলি, "ওদাদা, একি? নিজ চোখে যে দেখলুম দু'ঝুড়ি?" দাদা হেসে ব'ললে, "দিয়ে খেতে হয় দিদি, সব আমি নিলে ওরা সব দাঁড়ায় কোথা? দাদার আমার দয়ার শরীর! তাকে এই তুচ্ছ জিনিস পাঠাতে লজ্জা করে; তবে কিনা বাড়ীর সামিগ্রী, ভালোবাসে খেতে, এই যা।"

এইখানেই গল্পের সূত্রপাত, নিরাপদবাবুর দুর্ভাগ্যেরও সূত্রপাত বলিতে পারেন। হালুমপুরে হরিপদর গাড়ী দুই মিনিট মাত্র ধরে। গাড়ীর ভিতর অসম্ভব ভিড়, একবার নামিলে আর ওঠা শক্ত হইবে অগত্যা হরিপদ গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পাঁচুর মাতার পরামর্শমতো চীৎকার আরম্ভ করিল, "এই কুলি কুলি? স্টেশনমাস্টারবাবুকে ডেকে দাওতো।" স্টেশনে কুলির সংখ্যা খুবই অল্প, সকলেই যাত্রীদের মাল নামাইতে উঠাইতে ব্যস্ত। যে বাবু নামিবে না, তাহার জন্য ব্যাগার দিতে যাইবার মতো কাহারও ফুরসৎ নাই, হরিপদর কথা অগত্যা কেহই কানে তুলিল না। এমন সময় স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ স্টেশনমাস্টারবাবু গার্ডের গাড়ীর দিক হইতে একটা খাতা হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছেন দেখিয়া হরিপদ হাঁকিল "মামাবাবু, মামাবাবু, একটু এদিকে শুনবেন।" হরিপদকে নিরাপদবাবু দীর্ঘকাল দেখে নাই, চিনিতে পারিলেন না। অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, "কে? কি চাই" উত্তরে হরিপদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আমি খাঁদা, পেঁচোর বন্ধু মামাবাবু। আমাকে চিনতে পারলেন না? ওদের পাশের বাড়ীতে থাকি। আপনার জন্যে খুড়িমা কচু পেঠিয়েছে। বাড়ীর মানকচু।" নিরাপদবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, "তাই বুঝি? বেশ, বেশ। তা, তুমি একবার নামবে না বাবা? বড়ো খুশী হলুম, উপাদেয় দ্রব্য। বেশ বেশ। ওরে রামটহল, ওরে আয়, আয়, বাবা, নামিয়েনে, নামিয়েনে।" সত্যই নিজের স্টেশনে তিনিই জজ, তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। কচু নামাইয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া ট্রেন ছাড়িতে পাঁচ মিনিট দেরি হইয়া গেল। ঘরমুখো ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল বিরক্ত হইয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করিল, "গাড়ী ছাড়ুন স্যার, কুটুম্বিতা পরে হবে।" নিরাপদবাবুর ভ্রূক্ষেপই নাই, তিনি কথা কহিতেছেন তো কথাই কহিতেছেন। বোনের বাড়ীর সমস্ত সংবাদ লওয়া শেষ হইলে সিটি পড়িল, গাড়ী ছাড়িল। কয়েকজন ছোকরা চীৎকার করিয়া শুনাইয়া গেল, "আচ্ছা, মাস্টার এক মাঘে শীত পালায় না। আমরাও দেখে নেব।"

ইহার পরদিন হইতেই দুর্ভোগ আরম্ভ হইল। নির্দিষ্ট সময়ে এস্ একশ্ বারো ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা হালুমপুর স্টেশনে পেঁ'ছিতেই ট্রেনের বিভিন্ন কামরা হইতে চীৎকার আরম্ভ হইল, "মামাবাবু, মামাবাবু এদিকে শুনে যান," "মামাবাবু কচু এনেছি, বাড়ীর কচু", "মামাবাবু, সে কচু খেয়েছেন? মুখে ধরেনি তো?" "মামা, কচু" ইত্যাদি। নিরাপদবাবু অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না গাড়ী চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আবার ফিফ্‌টি থ্রি আপ যাইবার সময়ও ঐরূপ ডাকাডাকি আরম্ভ হইল। সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে ডাউন লাইনেও একখানা কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতেও এই ট্রেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে চীৎকার শুরু হইল। নিরাপদবাবু মাঝে মাঝে দৃষ্টির দ্বারা অর্বাচীন ছোকরাগুলোকে ভস্ম করিবার চেষ্টা করিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "তোমার এত বোনপো ছিল, তাতো জানতুম না।" শঙ্করী অবাক হইয়া বলিলেন, "আমার বোনই নেই, তা বোনপো আসবে কোত্থেকে। তুমি তো আচ্ছা লোক? তাছাড়া আমার বোনপো হলে তো তোমায় মেশো ডাকবে!" নিরাপদবাবু বলিলেন, "আমারও তো ভাগনের মধ্যে সবেধন নীলমণি ঐ পাঁচু তা হঠাৎ দেশশুদ্ধ লোক আমাকে 'মামা' ডাকতে আরম্ভ ক'রলে কেন? আমি বলি বুঝি, তোমার সম্পর্কে ডাকছে। আমাকে বোধ হয় আয়ান ঘোষ ঠাউরেছে।" শঙ্করী বলিলেন, "রসিকতা করতে হলে আগে থেকে নুটিস দিয়ো। বুঝিনে।"

দিন যায়, নিরাপদবাবুর 'মামা' নামের খ্যাতি 'জিওম্যাট্রিক প্রোগ্রেসনে' বাড়িয়া চলে। সকালে বিকালে কমপক্ষে বারোখানি ট্রেন হালুমপুরে থামে, প্রত্যেকটি হইতেই আকুল আহ্বান উঠে, "মামা, কচু।" নিরাপদবাবুর ক্রমেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে, আজকাল তিনিও গালি গালাজ আরম্ভ করিয়াছেন," এঃ মামা! শালাদের বাবা-কেলে মামা পেয়েছে? ধরব আর আছড়ে মারব। হুঁঃ, আমাকে চেনে না। আমি কংস মামা, হুঁঃ, পুলিসে দে'ব শালাদের। মামা পেয়েছে, হুঁ"।

কে কাহার কথা শোনে? নিরাপদবাবু গালির মাত্রা যতই চড়ান, এপক্ষে ভক্তির মাত্রা ততই বাড়িয়া চলে। ক্রমে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্য হইতে দলে

দলে ছেলে-ছোকরা নামিতে লাগিল, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে কেহ মাথা নীচু করিয়া, কেহ কাঁকরে মাথা ঠুকিয়া, কেহবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিরাপদবাবুর পায়ের ধুলো লইতে লাগিল। নিরাপদবাবু মুখ ছাড়িয়া হাত ধরিলেন, দুম-দাম কিল চড় লাগাইতে আরম্ভ করিলেন, ভাগিনেয়দের লজ্জা নাই, দৃক্‌পাত নাই। বলে, "অনেক পুণ্যে আপনার মতো মামা পেয়েছি। গুরুজনের মার হল আশীর্বাদ, এতে কি রাগ করতে আছে! তা মামা, পুড়িয়ে খেলেন, না ভাতে দিয়ে?" "মা জিজ্ঞেস করছিলেন, মুখে ধরেনি তো?"

ক্রমে স্টেশনের কর্মচারীরাও পূর্ব সম্বন্ধ ছাড়িয়া অন্তরালে 'মামা' বলিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ মালবাবু, প্রৌঢ় তারবাবু প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে কথোপোকথনের সময় নিরাপদ-বাবু না বলিয়া 'মামা' ব্যবহার করিতেছেন, ইহা নিরাপদবাবু কয়েক দিন লক্ষ্য করিলেন। মনটা বড়োই খারাপ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট সাহেব কি কাজে ঐ পথে যাইতেছিলেন। পূর্বে সংবাদ দেওয়া ছিল না, ট্রেন থামিতেই প্ল্যাটফর্মে ভীষণ গোল-মাল দেখিয়া সাহেব সেলুন হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, দলে দলে যাত্রী নামিয়াছে, চতুর্দিক হইতে "মামা, মামা" রব উঠিতেছে, আর একদল যাত্রী পরিবৃত প্রৌঢ় স্টেশন মাস্টার সকলকে বেপরোয়া মারধোর করিতেছেন এবং ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। সাহেব



তরুণীর গালে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিলেন

বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ডিস্‌গ্রেসফুল!" এক-জন ডেলি প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? স্টেশন মাস্টার অমন করে কেন?" সে বুঝাইয়া দিল, "স্ক্রু লুজ সার। মাথার মধ্যে ইস্কুরুপ আলগা হয়ে গেছে 'মামা' বললেই ক্ষেপে যায়।" সাহেব অগ্র হইতেই স্টেশন মাস্টারের নজরে পড়িলে তিনি ভুঁড়ির উপর জামার অবাধ্য অংশট বোতামের সাহায্যে জব্দ করিবার চেষ্টা করি করিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেলাম দিলে সাহেব বলিলেন, "প্রাইভেট কথা আছে, ঘ চলো।" ঘরে ঢুকিয়া সাহেব প্রথম ব বলিলেন, "তোমার দ্বারা চলিবে না। তুমি র যাও, উটুম ষ্টান আছে।" নিরাপদবাবু অ কাকুতিমিনতি করিলেন, পায়ে ধরিতে বা রাখিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সাহে দয়া হইল। নিরাপদবাবু তাঁহার পরামর্শম বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন, দরখা অবিলম্বে মঞ্জুর হইল। বহুদিনের পরি কর্মস্থল ছাড়িয়া অন্য লাইনে অন্য পরিবে মধ্যে যাইতে তাঁহার মোটেই আগ্রহ ছিল কিন্তু উপায় কি? তিনি যাইবার স সাশ্রুনয়নে বলিয়া গেলেন, "শালার কচুই যত নষ্টের মূল। পেঁচোর বন্ধুটা যদি সে বোকার মতো 'মামা, মামা' ক'রে না চ্যাঁচা তাহলে আজ আমায় নড়ায় কে?" গৃহি স্টেশনের কোয়ার্টারটির উঠানে পালংশাক লঙ্কাগাছ করিয়াছিলেন, সেগুলির জন্য বি

পুত্র বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। সহকারী স্টেশন মাস্টারের পত্নীকে শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে 'মানুষমনুষ' করিয়া যথাসময়ে খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

ঝুড়িগ্রামে প্রথম প্রথম দিনকতক ভালোই কাটিল। স্বাস্থ্যকর স্থান, ঘি দুধ সস্তা, বিহারের সীমান্তে পড়ে। নিরাপদবাবু একদিন আপ্ পাঞ্জাব মেল পাশ করাইয়া নিজের ঘরে ফিরিবেন এমন সময় পিছনে নারী কণ্ঠে ডাক শুনিলেন "আরে মামাবাবু যে? আপনি এখানে আছেন তা'তো জানতুম না?" নিরাপদবাবু ইতিপূর্বে কোনোদিন কোনো অপরিচিতা মেয়ের গায়ে হাত তুলেন নাই, কিন্তু কয়েকদিন একান্ত নিশ্চিন্তে মধ্যে কাটাইয়া হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলেন, পিছন ফিরিয়া এক সুবেশা তরুণীর গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলেন। তরুণী বিস্ময়ে ক্রোধে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তাহারপর কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মারলেন যে?" নিরাপদবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জ্যাঠামি করবার আর জায়গা পাও নি? কুঁচিয়ে কাপড় পরলে আর হিলতোলা জুতো পরলেই ভদ্র মহিলা হওয়া যায় না"—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই একটি বিরাশি-সিক্কা ওজনের চড় নিরাপদবাবুর গালে আসিয়া পড়িল তিনি মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলার মামা স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা কয়েক মাইল ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেইসূত্রে মাঝে মাঝে স্টেশনেও আসিয়া পড়েন। পূর্বের স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল, নিরাপদবাবুর সঙ্গে তখনও আলাপ হয় নাই। ভাগিনেয়ী এক বান্ধবীর বিবাহ উপলক্ষে আসিতেছে সংবাদ পাইয়া সেই বান্ধবীর বাড়ীর লোকের সঙ্গেই তিনি স্টেশনে আসিয়াছিলেন তাহাকে লইয়া যাইতে। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা তরুণী সত্যই জানিত না, সহসা মাতুলকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিল, তাহার ফলে যে এরূপভাবে অপমানিত হইতে হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। এদিকে নিরাপদবাবু অপরাধীদের শাস্তি দিতে অভ্যস্ত, তাহারাও নির্বিবাদে তাঁহার প্রহার ও গালি মানিয়া লইতে অভ্যস্ত, ইহাই তিনি এতদিন দেখিয়া আসিতেছেন, অপরাধী যে নিরপরাধ হইতে পারে এবং তাহার পক্ষ হইয়া কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যে তাঁহাকে একজন মান্যগণ্য স্টেশন মাস্টারকে এরূপ সাংঘাতিক প্রহার করিতে পারে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। প্রহার বলিয়া প্রহার? অনিমেষবাবু তাঁহাকে নিমেষ ফেলিবার অবকাশ দিলেন না। অনেকদিন ব্যায়ামচর্চা করিয়া এবং ঘি-দুধ খাইয়া তাঁহার সওয়া ছয়ফুট শরীরে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করিয়া ছিলেন আজ সহসা ভাগিনেয়ীর অবমাননা-কারীর শাস্তিদানের ব্যাপারে প্রায় সমস্তটাই দরাজহস্তে খরচ করিয়া ফেলিলেন। চড়, কিল, লাথির মুষলধারায় নিরাপদবাবু ভাসিয়া গেলেন, প্ল্যাটফর্মের উপর লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্টেশনের কর্মচারীরা

এবং ভাগিনেয়ীর বান্ধবীর আত্মীয়রা যখন অনিমেষবাবুকে অনেক কষ্টে জড়াইয়া ধরিয়া আটকাইয়া ফেলিল তখনও তিনি ক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন এবং মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়িতেছেন, "ব্রুট, ছোটলোক স্কাউণ্ড্রেল!"

শেষ পর্যন্ত নিরাপদবাবু যখন মুক্তকচ্ছ অবস্থায় স্টেশনের ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন অনিমেষবাবুর বন্ধুরা আসিয়া তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে এবং তরুণীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলিলেন। নিরাপদবাবু প্রথমে কিছুতেই রাজি হ'ন না, "দোষও করলে ওরা মারও দিলে, আবার ক্ষমাও চাইতে হবে। অত সুখে কাজ নেই। আমি ডিফ্যামেশনের নালিশ করব। জেলে দে'ব দুজনকে—"—ইত্যাদি। শেষে যখন বুঝিলেন অপরাধ তাঁহারই এবং অনিমেষবাবু একজন রিটায়ার্ড জেলা জজ, তখন মোকদ্দমার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষমা চাহিলেন। মেয়েটির কাছে সেই উপলক্ষে 'মামা' ডাক সম্বন্ধে পূর্বকথা সমস্তই বলিতে হইল। তাঁহার ধৈর্যচ্যুতির কারণ শুনিয়া অণিমা হাসিল, অনিমেষবাবু হাসিলেন, শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইয়া গেল। অনিমেষবাবু ক্ষমা চাহিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ি গেলেন।

ব্যাপারটা আপাততঃ মিটিল বটে, কিন্তু একেবারে মিটিল না নিরাপদবাবুর গায়ের ব্যথা মরিতে সাতদিন গেল, তাঁহার প্রহারের সাক্ষী অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে আরও দিনকয়েক গেল। ইতিমধ্যে স্টেশন হইতে স্টেশনে 'মামা' নাম প্রচারিত হইয়া গেল। দোকানে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে পরিচিত মহলে সর্বত্রই তিনি চলিয়া যাইবার সময় শুনিতে পান, পিছনে 'অনুচ্চস্বরে তাঁহার মাতুলত্ব লইয়া হাসাহাসি চলিতেছে। তিনি আজকাল নিজেকে যতদূর সাধ্য সংযত রাখেন, কিন্তু বেশীদিন সংযম রক্ষা করা সম্ভব হইল না। ট্রেন থামিলেই ডাক উঠিতে আরম্ভ হইল, "মামা কচু!" দিনদশেক নিরাপদবাবু মিষ্টকথায় প্রতিবাদ করিয়া দেখিলেন "দ্যাখো বাপ-সকল, আমি তোমাদের বাপের বয়সী, বৃদ্ধ মানুষ। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করা কি তোমাদের উচিত হচ্ছে? তোমরা হ'লে শিক্ষিত, ভদ্দরলোকের ছেলে"—

কে কাহার কথা শোনে, তিনি যতই বোঝান, ছেলেগুলো ততই চ্যাঁচায় "মামা, মামা। আবার মারধোর আরম্ভ হইল, উন্মত্তের মতো ছুটাছুটি এবং তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল। ইহাকে মারিতে যান তো ও আসিয়া কানের কাছে বলে "মামা" উহাকে তাড়া করেন তো এ হাঁসিয়া বলে "মামা।" তিনচারদিন আছাড় খাইলেন, একদিন এক ছোকরাকে বেশী মারিয়াছিলেন, সে ল্যাং মারিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় সম্মুখের একটা দাঁত ভাঙিয়া গেল। চতুর্দিকে গান আরম্ভ হইল "সত্যি কি মামা মামীকে মারে? গামছার বাড়ী দিয়া তামাশা করে।"

"মামা কাটেন সরু সুতো মামীর মাথায় পাগ। সত্যি ক'রে বলুগো মামা, মামী কি তোর বাপ?" নিরাপদবাবুকে পাগল করিয়া তুলিল।

এই সময় অনিমেষবাবু একদিন স্টেশনে আসিলেন। ট্রেন চলিয়া যাইবার পর বাড়ি ফিরিবার পথে নিরাপদবাবুকে কিছুদূর সঙ্গে লইয়া গেলেন। বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি রাগেন ব'লেই তো ওরা রাগায়? আপনি একমাস চুপ ক'রে থাকুনদিকি, কেমন ওদের মামা বলা না বন্ধ হয় দেখি। আপনি না রাগলে ওরা ব'কে ব'কে হয়রান হ'য়ে আপনিই থেমে যাবে। নিরাপদবাবু বলিলেন "রক্তমাংসের শরীর তো, রাগ সামলাতে পারি না যে?" অনিমেষবাবু বলিলেন, "মানুষের অসাধ্য আর কি আছে? চেষ্টা করুন, ঠিক পারবেন।"

ইহার পর নিরাপদবাবু ক্রোধ দমন করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। "বাড়ির দেওয়ালে টাঙ্গাইলেন মামা বলিলে রাগ করিব না।" "মামা" বলিয়া কেহ ডাকিলে বলেন, "বেশ বেশ, বাড়ির সব ভালো? ক্ষেন্তির পেটের অসুখ সেরেছে?" কাহাকেও বলেন "এস বাবাজী এস, তোমরাই তো আমার বংশধর। ছেলে নেই, পুলে নেই, তোমরা তবু "মামা" বলে ডাকো, শুনে প্রাণটা জুড়োয়। "একদিন তিনচারটি ছেলেকে বাড়ি লইয়া গিয়া পরোটা খাওয়াইয়া দিলেন। বলিলেন," আহা-হা, লজ্জা ক'রে খেয়োনা। মামা বলে যখন ডেকেছ, তখন আপনার মামার বাড়ি মনে করে আসবে যাবে, খাবে দাবে।" প্রতিপক্ষ সত্যই ঘাবড়াইয়া গেল, ব্যাপার কি? সত্যই লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? একদিন একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মনে কষ্ট পান, মামা বললে না?" নিরাপদবাবু বলিলেন "তোমার যেমন কথা? মামা বললে রাগ করার বা কষ্ট পাওয়ার কি আছে?" ইহার পর চতুর্দিক হইতে প্রশ্নবর্ষণ আরম্ভ হইল, "মামা, আপনি নাকি আর মামা ব'ললে রাগ করেন না?" নিরাপদবাবু সকলকেই বলেন "রাগ করব কেন? ডাকোনা যত খুশি।"

কিন্তু নিরাপদবাবুর প্রতিজ্ঞা বেশীদিন রহিল না। তাঁহার সহকর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া পরিচিত অপরিচিত সকলেরই এক প্রশ্নে তিনি ক্রমে ধৈর্য হারাইলেন। রাগ করিবেন না ইহা তিনি স্থির করিয়াই ফেলিয়াছিলেন, কেবল সেই সংবাদটা উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বরে তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই প্রচারের ভাষায়, তাঁহার সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিনি অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্রোধকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় একদিন লেখকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। পাটনা হইতে বোলপুর যাইতেছিলাম, দানাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীর একখানা কামরায় জানালারধারে বসিয়াছিলাম। ট্রেনখানা ঝুড়িগ্রাম স্টেশনে থামিতেই বিভিন্ন কামরা হইতে চীৎকার উঠিল, "মামা, মামা, এ দিকে।" "মামা, কচু এনেছি।"

একজন কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি একহাতে জামার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে অপর হস্তে মাথার টুপি ঠিক করিতে করিতে প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গার্ডের সঙ্গে কি কাজ ছিল সারিলেন, এ এস এম-কে কি বলিলেন। তাহার পর ট্রেনের যাত্রীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ব'লে যাও, ব'লে যাও, আর আমি 'মামা' ব'ললে রাগ করি না।"

যাত্রীদের চীৎকার পর্দায় পর্দায় চড়িতে লাগিল, মামার হুংকারও ক্রমে পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল। মিনিট দুই পরে যখন ট্রেন ছাড়িল তখন মুক্তকচ্ছ স্টেশন মাস্টার প্ল্যাটফর্মে লাফাইতেছেন আর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া যাত্রীদের হুংকার ছাড়িতেছেন, "আর আমি মামা ব'ললে রাগ করিনারে শালারা!"



ইন্দ্রজিতের আসর

রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন—এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়!—তখনও রেডিয়ো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। গৌড় দেশীয় পণ্ডিতরাই তখন পৃথিবীর মুখরতম যন্ত্র ছিল। তাঁরাই কোলাহলে দশদিক মাতিয়ে রাখতেন। উক্ত পণ্ডিতদের কণ্ঠস্বর কবির পক্ষে নিশ্চয় যথেষ্ট পীড়াদায়ক মনে হয়েছে নতুবা এরূপ পরিহাস বাক্য তাঁদের সম্বন্ধে উচ্চারণ করতেন না। আশা করা যায় পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত বদলেছিলেন। বাঙালী পণ্ডিতদের বাকযন্ত্রের চাইতেও মারাত্মক যন্ত্র যে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হতে পারে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন এবং স্বকর্ণে তার মুখরতার প্রমাণ পেয়েছেন।

অনাবশ্যক চেঁচামেচি ব্যাপারটা সব সময়েই হাস্যকর। তাহলেও একটু ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হয় যে, উচ্চকণ্ঠ কলরবের আবশ্যকতা পূর্বকালে যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। লোকে যখন লেখাপড়া জানত না তখন মৌখিক বাক্য ছাড়া তাকে নতুন কথা শোনাবার দ্বিতীয় উপায় ছিল না। আজকের দিনে খবরের কাগজ আর ছাপাখানার দৌলতে আপনার বক্তব্য আপনি নিঃশব্দেই প্রচার করতে পারেন। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার প্রসার হয়েছে আর সেই সঙ্গে মৌখিক বাক্যের প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে। অন্তত তাই হওয়া উচিত ছিল।

তাছাড়া কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যের চাইতে ছাপার অক্ষর অনেক বেশী দূরগামী। কবিরা ছাপার অক্ষরকেই বলেছেন winged words। মনের নিঃশব্দ চিন্তা পক্ষ বিস্তার করে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত। ঐ winged words কথাটির মধ্যে অনেকখানি সূক্ষ্ম অনুভূতি লুক্কায়িত আছে। আজকের মানুষ সত্যি সত্যি কথার গায়ে পাখা জুড়ে দিয়েছে। কথা আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে আর আমরা ঘরের কোণে একটি রেডিয়ো যন্ত্র নিয়ে গোষ্ঠ মামার মতো থাপ্ পেতে বসে আছি উড়ো কথা খপ্ করে ধরবার জন্যে। কল্পনার সত্যটিকে বাস্তব রূপ দিতে winged words কথার কবিত্বটুকুকে হত্যা করেছি। শব্দকে নিঃশব্দ করার মধ্যে কৃতিত্ব আছে, শব্দকে সশব্দ করার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? এতো তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো। সুসভ্য মানুষের ব্যবহার সংযত এবং বাহুল্য-বর্জিত। আজকের মানুষের বাড়াবাড়ি দেখলে সে সুসভ্য কি না সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। কোনো জিনিসই আর সূক্ষ্ম থাকছে না। বেশ একটু স্থূল আকারের না হলে চোখেও পড়ে না, কানেও ঢোকে না।

Written word আর spoken word—এই দুই-এর মধ্যে অনেক তফাৎ। একজনের স্বভাব বিনম্র,—বলছেন, তোমাকে দুটো কথা বলবার ছিল। এই লিখে রাখলুম—কোনোদিন যদি সময় হয় তো পড়ে দেখো। যদি ভালো লাগে তো পোড়ো, ভালো না লাগে তো পড়ো না। spoken wordএর মালিক অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন্। শুনিয়ে তবে ছাড়বে—ও শ্যামাদাস আয় তো দেখি, বোস্ তো দেখি এখেনে ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রী মশায় হয়তো স্টেটমেণ্ট ঝাড়ছেন—খাদ্যসমস্যা যে বেমালুম সমাধান হয়ে গেছে সেই কথাটা মাথায় গজাল মেরে বুঝিয়ে তবে ছাড়বেন। আগেকার মানুষ মনের কথা লোককে শোনাতেন, একালের মানুষ মুখের কথা লোককে শোনায়। তার কারণ, এরা মুখে এক, মনে আর।

আগে বলেছিলাম মুখের কথার চাইতে ছাপার কথা বেশি দূরগামী। হঠাৎ মানুষ আবিষ্কার করেছে যে, ছাপার অক্ষর দূরগামী হলেও 'হয় নাই সে সর্বত্রগামী'। কাজেই যন্ত্র চাই। বায়ুবাস্ত্রের মতো বাক্যকে বায়ুতে নিক্ষেপ করতে হবে। আগে বলতাম গানের সুর ঝরে পড়ছে। এখন বলি গানের সুর ছুড়ে মারছে।

আগে মানুষ কান সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। হাতে ধরুন, পায়ে ধরুন আপত্তি নেই; কিন্তু কানে ধরলে আর রক্ষে ছিল না। এখন সেই কানের কি অবস্থা হয়েছে একবার ভেবে দেখুন। আমরা কলকাতার অধিবাসী নই, পল্লী অঞ্চলে থাকি। আমাদের কান দুটো জুড়োবার একটু তবু অবসর ছিল; কিন্তু সভ্যতা নাছোড়বান্দা। এখানেও আমাদের পিছু পিছু তাড়া করে এসেছে। আর হাত বাড়িয়ে ধরবি তো ধর, সর্বাগ্রে কান দুটোকেই পাকড়িয়েছে। প্রথম যখন এদিকটাতে আসি তখন একটিমাত্র রেডিয়ো ছিল। সারাক্ষণ সপ্তমে বাঁধা থাকত, কাজেই ঐ একটি একাই একশো ছিল। এখন একটি একটি করে বেড়ে পঁচিশটিতে দাঁড়িয়েছে। দু একজন গৃহস্থের মনে তবু একটু দয়ামায়া আছে, সারাক্ষণ আকাশবাণী শ্রবণ করেন না। তথাপি কলরব পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি না পেলেও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছেলেবেলায় বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প পড়ে আনন্দ পেয়েছি। এখন এই প্রৌঢ় বয়সে বেতার-পঞ্চবিংশতির কলরবে কি যে অবস্থা হয়েছে কি বলব। এর পাল্লায় পড়লে স্বয়ং বিক্রমাদিত্যের বিক্রমও ঠাণ্ডা হত।

পৃথিবীর ভাষা বিভ্রাটের গল্প আমরা বাইবেলএ পড়েছি। সে গল্পটা আজগুবি। সত্যিকারের Tower of Babel হল এই বেতার যন্ত্র। পৃথিবীতে এত ভাষাও আছে। আর তারও চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার সব ভাষাতেই সঙ্গীত চর্চা সম্ভব। শরৎবাবু ঠাট্টা করে বলেছিলেন—কাবুলিওয়ালাও গান করে। কেন কাবুল রেডিয়োতে কি গান হয় না?

তাও রেডিয়ো যদি কেবল গানই বিতরণ করত। কিন্তু গানের সঙ্গে যে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা সেটাই বড় মারাত্মক হয়ে উঠেছে। জ্ঞান মানে তত্ত্বকথা নয়—information, আধুনিক ভাষায় এর নাম propaganda। একটু নমুনা শুনুন—আমাদের বোমারু বিমানসমূহ গতকল্য উত্তর কোরিয়ার অমুক শহরে অনুমান হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করেছে, শহরটি দাউ দাউ করে জ্বলছে, পাঁচ সহস্রাধিক লোক হতাহত হয়েছে ইত্যাদি এরূপ বর্বর উক্তি যে এমন নির্লজ্জভাবে জগৎবাসীকে শোনানো যেতে পারে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও তা কল্পনা করা যেত না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি পরিমাণ রুচি বিকার ঘটছে সেটাই ভাববার বিষয়। এই সব আপ্তবাক্য শুনবার জন্য আমরা রেডিয়ো চালিয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকি। সভ্যতা জিনিসটা শক্-প্রুফ্। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ যে কথা শুনে শিউরে উঠতেন আজকের মানুষ দিব্য হাসিমুখে তা শুনতে পারে।



পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লী শহরে হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুতুব মিনারের গায়ে লাগানো কুওৎউল্-ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ, দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু'একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম 'বর্ণনা' এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এতো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার প্রকার দেখলেও মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে নির্মিত হয়েছিল। মনে কণামাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে কোন দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুতুব মিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দীন খিলজির মসজিদ, গিয়াস্ উদ্দীন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদর জঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন! দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট, ওয়ার মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিমযুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্রশব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে

সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের

দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসীগুণী ক্লেমাঁসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, 'বাই গদ্, হোয়াৎ ওয়ান্দারফুল রুইন্স্ দে উইল মেক্!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

* * * *

কিন্তু এ সব-কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ ভী থাকবে। যেহেতুক মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব-মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি? সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসেবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি। অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলুম শ্রীগাড্‌গিল মূর্তিটির মডেল দেখে উর্ধ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটি মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়! কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না—যদি কোনো রস দেয় তবে সে ভয়ংকর—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার-আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণভরে প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাৎ না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিম্বা লণ্ডনে বসে মূর্তিটার ছবি দেখে যে ঠাঠা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমার ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

যুগ-বিপ্লব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

চতুর্থ দৃশ্য

পেশবা বালাজী রাওয়ের প্রাসাদ

দৃশ্য সূচনার অন্ধকারের মধ্যে নরিন্দর গিরি গোস্বামীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল।

—পেশবা বালাজী বাজীরাও! পণ্ডিত!

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—শূন্য অলিন্দ। মধ্যস্থলে দরজা।

নেপথ্য নরিন্দর গিরিঃ—(পুনরায় ডাকিলেন) পেশবা বালাজী বাজী রাও!

প্রবেশ করিল একজন প্রহরী। সে মধ্যস্থলের দরজা খুলিল। দেখা গেল ভিতরে বালাজীরাও এবং দুইজন কর্মচারী বসিয়া আলোচনামগ্ন।

প্রহরীঃ—(দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল) মহামান্য পেশবা! গোস্বামী মহারাজ নরিন্দর গিরি!

বালাজীঃ—নরিন্দর গিরি মহারাজ? (কর্মচারীর প্রতি) সসম্মানে তাঁকে নিয়ে এস। আগে পাদ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করবে।

প্রহরী ও একজন কর্মচারী চলিয়া গেল। বালাজীরাও ও কর্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। বালাজীরাও শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, ললাটে রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আভরণহীন কিন্তু দরবারী পোষাকে ভূষিত! মুখে-চোখে কঠোর চিন্তার স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে।

বালাজীঃ—পড় আবার পড়! শেষপত্র!

কর্মচারীঃ—"অদূরে ভবিষ্যতে অতি অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র আফগান শক্তিকে গ্রাস করিতে পারিব বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সমস্ত নবাব আমীরেরা প্রতিশ্রুতি দিয়াও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। ধর্মের দোহাই দিয়া বাবরশাহী তখত রক্ষার জন্য আফগান শিবিরে সসৈন্যে গিয়া যোগ দিয়াছে। রাজা সুরজমল জাঠ নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিয়াছে। রাজপুত রাজারাও তাই। অবিশ্বাসী ও ঈর্ষাকাতর জাঠ কিষাণের দল আদেশ অমান্য করিয়া দলবদ্ধ মর্কটের মত বনে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শিখ কিষাণেরাও দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আমাদের বাহিনীতে ষাট হাজার সৈন্য; আবদালীর নিজের চল্লিশ হাজার এবং হিন্দুস্থানের মুসলমান সৈন্য চল্লিশ হাজার, সর্বশুদ্ধ আশী হাজার সৈন্য। তবুও আমি জয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী। এপর্যন্ত বারোশো ঘোড়া, চারশো উট এবং চারটি হাতী আমরা কাড়িয়া লইয়াছি। দোয়াবের রসদের পথ বন্ধ হইয়াছে; গোবিন্দ বুন্দেলা পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। আফগান শিবিরে ক্ষুধার তাড়না শুরু হইয়াছে। আমরা স্থির হইয়া বসিয়া আছি!

বালাজীঃ—হঁ্যা! (একটু চিন্তা করিয়া) উত্তরে আমার নির্দেশ "কানায় কানায় পরিপূর্ণ জলপাত্র হাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না ক'রে পথ চল। স্থির প্রতীক্ষায় লগ্ন ক্ষণ নির্ণয় কর।" এই না!

কর্মচারীঃ—হ্যাঁ, মহামান্য পেশবা!

বালাজীঃ—কবে গিয়েছে সে পত্র? আজ সাতাশ দিন নয়?

কর্মচারীঃ—হ্যাঁ, পেশবা!

বালাজীঃ—পত্র হস্তগত হয়েছে এতদিনে। (আবার চিন্তা করিলেন) কৃষ্ণ যোশীর পত্র? যোশীও এই কথাই সমর্থন করেছে। সে যেন লিখেছে, "মুক্তার মধ্যে সর্বোজ্জ্বল মুক্তার মত বাদশাহের বাদশাহ দুরি দুরাণী আহমদ শাহের শিবির আজ আটদিন স্তব্ধ।

কর্মচারীঃ—(পত্র লইয়া খুলিয়া) হ্যাঁ, মহামান্য পেশবা! "আমাদের সৈন্যরা প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে একশতজন রোহিলা রসদবাহী সৈন্য ধ্বংস করিতেছে। আফগান শিবিরের বাজারে ছোলার দর টাকায় আড়াই সের, আটা টাকায় তিন সের। দুই টাকা সের মূল্য দিয়াও ঘৃত দুষ্প্রাপ্য। আমাদের শিবিরের বাজারে আটা ষোল সের, ছোলা বারো সের, ঘৃতের দর টাকায় আড়াই সের।" (থামিল)

বালাজীঃ—(চোখ বুজিয়া বলিয়া গেলেন) তাও জাঠ কিষাণদের অবাধ্যতার জন্যে। জবাহির সিং তাহাদের নেতা। সে ধুয়া তুলিয়াছে, তোমরা রাজ্য জয় করিয়া রাজা হইবে আমরা বাঁচিব কি খাইয়া? তাহারা আমাদের অনিষ্ট করে নাই এবং আফগানদের হত্যা করিয়া আমাদের সুবিধা করিতেছে বলিয়া আমরা তাহাকে কিছু বলি নাই।" (চোখ খুলিয়া) উচিত ছিল। উচিত ছিল!

(নরিন্দর গিরি প্রবেশ করিলেন)

নরিন্দরঃ—নমো নারায়ণায়! আনন্দ রহো ভাই। (সবিস্ময়ে) এ কি পণ্ডিত?

বালাজীঃ—নমো নারায়ণায়। নমস্তে গিরি মহারাজ। একি গোস্বামীজী, আমিও যে বিস্মিত হচ্ছি আপনাকে দেখে! আপনার চোখ?

নরিন্দরঃ—একটা চোখ দিতে হয়েছে পণ্ডিত। এক পাগল নিয়েছে। একটা রেখেছি কোনমতে। কিন্তু তুমি? পণ্ডিত—

বালাজীঃ—ভিতরে আসুন গোস্বামীজী!

অগ্রবর্তী হইলেন মধ্যের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গিরি অনুসরণ করিলেন।

[দৃশ্যান্তর ঘটিল]

[দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য]

শুধু আলো জ্বলিতেছে না। কাল দিনমান

নরিন্দরঃ—(বালাজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া) জীবনের জ্যোতিতে ভাস্বর তুমি পণ্ডিত, তোমার এই মূর্তি! দেহ শীর্ণ, মাথার চুল শাদা হয়েছে, মসৃণ ললাটে তোমার ফুটে উঠেছে সারি সারি রেখা। পণ্ডিত!

বালাজীঃ—(হাসিয়া) কালের পথ প্রস্তুতের ভার পড়েছে গিরি মহারাজ; বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হ'তে হয়েছে। বয়স বেড়ে গেছে মহারাজ। এ আমার মহাকালের শুভ্র প্রসাদের চিহ্ন।

নরিন্দঃ—মানুষ সন্ন্যাসী হয় পণ্ডিত, জীবন হয় না; মানুষ ইহকাল পরকাল মায়া মমতা সব বর্জন করতে চায়, জীবন চায় না, সে কেঁদে সারা হয়। আমার চোখে জল আসছে পণ্ডিত। জীবনকে তুমি একি পীড়ন করছ ভাই?

বালাজীঃ—ভবিষ্যতের উদয় হলেই আবার আমি নবীনত্ব ফিরে পাব মহারাজ। পানিপথের প্রতীক্ষা করছি আমি। পানিপথেই ভবিষ্যত ভূমিষ্ঠ হবে। প্রসন্ন মনে সমস্ত উত্তর ভারত পরিক্রমা করব, নবকলেবর নিয়ে ফিরব।

নরিন্দরঃ—পানিপথ! পেশবা, পানিপথের কথা নিয়েই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি!

বালাজীঃ—নূতন কি সংবাদ আপনি এনেছেন গিরি মহারাজ? (ব্যগ্রভাবে)

নরিন্দরঃ—পণ্ডিত, আমি গভীর বেদনা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

বালাজীঃ—(মুহূর্তে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন) বুঝেছি গোস্বামীজী, আমি বুঝেছি আপনি যে জন্যে এসেছেন। জবাহির সিং—রঘুনাথ সর্দার! এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল মারাঠা সেনাপতির। কর্তব্য কর্মে সে ত্রুটি করেছে।

নরিন্দরঃ—পেশবা! কি বলছ তুমি?

বালাজীঃ—ঠিক বলছি আমি। আপনি জবাহিরকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

নরিন্দরঃ—সে নিষ্ঠুর নির্যাতন তুমি দেখনি পেশবা, অসুস্থ মস্তিষ্ক, সরল যুবক—

বালাজীঃ—আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাষ্ট্রনীতি পরিচালক, আমি বিচলিত হতাম না গোস্বামীজী! অসুস্থ মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে আমি শিকলে বেঁধে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিতাম। জবাহির সিং—

নরিন্দরঃ—জবাহির সিং-এর কথা থাক পেশবা। গোটা হিন্দুস্থানের কিষাণেরা জর্জরিত হয়ে উঠেছে।

বালাজীঃ—রাষ্ট্র বিপ্লবে তাই হয় গিরি-মহারাজ, তাই হয়।

নরিন্দরঃ—তাই এক রাষ্ট্র বিপ্লবের পরে আবার রাষ্ট্র বিপ্লব আসে। পেশবা, তুমি একবার হৃদয় দিয়ে অনুভব কর। দুঃখের তাদের অন্ত নাই, মানুষ মরে যাচ্ছে—

বালাজীঃ—গোস্বামীজী, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। বিরাট যজ্ঞে অনেক বলির প্রয়োজন হয়। মৃত্যু তো পৃথিবীতে অবধারিত, বৃহতের প্রয়োজনে তাকে ত্বরিত করে দেওয়া হয়। শক্তি যেখানে নগ্নিকা, সেখানে তাই তার ধর্ম!

নরিন্দঃ—(গম্ভীরভাবে) পেশবা সমস্ত হিন্দুস্থানে আগুন জ্বলে উঠবে। উঠবে নয় বোধ হয় উঠল। বহ্নি আর বায়ু এক হয়ে গেল।

বালাজীঃ—(হাসিয়া উঠিল) বর্ষণে তাকে নির্ভিয়ে দেব। মেঘ আমার আয়ত্তে গোস্বামীজী! আমরাই মর্তের ইন্দ্র!

নরিন্দরঃ—পণ্ডিত! পণ্ডিত! পাণ্ডিত্যের তীব্রতা তোমাকে উন্মত্ত করে তুলছে। তুমি উন্মাদের মত মিথ্যা কল্পনার আকাশপ্রাসাদ রচনা করে তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ। নিজেকে নিজে প্রতারণা করছ! হয়তা বা (স্তব্ধ হইলেন)

বালাজীঃ—(হাসিয়া) হয়তো বা নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছি? অভিশম্পাত দিচ্ছেন গোস্বামীজী?

নরিন্দরঃ—না। বেদনায় আমার চোখে জল আসছে। তাই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম না। পেশবা, সন্ন্যাসী হয়েও তোমাকে স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি।

বালাজীঃ—গোস্বামীজী, আমার পুত্র পানিপথে, আমার মারাঠা বাহিনী পানিপথে, আত্মীয় বন্ধু সব সেখানে। স্নেহ, মমতা এসবের তৃষ্ণা আমার নাই।

নরিন্দরঃ—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। আত্ম-প্রবঞ্চনা করছ তুমি! ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর!

(নেপথ্যে প্রহরী)—মহামান্য পেশবা মহারাজ!

বালাজীঃ—মার্জনা করুন গিরি মহারাজ—আগে দেখি কি সংবাদ! (আগাইয়া গেলেন—) কি সংবাদ!

নে প্রহরীঃ—পানিপথের পত্রবাহক।

বালাজীঃ—পত্রবাহক! পানিপথের! কই? কোথায়?

(পত্রবাহকের প্রবেশ)

পত্রবাহকঃ—(অভিবাদন ও পত্রদান)

বালাজীঃ—(পত্র পড়িয়া মুঠা করিয়া পেষণ করিতে লাগিলেন পত্র)

নরিন্দরঃ—পেশবা!

বালাজীঃ—(পত্রবাহককে ইঙ্গিত করিলেন, যাও। সে চলিয়া গেল। স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া আপন মনে পত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন) অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। আমিদুল মুল্কের ষড়যন্ত্রে গোবিন্দ বুন্দেলা নিহত হয়েছে। নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করেছে শত্রু। অদৃষ্টের পাকচক্রে, দিল্লী থেকে অর্থবাহক দল রাত্রির অন্ধকারে ভ্রমক্রমে আমাদের শিবিরের পরিবর্তে আফগান শিবিরে উঠে তারা ধ্বংস হয়েছে। অর্থ হস্তগত হয়েছে শত্রুর। চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে একদল শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেও অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। দেওয়ান বলবন্ত রাও নিহত হয়েছেন। আমাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হয়েছে। বিনা অর্থে কৃষকেরা শস্য জোগাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে!"

নরিন্দরঃ—বালাজী রাও পণ্ডিত, তোমার নীতির তুমি পরিবর্তন কর। আদেশ দাও মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, আদেশ দাও পানিপথে মারাঠা বাহিনীর পাশে তাদের স্থান দেওয়া হোক, পণ্ডিত—

(নেপথ্যে প্রহরী)ঃ—মহামান্য পেশবা মহারাজ!

বালাজীঃ—(স্থির মুহূর্তেই দাঁড়াইয়া-ছিলেন)—কি সংবাদ?

(প্রবেশ করিল কর্মচারী)

কর্মচারীঃ—আহমদশাহ আবদালী এক পত্র পাঠিয়েছেন। এই পত্র।

(বালাজী প্রথম পত্র ফেলিয়া দিলেন। গিরি মহারাজ তুলিয়া লইলেন)

(বালাজী পত্র লইলেন। পড়িলেন। মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

বালাজীঃ—পত্রবাহক অপেক্ষা করছে?

কর্মচারীঃ—হ্যাঁ, মহামান্য পেশবা!

বালাজীঃ—উত্তর লেখ, শক্তিমান আবদালী, আমারও শক্তি আছে, আপনি তা স্বীকার করেছেন কিন্তু আপনার মত রূঢ় ভাষা আমার নাই। মার্জিত ভাষা যদি মনোমত না হয় মার্জনা করবেন। পাঞ্জাব চেয়েছেন, আর চেয়েছেন হজরত বেগম। পাঞ্জাবে আফগান এসে বাস করেছে বলে আফগানিস্থানের অংশ বলে দাবী জানিয়েছে। সে দাবী আমি অস্বীকার করি!—পাঞ্জাবে আফগানেরা বাস করেছে বলে পাঞ্জাব আফগানিস্থানের অংশ নয়, আফগানেরা এখানকার রুটি আর মাটির গুণে হিন্দুস্থান-বাসীতে পরিণত হয়েছে। আফগান যদি তা স্বীকার না করে, তবে ফিরে যাক তারা আফগানিস্থানে। আমার শিবিরের অবস্থার কথা লিখেছেন—আমি জানি, আমি জানি—আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা—

(একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন)

না! কোন কথা লিখতে হবে না। শুধু লিখে দাও একটি কথা।—'না।' আর কিছু না। শুধু—না! যাও।

(পত্রবাহক চলিয়া গেল)

গিরি মহারাজ! (গিরি মহারাজ তখন পত্র পড়িতেছিলেন)

নরিন্দরঃ—পণ্ডিত!

বালাজীঃ—আপনাকেও আমার উত্তর। না।

নরিন্দরঃ—বালাজী রাও পেশবা!

বালাজীঃ—আপনাকে আমার বন্দী করা উচিত, কিন্তু—

নরিন্দরঃ—(উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন) কর, কর, বন্দী কর পেশবা। পারত আমায় হত্যা কর। মহা ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশ করবে, সে দেখার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। হে শঙ্কর! দয়া কর! হে শঙ্কর!

বালাজীঃ—গিরিমহারাজ। (সরোষে)

নরিন্দরঃ—স্নেহ মমতার তৃষ্ণা তোমার নাই পণ্ডিত। কিন্তু তোমার ভয় আছে। ভয়ে তোমার অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপছে। হায় পণ্ডিত! হায় পেশবা! পণ্ডিত তোমার বুকের ভিতরে কাতরকণ্ঠ বাইরের কোলাহলে তুমি শুনতে পাচ্ছ না। পানিপথে মারাঠা বিপন্ন, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার ভাই সদাশিব—

বালাজীঃ—গোস্বামীজী—

নরিন্দরঃ—তোমার পুত্র কার্তিকেয়ের মত কুমার কিশোর বিশ্বাস রাওয়ের সম্মুখে ধ্বংস বিভীষিকা—

বালাজীঃ—গিরিমহারাজ। আঃ—। গিরি-মহারাজ।

নরিন্দরঃ—বিশ্বগ্রাসী কামনা আকাশস্পর্শী দম্ভ নিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে মরীচিকা রচনা করে চলেছ তুমি। মাথার উপরে তোমার নেমে আসছে উদ্যত বজ্র—তোমার ভ্রূক্ষেপ নাই। পায়ের তলায় মাটির মানুষের বুকে জড়িয়ে ধরে তোমাকে রক্ষা করতে চাইলে কাঁদলে তুমি শুনলে না। অথচ তুমি শঙ্কায় উদ্বেগে বিক্ষিপ্ত চিত্ত অধীর; থরথর করে কাঁপছ তুমি। পত্রখানির শেষ পর্যন্ত তোমার পড়বার ধৈর্য হল না পেশবা। পড়—পড় পেশবা পত্রের শেষ কয় ছত্র পড়! আমি চল্লাম—। সাত সপ্তাহ! চার সপ্তাহে এসেছে, আর তিন তিন সপ্তাহ। আমি চল্লাম পণ্ডিত।

বালাজীঃ—মহারাজ।

নরিন্দরঃ—অবসর নাই। পত্র পড়ে দেখ। (পত্র ফেলিয়া দিয়া) পানিপথ! পানিপথ। শঙ্কর! শঙ্কর।

(দ্রুত প্রস্থান করিলেন)

বালাজীঃ—(পত্র কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন) আ!—মাত্র সাত সপ্তাহের রসদ আমাদের বর্তমান। তাও এক বেলার হিসাবে। অর্থ-ভাণ্ডার শূন্য। তারপর জানি না। (আপন মনে বলিতে লাগিলেন)

তারপর জানি না। তারপর জানি না। হিসাব? হিসাব জানি না? হিসাব!

(মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়লেন)
(স্থির দৃষ্টিতে ভাবিতে লাগিলেন)
(যেন স্বপ্নের মত।)

আবদালীর রসদের পথ মুক্ত। অর্থভাণ্ডার শূন্য। পথে মারা পড়েছে। সাত সপ্তাহের রসদ বর্তমান! তারপর জানি না। গোবিন্দ বুর্দেনা মাই। সাত সপ্তাহ! সাত সপ্তাহের পরে? তার পরে? —খাদ্যাভাবে শীর্ণ মারাঠা! হিন্দুস্থানে মানুষ মারাঠার বিরোধী! হিন্দুস্থানে আগুন জ্বলে উঠেছে! বহ্নি এবং বায়ু মিলিত হয়েছে। তারই মধ্যে মারাঠা! সামনে—আশী হাজার পাঠান সৈন্য। আবদালী আহমদ শাহ! পরাজয় তার ভাগ্যে নাই! সাত সপ্তাহ! চার সপ্তাহ চলে গেছে। এক, দুই-তিন, তারপর? নিরুপায়-মারাঠা-বাহিনী—মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে চলল!

(থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

(যেন চোখে দেখিতেছেন)

ধুলো—উড়ল;—কেঁপে উঠল আকাশ;—এগিয়ে এল পাঠান—! প্রচণ্ড সংঘাত!

(চিৎকার করিয়া উঠিলেন)—বিশ্বাস রাও! সদাশিব! মারাঠা! মারাঠা!

(অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে) পানিপথ—পানিপথ! আমি যাব। আমি যাব। পানি-পথ!

প্রচণ্ড সংঘাত দ্যোতক শব্দ বালাজী রাও শুনিতে পাইলেন। শব্দ উঠিল। সব অন্ধকার হইয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

পানিপথ সন্নিহিত

গ্রাম্য প্রান্তরের জঙ্গল।

দৃশ্য সূচনায় অন্ধকারে সংঘাতদ্যোতক শব্দ এবং তোপধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার রেশ মিলাইয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে লাল আলো ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার আভাষ জাগিয়া উঠিল। পানিপথের শেষ তোপধ্বনি ধ্বনিত হইয়া ধীরে ধীরে সব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। জনহীন জঙ্গলের মধ্যে জবাহির সিংহের দল লুকাইয়া আছে। জবাহির ধীরে ধীরে একটি গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্থিরদৃষ্টিতে পানিপথ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিছন হইতে প্রবেশ করিল গন্নাবেগম। তাহার অংগে যোদ্ধার পরিচ্ছদ। কাঁধে বন্দুক! কোমরে তলোয়ার। সে পিছন হইতে আসিয়া জবাহিরের কাঁধে হাত রাখিল। জবাহির মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আবার পানিপথের দিকে চাহিয়া বলিল।

জবাহির:—মাট্টি লাল হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল পানিপথ। আসমানে তার ছটা বাজল; সারা আসমানটা লাল! ওঃ এখনও কি ধুলো উড়ছে দেখ! ধুলো পর্যন্ত রক্তের মত রাঙা! লাল। পাণিপথের লড়াই শেষ! মরা মানুষে পাহাড় হয়ে গিয়েছে। হে—ভগবান!

গন্না:—ভগবান! ভগবান কি করবে সর্দার? মানুষের করম ফল; মানুষের করম বাধিয়ে তোলে যুদ্ধ, যুদ্ধ নিয়ে আসে ধ্বংস। লোভে-হিংসায় মানুষ অন্ধা হয়ে যায় জবাহিরজী—বনে যায় জানোয়ার (জানবর); জানোয়ারের (জানবরের) মতই ডাক ছেড়ে এ-ওর ঘাড়ে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে, টুঁটি কামড়ে ধরে নিজেদের রক্তে আসমান মাটি লাল করে দেয়!

জবাহির:—তাই বটে রট্টা—তাই বটে! এত বড় ধরতি, এত এলাকা, এত ক্ষেতি, এত ফসল, এত পানি, তবু মানুষ খুসী হয় না। এক একজন মালিক সেজে মানুষকে ভুলিয়ে দল বেঁধে বলে সব আমার! ওদিক থেকে আর একজন বলে ওঠে—না! সব আমার! বাস—। পানিপথ!

গন্না:—তুমি যেন রাজা হয়ে বসো না মেরি সর্দার! তুমি যেন কিষাণ জাঠদের মালিক সেজে বলো না—সব আমার।

জবাহির:—না—রট্টা। না।

গন্না:—সর্দার দেখছ? ওই—! আ-হা-হা। হাতীর উপরে—মুখে লাল ছটা বেজেছে সন্ধ্যার আলোর—! জবাহিরজী—! ও কি ঘুমিয়েছে—? না—আঃ—মুখে যে সে কথা বলতে পারছি না সর্দার? তিন দিন আগে যে মরেছে তার এত রূপ?

জবাহির:—ওই—ওই কুমর বিশ্বাস রাও! আ-হা-হা! একেবারে ভবানীমায়ের কুমর কার্তিক! মরে গিয়েছে! আফ্গানেরা নিয়ে যাচ্ছে দেহটা! দেখাচ্ছে সকলকে—মারাঠা প্রধানকে তারা খতম করেছে! খত গেল পেশবার কাছে—দুটি মুক্তা—সাতাইশ মোহর—চাঁদির টাকা তামার দামড়ীর হিসাব নাই, পানিপথের ধুলোয় মিশিয়ে গেল! দুটি মুক্তা একটি কুমর বিশ্বাস রাও একটি মারাঠা প্রধান সদাশিব রাও ভাও! পানিপথ হা-রে পানিপথ, মারাঠা খতম হয়ে গেল পানিপথে!

গন্না:—আফ্গানও গিয়েছে! সেও খতম হবে। দুটো শেরে লড়াই হলে সর্দার একটা হয়তো তখুনি মরে, কিন্তু যেটা জিতেছে মনে ক'রে বন কাঁপিয়ে চেঁচায়—সেটা মরে দশ দিন পরে। ভাঙা পাঁজার ভোঁতা থাবা নিয়ে কান্দিরার মধ্যে গোঙায় ধুঁকে ধুঁকে মরে! আফগান মরবে!

জবাহির:—আফ্শোষ, আফ্শোষ রট্টা—হিন্দুস্থানের বুক কবরস্থান করে দিয়ে গেল লুঠেরা—তার কবর আমরা খুঁড়তে পারলাম না! মারাঠা আমাদের উপর কম জুলুমবাজী করেনি, কম ঘেন্না করেনি, বলত বান্দর—কিন্তু তবু তারা হিন্দুস্থানের শের তাই বহুত দুখ বহুত দুখ আমার মনে। আফগান লুঠেরা—ওঃ—আবদালীকে দেখলে শরীর শিউরে ওঠে; পেশবা বালাজী রাও—ব্রহ্মণ, আ—কি ঝকমক আলো তার মুখে তার কথায়! তাই দুখ মারাঠার জন্যে। আফগান আমাদের বলে—নেকড়া! আমরা নেকড়া আমরা তাকে ছিঁড়তে পারতাম—রট্টা!

গন্না:—ওঠ সর্দার আগুন জ্বালো!

(গন্না জবাহিরের হাত চাপিয়া ধরিল)

সর্দার! জখমী শেরটা কান্দাহারে তার কন্দরে ফিরবে! চল সর্দার নেকড়ার মত আমরা পাশে পাশে ছুটি! সুযোগ পেলেই কামড়াই!

জবাহির:—হাঁ, রট্টা—হাঁ! চলু! তাই যাব। যা নিয়ে যাচ্ছে মুখে ক'রে—তা যতটা পারি ছিনিয়ে নিয়ে আসব! রট্টা—যে মারাঠী বহুজীকে কাল আমরা বাঁচিয়েছি তার কান্না আমার বুকে এখনও বাজছে! কত বহু, কত বেটী এখনও আছে। ছিনিয়ে নোব তাদের—। হিন্দু এখনও আছে। ছিনিয়ে নোব তাদের—! হিন্দুস্থানের দৌলত যতটা পারি ছিনিয়ে নোব! চল যাব! হো—জাঠ-ভাইয়ো! হো—!

(নরিন্দর গিরির দ্রুত প্রবেশ)

নরিন্দর:—কে?—জবাহির?

জবাহির:—কে? গুরু মহারাজ? প্রণাম—বাবা গুরু।

(নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া আর উঠিল না বসিল)।

নরিন্দর:—জবাহির! পানিপথ শেষ?

গন্না:—শেষ গুরু মহারাজ!

নরিন্দর:—মারাঠা শেষ?

গন্না:—কিন্তু আমরা আছি মহারাজ!

নরিন্দর:—তোমরা আছ—যারা বেঁচেছে তাদের বাঁচাতে পেরেছ?

জবাহির:—যারা আমাদের এলাকায় এসেছে তাদের বাঁচিয়েছি। আমাদের রুটির ভাগ দিয়েছি, জল দিয়েছি। কিন্তু এখনও এখনও অনেক।

নরিন্দর:—কুমার বিশ্বাস রাও নাই?

গন্না:—নাই, মহারাজ নাই! হাতীর উপর তার শবদেহ দেখেছি মহারাজ;—ভাও মহারাজ হাতীর উপর কুমার সাহেবের দেহ চাপিয়ে তাকে দু চোখ ভ'রে দেখলে! কুমারের সে দেহ দেখে আফগানেরা হায়—হায় করে উঠল! ওঃ মহারাজ! কুমার যেন নিদ গেল!

জবাহির:—তারপর গিরি মহারাজ! ভাও সাহেব তার খোরাসানী ঘোড়ায় চড়ে হর হর ধ্বনি দিয়ে ছুটল। সংগে ছুটল—বড় বড়

মনসবদার দশ বিশ জন—আর শ দুয়েক সওয়ার! অাফগানের হাজার দু হাজার জম্বুরাক কামান গর্জে উঠল! চার পাঁচ হাজার সওয়ার ছুটে এল;—ধুলো উড়ল; বাস্—মরণ সমুন্দরের লোনা জলে নুনের পুতলীর মত তারা গলে গেল!

নরিন্দরঃ—শঙ্কর—শঙ্কর! তারপর?

জবাহিরঃ—তবু ভাওজী বীর মরেনি। মরণ হয়নি। তিন তিন ঘোড়া মরল। শেষ পায়ে গুলী বিঁধে পড়ল ভাও সাহেব। আবার উঠল। ভাঙা বর্শা—তারই পর ভর দিয়ে এগুলো আফগানদের দিকে! চোখে ভাসছিল মরণের স্বপন! আফগান এগিয়ে এল! তাদের চোখ—ভাও সাহেবের কানের মুক্তার দিকে—গলার মালার দিকে। পাঁচ আফগান—ঘিরলে—বললে—কাফির ফেলু তলোয়ার। ভাও আবার একবার চেঁচিয়ে উঠে তুললে তার তলোয়ার! তিনজনকে করলে জখম! নিজে পড়ল। আফগান তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেল! খতম হ'ল পানিপথ! কি করব গুরু মহারাজ! আমাদিগে নিলে না লড়তে। আমাদের পেলে কয়েদ করতে চাবুক মারতে হুকুম ছিল। নইলে—আমরাও মরতাম—। আফ্‌শোষ থাকত' না!

গয়াঃ—আফ্‌শোষ রাখব না। থাকবে না আফ্‌শোষ! চল আমরা যাব!

জবাহিরঃ—চরণ দাও গুরু মহারাজ! আমরা যাব!

গয়াঃ—আবদালী ফিরবে দিল্লী হয়ে আফগানিস্তান। জিতেছে সে কিন্তু পাঁজরা তার ভেঙেছে। ওই ঘা তার শুকুতে দেব না। বলে জংগলে পাহাড়ে লুকিয়ে আমরা পাশে পাশে ছুটব।

জবাহিরঃ—জখমী শেরের পাশে নেকড়ার মত। আবদালী আমাদের বলে নেকড়া! হাঁ! গুরু মহারাজ! কত বহু কত বেটী কত বালবাচ্চা তারা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—তা তুমি জান না। হিন্দু বাছে নি মুসলমান বাছে নি। লুঠেছে। নিজেরা বাজার বসিয়ে দামাড় দাম নিয়ে মানুষ বেচছে! হিন্দুস্থানের দৌলত বুঝি আর রাখে নি। এত সোণা রূপা জহরত মহারাজ যে—তামা-পিতল কাঁসার জিনিষ তারা ভেঙে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে! আমরা যত পারি ছিনিয়ে নেব!

নরিন্দরঃ—"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী!"

জবাহিরঃ—গুরু মহারাজ, কি বলছ তুমি?

নরিন্দরঃ—বলছি যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে যাত্রী!

জবাহিরঃ—আ! গুরু মহারাজের হুকুম মিলেছে—আশীষ মিলেছে—আর কি?—(হাত তুলিয়া ডাকিতে গিয়া হাত তুলিয়াই থমকিয়া বলিল) ও—কি?

নেপথ্যে বালাজীর কণ্ঠস্বরঃ—বিশ্বাস রাও! সদাশিব রাও ভাও! মারাঠা!

তিনি তাঁহাদের খুঁজিতেছেন। মস্তিষ্ক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। মারাঠারা যেন দূরে বা কাছে কোথাও রহিয়াছে। তিনি তাহাদের ডাকিতেছেন।

নরিন্দরঃ—(ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।) মৃদুস্বরে বলিলেন) পণ্ডিত। পেশবা বালাজী বাজীরাও!

গয়াঃ—দুর্ভাগা-পেশবা!

জবাহির ঃ—পেশবা মহারাজ বালাজী বাজী-রাও!—আ! (মৃদুস্বরে সবিস্ময়ে সসম্ভ্রমে)।

নরিন্দর ঃ—তোমরা যাও—জবাহির! চলে যাও নিজের পথে। পেশবা! পণ্ডিত বালাজী রাও! সে খুঁজছে তার মারাঠাকে তার সন্তানকে তার আত্মীয়কে সে তোমরা দেখো না! চলে যাও! দেখেছ? আলো জ্বালিয়ে মিছিল করে একটা তাঞ্জাম চললো দেখেছ?

নেঃ পেশবা ঃ—বিশ্বাস রাও! কুমার বিশ্বাস রাও! মারাঠা—!

জবাহির ঃ—হাঁ!—রট্টা!—হে—জাঠ ভেইয়ো—হে!

চাপা গলায় হাঁকিতে হাঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

নরিন্দর গিরি দাঁড়াইয়া রহিল অন্ধকার হইল মঞ্চ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আহমদশা আবদালীর শিবির।

অন্ধকারের মধ্যে শব্দ হইল—ধীরসে—তাল্লাস! ধীরসে!

আলোর মধ্যে দেখা গেল শিবিরের মধ্যে তাঞ্জাম

নামান! বাহির হইতে প্রবেশ করিল আবদালী! ক্রুদ্ধ উল্লাসে উল্লসিত—' আ শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল!

আবদালী ঃ—আ। ফকিরিণী বেগম! ফকিরিণী বেগম! এসেছিস? আসতে হয়েছে? এইবার? এবার ফকিরিণী? কি করবি?

হজরত ঃ—কি করব? শাহানশাহকে মালা দেব।

(বাহির হইলেন তাঞ্জাম হইতে)

আবদালী (হাসিয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলেন)—

হজরত ঃ—(সাপের কঙ্কাল গাঁথা মালা বাহির করিয়া ধরিল) নাও মালা শাহনশা। মালা? নাও।

আবদালী ঃ—(পিছাইয়া গেল) আ!

হজরত ঃ—ভয় পেলে শাহ আবদালী! সাপের মণির মালা! পর! পরবে না? তবে আমি পরি!

আবদালী ঃ—(ছোরা বাহির করিল) শয়তানী!

হজরত ঃ—শাহান শা! মরণকে আমি ভয় করি না। সাপের বিষ মাখানো কাঁটা আমার সঙ্গে। মরতেই আমি এসেছি! আমাকে তুমি মারবে আমি কোন রকমে তোমার হাতে কাঁটাটা বিঁধে দেব। তুমি মনে করেছ পানি-পথে জিতেছ বলে সারা হিন্দুস্থানকে জিতে নিয়েছ? না না তুমি জেতনি। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি। নইলে ঘরেই মরতাম!

আবদালী ঃ—তোর এত বড় সাহস পচা বাদশাহের ঘরের বেটী! আমি জিতি নি?

হজরত ঃ—তোমার চোখে-মুখে হারের ছাপ পড়েছে শাহনশাহ। কথাটা বলতেও তুমি জোর পেলে না! জিতেছ তুমি? জিতেছ? তোমার অর্ধেক ফৌজ খতম!

আবদালী ঃ—এ—ও! (চীৎকার করিয়া উঠিল)

হজরত ঃ—তোমাকে আমি ভয় করি না শাহনশাহ। তোমাকে ভয় আমি জয় করেছি। হাতে আমার এই কাঁটা আমার হাতিয়ার। জিন্দিগীর কোন দাম আমার নাই, মৃত্যু কামনা আমার বর্ম। কেন ভয় করব তোমাকে? তুমি যখন নাজর শাহের নোকরী করতে, তখন তো ভয় করতাম না। আজ কেন করব? তুমি জেতনি শাহনশাহ। ইসলামের জিগীর তুলে মারাঠাকে খতম করেছ। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলমান আর তোমাকে চাইবে না। বেশিদিন থাকলে তারাই তোমাকে খতম করবে। পালাও তুমি শাহনশাহ—তুমি পালাও। হিন্দু চাষীর সঙ্গে মুসলমান চাষীও খেপবে। আর তারা মানবে না। পেটের জ্বালা—বুকের জ্বালা—জ্বলবে এবার। ইসলামের ধ্বজা তুলে তুমি বাঁচবে না।

আবদালী ঃ—অধর্মী তুই! তাই তোর এমন মতি!

হজরত ঃ—হাঁ! তুমি খাঁটী মুসলমান! জেনানী হল জননী, তার ইজ্জত তুমি পায়ের তলায় দলে দাও। তুমি মুসলমান! মানুষ খোদাতয়লার সৃষ্টি তার গলা কেটে তুমি নাচ! তুমি মুসলমান! তুমি ঘর জ্বালাও, তুমি লুঠ কর, তুমি মুসলমান! ধার্মিক! আমি অধর্মী!

আবদালী ঃ—(চীৎকার করিয়া) আরে—তুই কাফিরের মহব্বতিতে দেওয়ানা।

হজরত ঃ—ঝুট! ঝুট্! ঝুট্!

আবদালী ঃ—পেশবার বেটা বিশ্বাস রাওয়ের সুরত দেখে তুই ভুলিস নি?

হজরত ঃ—ভুলেছি! সুরত দেখে কে না ভোলে? আবদালী তার সুরত দেখে তোমার আফগান রিসালারা হায় হায় করেছে! মাথা কেটে বর্শায় গাঁথা তোমাদের উল্লাস বিলাস! তার সুরত দেখে তোমরা তার মাথা কাট নি! তেমনি ভুলেছি আমি! মহব্বতি নয়!

আবদালী ঃ—জরুর মহব্বতি! তোর মহব্বতির কিচ্ছা আফগানিস্তানে বসে আমি শুনেছি! শাহ ফানা আমাকে বলেছে!

হজরত ঃ—মানুষের মনে—একটা মক্ষি—মাছি আছে শাহ আবদালী। তারা মধুর উপর বসে তাতে বিষ মাখিয়ে দেয়।

আবদালী ঃ—ওরে লৌণ্ডি—

হজরত ঃ—খবরদার আবদালী—আমি শাহজাদী!

আবদালী ঃ—শাহজাদী! (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

হজরত ঃ—শাহজাদী বলতে যদি ঘেন্না হয়, তবে ফকিরীণি বল! আমি ফকিরীণি!

আবদালী ঃ—আ। ফকিরীণি! আরে ফকিরীণি—তোর কথা সত্যি তার সাবুদ কি?

হজরত ঃ—সাবুদ দেব খোদাতয়লার কাছে। তোমার কাছে কি দেব? আমি বলে যাই, বিশ্বাস করতে হয় কর—নয় করো না। পেশবার বেটার সুরত দেখে ভাল আমার লেগেছিল—

চোখে নেশার সুরমা পরিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল ওকে না পেলে দুনিয়ার কোন দাম নেই, জিন্দিগীর কোন দাম নেই। হয়তো তারও লেগেছিল ভালো। কিন্তু আমি মুসলমানের বেটী, আমি ধরম ছেড়ে কেন তার জন্য দেওয়ানা হব? সেও হয়নি! সে যদি তার ধরম ছেড়ে বলত আমি শুধু মানুষ, তবে আমি বলতাম—

আমি মানুষ। সে-ও তা করেনি, আমিও করিনি। আমি খোদার নাম জপ করে—নিজেকে জয় করেছি। শাহ আবদালী এই কথা বলতে চেঁচিয়ে বলতে শুধু তোমার এখানে এসেছি! নইলে এ কাঁটা আমার বিছানায় থাকে।

আবদালীঃ—ফেলে দে ও কাঁটা! ফেলে দে ও মালা!

হজরতঃ—(হাসিয়া উঠিল)—ডর লাগছে?

আবদালীঃ— সয়তানী— ডাইনী, তোকে সায়েস্তা করব আমি। বহুত অওরৎ আমি দেখলাম।

হজরতঃ—হাঁ তা দেখেছ। দেখেছ তুমি যে অওরৎ প্রাণ ফাটিয়ে কেঁদেছে সে অওরৎ তোমার ছুরির ভয়ে চুপ হয়ে গেছে। তুমি দেখেছ কতজন তোমার মুখ দেখে ভয়ে নিষ্প্রাণের মত আত্মসমর্পণ করেছে। তুমি দেখেছ দিল্লীর বাদশাহের বেটী নাদিরশাহের বেটার বহু আয়ফতকে, সে সভয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তুমি দেখেছ বেগমকে সে অঝোর ঝরে কেঁদে বিষ খাব বলেও খেতে পারেনি। তুমি দেখেছ হয়তো হাজারো এমনি অওরৎ। তা থেকেই তুমি তৈরী করেছ অওরৎদের স্বভাবের ইতিহাস! হাঁ সে ইতিহাসের বিচার তুমি নির্ভুল করেছ বটে। অসহায় অওরৎ—শেষমুহূর্তে জীবনের মায়ার হার স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে তারপর সয়ে যায়, আবার হাসে আবার গান গায়। কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়ায় প্রাণটা হেলায় দেয় এমনও তো না-দেখা নও! কেন মনে থাকে না? তাই তাই তোমাকে আমি ভয় করি না! দেখবে? তুমি দেখবে?—দেখবে?

(কাঁটাটি নিজের গলায় বসাইয়া দিল)

আবদালীঃ—হাকিম! হাকিম!

হজরতঃ—হাকিমের সাধ্য নাই শাহ আবদালী! বৃদ্ধ গোখরোর বিষ! ফাঁপা কাঁটার ভিতরটা পূর্ণ হয়ে আছে! শুইয়া পড়িল একটি আসনে)

আবদালীঃ—(ছুঁইতে গিয়া ছুঁইতে পারিল না।)—

হজরতঃ—ছুঁয়ো না—আমাকে ছুঁয়ো না। শুধু ঢেকে দাও কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। চিৎকার করব না। নিঃশব্দে মরব আমি।

(আবদালী ঢাকিয়া দিল)

আবদালীঃ—(কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) আরে লৌণ্ডি! আরে লৌণ্ডি!

(তরুণীর প্রবেশ)

তরুণীঃ—জাঁহাপনা!

আবদালীঃ—(ছোরা বাহির করিয়া) তোকে খুন করব আমি। তোর কলিজা চিরে বের করে কুত্তাকে খাওয়াব আমি!

তরুণীঃ—জাঁহাপনা!

আবদালীঃ—না! না। তুই না! জেহান খাঁ!

(জেহান খাঁর প্রবেশ)

জেহানঃ—জাঁহাপনা!

আবদালীঃ—শাহফানা! শাহফানা! তাকে। —তার চোখ দুটো তুলে দাও। যে চোখে সে নসীব গুণেছে সেই চোখ দুটো! আমাকে!

(জেহান প্রস্থান করিল)

(আবদালী ধীরে ধীরে গিয়া হজরতের মুখের কাপড় তুলিল)

আ! নীল হয়ে গেল!

(কাপড় ঢাকিয়া দিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তরুণীটি দাঁড়াইয়া আছে)

লৌণ্ডি!

তরুণীঃ—জাঁহাপনা!

আবদালীঃ—আমি হেরে গেলাম! হাঁ আমি হেরে গেলাম! এত বড় ফৌজ আমার অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। হিন্দোস্থানের নবাব আমীররা ভিতরে ভিতরে শল্লা জুড়েছে! এখানে থাকলে খতম ক'রে দেবে আমাকে। এতটা পথ কান্দাহার আমি ফিরব কি ক'রে? পেলাম কি? কি নিয়ে ফিরব? আ! আমি হেরে গেলাম!

(নাজিব খাঁর প্রবেশ)

নাজিবঃ—শাহানশাহ! পেশবা ফৌজ নিয়ে রওনা হয়েছে শুনে খবর নিতে পাঠিয়েছিলাম! পেশবা আসছিল। কিন্তু পথে পানিপথের খবর শুনে পাগল হয়ে গেছে।

আবদালীঃ—পাগল হয়ে গেছে? আঃ খোদা! (নেপথ্যে বালাজীর কণ্ঠস্বর যেন তাহার কানে ভাসিয়া আসিল) বিশ্বাস রাও! সদাশিব রাও—ভাও! মারাঠা!

আবদালীঃ—ওঃ! শাহ নাদের পাগল হয়েছিল!

নাজিবঃ—তবে পাঞ্জাবের খবর সত্যি। শিখেরা বহুত সোর তুলেছে!

আবদালীঃ—আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল নাজেব খাঁ!

নাজিবঃ—কেন জাঁহাপনা?

আবদালীঃ—পানিপথের পর আমার তাগদ যেন নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু ছিল, তাও আজ গেল!

নাজিবঃ—কি হয়েছে শাহন শাহ?

আবদালীঃ—তা বলতে পারব না। কেউ জানবে না তা দুনিয়ায়। দেব না জানতে। শুধু এইটুকু বলছি পানিপথের জয়—নাজিব খাঁ—। আমি যদি পাগল হয়ে যাই নাজিব খাঁ!

(নেপথ্যে পরপর কয়েকটি গুলীর আওয়াজ হইল)।

(তাবুর দরজা হইতে একটা সিপাহী আসিয়া লুটাইয়া পড়িল)।

এ—কি? গুলী?

(নেপথ্যে হইতে ভাসিয়া আসিল) হো-হো-হো! হো-হো-হো, হো-হো-হো! হো-হো-হো—হো!

আবদালীঃ—আ। নেকড়া! নেকড়া!

নেপথ্যেঃ—বাত্তি নিভাও—বাত্তি নিভাও। নেকড়া!

(আবার বন্দুকের শব্দ হইল)

আবদালী নিজে ফুঁ দিয়া বাতি নিভাইয়া দিল।
রঙ্গমঞ্চে রাত্রি ফুটিয়া উঠিল।

আবদালীঃ—নাজিব। জলদি, জলদি ছাউনি তোল। জলদি! কবরস্তান পানিপথ! কবরস্তান! (নাজিব ছুটিয়া চলিয়া গেল)

নেপথ্যে বালাজীঃ—মারাঠা! মারাঠা! মারাঠা!

অন্য দিকে নেপথ্যেঃ—হো-হো-হো। হো-হো-হো। হো-হো-হো।

আবদালী তাঁবুর দরজার পর্দা খুলিলেন, দূরে পাহাড়ের আড়ালে নীলাভ অন্ধকারে দেখা যাইতেছে জবাহির, গঙ্গা—মধ্যস্থলে নরিন্দর।

নরিন্দরঃ—পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী হেচির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি! (ফেলিয়া দিলেন পর্দা।)

এই সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিলাইয়া—হো-হো-হো! হো-হো-হো।

দারুণ বিপ্লব মাঝে
তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা
হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!

যবনিকা

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩৩

এ পর্যন্ত নষ্টামির যে তিনটি উদাহরণ বৃত করেছি, সেগুলির কোনওটিকেই ঠিক 'নিষ্টামি' বলা চলে না। সেগুলি এক ক্ষকে, অর্থাৎ উত্তম পক্ষকে যতটা তুকান্বিত করেছে, মধ্যম পক্ষকে ততটা ীড়িত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। এবার ষ্টামির যে কাহিনীটি বলতে উদ্যত হয়েছি, তে মধ্যম পক্ষকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত এবং পদ্রুত করা হয়েছে। সুতরাং এ উদাহরণটিকে নিষ্টামির' পর্যায়ে ফেলা চলে।

সত্য সত্যই অনিষ্ট করবার কতটা অভিসন্ধি ক্ষেত্রে ছিল, তা বলা কঠিন। বস্তুত যে পরিমাণ নিষ্ট করা হয়েছিল, তা' দেখে পাঠকেরা শ্চয়ই ক্ষুব্ধ এবং পীড়িত বোধ করবেন। দিক থেকে বিচার করলে এ কাহিনীটি হয়ত বৃত না করলেই ভালো ছিল। কিন্তু নিছক াহিত্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে গল্পটির শ একটু মূল্য পরিলক্ষিতও হবে। কয়লার ক প্রান্তে নিবদ্ধ হীরককণার ন্যায় এর একটি জ্জ্বল দিকও আছে।

গল্পটি আমি ইতিপূর্বে বন্ধু-বান্ধবের ঠকে কয়েকবার বিবৃত করেছি। সকলেরই নে গল্পটি একটা ক্ষোভ ও বিরক্তিমিশ্রিত দনা জাগিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্র কৌতুকরসের আনন্দের সৃষ্টি করতেও ড়েনি। কাহিনীটি শুনলে রসজ্ঞ পাঠকেরা ঝতে পারবেন এ কাহিনীতে যে কৌতুকরস-সম্পন্নতা আছে, তা সত্যই সাহিত্যের বস্তু।

আমার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় এবং বিশিষ্ট বন্ধু সুকবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় আমার মুখে এই গল্পটি শুনে বিশেষ পুলকিত হয়েছিলেন এবং গল্পটি যাতে সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে, অজানার তিমিরগর্ভে হারিয়ে না যায়, সেজন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। আজ এ কাহিনীটি লিখতে উদ্যত হয়ে সুরেনবাবুর কথা সহসা মনে পড়ে গেল।

গল্পটি পূর্বোক্ত কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শোনা। নষ্টামি করবার বিষয়ে কামিনীবাবু যে সহজ ও অসামান্য নিপুণতার অধিকারী ছিলেন, তা'তে আমার সন্দেহ হয়েছিল তিনিই এ গল্পের নায়ক, অর্থাৎ প্রথম পক্ষ; পরিকল্পনাটি তাঁর মতো চতুর লোকের দ্বারাই উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হবার উপযুক্ত। তিনি কিন্তু সে কথা অস্বীকার করেছিলেন। হতেও পারে; গুরুরও গুরু থাকা ত অসম্ভব নয়। এবার কাহিনীটি বলি।

দীর্ঘকাল পূর্বের কথা। তখন ভারতবর্ষে সেন্সাসের কাজ চলছে। ভাগলপুর ডিভিশনের প্রধান অফিস ভাগলপুর শহরে অবস্থিত। সেই অফিসে কামিনীবাবু কাজ করেন।

সেন্ট্রাল সেন্সাস অফিসের আট-দশটি বাঙালী কর্মচারী কামিনীবাবুর সহিত একত্রে মিলিত হয়ে যোগসর পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া নিয়ে বাস করে। মেসের সকল সদস্যই অবিবাহিত, একমাত্র রামনাথ লাহিড়ী ব্যতীত।

রামনাথের নিবাস পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায়। তার এক পায়ে কুশ-দোষ ছিল বলে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। মেসের সদস্যরা সামনে তাকে রামদা বলে ডাকত, আড়ালে বলত খোঁড়ারাম। পল্লীর অবাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট রামনাথ 'লংড়াবাবু' নামে পরিচিত ছিল।

প্রথমে চার-পাঁচটি যুবক মিলে বাসাটির পত্তন করে। তারপর ক্রমশ এক একজন করে যোগ দিয়ে দলবৃদ্ধি করেছে এবং দেখতে দেখতে মিছরির সরবতে মিছরির টুকরার মতো বেমালুম মিশে গেছে। রামনাথ কিন্তু সেই যে প্রথমদিন মিছরির সরবতে পাথরকুচির মতো পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে যে পাথরকুচি সেই পাথরকুচিই রয়ে গেছে। না পাথরকুচি খানিকটা গলে সরবতের মধ্যে মিশেছে, না সরবত দুশ্ছেদ্য পাথরকুচির মধ্যে কতকটা অনুপ্রবিষ্ট হতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মেসে দুটি দল বর্তমান —একটি মিছরির সরবতের, অপরটি পাথরকুচির। পাথরকুচির দলে রামনাথ অবশ্য একাই এক শ'।

উভয় দলের মধ্যে এতটা বিস্তৃত পার্থক্যের সহজে প্রতীয়মান কয়েকটা কারণ ছিল। বয়সে রামনাথ অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে পাঁচ-ছ' বৎসরের বড় ত' ছিলই, তা ছাড়া সে ছিল বেশ খানিকটা নীরস সত্যবাদী সততাধিক্য কঠোর রূঢ়ভাষী মানুষ। একমাত্র ভর্ৎসনার বিদ্রূপাত্মক হাসি ভিন্ন অন্য কোনো শ্রেণীর হাসির সহিত তার মুখের বড় একটা পরিচয় ছিল না। কৌতুক-পরিহাসকে সে মানুষের আদিম বর্বরতার অন্তগমনোন্মুখ চিহ্ন বলে মনে করত; আর গান-বাজনা-খেলাধূলাকে সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ব্যসন মনে করে পাশ কাটিয়ে চলত।

গৃহের মধ্যে একটি ছোট ঘর ছিল, তাতে দুজনের বাস করা কষ্টকর নয়। কিন্তু 'দুর্জনকে বর্জন করো' নীতি অবলম্বন করে মেসের সদস্যরা একা রামনাথকে সে ঘরে নির্বাসন দিয়েছিল। রামনাথও তার হাস্য-পরিহাসপ্রিয় গীতিগুঞ্জনপরায়ণ লঘু প্রকৃতি সঙ্গীদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করবার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর কয়েকজন সদস্য একত্র হয়ে হয়ত' তাস খেলায় অথবা গান-বাজনায় বসে। ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বহুদিনের পুরাতন একখানি জীর্ণ চৈতন্য-চরিতামৃত খুলে পড়তে বসে রামনাথ। তাসের হর্‌রা অথবা গানের উচ্ছ্বাস উদ্দাম হয়ে উঠলে চৈতন্যচরিতামৃত বন্ধ করে সে উঠে পড়ে; তারপর ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে নিকটবর্তী বুঢ়ানাথের ঘাটে গিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তথায় কাটিয়ে ততক্ষণে তাস ও গানের দৌরাত্ম্য থেকে গৃহ মুক্তিলাভ করেছে অনুমান করে বাসায় ফেরে।

একদিন বিজয় নামে এক মেম্বার দাবা খেলায় রামনাথকে আহ্বান করেছিল। উত্তরে রামনাথ বলেছিল, তোমাদের সেই শুঁড়বিহীন গজের খেলা ত' বিজয়? ছেলেবেলায় হাত-পাবিহীন কাঠের পুতুল নিয়ে হয়ত খেলা করেছিলাম, কিন্তু এখনো যদি শুঁড়বিহীন কাঠের গজ নিয়ে খেলা করি, তাহ'লে বয়সের সামঞ্জস্য থাকবে ত?"

উত্তরে বিজয় বলেছিল, "তোমার মুখে শুনেছি রামদা, দেশে তোমাদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছে। হাত-পা মুখ-চোখ-বিহীন সেই শিলাখণ্ডকে এই বয়সে তুমি কোন্ সামঞ্জস্যের জোরে পুজো কর, বুঝিয়ে দিতে পার?"

রামনাথ উত্তর দিয়েছিল, "তুমি শুঁড়-বিহীন কাঠের গজের খেলোয়াড়, হাত-পাবিহীন শিলাখণ্ডকে পুজো করবার মর্ম কেমন করে তোমাকে বোঝাতে পারি বল?"

হা হা করে হেসে উঠে বিজয় বলেছিল, "পার না ত? তা হলে, না খেলেও শুঁড়বিহীন কাঠের গজের চালে তুমি মাৎ হয়েছ রামদা! প্যারা উচিত ছিল তোমার। আমি কিন্তু তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।"

এই ধরণের বাদ-বিসম্বাদ বিতর্ক-বিরোধ রামনাথ এবং অপর সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই লেগে থাকত। কিন্তু এসব নিয়েও একত্রে বাস করা চলে, এমনকি, উভয়পক্ষ থেকে খানিকটা শ্রদ্ধা-স্নেহের আদান-প্রদানের সহিতও। বস্তুত,

রামনাথের সরল চরিত্র এবং নিষ্কলুষ প্রকৃতির জন্যে মেসের অপর মেম্বাররা মনে মনেও তাকে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখত, তার কঠোর আচরণ এবং রূঢ় বচনকে কতকটা হাতীর লাথির মতো তারা সহ্য করত।

এতদিন এই বিরোধ এবং মতভেদ চলছিল সংসারের লঘু এবং কতকটা অগার্হিত বিষয়কে আশ্রয় করে। সুতরাং তার গ্লানি অন্তরের গভীর প্রদেশ স্পর্শ করতে পারত না। তাস খেলাকে প্রতিরোধ করা চলত চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতসাগরে ডুব মেরে; গানবাজনার প্রতিবাদ করা চলত, রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত বুড়ানাথের ঘাটে নিঃশব্দে বসে কাটিয়ে। কিন্তু লখিয়া নামে পনের ষোল বৎসর বয়সের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের সহসা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পর থেকে মতভেদ হয়ে উঠল প্রখর। নরম মৃত্তিকার ক্ষেত্রে যে বিরোধ এতদিন ছিল সাধারণ, নীতির কঠিন পাষাণে শাণিত হয়ে, অন্তত রামনাথের দিক থেকে, সে বিরোধ হয়ে উঠল সুতীক্ষ্ন।

মেয়েটি এতদিন ছিল তার মামার বাড়িতে; অকস্মাৎ একদিন পিত্রালয়ে এসে উপস্থিত হওয়ার সমস্ত পল্লীটা একটা নূতন আলোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মুদীর মুখে সহাস্য কুশল প্রশ্ন; সঙ্গিনীদের মুখে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি; পথচারীদের নেত্রে সানন্দ বিস্ময়ের উচ্ছল আলোক। মেসবাবুদের দ্বিতলের বারান্দাও এই নবাগত আলোকের প্রভা থেকে পরিত্রাণ পেলে না। একমাত্র রামনাথ ব্যতীত একে একে আর সকলেই এই নূতন আলোকের কিরণধারায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অপ্রয়োজনে লখিয়াকে কখনো গৃহের বাইরে দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু দুটি জায়গায়, প্রথমত, প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসার পথে, দ্বিতীয়ত রাস্তার কলের জলের হাইড্রান্টে। হাইড্রান্টটি সেন্সাস বাবুদের মেসের ঠিক সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে অবস্থিত। শূন্য কলসী কাঁখে নিয়ে লীলায়িত গতিতে লখিয়া জল ভরতে আসে, সে এক অপরূপ দৃশ্য। ভূমিতলে কলসী স্থাপন করে হাইড্রান্টের দেহের উপর নিজের দেহবল্লরী হেলিয়ে দিয়ে ঘনপক্ষ্ম আয়ত নেত্রের স্তব্ধনত দৃষ্টির দ্বারা জলভরা দেখতে দেখতে লখিয়া চিত্রকরের পক্ষে লোভনীয় বিষয়বস্তু রচিত করে; তারপর, কুম্ভপূর্ণ হয়ে গেলে মাথার উপর কলসী বসিয়ে বাম হাতখানি আলগাভাবে কলসীর দেহে স্থাপন করে ডান হাত ঈষৎ আড়ভাবে আড়ষ্ট করে গৃহে ফেরে,—সেও এক কম অপরূপ দৃশ্য নয়। সকালবেলা গঙ্গাস্নানের পর লখিয়া তার ষোল বৎসর বয়সের সুঠাম দেহযষ্টি সিক্তবস্ত্রে আবৃত করে গৃহে ফেরে, পাশের মুদিখানার দোকান থেকে বৃদ্ধ দেওকী-নন্দন লখিয়ার এই উচ্ছল যৌবনোৎসব দেখে, আর, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার তার পঁচিশ বৎসর বয়সের কথা স্মরণ করে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। লখিয়ার অদেহী নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য তাকে পঁয়ত্রিশ বৎসরের অতীতে টেনে নিয়ে যায়।

একদিন সকাল বেলা মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরেশ নামে এক মেম্বার পথের লোক চলাচল দেখছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ চোখে পড়ল লখিয়াকে। জলের হাইড্রান্টের ওপর ভর দিয়ে লখিয়া জল ভরছে। সৌন্দর্যের একটি কমনীয় লীলা হাইড্রান্ট বেষ্টন করে রয়েছে, যৌবনরসমর্মীর চক্ষে ভারি ভাল লাগল পরেশের। ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থেকে দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করে পরেশ বললে, "সুকুমার শীগগির!"

তাড়াতাড়ি পরেশের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে পরেশের অঙ্গুলি নির্দেশে লখিয়াকে দেখতে পেয়ে সুকুমার একমুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়াল; তারপর ধীরে ধীরে বললে, "সত্যিই অপরূপ পেখনু রামা! মুখখানি যে হরিণহীন হিমধামা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!"

পরেশ বললে, "তুমি কবি মানুষ, তাই তাড়াতাড়ি তোমাকে খবর দিলাম।"

সুকুমার কবি মানুষ হতে পারে; কিন্তু দিন দুয়েকের মধ্যে বোঝা গেল, একমাত্র রামনাথ ব্যতীত মেসের কোনো সদস্যই অকবি নয়; লখিয়া কাব্যসুধারস বিষয়ে সকলেই একই মাত্রায় রসিক। উৎসাহী বিজয়কুমার চিনি কিনতে গিয়ে কথায় কথায় বৃদ্ধ দেওকীলালের কাছ থেকে লখিয়া নামটাও সংগ্রহ করে আনলে। শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হল। লখিয়া নাম যে অতি সুমিষ্ট নাম, এমনকি, বাঙলা দেশের 'অমিয়া' নামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা গেল না।

সুকুমার বললে,

"লখিয়া লখিয়া বাজিছে শ্রবণে,
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
লখিয়া লখিয়া লখিয়া নাম!"

উল্লাসের সমুচ্চ হাস্যরবে মেস-গৃহ চকিত হয়ে উঠল!

এর পর মেসের সদস্যদের মধ্যে লখিয়া-সন্দর্শনের উৎসাহ দিনে দিনে বেড়েই চলল। সমাজ এবং পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অনূঢ় যুবকের হৃদয়ে লখিয়া মোহের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে দাঁড়াল।

কথাটা রামনাথ খানিকটা উপলব্ধি করলে, খানিকটা শুনলে। লখিয়ার নামটাও তার জানতে বাকি রইল না। লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভের গ্লানিতে তার হৃদয় পীড়িত হয়ে উঠল। ছি ছি! ভদ্রসন্তান বলে নিজেদের পরিচয় দিতে যারা ইতস্তত করে না, তাদের এই হীন আচরণ! নীতি কি তাহলে শুধু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে, মানুষের জীবনে কোনোদিন তা দেখা দেবে না? মনে মনে সে সংকল্প করলে, এই মলিন আচরণ সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সে এর প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে। তা যদি না করে তাহলে এ মেসে থাকবার যোগ্য সে নয়।

লখিয়া কলে জল ভরছিল, আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরেশ প্রভৃতি কয়েকজন তাকে দেখতে দেখতে তার সম্বন্ধে সরস আলোচনা করছিল, এমন সময়ে রামনাথ তথায় উপস্থিত হয়ে রূঢ় কণ্ঠে বললে, "কি তোমরা দেখছ ওখানে?"

শান্ত কণ্ঠে বিজয় বললে, "লখিয়াকে ছ রামদা!"

"কেন দেখছ?"

উত্তর দিলে শৈলেশ নামে এক সদস্য; ল, "Simply because আমাদের চোখ হ।"

শৈলেশের প্রতি তীব্র নেত্রে দৃষ্টিপাত করে াথ বললে, "আছে কি চোখ তোমাদের? ার ত' মনে হয় নেই। থাকলে চক্ষুলজ্জাও ত!"

স্মিতমুখে সুকুমার বললে, "আমার মনে তোমারও চোখ নেই রামদা। থাকলে য়াকে তুমি দেখতে।"

একটা সমবেত উচ্চহাস্যে রাজপথ চমকিত উঠল। কৌতূহলী হয়ে লখিয়াও বোধ- একবার বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে কতকগুলো রোনাস্তি কঠোর বাক্য বলে রামনাথ দুই অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

পরেশ বললে, "তোমার কোপ দেখে মনে সত্যিই তুমি বরিশালের রামদা। এক পেই তুমি আমাদের সকলকে সাবাড় করতে!"

কঠোর স্বরে রামনাথ বললে, "বরিশালের দার হাত থেকে তোমরা হয়ত রক্ষা পেতে া। কিন্তু যে পথে চলেছ সেই পথেই চলো, তাহ'লে ভাগলপুরের ডান্ডা থেকে াদের নিস্তার নেই; একদিন তা তোমাদের গুঁড়ো করবেই।"

আর অপেক্ষা না করে ঝড়ের বেগে রামনাথ ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে।

এর পর থেকে সর্বদাই উভয় পক্ষের মধ্যে র্ষ বাধতে লাগল। কিন্তু কেউ কাউকে স্ত করতে পারে না। একপক্ষের চক্ষু এবং র পক্ষের জিহ্বা সমানে পরস্পরকে টক্কর য় চলে।

একদিন সকাল বেলা রামনাথ সবেমাত্র চরিতামৃত খুলে বসেছে, এমন সময়ে প্রবেশ করল শৈলেশ, সুকুমার প্রভৃতি চার জন বন্ধু। বইয়ের পাতায় একটা স্লিপ য় বইখানা মুড়ে রেখে রামনাথ বললে, ব্যাপার?"

গম্ভীর মুখে শৈলেশ বললে, "কাল রাত্রে সুকুমার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে দা, আমরা তার কোনো অর্থ করতে ছিনে। তুমি ত' স্বপ্ন-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক শুনো করেছ, তুমি যদি ওর অর্থটা বাৎলে ত পার।"

অসংশয়িত চিত্তে রামনাথ জিজ্ঞাসা করলে, স্বপ্ন দেখেছে?"

শৈলেশ বললে, "স্বপ্ন দেখেছে, ও যেন আমাদের মেসের সামনে জলের কলের হাইড্রান্ট হয়েছে।"

যে কৌতুকহাস্য এতক্ষণ সযত্নে অবরুদ্ধ ছিল, তাকে আর কিছুতেই সামলে রাখা গেল না, সজোরে মুক্তিলাভ করলে।

নিমেষের জন্যে রামনাথের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠল; কিন্তু মনে মনে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বললে, "স্বপ্নটা সুকুমার এখনো সবটা দেখেনি; দেখতে আর একটু বাকি আছে। সেটুকু দেখা হয়ে গেলে অর্থটা তোমাদের কাছেও আর অস্পষ্ট থাকবে না। আজ শেষরাত্রে সুকুমার স্বপ্ন দেখবে, আমাদের পাড়ার চম্পা মেথরাণী তার নোংরা ঝাঁটাটা সেই সুকুমার-হাইড্রান্টের গায়ে মেরে মেরে পরিষ্কার করছে।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে রামনাথের কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

রামনাথ বলতে লাগল, "শোন শৈলেশ, তোমরা যদি এই অভদ্র দুর্নীতির পাপ থেকে নিজেদের রক্ষে না কর, তাহ'লে নিশ্চয় জেনো এর প্রায়শ্চিত্ত একদিন তোমাদের করতেই হবে।"

রামনাথ যখন এই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত করছিল তখন সে জানত না, সে একটা ভবিষ্যবাণীই উচ্চারিত করছে; প্রায়শ্চিত্ত আসন্ন হয়ে উঠেছে; বেদনান্ত লখিয়া নাটকের যবনিকা-পাত হতে আর দেরি নেই।

দিন দুই পরের কথা। ডিসেম্বর মাসের দুর্জয় শীত, তার উপর সকাল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে; যার ফলে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো শীতটা চতুর্গুণ বৃদ্ধিলাভ করেছে। ছুটির দিন বলে তবু খানিকটা রক্ষে।

মন্মথ নামে সেন্সাস-মেসের এক সদস্য বিশেষ প্রয়োজনে এমন দুর্দিনেও বৈকালের দিকে বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সে যখন বাসার কাছে পৌঁছল, তখন তমসাচ্ছন্ন কলতলায় দাঁড়িয়ে লখিয়া জল ভরছে। মন্মথর মাথায় ছাতি, গলায় কমফরটার, দেহে আলোয়ান। অকস্মাৎ তার মস্তিষ্কে একটা দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হ'ল; নষ্টামির পরিকল্পনাটা এমনই উগ্রলোভাত্মক যে, তদ্বিষয়ে ভালমন্দ ঔচিত্য অনৌচিত্য ভেবে দেখবার বিবেচনা না পেলে আসবার পথ না পেলে চিন্তার সময়।

তাড়াতাড়ি মন্মথ পথের দুই দিকে চেয়ে দেখলে, পথ জনশূন্য; দেওকীলালের দোকান ঘরেরও ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে বাতিও বোধ হয় জ্বলছে না। ছাতাটা যথাসম্ভব নীচু ক'রে দিয়ে লেংচাতে লেংচাতে মন্মথ লখিয়ার নিকট উপস্থিত হ'ল, তারপর মুহূর্ত মাত্র তথায় অবস্থান ক'রে পুনরায় লেংচাতে লেংচাতে মেসে প্রবেশ ক'রে দরজা লাগিয়ে দিলে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মেসের সম্মুখে পথের উপর রৈ-রৈ কাণ্ড! আট-দশজন বলিষ্ঠ যুবক বড় বড় লাঠি নিয়ে মারমুখ হ'য়ে ছুটে এসেছে,—'আজ লংড়া বাবুকো জানসে মার দেগা!'

বিপাকও আবার এমনি, কোলাহল শুনে কৌতূহলী হ'য়ে রামনাথই সর্বপ্রথম বারান্দায় গিয়ে হাজির! আর যায় কোথায়! তাকে দেখামাত্র অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে লোষ্ট্র-বর্ষণও। ওদিকে সদর দরজার ওপর ধড়াদ্ধড় লাঠি পড়ছে,—খোলো, দরবাজা খোলো, নহি তো তোড় দেখা!

হাঙ্গামা বাধবার পূর্বেই মন্মথ বোধ হয় কারো কারো কাছে কথাটার একটু আভাস দিয়েছিল। পরিণতি দেখে বুঝতে কারো বাকি রইল না, একটা দুর্মোচ্য সংকটের তাড়নায় মেস এবং মেসবাসীরা উৎকটভাবে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে! যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ, সেই রামনাথকে নিয়েই উপস্থিত সকলের চেয়ে বিপদ। বিজয় ও শৈলেশ বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে যখন রামনাথের কোমর জড়িয়ে ধ'রে টানাটানি লাগালে, তখন রামনাথ উত্তেজিত হ'য়ে বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়েই না পড়ে, এমনি অবস্থা! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলছে, "হ্যাঁ হাঁ ও কাজ আমিই করেছি, লাঠি দিয়ে তোমরা আমার মাথা গুঁড়িয়ে দাও! দাঁড়াও আমি গিয়ে দরবাজা খুলে দিচ্ছি।"

উন্মত্ত রামনাথকে জড়িয়ে ধ'রে বিজয় ও শৈলেশ কোনোমতে রামনাথের ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। উভয়ের বন্ধন হ'তে মুক্ত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে রামনাথ বলতে লাগল, "না, না, ছেড়ে দাও আমাকে! ওদের মধ্যে গিয়ে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও!"

বাহিরে তখন মেসের সদর দরজার সম্মুখে বৃদ্ধ দেওকীলাল এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন ক'রে বলছে, "খবরদার! হুজ্জোত কোরো না। আমি থানায় খবর দিয়েছি, এখনি পুলিশ আসবে। উল্টা তোমরাই বিপদে প'ড়ে যাবে। লংড়াবাবু এমন কাম করতে পারেন ব'লে আমার কিছুতেই মনে হয় না, আলবাৎ এর মধ্যে কোনো ভেদ (রহস্য) আছে। আমাকে ভিতরে যেতে দাও, খবরদার কেউ সঙ্গে এসো না।"

ধনবান ব'লে পাড়ার মধ্যে দেওকীলালের খানিকটা প্রতিপত্তি আছে। পল্লীর অধিকাংশ লোকই তার খাতক। তা ছাড়া, চতুর দেওকীলাল থানায় খবর দেবার ভয় দেখিয়েছিল। জনতা অনেকটা শান্ত হ'ল।

বাকিটুকু সংক্ষেপেই বলি। দেওকী-লালের মধ্যস্থতায় পঞ্চায়েৎকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে হাঙ্গামাটা

একেবারে মিটে গেল। উৎকট সংকট থেকে এত সহজে মুক্তিলাভ ক'রে মেসের মেম্বাররা নিজেদের সৌভাগ্যবান ব'লে বিবেচিত করলে। তখনি তারা নিজেদের মধ্য থেকে টাকাটা সংগ্রহ ক'রে দেওকীলালের হাতে জমা ক'রে দিলে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে অবসন্নভাবে রামনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাছে সে জেগে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে কোনো হাঙ্গামা বাধায় সেই ভয়ে তার ঘরের দরজায় শিকল চড়িয়ে দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। আহারের সময়ে তাকে ডাকতে এসে দেখা গেল, কোনো এক সময়ে সে ভিতরের হুড়কা লাগিয়ে দিয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও সে দোর খুললে না,—একবার যেন চাপা গর্জনের মতো একটা কি শোনা গেল, কিন্তু সেই পর্যন্তই। সুতরাং সে রাত্রি রামনাথ অনাহারেই রইল।

শুধু রামনাথই নয়, সে রাত্রে মেসের অনেকেই আহারে বসতে পারলে না; গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রাহীন শয্যায় নির্বাক হ'য়ে এ পাশ ওপাশ ক'রে কাটালে।

প্রত্যূষে উঠে সকলে একত্র হয়ে ক্ষণকাল আলোচনার পর স্থির করলে, ভুলেও আর কখনো তারা লখিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। রামনাথকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য সকলে রামনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল একটা কাঁচের গ্লাস চাপা দেওয়া দুখানা চিঠি।

চাকরিতে ইস্তফা জানিয়ে প্রথম চিঠি সে লিখেছে অফিসের প্রধান কর্মচারীকে। দ্বিতীয় চিঠি, বিশেষ ক'রে কাউকে সম্বোধন করা না হ'লেও মেসের মেম্বারদের লিখেছে তা সুস্পষ্ট। চিঠিখানা এই রকম—

এ চিঠি তোমরা যখন পড়বে তখন আমি বরিশালের পথে এগিয়ে চলেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যখন খানিকটা করতে হয়েছে, তখন না গেলেও হয়ত চলত। কিন্তু একটা কথা মনে ক'রে থাকতেও পারলাম না। সেন্সাসের লোক গণনার দিন আসন্ন। আমাদের মেসেও লোক-গণনা অবশ্যই হবে। গোটা আষ্টেক পশু যখন মানুষ ব'লে নাম লেখাবে, তখন সেন্সাসের লোক হ'য়ে কি ক'রে আমি তা বরদাস্ত করব? তাই স'রে পড়লাম।

অফিসের চিঠির মধ্যে দেরাজের চাবি আছে। চিঠি ও চাবি অফিসে দিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

আর এক কথা। আমার ট্রাঙ্ক-বাক্স বিছানা-পত্র যা কিছু রইল গরিবকে বিলিয়ে দিয়ো। হবে। এক কাজ না হয় কোরো। রবিবারে রবিবারে শিঙ্গা বাজিয়ে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত যে লোকটা আসে, নাম বোধ হয় বুন্ধন,—তাকেই সব দিয়ে দিয়ো। ট্রাঙ্ক খোলা রইল। ইতি—

রামনাথ

স্পষ্টবাদী রূঢ় ভাষী রামনাথ তার বিদায়-পত্রেও তীব্র রূঢ়তার একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা রেখে গেছে।

দলের মধ্যে সুকুমারই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কোমল প্রকৃতির। দেখা গেল, ঘন ঘন সে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছছে।

(ক্রমশ)

"দর্পচূর্ণ"—(প্রাত্যা চিত্রকলা মন্দির—ইস্টার্ন টকীজ)—কাহিনী ঃ জ্যোতি বাচস্পতি; পরিচালনা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়; আলোকচিত্র ঃ দিব্যেন্দু ঘোষ; শব্দ-যোজনা ঃ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়; সুর-যোজনা ঃ পণ্ডিত কালীকিঙ্কর, খগেন দাশগুপ্ত; রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ অনাদি দস্তিদার; শিল্পনির্দেশ ঃ মদন গুপ্ত; ভূমিকায় ঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বাণীব্রত, হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যারাণী, শান্তি সান্যাল, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, মায়া বসু, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি।

জীবন্তদের দিয়ে রূপায়িত করানো বলেই চ্চিত্র মৌলিকধর্মে সব সময়েই মজুদ 'মান। তাই কাহিনীকে যে কোন কালের বহাওয়ায় দাঁড় করিয়ে যে কোন্ সাজ-যাকের আবরণেই ঢেকে দেওয়া হোক, তার তঃপ্রবাহী আবেগটা বর্তমানেরই সহজাত না ল সে কাহিনীর ওপর দর্শকমনের সায় পাওয়া তে পারে না।

"দর্পচূর্ণ"তে বলবার যে কথাটা—ধর্মের ্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই ধর্ম; সমাজের ন্যেই মানুষ নয়,, মানুষের জন্যেই সমাজ ষ্টি—এ তত্ত্ব বর্তমানেরও কথা, কিন্তু একেই টাবার জন্যে যে সমস্যা তুলে এবং তাকে ঘিরে কাহিনী বুনে নেওয়া হয়েছে তা এখনকার ন পৌঁছবার মতো নয়, একেবারেই কয়েক গ আগের। প্রযোজক সুধীরবন্ধু বন্দ্যো-াধ্যায় সম্পর্কে এইটেই হলো নালিশ।

সুধীরবন্ধু বাঙলা ছবির অল্পসংখ্যাক রমিত প্রযোজকদের মধ্যে একজন। ুতরাং, কোথায় কিভাবের রস কি করে জমে র্থাৎ জমানো যায় এবং কোন্‌টা বীত-আবেগ আবেগকে কি করে বর্তমানের সহজাত করে তালা যায় এ জ্ঞান ও বিদ্যা, তিনি অন্তত ভিজ্ঞতার জোরেও আয়ত্ত করেছেন বলেই ধরে ওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু "দর্পচূর্ণ" তার সে র্বের প্রকাশ নয় একটুকুও।

কাহিনীটি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা সটা অতি সেকেলে এবং বিষয়বস্তু যা তারও ময়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, অন্তত এখন থেকে তন চার পুরুষ আগেই। কাজেই তার মধ্যে কইবা আবেদন থাকতে পারে, আর সুধীরবন্ধুই া তার মধ্যে রস ও আবেগ প্রবাহিত করে তালার এমন কিইবা বাহিকা দেখতে পেলেন! বধবার মেয়েকে বিয়ে করা সমাজগর্হিত কাজ লে কে কোথায় বা মনে করতে পারে? তাও অবৈধ সন্তান নয়, বিধবার পুনর্বিবাহিত জীবনে জাত সম্পূর্ণ বৈধ সন্তান, কিন্তু তাকেই ববাহ করা ব্যাপারটাকে শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধ কাজ লে তুলে ধরে তাকে ঘিরে বিষয়বস্তু রচনা করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তু কি করে লোকের দায় পেতে পারে? এই নিয়ে সমাজকে প্রথা ও সংস্কারের গোঁড়ামীতে অন্ধ ও অবুঝ দেখাবার জন্যে যে কাহিনীর নজীর তোলা হয়েছে সেটা

রঙ্গজগৎ

এ শতাব্দীর আগের ইতিহাস; তাকে এখনকার বলে চালালে কেউ তা গ্রাহ্য করবে না।

জমিদার ধর্মদাস গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার নব্যশিক্ষিত যুবক মহিমকে গ্রাম ছাড়া করলে এই অপরাধে যে সে মাধবী নামে এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে যার মা বিধবা হবার পর আবার বিবাহ করেছিলো, মাধবীর জন্ম অবশ্য দ্বিতীয় বিবাহের ফলেই। মহিমদের তাড়ানো হয়েছে অন্যায়ভাবে এবং ধর্মদাসকে তার প্রতি-ফল পাইয়ে দেবার জন্যেই যেনো জমিদার বাড়ীতে হঠাৎ এসে উদয় হলো অধীর নামে এক যুবক। জমিদার গৃহিণী লতিকার সে অধীরদা। সে এসেছিলো লতিকার জীবনের গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দিতে সঙ্গে প্রামাণ্য দলিল নিয়ে। এরপরই লতিকার জীবন ওলোট-পালোট হয়ে গেলো। সে মনে করে নিলে যে, যে-অপরাধে মাধবীকে তার স্বামী গ্রামছাড়া করেছে সে নিজেই সেই অপরাধে অপরাধিনী এবং এই ভেবে সে গৃহত্যাগ করলে। ট্রেনে সে এক সজ্জন বৃদ্ধের দৃষ্টিতে পড়ে এবং সেই বৃদ্ধ তাকে আশ্রয় দেবে বলে সঙ্গে নিয়ে নেয়। লতিকা বৃদ্ধের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলেও ট্রেনে যেতে যেতে তার মনে যে চিত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠলো তাতে জানা গেলো যে সে তার মার সঙ্গে কাশীতে থাকতো এবং সেখানে স্বদেশ সেবায় ব্রতী অধীর ও রতনের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। অধীরের আগ্রহাতিশয্যে লতিকার সঙ্গে রতনের বিবাহ হয় কিন্তু কুশণ্ডীকা এবং মাথায় সিঁদুর পরাবার আগেই রতন হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পা[illegible] রতন লতিকাকে অধীরের হাতে দি[illegible] এবং অনুরোধ করে অধীর যেনো ল[illegible] বিবাহ করে। অধীর দেশের কাজে কয়েকদিনের জন্যে ওদের ছেড়ে যায়; কিন্তু তার ফিরে আসতে দেরী দেখে লতিকাকে নিয়ে তার মা পিতৃগৃহে যান; যাবার আগে লতিকাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নেন সে যেন তার পূর্ববিবাহের কথা প্রকাশ না করে। ইতিমধ্যে অধীর ধরা

পড়ে এবং তার দ্বীপান্তরের সাজা হয়। তারপর লতিকার সঙ্গে ধর্মদাসের বিবাহ হয়। গৃহত্যাগ করার পর ট্রেনের সেই বৃদ্ধ লতিকাকে কাশীতে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান; কিন্তু সেখানে মুখরা গৃহিণীর গঞ্জনা সইতে না পেরে লতিকা সে আশ্রয় ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে আর এক জায়গায় এক মহিলার আশ্রয়ে ঘরভাড়া নিলে। খুঁজতে খুঁজতে অধীর সেখানে গিয়ে পৌঁছলো এবং লতিকাকে নিয়ে তার স্বামীর গৃহে ফিরে এল। ধর্মদাস লতিকাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না সে গৃহত্যাগিনী বলে। তারপর লতিকা ও অধীর যখন লতিকার আগের বিবাহের কথা তুললে তখন ধর্মদাস লতিকাকে দ্বিচারিণী বলে অভিহিত করতেই লতিকা ভূমিশায়িনী হয়ে মারা গেলো, অথবা মারা গিয়ে ভূমিশায়িনী হলো। আর তাতেই ধমদাস গেলো পাগল হয়ে। ঠিক সেই সময়েই এসে উপস্থিত হলো মহিম-মাধবীকে নিয়ে মহিমের বাবা। ধর্মদাস মহিমের ওপর অন্যায় আচরণের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করে মহিমের ওপরেই সমাজের ভার অর্পণ করলে।

সাজপোষাক, পরিবেশ যা ঘটানো হয়েছে তা একেবারেই আধুনিক এবং সেই পশ্চাদপটেই মহিমকে গ্রাম ছাড়াবার জন্যে গত শতাব্দীর এক যুক্তির অবতারণা করায় সবটুকুই একেবারেই গুরুচণ্ডালী রূপ নিয়ে বসেছে। যুক্তিটাতো টেঁকসই হয়ইনি, তার ওপর এম এ পাশ নব্য-

যুবক মহিম-চরিত্রটাকে মনুষ্যত্বহীন এমন একটি নির্বীর্য জীবে পরিণত করে তুলেছে যে তার ওপর অবিচার হওয়া সত্ত্বেও কারুরই সহানুভূতি জাগতে পারে না। গল্পটার একটা উদ্দেশ্য ছিলো, অন্তত মনে হয়, সমাজকে কুপ্রথা, অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে মুক্ত করে তোলার নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু কার্যত দেখানো হলো ঐসবেরই বিজয়। গল্পটাকে এমনভাবে টেনে আনা হলো যার শেষ প্রতিপাদ্য দাঁড়ালো,—যেমন কর্ম তেমনি ফল। ধর্মদাস মহিমকে তাড়ালো মাধবীর জন্যে আর সেই অন্যায়ের প্রতিফল স্বরূপই যেনো অর্থাৎ ধর্মদাসকে কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতেই তার স্ত্রী লতিকার সঙ্গে কলঙ্ক জড়িয়ে দেওয়া হলো। নয়তো অধীরের হঠাৎ এসে পড়ার হেতু কী? পূর্ব-বিবাহের দলিল হাতে নিয়ে সে লতিকাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়নি, বরং সে লতিকাকে সুখীই দেখতে চেয়েছিলো। তাহ'লে? অধীরকে কাহিনীতে এনে ফেলা হয়েছে জোর করেই এবং যুক্তির মুখের দিকে না তাকিয়েই তাকে লতিকার জীবনে কলঙ্ক আরোপ করার বাহনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

লতিকার পূর্ববিবাহ সংক্রান্ত দলিল কাশী থেকে কাণপুরের এক নামকরা মহাজনের হিফাজতে গিয়ে পড়ে আর অধীর তা উদ্ধার করে ডাকাতি করে, এটা যেমন এক হাস্যোদ্দীপক রহস্য, তেমনি যুক্তিহীন সেই দলিলের সন্ধানকারী গোয়েন্দার আচরণ। গোয়েন্দা ধর্মদাসের বাড়িতে এসে একজন নবাগতের সন্ধান পেলে কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে না একবারও! শেষ পর্যন্ত দলিলটা সে পেলে কিন্তু তা পড়ে দেখাও দরকার মনে করলে না! অধীর গোয়েন্দার হাত থেকে দলিলটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও গোয়েন্দা ব্যাপারটার মধ্যে এমন কোন গুরুত্ব পেলে না যাতে অধীরকে গ্রেপ্তার করা যায়! ভুল বিষয়ের ওপরে যে কাহিনীর ভিত্তি আগাগোড়া তাকে এমনিধারা অযৌক্তিকতার সোপান বেয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

অভিনয়ে ধর্মদাসের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালকে প্রশংসা করা যেতো যদি-না তিনি লতিকার পপাতমৃত্যু দেখে পাগল হয়ে যেতে গিয়ে হাসির তুফান তুলে বাড়াবাড়ি পাগলামো না করে বসতেন। দু'জনে সদাই মুখোমুখি এক দম্পতীযুগল, মহিম ও মাধবীর ভূমিকায় যথা-ক্রমে রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণী, ছবিতে আছেন, এর বেশী আর সাড়া জাগিয়ে তোলেন না। নবাগতা বলে শান্তি সান্যালের অভিনয় নিতান্ত কাঁচা নয়, উপযুক্ত ভূমিকা ও সুযোগ পেলে তিনি দক্ষতা প্রকাশ করতে যে পারবেন তার আভাস পাওয়া গেলো। অধীরের ভূমিকায় বাণীব্রতকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর লাগে,

এমনকি লতিকাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার মতো ক্ষেত্রে সহানুভূতি জাগে না।

দুখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'ঝরা পাতা গো' এবং 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' দুটি বেখাপ্পা জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও চারখানি গান আছে তার মধ্যে তিনখানি ভজন ঘেঁষা, গেয়েছেন শান্তি সান্যাল নিজেই। কলাকৌশলের দিক সাধারণ। শব্দের মধ্যে একটা কাংসরেশ সবায়ের স্বর বদলে দিয়েছে।

"ঋতু-চক্রের" বসন্তোৎসব

গত রবিবার ১৮ই মার্চ আশুতোষ হলে দক্ষিণ কলকাতার সংস্কৃতি পরিষদ "ঋতু-চক্র" বসন্তের আগমনে একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানসূচীতে বহু-শিল্পীরই নাম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশই অংশ গ্রহণে বিরত থাকেন। নিতান্তই পাড়ার ব্যাপার বলেই বোধহয় সাড়ে পাঁচটার জায়গায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সাতটারও পরে। তবে দীর্ঘ বিরক্তিকর প্রতীক্ষাকে শেষ পর্যন্ত পুলকে ভরিয়ে তোলে ছোট্ট নৃত্যশিল্পী মঞ্জুলিকা দাস একটি কথক নাচের মধ্যে দিয়ে। অল্প বয়স কিন্তু ওস্তাদ নাচিয়েদের সমকক্ষ বাহাদুরী খুলেছিলো তার নাচের মধ্যে। তারই অগ্রজা দীপিকা দাসও দুটি নাচে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এরা ছাড়া নাচে অর্জুন নৃত্যে পিনাকী এবং একটি গ্রাম্য নৃত্যে পিনাকী ও সুধা ঘোষই ছিলেন সেদিনের আসরের উল্লেখ করার মতো শিল্পী।

"মালঞ্চ"-র চিত্ররূপ

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের "মালঞ্চ"র চিত্ররূপদান এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির প্রযোজক হচ্ছে আই এন এ পিকচার্স, যারা এর আগে "মাইকেল মধুসূদন" তুলে সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। "মালঞ্চ" তোলা হচ্ছে হিন্দী ও বাঙলা উভয় ভাষায় এবং এতে অভিনয় করার জন্যে সমগ্র ভারত থেকে নতুন শিল্পী আহরণ করা হয়েছে, পরিচিতদের মধ্যে আছেন একমাত্র শ্রীমতী যমুনা।

পুস্তক পরিচয়

সাগর পারের ওপারে—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস। ঠাকুরদাস লাইব্রেরী, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

রামনাথবাবু বিখ্যাত ভ্রমণকারী এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক। কিন্তু বর্তমান বইটি কোন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয়,—আমেরিকার পটভূমিতে লেখা একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। সুবোধ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক আমেরিকায় পলাইয়া যায় এবং সেখানে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসিয়া নানা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করে। সুবোধকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাহার চারিদিকে লেখক নিগ্রো ও রেড ইন্ডিয়ানদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, ডলারস্ফীত ধনীদের স্পর্ধা, বিপ্লবীদের সাহস, গুপ্তচর ভারতীয়দের নীচতা প্রভৃতির চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সব মিলিয়া তাঁহার কাহিনী সার্থক হইয়া উঠে নাই। গল্প, উপন্যাস, নাটকের মারফৎ আমেরিকা-বাসীদের বর্বরতা, নৃশংসতা, অন্তঃসারশূন্যতা উন্মুক্ত করিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে স্থাপন করিবার মত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক আমেরিকায় আছে। সেই জন্য ভারতীয় কলমের সাহায্য প্রয়োজন নাই। বিদেশ এবং বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত ভারতবাসীর কাছ হইতে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিতে চাই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কিংবা মানবেন্দ্র রায় যখন স্বীয় বিপ্লবী-জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়া আমেরিকার অন্যায় অবিচারকে উদ্ঘাটিত করেন, তখন তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমিন চিন্তাজনক হইয়া উঠে; কাল্পনিক কাহিনী লিখিলে যাহা কখনই হইত না। অবশ্য বর্তমান কাহিনীর অসাফল্যে রামনাথবাবুর গৌরব কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না; তাঁহার ক্ষমতা অন্যদিকে সজীব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনায়। এই বইটিতেও বিভিন্ন স্থান এবং চরিত্রের বর্ণনায় লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানা কথ্যভাষায় লেখা; কিন্তু তাহার মধ্যে হঠাৎ 'বুঝিতে পারিয়া' (১১ পৃঃ), 'আসিয়া' (২৬ পৃঃ), 'দেখাইতেছিল' (১১১ পৃঃ) কেন? ৫৪।৫১

স্বাধীনতা দিনের উপহার—কাজী আবদুল ওদুদ। প্রকাশক—কাজী খুরশীদ বখ্‌ত, ৮বি, তারক দত্ত রোড, কলিকাতা—১৯। মূল্য পাঁচ আনা।

সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠিলে যে একপ্রকার সজাগ, প্রসন্ন মন প্রকাশিত হয়, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের এই পুস্তিকায় সেই মনের পরিচয় রহিয়াছে। তদুপরি ওদুদ সাহেবের মন চিন্তায় উৎকর্ষিত এবং এক স্বচ্ছন্দ গদ্যে পরিস্ফুট। পুস্তিকাটি ছয়টি ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং একটি গদ্য-কবিতার সঙ্কলন। তাহার মধ্যে তিনটি নিবন্ধ তিনজন মনীষীর (গান্ধীজী, রামমোহন ও গ্যেটে) উদ্দেশে রচিত। বাকী তিনটির বিষয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পূর্ববঙ্গের বাংলা-উর্দু সমস্যা এবং কাব্য পাঠ। গদ্য-কবিতাটি লেখকের সুভাষ-বন্দনা। ওদুদ সাহেব গ্যেটে সাহিত্যে বিশেষ সুপণ্ডিত। সুতরাং গ্যেটে সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আমরা তাঁহার কাছ হইতে এই পুস্তিকায় আশা করিয়াছিলাম। ৫৩।৫১

সরল যোগ-ব্যায়াম—আয়রনম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার প্রণীত; ১৫নং কলেজ স্কোয়ারস্থ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য হিন্দু যোগিগণ বিভিন্নরূপ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। সেই প্রক্রিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন-প্রসূত। শ্বাস-প্রশ্বাস ও আঙ্গিক চর্চা দ্বারা নীরোগ দেহ ও দীর্ঘজীবন লাভের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে সাধারণত অভিজ্ঞ গুণীর সাহায্য প্রয়োজন। অথচ সমাজের বর্তমান অবস্থায় কর্মব্যস্ত মানুষের অবকাশ কম; কাজেই সহজে ও সংক্ষেপে মোটামুটি চলনসই গোছের একটি ব্যবস্থা করিয়া লইবার সকলেই পক্ষপাতী। এই দিক হইতে আয়রনম্যান সরকারের 'সরল যোগ-ব্যায়াম' বইটি বিশেষ কার্যোপযোগী। ইহাতে মোট ৪৩টি যোগ-ব্যায়াম ও আসনের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া যৌবন রক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ, চক্ষু, দাঁত ও চুল ভাল রাখা, আহার ও নিদ্রা প্রভৃতির নিয়মও সংক্ষেপে বর্ণনা করায় পুস্তকটি বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে। ৩২৮।৫০

টোটকা—কথক 'ভাই'। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ সন্তোষকুমার দে, ২৮নং ব্রজলাল মিত্র লেন, কলিকাতা—১।

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বাণীর সংগ্রহ। তৎসম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ পাঠে উপকৃত হইবেন।

রাষ্ট্রভাষা—কল্পতরু রায়। বিনয় চক্রবর্তী কর্তৃক ৪০, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ হইতে প্রকাশিত।

রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দী ভাষার আক্রমণে বাংলা ভাষার মত একটি সম্পদশালী ভাষা পিষ্ট হওয়ার আশংকায় লেখক ভারতবর্ষে একাধিক রাষ্ট্র-ভাষা প্রচলনের দাবী করিতেছেন। রাষ্ট্রভাষার সমস্যাটি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। ৪৬।৫১

খেলাধূলা

হকি

বাঙলার হকি খেলার মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর যে সময় এই মরশুমের খেলা আরম্ভ হইয়া থাকে এই বৎসর ঠিক সেই সময় করিতে না পারায় এখনও পর্যন্ত লীগ প্রতিযোগিতারই বিভিন্ন বিভাগের খেলা শেষ করা পরিচালকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই সকল অবশিষ্ট খেলা শেষ করিতে মার্চ মাস অতিবাহিত হইয়া যাইবে এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পর আরম্ভ হইবে বিভিন্ন হকি প্রতিযোগিতার খেলা। এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই প্রতি বৎসর অপরাহ্নে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই জন্য আশঙ্কা হয় হকি মরশুমের শেষ ভাগে পরিচালকদের অনেক বাধা ও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সময় কোন খেলাই উন্নত স্তরের হইবে না বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। হকি খেলায় ভারত পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান। সুতরাং এই খেলার অনুষ্ঠানে কোনরূপ প্রাকৃতিক বাধা ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ইহা কেহই চাহে না। এই জন্য প্রশ্ন উঠিতে পারে "মরশুম কেন বিলম্বে আরম্ভ হইল।" পরিচালকগণ সহজ ও সরল ভাষায় উত্তর দিবেন "ক্রিকেট মরশুমের চাপের জন্যই ইহা করিতে হইয়াছে।" ইহার পর যদি প্রশ্ন করা হয় "ক্রিকেট খেলার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?" পরিচালকমণ্ডলী সম্পূর্ণ নীরব থাকিবেন। নীরব না থাকিয়া কোন উপায় নাই। বাঙলা দেশের হকি খেলার পাণ্ডা যাঁহারা, তাঁহারাই ক্রিকেট খেলার, এমন কি ফুটবল খেলারও। এক কথায় বলা চলে ইহারা সকল খেলার "অধিকারী।" যে কোন খেলার বা ব্যায়ামের পরিচালকমণ্ডলী বাঙলায় গঠিত হউক না কেন একই শ্রেণীর কতকগুলি লোককে উহাতে দেখা যাইবেই। পরিচালনা করিবার মত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ইহাদের আছে কিনা বিচার পর্যন্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহারা সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এই জন্য ইহাদের খুশী মতই বিভিন্ন মরশুমের খেলা আরম্ভ হইয়া থাকে ও শেষ হইয়া থাকে। হকি খেলারও সেই জন্য এই বৎসরে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কবে যে এই সকল অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া সকল খেলা ঠিক সময় আরম্ভ হইয়া নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হইবে বলা কঠিন।

তবে ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয় যে এই বৎসরে হকি খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব জনসাধারণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রতি বৎসরের ন্যায়ই এই বৎসরেও প্রতিদিন প্রথম বিভাগীয় লীগের বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হইতেছে। কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে অথবা কোন দলের সম্ভাবনা আছে এই আলোচনা বা গবেষণা করিবার মতও লোক প্রচুর মাঠে সমবেত হইয়া থাকে। খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান খুব উন্নত স্তরের না হইলেও তীব্রতার মধ্যেই বিভিন্ন খেলা শেষ হইয়া থাকে। গত বৎসরের প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান কাস্টমস দল এখনও পর্যন্ত অপরাজিত আছে। ইহার সহিত সমান পাল্লা দিতেছে মোহনবাগান ও ভবানীপুর ক্লাব। মোহনবাগান দল কয়েকবার হকি লীগের রানার্স আপ ও একবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে, সেইজন্য এই দল পূর্ব গৌরব অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি! কেবল ভবানীপুর দলের কৃতিত্বই অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে। বিভিন্ন ক্লাবের পরিত্যক্ত খেলোয়াড়দের একত্র করিয়া ভবানীপুর দল এইরূপ নৈপুণ্য ও সাফল্য অর্জন করিবে ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। এই তিনটি দলই বর্তমানে অপরাজিত আছে এবং ইহাদের মধ্য হইতেই একটি দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা নিশ্চিত কিন্তু কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে বর্তমানে ইহা বলা খুবই কঠিন। আলোচ্য সপ্তাহের খেলার ফলাফল লক্ষ্য করিলে আগামী সপ্তাহে হয়তো বা বলা সম্ভব হইবে। সেই জন্য কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে আমরা বিরত রহিলাম।

বাঙালী খেলোয়াড় কোথায়?

প্রতি বৎসরই হকি মরশুমের সময় আমরা যে প্রশ্ন করিয়া থাকি এইবারেও করিতে বাধ্য। "বাঙালী খেলোয়াড় কোথায়?" প্রাদেশিকতার মনোভাব লইয়াই আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, যদি কেহ এরূপ মনে করেন তাহা হইলে ভুল করিবেন। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি না যে, বাঙলার মাঠে বাঙালী খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করিতে দেখিলেই আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করিব। কয়েক বৎসর পূর্বেও প্রথম বিভাগীয় হকি লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলে যে সংখ্যক বাঙালী খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখা যাইত বর্তমানে তাহাও নাই। বাঙালী খেলোয়াড়দের সংখ্যা এতই কম হইয়া পড়িয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন দলে কোন বাঙালী খেলোয়াড় থাকিবে কি না সেই বিষয়েও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন বাঙালী যুবকগণ হকি খেলায় দলে দলে যোগদান করিতেছে না, কি তাহাদের অসুবিধা ইহা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু এই অনুসন্ধান কে করিবে? পরিচালকগণ সাফাই গাহিয়া দেন "কি করিব দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে অ-বাঙালী খেলোয়াড় ছাড়া চলে না।" নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর যদি পরিচালকগণ এই কথা বলিতেন তাহা হইলে আমরা কিছুই বলিতাম না। গত ২৮ বৎসর সমানে আমরা বলিয়া আসিতেছি "বাঙালী হকি খেলোয়াড় তৈয়ারী করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই শিক্ষার সূচনা বা ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে স্কুল ও কলেজের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে কোনদিনই খেলোয়াড় তৈয়ারী হইবে না। তৈয়ারী খেলোয়াড় দলে দলে বিভিন্ন দলে না যোগদান করিলে বাধ্য হইয়াই হকি খেলার মাঠে গিয়া দেখিতে হইবে অ-বাঙালী খেলোয়াড়ের ভীড়। বাঙালী হইয়া বাঙলার মাঠের এই দৃশ্য কি করিয়া যে আমরা সহ্য করিতেছি বুঝিতে পারি না।" এইবারেও ঠিক ঐ একরূপেই খেদোক্তি করা ছাড়া আমাদের কোনই উপায় নাই। সেইজন্যই আমাদের মনে শতই প্রশ্ন জাগিতেছে "বাঙালী খেলোয়াড় কোথায়?" আমাদের প্রশ্নের উত্তরদান করিবার জন্য একদিন না একদিন বাঙালী উৎসাহী হকি খেলোয়াড়গণ অগ্রসর হইয়া আসিবেন, কিন্তু সেদিন হয়তো বা আমরা থাকিব না ইহা কে বলিতে পারে?

সন্তরণ

বাঙলার সন্তরণ মরশুম সমাগত প্রায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতি বৎসর সন্তরণ মরশুমের সূচনায় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এইবারেও তাহার কোনই পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি বাঙালী সাঁতারু শচীন নাগ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে ১০০ মিটার সন্তরণে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঙালী ডাইভার আশু দত্ত স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বাঙলার সন্তরণেই গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। বাঙালী খেলোয়াড় পরিচালিত ওয়াটারপোলো দল বিজয় গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন। ইহার পর বাঙলার সাঁতারু ও পরিচালকগণ সন্তরণ মরশুমের পূর্ব হইতেই চঞ্চল ও উৎসাহিত না হইয়া পূর্বের ন্যায়ই নীরব ও নিরুৎসাহপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রহিলেন ইহা আমাদের সত্য সত্যই আশ্চর্য করিয়াছে। বাঙালী জাতি জীবিত না মৃত ইহা যদি কেহ বলেন বোধ হয় খুব অন্যায় হইবে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১২ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বিচার-বিভাগীয় বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীযুত জ্যোতি বসু আদালতের স্বাধীন কার্যে বর্তমান মন্ত্রিসভার হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে বাজেটের সাধারণ আলোচনার দ্বিতীয় দিবসে অধিকাংশ বক্তা একথা বলেন যে, গভর্নমেণ্ট পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে পারেন নাই এবং কিভাবে তাঁহারা উহা রোধ করিতে পারেন, সে বিষয়েও কোন আভাস দেন নাই।

বিহারে জমিদারী প্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে বিহার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার আইন নামে এক আইন করা হয়। পাটনা হাইকোর্টের এক স্পেশ্যাল বেঞ্চ রায় দিয়াছেন যে, এই আইন অবৈধ, কেননা এই আইন ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের বিরোধী।

"অত্যাবশ্যক পণ্য সংগ্রহের সর্বাধিক সম্ভব সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে" ভারত সরকার ১৯৫১ সালের জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতির কঠোরতা হ্রাস করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১৩ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কাশ্মীরের উপর নূতন আক্রমণকে ভারতের উপর আক্রমণ বলিয়াই গণ্য করা হইবে।

গো-হত্যা নিষিদ্ধ করিবার জন্য শ্রীঅর্জুন ভগতের আ-মৃত্যু অনশনের সমর্থনে অদ্য আমেদাবাদে ত্রিশ সহস্র মিল-শ্রমিক অকস্মাৎ ধর্মঘট আরম্ভ করে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্য সরকারের পুলিশ বাজেট লইয়া বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষ হইতে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও নির্যাতন-মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৪ই মার্চ—ভারত সরকারকে ঠকাইবার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য হোসেনভাই লালজীর চারি পুত্র বোম্বাইর অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, অবাধ্যতার দরুণ পাক-পাঞ্জাব সেক্রেটারিয়েটের ছয়টি অফিসের প্রায় তিন সহস্র কেরানীকে ডিসমিস ও সসপেণ্ড করিয়া তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে। কেরাণীগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধির দাবী গৃহীত না হওয়ায় উহার প্রতিবাদস্বরূপ গত সোমবার কলম-ধর্মঘট করিয়াছিলেন।

১৫ই মার্চ—নয়াদিল্লীতে ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আহূত নিখিল ভারত বিজ্ঞজন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। উহাতে ভারতে সমস্ত ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য একটি জাতীয় বিজ্ঞজন পরিষদ গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অদ্য পার্লামেণ্টে আয়কর (তদন্ত কমিশন) সংশোধন বিলের আলোচনাকালে যে সকল লোক আয়কর ফাঁকি দিতেছে, সে সকল প্রবঞ্চকদের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণার জন্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু উহা ২৩—৭৪ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি দমনে মন্ত্রিসভার অনিচ্ছা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে রাজ্য সরকারের আগামী বৎসরের বাজেটে 'স্থানচ্যুত ব্যক্তি সাহায্য' খাতে ১০,০১,১৩,০০০৲ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হয়।

১৬ই মার্চ—ভারতীয় পার্লামেণ্টে রাজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রের "গ" তালিকাভুক্ত রাজ্যসমূহে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে জরুরী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে বিল উত্থাপিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ দুইটির বাজেট লইয়া বিরোধী পক্ষ হইতে ঐ দুই বিভাগের কার্য পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অনাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

অদ্য রাত্রে উত্তরপাড়ায় যানবাহন চলাচলে বাধাদানকারী এক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং আরও ছয়জন আহত হয়।

১৭ই মার্চ—বিলোনিয়ার (ত্রিপুরা রাজ্য) সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমায় হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মোটর যান কর আইন সংশোধনের জন্য যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রাইভেট মোটর, বাস, ট্যাক্সী প্রভৃতি সকল প্রকারের মোটর যানের করের হার বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৮ই মার্চ—অদ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন কর্তৃক কাণপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন কালে সভায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও উচ্চ কলরবের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, একমাত্র কংগ্রেসই গভর্নমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব বহনে সক্ষম।

বিদেশী সংবাদ

১২ই মার্চ—মধ্য কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অভিযানের ফলে কম্যুনিস্ট বাহিনীর অতর্কিত পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করার ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে। আক্রমণোদ্যোগ রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর করায়ত্ত রহিয়াছে।

অতলান্তিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেন হাওয়ার মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও সেনা বিভাগীয় কমিটির যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন, আণবিক বোমা ব্যবহারের দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে সাহায্য হইবে, একথা বুঝিতে পারিলেই আমি তৎক্ষণাৎ উহা ব্যবহার করিব।

অদ্য রাশিয়ার সর্বোচ্চ আইন পরিষদে যুদ্ধের অনুকূলে প্রচারকার্যকে 'মানব-সমাজের অহিতকারী গুরুতর অপরাধ' বলিয়া অভিহিত করিয়া একটি বিল গৃহীত হইয়াছে।

১৪ই মার্চ—দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর সৈন্যগণ অদ্য বিনা প্রতিরোধে রাজধানী সিউল নগরীতে পুনঃ প্রবেশ করে।

অদ্য ইউরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং জার্মানী এই চারিটি দেশে যুগপৎ ভূকম্পন অনুভূত হয়।

১৭ই মার্চ—লণ্ডনে সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বৃটেন আণবিক বোমা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

অদ্য অস্ট্রেলিয়া পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ২৮শে এপ্রিল নূতন নির্বাচন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৮ই মার্চ—টোকিও-র সংবাদে প্রকাশ, দেড়শত মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গন বরাবর রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী অগ্রসর হইতে থাকায় চীনা ও উত্তর কোরীয় বাহিনী অদ্য রাত্রিতে দক্ষিণ কোরিয়া হইতে পশ্চাদপসরণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

কোরিয়া যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে গ্রীক বাহিনীকে হংচন শহরের পশ্চিমাঞ্চলে কম্যুনিস্টদের সহিত প্রচণ্ড হাতাহাতি সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৹ আনা, বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 31st March, 1951. [২২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় পরিষদের বিতর্ক

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইল। এই অধিবেশনের সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে প্রথমত, বিরোধী পক্ষের শক্তিবৃদ্ধি সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। এই শক্তি অবশ্য সংখ্যার দিক হইতে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়; কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনার তীব্রতা এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণের রীতিতে পূর্বাপেক্ষা অনেক জোর বাড়িয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিরোধী দলের প্রায় সব প্রস্তাবই ভোটের জোরে নাকচ হইয়া গিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহাদের আক্রমণ সরকার-পক্ষকে বহু স্থলে অস্বস্তি-কর অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। ফলত মন্ত্রীদের কেহই সেই আক্রমণের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে আগাইতে পারেন নাই। মুখ্য মন্ত্রীকে স্বয়ং এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ডাক্তার রায় স্বপক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য তৎপরতা যথেষ্টই প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অক্ষমতা প্রভৃতি নানারকম অভিযোগ বিরোধী পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী সেগুলি খণ্ডন করিতে গিয়া সর্বত্র ধীরতার সঙ্গে যুক্তি-বিচারের পথ অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার রায় প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ ব্যক্ত করিয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন এবং অভিযোগের মূল কারণ এড়াইয়া গিয়া তিনি অভিযোগ করাই যেন পরম অপরাধ এবং সামাজিক দুর্নীতির পরিচায়ক, এমন একটা ধারণা লইয়া সময় সময় একান্ত অধীর উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে এ রীতি চলে না। ইহার ফলে কার্যত তিনি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে লোক-চিত্তে বিক্ষোভের ভাব বাড়াইয়া তুলিবার পথই প্রশস্ত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুত সমালোচনার পথেই গণতান্ত্রিক শাসনের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেই অধিকারের মর্যাদা যেখানে রক্ষিত হয় না, সেখানে স্বৈরাচারই প্রশ্রয় পায়। বাস্তবিকপক্ষে সমালোচনার অধিকার সঙ্কুচিত হইলে শাসকদের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটিবার সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। বাস্তবিকপক্ষে শাসকদের শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও মানব-প্রকৃতির এই গতির ব্যতিক্রম ঘটে না, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সমালোচকদের প্রতি অসংযত উত্তেজনা প্রকাশ করিলে নিজেকেই লঘু করা ছাড়া অন্য কোন ফল হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিপক্ষ দলনে এরূপ নীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের দাবীকে একেবারে উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। বিড়লা ব্রাদার্সের সম্পর্কে বিক্রয়-কর ফাঁকি দিবার যে অভিযোগটি উত্থাপিত হইয়াছিল, অবশেষে সেই ব্যাপারটি বিচারার্থ একটি ট্রাইবিউনালের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সিদ্ধান্ত তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবত কংগ্রেসী দলের ভিতর হইতে চাপই এই ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাইবার মূলে কাজ করিয়াছে। কংগ্রেসী দল যে ব্যাপারটির সম্বন্ধে বিচারের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিতও হয়। কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, বাজেট অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত বিচারের দাবী যদি প্রথমেই সরাসরি মানিয়া লইতেন, তবে তাহাই সমধিক সমীচীন হইত। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কারবারী উভয় পক্ষের স্বার্থের দিক হইতে বিষয়টি বিচারার্থ উপস্থিত করিবার যুক্তির সঙ্গতি ডাক্তার রায় তাঁহার এতৎ-সম্পর্কিত পরবর্তী বিবৃতিতে বিশেষভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরা সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বিড়লা ব্রাদার্সের সম্পর্কিত অভিযোগটি ট্রাইবিউন্যালে বিচারার্থ উপস্থিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ফলে বিরোধী পক্ষকেও বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে জড়িত করা হইল। কারণ ট্রাইবিউন্যালের বিচারের ফলে যদি অভিযোগটি প্রতিপক্ষের নিতান্ত ধাপ্পাবাজী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিরোধী পক্ষকে বিশেষ অসুবিধার ভিতর পড়িতে হইবে এবং তখন তাঁহাদের কথায় লোকের তেমন শ্রদ্ধা আর থাকিবে না।

নব ভারতের দুইজন স্রষ্টা

বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সংস্থার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ভারতে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহার নাম ভারতীয় জাতীয় কমিশন। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল

সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে জগতের আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার নৈরাশ্যের ভাবই সূচিত হইয়াছে। পণ্ডিতজীর মতে পৃথিবীর অনেক দেশ বর্তমানে অপর দেশকে নিজেদের মতে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সেজন্য নানারূপ কূটকৌশল প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পণ্ডিতজী বলেন, এই মনোভাবে যদি বাধা দেওয়া না হয়, তবে অচিরে বিশ্বব্যাপী বৃহৎ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে এবং মানব জাতির বিপর্যয় ঘটিবে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক মনীষীদের মস্তিষ্কের আলোড়ন ও সঞ্চালনের বহু রকমের আড়ম্বর আমরা দেখিতেছি, তাহা সত্ত্বেও জগতের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে এই সত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই সব রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরদের উদ্যমের মূলে গলদ কোথায়ও আছে, আছে আন্তরিকতার অভাব। পণ্ডিত জওহরলাল এই প্রসঙ্গে অনেকটা ভারতের ঘরের কথার মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের নিজেদের সমস্যার সঙ্গে বিশ্ব-সমস্যার সম্পর্ক জড়িত রহিয়াছে, সুতরাং পণ্ডিতজীর মন্তব্য এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে না। তিনি বলেন, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুইজন মহামানব যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়াই ভারত বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইঁহারাই ভারতকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি উভয়কে গড়িয়া তুলিয়াছিল। ভারতের দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতিবেশে ইঁহাদের অসামান্য মনো-মহিমার উন্মেষ ঘটে। ভারতীয় সংস্কৃতির বহুবিধ সম্পদ ইঁহারা দুইজনেই আমাদিগকে দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের নব জাগরণের মূলে ইঁহাদের উভয়ের শক্তিই প্রধানত এতদিন কাজ করিয়াছে এবং এখনও সম্ভবত অনেকের অন্তরে ইঁহাদের আদর্শই প্রাণময় প্রেরণা সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু ক্রমেই আমরা বর্তমানে ইঁহাদের আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। পণ্ডিতজী এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুগধর্মেরই ইহা ফল। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির যুক্তি আমরা বুঝিতে না পারি এমন নয়; যুগধর্মের উপর এইভাবে দোষ চাপাইয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়ান যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা সমস্যার কিছু সমাধান হয় না কিম্বা মানব-সংস্কৃতির অধোগতিও রুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। দেখা যায়, এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ কি, পণ্ডিতজী তাঁহার অভিভাষণে সে ইঙ্গিতও কিছু করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মতে অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় আদর্শের সম্বন্ধে আমরা কথা বলি, তাহার ফলে কোন আন্তরিকতা থাকে না। ফলত আমরা মুখে যাহা বলি, কাজে তাহা করি না। আমাদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কথা ও কাজের মধ্যে এই ব্যভিচার বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কথাটা অপ্রিয় হইলেও খাঁটি সত্য। সত্যই গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনের জীবনাদর্শের প্রতি যদি আমাদের কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিত, তবে মিথ্যাচারের এমন পাপ নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় জীবনকে অভিভূত করিতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী ইঁহারা উভয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং পরিপোষক ছিলেন, কিন্তু সেজন্য বিশ্ব মানব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের অবদান সংকুচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে উদার সৌভ্রাত্র এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ের উদ্দীপনাকেই তাঁহাদের উভয়ের জীবনাদর্শ বিশ্বের মনোমূলে সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু আমাদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এই যে শ্রদ্ধা, ইহা যেন গৌণ হইয়া পড়িতেছে। বস্তুত বিশ্ব রাজনীতির দিকেই আমাদের গতি প্রধাবিত। ইহার ফলে এদেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে নেতাদের রাজনীতির সাধনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। নেতারা জাতির অন্তরকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে বেদনার যেখানে অভাব, বঞ্চনা সেখানে কিছু আসিবেই। এই তো অবস্থা। সত্যই যদি ইহার প্রতিকার করিতে হয়, তবে বঞ্চনার ভাবকে মনের মূল হইতে বর্জন করিতে হইবে। সমাজের বৃহৎ বেদনাকে আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনের ইহাই আদর্শ—ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথাও তাহাই এবং বিশ্ব মানব-সংস্কৃতিও সেই সত্য হইতে ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নয়। ফলত মানব-সংস্কৃতির মূলীভূত এই সত্যটি ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বীজস্বরূপে রহিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী তাঁহাদের উভয়ের সাধনায় ও অবদানে ইহাকে আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদি আমরা এদিকে শ্রদ্ধাপরায়ণ না হই, তাহা হইলে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনা মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে; পরন্তু কেবলমাত্র রাজনীতিক মনীষার তীক্ষ্ণতা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার পরিপ্রেক্ষায় এদিকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ববঙ্গের পরমুখাপেক্ষিতা

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে বাঙলা ভাষাকে নির্বাসিত করিবার জন্য কিরূপভাবে কূটকৌশল পরিচালনা করিতেছেন, পূর্বে এ সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি করাচীর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের গভর্নর জনাব ফিরোজ খাঁ নূনের উপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গেরই স্বাস্থ্য-সচিব জনাব হবিবুল্লা বাহারের উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। গভর্নর নূন সাহেব নিজে পাঞ্জাবী। পূর্ববঙ্গে আরবী অক্ষর চালানো হয়, তিনি ইহাই চাহেন। সরকারী সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই উদ্ভট যুক্তি উপস্থিত করেন যে, পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই বাঙলার পরিবর্তে আরবী হরফ চালাইবার পক্ষপাতী। বাহার সাহেব গভর্নর নূন সাহেবের সম্মুখেই এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি এ কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে আরবী হরফে বাঙলা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থব্যয়েও মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই তথ্য সর্বসাধারণের পক্ষে অবিদিত নহে। পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদেও প্রশ্নোত্তরসূত্রে একথা প্রকাশ পায়। পরন্তু বাঙলার পরিবর্তে এইভাবে আরবী হরফ চালাইতে গেলে ফল কি দাঁড়াইবে, পূর্ববঙ্গবাসীদের সে সম্বন্ধে সময় থাকিতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি কুমিল্লায় পূর্ববঙ্গের কলেজ শিক্ষকগণের একটি সম্মেলনে ডক্টর সহীদুল্লা সভাপতিস্বরূপে তাঁহার অভিভাষণে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ডক্টর সহীদুল্লা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের জন্য বাঙলা ব্যতীত যদি শিক্ষার মাধ্যম-স্বরূপে অন্য ভাষা প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে তেমন কাজ তথাকার ভাষার ক্ষেত্রে হত্যার সমান অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার এমনও অভিমত যে, এমন উদ্যমের বিরুদ্ধে শিক্ষাব্রতীদের প্রত্যেকের প্রতিবাদ করিতে হইবে; অধিকন্তু যদি প্রয়োজন হয়, বিদ্রোহ করাও অন্যায় হইবে না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্থানের মুখাপেক্ষী এবং পদানত করিয়া রাখাই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্থানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর ভাষা বাঙলা হইলেও তাঁহারা বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন নাই। অধিকন্তু বাঙলা হরফ তুলিয়া দিয়া আরবী হরফ চালাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের শিক্ষার পথ সংকীর্ণ করিবার অভিসন্ধিতেই তাঁহাদের নীতি প্রযুক্ত হইতেছে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের রাজস্বের মোটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব

নূরুল আমীন সাহেব সম্প্রতি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছেন—পূর্ববঙ্গের মৃতদেহের উপর পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার যেন সৌধ গড়িবার স্বপ্ন না দেখেন; কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাঙলা ভাষা-ভাষী এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাহারা বাঙ্গালী। পাকিস্থানী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সঙ্কট দেখা দিয়াছে এইখানে। পূর্ববঙ্গের এই বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারাকে বিলুপ্ত করিতে না পারিলে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে পাকিস্থানের সংহতি-সাধনে অন্তরায় ঘটে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁহারা কর্তা-ব্যক্তি, তাঁহাদের স্বজন-পোষণের নীতি চলে না; এইভাবে পূর্ববঙ্গের শাসন-ব্যাপারে তাঁহাদের প্রাধান্য পরিচালনের সুবিধা নষ্ট হয়।

পাকিস্থানের নীতি-নৈপুণ্য

পাকিস্থানে অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম আহম্মদ পাকিস্থানের অপ্রত্যাশিত অর্থ-সমাগমে নিজেই বিস্মিত হইয়াছেন। ১৯৫০--৫১ সালের বাজেটে দশ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, বৎসরের শেষে উহা ২৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। আগামী বৎসরে ২০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। পাকিস্থানের এমন অর্থ-সাফল্যের মূলে কোরিয়ার যুদ্ধজনক পরিস্থিতি এবং তজ্জন্য কাঁচামাল সংগ্রহে শক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে ব্যগ্রতা অনেকখানি রহিয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য; তথাপি এ সম্পর্কে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বস্তুত পাকিস্থানের রাষ্ট্র-নিয়ামকগণ সর্বত্র একটা নীতি-নিষ্ঠা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন এবং সেই নীতি লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করিবার যে কৌশল থাকা দরকার, তাহা তাঁহাদের কাজে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যুত ভারতের রাষ্ট্র-নীতির নিয়ামকদের পক্ষে এমন দূরদৃষ্টির এবং নীতি-নিষ্ঠার অভাব একান্তভাবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে নীতি বহু আড়ম্বরের সঙ্গে অবলম্বন করেন, দুই দিনের মধ্যেই বাস্তব সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পাকিস্থানের শাসকগণকে আমরা নৈতিক এমন ডিগবাজী খাইতে দেখি না। যখন ভারত-রাষ্ট্র বাণিজ্য বৃদ্ধির আশায় এবং সম্ভবত ইংরেজ ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তুষ্টি বিধানের জন্য মুদ্রামান হ্রাস করিল, তখন পাকিস্থান তাহা উপেক্ষা করিয়া নিজের নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল। সে সময় পাকিস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইবে এবং সে কারণ অর্থ সংকটের মধ্যে পড়িবে বলিয়া বহু ভারতীয় অর্থনীতিক তাঁহাদের মস্তিষ্কের প্রখরতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সব অনুমান কার্যত উল্টিয়া গিয়াছে। ফলত পাকিস্থান ব্যবসার পথে বিপুল অর্থ অর্জন করিয়াছে। ভারত বাট্টার সংগ্রামে পাকিস্থানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, অধিকন্তু আন্তর্জাতিক বাট্টা তহবিলও পাকিস্থানী বাট্টা মানিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানের অর্থনৈতিক সংস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক পাকিস্থানের উন্নতিমূলক কার্যে ৬ কোটি ডলার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানে সম্মত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের ব্যয় সংস্থান করিবার জন্য নূতন নূতন কর বসাইতে বাধ্য হইতেছে, পক্ষান্তরে পাকিস্থান অর্থসমৃদ্ধ হইয়া লোকের কর ভার হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিলে এবং জগতে স্বাভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে পাকিস্থানের এই সুবিধা আর থাকিবে না, কেহ কেহ অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্যবলে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিলেই যে শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যুদ্ধজনিত অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহে আগ্রহ থাকিবে না, আমাদের ইহা মনে হয় না। অন্তত কয়েক বৎসরের মধ্যে তেমন অবস্থা নিশ্চয়ই আসিতেছে না এবং তাহার ফলে পাকিস্থান নিজকে সুদৃঢ় করিতে সুযোগ লাভ করিবে। বস্তুত নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সুনিশ্চিত পথে পাকিস্থানের রাষ্ট্র-নিয়ামকগণের নীতি-নিয়ন্ত্রণে নৈপুণ্য ও দৃঢ়তা আমরা আগাগোড়া লক্ষ্য করিতেছি এবং দেখা যাইতেছে, দৈবও এক্ষেত্রে তাঁহাদের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলত ইহাকে শুধু আকস্মিকতা বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহি এবং সব ক্ষেত্রে তেমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীনও হইবে না। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের নিয়ামকদের নীতি-নৈপুণ্যের পরিচয়, এ সম্পর্কে যে অনেকখানি রহিয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ যাহাই হোক, নীতির প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে তাহাকে অতিক্রম করিবার, অধিকন্তু তেমন অবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে করিয়া লইবার যে দক্ষতার পরিচয় পাকিস্থানের রাজনীতিকেরা প্রদর্শন করিতেছেন তাহার প্রশংসা করিতেই হয়। আমরা তো স্পষ্টই দেখিতেছি ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মন যোগাইয়া এমনকি নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দিয়া চলিয়াও যাঁহাদিগকে নিজেদের অনুকূলে আনিতে পারিতেছেন না, পাকিস্থানের নীতি স্বচ্ছন্দে তাঁহাদিগকে তাহার লক্ষ্য-সিদ্ধির অনুকূলে করিয়া লইতেছে। ইংরেজ-মার্কিন বর্তমানে পাকিস্থানের সবচেয়ে বড় বন্ধু। নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগীভাবে নীতি-নিয়ন্ত্রণে এই কুশলতার জন্য পাকিস্থানের রাজনীতিকগণ সত্যই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

দেশ পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি

সম্প্রতি সংবাদপত্রের কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ভারত সরকার কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যে বিধি-বিধান ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার জন্য আগামী ৭ই এপ্রিল, ২৩ সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকার আকারের সামান্য পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং সেই সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি করা হইবে। 'দেশ'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়াইয়া ৬০ পৃষ্ঠা (কভার সহ) করা হইবে, বর্তমানে উহা ৫২ পৃষ্ঠা আছে।

গত ১৮ বৎসর ধরিয়া আমরা 'দেশ'র মধ্য দিয়া পাঠকদের রুচি ও চাহিদার উপযোগী উপকরণ পরিবেষণ করিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, উত্তরোত্তর 'দেশ'র উন্নতিসাধন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টাও আমরা বরাবরই করিয়া আসিতেছি। এই আকৃতির পরিবর্তন ও মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু ও রূপসজ্জা উভয় দিক দিয়াই যাহাতে 'দেশ' পাঠকবর্গের নিকট আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আগামী সংখ্যা হইতে এজেন্টের মারফৎ দেশ লইলে প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা এবং ডাকযোগে বার্ষিক মূল্য ২০৲ টাকা হইবে। (পাকিস্থানে পাক্-মুদ্রায় প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা ও বাৎসরিক পাক্-মুদ্রায় ২০৲ টাকা হইবে।) ইতিপূর্বে যাঁহারা অগ্রিম চাঁদা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর বর্ধিত মূল্য আরোপিত হইবে না।

সম্পাদক, 'দেশ'

বৈদেশিকী

কোরিয়ার পরিস্থিতি

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সৈন্যেরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে এখন মোটামুটি ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর একটা লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পশ্চাদপসরণ অংশত ইচ্ছাকৃত এবং অংশত অবস্থার চাপে বলে মনে হয়। উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সৈন্যেরা বিনা-যুদ্ধেই সিউল পরিত্যাগ করে এসেছে, স্থলযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পিছিয়েছে, ঠিক এরূপ হয়নি। তাদের পিছন পিছন ম্যাকআর্থারী ফৌজ এগিয়েছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অনবরত বোমারু বিমানের আক্রমণের ফলে উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে সম্ভবত তারা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাতে অনিচ্ছুক বা অশক্ত। তবে সংবাদ থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে উত্তর কোরিয়ান ও চীনারা ৩৮ অক্ষরেখার কাছ বরাবর একটা আত্মরক্ষা লাইন ঠিক করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে তাদের হটানো সহজ হবে না। ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য হয়ত প্রস্তুতিও চলছে।

ম্যাকআর্থারী ফৌজ এখন কী করবে, সেইটাই প্রশ্ন। কিছুদিন আগে জেনারেল ম্যাকআর্থার নিজেই এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি চীনের ভিতরকার ঘাঁটিগুলির উপর নৌ ও বিমান আক্রমণের নিষেধ বলবৎ থাকে, তবে অচিরেই যুদ্ধের একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হবে। সম্ভবত বর্তমান অবস্থা তারই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, চীনের ওপর আক্রমণ চালাবার স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি গত শীতকালের ন্যায় আবার একবার সমগ্র উত্তর কোরিয়া অধিকার করার জন্য অগ্রসর হতে রাজী নন। গতবারের শিক্ষা সহজে ভুলবার নয়। সুতরাং সামরিক দিক থেকে একটা অচল অবস্থারই সূচনা দেখা যাচ্ছিল। তা লক্ষ্য করেই শ্রীনরসিংহ রাও কয়েকদিন পূর্বে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আর একবার শান্তি স্থাপনের চেষ্টার সুযোগ হয়ত উপস্থিত হোল। অনেকের ধারণা যে, সেবার যদি ম্যাকআর্থারী ফৌজ ৩৮ অক্ষরেখা পার হয়ে মাঞ্চুরিয়ার দিকে ধাওয়া না করত, তবে পিকিং সরকার উত্তর কোরিয়ানদের সাহায্য-কল্পে চীনা সৈন্য পাঠাতেন না। এবারও যাতে ম্যাকআর্থারী ফৌজ ৩৮ অক্ষরেখা পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ার ভিতর অভিযান শুরু না করে, তার জন্যে অনেকে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন।

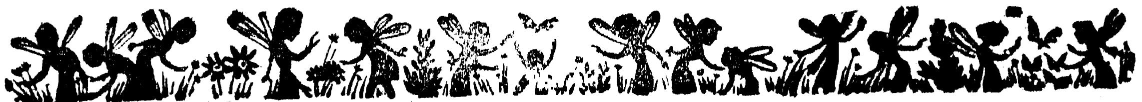
উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী কিম ইর সেন-এর উদ্দেশ্যে প্রেরিত মার্শাল স্টালিনের একটি বাণী সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার রেডিয়ো থেকে প্রচারিত হয়েছে। তাতে মঃ স্টালিন এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, 'সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ' প্রতিহত করার জন্য রাশিয়া সর্ব-প্রকারে উত্তর কোরিয়ানদের সাহায্য করবে। এর অর্থ এই যে, ম্যাকআর্থারী ফৌজ যদি সমগ্র উত্তর কোরিয়া দখল করার চেষ্টা করে, তবে উত্তর কোরিয়ানদের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে রুশ সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করার ফল অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে।

বৃটেন পূর্ব থেকেই সাবধান-নীতির পক্ষপাতী। গত শীতকালের অভিযানে মার্কিন সৈন্যের পরাজয়ের পরে আমেরিকার জনমত চীনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল এবং সরাসরি চীনের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাবার দাবীও উঠেছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে বৃটেনের চেষ্টায় তখন মার্কিন নীতি কিছুটা সংযত হয়েছিল, ম্যাকআর্থারী দলের ইচ্ছা একেবারে পূর্ণ হতে পারেনি। পরে কোরিয়ায় অসংখ্য কম্যুনিস্ট বধ ও সর্বাত্মক ধ্বংসকার্যের অগ্রগতির সংবাদে আমেরিকার জনমত অনেকটা শান্ত হয়েছে, সুতরাং একটা শান্তি-প্রচেষ্টার সুযোগ হয়ত উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু জেনারেল ম্যাকআর্থারকে কে বাগ মানাবে?

যখন পৃথিবীর আর সকলে ভাবছে উভয় পক্ষের মধ্যে কীভাবে শান্তির কথা পাড়া যায়, তখন জেনারেল ম্যাকআর্থার তাঁর নিজস্বভাবে এমন একটি উক্তি করে বসলেন, যাতে নিষ্পত্তির পথ আর একটু দুর্গম হতে বাধ্য। ম্যাক-আর্থার বলেছেন যে, তিনি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য কোন কম্যুনিস্ট সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছেন, তবে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নের সঙ্গে ফরমোজার ভবিষ্যৎ বা অন্য কোন প্রশ্ন জড়ানো চলবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, চীনাদের এখনও চেতনা হওয়া উচিত। এখনও তাদের বুঝা উচিত যে, যুদ্ধ একবার চীনের ভিতর পর্যন্ত চালাতে শুরু করলে অচিরে চীনের সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। একথার তাৎপর্য এই হতে পারে যে, চীনারা যদি এখনও ভালোয় ভালোয় ফরমোজা প্রভৃতির সম্পর্কে তাদের আবদার পরিত্যাগ করে কোরিয়ার যুদ্ধে ভঙ্গ না দেয়, তবে অদূর-ভবিষ্যতে চীনাদের স্বদেশের উপর আক্রমণ চালানো হবে। কেউ আশা করে না যে, এরূপ ভয় দেখালেই চীনারা সুবোধ বালকের মত ম্যাকআর্থারের আজ্ঞা পালন করবে। জেনারেল ম্যাকআর্থারও নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু ম্যাকআর্থার তো কেবল সেনাপতি নন, তিনি নিজেকে মার্কিন রাজনীতির একজন নিয়ামক বলেও মনে করেন এবং আমেরিকার রিপাব্লিক পার্টির বহু লোক এ বিষয়ে তাঁর সমর্থক, যার ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের শাসনও তিনি অনেক সময়ে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন ও করেন। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মত অতি সুস্পষ্ট। তিনি আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্য ফরমোজাকে মার্কিন এক্তিয়ারের মধ্যে রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন, তিনি চীনের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে চিয়াং-কাইশেককে দিয়ে চীন আক্রমণ করতে এবং চীনের মধ্যে গেরিলা বিদ্রোহ ঘটাবার ব্যবস্থা করতে চান। ম্যাক-আর্থার চীনের বর্তমান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন নিষ্পত্তিতে আদৌ বিশ্বাসী নন। সুতরাং তিনি যে ধরণের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করবেন, তাতে যে নিষ্পত্তির পথ আরও দুর্গম হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? কেবল আশ্চর্য এই যে, ইনিই হলেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ব্রতী, পৃথিবীর শান্তিরক্ষাকারী ইউনো'র নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষ।

২৭।৩।৫১



নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

হোলীর হুল্লোড়

আমি বোধ হয় খুব শিগ্‌গিরই ধর্মান্তর গ্রহণ কর্চ্ছি—কারণ চতুর্দিকের ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আর হিন্দু হয়ে থাকা আমার চললো না। পাল, পার্বণ, পুজোর ধুম তো স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছেই—উপরন্তু চাঁদা, হুজুগ ও হুল্লোড় যেভাবে ওগুলির সঙ্গে তাক্‌ দুমাদুম্‌ করতে করতে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, তাতে পিত্তি পর্যন্ত খাক্‌ হয়ে গেল। সবাই মিলে যাকে বলে একেবারে পাগল করে আমায় ছেড়ে দিলে।

নির্বিঘ্নে, ভদ্রসম্মতভাবে, লোককে না জ্বালিয়ে কোন উৎসব এদেশে বোধ হয় হবে না। হয়তো আপনারা বলবেন, উৎসব হলেই হৈ-চৈ একটু হয়ে থাকে, মানুষের প্রাণের চাপা আনন্দ বাইরে ফেটে বেরিয়ে আসে—সে সময় অত হিসেব করে কেউ চলে না, চলতে পারে না। তোমার আমার সবেতে ফুট্‌ কাটা স্বভাব।

আজ্ঞে ভুল করছেন, উৎসবের নাম ক'রে যখন লোকে কাঁধে চেপে চূড়ান্ত বাঁদরামি করে দেখি, তখনই আর থাকতে পারি না। ফুট্‌ কি সাধে কাটি, সকলে মিলে তপ্ত কটাহে বসিয়ে এদিকে যে আমায় ফুট্‌কড়াই করে ছেড়ে দিলে, সেটা তো আপনারা দেখতে পান না—শুধু আমারই দোষ দেখেন। এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা হবে কোথা থেকে বলুন? আমার মত যদি হেঁটে প্রত্যহ দুবেলা বাজার-দোকান করতে হ'ত, আপিসে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে ট্রামে-বাসে যেতে হ'ত এবং একশো টাকা নিয়ে একত্রিশটি হাঁরের ভেতর কিছু মাল ঠেসে দিতে হ'ত তাহলে বুঝতেন যে, গা ঘামে কি না।

বাবুরা সেদিন দোল খেলতে বেরিয়েছিলেন। কাগজে দেখেছেন বোধ হয়, পাঁচশো পঁচাত্তর জন সেদিন দোলের স্ফূর্তি মারতে গিয়ে পুলিস হাজতে গেছেন—এর মধ্যে আমার গুষ্টির ক'জন আছেন, খবর রাখেন কি? অন্তত পঁচাত্তর জন। আদালতে পাঁচটি দশটি করে নগদ মানি (Money) খেসারৎ দিয়ে নীলমণির দল একে একে বাড়ি ফিরে এসেছেন, কিন্তু ভুটে, গোঁদল, ন্যাংচা, ধুমসো, কেঁদো আর হুড়কোটাকে এখনও জামীনে খালাস করে আনতে পারি নি।

বাড়িতে আবার তার জন্যে কান্নাকাটি কত! আমি বলি, যখন এরা বাইরে মাথা ফাটাফাটি করে বেড়ালো, তখন বারণ করতে কারুর খেয়াল হয় নি? আর এখন বিপত্তারণ মধুসূদনকে স্মরণ করতে করতে ছুটে মর তুমি। তার ফলে পাহারাওয়ালা থেকে শুরু করে উকীল, ব্যারিস্টার, এটর্নীর পদধারণ করে আমায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, প্রত্যেকের কাছে নাকখৎ দিয়ে বলতে হচ্ছে, যাক্‌গে মশাই, ছেলেমানুষ খেয়ালের চোটে কতকগুলো বেমক্কা কাজ করে ফেলেছে, ওদের এবারটা রেহাই দিন। তাই শুনে তাঁরা আবার আমায় এই মারেন তো এই মারেন!

ছেলেমানুষ? বলে, সময়ে বিয়ে দিলে সব হাতীর মত দুম্বো দুম্বো ছেলে হয়ে যেত, ছেলেমানুষ?—ইত্যাদি ইত্যাদি মুখ ভেংচে সে কি গালাগাল।

মানে, বুঝলুম দ'কে পড়লে কারুর মুক্তি নেই। সবাই নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করবেনই। আমি কী প্রতিকার করবো বলুন?

তোরা করবি নিত্যি উৎপাত, আর বার বার আমি কাঁহাতক খেটেখুটে এসে থানা-আদালত আর উকীল-বাড়ি করে বেড়াই বলুন তো? সংসারে এমনি প্রতিদিন চাল-ডাল, কাপড়চোপড় কেনবার ভাবনায় মাথার ঘিলু চ'লকে চলকে প'ড়ে ভাঁড় খালি হয়ে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর এইসব ছেঁড়া-ন্যাটার উপদ্রব নিত্যি সওয়া যায়?

বাবুরা রোজ একটা না একটা হাম্‌লা করে আসবেন, আর তার তাল সামলাবার ভার পড়বে আমার ওপর। তাও এক-আধবার হয়, নয় তার মানে বোঝা যায়, কিন্তু যে কোন পাল-পার্বণ আসুক, অমনি দেখবেন একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে আছে। এটা যেন এদেশের ছেলেপুলেদের একটা স্বাভাবিক চারিত্র্য-ধর্মে দাঁড়িয়ে গেল। এতটুকু নিয়ম, এতটুকু রসবোধ, ওজন, বুদ্ধি কোন কিছুর বালাই নেই। অপর জায়গায় যাও-বা আছে, আমার বাড়িতে তো একদম নেই।

গম্ভীরভাবে বাড়ির সবাই বললেন, দোলে রং খেলতে হয়, ফাগ মাখতে হয়—তাতে নাকি শরীর ভাল থাকে। শরীরের জন্যে যোগ-ব্যায়াম আছে, ডাম্বেল আছে, ডন-বৈঠক আছে, সংযম পালন করার কথা আছে, সে সব চুলোর দোরে যাক্‌—একদিন ফাগ মেখে এঁরা একেবারে কান্তি বদলে ফেলবেন। আচ্ছা, এসব কথা শুনলেও রাগ হয় কিনা বলুন? যাই হ'ক ফাগ কোথাও মেলে নি, বাবুরা রং খেলতে বেরুলেন, যেখানে সেখানে যার-তার মুখে এমন রং মাখালেন, যার ফলে তাঁদের অভিভাবকদের আজও মুখে আলকাতরা মেখে হনুমান সেজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বলবার যো নেই—ধর্মে হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে হয়তো। অতএব সব নীরবে সহ্য কর! এতে যদি আমি ধর্মান্তর গ্রহণ করার কথা ভাবি, তাহলে আমার কোন অপরাধ হয় কি? ধর্মের নাম নিয়ে, মোচ্ছবের নাম নিয়ে চরম ইয়ার্কি করে বেড়াবে তোমরা, আর আমরা জুলজুল করে চেয়ে চেয়ে তাই দেখবো—এ অসহ্য!

মশাই, পঞ্চাশবার—বুঝেছেন, দোলের আগে থেকে জানি পরে সবাইকে ঘোল খাওয়াবে ভেবে ছোঁড়াগুলোকে খবরের কাগজের কাটিং কেটে কেটে বুঝিয়েছি যে, দেখ্‌, দিনকাল খারাপ যার তার গায়ে রং ছিটুস্‌ নি—এ আর ১৫ই আগস্ট নয় যে, লাটসাহেবের বাড়ি থেকে থালা, ডিস্‌ পর্যন্ত গ্যাঁড়া মেরে বাড়িতে ঢোকাবি, আর কেউ কিছু বলবে না—এখন অন্য ব্যাপার, দোহাই তোদের, কোন ফ্যাসাদ বাধাসনি। তখন সব ক'টা মিচ্‌কের মত চুপ করে রইলো।

তারপর দিনই 'হোলী হায়!' বলে যত কিছু আনুহোলি ব্যাপার আছে, তাই সংঘটনের জন্য সকাল থেকে আদা-জল খেয়ে সব দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পাড়ায় সুবিধে হবে না, সেখানে পট্‌কা আর পুঁটকেগুলোকে রেখে তাঁরা বে-পাড়ায় বেরুলেন হুজ্জুৎ করতে। তার ফলে ফচ্‌কেগুলো পিছনে বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ওঁরা পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। তবে ছ্যাব্‌লাগুলোও কম গেল না!

প্রাতঃকাল থেকেই হাঙ্গামা শুরু হল। পট্‌কাকে দু'আনা পয়সার ফাগ কিনতে দিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি তৎপরিবর্তে বাঁদুরে রং গুলে গঙ্গাস্নান গমনোদ্যত এক বৃদ্ধাকে এমন রং মাখালেন, যার ফলে আমি ও আমার চোদ্দ-পুরুষ সকলে অনিবার্য নরকবাসের ব্যবস্থা-পত্র পেয়ে গেলুম। উঃ! স্ত্রীলোক যে কী গাল দিতে পারেন, সেইদিন মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলুম।

বেলা বাড়তে সে যে কী কাণ্ড শুরু করলে, তা কি বলবো! ট্যাক্সি করে লোক যাচ্ছে, দে ট্যাক্সিতে আবলেশ রং ছিটিয়ে, ট্রামে-বাসে লোকে নিতান্ত দায়ে পড়ে সেদিন কেউ বেরিয়েছে, তার ঘাড়ে দে খানিকটা গোবর আর আল্‌কাতরা গুলে। পৃথিবীতে ভদ্দরলোক রং যতগুলো আছে নয় তাই দে, যা ধুলে উঠে যায়—তা নয়, যত বিদ্‌কুটে কিম্ভূত, নোংরা, দুর্গন্ধ, রং-বেরং বাজারে বেরিয়েছে বা বেরোয় নি—তাই আবিষ্কার করে করে কলম্বাসের ছানারা লোককে ছিটুতে লাগলো।

ওদের খ‍ুঁজতে গিয়ে আমি পর্যন্ত মনে করুন, যখন বাড়িতে দ‍ুটোর সময় ফিরল‍ুম, তখন মনে হল আফ্রিকার কোন জঙ্গল থেকে কোনক্রমে বেরিয়ে শহরে ঢ‍ুকে পড়েছি।

আমায় সেই অবস্থায় দেখে সবাই কোথায় একট‍ু সহান‍ুভূতি দেখাবে তা নয়, উপরন্তু গিন্নী



বসন-কলঙ্ক অপবাদ

পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, ওমা! এই সেদিন কণ্ট্রোল থেকে ঐ কাপড়টা কেনা হল, আর তুমি ব‍ুড়ো-মদ্দ তাই প'রে রং খেলে এলে?

শ‍ুনলেন কথাটা? আমি ব‍ুড়ো দামড়া, আমার আর কাজ-কর্ম নেই, আমি রং খেলতে বের‍ুল‍ুম? এসব ঢংয়ের কথা শ‍ুনলে রেগে টং হয়ে যেতে হয় কিনা আপনারাই বল‍ুন তো?

আমিও তাই খিঁচিয়ে জবাব দিল‍ুম, তাইতো! আমিই তো ইচ্ছে করে সং সাজল‍ুম কিনা—ওদিকে যে তোমাদের গ‍ুণধর কিং-কংরা বাঙলাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার খেয়াল রাখ?

কথাটা আর শেষ কর্তে হল না, ইতিমধ্যেই বাব‍ুদের সব মাতামাতির খবর কাণে পৌঁছল। তখন ছোটো—তাদের খালাস করতে।

এ-বাজারে একটা ছেলে খালাস করা সোজা কথা? বিশেষ প‍ুলিসের হেফাজৎ থেকে? টানাটানিতে প্রাণ যায় আর কি! তারপর প্রত্যেক ছোড়াটার নামে যা সব অভিযোগ, তা শ‍ুনলে তো একটি একটি রসগোল্লা জলযোগ করে বিছানায় কাৎ হয়ে শ‍ুয়ে পড়া ছাড়া ভেবে কিছ‍ু কুল-কিনারা করতে পারা যায় না।

গ‍ুণের কথা বলবো কি, ন্যাংচা, ধ‍ুম‍্সো, আর হ‍ুড়্কোটা কোথা থেকে বোধ হয় সিদ্ধি-মিদ্ধি গিলে একটা হরিনামের খোল, খন্তাল জোগাড় করে তাই বাজাতে বাজাতে ভূত সেজে কোন্ হাসপাতালে এক অপারেশনের ঘরে ঢ‍ুকে নেত্য শ‍ুর‍ু করে দিলে। আচ্ছা, কী কাণ্ডটা ব‍ুঝ‍ুন!

ভুঁটে আর কেঁদো আবার অতি-আধ‍ুনিক তো? তাঁরা আবার গোটাকতক বান্ধবী জোগাড় করে, জীপ নিয়ে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত রং খেলবার জন্যে ট্রিপ্ দিতে বেরিয়েছিলেন, তারপর বে-জায়গায় আর এক-দলের সঙ্গে হিচ্ হতে তারা আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে সব ডিচে ফেলে দিয়ে যায়—পরে দলবল সমেত ধরা প'ড়ে তাঁরা থানায় যান।

ধন্যি এদের সখীরাও বাবা! থিয়েটারে, বায়োস্কোপে, হোটেলে নেচেও এদের আর স‍ুখ হচ্ছে না। 'উন্মাদিনী কে রে ফেরে' করে সব রাস্তায় মাতন করতে দ‍ুম্ দ‍ুম্ বেরিয়ে পড়লো।

বলবার যো নেই—সব সমান! নারী-প‍ুর‍ুষের সমান অধিকার। কিন্তু বাপ‍ু, এটা বোঝো না যে, স্বয়ং বিধাতা-প‍ুর‍ুষের সে ইচ্ছে থাকলে তো গড়বার সময়ই দ‍ুপক্ষকেই এক প্যাটার্ন করে ছেড়ে দিতেন। তা এসব বললে, শ‍ুনছে কে? বেশী বললেও বিপদ! কোনদিন রাস্তায় ধরে বেইজ্জত করবে! নিজেরা না



'জীপ‍্সি'দের রঙীন ট্রিপ্

কর‍ুক, কতকগ‍ুলো ষাঁড়কে লেলিয়ে দিয়েও হয়তো গ‍ুঁতুবে, তাই চুপচাপ থাকাই ব‍ুদ্ধিমানের কার্য। কিন্তু ক্রমশ সব দেখে-শ‍ুনে আক্কেল গ‍ুড়‍ুম হয়ে যাচ্ছে, আর ভাবছি যে, মরবার বয়েস হয়ে এল—চিতায় ওঠবার সময় বরাবর এখনও না জানি আরও কি কি অভিজ্ঞতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভবনদীর ক‍ুলে গিয়ে ঘাই মারতে হবে।



চিত্রপ্রদর্শনী

চীনা শিল্প

শিবজেন্দ্র মৈত্র

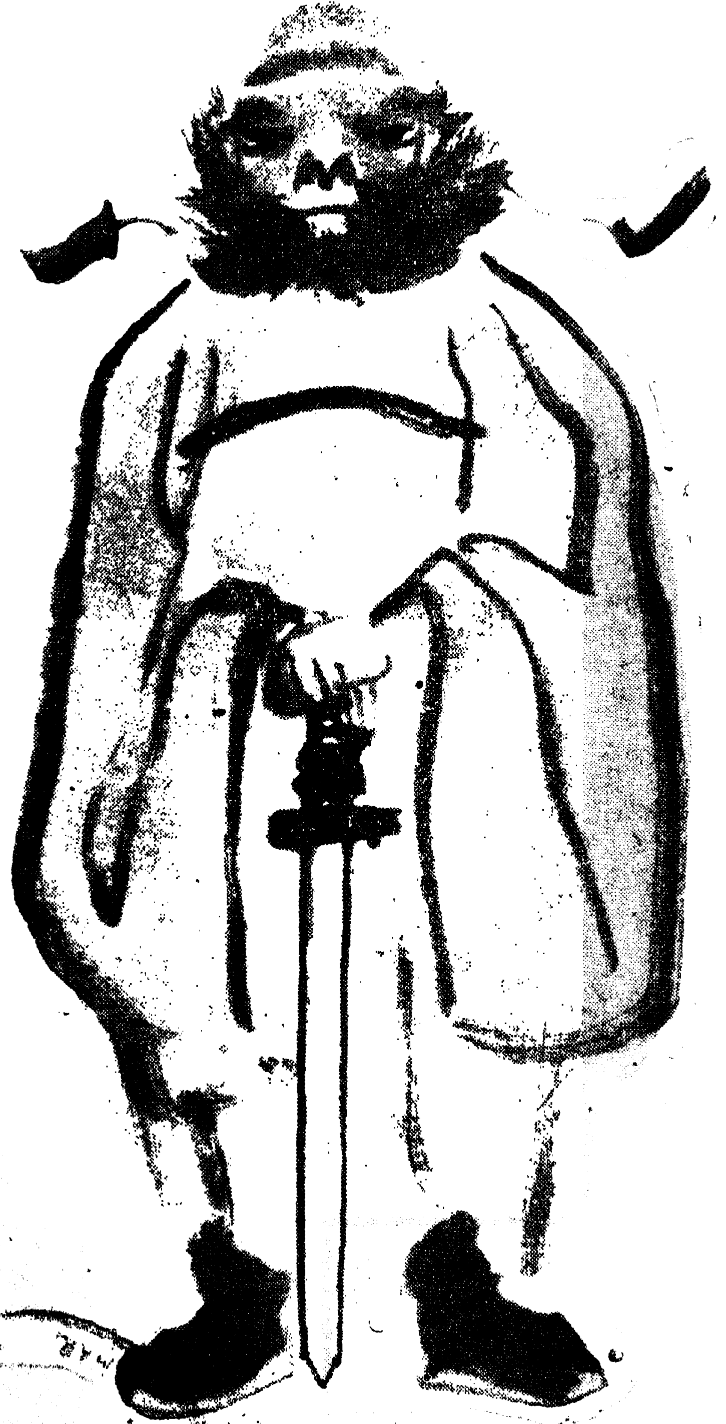
বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বের ভৌগোলিক ব্যবধান যতো সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, মানুষের জাতিগত বিশিষ্টতাও ক্রমশ অবলুপ্তির পথে চলেছে। আধুনিককালে যে কোন সভ্য মানুষের সমাজে একীকরণের রূপ এতো স্পষ্ট যে, জাতিগত রূপের মৌল সুগন্ধটি পাওয়া একান্ত দুর্লভ হয়েছে। আজকের দিনে কোন জাতির বিশিষ্ট রূপটির সন্ধান পেতে হলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

যে প্রবলতম অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক ভাবনার আক্রমণে বিশ্বের সর্বত্র সমাজ ও সংস্কৃতিতে রূপান্তর হতে চলেছে, অনিবার্য-ভাবে সাংস্কৃতিক কারুকর্মের এক বর্ণসংকর রূপসত্ত্বার অভ্যুদয় হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ, জাপান ও চীন দেশ থেকে পাওয়া যাবে।

কিছুদিন আগে চীনা শিল্পেব একটি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী কোলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিত্রশিল্প, পুতুল, গালার কাজ প্রভৃতি শিল্পের নমুনা এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হয়েছিল। অবশ্য চীনা শিল্পের অতি আধুনিক নমুনা এই প্রদর্শনীতে পাওয়া যায়নি। শিল্পীরা প্রায় সকলেই প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যপন্থী, যদিও সময়ের দিক থেকে তারা অনেকেই সমসাময়িক ও জীবিত।

প্রাচীন চীনা শিল্পের অভিনবত্ব, উৎকর্ষ ও মহার্ঘতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি অল্পদিনই এবং তাও একান্তভাবে য়ুরোপীয় শিল্পরসিকদের কল্যাণে। নব্যভারতীয় শিল্প আন্দোলনের অনেক শিল্পীর কাজেই চীনা শিল্পের আঙ্গিগত ব্যবহারের একটা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেই আঙ্গিক ব্যবহারে মূলগত দৃষ্টিকোণ আমাদের শিল্পীদের আয়ত্বের বাইরে ছিলো। সেই কারণে চীনা শিল্প সমগ্র প্রাচ্য-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও আজও তা আমাদের কাছে রহস্যময় ও অনুভবের অতীত বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

কোন দেশের শিল্প সেই দেশের সামাজিক অবস্থা ও জীবনাদর্শের প্রতীক হয়ে প্রকাশ পায়। চীনা শিল্পের সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসে যে রূপজগৎ উন্মিলিত হয়েছে তা চীনা জীবন ও



দ্বাররক্ষী দেবতা

ভাবনারই রূপপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং চীনা শিল্পকে উপলব্ধি করতে হলে চীনের জীবন-দর্শন, আধ্যাত্মিক চেতনা ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পবিচার ছাড়াও আর একভাবে আমরা চীনা শিল্পের রসাস্বাদন করতে পারি। তা হচ্ছে আঙ্গিক বিচারের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন, চীনা শিল্পের আঙ্গিক তার দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতার আর একটি দিক। চীনা শিল্প মূলতঃ রেখাধর্মী। এই রেখার সাবলীল ব্যবহার, তার ইচ্ছাকৃত সংক্ষিপ্ততা, রঙের ন্যূনতম প্রয়োগ ও অবকাশের (space) সৃষ্টি দ্বারা ভারসাম্য রচনা এই হলো চীনা শিল্প আঙ্গিকের মূলকথা। যদিও চীনা শিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শৈলীর উদ্ভব হয়েছে এবং ভিন্ন দেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তবুও চীনা শিল্পের এই আঙ্গিকগত গুণ সমগ্র শিল্প ইতিহাসকে এক ঐতিহ্যগত ঐক্যে বিধৃত করেছে।

এই প্রদর্শনীতে যে ক'টি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিলো তার থেকে চীনা শিল্পের অলৌকিক সুষমার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো শিল্পী লী, খ, রাণের 'মহিষ ও বালক' (৪৩) রচনাটি। চীনা শিল্পের আঙ্গিকগত উৎকর্ষের এটি একটি আশ্চর্য উদাহরণ। যে কোন শ্রেষ্ঠ চীনা শিল্পীর তুলিতে কালো রঙ্ এক অসীম ব্যঞ্জনার ধারক। এইভাবে কালো রঙের ব্যবহারের মধ্যে যে বিভিন্ন টোন সৃষ্টি হয়, তাতে শুধু বর্ণের অবস্থাগত পার্থক্য এনে দেয় তা নয়, বস্তুর গভীরতা, গুণের ব্যঞ্জনা এনে দেয়। এই ছবিটিতে যেভাবে কালো রঙ্ ছাড়বার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং তার ফলে যে টোন সৃষ্টি হয়েছে তা এই চিত্রটিকে অপূর্ব গুণবিশিষ্ট করেছে। এই প্রসঙ্গে চীনা শিল্পীর পশু ও জীবজগৎ সম্বন্ধে ঐতিহ্যগত ধারণাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্রামরত মহিষের একটা দৃষ্টিগত যথার্থতার পরিচয় দেওয়া অথবা তার রূপকাভায় ব্যক্ত করাও শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়। নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রাণীর অন্তর-দীপ্তি, শক্তি ও আরামের আভাষ দেওয়াই শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতপক্ষে কী রচনা গুণের দিক থেকে, কী শিল্পীর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতার দিক থেকে এ চিত্রটিকে নিঃসংশয়ে প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা যেতে পারে। এই শিল্পীরই আর একটি রচনা এ প্রদর্শনীতে আছে, তা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। 'দ্বাররক্ষী দেবতা' রচনার সংক্ষিপ্ততায় ও ব্যঞ্জনার উৎকর্ষে একটি অপূর্ব শিল্পরচনা বলে পরিগণিত হবে।

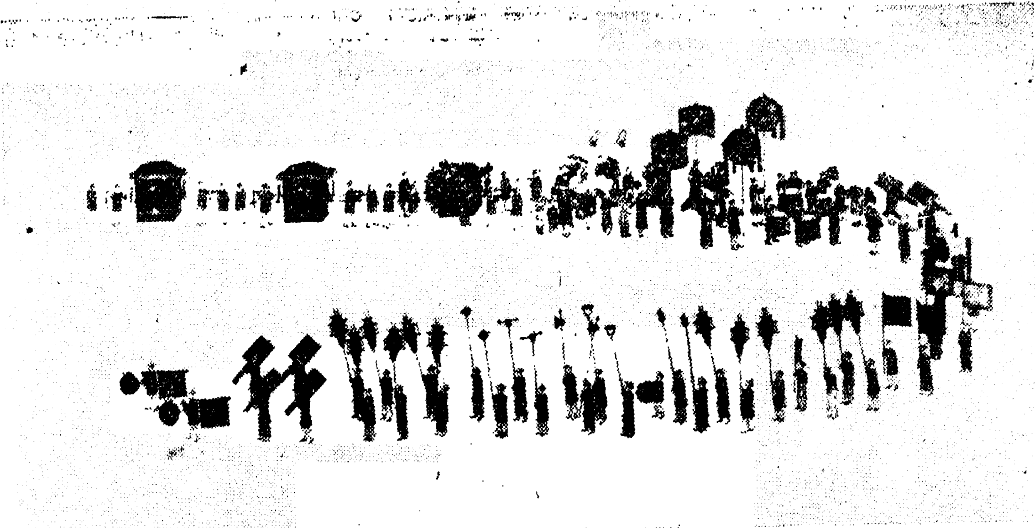
শ্রীমতী ইউ উন শানের কয়েকটি ছবি এই প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করেছে। তার মধ্যে রাজগৃহ (৩৫) দার্জিলিং-এর দৃশ্য (৩৬) বৃষ্টি (৩৮) বসন্তের ফুল (৬৮) বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। রাজগৃহ চিত্রটিতে ভারতবর্ষীয় নিসর্গ চীনা শিল্পীর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতায় কিভাবে যে রূপান্তরিত হতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাজগৃহের নিসর্গ শিল্পীর চোখে যে বিরাট ও অচঞ্চল ব্যাপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, সেই গাম্ভীর্য ও বিরাটত্বের আভাসই এই নিসর্গ চিত্রকে এক আশ্চর্য মহিমা দিয়েছে। 'বৃষ্টি' ও 'বসন্তের ফুল' চিত্র দুটিতে শিল্পীর ঐতিহ্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ছি ওয়ান পোর 'বাঁশ গাছে ফড়িং' চিত্রটিও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। চীনাদের কাছে হস্তলিপি ও চিত্র-রচনা এই শিল্প আবেদনের পর্যায়ভুক্ত। এই প্রদর্শনীতে চীনা হস্তলিপির কয়েকটি উৎকৃষ্ট নমুনা লক্ষ্য করা গেলো।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। চীনা শিল্পে বিভিন্ন রঙের ব্যবহারের অবকাশ অত্যন্ত অল্প। কালো রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পী প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে। সুং যুগের শিল্পীদের হাতে এই কালো রঙের ব্যবহারের চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেছে। চীনা শিল্পী তার চিত্ররচনায় যখন অন্য রঙ্ ব্যবহার করেন, তখন তা একান্ত অপরিহার্য বলেই, তাও সংক্ষিপ্ততম ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। এই প্রদর্শনীতে কয়েকটি চিত্রে ফুলের রঙ ব্যবহারে যে সস্তা



মহিষ ও বালক



বিবাহের শোভাযাত্রা

[লোক-শিল্পের নিদর্শন]

যাহার লক্ষ্য করা গেলো তা কোনক্রমেই দৃষ্টিকে পরিতৃপ্তি দেয় না। তারপর কয়েকটি চিত্রে আধুনিকতার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস, শিল্পকে মূল্যহীন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঝড়ের মধ্যে পাখী' এই ছবিটিতে গভীরতা সৃষ্টির জন্যে অনাবশ্যক কলো রঙের প্রলেপ একটা বর্ণসংকরতার সৃষ্টি করেছে।

পিকিংএর শিল্প-শিক্ষালয়ের জনৈক শিক্ষকের হস্তমুদ্রার কয়েকটি রেখা রচনা এই প্রদর্শনীর একটি মূল্যবান সংগ্রহ। ভারতবর্ষীয় রেখা রচনার ও শিল্প আদর্শের সঙ্গে চীনা আদর্শের এই যোগাযোগ ও ঐক্যের নমুনা হিসেবে এই রেখারচনামালার একটি বিশেষ মূল্যে আছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে চীনা শিল্পের এই ঐক্য যে মূলগত, তার প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যাবে এবং আমাদের আধুনিক শিল্পশিক্ষাব্রতীদেরও পরস্পরের সংস্কৃতি অনুধাবন করার পক্ষে সহায়ক হবে।

শ্রীসুধী

"সহস্রাক্ষ"

শ্রীসুধীর একক চিত্রপ্রদর্শনীটি 'কাফে এভারেস্ট স্টুডিও'তে গত ১৮ই মার্চ সাধারণের সম্মুখে খোলা হয়েছে, শিল্প বা চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে এই ধরণের রেস্তোরাঁ এক যুগে ফ্রান্সে বেশ চালু ছিলো। কিন্তু এই হাওয়া সম্প্রতি আমাদের দেশেও বইতে শুরু হয়েছে। কোন ছবির প্রদর্শনীর মধ্যে শুধু ছবির সমাবেশই প্রধান কথা নয়, দর্শকের ছবি দেখা ও অনুভব করার অনুকূল পরিবেশ রচনা করাও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কর্তব্য। অন্ততঃপক্ষে নিরূপদ্রব আবহাওয়ার দাবী দর্শকেরা করতে পারেন। রেস্তোঁরার ভোজন ও আড্ডাবিলাসী খরিদ্দারের উচ্চকিত কোলাহল ও বিপরীত চিত্তবৃত্তি একান্তভাবেই শিল্পরসগ্রহণের পক্ষে বাধাস্বরূপ। এই সত্যটি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। 'কাফে এভারেস্ট স্টুডিও'তে ছবি দেখতে গিয়ে ঠিক এই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। তা'ছাড়া স্থান সংকুলানের জন্য অনেক ছবির কাছে পৌঁছানই অসম্ভব! তবুও বেশি ছবির ভিড় সেখানে নেই তাই ছবি দেখে পরিশ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয় না।



বনের পথে

ভারতীয় কোন শিল্পধারাই শিল্পীকে আকৃষ্ট করেনি তাই ভারতীয় আঙ্গিকে আঁকা কোন ছবিই এ প্রদর্শনীটিতে নেই। "ইমপ্রেসানিস্টদের" কাজ শিল্পীকে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তাই তাঁর কাজে ইমপ্রেসানিস্টদের কাজের ছাপই বেশি, যদিও কোথাও কোথাও মডার্ন (?)পন্থীদের অনুকরণের প্রচেষ্টা তাঁর কাজে পাওয়া যায়—যেমন, 'অন্তর প্রেরণা'



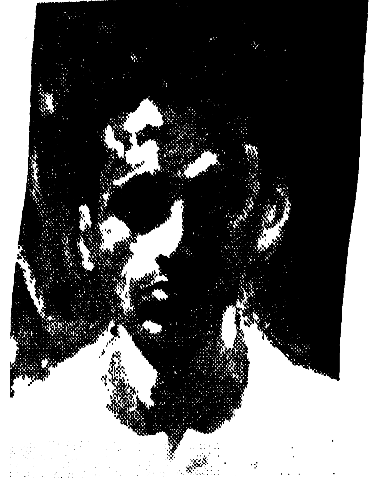
ফুলদানি



বাগানের ফুল

(১) 'কিস্' (২,৪) ছবিগুলো। সব ছবি-গুলোই 'টেম্পেরা' ও 'ওয়াশ' প্রথায় অঙ্কিত শুধু একটি তৈল রঙের ছবি বাদে। ৩নং ছবিটার ত্রিকোণ প্রথায় আগাগোড়া অঙ্কিত হলেও পেছনের প্রবহমান রেখাগুলোয় সামগ্রিক ছন্দগুণ নষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া পেছনের লাল ও নীল রঙের ব্যবহারও চোখকে পীড়া দেয়। এই গুরুচণ্ডালী দোষ আরও কয়েকটি ছবিতে দেখা যায়। এদিক দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি (নং ২৪) সার্থক সৃষ্টি। উদ্যানের পুষ্পগুচ্ছতে ফুলের টবটি বাদ দিয়ে নীচের দিকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হত মনে হয়। স্টিল লাইফ (এ এবং বি) মন্দ নয়, রঙের ব্যবহারও তৃপ্তি দেয়। 'বানজারা'য় রাজপুতনার সেই বীর বানজারাদের তেজোদৃপ্ত সুঠাম মুখের ছাপ পাওয়া যায় না—তাদের শিরোভূষণের সেই বৈচিত্র্যও এতে নেই। 'বনের পথে' আর একটি উৎকৃষ্ট ছবি।

তবুও শিল্পী আমাদের একবারে নিরাশ করেননি যে, অতি আধুনিকতার ফ্যাসানে আজ অধিকাংশ শিল্পীই আত্মবিক্রীত, সেই সর্ব-গ্রাসী উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি পেলেই তাঁর শিল্প, স্বকীয় ঐশ্বর্যে দেখা দেবে।



নিজ প্রতিকৃতি

এই হৃদয়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তবে যাই।
তবে যাই যেইখানে মাঠে মাঠে স্বর্ণরৌদ্র ঝরে,
আলোকের বর্ণধারা ফসলের বুকে এসে পড়ে।
আকাশের দিগন্ত সীমায়
থরে-থরে শাদা-শাদা মেঘের পালক; সারা নীলিমায়
যেইখানে থরো-থরো জীবনের নিভৃত আলোক।

সেইখানে চলো যাই।
তেপান্তর পার হ'য়ে সেইখানে রাতের শিশির
মুক্তার মতন নড়ে; অশোকের পলাশের ভিড়
ছড়ায় নিবিড় ঘ্রাণ ছবির মতন যতো ছোট-ছোট নীড়ে;
মুক্তা ঝরে রাত্রিকালে জোৎস্না-ধোওয়া বেনুমতী তীরে।

সেইখানে জীবনের নিভৃত স্বপন যতো জটলা পাকায়।
পাতা ঝরে; বনমর্মরের ঢেউ মাধবী শাখায়।
অর্ধরাতে ঝিল্লীস্বর; স্তব্ধতাকে দীর্ণ ক'রে পথের বাতাসে
কৃষ্ণচূড়ার ঘ্রাণ বাতায়নপথে ঘরে আসে।
সেইখানে সংসারের যতো খেদ যতো ভাবনারা
নিমেষে উধাও হয়; শুধু ক্ষেত, শুধু ভিটেমাটি
পটে-আঁকা ছবিটির মতো পরিপাটি;
ছোট স্বপ্ন ছোট তৃষা হৃদয়কে দেয় শুধু নাড়া।
চলো যাই যদি থাকে সে-রকম কোনোও সংসার
কোনোখানে;
চলো যাই তবে দূরে অন্য কোনো নীড়ের আহ্বানে।
তুমি, আমি, আমাদের যিনি প্রতিবেশী,
চলো না সবাই হই আজ ভিনদেশী;
অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।

বিমূঢ় হৃদয়টাকে শব্দঘর পৃথিবীর এইখানে রেখে
যদি পারো তবে চলে' যাও।
তোমার অন্তর আজ শত ভগ্ন শত দীর্ণ বর্শার ফলকে;
এইখানে হৃদয়কে তাই রেখে যাও।
শতাব্দীর বিষবাষ্প সংক্রামিত হৃদয়ে তোমার,
অতৃপ্ত অস্থির দাহ পাষাণের মতো গুরুভার;
যদি পারো এইখানে সবি তুমি রেখে চলে' যাও।

নতুবা যেখানে যাও
হৃদয়ের বিষবাষ্প সমুত্থিত হবে ক্ষীপ্র ঝলকে-ঝলকে,
অরণ্যের দাবানলে শুরু হবে খাণ্ডবদাহন—
তুমি টের পাও?
যেখানেও যাও তুমি হৃদয়কে এইখানে রেখে
তবে যেতে হবে;
কেননা মানুষ আজ নিজেদের হৃদয়ের বিষবাষ্পে পৃথিবীকে ঢেকে
বৃথাই পালাতে চায় অন্য কোনোখানে;
অনেক সংসার আজ পুড়ে' খাক লোভাতুর হৃদয়েরই টানে॥

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে গুঁড়িয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরী করছি তাঁদের সঙ্গে দেশের পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা বন্ধু। সত্যিকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কনফুৎসিয়ে টে-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ততমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সায়েব বললে, "লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।"

আমার চীনা বন্ধুটি আদব-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিল-ক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, "কি গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।" তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন,

"চীনা গুণী আচার্য উ তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

"সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওলা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সেকথা সকলেরই জানা ছিল।

"ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। ধন-প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই এক জোট হয়ে—

"এমন সময় বাড়ির দরোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।'

"যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়! জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট, দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

"কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বারবার প্রণাম করে বলল, 'হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলিম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার সামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।' সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।"

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে "সাধু, সাধু", "শাবাশ, শাবাশ" বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, "এ একটা গল্পের মত গল্প বটে।"

আচার্য উ বললেন, "এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি?"

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী কিন্তুর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার! বাপরে বাপ। দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।"

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, "ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এ রকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।"

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, "আমি প্রমাণ করতে পারি।" রাজা বললেন, "ধরো বাজি।" "কত মহারাজ?" "দশ লাখ?" "দশ লাখ।"

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে হুকুম জারী হল—বিষ্যুৎবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, "মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।"

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙ-টিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যখানে লিকলিক করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেননি। মন্ত্রীকে বললেন, "তুমিই বাজি জিতলে। এই *নাও দশ লখা হার।" মন্ত্রী বললেন, "দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।"* মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, "তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি।"

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "অতশত বুঝিনে হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে *বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।' তাই আমি ওদিকে যাইনি।"*

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প, যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।"

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি?

অর্থমনর্থম্

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

শরৎ চট্টোপাধ্যায় কাবুলিওয়ালার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে যে রসিকতা করিয়াছেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সত্যই এই দুনিয়ায় সকলই সম্ভব। নহিলে, আমিও কি না হিসাব রাখি! আমার হাঁড়ির খবর অবশ্য ধর্মের তত্ত্বের মত গুহায় নিহিত নয়। রাস্তার লোক ধরিয়া তাহার কাছে আমার আর্থিক দুরবস্থার কাহিনী নিবেদন করিতেও যেমন আমি নারাজ, পরিচিত ও অন্তরঙ্গ মহলে মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য অর্থের উল্লেখে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আমি টাকা করিতেছি এ হেন গঙ্গাজলী মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতেও আমি তেমনি অক্ষম। সুতরাং আমার কোনও বন্ধু যদি আমার মত বে-হিসাবীর হিসাব রাখায় বিস্মিত হন, তাঁহার কাছে আমার কৈফিয়ৎ এই যে হিসাব করা ও হিসাব রাখা দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া, এমন কি হয়ত বিপরীত ধর্মী। যাহারা হিসাব করে, তাহাদের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ তাহারা নিজের অর্থ নিজেরা ব্যয় করে। ব্যয় করিবার অর্থ নাই বলিয়াই আমার স্বর্গত মাতামহদেবের মত আমারও হিসাবের খাতা জমিতেছে। শেষ পর্যন্ত বাঁধান হিসাবের খাতাগুলি পুত্রদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিব।

তবে মাতামহদেব বিবাহের পূর্বে হইতেই এ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর পেনশান্ ভোগের পর অশীতি বৎসর বয়সে যখন তিনি দেহরক্ষা করিলেন তখন দেখা গেল মফঃস্বল শহরে নাতিবৃহৎ একখানি বসতবাড়ী, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ মূলক কয়েক শত গ্রন্থ ও অতি সযত্নে সংরক্ষিত পঞ্চান্ন বৎসরের হিসাবের খাতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি রাখিয়া যান নাই। পরদুঃখকাতরতা ও পরিজন-বাৎসল্যের রন্ধ্রপথে তাঁহার উপার্জিত অর্থ অদৃশ্য হইয়া যাইত। ফলে হিসাবের খাতার ভিতরে ও বাহিরেই তাঁহার আয়ের স্ফীতি ও সঙ্কোচের সমগ্র ইতিহাস নিবদ্ধ ছিল। আয়ের বৃদ্ধির অনুপাতে খাতাগুলি ক্রমশ কাপড়, চামড়া ও মরক্কোতে বাঁধান। ভিতরেও সেই অনুযায়ী হিসাবের অঙ্ক বাড়িয়াছে; কিন্তু পরিমাণে আয়ের অনুপাতে সঞ্চয় তিনি বাড়াইতে পারেন নাই। হিসাবের খাতায় তাই হিসাবী মনের স্পর্শও লাগে নাই।

তাহার কারণ হিসাব করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও হিসাব রাখা তাঁহার ধর্মের অঙ্গ ছিল। প্রতিটি কপর্দকের যথাযথ হিসাব নিকাশ না করিতে পারিলে ভগবানের কাছে দায়ী হইতে হয় এইরূপ দৃঢ় সংস্কার তাঁহাকে চালিত করিত। গান্ধীজী বিলাতে প্রবাসকালীন একটি পেনির হিসাব গরমিলের জন্য যে আত্ম-ধিক্কার করিয়াছেন মাতামহদেব তাহাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া কখনও উপহাস করেন নাই। হিসাব রাখা তাঁহার নিত্য কর্মপদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল। ইহার জন্য আয়াসও তাঁহাকে কম স্বীকার করিতে হয় নাই। এক রাত্রের কথা মনে পড়ে। সম্ভবত ১৯১৫ সালের শীতকাল। বাহিরে বরফ পড়িতেছে। মাতামহদেবের শয্যাপ্রান্তে শুইয়া আছি। রাত্রি প্রায় দশটা। কেন জানি না সে দিন জাগিয়া ছিলাম। ডোমওয়ালা একটি বাতিদানের আলোক প্রবাহ হিসাবের খাতার পাতায়। দাদামহাশয়ের মুখখানি শেডের ছায়ায় অর্ধস্ফুট, কিন্তু বিলম্বিত শ্মশ্রু-রাজির নিম্নভাগে সেই আলোক—প্রবাহ। খুব মজা লাগিতেছিল। হঠাৎ দেখি, দাদামহাশয় ২।৩ বার তাঁহার অর্থপেটিকা ঝাঁকাইলেন; নোট, টাকা ও রেজকি ৩।৪ বার গুণিলেন; বুঝিলাম, হিসাব মেলে নাই। তাহার পর হাঁকডাক আরম্ভ হইল। মাতামহী আসিলেন। অভিযোগ শুনিয়া নির্লিপ্তচিত্তে তাঁহার শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন; অভিযোগ নূতন নহে। আমার কনিষ্ঠ মাতুল ও মাতুলোপম পরিচারক কেহই আসিয়া সুরাহা করিতে পারিলেন না। গরমিল হইতেছিল বোধ হয় একটি আনির তাহা নিবারণ করিতে সেই যুদ্ধের বাজারে গোটা একটি দুর্মূল্য মোম-বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। অবশেষে দাদামহাশয় দেখিলেন, ঠিকে ভুল। তখন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হিসাব গুটাইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে মনোসংযোগ করিলেন। এই হইল দাদামহাশয়ের হিসাব রক্ষার নিতান্ত মামুলি নিদর্শন।

আমাকে হিসাব রাখিতে হয় অন্য কারণে। আমি যে ঠিক কর্তব্যবুদ্ধির খাতিরে হিসাব রাখি তাহা নয়। নিজের অর্থ নিজে ব্যয় করিব, তাহার আবার হিসাব কি? কিন্তু সত্যই কি নিজের অর্থ বলিয়া আমার কিছু আছে? সারা জীবনই যে পূর্বতন ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থার্জন করিলাম। অবশ্য নগদ টাকা কর্জ না করিলে তাহাকে আমরা ঋণ বলিয়া স্বীকার করি না; কিন্তু এই যে সারা মাস স্বচ্ছলতার মুখোশ পরিয়া ভদ্রসমাজে আমরা বুক ফুলাইয়া চলি ইহাও অপরের অর্থের কল্যাণেই। আগের মাসে যাহাদের মহানুভবতায় ভদ্রতারক্ষা করিয়াছি সেই মুদি, গয়লা, মাছওয়ালা, মাংসওয়ালা, পরিচারক, রজক ইত্যাদিকে তাহাদের পাওনা মিটাইয়া, যদি কিছু থাকে তাহা উপচীয়মান ঋণভারের লাঘবতা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নিঃস্বতাপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে তাহাদের কাছে অভাব-অনটনের প্রসঙ্গ নিতান্তই ছেলেমানুষী। সত্যই ত অভাব কিসের? হাত-চিঠা ফাঁকাইলেই প্রায় সব প্রয়োজনই মিটান সম্ভব। অথচ দেখুন, যাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ আছে তাঁহাদের কত বিপত্তি! কোনও রকমে দুধে হাত পড়িলেই তাঁহাদের মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাপ্‌স্! ব্যাঙ্কের আমানত ভাঙ্গাইয়া খাওয়া। পক্ষান্তরে আমার মত যাঁহারা চাকুরী ও সুনাম বাঁধা দিয়া কালাতিপাত করেন তাঁহাদের মুখে অভাবের কথা বড় একটা শুনিবেন না। তবে অভাবকে জয় করিলেও স্বভাবকে ভয় করি। ঋণ পরিশোধ করি বলিয়াই ঋণ পাই, কিন্তু সে ঋণের হিসাব না রাখিলে যে চলে না।

পাওনাদারের খপ্পর এড়ান যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন একমাত্র পরিত্রাণের উপায় পাওনাদার বদল। অর্থাৎ একজনের পাওনা আর এক জনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া। ধরুন ১৭৷৷৵১০ কোনও দোকানদারকে দিতে হইবে। না দিলে আর ভাল দেখায় না। মাসকাবারী চুকিয়া যাইবার পর ৭ই তারিখে দেখিলেন তহবিলে ৪৷৵১৫ অবশিষ্ট আছে। মাসের আরও ২৪ দিন কেমন করিয়া চালাইবেন সে চিন্তায় বৃথা বিচলিত না হইয়া কোনও বন্ধুর দ্বারস্থ হইলেন। আপনার বন্ধু হইলে তাঁহারও অবস্থা আপনারই মত হওয়ার কথা। তবে সন্ধান লইয়া জানিলেন তিনি সেইদিনই টুইশ্যান, বা লেখা বা জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে কিছু পাইয়াছেন। ঐ যে ১৭৷৷৵১০ আপনার দেয় সে দায় ত আপনারই। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল আপনার বন্ধুরে দুইখানি ১০্ টাকার নোট আপনার পকেটস্থ হইল। কারণ ১৭৷৷৵১০ ত কোনও ভদ্রলোক চাহিতে পারে না। ঋণ পরিশোধ করিয়া ফিরিতেছেন। হিন্দু কলেজের ফটকের সামনে কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা। পাশেই কার্লটন; কফি ও পেস্ট্রি অবলম্বন করিয়া উদ্বৃত্ত ২।১০'র ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আপনার দায় বন্ধু লইয়া আপনাকে এ যাত্রা বাঁচাইলেন; কিন্তু যবেই হউক, আবার অন্য এক বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া এ ঋণ ত আপনাকে পরিশোধ করিতে হইবে। সুতরাং এই যে পরের টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আধবুড়া হইতে চলিলাম এই এজমালী তহবিলের হিসাব না রাখিলে যে চোর অপবাদে পড়ার ভয়। যে দিন হইতে স্বোপার্জিত অর্থে আমার অভাব মিটাইবার দুরপনেয় দুরাশা বিসর্জন দিয়াছি সেই দিন হইতেই হিসাবে মন গিয়াছে। বিগত ১০।১২ বৎসরে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে পাওনাদার অনেকটা কুসংস্কারের মত। এড়ান যায় না; বড় জোর বদলান যায়। আমার হিসাব আসলে এই পাওনাদার বদলের হিসাব।

অবশ্য বলিতে পারেন বে-হিসাবী হওয়া বাহাদুরীর কথা নয়। অবশ্যই নয়। ধরুন, ভাল একটি খেলনা চোখে পড়িল। ছোট্ট মেয়ে; তাহার উপর নিজের। খুব ইচ্ছা খেলনাটি কেনেন; কিন্তু মাসপয়লার পর আর কেনার উপায় নাই; বিক্রেতা অপরিচিত। কিম্বা হয়ত অক্সফোর্ড বুকশপে গিয়া দেখিলেন, হুইসলারের 'অন দি জেন্ট্ল আর্ট অফ মেকিং এনিমিজ।' বহুকাল তাকে তাকে ছিলেন, আজ বাগে পাইয়াও বানাইতে পারিলেন না; কারণ অক্সফোর্ড আত্মারাম নয়। সেখানে নগদ কড়ি ফেলিতে হয়। অবশ্য ভগবান দয়ালু। রোগ কম হয়; তাই টাকার অভাবে চিকিৎসা না করিতে পারার গ্লানি বিশেষ ভোগ করিতে হয় নাই। তবে অর্থের স্বচ্ছলতার কথাই বলিতেছি, বাহুল্যের কথা নয়। হয়ত স্বচ্ছলতা বলিয়া কিছুই নাই। তবে আমি যে স্বচ্ছলতার কথা বলিতেছি সেটা ঠিক অর্থবানের স্বচ্ছলতা নয়। শুনিয়াছি যাহারা একবার সঞ্চয়ের স্বাদ পায় তাহারা সঞ্চিত অর্থের ব্যয়কে তহবিল তছরূপের মত পাপ বলিয়া মনে করে। আরও তুরীয় লোকে উঠিলে সুদ খরচ করিতেও নাকি খচ খচ করে। তবে এ সব শোনা কথা। আমরা যাঁহাদের সহিত চলাফেরা করি তাঁহারা অন্য জাতের লোক। ইঁহাদের মধ্যে যদি কাহাকেও মাসের মাঝামাঝি নগদ মূল্যে কোনও জিনিস কিনিতে দেখি বড় আনন্দ হয়। মাসের একেবারে শেষে চাঁদা আদায় করিতে গিয়া তখনই পাইলে পা জড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ইহাই আমাদের বিচারে স্বচ্ছলতা।

এই স্বাচ্ছল্য অধিকারের বহির্ভূত রহিয়া গেল বলিয়াই অর্থের মূল্য বুঝিতে শিখিলাম না। উদ্ভটকার বলিয়াছেন অর্থের অর্জনে অর্জিত অর্থের রক্ষণে, অর্থের আয়ে ও ব্যয়ে সব কিছুতেই দুঃখ। শেষ কথাটি মানিতে পারি নাই। ব্যয়ে আমার বিপুল আনন্দ। যতক্ষণ ট্যাঁক একেবারে খালি না হয় আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। পকেটে টাকা লইয়া রাস্তায় বাহির হইলে, আমি খরচ না করিয়া বাড়ি ফিরিতে পারি না। আমি নির্লোভ এমন ধৃষ্ট দম্ভ করিব না; কিন্তু লোভের কাছে আত্মাহুতি দিয়া তাহার হাত এড়াইবার জন্যই এমন করি, এ কথাও ঠিক নহে। আসল কথা, যার ছেলে যত পায়, তার চাহিদা তত বাড়ে, এটি একেবারে বাজে কথা। বস্তুত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উপলক্ষ্য পাইলেই মাথা-চাড়া দিয়া উঠে। আমার মত যাহার নিত্য অভাব, মাস পয়লায় তাহার মরিয়া হইয়া উঠা অনিবার্য। হয়ত গৃহিণী বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তোষক না করাইলে আর চলে না। তেমনি গৃহস্বামীর বহির্বাস, কনিষ্ঠ পুত্রের মোজা, কন্যার জুতা সবই সমান অপরিহার্য। সুতরাং কার্যকালে দেখা গেল এই সবের পরিবর্তে হয়ত পীক-ফ্রীনের বিস্কুট দুই টিন লইয়া উপস্থিত হইলাম। কোনও মাসে হয়ত শুনিলাম শীত আসিয়া পড়িয়াছে। আগামী মাসে পশম চাই। পয়লা তারিখে পশম কিনিতে লাজপত রায় বাজারে গিয়া অতি সুন্দর অর্গ্যান্ডি দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিলাম না। মেয়েটার খাসা ফ্রক- হইবে ভাবিয়া বহাত ঠকিয়া কিনিয়া ফেলিলাম। তাহার মাতার মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভয়েলের ছিটও লইলাম। পশম আর কেনা হইল না। অপরের মুখ বন্ধ করিবার অপচেষ্টায় শেষ অবধি নিজের মুখ বন্ধ করিতে হইল। অথচ আমি ধার্মিক নই; ব্রহ্মানন্দের মত ভার্যা-নিপীড়ন করিয়া ধর্ম-জীবন আরম্ভ করিব, এমন সঙ্কল্পও করি নাই। বস্তুত মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য যেদিন হইতে রক্ষা করিতে পারিব, সেই দিন হইতে আর গৃহিণীকে আমার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে এত সংশয়ী হইতে হইবে না। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'ব্যালান্স' শব্দটি বণিকের অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত বলিয়া মনে করিতাম। আজ বুঝিয়াছি, হেগেনবেকের সার্কাসে পোষা সীল নাকের ডগায় রবারের বল ব্যালান্স করিয়া যে কসরৎ দেখায়, মাসিক আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা তেমনই দুরূহ। হেগেনবেকের মত শিক্ষক হইলে এই সীলকেও হয়ত শিখিতে হইত। যাক্ সে কথা।

কিন্তু আমার মত কায়ক্লেশে যাঁহারা পাওনাদার বদল করিয়া তাহারই হিসাব রাখিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদের জীবন দুর্বিষহ এমন কথা ভাবিবার কারণ নাই। পৃথিবীতে তিন জাতের মানুষ আছে; সঞ্চয়ী, ভোগী ও বে-পরোয়া। সঞ্চয়ীদের সঞ্চয়েই আনন্দ। অনেক সময় সঞ্চয়ের চেষ্টাতেও। আমার বদনাম আছে, বাজারে গিয়া আমি সস্তা মাল খুঁজিতে বা দরদস্তুর করিতে পারি না। হয়ত তাহাতে ঠকিতে হয়। বলিতে পারি না; কিন্তু পয়সা বাঁচাইবার জন্য অনেক আয়াসে খারাপ জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই যে সব সময় সস্তা পড়ে, তাহাও নয়। আমার মাতা অপব্যয় সহ্য করিতে পারেন না। আমি ও পিতৃদেব যে অমিতব্যয়ী, বা অন্তত শ্রমকুণ্ঠ, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার জনৈক আরাধ্য আত্মীয় হয়ত আমার মাতাকে জিজ্ঞসা করিলেন, 'আলু কত করে আনা হয়েছে?' উত্তরে নিঃসংশয় হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আলুর যে ভগ্নাংশ পাকশালায় প্রবেশ করিল, তাহা মহার্ঘ্যতর। তাই বলিতে-ছিলাম, সঞ্চয়ীদের সঞ্চয়ের চেষ্টাতেও আনন্দ। ভোগী যাহারা, তাহারা ভোগক্লান্ত। অর্থ-বাহুল্যের অনর্থে সর্ববিধ ভোগের উপচার তাহাদের সম্মুখে। ত্যাগ-স্বীকার না করিয়া, কোনও ক্লেশ সহ্য না করিয়া অতি সহজে যে ভোগ, তাহাতে তৃপ্তি কোথায়? কঠোর মানসিক পরিশ্রম বা কায়িক ক্লেশ সহ্য না করিয়া আহারে রুচি থকে না। রুচির অভাবে রসনায় আর চমক লাগে না। বিরিয়ানি পোলাও, মোরগ-মসল্লম, উৎকৃষ্ট পাকের সন্দেশ রোজ জোটা দুর্ভাগ্যের বিষয়ও হইতে পারে। মোটা একখানা চেক লিখিয়া দিয়া যাহারা গোটা গ্রন্থশালা কিনিয়া ফেলিতে পারে, তাহারা বিত্তহীনের অপব্যয়ের উল্লাস বুঝিবে কি করিয়া। যাহারা ফ্যাশানের অজুহাতে কালিম্পং, কার্লসবাড, নীস, নীলগিরি চষিয়া বেড়ায় তাহারা দশ বৎসরের চেষ্টায় একবার

বেড়াইতে বাহির হইবার উত্তেজনার স্বাদ হইতে বঞ্চিত। তাই বলিতেছিলাম, বেপরোয়াই বাহাদুর।

অবশ্য সঞ্চয়ীর কাছে বেপরোয়া বেল্লিকও বটে; কিন্তু সঞ্চয়ীরা যে অসূয়া-পরবশ তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ আমাদের ভাষায় অমিতব্যয়ীকে কটাক্ষ করিয়া যতগুলি প্রবচন আছে, গোবিন্দের ভজনা ও রাধা-কৃষ্ণের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেও সেই জাতীয় অন্তত দুইটি বাক্য শিষ্ট-সমাজে অনুচ্চার্য। বেপরোয়া বড় জোর হাড়িফাটা কথা বলে। সে যাহা হউক, অমিতব্যয়ীর বেপরোয়াগিরির মজা ভোগীও পায় না। একটি ছা-পোষা গৃহস্থ ভদ্রলোকের কথা জানি। আয় মোটামুটি মন্দ নয়; কিন্তু নানা দুর্বাতিকের তাড়নায় আয়ের অনুপাতে পাওনাদারের সংখ্যা ভয়ানক বাড়িয়াছে। এই সব পাওনাদারের ব্যূহ ভেদ করিয়া অনেকদিনের চেষ্টায় অতীব সুদৃশ্য উর্সটার চীনামাটির একটি কফি-সেট ২০০ টাকা দিয়া কিনিয়া ফেলিলেন। ধনী বিস্মিত হইবেনঃ মোটে ২০০ টাকা;। তাও জোটে না! জোটে না বলিয়াই ত মজা। পিয়রমণ্ট মর্গ্যান ধনকুবের। বিরাট তাঁহার গ্রন্থশালা; অমিত তাঁহার দুর্লভ পুস্তকের বৈভব। কিন্তু ৫।১০ বৎসরের চেষ্টায় একখানি পরিমিত সংস্করণের নানসাচ বা এল্‌সেমিয়র বা কেল্‌মস্কট মুদ্রণালয়ের নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারিলে আমি সেই রকম আনন্দ পাই, যেমন নাকি প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা পাইতেন, সূত্রে একটি অক্ষর-সংকোচ সাধিত করিতে পারিলে। আর এই অমিতাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়ত ৩।৪ মাসের মধ্যে এক জোড়া জুতো কিনিয়া উঠিবার সঙ্গতি থাকে না।

তবে চোরাকে ধর্মের কাহিনী শোনাইবার মতই সঞ্চয়ীকে অমিতব্যয়ের পুণ্যার্জনে প্রবন্ধ করিতে যাওয়া নিরর্থক। অর্থব্যয়ের যে আনন্দ, তাহা হইতে হীনবিত্ত স্বতই বঞ্চিত। সেই বঞ্চনা স্বীকার করিয়া যাহারা সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বেপরোয়ার বিদ্রোহের মর্ম কেমন করিয়া বুঝিবে? আমরা কলিকাতায় যে জীবন যাপন করিতাম, কাহারও অবিদিত নাই। জোড়াতালি দিয়া বেশ চলিত। তাহার মধ্যেই বই কিনিতাম। নিত্য সখ না মিটাইতে পারিলেও, মাঝে মাঝে প্রয়লঙ্কর কাণ্ড করিয়া বসিতাম। একদিন প্রাতঃকালে গৃহিণী বলিলেন, আজ বাজার-খরচ নাই। কথা নূতন নয়; অমন মাসে মাসে হইয়াই থাকে। ভীত না হইয়া ছুটিলাম বন্ধু ধ——র বাড়ির দিকে। ল্যান্সডাউন রোড পার হইতেছি। বিপরীত দিক হইতে আর এক ভদ্রলোক একেবারে গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। বিরক্ত হইব ভাবিবার পূর্বেই দেখি 'ধ'। অযথা বাগাড়ম্বর না করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'একটা পাঞ্জা হবে?' কালক্ষেপ না করিয়া বন্ধু উত্তর দিলেন, 'পাঞ্জার খোঁজেই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। বলিয়া জঠরদেশের উপর হস্ত স্থাপিত করিলেন। বলিলাম, 'কুছ-পরোয়া নেহি।' রাস্তার অপর পারে আর এক অধ্যাপক বন্ধু থাকেন। প্রতীক্ষমান 'ধ'কে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া 'স'র কাছে গিয়া হাত পাতিলাম। 'একখানা ১০ টাকার নোট হবে?' 'বিলক্ষণ' বলিয়া সঞ্চয়ী বন্ধু দুইখানি ৫ টাকার নোট হাতে দিলেন। এক একখানি নোট হাতে 'ধ' ও আমি পরম পুলকিত হইয়া যে যাহার মত বাজারে গেলাম। সেদিন কাটিল। তাহার পরও হাজার চারেক দিন কাটিয়াছে। আরও কয়েক হাজার দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইবে। লায়ালপুরে থাকিবার সময় সতীর্থ অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে গল্পটি বলিয়াই বুঝিলাম, স্থান-কাল-পাত্র ঠিক করিয়া বিচার করি নাই। হয়ত আমার নির্বুদ্ধিতায়, হয়ত বা আমার নির্লজ্জতায় সতীর্থেরা হতভম্ব হইলেন। মুখে হাসি ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া আমারই কষ্ট হইল। আহা বেচারীরা! তবে উত্তর ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলেও কলিকাতায় গেলেও আগেকার সেই বেপরোয়াদের আর তেমন স্ফূর্তি দেখি না। সবাই যদি সঞ্চয়ী হইয়া হিসাব করিতে আরম্ভ করে, আমার হিসাব রাখার মজা কাহাকে বুঝাইব। মিকবারদের একমাত্র গতি অস্ট্রেলিয়া। সামলাইতে না পারিলে অস্ট্রেলিয়ায়ই পাড়ি দিতে হইবে। সেখানে বন্ধু অর্ধেন্দু বক্সী আছেন। তাঁহাকে পত্র লিখিব নাকি?

একটী চিঠি

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বলাকা, তোমার শুভ্র চোখেতে পায়নি ঘুম?
জানো নাকি এটা কুয়াসায় ঢাকা
রাত নিঝুম!
স্বপ্ন দেখোনা? এখোনো কি তার
সময় নয়?
বলাকা, তুমি কি পেয়েছো ভয়?
জানো নাকি আমি পথে ঘুরে ঘুরে, দিশে হারা।—
আকাশের মায়া গান গেয়ে করে
গৃহ ছাড়া।
তোমার বাঁশীতে ফু দিয়েছি আমি
সেই ধ্বনি—
বলাকা এই কি জাগরণী?
মরু পর্বতে ঘূর্ণি ঝড় যে হোল সুরু।
আকাশের বুকে মেঘ শিশুদের
গুরু গুরু।
হিংস্র নখর এখনো লুকোয় বাঁকে বাঁকে
সরল কুমারী বোবা চোখে শুধু
চেয়ে থাকে।

সমুদ্র-ঝড় আসেনি এখনও
মনে মনে?
বলাকা-হৃদয় এখনো কি শুধু দিন গোণে?
মন উত্তাল পাখী শুধু ডাকে বোবা যুগে,
ফেরারী বাহিনী বছর কাটায়
উদ্যোগে।

মনের সূর্য তবুও ভাঙবে
অন্ধ ঘোর
বলাকা, তুমি কি দেখোনি ভোর?
হৃদয় জাগানো পরশমণির সন্ধানেই
তাইতো অলস দুপুর যাপনে,
শঙ্কা নেই।

স্বপ্ন-সাগরে, দিয়েছি নিজেকে
বিসর্জন
বলাকা, তোমার গ্রন্থি হবে না উন্মোচন?

মুখে ওরা যা-ই বলুক

শ্রীবিমল মিত্র



চল্লিশ জোড়া চোখ একদৃষ্টে প্রমীলার দিকে চেয়ে আছে। প্রমীলা বই থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। একদিন ওদের মত বয়েস ছিল প্রমীলার। ওদেরই মত সাড়ীটাকে আঁটসাট করে পরে দশটা বাজতে না বাজতে এসে বসতো ফার্স্ট বেঞ্চে। তারপর কী মনোযোগ দিয়েই না পড়ানো শুনেছে টীচারদের। একে একে ইংরিজী, হিস্ট্রী আর অঙ্কের ক্লাসের পর আধ ঘণ্টা টিফিনের ঘণ্টা—তারপর আবার একে একে সমস্ত ক্লাসের শেষে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী যাওয়া।

—বাসন্তী—

বাসন্তী ঘোষাল পেছনের বেঞ্চে বসে পাশের মেয়েটির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে গল্প করছে আর হাসছে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে আসছিল প্রমীলা।

—বাসন্তী—

প্রমীলা আবার তাকালে। সব মেয়েরা পেছন ফিরে দেখলে। প্রমীলা যখন ওদের মত ছাত্রী ছিল, তখন এমন করে কোনওদিন টীচারদের পড়ানোর সময় গল্প করেনি।

করুক গে গল্প। লেখাপড়া করেই বা তার কী হয়েছে। হয়ত বাসন্তী ঘোষাল আর পড়বেই না কাল থেকে। হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে আজ-কালের মধ্যে। মস্ত বড় ঘরেই হয়ত পড়বে। বলতে গিয়েও কিছু বলা হলো না বাসন্তীকে।

বোর্ডিংএর দালানে বসে প্রমীলা তরকারী কুটছিল।

গৌরী এল। বললে—প্রমীলাদি একটা সুখবর আছে—ওর বাবা রাজী হয়ে গেছে—

প্রমীলা মুখ তুললে। বললে—তা হলে মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে বল্—

—সত্যি প্রমীলাদি, আমি ভাবতেও পারি নি—আজ সকালবেলা ইস্কুলে গেছি তখনও জানি না, দুপুরবেলা চিঠি এসেছে—এতদিন পরে ওর বাবা মত দিলে—

—মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে শুনি—

—বারে, ও আসুক, ওকেই ধরো না তোমরা—শনিবার তো আসছে—

ক'মাস মাত্র গৌরী এসেছিল এ-স্কুলে। বড় দুঃখও নেই কোনও, বড় আশাও ছিল না কখনও হয়ত। শৈলেশকে ভালবাসা ছাড়া জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য ওর নেই। শেষ পর্যন্ত শৈলেশের বাবা মত দিয়েছে—এযে কত বড় সুখবর এ শুধু গৌরীই বোঝে।

গৌরীর মত করে কজন সুখী হতে পারে!

আভা তখনও ফেরে নি। ইস্কুলের পর দুটো টুইশানি করতে হয় ওকে। শীলা এতক্ষণ বোধ হয় আহ্নিক করছে ওর ঘরে। রেবা হয়ত চিঠি লিখতে বসেছে। সপ্তাহে অন্ততঃ দুটো করে চিঠি আসে রেবার নামে। এত চিঠিও ওরা দুজনে দুজনকে লিখতে পারে।

—বামুনদি'—

প্রমীলা আলাদা করে একটা বাটিতে কপির টুকরোগুলো তুলে রাখলে।

—এই রইল শীলার নিরামিষ তরকারী—আর এই মাছের কালিয়ার আলু কুটে দিলাম—আভার জন্যে ঝাল দিয়ে এগুলো রেঁধো—ও আবার ঝাল না হলে খেতে পারে না—জানো তো—

প্রতিদিনের খাবার দিকটা প্রমীলাকেই দেখতে হয়। ওদের সকলের বয়েস কম। বাপ-মা ভাই-বোনদের ছেড়ে এতদূর বিদেশে চাকরী করতে এসেছে। জীবনে প্রমীলা কারো স্নেহ-ভালবাসা পেলে না বলে ওদের সে-স্নেহ থেকে কেন বঞ্চিত করবে।

—শীলা, আজ নিরিমিশ কপির তরকারীটা কেমন হয়েছে রে আমি নিজে রেঁধেছি—

—আভা রোজ রোজ তোমার খাবার নষ্ট হয়—বড়লোক ছাত্রীর বাড়ীতে রোজ রোজ খেয়ে এলে এদিকে যে নষ্ট হয়—আগে বলে যেতে পারো না—

—গৌরী, তুই এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তোর শৈলেশ ভাববে প্রমীলাদি বুঝি ভালো করে খেতে দেয় না—ও তো জানে না শৈলেশের কথা ভেবে ভেবে রোগা হচ্ছিস—

গরমের দিনে রবিবারের দুপুরে আভা দৌড়ে এসেছে এ-ঘরে।

—প্রমীলাদি, আইসক্রীমওয়ালা যাচ্ছে—আইসক্রীম খাওয়াবে—

বামুনদিদি খবর পাঠালে মালীকে। মালী নিয়ে এল আইসক্রীম—

—একি, তুমি খাবে না প্রমীলাদি—

আভা রেবা গৌরী দুটো দুটো করে নিয়েছে। প্রমীলা ছ'টা আইসক্রীমের দাম বার করে দিলে ব্যাগ থেকে।

—তুমি খেলে না প্রমীলাদি, তবে আমরাও খাবো না—

আভা রেবা গৌরী রাগ করলে। প্রমীলাদিই যদি না খাবে, তবে কিসের এই আনন্দ। তুমি আমি সকলে মিলে খেলেই তো মজা। এ যেন খেতে চেয়েছি বলে খাওয়ানো।

—আর যদি কখনও খাই তো কী বলেছি—গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বসলো।

—আরে না না—রাগ করিসনি তোরা—আজ শীলার একাদশী কি না—

সবাই বুঝলো। তা তো বটেই। শীলার আজ নির্জলা একাদশী, ও জলটা পর্যন্ত ছোঁয় না। এতোটুকু মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে এ কী নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্রসাধন। স্বামীর স্মৃতিকে হয়ত এমনি করেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। তা সে যা' হয় হোক্, প্রমীলা শীলার এই একাদশীর দিনে কেমন করে এই বিলাসিতা করতে পারে। শীলার মা এখানে নেই—তিনি থাকলে তিনিই কি মেয়ের নির্জলা উপোসের দিনে আইসক্রীমের নিষ্প্রয়োজন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন। প্রমীলার বয়স যাই হোক—পদমর্যাদায় প্রমীলাই বা সকলের মা'র চেয়ে কম কিসে।

বোর্ডিংএর সমস্ত টীচারদের সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ সব দেখতে হবে প্রমীলাকে। শুধু যে বয়েসে বড় তা বলে নয়। বহুদিনের গুরু-দায়িত্বে অভ্যাসে এটা এখন কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। ওদিকে সেক্রেটারী রায়সাহেব যদুনাথ চৌধুরী আছেন। ইস্কুল সম্বন্ধে যা কিছু তাঁর করণীয় সব করতে হবে প্রমীলাকেই।

—এই টেক্সট্ বইগুলো পড়ে দেখো প্রমীলা, চলবে কি না—পাব্লিশার বড্ড ধরেছে আমাকে—

—ইস্কুলের নতুন খান পঞ্চাশেক বেঞ্চ দরকার, দেখো তো প্রমীলা এই কোটেশনগুলো—

—ইস্কুল ফাণ্ডের সেই যে ছ' হাজার টাকা পড়েছিল বাজে একটা ব্যাঙ্কে, ভাবছি ওটা তুলে নেব, চারদিকে যেমন ফেল হচ্ছে ব্যাঙ্ক—কোনটায় রাখি বলো তো—

রায়সায়েব বৃদ্ধ হয়েছেন। একদিন কী খেয়ালে একটা ছোট চালাঘরে মেয়েদের ইস্কুল করেছিলেন। পাঠশালার মতন দু'জন পণ্ডিত-মশাই নিয়ে। বাঙলা দেশের বাইরে বাঙলা শেখাবার আগ্রহটা ছিল মনে মনে। রামমোহন, ভূদেব মুখুজ্যের ভক্ত ছিলেন, বড় কিছু না হোক্, ছোটখাট একটা কীর্তি রেখে যাবেন এমন বাসনাও ছিল বোধ হয়। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। বিশেষ করে বোমার হিড়িকে ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যায় আশাতীত। তারপর অনেকে রিটায়ার করে এখানেই বাস করছেন। এখানকার পোষ্টঅফিস, রেলস্টেশন, বাজার-হাটের মত ইস্কুলটা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রায়সায়েব বলেন—এই যে, এইটিই আমার হেড্-মিস্ট্রেস্—প্রমীলা এঁকে প্রণাম করো, ইনি হলেন পুরোন বন্ধু আমার, রিটায়ার্ড সাব-জজ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গোলগাল মোটাসোটা বড় শরীরটা নিয়ে ছোট একটু প্রণাম করে প্রমীলা—

কোথাও সভা-সমিতি বা সম্মিলনীর আয়োজন হলে রায়সায়েব উদ্যোক্তাদের বলেন—কমিটির মধ্যে ওঁকেও নিও, আমার হেড্-মিস্ট্রেসকে......প্রমীলা দেবী, একজন মহিলা সভ্যা থাকা ভালো......কী বলো—

অনেক দূর দূর থেকে মেয়েদের গার্জেনরা আসেন। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেব্‌লের সামনে বসে বলেন—আপনার নাম শুনেই আসা—শুনেছি এখানে শিক্ষাটা ভালো হয়—আমার মেয়েটি আবার একটু দুষ্টু কিনা—

ওই সুনামটা বজায় রাখতে প্রমীলাকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা চারদিকে নজর রাখতে হয়। মেয়েদের খাবার জলের জায়গাটা ঢাকা রইল কি না; মেয়েদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে কি না—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দিকেও দেখতে হয়। ইস্কুলের মধ্যে মেয়েদের পান খাওয়া নিষেধ। চীৎকার, গোলমাল, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখা, সমস্তই বারণ।

আভার সেদিন সন্ধেবেলা পড়াবার কাজ নেই। এসে বললে—প্রমীলাদি গৌরী আমাদের সিনেমা দেখাচ্ছে—

—ও, বিয়ের আনন্দে বুঝি—

—না, আমরাই তো ধরেছি সবাই, রেবাটা আজ চেপে ধরেছে, হাতে পয়সা নেই বলতে পারবে না—আজই মাইনে পেয়েছে—চলো বাবে—শেষকালে দেখ্‌ছি তোমার জন্যেই দেরী হয়ে যাবে—

রেবাও এসে গেল। নিখিলের পুজোয়-দেওয়া সাড়ীটা পরেছে আজ। আজ যেন রেবা আর ইস্কুল-মিসস্ট্রেস নয়। প্রমীলা চেয়ে দেখলে। বেশ মানিয়েছে রেবাকে। কতদিন ধরে মাষ্টারী করছে রেবা। আর কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে নিখিলের জন্যে। নিখিলের একটা ভালো চাকরী হলেই ও ছেড়ে দেবে এ-চাকরী। তারপর দুজনে মিলে এক জায়গায় নীড় বাঁধবে। ছোট সংসারের নিবিড় পরিবেশে দুজনে করবে স্বর্গ রচনা।

রেবা বললে—অনেকদিন পরে এ ছবিটা এল প্রমীলাদি, নিখিল লিখেছে এ বছরে একাডেমী প্রাইজ পেয়েছে ছবিটা, ওরও খুব ভালো লেগেছে—তৈরী হয়ে নাও প্রমীলাদি—গৌরী বাথরুমে ঢুকেছে—এল বলে—

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে—কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না রে তোদের সঙ্গে—

—কেন? বা রে, তা' হলে আমরাও...... আমি বলছি প্রমীলাদি ছবিটা তোমার ভালো লাগবেই—নিখিল লিখেছে যে......কে কে আছে জানো ছবিতে—

প্রমীলা হাসলো। বললে—বলুক গে তোর নিখিল—বরং তুলসীদাস কি মীরাবাঈ এলে দেখা যাবে—তা' হলে শীলাও যাবে আমাদের সঙ্গে......আমরা সবাই যাবো আর ও-ই একলা বোর্ডিংএ থাকবে—সে কেমন করে হয়—

শেষ পর্যন্ত হৈ হৈ করতে করতে ওরা চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রমীলা শীলার ঘরে গিয়ে হাজির।

—এই দেখ ক্লাশ টেন্-এর মেয়েরা এমন বানান ভুল লিখেছে, আমি এদের কেমন ক'রে পাশ করাই বলো তো প্রমীলাদি—বিশ্বাস না হয় তো নিজের চোখেই দেখ—

শীলার ধব্‌ধবে সাদা থানের মত বিছানায় চোখ ধাঁধানো সাদা চাদরের ওপর প্রমীলা বসলো। শীলার কাছে শীলার বিছানার ওপর বসতেও যেন কেমন সঙ্কোচ হলো প্রমীলার। শীলাকে দেখলেই যেন কেমন চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শীলার অকাল বৈধব্য তা'কে যেন এই ইস্কুল-মিস্ট্রেসদের বোর্ডিং-এর আবহাওয়ার মধ্যে এক অপরূপ স্বাতন্ত্র এনে দিয়েছে। দল বেঁধে আইসক্রীম খাওয়ার দলে সে নেই, সিনেমায় যাওয়ায় পার্টিতে সে নেই। কিন্তু তবু প্রমীলাকে কেবল এই দু'টো দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। সংসারে বুঝি এই স্কুল ছাড়া শীলার আর কোথাও কিছু আকর্ষণ নেই। এই এক জায়গায় দু'জনের যেন অপূর্ব মিল। যখন গরমের দীর্ঘ ছুটিতে সবাই যে-যার বাড়ীতে চলে যায়, শীলা পড়ে থাকে এই বোর্ডিং-এ। আর থাকে প্রমীলা। একজন কুমারী আর একজন বিধবা।

ইস্কুলের উন্নতির চিন্তায়, মেয়েদের মানুষ করবার মহৎ প্রেরণায় ওরা জীবন যৌবন জলাঞ্জলি দিচ্ছে—ওদের দেখে এমনি ধারণা পোষণ করাও বুঝি অন্যায় নয়।

শীলা বললে—এবার সামার ভেকেশনের সময় আমি কোচিং ক্লাশ করবো প্রমীলাদি—এ-রকম হ'লে আমাদের স্কুলের যে বদনাম হবে—

সেদিন আভা বললে—জানো প্রমীলাদি—আমার টুইশ্যানি কমলো একটা—

—কেন—

বাসন্তী ঘোষালের বিয়ে। বিয়ের পর কে আর পড়ে বলো—তা' মেয়েটার ভাগ্যি ভালো, স্বামী বুঝি কোন মেজর একজন—দেখতেও চমৎকার—ক'লকাতায় নিজেদের বাড়ি—

আভার তিরিশ টাকার টুইশ্যানি যাওয়ার চেয়ে বাসন্তী ঘোষালের বিয়ের সংবাদটাই বড় মনে হলো প্রমীলার কাছে। দেখতে বাসন্তীকে কী খুবই ভালো? লেখা-পড়ার ধার দিয়েও যেত না কখনও। এম-এ পরীক্ষার পর বি-টি দেবার সময় প্রমীলারও মনে এ-কথা উদয় হয়েছিল একবার। সঙ্গে যারা পড়তো একে একে সবাই যখন সরে পড়লো। নিজেকে তখন বিজয়িণীই মনে হয়েছিল। তারপর মোটা চশমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও মোটা হয়ে এল। পদোন্নতি হলো। প্রতিষ্ঠা হলো। সময় গড়িয়ে চললো কুটিল গতিতে। নিজেকে কৃপা করবার অবসর আর মিললো না।

রায়সায়েব ডেকে পাঠালেন সেদিন। বললেন—তুমি মা রেবা ভাদুড়ীকেও এক-মাসের ছুটির রেকমেন্ড করেছ—ইস্কুল চলবে কেমন করে—এমনিতেই কম্ স্টাফ্ নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে—

প্রমীলা ফাইলটা হাতে নিয়ে পাখার তলায় বসেও ঘামতে লাগলো।

—এই সেদিন গৌরী চাটার্জি বিয়ের জন্যে ছুটি নিয়ে গেল, তা'ও তিন মাস হয়ে গেছে—এখনও তো এল না—আর আসবেও না বোধহয়—

শৈলেশের বড়লোক বাবার মত হওয়াতে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে কেন আর এই সাতশো মাইল দূরে চাকরী করতে আসবে। প্রমীলা তা'কে বাধা দেবার কে! তারপর এই রেবা। নিখিল যে একটা চাকরি জুটিয়েছে।

সেক্রেটারী জিগ্যেস করলেন—এই তো সামার ভেকেশন গেল সেদিন—বাড়ি থেকে এল সবাই—এরি মধ্যে আবার ছুটির দরকার হলো কিসে—এরও কি বিয়ে নাকি মা—

—হ্যাঁ—একটু হেসে মাথা নিচু করলে প্রমীলা।

—সে তো ভালো কথাই মা—ভালই কথা—কিন্তু......সামনে টেস্ট্ পরীক্ষা—ক্লাশ প্রমোশনের সময়—

কিন্তু সেক্রেটারীর যুক্তিটায় যেন জোর কম বলে মনে হলো। কিম্বা বিবাহিত রায়সাহেব বুঝি অবিবাহিতা হেড মিস্ট্রেসের সামনে তা' নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসংগত মনে করলেন না।

বাইরে নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। হেড মিস্ট্রেসের অফিসে চেয়ারে বসবার অবসরটুকুও যেন নেই তার। রেবাকে দেখবার আগ্রহে বুঝি এতই অধীর সে।

রেবা পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করলে। বললে—বিয়েতে যেতে চেষ্টা করো প্রমীলাদি—

মালকোঁচা করে ধুতিটা পরা। গায়ে একটা নীল সার্ট। চুল ওল্টানো। পায়ে কাবলী জুতো। রেবার বিছানার বান্ডিল আর সুটকেসটার পাশে দাঁড়িয়ে রেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তারপর একটা সাইকেল-রিক্সা ডেকে দু'জনে গিয়ে ট্রেণে উঠবে। শৈলেশও একদিন ওমনি করে এসেছিল গৌরীকে নিতে। গৌরীর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও এসেছিল। তারপর আভাও হয়ত এক-দিন চলে যাবে। অবস্থা খারাপ বলেই এতদিন চাকরি করতে হচ্ছে। কিন্তু তারপর? তারপর শীলা! শীলা আর সে।

কিন্তু এত কথা ভাববার সময় নেই প্রমীলার।

অনেক রাত হয়ে গেছে। বোর্ডিং-এর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পশ্চিমের রাত। শুকনো আবহাওয়া। হাওয়া নেই কোথাও। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। মাটি আর আকাশ যেন এদেশে এসে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ততঃ প্রমীলার কাছে তাই মনে হয়। শীলার মতন সর্বাঙ্গে বৈধব্যের সাজ এখানকার মাটিতে, আর আকাশের গায়ে।

ছোট বাড়িতে এত ছাত্রী ধরতো না। তাই সেক্রেটারীর বাড়ির পাশে ইস্কুলের নতুন দোতলা বাড়ি তৈরী হয়েছে। ছাত্রী আরো বেড়েছে—প্রমীলার বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও আরো বেড়েছে। প্রমীলা শরীরের চাপে না হোক দায়িত্বের চাপে আরো ভারি হয়েছে ইদানীং। আশে পাশের আরো অনেক শহরে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিলাসপুরের ইস্কুলের আর তার হেড মিস্ট্রেস প্রমীলা সরকারের।

দূরে থেকে হেড মিস্ট্রেসকে আসতে দেখলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল ছাত্রীরা। বড় কড়া লোক এই প্রমীলা সরকার।

গার্জেনরা বলে—এই-ই তো ভালো—একটু শাসনের মধ্যে না থাকলে কি ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো—সৎশিক্ষা পায়—

কিন্তু এত অমায়িক ব্যবহারও আবার আর কারো কাছে পায় না ছাত্রীরা।

বাবা মারা গেছে, ছ'মাসের মাইনে দিতে পারেনি, এমন ছাত্রীকে ফ্রি শিপ্ করিয়ে দিতে আর কে পারতো। রায়সায়েব এখন বৃদ্ধ হয়েছেন আরো নিজের ব্যবসার কাজে আরো সময় পান না—স্বাস্থ্যেও তেমন কুলায় না। প্রমীলাকেই একলা সেক্রেটারীর কাজ, স্কুল কমিটির সমস্ত কাজ দেখতে হয়। নতুন বিল্ডিং হবে তার কন্ট্রাক্ট দেওয়া, ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ম্যাট্রিকে মেয়েদের পরীক্ষার সেণ্টার নিয়ে চিঠিপত্র লেখা, চাকরির য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা সমস্তই করতে হয় প্রমীলাকে। সেক্রেটারী শুধু তলায় নামসই করে দিয়েই খালাস।

শীলা এল। বললে—প্রমীলাদি আমার একমাসের ছুটি রেকমেণ্ড করতে হবে—

—ছুটি! প্রমীলা অবাক হয়ে গেল। গৌরী গেছে, রেবা গেছে। আভাও একদিন বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। ভাই নেই, সব ক'টাই বোন। ছ'টি সাতটি ছোট ছোট বোনের তদ্বির তদারক এক-কথায় বোনদের মানুষ করতে একমাত্র আভাই ছিল সকলের মাথার ওপর। এখানে যতগুলো টাকা মাষ্টারি আর টুইশ্যানি করে উপায় করতো সব পাঠিয়ে দিত সংসারে। তারও একদিন চিঠি এসেছে। বিয়ে হয়ে গেছে তার। তা হ'লে শীলারও কি গোপন টান আছে কোথাও?

শীলার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে প্রমীলা। সারা দেহে তার বৈধব্যের প্রশান্তির প্রলেপ। ও কি তবে ছদ্মবেশ! ওর ভেতরেও কি আগুন ছিল!

—প্রাইভেটে এম-এটা দেবো—তারপর যদি পারি তো বি-টি টাও—

শীলাও শেষ পর্যন্ত একদিন চলে গেল বিলাসপুরের বোর্ডিং ছেড়ে। অন্য কিছু না হোক, শিক্ষায়িত্রী হিসেবে উন্নতি করবার উচ্চাকাঙ্খা তারও আছে। যে একদিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাসপুরের এই স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সামার ভেকেশনে বোর্ডিং ছেড়ে এক রাত্রির জন্যেও যার যাবার কোনও ঠাঁই ছিল না—সে-ই আবার ফিরে গেল যেন তার ফেলে আসা সংসারে। শীলার ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তারপরেও অনেকক্ষণ প্রমীলা সরকার বিলাসপুরের "বাণী বিদ্যায়তনের" হেড মিস্ট্রেস প্লাটফরমের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নতুন নতুন মিস্ট্রেস, নতুন ছাত্রী, শহরে অনেক নতুন লোক এসেছে। প্রমীলা বুঝি আজকাল আরো মোটা আর ভারী হয়েছে। আরো মোটা চশমা উঠেছে চোখে। কাজ আরো বেড়েছে—সুনাম বেড়েছে ততোধিক।

সকাল বেলা নিয়ম করে সেক্রেটারীর বাড়ি একবার ফাইল নিয়ে যেতে হয়। সেখানে প্রায় একঘণ্টা কাটে স্কুলের দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায়। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে এগারোটার মধ্যে স্কুল।

ইতিহাসের ক্লাশে দাঁড়িয়ে প্রমীলা ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

"......তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে——দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়......সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে...তার নাম হেলেন...অপরূপ রূপসী সেই হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়—ঐতিহাসিকরা বলেন—হেলেনের রূপের আগুনেই ট্রয় নগরী নাকি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল...ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আর একবার আমাদের এই ভারতবর্ষে ......পাঠান যুগে......যখন......"

সেক্রেটারী সেদিন বললেন—এবার থেকে আমাকে ছুটি দাও মা—আমি বৃদ্ধ হয়েছি—আমার ছেলে আসছে বদলি হয়ে, এবার থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে তোমার কাজ...

রায়সাহেবের একমাত্র ছেলে বহুকাল পরে বদলি হয়ে এখানে আসছে। সরকারী চাকরীতে নতুন কী একটা প্রমোশন পেয়েছে। এতদিন বাইরে বাইরে কাটিয়েছে প্রদ্যোৎ, এবার অনেক তদ্বির করে বাড়িতে আনিয়েছেন তাকে নিজের জেলায়।

রায়সাহেব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গ্রামের জমিদারীতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। প্রদ্যোৎ চৌধুরী মানুষটি ভালো। বললেন বসুন, আমি তো কিছুই বুঝি না ও-সব—যেমন আপনি করছেন—তেমনিই করবেন, আমি শুধু...

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও এসেছে। সেদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা চমকে উঠেছে। প্রীতি সেন। পাঁচশো মাইল দূরের বহুদিন আগের বন্ধু ক্লাসমেট।

—একি, প্রমীলা তুই—ঝলমল্ করে উঠলো প্রীতি সেন।

—চেন নাকি এ'কে—প্রদ্যোৎ চৌধুরী স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন।

—বারে, প্রমীলা আমাদের ক্লাশের ইটার্ণাল ফার্স্ট মেয়ে—

তারপর কাছে এসে একেবারে প্রমীলার হাত দু'টো ধরেছে। সেই প্রীতি সেন। লেখাপড়ায় বরাবর ছিল কাঁচা। ক্লাসে আসতো দেরীতে। একবার পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে নাকাল হয়েছিল খুব। তবে একটা গুণও ছিল ওর। মিশুক ছিল ভারি। বাবার পয়সাও ছিল বোধহয় বেশ। ক্লাশময় মেয়েদের রেস্টুরেণ্টে খাওয়াতো খুব।

থাক তোমাদের কাজের কথা, তুই আয়তো প্রমীলা...আরে তুই আমাদের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস তাকি জানি ছাই—

*টানতে টানতে একেবারে নিজের খাস-*কামরায় নিয়ে এসেছে প্রীতি। সেক্রেটারীর বাড়ির ভেতরে কখনও আসেনি প্রমীলা।

—আয় বোস্ এখেনে, এই কোচটায়, ফার্ণিচার টার্ণিচার কিছুই এখনও প্যাক্ খোলা হয়নি ভাই—দ্যাখ্ না—ড্রেসিং বুরোটা এখনও এসে পৌঁছুলো না, পিয়ানোটার যে কী দশা হয়েছে কে জানে—এমন অসুবিধে হচ্ছে—

তারপর সামনে আঙুল দিয়ে দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখালে—ওই তো আমার বড় মেয়ে বেবি—দেরাদুনে পড়ে— ওইটুকু তো মেয়ে—তুই ওর ইংরিজী গান শুনলে হাসতে হাসতে তোর পেটে খিল্ ধরে যাবে—উনি বলেন—

উনি কী বলেন, তা আর বলা হলো না, প্রীতি মিহি গলায় ডাকলে—দায়ি—ও দায়ি—

ঝি আসতেই প্রীতি বললে—আমাদের দু' কাপ চা খাওয়াতে পারিস দায়ি—আর দ্যাখ্, কালকে বেকারী থেকে কি কি এসেছিল নিয়ে আয়তো আমার কাছে......

অনেক কথা। অনেক হাসি। প্রীতি কথার বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দিলে। প্রীতিকে দেখে মনে হয়, বয়েস যেন প্রীতির অনেক কমে গেছে। এত সুন্দর তো ও ছিল না আগে। টেবিলের ওপর প্রদ্যোৎ চৌধুরী আর প্রীতির কাঁধে কাঁধ লাগানো একখানা জোড়া ফটোগ্রাফ। কোথায় কোন্ ঘটনাক্রমে এদের দুজনের বিয়ে হলো কে জানে।

—হ্যাঁরে, কত পাস তুই এখানে?

চা এসে গেছল। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতি উঠলো। বললে—দাঁড়া আমার এ্যালবামটা তোকে দেখাই......এবার মুসৌরী গিয়েছিলাম সামারে —সেখানে গিয়ে কী কাণ্ড হলো শোন্—

প্রীতি এক মিনিট চুপ করে থাকতে জানে না।

প্রমীলা বললে—এবার উঠছি প্রীতি—

—সে কিরে, না, না, আজ ইস্কুল কামাই করে দে—তোর কথা কিছু শোনাই হলো না—

—তা ওই মাইনেতে তোর চলে—?

প্রীতি সহানুভূতিতে এক সময়ে শান্ত হয়ে এল। বললে—তোর জন্যে ভাই আমার দুঃখু হচ্ছে......অত খেটে রাত জেগে লেখাপড়া করলি—বিয়ে-থাও হলো না—আর এখন তো যা' মোটা হয়েছিস—ভালো কথা—তোর সেই উত্তম রায় এখনও আমাকে চিঠি লেখে জানিস্ —আমিও ছেড়ে কথা বলি না জানিস তো—আমি তাকে বলেছিলাম........

প্রমীলা বললে—আচ্ছা আজ তাহলে উঠি রে—

প্রীতি নিজের কথার জের টেনে বললে—

আমিও উত্তমকে বলেছিলাম যে, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল প্রমীলার সঙ্গে তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছ—

সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বললে, —ভালো করিনি, কি বলিস তুই—তোর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখু হয় ভাই—সত্যিই তো আজ তোর এই অবস্থার জন্যে উত্তম ছাড়া আর কে দায়ী বল—ওর জন্যেই তো তুই ......

দরজার কাছে এসে প্রমীলা বললে—আচ্ছা আসি ভাই—

রাস্তায় নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে। কিন্তু তবু প্রমীলার মনে হলো সে যেন আজ বিলাসপুরের সকলের কাছে বড় কৃপার পাত্রী হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে সবাই আজ থেকে তাকে অনুকম্পা করছে। একটি সামান্য কারণে তার সমস্ত শিক্ষা শ্রম নিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে। সে যেন আশ্রিত। নেহাৎ পৃথিবীর কোনও কোনে তার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই এখানে সে মেয়েদের মানুষ করবার অছিলায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করেছে। আজ প্রমীলার কাছে এই কথাটাই প্রকট হয়ে উঠলো যে, তার এই হেড-মিস্ট্রেস পদের কোনও গৌরবই নেই বরং লজ্জা, অপমান আর বিড়ম্বনাই কেবল সার হলো তার।

বোর্ডিংয়ে এসে মাথাটা খুব ভারি মনে হলো।

—বামুণ দি—

একটা ছোট শিলপে এক লাইন লিখে দিয়ে বললে—এইটে মালীকে গিয়ে দাও তো বামুন-দি—বলো ছোট দিদিমণির হাতে গিয়ে যেন দেয়—আর যেন বলে যে আমার শরীর খারাপ, আমি আজ স্কুলে যেতে পারবো না—

সেদিন মাথাটা আর কিছুতেই ছাড়লো না।

সেক্রেটারী সেদিন বোর্ডিং-এ এলেন। বললেন—ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবখন—এখন তাড়াতাড়ি স্কুলে যাবার দরকার নেই, আপনি বরং বিশ্রাম নিন দিন কয়েক—

দিন কয়েক বিশ্রামই নিতে হলো। কিন্তু এ বড় বিড়ম্বনা। বরং সারাদিন কাজের তাগিদে ব্যস্ত থাকা—সে এর চেয়ে অনেক ভালো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। নিজেকে ভুলে যেতে পারা যায়। সমস্ত অতীতটা এমন মুখর হয়ে তাকে পীড়া দিতে পারে না।

শেষে একদিন গা হাত পা ঝেড়ে উঠলো। এমন করে আর কদিন ধরে পড়ে থাকা যায় বিছানায়। হঠাৎ বামুনদি ঘরে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নতুন সেক্রেটারীর বাড়ি থেকে এসেছে। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর মনোগ্রাম করা খাম।

কিন্তু সেক্রেটারী নয়। লিখেছে প্রীতি।

"......শুনলাম তুই একটু ভালো আছিস... আজকে একবার বেড়াতে বেড়াতে আয় না আমাদের বাড়িতে ......উত্তম রায়ের একটা চিঠি

এসেছে......তাকে লিখেছিলাম যে, তুই এখানে আছিস......সে কি লিখেছে জানিস......যা' হোক্ তুই এলেই তোকে দেখাবোখন চিঠিটা... আজকে যখনি সময় পাবি একবার আসিস্......বুঝলি—"

অপমানে ধিক্কারে প্রমীলার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে উঠলো।

একটা কাগজ কলম নিয়ে বিকেল বেলাই লিখতে বসলো। লম্বা একটা দরখাস্ত।

সন্ধ্যের পর সেক্রেটারী এলেন।

বেড়াবার ছড়িটা নিয়ে নীচের বসবার ঘরে বসে আছেন। প্রমীলা খবর পেয়ে নিচে নেমে এসে নমস্কার করলে—

সেক্রেটারী বললেন—লম্বা ছুটির দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু স্কুলের কাজে বড় গোলমাল দেখা দিয়েছে——সেকেন্ড টিচার সব পেরে উঠছেন না......অবশ্য বিশ্রাম আপনার চাই স্বীকার করি.........

প্রমীলা বললে—আমার ছুটিটার জরুরী দরকার ছিল—আমি কলকাতায় যাবো—

সেক্রেটারী বললেন—সেইটেই তো মুশকিল হয়েছে, আপনি ছুটিতে থাকলেও দরকারের সময় আপনার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতো...... কিন্তু কলকাতায় চলে গেলে—

প্রমীলা চুপ করে রইল।

সেক্রেটারী বললেন—অবশ্য দরখাস্তে কিছু কারণ দেননি—বোঝা যায় বিশ্রামই দরকার আপনার—কিন্তু তবু কমিটির কাছে একটা যা' হোক কিছু কারণ.........

প্রমীলা মুখ তুললে। তারপর মুখ নিচু করে বললে—আমার বিয়ে——

প্রদ্যোৎ চৌধুরী ধুতি পাঞ্জাবি পরে ছড়ি নিয়ে হয়ত সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এমন ঘটনার মুখোমুখি হবেন, ভাবতে পারেন নি। তাহলে হয়ত প্রস্তুত হয়ে বেরুতেন। কিন্তু প্রমীলার মনে হলো যেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী নয়—প্রীতি চৌধুরীকেই সে তার কথা শোনাচ্ছে।

সেক্রেটারী বললেন—কিন্তু............আমি শুনেছিলাম——

প্রমীলা শেষ করতে দিলে না। সেক্রেটারী কী বলবেন, তা যেন সে আগে থেকেই জানতো। বললে—আপনি ভুল শুনেছিলেন—

প্রমীলার এই হঠাৎ বাঙ্ময় আত্মঘোষণা প্রদ্যোৎ চৌধুরীর কাছে যেমন আকস্মিক, তেমনিই অস্বাভাবিক। তাই মুখ দিয়ে তার কোনও কথাই বেরুল না।

প্রমীলাই আবার বললে—গত দশ বছরে একদিনও কামাই করিনি বা ছুটি নিইনি—— ইস্কুলটা গড়ে তোলবার দিকেই মন ছিল, নিজের কথা আর ভাববার সময়ই পাইনি, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারছি না—তা ছাড়া......উত্তেজনার চোটে আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো হুবহু আজই প্রীতি নিশ্চয় শুনবে। প্রদ্যোৎ চৌধুরী দরখাস্ত মঞ্জুর করে দিয়ে উঠলেন।

প্রদ্যোৎ চৌধুরীর গাড়িটা শব্দ করে চলে যাবার পরও প্রমীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। তাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কেউ আসবে না সত্যি। তাকে একলা গিয়েই ট্রেণে উঠতে হবে। তারপর? তারপর হাওড়া স্টেশনে নেমে ভাবা যাবে কোথায় উঠবে সে।

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে যখন প্রমীলা প্রথম এসে নেমেছিল সেদিনও সে জানতো না যে, শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই আশ্রয় মিলবে তার।

বউবাজারে একটা গলির মধ্যে নোনাধরা ইটের পুরোনো বাড়িটাতে এতদিন কাটলো কেমন করে, একথা প্রমীলা নিজেই ভাবতে পারে না।

ইন্দু-মাসিমা অনেক দেরি করে বাড়ি আসেন। সারাদিন ইস্কুলে পড়ানোর পর চলে যান ছাত্রীদের বাড়ি। একটা, দুটো, তিনটে জায়গায় টুইশ্যানি সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়। বিধবা মানুষ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই।

ইন্দু-মাসিমা বলেন—হ্যাঁরে প্রমীলা—কী ঠিক করলি—

জমানো কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল প্রমীলা। বিলাসপুরে বিশেষ খরচ ছিল না— কিছু টাকা জমেছিল। তাও এমন কিছুই নয়। বসে খেলে কুবেরের ভাঁড়ারও শেষ হতে কতক্ষণ লাগে।

প্রমীলা বলে— ভাবছি আর ফিরে যাবো না মাসিমা—এখানেই একটা চাকরি টাকরি কিছু জোগাড় করে দিন।

ইন্দু-মাসীমা এসেছিলেন হাওড়া স্টেশনে কোন্ ছাত্রীদের ট্রেণে তুলে দিতে। সেইখানেই দেখা। সাত আট দিন থাকবে সেই রকম ঠিক ছিল— তার বদলে সাত মাস হয়ে গেল।

রান্না-বান্না করে ইন্দু-মাসীমা দশটার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তারপর প্রমীলাও বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গায় দেখা করাও হয়ে গেছে। দরখাস্তও পাঠিয়েছে অনেক জায়গায়।

প্রীতি চিঠি লিখেছে—তোর বিয়ের খবর শুনে খুব সন্তুষ্ট হলাম—আগে জানালে যেতাম —কবে আসছিস—দুজনে আসিস—আলাপ করবো——

সেক্রেটারীও একটা চিঠি লিখেছেন—হেড মিস্ট্রেসের পদটা এখনও খালি রাখাই হয়েছে— প্রমীলার কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলে অন্য ব্যবস্থা করবেন—

প্রমীলা অনেক গর্ব করে চলে এসেছিল বিলাসপুর থেকে—আবার সে কেমন করে সেখানেই ফিরে যাবে।

গৌরী চিঠি দিয়েছে—প্রমীলাদি, বিয়েতে তো তুমি এলে না......দীপুর অন্নপ্রাশনে নিশ্চয় আসতে চেষ্টা করবে—যদি একান্তই না আসতে পারো—তোমার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিও—

রেবারা বদলি হয়ে গেছে জব্বলপুরে। নতুন জায়গায় বিবরণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে রেবা। নিখিলের নাকি আর একটা প্রমোশন হয়েছে চাকরীতে।

আভাও ভাল আছে। বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে লেখা চিঠিটা এতদিন পরে হাতে এল। সব চিঠিগুলোই বিলাসপুরের পোস্ট অফিসে ঘুরে এখানে এসেছে।

আস্তে আস্তে সব টাকাগুলো প্রায় ফুরিয়ে এল। অথচ কোনও কিছুর ব্যবস্থা হলো না।

ইন্দু-মাসীমা সেদিন আরো ভাবিয়ে দিলেন—

—ওরে প্রমীলা, খুব মুশকিল হয়েছে রে— আমার চাকরি বোধ হয় গেল—

—কী রকম—প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেল।

—এবার রিটায়ার করতে বলছে আমাকে— বলছে, অনেক বয়েস হলো এবার বিশ্রাম নিন— দ্যাখ্ তো মা, আমার না-আছে সংসার, না-আছে কেউ—সারা জীবন ওই ইস্কুল নিয়েই রইলুম—শেষে কি না........

তা' ইন্দু-মাসীমার তেমন ভাবনা নেই। চাকরি গেলেও ছাত্রীরা ইন্দু-মাসীমাকে সবাই ভালবাসে। পুরোন ছাত্রীদের কত বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে—যার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, সেই মাথায় তুলে রাখবে—

কিন্তু প্রমীলার নিজের ভাবনাটাই বাড়লো সেইদিন থেকে।

একদিন ইন্দু-মাসীমা বললেন—হ্যাঁরে, এমনি করে কাটিয়ে দিলি—বিয়ে থা-ও করলি নি——

মাসীমা নিজের মায়ের মতন। তাঁর কাছে লজ্জা নেই। ঠান্ডা মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল প্রমীলা। হ্যারিকেনটা নেভানো। অন্ধকার ঘর। প্রমীলা বললে —করলুম না নয় মাসীমা—হলো না—

সেদিন আর এক কান্ড ঘটে গেল। এমন করে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

—প্রমীলাদি—

হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে.........

সেই আর পাশে আর একটি সুট পরা লোক। শীলার পরনে শাড়ী—সিঁথিতে সিঁদুর—

—তোমার সংগে এমন করে দেখা হবে, ভাবিনি প্রমীলাদি—কবে এলে বিলাসপুর থেকে—

যেন শীলার সংগে এমনভাবে দেখা হবে তা প্রমীলাই ভাবতে পেরেছিল!

—জানো প্রমীলাদি লেক কলেজে প্রফেসারি করছি আজকাল—

তারপর যাবার সময় বললে—এ'র সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই প্রমীলাদি—

রাত্রে বাড়ি এসে প্রমীলা বললে—ইন্দু-মাসীমা কাল সকালবেলা ট্রেণ—

—সে কি—কোথায় চললি তুই—ইন্দু-মাসীমা অবাক হয়ে গেলেন—

—রাজপুতানা—

এত জায়গা থাকতে রাজপুতানার নাম মুখ দিয়ে কেন বেরুল, কে জানে। ইতিহাসের পাতায় তো আরো অনেক দেশের নাম আছে। কিন্তু শীলার সিঁথির ওপর সিঁদুরের শিখাটা তখনও যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রমীলার মনে পড়লো রাজপুতানার মেয়েরাই তো জহর ব্রত করতো—ইতিহাসে লেখা আছে।

সেক্রেটারী প্রদ্যোৎ যথারীতি সকালবেলা নিজের অফিস ঘরে বসেছিলেন। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। কিম্বা দেখলেও বুঝি লোকে এত চমকায় না।

—এ কি—এর বেশি কিছু মুখ দিয়ে বেরুল না তাঁর।

—বসুন—

প্রমীলা বসলো। বললে—আপনি লিখেছিলেন—তাই আবার আমি এলাম—

—ভালোই করেছেন—কিন্তু...বেশী কিছু বলতে পারলেন না প্রদ্যোৎ চৌধুরী—

খবর পেয়ে ঝলমল করে দৌড়ে এল প্রীতি। ঘরে ঢুকে সেও পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেছে। প্রমীলার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কী যে সে বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর সামনে এগিয়ে এসে প্রমীলার হাত দুটো ধরলে।

প্রীতির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বললে—কী করে হলো ভাই—

প্রীতি প্রমীলাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—কী করে হলো ভাই—

—হঠাৎ হলো—কিছু টের পাইনি—প্রমীলা মাথা উঁচু করে বললে।

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—অমন স্বাস্থ্য—অমন লম্বা চওড়া চেহারা—কিছুতেই ভাবতে পারিনি—দশ বছরে একদিনের জন্যে একটু মাথা ধরারও খবর পায়নি—সেই লোক কিনা......

বলতে বলতে প্রমীলা মাথা নিচু করলে।

প্রীতি জিগ্যেস করলে—ডাক্তারেরা কী বললে—

—ডাক্তারেরা আর কী বলবে—কোনো ডাক্তার আর বাকি ছিল না ডাকতে—সাতদিনে সর্বস্ব খুইয়ে ফতুর হয়ে গেলাম—

বোর্ডিং-এ এসে প্রমীলা আবার তার পুরোন ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো।

সাদা থান, সাদা সেমিজ, পায়ে সাদা কেড্‌স্‌। পুরোন ছাত্রীরা সবাই এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ভালোই আছে। এবার আর কেউ তো কৃপা করবে না, অনুকম্পা করবে না—সমস্ত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। ক্লাশে দাঁড়িয়ে প্রমীলা পড়ায়—

"......তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে...তার নাম হেলেন... অপরূপ রূপসী হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়... ঐতিহাসিকরা বলেন, হেলেনের রূপের আগুনেই নাকি ট্রয় নগরী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল...ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশে—এই ভারতবর্ষে...আলাউদ্দিন খিলজী পদ্মিনীর রূপে উন্মাদ হয়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করলে...কিন্তু পদ্মিনী... ঐতিহাসিকরা বলেন...পদ্মিনীর সেদিনকার আত্মত্যাগের ফলে দেশকে শত্রুর অত্যাচার থেকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন—পদ্মিনী সেদিন জহর-ব্রত করেছিলেন—জহর-ব্রত কাকে বলে জানো...তুমি জানো...অনুপমা তুমি জানো ...উৎপলা তুমি—ইলা তুমি...তুমি...তুমি...তুমি ...তুমি...তুমি..."

উত্তেজনায় প্রমীলার কণ্ঠস্বর ক্রমে পর্দায় পর্দায় উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো।

পুনর্নবা

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অনেক বন্ধুর পথ বেয়ে
অনেক সাগর জলে নেয়ে,
এপারেতে এসে দীপ জ্বালি,
আকাশে দ্বিতীয়া চাঁদ
অন্ধকারে ওঠে এক ফালি।

মনের কোণের এক ধারে
জেগে ওঠে কত চুপিসাড়ে
অকৃপণ পুনর্নবা আশা,
অন্য কোনোখানে নয়
হেথা এসে মিটিবে পিপাসা।

প্রান্তরে ঝড়েরা সমুদ্যত
তবু মনে দর্পণের মত
কাঙ্খিতার স্বপ্ন স্মৃতিময়,
আমার একক সত্তা—
এ নির্জনে কী বিশ্বাসে রয়!

ঘুরপথে, অনেকের ভিড়ে
খোঁজাশেষে—অবশেষে ফিরে,
এপারেতে এসে দীপ জ্বালি
আকাশে দ্বিতীয়া চাঁদ,
অন্ধকারে ওঠে এক ফালি।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

১

লিখতে তার ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখক যে সে কোনদিন হতে পারবে না তা সে জানে; কেননা খুঁটিনাটির উপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিসই যায় কলম এড়িয়ে। ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মত ক্ষমতা আর ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের উপর চেপে বসেছিল অসংখ্য খবরের বোঝা—যাকে সরল লোকে বলে পাণ্ডিত্য। এই বোঝার চাপে তার হাঁফ ধরেনি কোনদিন, বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা তার চিরকালের। নইলে ভয় ভয় করে পেছিয়ে পড়ছে বলে। মনে মনে তার গর্ব যে, সে কঠোর যুক্তিবাদী। সব জিনিস স্বাধীনভাবে ভাববার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু কেবল কথা বলবার সময় নয়, নিজে নিজে ভাবতে গেলেও বইয়ে পড়া চিন্তাগুলোর সূত্র ধরেই আসে তার তথাকথিত নিজস্ব মতামত। সংবাদ সংগ্রাহকের সবজান্তা ভাবটা তার আছে পুরো মাত্রায়। স্বভাবসুলভ সৌজন্যে নিজের এই সবজান্তা ভাবটা অপরকে জানতে দিতে সংকোচও ছিল। কিন্তু তার গোপন মনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, লোকে তার এই পাণ্ডিত্যকে স্বীকৃতি দিক। মানুষকে সে ভালবাসত। তার কাজে উৎসাহের প্রেরণা-যোগাতো তার আশাবাদী মন, পরিবেশে স্বাদ জাগাতো নিজের পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু। তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসার-ধর্ম করবার কথা তার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।

এই মনে পরিবর্তন আসছিল কিছুদিন থেকে, নিজের অজ্ঞাতে। স্রোতের উৎসমুখ আসছিল বন্ধ হয়ে, প্রশ্নের শৈবালে। ঋতুর পরিবর্তনের মত, মনের পরিবর্তনটাও সময় নেয়। প্রথমে সে মনে করেছিল তার চল্লিশ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতার ফল এগুলো। তারপর সে একদিন তার অতিপরিচিত মনটাকে চিনতেই পারে না;—মানুষের উপর বিশ্বাস কমছে; মানুষ কেন বিশ্বাসের কোন জিনিস খুঁজে পায় না পৃথিবীতে; সব জিনিসে ভালর চেয়ে মন্দটাই বেশী চোখে পড়ে। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলেও তার যথার্থ অভিসন্ধিটা জানতে ইচ্ছা করে। একটা জিনিস দেখেই প্রথমে যে ধারণাটা হয়, তার বিরুদ্ধে তার মন প্রশ্ন তোলে। প্রচলিত চিন্তাধারা-গুলোর মেকিপনা ধরবার ভার যেন তারই উপর পড়েছে। যত ভাবে ততই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। অমিত্রায়ের বঙ্কিমকটাক্ষে দেখা পৃথিবীটাই কি আসল পৃথিবী! মনে চালশে ধরে কি এমনি করেই? চল্লিশের পর সকলের স্কাউণ্ড্রেল হওয়ার প্রক্রিয়াটা কি এই? চারি-দিকে তার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবরা, সংসারের মাপকাঠিতে এতদিনে সাফল্যের শিখরে উঠতে আরম্ভ করেছে। এরই উপর কি তার লোভ? এই নিরাশার পরিণতিই কি তার বর্তমান মন? এসব জিনিসের উপর লোভ তার কোনদিন ছিল বলেত মনে পড়ে না। সে ভেবে কূল কিনারা পায় না। ক্রমে মনটা কেমন যেন, বাইরের জিনিসে,—ভালতে মন্দতে কিছুতেই সহজে সাড়া দিতে চাচ্ছে না। অথচ ছোটবেলায় একবার একটা কুকুরছানা বাঁচাতে গিয়ে, মোটরগাড়ীর সামনে গিয়ে পড়েছিল।

এগুলো অবশ্য তার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা।

বাস্তব থেকে বোধহয় তার মন পালাতে চায়। তাই তার ঝোঁক ওঠে বিদেশ যাবার। মেকি ধরবার ঠিকাদার নিজের মনকে মেকি আশ্বাস দেয়,—বেশী লোক তুমি দেখনি; তাই তোমার ছোট্টো মনখানি এত প্রশ্ন তুলছে। 'দেশভ্রমণ' এর উপর রচনা লিখবার পয়েন্ট-গুলো, চোখের সম্মুখে নিওন লাইটে লেখা হয়ে যায়। রুগী ঘুমুলে ফাইলেরিয়ার বীজাণু-গুলি রক্তের মধ্যে কিলবিল করে ওঠে। মত স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুকালের পোষা বিলাত না যাবার হীনতাভাবটা সুপ্ত মনের নীচের পরতটায় হঠাৎ সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করে। নিজের অহমিকা ও ইচ্ছা দুই-ই সমর্থন পায়, এরকম অনেকগুলো গালভরা যুক্তি এক সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ তার চিরকালের অভ্যাস। নিজেকে অমিত্রায়ে মনে করা, মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার কথা তোলা, সবই হয়ত ভুয়ো। হয়ত অন্তিম নির্ণয়ে পৌঁছবার পরের মনগড়া ধাপ সেগুলো। কিছু বলা যায় না।

যাক, সেসব অনেক কথা।

ইংলণ্ড হয়ে সে গিয়েছিল প্যারিসে।

পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সে প্যারিস বাছলো কেন তা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। নানা কারণ অকারণ মিলিয়ে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে ইংরাজের মনটা বেনের, আর ফরাসী মনটা কবির। সে শেয়ার কিনতে হলে ইংরাজ কোম্পানীর কিনবে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হলে ইংরাজের ব্যাঙ্কে রাখবে; কিন্তু যেসব দেশের লোক ভাবোচ্ছ্বাসের আস্বাদ জানে না সেসব দেশে সে থাকতে চায় না। যাবে সে ইউরোপের সব দেশেই—দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে। কিন্তু ফ্রান্স! সে হচ্ছে অন্য জিনিস। আট আনা সংস্করণের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' তার মনে ছোটবেলায় রোমাঞ্চ আনত। সে সময় ফরাসী সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ সেকালের বাঁধানো 'ভারতী'তে কত পড়েছে। 'মুকুল' এ প্রকাশিত "দুঃখীরা", 'ভারতীর' "নবাব"। কি অদ্ভুত অদ্ভুত উচ্চারণ লেখকদের নামের। গী দ্য মোপসাঁ। দোদে। অপরিণত বয়সে এই জাতীয় নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় রাখবার অপরাধে সে একসময় হয়ে পড়েছিল তার সহপাঠীদের ঈর্ষা আর বিদ্রূপের পাত্র। তার এক দূর সম্পর্কের শান্তিপুরের মাসিমার খ্যাতি ছিল ছোটবেলায় রাসের রাধিকা সাজতেন বলে। তিনি ছেলেমেয়েদের জটলা করতে দেখলেই বলতেন "কি প্যারিসের গেট দেখছিস তোরা ওখানে?" প্যারিসের গেট যে কি অপরূপ জিনিস সে সম্বন্ধে কারও ঝাপসা ধারণাও ছিল না। তবে হ্যাঁ—ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মত সেটা যে একটা দেখবার জিনিস, একথাটা সবাই বুঝতো। পাড়ার কুৎসার টার্গেট এক ভদ্র-মহিলার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সে তার এক পিতৃবন্ধুকে প্যারিসের নাম উল্লেখ করতে শুনেছিল। আরও কিছুকাল পরে সে খবর পেয়েছিল যে, মতিলাল নেহরু আর সি আর দাশের পোষাক প্যারিস থেকে কাচিয়ে আসত। এই রকম বহু জিনিস মিলিয়ে তার ফরাসী দেশের উপর টান। বড় হয়ে অবশ্য তন্দ্রাহীনা লজ্জাহীনা প্যারির সত্য মিথ্যা অনেক চটকদার খবর তার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। তারপর সে ফরাসী ভাষা শিখেছে ফরাসী সংস্কৃতি আর ইতিহাসের উপর প্রচুর বই পড়েছে। রুশের নূতন সভ্যতার নূতন মানুষ দেখবার ইচ্ছাও তার খুব। ভিসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল প্যারিস থেকেই রুশের ভিসা যোগাড় করা সহজ, কারণ মস্কোর বাইরে

মস্কোর আবহাওয়া পেতে হলে নাকি প্যারিসেই যেতে হয়।

তার প্যারিস বাছবার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ কারণ এইগুলো। ফরাসীরা নিজের দেশকে বলে "ইউরোপের সিংহদ্বার"। সে ঠিক করে যে প্যারিসকে হেড কোয়ার্টার করেই সে সারা ইউরোপ দেখবে। এক কেবল জার্মাণীতে সে যেতে চায় না। ঐ আজ্ঞানুবর্তিতার দাস দেশটার উপর তার শ্রদ্ধা গিয়েছে, যবে থেকে তারা আইনস্টাইনকে দেশ ছাড়া করিয়েছে। সে দেশের মানুষ দেখলে হয়ত মানুষের উপর সংশয় আরও বাড়বে। "মার্চেণ্ট অফ ভেনিস" পড়বার পর থেকে ইহুদীদের উপর তার মায়া হয়।

গোমড়ামুখো ইংলণ্ড থেকে এসে ফ্রান্সে পা দিলেই মনে হয়, যে একটা নূতন জগতে এসে পৌঁছেছি। ক্যালে ডোভার এর মধ্যের দূরত্ব মাইল বিশেক হবে। কিন্তু এই দুই জায়গার লোকের মনের গড়নে তফাৎ, কলকাতা আর ত্রিবন্দ্রমের লোকের পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশী। ইংলিশ চ্যানেল কথাটাই নেই ফরাসী মানচিত্রে। ফরাসী একে বলে লা মাঁশ (আস্তিন) জাহাজ ঘাটে লাগতেই কুলি চাই কিনা, এই হাঁক ছাড়তে ছাড়তে হুড়মুড় দুড়দাম করে লাফিয়ে পড়ল কুলির দল। অনেকদিন পর স্বাভাবিক মানুষ দেখে ভারি আনন্দ হল তার। হাঁফিয়ে পড়েছিল সে এতদিন ইংলণ্ডে থেকে। ইংলণ্ডের লোক-গুলো কোট-প্যাণ্ট জড়ানো একতাল গাম্ভীর্য ও বাঁধা নিয়মের বোঝা। কথা বলে মেপে। বৃষ্টির দিনও অভ্যাসের অন্যমনস্কতায় 'সুন্দর আবহাওয়া!' বলে ফেলতে পারে। কিন্তু ব্যস্! ঐ পর্যন্ত। এর চেয়ে এক-পা বেশি এগুতে গিয়েছ কি, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অলিখিত সাইনবোর্ড 'ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্র; প্রবেশ নিষেধ'। সহযাত্রী ইংরাজটির সঙ্গে গল্প জমাবার বহু চেষ্টা করে লেখক তাঁকে একটা কথা বলাতে পেরেছিল। রেল লাইনের পাশের একটা গাছের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওটা বোধহয় উইলো'। এইটুকু মাত্র। তারপর একটা নিরাসক্তির ভাব দেখিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। তিনি জেণ্টলম্যান। তাই মনের ও কামরার শান্তি-ভঙ্গকারী বিদেশী লোকটার উপর রাগও করেন নি, তাকে অবজ্ঞাও করেন নি। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল একটা সহানুভূতির রেশ—আহা নতুন এসেছে এদেশে একটা অনুন্নত দেশ থেকে—শিখে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই শিষ্টাচার। একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত সেদিন দৈবক্রমে ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল না যে, ব্যারিকেডের আড়ালে তিনি মুখ গুঁজতে পারেন। ......লেখক মনে মনে খুব হেসেছিল।

এর পর ফরাসী কুলিদের এই সমবেত হুঙ্কার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির রিপোর্ট পাঠের মতনই খারাপ অথচ মিষ্টি মনে হয়েছিল। যাক্, আবার সে তাহলে মানুষের দেশে এসে পড়েছে। 'চিউইংগাম' পর্যন্ত তখন ইংলণ্ডে রেশন করা। তাই ইংরাজ যাত্রীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে চকোলেট-ভরা ঠেলাগাড়ির উপর। নূতন কামরার সহযাত্রিণী ফরাসী বৃদ্ধাটি সেই দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এরাই হয়ত কাল ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসন মূর্তির নীচে পায়রাদের দানা খাওয়ানো দেখতে গিয়েছিল।'

তাঁর রসিকতায় লেখককে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর যাওয়া হবে? পারি? মঁসিয়ো, এর আগে আর পারিতে গিয়েছেন নাকি? যান নি? তাহলে পারি নিশ্চয়ই আপনার খুব ভাল লাগবে। অনেকদিন থাকবেন, না দু-চার দিন? অনেক দিন? ফরাসী উচ্চারণের চাইতে প্যারিসের ধরনধারণ নিশ্চয়ই শিখে যাবেন অনেক তাড়াতাড়ি। ধরনধারণ কথাটা বলবার সময় চোখ টিপে এমন একটা গূঢ় ইঙ্গিতের সূচনা দিলেন যে, লেখক তার উচ্চারণের প্রতি কটাক্ষপাতটাতে ক্ষুণ্ন হবার অবকাশ পেলেন না। —দেখেন না প্যারি বলতে গিয়ে ইংরাজরা বলে ফেলে প্যারিস—যে প্রেম-পাগল রাজপুত্রের খামখেয়ালির জন্যে ট্রয় নগরে এককালে মহাযুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। ইংরাজ রসিকতা করে নিজের অজান্তে।

ইংরাজদের উপর লেখকেরও বোধহয় অনেক-কালের সঞ্চিত একটা বিদ্বেষ আছে। সে মহিলাটির কথায় সায় দিয়ে তার সমর্থনে একটা গল্প ঝাড়লে। এডেনে সে এই রকম ইংরাজী রসিকতার একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখেছিল। সেখানে প্রাচীনকালের একটা পুকুর আছে, টুরিস্টদের সবেধন নীলমণি দেখবার জিনিস। শুকনো খটখটে পুকুর। এক ফোঁটা জল নেই বর্ষাকালেও, অথচ ইংরাজ অফিসারের দস্তখত করা প্রকাণ্ড নোটিশ সেখানে— 'এই পুকুরে স্নান করা বারণ।'

বৃদ্ধাটি বাঁধানো দাঁতের পাটি বার করে হেসেই আকুল। তারপর তাঁর সঙ্গে গল্প জমে ওঠে। উৎকট উচ্চারণে ফরাসীতে গল্প করতে আরম্ভ করলে সময় কাটে খুব তাড়াতাড়ি। প্যারিসে যখন তারা পৌঁছল, তখন সূর্য ডুবেছে, কিন্তু অন্ধকার হয়নি। মহিলাটি তাকে দুটো সস্তা হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিলেন— সেগুলো শহরতলীর। বিদেশী টুরিস্টদের সাহায্য করবার জন্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান Les Hotesses de Paris-এর নীল পোষাক-পরা ভদ্রমহিলারা স্টেশনে থাকেন। সস্তা হোটেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন, 'ল্যাটিন কোয়ার্টার'-এ যেতে—ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকায় থাকবার জায়গার কোনই অভাব নেই সেখানে। এখানকার বহু লোকের নামে সে পরিচয়-পত্র এনেছে। কিন্তু নেহাৎ দরকার না পড়লে সেগুলোকে কাজে লাগাবে না। নিজের চেষ্টায় সে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে চায়। কোথায় উঠবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই সে যায় বাক্স-পেটরা পরীক্ষা করানোর জন্য শুল্কের ঘাটিতে।

—কি মশাই, আপনি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন নাকি? বাক্সে দেখছি বোম্বাইয়ের লেবেল আঁটা। তাই জিজ্ঞাসা করলাম। কিছু মনে করবেন না।

অনেক কালের পুরানো লেবেল। লেখক লণ্ডন থেকে আসবার সময় এই লেবেলগুলোকে তুলবার চেষ্টা করেছিল। তুলতে গেলেই সস্তা ফাইবারের সুটকেসের ছাল শুদ্ধ উঠে আসে কাগজের সঙ্গে। ভাইপোর ঘুড়ির আঠা দিয়ে আঁটা হয়েছিল এগুলো। লেখক প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বেশ চটপটে কেতাদুরস্ত ছেলে —চেহারাটি সুন্দর, ফুটফুটে রঙ, ছিপছিপে গড়ন। পরিচয় হল—সিন্ধী; নাম আদবানী; তবে গান্ধী বলেই ডাকবেন; এখানে সবাই ঐ নামেই ডাকে; হ্যাঁ সে ছাত্র বইকি; সারা জীবনই লোকে স্টুডেণ্ট; তার অধ্যয়নের বিষয় হল কমার্স।

—আর আপনি?

এবার গান্ধীর জিজ্ঞাসার পালা।

—পড়বার জন্য নাকি? ডক্টরেট? লণ্ডনে পাননি নাকি? হিন্দী-ইংরাজী-জানা তার এক ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে সে দরকার হলে দেখা করিয়ে দিতে পারে। তাঁর কাজই হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে দেবার থিসিসগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করে দেওয়া। আলাপ-সালাপও আছে তার অনেক প্রোফেসরের সঙ্গে। —আপনি নিশ্চয়ই Study leave নিয়ে এসেছেন?

গান্ধী নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়ে চলে। লেখককে কথা বলতেই দেবে না। অতিকষ্টে লেখক তাকে জানায় যে, সে পড়তে আসেনি; Study leave নিয়েও আসেনি; অতি সাধারণ ভ্যাগাবণ্ড গোছের লোক সে; এসেছে বেড়াতে, অর্থাৎ কিনা ফরাসী সংস্কৃতিকে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে।

গান্ধীর চোখ একটু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। —তাই বলুন! অনেক দেরি করে ফেলেছেন মঁসিয়ো। ফরাসী সংস্কৃতির স্বাদ নিতে হলে আরও কম বয়সে আসা উচিত ছিল প্যারিসে। আপনাদের মত বয়সে ইণ্ডিয়া থেকে এখানে আসে Study leave নিয়ে প্রোফেসরেরা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করাতে। মনের হ্যাংলা-পনা ঢাকতে গিয়েও বলে ফেলে,

'মা-লক্ষ্মীদের স্বাস্থ্যটাত দেখি খুব ভাল এদেশে।' আপনি বড়লোক না গরীব? তাহলে চলুন সস্তা হোটেলে আপনার জায়গা ঠিক করে দিই। তারপর প্রাণ খুলে কিছুদিন হিন্দীতে কথা বলা যাবে। ইণ্ডিয়ার খবর অনেককাল থেকে জানি না। সব শোনা যাবে। —বিনা পরীক্ষায় লেখকের মালগুলো পাস হয়ে যায়; গান্ধীর সঙ্গে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের আলাপ; ইস্টিশানের কুলিদের সঙ্গে পর্যন্ত মুখচেনা।

দেশ থেকে লেখক ঠিক করে এসেছিল যে, এদেশে এসে ভারতবাসীদের সে একটু এড়িয়ে চলবে। নিজের দেশের লোকের একটি পরিচিত গোষ্ঠী জুটে গেলে নূতন দেশের লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ-সুবিধা, ইচ্ছা সবই কমে যায়। সে সঙ্কল্প এখন কোথায় ভেসে যায়। খানিকটা ভাবনা-চিন্তার ঝঞ্ঝাট থেকে অব্যাহতি পাবার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়ায় গান্ধীর হোটেলে। সেদিন আকাশ পরিষ্কার। প্যারিসের পথঘাট, এমনকি, এই কাণাগলির হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্যন্ত তখনও গোধূলির আলোতে রঙিন হয়ে রয়েছে। প্যারি! এর জুড়ি নেই দুনিয়াতে। নিউ ইয়র্ক আমেরিকার রাজধানী নয়; দিল্লী ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শহর নয়। পিকিং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সাংহাই, মস্কোর লেনিনগ্রাদ।- অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য মিলিয়ে জার্মানী এই সেদিন জন্মেছে বলে নিজের দেশের মধ্যে বের্লিনের আভিজাত্য নেই। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডনের চাইতে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের নাম-ডাক বেশি। কিন্তু কোন বিষয়ে প্যারির একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে কোন ফরাসী আজ পর্যন্ত প্রশ্ন তোলার কথাটা ভাবতেও পারেনি। প্যারি সব পারে।

লেখকের খেয়ালিপনার মধ্যেও একটা হিসেবী মন আছে। পড়তে নয়, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, সে এসেছে গাঁটের পয়সা খরচ করে মনের প্রসার বাড়াতে। কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতার পুঁজি কিছু বাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেই কি তার চলবে? আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে তার চিরকেলে ভ্যাগাবণ্ড নামটা আবার একটা নূতন বার্নিশের পালিশ পাবে মাত্র! মঁসিয়ো গান্ধীর মত সে কমার্সের ছাত্র না হোক, দেশ-ভ্রমণের ব্যবসায়িক দিকটার উপরও সে নজর দেবে। ভ্রাম্যমাণ ক্যানভাসাররা কোম্পানীর অর্ডারের পুঁজি বাড়ায়। সে বাড়াবে লেখার পুঁজি। ফরাসী লেখকরা সকলেই নিয়মিত জুর্ণাল (ডায়েরি) লেখেন। এই ডায়েরীগুলোর এদেশে কদর খুব। রোমে এসে রোমানদের মতই হওয়া উচিত। সে-ও এবার থেকে তার চিন্তার ডায়েরি রাখবে —প্রত্যহ না হোক, অন্তত মধ্যে মধ্যে ত নিশ্চয়ই লিখবে। যুদ্ধোত্তর 'চার স্বাধীনতা'র সত্যযুগ এটা। তাই সে জুর্ণালের মধ্যে নিজের স্বাধীন মতামতই ব্যক্ত করবে—সম্পূর্ণভাবে বাইরের চাপ থেকে নিজের মনকে মুক্ত রেখে। নিজস্ব বক্তব্য সে জানাতে ছাড়বে কেন পৃথিবীকে, যদি সে পারে ত। সেই লেখাগুলোকে সে ভ্রমণ কাহিনীর বই হিসাবে বার করবে।

ভ্রমণ কাহিনী বললেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে। পিসিমার তীর্থ সেরে আসবার মানেই অনেকদিন ধরে অনেকগুলো প্রায় মিথ্যে গল্প করবার একটা সামাজিক লাইসেন্স নিয়ে আসা। লেখকও ফ্রান্সে তীর্থ-যাত্রীর চাইতে বেশি কিছু নয়। রূপকথায় রাজার নফর সফরে যায়, ভ্রমণ কাহিনীতে যায় লেখক। এইটুকু মাত্র তফাৎ। তাই যারা বুদ্ধিমান, তারা ভ্রমণ কাহিনীও পড়ে না, তথা-কথিত আন্তর্জাতিক মিশন থেকে ঘুরে আসা রাজার নফরের স্টেটমেণ্টও পড়ে না। তারা কেনে টুরিস্ট গাইড। এদের চাইতেও যারা কড়া পাকের লোক, তারা কেনে কেবল রেলওয়ে টাইম টেবলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তারা বলে মিথ্যেটাকে মিথ্যের মত করে লিখলে তাকে বলে উপন্যাস; আর মিথ্যেটাকে সত্যর মত করে লিখলে হয় ভ্রমণ কাহিনী, জীবন-বৃত্তান্ত, না হয় মেস-ম্যানেজারের হিসাবের খাতা। তবে লেখকদের ভরসা যে, এরকম বুদ্ধিমান পাঠকের সংখ্যা কম, আর তাদের বই কিনবার পয়সাও নেই। বুদ্ধিমান লোকে আবার যদি রোজগারের ফন্দি-ফিকিরেও উঠে পড়ে লাগে, তাহলে বোকারা করে খেত কি করে?

এর আগে বহুবার লেখক নববর্ষের দিন নিয়মিত ডায়েরি রাখবার প্রতিজ্ঞা করেছে; কিন্তু প্রতিবার দিনকয়েক পরই তার উৎসাহ উবে গিয়েছে। অনেক ধরণের অনেকগুলো মনের সমষ্টি একটা মানুষ। কেবল নিজের জন্য লেখা ডায়েরিতেও, নিজের সব মন কয়টির কথা লেখা যায় না কাগজে-কলমে। তাই চিরকাল মনে হয়েছে যে, এ পরিশ্রম নিরর্থক; কিন্তু এবারকার ডায়েরিটা হবে পরের জন্যে লেখা। এর আবার একটা অর্থকরী উদ্দেশ্যও আছে। কাজেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত উৎসাহটা মিইয়ে যাবে না।

ডায়েরী

অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক ফরাসী লোকগুলো। নিজের মনের ভাবটা চেষ্টা করে না চাপা এদেশে অধিকাংশ সময়েই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ নয়। মাটির নীচের রেলগাড়িকে এদেশে বলে 'মেত্রো'। সেই গাড়ির কামরা-গুলিতে যেখানে লেখা থাকে 'আঠারজন বসিবে এবং চুয়াল্লিশজন দাঁড়াইবে, তার পাশেই আছে বড় বড় করে লেখা সাইনবোর্ড "গাড়ির ভিতর থুথু ফেলা বারণ"। ফ্রান্সের মধ্যেও আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের দুর্নাম যে, তারা বড় বেশি কথা বলে। সেদিককার মোটর বাসগুলির মধ্যে লেখা —যাত্রীদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ড্রাইভারের সহিত গল্প না জমান। বিশ্বাস পায় না গভর্নমেণ্ট দেশের সাধারণ লোককে। কারণও আছে। কলকাতার গলির দেওয়ালের বারণ-করা লেখাটার যা মর্যাদা, এখানকার সাইনবোর্ডগুলিরও প্রায় তাই। খাবার টেবিলে গল্প করতে করতে দাঁত খুঁটতে এদের লজ্জা নেই। রেস্তোরাঁতে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে গল্প কর, হুস্ করে শব্দ করে কফিতে চুমুক মার, মাছের কাঁটা আর ফলের বীচি যেমন করে ইচ্ছে মুখের থেকে বাইরে ফেল, কাঁটা দিয়ে আইসক্রীম খাও, কেউ ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু করতো দেখি খানিকক্ষণ কাঁটা-চামচের শব্দ একটু বেশি জোরে ইংলণ্ডের হোটেলে, একশ জোড়া মৃত্যু-সন্ধানী চোখ এমনভাবে তাকাবে তোমার দিকে যে, তুমি শব্দটা থামাতে ভুলে যাবে। তোমার অনভ্যস্ত হাতে ম্যাকারনি খাওয়ার বিপদের সময় জেণ্টলম্যান ইংরাজ জোর করে অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। ফরাসীরা হো-হো করে হাসে, প্রাণ খুলে ফুটপাথের উপর নাক ঝাড়ে, বেপরোয়াভাবে ঢেকুর তোলে, মুখ-চোখ নেড়ে কথা বলে, চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক আটকিয়ে প্রেয়সীকে চুমো খায়, শনিবারের শেষ রাত্রে চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরে। অপরিচিত ভদ্রলোককে পিছন থেকে ডেকে তাঁর দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরানো এখানে সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য নয়। পার্কের বেঞ্চে উপবিষ্টা ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিনা পরিচয়ে গিয়ে গল্প আরম্ভ করতে পার। ভিসার স্ট্যাম্প কিনতে সরকারী অফিসে গিয়ে দেখবে যে, কেরানী ভদ্রমহিলা একটা লম্বা কিউকে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে তুলমারী ঝগড়া করছেন। অঙ্গভঙ্গী, কথার চটক, মুখঝামটা, চোখের নাচন, মেয়েদেরই বেশি। ছোট ছেলের অবশ্যকরণীয় কার্য ফুটপাথের উপর করাতে বা পথচারীর মাথার উপর কার্পেটের ধুলো ঝাড়তে এদেশের মেয়েরা দ্বিধাহীনা। হোটেলে কেবল আণ্ডার-উয়ার পরিহিতা ভদ্রমহিলা সকাল বেলা পাঁচতলা থেকে নেমে একতলায় এসে ফোন ধরেন। পথে পায়জামা পরিহিত আলজিরিয়ার লোক দেখলে পুরুষরা ক্রুদ্ধ ও মেয়েরা হতবাক্ হয়ে পড়েন না—ইংরাজদের মত। গলিঘুঁজিতে পাঁচ আইন ভঙ্গরত লোক দেখা আমাদের দেশের মত অত না হলেও একেবারে বিরল নয়। কলকাতার রাস্তায় গরুর যতগুলো অধিকার আছে, সেসবগুলো আছে এখানকার কুকুরের। তফাৎ কেবল যে, শীতকালে এদেশে কুকুররা গরম

জামা গায়ে দেয়; আর ট্রাফিক পুলিশ মানুষের চেয়ে কুকুরের উপর সময় খরচ করে বেশি।

টিউব স্টেশনে নামবার সিঁড়ির ধারে ইয়ার-বন্ধুরা মিলে চব্বিশ ঘণ্টা গুলতানি করে। ফুটবল স্টেডিয়ামে দর্শকদের উত্তেজনা আর পক্ষপাতিত্ব হুবহু আমাদের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দিনের ধরণেই প্রকাশ পায়। সেই রকমই টীকা-টিপ্পনী—তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মিঠেকড়া রসিকতায় ভরা। সম্মুখের দিকের দর্শক দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে চেষ্টা করলে পিছনে উপবিষ্ট ছেলেরা সৌজন্যের খাতিরে তাঁকে বসতে অনুরোধ করে না। শুধু অন্য-দিকে তাকিয়ে কমলালেবুর খোসা আর চীনা-বাদাম ছুঁড়ে মারে। ফুটপাথের জুয়োড় স্টলে অনবরত বন্দুক ছোঁড়ে বলে, এই সব ছেলেদের হাতের নিশানা অব্যর্থ। সস্তা সিনেমা ঘরে ছবি আরম্ভ করতে দেরি হলে এখানে আমাদের দেশের শিস্ ছাড়াও বিড়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। কেবল ইংরাজ দেখে আমরা সাহেব আর স্নবারি কথা দুটোকে আলাদাভাবে ভাবতে শিখিনি। ফ্রান্সে এসে সে ধারণা যায় উল্টে। এদের ভাবভঙ্গীতে আড়ষ্টতা, যান্ত্রিকতা নেই একেবারে। হাই এলে গিলে ফেলবার ব্যর্থ প্রয়াস এরা করে না। এই একজন রাত বারোটার সময় ঠিক মাথার উপরের ঘরটাতে কাঠের মেঝের উপর গানের তাল ঠুকছেন, জুতোর গোড়ালি দিয়ে। সম্মুখে রাখা খবরের কাগজখানিতে বড় বড় অক্ষরে একটা খবর বেরিয়েছে—ইন্দোচীনের লোকদের দিকে টেনে একটা বক্তৃতা দেবার পর নামজাদা কমিউনিস্ট মাদাম অমুক চিঠি পেয়েছেন—এই বলে রাখলাম, তোর তিনটে ছেলেকেই মেরে ফেলে দেব—নির্ঘাত মারব জেনে রাখিস।

এতদিনের একটা সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ আমাদের বোঝে না, আমরাও ইংরাজদের বুঝি না। ফরাসীরা কিন্তু আমাদের চেনা মানুষ। স্বাভাবিক বলেই তারা এত সুন্দর।

২

এই কদর্য হোটেলটার নাম 'ফুলের হোটেল'। রাস্তার দিকে হোটেলওয়ালীর বসবার ঘর। ঘরখানি বড় আর বেশ ভাল করে সাজানো। এছাড়া আর কোন ঘরে আলোবাতাসের নাম গন্ধ নেই। চারতলার একটি ঘরে লেখকের জায়গা হয়েছিল। সেদিন গান্ধী বলেছিল, মঁসিয়োঁ লেখক, দৈবক্রমে এরকম সস্তা ঘর পেয়ে গেলে। এই ঘরে এক ফরাসী ভদ্রমহিলা থাকতেন, একজন আল-জিরিয়ার লোকের সঙ্গে। তাঁরা পরশু হঠাৎ চলে গিয়েছেন।

লেখক বড়লোক নয়। টাকার কথা না ভেবে উপায় নেই তার। প্রথম থেকে তার চেষ্টা কি করে সস্তায় সে চালাবে। এখন থেকে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি না রাখলে পরে টাকার টানাটানিতে পড়তে পারে। বেশী বয়সে প্যারিসে আসবার নিরর্থকতার কথাটা গান্ধী উঠতে বসতে শোনাচ্ছে। অন্তত বয়সের অভিজ্ঞতায় এই বুঝে শুঝে খরচ করবার ব্যাপারটায় তার স্থিতি কমবয়সী লোকের চেয়ে ভাল।

হোটেলওয়ালীকে এদেশে বলে 'প্যাত্রোন'। তাঁর ঘরের টেবিলে কাঠের বুদ্ধমূর্তি। চীনে-ম্যানের মত মুখ মূর্তিটার। সোনা বাঁধানো সমুখের দাঁত বার করে মাদাম প্যাত্রোন প্রথম পরিচয়ের সময়ই বললেন যে, ঐ মূর্তিটি গ্যান্ধীর দেওয়া। তার দুই বছরের ছেলেটাতো গ্যান্দীঅন্ত প্রাণ। দিনরাত কেবল গ্যান্দী গ্যান্দী। জানেন ত গ্যান্দী ওর ধর্মবাপ। দেখুন লক্ষ্মী ছেলে আপনাকে পুটপুট করে দেখছে। তোমার হাতটা দাও খোকা মঁসিয়োকে, নইলে আবার উনি তোমার নিন্দে করবেন।

হোটেলওয়ালীর স্বামী স্পেনের লোক। কিসের যেন ব্যবসা করেন। সেই উপলক্ষে স্পেন আর মরক্কোতেই থাকতে হয় বেশী। গান্ধী হোটেলওয়ালীর টেবিলেই খায়। বন্ধুত্বের চেয়েও তাদের অন্তরঙ্গতাটা কিছু বেশী একথা সকলেই জানে। তবে এসব অতি সাধারণ, অতি স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর স্পৃহা বা সময় প্যারিসে কারও নেই।

পাড়াগেঁয়েকে কলকাতা দেখানর মত মুরুব্বিয়ানা ভাব গান্ধীর। কোন্ দোকানে গেলে ঠকবার সম্ভাবনা নেই; সিঁড়ির আলোর বোতাম টিপলে কেন এক মিনিট পর আপনা থেকে আলো নিভে যায়; সাপ্তাহিক টিকিট কিনলে টিউবট্রেনে কত সস্তা পড়ে; সব খুঁটিনাটি জিনিসে সে লেখককে তালিম দেয়। প্রত্যেক বাড়িতে একজন করে 'কঁসিয়েৰ্জ' (দারোয়ান) থাকে এখানে জানেন ত মঁসিয়ো লেখক? কথা বললে কামড়াতে আসে। দারোগার চাইতেও নিজেকে বড় মনে করে। সাবধান! কঁসিয়েৰ্জকে চটিয়েছেন কি গিয়েছেন! চিঠি এলে পাবেন না, কেউ খোঁজ করতে এলে ফিরে যাবে। অথচ এখানকার আইন জানেন ত? ভাড়াটে ঘর ছেড়ে দেবার এক বছর পর পর্যন্ত কঁসিয়েৰ্জের ডিউটি পুরনো ভাড়াটের চিঠি যথাস্থানে রিডাইরেক্ট করে দেওয়া। আরও কত দরকারী জিনিস গান্ধী লেখককে শেখায়।

নাচঘর, অপেরা, থিয়েটার, ক্যাসিনো, বহু জায়গায় সে লেখককে নিয়ে যায়, তাকে একটু চালাক চতুর করিয়ে দেবার সদুদ্দেশ্যে। খরচটা অবশ্য লেখকেরই। টাকাপয়সা সম্বন্ধে সজাগ হওয়া সত্ত্বেও লেখক এ খরচ করতে দ্বিধা করেনি পাছে গান্ধী তার বয়সের কথাটা তুলে আবার খোঁচা দেয় বলে। আর সে এসেছে ফরাসী সংস্কৃতি জানতে। এসব জিনিসও ত ফরাসী সংস্কৃতির অঙ্গ। ফরাসী জীবনের অনেকখানি এইসব জিনিসের সঙ্গে জড়ানো।

রাত্রে ছাড়া গান্ধীর সময় নেই। সারাদিন সে কর্মব্যস্ত। কোথায় থাকে, কি করে, কে জানে! ইউনিভার্সিটি গরমের ছুটির পর এখনও খোলেনি। তবে বেশ ছেলে গান্ধী। ইংরাজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, তিনটে ভাষাতেই অনায়াসে কথা বলতে পারে। সে আগে ছিল তানজিয়ারে। সেখানে তার কাকার ব্যবসা আছে—মশলাপাতির পাইকারী ব্যবসা। প্যারিসে সেই ব্যবসার শাখা আছে।

আরও কত কথা গান্ধী গল্পে গল্পে বলে। অধিকাংশই তার প্রণয় সংক্রান্ত।

...এই যে যাঁর ঘরে তুমি এসেছ, সেই ভদ্রমহিলার মেয়েটি থাকে সতর নম্বর ঘরে। খুব ভাল বেহালা বাজায়। আলাপ করিয়ে দেব। ইংরাজী শিখতে চায় সে। আমার সময় কোথায়। তুমি ইংরাজী শেখাও। এক্সচেঞ্জে ফরাসী উচ্চারণটা ভাল করবার সুযোগ পাবে। তবে তোমার বয়সটা একটু বেশী—এই যা মুস্কিল।

সংকুচিত হয়ে পড়ে লেখক। বয়স বেশী হলে ইংরাজী পড়াবার অযোগ্য হয়ে যায় নাকি লোকে! এই এক্সচেঞ্জ জিনিসটাই বড় গোল-মেলে ব্যাপার—পরিবর্তে বিয়ে থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধবন্দীর বিনিময় পর্যন্ত। তেমনি কি এখানে এই এক্সচেঞ্জ-এর হুড়োহুড়ি! 'বার্টার'-এর স্বর্গরাজ্য আবার ফিরে আসছে নাকি দুনিয়াতে! বিদ্যায়তনগুলিতে 'পাঠ-বিনিময়'এর নোটিশের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনের দোকানগুলিতে শতকরা আশিটি বিজ্ঞাপন ভাড়াটেদের থাকবার ঘর 'বিনিময়' সংক্রান্ত। ফরাসীদের আইন কানুন সবই অদ্ভুত। অন্যের বাড়ি ভাড়া নিয়ে আবার সেটার বদলা-বদলি! 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' আবার এই এক্সচেঞ্জের চাইতেও দুষ্পাচ্য জিনিস। তাই টুরিস্টরা একে ভয় করে আরও বেশী। দেশ থেকে আসবার আগের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছুটোছুটির কথাটা অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে লেখক ভুলবে না। তারপর নিজের টাকা খরচ করবার দুর্লভ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে সে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল প্যারিসের একটা ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলবার জন্য। রাজনীতির লোকদের কথা বিশ্বাস না করে লেখক আজ পর্যন্ত কখনও ঠকেনি। তাঁরা বলছিলেন, পাউণ্ডের দাম কিছুতেই কমানো হবে না। সেইজন্য সে ধরে নিয়েছিল যে, নিশ্চয়ই কমানো হবে। নিজের দূরদৃষ্টির কথা ভেবে তখন গভীর আত্মপ্রসাদ হয়েছিল তার। কিন্তু একটা জিনিসকে সে হিসাবের মধ্যে ধরে নি—প্যারিসের ব্যাঙ্কের সততা। তার একাউণ্ট

খুলবার বহুদিন পর পাউণ্ডের দাম কমিয়েছে ইংরাজ সরকার। তবু ব্যাঙ্ক বলে যে, তোমার টাকা আমরা পাউণ্ডেই রেখেছিলাম; এখন চুপসে ছোট হয়ে গিয়েছে। ইংরাজী, ফরাসী দুটো ভাষায় মিলিয়ে মারাত্মক ঝগড়া করেও কোন ফল হয় নি। ফরাসীদের সঙ্গে ঝগড়া করে ফল হয়ও না কোনদিন। দুইজন ফরাসীতে ঝগড়া হলে দুজনেরই জিৎ হয়। বিশ্বকে খোঁচা মেরে নিজের ঔদ্ধত্য জাহির করতে রবীন্দ্রনাথ বারণ করেছিলেন। পড়বার সময় বেশ লেগেছিল কথাটা। কিন্তু এরা কি সে সংকল্প রাখতে দেবে!

ডায়েরি

বড় আপনভোলা জাত ফরাসী দোকানদাররা। একই লণ্ড্রিতে বিদেশীদের কাপড় কাচবার রেট এক এক সপ্তাহে এক একরকম। বিদেশী ক্রেতার দামের হিসাবে দোকানদার প্রায়ই ভুল করে—আর আশ্চর্য যে ভুলটা কখনও খদ্দেরের অনুকূল হয় না। না দেখে নিলে রুটির দোকানে বাসি কিম্বা পোড়া পাঁউরুটি চালিয়ে দেয়। মার্গারিন দিয়ে মাখনের দাম নেয়। দাম লিখে দিতে বললে, পেন্সিলের সীস জিভে ঠেকিয়ে, সাত সংখ্যাটির পেট কেটে, দশমিক চিহ্নের পর কতকগুলো সাঁতিম (ছোট মুদ্রা) লিখে, একুনে এমন একটা জগাখিচুরি করে দেবে যে, তার চাইতে নোটের গোছা বিক্রয়িত্রী মাদামোয়াজেলের সম্মুখে নিবেদন করে দেওয়াই ভাল; যতগুলো ইচ্ছে তিনি যেন নিয়ে নেন।

সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা কাগজের বোঝাগুলোর নাম নোট। নিত্য-নূতন ছবি—চিত্রকরদের হাত-পাকানোর পট। ডাকটিকিটের তবু একটা ব্যবসায়িক দিক আছে, টিকিট সংগ্রাহকদের একটা অহেতুক খেয়ালের দৌলতে। কিন্তু ফ্রান্সের এই নোট! কাগজ আর রঙের দাম ওঠে কি করে গভর্নমেন্টের। মনি-ব্যাগ ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। একদিককার পকেট ভারে বেশী ঝুলে পড়লে নোটগুলো দুই পকেটে ভাগ করে নিতে হয়। দরকার না থাকলেও যখন তখন ছোটগুলো দিয়ে খবর-কাগজ কিনতে হয়। ফ্রাঁকের দাম ত এক পয়সাও না। তবু গালভরা উচ্চারণে ফ্রাঁ বলতে এরা অজ্ঞান। প্রথম প্রথম এই হাজার ফ্রাঁকের নোটগুলো পকেটের মধ্যে কড় কড় করলে ভুল হয় যেন অনেকগুলো হাজার টাকার নোট পকেটে রয়েছে। একটু দাম্ভিকতার আমেজ আসে মনে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থার্ড ক্লাস গাড়ির সম্মুখের ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি দেখার মত মানসিক বিলাস এটা। এ নোটগুলো যে মশলার ভাঁড়ারের তেজপাতার বোঝা, এটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে কিছুদিন সময় কেটে যায়।

তবে একটা বিষয়ে ফরাসীদের তারিফ না করে উপায় নেই। তাদের সবচেয়ে ছোট মুদ্রাগুলি অ্যালুমিনিয়মের—তাই বেশ হালকা। ইংলণ্ডের গুটিকয়েক পেনি পকেটে রেখে ওজন হলেই, আমার মত ওজনের লোকের লাইফ পর্যন্ত মঞ্জুর করে নেবে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। অথচ সময়ে অসময়ে কাজে লাগে বলে সেগুলো ইংলণ্ডে সর্বদা রাখতেও হয় পকেটে।

নিমকহারামি করব না;—এই কাগজের বোঝাগুলো থেকে একটা উপকার পেয়েছি। শিক্ষায়তন কণ্টকিত প্যারিসে, এক জায়গায় ফরাসী সাহিত্যের ক্লাসে ভর্তি হতে গেলে, সেখানকার মহিলা প্রোফেসর আমার ফরাসী ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার পকেটে কি কি জিনিস আছে, নাম বলে বলে বার করুন। পেন্সিল, ছুরি, চাবির রিং, রুমাল, পকেট অভিধান—তারপর বললাম মনিব্যাগ।

"না না, একে মনিব্যাগ (porte-monnaie) বলে না। এর নাম কাগজ রাখবার ব্যাগ (porte-feuille)।"

ফরাসী নোটের তাড়া দেখিয়ে আমি জবাব দিই—"ফরাসী দেশে মনিব্যাগে আর কাগজের ব্যাগে তফাৎ আছে নাকি আজকালও?"

জিপ্‌সি মেয়েরা ছাড়া হাসতে ফরাসী মেয়েদের জুড়ি আর কেউ নেই। খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়েন মাদাম প্রোফেসর। দুই একজন সহকর্মিণীকে ডেকে মুসিয়ো হিন্দুর রসিকতাটা শোনান। পকেট অভিধানখানি তুলে ধরে বলেন, "পুরুন এই বিরাট এনসাইক্লোপিডিয়াখানা এবার পকেটে।" আমার কাজ হয়ে যায়।

গুছিয়ে কথা বলাটা এরা ভারি পছন্দ করে। ফরাসীরা প্রাণ খুলে প্রশংসা, প্রাণ খুলে নিন্দা করে। ইংরাজের মত মতামত প্রকাশে গোঁজামিল দেওয়াটা পছন্দ করে না। ইংরাজ যখন একটা বিষয়ের উপর কিছু বলতে চায় না, তখন বলে —That's very interesting. নিজের লেখা বই প্রেজেন্ট করলে বলে "বেশ মলাটটা।" হাসি যেমন আসে, কান্না যেমন লোকের পায়, মতামত জিনিসটা তেমনি ফরাসীদের আসে, পছন্দ-অপছন্দটাও তেমনি পায়। টেলিফোনে বিদেশীর ভুল উচ্চারণের কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হলে অধৈর্য হয়ে ঝনাৎ করে ফেলে দেয় ফোনটা। কথায় কথায় অবাক হয়ে "ওলালা!" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। খবরের কাগজের লেখা পছন্দ না হলে দল বেঁধে কাগজের অফিসে হানা দেয়। এই সাময়িক মাথা-গরমের ওষুধ হিসাবে এখানকার পুলিস তাদের উপর হোসপাইপ দিয়ে জল ছিটোয়।

(ক্রমশঃ)

রোমাণ্টিক

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

হিমেল রাতের স্বপ্ন-জড়িমা কুহেলী তিমির মাঝে
ওগো ও কন্যে
সোনার কন্যে
স্বপন কন্যে গো!
এসেছিলে তুমি অপরূপ কোন সাজে।

কন্যে গো তুমি স্বপনবিহারী
ঘুমেল চোখেতে স্বপনের কণা জাগে
নিশি-গন্ধার পরশন লাগা প্রাণে
[illegible]স-বলাকা-বর্ণা তুমি গো মেয়ে!

তিমির তীর্থে কৃষাণী মেয়ের কমণীয় মুখখানি
কঠিন রাত্রি : মুখখানি যেনো অভিসার নমনীয়
ময়ূর-পংখী আকাশের সেই অচপল ইসারাতে
অরুণ-মেখলা-নন্দিতরূপে পৃথিবীও বিস্মিত।

কন্যে তোমার উচ্ছল যৌবন
সবুজ পৃথিবী : রাত্রি শেষের নবীন সূর্যালোক।
মৌসুমী বায়ু : ধূসর আকাশ : কাশ্মিরী লালফুল
হোয়াং হোয়ের সজল সবুজ হাওয়া
বনহংসীর চঞ্চল চোখে অবাধ কামনা শিখা।
স্বপ্ন-জড়িমা কুহেলী রাতের : রক্তকণিকা কথা ক'য়ে ক'য়ে ওঠে—
ওগো ও কন্যে, সোনার কন্যে, জীয়ন কন্যে গো!

দেহ লক্ষণা

পাকস্থলীর কাজ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

খাদ্য সম্বন্ধে মুখের তরফের কাজ শেষ হবার পরেই শুরু হবে পাকস্থলীর তরফের কাজ। কিন্তু গলাধঃকরণ করবার পরেই কোনো খাদ্য সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না, গলা ও পেটের মাঝে রয়েছে অনেকটা পথের ব্যবধান। গলার নিচে নেমে প্রায় দশ ইঞ্চি পথ অতিক্রম ক'রে তবে খাদ্যকে পেটের ভিতরকার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। এই নলের মতো লম্বা যাত্রাপথটির নাম অন্ননালী। পৌষ্টিক নালীতন্ত্রের অন্তর্গত হলেও এই অন্ননালীর মধ্যে কোনো হজম ক্রিয়া ঘটে না, ঐটি বাহক যন্ত্রের মতো কেবল খাদ্যকে পাকস্থলীতে পৌঁছে দেবার কাজটাই করে। যন্ত্রের মতো এইজন্য বলছি যে এই বহন ক'রে নিয়ে যাবারও এর এক বিশেষরকমের প্রক্রিয়া আছে। এটি মাংশপেশী নির্মিত লম্বা আকারের একটি নল বটে, কিন্তু নল হলেও কাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ফাঁপা অবস্থাতে কখনো থাকে না। খাদ্যের চাপ পড়লেই অমনি কেবল যেখানটিতে চাপ পড়ে সেই অংশটা তৎক্ষণাৎ ফাঁক হয়ে যায় এবং সেখান থেকেই এর একরকম পেশীক্রিয়া শুরু হয়, অর্থাৎ সেই খাদ্যকে এর পেশীগুলি তখন সংকোচন ক্রিয়ার দ্বারা উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে ঠেলতে থাকে, এবং সেই চাপে পরম্পরাক্রমে ক্রমশ নিচের দিকটাও ফাঁক হয়ে গিয়ে তাকে জায়গা দিতে থাকে। এইভাবে সংকোচন ক্রিয়ার দ্বারা একদিক থেকে অন্য দিকে ঠেলে ঠেলেই খাদ্যকে গলা থেকে পাকস্থলীর দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই ক্রিয়াকে বলে পেরিস্টলসিস বা একদিক থেকে অন্যদিকে নালী-সংকোচনের ধারাবাহিক স্রোতক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার দ্বারাই খাদ্যবস্তু গোটা পৌষ্টিক নালীর সারা পথটা অতিক্রম করে। খাদ্য যে আপন ভারেই গলার থেকে নিচের দিকে নেমে যায় তা মনে করা উচিত নয়। জল বা কোনো তরল বস্তু পান করলে সেটা অবশ্য গড়িয়েই চলে যায়, কিন্তু কঠিন বস্তুর সম্বন্ধে সে কথা নয় তাকে ঐ পেশীক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অধঃকরণই করা হয়। এক একটি কঠিন খাদ্যের পিণ্ডকে এই দশ ইঞ্চি পরিমাণ রাস্তাটা এই ভাবে পার ক'রে দিতে প্রায় আট সেকেণ্ড ক'রে সময় লাগে। আমরা সাধারণত মনে করি যে গলাটা রয়েছে উপরে আর পাকস্থলীটা রয়েছে নিচে, তাই যা খেলুম তা উপর থেকে আপনিই নিচের দিকে নেমে গেল। কিন্তু বাস্তবিক ওটা তো নেমে যাওয়ার ব্যাপার নয়, ওটা ঠেলে পাঠানোর ব্যাপার! তাই শুয়ে শুয়েও আমরা খেতে পারি, এমন কি শীর্ষাসনের অবস্থাতে অর্থাৎ মাথা নিচের দিকে এবং পা দুটো উঁচু দিকে রেখেও আমরা খেতে পারি। সকলেই জানে যে ঘোড়া সারস জিরাফ প্রভৃতি লম্বগ্রীব জন্তুরা যখন গলা বাড়িয়ে জল পান করে তখন সেই জলটাও নিচের পাত্র থেকে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে ওদের পাকস্থলীর মধ্যে তারা টেনে নেয়। আমরাও ইচ্ছা করলে শীর্ষাসনের অবস্থাতে ঐ ভাবে জল পান করতে পারি। এই অন্ননালী সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভুল ধারণা আছে। কেউ কেউ এমনও ভাবে বড়ো আকারে একটা ওষুধের বড়ি কিংবা বড়ো গোছের একটা পিণ্ড গিলতে গেলে বুঝি সেটা গলায় আটকে থাকবে। খুব বড়ো জিনিস হলে অবশ্য পেশীগুলি তাকে ঠেলে পাঠাতে সক্ষম হতে না পারে, কিন্তু আমরা যতটা ধারণা ক'রে থাকি, অন্ননালীর ফাঁকটা ততটুকু ছোটো নয় এবং প্রয়োজন হলে সেটা আরো অনেক ফাঁক হতে পারে। অনেকে আবার মনে করে যে, অকস্মাৎ গলার ফুটো বুজে গেছে, যা খাচ্ছি তা বুকে গিয়ে আটকাচ্ছে। এ সমস্তই ভুল ধারণা এবং স্নায়ুবিকার থেকেই সাধারণত এমন ধারণার সৃষ্টি হয়। বস্তুত ক্যান্সার প্রভৃতি কোনো কঠিন রোগ ছাড়া গলার বা অন্ননালীর ফাঁকটা সহজে কখনো বুজে যেতে পারে না। তবে বিশেষ কোনো কারণ থাকলে বুজে যেতে পারে অন্ননালীর শেষ প্রান্তের দরজাটি, যাকে বলা হয় পাকস্থলীর আগমদ্বার। এই দরজা দিয়েই খাদ্যবস্তু অন্ননালীর সীমা পার হয়ে পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে ঢোকে। স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট মাংসপেশী তৈরি বলে এই দরজা প্রয়োজনকালে অবশ্য বন্ধই হয়ে যেতে পারে। খুব কঠিন একটা খাদ্যবস্তু যদি ভালো ক'রে না চিবিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলা যায় তাহ'লে সেটা এইখানে গিয়ে আটকাতে পারে। কোনোরকম তীব্র অ্যাসিড খেয়ে ফেললেও সেটা ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ আটকে থাকে। কিন্তু এমনি বিশেষ অবস্থা ছাড়া সাধারণ-ক্ষেত্রে সহজে ঐ দরজা বন্ধ হয় না।

যাই হোক, খাদ্য পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে পড়লেই তখন থেকে সেখানে আবার এক রকম হজমের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সাধারণত যেমন মনে ক'রে থাকি যে হজম করার আসল ব্যাপারটি বুঝি পাকস্থলীর মধ্যেই সমাধা হয়ে যায়, অর্থাৎ ঐটাই বুঝি হজমের পক্ষে সবচেয়ে প্রধান কিংবা একমাত্র যন্ত্র, সে কথা ঠিক নয়। আর হজমের দোষ হ'লে যে তা পাকস্থলীতেই হয় তাও ঠিক নয়। হজমের কাজ ওর মধ্যে কিছুটা মাত্রই হয়ে থাকে, তার চেয়ে বরং আরো দরকারী কাজ ওর পক্ষে থলির কাজটা, অর্থাৎ আধার স্বরূপ হয়ে সমস্ত খাদ্যটাকে কিছুক্ষণের জন্যে একস্থানে আটকে রেখে তাকে পরবর্তী হজম ক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত ক'রে তার পরে তাকে পরবর্তী হজমস্থানে পাঠিয়ে দেবার কাজটা। হজমের জন্যেই যে পাকস্থলীটার বিশেষ দরকার তা নয়। এমন কি পাকস্থলীটা একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দিলেও মানুষে ওর অভাবে নিচেকার অন্ত্র দিয়ে খাদ্য হজম করে অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। অতএব এই পাকস্থলীর প্রকৃত কাজ হচ্ছে হজমের প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে এগিয়ে দেওয়া মাত্র, তার বেশি আর কিছু নয়, আর দ্বিতীয়ত খাদ্যবস্তুকে ওর ভিতর থেকে উপযুক্ত অবস্থায় একটু একটু ক'রে অন্ত্রের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে থাকা।

অতএব পাকস্থলী হোলো প্রধানত খাদ্য ধারণের একটি থলি কিংবা আধার। এর আকারটা দেখতে অনেকটা আড়াআড়িভাবে লম্বমান ভিস্তিওয়ালার মশকের মতো, উপরের দিকটা তার প্রশস্ত ধরণের মাংসপেশীর দ্বারা মোড়া, আর ভিতরের দিকে আছে ঝিল্লীর স্তর। এর ভিতরকার আয়তন যতখানি বড়ো, সেখানে বিছানো ঐ ঝিল্লীর চাদরটা তার চেয়ে আয়তনে অনেকখানি বড়ো। কাজেই সেটা নানাস্থানে কুঁচকে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। এর কারণ আছে। পেট খালি অবস্থায় থাকলে এই রকমটাই তার চেহারা হয়; কিন্তু সদ্য খাবার পরে পেটটি ভরে উঠলে ওর উপরগাত্রের স্থিতিস্থাপক মাংসপেশীগুলি তখন প্রশস্ত হয়ে পাকস্থলীর আয়তনটা বাড়িয়ে দেয়, এবং সেই সময়ে ভিতরকার ঝিল্লীর চাদরটাও সেই অনুপাতে বিস্তার লাভ করতে পারে। অতএব পাকস্থলীর গহ্বর প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তেও পারে কমতেও পারে। বাইরের থেকে দেখতে ছোটো মনে হলেও এমনিভাবে ফুলে গিয়ে এর মধ্যে একসের থেকে আড়াই সের পর্যন্ত জিনিস আটতে পারে।

পাকস্থলীর ভিতরকার যে ঝিল্লী সেটাই হোলো ওর হজমের কাজের যন্ত্র। এই ঝিল্লীর

গায়ে বিস্তর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি ছড়িয়ে আছে, সংখ্যায় সেগুলি লক্ষাধিক হবে। ঐ গ্রন্থিগুলির কাজ হোলো বিশেষ এক রকমের জারকের ক্ষরণ করতে থাকা। এই জারকের নাম পাকস্থলী-রস, এর মধ্যে পাওয়া যায় প্রধানত তিন রকম সামগ্রী,—(১) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, (২) পেপসিন, (৩) রেনিন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হোলো বিশেষ এক রকমের অম্ল রস, ওটি মুখ থেকে সদ্যাগত ক্ষারগুণযুক্ত খাদ্যকে অম্লগুণযুক্ত ক'রে দেয়। এই অ্যাসিডের অপর কাজ হোলো খাদ্যের সংগে কোনো দোষাক্ত বীজাণু এসে থাকলে সেগুলিকে এটা নষ্ট ক'রে ফেলে। এর আরো একটি প্রধান কাজ, পেপসিন নামক জারকের ক্রিয়াকে এই অ্যাসিড বিশেষ সাহায্য করে। আর ঐ পেপসিন নামক জারকের বিশেষ কাজ হোলো যাবতীয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে এটি কতক পরিমাণে হজম করায়। কতক পরিমাণে বলা হচ্ছে এই জন্যে যে প্রোটিন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ তাকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করা পেপসিনের দ্বারা সাধ্য নয়, কিন্তু এই পেপসিনের ক্রিয়াটি আগের থেকে না হয়ে থাকলে পরে অন্ত্রর মধ্যে গিয়ে সে কাজটি সহজে সমাধা হবে না। এ ছাড়া রেনিন নামক জারকটির বিশেষ কাজ হোলো দুধের ছানা কাটানো। এই রেনিন সকল রকম জন্তুর পাকস্থলী-রসে থাকে না, বিশেষ ক'রে মানুষের বেলাতেই থাকে। দুধ হজম করাবার জন্যেই বিশেষভাবে প্রকৃতি এর ব্যবস্থা করেছে মনে হয়।

পাকস্থলী-রস কি সব সময়েই ক্ষরিত হচ্ছে? তা নয়। খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকলে কিংবা ঢোকবার সম্ভাবনামাত্র হলেই তখন থেকে এটি ক্ষরিত হতে থাকে। এমন কি দূর থেকে খাদ্যের চেহারা দেখলে কিংবা খাদ্যের আঘ্রাণ পেলেও অমনি পাকস্থলীর মধ্যে এই রসের ক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। পেটের ভিতরকার এত খবর আমরা জানলুম কেমন ক'রে? বিখ্যাত একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কুকুরের পেটে অপারেশনের দ্বারা এটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। কুকুরের পাকস্থলীর খানিকটা অংশ কেটে তিনি বাইরের দিকে ফাঁক ক'রে রেখেছিলেন। তাতেই তিনি দেখলেন যে ঐ কুকুরকে মাংসখণ্ড দেখালেই সেই ফাঁক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাকস্থলী-রস ক্ষরিত হচ্ছে। খাবার জিনিসের আঘ্রাণে বা আস্বাদনেও ঠিক তাই হচ্ছে। আবার কুকুরকে না জানিয়ে যদি খাবার জিনিস ঐ ফাঁক দিয়ে পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতেও তাই হয়। আবার এদিকে দূর থেকে খাবার আসছে দেখতে বা জানতে পারলেও তাই হতে থাকে। [illegible] [illegible] এ সমস্তই হয় নার্ভের ক্রিয়াতে। আর এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদেরও পক্ষে তাই হয় এবং এখানে মনের সংগে তার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আমাদের পেটে খিদে থাকলে রান্নাটি ভালো হ'লে, এবং মনের অবস্থা সন্তুষ্ট হলেই এই নার্ভের ক্রিয়াটি সহজে উত্তেজিত হয়, সুতরাং পাকস্থলী-রসের ক্ষরণও তাতে ভালো হয়। যার পক্ষে যেটি মুখরোচক খাদ্য তার সেই খাদ্য খেলেই সেখানে এই রসের ক্ষরণ এবং ক্রিয়া সব চেয়ে ভালো হয়, এবং এর কাজটা ভালো ভাবে হতে পারলেই এর পরবর্তী হজমের কাজটাও খুব ভালোভাবে হতে পারে। আর পেটে খিদে থাকলেও যদি রান্না ভালো না হয়, যদি খাবার সময় কোনো বিঘ্ন দেখা দেয় আর যদি শরীরটা থাকে অবসন্ন, তাতেও এই রসের ক্ষরণ হয় না। মন কাতর বা উদ্বিগ্ন থাকলেও এর ক্ষরণ উত্তমরূপে হয় না। এই কারণেই আমাদের খাবার সময় সব কিছু দুর্ভাবনা ছেড়ে এবং অন্যমনস্কতা ছেড়ে মনকে খুশি রাখতে বলা হয়, যাতে পাকস্থলীর ভিতরকার ঐ কাজটা ভালোভাবে হতে পারে। খাবার সময় মনটি যাতে প্রফুল্ল থাকে, পছন্দসই খাদ্য খেয়ে যাতে মনের তৃপ্তি হয় খেটেখুটে এসেই যাতে খেতে বসা না হয়, বিরক্ত হয়ে বা রেগে খাওয়া না হয়, সেই দিকে তাই বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, মনকে বাদ দিয়ে কেবল যন্ত্রের মতো খেয়ে গেলেই চলবে না। মনুষ্য সমাজে খাবার সময়টিতে তাই মনের স্ফূর্তিতে থাকা, নানারকম গল্পগুজব করা, গানবাজনা শোনা প্রভৃতি নানা রকমের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে প্রায়ই লোকে ডিসপেপসিয়াতে ভোগে, সাধারণ খাদ্যও তাদের ভালো ভাবে হজম হয় না। এই ডিসপেপসিয়া জাতীয় রোগের কারণ আছে অনেক প্রকার, কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে মানসিক কারণটাই তার মধ্যে প্রধান। মনের ক্লিষ্টতা ও উদ্বিগ্নতা থেকেই সে কারণের সৃষ্টি। হজম ক্রিয়ার সংগে মনের যে খুবই একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং মনের দোষ দূর হয়ে গেলেই হজমের দোষও দূর হয়ে যায়। এ স্থলে এইটুকু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে হজমের কাজটা স্থূলে রাসায়নিক যন্ত্রক্রিয়া হলেও মনের দিকের খানিকটা সাহায্য তার পক্ষে বিশেষ দরকার।

পূর্বে আমরা খাদ্যনালীর ক্রমসংকোচন ক্রিয়ার কথা বলেছি। পাকস্থলীতেও সেই রকমের সংকোচন ক্রিয়া হয়, তবে এখানে সেই ক্রিয়াটি হয়ে থাকে পাকস্থলীর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে তার কারণ পাকস্থলীর আগমদ্বারটি রয়েছে বাঁ দিকে, আর নিগমদ্বারে রয়েছে ডান দিকে। পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু গিয়ে পৌছবার কিছুক্ষণ পর থেকেই তার মধ্যে এই সংকোচনের ঢেউ ওঠা শুরু হয়, এবং অনবরত একটির পর একটি এমনি ঢেউ উঠতে থাকে। কিন্তু তখন নিগমদ্বারটি থাকে রুদ্ধ। কাজেই এই সংকোচন ক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তুগুলি ওলট-পালোট হয়ে ওর জারকরসের সংগে ওতপ্রোত-ভাবে মিশতে থাকে। কিন্তু খাদ্যবস্তুটি যদি বিস্বাদ কিংবা আপত্তিজনক হয় তা হ'লে পাকস্থলীর মধ্যে এই সংকোচন ক্রিয়া হতে থাকে উল্টো দিকে, অর্থাৎ পাকস্থলী সেটাকে বাইরের দিকে বের ক'রে দিতে চায়; কাজেই সে জিনিসটা তখন বমি হয়ে যায়। খুব বেশি পরিমাণে খেলেও অনেক সময় তাই হয়, পাকস্থলী তাকে রাখতে চায় না। যাই হোক, স্বাভাবিক সংকোচনের দ্বারা এই মিশ্রণ ও ওলটপালোট হতে থাকার ফলে খাদ্যবস্তুর হজমের কাজটা খানিক এগিয়ে যায় এবং সেটা অপেক্ষাকৃত তরল ভাবাপন্ন পাকমণ্ডের অবস্থায় পরিণত হয়। তার কারণ ইতিমধ্যে পাকস্থলীর ভিতরে লালারসের টায়ালিনের ক্রিয়াতে কার্বো-হাইড্রেট জাতীয় খাদ্যও খানিকটা হজম হয়ে এসেছে, এবং পাকস্থলী-রসের ক্রিয়াতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও খানিকটা গলতে শুরু হয়েছে। এই ভাবে পাকস্থলীর কাজটা যখন কতক সমাধা হয়েছে তখন ওর নিগমদ্বারের মুখটি একটু খুলে যায়, এবং সেখান দিয়ে সেই পাকমণ্ড অন্ত্রের মধ্যে কতক কতক ঢুকে পড়ে।

এই নিগমদ্বারের খোলা-বোজার প্রক্রিয়াটি একটু অদ্ভুত রকমের। এর মুখটি সাধারণত যথেষ্ট আঁট হয়ে বুজে থাকে, সেখান দিয়ে তখন কিছুমাত্র গলে যাবার উপায় নেই। কেবল আংশিকভাবে হজম করা খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর সংকোচন ক্রিয়ার দ্বারা ওর মুখের কাছে গিয়ে ঠেলতে থাকলেই তখন দরজার মুখটি কিছুক্ষণের জন্যে একবার খুলে যায়। কিন্তু কিছু পমিাণ খাদ্য যেমনি অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে, অমনি তার মুখটি আবার আগের মতো বুজে যায়। অর্থাৎ এককালীন অনেকখানি খাদ্যকে সে অন্ত্রের মধ্যে ঢুকতে দিতে চায় না। যদিও এই ব্যাপারটা আমরা চেতনার দ্বারা জানতেই পারিনা, কিন্তু এটি হতে থাকে অচেতন নার্ভের ক্রিয়াতে। প্রায় প্রতি কুড়ি সেকেন্ড অন্তর একবার ক'রে পাকস্থলীর সংকোচনের ঢেউ ওঠে, কিন্তু তার ধাক্কায় প্রত্যেকবারেই যে নিগমদ্বারটি খুলে যাবে তা নয়, কোনো বারে হয়তো খোলে, কোনো বারে খোলে না। সেটা নির্ভর করে খাদ্য কতখানি তরল হয়ে এসেছে তার উপর। তেল ঘি চর্বি প্রভৃতি মিশ্রিত মাংসাদি গুরুপাক খাদ্য খেলে সেটা পাকস্থলীর দ্বারা ঐ ভাবে তরলীকৃত হতে অনেক বিলম্বও হয়, কাজেই নিগমদ্বারও তখন সেই খাদ্যকে অন্ত্রের মধ্যে সহজে ঢুকতে দিতে চায় না। এই কারণেই

গুরুপাক খাদ্য খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটের মধ্যে একটা ভার বোধ হতে থাকে, অর্থাৎ পাকস্থলীটা তখনো পর্যন্ত খালি হয় নি। কিন্তু লঘুপাক খাদ্য পেটভরে খেলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট আবার খালি হয়ে যায়, অর্থাৎ অল্পক্ষণের মধ্যেই নিগমদ্বারটি খুলে যাওয়াতে পাকস্থলী একেবারে খালি হয়ে গেছে। সুতরাং কতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী ভরা থাকবে সেটা নির্ভর করে খাদ্যের গুরুত্বের উপর। পেটভরা খাদ্য খেলে সেটা পাকস্থলীর মধ্যে সাধারণত আড়াই ঘণ্টা থেকে ছয় ঘণ্টাকাল পর্যন্ত থেকে যায়। কারণ বারে বারে একটু একটু ক'রে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে সমস্ত খাদ্যটার অনেকটাই সময় লাগে। আবার যাদের ডিস্‌পেপসিয়া রোগ হয়েছে তাদের পক্ষে এর চেয়েও হয়তো আরো বেশি সময় লেগে যায়। সেটা হয় প্রধানত নার্ভের দোষে। ওখানকার নার্ভগুলি বিগড়ে থাকাতে নিগমদ্বার সহজে খুলতেই চায় না। এমনও হতে পারে যে লঘুপাক খাদ্য খেয়েও আট দশ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত পেটটি ভার হয়ে রইল, হয়তো তখনো পর্যন্ত সদ্য খাওয়া হয়েছে এই ভাবে খাদ্যের ঢেকুর উঠতে লাগলো, অর্থাৎ নিগম দ্বারটি তখনো পর্যন্ত খোলেনি, খাদ্যগুলি পাকস্থলীর মধ্যেই রয়ে গেছে। নিগমদ্বার না খুলে গেলে কোনো খাদ্যেরই পাকস্থলীর আশ্রয় ত্যাগ করবার উপায় নেই। জল বা ঐ জাতীয় পানীয়ের পক্ষে কিন্তু এই নিয়ম নয়। খালি পেটেই হোক কিংবা ভরা পেটেই হোক, জল প্রভৃতি পান করলেই সেটি তখনই নিগমদ্বার পার হয়ে অন্ত্রের মধ্যে নেমে যাবে, ঐ দরজা তাকে কখনো আটকাবে না। নিগমদ্বারের এত রকমের কড়াকড়ি কেবল কঠিন খাদ্যেরই বেলাতে। ডিস্‌পেপসিয়াতে আবার এই কারণে পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্য গেলেই অতিরিক্ত মাত্রায় অম্লরস ক্ষরিত হতে থাকে, তাকেই আমরা বলি "অম্বল হওয়া।" সোডা প্রভৃতি ক্ষারগুণী কিছু জিনিস খেলেই সেই অম্লটুকু নষ্ট হয়ে যায়।

অন্ত্রসমূহের কাজ

পাকস্থলীর নিগমদ্বার থেকে শুরু ক'রে মলদ্বারে গিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত পৌষ্টিক নালীর সমস্ত অংশটাকেই মোটের উপর অন্ত্র বলা হয়। কিন্তু এই সমগ্র অন্ত্রটা দুই ভাগে ভাগ করা। ওর প্রথম দিকের অংশটাকে বলা হয় ক্ষুদ্র অন্ত্র, আর শেষের দিকেরটাকে বলা হয় বৃহৎ অন্ত্র। কিন্তু নামে ক্ষুদ্র হলেও ক্ষুদ্র-অন্ত্রটি আকারে কোনোমতেই ক্ষুদ্র নয়, দৈর্ঘ্যে সেটি প্রায় একুশ ফুট লম্বা। নলটা সরু বলেই তার ক্ষুদ্র-অন্ত্র নাম দেওয়া হয়েছে। এতখানি লম্বা নলটি পেটের ভিতরকার অল্প আয়তনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।

এই ক্ষুদ্র-অন্ত্রই হোলো আমাদের আসল হজমশালা, বিশেষত ওর গোড়ার অংশটা। হজমের কাজটি অন্য কিছুই নয়, আসলে ওটি রাসায়নিক উপায়ে ভাঙাগড়ার কাজ, অর্থাৎ বাইরের থেকে আমদানি বিবিধ খাদ্যবস্তুগুলিকে নানারকম জারক রসের দ্বারা ভেঙে গড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে আপন ঘরের জিনিসের মতো ক'রে নেবার কাজ।

এই ক্ষুদ্র-অন্ত্রটিকে তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশটির নাম ডুওডিনম, দ্বিতীয় অংশের নাম জেজুনম, তৃতীয় অংশের নাম ইলিয়ম। এর মধ্যে ডুওডিনমের অংশটাই হজমের কাজের দিক দিয়ে সব চেয়ে প্রধান। তার কারণ নানা রকমের জারকরস এইখানে এসে জমা হয় আর সেগুলির দ্বারা সব রকমের খাদ্যবস্তুর সম্পূর্ণ রকমে হজম হয়ে যাওয়া এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়।

পাকস্থলীর নিগমদ্বার থেকে ক্ষুদ্র-অন্ত্রের দশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা অংশটির নামই ডুওডিনম। ঐ নিগম দ্বার থেকে প্রায় চার ইঞ্চি নিচে একটি রসবাহী নালী বাইরের থেকে এসে ওর মধ্যে ঢুকেছে। এর নাম সম্মিলিত পিত্ত নালী, তার কারণ লিভার বা যকৃতের ভিতর থেকে একটি নল এবং প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের ভিতর থেকে একটি নল বেরিয়ে দুটিতে মিলে এই সম্মিলিত নলটির সৃষ্টি করেছে। এই নলের ভিতর দিয়ে দুই জায়গার দুই রকমের জারক রস গড়িয়ে আসে, এবং সেটি আসে ঠিক প্রয়োজনের সময়। কিন্তু দুই রকমের রস যে একসঙ্গে মিশে আসে তা নয়। ডুওডিনমের মধ্যে যে প্রক্রিয়াটা হয় সেটা এই রকম। খাদ্যের পাকমণ্ড ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকলেই ওর ভিতরকার ঝিল্লীগাত্রের নিজস্ব গ্রন্থিগুলি থেকে এক রকমের আন্ত্রিক-রস ক্ষরিত হতে থাকে। তার পরে এই খবরটি লিভার বা যকৃতে গিয়ে পৌঁছলেই সেখান থেকে পিত্তরস নির্গত হতে শুরু হয়, সেটা পূর্বোক্ত নল দিয়ে ডুওডিনমের মধ্যে গড়িয়ে এসে হাজির হয়। তার পরে সেই আন্ত্রিক-রস ও পিত্তরসে মিলে অগ্ন্যাশয়ের কাছে খবর অর্থাৎ উত্তেজনা পাঠায়, তখন সেখান থেকে অগ্ন্যাশয়-রসটিও ওর মধ্যে এসে হাজির হয়। এই তিনটি রসে মিলে তখন পরিপাক ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে।

খাদ্যের মধ্যে প্রধানত তিন জাতেরই জিনিস থাকে,—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট। তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য আগেই খানিকটা হজম হয়ে এসেছে মুখের লালারসের টায়ালিনের দ্বারা, সেই টায়ালিন পাকস্থলীর মধ্যে এসেও ওর উপর কিছু ক্রিয়া করেছে। বাকি কাজটা ডুওডিনমে এসে সম্পূর্ণ হয় ওর নিজস্ব আন্ত্রিক-রস এবং অগ্ন্যাশয় রসের ভিতরকার অ্যামাইলেজ নামক জারকের দ্বারা। বাকি কাজ মানে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যমাত্রই ভেঙে চুরে শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও পাকস্থলীর মধ্যে ওর পেপসিন জারকের দ্বারা খানিকটা হজম হয়ে এসেছে। ডুওডিনমে এসে সেটা আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন জারকে এবং তার সঙ্গে অগ্ন্যাশয়-রসের ট্রিপ্‌সিন জারকের দ্বারা হজম হয়ে যায়, তার মানে প্রোটিন খাদ্যমাত্রই শেষ পর্যন্ত ভেঙে চুরে অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যায়। আর তৃতীয়ত ফ্যাট হজমের কথা। প্রথমে পাকস্থলীতে গিয়ে এই জাতীয় খাদ্য লাইপেজ নামক জারকের দ্বারা সামান্য কিছু বিশ্লিষ্ট হয়। তারপরে এই ডুওডিনমে গিয়ে প্রধানত পিত্তের দ্বারা এবং অগ্ন্যাশয়-রসের লাইপেজ জারকের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা অবদ্রবে পরিণত হয়। এই ভাবে এখানে তিনরকম খাদ্যের তিনরকম পরিণতি ঘটে।

ডুওডিনমে এই খাদ্য হজমের কথাটা হয়তো একটু জটিল হয়ে পড়লো। বিভিন্ন রকমের জারক রসগুলিকে ধরে একে একে তাদের কাজ-গুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। (১) মুখের লালারসের কি কাজ? কার্বোহাইড্রেট খাদ্যকে কিছু হজম করিয়ে তাকে গ্লুকোজে পরিণত করবার কাজটা খানিক এগিয়ে দেয়। (২) পাকস্থলী-রসের কোন কাজ? ওর অম্লরসটা খাদ্যকে অম্লগুণী করে, ওর পেপসিন প্রোটিন-খাদ্যকে কিছু হজম করায়, ওর রেনিন কতকাংশে দুধ হজম করায়, ওর অ্যামাইলেজ কতকাংশে ফ্যাট হজম করায়। (৩) আন্ত্রিক-রসের কি কাজ? ওর ভিতরকার সিক্রিটিন নামক জিনিসটা অগ্ন্যাশয়ে গিয়ে তাকে উত্তেজনা দান করে, আর ওর ইরেপ্‌সিন জারক প্রোটিন-খাদ্যকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। (৪) অগ্ন্যাশয়-রসের কি কাজ? ওর কাজটা তিন রকম খাদ্যের উপরেই হয়, অর্থাৎ ওর অ্যামাইলেজ হজম করায় কার্বো-হাইড্রেটকে ওর ট্রিপ্‌সিন হজম করায় প্রোটিনকে এবং ওর লাইপেজ হজম করায় ঘি তেল প্রভৃতি ফ্যাটকে। (৫) পিত্তের কি কাজ? এর প্রধান কাজ অগ্ন্যাশয়-রসকে সাহায্য করা এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্যকে হজম করানো।

এর পরে কি হয়? খাদ্যগুলি ঐভাবে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ হজম প্রক্রিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে ডুওডিনম থেকে আরো নিচে যখন নেমে যায়, তখন সেখান থেকে অর্থাৎ জেজুনম ও ইলিয়মের ভিতর থেকে সেখানকার ঝিল্লীগাত্র দিয়ে সেগুলিকে মোক্ষণ করা অর্থাৎ

রক্তের মধ্যে শ্বষে নেওয়ার প্রক্রিয়া শ্বরু হয়। এই শোষণের কাজটা ওখানকার অন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে প্রধান কাজ। এই কাজটি করবার জন্যে অনেকখানি বিস্তীর্ণ ঝিল্লীযন্ত্রের দরকার, তাই ওখানকার ঝিল্লীর পর্দা আগাগোড়া কুঁচকে কুঁচকে অল্প জায়গার মধ্যে ওর অনেকখানি বিস্তৃতির সংকুলান ক'রে নিয়েছে। এই সমস্ত কোঁচকানো ঝিল্লীগাত্রে রয়েছে কোটি কোটি অতি সূক্ষ্ম ঘাসের শিষের মতো সরু সরু শ্বঁয়া, এগ্বলিকে বলে ভিলাই। এইগ্বলি হোলো অন্ত্রের বিশিষ্ট রকমের শোষণ যন্ত্র। এরাই পিচকারির দ্বারা জল টেনে নেওয়ার মতো ক'রে তরল খাদ্যসারগ্বলিকে টেনে বা শ্বষে নেয়। এই শোষণ ক্রিয়াটি আবার দ্বইরকমভাবে হয়ে থাকে। কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন খাদ্যের তরলসারগ্বলি এরা শ্বষে নিয়ে কাছাকাছি যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তশিরা রয়েছে তার মধ্যেই সেগ্বলিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফ্যাটের বেলা তা হয় না। তার বেলা যেটা অবদ্রবের মতো জিনিস দাঁড়ায় সেটাকে রসনালী নামে অন্য একরকমের শিরার মধ্যে নিয়ে ফেলে, তারপরে সেটা স্বতন্ত্র রকমের মোটা রসনালী দিয়ে শেষ পর্যন্ত রক্তের সঙ্গে গিয়ে মেশে।

এইভাবে সকল রকমের খাদ্য হজম হয়ে গিয়ে তার অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে থাকে সেটা ক্ষুদ্র-অন্ত্র পার হয়ে বৃহৎ-অন্ত্রে গিয়ে প্রবেশ করে।

গিলবার্ট কীথ চেস্টরটন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মানুষকে বরং কাঁদানোই সহজ, হাসানো নয়। সহজ তো নয়ই, অত্যন্ত কঠিন। পাঠককে হাসানো আরও কঠিন, বিশেষ তিনি যদি আবার রুচিশীল হন। লেখককেই তখন চোখের জলে ভাসতে হয়।

এ বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। যে পথ সহজায়ত —কাঁদানোর পথ—সেই পথেই মোক্ষলাভ। অন্তত সাহিত্যের মোক্ষ। সময়ের নিদারুণ প্রহার সহ্য করেও যে-কখানা গ্রন্থ এখনো টিঁকে আছে, টিঁকে থেকে ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদালাভ করেছে, মনে মনে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা যাক্। দেখা যাবে, তার সবক'খানাই ট্র্যাজেডী। প্রায় সর্বত্রই তার কাহিনীগত পরিণতি শোকাবহ। সে-শোকের ওপর কখনো বা একটা মহত্বের প্রলেপ পড়েছে, এই পর্যন্ত।

ট্র্যাজেডী টিঁকে থাকে, সরসসাহিত্য থাকে না। অন্তত তার নজীর নেই। তবে কি আমরা তাকে ভালবাসিনা? বাসি, কিন্তু তাকে মনে রাখি না। কী এর কারণ আপাতত সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই,—এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সরসসাহিত্যের যাঁরা কারবারী, পাঠকের সেই অনিবার্য বিস্মরণের ঝুঁকিকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁদের সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। পাঠককে তাঁরা ভালবাসেন, তার মুখে তাঁরা হাসি ফুটিয়ে তুলতে চান। পাঠক তাঁদের মনে রাখবে না, এ কথা জেনেও।

এ কথা জানবার পর আর সরসসাহিত্য-রচনায় আগ্রহ না জন্মানই স্বাভাবিক; এ পথে যাঁরা অগ্রসর হন স্বভাবতই সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। এ যুগের ইংল্যাণ্ডে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, চেস্টরটন তাঁদের সর্বাগ্রগণ্য।

চেস্টরটনের পুরো নাম গিলবার্ট কীথ চেস্টরটন; সংক্ষেপে জি-কে-সি। এই সংক্ষিপ্ত নামটিকেই আমরা চিনি, জানি, ভালবাসি। প্রস্তাবনায় এঁর জীবনবৃত্তান্তটুকু সেরে নেওয়া যাক্।

এঁর জন্ম লণ্ডনে, ১৮৭৪ সালে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। আরো দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—সমরসেট মম্ এবং মরিস ব্যেরিং—এই একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন। চেস্টরটনের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না, খারাপ ছেলে বলে দুর্নাম অর্জনের জন্যে বরং অসাধারণ উৎসাহ ছিল। কিন্তু, নেহাৎই দুর্ভাগ্য তাঁর,—দুদিন বাদেই মাস্টার মশায়রা সব রায় দিয়ে বসলেন, 'না, তেমন তো বদ্ ছেলে নও, লেখাটেখায় হাত রয়েছে দেখছি। চেষ্টা করো বহু, চেষ্টা করো; কিছুই বলা যায় না, সত্যিই হয়তো একদিন লিখতে পারবে।' উৎসাহ পেলেন চেস্টরটন, বলাই বাহুল্য। এর পরে আর তিনি সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে টিঁকে থাকেন নি। তখন তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, সাহিত্যকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। গেলেন স্লেড্ স্কুলে—নাঃ, ভালো করে পড়াশুনো করতে হবে। ঐ সংকল্পই সার, সেখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পড়াশুনো করা দরকার; দরকারই তো,—কে তা অস্বীকার করছে। কিন্তু আড্ডা ছেড়ে পড়াশুনো! নৈব নৈব চ। কিছুই বলা যায় না, এমনি আড্ডাবাজ মানুষ চেস্টরটন—শুধু আড্ডা দিয়েই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতেন। কপাল ভালো ইংরাজী সাহিত্যের, আর্নেস্ট্ হডার উইলিয়ম্‌স্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। উইলিয়ম্‌স্ ঝানু জহুরী; বুঝলেন, এ ছেলের মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। আপাতত তা গুপ্ত,



জি কে চেস্টরটন

সুপ্ত। একদিন তা নির্মোকমুক্ত হতে পারে, জেগে উঠতে পারে। শুধু উৎসাহ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তাড়া দিয়ে তাঁকে লেখাতে শুরু করলেন। তাঁরই অনুরোধে সমালোচনা-সাহিত্যে হাত লাগালেন চেস্টরটন, সাময়িক পত্রপত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার ভার নিলেন। সাহিত্যজীবনের এইখানেই তাঁর শুরু।

অতঃপর, যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, প্রচুর গল্প উপন্যাস প্রবন্ধকাব্য তিনি রচনা করেছেন এবং পুস্তক সমালোচনায় তাঁর যে সাহিত্য জীবনের উপক্রমনিকা, অবিলম্বে তাকে প্রসিদ্ধির সিংহদ্বারে পেঁছে দিতেও তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়নি। বরঞ্চ বলা যায়, প্রসিদ্ধ হবার জন্যে তাঁর আদৌ মাথাব্যথা ছিল না। হেসেখেলে, গালগল্প করে, আর আড্ডা দিয়েই তিনি জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন,—খ্যাতির দেবতার যে 'স্নেহ-সুকোমল কটাক্ষ' তাঁর ওপর বর্ষিত হলো—সম্পূর্ণই তা অযাচিত।

জি-কে-সির সাহিত্য-প্রতিভা প্রারম্ভে অগ্রসর হয়েছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে, সে কথা বলেছি। সে প্রতিভা সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল ১৯০৪ সালে তাঁর 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল্' বেরোবার পর। তাঁর বয়স তখন তিরিশ। 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল' তাঁর উপন্যাস, উপন্যাসই যদি বলতে হয়। কেননা, প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী উপন্যাস বলতে যা বুঝি আমরা, তার সঙ্গে এর আশমানজমিন ফারাক্। এ একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস। প্রথমটায় হক্চকিয়ে গেল সবাই, তারপর একটু একটু করে চেখে দেখলো। বিস্ময়ের জের না কাটতেই বেরোলো 'দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেডস্।' অনতিদীর্ঘ ছ'টি কাহিনীর একত্রিত উপন্যাসরূপ। এর প্লটগুলি সব অদ্ভুত, উদ্ভট। পরিবেশ সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ। ভালো কি মন্দ, উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, সে সব বিচারের তখন সময় নেই পাঠকদের; তারা শুধু বুঝলো, এমন জিনিস আর আগে তাদের পাতে পড়ে নি। সুতরাং, সব দেশেই পাঠকদের যা রেওয়াজ, চিৎকার ওঠালো তারা—এই জিনিসই চাই এবং আরো চাই,—আরো।

আরো চাই? বেশতো, খুব ভালো কথা। কিন্তু দেবে কে? চেস্টরটন? তিনি তখন তাঁর আড্ডায় মশগুল। আড্ডার কাছে সাহিত্য! সুখের কথা এই যে, খ্যাতির সম্পর্কে লেখকরা যতোই না কেন উদাসীন হোন, ব্যবসায়ের সম্পর্কে প্রকাশকেরা তার অর্ধেক পরিমাণও উদাসীন নন। তাঁরা বুঝলেন, চেস্টরটনকে দিয়ে বই লিখিয়ে নেওয়া দরকার, তাঁদের নিজেদেরই স্বার্থে এবং 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল'-এর পরে যতো বই লিখেছেন চেস্টরটন—প্রায় সর্বত্রই তার মূলে প্রকাশদের এই নিরন্তর তাগিদ বর্তমান। চেস্টরটনের কাছে সুবিধে হতো না, তাই চেস্টরটন-গৃহিনীর কাছে তাঁরা বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন,—স্বামীকে যেন তিনি আড্ডায় ভিড়তে না দেন, তাঁকে যেন তিনি তালাবন্ধ করে রাখেন। তা তিনি রাখতেনও; আর সেই নিরুপায় বন্দীদশাতেই চেস্টরটন তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেছেন। একের পর এক তাঁর বই বেরোতে লাগলো; কখনো খুবই দ্রুত—প্রায় পিঠোপিঠি, কখনোবা অনতিদীর্ঘকালের ব্যবধানে। সে বই, আগেই বলেছি, নানান ধরণের; —উপন্যাস-গল্প-নাটক-কবিতা-জীবনী-সমালোচনা। প্রকাশকালের পারম্পর্য অনুসারে তাঁর বিখ্যাত কয়েকখানি বই-এর নাম করছি,—চার্লস্ ডিকেন্স (জীবনী, ১৯০৬), দি ম্যান হু ওয়াজ থার্সডে (উপন্যাস, ১৯০৮), ম্যাজিক (নাটক, ১৯১৩), দি ফ্লাইং ইন্ (উপন্যাস, ১৯১৪), সেন্ট ফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি (জীবনী, ১৯২৩), ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ্ (ছোট গল্প, ১৯২৯)। এর মধ্যে তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থ 'ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ' অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে জি কে চেস্টরটনের রচনা 'আজব জীবিকা' (দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেডস্) ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক, দেশ

ইংল্যান্ডের পাঠক সমাজকে উত্তুঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া হাসির তুফানে ভাসিয়েছেন চেস্টরটন, কিন্তু তাঁর এই নির্বারিত রসসৃষ্টি-প্রবণতা নেহাৎই অকারণ নয়। তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবনবোধেরই শিল্পায়ন, সাহিত্য পরিবেশণের অন্তরালে তাঁর সেই জীবন-বোধকেই সর্বত্র তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন।

কথাটা একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। চেস্টারটনের সাহিত্য-সাধনার যখন প্রাথমিক পর্যায়, ইংল্যান্ডের ভাবনা-মানসের ক্ষেত্রে তখন এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরই সমসাময়িক তিনজন মহারথী—শ, গল্স্‌ও-অর্দী এবং ওয়েলস্—তার হোতা। তিন-জনেই তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন; প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে, বলাই বাহুল্য। শ' তাঁর নাটকে পর্যুষিত বিধি-বিন্যাসের প্রতি নির্মম ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করছেন, গল্স্‌ওঅর্দী'র রচনায় শোনা যাচ্ছে তার অন্তিম নাভিশ্বাস। জাতীয় জীবনের আচার-অন্ধত্বের এ'রা দুজনেই বড়ো ত সমালোচক, কোনও অবস্থাতেই তাকে এ ক্ষমা করেন নি। সর্বপ্রকার গোঁড়ামী বিসর্জন দিয়ে এ'রা নিজেদের দেশ, দেশে বিধিব্যবস্থা, তার মূল্যবোধকে বিচার ক দেখেছেন; তীব্র কশাঘাতে জর্জর করেছে তাকে। আর, তারই একপাশে দাঁড়িয়ে এই জি ওয়েলস্ তখন স্বপ্ন দেখছেন—বিজ্ঞান-সাধনার কল্যাণস্পর্শেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে।

বিচারবুদ্ধির এই পরিবর্তনের মুহূর্তেই চেস্টরটনের আবির্ভাব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিরুদ্ধে তিনি সামাজিক ঐতিহ্যপরায়ণতার স্বপক্ষে অবতীর্ণ হলেন। এ কাজে তিনি একজন সহকর্মীও খুঁজে পেলেন অবিলম্বে, হিলায়ার বেলক্। দুজনেরই ধর্মবিশ্বাস একই খাতে প্রবাহিত, দুজনেই বিশ্বাস করতেন—সদ্যভূমিষ্ঠ যন্ত্রযুগই সমস্ত অনিষ্টের মূল, ঐতিহ্য এবং মানবিক শুভবুদ্ধির ওপর আস্থাস্থাপন করলেই এ দুর্যোগের অবসান হবে।

চেস্টরটন এবং বেলক্—একমত হয়েও এ'রা একপথ নন। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এ'রা এক, পন্থার ক্ষেত্রে পৃথক। তাই এ'দের সাহিত্য-কর্মে সর্বত্র একই সুর ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্র আলাদা। আঘাতের উত্তরে শুধু উলঙ্গ আঘাতই হেনেছেন বেলক্, চেস্টরটন তাকে সরসতার ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছেন। গভীর সুরে তিনি গভীর কথা বলেননি বটে, কিন্তু সুরটা হাল্কা বলেই যে তাঁর কথাটাও অগভীর—একথা মনে করাও সম্পূর্ণ ভুল। বিজ্ঞানের বিকলাঙ্গ সাধনাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, জীবনের সহজ উন্মেষে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন, ক্যাথলিক ধর্মবন্ধনে তিনি প্রত্যয় জ্ঞাপন করেছেন, বারংবার তিনি ঘোষণা করেছেন—অভিজ্ঞতাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আর এই বিদ্রূপ, এই আনন্দ, এই প্রত্যয়, এই সত্য ঘোষণা—এর সব কিছুরই মধ্য দিয়েই তাঁর সরস পরিহাসচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

কিঞ্চিদধিক একযুগমাত্র অতিবাহিত হয়েছে চেস্টরটনের মৃত্যুর পর, ইতিমধ্যেই তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। তাঁর প্রতিভার সম্যক ও যথার্থ সমাদর, এ দেশে অন্তত, এখনো হয়নি। অথচ তা হওয়া দরকার। পরিচিত হওয়া প্রয়োজন তাঁর শিল্পীমানসের সঙ্গে। আর কিছুর জন্যে না হোক—অন্তত এইজন্যে যে, একালের ইংল্যান্ডে তিনিই বোধ হয় একমাত্র সার্থক শিল্পী—শ এবং গল্স্‌ও-অর্দী'র সমসাময়িক হয়েও যিনি তাঁর চিন্তা এবং জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩৪

তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ি। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় কলিকাতায় দুর্দান্ত গরম পড়েছে। মধ্যাহ্ন কাল। ধূলি-পাংশু উত্তপ্ত আকাশ অপ্রসন্ন খরনেত্রে কলিকাতা মহানগরীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে আগুনের হল্কা। রাজপথে পথচারীর সংখ্যা বিরল। এমন কি, গাড়ি-ঘোড়াও বেশী চলছে না।

আমাদের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি চল্‌ছে। পথের দিকের সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিয়ে নীচেকার বৈঠকখানায় নিদ্রা-জাগরণের মাঝা-মাঝি অবস্থায় কাটাচ্ছি, এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কড়া নাড়ার উৎসাহ দেখে বুঝলাম আগন্তুক আর এক মুহূর্তও বাইরের মার্তণ্ডের ক্রোধাগ্নির মধ্যে অবস্থান করতে প্রস্তুত নয়। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললাম। আরক্ত-স্মিতমুখে প্রবেশ করলেন সৌরেন,—অর্থাৎ পরবর্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ছাতা একটা আছে বটে, কিন্তু মাইলখানেক পথ উত্তপ্ত বায়ুর মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার জন্য সমস্ত অঙ্গে ঝলসানির একটা সুস্পষ্ট রুক্ষতা।

অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুকে পেয়ে খুসি নিশ্চয়ই হলাম,—কিন্তু বিস্মিত হলাম তার চতুর্গুণ। বৈঠকখানা ঘরে এসে একটা জানালা খুলে দিয়ে বসে বললাম, "ব্যাপার কি বলত সৌরেন? এই ভীষণ রুদ্দুরে—"

কথা শেষ না করতে দিয়ে সৌরেন বললে, "তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কাজ আছে উপেন।"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বল ত?"

"আমাকে গান শেখাতে হবে!"

প্রস্তাব শুনে ত' চক্ষুস্থির! গান শেখাতে হবে, সে অবশ্য এমন-কিছু অন্যায় কথা নয়,—কিন্তু আরম্ভটা তাই বলে এই ভয়াবহ লগ্নে? বল্‌লাম, "হারমোনিয়ম্‌ কিনেছ না-কি?"

"হারমোনিয়ম্‌ কি হবে?"

কথাটা সৌরেন এমন একটু বিস্ময়চকিত সুরে বললে যে, খানিকটা অপ্রতিভ বনে যেতে হল। বললাম, "হারমোনিয়মের সাহায্য না নিয়ে গান গাইতে পারলে অবশ্য খুবই ভাল হয়, তবে আরম্ভের দিকে সামান্য একটু সুরের আশ্রয় নেওয়াও মন্দ নয়।"

আমার সারগর্ভ উপদেশে সৌরেন বিন্দু-মাত্র কর্ণপাত করলে বলে মনে হল না, অধীর-ভাবে বল্‌লে, "না-ও, আরম্ভ কর। শেখাও।"

আগ্রহ প্রশংসনীয়; কিন্তু 'সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্‌' নীতি অনুযায়ী খানিকটা যেন 'অত্যন্ত'র কাছ ঘেঁষে চলেছে। বল্‌লাম, "ক্লান্ত হয়ে এসেছ, একটু বিশ্রাম করে নাও।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সৌরেন বললে, "বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই, বিশ্রাম গান শিখতে শিখতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।"

দেখলাম, একটা যা-হয়-কিছু না করে উপায় নেই। বললাম, "সা-রে-গা-মা আয়ত্ত আছে তো?"

বিস্মিতকণ্ঠে সৌরেন বললে, "সা-রে-গা-মায় কি হবে?"

বিপদে পড়লাম! কিছুতেই যদি কিছু না হয় তা হলে কিছু হয়ই-বা কোন্‌ উপায়ে? বললাম, "হারমোনিয়ম না হলে হয়ত হয় সৌরেন, কিন্তু সা-রে-গা-মা না হলে হয় না। ভাষা শিখতে গেলে যেমন বর্ণ পরিচয় আবশ্যক, গান শিখতে গেলে তেমনি সা-রে-গা-মা আবশ্যক।"

ব্যস্ত হয়ে সৌরেন বললে, "তুমি বুঝছ না উপেন, মজলিস-মজানো গান ত' আমি শিখতে চাচ্ছিনে, আমি চাচ্ছি সাধারণভাবের একটু শিক্ষা; আমার সা-রে-গা-মায় দরকার কি বল?"

বললাম, "কেউ যদি বলে, আমি রামায়ণ-মহাভারত পড়তে চাচ্ছিনে, পড়তে চাচ্ছি শুধু পদ্যপাঠ—কথামালা পর্যন্ত, তারও ত' বর্ণ-পরিচয়ের দরকার হয় সৌরেন?"

সৌরেন বললে, "তা হলে আসল কথাটা তোমাকে খুলে বলি। আমার এক-আধটা বই যখন স্টেজে অভিনীত হতে আরম্ভ করেছে তখন গান গাওয়া বিষয়ে কিছুটা ধারণা আয়ত্ত করতে পারলে গান রচনার কাজটা কতকটা সহজ ও সুষ্ঠু হতে পারবে। সুতরাং আমাকে তুমি সোজাসুজি গান শেখাও।"

এর পরও তর্ক করা চল্‌ত, কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করলাম; বললাম, "কি রকম গান শিখবে বল?"

সৌরেন বললে, "থিয়েটারের গান, বেশ নাচুনে তালের।"

নাচুনে তাল কি বস্তু, তা আমার জানা ছিল না; বল্‌লাম, "বুঝেছি।"

পূর্বেই বলেছি, সে সময়ে খুব জোর আলিবাবার যুগ চলেছে; বল্‌লাম, "বাজে কাজে মিনসে কে আর' ধরব?"

সৌরেনের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল; বললে, "চমৎকার হবে। ধর।"

ধরলাম। ক্ষণকাল ধরে যে ব্যাপার চল্‌ল, তা শুধু মানুষের পক্ষেই নয়, দেবতাদের পক্ষেও উপভোগের বস্তু! একজন চল্‌ল গান গেয়ে, আর, প্রসন্ন মুখে আর একজন চল্‌ল তার সঙ্গে স্রেফ্‌ কথা কয়ে। সে কথা কওয়ার মধ্যে স্বর আছে, কিন্তু সুর নেই। হার-মোনিয়মের পর্দায় সে স্বর ধরা পড়ে না। কিন্তু তার উপর সওয়ার হয়ে আছে এক রাশ মাথা-নাড়ানো হাত-দোলানো প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী। নাচুনে তাল কি বস্তু তা কতকটা বুঝলাম।

গান শেষ করে সৌরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু সুবিধে হল সৌরেন?"

প্রফুল্লমুখে সৌরেন বল্‌লে, "হল বৈ কি, নিশ্চয় হল। নাও আর একটা ধর।"

আলিবাবা নাটকের 'লেও সাকি, দেও ভর পিয়ালা' গানটা ধরলাম। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে অঙ্গভঙ্গী সহকারে সৌরেনও আরম্ভ করলে। যুগ্মকণ্ঠের সেই মিলিত সঙ্গীতে কথার মিল ছিল, কিন্তু সুরের মিল ছিল না; অর্থাৎ কতকটা যেন মুখের মিল ছিল, মনের ছিল না।

ঠিক একই পদ্ধতিতে আরও গোটা-দুই গান শেষ করে সৌরেন বললে, "চললাম উপেন।"

বললাম, "চল্‌লে ত,—কিন্তু কিছু সংগ্রহ হল? কিছু নিয়ে চল্‌লে কি এখান থেকে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সৌরেন বললে, "নিয়ে চললাম বই কি! বেশখানিকটা নিয়ে চললাম।"

"গানগুলো আয়ত্ত হয়েছে?"

"কাজ চালানোর মত।"

"একটু চালাও ত' দেখি কাজ।"

"কোন্‌টা শুনবে?"

"ধর, 'বাজে কাজে'-টা।"

দু হাতে নিঃশব্দ তুড়ি দিতে দিতে, জায়গায় জায়গায় কথার ওপর বিশেষ একরকম ঝোঁক দিয়ে দিয়ে, সময়ে সময়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, সৌরেন গানটা শেষ করলে। আলিবাবার

গানগুলো সৌরেনের পূর্ব হতে কণ্ঠস্থ ছিল, সুতরাং কথায় বাধল না। সুরেও অবশ্য বাধল না; কারণ যে সুর সৌরেন গানের উপর প্রয়োগ করলে তা সম্পূর্ণরূপে রাগ-রাগিণী নিরপেক্ষ,—সঙ্গীতবিদ্যার সপ্তসুরের মধ্যে কোনো সুরেরই বালাই তার মধ্যে খুঁজে পাবার উপায় নেই।

বললাম, "আমাকে বিশ্বাস কর সৌরেন, এক বিন্দুও নতুন-কিছু তুমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছ না। নিয়ে যাচ্ছ বলে যা মনে করছ, আসবার সময়ে তার ষোল আনাই সঙ্গে এনেছিলে।"

অপ্রত্যয়ের মৃদু হাসি হেসে সৌরেন বললে, "পাগল হয়েছ! এতখানি সময় তা হলে বৃথাই কাটালাম না-কি?" তারপর তার পূর্বতন যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে বললে, "তুমি ভুল করছ উপেন, আসর সরগরম করা আমার উদ্দেশ্য নয়,—আমার উদ্দেশ্য গানের বিষয়ে ঠিক ততটুকু ধারণা আদায় করা, গান রচনা করবার বিষয়ে যতটুকুর একান্ত প্রয়োজন।"

"আদায় করেছ?"

"অবশ্য করেছি।"

"কার কাছ থেকে?"

"তোমার কাছ ছাড়া আবার কার কাছ থেকে?"

কোনো ধর্মগ্রন্থে পাঠ করেছিলাম, বিধাতা-পুরুষ যে দান করেন তা শুধু অনভিপ্রেতই নয়, অনুপলব্ধও। আমার মতো অধম পুরুষও যে, অনুপলব্ধ দান করতে পারে, তা অবগত হয়ে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলাম। বুঝলাম, এই জন্যই সাধু ব্যক্তিরা বলে থাকেন, ভগবান সর্বজীবে বিরাজমান।

বললাম, "এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কেন, আর একটু পরেই ত' উনানে আঁচ দেবে, চা-টা খেয়ে যেয়ো।"

ব্যস্ত হয়ে সৌরেন বললে, "ক্ষেপেছ! এখনি গিয়ে গোটা দুই গান তৈরি করে ফেলতে হবে।"

বললাম, "টাটকা-টাটকা?"

স্মিতমুখে সৌরেন বললে, "হ্যাঁ, টাটকা-টাটকা।"

ঝড়ের মতো সৌরেন এসেছিল, ঝড়ের মতো চলে গেল। সৌরেনের সঙ্গে সেদিনকার কথা মনে পড়লে আমার মনে একটা আনন্দের উদয় হয়। অবশ্য আনন্দটা একেবারে খাঁটি আনন্দ নয়,—সপুলক আনন্দ। সেদিন সৌরেনের মনে যে খুসি উদ্রিক্ত হয়েছিল তা 'অকারণ' খুসি বলেই সকৌতুক আনন্দ। সত্যি সত্যিই কিছু দিয়ে মানুষকে খুসি করা কঠিন ব্যাপার; কিছু না দিয়ে খুসি করা প্রবল সৌভাগ্যযোগ না থাকলে ঘটে না।

একটা কথা বলা দরকার। পরবর্তীকালে সৌরেন গান রচনার বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে শেখা বিদ্যা যে তাকে সে বিষয়ে কোনও সাহায্য করেনি, প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি।

সঙ্গীত সম্পর্কে সৌরেনের কথা থেকে ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সৌরেন সুর-সপ্তকের সাতটি সুরকেই অস্বীকার করেছিল,—প্রভাচরণ কিন্তু সপ্তকের প্রথম চারটি সুরকে স্বীকার করে বাকি তিনটিকে অস্বীকার করেছিলেন। কথাটা খুলে বললে এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার বোঝা যাবে।

প্রভাচরণের ওকালতিতে পসার যখন বেশ খানিকটা জমে উঠেছে, হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হল গান শিখতে হবে। একান্তই শিখবেন যখন, যথাসম্ভব ভাল করে শেখাই উচিত। সুতরাং ভাগলপুরের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ দেবী সিংকে নিযুক্ত করলেন। দেবী সিং সুদূর পশ্চিমের বড়-ঘরনার গায়ক, সঙ্গীত-সরোবরের রুই কাৎলার ব্যাপারী। তিনি গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই প্রভাচরণকে নিযুক্ত করলেন সর্গাম সাধনার কার্যে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা কাল প্রভাচরণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত সঙ্গীত-সাধনায় বসেন; নিরলসকণ্ঠে নিরন্তর অভ্যাস করেন,—সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। পাশের ঘরে অপেক্ষারত মক্কেলগণ ওকীলসাহেবের সঙ্গীত-অনুশীলনের সমাপ্তির প্রত্যাশায় অধীর হয়ে ওঠে। তদানীন্তন ভাগলপুরের সর্বপ্রধান ফৌজদারী উকিল উপেন্দ্রনাথ বাগচী ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক। মক্কেলরা মনে করে, দুদিকের পাল্লা সমান করবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানি উকিল প্রভাচরণ বোধ হয় সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। এই সদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মনের মধ্যেও তারা কোনো প্রতিবাদকে প্রশ্রয় দিতে সাহস করে না।

পঞ্চাশ টাকা মাসিক দক্ষিণায় দেবী সিং সপ্তাহে তিন দিন শিক্ষা দিতে আসেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রভাচরণ গুরুর সম্মুখে বসে সার্গম সাধনা করেন,—সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা।

দেবী সিং আপত্তি করে বলেন, "শোন প্রভাচরণ, সার্গামের সুরগুলি কি তোমার মকর্দমার সাক্ষী যে, সব সাক্ষী এক আওয়াজ করলেই খুশী হওয়া চলবে?"

উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রভাচরণ প্রশ্ন করেন, "কেন ওস্তাদজী?"

দেবী সিং বলেন, "কেন, তাও বলতে হবে তোমাকে? সপ্তকের প্রথম চারিটি পর্দা তুমি ঠিক ঠিক সুরেই উচ্চারিত করছ; কিন্তু তারপর পা ধা নি সা এবং সা নি ধা পা-র মধ্যে কোনো ভেদ করছ না, ওঠ-নামা দেখাচ্ছ না, সবই মধ্যমের সুরে বলছে,—এ কি তোমার রীতি! এক না চলো, চোলো না; কিন্তু এ-রকম 'বেপরোয়ার' সঙ্গে ভুল পথে চললে, কোন ফায়দা নির্গত হবে শুনি? নাও, ঠিক আমার মত করে বল, সা রে গা মা পা।"

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সুস্পষ্ট সমুচ্চ-কণ্ঠে প্রভাচরণ গুরুর কণ্ঠ অনুসরণ করেন; সা-রে-গা-মা পর্যন্ত চারটি সুর ঠিক সুরে সুরেই উচ্চারিত করেন, তারপর সতর্ক সমাহিত হ'য়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন, পা-আ-আ-আ,—সুরে কিন্তু তা হয় মা-আ-আ-আ। হতাশার বিরক্তিতে দেবী সিং বিহ্বল হয়ে ওঠেন।

একদিন নয়, দু দিন নয়,—এক মাস নয়, দু মাস নয়—সুদীর্ঘ ছ মাস ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও দেবী সিং প্রভাচরণকে মধ্যম থেকে পঞ্চমে তুলতে সমর্থ হলেন না। অগত্যা একদিন তিনি বললেন, "প্রভাচরণ, আর আমি তোমাকে গান শেখাতে আসব না।"

হাত জোড় ক'রে প্রভাচরণ বললেন, "কাহে ওস্তাদজী? কিয়া কসুর হুয়া?" (কেন ওস্তাদজী? কি অপরাধ হয়েছে?)

দেবী সিং উত্তর দিলেন, "কসুর পুরা হুয়া! ছও মহিনা রগড়ঘষ করনেসে ভি তুম মধ্যমসে পঞ্চম উঠ্ নহি শকা,—তুম পত্থল হ্যায়!" অপরাধ পুরো হয়েছে! ছ মাস ধ্বস্তাধ্বস্তিতেও তুমি মধ্যম থেকে পঞ্চমে উঠ্‌তে পারলে না, তুমি এক পাথর!"

ভাগলপুরে ওকালতি করতে গিয়ে 'তুম পত্থল হ্যায়' গল্প আমি একাধিক লোকের মুখে শুনেছিলাম। অথচ প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার পর একান্তে ও গোপনে তাঁর মুখে রামপ্রসাদী ও অন্যান্য প্রাচীন সুরের সেকেলে গানও কিছু শুনেছিলাম। প্রভাচরণ সুকণ্ঠ ছিলেন, সে কথা বলছিনে; কিন্তু পা-ধা-নি নামে যে তিনটি লাজুক সুর তাঁর সুরসপ্তক সাধনাকালে বহু সাধাসাধিতেও আত্মপ্রকাশ করেনি, তাদের কিন্তু প্রভাচরণের গান গাওয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম। নিরাবরণ একাকিত্বের নগ্নতায় উপস্থিত হ'তে যারা কিছুতেই স্বীকৃত হয়নি, গানের শব্দসম্ভারের আবরণের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার তারা হয়ত পথ খুঁজে পেয়েছিল।

১৯১৩ সালের ২রা জানুয়ারী আমি যখন ওকালতি ব্যবসায়ের কঠোর প্রাঙ্গণে প্রথম পদার্পণ করলাম, তখন প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পসার খুব জমজমাট। প্রত্যেক বড় মকর্দমায় একপক্ষে অথবা অপর পক্ষে তিনি থাকেনই। বিশেষতঃ কোনো মকর্দমায় হিন্দু আইনের প্রশ্ন যদি জড়িত থাকে, তা হ'লে ত' তাঁকে নিযুক্ত করবার জন্য বাদী ও প্রতিবাদীর

মধ্যে হুটোপাটি প'ড়ে যায়। হিন্দু শাস্ত্রে হিন্দু আইনে এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

বাঙালী সমাজে 'প্রভাচরণ পণ্ডিত মশায়', অথবা শুধু 'পণ্ডিত মশায়' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। বেহারী জনসাধারণ, এমন কি বেহারী ও মুসলমান হাকিমগণ, তাঁকে পণ্ডিতজী ব'লে সম্বোধন করতেন। বোধ করি ওকালতিতে প্রবেশ করবার পূর্বে তিনি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা করতেন ব'লে এই আখ্যা লাভ করেছিলেন।

কয়েকটি দুর্লভ গুণের জন্য প্রভাচরণ পণ্ডিত মশায়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ জনসমাজে কৃপণ ব'লে তাঁর নিন্দা ছিল। যারা শুধু তাঁর বাইরের দিকটার খবর রাখ্‌ত, তারা তাঁকে কৃপণ ব'লেই মনে করত; কিন্তু বাইরের সীমান্তরেখা অতিক্রম ক'রে অন্দর-মহলে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র যারা পেত, তারা তাঁর বদান্যতার অপূর্ব ভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হ'ত। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

পণ্ডিত মশায় আটহাতি অদীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করতেন। লম্বা চওড়া মানুষ, পরিপুষ্ট দেহ, আটহাতি বস্ত্রে বেমানান হ'ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই; লোকে বল্‌ত প্রভাচরণ হাড় কেপ্‌পন।

কিছুকাল ভাগলপুরে ওকালতি করবার পর পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে একটা গভীর অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠ্‌লে এই আটহাতি বস্ত্র ব্যবহারের মর্ম-কথা অবগত হ'য়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আপাতকৃপণ প্রভাচরণের পরিধেয় বস্ত্রের অপ্রশস্ততার মধ্যে যে উদার বদান্যতা আত্মগোপন ক'রে ছিল তার কোনো পরিচয় অথবা আন্দাজ পূর্বে পাইনি।

কথায় কথায় একদিন পণ্ডিতমশায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "পণ্ডিতমশায়, ক'হাতি ধুতি আপনি ব্যবহার করেন?"

স্মিতমুখে পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন, "আট হাতি ভাই।"

"আর হাত-দুই বাড়ালে ভাল হয় না?"

"হয়; কিন্তু একদিকে অসুবিধেও হয় একটু।"

"কি অসুবিধে বলুন ত?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে মৃদু হেসে পণ্ডিতমশায় বললেন, "তিনখানা ধুতি হ'লে ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়ার অসুবিধে হয়।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে?"

পণ্ডিতমশায় বললেন, "তার মানে, আমার যখন কাপড়ের দরকার হয়, তখন বিশ-গজি একটা থান কিনি। তাতে চারখানা দশ-হাতি কাপড় অবশ্য হয়,—কিন্তু—" মুহূর্তের জন্য পণ্ডিতমশায় থেমে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু কি?"

হাসতে হাসতে পণ্ডিতমশায় বললেন, "সব কথাই তুমি জেনে নিতে চাও না-কি?"

কথায় কথায় সব কথাই শেষপর্যন্ত জেনে নিলাম। বিশ-গজি থান কিনে পণ্ডিতমশায় পাঁচটি সমান দৈর্ঘের খণ্ড ক'রে চার খণ্ড রাখেন নিজের ব্যবহারের জন্য, পঞ্চম খণ্ড দান করেন কোনো বস্ত্রাভাবপীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিকে।

পাঁচ খণ্ডের পরিবর্তে চারখণ্ড করলে এক এক খণ্ড অবশ্য দশহাতি করে হয়, কিন্তু চার খণ্ড থেকে এক খণ্ড দরিদ্রকে দিলে বাকি তিন খণ্ডে প্রতি ধোপে দুখানা কাপড় ধোপার বাড়ি দেওয়া চলে না।

পণ্ডিতমশায় বললেন, "দেখ উপেন, অন্ন-বস্ত্রের অভাবের চেয়ে বড় অভাব মানুষের আর কিছু নেই। এ দুটি জিনিসের অভাবে মানুষকে যতটা অমানুষ করে, এমন আর কিছুতেই করে না। সেইজন্যে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা থেকে কিছুটা অংশ অভাবগ্রস্তের জন্যে ত্যাগ করা। নইলে আত্মার অকল্যাণ হয়। খেতে বসবার আগে বাড়া ভাত থেকে দু'মুঠো অন্ন ক্ষুধার্তকে দিতে পারলেই ভাল হয়; অভাবে, পশুপক্ষীর সামনে খানিকটা ছড়িয়ে দেওয়াও ভাল। বস্ত্রের কথা যদি বল, আমি অবশ্য আমার উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে মাঝে মাঝে এক-আধখানা বস্ত্র অভাবগ্রস্তকে দিতে পারি। কিন্তু প্রথমতঃ উদ্বৃত্ত অর্থ আমার এমন-কিছু বেশি নেই; দ্বিতীয়ত উদ্বৃত্ত অর্থের উপর একা আমার অধিকার নেই, সংসারের সকলেরই অধিকার। কিন্তু আমি যদি আমার নিজের বিশ-গজি থান থেকে চার গজ গরীবকে দান করি তা হ'লে কেউ-ই আপত্তি করতে পারে না। একমাত্র আপত্তি করতে পারে যাকে দিই সেই গরীব লোক; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যেও কেউ আপত্তি করেনি।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

আমি উত্তর দিলাম, "আজ থেকে আমিও আপত্তি করব না।" মনে মনে পণ্ডিতমশায়কে একটা প্রণাম করলাম।

চাঁদার খাতায় পণ্ডিতমশায়ের অঙ্ক পড়ত অত্যন্ত সামান্য পরিমাণের। ওঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিরা যেখানে পঁচিশ টাকা সই করত, উনি করতেন পাঁচ টাকা। লোকে বলত কৃপণ প্রভাচরণ।

যারা বল্‌ত, তারা মাসান্তে হয় ত' একটা মণিঅর্ডারও বাঙলা দেশে পাঠাত না; পণ্ডিতমশায় কিন্তু প্রতি মাসে নিয়মিত পাঠাতেন এক গোছা; কোনোটা পাঁচ, কোনোটা দশ, কোনোটা বিশ, কোনোটা পঁচিশ। প্রতি ইংরাজি মাসের শেষ সপ্তাহে মণিঅর্ডারগুলি লিখে নিয়ে এসে বুড়ো লাইব্রেরীর চাকরের হাতে টাকা হিসেব করে দিয়ে মণিঅর্ডার করতে ডাকঘরে পাঠাতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "যাদের আমি ধারি, সেই পাওনাদারদের কিস্তি পাঠালাম।"

আমরা কিন্তু জানতাম পণ্ডিতমশায়ের পাওনাদার ছিল বাঙলাদেশের কয়েকটি উপায়হীনা বিধবা, উপার্জনহীন বৃদ্ধ, দরিদ্র ছাত্র এবং অভাব-অনটনক্লিষ্ট পীড়িত ব্যক্তি।

পণ্ডিতমশায় আমাকে বলতেন, "উপেন, বড়লোকদের জন্যে চাঁদার খাতা আছে। কিন্তু দরিদ্রদের জন্যে আমরা দরিদ্ররা যদি না থাকি, তা হ'লে তাদের উপায় কি হয় বল দেখি।"

পণ্ডিতমশায় ছিলেন বালকের মতো সরল এবং সাধুর মতো অনাড়ম্বর। পারিপাট্য ব'লে কোনো বস্তু আছে, তা তাঁর সাজ-সজ্জা পোষাক-পরিচ্ছদ উদাত্তরবে অস্বীকার করত। পাতলুন নামে তিনি যে জিনিস পরিধান করতেন, একমাত্র আব্রু ছাড়া তার দ্বারা আর কিছুই রক্ষিত হোত না; সৌষ্ঠব ত' নয়ই, সঙ্গতিও বোধকরি নয়। তার নিম্নপ্রান্ত গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবার ইঞ্চি দুয়েক পূর্বেই গতিরোধ করত। পাতলুন এবং জুতার মধ্যবর্তী পদার্থ মোজাকে শীতকালেও পণ্ডিতমশায় অনাবশ্যক বিলাস-বস্তু মনে করে পরিহার করে চলতেন। এবং যে জুতা তিনি ব্যবহার করতেন, দু-চার মাসের মধ্যে তা এমন একটা ধূসর-ধূমল রঙ ধারণ করত যে, বাজার থেকে প্রথম আগমনের দিন তা কৃষ্ণবর্ণের ছিল বললে সহজেই বিশ্বাস করা যেতে পারত, এবং বাদামী রঙের ছিল বললেও অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যেত না।

অকস্মাৎ একদিন পণ্ডিতমশায় তাঁর সেই 'সর্বরঙিন' জুতার পরিবর্তে একজোড়া যৎ-পরোনাস্তি সৌখীন এবং মূল্যবান আনকোরা নূতন কার্পেটের জুতা পায়ে দিয়ে আদালতে আবির্ভূত হ'য়ে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। দু-পাটি জুতার মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ দুটি বৃহৎ আকারের লাল গোলাপ ফুল সকৌতুক আনন্দে পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপিত করে এজলাস থেকে এজলাসে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। আধ-ময়লা পাতলুনের নিম্নপ্রান্ত-দুটি ইঞ্চি দুয়েক উপরে ঈর্ষামলিন মুখে ঝুলে রইল।

এতবড় সঙ্গতিসামঞ্জস্যহীন ব্যাপার উপেক্ষিত হবার নয়,—দেখতে দেখতে কথাটা আদালতময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল; এমন কি, দু-চার জন হাকিমের কানে উঠ্‌তেও ছাড়ল না।

পণ্ডিতমশায় এজলাসে উপস্থিত হ'লে কৌতুক হাস্যে উকিল-ব্যারিস্টারদের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, হাসি লুকোবার জন্যে পেশকার নথি দিয়ে মুখ ঢাকা দেন, হাস্যবরুদ্ধ মুখে হাকিম ঈষৎ ঝুঁকে প'ড়ে সেই পরম কৌতুকের বস্তু কার্পেটের জুতা জোড়া দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

চতুর্দিকে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ,—মধ্যস্থলে পণ্ডিতমশায় কিন্তু নির্বিকার! জুতা, জুতা হ'লেই হল। সকলপ্রকার জুতার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি;—তা সে নিজের ধূসর-ধূমল জুতাই হোক, অথবা সদ্যবিবাহিত পুত্রের দানসামগ্রীর মধ্যে প্রাপ্ত কার্পেটের জুতাই হোক। কাছারি আসবার সময়ে সামনে পড়েছে, পা গলিয়ে দিয়ে প'রে এসেছেন,—গোলাপ ফুল দুটির আরক্ত শোভার দ্বারা লুব্ধ হ'য়েই যদি হয়, তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। জুতা পায়ে দিয়েই তিনি খালাস; তারপর সে জুতা তাঁর মুখের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে অথবা পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সুসমঞ্জস হল কিনা, সে চর্চা অপরের।

এই দুর্লভ ছাঁচের মানুষ ছিলেন প্রভাচরণ পণ্ডিত মহাশয়।

মৃত্যুকালে তিনি কয়েক লক্ষ টাকার ধন-সম্পত্তি রেখে যান। এই বিপুল সম্পদের সমস্তটাই তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ের সূত্রপাতে ভাগ্যদেবতার যে বিকট ভ্রূকুটি তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল, তার ইতিহাস কৌতুকপ্রদ।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পণ্ডিতমশায় ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করলেন। একটি সামান্য ক্ষুদ্র বাড়িতে বাস করেন; অকিঞ্চিৎকর আসবাব-পত্র; পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আইনের বই নেই বললেই চলে। এই সামান্য উপকরণ নিয়ে দোকান সাজিয়ে পণ্ডিত মশায় আকুল প্রতীক্ষায় ব'সে থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠুর মক্কেল দেখা দেয় না!

সকলের আগে আদালতে যান, সকলের পরে ফেরেন,—টাকা নিয়ে কিন্তু নয়, ব্যর্থতার ক্লান্তি নিয়ে। সামান্য বেতনে একজন ঠিকা চাকর আছে; সে দু'বেলা মোটামুটি দু-চারটে কাজ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়, নিজহস্তে পণ্ডিতমশায় রন্ধন করেন।

দিনে দিনে দিন যায়; মাসে মাসে মাস। দুঃখ-দৈন্য-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে বৎসরও আবর্তিত হ'য়ে গেল। সঞ্চিত অর্থ সামান্য যা ছিল দেশের খরচ জোগাতে ও ভাগলপুরের খরচ মেটাতে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে দশ-পনেরো টাকাও বোধহয় পড়ে নেই।

সন্ধ্যাকাল। উঠানে একটা খালি তক্তাপোষের উপর চিৎ হ'য়ে শয়ন ক'রে পণ্ডিতমশায় অকূলপাথার ভাবছেন। এক আকাশ নক্ষত্র তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঝিক্‌মিক্ করছে। কি তাদের ভাষা কে জানে! একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মুক্তিলাভ ক'রে বোধকরি সেই নক্ষত্ররাশির দিকেই উধাও হ'ল।

কি করা যায়! কি করা যায় তাহ'লে?...... তবে কি শেষপর্যন্ত দেশে ফিরে গিয়ে যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সামান্য জীবনেই প্রবেশ করতে হবে? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ-আয়োজন, এতদিনকার বহুকষ্টার্জিত বহুযত্নাধীত বিদ্যা—সকলই কি ভস্ম হয়ে পড়ে থাক্‌বে এই ভাগলপুরের আদালতের ঊষর প্রান্তরে?......ভাগ্যদেবতার তাই যখন ইচ্ছা, তখন তাই হোক! পণ্ডিতমশায় মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, সামান্য যা-কিছু আসবাব-পত্র আছে বেচে-বুচে দু-চার দিনের মধ্যেই ভাগলপুর পরিত্যাগ ক'রে যাবেন। শেষকালে পাথেয়র জন্যে কার কাছে হাত পাতবেন? মানে মানে স'রে পড়াই ভাল।

ঠিক এমন সময়ে সদর দরজায় ভাগ্যদেবতা কড়া নাড়লেন,—এতদিন বিমুখ বিরূপ হয়ে যিনি অবস্থান করছিলেন, সেই ভাগ্যদেবতা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক শোনা গেল, "পণ্ডিতমশায় বাড়ি আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি। আস্তাজ্ঞে হোক!" ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে পণ্ডিতমশায় সদর দরজার দিকে ছুটলেন। প্রথম সবজজের কণ্ঠস্বর!

সাবজজকে নিয়ে এসে পণ্ডিতমশায় কোথায় বসাবেন ভেবে পান না। উঠানে তক্তাপোষ দেখতে পেয়ে সাবজজ বললেন, "এইখানেই ফাঁকায় বসা যাক্ পণ্ডিতমশায়।"

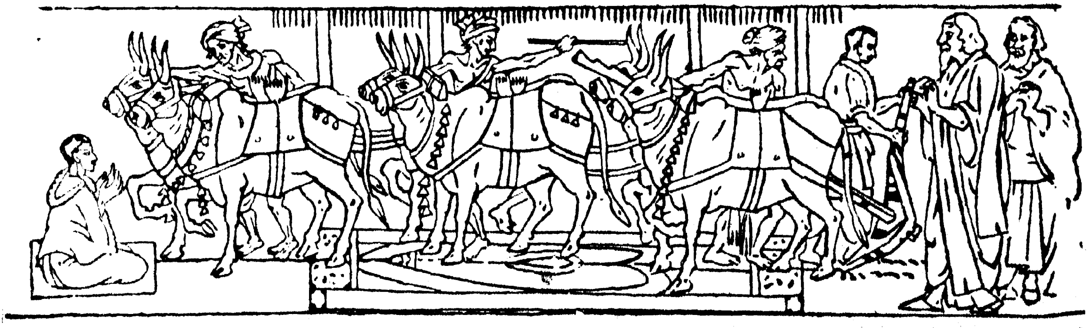
দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর সাবজজ আসল কথা পাড়লেন; বললেন, "একটা কথা ছিল পণ্ডিতমশায়, কিছু যদি মনে না করেন, তাহ'লে বলি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে পণ্ডিতমশায় বললেন, "আজ্ঞে নিশ্চয়ই বলুন!" সাবজজ্ বললেন, "আমার ছেলেটি এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। সংস্কৃতে সে কাঁচা। আপনি যদি অনুগ্রহ করে তাকে একটু সাহায্য করেন, আমি আপনাকে মাসিক চল্লিশ টাকা ক'রে দেবো।"

নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারের মধ্যে পণ্ডিতমশায় আশার আলোক দেখতে পেলেন। তাহ'লে আরও কিছুকাল দুস্তর সাগরে সাঁতার দেওয়া চলবে! পণ্ডিতমশায় সম্মত হলেন, এবং পরদিন থেকেই অধ্যাপন আরম্ভ করে দিলেন।

মাসিক চল্লিশ টাকা আয়ের জন্য ভাগ্যদেবতা নিজ হাতে কড়া নাড়েন না। সৌভাগ্যের প্রকৃত উদয় হ'ল প্রথম সাবজজের গৃহে নয়, এজলাসে। রাষ্ট্র হ'য়ে গেল প্রভাচরণ উকিল 'আউয়াল' (প্রথম) সাবজজের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। একে একে মক্কেল এসে জুটতে লাগল। ছোটখাট ব্যাপারে যেখানে অবিচার না করেও আনুকূল্য দেখানো যায় সেখানে প্রথম সাবজজ পণ্ডিতমশায়কে ষোল আনা আনুকূল্য দেখাতে লাগলেন। সুযোগের অভাবে যে উপযুক্ততা এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করছিল, এখন তা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। অগ্নি যেমন ক্রমশ এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে, পণ্ডিতমশায়ের পসারও তেমনি এক এজলাস থেকে অপর এজলাসে বিস্তৃতি লাভ করে চলল। সফলতার রাজপথে সৌভাগ্যের রথ গতি লাভ করলে।

(ক্রমশ)



ইন্দ্রজিতের আসর

এবার মহিলাদের কাছে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। বাড়ির কর্তাদের বাগে আনতে হলে বাড়ির গিন্নীদের সাহায্য প্রয়োজন। কথাগুলি যদিচ পুরুষদের উদ্দেশ করে তথাপি মেয়েদের মুখ দিয়ে পরিবেশন না হলে ঠিক ফল হচ্ছে না। এই জন্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করছি। সেদিন কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। এঁরা আমার ছাত্রী। কথা হচ্ছিল এই দেশব্যাপী দুর্নীতি সম্বন্ধে। তাঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন এর প্রতিকার কি? আমি বললুম, এর প্রতিকার তোমাদেরই হাতে। একথা শুধু যে ওঁদের খুশি করবার জন্য বলেছি এমন নয়। দুর্নীতি দূরীকরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক কথা লেখাও হয়েছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। তার কারণ কথা শুধু ধারে কাটে না, ভারেও কাটে। আমাদের বলা বা লেখার পশ্চাতে সে ভার নেই, ইংরেজিতে যাকে বলে sanctions. অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি যদি আমার কথা না শোনে তবে তাকে সায়েস্তা করবার পন্থা আমার আয়ত্তে নেই। সরকার ইচ্ছে করলে তাকে সায়েস্তা করতে পারত। কিন্তু সরকারের সরষের মধ্যেই ভূত, কাজেই তার কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। মেয়েদের হাতে সেই sanctions আছে, সেইখানেই তাঁদের জোর। চোর, জোচ্চোর ঘুষখোর চোরাকারবারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। এরা সবাই গৃহী, এদের গৃহিণী আছে। এখন সেই গৃহিণী যদি বলেন, ঘুষের অন্ন খাব না, চোরাকারবারীর স্ত্রী যদি বলেন, চুরির মাল ঘরে রাখব না, চোরের ঘর করব না তবে সমাজের অসাধুতা দূর হতে ক'দিন লাগে? অসাধু কর্মচারী ঘুষ নেয় ঘুষের টাকায় স্ত্রীকে গয়না পরাবে বলে; কিন্তু স্ত্রী যদি বলেন, আমি ঘুষের টাকায় পরব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি তবে সেই কর্মচারী ঘুষ নেবে কার জন্যে। কোন্ সাহসে? মেয়েরা জেনে শুনে এদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এইটেই সব চাইতে দুঃখের ব্যাপার। অসাধু কর্মচারী আর চোরাকারবারীর দৌরাত্মে দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে তার পশ্চাতে যদি বলি মেয়েদের সায় আছে তবে কিছু অন্যায় বলা হবে না। কারণ ঘুষখোরের স্ত্রী কি ঘুষ-খোরের সহধর্মিণী নন অর্থাৎ তিনিও কি ঘুষ খাচ্ছেন না?

মেয়েরা আমাদের গৃহলক্ষ্মী। তাঁদের উপরেই গৃহের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। সমাজ হচ্ছে গৃহ বা পরিবারের সমষ্টি। কাজেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও তাঁদের উপরেই নির্ভর করবে। তাঁরা যেমনটি চান ঠিক সেই ভাবেই সমাজকে গড়ে তুলতে পারেন। সেই ক্ষমতার ব্যবহার তাঁরা করছেন না বলেই সমাজের অধঃপতন এত বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। গৃহে যদি শৃঙ্খলা না থাকে, লক্ষ্মীশ্রীর অভাব হয় লোকে তখন গৃহিণীকেই দোষ দেয়। আজকে সমাজে যে দুর্নীতি এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সেজন্য মেয়েদেরকেই প্রধানতঃ দায়ী করব।

নতুন আইন করে নারীকে নতুন অধিকার দেবার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার মেয়েরা চাচ্ছেন। সে অধিকার নিশ্চয় তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু কোন্ স্বামীকে ত্যাগ করবেন—

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর নূতন উপন্যাস **"জলজঙ্গল"** ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক, দেশ

যিনি অর্থাভাবে গয়না দিতে পারেন না তাঁকে না যে স্বামী ঘুষ খেয়ে গয়না গড়িয়ে দেয় তাকে? এইটি আগে স্থির করুন। অসাধু স্বামীর ঘর করব না, এই কথা বলবার জন্য আইনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর আইন যদি হয় তো তার সদ্ব্যবহারও যেন হয়। বেশীর দরকার নেই, জন কয়েক স্ত্রীলোক আদালতে এসে বলুন, আমার স্বামী চোরাকারবারী, এমন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না, এর বিবাহ বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই। একবার পরীক্ষা করে দেখুন কালাবাজার কদিন টেকে। মেয়েরা যদি সত্যি সত্যি চান তো কালাবাজারীকে সাদা করতে না পারেন সিধে করতে নিশ্চয় পারবেন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন এর অধিবেশন হচ্ছে বছরের পর বছর। সেই সম্মেলনে যে প্রস্তাবটি সর্বাগ্রে উপস্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, আজ পর্যন্ত সেটির উল্লেখমাত্র হয়নি, তাই দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁরা কেন বলেননি, অসাধু পুরুষ নারীর অযোগ্য। পরনারীতে আসক্ত স্বামী যদি বর্জনীয় হয় তো পরধনে আসক্ত স্বামীও বর্জনীয়। মেয়েরা অধিকার চাচ্ছেন ভাবতেই আমার হাসি পায়। অধিকার চাচ্ছেন কার কাছে? না অধঃপতিত পুরুষের কাছে। অর্থাৎ বলছেন, এখন আমরা তোমাদের যোগ্য হয়েছি, অতএব তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করছি। বলা উচিত ছিল উল্টো কথা,—তোমরা আর আমাদের যোগ্য নও। আমাদের উপরে যা তোমাদের অধিকার ছিল, নিজ দোষে তা খুইয়েছ। কালাবাজারের কালো মুখ আর আমাদের দেখাতে এসো না। আমাদের মুখে তোমরা চুণকালি দিয়েছ। অতএব—ইত্যাদি ইত্যাদি। কই, কোনো মেয়ের মুখে তো এমন কথা শুনিনি।

একদা সমাজ বলেছে—None but the brave deserves the fair. এইতো সুসভ্য সমাজের যোগ্য উক্তি। নারীরত্ন একমাত্র বীরেরই প্রাপ্য। আজকের বীরবাহু কে? যে দু হাতে টাকা লুঠছে সে? যে নারী বীরের গলায় বরমাল্য পরাবেন তিনিই এর জবাব দিন। আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব সমাজের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আজ বীরত্বের একটি-মাত্র সঙ্গত সংজ্ঞা সম্ভব। তার নাম সততা। সেই ব্যক্তিই বীর যিনি সৎ। নারী হস্তের বরমাল্য তাঁরই প্রাপ্য।

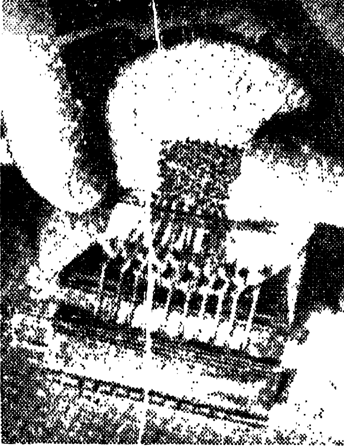
বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, এখন দেখছি বাঙালী মেয়েরা আরো বেশী আত্মবিস্মৃত। তাঁদের যে কি অসীম ক্ষমতা সে কথা তাঁরা জানেন না কিম্বা জানলেও ভুলে থাকেন। নারী চিত্ত জয় করবার জন্য পুরুষ যে কোনো মূল্য দিতে রাজী হবে। সেই মূল্য তাঁরা দাবী করতে শিখুন। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সস্তা করে দিয়েছেন। আমাদের কবি বলেছেন—রমণীর মন সহস্র বৎসরের, সখা সাধনার ধন। সহস্র বৎসরের সাধনায় যা লভ্য সে জিনিস যদি সহস্র মুদ্রায় লাভ করা যায় তবে নারীর উপযুক্ত মূল্য পুরুষ দেবে কেন? হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যাকে পেতে হবে ঘুষের টাকায় তার চিত্ত জয় করবে এত বড় আস্পর্ধা বাঙালী পুরুষের কেমন করে হ'ল?

অনেক দুঃখে আজ এ সব কথা বললুম। রাগ করবেন না, মনে মনে ভেবে দেখবেন। বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের কাছেই নিবেদন জানিয়েছি এই জন্য যে, একমাত্র বাঙালীর উপরেই (এমন কি অধঃপতিত বাঙালী পুরুষের উপরেও) আমার আস্থা আছে, অপরের উপরে ততটা নেই।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যার মানে সময়মত একটি সেলাই অমন নয়টি সেলাইএর কাজ করে। তবে সব সময় এই "সময়মত" কাজটি হয় না। বিশেষ করে ছেঁড়া কাপড় রিপু করা বড় বিরক্তিকর কাজ। ছবিতে যে ছোট্ট তাঁতটি দেখান হয়েছে এটি রিপু করার যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে সূতি, কাপড়, পশমী রেশমী সব রকম কাপড়ের ছেঁড়া



ছোট্ট তাঁতটি দিয়ে ছেড়া কাপড় নতুন করা হচ্ছে

মেরামত করা যায়। এতে করে ঠিক তাঁতের মতই কাজ হয়। সময়ও খুব কম লাগে। কাজটি এত সূক্ষ্ম হয় যে, রিপু করার পর বোঝাই যায় না যে, ঠিক কোন জায়গাটি সারান হয়েছে। ছবিতে অবশ্য রিপু করা জায়গাটি বিশেষ করে অন্য রংএ দেখান হয়েছে। এই যন্ত্রটির নাম Speed Weave. এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট তাঁত।

*

হাইড্রোজেন বোমা, এ্যাটম বোমা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড় বড় শক্তি উঠে পড়ে লেগে গেছে কে কত রকমের বোমা তৈরি করতে পারে। জলের ওপর, স্থলের ওপর বোমা ফাটিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু মাটির তলায় এ্যাটম বোমা ফাটালে তার কি ফল হতে পারে, সে নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বলেন যে, যদি একটা দু' পাউণ্ডের বোমা মাটির তলায় ফাটান যায়, তাহলে সেখানে একটা ভূকম্পন হবে। তা ছাড়া মাটিতে একটা প্রায় ২০০ ফুট গর্তের সৃষ্টি হবে। বৈজ্ঞানিকের মত হচ্ছে যে, মাটির ওপর বোমা ফাটার জন্য বাড়ি-ঘর-দোরের যতটা ক্ষতি হয়, মাটির ভেতর ফাটলে ক্ষতিটা এত বেশি হবে না। খুব সম্ভব এর পর মানুষ এইজন্য মাটির তলায় তাদের ঘর, বাড়ি তৈরি করবার নতুন নতুন উপায় ভাবতে আরম্ভ করবে।

কাটা-ছেঁড়া জোড়া দিয়ে নতুন করে তোলার পদ্ধতি ডাক্তারি শাস্ত্রে অনেকদিন থেকেই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এই জোড়া দেওয়ার ফলে আজকাল কত অসম্ভব ব্যাপার যে সম্ভব হচ্ছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। লণ্ডনের তিনজন অস্ত্র-চিকিৎসক এইভাবে একটি ছেলেকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন। কোনও দুর্ঘটনায় ছেলেটির জিভটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা তার শরীর থেকে চামড়া সংগ্রহ করে একটি নতুন জিভ তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে ছেলেটি কিছুটা কথা বলতে পারছে। অবশ্য খুব ভালভাবে কথা বলতে পারে না; কারণ তার জিভের সামনের অংশটি আর এক-বার সংস্কার করলেই সে ভাল করে কথা বলতে পারবে আর খাদ্যাখাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। এইভাবে অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা ছেলেটির বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে আনতে তিনটি ডাক্তারের এক বছর সময় লেগেছে এবং অনেক-বার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

*

মানুষ কত রকমেই যে পয়সা রোজগার করে তার ঠিক নেই। জার্মানের এক ভদ্রলোক জাপান থেকে এক অদ্ভুত বিদ্যা আয়ত্ত করে এনেছেন। ভদ্রলোক দেশে ফিরে এসে সেই বিদ্যের সাহায্যে বেশ দু' পয়সা রোজগার করছেন। বিদ্যেটি আর কিছুই নয়—তিনি খুব কাঁচ মুর্গীর বাচ্চা দেখে বলে দিতে পারেন যে, কোন্‌টি মোরগ আর কোন্‌টি মুর্গী। কথাটা খুব সামান্য নয়। বাচ্চাগুলো বড় হলে ঝুঁটিওয়ালা মোরগ আর ঝুঁটিবিহীন মুর্গী চেনা খুব সহজ; কিন্তু খুব কাঁচ বেলায় চিনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। ভদ্রলোক বাচ্চাদের দেহের কয়েকটি লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারেন। এর ফলে বাচ্চাগুলি বিক্রয় করার সময় মুর্গীগুলি রেখে মোরগগুলি বিক্রয় করলে অনেক সুবিধে হয়। তিনি এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল খুলেছেন। তিনি বলেন, এটি জানবার জন্য কোনও বাঁধা-ধরা পদ্ধতি নেই অবশ্য, তবে অভ্যাসের ফলে চোখের দেখাতেই বোঝা যায়।

*

এটি কিন্তু বাবুই পাখীর বাসা নয়, এটি এক ধরণের গাছের অংশ; সাধারণত আমরা একে 'ঘট-পত্রী' বলি। এর আসল নাম "নেপেনথেস" বা "পিচার প্ল্যাণ্ট"। কলসীর মত দেখতে বলেই পিচার-প্ল্যাণ্ট বলা হয়। এই ধরণের কয়েক রকম উদ্ভিদ আছে, যাদের পতঙ্গভুক বা কার্নিভোরাস প্ল্যাণ্ট বলা হয়। "ঘট-পত্রী"ও পতঙ্গভুক জাতীয়। এই ঘটের মত জিনিসটি প্রকৃতপক্ষে একটি গাছের পাতার অংশবিশেষ। এর মুখে একটি ঢাকা অর্ধেকটা খোলা অবস্থায় লাগান থাকে। আর ভেতর দিকে কয়েকটি চুলের মত সরু সরু সোঁয়া লাগান থাকে। এর মধ্যে এক রকম মধুর মত মিষ্টি রস নির্গত হয়। কীট-পতঙ্গেরা ঘট-পত্রীর বাইরের চটকদার রঙ দেখে আর মধুর



একটি ঘট-পত্রী

লোভে ঘটের ভেতরে ঢুকে যায়। মজাটা এই যে, এই সব পোকাগুলো ঘটের ভেতরে এক-বার ঢুকলে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে। এর পিছল গা বেয়ে এরা আর ওপর দিকে উঠতে পারে না। এইখানেই এরা মরে যায়। তারপরে এদের পচা দেহ এই ঘটপত্রীর খাদ্য হয়।

*

ডাক্তাররা ওষুধ খাইয়েই সব রোগের চিকিৎসা করেন এবং পাগলামীর চিকিৎসাও এইভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার এক ডাক্তার আবিষ্কার করেছেন যে, পাগল মানুষের খাদ্য-নির্বাচনের ওপর তাদের রোগ সারান যায়। পাগল রোগীদের খাদ্য-তালিকা থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বাদ দিয়ে প্রোটীন জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, মাখন ইত্যাদি খাওয়ান দরকার। এই ডাক্তার পাগল রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাদের রক্তে এ্যাসিড জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে আর খাদ্যের শর্করা জাতীয় উপাদান এই এ্যাসিড উৎপন্ন করে। সুতরাং তাদের খাবার থেকে ঐ পদার্থ বাদ দিলে রোগের উপশম হবে। তিনি চারজন রোগীকে এই পদ্ধতিতে রোগ সারিয়ে দিয়েছেন অথচ কোনও রকম ওষুধই এদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়নি।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

নিদ্রা

ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী

নিদ্রা দেবী আজো সেই চিরদিনের মতই রহস্যময়ীই রয়ে গেছেন। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি এ অবস্থার স্বরূপ আজো আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারিনি। মৃত্যুকে আমরা যেদিন বিজ্ঞান দিয়ে জানতে পারব সেদিনই হবে নিদ্রা সমস্যার সমাধান। সত্যি সত্যিই আমাদের জীবনের অর্ধেকটাই প্রায় কেটে যায় এই নিদ্রায়, আর প্রায় আর্ধেকটা থাকি আমরা ঠিক ঠিক সকর্মকভাবে বেঁচে।

রাতের আঁধারের সাথে নিদ্রাকে দেখেছি আমরা ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুটীরে—আমরা দেখেছি এর কুহকে দুঃখী ভুলেছে তার দুঃখ, রোগী ভুলেছে তার রোগ, রিক্ত ভুলেছে তার ক্ষতি, ভয়ার্ত ভুলেছে তার ভয়, শোক-গ্রস্থ ভুলেছে তার শোক, বিরহী ভুলেছে তার বিরহ। ম্যাকবেথের মত যে অভাগার রাতের পর রাত কেটে যায় তারই বিনিদ্র উপাধানের পর, কেবল সেই অতি দুঃখে বলতে পারেঃ

'Sleep no more
Macbeth does murder sleep—
the innocent sleep,
Sleep that knits up the ravelled
sleave of care,
The death of each day's life,
sore labour's bath,
Balm of hurt minds, great
nature's second course,
Chief nourisher in life's feast.

গিরিশচন্দ্রের বাঙলা অনুবাদঃ—

ঘুমা'ও না আর
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ',
নিদ্রা অবিরোধী;
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তি প্রদায়ক—
দিনগত শ্রম-বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ;—

নিদ্রার চারদিক ঘিরে একটা প্রহেলিকার মায়াজাল থাকলেও কিন্তু একে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমরা কৃত্রিম উপায়ে ওষুধ দিয়ে এনে দিতে পেরেছি বিনিদ্র কত নয়নে ঘুমের আবেশ।

নিদ্রার সঙ্গে আছে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ যোগ, তাই তার সংজ্ঞা দিয়েছি আমরা চিরনিদ্রা। নিদ্রার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে অসংখ্য মতবাদ (theory) প্রমাণ করে আমাদেরই এ বিষয়ের গভীর অজ্ঞতা। যেখানে পথ অচেনা বা অজানা সেখানেই মত নানা ও বহুল।

নিদ্রার কারণ নির্দেশ করতে শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কেউই কিন্তু পেছপাও নন। সবাই তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টি কোণ থেকে অভিনব নতুন নতুন সব মতবাদ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের এই মতবাদকে সত্য বলে খাড়া করবার জন্য চেষ্টাও করেছেন অনেক এবং অসীম।

থিওরীগুলির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কিন্তু বলতে হয় শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বা Physiologistদের কথা। এরা নানা সময়ে এবং নানা জায়গায় যে বহুতর থিওরী বা মত-বাদ দিয়েছেন, সেগুলো হল—

(১) **Fatigine theory:** সারাদিনের কর্মক্লান্তি ও অবসাদ তারপর বিশ্রাম। জীবনের সব কিছুই যেন ছন্দে বাঁধা। কর্মের পর এলো বিশ্রাম, এলো রাত্রির সাথে নিদ্রা এবং তারপর আবার এলো দিনের আলোর সাথে পাখীর গান নতুন জীবন ও নতুন কর্মের প্রেরণা।

(২) **Neurogenic theory:** স্নায়ু-মণ্ডলীর সংকোচনকে অনেকে ঘুমের কারণ বলে নির্দেশ দিয়েছেন, এঁরা মনে করেন যে, স্নায়ু-কোষ-কেন্দ্রে যে স্পন্দন বের হয় তা আমাদের জাগরিত অবস্থায় অনায়াসে স্নায়ু-শাখা দিয়ে চলাচল করে, কিন্তু ঘুম আসবার ঠিক আগে স্নায়ু স্পন্দনগুলি স্নায়ু-কোষ কেন্দ্রে উৎপাদিত হলেও তারা আর তাদের স্নায়ু-শাখা দিয়ে চলতে পারে না, এই যোগ-সূত্র সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কতক সময়ের জন্য তখন স্তব্ধ হয়ে যায় সব স্নায়ু স্পন্দন, আসে কর্মবিরতি, আসে নিদ্রা।

(৩) ক্লেইটম্যান (Kleitman) মনে করেন যে নিদ্রাটা মস্তিষ্কের নিম্নবর্তী অংশ Hypothalamus-এরই ছন্দিত ক্রিয়াবিশেষ; তবে এ ছন্দের রূপ দেয় মস্তিষ্কের প্রধান অংশ Cerebrum, Hypothalamus এবং Cerebrum এ দুয়ের কর্ম-ছন্দের তাল কেটে গেলে আসে অনিদ্রা।

(৪) আর একদল শরীরবিদের ধারণা যে, আমাদের শরীরের প্রত্যেক কাজের পরই—যেমন হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পাকযন্ত্র প্রভৃতির স্বাভাবিক জীবনধারণের কাজগুলিতে শরীরে বহুল পরিমাণে বিষ আপনাথেকেই তৈরী হয় (metabolic poisons & anto-intoxication) এ সকল বিষের ক্রিয়া স্নায়ু-মণ্ডলের পরই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, তাতে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য এরা এনে দেয় স্নায়ুমণ্ডলীর স্তব্ধতা এবং তার পরই আসে নিদ্রার আবেশ। উপরের এটাকে কেবল মতবাদ বললে অন্যায় করা হবে, কারণ এর পেছনে খুব সুন্দর একটি গবেষণামূলক পরীক্ষাও রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে একটি কুকুরকে বহুদিন পর্যন্ত ঘুমাতে না দিয়ে রাখার পর দেখা গেছে যে, কুকুরটি পাগলের মত হয়ে গেছে এবং এর শরীরে ও মনে এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তনটি দেখে তাকে কোন বিষ ক্রিয়ারই বিশেষ ছবি বলে মনে হয়। শরীরবিদ্‌গণ কেবল এতেই ক্ষান্ত হননি—তাঁরা এ সব কুকুরের মাথা কেটে পরীক্ষা করে—মাথার ভেতরস্থ কোষসমূহেরও অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। পরে বৈজ্ঞানিকগণ এ সমস্ত কুকুরের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে (সম্ভবত সে রক্তের ভেতর metabolic ও anto-intoxication বিষ রয়েছে) সাধারণ সুস্থ কুকুরের ভেতর চালনা করে দেখিয়েছেন. এ সব সুস্থ কুকুরের ভেতরও উপরের পরীক্ষিত কুকুরের ন্যায় শারীরিক, মানসিক ও মাথার কোষসমূহের পরিবর্তন হয়। এ থেকে এঁরা এই অনুমান করলেন যে, ঘুমের কারণ শরীরেই সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালী এবং এই জীবনযাত্রা প্রণালীতে শরীরে যে বিষ উদ্গীরণ হয় তাই।

(৫) অন্যদিকে কিন্তু আর একদল শরীর-বিদ্ মনে করেন যে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী সব চেয়ে সেরা কাজ করে বলে—তারা স্বার্থ-পরের মত শরীরের সব জায়গা থেকে বেশী পুষ্টিগ্রহণ করে এবং পায়, তাদের কাছে এই পুষ্টিকর বস্তু পৌঁছে দেয় ধমনীর রক্ত—কিন্তু শরীরের ধমনীর রক্ত মাঝে মাঝে শরীরেই অবস্থাভেদে স্নায়ুমণ্ডলের ভেতর কমে যেতে থাকে এবং তখন সে মানুষের আসে অবসাদ, আসে নিদ্রা। এদের নিজেদের পক্ষের প্রমাণস্বরূপ এরা বলেন যে সবাই জানেন যে খুব ভাল রকমের খাওয়া দাওয়ার পর যখন, বহুল পরিমাণে রক্ত পাকস্থলীর দিকে চলে যায়, এবং মাথা ও অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলীর আসে রক্তাল্পতা তখনই আসে আমাদের ঘুমের একান্ত ইচ্ছা।

(৬) উপরের মতের ঠিক উল্টো মতের কথাও কিন্তু কারো কারো মুখে শুনা যায়। এ সব বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ঘুমের ঠিক আগে আমাদের মাথার ভেতর রক্তের পরিমাণ যায় অনেক বেড়ে এবং তাতেই আসে আমাদের কর্মবিমুখতা, আসে আমাদের নিদ্রা।

(৭) উপরের মতবাদগুলি কতক পরিমাণে পুরনো কাজেই তাতে ততটা চমকপ্রদ আধুনিকভাব নেই। আধুনিক যে সব মতবাদ বেরিয়েছে তার মধ্যে রুশীয় বৈজ্ঞানিক পাভলফের (Pavlov) মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি কুকুর নিয়ে গবেষণা করে, তা থেকে মাথার কঠিনতম কাজসমূহেরও বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইনি মনে করেন যে, মানুষের সাধারণ পছন্দ থেকে আরম্ভ করে মানুষের কঠিনতম বুদ্ধির কাজ সবই conditioning বা কতকটা পূর্বতন অভ্যাসেরই ফল মাত্র। এর মতে ঘুম তখনই আসে যখন এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি অভ্যাসের পথে আসে অনভিপ্রেত বাধা। ইনি কুকুর নিয়ে এবং পরে এঁর শিষ্যেরা শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে এদের ভেতর তখনই ঘুম এসেছে যখনই এদের পুরান প্রত্যাশিত জীবন-যাত্রাপথে হঠাৎ কোন পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন আনে বাধা, আনে কর্মের সমাপ্তি ও অবসাদ এবং পরিশেষে নিদ্রা। উপরে আমরা Physiological বা শরীরতত্ত্ববিদ্গণের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবার আমরা মনস্তত্ত্ববিদ্গণ এ বিষয়ে কি মনে করেন সে বিষয়ে কিছু বলব।

(১) বহু মনস্তাত্ত্বিক মনে করেন যে—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা বড়ই রূঢ়, এতে আছে অসাফল্যের দুঃখ, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার অনভীপ্সিত পরিসমাপ্তি, কিন্তু আমরা সকলে জানি যে আমাদের জন্মের পূর্বে যখন আমরা মায়ের সঙ্গে এক দেহী হয়ে ছিলাম—তখন আমাদের কোনও কিছু অসাফল্য, দুঃখ গ্লানি মোটেই ছিল না, তাই ঘুমের ভেতর দিয়ে আমরা মাতৃ জঠরের সেই চিন্তা-ভাবনাহীন সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল জীবনের ভেতর ফিরে যেতে চাই। সে জন্যই বিছানা, বালিস মশারিতে, আমাদের শোবার বিশেষ ভঙ্গীতে ও রাত্রের অন্ধকারের ভেতর আমরা ফিরে যাই আমাদের সেই মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ অবস্থায়।

(২) ক্লাপারিড (Claparede) বিশ্বাস করেন যে আমাদের অন্য পাঁচটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির (Instinct) ন্যায় নিদ্রাও একটি প্রবৃত্তি মাত্র। জীবিত মাত্রেরই জীবন রক্ষার জন্য ক্ষুধা প্রভৃতির ন্যায় এরও নিতান্ত প্রয়োজন। এসব স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিয়ম হচ্ছে এই যে, এরা যখন আসে, তখন এরা চায় যে সবার আগে এদের দাবী যাতে মেটান হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এদের দাবী না মেটে ততক্ষণ পর্যন্ত এরা শরীরে ভেতর একটি অবর্ণনীয় অস্বস্তির সৃষ্টি করতে থাকে। একবার এদের দাবী-দাওয়া মিটে গেলে শরীর ও মনের ভেতর একটা অদ্ভুত রকম আনন্দ ও সন্তুষ্টি আসে। বহুদিন পর্যন্ত এ সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হলে মৃত্যু অবধারিত।

(৩) নিদ্রার সাময়িক পর্যায়ক্রম দেখে কেউ কেউ ভেবেছেন যে জীব জীবনের প্রথম উন্মেষের সময়, যখন সমুদ্রে তার জীবন আরম্ভ হয়, তখন যেমন জোয়ার ভাঁটা একের পর আর এক আসতো, এখনও জীব জীবনের কর্ম-মুখরতা ও কর্মবিরতির ভেতর, জাগরণ ও নিদ্রায় আমরা যেন সেই বহু বহু পূর্বতন জীবনেরই রেশ আজো টেনে চলেছি।

(৫) মনস্তাত্ত্বিকদের ভেতর একদল আবার ঘুমকে সম্মোহনেরই প্রকারান্তর বলে মনে করেন। এরা মনে করেন যে, এখানে সম্মোহক ও সম্মোহিত একই ব্যক্তি। সকলেই নিজেকে নিজেই সম্মোহিত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে এইজন্য এর নাম দিয়েছেন Auto-Hypnotis.

(৬) ফ্রয়েড মনে করেন যে, কোনও মানুষের জীবনে দুইটি প্রধানতম প্রবৃত্তির নিরন্তর কলহ চলছে। একদিকে রয়েছে Eros যা কিনা জীবনামৃত ও প্রেম দিয়ে গড়া আর অন্যদিকে রয়েছে THANATOS বা মৃত্যু। আমাদের প্রত্যেক জীবনের ও প্রেমের একদিন শেষ হবেই মৃত্যুতে। আমাদের প্রত্যেককেই ফিরে যেতে হবে জড়ত্বে, যে জড় থেকে জীবন এক মহা মুহূর্তে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। মরণশীল সাগর থেকেই জীবন একদিন সুধার স্রোতে বেড়িয়ে এসেছিল আবার মৃত্যুতেই তার শেষ। জীবনকে তাই প্রতি মুহূর্তে জড় ফিরে পেতে চাইছে তার নিজের মাঝে। জীবন যাতে অল্পেতেই জড়ত্বে না ফিরে যায়, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমাদের দৈনিক জীবনে দরকার নিদ্রারূপ ক্ষণস্থায়ী জড়ত্ব বা মৃত্যু তা না হলে আমাদের জীবনের মাপ হয়ে আসবে ছোট তাড়াতাড়িই তাকে ফিরে যেতে হবে তার জড়ত্বে।

নৃতত্ত্ববিদ্গণের মতবাদ

নৃতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন যে, বহু পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন গুহায় গুহায় তার জীবন যাপন করতো, তখন রাত্রের অন্ধকারকে সে বড় ভয় করতো, কারণ আরম্ভের দিকে তার না ছিল আগুন, না ছিল কৃত্রিম আলো। কাজেই তাকে হিংস্র সাপ বাঘ প্রভৃতির হাত হতে জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় উদ্ভাবন করতে হল যে, গুহার অন্ধকারে সে মৃতের ভাণ করে হাত পা না নাড়াচাড়া করে পড়ে থাকতো। এতে বাইরে থেকে মনে হতো যে, গুহাটি খালি এবং সেখানে কেউ নেই, এতে আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুরা আর সেখানে প্রবেশ করতো না। ক্রমশ অন্ধকারে এরূপ অনড়ভাবে বহুক্ষণ ধরে পড়ে থাকায় আস্তে আস্তে প্রকৃতি তার রক্ষায় এলো, এবং রাত্রে তার এই অসম্ভব অবস্থা থেকে উদ্ধার স্বরূপ ঘুম আসতে লাগল। পরে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। পূর্বতনদের যা ছিল অভ্যাস পরবর্তীদের জীবনে তাই দেখা দিল প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির রূপ নিয়ে। আমাদের আবেষ্টনীর ও জীবনধারার অনেক পরিবর্তনই আজ আমাদের জীবনে এসেছে, কিন্তু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সে রাতের ঘুমের অভ্যাস আর ছাড়তে পারিনি। আর জীবনযুদ্ধে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে এর দরকারও বড় কম নয়।

ঘুম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

একেবারে না ঘুমিয়ে কেউ বেশী দিন বাঁচতে পারে না। ঘুমের অভাব হলে প্রথমে কাজের উৎসাহ কমে আসে, আলস্য বাড়ে, অনবরত হাই তুলবার ইচ্ছা হয়, খাবার ইচ্ছা কমে আসে, বার বার জল খেতে ইচ্ছা হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্রাব হয়, চোখ লাল হয়ে উঠে ও কড় কড় করতে থাকে। এ সত্ত্বেও না ঘুম হলে ক্রমশ বাইরের দিকের আর কোনও কিছুতেই আনন্দ বা উৎসাহ থাকে না, রোগীর বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষের ঘুম স্থান কালের বিশেষ অধীন। নতুন জায়গায় ও নতুন আবেষ্টনীতে ঘুমান বড়ই কষ্টকর। ঘুমের নির্দিষ্ট সময়ে একজনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার চোখ বুজে আসতে চায় নিজে থেকে। তবে ঘুমের পরিমাণ অনেক সময় অভ্যাসে ইচ্ছাধীন করা যায়। অর্থাৎ কোনও কাজের দরকার থাকলে অনেকেই ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে উঠে পড়তে পারে।

ঘুমের প্রথম দিকে ঘুম কয়েক ঘণ্টা গভীর হয়, পরে ঘুম পাতলা হয়ে আসে, আবার শেষ রাতের দিকে ঘুম গাঢ়ো হয়। কিন্তু এরকম বহু সময় দেখা যায় যে, বাইরের বহু শব্দে ঘুমের কোনই ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু মায়ের কোলের শিশুর সামান্য ক্রন্দনেই মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

শিশুরা প্রায় সব সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। ক্রমশঃ বয়স বাড়বার সাথে সাথে ঘুমের সময়ের মাত্রা কমে আসে। বয়স্কদের ৬—৮ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নের সুপ্তি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৃদ্ধেরা সাধারণতঃ ৪।৫ ঘণ্টা ঘুমান এবং এদের ঘুম অপেক্ষাকৃত পাতলা। নিদ্রাহীনতাও বেশীর ভাগ ৪০ বছরের পরেই সাধারণতঃ দেখা দেয়। পুরুষেরাই সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় বেশী নাক ডাকে। মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় তিরিশবারের বেশী পাশ বদল করে না।

সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, কেবলমাত্র পাতলা ঘুমের ভেতরই স্বপ্ন আসে এবং গভীর ঘুমের ভেতর কোনও স্বপ্ন আসে না, কিন্তু মন-বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড বলেন যে, স্বপ্নই হল ঘুমের গাঢ়ত্বের প্রমাণ। স্বপ্ন

আমাদের চারিদিকে তার মায়াজাল দিয়ে আমাদের অন্তরের আন্তরিক কামনা, বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করে ঘুমকে আর ভাঙতে দেয় না। কঠিন বাস্তবকে ছেড়ে আমরা স্বপ্নের আকাশ-কুসুমের ভেতর আমাদের ঢেলে দি।

নিদ্রা ও মৃত্যু

নিদ্রা ও মৃত্যুর ভেতর মিল আছে অনেক, দুই অবস্থায়ই বাহ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহে আমাদের শরীর বা মনের পর তাদের কোনরূপ দাগই কাটতে পারে না। দুই অবস্থায়ই আমরা চোখ বুজে নিশ্চেষ্টভাবে শায়িত অবস্থায় পড়ে থাকি। কিন্তু নিদ্রার যেরূপ ছেদ আছে মৃত্যুতে সেরূপ কোনও ছেদ নাই। নিদ্রাকালে শরীরের স্বাভাবিক কার্যাদি ধীরে হতে থাকলেও তা চলতে থাকে কিন্তু মৃত্যুর ভেতর তাদের হয় চিরবিরতি—চির সমাপ্তি।

নিদ্রা ও সম্মোহন

নিদ্রা ও সম্মোহন এ দুই অবস্থায়ই আমরা নিশ্চেষ্ট ও বহুল পরিমাণে অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হই। কিন্তু ঘুমের ঘোরে আমরা সহসা কারো কথাতেই সাড়া দেই না, কিন্তু সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহকের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পরে এবং কেবলমাত্র তাঁরই অনুজ্ঞা অনুসারে সম্মোহিত ব্যক্তি উঠা বসা কথা বলা সব কিছুই করে থাকে। এমন কি নিজেকে সবার সামনে হাস্যাস্পদ করতেও পেছপা হয় না; এবং পরে কেবলমাত্র সম্মোহকের আজ্ঞামাত্রই সজ্ঞান অবস্থায় ফিরে আসে।

নিদ্রা ও অচেতনকারী ঔষধ

অচেতনকারী ঔষধ ক্লোরোফরম, ঈথার, প্রভৃতিতে যে নিদ্রাভাব হয়, সে স্বাভাবিক ঘুম থেকে অনেক গাঢ়ো এবং এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার প্রভৃতি করলেও রোগী মোটেই তা বুঝতে পারে না বা কষ্ট পায় না। অচেতনকারী ঔষধগুলি সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর অম্লজান ব্যবহার করবার ক্ষমতা কমিয়ে এনেই তাদের নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

পুস্তক পরিচয়

নবীন যাত্রা :—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

নিপুণ গল্পকার হিসেবে মনোজ বসুর তুলনা নেই। অযথা চরিত্রের সমাবেশ নয়, মনগড়া পরিবেশের সাহায্য নয়, ঋজু বলিষ্ঠ প্রকৃতির কয়েকটি চরিত্র, দু একটি কথায় যারা পাঠকচিত্ত অনায়াসে জয় ক'রে নেয়। সামান্য কয়েকটি আঁচড়, একটি দুটি কথা, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণ হয় ছবি। বাড়তি রং ফলাবার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন চরিত্রের প্রতি অবহেলা যেমন নেই, তেমনি কোন চরিত্রের ওপর অহেতুক দরদের প্রয়োজন হয় না, সেই কারণেই নির্মল মাস্টার আর ইন্দ্রাণী দেবীর পাশাপাশি ফুটে উঠে ভীমসর্দার আর হৃদয় পিয়ন, প্রসন্ন পণ্ডিত আর শঙ্করীবালা।

ক্ষুদ্র যাত্রার স্বল্প পরিসরকে নবীনযাত্রার আদিগন্ত পরিসরে রূপান্তরিত করা—এ শুধু মনোজ বসুর লেখনীতেই বুঝি সম্ভব। ৩৮।৫১

হে মোর অতীত :—বিনয় চৌধুরী, টারগেট বুকস্, ৪৪, ফুলবাগান রোড (ইণ্টালী), কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

চিরদিনের জন্য পিছনে ফেলিয়া আসা জন্মভূমির বেদনা-মধুর স্মৃতি-বিস্মৃতির আলেখ্য। উদ্বাস্তু হৃদয়ের আবেগ ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত। উদ্ধৃত পল্লী-গাথাগুলি অন্যান্য প্রচলিত পল্লীগীতির মতই সহজ সুন্দর। ছাপা ও মলাট মন্দ নয়। ৫৮।৫১

ছেঁড়া পাতা—"চক্রবাক্" প্রণীত। প্রকাশক—পরিমল সরকার, ৬৯, কাঁসারিপাড়া রোড, কলিকাতা। দাম—এক টাকা চার আনা।

পরিবর্তনের স্রোতে মানুষ ভাসিয়া যায়। কিন্তু যাত্রাপথের প্রতি পদক্ষেপে রাখিয়া যায় কত ছোট বড় ঘটনা, কত ভুলে-যাওয়া মুখ আর মনের পরিচয় মহাকালের উদ্দেশ্যে। এমনি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী ও অসম্পূর্ণ চরিত্র লইয়া রচিত ছেঁড়া পাতা। এই ধরণের রচনায় যে বুদ্ধির ঝলকানি, যে ভাষার ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা, যে নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং চরিত্র অঙ্কনের যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল একান্ত প্রয়োজন, লেখকের তাহা আছে কিনা সন্দেহ। ৫৫।৫১

শরীর ও শক্তি (দ্বিতীয় সংস্করণ)—আয়রনম্যান নীরদকুমার সরকার, ১৫, কলেজ স্কোয়ারস্থ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ সিকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বুঝা যায় যে, বাঙালী পাঠকসমাজে আলোচ্য পুস্তকের সমাদর হইয়াছে; কারণ প্রবন্ধ-পুস্তক, বিশেষত শরীরচর্চা সম্পর্কিত কাটখোট্টা রচনা কিনিয়া পড়িবার মত সুনাম আমাদের নাই বলিয়াই জানি। কিন্তু হাওয়া ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। মনের মত করিয়া প্রকাশ করিবার ভঙ্গী এবং আন্তরিকতার ছাপ থাকিলে নীরস রচনাও সকলের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে। আয়রনম্যান সরকার একদিকে যেমন ব্যায়াম অনুশীলনে আবাল্য আত্মনিবেদিত ও ইহার চর্চায় খ্যাতিমান, তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচারের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে সহজ ব্যায়াম, খালিহাতে ব্যায়াম, আসন, বারবেল ব্যায়াম, ব্যায়ামের নিয়ম, আহার, স্নান, ভ্রমণ, ঘুম, উপবাস প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় একসঙ্গে আলোচনা করায় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। লেখকের সুদীর্ঘ অনুশীলনলব্ধ অভিজ্ঞতায় পুস্তকটি সমৃদ্ধ; ইহা বাঙলা ভাষায় লিখিত ব্যায়াম সম্পর্কিত পুস্তকের অভাব অনেকাংশে পূরণ করিয়াছে। ইহা পড়িয়া অভিজ্ঞ ও নবীন সকলেই উপকৃত হইবেন। ১১।৫০

গ্রীন-টাজেডি :—বিনয় চৌধুরী, টারগেট্ বুক্স, ৪৪, ফুলবাগান রোড (ইণ্টালী), কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

গল্প রচনার মধ্যে কোথাও কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কি আখ্যায়িকায়, কি কথোপকথনে, কি চরিত্র সৃষ্টিতে। ছাপা ও কাগজ চলনসই। মলাটেব ছবি ছেলেদের বইয়ের উপযোগী। ৫৭।৫১

পূর্বরঙ্গ—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির; ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা—৮। মূল্য তিন টাকা।

কোন নূতন বাণী শুনিবার আশা না লইয়া, এমন কি কেবলমাত্র সুন্দর ছন্দের ঝঙ্কার শুনিবার আগ্রহেও আমরা কবিতা পড়ি। কিন্তু চাহিদার এই সামান্যতা সত্ত্বেও অমিয়বাবু তাঁহার এই কবিতা-সঙ্কলন দ্বারা আমাদের পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার চিন্তা—চিন্তার কথা বরং বাদ দেওয়াই ভাল,—তাঁহার আবেগ-অনুভূতি অস্ফুট; আধাআধি স্তরে, তাহাকে ছানিয়া মাখিয়া সুডৌল, সুরূপ সামগ্রীতে পরিণত করিতে তিনি অক্ষম। তাঁহার প্রেমের কবিতার কথাই ধরা যাক। মেঘদূত, মনোবাসর, দুঁহু, উপহার প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, পশ্চাতে একটি সরল, সহজ, অকৃত্রিম ভাব আছে, কিন্তু যে অন্তরদৃষ্টি, শৃঙ্খলা, সর্বোপরি নিজেকে আঘাত দিয়া দিয়া সুর বাহির করিবার যে-কৌশল আয়ত্তে থাকিলে কবিরা আমাদের মর্মস্পর্শ করিতে পারেন, অমিয়বাবুর তাহা নাই। 'মহানিষ্ক্রমণ' এবং 'কালতরঙ্গ' কবিতা দুইটি উৎরাইয়াছে। 'পুরুষ' কবিতাটি উঠি-উঠি করিয়াও উপরে উঠিতে পারে নাই। নজরুল ইসলামের কিছুটা প্রভাব অমিয়বাবুর উপর পড়িয়াছে। কিন্তু নজরুলের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁহার শব্দ ও ছন্দের উপর মুন্সীয়ানাটি যদি অমিয়বাবুর থাকিত! ৪৭।৫১

সাভারকরবাদ—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী। প্রকাশক—সাভারকরবাদী পাঠচক্র, বালী রোড, হুগলী। মূল্য দুই আনা।

লেখক সাভারকরের মতবাদ ব্যক্ত করিতে অভিলাষী। কিন্তু তথ্য, যুক্তি এবং চিত্তের স্থৈর্যের অভাবের ফলে বক্তব্য দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। ৪৮।৫১

জনশিক্ষা—(১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৭)—সম্পাদক : ডাঃ পরিমল রায়। শিক্ষা অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার অতীব স্বল্প। ইহা খুবই পরিতাপের কথা। স্বাধীনতা লাভের চতুর্থ বৎসরের পরও শিক্ষিতের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা আরও পরিতাপের কথা। কারণ শিক্ষাহীন জনসংখ্যা রাষ্ট্রের ভার বিশেষ। এই দুঃসহ অবস্থা সমূলে উৎসাদনের জন্য যে বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে তাহা মনে হয় না। কিঞ্চিন্মাত্র যে সরকারী চেষ্টা চলিতেছে তাহারই নমুনা 'জনশিক্ষা' নামক মাসিক পত্র। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে সদাস্বাক্ষর নরনারীর উপযুক্ত রচনায় পূর্ণ করিয়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হইতেছে এবং বিনামূল্যে সমাজশিক্ষাকেন্দ্র ও অন্যান্য সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরিত হইতেছে। সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে কেবলমাত্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিলেই পত্রিকার উদ্দেশ্য সফল হইবে না—প্রত্যেকটি পত্রিকা যাহাতে

পঠিত হয় সেদিকেও সরকারকে অবহিত হইতে হইবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সহজবোধ্য ও সুন্দর। ছাপাও চিত্তাকর্ষক। আরও অধিক পরিমাণে রঙিন ও রেখাচিত্র দিলে পত্রিকাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

বিদ্যার্নাধ পঞ্জিকা—১৩৫৮ সাল, প্রাপ্তিস্থান—সম্বন্ধ নির্ণয় কার্যালয়, ৯৩।৪, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য ৷৷০ আনা।

ছোট পঞ্জিকা। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সব জ্ঞাতব্য বিষয়ই বেশ গোছাইয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ৩১।৫১

রূপান্তর:—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দু টাকা।

বিষয়ভেদে হাসির আকারভেদ আছে। মুচকি হাসি, ওষ্ঠের কোণে হাসির বিজলি ঝলক, বৈদগ্ধজনোচিত মাত্রানুযায়ী হাসি আবার স্বতঃস্ফূর্ত ছাদ কাঁপানো হাসি। বিভূতিভূষণের রচনা এই শেষোক্ত ধরণের হাসির উদ্রেক করে। হাসিতে হাসিতে বেসামাল হইয়া যাইতে হয়। অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টি নয়, কষ্টকল্পিত পরিবেশ নয়, কথার সাহায্যে অনাবিল হাস্যরসের স্রোত এ কেবল বিভূতিভূষণের দ্বারাই সম্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের ইতস্ততঃ প্রকাশিত এগারোটি গল্পের সমষ্টি। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই বিভূতিভূষণের রচনাবৈচিত্র্যের ধারক ও বাহক। কবি কুণ্ডললালের মেঘদূত সমান্তরালভাবে চলিয়াছে কালিদাসের মেঘদূতের সহিত। বিরহী যক্ষের নিবিড় বিরহবেদনাও যেন অলীক হইয়া উঠে, মনে হয় কুণ্ডললালের মেঘকে দূতরূপে প্রিয়ার সকাশে প্রেরণ করার মত বিরহী যক্ষেরও বুঝি কোন বাণিজ্যিক অভিসন্ধি ছিলো। বর্তমান পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে commercialisation-এর ছাপ, প্রেমও যেন means to an end-এর পর্যায়ে পড়িয়াছে। বিভূতিভূষণের ব্যঙ্গ নির্মম কশাঘাত নয়, শাণিত ছুরিকা দ্বারা সামান্য একটু চিরিয়া দেওয়া। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিবার পূর্বেই কাজ শেষ হইয়া যায়। সেই ক্ষত-মুখে পূঁজ আর দূষিত রক্ত বাহির হইয়া আসে।

'ধর্মতত্ত্বে'ও দুধওয়ালা হারুনির ধর্মবোধের অপূর্ব যুক্তিতে পাঠককে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতে হয়। ধর্ম ও ব্যবসার মধ্যে মৌলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা সত্যই হাস্যকর। কিন্তু হারুনির ওই কথাটুকুই শেষ কথা নয়, হয়তো গভীরতর কোন কথার শুরু মাত্র। 'ধর্ম বাঁচিয়ে' দুধে জল মেশানোর চেষ্টা এযুগের পৃথিবীতে মোটেই বিরল নহে।

'ঘৃততত্ত্বে'র মূল কাহিনী মৌলিক নহে, কিন্তু লেখকের প্রসাদগুণে রচনাটি অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। টিনের আগাগোড়া ভেজিটেবল ঘি কেবল উপরে খুরজার এক নম্বর ঘি ছড়ানো, বৈবাহিককে জব্দ করিবার অনবদ্য উপায়; শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির মত মেয়েটিও সতের হাজার টাকার অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া পালকি হইতে নামিল, কিন্তু "সাত চড়েও" কথা বলিল না। বোবা মেয়েটিকে গছাইয়া দিয়া কন্যার পিতা উপযুক্ত প্রত্যুত্তরই দিয়াছেন।

'এক দাগ' ও 'গ্রহস্পর্শ' যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা অদ্ভুত গল্প।

গল্পগুলি শেষ করিয়া বারবার এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, বিভূতিভূষণের বিষয়বস্তু যেমন প্রায়শঃই বাঙালী চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া, তেমনি তাঁহার রসানুভূতি ও হাস্য-পরিহাসের ধরণও সম্পূর্ণ ভেজাল-বর্জিত বাঙালীয়ানার প্রতীক। উন্নাসিক ইঙ্গভাবাপন্ন বাঙালীর ড্রইংরুমী মৃদু-হাস্য নয়, দাওয়ায় শীতলপাটির উপর উপবিষ্ট অনাবৃত বক্ষ মধ্যবিত্ত বাঙালীর বলিষ্ঠ বৈঠকি হাসি। এ হাসি শুধু যে হাসে তাহারই নহে, বাতাসের স্তরে ভাসিয়া এ হাসি ভিনগাঁয়ে ছড়াইয়া পড়ে, ভিনদেশী মানুষকেও মাতাইয়া তোলে।

ছাপা ও বাঁধাই প্রকাশকের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে, কিন্তু প্রচ্ছদপট অলংকরণের বর্ণবিন্যাস আমাদের ভালো লাগে নাই। ৩।৫১

বেতার প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাট্যের বেতার ভাষ্য

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নিয়ে বেতার প্রতিষ্ঠান যে প্রহসন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি। এই নাটকটি বেতারে প্রচার করার উপযোগী (?) করে তুলবার জন্যে নাটকটি সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। বেতার কর্মীরা যে নিজের ভাষায় এই সংযোজন করেনি, তা জানাবার জন্যে তাঁরা বলেছিলেন, তাঁরা 'রাজা ও রাণী'র যে জায়গা অদল-বদল করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই নাকি করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের বানানো কথা দিয়ে নয়। 'রাজা ও রাণী' বেতারস্থ করার জন্যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' থেকে কিছুটা অংশ এখানে এনে জুড়ে দেন। কাজটা যতটা গর্হিত এই কৈফিয়তটা নির্বোধ ঠিক সেই অনুপাতে। বেতারের সেই মহাকবিটি হয়তো এবার তাঁর স্বকীয়তা দেখাবার জন্যে নূতন উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নামে চালিয়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন—যোগাযোগ থেকে কয়েকটি প্যারা, গোরা থেকে কয়েকটি ছত্র এবং শেষের কবিতা থেকে কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে এই নূতন রবীন্দ্র-উপন্যাসটি রচিত। এইভাবে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে এন্তার বই লিখে যাওয়া যেতে পারে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিমাণ পাহাড়প্রমাণ করে তোলাও হয়তো এইভাবে যায়। আমরা বেতারের সেই উর্বর-মস্তিষ্ক পরম বিজ্ঞটির পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত জানতে পারিনি। তাঁর বুদ্ধির এই প্রখরতার জন্যে ও কমনসেন্সের এই প্রচণ্ডতার জন্যে তাঁর পদবৃদ্ধি করা হয়েছে কি না, এই সংবাদটি আমাদের সকলের জানার আগ্রহ হয়েছে। এরূপ মহাপ্রাজ্ঞকে একটি বেতার প্রতিষ্ঠানের অখ্যাত কলমচি করে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। তাঁর পদ ইতিমধ্যে দ্বিগুণিত হয়েছে বলে আমরা আশা করব।

'রাজা ও রাণী'কে পরিবর্তিত পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত বেতার-সংস্করণ করায় বিশ্বভারতীর অনুমোদন ছিল কি না, আমরা এ কথাও জানতে চেয়েছিলাম। সে কথা এবার পরিষ্কারভাবে জানা গিয়েছে। তাঁদের এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ সমর্থন যে ছিল না, তা তাঁরা জানিয়েছেন।

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সংবাদপত্রে এ বিষয় তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে বলেছেন—

> গত ৫ই জানুয়ারী অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক অভিনীত "রাজা ও রাণী"তে যে কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের শিক্ষকগণের নিকট হইতে একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রেও এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর সম্মতি ও মঞ্জুরী ছাড়াই প্রক্ষিপ্ত বিষয়গুলি যোগ করা হইয়াছে। বিশ্বভারতী অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের ডাইরেক্টারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিও আরও সতর্কতা অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা তাঁহাদিগকে ইহা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছি যে, এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অবতারণার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না এবং তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

বিনা মঞ্জুরীতে এভাবে প্রক্ষিপ্ত বিষয় যোগ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আজ কোথায়? এ বিষয় তাঁদের তরফ থেকে কিছু বলার আছে কিনা—সে কথা সকলে জানবার জন্যে আগ্রহী। বেতার-প্রতিষ্ঠান যে অন্যায় করেছেন এবং করছেন, তার জন্যে তাঁরা অনুতপ্ত হয়েছেন বলে মনে হয় না। হঠাৎ কোনো ভুলের জন্যেই মানুষ অনুতাপ করে; বেপরোয়াভাবে যে কাজ করা হয় তার জন্যে অনুতাপ বড় একটা করা হয় না। কিন্তু অনুতাপের প্রশ্ন এখানে উঠছে না। তাঁরা এভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে যথেচ্ছাচার শুরু করেছেন কেন, এর পিছনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে কিনা, এই কথাটাই সকলে জানতে চায়। Fools rush in বলে একটা কথা আছে, সেই কথাটাই আমাদের বারবার মনে পড়ছে। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানী ও গুণী তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিটি কথার অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন; একটা কমার বদলে একটা সেমিকোলন বসাতে তাঁদের পাঁচবার চিন্তা করতে হয়, দশজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। কিন্তু এঁরা কারো ধার ধারেন না; এঁরা বিশ্বভারতীর কাছে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করাও সমীচীন মনে করেন না। বিশ্ববিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছেন। এঁদের অপদার্থ বললে আদর করা হয়; এঁদের যে বিশেষণে অভিহিত করা সঙ্গত তা হয়তো অভিধান ঘেঁটেও পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বেতার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিভাবে অবহেলিত হচ্ছে তার হিসাব এর আগে আমরা দিয়েছি। তাসের দেশ পুরো অভিনয় করতে যতটা সময় দরকার, ততটা সময় তাঁরা দিতে পারেন না ও পারেননি; সময়ের এত টানাটানি কেন? সেই সময়টা হয়তো কোনো উচ্চাঙ্গের অশ্রাব্য আধুনিক গান গাইয়ে খরচ করা হয়। সরকারী অর্থ অপচয় হচ্ছে অনেক ভাবে, এই অভিযোগ অনেক শোনা যায়। এবং তার প্রতিবাদও হয়। কিন্তু কলকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান যেভাবে অর্থের অপচয় করছেন, তার হিসাব একবার খতিয়ে দেখা উচিত। অশ্রাব্য ও কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান দিয়ে তাঁরা সরকারী অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন। যে অর্থ এই বাবদ খরচ হচ্ছে তার অর্ধেক অর্থের দ্বারা এর চেয়ে অনেক রুচিপূর্ণ ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়।

জনতা যা চায় বেতার তাই পরিবেশন করবে—এমন কোনো গণতান্ত্রিক যুক্তি দেখানো চলে না। বেতারের কর্তব্য হচ্ছে জনরুচি উন্নত করা। এই জন্যে শোভন ও রুচিপূর্ণ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান দিয়ে জনচিত্তের চাহিদা বাড়াতে হবে। টোকো আম খাওয়াই যার অভ্যাস, তাকে কেবল টক আম জুগিয়েই চললে চলবে না; তাকে জানাতে হবে এর থেকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যও সংসারে আছে।

কিন্তু বেতার সেদিকে মন দিচ্ছেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। যাঁদের ওপরে অনুষ্ঠান প্রণয়নের ভার আছে, তাঁরা নিজেরাই রুচিবোধহীন। তাঁরাও অজ্ঞ জনতারই অঙ্গ। জনরুচি উন্নত করার ভার পড়েছে তাঁদেরই ওপর। মারাত্মক ট্র্যাজিডি তো ঘটে গেছে এইখানেই। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে, সেই সরষেই যে ভূতগ্রস্ত।

চুটকি নাটকের জন্যে যতটা সময় বরাদ্দ করা হয়, রবীন্দ্র-নাটকের জন্যে এই কারণেই সময়ের বরাদ্দ হয় তার চেয়ে অনেক কম। অনুষ্ঠান-রচনাকারীরা নিজেরাই রবীন্দ্র-নাটকের রস গ্রহণে সমর্থ নন, তাঁদের কাছে এ সব নাটক নীরস ঠেকে; এই কারণেই তাঁরা তাঁদের পছন্দ মত নাটকের জন্যে সময় খরচ করতে কৃপণতা করেন না।

এ সব বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া আবশ্যক হয়েছে। জনকয়েক কলমচির উপর বাঙলার সঙ্গীত ও সাহিত্যকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। যদি এইভাবে এসব বিষয় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা হয়, তাহলে এর পরিণাম কি হবে, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অচিরেই তাহলে আমরা বেতারের কোনো কলমচি-মহাকবি রচিত এমন রবীন্দ্র-নাট্য শুনতে বাধ্য হব—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যা শুনলে হার্টফেল করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান, তিনি তিরোহিত। হার্টফেল করার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরই—এই বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে।

রঙ্গজগৎ

প্রমোদ জগতের অচল পরিচ্ছেদ

বাঙলার রঙ্গজগতে বেশ একটা নৈরাশ্যের হাওয়া বয়ে চলেছে। নাচ গান নাটক ছবি কোনটাই কোথাও জমতে পারছে না, অথবা এমনও হতে পারে যে জমতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা, উদ্যোক্তারা, গাইয়ে নাচিয়ে নাট্যকে প্রভৃতি শিল্পীরা দেশের লোকের রুচি, পৃষ্ঠপোষণস্পৃহা ও শিল্পের আদর-প্রবৃত্তির অভাব ঘটেছে বলে দোষ দিচ্ছে; দেশের লোকে দায়ী করছে অনুষ্ঠান-অবদান-গুলির নিকৃষ্টতাকে। একদল, প্রমোদাদি ব্যাপারে সরকারী নিস্পৃহতাকে মিইয়ে পড়ার কারণ বলে ধরে নিতে বলছে; আবার আর একদল তথ্য-তল্লাসের খতিয়ান তুলে ধরে রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আরও কতক ইক্‌প্রত্যয়যুক্ত কারণকে প্রমোদ আহরণে ও প্রমোদ বিতরণে দুদিকেরই নিরুদ্দীপনার হেতু বলে মেনে নিতে বলছে। হয়তো ঐ সবকটা হেতুই কারণ, কিংবা ওর কোনটাই হেতু নয়। কিন্তু রঙ্গজগতে অসাড়ত্বের ঠাণ্ডাটা এসে বিঁধছে সবায়েরই গায়ে। মনভরা কোন অবদান পাওয়াই যায় না, আবার দৈবাৎ যদি পাওয়া যায় তো তার মোটে আদরই হয় না। অত্যন্ত জঘন্য একটা কিছু হাজির করে তা গৃহীত ও আদৃত না হওয়ার জন্যে দেশের লোককে গাল দেওয়া হচ্ছে, আবার একটা মনদোলানো কিছু পেলেও তাকে স্বীকৃতি দান করতে উৎসাহ দেখা যায় না কারুরই। রঙ্গজগতের এ এক বিচিত্র পরিচ্ছেদ এখন।

"রত্নদীপ" নিয়ে রসিকদের যতটা মেতে যাওয়া উচিৎ তা দেখা যাচ্ছে না। "ছিন্ন-মূল"কে কেউ আমলই দিলে না। "বরযাত্রী"কে সবাই হেসেই উড়িয়ে দিতে (অথবা উঠিয়ে দিতে) চাইছে। জাতীয় নাট্য পরিষদ, বহু-রূপী প্রভৃতিদের প্রতিভাকে কেউ গ্রাহ্যই করতে চাইছে না। অপরদিকে দেখা দিচ্ছে "রূপান্তর", "ভৈরব মন্ত্র", "জিঘাংসা" "সংকেত", "নিয়তি" প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বিকৃত ও বিকৃত অপমানুষদের নিয়ে জৌলুষ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। ছবিকে "কাপুরুষদের জন্যে নয়" অর্থাৎ অতি ভয়াবহ ব্যাপার, অথবা "কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" অর্থাৎ নীতি-বিগর্হিত ব্যাপার বলে ঘোষণা করে বাহাদুরী দেখাবার ঝোঁকও দেখা দিয়েছে ব্যাপকভাবে। আর ওদিকে মঞ্চেতে দেখা যাচ্ছে ইটের পাশ ফিরিয়ে ইমারতের চেহারা বদলানোর ফেরফার।

সেই "চাঁদসদাগর", "সিরাজউদ্দৌলা;" সেই "চন্দ্রনাথ", "চরিত্রহীন"। ছবির জন্যে আমরা পিছন দিকে ছুটে চলেছি বঙ্কিমযুগে, এমন কি তার চেয়েও পিছনে, একেবারে দীন-বন্ধুর আমলে। মঞ্চের বেলাতেও পিছন পথে গিরিশের আমল, কি তার চেয়েও পুরণো যুগের দিকে ঝোঁক পড়ছে। সামনের দিকে যেনো পথ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিংবা সামনের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—খুঁজে নিতে চাইছেও না যেনো কেউ।

একটা অনপসরণের গণ্ডী যেনো দেশের সমগ্র প্রমোদ জগতটাকেই অনড় করে রেখে দিয়েছে। প্রমোদ-স্রষ্টা ও শিল্পীদের সবাই আটক পড়ে গিয়েছে তার মধ্যে। কেউই ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, হয়তো পারছে না বলেই। নতুনের উদয়ও নেই কোনটির বেলায়, উদয়নের আভাসও নেই। চিরকাল ধরে যাদের দেখে ও শুনে আসছে সবাই—সেই দেবকী বসু, নরেশ মিত্র, প্রফুল্ল রায়, মধু বসু, হেমচন্দ্র, শৈলজা-নন্দ—সেই অহীন্দ্র, ধীরাজ, জহর, ছবি, মলিনা, চন্দ্রা কানন—সেই পঙ্কজ, রাই, কমল, সুবল, রবীন—সেই হেমন্ত, ধনঞ্জয়, গিরীন, জগন্ময় প্রভৃতিরা সব আজ সৃজনী শক্তির ভাঁটার মুখে এসে পড়লেও তাদের হাত থেকে হাল কেড়ে নেবার মতো শক্তিমান আসছে না কোন। পুরানোরাই রয়ে গিয়েছে তাদের বীত-যুগের প্রতিভা নিয়ে আর তারা টানছে এবং

টেনেও রেখে দিতে চাইছে সবকিছুকে তাদের সেই পুরণো আমলেই। না কোন নতুন স্রষ্টা, আর না লোকের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার মতো নতুন কোন সৃষ্টি! কিন্তু এই আড়ষ্টতাকে সহ্য করে যাওয়া চলতেই বা পারে কি করে?

প্রমোদ উপাদান দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির আয়না। সেদিকে সৌন্দর্য, মোহনীয়তা ও সত্যদৃষ্টির প্রতিফলন দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির মহিমাকেই ফুটিয়ে তোলে। আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি তো সত্যিই ভোঁতা নয় যে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে যাবে! পৃথিবীর বিচারে আমাদের দেশ কৃষ্টিসম্পদে মহান গৌরবেরই আসন পায়। তাহলে বুঝতে হবে যে কোথাও যেনো কি একটা আটকাচ্ছে—সে প্রতিবন্ধকটা কি?

ঐন্দ্রজালিক দেবকুমার

তরুণ ঐন্দ্রজালিক দেবকুমার ঘোষাল, কিছুদিন পূর্বে যিনি চোখবাঁধা অবস্থায় ব্যারাকপুর এবং বাঙলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য বহুস্থানে মোটর বাইক চালিয়ে প্রভূত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি প্রখ্যাত উদ্যোক্তা ধীরেন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় আগামী ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তার অন্যান্য বিস্ময়কর যাদুখেলা প্রদর্শন করবেন। আগামী প্রদর্শনীতে দেবকুমার করাতের সাহায্যে নারীকে দ্বিভক্ত করার আশ্চর্যজনক খেলাটিও দেখাবেন।

যাদুবিদ্যায় প্রাচ্যের যে সুনাম আছে, অল্পবয়স্ক হলেও দেবকুমার কৃতিত্বে তা সমুজ্জ্বল রেখেছেন।

জাতীয় নাট্য পরিষদের নতুন অবদান

গত ৪ঠা ও ১১ই মার্চ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে জাতীয় নাট্য পরিষদ দুটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করে—"শেয়াল পণ্ডিতের দেশে", ছোটদের জন্যে বাংলা নাটক, আর 'সমস্যা', হিন্দী নাটক। দুখানি নাটকেরই রচয়িতা ও পরিচালক হলেন তরুণ রায়।

যুগের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে জাগিয়ে রেখে অতি বলিষ্ঠ এবং প্রগতিশীল যে কয়েকটি নাট্যধারা বাংলা তথা ভারতের মঞ্চকে প্রাণসম্পদে ভরিয়ে তোলার সম্ভাবনাকে সার্থক করার দিকে তলে তলে এগিয়ে চলেছে জাতীয় নাট্য পরিষদ তাদেরই অন্যতম। বাঁধাধরা মঞ্চের সঙ্গে এ দলের কারুর কোন যোগ নেই, তাই চিরাচরিত পথ ছেড়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং নতুন পরীক্ষার দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে পেরেছেন। এদের ভাব ও ও সুর নতুন এবং লোককে তা মাতিয়ে তোলার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। জাতীয় নাট্য পরিষদ হঠাৎ খেয়ালী সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় নয়। বাংলার মঞ্চকে নূতন প্রাণধারায় আপ্লুত করে তোলার ব্রতকে সফল করার একটা অদম্য উৎসাহ ও অপরিমিত নিষ্ঠার পরিচয় তাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

পরিষদের বৈচিত্র্য আনার একটি বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে পরিষদ কুমার সম্ভব, অভিনয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমপর্যায়, রূপকথা ও ক্ষুধিত পাষাণ মঞ্চস্থ করেছেন, প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন টেকনিকে, ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জায় এবং প্রত্যেকটি ভিন্নতর বিষয়বস্তু নিয়ে এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন একটার ছাপ আর একটার ওপর গিয়ে পড়েনি। এদের প্রত্যেকটি অবদানেরই আকর্ষণ স্বতন্ত্র।

'শেয়াল পণ্ডিতের দেশে' ছোটদের জন্যে লেখা নাটক এবং আগাগোড়াই ছোটদের দিয়ে অভিনয় করানো। নাটক হিসাবে রচনাটি পরিপুষ্ট নয়, কিন্তু যাদের জন্যে এবং যে বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটির রচনা সে বিষয়ে নাটকখানি একটি সার্থক সৃষ্টি বলতে পারা যায়। অজানার অভিযানে ছোটদের

প্রেরণা দেওয়া, তাদের সাহসী ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষা দেওয়া, ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা, ও শিক্ষাকে প্রসারিত করা, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং আর্ত ও নির্যাতিতকে রক্ষায় বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া, এই সবেরই প্রেরণা জাগিয়ে তোলার মতো করেই ঘটনাবলী সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে।

গল্পের নায়ক হচ্ছে ছোট্ট অশোক। ছোট-কাকার শাসনে উদ্ব্যস্ত হয়ে সে তার ছোট্ট দুই দিদিকে সঙ্গে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পৌঁছয় এক জংলী রাজ্যে। সেখানকার রাজা আর রাজকন্যা ওদের আশ্রয় দান করলে। পরিবর্তে এরা সে রাজ্যের লোককে লেখাপড়া নাচ-গান শিখিয়ে মানুষ করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলে, কিন্তু তাদের বাধা দিতে আরম্ভ করলে রাজ্যের মন্ত্রী শেয়াল পণ্ডিত। সে রাজ্যে এক ভয়ানক দস্যু ছিলো রঘুডাকাত; তার ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত দেখে অশোকরা তাকে হত্যা করার সংকল্প করলে। অশোকদের মহত্ত্ব দেখে পরীরাণী বিদ্যেধরী তাদের কাজে সহায়ক হলো। অবশেষে অশোকের চেষ্টায় সবাই একতাবদ্ধ হয়ে এবং বিদ্যেধরীর মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে ওরা রঘু ডাকাতকে মেরে ফেললে; তখন তার ছদ্মবেশ খুলতে দেখা গেলো যে, রঘুডাকাতই হচ্ছে শেয়াল পণ্ডিত নিজে। এর পর রাজ্যে শান্তি ফিরে এলো।

রচনায় যথেষ্ট ত্রুটি থাকলেও বিন্যাস গুণে এবং ছোটদের প্রায় সবায়েরই চমকপ্রদ অভিনয়নৈপুণ্য নাটকখানিকে একটি স্মরণীয় অবদানে পরিণত করে তুলেছে। শুধু ছোট-দেরই নয়, বড়দের মনেও সাড়া জাগিয়ে তুলবে। নাটকে চরিত্রগুলির নামকরণ হয়েছে শিল্পীদের আসল নাম মিলিয়ে। তাতে শিল্পী-দের মধ্যে আত্মচেতনা জাগিয়ে চরিত্রের সঙ্গে মিশে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; অভিনয়ও হয়েছে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত। অভিনয়ে বিশেষ করে নাম করতে হয় অশোকের ভূমিকায় অশোক দাশগুপ্ত; ছন্দা, কৃষ্ণা ও রত্নার ভূমিকায় যথাক্রমে ছন্দা রায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রত্না সেন; বন্য রাজকুমারীর ভূমিকায় বনশ্রী ঘোষ, এর গানের গলাটি বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়; শেয়াল পণ্ডিতের ভূমিকায় বুলা দাস; কিন্তু সবাইকে বোধ হয় ছাপিয়েই গিয়েছে হাবাবোকা অনুচর ভুৎনীর ভূমিকায় অশোকা দত্ত। বাকীদের মধ্যেও অভিনয় কারুরই নিন্দনীয় নয়। এরা সবাই আট দশ বারো বছর বয়সের কিন্তু অভিনয়ে পাকা শিল্পীদের মতোই কৃতবিদ্য। অর্থাৎ এ থেকেই বোঝা যায়, পরিচালক তরুণ রায়েরই কৃতিত্ব। দৃশ্য ও সাজসজ্জা এবং আলোক-সম্পাতে নীলিমা বড়ুয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা এখনকার পেশাদার মঞ্চকেও হার মানিয়ে দেবার মতো; চমৎকার একটা নতুনত্বের রেশ ফুটে উঠেছে। নাচ ও গানের দিকেও আকর্ষণ কম নয়। গানের ক্ষেত্রে সংগত বেশী জোর হয়ে পড়ায় কথা অনেক সময় জড়িয়ে গিয়েছে, এ ত্রুটি সংশোধন করা যাবে। 'আইস-ক্রীম'-এর গানটার সুর সম্প্রতি প্রদর্শিত এক-খানি হিন্দী ছবির গান থেকে নকল করা—এতে মৌলিক একটা সুর যোজনায় বাধা ছিলো কোথায়?

নতুন অবদানের দ্বিতীয়টি হচ্ছে হিন্দী নাটক 'সমস্যা'। হিন্দী বলতে গলাবাজী আর 'বাহাদুরকা খেলা' যা বুঝিয়ে আসছে চির-কাল এ নাটকখানি তার ব্যতিক্রমই শুধু নয়, এখানি সমস্ত দিক থেকেই বাংলা নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতাসম্পন্নও। অবশ্য 'সমস্যা'-কে ঠিক নাটক বলার চেয়ে এখনকার মধ্যবিত্ত জীবনের একটা রেখা-চিত্র বলাই বোধ হয় সমীচীন হবে।

কাহিনীটির প্রবাহকাল হচ্ছে মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা। বহুবিধ সমস্যা সঙ্কুল মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের বাস্তব রূপ। বড়ো ছেলে সুরেশই কেবল চাকরী করে; বাবা মা, বিবাহযোগ্যা ভগিনী, ছোট ভাই, স্ত্রী, সন্তানসন্ততী তো পোষ্যের মধ্যে আছেই, তাছাড়া আছে যক্ষ্মা-গ্রস্তা ভগিনী। ছোট ভাই তথাকথিত কম্যু-নিস্ট দলের কর্মী; দলের কাজের জন্যে সে বাড়ির দিকে ফিরেও চায় না, এমন কি অনটন জেনেও রুগ্না ভগিনীর চিকিৎসার জন্যে রাখা টাকাও আত্মসাৎ করে। ভগিনীর বিবাহের যৌতুক সমস্যা। কালোবাজার। চোরা কার-বারী। উপকারিণীর নামে কুৎসা রটনা। জীবন নিয়ে ডাক্তারদের ছিনিমিনি খেলা। ইত্যাদি এখনকার দিনের যাবতীয় সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে সাতটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে।

এ নাটকখানিরও উপস্থাপন কৌশলে যথেষ্ট অভিনবত্ব প্রকাশ লাভ করেছে। রেডিওর সাহায্যে গানের উপস্থাপনটা প্রথমে লোককে সত্যিই রেডিও বলে চমকে দেয়; নাটকের দৃশ্যের সঙ্গে এমন স্বাভাবিকভাবে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। একটি দৃশ্যে চিঠি পড়ার ব্যাপারে মঞ্চের এক কোণে পত্ররচয়িতাকে আধা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার মুখ দিয়ে বলিয়ে যাওয়ার কৌশলটিও অভিনব এবং মনোজ্ঞ। শেষ দৃশ্যে কম্যুনিস্ট ভাইয়ের অন্তঃপীড়নকেও দুটি কণ্ঠের অবতারণা করে বেশ নাটকীয় করে তোলা হয়েছে। এ সমস্তে এইটেই প্রকাশ পায় যে, পরিচালক নাটক উপস্থাপনে নতুন কিছু দেবার চেষ্টাকেই সর্বদা মনে জাগিয়ে রেখেছেন এবং তিনি অসাধারণ সাফল্যও লাভ করেছেন।

'সমস্যা'-র অভিনয় শিল্পীরাও সবাই আনকোরা নতুন। কিন্তু চরিত্রগুলির রূপায়ণে তাদের সবাইয়ের আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। সুরেশকে একটি বাস্তব জীবন্ত চরিত্রে রূপায়িত করে তোলার জন্যে ভঁওরমল সিংঘীর কৃতিত্ব সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অন্যদের মধ্যে প্রমীলার ভূমিকায় বিজয়া মেহতা, দিদির ভূমিকায় প্রতিভা অগ্রওয়াল, পুষ্পার ভূমিকায় সুশীলা ভাণ্ডারী, উপকারি বন্ধু বিজনের ভূমিকায় গোবিন্দ কানোরিয়া, শেঠ ও পকেটমারের ভূমিকায় যথা-ক্রমে বনওয়ারীলাল নিমানী ও তরুণ রায়ও প্রশংসা লাভ করবেন। শিল্পীদের সকলেই চরিত্রগুলির মধ্যে নিজেদের যে কিভাবে মিশিয়ে ফেলেছিলেন তার উদাহরণ হলো, শেষ দৃশ্যে রুগ্না ভগিনীর মৃত্যুর পর সুরেশের পত্নী সবিতার ভূমিকাভিনেত্রী সুশীলা সিংঘীর স্বতঃস্ফূর্ত কান্নায় ভেঙে পড়া দেখে। তিনি নিজেকে এতোই হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, দৃশ্যটি শেষ হবার পরও প্রকৃতিস্থ হতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে-ছিলো। নাটকখানির শেষ দৃশ্যটি সব দিক থেকেই একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

জাতীয় নাট্য পরিষদের কৃতিত্বের মূলে রয়েছে দলের সবায়ের যত্ন, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, আর এরই জোরে তারা নবনাট্য-ধারাকে সার্থক করে তুলতে পারার আশ্বাস দিতে পারছেন, তাই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি-গুলিকে এ আলোচনায় প্রশ্রয় দেওয়া গেলো না।



খেলাধুলা

হকি

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইতে এখনও অনেক দেরী আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া কাস্টমস, মোহনবাগান ও ভবানীপুরে এই তিনটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই তিনটি দলই এই পর্যন্ত অপরাজিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা খুবই কঠিন। অনেকেই মনে মনে আশা রাখেন গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান কাস্টমস পুনরায় অর্জিত গৌরব রক্ষা করিবে। আবার কেহ কেহ মনে মনে কল্পনা করিতেছেন, মোহনবাগানের সাফল্য। ভবানীপুর সমানে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করা সত্ত্বেও কেহই এই দলের সাফল্য সম্পর্কে কোনরূপ কিছু অভিমত প্রকাশ করেন না। ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এই তিনটি দলের মধ্যে যে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইলেই আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিব না। আমাদের একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য হইতেছে হকি খেলার মানের বা স্টান্ডার্ডের দিকে, চ্যাম্পিয়ানসিপের দিকে নহে। এই সম্পর্কে আমরা খুবই হতাশ হইয়াছি। ভারত হকি খেলায় বিশ্বের চ্যাম্পিয়ান গত ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হইয়াছে সত্য, ১৯৫২ সালে হইবেই এইরূপ আশা বা ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাঙলার হকি স্ট্যান্ডার্ড বা মান যে স্তরে উপনীত হইয়াছে তাহা দ্বারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসিপ রক্ষা করা অসম্ভব। কেহ কেহ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিবেন "পাঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যের হকি খেলা না দেখিয়া এইরূপ হতাশপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করা খুবই অনুচিত হইতেছে।" ইহার উত্তরে আমরা বলিব সকল রাজ্যের হকি খেলার মান বা স্ট্যাণ্ডার্ডের খবরাখবর আমরা রাখি এবং সেই সকল বিচার করিয়াই উক্ত অভিমত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। বাঙলার তথা ভারতের হকি খেলার পরিচালকমণ্ডলী কেবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যে কর্তব্য কর্ম শেষ করিতেছেন তাহা করিলে যে ভবিষ্যৎ ফল ভাল হইবে না ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। ১৯৫২ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠান ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি শহরে হইবে জুলাই মাসে সুতরাং এখনও অনেক দেরী আছে ইহা মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতের মান, সম্মান ও অর্জিত গৌরব যাহাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ফুটবল পরিচালক-মণ্ডলী যেভাবে বাছাই খেলোয়াড়দের একত্র করিয়া শৈলাবাসে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন হকি খেলা বিষয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া বিশেষভাবেই প্রয়োজন আছে।

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা

হেলসিঙ্কির অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীর বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এইবারের অনুষ্ঠানে কেবল ১৩টি দেশের প্রতিনিধি দলকেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক দলকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে ইহাতে অন্যান্য দেশ হইতে বিশেষ আপত্তি উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে পরিচালকমণ্ডলীর দল গঠন সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপের দলসমূহ গঠিত হইবে ১৬ জন খেলোয়াড় লইয়া আর ইউরোপের বাহিরের দলসমূহ গঠন করিবে ১৮ জন খেলোয়াড় লইয়া ইহা পরিচালকমণ্ডলী কিরূপে নির্দেশ দিলেন বুঝিতে পারা গেল না। সকল দেশের জন্যই এক নিয়মই প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল। ১১ জন খেলোয়াড় লইয়া যখন একটি দল গঠিত হইয়া থাকে তখন আহত ও অসুস্থ খেলোয়াড়ের স্থান পূরণের জন্য অতিরিক্ত পাঁচজন খেলোয়াড় দলে থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা অপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক খেলোয়াড় আনিতে সুবিধা দেওয়া কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের কোনরূপ সুযোগ বা সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবার যথেষ্ট কারণ হইতে পারে।

ফুটবল—

বাঙলার ফুটবল মরশুমের খেলা আরম্ভ হইতে দেরী থাকিলেও বিভিন্ন দলের পরিচালকদের দল গঠন বিষয়টি বেশ কিছু উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। ২৬শে মার্চ ছিল স্থানীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের আবেদন করিবার শেষ দিন। এই দিন ও ইহার পূর্বে কয়েকদিন আই এফ এ অফিসে ও তাহার আশে-পাশে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে এইটুকু বলা চলে যে, ফুটবল মরশুমে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও উত্তেজনা মাঠে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। জয়-পরাজয় লইয়া হাতাহাতি ও মারামারিরও কোন অন্ত থাকিবে না। এমন কি অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে আরও অধিক সংখ্যক অ-বাঙালী খেলোয়াড়কে বিভিন্ন বিশিষ্ট দলে খেলিতে দেখা যাইবে। স্থানীয় খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের আবেদন পত্রের সংখ্যা শেষ দিনে দাঁড়াইয়াছিল ৩৮৭টি। কয়েক বৎসরের মধ্যে এত অধিক আবেদনপত্র দাখিল করিতে দেখা যায় নাই। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের বাঙলার মাঠে খেলিবার আবেদনপত্রও যে অন্যান্য বৎসরে সংখ্যাকে অতিক্রম করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই কানাঘুষা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে, কোন কোন বিশিষ্ট দলের পরিচালক—বর্মা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ হইতে ফুটবল খেলোয়াড় আমদানী করিবার জন্য বিমান-যোগে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙালোর, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বাঙলার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ খেলোয়াড় লইয়া রীতিমত লড়াই করিতেছেন ইহা বলাই বাহুল্য। এই সকল সংবাদ শ্রবণে অনেকেই উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা কেবল চিন্তা করিতেছি বাঙলার ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের কি শোচনীয় অবস্থা হইবে। গত বৎসরেও তাঁহারা যেরূপ বিভিন্ন বিশিষ্ট দলে খেলিবার সুযোগ পাইয়াছে এইবারে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে আমদানী করা অ-বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণের সংখ্যা বাঙলার মাঠে বৃদ্ধি পাইয়া বাঙলার তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়দের সকল আশা ও ভরসার পথ রুদ্ধ করিবে অথচ তাঁহারা তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিবেন ইহা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের যুব-সমাজের শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। কিন্তু বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ সেই উদ্দেশ্য হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কেবল দলের ও ক্লাবের সুনাম ও গৌরব বৃদ্ধিই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কি মোহিনী শক্তি ইহাদের আছে, আমরা বুঝিতে পারি না যে, গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই প্রথা বন্ধ করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াও কি খেলোয়াড়, কি দর্শক, কি পরিচালক কাহারও সহানুভূতি বা সাহায্য পাই নাই। সকলেই গতানুগতিক প্রথার প্রবল স্রোতে ভাসিয়াই চলিয়াছেন। নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। দেশের মাঠে দেশের ছেলেরা সুনাম ও গৌরব অর্জন করুক এই ইচ্ছা বা আশঙ্কা ক্ষণিকের জন্যও ইহাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয় না ইহা সত্য সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। ১৯৩৩ সালের কথা আজ স্মরণে জাগিতেছে ঐ বৎসর কয়েকটি বিশিষ্ট দলকে আমদানী করা খেলোয়াড় লইয়া দল গঠন করিতে দেখিয়া আমরা ভবিষ্যৎবাণী করি "বাঙলার ফুটবল মাঠ অ-বাঙালী খেলোয়াড়দের সুনাম ও গৌরবের একমাত্র স্থান হইবে।" আমাদের সেই উক্তি এখন অনেকেরই বিস্ময়ের কারণ হয়, কিন্তু বর্তমানে কি তাঁহারা উহার সত্যতা ও প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইতেছেন না?

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন

সম্প্রতি কটকে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। এই সভায় আগামী বৎসরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাঁহারা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে ছিলেন তাঁহারা পুনরায় নির্বাচিত না হওয়ায় অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন "এতদিন পরে নূতন কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইলেন।" কিন্তু আমরা জানি এই নির্বাচনের পশ্চাতে কি গূঢ় রহস্য লুক্কাইত আছে। সকল কিছু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই তবে এইটুকু বলিতে পারি, ভারতীয় ফুটবল খেলায় ইহাতে বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না। যাঁহারা "ওরফে" ছিলেন তাঁহারাই সর্বময় কর্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন মাত্র—নির্বাচন পর্ব একটি বিরাট প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নহে। সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ কি ইহা লক্ষ্য করেন যে, একব্যক্তি যাহার সকল কর্ম-ক্ষেত্র বাঙলায় তিনি বিহারের প্রতিনিধি হিসাবে ফেডারেশনের সভায় যোগদান করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন? মুখোস বদলাইতে যাঁহাদের তিলটুকু দ্বিধা বোধ হয় না তাঁহাদের যত বড় পদে অধিষ্ঠিত করুন না কেন তাঁহারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ সকল সময়ই দেখিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কোন ব্যক্তি বিশেষকে হীন প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা উল্লেখ না করিয়া আমরা পারি না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—গতকল্য সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের নিকট একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়া যাইবার ফলে একজন লোক নিহত ও ১১ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন খড়্গপুর রেলওয়ে হাসপাতালে নীত হওয়ার সময় মারা গিয়াছে।

পাকিস্থান সশস্ত্র পুলিশ ও আন্সার দল জলপাইগুড়ি জেলার ভারতীয় এলাকার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং উহার কিছুটা জায়গা দখল করে বলিয়া কলিকাতায় এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিহার রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গত মাসে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনশনে মৃত্যুর কয়েকটি সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু সরকারীভাবে এই সংবাদগুলি সমর্থিত হয় নাই।

'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি গৃহীত আদম সুমারী অনুযায়ী পাকিস্থানের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হইতে ৭ কোটি ৭০ লক্ষের মধ্যে। এই জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন পূর্ব পাকিস্থানের বাসিন্দা।

২০শে মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তাবিত অনধিকারী উচ্ছেদ বিলের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যদি কোন প্রকৃত উদ্বাস্তু কোন দখলীকৃত জমির উপর নিজের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং ঐ জমির মূল্য যদি অত্যধিক না হয়, তাহা হইলে উক্ত উদ্বাস্তুর স্বার্থে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে ঐ জমি দখল করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্য সরকারের বাজেট আলোচনার পরিসমাপ্তি দিবসে রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাতের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর সংক্রান্ত বিতর্ক-কালে বিরোধী পক্ষ হইতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের পরিচালনায় অর্থের অপব্যয়, অযোগ্যতা ও মন্ত্রিগণের স্বজন ও আশ্রিত-পোষণের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইলে পুনরায় পরিষদে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অদ্য বারাণসীতে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকট মাঝিরা সাতটি গলিত মৃতদেহ তুলিয়া আনে। এই মৃতদেহগুলি গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া আসে। মৃত ব্যক্তিদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

২১শে মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি সতেরজনের সদস্যের এক সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। বিরোধী পক্ষ হইতে শ্রীদেবেন সেন গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমান কর্পোরেশনেও নানারূপ দুর্নীতি, ঘুষ ও অনাচার চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁন অদ্য পাক-পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, গত ৯ই মার্চ তিনি লাহোরে যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কম্যুনিস্ট আদর্শে গভর্নমেন্ট গঠন করিয়া দেশে সামরিক এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

বাস্তুহারা উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অদ্য ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে উদ্বাস্তুদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। উহাতে প্রস্তাবিত অনধিকারী উচ্ছেদ বিলের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ইহার প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। শ্রীযুক্তা লীলা রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

২২শে মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কোন বন্দীকে প্রহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সর্বস্তরের পুলিশ কর্মচারীর উদ্দেশ্যে এই মর্মে আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, থানা হাজতে থাকিবার সময় ধৃত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা এবং পূর্ববঙ্গের কুষ্ঠিয়া জেলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি স্থান সম্পর্কে যে বিরোধ ছিল, উক্ত সীমান্তে সীমারেখা নির্ধারণের কার্য সমাপ্ত হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি হস্তান্তরিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সীমা নির্ধারণের ফলে জয়নগর মৌজাটি পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উহার অপর তিনটি সংলগ্ন গ্রাম ভাটুপাড়া, বেতাই এবং লালবাজার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে। জয়নগর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এলাকাধীন এবং শেষোক্ত তিনটি গ্রাম পাকিস্থান দখল করিয়া লইয়াছিল।

২৪শে মার্চ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার সহিত সহযোগিতার জন্য গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, পৃথিবীর অনেক দেশ আজ অপরকে স্বমতে আনয়নই তাহাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে। এই মনোভাবে যদি বাধা দেওয়া না হয়, তবে বৃহৎ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে এবং মানবজাতির জীবনে বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশ্রীপ্রকাশ অদ্য পার্লামেন্টে এক বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়া বলেন যে, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বেরিল ও মোনেজাইট প্রভৃতি আণবিক শক্তি-উৎস খনিজ সম্পদসমূহ দেশের কোথায় কোথায় রহিয়াছে এবং উহাদের পরিমাণই বা কত, তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি কমিশন দেশের সর্বত্র অনুসন্ধানকার্য চালাইতেছেন।

মিঃ এম এ খুরো অদ্য রাত্রে সিন্ধুর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে পাকিস্থান জাতীয় নারী রক্ষিবাহিনীর অধিনায়িকা মিস্ খাঁকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে।

২৫শে মার্চ—অদ্য রামলীলা ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে।

গত শুক্রবার বেরিলী জিলার কেশবপুর নামক গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে রং দেওয়ার ফলে এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ৭ জন নিহত ও ২০ জন লোক আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর টহলদার দল পাঁচটি স্থানে মূল বাহিনী অপেক্ষা ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দিকে কয়েক মাইল বেশী অগ্রসর হইয়াছে। মূল বাহিনী অক্ষরেখার ১৭ মাইল দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অদ্য কম্যুনিস্টদের বিমান বিধ্বংসী কামানের বৃহত্তম সমাবেশ হয় এবং ঐগুলি হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর বিমানবহরের উপর গোলা বর্ষিত হইতে থাকে।

২০শে মার্চ—টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর কোরিয়া বেতার হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের" বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার প্রচেষ্টা সমর্থন করিবার এবং উক্ত প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য রুশ জনসাধারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মার্শাল স্টালিন উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও সর্বাধিনায়ক কিম ইর সুন-এর নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আপোষ আলোচনার জন্য শ্রমিক গভর্নমেন্ট গতকল্য রাত্রিতে বিরোধী রক্ষণশীল দলকে আহ্বান জানান।

পারস্যের শাহ অদ্য সামরিক গভর্নরের অধীনে দুই মাসের জন্য সরকারীভাবে সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন। জেনারেল আবদুল হোসেন হেজাজীকে সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

২১শে মার্চ—অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে কাশ্মীর সম্পর্কে একটি সংশোধিত যুক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়।

দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী উপকূল বরাবর অগ্রসর হইয়া অদ্য ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার ৮৷৷ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে।

২২শে মার্চ—গতকল্য নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁহাদের সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করেন। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গ্ল্যাডউইন জেব এবং মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ আর্নেস্ট গস সংশোধিত প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার পর পরিষদ কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্ক ২৯শে মার্চ পর্যন্ত মুলতুবী রাখে।

২৪শে মার্চ—গতকল্য সিউলের ২৫ মাইল উত্তরে অবতরণকারী সহস্র সহস্র প্যারা সৈন্যের সহিত ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অভিমুখে অভিযান-কারী রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থলবাহিনীর সংযোগ সাধিত হওয়ায় অদ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় কম্যুনিস্টদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা কার্যতঃ বিনষ্ট হইয়াছে।

২৫শে মার্চ—দক্ষিণ কোরীয় টহলদার বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় কয়েকবার ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে। অদ্য মধ্য রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্যাঙ্কবহর ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দুই মাইলের মধ্যে উপনীত হয়।

গত শুক্রবার একখানি মার্কিন বিমান ৫৩ জন যাত্রীসহ অতলান্তিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়। বিমানখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৹ আনা, বার্ষিক—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 7th April, 1951. [২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গতি কোন্ দিকে—

২৪ পরগণা দক্ষিণ-পূর্ব মুশ্লিম নির্বাচক-মণ্ডলী এবং মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় হইয়াছে কিন্তু এই জয়ের প্রকৃত মূল্যে কতখানি বিচার করিতে গেলে মনে হয়, ২৪ পরগণা মুশ্লিম নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেস পক্ষের জয়লাভের মূলে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক আদর্শই মোটামুটিরকমে কাজ করিয়াছে এবং ভোটদাতাগণ সেইটিই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী অপর পক্ষের নীতির বাস্তব গতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এপক্ষে কংগ্রেসকে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু মালদহের উপনির্বাচনে লক্ষ্য করা যায় যে, কংগ্রেস-বিরোধী দুইজন প্রার্থী কংগ্রেসপ্রার্থী অপেক্ষা মিলিতভাবে ২ হাজার ভোট বেশী পাইয়াছিলেন; সুতরাং এই ভোট যদি দুই ভাগ হইয়া না পড়িত, তবে কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত হইতে হইত; সুতরাং এই বিজয়-লাভও কংগ্রেসপক্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশার সূচনা করে না। অপরপক্ষে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের স্পষ্টতঃ পরাজয় ঘটিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেস-পক্ষের এই পরাজয় অবশ্যই তুচ্ছ ব্যাপার নয়; এবং পরিষদের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপক্ষের জয়লাভও এক্ষেত্রে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ বিবেচনা করা যায় না। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে কংগ্রেসপক্ষের পরাজয়ে অন্ততঃ একটি সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইহা বোঝা গিয়াছে যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন হইতে কংগ্রেস ক্রমশঃই বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই; কারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমর্থনই প্রধানতঃ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙলার সমাজ-জীবনের মূলীভূত সংস্কৃতির এই সম্প্রদায়ই ধারক, বাহক এবং পরি-পোষক; সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে, এই পৌর-নির্বাচনেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মিউনিসিপ্যাল অথবা পরিষদের জন্য নির্বাচনে নাগরিক কেন্দ্র-গুলিতে কংগ্রেসের প্রাধান্যই এতদিন পর্যন্ত একরূপ অবিসংবাদিত ছিল। শুধু দক্ষিণ কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের জয়লাভেই এক্ষেত্রে অন্যথা ঘটে; কিন্তু সে স্থলে কারণও অনেক ছিল। শরৎচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও জাতির জন্য তাঁহার ত্যাগময় অবদান এক্ষেত্রে ভোটদাতাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের সম্বন্ধে তেমন কথা বলা যায় না; সুতরাং আদর্শের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি যে ক্ষুন্ন হইতে চলিয়াছে, এই নির্বাচনের ফলে এমন সিদ্ধান্তই করিতে হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটিকে কলিকাতা শহরের অংশ স্বরূপেই গণ্য করা যাইতে পারে এবং এখানকার নির্বাচকমণ্ডলী বিশেষভাবেই রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন। সুতরাং এই মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের ফলের গুরুত্ব উপেক্ষা করা চলে না এবং এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসকর্মীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের এই সত্য উপলব্ধি করা দরকার যে, কংগ্রেসের অতীত গৌরবের দোহাই দিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে এখন আর চলিবে না। পরন্তু বর্তমানের প্রতিবেশের উপযোগীভাবে কংগ্রেসের নীতিকে জন-স্বার্থের সঙ্গে সেবা ও সাধনার পথে সুসংবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। বস্তুত কংগ্রেসের নৈতিক আদর্শের পুনরুজ্জীবনই কংগ্রেসকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে, পরন্তু আদর্শবিহীন ঐক্যও কোন প্রতিষ্ঠানকে শক্তি দিতে সমর্থ হয় না।

আদর্শের নৈতিক বিপর্যয়

উপদেশের অপ্রতুলতা এদেশে নাই, পরন্তু আদর্শনিষ্ঠারই একান্ত অভাব। সম্প্রতি ভারতের পার্লামেণ্টের বাজেট বিতর্ক প্রসঙ্গে সরকারী কাজে অর্থনৈতিক যে-সব কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সত্যই আমাদিগকে অধোবদন হইতে হয়। ফলতঃ যাঁহাদের হাতে দুর্নীতি দমনের ভার রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেই যদি দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব চলিতে

থাকে, তবে অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয় হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের সব শক্তি সেই পথে শূন্য হইয়া যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জনসাধারণের উপর দোষ চাপাইয়া দিতেই এদেশের শাসকবর্গ অনেকটা ব্যগ্র কিংবা আন্তর্জাতিক দুর্নীতির দার্শনিকতার জাল বিস্তার করিয়া নিতান্তই নির্লজ্জভাবে নিজেদের দায়িত্ব লঘু করিতেই তাঁহারা সমধিক আগ্রহশীল। জগতের সর্বত্রই যখন দুর্নীতি বাড়িয়া চলিয়াছে, তখন এদেশেও তাহা বৃদ্ধি পাইবে, এমন যুক্তি উপস্থিত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু এই ধরণের কৈফিয়ৎ যে একেবারেই অকেজো শাসকদের ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই সব ব্যাপার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশের লোকের টাকার জন্য যেন দরদ কাহারো নাই। বিশেষভাবে সেনা বিভাগের তোড়জোড় সংগ্রহ সম্পর্কিত দুর্নীতির ব্যাপারে এমন আশঙ্কাও দেশের লোকের মনে স্বভাবতঃই জাগিবে যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও এমন প্রতিবেশের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এমন সব আর্থিক কেলেঙ্কারী ঘটা সত্ত্বেও কর্তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহারা রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ টাকা এমনভাবে লোপাট করিয়াছে, তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্য তাঁহাদের কিছুমাত্র আগ্রহ যে আছে, এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টের বিতর্কসূত্রে যদি ভিতরের কথা প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে সরকারী অর্থ লইয়া এসব দুর্নীতির খেলা দেশের লোকের অগোচরেই থাকিয়া যাইত। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিতর্কের উত্তরে বলিয়াছেন যে, দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগের বিচার করিবার জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন; কিন্তু সেজন্য অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই কথায় দেশের লোক কতটা আশ্বস্ত হইতে পারিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; কারণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী অর্থের অপব্যয় এবং আত্মসাৎ করিবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করা সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেণ্ট এতৎসম্পর্কে সন্তোষজনকভাবে তদন্ত করিতে কিংবা অপরাধীদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য আন্তরিকতা দেখান নাই। বাড়ি তৈয়ারী কারখানা সম্পর্কিত কেলেঙ্কারীর তদন্ত করিবার জন্য অর্থ-সচিবের সভাপতিত্বে নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি স্বাস্থ্যসচিব সে ব্যবস্থা করেন নাই। স্বাস্থ্যসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউরের এ সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ আছে দেশের লোকের স্বতঃই জানিতে আগ্রহ হইবে। বাস্তবিকপক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের যদি এমন ধারণা হইয়া থাকে যে, এইসব কেলেঙ্কারীর ব্যাপার কিছুদিন উপেক্ষা করিলেই সেগুলি চাপা পড়িয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা সাবধান হইবেন, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। ফলত এইরূপ আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রবঞ্চনারই সমতুল্য। কারণ, নৈতিক আদর্শ সে পথে উজ্জ্বল হয় না। যাহারা অপরাধী, তাহাদের দণ্ড বিধান করাই এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন এবং বিশেষ কঠোরতার সঙ্গেই তাহা করা দরকার; কারণ, এই শ্রেণীর অপরাধ সামান্য অপরাধ নয়। ইহারা রাষ্ট্রদ্রোহী, ইহারা বিশ্বাসঘাতক। ইহাদের ক্ষমা নাই। ইহাদের প্রতি দণ্ড বিধান সম্পর্কে শাসকদের অন্তরে কোমলতার অর্থই দুর্বলতা এবং তাহার অর্থই দুর্নীতির পরিপোষকতা করা। যে রাষ্ট্রের শাসকগণ এমন দুর্বলতার দ্বারা অভিভূত তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে।

কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সংশোধিত প্রস্তাব ভারত কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। তিনি বলেন, কাশ্মীর ভারতেরই অঙ্গ এবং ভারতের শাসনতন্ত্রানুযায়ী সে রাষ্ট্র শাসিত হইতেছে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ভারত তাহার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে জোর অবশ্য আছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে, নিরাপত্তা পরিষদ যুক্তির জোর কোনভাবেই স্বীকার করিতে রাজী নয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পরিষদের যাঁহারা মুরুব্বী তাঁহারা কাশ্মীর সম্পর্কিত মূল অভিযোগটা বেমালুম এড়াইয়া গিয়া এই সমস্যাকে সূত্র করিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথই উন্মুক্ত করিয়াছেন। ফলত কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রগত দাবী কাহার— ভারতের না পাকিস্থানের, এই অভিযোগ লইয়া ভারত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে উপস্থিত হয় নাই। পাকিস্থান পররাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, ইহাই তাহার অভিযোগ। বস্তুত ভারতের অভিযোগ ন্যায়সংগত হইলেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ন্তা শক্তিগোষ্ঠী ভারতের দাবীকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি আস্থা রাখিবার পক্ষপাতী; কারণ, বিশ্ব সমস্যা সমাধানের পক্ষে ঐটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, সুতরাং বিশ্বশান্তির দিকে তাকাইয়া সঙ্ঘের মর্যাদা রক্ষা করা তিনি উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সঙ্ঘের যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে পরিচালক, তাঁহারা যদি নিজেদের স্বার্থের জন্য আন্তর্জাতিক নীতির মর্যাদাকে বিবেকহীনভাবে ক্রমাগত লঙ্ঘন করিয়াই চলিতে থাকেন, তথাপি একান্ত অসহায়ের মত তাহাদের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে, এমন যুক্তি দুর্বলেরই যুক্তি। আমরা ইহার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। প্রাণের চেয়ে আমাদের কাছে দেশ ও জাতির মানই বড়। ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থক দল তো নিরাপত্তা-পরিষদে তাঁহাদের প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী তো উল্লাসে বিশেষ অধীর হইয়া পরিষদকে সালিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত লইয়া আগাইয়া যাইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন! কেননা তাঁহাদের জয় সুনিশ্চয় ইহাই তাঁহার বিশ্বাস কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট এ অবস্থায় কি করিবেন? প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের অযৌক্তিক রায়ে সায় দিয়া চলিবার অবসর আর নাই, আমরা ইহা মনে করি। আমরা জানি, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানকে তোষণের যে নীতি পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন দল অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিবেন না। কমিউনিস্ট চক্রের প্রতিরোধকল্পে পাকিস্থান তাঁহাদিগকে সামরিকভাবে সাহায্য করিবে তাঁহারা ইহা স্থির বুঝিয়াই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে কূটনীতি প্রয়োগ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ পক্ষে প্রমাণও যে না পাওয়া যাইতেছে, এমন নয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক নীতির আদর্শের অবস্থা যাহাই ঘটুক, কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিবে না; অন্যপক্ষে তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে গিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেও সে সম্ভবত সংকুচিত হইবে না, কারণ, কাশ্মীর তাহার চাই-ই। ফলত ইশ্লাম

...রী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাষ্ট্রের মূলীভূত সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচিত করিবার জন্যই ইহা তাহার দরকার। এরূপ অবস্থায় ভারত যদি কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার নীতিতে এখনও দুর্বলতাই প্রদর্শন করে তবে, তাহার অপমানের বোঝা আরও বাড়িয়া যাইবে এবং অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে যে সুনাম অর্জন করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ গর্ব করিয়া থাকেন, তাহাও একান্ত অন্তসার-হীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং অপরের নিকট হইতে সুবিচারের অপেক্ষা না করিয়া বৃহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হওয়াই ভারতের পক্ষে কর্তব্য। বস্তুতঃ যে দুর্বল, এ জগতে সে সুবিচার কোন-দিনই পায় না। ভারতের রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণ কাশ্মীর সম্পর্কে এই সত্যের সারবত্তা এখনও উপলব্ধি করিবেন, আমরা ইহাই কামনা করি।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

সম্প্রতি বোম্বাইতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সম্মেলনের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিদেশ হইতেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং দার্শনিক যোগ-দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে ইংরেজ কবি ডারিউ এইচ অডেন, মার্কিন ঔপন্যাসিক নরমান টমাস, সুইজারল্যান্ডের দার্শনিক রুজম', মার্কিন বৈজ্ঞানিক মিঃ মুলার, সুবিখ্যাত ইহুদী লেখক জুলিয়াস মার্গো-লিন, স্পেনীয় সাহিত্যিক সেনর মাদারিগা ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের মন্ত্রী ডক্টর আম্বেদকর এবং শ্রীযুত কে এম মুন্সী এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সম্মে-লনের বক্তাদের বক্তব্যে এবং প্রস্তাবে একটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। মানুষের চিন্তা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে একনায়কত্বের সর্বগ্রাসী পীড়ন হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়োজনের প্রতি সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বস্তুত মানুষের চিন্তাকে বিশেষ একটি রাজনৈতিক এবং সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যবস্থার অনুগত করিবার জন্য কম্যুনিস্টতন্ত্র যে উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মানব-সভ্যতার পক্ষে তাহা মহা বিপদ স্বরূপে দেখা দিয়াছে। এই মতবাদের সমর্থকদের কাছে অন্য কোন সংস্কৃতি বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পাপ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং তাহার পোষকতা করাও অপরাধ স্বরূপে বিবেচিত হয়। মানুষের শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তা, শ্রম এবং সাধনায় আবিষ্কৃত শিল্পকলা, সাহিত্য ইঁহারা বাতিল করিয়া দিয়া উদ্ভট একপ্রকার হাতুড়িপেটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইঁহাদের এই প্রয়াস ভারতেও সংক্রমিত হইয়াছে। মার্ক্সবাদের নামে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথ-গান্ধীর চিন্তা ও সাধনাকে কদর্যভাবে আক্রমণ করিয়া "বাস্তব ও প্রগতি সাহিত্য" প্রচারের চেষ্টা ভারতেও চলিতেছে। মুনি-ঋষিদের কথা তো ইঁহারা শুনিতে পারেনই না এবং ভারতের অতীত সাধনার মধ্যে বর্বরতার সন্ধান পাইয়া অশ্রদ্ধায় ইঁহাদের নাসিকা সংকুচিত হইয়া উঠে। শ্রীযুত মুন্সী সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান শিক্ষিত সমাজেরও কেহ কেহ নিজেদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আদর্শ এবং চিন্তার প্রতি বিশ্বাস, এই উৎকট আন্দোলনের প্রভাবে পড়িয়া হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহার ফলে জাতির অগ্রগতির পথই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ফলত মুন্সীজীর এই অভি-মতের গুরুত্ব আমরা সর্বাংশে উপলব্ধি করি। আমাদের মতে এইরূপ অন্ধ পরানুকরণ দাসোচিত মনোবৃত্তিরই পরি-চায়ক এবং ইহা মনুষ্যত্বের বিকাশের বিরোধী। ফলতঃ ঘৃণ্য এই পরানুকরণ-প্রবৃত্তি এবং পরবশ্যতার অভিমুখে অন্ধভাবে গতিকে রোধ করিবার জন্য জাতির চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেরই বর্তমানে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, ভারত জুলু বা হটেনটটের দেশ নয়। এ দেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতি রহিয়াছে এবং গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। সম্মেলনের উপসংহারকালীন অধি-বেশনের সভাপতিস্বরূপে সেনর মাদারিয়াগা ভারতীয় সংস্কৃতির এই শান্তি ও সমৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সত্য কথা এই যে, বিশ্বের দুয়ারে ভিখারীর মত থাকিবার জন্য ভারতের সৃষ্টি হয় নাই; পরন্তু ভারত তাহার নিজস্ব অবদান-মহিমায় বিশ্ব-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিবার শক্তি রাখে এবং সে শক্তিকে ভিত্তি করিয়াই ভারত যুগোচিত ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ; প্রত্যুত আত্মশক্তিতে যাহাদের বিশ্বাস নাই তাহারা পশুরই সমতুল্য এবং গর্ব করিবার মত যাহাদের সংস্কৃতি নাই, জগতে তাহারা চিরদিনই দুর্গত এবং পতিত। ভারতকে যাহারা অমন দুর্গতির মধ্যে টানিয়া লইতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সম্মেলনের বিগত অধিবেশন একাজে অনেকটা সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থসংঘাত

ভারতীয় বণিকসভার চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে গিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের বাণিজ্যপতি-দিগকে সমগ্র জগতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বাণিজ্যপতিদিগকে কতকটা হুঁসিয়ার করিবার জন্যই যেন বলেন, 'জাতির বুকের উপর দিয়া একটা দারুণ সংকটের কাল যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় বিশ্বসমস্যার মূল কারণগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, এদেশের লোকের মনস্তাত্ত্বিক গতির সম্বন্ধেও বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা নির্ভুল পথে চলিতেছি, এমন ধারণা আমাদের মনে যতই থাকুক না কেন, ঘটনার গতি সম্বন্ধে দেশের লোকে কি মনে করে তাহার উপর আমাদের কাজের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। দেশের লোকে যদি মনে করে যে, আমাদের কাজ ঠিক হইতেছে না, তাহা হইলে আমাদের নীতির সঙ্গতি সম্বন্ধে আমাদের মনে আত্মতুষ্টি যেমনই থাকুক, তদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।' ভারতের প্রধান মন্ত্রী এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির মূল তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জনগণের স্বার্থ-চেতনার পথে জাতির সংহতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে এই যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সরকারী নীতির সাফল্য এই দিক হইতে কতটা ঘটিয়াছে। ফলত একদিকে দেশের স্বার্থ এবং দেশবাসীর জনমত, অপর পক্ষে ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ বা গোষ্ঠী-স্বার্থের মধ্যেই ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি দোল খাইতেছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র উভয় নীতিই অতীত সংস্কার-সুলভ পথে ব্যষ্টি কিংবা গোষ্ঠী-স্বার্থের

দিকেই সর্বাধিক ঝুঁকিয়া চলিতেছে, কার্যত ইহাই দেখা যায়। এইভাবে শাসকদের অবলম্বিত নীতি দেশের লোকের মনে একটা সংকটমূলক মনস্তাত্ত্বিকতা সৃষ্টি করিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল বণিকপতি-দিগকে দেশের লোকের স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বাধিক অবহিত হইতে বলিয়াছেন। অতীতেও প্রধান মন্ত্রী এই ধরণের অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতের বণিকচক্র নিজেদের স্বার্থগৃধ্নুতাকে কিছুমাত্র সংকোচ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। পক্ষান্তরে দেশের দুর্দশাকে সুযোগস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নির্বিবেকভাবে নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধ করিয়াছেন। পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। ফলত পণ্ডিত জওহরলালের নৈতিক উপদেশ এক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত কোন কাজেই লাগে নাই। পক্ষান্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নৈতিক নিষ্ক্রিয়তার ছিদ্রপথে শক্তিবর্গের গোষ্ঠী-স্বার্থ বর্তমানে ভারতকে অভিভূত করিতেই উদ্যত হইয়াছে। ইহার ফলে শাসন-নীতির সঙ্গে দেশের লোকের সহানভূতির সূত্র উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জনমতের প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধির উপরে এক্ষেত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজেদেরই সেদিকে নিষ্ঠাবুদ্ধির অভাব দেশের লোকে একান্তভাবে উপলব্ধি করে—গভর্নমেণ্টের শক্তি সত্যই সুদৃঢ় করিতে হইলে শাসন-নীতির নিয়ামকদের কথায় ও কাজের মধ্যে এই যে ব্যবধান, ইহা আগে দূর করা দরকার।

সুবিধাবাদের চাতুরী

ডক্টর ইসতাক্ হোসেন পাকিস্থানের পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী। মন্ত্রী সাহেব কিছুদিন পূর্বে রাওলপিণ্ডি হইতে বেতারযোগে এক বক্তৃতায় নীতি-চাতুর্য প্রয়োগে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পাকিস্থানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ভারতের মুসলমানেরা যতদিন পর্যন্ত নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হইবে এবং ভারতে অত্যাচার ও নির্যাতনের অতীত অভিজ্ঞতার বিভীষিকা হইতে তাহারা মুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্থানের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবুদ্ধি প্ররোচিত করিবার এই যে কৌশল, পাকিস্থানের শাসক-চরিত্রে ইহাকে আমরা স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি, সুতরাং এমন দুরভিসন্ধি পূর্ণ মিথ্যার উক্তির প্রতিবাদ করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। কোরেশী সাহেবের অপর অভিযোগের সম্বন্ধেই আমরা কয়েকটি কথা বলিব। পাকিস্থানের পুনর্বাসন-সচিব বুঝিয়া লইয়াছেন যে, ভারত হইতে উদ্বাস্তু মুসলমানদের সম্পত্তি হস্তগত করিয়া পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষতি পূরণ করিবার অভিসন্ধিতে ভারত গভর্নমেণ্ট পরিচালিত হইতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত হইতে কত মুসলমান পাকিস্থানে আশ্রয় লইয়াছে এবং পাকিস্থান হইতে কি পরিমাণ হিন্দু ভারতে ভিটামাটি ছাড়া অবস্থায় আসিয়াছে, এই হিসাবটা কোরেশী সাহেবের না জানা আছে ইহা নয়। তিনি ইহাও নিশ্চয়ই জানেন যে, উদ্বাস্তু মুসলমানদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করিলেও পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের সামান্য অংশেরও ক্ষতিপূরণ করা ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। সে যুক্তি বরং পাকিস্থানের পক্ষেই খাটে এবং সেদিক হইতে তাহাদের প্রচুর লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। বস্তুত উভয় সরকারের মধ্যে যদি এমন ব্যবস্থা হয় যে, ভারত সরকার ভারত হইতে যে সব মুসলমান পাকিস্থানে গিয়াছে, তাহাদের সম্পত্তি দখল করিয়া পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দুদের ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং পাকিস্থান তথা হইতে উদ্বাস্তু হিন্দুদের সম্পত্তির দ্বারা আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ করিবেন, তবে পাকিস্থানের কর্তাদের উল্লাসেরই অন্ত থাকিবে না। বলা বাহুল্য, কোরেশী সাহেবের উক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাদের মনের গোপন ইচ্ছাটিই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির ক্ষতি-পূরণ দুই গভর্নমেণ্টের মধ্যে মীমাংসাসূত্রে হইবে না। উদ্বাস্তুদিগকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও অসহায়, দুর্বলের সর্বনাশ সাধন করিয়া পাকিস্থানী গভর্নমেণ্টের স্বার্থ পোষণই কোরেশী সাহেব বড় করিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি জানেন, এই উপায় অবলম্বিত হইলে হিন্দুরা একরূপ বিনা মূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যেই পাকিস্থানস্থ তাহাদের সম্পত্তি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবস্থা তো সেইরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুদিগকে যখন দেশ ছাড়িতেই হইবে, তখন তাহাদের সম্পত্তির জন্য মূল্য দিতে যাইবে কে? এইভাবে মূল্যবান সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু উদ্বাস্তু নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছেন এবং মুসলমানেরা তাহাদের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে ভোগ দখল করিতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নিজেদের মূল্যবান্ সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য হইতে এইভাবে চাপ দিয়া বঞ্চিত করার নিতান্ত নিষ্ঠুর নীতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে রোধ করা প্রয়োজন। ভারত গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে ঔদার্যের নামে দুর্বলতা প্রদর্শন না করেন আমরা ইহাই দেখিতে চাই।



শিল্পী
শ্রীনন্দলাল বসু



জননী



মাঝি

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

ডাক্তাররা বলেন যে, সূর্যের আলো শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সূর্যের আলোর মধ্যে আলট্রা ভায়োলেট রে' আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী। এই আলোর ভিটামিন ডি মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও হাড়ের গঠনের সহায়ক। এইজন্যই আমাদের দেশে কচি কচি ছেলেদের তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখার প্রথা আছে। পাশ্চাত্য দেশেও এই সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি শরীরে গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত আছে। আজকাল 'রৌদ্র-স্নান' একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে সূর্যের আলো পাওয়া যায় না সেই দেশের জন্য এক রকম কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন ডি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকায় এক রকম ফ্লোরেশণ্ট লাইট বার হয়েছে যার আলো থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। এই আলো ওদেশের চাষীদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। কারণ ওদের দেশে শীতকালে গরু, ছাগল, ভেড়া মুরগী ইত্যাদি জন্তু ঘরের মধ্যেই রাখতে হয়। আর এর জন্য সূর্যের তাপের অভাবে এদের দেহের বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রে এই ফ্লোরেশণ্ট আলো গোহালে বা পোলট্রীতে ব্যবহার করায় ভিটামিন ডি থেকে বঞ্চিত হতে হয় না ফলে সাধারণ বৃদ্ধিও নষ্ট হয় না।

অবশ্য এই আলো এখন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। ফ্যাক্টরী, হাসপাতাল, স্কুল ঘর এমন কি সাধারণ গৃহস্থ ঘরেও এই আলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

*



Twin Phoneএর দুটি Recciverএর মধ্যে একটি হাতে ধরা আছে, অন্যটি টেলিফোনের গায়ে লাগান

আজকাল একরকম নতুন টেলিফোন বার হয়েছে এতে দুটি রিসিভার থাকে। একটা টেলিফোনে দুজন লোক একসঙ্গে শুনতে পায়। এইরকম টেলিফোনকে "টুইন-ফোন" বলে। অবশ্য এই ফোনে সব সময় যে দুটো রিসিভার ব্যবহার করতে হবে এমন কথা নয়। একটা রিসিভার রেখে দিয়ে কেবল-মাত্র একটা রিসিভার-এ কথাবার্তা বলা যায়। তবে সুবিধা এই যে, দরকার হলে দুটো রিসিভার একসঙ্গে কাজে লাগান যায়।

*

মানুষের রূপচর্চার প্রচেষ্টা অসীম এবং এ প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত মনুষ্য জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে সিডনীর এক চিড়িয়াখানার একটি হাতীর মাহুত তার হাতীর শ্রী ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েছে। ঐ হাতির রূপচর্চার জন্য মাহুতটি কয়েক গ্যালন তেল ও একটি তারের ব্রাশ চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করেন। এছাড়া পায়ের নখ ঠিক করার জন্য একটি নরুণ জাতীয় পদার্থ আর নোখে লাগাবার জন্য কিছু রং-এর কথাও বলে। এছাড়া হাতিটীকে "স্লিম" করার জন্য তার বরাদ্দ খাবার থেকে কিছু কমিয়ে দেওয়ার কথা কর্তৃপক্ষকে বলে। ঐ মাহুতের মতে হাতিটীর ৬ ইঞ্চি লম্বা ভুরু জোড়া সত্যই দেখার মত।

*

আজকাল ডায়াবিটিস রোগের কথা খুবই শোনা যায়। একটু বয়স হলেই এই রোগটি দেখা দেয়। শরীর যখন খাদ্য থেকে শর্করা জাতীয় উপাদান গ্রহণ করতে পারে না তখনই রোগের উৎপত্তি হয়। আমাদের যকৃত থেকে ইনসুলিন নামে যে রস-ক্ষরণ হয় তাই শর্করা জাতীয় পদার্থকে শরীর গঠনের উপযোগী খাদ্যে রূপান্তরিত করে। যকৃতের কয়েকটি 'সেল' থেকে ইনসুলিন উৎপন্ন হয়। এই 'সেল'গুলি নষ্ট হয়ে গেলে আর ইনসুলিন তৈরী হতে পারে না আর তার ফলেই 'ডায়াবিটিশ' হয়। এ রোগ সম্পূর্ণভাবে সারান সম্ভব হয় না। তবে যদি রোগের প্রথম অবস্থায় ধরা পড়ে তবে অন্য জন্তুর শরীরের ইনসুলিন নিয়ে ইনজেকশন দিলে এবং শর্করা জাতীয় পদার্থবর্জিত খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করলে এই রোগের হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়া যায়।

*

যাঁরা মোটর গাড়ী চালান তাঁরাই জনেন যে, গাড়ীর ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকলে তাতে স্টার্ট দেওয়া কি কষ্টকর। আর এই কষ্ট শীতকালে যে বেশী হয় তাও ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। গাড়ীর ইঞ্জিন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজন মত গরম হয় ততক্ষণ কোনও



এইটি Re-Moto-Start যন্ত্র

মতেই গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়া যায় না। রি-মোটো-স্টার্ট নামে যন্ত্রটি দিয়ে এই রকম অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রটি মোটর গাড়ীর ড্যাশ বোর্ডের নীচে যেখান থেকে স্টার্ট দেওয়ার তারটি যায় সেখানে এটিকে আটকে রাখা হয়; আর একটা তার টেনে নিয়ে একটি ১১৫ ভোল্টের যে কোনও ইলেকট্রিক প্লাগের সঙ্গে যোগ করা হয় যাতে গ্যারেজে গাড়ী রাখার সময় এই যন্ত্রটি চালু করে রাখলে সকালে গাড়ীটা গরম হয়ে থাকে ফলে স্টার্ট দিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

[সুন্দরবন ও কাছাকাছি অঞ্চলের অরণ্য, নদীখাল এবং মানুষদের নিয়ে এই উপন্যাস। জায়গাটা দূরবর্তী নয়, কিন্তু মানুষগুলি অনেক দূরের। ইতিপূর্বে ছাড়া-ছাড়া ভাবে অল্পসল্প এদের কাহিনী বলেছি। এবারে অনেককে এক আসরে জমায়েত করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আগেকার-বলা কথার পুনরুক্তি ঘটবে। অপরাধ কবুল করে পূর্বাহ্নে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।—লেখক।]

১

মা গো মা— তোর বালক আইল বনে
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে—

জঙ্গলের মুখে আইট একটা। উঁচু জায়গা—কোটালের সময়েও জোয়ার-জলে ডোবে না। ঢেউয়ের আঘাতে আইটের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়ছে—প্রতি বছরই গাঙের নিচে দশ-বিশ হাত তলিয়ে যাচ্ছে। এমন খাড়া এদিকটা যে নৌকা ঘুরিয়ে লা-ভাঙার খালে না নিয়ে ডাঙায় ওঠা মুশকিল।

সদ্য ভেঙে-পড়া ঐ সব জায়গায় নজর করে দেখলে পাতলা-পাতলা সেকেলে ইট চোখে পড়বে। মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। ইট রয়েছে যখন, বসতি ছিল নিশ্চয়। মানুষ ছিল, ঘরবাড়ি ছিল, মানুষের সুখ-দুঃখ ছিল। এখন কিছু নেই—হেঁতাল ও বলাঝোপে সমাচ্ছন্ন ভূমিপ্রান্তে নোনা জলের ঢেউ দিনরাত আছাড়ি-পিছাড়ি খায়।

ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে অনতিদূরে ফাঁকার মধ্যে এক বকুলগাছ। বকুল এই অঞ্চলের গাছ নয়—কেমন করে এল এখানে তার কোন পাকা ইতিহাস নেই। বাড়-বৃদ্ধি নেই বকুলগাছের—ফুলফল ধরে না, নূতন একটা ডাল গজাতে দেখা যায়নি বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে।

বনবিবিতলা এটি। বাদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই একটি কেবল নয়—বনের এখানে সেখানে তাঁর অনেক আস্তানা। জঙ্গলে ঢুকবার আগে বাওয়ালিরা থানে এসে সিন্নি মানত করে, পূর্ব-প্রতিশ্রুত মানত শোধ দিয়ে যায়। কেউ জীবন্ত মুরগী ছেড়ে দিয়ে যায় দেবীর তুষ্টির জন্য, কেউ বা বকুলগাছের গোড়ায় নিরামিষ ছাঁচ-বাতাসা সাজিয়ে দেয়। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমার দিন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সমারোহে দেবীর পূজো হয় এখানে। বছরের মধ্যে এই বিশেষ একটি দিন। দূর-দূরান্তর থেকে বিস্তর লোক জমায়েত হয়। আমোদ-স্ফূর্তি হয়। আলো-আলোময় হয়ে যায় জঙ্গলরাজ্য।

একবারের পুজোয় ভারি জাঁকজমক। আটটা ঢাক এবং তিনটে ঢোল-কাঁসি। ধামা ধামা বাতাসার হরির লুঠ। পাঁঠা পড়েছে পনেরটা—রক্তের স্রোত গড়িয়েছে বনবিবিতলা থেকে প্রায় লা-ভাঙা অবধি। কবন্ধ পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে মহাপ্রসাদ এক পাশে চাঙারি ভরতি করে রেখেছে—পুজো অন্তে বখরা হবে মাতব্বরদের মধ্যে।

পুজোর মতো পুজো। একা মধুসূদন রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কম পড়ে যায়—ভাবনার কি আছে—আরও দেবেন তিনি। যে সে লোক নন মধুসূদন—রামনিরঞ্জন রায় নবাব সরফরাজ খাঁর দেওয়ান ছিলেন, সেই সুবিখ্যাত বংশের ছেলে। বিদ্যেও নাকি অঢেল—কিন্তু আলাপে আচরণে ধরতে পারবে না। ভাইরা কলকাতায় থাকেন। মাটিতে পা দেন না তাঁরা—গাড়িতে গাড়িতে ঘোরেন, গাড়ি থেকে নেমে পালিশ-করা উঠোন-মেজের উপর দিয়ে দোতলা-তেতলায় উঠে যান। মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে রায়গ্রামের পৈতৃক বাড়ি এবং এই বনবিবিতলার অনতিদূরবর্তী মৌভোগের কাছারি-বাড়িতে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। জঙ্গল হাসিল করে চাষবাসের ব্যবস্থায় মেতে আছেন। এমন দরের লোক, তা বলে বাছবিচার নেই। চাষাভুষোর আসরে বসে হল্লা করেন। মন্দ লোকে নানা রকম রটনা করে। তাঁর জন্যে একখানা পিঁড়ি বা জলচৌকি—সকলের সঙ্গে এইটুকু মাত্র স্বাতন্ত্র্য।

সম্প্রতি আর একজন এসে জুটেছেন—মতিরাম সাধু। সাধু ব্যক্তি সত্যিই পুজো-আচ্চার ব্যাপারে মুক্তহস্ত। মায়ের কৃপাও [illegible] উপর—সচ্ছল সংসার, কোন রকম অভাব-[illegible] নেই। বনবিবির পুজো এবং আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে বাজি পোড়ানো হবে—এই প্রস্তাব এবং যাবতীয় ব্যবস্থা মতিরাম করেছেন। খরচপত্র তাঁরই। বাজি পরমাশ্চর্য বস্তু। নামই শুনেছে সকলে, চোখে আর দেখেছে ক'জন? মায়ের পুজো তো ফি বছর হয়ে থাকে—কিন্তু এত বেশি ভক্তের সমাবেশ (দোহাই মা, দোষ নিও না) দেখেছে কেউ কখনো?

আরও আছে। বাজির আগেই সেটা। কুস্তির পাল্লা হবে। পুরন্দর ও লা-ভাঙার মোহনায় লোনা-ওঠা চৌরস চরের উপর খানিকটা জায়গা ঘেরা হয়েছে। পুজো শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এল। যত মানুষ তখন ভেঙে পড়ল এদিকে। মেয়েলোকও কিছু কিছু জুটেছে—ছায়ার দিকটায় একধারে একটু আলাদা মতো হয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। ঢাকের বাজনা বন্ধ—তিনটে ঢোল বাজছে শুধু এক তালে। কাঁসি খ্যান-খ্যান করছে। লম্বা এক বাঁশের মাথায় অনেক উঁচুতে টাঙানো পিতলের কলসি—পড়ন্ত রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। সকলকে যে হারাতে পারবে, এ কলসি তার। যারা হারবে, তারাও যে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাবে, তা নয়—এক একখানা লাল গামছা দেওয়া হবে প্রত্যেককে।

ঘেরা জায়গার এক প্রান্তে মাদুর পেতে দিয়েছে—মতিরাম সাধু ও মধুসূদন রায় সেখানে বসেছেন। এঁরা বিচারক। আর একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—কুস্তির মধ্যে যদি মারামারির উপক্রম হয়, সামাল দেবে। গরানের বেড়াও ঐ কারণে—মারমারির মুখে দর্শকজনের মধ্যে এসে না পড়তে পারে!

তবে কথা দাঁড়াচ্ছে, মারামারি করবে কারা? তাগত আছে ঐ রোগা পুঁটকে ছোঁড়া দুটোর—যারা মল্লক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? জানুতে থাবা মেরে যখন প্রতিপক্ষকে তারা আহ্বান করছে, আর পায়তারা কষছে—হাসি চেপে রাখা দায়। পা হড়কে পায়তারার মুখেই পড়ে যাচ্ছিল একজন—ছোকরা ঢুলিটা আর

পারে না, বাজনা থামিয়ে হি—হি করে হাসতে লাগল।

হাসো কেন?

পড়ে যাচ্ছ—আমি বলি ওস্তাদ, লাঠি-নড়ি একটা কিছু ভর দিয়ে দাঁড়াও—

বলেই জোরে জোরে বাজিয়ে উঠল। গরম হয়ে ছোকরা কি গালিগালাজ করল, কারো তা কানে গেল না। হাসির লহর বয়ে গেল চারিদিকে।

তড়াক করে বেড়া টপকে ভিড়ের একজন বিচারকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি লড়ব এক হাত—

মধুসূদন বললেন, বেশ তো! নামটা কি বলো—

কেতুচরণ ঢালি—

খাতায় লেখা হল কেতুচরণের নাম। মতিরাম বলেন, ওধারে ঐ বাইরে গিয়ে দাঁড়াও বাপু। আর কে কে লড়বে—ভিতরে আসতে হবে না, ঐখান থেকে নাম বলো। পর পর ডাক পড়বে।

শেষটা বিষম জমে উঠল। বুড়োরাও ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে, দু-দশ বছরের মধ্যে এমন খেলা দেখেনি কেউ। মুহুর্মুহু বাহবা দিচ্ছে। প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে আসছে বনস্থলী থেকে। আকাশ বুঝি ফেটে যাবে!

পুজো উপলক্ষে সাঁকো বাঁধা হয়েছে লা-ভাঙার খালে। নিতান্তই অস্থায়ী সাঁকো—তোড়ের মুখে টিকবে না—আজকের দিনটেই যদি ভালোয় ভালোয় যায়, খুব রক্ষা। নইলে লোকজনের পারাপারে কষ্টের অবধি থাকবে না। ভর সন্ধ্যা। পূর্বাকাশে থালার মতো পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিয়েছে। কলসি জিতে নিয়ে কেতুচরণ সাঁকো পার হয়ে এল।

মধুসূদনের বন্দোবস্ত-নেওয়া লাট এপারে। বাদা একবার কাটা হয়েছে; ছিটে বন জন্মেছে। আগামী বছর আর এক কাটা দিয়ে ধান ছড়ানো হবে। অল্প অল্প জন্মাবে। পুরো হাসিল হতে এখনো তিন-চার বছর। বেশিও লাগতে পারে—ঢেউয়ের মুখে মাটির বাঁধ কতটা টিকবে, সমস্ত নির্ভর করছে তার উপর।

সদ্য মাটি-ফেলা সঙ্কীর্ণ বাঁধের উপর দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিল কেতু। পায়ের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! সেই মেয়েটা—ভিড়ের মধ্যে অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কুস্তির প্রাণান্তক প্যাঁচ-কষাকষির মধ্যেও কেতু লক্ষ্য করেছে। হাজার জনের মধ্যেও চোখ পড়ে যায়, এমনি মেয়ে। হাত বাড়ালে ধরা যায়—এত কাছে পিছন পিছন আসছে। কতক্ষণ এমনি আসছে কে জানে?

কে গো?

আমি—

আমি বললে কি চেনা যায়?

নাম যদি বলি এলোকেশী দাসী, তাতেই বা কি চিনবে গো? মতিরাম সাধু হলেন আমার ঠাকুর। উই যে মৌভোগ—ঐ গাঁয়ে বাড়ি আমাদের।

জঙ্গলের ধারে ধারে নূতন বসতি গড়ে উঠছে। এলোকেশী একদিকে আঙুল দেখাল। দেড়ক্রোশ দু-ক্রোশ দূরে তো হবেই।

কেতুচরণ বলে, সোমত্ত মেয়ে একলা চলেছ—ডর লাগে না? সাধু মশায় ছেড়ে দিলেন যে বড়!

টের পেয়েছেন কিনা? মধুবাবুর সঙ্গে কি রকম জমে গেছেন, দেখলে না? কত রাত অবধি চলবে—আমি বাপু বসে থাকতে পারিনে, ভাল লাগে না। তুমি যাচ্ছ দেখে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে এসেছি।

হেসে উঠল এলোকেশী। হাসি ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে যেন নির্জন বনভূমির মধ্যে। হু-হু করে গাঙের হাওয়া আসছে—চুল উড়ছে এলোকেশীর, আঁচল উড়ছে।

কেতু বলে, ধরো—আমি যদি কোন রকম বেইজ্জতি করে বসি এখানে! কার কেমন রীতপ্রকৃতি, উপর দেখে তো জানা যায় না?

এলোকেশী আরও হাসতে লাগল।

তা পারো বোধ হয় তুমি। কি রকম দেখালে—উঃ! ধোপার পাটে কাপড় আছড়াবার মতো বেটাদের আছড়েতে লাগলে। মেয়েমানুষ আমি—আমার তো কথাই নেই।

প্রতিযোগীদের এক একটাকে ধরে কেমন জব্দ করেছে, সেই সব গল্প চলতে লাগল। নিজের বীরত্বের ব্যাখ্যানে কেতুচরণ বড় খুশি। পথ দেখে চলছে না এলোকেশী, কেবলি বকবক করছে। বাঁধের উপর পা ফসকে পড়ে গেল সে হাত দেড়েক নিচে পাশের জমির উপর। বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে।

কেতু বলে, কি হয়েছে? লাগল?

নাক-মুখ ছিঁড়ে গেছে হরগোজা-কাঁটায়।

উ—হু-হু—

কাতরাচ্ছে, ঠোঁটে তবু হাসির রেশ। হরগোজা-ঝোপ আছে বটে, কিন্তু এ একেবারে গা বাঁচিয়ে হিসেব করে পড়া। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে মুখের উপর। তবু কিন্তু কেতু ঠাহর করতে পারে না। কি হয়েছে তার—চোখে দেখছে ঠিকই, কিন্তু দেখেও যেন বুঝতে পারে না কোন-কিছু। আন্তরিক সমবেদনার সঙ্গে সে নিচু হয়ে ভাল করে দেখতে যায়।

এলোকেশী সরে বসল।

বেগার-দেওয়া দেখা দেখতে হবে না—

বেগার-দেওয়া হল কি করে?

বকের মতো উঁচু হয়ে অন্দূরে থেকে দেখা যায় নাকি? তুমি যাও গো—যেমন যাচ্ছিলে, চলে যাও—দাঁড়ালে কেন?

কেতু অতএব বাঁধ থেকে নেমে সামনে এসে উবু হয়ে বসল।

দেখ, দেখতে পাচ্ছ—রক্ত বেরিয়ে গেছে এই দেখ।

দুটো আঙুল গালের উপর বুলিয়ে চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলোকেশী রক্ত দেখছে। কেতু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সেটা প্রকাশ করে বলা চলে না। বরঞ্চ বিশেষ সহানুভূতি দেখানোই উচিত।

আ-হা-হা—

কিন্তু তাতেও এলোকেশী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

উড়ো-দরদে কাম নেই। আমি হাঁড়ি-মুচি না কালো-কুচ্ছিৎ যে বিশ হাত দূরে অমন করে গিয়ে বসেছ?

বিশ হাত কেন—ব্যবধান বোধ করি বিশ ইঞ্চিও নয়। অকস্মাৎ এলোকেশী এক কাণ্ড করে বসল—কেতুর দু-চোয়াল সজোরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এল একেবারে নিজের মুখের কাছে।

দেখতে পাচ্ছ না—কানা নাকি তুমি?

দু-হাতের বজ্র-আঁটুনি সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে। বলে, দেখ—

দেখবে কি কেতুচরণ—সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দুঃসাহসী মেয়েটার রকম-সকম দেখে। একবার মনে হল বাঘিনী ধরেছে তাকে। হিংস্র বটে, কিন্তু অতি মনোরম বাঘিনী।

হেসে উঠে হঠাৎ এলোকেশী ছেড়ে দিল কেতুকে। দিয়ে ভালমানুষের মতো বাঁধের ওধারে সরে বসতে যায়। কেতুচরণের রক্ত গরম হয়েছে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সে-ই বাগ মানবে না এখন। এত গৌরবের পিতল-

কলসি পায়ের আঘাতে গড়িয়ে পড়ল—ছুটে গিয়ে ধরল এলোকেশীকে। কোমল এক তাল কাদার মতো দু-হাতে চেপে ধরেছে। পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে অবহেলায়।

এইবার?

এ কি কাণ্ড! কি কৌশলে ছিটকে পড়ে এলোকেশী জোড় পায়ে লাথি দিল কেতুকে। আচমকা আঘাতে কেতু ভুঁয়ে পড়ে গেল। হি-হি করে উচ্চ হাসি হাসে এলোকেশী। বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো হাসির স্রোত। বেকুব হয়ে কেতু গায়ের ধুলো ঝাড়ে। রাগও হচ্ছে তার।

পারলে না কিন্তু। আমি জিতলাম। একেবারে চিৎ হয়ে পড়েছ, পুরোপুরি হার হয়ে গেল। চালাকি আমার সঙ্গে?

কেতুচরণ এত সহজে হার স্বীকার করবে? আর এক হাত সে লড়তে চায় বুঝি! এলোকেশী পালাচ্ছে। দৌড়, দৌড়। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন কুমীর-কুমীর খেলে, সেই রকম। ঝুপসি-ঝুপসি গেঁয়োগাছ—তারই মাঝে এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছে। বসে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আর পেরে উঠছে না—হাঁপাচ্ছে এলোকেশী। চেঁচিয়ে ওঠে আর্তকণ্ঠে। চিৎকার শুনে কেতুচরণ থমকে দাঁড়ায়। এলোকেশী বলছে, তুমি নচ্ছার, অতি বজ্জাত—

সোঁ করে একটা হাউইবাজি উঠল আকাশে। লাল সাদা সবুজ তারা কাটছে। বনবিবিতলায় বাজি পোড়ানো শুরু হল তবে এতক্ষণে। আনন্দে এলোকেশী হাততালি দিয়ে উঠল।

বাঃ, বাঃ—

কখন কেতুচরণের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণের এত ব্যাপার কিছুই যেন মনে নেই। হঠাৎ শিউরে খানিকটা দূরে পেছিয়ে যায়।

মাগো! বাজির আগুন গায়ের উপরে পড়বে না তো?

কেতুচরণ বলে, বাজি না দেখে ফিরে যাচ্ছ যে?

তুমি কেন যাচ্ছ?

আমার সঙ্গে তোমার পাল্লা? আমি থাকি সাঁইতলায়—হয়তো বা এখনই ধর্ম-খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ফলুইমারি সাঁতরে পার হতে হবে। তারপর যদি গিয়ে দেখি, খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে—আস্ত এক এক কুম্ভকর্ণ তো—সারারাত তা হলে পেটে কিল মেরে গোয়ালঘরে পড়ে থাকতে হবে।

এলোকেশী বলে, আমারও সেই বৃত্তান্ত। গিয়েই হাঁড়ি-বেড়ি ধরব। নইলে এক সংসার লোকের নিরম্বু উপোস।

কাঁচাবয়সি মেয়ের ভারিক্কে কথায় কেতুচরণের বড় কৌতুক লাগে।

সংসারের গিন্নি নাকি তুমি?

হুঁ—। যে দিকটা না দেখব, একখানা অনাছিষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে। আর পারিনে বাপু! চু-উ-উ—

দায়িত্বের কথা স্মরণ হতেই বিচলিত গিন্নি দৌড় দিল। দম ধরে ছুটেছে কপাটি-খেলার মতো। অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে—তবু ভ্রমরের একটানা গুঞ্জনের মতো মিষ্টি আওয়াজটা ভেসে আসছে। মুগ্ধ কেতুচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। সবিস্ময়ে ভাবে, মানে কি মেয়েটার হঠাৎ এইরকম সঙ্গ নেওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার? কেতু সকলকে হারিয়েছে—কেতুকে হারিয়ে আমোদ পেতে চাইল? তা হারিয়ে দিয়েছে ঠিকই।

গুঞ্জন অনেকক্ষণ আর শোনা যায় না। চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সেই বনঝোপের ধারে কেতু তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা পথ যেতে হবে সে কথা আর মনে নেই। বনবিবির জকার উঠছে ঘন ঘন—উৎসব শেষ হল বুঝি এইবার!

(২)

চৈত্র-পূর্ণিমায় দেবী নাকি ঐ বকুলতলায় চাক্ষুষ হয়েছিলেন। বাওয়ালিদের মুখে মুখে সেই গল্প। মধুসূদন রায়ের ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্র হালদার—জঙ্গল-কাটা ও বাঁধবন্দির রোজগণ্ডা মিটিয়ে দেবার সময় ঈশ্বরবৃত্তি খাতে জন পিছু সে দু-পয়সা চার পয়সা এই রকম আদায় করে। সকলে স্বেচ্ছায় দিয়ে যায়। মাঝিরাও মর্জাল বনকর-স্টেশনে নৌকার কুত করবার সময় মায়ের নামে কিছু কিছু জমা রেখে আসে। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, মায়ের নামে দেওয়া একটি আধেলা কেউ এদিক-ওদিক করে না। বার্ষিক পুজোয় সমস্ত খরচ হয়।

করুণাময়ী বনবিবি। বাদাবন তাঁর রাজ্য। হিংস্র বাঘ-কুমীর ও দাঁতাল তাঁর কাছে পোষা মেষের মতন। খলসি ফুল, হেঁতাল ফুল, গরান ফুল—এই তিন ফুল ফোটে চৈত্রমাসে। তার মধু সঞ্চয় করে মৌমাছি। সাদা রং—এক এক ফোঁটা অবিকল মুক্তোর মতো। রেখে দিলে গড়িয়ে পড়বে না। সেই মধু মায়ের পুজোয় দাও, মা বড় খুশি হবেন। বাদাবনের এখানে সেখানে বনবিবির কত মন্দির ছড়িয়ে আছে! দেড় হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একটুখানি জায়গা মেপে নাও, হাতখানেক উঁচুতে গোলপাতার একটু ছাউনি করো, ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে 'মা-মা' বলে ডাকো বার কয়েক—ব্যস, হয়ে গেল মায়ের মন্দির। ফুল যদি না-ই জোটাতে পারো, গরান-পাতায় পুজো কর, মা-জননী তাতেই তুষ্ট।

তবে বকুলতলার কথা হল আলাদা। এর নামডাক বেশি—অত্যন্ত জাগ্রত স্থান। উত্তর অঞ্চল থেকে যারা বাদাবনে আসে, তারা সর্বাগ্রে নৌকা বাঁধে এখানে—লা-ভাঙার মোহনায়। পুরুত-পাণ্ডা অথবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই, মায়ের বালক নিজেরাই গিয়ে বকুলতলার রজ সর্বাঙ্গে মাখে (অশীতিপর ঝুনো বাওয়ালি মায়ের কাছে বালকই)। বাদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই মুহূর্তেই বাদা ছেড়ে চলে যাওয়ার বিধি—তিলার্ধ গড়িমসি করতে নেই, দেবী কুপিত হন তা হলে। এর পর আবার যখন আসে, আগের বারের মানত শোধ দিয়ে তবে জঙ্গলে ঢোকে।

বনবিবির করুণার অন্ত নেই। সাংঘাতিক রকম গোনাহ্‌ না থাকলে কেউ মরে না বাদায় এসে। বাদাবনের নীতি-নিয়ম তোমাদের জনসমাজের মতো নয়। সেই সব নিয়ম জেনে নাও আগেভাগে, সাবধান হয়ে প্রতিপালন কর, সাবধানে বেড়াও, কথাবার্তা সামাল হয়ে বলো।—কোন ভয় নেই, মায়ের দয়া সব সময় তোমায় ঘিরে থাকবে। কাজ-কর্ম চুকিয়ে ঘরের মাণিক ঘরে ফিরে যাবে, কেউ কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে না।

থানের মাহাত্ম্য বলছি, শ্রবণ কর। সেই যে দেবী প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান। ভক্তিযুক্ত হয়ে শুনবে। অবিশ্বাসী যদি কেউ থাক, পুঁথি বন্ধ কর এখানেই।

মোম-মধু সংগ্রহের মরশুম হচ্ছে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে পুরোপুরি জৈষ্ঠ অবধি। নানারকম ফুল ফোটে জঙ্গলে, গাছে গাছে বিস্তর চাক হয়। মধুর প্রাচুর্যে চাকের

রং ঘষা-কাচের মতো হয়ে ওঠে, টলমল করতে থাকে চাক। বাতাস এলে মধুর ভারে চাপের অংশ ভেঙেও পড়ে কখন কখন।

মউলেরা দলের পর দল এই সময় বাদায় ঘোরে। একদল এসেছিল কেশবপুর অঞ্চল থেকে। সে অনেক দূরে—জোয়ার মেরে উঠতে হয়, দু-তিনটে গোন লাগে। আকাশমুখো তাকিয়ে তাকিয়ে তারা ঘাড় ব্যথা করে ফেলল—আশ্চর্য ব্যাপার, মৌমাছি উড়তে দেখল না কোথাও। নিয়ম হচ্ছে, মৌমাছি দেখলেই বনবাদাড় ভেঙে তার অনুসরণ করবে। এমনিভাবে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গাছের মাথায় চাকের আবিষ্কার হয়। কিন্তু মরশুমে এসে এমন ডাহা বেকুব আজ অবধি কেউ হয় নি। কি দোষে কি হচ্ছে—সকলের মন খারাপ—রাত্রি বেলা রান্নাবান্না করল না তারা, রান্নায় মন নেই। খালের মধ্যে নৌকো বেঁধে চুপচাপ শুয়ে পড়েছে।

ওদের মধ্যে নিমাই কাপালি উৎকৃষ্ট গুণিন—নীতি-নিয়ম মেনে ষোল-আনা শুদ্ধাচারে থাকে। নিমাই স্বপ্ন দেখছে—ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ, মুলোর মতো দংষ্ট্রাপংক্তি, গালপাট্টা গোঁফদাড়ি এক বিরাট পুরুষ বলছেন, মহামাংস খাইনি অনেক-দিন—খাইয়ে তুষ্ট কর, সব দোষ খণ্ডন করে দেবো। মধুর ভরা নিয়ে যাবি আমার বরে।

গুণিন বলল, জলে-জঙ্গলে ঘুরি, ধ্যান জানি নে জ্ঞান জানি নে—কি করে পুজো করব বিধান দাও ঠাকুর—

মহাভোগ ছেড়ে দিয়ে যাবি ডাঙার উপর। বাঘের মূর্তি ধরে আমি খেয়ে নেবো। তার-পর যে বনে পা দিবি, মাথা তুলে দেখতে পাবি গাছে গাছে মধুর ভাণ্ডার। এক যাত্রায় দশ ক্ষেপের মধু নিয়ে যাবি।

গুণিন ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠল। ভরা পূর্ণিমা—আরণ্য রাত্রি দিনমানের মতো ফুটফুট করছে। দিনমান ভেবে পাখী ডাকছে—ডালে ডালে। তাড়াতাড়ি নিমাই সকলকে ডেকে তুলল, শলাপরামর্শ চলল অনেকক্ষণ ধরে।

দলের মধ্যে ফেলনা নামে বোকাটে ধরনের এক ছোকরা—কোন কাজের নয়। সে উঠল না কিছুতে, অঘোরে ঘুমুতে লাগল। তাকে জাগিয়ে তোলবারও অবশ্য প্রয়োজন নেই। ফেলনার মা দশবাড়ি ধান ভেনে গোবর-মাটি লেপে দিন গুজরান করে। ফেলনা পালিয়ে চলে এসেছে, বুড়ি কিছু জানে না। বাদায় আসবার লোক জোগাড় করা কঠিন হয় অনেক সময়, ভয়ে আসতে চায় না সকলে। এদের দাঁড়ের লোক কম পড়েছিল—নিমাই কাপালিই ভুজু-ভাজাং দিয়ে ফেলনাকে এনেছে। এনে ঠকেছে। ধরো, কোন মুল্লুক থেকে চাল-ডাল নুন-তেল রান্নার জল, খাবার জল বয়ে আনতে হয়—তিন বেলা তিন কাঁসির ঐ দুষ্প্রাপ্য চালের ভাত গিলছে, খাবার জলটুকু গড়িয়ে খাবার মুরোদ নেই, এক ফেরো খাবে তো তিন ফেরো জল ঢেলে ফেলবে। এই অকর্মার ধাড়িটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা।

চোখ টেপাটেপি করে নিজেদের মধ্যে অবশেষে তারা সাব্যস্ত করল, ফেলনাকে দিয়ে দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট করা যাক। কঠিন ব্যাপার কিছু নয়—যেমন গোগ্রাসে সে খায়, তেমনি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়। রাত দুপুরে গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে নামিয়ে বনের প্রান্তে রেখে দিলে টেরই পাবে না। বাঘরূপী দক্ষিণ রায় যথাসময়ে পরমানন্দে মুখে গ্রাস তুলে নেবেন, দাঁতের আঘাতে তখনই যদি তার কিছু সাড় হয় এক লহমার জন্য। গাঁয়ে ফিরে সত্যি কথাই বলবে তারা—বাঘের পেটে গেছে ফেলনা। এ কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়—অনেক ক্ষেত্রেই তো ঘটে এ রকম। জুতমতো মাল যদি মেলে, তার থেকে কিছু মধু ও নগদ দু-পাঁচ টাকা ফেলনার মা বুড়িকে দিয়ে দিলে হাঙ্গামা মিটে যাবে।

তখন ঘন জঙ্গল বনবিবিতলা এবং পুরন্দর ও লা-ভাঙার এপার-ওপার জুড়ে। রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে ফেলনা। নৌকা এগিয়ে মোহানায় নিয়ে এল। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছে এত বড় জাগ্রত স্থান এটা? রাতে বাদায় নামা বিধেয় নয়—নিমাই কাপালি মন্ত্র পড়ে বাঘবন্ধন করেছে। এ ছাড়া কাচের চৌখুপির মধ্যে টেমি জ্বলছে। আলোর নিকটে জানোয়ার এগোয় না। খুব সতর্ক হয়ে তারা নামল। আর বনের ভিতরে যাবারও প্রয়োজন হবে না। ভাঁটা সরে গেছে, ফেলনাকে চরের উপর ফেলে সরে পড়বে।

ধরাধরি করে নামাতে কিন্তু ফেলনা জেগে উঠেছে। এটা অভাবিত। বুদ্ধি করে তাড়া-তাড়ি নিমাই সামলে নিল। বলল, লা বান-চাল হয়েছে রে ফেলনা, জল উঠছে। নাম্ একটু, সবাই আমরা নামছি। জলটা সেঁচে ফেলব।

ঘুমের ঘোরে ফেলনা বুঝতে পারেনি—যেমন বলেছে, তেমনি সে নেমে দাঁড়াল। ভাল করে বুঝবার আগে এরা নৌকায় এক ধাক্কা দিয়ে বেশি জলে নিয়ে গেল। ভাঁটার খরস্রোতের সঙ্গে চারখানা দাঁড় পড়ে নৌকা যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

পাটনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়

সুকুমারী চৌধুরী

গীতি নাট্য, অথবা সুনিপুণ নাট্যাভিনয় এই দুইপ্রকার অভিনয়ই মানব মনকে স্বভাবত আকৃষ্ট করে। কিন্তু মানুষের সুখ, দুঃখ, মিলন বিরহের অভিনয়, শুধু-মাত্র নৃত্য দ্বারা অনুষ্ঠানের আয়োজন



চিত্রাঙ্গদা ও রূপান্তরিত চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় সেবা মিত্র ও প্রণতি চট্টোপাধ্যায়

বোধহয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে প্রচলন করেন।

কিছুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের শিল্পীবৃন্দ এইপ্রকার নৃত্য-নাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করিয়া পাটলীপুত্রনিবাসী রস-বিদগ্ধ সুধীজনের মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বিহারের রাজ্যপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে মহোদয়ও এই অভিনয় দেখেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় শান্তিনিকেতন এবং কবিগুরুর অবদানের উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অভিনয়ের 'চিত্রাঙ্গদা' কবি সম্রাটের আপন সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মহাভারতে আমরা 'অর্জুনের চিত্রাঙ্গদার পানিগ্রহণ' নামে যে অধ্যায়টি দেখি তাহাতে মনে সামান্য রেখাপাতমাত্রও হয় না।

বনমধ্যে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া অর্জুন মুগ্ধ হইলেন। তাহার পরই মণিপুর রাজার নিকট তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থী হইলেন। মণিপুররাজ কহিলেন, তাঁহার পুত্রস্থানে কন্যা হইয়াছে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুনের তনয়কে যদি মণিপুরের ভবিষ্যৎ রাজা হইতে অর্জুন দেন তবে এই বিবাহে তাঁহার আপত্তি নাই। অর্জুন রাজী হইলেন এবং বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রসঘন ভাবের তুলিতে আঁকা চিত্রাঙ্গদা মনে শুধু গভীর রেখাপাতই করে না মনকে তুমুলভাবে আলোড়িত করিয়া যায়। পুরুষের শক্তি, বুদ্ধি, তেজ সবই হয়ত নারী আয়ত্ত করিতে পারে—কিন্তু পারে না শুধু তাহার অন্তরের অন্তরতম কোণে যে চিরন্তন নারী সুপ্তিমগ্ন তাহার কণ্ঠরোধ করিতে। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের শক্তি, পুরুষের বুদ্ধি এবং পুরুষের শৌর্যও লাভ করিয়াছিল। অর্জুনের দর্শনের পর হইতেই সে জীবনে প্রথমবার বুঝিল সে নারী। সুপ্তা নারী তাহার অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল। এতদিনে যেন সে তার নিজ পরিচয় পাইল।

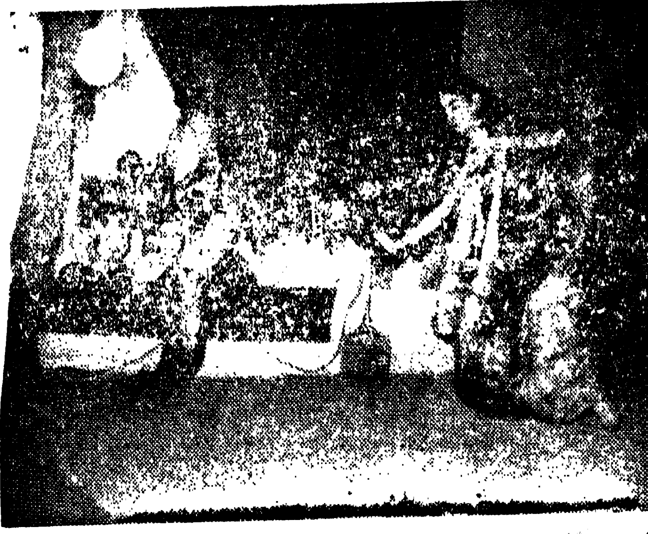
"পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু,
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কনক কিঙ্কিনী কাঞ্চি অনভ্যস্ত সাজ।"

শ্রীমতী সেবা মিত্র চিত্রাঙ্গদারূপে এই-স্থলে চিরন্তন নারীর দুঃখ, বেদনার অপূর্ব অভিব্যক্তি নৃত্যে রূপায়িত করিয়া দর্শক-চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেন। অর্জুন তখন বার বৎসর ব্রহ্মচর্যের ব্রত লইয়া বনে বনে ভ্রমণে রত। রূপহীনা চিত্রাঙ্গদার অপটু সজ্জায় তাহার মন ভুলিল না। অর্জুনবেশী হরিদাস নায়ারের 'ব্রহ্মচারী-ব্রতধারী' বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে নৃত্যটি অপরূপ হইয়াছিল।

তারপর চিত্রাঙ্গদা মদনের আরাধনায় তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে এক বৎসর অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইলেন। রূপসী চিত্রাঙ্গদার নৃত্যের ছন্দে বীর ব্রহ্মচারী অর্জুনের ব্রহ্মচর্য কোথায় ভাসিয়া



সুন্দরীর আবরণ পরিত্যাগ করিয়া স্বমহিমায় 'গরীয়সী' চিত্রাঙ্গদা নিজেকে অর্জুন সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন



মদনের বরে অপূর্ব লাবণ্যবতী চিত্রাঙ্গদা

গেল। তারপর "আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি।"

প্রেমের আর্ত আবেদন নায়কের প্রতি পদ-ক্ষেপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইখানে কবিগুরু নারী সৌন্দর্যকেই সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। অর্জুনের মত বীর ব্রহ্ম-চারীর মনও সুন্দরীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে জয় করিবার জন্য রূপ চাহিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহার সেই রূপের নিকট অর্জুনের আত্মনিবেদনে তথা অর্জুনের আত্মপরাজয়ে তাহার নারী হৃদয় ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছিল কম নয়।

"হায়! আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারি জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি বীরত্ব তোমার!"

রূপের জালে জড়াইয়া প্রিয়তমকে লাভ করিলেও তাহার অন্তরের চিত্রাঙ্গদার কোথায় জয় কোথায় তাহার তৃপ্তি? আক্ষেপের সীমা ছিল না তাহার। তাই অর্জুন-জয়ী রূপও তাহার সপত্নীতুল্য হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব নৃত্যে রূপায়িত করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন রূপান্তরিত চিত্রাঙ্গদা শ্রীমতী প্রণতি চট্টোপাধ্যায়। "অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন"— অপরূপ নৃত্যভঙ্গী দ্বারা শ্রীমতী প্রণতি দর্শকদের মনে সহানুভূতির করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছিল এইস্থলে। কিন্তু এই প্রকার আত্মবঞ্চনা চিত্রাঙ্গদার এতই অসহ্য হইয়াছিল যে রূপের প্রলোভনে বাঞ্ছিতকে লাভ করা অপেক্ষা তাহাকে না পাওয়াও তাহার শ্রেষ্ঠ মনে হইয়াছিল। তাই তাহার অন্তরে ক্ষুব্ধ আত্মাধিকার বার বার ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল।

"সেও ভালো। এই ছদ্ম রূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।
ভাল যদি নাই লাগে, "
ঘৃণা ভরে চান যদি, বুক ফেটে মরি যদি আমি,
আমি রব। সেও ভালো।"

তেজ-গর্বা চিত্রাঙ্গদার আত্মগ্লানিতেই শুধু তাহার আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়াছিল তাহা নয়, অর্জুনের আত্ম-অপমানও তাহাকে তীক্ষ্ম কষাঘাত করিয়াছিল।

এখানে কবিগুরু নারী মনের গভীর অন্ধকারের উপর এক তীব্র আলোর রেখা-পাত করিয়াছেন। নারী যাহাকে কামনা করে তাহাকে সত্যভ্রষ্ট আত্ম-অপমানের মধ্যে দিয়া পাইতে চাহে না। নারী ভালবাসে তার প্রিয়তমের পৌরুষ। গর্বিত তেজে আপন মহিমায় যিনি উজ্জ্বল ও প্রতিষ্ঠিত।

যে বীরের ব্রহ্মচর্য ভাসিয়া যায় তুচ্ছ রূপের নিকট, তাহাকে চিরসঙ্গী করিয়া গৃহিণী, পত্নী হইতে চাহে না নারী। শুধু ক্ষণকালের প্রিয়া হইতে পারে সে। যে গৃহে সন্তানবতী পত্নীর স্থান—সেখানে রূপ-জীবিনী প্রেয়সীর স্থান কোথায়?

তারপর সময় হইল। আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় দীপ্তগর্বে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিল চিত্রাঙ্গদা। তাহার লাস্যময়ী প্রিয়া-রূপের আর প্রয়োজন নাই। আসন্ন মাতৃত্বে তাহার কুরূপের সকল লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছিল। অর্জুন-তনয়ের জননীর আর কুণ্ঠা নাই। তাই সুন্দরীর আবরণ পরিত্যাগ করিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিল চিত্রাঙ্গদা—

"আমি চিত্রাঙ্গদা—
দেবী নহি, আমি নহি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি নই,
অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে
সেও আমি নহি।
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

সুন্দরীর আবরণ ত্যাগ করিয়া এইস্থানে পুনরায় পুরাতন চিত্রাঙ্গদা, শ্রীমতী সেবা মিত্র তাঁহার নৃত্যে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই তাঁহার শেষ নৃত্য। এই নৃত্যের ভিতর দিয়া নারীর শাশ্বত মহিমা, স্ত্রীর মহান গরিমা, এবং প্রেমিক হৃদয়ের অপরূপ অভিব্যক্তি তিনি নিখুঁত-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে নৃত্যে লাস্য নাই, মোহাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস নাই।

এইস্থানেই শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন দেশকে বহু জিনিস দিয়াছে। দেশের কৃষ্টিগত উন্নতির মূলে শান্তিনিকে-তনের অবদান যে কত বেশী তাহা একদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেশবাসী জানিবে। রবীন্দ্রযুগে শান্তিনিকেতনের কৃষ্টি যে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল—রবীন্দ্রোত্তর যুগেও তাহা অব্যাহত আছে। ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

বিশ্বভারতীর শিল্পিগণ কর্তৃক এই অভিনয় পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়। পাটনার রবীন্দ্র পরিষদ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন। টিকিট বিক্রয়ের অর্থ, পাটনার রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে প্রেরিত হয়।

[শীঘ্রই কলিকাতার কোনো একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য-নাট্য ও 'তাসের দেশ' অভিনীত হইবে।]

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

এষাস্য পরমগতি

প্রাচ্য ভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীন দেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে এক দিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরীপ করা যায়। চীন, ভারত-পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্য দেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুৎ। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারেনি।

কিন্তু এরকম পদ গুণে গুণে কি ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন্ পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য কলায় যাদের মোহ) কেউ বা ভক্তিযুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবরের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জী খাও, কেউ বলেন, 'ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামেশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী রাষ্ট্রের' নামে শক্তি-সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই সামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এঁদেরই নাম দার-উল-ইসলাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, প্রাচ্য, প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্বপ্রকার প্রগতির 'এনিমি নাম্বার ওয়ান।' আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রংঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্য ভূমিও একদিন মার্কসের অলংঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া'—সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবকযুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিকস পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কোরান-হদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁর স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরাণী, ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তি ভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এত দিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারেনি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভব সম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শহরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা।

বিশ্বসংসারের সব-আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলা-প্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদা-জাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি।

সমীপেষু

হীরালাল দাশগুপ্ত

যদি তুমি আসো কোন দিন,
বিস্মৃতির রত্ন দ্বীপ হতে,
কোন দিন আসো যদি তুমি,
স্বপ্নের সমুদ্র হতে
রক্ত-স্নান করি—
গোধূলির সোনালি আলোয়,
দিনের সমাধি শেষে,
নতুন রাত্রির মুখোমুখি,
আলো আর অন্ধকার
তরঙ্গ আকুল—
স্মরণের স্বর্ণতারে
ঝঙ্কারিয়া সুরের শৃঙ্গার;
যদি তুমি আসো কোন দিন,
বিবশ বাহুতে মোর—
সংজ্ঞাহীন বিবর্ণ ব্যথায়—
প্রথম আলোর মত ধারাল ঠোঁটের
পেলব পরশ আনো
মরণ-নেশায়
নিমীলিত প্রাণ-পদ্ম
পাতায় পাতায়;
শুনিবে সেথায় তুমি
শব্দ অপরূপ,
সুরহীন
ছন্দহীন
অর্থহীন গান—
ঘুমন্ত গানের মত
রেলের চাকায়
(নিদ্রাহীন রজনীর শেষে)
বসন্তের অভিসারে
অরণ্য মর্মর,
রক্তের শব্দের মত
শ্রান্ত ধমনীর,
শিখার শব্দের মত
সিক্ত অগ্নি-শিখা
আকাশ-উজ্জ্বল,
রজনীগন্ধার মত,
শ্রাবণ রাত্রির মত,
স্বপনের শূন্য পাত্রে
মদের ফেনার মত
সৃষ্টি-উচ্ছলতা,
বিলম্বিত শূন্যে শূন্যে
বন্দরের মৃত্যু-নেশা বাঁশি
গোত্রহীন সমুদ্র সৈকতে;
হঠাৎ শঙ্খের ধ্বনি
উত্তীর্ণ সন্ধ্যায়,
বিকম্পিত গুরু বক্ষ
কুটিল নয়ন
প্রিয় সখি পীতম পাহুন।•
দিগন্তের গগন অন্তরে
পুড়ে যায় কামনার ধূপ,
নয়নের বাদল ধারায়,
শরীরের ঘন অন্ধকারে,
কমনীয় কলঙ্ক রেখায়,
সঙ্গীহীন অরণ্যের সবুজ ছায়ায়
নিশীথের যবনিকা
নামে ধীরে ধীরে—
মজ্জমান জাহাজের
নিশানের নীল মনে হয়;
যদি তুমি আসো কোন দিন,
কোন দিন আসো যদি তুমি।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী



পাগল ক'রে দিলে ও আমাদের। চব্বিশজন যুবক, ফরডাইজ লেনের দিক্‌পাল ক্রিকেটিয়ার ফণী চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ ক'রে ফিয়ার্স লেনের ফাইন আর্টিস্ট ননী মজুমদার, ফড়িয়াপুকুরের নামজাদা ব্রীজ খেলোয়াড় লটু দত্ত, তালপুকুরের নামজাদা ভায়লনিস্ট হারান গাঙ্গুলী, সাহিত্যিক রমা বোস, গড়িয়ার ম্যাজিশিয়ান অতুল সরকার, শ্যামবাজারের বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার শশী সামন্ত, কে না?

বস্তুত, ভাবতে অবাক লাগত, কি ক'রে আমরা সব একত্র হয়েছিলাম, কে খবর দিলে বালীগঞ্জ প্লেসের বসন্ত ভিলায় আমাদের গুণীদের সম্বর্ধনা করবার জন্যে ক্যাপ্টেন বি কে গুহ তাঁর সুন্দর বাগান, গাড়ি, বাড়ি, দামী সিগারেট, আর পেয়ালা পেয়ালা দার্জিলিং-এর টাট্‌কা অরেঞ্জ পিকো নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অবশ্য তিনি কোনো টি-গার্ডেনের অংশীদার ছিলেন বলে পেটি পেটি চা পেতেন আর তা-ই অকাতরে মুক্তহস্তে আমাদের পান করতে দিয়েছেন। বসন্ত-ভিলার কিচেনে একটা উনান সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জ্বলত আর সেই উনানে চাপানো থাকতো প্রকান্ড গরমজলের হাঁড়ি। বগ্‌বগ্‌ ক'রে জল ফুটত আর তাই থেকে কখনো অতুল কখনো আমি কি শশী কি হারান নিজের হাতেই কাট্‌লিতে খানিকটা খপ্‌ ক'রে ঢেলে নিয়ে তাতে মুঠ মুঠ পিকো ভিজিয়ে পানীয়টি তৈরী করেছি তারপর তা পেয়ালায় ঢেলে এবং তাতে চুমুক দিতে দিতে আবার ফিরে এসেছি বসন্তবাবুর ড্রয়িং-রুমে। হয়তো অতুলের তাশের ম্যাজিক চলছে, কি সাহিত্যিক রমার সদ্যরচিত প্রেমের গল্পপাঠ কি হারানের কুশলী হাতের বেহালা বাজনা।

নিশ্চয়ই, বসন্তবাবু গুণীলোক ছিলেন, না হলে এতগুলো গুণী ছেলেকে তিনি কি ক'রে ধরে রাখতেন তাঁর বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা। এবং বসন্ত-পত্নী।

বিকেল পড়তে মিসেস গুহ আমাদের বাগানে টেনে নিয়ে গেছেন। সবুজ রং করা ডিম্বাকৃতি সারি সারি বেতের চেয়ারে ব'সে আমরা গল্প করেছি, গান গেয়েছি, আবৃত্তি করেছি। ক্রিকেটিয়ার ননী তার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের কাহিনী শোনাতো, দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়। যখন ওর গল্প চলতো ক্যাপ্টেন গিন্নী নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে দামী হাভানা চুরুটের বাক্সটি আমাদের নাকের সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরাও কথাটি না করে চুরুটটি তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের সুরম্য লাইটার থেকে তাতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে পুনরায় মজুমদারের খেলার গল্পে মনঃসংযোগ করেছি। হ্যাঁ, এত আদর করতেন মিসেস গুহ। নিজের হাতে খোসা ছাড়িয়ে তিনি আমাদের আপেল কেটে খাওয়াতেন, আনারস, ফজলী আম, সিঙ্গাপুরী কলা, বাতাবী নেবু। বাগানের মধ্যে চলে আসতো সিঙ্গাড়া, সবশেষে ট্রে-ভর্তি ছাব্বিশটি সোণালী পেয়ালা। সোণার রঙ চা চলকে উঠতো কথা হাসির ধাক্কায়। আমরা চব্বিশজন আর কর্তা-গিন্নী।

আ, কি আড্ডা!

বাড়িটা জমিয়ে রাখতুম, বলা চলে জমে থাকতুম সব বসন্ত-ভিলায়।

দুপুরে চলতো ব্রীজ, পাশা, বাগাটেলী, পিংপং, ক্যারম। কি ক্যারিকেচারিস্ট কেদার নন্দীর কণ্ঠ ও বিচিত্র মুখভঙ্গী। বাদল চাক্‌লাদের ইণ্টারন্যাশনেল পলিটিক্স।

বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক শ্রীপতি চ্যাটার্জি'র খালি গলার গান। প্রোগ্রাম ছিল না কিছু। প্ল্যান করে ফূর্তি করা নয়। এমনি। যখন যেটা ভালো লাগ্‌তো।

'রিটায়ার্ড লাইফ। এখন আর রুটিনের বালাই নেই।' ক্যাপ্টেন বলতো, 'রাশ ছেড়ে দিয়ে ফূর্তি করব বলেই তো তোমাদের ডেকেছি, ইয়াংমেন।' গৃহ বাঘের চোখের মতন দুই বিশাল জ্বল্‌-জ্বলে চোখে, বলা চলে আসল প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিতে আমাদের চব্বিশটি চওড়া বুকের দিকে যখন তাকিয়ে থাকতেন, দেখে ভয় হ'তো। যেন আনন্দের আতিশয্যে আমাদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বেন নাকি ঈর্ষার উত্তেজনায় ভাবতাম। এত বড় ছিল তাঁর শরীর, নাতিদীর্ঘ দেহ। হাতের কব্জিতে এখনো কত জোর তা দেখিয়ে দিয়েছেন একদিন ক্রিকেটিয়ারের সঙ্গে বক্সিং লড়ে।

এমনিও হাত পা সুস্থির থাকত না বুড়োর। এর কাঁধে কিল ওর পিঠে ঘুসি, ওর পেট গুঁতো, তার পিছনে লাগ-মারা চব্বিশ ঘণ্টা চলছিল। আর, এক ধরণের নাক দিয়ে হেসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজ বার করা, আক্ষেপ? আস্ফালন। 'ইয়াংম্যান, ইয়াংম্যান।'

যেন যৌবনের গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে-ছিল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল পঁয়ষট্টি বছরের পুরোণো রক্ত। খেতে বসে সবচেয়ে বেশি খেতেন, সবচেয়ে বেশি আওয়াজ হত তাঁর দাঁতের। পাঁঠার হাড় কি রুইয়ের মুড়ো কুড়মুড় করে যখন ভাঙতো। আর ঠিক তখন, 'ফ্রেন্ড, আর একটু খাও, আর একটু দিই,' ব'লে গৃহগিন্নী রুপোর চামোচ উপুড় ক'রে মাংস, ঝোল, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট আমাদের পাতে ঢেলে দিতেন, ঠেলে দিতেন চাপ চাপ পোলাও। 'এই বয়েস খাবার। কাঁচা রক্ত। লোহা খেয়ে হজম করবে, নইলে কিসের জোয়ান মরদ ছেলে।' কথা শেষ করে রুপোলী কণ্ঠে গৃহিণী ঘুরে ঘুরে হাসতেন।

সত্যি, ওই বয়সেও রুপোলী ছিল তাঁর গলা। ভেবে অবাক হতুম, শুধু গলা? তাঁর গাল ও গলার অপূর্ব মসৃণ ত্বক দেখে কতদিন আমরা চমকে চমকে উঠেছি এবং ভেবেছি এ কি করে সম্ভব। এও কি সম্ভব পঞ্চাশের প্রান্তবর্তিনী নারীদেহে এই রূপ। নিটোল সুন্দর বেণী কানের দু'দিকে ঘিরে কাঁধ বেয়ে যখন আমাদের প্লেটের কাছাকাছি এসে ঠেকতো, কেন জানি একটুও বেমানান ঠেকত না, বরং চকিত হৃদস্পন্দন নিয়ে ইয়ং ফ্রেন্ডদের কেউ-না-কেউ প্রায় রোজই প্রতিজ্ঞা করতাম 'আজ বাজারের সেরা অর্কিডটি কিনে এনে উপহার না দিলে গৃহিণীর অসম্মান করা হবে।' অর্থাৎ প্রীতিভোজনের বিনিময়ে প্রীতি উপহার দেওয়া।

বিকেলে সেই অর্কিড হাতে নিয়ে গৃহ-গিন্নী আমাদের সঙ্গে যখন আড্ডায় বেজায় মেতে গেছেন তখন পিট্‌পিট্ চোখে বিরল-কেশ স্থূলোদর গৃহ আমাদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন ইয়ং ফ্রেন্ডদের নিয়ে আর কি আনন্দ করা যায়, অন্যরকম ফূর্তি।

পরদিনই ক্যাপ্টেন তিনটে ট্যাক্সী ভাড়া করেছেন। সঙ্গে আছে তাঁর গাড়ি। ছাব্বিশ-জন হৈ-হৈ ক'রে গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেছি।

ক্যাপ্টেন কোটপেণ্টুলন খুলে আমাদের সঙ্গে জলে নেমে সাঁতার কেটেছেন, খালি গায়ে মাঠে ছুটোছুটি করেছেন একাধিকবার।

অবশ্য ক্যাপ্টেন-গিন্নীও তখন থাকতেন সঙ্গে।

সাঁতারের শেষে খেলার শেষে আবার যখন আমরা হৈ-হৈ করে গাছের ছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছি, ক্যাপ্টেন-গিন্নী বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁর সঙ্গে-আনা হাঁড়ি থেকে অনেক সন্দেশ আর পেস্তার বরফি তুলে আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন আর মিটিমিটি হেসেছেন।

আর বুড়ো ক্যাপ্টেন হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কি তখন ভেবেছেন যেন।

যাকগে, যতই আড়াআড়ি করুক তাঁরা ইয়ং ফ্রেন্ডদের নিয়ে, তরুণ বন্ধুদের সান্নিধ্য—সুখ ভোগের লালসায় আমরা কিন্তু দুজনেরই মনোরঞ্জনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। গিন্নীকে যেমন কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল এনে দিয়েছি কর্তাকেও উপহার দিয়েছি বাক্স বাক্স চুরুট। খুশি ছিলেন দুজনই।

বসন্ত-ভিলা।

বসন্তের সেই অরণ্যে হাসি গান লম্ফ-ঝম্পের শেষ ছিল না। আমাদের লাভ?

আগেই বলা হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেয়ালা ভর্তি ধূমায়িত সোণালী চা, দামী চুরুট, ফি শনিবার মুর্গি পাঁঠা মেরে মজাদার ফিস্টি, এবং ফাঁক পেলেই ট্যাক্সী চেপে আনন্দ-অভিযান।

সেই সুখের আড্ডা ছেড়ে কে-ই বা আ... আর, কেউ তো আমরা হাতি-ঘো... মারছিলাম না। আর্টিস্ট, খেলোয়াড়, ম্যাজি... শিয়ান, কেরিকেচারিস্ট, কি কবি বলেই ... হুট্ হুট্ ক'রে এক একজন চাকরি ... যাব আর দশটা-পাঁচটার নিয়মিত জী... যাপন করব এমন সমাজব্যবস্থাই ... আমাদের আছে। সব বেকার। বাড়ির লো... 'দূর্-দূর্' করছিল।

বাইরে ঘোরার সম্বল নেই।

তাই যৌবনের সাধ-আহ্লাদ বুকের ভি... লুকিয়ে যেন অনেকটা নাচার হয়ে আম... বুড়ো বুড়ির প্রসারিত শাখায় মধুর চা... বেঁধেছিলাম। ভারি সুখে কাটছি... দিনগুলি!

কে জানতো সেই বসন্তের অরণ্যে আগু... লাগবে। আমাদের গুণগুণানি থামল, পা... ঝিমিয়ে এল একদিন। সেদিন এ ও... মুখের দিকে অসহায় চোখে চাওয়া চাওয়ি করলাম কতক্ষণ।

তারপর বসন্ত-ভিলা থেকে বেরিয়ে এ... সব রাস্তার একটা চায়ের দোকানে ঢু... গোল হয়ে বসে সমালোচনা করলাম এক নাগাড়ে আড়াই ঘণ্টা। একশ কুড়ি কাপ চা খেয়েছিলাম সেই দোকানে মনে আছে। 'বুড়োটা স্বার্থপর।' ম্যাজিশিয়ান বলল। 'বুড়িটা বিশ্বাসঘাতকিনী।' সাহিত্যি... মন্তব্য করেন।

আশ্চর্য, বলাবলি করতে লাগলাম, কি... ক'রে ওরা না বলে পারল এতকাল। না ... আমরা ছোঁ মেরে নিয়ে যেতাম, কি খোঁ... পেলে চড়াও করতাম গিয়ে ওর বোর্ডিং।

বলব কি, গাড়ি থেকে নেমে একটা এটা... হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি বারান্দা পার হয়ে ... যখন আমাদের সামনে দিয়ে ওপরে উঠে গে... মুহূর্তকালের জন্যে গৃহ-দম্পতী অপ্রস্তু... হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য স্বীকার করতে হ'ল দুজনকে... তা ছাড়া উপায় ছিল না। অরণ্যে ফুল ছি... পাতা ছিল হাসি গান মধু-মর্মর জাগা... হওয়া কোনোটার অভাব ছিল না, এখ... হঠাৎ, সবুজ আর নীল পালকে মো... অপরূপ এই পাখি দেখে আমরা অস্থি... উন্মনা হয়ে উঠব আর চব্বিশ জোড়া উৎসু... চোখ দিয়ে তখুনি মেয়ের চুল চোখ ন... ভুরু জরীপ করতে থাকব সহজ কথাটা ... বুড়ো-বুড়ি বুঝছিল না, বুঝতে পে... যেন দুজনের চেহারা এমন ফ্যাকাশে হ... গিয়েছিল টের পেলাম, কিন্তু অপর-প...

...ন দাঁড়াল না, আমাদের সঙ্গে দূরে থাক, ...মার সঙ্গেও কথাটি না কয়ে সরাসরি ওপরে চলে গেল দেখে ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেন-গিন্নী নিশ্চিন্ত হলেন,—দু'জনের মুখের ... বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেসে, অল্প-... হেসে বললেন, 'সামনে ওর এগ্‌জামিন। ...দের মাথা গরম। বোর্ডিং-এ থেকে তেমন পড়াশোনা হবে না, তাই লিখেছিলাম বাড়িতে চলে এসো, এখানে আমাদের চোখের সামনে কিছু না হোক অন্তত—কিছু-তো পড়াশোনা চলবে, কি বলো তোমরা? বেথুনে এবার আই-এ দিচ্ছে বোনা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ভদ্রতার খাতিরে সমস্বরে ...কেবল মন্তব্য করলাম।

'বড্ড শাই। ভাল করে মেয়েটা আজো কারু সঙ্গে কথা বলতেই শিখলে না। অবশ্য একদিক থেকে ভালই। মেয়েছেলে যখন।'

বুড়ো দাঁত বার ক'রে হাসছিল, আমাদের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল।

আর, এক থাবা মেরে, যেন মাছি তাড়ানোর মতন মেয়ের প্রসঙ্গটাই বুড়ো উড়িয়ে দিলে চালাকি করে। 'কাল ব্যারাকপুরে আমরা দল বেঁধে পিক্‌নিক্ করতে যাচ্ছি। আশা করি ইয়ং ফ্রেণ্ডরা সবাই উপস্থিত থাকবে।'

'তা থাকব।' একজন কি দু'জনের গলা মৃদু শোনা গেল অন্যদিন এই প্রস্তাবে চল্লিশটা চড়া গলা একসঙ্গে হুররে করে উঠত।

'কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সরকারের পায়রার ম্যাজিক, যেন মনে থাকে।' বিনুনী দুলিয়ে ওদিক থেকে ড্যাবড্যাবে চোখে গিন্নী অতুলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নতুন আকাশে অতুল পায়রা উড়িয়ে দিয়ে চিরকালের মতন তাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার ম্যাজিক শিখেছে এবং সেটাই বিকেলে বসন্ত-ভিলার বাগানে দেখানোর কথা হচ্ছিল।

কিন্তু যে পায়রা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চকিতে দোতলার সিঁড়ির আড়ালে অদৃশ্য হ'ল তার কথা ভেবেই তখন আমরা মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলাম।

'লোটন।' সাহিত্যিক রমা মন্তব্য করল।

'ঝুঁটি।' বেহালাবাদক গাঙ্গুলী মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাড়িতে এসে লোটন সেজেছে। খোপা খুলে বেণী করতে কতক্ষণই বা লাগে।'

'রাইটো।' শশী চীৎকার করে উঠল। 'শাই টাই সব বাজে কথা। সেয়ানা মেয়ে। ওপরের সিঁড়ির মোড় ঘুরবার সময় সারসের মতন গলা বাড়িয়ে ও আমায় দেখছিল মাইরি। আমি সিঁড়ির ঠিক নীচে বসে-ছিলাম তোরা খেয়াল রাখিস?

ফাইন আর্টিস্ট ননী মিটি মিটি হাসে।

'বাগান পার হয়ে যখন বারান্দায় ওঠে ঠিক তখনই তো আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বাবা, নাবালক নাকি যে সেই চোখের ভাষা শর্মার অজানা থাকবে।'

'খুব ফরোয়ার্ড মেয়ে।' ক্রিকেটিয়ার চক্রবর্তী একটা গোল্ডফ্লেক ধরায়। 'বারান্দা ক্রশ্ করে যখন সিঁড়ির দিকে যায়, তোরা লক্ষ্য করিসনি, এটাচিটা ও ঠিক আমার রাইট এল্-বো ছুঁইয়ে নিলে।'

চুপ করে রইলাম সব কতক্ষণ। ভাবলাম, রেস্টুরেণ্টের হাতলভাঙ্গা পেয়ালায় করে আর এক প্রস্থ চা গিললাম। গুড় মেশানো তেতো তামাটে স্বাদের চা। কিন্তু তা-ই 'অমৃত,'—মনে মনে বললাম। বসন্ত-ভিলার অরেঞ্জ-পিকো দিয়ে বহুদিন জিহ্বা পুড়িয়েছি। আর কেন।

'তোরা সব বেকার বাউণ্ডুলে, বুঝলিনে?' চক্রবর্তী সবাইকে একটা করে সিগারেট প্রেজেণ্ট করে। 'বুড়ো-বুড়ির সাধ আছে ব্যারিস্টার আই-সি-এস ছেলেকে জামাই করার। শুনলি না? আসতে-না-আসতে এগজামিনের লম্বা চওড়া বক্তৃতা।'

'মানে সুরুতেই সোনার হরিণকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা,' শশী বলল, 'বেজায় হুঁশিয়ার ওদিক থেকে।'

'ব্যাচেলার সব তোরা। রক্ত গরম।' চক্রবর্তী কথা শেষ করে তেরছা ঠোঁটে হাসল আর ধোঁয়া ছাড়ল। আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু এখন কি করা যায়, জল্পনা কল্পনা করলাম, একযোগে সবাই বসন্ত-ভিলা স্ট্রাইক্ করব? যদি আর না যাই কেউ? দেখি বুড়ির দিন কাটে কাদের নিয়ে, কাকে দেখায় পাকা বেণী আর জর্জেট-মোড়া মোটা কোমরের হেলানি-দুলানি? চুপচাপ একলা বাড়িতে বসে থেকে বুড়োটার হোক ডায়বেটিস। ইয়ং-ফ্রেণ্ডদের গলা জড়িয়ে বোতল বোতল বীয়ার টানা আর মুর্গির হাড় চিবানো শেষ করে দিই। কি বলিস?

'লাভ নেই।' সাহিত্যিক রমা মন্তব্য করল। 'শেষ পর্যন্ত কি হয় দ্যাখো না। পাখি যখন একবার দেখে ফেলেছি পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখবে ক'দিন? কতক্ষণ? বরং আড্ডা আরো গরম ক'রে ও-বাড়িতে তুলব আমরা। আঠালীর মতন লেগে থাকব।'

'পাখি তা'লে উঁচু ডাল থেকে নীচে নেমে আসবে? দোতলার পড়ার ঘর ছেড়ে বাগানের ঘাসে?' ফুটবলীয়ার সামন্ত প্রশ্ন করল, 'সবুরে মেওয়া ফলবে?'

'আলবৎ।' ক্রিকেটিয়ার বলল। 'ফলতে হবে।'

'আসতেই হবে।' তরুণ গোঁফের রেখায় আঙ্গুলের মোচড় দিয়ে আর্টিস্ট মজুমদার বলল, 'ওর শরীরে যৌবনের কলরোল সুরু হয়েছে।'

'নেহাৎ যদি তালাচাবি দিয়ে ঘরে আটকে রাখে।' গলায় জোর দিলে ক্রিকেটিয়ার, 'চোখের কড়া পাহারা এই মেয়ে মানবে না। ওর জুতোর শব্দ আর ভুরুর ভাষা দেখেই আমি বুঝেছি সাবালিকা, সাঁতার কাটতে তৈরী।'

আমরা কতক্ষণ স্পন্দনহীন হয়ে যে যার আসনে বসে বসন্তভিলার বেথুনে-পড়া কোমলাঙ্গী রাজহংসীর ছবিটি মানসপটে আঁকলাম।

'বন্দনার' অপভ্রংশ—'বোনা'। সুন্দর নাম। সেই নাম শুনে আমাদের বুকের মধ্যে দুন্দুভি বাজল।

'বন্দনা!' —আমাদের ডাকছিল তখন বুড়ো ক্যাপ্টেন। সময় অপরাহ্ন। বাগানে অতুলের পায়রার ম্যাজিক আরম্ভ হয়েছে। ক্যাপটেন গিন্নীর জমকালো সাজ। গোলাপী সিল্ক। ময়ূরকণ্ঠী-রং ব্লাউজ। ঠোঁটে রং। চোখে কাজল। পায়ে শাদা উঁচু-হিলের জুতো। অবিকল একটি মেয়ের মতন। আর সবচেয়ে যা ও'র আকর্ষণীয়, কানের দুদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিশোরীসুলভ লোটন বেণী। বেণী দুলিয়ে তিনি যখন আমাদের সামনে পাকা পেপে, ডালিম-দানা আর আঙুরে ভরতি পাথরের বাটিগুলো সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত, ও অতুলের চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হেসে 'ইয়ং ফ্রেণ্ড, তোমার পায়রা আজ আকাশের কোন্ কোণায় লুকোয় আমি ধরব, ধরে ফেলব সব জারিজুরি,—দৃষ্টির ধার তোমার চেয়ে আমার কম নেই;' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছেন, দেখা গেল ক্যাপ্টেন ভয়ানক গম্ভীর। তাঁর দৃষ্টি ঠিক আকাশের দিকে নয়, দোতলার কোন জানালার ওপর নিবদ্ধ। ইতিমধ্যে আমরাও সহস্রবার সেই জানালায় দৃষ্টি বুলিয়েছি এবং হতাশ হয়ে ফের অতুলের মুঠোর মধ্যে ধরা শাদায়-কালোয় চিত্রল পায়রাটাকে দেখেছি।

পায়রা ভয়ানক ছটফট করছিল।

—ক্রিকেটিয়ার বলছিল, 'ছেড়ে দে, বেচারাকে আর কতক্ষণ কষ্ট দিবি।'

সাহিত্যিক বলছিল, 'বিহঙ্গিনীকে বন্দী করে রাখা ঠিক নয়।'

'উহুঁ, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না বলেই তো ম্যাজিশিয়ান পাখি উড়োনোর বিলম্ব করছে' বলে গিন্নী ফাটা ডালিমের দানার মতন দাঁত বার করে যেই হেসে উঠছিলেন, কর্তা বাজখাই গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন—'বোনা'। সেই ডাক শুনে আমাদের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বুঝি বা দোতলার জানালায় শান্তিপুরীর শুভ্র আঁচলের একটা ঝলকও দেখেছিলাম, কিন্তু হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া চৈত্রের মেঘের টুকরোর মতন তা আবার মিলিয়ে গেল।

'দেখলে কাণ্ড!' ইয়ং ফ্রেন্ডদের সম্বোধন করে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ক্যাপ্টেন গিন্নী বলেন, 'কাল বাদে পরশু মেয়ের এগ্‌জামিন, পড়ছে, আর শখ করে ডাকছে ও ওকে আড্ডায় ম্যাজিক দেখতে, তোমরা বলে একে বুঝিয়ে দাও, পড়া ছেড়ে বোনা এখন আসবে না।'

আমাদের বোঝাতে হ'ল না।

গিন্নীর চেহারা দেখেই কর্তা চুপ।

যেন ড্যাবড়াবে চোখে মিসেসের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন মনে মনে বলছিলেন, শখটা যে তুমিই একলা পুরো-পুরি লুটছ বন্ধুদের নিয়ে। পায়রার ঝটপটির চেয়ে তোমার ছটফটানি বেশী, তোমার বেণী কাঁপছে বেশী পাখীর ঝুঁটির চেয়ে।

বোনা আর এলো না।

আর সমস্ত বিকেলটা, যতক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে অতুলের পায়রা ওড়ানো দেখলাম, শুনলাম গাঙ্গুলীর বেহালা বাজনা গৃহগিন্নী বাগানে চড়কিপাক খেয়ে আমাদের চব্বিশজনকে কখনো সিগারেট, কখনো চা, ফলমূল কি মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করেছেন, ম্যাজিকের শেষে অতুলের গলা জড়িয়ে ধরে সে কী উচ্ছ্বাস। 'ব্রাভো! এমনটি আর দেখিনি, কোথায় শিখলে এই খেলা আমায় শেখাও, আমায় শেখালে নিজের হাতে রোজ তোমায় পেস্তার বরফি করে খাওয়াব।' অতুল শব্দ করেনি।

বুড়ির কাণ্ড দেখে রমা দাঁত কিড়মিড় করছিল, ক্রিকেটিয়ার পায়ের জুতো দিয়ে ঘাস ছিঁড়েছে, আর আর তিনি—স্বয়ং গৃহকর্তা অদূরে একটা পামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে চুরুট টেনেছেন:

অথচ অন্য দিন মিসেসের এই আদিখ্যেতা আমাদের কত ভাল লাগতো। উপভোগ করতাম ইয়ং ফ্রেন্ডদের নিয়ে গিন্নী প্রমত্ত থাকার দরুণ ক্যাপ্টেনের দুর্জয় অভিমান এবং সঙ্গিণী-হারা মহিষের মত দূরে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ-বিক্ষেপ ও নাকমুখ দিয়ে অবিশ্রাম বর্মা চুরুটের ধূম উদ্গীরণ।

কিন্তু গৃহিণীর এই নাচানাচি চুপ করে হজম করার পাত্র তিনি নন বলেছি আপনাদের। শনিবার পিক্‌নিক্ দেরী হয়ে যায়, দু'দিন অপেক্ষা করার সবুর নেই তাই সেটা তিনি সোঁৎ করে নিয়ে এলেন বিষ্যুতবারে।

তিনটে ট্যাক্সি এবং তাঁর নিজের গাড়িতে চেপে সব রওনা হলাম। শেষ পর্যন্ত আশা—ছিল। কিন্তু—

সেখানে গিয়ে অবশ্য গিন্নী প্রচুর রাগ করলেন। কিন্তু শোনে কে।

বারুইপুরের তালপুকুরের ধারে চড়ুই-ভাতি খেতে আসার উদ্দেশ্যই হল দলবল নিয়ে দীঘির কালো জলে নেমে ছোকরাদের সঙ্গে কোমর মিলিয়ে উদ্দাম সাঁতার কাটা। যেন ক্যাপ্টেন সেদিন গায়ে জোর পাচ্ছিলেন বেশী। আমাদের কারোর মাথায় গাঁট্টা মেরে কারোর চোখে মুখে পায়ের জল ছিটিয়ে ওঁর যেন আশ মিটছিল না, আর মাঝে মাঝে এর ওর গলা জড়িয়ে ধরে 'ইয়ং ফ্রেন্ড, রাগ করলে কি, স্পোর্টসে নেমে রাগলে চলবে কেন, এসো, আর একবার দীঘিটা ক্রশ করি' বলে হুড়মুড় করে আমাদের হাত ধরে ফের জলে নেমেছেন। কিন্তু সেই সাঁতারে আনন্দ পেয়েছি কতটুকুন!

তীরে উঠে দেখি গিন্নী একলা চুপচাপ তালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মুখ কালো করে বসে।

'একলা এতগুলো মুর্গী আমি কি করে ছুলি! বোনা এলেও তো খানিকটা হেল্‌প করতে পারতো।'

'তুমি ক্ষেপেছো গিন্নী?' তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে কর্তা বলছিলেন, 'সামনে মেয়ের এগ্‌জামিন। আমাদের মাথা-ভাঙ্গার দলে টেনে এনে ওর মাথাটি খাওয়া কেন, কি বলো বন্ধুরা?'

কেউ শব্দ করলাম না।

পুরো একটা ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে এবং পর পর গোটা তিন চার বীয়ার শেষ করে বুড়োর চোখ দুটো পাটনাই পেঁয়াজের মত টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিন আমরা সেই চোখকে ... করেছি, পয়ষট্টিতে পা দিয়ে যৌবনের অ... তেজ পোষণ করছিল বলে নীরব অভিনন্দন জানিয়েছি, কিন্তু সেদিন রাগ হল ঘৃণা হল। বরং সবাই তখন ভিজে কস্ট্যুম গায়ে রেখেই মিসেসের পাশে বসে পড়ে মুর্গী ছোলা ও ওঁর বাটনা বাটায় সাহায্য করতে লেগে গেলাম।

বাগানে অনেক পাখি ডাকল, ঘাসের উপর গোল হয়ে বসে আমরা প্রচুর মাংস পোলাও ভোজন করলাম, ঝিরঝিরে বাতাস দিলে, দীঘিতে ঢেউ জাগল। পাতার মুকুট মাথায় পরে ক্যাপ্টেন জংলী-রাজা সেজে নৃত্য করল, বনফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে ক্যাপ্টেনগিন্নী জংলী-রাণী হয়ে গান করল, কিন্তু আমরা সব ঝিমিয়ে ছিলুম। আর আর দিনের মতন ইয়ং ফ্রেন্ডরা যে উত্তপ্ত হয়ে উঠছি না তা লক্ষ্য করারও সময় ছিল না দুজনের। আনন্দে এত মগ্ন ছিল। মুর্গীর হাড় চিবোনোর ছলে আমরা ঘাসের দিকে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত ঘসলাম শুধু আর কল্পনার চোখে 'বসন্ত-ভিলা'র দোতলার একটা জানালা দেখলাম। আমাদের মন পড়েছিল সেখানে।

পরদিন ফণী একটার বদলে এক ডজন ফুলের তোড়া নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের বাড়িতে। অর্থাৎ শেষ ছবি বিক্রী করে ক'টা টাকা বেচারা পেল সব ফুলের তো... খরচ করল। শেষ চেষ্টা।

লাভ হল কিছু?

একটি ফুলও যথাস্থানে পৌঁছয়নি।

চোখের ওপর দেখলাম এক একটা তো... থেকে বেছে বেছে ফুল নিয়ে বু... বেণীতে গুঁজল ব্রোচে আটকাল। বু... কিছু ফুল রাখল পকেটে কিছু গুঁজে বোতামের গর্তে। যেন ওদের জন্যেই ফ... নেয়া।

মুখ চুণ করে মজুমদার সেই যে বস... ভিলা ছাড়ল আর গেল না।

ফুটবলের শশী কি করে ক'টা ট... যোগাড় করে একদিন চার বাক্স চকো... কিনে নিয়ে যায়।

বুড়োবুড়ি ভাগাভাগি করে খেয়ে উজাড় করে দিলে। বেহালাবাদক তিন ...

ভীমনাগের আম-সন্দেশ নিয়ে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি।

তালুকদার নিয়েছিল চুলের রীবন, স্নো, পাউডার, সাবান। যদি একটা যায়, একটাও দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরের কোন ঘরে গিয়ে ওঠে।

হেসে ক্যাপ্টেন-গিন্নী পুরানো রীবন ছেড়ে নতুন রীবন বাঁধলেন, বিকেলে তালুকদারের দেওয়া সাবান দিয়ে তিনবার মুখ ধুয়ে নতুন স্নো মাখলেন। তালুকদার মুখ কালো করে বসে সেখানে ঘণ্টাখানেক কোনরকমে কাটিয়ে সেই যে চলে এলো, আর গেল না।

পরাজয়, প্রচণ্ড এক-একটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সব খসে পড়তে লাগল।

কিন্তু বুড়োবুড়ি দমবে না।

'তাতে কি, এখনো তিনটে ইয়ং ফ্রেন্ড আছে। স্ফূর্তি করতে এরাই যথেষ্ট।'

ক্যাপ্টেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মোষের মতন মোটা ঘাড় নাড়েন। এসে যোগ দেন গিন্নী।

'হ্যাঁ, আনন্দ করতে বেশি লোকজন নাই-বা থাকল। এবার আমাদের আড্ডাটি নিবিড় হয়ে জমবে, কি বলো চক্কোত্তি?'

ক্রিকেটিয়ার নীরব থেকে ঘাড় নাড়ল।

অর্থাৎ থেকে যাওয়ার মধ্যে আমি, ম্যাজিশিয়ান ও সাহিত্যিক রমা আছি শুধু বসন্ত-ভিলায়।

গিন্নীর কথা শুনে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, আর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

তারপরও ক'দিন কাটল।

শরতের শিউলিরা মজে গেল। শীতের কনকনে বাতাস বইছিল। হঠাৎ শোনা গেল বোনার একজামিন শুরু হয়েছে।

রাস্তার সেই চায়ের দোকানে ঢুকে তিন-জন আবার জল্পনাকল্পনা আরম্ভ করলাম।

'যদি শীত এলো বসন্ত আর কতদূর।'

সাহিত্যিক রমা হাতলভাঙ্গা কাপ থেকে মুখ তুলে বলল, 'এতকাল সবুর করেছি, এবার মেওয়া ফলবে, আমি বলেছি তোদের আগে।'

'একজামিন শেষ হতে ক'দিন লাগবে?' ম্যাজিশিয়ান আমার মুখের দিকে তাকায়।

'সাত দিন।' বললাম।

'সাত দিনের মধ্যে ভিলার সবগুলি গোলাপ কলি ফুটবে।' সাহিত্যিক রমা কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখে।

আমরা বসে বসে গোলাপের স্বপ্ন দেখলাম। রেস্টুরেন্টের ময়লা টেবিলে মাছি বিজবিজ করছিল।

হঠাৎ ম্যাজিশিয়ান নিজের মনে হেসে উঠল। কতক্ষণ পর সাহিত্যিকও হাসল।

দুজনের নীরব হাসির কারণ বুঝলাম। সফল হবার স্বপ্ন দেখছিল তারা।

আপনারা শুনে হয়তো হাসবেন। আমিও হেসেছিলাম। আমিও স্বপ্ন দেখছিলাম বসন্তের রৌদ্র প্রজাপতি ও অফুরন্ত গোলাপের হাটে বসে একজামিনের শিকল থেকে সদ্যোমুক্তা (?) হৃষ্টমনা, স্বচ্ছন্দ-গামিনী অষ্টাদশীকে সামনে রেখে গল্প করছি, হাসছি, গান করছি, খেলছি। ক'দিন, কতকাল বাপ-মা ওকে ঠেকিয়ে রাখবে?

'ভালয় ভালয় পরীক্ষাটা ও দিয়ে সারুক।' দার্শনিকের মত দুই চোখের তারা ঊর্ধ্বে তুলে ম্যাজিশিয়ান মন্তব্য করল।

আর এক প্রস্ত চায়ের ব্যবস্থা করে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওদিক থেকে মেয়ে বাপ-মাকে সন্তুষ্ট করবে। চালাক, বোকা নয়।'

'এক দিক বজায় রাখুক, তবে তো আর একদিক পাবে। পরীক্ষায় ভাল করলে কর্তা-গিন্নী মেয়েকে আমাদের সংগে মিশতে দেবে বেশি, বোনার এইটুকু বোঝা উচিত, এত-টুকুন বোঝার বয়েস হয়েছে ওর।' রমা বোস আমাদের চোখে চোখ রাখল।

'কি বলছো তোমরা?'

'একশোবার, এক হাজারবার।' আমরা রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুরের দিকে তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভগবানকে ডাকলাম।

'ওর পরীক্ষা ভাল করে দাও, ওকে ফার্স্ট করে দাও, বসন্ত-ভিলার মান বাড়ুক, তবে তো আমাদের আশা, আবার।'

জানি না, ভগবান এই প্রার্থনা শুনে-ছিলেন কিনা। মাছি ও ধোঁয়া-ভর্তি রেস্টুরেন্টে বসে তিনজন সেদিন মাথাপিছু আট কাপ চা খেয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ রেস্টুরেন্টওলার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের জানাশোনা হয়ে গিছল। ধারে খেয়েছিলাম সব।

হ্যাঁ, তার পরের ঘটনা।

শুনুন আমাদের এক-একজনের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী। বোনা যে পরীক্ষায় এত ভাল করবে, তা ও'রা আশা করেননি। ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেন-গিন্নী সরবে ঘোষণা করলেন এক বিকেলে।

শুনে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'অবশ্য ফল বেরোতে দেরি আছে।' বল-ছিলেন গিন্নী।

'কর্ম যখন ভাল হয়েছে, তার ফলও ভাল হবে।' সাহিত্যিক রমা দার্শনিক উক্তি ছাড়ল। 'সব কটা প্রশ্নের উত্তর ভাল হয়েছে, আর চাই কি।'

'হ্যাঁ,' হুস্ করে ক্যাপ্টেন নাক দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ঝাড়লেন। 'এবার নিশ্চিন্ত মনে আমরা আমোদফূর্তি করব। এসো, ম্যাজিশিয়ান, কাল সকালে নতুন খেলা দেখাও।'

'খুব ভাল একটা খেলা শিখেছি।' আনন্দে চোখ বড় করল ম্যাজিশিয়ান। আর চোখের দৃষ্টিকে বেচারা এক ফাঁকে দোতলার একটা জানালার ওপর বুলিয়ে নিলে, কর্তা গিন্নি লক্ষ্য করেননি, আমি ও রমা লক্ষ্য করেছিলাম।

বলা চলে বহুদিনের প্রত্যাশিত সেই সোনালী প্রত্যুষ। খুব সকালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেদিন তিনজন বসন্ত-ভিলায়।

গিন্নী শুকনো বেণী দুলিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। কর্তা পা ফাঁক করে বিলিতি কায়দায় ইয়ং ফ্রেন্ডদের করমর্দন করলেন। একটা উৎসবের সুর ছিল গোড়াতে। বাগানে চেয়ার পড়ল। চায়ের ট্রে চলে এলো, এলো কেক্ বিস্কিট মাখন রুটি কলা ডিম আর তিন টিন সিগারেট।

চায়ের প্রথম পর্ব শেষ হতে গিন্নী প্রস্তাব করলেন, 'এবার তোমার খেলা আরম্ভ হোক্ সরকার।'

আমি অতুলের চোখের দিকে তাকালাম, অতুল তাকায় রমার দিকে।

না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল আর একটা চেয়ার পড়বে, আর একজন উপস্থিত থাকবে ম্যাজিক দেখতে।

নতুন তাশের প্যাকেটটা দুবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে অতুল পরে সেটা সামনের টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল।

'কি ব্যাপার?' গিন্নী ভুরু কুঁচকোন।

'কোনো অসুবিধা হচ্ছে, বাদার?' কর্তার মোটা ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'না।' অতুল শুকনো হাসল। 'আমি এমন একজনের হাতে তাশ রাখতে চাই যে তাশ খেলা জানে না এমন কি তাশের দাগও ভাল চেনে না, তবেই এ খেলার চার্ম থাকে।'

রমা ও আমি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং ঠোঁট টিপে হাসলাম।

ওদিকে কর্তা গিন্নীর দিকে তাকান, গিন্নী তাকান কর্তার দিকে। দুজনেই ভাবে বৃহস্পতি। হুট্ করে অতুল বলল, 'বন্দনাকে ডাকুন না, ওর তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আর আমার বিশ্বাস তাশটাস ও তেমন ভাল চেনে না। রাতদিন পড়াশোনা নিয়েই তো আছে, ছিল।'

কর্তা আমতা আমতা করেন। 'হ্যাঁ, তা, কথাটা মিথ্যে নয়, তাশফাশের স্কোপ বড় একটা পায় না ও. কিন্তু কিন্তু—'

গিন্নী কর্তার চেয়েও ধূর্ত। খল্ খল্ হেসে উঠে বললেন, 'চেনে না কি, বোর্ডিং-এ থাকে মেয়ে, পাঁচটি মেয়ের সংগে মিশে কমবেশি এক আধটু নিশ্চয়ই শিখেছে।'

'তা হলেও ওকে আমি ডাকতে চাই না।' যেন ইতিমধ্যে মগজ পরিষ্কার হয়ে গেছে কর্তার। প্রস্তাবটি তিনি অন্যভাবে এড়ান। 'কাল সন্ধ্যার পর আই-স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছলাম ওকে। পরীক্ষার কটা মাস চোখে তো আর চোট কম পড়েনি। বোধ হয় গ্লাস নিতে হবে। শুয়ে আছে।'

'ওকে ডাকা না ডাকা সমান। মেয়ে এখন একরকম অন্ধ বলা চলে।' গিন্নী এবার ফুরফুর করে হাসলেন। 'বেশ তো ওই বাচ্চাটাকে ডাকো না। ওর হাতে তাশ রেখে তোমার ম্যাজিক সুরু কর।'

অদূরে বাগানের মালী কাজ করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল মালীর সাত আট বছরের ছেলে।

'এই ঘেণ্টু, ইদিকে আয়।' গিন্নী ডাকলেন।

ঘেণ্টু নোংরা দন্তরাজি বিকশিত করে অতুলের সামনে এসে দাঁড়ালো তাশ ধরতে। বাগানের রৌদ্র গোলাপ প্রজাপতি ও ফুরফুরে হাওয়া থাকা সত্ত্বেও মনে হ'ল যেন মরুভূমিতে বসেছিলাম আমরা।

কোনো রকমে তাশের খেলা শেষ করে অতুল চিরদিনের জন্যে 'বসন্ত-ভিলা ছাড়ল।

দুপুরে রেস্টুরেন্টের হাতল-ভাঙা পেয়ালা সামনে নিয়ে সাহিত্যিক ও আমি মাথা ঘামালাম।

'সেদিন ওর চোখ খুলবার পালা ঠিক সেদিনই ওকে অন্ধ করে রাখল।' যেন এতকাল পর হাল ছেড়ে দিলে রমা।

'স্বার্থপর বাপ মা।' দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, 'তবু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব।'

'লাভ নেই।' রমা বোস বিড়ি ধরায়। 'খামোকা সেখানে গিয়ে আর অপমানিত হওয়া কেন।'

'উঁহু।' আমি পেয়ালার ধার থেকে ময়লা মাছি দুটোকে হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'বরং না-যাওয়াতেই আমাদের অপমান বেশী হবে। যৌবনকে এভাবে পরাজয় স্বীকার করতে দিতে আমি রাজী নই।'

ক্ষোভে উত্তেজনায় সাহিত্যিকের দুই চোখ জ্বলছিল, লক্ষ্য করলাম। রুক্ষ চুল। বেশভূষার পারিপাট্য ক'দিন ধরে চলে গেছে বেচারার।

কি করি, কি করব। ভাবতে ভাবতে, রমা তার বহুকালের হাতঘড়িটা চায়ের দোকানে বাঁধা দিয়ে ক'টা টাকা ধার নিলে।

অনেক দুঃখে হাসলাম।

'বোনাকে নিয়ে সিনেমায় যাবি?'

পরম দুঃখে রমাও না হেসে পারলে না। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাদের কর্তব্য আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করব। 'অসুস্থ ও, কিছু ফল কিনে নিয়ে যাই।'

রমার ফলের দশা কি হল জানেন?

বড়বাজার থেকে বেচারা আপেল কিনেছিল, নিউ মার্কেট থেকে আঙুর, বৌবাজার থেকে কমলালেবু, কলেজ স্ট্রীট থেকে আখরোট আর হাতীবাগানের তার পরিচিত কোনো দোকান থেকে আনার।

আশ্চর্য, কি করে কর্তা-গিন্নী দুজনে ফলগুলোকে বারান্দায় বসে সাবাড় করলেন। খোসাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে হাসলেন। বোনার দাঁত ফুলেছে আখরোট চিবোতে পারবে না, গা গরম টক্ আঙুর সুবিধা হবে না, কাল রাত্রে, পেটে একটু এসিড হয়েছিল কমলালেবু খেয়ে কাজ নেই ইত্যাদি।

ফলের ঝুড়ি গায়ে 'বোনা' নামাঙ্কিত লেবেল এঁটে দিয়েছিল সাহিত্যিক। তাই। দুহিতাকে ফল না দেওয়ার কারণগুলো একটি একটি করে বলা শেষ করে ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেনগিন্নী রমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন আর মধুরে রসালো আঙুর আর কমলালেবুর কোয়া টপাটপ মুখে ফেলতে লাগলেন।

রমার মুখে শব্দ ছিল না।

মুমূর্ষুর মত চোখ করে পেটে একটা 'পেইন' হয়েছে বলে সেই যে বেচারা বসন্ত-ভিলা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল আর গেল না।

বুড়ো-বুড়ি ভাঙল না।

যেন একলা আমাকে পেয়ে দুজন আরও বেশি খুশি। 'দরকার কি ঝামেলায়। গণ্ডগোলে ফুর্তি গুলিয়ে যায়।' গলা জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা।

একে একে সব ক'টি দেউটি নিভে গেছে। শিবরাত্রির সল্‌তের মত আমিই শুধু জ্বলছি। পাছে আমিও নিভে যাই সেই দুর্ভাবনাও ছিল দুজনের।

তাই একদিন বুদ্ধি করে খানিকটা তেল ঢেলে দিলেন বাপ মা যৌবনের সল্‌তের গোড়ায়। অর্থাৎ বোনাকে আমার সামনে এনে দাঁড় করানো হ'ল মিনিট দশেকের জন্যে। যেন দশ মিনিট এই মেয়েকে চোখের দেখা দেখলে আমি আরও দশ বছর কামড়ে পড়ে থাকব বসন্ত ভিলার সিমেণ্টে।

আর ইয়ং-ফ্রেণ্ডকে নিয়ে সকালে বেরোবেন কর্তা। ইয়ং ফ্রেণ্ডের হাত ধরে বিকেলে বেরোবেন গিন্নী।

তা দশ মিনিট খুব কম সময়ই বা কি। দশ বছর অপেক্ষা করা যায় এর জন্যে।

দশ সহস্র ঢেউ দিয়ে গেল ওই সময় আমার বুকের ভিতর।

কিন্তু বসে বসে সেই ঢেউ দেখতে কর্তা গিন্নী মেয়েকে ডাকেননি আমার সামনে। ডেকেছিলেন মেয়ের চশমার বিল দেখতে। এইমাত্র ও ফিরেছে ডাক্তারের বাড়ি থেকে। বিল দেখা হয়ে যাবার পর মেয়েকে উপরে চলে যেতে বলা হল।

এবং আমি যখন ওর চলে যাওয়া দেখতে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন, সেই ভয়ংকর দামী নিষ্ঠুর মুহূর্তে দুজনই আমার চোখে চোখ রেখে এমনভাবে দৃষ্টিকে চেপে ধরল যে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির দিকে আর তাকাতেই পারলাম না, পায়ের তলার সিমেণ্টের ওপর দৃষ্টি রেখে অত্যন্ত চুপিচাপি, প্রায় চুরি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শুনলাম জুতোর শব্দ ওপরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'যাকগে।' যেন অদরকারী কথা বলছিলেন তাঁরা, বোনার চশমার বিষয়, ও চলে যেতে দুজন ঝুপ্ করে দরকারী কথায় নেমে পড়লেন। 'তুমি আর আমি।' আর কেউ

থাকবে না। চলো একদিন। ফাইন এপ্রিল মর্ণিং।' এপ্রিলের আকাশের দিকে যত না তাকালেন, তার চেয়ে বেশী তাকালেন গিন্নী আমার মুখের দিকে। 'রাজী তো?'

বললে হাসবেন, আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমি যে তখনও বোনার জুতোর শব্দ বুকের ভিতর শুনছিলাম। বুড়ি গৃধিনীর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ইয়ং-ফ্রেন্ডকে দেখছিল।

বুড়ির কথায় রাজী হওয়াতে তৎক্ষণাৎ বুড়ো বায়না ধরল। 'চলো আমি তোমাকে নিয়ে বেরোবো—এক ইভিনিং-এ। এগ্রিড?'

আমি মাথা নাড়লাম।

দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম।

এখন একলা আমি তাই আব্দারটাও বেশী গাঢ় হল। সুযোগ বুঝে আমিও চট্ করে ছোট ছেলের মতন তৎক্ষণাৎ আব্দার করে বসলাম।

'বোনাও সঙ্গে যাবে।'

যেন নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন কর্তা-গিন্নী, মুমূর্ষুর মতন হাসলেন।

তারপর নিমরাজী হওয়ার মতন দুজনই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'ওর শরীরটা ভাল নেই। যাকগে, বোনা সঙ্গে থাকলে যদি তোমার ভাল লাগে, যাবে। একদিনের তো মামলা।'

আমি জয়ী। বাড়ি ফিরে মনে মনে বললাম আমাকে ধরে রাখতে হলে মেয়েকে সঙ্গে রাখতে হবে। আমি ছাড়া তোমাদের আর আছেই-বা কে।

যেন বুকের মধ্যে পুজোর ঘণ্টা বাজছিল। সেলুনে গিয়ে ভাল করে চুল ছাঁটলাম। ধার করে এক বড়লোক আত্মীয়ের দামী টাই স্যুট জোগাড় করলাম। একটি ঘণ্টা বুরুশ চালিয়ে পুরোণো জুতাটাকেই আয়নার মত চকচকে করে তুললাম। উদ্যমের অন্ত ছিল না।

সাহিত্যিক বিক্রী করেছিল হাতঘড়ি। আমি বিক্রী করলাম ঘরের পুরোনো একটা চেয়ার, ছাতা, লণ্ঠন এবং প্রয়োজনীয় আরও দু'একটা তৈজস।

বোনার উপহার কেনার জন্যে টাকা চাই যে।

না, মনে মনে স্থির করলাম, আর আর বন্ধুরা যেমন ওর জন্যে রীবন ক্রীম পমেটম ফুল সন্দেশ ফল সাবানের বাক্স নিয়ে গিয়েছিল, আমি তা নেব না।

ক্যাপ্টেন কি—ক্যাপ্টেন-গিন্নী আত্মসাৎ করতে না পারে এমন জিনিস দিতে হবে।

বোনার পায়ে লাগে এমন একজোড়া সুন্দর জুতো আঙুলে পরতে পারে পাথর বসানো একটি আংটি।

কিন্তু, কিন্তু এতটাকা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। আর, ধারকর্জ করে নয় আরো কিছু টাকা যোগাড় করলাম, কিন্তু মেয়ের আঙটি বা জুতোর মাপ পেতাম কোথায়। বুড়ো-বুড়ি দিত না।

বরং আঠারো বছরের মেয়ের গায়ে লাগতে পারে এমন আন্দাজ করে দর্জিকে দিয়ে কাশ্মীরী সিল্কের দুটো ব্লাউজ তৈরী করালাম। গলায় পরতে পারে মোটামুটি একটা মাপ ঠিক করে লাল কাচের একছড়া মালা কিনলাম। সস্তায় সুন্দর জিনিস।

বলা তো যায় না।

কচি খুকীর মতন সাধ ক'রে বুড়ি ঐ মালাই গলায় পরতে পারে। গায়ে দিতে পারে মেয়েদের ব্লাউজ। কিন্তু জানি কোনোটাই ওর শরীরে ধরবে না। মালা ছিঁড়ে যাবে ব্লাউজ ফেটে যাবে। আর আর বন্ধুদের মতন আমার উপহারেরও দুর্দশা চিন্তা ক'রে বুক দুরুদুরু করছিল।

উপহারের প্যাকেটটা প্রথমে পকেটে লুকিয়ে রাখলাম।

বলছি যেদিন সকালবেলা প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ক্যাপ্টেন-গিন্নী আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। ক্যাপ্টেন বোনাকে সঙ্গে গেঁথে দিলেন। উভয়েরই বোনাকে আমার সঙ্গে যেতে দেওয়ার গূঢ় কারণটা তখন বুঝলাম।

কিন্তু মেয়েকে বুড়ি কতকক্ষণ বা মনে রাখল?

আ, সেই ফুরফুরে একটি চৈত্র সকালের শোচনীয় মৃত্যু চিরকাল আমার বুকে লেগে থাকবে।

হাল্কা নীল চোখ, উঁচু নাক, ভরা লাল ঠোঁট বোনার। কোঁকড়ানো চুল, কোমল দেহবল্লরী।

কিন্তু কেমন করুণ ক্লান্ত মনে হ'ল মেয়েকে।

প্রথম দিন বসন্ত-ভিলায় ওকে দেখার পর আমরা বন্ধুরা মিলে যে বর্ণনা করেছিলাম সেই বোনার সঙ্গে এই মেয়ের কত পার্থক্য যখন খুব কাছে এসে দাঁড়ালো টের পেলাম।

আমার দিকে চোখ তুলে ও তাকাতেই পারল না। চোখ তুলেছে কি ক্যাপ্টেন গিন্নীর খরদৃষ্টি তুনীরের মত ছুটে গিয়ে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে।

রক্তরাঙা পলাশ গাছের নীচে ঘাসরং সুজনী বিছিয়ে গিন্নী আমার সঙ্গে লুডো খেলতে বসলেন। ছবিটা একবার কল্পনা করুন।

বোনাকে অদূরে একটা উঁইঢিবির পাশে মুর্গি ছুলতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। বাটনা বাটতে হবে ওকে, রাঁধতে হবে।

'কেবল কলেজের পরীক্ষা পাশ করলে হয় না। এ সব কাজও শিখতে হয়। মেয়ে সন্তান।'

খেলার ফাঁকে ফাঁকে বুড়ি মেয়েকে এক একবার আড় নয়নে দেখে আমার দিকে চোখ তুলে হি হি ক'রে হাসছিল। যেন হাসি নয়, শুকনো পাতা ঝরানো দমকা হাওয়া। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

পাতার আড়ালের গোলাপ কুঁড়ির মতন ঢিবির ওপাশ থেকে চোরা চোখ তুলে বোনা আমাকে দু' একবার দেখেছে, কিন্তু তা কতো ক্ষণস্থায়ী কতো ক্ষীণ। সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেই, তার ওপর আমি একলা। বুড়ির আনন্দ যেন উত্তাল ঢেউ হয়ে হয়ে আমার ওপর আছড়ে পড়ছিল।

যে ভয় করছিলাম।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেটটি এক সময় ঠিক বার করে নিলে। আমি বলতেই পারলাম না। এগুলো বোনার। অত মোটা শরীরে ব্লাউজ পরতে গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলল, মালার যা দশা হ'ল তা অবর্ণনীয়। ঘাসের ওপর ছিটকে পড়া লাল পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বুড়ি ক'কিয়ে ওঠল। 'ছি ছি এতকাল এক সঙ্গে থেকে এতদিন দেখেও কি তুমি আমার বডির প্রমাণ সাইজ না হোক মোটামুটি একটা মাপ ঠিক করতে পারলে না।' বলে বুড়ি খিল খিল হেসে উঠল, লক্ষ্য করলাম ঢিবির ওধার থেকে বোনা ঘাড় তুলে একবার এদিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে আমি প্রশস্ত নিঃশ্বাস ফেললাম। একটা নিঃসঙ্গ প্রজাপতি মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'ওকি, ফ্রেন্ড, কথা বলছ না কেন, রাগ করলে?' ভাবছিলাম কতক্ষণে সময়টা কাটবে।

আমি কান পেতে ছিলাম ঢিবির ওপাশ

থেকে কোনো শব্দ ভেসে আসে কি না শিল নোড়ার কি এলুমিনিয়মের ডেকচিতে হাতা খুন্তি নাড়ার।

কিন্তু কোনো শব্দ তৈরী করার মৌলিকত্ব মা ওই মেয়ের মধ্যে সৃষ্টি হ'তে দেয়নি এই অনুমান ক'রে ঘাসের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে বুড়ির কাকলী শুনতে লাগলাম। এ ছাড়া আর উপায় ছিল কি।

পরদিন বিকেলে ছিল ক্যাপ্টেনের প্রোগ্রাম। বুড়ি আমাদের সঙ্গে বোনাকে গেঁথে দিলে। আগের দিন সারা সকাল দুপুর আমায় নিয়ে বনভোজন করেও বুড়ির আশ মেটেনি, চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন যখন আমার হাত ধ'রে গাড়িতে ওঠেন দরজায় দাঁড়িয়ে গিন্নী হাঁসফাঁস করছিলেন।

'যেখানে যাও, বোনাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখবে।'

'রাখব।' গাড়ির দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কর্তা গিন্নীকে আশ্বাস দিলেন। 'নইলে আর তিনজন এক সঙ্গে বেরুচ্ছি কেন।' হা—হা।'

লক্ষ্য করলাম পিছনের সীটে পুতুলের মতন চুপ চাপ ব'সে বোনা আঙুলের নোখ খুঁটছে। আমার দিকে ও তাকাতে পারছিল না কেননা ক্যাপ্টেন মুহুর্মুহু ঘাড় ফিরিয়ে দুহিতাকে দেখছিলেন।

গিন্নী চোখের আড়াল হলে কর্তাও মেয়েকে বেশিক্ষণ মনে রাখবেন না আগেই অনুমান করেছিলাম।

বনভোজনের সময় বোনা তবু ধারেকাছে ছিল।

কিন্তু বনে গিয়ে ভোজন করার মেজাজ ক্যাপ্টেনের ছিল না তখন। নির্জন নদী-তীরে কি নিরালা পার্কেও গেলেন না তিনি। বীয়ারের নেশায় বড় বেশি নাগরিক হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রিলের সুদূর সন্ধ্যা। চৌরঙ্গি লক্ষ্য ক'রে ক্যাপ্টেন গাড়ি ছোটালেন।

ফুর্তিটা ঠিক কি ধরণের হবে ভাবছিলাম, কি ভাবতে যাব, এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলেন।

চমকে তাঁর চোখের দিকে চোখ রাখলাম। পঁয়ষট্টি বছরের ধূসর চোখ ক্ষুধিত বাঘের চোখের মতন জ্বলছিল।

আমি চুপ ক'রে ছিলাম।

'কি, কথা বলছ না কেন, ফ্রেন্ড?' যেন দমকা হাসির হাওয়ায় আমায় নাড়া দিয়ে তিনি সতেজ ক'রে তুলতে চাইলেন। তাঁর হাসির ধমকে গাড়ির হুড কাঁপছিল।

তথাপি আমি চুপ।

যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলাটা হঠাৎ নিচু করলেন বসন্তবাবু।

'আজ গিন্নী সঙ্গে নেই। আজ তৃতীয় কোনো বন্ধু পর্যন্ত নেই। কাজেই এসো—'

আমি তাঁর আবেশাতুর লোভী চোখে চোখ রাখলাম। পুরোনো চোখের শিরায় এত প্রচুর নতুন লাল রক্ত মুহুর্মুহু কি ক'রে এসে জমে ভাবছিলাম।

অল্প অল্প হেসে তখনো তিনি আমায় উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন।

'বহুদিনের ইচ্ছা আমার,' অনেকদিন ভেবেছি—' ব'লে ক্যাপ্টেন থামলেন।

কেননা আমি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সীটে উপবিষ্টা তাঁর অষ্টাদশী কুমারী মেয়েকে দেখছিলাম।

'অ, আপত্তি তোমার ওখানে, ওর জন্যে ভাবনা কি।' যেন আমার নিরুত্তর তেজ-হীন হয়ে থাকার কারণ অনুধাবন ক'রে ক্যাপ্টেন আগের চেয়ে এবং চতুর্গুণ জোরে হেসে উঠলেন। 'এই তো লাইট-হাউস এসে গেল। ওয়ালট ডিজনে হচ্ছে। নির্দোষ বই। বোনা ততক্ষণ বসে দেখুক, কেমন? তুমি ততক্ষণ ব'সে সিনেমা দেখ, মা। আমরা দুই বন্ধু একটু বেড়িয়ে টেরিয়ে আসি?' ব'লে তিনি মেয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

কলের পুতুলের মতন ঘাড় কাত করল মেয়ে। এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গাড়ি যখন লাইট-হাউসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন চোখের ইঙ্গিতে বোনাকে নেমে যেতে আদেশ করলেন। নেমে গেল ও।

শেষ বারের মতন আমাদের মধ্যে গোপন দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। বাসনার একটি শ্বেতকুঁড়ি মাথা জাগাতে না জাগাতে কাঁটার অরণ্যে হারিয়ে গেল। আমার পিঠে এবার জোরে নাড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন সাড়া তুলতে চেষ্টা করলেন। 'আশ্চর্য একেবারে মিইয়ে গেলে দেখছি, বড্ড নার্ভাস তুমি।'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঘামছিলাম। সত্যি কেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। এ রকম একটা প্রস্তাব তিনি তুলবেন ভাবিওনি।

মেয়ে চলে যাওয়ার পর গাড়ির ভিতরটা আরো বেশি নির্জন মনে হয়। আহ্লাদে বিড়ালের মতন বসন্তবাবুর গলায় গরর্ শব্দ হচ্ছিল। যেন ঝোলা গুড়ের মতন লালা ঝরে পড়ছিল তাঁর জিভ থেকে কথা বলার সময়।

'কি, তবে কি বলছ একটিও নেই, একজন গার্ল ফ্রেন্ডও তোমার নেই যে দু'জন গিয়ে একটা সন্ধ্যা একটু ফুর্তি করব। আমার অনেক দিনের শখ।'

কুণ্ঠিতভাবে মাথা নেড়ে বললাম, 'নেই।'

এবার শুয়োরের মতন 'ঘোঁৎ' শব্দ ক'রে তিনি নাকে হাসলেন। 'একেবারে জলো, পানসা তুমি, ফ্রেন্ড।' কি একটু ভেবে স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে পরে বললেন, 'যাকগে, শহরে তো গার্লের অভাব নেই, আমি নিয়ে যাব তোমায়, আমার সঙ্গে চল।' সুরেন ব্যানার্জি রোড ক্রশ ক'রে গাড়ি অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন গলিতে ঢুকল। আস্তে আস্তে, চুরুটের হাল্কা ধোঁয়া ছাড়ার মতন তিনি কথাগুলো আমার সামনে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। 'যা-ই তোমরা বল, যতই বল, ভেতরটা আমার গ্রীণ আছে নিজেও ফিল্ করি, কিন্তু বাইরেটা তো পাকতে সুরু করেছে। বুঝলে, একটি ইয়াং ফ্রেন্ড সঙ্গে না নিয়ে গেলে একটি মেয়ে তেমন জ্বলবে কেন, ষোল আনা ওর তাপ পাব কি ক'রে; —হা—হা, সত্যি কিনা ব্রাদার?'

অধোমুখ হয়ে নোখ দিয়ে গদির চামড়া খুঁটছিলাম।

সেদিন আর একবার বোনাকে দেখে-ছিলাম। সান্ধ্য বিহার শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সিনেমা হাউস থেকে যখন ওকে আমরা গাড়িতে তুলে নিই।

আর দেখিনি। আর আমি যাইওনি বসন্ত-ভিলায়। তেইশজন খসল আমিও চিরকালের মত খসলাম।

তবু অনেকদিন লোভ হয়েছে, বসন্ত-ভিলার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি আর দোতলার জানালাটার দিকে তাকিয়েছি কিন্তু সেই জানালা একদিনও খোলা দেখিনি দেখতাম শুধু বুড়ো বুড়ি একলা চুপচাপ বাগানে বসে আছে কি বারান্দায় বসে আপেল চিবোচ্ছে লজেনস চুষছে আর থেকে থেকে তৃষিত চাতকের মতন পথের দিকে চেয়ে আছে।

ওরা কার অপেক্ষায় প্রহর গুণত নিশ্চয় আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

গান্ধীর অভিভাবকত্বে লেখকের দিন কেটে যাচ্ছিব মন্দ না। সারাদিন নিজের ইচ্ছায় বা প্রয়োজনে, আর সন্ধ্যার পর গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী চলা, এ division of labour খারাপ লাগছিল না। ফ্রান্সে তার থাকবার অনুমতি ছিল তিন মাসের। টুরিস্টরা তিন মাসের বেশী ভিসা পায় না। ফ্রান্সের স্বাদ পাবার পর বহু টুরিস্ট আর নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় না। এখানেই চাকরি-বাকরি করে থেকে যাবার চেষ্টা করে। দেশের সব লোকের চাকরি জোটানই শক্ত। তাই ফরাসী সরকারের এত কড়াকড়ি। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের বাড়ি থেকে টাকাও আসে না, আবার ফ্রান্সে কিছু জানাশোনা রোজগারও নেই। স্বভাবতই এ জাতীয় লোকদের উপর পুলিসের কড়া নজর। আইনসঙ্গতভাবে তিন মাসের উপর থাকতে গেলে পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে, তুমি এখানে পড়াশুনা করছ, রোগের চিকিৎসা করাচ্ছ, না হয় ঐ জাতীয় কোন একটা উদ্দেশ্যে আছ। সেই-জন্য লেখক অনেকগুলো স্থানীয় শিক্ষায়তনে ভর্তি হয়ে যায়। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ফরাসী-বিপ্লবের যুগের জায়গার নামগুলোকে খুঁজে বার করে। বাস্তিল! তুয়েলরিজ! ভের্সাই! এদেশের অভিনবত্ব বোধ হয় কোনদিনও ঘুচবে না তার চোখে। যে আগ্রহ নিয়ে দেখতে যায়, দেখবার পর সে অনুপাতে তৃপ্তি পায় না। কোন জিনিসের সম্বন্ধে লেখা বিবরণে তার মন যতটা সাড়া দেয়, চাক্ষুষ দেখায় ততটা দেয় না। লেখার অক্ষরের সম্মুখে না আসা পর্যন্ত জানা জায়গায় এসেছি বলে বোধ হয় না তার। চিরকাল খেলা দেখে এসেও, সে অধীর আগ্রহে খবরের কাগজের প্রতীক্ষা করে, খেলার রিপোর্টটা খুঁটিয়ে পড়বে বলে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে, পৃথিবীর এই সব-চেয়ে কসমপলিটান শহরের বিভিন্ন জাতের লোকজন দেখে। সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে আলাপ করে। এ সুযোগ বেশী ঘটে শিক্ষায়তনগুলিতে। বহু জিনিস দেখে অবাক হয়। কি বড় বড় বরফের গাড়ির ঘোড়াগুলো। ইংলন্ডের দুধের গাড়ির ঘোড়া থেকেও বড়। তবে কেন এখানে বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছবার রেওয়াজ নেই? ভারতবর্ষে এত মোটা আর বড় ঘোড়া দেখা যায় না। লেখক বোঝে কেন প্রাচ্যে ঘোড়া গতির প্রতীক, আর পাশ্চাত্যে শক্তির প্রতীক—কেন হর্স-পাওয়ার কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল—কেন ইউরোপের আদিম মানুষদের গুহার ঘোড়ার পোড়া হাড় এত পাওয়া যায়, কেন এখানে পাড়ায় পাড়ায় এত ঘোড়ার মাংসের দোকান। আশ্চর্য! ঠিক কাশীর পেয়ারার মত খেতে এখানকার নাশপাতিগুলি। পেয়ারা কথাটা কি এই pear থেকেই এসেছে নাকি? এখানকার মত তিন হাত লম্বা পাঁউরুটি সে আর কোথাও দেখে নি। তরকারির দোকানে কমলালেবুর রঙের কুমড়ো। রেস্তোরাঁতে আলু-কপির পুর-ভরা বেগুনের ডিস খেয়ে অবাক হয়। কি শব্দ করে প্যারিসের মোটরগাড়িগুলো। গাড়িগুলো অযথা হর্ন বাজাচ্ছে একটানা। পুলিস একবার এই বদভ্যাস বন্ধ করবার চেষ্টা করায়, ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা ধর্মঘট করেছিল। মধ্যে মধ্যে পটকা ফোটাবার মত শব্দ হচ্ছে গাড়িগুলো থেকে। লন্ডনের শান্ত সুশৃংখল ট্রাফিকের কথা বাদ দাও—কলকাতার রাস্তা পর্যন্ত শব্দের দিক দিয়ে এর কাছে গোরস্থান। পেট্রোলের গন্ধটা এরকম কেন এখানে? কিছু মেশায় নাকি পেট্রোলের সঙ্গে? কেরোসিনের ধোঁয়ার মত কেমন যেন ভারী ভারী। দুই দেশের লোকের মনের ভাব প্রকাশের ভাষাতীত মাধ্যমেও কত তফাৎ। চারটি আঙুল দিয়ে সংখ্যা দেখালে ফলওয়ালা বুঝতে পারে না যে, চারটি আপেল চাই। ঘাড় নেড়ে হাঁ কিম্বা না বললে এরা চিন্তিত নেত্রে তাকায়—আহারে, মুসিয়োর কলারের মধ্যে দিয়ে পোকামাকড় কিছু ঢুকেছে বুঝি। তিন বছরের ছেলেটা পর্যন্ত ঘাড় shrug করতে জানে। দূর থেকে আর একজনকে ডাকবার সুরটাও অদ্ভুত। কু-উক্‌কু! কু-উক্‌কু! মিকিমাউস আর ডোনাল্ডডাক-এর ছবিতে বহুবার এই সুরটি সে শুনেছে দেশে থাকতে। কিন্তু এর অর্থটা ঠিক ধরতে পারে নি এখানে আসবার আগে। অ্যাকসেণ্ট-এর টোক্কা মারা মারা ইংরাজী কথা কানে সয়ে যায় কিছুদিন ইংলন্ডে থাকবার পর, কিন্তু ফরাসী কথার টানা টানা সুরটা ভাল লাগে প্রথম থেকেই। দূর থেকে মনে হয় ঠিক যেন উর্দু বলছে। কি সুন্দর এখানকার দোকানের নামগুলো। মুদীর দোকানের নাম "একটু একটু সব"; কাপড়ের দোকান "সাদা বাড়ি"; মেয়েদের জামার দোকান "জাঁর মায়ের বাড়ি"; ছেলেপিলেদের খেলনার দোকান "কড়ে আঙুলদের জন্য"; রেস্তোরাঁর নাম 'ভোজনবিলাসী"; বৃক্ষহীন ভালপাতার গলিটা যেখানে চিমনিহীন চার চিমনীর বুলভারে গিয়ে মিলেছে, সেই মোড়ের উপরের কাফের নাম "মোটা ও সরু সময়ে"; পিতলের ঘোড়ার মাথা বসানো ঘোড়ার মাংসের দোকানের সাইনবোর্ড "ঘোড়াটে"; তার পাশের বাড়িতে লেখা "জ্ঞানী নারী" অর্থাৎ ধাত্রী; লেবু দিয়ে সাজানো শামুকগুলির দোকান আর স্নানের দোকানের মাঝের ফুলের দোকানটার নাম "মিমোসাফুলেতে"; যাঁরা দু-চার মাসের মধ্যে মা হবেন তাঁদের উপযোগী পোষাকের দোকান "মাতৃকা (ভিতরে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা আছে)"।

কি মজার দেখতে ফরাসী পুলিসের—ঘেরাটোপের মত বোতামহীন আলখাল্লা-গুলো। ভারতবর্ষের গরীবলোকের চটের থলের বর্ষাতিগুলো প্রায় এই রকম।

যে পথেই যাও—পৌঁছে যাবে একটা বইয়ের দোকানে। প্যারিসের মত এত বইয়ের দোকান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বই না কিনে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তেও পার। তাতে একটুও বিরক্ত হবে না দোকানদার। লেখকের বই কেনবার বাতিক চিরকালের। সিন নদীর ধারের পুরনো বইয়ের দোকানগুলিতে প্রত্যহ একবার টহল সে দেবেই দেবে। তরু দত্ত, অরু দত্ত কিম্বা মাইকেলের নিজের ব্যবহার-করা বই যদি দৈবাৎ হাতে পড়ে, একথা ভাবতেও বেশ লাগে।

পড়াশোনা না হলেও বইয়ের বোঝা, তার ঘরের টেবিলে জমতে আরম্ভ করে। রাতে গান্ধীর সঙ্গে ফিরে আসবার পর আর এক মিনিটও জেগে থাকতে পারে না। নিয়মিত

ডায়েরী লেখা দূরে থাক, সকালে কেনা খবরের কাগজখানা পর্যন্ত অনেকদিন পড়া হয়ে ওঠে না। বাড়ি ফিরে আসবার পরও গান্ধী এক একদিন তার দায়িত্বের কথা ভুলতে পারে না। লেখকের ঢুলুনি আসছে তবু সে বোঝাবে নাচঘরের "ট্যাক্সি-গার্ল'স"দের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়; নইলে সেগুলো পেয়ে বসে; প্যাত্রোন কবে এক ঘণ্টার জন্য এক ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে একটা ঘর ভাড়া দিয়ে কি মোটা টাকা পেয়েছিল; আরও অনেক এই রকম চটকদার খবর। "এই হচ্ছে প্যারিস। প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে এর হাওয়াকে আপন করে নাও। তবে না মনটা আবার কমবয়সী হয়ে উঠবে। একি ঘুমিয়ে পড়লে যে মঁসিয়ো লেখক বসে বসেই। কাল ভোরেই আবার আমাকে উঠতে হবে। শুভ রাত্রি।"

বিছানাতে শুয়েও নিস্তার নাই। পাশের ঘরের রেডিও এখনও থামে নি। এত রাতে রেডিওতে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু দেয় না। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো ঘোষণা করবার সময় এরা অদ্ভুত সুরে চীৎকার করে। ফিরিওয়ালার উদ্ভট হাঁকের মত। খেলার মাঠেও সে এ সুর শুনেছে।......"ব্যবহার করে দেখুন 'টেঁকসই লিপ্স্টিক।' ইলেক্ট্রিক আলোতেও এ দিয়ে রাঙানো ঠোঁট কালো দেখায় না। সব রকম সম্ভব ব্যবহারের পরও 'টেঁকসই লিপ্স্টিক'। টেঁকসই লিপস্টিক!"

গরমের জন্য নিশ্চয়ই জানলা খুলে দিয়েছে। ইংলণ্ডে এ জিনিস হতে পারত না—রেডিও খুলবার আগে তারা দরজা জানালা বন্ধ করে।

লেখক কখন ঘুমিয়েছে জানে না। ভোরবেলা দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠে। ড্রেসিং-গাউনটা পর্যন্ত গায়ে দেবার অবকাশ পায় না। তিনজন পুলিসের লোক ঘরে ঢোকে—সঙ্গে হোটেলওয়ালী। তারপর চলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কি করেন এখানে? থাকবেন কতদিন? মঁসিয়ো আদবাণীর সঙ্গে আলাপ কবে থেকে? অফিসারের স্বর বেশ রুক্ষ।

লেখক তার শিক্ষায়তনের বিদ্যার্থী কার্ডগুলো দেখায়। অফিসার টেবিলের উপরের বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেন—কর্নেই, রাসিন থেকে আরম্ভ করে মরিয়াক, মাঁর্তা দ্যু গার্দ্-এর বই পর্যন্ত রয়েছে। [illegible] ফরাসী পুলিস অফিসারও সাহিত্যের খোঁজ রাখে। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাও হয়ত এদের ডিউটির মধ্যে। কিছু বলা যায় না। এদেশের আদি কবি ভিলোন ছিলেন ডাকাত; খুনের দায়ে পড়েছিলেন তিনি।

অফিসার আড়চোখে লেখকের দিকে চেয়ে দেখে—লোকটাকে মিথ্যাবাদী বলে ত মনে হচ্ছে না।

Sartreএর লেখা Le Mur বইখানা হাতে করে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, খুব চমৎকার গল্পটা—তাই না?

লেখক বইখান এখনও পড়ে নি—তবে শুনেছে যে, স্পেনের বিপ্লবের পটভূমিকায় গল্পটা লেখা। তবে কি পুলিস রাজনীতিক কোন বিষয়ে তার উপর সন্দেহ করছে? সে ঢোঁক গিলে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, বেশ বই।

তাস শাফ্ল্ করবার মত ফর্র্র্ করে শেষ পাতা থেকে উপরের মলাটটা পর্যন্ত অফিসার একবার উল্টে নেন।

ভয়ে ঘেমে ওঠে লেখক—বইয়ের একখানা পাতাও কাটা নেই। কোন ফরাসী বইয়ে থাকেও না সেকেণ্ডহ্যাণ্ড না হলে। এমনি ফ্রান্সের জিনিসের 'ফিনিশ'! নূতন বই কিনে এনে একখান একখান করে পাতা কাটবার নিয়ম। ধন্যি এদের পুস্তক প্রকাশক। ধন্যি এদের সাহিত্য-প্রীতি। ছোটবেলায় পুলিস-সার্চের ভয়ে একবার আনন্দমঠ পোড়াতে হয়েছিল। বর্তমান বইখান যদি 'প্রস্ক্রাইব' করা বইও হয়।—তাহলেও সে যে এক লাইনও পড়ে নি, তার প্রমাণ রয়েছে পাতায় পাতায়।

—দেখি, মঁসিয়ো আপনার পাসপোর্ট। পাসপোর্টের ফটোর সঙ্গে লেখকের চেহারাটা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে।—ঠিক এই লোকেই ত?

ভারতবর্ষের ফটোগ্রাফার সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই, লেখকের আসল চেহারাটার চাইতে পাসপোর্টের ফটোর মুখ-চোখ একটু বেশী ভাল করে দিয়েছিল।

আবার যোগাযোগও এমন! প্যারিসে তখন চিনির রেশন ছিল। পাড়ার টাউন-হল থেকে চিনির টিকিট আনতে হ'ত। টাউন-হলের কেরাণী ভদ্রমহিলাটি স্বভাব-সুলভ দয়ায় লেখককে দুইজনের বরাদ্দ চিনির টিকিট দিয়েছিলেন। লেখক বলেছিল যে, সে একা। মহিলাটি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—তা হ'ক; একটু বেশী করে চিনি খাবেন; আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চিনি দিতে পারি। তারপ[illegible] লেখকের বারণ করা সত্ত্বেও পাসপোর্টে[illegible] বৈদেশিক-মুদ্রা-বিনিময়ের পাতায়, স্বামী-স্ত্রীর বরাদ্দ চিনির পরিমাণ আর তা[illegible] নিপুণহস্তে লিখে দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফরাসী জাতটার সৌজন্যের প্রশংসা করতে করতে সে হোটেলে ফিরে এসেছিল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার স্ত্রীর জন্য চিনি নিয়েছেন দেখছি—অথচ পাটপোর্টের প্রথম পাতায় আপনার গভর্নমেণ্ট লিখে দিয়েছে যে, আপনি অবিবাহিত? একে Sartre[illegible] অস্তিত্ববাদের ছোঁয়াচ, তার উপর চিনির রেশনের মিষ্টি পরশ। সর্বাঙ্গে ঘামের ঠেলায় নিজের অস্তিত্ব বাদে আর কিছুই মনে পড়ে না—মধুসূদনের নাম পর্যন্ত নয়। অতিকষ্টে সে সত্যি কথাটা বুঝোবার প্রয়া[illegible] পায়। কি বলেছিল না বলেছিল, তা তা[illegible] মনে নেই। তবে কাঁদো-কাঁদো মুখে ঢোঁ[illegible] গিলবার ফল হয়েছিল। তার মনে হয়েছি[illegible] ফরাসী জাতিটা ভারি বুদ্ধিমান—বুঝোতে চট করে বোঝে; জানে যে, লেখকদের কাজ[illegible] মিথ্যা বলা।

পাসপোর্ট থেকে সে লেখক এই কথা[illegible] জানতে পেরেই অফিসারের মুখের ভাব[illegible] নরম হয়ে আসে। খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেন—আপনি 'লেৎরে' অর্থাৎ পণ্ডিত। [illegible] হোটেলে এলেন কি করে?

সে কোন কথা লুকোয় না। অফিস[illegible] সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনে, অনে[illegible] ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেন। বড় মি[illegible] প্যারিসের লোকের কথাবার্তা। শান্তিপুরে[illegible] কথার মত প্যারিসের কথার নাম, ফরা[illegible] ভাষাভাষীদের মধ্যে। সাধে কি অ[illegible] সাহিত্যিক ডিক্টেটার মালের্ব তিনশ ব[illegible] আগে প্যারিসের কথ্য ভাষাকেই ফরা[illegible] সাহিত্যের প্রামাণ্য ভাষায় পরিণ[illegible] করেছিলেন। সাধে কি আর পাঁচশ ব[illegible] আগেই কবি ভিলোন গেয়েছিলেন—"কে[illegible] পারির লোকেই পারে কথা বলতে"।

কনস্টেবলটা যায় সব শেষে। যা[illegible] সময় জিজ্ঞাসা করে—মঁসিয়ো, সিগা[illegible] আছে নাকি? অ্যামেরিকান সিগারেৎ?

লেখক দোষ আর কাকে দেবে, নি[illegible] কপালকে ছাড়া। কি করেছে সে এতদি[illegible] সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটা পর্যন্ত করে [illegible] খাক না খাক, কাল থেকে সে দেশলাই [illegible] সিগারেট সব সময় কিনে রাখ[illegible]

অভিজ্ঞতা কথাটার মানেই ফাঁড়া কাটবার অব্যবহিত পরের মনের অবস্থা।

বুকের উত্তাল ধুকধুকুনিটা একটু কমবার পর সে বার হয় ঘর থেকে। হোটেল-ওয়ালির কাছ থেকে জানতে পারে যে, গান্ধীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিস অফিসে। আমেরিকান সিগারেট তানজিয়ার থেকে আইনের চোখ এড়িয়ে এখানে চালান দেবার একটা বড় দল আছে। পুলিসের বিশ্বাস যে, গান্ধী সেই দলের লোক। ঐ দলের একজন লোক নাকি ধরা পড়েছে। তার খাতায় লেখা আছে যে, গান্ধীকে বিশ হাজার ফ্রাংক দেওয়া হয়েছে। যেমন পুলিস তেমনি তার বুদ্ধি। বিশ হাজার ফ্রাংক পেয়েছে না হাতী। আজ দেড় বছর থেকে আমি বলে ওকে খাওয়াচ্ছি নিজের পয়সায়।

তবে যে গান্ধী বলেছিল যে, 'কমার্স'এর ছাত্র। সে কথা কি মিথ্যে? ঠিক বুঝতে পারে না লেখক। বুদ্ধিমান পুলিস কনস্টেবল কেন তার কাছে আমেরিকান সিগারেট চেয়েছিল, সেই কথাটা কেবল এতক্ষণে তার বোধগম্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝে যে, আর এ হোটেলে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দরকার কি? বিদেশে বিভূঁয়ে। যেমন করে হ'ক, কালই সে হোটেল বদলাবে।

সন্ধ্যাবেলা গান্ধী ফিরে এল হোটেলে। মুখ শুকনো, চোখ বসে গিয়েছে। সারাদিন পুলিস তাকে হাবিজাবি কথা জিজ্ঞাসা করেছে। তার অসংলগ্ন কথা থেকে বোঝা গেল, ফরাসী পুলিস যেমন বেআক্কেলে, তেমনি বদ। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না, মানীর ইজ্জত রাখে না। কিন্তু সেই পুলিসের চাইতেও বদ একজন মাদ্রাজী। নাম বুঝি নায়ার। সেই লাগিয়েছে পুলিসের কাছে;—আসল কথা একটি মেয়েকে নিয়ে আমাদের মনোমালিন্য হয়, একদিন নাচের সময়। সেইদিনই নায়ার শাসিয়েছিল এর প্রতিফল দেবে বলে। এতদিনে সাপটা ছোবল মেরেছে। লোকটা আবার বলে যে, সে নাকি জার্মানীতে নেতাজীর ডান হাত ছিল। ছাই ছিল। ওটার আমি কম উপকার করেছি। যখন খেতে পাচ্ছিল না, তখন কত টাকা পাইয়ে দিয়েছি।

রাগে, দুঃখে গান্ধীর গলার স্বরটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

ফরাসী পুলিসকে জানি তো। একবার পিছনে যখন লেগেছে, তখন আর সহজে ছাড়বে না বোধ হয়। ফ্রান্স ছেড়ে আজই আমি চলে যাব জেনিভাতে। নাইবা থাকল ভিসা। আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট—তোমাদের মত অশোক-চক্র দেওয়া পাসপোর্ট নয়। কতবার চলে গিয়েছি বিনা ভিসাতে। সুইটজারল্যান্ডের লোকরা ভদ্দরলোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় জানে। এদের মত সংকীর্ণ মন নয় তাদের।

তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না লেখক। হোটেলওয়ালি গান্ধীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদে। তাকে যেতে বারণ করে। ছেলেটাকে গান্ধীর কোলে দিয়ে—কাঁদতে কাঁদতেই গান্ধীর জিনিসপত্র বাধা-ছাঁদা আরম্ভ করে। চুমোতে আর আদরে গান্ধী ছেলেটাকে বুঝি চটকে পিষে ফেলে দেবে আজ! ছেলেটা না ঘুমুনে পর্যন্ত গান্ধীর বেরুবার উপায় নেই।

বড় মায়া হয় লেখকের গান্ধীর উপর। হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও লোকটা ছিল ভাল। রাত দশটার সময় হোটেলওয়ালি যখন গান্ধীকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে যায়, তখন পুলিশের ভয়ে লেখক তাদের সঙ্গে যায়নি। হোটেল বদলাবার চিন্তা তখন তার মাথায়। তার ফ্রান্সের জীবনের গান্ধীযুগ এমন করে অকস্মাৎ শেষ হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। গান্ধীর সঙ্গে স্টেশনে যাবার সময় হোটেলওয়ালি তাকে ডেকেছিল। সে ছুতো দেখিয়েছিল শরীর খারাপের। কি মনে করল! গান্ধীর কাছে সে উপকৃত। নিজের ভয়ের জন্য তার সঙ্গে গেল না, কথাটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বেঁধে। সে মরতে ভয় পায় না, অথচ আঘাতকে ভয় করে, ঝঞ্ঝাটে ভয় পায়। গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে সাপের ভয় সে করে না। অথচ ঘুম ভেঙ্গে ঘরে চোর ঢুকেছে জানতে পারলে, হয়ত মটকা মেরে শুয়ে পড়ে থাকবে; মনকে প্রবোধ দেবে—কি আর নেবার মত আছে ঘরে! এইরকম মনবোঝানো যুক্তির অভাব তার কখনও হয় না। তাই এখন ভাবে যে স্টেশনে গেলে এই বিদায় ও বিচ্ছেদের সময় হোটেলওয়ালি আর গান্ধীর অসুবিধাই করা হত।

ডায়েরী

ফরাসীদেশের বিশেষ করে প্যারিসের নামের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। প্রাণ-বাঁচানোর জন্য আবশ্যক জিনিসগুলোর পর, আরও কতকগুলো জিনিসের দরকার হয় মানুষের। এই পরের জিনিসগুলোর কেন্দ্র প্যারিস। এগুলো পড়ে দুই পর্যায়ে—স্থূলে উপভোগের মালমশলা আর সূক্ষ্ম রসানুভূতির উপকরণ। বিদেশী আকর্ষণ করবার চুম্বক তৈরী করাটাই ফ্রান্সের পেশা, বিদেশীর কল্পনাপ্রবণতাটা এর পুঁজি। প্যারিসের কুৎসিৎ বাস্তব রূপটা এরা বিদেশীদের দেখায় না। গতযৌবনা প্যারী বুলভারের আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে, ফিনফিনে ফরাসী সিল্কের আধাঘোমটার আড়াল থেকে চোখইশারা করে। বিদেশীর চোখে বর্ণালীর ধাঁধা লাগিয়ে তার মনে জাগাতে চায় আনারকলির নেশা। আমেরিকান নাগরই তার পছন্দ। তাতে হাতে খানিকটা বেশী কাজ পাওয়া যায়—তাদের ভারি মণিব্যাগ হাল্কা করবার কাজ। ঠিক তাচ্ছিল্য না করলেও, আমেরিকান ছাড়া অন্য টুরিস্ট-দের তারা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। এই আমেরিকান টুরিস্ট-ট্রাফিক কি করে জীইয়ে রাখতে হয়, সে বিষয়ে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা অনেক কালের। এ বছর গ্রীষ্মকালে শুধু প্যারিসেই সাড়ে চার লাখ আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। এত বেড়াতেও পারে আমেরিকার লোকেরা। বড় লোকের দেশ আমেরিকা; আর বেড়ানর সমস্যায় পয়সাটাই অবশ্য সবচেয়ে বড় জিনিস। কিন্তু সমান আর্থিক অবস্থার লোকের মধ্যে দূরদেশে বেড়াতে যাবার হার, আমেরিকার সমান কোন দেশে নয়। এরা খরচে বিশ্বাস করে; পুরনো দেশের লোকের মত টাকা জমানোতে নয়। তারা অর্থনীতি না পড়েও জানে যে, বর্তমান সভ্যতাটা তত ভাল চলবে, যত তাড়াতাড়ি তুমি পকেটের টাকাটা খরচ করে দিতে পারবে। ফ্রান্সে যেখানে যাবে, দেখবে আমেরিকান টুরিস্টদের ভিড় আর তাদের অফুরন্ত ফুর্তি দেবার আয়োজন। তাই Guilde de France ফরাসীদেশের প্রতি অঞ্চলের ভাল ভাল রান্নার আর মদের প্রচার করেন, টুরিস্ট ও হবুটুরিস্টদের মধ্যে। টুরিস্টদের গাড়ী যাবার সময় গ্রামের ছোট হোটেলটিতে পর্যন্ত স্থানীয় নামজাদা খাবারটা পরিবেশন করা হয়। প্যারিসের ত' কথাই নাই। এখানে বারো মাসে তের পার্বন। এই কথাটাকে ফরাসীভাষায় বলে—'চার ঋতুর সহর' প্যারিস। এখানকার পালা-পার্বনগুলোকে বারোমাস বিদেশীদের সম্মুখে তুলে ধরবার জন্য একটা বড়

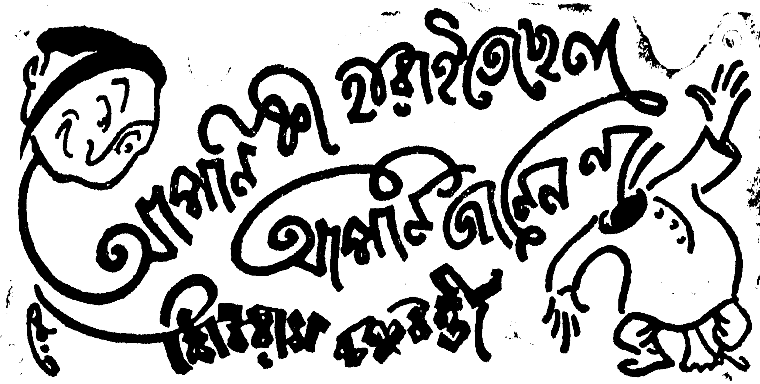
সমিতি আছে। Jules Romains-এর মত বড় সাহিত্যিক তার সভাপতি। যতই অব্যবসায়ী আর আপনভোলা হ'ক-না-কেন এই ফরাসী জাতটা, টুরিস্ট আমদানীর ব্যবসাটা তারা বোঝে ভাল। যেখানে টুরিস্ট নিয়ে কারবার, সেই সব দপ্তরেই কাজ দেওয়া হয়, অকেজো ফরাসী সুন্দরীদের। এ'দের একমাত্র কাজ দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনের সাধা হাসিটি মুখে ফুটিয়ে অফিসে বসে থাকা। এই আমেরিকান টুরিস্টদের জন্যই বোধহয় দোকানের শো-কেসগুলোতে নিখুঁতভাবে সাজানো অসংখ্য বাজে জিনিস —দ্বিগুণ বেশী 'আসল দাম'এর সংখ্যাটা কেটে বাজারদরের চেয়ে বেশী Sale Price লেখা। এই একই উদ্দেশ্যে ভাল পাড়ার দোকানগুলোতে সাইনবোর্ড টাঙানো— "এখানে ইংরাজী বলা হয়"। এ লেখাটা ইংরাজদের জন্য নয়। ইংরেজ জাতটাকে ফরাসীরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না; কিন্তু আমেরিকান ঠকাতে হলে ইংরাজী না জানলে চলে কই। যারা ফুর্তি বেচাকেনার দালালি করে ইংরাজি না জানলে তাদের পেশা চলে না! এদের সংখ্যা কম নয়। এই কারণেই বোধহয় ফরাসী মেয়েরা ফরাসী পুরুষদের চাইতে ভাল ইংরাজী বলে। আমেরিকান ছবি না দেখালে ভাল পাড়ায় সিনেমা-হাউস চলে না। আমেরিকান লেখকদের লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ বইগুলো স্তূপাকার করে রাখা থাকে বইয়ের দোকানে। তাই চটুলা তন্দ্রা-হীনা প্যারিসকে আমেরিকানরা এত ভালবাসে। একটা কথা আছে যে, আমেরিকার কোটিপতিরা মরলে পর প্যারিসে আসে ভূত হয়ে। আমেরিকানরা কোন দেশে না যায়! কিন্তু আর সব দেশে যায় দেখতে, বেড়াতে; সুইট্‌জারল্যান্ডে যায় খেলার ডিউটি দিতে; ইটালিতে যায় সেখানকার টুর পর্ব কোনরকমে সারতে; কিন্তু ফ্রান্সে আসে উপভোগ করতে, নিংড়ে প্যারিসের রস নিতে। অন্য জায়গাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে, এখানে এসে খুঁটি পোঁতে। আসেন আবার বেশীর ভাগ এমনি খাজা টাইপের দেবাদেবী যে, আমুদে ফরাসী জাতটা, পেটের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে রসের খোরাকও পায় তাদের কাছ থেকে। ফুট-পাথে পানরতা প্রৌঢ়া আমেরিকান ভদ্রমহিলা, কাগজওয়ালার কাছে যখন গম্ভীরভাবে Salt lake City Evening star চান, তখন সে এই অসঙ্গত চাহিদাটাকে পয়সার গরমের ঔদ্ধত্য না মনে করে, ততোধিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের কণ্টিনেণ্টাল সংস্করণ, তাঁর হাতে দেয়। জানে যে এটা তাঁর থলের মধ্যেই থাকবে, যতক্ষণ না ভের্সাইএর বাগানে পেতে বসবার জন্য এর দরকার হয়। "আর্ট নেই আমাদের দেশে"—কাগজখান নেবার সময় এই কথা বলে ভদ্রমহিলাটি কাগজ-ওয়ালার কাছে, নিজের আর্টে রুচির কথা জানিয়ে দেন। খবরের কাগজওয়ালাই বা একথা অস্বীকার করে কি করে। তার হাতের ফরাসী কাগজগুলিতে প্রত্যহ "গজদন্তের হাতুড়ীর নীচে" শীর্ষক একটি করে কলাম থাকে—দেশের আর্ট ট্রেজারস্ নিলামের লিস্ট। সব চলে যাচ্ছে আমেরিকায়।

ফরাসীরা জানে যে আমেরিকান টুরিস্টরা পথের ধারের যে কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতি-মূর্তিরও ফটো নেয়; লুভ্র মিউজিয়ম দেখবার পর হাতের লিস্টের 'মোনা-লিসা' কথাটার পাশে লাল পেন্সিল দিয়ে ঢেঁড়া কাটে; টুরিস্ট এজেন্সির গাইডদের কাছে কাতর মিনতি জানায়— 'দেখো বাপু এক জিনিস দুইবার দেখিয়ে দিয়োনা যেন আমাদের নতুন লোক পেয়ে।' ঠকাটাকে আমেরিকান টুরিস্টরা একটা স্পোর্ট বলে মনে করে। তাই ফরাসীদের ক্যাথলিক নীতিজ্ঞান বলে যে এদের ঠকালে পাপ হয় না; দেউলে হয়ে গেলেও নতুন দেশে আবার একটা নতুন ব্যবসা খুলে সামলে নিতে তিন মাসও লাগবে না।

টুরিস্ট ছাড়াও কেবল প্যারিসেই এখন ষোল হাজার আমেরিকান ছাত্রছাত্রী আছে। ডলার উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে এদের আদর খুব; কিন্তু এদের উঠতে বসতে ব্যঙ্গ করেন মহিলা প্রোফেসারের দল। অস্তগামী সূর্যের উপর অ্যাটম বোমা ছাড়বার রঙওয়ালা আমেরিকান টাই দেখে মাদাম প্রোফেসর 'ফর্মিদাব্‌ল্‌' বলে আঁতকে ওঠেন। আমেরিকান ছাত্রীকে 'তোমরা আবার প্রেমে পড়তে জান নাকি' বলে ঠাট্টা করেন। নীতি-বাগীশ প্রোফেসার কুমারী মেয়েদের একা একা 'ফলিজ বার্জের'এ যাবার জন্য ভর্ৎসনা করে বলেন—'তোমাদের আমেরিকান সমাজ জানি না বাপু, আমাদের ফরাসী সমাজে এ জিনিস চলে না।' তারপরই ছাত্রীদের দুষ্কৃতির মূল্য কিম্বা অনুশোচনার প্রমাণ হিসাবে অনেকগুলি করে বাজে বই কিনতে বাধ্য করেন। বইগুলি সম্মুখের টেবিলে সাজানো ছিল। আশ্বাসের সুরে বলেন, তোমাদের বেশীর ভাগই ত' যুদ্ধে কাজ করেছিলে—তোমাদের বইয়ের দাম ত' তোমাদের রাজদূতের অফিস থেকেই দেবে।

সাধারণ লোকে ডলার এক্সচেঞ্জ বোঝে না 'মার্শাল এড'-ও বোঝে না। তারা হোটেল-ওয়ালা, দোকানদার, টুরিস্ট এজেন্সি বা প্রোফেসরের ব্যবসাদারি চোখে আমেরিকান-দের দেখে না। তারা ঈর্ষা করে আমেরিকান-দের সিগারেটের। কতগুলো আমেরিকান সিগারেটের বদলে কি চাই তার নোটিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশবোর্ড ভরা। রাস্তার ঝাড়ুদার গলায় ক্যামেরা ঝোলানো উদ্ভট পোষাকের লোক দেখলেই গল্প জমাতে চায় আমেরিকান সিগারেটের লোভে। করেই বা কি ফরাসীরা। এদেশের তামাক সিগারেট তৈরীর ব্যবসাটা গভর্নমেন্টের একচেটিয়া। আর এই সিগারেটগুলোয় এমন দাকাটা তামাকের গন্ধ, যে ফরাসীদের মত ভাবাবেগ-প্রধান ও নেশায় সৌখিন জাতের, এই একটি কারণেই দেশে বিপ্লব করা উচিত। বিক্রিও আবার যে সে করতে পারে না—সরকারের অনুমতিপত্র না থাকলে। এই সিগারেটেরই আবার কি গালভরা নাম! সবচাইতে ভালোটার নাম High Life—আমেরিকানদের জন্য ইংরাজী নাম। সিগারেটের দোকানে গিয়ে হাই লাইফ সিগারেট চাও—দোকানদার বুঝতেও পারবে না। চোখ বড় বড় করে তাকাবে। এর এদেশে নাম 'ইগ্‌লিফ্‌'— অথচ এদের ধারণা যে শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ করছে। ফরাসী ভাষায় সাধারণত h-এর উচ্চারণ হয় না—আর i-এর উচ্চারণ ই। পায়জামাকে বলে পিজামা, গাইডকে বলে গিদ্। শুনলেই মনে পড়ে আমাদের ওখানের বুড়ো বিনোদবাবুর কথা। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণের সুনাম ছিল। তিনি সেকালে মিশনারী স্কুলকলেজে নাকি ইংরাজী বলতে শিখেছিলেন। তাঁর অফুরন্ত উপদেশাবলীর মধ্যে একটা মনে আছে। তিনি বলতেন, i অক্ষরটার উচ্চারণের জায়গায় যখনই তুমি নিশ্চিত নও যে সেটার উচ্চারণ ই-র মত না আই-এর মত, ধরে নেবে সেটাকে বলতে হবে আই-এর মত করে। তাতেই ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম—এই নাকি ছিল পার্সিভাল সাহেবের মত। সেইজন্য বিনোদবাবু চিরকাল Cinema-কে সাইনেমা বলেছেন—মরবার দিন পর্যন্ত। এই ইগ্‌লিফের দেশে তাঁর নিয়মে চলতে গেলেই হয়েছিল আর কি।

(ক্রমশ)



'খোকা ডুগডুগির জন্যে ভারি বায়না ধরেচে—'

'চাইছে। তবে দাওনা কিনে!" চিন্তাহরণ-বাবুর তক্ষুণি তক্ষুণি বায়না দেওয়া।'

'কিনে দাও! তুমি তো বলেই খালাস! এদিকে—' খোকার মা বলতে গিয়ে হোঁচোট খেলেন—চিন্তাহরণের দিকে তাকালেন খানিক—'এদিকে বড়োদিনে মামাবাবু আসছেন যে।' তাঁর কপালে চিন্তার রেখারা দেখা দেয়।

'এলেনই বা! আসুন না। এলেন তো কী?' চিন্তাহরণ নিশ্চিন্ত।

'বড়োদিনের কদিন বা আর? বড়মামাও আসবেন, আর এদিকে খোকাও ডুগড়ুগি নিয়ে মেতে উঠবে। বাজাতে থাকবে দিন-রাত। তার ডুগডুগুনি লেগে থাকবে সারাক্ষণ......'

'থাকলোই না হয়! তার হয়েছে কী!'

'হয়েছে কী? অবাক্ করলে তুমি! জানো না, বড়মামাবাবু গোলমাল একদম ভালো-বাসেন না? তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ—তার ওপরে তিরিক্ষি মেজাজের—খোকার ওই ডুগডুগাডুগ শুরু হলে কি আর রক্ষে থাকবে?'

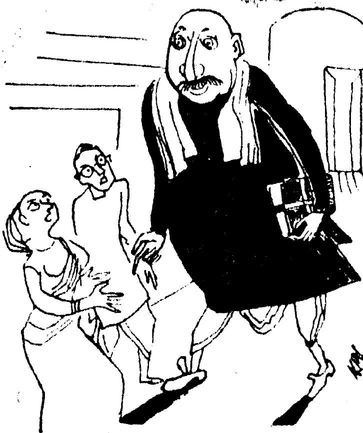
'না সয় তাঁর, কানে তালা দিয়ে থাকবেন না হয়।'

'তালা আর কাউকে দিতে হবে না, খোকাই কানে তালা লাগাবে সবার।'

'লাগাক্, তা বলে আমাদের খোকা ডুগডুগি চাইছে, আর তা পাবে না, এ হতেই পারে না। ছেলেদের—ছোটবেলার—সব আবদার রাখতে হয়। শিশু-মনের সাধ না মেটালে কী হয় জানো?......'

এই বলে চিন্তাহরণবাবু শিশুকালের অবদমিত বাসনা কিভাবে পরে উদ্দমিত হয়ে পরকালের সমস্তটাই ঝরঝরে করে দেয় উদাহরণসমেত তার সমূহ বিবরণ উদ্ধার করতে লাগেন।

'বুঝলুম গো বুঝলুম। কিন্তু তোমার মামাবাবু কি এসব ব্যাখ্যানা বুঝবেন? সেবার কী কাণ্ড করেছিলেন মনে নেই? আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতেই না তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—থামো থামো! থামাও তোমার আর্তনাদ। বলি, ও কী



কই আমার তেড়েনাম কোথায়?

হচ্ছে? গান? গান করতে হয়—বাগানে। লোকালয়ের নশ্বর জীব, ক্ষণভঙ্গুর আমাদের জীবন। সামান্য এই চর্মকর্নে কি ঐ অসামান্য স্বরলহরী সইবে? সয় কখনো? কান্নাকাটি করতে হয় তো যাও, অরণ্যে যাও—সেখানে গিয়ে রোদন করো গে প্রাণ ভরে'। পশুপক্ষীরা কোথায় গায়? কোন্ জায়গায়? এই বলে কী ধমকটাই না দিলেন আমায়। কথাগুলো এখনো যেন আমার মর্মে বিঁধে আছে।'

'আমিই কি ভুলেছি? আর, পাশের বাড়ির সেই সেতারের আওয়াজে—'

'সেতার নয়, বেতার। বেতারে তখন সেতার বাজাচ্ছিল। উনি সেতারীকে চড় মারবার চাগুল্যে পাশের বাড়ি গিয়ে চড়াও হয়ে-ছিলেন। হাতে-নাতে শিক্ষা দিতে গিয়ে দ্যাখেন, লোকটা হাতের নাগালের বাইরে। এরকমের শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে কি কম অশান্তি?'

'তা হোক। তা বলে ওঁর জন্যে যে আমাদের ছেলে একটা ডুগডুগি পাবে না, তা হতেই পারে না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি ছেলে! দেবই আমি ডুগডুগি।'

চিন্তাহরণবাবুর সাফ কথা শেষ পর্যন্ত।

'তুমি তো দিয়েই খালাস! আমাকে সব দিক দেখতে হয়—।' শ্রীমতী সমস্ত খতিয়ে দ্যাখেন—শেষের পরেও যে বিশেষ থাকে সে পর্যন্ত গিয়ে কতো ক্ষতি দাঁড়াবে—ক্ষত-বিক্ষতি অবধি গড়াবে কিনা—ভেবে দেখতে হয় তাঁকেই। খোকা ডুগড়ুগি চর্চা করুক, আর তাকে নিয়ে তার দাদু আরেক রকমের চড়চা চালান—তাঁর চওড়া হাতের চড়-চাপড় চলুক—গান বাজনার দিকে থেকে এ ধরণের সঙ্গত কতখানি সঙ্গীণ, আর কতোদূর যে অসঙ্গত, ভুরু কুঁচকে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলেই তা চোখে পড়ে।

কিন্তু যতই না তিনি কর্তাটিকে সমঝান—কিছুতেই তাঁকে বিমত করানো যায় না। খোকা ডুগ্‌ডুগি পাবেই—তিনি নিজেই তাকে কিনে এনে দেবেন—বড়ো-দিনের শুভ সকালেই। খোকার বাবার গোঁ খোকার চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। হাজার অনুরোধ উপরোধেও—ঢেঁকি ঠিক না হলেও—হাঁ করে যে-ডুগ্‌ডুগি তিনি গিলেছেন একবার—তা কে আর না করায়? ওই গলা দিয়ে ওগ্‌লোয় কার সাধ্য?

অবশেষে বড়ো মামা আর বড়দিন দুই এসে হাজির—এক তারিখেই! ডুগ্‌ডুগির সঙ্গেই।

ডুগ্‌ডুগি অবশ্যি তার একটু আগেই এসেছিলো। পৌষ মাস আর সর্বনাশ এক সাথেই ঘনালো।

বড়োমামা চৌকাঠে পা দিয়েই বাড়ি মাথায় করলেন—'কই, আমার তেড়েনাম্ কই? তেড়েনাম?'

'তেড়েনাম? সে আবার কে?' চিন্তাহরণ সপরিবারে হাঁ করেন।—'তেড়েনাম কী?'

'তেড়েনাম কী, তাও জানো না? এতদিন ধরে রেডিয়োয় রামধুন্ শুনলে আর তেড়েনাম জানা নেই?' মামাবাবু যেন তেড়েই আসেন—'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, পতিতপাবন সীতারাম।'

চিন্তাহরণ বোঝেন কি না কে জানে, মুখের হাঁ কিন্তু বোজেন না।

'কই, আমার তেড়েনাম কোথায়?' বড়মামার বেজায় তাড়া। তাকে না দেখলে যেন স্বস্তি নেই।

'তেড়েনাম! তেড়েনাম......?' ভাগনেবৌয়ের আওয়াজ বেরয়। আমতা-আমতা হয়ে—'তেড়েনাম কে মামাবাবু?'

'কে আবার? আমার দাদু। আমার স্বর্গের বাতি—নাতি আমার। আবার কে?'

'ও খোকা! খোকন? তেড়েনাম তো নাম নয় তার মামাবাবু। এখনো সে খোকাই—বছর চারেক হোলো কিন্তু তার কোনো ভালো নাম রাখা হয়নি এখনো।'

'রাখা হোক্ এবার। এই তো বেড়ে নাম—তেড়েনাম। ঈশ্বর আল্লা তেড়েনাম—— ভগবানের নাম কি খারাপ?'

'না, খারাপ কি।' চিন্তাকুল চিন্তাহরণ নিজের চিন্তাজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হন। চিন্তার কূল পান।

'আমার পাঁচ ভাগনের ছেলেদের নাম তো আমিই রাখলাম—বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার। যাদের নামকরণ হয়েছিলো—তাদেরো নাম পাল্টে দিলাম। উলটেপালটে দিতে হোলো। বড়ো ভাগনের ছেলেটির নাম রেখেছি ঈশ্বর, মেজভাগনের একটিমাত্র মেয়ে—আদুরে মেয়ে—তার নাম হয়েছে আল্লা। আল্লা কিন্তু কিছুতেই আল্লা হতে রাজি হচ্ছে না। বিস্তর চকোলেট খাইয়ে তবে তাকে রাজি করিয়েছি। এবার এলাম তোমাদের বাড়ি—তোমাদের পালা এখন। খোকার নাম রইলো তেড়েনাম। বুঝলে?'

দাদু তাঁর নাতিদের সুনাম রটান্—তাড়িতবার্তার মতই দুঃসংবাদগুলি অবারিত হয়।—

'এখন বাকী থাকলো আমার আর দুই ভাগ্নে। সান্কুর, পান্কুর হয়েছে; চান্কুরও হোলো—বাকী রইলো শুধু মান্কু আর নান্কু।'

'ছোট্ঠাকুরপোর তো এই সেদিন মাত্র হোলো—' ভাগনে বৌ বলতে যায়।

'হোলোই বা। এখন হলে কি এখনি রাখতে নেই নাম?' মামাবাবু অবাক হন।

'তাও আবার যমজ।' চিন্তাহরণের খট্কা অন্য জায়গায়।—'তার একটা ছেলে একটা মেয়ে আবার।'

'সেই জন্যেই তো তারা সীতারাম। একটা সীতা আর একটা রাম। ভগবান, সত্যিই, এমন সব মিলিয়ে রাখেন! রাখতে পারেন। ভাবলে অবাক হতে হয়। যেন আমাদের বোম্বাই।'

'বোম্বাই—সে আবার কী?' তেড়েনামের মা যেন আরেক ধাক্কা খান্। তাকান্ মামার মুখে। তাঁর এই নতুন বাই—নাম করার বাইটাই তো বোম-এর মতন—এর ওপরেও রোমাঞ্চকর আরো কিছু আছে নাকি?

'বোম্বাই, মানে, 'খালি মিল্ আর মিল্'। যেন রবিঠাকুরের কবিতা গো!

জানালেনন মামাবাবু ঃ 'ভগবানের রাজ্যে কি কোথাও এতটুকু গরমিল হবার আছে?

গরমিলের কথায় গিন্নির গোঁজামিলের কথা মনে পড়ে—ডুগ্‌ডুগির কথা। তার গঞ্জনা থেকে এই মিলনপর্বকে অক্ষুন্ন রাখতে তিনি আগেভাগেই অবহিত হন। আস্তে আস্তে ভাঙতে যান।

'তেড়েনামের জন্যে কী এনেছেন মামাবাবু? ঝুমঝুমি টুমঝুমি—কিছু?'

'ঝুমঝুমি? ঝুমঝুমি তো বাজে। ছেলেদের হাতে কি বাজে জিনিস দিতে আছে?' মামাবাবুর ভুরু কুঁচকায়।

'শিশুরা তো বাজনাই ভালোবাসে মামাবাবু!' চিন্তাহরণেরও চিন্তা-সুত্রপাত।

'খোকার—মানে, আপনার তেড়েনামের ডুগডুগির কিন্তু ভারী সখ। দিন্ না মামাবাবু তাকে একটা ডুগডুগি কিনে।' খোকার মায়ের আব্দার।—'এবারের বড়দিনে?'

'উহুঁ। বাচ্চাদের এমন জিনিস দিতে হবে যা বাজে না। আজে বাজে না। যেমন ধরো বই। কিন্তু বাজে বই নয়।'

'বই! বইয়ের খোকা বুঝবে কি! হাতেখড়িই হয়নি এখনো।'

'না হোক হাতেখড়ি, তাতে কি? বই নিয়ে ছিঁড়ুক খুঁড়ুক—সেও ভালো।'

'বই কি খোঁড়া যায়?' চিন্তাহরণের একটি সুচিন্তিত প্রশ্ন। কুট এবং কটু।

কিন্তু সে-লেম্ - এস্‌কিউজ মামা কানেই তোলেন না—

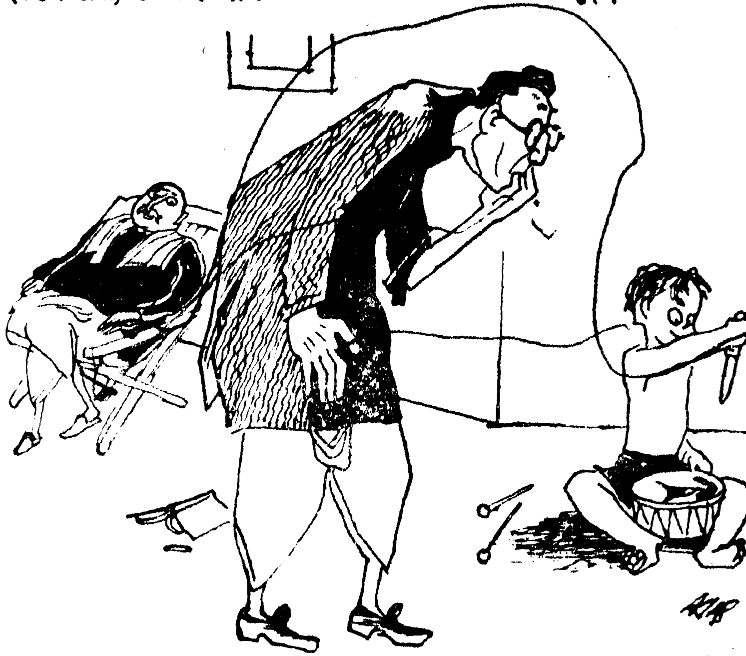
'ছিঁড়লেই তো বই মাটি। মাটি তো খোঁড়া যায়? খুঁড়ুক না তখন!'

কিন্তু বেশি খুঁড়তে হোলো না, ক্ষুরধার ডুগ্‌ডুগিনাদ ভেসে এলো অদূর থেকে।—হাতে খড়ি না হলেও খোকার হাতে খাঁড়া যে হয়েছে তার খবর পাওয়া গেল—বলতে না বলতেই। ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ—সাড়া পড়ে গেল সারা বাড়িতে: মামাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন—

কানে হাত দিয়ে বসে পড়লেন কেদারায়—'কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ।'

চিন্তাহরণ মন মনে খুসীই হন। ডুগ্‌ডুগির আওয়াজ তাঁর কানে যেন মধু ঢেলে দেয়। খোকা যদি সমানে এই রণ-বাদ্য বাজিয়ে যেতে পারে তাহলে হয়ত এযাত্রা অতি সহজেই মামাত ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। এক্ষুণি হয়ত মামাবাবু ঐ ডুগডুগির তাড়নায় রেগেমেগে এই পাপপুরীর ত্রিসীমানা থেকে রেহাই পেতে তড়িদ্বেগে বেরিয়ে পড়বেন—অভাগা চান্কুকে চিরকালের মতই ত্যজ্য ভাগনে করে তাঁর স্নেহের মান্কু-নানকুর অভিযানে। পতিতপাবন (একক) আর সীতারাম (যুগপৎ)এর অতিজরুরী নামকরণের তাগাদায় মানভূম আর সাঁওতাল পরগণার দিকে তাঁর হামলা সুরু হবে। মামলা মিটে যাবে সহজেই।

ফূর্তির আতিশয্যে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। সেখানে বসেই ডগমগ হয়ে শুনতে লাগলেন ডুগডুগি। ডাগ ডুগা ডুগ্—বেড়ে বেড়ে ক্রমেই আরো বেড়ে হয়—বেশ ডাগর ডুগর হয়ে ওঠে। নিজের পরাক্রমেই! আহা, কী মিষ্টি—কী সুমধুর ধ্বনি! এই ডাগডুগা ডুগ। শুনতে শুনতে অশ্রু স্বেদ পুলক রোমাঞ্চ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ বাহ্য দশাতেই দেখা গেল তাঁর। তেড়েনামের হাতে পড়ে ডুগডুগির ডুগডুগুনিও তেড়ে ফুঁড়ে উঠতে লাগলো সমান তালে—সটানে—উদারা—মুদারা—তারায়। তারপর চূড়ায় উঠে তাড়াতাড়ি থেমে গেল হঠাৎ। চুপ্! একেবারে চুপ্। অভাবে বিভোর হয়ে অর্ধবাহ্য দশায় বেরুলেন তিনি বাথরুম থেকে। ব্যাপার কি? চিন্তাহরণকে একটু চিন্তিত হয়েই বেরুতে হোলো—বলতে কি!



এই কোথায় পেলি এই ছুরি? গর্জে উঠলেন তিনি।

বেরিয়ে দেখলেন মামাবাবু সেরা ডেক্ চেয়ারটিতে বিস্তারিত হয়ে সকালের খবর-কাগজটিকে চোখের সামনে বিস্ফারিত করেছেন। কাগজের ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায়, তাঁর মুখে আরামবাগের ছবি,—যে-আরাম কদাচিৎ মানুষের বাগে আসে! মানভূমের টিকিট কাটবার কোনো লক্ষণ সেখানে নেই।

এই মানচিত্র দেখবার পর ভূগোলের অন্য দিকে তাঁকে ছুটতে হোলো—অকস্মাৎ না-গোলের কারণ জানতে।

গিয়ে দ্যাখেন খোকা পা ছড়িয়ে বসেছে ছুঁয়ে—ডুগডুগিটাকে বাগিয়ে ধরেছে দুপায়ের ভেতর। তার হাতে ছোট্ট একটা ছুরি—চকচকে আর ধারালো। তাই দিয়ে ডুগডুগিটাকে সে কেটে কুটে শেষ করেছে—কিছুই তার বাকী নেই আর।

'এই! কোথায় পেলি এই ছুরি?' তিনি গর্জে উঠলেন।

'তোমার নয়।' বল্ল খোকা। 'দাদু দিয়েছে আমায়।'

'কী হচ্ছে ঐ শুনি? আঁ? ছুরি দিয়ে ডুগডুগিটাকে—' ছুরিটার সবখানি ধার আর সমস্ত চাকচিক্য যেন তাঁর মুখ-চোখে খেলতে থাকে। তাই দিয়ে ছেলেটার সমস্ত ছলাকলা যেন তিনি ফলাফলা করতে চান।

'ফাঁক করে দেখছি আমি কোথায় সেই দুষ্টু ছেলেটা।' খোকা জানালো একটুও দ্বিধা না করে—'যে দুষ্টু ছেলেটা তোমার এই ডুগডুগির মধ্যে ঢুকে যতো গোলমাল করছে, একটা দুষ্টু খোকা বুঝলে বাবা? আমি সেই দুষ্টুটাকে ধরবো, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজেই পাচ্ছি না।' খোকা ডুগডুগির ফাঁকে ফোকরে উঁকি মারে।

'দুষ্টু ছেলে? দুষ্টু ছেলে বসে আছে ডুগডুগির মধ্যে—কে বল্লে তোমায়?' চিন্তাহরণ ফেটে পড়েন। প্রায় তাঁর সদ্য-বিস্ফাটিত বড়োদিনের উপহারটির মতই।

'বারে! দাদুই বল্লে তো' জবাব দিলো খোকা—অম্লানবদনেই।





আজব জীবিকা

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদকঃ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

অনুবাদকের বক্তব্যঃ—'আজব জীবিকা' (দি ক্লাব অব কুইয়ার ট্রেড্স্) একখানি উপন্যাস। তবে, প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, উপন্যাসের সর্বজনসম্মত আঙ্গিকের সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। দুটি সমরস সরস গল্পকে এখানে একত্রিত করেছেন চেস্টরটন; প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি অন্তঃপ্রবাহী যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। সর্বশেষ গল্পে তা এক উচ্চচূড় অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় নিষ্ঠার অধিকারী হয়েও লেখক হিসেবে চেস্টরটন উদ্ভটরসের রসিক। 'আজব জীবিকা'ও সেই একই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত।

প্রথম গল্পঃ মেজর ব্রাউন-এর সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চার

বিচিত্র চিজ এই ফ্ল্যাট বাড়ি। কার মাথায় যে এর আইডিয়া ঢুকেছিল ইংল্যান্ড আর আমেরিকায়, ঈশ্বর জানেন। জায়গা বাঁচানোর জন্যে যে কায়দায় এখানে বাড়ির ওপর বাড়ি, দরজার ওপর দরজা, চাপানো হয় সে এক এলাহী ব্যাপার। ইটকাঠের এই জটিল দুর্ভেদ্য আরণ্যক প্রহেলিকা—যে কোনও অভাবিত জন্তু এখানে বাস করতে পারে, যে কোনও অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। আর এরই কোনও একটার ভেতর, যদ্দুর আমার ধারণা, 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর হদিশ পাওয়া যাবে। নামটা একটু বিচিত্র সন্দেহ নেই। মনে হতে পারে, নেমপ্লেট দেখে পথচারীরা নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ। সে ধারণা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। এমনই জায়গা এ সব, কোনও কিছুতেই কখনো কেউ বিস্মিত হয় না। তারা যাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তাতেই মশগুল, কেউ হয়তো মন্টিনেগ্রো শিপিং এজেন্সীতে যাবে, কেউ হয়তো রাটল্যান্ড সেন্টিনেল্-এর লন্ডন অফিসে। ভাবলেশহীন তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখ তাদের; দেখে মনে হয়, বিষণ্ণ স্বপ্নের প্রায়ান্ধকার গলি-ঘুঁজিতে সব ঘুরে মরছে। কোনও কিছুতেই উদ্বেগ নেই, কৌতূহল নেই। ধরুন, বিদেশী মানুষদের সব ধরে ধরে খুন করবার জন্যে যদি একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হতো, আর নরফোক স্ট্রীটে একটা অফিস বসাতো তারা, আর সে অফিসে যদি কৌতূহলী মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে নিরীহ গোবেচারা গোছের কর্মচারী নিযুক্ত করা হতো একজন- তবে, এমন একটা তাজ্জব ব্যাপারের গন্ধ পেয়েও, বিশ্বাস করুন, কেউই কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না সেখানে, কারুর মনেই কৌতূহল জাগতো না এতটুকু। আজব জীবিকা সঙ্ঘ-এর কথা হচ্ছিলো, এইখানেই তার আস্তানা।

সঙ্ঘের কার্যকলাপ কী, তা আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম। দুচার কথায় পাঠকদের সেটা জানিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা আধা-পাগলাটে ছন্নছাড়া ক্লাব। সদস্য হবার ব্যাপারে একটা অবশ্যপালনীয় সর্ত বর্তমান। সদস্যের যেটা পেশা- যার ওপর তাঁর ভরণ পোষণ চলে—সে পেশা তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত হওয়া চাই। কথাটা একটু গোলমেলে ঠেকছে বোধ হয়,—তা ঠেকতেই পারে। সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে এই আবশ্যিক সর্তের একটা যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া রয়েছে। তাতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, প্রথমতঃ সে পেশা আনকোরা নতুন হওয়া চাই; চলতি কোনও পেশার রকমফের হওয়া চলবে না। যেমন ধরুন, কোনও বীমার দালাল যদি জীবন অথবা ধনসম্পত্তি বীমা করবার সাবেকী পথ ছেড়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, এখন থেকে সে তার খদ্দেরদের ট্রাউজার বীমা করে বেড়াবে, আর পাগলা কুকুরের আঁচড়ে সেই ট্রাউজার ছিঁড়লে কোম্পানীর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে তার—তাহলে, ব্যাপারটা যদিও বে নতুন ধরণেরই হলো, সেইজন্যেই যে তাকে আজব জীবিকা সঙ্ঘ-এর সদস্য করে নেয় হবে তা নয়। কেননা, এটা হলো গিয়ে চলতি বীমা-ব্যবস্থারই একটা রকমফের মাত্র, নতুন কিছু নয়। এই গেল গিয়ে সর্তের প্রথম অংশ। স্টর্মবি-স্মিথের ব্যাপার নিয়ে যখন ক্লাবে একটা আপত্তি উঠেছিল, স্যার ব্র্যাডক বার্ণাবি-র‍্যাডক, তখন তাঁর চিত্তহারী সরস বক্তৃতায় বেশ ভালভাবেই এ অংশটুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আবিষ্কৃত পেশাটি অর্থকরী হওয়া চাই, তাতেই যেন সদস্যের ভরণপোষণ চলে। কেউ যদি আজ রাস্তাঘাটে শুধু সার্ডিন মাছের খালিকৌটো কুড়িয়ে বেড়ায়, তাতেই তার কিছু এ সঙ্ঘের সদস্য হবার অধিকার জন্মাবে না। তবে সেই খালি-কৌটোরই যদি সে একটা ব্যবসা খুলে বসে, প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে তার থেকে, তো সে অবিশ্যি আলাদা কথা। প্রফেসর চিক তাঁর বক্তৃতায় সে কথা খুলে বলেছিলেন। প্রফেসরের নিজের পেশাটা যে কী তা যদি খুলে বলি তো আপনারা হাসবেন-না-কাঁদবেন তা-ই ঠিক করে উঠতে পারবেন না।

অদ্ভুত এই প্রতিষ্ঠানটিকে আবিষ্কার করে আমরা বেশ একটু খুশীই হয়েছিলাম। এখনো গোটা কতক নতুন পেশা আছে এ সত্যের সন্ধান পাওয়াও যা, পৃথিবীর প্রথম জাহাজ অথবা প্রথম লাঙলের সন্ধান পাওয়াও তাই। দুটো জিনিসই সমান বিস্ময়কর, সমান অবিশ্বাস্য। কেমন যেন মনে হয়—কী আর মনে হবে, যা মনে হওয়া উচিত তা-ই মনে হয়; মনে হয় যেন সৃষ্টির সেই প্রথম শৈশবে ফিরে গিয়েছি। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি যে শেষতক এই 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর সন্ধান পেলাম, কিছুই তাতে অবাক হওয়ার নেই। কেননা এ-ই হলো আমার নেশা, যতোগুলো ক্লাবের সদস্য হওয়া সম্ভব অবিলম্বে তাদের সদস্য হয়ে যাওয়া। ক্লাব কুড়োনই আমার এই মরজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলতে পারেন। সেই যে যৌবনে আমি 'এথেনিয়াম'-এর সন্ধান পেয়েছিলাম—ব্যস, তারপর থেকে কতো নতুন ধরণের ক্লাবের যে আমি সদস্য হয়েছি তার আর কোনও লেখাজোখা নেই। ভবিষ্যতে কাউকে যদি বলবার দিন আসে, সে সব কাহিনী খুলে বলবো। সেই 'মড়া মানুষের পাদুকা সংগ্রহ ক্লাব'-এর কথাও

বলবো। (নাম শুনে যতো খারাপ লাগছে, আসলে কিন্তু ক্লাবটি ততো খারাপ নয়)। 'বেড়াল-ক্রীশ্চান ক্লাব'—এতো দুর্নাম যাদের নামে—তারও উৎপত্তির কাহিনী বলবো সকলকে। সারা পৃথিবী সেদিন জানবে কী সেই নিগূঢ় কারণ 'টাইপরাইটিং সঙ্ঘ' যার জন্যে 'লাল টিউলিপ লীগ'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু হ্যাঁ, 'দশ পেয়ালা ক্লাব'-এর সম্পর্কে কিন্তু একটি কথাও বলবো না, তা-সে যিনিই যতো অনুরোধ করুন না কেন। বলবার উপায় নেই কিনা, তাই। আপাতত আমি 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ' এর কথা বলতে বসেছি। এটাও সেই বিচিত্র ক্লাবগুলিরই অন্যতম। আর আমার নেশার কথাও তো শুনলেন, আজ হোক কাল হোক, এ ক্লাবের সঙ্গে যে আমার পরিচয় ঘটবে সে তো অনিবার্য। শহরের ফাজিল ছোকরারা আমার নাম দিয়েছে 'ক্লাব-সম্রাট।' কেউ কেউ আমাকে 'শয়তানের সাকরেদ' বলেও ডাকে। বুড়ো বয়েসেও আমার চেহারা পাল্টায়নি, এখনো আমার অদম্য স্ফূর্তি,—সেইজন্যেই হয়তো। তা ডাকুক। ইহলোকে আমার প্রচুর খানাপিনা জুটছে। পরলোকে যেন তার ঘাটতি না ঘটে—এই শুধু আমার একমাত্র প্রার্থনা। কি বলছিলাম যেন? 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ' আবিষ্কারের কথা। এখন মজাটা কি জানেন, আসলে আমি কিন্তু এটাকে আবিষ্কার করিনি, করেছে আমার বন্ধু বেসিল গ্রান্ট। হ্যাঁ, সেই বেসিল গ্র্যান্ট,—সেই পরম দার্শনিক, সেই মরমী মহাপুরুষ—জীবনে যে কখনো তার আস্তানার চৌহদ্দী ছেড়ে বাইরে বেরোয়নি। অর্থাৎ বেরিয়েছে, তবে খুব কম।

এবং খুব কম লোকই তাই বেসিলকে চেনে। তার মানে এই নয় যে, বেসিল অমিশুক। আসলে কিন্তু খুবই মিশুক সে। কোনও অচেনা লোকও যদি তার ঘরে ঢোকে একবার, সারা রাত্তির বেসিল তাকে গালগল্পে আটকে রাখবে। তা সত্ত্বেও খুব কম লোকের সঙ্গেই তার আলাপ। কবি প্রকৃতির লোক কিনা, আলাপ না করলেও তার চলে। কোনও আগন্তুককে যখন সে অভ্যর্থনা জানায়, দেখে মনে হয় কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গী ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। সূর্যাস্তের রঙ বদল দেখে যেমন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ পাই আমরা। এবং সেই রঙ্‌বদলের ব্যাপারে যেমন আমাদের হাত নেই, হাত লাগাবার প্রয়োজনও আমরা বোধ করি না, বেসিলের বেলাতেও ঠিক তেমনি। কেউ এলে সে খুশী হয়, এই পর্যন্ত; তাই বলে উদ্যোগ আয়োজন করে এর-ওর-তার কাছে গিয়ে আড্ডা জমাতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। নিজের থেকে কেউ যদি আসে, ভালোই; না যদি আসে, তাতেই বা কী। ল্যাম্বেথ-এর ওদিকে ছোট্ট মতন একটি কুঠরি ঘরে তার আস্তানা। জিনিসপত্র বিশৃঙ্খল। আর সে জিনিসগুলোও সব এমনি, আশপাশের বস্তীগুলোর সঙ্গে তাদের এতটুকু সামঞ্জস্য নেই। যেমন ধরুন পুরোনো সব ধুলোট কেতাব, তরোয়াল, কিম্ভূত সব অস্ত্রশস্ত্র এই সব। বেশ একটা মধ্যযুগীয় রোমান্টিক আবহাওয়া। এবং এই পরিবেশের মধ্যে সবচাইতে বেমানান সে নিজে। একেবারে আধুনিক তার চেহারা, তার মুখ। সেই সঙ্গে একটু কঠিন। অনেক আইন-ঘাঁটা-ঘাঁটির ছাপ পড়েছে তাতে। আসলে কী তার পরিচয় একমাত্র আমিই তা জানি।

আশা করি সেই বীভৎস ব্যাপারটার কথা আপনাদের মনে আছে, সেই যে ইংল্যান্ডের একজন নামজাদা জজ যখন আদালতের মধ্যেই পাগল হয়ে গেলেন? তার নিগূঢ় কারণ যাই হোক না কেন, ব্যাপারটাকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। মাস কয়েক ধরেই, না না—বছর কয়েক ধরেই, সকলে তাঁর আচার আচরণে একটা খ্যাপাটে ভাব লক্ষ্য করে আসছিলো। আইনে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, তা সত্ত্বেও তাতে তিনি উৎসাহ হারিয়েছিলেন। তার বদলে সকলকে তিনি নৈতিক উপদেশ দিতে সুরু করেছিলেন ইদানীং। এবং সে উপদেশও তিনি বেশ পষ্টাপষ্টিই দিতেন। কথাবার্তায় একটা ইস্টগুরুসুলভ মেজাজ ফুটে উঠছিলো; না কি তাকে ডাক্তারী মেজাজ বলবো? তাতেও সকলে খুব অবাক হয়নি। অবাক হলো যখন একটা ফৌজদারী মামলার রায় দিতে গিয়ে আসামীর উদ্দেশে তিনি বললেন, "তিন মাসকাল তোমার পক্ষে সমুদ্র তীরে হাওয়া পরিবর্তন করিতে যাওয়া উচিত,—এই দৃঢ় সঙ্গত ও ঈশ্বর-অভিপ্রেত প্রত্যয়ের বশবর্তী হইয়া তোমাকে আমি তিন বৎসরকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।" আসামীদের তিনি শাস্তি দিতে সুরু করলেন তাদের আইন ঘটিত অপরাধের জন্যে নয়, তাদের আত্মম্ভরিতা, রসবোধের অভাব, আর নয়তো তাদের সযত্ন-লালিত চিত্তবৈকল্যের জন্যে। বাপের বয়েসেও কেউ এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখেনি। সেই হীরে-চুরির মামলাটার কথা আপনাদের মনে আছে তো? সেই যে সেই মামলা, অসীম আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রীকেও যাতে নিতান্তই অনিচ্ছুকভাবে তাঁর ভৃত্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল? মনে পড়েছে, কেমন? তাতেই গিয়ে ব্যাপারটা চরমে দাঁড়ালো। বেশ সওয়াল জবাব চলছিল, জজ হঠাৎ খেপে গেলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশে, "আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করুন। আত্মার যা পরিচয় পেলাম আপনার ও-আত্মা একটা নেড়ী কুত্তারও যোগ্য নয়। যান, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করুন।" যে মামলায় সত্যিই তিনি পাগল হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত, বুদ্ধিমানদের ধারণা এসব তার পূর্বাভাষ মাত্র। সেই কথাতেই আসছি। মানহানির মামলা সেটা, রীতিমত প্রতিপত্তি-শালী দুই বিত্তবানের মধ্যে। দুজনেই দুজনের নামে পাল্টা অভিযোগ এনেছেন। দীর্ঘ জটিল মামলা। কৌঁশুলীরা তাঁদের থলি ঝেড়েঝুড়ে বক্তৃতা করেছেন দিনের পর দিন। তারপর তাঁদের সেই একটানা বাকজাল-বিস্তারের পর অবশেষে রায় দেবার মুহূর্ত সমাগত হলো। সকলেই আশা করেছিলো, জজ এবার একটা ঐতিহাসিক রায় দেবেন; আইন আদালতের ব্যাপারে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ নজীর হয়ে থাকবে সেটা। মামলা যতদিন চলেছিল, জজ সাহেব তাঁর মুখ খোলেননি, বিষণ্ণভাবে শুধু শুনে যাচ্ছিলেন সব কিছু। এবারে তিনি রায় দেবেন। মুহূর্ত কয়েক তিনি গুম মেরে বসে রইলেন, তারপর ছড়াকাটার সুরে বিচিত্র একটা গান গেয়ে উঠলেন অকস্মাৎ; নিচে সেটা তুলে দিচ্ছি ঃ—

'ও রাউটি-আউটি টিড্‌লি-আউটি
টিড্‌লি-আউটি টিড্‌লি-আউটি
হাইটি-আইটি টিড্‌লি-আইটি
টিড্‌লি-আইটি আও।'

অতঃপর তিনি তাঁর চাকরী ছেড়ে দিলেন, ল্যাম্বেথ অঞ্চলে গিয়ে কুঠরি ভাড়া করলেন একটা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে বসে আছি, —আমি এবং বেসিল গ্র্যান্ট। সামনে আমার এক্‌গ্লাস বার্গান্ডি। বেসিল তার চিঠিপত্তরের জঞ্জালের পেছন থেকে

বার্গান্ডীর বোতল বার করে এনেছে। আনমনে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, কখনো বা একটা তরোয়াল তুলে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করে দেখছে। এটা তার একটা মুদ্রাদোষ। চুল্লীর ভেতর আগুন জ্বলছে। তার আভা এসে পড়েছে বেসিলের মুখের ওপর, তার ধূসর চুলে। দু চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন। সেই স্বপ্নসমাহিতভাবেই কি যেন বলবে বলে সবেমাত্র মুখ খুলতে যাচ্ছিল বেচারা, দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। আর একটি শীর্ণ যুবক এসে ঘরে ঢুকলো আমাদের। বেশ উত্তেজিত। লালচে চুল, গায়ে একটা বিরাট ফারকোট।

"এই যে বেসিল," হাঁফাতে হাঁফাতেই সে বললো, "তোমাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানেই একটু কথাবার্তা বলে নিতে চাই। আমারই এক মক্কেল। মানে, আগের থেকেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না মশাই।" বলে সে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

বেসিলও তাকালো আমার দিকে; হেসে বললো, "ওহো, তুমিতো আবার একে চেনো না, তোমাকে বলা হয়নি। এটি আমার ভাই, শ্রীমান রুপার্ট গ্র্যাণ্ট। কাজের ছেলে, এমন কোন কাজ নেই যা ওর সাধ্যাতীত। আমাকে তো জানো, কর্মক্ষেত্রে কেমন নাকানি-চোবানি খেয়েছি। রুপার্ট তার উল্টো, সব কাজেই সমান ওস্তাদ। কত চেহারাই যে ওর দেখলাম! সাংবাদিক, বাড়ির দালাল, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রকাশক, স্কুল মাস্টার,—হ্যাঁ ভালো কথা রুপার্ট, এখন যেন তুমি কী করছো?"

গম্ভীর মুখে রুপার্ট জবাব দিল, "আমি এখন প্রাইভেট গোয়েন্দা, বেশ কিছুদিন যাবৎ এ-লাইনে আছি। আরে, আমার মক্কেল এসে গেছে দেখছি।"

দরজায় ঘা পড়লো সজোরে। অনুমতি দিতেই, দরজাটা খুলে গেল এবং বলিষ্ঠ একজন ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর তিনি তাঁর রেশমী টুপি নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "শুভসন্ধ্যা।" শব্দের শেষার্ধ এমনই সজোরে উচ্চারণ করলেন তিনি যে তাঁর থেকেই তাঁর চরিত্রগত দার্ঢ্যের খানিকটা আভাষ পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো, চুল কাঁচাপাকা। সেই সঙ্গে একখানা বেঁটে কালো গোঁফ। তার থেকে তাঁকে বদরাগী বলে মনে হতে পারতো; কিন্তু না, দুচোখ তাঁর সমুদ্র-সুনীল, অগাধ বিষণ্ণতা সেখানে।

ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকতেই বেসিল উঠে দাঁড়ালো, আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "চলো হে বন্ধু, পাশের ঘরে যাওয়া যাক।"

"দরকার নেই। থাকুন। সাহায্যে আসবেন।"

প্রথম থেকেই কেমন যেন চেনাচেনা ঠেক-ছিলো, এবার এই কাটাকাটা বাচনভঙ্গী শুনে আর সন্দেহ রইলো না। যতদূর মনে পড়ছে, নাম মেজর ব্রাউন। বেসিলেরই সংস্পর্শে একদিন আলাপ হয়েছিল। ভদ্র-লোকের এই তামাটে, রোদেপোড়া অথচ ছিমছাম, চেহারা এবং বৃহৎ মস্তক এখন বিস্মৃতিধূসর হয়ে এসেছে আমার মনে; তবে তাঁর বিচিত্র বাচনভঙ্গী এখনো ভুলতে পারিনি। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি সহ পুরো একটি বাক্য কখনও তিনি বলেন না, বাক্যের মাত্র একচতুর্থাংশ বলেই তিনি ক্ষান্ত হন। তবে বেশ সজোরে বলেন; এতই জোরে যে, মনে হয় কামান দাগছেন। সৈন্যবাহিনীকে অর্ডার দিয়ে দিয়েই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মেজর ব্রাউন একজন ভাইসরয়েস্ কমিশনড অফিসার, যোদ্ধা হিসেবে বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন। তবে আচারে ব্যবহারে সেই যোদ্ধৃভাব নেই। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের যাঁরা ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেই অসংখ্য চোয়াড়ে-চরিত্র ব্যক্তির মতোই তাঁর মানসিক গঠন, বৃদ্ধা পরি-চারিকার মতোই সহজাত সংস্কার এবং পুরোনো আমলের রুচিতেই তা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। বেশভূষা ছিমছাম, আচারে ব্যবহারেও শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই। একটিই-মাত্র জিনিসে ইদানীং তাঁর সমস্ত উৎসাহ এসে বাসা বেঁধেছে—সে হলো প্যানসি ফুল। তারই চাষ করে সময় কাটাচ্ছেন এখন। এ জিনিসটির ওপর তাঁর বড়োই মমতা, সে মমতা এতই নিবিড় যে প্যানসির কথা বলতে গিয়ে দুচোখ তাঁর খুশীতে টলমল করে উঠলো। সেই সমুদ্রসুনীল চোখ, কান্দাহারের বিজয়বার্তাতেও যা এতটুকু বিচলিত হয়নি।

"তারপর, মেজর—" চেয়ারের মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসে রুপার্ট গ্র্যাণ্ট বললো, "এবার আপনার সমস্যাটা কী বলুন।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে মেজর বললেন, "হলদে প্যানসি। কয়লা কুঠরি। পি জি নর্টহোভার।"

আমরা শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, কিছুই আমাদের বোধগম্য হলো না। সেই তন্দ্রাচ্ছন্নের মতোই চোখ বুঁজে বসেছিল বেসিল, সে শুধু বললো,

"কি বললেন?"

"এই তো ব্যাপার। রাস্তা, বুঝতেই তো পারছেন। একটা মানুষ, প্যানসি। দেয়ালের ওপর। আমাকে খুন করবে। ব্যাপার গুরুতর। সর্বনাশা কাণ্ড।"

বোকার মতোই আবার মাথা নাড়লাম আমরা। তারপর একটু একটু করে, প্রধানতঃ বেসিলেরই সাহায্যে, উত্তেজিত মেজরের সেই টুকরো টুকরো কথাগুলির অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম। সে এক আশ্চর্য গল্প। তবে তার মর্মোদ্ধার করতে আমাদের যে নিদারুণ বেগ পেতে হয়েছিল, পাঠকদের ওপর আর সে যন্ত্রণা চাপিয়ে দিতে চাই না; আমার নিজের জবানীতেই বরং গল্পটা বলা যাক। পাঠকরা শুধু একবার আমাদের অবস্থাটা কল্পনা করুন। বেসিল সেই তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই বসে আছে, মুদ্রিত-নয়ন। এদিকে রুপার্ট আর আমার চক্ষু ক্রমশই গোলাকার হয়ে উঠছে। সামনে বসে আছেন মেজর ব্রাউন;—কালো পোষাক পরা ছোটখাটো মানুষটি, টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত টুকরো-টুকরো ভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। সেদিন তাঁর মুখ থেকে যে অদ্ভুত কাহিনী আমরা শুনলাম, পৃথিবীর সবচাইতে উদ্ভট গল্পকেও তা অক্লেশে হার মানায়।

(ক্রমশঃ)



চৌবাচ্চা

সুশীল রায়

মায়া হয়। ইচ্ছে হয় না এই টলটল নিটোল আর নিস্তব্ধ জলে ঢেউ জাগিয়ে দিই।

পরিচ্ছন্ন জলে টইটম্বুর হয়ে আছে চৌবাচ্চা। গলা কাচের মত জল। এক মনে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে শুধু। কেবলই মনে হচ্ছে, একটু ছোঁয়া পেলেই বুঝি চমকে উঠবে, ওর মসৃণ শরীরটায় অগণিত টোল পড়ে যাবে।

আস্ত জিনিস এই প্রথম দেখছিনে। এর আগে কত জায়গায় কত রকমের অখণ্ড ও অনাবিল পদার্থ দেখা গেছে; কিন্তু তাদের কারো ওপরেই এমন মায়া পড়ে যায় নি। প্রয়োজনে, এমন কি বিনা প্রয়োজনেও, তাদের খান খান করে ভেঙে দিতে দ্বিধা হয় নি এতটুকু, বিন্দু-বিসর্গ সংকোচও বোধ করি নি; কিন্তু আজ চৌবাচ্চার কিনারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হাতের বালতি হাতেই ঝুলতে লাগল।

যে জলের সীমা নেই, পার নেই, শুরু নেই, শেষ নেই, পৃথিবী-জোড়া সেই জলের তুলনায় এর জল তো সামান্য একটি বিন্দু-মাত্র। শুনেছি, অনেকে সেই মহাসিন্ধুর কিনারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। সে-বিস্ময়ের কারণ হয়তো আছে; কিন্তু এখানে এভাবে আমার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার হেতুটা কি—সেই কথাই ভাবছিলাম।

চারদিকে চারটে প্রাচীর খাড়া ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে এই জলকে। এর বন্দীত্বের জন্যেই মনে কোন করুণার উদয় হল কি না খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, করুণার কণাও কোথাও পাওয়া গেল না—তন্ন তন্ন করে খুঁজেও। খুঁজে যা পাওয়া গেল, তার আগাগোড়া সবটুকুই অকৃত্রিম মায়া।

ছোট একটা চৌবাচ্চার সামান্য এই জল আমাকে এভাবে কাবু করে দিতে পারে, একথা তো আগে স্বপ্নেও ভাবি নি। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা অবশ্য বলেন যে, বড় পাহাড় যাকে বশ করতে না পারে, এমন কঠিন পাষাণও দৈবাৎ নাকি একটা ছোট পাথরের নুড়ির টানে পড়ে যায়। কেন যায়, তার ব্যাখ্যা তাঁরা যদি করে যেতেন, তাহলে নিজের অবস্থাটা তার সঙ্গে পরখ করে দেখে নেওয়া যেত। স্থানবিশেষে সামান্য ছোটরও কদর নাকি বেড়ে যায় অনেক, উদাহরণস্বরূপ নাকি বলা যেতে পারে—ছোট্ট চোখের তারার 'পরে পড়লে ছোট ছানি।

এই চৌবাচ্চার জল তাহলে আমার মনশ্চক্ষের তারার ওপর ছানি হয়েই দেখা দিল কিনা, সেটা ভেবে দেখা দরকার। মায়া জিনিসটা যদি অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হবে, সত্যি, আমি ওর ওই নিস্তরঙ্গ নিটোল আর নিস্তব্ধ জল দেখে অন্ধই হয়ে গেছি। তাইতো অপলক চোখে তাকিয়ে এইভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে একটানা।

ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র-সিঞ্চন নাকি অসম্ভব। কি কারণে অসম্ভব, সে কথা তুলে দরকার নেই। কিন্তু বালতি দিয়ে চৌবাচ্চা সিঞ্চন করা যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পারছি, অথচ তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছিনে কিছুতে। যে কথা আগে বলেছি, এ কি শুধু তাই—কেবলই মায়া! আর যদি মায়াই হয়ে থাকে, তাহলে ওই জলকে তফাতে না রেখে সর্বাঙ্গে মেখে ফেলাই তো সমীচীন। যার ওপর টান এতটা, তাকে কেউ স্বেচ্ছায় এমন দূরে রেখে দেয় না বলেই তো শুনেছি।

নিজের অকারণ এই সংকোচ মনে মনে সমর্থন না করলেও ওর ওই নিশ্চলতাটা ভেঙে দিতে পারছিনে। তাই দুপায়ে সমান জোর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ থেকে। এক-একবার মনে হচ্ছে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই; আজ না হয় ভেঙেই দিই ওকে, কাল আবার নতুন করে গড়ে নেওয়া যাবে। তা হয়তো যাবে, কিন্তু আজ যে মনটাকে নিয়ে এর পাশে এসে দাঁড়ানো গেছে, ঠিক সেই মনটাকে যদি কাল আর হাতের কাছে পাওয়া না যায়। ভরা চৌবাচ্চা আজই তো জীবনে এই প্রথম এল না, কিন্তু এর আগে যখন এমন থমকে দাঁড়াইনি কখনো, তখন আজ না হয় একটু দাঁড়িয়েই রইলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে যখন কোন ক্লেশ হচ্ছেনা, কোন অস্বস্তিবোধ হচ্ছে না, তখন দাঁড়িয়ে থাকাতেই বা ক্ষতি কি!

কোন তাড়া বা কোন তাগাদা যদি না থাকত, সময় নষ্ট হচ্ছে, এই রকমের বোধের হাত থেকে যদি রেহাই পাওয়া যেত পুরো-পুরি, তাহলে আমি হয়তো সারাটা জীবন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম এইভাবে একটানা। সামনে ওই জল—নিটোল আর নিস্তব্ধ, কানায় কানায় ভরা। জলকে জল বলে মানতেই ইচ্ছে করে না আদপে। মনে হচ্ছে, গলিত কাচ দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে আমার এই চৌবাচ্চা। এর চারটে প্রাচীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার ভিতর এবং তার বাহির; তার তল এবং তার উপর। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আর উদার হয়ে অবারিত আগ্রহ নিয়ে সে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এমন আন্তরিকভাবে কোন-দিন কেউ হয়তো দেখেনি তাকে, তাই তার চোখে এই বিস্ময়।

তারই বিস্ময় কি না, তাও ভালভাবে বুঝতে পারছি নে অবশ্য। আমার বিস্মিত চোখের ছায়া গিয়েই তার ওপর পড়ে থাকবে। তার মারফৎ আমি হয়তো-বা আমার বিস্ময়টাই দেখছি তাহলে। আমার চোখের বিস্ময়টা ত তাহলে অমনি স্তব্ধ আর অমনি নিটোল। আমার চোখ দুটোই অমনি কাচ-স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে কি না, কে বলবে।

এতটুকু উচ্চকিত না করে ওকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে হল। ডান হাত থেকে বালতিটা বাঁ হাতে পার করে ডান হাতটাকে মুক্ত করে দাঁড়ালাম। সন্তর্পণে আঙুলটা এগিয়েও নিয়ে গেলাম; কিন্তু পারলাম না কিছুতে, কিছুতে ছুঁতে পারলাম না ওকে। ঠিক মনে হল, ও সজল চোখে তাকিয়ে নীরবে আমাকে যেন নিষেধ করল।

চৌকো চোখ দেখি নি কখনো, তাই হয়তো ওই চোখের ইশারায় চমকে গিয়ে থাকব। কিন্তু এর আকার যেমনই হোক, এর আচরণ অনেকটা সজল চোখেরই মত। ওই চৌবাচ্চার জলের রূপ নিয়ে তাহলে হয়তো আস্ত একটি চোখ এসে দাঁড়িয়েছে আমার চোখের সামনে। আর আমি তাইতেই অভিভূত হয়ে আছি।

চোখের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক নাকি ঘনিষ্ঠ। কবিরা নাকি চোখের দ্বারা অভিভূত হয়েছেন এবং চোখের অনেক গুণ-কীর্তন করেছেন। একটি সামান্য চোখ নিয়ে নাকি বৃহৎ মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নিয়ে তো আমার কাজও নয়, কারবারও নয়। আমি কবি নই, কাব্যও বুঝি নে; ঠিক এই মুহূর্তে এখন আমি সামান্য একজন স্নানার্থী। তাই এই সলিল-তীর্থে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মুখের কথার সলিল-তীর্থে যে সত্যিকারের তীর্থের গরিমা নিয়ে দাঁড়াবে, এতটা ভাবা যায় নি। সত্যিই, আমার মনে হতে লাগল, আমি প্রাত্যহিক নিয়মিত একজন স্নানার্থী যেন নই। আমি এসেছি যেন এক তীর্থের কিনারে, এখানে পুণ্য অর্জন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

চৌবাচ্চা থেকে চোখে, সেখান থেকে সরাসরি এক তীর্থে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু এতটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এক পা আমি এগোতে পারলাম না, আঙুলটা একটু এগিয়ে নিয়ে ওকে ছুঁতে সাহস পেলাম না।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানিনে। এখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা। ছোট এই স্নানের ঘরে সময়কেও তাহলে বন্দী করে ফেলা গিয়েছে। ওই জলকে যেমন চারটি প্রাচীর দিয়ে বাঁধা হয়েছে ওই বাঁধা-জল আমাকে যেমন বেঁধে ফেলেছে, ঠিক সেইভাবেই আমরা বাইরের সময়কে এখানে এনে বেঁধে ফেলে থাকব। আমি স্বয়ংই হয়তো সেই বহমান নদীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি। যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ছুটোছুটি করতে হয়, কে কাকে হারাতে পারে—এই পাল্লা চলে হরদম। কিন্তু তার সম্মুখের ঝাঁকড়া চুল মুঠিতে এঁটে ধরেও তাকে কাবু করা যায় না, তার দৌড় কমানো যায় না। অথচ এখানে আলগোছে সরে এসে সমস্ত শরীরকে আলগা দিয়ে সময়ের সঙ্গে পাল্লা না দিয়েও সেই সময়কে কাবু করা গেল।

আর যে লোকসানই হয়ে থাক না কেন, সময়কে এইভাবে যে বাঁধতে পারা গেছে—এইটুকুই লাভ। জীবনের মহাসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উচ্ছলতার মাঝে মাঝে এমনি এক আধটা চৌবাচ্চা থাকা যে বিশেষ দরকার—এতে আর সন্দেহ কি। এদের পাশে এসে তবু একটু নিশ্চিন্ত নীরবে দাঁড়ানো যায়, বাইরের ঝড় আর সময়ের হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ছোট হোক, বড় হোক, মাঝারি হোক—টল টল জলে তা যেন থাকে ভরপুর।

যে সমুদ্রের কথা বললাম, তার জল বড় গাঢ় নীল, আর বড় লোনা, তার তল দেখা যায় না। সেই অতল অগাধ মহাসিন্ধুতে সাঁতার কেটে যখন হাত-পা অবশ হয়ে আসে, বিস্বাদ জলের আস্ফালনে সর্বাঙ্গ যখন তিক্ত হয়ে যায় তখন যদি চোখের সামনে মেলে ধরে কেউ এমনি একটু স্বচ্ছ চৌবাচ্চা, তাহলে মন পুলকে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারে না। অতলতার রহস্য দিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি কোনো দিন কোনো চৌবাচ্চা করেছে বলে শুনিনি; তার জলের স্বাদ লোনাও তো হয় না।

এ হেন চৌবাচ্চাকে ফেলে মানুষে কেন সমুদ্রের লালসা পোষণ করে, এ রহস্যটা আমার কাছে উদঘাটিত হল না কিছুতে। আমি আজ যে আবিষ্কার করে ধন্য হয়েছি, সকলে তার অংশ-ভাগী হোক—এই আমার ইচ্ছে। তারা সকলে মিলিত হোক চৌবাচ্চাদের চারধারে, স্বচ্ছ চোখে একবার তাকিয়ে দেখুক এর প্রশান্ত আর অতল সৌন্দর্য আছে কিনা।

যা বিরাট আর যা বিশাল, তারাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, এই জন্যেই ছোটখাট চৌবাচ্চারা ছোট ছোট ঘরে বন্দী হয়ে অখ্যাত জীবন যাপন করে চলেছে। তাই বলে এদের বাইরে টেনে আনতে অবশ্য বলিনে; এরা নেপথ্যবাসী, নিভৃতেই এদের সঙ্গে দেখা হওয়া সমীচীন।

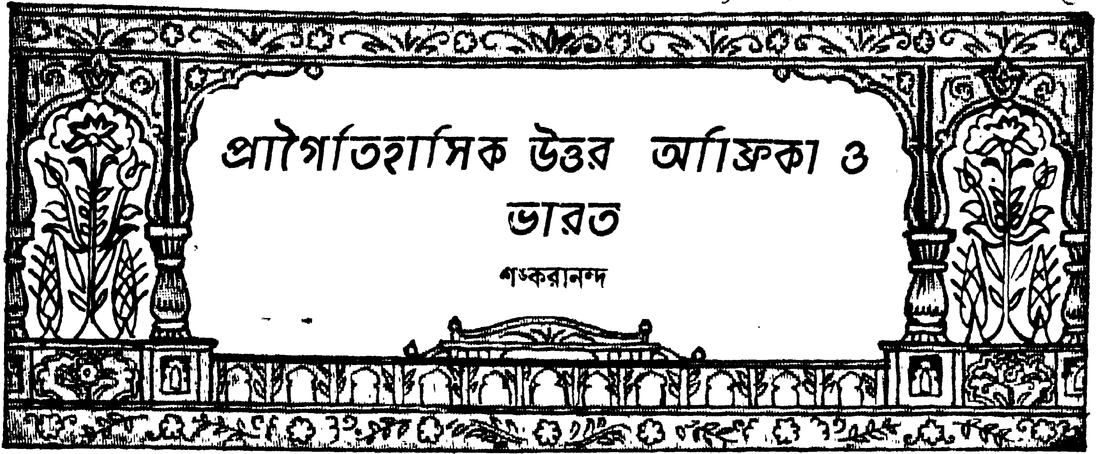
একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ধৈর্য হয়তো ফুরিয়ে এল। সন্তর্পণে একটা আঙুল দিয় স্পর্শ করলাম ওই জল। প্রতিবাদ করে উঠল যেন অমনি; আপত্তির ঢেউ উঠল তার বুকে; হাত দিয়ে ছুঁয়েই ফেললাম তাকে। জল ছলকে পড়ল তার কিনারা উপছে। অপরাধী বলে মনে হল নিজেকে। সরে এলাম এক পা। দেখলাম, সে নিটোল সৌন্দর্য আর নেই; নিষ্ঠুর করাঘাতে তার নিস্তব্ধতা চুরমার করে ভেঙে দিয়েছি।

বাইরে থেকে এক ঝাঁক সময় ঢুকে পড়ল যেন স্নানের ঘরে হুটপাট করে। আর দেরী করা চলে না। তারা এসে তাড়া দিতে লাগল। বাঁ হাতের বালতি ডান হাতে চালান করে এবার সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলাম মাথায়। যা মনে হয়েছিল গলিত কাঁচ, আসলে তা সামান্য জল হয়ে গেল। একেবারে ঘরোয়া, একেবারেই সাধারণ।

কঠিন আঘাতে এমনি অনেক স্বচ্ছ চোখেরও সর্বনাশ হয়তো হয়। জীবনের সঙ্গে এইভাবে মেনে নিতে গেলেও হয়তো স্বপ্নিল সে চোখের জাদু আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা না যাক্। তার জন্যে কোনো অক্ষেপ নেই। কিন্তু প্রত্যহ অন্তত একবারও যেন এমনি সহজ স্বচ্ছ নিটোল আর নিশ্চল চৌবাচ্চার সঙ্গে দেখা হয়, এটা মনে প্রাণে রোজ চাইব। হয়তো রোজ পাওয়া যাবে না, কিন্তু বলেছি তো, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ এই মহাসাগরের মাঝে দম নেবার উপযুক্ত ছোট খাট এক-আধটা ঘাঁটি যে চাই-ই। নিজের দুর্বুদ্ধিতার তাগিদে হয়তো তা ভেঙে খান খান করব রোজই, কিন্তু চাহিদাটা সেইজন্যই বর্জন করব কেন।





প্রাগৈতিহাসিক উত্তর আফ্রিকা ও ভারত

শঙ্করানন্দ

১

গিরিচিত্রে প্রাচীন ইতিহাস.

উত্তর আফ্রিকার পূর্বে মিশর, পশ্চিমে অতলান্তিক সাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে সুদান ও সাহারা মরুভূমি। এই বিরাট ভূখণ্ডে বার্বার নামক একই জাতি বাস করিলেও ইহা তখন লিবিয়া, টিউনিস, ট্রিপোলি, মরক্কো প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। আফ্রিকার এই অঞ্চল সম্বন্ধে ভারতবাসী অতি অল্পই জানেন। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই অঞ্চলের তথ্য অবশ্য-জ্ঞাতব্য বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দিগ্বিজয়ী দলসমূহ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এই অঞ্চলে তাহাদেরই এক দলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের সমাধিক্ষেত্রসমূহ এবং সেই সকল সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক দেবতাদের অঙ্কিত প্রতিমূর্তি এখনও বিদ্যমান থাকিয়া এই প্রাচীন সভ্য জাতির সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেবগণের প্রতিমূর্তি গিরিগাত্রে অতি সযত্নে অঙ্কিত ছিল। তাহা সহস্র বৎসরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবহেলা করিয়া এখনও বর্তমান।

এই গিরিগাত্রে অঙ্কিত চিত্রসমূহ লিবিয়ায় টাসিট মরুদ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিমে এন্‌ফৌস নামক স্থানের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রহিয়াছে। ইহার উত্তর-পশ্চিমে স্কট নামক বিরাট নিম্নভূমি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুপ্রান্তর আর্গ। প্রস্তর ও তাম্র প্রস্তর যুগে। অঙ্কিত এই সকল গিরিচিত্র অধুনা জনশূন্য ও পরিত্যক্ত প্রাচীন লোকালয়ের সন্নিকটে বর্তমান ছিল। ইহা এত প্রাচীনকালের পুরাতন নগরী যে আশে-পাশের মরুদ্যানে যাহারা বাস করে, তাহারা জানে না, এই সকল স্থানে কাহারা বাস করিত। এমনকি, যে সকল প্রাণীর চিত্র রহিয়াছে, তাহারা যে কি জাতীয় প্রাণী, তাহাও তাহারা জানে না। গিরিগাত্র ছাড়াও টাস্‌টানিয়া নামক স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের উপরেও বহু গিরিচিত্র ছিল।

সমাধি ও গিরিচিত্র

অনুসন্ধানের ফলে এই অঞ্চলের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র এবং গিরিচিত্রের ভিতর যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার হইতে দেরি হয় নাই।

এই স্থানে দুই জাতীয় সমাধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। (১) প্রাচীনতম সমাধি-ক্ষেত্রের উপরে শিলাখণ্ডের স্তূপ সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত সমাধি। (২) স্তরে স্তরে সজ্জিত সমাধিসমূহ। এই সকল সমাধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্মিত বাক্সের ন্যায়। বাক্সের ডালাতে প্রাচীন লিপিতে লিখিত পংক্তিসমূহ রহিয়াছে। যে স্থানেই গিরিচিত্র রহিয়াছে, সেই স্থানেই শত শত সমাধি-স্থান থাকায় প্রমাণিত হয়, এই অঞ্চলটি এক সময়ে লোক-কোলাহলে মুখরিত জনপদ ছিল। গিরিচিত্রসমূহ যে শখ বা খেয়ালের বশে অঙ্কিত হয় নাই—ইহা এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসিগণের ধর্ম-বিশ্বাসের একটি অঙ্গ বলিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গিরিচিত্রে অঙ্কিত সিংহ যেন আপন মহিমায় সগর্বে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখস্থিত অগণিত সমাধিতে সুপ্ত নরনারীগণকে রক্ষা করিতেছেন। গিরিগাত্রে অঙ্কিত হস্তীযূথ যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহারাও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই যেন অতি মন্থরগতিতে নম্রভাবে অগ্রসর হইতেছে। সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক এই সকল সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, একশৃঙ্গী হরিণ, উট প্রভৃতি হয়ত এই অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের উপাসিত ধর্মপ্রতীকসমূহ; তাহাদের ঈশ্বরের পার্থিব রূপ। মৃত্যু-রাজ্যেও যাহাতে তাহাদের দেবগণ তাহা-দিগকে রক্ষা করেন, সেই জন্য সমাধিক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়, পরিবার বা কৌমের বিশেষ বিশেষ প্রতীকটি গিরিগাত্রে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাধিসমূহ হইতে প্রস্তর ও তাম্রনির্মিত নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি

---

(১) জার্মান পণ্ডিত লিও ফ্রোবিনাস্‌ (Leo Frobinus) এবং হিউগো ওবারমিয়ার (Hugo Obermier) সম্পাদিত Hadschra Maktuba নামক গিরিচিত্রের গ্রন্থ সহায়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ডি. লিট্‌ মহাশয় আমাকে এই চিত্রের গ্রন্থখানি দেখিতে দেন। ইহাতে ভারতীয় স্বস্তিকা এবং সিন্ধুনগরীর একশৃঙ্গীর (unicorn) চিত্র দেখিয়া আমার কৌতুহল বৃদ্ধি পায়। পরে স্বর্গীয় কান্তিচরণ ঘোষের স্ত্রী শ্রীযুক্তা এটা ঘোষ এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি জার্মান ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া দিলে, উত্তর আফ্রিকা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত হিরোডোটাসের 'লিবিয়া ওলিবিয়ান' এবং Encyclopaedea Britanica হইতে বার্বার জাতি সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতেও এই প্রবন্ধের মালমশলা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে অনুমান হয়, ইহারা তাম্র ব্যবহার করিতে জানিত।

চিত্রাংকনের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য

এই স্থানে দুই প্রকার চিত্রাংকন পদ্ধতি লক্ষিত হয়। (১) হাতুড়ি ও বাটালির সাহায্যে খোদিয়া চিত্র প্রস্তুত করা; (২) আর রং-তুলির সাহায্যে চিত্রাংকণ করা।

(১) প্রথমে প্রস্তরের উপর খড়িমাটি দিয়া চিত্র অংকিত হইলে চিত্রের লাইন ধরিয়া সূচ্যগ্র মুখ বাটালি দিয়া হাতুড়ির ঘায়ে বিন্দুশ্রেণী প্রস্তুত করা হয়। পরে সেই বিন্দুশ্রেণী অন্য প্রকার বাটালির সাহায্যে একটি গভীর রেখাতে পরিণত করা হইত। পরে সমস্ত ক্ষেত্রটি ঘষিয়া মসৃণ করা হইলে জমিটি তুলির সাহায্যে অতি সুন্দর রং করা হইত। অবশ্য চিত্রটির রং ও জমির রঙে পার্থক্য থাকিত।

(২) রং-তুলির সাহায্যে যে সকল চিত্র অংকিত হইয়াছে, তাহা অংকিত হইবার পূর্বে প্রস্তরকে অতি ভালভাবে মসৃণ করা হইত। অতি উচ্চ এবং দুর্গম স্থানেই তুলির সাহায্যে চিত্রাংকিত হইত। সাধারণত 'গিরি' রংই বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল দুর্গম এবং ঝুলিয়া-পড়া উচ্চ পর্বতগাত্রে চিত্র অংকিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, চিত্রাংকণ একটি বৃত্তি ছিল। ইহা সকলের কাজ ছিল না। একদল লোক শুধুই এই কাজ নিয়া থাকিত। তাহা না হইলে এত অবসর সকলের কি করিয়া হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

চিত্রের অংকনপ্রণালী অত্যন্ত নিপুণতার নিদর্শন। যে স্থানে একসংগে বহু প্রাণীর চিত্র অংকিত হইয়াছে, সেই স্থানেও কোনও-প্রকার অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে নাই। এই সকল চিত্রকরগণ অত্যন্ত দক্ষ কারিগর ছিলেন। এই বিদ্যা যে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বহু যুগ ধরিয়া শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। শিল্পিগণ সম্মুখ দিক কিংবা পার্শ্বদিক প্রদর্শন করিয়া উভয় প্রকারেই চিত্র অংকিত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গিরিচিত্রশিল্পে যে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন-ব্যতিরিক্ত লৌকিক প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে। মনে হয়, আদি সমাজের যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবধারা ছিল, তাহা বহুকাল ধরিয়া চলিতে চলিতে নিজের খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং যে গিরিচিত্র শুধু ধর্মের প্রতীকসমূহ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পরে লৌকিক চিত্রের সমাবেশে আর নিজেদের প্রাচীন গাম্ভীর্য ও মহিমা রক্ষা করিতে পারে নাই। এই যুগের চিত্রে দেখিতে পাই, হস্তিনী চিতাবাঘের কবল হইতে নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতেছে। চিতাবাঘ হরিণ দলকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে। একটি লোক উট-পাখি শিকার করিতেছে, আর তাহার স্ত্রী গাভীর নিকট দাঁড়াইয়া শিকার দেখিতেছে। এই যুগের চিত্রেই মানুষ, ঢাল, বুমেরং ধনু প্রভৃতি চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই যুগের চিত্রও অতি উচ্চদরের; শুধু কল্পনা হইতে আধ্যাত্মিক ভাবটি তিরোহিত হইয়াছে মাত্র!

ইহারও পরের অবস্থা আছে। ইহা অবনত বা শেষ যুগের শিল্পকলা। এই যুগের চিত্র অতি ক্ষুদ্র জাতীয়। সমষ্টি অংকনপদ্ধতি ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে। রেখা দ্বারা আবদ্ধ শূন্য স্থানকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, তাহা ইহারা জানে না। কাজেই শূন্য স্থানকে বৃত্ত, স্বস্তিকা, লিপি প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা! এই যুগের চিত্রেই প্রথম গরুরগাড়ি ও চক্রযানের চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। অধিবাসিগণ যে গম্বুজ প্রস্তুত করা জানিত, তাহাও এই যুগের চিত্রকলা হইতে জানিতে পারা যায়।

চিত্রাংকনপদ্ধতির বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কিভাবে একটি প্রাচীন সভ্যতা ধীরে ধীরে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং কিভাবেই বা অবনতি বা মৃত্যু আসিয়া অলক্ষিতে তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া গিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গিরিচিত্রসমূহ সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসের মূক সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহা নূতন নহে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংস দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু ধ্বংস যে অনিবার্য প্রাকৃতিক কারণেই উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের মনে থাকে না। সভ্যতার স্রোত চলিতে চলিতে পঙ্কিল হইয়া নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনে। মৃত্যুই তখন তাহার গৌরব। যাহা কিছু গৌরবের, তাহা সমস্ত হারাইয়া যখন একটি সভ্যতা জীবনধারণ মাত্র করিতে থাকে, তখন মৃত্যুই তো তাহাকে সকল অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে। যখন আমরা সিন্ধু সভ্যতার বা প্রাচীন মিশর, মেক্সিকো, থুসোর, এশিরীয়, গ্রীস, রোম প্রভৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করি সকল স্থানে এই একই ইতিহাসের পুনরাবর্তন, ক্রমবিকাশ, উন্নতি ও পতন। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা সকল একবার পড়িয়া আর উঠিতে সমর্থ হয় নাই ভারতেই শুধু বার বার উত্থানের পর পতন এবং পতনের পর উত্থান হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ এমনই শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত যে সহস্র সহস্র বর্ষের সহস্র সহস্র আঘাতেও তাহা অক্ষত রহিয়াছে। আঘাতের ফলে হর্মের কিছুই হয় নাই, শুধু চূণবালি খসিয়াছে মাত্র।

সমাধিক্ষেত্রের সহিত ধর্মসাধনের সম্বন্ধ

প্রাচীন অধিবাসিগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা পূর্বপুরুষের আচরিত রীতিনীতি ভুলে নাই। তাহারা অতি সংগোপনে তাহাদের প্রাচীন আচরণ পালন করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে তাহারা গিরিচিত্রের সম্মুখে এবং সমাধিক্ষেত্রের নিকটে মেষ বলি দিয়া তাহাদের প্রাচীন দেবগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকে। বস্তুত যে স্থানেই গিরিচিত্র আছে, সেইস্থানেই বার্বারিগণ এই জাতীয় প্রাচীন উৎসব প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহারা কাহার উদ্দেশ্যে ইহা করে তাহা জানে না, তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু পিতৃপুরুষ আচরিত প্রথাকে প্রাণপণে রক্ষা করিতেছে। তাহাদের যে লোক-কাব্য আছে, তাহার সংগ্রহ হইতে দেখা যায় যে, জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের ভিতর প্রচলিত ধারণা এখনও অব্যাহতভাবে তাহাদের ভিতর রহিয়াছে। প্রাচীন রীতিনীতির বহু অংশ যেন তাহাদের স্বভাবেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

বার্বারগণ এখনও পুণ্য মেষের আদেশ মানিয়া চলে। গিরিগাত্রে যে সকল মেষের প্রতিকৃতি আছে, তাহার মাথায় একটি গোলাকার চক্র এবং তাহার সম্মুখে একটি লোক বসিয়া উপাসনা করিতেছে এইভাবে তাহা অংকিত।

সিংহ বা মেষ মিশরে পুণ্য প্রতীকরূপে উপাসিত হইত। সুতরাং ইহাদের উপাসনা প্রণালী মিশর হইতে আমদানী হইতে পারে। হিরোডোটাসের মতে লিবিয়ান-গণের সহিত মিশরের সম্বন্ধ ছিল। মিশরের

মেষ দেবতার মাথায়ও গোলাকার চাক্‌তি। মনে হয় ইহা সূর্যের প্রতীক বোধক।

একশৃঙ্গী বা Unicorn ভারতীয় প্রতীক(১)। ইহা ভারতীয় তাম্র-প্রস্তর-যুগের সভ্যতায় ব্যবহৃত প্রতীক। বিষ্ণুর এক নাম একশৃঙ্গী। সুতরাং মনে হয় এই প্রতীকটি ভারত হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষের বাহিরে একশৃঙ্গীর এত অধিক চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। একটি মাত্র একশৃঙ্গী গলদেশীয়(২) মুদ্রাতে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত লিবিয়াতে ইহা ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতে আবিষ্কৃত একশৃঙ্গীর মূর্তি অনেক সময় মাদুলীর আকারে ব্যবহৃত হইত। মাদুলী প্রস্তুত করিবার সময় নানাবর্ণের প্রস্তর দিয়া ইহাকে সুন্দর করা হইত। সেইজন্য



(১) মহেঞ্জোডারোর একশৃঙ্গী

একশৃঙ্গীর মূর্তির মাঝে মাঝে ছিদ্র করিয়া রাখা হইত, তাহাতে পরে ধারণকারীর ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তর অথবা স্বর্ণরৌপ্যাদি পূরণ করিয়া দেওয়া হইত(৩)। উত্তর আফ্রিকার গিরিগাত্রে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে পূর্বোক্ত মাদুলীরূপে ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত ছিদ্রবান ইউনিকর্নের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে ৪। মাদুলীর ভিতরে সোন-রূপা বা মূল্যবান প্রস্তর বসাইবার জন্য যে সকল ছিদ্র করা হইত, গিরিগাত্রে অঙ্কিত একশৃঙ্গীর শরীরে বর্ণবিন্যাসের দ্বারা সেই সকল ছিদ্র প্রদর্শনের কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং মনে হয় উপরোক্ত মাদুলীতে অঙ্কিত একশৃঙ্গীর চিত্র সম্মুখে রাখিয়াই ৪ (ক, খ, গ,) চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা মহেঞ্জোডারোতে প্রাপ্ত মাদুলীর চিত্রে খোদিত ইউনিকর্নের অনুরূপ। সুতরাং



(২) গল (ফ্রান্স) দেশীয় মুদ্রার একশৃঙ্গী

ইহা যে ভারত হইতে লিবিয়াতে নীত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হয়।* মনে হয় যে সকল ভারতীয় বণিক একশৃঙ্গীরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন, তাঁহারাই তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের মৃতাত্মার সদ্গতির জন্য তাঁহাদিগের দেহ একশৃঙ্গীরূপধারী বিষ্ণুর প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রোথিত করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান বিষ্ণু যেন পরলোকে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। লিবিয়ার গিরিগাত্রে ভারতীয় ধর্ম-প্রতীকের সন্ধান পাওয়াতে মনে হয় এক সময়ে এই অঞ্চলে ভারতীয়গণের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রাগৈতিহাসিক উত্তর আফ্রিকার যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা পরবর্তীকালে কিভাবে বিবর্তিত হইয়াছিল, সেই সংবাদ হিরোডোটাস কিছু কিছু তাহার ইতিহাসে রক্ষা করিয়াছেন এবং আধুনিক লিবিয়াবাসী যে প্রাচীন সংস্কৃতির বহুল অংশ রক্ষা



(৩) মহেঞ্জোডারোর কবচের একশৃঙ্গী

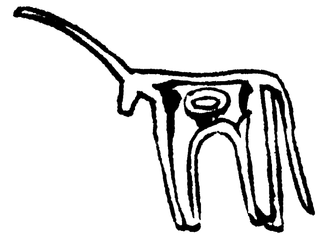
* প্রবন্ধের ইউনিকর্নের ১, ৩, ৪, সংখ্যক চিত্রগুলি ডাঃ শ্রীনন্দলাল বসু ডি, লিট্ মহাশয় কর্তৃক অঙ্কিত। ২নং ইউনিকর্নের চিত্রটি শিল্পী শ্রীযুক্ত বরেন নিয়োগী কর্তৃক অঙ্কিত।

করিতেছেন তাহার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে লিবিয়া বা উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীও সংস্কৃতির ধারা নানা ঝড়-ঝঞ্চার ভিতর দিয়াও অব্যাহত রহিয়াছে তাহা হিরোডোটাসের কাহিনী ও আধুনিক লিবিয়াবাসীর ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়।

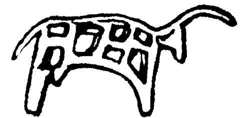
২

ঐতিহাসিক যুগ ও হিরোডোটাসের কাহিনী

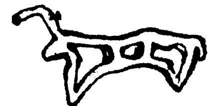
মিশরের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল লিবিয়া কৌম বাস করিত



লিবিয়ার একশৃঙ্গী (৪ক)



লিবিয়ার একশৃঙ্গী (৪খ)



লিবিয়ার একশৃঙ্গী (৪গ)

হিরোডোটাস একটি একটি করিয়া পর পর তাহাদের নাম করিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও দিয়াছেন। হিরোডোটাসের আবির্ভাব কাল ৪৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঐ সময়ে লিবিয়াতে, লিবিয়ার আদিম অধিবাসী, ফিনিসীয় এবং গ্রীকগণ বাস করিত। ফিনিসীয়গণের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কার্থেজে ছিল। তাহারা ঐ অঞ্চলে অনুমান খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশের নাম ছিল কার্থডিসা (কার্থেজ)। ইহারা নিজেদিগকে পণি (Peoni) বলিত। রোমানগণ তাহাদিগকে বলিত পিউনিক (Punic)। সমগ্র উত্তর উপকূলে তাহাদের অসংখ্য উপনিবেশ ছিল, এই সকল উপনিবেশের সাহায্যে

তাহারা উত্তর আফ্রিকার অধিবাসিগণের সহিত বাণিজ্য করিত। অজ্ঞাতভাষা দুই জাতি কি করিয়া দ্রব্য বিনিময় করিত তাহার এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ হিরোডোটাস দিয়াছেন। তিনি বলেনঃ "কার্থেজীয়গণ বলে হারকিউলিসের পিলারের বাহিরে তাহারা যখন বাণিজ্য করিতে যায়, তখন জাহাজ তীরে লাগিবামাত্র, তাহারা সকল দ্রব্যাদি তাড়াতাড়ি করিয়া তীরে নামাইয়া দেয়। দ্রব্যগুলি বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া রাখে, তারপর এক মস্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নৌকাতে আসিয়া বসিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণ ধূম দেখিয়া বুঝিতে পারে ব্যাপারীরা আসিয়াছে। তখন তাহারা দলে দলে আসিয়া বিক্রয়ের জিনিসগুলি দেখিতে থাকে। পরে যে জিনিস তাহারা কিনিবে তাহার একটি আনুমানিক স্বর্ণ-মূল্য রাখিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। তখন কার্থেজীয়রা নামিয়া আসে, যদি দেখে তাহাদের ন্যায্য দাম হইয়াছে, তাহা হইলে সওদা রাখিয়া স্বর্ণ লইয়া চলিয়া আসে এবং অধিবাসিগণ সেই সকল মাল লইয়া যায়। যদি মূল্য কম হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে হয় তাহা হইলে তাহারা সেই দাম ফেলিয়া রাখিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসে। তখন অধিবাসিগণ আবার আসিয়া আরও কিছু সোনা দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। এইভাবে যতক্ষণ না দরে বনিতেছে ততক্ষণ দর কসাকসি ও যাতায়াত চলিতে থাকে।"

এইভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লোককে সংবাদ দেওয়া বৈদিক যুগে ভারতে প্রচলিত ছিল। সেইজন্য অগ্নিকে দেবতার দূত বলা হইত। বর্তমান যুগে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত আছে।

লিবিয়ায় তিন শত নগর কার্থেজের অধীনে ছিল এবং তাহারা রীতিমত কর যোগাইত। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে কার্থেজের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তাহাদের অজেয় নৌবহরই তাহাদের শক্তির মূলভিত্তি ছিল। বাণিজ্যপ্রধান কার্থেজ নগরী সেই সময় সমগ্র উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র ছিল। ইহার পরিধি বিংশতি মাইলেরও অধিক ছিল।

ফিনিসীয়গণের মাতৃভূমি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিরোডোটাসের মতে ইহাদের আবাস ইরিথিয়া বা ভারত মহাসাগরের কোনও অঞ্চলে ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন পারস্য উপসাগরের উপকূলে ইহারা বাস করিত। একদল ভারতীয় পণ্ডিতের মতে ইহারা বৈদেশিক পণিগণের বংশধর! কার্থেজীয়গণের 'পণি' (Peoni) নাম হইতে শেষোক্ত মতের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন লিবিয়গণের ন্যায় ফিনিসীয় কার্থেজবাসিগণকে ভারতীয় বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়।

হিরোডোটাসের মতে মিশরের পশ্চিম সীমা হইতে যে লিবীয় কৌম বাস করিত তাহাদের নাম ছিল **আদ্যরমাচাই (আদ্যঃ মাচি)**। ইহাদের রাজ্য পশ্চিমে প্লিনাস বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইহাদের পরে যাহারা বাস করিত তাহাদের নাম জিনিগামি। তাহার পর আমাধিষ্টি, ঔশিচজ, নাসামন, সাইলি প্রভৃতি যথাক্রমে বাস করিত। সাইলি জনপদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, মরুভূমির বালি ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া তাহাদের জলাশয় শুকাইয়া তোলে। তাহারা এই বিপদের মূল কারণ দক্ষিণ বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বালুকা চাপা পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিরোডোটাসের এই কাহিনীর ভিতর এইটুকু সত্য আছে যে, লিবিয়ার বহু অঞ্চল সত্য সত্যই সাহারার বালুকা রাশির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জল শূন্য হইয়া গিয়াছে। ফলে ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণ স্থায়ী বাসিন্দা হইতে বেদুইনে পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নাসামনিয়গণের দক্ষিণে—দূরে, আরণ্য-জন্তু সমাকুল অঞ্চলে 'জরামন্তগণ' বাস করে। তাহারা সর্বপ্রকার লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া চলে। ইহারা কাহারও সহিত মিলামিশা করে না। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র নাই এবং কি করিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে হয় তাহাও জানে না।

এই জরামন্তগণ কাহারা? জরা শব্দ বার্ধক্যজ্ঞাপক। ইহারা বানপ্রস্থী নহে তো? আলেকজেন্দ্রিয়ার নিকটে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে একদল বানপ্রস্থীর অস্তিত্বের কথা ফাইলো উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উত্তর আফ্রিকায় থাকা অসম্ভব নহে।

নাসামনিগনের পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূল ভাগ জুড়িয়া 'মছি' নামক কৌম বাস করে। সিন্ধু উপত্যকায় 'মছি' কৌমের শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। 'মছি' কৌমের পশ্চিমে গিন্দানীগণ বাস করে। তাহাদের পশ্চিমে লটফাজী, লটফাজীর পশ্চিমে 'মছলি' কৌম বাস করে। মছলি কৌমের পশ্চিমে 'আউসি' কৌম বাস করে। দক্ষিণ-দিকে লবণ পাহাড়ের অভ্যন্তরে বহু কৌমের বাস, তাহাদের মধ্যে 'গ্রামন্থি' অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত। তাহারা চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করে এবং তাহারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ইহাদের দক্ষিণে আতরন্তিগণ রহিয়াছে। হিরোডোটাস লিবিয়ায় এই সকল কৌমের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে হিরোডোটাসের সংবাদ বালসুলভ।

এতদ্ব্যতীত যাহাদের নামে এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে, সেই লিবু কৌম এবং তাহাদের সহিত মাশুয়াসা, তামাহু, তেহেনু প্রভৃতি কৌমের নাম মিশরীয়গণের নিকট হইতে জানিতে পারা যায়। 'লিবু' কৌম মহেঞ্জোদড়োর লব কিংবা আবু কৌমের সামান্য পরিবর্তিত নাম হইতে পারে।

সুতরাং হিরোডোটাসের বিবরণী হইতে দেখা যায়, শুধু প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জযুগে নহে, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতেও যে সকল কৌম ঐ অঞ্চলে বাস করিত তাহাদের কোনও কোনটির সহিত যে ভারতীয় প্রাচীনতম কৌমসমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল তাহা লক্ষিত হয়। বিশেষত কার্থেজবাসী পণি যে বৈদিক বৈশ্য এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী পণি হইতেই উদ্ভূত তাহার অনুমানের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বিশেষত হিরোডোটাস যে ইরিথ্রিয় সাগরের তীর হইতে ফিনিসীয়গণ গমন করিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। কারণ ইরিথ্রিয়সাগর, ভারত মহাসাগরেরই গ্রীক নাম।

৩

আধুনিক লিবিয়গণ (বার্বার)

প্রাচীনকালে উত্তর আফ্রিকার এই অঞ্চলটি প্রবল সাম্রাজ্যসমূহের সংঘর্ষ ও উত্থান-পতনের সহিত জড়িত হইয়াছে। কার্থেজ প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছিল। সদ্যোজাগ্রত রোমের সহিত তাহার যে সংঘর্ষ হয় তাহার ফলে কার্থেজ ধ্বংস হইয়া যায়।

কার্থেজের পতনের পর উত্তর আফ্রিকা রোমের অধীনে যায়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর তাহা প্রথমে আরবদের পরে তুর্কীদের হাতে গিয়াছিল। ইহা এখন ইউরোপীয় শক্তিগণের প্রভাবের অধীন। বিভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন জাতি নিচয়ের অধীনে বহুকাল ধরিয়া থাকিলেও এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসিগণ নিজেদের সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেকগুলি রক্ষা করিয়াছেন।

আধুনিক বার্বারগণ

নাম—অনেকে মনে করেন বার্বার নামটি গ্রীক Barboroi শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। বর্বর, বর্বরতা প্রভৃতি 'গণের' নাম মিশরীয় শিলালেখে পাওয়া যায়। (১৭০০-১৩০০ বি সি)। কিন্তু সাধারণভাবে মিশরীয়গণ এই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে লিবু, মশুয়াসা, তামাহু, তাহেনু এবং কাহাকা নামে অভিহিত করিত।

সিন্ধু লিপিতে লেখা শীলমোহর হইতে আবু, লব প্রভৃতি নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবু, লিবুতে যেমন পরিবর্তিত হইতে পারে, তেমনি লব শব্দও লিবু শব্দে রূপান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং অনুমান হয় আধুনিক বার্বারগণের সহিত প্রাচীন সৈন্ধব সভ্যতার যোগ ছিল।

জাতি—ইহারা কাফ্রী বা ইহুদী জাতীয় নহে। ইহারা শ্বেতকায় জাতীয় লোক। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী, ইহাদের কাল চুল, হেজেল বর্ণের চক্ষু। আরবদের অধীনে বহু শতাব্দী একই ধর্ম আচরণ করিয়া বাস করিলেও দুই জাতি মিশ্রিত হইতে পারে নাই।

স্বভাব—বার্বারগণ ধার্মিক, স্পষ্টভাষী, ধন উপার্জনে অত্যন্ত তৎপর হইলেও অন্যায় উপায়ে ধন আহরণ করিতে সচেষ্ট নহে এবং বিশ্বাসী। ইহাই প্রাচীন ভারতীয়গণের স্বভাব ছিল। এই স্বভাব ভারতের বাহিরে কোথাও ছিল না। এই বিশ্বস্ততার জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ভারতীয়রাই ছিল।

শাসন প্রণালী—বার্বার গ্রামগুলিই এক একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। গ্রামের ধনী দরিদ্রনির্বিশেষে এই স্থানে সকলেরই সমান অধিকার। ইহাদের তিন চারিটি গ্রাম্য রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটি 'অর্ষ' হয়। এই জাতীয় "গণ" এবং গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী ভারতে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, লিচ্ছবি, শাক্য প্রভৃতি 'গণের' নাম বিখ্যাত। 'অর্ষ' শব্দটি অর্থপূর্ণ। সংস্কৃতে "অর্য" আর "অর্ষ" একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ বৈশ্য বা কৃষিজীবী। অর্ষ শব্দের ব্যবহার হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের ভিতরে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে।

বার্বার বালক—ষোল বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বার্বার বালককে জামায়াতে আনিয়া প্রাপ্তবয়স্কগণের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাহাকে তখন অস্ত্র দেওয়া হয়। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহা সে ব্যবহার করিতে পায়।

মারাবুত বা ব্রাহ্মণ—প্রাক ইস্লামীয় সমাজে যাহারা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারাই যে মারাবুতগণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। অস্ত্রধারণ বার্বারগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইলেও মারাবুতগণ অস্ত্রধারণ হইতে রেহাই পান। অনেকগুলি কর তাঁহাদের উপর ধার্য হয় না। তাহারা প্রায় সর্বদাই বিবাদে মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করেন। "গণ" বা কৌমের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। অনেক সময় তাঁহারা জামায়া বা সাধারণ সভার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই বিবেচিত হন।

ভারতে ব্রাহ্মণগণের উপর কোনও কর ধর হইত না। তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য ছিলেন না এবং নিঃস্ব হইলেও সমাজের উপর তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এবং অনেক সময় তাঁহারা রাজশাসনকে সংযত করিবারও ক্ষমতা রাখিতেন। সুতরাং মনে হয় মারাবুতগণ ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

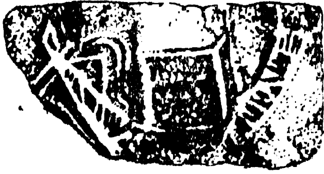
বার্বার নারী—মুসলমান হইলেও বার্বার সমাজের নারী তাহার আরব ভগিনী হইতে বহুগুণে অধিক সম্পদের অধিকারিণী। বালকের জন্ম যেমন আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি করে তাহার জন্ম সেইরূপ না করিলেও তিনি সমাজে বালকের চেয়ে কিছুতেই কম নহেন। অবশ্য পুত্রবতী বার্বার নারী কপালের উপরে তাফাজিন্ নামক যে গহনা পরিতে পান কন্যাবতী বার্বার নারী তাহা পান না।

বার্বার নারী সামাজিক পরামর্শে যোগদান করিতে পারেন এবং যুক্তিযুক্ত হইলে তাঁহার কথাতেও বহু অমীমাংসিত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সামাজিক আইন আছে। তিনি অবগুণ্ঠন মুক্ত। তিনি যে অর্থ উপার্জন করেন তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। উইলের দ্বারা যে সম্পত্তি তিনি পান তাহারও তিনি মালিক। তিনি ধর্মসাক্ষী করিয়া যে



কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং সেই চুক্তি দ্বারা তাঁহার পরিবার আবদ্ধ থাকিবে। যদি জীবদ্দশায় তিনি তাহার চুক্তিমত কাজ করিতে না পারেন তবে সেই চুক্তিমত কাজ করিবার জন্য তাঁহার পরবর্তীরা দায়ী থাকেন।

বার্বার নারীগণ ধর্মগুরু হইতে পারেন এবং তাঁহারা সমাজে অত্যন্ত উচ্চাসন লাভ করিয়া থাকেন। 'সাহিয়া কর্তা' নামক ধর্ম সম্প্রদায়ের নায়িকা ছিলেন একজন মহিলা। তিনি ঐ অঞ্চলের সর্দারের পত্নী। নারীই বার্বার সমাজে প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। কারণ জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্রই সম্পত্তির মালিক, পুত্রের পুত্র নহে। বার্বার নারীর সম্পত্তির অধিকার কতকটা বাঙলা দেশের দায় ভাগের দ্বারা নারীর



মহেঞ্জোডারোর সমুদ্রগামী নৌকা

অধিকারের মত। উত্তরাধিকার ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের মত। ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশে ভাগিনেয়ই রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন পুত্র নহে। ধর্মে নারীদের আচার্য পদবী লাভ একমাত্র ভারতীয় প্রথা। বৈদিক যুগ হইতেই এই বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা আরও বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তান্ত্রিক সমাজে নারী গুরু পুরুষ গুরুর সমান ক্ষমতাসম্পন্না। সুতরাং বার্বার নারী-গণের যে সকল অধিকারের কথা বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই ভারতীয় প্রথা।

কৃষি শিল্প বাণিজ্য—বার্বারগণ অত্যন্ত ভাল কৃষক। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যে সকল অতি জটিল সেচের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সহস্র বৎসর পরেও ঠিক পূর্বের ন্যায় কার্যকরী হইয়া আছে। তাঁহাদের বেশীর ভাগ জমি তখন পাদ্রিরা ভাগে চাষ করাতে, প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার দিকে তাঁহদের নজর নাই। সুতরাং প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বার্বারগণ খনি হইতে তাম্র প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন করিয়া থাকেন। তাঁহারা এখনও তাহা করেন। তাঁহারা সীসক, তাম্র ও লৌহ হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া থাকেন।

বার্বার সমাজে প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনও এক একটি ব্যবসা এক একটি জাতিগত। যেমন বস্ত্র বয়ন, মৃণ্ময় দ্রব্য, লোহার বা কামারের কাজ। বেনি আব্বাস নামক জাতি শুধু আগ্নেয়াস্ত্র, কামান বন্দুকাদিই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাও ভারতীয় প্রথা।

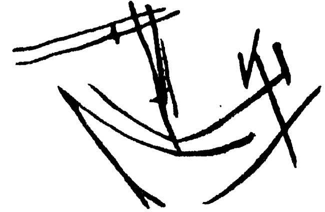
বার্বারগণ অতি পরিশ্রমী বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ফসল তুলিয়া তাঁহারা গ্রামে গ্রামে নানাবিধ দ্রব্য ফেরি করিয়া বেড়ান। বার্বার-গণের এই স্বভাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা এককালে বণিক ছিলেন এবং নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

প্রাচীন লিবিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক পদার্থসমূহ এবং আধুনিক বার্বারগণের জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে একদল ভারতীয় বণিক বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। বর্তমান। বার্বারগণ তাহাদেরই বংশধর। এই বার্বার জাতি সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত, কারণ বার্বার লিপিতেও সিন্ধুলিপির প্রভাব লক্ষিত হয়। বার্বার লিপিতে সিন্ধু-লিপিরই ন্যায় মাত্রিকার ব্যবহার হইয়াছে।

বার্বার শব্দটি গ্রীক Barboroi শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইলেও আসলে ইহা ভারতীয় শব্দ। ইহা 'বাহির' শব্দের অপর রূপ। বাঙলা দেশে গ্রাম অঞ্চলে 'বাহির বাড়ী' না বলিয়া বারবাড়ি' বলা হইয়া থাকে। 'বার-বাড়ি'র লোক অর্থাৎ ঘরের লোক নহে। গ্রীক বার্বারই শব্দ দ্বারা গ্রীক ভিন্ন অন্য জাতি বুঝাইয়া থাকে। গ্রীক বার্বারই, হিব্রু পেগান আরবীয় কাফে ও সংস্কৃত অনার্য শব্দ দ্বারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য সকল জাতি অর্থাৎ বিদেশীকে বুঝাইয়া থাকে।

ভারতের বর্তমান পতিত অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে, এত প্রাচীনকালে ভারতের পক্ষে উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা। মহেঞ্জোডারোর শীল-মোহরে যে সকল সমুদ্রগামী নৌকার চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় ভারতবাসী সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন ভারতীয় সংস্কৃতি। মহেঞ্জোডারোর নৌকার যে চিত্র দুইখানি দেওয়া হইল তাহার একখানি সমুদ্রগামী ও অপরখানি নদীতে চলাচল করিবার নৌকা।

বর্তমানে যে স্থানে সুয়েজ খাল আছে, প্রাচীনকালে ঐ স্থানে অনেকগুলি লবণাক্ত



মহেঞ্জোডারোর দেশী নৌকা

জলা ছিল। সেই সকল জলা লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধন করিয়া-ছিল। এই পথেই ভারতীয় বণিক প্রাগৈতি-হাসিক যুগে ভূমধ্যসাগরের তীরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। পরে যখন মরুভূমির বালুকারাশি এই সকল জলাকে ভরাট করিয়া ফেলিল তখন মিশরের ফারোয়া, ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিবার জন্য বহু ব্যয়ে নীল নদী হইতে খাল কাটিয়া লোহিত সাগরের সহিত নীল নদীর সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। এই পথেই ভারতীয় বণিক পণি ও লব প্রভৃতি ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে গিয়া স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

নৌকার চিত্র দুইটি চিত্রশিল্পী শ্রীযুত বরেন নিয়োগী অঙ্কিত)



স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩৫

১৯১৩ সালের ২রা জানুয়ারী আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। চকিত-উৎসুক হৃদয়ে, কতকটা বিষণ্ণ-গভীর মনে, পঠদ্দশাকে শেষ বিদায়-অভিবাদন জ্ঞাপন করে সেদিন তথাকথিত কর্মজীবনের, অর্থাৎ ভাগলপুরের আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ের, সূত্রপাত করেছিলাম।

যাঁরা আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব,—আমার জীবনের গতিকে লক্ষ্য করবার যাঁদের সুযোগ-সুবিধা কিছু ছিল, তাঁদের মতে শনির দশায় অতিবাহিত হয়েছিল আমার পঠদ্দশা। জ্যোতিষ-গগনের শনি না হলেও ভাগ্য-গগনের কোনো এক শনি যে, সে সময়ে আমার প্রতি, শুধু খর নয়, প্রখর দৃষ্টি বর্ষণ ক'রে চলেছিল, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, সে শনি আমার অনিষ্ট-সাধনই শুধু করেনি, অনিষ্ট-সাধনের আশে-পাশে উপকার-সাধনও কিছু কিছু করেছিল। আমার জীবনের তটভূমি হতে সে হয়ত শীতল সরস জলধারাকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছিল বিস্তৃত বালুকা-প্রান্তর, যেখানে আম-কাঁঠালের ফসলের কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও তরমুজ-খরমুজের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল। এই রূপকের তরমুজ-খরমুজ আমার বাস্তব জীবনের কোন্ পদার্থ, তা নির্ণয় করবার জন্য গবেষণাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে স্মৃতিকথা তত্ত্ব-কথায় পরিণত হবে। সুতরাং আপাতত সে কথা স্থগিত রেখে স্থূল ঘটনাত্মক প্রসঙ্গের কথাই বলি।

গান ধরবার পূর্বে গায়কেরা যেমন ক্ষণকাল তানানানা করে সুর ভাঁজে, আইন পাশ করবার পর আমিও কিছুদিন সেইরকম তানানানা, অর্থাৎ 'এনা-ওনা-তানা' করে কাটালাম। কলিকাতায় ওকালতি করব, অথবা ভাগলপুরে,—সেই প্রশ্ন নিয়ে তানানানা। কলিকাতায় দাদা হাইকোর্টে ওকালতি করেন; তা ছাড়া, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও দু-চারজন উকিল-অ্যাটর্ণির অভাব নেই; সুতরাং কলিকাতায় ওকালতি করবার সপক্ষে খানিকটা যুক্তি ছিল। পক্ষান্তরে, ভাগলপুরে আমার সেজদাদা নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ওকালতি ব্যবসায়ে বিস্তৃত পসার, সেখানে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করেছেন; সুতরাং ভাগলপুর যাওয়াও অযৌক্তিক নয়। মনের যখন এইরকম দ্বিধা-ভিন্ন অবস্থা, তখন একটা গুরুতর গোছের পারিবারিক কারণ ভাগলপুরের দিকের পাল্লায় বেশ খানিকটা ভার চাপিয়ে দিলে। কাজে কাজেই, ট্রাঙ্ক-বাক্স সাজিয়ে বিছানা-পত্র বেঁধে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে একখানা ভাগলপুরের মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কেটে ট্রেনে সওয়ার হলাম।

গাড়ি ছাড়তে তখনো বিলম্ব ছিল; এক-জন সহযাত্রীকে আমার জিনিস-পত্রের উপর একটু দৃষ্টি রাখবার জন্য অনুরোধ করে একটা টাইম্-টেবল্ খরিদ করবার উদ্দেশ্যে হুইলারের বুক্ স্টলে উপস্থিত হলাম। টাইম টেবল্ কিনে প্ল্যাট্‌ফর্মে ফিরে এসে আমার কামরায় উঠ্‌তে উদ্যত হয়েছি। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "মশায়, আপনার হাতে ওটা কি নতুন টাইম টেবল্?"

বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন।"

ভদ্রলোকের হাতে টাইম্ টেবল্ দিলাম। একটা বিশেষ কোনো পাতা খুলে নিবিষ্ট মনে বোধকরি সময়ের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দীর্ঘাকার নাতিকৃশ দেহ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পরিধানে ধুতি, অঙ্গে কালো রঙের চপকান, মাথায় টুপি হাওড়া স্টেশনের পরিবর্তে কোনও ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখলে স্টেশন মাস্টার বলে ভুল করলে দোষ দেওয়া চলে না।

দেখা শেষ হলে আমার হাতে টাইম টেবল্ প্রত্যর্পণ করবার সময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভদ্রলোক সহসা শিউরে উঠলেন, "ইশ্! কি দেখলাম!"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দেখলেন?"

আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ রেখে ভদ্রলোক বললেন, "জ্যোতি।"

"জ্যোতি?—কিসের জ্যোতি?"

"সৌভাগ্যের।"

"কোথায় দেখলেন?"

"আপনার ললাটে।" ভদ্রলোক বলে চললেন, "এরকম সুস্পষ্ট জ্যোতি কদাচিৎ দেখা যায়! এ কিন্তু কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি প্রোফেসার সতীশচন্দ্র মুখার্জি, অ্যাস্ট্রলজার, নিবাস বালী,—আমি বলে রাখলাম, অচিরে আপনি বিপুল অর্থের অধিকারী হবেন। ভুলবেন না আমার নাম; মনে রাখবেন।"

ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ সব কথা ভিতর থেকে বিশ্বাস করতে পারিনি, সেদিনও পারিনি; কিন্তু অচিরে বিপুল অর্থের অধিকারী হওয়ার মতো 'ভাল কথার মিছেও ভাল'। তাই বোধকরি মনে মনে অকারণে খুসি হওয়ার একটা আভা মুখের উপরও এসে উপস্থিত হয়েছিল। আগেকার জ্যোতি দেখে থাকুন আর না-ই দেখে থাকুন, বর্তমান আভা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন; দক্ষিণ হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করে বললেনঃ "কিছু অর্পণ করুন।"

মনের মধ্যে কে-একজন সজোরে 'ও!' বলে অট্টহাস্য করে উঠ্‌ল। সংযত কণ্ঠে বললাম, "'কিছু' নয়, অর্পণ করব 'প্রচুর'। কিন্তু আজ একটি পয়সাও নয়। যেদিন বিপুল অর্থের অধিকারী হব, সেদিন আমার প্রথম কর্তব্য হবে বালীতে এসে আতিপাতি করে আপনাকে খুঁজে বার করে প্রচুর অর্থ অর্পণ করা। আজ নমস্কার!" গাড়ির পাদানিতে এক পা দিয়ে ফিরে তাকিয়ে স্মিতমুখে বললাম, "চিন্তা করবেন না,—

নিশ্চয় মনে থাকবে, প্রোফেসর সতীশচন্দ্র মুখার্জি, অ্যাস্ট্রলজার, নিবাস বালী।"

কামরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ভদ্রলোকও বোধহয় নিষ্ফলা ভূমির মতো আমাকে পরিত্যাগ করে আর কারো ললাটে জ্যোতি দেখবার চেষ্টায় হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলেন।

লোকজনের ভীড়ে, কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনার গোলমালে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। ব্যান্ডেল জংশন অতিক্রম করার পর ডেলি প্যাসেঞ্জার ও লোক্যাল প্যাসেঞ্জারের ভীড় কমে গেলে পাশের দিকের একটা বেঞ্চে শয্যা পেতে ফেলে পা ছড়িয়ে জুৎ করে বসলাম। চিন্তার পথ নিরর্গল হতেই মনে পড়ল সতীশ অ্যাস্ট্রলজারের কথা। একটা অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং সংস্কার, যার সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসছি, ধীরে ধীরে আমার মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করলে। কে জানে সতীশ অ্যাস্ট্রলজার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ কি-না! সাধারণ লোকের কাছে মানুষের অদৃষ্টের যে ভাষা অনধিগম্য, কে বলতে পারে সতীশ অ্যাস্ট্রলজার সে ভাষার লিপি-উদ্ধার করতে সমর্থ হয়নি? সে অবস্থায় একটা বিপুল অর্থ আমার ভাগ্যে যদি আসন্নই হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কি এমন থাকতে পারে?

কিন্তু, একটা কথা। সৌভাগ্য যদি একান্তই আসে, তা হ'লে আসবেই বা কোন্ পথে? আগে ত পথ, তারপর আসা। যে পথে অর্থ উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে ভাগলপুরে চলেছি, সে পথ ত' অন্ততঃ বছর দশেকের মতো অনর্থেরই পথ হয়ে থাকবে। অচিরকালের মধ্যে সে পথে বিপুল অর্থ অর্জন করতে হলে রাত্রে মক্কেলের ঘরে সিঁদ না কেটে শুধু তার মামলা-মকর্দমা করলে চলবে না।

সে যাই হোক, একটা কথা আছে, খোদা যব দেতে হেঁ ছপ্পর ফোঁড়কে দেতে হেঁ। অতএব হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। অদৃষ্টের ভাষ্যপাঠে সতীশ জ্যোতিষীর যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে খোদা ছাপ্পর বিদীর্ণ করেই দেবেন; সৌভাগ্য নিজের পথ নিজে তৈরী করে এসে হাজির হবে। ভাগলপুর আমার জন্মস্থান, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সেখানে অভাব নেই, বাল্য এবং যৌবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি ভাগলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তবু কলকাতা থেকে নিজেকে উৎপাটিত করে নিয়ে যেতে সারা মনকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছিল স্তিমিত বেদনার একটা স্থূল অনুভূতি। তারই মধ্যে কোথায় যেন এক জায়গায় টের পাচ্ছিলাম একটা তীক্ষ্ণতর টন্‌টনানি। বুঝতে পারলাম সেইটেই বেদনার কেন্দ্র-স্থল। টিপে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করতে বিলম্ব হ'ল না, সে কেন্দ্রস্থল 'যমুনা' মাসিক পত্রিকাকে ছেড়ে আসার দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ছেড়ে আসার দুঃখ অবশ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে আসার দুঃখ নয়; তার দুঃখ থেকে অসুবিধা থেকে, তার সমস্যা থেকে সঙ্কট থেকে দূরবর্তী হওয়ার দুঃখ।

'যমুনা' আমার নিজের কাগজ নয়, বন্ধুর কাগজ; তার লাভ-লোকসান ভাল-মন্দর সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো স্বার্থের যোগ ছিল না। কিন্তু তার অতিশয় দুঃখের দিনে পরিপূর্ণভাবে তার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পেরেছিলাম বলে আপনার না-হয়েও সে আমার অতি আপনার হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ সম্প্রতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যমুনার শুভাশুভের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম বলে যমুনার প্রতি আমার ঔৎসুক্য এবং দায়িত্ব প্রবলভাবে বেড়ে উঠেছিল। তাই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে যমুনা-সম্পাদক বন্ধুবর ফণীন্দ্রনাথ পাল যখন নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত বলেছিলেন, "যমুনার এতটা বাড়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন উপেনবাবু, দেখবেন শেষ পর্যন্ত ভরা-ডুবি যেন না হয়।" তখন উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, "কোনো ভয় নেই ফণীবাবু, গভর্মেণ্টের ডাক বিভাগের কল্যাণে কলিকাতা হতে ভাগলপুরের ২৬৫ মাইলের দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যমুনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বজায় থাকবে।"

সেদিন কলিকাতা হতে ভাগলপুর যাত্রার পথে যমুনাকে অবলম্বন করে সাহিত্য এবং সাহিত্য সাধনার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ অপর সকল আকর্ষণকে ছাপিয়ে মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বারো বৎসর পরে আবার একদিন ঠিক সেই আকর্ষণই আমাকে ভাগলপুর থেকে সমূলে উৎপাটিত করে কলিকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে "বিচিত্রা"র পরিচর্যায় নিযুক্ত করবে,—সেকথা সেদিন সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল।

জীবনে ঘটনাক্রমে তিনটি সাহিত্য পত্রিকার সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হবার সুযোগ হয়েছিল। আদ্য তরণী; মধ্য যমুনা; এবং অন্ত্য বিচিত্রা। তরণী ছিল আমাদের ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং আমি ছিলাম এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। সৌরেনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং যত্নের ফলে তৎকালিক হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যে 'তরণী' শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল বল্‌লে অত্যুক্তি করা হয় না।

এ কথার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তখন-কার দিনের সাহিত্য-মণিমাণিক্যের জহুরি 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কাছে। ঘটনাক্রমে একদিন এক বৎসরের

বাঁধানো 'তরণী' ত'ার হাতে পড়ে। রচনা-গুলির উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ এক সময়ে তিনি অনুযোগের সুরে বলে উঠলেন, "করেছ কি তোমরা! যে-সব লেখা অনায়াসে ছাপা কাগজের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে, তাদের নির্বাসন দিয়ে রেখেছ হাতের লেখা কাগজের অন্ধকার গুহায়?" তারপর বলা নেই—কওয়া নেই, নির্মম শক্তির প্রয়োগে সেই মজবুত-বাঁধানো তরণীর কলেবর হতে দু-চারটি রচনা পড়্‌পড়্ করে ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, "আপাতত এগুলি আমার কাছে রইল; একে একে 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় এগুলিকে তোমরা দেখতে পাবে।"

সেদিন সমাজপতি মহাশয়ের বাক্যে ও আচরণে আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের একদিক হর্ষে এবং আর একদিক বেদনায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল।

তরণীর বাঁধানো খাতার উপর এই জুলুম-জবরদস্তি একবার করেই সমাজপতি মহাশয় নিরস্ত হননি; পরেও এর অনু-বর্তন করেছিলেন।

যে সময়ে আমরা ভবানীপুরে 'তরণী' প্রকাশ করে চলেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে ভাগলপুরে প্রকাশিত হচ্ছিল "ছায়া" নামে আর একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা। "ছায়া"র পরিচালক দলের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি-ভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। বিভূতিভূষণের ভগ্নী প্রসিদ্ধ লেখিকা নিরুপমা দেবীও ছায়ার লেখক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সমালোচনার জন্য "তরণী" এবং "ছায়া"র মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রবর্তিত ছিল। আমরা ডাকে ভাগলপুরে "তরণী" পাঠাতাম; ছায়ার পৃষ্ঠায় নির্মমভাবে সমালোচিত হবার পর 'তরণী' ফিরে আসত আমাদের হাতে। পক্ষান্তরে, ভাগলপুর থেকে আমাদের নিকট 'ছায়া' উপস্থিত হলে তরণীতে কঠোরভাবে তার সমালোচনা করার পর ফেরৎ পাঠানো হোত ভাগল-পুরে। আমাদের উভয় পক্ষের সমালোচনার মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা চক্ষুলজ্জার কোনো দুর্বলতা দেখা যেত না। কাগজের পরিবর্তে, "ছায়া" এবং "তরণী"র দেহ যদি মাংসের দ্বারা গঠিত হত, তা হলে উভয়ে যে নিজ নিজ স্থানে রক্তাক্ত কলেবরে প্রত্যাবর্তন করত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সৌরেন তরণীর শুধু সম্পাদকই ছিল না, মুদ্রাকরও ছিল। ছায়ার মুদ্রাকর ছিল গিরীন্দ্র। বলা বাহুল্য, মুদ্রাযন্ত্র ছিল উভয়ের নিজ নিজ লেখনী।

আজকালকার মতো তখনকার দিনের হস্তলিখিত পত্রিকায় চিত্র এবং অপরাপর অলংকরণের চোখ-ঝলসানো আড়ম্বর ছিল না। আমাদের তরণী ত' ছিল তপস্বিনীর মতো নিরাভরণা। কিন্তু তপস্বিনীর মতোই তার মধ্যে পাওয়া যেত বিভূতির স্নিগ্ধতা এবং সাধনার নিষ্ঠা।

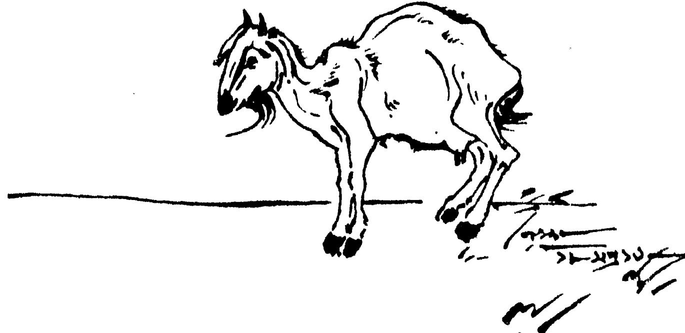
আমার প্রত্যক্ষ যোগের মধ্যযুগের মাসিক পত্রিকা যমুনার বিষয়ে পূর্বে অনেক কথাই বলেছি। পুনরায় সে সকল কথার অবতারণা করতে গেলে অনেক সময়ে পুনরাবৃত্তি অপরাধে অপরাধী হতে হবে। প্রয়োজনও তার এমন-কিছু নেই।

'বিচিত্রা'র কথা আমার জীবনের একটা বৃহৎ অংশের কথা। আমার জীবনের সে বিচিত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিচি কল্পনা আমার, সৃষ্টি আমার; বিচিত্র মৃত্যুও আমার কোলেই ঘটেছিল। জন যেমন তার সন্তানকে সমস্ত সত্ত্বা দি ভালবাসে, বিচিত্রাকে আমি ঠিক সেইভাবে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু যেদিন নিঃসংশ বুঝেছিলাম মৃত্যুর কীট তার অন্তরের মে আশ্রয় করেছে, সেদিন বোধ করি স্নেহম জনকেরই মতো তার মৃত্যুর ত্বরিত গতি কামনা করেছিলাম। বিচিত্রার সে সক যৎপরোনাস্তি বিচিত্র কথা ভবিষ্যতের জন্যে আজ মুলতুবি রাখলাম।

পরদিন প্রত্যুষে জনকোলাহলম ভাগলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবতর করে সমস্ত পুরাতন জিনিসকে নূতন আলোকে রঞ্জিত দেখে বিস্মিত এব পুলকিত হলাম! বিহারী পুরুষ মানুষদের মুখে মুখে 'মবক্কিলের' (মক্কেলের) ছাপ; কোনো বস্তা দেখলে মনে হয় বুঝি তা মামলা-মকর্দমার দলিল-দস্তাবেজের বস্তা; কেউ টাকা গুনছে দেখলে মনে হয় উকিলের ফিজ্ গুনছে। আমার অতীতের 'আমি' মৃদু হেসে বর্তমানের 'আমিকে' একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'তবে আর কি ওকীল সাহেব,—আমি এখন বিদায় হই।' সে তাড়াতাড়ি চলে গেল,—বোধ করি প্রস্থা-নোদ্যত রেলগাড়ির একটা কোনো কামরাতেই লাফ্ মেরে উঠে।

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে বাইরে স্টেশন-প্রাঙ্গণে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে খঞ্জরপুরের পথে রওনা হলাম।

(ক্রমশ



ইন্দ্রজিতের আসর

আমি যে স্থানে বাস করি সে স্থান যে অত্যন্ত সভ্য ভব্য স্থান তার প্রমাণ যদি চান তো বলব দোলের সময় আমাদের এখানে পুলিশ মোতায়েন করতে হয় নি। অথচ দোলকে উপলক্ষ করে এখানে রীতিমতো একটা উৎসবের আয়োজন হয়, বাইরে থেকে কিছু জনসমাগমও হয়ে থাকে। উৎসবের রং মনেই লাগে, গায়ে লাগে না। যেটুকু বা লাগে সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিলে পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। এ শুধু এখানেই সম্ভব; এখানে দোলটা উপলক্ষ, উৎসবটাই লক্ষ্য। অন্যত্র উৎসবের নামে উৎপাত। কারণ বাইরে থেকে যাঁরা এসে পৌঁছেছেলেন তাঁরা কেউ অক্ষত দেহে এসে পৌঁছতে পারেন নি। অবশ্য ক্ষত মানে ক্ষতি। এই বস্ত্র সংকটের দিনে দৈহিক ক্ষতের চাইতে বস্ত্রের ক্ষতি বেশি অসহনীয়। অনেক ক্ষেত্রে রং এমন পাকা হয়ে লেগেছে শতধৌতেও এর মলিনত্ব মোচন হবে বলে মনে হল না। মানুষ যে সজ্ঞানে এমন নির্মম রসিকতা করতে পারে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মানুষ আনন্দ করবে, ফূর্তি করবে তাতে কার আপত্তি? সুসভ্য মানুষের আনন্দ যেমন শোভন তেমনি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু বর্বরের ফূর্তি আবার তেমনি প্রাণান্তকর। ভেবে দেখুন, মানুষের ফূর্তির হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্য সরকারী ইস্তাহার জারী হয়েছে, পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে--পাছে শ্যামবাজারের লোক পিচকিরি হাতে বালিগঞ্জ অবধি ধাওয়া করে আর টালিগঞ্জের লোক টালা অবধি! স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন--মাত্রা ছাড়িয়ে যেয়ো না। ভাবলেও হাসি পায় যে, হোলিটা এখন একটা নিখিল ভারতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করতেন, এখন তাঁর কাজ হয়েছে ফূর্তিবাজ মানুষকে সামলে রাখা।

কিন্তু কে কাকে সামলায়? মাত্রা নির্ধারণ করবে কে? যে সরকার ইস্তাহার জারী করেন সে সরকারের কর্মচারীদের কীর্তি শুনুন। নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ একদল সরকারী কর্মচারী প্রধান মন্ত্রীর আবাস গৃহে হানা দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই শিক্ষিত ব্যক্তি। প্রথম হামলা প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মাথাই-এর উপর। মাথাই সাহেবের মাথায় পুরো এক বালতি রং ঢেলে দেওয়া হল। এই যদি সরকারী মহলের দস্তুর হয় তো রাস্তার লোককে দোষ দেওয়া কেন? এদিকে মাথাই এর পরে নেহরুর পালা। তিনি সরকারী ফাইল নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু রংরসিকদের তর সইলে তো। মুহূর্তমধ্যে ফাইল ভিজে চুপচুপে। মাথা বাঁচানোর চাইতে ফাইল বাঁচানো বুদ্ধিমানের কাজ। পণ্ডিতজীকে আসন ছেড়ে উঠতে হল। এককালে পুলিশের ব্যাটন মাথা পেতে নিয়েছেন, তেমনি বীর বিক্রমে হোলির রং শিরোধার্য করে নিলেন। দেখছি, নেহরুর কপালে অনেক দুঃখ আছে। সবে শুরু, এখন না হয় লাল নীলের উপর দিয়ে যাচ্ছে।

যাক্‌ দিল্লীতে তো কেলেংকারী লেগেই আছে। ওখানে যা হবার হোক; কিন্তু বাঙলা দেশে এই রুচি বিকার কেমন করে এল! আমাদের ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ কুড়ি বাইশ বছর আগেও কলকাতায় যে হোলি খেলা দেখেছি তাতে এই বীভৎসতার চিহ্নমাত্র ছিল না। তার মধ্যে বাঙালীসুলভ শ্রী ছিল, প্রীতি ছিল, সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল। এ উৎসবের মর্মগ্রহণ করবার মতো রসবোধ তখনও বাঙালীর মনে ছিল। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হিসাবে দোলকে বসন্তোৎসব বলেই জানত, দুর্গাপূজো যেমন ছিল শারদোৎসব। এখন সে সূক্ষ্ম রসবোধটুকু গিয়েছে। আগে যা ছিল ঋতু-উৎসব এখন তা হয়েছে ঋতু-সংহার। শারদোৎসবে পাঁঠাবলি আর বসন্তোৎসবে সকল রকম শ্লীলতার বিসর্জন। কোনো জাতির স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ যখন নষ্ট হয়ে যায় তখনই বুঝতে হবে তার অধঃপতন অনিবার্য হয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে ভারতবর্ষে এক জাতীয়ত্বের ব্যর্থ সাধনা আমরা দেখেছি। একনায়কত্ব যদিবা স্বল্পকালের জন্য হয়েছিল, এক জাতীয়ত্ব কোনোকালে হয়নি। মাঝখান থেকে সকলের সঙ্গে সুর মিলাতে গিয়ে বাঙালীচরিত্র স্থূলতর হয়েছে। সূক্ষ্মতাটুকু বিসর্জন দিয়ে বাঙালী তার বুদ্ধিটাকে ভোঁতা করেছে। আগে যে কাজ করতে বাঙালীর রুচিতে বাধত, এখন অনায়াসে তাই করতে পারে।

আজকের ছাত্রসমাজের মতিগতি আমি ভালো করে জানিনে। জানতে ইচ্ছে করে তাঁরা এই বীভৎস আনন্দে যোগদান করেন কিনা। যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখছি ততক্ষণ বিশ্বাস করব না, কারণ এখনও পর্যন্ত বাঙলার যুবশক্তির উপরে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। অবশ্য তাঁরা যদি এই কদর্যতা থেকে দূরেও থাকেন তাহলেও তাঁরা একেবারে দায়মুক্ত নন। বলব এ বিষয়ে তাঁরা উদাসীন। ঔদাসীন্য যৌবনকে মানায় না। তাঁরা এগিয়ে আসুন, বাধা দিন। পুলিশের পক্ষে যা অসাধ্য, ছাত্রদের পক্ষে তা অনায়াসসাধ্য একমাত্র তাঁরাই এই মতিভ্রান্তি থেকে সমাজকে বাঁচাতে পারেন।

সমাজের কথাই যখন উঠল তখন আরেকটা কথা বলি। অভাবগ্রস্ত সমাজের স্বভাব নষ্ট হয়েছে। যে নৈতিক অবনতি সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করেছে হোলির এই কদর্যতা সেই চারিত্রিক অবনতির একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। অন্ন বস্ত্র এবং অন্যান্য দৈনন্দিন উপকরণের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও অভাব ঘটেছে। পেট ভরাবার জন্য যখন মোটা ভাত জোটে না, লজ্জা নিবারণের জন্য যখন মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হয় না, মন ভরাবার জন্য তখন অত্যন্ত মোটা উৎকট রকমের ফূর্তির প্রয়োজন হয়। যারা কালি মেখে আপনার বস্ত্রকে কলঙ্কিত করেছে খোঁজ নিয়ে দেখুন তাদের বেশির ভাগের পরিধানে উপযুক্ত বস্ত্র নেই। যার নিজের বস্ত্র নেই অপরের বস্ত্রের প্রতি তার মায়া থাকবে কেন? লজ্জা নিবারণের দায় চুকিয়েছে বলেই এতখানি সে নির্লজ্জ হতে পারে। ভাত রুটির Substitute যখন মানুষকে খুঁজতে হয় তখন সুষ্ঠু আনন্দের Substituteও সে খুঁজবে। রসবোধের রূপান্তর ঘটবে বিকৃত রসিকতায়। দোষ দেবেন কাকে? যে সরকার ইস্তাহার জারী করে এই বর্বরতা রোধ করতে চায় সে কি এক মুহূর্ত ভেবে দেখেছে এই রোগের মূল কোথায়? পুলিশ মোতায়েন করে মানুষকে ভদ্র করা সম্ভব? মানুষ তো আর মানুষ নেই। মানুষের খাদ্য সে খায় না, মানুষের পোষাক সে পরে না। মানুষের মতো ব্যবহার সে করবে কেন?

পুস্তক পরিচয়

সমকালীন বাংলা কবিতা—প্রকাশকঃ সুহৃদ রুদ্র। ৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

১৯৪০'এ শ্রীহীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীআবু-সয়ীদ আইয়ুব কর্তৃক সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" বেরোয়। তারপরে বাংলা কবিতার আরও রূপান্তর ঘটেছে। সে সময়ের অনেক কবি আজ অবসৃত। সে যুগের কাব্য-রীতিও আজ পরিবর্তনের মুখে। এই এগারো বছরে, বহু কবিতা লেখা হ'লেও, বহু নতুন কবির আবির্ভাব সত্ত্বেও কোন নতুন কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়নি। তাই বাংলা কবিতার এ যুগের রূপান্তরের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়নি। "আধুনিক বাংলা কবিতা"—এই একটি সংকলনেই রবীন্দ্র পরবর্তী, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরের যুগের বাংলা কবিতার স্বরূপ ধরা পড়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে তখনকার প্রাণস্পন্দন ঐ একটি বই পড়লেই বোঝা যায়। অনেক দিন পর "সমকালীন বাংলা কবিতা" নামে আরেকটি সংকলন বেরোল।

১৯৪০'র সংকলনের পর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা স্তব্ধতা লক্ষ্যনীয়। কবিতার পথ নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়ে গেছে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফললাভ হয়নি। আধুনিক কবিতার নামে এক সময় জটিল আঙ্গিকের চমক ও সাম্যবাদের ঢাক পেটানো বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মুখরতা থিতিয়ে পড়ল। যে ব্যাঙ্গ, বিদ্রূপ ও মতপ্রচার কবিতায় কাব্যের চেয়েও বড় হয়েছিল, তার পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নতুন পথ ধরলেন। রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌'র দিন চলে গেছে—এ উক্তি মিথ্যা প্রমাণ হ'ল। "সমকালীন বাংলা কবিতা"র ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এই সংকলন নিঃশংসয়ে প্রমাণ করবে, রোমাণ্টিক মনোভাব আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে", "একক জীবনের সৌন্দর্য উপাসনাই তার (এ যুগের কবির) কাব্যের প্রস্তুতি।"

ভূমিকাকার দাবী করছেন রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌'র পুনপ্রতিষ্ঠাই এযুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই সংকলনের কবিরা রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ আবার গ্রহণ করেছেন। এইখানেই তাঁদের সঙ্গে আগের পর্যায়ের কবিদের পার্থক্য। এই রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ তাঁদের নতুন দান।

প্রথমেই তবে বিচার্য যে-রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌'র কথা ভূমিকায় বলা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য কোথায়, আর তা সত্যিই কোন নতুন সুর দিয়েছে কি না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কোন নতুন সুর খুঁজে পাওয়া গেল না। এ'দের মধ্যে অনেকেই পুরোপুরি রোমাণ্টিক নন। মঙ্গলাচরণ, জগন্নাথ চক্রবর্তী এ'রা ত ননই, সেকথা সম্পাদকও স্বীকার করেছেন। অন্য অনেক কবির বেলায়ই দেখা যাবে, তাঁরা ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের মধ্যে রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ হারিয়ে বসে আছেন। আর কয়েকজন দেখা যায় বুদ্ধদেব বা জীবনানন্দের প্রভাবে আচ্ছন্ন। তার মানে এই নয় যে, তাঁদের কোন স্বকীয়তা নেই, তবে নতুনত্বের দাবী হয়ত তাঁরা করতে পারেন না। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেই এই আন্দোলনের সার্থক মুখপাত্র বলা যায়। তিনি খাঁটি রোমাণ্টিক। তাঁর "সময়চারী" কবিতাটি অন্ততঃ সেই সাক্ষ্য দেবে। অন্য আরো কয়জন উল্লেখযোগ্য কবি আছেন, কিন্তু নতুন আন্দোলনের মূলে যে প্রাণস্পন্দন থাকে, তা এ'দের কবিতায় নেই। অনেক সময় এ'দের রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ও অনেকটা শুধু ভঙ্গী দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা "আধুনিক বাংলা কবিতায়" জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে'র মধ্যে যে রোমাণ্টিসিজ্‌ম দেখা যায়, তারপর আর কিছু এই কবিরা করতে পেরেছেন বলা যায় না।

বাঙলা কবিতার একটা বিশেষ দিকের পরিচয় দিতে এই সংকলনটি সমর্থ। এটা ঠিক এখন রোমাণ্টিক কবিতা বলতেই তাকে বরবাদ করে দেওয়া যায় না, মাঝখানে যা হয়েছিল। রোমাণ্টিক কবিতার আসর আবার তৈরী হচ্ছে তার প্রমাণ এই বইটিতে পাওয়া যাবে। সাম্যবাদের নামে কাব্যগন্ধহীন রাজনৈতিক মতপ্রচারের জের কেটে গেছে। যে গীতিকবিতা বাঙলাকাব্যের সম্পদ, তার দৈন্য আজ অত্যন্ত বেশী। খাঁটি রোমাণ্টিক কবিতা, যার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য এই কবিরা সচেষ্ট তারও অভাব। বিশেষ করে অভাব সত্যিকারের ভাল প্রেমের কবিতার। ১৯৪০'র সংকলনেও এই সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সংকলনটি অত্যন্ত ছোট আর একপেশে। একালের বাঙলা কবিতার পূর্ণছবি পাওয়া যায় না। মনে হয় কোন বিশেষ দলের কবিদের নিয়েই গঠিত। অথবা ১৯৪০ সালের সংকলনের কবিদের ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। সমগ্র বইটির মধ্যে একমাত্র মঙ্গলাচরণের আর তারপর নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা ছাড়া আর কারো লেখায় নতুন প্রতিভার ছাপ পাওয়া যায় না। অন্যরা অনেকেই রোমাণ্টিক হবার চেষ্টা করেছেন, সবাই মোটেই সার্থক নন। অনেকেই ভঙ্গীসর্বস্ব। হরপ্রসাদ মিত্র'র প্রতি সম্পাদক অবিচার করেছেন। তাঁর আরও কবিতা, আরও ভাল কবিতা বাছাই করা চলত। সংকলনটির উদ্দেশ্য আর কবিতা চয়নের রীতি বোঝা যায় না। ১৯৪০'র পর বাংলা কবিতার ধারার একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশের পরিচয় দিতে সক্ষম এই বইটি। "আধুনিক বাঙলা কবিতা"য় সংকলিত কবিদের মধ্যে অনেকে আরও নতুন কবিতা লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, সুভাষ মুখোঃ, দীনেশ দাস প্রভৃতির আরও কবিতার বই বেরিয়েছে। সে সব বইয়ে ঐ কবিদের স্বপরিণতির নির্দেশ পাওয়া যায়। তাঁদের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতাও ঐ সব বইয়ে রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক কবি রয়েছেন, যেমন সুশীল রায়, হীরালাল দাশগুপ্ত ,সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাল্য বসু প্রভৃতি সমকালীন বাঙলা কবিতার আসরে যাঁদের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংখ্যা ও সম্পদ কোন দিক দিয়েই এ'দের অবহেলা করা যায় না। এ'দের বাদ দিয়ে সমকালীন বাঙলা কবিতার কোন পূর্ণছবি দেওয়া যায় না। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা আধুনিক বাঙলা কবিতার দুটি সংকলনের একটিতেও কেন স্থান পেল না, বুঝলাম না।

ভূমিকায় সংকলনের উদ্দেশ্য, রীতি, আর পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। সমস্ত সংকলনটি ভূমিকাটি নিয়ে অত্যন্ত অচিন্তিত আর সংকীর্ণ।

আবাহন——বীরেন্দ্রকুমার রায়। শ্রী-ভারত পাবলিশার্স; ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

কাব্য-গ্রন্থ। কবিতাগুলির মধ্যে নীতিমূলক সু-কাব্য রচনা করিবার সাধু প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। অতি পরিচিত পুরাতন ছন্দে বাঙলা কাব্যে বহু প্রচলিত কতগুলি ভাবকে আপনার ভাষায় লেখক প্রকাশ করিয়াছেন।

মুদ্রণ ও বন্ধনের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট নাই। ৬৪।৫১



রাশিয়ার রাজদূত

একমাত্র 'বাইবেল' ভিন্ন অন্য কোন বই এর এতগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ-নৈপুণ্যে ইহাকে মৌলিক উপন্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও সংবাদ-পত্রাদিতে উচ্চপ্রশংসিত। ছোট-বড় সকলের উপযোগী ও উপহারযোগ্য।

প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য—২৷৷৹



রূপকথা

অরুণচন্দ্র গুহ

'রূপকথা' নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ইন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের মনের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নানান বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। তাই রূপকথা আজিও এত মধুর।

অভিজ্ঞ লেখক অরুণবাবুর কুশলী হস্তের সৃষ্টি নূতন যুগের রূপকথার অভিনবত্ব দেখিয়া আপনি চমৎকৃত না হইয়া পারিবেন না। যে দেব-দেবীদের লইয়া গল্প-কাহিনীর আমাদের অন্ত নাই, সেই দেব-দেবীদের জগৎটির নূতন একটি পরিচয় পাইবেন তাহাদের নিজেদেরই মুখে শুনিয়া।

'মানুষের প্রয়োজনেই দেবতার সৃষ্টি। সর্বশক্তিমান্ যে দেবতা সে ত' মানুষেরই অন্তরের জিনিষ!' সহস্র বিড়ম্বনা-পূর্ণ এই অসহায় মানবজীবনে লেখকের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীটি আপনাকে নূতন পথের সন্ধান দিবে।



সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

নরেন রায়

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে উত্তরবঙ্গে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল '৭৬-এর মন্বন্তরের সম-সময়ে, তারই নাম সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী সৈন্যদের অসীম বীরত্ব, অপূর্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী আজকের দিনের পর্যুদস্ত বাঙ্গালীর ছেলেদের কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা' মিথ্যে নয়। **মূল্য—২.**

'দেশ' বলেনঃ—ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপন্যাসের আকারে লিখিয়া বইখানিকে রসাল করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বইর বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগে খুবই বেশী।

'পূর্বাশা' বলেনঃ—এ গ্রন্থ নিষ্করুণ ইতিহাস মাত্র নয়, সরস কাহিনী-কথাও। লেখার পদ্ধতিটাও, তাই, বড় ভাল লাগল।

'আনন্দবাজার' বলেনঃ—কাহিনী চিত্তাকর্ষক, প্রত্যেকটি চরিত্র সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া স্বদেশপ্রীতির আবেগ সমগ্র কাহিনীর মধ্যে সার্থকভাবে সঞ্চারিত।



জীবনের বসন্ত

অরুণচন্দ্র গুহ

অনবদ্য কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। যে বৈশিষ্ট্য থাকিলে গল্পমাত্রই পাঠকদিগের আদরণীয় হয়, তাহা এই সকল গল্পে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ভাষায় ও ভাব-গভীরতায় প্রত্যেকটি গল্প অননুকরণীয় মাধুর্যের পরিচয় দিবে। এই বইখানি পড়িবার মত এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত। **মূল্য—২৳**

আনন্দবাজারঃ—ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অরুণবাবুর রচনা উচ্চাঙ্গ গল্প-সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য। গল্পানুরাগী পাঠকমাত্রেই এই পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিবেন।

যুগান্তরঃ—বইটি পড়িয়া শুধু চমৎকৃত হই নাই, বিস্মিত হইয়াছি—কি গল্পের বিষয়-বিন্যাসে, কি সংলাপ-রচনায়, কি অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে, সর্বত্রই পাকা গল্প লিখিয়ের হাতের ছাপ লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত, সুচিন্তিত, শিল্পগুণসমৃদ্ধ। বইয়ের ছাপা বাঁধাই মনোজ্ঞ। আমরা ইহার যোগ্য সমাদর কামনা করি।

সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২.

বিনামূল্যে সুন্দর একখানা পুস্তক তালিকার জন্য আজই লিখুন। রূপকথার দাম—২.

(1) **Third Year of Freedom** (স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষ) (2) **Chief Ministers Speak** (মুখ্যমন্ত্রীদের বক্তব্য)—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—(উক্ত সমিতির) প্রকাশন বিভাগ, ৭নং যন্তর মন্তর রোড, নয়াদিল্লী। মূল্যে যথাক্রমে দেড় টাকা ও আড়াই টাকা।

স্বাধীন ভারতে গবর্নমেণ্ট বিভিন্ন দিকে কি কাজ করিতেছেন, কিভাবে করিতেছেন, কোন্ কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রই বা কোন্ দায়িত্ব কিভাবে বহন করিতেছেন, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য ও অধিকার স্বাধীন ভারতের নাগরিক মাত্রেরই আছে। কিন্তু কোথাও সুগ্রথিতভাবে এই বিবরণ না পাইলে সংবাদপত্র ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক ধারণালাভ করার ধৈর্য অনেকেরই নাই। ফলে যে অজ্ঞতা ও অল্পাজ্ঞতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেই উদ্ভব হয় নানারূপ হাস্যকর মতবাদের ও মনোভাবের। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশ করার ফলে তথ্য-জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত বিবরণই সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইতঃপূর্বেও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি "One Year of Freedom" (স্বাধীনতার এক বৎসর), "Second Year of Freedom" (স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে রাষ্ট্র-কর্মের পরিচয় লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষ পুস্তকখানিতে ১৯৪৯, আগষ্ট হইতে ১৯৫০, আগষ্ট পর্যন্ত রাষ্ট্রিক কার্যের তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুখবন্ধে শ্রী বি পট্টভি সীতারামিয়া এই সময়ের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর একখানা চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পৃথক পৃথক মানচিত্র, ভারতীয় রেলপথসমূহের মানচিত্র, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালবৃন্দ, কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মন্ত্রিগণের চিত্র ও অন্যান্য চিত্র গ্রন্থের শোভা ও উপযোগিতা বর্ধিত করিয়াছে। পরিশিষ্টে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের নাম, 'ওভার-সীজ্ কম্যুনিকেশন সার্ভিস' প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানির মূল্য প্রথম সংস্করণে তিন টাকা ছিল। বর্তমান সংস্করণের মূল্য অর্ধেক হওয়াতে ইহা অধিক-সংখ্যক লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে।

দ্বিতীয় গ্রন্থের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। স্বাধীনতার তিন বৎসর (১৯৪৭—৫০) ভারতের কোন্ রাজ্যে কি কাজ হইয়াছে, কি বাধা তাহাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কোন্ কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, কি কি কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে ইত্যাদি বিবরণ দিয়াছেন প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে বিবরণগুলি যেমন নির্ভরযোগ্য হইয়াছে, তেমনি প্রত্যেক লেখার মধ্য দিয়া প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত ব্যক্তিত্বের রূপও যেন আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে শ্রী আয়ার আর দিবাকর তিন বৎসরের রাষ্ট্রিক কার্যের পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও তথ্য ও চিন্তাপূর্ণ। এই গ্রন্থেরও মুখবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রী বি পট্টভি সীতারামিয়া।

গ্রন্থ দুইখানিই ইংরেজীতে লেখা। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ গ্রন্থ যদি রাষ্ট্রভাষায় ও বিভিন্ন রাজ্যের ভাষায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে উহা দেশের লেখাপড়া জানা লোকমাত্রেরই নিকট পৌঁছিবার সুযোগ পাইবে। ফলে দেশের মানুষের মনের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইবে এবং দেশের মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা সুস্থতর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

৪২-৪৩।৫০

মধুমিতা, তিমির-তৃষা—দিলীপ দাশগুপ্ত। প্রকাশক : দীপালী গ্রন্থশালা। ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—যথাক্রমে দেড় টাকা এবং আট আনা।

কবিতার বই। মলাটে মুদ্রিত কবি প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, "বাল্যকাল থেকে অদ্যাবধি যত্রতত্র, যে-কোন অবস্থায়, বিনা আয়াসে এর মত কাব্য রচনা আর কোন সাম্প্রতিক কবির ভেতরে দৃষ্ট হয় না।" এ সম্বন্ধে আমরা এক মত। বহু দিন যাবৎ যত্রতত্র, বিনা আয়াসে, কবিতা লিখিয়া লেখক পাঠক সমাজে পরিচিত হইবার আপ্রাণ চেষ্টায় মুখর। বিনা আয়াসে কবিতা লিখিতে পারা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ চেতনা ও মননশীলতা বিবর্জিত ছন্দ মিলাইয়া প্রেমের কবিতা রচনায় কোনও আয়াসের প্রয়োজন হয় বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। আযৌবন স্বপ্নময়ীর সাধনা করিয়া অবশেষে কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে শুধু স্বর্গীয় মদের ফেনায় নেশা হয় না:—

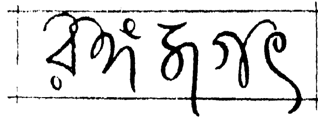
"তোমারে বাসিয়া আমি পেয়েছি যে
পৃথিবীর ক্ষুধা" (মধুমিতা)

এই পৃথিবীর ক্ষুধা জীবনের সহজ পথে মিটাইতে না পারিয়া "অনিবার্য কারণে সুন্দরের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে, অভিমানহত আত্মা কুৎসিতার বন্দনা গানে উন্মুখর হয়।" আমাদের আশঙ্কিত হইবার পূর্বেই কবি আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, ইহা—এই কুৎসিতার বন্দনা—"মাত্র কয়েক রাত্রেরই ঘটনা।" আশা করা যাইতে পারে যে এই "কয়েক রাত্রেরই ঘটনার" মধ্যে কাব্যকে উপলব্ধি করিতে গিয়া কবি বিজ্ঞানকে ভুলিয়া যান নাই। কারণ কুৎসিতার

"সই পঞ্জরে থাইশীশ্-বীজ,
নিশ্বাসে শুধু গরল।" (তিমির-তৃষা)

লেখকের মিষ্টি ছন্দ ও মোলায়েম ভাষার উপর দখল আছে। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদের মধ্যেও কবিত্ব ফুটাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা আছে।

৬১-৬০।৫১



ভৈরব-মন্ত্র (বসু মিত্র ইস্টার্ণ টকীজ)—

কাহিনী : গৌরাঙ্গ বসু, পরিচালনা: মনি ঘোষ; আলোকচিত্র : দিব্যেন্দু ঘোষ; শব্দযোজনা : পরিতোষ বসু; সুর-যোজনা : দেবেশ বাগচী; শিল্প-নির্দেশ : চারু রায়। ভূমিকায় : শিশির মিত্র, অভি ভট্টাচার্য, নৃপতি, গুরুদাস, হরিদাস, নরেশ বসু, প্রীতিধারা, রাণী-বালা প্রভৃতি।

গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ-এর পরিবেশনায় ৩০শে মার্চ মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের তান্ত্রিক সংস্করণ "ভৈরব মন্ত্র" রুচী-দেউলিয়া বাংলা চিত্র-নির্মাতাদের পোষাক-ছাড়া মনোবিত্তিটির একটি কুৎসিত বিবরণ। এ যেনো ছবির আড়ালে নিজেদের কতকগুলো দুষ্প্রবৃত্তিকে আস্কারা দেবার একটা তাল খুঁজে নেওয়া।

সংস্কৃতি ও নীতিবোধের লেশমাত্র ছোঁয়াচ থাকলেও পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশই এমনি ধারা একেবারে খোলাখুলিভাবে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, শবসাধনের একটা কুৎসিত প্রদর্শনীর কথা কল্পনাও ক'রতে পারে না। আমাদের দেশে তা তৈরী হ'তে দেওয়া হ'য়েছে এবং তা সাধারণ্যে দেখাবার জন্যে ছাড়পত্রও দেওয়া হ'য়েছে। সেন্সর বোর্ডে যারা এখন সভ্য তাদের মধ্যে রুচি এবং শিল্প ও সাহিত্যবোধ আছে ব'লেই বিশ্বাস কিন্তু হঠাৎ তারা সে-সব হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন কেন এ ছবিখানির বেলায়? সভ্যদের মধ্যে রয়েছেন বাংলা চিত্র-শিল্পের কর্ণধার শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই সেদিনও "বিদ্যাসাগর"-এর মতো ছবি উপহার দিয়ে সারা দেশের কাছ থেকে শ্রদ্ধালাভ ক'রেছেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় কি এমনি ন্যক্কারজনক একখানা ছবির কল্পনাও ক'রতে পারতেন? রয়েছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস সাহিত্যে রুচি ও শ্লীলতা রক্ষায় যিনি জোর কলম আসছেন এতোদিন ধ'রে—তিনি পারতেন এমনি কুৎসিত একটা বিষয়বস্তুর পরি-কল্পনা করতে? আরও রয়েছেন ডাঃ সত্যচরণ লাহা, শ্রীঅন্নদা চৌধুরী, শ্রীসীতা চৌধুরী—তারা কি ক'রে এমনিধারা নীতি-বিরূপ একটা বিষয়কে প্রশ্রয় দিতে পারলেন? এ ছবিখানির বিচারে মস্তো একটা গলদ নিশ্চয়ই ঘটে গিয়েছে কোথাও। "ভৈরব-মন্ত্র" স্পষ্ট ক'রে দেখানো তান্ত্রিক কর্তৃক নারীধর্ষণের একটা গল্প।

এক নীতিভ্রষ্ট ব্যভিচারী তান্ত্রিক—যে এক অনূঢ়া মেয়েকে দেখে তাকে তার জন্ম জন্মান্তরের নায়িকা ব'লে ধ'রে নেয়। তাকে পাবার জন্যে সে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, সবসাধনা, ধর্ষণ কোন কিছুই বাকী রাখলে না। শেষে, যে শবকে প্রাণদান ক'রে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুচর ক'রে নিয়েছিলো তারই হাতে তান্ত্রিকের মৃত্যু হ'লো। এর মধ্যে কোন সাহিত্য নেই, কোন নীতিকথা নেই, শিল্পও নেই—আছে শুধু নারীধর্ষণ প্রক্রিয়ার একটা বীভৎস আবদার।

মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোকে সুড়সুড়ি দিয়ে পয়সা রোজগারের ধান্দায় অনেক ছবিই তোলা হ'য়েছে, হ'চ্ছেও, কিন্তু "ভৈরব মন্ত্র" সে সবকে টেক্কা মেরে গিয়েছে। ছবিখানিকে প্রচারই করা হ'চ্ছে ভয়াবহ ব্যাপার ব'লেই, 'ভয়াল ভয়ংকর' ব'লে। ওতেই এরা ক্ষান্ত নন—ছবির জন্যে টিকিট কিনতে গিয়ে যারা আহত হ'য়েছে, তাদের আহত হওয়ার জন্যে এরা ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ছবিখানি তৈরীর পিছনেও এই ধর্ষকাম মনোবৃত্তিটাই কাজ ক'রে গিয়েছে আগাগোড়াই।

বাংলা ছবি অন্যদিকে যতো নিকৃষ্টই হোক রুচির দিক থেকে কৌলীন্য বজায় রাখার একটা চেষ্টা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে বেশ দম্ভের সংগেই রুচি ও নীতিকে উৎখাত করার চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়। বীভৎসতাকে রসগ্রাহ্য ও শিল্পোত্তীর্ণ নাট্যবস্তুতে পরিণত ক'রে তুললেও পৃথিবীর প্রায় সব দেশই প্রমোদের মধ্যে থেকে এ ধরণের বিষয়বস্তুকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আর সে জায়গায় আমরা সেই সবই প্রসারের দিকে ঝোঁক দিতে চাইছি। বৈচিত্র্য নিয়ে আসার অনেক কিছুই আছে কিন্তু যা রসগ্রাহ্য নয়, রুচিকে আহত ক'রে তোলে, মনকে বিষাক্ত ক'রে দেয় তাকে প্রমোদ-আসরে ঠাঁই দেওয়া অপরাধ ব'লেই স্বীকৃত হবে।

সে নিলো বিদায় (ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান—শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স)—

কাহিনী ও পরিচালনা : জ্যোৎস্নাময় মিত্র, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : শচীন সেনগুপ্ত, গান : প্রণব রায়, আলোকচিত্র : জয়ন্তীভাই জানী, শব্দযোজনা : ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরযোজনা : সুবল দাশগুপ্ত, ভূমিকায় : কৃষ্ণধন, সন্তোষ সিংহ, বিপিন মুখো-পাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি, খগেন পাঠক, স্মৃতি, রেণুকা, পূর্ণিমা, অপর্ণা, রেবা, প্রভা, অনিমা প্রভৃতি।

ইণ্ডিয়া পিকচার্সের পরিবেশনে ২৩শে মার্চ চিত্রা ও পূর্ণতে মুক্তিলাভ করেছে।

এক একখানা ছবি আসে যেগুলি ধৈর্যের মিটারের কাজ করে—ধৈর্য ধরে কতক্ষণ দেখা যায় তারই পরীক্ষা। আবার কোন কোন ছবি আসে যেগুলো জনকয়েক প্রতিভাবানের সংযোগ ও সহযোগিতা সত্ত্বেও নিকৃষ্টতায় বিস্ময়কে ছাপিয়ে যায়। "সে নিল বিদায়" এই দুরকম ছবির সমন্বয়কেও টেক্কা মেরে গিয়েছে।

সাধারণ হিসেবে এ ছবির এদিক ওদিক, কোনদিকেরই মন্তব্য পেশ যোগ্য নয়, কিন্তু তবুও একে নজরে ধরতে হলো, প্রধানত, শচীন সেনগুপ্তের নাম যুক্ত রয়েছে বলে। শচীন সেনগুপ্ত বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে প্রখ্যাত হয়ে আসছেন। সুতরাং তিনি যখন চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করে দিয়েছেন তখন আর কিছু না হোক, পরিস্থিতি এবং সংলাপের মধ্যে নাটকীয়তার অভাব থাকবে না নিশ্চয়ই, আর সে জোরে কাহিনীর দুর্বলতাও অন্ততঃ কিছুটা নিভে যাবেই। কিন্তু সে জায়গায় আমরা যা পেয়েছি তার সংগে শচীন সেনগুপ্তের যোগ রয়েছে মনে করতেও আমাদের লজ্জা হয়।

গল্পটি আরম্ভ সীতা নামের এক পাগলিনীকে নিয়ে। তার ধনী পিতা মিঃ দত্তর কথায় জানা গেলো যে সীতা আঠারো বছর পাগলিনী এবং তার চিকিৎসা করছেন ডাঃ বসু যিনি তখন জমিদারী দেখতে গিয়েছেন জব্বলপুরে। ডাঃ বসুর কথা উঠতেই এলো জব্বলপুরের দৃশ্য। দেখা গেলো ডাঃ বসু এবং তার কন্যা লিলিকে। বাবার কথায় লিলি শুতে যাবার পথে গিয়ে দাঁড়ালো তার দাদা জ্যোতির সামনে। ভাণটা একখানা বই চাওয়ার হলেও আসলে কথার মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে দিলে যে আইভিলতা নামে দাদার এক

প্রণয়িনী আছে কলকাতায় যার সঙ্গে বিয়েও ঠিক এবং জ্যোতি তখন তাকেই চিঠি লিখছিলো। আইভি পরলোকগত স্যার কানু ও লেডী চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। বিলেতে দশ বছর থেকে মানুষ হয়েছে। জ্যোতির চিঠি গিয়ে পৌঁছলো আইভির হাতে। চিঠি পড়ে আইভি ঠিক করলে সে জব্বলপুরে যাবে। জব্বলপুরে সে এসে পৌঁছলো প্লেনে করে। আইভি দেখে ও বাড়ির চাকর-খুড়ো বাবুর্চি-ভাইপোকে প্রশ্ন করে জানলে যে মেম সাহেবটি জ্যোতি দাদাবাবুর ভাবী স্ত্রী। ওদের বিয়ে হবে দলিল সই করে, জমি কেনার মতো, আর মেমসাহেব এসেছে তারই বায়না নিয়ে যেতে। (চমৎকার আলাপ!) আসার পর আইভি ভাইবোনের কথার মাঝখানেই সিঁড়ি দিয়ে গান গেয়ে নেমে জ্যোতির সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করলে। (চাকর খুড়োর টাকে বাবুর্চি-ভাইপো তখন গানের তাল ঠুকছে)। গানের মধ্যে আইভি বারবার জ্যোতির কাছ ঘেঁষতে চাইলে কিন্তু জ্যোতির ছিটকে ছিটকে সরে বসার ভাব দেখে তখনই মনে হলো যে আইভির প্রতি তার আকর্ষণ নেই, নিশ্চয়ই তার দৃষ্টি পড়বে পরে আর কারুর ওপরে। এর পর জ্যোতিকে বন্দুক নিয়ে বনে ঘুরতে দেখা গেলো। বনের এক কুটিরে দেখা গেলো এক রুগ্ন বৃদ্ধ আর তার সেবায় দুই অনূঢ়া মেয়ে। ধানিপটকার মতো বন্দুকের একটা আওয়াজ হলো আর বৃদ্ধ সেই শব্দেই মারা গেলো। মেয়ে দুটি কান্না আরম্ভ করলে। সে কান্না পৌঁছলো জ্যোতির কানে। জ্যোতি এসে কুটিরে পৌঁছলো, আর মেয়ে দুটির মধ্যে বড়টি তার কাছে বন্দুক দেখে তাদের বাবার মৃত্যুর জন্যে জ্যোতিকেই দায়ী করলে। তাই শুনে জ্যোতি যেমন এসেছিলো, নির্বাক ফিরে গেলো এবং তার সঙ্গীর কাছে বন্দুক সমর্পণ করে দিলে। (ঘটনা ও পরিস্থিতির রচনার জন্যে কাহিনীটি যদি এরই মধ্যে কারুর শুকনো ও একঘেয়ে লেগে থাকে তো আমরা নাচার, কারণ ছবিতেই এই রকম)। বন্দুক সমর্পণের পর জ্যোতির ফিরতি পায়ের বদলে অন্য দুটি পা মেয়ে দুটির সামনে এসে থামলো। পদাধিকারী স্যুট পরা এক ব্যক্তি। বৃদ্ধের মৃত্যুর কথা শুনেই সে মেয়ে দুটির কাছে দেরাজের চাবি চাইলে। দু'একবার চড়া স্বরে দাবী জানাতেই বড় মেয়েটি ওর হাতে চাবি দিয়ে দিলে। দেরাজ খুলে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আগন্তুক জানালে যে সে টাকাকড়ি বা গহনাপত্তরের জন্যে আসেনি, সে চায় একটুকরো হলদে কাগজ। এখন বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেলো। মোটরের দরজা বন্ধ করার শব্দটা আগেকার মারাত্মক বন্দুকের শব্দের অনুপাতে কামানের আওয়াজ মনে হলো। আওয়াজ পেয়ে আগন্তুক গিয়ে দাঁড়ালো দরজার পাশে। ঘরে এসে প্রবেশ করলো ডাঃ বসু আর এক যুবক। মেয়েদের কথায় জানা গেলো সে ওদের জীবনদা। ওরা চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে ঢুকতেই আগন্তুক সেই লোকটি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। জীবনের কাছ থেকে শোনা গেলো বড়ো মেয়েটির নাম অলকা। অলকা সেই আগন্তুকের কথা ও তার অদ্ভুত আচরণের কথা জানাতেই জীবন বেরিয়ে পড়লো তার খোঁজে। অল্প দূরেই তাকে ধরে ফেললে। কিন্তু আগন্তুকের চড়া কথা, ঘুষি এবং পিস্তল দেখেই জীবন তার বশ হয়ে গেলো

এবং আগন্তুককে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে রাজী হলো। আগন্তুক তাকে ধনী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে এবং তখনই দিলে পাঁচশো টাকা। আগন্তুক তার নাম জানালে চক্রপাণি চাকী। জীবন ফিরে এসে ডাঃ বসু ও অলকাদের প্রশ্নের উত্তরে জানালে যে, সে আগন্তুকের দেখা পেয়েছিলো, তবে সে লোকটি অলকার বাবার বন্ধু এবং ওদের হিতৈষী। ডাঃ বসু অলকাদের ওভাবে একা ফেলে আসা সমীচীন নয় মনে করে ওদের নিয়ে নিজের বাড়িতে চললেন। এক ফাঁকে জীবন এসে চক্রপাণিকে সে খবর দিয়ে গেলো। জ্যোতি একটা লোককে খুন করার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে আর অলকার তখনকার অসহায় চেহারার কথা মনে করছে এমন সময় ডাঃ বসু অলকাদের এবং জীবনকেও সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরলেন। জ্যোতি জানালে অলকার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে। ঠিক হলো অলকার জ্যাঠতুতো দাদা মহীতোষ যার আসবার কথা ছিলো, সে যদি এসে না পৌঁছয় তো ডাঃ বসু ওদের কলকাতায় নিয়ে যাবেন। রাত্রে অলকা ও বোন মেনকার শুতে যাবার সময়কার আলাপে জানা গেলো অলকার সঙ্গে জীবনের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। (গল্পটা শেষ করতে আরও ধৈর্যের দরকার, কিন্তু তার জন্যে আমরা দায়ী নই)। পরদিন বেয়ারাকে একখানা চিঠি হাতে যেতে দেখে আইভি তাকে জেরা করে জানলে চিঠি লিখছে জ্যোতি অলকাকে। চিঠিখানা আইভি নিয়ে পড়েই ক্ষেপে গেলো যেনো। জ্যোতির কাছে গিয়ে চিঠিখানা তার দিকে ছুঁড়ে তার নামে অলকাকে ভালোবাসার অভিযোগ আনলে। আইভি এতো চটু করে অলকার প্রতি জ্যোতির ভালবাসা ধরতে পারলে কারণ সে বললে যে সে জানে আগে বেদনাবোধ, তারপর সহানুভূতি, তারপরই প্রীতি—এই হলো প্রেমের সাইকলজি। জ্যোতির কাছ থেকে এক ঝটকায় আইভি একেবারে কলকাতার বাড়িতে এসে ঢুকলো জীবনকে সঙ্গে নিয়ে। উৎকোচ, উৎসাহ ও উপরাগ দেখিয়ে আইভি জীবনের কাছ থেকে অলকার জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাইলে। তারপর আইভি তার মাকে গিয়ে জানালে জ্যোতি আর অলকার ব্যাপার। লেডি চৌধুরী জানালেন যে, তিনি আইভির জন্মদিনের এমন একটা পার্টি করবেন যা কেউ দেখেনি কখনও। সেই পার্টিতে তিনি জ্যোতি আর আইভির বিবাহ-বার্তা ঘোষণা করবেন।

ইতিমধ্যে ডাঃ বসুও তাড়াতাড়ি জ্যোতির বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত, সেইসঙ্গে লিলিকেও পাত্রস্থ করতে চান। লিলির জন্য তিনি জীবনকেই উপযুক্ত বেছে নিলেন। অলকা আর মেনকা এসে উঠেছিলো ওদের দাদা মহীতোষের বাড়ীতে। মহীতোষের স্ত্রী ওদের গঞ্জনায় অস্থির করে তোলে, কিন্তু অলকার কাছ থেকে ওদের খরচ বাবদ টাকা পেয়ে কথঞ্চিত শান্ত হয়। (আর খানিকটা ধৈর্য)। ইতিমধ্যে চক্রপাণিকে দেখা গেলো মিঃ দত্তের বাড়ীতে। জানা গেলো চক্রপাণির আসল নাম নিরঞ্জন, সে মিঃ দত্তের জামাতা, সীতার স্বামী। ১৮ বছর আগে তার জেল হওয়ায় সীতা পাগল হয়ে যায়। মিঃ দত্ত নিরঞ্জনকে নিয়ে যায় সীতার পাশে; সীতাকে সে অবস্থায় দেখে নিরঞ্জন দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে সেখান থেকে চলে যায়। জীবন তখন ডাঃ বসু, জ্যোতি ও লিলির সঙ্গে চা খাচ্ছে। ডাঃ বসু তখনই লিলিকে তার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করে চলে গেলেন। একটু পরে জ্যোতিও চলে গেলো। জীবন লিলির কাছে প্রেম জানাবার সুযোগ পেলে। ডাঃ বসু ফিরে আসতেই লিলির হাত কেটে গেলো, ডাঃ বসু গেলেন ওষুধ আনতে। জীবন লিলিকে প্রেম জানাতে আরম্ভ করলে তার হাত ধরে; হাতটা সত্যিই কাটেনি, কারণ ছুরিটা ছিলো মাখন মাখাবার, আর ডাঃ বসুকে সরিয়ে প্রেম করার জন্যেই লিলি অমন ভাণ করেছিলো। ওরা হাত ধরে প্রেম নিবেদন করছে এমন সময় জ্যোতি এসে দাঁড়ালো ওষুধ নিয়ে। এরপর দেখা গেলো নিরঞ্জন জীবনকে হুকুম করছে অলকাকে সীতার সেবার জন্যে নিয়ে আসবার জন্যে। রাগারাগির পর জীবন গেলো অলকাকে আনতে। ইতিমধ্যে আইভি তার জন্মদিনে অলকাদেরও নিমন্ত্রণ করেছে, জ্যোতির সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে, ওদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে। জ্যোতি চেয়েছিলো অলকারা তাদের বাড়ীতে এসে থাকুক। কিন্তু ডাঃ বসু রাজি হননি। জ্যোতি অলকার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে। জ্যোতি চলে যাবার পর অলকার কাছে এলো জীবন। অলকা তার কাছে গলার হার খুলে দিয়ে সেটা বিক্রী করে টাকা এনে দিতে বললে, কারণ তা নাহলে বৌদি ওদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কথায় কথায় জীবন অলকাকে সীতাকে সেবা করার চাকরির কথা বললে; অলকা রাজী হলো। অলকাকে জীবন

নিরঞ্জনের কাছে হাজির করলে। অলকা প্রথমে জব্বলপুরের সেই দুর্বৃত্তকে দেখে ভীতা হয়েছিলো, কিন্তু নিরঞ্জন যেই জানালে যে তার স্ত্রী রুগ্না আর অলকাকে তার সেবার ভার নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে অলকা দরদে গলে গিয়ে রাজী হয়ে গেলো। নিরঞ্জন তাকে নিয়ে হাজির করলে মিঃ দত্তের কাছে। মিঃ দত্ত চাকরি দেবার আগে অলকাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, কারণ এর আগের নার্সরা রুগীর দিকে না চেয়ে পয়সাটাই দেখেছে তাই তিনি দেখেশুনে লোক রাখতে চান। অলকাকে নিয়ে গিয়ে সীতাকে দেখিয়ে আনা হলো। অবস্থা দেখে করুণায় ভরে গিয়ে অলকা যেই জানালে যে সীতার কষ্ট দেখলে চোখে জল আসে, ব্যস্, তাতেই খুসি হয়ে মিঃ দত্ত ওকে বহাল করলেন; মেনকাকেও সেখানে আনানো হলো এমন কি আইভির জন্মদিনে ওদেরও নিমন্ত্রণ জেনে মিঃ দত্ত নিজেই ওদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন বললেন। পরদিন মিঃ দত্ত ওদের ভালো ভালো পোষাক ও গহনা ব্যবহার করতে দিলেন, ওরা গিয়ে পার্টিতে হাজির হলো। এর আগে অলকাকে নিয়ে জ্যোতি আর আইভির মধ্যে এক পশলা হয়ে গিয়েছে। আইভি একা বাগানের কোণে বসে আছে দেখে জীবন তাকে একটা উপহার দেবার জন্যে এলো। আইভি দেখলে একছড়া হার, তার লকেটে প্রমাণ ফুলস্কাপ মাপের একখানা হলদে কাগজ। হলদে কাগজ দেখেই জীবন সেটা নেবার জন্য ব্যস্ত হলো, কিন্তু আইভি তা দিতে চাইলে না। জীবন নিরঞ্জনকে সে খবর দিলে নিরঞ্জন পিস্তল দেখিয়ে আইভির কাছ থেকে সেটা আদায় করতে গিয়ে গুলী ছুড়লে। আইভি পড়ে যেতে জীবন কাগজ নিয়ে পালালো। পার্টি থেকে মিঃ দত্ত অলকাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরতে নিরঞ্জন তাদের কাছে জানালে যে সেই আইভিকে হত্যা করেছে। বলে সে নিজেকে ধরা দেবার জন্যে পুলিসকে টেলিফোন করলে এবং তারপর হলদে কাগজের রহস্য প্রকাশ যা করলে তাতে জানা গেলো যে আঠারো বছর আগে তার জেল হওয়ার সময় সীতা পাগল হওয়ায় সে জব্বলপুরে তার বন্ধু প্রাণতোষের কাছে তার শিশু কন্যাকে রেখে আসে এবং রটিয়ে দেয় যে তার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। ঐ হলদে কাগজেই প্রাণতোষের সঙ্গে তার সেই চুক্তি-নামা এবং তার সেই শিশু কন্যাই হচ্ছে অলকা। তারপর পুলিস এসে নিরঞ্জনকে হাত-কড়া পরালে; সীতা তার স্বামী সন্তানকে ফিরে পেয়ে জ্ঞান ফিরে পেলে কিন্তু নিরঞ্জনকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে আবার সে আছড়ে পড়ে জ্ঞানহীনা হলো আইভি মৃত্যুর আগে জবানবন্দী দিলে যে তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। অর্থাৎ জ্যোতির জীবন থেকে আইভি নিলো বিদায় সীতার জীবন থেকে নিরঞ্জন, আর অলকার জীবন থেকে জীবন তো আগেই সরে পড়েছে। (গল্পটা শেষ করতে পারলে ধৈর্য ধরার পরীক্ষায় বাজী রেখে জেতা যায় অবশ্য ছবিতেই তাই)।

কোন সার বস্তু নেই, বক্তব্য নেই নাটকীয় পরিস্থিতিও নেই। তাই আগাগোড়া কোনখানে অণুমাত্র আবেগও জাগে না, অনুরাগও নয়। মন্থরগতি নিষ্প্রভ সংলাপ। কোনরকমে গোঁজা-মিল দিয়ে ঘটনার সূত্র ধরিয়ে যাওয়া এমন বাজে কাহিনী ও পরিচালনা সচরাচর চোখে পড়ে না, তার সঙ্গে যোগ মিলতে শচীন সেনগুপ্তের মতো একজন সেরা নাট্যকারও কতোটা বাজে হ'য়ে যেতে পারেন ছবিখানি শুধু তারই একটি স্মারক।

ধূসর মনের আকৃতি

দীপংকর দাশগুপ্ত

আমার সাহারা মনে ওরা তবু কথা ক'য়ে ওঠেঃ
তৃষার্ত উটের সারি ওয়েসিস্ খুঁজে ফেরে বুঝি,
বেদুঈন, শোনো শোনো, নিঃশেষিত জীবনের পুঁজি।

মৃত মন প্রজ্জ্বলিত অকরুণ সূর্যের বিভায়,
আরক্তিম বালিকণা উড়ে চলে ঝড়ের হাওয়ায়,
দিগ্‌ভ্রান্ত বেদুঈন, এ-মরুতে পথ চলা দায়।

সবুজ ঘাসের রঙ এখানেতো এতটুকু নেই,
নির্জন খর্জুর বন হ'য়ে গেছে মরু-মরীচিকা,
বেদুঈন, তবু কেন অনির্বাণ চোখে স্বপ্ন-শিখা?

আমার ধূসর মনে ওরা তবু কথা ক'য়ে ওঠেঃ
কথা কয়, কথা কয়,—কী উচ্ছল স্বপ্ন-ফুল ফোটে।

ঘুম

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ঘুম চাই, কিছুক্ষণ, ঘুম চাই গভীর-গহন
সব দুঃখ-দায় থেকে প্রশান্ত মরণ
ঘুম চাই, চাই ছুটী দায়-ছুট শান্তির পাড়ায়—
তেপান্তের নিঃসঙ্গতা, মুগ্ধ মৌন দু'হাত বাড়ায়
যেখানে বন্ধুর মত, বুকে টানে ক্লান্ত চেতনাকেঃ
ফেরারী ঘোষণা করো সেখানে আমাকে।

সেখানে আমাকে দাও খানিক আশ্রয়।
খ্যাতি, অর্থ, প্রেম, হিংসা কোনো কিছু নয়—
শুধু ঘুম, একা-একা, একাকীর অতল তিমিরে
ঘুমুবো নিজেকে নিয়ে হৃদয়ের তীরে
নিগূঢ়, নিঝুম—
ঘুম দাও স্বপ্নহীন, স্বাদহীন ঘুম।

ঘুম চাই জ্ঞান আর বুদ্ধি থেকে পূর্ণ বিরতিরঃ
শাসন বিলুপ্ত চাই কষ্টের স্মৃতির;
চাই মুক্তি এই আলো, অন্ধকার থেকে—
যা কিছু সহজ সত্য এতদিন গেছে চুরে-বেঁকে
সে সবেরে ফিরে পেতে চাই।
ঘুম চাই, ঘুম ছাড়া হবে না যাচাই।

ফাল্গুনে

নলিনীকান্ত রায়

বসন্ত-আবিরে আজ আকাশের চোখ ঝলমলো,
আবার ফাগুন ফিরে এলো।

মাটির কঠিন বুক, স্নেহ-হারা বঞ্চিতা পৃথিবী—
ধূসর মধ্যাহ্নে যেন সাহারার ক্লান্ত এক ছবি।
ঝড়ের হাওয়ারা আজো বয়ে আনে ঢের
অনেক আগস্ট আর পঞ্চাশের জের।
চোখের ব্যথায় ভেজা মৃত্তিকার তাল
রক্ত মেখে আরো হলো লাল।

তবু তো ফাগুন এলো
সবুজ ওড়না গায়ে, মহুয়ার মদে টলমলো।
পলাশের বনে জাগে রক্তিম গুঞ্জন,
প্রাণ আর মন
তবু কাঁপে,—কেঁপে ওঠে হৃদয় বীণার যতো তার
নরম আঙগুল ছুঁয়ে কার।

শূন্য বুক—ব্যর্থতার দৈন্যে ভরা নীরব হৃদয়,
ভুলে গেছি জীবনের যতো পরিচয়।
তবু যেন মনে হয় খাতায় কলমে
বারেক মিলিত করি লিখে যাই একান্ত গোপনে
ছোট ছোট গোটা দুই কথা—
ফাগুনের নতুন বারতা।

মহানাগরিক

নির্মলেন্দু গুপ্ত

নগরীর নভে বৈশাখী ঝড় মাঝে মাঝে দেয় দোলা;
ভিৎ-ভাঙা সেই ঝড়ে,
হাতীর দাঁতের মিনারের মর্মরে
অচলায়তন-বাতায়ন হয় খোলা।
বৈশাখী সেই ঝড়—
নাড়া দিয়ে যায় রাত্রির অম্বর
(রাত্রি যেখানে ঘৃণার নীলিমা মাখা
দাঁড়কাক রাত ময়ূর-পুচ্ছে ঢাকা!)
ছাতের কোণের টবের সিউলি ঝাড়ে,
সেই চৈতালী ঝড়ের ইসারা আসে,
এখানে-ওখানে কৃষ্ণ-চূড়ার সারে
আরণ্যকের নিবিড় স্বপ্ন ভাসে,
এই নগরেও আষাঢ়ের পরিবেশে
কাজল-মেঘের অতল-নিবিড় নামে
হাস্নুহানারা স্তব্ধ কোন-ও যামে,
কেঁপে কেঁপে ওঠে গ্রামীন স্বপ্নাবেশে।
নগরীর নভে চৈতালী ঝড় মাঝে মাঝে দেয় সাড়া
অচলায়তন প্রাচীরের ভিৎ-নাড়া!
উদ্ধত সেই মিনার—কাঁপিলো ঝড়ে
সাড়া দিয়ে যায় রাত্রির অম্বরে।

খেলাধূলা

হকি

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কোনরূপেই শেষ হইতে পারে না দ্বিতীয় সপ্তাহেও হইবে কিনা সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ ইহার মধ্যেই কালবৈশাখীর আগমনের সূচনা দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই অপরাহ্ণে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল বাত্যাসহ বারিপাত হইতেছে। ইহাতে হকি খেলা পরিচালনায় যে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে ইহা বলাই বাহুল্য। ঠিক সময় মরসুমের খেলা আরম্ভ না করিয়া পরিচালকগণ কি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন ইহা উপলব্ধি করিলেও দ্রুত শেষ করিবার কোনই উপায় নাই। ইহার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কিভাবে দ্রুত শেষ করা যায় এই চিন্তাই উঁহাদের বিশেষ বিচলিত করিয়াছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা যদি আগামী বৎসরে ঠিক সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে বাধ্য করে তবেই বুঝা যাইবে ইঁহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে। আমরা কিন্তু এই বিষয় খুব নিঃসন্দেহ নহি।

প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া কাস্টমস, মোহনবাগান ও ভবানীপুর এই তিনটি দলের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল এখনও তাহা বর্তমান আছে। তবে ভবানীপুর অপর দুইটি দল অপেক্ষা একটি বিষয়ে গৌরব করিতে পারে, তাহা হইল এই দলের অপরাজিত আখ্যা। কাস্টমস ও মোহনবাগান উভয়েই একটি করিয়া খেলায় পরাজয় বরণ করিয়াছে, ভবানীপুরের ভাগ্যে তাহা হয় নাই। এই জন্যই অনেকে আশা করেন ভবানীপুর এইবারের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব লাভ করিবেন। আমরা কেন জানি না ঐ অভিমত দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিতে পারিতেছি না। আমাদের কেবলই মনে হইতেছে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ানই এইবারের সম্মান লাভ করিবেন। কাস্টমস দল একটি খেলায় পরাজিত হইলেও দলের খেলোয়াড়দের খেলিবার পদ্ধতি ও দৃঢ়তা অপর দুই দল অপেক্ষা যে ভাল ও প্রশংসনীয় ইহা আমরা না বলিয়া পারি না। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত কাস্টমস দল চ্যাম্পিয়ান হইলে আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হইব না। ভবানীপুর দল যদি চ্যাম্পিয়ান হয় তাহা হইলেও আমরা আন্তরিকভাবেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব। বিভিন্ন দলের পরিত্যক্ত খেলোয়াড়দের একত্র সমাবেশে গঠিত ভবানীপুর দল এই পর্যন্ত যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং শেষ পর্যন্ত উহা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এইজনাই আমরা ভানবীপুর দলের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। মোহনবাগান লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে যেরূপ খেলিতেছিল তাহাতে সত্য সত্যই আমাদের পর্যন্ত মনে আশা হইয়াছিল কোন দলই ইহাদের চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। কিন্তু বর্তমানে এই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেককেই যেন ক্লান্ত ও শক্তিহীন বলিয়া মনে হইতেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অথবা কি কারণে বলা কঠিন খেলার পদ্ধতির মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। ঠিক কোন একটা নিয়মিত ধারায় এই দল আক্রমণ রচনা অথবা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করে না। এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়া ফেলিলেই স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই ধারণা যেন প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। সুতরাং আমরা যে ফলাফল সম্পর্কে উল্লেখ করিতেছি তাহা হইবেই এইরূপ ধারণার বশবর্তী হওয়াও অন্যায় হইবে। এই বারের প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ যেরূপ জটিলতা ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই—ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট দল যে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এই দলকে দ্বিতীয় ডিভিসনে পুনরায় খেলিতে হইবে সে বিষয়ে কোন কোনই সন্দেহ নাই। অপর কোন দল রাজস্থান অথবা কালীঘাট উঁহাদের অনুগামী হইবে তাহা শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগের ২রা এপ্রিল পর্যন্ত যে ফলাফল হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—
হইল:—

হকি লীগ-কোঠায় কাহার কি স্থান

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বি	পয়েঃ
কাস্টমস	১৭	১৩	৩	১	৩১	৬	২৯
মোহনবাগান	১৬	১৩	২	১	৪৮	১০	২৮
ভবানীপুর	১৪	১১	৩	০	৩১	৭	২৫
পাঞ্জাব স্পোঃ	১৭	১০	৩	৪	৩৫	১৪	২৩
মেসারার্স	১৭	৮	৪	৫	২৪	১১	২০
ইস্টবেঙ্গল	১২	৭	৩	২	১৯	৯	১৭
ডালহৌসী	১৬	৬	৪	৬	১৫	৯	১৬
ক্যালকাটা	১৫	৭	২	৬	২৬	৩৪	১৬
গ্রীয়ার	১৬	৫	৫	৬	২৫	২৫	১৫
পুলিশ	১১	৭	০	৪	২০	১২	১৪
আর্মেনিয়ান্স	১৪	৩	৮	৩	১৫	১৪	১৪
রেঞ্জার্স	১৪	৫	৪	৫	১১	১৮	১৪
ক্যালঃ গ্যারিঃ	১৪	৫	৩	৬	২২	১৯	১৩
স্টোপা	১৪	৫	৩	৬	১২	২৯	১৩
পার্শী	১৩	৪	২	৭	১৩	২৪	১০
মহঃ স্পোর্টিং	১৭	৩	৪	১০	১৪	৩০	১০
পোর্ট কমিঃ	১৩	৩	৩	৭	১০	২৪	৯
সেণ্ট জেমস	১২	২	৪	৬	৯	১৩	৮
কালীঘাট	১৪	২	২	১০	৫	৩১	৬
রাজস্থান	১৬	১	৪	১১	৫	৩৬	৬
বালীগঞ্জ ইনঃ	১৪	০	০	১৪	৪	৩৫	০

আগা খাঁ হকি কাপ

বোম্বাইয়ের আগা খাঁ হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যের বিশিষ্ট দলসমূহ ইহাতে যোগদান করিয়াছে। বাঙ্গলার কাস্টমস ও পাঞ্জাব স্পোর্টস দলও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। প্রতিযোগিতাটির কয়েক বৎসর পূর্বেও সেইরূপ কোন খ্যাতি ছিল না বাঙ্গলার বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতাই ছিল ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা কিন্তু বর্তমানে আগা খাঁ হকি কাপ প্রতিযোগিতাই যেন বেটনের সকল গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসরের একটি প্রতিযোগিতা এইভাবে অর্ধ শতাব্দীর অধিককালের পরিচালিত বেটন কাপের সকল গৌরব ও সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল কি করিয়া, ইহা চিন্তা করিলেই অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন, কিন্তু আমরা এতটুকুও আশ্চর্য হই নাই। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হইতেই বেটন কাপের প্রাধান্য ধ্বংস করিয়া আগা খাঁ কাপের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। ঐ সময় বেটন কাপের পরিচালকদের সাবধান পর্যন্ত করিয়া দিবারও চেষ্টা করি। পর পর কয়েক বৎসর একই বিষয় উল্লেখ করিয়া যখন দেখা গেল পরিচালকগণ একরূপ সব কিছু জানিয়া শুনিয়াও নীরব, তখন অযথা একটা বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা হইতে নিজেদের সংযত করি। বেটন কাপ প্রতিযোগিতা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হিসাবে অন্যান্য রাজ্যের হকি দল মনে করেন না, তাহার প্রমাণ এইবারের বেটন কাপের যোগদানকারী দলসমূহের নামই উহা প্রমাণিত করিবে; সুতরাং ঐ বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইলেন "বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন" অথচ বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, এমন কি কলিকাতায় যাহা কিছু মুষ্টিযুদ্ধ হয়, তাহা পরিচালনা করেন "বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন"। ইহাতে সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে বেঙ্গল বক্সিং ফেডারেশন তাহা হইলে কি করেন এবং তাঁহাদের কর্মসূচী কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হইলে এমন অনেক কিছু বলিতে হইবে যাহার ফলে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে। এইজন্য আমরা এই সকল প্রশ্নকারীদের সরাসরি বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি। বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন সম্পর্কে এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল বাঙালী যুবসমাজের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচার ও প্রসারের একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্যও উক্ত এসোসিয়েশনে কয়েকজন নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কর্মীও আছেন। এই সকল কর্মী সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ, বাধা-বিপত্তি অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া লক্ষপথে চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইজন্য ইঁহাদের গতি আছে, শিথিলতা নাই।

দেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—ভারতীয় পার্লামেন্টে দেশরক্ষা মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার দেশরক্ষাবাহিনী হইতে ৫০ হাজার লোক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ৫০ হাজারের অধিকাংশকে ইতোমধ্যে ছাঁটাই করা হইয়াছে। দেশরক্ষা দপ্তর সামরিক সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য যেভাবে বিদেশী ফার্মের নিকট অর্ডার দিয়াছিল, তৎসম্পর্কে শ্রীশিব রাও ও পণ্ডিত কুঞ্জরু পার্লামেন্টে অতীব চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। শ্রীশিব রাও বলেন যে, দেশরক্ষাদপ্তর ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের দুই হাজার জীপ গাড়ীর জন্য ইংলণ্ডের এমন একটি ফার্মকে অর্ডার দিয়াছিল যাহার মূলধন মাত্র ৬০৫ পাউণ্ড।

অদ্য হাওড়া পৌর সভার কমিশনার নির্বাচনে ১নং হইতে ৫নং ওয়ার্ড পর্যন্ত পাঁচটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

কংগ্রেসপ্রার্থী মিঃ আব্দুস সত্তার (খাঁ সাহেব) বিপুল ভোটাধিক্যে ২৪ পরগণা মধ্য পল্লী মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৭শে মার্চ—কংগ্রেসকর্মী **মহম্মদ কাসেম** আলী অদ্য বিপুল ভোটাধিক্যে ২৪ পরগণা উত্তর-পূর্ব পল্লী মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই উপনির্বাচনে কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল।

২৮শে মার্চ—হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছে। মোট ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস-প্রার্থিগণ পাইয়াছেন ১৪টি, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক পাইয়াছেন ১৫টি এবং একটি আসন লাভ করিয়াছেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

অদ্য কলিকাতায় এসপ্লানেড অঞ্চলে উদ্বাস্তু নরনারীর শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চালনা করে। প্রস্তাবিত অনধিকারী উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য শোভাযাত্রাটি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। ঐ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে এবং তাহাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে লাঠি চালনা করে। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীমতী লীলা রায় এবং শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অদ্য ভারতীয় পার্লামেন্টে পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বিতর্কের উত্তর দান

সাপ্তাহিক সংবাদ

প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর আইনত ও রাজনৈতিক দিক দিয়া ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২৯শে মার্চ—অদ্য দিল্লীর আকাশে একখানা অজ্ঞাত পরিচয় বিমানের আবির্ভাব হয়। বিদেশাগত এই বিমানখানা দিল্লীর আকাশে প্রায় ১৫ মিনিট ঘুরিয়া বেড়ায়। অতঃপর উহা অতি উচ্চে উঠে এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়িয়া যায়। উহার গতিরোধের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের আদমসুমারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ কে মিত্র এক বিবৃতিতে জানান যে, ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৮৩; তন্মধ্যে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯৬।

পশ্চিমবঙ্গে মোটর যানসমূহের উপর বর্ধিত হারে কর ধার্য করার উদ্দেশ্যে আনীত বঙ্গীয় মোটর যান কর (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বিলটি অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হয়।

গতকল্য কলিকাতায় উদ্বাস্তু শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি চালনা এবং উদ্বাস্তুদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অদ্য কলিকাতার অধিকাংশ স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। এই দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র ও উদ্বাস্তুদের এক বিরাট সভায় উদ্বাস্তুদের উপর লাঠি চালনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী জানান হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসৌরেন মিশ্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর দুইজন প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন।

অদ্য পাকিস্থান পার্লামেন্টে সর্দার সৌকত হায়াত খাঁ এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, করাচী হইতে সাত মাইল দূরবর্তী মৌরীপুর বিমান বন্দরের একাংশ বৃটিশ বিমানবহরের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—অদ্য ভারতীয় পার্লামেন্টে পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী এ পি জৈন বলেন যে, সহর অঞ্চলে উদ্বাস্তু সম্পত্তি সম্পর্কে পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট যে বেপরোয়া এবং অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, ভারত গভর্নমেণ্ট উহা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিতেছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী পক্ষ রেলওয়ে রসিদ জাল করিয়া প্রতারণা করার অপরাধে দণ্ডিত শ্রীরাধাশ্যাম চনচনিয়া নামে জনৈক ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সর্তাধীনে মুক্তি দান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে কিছুক্ষণের জন্য পরিষদ কক্ষে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ নীতি সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ। ওয়াশিংটনে আমেরিকার ২১টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেন যে, পশ্চিম গোলার্ধকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় যাহারা কম্যুনিস্ট কর্তৃত্ব হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের সাহায্যের জন্যও সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

২৭শে মার্চ—জেনারেল ম্যাকআর্থার অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জে বলেন, "কম্যুনিস্টদের সামরিক শক্তি দুর্বার—গত মাসের যুদ্ধেই এই ভ্রান্তধারণার নিরসন হইয়াছে।"

৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তরদিকস্থ কুমওয়া হইতে চুনচুন পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য কোরিয়ার সড়ক বরাবর ৯০ হাজার কম্যুনিস্ট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া অদ্য রাত্রে জনৈক মার্কিণ মুখপাত্র হিসাব করিয়াছেন।

২৯শে মার্চ—জেনারেল ম্যাকআর্থার যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইবার জন্য কোরিয়া রণাঙ্গনস্থিত কম্যুনিস্ট সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎকারের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অদ্য পিকিং বেতারে প্রচারিত এক বিবৃতিতে তাহা উত্তরদানের অযোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

অদ্য বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যদল সিউলের পূর্বদিকে এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে। এই এলাকায় আক্রমণকারী সৈন্যদল ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা হইতে অনুমান ৮ মাইল দূরে উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ কোরীয় সৈন্যদল ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দশ মাইল উত্তরে উপনীত হইয়াছে।

অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী বি এন রাও বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সালিশীর যে প্রস্তাব করিয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ । শনিবার, ৩১শে চৈত্র, ১৩৫৭ সাল। Saturday, 14th April, 1951. [২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙালীর নববর্ষ

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। ১৩৫৭ সাল অতিক্রান্ত হইয়া ৫৮ সালের বর্ষচক্র বিঘূর্ণন আরম্ভ হইল। কালের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অতীতের দুঃখ ও বেদনা বিস্মৃত হইয়া ভবিষ্যতের দিকেই আমরা তাকাইব এবং অনাগতকেই অভিনন্দিত করিয়া লইব। মানুষের ইহাই ধর্ম। ভ্রান্তির ভিতর দিয়া নূতন শক্তির অভিব্যক্তিতে স্মৃতির নবজন্ম লাভ। কয়েক বৎসর হইল বাঙলার বুকের উপর দিয়া দুঃখ-দুর্দৈবের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। গত বৎসরও তাহার বিশেষ কিছু নিরসন ঘটে নাই। দিল্লী-চুক্তির ফলে দেশের বুকে একটা ভরসা অবশ্য জাগিয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর পরেও সে সমস্যার সমাধান সম্যকরূপে হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। কারণ পূর্ববঙ্গের শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রভুত্ব এখনও চলিতেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র-শাসনের ক্ষেত্রে কার্যত সমানাধিকার সেখানে অদ্যাপি স্বীকৃত হয় নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ন্যায় সুখী মানুষ পৃথিবীতে দেখা যায় না, সেখানকার গভর্নর সেদিনও করাচীতে গিয়া গর্বভরে এমন কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান জগতে দেশের রাষ্ট্র-নীতি পরিচালনে যাহাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহাদের আবার মানুষের মর্যাদা কোথায় এবং মনের সুখ বা সন্তোষই বা কেমন করিয়া থাকা সম্ভব? সুতরাং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বেদনা এখনও ঘুচে নাই এবং পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনেও তজ্জনিত গ্লানির ভার আসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে উভয় বঙ্গের সম্পর্ক এখনো নিরবচ্ছিন্ন রহিয়াছে। বস্তুত বাঙলাদেশের এক অংশকে রাতারাতি অপর অংশের পক্ষে পর করিয়া তোলা যায় না; কিন্তু কার্যত পূর্ববঙ্গের শাসন-নীতিতে তেমন চেষ্টাই চলিতেছে। উর্দু চালাইয়া এবং আরবী হরফের রেওয়াজ করিয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সেখানে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য চক্রান্ত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের কুড়িটি কেন্দ্রে ইহার মধ্যেই আরবী হরফে বিদ্যা বিতরণ সুরু হইয়া গিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি একটা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ফলেও উভয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সাধিত হয় নাই। পক্ষান্তরে উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রানীতিও সমস্যাকে জটিলতরই করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর কাশ্মীর সমস্যা আমাদের ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়া রহিয়াছে। এই সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার দৌরাত্ম্য কোন দিন আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে, এ আতঙ্ক আমাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের নিজের সমস্যাও কম নয়। কেন্দ্রীয় সরকার 'খাদ্য ফলাও' আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে এই বাবদ ভারত সরকারের প্রায় ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রধানত অপচয়ে গিয়াছে বলা চলে। ভারত অন্নের জন্য বর্তমানে অপর দেশের দুয়ারে ভিখারীর অবস্থায় উপনীত। পশ্চিমবঙ্গ অন্নাভাবে পীড়িত। নূতন বৎসরে এই সংকট সর্বাধিক জটিল হইয়া উঠিবে, এমন আশংকাও রহিয়াছে। বিশ্বের দিকচক্র যুদ্ধের আতঙ্কে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যদি পুনরায় একটা বিশ্বগ্রাসী সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তবে আমাদিগকে অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে হইবে, আশ্চর্য নাই। ইহার উপর বস্ত্র-সংকট। বস্ত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং বণ্টন এই দুই দিকেই সরকারের নীতি-ব্যর্থতা পর্যাপ্তরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ বস্ত্রের এমন অভাব কোন দিনই দেখা যায় নাই। সর্বোপরি আছে উদ্বাস্তু সমস্যা। বাঙলার সমাজ-জীবনের একটা বৃহৎ অংশ বর্তমানে নিরাশ্রয় ও গৃহহীন এবং ইহার প্রতিক্রিয়া বাঙলার সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাকে কার্যতঃ বহু দিন পর্যন্ত কোনরূপ গুরুত্বই প্রদান করেন নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এদিকে তাঁহাদের কিছু দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতৎসম্পর্কিত নীতি কতকটা সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। দেশের এই অবস্থা এবং জাতির আজ এমনই দুর্গতি; অথচ এই সব দুঃখকষ্ট এবং অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেও শাসকদের আপত্তি এবং বিরক্তি। ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাহাতে রুষ্ট হইয়া উঠেন। সেদিনও তিনি অনেকটা উত্তেজিত ভাবেই বলিয়াছেন যে, এদেশের লোকেরা

অভাব-অভিযোগের কথাই শুধু তোলে। ইউরোপের লোকেরা তো সেজন্য টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করে না। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের নীতির সমালোচনায় যেমন অসহিষ্ণু, প্রাদেশিক সরকারের কর্ণধারদের মনোভাবও তদনুযায়ী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের দুঃখ-কষ্টের কারণ তাহাতে কমিতেছে না বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। দুর্নীতির জাল চারিদিকে সম্প্রসারিত—মানুষের জন্য মানুষের অন্তরের দরদ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেশব্যাপী চলিতেছে মৎস্য-ন্যায়ের নীতি। এরূপ অবস্থায় কিসের ভরসায় ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব, কোন আশায় আমরা দিন গণিব? অবসাদ সহজেই আসিবার কথা; কিন্তু অবসন্ন হইবার মত জাতি বাঙালী নয়। বৃহৎ আদর্শের জন্য বাঙালী অতীতে বহু সংগ্রাম করিয়াছে। *মানবতার বেদীমূলে সে অকুণ্ঠভাবে আত্মদান করিয়াছে, জাতির স্বাধীনতার আদর্শে সে আপনাদের উৎসর্গ* করিয়াছে। বঙ্গ-সংস্কৃতির এই শক্তিই আমাদিগকে উজ্জীবিত রাখিবে এবং হৃদয়ের রক্ত উৎসর্গ করিয়া নূতন বাঙলা গড়িয়া তুলিতে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। প্রলয়-অনলে নবশক্তির উদ্বোধন এখানে ঘটিবে। ইহাই বুঝি বিধাতার অভিপ্রায়। দেবতার সেই মহতী ইচ্ছা পূর্ণ হোক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ভয়ঙ্কর যিনি, তাঁহার অভয় আশীষের প্রখর আলোকে নববর্ষের বৈশাখী ঊষাকে যেন আমরা বরণ করিয়া লইতে পারি।

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি

ভারত গভর্নমেণ্ট আর এক দফা বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের এতৎসম্পর্কিত বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এপ্রিল মাসে মিলগুলিতে যে কাপড় গাইটবন্দী হইবে, সেই কাপড়ের উপরই বর্ধিত হারে মূল্যের ছাপ পড়িবে; সুতরাং এই কাপড় বাজারে আসিলে বর্তমানের নির্দিষ্ট মূল্যের অপেক্ষা শতকরা ৩, টাকা হইতে ৩৫, টাকা অধিক মূল্য দিয়া কাপড় কিনিতে হইবে। বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণস্বরূপে সরকারী বিবৃতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, দেশী ও বিদেশী তুলার মূল্যবৃদ্ধিই উপস্থিত বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। প্রধানত মিশরীয় এবং অন্যান্য বিদেশী তুলা হইতেই ভারতের কলগুলিতে মিহি কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মিহি কাপড়ের দামও বাড়াইতে হইতেছে। এ যুক্তি পরিষ্কার। কিন্তু মোটা ও মাঝারি কাপড়ের সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না। বস্তুত দেশী তুলার মূল্য বৃদ্ধিও এ পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। কারণটি অন্যত্র রহিয়াছে এবং সরকারী প্রেসনোটেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মিলওয়ালাদের দাবীই ইহার মূলে রহিয়াছে। ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে মিলের মালিকেরা অন্ন ও বস্ত্র মূল্য হ্রাসে সরকারী উদ্যমের সহায়তাকল্পে মিলে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য শতকরা ৪, টাকা হ্রাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত অন্ন ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন মিলের মালিকেরা দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির অজুহাত *উপস্থিত করিয়া বস্ত্রের মূল্য শতকরা ৪, টাকা হ্রাস বাতিল করিয়া দিয়া শতকরা ৪, টাকা বৃদ্ধির অনুমতি তাহাদিগকে দিতে* হইবে, ভারত সরকারের নিকট এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই দাবী গ্রাহ্য হইয়াছে। শিল্পপতিদিগকে এইভাবে সন্তুষ্ট করিয়া বস্ত্র সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে সরকার ইহাই আশা করিতেছেন। শিল্পমন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাব আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্ট ভারতীয় মিলগুলিতে বেশী করিয়া ধুতী ও সাড়ী উৎপাদনের নির্দেশ দিয়াছেন। তদনুযায়ী এপ্রিল মাস হইতে মিলের কাপড় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। সেই কাপড় যখন বাজারে আসিয়া পড়িবে, তখন আর কাপড়ের দুঃখ দেশের লোকের থাকিবে না। বলা বাহুল্য, শিল্পমন্ত্রী ভবিষ্যতের এই যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্তি লাভ করা সম্ভব হইতেছে না। জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের কাপড় ধুতি শাড়িতে ছাইয়া যাইবে, এমন আশা এখনও আমাদের কল্পনারও অতীত। ফলত শিল্পপতিগণ আমাদের দুর্দশা দেখিয়া কতটা সদয় হইবেন এ বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ দুর্বলতা তাঁহারা কোনদিনই দেখান নাই। পক্ষান্তরে দেশের দুর্গত নরনারীকে শোষণ করিয়া লাভের অঙ্ক মোটা করিবার দিকেই বরাবর তাঁহাদের নজর রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সরকার যদি দেশবাসীর অভাব মিটাইবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য না করেন এবং সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে দুই মাসের মধ্যেই তাঁহারা মোড় ঘুরিয়া দাঁড়াইবেন; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে অধিকতর সুবিধা দিবার জন্য আর এক দফা আবদার লইয়া তাঁহারা দিল্লীর দরবারে হাজির হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। দেশের লোকে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু তাহাদের ত্যাগস্বীকারে এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থলিপ্সা পুষ্ট হইবে, এমন অবস্থা তাহারা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়। ইহা বুঝিয়া বস্ত্র সমস্যার সমাধানে ভারত সরকারের সমধিক অবহিত হওয়াই আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

সংকট সৃষ্টির চেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিলটির আলোচনা প্রসঙ্গে নিজেদের গোষ্ঠী-স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত অহমিকার বিক্ষোভ বশে কয়েকজন সদস্য যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছি। এই সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা যে না হইয়াছে, এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং তাহাদিগকে অধিকারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষার অনুকূলে বিরোধী পক্ষ যুক্তিসঙ্গত প্রায় সকল প্রস্তাবই তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিলটির নাম যথোচিতভাবেই সংশোধিত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং তাহাদের অধিকারকে আইনগত মর্যাদা দেওয়াই ব্যবস্থাটির মুখ্য উদ্দেশ্য, সংজ্ঞায় ইহা সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষক-প্রজা এবং মজদুর দল বিলটির প্রধান বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের দাবী স্বীকৃত হওয়াতে তাঁহারা বিলের বিরোধিতা হইতে কার্যত প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু দলের ভিতরে এই ব্যাপার লইয়া উপদলীয় চক্রান্তের পরিচয় প্রকট হইয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী

মাইতি, শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা—মন্ত্রিবর্গের মধ্যে ই'হারা যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে প্রশংসনীয় মনোভাবসম্পন্ন নহেন, এ অভিযোগ পূর্ব হইতেই শোনা গিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে হাওড়াতে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও এই মনোভাব প্রকট হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী ও নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহকর্মীদের পরামর্শ ও সহযোগিতাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া মন্ত্রী মাইতি মহাশয়ের চিত্তবিক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি পরবর্তী একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে তিনি পদত্যাগ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার এমন কৃপায় আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ অনাথ হইয়া পড়িবে না, ইহা তাঁহার জানিয়া রাখা ভাল। বিরোধী পক্ষেও কয়েকজন এইরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং বিলটি যাহাতে গৃহীত না হইতে পারে, এমন চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, এই সম্পর্কে অকারণ এবং অনর্থক রকমে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের প্রসঙ্গ জড়াইয়া আনা হইয়াছে। বস্তুত এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ, হিন্দু বা মুসলমান যাহারই জমি বে-দখল হইয়া থাকুক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই মালিকদের সম্মতি ব্যতীত জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইবে না, বিলে ইহা স্পষ্ট রহিয়াছে। ফলত ব্যক্তিগত অধিকারের মূলেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব স্বীকার করাই দরকার হইয়া পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ ও অধিকারকে জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা এই ধরণের জরুরী প্রশ্নে প্রয়োজন হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রিস্বরূপে ডাক্তার রায় সেই পথেরই নির্দেশ করিয়াছেন। শুধু বাধাদানের উদ্দেশ্যেই বাধাদান করিতে হইবে, এক্ষেত্রে এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার বশে যাঁহারা পরিচালিত হইয়াছেন এবং সেইভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানকে বিলম্বিত করিয়া নিজেদের মতলব বাগাইয়া লইবার ফিকিরে আছেন, তাঁহাদের এখনও সংযত হওয়া উচিত। বাস্তবিকপক্ষে এদেশের রাজনীতিতে নেতাগিরির এমন ব্যবসা আর চলিবে না।

কংগ্রেসে ঐক্য বিধান

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে এবং কংগ্রেসের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে দল গঠন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐক্যের জন্য চেষ্টা এখনও চলিতেছে। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই চেষ্টা আজ নূতন নয়। গত ৩০শে জানুয়ারী নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুই মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং এই দুই মাসে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কোন ফলই প্রসব করে নাই। পরন্তু ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ভেদ-বিভেদই যেন উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কি? আমাদের মতে আদর্শনিষ্ঠার অভাবই ইহার মূলে রহিয়াছে। একদিন বিদেশী শাসনের প্রতি যে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধি এদেশের সমষ্টি-জীবনে বৃহদাদর্শের প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল, ব্রিটিশের প্রভুত্ব এখান হইতে অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেরণা পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেই প্রেরণার ধারাটিকে দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট এবং তাহাদের বেদনার সঙ্গে আমরা যুক্ত করিয়া লইতে পারি নাই। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের শক্তি হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। প্রত্যুত মহামানব গান্ধীজীর জীবনে এই বেদনাটি ছিল প্রধান বস্তু। বিদেশী প্রভুত্বকে অপসারিত করিবার উদ্যম, তাহার আনুষঙ্গিকভাবেই আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে শাঁস ছাড়িয়া খোসা লইয়াই টানাটানি আরম্ভ করিয়াছি। ফলত কংগ্রেসের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থসাধনায় আন্তরিকতাকেই সেখানে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে, পরন্তু যদি সেই প্রেরণা কংগ্রেসের সাধনার মধ্যে জীবন্ত হইয়া না উঠে, তবে জোড়াতালি দিয়া ঐক্যেও কোন কাজ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, তেমন ঐক্য একান্তই বাহ্য এবং তাহার মধ্যে বীর্য বা প্রাণশক্তিরই প্রকৃত অভাব থাকিয়া যাইবে; তাহার ফলে মূল আদর্শের শক্তিই উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া পড়িবে। এদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উপর জগতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও সংকটজনক। অবস্থা বর্তমানে এমন যে, যে কোন মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। এই সংকট মুহূর্তে আসন্ন বিপর্যয়ের আঘাত হইতে দেশকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে কংগ্রেসের আদর্শকে পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বৈদেশিক প্রভুত্বকে ভারত হইতে অপসারিত করিবার জন্য আদর্শের যে অগ্নি সাধনা কংগ্রেস একদিন জাতির জীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমন সাধনাই দরকার হইয়া পড়িয়াছে; শুধু তাহাও নয়, সে প্রয়োজন সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাই আমরা মনে করি। কারণ, এবার কোন আঘাতে যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হয়, তবে দীর্ঘ দিনেও আমরা তাহা ফিরিয়া পাইব না।



স্মরণে

নববর্ষের আরম্ভে আমাদের মন বিপুল বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। সাত বৎসর পূর্বে ১৩৫০ সালের বর্ষের শেষ দিন, চৈত্র-সংক্রান্তিতে আমরা প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়কে হারাইয়াছি। প্রফুল্লকুমার আমাদের পরিচালক ছিলেন, তিনি আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। 'দেশের' প্রতি তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল। প্রফুল্লকুমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক



ছিলেন, তিনি সমাজ-সেবক ছিলেন। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবোচিত সকল গুণ তাঁহার জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। দেশ ও জাতির প্রতি বেদনা তাঁহার সমগ্র জীবনাদর্শকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। জাতির সভ্যতা এবং সংহতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা-বুদ্ধি প্রফুল্ল-কুমারের সমগ্র সাধনাকে উজ্জ্বল রাখিয়াছিল। সেই সংস্কৃতির উদার অভ্যুদয় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে অনুদিন ছিল এবং সেই দিকেই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। বাঙলা দেশের সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে প্রফুল্লকুমার নবযুগের উদ্বোধন-কর্তাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গৌরবময় ঐতিহ্য এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের' সর্বভারতীয় প্রতিপত্তি সে পরিচয় দিতেছে। 'দেশের' প্রতিষ্ঠামূলে প্রফুল্লকুমারের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য মর্যাদাবোধ এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অন্তরের অগ্নিময় উদ্দীপনা সব সময় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। প্রফুল্লকুমার স্বদেশকে স্বাধীন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। পরাধীন অবস্থায় 'দেশে'র আদর্শানুযায়ী সাধনার পথে অন্তরায় তখন প্রবল ছিল। অনবরত রাজরোষের অগ্নিজ্বালার ভিতর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সে দুর্দিনে প্রফুল্লকুমারের আত্যন্তিক আদর্শানুরাগ, তাঁহার অবিচল অধ্যবসায় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত রাখিয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র-শক্তি এবং মনোবল আমাদের পথের আঁধার আলো করিয়াছে। প্রফুল্লকুমার ভগবদ্বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। গীতার জ্ঞানময় প্রভাব তাঁহার মধুর এবং কোমল প্রকৃতিকে অন্তরনিষ্ঠায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ভয় তিনি কাহাকে বলে জানিতেন না—কর্মসাধনাই বড় বলিয়া বুঝিতেন। প্রফুল্লকুমারের জীবনের মূলীভূত ঔদার্য ও মাধুর্যের উৎস অধ্যাত্ম-সাধনালোকিত অভয়ত্বের উপলব্ধিতে নিহিত ছিল। সেই উৎস হইতে তাঁহার প্রতি আচরণে আত্মীয়তার আপ্যায়ন সর্বত্র অনাবিল ধারায় সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তাহার অমোঘ প্রভাবে আমাদের নৈরাশ্য ও অবসাদ দূর হইয়া গিয়াছে। দেশ আজ স্বাধীন—রাজনীতিক সংগ্রামের দিক হইতে প্রফুল্লকুমারের সাধনা আজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু দেশের অভীষ্ট এখনো পূর্ণ হয় নাই। জাতির অভ্যুন্নতি, সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্থিতি এবং জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এখনো পূর্ণতা লাভ করে নাই। আমাদের অভ্যুন্নতির পথে অন্তরায় আজিও অনেক রহিয়াছে। প্রফুল্লকুমারের আদর্শই আমাদের পূর্ণাভীষ্টলাভের পথে শক্তি সঞ্চার করিবে। বস্তুত মর্তদেহ অতিক্রম করিয়া প্রফুল্লকুমার তাঁহার আদর্শের মধ্যেই অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমরা তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।



বিজ্ঞান কৌতুক

এই ভুতের মত হাত পাওয়ালা ছবিটা কিন্তু ভুত নয়। এটা একটা যন্ত্র। তবে এ দিয়ে যা কাজ হয় তা ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। এই যন্ত্রটা অনেকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত দেখতে। অবশ্য এটা স্থলের ওপর যুদ্ধ করে না জলের মধ্যে যুদ্ধ করে। এই দানবীয় যন্ত্রটীকে সমুদ্রে নামিয়ে দিলে এটি তার যান্ত্রিক হাত পা



গভীর সমুদ্রে কাজ করার জন্য এই দানবীয় যন্ত্র

দিয়ে সমুদ্রের নীচে ডুবুরীর মত নানা রকম কাজ করতে পারে। যন্ত্রটীতে যেমন হাত লাগান হয় সেইরকম কাজ করে। কখনওবা সমুদ্রের তলা থেকে জিনিষপত্র তুলতে পারে, স্টীলের পাতে ফুটো করতে পারে, দড়িতে গিট দিতেও পারে। বলা বাহুল্য যে, এটী ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলে। এর সবশুদ্ধ ওজন প্রায় ২৫ টন। আর প্রায় দুহাজার ফিট গভীরে গিয়ে কাজ করতে পারে। এই যন্ত্রটীর আবিষ্কার কর্তার ইচ্ছে আছে যে, যখন এই করিতকর্মা যন্ত্রটী সর্বপ্রথম সমুদ্রে নামান হবে তখন তিনি নিজে এর সঙ্গে নেমে দেখবেন, এর কাজকর্ম।

*

আমেরিকার মেডিক্যাল ইউনিট পরীক্ষা করে দেখেছে যে, "টাইফাস ফিভার" আর "এ্যামেবিক ডিসেন্ট্রি" টেরামাইশিন নামক ঔষুধের সাহায্যে সারান যায়। তাদের প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল ইজিপ্ট এবং কায়রো। আমেরিকা ও ইজিপ্টের প্রায় ৬০ জন ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিক কায়রো হাসপাতালে পাঁচ বছর পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন যে, এই সব রোগের মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য একমাত্র টেরামাইশিনের দরকার। যদি পাঁচ ছয় দিন ধরে বাইশ গ্রাম করে টেরামাইশিন ব্যবহার করা হয় তাহলে টাইফাস ফিভার সারান সম্ভব হয়। আর এ্যামেবিক ডিসেন্ট্রীগ্রস্ত রোগীকে চৌদ্দদিন ধরে পয়ষট্টি গ্রাম টেরামাইশিন দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে ওঠে।

*

খবরের কাগজের জন্য যে কাগজ ব্যবহার হয় সেগুলি বিদেশ থেকে আমদানী হয়। একে News Print বলা হয়। এই নিউস প্রিণ্ট পাইন অথবা দেবদারু জাতীয় গাছের মণ্ড থেকে তৈরী করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একজন নিউস প্রিণ্ট প্রস্তুত কারক প্রায় ১৮ বছর ধরে গবেষণা করে নিউজ-প্রিণ্ট তৈরীর এক নতুন উপায় বার করেছেন। তিনি ধান আর গমের শুখনো খড়ের মণ্ড থেকে নিউজ প্রিণ্ট তৈরী করেছেন। এই পদ্ধতিতে দুই টন খড়ে যে মণ্ড হয় সেই মণ্ড দিয়ে প্রায় এক টন কাগজ তৈরী করা যায়। তিনি আরও হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকায় যত খড় হয় তাই দিয়ে কাগজ হলে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর নিউস প্রিণ্টের চাহিদা বন্ধ করা সম্ভব হতো।

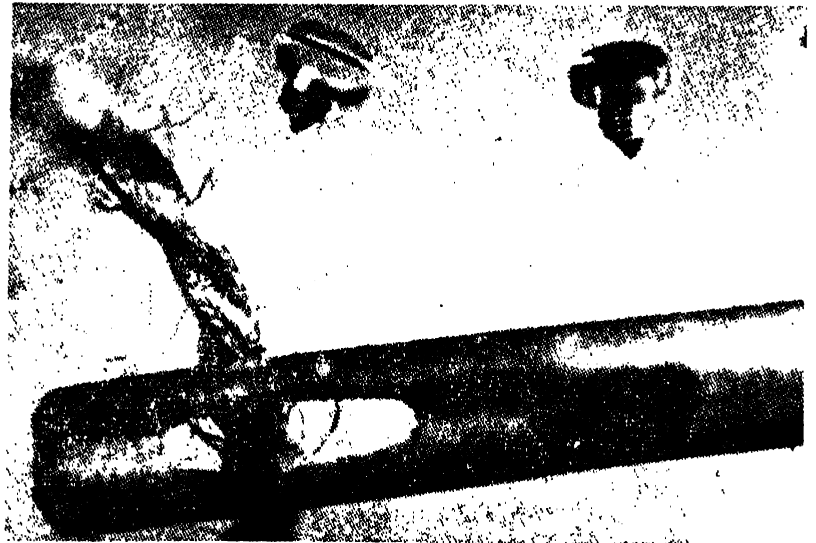
*

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে চা এর সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। বছরে প্রায় ১০৪ লক্ষ পাউণ্ড চা এদের দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানী হয়। ১৯৫০ সালে এর ওপর আবার শতকরা সতের ভাগ বেশী আমদানী হয়েছে।

*

রিলের সরু সুতা সূচের গর্তে ঢোকাতে যাঁরা ঘায়েল হয়ে পড়েন তাদের কাছে খবরটী শুধু আশ্চর্যজনক হবে না অবিশ্বাস্য মনে হবে।

ছবিতে ছড়ানো স্ক্রু গুলো দেখতে যতটা বড় মনে হচ্ছে সত্যিই ওগুলো অত বড় নয়। ওগুলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের স্ক্রু এগুলো এত ছোট যে, একটা সূচের গর্তের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে। আর এগুলো বড় একটা স্ক্রুর চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এতেও বেশ ভালকরে প্যাচ দেওয়া আছে আর মাথাটা বড় স্ক্রুর মত খাঁজকাটা আছে। এই রকম ছোট স্ক্রু এক লক্ষটী পেলে তবে এক পাউণ্ড ওজন হবে। এই স্ক্রুগুলি খুব সূক্ষ্ম ঘাড় কিংবা সূক্ষ্ম সামরিক যন্ত্রপাতির কল কব্জায় ব্যবহার করা হয়।



এই স্ক্রু গুলোই সাধারণ সূঁচের গর্তের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাসের দেশ

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও,
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও॥

শান্তিনিকেতনের
ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক
অভিনয়

নিউ এম্পায়ার থিয়েটার

বৃহস্পতিবার, ১৯ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬টা
শুক্রবার, ২০ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬টা

প্রবেশমূল্য
২০, ১০, ৫, ৩, ও ২,
বক্স ৪০,



নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে
টিকিট পাওয়া যাইবে

চিত্র প্রদর্শনী

আগামী মঙ্গলবার ১৭ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য ১৫ পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রী হাউস-এ কুমারী জয়া আপ্পাস্বামীর চীনা ও ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হবে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ এই প্রদর্শনীর উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন এবং পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন।

শিল্পী জয়া দেবী দক্ষিণ ভারতের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ পাশ্ করে তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনে দীর্ঘ আট বৎসর থেকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামকিংকরের কাছে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা লাভের পর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালে জয়া দেবী চীনা-শিল্প শিক্ষার জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ লাভ করেন এবং পিকিং-এ আড়াই বছর থেকে প্রথমে চীন দেশের ভাষা ও ইতিহাস এবং পরে ন্যাশন্যাল আর্ট কলেজে চৈনিক কলা শিল্পের চর্চা করেন। চীন দেশের ট্রাডিশনাল চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি অনুশীলনের দিকেই তিনি বিশেষভাবে প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রদর্শনীতে জয়া দেবীর চিত্রাঙ্কণের মধ্যে চীনা ও ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির সমন্বয় রূপ কলকাতার চিত্রকলা রসিকদের আনন্দ দিতে পারবে বলে আমাদের ধারণা।



প্রস্ফুটিত পদ্ম
শিল্পী : জয়া আপ্পাস্বামী

নৃত্যনাট্য

চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী,
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি' মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি' মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি!
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে,
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হোতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন
আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।

শান্তিনিকেতনের
ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক
অভিনয়

নিউ এম্পায়ার থিয়েটার

সময়

রবিবার, ২২ এপ্রিল, সকাল ১০-৩০টা
সোমবার, ২৩ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬টা

প্রবেশমূল্য
২০, ১০, ৫, ৩, ও ২,
বক্স ৪০,



নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে
টিকিট পাওয়া যাইবে

তাসের দেশ

নারায়ণ চৌধুরী

শীঘ্রই কলকাতায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটিকার অভিনয় হবে। কলিকাতাবাসীর পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। তাসের দেশ গোড়ায় একটি গল্পাকারে লিখিত হয়, পরে সেটিকে নাটিকায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় নাটিকাটির প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় হয়, কবি তাতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তার পরেও এই শহরে বার কয়েক নাটিকাটির অভিনয় হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক বারই সে অভিনয় জনসাধারণের দ্বারা বিশেষভাবে আদৃত ও অভিনন্দিত হয়েছে। এই সেদিন শান্তিনিকেতন-সম্প্রদায় রেডিও মারফৎ কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে তাসের দেশ পরিবেষণ করলেন; সেটিও শ্রোতৃবর্গের বিশেষ মনোগ্রাহী হয়েছিল বলে শুনেছি।

অতীতে কলকাতায় নাটিকাটির বারকয়েক অভিনয় হয়েছে এই যুক্তিতে অবশ্য নাটিকার আকর্ষণ-ক্ষমতা কিম্বা পুনরভিনয়ের যৌক্তিকতা হ্রাস পায় না। বরং এমন একটি ভালো নাটকের যতো বেশী অভিনয় হয় ততোই কলকাতার নাট্যামোদীদের পক্ষে লাভ। কলকাতার পেশাদার রংগমঞ্চগুলিতে সচরাচর যে ধরণের নাটক আমরা দেখে থাকি—তাদের অপ্রশংসা না করেও বলতে পারি, তাদের ভিতর যে পরিমাণ অভিনয়যোগ্যতা আছে সে পরিমান শালীনতা নেই, প্রায়ই নাটকগুলির ঘটনা-বহুলতা তাদের কল্পনার দৈন্য ঢেকে রাখে। এদের পিঠে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি নাটক অভিনীত হতে দেখলে বুঝতে পারি, আমোদের আকর্ষণ আর সৌন্দর্যের আকর্ষণে তফাৎ কোথায়। কলকাতার গতানুগতিক নাটকে শুধুমাত্র আমোদপ্রিয়তা, নাটক দেখে আমোদ পেলেই দর্শকের দাবী মিটে গেল; আর রবীন্দ্রনাথের নাটক যেন সৌন্দর্য আর কল্পনার অবিচ্ছিন্ন অফুরন্ত উৎস। পার্থক্যটা এত গভীর আর এত স্পষ্ট যে, নাটকের প্রকৃতিভেদে রসের ভেদ কতো দূরপ্রসারী হতে পারে সেটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ধরণের নাটক অনেকদিন দেখতে দেখতে দৈবাৎ যখন কবিকৃত কোন নাটক দেখবার সুযোগ হয়, মনে হয় আমাদের চিত্ত এতোদিন উপবাসী হয়েছিল, সেটা টের পাই নি, এই প্রথম অভাববোধ তীব্র হয়ে নিজেকে লজ্জা দিলে। তারপর নাটক দেখতে দেখতে কখন মন স্বপ্নকল্পনার দেশে ভেসে চলে যায় তার হদিস থাকে না।

কাজেই রবীন্দ্রনাথের নাটক যখনই কলকাতায় অভিনীত হবার আয়োজন হয়, তাকে একটা পরম সুযোগ বলে গণ্য করতে হবে। এক জিনিস এক নাগাড়ে অনেকদিন চাখতে চাখতে যখন রসনার আড়ষ্টতা দেখা দেয়, তখন স্বাদ বদলের মতো কিছু নেই। রবীন্দ্রনাটকে আছে সেই পরমপ্রার্থিত স্বাদবদলের আস্বাদ। শুধু স্বাদের বদল নয়, স্বাদের অপরূপ মাধুর্য।

কবিকৃত নাটকগুলির মধ্যে আবার তাসের দেশ-এর প্রকৃতি কিছু বিশিষ্ট। কল্পনার সৌন্দর্য আর ব্যঙ্গের তীব্রতা যেন এর মধ্যে অংগাংগী হয়ে রয়েছে। কবির আর যে সকল নাটক আছে তাদের ভিতরও ব্যঙ্গ আছে প্রচুর, কিন্তু ব্যঙ্গ সেখানে নাট্যকারের মুখ্য লক্ষ্য নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টির তলায় তলায় পরিহাসরসিকতার স্রোত প্রচ্ছন্ন ধারায় বইছে মাত্র। কবির নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এমন একটা সহজ কৌতুকপ্রাণতা অনুস্যূত হয়ে আছে যে, অনেক সময় ভারী ভারী কথার মধ্যেও কৌতুকের আমেজ পাওয়া যায়। আপাততুচ্ছ সংলাপের মধ্য থেকেও যেন কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কবি সহজ প্রাণের আনন্দে সংলাপের পর সংলাপ লিখে গেছেন, কখন যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসরসিক মন সংলাপের ভাষায় পরিহাসের সুর লাগিয়ে গেছে তা বোধ করি সব সময় তাঁর নিজেরই খেয়াল হয় নি।



তাসের দেশ-এর একটি দৃশ্য। রাজকুমারীদের নৃত্য।

কিন্তু তাসের দেশের জাত আলাদা। ব্যঙ্গই এই নাটিকার মূলকথা। ব্যঙ্গই এই নাটিকার প্রাণ। যে বিষয় নিয়ে কবির ব্যঙ্গ, গোড়া থেকেই সেটি তাঁর মনে ছিল এবং সেটিকেই নাটকের মধ্যে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। এমন কি, "তাসের দেশ" নামকরণের মধ্যেও ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির প্রায় সব নাটকই রূপকধর্মী। কিন্তু সব রূপক এক জাতীয় নয়। শুধু মাত্র ব্যঙ্গের আশ্রয়ে রূপক পরিস্ফুট করবার প্রয়াস একমাত্র তাসের দেশে-এই দেখা যায়। এই নজীরে তাসের দেশকে 'প্রহসন' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও কথা আছে। প্রহসন অর্থে সাধারণত সামাজিক অন্যায়-অবিচার অসংগতি মূঢ়তার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-নাট্যের কথা মনে জাগে, কিন্তু তাসের দেশ বিদ্রূপাত্মক হলেও সেটি ঠিক একই জাতের বিদ্রূপ-নাট্য নয়। তাসের দেশ-এ যে বিদ্রূপ-চিত্র আঁকা হয়েছে সেটি দেশকালবদ্ধ কোন বিশেষ সমাজের কথা মনে করে আঁকা হয় নি, তার লক্ষ্য একটি আইডিয়া। আইডিয়াটির কুপ্রভাব হালের সভ্যতায় অনেকেরই মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুখ্যত এ দেশের কথা মনে করে লেখা হলেও অপরাপর দেশেও যে তার প্রাবল্য নেই এমন কথা মনে করা যায় না। আলোচ্য আইডিয়া একটি বিশেষ জীবনদর্শনের প্রতীক। এক বিশেষ মনোভঙ্গী, এক বিশেষ জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এই জীবনদর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। সেই বিশেষ ভাবাদর্শটিকেই এখানে বিদ্রূপের ছুরিকায় চিরে-ফেড়ে দেখানো হয়েছে। কাজেই প্রচলিত অর্থে তাসের দেশকে প্রহসন বলা যায় কি না সেটি বিতর্কের বিষয়।

মনে হয় আইডিয়াধর্মী প্রহসন ভিন্ন-শ্রেণিভুক্ত হওয়া উচিত। তাসের দেশ সম্পর্কে একথাটা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য এজন্যে যে প্রহসনের পাশে পাশে এর ভিতর গীতিকবিতার মাধুর্যও বড়ো কম লুকোনো নেই। নিয়ম আর সংস্কারবদ্ধ আপাতশান্তিপূর্ণ প্রাণহীন জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তাসের দেশে-এ যে বিদ্রূপের অভিযান উদ্যত হয়েছে সেটি নাটিকার নঙর্থক দিক। সদর্থক দিকে আছে নবীনের আবাহন, সহজ প্রাণের আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বাধীন জীবনযাত্রার জয়গান। সে গানের সুরে মধুর রসের আমেজ লেগেছে। গীতিকবিতার সৌন্দর্য তাসের দেশ-এর বিদ্রূপ-ভঙ্গিমার মধ্যে একটা সহজ কমনীয়তা একটা সহজ মাধুর্য এনে দিয়েছে।

আরও একটি কারণে তাসের দেশ-এর প্রকৃতি কিছু ভিন্ন।

কবিকৃত নাটকগুলির পাঠযোগ্যতা অসাধারণ। তার অর্থ, মঞ্চোপরি তাদের অভিনয় হোক বা না হোক, তাতে সাহিত্য হিসাবে তাদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা হয় না। পাঠ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাটক পরম উপাদেয় বস্তু। নাটকমাত্রই নাট্যীকৃত হবার জন্য লিখিত হয়। অভিনয়ের মধ্যেই নাটকের চূড়ান্ত সার্থকতা। কিন্তু এমন অনেক নাটক আছে যেগুলি শুধু মাত্র সাহিত্য হিসাবেও অপরিসীম উপভোগ্য। অভিনয়-নিরপেক্ষ তাদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তার দাম বড়ো কম নয়। কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়ার এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক এই শ্রেণীর নাট্য সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু উপরের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সব নাটক সম্বন্ধে খাটলেও তাসের দেশ সম্পর্কে বোধ করি সম্পূর্ণ খাটে না। তাসের দেশে-এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে তাকে অভিনয়ে দেখা প্রয়োজন। তার কারণ, তাসের দেশ মুখ্যত 'দৃশ্য' নাট্য এবং দৃশ্য নাট্য হবার জন্যেই তার সৃষ্টি। শুধুমাত্র পাঠে তার সম্পূর্ণ রস ধরা পড়ে না। তাসের দেশের মানুষদের কিম্ভূত ধ্যানধারণা বিশ্বাস, তাদের জরা আর মূঢ়তা, তাদের গতিহীন জীবনযাত্রা—এগুলি যখন অভিনয় আর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের চোখের সামনে রূপায়িত করে তোলা হয়, সে সবের হাস্যকরতা এমন তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে যে, নাটক রচনার উদ্দেশ্য ওইখানেই সিদ্ধ হয়ে যায়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত আর কোন প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। তাসের দেশ-এর রাজা-সাহেব, গোলাম, নহলা পণ্ডিত, ছক্কা পঞ্জা প্রভৃতি—নিয়মের নিগড়ে বন্দী প্রাণহীন মানুষের এক একটি মূর্তিমান আলেখ্য। ভিন্ দেশের রাজপুত্র তাদের ভিতর খুসির হাওয়া বয়ে নিয়ে এলো, আর সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। অসার নিয়ম-নিষ্ঠার বদলে দেখা দিল প্রাণচাঞ্চল্য আর স্বাধীনতার স্ফূর্তি, অতীতের মোহ ঘুচে গিয়ে দেখা দিল **জীবন-চেতনা; আচারের গোঁড়ামি ভেদ করে বেরিয়ে এল নূতনের প্রদীপ্তি—তাসের** দেশের রূপ দেখতে দেখতে আমূলে বদলে গেল। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের পথে এই যে অভিসার, অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির আনন্দে বিহ্বল হওয়ার এই যে আকুতি, অসার জড়তার খোলস ভেদ করে প্রাণচেতনার এই যে ক্রমস্ফুটন, এককথায় নাস্তিবাদ থেকে অস্তিবাদে পরিক্রমার এই যে নাটকীয় চিত্র—চোখের উপর না দেখলে এর তাৎপর্য পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাসের দেশ সেই কারণে পাঠ্যও বটে, দৃশ্যও বটে। পাঠ্যের উপর দৃশ্য হলে তো আর কথাই নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় অর্থহীন আচার, আত্যন্তিক ঐতিহ্য প্রীতি, মূঢ় নিয়মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সর্বপ্রকার জড়তা আর প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ কুণ্ঠাহীন। কিন্তু তাসের দেশ-এ এ বিদ্রোহ যে রকম নাটকীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। তার কারণ, এ বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে ভাষা দেবার জন্যই তাসের দেশ রচিত হয়েছে, আর যেহেতু নাটকের প্রাণ সংঘর্ষে, সেইহেতু নূতন আর পুরাতনের দ্বন্দ্ব (যা তাসের দেশ-এর মূল উপজীব্য) এখানেই সব চাইতে বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কবির লেখনীমুখে নূতনের জয়গান স্বতঃ—এবং সতত-উৎসারিত। কিন্তু তাকে যদি কেউ নাটকীয় রূপে দেখতে চান, তাঁর পক্ষে তাসের দেশ দেখাই সব চাইতে বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে।

পূর্বেই বলেছি, 'তাসের দেশ' নামটি ব্যঙ্গাত্মক। এই ব্যঙ্গের উৎস কোথায় তার সন্ধান করা যেতে পারে।

হাল আমলের সভ্যতার আওতায় আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি তা যেমনি কৃত্রিম তেমনি আড়ষ্ট। নূতনকে আমাদের প্রচণ্ড ভয়, তাই অতীতের দিকে মুখ করে সবাই বসে আছি। পূর্বপুরুষেরা যে রীতি বেঁধে দিয়ে গেছেন তা বর্তমান যুগের উপযোগী হোক বা না হোক নির্বিচারে তা অনুসরণ করাকে আমরা পরমার্থ বলে জেনেছি। পিতামহতন্ত্র, পুরোহিত-তন্ত্র আর পণ্ডিততন্ত্র—এ তিনে মিলে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। সংসারে নিজের জন্য নিজের পথ যে করে নিতে **চায় তাকে নিজের ভাবনা নিজেকে ভাবতে**



তাসের দেশ-এর আরেকটি দৃশ্য

হয়। কিন্তু ভাবনা-চিন্তার বড়ো জ্বালা। মস্তিষ্ক চালনায় শ্রমের প্রয়োজন হয়, এ শ্রম করতে অনেকেই আমরা নারাজ। তাই যাতে শ্রমের প্রয়োজন হয় না, ভাবনা-চিন্তার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না, তেমন কিছু আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে। অর্থাৎ পিতৃপিতামহক্রমাগত নিয়ম-বিধানের নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। 'ঐতিহ্য' বলতে আমরা অজ্ঞান (কবি যাকে 'কৃষ্টি' বলে বিদ্রূপ করেছেন)। নিয়ম আর সংস্কারের প্রভাব আমাদের জীবনের উপর এতোই সর্বগ্রাসী যে সাহস করে নূতন কিছু করতে আমাদের প্রতি পদে সংকোচ, পাছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘূর্ণি হাওয়ার পাকে পড়ে আমাদের অভ্যস্ত আরাম নষ্ট হয়, আমাদের নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয়। তাসের দেশ-এ সদাগর পুত্র রাজপুত্রকে বলছে, "রাজপুত্র, তুমি তো কেবলি নতুন নতুন করে অস্থির হোলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বলো বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।" এটা শুধু সদাগর পুত্রের কথা নয়, এটা প্রায় আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এই অসার আরামপ্রিয়তার উপরেই আঘাত হানা হয়েছে সব চাইতে তীব্রভাবে তাসের দেশ নাটিকায়। 'ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে", রাজপুত্র বলেছেন। কূপ-মণ্ডূকের আরামপ্রিয়তা আর সংকীর্ণতা উভয়ই এই মন্তব্যের আক্রমণের লক্ষ্য।

আমাদের কূপমণ্ডূক তুল্য জীবনকে উদ্দেশ করে রাজপুত্রের মুখ থেকে আরও অনেক মর্মভেদী শ্লেষ নির্গত হয়েছে। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, নূতন যতো অনিশ্চিত হোক, সাহসের সহিত তাকে বরণ করার মধ্যেই জীবন; অভ্যাসের মোহে পুরাতনকে যারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তাদের মানসিক মৃত্যু ঘটে গেছে। কাজেই

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও॥
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও॥

অপরিবর্তনীয় নিয়মের নিগড়ে বন্দী যে মানুষ, যার ভিতরটা অতীতাশ্রয়িতা, কৌলীন্যপ্রীতি আর সংরক্ষণশীলতার বাষ্প দিয়ে ঠাসা, সে যেন একখণ্ড তাস, ফুঁ দিলে উড়ে যাবে, নইলে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এই ধরণের অনেকে মিলে যে সমাজ, সে যেন তাসের ঘর, উদ্দাম একটু হাওয়া দিয়েছে কি ভেঙে পড়বার দাখিল। সত্যি, সংস্কারান্ধ নিয়ম-সর্বস্ব মানুষকে তাসের মানুষ ছাড়া আর কী বলা যায়। তাসের মতোই তাদের গায়ে লেবেল এঁটে ছাপ দিয়ে আলাদা আলাদা হাস্যকর নামকরণ করে সংসার ক্রীড়াঙ্গণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বীর্যবান আর সাহসিকেরা তাদের যেমন তেমন ক'রে ওলট-পালট করছে, ছুঁড়ে দিচ্ছে। ইচ্ছার জোরের কাছে নিয়মের প্রতি পদে হার হচ্ছে। সচলতা স্থানুত্বকে দুপায়ে মাড়িয়ে অগ্রগামিতার জয়তিলক আর গৌরব লাভ করছে। প্রাণপ্রাচুর্যের প্রবল তোড়ের মুখে সংরক্ষণশীলতার বাঁধ যাচ্ছে বানের মুখে কুটোর মতো নিয়ত ভেসে। তাসগোষ্ঠী তাদের তাস-জন্মের আকিঞ্চিৎকরত্ব নিয়ে আত্মগ্লানির কোন্ গুহাগহ্বরে গিয়ে মুখ লুকোচ্ছে তার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত।

আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই
আমরা বিদ্যুৎ॥

—রাজপুত্রের মুখের গান। যৌবন আর প্রাণপ্রাচুর্যের এই প্রশস্তির মধ্য দিয়ে কবি মানবচিত্তের বাঁধভাঙা খ্যাপামিকে সমর্থন

জানিয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, খ্যাপামি জিনিসটা কি ভালো? অস্থিরতা বিক্ষেপ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম—এগুলি কি খ্যাপামির সহচর নয়? খ্যাপামির অভ্যাস প্রতি পদে বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে না কি?—এর উত্তরে কবির বক্তব্য হচ্ছে এই যে, অর্থহীন আচারের শৈবালদামের মধ্যে বিচারবুদ্ধিকে রুদ্ধ করে রাখার চাইতে প্রাণস্রোতকে বিপদ-শঙ্কাপূর্ণ অনিশ্চিতের পানে ভাসিয়ে দেওয়া ঢের ভালো। ক্ষুদ্র নিয়ম আর ক্ষুদ্র সংযম-বন্ধনের মধ্যে দেশকাল-পাত্রের সীমিত, কিন্তু অগৌরবের অস্তিত্ব যাপন করার চাইতে বৃহৎ অনিয়ম বৃহৎ অসংযমের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ভালো। যে সংযম আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না, যে নিয়ম-বন্ধনের জটিল তন্তু-জালে জড়িয়ে আমাদের প্রাণ অধীনতার বদ্ধ গম্বুজের মধ্যে ক্রমাগত হাঁসফাঁস করছে, তা আমাদের ব্যক্তিত্বকে অপমানিত করছে, আমাদের স্বভাবকে নিম্নগামী করে দিচ্ছে। নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত এই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকার চাইতে বড়ো রকমের একটা কিছু করা চাই, যাতে সমগ্র অস্তিত্বটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে নিজেকে নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ "সোনার তরী"র কয়েকটি কবিতার মধ্যে (যথা—'দেউল', 'ঝুলন' ইত্যাদি) এই ভাবটি বড়ো সুন্দর ভাবায় ব্যক্ত করেছেন। দুটি কবিতারই ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে, আমরা যতদিন স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন থাকি, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ততদিন নিজেকে ভালো করে জানতে পারি নে। কিন্তু যখনই বড়ো রকমের কোনো একটা আঘাত আমাদের উপর এসে পড়ে, আমরা জাগ্রত হয়ে উঠি, আর তখনি শুধু নিজের অস্তিত্বটাকে নিবিড় করে উপলব্ধি করা সম্ভব।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা;
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথবেলা॥
('ঝুলন')

তাসের দেশ-এ কবি যে 'ভাঙনের জয়গান' গেয়েছেন উপরের ভাবটির সঙ্গে সেটিকে যদি মিলিয়ে দেখি, তা হলে আর তাকে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। মানুষের স্বাধীন চিত্তের স্ফূর্তি মলিনকারী, ব্যক্তিত্বের অবদমনকারী যতো প্রকারের অনুশাসন আছে, তা আমাদেরকে ক্ষুদ্র অস্তিত্বের পাকে জড়িয়ে রেখেছে। বিধিনিষেধ-কণ্টকিত সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের রুদ্ধ অচলায়তন ভেঙে তার সমাধিভূমির বৃহৎ বিস্তারের উপর মুক্তির হাওয়া ছড়িয়ে দিতে হবে। নিজের মনের স্বাধীন ইচ্ছাটাকে যতদিন পর্যন্ত না আমরা কুর্নিশ করতে পারছি, ততদিন আমাদের ব্যক্তিত্ব সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই। প্রবলভাবে যদি বাঁচতে না পারলুম, সে বাঁচাকে বাঁচা বলে না। আর প্রবলভাবে বাঁচা মানেই হলো জীবন্তভাবে বাঁচা। যাকে বিপজ্জনকভাবে বাঁচা বলে, সে বাঁচা যদি তা-ই হয়, তবে তা-ও স্বীকার। তবু প্রাণপূর্ণ জীবনযাত্রার আদর্শ থেকে পিছপা হলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে "নৈবেদ্য"র কবিতাগুচ্ছ স্মরণীয়। 'ত্রাণ' কবিতায় আছেঃ

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চির পেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো।

'প্রার্থনায়' আছেঃ

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—,
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

কিম্বা স্মরণীয় "চৈতালি"র 'বঙ্গমাতা'ঃ

পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

এই সকল কবিতায় যে ভাবটি পাওয়া যায়, তা তাসের দেশ-এর অন্তর্নিহিত ভাবের স্বগোত্র। তাসের দেশ-এরও উদ্দিষ্ট ভাবাদর্শ হচ্ছে, প্রাণ-প্রাচুর্যের মধ্যে সাহসের মধ্যে বীর্যের মধ্যে জীবনকে আবাহন করো, তাই মুক্তি। আর মুক্তির আনন্দ হচ্ছে প্রকৃত আনন্দ।

কবি তাসের দেশ নাটিকা সুভাষচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছেন। এটিও বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। আর এই তাৎপর্যের পরিচয় কবির উৎসর্গপত্রের ভাষার মধ্যেই পাওয়া যায়। "স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ" নাটিকা উৎসর্গ করলুম।" সুভাষচন্দ্রের জীবন যৌবনের প্রজ্বলন্ত বিভায় ভাস্বর। তাঁর উত্তর জীবনের কর্মকলাপে সেকথার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেছে। এই বিচারে সুভাষচন্দ্রকে যৌবনের প্রতীক বললেও অন্যায় হয় না। যৌবনের যিনি অগ্রদূত, যৌবনের বন্দনাগান-মূলক নাটিকা তাঁকেই উৎসর্গীকৃত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!



প্রদর্শনী শিল্প

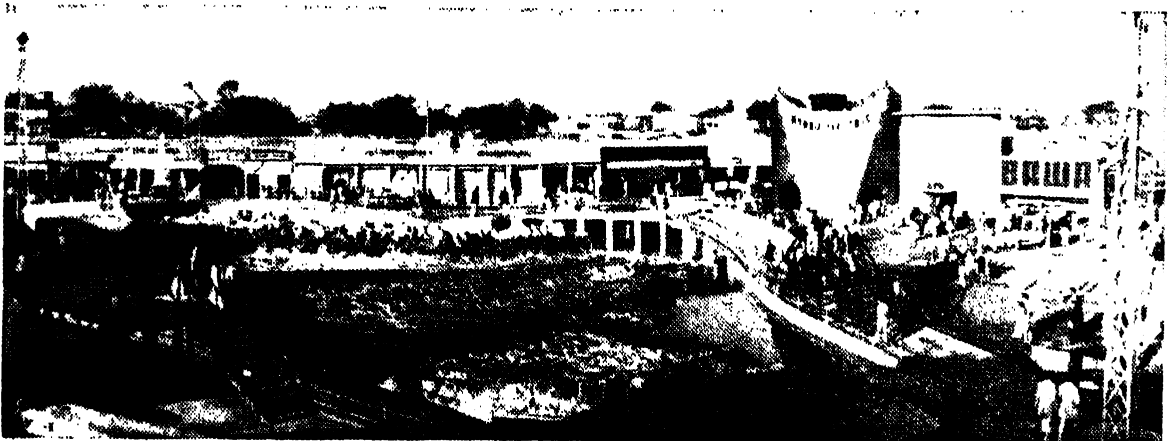
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প প্রচেষ্টার সংগে সম্বন্ধ রেখে যেসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তার প্রকার ও প্রকৃতি নিরূপণ করতে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তার সন্ধান হয়তো অনেকেই রাখেন না। কিন্তু তার জন্য আমাদের দেশে প্রদর্শনীর আয়োজন ঠেকে নেই। কোথাও না কোথাও কখনও না কখনও কিছু না কিছু প্রদর্শনীর আয়োজন লেগেই আছে। সারা ভারতের যে চেষ্টা এব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় তার সমষ্টিগত খরচের পরিমাণ এবং কাজের পরিসর একটু নয়। বহু অর্থ এবং পরিশ্রম প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে ব্যয়িত হয় এবং এই কাজ বছরের পর বছর চলে এসে এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যখন কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

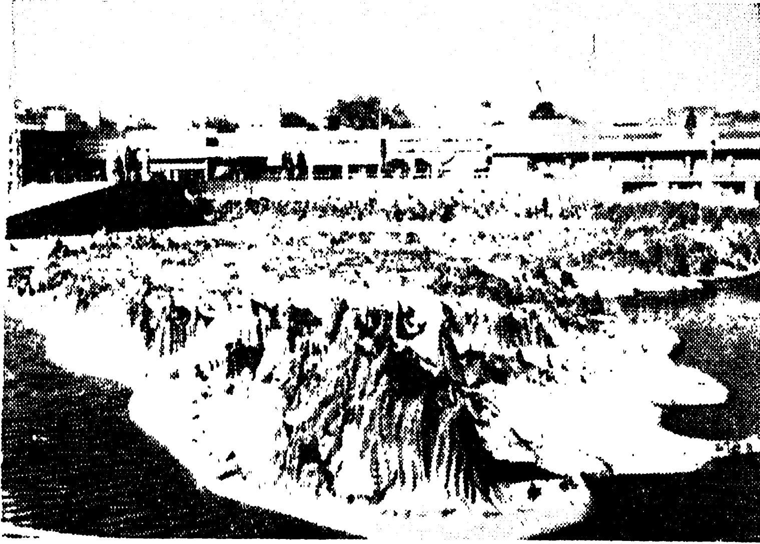
এ-বিষয়ে বৈদেশিক দেশগুলির চেষ্টা অনেক অগ্রসর হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ বহু পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রদর্শনীর ব্যাপার আলোচিত হয়ে থাকে এবং এমন অনেক ব্যাপার আছে যা হয়তো আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয় তা বেশ ফলাও করে সেসব পত্রিকার স্থান পায়। ফলে প্রদর্শনী গঠন এবং তার মূলগত বৈশিষ্ট্য-গুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকাশ পাওয়ার পরিবেশ লাভে সমর্থ হয়। আমরা শুধু প্রদর্শনীর বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং সেই দিকেই এতদিন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। কিন্তু এসবের পশ্চাতে যে শিল্পী নিজ অনুরাগ দিয়ে সমস্ত স্থানটি, কিংবা সমস্ত কক্ষটি সাজিয়ে-গুজিয়ে বস্তুগুলি উপযুক্তভাবে প্রদর্শনে সহায়তা করে তার কথা আমরা ভেবে দেখি না। আবহাওয়া সৃষ্টির কৃতিত্ব বস্তুগুলির প্রতি যে আলোকপাত করে, তা আজকাল এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যা আর অবহেলা করা চলে না। বর্তমান যুগে শিল্প-প্রচেষ্টার অংগ হিসেবেই তাই বৈদেশিক দেশগুলিতে এক নূতন প্রকার শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে যার কাজ শুধু তুলিতেই নিবদ্ধ নয়। কাঠ, লোহা, পেরেক, বাঁশ, কাপড়, সিমেন্ট, শুরকি, টিন, এ্যাসবেস্টস্, চট, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে তার শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্র। আর্ট ও আর্কিটেক্ট-এর যুক্ত বেদীমূলে তার আসন এবং অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবক হিসেবেই তার সার্থকতা।

শিল্পপতিরা যখন বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাদের নিজেদের বস্তু দেখানোর ব্যবস্থা করেন তখন তাদের মনোগত বাসনা যে শুধু শিল্প বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা তা নয়। শিল্পীর অবদান এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির নিছক কল্পনার বাইরে যে বিষয়টি সব চাইতে প্রধান তা হচ্ছে চাহিদা সৃষ্টির প্রয়াস। শিল্পপতিরা প্রচারের বাসনা নিয়েই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষজ্ঞের সহায়তা না নিয়ে একটা কিছু খাড়া করে তাঁরা বিশেষ লাভবান হতে পারেন না। দোষ এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ দেওয়া যায় না, কারণ আমাদের দেশে প্রদর্শন শিল্পী সম্বন্ধে সচেতনতা এখনও তেমন আসেনি। এ ধরণের শিল্পীরও যে বিশেষ অভাব আছে তাও অস্বীকার করার উপায় নাই। বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন এবং সেই জন্যই হয়তো আগ্রহের আতিশয্য সেদিকে উৎসারিত হয় নি। ভবিষ্যতে যে হবে না এমন কথা বলা চলে না। সম্ভাবনা ও আগ্রহ এ-দুয়ের তাগিদে আমাদের দেশেও হয়তো এ ব্যাপারে এমন শিল্পীর আবির্ভাব হতে পারে যার অবদান শিল্পপতিদের কাজে অনেক সহায়তা করবে। সে সুদিনের সূচনা এখন থেকে হলেই ভালো হয়, কারণ প্রচারের বাহন হিসেবে প্রদর্শনী প্রস্তুতের কাজ সারা ভারতবর্ষে বড়ো কম হয় না! এই বাবদ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম যাতে ফলপ্রসূ হয় তার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রদর্শন শিল্পীর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রদর্শিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে দর্শকের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হয়। চক্ষুর পীড়াদায়ক



নয়াদিল্লীতে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রদর্শনীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ভারতের মডেল রিলিফ ম্যাপ



মডেল রিলিফ ম্যাপের একাংশ। পাহাড়, নদী, নালা, সুন্দরভাবে গড়া

অসংযত ও প্রক্ষিপ্ত সাজ সমর্থনযোগ্য নয়। প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হলে সেই সব-প্রদর্শন-রীতিই কার্যকরী যাতে উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যটি বেশ স্পষ্টভাবে এবং অধিক জোরের সহিত দেখানো হয়। এ-কাজটি ভালো মন্দ দুইভাবেই করা যেতে পারে, কিন্তু সেই কথা ভুললে চলবে না যে ভালোর আকর্ষণ মন্দের চাইতে অনেক বেশী। উত্তম সাজ ও মনোরম পটভূমিকা বাদ দিয়ে কখনও প্রদর্শন শিল্পের ভিত প্রস্তুত হতে পারে না। কিন্তু এই কাজে শিল্পী বা প্রদর্শনী উদ্ভাবকের মনে রাখতে হবে যে, তার ক্ষেত্র শূন্যে নয় পৃথিবীরই বুকে। তাকে চিন্তা করতেই হবে এবং স্বপ্নও দেখতে হবে কিন্তু সর্বশেষ যে-কথাটি তার মনে রাখা কর্তব্য সেটি হচ্ছে, চিন্তা ও স্বপ্নের পরিসমাপ্তি কল্পলোকে নয়; মর্ত্যেরই বিষয়বস্তুর মধ্যে। কল্পনার স্রোতে হাবুডুবু খেয়ে কিছু দৃশ্যবস্তু প্রস্তুত না হলে সে-কল্পনার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই জন্য বিষয়বুদ্ধি প্রণোদিত প্রদর্শন শিল্পীর প্রয়োজন আজ যে কত তা বলে শেষ করা যায় না।

এই নবীন শিল্পের গোড়ার কথা ভাবতে গেলে সেই সময়কার কথাই মনে পড়ে যখন দিগ্‌বিজয়ী বীরেরা রাজ্য জয় করে এসে বিজিত দেশের উল্লেখযোগ্য মহামূল্য বস্তুগুলি নিজ দেশের জনসাধারণের সামনে পেশ করতো। আমাদের দেশে এ ধরণের ব্যাপার রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং সাগরপারের দেশগুলিতেও তাই। গ্রীক ও রোমক যুগে দেখা গেছে যে বিজিত দেশ থেকে আনীত দ্রব্যগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য মন্দির কিংবা বাজারের প্রাঙ্গণে প্রদর্শন করা হতো। পরবর্তী যুগেও এই ধরণের ব্যাপার ব্যক্তিগত আহরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। আহরণের আগ্রহ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হলেও তার ফলাফল ঘোষণার প্রবৃত্তি সচরাচর সকলের মনেই আসে এবং এই জন্যই আহরণ ও ঘোষণার ক্ষেত্র যুক্ত-ভাবেই গড়ে উঠেছে। তারই পরিসমাপ্তি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রদর্শন শিল্পে। এখানে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের কাজটি আহরণের পদবাচ্য এবং ঘোষণার কাজটি প্রদর্শনীর সমপর্যায়ভুক্ত বলা চলে। প্রথমে সামান্য আকারে ঘোষণার কাজটি শুরু হয়েছিল। একটি প্ল্যাকার্ড বা ঐ ধরণের কিছু একটা খাড়া করে পণ্যপ্রস্তুতকারী চেষ্টা করতেন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু তারপর শিল্পপ্রসারের বহুমুখী ধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে রকম রকম দৃষ্টি আকর্ষণের ধারাও সৃষ্টি হলো। জুতোর ব্যাপারে প্রথমে ভালো জুতো পাওয়া যায় এই কথা বললেই যথেষ্ট হতো, কিন্তু তারপর যখন বিভিন্ন জুতো বিভিন্ন আকার নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো তখন প্রস্তুত-কারীদের বলা প্রয়োজন মনে হলো যে কোন কোন ধরণের জুতো তাদের নির্মাণ তালিকার অঙ্গ এবং কী কী তার বৈশিষ্ট্য। এইভাবে শিল্প প্রসারের সঙ্গে অবগতির ক্ষেত্রও ক্রমে এক হতে বহুতে পর্যবসিত হতে চললো।

আজ এই প্রদর্শন শিল্প উক্ত বহুরই অন্তবর্তী। পণ্যপ্রস্তুতকারককে আজ



দিল্লী ওয়াটার ও য়ার্কস্‌-এর মডেল

ঘোষকের অংশ গ্রহণ না করে উপায় নেই, কারণ আগের মতো প্রস্তুতকারকের সংখ্যা আর সীমাবদ্ধ নেই। কিন্তু এ-ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে প্রদর্শনীর পরিকল্পনা পণ্যদ্রব্যের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দামী জিনিসের প্রদর্শনরীতি এবং সস্তা জিনিসের প্রদর্শনরীতি কখনই এক হওয়া উচিত নয়। প্রথমটিতে প্ল্যাস্টিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের ভিত প্রস্তুত করা যেতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে বাধ্য। পণ্যদ্রব্যের গ্রহণরীতি তাই প্রদর্শনশিল্পীর ভুলে গেলে চলবে না। ব্যবহারকারীর বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, ব্যবহারিক জীবন এবং মানসিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রদর্শনীর ভিত পত্তন করা হলে সুফলের সম্ভাবনা যে সুনিশ্চিত সেকথা নির্বিবাদে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে আর যেসব ব্যাপার মনে রাখা কর্তব্য তা হচ্ছে—ঘোষণার রীতি, পরিকল্পনার অভিনবত্ব এবং নাট্যাকারের সমপর্যায়ভুক্ত দৃশ্যাবলীর অবতারণা। শেষোক্ত বিষয়টিই সার্থক প্রদর্শনী গড়ার ব্যাপারে ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু এইখানেই গলদের সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনুপযুক্ত দৃশ্যাবলীর জন্য প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। রং, কাঠামো, শিল্পনৈপুণ্য এবং গঠনপ্রণালী বিসদৃশ হওয়াতে দর্শকের মনে আপনা হতেই বিরূপ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। রংয়ের রুক্ষতা এবং গঠনপ্রণালীর চিরাচরিত ধারা যতটা সম্ভব বর্জন করা উচিত, কারণ একথা খুবই ঠিক যে, দর্শক যতক্ষণ না প্রদর্শনী দেখে মনে করেন তিনি এর আগে এমন আর দেখেন নি ততক্ষণ প্রদর্শন শিল্পের সার্থকতা কোথায়!

এখানে বলা প্রয়োজন যে, পণ্যদ্রব্যের সাহায্যকল্পে প্রদর্শনীর পরিকল্পনা শিক্ষাগত প্রদর্শনী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটির কথা পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয়টির কার্যক্রম আরও সূক্ষ্ম। কারণ এ ধরণের প্রদর্শনীতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির অনুরূপ কোনও ধারার স্থান নেই। আছে বিশদভাবে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া। জ্ঞানবৃদ্ধির আগ্রহ সৃষ্টি এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের প্রচাররীতি কখনও এক হতে পারে না। প্রথমটির উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টিতে পুরোপুরি সমর্থন লাভ না করলেও একেবারে অসংলগ্নও বলা চলে না। কারণ প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা গেছে পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ প্রচারের ফলে চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য যে জ্ঞানগত প্রচার এবং চাহিদাগত প্রচারের মধ্যে পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় এবং প্রদর্শন শিল্পীরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। স্বাস্থ্য, কৃষি বা অনুরূপ সামাজিক অবস্থা বা রীতিনীতিগত প্রদর্শনীর ভিত গড়তে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে সাবান, তরল আলতা বা বিজলী পাখা প্রদর্শনের ধারা মেনে চললে সার্থক প্রদর্শনী প্রস্তুত করা কখনও সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান পেলাম কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ারিং প্রদর্শনীতে। হঠাৎ এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দিল্লীতে যেতে হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন শীতের প্রকোপে সারা শহর যেন জড়সড় হয়ে পড়েছে।

শিল্প, বিদ্যুৎ ও বাঁধ সংক্রান্ত সম্মেলনের অনুচারী হিসেবে এই প্রদর্শনীর ভিত পত্তন করা হয়। পুরাতন ও নূতন দিল্লীর মাঝামাঝি খোলা জায়গায় তুর্কমান গেট থেকে দিল্লী গেট পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাইল স্থান জুড়ে এই বিরাট প্রদর্শনীর কাজ অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে। তখনও প্রদর্শনী খোলার কয়েক দিন বাকি। কিন্তু আগ্রহের ভার কমাতে না পেরে হঠাৎ একদিন ঢুকে পড়লাম প্রদর্শনীর প্রসর ক্ষেত্রে। টিকিটের বিধি তখনও প্রযুক্ত হয়নি, কাজেই দর্শনীর ব্যয় বাবদ চার আনা উদ্বৃত্তই রইলো। ফটকের দরোয়ান হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না, ঠিক বলতে পারি না।

ফটক দিয়ে ঢুকেই দেখি চারিদিকে কাজের তাড়া। প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল তখন নির্মাণের শেষ পর্যায়ে। কুলি, মিস্ত্রি, কারিগর, পরিদর্শক শ্রেণীর সকলের যেন নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নাই। হৈ চৈ, হাঁকাহাঁকি, লরি, মোটর, টাঙ্গা, ঠেলাগাড়ির ক্ষিপ্রগতি যেন সমস্ত স্থানটাকে মুখর করে রেখেছে। রাস্তায় তখনও ইট, বালী, সুরকী, ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত আকারে পড়ে আছে, তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে কাজের অদ্ভুত উদ্দীপনা। লাঙ্গা পরিহিত জয়পুরী মজুরনীরা ঝুড়িভর্তি মাটি এনে উঁচু-নীচু স্থানকে সমতল করবার কাজে ব্যস্ত। তাদের চলবার ভঙ্গীতে সজীবতা থাকলেও তা শ্রমজনিত অবসাদযুক্ত নয়। তাদেরই পুরুষশ্রেণী একটু রোদের তাপ দেহে লাগাবার জন্য এদিক ওদিক চাইলেও তদারক শ্রেণীর গম্ভীর মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে আশা চেপে রেখে কাজে হাত লাগাতে হয়। বড় বড় স্টল-এর ভিতর ও বাইরে রং লাগানোর কাজ একটানা চলেছে। উঁচু মইয়ে উঠে রং লাগাতে গিয়ে কিছুটা রং যারা লাগাচ্ছে তাদের গায়েও ঝরে পড়ছে এবং তার ফলে এক একজনের চেহারা এমন কিম্ভূত-কিমাকার দাঁড়িয়েছে যে, তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, অবিরাম



বিরাটাকার বুলডজারের একাংশ

চলেছে তুলির টান। শুধু দিনে নয়, রাতেও বহুক্ষণ ধরে তাদের কাজ করতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রদর্শনী খোলার সহায়তায় তাদের এই যে পরিশ্রম তা একটু ঘুরেই বুঝতে পারলাম বেশ সার্থক হবে। কিন্তু আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে তাদের যাদের উপর বিভিন্ন স্টল প্রস্তুতের ভার ছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই প্রদর্শনী খুলতে কর্তৃপক্ষের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং আরও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি। যন্ত্রপাতি, মডেল, ম্যাপ, চার্ট বাবদ যত প্রকারের দর্শনীয় বস্তু প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তার মোট মূল্য হিসাব করলে দাঁড়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা। এত বিরাট প্রদর্শনীতে ঢুকে তাই বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করলাম সেই সব প্রদর্শন শিল্পীকে যাদের পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফল চারিদিকেই গড়ে উঠতে চলেছে। এর মধ্যে ভারতীয় শিল্পীরা আছেন, আর আছেন বৈদেশিক শিল্পীরা। বিভিন্ন দেশের শিল্পপ্রচেষ্টা কিভাবে আজ অগ্রসর হতে চলেছে, ছবি, মডেল ও ফটো দিয়ে তারা তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

প্রধান ফটক দিয়ে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে ভারতবর্ষের এক বিরাট রিলিফ ম্যাপ। তারই একদিকে হিমালয়ের শিখরে মহাত্মা গান্ধীর একটি শ্বেত মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। ম্যাপের নদীগুলিতে জলের স্রোত চলেছে। বড় বড় খাল, বিদ্যুৎ প্রজনন কেন্দ্র এবং বাঁধ ইত্যাদিও উক্ত ম্যাপে স্থান পেয়েছে। ম্যাপের সমস্ত ক্ষেত্রটি রাত্রিতে ইলেকট্রিক আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করার ব্যবস্থা আছে এবং দর্শকদের যাতে সমস্ত স্থানটি দেখার কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য উঁচু প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প পরি-কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ম্যাপের মডেল তৈরি করতে পরিশ্রম ও পরিকল্পনা দুয়েরই প্রয়োজন হয়েছে প্রচুর। প্রদর্শন শিল্পের এ একটি সার্থক কাজ বলা যায়। এই প্রসঙ্গে দামোদর বাঁধের মডেলটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের রেলপথ সংক্রান্ত মডেলটিও সুন্দর বলা চলে।

নিম্নলিখিত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি এই প্রদর্শনীতে নিজ নিজ দেশের শিল্পপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রচার করবার বাসনা নিয়ে স্টল স্থাপন করেঃ এ্যালজিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সিলোন, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, ইটালী, মরোক্কো, নরওয়ে, পাকিস্তান, পর্টুগ্যাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, আমেরিকা, ও যুগোশ্লাভিয়া। এর মধ্যে ফ্রান্স, সুইজার-ল্যান্ড, জার্মানী, ইংলন্ড ও আমেরিকার স্টলই সবচাইতে সুন্দর বলা চলে। ফ্রান্সের স্টল-এ ৪ ফুট ৩ ফুট এক একটি ফটো এনলার্জমেন্ট দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। এত বড় এনলার্জমেন্ট সচরাচর দেখা যায় না। সেগুলিকে উপযুক্ত শিরোনামা দিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে টাঙানোর কায়দা চমৎকার। এই স্টল-এর ইঞ্জিনীয়ারিং মডেলগুলি দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। বিদেশী প্রদর্শন শিল্পীর পরিচয় নিতে গিয়ে দেখলাম তিনি মজুরদের সঙ্গে সম্মুখভাগের বড় বড় অক্ষরের ফ্রান্স লেখাটি খাটানোর ব্যাপারে খুব ব্যস্ত। সামান্য কিছু আলোচনা করে অন্য স্টলের দিকে পা বাড়ালাম। সুইজারল্যান্ডের প্রদর্শন শিল্পীর পরি-কল্পনা অপূর্ব। সৌন্দর্য ও প্রচারবাণী প্রেরণের অদ্ভুত সমন্বয় তিনি করতে পেরেছেন। ইন্ডিয়ান রেড রংএর বহির্ভাগ তার সার্থক হয়েছে বলা চলে। অন্যান্য আরও কয়েকজন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় হলো এবং তাদের পরিকল্পিত রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পেলাম। ইংলন্ডের স্টলটির বহির্ভাগের পরিকল্পনা শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি। সৌন্দর্যসৃষ্টির ব্যাপারে নূতন আকারের যে কতটা প্রয়োজন তা এই স্টলটি দেখলেই বোঝা যায়।

আমাদের দেশের শিল্পীরাও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু উপরোক্ত শিল্পীদের পর্যায়ভুক্ত তাদের করা চলে না। দু'একটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যথা কুটীর শিল্পের স্টলটি। প্রমোদ প্রাঙ্গণের কাছে এই স্টলটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, কারণ তার গঠনপ্রণালীতে যথেষ্ট অভিনবত্বের সন্ধান আছে। সরু বাঁশ সাইজ মাফিক কেটে নিয়ে কতকগুলি সোজাসুজি কতকগুলি আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেছনে দেওয়া হয়েছে চটের লম্বা লম্বা ফালি। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে গৃহ-শিল্পের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এরই সামনে এক কাচ কোম্পানীর স্টলটিতেও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। স্টলটির চারিদিক খোলা, কেবল মাঝখানে গ্যালারির মতো ব্যবস্থা করে কাচের গেলাস, বাটি, এবং অন্যান্য বাসনপত্র সারিবন্ধভাবে বসানো হয়েছে। ছাদ বা সিলিংটি গড়া হয়েছে বড় বড় আয়নাকে পরস্পর সংলগ্ন করে। ফলে হয়েছে কি যে, গ্যালারির শ্রেণীবন্ধ বাসনগুলি ছাদের আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেছে। কারণ বসানো বাসনগুলি সোজা দেখা গেলেও তাদের প্রতিচ্ছবি উল্টো আকারে দেখা যাচ্ছে। লোকজন, আলোবাতি এবং অন্যান্য সকল বস্তুই এইভাবে সোজা উল্টো দেখা গেলে অদ্ভুত মনে হবেই।

এছাড়া টাটা, বিড়লা, এসোসিয়েটেড সিমেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রদর্শন-রীতিও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সত্য কিন্তু তার মধ্যে নূতনত্বের সন্ধান খুব কমই পাওয়া গেল। বহু ট্রাক্টর কোম্পানী এই প্রদর্শনীর অঙ্গন ঘিরে আছে দেখলাম। এক পণ্যবস্তুর অভিনবত্ব ছাড়া স্টল গঠনের কৃতিত্ব কারও ক্ষেত্রে তেমন পরিলক্ষিত হলো না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা উজ্জ্বল আলোর উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন, কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে মাঠেই মারা গেছে বলে মনে হয়। বিরাট বিরাট ট্রাক্টরের পাশে ছোট একটি পরিচয়লিপি আমার কাছে বড় বেমানান ঠেকেছে। ট্রাক্টরের এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম পূর্ণাকারের একটি প্রিফ্যাব্রিকেটেড গৃহ বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রদর্শন শিল্পীর এ আর একটি সার্থক সৃষ্টি বলা চলে। ঢুকতেই ছোট একটি বাগান, টব-এ নানা রংএর ফুল ফুটে আছে। বারান্দায় উঠতেই দেখলাম ঘরগুলি পূর্ণাকারে সজ্জিত। বসবার ঘরে দেখলাম একটি সুন্দরী তরুণী বসে সোয়েটার বুনছেন। প্রশ্ন করে জানলাম, গৃহটি এক জার্মান প্রতিষ্ঠানের গড়া। খরচ কত ইত্যাদি বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে তরুণীটি মাথা নেড়ে জানালেন জানি না। বুঝলাম, শুধু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ক্রুশ-কাটা দিয়ে তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ভাবলাম, দৃষ্টি আকর্ষণের এ মন্দ পন্থা নয়।

[প্রবন্ধের ছবিগুলি দেশ পত্রিকার ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত]

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

নিন্দের চোট

পৃথিবীতে এসে জন্মদিন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মানুষের আর অভিজ্ঞতার অন্ত থাকে না। আমার জীবনে বরাতের ফেরে কিন্তু মধুর অভিজ্ঞতা কিছুতেই হল না, চিরদিনই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে যেতে হ'ল।

বাল্যকালে আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে বোধ হয় আমার মত লোককে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাই এত গাল খেয়ে মরি, নিশ্চয় এটা কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ফল, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝেছি যে নাঃ! পৃথিবীটাই এমন গোলমেলে যে এখানে কেউ কাউকেই দেখতে পারে না—বিশেষ ক'রে এদেশে তো নয়ই। যে যা-করুক ঠিক তার পেছনে ভুরুভিরকুটে প্রকাণ্ড একদল নিন্দেকুটে বসে আছে। এ'দের হাত থেকে গৃহজীবনে, কর্মজীবনে, ধর্মজীবনে কোথাও মুক্তি নেই! পেছন ফিরলেই দেখবেন জিভ্ বার করে ভেঙাচ্ছে। মোক্ষলাভ না হলে বোধহয় এর হাত থেকে রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই।

বাঙলাদেশে যেমন পাঠকের চেয়ে লেখক, গাইয়ের চেয়ে তবলিয়া, মক্কেলের চেয়ে উকীল, কর্মীর চেয়ে কর্মপণ্ডকারী, সিনেমা তারকার চেয়ে ডিরেক্টর, কেরাণীর চেয়ে অফিসার, চোরের চেয়ে পুলিশ বেশী—তেমনি এখানে স্রষ্টার চেয়ে সমালোচকের ঠেলায় চক্ষু অন্ধকার! তাও সমালোচনা হলে তো বাঁচতুম, নিছক পেছনে লাগা। সকলের কাছ থেকে ঠোনা খেতে খেতে প্রাণ যায়!

পৃথিবীতে কেউ ভাল নয়, কোনটা ভাল নয়, কিছু ভাল নয়। সর্বদা রামচিমটে নিয়ে সব্বাই সবার নাক ধ'রে টানাটানি ক'চ্ছে। তার ফলে সেইটেই ক্রমাগত লম্বা হয়ে আসছে কিন্তু মা জগদম্বা আসল উন্নতির ক্ষেত্রে রম্ভা দেখিয়ে সরে পড়ছেন।

আমার সঙ্গে যারই দেখা হয়, দেখি সেই তাক খুঁজছে একটা কিছু অপরের পেলে হয়—আচ্ছা ক'রে ঠুকে দিই এইভাব আর কি! চতুর্দিকে লোকে হাতুড়ি, খোন্তা, কাস্তে, র‍্যাঁদা নিয়ে ঘুরঘুর কচ্ছে। যাদের তা নেই তাদের কাগজ আছে, সেটাও যার নেই তার মুখ আছে, যদিও সে মুখের দিকে চাওয়া যায় না, কারণ সে এমনি ছিরকুটে আছে। কাছে গেলেই মনে হয় কামড়ে দেবে। তাহ'লে আপনারা বলতে পারেন, এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে আমরা বেচারীরা করি কি? মানুষ সমালোচনা করুক দুঃখ নেই কিন্তু সমালোচনার নাম ক'রে যদি চোনা ছড়াতে ছড়াতে চলে, তাইলেই চক্ষু পোনামাছের মত গোল হয়ে ওঠে কিনা বলুন?

আপনারা হয়তো যুক্তি দেখিয়ে বলবেন, যে বাপু হে, সংসারটি যে এখনো পানসে



ব্যালান্স রক্ষা

তরমুজের মত হয়ে যায়নি তার কারণ—লোকের কাছ থেকে নিন্দের ভয় আছে। তা না হলে দেখতে সবাই অকুতোভয়ে যা-খুশী তাই ক'রে বেড়াতো, কারুর রক্ষে থাকতো না। এত ক'রেও মনে কর, সব রক্ষে করা যাচ্ছে না, কত কেলেঙ্কারী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঐটি না থাকলে যে কি অবস্থা হত, তা কল্পনাও করতে পারতে না।

রাস্তায় চলেছ হঠাৎ হয়তো অনুভব করলে যে, একজন তড়াক্ ক'রে তোমার কাঁধের ওপর চ'ড়ে হেদো পর্যন্ত এগিয়ে গেল—বাজার যাচ্ছ পেছন থেকে এসে একজন কাছাটি খুলে দিয়ে গেল, ফুটপাতে এক-জনের পা পিছুলে গেল, সে হয়তো তোমার লম্বা দাড়িটা ধরে কিম্বা চলমান কোন কুমারীর লম্বমান বেণীটি পাকড়ে ব্যালেন্স ঠিক করে নিলে। এসব করতে যে লোকে ভরসা পায় না—তার কারণ, ঐ নিন্দের ভয়—ঐ গালাগাল!

কিন্তু গাল খেয়ে যদি মানুষ শোধরাতো তাহলে আর দুনিয়ায় কেউ বেতাল হ'ত না। এত গালমন্দের ভেতরেই দুনিয়ার চতুর্দিকে যে সব মাল আমদানী রপ্তানি হচ্ছে তার কোনটা ভাল বলতে পারেন? সব সমান!

আচ্ছা, চুরি নিন্দনীয়—গাল খাবার জিনিষ। হাতে হাতে ধরা পড়লে, মার তো অনিবার্য কিন্তু এখন সবাই গাল দিয়ে বেড়ালেও তা কমেছে কি? বরং চতুর্দিকে যুদ্ধের পর এত লোভের ও লাভের চার ফেলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা পাবার পর দেশের যা-কিছু আছে তাই যে-যেখানে পারছে পাচার করতে সুরু করেছে। ছিঁচকে চোরদের জন্যে পেনাল কোড আছে, কিন্তু চোরাকারবারীদের পুলিশে ধরিয়ে দিলেও আইনে তাদের ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই! ডিফামেশন বাঁচিয়ে খবরের কাগজে তাহলে গাল দিন।

লোককে ঠেঙানো পাপ—দিলে মাথার এগারো ইঞ্চি বা আধলা ঝেড়ে, আপনি তিন হাত লাফ দিয়ে তারপর শুয়ে পড়লেন। মারের কারণ জিজ্ঞাসা করুন, হয়তো শুনবেন ব্যাপারটা কিছুই নয় তার মতের সঙ্গে আপনার প্রাণের গৎ ঠিকমত মিলছিল না। এদের গাল দিয়ে ঠিক করবেন?

ছেলের বিয়েতে মেয়ের বাপের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করাটা নিন্দের কিন্তু কোন বেয়াই কি গাল খেয়েও আপনার গাল খামচাতে ছাড়ছেন?

এগ্‌জামিনে টোকা অনুচিত—সেখানে একেবারে টেলীগ্রাফের টরে টক্কা করতে করতে ছেলেরা টুকে যাচ্ছে, পাশ করলেই বাবা একটা টুকটুকে বৌ এনে দেবে তো? লোকে নিন্দে করলে তো ভারী বয়েই গেল! বরং অবিরত নিন্দে কুড়িয়ে কুড়িয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই অনিন্দ্যনীয় পুরুষ হয়ে বসে আছে এই তো দেখতে পাচ্ছি।

অবিরত গাল খেয়ে খেয়ে লোকের গায়ের ছাল যে কি রকম শক্ত হয়ে ওঠে সেটা কেউ বোঝেন না। ছেলেবেলা থেকে মরবার টাইম পর্যন্ত এই দেশের সর্ববিভাগে জীবন-যাত্রার প্রথম পাথেয় গাল খাওয়া—গাল ধ'রে আদর করার লোক এক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর তো বাস্তবে পেলুম না। তার ফলে হয়েছে কি শতকরা নব্বই জনের মেজাজে সোডা ওয়াটারের চেয়ে বেশী ঝাঁঝ,

কথা কইলেই ফোঁস ক'রে ওঠে। যে সুবিধে পাচ্ছে সেই অপরকে তেড়ে মারতে যাচ্ছে। কেন একটু ভাল ক'রে কথা কইলে কি ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়? আসল গলদ না দেখিয়ে শুধু গাল দিলে কেউই তাল ঠিক রাখতে পারে না সেটা বোঝেন না?

ছেলেবেলা থেকে কি সুরু হয়েছে দেখুন। সকলেরই ইচ্ছে আমাকে আদর্শ চরিত্রে দাঁড় করাবেন। তার ফলে সবাই মিলে আদা-জল খেয়ে গাল সুরু করলেন। হনুমান, গর্দভ, জাম্বুবান ও অন্যান্য যাবতীয় বিদ্ঘুটে প্রাণীর তুলনায় আমি যে সমান তা প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রমাণিত করবার জন্য বাড়ির অভিভাবকদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সে পর্যায় থেকে বোধ হয় আজও উঠতে পারিনি ব'লে আমার বন্ধুবান্ধবদের ধারণা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকমশাইদের কাছে গেলুম। —বিদ্যালাভ করতে তাঁরা একপায়ে ডবল বেঞ্চির ওপর কাণ ধরিয়ে আমায় দাঁড় করিয়ে রায় দিয়ে দিলেন আমি একটি বৃহৎ অনড্বান। বাড়িতে গিয়ে আবার অভিধান খুলে তার মানে দেখি, ষাঁড়, পড়াশুনো না করিয়ে আমাকে নাকি দিশী ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দিলে ফসল ফলতো ভাল।

আপিসে বেরোলুম—বড়বাবু বলে দিলেন তুমি তো একটি আস্ত আহাম্মক হে, কি ক'রে পাস করেছিলে? ইংরিজিতে একখানা গুছিয়ে চিঠি লিখতে পার না?

আমি নিতান্ত বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে ওটা এদেশে বোধহয় কেউই লিখতে পারে না। কারণ আপনি যা লেখেন তা ছোটসাহেব কেটে দেন, আবার ছোটসাহেব যা পাঠান বড় সাহেব তার চেহারা পাল্টে দেন, শেষপর্যন্ত আর কারুরটাই ঠিক থাকে না বলে আমি আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

চাকরি যেতে যেতে সাহ'ক করে রয়ে গেল। পরে শুনলুম টিফিনের সময় আমি খেতে গেলে সারা ডিপার্টমেন্টে বড়বাবু আমার আহাম্মুকীর বার্তা প্রচার করতে করতে গাল দিতেন, আর যাদের চাকরিতে উন্নতির ইচ্ছে, তারা আবার সব-কিছু বুঝতে না পারলেও হো-হো ক'রে হেসে, বড়বাবুর তালে তাল দিয়ে একেবারে নিজেদের টিফিন খাওয়ার কথাটও ভুলতে সুরু করতেন।

যাক্ মশাই, এরপর সামাজিক ক্ষেত্রে আসা। বিয়ে হ'ল। লোক-পরম্পরায় শুনলুম আমার ব্যাখ্যানায় শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্নখানেওয়ালারা বাড়ি গিয়ে নাকি প্রচার করেছেন যে, এর চেয়ে ওরা মেয়েটার গলায় একটা পাথর বেঁধে ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গায় ছেড়ে দিয়ে এল না কেন? ঐ মোষের মত রং, জালার মত পেট, বোয়ালমাছের মত চোক, সিংহি মাছের মত নাক ইত্যাদির সঙ্গে কেউ মেয়ে বিয়ে দেয়?

আবার এপক্ষে যারা খ্যাঁট্মেরে বৌ-ভাত রক্ষে করে গেলেন তাঁরা আড়ালে কনের ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কোথা থেকে এক শাঁকচুন্নীকে ধরে নিয়ে এল বলতো? উপরন্তু বৌ-ভাত করার দরকার কি ছিল? আমি যা খাইয়েছি তা নাকি সব খারাপ। কারুর পেট ছেড়ে দিয়েছে, কারুর সারাদিন



এ্যাঁ!

চোঁয়া ঢেঁকুর উঠেছে আবার কারুর খেয়ে নড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই।

পরে বছর তিনচারের মধ্যে ছেলেপুলে গুটি তিনেক হতেই আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমার অক্কেলের অভাব দেখলেন। সবাই প্রায় একবাক্যেই যাচ্ছেতাই করে বলতে সুরু করলেন, ও একটা গাধা না কী? দেখছে আমরা প্রত্যেকে সাত আটটা ক'রে নেণ্ডি-গেণ্ডি নিয়ে নাজেহাল হচ্ছি, এ দেখেও হতভাগাটার একটু শিক্ষা হল না? ছিঃ ছিঃ!

এসব গেল পারিবারিক জীবনের কথা। এইবার বাইরের ব্যাপার শুনুন। কাগজে একটি লেখা বার করলুম সমালোচকরা যেন মুখিয়ে ছিলেন। তিন তিনখানা কাগজে আমার খারাপ লেখার বদলে ভাল ভাল সব প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল—উঃ তার কী ওজস্বিনী ভাষা! সমালোচকরা লিখলেন—উহার কলম কাড়িয়া লও, লেখা ইয়ার্কি নহে, বাঁদরামি করিতে হয় আলিপুরের চিড়িয়াখানা আছে ঢুকিয়া পড় সেখানে বহু সুযোগ পাইবে—মানে, ওঁরা যেন সেখানকার সুলুক সন্ধান আগে থেকে দেখে এসে এখন ছাড়ান পেয়ে বলছেন, এই ভাবটা আর কি! মশাই, লেখা ছেড়ে দিলুম ঐ দুঃখে!

গেলুম পলিটিক্সে—সেখানে একটা কানই লোকে কামড়ে উড়িয়ে দিলে—টিঁকতে পারলুম না। যাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলুম তাঁরা বললেন যে, ধৈর্য ধ'রে থাকো, বাকী যে কানটা আছে ওটাও খোয়াও তারপর শাইন্ (shine) করবে—কারণ ও-দুটোর কোনটাই যখন কেউ পাকড়াতে পারবে না—তখনই তুমি নেতা হবার যোগ্যতা অর্জন করবে, লোকে যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ দিলেও শুনতে পাবে না। অতটা পারলুম না তাই পালিয়ে গিয়ে ঢুকলুম স্টেজে, ওর চেয়ে একটু ছোটখাট জায়গায়।

সেখানে তো প্রথম থেকেই গাল খাওয়া সুরু হ'ল। বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। একটা ভাল পার্ট কপালে জুটলো না, মাইনেও না। উপরন্তু শুনলুম সমস্ত নাটকটা নাকি আইসক্রীমের মত সবার অভিনয়ে জমে উঠলেও শুধু একটা দূতের জন্য ঝুলে পড়েছে। বলা বাহুল্য সে দূত—আমি। একা একটা মাঠে, দূত দৌত্য করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে গেল। কথার মধ্যে তার ছিল, এ্যাঁ—এইটুকু বলা, কিন্তু তাতেই থিয়েটারের ভেতর মহলে চ্যাঁ ভ্যাঁ সুরু হয়ে গেল। লাঞ্ছনার যেটুকু বাকী ছিল তা আবার নাট্য-সমালোচকরা ঠিক ক'রে দিলেন।

দূতের ওপরই দু-কলম বেরিয়ে গেল। দূত অবধ্য এটা কর্তৃপক্ষই যখন মানলেন না তখন তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন? লিখলেন—এইভূতটিকে পরিচালক মহাশয় কোথা হইতে যোগাড় করিয়াছিলেন? দূৎ দূৎ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেও আমাদের গায়ের ঝাল মিটাইতে পারা যায় না—উহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্টেজ হইতে গুঁতাইয়া বাহির করিয়া না দিতে পারিয়া আমাদের মন সারাক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। তারপর সে আরও কত কথা! পার্ট করতে না-এসে হাটে আমার বেগুন বেচা উচিত ছিল, কিম্বা গরুর জাবনা দিলে উপকার হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ'দের গুঁতোনোর হাত থেকে বাঁচতে

শেষে সম্পাদক মশাইকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানাই—দোহাই মশাই, হয় আমার পার্টের দোষটা দেখিয়ে দিতে বলুন, নয় ও'দের শিং ধরে গোয়ালে পুরুন—নইলে আমি গরীব বেচারী গেলাম! এ'দের গ'ুতো আর সহ্য হচ্ছে না!

কিন্তু সহ্য না করেই বা উপায় কি? কার গ'ুতুলি থেকে বাঁচবো?' সংসারের চতুষ্পার্শ্বে এ'রা ছাড়াও এত চতুষ্পদ বিচরণ করছে যে, সবার গ'ুতুনি খেতে খেতেই মাটিতে উবুড় হয়ে প'ড়ে থ'ুতনিটাই পেলন হয়ে এল—আমি সামলাবো ক'দিক?

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

এর পর দিনকয়েক কেটে যায় নূতন হোটেল খ'ুজতে। প্যারিসে ঘর পাওয়া যে এত শক্ত তা আগে লেখক বুঝতে পারেনি। প্রত্যেক সস্তা হোটেলে 'সব ঘর ভর্তি'র নোটিশ মারা। স্কুল কলেজ খুলে যাওয়ায় ল্যাটিন কোয়ার্টার ভরা। সকলেই বলে আর কিছুদিন আগে এলে না কেন? কেন যে এখন আসছে সেকথা আর লেখক তাদের খুলে বলে কেমন করে। সব হোটেলেই শোনে যে একজন মুসিয়ো আমেরিকান ঘরখানা ভাড়া নিয়ে রেখে দিয়েছেন—অসম্ভব বেশী ভাড়ায়। অর্থাৎ তার চাইতে বেশী যদি দাওত ভেবে দেখতে পারি, এই ভাব। পাঁসিয়ো বা আধাহোটেলগুলোতেও একই ব্যাপার—কেবল খরচটা আরও বেশী। গত যুদ্ধের কল্যাণে অজস্র আমেরিকান নামকাটা সেপাই প্যারিসে সরকারী খরচে পড়ছে কিম্বা পড়বার নাম করে আছে। পশ্চিম জার্মানীর আমেরিকান মিলিটারির লোকরা ছুটি পেলেই অথবা ফরাসী ছুটি নিয়েই প্যারিসে আসে দুদিন ফুর্তি করতে। অনেকের স্থায়ী ঘর ভাড়া করা আছে; অনেকের নেওয়া ঘরে একজন করে ফরাসী ভদ্রমহিলাও থাকেন; অনেক ঘরে ছোট ছেলেপিলের কান্নাও শোনা যায়। যুদ্ধের পরের সস্তা রসিকতাই ছিল—দেখতো ঐ খোকার পেরাম্বুলেটারটা আমেরিকান কিনা।

ইংলণ্ডের কাগজের বিজ্ঞাপনে সে দেখেছে যে, হবুভাড়াটের ছোট ছেলেপিলে আর কুকুর থাকাটা ভাড়াটে হবার পক্ষে অনেক সময় একটা অন্তরায় বলে গণ্য। 'দুপুরে বেলায় বাসায় থাকি না'—এই অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্বলিত ঘরভাড়া চাওয়ার বিজ্ঞাপন সেদেশে বিরল নয়। এসব জিনিস ফ্রান্সে বিশেষ চোখে পড়ে না। কারণ ফরাসীরা ছোট ছেলেপিলে ভালবাসে—অপরের হলেও। আর পারতপক্ষে paying guest রাখে না পরিবারের মধ্যে। ফরাসীদের অযথা লজ্জাসরমের ভানটাও কম; সেটাও একটা কারণ। ফ্রান্সের চেয়ে গুণগ্রাহী দেশে থাকলে, লেখকের ভাড়াটে হবার বিশেষ যোগ্যতাগুলো এমন মাঠে মারা যেত না। অথচ এদেশে কোয়ালিফিকেশনের কদর যে নাই তা নয়। 'চাকর চাই' বিজ্ঞাপনে বাড়ির কর্তাকে লিখতে দেখা গিয়েছে যে, তিনি সদয় মনিব; একথার প্রমাণে তাঁর আগেকার চাকরদের সার্টিফিকেট তাঁর আছে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর একটু দূরে Renault মোটর কারখানার পাড়ায়, একটা হোটেলে দোতলায় একখানা ঘর পাওয়া যায়। ভাড়া দৈনিক রেটে—অর্থাৎ বেশ বেশী লেখকের পক্ষে। উপায় কি। ফুটপাথে শোবার প্রথা যে শীতের দেশে নেই। আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা যে ব্যবহার করা যায় মোটে রাত দেড়টা পর্যন্ত। নিজেদের দেশের গাছতলার সাড়েতিনহাত জমির রাজাদের উপর ঈর্ষা হয়। হোটেলওয়ালারা লেখকের মুখচোখের ভাব দেখে কি বোঝে জানি না। জিজ্ঞাসা করে কতদিন থাকা হবে? বছর দুই! তার স্বর নরম হয়। একটা চোখ পিট্‌পিট্ করে গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'থাকুন ত দিন কয়েক এই ঘরে, তারপর হয়ে যাবে একখান মাসিকভাড়ার ঘর খালি।' ঠিক মনে হয় যেন একজন পাঞ্জাবী শালওয়ালা একখান আলোয়ান গছনোর পর হুজুরের কাছে কাতর নিবেদন করছে যে, এর দামটা যেন আর কাউকে না বলা হয়।

যে ভাড়াটের দুই বছর থাকার আশা আছে, তার সঙ্গে গল্প করবার নিয়ম, যে ভাড়াটে দুই দুগুণে চার বছর থেকে হোটেলে আছে তার সঙ্গের ব্যবহারের আত্মীয়তার সুরে। কাজেই হোটেলওয়ালা গল্প জমায়।

—জানেনইত এদেশে হোটেলের কিরকম হাতফের হয়। ইংলণ্ড থেকে আসা লোকের এই বছর বছর হোটেলের স্বত্ব বদল হওয়াটা, আশ্চর্য লাগবারই কথা। আমরা এই হোটেল নিয়েছি মাত্র এই সপ্তাহে। ছোট হোটেল নয় এটা। দেখছেন ত এই চিঠি রাখবার পায়রাখুপীগুলো—প্রতি ঘরের নম্বর দেওয়া দেওয়া—চুরাশিটা ঘর আছে এই হোটেলে। তিন ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সেরকম দুর্নামওয়ালা বাড়ি এটা নয়। মাসিক ভাড়ার ঘর খালি হলে প্রথম দাবি আপনার—পেয়েই যাবেন দিনকয়েকের মধ্যে। আগের মালিক কি যে করে রেখেছে হোটেলটার তা যদি জানতেন। আমাদের একটু গোছগাছ করে নিয়ে বসতে দেন না, দেখিয়ে দেব ভাড়াটেদের সুবিধার দিকে তাকিয়ে হোটেল চালাতে হয় কি করে। তবে কি জানেন, ভাড়াটেদেরও আমাদের সঙ্গে সহযোগ দেওয়া চাই। এতক্ষণে হোটেলওয়ালার গিন্নিও মুসিয়ো হিন্দুর সঙ্গে আপনার জনের মত গল্প আরম্ভ করেন। সেই সনাতন 'ছেলেপিলে কটি?' থেকে আরম্ভ। ফরাসী দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জানে যে চীনেম্যান আর হিন্দুদের প্রচুর ছেলেপিলে হয়।......গল্প শেষ হয় কাজের কথায়—'জানেনত মুসিয়ো আন্তর্জাতিক ছাত্রসংঘের অনুমোদিত হোটেল এটা?'

এইখানেই লেখক এসে ওঠে। 'রেনো' মোটর কারখানার মালিকরা যুদ্ধের সময়

জর্মনদের সাহায্য করেছিলেন। তাই ফরাসী সরকার এটাকে বাজেয়াপ্ত করে জাতীয়-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ পাড়ার অধিকাংশ লোকেই এই কারখানার সঙ্গে কোন না কোন রকমে সংশ্লিষ্ট। লেখক ভাবে যে, এ তার হ'ল শাপে বর; এ পাড়ায় থাকলে এদেশের মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করবার সুযোগ পাবে।

গান্ধী চলে গেলে কি হয়, গান্ধী সম্পর্কিত অস্বস্তির অবশেষ এ কয়দিন লেখকের মন থেকে যায়নি। নতুন ঘরে আসবার পর তার মনটা হাল্কা হয়। তখনই সে ঘর বন্ধ করে বার হয় নতুন পাড়ার লোকজন দেখতে। মেত্রোর ধারে যে ছেলেটি কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ 'লুমানিতে' বেচছিল, কাগজ কিনতেই সে জিজ্ঞাসা করে যে মুসিয়োর বাড়ি মিশর দেশে কিনা? মুসিয়ো জাতে হিন্দু শুনে সে খুব খুশী; কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতি দেখতে এসেছে শুনে মর্মাহত হয়। লেখকের চেয়েও বেশী সব-জান্তা ভাব ছেলেটির।

—ভুল করেছেন মুসিয়ো। এই জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু সংস্কৃতির কি দেখবেন? আছেনত এখন কিছুকাল? একটা কাফেতে 'রাঁদাভু' ঠিক করে, একদিন আমি আমার কয়েকজন সাথীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন তাদের সঙ্গে ফ্রান্স সম্বন্ধে কথা বলে।'......

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভুল করতে করতেই লেখকের জীবনটা কেটে গেল;—এও বলে ভুল করেছেন ফ্রান্সে এসে! থাকগে! আজ আর সে নতুন পাড়া দেখবে না। নতুন ঘরে আরাম করে বসে খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে পড়বে। জিনিষপত্র টানাটানি করে, আজ সে একটু পরিশ্রান্তও হয়ে পড়েছে।......

এ কি! তার ঘরের দরজা খোলা কেন? ও তাই বল! মেড বিছানা পাতছে।

"ও লালা! বঁজুর মুসিয়ো"

বেশ হাসিখুসী স্ত্রীলোকটি। এ মেড অপ্রস্তুত হতে জানে না। জিজ্ঞাসা করে—"এখনই এলেন; না? আমিও এ তলাতে আজকেই বাহাল হয়েছি। আগে কাজ করতাম চার পাঁচ আর ছয় তলার ঘর-গুলোতে। দুজন মেড আছে কিনা এই হোটেলে। একজন কাজ করে উপরের তিন তলায়; আর একজন নীচের তলাগুলোয় আর লণ্ড্রিতে। মাটির নীচের তলায় গিয়েছেন—যেখানে জল গরম করবার যন্ত্র আর লণ্ড্রি আছে। সেই লণ্ড্রিতে আগের মেড ভাড়াটেদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তাদের জামা কাপড় কেচে দিত। সে লণ্ড্রি হল হোটেলের তোয়ালে চাদর কাচবার জন্য —সেখানে ভাড়াটের কাপড় কাচলে চলবে কেন। তাই নতুন মালিক সে মেডকে বিশ্বাস পায় না। নিজের রোজগারেই যদি ব্যস্ত থাকবি তাহলে মালিকের কাজ করবি কখন! আমাকে তেমন পাওনি, কড়ায় ক্রান্তিতে মাইনেটি গুণে নেব, আর মুখ বুঁজে মালিকের জন্য কাজ করে যাব। ...ওলালা! বলতে ভুলে গিয়েছি—আমার নাম অ্যানি। নতুন মেড, নতুন ভাড়াটে, নতুন মালিক। বেশ মজার, নয়?......

খুব কথা বলতে ভালবাসে অ্যানি—বিশেষ করে 'ওলালা!' বলতে। অবাক হলে পর 'ওলালা' বলবার কথা; অ্যানি আশ্চর্য না হলেও বলে। বেশ চটপটে। কালো চোখ, ছুঁচলো নাক, চুলগুলো স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, গায়ে কাজের এপ্রন, পায়ে কম্বলের জুতো। পায়ের গোছা কি মোটা! এর কথা আশ্চর্য-রকমের স্পষ্ট; আর বলেও খুব আস্তে আস্তে। সব কথা সুন্দর বোঝা যায়। প্রত্যহ এর সঙ্গে খানিকটা করে গল্প করলে, ফরাসীতে কথাবার্তা বলা বেশ অভ্যাস হয়ে যেতে পারে।......

—"জানো ,আমাদের দেশেও মেয়ের নাম হয় আনি, অ্যানি নয়, আনি। এইরকম ছোট নাম আমার খুব পছন্দ। দেশে থাকতে ফরাসী ভাষার মাস্টার আমাকে কি শিখিয়ে-ছিল জানো? বলেছিল ফ্রান্সে কারও নাম ধরে ডাকলে, সে নাকি কথার জবাব দেয় না।"

—ও লালা! আমি কি মাথায় টুপি পরি যে, আমায় মাদাম-বলে ডাকতে হবে?

এবারকার 'ও লালা' কথাটা সত্যসত্যই অবাক হয়ে বলা। অ্যানি আর দাঁড়াতে পারে না—এখনও ব'লে তার সাতখানা ঘর সারা বাকি।......

ডায়েরি

আমাদের আদর্শ রিপু জয় করা; এদের আদর্শ সেগুলো বাইরে উৎকটভাবে প্রকাশ না পেয়ে যায় তাই দেখা। আমাদের আদর্শে অতিমানব ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না; ওদের আদর্শে সাধারণ লোকও চেষ্টা করে পৌঁছে যায়। মনের ভিতরের রিপুগুলোর কথা তাই ফরাসীরা ভাবে না। যারা ভাবতে জানে তারা ভাবে বাইরের রিপুর কথা। এই বাইরের রিপু চারটে। গুরুত্বের ক্রমানুসারে সেগুলো এই:—

(১) জার্মান বলে যে বর্বর জাতটা গত আশি বছরের মধ্যে তিনবার তাদের আক্রমণ করেছে।

(২) দেশের জনসংখ্যা না বৃদ্ধি পাওয়া।

(৩) ফরাসী উপনিবেশগুলির লোকদের স্পর্ধা

(৪) একটি রুচিহীন অমার্জিত জাতির হাতে মানব সভ্যতার নেতৃত্ব ধীরে ধীরে চলে যাওয়া।

এই চার রিপুর দেশে ঋতুও মোট চারটে—বসন্ত, গ্রীষ্ম অটাম্ন ও শীত। এখন অটাম্ন, অর্থাৎ বৃষ্টির ও পাতা ঝরার সময়। তবে আমাদের দেশের বৃষ্টি ছাতায় আটকায় না; এখানকার বৃষ্টি জামায় আটকিয়ে যায়।

অটাম্নে ছিঁচকাঁদুনে প্যারি বায়না ধরে—আর বুলভারে বসে কফি খেয়ো না। ওঠ; যাও, কাফের ভিতর বসে লালমদ খাও। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে থাকলে লালমদটা একটু গরম করে নিও। ইচ্ছে হলে সাদা-মদও খেতে পার। সাদাটা খেতে মিষ্টি হলে কি হয়, আটপৌরে লালটাই ভাল শরীরের পক্ষে। নেহাৎ যদি স্নায়ুরোগগ্রস্ত লোক হও, তবে না হয়, আপেলের মিষ্টি মদ খেয়ো দু গেলাস। 'কনিয়াক'টা কিন্তু খবরদার যখন তখন নয়। ইংরাজ জার্মান-দের সুরুচি আসবে কোথা থেকে। বার্লি-চোয়ানো উৎকট স্বাদের মদ খেলে কি আর রুচি ঘোলাটে না হয়ে গিয়ে পারে। তাদের দেশে আঙুর থাকলে কি আর তারা ঐ তেতো বিয়ার খেয়ে মরত। গরমের সময় এক আধ গ্লাস আলসাসের বিয়ার যে এদেশের লোকেও না খায়, তা নয়। কিন্তু ভরা শীতে বিয়ার! ও লালা! আঙুরের তৈরী কনিয়াকএর স্বাদ, আর বার্লি থেকে তৈরী হুইস্কির স্বাদ! কিসে আর কিসে! হঠাৎ-বাবু আমেরিকার পানীয়গুলোও ঐ একই রকম! ঐ যে নতুন কোকাকোলার ধুয়ো উঠেছে। খবদ্দার খেয়োনা; খারাপ জিনিষ। শুনেছি নাকি আমেরিকা ফরাসীদের মদ খাওয়া ছাড়িয়ে কোকাকোলা ধরাবে। পড়নি দ্যগলএর কগজ 'রাসাম্‌ব্‌লমা'তে? হাজারে হাজারে নাকি কাকাতুয়াদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে—ফরাসী ভাষায় 'কোকাকোলা খাও' বলতে। বিনা পয়সায় দেওয়া হবে পাখী-গুলোকে, সব বার, কাফে, ক্যাসিনোতে। ভাল মদ তৈরী করার পিছনে কত মঠের

ধর্মযাজকদের, হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য আছে, সে খবর কি রাখে আমেরিকার কোটিপতিরা? মাত্র দু'শ বছরের ইতিহাস আমেরিকার পুঁজি; একশ বছর আগেকার বাড়ী নিয়ে তারা ঐতিহাসিক গবেষণা করে। তারা আসে আমাদের মদের উপর কথা বলতে। ওরাই, আমাদের সর্বনাশ করবে, এই বলে রাখলাম! 'মার্শাল এড' না ছাই! কোথায় বাড়ি তয়ের করবার মালমশলা পাঠাবে, তা নয় বাড়ি ভাঙবার বোমা পাঠাচ্ছে! নিজের দেশে ত একবার মদ-খাওয়া তুলে দিতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেয়েছিলি। নিজের ফেলা থু থু চেটে তুলতে হয়েছিল আবার। ছাপার অক্ষরে অরুচি না থাকলে আমেরিকানরা বুঝতো যে, আসল ওমর-খৈয়েমের দেশ এইটাই। এখানকার কবিরা মদ আর আঙুর ক্ষেতের উপর কবিতা লেখে। মদের বোতল গেলাস আঁকেননি এমন চিত্রকর এদেশে জন্মাননি। মদের প্রদর্শনী হয় এখানে প্রতি বছর। 'মদের বাজার' (Halle au Vins) প্যারিসের একটা নামজাদা টিউব স্টেশন। সেখানকার রাস্তাগুলোর নামেরই বা কি বাহার! শ্যাম্পেনের পথ, বোর্দোর সড়ক ইত্যাদি। ফ্রান্সে বকশিশকে বলে 'পুরবোয়া' —অর্থাৎ মদ খাওয়ার জন্য পয়সা। উৎকোচকে বলে মদের পাত্র (pot-de-vin)। শাকভাতকে বলে মদরুটি। এদেশের সাধারণ ভদ্দরলোক চোখ বেঁধে দিলেও, কেবল গন্ধ শুঁকে অন্তত পঁচিশ রকমের মদ কোনটা কোথাকার, তা বলে দিতে পারে। প্রতি ডিশের আগে পরে সময়োপযোগী মদ না পেলে অভ্যাগতরা গৃহস্বামীর অকল্যাণ কামনা করেন। ভাল হোটেলের মেনুতে রসবেত্তাদের বাছবার সুবিধার জন্য কোথাকার কাদের ক্ষেতের আঙুর থেকে কোন মদটা তৈরি, তাও লেখা থাকে। মদের বয়স নিয়ে কর্তাগিন্নির মধ্যে ঝগড়া হয়; মদ মিলানোর উপর হোটেলের chefদের পুরস্কার প্রতিযোগিতা হয়। সবকষ্টটা বেদাঙ্গ সমেত মদের বেদ না জানলে, এদেশে কাউকে মার্জিতরুচি বলা হয় না। যে দেশের মেয়েপুরুষ মদের ব্লটিংপেপার, তাদের এসেছে কোকাকোলার মন্তর শোনাতে! কত পুরুষের মেহনৎ আছে দক্ষিণ ফ্রান্সের পাহাড়ের গায়ের ধাপে ধাপে আলদেওয়া আঙুর ক্ষেতগুলোতে, তার খবর বাইরের লোক রাখে কি? পাথর কাটতে হয়েছে; দূর দূর থেকে তার উপর মাটি এনে ফেলতে হয়েছে। বিদেশীরা অনধিকার চর্চা করে কাগজে লেখে যে কর্তার মদ খাওয়া কমলে, ফরাসী-গিন্নির সংসার চালানোর সুবিধা হবে। বাজে কথা! মদ পেটে না পড়লে গিন্নির মুখে হাসি বেরোয় কই! মধ্যযুগের লেখক Robert de Blois-র লেখা বইয়ে ভাল মেয়েদের প্রতি উপদেশ দেওয়া আছে—"মদ খাওয়ার আগে ঠোঁট অবশ্য মুছে নেবে।" কেন জানি না।

এদেশের মেয়েপুরুষের মধ্যে মদ খাওয়ার পরিমাণে সাম্য আছে। কেবল তফাতের মধ্যে, অলিখিত আইন অনুযায়ী, টেবিলের সব মেয়েদের মদের বিলটা পুরুষকেই দিতে হয়।

সত্যিই এদেশে আলাপ পরিচয়, বন্ধুত্ব ভালবাসা, সভাসমিতি, সামাজিকতা, খেলা-ধুলো, ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবসায়িক কথাবার্তা, কোন কিছু সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে না, যদি মদ না থাকে।

ডেলিরিয়ম ট্রেমেন্স্ ও মাতাল বাপের পুত্রহত্যার সংখ্যা সম্বলিত প্যাম্ফলেট্-গুলো বিনা পয়সায় দিলেও কেউ নেয় না। কেন নেয় না এই সমস্যা যখন সভাতে বিচার করতে বসেন টেম্পারানস্ সোসাইটির সদস্যরা, তখনও টেবিলের উপর কফি আর ভিশিওয়াটার ছাড়াও অন্য পানীয় থাকে।

প্রাচীন সমাজে দেওয়া হত নেশার জিনিষের আধ্যাত্মিক রূপ; এখন দেওয়া হয় সামাজিক রূপ। আমাদের দেশের সমাজ, জাত আর চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ। তাই কোন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে সাদা চামড়ার যবনে তামাকপাতা আনল, আর আমাদের হুঁকোর সঙ্গে বাঁধা হল কড়ি। উত্তর ভারতে সমাজ থেকে বার করে দেওয়ার ইডিয়ম হচ্ছে 'হুঁকোজল বন্ধ করা'। সাধে কি আর ফরাসী ভাষায় ইডিয়মের প্রতিশব্দ idiotisme!

ফরাসীদের লেখা ইতিহাসে, কোন কোন সময়ে দেশের দুরবস্থার জন্য লোকদের মদের বদলে জল খেতে হয়েছিল, তার উল্লেখ থাকে।

তেষ্টা পেলে জলস্পর্শ না করবার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য, ক্যাথলিকধর্মী ফরাসী জাতির চরণে, গুরুধর্মী আমাদের দেশের পক্ষ থেকে নতি জানাই।

এখনও টিপটিপুনি বৃষ্টি পাতাঝরার গান গাইছে। যাদের বয়স হয়েছে তারা এই বৃষ্টিটাকে কাফের মদের গ্লাসের হাতছানি বলে ভাবে না। আমাদের দেশেই বলে "মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে, আর বুড়োবুড়ী মরে"। এখানকার শীতে! ও লা লা! সত্তর বছরের অভিজ্ঞতার চাপে কুঁজো বুড়ী বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, বুলভারের গাছতলা থেকে লাল-চেস্টনাট কুড়োয়, শীতের সময় জ্বালানি করবে বলে। এই সব বুড়ো-বুড়ীরা প্যারিসে অবান্তর; কেননা মদ খেলেই এদের লিভার খারাপ হয়। মানবের যুগযুগব্যাপী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছাপা বইয়ের যুগে, বুড়োদের বেঁচে থাকবার কোন সামাজিক সার্থকতা নেই, টিউবট্রেনে ও বাসে উপবিষ্ট লোকদের ওঠানোর কষ্ট দেওয়া ছাড়া।

(ক্রমশ)

স্বদেশী বৌ

ফণীন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত

বাংলা ১৩১৩ সাল, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে বটে কিন্তু 'স্বদেশী' বলতে গদগদ সহজ ভাব আসেনি তখনও আপামর জনসাধারণের মধ্যে। অনেক শংকা, অনেক দুর্বোধ্য রহস্য ঘিরে রয়েছে ঐ'কটি অক্ষরে। স্বদেশী আন্দোলন তখন শহর ছেড়ে আস্তে আস্তে গাঁয়ে ঢুকছে, তবে নিতান্ত অন্য বেশে, স্বতন্ত্র পরিবেশে।

খবরটা আনল প্রথমে ননদ শ্যামা।

রাধারাণী বসে শুকনো বেতের ছাট কেটে সরু শলা বের করছিল। শাশুড়ীর দাঁত খুঁটবার কাঠি তৈরী হবে।

শ্যামা দৌড়ে এসে উল্লসিত হয়ে বলল : গাঁয়ে যে যাত্রা গানের দল এসেছে, জানিস পোড়ামুখী!

রাধারাণী হেসে বলল : তুইত গানের নামেই পাগল। গাঁয়ে এসেছে তাতে আমাদের কি? হাটের আসরে তোকে আমাকে কেউত আর নেবে না এবার।

শ্যামা তার খোঁপা ধরে একটা টান মেরে বলল : ঘরের মধ্যে বসেই তুমি সব জান্তা হয়েছ! হাট কোথায় লো, সরকারদের নাট মন্দিরে। নিজের চোখে দেখে এলুম বড় বড় লণ্ঠন সব পরিস্কার হচ্ছে।

এবারে রাধারাণী আর উৎসাহিত না হয়ে পারল না।

—সত্যি ভাই? কবে—কখন?

—আজই। শুনছি নাকি সন্ধ্যে থেকেই সুরু হবে।

আনন্দে গলার আওয়াজ একেবারে ভেঙে পড়ল শ্যামার।

রাধারাণী চুপি চুপি বলল : তবে মাকে গিয়ে ধর।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, সব ব্যবস্থাই করছিরে রাক্ষুসী।

আশ্বাস দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল শ্যামা।

বাড়ীতে বুড়ি থাকে মেয়ে আর ছেলের বৌকে নিয়ে। চাকরও একটা আছে। ছেলে অতুল খালের ওপারে সেই নকল বন্দর থানার জমাদার। হাট থেকে সওদা করে শনিবার রাতে আসে আবার রবিবার খেয়ে দেয়ে চলে যায়। কোন কোন বার আসেই না নয়ত হঠাৎ এসে একদিন হাজির হয়। কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে আবার চলে যায়।

শ্যামা গিয়ে কথাটা পাড়তে বুড়ি আর আপত্তি করল না। বড় সরিকের মেয়ে বউ যাচ্ছে যাত্রা শুনতে। তাদেরই দলে ভিড়ে গেল শ্যামা আর রাধারাণী।

আসরে গিয়ে সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়। যাত্রার দলের হাবভাব দেখে, তাদের কথাবার্তা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারল না তারা।

শ্যামা ত স্পষ্টই বলল : ছাই যাত্রা। না আছে পোষাকপত্তর না আছে রাজা রাজড়ার যুদ্ধ! মনে নেই বৌ সেই সেবার দাদা নিয়ে গেল হাটের আসরে! ইঃ ক'গণ্ডা সাজা মেয়ে কী নাচটাই না নাচলো!

রাধারাণী তার গায়ে চিমটি কেটে বলল : আঃ চেঁচাচ্ছিস কেন! শোন না চুপ করে।

শ্যামা কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ক'জন আবার উঠেও পড়ল আসর থেকে।

শ্যামা বলল : আমাকে শীতে ধরেছে বৌ, বাড়ি চল।

শ্যামার হাত দুটো ধরে ফিস ফিস করে রাধারাণী বলল : লক্ষ্মী বোনটি চুপ করে বসে মন দিয়ে শোন। আর না হয়, এই নে,—এইখানে আমার কোলে মাথা রেখে একটু গড়িয়ে নে।

যাত্রার আসরে আড়ম্বর নাই। জন-কতক লোক খোল, করতাল আর হারমো-নিয়াম বাজাচ্ছে। সবারই পরণে গেরুয়া। আসরের মাঝখানে বাঁশের লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে আর একজন। গেরুয়া আলখাল্লা পরে মাথায় পাগড়ী বেঁধে বাজনার তালে তালে সে গাইছে :

"তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্নমেলা ভার
দেশী বস্ত্রশস্ত্র বিকায় না কো আর
হল দেশের কি দুর্দিন!"

রাধারাণী তন্ময় হয়ে শুনছে :—

"সুই সুতা পর্যন্ত আসে তুংগ হতে
দিয়াশলাই কাঠি সেও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!"

বাপের বাড়ি থাকতে, শশুরবাড়িতে এসেও রাধারাণী ত আর কম কীর্তন আর যাত্রা শোনে নাই! গান শুনে আসরের মাঝে বসে বাহবা দিয়েছে, ভাঁড়ামি দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছে, আবার চোখের জলও ফেলেছে রাধিকার বিরহে, সীতার দুঃখে। কিন্তু এবার এ হোল কি! কেমন যেন একটা অস্পষ্ট আত্মগ্লানি এল মনে, গত মাসের মাইনে পেয়ে ফিনফিনে এক বাহারে শাড়ি এনেছিল অতুল আর এনেছিল রং বেরং-এর কাচের চুড়ি। সেগুলি পরেই এসেছিল রাধারাণী যাত্রা শুনতে। অবশ্য একা রাধারাণী নয়, অমন সাজে আরও এসেছিল কতজন। কিন্তু সেটা কোন কৈফিয়ৎই বলে মনে হোল না। মনটা তার খুঁত খুঁত করতে লাগল।

গ্রামের লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশী যাত্রার দলের কথা।

শ্যামা হেসে বলল : স্বদেশী না গুষ্ঠির মুণ্ডু। আহা; গানের কি ছিরি! স্বদেশী মানে কিরে বৌ?

স্বদেশী গান শুনে মনে দোলা লেগেছে রাধারাণীর। বাপের বাড়িতে ন' পিসেমশাই-এর মুখে এ ধরণের গান সে শুনেছে। বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে আছেন পিসেমশাই কিন্তু কারও কোন ধার ধারেন না। দু'দিন বাড়িতে থাকেন ত দশদিন বাইরে কাটিয়ে আসেন। মাথা নেড়া করা, পরনে তারও গেরুয়া---ছেলেদের লাঠিখেলা শেখান এখানে ওখানে গিয়ে। নিজের দেশকে ভালবাসার কথা তিনি সবাইকে বলতেন।

শ্যামার প্রশ্নের উত্তরে রাধারাণী বলল : কথাটার মানে হোল, নিজের দেশ, তাকে ভালবাস।

শ্যামা বিজ্ঞের মত হেসে বলল : দেশ কি একটা মানুষ যে তাকে ভালবাসতে হবে!

তর্ক করে, চুলচেরা বিচার করে বোঝাতে ঠিক পারে না রাধারাণী। তবু মনে হয় শ্যামাটা একেবারেই বোকা; নিরেট মাথা ওর।

গান আজও হবে। শ্যামা কিন্তু একেবারে বেঁকে বসল। সে যাবে না কিছুতেই। শ্যামা না গেলে রাধারাণীরও যাওয়া হয় না। কিন্তু অদৃশ্য থেকে সুতো ধরে কে যেন টানছে তাকে যাত্রার আসরে।

সকাল সকাল কাজ সেরে শ্যামার হাত ধরে অনুনয়ের সুরে রাধারাণী বলল : লক্ষ্মী ভাই আমার ঠাকুরঝি, আজ চল। আর কোনদিন বলব না তোকে। না হয় তোর জন্যে চাদর বালিশ নিয়ে যাব।

শ্যামা বলল : হ্যা, ঘর ছেড়ে আসরে গিয়ে শুই আর কি!

রাধারাণী লোভ দেখাল : কালই আমার সেই ভুরেকাটা শাড়িটা তোকে দিয়ে দেব। মাইরি বলছি!

শেষ পর্যন্ত কাপড়ের লোভে শ্যামা রাজী হল। শুধু তাই নয় বুড়ির অনুমতিও সে আদায় করল।

পালা গানের গল্পের ভেতর দিয়ে সংসারে ভায়ে ভায়ে মিলনের কথা, হিন্দু মুসলমানের একতার কথা এবং সর্বোপরি নিজের দেশকে ও দেশী পণ্যকে ভালবাসার কথা গান করে তারা শোনাচ্ছে সবাইকে।

কালকের দেখা সেই গেরুয়াধারী পাগড়ীওয়ালা তাণ্ডব নাচ নাচছে আর গাইছে :—



হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি চিক্‌ খুলে আসরে ছুড়ে দিল

"মাভৈঃ মাভৈঃ ঐ শোনরে অভয়বাণী
হুংকারে ঝংকারে কাঁপিছে মেদিনী
দানব দলনী হ'গো উন্মাদিনী
'আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।"

গায়কের গলার ধমকে আসরটা গম গম করছে। খোল করতালগুলো যেন সজীব হয়ে উঠেছে। তারাও যেন কথা বলছে ঃ ঝন্ ঝন্ ঝংকার। খোল মৃদংগে হুংকার ছাড়ছে!

রক্তে যেন অজানতে কে এসে নাচন লাগিয়ে দিয়েছে রাধারাণীর। মাথার ঘোমটা খসে পড়ছে তার।

রাত অনেক হয়েছে। পাশে শুয়ে শ্যামা দিব্যি ঘুম দিচ্ছে! আসরে টুঁ শব্দটি নেই।

শেষ দৃশ্যে আঙ্গুল কাটা তাঁতি সেজে একজন ছুটতে ছুটতে আর্তনাদ করতে করতে এল। তাকে দেখলে হাসি পায় কিন্তু কথাগুলি মর্ম স্পর্শ করে তীব্রভাবে।

সে যখন কাঁদিতে কাঁদতে গাইতে আরম্ভ করল ঃ—

"মোমিন বলে কারিগো মানা
ভাতের দুঃখু আর থাকব না
বিলাতী চিজ কিনবা নারে আর
কও কসম করি
ওরে দেশের টাকা রইব্রোরে দেশে
লক্ষ্মীঘরে আসবোরে ফিরি।"

রাধারাণী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি খুলে চিক তুলে আসরে ছুড়ে দিল।

আসরে সোরগোল উঠল।

কে ফেলল? কে ছুড়ে ফেলে
দিল কাঁচের চুড়ি?

আশেপাশের মেয়েরা দেখেছে। তাদের ভেতর একজন বুড়ি চেচিয়ে উঠল; ফেলেছে রাধা, পুবের বাড়ির যতীন ঘোষের পুতের বৌ রাধারাণী।

যাত্রার দলের সেই পাগড়ীধারী ধীরে ধীরে আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মেয়েদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে নমস্কার জানাল, বলল ঃ ধন্য মা ধন্য!

রাধারাণী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল চিকের আড়ালে।

বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাধারাণী। ঘটনাটির নাটুকেপনায় এবার সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে শ্যামাকে নিয়ে কোন মতে আসর থেকে সরে পড়ল রাধারাণী।

পথ চলতে চলতে শ্যামা বলল ঃ অমন বাহারে চুড়িগুলো ফেলে দিলি যে বড়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে শ্যামার কাঁধে হাত রেখে রাধারাণী গুণ গুণ করে গান ধরল ঃ

"ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরো না
জাগগো ও ভগিনী ও জননী,
মোহের ঘোরে আর থেক না।"

শ্যামা বলল ঃ মরণ আর কি! রঙ্গ দেখ না,—ঘর ছেড়ে যা না তবে যাত্রার দলে।

বাড়ির কাছে পৌঁছতেই রাধারাণী শ্যামার হাত ধরে বলল ঃ ও ভাই ঠাকুরঝি চুড়ির কথা মাকে বলিস না যেন!

শ্যামা বলল ঃ আসরের মাঝখানে অমন কান্ডটা করলি, আমাকে আর বলতে হবে না!

তাও বটে। রাধারাণী ভাবল মনে মনে। কিন্তু কোন অন্যায় ত সে করে নি তবে রাগ করবে কেন শাশুড়ী, অতুলও বা অনুযোগ করবে কেন?

সবশুনে শাশুড়ী কিন্তু অকথ্য গালাগালি দিল। গালাগালই দিল না শুধু, ভয়ও দেখাল ছেলের কাছে নালিশ করবে বলে।

অতুল বাড়ি আসতে না আসতে বুড়ি গিয়ে লাগাল দশকথা।

বড় সরিকের বড় দাদার কাপড়ের দোকান আছে বাজারে, বিলাতী কাপড় ঠাসা সেখানে। যাত্রার দলের গান শুনে হাড়ে হাড়ে সে চটেছে তাদের উপর।

অতুলকে সামনে পেয়ে সে বলল ঃ পুলিশে কাজ কর অথচ ঘর সামাল রাখতে পার না? সরকারের কানে গেলে ভেবেছ সেটা ভাল হবে?

অতুল কিন্তু চট করে ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। এখন বুঝতে পেরে গুম মেরে রইল।

রাতে খাবার পর শুতে এসে রাধারাণী দেখল অতুল গম্ভীর হয়ে ঠায় বসে আছে খাটের উপর। বাড়িতে এসে অবধি একটি কথাও সে বলে নি এবার তার সঙ্গে।

রাধারাণী আস্তে আস্তে অতুলের সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বলল ঃ রাগ করছ কেন?

অতুল বলল ঃ এসব শুনছি কি? চুড়ি হাত থেকে খুলে যাত্রার আসরে ফেলে দিয়েছ,—ছিঃ—!

রাধারাণী বলল ঃ তুমি যদি সে সব গান শুনতে রাগ করে এমন করে থাকতে পারতে না।

অতুল গলল না। প্রশ্ন করল ঃ চুড়ি ফেলে দিলে কেন?

—বিলেতী বলে।

বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই রাধারাণীর গলার আওয়াজে।

অতুল ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে। বলল ঃ জান এ দেশটা শাসন করছে বিলেত। তাদের দৌলতে আমরা খেতে পাই।

রাধারাণী চুপ করে একটু হাসল মাত্র।

অতুল তত্ত্বকথা বলতে আরম্ভ করল ঃ দেশে এত বড় বড় জজ, ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে ঐ যাত্রাওয়ালার কথাই বড় হয়ে গেল। ওদের কি মান সম্মান আছে নাকি?

রাধারাণী এবারও উত্তর দিল না। কিন্তু স্বামীর কথায় মনের কোনটাতে খচ্ করে একটা ব্যথা লাগল। ঐ যে গেরুয়াধারী গায়ক ওঁর কোন সম্মান নাই? দেশকে ভালবাস, দেশের জিনিস কেন বললে তা অপরাধ হবে? না, তা হতে পারে না। বুড়ি শাশুড়ীটাই বোধহয় বানিয়ে যা তা বলেছে। অতুলের ব্যবহারে বড় অভিমান হোল রাধারাণীর।

অতুল তার বক্তব্যের উপসংহার করল ঃ ফের যদি কোনদিন এসব শুনি ত ভাল হবে না বলছি। গেরস্থ ঘরের বউ ঝিদের অত ঢং কিসের?

শ্যামা আর তার দাদার মধ্যে তফাৎ কোথায়? ওদের মন বলে কিছু নেই।

শুয়ে শুয়ে রাধারাণী যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার একপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ন' পিসেমশাই, আর একপাশে সেই গেরুয়াধারী গায়ক। বুকের মধ্যে যেন শত শত পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। দুর্গাবতী আর পদ্মিনীর গল্প শ্বশুর বাড়ীর নয়। চুল কেটে ধনুকের ছিলে তৈরী করে মায়েরা পাঠাত ছেলেদের যুদ্ধে একথা শুনে ওরা হাসে।

রাধারাণী স্বপ্ন দেখছে সে বীরাষ্টমী ব্রত করছে......তার ছেলে হয়েছে......মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে করে গান করে সে ফিরছে গাঁয়ে গাঁয়ে ঃ

"ছেড়ে দিয়ে সুখ, দূরে রেখে মান
বীর সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ।"

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙেগ গিয়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়াতে রাধারাণী খুসী হয়ে উঠল। মনের সব গ্লানি যেন তার ধুয়ে মুছে গেছে।

সকাল বেলায় রাধারাণীকে ফের অতুল প্রশ্ন করল : অমন মোটা মোটা কাপড় পরে বেড়াও কেন? সেই মিহি কাপড়গুলি গেল কোথায়?

এই বুঝি আবার ধমকানি চললো।

রাধারাণী অতুলের হাত ধরে বলল : বলছি এস ঘরের ভেতর।

অতুল ঘরের ভেতর এলে রাধারাণী বলল তাকে : দেখ, বিলেতী কাপড় আর এনো না। ও আমি পরব না আর।

এবারে আর উপদেশ নয়। অতুল ক্ষেপে উঠে বলল : এতদূরে আস্পর্ধা হয়েছে তোমার?

রাধারাণী কেঁদে ফেলল। বলল : অপরাধ যদি হয়ে থাকে দণ্ড দাও। আমার মন যে বলে ওসব ছোঁবে না। দেখ, বুকে হাত দিয়ে দেখ।

নিজের হাতখানা টেনে সরিয়ে নিল অতুল। মুখ ভেংচি কেটে অশ্লীল সুরে বলল : তোমার মন হয়েছে তবে সেই শালা যাত্রাওয়ালা।

পরক্ষণেই রুক্ষকণ্ঠে বলল : গাঁটের পয়সা ত আর ন্যাকামি দেখবার জন্যে খরচ করিনি। যাও নিয়ে এস সেই কাপড়গুলো।

বাক্স খুলে রাধারাণী ভয়ে ভয়ে কাপড়গুলি নিয়ে এল।

অতুল যেন চোর ঠেঙাচ্ছে। বলল : যাও একখানা গিয়ে পরে এস এখুনি।

কাপড় পরতে গিয়ে রাধারাণীর মনে হোল যেন গলায় ফাঁস দিচ্ছে সে।

বাড়ি থেকে যাবার সময়ও ধমকে গেল অতুল : এ বাড়িতে থাকতে হোলে যাত্রার দলের কথা শুনলে চলবে না। শুনতে হবে আমার কথা।

অতুল চলে যাবার পর কান্নায় একেবারে ভেঙেগ পড়ল রাধারাণী। বার বার মনে ক্ষমা চাইতে লাগল—আমার মন ত জান তোমরা। অপরাধ নিও না।

রাতে পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে শ্যামা। সবগুলি বিলাতী কাপড় ছোট বাক্সটার পুরে চুপি চুপি দোর খুলে বেরিয়ে এল রাধারাণী।

এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে, রাধারাণী আস্তে আস্তে গড়িয়ে ফেলে দিলে বাক্সটা পেছনের ডোবার মধ্যে।

দোরটা খোলাই রাখল।

বিছানায় উঠে বসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাধারাণী: ও ঠাকুরঝি চোর, চোর এসেছে ঘরে।

ধাক্কা খেয়ে শ্যামাও উঠে চেঁচাতে লাগল: চোর—চোর।

পাশের ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে শাশুড়ী এল, চাকর গোপী এল। বড় সরিকেরও কেউ কেউ এল।

বেশী কিছু নিতে পারে নাই। রাধারাণীর কাপড়ের বাক্সটা নিয়েই পালিয়েছে চোর।

চোর চুরি করেছে! কে আর কাকে দোষ দেবে। তবুও বুড়ি বক্‌বক করতে লাগল।

মন খুলে একটা গানও করতে পারবে না রাধারাণী। বুড়ি গিয়ে আবার লাগাবে ছেলের কাছে। স্বদেশী গান যেন হয়েছে কবির খেউর। রাধারাণীর অন্তরঙ্গ আছে একজন শুধু এই শত্রুপুরীতে। সে বড় সরিকের ছোট ছেলে ঝণ্টু।

চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকে ঝণ্টু বলল: গানের খাতা নেবে সুন্দরবোঠান?

—কি গানের খাতা ভাই ছোটঠাকুরপো?

চাপা গলায় বলল ঝণ্টু: স্বদেশী গান।

—কোথায় পেলে তুমি?

আনন্দে লাফিয়ে উঠল রাধারাণী।

ঝণ্টু বলল: যাত্রার দলের একটা ছেলের কাছ থেকে টুকে নিয়ে এসেছি।

—দাও ভাই দাও। রাতে সবাই ঘুমুলে একা বসে গান করব।

খাতাটা টুকে নিল রাধারাণী।

রাধারাণী যেন মহারত্ন লাভ করেছে। বার বার খাতাটা কপালে ঠেকাতে লাগল যেন মঙ্গলচণ্ডীর দণ্ড।

নিশুতি রাতে উঠে চুপি চুপি মাটির প্রদীপটা জেবলে শিয়রে রাখে সে।

......গানের কথাগুলি তাকে এক স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে যায়। গর্ভধারিণী যেমন মা তেমন মা এই জন্মভূমি। তাঁর প্রভু হয়েছে বিদেশী। ঐশ্বর্য হারিয়ে মা হয়েছে কাঙালিনী, আমরা হয়েছি পরমুখাপেক্ষী।

কাচের চুড়ি ফেলে বিলাতী কাপড় কেনা বন্ধ করে কতদিনে যে বিদেশী তাড়ান যাবে সেটা ঠিক বুঝতে পারে না রাধারাণী। তবুও ভাবতে বড় ভাল লাগে বিদেশী চলে যাবে। ভাললাগে স্বদেশকে ভালবাসতে, বীর পুত্র পেতে যারা গিয়ে দোরে দোরে বলবে: বিদেশীর কাছে হাত পেত না। দ্রৌপদী, কৌশল্যা, কুন্তীর চেয়ে তখন তারা কম কিসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙেগ যায় শ্যামার।

—আঃ, এত রাতে আলো জেবলে করিস কিলো?

বালিশের তলায় খাতা লুকোতে লুকোতে রাধারাণী বলে: তোর তো ভাই কুম্ভকর্ণের ঘুম। এদিকে ছারপোকায় ত আমার সব রক্ত চুষে নিল। বেটাদের বংশ আজ নির্বংশ করব বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছি।

সজাগ পাহারা চারিদিকে রেখে গেছে অতুল। যাত্রার গানের একটি শব্দও মুখে আনতে পারবে না বলে বার বার শাসিয়ে গেছে সে! কিন্তু মুখ বন্ধ করালে ত আর মন বন্ধ করা যায় না। মনে মনে কত গান করে রাধারাণী, বড় ভাল ছেলে ঝণ্টু। তার একমাত্র আত্মার আত্মীয়। গানের খাতা ত নয় স্বর্গের চাবিকাঠি দিয়ে গেছে সে তার হাতে।

পরমানন্দে কটা দিন কাটল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে রাধারাণী।

পেছন থেকে চুপি চুপি ঝণ্টু ডাকল: সুন্দর বোঠান।

—কি ভাই ছোট ঠাকুরপো?

আলোটা তুলে ধরে এগিয়ে এল রাধারাণী।

—একি, চোখমুখের চেহারা অমন হয়েছে কেন?

রাধারাণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

ঝণ্টু বলল: শোননি এখনও?

—না, শুনব কি?

ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল রাধারাণীর।

ঝণ্টু বলল: স্টেশনের পাশে গান হচ্ছিল। পুলিশ এসে আসর ভেঙেগ দিয়েছে, ধরে নিয়ে গেছে সেই মাস্টারকে।

পুলিশে ধরে নিয়ে গেল তাঁকে?

একহাতে দাওয়ার খুঁটিটা ধরে রাধারাণী প্রশ্ন করল!

—হ্যাঁ, শুনছি কয়েদে রাখবে। স্বদেশী গান গাইলে অমনি নাকি সবাইকে ধরবে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রাধারাণীর।

অতুলও ত পুলিশ। তবে কি পুলিশে

স্বদেশীতে শত্রুতা আছে? এতদিনে সে যেন বুঝতে পারল গানে অতুলের রাগ কেন এত। কিন্তু পুলিশও ত এই দেশেরই লোক। কী জানি এদের হাবভাব বুঝতে পারে না রাধারাণী।

মনের অবসাদটা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকল না। অভিমন্যু মারা গেলে দ্রৌপদী ত কেঁদে ক'কিয়ে নেতিয়ে পড়ে নি। অতটুকু মেয়ে উত্তরা সেও ত ছিল সোজা হয়ে। হঠাৎ মনে যেন অসীম বল এল রাধারাণীর। এত হবেই এই ত স্বাভাবিক। একদল ভাল করবে আর একদল তা' রুখবে। ছোটবেলায় ন' পিসেমশাই এর বড় আদরের ছিল সে। তাঁর মুখে রঘুডাকাতের গল্প শুনেছে, আনন্দমঠের গল্প শুনেছে আর শুনেছে এই দেশের বড় বড় বীরদের কথা। বহুদিন পরে শ্বশুরের দেশে এসে শুনল এই স্বদেশীওয়ালার গান। দুজনার কথার পার্থক্য আছে, কিন্তু সুর এক। ছোটবেলায় গল্প শুনেছে কৌতূহলী হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, আর আজ গান শুনে কৌতূহল নয় এসেছে মাতন শিরা উপশিরায়। বিষণ্ণ ঝণ্টুর মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে গান ধরল:

"ফিরিঙ্গি আর কি দেখাও ভয়
দেহ তোমার অধীন বটে মন ত স্বাধীন রয়।"

যাত্রার দলের মাতব্বরটাকে ধরে আনতে অতুলেরই উৎসাহ ছিল বেশী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে নিতান্তই চুনোপুঁটি। স্বয়ং সুপার সাহেব এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে। বড় বড় অফিসাররা সব এসেছে যাত্রার আসর ভাঙতে।

তাদেরই থানার নীলকণ্ঠ লাহিড়ী জমাদার থেকে ছোট দারোগা হয়েছে। সে হেসে বলল অতুলকে: নিজের ঘরও ত সামলাচ্ছ অতুলবাবু? তোমার বউ ত' শুনি চুড়ি ফেলে দিয়েছিল ওদের আসরে।

কী সর্বনাশ! সে সংবাদ কি এদের কানেও পৌঁছেছে। মনে মনে একটু ভয় পেলেও মুখে হো হো হেসে উঠল অতুল।

—গেঁয়ো মুখ্যু মেয়ে মানুষের কথা আর বলেন কেন? ওরা যাত্রার আসরে কাউকে মরতে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদবে। চুড়ি খুলতে বললে নির্বিবাদে খুলে দেবে। বোকাগুলোই ঠকে এমনি করে।

আবার এক চোট হেসে নিয়ে অতুল বলল: এখন আবার কাঁচের চুড়ি না হলে চলবে না। এরি মধ্যে তাগাদা দিয়ে দুখানা চিঠি এসে গেছে।

কাজের চাপে গত সপ্তাহে বাড়ী যেতে পারে নি অতুল। আজ কয়েক ঘণ্টার ছুটি পেয়ে বাড়ী যাবার যোগাড় করছিল।

নীলকণ্ঠ এসে বলল: কিহে বাড়ী যাবে নাকি?

অতুল বলল: হ্যাঁ বড়বাবুকে ধরে কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়েছি।

নীলকণ্ঠ বলল: চল যাই আমিও যাব এড়োশিবসার হাটে একটা তদন্তে।

উৎসাহ দেখিয়ে অতুল বলল: বেশ ত' ভালই হোল। আমাদের বাড়ীতে একটু বিশ্রাম নিয়েই তদন্তে বেরুবেন।

নীলকণ্ঠ সাথে রয়েছে। ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে এক প্রস্থ রংবেরং-এর কাঁচের চুড়ি

আর একটা ম্যানচেস্টারের শাড়ী কিনে ফেলল অতুল। হেসে বলল ঃ এক কাঁচের চুড়ি কিনতেই কি কম টাকা বেরিয়ে যায়!

নীলকণ্ঠ নতুন বিয়ে করেছে। অতুলের কথা শুনে সে হাসল।

নীলকণ্ঠকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীতে ঢুকল অতুল। ব্যস্ত হয়ে ডাকলঃ মা—মা। শ্যামা—। বসুন এখানে আপনি।

বাইরের ঘরে নীলকণ্ঠকে বসিয়ে রেখে সে ভেতরে যাচ্ছিল এমন সময় ডাক শুনে রাধারাণী নিজেই এসে উপস্থিত হোল।

নীলকণ্ঠ আড়চোখে চেয়ে দেখল রাধারাণীকে। আন্দাজে বুঝল অতুলেরই স্ত্রী। পরণে একটা অতি সাধারণ তাঁতের ডুরে শাড়ী। হাতের শাঁখার পাশে লাল সুতো বাঁধা।

ঘরে অন্য মানুষ দেখে রাধারাণী যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল।

বউ-এর সাজসজ্জা দেখে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল অতুলের। নীলকণ্ঠের সামনে মুখ তুলে চাইতে পারল না সে।

নীলকণ্ঠ বুঝল ব্যাপারটা। নিজেই বললঃ কৈ হে খাবার আনাও। বেশী দেরী করতে কিন্তু পারব না।

অতুলের মাথা তখন জ্বলছে। মাকে গিয়ে বললঃ ঘরে যা খাবার আছে শিগ্‌গির শ্যামাকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দাও। একজন অফিসার এসেছে থানা থেকে।

অতুল ঘরে ঢুকে দেখে নীলকণ্ঠ ছোট্ট একখানি খাতা বের করে পড়ছে।

অতুল ঢুকতেই নীলকণ্ঠ বললঃ টেবিলের তলা থেকে কুড়িয়ে পেলাম। খাতাখানা কার হে?

নীলকণ্ঠ পড়তে লাগলঃ

"মাই দেশের রাজা, মাই দেশের রাণী
আর কে রাজা, আর কে রাণী আর তো নাহি জানি"

নীলকণ্ঠ পাতা উলটিয়ে পড়লঃ

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পরদাস খতে সমুদয় দিলে।"

আরও কয়েকটি পাতা উলটিয়ে বলল নীলকণ্ঠঃ বাপস্‌ এক আধটা নয়, খাতা ভর্তি যে গানে গানে। এসব কিহে অতুলবাবু?

এগিয়ে এসে অতুল বিস্ময়ের সুরে বললঃ দেখি।

খাতাটা দেখে অতুল হেসে বললঃ আমাদের বড় সরিকের কোন ছেলের হবে।

নীলকণ্ঠ কোন কথা বলল না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে গেল। দেখে মনে হয় সেই যেন লর্ড কার্জন।

এগানগুলি নিশ্চয়ই সেই যাত্রার দলের। কে এখানে আনল এ খাতা। অতুল দারুণ একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এসব কথা থানায় গেলে ত আর রক্ষা নাই।

খাবার খেয়ে নীলকণ্ঠ বেরিয়ে যেতেই অতুল রাগে একেবারে ফেটে পড়ল। চীৎকার করে ডাকলঃ মা, এদিকে এস।

বুড়ী সামনে এলে হুংকার ছেড়ে সে বললঃ ডাক তোমার বৌকে।

রাধারাণী এল। শ্যামাও এল পেছু পেছু।

অতুল প্রথমটা সংযত হয়েই বললঃ ভদ্রলোকের সামনে এবেশে গিয়েছিলে কেন? হাতে গয়না কোথায়? সেদিন যে কাঁচের চুড়ি পাঠিয়েছিলাম সেগুলোই বা কৈ?

অতুল হাঁপাতে লাগল।

রাধারাণী কোন উত্তর দিল না।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বললঃ ওর ভাল মিহি কাপড়গুলি সব চুরি হয়ে গেছে দাদা।

চুরি হয়েছে!

দপ করে জ্বলে উঠল অতুল।

—চোর বদমাইস নিয়ে কাজ করি ওসব ন্যাকামি ঢের আমার জানা আছে। সত্যি বল সেগুলো ফেলে দিয়েছ না আগুনে পুড়িয়েছ? মিথ্যে বললে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

উত্তেজনায় উঠে এসে অতুল রাধারাণীর একখানা হাত খপ করে ধরল।

রাধারাণী অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলঃ পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছি।

—গানের খাতা কার?

—আমার।

হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি মেরে অতুল বললঃ ইচ্ছে করছে লাথি মেরে শেষ করে দি। তুমি কি আমার হাতে দড়ি দিতে চাও?

যন্ত্রচালিতের মত রাধারাণী বললঃ দড়ি আমার হাতে দাও। তুমি বাঁচ।

অতুল বললঃ শুনছ মা, হারামজাদীর কথা? ওকে এখুনি বিদায় করে তবে থানায় যাব নইলে সত্যি বলছি নীলকণ্ঠ দেখে গেছে সব, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

বুড়ি কেঁদে উঠলঃ অলক্ষ্মী জ্বালিয়ে খেল সংসার।

অতুল রাধারাণীকে একটা ধাক্কা মেরে বললঃ যাও, যা যা নেবে সাথে গুছিয়ে নাও এক্ষুণি।

শ্যামা কেঁদে উঠল।

—এখুনি তাড়িয়ে দেবে দাদা? একটু ভাববে না?

বোনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে অতুল উত্তর দিলঃ না। বিয়ে ফেরান যায় না কিন্তু বউ ফেরৎ দিলাম। এঘরে আর ওর স্থান নেই।

একটু চুপ থেকে আবার বললঃ থানায় গিয়ে আজই এসংবাদ দিতে হবে নইলে কাল আর আমাকে দেখবে না কেউ।

অন্ধকার ঘরে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রাধারাণী। ঐ পুলিশটা কি তবে তাকেই ধরতে এসেছিল। ঘরে বসে গান গাইবার অপরাধে স্বামীর চাকরী যাবে, জেল হবে। মায়ের নাম করলে অপরাধ?

বাইরে থেকে অতুল ডাকলঃ হোল তোমার?

কোন কথা না বলে এক কাপড়ে এসে দাঁড়াল রাধারাণী।

চাকর গোপীকে ডেকে অতুল বললঃ এই নে টাকা। ঝালকাঠির মিস্তিরদের বাড়ী ওকে রেখে আসবি। তুইত চিনিস ওর বাপের বাড়ী?

গোপী ঘাড় নাড়ল।

অতুল বললঃ তবে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। তোদের রওনা করে দিয়ে আমি থানায় ফিরব।

রাধারাণী খেল না কিছু। গোপী প্রস্তুত হয়ে এল।

খালের মুখে একটা নৌকায় অতুল উঠিয়ে দিল দুজনকে।

রাধারাণী প্রণাম করতে গেলে পা সরিয়ে অতুল বললঃ তোমার বাবাকে বল আমি চিঠি দিয়ে তাঁকে জানাব সব কথা।

মুখফুটে শেষবার প্রশ্ন করল রাধারাণী—আর কোনদিনই আসতে পারব না এ বাড়ীতে?

অতুলের স্নেহ দয়ামায়া নেই। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ সে আশাও রেখ না।

রাধারাণী আর কথা বলল না। নৌকায় গিয়ে উঠল।

নৌকার ভেতরে চুপ করে বসে আছে দু'জনে। গোপী জানে বাপের বাড়ীতে মা নেই রাধারাণীর। এখন বিমাতার সংসার। ভাই একটা ছিল, সেও ক'বছর হোল সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গোপী বললঃ বাপের বাড়ীতে থাকতে পারবে তুমি বোঠান?

রাধারাণী হেসে উঠল। বললঃ তোর ভাবনা কেনরে গোপীদা? যার ভাবনা সে ত' ভাবল না?

এদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারে না গোপী। বুড়ো মানুষ ভাবে এ ঝগড়া দু'দিনের। হাজার হোক সোমত্ত মেয়ে মন্দ ত! আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। গোপী চুপ করে যায়।

দোল পূর্ণিমার রাত।

খালের এ পাড়ের ধান বনে, ও পাড়ের দিগন্তপ্রসারী মাঠে আলোর ঢল নেমেছে।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখছে রাধারাণী আর গুণ গুণ করে গান গাইছে।

খাল ছেড়ে বড় নদীর মুখে নৌকা পেঁাছবার আগেই রাধারাণী মাঝিকে ডেকে বললঃ নৌকা পাড়ে লাগাও মাঝি।

পুলিশের বৌ-এর হুকুম। মাঝি বিনা-বাক্যব্যয়ে নৌকা পাড়ে ভিড়াল।

রাধারাণী বললঃ নেমে যাও গোপীদা। এই পথটুকু হেঁটে বাড়ী চলে যাও।

সবিস্ময়ে গোপী বললঃ নেমে যাব? কেন?

হেসে রাধারাণী বললঃ বাপের বাড়ী যেতে আবার সাথী লাগে নাকি? খুলনায় গিয়ে দিব্যি স্টীমারে উঠে বসব। যাও, নেমে যাও শিগ্‌গির—

একরকম জোর করে ধরেই নামিয়ে দিল সে গোপীকে। নিজেই লগি ঠেলে নৌকা পাড় থেকে সরিয়ে আনল।

গোপী চেঁচিয়ে বললঃ ছোটবাবু যদি রাগ করে!

—না করবে না। মাঝি সাক্ষী থাকল।

—টাকাও নেবে না?

—না। আমার আছে টাকা।

বিস্মিত হতবাক গোপী চেয়ে চেয়ে দেখল নৌকা খালের মোড় ঘুরে বড় নদীতে গিয়ে পড়ল।

রাধারাণীকে খুলনায় পেঁাছে দিয়ে মাঝি এসে বাড়ীতে খবর দিয়ে গেল।

অথচ কি আশ্চর্য, সাত আট দিন পরে অতুলের পত্রের উত্তর দিয়েছে ঝালকাঠির নীলমণি মিত্রঃ রাধারাণী ঝালকাঠি পেঁাছায় নি।

বেতারে পঁচিশে বৈশাখ

আসছে মাসে পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এই উপলক্ষে বাঙলা দেশে এবং বাঙলার বাইরে যেখানে বাঙালী বাস করে সর্বত্রই ঐ দিনটিকে সকলে সাধ্যমত উৎসবদিনে পরিণত করবে। এই উৎসবের একটি সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এই একটি দিনকে উপলক্ষ করে বাঙালী মাত্রেই রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে বোঝবার জানবার সুযোগ পায়। সারা বৎসরের কত বিচিত্র-রকমের উত্তেজনা, চিন্তা, ভাবনার মধ্যে এই মহাজীবনের স্মৃতি মনে অনেকখানি ম্লান হয়ে আসে। যেন ঐ বিশেষ দিনটিতে আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দম দিয়ে দেওয়া হল। সেই দম বছরের মধ্যে ফুরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই পঁচিশে বৈশাখের দিন জন্মদিনের উৎসব রূপে এসে নতুন দম নেবার জন্যে ডাক দেবে।

বাঙলা দেশের এই উৎসবটি একটি প্রাণবান সাংস্কৃতিক বিকাশের উৎসবে পরিণত হওয়া উচিৎ। এখনো পর্যন্ত এই উৎসবকে ঘিরে আমরা আমাদের হৃদয়াবেগের দুর্বলতাকেই বড় করে তুলেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা মহাকবি, ঋষি-রূপে প্রচার করে আমাদের কর্তব্য শেষ করি। যেন সে কথা প্রমাণ করার আজো দরকার আছে। আর দেখি তাঁর সাহচর্য পাবার সৌভাগ্যে নানারূপ স্মৃতিকথার উচ্ছ্বাসে নিজের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা এক-দলের মধ্যে। এই রকমের দুর্বল স্মৃতি-উচ্ছ্বাস আমাদের ত্যাগ করতেই হবে। এখন আমাদের দেখতে হবে, আমাদের সামনে যে জীবন পড়ে আছে সেই পথে কাকে অবলম্বন করে আমরা এগুতে পারি। সে-পথে কবিগুরু আমাদের চালাতে পারেন কিনা এবং পারলেও কিভাবে আমরা চালিত হতে পারি। কবিগুরুর স্মৃতিপূজায় সেইটিই যেন আমাদের হয় মূল লক্ষ্য। যতক্ষণ না এই আদর্শে আমরা তাঁর স্মৃতি-উৎসবকে গ্রহণ করতে পারছি ততক্ষণ কেবল দুর্বল হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসই আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেবে।

আমরা তাঁর গান আজকাল যথেষ্ট গাইছি। কিন্তু সে গানের ভিতর দিয়ে কবিগুরুর যে ব্যক্তিত্বটি প্রকাশ পায় তার কথা একজনেরও মনে জাগে কিনা বলতে পারি না। তাঁর গান শুনছি সিনেমা, রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডের ভিতর দিয়ে; কিন্তু সেইসব গানের পিছনে যে মানুষটির মন বিকাশ লাভ করেছে সেটিও আমাদের ভাল

বেতার প্রসঙ্গ

করে বুঝতে হবে। কেবল, তিনি সবচেয়ে বড় গীতকার, বহুরকম সুরের স্রষ্টা এই পরিচয়ই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। গান-গুলি যে রসে তাঁর মনে উদয় হত এবং মনকে ভরে রাখতো ঠিক সেই রসের অনুভূতির দিকে আমাদের জীবনকে পরি-চালিত করতে আমরা এখনো পারিনি। আমরা গান শুনি এবং শুনে তারিফও করি। কিন্তু তিনি সেই গানের সাহায্যে যে আনন্দের অধিকার লাভ করেছিলেন সেদিকে আমরা এগুলাম কই। মোটকথা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির জীবন থেকে যতক্ষণ না জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পাবে ততক্ষণ স্মরণ উৎসব আমাদের কাছে ব্যর্থ। আমরা তাঁর মহাজীবনকে মুখের বক্তৃতায় ও পত্রিকার পাতায় জোর গলায় স্বীকার করি। কিন্তু সেই জীবনকে আদর্শ মেনে নিজেকে সেই পথে এগিয়ে নেবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। পঁচিশে বৈশাখের উৎসব দিন আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে আমাদের উৎসাহিত করুক।

এ পথে কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের একটা মস্ত দায়িত্ব আছে। এটি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে এক অতি বড় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্যে জন-সাধারণের চিত্তকে নানা দিক থেকে বেশ নাড়া দেওয়া যায়। সুতরাং কলিকাতার বেতার কেন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করে ঐ দিনে কবিগুরুকে যথাযত প্রকাশ করে দেশের সামনে ধরুক। এমনভাবে কার্যসূচী রচিত হোক, যার দ্বারা দেশবাসী নানাভাবে দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির পথে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। কবিগুরু কেবল দেশের বাহ্যিক সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করেননি, তিনি দেশের মনের কথাও চিন্তা করে গেছেন, তাঁর নিজের জীবনকে আদর্শরূপে খাড়া করে, তাঁর লেখাতে, তাঁর নানারূপ সৃষ্টিতে, তাঁর চিন্তায়। তিনি দেহের বাহিক শক্তি ও মনের শক্তিকে একসঙ্গে সমান তালে বাড়াতে বলে গেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল; দেহ ও মনের সুষ্ঠু সমন্বয় ছাড়া, বিকাশ-ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ নয়। যে কোন এক-দিকের উন্নতির চিন্তায় মানুষ নিজেরই সর্বনাশ করে।

কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের পরিচালকরা পঁচিশে বৈশাখের দিনে এইরূপ একটা গঠনমূলক কার্যসূচী কি করে রচনা করতে পারেন সেই কথাই তাঁরা বিশেষ করে ভাবুন। পূর্বের মত দুয়েকটা উচ্ছ্বাস-পূর্ণ বক্তৃতা, দু-একটি বিশেষ শিল্পীর বা শিল্পীদলের গানেই যেন তাঁদের অনুসকর্তব্য শেষ না করেন। পঁচিশে বৈশাখের দিনে বেতার পরিচালকমণ্ডলীর উচিত হবে, সেই একটি মহাজীবনকে ঘিরে যে বিচিত্র সৃষ্টির প্রকাশ দেখা দিয়েছিল, তাকে এমনভাবে তুলে ধরা, যাতে জনসাধারণ সেই পূর্ণ মানুষটির পরিচয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে। এইভাবে পুলকিত করতে পারলেই উৎসব দিন সার্থক।

এবিষয়ে আমরা বেতার পরিচালকদের কাজের সুবিধার জন্যে সংক্ষেপে দু-একটি প্রস্তাব দেবো। তারা যদি এই ইঙ্গিতকে কাজে পরিণত করতে পারেন তাহলে আমাদের ধারণা সত্যই দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যাবে।

কবিগুরু ছিলেন গীতকার, চিত্রকার, কবি, নানাবিষয়ে চিন্তাশীল, নাট্যকার, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক, অভিনেতা, ঈশ্বরে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস, দার্শনিক, শিক্ষাধারার প্রবর্তক, দেশসেবক, এযুগের নৃত্য আন্দোলনের প্রথম ও সফল প্রবর্তক এবং সর্বদিকেই তিনি ছিলেন সকলের অগ্রগামী। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দেশ একতালে চলতে পারেনি। এইভাবে কত দিকে তিনি দেশের সামনে নিজেকে আদর্শরূপে প্রকাশ করেছেন। এবং তাঁর জীবনের এইসব বিচিত্রতার পথে তিনি এতদূর অগ্রসর ছিলেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশ সেই প্রভাব ত্যাগ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। নতুনত্বের চেষ্টায় অনেকেই নানা-ভাবে মাথা খুঁড়ছেন, কিন্তু সে চেষ্টা যে কবিগুরু-প্রদর্শিত আদর্শেই ঘোরাফেরা করছে এ হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেন না। যাই হোক বেতার কার্যসূচীতে তাঁর জীবন থেকে আদর্শ হিসেবে দেশ কত দিকে গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করতে পারে সেই কথাই যেন প্রকাশ করা হয়। এই পরিকল্পনার সময় কেবল সমাজের দেহের কথা চিন্তা করলেই চলবে না তার মনের কথাও ভাবতে হবে। দেহ ও মনের উভয় দিকেই কবিগুরুর চিন্তা কিভাবে আমাদের প্রাণবান করতে পারে সেইরূপ কার্যসূচী রচনা করুন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর

রচিত গানে, গল্পে, কবিতায়, নানারকমের প্রবন্ধে, আলোচনায়, অভিনয়ে দিনটিকে ঠেসে দিতে হবে। ঐ দিনকে উপলক্ষ করে সব শ্রেণীর সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি, শিক্ষাবিদ, দেশসেবক, চিত্রকার, নর্তক, অভিনেতা, গায়কদের ডেকে আসর সাজাতে হবে। এও দেখতে হবে যে তারা এসে যেন এই আসরটিক একটি অলস বিলাসের আসরে পরিণত না করেন ও বড় বড় উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যজালে আসর সরগরম না করেন। তাঁদেরও ভেবে চিন্তে আসতে হবে আগে থেকেই। এবং এমনভাবে তাঁরা সেখানে কবিগুরুকে প্রকাশ করবেন যে, তাঁর দ্বারা জনসাধারণ উন্নততর জীবনের দিকে প্রেরণা পায়। কোন একটি বিশেষ দল বা কয়েকটি বিশেষ বক্তার দ্বারাই সহজে কাজ হাসিল করার এতদিনকার মামুলি প্রথায় বেতারের কার্যসূচী রচনা না করতে অনুরোধ করি। অর্থ ব্যয়ের কথা তুলে আমাদের এই প্রস্তাবকে বেতার পরিচালকরা নাকচ করতে চাইবেন। কিন্তু আমাদেরও দৃঢ় ধারণা আছে যে, যদি একাগ্রতা নিয়ে পরিচালকরা বাঙালীর কাছে আবেদন করেন তাহলে খুব অল্প পয়সা ও এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিনি পয়সাতেও অনেকেই তাঁদের সাহায্য করতে রাজী হবেন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করি।

দুপুরে প্রতিদিনই আধ ঘণ্টা করে নানা প্রকার ইউরোপীয় সংগীত রেকর্ডে বাজানো হয়। মনে হয় এই ব্যবস্থাটি দেশস্থ ইয়োরোপীয় এবং যাকে আমরা বলি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তাদের জন্যেই করা হয়েছে, তাদের দুপুরের খাবার অবসরের কথা ভেবে। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের দিনেও তাদের সেই কার্যসূচীর কোন পরিবর্তন কখনো হয়নি। আগের দিনে অবশ্য সে দাবী করা সহজ ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতার পরে আজও দেখছি সেই একই নিয়ম নির্বিঘ্নে চলে আসছে। যাদের জন্যে সারা বছর একনিয়মে ইয়োরোপীয় সংগীত শোনবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা কি এক দিনের জন্যেও কবিগুরুর গান বা তাঁর কথা শুনতে চান না? তাঁরা এদেশে থেকে যদি একদিনের জন্যেও দেশের একজন মনীষীর কথা জানতে বা শুনতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাদের প্রতি বেতারের তরফ থেকে অন্য ব্যবস্থাই হওয়া উচিত।

গতবারে লক্ষ্য করেছিলাম মজদুরমণ্ডলীর কার্যসূচীকেও কবিগুরুর পরিচয়ের কাজে সম্পূর্ণভাবে লাগানো হয়নি। দেশের মজদুরদের বিষয়ে কবিগুরুর চিন্তা থেকে কি কিছুই জানাবার নেই? আমাদের দেশের মজদুর ও পল্লীবাসীদের কাছে কবিগুরুর পরিচয়ের ব্যবস্থা আরো বিশেষভাবে করা প্রয়োজন। কারণ তারা কবিগুরুকে এত কম জানে যে, তাঁকে না জানারই সামিল বলা চলে। বৎসরে ঐ একটি দিনে মজদুর ও পল্লীবাসীদের কাছে কবিগুরুকে ভাল করে প্রকাশ করে ধরবার চেষ্টা যাতে করা হয়, সেই অনুরোধও আমরা জানাচ্ছি।

আজব শাস্তি

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদকঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফৌজী জীবনে মেজর ব্রাউন বেশ উন্নতি করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তবে, সত্যি বলতে কি, চাকরির ওপর তাঁর আদৌ আকর্ষণ ছিল না। তাই অর্ধেক বেতনে যখন তাঁকে রিটায়ার করতে হলো, মোটেই অখুশী হলেন না তিনি। রিটায়ার করে ছোট্ট একখানা বাড়িতে এসে উঠলেন। ফুলের মধ্যে প্যান্সি আর পানীয়ের মধ্যে পাতলা চা—এ-ই এখন তাঁর একমাত্র নেশা। ফৌজী জীবনের তরোয়াল-খানা এখন তাঁর গৃহসজ্জার সামগ্রীমাত্র, দুটি স্টু-পট আর একখানা সস্তা জলরঙা ছবির পাশে সেই তরোয়াল এখন তাঁর দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। যুদ্ধবিগ্রহের ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এই যে তিনি তাঁর ছোট্ট বাড়িটির রৌদ্রোজ্জ্বল বাগানে এসে আশ্রয় নিতে পেরেছেন, এতেই সারা মন তাঁর আনন্দে ভরপুর। বিগতদিনের তুলনায় এ-জীবনকে তাঁর স্বর্গ বলে মনে হয়। আর বাগান করার রুচিও তাঁর নিখুঁত। সাজানো-গোছানো প্রকৃতির মানুষ, অসঙ্গতি তাঁর সহ্য হয় না। পারেন তো ফুল-গুলিকেও তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ করিয়ে নেন। কোথাও এতটুকু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। একদল লোকই থাকে এমনিতরো। ছাতা রাখবার স্ট্যান্ডে যদি তিনটি ছাতা রাখতে দেওয়া হয় তো তারা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করবে। চারটে ছাতা পেলে তবেই তারা খুশী। স্ট্যান্ডের এধারে যদি দুটো ছাতা রাখে তো ওধারেও রাখবে দুটো। নইলে যে সঙ্গতি রইলো না! মেজর ব্রাউনও এমনি ধাঁচের মানুষ। জীবনকে তাঁর একটা মাপাজোকা ছক্‌কাটা নক্সার মত মনে হয়। এ-হেন মানুষকে যদি কেউ এসে বলতো যে, বাড়ির থেকে দু-পা এগিয়েই তিনি এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জালে জড়িয়ে পড়বেন তো তিনি সেকথা বিশ্বাস করতেন না, বলাই বাহুল্য। হয়তো তার অর্থই তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। আর সেই অ্যাড-ভেঞ্চারও কি যেমন-তেমন? গহন অরণ্যেও তা কল্পনা করা যায় না, যুদ্ধক্ষেত্রের অ্যাড-ভেঞ্চারকেও তার পাশে নিতান্তই জোলো বলে মনে হয়।

ঘটনার দিন মেজর ব্রাউন রুটিনমাফিক হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। ঝলমলে উজ্জ্বল বিকেল, ফুরফুরে হাওয়া বইছে। একটা সরুমতন গলিরাস্তার মধ্যে দিয়ে চলেছেন তিনি। সকলেই এ-ধরণের রাস্তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। বড়ো বড়ো অট্টা-লিকার পেছনদিককার দেওয়াল-ঘেঁষা নির্জন রাস্তা, দেখলেই কেমন যেন মনে হয়—একটা থিয়েটার-হলের পেছন দিয়ে হাঁটছি। আর কেমন অস্বস্তি লাগে। মেজর ব্রাউনের কিন্তু খারাপ লাগছিল না। উল্টো দিক থেকে আর-একজন পথচারী এগিয়ে আসছিল; হাতে তার একটা ফুলবোঝাই ঝাঁকা। দশাসই পুরুষ, চোখদুটি মাছের চোখের মত ভাবলেশহীন। মেজর ব্রাউনের সামনাসামনি এসে সে তার ফুলের ঝাঁকা এগিয়ে ধরলো। সে কী ফুল! তার তুলনা হয় না। সবরকমেরই ফুল রয়েছে তাতে, তার মধ্যে প্যান্সিগুলোই আবার সব থেকে সুন্দর। মেজরের আর আনন্দ ধরে না। দু-চার কথার পর ফুলওয়ালার সঙ্গে তিনি দরদস্তুর শুরু করলেন। প্রথমটায় একটু হিসেবী হবার চেষ্টা করেছিলেন; এটাকে ভালো বলেন তো ওটাকে ঠেলে রাখেন। তবু সে আর কতক্ষণ। দু-একবার বাছাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন তিনি, তারপর সবগুলোই কিনে নিলেন! দাম নিয়ে চলে যাচ্ছিল ফুলওয়ালা, কী ভেবে সে ফিরে এল আবার। এসে বললো, "একটা কথা বলি শুনুন। আপনার তো খুব ফুলের শখ, যান ওই দেয়ালটার ওপর উঠুন গিয়ে।"

"দেয়ালে উঠবো! সে কি কথা!" স্তম্ভিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর। ফুলওয়ালা বলে কী। পরের দেয়ালে উঠতে হবে! কী বিদ্ঘুটে প্রস্তাব। কল্পনা করতেই তাঁর পরিশীলিত মার্জিতরুচি হৃদয় যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

"উঠুন না গিয়ে, উঠে তারপর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন একটা ফুলের বাগান। আর তাতে চমৎকার সব হলুদে প্যান্সি ফুটে রয়েছে। এত ভালো প্যান্সি ইংল্যান্ডের আর অন্য কোনও বাগানে নেই।"

সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ ভেসে গেল মেজরের। প্যান্সি-বাগান! শূন্যে পা ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় অবলীলাক্রমেই তিনি বাগানের প্রান্তে সেই প্রাচীরের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপরেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল। এ কী করেছেন তিনি। বাতাসে ফ্রককোট উড়ছে, নিজেকে তাঁর একটা নিরেট মূর্খ বলে মনে হলো। কিন্তু সে-মনোভাবও বেশীক্ষণ টিঁকলো না। কেননা, পরক্ষণেই এক বীভৎস-সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়লো তাঁর। সুন্দর, সেইসঙ্গে ভয়ংকর। কী দেখলেন মেজর ব্রাউন? দেখলেন, বাগানের প্রায় মাঝখানে অজস্র প্যান্সিফুলের সমারোহ। অপূর্ব, অপরূপ। আর সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে আর একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়লো। তিনি দেখলেন, প্যান্সি গাছগুলো সব বিরাট বিরাট অক্ষরের আকারে সাজানো রয়েছে, সব মিলিয়ে তৈরী হয়েছে একটা গোটা লাইন। লাইনটা হলোঃ

"মেজর ব্রাউনকে হত্যা কর"

বুড়ো একজন মালী ঝাঁঝরিতে করে সেই প্যান্সি-গাছে জল ঢালছে। ভালোমানুষ-গোছের চেহারা, সাদা গোঁফ।

দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থেকেই বিদ্যুৎ-বেগে মেজর ব্রাউন রাস্তার দিকে ফিরে তাকালেন। নির্জন গলি, ফুলওয়ালা উধাও হয়ে গিয়েছে। বাগানের দিকেই আবার ফিরে তাকালেন তিনি। সেই সুন্দর প্যান্সিফুল, সেই অবিশ্বাস্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ। অন্য যে কোনও লোকের মনে হতে পারতো যে তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মেজরের কিন্তু তা মনে হলো না। মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে তিনি বার হয়েছিলেন, তার ব্যাজের ওপর তিনি হাত বুলিয়ে নিলেন বারকয়েক। অতীতে, ফৌজী জীবনে,

সুন্দরী সব মেয়েরা যখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর ব্যাজের ওপর ঝুঁকে পড়তো, নিজেকে তখন মেজরের অত্যন্তই নীরস এবং চোয়ারে গোছের লোক বলে মনে হয়েছে। আজ সেই ব্যাজেই হাত বুলিয়ে তিনি বুঝলেন, না—তিনি পাগল হয়ে যাননি। অন্য যে-কোনও লোকের একথাও মনে হতে পারতো যে, কেউ তার সঙ্গে একটা মর্মান্তিক মারাত্মক রসিকতা করেছে। তা-ও মেজরের মনে হলো না। কেননা, বর্তমানক্ষেত্রে এই প্যান্সি ফুলের নক্সার ওপর যে বিপুল-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে অতো টাকা খরচ করে' কেউ রসিকতা করতে যায় না। কী তাহলে এর অর্থ! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মেজর ব্রাউন। পথ চলতে চলতে একটা ছ'পা-ওয়ালা মানুষ দেখলে যতোখানি অবাক হয়ে যাবো আমরা, ব্যাপার দেখে ততোখানিই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ পড়লো সেই বুড়ো মালীর। মেজরকে দেখে সে-ও কিছু কম অবাক্ হলো না। হাত থেকে তার জলের ঝাঁঝরিটা মাটিতে পড়ে গেল, জল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারদিকে।

"কে আপনি?" কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সে।

"আমি মেজর ব্রাউন।" ঠাণ্ডাস্বরে মেজর জবাব দিলেন। বিপদের মুহূর্তে তিনি বিচলিত হন না।

জবাব শুনে সে আরও অবাক্ হয়ে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাঙায়-তোলা মাছের মতো খাবি খেতে লাগলো যেন। তারপর সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো আবার, "নেমে আসুন, শীগগীর নেমে আসুন।"

"বেশ, ভালো কথা।" বলে একলাফে মেজর সেই বাগানের মধ্যে নেমে পড়লেন। তবে, এতই টিপ্‌টপ্ মানুষ তিনি, এই বিরাট লম্ফেও তাঁর রেশমী টুপীটি স্থানচ্যুত হলো না।

বুড়ো মালী ফিরে দাঁড়ালো। বাগানের ঠিক সামনেই একটা বাড়ি, সেইদিকে ছুটতে লাগলো সে; মেজর তাকে অনুসরণ করলেন। খিড়কীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তাঁরা; চলতে চলতেই মেজর বুঝতে পারলেন, বাড়িটি প্রায় প্রাসাদোপম। অবশেষে তাঁরা বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজা। মালীটি হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। সায়াহ্নের সেই ম্লানালোকেও মেজর স্পষ্ট দেখলেন, সারা মুখ তার অসহ্য ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে।

মালী বললো, "একটি নিবেদন আছে হুজুর; দয়া করে এখানে খেঁকশিয়ালের নাম করবেন না। ঈশ্বরের দোহাই।" বলেই সে দরজা খুলে দিল, ভিতর থেকে লাল আলোর রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়লো বাইরে। মালী আর একমুহূর্ত দাঁড়ালো না, সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে নীচে নেমে গেল।

মেজর ব্রাউন গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাথার থেকে টুপী নামিয়ে সেটিকে এখন তিনি হাতে নিয়েছেন। ঢুকেই তিনি বিস্মিত হলেন। সুসজ্জিত ঘর, আর তারই এককোণে জানালার পাশে বসে আছেন একটি ভদ্রমহিলা। জানালা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধারেকাছে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মেজর বিস্মিত হলেন বটে, তবে অপ্রতিভ হলেন না। ভব্যতায় তিনি অদ্বিতীয়; মহিলাদের সামনে এসে ঘাবড়ে যায় সে-দলের লোক নন।

মাথা নুইয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "আমার নাম মেজর ব্রাউন।"

বাইরের দিকেই চেয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা, ফিরে তাকালেন না। সেই অবস্থাতেই শুধু বললেন, "বসুন"।

ভদ্রমহিলা সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। সবুজ পোষাকে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে। মাথায় একরাশ সোণালী চুল। গা থেকে মৃদু সৌরভ বেরুচ্ছে। বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, "বুঝতে পেরেছি, সেই দলিলপত্র নিয়েই আবার আমাকে জ্বালাতে এসেছেন।"

মেজর ব্রাউন বললেন, "আজ্ঞে না। আমি শুধু জানতে এসেছি ব্যাপারটা কী। কেন আপনার বাগানে আমার নাম লেখা রয়েছে? অমন সাংঘাতিকভাবেই বা লেখা রয়েছে কেন?"

মেজরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, বিক্ষুব্ধ। বাগানের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তাঁর শান্তিপ্রিয় মনের ওপর এই প্রসন্ন বিকেলেও যে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। এই মধুর পটভূমিকায় কী সাংঘাতিক দৃশ্য। প্যান্‌সি-ফুলের সজ্জিত হরফে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ লেখা রয়েছে!

"আপনি তো জানেন," ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার এখন ফিরে তাকাবার উপায় নেই। প্রতি সন্ধ্যায় ছ'টা না বাজা পর্যন্ত আমাকে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাক্‌তে হয়।"

সমস্ত ব্যাপারটাই মেজর ব্রাউনের কাছে একটা প্রচণ্ড প্রহেলিকার মত ঠেক্‌ছিল। অথচ বিস্মিত হবার শক্তিটুকুও যেন এখন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি আর তাই কথা বাড়ালেন না। বিনা প্রতিবাদে বললেন, "তা ছ'টা তো প্রায় বাজতে চললো—"। বলতে না বলতেই দেয়ালঘড়িতে ছ'টা বাজার ঘণ্টা পড়তে শুরু হলো। ঘণ্টা বাজা শেষ হবামাত্রই ফিরে দাঁড়ালেন মহিলা। এতক্ষণ যাঁকে শুধু সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল, মুখ দেখে বোঝা গেল—তিনি অপরূপ সুন্দরী। মেজর ব্রাউন অন্ততঃ এত সৌন্দর্য আর অন্য কোথাও দেখেননি।

চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা, "প্রতীক্ষার তৃতীয় বছর আজ আমার পূর্ণ হলো। আর আমি পারি না, আর আমার প্রতীক্ষা করে

বসে থাকবার ক্ষমতা নেই। এর চাইতে যদি সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটে যায় তো সেও অনেক ভালো।"

মহিলার কথা শেষ হতে-না-হতেই তীব্র একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল নীচের থেকে। সন্ধ্যার অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে যেন চীৎকার করে বলছে, "মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁকশিয়ালের বাসা কোথায়?"

মেজর ব্রাউন নীরবকর্মী। নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে তিনি সামনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন, চেয়ে দেখলেন চতুর্দিকে। জন-প্রাণীর চিহ্নও নেই কোথাও, দু-একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে শুধু রাস্তার ওপর ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরে ফিরে এলেন মেজর ব্রাউন, এসে দেখলেন প্রবল আতঙ্কে সেই ভদ্রমহিলা থরথর করে কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই তিনি বললেন, "আর রক্ষা নেই। হয়তো আমাদের দুজনকেই এবার মরতে হবে। যখনই—"

এবারেও তাঁর কথা শেষ হলো না। সেই তীব্র চীৎকার ভেসে এল রাস্তার থেকেঃ

"মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁক-শিয়ালটা মরলো কিসে?"

আবারো ছুটে বেরিয়ে এলেন মেজর, আবারো তিনি হতাশ হলেন। কাউকেই দেখা গেল না। সেই নির্জন রাস্তায় যেন সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মেজর ব্রাউন, বলতে কি, খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন তিনি। ঘরে ঢুকতেই আবার সেই চীৎকারঃ

"মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁক—"

চীৎকার আর এবার শেষ হলো না। বিদ্যুৎবেগে মেজর ব্রাউন ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। এবং, যে দৃশ্য দেখলেন তিনি, তাতে রক্ত জমে তাঁর বরফ হয়ে গেল। ফুটপাতের ওপর একটা কাটা মুণ্ডু।

পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা। কয়লার ধোঁয়া বেরুবার জন্যে রাস্তার ওপর যে গর্ত থাকে তারই মধ্যে কে যেন শরীর ঢুকিয়ে দিয়েছে। শুধু তার মুণ্ডুটা রয়েছে বেরিয়ে। নিমেষের মধ্যেই মুণ্ডুটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজর ব্রাউন তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মহিলাটির দিকে তিনি ফিরে তাকালেন। বললেন, "মাটির নীচে আপনার কয়লাকুঠরির সঙ্গে রাস্তার ঐ গর্তটার নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে। দয়া করে কুঠরিটা আমাকে দেখিয়ে দিন।"

ভদ্রমহিলা অবাক বিস্ময়ে মেজরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, কুঠরি দিয়ে আপনি কি ঐ অন্ধকার গর্তটার দিকে যেতে চান নাকি? ঐ শয়তানটা যে ওখানে রয়েছে?"

"এইটেই কি কয়লাকুঠরির পথ?" কথা না বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন মেজর। তারপর রান্নাঘরের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি নীচে নামতে শুরু করলেন। কয়লা-কুঠরির সামনে গিয়ে একটু থেমে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর তার দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পকেটে হাত ঢোকালেন মেজর, দেশলাইটা বার করবেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে অতিকায় একজন মানুষের রোমশ দুটি হাত বেরিয়ে এসে মেজর ব্রাউনকে জাপটে ধরলো। ঘাড় ধরে মেজরকে সে নীচে টেনে নামাতে লাগলো,—নীচে, নীচে, আরও নীচে। চার-দিকে দমবন্ধ অন্ধকার। এই চরম সংকটেও বুদ্ধি হারালেন না মেজর, সেই অদৃশ্য শত্রুকে প্রথমটায় তিনি বাধাও দিলেন না এতটুকু। তারপর তাঁর ঘাড় বেঁকে যখন প্রায় হাঁটুতে এসে ঠেকবার উপক্রম, হঠাৎ তিনি তাঁর বজ্রদৃঢ় হাত বাড়িয়ে শত্রুর একখানা পা জাপটে ধরলেন। তারপরেই সজোরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সামনের দিকে। সশব্দে সে মেঝের ওপর গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু মেজর তখন তার টুঁটি টিপে ধরেছেন। সেই অবস্থাতেই জাপটাজাপটি চললো কিছুক্ষণ। শত্রু তখন কাবু হয়ে এসেছে, সে তখন পালাতে পারলেই বাঁচে। পাগলের মত সে দরজা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু, মেজরও সহজ পাত্র নন। এক হাতে তিনি কুঠরির একটা কড়ি আঁকড়ে ধরেছেন, আরেক হাতে পাকড়ে ধরেছেন শত্রুকে। মেজরের হাতের মুঠোয় তার কোটের কলার। কিন্তু কতক্ষণ আর এইভাবে এই ষণ্ডাটাকে পাকড়ে রাখা যায়, অনবরত সে ঝাঁকুনী দিয়ে ছিটকে যেতে চাইছে। মেজরের মনে হলো, ঝাঁকুনীর চোটে কাঁধ থেকে হাতখানা তাঁর ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। ছিঁড়লোও শেষপর্যন্ত। তবে মেজরের হাত-খানা নয়, শত্রুর কোট। দৌড়ে সে পালিয়ে গেল, ছেঁড়া কোটটা পড়ে রইলো মেজরের হাতে। সংগ্রামের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছেঁড়া সেই কোটের টুকরো হাতে নিয়ে মেজর ব্রাউন ওপরে এলেন। এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। ভদ্রমহিলা উধাও। ঘরের বহুমূল্য আসবাবপত্র, এমন কি সেই দেয়াল-ঘড়িটা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোনও কিছুরই আর চিহ্নমাত্রও নেই। সদ্য চুনকাম করা শাদা দেয়ালগুলো শুধু দাঁত বার করে হাসছে।

গল্প যখন এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে রুপার্ট গ্রাণ্ট হঠাৎ মন্তব্য করলো, "বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ভদ্রমহিলাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত রয়েছেন।" এ কথায় লাল হয়ে উঠলো মেজরের মুখ। তিনি শুধু বললেন, "আজ্ঞে না, আমার তা মনে হয় না।"

রুপার্ট ভুরু কোঁচকালো একবার, মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলো মেজরের দিকে, তবে কথা বললো না। খানিক বাদে বললো, "ছেঁড়া কোটটা তো আপনার কাছেই রয়েছে, তার পকেটের মধ্যে কিছু পেলেন?"

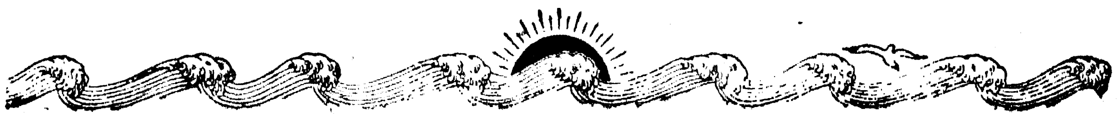
"পেয়েছি। কিছু খুচরো পয়সা, সব-শুদ্ধ সাড়ে দশ পেনি। তা ছাড়া একটা সিগারেট-হোল্ডার, এক টুকরো দড়ি, আর এই চিঠিখানা।" বলে তিনি চিঠিখানাকে টেবিলের ওপর রাখলেন। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

"প্রিয় মিঃ প্লোভার,

মেজর ব্রাউনের সম্পর্কে যে-ব্যবস্থা আপনাকে করতে বলা হয়েছিল, তাতে বিলম্ব ঘটায় আমি উদ্বেগ বোধ করছি। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামীকালই তাঁকে আক্রমণ করবেন। হ্যাঁ, কয়লাকুঠরির মধ্যেই।

আপনার বিশ্বস্তঃ
পি জি নর্টহোভার"

(ক্রমশঃ)



জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

ফেলনা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। এতক্ষণে বুঝেছে এদের ষড়যন্ত্র। ভয় করছে। চরের কাদায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।

ফেলে যেও না—নিয়ে যাও তোমরা। আর আমি অত ভাত খাবো না। যে ক'টা দেবে, চাইব না আর তার উপর।

দাঁড় টানার ছপছপানি হচ্ছিল, সে শব্দ ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে আর শোনা যায় না। নোনা জলের তরঙ্গে ঝিলিক দিচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো বনপ্রান্তে দৌড়তে লাগল। হাপুস নয়নে কাঁদছে হাঁদা ছেলেটা মায়ের কথা মনে হচ্ছে, আকুল হয়ে ডাকছে, মা-মা-মা—

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখে, মানুষ-জন কেউ নয়—বাঘ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে—লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে এইবার।

মা গো—বলে মর্মান্তিক চীৎকার করে বকুলতলায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। তোমরা বলবে, ফেলনা যদি অজ্ঞান হয়েই থাকে, এ কাহিনী দশজনার কাছে প্রচার করল কে? প্রচার করেছে ফেলনাই। স্বপ্নে দেখেছে, তবু ব্যাপারটা সত্যি—নইলে বেঁচে আবার দেশে-ঘরে ফিরে এল কেমন করে, সে কথা বলো। দেখল, এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বকুলতলায় নেমে এলেন। মাথায় সোনার মুকুট ঝিকমিক করছে, পূর্ণিমার আলোর মতো ফুটফুটে গায়ের রং। ফেলনার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন তিনি। বাঘ মুহূর্তে পোষা কুকুরের মতো শুয়ে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে ফেলনার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, মধুর আবেশে তার সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। জঙ্গলে হঠাৎ যেন কত ফুল ফুটেছে, চিত্তহরা মৃদু বাজনা বাজছে যেন চারিদিকে!

মেয়েটি হালকা পালকের মতো তাকে তুলে নিলেন। নিয়ে ঘাটের জলে নামলেন। প্রকাণ্ড আয়তনের কালো এক কাঠের গুঁড়ি ভেসে ছিল সেই জায়গায়। এখন জোয়ার আসছে, ভরা কোটালের দুরন্ত দুর্বার স্রোত। গুঁড়ি দুলছে কিন্তু একটু। সেই গুঁড়ির উপর ফেলনাকে শুইয়ে দিলেন। শিমুলের গুঁড়ি নাকি? সেই রকম কাঁটা-কাঁটা। কাঁটা বিঁধছে ফেলনার পিঠে—উঃ-আঃ করছে। বুঝতে পারলেন দেবকন্যা। কাশের গোছা তুলে এনে বিছানার মতো পেতে দিলেন কাঁটার উপর। তারপর পরম যত্নে ফেলনাকে শুইয়ে একটা থাবড়া দিলেন গুঁড়ির গায়ে—

যা, চলে যা—

গুঁড়ি খরবেগে ভেসে চলল। ভাঁটা শেষ হয়ে গিয়ে জোয়ার এল—তবু উজান কেটে একমুখো ভেসে চলেছে। আবার জোয়ার এল। আবার ভাঁটা। চলেছে, চলেছে।

দু-দিনের পর বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে ফেলনার মা বুড়ির চোখ অন্ধ হবার দশা। এমনি সময় পাড়ার কে যেন এসে বলল, ও বুড়ি, দেখসে এসে—ছাওয়াল তোর পালঙ্কে শুয়ে ভেসে ভেসে আসছে।

লোকারণ্য ঘাটে। জনতার কোলাহলে ফেলনার ঘুম ভাঙল। এত মানুষ—কিন্তু একজন কেউ জলে নামছে না তাকে তুলে আনতে।

ওরে ফেলনা, কিসের সওয়ার হয়ে এসেছিস?

ফেলনা তাকিয়ে দেখে, গাছের গুঁড়ি নয়—সুবিশাল কুমীর। কুমীর চুপচাপ গা ভাসান দিয়ে আছে। ফেলনা নেমে এল, কুমীর জলতলে অদৃশ্য হল ধীরে ধীরে।

এর অনেক দিন পরে মউলের দল ফিরল। কুমীরের সওয়ার ফেলনা তখন মায়ের নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে। যে শোনে সেই অবাক হয়। সেই থেকে মহিমা প্রচার হল বনবিবির পীঠস্থান ঐ বকুলতলায়।

বনবিবির অপার করুণা। বাদাবনে তাঁর রাজত্ব—বাদার এলাকায় প্রবেশ করার আগে সিন্নি মানত করে যেও। বনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভরা নিয়ে ফিরবে।

(৩)

সেরাতে সেই যে এলোকেশী গুঞ্জন তুলে ছুটে পালাল, কেতুচরণ তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে চলে গেছে। বিদ্যুতে যেন ঝলসে দিয়ে গেছে হিয়ে-মন-প্রাণ।

হিয়ে-মন-প্রাণ ইত্যাদি গোলমেলে বস্তুর খবরাখবর কেতুচরণ কস্মিনকালে রাখত না। সম্প্রতি কেবল কিছু কিছু শুরু করেছে উমেশের কাছে। সাঁইতলার মান্যধর মোড়লের ছেলে উমেশ—কেতু তাদের বাড়ি থাকে। দুর্বুদ্ধি হয়েছিল মান্যধরের—উমেশকে শৈশবে পাঠশালা পাঠায়। ফলে হতভাগাটা বাড়ির কাজকর্মে কোনদিন মন দিল না—গান গায়, ছড়া বাঁধে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে। মান্যধরের সে দু-চক্ষের বিষ—রাগ করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিল একবার। কিন্তু একটিমাত্র ছেলে—কয়েকটা দিন না দেখে মন কেমন করতে লাগল। আবার উমেশ ফিরে এল, তারপর থেকে মান্যধর বিশেষ কিছু বলে না, সাঁইতলার মোড়লঘরের ছেলের অধোগতি পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে নীরবে নিশ্বাস ফেলে শুধু।

কেতুচরণ প্রায় সম্বিত হারিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বনমোরগের ডাকে চমক ভাঙল। মোরগ ডাকছে—সকাল হল নাকি? না—জ্যোৎস্নায় ভুল করে সকাল বলে ভেবেছে। বাদাবনে শিয়াল নেই যে প্রহরে প্রহরে ডেকে সময়ের সঠিক জানান দেবে। মোরগ আছে অজস্র। লোকে মানত-করা মোরগ ছেড়ে দিয়ে যায়—বনবিবির সেই সব মোরগ বনে চরে বনমোরগ হয়ে গেছে। সকাল হবার আগে এদিকে সেদিকে শুনতে পাবে, অগণন মোরগ ডাকছে। দিনমানেও যখন তখন শুনবে। হঠাৎ ভুল হয়ে যায়, গ্রামে এসে পড়লাম নাকি? বনবিবির জীব ধরে স্বচ্ছন্দে বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারো—বাধা নেই। বাধার সময় শুধু মুখের কথা

বলে যেও, নিয়ে যাচ্ছি মা—। তারপর মুরগির ছা-বাচ্চা হলে অর্ধেকগুলো বনে ছেড়ে দিয়ে যেও বনবিবির নামে। নিশ্চয় দিয়ে যেও, অবহেলা কোরো না। নইলে দেখবে, সমস্ত মরে যাচ্ছে—একটাও টিকে থাকবে না শেষ অবধি।

কেতু বাড়ি পৌঁছল, তখনও খানিকটা রাত আছে। কলসি উঠানে নামিয়ে রাখল, ভারবোঝা নামিয়ে যেন বেঁচে গেল। ডাকাডাকি করল না কাউকে। চোখের ঘুম পেটের ক্ষিধে সমস্ত লোপ পেয়েছে, শুতে বসতেও মন চায় না। কাঁধে ভুত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—উঠোন এবং বাইরের অনেক দূর অবধি ঘুরে ঘুরে সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

মান্যধর কাশতে কাশতে সকলের আগে দোর খুলে বেরুল।

সেই যে দুপুরবেলা এক পাথর গিলে বেরিয়ে পড়লে, বাস, আর কোন পাত্তা নেই। কোন লাটসাহেবের দরবার আলো করে বসেছিলে বল দিকি বাপু?

কেতু ভালমন্দ জবাব দেয় না। কথা কাটাকাটি করতে তার এখন রুচি নেই।

মান্যধর বলে, তা সেই লাটসাহেব তিন বেলা পাকি তিন সেরের ঝক্কিটা নিলে তো পারে! তাহলে আর কাজের কথা বলতে যাব না।

খোঁটার জবাবে কেতুচরণেরও বলার ছিল। বলতে পারত, এই যে ঘর ছাওয়া, ভুঁই নিংড়ানো, হাটবাজার করা—যখন যা আটকাচ্ছে, সর্বকর্ম করে বেড়াচ্ছি—সে কি শুধু তিন বেলা রাঙা চালের ভাত আর গোটাকয়েক লঙ্কা-পোড়ার জন্য? আসল ব্যাপারের তো বোঝা যাচ্ছে একেবারে ফক্কিবার। নামে তালপুকুর, এখন আর ঘটি ডোবে না। রোসো, আবার কোন একটা সুলুক সন্ধান পেলে হয়। সুড়ুৎ করে সরে পড়ব, চোখ গরম করা বেরিয়ে যাবে। তোমার ঐ ছড়াদার ছেলেকে ভুঁই নিংড়াতে বসিয়ে দিও, ঘাসে-ধানে যে তফাৎ বোঝে ধান মেরে সাফ করে ঠিক সে ঘাসগুলো রেখে আসবে।

এসব কিছুই সে বলল না। দিন এলে তখন বলবে। বলে,, সমস্ত সেরে সুরে তো বেরিয়েছিলাম। গরুর জাবনা অবধি মেখে রেখে গিয়েছি। কোন কাজটা আটকে আছে শুনি?

আটকায় নি? কোটালে ঘোলাজল এসেছে। গাঁয়ের মানুষ কেউ বাড়ি-ঘরে ছিল না, বিকাল থেকে সবাই গাঙের ধারে।

সত্যি নাকি?

কেতু খবর শুনে বিচলিত হল। মনে মনে হায় হায় করছে গ্রামে না থাকার জন্য। ঘোলাজল গাঙে হামেশাই আসে না—বছরে দু-চারবার মাত্র। এমনও হয়েছে, কোনবার আদৌ আসেনি। দেদার চিংড়ি পড়ে সেই সময়। অঞ্চল জুড়ে সাড়া জাগে।

সদুঃখে মান্যধর বলতে লাগল, ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ মেরেছে সকলে, ঝোল-অম্বল চচ্চড়ি-ভাজা খেয়েছে, ঘটিতে দুই-চার-পাঁচ টাকার বিক্রিও করেছে। সারা গাঁয়ের মধ্যে আমরাই কেবল নিরামিষ খেলাম। করব কি, একজন বুড়ো-থুথুড়ে আর একটি অকাল-কুষ্মাণ্ড—

অনুতাপে কেতু বিগলিত হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বলে, একা ওমশা কি করবে, তার কি দোষ? ডিঙি বাইবে না মাছ ধরবে? তা বেশ তো—একটা রাতের মধ্যে কি শেষ হয়ে গেল? এখনই রওনা হচ্ছি—

উমেশের মায়ের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে

কৌতুককণ্ঠে বলে, ডয়াকলার কাঁদিটা কেটে রেখো মামি। দু'ভেয়ে বেরুচ্ছি। গলদা-চিংড়ি আর ডয়াকলায় মজে ভালো।

রাতে উপোস গেছে—তবু ফ্যানসা ভাত রান্না হওয়া অবধি সবুর সইল না। কাঁচা-চি'ড়ে কোচড় ভরে নিয়ে তাই চিবোতে চিবোতে উমেশকে টেনে নিয়ে গাঙমুখো চলল। উমেশের কাঁধে বৈঠা ও ধুজি, কেতুচরণ খেপলা-জাল নিয়েছে। একটা টোকাও নিল, রোদ চড়ে উঠলে কাজে লাগবে।

তাই বটে, ঘোলা জলের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। নাম বটে ফলুইমারির গাঙ কিন্তু আসলে বড় খাল একটা, নদী একে বলা চলে না। জলের ধারে যেন হাট বসে গেছে। কাল বিকাল থেকে চলছে—রাতের মধ্যে আরও জানাজানি হয়ে দূর-দূরন্তরের লোক এসে পড়েছে। কত নৌকো! নৌকো যাদের নেই, পারে দাঁড়িয়ে জাল ফেলছে। কিন্তু মাছ পড়ছে না তেমন। এত হৈ-চৈর মধ্যে বনের বাঘ পালিয়ে যায়, এ তো জলের মাছ।

উমেশ বোঠে ধরেছে, কেতু জাল বাইছে। দেড় প্রহর বেলা হল, এখনো একটা ঝুড়ি বোঝাই হল না।

উমেশ বলে, দূর দূর! এ কি হচ্ছে? কালকে এমন হল, শেষটা শুনলাম খটিতেও আর নিতে চায় না—

আনবার মুখে স্বচক্ষে তার নমুনা দেখে এসেছে বটে! চারটে চিংড়ির খটি—মাছ শুকিয়ে তারা বাইরে চালান দেয়। গরাণের আগুনে যেন রাবণের চিতা জ্বালিয়েছে—তবু দেখে এল, গাদা গাদা চিংড়ি বাইরে পচছে—এখনো তার ব্যবস্থা করতে পারেনি।

উমেশ প্রস্তাব করে, আর পারা যায় না—নৌকা বেঁধে একটু ছায়ায় গিয়ে বসা যাক—

উঁহু, দোখালায় চলো! দু'দিক থেকে মাছ উঠে এক জায়গায় জমেছে।

ভাটার টান ধরেছে—কোটালের টান। উজান কেটে নৌকা দোখালায় নেওয়া শক্ত। কিন্তু দুই মরদ জোয়ান রয়েছে আর ঐটুকু এক ডিঙি। দরকার বুঝলে ডিঙি কাঁধে করে বয়েও তো খালে নিয়ে ফেলতে পারে!

দোখালায় এসে মিলছে বটে—কিন্তু নিতান্ত গুঁড়ো চিংড়ি। কেতু হেন লোক ঝুড়িখানেক এই বস্তু নিয়ে ঘরে ফিরছে, এর চেয়ে হাস্যকর কি হতে পারে? চিৎকার করে উমেশের মাকে যে গলদা-চিংড়ির আশ্বাস দিয়ে এল, তারই বা উপায় কি?

উমেশকে বলে, পাড়ে ধরো দিকি—

উমেশ পরমোল্লাসে বলে, সেই ভাল। গীত গাওয়া যাক গাছতলায় বসে বসে। যা হয়েছে, এতেই দু-বেলা বেশ চলবে আর দরকার কি?

কেতু বলে, তুমি গাও—আমি শুনি। শুনতে শুনতে আর এক রকমে চেষ্টা দেখি।

ধুজিটা হাঁটুর নিচে ধরে দু-হাতে টান দিল। মড়মড় করে ভেঙে গেল সেটা। বেশ দু-খানা লাঠির মতো হল। তার একটা হাতে নিয়ে টোকাটা মাথায় চড়িয়ে জলের কিনারে অতি সন্তর্পণে সে এগুচ্ছে।

উমেশ গান ধরেছে। কেতুচরণ গান শুনছে ঠিকই, কিন্তু নজর ওড়ার জঙ্গলের দিকে। জলের আবর্তে চিংড়ির দাড়ির রক্তাভ ক্ষীণ চিহ্ন ভেসে উঠছে এক একবার। অনভ্যস্ত চোখ কিছুই দেখবে না, আঙুল দিয়ে দেখালেও ধরতে পারবে না। দু-হাতে দিচ্ছে লাঠির বাড়ি জলের উপর জায়গাটা লক্ষ্য করে। আহত আধমরা মাছ চিত হয়ে পড়ছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগে তাড়াতাড়ি খালুইতে তুলছে। বাছাই মাছ এগুলো—খেপলা-জালে কদাচিৎ ওঠে। যাক—নিশ্চিন্ত! মামি ডয়াকলার কাঁদি যদি সত্যি সত্যি কেটে থাকে, বৃথা যাবে না।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল। অনেক দূরে একটা বাঁকের মুখে কারা ডাকাডাকি করছিল পারে যাবার জন্য। মেয়েলি গলা। কেতু-চরণের তত ইচ্ছা নয়—অনেকখানি উল্টো যেতে হবে। বেলা দুপুর, পরোপকার করতে গেলে আরও বেলা হয়ে যাবে। কিন্তু বোঠে উমেশের হাতে—ঝপ-ঝপ করে বেয়ে পারার্থীদের কাছে যে চলে এল। গলা শুনে আন্দাজ করছিল হয়তো। সামনাসামনি এসে উমেশ কেতুর গা টেপে।

পদ্ম—সেই যে...

পদ্ম, তার মা মুখিয় বুড়ি ও বড় ভাই পাঁচু। উমেশ পদ্মর গল্প সংগোপনে করেছে কেতুর কাছে। বনবিবির পুজো দেখতে কাল দল জুটে এরা গিয়েছিল। বাজি ইত্যাদি দেখে অনেক রাত হয়ে গেল বলে মৌভোগে কোন কুটুম্বর বাড়ি কাটিয়েছে। অনেকক্ষণ বসে আছে—একটা নৌকো কোন দিকে নেই, মাছ ধরতে সমস্ত ফলুইমারি গিয়ে জমেছে।

এই তবে পদ্ম? নিটোল কালো মেয়ে—আর যাই হোক, পদ্মফুলের ...টা কিন্তু এমন নয়। কেতুচরণ ইতিমধ্যে ধাঁ করে টোকা ফেলে বড় চিংড়ির খালুই ঢেকে দিয়েছে। লোভনীয় মাছ—সকলের চোখের সামনে আলগা রাখা উচিত নয়।

কিন্তু পদ্মমুখীর গতিক দেখ—তিন ক্রোশ পথ দিব্যি মেরে এল, আর ডিঙিতে পা দিয়েই ননীর পুত্তলি উত্তাপে গলে পড়েন আর কি! কেতু হাঁ-হাঁ করে ওঠে—কিন্তু তার আগেই সে হোগলার টোকা মাথায় দিয়ে মেমসাহেব হয়ে বসেছে।

এবং যা আশংকা করে গিয়েছিল—বাঃ, খাসা চিংড়ি যে!

উমেশ ভয়ে ভয়ে কেতুচরণের দিকে তাকাল। কেতুচরণ কানে নেয়নি। তাড়াতাড়ি এখন পারে পৌঁছে দিতে পারলে যে হয়!

পাঁচু স্পষ্টাস্পষ্টি চেয়ে বসল, জলের মাছ তো! খেতে দাও না ক'টা আমাদের—

নির্জীব কণ্ঠে উমেশ একটা শব্দ করল যার অর্থ হাঁ-না—দুইই হতে পারে।

পদ্ম মারমুখি হয়ে ওঠে—

না-না—মাছ-টাছ কেন দেবে? অত খাতির কিসের? একটুখানি এগিয়ে শুধু যদি বাড়ির ঘাটে আমাদের তুলে দিয়ে এসো—

উমেশ ঘাড় নিচু করেছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছে, ভাব দেখে বোঝা যায়। বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে, তার উপর, কেতু আপত্তি করে উঠল, বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে, এখন হবে না।

পদ্ম সুর নরম করে বলল, সে-ও গেরস্ত-বাড়ি গো! ক্ষিধের উপায় হবে। সত্যি, আর পারা যাচ্ছে না—হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

ফিক করে সে হেসে ফেলে। আজব মেয়ে—এই মেঘ এই রৌদ্র খেলা করে তার মুখে।

উমেশও জুত পেয়ে বলল, তা হলে মাছ নেবে বলো। পাঁচু-দা সরল মানুষ—ভালো দেখেছে, মুখ ফুটে বলল—তোমার মতো মনে তার জিলিপির প্যাঁচ নেই।

ভাল রে ভাল! ভালবাসা করবি—তা নিজের যা আছে, দানসত্র করগে না! কেতুর কষ্ট করে ধরা মাছ জিজ্ঞাসাবাদ না করে দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিন্তু এই অবস্থায় মুখের উপর কিছু বলা চলে না।

উমেশ বলছে, পাঁচটা কি ছ'টা চিংড়ি আছে বেশ মোটা মতন। ও ক'টা সমস্ত নিতে হবে। নয়তো নেমে পড়ো এখানে। নৌকো আর এগোবে না।

পদ্ম বলে, নিতে পারি এক কড়ারে। গান শোনাতে হবে।

উমেশ ঘাড় তুলে সগর্বে তাকাল কেতুর দিকে। কেতু বোঠে ধরেছে আর বিটির-বিটির করে পাঁচুর সংগে গপ্প জমিয়েছে কাড়ালে বসে। উমেশের দিকে তাদের নজর নেই। উমেশ তখন শব্দ করে জানান দেয়, যাঃ—আমার আবার গান!

ভবী ভোলে না। পদ্মদের ঘাটে পেঁ।ছে গিয়েও সেই কথা।

গান শোনাবে তো বলো। নইলে খালুই ছোঁব না।

উমেশ কথাও বেশ কইতে পারে, দেখা যাচ্ছে। বলে, ফাঁকি দিয়ে এদ্দুর নিয়ে এসে ......এই বুঝি কুলির ধর্ম পদ্ম!

নির্দয় পদ্ম বলে, গান তো গাইবে আর খেয়েও যাবে দু-জনে। তবে মাছ নেবো। আমার হাতের তরকারি খেলেই বা একদিন!

পদ্মর মতো মেয়ে আর একটি যদি দেখতে পাও! খাওয়াচ্ছে সামনে বসে—তা-ও রণমূর্তি।

উমেশ এমনই একটু কম খায়। তার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে পরম ভব্য ভাবে বসবার দরুন গলা দিয়ে ভাত বেশি নামছে না। কিন্তু কেতুচরণের সম্পর্কে তো কিছু বলতে পারবে না। সাধারণ জন তিনেকের ভাত-ব্যঞ্জন শেষ করেছে, তার ব্যাপারেও তবু পদ্মর সন্তোষ নেই।

উঠছ? গুড় আনলাম কার জন্যে তবে? গুড়-তেঁতুল দিয়ে মেখে জল ঢেলে নাও—

ঢেঁকুর তুলে কেতু বলে, ওরে বাবা, আর পারব না—

খেতেই হবে।

গুড়ের বাটি পাতে উপুড় করল। ঘটি থেকে হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল।

উমেশ বলে, যা খাওয়ান খাওয়ালে পদ্মমুখী, হাত ধরে ওঠাতে হবে। নিজের বলে পেরে উঠব না।

মাদুর পেতে দিয়েছি। হাত ধুয়ে গড়িয়ে পড়োগে। কি কাজ আর এখন?

সত্যি, ভারি যত্ন করল। কেতুচরণ পদ্মকে এই প্রথম দেখল। আর একদিন অনেককাল পরে ভিন্ন অবস্থায় দেখা হয়েছিল। সেদিন সর্বপ্রথম কেতুর মনে উঠেছিল পরম যত্নে এই দিনের এই সামনে বসে খাওয়ানোর কথা। (ক্রমশ)

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

'জিদ-ওয়াইলড্'

আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জুর্নাল'গুলো (ডায়েরী) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মত আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্সদেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্ রঙের। অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইলড্। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইলড্ও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইলড্ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত। তার উপর ওয়াইলড্ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তার চটি বই 'অস্কার ওয়াইলডের স্মরণে'তে লিখেছেন "ওয়াইলড্ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভাণ করতেন যেন জুৎসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তার প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারী নূতন ধরণের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়ত ওয়াইলড্ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—যে-লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কক্খনো পরিবেশন করতেন না। যার যে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তার কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিম্বা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গেঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইলড্কে চিনতে পেয়েছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশী দেনে-ওয়ালা হিসেবে (amuseur=amuser)।"

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ওয়াইলড্কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়' 'ভাঁড়'রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছেন "ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করায়।" তাই বোধ করি, জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে টকটক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা অজানাতে হরদম করে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্ড্ কোন্ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্ডে দেখেন লণ্ডন-সমাজ তাঁর তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্ডের বিস্তর তত্ত্ব-তাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেননি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্ড ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দু'চার বার দেখা সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মত বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন, "ওয়াইলড্ যখন দেখতে পেলেন দু'চারখানা দরজা তার জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।"

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্ড এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাৎ হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্ড দুটো কক্‌টেল অর্ডার দিলেন। আমি তার মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিক পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইলড্ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মত নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইলড্ সম্পূর্ণ ভুল করেননি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন,

'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তারপর দু'জনাতে কি কথাবার্তা হ'ল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকামি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইলডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেননি এবং আজ যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তার মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন। †

* * * * *

কিন্তু হ'ল না। এই বাহ্য। আরেক দিন দেখা যাবে।

---

†Andre Gide: Oscar Wilde, in m…riam, Paris, Mercure de Fra…

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

শ্রী ঠাকুরের "মানসপুত্র" রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবা যতদিন করিবার ভাগ্য হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে লিখিতেছি। ইঁহাকে কেহ কেহ 'মহারাজ' বা 'রাজা'ও বলিতেন। স্বামীজি (স্বামী বিবেকানন্দ) ইঁহাকে 'রাজা' বলিয়া ডাকিতেন এবং চিঠিতে 'অভিন্নহৃদয়েষু' বলিয়া লিখিতেন। কেবল তাহাই নহে, স্বামীজি মহারাজকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে মঠের মোহান্ত পদে অভিষেক করিয়াছিলেন এবং মঠের যাবতীয় ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অপরদিকে মহারাজ কাঞ্চন স্পর্শ না করিয়াও আমাদের কাহারও না কাহারও দ্বারা সে কার্য ঠাকুরের কার্য হিসাবে করাইয়া লইয়াছেন। স্বামীজি এবং মহারাজ দুই-জনকে দেখিলে সকলেরই মনে অভিন্ন-হৃদয়ের সত্যতা জাগরিত হইত। আর দুইজনকে যেন শ্রীঠাকুরের দ্বারা এক সূত্রে গাঁথাই বলিয়া ধারণা হইত। আর আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে উভয়ে অভিন্নহৃদয় হইলেও তাহার ভিতরে কার্যত যে পার্থক্য প্রকাশ পাইত, তাহা স্বামীজির ভিতর হইতে নেতৃত্ব এবং মহারাজের পক্ষ হইতে সেই নেতৃত্ব পালনে বিকশিত বলিয়াই মনে হইত। মহারাজ শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বামীজিকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল হইতে তপভঙ্গ করাইয়া শ্রীঠাকুরকে ধরায় আনিতে হইয়াছিল—ইহাই শুনিয়াছি।

এক্ষণে মহারাজের বিষয় বলা যাউক। লেখক অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সন ১৮৯৮ সালে মঠে অন্তর্ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। মঠ তখন বেলুড়ে 'নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাটীতে। স্বামীজি মঠে ছিলেন না—দার্জিলিংয়ে ছিলেন। প্রথমেই সে মহারাজের নিকট নীত হয়। মহারাজ, জানি না লেখকের কি সুকৃতি-বলে, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কৃপাচক্ষে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পরিধানের জন্য একজোড়া ৯ হাতি লাল-পাড় ধুতি কলিকাতা হইতে ক্রয় করাইয়া আনাইলেন। সেইদিন হইতে সে মহারাজের সেবায় বিশেষ করিয়া রহিল।

এই সময় একদিন তাহার জীবনে একটা অভিনব ঘটনা ঘটে। একদিন সন্ধ্যার পর সে মহারাজের পদসেবা করিতে করিতে শ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তি দেখিতে পায় এবং সে মূর্তি তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত থাকে যতক্ষণ না সে মহারাজের আজ্ঞায় তাঁহার জন্য রন্ধনশালা হইতে খাবার লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাইতে বসায়। তিনি খাইতে বসিলে সে মূর্তি অন্তর্হিত হয় এবং সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে "মহারাজ, আমি যখন আপনার পদসেবা করিতেছিলাম, আপনি তখন কি ঠাকুরের ধ্যান করিতে-ছিলেন?" ইহা শুনিয়া তিনি উল্টা জিজ্ঞাসা করেন, "কেন বল্ দিকি?" সে বলে, "আপনার আজ্ঞায় আপনার জন্য খাবার আনতে রান্নাবাড়ীতে গেছি, সমস্ত পথটি যাবার এবং ফেরবার সময় আমি নিজের চক্ষের সুমুখে ঠাকুরের প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছি; এ রকম ত আপনাদের মত মহাপুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে সম্ভবে না—তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তিনি নিরুত্তর হইয়া আহার করতে বসিলেন। ঐ ঘটনার দিন কয়েক পরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীমার নিকট ঐ বিষয় উল্লেখ করিলে, তিনি বলেন, "ওরা কি যে সে?—ওরা ঠাকুরের সন্তানঃ—ঠাকুর যে ওদের এনেছেন! ওদের স্পর্শে মানুষ দেবতাও হতে পারে!"

কলিকাতার সঙ্গীত সমাজের কয়েকজন সভ্য যখন মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন, তখন উক্ত সমাজের মণি বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক সভ্যের আগ্রহাতিশয্যে মহারাজ তাঁহার জন্মস্থান গোবরডাঙ্গায় যাইতে সম্মত হন। সে যাত্রায় তাঁহার সঙ্গে মণিলাল, গায়ক পুলিন মিত্র, ডাঃ কাঞ্জী-লাল, বিপিন লাহা, গিরিজা প্রভৃতি এবং মঠ হইতে লেখক ও অপর একজন সাধু যান। রেলযোগে গোবরডাঙ্গা স্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখা যায় মণিলালের বন্দোবস্তে তথাকার জমিদারদিগের কয়েকটি হাতী সকলকে লইতে আসিয়াছে। মহারাজকে একটি হাওদাওয়ালা হাতীতে চড়াইলে তাঁহার ফিটের মত এমন একটা হাসির ফোয়ারা উঠে যাহা মণিলালের বাড়ী পর্যন্ত স্থায়ী হয়—মধ্যে কোথাও সে হাসির বিরাম ছিল না।

পরদিন বৈকালে মহারাজকে লইয়া সকলে 'যমুনা' নদী তটে গিয়া একখানি নৌকায় উঠিয়া পরপারে কিয়দ্দূর যাওয়া হয়। গায়ক পুলিন এবং তাঁহার সঙ্গে সকলে নৌকা মধ্যে তান ধরেন—

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী
(ও) যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাইত
সেই নীলকান্তমণি?"
ইত্যাদি।

মণিলাল দর্শিত স্থানে নৌকা যমুনার পরপারে থামিলে সকলে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর পদব্রজে গিয়া এক অট্টালিকার সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র উহার দ্বার খুলিয়া গেল এবং এক যুবক (বর্তমান গৃহস্বামী) বাহির হইয়া শ্রীমহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং অন্য সকলকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন। তৎপরে নিজ জীবনেতিহাস বিবৃত করিলেন, যাহাতে বুঝিলাম—তাঁহারা ওখানকার জমিদারদিগের ছোট অংশীদার এবং বহুদিনের কলহ উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের বাড়ী এমনভাবে তৈয়ার হইয়াছে যে, কেহ সহসা আক্রমণ করিতে পারে না, পিতা ছাদে মাটি ফেলাইয়া তাহাতে তাঁহার বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে কুস্তীর বাগ শিখাইতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মাতা তাঁহার সহিত কুস্তী লড়িয়া তাঁহাকে কতকটা ওস্তাদ করিয়া দিয়াছেন।

বৈঠকখানায় রক্ষিত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র দেখাইয়া স্বীয় বাল্যাবস্থায় পিতার নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতে থাকিলেন যন্মধ্যে দুইটির বিষয় এতকাল অতীত হইলেও আজও মনে আছে। প্রথমটি তম্বুরা—অত বৃহদায়তন তম্বুরা খুব কমই দেখা যায়। উহা দেখাইয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতে থাকিলেন—"পিতাঠাকুর বলিতেন এই সব বাদ্যযন্ত্র দেবতাদের মজলিসে বাজিত বলিয়াই শুনা যায়।" তম্বুরাটি বাঁধা হইলে পুলিনকে গাহিতে বলিলেন। পুলিন উহার দুই একটি কান মলিয়া কোন ঠেকা ব্যতিরেকেই একখানি গাহিলেন। পরে তেমনি বৃহদা-

রতন একটি মৃদঙ্গ বাহির করিয়া তম্বুরার সঙ্গে বাঁধিয়া বাজাইতে বাজাইতে গাহিলেন—

আমি শম্ভু হর নাচত ডমরু করে।
বাজাওত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ
আনন্দভরে॥
পঞ্চবদন অনাদি নাদ আলাপ করে, গাওত
সুরগণ সমবেত ভয়ে, রঙ্গনাথ নিরখি
মোহন বিগলিত রূপ মে বিরাজে॥

মৃদঙ্গটির বিষয় বলিলেন,—"বাবা আমাকে সেই ছোট ছোট হাত দুইটি দিয়ে বাজাতে শেখাতেন—আমি ধরতেই পারতেম না, তা বাজাব? যাই হ'ক, অভ্যেস করতে করতে এক রকম গা-সওয়া গোছের হয়ে গিয়েছিল।" মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকিলেন—একবার দেখুন, বাবার কাছ থেকে কি রকম বাজাতে শিখেছি, সেই বয়সে?" ইহা কহিয়া মৃদঙ্গের ভিতর হইতে অতি সুমিষ্ট বোল বাহির করিলেন। শুনিয়া আমরা সকলেই বলিলাম,—"অতি সুমিষ্ট কিন্তু আমাদের জানা কোন গৎ নয়।" তিনি হাসিয়া পুনরায় বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন— "শুনুন—দেবতাদের ... স্বর মৃদঙ্গের ভিতর দিয়ে বেরুচ্ছে। এ দেবতাদের বাদ্যযন্ত্র।" আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিলাম—অতি সুমিষ্ট লাগিল, অথচ অর্থ ধরিতে পারিতেছি না যে, কি বাজিতেছে! অবশেষে তিনি বলিলেন—"এইবার শুনুন—আমি মুখে বলিয়া বাজাইতেছি এটি শ্রীশঙ্করাচার্যের অপরাধ-ভঞ্জন স্তব।"—আমরা লক্ষ্য করিলাম—তাঁহার মুখে বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ হইতে স্পষ্টত বাহির হইতেছে—

"বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিত বপুঃ
স্তন্যপানে পিপাসা,
নোশক্যঞ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা
জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগাদিদুঃখাদ্দের পরবশঃ শঙ্করং ন
স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেবো শম্ভোঃ॥"

আমরা মৃদঙ্গ হইতে দেববাণী বাহির হইতে শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। মহারাজ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আর একটা এইরূপ মুখে বলিয়া বাজাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি গাহিতে গাহিতে বাজাইলেন,—

কিম্বানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন
রাজ্যেন কিম্,
কিম্বা পুত্র কলত্রমিত্রপশুভি র্দেহেন গেহেন
কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদিরে ত্যাজ্যং
খলো দুরতঃ,
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ
শ্রীপার্বতীবল্লভম্॥

পরে নানাভাবে আদর সৎকার করিয়া গৃহস্বামী আমাদিগকে বিদায় করিলেন।

বৈদেশিকী

গ্রুপ এরিয়াজ এ্যাক্ট

দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যালান সরকারের বর্ণ-বিদ্বেষনীতির চরমলীলা শুরু হোল। সর্বপ্রকার আপত্তি প্রতিবাদ, উপরোধ অনুরোধ এমন কি ইউনোর নির্দেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে ম্যালান গভর্নমেন্ট কেপ প্রভিন্স, ন্যাটাল এবং ট্রান্সভালে "গ্রুপ এরিয়াজ এ্যাক্ট" বলবৎ করেছেন। এই আইন অনুসারে ইউরোপীয়বংশসম্ভূত, আফ্রিকান এবং ভারতীয় প্রভৃতি অন্য জাতীয়দের জন্য পৃথক পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করা থাকবে। নিজের নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে কেউ বসবাস, বিষয়সম্পত্তি অর্জন বা ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারবে না। এর ফলে, বহু ভারতীয়ের সর্বনাশ হবে এবং মোটের উপর দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে। তাই করাই অবশ্য এই আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাড়াতে পারলেই যে তাঁরা খুশী হন, একথা ডক্টর ম্যালান ও তার দলের লোকরা অনেক দিন থেকেই খোলাখুলি বলে আসছেন। শুধু ভারতীয়দের তাড়ানো নয়, আফ্রিকান—যাদের ওটা দেশ,—তাদের জন্য পর্যন্ত পশুর মতন খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা করে নিজেদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যা কিছু ভালো সবটা সংরক্ষিত করে রাখাই এদের মতলব। স্বাধীন প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়; আফ্রিকানদের মধ্যেও স্বাধিকারলাভের প্রচেষ্টার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, অচিরে যে তারা মানুষের পূর্ণ অধিকার দাবী করবেই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয়দের উচ্ছেদ ও আফ্রিকানদের চিরবঞ্চিত করে রেখে 'সাদা'দের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই এই "গ্রুপ এরিয়াজ এ্যাক্ট" রচিত হয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষ পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনও বেশ ক্রিয়মাণ রয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে 'আইন' বানিয়েছেন বর্তমান জগতে তার তুলনা নেই। এই আইনের মূলে যে মনোভাব রয়েছে মানবজাতির পক্ষে তা সমূহ অকল্যাণকর। কে বলতে পারে এই বর্ণ-বিদ্বেষ থেকে একদিন পৃথিবীময় বর্ণ-যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে না? শ্বেত-জাতিরা কয়েক শতাব্দী ধরে এশিয়াকে লুণ্ঠন করেছে, এশিয়াবাসীদের উপর প্রভুত্ব করেছে, এখন তারা বুঝছে যে সে নাট্যের অবসান আসন্ন—এশিয়া জেগেছে। কিন্তু তারা ভাবছে যে আফ্রিকার ঘুম ভাঙতে এখনও অনেক দেরী অথবা ঘুম ভাঙলেও তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু তাই কি? আফ্রিকার জাতিসমূহের মধ্যে একটা নবজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকাতেই নয়, আফ্রিকার অন্যত্রও। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'সাদা'রা অবশ্য চেষ্টা করছে যাতে ভারতীয়েরা এবং আফ্রিকানরা একজোট হতে না পারে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি চেষ্টা 'সাদা' নীতির একটা চিরকালের অঙ্গ। কখনও কখনও সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতীয় এবং আফ্রিকানরা উভয়েই বুঝতে পারছে যে এই ভেদনীতিকে পরাজিত করতে না পারলে উভয়েরই সর্বনাশ নিশ্চিত। সুতরাং ম্যালান গভর্নমেন্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ভারতীয় ও আফ্রিকানদের এক-যোগে কাজ করতে হবে। পূর্বে যে যার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে, তাতে বলক্ষ

প্রতিপক্ষ উভয়কেই অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয়েরা এবং আফ্রিকানরা যদি একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। ভারতবর্ষ এখনও কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাও কমনওয়েলথ-এর মধ্যে, তথাপি ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এরূপ ব্যবহার! অনেকে ভারত গভর্নমেণ্টকে এই সূত্র ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উপর বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দ্বারা চাপ দেওয়াতে চান। আবার কেউ কেউ ইউনোর দিকে তাকিয়ে আছেন। অবশ্য ম্যালান সরকারের বর্বরতার বিরুদ্ধে সর্বত্র জনমত স্থায়ী করার প্রচেষ্টা কর্তব্য, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বা ইউনোর দিকে তাকিয়ে থাকলে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না। যেটা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সেটা হোল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে ঐক্য। এখানে ভারতবর্ষের কমনওয়েলথ-এর ভিতরে থাকার কথাটা বেশি জোর দিয়ে বলা আবশ্যক। ভারত গভর্নমেণ্টও বোধহয় এতদিনে বুঝেছেন যে, ম্যালান নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় আন্দোলনের শক্তি ও ব্যাপকতার উপর এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, ভারত গভর্নমেণ্টও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের তথাকার আফ্রিকানদের সংগে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করবেন।

ইরাণী ও ইরাকী তেল

এ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর চুক্তি বাতিল করে ইরানী তৈলশিল্পের জাতীয়করণের প্রস্তাবের পরিণতি কী হবে তা এখনও বলা যায় না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে সহজে ছাড়বেন না সেতো জানা কথাই। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কেবল ইরান সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েই বসে নেই, তাঁদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পারস্যোপসাগরে কয়েকখানি বৃটিশ রণতরীও পাঠিয়েছেন। কাছাকাছি প্যারাসুট সৈন্যও নাকি এনে রাখা হয়েছে, যাতে প্রয়োজন হলে অবিলম্বে কাজে লাগানো যায়। বলাবাহুল্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আশা করেন যে তার প্রয়োজন হবে না, ফোঁস করলেই যথেষ্ট হবে, যেমন পূর্বে হয়ে এসেছে। এ্যাংলো-ইরানিয়ানএর বর্তমান চুক্তি সম্পাদনের সময়েও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পারস্যোপসাগরে রণতরী পাঠিয়েছিলেন, কারণ ইরানীরা স্বাক্ষর করতে গড়িমসি করছিল। এবারও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আশা করছেন যে, চারদিক দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত ইরানীরা 'জাতীয়করণের' এরূপ একটা ব্যাখ্যায় স্বীকৃত হবে যাতে ইরানী পার্লামেণ্টের মুখ ও বৃটিশের স্বার্থ উভয়েরই রক্ষা হবে। তবে এবারকার পরিস্থিতি একটু আলাদা। ১৯৩৩ সালে যখন বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন রাশিয়ার নৈকট্য আজকের দিনের মত এত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তখন ইরাণের জনমত এখনকার মতো এত জাগ্রত ছিল না।

ইরাণের দেখাদেখি ইরাকেও তৈল কোম্পানীগুলির জাতীয়করণের ধুয়া উঠেছে। ইরাকী পার্লামেণ্টের একদল মেম্বর ইরাকের তৈলশিল্পের জাতীয়করণের উদ্দেশে এক বিল এনেছেন। ইরাকের তৈলশিল্প ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর হাতে। ইহার মালিকানার একশত ভাগের ৯৫ ভাগ চারিটি কোম্পানীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত—এই চারিটি কোম্পানীর একটি হোল বৃটিশ, একটি ফরাসী, একটি ডাচ-বৃটিশ এবং একটি আমেরিকান। একশ ভাগের বাকী পাঁচ ভাগের মালিক হলেন গুলবেনকিয়ান (Gulbenkian) নামীয় একজন বৃটিশ প্রজা, ইনি লিসবন-এ বাস করেন। ইরাকের তৈলশিল্পের জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে ইরাকের বর্তমান গভর্নমেণ্ট যে জাতীয়করণের নীতি অবলম্বন করবেন তার সম্ভাবনা নেই এবং ইরাকের সে সাধ্যও নেই। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নুরি পাশা ইরাকী এয়ার লাইন-এর চেয়ারম্যান। এই কোম্পানীটি হোল BOAC (British Overseas Air Corporation)এর একটা লেজুড় মাত্র। সুতরাং নুরি পাশা যতদিন ইরাকের প্রধান মন্ত্রী আছেন—এবং বর্তমান অবস্থায় ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হবার সাধ্য কারো নেই—ততদিন ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, তবে নুরি পাশার মুখ রক্ষার জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা হয়ত কোম্পানীর দেয় রয়ালটির পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিতে পারে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫১।



স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভাগলপুরে পৌঁছে ওকালতি ব্যবসায়ের উদ্যোগ পর্বে মনোনিবেশ করলাম। সেজদাদার পরামর্শে কয়েকজন বড় বড় উকিল এবং দু-চার জন হাকিমের সঙ্গে দেখাশুনা ক'রে বেড়াতে লাগলুম।

উকিলরা অবশ্য অনেকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন, শুভেচ্ছাও জানালেন; কিন্তু খুসিতে মন ভ'রে গেল দীননাথদের নিকট হ'তে উচ্ছল অকপট অভ্যর্থনা লাভ ক'রে। দীননাথ তখন ভাগলপুরের প্রথম সবজজ, প্রখর বুদ্ধিশালী ব্যক্তি; সহজ সাবলীল বিচার নৈপুণ্যের গুণে উকিল-ব্যারিস্টার-মক্কেল সকলের চিত্ত থেকে সমভাবে শ্রদ্ধা নিষ্কাশন করেন।

আমার নাম শুনে দীনবাবুর দুই চক্ষে কৌতূহলের রশ্মি দেখা দিলে; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়? সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ না-কি আপনি?"

ভারি বিপদে পড়া গেল; হ্যাঁও বলতে পারি নে, না-ও বলতে পারিনে। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ নাম এখন না হয় কোনো প্রকারে বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তখনকার দিনে মাসিক পত্রে কয়েকটি গল্প ও কবিতা এবং সপ্তক নামে সামান্য একটি গল্পের বই প্রকাশিত হওয়ার দাবিতে কি ক'রে 'সাহিত্যিক' আখ্যা গলাধঃকরণ করতে পারি! বেঙাচিকে বেঙ বললে বেঙাচির যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তার চেয়েও করুণ মনে হ'তে লাগল। কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অল্প-স্বল্প একটু-আধটু লিখে থাকি।"

"প্রতিক্রিয়া ত' আপনার লেখা?"

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাল্কা হ'লাম! তা হ'লে, অন্ততঃ দীননাথের মতে, আমিই 'সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ।' বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ও লেখাটা আমারই।"

আমার উত্তর শুনে খুসি হ'য়ে দীনবাবু বললেন, "আনন্দের কথা, এখানকার উকিল-মহলে একজন লেখক এসে যোগ দিলেন।" তারপর সাহিত্য বিষয়ে উকিলদের সাধারণভাবে ঔদাস্যের এবং অকৃতিত্বের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ বিষয়ে হাকিমদের দিকটা কিন্তু খুব উজ্জ্বল।"

উত্তরে আমি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন আইন ব্যবসায়ী লেখকের নাম উল্লেখ করলাম।

দীনবাবু বললেন, "এ'রা সাহিত্যিক সে কথা মানি, কিন্তু যে সাহিত্য-গগনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ বঙ্কিম চাটুজ্জে চন্দ্র, সেখানে এ'রা তারা ভিন্ন আর কিছুই নন্।"

হালে পানি পায় না দেখে আমি মহাকবি মাইকেলের নাম করলাম।

মৃদু হেসে দীনবাবু বললেন, "বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে এসে মধুসূদন যদি কোনো কিছু প্রমাণ ক'রে থাকেন ত' এই কথাই প্রমাণ করেছিলেন যে, আইন-ব্যবসায়ের তিনি কেউ ছিলেন না।"

এই কঠোর সত্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রে গেলাম।

বিদায় গ্রহণকালে দীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "দোসরা জানুয়ারী যোগ দিচ্ছেন ত?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দোসরা জানুয়ারিই।"

আমার একজন তায়িদ (মুহুরি) নিযুক্ত করা হ'ল।

হাকিমের যেমন পেস্কার, ডাক্তারের যেমন কম্পাউন্ডার, উকিলের তেমনি মুহুরি। আমার মুহুরির নাম ত্রিলোকনাথ পাঁড়ে, উগ্র গৌরবর্ণ দেহ, সুশ্রী মুখাবয়ব, বয়স বছর পঁচিশ ছাব্বিশ। সেজদাদার মুহুরি বৈকুণ্ঠনাথ পাঁড়ের সে খুড়তাত ভাই। আমি ওকালতি করতে আসছি ব'লে ত্রিলোক আমার জন্য জীয়ানো ছিল। সে এবং আমি এক সঙ্গেই জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। সে দিন সকলে বলেছিল, যেমন সওয়ার তেমনি বাহন। সওয়ার অর্থে সেদিন অবশ্য আমাকেই মনে করা হয়েছিল; কিন্তু উত্তরকালে এক এক সময়ে এমন অবস্থা ঘট্‌ত যে, কে সওয়ার কে বাহন তার ঠাহর ঠিক পাওয়া যেত না; অনেক সময়ে আমিই যেন বহন করতাম ত্রিলোকনাথকে।

সকাল-সন্ধ্যা সেজদাদা মক্কেলের দঙ্গল নিয়ে কাজে বসেন; আমি তাঁর বাম পার্শ্বে উপবেশন ক'রে মুদ্দই (বাদী), মুদ্দালেহ (প্রতিবাদী) ও গবাহদের (সাক্ষীদের) কথা-বার্তা শুনি, এবং আর্জি (Plaint), বিয়ান-তহরির (Written Statement) ও দরখাস্তের (Petition) অর্ধবোধ্য ভাষার মর্মোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করি। একদিন বৈকুণ্ঠ পাঁড়েকে দিয়ে সেজদাদা একটা দরখাস্ত লেখাতে গিয়ে সম্বোধনের পাঠ লেখালেন, 'গরিবপরবর সলামৎ'। কথাটা নূতন শুনলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল ভিন্ন পরিচ্ছদে একে যেন পূর্বে কোথাও দেখেছি। সহসা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, "সেজদা, এই 'গরিবপরবর সলামৎ'ই কি ইংরাজির Hail cherisher of the poor?"

স্মিতমুখে সেজদাদা বললেন, "হ্যাঁ। কি ক'রে তা জানলে?"

বললাম, "কলকাতায় দাদার হাইকোর্টের পেপার বুকে প্রায়ই ও বাক্যটা দেখতাম।"

Paper Book-এর মধ্যে 'Hail cherisher of the poor!' দেখে একদিন যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলাম। মামলা-মকর্দমার কঠোর বাস্তব ক্ষেত্রে এতটা অনাবশ্যক বিনয়ের উচ্ছ্বাস মনকে একটু পীড়িতই করেছিল। আজ 'Hail cherisher'-এর মৌলিক মূর্তি দেখে মনে মনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলাম। একটা বচন আছে, 'এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্য ভেদ নাই।' আদালত সম্বন্ধে এ বচনটি সুপ্রযোজ্য। এখানে বাস্তবিকই গুরু শিষ্যের ভেদ নেই। 'গরিবপরবর সলামৎ' সে কথার প্রতীক। প্রকৃতই যে গরিব তাকে ত' বলতেই হয় 'গরিবপরবর সলামৎ'; বিপুল ধনৈশ্বর্যের অধীশ্বর দ্বারভাঙ্গার ম

রাজাকেও সেই একই বুলি আওড়াতে হয় 'গরিবপরবর সলামৎ'।

এ না-হয় ধর্মাধিকরণের লোকাতীত মহিমার প্রতি আনুগত্যের অভিভাষণ. এ জিনিস পরিপাক করা কঠিন নয়;—যা আমাকে সত্য সত্যই পীড়িত করত তা হচ্ছে আইন-আদালতের পরিবেশের মধ্যে মিথ্যার অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তা, এমন কি, উপকারিতা। 'অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তা' কথাটা শ্রুতিকটু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুলও নয়। অনেক সময়ে সত্য মামলাকে জয় করতে হয় মিথ্যা সাক্ষী-সবুতের সাহায্যে; আবার মিথ্যার দ্বারাই অনেক সময়ে মিথ্যা মামলাকে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন হয়, কতকটা কণ্টকের দ্বারা কণ্টককে উৎপাটিত করার মতো। মামলা-মকর্দমার ক্ষেত্রে মিথ্যা যতটা সবল এবং সচল বস্তু, সত্য ততটা নয়। ভাল ক'রে আটঘাট বেঁধে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করাতে পারলে মিথ্যার চকমকানির কাছে সত্য অপ্রতিভ হ'য়ে অবস্থান করে। সেরূপ অবস্থায় অনেক খুঁদে হাকিমও মিথ্যার চোখ-ঝলসানো আলোকের দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়ে নিষ্প্রভ সত্যকে অসত্য ব'লে ভুল করেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দোসরা জানুয়ারি এসে পড়ল। একটু সকাল-সকাল কাজকর্ম থেকে উঠে স্নানাহার সেরে পোষাক পরিধানের কার্যে ব্যাপৃত হলাম। সে বিষয়ে মনে মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। এতদিন ভদ্রলোকের সহজ সরল পোষাক প'রে এসেছি, মিনিট দুয়েকের মধ্যে বেশ পরিবর্তন সম্ভব হ'ত। এখন প্যাণ্ট, চোগা, চাপকান, গলায় শক্ত উঁচু কলার, পায়ে লেসবাঁধা শু, গরম মোজা, মাথায় শালের ফিতা জড়ানো শামলা,—সে এক বিপর্যয় ব্যাপার! আধ ঘণ্টা ধ'রে টানা-হেঁচড়া ক'রে, ভাগলপুরের হাড়কাঁপানো শীতেও ঘর্মাক্ত হ'য়ে, পোষাক পরা শেষ হ'ল। কথায় বলে, অনভ্যেসের ফোঁটা, কপাল চড়চড় করে। আমার অনভ্যাসের বেশে সমস্ত দেহ চড়চড় করতে লাগ্‌ল।

মাথায় শামলাটা দিয়ে আয়নার মধ্যে দৃষ্টিপাত ক'রে না হেসে থাকতে পারলাম না। যাকে বলে যাত্রার দলের জুড়ি একবারে হুবহু তাই!

ওদিকে সেজদাদা ইতিমধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে বাইরের ঘরে ব'সে আমার জন্যে অপেক্ষা ... ... আমার মা

পোষাক, একমাত্র কড়া কলার বাদে, তাঁরও তাই। কিন্তু পনের-ষোল বৎসরের ক্রমান্বয়ে ব্যবহারে তারা তাঁর কাছে এমন বশ্যতা স্বীকার করেছে যে, মিনিট তিনেকের মধ্যে যে-যার নিজ নিজ স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মেজ জেঠাইমাকে প্রণাম ক'রে সেজ বউ-দিদির কাছে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে সহাস্য মুখে সেজবউদিদি বোধ হয় একটু কৌতুকান্বিত হয়েই, বললেন, "বেশ দেখাচ্ছে।"

মাথায় শামলা চড়িয়ে বল্‌লাম, "ধরব না-কি তাহ'লে?"

"কি ধরবে?"

"জুড়ির গান?"

রহস্যটা বুঝতে পেরে সেজবউদিদি হাসতে লাগলেন; বললেন, "বেশ ত', ধর না। একাই বা ধরবে কেন? বাড়িতে ত আরও জুড়ি আছে।"

ভজুয়া চাকর এসে তাগাদা দিলে; বললে, বাবু তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন।

সেজবউদিদিকে একটা প্রণাম ক'রে বললাম, "তাঁর সঙ্গে জুড়ির গান গাইতে আদালতের যাত্রার আসরে চল্‌লাম।"

আদালতে বার লাইব্রেরীতে পৌঁছানো মাত্র আমার 'সগুণ' অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'য়ে গেল। বড় বড় উকিলরা আমাকে দেখেন আর তাঁদের মুহুরিদেরকে বলেন, "বাবু আজ প্রথম ওকালতি আরম্ভ করলেন, বাবুকে ভাল ক'রে সগুণ করাও।"

সগুণ অর্থে উপার্জনের মাঙ্গলিক আরম্ভ। নূতন উকিলের প্রথম দিনের সূচনা যাতে অর্থহীন না হয় সেই উদ্দেশ্যে বড় উকিলেরা তাঁদের মক্কেলদের কাছ থেকে কিছু অর্থ পাইয়ে দেন। চল্‌তি মামলার ওকালতনামায় সদ্যাগত উকিল নিজের নাম সই করেন ও টাকা দুই ক'রে দক্ষিণা পান। সুদীর্ঘকাল হ'তে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রথার কথা উকিলদের মুহুরীরা ত জানেই, যে-সকল ব্যক্তিদের আদালতে সর্বদা মামলা-মকর্দমা থাকে তাদেরও এ প্রথার মর্ম বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। নূতন মুখের উকিলের সঙ্গে নিজের উকিলের মুহুরিকে দেখলেই এরা টাকা বার করবার জন্য ট্যাঁকে হাত দেয়।

প্রথমে বৈকুণ্ঠনাথ পাঁড়ে সেজদাদার মক্কেলদের কাছে সগুণ করাতে আরম্ভ করলেন। ওকালতনামার উল্টো পিঠে আমি নাম সই ক'রে তারিখ বসাই, মক্কেলরা কেউ দেয় দু'টাকা, কেউ চার টাকা, কেউ বা পাঁচ।

সেজদাদার মক্কেল শেষ হ'লে অন্য উকিল-দের মক্কেল আরম্ভ হ'ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মণিব্যাগ ছাপিয়ে টাকা চাপকানের পকেটে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলে। বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ডানদিকের চাপকানের পকেটের ভিতরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব এমন বৃদ্ধি লাভ করলে যে, তার টান কণ্ঠদেশে উপস্থিত হ'য়ে পীড়ন করতে লাগ্‌ল। তখন ডানদিকের পকেটের অর্ধেক টাকা বামদিকের পকেটে চালান দিয়ে দেহের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করলাম।

ইত্যবসরে এক সময়ে একজন আরদালি এসে হাজির। আমাকে অভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারই নাম কি উপেনবাবু?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"হাকিম আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।"

একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ হাকিম?"

"ঐয়ল্ সবজজ।"

বল্‌লাম, "আচ্ছা চল, যাচ্ছি।"

তখন এজলাসের সময়। দীননাথ দের এজলাসে উপস্থিত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে বললাম, "আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যার?"

স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন ক'রে দীনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ডেকেছি। একটা মকর্দমায় আপনাকে নাবালক প্রতিবাদীদের পক্ষে Guardian-ad-litem নিযুক্ত করেছি, আর অন্য একটা মকর্দমায় আপনাকে Commissioner করেছি সাক্ষীর এজাহার নেবার জন্যে। অফিসে গিয়ে সেরেস্তাদারের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে যান।"

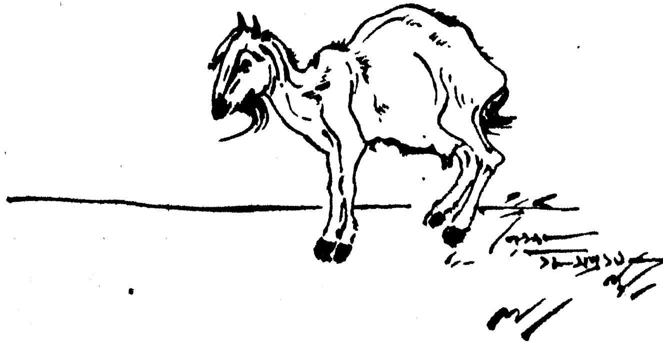
হাকিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন ক'রে অফিসে উপস্থিত হলাম। তারপর সেরেস্তাদারের কাছ থেকে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় আরম্ভ করলাম।

সেরেস্তাদার বললেন, "প্রথম দিনের একজন উকিলকে বড় বড় মকর্দমায় এক সঙ্গে গার্জেন করা আর কমিশন দেওয়া, সচরাচর বড় দেখা যায় না। হাকিম আপনাকে বিশেষ খাতির দেখিয়েছেন,—বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন।"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই করেছেন।"

সেরেস্তাদার বললেন, "মকর্দমা দুটিই মাঝারি রকমের বড়। দুটোতে মিলে নিদেন পক্ষে শ দেড়েক টাকা উপায় করতে পারবেন।"

পকেটে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, হাতে শ দেড়েক, —মন্দ নয় ত! খুসিতে মন ভরে উঠ্‌ল। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, 'Morning shows the day'। ওকালতি জীবনের আজকের দিনটা যদি সেই Morning হয়, আর বাকি জীবনটা যদি আজকের অনুপাতে day হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে জয় হোক্ আজকের দিনের! (ক্রমশ)



শরীরটা বেশ মজবুত

অমরেন্দ্রকুমার সেন

কিছুদিন পূর্বে রাস্তায় একটি লোকের মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার জন্য মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের পর করোণারের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে মৃত ভদ্রলোকের যক্ষ্মা ছিল যার জন্য তাঁর ফুসফুসের একাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীগুলিও সুস্থ ছিল না, তাঁর শিরাগুলি কঠিন হতে আরম্ভ হয়েছিল এবং তাঁর পুরাতন ব্রাইটস্ ডিজিজ নামে মূত্রাশয়ের রোগ ছিল। কিন্তু এতগুলি রোগের মধ্যে কোনোটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়নি। ভদ্রলোক মারা গিয়েছিলেন এক দুর্ঘটনায়, একটি কুড়ি টন মালবাহী লরি তাঁকে চাপা দিয়েছিল। ভদ্রলোকের রোগের বিবরণ শুনে মনে হতে পারে যে তিনি তাঁর রোগ-জর্জর দেহ নিয়ে হয়ত চলাফেরা করতে পারতেন না, কিন্তু ঠিক তার বিপরীত, তিনি কঠিন পরিশ্রমী ছিলেন অবশ্য ভেতরে ভেতরে তাঁর দেহযন্ত্র নিরন্তর মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল। কিন্তু তাঁর রোগ অথবা সংগ্রাম, কোনটিরই বিষয় ভদ্রলোক অবগত ছিলেন না।

আমরা যে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি সেইটাই আশ্চর্য, মনে হয় 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত'। দুর্ঘটনা ও যুদ্ধের বোমাবর্ষণের কথা বাদ দিলেও সদা সর্বদা দেহকে রক্ষা করতে হয় অদৃশ্য ব্যাক্টিরিয়া আর ভাইরাসদের হাত থেকে, যারা নানা-রকম মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়। চিকিৎসাবিজ্ঞান এই সকল জীবাণুদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করে চলেছে, কে যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে কে বলতে পারে। নানারোগে নানাভাবে মানুষকে মরতে দেখে আমরা নিরাশবাদী হয়ে উঠি, এবং বরাতে যা হয় হবে ভেবে কলেরা মহামারীর সময়ে বাজারের বাসি খাবার অথবা পচা মাছ যেন ইচ্ছা করেই কিনে খাই। কিন্তু মৃত্যু কি এতই সহজ? ঐ লোকটির মতই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমাদের শরীর সর্বদা ব্যস্ত আছে এবং এমনই ব্যস্ত যে সব কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে মৃত্যু অত সহজ নয়, সহজ হলে অবশ্য আর বাঁচতে হতো না, অনেক আগেই সব মারা যেতুম। জীবনযুদ্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ জয়ী হয়েছে এবং হচ্ছে তবে পরে হবে কিনা অথবা কতদিন হবে তা অবশ্য বলা শক্ত।

বাড়ীতে যখন নতুন শিশু অতিথির আগমন হয় তখন সাধারণ বাঙালী পরি-বারে তাকে ও তার মাকে যেভাবে স্থান ও বাস করতে দেওয়া হয় তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে যে যে-কোনো রোগ বীজাণু আক্রমণ করে শিশুটিকে হয়ত রোগগ্রস্ত করে তুলবে, কিন্তু তার মায়ের অসুখ-বিসুখ করলেও ছেলেটির বড় একটা অসুখ-বিসুখ হয় না, কারণ সে রোগ-বীজাণুর বিরুদ্ধে কিছুদিনের মতো প্রতিরোধ করবার শক্তি নিয়েই জন্মায়। অবশ্য একান্ত অবহেলা করলে তাদের কোনো কোনো অসুখ হতে পারে।

আমাদের শরীরের ভেতরে ও বাইরে সদাসর্বদা বহুরকমের রোগ বীজাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্স-রে পরীক্ষা করলে হয়ত ধরা পড়বে যে কোনো একসময়ে আপনার যক্ষ্মা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা জানতেও পারেন নি। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের অতি-সূক্ষ্ম বীজাণু বাতাসে সদাসর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়ত এই মুহূর্তে আপনার নাকের মধ্যে কয়েক লক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণু গিজ্-গিজ্ করছে কিন্তু তবুও আপনার ইন-ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে না। শরীরে রোগ বীজাণু প্রবেশ করলেও যে অসুখ হয় না এমন হয় না, অবস্থা বিশেষে অসুখ নিশ্চয় হয়। তবে সব শরীরেরই রোগ ও রোগবীজাণু প্রতিরোধ করবার স্বাভাবিক শক্তি আছে। এই শক্তি অনেক সময়ই টের পাই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কোনোদিন হয়ত লক্ষ্য করা গেল যে গলাটা খুস্‌খুস্ করছে, কিংবা সামান্য একটু জ্বর হয়েছে হয়ত, অথবা আয়নাতে মুখ দেখবার সময় গালে দু' একটা ফুস্‌কুড়ি লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য আরও নানারকম লক্ষণ দেখে রোগ-বীজাণুর প্রকৃতি ও প্রখরতা ধরা পড়ে। তবে একথা ঠিক যে যতবার রোগবীজাণুরা আমাদের আক্রমণ করে আমরা তার চেয়ে বহু কমবার ভুগি। গলাটা যখন খুস্‌খুস্ করে, স্বরভঙ্গ হয় কিংবা ফোলে অথবা ব্যথা হয় তখন বুঝতে হবে যে সেইখানে রোগবীজাণু আক্রমণ করার জন্য সেখানে অতিরিক্ত রক্ত ছুটে চলেছে, এবং এই অতিরিক্ত রক্তকে স্থান দেবার জন্য গলাটা ফুলেছে; আর সেই রক্তে আছে লিউকো-সাইট নামে লক্ষ লক্ষ সাদা কণিকা যাদের কাজ হল রোগ বীজাণুদের খেয়ে ফেলা। সাধারণত শরীরে যত সংখ্যক সাদা কণিকা থাকে, বিপদের সময় আবার সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যখন রোগবীজাণুদের সঙ্গে লিউকোসাইটরা যুদ্ধ করে তখন "রিজার্ভ বাহিনী" ডাকবার জন্য হাড়ের ভেতর মজ্জায় খবর চলে যায়, সেই মজ্জায় তৈরী হয় রিজার্ভ বাহিনী অর্থাৎ আরও লিউকোসাইট। কিন্তু যদি বহুসংখ্যক লিউকোসাইট তৈরী করতে হয় তাহলে হয়ত আপনার জ্বর হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধ তখন ঘোরতরো হয়ে উঠেছে। অবশ্য জ্বর হবার আগেই আপনার গলার অসুখটুকু সেরে যেতে পারে, কিন্তু যদি না সেরে জ্বর হয় তাহলে বুঝতে হবে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। জ্বর তাহলে রেলের লাল সিগন্যালের মতো সতর্ক করে দিচ্ছে।

শরীরের উত্তাপ যদি খুব কম হয় তাহলে বীজাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়; উত্তাপ যদি খুব বেশী হয় তাহলে বীজাণুগুলি মরে যায়। জ্বর হলেই নিজে ওষুধপত্তর না খেয়ে ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে শরীর অবশ্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে। যখন শ্বেতকণিকারা পারে না, তখন শরীর প্রতিবিষ অর্থাৎ এমন রসায়ন উৎপন্ন করে যা রোগবীজাণুকে ধ্বংস করে; এক একরকম রোগবীজাণুর

জন্য এক একরকম প্রতিবিষ শরীর তৈরী করতে পারে। পেনিসিলিন অথবা সাল্‌ফা জাতীয় ওষুধ তৈরী করতে যেখানে বৎসরের পর বৎসর গভীর গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন সেখানে আপনার শরীর সাতদিনের মধ্যে প্রতিবিষ তৈরী করতে পারে। নিউমোনিয়ায় ভুগে আপনার অবস্থা হয়ত 'যায় যায়', ডাক্তারবাবু আশাভরসা হয়ত ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় আপনি হয়ত সেরে উঠলেন, কেননা নিউমোনিয়া রোগের বীজাণু নিউমোকক্কাইদের ধ্বংস করবার প্রতিবিষ আপনার শরীরে রসায়নের কারখানা তৈরী করে ফেলেছে এবং এই প্রতিবিষই আপনাকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে।

যখন মুখের ওপর ছোট্ট একটি ফুস্‌কুড়ি দেখা দেয় প্রথম অবস্থায় সেটি থাকে লাল, কারণ রোগবীজাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার রক্ত তখন তার যোদ্ধা সৈন্য লিউকোসাইটদের সেখানে পাঠাচ্ছে। কিন্তু পরে হয়ত সেই লাল ফুস্‌কুড়ি সাদা হয়ে গেল অর্থাৎ বীজাণুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিউকোসাইট মানে সাদা কণিকারা হেরে মারা পড়ে সেখানে জমা হচ্ছে। সাধারণত রক্তই মৃত শ্বেত-কণিকাদের সরিয়ে নেয়, কিন্তু শ্বেত কণিকাদের মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত ও বেশী হতে থাকলে তখন রক্ত আর সরিয়ে উঠতে পারে না, প্রচুর পরিমাণে মৃত সাদা কণিকা অথবা পুঁজ জমতে থাকে। অনেকে ফুস্‌কুড়ি আঙুল দিয়ে টিপে গালিয়ে দেন কিন্তু তার দ্বারা হয়ত কিছু রোগবীজাণু অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ক্ষতিও হতে পারে এবং হয়েও থাকে।

আপনাকে যদি প্রশ্ন করি, "আপনি বিষ খান?" আপনি নিশ্চয় বলবেন "না খাই না," কিন্তু আপনি চা, তামাক, কফি, সিগারেট ইত্যাদির সঙ্গে খুব অল্প মাত্রায় বিষ খাচ্ছেন, অথচ মারা যাচ্ছেন না। আপনার যকৃত এবং মূত্রাশয়ের মধ্যে যে ছোট্ট ল্যাবরেটরি আছে, তাই বিষকে নির্বিষ করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখছে। অবশ্য বেশী পরিমাণে বিষ খেলে.........! আপনার শরীরের হাড়গুলিও আর্সেনিক, সীসে, রেডিয়াম এবং ফ্লোরিন জাতীয় বিষদের নিজেদের মধ্যে জমিয়ে ফেলে। ফলে সেই সকল বিষ শরীরের আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

শরীরটা যখন সুস্থ থাকে তখন যকৃতের মাত্র পাঁচ ভাগের তিনভাগ কাজ করে। মানুষ একটা মাত্র ফুস্‌ফুসেই কাজ চালিয়ে নিতে পেরেছে, আয়ু কিছু কমেও যায়নি। হৃদ্‌যন্ত্রও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেশী মজুত রাখে। হৃদযন্ত্রটা বন্ধ হবার আগে একবার সব কয়টা পেশী সজোরে যন্ত্রটাকে চালু রাখবার চেষ্টা করে। শরীরের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই থামবার আগে একবার আপনাকে সাবধান করে দেবে। গা-হাত-পা ব্যথা করলে বুঝতে হবে কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। শরীর ক্লান্ত হলে বুঝতে হবে অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, বিশ্রাম কম হচ্ছে, অথচ শরীরের মেরামত কাজের জন্য বিশ্রাম দরকার। শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কমে এলেই জ্বর হয়, তখন সাবধান হওয়া দরকার এবং ডাক্তারবাবুকেও খবর দেওয়া প্রয়োজন। শরীরে যতরকম প্রতিরোধ শক্তি থাকুক আর প্রতিবিষ তৈরী করবার ব্যবস্থা থাকুক, অসুস্থ হলেই বুঝতে হবে যে, শরীর আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে অতএব যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন।

আপনার কোমরের হাড় লিগামেণ্ট অর্থাৎ সন্ধিবন্ধনীর সাহায্যে উরুর মোটা হাড় অর্থাৎ ফিমারকে আটকে রাখে। এই সন্ধিবন্ধনী এতই শক্ত যে তারা প্রায় পাঁচশত সের ভারী জিনিসকে টানতে পারে। আমাদের শরীরে সাধারণত ২২২টা হাড় আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত হ'ল পায়ের লম্বা হাড়টা, যাকে বলা হয় শিন বোন। এই হাড়টি আঠারশ' সেরের ভার সহ্য করতে

পারে। হাড় মাত্রই কিন্তু কঠিন নয়, মাথার খুলি ফাটবার আগে রবারের মতো বেশ খানিকটা নেমে যায় তারপর মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যায় তখনি ফাটে।

মানুষের মোট পেশীর সংখ্যা ৬৩৯টি। উপযুক্ত ব্যায়াম এবং কৌশলের সাহায্যে এক ঘন ইঞ্চি পেশীর সাহায্যে ৫৬ থেকে ১৪০ পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন তোলা যায়। সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী হল যার জোরে আমরা খাদ্য চর্বণ করি। তাদের শক্তি অন্যভাবে মাপলে হিসেবটা এইরকম করা যায় যে, ঐ পেশী তার অধিকারীর দ্বিগুণ ওজন মাল টেনে তুলতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও শক্তিশালী হল সন্তানবতী নারীর জরায়ুর পেশী।

শহরে বা গ্রামে আমাদের নাকের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ধুলো ঢোকে, নাক ছাঁকুনির কাজ করে, বহু রোগবাহী বীজাণুকে আটকে দেয়, কিন্তু তবুও কিছু ধুলো নাকের মধ্য দিয়ে ভেতরে চলে যায়। একজন মানুষের নাক দিয়ে শরীরের মধ্যে কত ধুলো ঢোকে জানেন? পাঁচ সের? সাড়ে সাত সের? আরও অনেক বেশী; সাড়ে বাইশ সের! যারা ময়দার কল, খনি অথবা ধূলিপূর্ণ স্থানে কাজ করে তাদের অন্তত পঞ্চাশ সের ধুলো প্রবেশ করে।

আপনার শরীরটা এমন মজবুত বলেই আপনি প্রতিদিন বিশ হাজার বার পদক্ষেপ করতে পারেন আর যদি আশি বৎসর বাঁচতে পারেন তাহলে ঐ সকল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পদক্ষেপ দ্বারা ছয় বার সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারবেন। নাঃ আপনার শরীরটা বেশ মজবুত বলেই ত মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যে অম্বল, অর্শ আর ডায়াবেটিসে ভোগেন? কিন্তু তাতে কি!

আলোচনা

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার ২২শ সংখ্যায় ইন্দ্রজিতের আসরে বাঙলা দেশ হইতে দুর্নীতি দমন করিবার উপায় হিসাবে নারী সমাজের কাছে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। একই সমাজ ব্যবস্থায় নারী এবং পুরুষের চরিত্র ভিন্ন রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সমাজে পুরুষেরা যে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে তাহার মূল কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দোষ। পুরুষের এই সক্রিয় দুর্নীতিমূলক কার্যে নারীরও সহায়তা এবং সমর্থন আছে। বর্তমানকালে নারী ও পুরুষ উভয়েই দেখিতেছি যে, অর্থ থাকিলেই সমাজে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ করা যায়; সেই অর্থ কি উপায়ে অর্জিত সে প্রশ্ন কেহ করে না; সুতরাং অর্থ চাই তা সে যে কোন প্রকারেই হোক।

ধনতন্ত্রবাদী সমাজ-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশেও আছে; কিন্তু সেসব দেশে দুর্নীতি এত প্রবল হয় নাই তাহার কারণ অন্যান্য দেশের লোকে প্রথমত সমগ্রভাবে জাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, যাহা আমাদের দেশের কাহারও নাই। দ্বিতীয়ত দারিদ্র্যের চরম দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা দুর্নীতিমূলক কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ আছে এমন পদস্থ ব্যক্তিগণ ভাবেন যে, সুযোগ যখন পাওয়া গিয়াছে তখন যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা যাক, তাহা হইলে বংশপরম্পরা দারিদ্র্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের লোকেরা অর্থলোলুপতার তথা দুর্নীতির প্রধানত তিনটি কারণ যথা সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা, জাতির কল্যাণ-চিন্তার এবং স্বদেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাব আর দারিদ্র্যের হাত থেকে বংশপরম্পরা নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা।

উক্ত তিনটি মনোভাব পুরুষেরও যেমন আছে নারীরও সেইরূপ আছে। ইহা ছাড়া আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার না থাকায় তাহারা নিজেদের খুব অসহায় মনে করে, ফলে তাহাদের মধ্যে অর্থ ও অলঙ্কারের প্রতি লোলুপতা আরও বৃদ্ধি পায়। এমনকি বর্তমানে মেয়েরা শিক্ষিত হইয়াও শাড়ী, অলংকার ও বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ কমাইতে পারে নাই বরং শিক্ষিতাদের মধ্যেই বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। মেয়েরা বা তাহাদের মায়েরা আজও যখন অর্থবান পাত্রকেই বেশী যোগ্য বলিয়া মনে করে তখন চাণক্য শ্লোকের কথা মনে পড়ে—কন্যা বরয়তে রূপং মাতাবিত্তং পিতাশ্রুতং। বর্তমান কালের শিক্ষিত মেয়েরাও স্বামী হিসাবে অধ্যাপক অপেক্ষা পুলিশের দারোগাকেই বেশী যোগ্য বলিয়া মনে করে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একটি মেয়ের বিয়ের জন্য দুটি পাত্রের সঙ্গে কথা চলিতে থাকে একটি গ্রাজুয়েট স্কুল শিক্ষক বেতন মাসিক ৫০১; অন্যটি জেলা কালেক্টরী অফিসে কেরাণী ম্যাট্রিক পাশ বেতন মাসিক ৩৫১। মেয়েটির বাবা শিক্ষকটিকেই মনোনীত করিতে চান; কিন্তু তাহার মা ঐ কেরাণীটিকেই যোগ্যতর বলিয়া সাব্যস্ত করেন; কারণ বেতন কম হইলেও তাহার উপরি পাওনা আছে এবং এইরূপ মা'র সংখ্যাই সমাজে বেশী। এ অবস্থায় দুর্নীতি দমনে নারী সমাজের কাছে কোন সহায়তা আশা করা চলে না। অবশ্য বাঙালী নারী সমাজ যদি সতাই এবিষয়ে সহায়তা করেন তবে তাহারা যে নারী সমাজে এক আদর্শ স্থাপন করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—প্রদ্যোতকুমার দাশ, দিল্লী।

২

মহাশয়,—বিশেষ দুঃখের সহিত একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গত ২৪শে চৈত্র, শনিবার ১৩৫৭ সালের "দেশ" পত্রিকার (অষ্টাদশ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা) ৪২২ পৃষ্ঠায় "বিজ্ঞান বৈচিত্রের" মধ্যে ডায়েবেটিস সম্বন্ধে পড়িলাম। ইহাতে লিখিয়াছেন—

"আমাদের যকৃত থেকে ইনসুলিন নামে যে রস ক্ষরণ হয় তাহা শর্করা জাতীয় পদার্থকে শরীর গঠনের উপযোগী করে। যকৃতের কয়েকটি সেল থেকে ইনসুলিন উৎপন্ন হয়।"

বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ইনসুলিন যকৃত (Liver) থেকে উৎপন্ন হয় না। ইনসুলিন উৎপন্ন হয় ক্লোম (Pancreas)-এর আন্তঃক্ষরণকারী বিশেষ সেল হইতে। ইহাকে বলা হয়—

"Islets of Langerhans—scattered, between the ordinary alcoli of the Pancreas, are small clamps of epithebal cells which are free from ducts ......The islets elaborate an internal secretion Insulin"..........

—applied Physiology by Samson Wright.

ইতি ভবদীয়—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল।
কলিকাতা।

পুস্তক পরিচয়

যন্ত্রসংগীত প্রবেশিকা—প্রথম ভাগ—শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রেয়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মৈত্রেয় বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে একজন নামী শিল্পী। শরদ বাজনায় তিনি বর্তমান বাঙালীদের মধ্যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছেন। প্রথম শিক্ষার্থীকে কিভাবে শেখালে ভাল কাজ পাওয়া যায় সেই-দিক থেকে বইটির পরিকল্পনায় মৌলিকত্ব আছে। ভূমিকায় লেখক সেই কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরাও সেই সূত্রটি ধরে বিচার করতে গিয়ে দেখলাম যে, সত্যিই তিনি ঠিক পথেই গেছেন। কণ্ঠসংগীতের কতগুলি সুবিধা আছে যা যন্ত্রসংগীতে নেই। উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের শিক্ষা না নিয়েও লোকে গান গাইতে পারে তার জন্যে আলাদা করে কোন সাধনা করতে হয় না। নানাপ্রকার দেশী সংগীত, পল্লীসংগীত গলায় সারে গামা ইত্যাদি সুর বা রাগরাগিনী না সেধেও লোকে গান গেয়ে থাকে। মোট কথা এই সব গান শেখার জন্যে গলা সাধার আলাদা প্রচেষ্টা দেখি না। কিন্তু যন্ত্রসংগীতে তা সম্ভব নয়। আঙুলে চালনার বা হাত চালনার মূল কায়দাগুলি না শিখে কোন প্রকার যন্ত্রে কিছুতেই সংগীতযোগ্য সুর বের হবে না। তাই তার জন্যে কিছু পরিমাণও হাতে কাজকে সাধনার দ্বারা আয়ত্তে আনতে হয়। এইটুকুর জন্যেও যন্ত্রে পরিশ্রম না করে উপায় নেই। তেমনি শরদ যন্ত্রের হাত চালনায় বা আঙুল চালনার আরম্ভে যে কয়টি মূল পদ্ধতির প্রয়োজন লেখক ঠিক সেই দিকটার উপর ভিত্তি করেই বইটি লিখেছেন। এতদ্দ্বারা উপকার হবে এই যে, যে কোন যন্ত্রী অল্পদিনের মধ্যেই এই যন্ত্রে সাধারণ সুর বাজিয়ে তুলতে পারবে। তার পরে সেই সফলতার আনন্দে ধীরে ধীরে তার মন আরো দুরূহ ছন্দের বা হাতের কায়দার দিকে আপনিই আকৃষ্ট হবে। তখন সেই সব কষ্টসাধ্য হাতের কাজগুলি আর তত নীরস মনে হবে না। সেতার ও শরদের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পরীক্ষা করে দেখলে আমাদের বিশ্বাস বিশেষ উপকার পাবেন। বইয়ের শেষ অংশে পরিশিষ্টে "বর্ণ-জাতি" নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা পড়ে দু একটি কথা মনে এলো। আমাদের মনে হয়, সংগীতের পরিভাষা নিয়ে সমালোচকদের ভাল করে ভাবা উচিত। এক শব্দ সংস্কৃত শাস্ত্র মতে এক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার প্রাচীন ধারণায় প্রচলিত পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে আর এক রকমের। এই বিষয়ের কিছু মীমাংসা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং প্রাচীন শাস্ত্রে সংগীত বিষয়ে কোন শব্দের ব্যাখ্যা কিছু পেলেও প্রাচীন ঘরাণার সংগীতবিদ্ তার কি ব্যাখ্যা পূর্বপুরুষদের কাছে পেয়েছেন এ বিষয়েও আমাদের বিশেষ করে খোঁজ করা প্রয়োজন। তাঁদের ব্যাখ্যাটির একটা মূল্য এই বুঝি যে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁদের গান ক্রিয়ার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের গীত পদ্ধতিতে সেইসব শব্দের ব্যাখ্যা জীবন্তভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের চেয়ে প্রাচীন ঘরাণার জীবিত গায়কদের কথার দাম আমাদের কাছে অনেক বেশী। লেখকের এই আলোচনার মধ্যে ভাববার বিষয় আছে। বইটির ছাপা পরিস্কার। দেখতেও সুশ্রী। ৪১।৫১

বিপ্লবের ডাক:—সুশীল জানা। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, মূল্য দু টাকা।

সুশীল জানা অনবদ্য ভাষায় কিশোরদের সামনে মেলে ধরেছেন এদেশের ইতিহাসের রক্তাক্ত এক অধ্যায়। মুক্তিকামী শহীদের ব্যথাবেদনা, জ্বালা আর আত্মচেতনা কুশলী শিল্পীর লেখনীতে অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রথম শ্রেণীর।

পনেরো—আগস্ট—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা। প্রকাশক: শ্রীকুঞ্জবিহারী জানা, বারিপদা; প্রাপ্তি-স্থান: জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।

'পনেরো আগস্ট' একশত পৃষ্ঠায় লেখা ছয় অঙ্কের একখানা নাটক। সমীর নামক জনৈক রাজবন্দী জেলখানায় নানাভাবে নিপীড়িত ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়। পরে পনেরো আগস্টের কয়েকদিন পূর্বে মুক্তিলাভ করিয়া চৌদ্দই আগস্ট রাত বারোটার পূর্ব মুহূর্তে স্বীয় শিষ্যা ও প্রেমিকা সুস্বপ্না ও অন্যান্যদের সম্মুখে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাই মূল ব্যাপার। তবে ইহার মধ্যে প্রেম, বিরহ, ষড়যন্ত্র এবং কিছুটা রসিকতা যে নাই তাহা নহে। তবে সবচেয়ে বেশী যা আছে তা ভাবপ্রবণতা। নাটকে বহু চরিত্র সমাবেশ করা হইলেও একমাত্র নিষ্ঠাবতী সুস্বপ্নার চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্র ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সংলাপ জোরালো নহে। ঘটনা সংস্থানও মনে দাগ কাটিতে পারে না। মোট কথা, পনেরো আগস্ট নাটক হিসাবে অসার্থক সৃষ্টি।

নাটক ছাড়াও 'পনেরো আগস্ট' নামক একটি কবিতা ও সুদীর্ঘ নিবেদন বইটিতে যুক্ত হইয়াছে। ৩০৭।৫০

শিশুপাঠ্য কৃত্তিবাস—শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক: এ মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—৩।

আলোচ্য পুস্তকটি ভারতের
কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংক্ষিপ্ত শি
শিশুদের পক্ষে ভারতের মহাকাব্য
আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক।
পূরণ করিবার জন্য সুপরিচিত শি
শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশ
শিশুচরিত্র গঠনের অন্তরায় প্রসঙ্গ
'শিশুপাঠ্য কৃত্তিবাস' রচনা করিয়াছে
এই রচনা সার্থক ও সময়োপযোগ
কালিদাস রায় ভূমিকায় লিখিয়াছেন
যতদূর সম্ভব কৃত্তিবাসের প্রচলিত
করিয়াছেন—স্থলে স্থলে সূত্ররক্ষার
ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু
প্রাঞ্জল এবং তাহা কৃত্তিবাসের ভা
অনুবর্তী যে, কৃত্তিবাসের নিজের ভ
মনে হয়। মোটের উপর গ্রন্থখানি
বালিকাদের পক্ষে সুখপাঠ্য করিয়া তু
আমরা তাঁহার মন্তব্যের সহিত একমত
প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত কয়ে
ও একবর্ণ চিত্র-সংযোজিত হওয়ায়
শিশুদের মন আকর্ষণ করিতে সম
ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপট ম

**ROLE OF PRIVATE ENTE
IN INDIA—IN RETROSPEC
PROSPECT**—Published by
er's Association: 15. Park
Calcutta. Price Re. 1-.

স্বাধীন ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি
হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার
একান্ত প্রয়োজন। বে-সরকারী শি
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির বিষয়
পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে। সরকার
পতিগণের দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্য অনে
শিল্পে অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া
সুতরাং উভয়ের সহযোগিতাই যে শিল্পে
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দে

রঙ্গজগৎ

পরিত্রাণ (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ ভোলানাথ মিত্র; আলোকচিত্র ঃ রবি ধর; শব্দযোজনা ঃ রণজিৎ দত্ত; সুরযোজনা ঃ রাইচাঁদ বড়াল; শিল্প-নির্দেশ ঃ সুনীতি মিত্র। ভূমিকায় ঃ অভী ভট্টাচার্য, নরেশ বসু, গৌরীশংকর, শিশির বটব্যাল, হরিমোহন বসু, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, অসিত সেন, বলীন সোম, জহর রায়, পণ্ডিত নটবর, শিপ্রা, ডোরা স্যামুয়েল, মঞ্জু ব্যানার্জি, মনোরমা প্রভৃতি।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনে ৬ই এপ্রিল থেকে চিত্রা, পূর্ণ ও প্রাচীতে দেখানো হচ্ছে

কিসের জন্যে ছবি জমে—বড়ো বড়ো পরিচালকের অধীনে অনেক ছবিতে কাজ ক'রে আসা একজনের পক্ষে, আর কিছু না হ'লেও, সে কারণটা অন্তত জেনে ফেলা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। যে কোন পরিচালকের ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে তার মৌলিক জ্ঞান, তার সৃজনী কল্পনার ভিৎ। কারুর এ-জ্ঞান আছে ব'লে সকলের বিশ্বাস থাকে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যদি আর তার উপর সে বিশ্বাসকে অটুট রাখার সুযোগ না পাওয়া যায়, সেজন্যে মনে যে পরিতাপ জাগে, "পরিত্রাণে"র ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

"পরিত্রাণ" নিউ থিয়েটার্সের দু'দিকেরই গতিধারার পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। যে যে গুণের জন্যে নিউ থিয়েটার্স ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান ব'লে প্রখ্যাত, সে সব গুণের কতকগুলি যেমন ছবিখানিতে আছে, তেমনি আবার যে যে ত্রুটির জন্যে নিউ থিয়েটার্সের গৌরব বিচলিত, তারও কিছু এতে আছে। পরিচ্ছন্নতা, সর্বাঙ্গীণ কলাকৌশল সৌষ্ঠব এবং আপাতমাধুর্য যেমন "পরিত্রাণ"কে একটি সুষ্ঠু প্রমোদ-চিত্রে পরিণত করে তুলেছে, তেমনি আবার অপরদিকে ব্যর্থতা এনে ফেলেছে কাহিনীর চেয়ে কলাকৌশলের দেমাককে বেশী করে দেখাতে গিয়ে। কাহিনীটাই যে একমাত্র আসল কথা এবং তাকে স্বতঃস্ফূর্ত ক'রে তোলায় এবং তার নাটকীয় প্রয়োজন মিটিয়ে যাওয়ার জন্যেই যে কলাকৌশলের অবস্থিতি এটা যেন "পরিত্রাণে"র পরিচালক স্বীকার করেন না। ফলে তিনি ছবিখানির জন্যে অনেক কিছু ক'রতে গিয়েও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

এ ছবির গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য পরিচালকের নিজেরই পরিকল্পিত ও রচিত ব'লে তাঁকেই সরাসরিভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তিনি কাহিনীর মধ্যে কি এমন দেখেছেন, যা তার প্রেরণার উৎস হতে পেরেছে?—আর সত্যিই মনে-প্রাণে যদি তিনি কাহিনীটির গরিমা সম্পর্কে সংশয়হীন ছিলেন, তাহলে ছবির সবদিকের মহিমাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেও তিনি কাহিনীর প্রাণবস্তুটিকে জাগিয়ে দিতে পারলেন না কেন?—এর দুটো কারণ হতে পারে। হয় তিনি কলাকৌশলের চেয়ে কাহিনীকে বড়ো মনে করেন না, আর না হয় তিনি গল্প লিখতে চান ক্যামেরা-মাইকের আঁচড় দিয়ে।

কাহিনীটির বিন্যাস অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, কাহিনীটি কল্পনায় এসে জড়ো হবার আগেই তার চলার রাস্তাটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে কাহিনী তার নিজের রাস্তায় চলতে গেলেও চিত্র-নাট্যকার বা পরিচালক তাকে সরিয়ে পূর্ব-নির্দিষ্ট রাস্তায় ধরে এনেছেন। এর জন্যে কাহিনীর বিব্রত ভাবটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

গল্পের আরম্ভ আশুবাবু ও তার কন্যা মৃত্তিকাকে নিয়ে যারা তখন বিলিতী সমালোচকের কাছে তারিফ পাওয়া ভাস্কর রায় নামক এক শিল্পীর প্রশংসায় রত। এরা দুজনে এসে পড়লেন ভাস্কর রায়ের বাড়িতে। কিন্তু দরজাতে পা দিতেই তাঁদের চোখে চিত্রকর বা ছবির জায়গায় তাঁদের কানে এসে পৌঁছলো নটরাজ বন্দনার একখানি গান। বিশ্ববিশ্রুত চিত্রকর ব'লে পরিচয় দিয়েই তাকে হাজির করা হ'লো গায়ক হিসেবে হয়তো মৃত্তিকাদের তথা দর্শকদের ভাস্কর রায় সম্পর্কে বিস্ময় ও কৌতূহল বাড়িয়ে দেবার জন্যেই, কিন্তু চিত্রকরসুলভ কোন ক্রিয়ার বদলে গান শুনিয়ে সে উদ্দেশ্য কি ক'রে ফললাভ ক'রতে পারে। অবশ্য এ গানখানির সঙ্গে কাহিনীর পরিসমাপ্তির একটা যোগাযোগ আছে, কিন্তু সেটাও বিকল্প ব্যাপার।

গানের রেশ অনুসরণ ক'রে মৃত্তিকা ওপরে উঠে গিয়ে একজন শিল্পীকে দেখলে। ছবি আঁকায় এতো আত্মনিমগ্ন যে, ঘরে মৃত্তিকার উপস্থিতি টের পেলে না, এমন কি তার চাকর গঙ্গাধর মৃত্তিকাকে উপলক্ষ্য করে একটা রীতিমতো প্রহসনের সৃষ্টি করে তুললেও তার হুঁস ছিল না। এ থেকে ধরা পড়লো যে, ছবি আঁকাই হচ্ছে ভাস্কর রায়ের প্রাণ-ধ্যান। মৃত্তিকার সঙ্গে আলাপ হ'তে ভাস্কর জানলে যে, তারা এসেছিল তারই একটি ভাড়াটে-বাড়ির এক ভাড়াটের হয়ে ভাড়া বাকী রাখার তদ্বির নিয়ে। মৃত্তিকা জানায় যে, ভাড়াটে দীননাথবাবু রোগশয্যায় শায়িত বলে ভাড়া দিতে পারছেন না। ভাস্কর তাকে বলে যে, ভাড়ার জন্যে তার তাগিদ নেই, দীননাথবাবু ভালো হয়ে উঠুন, তারপর দেবেন; সে একলা মানুষ, ও টাকা না পেলে তার কিছু

এসে যাবে না। দেখা গেলো ভাস্করের শিল্পীমনে পার্থিব সম্পত্তির ওপর আসক্তি কম বা নেই।

এর পর ভাস্করকে দেখা গেলো লিলি নামে একটি ইঙ্গ-বাঙালী মেয়ের সঙ্গে। তাদের কথা থেকে ধরা গেলো যে, তাদের বিয়ে হবে শীগ্গিরই। লিলির সঙ্গে ভাস্করকে যেভাবে দেখানো হলো, তাতে তখন তার অতো বড়ো চিত্রকর, আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব রইলো না, সাধারণ প্রেম-পাগল প্রগল্‌ভ একজন মাত্র। বিয়ের আশীর্বাদের দিন ঠিক, এমন সময়ে খবর এলো যে, ভাস্কর তার যে কাকাবাবুকে ব্যবসা করার জন্যে লাখ টাকা দিয়েছিলো, তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তাই শুনে লিলিও ভাস্করকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিয়ে করলে। ভাস্কর প্রায় পাগল হয়ে গেলো; টাকার জন্যে এবং লিলির জন্যেও। —যা গোড়ায় দেখানো আত্মভোলা, সম্পত্তিতে অনাসক্ত চরিত্রের একেবারে ব্যতিক্রম। পৃথিবীর রূপ ও রসের নেশায় যে মোহাচ্ছন্ন ছিল, অত চট করেই তার কাছে পৃথিবীটা হয়ে উঠলো ক্লেদ-পঙ্কিলময়। তাও ভাস্কর একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো না—মাসে চারশো টাকা ভাড়া তোলার মতো তার বাড়ি রয়েছে; রাশি রাশি তার ছবি রয়েছে, যা চড়া দামে বিক্রী হয়। কিন্তু তবুও সে উন্মাদ হলো প্রায় টাকারই শোকে। ভাস্কর তার সব ছবি পুরনো কাগজের দরে বেচে দিতে চাইলে। রূপ বদলে ফেলে ভাস্কর একদিন লাঠি হাতে দীননাথের কাছে ভাড়া আদায় করতে হাজির হলো। চীৎকার করে, জিনিসপত্র তচনচ করে ভাস্কর ভাড়া দাবী করলে; অসুস্থ দীননাথ উঠে আসতে গিয়ে পড়ে গেলো। মৃত্তিকা ছিল সেখানে; তার কাছে ভাস্কর জানালে যে, ভাস্কর মরেছে এবং সে তার ভাই বি রায়। মৃত্তিকা ভাড়া আদায়ের নাম করে অসহায় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর এই জুলুমের প্রতিবাদ জানায়। তর্কাতর্কি করে ঠিক করে নেওয়া হয় যে, যেহেতু দীননাথের ফ্ল্যাটের দরুণ বি রায়ের ভাড়া চাই-ই এবং মৃত্তিকা তাদের হয়ে ওকালতি করছে, সেই-হেতু মৃত্তিকারা তাদের নিজেদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বিনাভাড়ায় বি রায়ের বাড়িতে এসে থাকুক। বি রায়ের বাড়িতে এসে একদিন মৃত্তিকা প্রথম ও বাড়িতে এসে নটরাজ বন্দনার যে গান শুনেছিলো, সেটি গাইতে থাকে। বি রায় অর্থাৎ ভাস্কর তা থামাবার জন্যে সরাসরি মৃত্তিকার ঘরে প্রবেশ করে। মৃত্তিকা তাকে অপমান করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার সেই গান গাইতে থাকে। অপমানের জ্বালায় ভাস্কর ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেকে নরকের কীটে পরিণত করে তোলার জন্যে মদ খায়। বাড়ি ফিরেই সিঁড়িতে মৃত্তিকার সঙ্গে দেখা। আশুবাবু ফিরে আসতে মৃত্তিকা বি রায়ের আচরণের কথা তাঁকে জানালে। তারা ঠিক করলে কিছু-দিনের জন্যে কার্মাটারে চলে যাবে। পরদিন জিনিসপত্র সব গাড়িতে উঠেছে, ওরা যাবার জন্যে প্রস্তুত, এমন সময় গঙ্গাধর এসে জানালে যে, তার দাদাবাবু পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। মৃত্তিকারা গেলো দেখতে এবং শুনলে যে, বি রায়ই হচ্ছে চিত্রকর ভাস্কর রায়। ওদের আর যাওয়া হলো না, মৃত্তিকা ভাস্করের সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলে। সুস্থ হয়ে উঠে ভাস্কর বুঝতে চাইলে, কি স্বার্থে মৃত্তিকা তার সেবা করেছে। তাকে সে টাকা দিতে গেলো, কিন্তু মৃত্তিকা চেক ছিঁড়ে ফেললে। এই সময় উদয় হলো রাধাকান্ত চৌধুরী নামে এক লম্পট জমিদার—মৃত্তিকাকে সে চায়। একদিন ভাস্কর মৃত্তিকাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললে। পরদিন সকালে দেখা গেলো মৃত্তিকারা নেই; গঙ্গাধরের কাছে শুনলে যে, ওরা স্টিমারে করে বেড়াতে গিয়েছে। কিন্তু সেদিন তারা না ফেরায় ভাস্কর উদ্বিগ্ন হলো এবং পরদিন কাগজে স্টিমার ডুবির খবর পেয়ে চতুর্দিকে ছুটলো ওদের খবর আনতে। শেষে মৃত্তিকারা ফিরতে ভাস্কর শান্ত হলো। মৃত্তিকা বুঝলো, ভাস্কর তাকে ভালবাসে। ইতিমধ্যে ভাস্কর তার বাড়ি বন্দক দিয়ে একটা শেয়ার কিনেছিল। খবর এলো যে, সে শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়ায় বন্দকধারী আগরওয়ালা টাকা দাবী করে বসলে। টাকা জোগাড় না হলে ভাস্কর সর্বস্বান্ত হয় দেখে তার বন্ধু মৃত্তিকার কাছে গেলো এবং তার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে রাধাকান্তর কাছে হাজির হলো, রাধাকান্ত মৃত্তিকাকে পাবার একটা চাল দেখতে পেলে। রাধাকান্ত গেল ভাস্করের উক্ত বন্ধুর অফিসে, কিন্তু গিয়ে শুনলে যে, শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়ার খবরটা ভুল। সেই বন্ধু সেইদিনই শিলং যাত্রা করার আগে মৃত্তিকাকে এ সুখবরটা দিতে চাইলে রাধাকান্ত জানালে যে খবরটা সে নিজেই দিয়ে আসবে। রাধাকান্ত মৃত্তিকার কাছে উল্টো খবর দিলে। সে জানালে যে ভাস্কর পথের ভিখারী হতে চলেছে এবং রাধাকান্ত তার শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে তাকে বাঁচাতে পারে, যদি মৃত্তিকা তাকে বিয়ে করে। প্রথমে মৃত্তিকা কিছুতেই রাজী হয় না, কিন্তু দারিদ্র্যের পাকে পড়ে মৃত্তিকা যাকে সবচেয়ে ভালো-বাসে সেই ভাস্করের কি দুরবস্থা হবে সেকথা রাধাকান্ত বর্ণনা করার পর মৃত্তিকা অবশেষে বিয়েতে রাজী হলো। ভাস্কর বিয়ের খবর পেলে যখন আশুবাবু তাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। বিয়ের জন্যে মৃত্তিকারা চলে গেলো কার্মাটারে। সেখানে আশীর্বাদও সমাপ্ত হ'লো। মনের দুঃখে ভাস্কর দেশত্যাগী হওয়া ঠিক ক'রলে; একটা কাজ জোগাড় ক'রে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। বিয়ের দিন চাকর গঙ্গাধর দুখানি চিঠি নিয়ে মৃত্তিকার কাছে হাজির। চিঠি পড়ে মৃত্তিকা ভাস্করের চলে যাওয়ার খবর পেলে এবং সেই সঙ্গে পেলে একখানা দানপত্র —ভাস্কর তার বাড়িগুলি মৃত্তিকাকে দান ক'রে দিয়েছে। চিঠিতে ভাস্কর বম্বে মেলে তার কলকাতা ত্যাগের তারিখ জানাতে ভোলেনি, আর তাই ধ'রেই মৃত্তিকা কার্মাটার থেকে সটান মোটরে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছানো মাত্র বম্বে মেল ছেড়ে গেলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হট্টগোল শুনে মৃত্তিকা এগিয়ে গিয়ে ভাস্করকে পেলে; থার্ডক্লাশের ভীড়ের চাপে সে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলো। মৃত্তিকা তাকে এম্বুলেন্সে বাড়ি নিয়ে এলো। রাত্রে মৃত্তিকা স্বপ্ন দেখলে ভাস্কর যেনো তিনতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে আর সে ছুটে গিয়ে ভাস্করের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ ক'রছে। সকাল হ'তে ভাস্কর এক ফাঁকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মৃত্তিকা ধ'রে ফেললে। দুজনের মধ্যে প্রেমের বিতর্ক হ'চ্ছে এমন সময় রাধাকান্ত এসে হাজির। রাধাকান্ত মৃত্তিকাকে ধিক্কার দিয়ে তার সঙ্গে ফিরে গিয়ে বিয়েটা শেষ ক'রতে বললে। মৃত্তিকা ইতিপূর্বেই ভাস্করের শেয়ার সংক্রান্ত ব্যাপারটা জেনেছে। এদের দুজনের বিতর্কটা দরজার আড়াল থেকে শুনে ভাস্কর বুঝলে যে মৃত্তিকা তাকে বাঁচাবার জন্যেই রাধাকান্তকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো অবশ্য রাধাকান্তর ধাপ্পা ধরতে না পেরে।

এখন রাধাকান্ত মৃত্তিকাও সেই সঙ্গে ভাস্করের সামনে সরাসরি ধরা পড়ে গিয়ে সরে পড়লো। পরস্পরের প্রতি প্রেমের এতো স্পষ্ট খবর তৈরী হ'লেও দুজনের মিলন দেখাবার জন্যে আরও একটা কৃত্রিম ঘটনার সৃষ্টি করতে হলো। সেটা হলো—মৃত্তিকা গঙ্গাধরকে দিয়ে সামনের মন্দিরে খবর দিতে বললে তারা যেনো সন্ধ্যায় নটরাজ-বন্দনার সেই গানটি না গায় কারণ সে মনে ক'রলে যে ঐ গান শুনলেই ভাস্কর বিগড়ে গিয়ে চলে যেতে পারে। পরক্ষণেই তার কানে ভেসে এলো সেই গান, আর চোখ তুলতেই দেখলে গত রাতে স্বপ্নে যেমন দেখেছিলো ভাস্কর সেইরকম দাঁড়িয়ে আছে তিনতলার বারান্দায়। আর্তনাদ তুলে মৃত্তিকা ছুটলো তিনতলায়। দেখলে গান গাইছে ভাস্কর নিজে। এইখানেই হ'লো ওদের মিলন।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটা ঠিক এইভাবে মাত্র একটা স্তরের ওপর দিয়েই চলে গিয়েছে। ঘটনা ও চারিত্রিক মনোবিকলনের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে নাট্যস্তর বদলানোর প্রয়োজন দেখা দিলেও মিটিয়ে যাওয়া হয়নি। সাবলীলভাবে ঘটনাকে আসতে দেওয়ার চেয়ে মেপেছেঁকে ঘটনাকে ঘটিয়ে দেবার ঝোঁকটাই বেশী। এই ঝোঁকের জন্যে অনেক জায়গায় বেখাপ্পা ব্যাপারও ঘটে গিয়েছে। গোড়াতেই যেমন ভাস্কর সম্পর্কে মৃত্তিকার আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে গান—ঠিক খাপ খাবার মতো নয় এটা। তারপর ভাস্করের যে পরিচয় দেওয়া হ'লো এবং লক্ষ টাকা ও লিলি ওকে ফাঁকি দেওয়ায় ও যা হয়ে উঠলো—পৃথিবীটাকে সঙ্গে সঙ্গে নরক ধ'রে নিয়ে নিজে পাঁকের কীট হ'তে গেলো—এর মধ্যেও সামঞ্জস্য দাঁড় করানো যায়নি। মৃত্তিকা ও ভাস্করের প্রেমকে ত্রিকোণে ফেলে গভীরতর ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে রাধাকান্তকে টেনে আনা হ'লো অতি আকস্মিকভাবে। ভাস্করকে দিয়ে শেয়ার কেনানো যেমন স্বাভাবিক পথের ঘটনা নয়, তেমনি ঐ শেয়ারগুলোকেই রাধাকান্তের জুয়াচুরির সুযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও তেমন একটা জোরালো বিষয় হয়ে ওঠে নি। শেয়ারের দাম পড়ে যাবার খবরটা ভুল জানতে পারার পর সে শুভ খবরটা রাধাকান্ত মারফৎ মৃত্তিকাকে পৌঁছে দেবার ভার ছেড়ে দিলেও ভাস্করের পরম হিতৈষী বন্ধুটির তৎক্ষণাৎ শিলং চলে যাওয়াটা কি খুব স্বাভাবিক? ভাস্কর সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দেশত্যাগী হওয়াই যখন ঠিক ক'রেই নিলে, তখন, যার জন্যে সে এই পথ ধরতে বাধ্য হ'য়েছে সেই মৃত্তিকাকেই চিঠি দিয়ে তার যাবার দিন এমন কি গাড়ীর খবরটাও দিতে যায় কি হিসেবে?

"পরিত্রাণ"-এ গল্প একটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'য়েছে যার মধ্যে দিয়ে এই কথাই বোঝাতে যাওয়া হ'য়েছে যে পৃথিবীটা সত্যিই নরক নয়, এর মধ্যে সুন্দরও আছে, সৎও আছে, সত্যি ভালোবাসাও আছে। কিন্তু বলতে গিয়ে এমনি কৃত্রিমতা অবলম্বন করা হ'য়েছে যে রসও জমেনি, আর বলার কথাও স্পষ্ট হয়নি।

ভাস্কর চরিত্রটির মধ্যে পদে পদে এতো অসমঞ্জস ব্যতিক্রম এনে দেওয়া হ'য়েছে যে মনকে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল হয়, যদিও পরিবর্তনের ধাপ অনুযায়ী অংশ ভাগ করে বিচার ক'রলে অভী ভট্টাচার্যের অভিনয় অতোটা বেখাপ্পা নয়। চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়ে দেবার একটা চেষ্টা তার রয়েছে, একটা ব্যক্তিত্বও ফুটেছে সে চেষ্টায় কিন্তু দাঁড়াতে না পারার দোষটা তার নয়। মৃত্তিকার ভূমিকায় শিপ্রা বিতর্ক ও মেজাজ দেখানোর ক্ষেত্রে বাচনে ও অভিব্যক্তিতে বেশ চোখালো, কিন্তু প্রেমের বিলসনে বেসুরো। নতুন অভিনেতা গৌরীশঙ্কর রাধাকান্তের দুর্বৃত্তপনাকে বিন্যাসের ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় গুণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তারই পরিত্যক্তা স্ত্রীর ছোট্ট ভূমিকায় নবাগত মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রখ্যাত প্রাক্তন নৃত্যশিল্পী মঞ্জু দে সামান্যক্ষণের মধ্যেও ছাপ দেবার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এদের দুজনেরই অভিনয় নৈপুণ্য তাদের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দর্শকদের উৎসুক করে রাখবে। চাকর গঙ্গাধরের সহানুভূতিশীল চরিত্রটি হরিমোহন বসুর অভিনয়ে দর্শক-দৃষ্টিকে ঘিরে রাখে।

কলাকৌশলের দিকটাই ছবির সৌষ্ঠব বজায় রেখেছে। সাধারণ ছবির চেয়ে "পরিত্রাণ-এর মর্যাদা বেশী এই দিক দিয়েই।

চন্দ্রনাথ

কাহিনী : শরৎচন্দ্র; নাট্যরূপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; পরিচালনা : অহীন্দ্র চৌধুরী; ভূমিকায় : অহীন্দ্র, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস; জীবন গোস্বামী; শিবকালী, সমর মিত্র, বঙ্কিম দত্ত, সূর্য সেন, নকুল গাঙ্গুলী, সরযূবালা, অপর্ণা উষাবতী, রাণীবালা (ছোট), লীলাবতী গিরিবালা প্রভৃতি।

বর্তমানে মিনার্ভা থিয়েটারে শনি ও রবিবারের আকর্ষণ।

"গল্প পেলে আর কিছু দরকার হয় না"—এটা কেবল কথার কথাই নয়, কার্যতও এইটেই হচ্ছে আসল সত্য। নাটকের দুর্বল গঠন, অনাড়ম্বর উপস্থাপন, সংলাপে তেজের অভাব এবং চোখ-ঝলসানো দৃশ্যের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও গল্প নিজের জোরে যে দর্শককে কতখানি আবেগে আপ্লুত করে তুলতে পারে "চন্দ্রনাথ" তার সাক্ষী।

তিন অঙ্কের নাটক; প্রথম দুটিতে সাতটি করে দৃশ্য এবং শেষেরটিতে ছটি—সরাসরিভাবে গল্পটা পাঠ করে যাওয়ার